৩৮শ বর্ষ] ১৩৬৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত [১ম খণ্ড

আলোকচিত্র— ৩২ক, ১৬৬ক ; ২১৬ক, [illegible] ; ৫০৪ক ; ৫৪৮ক, ৭০৪ক ; ৭৮৪ক, ৮৮০ক ; ৯৫২[illegible]

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মাসিক বসুমতী
। বৈশাখ, ১৩৬৬ ।।

(জলরঙ)

নৃত্যমঞ্চ

—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
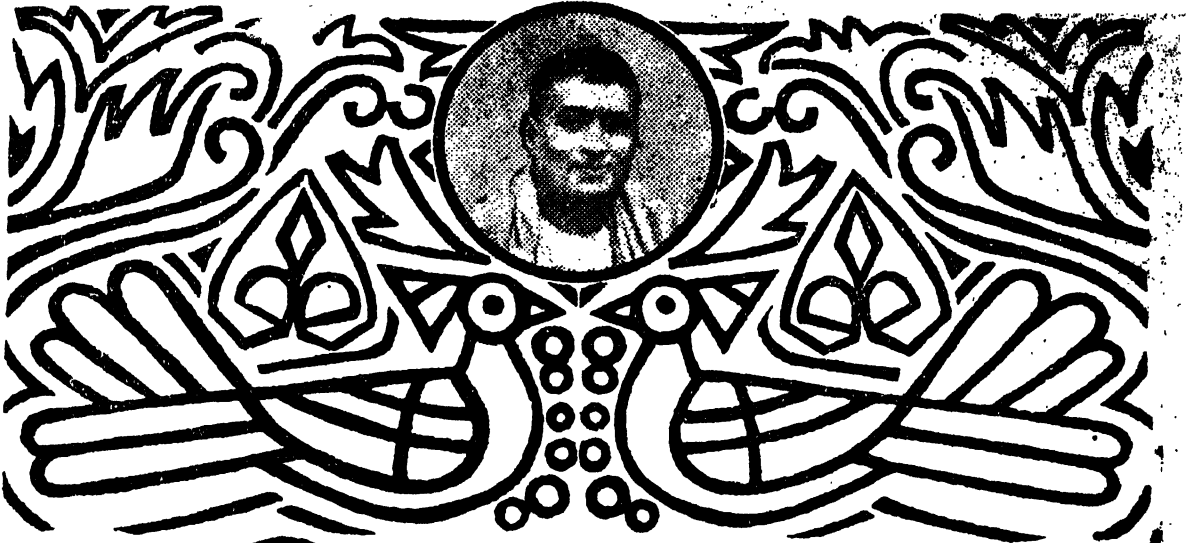
মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ‘আমার চৌদ্দপুরুষের কেহ শিবকেও কখন দেখেনি, বিষ্ণুকেও কখন দেখেনি ; অতএব কে বড় কে ছোট, তা কেমন ক’রে বোলবো ? তবে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বাড়িয়েছে ; অতএব যার যে ইষ্ট, তার কাছে সেই দেবতাই অন্য সকল দেবতা অপেক্ষা বড়।’

“পদ্মলোচন অত বড় পণ্ডিত হ’য়েও এখানে (আমাতে) এতটা বিশ্বাস ভক্তি কোরত ! বলেছিল—‘আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে, সভা ক’রে সকলকে বোলবো, তুমি ঈশ্বরাবতার ; আমার কথা কে কাটতে পারে দেখবো।’ মথুর (এক সময়ে অন্য কারণে) যত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভায় যোগাড় করছিল। পদ্মলোচন নির্লোভ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ; সভায় আসবে না ভেবে আসবার জন্য অনুরোধ করতে বলেছিল। মথুরের কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—‘হ্যাঁগা, তুমি দক্ষিণেশ্বর যাবে না ?’ তাইতে বলেছিল—‘তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি। কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা ?’

‘কেউ ডাক্তারি করে, কেউ থিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বললেন। ওরা মনে করে ‘অবতার’ ব’লে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় করলে ! কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি ? ওদের এখানে আসবার ও অবতার বলবার ঢের আগে পদ্মলোচনের মত লোকে—যারা সারা জীবন ঐ বিষয়ের চর্চ্চায় কাল কাটিয়েচে—কেউ ছয়টা দর্শনে পণ্ডিত, কেউ তিনটা দর্শনে পণ্ডিত—কত সব এখানে এসে অবতার ব’লে গেছে। অবতার বলায় তুচ্ছজ্ঞান হ’য়ে গেছে। ওরা অবতার ব’লে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল ?’

“গুটি সব ঘর ঘুরে তবে চিকে উঠে ; মেথর থেকে রাজা অবধি সংসারে যত রকম অবস্থা আছে সে সমুদয় দেখে, শুনে, ভোগ ক’রে, তুচ্ছ ব’লে ঠিক ঠিক ধারণা হ’লে তবে পরমহংস অবস্থা হয়, যথার্থ জ্ঞানী হয় !” এ ত গেল সাধকের নিজের চরমজ্ঞানে উপনীত হইবার কথা। আবার লোকশিক্ষা বা জনসাধারণের যথার্থ শিক্ষক হইতে হইলে কিরূপ হওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বলিতেন—“আত্মহত্যা একটা নরুন দিয়ে করা যায় ; কিন্তু পরকে মারতে হ’লে (শত্রু জয়ের জন্য)

প দ্মা গা ঙে র খে য়া

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

কথায় বলে 'এক নদী বিশ ক্রোশ', বিশেষ করে পদ্মা গাঙের খেয়াঘাটে।

এপারে কালোয়ার চর থেকে ওপারে বাজিতপুরের ঘাট অবধি পৌঁছুতে লাগবে বাড়া এক ঘণ্টা, যদি নদী শান্ত থাকে। এপারে শিলাইদহ ওপারে পাবনা সহর। বাজিতপুর পাবনা সহরের বন্দর। উজান ভাটি আড়াইতলা ষ্টীমারগুলো ঢেউএর প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে খেয়াঘাটটা পদ্মার বুকের মধ্যে মধ্যে পাশ কাটিয়ে পাবনা গোয়ালন্দ যাতায়াত করে। কাঁচি চর চিক্ চিক্ করে। সময় সময় খেয়ানাও সে চরগুলিকে সাবধানে অতিক্রম ক'রে পারাপার করে। বর্ষাকালে যখন এই চরগুলো ডুবে যায়, তখন পদ্মা সমুদ্র বিশেষ।

ভোর হয়েছে। প্রথম খেয়া ছাড়বার সময় হয়েছে কালোয়া ঘাট থেকে। শীতের শেষ। প্রভাতে মিঠে মিঠে রোদ, সঙ্গে শিরশিরে পদ্মার হাওয়া। পারের যাত্রীরা বেশ আরামেই প্রথম খেয়ার অপেক্ষায় গল্প-গুজব করছে, তামাক খায় খেয়া মাঝির কুঁড়ে ঘরের সামনে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে। মাছ, তরিতরকারী, দুধ, মটর কলাই, প্যাঁয়াজ, গুড়ের হাঁড়ি, শাকসবজী, গরু, ছাগল, মোষ, মুরগী, পারের আশায় খেয়া মাঝির ঘরের সামনে ছোটখাটো একটা বাজার বসিয়েছে, কিন্তু প্রথম খেয়া ছাড়তে দেরী হবে।

যাত্রীদের প্রশ্নের পর প্রশ্নে জানা গেল, জমির ভাই অনুপস্থিত বলেই প্রথম নাও ছাড়তে দেরী হবে। বেলা বাড়ছে। খোদাবক্স নিকারী হাঁক ছাড়লো এনায়েৎ চাচা, নাও ছাড়ো, বেলা হল, ইলিশ মাছ বেশীক্ষণ রাখা যাবে না।

এনায়েৎ বুড়ো মানুষ। এই খেয়াঘাটের মাঝি ও মালিক। অনেক টাকায় সে ঠাকুর বাবুর কাছারী থেকে এই ঘাট বন্দোবস্ত নিয়েছে। নিজে খাটতে পারে না। এনায়েতের দুই ছেলে জমির আর জছিম পারঘাটের খবরদারী করে, পারাপারের যাবতীয় বন্দোবস্ত করে দুই জন মাইনে করা মুসলমান মাঝির সাহায্যে। বুড়ো এনায়েৎ ঘাট খুব ভালই চালাচ্ছে, সবাই তার উপরে খুশী। বড় ছেলে জমিরই খেয়ার কর্ত্তা। পারঘাটের কায়দা কানুন, ধরণ ধারণ, নদীর অবস্থা, খেয়ার অন্ধি-সন্ধি তার নখদর্পণে। জমির নতুন বিয়ে করেছে আজ মাসখানেক হল। রবিবারে সেই যে নতুন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে, আজ বার দিন হল ফেরে নাই। তাইতেই খেয়া পারাপারের কিছু অব্যবস্থা হবে। একারণে বাপ এনায়েৎ অত্যন্ত চিন্তিত ও বিরক্ত। খেয়াঘাটের এতদিনকার সুনাম নষ্ট হবে, সে কথা সে ভাবতেও পারে না।

খেয়াযাত্রীদের সোরগোল সুরু হল। দীনু শিকদারের পাবনা জুজকোর্টে মোকর্দ্দমা আছে। শিকদার মশাই বললেন এনাৎ ভাই, পোড়েতদের দিয়েই নাও ছাড়ো। বেলা বাড়ছে। ওদিকে গয়লারা চ্যাঁচাচ্ছে পাবনা বাজার ধরতে হবে এনাৎ ভাই! সহরের বাজার। সে তো শিগেদের হাট নয়।

এনায়েতের বকাবকির ঠ্যালায় ছোট ছেলে জছিম গজর গজর করতে করতে বড় নাওখানার লগি খুলে ফেলে ডাকলো—আয় রে তামিজ ভাই, দাঁড় ধর। তোমরা সব উঠে পড়ো ভাই সব। নাও ছাড়লাম।

পারের যাত্রী অধিকাংশই আগে ভাগেই মালপত্র নিয়ে বড় নৌকোয় উঠে বসেছে, নৌকোর গলুই পর্য্যন্ত বোঝাই। যারা তীরে দাঁড়িয়েছিল তারাও তাড়াতাড়ি এক হাঁটু জল ভেঙে নৌকায় উঠে পড়ল। নৌকা ছাড়ল।

নৌকা ছাড়ামাত্র এপারের ছাবিগাঁয়ের পাড়ির উপর থেকে ছাতামাথায় দু-তিন জন লোক চ্যাঁচাতে লাগলো—আমাদের নিয়ে যাও মাঝিভাই, জমির, জমির ভাই দাঁড়াও।

আর 'মাঝিভাই দাঁড়াও।' ততক্ষণ হালের দুই তিন খাইতে নৌকাখানা আধরশি এগিয়েছে, তীরের জলস্রোতে কল কল ধ্বনি তুলে যাত্রীদের কলগুঞ্জনের মধ্যে যাত্রা সুরু করেছে। কেউ কেউ মন্তব্য করছে—আরে বাবা, সারাপথ ছুটোছুটি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি। পরের নাওএ আইসো গো—পরের নাও ছাড়ছে।

প্রভাতে পর পর দুখানা নৌকা ছাড়বার নিয়ম। তাই পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে আবার অনেক যাত্রী জড় হল। তিনটে গাইবাছুর এলো ওপারে সাদিপুর বাথানে যাবে। নৌকা আর একখানা না ছাড়লেই নয়। বুড়ো এনায়েৎ তামাক খেতে খেতে পড়েৎ জমারৎকে বলল, দেখতো জমারৎ, হারামজাদা জমিরের আক্কেলখানা দেখ। বেটার তিন তিনটে দিন শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি খেয়েও আশ মিটলো না। এতবড় পদ্মাগাঙের খেয়া। বেঠা শাউড়ি দেখে ভুলেছে। আহম্মকটাকে পেলে হয়, আমি ওকে পায়জার পেঠা করব। আমার কিসে তাগোৎ আছে রে বাবা! যাক্ চল, আমিই হাল ধরছি। মাজায় গামছা বেঁধে চট জরে চলে আয় জমারৎ।

বুড়ো এনায়েৎ সাঁ করে গিয়ে আর একখানা খেয়ানৌকার হাল ধরে ফেলল। ধবধবে সাদা গোঁফদাড়ি, বুকে সাদা গোঁফ সত্তর বছরের বুড়ো, গামছাটা মাথায় বেঁধে শীর্ণ দুখানা হাতে হাল ধরে ফেলল। বার্দ্ধক্যে চিমড়ে শুকনা দেহখানা যেন হঠাৎ বীরদর্পে বিগত যৌবনের স্ফুলিঙ্গে কেঁপে উঠলো। সবাই অবাক। আজ চার-পাঁচ বছর এনায়েৎ খেয়া নাওএর হাল ছোঁয় না। বৃদ্ধ যাত্রীরা বলল একী এনায়েৎ চাচা, তুমিই যে হাল ধরলে?

আর বোলো না বাপু, সে হারামজাদা গেছে শ্বশুরবাড়ি হাসিমপুরে। তার কথা আর বোলো না। আমার নসিব। ছেলেটা একেবারে বেয়াক্কেলে নাংলা চাষা। আজ তিন দিন হল গেছে। এতবড় একটা খেয়াঘাটের ভার তারি উপরে। হারামজাদা নিমকহারাম! কথায় বলে চাষা বুদ্ধিনাশা—ঘরে আগুন বাইরে বাসা। আমার সেই দশা এই বুড়ো কালে। নে ভাই সব উঠে পড়। ওরে গরুছুডো ছটফট করছে, নাও দুলছে—ওদের মুখের কাছে খড় দেনা রে ভাই। জমারৎ, দাঁড় ধর। দেখো ভাই সব, নাও কাৎ না হয় যেন। ওরে ছাগল কয়টারে বাঁধ। আরে বেশ বাতাস উঠেছে রে। পাল পাবে-পাল পাবে। পালের ছালা বাঁধ। তমিজ

ভাই, ছালার দড়িটা ধরো না—ঐখানে বাঁধো। পাল খাটাই। কেমন চমৎকার হাওয়া পেয়েছে! এইতো রেলগাড়ির মত দৌড়োবে লাও।

যাত্রী তমিজ সেখ এনায়েতের বিশেষ পরিচিত ও অনুগত। সে পালটা ঠিক করে ফেলল। একে পুবাল হাওয়া, তার পর শান্ত নদীর তরতরে স্রোত। সমস্ত পালখানাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ফুলিয়ে বোঁবোঁ শব্দে গাঙের অঙ্গে জলে কলকল শব্দ তুলে নৌকাখানা পদ্মার বুকে ছুটে চলল। অনেক দিন পরে পাকা বহুদর্শী মাঝির হাত পড়েছে খেয়া নৌকোয়।

ডানহাতে প্রকাণ্ড হালখানা ধরে বৃদ্ধ এনায়েৎ দাঁড়ালো চোখে মুখে তার যে বিরক্তি ও অসহায় ভাব ছিল, তা কোথায় উড়ে গেল। মনে হল যেন চব্বিশ বছরের যুবক এনায়েৎ মাঝি আজ বহুকাল পরে পদ্মা গাং পাড়ি দেবার জন্য খেয়ানৌকার হাল ধরেছে। বোঝার নৌকা চলছে—সাঁ সাঁ করে পদ্মার বুকে নিবিড় কলরোল তুলে। এনায়েৎ বেশ প্রফুল্ল চিত্তে গল্প জুড়ে দিল। মেজাজ ভাল থাকলে এনায়েৎ গল্প বলে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিত। আজও নির্ভাবনায় কিসের যেন স্ফূর্ত্তিতে সে গল্প জুড়ে দিল—তার যৌবনের ইতিহাস।

বুঝলে তমিজ ভাই! তুমিও তো ঠাকুর বাবুর শিলেদা কাছারীতে বরকন্দাজী করেছ। তোমরা আর কী দেখেছ ঠাকুর বাবুর দাপোট। সে সব দিন কি আছে রে ভাই? সে সব দিন কি আর ফিরবে? শোনো, সে সব কাণ্ডকারখানা। স্বদেশীর ঢেউ লেগেছে সারা তাশে। ইংরাজরাও বাবুদের ধরে ধরে জেল দিচ্ছে। তবু তাশময় হৈ-চৈ। ঐ যে কী বলে বাবুরা—বন্দে মাতরং নাকি—ঐ বুলি সবার মুহে মুহে, কত গান, কত কেত্তন। বাবুমশাই আসেন জমিদারীতে—হৈ হৈ কাণ্ড, গাঁয়ে গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেল। কী চেহারা বাবুমশায়ের। আঃ! দুধে-আলতায় গায়ের বরণ, সোনার বরণ দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল, পদ্মফুলের মত দুটো চোখ। বাঁশীর মত গলার সুর। বাবুমশাই গান গাইতেন—কত গান। সে সব ভুলে গেছি। না না; হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে আছে—ঐ যে 'তোর মরা গাঙে বান্ এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী।' ডেঙী নায়ে বসে বাবু গাইতেন,—পেরজারা হৈ-চৈ করে গাঁ ছেড়ে তাঁকে ঘিরে ধরতো। কত ভদ্দরলোক বাবু আসতো—নানান্ তাশ থেকে। স্বদেশী বাবুরা গান গাইতো আর বাবু মশাইয়ের হাতে লাল সুতো বেঁধে দিত,—সবার হাতে ঐ রাঙা সুতো, ঐ 'রাখি বন্ধন' না কি যে বলে, তাই বাঁধা। সব বাড়িতে রাঁধাবাড়া বন্ধ। বিলেতী কাপড়, পাঙ্গা নুণ রাস্তায় ফেলে দিতো, পুড়িয়ে দিতো। সবাই পদ্মা গাঙে চান করতো সাঁতার খেলত। আর বাবু মশাই কথা বলতেন—কী মিঠে গলার সুর—বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—আঃ—সে দিনের কথা কী বলব!

তমিজ বলল—আমরা শুনেছি। চোখে দেখিনি। আচ্ছা, তুমি তো আগে ডাকাতি করতে? তুমি ডাকাতি ছেড়ে ঠাকুর বাবুর বরকন্দাজীতে বহাল হলে কেমন করে, সেই গল্প কর চাচাজী!

এনায়েৎ একটু কেশে হেসে আবার আরম্ভ করল তার ডাকাত-জীবনের ইতিহাস। শোন্—তবে শোন্। আমি ডাকাতি করতাম কনিমুদ্দী সর্দ্দারের দলে। সে বারে খুরেৎপুরে কড়ি বসাকের বাড়ীতে যে ডাকাতি হ'ল—তাতে আমিও ছিল্যাম একজন আসামী। আরে আমি কনিমুদ্দির দলের লোক হলে কি হয়—জানি নে, শুনিনে,—আমাকেও লাল পাগড়ী পুলিশে ধরে নিয়ে আলো। কত তদন্ত হল, দারোগা এলো, কনিষ্টবল এলো দলে দলে। কনিমুদ্দী ধরা পড়লো। মামলা হল কুষ্টের আদালতে। আমি ঐ ডাকাতিতে সত্যিই ছিলাম না—তার পেরমাণ হয়ে গেল। আমি খালাস পেলাম। সাতবেড়ের রায়দের বাড়ীর ডাকাতিতে এক বছর জেল খেটেছিলাম। বেটনগরের জেলে, ঘানি টানিছি, খোয়া ভাঙিছি—ওঃ বড় কষ্ট! তাই খালাস পেয়েই একেবারে শিলিদা বোটে বাবু মশায়কে ধরলাম সেলাম ঠুকে। তখন এদিগরের সেরা ওস্তাদ লেঠেল মেহের সর্দ্দার বাবু মশায়ের সর্দ্দার বরকন্দাজ হয়েছে। আর কালোয়ার মধু মাল, একাব্দি, ছেঁউড়ের হায়ধর সর্দ্দার রহিম বক্স, কোটপাড়ার এসমাইল, জোলাবালি, শিলিদার তারণ সিং, কেতু ঢালী—এরা সব অনেকে ডাকাতি ছেড়ে বরকন্দাজীতে ভরতি হয়েছে। বাবুমশাই সব গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে স্বদেশী দল গড়লেন। তাদের সবাইকে লাঠিখেলা আর কুস্তী শেখাতে হবে। কুঠীবাড়ীতে লাঠিখেলা হল। আমি বাবু মশাইকে সেলাম করে কয়েক হাত লাঠি খেললাম। বাবুমশাই ভারি খুশী হলেন। আমি বরকন্দাজী চাকরীতে বহাল হলাম। সে সব কি দিন গেছে রে বাবা!

তার পরে শোনো, মস্ত বড় তাঁতের ইস্কুল হল। ঠকাঠক ঠকাঠক তাঁত বসল শিলিদহ কাছারীর মাঠে টিনের ছাপড়ায়। দিন-রাত ভ্যানর ভ্যানর চরকা চলে। কুষ্টে কুঠীবাড়িতেও তাঁত বসল। কত সভাসমিতি হল—কত গান। কাপড়, গামছা, চাদর তৈরী হল। জমিদারীর ওস্তাদ জোলা কারিকররা গাঁয়ের লোকদের আর ছাত্তোরদের তাঁতের কাজ শেখাতে লাগল। আবার খোলকর্ত্তাল নিয়ে সাঁঝের বেলা নগরসংকীর্ত্তন বেরোতো গাঁয়ে গাঁয়ে। কী সব গান—আমার মনে আছে, ভুলিনি—'সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি। আবার আগে চল ভাই'—ওঃ সে কত রকমের গান। আর একবার কী হল জানো? বাবু মশাই বোটে চড়ে পাবনা সহরে গেলেন। সেখানে মস্ত বড় সভা। শিলিদহ কুঠীর হাট থেকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাবুমশাই বোট ছাড়লেন। উঃ! কী সে ঝিষ্টি! মুশলধারে ঝিষ্টি। ম্যানেজার বাবু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। পদ্মাগাঙে বাবু মশায় কী বিপদ হবে। তাঁর হুকুমে আমরা চরমহালের পেরজারা সব ডিঙী-লাও নিয়ে রওনা হলাম। পঞ্চাশখানা লাও তিন চারশো দাঁড়ি। উঃ ঐ ঝমাঝম বৃষ্টি মাথায় করে বাজিতপুরে দল বেঁধে যেয়ে দেখি, বাবু মশাই হাসছেন—পৌঁছে গেছেন ঐ দুরন্ত পদ্মা পাড়ি দিয়ে। আল্লার কুদরত। ভারি ফূর্ত্তি। রোদ্দুর উঠলো ঝলমল করে। উঃ পাবনা সহর তোলপাড়। বাবু মশাই গান করলেন, ঝাড়া তিন ঘণ্টা বক্তিমে দিলেন। লোকে লোকারণ্য। আমরা মুখ্যু মানুষ, কী বা বুঝি। কতো রাজা মহারাজা আমীর ওমরাও এসেছিলেন। গাড়ি-ঘোড়া লোকলস্করে পাবনা সহর গুলজার। ফিটন গাড়িতে বাবু মশাইকে চড়িয়ে পাবনার উকিল বাবুরা বন্দে মাতরং শব্দে সহর কাঁপায়ে দিলো।

খেয়া নৌকো তীরবেগে চলছে। এনায়েৎ তখন গল্পে মজে গিয়েছে। ভরা নৌকোর সবাই হাঁ করে শুনছে। এনায়েৎ বলতে লাগলো—

তারপরে শোনো এক মজার কাণ্ড! আমি বরকন্দাজী করি

তখন ঠাকুর বাবুর ঘোষপুরচরে। ভৈরব পাড়ার সীমানা নিয়ে নাটোরের ছোট তরফ রাজার সঙ্গে ঠাকুর জমিদারের বিবাদ। মামলা মোকর্দ্দমা, দেওয়ানী ফৌজদারী, অনেক হল। শেষে নাটোরের ছোট তরফের নায়েব করল এক মজার কারসাজী। বলা নেই কওয়া নেই, ঠাকুর বাবুর সীমানা প্রায় তিন রসি চর জবর দখল করে ঐ মাদারতলার ছামে প্রায় দুই তিন কুড়ি নাড়ার কুড়েঘর বানিয়ে তাদের পেরজা বসিয়ে দিল। তাদের গরু মোষ ছাগল চরতে থাকে। পেরায় একশো দেড়শো বাসিন্দা। নায়েব মশাই বললেন—এনায়েৎ, আর তো ওদের সঙ্গে ফৌজদারী করতে পারি না। ওরাই ফৌজদারীফাদা করুক, আমরা হব আসামী। কী উপায় করা যায় বল। আমি বললাম—হুজুর চুপ করে বুকে থাবা দিয়ে বসে থাকুন। যেন কিচ্ছুই হয় নি। হৈ-চৈ করতে বারণ করুন। আমি ফৌজদারীর আসামী হয়ে কাজ সাবাড় করে দি। নায়েব মশাই নিশ্চিন্দি। কোন হৈ-চৈ নাই, আমরা যেন কিছুই জানি না। একদিন ঠিক দুপুর। খাঁ খাঁ করছে চরের আগুনের মত রোদ। আমি চুপ করে ওদের পাড়ার কাছে ঘটি হাতে করে ঐ কাশবনে পায়খানা করতে গিয়েছিলাম এক মজার কাণ্ড করে। আর যায় কোথায়? পেল্লায় কাণ্ড। ঐ দুপুরে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড। সব নাড়ার কুঁড়ে ধুধু করে জ্বলে উঠল। মেয়েরা গিছিল চানে, মিনসেরা সব মাঠে, গরু-বাছুর সব চরছে ঝাউবোনাজে। কেউ পরাণে মরল না—হৈ-হৈ কাণ্ড, গরু বাছুর গাঁ গাঁ করে ছুটতে লাগলো, মেয়েছেলেরা হাউ-মাউ কেঁদে চর ফাটিয়ে দিল। কী ভয়ঙ্কর আগুন! শেষে হায় হায় রব ছেড়ে আমরাই আগুন নিবিয়ে দিলাম। সব পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। তার পরের দিন আমরা সেখানে পেরায় ত্রিশ-চল্লিশ জন লাঙল লাগিয়ে চ'সে কলাই ছিটিয়ে দিলাম। দশ-বারোজন আমাদের পক্ষের পেরজা মোতাইন করে দিলাম একদিনের মধ্যে। নাটোর রাজার নায়েব ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গেল। কিল খায়ে কিল চুরি করল,—ফৌজদারীতে মোটেই গেল না। ঐ মাদারতলার ছাম আমাদের দখল হয়ে গেল। তারপরে চলল দেওয়ানী মামলা। পাবনা কোর্ট, হাইকোর্ট। যেমন ঠাকুর জমিদার তেমনি নাটোরের রাজা। কেউ কম নয়। বাবুমশাই চার মহাল তদন্ত করলেন, কাগজপত্র চিঠে খতেন নকসা কত দেখলেন। জেদের মামলা চলল বছরের পর বছর। তারপর আমাদের গাঁয়ে লাগল কলেরা। অনেক লোক মরল, গাঁ সাফ হয়ে গেল। আমার বিবি সেই কলেরাতেই মারা যায়। দুভো চ্যাংড়া ছাওয়াল নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়লাম। সবাই বলল—নিকে করো। আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াতাম। কোন ছোটলোকের মাইয়া আনবো, ছাওয়াল দুডার যতন হবে না—সংসারে অশান্তি হবে। নিকে পুরতে মন সরল না। জহিরুদ্দি মোল্লা বলল—নিকে করো। ছলিম মোল্লার বিধবে ম্যারাভারে নিকে কর, বড় ভাল মায়ে, তোমার ছাওয়ালদের অযত্ন হবে না। পারলাম না। দিনরাত বৌএর মরা মুখ চোখের উপর ভাসতো, তার কথাগুলো কানের মধ্যে বাজতো। তার জন্যে পরাণডা সারাদিন আইলি-বিছলি করত। তার ডাগর ডাগর চোখ দুডো—আহা, মিষ্টি কথাগুলো—

স্ত্রীর স্মৃতি জেগে উঠলো যৌবনের স্মৃতিকথায়। তাই লজ্জা পেয়ে এনায়েৎ সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিল। এদিকে পালের জোরে নৌকা পদ্মাপাড়ি দিয়ে ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বাজিতপুরের ঘাটে এসেছে।

মাস ছয়েক কেটে গেল। বড় ছেলে জমির এসে ঘাটের ভার নিয়ে যথারীতি খেয়ার কাজ চালাচ্ছে।

খেয়াঘাটের উপরেই ঘাটমাঝির দোচালা ঘর। ঘরের সামনে বাঁশের বাখারির তৈরী 'চরাট' গুক্তাপোষের মত সবার বসবার জন্যে, আতিথ্য দেবার জন্য। সারাদিন হুকা কলকে তামাক চলে। একটা চারপায়ার উপর বসে এনায়েৎ সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ঘরখানার পিছনে একখানা ছোট্ট চালায় রান্নাঘর। এনায়েৎ রান্নাবান্না করে কখনো কখনো। আবার অনেক সময়ই মুড়ি চিড়ে ছাতু খেয়ে দিন কাটায়। আলস্য ও অবহেলায় খাওয়া দাওয়ার অসুবিধায় এনায়েতের বার্দ্ধক্য বেশী প্রকট হয়েছিল।

ছেলে-অন্ত প্রাণ এনায়েৎ জমিরের শ্বশুরবাড়ির উপরে অস্বাভাবিক টান কোন কারণে, তা অনেক দিন আগেই বুঝেছে। তাই তার নিজের বাড়িখানা যা একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছিল, মেরামত করে নিয়েছে প্রায় দুশো টাকা খরচ করে। শুধু তাই নয়, গরু ছাগল পুষেছে মুরগী পুষেছে। বেটার বৌকে এনে সংসারে পরম স্নেহে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। লাউ কুমড়োর মাচা, মরিচ বেগুনের ক্ষেত তৈরী করে বেটার বৌ-এর সাধআহ্লাদ মেটাবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিয়েছে। ছোট ছেলের বিয়েও প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছে। দুই ছেলেকে সংসারে স্থিতু করতে পারলেই এনায়েৎ নিজের কর্ত্তব্য শেষ করতে পারে। নিমতলামাঠে হোসেন সর্দ্দারের জোতটা নিলাম খরিদ করে সতেরো বিঘে ধানজমিও ছেলেদের জন্য করে দিয়েছে। খেয়া-ঘাটের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার সাংসারিক উন্নতিও অব্যাহত আছে। ছেলে-অন্ত প্রাণ এনায়েৎ অক্ষরে অক্ষরে তার পিতৃকর্ত্তব্য পালন করে চলেছে। এ যেন তার পিতৃ-দায়িত্ব, কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন মাত্র। এত করেও এনায়েৎ খেয়াঘাটিতে থাকতো, রাত কাটাতো, খাওয়া-দাওয়া করত। বলত, ছেলেদের ঘর-দুয়োর গুছিয়ে দিলাম। আর কি, আমি তো এখন খালাস। ওরা মানুষ হোক্, সুখে থাক, খেয়াঘাট চালাক, আর কি করব আমার কাজ খতম্। এখন আল্লা কবে তাঁর পায়ের তলায় ডেকে নেবেন তারই আশায় আছি বাবু। আমার কাজ আমি করেছি।

খেয়াঘাটে ভাঙা দোচালা ঘরে চুপচাপ বসে থাকে এনায়েৎ। খেয়াঘাটের ঘরই যেন তার বাড়ি-ঘর সব। নিজের তৈরী সোনার সংসার যেখানে, সে বাড়িতে সে অল্পই যায়, সেও যেন নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে। বেটার বৌদের ব্যবহার কথাবার্ত্তা চাল চালনে সে আনন্দ পায় না। তারা পরের মেয়ে, এসেছে সোয়ামী-সংসার নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে। শ্বশুর শাশুড়ী বা আর কেউ যে সংসারের ভাগিদার থাকবে, তাদের সুখের ভাগ বসাবে সে রকম শিক্ষা তারা পায় নাই। এনায়েৎ স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পেল। দুটি ছেলে তার নয়নের মণি, তাদের সুখই তার সুখ। বৌমারা শ্বশুরকে খেতে বলত, দুটো ভাত বেড়ে দিত, তামাক সেজে শ্বশুর অনুরোধ করলে কল্কের একটু আগুন দিত, দাওয়ার বসবার জন্য চাটাই দিতো, এইমাত্র। এর বেশী যে স্নেহমমতা আদর-যত্ন বৃদ্ধ পুত্রগত প্রাণ শ্বশুর আশা করে, তারা তা বুঝতো না। বাড়িতে এলে এনায়েতের পরলোকবাসিনী স্ত্রীর স্মৃতি

এইজন্তেই তাকে বেশী কষ্ট দিত। তার সোনার সংসার তো নয় তার সবই পর হয়ে গেছে।

কিছুদিন সহ্য করবার পর এনায়েৎ এ সব আর গায়ে মাখতো না। খেয়ার কুঁড়ে ঘরে বেশ আরামে সে থাকে। অসুবিধার মধ্যে সে রান্না ক'রে খাওয়াটা একটা হাংগাম মনে করে। দু-তিনখানা গাঁয়ের স্নানের ঘাট এই খেয়াঘাটেরই পেছনে। একটা ঝাউ বোনাজের প্রাচীরের ধার দিয়ে সেই একপেয়ে রাস্তাটা জলে নেমেছে। গ্রামের পুরুষ রমণী ছেলেমেয়েরা সেই ঘাটে আনাগোণা করে। তারা বুঝতে পারে যে এনাৎ মাঝি বাড়িতেও যায় না, রান্না করেও খায় না।

ঘর-সংসারওয়ালা বুড়ো মানুষটা এভাবে বাঁচে কি ক'রে? চিড়ে-মুড়ি ছাতু খেয়ে একটা সমর্থ বুড়ো মানুষ বাঁচতে পারে? ছেলে জমিরের কাছে অনেকেই অনুযোগ করে, কড়া কথা শোনায়—তার গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই? সত্যি কি সে বুদ্ধিনাশা চাষা? এমন স্নেহপ্রবণ বাপের উপর সমস্ত মায়ামমতা কি তারা সুন্দরী বৌ পেয়ে একেবারে ভুলে গেছে? জমির আর জছিম এই নিয়ে তাদের স্ত্রীদের সাথে ঝগড়া বাধায়, ছোটলোক চাষার ঘরের মেয়ে বলে গালাগাল পাড়ে। বাপের কাছে এসে অনুরোধ জানায় দুই বেলা বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবার জন্তে। বাপ সবই শোনে, ছেলেদের মনের ভাব বেশ বোঝে, কিন্তু যে পাষাণের আঘাতে বৃদ্ধের বুক ভেঙেছে, সে আঘাতকে এড়িয়ে চলতে চায়। হা হা করে হেসে ছেলেদের অনুযোগ উড়িয়ে দিয়ে সে বলে এই পদ্মাগাঙের অফুরন্ত জল আর হাওয়ায় প্রায় বিশ বছর মানুষ হয়েছি। এই আমার ভালো। এই খেয়াপারের যাত্রীদের আনাগোণা মেশামিশি সারা দিনমান আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, কাজে ডুবিয়ে রাখে। আমার সেই সুখের পথে তোরা বাদী হ'সনে বাপজান্! আমি বেশ আছি, সুখে আছি।

বুড়ো এনায়েতের মনের মধ্যেকার গভীর ক্ষতের প্রকৃত সন্ধান পায় অনেকেই। বিশেষ করে একটি অনাথা স্ত্রীলোক। সেও জীবনে কারো স্নেহ পায় নাই, স্বামিপ্রেমের স্বাদও সে পায় নাই, কারণ সে বাল-বিধবা। কারও ঘরণীও সে হতে পারে নাই, কারণ সে রকম চেষ্টা করবার মত দরদ তার ভাইদের নাই। তার ভাইবৌরাও এই অবীরা বিধবা বাঁদীর মনের খোঁজ তো রাখেই না বরং উঠতে বসতে তাকে খোঁটা দেয় গরীব ভাইদের ঘাড়ে বসে সে ভাত গেলে, আর পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। বাপ ছলিম মোল্লা শেষ বয়সে ভিক্ষা করে খেতো—আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হল। নছিরণ দু'মাসও স্বামীর ঘর করে নাই। ঘোর বর্ষায় পদ্মায় মাছ ধরতে গিয়ে তার স্বামী ঝড়ের মধ্যে মারা যায়। বাপ মা ভায়ের স্নেহ স্বামীর আদর সোহাগ বিধাতা তার কপালে লেখেন নাই। সারা পাড়ায় হতভাগিনী টো-টো করে ঘোরে—যেখানে পায় সেখানেই দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু ক'দিন কে কা'কে খেতে দেয়। তাকে পাড়ার চাহিদামত গতর খাটিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়। উদাসীন এনায়েৎকে দু'বেলা দেখে খেয়াঘাটে।

বুড়ো এনায়েৎ খেয়াঘরে বসে বসে চুপ করে দেখে নছিরণ কারো বাড়ির জল টানছে কাঁখে কলসী নিয়ে, কারো ধারে কাপড় কেচে দিচ্ছে সারা দুপুরের রৌদ্র মাথায় করে। একদিন নছিরণ এনায়েৎকে ঘাটে একা পেয়ে বলল—মাঝি গো, তুমি এরকম উপোস করে ক'দিন বাঁচবে? আমি তোমায় দুবেলায় রেঁধে খাওয়াবো। ঐ রান্নার চালায় রাঁধবো—বুঝলে? একটা বুকফাটা কান্না তার গলার স্বরে।

এনায়েৎ সবই বুঝেছে, কারণ স্বচক্ষে হতভাগিনীর এই দুর্দশা সে দিনের পর দিন দেখে আসছে—দুটো ভাতের জন্ত তার কী হানস্তা। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না—সইতেও পারছে না। সে বলল—বেশ, তুই দুবেলা আমায় রেঁধে খাওয়াস। আমি সব বন্দোবস্ত করে রাখবো।

সেই থেকে এনায়েৎ দুবেলা রান্নাভাত খাচ্ছে, নছিরণের সেবাযত্ন পাচ্ছে। হাটের দিনে একখানা সাড়ি আর গামছা কিনে বলল—নছিরণ, এই নে, সাড়িখানা পরিস। নছিরণ হাসিমুখে সাড়িখানা হাতে নিলো—চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। তা কিন্তু এনায়েতের দৃষ্টি এড়ায় নাই। গভীর সমবেদনায় তার মনের মধ্যেকার ঘুমন্ত ভালবাসা জেগে উঠল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বর্ষার আগমনী সুরু হয়েছে দুকূলপ্লাবী উন্মাদিনী নবযৌবনা পদ্মার অঙ্গে। পদ্মার বুকে অস্থায়ী চরগুলো পদ্মার বিশাল বুকে আশ্রয় নিয়েছে। কালবৈশাখীর উদ্দাম নৃত্যে যৌবন-চঞ্চলা পদ্মাও নৃত্য সুরু করেছে।

শিলেদহ সদর কাছারী থেকে বরকন্দাজ মোহন সিং পরোয়ানা এনে দেখালো খেয়ামাঝি এনায়েৎকে। আগামী স্নানযাত্রা মেলায় যে বিপুল যাত্রীসমাগম হবে গোপীনাথের স্নানযাত্রার উৎসব দেখতে, তাদের পারাপারের উপযুক্ত সুবন্দোবস্ত করবার জন্ত ম্যানেজারবাবুর হুকুম সে শোনালো। এবছরে খেয়া পারাপারের নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। গত বৎসর ঐ প্রকাণ্ড মেলার পরদিন সাদিপুর খেয়াঘাটের ওপারে চরের মধ্যে একটা নারীধর্ষণ হয়েছিল, অনেক কষ্টে সেই অপরাধী গুণ্ডাকে পুলিশ পাকড়াও করে। মামলা-মোকর্দ্দমা হয়ে সেই গুণ্ডার শ্রীঘর বাস শাস্তি হয়। মেলায় কয়েক দিন পদ্মার চরের নিকটেই গভীর রাত্রে নির্জ্জনতার সুযোগে গুণ্ডারা এই রকম অত্যাচার করায় ঠাকুরবাবুদের দুর্নাম রটেছে, মেলার ক্ষতি হয়েছে, জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। তাই ম্যানেজারবাবুর কড়া হুকুম, স্নানযাত্রার মেলায় তিন দিন তিন রাত্রি পারাপারের অতিরিক্ত বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে, আর সূর্য্য অস্ত যাবার পর পরই এপার ওপার দুপারের খেয়া নৌকা যাত্রীবহন করতে পারবে না। পুলিশ আর গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকেরা এই সব তদ্বির তাগাদা করবে।

স্নানযাত্রার মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসরই খেয়া পারাপারের অতিরিক্ত বন্দোবস্ত করতে হয়। এতে যেমন খরচ হয় আরও খুব বেশী হয়ে থাকে। এবারেও সেই সমস্ত মামুলী ব্যবস্থা করবার জন্ত জমির জছিম দুই ভাই উঠে পড়ে লাগলো। এদিকে ঢোলসহরৎ দিয়ে কাছারী থেকে প্রচার করে দেওয়া হয়েছে—মেলার তিন দিন তিন রাত সূর্য্যাস্তের পর সমস্ত খেয়াঘাট বন্ধ। কোন যাত্রী যেন পারাপারের চেষ্টা না করে এবং খেয়ার ঘাটমাঝি যেন সতর্ক হয়।

এনায়েতের খেয়াঘাটে মেলার প্রথম দিন থেকেই যাত্রী-যাত্রিনীর

অসম্ভব ভিড়। পুরুষ-যাত্রীর দ্বিগুণ মেয়েযাত্রী। মেয়েদের বিরাট হুলুধ্বনির মধ্যে খেয়ার নাও ছাড়ে। আবার নতুন যাত্রী-পরিপূর্ণ নৌকা ঘাটে ভিড়লেও অনুরূপ কলধ্বনি। কয়েকজন যাত্রী খেয়াঘাটে বসেই রান্না-খাওয়া সেরে নেয়। অপরূপ চেহারার নানা দেশের যাত্রী-যাত্রিনীর বৈচিত্র্যে খেয়াঘাটের একঘেয়ে চেহারাটা বদলে গেছে।

বুধবার মেলার শেষ দিন। তিন দিন তিন রাত্রি অবিরত পরিশ্রমে খেয়ার মাঝিরা সবাই ক্লান্ত। স্বয়ং এনায়েৎকেও কয়েক বার হাল ধরে যাত্রী-পারাপার করতে হয়েছে। সারা দিন রাত খেয়াঘাট লোকসমাগমে সরগরম। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কীর্তন আর বাউল-ফকিরদের গানে বুড়ো এনায়েতের মনটা খুশীতে ভরপুর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় রূপালী চরখানা পদ্মার বিশাল বুকখানা ঝকমক করছে। সূর্য্য অস্ত যেতে যেতেই খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে, লোকের আনাগোণা নাই। নীরব নির্জন পদ্মাবক্ষ, খেয়াঘাট পদ্মার চর, তীরভূমির গ্রামগুলো। খেয়াঘাটে কেউ নাই—একা এনায়েৎ চরের উপর বসে তামাক খাচ্ছে। অনেক দিন থেকেই সে অতিমাত্রায় বেশী গম্ভীর। নছিরণ রান্নার চালায় রান্না করছে। এনায়েৎ আজ বেশ খুশি। নছিরণকে বেশ খোসমেজাজে ডাকল—নছির, মেলায় গিয়েছিলি? মেলা দেখবি না? নছিরণ কোন জবাব দিল না। খুব চাপা মেয়ে নছিরণ। সে জানে এনায়েৎ তার জন্যে মেলা থেকে রসগোল্লা পানতুয়া এনেছে, একখানা তাঁতের সাড়ি এনেছে। সে জানে, এনায়েৎ তাকে খুব ভালবাসে। এনায়েতের মনটা এই কারণেই খুশী আত্মতৃপ্ত। নছিরণ আজ আর নিরাশ্রয় নয়।

এমন সময় হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক একা এসে হাজির খেয়াঘাটে। তার সঙ্গে না আছে কোন মেয়ে বা পুরুষ-সঙ্গী। রাত কম হয় নাই। এমন সময়ে একাকিনী স্ত্রীলোকটি খেয়াঘাটে হাজির হল কেন? এনায়েৎ ভাবতে লাগলো, মেয়েটির সাহস তো বড় কম নয়। খেয়াঘাটে এই চরে সে কেন মরতে এলো?

মেয়েটি এনায়েতের কাছে এসেই এনায়েতের পা জড়িয়ে ধরল। কান্নায় ভাঙা গলায় বলল—মাঝি, তুমি আমার বাপ। আমায় বাঁচাও তুমি। আমার জাত যায় ধর্ম যায়। আমি তোমার মেয়ে। এনায়েৎ আন্দাজ করল, কোন গুণ্ডা বদমায়েস এর পেছু নিয়েছে। সে বলল—ব্যাপার কি গো? কি হয়েছে বল তো?

সে বলল—এই চরের একটা লোক আমায় ভুলিয়ে এনেছে। আমার গাঁয়ের সাথীরা গোপীনাথের মন্দিরের ভিতরে ছিল, আমি বাইরে মেলার মধ্যে কাচের চুড়ি কিনছিলাম। সে লোকটা এসে বলল, তোমার বাড়ি তো সাতবেড়ে? তোমার সঙ্গীরা তোমায় খুঁজে না পেয়ে বাড়ী রওনা হয়ে গিয়েছে। আমায় বলে গেছে তোমায় খেয়া পার করে কাজীপাড়ায় নিয়ে যেতে। কাজী-পাড়ায় তারা তোমার অপেক্ষা করবে। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম আমি হেথায় থাকবো, তারা ঠাকুর দেখে আমায় নিয়ে যাবে, কথা আছে। লোকটা তা শুনল না। তার সঙ্গে আরো তিনজন মুসলমান ছিল। শেষে তারা ভয় দেখালো, নানারকম খারাপ কথা বলল, সে সব কথা বলতে লজ্জা করে। তখন মনে করলাম, ওদের কথামত খেয়াঘাট অবধি যাই। সেখানে গেলে হয়তো বাঁচতে পারবো।

এনায়েৎ আগুন হয়ে উঠল, বলল, তুমি এসো বাছা, আমার ঐ ঘরের মধ্যে গিয়ে বসে থাকো। তোমার কোন ভয় নেই। যা করবার আমি করছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার জন ষণ্ডামার্ক যুবক এসেই বলল, মাঝি, আমরা পারে যাবো। আমাদের বাড়ির একটা মেয়ে এখানে এসেছে। তার মায়ের বড় অসুখ। তাকে নিয়ে এই রাত্তিরেই বাড়ি যেতে হবে। সে মেয়েটা তোমার ঘরে আছে বোধ হয়, তাকে আসতে বলো। নাও ছাড়ো, না হয় বল, আমরাই ছোট নাওখানা নিয়ে পার হই।

এনায়েৎ বলল এখন কেউ পারাপার হবে না। এখন যাও, কাল ভোরে এসো, পার করে দেব। সন্ধ্যা থেকে পারাপার বন্ধ, তা জানো না?

তারা ক'জনেই অনেক কড়া কড়া কথা শুনালো, তর্ক করল। শেষটায় ওরা ছোট নৌকাখানা খুলে নিয়ে পার হবে জানিয়ে বলল, মেয়েটি কোথায়? তাকে ছেড়ে দাও। নইলে তোমার মাঝিগিরি শিখিয়ে দেবো। চালাকী কোরো না।

এনায়েৎ বুঝলো এরা দলে ভারী। খেয়াঘাটে সে সঙ্গিহীন একা। তার পক্ষে দ্বিতীয় পুরুষ নেই। তাইতে এরা সাহস পেয়ে গেছে। সে অনুরোধ করল—এখন খেয়া ছাড়া বেআইনী। তারা নৌকায় হাত দিলে তাদের বিপদ হবে। কিন্তু তারা কিছুতেই শুনবে না। একজন বলল—মার শালাকে। আর দুজন খেয়ার কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হল।

এনায়েতের মাথা গরম হয়ে উঠলো; বলল—শোনো, আমি এনায়েৎ লেঠেল, এনায়েৎ ডাকাত, আমার গায়ে হাত দিলে তোমাদের ভাল হবে না। আমার ঘরের মধ্যে কেউ গেলে মারা পড়বে। সাবধান! তোমাদের চিনি। বুড়ো মানুষের কথাটা শোনো।

লোক কয়টির হাতে লাঠি ছিল। তারা গালাগাল দিয়ে উঠলো। এনায়েৎ এক লাফ দিয়ে কুঁড়ে থেকে তার বড় আড়লাঠীখানা নিয়ে এগিয়ে এলো, আর বদমাশরা আর আমার সামনে। নছিরণকে বলল নছীর, মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়। শীগগির পালা।

বাধলো মারামারি। এনায়েতের লাঠির ঘায়ে একজন ধরাশায়ী হল, তখন আর তিন জন তাকে একসঙ্গে আক্রমণ করল। নছিরণ হঠাৎ মাছের বঁটি নিয়ে ধেয়ে এলো গাছকোমর বেঁধে। তার তখন চামুণ্ডা-মূর্তি। সে যাকে পাচ্ছে তাকেই বঁটির কোপ দিচ্ছে আর প্রাণপণে চীৎকার করছে তোমরা এগোও, এগোও, ডাকাত পড়েছে ডাকাত পড়েছে।

সেই চীৎকারে বহু লোক ছুটে এল। তিন জন জোয়ান মর্দ্দর সঙ্গে একা লাঠি চালিয়ে বৃদ্ধ এনায়েৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু গুণ্ডা ক'জনও বেশ জখম হয়েছে। বহু লোক এবং সঙ্গে সঙ্গে মেলার পুলিশ ছুটে এল। গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ঐ রাত্রেও কাছাকাছি ক'খানা গাঁয়ের লোক সেখানে জমা হল। জমির আর জহিম এসে

পড়েছে। বৃদ্ধ এনায়েতকে ধরাধরি করে চতাটার উপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এনায়েতের জ্ঞান নাই, বুকের ডান পাশে ভয়ানক জখম, দরদরধারে রক্ত পড়ছে। এ তো লাঠির ঘা নয়। নছিরণ বলল—গুণ্ডাদের হাতে ধারালো অস্ত্রও ছিল। মনে হল তারা আত্মরক্ষার জন্য ছোরা ব্যবহার করেছে। এনায়েতের ঐ অবস্থা দেখে সবাই ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। নছিরণ জল ঢেলে এনায়েতের জ্ঞান সঞ্চার করতে না পেরে তার বুকের উপর কেঁদে আছড়ে পড়ল—ওহে আল্লা, এ কি করলে? মাঝিকে বাঁচাও আল্লা! তার বুকফাটা অবিরাম কান্নায় সবাই বেশী বিব্রত হয়ে পড়লো, সরকারী ডাক্তার ডাকা হল।

ডাক্তার সব দেখে-শুনে বললেন, গুণ্ডারা ছোরা মেরেছে বুকের বাঁ দিকে, রক্ত বন্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য! সবাই হতাশায় ভেঙে পড়ল। কুষ্টে থেকে বড় ডাক্তার আনবার সময় পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। জমির ও জছিমের মুখ শুকিয়ে গেল, বাপজান বাপজান চীৎকারে তাদের দু'ভায়ের কান্না, উপস্থিত জনতার চোখেও জল। সবার কান্না ছাপিয়ে উঠল নছিরণের কান্নার রোল—মাঝি গো মাঝি—আমায় ছেড়ে যেও না মাঝি—হা আল্লা, আমার মাঝিকে বাঁচাও। আমার রক্ত নাও।

সরকারী ডাক্তার রক্ত বন্ধ করবার জন্য কোন ত্রুটি করছেন না। নছিরণ পাগলিনীর মত একবার জল ঢালছে—এদিকে ওদিকে ছুটে ডাক্তারের ওষুধ এগিয়ে দিচ্ছে আর ডাকছে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে—মাঝি গো মাঝি—একবার তাকাও মাঝি। ঐ যে তোমার জমির জছিম দাঁড়িয়ে কাঁদছে। একবার চোখ মেলে চাও। আমি এই যে ডাকছি একবার কথা কও মাঝি, ওঠো কথা কও।

হঠাৎ এনায়েতের যেন জ্ঞান হল। চারিদিকে চেয়ে যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে ডাকলো—নছির, আয়, আমার কাছে আয়। উঃ আমার পরাণ যে বেরিয়ে যায় নছির, নছিরণ আয় আয় আমার কাছে আয় তোকে গাঙের জলে ভাসায়ে দিয়ে গেলাম রে—

নছিরণ তখন উন্মাদিনী। এনায়েতের বুকে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে মাঝি গো, আমায় নিয়ে যাও, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে মাঝি গো—উন্মাদিনী নছিরণের বুকফাটা ক্রন্দন, সমবেত জনতার অশ্রুধারা—সব শেষ করে দিয়ে এনায়েৎ দু'তিনবার মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেললো। খেয়াঘাট ক্রন্দনরোলে মুখরিত, অভাগিনী উন্মাদিনী নছিরণ বালির মধ্যে গড়াচ্ছে আর বুকফাটা চীৎকার করছে মাঝি গো—মাঝি গো! পদ্মার কলরোল ছাপিয়ে উঠছে তার রোদনধ্বনি।

স্যানাটোরিয়ম

শক্তি মুখোপাধ্যায়

এখানে বেশ আছি। সবুজ পাহাড়ের গায়
সুনিপুণ শিল্পীর হাতে-আঁকা ছবির মতন
প্রকৃতির বুক থেকে জেগে-ওঠা নতুন জীবনে
আলোর সন্ধান। স্যানাটোরিয়ম।

এখানে বেশ আছি। স্যাঁৎসেঁতে বস্তির গলি-ঘুঁজি ঘরে
আর নয় খুক খুক কাশি।
মুখ দিয়ে রক্ত নেমে বুক ভেঙে অবিরত
আর নয় তিলে তিলে বিদগ্ধ জীবন।

এখানে বেশ আছি। তপতী তুমি আজও
নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাতায়ন খুলে
বসে আছো এলোচুলে। আমার বারতাখানি
তোমার স্মৃতির দ্বারে স্বপ্ন নিয়ে নামে।

এখানে বেশ আছি। প্রশস্ত ঘরের কোণে
আমার বেডের ওপর কোন এক হতাশ প্রেমিক
রোমাঞ্চ কাহিনী নিয়ে অভিশপ্ত জীবন মাঝখানে
বিশীর্ণ দেহ তার তন্দ্রালু চোখ মেলে জাগে।

এখানে বেশ আছি। সকলেই বলে,
রাজরোগ সেরে যাবে সুস্থ হবো আগের মতন
জীবনকে ফিরে পাবো
আগামী কালের কোন দিনে।

এখানে বেশ আছি। এ শুধু আশ্বাস বাণী
মন আমার আশাহত, ভয় হয় প্রতি পদক্ষেপে
প্রেমের ও জীবনের
মৃত্যু এসে এই বুঝি শিয়রে দাঁড়াল!

পৃথিবীর আলো যদি ক্ষয়ে ক্ষয়ে
চোখ দিয়ে অন্ধকার নামে
আমার হতাশ প্রেম মৃত্যুর মুখোমুখি এসে
প্রিয়ার অশ্রুজলে হবে তার জীবন-সমাধি।

ইণ্টারমিডিয়েটে অশ্লীল পাঠ্যপুস্তক

ডক্টর শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওড়িয়া ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় একটি কবিতা পাঠ্য করেছেন। তার বিষয়বস্তু আর যাই হোক, সুকুমারমতি বালক-বালিকার নিকট পরিবেশনযোগ্য নয়। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।—স]

কিছুদিন আগে ভার পড়েছিল ইণ্টারমিডিয়েট ওড়িয়ার একটি ছাত্রকে কিছুটা সাহায্য করার। বাংলা-হিন্দীর মতই ওড়িয়াতেও টেক্সটবুক বা পাঠ্যপুস্তকের চাপ বেশী, নম্বর কম। চল্লিশ নম্বর বইয়ে, ষাট নম্বর বাইরে। কলেজ-এ অধ্যাপনা করতে করতে বিরক্ত হয়েছি এ কথা ভেবে যে, দুবছর ধরে ছাত্রদের যে ইণ্টার বাংলার টেক্সট পড়ান হয় তাতে মাত্র চল্লিশ নম্বরের বিশদ আলোচনা করা হয়। আর বাকী ষাট নম্বর যে-কলেজে ভাল টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা আছে সেখানে কোন রকমে বুড়ী-ছোঁয়ার মত শেষ করা। অর্থাৎ অধ্যাপকরা 'টীচ্ এণ্ড গো' না অনুসরণ ক'রে 'টাচ এণ্ড গো' পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরীক্ষা সেই ধরণের হয়। ওড়িয়া পড়াতে গিয়েও সেই ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। দুটি গদ্যগ্রন্থ। দুটি কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতা। রাধানাথ গ্রন্থাবলী পূর্ব্বেই নাড়াচাড়া করেছি। ওড়িয়া সাহিত্যের উপর বাংলার প্রভাব নিয়ে 'বসুমতী'তে 'বঙ্গসাহিত্য ও বহির্বঙ্গ' নামে আলোচনাও করেছি ১৯৪৬ সালে। প্রথম ভেবেছিলাম ঐ বিষয়ে থীসিস দেব। পরে হিন্দী-সাহিত্যের উপর বাংলার প্রভাব নিয়ে থীসিস দিই। পুরোনো বই হাতে আসাতে অধীর আগ্রহের সাথে পুনর্মিলনের আনন্দ অনুভব করলাম। 'রাধানাথ গ্রন্থাবলী'র সব কবিতা পূর্বে পড়া হয়নি। তের বছর আগে গ্রন্থাবলীর ভূমিকা এবং 'মহাযাত্রা' কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তের বছর বাদে 'গ্রন্থাবলী'র অপর একটি কবিতা পড়াতে বসার আগে পড়তে বসলাম। ইণ্টারমিডিয়েট ওড়িয়ার পাঠ্য কবিতা 'পার্ব্বতী'। ওড়িয়া সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ রাধানাথ রায়। ভূদেব-নবীনের সমসাময়িক···ভূদেব-নবীনের প্রীতিবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে ভূদেব-নবীনের যে স্থান, ওড়িয়া সাহিত্যে রাধানাথের স্থান তার চেয়ে কম নয়। "কবিবর ৺রাধানাথ আধুনিক উৎকলর সাহিত্যিক সম্প্রদায় এবং গুণগ্রাহী বিদ্বমণ্ডলী-কর্ত্তৃক সাহিত্যসম্রাটর সুবর্ণ সিংহাসনরে অভিষিক্ত হোই অছন্তি। বস্তুতঃ ৺রাধানাথ আধুনিক উৎকল সাহিত্য মন্দিরের সর্বপ্রধান নির্মাতা।" "কবিবর রাধানাথ" সত্যই একজন শক্তিশালী কবি। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অনুগামী হিসেবে হেম-নবীন যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, ওড়িয়া সাহিত্যে মধুসূদনের অনুগামী অমিত্রাক্ষরের কবি হিসাবে রাধানাথের স্থান তার চাইতে উঁচুতে বলেই আমার মনে হয়। অন্ততঃ হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। মধুসূদনের কবি-প্রতিভা হেমচন্দ্রের ছিল না, তাই ব্যর্থ অনুকৃতি হিসেবে হেমচন্দ্রের কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য আছে, চিরন্তন মূল্য নেই। রাধানাথ কবি। তাঁর সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। ভারতের যে কটি সাহিত্য পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাতে বিগত শতাব্দীর ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে রাধানাথের যে বিশিষ্ট স্থান আছে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এই রাধানাথের 'পার্ব্বতী' কবিতা ইণ্টারমিডিয়েট-এ পাঠ্য। পরম আগ্রহের সঙ্গে কবিতাটি পড়তে সুরু ক'রে দিলাম।

কবিতা পড়তে পড়তে মাথাটা যেন কেমন এক রকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি ত? কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে কবিতাটা। নিঃসন্দেহে কবিতাটি ভাল, কিন্তু বিষয়বস্তু ইণ্টার-মিডিয়েটের, যারা পনেরো ষোলয় পা দিয়েছে তাদের পক্ষে, একেবারেই অপাঠ্য বলে মনে হচ্ছে। ঈডিপাসের ট্র্যাজেডির ভীষণতা এবং অতলান্ত হাহাকার বয়স্ক পাঠকের বোধগম্য···এবং গ্রীক সাহিত্যপিপাসুর পাঠ্য। বালক-বালিকাদের অপাঠ্য বিষয়বস্তু—মাতা পুত্রের বিষম পরিণতি। তবু সেখানে নিয়তির বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত মনুষ্যপ্রেমের অভিশপ্ত আর্ত্তনাদ। এখানে ব্যাপার আরও গভীর···এখানে পিতা-পুত্রীর মধ্যে ব্যাপার, তাও উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের অজ্ঞতা নেই। এ ধরণের কাহিনী সাহিত্যে অপ্রচলিত নয় পিতার জন্য উন্মত্ত কন্যার কাহিনী ওভিদের "মেটামরফসেস"-এ রয়েছে (Cinyras and Myrrha)। কন্যার জন্য উন্মত্ত পিতা শিবঠাকুর বাংলা পদ্মপুরাণে দেখা দিয়েছেন। ঋগ্‌বেদে এবম্বিধ কাহিনী আছে। Cenciর ঘটনাও অজানা নয়। তবে 'এনসাই ক্লোপিডিয়া বিট্র্যানিকা' বলে যে পিতা Francesco Cenci যে কন্যা Beatrice Cenci সঙ্গে ঐ ধরণের অন্যায় কিছু করেছিলেন তা প্রমাণিত নয় ("but there is ho evidence that he tried to commit incest with her, as has been alleged")। এবম্বিধ ঘটনা সাহিত্যে আলোচিত হ'লেও ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আলোচিতব্য একেবারেই নয়। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া-ইণ্টারমিডিয়েট-এ যাঁরা বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেছেন তাঁরা হয় কবিতাটি (পার্ব্বতী) না পড়ে নির্ব্বাচিত ক'রেছেন, বা না ভেবে নির্ব্বাচিত করেছেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভালও বাসি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তবুও একথা বলব যে না-পড়ে প্রশ্ন করার ঘটনা বিরল নয়। আমার পাঠ্যজীবনেই ঘটেছে। ১৯৪৫-এ এম-এ'তে আমার প্রাদেশিক ভাষা 'ওড়িয়া' ছিল। একটি ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থে 'নববর্ষা ভাবনা' কবিতা পাঠ্য ছিল। কবিতাটি নূতন বর্ষাকাল সম্বন্ধীয়। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বইটি পড়েন নি। দ্রুতবেগে 'নন্দকিশোর বল' এর 'নির্ঝরিণী' কাব্যগ্রন্থ উল্টোতে গিয়ে 'নববর্ষ ভাবনা' পড়েছিলেন; এবং ইংরাজীতে প্রশ্ন ক'রেছিলেন যে "advent of new year" সম্বন্ধে কবি কি লিখেছেন বল? প্রশ্ন করেছিলেন কে জানি না, তবে শুনেছি খুব সম্ভব পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র। পরীক্ষা দেবার পর আমরা দল বেঁধে কন্ট্রোলারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম এবং তদন্তের পর ঐ প্রশ্নটির জন্য সবাইকে কত নম্বর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল শুনেছি। বলা বাহুল্য, ঐ 'ডিস্‌-প্রেস' নম্বর না পেলেও হয়ত ওড়িয়াতে আমি প্রথম হ'তাম।

এখানেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং বিষয় নির্ব্বাচন যাঁরাই করে থাকুন আমার এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক রামতনু লাহিড়ী

অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় গুরু ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের খয়রা প্রফেসর ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে আমার গুরু এবং হিন্দী বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থের নির্দেশক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়কে আমার প্রবন্ধের যৌক্তিকতা বিষয়ে এবং ইণ্টার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে পাঠ্য হিসাবে নির্ব্বাচিত না করার জন্ত আমি যে অভিমত জানাচ্ছি তা কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার করতে বলি।

অশ্লীলতা বিষয়গতও হতে পারে, বর্ণনাগতও হতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ শুক্ল যজুর্বেদে, জেমস জয়েসের ইউলিসিস গ্রন্থে। প্রথম শ্রেণীর অশ্লীলতা 'পার্ব্বতী'তে বিশেষ করে যখন আমরা চিন্তা করি যে নির্ব্বাচকমণ্ডলী পনের যোলোর কচি কাঁচা ছেলে-মেয়েদের জন্ত বিষয়বস্তুটি অনুমোদন করেছেন।

কবিবর রাধানাথ রায় 'পার্ব্বতী'র দুটি সর্গ কবিতায় লিখে যেতে পেরেছেন, বাকী অংশের প্লট গদ্যে লেখা রয়েছে তা তিনি কবিতায় রূপায়িত করার পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছেন। 'পার্ব্বতী'র ঘটনা এইরূপ—

সমস্ত উৎকলে দিগ্বিজয় সেরে বীরসিংহ গঙ্গেশ্বর রত্নপুর দুর্গ অবরোধ করার জন্ত তৎপর। পঞ্চবর্ষব্যাপী কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত মহাপ্রাণী হত হয়েছে কিন্তু রত্নপুরপতির মস্তক অবনত হয়নি এখনও। তাই রাজা গঙ্গেশ্বর সমস্ত বিজিত রাজা ও রাজসৈন্যসহ আপন সৈন্যবাহিনীর অধিপতি হ'য় সেখানে দুর্গ অবরোধ করে রয়েছেন দীর্ঘ দিন। সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজা নিজ কন্যাকে নিয়ে গেছেন। কন্যা কৌশল্যা "একমাত্র পুষ্প অভ্রময় সেহি শিবির-কণ্টকবনে" কাঁটার মধ্যে সুন্দর ফুলের মত ফুটে রয়েছেন। এ কন্যা "রূপে গুণে বালা অতুলা জগতে"। কিন্তু এই কন্যা—

"গুপ্ত প্রেমে পড়ি সসত্ত্বা কৌশল্যা
হেলা সে সেনা-নিবেশে,
জলে তৈলবিন্দু পরা এ কলঙ্ক
ব্যাপি গলা দেশে দেশে।"

চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে রাজকন্যার কলঙ্ক। কুমারী রাজকন্যা 'সসত্ত্বা'। রাজা রয়েছেন সৈন্য ও কন্যাকে নিয়ে অবরোধ ক্ষেত্রে, সেখানে এ দুর্ঘটনা কি করে ঘটল! রাণী রয়েছেন দেশে, তাঁর অন্তর এই সংবাদে "পুটপাক" প্রায় নিরন্তর জলছিল। মনে তাঁর শান্তি নেই। কেবল কৌশল্যার দুর্ভাগ্যের চিন্তা। হঠাৎ রাণীর কর্ণকুহরে এক অশরীরী বাণী প্রবিষ্ট হল—"কৌশল্যার কথা কহিব সে আসি"। চমকে উঠলেন রাণী। কেউ কোথাও নেই।

এদিকে প্রাসাদ-শিখরে বসে রয়েছে পর্য্যবেক্ষণ-নিরত কঞ্চুকী। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে কত দূরে রত্নপুর অবধি। প্রতি পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা রয়েছে। রত্নপুর বিজয়ের সংবাদ অগ্নিমুখে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে দ্রুতবেগে ছুটে আসবে গঙ্গেশ্বরের দেশে তারই ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি রাত্রে অন্ধকারের গায়ে ডুবে যাওয়া শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থাকে কঞ্চুকী। আগুন জ্বলল কি? বিজয় সংবাদ কি আগুনের অক্ষরে শৈলশিখরে ঝলসে উঠল? প্রতীক্ষায় মাসের পর মাস যায়। হঠাৎ একদিন জ্বলে উঠল পাহাড়ের আগুন..এ পাহাড় হতে সে পাহাড়ে অগ্নিসংকেত। আনন্দ সংবাদ! কঞ্চুকী রাণীর কাছে ছুটল সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে। কিন্তু কেবল আনন্দ সংবাদ। অন্ধকারের মধ্যে কেবল বিজয়ের অগ্নি সংকেতই লক্ষ্য করেনি কঞ্চুকী, আরও কিছু লক্ষ্য করেছে। অশরীরী রাজকন্যা মূর্ত্তি সে স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে..সেই অন্ধকারে। অবিকল সেই আকৃতি, সেই বেশভূষা কিন্তু "সে প্রফুল্ল ভাব নাহি সে বদনে কেবল বিষাদ রেখা।" সংবাদ শুনে রাণী স্তম্ভিত। চতুর্দ্দিকে আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'জয় গঙ্গেশ্বর,' কেবল রাণীর মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। প্রভাতে অশ্বারোহী দূত এক গঙ্গেশ্বরের বিজয় সংবাদ নিয়ে—

"বৃদ্ধ রত্নপুর পতি কেলে মহা—
রাজাঙ্ক হস্তে নিধন,
রত্নপুর জেমা অন্নপূর্ণা এবে
সেবিবে দেবী চরণ।
পূর্ণমাসী দিনে বীর গঙ্গেশ্বর
বিজে করিবে ভবনে,
বিজিত যাবত সামন্ত ভূপাল
আসিবে নৃপ-গহনে।"

রাজা গঙ্গেশ্বর রত্নপুর রাজকন্যা (রাজসেমা) অন্নপূর্ণা সৈন্য ও ও সঙ্গী রাজাদের নিয়ে পূর্ণিমা তিথিতে ফিরবেন। আয়োজন চলল অভ্যর্থনার। সমস্ত পুরী আনন্দপূর্ণ কেবল রাণীর মনে সুখ নেই। কন্যা কৌশল্যার কি হ'ল? রাত্রে নিস্তব্ধ নিশীথে যখন সমস্ত পুরী নিদ্রামগ্ন তখন বহুদূর হতে ক্রন্দনধ্বনি ভেসে এল। রাণী সেই ধ্বনি লক্ষ্য ক'রে সাহসে ভর ক'রে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন কন্যার আকৃতি। বিলাপ করছে সে মূর্ত্তি। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাণী, পার্ব্বতী। কিছুক্ষণ কথা বেরুল না মুখ দিয়ে তার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি? আমার কন্যার আকৃতি নিয়েই বা তুমি এই ভাবে ঘুরছ কেন? মূর্ত্তি পরিচয় দিল—

"দুঃখিনী কৌশল্যা জননী লো, তোর
অছি কি আউ জীবনে?
স্নেহ বশে মাতা এ দুরাশা বৃথা
পোষু তুহি কি কারণে?
স্নেহরে পালিতা তনয়া তোহর
নাহি এ মর্ত্ত্য সংসারে
আর্ত্তে ভ্রমু অছি অভাগিনী এবে
ভব যবনিকা পারে।"

দুঃখিনী কৌশল্যা এই দশার কারণ নিবেদন করবে মায়ের কাছে, তাই সে এসেছে। কতদিন ধরে সে মাকে ডেকেছে মা ত তার ডাকে সাড়া দেয়নি। আজ মা এসেছে, মাকে জানাবে সে সব কথা। বলতে লাগল কৌশল্যা আপন কথা :—.

লোকে যে বলে রাজকুলে জন্ম হওয়া ভাগ্যের কথা সে কথায় ধিক। ধিক আমার জন্মে, ধিক রাজকুলে, ধিক সে লোকসম্মানে। "রাজাঙ্ক আদেশে মহাহর্ষভরে যাইথিলি যুদ্ধস্থলে, পিতৃসেবা, রাজ সেবারে মোহর দিন যাউথিলা ভলে।" একদিন পিতা সমস্ত বীর

রাজাকে (যারা তাঁর সঙ্গী ও সাহায্যকারী ছিলেন) সংবোধন করে বললেন, গজেশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা আপনারা শুনুন। বালিকা কৌশল্যা আপনাদের সম্মুখে, রূপে সে অতুলনীয়। গুণে সে বীরের যোগ্য। সেইজন্য কার্য্যস্থলে বাক্যবীর ও কার্য্যবীরের মধ্যে পার্থক্য করে স্বয়ম্বরা হবার জন্য এই যুদ্ধস্থলে কন্যা এসেছে। এই রত্নপুর দুর্গশিরে যে বিজয়ী রাজা পতাকা তুলতে পারবে তাকেই স্বয়ম্বরা গ্রহণ করবে পতিরূপে। তারপর একদিন—

সন্মিতে পুছিলে দিনে নৃপ মোতে
"কহিবুটি জেমামণি
লাবণ্য প্রতিমা গ্রহণ করিবা
অল্পপক্ষে তা কি মণি?
মুঁ কহিলি, 'তহিঁ কেঁউ দোষ?' রাজা
শুনি হেলে হৃষ্টমন,
কহিলে, যেমন্ত আকৃতি যাহার
বিচার তার তেমন।
কহিবার মুহে বচনে ঘটিলা
নিশাযোগে যাহা মাতঃ!
অভাগীর কর্ম দোষকু হেলা সে
দারুণ নিশা প্রভাত।

সেই রাত্রের দারুণ ঘটনায় নিদারুণ মৃত্যু ইচ্ছা জেগে উঠল। নিরস্ত করার জন্য বলতে লাগলেন দিনের পর দিন রাজা। অবশেষে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নির্জন কারায় প্রেরণ করলেন শিবিরের পাশে। লোক সমক্ষে রাজা বললেন যে, ভ্রষ্টা বলে কন্যাকে তিনি কারায় প্রেরণ করেছেন। সেই নির্জন কারাবাসে কেউ দেখা করতে আসত না, কেবল রাজার আসার অধিকার ছিল—

"কেহি ন আসিলে দেখিবাকু মোতে
এক' সে রাজা বিহনে,
রাজা সঙ্গে দেখা— ঠাক সে নির্জন
শ্রেয়ঃ থিলা শতগুণে।"

কারণ, রাজা কেবল দেখা করতেই আসতেন না। "মর্ত্ত্যে কুম্ভীপাকে" এই রকম কয়েক মাস কাটল। অবশেষে "পাপ পরিপাকে হেলা পাপগর্ভ লক্ষণ মোর প্রকাশ।" সংবাদটুকু বাইরে প্রকাশ করলেন রাজা, বিচারক তিনি। কঠোর ন্যায়বিচারক, ভ্রষ্টা কন্যাকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। সবাই রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ···আর কন্যার নিন্দায় ব্যস্ত। যথাকালে কারাগৃহে শিশু আবির্ভূত হল। রাজা দেখলেন সেই শিশুকে এবং

"তার অবয়ব দেখিলে নৃপতি
সে পুত্রে প্রতিফলিত"

'মহাপাপে মহাপাপ সংগোপন সংকল্প' দেখা দিল। নবজাতক ও কৌশল্যা গোপনে ধউলী পর্ব্বতে প্রেরিত হল। সেখানে এক কূপে পাতিত হল কৌশল্যা ও নবজাতক রাজার নির্দ্দেশে। সেই কূপে কিছু দিন স্তন্যদানে নবজাতককে বাঁচাবার চেষ্টা করল কৌশল্যা। তার পর মারা গেল সেই শিশু। নিদারুণ জঠর যাতনায় মাতৃদের মৃত্যু ঘটল। নবজাতকের প্রাণহীন দেহ ক্ষুন্নিবৃত্তি সহায়ক হ'ল মাতার—

সে কৌশল্যা এবে জঠর জ্বালায়ে
ওটারিলা শিশু শব।

পিতা কন্যাকে মারবার জন্য ফেললেন কূপে, আর মাতা পুত্র শরীরের সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পেল।

"পিতা হোই সুতা প্রাণ এহিরূপে
নাশিবার অনশনে,
মাতা হোই মন বলাইবা মৃত
তনয়-তনু-ভোজনে?
দেখিবার থাউ তেণি কি, এহো কি
শুনিথিলু কর্ণে কে বে?
কে কহিব এহি অমানুষী কথা
কেমন্তে সহিলে দেবে?

ক্রমে সেই কূপে জীবনযন্ত্রণা শেষ হল কৌশল্যার। এত সব কথা বলল কৌশল্যা মাকে। তার পর শেষ কথা বলে কৌশল্যা বিদায় নিল:—

"যাউছি মা' মোতে যুগে যুগে মিলু
তো পরি জননী ভবে,
মো পরি দুঃখিনী সুতা জাত পুনি
ন হেউ তোর গরভে।"

"ভীষণ অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা" শুনে রাণী হতভম্ব হ'য়ে রইলেন।

"মোর সুতা-ভাগ্যে এহি পিতা, হাহা!
মোহরি ভাগ্যে এ পতি!"

প্রথম সর্গের সমাপ্তির পর দ্বিতীয় সর্গে রাজ আগমন। সঙ্গে এলেন রত্নপুর-রাজকন্যা অন্নপূর্ণা। মধুসূদন দত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত রাধানাথ রায় 'মহাযাত্রা' মহাকাব্যে কি ধরণের অমিত্রাক্ষর ওড়িয়া সাহিত্যে প্রবর্ত্তন করেন তা আমি অন্যত্র (বঙ্গসাহিত্য ও বহির্বঙ্গে) আলোচনা করেছি। [এ প্রসঙ্গে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান দ্রষ্টব্য] এখানেও সীতা ও সরমাকে মনে পড়বে অন্নপূর্ণা ও পার্ব্বতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে। একজন শোকক্লিষ্টা পিতৃহারা অন্য জন শত্রুপুরীতে কল্যাণকারিণী। মধুসূদনের 'কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে' মনে পড়বে রাধানাথের কবিতা পড়তে পড়তে—

ম্রিয়মাণা আহা, অম্বুরাশি তলে
কিংবা বিম্বাধরা রমা।

অথবা মনে পড়বে মধুসূদনের:—

বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে; তেমতি যে মন!
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।

যখন রাধানাথের কবিতা পড়া হবে—

দেবি গো, প্রাবৃটে তটিনী যেমনে
ন পারে বারি সম্ভালি,
অসম্ভালে স্বচ্ছ পূর প্রবাহকু
বেনি কূলে দিএ ঢালি
দুঃখী সেহি পরি, হৃদে যেবে তার
বলি পড়ে হৃদ ব্যথা,
সম দুঃখি জনে হৃদয় ফিটাই
কহে নিজ-দুঃখ কথা।

এ অংশটি আরও অনেক স্থলে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের হুবহু অনুসৃতি। সে-প্রসঙ্গ এখন আলোচনা করব না। এই অংশে অন্নপূর্ণা আপন দুঃখ কাহিনী এবং রত্নপুর পরাজয়ের করুণ কাহিনী বলে সর্গ শেষ করলেন। বাকী অংশ গদ্যে লেখা ঘটনা কবি সেটিকে কবিতায় রূপ দিয়ে যেতে পারেননি। অন্নপূর্ণা রাজপুত্র-প্রেমিকা, এদিকে রাজা নিজে তাকে গ্রহণ করতে চায়। রাণী যখন শুনলেন যে পুত্রবধূ সমা অন্নপূর্ণাকে রাজা গ্রহণ করতে চান, আপন কন্যার ব্যাপারের পরেও তখন রাণী ভাবলেন, "এ মোহ পুত্রঠারে মন সমর্পণ করি থিবারু মোহর বধূ, সুতরাং কন্যা স্থানীয়া হোই-অছন্তি। এহাক উপরে পুণি অত্যাচার! হে বিধাতা! কেউ পাপরে এ ভলি স্বামী পাইলি? এ পরি নররাক্ষসকু পৃথিবী স্বীয় পতি বোলি সহি পারন্তি,—মাত্র মুঁ পারিবি নাহিঁ।"

রাণীর খড়্গের আঘাতে মারা গেলেন রাজা। রাণী পুত্রকে বললেন, "এ রাক্ষস নিজর রোপিত বৃক্ষচ্ছেদনর প্রতিজ্ঞা করিথিলা। শুনি বিস্মিত হুঅ নাহিঁ, এহি রাক্ষস কৌশল্যাকু ভ্রষ্টা করি সেহি অনাথা বালিকাকু সসন্তান নিহত করাইলা। কুমার, তুম্ভর সেহি প্রাণভগিনী ও মোহর সেহি প্রাণর দুহিতা কৌশল্যা আজ জীবনরে নাহিঁ। এ পামর নিজর রোপিত বৃক্ষ বোলি মোহ কন্যার সতীত্ব নষ্ট কলা।" রাজার মৃত্যু ঘটার পর, অন্নপূর্ণার মৃত্যু ও রাণীর নিরুদ্দেশে পার্ব্বতীর গদ্যাংশ সমাপ্ত। এই গদ্যাংশ কাব্যের কাঠাম কিন্তু কবিতা নয়। এই দুই সর্গের পার্ব্বতী কাব্য ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য। এখন আপনারা বিচার করুন পাঠ্য কবিতাটি ইণ্টার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অপাঠ্য কি না?

এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 'মাসিক বসুমতীর' ১৩৬৩ সালে ভাদ্রসংখ্যার 'সজ্জাদ-সম্বুল' প্রবন্ধটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীতে বি-এ অনার্স'এ পাঠ্য ছিল। 'সজ্জাদ-সম্বুল' গ্রন্থটি মৌলিক নয়, এবং এতে অনুবাদে বাঙ্গালীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে কিনা বাংলা কথার সাহায্যে তা বিবেচনা করার জন্য 'আমার আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান' গ্রন্থটি দেখতে বলি। অথবা এ ব্যাপারে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি বলেন, তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিশেষে, ওড়িয়া সাহিত্যানুরাগীরা যেন আমাকে ভুল না বোঝেন তার জন্য বলছি যে পার্ব্বতী কবিতার কাব্যমূল্য সম্বন্ধে আমি অচেতন মোটেই নই। বইটি ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীতে নির্ব্বাচিত করাতেই আমার আপত্তি। শ্রদ্ধা রাখি আমি ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি এবং কবিবর রাধানাথকে আমি বিন্দুমাত্র ছোট করার চেষ্টা করিনি। রাধানাথের অনেক আগেকার পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গালী কায়স্থ ছিলেন এটা বাংলার পক্ষেও গৌরবের কথা। আর বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনার প্রশ্নই ওঠে না, আমার সমালোচনার লক্ষ্য ইণ্টারমিডিয়েট সিলেবাসে কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি না হওয়া বিষয়ে। এ ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

খেয়ালী

মাধবী ভট্টাচার্য

ঘন রাত্রির কজ্জলমাখা উজ্জ্বল চোখ দু'টি
থমকে যেদিন দাঁড়াবে আমার শয্যার পাশে এসে,
নীল আশমানে রঙ্গীন চাঁদ হানিবে কুটিল ভ্রূকুটি
স্বপ্ন-কুহেলি বিছাবো আমার নিবিড় শয্যা-প্রদেশে।

ভোরের হাওয়ায় সত্তা আমার খেয়ালী স্বপ্ন বোনে
নীল নীল দু'টি চোখে
গভীরের মাঝে কান পাতি কোন্ অমরার বাণী শোনে।

ঘন রাত্রির অঞ্চলতলে সযতনে মুখ ঢাকি'
আত্মা ফুকারি হুংকারি বলে ভালবাসা কোথা রাখি?

রাত্রির কালো চোখে ইংগিত ভেসে ওঠে

খেয়ালের তরী ভেসে চলে ধীরে খেয়ালী তটিনী বাহি'
খেয়ালী সে কোন বালু-বেলায় খেয়ালের গান গাহি'।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-জিজ্ঞাসা

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত

বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার ও খৃষ্টধর্ম-প্রচারের চেষ্টা এবং ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ ধর্মের সনাতন আদর্শকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। যা কিছু প্রাচীন তার মহিমা-কীর্তন করে তাঁরা সমাজের ভাঙনকে রোধ করতে চেষ্টা করেন। ক্রমে যুগের প্রয়োজনে হিন্দুধর্মের সংস্কার আরম্ভ হয়। এই সংস্কার-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)।

জীবনের মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রতি প্রবণতা দেখান নি। সাধারণ ভাবে তিনি নিজেকে 'কোঁৎপন্থী' বা 'পজিটিভিষ্ট' ব'লে পরিচয় দিতেন। তবে তিনি যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর নয়। ত্রৈমাসিক 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের ১০৬ সংখ্যায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'Buddhism and the Sankhya Philosophy' বঙ্কিমচন্দ্রের বেনামে প্রকাশিত হয়েছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'The Mukherjee's Magazine'এর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'The study of Hindu Philosophy' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শোভাবাজার-রাজবাটীতে এক শ্রাদ্ধের ব্যাপারে পাদ্রী হেষ্টি ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে বঙ্কিমচন্দ্র 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে তাকে প্রতিরোধ করার সময়ে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসু হ'য়ে ওঠেন। এই সময় তিনি পজিটিভিষ্ট যোগেশচন্দ্র ঘোষকে Letters on Hinduism নামে কতকগুলি পত্র লেখেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ দেশে 'পজিটিভিজমের' প্রবল ঢেউ উঠেছিল। তালতলায় নীলমণি কুমারের এক আত্মীয়ের বাড়িতে একটি 'পজিটিভিষ্ট' ক্লাব ছিল। এই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন যোগেশচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলমণি কুমার প্রভৃতি। এঁরা সকলেই পুরোপুরি কোঁতের শিষ্য না হ'লেও 'হিউম্যানিটি' (humanity)এর সেবায় জীবন উৎসর্গ করাকে মহত্তম কাজ বলে মনে করতেন। যোগেশচন্দ্র কোঁতের মতবাদকে এদেশের লোকের উপযোগী করার জন্যে এর অংশবিশেষের পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। 'হিউম্যানিটি' এর মূর্তি যীশুখৃষ্টের জননী ম্যাডোনার প্রতিকৃতির অনুরূপ করাই কোঁতের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু যোগেশচন্দ্র ম্যাডোনার মূর্তির পরিবর্তে কস্তাপেড়ে শাড়ীপরা ও কপালে সিঁদুর দেওয়া একটি নারী শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছেন—এই রকম মূর্তি তৈরী ক'রে তার নাম দিয়েছিলেন 'নারায়ণী'। এই ব্যাপারে কৃষ্ণকমল এক জন বড় 'পজিটিভিষ্ট' ছিলেন। স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন, 'আমি positivist : আমি নাস্তিক।'১ যোগেশচন্দ্রের কোঁতের হিন্দুয়ানী সংস্করণ কটন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি 'পজিটিভিষ্টে'র সমর্থন [illegible] উঠেছিলেন এবং 'জবাকুসুমসঙ্কাশং' প্রভৃতি সূর্যের স্তব পর্যন্ত 'পজিটিভিজম'এর মধ্যে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। যোগেশচন্দ্রের মৃত্যুতে এই আন্দোলনের উত্তেজনা কমে আসে। যোগেশচন্দ্রের সংস্পর্শেই বঙ্কিমচন্দ্র যে কোঁতের 'হিউম্যানিটি'র ভাবে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের প্রেরণা, উৎকণ্ঠা ও প্রয়োজনকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি এ কথা স্পষ্ট ভাবেই বুঝেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রখর যুক্তিবাদের কাছে পুরাতন সংস্কার ও শাস্ত্রবিধি কোনমতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু তিনি এ কথাও অনুভব করেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণেই এ দেশের আদর্শ হ'তে পারে না। তবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সভ্যতার উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে তিনি কোন দিনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে হিন্দুধর্মকে নবযুগের প্রয়োজনানুযায়ী এক মানবধর্মে রূপদান করা। তাঁর মতে এ ব্যাপারে চিত্তশুদ্ধিই প্রাথমিক সোপান 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বকে, মানবধর্ম বলে ধর্মের একটি সর্বাঙ্গীন আদর্শ প্রতিপন্ন করেছেন।

কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের ধারণা স্পষ্ট হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের মূল কথাগুলি (২) এই—

"শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। এই জন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি; দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অনুশীলন ধর্ম পুরাতন ধর্মের সংস্কার মাত্র। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

"শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম! এ সকল নূতন কথা!

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।"(৩)

কালভেদে ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করতেন।

"গুরু।......তবে বিশেষ বিধিসকল ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্মের নব সংস্কারে এই মূল কথা।"(৪)

বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসের পক্ষপাতী একেবারেই ছিলেন না।

"গুরু।......সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তি মার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম। ভগবান স্বয়ং কর্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কর্মাত্মক।"৫

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, ভক্তিশূন্য যে ধর্ম তা অতি নিকৃষ্ট ধর্ম। বেদে যে ভক্তিবাদ নেই তা নয়, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম গীতোক্ত ধর্মের এক নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার তিনি বলেছেন যে, চিত্তশুদ্ধি ছাড়া কেউ সত্যিকার বৈষ্ণব হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতের মূলে কোথাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বা প্রকৃতিবাদকে অস্বীকার করা হয় নি। তিনি হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগকে অমর বলেছেন যা মনুষ্যের হিতসাধন করে এবং মানব-প্রকৃতিতে যার মূল।

"গুরু —হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর। চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না, মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি।" ৬

ধর্মতত্ত্বের মূলে এই প্রকৃতিবাদ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এই প্রকৃতিবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীবন ও জগৎ। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদ্রমতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি স্মরণীয়।

"গুরু।—নিখিল বিশ্বের সর্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়।" ৭

এই তত্ত্বদৃষ্টির প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধনা ও ভারতীয় অধ্যাত্মপিপাসার সন্ধি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে জগৎ সত্য এবং দেহই প্রধান ও আদি সাধনের বস্তু। দেহ ও মনের প্রধান ও মূল বৃত্তিগুলির পূর্ণ উন্মোচনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। মানুষের ধর্মপ্রবণতা মানুষের প্রকৃতি থেকেই জন্মলাভ করে। মানুষের প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতির যে অবস্থা তার আদর্শই ঈশ্বর নামে অভিহিত।

"শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য বৈদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেন না যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।—যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।"৮

বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরত্বের ধারণার মূলে ছিল 'হিউম্যানিজম' (Humanism)। এই 'হিউম্যানিজম' মানুষেরই পূজা, মানুষের মধ্যেই দেবতার অনুসন্ধান ও আরাধনা। এই 'হিউম্যানিজমে'র পথেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জীবনও ধর্মজিজ্ঞাসার একটা সেতুবন্ধন হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির অধ্যাত্ম সাধনাকে কোন প্রকারের স্বার্থসর্বস্ব মুক্তির আরাধনা বলে মনে করতেন না। সমাজসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বভূতের মঙ্গল ও ব্যক্তির আপন কল্যাণ সাধনের দ্বন্দ্ব মিটাতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে এই সমাজসেবার পথেই মানব-দেবতার সেবা করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের হিতবাদকে অনুশীলনতত্ত্বের অঙ্গীভূত করেছেন।

"গুরু।.....আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র।...

মূলকথা, অনুশীলন ধর্মে Greatest good of the greatest number গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৯

বঙ্কিমচন্দ্র আত্মহিত সাধনকে পরহিত সাধনের নীচে স্থান দিয়েছেন।

গুরু। পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ১০

চিত্তের যে অবস্থায় আত্মপ্রীতি ও পরপ্রীতিতে বিরোধের অবসান হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তার নামই চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই মানবপ্রীতিকেই সকল নৈতিক শুচিতার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে একে মানবধর্মের অন্তর্গত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতিকে অস্বীকার না করে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতির মধ্য দিয়ে বিশ্বহিত সাধনের প্রয়াসী ছিলেন।

"গুরু। বস্তুতঃ—জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজন-প্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। পরসমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। ১১

বলা বাহুল্য, এই দেশপ্রীতি ইউরোপীয় patriotism নয়; কেন না ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য পরসমাজের লুণ্ঠন করে নিজসমাজের পুষ্টি সাধন।

বঙ্কিম-প্রচারিত patriotism কে অরবিন্দ ঘোষ religion of patriotism বলেছেন।

"This is second great service of Bankim to his country that he pointed out to it the way of salvation and gave it the religion of patriotism, of the new spirit which is leading the nation to resurgence and independence, he is the inspirer and political Guru." ১২

বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন ধর্মাদর্শকেই যুগের প্রয়োজনে শোধন ক'রে নিয়েছিলেন। বলতে গেলে সনাতন ধর্মাদর্শ একটা নূতনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন,

"তিনি তত্ত্ববাদী (mystic) সাধক বা যোগী ছিলেন না—তিনি ছিলেন খাঁটি Humanist; Humanismকেই যতখানি শোধন করিয়া লওয়া যায় তিনি তাহাই করিয়াছেন, এই কথা মনে না রাখিলে তাঁহার সেই সাধনা ও বিশিষ্ট প্রতিভার মূল্য নির্ণয়ে ভুল হওয়াই সম্ভব। ১৩

বঙ্কিমচন্দ্র তৎপ্রচারিত অনুশীলন ধর্মের উদাহরণ-স্বরূপ 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা করেন। পৌরাণিক ঈশ্বর কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কৃষ্ণের মানবচরিত্র সমালোচন করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। যুগের ধর্মসংস্কারের প্রেরণাতেই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ, কেন না কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।

'প্রচারে' ধারাবাহিক ভাবে বের হ'য়ে 'কৃষ্ণচরিত্র' ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অনুশীলনতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) নামক তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন।

পূর্বেই বলেছি, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের বাড়িতে রাধাবল্লভের নিত্য পূজা হত। তিনি কীর্তন শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কীর্তনীয়ার চরিত্র সৃষ্টি ও কীর্তনের উল্লেখ তাঁর বৈষ্ণবধর্ম প্রীতির পরিচয় প্রদান করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "একবার শুনিয়াছি, কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি 'বঙ্গদর্শনের' তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন।১৪

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের ওপর বৈষ্ণবতার প্রভাব আছে। বৈষ্ণবতার প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে মানবতা ঢেলে দিয়েছেন। অন্য সেই সঙ্গে সঙ্গে শাক্তধর্মের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রকে দার্ঢ্য, ঐশ্বর্য ও তেজস্বিতায় মণ্ডিত করেছেন। শুধু তাই নয়। পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদের সাহায্যে তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে বহু পৌরাণিকতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে এনেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকে আদর্শজ্ঞানে লোকে উপাসনা করবে এ কখনই সম্ভবপর নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক অনুভূতির অভাব ছিল। শুধু rationalism-এর শক্তিই প্রধানতঃ তাঁকে কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে চালিত করেছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রধান দুর্বলতা সম্বন্ধে কালীনাথ দত্ত লিখেছেন, "সাধারণ মানুষে একজন উপাসকের আদর্শ চান—একজন ভক্তের প্রতিচ্ছবি দেখিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে 'ইহার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে না ছিল বৈরাগ্য ও ভগবৎনির্ভর, না ছিল ভগবৎভক্তি, না ছিল ভগবৎ-প্রেম, 'না ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা ও প্রশস্ততা।১৫

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই অভাব বোধ করেছিলেন "কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। 'ধর্মতত্ত্বে' বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধান বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কৈ?"১৬

বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র বুঝতে হলে তাঁর ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে দু'-একটি কথা জানা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান শিক্ষা তাঁর পিতার কাছে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ যাদবচন্দ্রের জীবন দান ক'রে তাঁকে দীক্ষিত করেন।১৭ এদিকে তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করেই বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে প্রথম ধর্মের উন্মেষ হয়। যে সব সংস্কৃত গ্রন্থাদি বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ করেন তাদের মধ্যে জ্যোতিষতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাদি থেকেও প্রমাণ করা যায় যে, তিনি তন্ত্র, মন্ত্রশক্তি, দৈববল ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শাক্তভাব প্রধানত এই বিশ্বাস থেকে পাওয়া। এর ওপর পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ, 'Humanity'-এর আদর্শ প্রভৃতি তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কল্যাণে লাভ করেছিলেন। এই তিনটি ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র অভিষিক্ত।

'তত্ত্ববোধিনী'তে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করলে 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র তার জবাব দেন। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছিলেন,

"কেন বঙ্কিম দু'টো কৃষ্ণের অবতারণা করিলেন, এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শেষা শষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়া পাকা positivist ছিলেন। Positive Philosophy যাহাই হউক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা Positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন grandman—মহাপুরুষ। বঙ্কিম বাবু ভাবিলেন, এই ত আমার হাতের কাছে একজন grandman রহিয়াছেন; যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই রকম চৌকস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে positivist religion দাঁড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে grandman করিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র।"১৮

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমতকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন। ১২৯১ সালের (১৮৮৪) অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র 'আদি ব্রাহ্মসমাজও নব্যহিন্দুসম্প্রদায়' নামে এক প্রবন্ধে এই আক্রমণের বলিষ্ঠ জবাব দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখা বলেছেন।

"ব্রাহ্মধর্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্মে পরিণত হইবে।"১৯

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষের দিকে পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি উত্তর ও পূর্ব বাংলা থেকে কলিকাতায় এসে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার শ্রোতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ। দু'তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হবার পর বঙ্কিমচন্দ্র আর যাননি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন,—

"......ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নাচিয়া 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, কোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম টেঁকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়।" (২০)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দৈবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' নামক প্রবন্ধের এক স্থলে ফুটনোটে বলেছেন,—

"পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে

নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিঁকিবে না এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।" (২১)

উপরের আলোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপ স্পষ্ট হবে ব'লে বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা ধর্ম। সেই কারণে তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে পরিচিত না হ'লে তাঁর রচনার পূর্ণস্বাদ গ্রহণ ও মূল্যনিরূপণ যথাযথ ভাবে করা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মজিজ্ঞাসার মধ্যে উনবিংশ শতকের শেষার্ধের উৎকণ্ঠা ও প্রয়োজন ধরা পড়েছে। এই হিসেবে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা একটি বিশিষ্ট মূল্যে মহৎ ও দীপ্তিময়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। বিপিনবিহারী গুপ্ত। পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়)। কলিকাতা ১৯১৩ : পৃঃ ২৩০

২। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (সাহিত্য গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ): বসুমতী সাহিত্য মন্দির রাজসংস্করণ : পৃঃ ৮২

৩। ঐ : পৃঃ ৭

৪। ঐ : পৃঃ ১৪

৫। ঐ : পৃঃ ১৮

৬। ঐ : পৃঃ ১৪

৭। ঐ : পৃঃ ১৭

৮। ঐ : পৃঃ ১১

৯। ঐ : পৃঃ ৬৭

১০। ঐ : পৃঃ ৬৬

১১। ঐ পৃঃ ৭৩-৪

১২। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (পরিশিষ্ট-২)। কলিকাতা ১৯২১ : পৃঃ ১৫।

১৩। মোহিতলাল মজুমদার : বাংলার নবযুগ : কলিকাতা ১৯৪৫ : পৃঃ ১৪।

১৪ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ : পৃঃ ১৫৭।

১৫ ঐ : পৃঃ ২৫০।

১৬ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ : পৃঃ ১৭০।

১৭ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ : পৃঃ ৯৮-১০২।

১৮ বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্যায় : কলিকাতা ১৯২৩ : পৃঃ ১১৪-৫।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ : পৃঃ ৩৩৯।

২০। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ : পৃঃ ৩০৩-৪।

২১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিবিধ (সাহিত্য পরিষদ সং)। কলিকাতা ১৯৪১ : পৃঃ ১৮৭।

ছুটি

অমিত বসু

কাগজ কাগজ রাশি রাশি নাম আদায় ধার
যাতায়াত খোঁজ কথোপকথনে কাটাই দিন,
জমা ও খরচ মিলিয়ে ঝরিয়ে মাথার ঘাম
বিল-ভাউচার সাজিয়ে-গুছিয়ে মিটিয়ে দাম।
প্রতি মিনিটের প্রতি আনা-পাই সুদে ও মূলে
চুকিয়ে তবেই ছুটির বাতাস লাগাই চুলে,
সে ছুটি মরবে দেওয়ালের চাপে ডাইনে-বামে
সে ফুল ঝরবে আস্তাবলের ধূলোর ঘামে?
অথচ সিন্ধু নেচে উত্তাল দু' বাহু তুলে
সেই নির্জন বালিয়াড়ি-কূলে উঠবে ফুলে,
ঢেউ ছেঁকে ছেঁকে ঝিনুক কুড়িয়ে দুজনে তারা
ফিরবে ক্লান্ত খুশিতে উথলে ক্ষুধায় সারা।
দুপুরের ছায়া বিকেলের মাঠে শিকার সেরে
হড়িয়াল ডাক বুনো তিত্তির সরাল মেরে,
আবার সুরের অন্দরে সুরা-ওমর-সাকী
দূরে সাড়া দেবে পাহাড়ের কোলে গানের পাখী।
বকুলের ফুল ঝরে টুপ টুপ কোলের কাছে
নিকটে উষ্ণ নিবিড় ঘুমের ইসারা আছে,
রাত গাঢ় হ'লে গাছেরা ঘুমোলে আকাশ জাগে
ফুলের পেয়ালা ভরে ওঠে ঘ্রাণে ভোরের আগে।

যন্ত্রদানব না যন্ত্রদেবতা ?

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

[এরা নানা জাতির লোক কলকারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ ও সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। —রবীন্দ্রনাথ (রাশিয়ার চিঠি)]

রক্ষণশীল বা সনাতনপন্থী বলতে যা বোঝায়, লোকে সাধারণত সেটা পছন্দ করে না। সমাজে রক্ষণশীলতার কদর নেই। অথচ আধুনিক চিন্তাজগতে সনাতনপন্থার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় নানা দিকে। এমন কি আধুনিকপন্থী বা প্রগতিপন্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ আচমকা একটা ঘা খেয়ে বা অন্য কোন কারণে রাতারাতি ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে সনাতনপন্থার গুণ গাইতে শুরু করেন। রক্ষণশীলতা কেউ পছন্দ করে না অথচ তার অস্তিত্বও থেকে যাওয়া এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে। আধুনিক রক্ষণশীলতার ইতিহাস হচ্ছে প্রগতিশীল গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সমস্ত রকম অগ্রগতি ও সাফল্যের বিরোধিতার ইতিহাস।

এডমণ্ড বার্ক ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে যা বলতেন আজকের সনাতনপন্থীরা রুশ বিপ্লব সম্পর্কেও সেই ধরণের কথাবার্তা বলেন। সমাজতন্ত্রের দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের অভাবনীয় কীর্তি দেখে আঁৎকে উঠছেন তাঁরা, বলছেন সেই যন্ত্রসভ্যতা মানুষের পক্ষে সমূহ বিপদ। কারণ মানুষ সেখানে যন্ত্র-দানবের দাস হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির ক্রমানুগতার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিকে যেতে তাঁরা নারাজ। অতীতের সামনে বর্তমানকে তাঁরা এমন ভাবে আলাদা করে খাড়া করতে চান যেন পচা-খসা আধুনিক যুগ গৌরবময় অতীতকে গ্রাস করে ফেলার চেষ্টা করছে। এই ধারণাটি মধ্য শ্রেণীর কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই বেশি দেখা যায়। তাঁরা সাননে সেকালের মধ্যে মুখ গুঁজে স্বস্তি পেতে চান। সমাজের অগ্রগতি তাঁদের মধ্যে এই ধরণের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স এবং আধুনিক সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের যাচাই করেন। তাঁরা আইনের বদলে কতটা শক্তি প্রয়োগ করা হোল বা চিরাচরিত প্রথার বদলে কত বর্বর ভাবে নতুন ধারা চালু করা হোল তাই দিয়ে। এঁদের চোখে মার্কিণ ও সোভিয়েত ব্যবস্থা দুই কুৎসিত কিন্তু সোভিয়েত আরো অনেক বেশি কুৎসিত। এখানেই শেষ নয়। তাঁদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত এই মতে ফিরে যান যে মানুষের প্রকৃতি কিছুতেই বদলায় না। এমন কি সাম্যবাদী সমাজেও নয়। তাঁরা বলেন, মানুষ জন্মগত অপরাধী ও বিদ্রোহী এবং বুদ্ধিবৃত্তির যতই চাষ করা হবে ততই ঘি ঢালা হবে 'নিহিলিজমে'র আগুনে। বর্বরতা মানুষের স্বভাবজাত এবং কোন রকম নতুন সামাজিক পরিবেশেই তা বদলায় না। এই সম্পর্কে মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিনের বক্তব্য বাদ দিয়েও এইটুকু বলা যায় যে, আদিম সাম্যবাদের যুগে মানুষ কিছুতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানত না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তার স্বভাব বিদ্রোহ করত। ব্যক্তিগত উৎপাদনের যুগে সেই প্রকৃতি আস্তে আস্তে তার বদলে গেল। তখন তার ধ্যান ধারনার রাজ্য দখল করে নিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তেমনি সমাজতন্ত্রের সমবায়িক পরিবেশেও মানুষের রুচি প্রকৃতি নতুন রূপ নিতে বাধ্য এবং নিচ্ছে।

মানুষের প্রকৃতি বদলায় কি না সেটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচ্য মানুষের সমাজে যন্ত্র বিশেষ করে অটোম্যাটিক বা স্বয়ংচালিত যন্ত্রের ভূমিকা। যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংচালনা মানুষকে যন্ত্রের দাস করে এবং মানুষকে যান্ত্রিক করে ফেলে নাকি মানুষই যন্ত্রকে নিজের হুকুম তামিল করতে বাধ্য করে, এই হচ্ছে মৌলিক প্রশ্ন।

সমাজের তথা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সবচেয়ে বড় বিষয় কী? একথা এমন কি ধনতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসবেত্তারাও স্বীকার করেন যে, সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে প্রধানত উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির ইতিহাস, উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতির ইতিহাস, উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতির ইতিহাস এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস।

মানুষ উৎপাদনের উপায় উপকরণগুলির উন্নতি করার চেষ্টা করে নিজের সুখ-সুবিধা আরাম-বিরামের জন্যে। যাতে অল্পসময়ে আরো বেশি ভোগ করবার জিনিষ তৈরী করা যায়, যাতে কম মেহনত করে বেশি উৎপাদন করা যায়, এই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এক কথায় প্রতিদিন মানুষের যে সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বেড়ে চলেছে তা যতদূর সম্ভব মেটাবার চেষ্টা করার জন্যেই মানুষ কল্ কৌশলের উন্নতি করতে চায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রকৃতিক শক্তিগুলি একের পর এক আয়ত্তে এনে সেগুলির সাহায্যে নতুন যন্ত্রকৌশলে উৎপাদন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার এবং মানুষের খাটুনি কমাবার চেষ্টা চলছে। সমস্ত মানুষ অংশ নিচ্ছে সেই কাজে সেই অভাববিহীন সমাজ ও তার সাংস্কৃতিক ইমারত রচনায়। সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন লেনিন যেদিন তিনি বলেছিলেন যে এমন দিন আসবে যেদিন একজন রাঁধুনীও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে। ইংরেজ কবি উইলিয়াম মরিসের স্বপ্নও ছিল তাই।

লেনিনের সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে, সফল হতে চলেছে প্রথমত নতুন ন্যায়সঙ্গত সমাজ ব্যবস্থার কল্যাণে এবং দ্বিতীয়ত যন্ত্রকৌশলের অপূর্ব সাফল্যের দৌলতে। সে দেশে যন্ত্রের উন্নতি ও ব্যবহার কাউকে বেকার করে না বরং তাদের মেহনত হাল্কা করে, সঙ্গতি ও সংস্কৃতির উন্নতি করে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পাঁচ-সালা বন্দোবস্তে

আমরা তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার খসড়া নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল :

"যন্ত্রকৌশলের আরও উন্নতির জন্য, উৎপাদনের মান উচ্চতর করার জন্য এবং কাজকর্ম আরও সহজ সরল করার জন্য যন্ত্রীকরণের বিপুল উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে এবং ব্যাপক ভাবে স্বয়ং চালনা ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।"

এখানে কাজকর্ম আরও সহজ সরল করার উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করার মত।

এবার নতুন ৭-সালা পরিকল্পনার কথা ধরা যাক। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে :

সামূহিক যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ অর্থনীতির উন্নতির প্রধান ও নিয়ামক উপায় এবং তাহার ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি নূতন ভাবে বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনের পড়তা খরচা কমিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও মেহনতী জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট কারণ হিসাবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি, পরিকল্পিত যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রচলনের ভিত্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

মেহনতী জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হবে (দৈনিক ৫ ঘণ্টা) এবং সপ্তাহে দু'দিন পুরো ছুটি দেওয়া হবে। অর্থাৎ মানুষ অনেক বেশি অবসর পাবে জ্ঞান সঞ্চয় ও সংস্কৃতিচর্চা করার জন্যে। তখন তারা সকলেই পলিটেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করবার সময় পাবে। জে ভি স্তালিন তাঁর "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী" বইখানিতে এই রকম ধারণাই দিয়ে গিয়েছেন সোভিয়েত দেশের আগামী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। তিনি বলছেন যে সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়মের প্রথম অংশটি হচ্ছে সমগ্র সমাজের প্রতিনিয়ত বর্দ্ধমান সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার যতদূর সম্ভব পরিতুষ্টি সাধন। কি ভাবে সেটা হবে সেকথা বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন :—

"শ্রমজীবী জনতার অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না করে সমাজের মানুষের সাংস্কৃতিক মানের বেশ ভাল রকম উন্নতি করা যাবে এ ধারণা ভুল। তার জন্য সর্বপ্রথমে দৈনিক কাজের সময় অন্তত ৬ ঘণ্টায় এবং পরে ৫ ঘণ্টায় কমিয়ে আনতে হবে। তারপর আবশ্যিক পলিটেকনিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন করার দরকার হবে, যাতে সমাজের লোকেরা নিজেদের পছন্দসই পেশা বেছে নিতে পারে, সারা জীবন একই পেশায় বাঁধা না থেকে।"

সাম্যবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের এই হচ্ছে নীলনক্সা। স্তালিন যে পূর্ণাবয়ব মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে মানুষকে সারা দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। বাকি সমস্ত সময়টাই সে সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার পিছনে খরচ করতে পারবে। স্বয়ংক্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিই তাকে এনে দেবে সেই সুযোগ।

রাশিয়ার চিঠির প্রথম পাতাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন। তাদের মানুষ হবার সময় নেই; কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। অথচ উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়? একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের মধ্যে ফলেছে।

কম খাওয়া, কম পরা, কম শেখা, এই কমের পালা সাঙ্গ করে পর্যাপ্তের বন্দোবস্ত করা এবং সেই সঙ্গে অবকাশের সুযোগ বাড়াতে পারলে তবেই গোটা দেশের সমস্ত মানুষ, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে, বিশ্বসংস্কৃতিকে করতে পারবে সমৃদ্ধতর। বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের উন্নতি এবং উৎপাদনের স্বার্থে সেগুলির ব্যবহারই তার একমাত্র উপায়। পুরাতন পৃথিবীর জরাজীর্ণ অন্যায় সমাজকে উল্টে দেবার "আর্কিমিডিসের লিভার" হচ্ছে এই সব অভিনব কলকৌশল। কিন্তু মানুষের এইসব নতুন কীর্তিকে অভিনন্দন না জানিয়ে একদল বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন তুলছেন যে এসবে মানুষের সুখ কি বাড়বে? 'সাইবার্নেটিকস' শব্দটি তাঁদের কাছে দুঃস্বপ্নের সামিল।

'সাইবার্ণেটিকস' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ কাইবার্ণেটিস থেকে, যার মানে মাঝি অর্থাৎ চালক। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক এসলিলে সটোমেশন বা স্বয়ং চালনার সংজ্ঞা দিচ্ছেন এই ভাবে :—

এমন ধরণের উঁচুদরের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতির প্রবর্তন করা যা মানুষের কায়িক পরিশ্রম এবং খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণ কার্য অনেকাংশে বাদ দিয়ে দেবে।

শুধু যন্ত্রীকরণে মেহনত কমে গেলেও তদারক বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থেকে যায়, পদে পদে যন্ত্রের কাজের প্রত্যেকটি ধাপের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় যন্ত্র নিজের কাজের তদারক নিজেই করে! মানুষের শুধু দায়িত্ব থাকে যন্ত্র ঠিক মত চলছে কি না সেইটুকু দেখা।

একটি উদাহরণ দিই। সোভিয়েত দেশে কে 'শেমাখা' নামে একটি মোটর জাহাজ আছে। সেটি যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন তাতে হাল ধরবার কোন লোক থাকে না সেই কাজের দায়িত্ব রয়েছে একটি কলের উপর; যার নাম "জাইরো-হেল্‌মসম্যান।" জাহাজটি পথভ্রষ্ট হলেই "জাইরো কম্পাসটি" (দিগদর্শন যন্ত্র) এক বৈদ্যুতিক কৌশলে জাইরো-হেমসম্যান যা যন্ত্রমাঝিকে সেই খবর পৌঁছে দেয় এবং যন্ত্রমাঝি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশলে জাহাজটি ঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।

আর একটি দৃষ্টান্ত। উক্রাইনের একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যা শরীরের যে কোন জায়গার রক্তচাপ ধরে দিতে পারে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও ধ্বনি রেকর্ড করে, হৃৎপিণ্ডের কাজে গলতি থাকলে তা জানিয়ে দেয়। এমন কি সেই অসুস্থতার চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করে। তাই যন্ত্রটির নাম "স্বয়ংক্রিয় ডাক্তার।"

উদাহরণ দুটি থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েত দেশে মানুষ স্বয়ংক্রিয়

হিসাবে। মানুষ একটা কাজ ঠিক করে দিচ্ছে এবং যান্ত্রিক "মস্তিষ্ক" মানুষের ইচ্ছা ও নির্দেশমত সেই কাজটি নির্ভুলভাবে করে দিচ্ছে অর্থাৎ মানুষের মেহনতটা যন্ত্র করে দিচ্ছে। তাই কার্ল মার্ক্স বলেছেন, সাইবার্নেটিক্স যন্ত্রপাতি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির শক্তির একটি প্রতিরূপ। সেগুলি মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া প্রক্রিয়ার অনুকরণ করে এবং অনেক সময় সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের চেয়েই অনেক তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়। আসলে সেগুলি যন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবার ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এই ধরণের একটি ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র আমাদের ষ্টাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটকে দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে। এই যন্ত্রটির "স্মরণশক্তি" আছে এবং সে এক হাজার সংখ্যা মনে রাখতে পারে, সেগুলি দিয়ে মানুষের নির্দেশমত হিসাব কষে দিতে পারে যে কোন বিষয়ে। তার স্মরণশক্তিতে ভুল হবার জো নেই। মানুষের স্মরণশক্তি ও মস্তিষ্কের ভুল ত্রুটি হয় কিন্তু স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্রের হয় না।

সোভিয়েত দেশে মানুষের পরিশ্রম কমানো এবং উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কারখানা-শিল্পে স্বয়ংচালিত কলকৌশল ব্যবহার হচ্ছে। লৌহশিল্পে লোহার চাদরে নির্দিষ্ট মাপের গর্ত করা এবং অন্যান্য নানা কাজ যন্ত্র আপনা আপনিই করে সুপারভাইজার টেলিফোনে হুকুম দিলেই। টেলিফোনের হুকুম অনুসারে যন্ত্রের গণনা ও স্মরণশক্তি বিভাগ কোন কাজটা কি মাপে এবং কতটা করতে হবে সেটা হিসাব করে নেয়। তার পর বোতাম টিপলেই হুকুম মাফিক কাজ চলতে থাকবে। স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র দিয়ে আজকাল শিল্প ও অর্থনীতির মানাংক কষা হচ্ছে, জেট বিমানের ইঞ্জিনের নক্সা তৈরি সংক্রান্ত হিসাবপত্র করা হচ্ছে, জলবায়ুর পূর্বাভাস দেওয়া যাচ্ছে, রকেটের চেয়েও দ্রুতবেগে রকেটের গতিপথ গণনা করা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সব কাজের পড়তা, খরচা হাজার হাজার গুণ কমে যাচ্ছে। অটোম্যাটিক রোলিং মিলে শ্রমিকদের আর ভারি লোহার তাল নাড়াচাড়া করতে হয় না। সে খালি বসে বোতাম টেপে। এমন কি সেখানে বসে বসে সে গল্পের বই বা কোন বই পড়তে পারে। যন্ত্রের কাঁধে নিজের কাজের ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সে খালাস। কাজের মধ্যেই সে অবকাশ পায়। যন্ত্র কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা, তার কোথাও কিছু বিকল হয়েছে বা বিগড়েছে কি না সেদিকে নজর রাখা এইটুকুই তার কাজ।

সাইবার্নেটিকস বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র নিবদ্ধ করেন মার্কিণ বৈজ্ঞানিক নর্বার্ট ওয়েইনার। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স সম্পর্কে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান পাভলভের শিক্ষাই সাইবার্নেটিকসের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। লেনিনগ্রাদেও "সভেৎলানা" নামে যে "ইলেকট্রো ভ্যাকুয়াম" কারখানা আছে সেখানে ১৯৩৫ সনে কুকুরের একটি বৈদ্যুতিক মডেল তৈরি করা হয় এবং সেই মডেলটিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স সৃষ্টি করা গিয়েছিল। তাই থেকে প্রমাণিত হয়, স্বয়ংচালিত নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ স্নায়বিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। মানুষের দেহে আছে কোটি কোটি (১৫০০ কোটি) স্নায়ুকোষ। সেই স্নায়ুকোষের জায়গায় গণনা যন্ত্রে রয়েছে ইলেকট্রনিক টিউব (সবচেয়ে বড় যন্ত্রে ২২।২৩ হাজার পর্যন্ত টিউব থাকতে পারে)। মানুষের দেহে যেমন স্নায়ু তেমনি গণনাযন্ত্রে বৈদ্যুতিক তার। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক লেভ গুতেনমাকার বলেছেন—এই ব্যাপারে মানুষের স্মরণশক্তিই বিশেষ করে জরুরী। ইলেকট্রনিক মেশিনের স্মরণশক্তির মানুষের স্মরণশক্তির সঙ্গে সেই ধরণের সম্পর্ক যে সম্পর্ক রয়েছে চোখের সঙ্গে আলোক কোষের বা মাইক্রোফোনের সঙ্গে কানের। এই ধরণের কোন কোন সাদৃশ্য আমরা সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু তাই বলে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে সব জৈব-পদার্থিক বা জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটে সেগুলি ইলেকট্রনিক মডেলের মধ্যে সৃষ্টি করার কোন দরকার নেই। মানুষের মস্তিষ্কের গাণিতিক বা সংখ্যা প্রক্রিয়া এবং মডেলের গাণিতিক প্রক্রিয়া মিলিয়ে দিতে পারাটাই আসল কথা।

এই ধরণের ইলেকট্রনিক যন্ত্র যে কোন বই-এর লেখা মুখস্থ করে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সাহায্যে অন্য সহরের পাঠকের চোখের সামনে টেলিভিসনের পর্দায় সেই লেখা প্রতিফলিত করতে পারবে। বি-ই-এস-এম মডেলের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ১০ মিনিটের মধ্যে আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস দিতে পারে সেই কাজ করতে একটি গোটা আবহাওয়া অফিসের ২ বছর লেগে যাবে।

সোভিয়েতে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের জন্য একরকম স্বয়ংচালিত চালক তৈরি হয়েছে যা সব দিক হিসাব করে প্রয়োজন মত গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং গাড়ীর নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে।

আগেই বলেছি, রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হিসাব করবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথা। হৃদ্‌রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হবে কিনা এবং উচিত হলে কখন করা হবে, এ সবই সেই যন্ত্র বলে দিতে পারে। সুতরাং শল্য চিকিৎসককে কোন ঝুঁকি নিতে হয় না।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। মস্তিষ্কের কোন অংশ আহত হলে অন্য অংশ সে কাজে আনাড়ি হলেও সে কাজের দায়িত্ব নেয় সাময়িক ভাবে। তার ফলে দেহযন্ত্রের কাজকর্ম আবার চলতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্ষেত্রেও অংশ-বিশেষ বিগড়ে গেলে অন্য অংশ যাতে তার কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আরো নির্ভরযোগ্য হবে। তা করতে পারলে "যন্ত্রের মস্তিষ্ক" পরিবেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার রকম কাজের জন্য হাজার রকমের যন্ত্র না করে, খালি বিভিন্ন অংশ অদল-বদল করে যাতে একই মডেলের দ্বারা নানা রকম কাজ করা যায়, সেদিকে চিন্তা করতে হবে এবং গোটা কারখানায় সমস্ত কাজের সামগ্রিক স্বয়ং চালনা প্রবর্ত্তন করতে হবে। এই হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের জন্য সমাজবাদী সমাজের দাবী।

কিন্তু যন্ত্র কি সত্যিই মস্তিষ্কের জায়গা দখল করবে? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডমণ্ড বার্কলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলিকে "বিরাট মস্তিষ্ক বা চিন্তাশীল যন্ত্র" আখ্যা দিয়েছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ইয়ং-এর মতে মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড গণনাযন্ত্র যার মধ্যে রয়েছে ১৫০০ কোটি স্নায়ুকোষ। এঁরা দুজনেই মানুষের মস্তিষ্ক আর যন্ত্রের মস্তিষ্কের ধর্মগত পার্থক্য উপেক্ষা করে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যটি দেখছেন।

প্রথমতঃ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের স্রষ্টা মানুষ, তার মালিকও মানুষ।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তার স্রষ্টার হুকুম তামিল করে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক বহু হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের পরিণতি। সবচেয়ে নিখুঁত যন্ত্রের সঙ্গেও মানুষের মস্তিষ্কের তুলনা করতে যাওয়া বাতুলতা। কারণ যন্ত্রের মানুষের মাথার মত চিন্তা করার, উপলব্ধি করার, জীবনকে বিশ্লেষণ করার, অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ ও সমীক্ষা করার এবং আগামীকালকে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা নেই। মানুষের প্রজ্ঞা আছে, বুদ্ধি আছে, আছে কল্পনা করবার ক্ষমতা। কিন্তু যন্ত্র যন্ত্রই, সে একটা স্বয়ংক্রিয় কৌশল মাত্র। অনুগত ভৃত্যের মত সে কাজ দিলে, তা ঠিক মত করে দেয় চোখ বুঁজে। মানুষের হুকুম না পেলে তার অবস্থা দাঁড়ায় একটা অচল জড়স্তূপের মত। সে অংক কষতে পারে কিন্তু সাহিত্য রচনা করতে পারে না, যন্ত্র-কৌশলের তথ্য তর্জমা করতে পারে কিন্তু উপন্যাস অনুবাদ করতে পারে না। তার স্মৃতির কোঠায় কিছু শব্দ আর কবিতার ছন্দের নিয়ম, সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করে দিলে সেই নিয়মে সে কবিতার লাইন সাজিয়ে দিতে পারে কিন্তু মূল কবিতা রচনা করতে পারে না। ছকে দেওয়া গণিতের সমস্যার সমাধান সে করতে পারে কিন্তু নতুন সমস্যা বার করতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অন্য যে কোন যন্ত্রের মতই মানুষের শ্রমের একটি হাতিয়ার মাত্র। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে মানুষের মস্তিষ্কের একটি প্রবর্দ্ধন মাত্র, যেমন প্রবর্দ্ধন হচ্ছে হাতুড়ি, মানুষের হাতের। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় কোটি কোটি বেকার আছে, মুনাফা শিকারের রেষারেষি আছে বলে সেখানে যন্ত্র এবং আরো বেশি করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র শ্রমিকের শত্রু; কারণ যন্ত্র বসানো মানেই কিছু লোক ফালতু হয়ে পড়া। যন্ত্র একাই তো তাদের অনেকের কাজ করে দেবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের দুনিয়ায় বেকার সমস্যা ও গলা-কাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই বলে যন্ত্র সেখানে মানুষের বন্ধু ও সহযোগী। আসল কথা যন্ত্র নিজে ভাল বা খারাপ, একথা বলার কোন অর্থ নেই। কে যন্ত্র ব্যবহার করছে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে, তার ওপরই যন্ত্রের শুভাশুভ নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত দিই। বৃটেনের কাউণ্ট্রী ওয়ার্কার্স জার্ণাল লিখছে:

"বৃটিশ শ্রমিকরা জানতে চায় যে কারখানা স্বয়ংচালিত হলে ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৮ জনের যদি চাকরী যায় তাহলে সেই কারখানায় তৈরি জিনিষ কিনবে কারা?"

ফরাসী পত্রিকা "ভিয়ে উভ্রিয়ে" মন্তব্য করেছে:—

"আমরা স্বয়ংক্রিয় ও অন্যান্য নতুন যন্ত্রপাতির শিকার হতে রাজি নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিণামটা যে কী তা আমাদের জানা আছে: মেহনতের তুলনায় মজুরী কমা আর বেকার হওয়া।"

এক্ষেত্রে নতুন যন্ত্রকৌশল যে মানুষের আত্মমর্যাদা নিয়ে মানুষের মত বাঁচার পথে বাধা দিয়ে মানবাত্মার অপমান করছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু কেন হচ্ছে এ রকম? হচ্ছে এই জন্যে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের হর্তাকর্তা বিধাতাদের জপমালা ও গায়ত্রী-মন্ত্র হচ্ছে মুনাফা। মূলধনের মালিক ও শ্রমিকের যে সম্পর্ক সেখানে তো উৎপাদনের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রমিক ছাঁটাই করে এবং মজুরী কমিয়ে সেখানে মুনাফার টাকা নতুন যন্ত্রকৌশলের পিছনে ঢালা হয়। ফলে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু সেই সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বেড়ে চলায় উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করার বাজার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। কারণ বেকার যত বাড়ে কেনবার লোক ততই কমে। ফলে বাজারে মাল পড়ে থাকে। রাস্তায় নগ্নদেহ, নগ্নপদ লোকেরা ঘুরে বেড়ায় কাজের সন্ধানে, তাকিয়ে থাকে লুব্ধ দৃষ্টিতে দোকানের শো-কেসে সাজানো হরেক রকমের জামা কাপড় জুতার দিকে। জিনিষ রয়েছে, চাহিদা রয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশী, কিন্তু মাল বিক্রী হয় না। সেই মাল শেষ পর্যন্ত হয়ত পচিয়ে, নয় ফুটপাথে নয় "Reduction sale" এ বেচতে হয় কিন্তু তবু যার কাপড় জামা নেই সে কাপড় জামা কিনতে পারে না। যার জুতা নেই তাকে বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে কলকাতা সহরের পিচের রাস্তায় পা পুড়িয়ে হাঁটতে হয়, মুসৌরীর প্রচণ্ড শীতে গা হাত পা অসাড় হয়ে গেলেও সে গরম জামা কিনতে পারে না। দোকানে দোকানে জামা সাজানো থাকা সত্ত্বেও। কারখানার মালিকের পক্ষেও নতুন যন্ত্রকৌশলের পিছনে মজুর-মারা টাকা ঢেলে যতটা লাভ হওয়া উচিত ছিল তা হয় না। তবু সেই বিষাক্ত রাস্তা ছাড়া তাঁর গতি নেই, কারণ টাকা ছাড়া তিনি কিছু চিনতে শেখেননি। বেকারের দল যত কাঁপবে মজুরী নিয়ে দরাদরি করার ক্ষমতাও মালিকের তত বাড়বে। কিন্তু পণ্য বেচবার বাজার না বাড়াতে পারলে মজুরী কমিয়ে বা ছাঁটাই করে তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে পারে না।

দেশের লোকের তো কেনার ক্ষমতাই নেই। সুতরাং তখন তাঁর মতলবটা সমব্যবসায়ীকে পথে বসাবার দিকে যায়। তিনি যে মাল তৈরি করেন সেই মালের অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে সস্তায় মাল বাজারে ছাড়তে পারলে তাঁর বাজার বাড়ে। নতুন যন্ত্রকৌশল লাগাতে পারলে উৎপাদনের পড়তা খরচা কমে। তাই যিনি যন্ত্রকৌশলের পিছনে যত টাকা ঢালতে পারেন তিনি তত বেশি করে চুনোমাছ জাতীয় ব্যবসায়ীদের লালবাতি জ্বালতে বাধ্য করে নিজে রাঘব-বোয়াল হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু লোভের কোন শেষ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করেও দেশের সাধারণ লোকের অভাব অনটন বাড়তে থাকার দরুণ, সব মাল তিনি দেশে বেচতে পারেন না। তখন বিদেশী বাজারের দিকে তাকান তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে। শেষ পর্যন্ত দেশের মধ্যে তাঁর তৈরি মালের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেই মাল বিদেশে রপ্তানী করেন, মুনাফার অংশ তিনি অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেন। বিদেশে গিয়ে তাঁর মাল অন্য দেশের রপ্তানী করা মালের সঙ্গে বাজারে যদি টেক্কা দিতে পারে তবেই তাঁর লাভ। সেই পাল্লা ছুটে জেতবার জন্য পড়তা খরচা আরো কমাতে গিয়ে তিনি মজুরী আরো কমাতে চেষ্টা করেন আরো লোক ছাঁটাই করার শাসানি দিয়ে। না হলে নিজের মুনাফার অংক ঠিক রেখে বা বাড়িয়ে অন্য দেশের রপ্তানীকারকদের চেয়ে সস্তায় তিনি বিদেশী বাজারে মাল ছাড়বেন কি করে? সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনর্গল উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে পারে না। সেই সমাজের পাণ্ডারা যখন মজুরদের বেল্ট কষে পেটের গর্ত ছোট করতে হুকুম দিয়ে উৎপাদন বাড়াও শ্লোগান ছাড়ল, সেটা হচ্ছে মজুরদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা মাত্র। সেজন্যে যন্ত্রকৌশলের পূর্ণ ব্যবহার করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে সমাজ সমস্ত মানুষের চাহিদা মেটানকেই সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে করে যন্ত্রকৌশলের পূর্ণ সুযোগ নিতে পারে সেই যদি সে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের আধিপত্য

কায়েম করতে পারে। ইতিহাসে এই ধরণের বহু নজির আছে। তাম্রযুগের মিশরীয় স্বৈরতন্ত্রকে লৌহযুগের আবির্ভাবের পর গ্রীসের অপেক্ষাকৃত স্থায়সঙ্গত সমাজের জন্তে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারপর মধ্যযুগের শেষের দিকে ভারি যন্ত্রপাতির উদ্ভবের ফলে কুটির-শিল্পভিত্তিক সামন্ততান্ত্রকে নতুন আগন্তুক ধনতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হয়। সেদিনকার সেই প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের কাছে আজ "প্রাচুর্য" বা অত্যুৎপাদন একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভাবের জমিতেই তার ফসল ফলে, দুভিক্ষ হলেই তার লাভ। প্রাচুর্যের "বিপদ" দেখা দিলেই সে কৃত্রিম কৌশলে অভাবের সৃষ্টি করে। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রকৌশল শ্রমিকের পক্ষে যন্ত্রদানব। সেই সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতে পরাজয় বরণ করতে হবে, এই হচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ বিধান। সেই নতুন সমাজে সমস্ত লোকের ক্রয়ক্ষমতা থাকার ফলে দেশের বাজারে কোন সময়েই চাহিদার অভাব থাকবে না, এবং মজুরী দিনকে দিন বাড়বে বলে চাহিদাও বেড়ে চলবে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রকৌশলের কল্যাণে খাটুনি কমতে থাকবে। মস্কোর বল বেয়ারিং কারখানায় বছর চব্বিশেক আগে প্রথম স্বয়ং চালনা বৈঠক হয়। তারপর সেখানে একটি 'যান্ত্রিক হাত' তৈরি হয় তারপর আসে যুদ্ধ। যুদ্ধের পর নতুন উদ্যমে স্বয়ং চালনার দিকে মন দেওয়া হয়। আজ সেখানে গেলে দেখতে পাবেন, সুপরিসর পরিচ্ছন্ন শপগুলিতে ফুটন্ত লোহার বা তেলের দুর্গন্ধ নেই, অলিগলি দিয়ে কোন ট্রলির চলাফেরা নেই, কোথাও লোহার রড়তি পড়তি ছাঁটাই গাদা হয়ে পড়ে নেই। লোক নেই, জন নেই, কোন আওয়াজ নেই। মনে হবে যেন এক দৈত্য ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু কারখানায় কাজ বন্ধ হয়নি, মজুর ছাঁটাইও করা হয়নি। ১৯৫৫ সালের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে ৬০ ভাগ। চোখের অলক্ষ্যে যন্ত্র মানুষের হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়তার দরুণ যাদের সেখানে আর দরকার নেই তাদের অন্য কাজ দেওয়া হয়েছে মাইনে বাড়িয়ে। আর যারা নতুন করে তালিম নিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উপর খবরদারী করছে, তাদের মাইনে বেড়েছে দেড়গুণ, দ্বিগুণ। কাল তারা ছিল কায়িক-শ্রমিক। আজ তারা শরীরের পরিশ্রমের বদলে মাথার পরিশ্রম করেই খালাস অর্থাৎ যন্ত্রকৌশল ও স্বয়ংচালনা দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়ে আনছে। এটা মানুষের মর্যাদা ও গৌরব বাড়াচ্ছে না কমাচ্ছে? যন্ত্রের দৌলতে সোভিয়েতের মানুষের অবসর সময় বাড়বার ফলে সেই অবসরের জমিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব নতুন ফসল ফলবে, তা মানুষের মর্যাদা বাড়াবে না কমাবে? সে ক্ষেত্রে যন্ত্র দানব না দেবতা?

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রীকরণের গতিবেগের তুলনায় আজকে ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বয়ংচালনার গতিবেগ বেশি হবে। কারণ আজ বিজ্ঞানকে সচেতনভাবে উৎপাদনের কাজে লাগান হচ্ছে। কিন্তু স্বয়ংচালনা ব্যবস্থা যত বেশি চালু হবে ধনতন্ত্রের নড়বড়ে অবস্থা ততই বাড়তে থাকবে। বিভিন্ন ধনিকের মুনাফার হারের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকার ফলে বাজারে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে সুষ্ঠু ভাব থাকবে না। কাজে কাজেই গলাকাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠবে আরো সঙ্গীন। সেই সঙ্গে শিল্পের অত্যুন্নত যন্ত্রকৌশল এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ কৃষিব্যবস্থার মধ্যে ফাঁকটা আরো বেড়ে যাবে। এই ভাবে শুধু কোম্পানীতে কোম্পানীতে কেন, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেবে। ওদিকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির মধ্যে অসমানতা বাড়তে থাকবে, দূরত্ব বাড়তে থাকবে অত্যুন্নত শিল্পপ্রধান দেশ ও অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতির মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ঐ সব অনুন্নত দেশের অর্থনীতির মধ্যে 'সাহায্যের' নাম করে মিলিত হবার চেষ্টা করে শোষণের মতলবে। কিন্তু আজ সমাজতন্ত্রের দেশগুলি যন্ত্রকৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতি ও ব্যবহারের কল্যাণে আমাদের মত গরীব অনুন্নত দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নেবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রকৌশল, বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন কৌশল ধনিক শ্রেণীর উৎপাদিকা শক্তি ও শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয়শক্তির অন্তর্বিরোধ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করে তুলবে। কারণ মজুরী হিসাবে কম টাকা খরচ করে মালিকরা বেশি মাল তৈরি করতে পারবে। ফলে উৎপাদিকা শক্তির, জনগণের ক্রয়শক্তিকে ছাপিয়ে যাবার যে স্বভাবজাত ঝোঁক ধনতন্ত্রের মধ্যে আছে সেটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দরুণ আরো জোরদার হতে থাকবে—যার পরিণাম হবে অর্থনৈতিক সংকট। আসলে স্বয়ংচালনা ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের জিনিষ। মানুষের বুদ্ধি ও মেহনতের চরম পরিপ্রকাশ হিসেবে স্বয়ংচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার সফল পরিণতি ঘটতে পারে, সেই সমাজে যেখানে উৎপাদনের উপায় উপকরণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উদ্বৃত্ত মূল্য কাঁপিয়ে তোলবার হাতিয়ার না হয়ে সমগ্র সমাজের মালিকানায় থেকে উৎপন্ন সামগ্রী সমাজের সমস্ত মানুষের হাতে তুলে দেবে।

স্বয়ংচালিত যন্ত্রকৌশল ও পারমাণবিক শক্তি ধনতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে এক প্রচণ্ড ভাঙ্গনের শক্তি। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদিকা সম্পর্কের অন্তঃসংঘাতকে তারা বিস্ফোরণের মুখে নিয়ে যাবে। বিংশ শতাব্দীর সর্বহারা বিপ্লবের যুগে বৈপ্লবিক যন্ত্রশক্তিরূপে স্বয়ংচালনা ও পারমাণবিক শক্তি হবে সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত। বিপ্লবের গর্ভে যে নতুন সমাজের অভ্যুদয় হবে সেখানে মানুষকে তার রুজি-রুটির জন্ম দুর্ভাবনা করতে হবে না। ভাল ভাবে খেয়ে পরে অজস্র অবসর নিয়ে সে জ্ঞানচর্চা করতে পারবে। সেই সমাজের শেষ স্তরে মাইনে মজুরী বলে কিছু থাকবে না। কারণ যন্ত্রকৌশল ও বিজ্ঞানের দৌলতে তখন এত ভোগ্য সামগ্রী তৈরি হবে যে মজুরী বা মাইনের বাঁধন দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা বেঁধে দিয়ে পণ্যের বাজারে "রেশন" চালু রাখার দরকার হবে না। সকলে সাধ্যমত সমাজের সেবা করবে, সমাজ সকলকে খালি সমমূল্যের পারিশ্রমিক না দিয়ে প্রত্যেককে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের মত জিনিষপত্র দেবে। সেখানে সকলেই কর্মনৈপুণ্য অর্জন করে শ্রেণীবিভেদের অন্তরায় দূর হবার পরবর্তী অগ্রগতির অন্তরায় অর্থাৎ বল ও বুদ্ধির ব্যবধান দেবে ঘুচিয়ে, সকলেই হবে একাধারে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী। অতএব যে অতীতের পুনরুজ্জীবনকামী সু-সমাচার প্রচার করা আজ অনিশ্চয়তাবাদ ও অতীত পুজার বেদীতে বসে ঠাণ্ডা লড়াইএর যোদ্ধাদের রসদ ও বারুদ জোগাবার চেষ্টা করছেন, বায়রনের ভাষায় বলা যায় যে, যে হাতের গাঁটা একদিন তাঁরা খেয়েছেন আজ সেই হাতই তাঁরা চাটছেন এবং বুকের মধ্যে নিজের প্রতি ঘৃণায় জ্বলে মরছেন। যন্ত্র মানুষকে কি সুখ দেবে? তাঁদের এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে—হ্যাঁ দেবে, নিশ্চয়ই দেবে।

বীররমণী জুডিথ

শ্রীঅমল সেন

বীরাংগনা জুডিথের কীর্তি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে। জগতে জুডিথই প্রথম নারী, যিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন স্বীয় রূপ এবং বুদ্ধিকে ষোল আনা কাজে লাগিয়ে।

সে প্রায় দু' হাজার বছর আগেকার কথা—খৃষ্টধর্মের তখন জন্মই হয়নি, ইহুদি জাতি দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের দেশ ছিল জেরুজালেম। আজ এই ইহুদি জাতি খৃষ্টানদের অমানুষিক অত্যাচারে দুনিয়া থেকে লুপ্তপ্রায়,—আজ তারা গৃহহীন, দেশহীন, জাতিত্বহীন, যাযাবর; কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি, তখন তাদের দেশ ছিল, জাতি ছিল।

এই ইহুদি জাতিরই একটি শাখা আসিরীয় রাজার অন্যায় অত্যাচার সইতে না পেরে জেরুজালেমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন জেরুজালেম ছিল সবুজ পাইন আর দেবদারু গাছে ঢাকা ছোট পাহাড়ী দেশ—ইহুদিরা এই দেশটিকে খুব পছন্দ করেছিল আর ভেবেছিল, এই সুরক্ষিত জায়গায় এখন থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ—আসিরীয় রাজার অন্যায় অত্যাচার থেকে অন্ততঃ তারা মুক্ত।

সেখানে কয়েক বছর তারা খুব সুখেই দিন কাটালো। অবশেষে এক দিন তাদের ভুল ভাঙলো। আমরাও আমাদের গল্প আরম্ভ করবো সেই দিন থেকেই।

তখন সবে সূর্যোদয় হ'য়েছে, একজন পথিক একটা মস্ত বড় শাদা ঘোড়ায় চেপে ইহুদিদের নগরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। অচেনা লোক দেখে কৌতূহলী নর-নারীর দল ভিড় ক'রে দাঁড়ালো তার চার পাশে। সৈনিকের হাতে একখানা খোলা চিঠি—সে এসে দাঁড়ালো ইহুদিদের সর্দারের বাড়ীর দরজায়।

কিন্তু সর্দারকে আর ডাকতে হলো না, তিনি নিজেই বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, একজন আসিরীয় সৈনিক তার বাড়ীর দরজায় ব'সে—দেখে তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। ক্রমে তার বিস্ময় শংকায় পরিণত হ'লো। চিঠিখানা প'ড়েই তা হাতের মুঠোয় চেপে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময়ে সর্দার সৈনিককে উত্তরের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা ক'রতে ব'লে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে চিঠির কথা সমস্ত নগরে ছড়িয়ে প'ড়লো। যুবক-বৃদ্ধ-বালক সবাই শুনলো। তারপর একে একে তারা এসে সমবেত হ'লো সর্দারের বাড়ীতে—এক অজানা শংকায় থেকে থেকে কেবলই তাদের সকলের মন দুলে উঠছিলো।

শেষকালে সর্বসমক্ষে চিঠিখানা পড়া হ'লো। আসিরীয় সম্রাট জানিয়েছেন তিনি দিগ্বিজয়ে বের হবেন, তার জন্য ইহুদি প্রজাদের অন্তত হাজার সৈন্য দিয়ে তাঁকে সাহায্য ক'রতে হবে। অন্যথায় ইহুদিদের রাজ্য আক্রমণ ক'রে তিনি তা ধ্বংস ক'রে ফেলবেন।

চিঠি প'ড়ে সবাই খানিকক্ষণ নির্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে রইলো, কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সবাই ঝড়ের বেগে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা অপরিসীম অপমান আর বেদনা-বোধ তাদের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। তরুণরা অপমানে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো,—এ অপমান কিছুতেই তারা সহ্য ক'রবে না। আসিরীয়ার রাজা এক সময়ে তাদের মনিব থাকলেও আজ আর তিনি মনিব নন। সুতরাং তার এ অন্যায় আদেশ ইহুদিরা মানতে রাজী নয়।

ইহুদিদের সর্দার আসিরীয় দূতের চোখের সামনে রাজার সেই আদেশ-লিপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে বাতাসে উড়িয়ে দিলো। আসিরীয় রাজদূত শুধু হাতে নিজের দেশে ফিরে গেলো।

আসিরীয় দূত ফিরে গেলো। কিন্তু আসিরীয়রা যে এ-অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না এ-কথা ইহুদিরা ভালো ক'রেই জানতো। তারা তাই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

সমগ্র ইহুদি জাতি পবিত্র ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে এক বৃহৎ সংঘবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হ'লো। তারা কয়েক মাসের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ ক'রে সমস্ত নগরবাসীদের নিয়ে এক উঁচু পাহাড়ী দুর্গে এসে আশ্রয় নিল। দুর্গম অভেদ্য সে বন-দুর্গ। বাইরে থেকে এই দুর্গের অবস্থান সহজে লোকের চোখে পড়ে না।

কিছুদিন পরে আসিরীয় সম্রাটের বিরাট সৈন্যবাহিনী এসে ইহুদিদের নগরের মধ্যে প্রবেশ ক'রলো, কিন্তু তারা দেখে আশ্চর্য্য হ'লো, ইহুদিদের ঘর-বাড়ী সব শূন্য প'ড়ে আছে—কোথাও কোনো লোকজন নেই। সেনাপতি অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলেন, লোকজন সব গেলো কোথায়? কোথায় যেতে পারে? তাঁর সৈন্যরা সব বেরিয়ে প'ড়লো ইহুদিদের সন্ধানে। অবশেষে বহু কষ্টে ইহুদিরা যে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল সেই দুর্গের সন্ধান মিললো। কিন্তু দুর্গদ্বারে উপস্থিত হ'য়ে দেখলো, দুর্গতোরণ বন্ধ। বিপুল বেগে তারা গিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো সেই দুর্গের উপর, তাদের প্রচণ্ড আঘাতে দুর্গ-দুয়ার ঝন্-ঝন্ ক'রে কেঁপে উঠলো—কিন্তু ভাঙলো না। আঘাতের পর আঘাতেও তা রইলো অটুট, অব্যাহত। আসিরীয় সৈন্যদল শ্রান্ত হ'য়ে গভীর হতাশায় ব'সে প'ড়লো। সেনাপতি বললেন, পাহাড়ের চারদিক ঘুরে খুঁজে দেখো এই দুর্গের আর কোনো দিকে কোন দুয়ার আছে কি না।

সৈন্যরা তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো এবং নগর প্রদক্ষিণ ক'রে এসে জানালো, না হুজুর, এর চার দিকে খাড়া উঁচু পাহাড়—ঢোকার কোনো উপায় নেই।

ইহুদিদের দুর্গদ্বারে বিরাট আসিরীয় সৈন্যবাহিনীর ছাউনি প'ড়লো। তারা দিনের পর দিন দুর্গে প্রবেশের উপায় অনুসন্ধান ক'রতে লাগলো, কিন্তু কোনো উপায়ই মিললো না। এদিকে তাদের খাদ্য যদিও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিন্তু জল ফুরিয়ে আসতে লাগলো। বিশেষ চিন্তার কথা। জল ফুরিয়ে গেলে বিপদের আর অন্ত থাকবে না। সেনাপতি মশাই ভয়ানক চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন। তিনি কয়েক জন সৈন্যকে ডেকে ব'ললেন, দেখো, এটা পাহাড়ী দেশ, কাজেই এখানে জল না থেকেই পারে না। খুঁজে বের করো কোথায় ঝরণা আছে।

সৈনিকরা ঝরণার অনুসন্ধানে বের হলো।

ইহুদিরা শত্রুর ভয়ে দিনের বেলা কখনো ঝরণা থেকে জল নিতে আসতো না, পাছে শত্রুরা টের পেয়ে ঝরণা আটক করে। তা হ'লে তারা জলের অভাবে শুকিয়ে ম'রবে। তারা রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি শত্রুদের অলক্ষ্যে এসে ঝরণা থেকে কলসী ভ'রে

জল নিয়ে যেতো। কাজেই আসিরীয় সৈন্তরা সহজে এর সন্ধান পেলো না।

কিন্তু একদিন আসিরীয় সৈনিকদের কাছে এ রহস্ত ধরা পড়ে গেলো।

ঝরণার সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে সেনাপতি তো এক লাফে স্বর্গে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যাও, এক্ষুণি দু'শো তীরন্দাজ নিয়ে গিয়ে ঝরণা আটকাও। দিনে বা রাতে কোনো ব্যাটা ইহুদি যেন তা থেকে এক ঘড়া জলও না নিতে পারে।

এমনি ভাবে ইহুদিদের জলের উৎস অবরুদ্ধ হলো।

ইহুদিরা বিশেষ চিন্তিত ও শংকিত হয়ে উঠলো। আসিরীয় সৈন্তরা যদি এক মাসের পরও দিনের পর দিন অবরোধ চালাতে থাকে তা হলে উপায়? ইহুদিদের মুখে একটা চিন্তার কালোছায়া ঘনিয়ে এলো।

আর আসিরীয় শিবিরে উঠতে লাগলো ঘন ঘন উল্লাসধ্বনি।

দেড় মাস পরে—

আসিরীয় সৈন্তদের অবরোধ তুলে ফেলবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। ইহুদিদের দুর্গ তখনও অবরুদ্ধ। এদিকে সঞ্চিত জল ফুরিয়ে গেলো। প্রথম দু-চারদিন ইহুদিরা মুখ বুজে জলের অভাব সহ্য করতে চেষ্টা করলো—কিন্তু জলের কষ্ট কি সওয়া যায়? তারা দু-চারজন মরিয়া হয়ে ছুটে গেলো শত্রুর কবল থেকে ঝরণা উদ্ধার করতে—ফল হলো মৃত্যু। শত্রুর বিষমাখা তীর এসে তাদের কণ্ঠ বিদ্ধ করলো।

শেষ কালে জলের অভাব তীব্র হয়ে উঠলো, সমস্ত নগরময় হাহাকার উঠলো—জল, জল! জলের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে সবাই পাগলের মতো ছুটে গেলো সর্দারের কাছে। কিন্তু সর্দার কি করবেন? তারা তৃষ্ণায় পাগল হয়ে গর্জে উঠলো, এ স্বাধীনতা আমরা চাই না। যে স্বাধীনতা আমাদের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণায় জলটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারে না তেমন স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কি হবে? আমরা বাঁচতে চাই। তুমি আমাদের অনুমতি দাও সর্দার, আমরা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

কিন্তু সর্দার অবিচলিত। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, না, তা হয় না।

তারা আবার চীৎকার করে উঠলো, হয় না? কেন হয় না শুনি? সর্দার সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, ভাই সব, তোমরা যে এতো দুর্বলচিত্ত তা আমি জানতুম না। সময় যখন ভালো থাকে তখন বীরত্ব অনেকেই দেখাতে পারে। খাঁটি বীরত্বের পরীক্ষা হয় দুঃসময়ে। জাতির স্বাধীনতা নিয়ে যেখানে প্রশ্ন সেখানে এর চাইতেও যাতনা, এর চাইতেও হৃদয়বিদারক দুঃখ দেখে বুক ফেটে গেলেও তা সইতে হবে। আজ শত্রুর কাছে নতজানু হ'য়ে জল ভিক্ষা ক'রে তৃষ্ণার দাবদাহ থেকে প্রাণ হয় তো বাঁচাতে সমর্থ হবে, কিন্তু তার পর? তার পর দীর্ঘ দিন দীর্ঘ যুগ জাতির ভবিষ্যৎ যে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে থাকবে, তার কথা ভেবে দেখেছো কি? ভেবে দেখেছো কি—পরাধীনতা এর চাইতেও শোচনীয় মৃত্যু, এর চাইতেও তিক্ততর বেদনা? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তখন অহরহ যে অভিশাপ দেবে, তারা যে অশ্রু বিসর্জন ক'রবে তার দাহ কবরেও যে আমাদের তিষ্ঠোতে দেবে না!

তবে কি করবো সর্দার? এ তৃষ্ণার জ্বালা যে আর সইতে পারি না!—তাদের উত্তপ্ত কণ্ঠ ধীরে ধীরে শান্ত হ'য়ে এলো।

সর্দার ব'ললেন, আজ তোমরা সবাই যে যার ঘরে ফিরে যাও ভাই! গিয়ে দেবতার চরণে প্রার্থনা করো, বলো, আমাদের বাঁচাও, তৃষ্ণার দাহ থেকে আমাদের রক্ষা করো! পরাধীনতার বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত রাখো। তার পরেও যদি কিছু না হয় তখন দেখা যাবে পরামর্শ ক'রে।

কী ক'রবেন তখন সর্দার? সর্দার চেয়ে দেখলেন একটি মেয়ে, তার চোখে-মুখে অপূর্ব দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে—দেবতার কাছে প্রার্থনা ক'রেও যদি আপনাদের ঈপ্সিত ফল না মেলে তা হ'লেই কি আপনারা আপনাদের দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশী শত্রুর পায়ে উৎসর্গ ক'রবেন? চকিতে সবাই মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালো।

এই-ই জুডিথ।

তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো তার কণ্ঠ,—নিরাভরণা, রুক্ষকেশ, জ্যোতির্ময়ী অপূর্ব যুবতী বিধবা। সকলেই বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—জুডিথ!

জুডিথ তার কণ্ঠকে আরো তীক্ষ্ণ, আরো ঝাঁঝালো ক'রে জবাব দিলো, হাঁ, আমি জুডিথ। আমি জানতে চাই, এই কি বিশ্বাস-পরায়ণ ইহুদিদের মতো কথা? এই কি মানুষের কাজ? দেবতা কি আমাদের গোলাম? সে কি কারুর তোয়াক্কা রাখে যে আমরা তার ওপরে হুকুম চালাবো? কতদিনে তিনি দয়া ক'রবেন তা তাঁর ইচ্ছা—পাঁচ দিনেও ক'রতে পারেন, পাঁচ হাজার দিনেও ক'রতে পারেন, ততদিন কি আমরা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকবো? আর যদি প্রার্থনা বিফল হয় তখনই কি আমরা মাটিতে লুটিয়ে প'ড়বো অসহায়ের মতো? আমরা কি মানুষ নই? নিজেদের স্বাধীনতার জন্ত যদি আমরা নিজেরা যুদ্ধ ক'রতে না পারি তবে মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম কেন? আপনারা আত্মসমর্পণের কথা ভুলে যান। সবাইকে একথা বেশ পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিন—আমরা পিপাসায় তিলে তিলে শুকিয়ে মরবো তবু শত্রুর কাছে মাথা নোয়াবো না।

সর্দারের মনে হ'লো, ভগবানের আদেশবাণী যেন জুডিথের মধ্য দিয়ে আজ আত্মপ্রকাশ ক'রছে। তিনি ব'ললেন, তবে তাই হোক মা! পুণ্যবতী তুমি, তোমার কথা কখনো মিথ্যা হবার নয়। সর্দারের আদেশে সবাই যে যার বাড়ী ফিরে গেলো। জুডিথও বাড়ী ফিরে এলো।

সেদিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জুডিথ স্বপ্ন দেখলো। দেখলো, সেই শৈলশিখরে দাঁড়িয়ে সে একা—আকাশ দিয়ে নিরাশার কালো ঢেউ ছুটে আসছে—নীচে তৃষ্ণার্ত নর-নারীর বুকফাটা চীৎকার। এমন সময়ে কে যেন তাকে উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলো, জুডিথ! এ জাতিকে নিরাশার হাত হ'তে, পিপাসার হাত হ'তে বাঁচাবার ভার তোমার।

জুডিথ ব'ললো, দীনা নারী আমি, আমার সে শক্তি কোথায় প্রভু?

উত্তর হ'লো, তুমি দীনা নও। চেয়ে দেখো, শক্তি তোমার নিজের মধ্যে—তোমার রূপে, তোমার মেধায়, তোমার নির্ভীকতায়।

কে এই জুডিথ? সকল কালের সকল দেশের স্বাধীনতার পূজারীদের ইনি নমস্যা।

মিরারী—ইহুদির আদরের কন্যা জুডিথ। অপূর্ব সুন্দরী, দেখে মনে হ'তো যেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী দুধপাথর খোদাই ক'রে এক জীবন্ত নারী-প্রতিমা সৃষ্টি ক'রেছেন, চাইলে চোখ ফেরানো যেতো না। একদিন মানাসেসের সংগে তার বিয়ে হ'য়ে গেলো।

কিন্তু কয়েক দিন বাদেই জুডিথ বিধবা হ'লো। মানাসেস অনেক ধনদৌলত রেখে মারা গিয়েছিল, কিন্তু জুডিথ ধনদৌলতের জন্য লালায়িত ছিল না। স্বামীর শোকে সে সন্ন্যাসিনীর মতো হ'লো—নিরাভরণা, উপবাসক্ষীণা, রুক্ষকেশ, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জিত। এমনি ভাবে জুডিথের দিনের পর দিন কাটছিলো।

কিন্তু সেদিন ভোরের আলোয় তার স্বপ্ন ভেঙে গেলো, সে চোখ মেলে চাইলো। সবাই অবাক হ'য়ে দেখলো, জুডিথ যেন আর সে জুডিথ নেই। কী অপূর্ব এক আনন্দ এবং আত্মতৃপ্তির আলোকে যেন তার এতদিনকার জমাটবাঁধা অন্ধকার দূর হ'য়ে মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

সারাটা দিন জুডিথ আনন্দ ক'রে কাটালো, সন্ধ্যাবেলায় সর্দারকে ডেকে এনে নিরিবিলিতে দু'জনে অনেকক্ষণ কি যেন পরামর্শ ক'রলো। তারপর জুডিথ তার পরিচারিকাকে ডেকে ব'ললো, আমায় সুন্দর ক'রে সাজিয়ে দাও তো?

বৃদ্ধা পরিচারিকা জুডিথের একথা প্রথমটা বিশ্বাস ক'রতে পারছিল না, ভাবলো, জুডিথ ঠাট্টা ক'রছে।

জুডিথ তার মুখ দেখে তার মনের ভাব বুঝতে পারলো, ব'ললো, হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছো কি? তোরঙ থেকে আমার ভালো ভালো গয়না-পত্তর জামা-কাপড় সব বের ক'রে নিয়ে এসো। আমি আজ অভিসারে যাবো।

পরিচারিকা আর কোনো কথা না ব'লে তার আদেশ মতো জিনিষপত্র এনে জুডিথকে সাজাতে ব'সলো। বসন-ভূষণে রত্নালংকারে তিলোত্তমা সেজে জুডিথ বের হ'লো অভিসারে। সংগে সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা। পরিচারিকার হাতে চার-পাঁচদিনের উপযুক্ত খাবার আর সেখানে গিয়ে প'রবার মতো কাপড়-চোপড়! পরিচারিকা জানে না কোথায় তারা যাচ্ছে।

নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুকে পথ রচনা ক'রে চ'লেছে দুটি নারী। জুডিথ আগে আগে, পিছনে সেই কৌতূহলী পরিচারিকা। দু'জনে পাহাড়ী পথ বেয়ে তর-তর ক'রে নীচে নামতে লাগলেন। নগরের সীমান্তে পৌঁছানোমাত্র দ্বারী দ্বার খুলে দিলো, জুডিথ বাইরে শত্রু-শিবিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। সবাই এসে ভিড় ক'রে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো, চার দিকে লুব্ধদৃষ্টি। কিন্তু জুডিথ সেদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে পরম নিশ্চিন্তভাবে ব'ললো,—তোমাদের সেনাপতি মশাই কোথায়?

একজন প্রশ্ন ক'রলো, তার কাছে তোমার কি দরকার?

জুডিথ উত্তর দিলো,—আমি একজন হিব্রু নারী, আর এই আমার পরিচারিকা। বিনা শত্রুক্ষয়ে ইহুদিদের দেশ জয় করার ফন্দী আমি জানি।

সবাই কোলাহল ক'রে উঠলো এক সংগে—কি? কি ফন্দী?

জুডিথ তাচ্ছিল্যের সুরে ব'ললো, তোমাদের সেনাপতি ছাড়া আর কাউকেই তা ব'লবো না।

অগত্যা জুডিথকে আর তার পরিচারিকাকে সেনাপতির কাছে হাজির করা হ'লো।

জুডিথের অতুলনীয় রূপ দেখে সেনাপতি মুগ্ধ হ'লেন। এমন সুন্দরী মেয়ে তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে সেনাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কি চাই তোমার?

আমি আপনাদের বিনা সৈন্যক্ষয়ে শত্রুজয় করার উপায় ব'লে দিতে পারি,—জুডিথ ব'ললো

সেনাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তাতে তোমার কি লাভ?

এক অদ্ভুত কুটিল হাস্যে সেনাপতিকে মুগ্ধ ক'রে জুডিথ ব'ললো, সেনাপতি মশাই, কেউ যদি আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহলোকের সর্বোত্তম রত্ন লুণ্ঠন ক'রে নিতে আসে তো কি দণ্ড আপনি তার বিধান করেন?

মুণ্ডচ্ছেদ!

আমিও তাই ক'রবো সেনাপতি! নগরের কেউ আমাকে সাহায্য ক'রতে পারবে না। তাই তো বেরিয়ে এসেছি প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে।

তাহ'লে তুমি আমাদের শিবিরেই থাকছো তো?

হাঁ, আপাতত তো আছি। দরকার মতো নগরে ঢুকে সংবাদাদি নিয়ে আসবো।

জুডিথের বাস করার জন্য একটি পৃথক তাঁবু ছেড়ে দেওয়া হ'লো। তার পর এলো রাশি রাশি খাবার, কিন্তু সে খাবার জুডিথ স্পর্শও ক'রলো না। তার নিজের সংগের খাবারই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এমনি ক'রে জুডিথ শত্রু-শিবিরে আস্তানা ক'রলো।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেলো—জুডিথ বসে বসে শত্রু-ধ্বংসের অবসর খুঁজছিলেন। অবশেষে এক দিন সে অবসর এলো। সেনাপতি রাত্রে জুডিথকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন,—জুডিথ সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা তো করলেনই না বরং সাগ্রহে তা গ্রহণ করলেন। এই-ই তার শত্রু ধ্বংস করবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি বুঝলেন, এই-ই শ্রেষ্ঠ লগ্ন স্বাধীনতার মন্দিরে পূজা দেবার। অনেকক্ষণ ব'সে তিনি দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানালেন,—দেশকে শত্রুর হাত হ'তে মুক্ত করবার জন্য আমার এ রূপ নিয়ে খেলা, আমার এ প্রেমের অভিনয়—এর জন্য নারীর রূপকে তুমি অভিসম্পাত ক'রো না ঠাকুর! তুমি আজ আমার রূপকে শতগুণে বর্ধিত করো।

সেনাপতির স্ফূর্তিতে সেদিন জোয়ার ডাকলো। স্বয়ং জুডিথ—মনোমোহিনী রূপসী, অপূর্বশোভনা জুডিথ আজ মদদাত্রী। কাজেই পানের মাত্রা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলো। পেয়ালার পর পেয়ালা নিঃশেষ হচ্ছে। শেষে এমন হ'লো যে, আর মাথা তোলার শক্তি নেই। সেনাপতি শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। জুডিথ একা,—তখন ঘরে আর কেউ নেই। গভীর রাত্রি।

জুডিথ সচকিত হ'য়ে দাঁড়ালো। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু,—তাকে ধ্বংস করার এই তো উপযুক্ত সময়।

ক্ষিপ্রহস্তে বসনের তল হ'তে একখানা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ছুরিকা

বের ক'রে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে একবার ঈশ্বরের নাম নিলো জুডিথ, তার পর সেই ছুরি সজোরে সেনাপতির গলায় বসিয়ে দিলো,—শির স্কন্ধচ্যুত হ'লো। সেনাপতি একবার হুঁ-হাঁ করারও অবসর পেলো না। জুডিথের হাত রক্তে রঙীন হ'য়ে উঠলো।

পরিচারিকা এতক্ষণ বাইরে বসেছিল। জুডিথের আহ্বানে ভিতরে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। জুডিথ বিনা বাক্যে স্থির অকম্পিত হস্তে সেনাপতির ছিন্নমুণ্ডটা ধ'রে পরিচারিকার ঝুড়িতে তুলে দিলো।

পরিচারিকা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

জুডিথ বললো, চলো, এখনই আমাদের নগরে ফিরতে হবে।

দু'জনে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো, কেউ তাদের বাধা দিলো না। কারণ তেমন হুকুম ছিল না। অন্ধকার ভেদ করে দুজনে এসে নগরের তোরণের কাছে দাঁড়ালো,—তোরণদ্বার খুলে গেলো। সেনাপতির মুণ্ডটা নগর-সীমান্তে ঝুলিয়ে রেখে জুডিথ খুব জোরে রণভেরীতে ঘা দিলো। পূর্ববন্দোবস্ত মতো হাজার হাজার বীর ইহুদি যুবক অস্ত্র হাতে নিয়ে ছুটে এলো। আবার নগর-তোরণ খুলে গেলো।

আসিরীয় সৈন্যরা এ-সবের কিছুই টের পায়নি। টের পেলো যখন তখন চারিদিকে ইহুদি-সৈন্য। সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, সেনাপতি কোথায়? সেনাপতি কোথায়? সেনাপতির তাঁবুতে দলে দলে সৈন্য ছুটে গেলো, গিয়ে দেখে, সেনাপতির ধড়টা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সৈন্যরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়লো। সেনাপতির মৃত্যুতে ভীত হ'য়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো।

পরদিন যখন পূবের আকাশ লাল হ'য়ে উঠলো, দেখা গেলো, প্রান্তর আসিরীয় সৈন্যদের শবে পরিপূর্ণ। একটি জীবিত আসিরীয় সৈন্যও সেখানে নেই।

বীরাংগনা জুডিথের কীর্তি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো। জুডিথই বোধ হয় জগতের ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রথম পূজারিণী।

ব্যর্থ সাধনা

শ্রীবেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনেতে ছিল যে নীরব বাসনা
তোমারই অর্ঘ করিব রচনা
আমারই নীরব সাধনা দিয়া,
তুমি তো জানিতে মনের বাসনা
চিরদিন আমি করেছি কামনা
তোমারে লভিব শ্রেষ্ঠ সাধনা দিয়া।

মনে ছিল আশা, সাধ্য ছিল না সে সাধ সাধিতে,
তবু নিশি-দিন করেছি কামনা
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধনা
কঠোর সাধনা দিয়া।

কত যন্ত্রী শুনায়েছে গান, তোমার যন্ত্র আনি
মোর গীতহীনা বীণা পড়ে থাকে
তোমারই বেদীর পরে,
ওগো, একটু করুণা লাগি
ব্যর্থ হবে কি মোর শ্রেষ্ঠ সাধনাখানি?

তুমি তো জান, এক তান
আমি সেধেছি শতেক বার,
তবুও তোমার কটাক্ষ হয়েছে যে উপহার,
তুমি জান ওগো, করি নাই হেলা
তোমারে শোনাতে মোর এই দীন বীণা
করেছে প্রয়াস শতেক বার।

তোমার শ্রবণে হইবে মধুর
ভাবিয়া মনেতে বৃথাই আমি যে সেধেছি সুর,
বৃথাই হবে কি এ সুর সাধনা নীরব বাসনা মোর?
মনেতে ছিল যে অনেক আশা
আমার সুরেতে ফুটিবে সে ভাষা;
আজি এনেছি বহিয়া ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
ফেরাও মুখ, করো গো একটু করুণা দান।
ফেল গো অশ্রু একটি বিন্দু করুণাখানি,
সব হতে তবে সার্থক হবে মোর ব্যর্থ সাধনাখানি।

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

নিমাই-ই নতুন কৃষ্ণ। একাধারে রাধাকৃষ্ণ। কৃষ্ণই 'রসানাং রসতমঃ'। সর্বভূতমনোহর। 'যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন, সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।' ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিত। কৃষ্ণের তিনটি বাঁশি। বৈণবী, হৈমী আর মণিময়ী। যখন গরু চরায় তখন সহচর রাখালদের আনন্দ দেবার জন্যে বৈণবী বাজায়। যখন গোপীদের আকর্ষণ করবে তখন বাজায় হৈমী। আর মণিময়ী? যখন সম্মোহিত করবে ত্রিজগৎকে। যখন মত্ত ময়ূর নৃত্য করবে আনন্দে। কৃষ্ণসারগেহিনী হরিণী মুগ্ধ হয়ে ছুটোছুটি করবে, কখনো বা গাঢ় প্রণয়দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকবে স্থির হয়ে। যখন স্তনক্ষরিত ফেনগ্রাস খেতে ভুলে যাবে গোবৎসেরা। প্রণতভারবিটপী ফলে-পুষ্পে মধুধারা বর্ষণ করবে। আবর্তছলে ভাবোচ্ছ্বাস জাগবে নদীতে। কৃষ্ণের তিন বাঁশি তাই আনন্দিনী, আকর্ষিণী আর সম্মোহিনী। যার আকর্ষণে বক্ষো-বিলাসিনী লক্ষ্মী পর্যন্ত আকৃষ্ট। 'যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।' যার 'পীরিতিময় প্রতি অঙ্গ', যে 'কেবল রসনিরমাণ'। সৌভাগ্যের 'পরং পদং', ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ।

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্যসিন্ধু। ক্ষীরোদকশায়ী। 'আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি ক্ষীরোদবিহারী।' কৃষ্ণের রূপ অসমোর্ধ্ব, অসম আর অনূর্ধ্ব, অর্থাৎ এর সমানও কিছু নেই, অধিকও কিছু নেই। এরূপ অনন্যসিদ্ধ, কোনো কৃত্রিম আভরণের ধার ধারে না। সকলসৌন্দর্যসারসন্নিবেশ। এ রূপ অপরিকলিতপূর্ব। এমনটি আর দেখিনি কখনো, শুনিনি কখনো। যত দেখি ততই অদেখা থেকে যায়। নিজের মাধুরীতে কৃষ্ণের নিজেরও অতৃপ্তি। যেহেতু নিজের রূপ নিজে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ আস্বাদন করতে পারছে না। 'দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী। আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥'

এই আস্বাদনের একমাত্র সামর্থ্য রাধিকার। মাদনাখ্য মহাভাবের যে অধিকারী। কে রাধিকা? যে আরাধনা করে সেই রাধিকা। যে গোবিন্দের আনন্দিনী। যে সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। ভাবের পরমাকাষ্ঠা। যার প্রথম স্নান কারুণ্যামৃত-ধারায়, দ্বিতীয় স্নান তারুণ্যামৃতধারায়, তৃতীয় স্নান লাবণ্যামৃতধারায়। স্নানশেষে পরেছে কী! 'নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ি পরিধান।' দ্বিতীয় বসন নেই? আছে। 'কৃষ্ণ-অনুরাগ-রক্ত দ্বিতীয় বসন।' বুক ঢেকেছে কী দিয়ে? প্রণয়-মান কঞ্চুলিকায়। অঙ্গানুলেপন করছে না? করছে বৈ কি। তবে তার উপাদান কী? নিজকান্তি কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন, আর অধরের হাসিটুকু কর্পূর। কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসই মৃগমদ, তার কলেবরের চিত্রলেখা। প্রেমকুটিলতাই দুই চোখের কজ্জল, অনুরাগই অধরের অরুণিমা। চারু ললাটে সৌভাগ্যের তিলক, প্রেমবৈচিত্ত্যই বুকের মধ্যমণি। সর্ব অঙ্গে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, গর্ব, আবেগ, জাড্য, ব্রীড়া, চিন্তা। কৃষ্ণনাম-গুণযশই কর্ণভূষণ। কৃষ্ণনামগুণযশই রসনার দীপ।

রাধিকাই একমাত্র দর্পণ, নির্মল সৎপ্রেমদর্পণ, যাতে কৃষ্ণমাধুর্য ঠিক-ঠিক প্রতিফলিত হতে পারে। আবার সেই প্রতিফলিত জ্যোতি কৃষ্ণে পড়ে কৃষ্ণমাধুর্যকে আরো মোহনীয় করে তোলে। 'মন্মাধুর্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি।' যত পান তত পিপাসা। যত স্পৃহা তত প্রীতি। যত প্রেম তত

মাধুর্য। যত মাধুর্য তত প্রেম। শুধু ইন্দ্রিয় থাকলেই কি দর্শন চলে? আর শুধু দর্শনেই কি আস্বাদন? চন্দ্র তো চিরমধুর, কিন্তু সেই মাধুর্য সেই পরিপূর্ণ আস্বাদন করতে পারে যার চোখে প্রেম আছে। যতটুকু প্রেম ততটুকুই ভোগ। কৃষ্ণ তো মধুরের সম্রাট, আর, কে এমন ব্রজবাসী আছে যে না ভালোবাসে কৃষ্ণকে? কিন্তু ব্রজবাসীদের ভালোবাসা আংশিক, পূর্ণতমের চেয়ে সব সময়েই কম। পূর্ণতম প্রেম একমাত্র রাধিকায়। রাধিকায়ই একমাত্র প্রৌঢ় নির্মল পরিপক্ক প্রেম, রাধিকায়ই ভাবের একমাত্র অবধি। সুতরাং রাধিকায়ই কৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনের পরিপূর্ণ অধিকার। রাধিকাই স্বাদ-শক্তিগরীয়সী।

দর্পণে নিজের মাধুরী দেখে কৃষ্ণের আবার ইচ্ছে হয় নিজেকে আস্বাদন করি। মানুষের এই ইচ্ছেই স্বাভাবিক যে আমার মাধুর্য অন্যে আস্বাদন করুক। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা লোকাতীত। তার ইচ্ছা, আমার মাধুর্য আর সকলে আস্বাদন তো করবেই, আমিও করি। এই-ই স্বভাব, এই-ই স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণমাধুরীর। আর সে পরিপূর্ণ আস্বাদন কি করে সম্ভব যদি না রাধাভাবে উদ্ভাসিত হই। তাই কৃষ্ণের রাধিকাস্বরূপ হবার উৎকণ্ঠা। কিন্তু রাধিকা হতে পারে না বলেই কৃষ্ণের খেদ। 'কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ। সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ।' কিন্তু কৃষ্ণে কই সেই রাধাভাব?

কৃষ্ণের ক্ষোভের নিবারণ হল শ্রীচৈতন্যে। হল স্বাদবাঞ্ছার পরিপূর্তি। রাধিকার ভাব আর কান্তি অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হলেন নবদ্বীপে।

> 'পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
> রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
> নবদ্বীপে শচী গর্ভ-শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
> তাহাতে প্রকট হৈল কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥'

১০

দেখ পড়ায় কেমন মন আমাদের নিমাইয়ের! বাড়ির বার হয় না ছেলে। সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকে। বাবা-মায়ের চোখের আড়াল হয় না। লেগে থাকে ছায়ার মত।

বিশ্বরূপ একখানা পুঁথি রেখে গেছে তার জন্যে। বড় হয়ে পড়তে বলেছে। কবে বড় হবে না জানি। কবে সব বুঝবে দাদার মত।

যাবার আগে বিশ্বরূপ ডাকল মাকে। বললে, 'মা, এই পুঁথিখানা তোমার কাছে রাখো।'

'কেন বল তো?'

'বড় হলে পড়তে দিও নিমাইকে।'

'সে কি,' অবাক হলেন শচী দেবী, 'তুই নিজেই তো দিতে পারবি। আমাকে টানছিস কেন? তোর পুঁথি তোর কাছেই থাক।'

বিশ্বরূপ হাসল। বললে, 'আমি যদি দিতে পারি, ভালো কথা। কিন্তু ঘটনার স্রোত কখন কোন দিকে যায়, আগে-পরে কে কবে মরে-বাঁচে, কে বলতে পারে? আমি বলছি, রেখে দাও তোমার কাছে।'

তখনো কিছু বোঝেন নি শচী দেবী। রাখলেন ছেলের কথা। রাখলেন পুঁথি।

খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, নিমাইকে পাঠালেন অদ্বৈতসভায়, দাদাকে ডেকে আনতে।

কিন্তু কোথায় বিশ্বরূপ! এখানে-ওখানে কোনোখানে সে নেই, নেই বুঝি বা সংসারসীমানায়। কান্নার রোল উঠল বাড়িতে। দাদা নেই, নিমাই লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। আর নিমাই যখন কাঁদছে তখন আর সব ভুলে আগে নিমাইকে শান্ত করো। নিমাই-ই তো সর্বঋণের পরিশোধ।

এই একজন বিমুখ সংসারে কৃষ্ণ-নাম করছিল, নবদ্বীপে বলাবলি করছে সবাই, সেও ছেড়ে গেল আমাদের। বিশ্বরূপই যদি বনে যায় তা হলে আমরাও তার সঙ্গী হব। কী সুখ হল কৃষ্ণ-নামে, 'পাষণ্ডীর' দল যখন উপহাস করবে তখন সইবে না বাক্যজ্বালা। আমরাও তাহলে কৃষ্ণ-তৃষ্ণা ছেড়ে দেব। সংসারকেই সার মানব। বাড়াব না প্রহসন।

কিন্তু অদ্বৈত টলে না। জগন্নাথের আঙিনায় সে হরিনামের ধ্বনি তোলে। বলে, হরিতেই সমস্ত হরণের পরিপূরণ। সর্বশূন্যের পূর্ণায়ন।

অদ্বৈতের উৎসাহে আর সকলেও প্রাণ পায়। আশায় বুক বাঁধে। কণ্ঠের সুর মেলায়। হরিধ্বনির লহর তোলে।

শিশুদের সঙ্গে নিমাই খেলছিল বাইরে, হঠাৎ খেলা বন্ধ করে বলে উঠল: 'আমাকে ডাকছে বাড়িতে।'

'তোকে আবার কখন ডাকল?' সঙ্গীরা আপত্তি করল।

'হ্যাঁ, ঐ যে, পাচ্ছিস না শুনতে?' ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল নিমাই।

নিমাইকে ছুটে আসতে দেখে সবাই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলে: 'কি রে, কি হয়েছে? কি চাই? আসছিস কেন হন্তদন্ত হয়ে?'

'বা রে, আমাকে ডাকলে যে তোমরা।' নিমাই তাকাতে লাগল চারদিকে।

'না তো, তোমাকে ডাকি নি তো কেউ। সবাই মিলে হরিকীর্তন করছিলাম।'

'ও, ডাকো নি বুঝি!' নিমাই আবার ছুটে চলে গেল খেলাস্থলে।

যাকে ডাকছে সে কে, নিমাই-ই বুঝি বুঝতে দিতে চায় না।

'নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।' অনেকে একত্র হয়ে স্ফুটকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করাই কি শুধু সঙ্কীর্তন? না। একলা বসে সম্যক কীর্তনও সঙ্কীর্তন। সম্যক কীর্তন কী? স্পষ্ট স্বরে নামের যথার্থ উচ্চারণই সম্যক কীর্তন। তাই সজনেই হোক, নির্জনেই হোক, দলবদ্ধ হয়েই হোক বা একাকীই হোক, যখনই নাম করবে শব্দ করে করবে। শব্দেই গাঢ় হবে অভিনিবেশ। দূরে যাবে চিত্ত-বিক্ষেপের সম্ভাবনা। সংযত হবে বাগিন্দ্রিয়। আর কে না জানে রসনাই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। রসনা বশীভূত হলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রশমন। তাই উচ্চঘোষে নাম করো। অনুচ্চে বা নীরবে নাম করলে কি ফল হবে না? আর সব ফল হবে শুধু প্রেম জাগবে না। নীরবে কি প্রেমসম্ভাষণ হয়? নৈঃশব্দ্য কি জাগাতে পারে প্রতিধ্বনি? তা ছাড়া উচ্চস্বর কীর্তনেই তো হতে পারে পরসেবা। বাঘের সঙ্গে নাচতে পারে হরিণ, সাপের সঙ্গে ময়ূর। পরস্পরকে চুম্বন করতে পারে। হরিদাসের ঘরের দুয়ারে বসে বেশ্যা হতে পারে বৈষ্ণবী।

প্রতিদিন এক লক্ষ নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করে হরিদাস। লক্ষহীরা তাকে ভ্রষ্ট করতে এসেছে, ব্যক্ত করেছে তার যৌবনের অভিলাষ। হরিদাস বলছে, অপেক্ষা করো, আমার নাম-সঙ্কীর্তন আগে শেষ হোক। তুমি ততক্ষণ বসে শোনো এই নামধ্বনি। নাম শেষ হলে তুমি যা চাও তাই হবে।

'হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সঙ্কীর্তন।
নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥'

নাম শোনবার পর তোমার যে মন হয়, অর্থাৎ তখন তোমার মনে যে বাসনা আসে তা চরিতার্থ করব। নাম শুনতে-শুনতে প্রস্তর দ্রবীভূত হল, সংখ্যাপূরণের পর লক্ষহীরার মনে জাগল শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা। 'তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি। দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে হরি-হরি।'

নামই পূর্ণতা-দাতা। নববিধা ভক্তির জনয়িতাও নাম। সর্ববেদ, সর্বতীর্থ, সর্বসৎকর্ম থেকেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। নামই পরম উপায়।

পড়ায় খুব মন দিয়েছে নিমাই। যা পড়ে তাই মনে রাখে, শোনামাত্রই সমস্ত প্রচ্ছন্ন অর্থ প্রকটিত করে। এমন সুবুদ্ধি শিশু আর দেখিনি কোথাও, পণ্ডিত-ছাত্র সবাই বলে একবাক্যে, বলে বিদ্যায় এ বৃহস্পতিকে অতিক্রম করবে।

দেখে-শুনে শচী খুব খুশি। কিন্তু জগন্নাথ বিষাদগম্ভীর। বলে, 'বিশ্বরূপেরও এমনি মতি ছিল অধ্যয়নে। সমস্ত শাস্ত্রপাঠ শেষ করে শেষ পর্যন্ত এই শিখল, সংসারে তিলমাত্র সত্য নেই, আর তাই জেনে বিষয়সুখ তুচ্ছ করলে। তোমার এই ছেলেও বিদ্যার অমনি ব্যাখ্যা করবে, সংসার ছেড়ে চলে যাবে অরণ্যে। সুতরাং ওর আর পড়ে কাজ নেই।'

'মূর্খ হয়ে থাকবে?' শচী দেবী আরেক রকম ভয় দেখলেন।

'তবু ঘরে তো থাকবে। থাকবে তো চোখের উপর।' বললেন জগন্নাথ।

'কিন্তু মূর্খ হয়ে থাকলে ওকে খাওয়াবে কে?' শচীর আরেক রকম নালিশ।

'যে সকলের পোষণ-পালন করছে সেই কৃষ্ণ খাওয়াবে। এই আমাকেই তো দেখছ। এত বিদ্যার্জন করেও কেন এত দারিদ্র্য? আর দেখ, যে ভালোমত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না তার দুয়ারে সহস্র পণ্ডিতের ভিড়। বিদ্যায় কিছু হবে না, যদি হয় তো হবে গোবিন্দের আনন্দে।'

আঁচলে চোখ ঝাঁপলেন শচী দেবী। 'মূর্খ হয়ে থাকলে কেউ তো কন্যা দেবে না নিমাইকে?'

'কপালে কৃষ্ণ যেমন লিখেছে, মূর্খই হোক আর

পণ্ডিতই হোক, ঠিক তেমনটি জুটে যাবে আপনা-আপনি। কৃষ্ণ-কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়। দৈন্যহীন জীবন আর কষ্টহীন মৃত্যু—তাও কৃষ্ণকৃপায়। ধনে-পুত্রেই বা কী হবে যদি কৃষ্ণ-আজ্ঞা কৃষ্ণ-ইচ্ছা না থাকে? সুতরাং চিন্তা করে লাভ নেই, কৃষ্ণই একা চিন্তাকর্তা। ডাকো নিমাইকে।'

ছ' বছরের শিশু, নিমাই কাছে এসে দাঁড়াল।

নির্মম শোনাল জগন্নাথকে। বললেন, 'আজ থেকে তোমার পড়া বন্ধ। পাঠশালা বন্ধ। বুঝলে? যেতে পারবে না আর গুরুর কাছে, পুঁথিপত্তর সব ফেলে দিয়ে এস গঙ্গায়।'

কাতর চোখে তাকিয়ে রইল নিমাই।

জগন্নাথ দমলেন না এতটুকু। কঠোর স্বরে বললেন, 'না কিছুতে না। বিদ্যাই একজনের কাল হয়েছে। আর নয়। আমার মূর্খ পুত্রই ভালো।'

যথা আজ্ঞা। বিদ্যারসে ভঙ্গ দিয়ে খেলা নিয়ে মাতল নিমাই। দাদার শোকে একটু সংবৃত হয়েছিল, আবার উদ্ধত হয়ে উঠল। শুধু দিনমানে নয়, রাত্রেও চলল তার চাপল্য। সন্ধ্যে হয়ে গেল, বাড়ি ফিরবি নে নিমাই? আমার কি আর পড়া আছে যে বাড়ি ফিরব? আমার কি আর বই নিয়ে বসা আছে? তার চেয়ে গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ষাঁড় সাজি, এ-বাড়ি ও-বাড়ি জিনিসপত্র ভেঙে দিয়ে আসি, পড়শীর কলাবনে ঢুকে তাণ্ডব লাগাই। এ কী মূর্খের মত ব্যবহার। মূর্খ করে রেখেছ, ব্যবহার কি তবে অন্য রকম হবে?

আঁস্তাকুড়ে ঢুকেছে নিমাই। এঁটো হাঁড়ি পর-পর সাজিয়ে সিংহাসন করে বসেছে। গৌর-অঙ্গে মেখেছে হাঁড়ির কালি। সঙ্গীরা ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে শচীকে। দেখবে এস নিমাইয়ের কীর্তি।

হায়-হায় করে ছুটে এসেছেন শচী। এ তুই করেছিস কী? এ তুই কোথায় এসে বসেছিস?

'আমি তার কী জানি!' নিমাই বলছে গম্ভীরমুখে, 'আমি তো মূর্খ। আমার কি ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান আছে? আমি কি জানি স্থানের ভালো-মন্দ? আমার কাছে সব জায়গাই সমান।'

'ছি ছি,' ধিক্কার দিয়ে উঠলেন শচী দেবী, 'তা বলে তুই এঁটো-ঝুঁটো মানবি নে? আবর্জনা ফেলবার অপবিত্র স্থানে গিয়ে বসবি?'

নিমাই বললে, 'আমি যেখানে বসি সে স্থান কি অপবিত্র?'

> 'প্রভু বলে, মাতা। তুমি বড় শিশুমতি।
> অপবিত্র স্থানে কভু নহে মোর স্থিতি॥
> যথা মোর স্থিতি সেই সর্বপুণ্য স্থান।
> গঙ্গা আদি সর্বতীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান॥'

'শীগগির উঠে আয় বলছি।' তাড়না করলেন শচী, 'স্নান করে আয় গঙ্গায়।'

নিমাই গ্রাহ্যও করল না।

'তোর বাবা দেখতে পেলে কী বলবেন বল তো?' শচীর কণ্ঠে এবার অনুনয় ঝরল: 'লক্ষ্মী মাণিক আমার, উঠে আয়।'

'তা হলে বলো আমাকে পড়তে দেবে? যেতে দেবে পাঠশালায়?' দুষ্টু হাসিতে নিমাইয়ের দু'চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বহু লোক জড়ো হয়েছে ইতিমধ্যে। দেখছে মা-ছেলের কাণ্ড। বাপের কাছে খবর পাঠিয়েছে।

'সত্যিই তো কেন পড়তে দেবে না? এ কোন শত্রু পরামর্শ দিল যে ছেলেকে মূর্খ করে রাখতে হবে?' সকলে গঞ্জনা দিল শচীকে। জগন্নাথ এসে পড়লে জগন্নাথকে বললে, 'কত বড় ভাগ্য তোমাদের, ছেলে নিজের থেকেই পড়তে চায়। এমনটি আর মেলে কোথায়? সেই ছেলের মনে ব্যথা দিয়ে লাভ কি? যা করবেন কৃষ্ণ করবেন। যদি কাউকে তিনি নিয়ে যেতে চান মূর্খ বলে নিরস্ত হবেন না।'

সকলে পীড়াপীড়ি করতে লাগল জগন্নাথকে। পড়তে দাও ছেলেকে। ছেড়ে দাও কৃষ্ণের হাতে।

কৃষ্ণই মূল কারণ। আর প্রকৃতি? প্রকৃতি গৌণ কারণ। ঘটের মূল কারণ কুম্ভকার। গৌণ কারণ চক্র-দণ্ড। অগ্নিস্পর্শে লৌহ তপ্ত হয়ে যদি দগ্ধ করে তবে সেই দাহের মূল শক্তি অগ্নি, গৌণ শক্তি লৌহ। তাই কৃষ্ণই আদিপুরুষ, প্রকৃতি তার মায়া, নিমিত্ত-কারণ। কি রকম কারণ? 'প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন।' কোনো কোনো ছাগীর গলায় স্তনের মত মাংসপিণ্ড ঝোলে। দেখতে স্তনের মত হলেও তাতে দুধ জমে না। অজাগলস্তন যেমন তাই সত্যিকার স্তন নয় তেমনি প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নয়। বাস্তব কারণ কৃষ্ণ। সবই কৃষ্ণশক্তি প্রস্ফুরিত। সব তাই অর্পণ করো কৃষ্ণকে।

জগন্নাথ বললেন, 'উঠে আয়। এবার থেকে দেব তোকে পড়তে।'

বর্জিত হাঁড়ির রাজসভা থেকে হাসিমুখে উঠে এল নিমাই। গঙ্গাদাসের পাঠশালায় আবার পড়তে গেল।

ব্যাকরণের অধ্যাপক, গঙ্গাদাস হিমসিম খাচ্ছে নিমাইকে নিয়ে। গুরু যাই ব্যাখ্যা করে তাই খণ্ডন করে নিমাই, আর যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে গঙ্গাদাস তখন আবার সেই মূল ব্যাখ্যা স্থাপন করে।

বিদ্যা-ব্যাখ্যা শুধু পাঠশালাতেই নয়, ঘরে-বাইরে, স্নান করতে এসে চালায় গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে। প্রতি ঘাটে সাঁতার কেটে এসে উপস্থিত হয় আর ব্যাকরণের বিশেষ কোনো সূত্র বা টীকা ধরে কলহ করে। কোনো দ্বন্দ্বেই গৌরচন্দ্রের সঙ্গে কেউ এঁটে ওঠে না। খণ্ডন করেছ কি, স্থাপন করি; স্থাপন করেছ কি ছেদন করি। আমি শুধু ছেদনে-কর্তনে নই, আমি আবার আরোপে-প্রতিষ্ঠায়।

গঙ্গার বড় ক্ষোভ ছিল, কৃষ্ণ শুধু যমুনাতেই লীলা-বিহার করেছে। ঈর্ষা ছিল যমুনার প্রতি। গঙ্গার সেই ক্ষোভ মিটিয়ে দিল গৌরহরি। নূতনতর লীলা করল। শুধু কৃষ্ণলীলা নয়, যুগলিত রাধাকৃষ্ণের লীলা। এক দেহে দুই প্রেম। এক ডুবে দুই স্নান।

এবার তবে পৈতে দাও ছেলের। দিনক্ষণ ঠিক করো।

উৎসবের আয়োজন করলেন জগন্নাথ। মৃদঙ্গ-সানাই বাজতে লাগল, বিপ্রগণ শুরু করল বেদপাঠ। গৌরাঙ্গ আজ শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র ধরবে, হাতে দণ্ড, কাঁধে ঝুলি, ভিক্ষেয় বেরুবে ঘরে-ঘরে। এস তোমরা দেখবে এস। বামনরূপ ধরবে আজ গৌরচন্দ্র।

বামনের মধ্যে বলি বিশ্বরূপ দেখল। দেখল হরির পদদ্বয়ে ধরণী, পদতলে রসাতল। নাভিতে আকাশ, জঙ্ঘাযুগলে পর্বতনিকর, কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র, কণ্ঠে সামবেদ, বাহু চতুষ্টয়ে দেবমণ্ডলী, কর্ণযুগলে দিক্, শিরে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় বায়ু, দুই চক্ষে সূর্য, বদনে অগ্নি, রসনায় বরুণ, ভ্রূদ্বয়ে অধর্ম, পাদন্যাসে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাস্যে মায়া, শিরায় নদী, নখে শিলা আর রোমে ওষধি। বামন বলল, হে অসুরবর, তুমি আমাকে ত্রিপাদপরিমিত ভূমি দিয়েছ, আমি দুই পদবিন্যাসে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করেছি, এখন তৃতীয় পদের জন্যে ভূমি নির্দেশ করো। গুরু শুক্রাচার্য দ্বারা তিরস্কৃত হয়েও সুব্রত বলি সত্য পরিত্যাগ করে নি, বললে, আমার মাথায় আপনি তৃতীয় পা রাখুন। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।'

নিমাইয়ের মস্তকমুণ্ডন হল, পরল রক্তবস্ত্র। জগন্নাথ ছেলের কানে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এ কি অঘটন। মন্ত্র শুনে নিমাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, পড়ে গেল মূর্ছিত হয়ে। সমস্ত দেহ পুলকে শিহরিত হচ্ছে, বিতরণ করছে উদ্দীপ্ত তেজ আর দুই চোখে নেমেছে অকূল শ্রাবণ। সকলের পরিচর্যায় যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের, তখন তার সে কী গম্ভীর মূর্তি! এ যেন তখন নতুন আরেক মানুষ, যেন এ জগতের কেউ নয়। ন' বছরের ছেলে তখন নিমাই, কিন্তু তার দেহে যে নতুন মানুষের আবেশ এসেছে, তাকে চিনতে কারুর ভুল হয়নি। 'চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপ অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার।' গৌরদেহে শ্রীহরির আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং এর নাম হোক গৌরহরি। গৌররায়!

হে কৃষ্ণ, জানি না তুমি কোথায়, জগন্নাথ প্রার্থনা করতে লাগলেন, আমার পুত্রের প্রতি রেখো তোমার শুভদৃষ্টি। কন্দর্পজয়ী এর রূপ, দেখো ডাকিনী-দানবেরা যেন বশ করতে না পারে তাকে। আর যে ছেলে সর্বদা তোমাকে দেখে, তোমাকে ডেকে খুশি, তার যেন না কোনো অমঙ্গল হয়।

প্রার্থনা শুনে মনে মনে হাসল বুঝি নিমাই।

হঠাৎ জ্ঞানীগুরুর মত গম্ভীর স্বরে মাকে ডাকল তার কাছটিতে। ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালেন এসে শচী। এ যেন তাঁর বালক পুত্র নয়, যেন কোন পরাক্রান্ত পুরুষ। শাসনশাণিত স্বরে বললে, 'মা, তুমি একাদশীর দিন ভাত খাও কেন? খাবে না ভাত।'

'খাব না।' অপরাধীর মত বললেন শচী, অনুজ্ঞা পালনের ভঙ্গিতে।

'আর,' আরো বললে নিমাই, 'শোনো, এ দেহ আমি ত্যাগ করলাম এ মুহূর্তে, চললাম গৃহ ছেড়ে। যে দেহ রইল সে তোমার পুত্র, তাকে স্নেহে-যত্নে পালন কোরো। সময় হলে আমি আবার আসব, আবার দেখবে আমাকে সকলে।'

নিমাই আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল। জলসেকে আবার তার চেতনা ফিরে এলে সকলে দেখল, সে চণ্ডতেজ দেবাবেশ আর তাতে নেই, এ নিমাই আবার সেই সন্তান-নিমাই। সেই নিতলশীতল নবনীকোমল লাবণ্যপুঞ্জ।

'কী বলছিলি বল তো?' জগন্নাথ মনে করিয়ে দিতে চাইলেন।

'কী বলছিলাম?'

'বলছিলি, এ দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যে রইল সে তোমার পুত্র, তাকে তোমরা দেখো।'

'কই! কখন!' বিস্ময় মানল নিমাই: 'আমি আবার কী বললাম!'

হে গোবিন্দ, নিমাই আমার ঘরে থাক, নিমাই আমার গৃহস্থ হোক। তার যত্নের আমরা ত্রুটি করব না। প্রাণপণ পরিচর্যা করব। পাখার উত্তাপের আড়ালে রাখব তাকে সন্তর্পণে।

'এ কি, এ প্রার্থনা করছ কেন?' শচী দেবী শুনতে পেয়েছেন স্বামীর কাতরতা।

'জানো, দুঃস্বপন দেখেছি।'

'কী দুঃস্বপন?' শচী দেবীর মুখ কালো হয়ে উঠল।

'দেখলাম নিমাই শিখার মুণ্ডন করেছে, ধরেছে সন্ন্যাসীবেশ। সব সময়ে কৃষ্ণ বলে হাসছে কাঁদছে চলছে নাচছে। দলে দলে লোক চলেছে পিছে-পিছে, অদ্বৈত আচার্য পর্যন্ত, সুরে সুর মিলিয়ে চলেছে। সে সুর আকাশ ছুঁয়েছে, ছুঁয়েছে দিক্‌দিগন্ত। সকলের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে নিমাই, অদ্বৈতের মাথায় পর্যন্ত, বসছে গিয়ে বিষ্ণুর সিংহাসনে। এ কী দেখলাম!'

শচী দেবী আশ্বস্ত করতে চাইলেন। বললেন, 'এ স্বপ্নমাত্র। এ কখনো ফলবার নয়। পুঁথি ছাড়া নিমাইয়ের আর কোনো মতি নেই, রুচি নেই। ঘরের বাইরে জানে না সে পথ-প্রান্তর। বিদ্যারসভাবই তার একমাত্র বস্তু, একমাত্র ধর্ম। তুমি চিন্তা কোরো না। নিমাই আমার ঘরের ভিত্তি, আমার অন্নের স্বাদ, আমার চক্ষের তারা। আমার দেহের মেরুদণ্ড। আমাকে ছেড়ে যাবে না এক পা।'

[ক্রমশঃ।

মেমোরিয়ালের মাঠের সেই মেয়েটি

বিমলচন্দ্র সরকার

মেমোরিয়ালের মাঠে দেখি তাকে
শঙ্খ সে সাজ করেছে একটি।
খুশিরে সান্ধ্য হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে,
মুঠো মুঠো ধূলি উড়িয়ে দেবার মতন।
উচ্ছ্বাসে মুখরা একটি চিত্রার্পিতা নদী,
অন্তর-বাহিরে লেগেছে যৌবনের ঢেউ!

আলতো গালে সূর্যের রক্তিম-আভা পড়েছে।
উচ্ছৃঙ্খল কুন্তলরাশি মুখে চপলা হাসি,
দেহের স্তবকে স্তবকে উদ্ভাসিত যৌবন-প্রবাহ।
শৃঙ্গার-হাসি তার দু'টি কাজলা আঁখি-ছায়ে;
স্বর্গের মেনকা যৌবনমদে গর্বিতা মেয়ে
প্রেমাসনে ভোগবতী শিল্পীর কল্পিত মানসী।

ঠোঁটে তার অলক্তক তিলক মাখা
কোন রক্তখাকী, বুঝি এক প্রেত্নিনী!
প্রেমোল্লাসে ছল ও কলার মায়াবিনী,
সাজ সাথে রতিসুখ-ভোগবিলাসিনী।
কামিনী অলকা মেয়ে, কলির মেনকা,
এ যুগের ভাবীজননী উগ্র আধুনিকা।

রিট্রিট

বাঁচে কাটছে মন্দ নয়। দিনের আলোয় অফিসের কাজ করো। আর রাতের আঁধারে জলের ধারে সমুদ্রের ঢেউ গোণো। ওরা আসে আবার চলেও যায়। মাঝে করে নিয়ে আসে প্রকাণ্ড এক তাল কি, রাতের আঁধারে তা চিক্ চিক্ করে জ্বলতে থাকে। ওরা কোন্ জানোয়ার জানতে ইচ্ছা যায়। ভয়ও হয়। যদি ওর সুনীল অতল জলধি থেকে উঠে আসে অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক কোনো জানোয়ার।

রাতের খানা-দানা সারা। শুয়ে আছি সেই পুরাতন গর্ত আশ্রয় করে, নেটের ট্রেঞ্চ মশারি মেলে। স্বপ্ন দেখেছি ভূতের। ভূতে তাড়া করেছে। আর আমার পাখা গজিয়েছে, তাই দিয়ে উড়ে উড়ে পালাচ্ছি। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে স্বপ্ন টুটে গেল। ঘুমও ছুটে গেল। প্লেন ক্র্যাশ? জাহাজডুবি? নাঃ। ও সব কিছুই নয়। আমার পুরোন ও-সির জিপ্-ড্রাইভার। নায়েক কাশেম আলি। ও কি এবারে ভূত হয়েছে? এত রাতে নির্জন বীচে এলো কি করে? ওর ইউনিট তো এখান থেকে বহু দূরে।

—কি খবর মিঞা সাব্?

—হুজুর, বড়া সাব্ গাড়ী ভেজা। তুরন্ত্ চলিয়ে। ও সেলাম দিয়ে জানায়। যাক্। অশরীরী নয়। সশরীরে এসেছে। কিন্তু এত রাতে? আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

তা ও জানে না। শুধু বললে ও-সির অর্ডার। তবু বিশ্বাস নেই। জাপানীদের হাতে বহু অপমৃত্যু ঘটেছে। টর্চ জ্বেলে দেখে নিই ওর ছায়া পড়ে কি না।

রাত সাড়ে বারটা। ক্রমে আরও গভীর হচ্ছে। যেতেই হবে। কেন না, খোদ ও-সির অর্ডার। জীপ পাঠিয়েছেন। ও এসেছে সেই জীপে করে। কিন্তু কেন? কোথায়?

ওই সব প্রশ্ন অচল। অবান্তর। সবই সিক্রেট। আমরা এক সিক্রেট সোসাইটীর সদস্য। কবে, কোথায়, কেন, কি হবে না-হবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও নিষেধ করতে হবে, তা এখনই। রাত বারটা, না তিনটে, সে কোনও কথাই নয়।

সুতরাং যেতে হোল। রাস্তা নয়। সমুদ্রসৈকত। জীপ ছুটেছে দুর্নিবার গতিতে। ভাটার টানে বালি জমে সিমেন্টের কংক্রিট হয়ে রয়েছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে তা ক্রমাগত আরও শক্ত হচ্ছে। তারও উপর দিয়ে গাড়ী ছুটেছে উন্মত্তের মতো। স্পীডো মিটারের কাঁটা বেড়েই চলেছে—ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর। নাঃ। আর ওদিকে চাওয়া যায় না। যে কোনো মুহূর্তে এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। নায়েকের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সীমান্তের পাঠান। ভয়-ডর নেই কোনো। চারপাশে লোকজনও নেই যে, পরদিন তারা দেখতে পাবে—এ্যাক্সিডেন্ট হলে বাঁচার আশা। রাতের আঁধার। বালির ওপর ক্ষীণ চাঁদের আভা। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে, দুপাশে মনে হচ্ছে যেন একখানা একটানা খুব লম্বা-চওড়া ফিতে। মসৃন রাতের বিছানা বিছানো।

ক্রমে গাড়ীর গতি স্তব্ধ। সামনে চঞ্চলা কিশোরী এক এঁকে-বেঁকে চলে গেছে বহুদূরে। নিশিপাতে উজ্জ্বল জোয়ারের জলে ভরে গিয়েছিল আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়। এখন তাই আবার ভেসে চলেছে আপন মনের খুশীতে। তেমনি উজ্জ্বল, আর অকৃপণ।

[illegible]

না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বেতাল

তেমনি চলে যায়। ধরে রাখা যায় না। তাই দিয়ে চলেছে নিঃশেষে। এখনও প্রচুর জল। সে জলে জীপ ঠাঁই পাবে না। আরও কমবে। তাবৎ অপেক্ষা করতে হোল নিঃশব্দে।

রাত্রি গভীর। একাদশীর বাঁকা শশী পশ্চিম দিগন্তে বিলীয়মান। আকাশ ম্লান। ম্লান জ্যোৎস্নায় ঢাকা ধরণী। দিগন্ত প্রসারিত গুল্মহীন বৃক্ষহীন প্রান্তর। চারিদিক ঢাকা। নির্জন সমুদ্রতীর, নিস্তব্ধ সমুদ্রজল। নিস্তব্ধ প্রকৃতিরাণী নিশীথের আবাহনে উৎকর্ণ। কী যেন এক ভাব সমাবেশে সবাই গম্ভীর, সবই রহস্যময়। মাথার উপর আবছা নীলাকাশ অন্ধকারে রহস্যময়ী ধরণী জলে গোল হয়ে মেশামেশি। পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রজলে ক্ষীণ চাঁদের আভা। মাঝে কচিৎ একটা ঢেউ। তাও নিঃশব্দ। আর তার ভিতরে জ্বলে হাজার হীরামাণিক। ভাঁটার টানে জলে টান ধরেছে প্রচুর। মনে বিঁধছে পিছনে ফেলে-আসা সমস্ত জিনিষ। সেই ট্রেঞ্চে। দামী ক্যামেরা, পার্কার সেট। দিনের আলোয় লোন্ দিয়েছি বন্ধুদের। আর কখনও তাদের দেখা মিলবে না। যদি হয়, এ্যাকসিডেন্ট। হতে পারে পরলোকে। যদি তা থাকে। প্রায় ঘন্টা দুই বসে, সেই নির্জন আবছা অন্ধকারে। খালের জল কমতে জীপও আবার চলা সুরু করেছে। কোমর জলের ভিতর দিয়ে গাড়ী পার হয়ে গেল। ওটা আগেই ওয়াটারপ্রুফ করা ছিলো।

আবারও মিটারের কাঁটা উঠছে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর। বেপরোয়া ড্রাইভার। সামনে জঙ্গল সুরু হয়েছে। কোথায়ও আলোর লেশ নেই। বিষাদে ম্রিয়মাণ শেষ চাঁদ ডুবেছে সমুদ্রজলে। সেই অন্ধকারেই গাড়ী ছুটেছে ভূতের মতো বনের ভিতর দিয়ে। গাড়ীতে আলো জ্বালা নিষেধ। ক্রমে সে জঙ্গল আরও ঘনীভূত। কাজেই স্পীডও কমতে কমতে একেবারে কমে গেছে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ওরা কে দাঁড়িয়ে? বড় বড় তালগাছ মাথা উঁচু করে কি দেখছে! আমাদের গতিবিধি? ওরই ফাঁকে ফাঁকে তাঁবু। তারাও প্রেতের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। ওরাও হয় তো কিছু দেখছে। কী যেন একটা কিছু ঘটতে চলেছে। অথবা হয় তো কারও ইসারায় অপেক্ষমান। আমাদের গাড়ী পৌঁছেছে সেই অন্ধকারেই। কিন্তু এ কি? এত রাতে সবাই চুপচাপ বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? নড়ন-চড়নও নেই কারো। লোকজন, অফিসার সবই সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সারিবদ্ধ, নিঃশব্দ। সবই কি প্রেতের রাজত্ব? কিসের অপেক্ষা?

সবাই প্রস্তুত। হাতে রাইফেল, কাঁধে ব্যাগ, পৌচে টোটা। বেয়নেট ঝুলছে। কোমরে আড়াই হাতি খাঁটি ষ্টীলের দা। ওটা তরোয়ালের মত ঝুলছে। বর্মার জঙ্গলযুদ্ধে ওটা দেওয়া হয়েছে একখানা করে। ঘাড়ের কাছে বাঁধা বেডিং। ছোট নেটের ট্রেঞ্চ মশারি ও আর খুব হাল্কা একখানা অষ্ট্রেলিয়ান র‍্যাগ। এই সম্বল। আরও আছে। ছোট এক টিন এমারজেন্সী রেশান। কিছু ব্যাণ্ডেজ।

সত্যিকারের ছাগল নয়। কাপড়ে তৈরী, জল রাখার কায়দা। মালামাল আর সবই তাঁবুতে পড়ে। খোদ ও-সি এণ্ড্ জুপীণ্ট সবারই ওই সাজ-পোষাক। কিন্তু কোথায়? সামনে, না পিছনে?

আমরা ফিরে এসেছি। বর্মার জঙ্গল থেকে পালিয়ে দক্ষিণ-ভারতের এক বন্দরে। রিট্রিট। বর্মার জঙ্গলে পড়ে মার খাচ্ছে ওদের হাতে। আর ওদের স্নাইপারের হাতে। প্রথম জাপানীরা যখন রেঙ্গুন আর সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে, বৃটিশ প্রাণভয়ে পালিয়েছিল। ভারতীয় আর্মি জাপানীদের হাতে বেচে নিয়ে বিনিময়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে। ইংরেজের সে ভুল ভেঙ্গেছে পরে। সেই বেচে আসা আর্মি রূপ নিয়েছে ন্যাশনাল আর্মির। খতম করেছে ডিভিশানকে ডিভিশান। পুরাতনী শিক্ষা। এবার তাই সবসমেত রিট্রিট? ক্রমে সে বন্দর ছেড়ে আমরা দক্ষিণাবর্তের রাস্তায় উঠেছি। আবর্তিত হয়ে চলেছি মোটরের চাকার সাথে।

কোক নাদার ছাউনী। লোক লোকালয় বহুত দূর। তা বিশ ত্রিশ মাইল। তালবনে ছোট ছোট তালপাতার কুঁড়ে। দোতলা বন্দোবস্ত। অর্থাৎ মানুষ-সমান উঁচু ঘরে মটকায় তুলে চারখানা খাটিয়া বাঁধা। দড়ির চারপাই। শবের বলতে পারেন। তারই নীচে মাটীতে আর চারখানা। আটজনের শয়নকক্ষ। বেড়া নেই। তার চার দিক খোলা। চার পাশে বসতি নেই মানুষের। জন্তুজানোয়ারও কি নেই? পাশেই ছোট ডোবায় জল। রান্নাবান্না হাতমুখ ধোয়া চলছে। আর খাবার জল এক হাত বালি খুঁড়ে মিলে।

বর্মার নামকরা জঙ্গল উখিয়া। সেখান থেকে আমাদের কোম্পানী দিয়ে এসেছে সসম্মানে। এসে আশ্রয় নিয়েছে দক্ষিণ-ভারতে এই তালবনে। বর্মা থেকে মাদ্রাজ। সগৌরবে পশ্চাদপসরণ। খবরে সর্বত্র ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে, আমরা এখনও জিতেই চলেছি এবং সে হিসাবে টোকিও বার্লিন দুটোই আমাদের ছাড়িয়ে যাবার কথা। অনেক আগে। তার বদলে আমরা গিয়েছি উল্টো দিকে। ভারতের নিরাপদ দক্ষিণ প্রান্তে। এই তালবনে। আসল খবর, বর্মার জঙ্গলে জাপানী আর আই-এন-এর হাতে আমাদের কয়েক ডিভিশান পুরো সাবাড় হয়েছে। মহামান্য জি এইচ কিউ সিমলাতে বসে। খবর পৌঁছচে ম্যালেরিয়ার। আসল তথ্য জেনেছেন ছয় মাসে। আরও সাবাড় হওয়ার পর। সুতরাং যুদ্ধের কায়দাকানুনও ক্রমাগত বদলাতে হচ্ছে। দিন দিন তা পালটাচ্ছে। জাপানীরা পৃথিবীর সেরা মিলিটারী। সেটা প্রমাণ দিয়ে গেল এই যুদ্ধে। বৃটিশ, আমেরিকা, জার্মাণ রাশিয়া? জাপানীদের কাছে ওরা তুলনাহীন। মনে অনেক দাগা পাওয়ার পর একজন আমেরিকান জেনারেল সেকথা স্বীকারও করেছেন সেদিন। "Although poverty-striken and lacking in mental development, the Japanese are the most formidable adversary," ভারতীয় কাগজে যদিও ওকে বর্বর আখ্যা দিয়েই চলেছে এখনো।

এখানে মাস দুই থাকার পর আমাদের ছাউনী আবার পথ ধরেছে। সকালে উঠেই হালুয়া-পুরী। সাথে চা-পান। তারপর গাড়ী ছাড়লো। ট্রেন নয়, মোটর কনভয়। সমস্ত দিন তা লাইন দিয়ে চলেছে। বেদের সংসার। লটবহর, ব্যক্তিগত মালপত্তর, খানাদানা, মায় কাঠ পর্যন্ত গাড়ীতে চাপান দিয়ে সে গাড়ী চলেছে। চলেছে তো চলেছেই। রাত দশটার আগে তার বিরাম নেই। যতক্ষণ না অন্য ছাউনী পৌঁছায়। রোজ গড়ে শ' মাইল। দুপুরে এক ক্ষেতের কাছে গাড়ীগুলো থাকে। ক্ষেতের জল নিয়ে চা তৈরী হয়। চা খাওয়ার পর গাড়ী আবার পথে উঠলো। ঘড় ঘড় করে চলেছে। ক্ষেতে জল নেই। ট্রেন থামাও। ওর বয়লারের গরম জলে চা তৈরী হলো। আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন। রাতের বেলায় অন্য ছাউনী। ধূলোয় আপাদমস্তক ঢাকা। এক কিম্ভূত কিমাকার দৃশ্য। ভূত সাজার কত বাকী? তখন কোনোরকমে হাত মুখ ধোওয়া বা স্নান করা। আর গোগ্রাসে খেয়ে যাওয়া। কারণ পেটের ভিতর বৈশ্বানরের লীলা। খাবারও থালে তৈরী থাকে। মাংসও থাকে। রাতটা তাই খেয়ে কাটলো। কিন্তু সকালে সূর্য ওঠার আগে আবারও সেই পথ। যে পথের শেষ অবধি শেষ পাইনি। সূর্যদেব কখন্ উঠে কখন্ অস্ত যান, সে খবর আমরা রাখি না। যদিও তিনি আমাদের সামনে মাথার উপর দিয়েই চলেছেন। আমরা কখন উঠবো, কখন অস্ত যাব বিছানায়, সেই ভাবনাই আমাদের প্রবল। কখনও উঠেছি পাহাড়ের চূড়ো, কখনও গভীর খাদ, কখনও অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে, কখনো বা চলেছি নদীর উপর দিয়ে।

নৌকো দিয়ে দিয়ে ব্রীজ তৈরী হয়েছে। তারই ওপর দিয়ে আমাদের মোটরগুলো পার হয়ে চলেছে। উঁচু নীচু, পাহাড় পর্বত, গিরি নদী, খালবিল, বনবাদাড় পেরিয়ে অবশেষে যেখানে পৌঁছেছি, তার নাম বোম্বাই সহর। আর ও দিকে এগোন বন্ধ। কারণ সমুদ্র। ও না থাকলে আরও যেতাম। আসবার পথে সরু পথের তীক্ষ্ণ বাঁক। পাহাড়ের চূড়োয়। এমনও হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে গেছে দুখানা মোটর একেবারে মুখোমুখি। এগোলে বিপদ। পেছোলেও বিপদ। একেবারে খাদের তলায়।

আমরা সহর ছেড়ে এবং ডক ছেড়ে এবার জাহাজে। এবার বসবার পালা। সমস্ত মোটর গাড়ীগুলোও জাহাজে উঠে গেছে। অফুরন্ত অবসর, খাও, দাও, ঘুমাও। প্রাণভরে স্নান করো সমুদ্রে, সমুদ্রের হাওয়া খাও। তিন দিন জাহাজে। সমুদ্রে সাঁতারও কেটেছি। কিন্তু ও সবই পুরোন হয়ে গেছে। দশ বিশবার সমুদ্র-যাত্রাও হয়েছে। ওতে আর মন ভরে না। মনটা লোকালয়ে যেতে চায়। লোকের সাথে মিশতে চায়। একটু প্রাণখোলা আলাপচারী, কয়েক বছর জঙ্গলে কাটানোর পর। কিন্তু সেটাই মানা। কারণ কারো অজানা নয়। ফ্রন্টে ন্যাশনাল আর্মি। সে খবর বাইরে না ছড়ায়। বাইরে যেতে পাশের প্রয়োজন? পাশ যদি বা মেলে, সবুজ পোষাকে যেতে হবে। রাস্তা ঘাট সব জায়গার বড় বড় গোল লেবেল মারা। তাতে একটা ক্রশ আর লেখা—Out of Bounds. তারপর মোড়ে মোড়ে এম পি অর্থাৎ মিলিটারী পুলিশ। অর্থাৎ বাবার বাবা! লড়াইয়ের সময়। পুলিশের উপর মিলিটারী। তার উপর মিলিটারী পুলিশ। চুরি করে সাদা পোষাকে গেলে ওরা কি করে ধরে ফেলে। অদ্ভুত ওদের ক্ষমতা। জব্বলপুরের ঘটনা। কয়েক বন্ধু মিলে চুরি করে সহরে বেরিয়েছেন। সাদা পোষাকে সহর বেড়ানো হচ্ছে। গল্পে মশগুল। আচমকা এক পস্তকায় ধ্বনি এলো—Halt! খুব জোর। হঠাৎ ঠাণ্ডায় জল যেমন জমে বরফ হয়, ওদের পাগুলো ঠিক তেমনি জমে বরফ হয়ে গেল এক লহমায়। ধরা পড়লো সবাই।
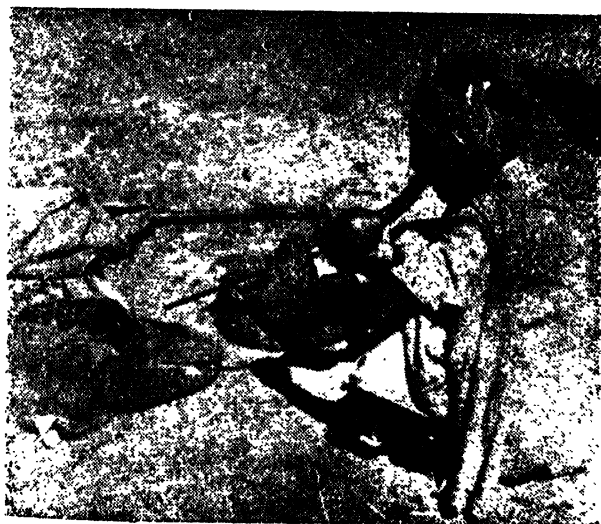
গৌরীকুণ্ড (ভুবনেশ্বর)

—অমলচন্দ্র দে

সাপুড়িয়া

—বারীন্দ্রনাথ প্রামাণিক

লিলি

-মিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না।]
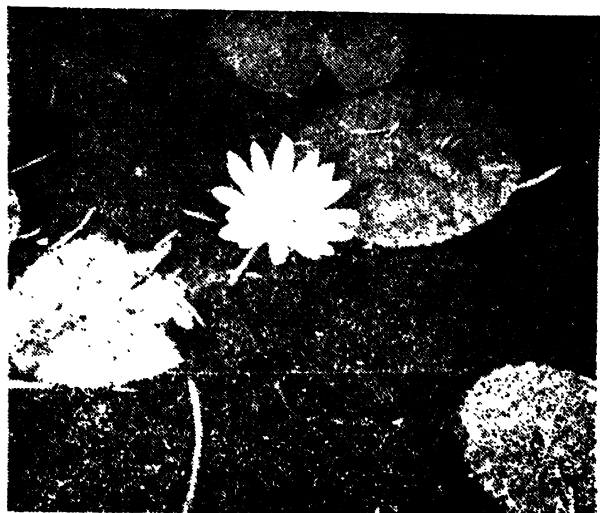
হুমায়ুনের সমাধি (দিল্লী)

—প্রভাত সেন
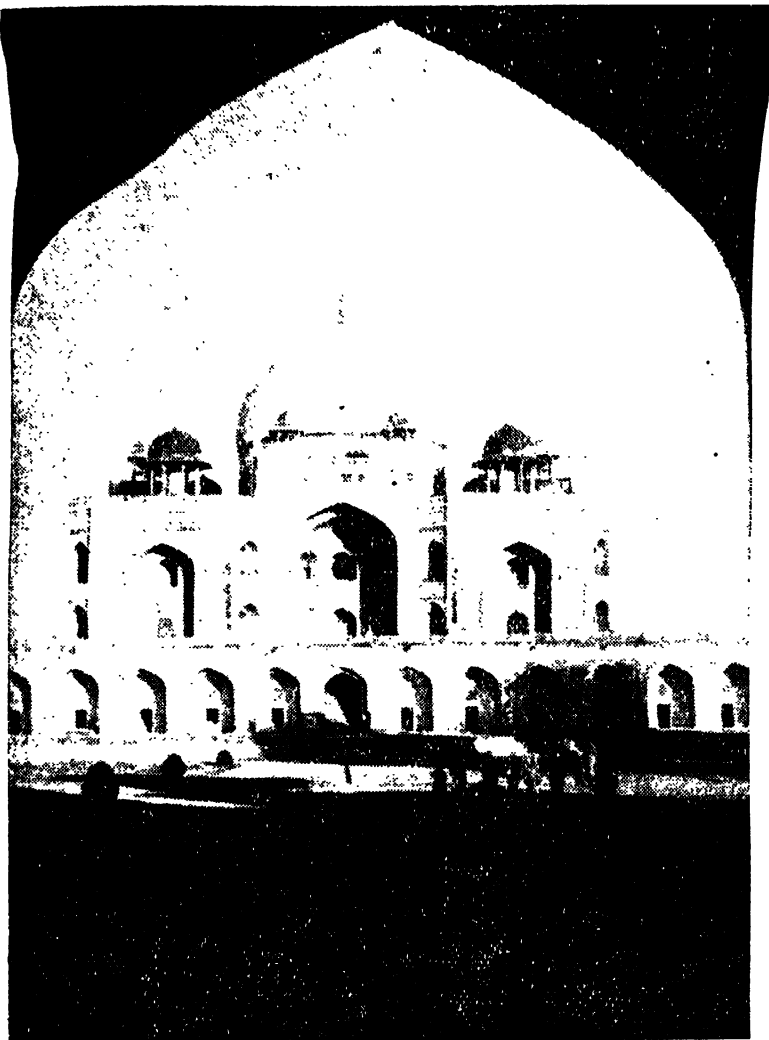
কবরী-বন্ধন

—অমলচন্দ্র দে

ভাই-বোন

—বাসন্তী মৈত্র

পল্লী

—ক্যাপটেন ব্যানার্জী

তাজমহল

—শ্রীপথিক

মর্মরমূর্তি —আশুতোষ সিনহা

জাম্বো

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

আমাদের রামায়ণে 'জম্বুবান' ছিলেন হনুমানের ভ্রাতা—জাতিতে বানর। 'জম্বু' বলতে আমাদের এই বানরকুলের কথাই মনে হওয়া উচিত। ইংরাজী ভাষায় 'জাম্বো' অর্থ হাতী। আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে 'জাম্বো' কথাটি সর্ব্বাধিক প্রচলিত। যে কোনও আফ্রিকানে আফ্রিকানে দেখা হলেই একে অপরকে হাসিমুখে অভিবাদন করে আর বলে 'জাম্বো'। মাউ মাউ অধ্যুষিত কেনিয়া রাজ্যে কিকুয়ুদের মধ্যে দেখেছি তারা, দেখা হলেই বলে 'জাম্বো'। উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালাতে রোটারী ক্লাবে দেখেছি, আফ্রিকান সভ্যরা নিজেদের মধ্যে প্রত্যভিবাদন করে বলে 'জাম্বো'। মধ্য-আফ্রিকায় নীলনদের মোহনায় জিঞ্জার জঙ্গলে শিকারীদের পরস্পরে অভিবাদন করতে দেখেছি 'জাম্বো' বলে। আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, আমি নিজে নিজেই আমার গাড়ীর সোফারকে একদিন সকালে দেখা হতেই বললাম 'জাম্বো'। আমার সোফার গিলাণ্ডো হেসে গদগদ হয়ে বললো 'জাম্বো, জাম্বো'। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করলো, 'সাহেব স্পিক সহেলী ?'—'সাহেব, আপনি সহেলী ভাষা জানেন!' পরে জানতে পারলুম আফ্রিকাতে অনেক জাত অনেক ভাগ-বিভাগ থাকলেও ওদের সবাইর একটা (Common Language) আছে যার নাম (Swahili) 'সোয়াহিলী' বা সহেলী। পরে তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারলুম যে আন্তর্জ্জাতিক কথ্য ভাষার মধ্যে এই সহেলী ভাষার স্থান সপ্তম এবং বিলাতে আন্তর্জ্জাতিক ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রে এই সহেলী ভাষা বিশেষ সমাদৃত। কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা, জাঞ্জিবার, নাইজ্যাল্যাণ্ড, কঙ্গো সর্ব্বত্রই সহেলী ভাষার প্রচলন আছে। এ ভাষা শিক্ষাও কঠিন নয়, ব্যকরণের দুর্গম কিল্লা ভেদ না করেই সহেলী শেখা যায়। সহেলী ভাষায় জাম্বো হ'ল প্রথম অভিবাদন, অনেকটা হিন্দী ভাষার "নমস্তে সুক্রিয়া" ইংরাজী "How do you do, Good Morning" "নমস্কার, কেমন আছেন," "জয় হিন্দ" অনেকটা এই জাতীয়। আজাদ হিন্দের সভ্যরা যেমন নিজেদের মধ্যে 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন করতো 'জাম্বো' কথাটির মধ্যেও ঐরূপ জাতীয়তার তাৎপর্য্যপূর্ণ আনন্দমিশ্রিত অকৃত্রিম শুভ কামনার ইঙ্গিত আছে। কাজেই যে কোনও আফ্রিকাবাসীকে 'জাম্বো-জাম্বো' বললে তারা খুশী হয়। জাম্বো অর্থ "নমস্কার, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

আফ্রিকায় এসে আমরা একদিন দল বেঁধে দুপুর বেলায় মোটরে চড়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করি। এদেশে নিয়ম হল, গাড়ী থেকে নামা নিষেধ, গাড়ীর দরজা-জানালা কাচ বন্ধ করে জঙ্গলের মধ্যে আড়ি পেতে থাকতে হয়। কিছুকাল মধ্যেই সব রকম বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের দেখা পাওয়া যায়। সঙ্গে এদেশীয় লোক 'গাইড' নিতে হয়—জঙ্গলের নাড়ী-নক্ষত্রের সব হিসাব তার জানা আছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ৫।৬টা সিংহ দেখতে পেলাম। আমাদের মোটরের মাত্র তিন চার ফুট দূর দিয়ে সিংহের দল চলে গেল। জেব্রা, জিরাফ, বাইসন দেখলাম শত শত, আর জংলী হরিণ দেখলাম হাজার হাজার। জঙ্গলের মাঝে মাঝে ঘাসের বন আছে—মাঠ আছে, সেখানে গাড়ী নিয়ে গেলে হাজারে হাজারে জেব্রা, জিরাফ, উটপাখী, হরিণ, বাইসন, সব কিছু দেখা যায়। মোটর গাড়ীতে বসে হাতী দেখা নিরাপদ নহে। আমরা উগাণ্ডা থাকাকালে যখন হাতী দেখতে বের হলাম—স্থির হল সারারাত্রি এখানকার এক (Tree Top Hotel) গাছের ডগায় হোটেলে থাকতে হবে। দিনের বেলা রওনা হয়ে ঐ গাছের ডালে (সিনেমার টার্জেনের মত বাড়ীতে) রাত জেগে বসে থাকতে হবে—নীচে আসবে সব রকম জন্তু-জানোয়ারের দল—বিশেষ করে হাতীর দল। আমরা যখন দেখার জন্য গেলাম তখন সব ব্যবস্থা সুন্দর ছিল। কারণ এর চার-পাঁচদিন আগেই ইংলণ্ডের রাজমাতা এখানে এসেছিলেন এবং তিনিও ঐ গাছের ডালের হোটেলে বসে জানোয়ার দেখেছিলেন। দিনে দিনে যেতে হয় আবার দিন হলে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় যে কোনও মুহূর্ত্তে যে কোনও বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া যেতে পারে। সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, হরিণ, হায়েনা, জেব্রা, জিরাফ এরা কেউই গাড়ী আক্রমণ করে মানুষ মারে না। গাড়ী বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকলে এদের জন্য কোনও ভয় নেই; তবে 'জাম্বো' বা হাতীর কথা স্বতন্ত্র। সেজন্য এখানকার গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি কর্ত্তব্য লিখে নোটিস দিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমতঃ জঙ্গলে ঢুকলেই মাঝে মাঝে লেখা দেখা যায় Elephants have the right of way অর্থাৎ এই পথে আগে হাতীকে যেতে দিতে হবে। হাতীরা সাধারণতঃ তাদের জানা রাস্তা দিয়ে বেশী যাতায়াত করে। কাজেই ঐ সব রাস্তা দিয়ে প্রায়ই জংলী হাতী যাতায়াত করতে দেখা যায়। ঐ সব বাঁধা-ধরা জায়গা ছাড়াও অন্যান্য সর্ব্বত্র প্রায়ই হাতীর দেখা পাওয়া যেতে পারে। তাই মোটর-চালকদিগকে

"জাম্বো"

নিম্নলিখিত উপদেশ ছাপিয়ে জানানো হয়েছে—(ক) রাস্তার পাশে ঝোপ থাকলে তাড়াতাড়ি মোটর চালাবে না, রাস্তা বাঁকা হলে খুব উঁচু-নীচু হলেও তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাবে না। (খ) রাস্তায় হাতী দেখলে এগিয়ে যেও না, সাবধান হয়ে দূরে সরে পড়বে, হাতীকে আগে পথ ছেড়ে দেবে। গাড়ী নিয়ে আস্তে হাতীর দিকে এগিয়ে যেও না, মনে করো না যে গাড়ী দেখে হাতী চলে যাবে বরং তুমিই অবাক হয়ে দেখবে যে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে তোমার পেছনেও একটা হাতী দাঁড়িয়ে আছে, বা রাস্তার ধারে যতগুলি ঝোপ দেখেছিলে সবই হাতীতে পরিণত হয়ে আছে। (গ) হাতী রাস্তার ধারে রয়েছে দেখে অধীর হয়ে গাড়ীর গিয়ার চেপে তীব্রবেগে পার হতে চেষ্টা করো না, হাতী এতে চমকে উঠে তোমার পেছনে ভীষণ ভাবে তাড়া করবে। (ঘ) হাতী দেখে গাড়ীর হর্ণ বাজিও না, বরং ইঞ্জিনের শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বুঝতে দিও যে তুমি যাচ্ছ। (ঙ) তোমাকে শেষ ফেরী ষ্টিমার ধরতে হবে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তা হলে অনেক আগে রওনা হও, কারণ মাঝপথে বুনোহাতী তোমাকে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত আটকে রাখতে পারে। (চ) হাতী যদি রাস্তার দিকে মুখ করে না থাকে, যদি রাস্তার দিকে আসতে না দেখ, যদি অনেক দূরে দেখ তবে ভয় নেই, নিশ্চিন্তে চলে যেও, হাতী তোমার দিকে নজরই দিবে না। আফ্রিকার জঙ্গলে পথ চলতে হলে এদেশের গাড়ীচালকদের এই ছয়টা কথা সর্ব্বদাই মনে রাখতে হয়। উগাণ্ডার Road Safety Propaganda Committee মাঝে মাঝেই এদেশের বড় বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সব কথা জানিয়ে দেন।

গভর্ণমেণ্টের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সমিতির প্রধান অফিসার (মি: আর, এম, বিয়ার) একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। সম্প্রতি একজন আমেরিকার ফিল্ম প্রডুসার তাঁর সহকারী সহ আফ্রিকার জঙ্গলে আসেন। এক দল হাতী এখানকার "নিয়ামাগাসানী" নদী পার হচ্ছিল তখন তিনি দুই-তিন শত গজ দূর থেকে ঐ হাতীগুলি দেখে গাড়ী থেকে নেমে ফিল্ম তুলতে আরম্ভ করেন, তৎক্ষণাৎ অন্য একটা হাতী বিদ্যুৎবেগে তার পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে। তিনি ক্যামেরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ক্যামেরাটিকে ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে হাতী ঐ কাঁটার ঝোপের মধ্য থেকে মিষ্টার ল্যাণ্ডারকে টেনে বের করে তিনবার শুঁড় দিয়ে ধরে উপর দিকে ছুঁড়ে মারে—যখন তিনি হাতীর দুই পায়ের ফাঁকের মধ্যে পৌঁছেন তখন তিনি সম্পূর্ণ মরার ভাণ করেন। এটা কার্য্যকরী হয়, কারণ হাতী তাকে ছেড়ে দিয়ে যায়—যদিও সন্দেহের সঙ্গে অনেকবারই পেছন ফিরে দেখেছিল। মিষ্টার ল্যাণ্ডার প্রাণে মারা যান নি, তবে তাঁর ডান পা-টি গিয়াছে, বাঁ পা-টিও মচকে গিয়েছে—সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষতের দাগ নিয়ে আজও বেঁচে আছেন।

আফ্রিকার জঙ্গলে একটা হাতী সর্ব্বাধিক সংবাদপত্রে পাবলিসিটি পায়। তার সম্বন্ধে এদেশে এবং বিলাতে অসংখ্য সংবাদ ও ফটো ছাপা হয়েছে। আফ্রিকায় জন্তু সংরক্ষণ সমিতির অন্যতম ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিষ্টার জন মিলস এই হাতীর অনেক বিবরণ লিখেছেন। আফ্রিকার যে হাতীটা এত প্রসিদ্ধি পেয়েছিল—জংলীরা তার নাম দিয়েছিল "লুবাংগাওন" (Lubangawon) যার ইংরাজী অর্থ করে ইংরেজগণ এর নাম দেন The Lord Mayor...যখন এই জঙ্গলের প্রধান কার্য্যালয় ১৯৫৪ সালে পারা (Paraa) নামক জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তখন প্রত্যেক দিন দুপুরে এই লর্ড মেয়র এসে কাঠের মিস্ত্রিদের কার্য্যস্থলে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিনও বাদ যায় নি—প্রত্যেক দিন দুপুর বেলায় লর্ড মেয়র এসে কাজের কাছে হাজির। মিস্ত্রিরা ঐ লর্ড মেয়রের অন্তত: ত্রিশ গজ দূরে থাকলে তবে কাজে মন দিত। লর্ড মেয়র কলা খেতে খুব ভালবাসতো। যদি সে বুঝতে পারে কোনও ক্যাম্পে বা মোটর গাড়ীতে কলা রয়েছে—তবে সে নির্ব্বিবাদে সেখানে গিয়ে শুঁড় দিয়ে কলা বের করে আনতো। মোটর গাড়ীর দরজায় জানালায় কাচের ফাঁক দিয়ে সে কৌশলে শুঁড় ঢুকিয়ে দিতে ওস্তাদ হয়েছিল। রাত্রিবেলায় ক্যাম্পের পাশে আগুন জ্বালিয়ে নিশ্চিন্ত মনে লোকেরা শুয়ে থাকে। আগুন দেখলে হাতী, গণ্ডার, সিংহ সব প্রাণীই ভয় পায়, কখনও ক্যাম্পের কাছে ঘেঁষে না। লর্ড মেয়রের কথা স্বতন্ত্র, সে রাত্রিবেলায় চুপি চুপি এসে জানালা দিয়ে শুঁড় ঢুকিয়ে কলা-মূলা যা পায় নিয়ে যায়।

আফ্রিকার হাতী আপন মনে জল খাচ্ছে

আফ্রিকার জঙ্গলে শুধু হস্তীরা নহে, জলহস্তীরাও দলে দলে চলে

আর নিদ্রিত লোকদের সাথে মজা করার জন্ত তাদের গায়ের লেপ, কম্বল সব টেনে নিয়ে যায়। লর্ড মেয়র কাউকে মারে নি, তবে ভয় দেখিয়েছে সবাইকে। কত শত লোক তার ফটো তুলেছে—তার ফটো দিয়ে কত রকম ফটো পোষ্টকার্ড তৈরী হয়েছে। এদেশীয় ও বিলাতী কত শত খবরের কাগজে তার ছবি প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে—এহেন বিশ্ববিখ্যাত হয়েও সে লোকজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কী করতে ভালবাসতো—কলা চুরি করে খেতো। একবার একদল শিকারী এসে এখানে একটা হোটেলে আশ্রয় নেয়। হোটেলে জায়গা বেশী ছিল না—তাই কয়েক জন গাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করে সেখানে শুয়ে পড়েন। কিন্তু খাওয়ার জিনিষ (কলামূলা) গাড়ীর নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। লর্ড মেয়র যথারীতি তার রাত্রিবেলার টহল দিতে এসে, ঐ কলার খোঁজ পান কিন্তু শুঁড় দিয়ে ঐগুলি আনতে না পেরে শেষে গাড়ীটাকে উল্টিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে কলা খেয়ে নেয়। গাড়ীর আরোহীরা অক্ষত দেহে থাকলেও তারা যে ভয় পেয়েছিল তা জীবনেও ভুলতে পারবে না। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানী আফ্রিকার জঙ্গলে ছবি তুলতে আসেন। তাঁরা হ্রদের একধারে ষ্টিমারঘাট তৈরী করে পাশেই তাদের Naked Earth নামক ফিল্মের 'সেট' তৈরী করেন। ঐ সেটে একটা খুব উঁচু কাঠের বেড়া দেওয়া হয়েছিল।

শক্ত কাঠের বেড়া দেওয়ার উদ্দেশ্য—যাতে হঠাৎ কোনও জংলী জানোয়ার সেখানে ঢুকতে না পারে। একদিন সকালে ফিল্ম কোম্পানীর সমস্ত লোকজনকে সচকিত করে সেখানে হাজির হল লর্ড মেয়র আর ঐ বেড়াটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে এসে হ্রদের জল খেয়ে গেল। ফিল্ম কোম্পানীর লোকেরা এই ব্যাপারটিকে পুরাপুরি ফিল্ম তুলে নিয়েছেন—জানা গেল যে ঐ ফিল্মে এই দৃশ্যটা দেখানো হবে। পরে ফিল্ম কোম্পানী লর্ড মেয়রের জন্ত ঐ বেড়ার এক দিকে রাস্তা ছেড়ে দেওয়াতে আর কোনও দিন নূতন বিপদ হয় নাই।

একবার এখানকার বন্য জন্তু সংরক্ষণ সমিতির অফিসারের বাড়ীর কাছে একটা জলের কল লর্ড মেয়রের দৃষ্টিতে পড়ে। লর্ড মেয়র জলের কল নাড়াচাড়া করে সেটাকে হঠাৎ খুলে ফেলে এবং প্রাণভরে ঐ নলের জল খেয়ে নেয়। পরে দেখা গেল যে প্রত্যেক দিন তিনি একটি করে জলের কল খুলে দিয়ে তার থেকে জল খাচ্ছেন। লর্ড মেয়র আর পচা ডোবা বা পঙ্কিল হ্রদের জল খেতে চান না, প্রত্যেক দিন কলের জল নিজে নিজে খুলে নিয়ে প্রাণ ভরে খেয়ে নেয—কিন্তু কোন দিনই তিনি আর কলটা বন্ধ করে রাখেন না। ফলে প্রতিবেশীদের হয় জলকষ্ট। তারা স্থির করলেন রাত্রিবেলায় জলের সাপ্লাই বন্ধ করে দেবেন। লর্ড মেয়র রাত্রিতে কল খুলে দেখেন জল নেই, এত বড় অপমান! সে কলটা ভেঙ্গে—মুচড়িয়ে অন্ত একটা কল খোলা হল সেটাতেও জল নেই। এই ভাবে পর পর কল ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ বেপরোয়া হয়ে হাতী যাতে না খেতে পারে (Elephant Proof) জলের কল বসিয়েছে। লর্ড মেয়র মানুষ খুন করে নাই—তবে কলা আর ভুট্টার খোঁজে সে অনেক তাঁবু ছিঁড়েছে, অনেক গাড়ী উল্টে দিয়েছে, লোকজনের বাড়ী ঘর অনেক ছোটখাট ইমারতী ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে। কাজেই গভর্ণমেণ্ট একদিন তাকে গুলী করে মারতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পর তার সমস্ত বিবরণ কাগজে ছাপা হয়—মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র বিশ বৎসর, তার দেহের ওজন ছিল ৩৷৷০ টন। আফ্রিকার ও বিলাতের পত্রিকায় পত্রিকায় তার ফটো ও মৃত্যু-সংবাদ ছাপান হয়েছে। লর্ড মেয়র মরেও আজ হস্তিকুলে অমর।

গাছের ডগার (Tree Top) হোটেল থেকে হাতীর দল দেখা যাচ্ছে

হাতী তাকিয়ে রয়েছে—এ রাস্তা মোটেই নিরাপদ নয়

"Ships that pass in the night, and speak each other in passing,
Only a signal shown and a distant voice in the darkness;
So on the ocean of life we pass and speak one another
Only a look and a voice, then darkness again and a silence."
—*H. W. Longfellow.*

সাধ্বী অঘোরকামিনী

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

[১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে (ইং মে ১৮৫৬) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মাইহাটি পরগণাভুক্ত শ্রীপুর গ্রামে স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জন্ম। ১৮৬৬ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁহার বিবাহ হয় স্বর্গীয় প্রাণকালী রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহিত। বর-বধূর বয়স যথাক্রমে ১৮ এবং ১০ বৎসর। অঘোরকামিনীর পরলোকগত হওয়ার তারিখ ১৫ই জুন ১৮৯৬। জন্ম—১৮৫৬, মৃত্যু—১৮৯৬, বিবাহ—১৮৬৬ এই বর্ষকালের প্রভাবেই হয়ত শ্রীবিধানচন্দ্র রায় আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সাধ্বী অঘোরকামিনী আমার প্রতিবেশী ডক্টর রায় মহাশয়ের পূজনীয়া মাতা ছিলেন। এই জীবন-আলেখ্যটি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত স্ত্রীচরিত্র নামক পুস্তকের (স্ত্রী-জাতীয়-উন্নতি বিষয়ক উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত) সংশোধিত ও বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত। তদানীন্তন বঙ্গ মহিলা সম্বন্ধে ১৩০৫ সনে প্রকাশিত এই অংশটুকু বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে জীর্ণ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮—১৬৪ হতে উদ্ধার করা গেল। কারণ মনে হয়, স্বর্গীয়া অঘোরকামিনীর চরিত্র আজকের দিনেও আমাদের সমাজের মা ও বোনেদের অনুকরণযোগ্য—।]

বর্ত্তমান সময়ে সাধ্বী অঘোরকামিনীর চরিত্র মহিলাকুলের পক্ষে বিশেষরূপে হিতকর। তিনি আমাদিগের নিকট পরিচিতা ছিলেন। এবং আমাদিগের পরমাত্মীয়া ছিলেন। উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গলার টাকী নামক পল্লীতে কায়স্থকুলে অনুমান ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অঘোরকামিনীর জন্ম হয়। ১৮১৫ শকে বাঁকিপুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাল্যকালে তাঁহার কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই। এবং দশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তির হস্তে তাঁহার ভার অর্পিত হয় তিনি অতি সুপাত্র ও সদাশয়। টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় অঘোরকামিনীকে বিবাহ করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন, অল্প বয়স হইতেই অঘোরকামিনীর ধর্ম্মে মতি জন্মে, ২১ বৎসর বয়:ক্রমে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা হয়। তখন হইতেই তাঁহার প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। তিনি ধর্ম্মিষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে একব্রত হইতে যত্নবতী হয়েন, এবং পরদুঃখে সহানুভূতি ও সহায়তা করিবার জন্য আত্মনিগ্রহে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া একটি প্রকাণ্ড ঝড় হয়, এবং তাহাতে লোকে যারপর নাই ভীত হইয়াছিল। তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য অঘোরকামিনী অর্থাভাবে আপনার স্বর্ণতাবিজ অকাতরে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরহিত-পরায়ণ স্বভাবের ইহাই প্রথম পরিচয়, অঘোরকামিনী নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই স্বামীর কর্ম্মস্থানে বিহার প্রদেশে বাস করেন।

মতিহারী ও বাঁকিপুর, বিশেষত বাঁকিপুর তাঁহার কর্ম্মভূমি হয়, যখন যেখানেই বাস করিতেন দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তির পরিচয় দান করিতেন, অতি সামান্য বিষয়েও পরসুখে মনযোগিনী হইতেন। যদি কেহ তাহাকে কোনপ্রকার ফল, মূল, কি মিষ্টান্ন উপহার দিত, তিনি তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাগ করিয়া অনেকের গৃহে পাঠাইতেন এবং তাহার একাংশ মাত্র নিজ পরিবারের জন্য রাখিতেন। বিহার অঞ্চলে নারিকেল বড় দুষ্প্রাপ্য বস্তু। একবার অঘোরকামিনী দুই চারিটি নারিকেল উপহার পাইয়া তদ্দ্বারা এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিলেন, এবং নিকটস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেন এবং ছাত্রেরা প্রবাসে অতি সামান্য আহার করিয়া থাকে, এই নিমন্ত্রণে সুস্বাদু মিষ্টান্ন ভোজনে অতিশয় আহ্লাদিত হইল।

এই সামান্য বিষয়ের উল্লেখ এইজন্য করা যে, অঘোরকামিনী অতি শীঘ্রই পরোপকার ব্রতে এত অধিক অনুরাগিণী ও উৎসাহী হইলেন যে অন্যের সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। যেরূপ লোক হউক না কেন, উচ্চপদস্থ হউক আর অতি নীচ জাতীয় হউক বিপন্ন হইলেই সাধ্বী অঘোরকামিনী তাহাদের সেবায় আত্মসমর্পণ করিতেন। একদিন সমাচার আসিল যে বাঁকিপুরের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর পত্নী প্রসবশয্যায় পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার রুগ্ন শিশুকে সেবা করিবার কোনো লোক নাই। অঘোরকামিনী তখন আহার করেন নাই। কিন্তু শুনিবামাত্র তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন এবং যদিও এই পরিবার তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি এরূপ যত্নের সহিত প্রসূতি ও শিশুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। অনাহারে সমস্ত দিন ইহাদের সেবা করিলেন কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তিনি আর একদিন শুনিলেন একটি অতি নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক প্রসবান্তে অতিশয় রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, দ্রুতগতি সেখানে গিয়া দেখেন, প্রসূতি একজন কয়লা-বিক্রেতার পত্নী, একটি অতি ক্ষুদ্র অপরিষ্কার কুটির মধ্যে বাস করে। আবার সে কুটীরের অর্দ্ধাংশ অঙ্গাররাশিতে পরিপূর্ণ, ঘরে ভয়ানক দুর্গন্ধ, শয্যা নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই পথ্য নাই। উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি নিজ পরিচিত চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইলেন। নিজগৃহ হইতে শয্যা ও বস্ত্র আনাইলেন এবং স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া ধূলি মলিন ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইলেন। দুঃখী গৃহস্থেরা অনেক নিষেধ করিল, তিনি শুনিলেন না, বলিলেন, এই দুই হস্ত কিসের জন্য? শীঘ্র কুটীর-বাসিনীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন এবং যতদিন সে সবল না হইল তাহার শুশ্রূষা করিলেন।

কোন আগন্তুক অতিথি অঘোরকামিনী দেবীর গৃহে নিরাশ্রয় হইয়া আসিলে ফিরিত না। একবার একদল সার্কাস অভিনেতা-দিগের মধ্যে একজন পীড়িত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। এ প্রকার লোকের সঙ্গে তাঁহার কখনও কোন সংস্রব ছিল না, তথাপি পীড়িত দেখিয়া তাহাকে তখনই গৃহে স্থান দিলেন এবং যত্ন সহকারে আরোগ্য করিয়া বিদায় করিলেন। এই প্রকার অনেক লোক তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইত, এবং সময়ে সময়ে ঘোর অকৃতজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশ করিত কিন্তু এক দিনের জন্য তিনি পরসেবায় বিরত হয়েন নাই। তাঁহার নিজ পরিবারে বিংশতিটি বালিকা প্রতিপালিত হইত। তাহারা নানা স্থান ও নানা পরিবার হইতে সংগৃহীত। তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সদাচার সমুদায়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার পাঁচটি সন্তানদের সঙ্গে তাহাদিগকে রক্ষণ ও পালন করিতেন। এবং আশ্চর্য্য এই যে,

নিজের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে পালিত সন্তানদের কোন প্রকার প্রভেদ রাখিতেন না। যদি কেহ বলিত তোমার অবিবাহিতা কন্যার হাতে কাচের চুড়ী খুলিয়া এক জোড়া সোনার চুড়ী পরাইয়া দেও। তিনি বলিতেন তা হলে অপর দশটি কন্যা কি ভাবিবে? পাছে তারা মনে দুঃখ পায়, পাছে তারা মনে করে আমাদের মা নাই, তাই আমাদিগকে শুধু হাতে থাকিতে হয়। অত এব আমি এরূপ ইতর-বিশেষ করিতে পারিব না।

অঘোরকামিনী নিজের পরিধানের জন্য অতি সামান্য এবং রুচিবিরুদ্ধ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া অনেক লোক নিন্দা ও বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিত, কিন্তু তিনি তৎ প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। প্রকাশ বাবু উচ্চদরের ডেপুটি কালেকটর; তাঁহার উচ্চ বেতন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী নীলে ছোবান থান পরেন, মাসের শেষ পর্য্যন্ত বেতনের টাকা কুলায় না, সাধারণের হিতকর কার্য্যে সমুদায় ব্যয় হইয়া যায়। বাঁকিপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান কার্য্যে অঘোরকামিনী সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। এবং তাহার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তাঁহার মাসিক আয়ের অনেক টাকা তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইত। আমরা সকলে ইহা জানিতাম, কিন্তু তিনি নিজে কখন ইহার উল্লেখ করেন নাই, এই বিদ্যালয় সম্পর্কে একটি অপূর্ব্ব কাহিনী আছে। ইহা স্থাপনের কিছুকাল পরে অঘোরকামিনী ভাবিলেন যে বিদ্যালয় চালাইতে গেলে নিজের উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক। আমার উচ্চ শিক্ষা নাই, শিক্ষা করিতে হইবে। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর, এই বয়সে পঞ্চ সন্তানের মাতা হইয়া, সম্পন্ন ব্যক্তির ভার্য্যা হইয়াও তিনি কিয়ৎ কালের জন্য বাঁকিপুর ত্যাগ করিলেন ও লক্ষ্ণৌ নগরে মিসনারীদিগের স্ত্রীবিদ্যালয়ে মহা উৎসাহে ছাত্রীরূপে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে নয় মাস কাল পরিশ্রম করিয়া নিজ পরিবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যে নূতন উদ্যমে পুনরারম্ভ করিলেন।

অঘোরকামিনীর এই সমস্ত হিতৈষণার উল্লেখ করিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি তাঁহার নিজ পরিবারের প্রতি এক দিনও উপেক্ষা কিম্বা অযত্ন করিয়াছিলেন। স্বামী ও সন্তানদের জন্য কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতেন ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, সমস্ত পরিবার সজল নয়নে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া ফুরাইতে পারে না। প্রকাশ বাবুকে সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইত। অঘোরকামিনী চিরদিন তাঁহার অনুগামিনী হইতেন। পথ ভ্রমণের সঙ্কট ও অসুবিধা অকাতরে বহন করিতেন। একবার প্রকাশ বাবুর অতি উৎকট পীড়াতে প্রাণসংশয় হয়, সাধ্বী অঘোরকামিনী দুই মাস পর্য্যন্ত দিন-রাত্রি তাঁহার চিকিৎসা-পথ্যের জন্য এরূপ অবিশ্রান্ত সেবা করিয়াছিলেন যে, যে তাহা দেখিয়াছে, সে কখন ভুলিবে না। অথচ অঘোরকামিনী স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার দৈহিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর বাহ্যিক সেবা তিনি জীবনের প্রধান কার্য্য মনে করিতেন না। স্বামীর ধর্ম্মভাগিনী হওয়াই প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন।

স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ বাধ্যতা তাঁহার প্রধান ব্রত। প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের একজন ব্যক্তি, তাঁহার নিষ্ঠা, ভক্তি, সচ্চরিত্রতা সকলেই জানেন। তাঁহার অনেক ধর্ম্মবন্ধু আছেন, কিন্তু তাঁহার ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্মবন্ধু তিনি অপর কাহাকেও কখন পান নাই। নিত্য ধর্ম্মপ্রসঙ্গে, ধর্ম্মবিশ্বাসে, ধর্ম্মপ্রচারে অঘোরকামিনীর অবিশ্রান্ত উৎসাহ। বাঁকিপুরে কোন সাধু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অঘোরকামিনী সুসজ্জিত পূজা-মন্দিরে মহাসমারোহ পড়িয়া যাইত। সেবার ও আদরের সীমা থাকিত না। অঘোরকামিনী প্রতি বৎসর অনেকগুলি আত্মীয়বন্ধু সঙ্গে করিয়া রাজগৃহ নামক বৌদ্ধতীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইতেন। ধর্ম্মসাধন করাই এই পর্য টনের একমাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন সেখানে প্রবল উৎসাহে ধর্ম্মোৎসব করিতেন, গম্যপথে লোকদিগের নিকট প্রকাশ্য উপদেশ ও নগর-সংকীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মাত্মা স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চব্রত পালন করিয়াছেন। ঈশ্বরোপাসনায় অঘোরকামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতেই তাঁহার পরসেবার প্রবৃত্তি, ভগবদ্ভক্তি এবং লোকসেবা সমান পরিমাণে তাঁহার চরিত্রকে গঠিত করিয়াছিল।

অঘোরকামিনীর দৃষ্টান্তে বাঁকিপুরস্থ মহিলামণ্ডলীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। আজ রেলগাড়ী ভ্রমণকারিণী স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশ্রামগৃহে স্ত্রী-জাতির প্রতি অত্যাচারী দুরাচারদিগের শাসনের জন্য গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা, আজ সাংবৎসরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান এরূপ নানা প্রকার সৎকার্য্যে তাঁহাদের সর্ব্বদা বিপুল উৎসাহ ছিল। কিন্তু বহু দিন হইতে অঘোরকামিনীর শরীর অসুস্থ হইতেছিল। নানা পরিশ্রমে ও নানা কষ্টভার গ্রহণের জন্য তিনি বার বার রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। শেষে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভয়ানক জ্বর-বিকার হইল, তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই বুঝিলেন যে, এবার আরোগ্যের কোন ভরসা নাই। সকলেই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। চিরজীবন তিনি লোকের সেবা করিয়াছিলেন, লোক এ অসময়ে কি তাঁহার গুণ ভুলিতে পারে? তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ অবিশ্রান্ত সেবার জন্য পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেবী অঘোরকামিনী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন দিবসে ভগবানের পবিত্র স্তোত্র শুনিতে শুনিতে ও করিতে করিতে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

আজ আর সে বাঁকিপুর নাই। বালিকা বিদ্যালয় আছে। ব্রাহ্মসমাজ আছে, স্ত্রীমণ্ডলী লোকমণ্ডলী সকলই রহিয়াছে, কিন্তু দেবী অঘোরকামিনীর অভাবে সকলই অঙ্গহীন, তেজোহীন, প্রাণহীন। অঘোরকামিনী সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না, সুরুচি কি সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হয়েন নাই, সকল বিষয়েও সদ্বিবেচনাও করিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার পরসেবায় আত্মসমর্পণ, সৎকার্য্যে উৎসাহ, সংসারবৈরাগী, চিত্তশুদ্ধি, পাতিব্রত্য, ধর্ম্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ভগবদ্ভক্তির কথা যে শুনিবে তাহারই বিশুদ্ধ আহ্লাদ হইবে। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহাদের উভয়কে শ্রদ্ধা করিয়া সুখী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি।

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ছাব্বিশ

পল্লব বাহুলগ্না বাগ্‌দত্তাকে নিয়ে পার্ক থেকে যখন বেরুল তখন রাত দশটা। উল্লাস দেন লিন্দসের মস্ত ফুটপাতে দলে দলে যুগল মূর্তি চলেছে আনন্দে। কিন্তু পল্লবের মনে হ'ল কারুর আনন্দই ওর আনন্দের কাছাকাছিও আসতে পারে না। ওর কাছে এমন আশ্চর্য ভাবে কখনো প্রত্যক্ষ হয়নি আনন্দের বিশ্ববিস্মরণী মূর্তি। বিশ্বের সম্পদ ওর কাছে আজ তুচ্ছ, নগণ্য, অবাস্তব নন্দন কানন থেকে পারিজাত ওর হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আর সব মর্ত্য ফুলই হ'য়ে গেছে ম্লান, নিষ্প্রভ গন্ধহীন। বাস্তব ওর বল্লভাকাঙ্ক্ষিতার বাহুর কোমল কবোষ্ণ চাপ ও নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেছে ওর সমস্ত চেতনা দিয়ে। এমন অপরূপা, এমন লোকললামভূতা, এমন আনন্দময়ী আজ ওকে বরণ করেছে—অঙ্গীকার করেছে জীবনপথে থাকবে ওর পার্শ্ববর্তিনী, দৈনন্দিন জীবনে হবে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশ, স্বপ্ন-বেদনার সাথী—সকালে উঠেই প্রথম দেখবে ওর তন্দ্রালস অনিন্দ্য মুখখানি, রাত্রে নিদ্রার অতলে তলিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত ওর কোমল স্পর্শ ওর অঙ্গে থাকবে লতার মতন জড়িয়ে, থেকে থেকে ঘুম ভেঙে উঠেও দেখবে ওকে অতৃপ্ত নয়নে—এই রকম আরো কত কী জল্পনা-কল্পনার নেশায় ও পথ দেখতে পায় না যেন! বাগ্‌দান···বাগ্‌দান···বাগ্‌দান···অথচ—ওর অবাক্ লাগে ভাবতে—দুদিন আগেও ও তো জানত না বিধাতার কোন্ আশীর্বাদ ওর পথ চেয়ে আছে? মনে পড়ল—পরশু দিন রাতে ওর চিত্ত-বিক্লবের কথা। আর আজ? মনে পড়ল ওর একটি প্রিয় গান: "স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী"···

হঠাৎ কর্কশ সাইরেণ ও আইরিনের চিৎকারে ওর বিহ্বল স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ফুটপাত থেকে কে একজন ওর বাহুমূল ধ'রে টান দেয়। বাহুলগ্না আইরিনকে নিয়ে ও লাফিয়ে ফুটপাতে উঠে কোনোমতে টাল সামলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে যায়। এক চুলের জন্যে বেঁচে-যাওয়া যাকে বলে!

কানে আসে পরিচিত বিদ্রূপের হাসি ও খাস বাংলায় ধমক: এমনি করেই কি প্রেম করে হে—মোড়ের মাথায়? আর একটু হলেই যে প্রেমলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল!

এ কী! য়ুসুফ?

য়ুসুফের দৃষ্টি পড়ে আইরিনের 'পরে: এ কী! ফ্রয়লাইন চের্কফ? মাফ করবেন—আপনাকে পিছন থেকে দেখেছিলাম ব'লে চিনতে পারি নি। পারলে আপনাকেই চেপে ধরতাম প্রথমে—ট্যাক্সিটা—এ কী?

ও কিছু না—কনুয়ের কাছে ঘেঁষ লেগে ওভারকোটটা একটু ছিঁড়ে গেছে।

ওভারকোটের জন্যে ভাবছি না—আপনার কনুয়ে—

না না লাগে নি—চোটটা বেচারি ওভারকোটের উপর দিয়েই গেছে।

পল্লবের এতক্ষণে সাড় ফিরে আসে, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে: সত্যি বলছ—লাগে নি চোট? দেখি—

আইরিন সকুণ্ঠে বলে: না, দেখবে আবার কী—কিছু হয় নি। কেবল ওভারকোটটার জন্যে একটু দুঃখ হচ্ছে।

য়ুসুফ হেসে বলল: সে জন্যে ড্যামেজ দেবেন তিনি—যিনি দায় না বুঝে ভার নিতে ছোটেন।

পল্লব মরমে ম'রে গেল: সত্যি আইরিন—তোমাকে আজ আমি···মানে···খুব অন্যায় হয়েছে···আমি দেখতে পাই নি···

য়ুসুফ হেসে আইরিনের দিকে চেয়ে চোখ মিট্‌মিট্ ক'রে বলে: কিন্তু এ দায় আপনারি ফ্রয়লাইন! মানে, অন্ধকে চক্ষু দানের।

আইরিন হেসে বলল: অবিচার করবেন না—অন্ধ নয়—সদ্যোজাত। তাই চোখ ফুটতে একটু সময় লাগবে।

পল্লব অপ্রতিভ স্বরে বলল: চলো য়ুসুফ, একটা কাফেতে ব'সে—

না ভাই, ধন্যবাদ! আজ আমার সঙ্গে একজন আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে two is company তার একটি বেশি হ'লেই রসভঙ্গ ব'লে টুপি খুলে রুষ কন্যার আইরিনের করচুম্বন ক'রে রুষভাষায় হেসে কি বলল। আইরিন খুশি হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। পল্লব শুধালো: কী বলল?

তোমার ভার নিতে—শুধু পথে চালাতেই নয়, পথ দেখাতেও বটে।

সাতাশ

রাত সাড়ে বারটায় যখন পল্লব বাসায় ফিরল তখন ওর মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেছে, রক্ত উঠেছে মাতাল হ'য়ে। চিন্তার দল এলোমেলো, কিন্তু ছুটেছে একই চিন্তার অভিসারে। ফিরে ফিরে মনে হয় আইরিনের প্রশ্ন: আমি তোমার ভার হব না তো?

ভার? দু'দিন আগেও ও এ-নিয়ে কতই ভেবেছে—বিবাহের হাজারো দায়িত্ব, সংসারের ভার, লোকমত, কুসুমের নিষেধ···আরো কত কী? কিন্তু আজ মনে হয় ওর নিজেরি উত্তর: বেদীর কাছে কি প্রতিমাকে মনে হয় ভার, না মুক্তি? কোত্থেকে মনে এল এ-উপমা? এরই নাম কি প্রেরণা? যদি হয় তবে এই-ই কি জীবন-বিধাতার সস্নেহ বিধান নয়? দেশের কাজ? কেন? দেশের কাজ কি বিবাহ করলে হয় না? তিলক, অরবিন্দ গান্ধী, দেশবন্ধু—দেশের কাজ এঁদের চেয়ে বেশি করেছে কে? বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে হঠাৎ। কিন্তু মন রুখে উঠে বলে: সবাইকেই কি বিধাতা এক ছাঁচে ঢালাই করেন? বিবেকানন্দ অবশ্য মহাপুরুষ—নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাই ব'লে কি বলতে হবে তাঁর পক্ষে যা ছিল স্বধর্ম তা আর সবার কাছেও হবে স্বধর্ম? রাম, কৃষ্ণ, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী···ও খুব জোর দিয়েই বলে মনে মনে: বিবাহ যদি মহত্তম জীবনের অন্তরায়ই হবে তবে এঁদের প্রত্যেকেই বিবাহ করেছিলেন কেন? মহাভারতেই কি বিধান নেই—সংসারে মোটামুটি চারটি স্বভাবের জীব জন্মায়? যার ইহকাল আছে কিন্তু পরকাল নেই, যথা ভোগী; যার পরকাল আছে কিন্তু ইহকাল নেই, যথা যোগী, যার ইহকালও নেই, পরকালও নেই যথা দুর্বৃত্ত লম্পট আর যার ইহকালও আছে পরকালও আছে যথা ধর্মভীরু গৃহস্থ। নারী নরকের দ্বার—এ-বিধান কি সত্যিই কেউ ভাগবত বিধান ব'লে মনে

করতে পারে? পল্লব ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে: কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ? দূর—ও একটা কথাই নয়।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখে, ওর লেখার টেবিলের উপরে একটি চিঠি। অতি পরিচিত হস্তাক্ষর। ঠিক আজই!···ও খুলল খামটি সন্তর্পণে, কুকুম লিখেছে:

"ভাই পল্লব,

বিলেত থেকে ফেরার পর প্রায় আড়াই বৎসর কেটে গেছে। তোমাকে চিঠি লেখাও হয় নি প্রায় বছর খানেক। লিখব কী—জেল থেকে ওরা মাসে একটি করে চিঠি লিখতে দিত, লিখতে হ'ত বাড়িতেই—বিশেষ করে বাবাকে আশ্বস্ত করতে। তাই কিছু মনে কোরো না। তোমাকে চিঠি লিখি না বটে, কিন্তু বোধ হয় এমন দিন যায় না যেদিন তোমার কথা একবারও মনে পড়ে না। বিশেষ ক'রেই মনে পড়ত জেলে—জল্পনা-কল্পনা করতাম কত রকম—কী ভাবে তোমার প্রবাস জীবন কাটছে, না জানি!

মাত্র পরশু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি এগার মাসের পর। বেরিয়েই প্রথম তোমাকে লিখছি।

দেশে পৌঁছেই তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। তাতে খবর দিয়েছিলাম—আমি দেশবন্ধুর নেতৃত্ব বরণ ক'রেই দেশের কাজে ঝাঁপ দিয়েছি। এর জন্যে একটি বারও আমার পরিতাপ আসে নি। আমার মনে হয়—তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই নয়, মানুষ হিসেবেও গান্ধীজীর চেয়ে বড়, যদিও গান্ধীজীকে আমিও এ যুগের মহৎ মানুষদের অন্যতম ব'লে মনে করি। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সার্থকতা সম্বন্ধে যাই বলা যাক না কেন, এ কথা না মেনেই উপায় নেই যে, তিনি তাঁর চরিত্রবল তথা আন্তরিকতার গুণে দেশে একটা নবজাগরণ এনেছেন; সে জন্যে তিনি আমাদের নমস্য বৈ কি! কিন্তু তবু বলব তাঁর মধ্যে সে হার্মনি ও গভীরতা আমি খুঁজে পাই নি যার গুণে দেশবন্ধু বড় হ'য়ে উঠেছেন। গান্ধীজী ত্যাগে খুবই বড়—এ কথা মানি, কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে আমি একমত যে, তিনি সামাজিক জীবনে হিন্দু হ'লেও নৈতিক দীক্ষায় বিদেশী, যেহেতু তাঁর গুরু গীতার কৃষ্ণ নন, তাঁর গুরু তিনটি বিদেশী—খৃষ্ট, টলস্টয় ও থোরো।

দেশবন্ধুর বেলায় একথা খাটে না, যেহেতু তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংরাজ হলেও, ধর্মনৈতিক দীক্ষাগুরু ভারতই বটে। তিনি অন্তর্বৈষ্ণব, বহিঃশাক্ত। তাঁর মহত্ত্বে আমি অভিভূত, তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য।

আমি গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রে বিশ্বাস না করলেও দেশবন্ধুর উপদেশে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিই—আরো এই ভেবে যে, এ-সূত্রে রাজনীতির টেকনিক তথা প্রিন্সিপল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারব। জলে না নেমে শুধু যে সাঁতার শেখাই যায় না তাই নয়—জলের বাধা কী জাতের সে সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় না। এর ফলে একটা মস্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে এই—যে কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলেন যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে ইংরাজ আমাদের প্রচণ্ড প্রতিপক্ষ হলেও আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু তারা নয়। আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু হল গৃহশত্রু ওরফে মডারেট ধুরন্ধররা। এ শুধু দেশবন্ধুর অভিজ্ঞতা নয়—১৯১৭-র লেনিনেরো ঠিক এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল—সব চেয়ে বেশি তাঁকে লড়তে হয়েছিল স্বদেশবাসীদেরি সঙ্গে কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে লেনিনের তফাৎ এই যে তিনি বলেন না তারস্বরে—এদের লিকুইডেট করতে হবে রাতারাতি, বলেন—এদেরো কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু মরুকগে রাজনীতি—এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলবার আছে, কিন্তু সে হবে তুমি ফিরে এলে।

বলেছি, আমি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে না দিতে ওরা আমার পায়ে নূপুর না হোক, হাতে বালা পরায় ও পাঠায় হরিণবাড়ি। সেখানে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে এক কারাকক্ষে কাটাই ছ'মাস—এ খবর তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। তারপর ফের আমাকে ওরা ধরে ঠিক এগার মাস আগে। পরশু ছেড়ে দিয়েছে, জেলে আমার শরীর খারাপ হবার দরুণ। তবে মনে হয় ওরা ওঁৎ পেতে বসে আছে—আমার শরীর ভালো হতে না হতে ফের পাকড়াবার জন্যে। এবার ধরলে বোধ হয় সহজে ছাড়বে না। গুজব—এবার ধরলে আমাকে পুলিপোলাও চালান দেবে বর্মায়—মাণ্ডালয় জেলে। আমি প্রস্তুত আছি। দেশের জন্যে দুঃখবরণ করেছি চোখ খুলেই—তাই সেজন্যে খেদ নেই। তবে মন খারাপ হয় ভাবতে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের স্বাধীন হবার কোনো আশাই নেই—মনে যদি না হঠাৎ ফের বিশ্বযুদ্ধ বাধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্য বাধবেই, কিন্তু কবে বাধবে ভাবি। মনে মনে জপি: নারদ নারদ! বাধাও বাধাও বাধাও শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই—তিলোত্তমা হোক কলোনিয়ানিসম দেবী।

জেল থেকে বেরিয়েছি নানান অসুখে ভুগে। প্রায় দশ সের ওজনে কমে গেছি ডাক্তারে বলছে—দু'টি মাস পুরো বিশ্রাম নিতে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সামনে অফুরন্ত কাজ, দেশবন্ধুও ক্লান্ত তথা অসুস্থ—কাজেই তাঁর অনেক কাজের ভারও আমাকেই নিতে হয়েছে। তন্দ্রালু দেশকে জাগানো কি সহজ ব্যাপার? আমেরিকার বাণী: 'সময় হ'ল টাকা', দেশবন্ধু ঠাট্টা ক'রে বলেন ভারতবর্ষের বাণী: সময় হ'ল দুন্দুভি। রসিক লোক—সাহসেও যেমন হাসিতেও তেমনি। একটা মানুষের মতন মানুষ দেখলাম বটে!

আমার কথাই ব'লে চলেছি। এগার মাস লৈপিক মৌনের প্রতিক্রিয়া আর কি। মরুকগে, এবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ বলতে ভুলছি—তোমার দু' তিনটি চিঠি পেয়েছিলাম, তখন আমি জেলে।

তোমার রুষ বান্ধবীদের কথা লিখেছ, বেশ লাগল। ওদের সঙ্গে মিশতে আমি বারণ করি না। দেশবন্ধুর সংস্পর্শে এসে আমার এ-সম্বন্ধে মত একটু বদলেছে। এখন আমার মনে হয়—ওদেশের মেয়েদের সঙ্গে যারা মিশতে পারে—পবিত্র ভাবে অবশ্য—তারা ওদের কাছে অনেক কিছু শিখতে, লাভ করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দও বার বারই বলেছেন ওদের দেশের মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই নেবার আছে। কেবল একটু 'কিন্তু' আছে।

বিবেকানন্দ যা পারতেন তা সবাই পারে না, এটুকু ভুললে চলবে না। মোহনলালেরই দৃষ্টান্ত নাও না। সে বড় গলা ক'রেই বলত যে সে জানে: where to draw the line—মনে পড়ে?

কিন্তু কার্যত কী ঘ'টে গেল, বলো দেখি? অবশ্য রিতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনো অভিযোগই নেই। এ-ও আমি মানব যে, সে মেয়ে ভালোই—স্বৈরিণী কি রঙ্গিনী নয়। কিন্তু কাল তার পাণ্ডুর রং ও ম্লান মুখ দেখে মনে হ'ল সে মনঃকষ্টে আছে। মোহনলাল যদিও বলল যে এদেশের গরম সইছে না ব'লেই তাকে এত ম্লান দেখাচ্ছে কিন্তু আমার মনে হ'ল এহ বাহ্য—রিতার সম্বন্ধে যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে: ও আমাদের দেশের শুধু জল-হাওয়াই নয়, আবহাওয়ার সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। মোহনলাল কথায় কথায় বলল—ওকে একবার চেঞ্জে সুইজর্লণ্ডে নিয়ে না গেলেই নয়—ওকে ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। আমি শুনে একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: শুনেছি যক্ষ্মা রোগের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয় সুইজর্লণ্ডে, কিন্তু ওর তো তেমন কোনো শক্ত অসুখ করে নি?

মোহনলাল যেন একটু ক্লান্ত কণ্ঠেই বলল: 'রিতা বলে—এদেশে কেউ ডাক্তারির কিছুই জানে না।' শুনে প্রথমে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম—কবুল করছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম রিতার খুব দোষ নেই। এ দেশের দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্যই সব আগে বিদেশীর চোখে পড়ে। তাছাড়া যতই কেন না আমদের দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে জাঁক করি, স্বাধীন দেশের লোক কিছুতেই এমন দেশকে শ্রদ্ধা করতে পারে না—যার কোটি কোটি সন্তানকে পদানত ক'রে রেখেছে হাজার পঞ্চাশেক ফিরিঙ্গি। আজই সকালে এই নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনিও বললেন: ঠিক এই জন্যেই আমাদের সব ছেড়ে আগে চাই স্বাধীন হওয়া, নৈলে আমাদের সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক সম্পদের বাণী ওদের কানের মধ্যে যেতে পারে কিন্তু মরমে পশবে না বাবা! ব'লেই মৃদু হেসে বললেন: তুমি জানো—আমার আপত্তি বিদেশিনী বিয়ে করায় নয়, আমার আপত্তি মেম বিয়ে করায়, কি না এমন মেয়েকে ঘরণী করায় যে শয্যাসঙ্গিনী হবার কায়দা-কানুন জানলেও সহদেশিনী হবার মন্ত্র-তন্ত্র শেখেনি। না, এ যুগে স্ত্রীকে শুধু সহধর্মিণী হ'লেই চলবে না—হ'তে হবে সহদেশিনী, এ কথাটা তুমি চালু কোরো কুসুম—পরে কাজে আসবে। কথার ক্ষমতা কত বেশি তুমি এখনো জানো না, কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে জেনেছি বাবা। এই রকম কত চমৎকার কথাই যে তিনি বলেন—তুমি থাকলে নিশ্চয়ই টুকে রাখতে কিন্তু যা বলছিলাম।

আমি মোহনলালকে বললাম একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়েই, এ দেশের ডাক্তারদের 'পরে যখন রিতার শ্রদ্ধা নেই তখন ওকে সুইজর্লণ্ডে নিয়ে যাওয়াই ভালো। কবে যাচ্ছ? মোহনলাল বলল: তোমার জেলে যাওয়ার দরুণই যেতে পারিনি, কারণ মাস খানেক আগে দেশবন্ধু বলছিলেন—তোমাকে এ যাত্রা ছেড়ে দেবে। এখন তুমি যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছ, তখন কালই পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করব, বোধ হয় মাস খানেকের মধ্যেই কালাপানিতে পাড়ি দেব, তারপরে যা করেন নিয়তি। ওর কথার মধ্যে একটু কী বলব ডিসাপয়েন্টমেন্টের সুর বেজে উঠল। অথচ মনে আছে ও বিলেতে যখন রিতার মোহে পড়ে (সহদেশিনী ছাড়া আর কারুর প্রতি সত্যিকার 'প্রেম' হ'তে পারে ব'লে আমার কোনো দিনই মনে হয়নি) তখন বলেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের গানকে নজির ক'রে:

'প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়।
আদানে প্রেম হয় না কো হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।'

কথা অনবদ্য কিন্তু এ প্রেম জাগে কখন? না, যখন দুটো মন একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে, তার আগে নয়। এই জন্যেই বিদেশিনীকে বিবাহ করায় আমার এত আপত্তি। অবশ্য যদি তেমন বিদেশিনীর দেখা মেলে যে নিজের স্বাজাত্য গৌরবকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে সহধর্মিণী তথা সহদেশিনী হ'তে পারে, তা হ'লে তাকে জীবন-সঙ্গিনী করা যেতে পারে। কিন্তু এমন মেয়ে পাওয়া দুর্ঘট, নৈলে মোহনলালের মতন সত্যিকার মহৎ যুবকও কি আজ এমন বিপাকে পড়ত? তাহ'লেই দেখ—পোষাকি মেকি প্রেমের রূপের সঙ্গে ঘরোয়া খাঁটি প্রেমের রূপের তফাৎ কতখানি!

এত কথা লিখতাম না, যদি না মোহনলালের অবস্থা দেখে মন খারাপ হ'ত। কিন্তু ও এখন করবেই বা কী—বলো? দেশের কাজ ও করতে চায় সত্যিই, কিন্তু স্ত্রীকেও তো ফেলতে পারে না? সত্যি, কাল কেবলই ভেবেছি ওর কথা। হয়ত ওর সঙ্গে তোমার মাস দুয়ের মধ্যেই দেখা হবে। কারণ ও বলছিল, রোম হয়েই বার্লিনে যাবে, সবশেষে সুইজর্লণ্ড। তোমার রিতাকে দেখে কি মনে হয়, আমাকে লিখো। আমার মনে হয়, ও এদেশে এসে সুখী হয়নি। তবে এ বিষয়ে আমার ভুল হ'তেও পারে।

শেষে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি: দেশে ফিরছ কবে? প্রায় আড়াই বছর হ'তে চলল, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর। গান তো অনেক শিখলে? আর কেন? এবার যা শিখলে দেশের কাজে লাগাও। দেশকে জাগাতে হবে গান গেয়ে—মনে রেখো। 'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য মানুষ আমরা নহি তো মেষ।' কবে যে ফের এই অপূর্ব গানটি শুনব তোমার মুখে, আর শিরায় শিরায় জাগবে উদ্দীপনা! দেশবন্ধুও তোমাকে চান। তা ছাড়া দেশবন্ধু কালই বলেছিলেন—তুমি দেশে ফিরে নানা চ্যারিটি কন্সার্ট ক'রে আমাদের টাকা তুলে দেবে—মানে, শুধু প্রেরণা নয়, পাথেয়ও হবে। তোমাকে ভগবান দিয়েছেন অনেক কিছু—দেশের কাজে লাগালে তবেই না সে সব দান সার্থক হয়ে উঠবে। চিঠি লিখো।

ইতি তোমার নিত্যশুভার্থী স্নেহবদ্ধ কুসুম।"

পুনশ্চ:—কাল রাতে মোহনলালের কথা ভাবতে ভাবতে একটা কথা কেবলি মনে হচ্ছিল ফিরে ফিরে। মনে হচ্ছিল, আরো এই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক হয়েছিল বলে। তুমি বলেছিলে: মোহনলাল যখন রিতাকে ভালোবেসে ফেলেছে, তখন তাকে বিবাহ না করে কি করতে পারত? আমি সে-সময়ে উত্তর খুঁজে পাইনি। কিন্তু কাল মনে হচ্ছিল যে, মোহনলাল একটা কাজ করতে পারত: রিতার প্রতি ওর ভালোবাসা প্রেম না মোহ, সেটা যাচাই করতে পারত কিছু দিনের জন্যে দূরে গিয়ে। আমার মনে হয়, প্রেমকে যাচাই করবার এ ছাড়া আর পথ নেই। কারণ, এক দিকে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি টান যেমন সান্নিধ্যের ইন্ধনে আগুনের মতই জ্বলে ওঠে, তেমনি অন্য দিকে সান্নিধ্যের খোরাক না পেলে নিবে যায়ই যায়। কারণ প্রেম প্রেম করে যতই কবিত্ব করি না কেন, কবিত্ব খানিকটা মায়াই বটে—মানে, নয়কে হয় করতে পারে তার যাদুমন্ত্রে

ছোঁওয়ায়। এর একমাত্র কাটান হচ্ছে, তাকে পরখ করা—অর্থাৎ দেহের সান্নিধ্যবশে যে উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে, তাকে আদর্শের নিকষে কষে দেখা।

আটাশ

পল্লবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। খানিকক্ষণ ও বিহ্বলের মতন চুপ ক'রে রইল। ওর মাথার মধ্যে ঘোরা-ফেরা করতে থাকে: সহদেশিনী সহদেশিনী!...

হঠাৎ ও রুখে ওঠে: যদি ধরেই নেওয়া যায় যে রীতা পারেনি মোহনলালের সহদেশিনী হ'তে—তা হ'লে কি এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে আইরিনীও পারবে না?

ওর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে: এ কথনো হতে পারে যে যুগ-যুগ ধরে কবিরা মিথ্যেই প্রেমের জয়গান করে এসেছেন? শুধু উচ্ছ্বাসের ঝণায় মোস্ত পড়ে, কবিত্বের আবেশেই বলে এসেছেন প্রেম অক্ষয়, অম্লান, অমর?

কিন্তু মোহনলালও তো রিতার সঙ্গে যখন প্রেমে পড়েছিল তখন ভেবেছিল এ-প্রেম ধোপে টিঁকবেই টিঁকবে? সত্যিই কি ও নিরাশ হয়েছে—সে প্রেমের রঙ দুদিনেই হারিয়েছে তার রঙ ঢঙ নিবিড়তা? আহা, আজ যদি মোহনলাল কাছে থাকত!

কুসুমের চিঠিটা ও ফের পড়ল আদ্যন্ত। পড়তে ওর মনে আবার জেগে উঠল দ্বন্দ্ব, সংশয়। একবার মনে হয়—আইরিন রিতা নয়, আবার অম্নি মনে হয়—কে জানে—হয়ত সেও রিতারই মতন পারবে না ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে?

কিন্তু না, এ একটা কথাই নয়। কে না জানে প্রেম মানুষকে বদলে দেয়—অবশ্য যদি সে খাঁটি প্রেম হয়। শুধু পরকে আপন করা নয় আপনকেও সে পর করে না কি প্রতিপদে? নব বধূ যখন স্বামীর ঘরে আসে তখন সে কেঁদেই সারা হয় পিতৃগৃহের কথা ভাবতে। কিন্তু তার পরে কি অচিন ঘরই হয় না আপন, চেনা ঘর যায় না দূরে সরে?

মনে পড়ল ওর প্রিয় কবির অপরূপ নববধূ কবিতা:

> ক্রমশ দিন কাটিয়া গেল সন্দেহ ও ভয়ে,
> কাটিয়া গেল ভাবনা ভীতি নিকট পরিচয়ে
> বুঝিলাম যে—আমার পতি আমার সখা তিনি,
> ভুবন 'পরে এমন আর কাহাকে নাহি চিনি।
> পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এত স্নেহ,
> বুঝেছি আজ—এমন আর আপন নহে কেহ।
> এ দেহ মন দিয়েছি আমি তাঁহারি পায়ে সঁপি
> জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি।(১)

এই অবিস্মরণীয় চরণ ক'টি তিনি লিখেছিলেন কি তাঁর স্ত্রীকে দেখেই নয়—যার মৃত্যুর পরে আর তিনি বিবাহ করেননি, বলেছিলেন—বিবাহ কেবল একবারই হয়? এই যে একনিষ্ঠ অতলান্তিক বেদনার ব্যবধানও ম্লান করতে পারেনি—এ কি শুধু কবিত্বের উচ্ছ্বাস? হতেই পারে না। কুসুম মহৎ, ত্যাগী, দেশব্রত, কিন্তু সে কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছে যে ভাবে 'নব বধূর' কবি ভালোবেসেছিলেন তাঁর বধূকে? দেশসেবার সম্বন্ধে ও অনেক কিছু জানতে পারে, কিন্তু বিবাহের ও কী জানে শুনি?

কিন্তু অমনি ফের উঁকি মারে উল্টো যুক্তি: তাঁর প্রেম যে মোহ ছিল না সেটা কবি প্রমাণ করেছেন কিসের সাক্ষ্যে?—উচ্ছ্বাসের না জীবনের? হাজার হাজার ক্ষেত্রে জীবনের সাক্ষ্য ঠিক এই প্রেমকেই না মঞ্জুর করে না কি? তবে? কেমন করে ও জোর করে বলতে পারে—আইরিনের প্রতি ওর প্রেম সত্যের কোঠায় পড়ে (যার প্রমাণ স্থায়িত্বে) না, মিথ্যার কোঠায় পড়ে (যার ধর্ম উবে যাওয়া)—যেমন হয়েছে হয়ত মোহনলালের ক্ষেত্রে?

কিন্তু এ তো কুসুমের সন্দেহ মাত্র? কে বলল যে মোহনলাল ও রিতার প্রেম উবে গেছে, কি মন্দা হয়ে এসেছে?

অমনি ফের সংশয় ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। কেসলার যাই হোক তাকেও আইরিন তো ভালোবেসেছিল আর যখন ভালোবেসেছিল তখন তো তার মনে হয়েছিল—এ স্থায়ী প্রেম? তবে? তবে কেমন করে পল্লব বলতে পারে যে, ওর প্রতি আইরিনের প্রেমের জাতই আলাদা?

নাঃ, কুসুম মিথ্যা বলেনি: ওদের প্রেম সার্থক হ'তে পারে না যদি আইরিন পল্লবের সহদেশিনী হ'তে না পারে। কিন্তু পারবে কি না আগে থেকে জানার উপায় কী? ওকে ছেড়ে কিছুদিন দূরে থাকা? একথা ভাবতেও ওর মন ব্যথায় টন-টন ক'রে ওঠে। কিন্তু যতই ভাবে ততই মনে হয় ফ্রাউ ক্রামারের কথা: সে, ব্যবধানের নিকষে প্রেমকে পরখ করলে তাতে ক'রে প্রেমের লাভ বৈ ক্ষতি নেই। আজকের মানুষ এ-যুগের আবহাওয়ায় গ'ড়ে উঠেছে, আর সে-আবহাওয়া, জর্মনরা যাকে বলে Zeifgeist—চায় সব কিছু ক'ষে দেখতে। আগেকার যুগের মানুষ ছিল সরল—যা দেখত তাকেই গ্রহণ করত তখনি তখনি। এ-যুগের মানুষের স্বভাব খানিকটা বদলে গেছে বৈ কি! কোনো কিছুরই সে আর দাম ধরতে পারে না তার বাজার দর নিয়ে। তাছাড়া যাচাই করতে এত ভয়ই বা কেন? মোহনলালের কথা একটু আলাদা: পাকে চক্রে রিতার এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যার ফলে তখনি তখনি বিবাহ না ক'রেই ওর উপায় ছিল না। কিন্তু আইরিনের তো ঠিক সে অবস্থা নয়। ও ঠিক করল—আইরিনকে বলবে সব কথা খোলাখুলি। না, মোহনলালের কথা বলবে না—কারণ তার ও রিতার প্রেমের এখনকার অবস্থা যে ঠিক কী তা তো ও জানে না—তবে কুসুমের 'সহদেশিনী' কথাটার মর্ম ওকে বুঝিয়ে দিতেই হবে—দেখি ও কী ভাবে নেয়—আর বলবে ওকে যে, কিছু দিনের জন্যে স্বেচ্ছাকৃত বিরহকে বরণ ক'রে দেখা যাক ওদের প্রেমকে যাচাই ক'রে। এতে ব্যথা বাজবে উভয়েরই—কিন্তু ব্যথাতে ভয় কী—যদি প্রেম সাঁচ্চা হয়?

তবু ব্যথায় বুক টন-টন ক'রে ওঠে। করুক। কুসুম দেশের জন্যে প্রাণ দিতেও পেছপাও নয় আর তার বন্ধু হ'য়ে ও কি না কিছু দিনের জন্যে বিরহব্যথাকে বরণ করতে ডরাবে? কুসুমের ত্যাগ, মহত্ব, আনন্দমঠের সন্তানব্রত বরণ ক'রে সর্বহারা হবার আদর্শ ওর মনে ফের জ্ব'লে ওঠে আলো হ'য়ে। প্রেম বড়—সত্য, কিন্তু শুদ্ধ হ'লে তবেই না সে বরেণ্য! ও কাল সকালেই আইরিনের কাছে কথাটা তুলবে। সে নিশ্চয় বুঝবে—মানে যদি

১। দ্বিজেন্দ্রলালের নববধূ কবিতা—মন্ত্র

ওকে সে সত্যিই ভালোবেসে থাকে। ওর মহৎ আদর্শের টানে সে নিশ্চয়ই হতে চাইবে ওর 'সহধর্মিণী'।

ঢং ঢং করে দুটো বাজল। ক্লান্ত হ'য়ে ও শুয়ে পড়ল।

* * * *

পরদিন সকালে উঠে কফি নিয়ে বসেছে, এমন সময় পরিচারিকা ঢুকল একটি চিঠি নিয়ে।

এ কী! মোহনলালের হস্তাক্ষর! সাগ্রহে পড়ে:

"ভাই পল্লব,

কুঙ্কুম হয়ত তোমাকে লিখে থাকবে রিতার শরীর ভালো যাচ্ছে না। তাই স্থির করেছি কয়েক দিনেই মধ্যেই রওনা হব। কারণ বোধ হয় দিন সাতেকের মধ্যেই একটা জাহাজে দুটো বার্থ পাওয়া যাবে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে রওনা হব মাসখানেক বাদে কিন্তু কাল সারারাত রিতার মাথা ঘুরেছে। ও-ও আর দেরি করতে চাইছে না, তাছাড়া যদি ওর শরীর সারতে ওকে য়ুরোপে যেতেই হয় তবে শুভস্য শীঘ্রম্—বটেই তো।

তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন হয়ত আমরা রোমে। কারণ আমরা ঠিক করেছি পোর্টসেড পর্যন্ত জাহাজে গিয়ে কায়রোতে দু'-চার দিন বিশ্রাম করে উড়ে যাব সোজা রোম। সেখানে আমাদের ঠিকানা: লুনা হোটেল। তুমি রোমে একবার ঘুরে যাও না? বেশ হয় তা'হলে যদি ধরো ধোমে গিয়েই দেখি—তুমি সশরীরে! লুনা হোটেলেই থেকো—মানে যদি রোমে আসো। যদি না আসতে পারো তবে আমাকে লিখো রোমে, আমরা বার্লিনে ঘুরে যাব সুইজলণ্ড—যদি সম্ভব হয় তোমাকে পাকড়াও করে। অনেক কথাই বলবার আছে, কিন্তু চিঠি লিখবার যুগ—তে হি নো দিবসা গতাঃ। এখন কেবল একটি জিনিষ পারি পূর্ববৎ: তোমাকে কাছে পেলে অনর্গল মনের কথা বলতে রিতাও তোমাকে বলতে চায় অনেক কিছু। আশা করি দেখা হবে রোমে কিম্বা বার্লিনে। ইতি

স্নেহবদ্ধ মোহনলাল।"

ঊনত্রিশ

হঠাৎ পল্লবের মন বিষাদে ছেয়ে যায়: সবাই মিলে চক্রান্ত করেছে ওকে আইরিনের কাছ-ছাড়া করতে! কালকের রাতের রঙিন শিহরণ আজ কোথায় তার জায়গা জুড়েছে আজ হাজারো বিরস ভয় ভাবনা, দ্বিধা সংশয়। কবির শ্লোক মনে পড়ে: "Rarely, rarely comest thou, o spirit of delight!

কিন্তু আজই আইরিনকে বলবে কোন মুখে সেধে বিরহ বরণ করার কথা? যদি সে হাসে, কি মান করে? পারবে কি তখন কৃচ্ছ্রসাধনের উগ্র সংকল্প বজায় রাখতে? কুঙ্কুমের আদর্শ তো ওর নিজের আদর্শ নয়? তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? গান শেখা সৌখিন বিলাস হ'তে পারে তবু তো একটা কাজ। অন্যত্র গিয়ে করবে কী? ভেরেণ্ডা ভাজবে? দূর—যত সব উদ্ভট জল্পনা!

তার পরেই মনে হয় মোহনলাল ও রিতার কথা। ওরা হয়ত এত দিনে রোমে এসে গেছে। রোসো, ওর চিঠি এসেছে ঠিক তেইশ দিনে। হ্যাঁ, ও যদি চিঠি লেখার সাত দিনের মধ্যে জাহাজ নিয়ে থাকে তবে কায়রোতে পৌঁছেছে দিন সাত আট আগে। তা'হলে এখন ওর রোমে পৌঁছে যাবার কথা। ও উঠে একটা টেলিগ্রাম ফর্ম নিয়ে বসে। লেখে: Mohon Ghosh, Allevgo Luna Roma—Telegrafate gubito Perfavove...(২)

এমনি সময়ে...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

Kommen Sie, herein! (৩) বলে ও চেঁচিয়ে।

হাসিমুখে য়ুসুফের অভ্যুদয়, বলে হাসিমুখে: Ruten Sie nicht den Teufel herein!(৪)

পল্লব হেসে বলে: ডাকা যায়—যদি সে হয় ব্যথায় ব্যথী। বোসো।

না ভাই বসবার সময় নেই। তোমাকে আমিই এসেছি ডাকতে।

ডাকতে? কোথায়?

য়ুসুফ আভূমিপ্রণত অভিবাদন করে ধরে ইতালিয়ান: Alla bellissima Italia—la culla della poesia! (৫)

সে কি?

কাজ থেকে দুমাস ছুটি নিয়েছি—আর পারি না শীত সইতে। আজই রোম রওনা হচ্ছি—তুমিও চলো না।

রোম?

অমন রাজধানী কি আর আছে ভাই—il pavadiso del sogna! (৬)

কিন্তু—

কিন্তু না—চলো তোমার তো আর চাকরি নেই যে ছুটি নিতে হবে। তোমাকে যত দেখি ততই জ্বলে-পুড়ে মরি—ঈর্ষায়! না ঠাট্টা নয়—চলো। সেদিনই তো বলছিলে ইতালি দেখবার তোমার খুব শখ। এখন ইতালিয়ানে হাতে খড়ি হয়েছে—অসুবিধে হবে না!

কিন্তু আজই?

য়ুসুফ ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বলে: আহা, নবলব্ধাটি জুড়িয়েযাবেন না, যাবেন না। বরং বিরহের আগুনে আরো জাজ্বল্যমানা হ'য়ে উঠবেন। মিলনকে চিনতে হলে চাই বিরহের চক্ষুদান।

কী যে তুমি!—না, এ বিরহ মিলনের কথা নয়—আমি নিজেই ভাবছিলাম একটু বেড়াতে যাব—

ব্যস, তবে আর কি? জর্মনদের ভাষায় বলি abgemacht! কেমন, কথা দিচ্ছ তো?

পল্লব একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে: বিকেলে বলব।

কী মুস্কিল! ট্রেনে ঘুমতে হবে তো। না, আর কথা নয়—আমি এক্ষুণি একটি শোবার কুপে রিজার্ভ করতে যাচ্ছি—টাকা দাও তো।

ব্যাঙ্ক থেকে আনতে হবে—কত টাকা?

কত আর তিন চার পাউণ্ড—সে যাক আমিই টিকিট করে রাখব। কেবল দেখো ভাই, গরীবের টাকাটা মারা না যায়।

২। Please wire at once ৩। ভিতরে এসো ৪। শয়তানকে ডাকতে নেই ঘরের ভিতর। ৫। সুন্দরীতমা ইতালি—কবিতার দোলনা।

৬। স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য।

চললাম এখন, বড় তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ শোনো, তুমি শুধু তোমার পাসপোর্টে ইতালিয়ান কনসালের কাছ থেকে একটি ছাপ নিও—ভিসা। আমিও সেখানে থাকব—ঠিক দুপুর বেলা, কেমন ?

শোনো শোনো। ইতালিয়ান কনস্যুলেট কোথায় ?

বিসমার্ক শ্‌ত্রাসে—হ্যাঁ, ট্রেন রাত পৌনে দশটায় ছাড়বে। পৎসদাম বানহফে ঠিক সাড়ে আটটার মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ো কিন্তু ভুলে গিয়ে আমাকে ফাঁসিয়ো না ভাই, লক্ষ্মীটি।

বলেই যুসুফ ঝড়ের মতন বেরিয়ে গেল টুপি নেড়ে: Addis, amico caro।(৭)

পল্লবের মন খারাপ হয়ে গেল: এ কী কাণ্ড। নিয়তি যেন উঠে পড়ে লেগেছেন ওকে রাতারাতি আইরিনের কাছছাড়া করতে। ওর মনের মধ্যে দুটো স্বর ওঠে বেজে: একটা স্বর বলে: হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। অন্য স্বরটা বলে: কী সেন্টিমেন্টাল। ভয় যে করে সেই হারায় সব আগে।

ভেবে চিন্তে ও টেলিফোন ধরে···আইরিনের নম্বর দেয়।

পরিচিত স্বর: কে ?

আমি—পল। আইরিন ?

হাসির শব্দ: এখনো পরিচয় দিয়ে চেনাতে হবে ? আমি যে টেলিফোনে তোমার নিশ্বাস শুনলে বলে দিতে পারি, মনামি শের।

পল্লব হেসে বলে: তোমার সঙ্গে কার কথা, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। এক্ষণি।

ফ্রাউ ক্রামারের ভাষায়—Ich applaudiere auf das her(৮) Zlichste এক্ষণি চলে এসো।

কোথায় ?

কোথায় আবার ? সোজা আমার এখানে। Nur Keine Angst। (৯) সকালে এখানে একেবারে নির্জন—কোনো ভয় নেই—সবাই কাজে বেরিয়ে যায়।

ভয় আবার কিসের ?

টেলিফোনে আইরিনের হাসি বেজে ওঠে: নাতাশা ভয় দেখায়নি—কুমারী শয়ন কক্ষে কুমারের আবির্ভাব এদেশে নিষেধ ? বলেই হেসে: কিন্তু এখন সে-ও কিছুই বলতে পারবে না—কেমন হয়েছে ?

পল্লবও হাসে: খুব সাজা হয়েছে তার। আচ্ছা আমি আসছি তাহলে। [ক্রমশঃ।

৭। গুড বাই, প্রিয় বন্ধু।

৮। আমি সর্বান্তঃকরণে সাবাস বলছি। ৯। মা ভৈঃ।

খর রৌদ্রে ঝলসিত

সত্যধন ঘোষাল

তীক্ষ্ণতার সীমানায় ঝলসে গেল।
চিকণচিকণ কথা বলার সুর,
এবং পাখীর ঠোঁটের মতন লাল হয়ে
জ্বলতে থাকলে তুমি
কিংবা সে তুমি নও—
এক অর্থময় দেহ।

তীব্র হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে জনতা
নিদারুণ নিদাঘেও কাঁপছে
ধূসর আকাশ আশ্চর্য হয়ে দেখছে
কেবল প্রাচীনা পৃথিবী নির্বিকার
আমাদের অর্বাচীন প্রেমময়তায়।

তীক্ষ্ণতার সীমানায় তীব্র হয়ে ছিটিয়ে পড়ছে সব।

জানি না কতক্ষণ তুমি জ্বলবে—
মুঠো-মুঠো মেঘ নিয়ে ধিকিধিকি আকাশ,
উন্মুক্ত কৃপাণের মত দীপ্রদিনের সীমানায়
ঘুরতে ঘুরতে ব্যগ্র কামনায় প্রৌঢ় হয়ে গিয়ে
আমিও
নিরস্ত জনতার মিশে যাব
কোন এক সময়।

পক্ষধর মিশ্র
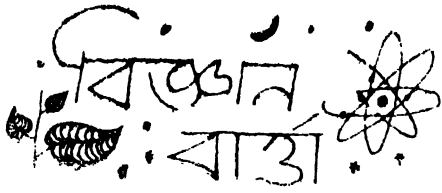
জন সি বেইলারের ছোট একটি আলোচনা চোখে পড়লো। আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে বর্তমান কালের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রণালীর পরিবর্তনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় প্রতিদিনই কিছু না কিছু মূল্যবান তথ্যাবলী তার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। সুতরাং পুরোনো শিক্ষাদানের প্রণালী আর বিশেষ কার্যকরী নয়। নতুনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করতে হবে, পুরোনোকেও ভুললে চলবে না। কারণ পুরোনো ফলাফল, মতবাদ এবং তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করেই নতুনের জন্ম হয়েছে। নতুন আবিষ্কার এবং তথ্যাবলীর সঙ্গে তার পূর্বতন পরিপ্রেক্ষিতের সম্মেলন ঘটিয়ে কোন কিছু ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা এক অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ শিক্ষাদানের সময় সীমাবদ্ধ, ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের সময়ও সীমাবদ্ধ, সুতরাং তার মধ্যেই ছাত্রদের ক্রমবিস্তারশীল বর্তমান বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। তাই মনে হয়, বর্তমানকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করা কঠিন কাজ। শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক বেইলার তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের কর্তব্য কি হওয়া উচিত, তার উপর তাঁর নিজের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন। বেইলার নিজে একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ। আমেরিকার অজৈব রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং বর্তমানে তিনি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। এদেশে বেইলারকে অনেকেই Mr. Inorganic Chemist বলে সম্মান জানান; তাই অধ্যাপক বেইলারের এই মতামতের বিশেষ মূল্যমান আছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার উন্নতি, অগ্রগমন, এবং প্রাধান্য বিশ্বের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। নিজের দেশের শিক্ষাধারার মধ্যেও আধুনিক কালের সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনের সুযোগ এবং সুবিধা বর্তমান, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও যদি বেইলারের মতো একজন শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী যদি তারও পরিমার্জনের জন্য চিন্তা করতে সুরু করেন, তাহলে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই চিন্তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব যে কতো বেশী, তা আমাদের দেশের যে কোন শিক্ষাবিদই উপলব্ধি করতে পারবেন। এদেশের সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষক তুলনামূলক ভাবে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষাদানের সুযোগ সুবিধার অধিকারী, শিক্ষাদানের পদ্ধতিও অনেক আধুনিক; তা সত্ত্বেও যদি তাদের বর্তমান কার্য্যপ্রণালী পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন যে কতো বেশী, তা যে কোন চিন্তাশীল পাঠকই উপলব্ধি করতে পারবেন।

শেষ অংশে যুক্ত করেছেন। উদ্ধৃতিটি হলো—*the mind is a pyre to be kindled not a vessel to be filled.* আজকের দিনে যে কোন বিষয়ের বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের এক ক্ষুদ্রাংশও মানুষ তার মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। মানুষ জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারে, তার মূল ভিত্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এতে মনের হয় সম্প্রসারণ, জ্ঞানের মূল ভিত্তির সঙ্গে সুপরিচিত হবার ফলে তার জ্ঞানভাণ্ডারের অপরিচিত অংশসমূহের কার্য্যকারণকে ব্যবহার করার তার ক্ষমতা জন্মায়। মনকে তাই জ্বালিয়ে তুলতে হবে, যাতে সে নিজের আলোয় এগিয়ে চলার পথ খুঁজে পায়, নিজের উত্তাপেই চলার পথের বাধাবন্ধকে গলিয়ে দিতে পারে—নিজের শিখাকে বিস্তৃততর করে বিশ্বকে আলো বিতরণ করতে পারে। জ্বালিয়ে তুলতে পারে আরও অজস্র নতুন দীপশিখাকে। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষকেরা যদি ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের ইচ্ছাকে জাগরিত না করতে পারেন, তাদের জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষমতার যদি বৃদ্ধি না ঘটাতে পারেন, তাহলে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ছাত্রদের মন হয়ে পড়বে জল ভরার পাত্র। শিক্ষকেরা তা ভরে দেবেন কিন্তু পাত্রের মধ্যে অবস্থিত বস্তুটির বিকাশ আর ঘটবে না। সর্ব দেশেই সর্ব প্রকার শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাই শিক্ষকদের পবিত্র দায়িত্ব হবে ছাত্রদের মনে জ্ঞানার্জনের ইচ্ছাকে প্রজ্বালিত করা। শিক্ষকদের এই দায়িত্ব অবশ্য নতুন নয়, এটা চিরকালের। তাঁরা ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন; জ্ঞান-ভাণ্ডারের সীমানা সম্প্রসারণের জন্য সঠিক পথে চলার নির্দেশ ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছ থেকেই পায়।

আমাদের দেশের অবস্থাটা কি? যে শিক্ষাধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের ছাত্ররা বিশ্বের জ্ঞান-জগতের বৃহত্তর পরিবেশের দিকে এগিয়ে যান, তার স্বরূপের সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় আছে। এতে ছাত্রদের মন প্রদীপের মতো জ্বলে উঠে না, সীমাবদ্ধ জলপাত্রের মতো প্রশ্ন এবং তার উত্তর মুখস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিশ্বের উন্নতিকামী জাতিরা যখন প্রতিদিনের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের শিক্ষাধারার কিছু না কিছু উন্নতি এবং পরিমার্জনের কথা চিন্তা করছেন, এখন আমাদের দেশের শিক্ষাধারা চলেছে কোন পথে? শিক্ষাদানের চেয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং মুখস্থ করে উত্তর লেখার প্রাধান্য এখনও ঠিক সেই আদিম কালের মতো একই ভাবে বিরাজ করছে। ছাত্রদের মন একটা বিরাট পাত্র, মাষ্টারমশাইরা সেই পাত্র কয়েকটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র দেখে ছাত্ররা যেগুলি তাদের জানার মধ্যে পেলো, সেগুলি দাগ দিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি খাতার মধ্যে বার করে দিয়ে এলো। সকলেরই মুখে এক কথা কটা 'কমন' পড়লো। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের ক'টা প্রশ্নের উত্তর ঐ এক এক জনের মনের ঘড়ার মধ্যে বিরাজ করছিলো। ঘড়া ফাঁক করে তা তারা সব ঢেলে দিয়ে এসেছে পরীক্ষার খাতায়। শেষ হয়ে গেছে তাদের কাজ—ঘড়া এখন ফাঁকা। পরীক্ষার ফল বার হলো, ঘড়া যাঁরা ফাঁক করতে পেরেছেন উত্তরের খাতায়, তাঁরা ডিগ্রী পেলেন। তাঁদের মান বাড়লো—ডিগ্রী হাতে করে এসে নামলেন কর্মক্ষেত্রে। ঘড়া যে সেই পরীক্ষার সময় ফাঁক করে তিনি উত্তরের খাতায় ঢেলে দিয়ে এসেছিলেন—তা তার পর ফাঁকাই রইলো।

রান্নাঘরের কুলুঙ্গীতে। এদিকে যিনি ঘড়া ভরেছিলেন নানা বস্তু সংগ্রহ করে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর ঘড়ার জিনিষ প্রশ্নপত্রে আসেনি—তার কি হলো? পরীক্ষার হলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন,—তাঁর ঘড়ায় রয়েছে জল আর পরীক্ষায় এসেছে তেল। অতএব এবার পরীক্ষায় তিনি ফেল করলেন—দোষ দিলেন ভাগ্যের। লেখাপড়ার পালা শেষ হয়ে গেল। কিছু দিন পরে তাঁর ভর্তি ঘড়ায় যা কিছু ছিল, তা সব পচে একেবারে শুকিয়ে গেল। পিতৃদেবের বহু কষ্টার্জিত অর্থের এই হলো সদ্‌গতি। এই ঘটনার আর একটি তৃতীয় পর্য্যায়ও আছে,—যদি বেশীর ভাগ ছেলেরই ঘড়ায় তেল থাকে আর প্রশ্নে আসে জল—তাহলে কি হবে? তাহলে ঘটবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা,—ছাত্ররা মিছিল করে চিৎকার করবে প্রশ্নপত্র কেন শক্ত হয়েছে? অর্থাৎ ঘড়ায় যা ছিল, তা কেন প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয়নি? আরে, কি করে দেবেন?—যিনি প্রশ্ন করেন, তিনি ঘড়ায় কি আছে, তা জানেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন আইন নেই, ঘড়ায় কি আছে তা দেখে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে।

পাঠকেরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, বেইলার সাহেবকে নিয়ে সুরু করে কথায় কথায় এতো দূরে চলে এলাম কেন? এলাম অনেক দুঃখে। সুদূর আমেরিকায় বসে দেশের খুব কম খবরই পাই—যা পাই তা অনেক সময় নিজেদের বিব্রত করে তোলে। এদেশে এশিয়ার খবর বলে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক বার হয় এবং যে-সব এশিয়াবাসী নানা কাজে, লেখাপড়ায় বা গবেষণায় যোগ দিতে এদেশে আছেন, বিশেষ করে তাঁরাই এটা নেন। এই পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় দেখলাম, কোলকাতায় না কি ছাত্রহাঙ্গামা হয়েছে। ব্যাপারটা সেই চিরন্তন—কোন একটি প্রশ্নপত্র নাকি কঠিন হয়েছিলো। এদেশে ঠিক এই কারণে ছাত্রদের দ্বারা ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা বোধ হয় কল্পনা করা যায় না। দোষটা কার—ছাত্রদের, শিক্ষকদের, যিনি প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন তাঁর না শিক্ষাদানের প্রণালী এবং পরীক্ষা গ্রহণের ধারায়? ছাত্রদের দ্বারা এরকম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তো আজ প্রথম নয়—এর অবলুপ্তির জন্য শিক্ষানায়কেরা কোন নতুন উপায়ের সন্ধান করেছেন?

যাই হোক, আবার নিজের কথায় ফিরে আসা যাক। বেইলার সাহেব বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তনের জন্য প্রত্যেক বিজ্ঞান-শিক্ষককেই তাঁদের শিক্ষাদানের প্রণালীর উন্নতি বিধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিদিনের উন্নতির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তার সময়োপযোগী পরিমার্জন ঘটান সহজ নয়। বিজ্ঞান-শিক্ষকদের সামনে এই মহাসমস্যা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের আকার ধারণ করেছে। আজকের বিজ্ঞান-জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে আগামীকাল যে পরিবর্তন শিক্ষকেরা আনবেন,—আগামীকালের বিজ্ঞান-জগতের অগ্রগমন এবং আরও কিছু নতুন আবিষ্কারের সংযোজন তার মধ্যে আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটাতে পারে। প্রত্যেক উন্নতিকামী দেশের চিন্তানায়করাই দেশের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ধারার পরিমার্জনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। কারণ, এর উপরেই তাঁদের নিজের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে উন্নত করতে হবে। প্রথমটি হলো শিক্ষাদানের পরিধির মধ্যে নতুন নতুন তথ্যাবলীর সংযোজন এবং দ্বিতীয় হলো যেসব প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এই সব নতুন আবিষ্কার সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করেছে তার সঙ্গেও ছাত্রদের মনের সংযোজন ঘটিয়ে দেওয়া। বেইলার বলেছেন যে, এই দুটির কোন একটিকেই কম গুরুত্ব দিলে শিক্ষকেরা তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন না। কারণ নতুন তথ্যাবলীকে বাদ দিয়ে শিক্ষাদান করলে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পূর্ণরূপে ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং বর্তমানকালের বিজ্ঞান-জগতের চিন্তাধারা কি ভাবে গড়ে উঠলো ও তার সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার পূর্বসূরীরা কি উপায়ে আধুনিক বিজ্ঞান জগতকে সুশোভিত করেছেন তার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে ছাত্ররা বিজ্ঞানের মনোভাবের সন্ধান পাবেন না। বিজ্ঞানের এই মনোভাবের সঙ্গে সুপরিচিত না হলে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পদার্পণ করা এক সুকঠিন কাজ।

এখন শিক্ষকেরা যদি এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁদের শিক্ষাধারা পরিচালিত করেন, তাহলে সমস্যাটা আসে কোথা থেকে? সমস্যাটা বিরাজ করছে শিক্ষাদানের মূলকেন্দ্রে। শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু রোজই যাচ্ছে বেড়ে কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণের সময় তো বাড়ে নি? সব তথ্য তো ছাত্রদের সামনে এই স্বল্প সময়ে উপস্থিত করা যায় না—উপস্থিত করলে তা পাত্র ভরাই হবে, প্রকৃত শিক্ষাদান করে মনকে উদ্দীপিত করা যাবে না। ছাত্রদের পক্ষে একই সময়ে এতো বেশী জিনিষ শিক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়। সেখানেই তো শিক্ষকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সুরু হলো। তাঁকেই স্থির করে নিতে হবে, কি ভাবে পড়ালে বিজ্ঞানের মূল মনোভাবের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করানো যাবে। ছাত্ররা পাবেন রসের আস্বাদ—তাঁদের জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা প্রজ্বলিত হবে। বিজ্ঞানের কোন তথ্যকে বেশী গুরুত্ব দেবেন, কোন তথ্যকে ঠিক কি ভাবে উপস্থিত করবেন, তার সমস্ত দায়িত্ব বিজ্ঞান-শিক্ষকের। বেইলার বলেছেন, আগের যুগের চেয়ে আধুনিক কালের ছাত্রদের অনেক বেশী বিষয়-বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবে, তাই শিক্ষকেরা যদি তাকে সংক্ষিপ্ত এবং সুসংবদ্ধ না করতে পারেন, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষার ধারা এক অসম্ভবের পর্য্যায়ে উপনীত হবে।

"He who first shortened the labour of copyists by device of Movable Types was disbanding hired armies, and cashiering most kings and Senates, and creating a whole new democratic walls; he had invented the art of Printing."

—*Thomas Carlyle.*

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৫

দুঃখের পসরা মাথায় নিয়ে কাটছিলো দিন। নিজের দিকে তাকাবার সময় ছিলো না চম্পার। সেই বিয়ে ভেঙে দেবার পর থেকে প্রতাপ আর তার মতো আরো ক'জন মাতব্বর পরিহার করলো তাদের। কিন্তু গ্রামশুদ্ধ মানুষকে কিছু তারা মাথা কিনে রাখে নি। বিষ্ণু, সুজন, ভগবতীপ্রসাদ এই সব গরীবগুরবো মানুষ সুরজকুঁয়ারীকে ত্যাগ করলো না। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা রইলো। পাল-পার্বণে তাদের ঘরের সামান্য আয়োজন ভাগ ক'রে নিতে ডাকও পড়লো তাদের। কিন্তু তাদের এমন ক্ষমতা নেই যে এদের কাপড়-রুটি জোগায়। লালা বৈজনাথের বাড়ীতেও মস্ত সংসার, অনেক কাজ। সাদা চুণ-রং করা দোতলা মেটে ঘর। তার নিচের কামরায় রেড়ির তেলের বাতি জ্বেলে গদীতে বসে থাকে বৈজনাথ। সুদ কষে। চাষী কিষাণের বিপদের সময়ে থলি ভরা টাকা বাজিয়ে সাহায্য করতে চায় সেধে সেধে। বলে—কিসের লিখাপঢ়া ভাই? ভাইকে টাকা দিচ্ছি, তাতে কিসের ভাবনা? শুধু তাই, সুদ কারবারের আদব রাখবার জন্যে এই ভুখা কাগজে একটি টিপছাপ দিয়ে যাও। হাঁ, তোমার আমার দু'জনের ইমান ঠিক রইলো।

টিপছাপ দিতে দুঃখী কিষাণের আঙুল যেন আর উঠতে চায় না। কেন না, তারা ভাল ক'রেই জানে তাদের অধস্তন তিন চার পুরুষেরও কপাল ঐ তৌজী খাতাতে বাঁধা পড়লো। সত্যি সত্যিই তাই হয়। হয় বান, নয় অনাবৃষ্টি, এই সব চোট ঠেকিয়ে যদি বা রুখভুখা মাটিতে সোনালী সবুজ গমের রং ঢেলে দিলো কিষাণ, সে ফসলে সে হাত ঠেকাতে পারে কোথায়? সব টাকা গিয়ে ওঠে ঐ লালার ঘরে। গণেশের সিঁদুরছাপ দেওয়া লোহার সিন্দুকে। কপাল চাপড়ে কিষাণ আবার ধার করে।

বৈজনাথের হাসি হলো মকরের কামড়। এমন করে দাঁত বসায় যে, ঠাহর হয় না অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত। তার পর সুদে-আসলে মিলে ধারের বহরটা যখন বুকে চেপে বসে, তখন মনের দুঃখে মাটিতে লাথি মেরে কিষাণ যায় ফৌজে নাম লেখাতে। কোম্পানীর ফৌজে রংরুট হওয়ার স্বপ্ন, সে যেন সোনার হরিণ। ফৌজে নাম লিখিয়ে একটা কিষাণেরও নসীব ফিরেছে? মনে তো পড়ে না। তবু তারা যায়। কেন যায়, জিজ্ঞাসা করলে ওপর দিকে হাত দেখায়। ভগবান জানেন, গৈবীনাথ জানেন, কেন ফৌজে যায় কিষাণ।

এই লালার বাড়ীতেই এক দিন ডাক পড়লো চম্পার মা'র। লালার ঘরেই উঠেছে তার স্বামীর জমি আর ক্ষেতী। তার দোরেই গিয়ে দাঁড়াতে মাথা কাটা গেল তার। কিন্তু দুঃখীর জাত-মানে ভয় করলে চলে না।

চম্পাকে নিয়ে তবু কি গাঁয়ের মানুষের কৌতূহলের শেষ আছে? বয়েস পনেরো পেরিয়ে গেল। ভরা ষোলো বছরে কোন্ মেয়ে অবিবাহিত থাকে? সমদুঃখে লালার বুড়ী-মা বললো—আমার কথা শোন্। তীর্থে যাব আমি। আমার সঙ্গে দে মেয়েকে। পুষ্করে চান করিয়ে সাবিত্রী-তিলক দিয়ে আনি তোর মেয়েকে। বিয়ে তো হবে না। দেবতার দোষ ধরে থাক্।

যৌবনে পড়ে মেয়ে হয়েছে মা'র গলায় কাঁটা। মা বলে—তাই করো নানী, আমার ভাবনা-চিন্তা দূর হয়ে যাক।

লালার মা বলে—ঘরে বসে তীর্থ হয়? না মক্কা গয়ে, না মদিনা গয়ে, বিচ মে বিচ হাজি থে। অমন ধর্ম ক'জন করে? আর ক'জন পারে? তীর্থে যাব, নিয়ে যাব মেয়েকে। রাস্তায় আমাকে একটু মদৎ তদবির করবে। তার পর লাগিয়ে দেবো আশ্রয় কোথাও। মনে করবি চম্পার মা, যে পরমেশ্বর তোর মেয়েকে নিয়েছেন।

এমনি সব ভাল ভাল কথা বলে লালার বুড়ী-মা। তার পর বলে—আমার রেজাইটা-তে একটু ছুঁচ চালিয়ে দিবি বহু? তো এনে দিই?

—বেশ।

মেরামতি আর ফুটোফাটা সারবার কাজ এনে দেয় চম্পাকে তার মা। এখন আর গাঁয়ে বেরোয় না চম্পা। ঘরে বসে মা-কে সব কাজ করে দেয়। মা-ও হয়েছে নানা জ্বালা। মেয়েকে যেন আর দেখতে পারে না। কেন জন্মালো এই মেয়ে? এই এক মেয়ে থেকে তার যতো দুঃখ; শুনতে শুনতে চম্পা-ও এক একদিন রেগে যায়। বলে—বিষ এনে দাও মা খাই। তুমি সুখে থাকো। জন্মালে মেরে ফেলতে পারোনি মা?

—তুই আমাকে এই কথা বললি? বলে মা-মেয়ে একসঙ্গে একটু কাঁদে বসে। কাঁদলে মনটা বড় হালকা হয় সুরজের। চম্পার বাবার নাম করে কেঁদে সে বলে—হে গৈবীনাথ, কেন আমাকে এমন করে দুঃখ দিলে? কেমন সাজানো সংসার পেয়েছিলাম। দশরথের মতো শ্বশুর, কৌশল্যার মতো শাস—রামের মতো স্বামী।

তারপরই সব অভিযোগ গৈবীনাথকে ছেড়ে স্বামীর ওপর এসে পড়ে।

—আমি হেঁটে গেলে তুমি বুকে ব্যথা পেতে, ইঁদারা থেকে জল বয়ে আনতে দাওনি তুমি! লুকিয়ে জল এনে দিতে তুমি, দুপুরবেলা ধারদেনা দিতে হাতের রূপোর চুড়ি খুলে দিলাম যখন, কত দুঃখ করেছিলে? এখন কি এত নির্দয় হয়েছো যে দেখতে পাও না, কত কষ্টে দিন কাটে আমার? তোমার মেয়ে আজ বানের মুখে ভেসে যায়, আমার বুকে জোর কি তাকে বাঁচিয়ে রাখি?

এমনি সব কথা বলে কেঁদে-কেটে সূরজ যায় কাজে। কিন্তু ষোল বছরের বুকে যে পাষাণ-ভার, তা তো চোখের জলেও হাল্কা হয় না? আর কান্না যেন আসে না চম্পার চোখে। তাকে কি ভগবান এত জ্বালা দিয়ে গড়েছিলো? ভেবে ভেবে কূল পায় না চম্পা। এসে থেকে সে কি শুধু দুঃখই দিলো লোককে? কিন্তু চন্দন তো সে কথা বলতো না?

জীর্ণ ঘরের ভাঙা গেরস্থালীর কাজ চম্পার সারা হয়ে যায়। বর্ষা পড়ে নদী কেমন ভরে উঠেছে। ঘাট ভেঙে ঘাট উঠেছে ওদিকে। এ ঘাটে কেউ আসে না আজ-কাল। চম্পাদের উঠোনে ছায়া ফেলে এক ঝাঁক বক উড়ে যায়। তবে কি বৃষ্টি আসবে? আকাশ ত মেঘে ঝেঁপে এসেছে। কাজল-কালো মেঘের দিকে চেয়ে চম্পার মন যেন কেমন উদাস হয়ে যায়। কোথায়, কতদূরে গিয়েছে চন্দন। কয় বছর যে হয়ে গেল! সুখী ঘরের এক ছেলে, এমন ক'রে নির্বাসনে থাকবার কি দরকার ছিল? প্রতাপ চাচা আর দুর্গা চাচীও ঘুরে এসেছে সেখান থেকে। নানা'র সঙ্গে নাকি কাজ করছে চন্দন! ফারসী শিখেছে, হিন্দী শিখেছে কোন বাঙ্গালীবাবুর কাছ থেকে। বাঙ্গালীবাবু কাকে বলে? জানে না চম্পা। তবে কৌশল্যার কাছে শুনেছে বাঙ্গালীবাবুরা মাছ খায়, মাংস খায়। সাহেবদের সঙ্গে এক সমান হয়ে কথা বলে। তাতেই বা কি হলো? এক ছেলে, তাকে বিয়ে দেবে না তার বাপ-মা? দিক না কেন, সুখী হোক না কেন, চম্পা কি বাদ সাধতে যাবে? কখনই না।

ভাবতে ভাবতে চম্পা বাড়ীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ তো এক ফালি নীল মেঘের মতো নদীখানি দেখা যাচ্ছে। চম্পা জানে, এই ঝোড়ো বাতাসে নদীর জল কেমন কুঁচকে যায়। কেমন রেখা পড়ে। আবার বৃষ্টি পড়ে যখন—টুপটাপ করে সুরু হয় বড় বড় ফোঁটাতে—তখন নদীটা কেমন অশান্ত হয়ে ওঠে। কত দিন দেখেছে চম্পা। চন্দন তাকে দেখিয়েছে। বৃষ্টির ঝাপটায় নীল হয়ে গিয়েছে মুখ। তখন বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে দু'জন বৃষ্টি ধরা অবধি অপেক্ষা করেছে। আবার ঝলমলে রোদের দিনে, নদীর জলে হাত পা ধুয়ে, খাবার খেয়ে নিয়ে কাঁধে শীলমোহর করা থলি ফেলে সরকারের ডাকবরদার যখন টাট্টু ঘোড়া নিয়ে খুট খুট ক'রে পাকা সড়ক ধরেছে—তার পেছন পেছন চলে গিয়েছে সে আর চন্দন। কোমরের পেটি আর কাঁধের তকমার লাল রং যখন অনেক দূরে মিলিয়ে গিয়েছে, তখন গমক্ষেতের মধ্যের সরু রাস্তা ধরে গাঁয়ে ফিরতে ফিরতে তারা দু'জনই গলা মিলিয়ে গান করছে—

—সোহে চন্দন চম্পক মালা
কানমেঁ কুণ্ডল নৈন বিশালা
বাজন বাজে ধন্তাচুরাগা
চলেঁ রামরাঘবকে বরাত, রে!

বেড়ার ওপর চিবুকখানি রেখে চম্পা উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। কোথায় চলে গেল চন্দন! আজ যদি ফিরেও আসে, চম্পা কি তার জীবনে আবার নিজের অভিশপ্ত ছায়া ফেলতে যাবে? এই তো সেদিন, কি কারণে মন খুসী হয়েছিলো। যুঁইফুল পরেছিলো চম্পা বেণীতে। সন্ধ্যের মুখে জল নিয়ে চলে আসছে চুপি চুপি, দেখে চন্দনের মা কেমন বিদ্রূপ করে বললো—দেখ দেখ, আমার ছেলেটাকে দেশ-ঘর ছাড়া করলো, এখনো ফুল প'রে মন ভোলাবার শখ যায় নি?

হোঁচট খেয়ে পা কেটে গেল, সেদিকে না তাকিয়ে প্রায় ছুটে চলে আসে চম্পা, তবু দুর্গার শাণিত কণ্ঠটা তাকে অনুসরণ করতে ছাড়ে নি—ও মেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে ওঠবে আর নাচনী হবে, তোমরা দেখে নিও।

চম্পা ভাবে না, দুর্গার ছেলের কাছে আর সে যাবে না। কোন দিনও না। বলা যায় না, হয় তো একদিন বরাত নিয়ে বেরুবে চন্দনের বাবা। না কি বৌ নিয়েই ফিরবে? চন্দনের নানা না কি এমন মেয়ে বাছাই করবে, যার জোড়া নেই—চন্দ্রবদনী, মৃগনয়নী কাঁচা সোনার মতো রঙ।

আর চম্পার তো বিয়েই হবে না! ভাবলে পরে মনটা খারাপ হয়ে যায় আবার। তার কোন দিন কিছু হবে না। যত আনন্দ উৎসব সব ঐ অন্য অন্য মানুষের হবে! নিজের দুঃখে নিজেই উদাস হয়ে চেয়ে থাকে চম্পা। বর্ষার জল পেয়ে কদম গাছে ফুল ফুটেছে। নদীর ওপারে বনে ময়ূর ডাকে শোনা যায়। চম্পাদের ঘরের পেছনে কেমন মখমলের মতো ঘাস হয়েছে। যুঁইগাছটা নাড়া দিলে ফুল আর বৃষ্টির জল ঝুই-ঝুই ঝরে পড়ে। একবার গাছটা নাড়ায় চম্পা। বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা জল বুঝি নিচের ঘন সবুজ পাতাগুলিতে তখনো লেগেছিলো! এবার তারা ঝরে পড়ে। চম্পার চুলে আটকে পড়ে দেখতে হয় ঠিক যেন মুক্তো লেগে রয়েছে।

হঠাৎ কানে আসে অনেকগুলো গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ। তাদের গাঁয়েই ঢুকলো বুঝি। কৌতূহলী চম্পা আগল খুলে এগিয়ে যায়। আরোহীদের চোখেই পড়ে না। কিন্তু সারি সারি তিনটে বয়েল গাড়ী এলো! বড় বড় চাকা। বাঁশের ছাউনীর মুখে ছাঁট লাল কাপড়ের থোপা-থোপা ফুল। যাত্রিবাহী গাড়ী। এ গাঁয়ের কারু ত' এমন সময় ফেরবার কথা নয়? তবে কি বাইরে থেকেই কেউ এলো? চম্পা ভাবে—কৌশল্যার কাছে জেনে নিলেই চলবে। চকিতে আত্মসচেতন হয়ে ভেতরে চলে আসে চম্পা। কৌতূহলী চোখে মাঝের গাড়ীটা থেকে কে যেন ঘুরে তাকালো। বুক দুরু দুরু করে তার। এমন নির্লাজ হয়ে এতখানি এগিয়ে আসা উচিত হয়নি তার। গায়ে আঁচল ছিল তো? মোটা হলদে ওড়নাটা টেনে নেয়।

কানপুর ও আকবরপুর থেকে রাস্তা এসে তেরাপুরের আগে মিলেছে। তারপর তেরাপুর হয়ে সেঙ্গার নদী পেরিয়ে সে পথ যমুনা পেরিয়ে কাল্পী হয়ে চলে গেল। এই পথ কোম্পানী সড়ক। এ পথের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে আশ-পাশ থেকে কত প

জালের মতো এসে মিলেছে। আকবরপুর, খাটমপুর, কোরা, কঠৌরা, হামীরপুর হিলকী, ফতেরপুর। এই সব জায়গা থেকে এসেছে সব ছোট ছোট পথ। সব পথই যে কোম্পানী সাহেবের বানানো তা নয়। যেমন তেরাপুরের পথ বানিয়ে দিয়েছিলেন রসুলবাদের গাজী সাহেবের শিষ্য মহম্মদ রসুল। বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি, হাতে তসবীমালা, কোরাণ কণ্ঠস্থ ছিলো গাজী সাহেবের। সিদ্ধপুরুষ, দিনান্তে এক আঁজলা দুধ খেতেন শুধু। আর সে দুধও নাকি একটি ধবধবে সাদা গাই এসে দিয়ে যেতো। গাজী সাহেবের অব্যর্থ ঔষধে আরোগ্য হতো সর্পদষ্ট ব্যক্তি। কি হিন্দু, কি মুসলমান সবাই বিপদকালে নিয়ে যেত গাজী সাহেবকে। মহম্মদ রসুলের ছেলেকে কাটলো বিষধর। গাজী সাহেব নিজে তখন মৃত্যুশয্যায়। তবু, মহাদুঃখের সেই কাল রাতে ঠিক চোদ্দ মাইল রাস্তা পেরিয়ে এলেন গাজী সাহেব। মহম্মদ রসুলের জনাকীর্ণ ঘরে ঢুকে একবার দাঁড়ালেন মৃত্যুপথযাত্রীর মাথার কাছে। হাতের লাঠিটা দিয়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন।

—কোন কাজ কলিস নি তুই বেটা। ময়দান পড়ে রয়েছে, তাতে একটা গমের চারাও ফৈলাদ করলি না—সে গাছের একটা দানাও কোন চিড়িয়া খেতে এলো না—কি হিসেব দিবি তুই আল্লার কাছে গিয়ে? উঠো, নিদ্‌ না রহো, দুনিয়া মেঁ আপনে কাম বঢ়াও!

তার পর চলে গেলেন। সকালের আগেই মহম্মদের ছেলে সুস্থ হয়ে উঠলো। সকৃতজ্ঞ মহম্মদ গাজী সাহেবের কাছে গেলেন দরগার ভেট নিয়ে। গিয়ে দেখেন, কাঁচা এক কবরে বাতি জেলে শোক করছেন ব'সে ভক্তবৃন্দ। গাজী সাহেব মারা গিয়েছেন গত সন্ধ্যায়।

মহা কৃতজ্ঞতায় মহম্মদ তেরাপুর থেকে রসুলাবাদ এক পাকা সড়ক বানিয়ে দিলেন। গাজী সাহেবের নাম নিয়ে চললে এ পথে যাত্রীর কোন বিপদ হয় না বলেই এ অঞ্চলের লোক বিশ্বাস করে।

এমনি ধারা আরো কত পথ। কোন ঠাকুরসাহেব হয়তো নিজের কীর্তি অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে পথ করেছেন। কেউ বা মৃত পিতৃপুরুষের নামে উৎসর্গ করেছেন কোন কাঁচা সড়ক। কিন্তু কোম্পানী সরকারের পাকা সড়কের সঙ্গে কারুরই তুলনা হয় না। চমৎকার পথ! চওড়া সুন্দর পথ। এই পথ দিয়ে কোম্পানীর ডাক চলে, কুচ চলে, রেসালা ও পদাতি ফৌজের সিপাহী সওয়ার-রা ছুটি কাটিয়ে গ্রাম থেকে হেড কোয়ার্টারে হাজিরা দিতে যায়। কখনো সাহেবরা শিকারে চলেন এ পথ ধরে। সাহেবরা এ জায়গা থেকে ও জায়গা গেলেন তো একটা দুনিয়া শিকড় উপড়ে চললো সাথে সঙ্গে। কত তাঁবু, কত বেয়ারা, আবদার, খানসামা, সহিস, মশালচি, বাবুর্চি, কুলী। ভেড়া, বকরা, মুরগী মুরগা, এমন কি দুধ দেবার গাইটিও চললো সাথে সাথে। সাহেবরা এলো তো আশপাশের মানুষ রাস্তা ছেড়ে নেমে যাবে পাশের ক্ষেত, নালা বা খাদে। যে নামবে না, তাকে ঘোড়া দিয়ে ভয় দেখিয়ে নামিয়ে দেবে ওরা। কোম্পানী সরকার। সাহেবরা সকলেই রাজা। রাজার সঙ্গে একই পথে একই সময়ে চলা কি আদব মাফিক?

পথ। তবু কালো চামড়ার মানুষগুলোকে দূরে রেখে বাঁচবার কি প্রয়াস! যত নতুন আমদানী সাহেব, ততো এই রকম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা। কোথায় বনজঙ্গল দিয়ে চলেছে সাহেব। তাঁবু খাটাবে, আসবাব সাজিয়ে খাটপালং চেয়ার আলমারীতে বন্দোবস্ত করে দেবে হিন্দুস্থানের মানুষ। দশ দিক খুঁজে পেতে মুরগী খাসীর মাংস, তোফা চালের বিরিয়ানী আর মদের ঠাণ্ডা বোতল, সে-ও আনবে তারা। গরমে পুড়ে তারা পাখা চালাবে, শীতে তারা-ই আগুন জ্বালাবে। সব সময় হুজুরে হাজির থাকবে। তাদের এই সবটুকু সেবা নিঃশেষে নেবে সাহেব। বুট উঁচু করে, পা নাচিয়ে, নিগার অথবা শূয়ার ব'লে। কিন্তু তাই ব'লে ত'দের মানুষ ব'লে স্বীকার করবে? অসম্ভব। এমন দৃঢ়মূল এ ধারণা, যে সভ্যতা থেকে অনেকদূরে, নগণ্য কোন নির্জন জায়গাতেও, কোম্পানীর সাহেবরা, সাহেবরা সাহেব ছাড়িয়ে মানুষ হয়ে উঠতে পারেন না। যে সব সাহেবরা লাখে একজন, এই সব অলিখিত কানুনের লক্ষণের গণ্ডী পেরিয়েছেন, তাঁদের এদেশের মানুষ শ্রদ্ধা করে, ও-পারের মানুষ তাচ্ছিল্য করে! সাহেবরা সাহেব, তাতেই তাঁদের সাত খুন মাপ। ভাষা বোঝেন না, বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই এ মহাদেশ সম্পর্কে, নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা প্রায়ই দণ্ডী দিয়ে মাপা যায়—তবু তাঁরা শাসন চালাচ্ছেন। সাল আঠারো শ' পঞ্চান্ন। কালো চামড়ার কোটি কোটি মানুষ আর তাদের জন্মভূমি হতভাগ্য সব মহাদেশ, তাদের ওপর শাদা চামড়া অব্যাহত শাসন চালাবে, এই হলো এই যুগের বাইবেলের নির্দেশ।

এত কথা তেরাপুরের মানুষ জানে না। তবে মাশুল তাদেরও দিতে হয় বৈ কি! তাই তেরাপুরের বুড়ো মানুষরা বলে।

—জমানা বদলাবারও একটা তরিকা ছিলো। আমরা বুঝতে পারতাম, কখন কি হচ্ছে! এখন আর কিছু ধরতে ছুঁতে পারি না। এমন তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে সব!

জোয়ানরা হাসে। তাদের রক্ত গরম। বলে বুড্‌ঢা লোকদের শুধু ভয়! সব ঠিক আছে। তোমরাই বুড়ো হয়ে যাচ্ছ!

—না, না।

মাথা নাড়ে বুড়োরা সবিষাদে। বলে—বদলাচ্ছে। কিন্তু ভাল হচ্ছে কিছু? কিছু না। এত অসুখ বিসুখ, ফসলে এত অজন্মা, আকাশের এত খামখেয়ালী, এ তো ভাল নয়!

বুড়োরা মাটির সঙ্গে গভীর টানে বাঁধা। গাছের মতো। তাই আবহাওয়ার বদলটা তারা ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে বোঝে। বোঝে কিন্তু বোঝাতে পারে না ছেলে-নাতিদের! মাথা নাড়ে শুধু বিভ্রান্তিতে।

তবু এই পথ তাদের জীবন-বৈচিত্র্যও জোগায়। পথ দেখে অনেক সময় যায় তাদের।

কে এলো নব আগন্তুক, জানবার জন্যে ব্যস্ত ছিলো চম্পা। তাছাড়া হঠাৎ যেন মনটা টলমল করে নড়ে গিয়েছে প্রশান্তি। পুরনো স্মৃতির সঞ্চারেই কি এমনটা হলো? মনের অতল থেকে উঠে এলো অনেক সব ছবি, যা নাকি মুছে যাবার কথা! প্রথম যৌবনেই যে মন এমন হয় তা জানে না চম্পা। সহসা অমান্য করছে বিধি-নিষেধ, জেনে-ও দুপুর বেলা একবার নদীর ধারে যাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলো চম্পা। সেই নদী, সেই বটগাছ, সেই প্রশান্ত, বিপুল, উদার ব্যাপ্তি। তার অনেক নিঃসঙ্গ বেদনা দিনের সঙ্গী।

কাল ছিলো স্থগিত বর্ষণ। মেঘ ভরে আকাশ নেমে এসেছিলো

চম্পাদের বাড়ীর ওপর। বৃষ্টির প্রতিশ্রুতি ছিলো। রাতে বিনিদ্র চোখে জানলা দিয়ে সেই নিকষ আঁধার দেখতে দেখতে চম্পা মনে মনে কামনা করেছে বৃষ্টি আসুক। ঝম্ ঝম্ করে নেমে ভাসিয়ে দিয়ে যাক সব কিছু। তাহ'লে ঘুমোতে ভালো লাগবে তার। সে ঘুমে সুন্দর কোন সুখের স্বপ্ন দেখাও সম্ভব। কিন্তু বৃষ্টি আসেনি।

সেই বৃষ্টি এলো আজ, এখন। এই অসময়ে। নদীর জল সিংহের মতো ঢেউয়ের কেশর ফুলিয়ে উঠে এলো। বৃষ্টিতে সত্যিই ঠাহর হয় না কিছু।

এ সময়ে বটগাছটার গোড়ার কাছে জল উঠে আসবার কথা। তবু তার কথাই মনে হলো চম্পার। শৈশব থেকে এই বটগাছটাকে সে মনে মনে বন্ধু বলে জেনেছে।

পা ফেলতে ভুল হয়েছিলো, আর একটু হলেই নরম মাটির ধ্বসের সঙ্গে বুঝি নিজেও চম্পা জলেই পড়ে যেতো আজ। যদি না তাকে ধরে ফেলতো চন্দন। অদ্ভুত একটা মুহূর্ত। পরে চম্পা চেষ্টা করেও এই মুহূর্তটার বিস্ময় আর চমক স্মরণে আনতে পারেনি। এ রকম আশ্চর্য দৈবী যোগাযোগ কচিৎ হয়।

—পড়ে যাবে চম্পা!

দুর্ঘটনা বাঁচলো। কিন্তু চম্পা চলে এলো কাছে এক টানে প্রায় বুকের ওপরেই এসে পড়লো বলা চলে। কিন্তু সে-ও মুহূর্তের বিভ্রম। তারপরই প্রায় রূঢ় ধাক্কায় চম্পাকে সামনে ঠেলে দিলো চন্দন। বললো—খুব বেঁচে গেলে।

বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। চম্পা বললো—তুমি?

—নয়তো কি?

কৌতুকের হাসিতে স্মিত মুখ চন্দনের। বলে—কাল অমন করে দেখলাম। দাঁড়িয়ে ছিলে পীলা ওড়নীতে বাহার দিয়ে। সঙ্গে দাদা বাবা ছিলো, নইলে!

—সে তুমি?

স্বীকার করে চন্দন মাথা নেড়ে বলে—আমি এসেছি সে কথা শোননি? আমি ত ভাবলাম তুমি শুনেই এসেছ দেখতে।

সচেতন হলো চম্পা। ঈষৎ গর্বের ও আহত অহমিকার সুরে বললো।

—গাঁয়ে আমি যাই না। গেলে নিশ্চয় শুনতাম। শরীফ হয়ে ফিরে এসেছে ছেলে, আমাদের মতো গরীবকে নিশ্চয় শোনাতো তোমার মা!

চন্দন জবাব দেয় না। তাই খোঁচাটা তাকে বিঁধলো কি না, বুঝে পায় না চম্পা। আঘাত করে নিজেরই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে যেন। তাই সেই মনটা জয় করে আবার চম্পা বলে—না জানি কত খয়রাৎ জকাৎ আজ তোমাদের বাড়ীতে। আমি তো তাতেও বাদ পড়েছি চন্দন!

—চম্পা, বাজে কথা বলো না।

মনে যে অনেক দুঃখ চম্পার। আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে—কিন্তু চন্দনের গলায় গম্ভীর সুর, সেই ছেলেমানুষী কিশোর কণ্ঠ কোথায় গেল? কথা বলতে চেয়ে কথা হারিয়ে ফেলে চম্পা। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রথম দর্শনের চমক আর ঘোরটা কেটেছে। তারপরে আবার নির্মম কোন কৌতুক করতে সাধ যায়। মনে হয় চন্দনের আত্মবিশ্বাসটা ভেঙে দেয় খোঁচা দিয়ে। সে কথা বললো বলেই ধন্য হয়ে গেল চম্পা? তা তো নয়। চম্পা বলে।—চেহারা তো রহীসদের মতো! অনেক দেশ ঘুরে এসেছ? আমার জন্যে কিছু এনেছ?

—নিশ্চয়!

—কি এনেছ?

বৃষ্টির ছোঁয়াচ কি চম্পার গলায়ও লাগলো! নইলে গলা এমন ভিজে কেন? যেন জুঁইগাছটার পাতায় ফুলে জল। নাড়া দিলেই ঝরে পড়বে। পাছে ঝরে পড়ে, তাই নিচু গলায় চম্পা আবার বলে—কি?

—দেখতে পাচ্ছ না? সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা আমার ধরে গেল।

এবার চম্পার অভিমান ফুলে ফুলে ওঠে। চিরদিনের অনাদরের মেয়ে। এতটুকু ভালোবাসার ছোঁয়াচ লেগেছে তো কথা নেই! চম্পা বলে:—এত দিন আসনি কেন?

—কাজে ছিলাম।

—কি কাজ?

—অনেক কাজ। কিন্তু সে সব কথা কেন চম্পা? এই ত এসেছি। ভোরবেলাই চলে আসতাম। কিন্তু জান তো সব!

এবার দুজনে পাশাপাশি ঘেঁসে আসে। বৃষ্টির সাদা আবরণটা দুজনকে ঘিরে রয়েছে। আড়াল করে রয়েছে বহির্জগৎ থেকে। চন্দনের কথা শুনে ম্লান হাসে চম্পা। সে জানে না চন্দনের আসা কত অসম্ভব! বলে—তুমি আর কি জানলে বল? এখানে প্রতিদিন, সে যে কত কথা—

বলতে বলতে চম্পার মুখে হাত চাপা দেয় চন্দন। বলে—বাস, আমি তো এসেছি! আর কেন ভাবনা?

মন্ত্রমুগ্ধ চম্পা তাকিয়ে থাকে। চন্দন বলে।—আমি অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি চম্পা! এরা জানে না তাই ছোট ছোট কথা নিয়ে পড়ে আছে। তুমি কিন্তু সে সব কথায় দুঃখ পেয়ো না।

বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ে চম্পা। তার পর চন্দন বলে—কি সুন্দর হয়েছ চম্পা? চেনা যাচ্ছে না জানো? কে বলবে এ সেই চম্পা!

—কেন বিশ্রী ছিলাম?

—এমন হবে কে ভেবেছিলো? চলো নিয়ে যাই শহরে। শহরে মেয়েরা কেমন সুন্দর ঘাঘরী ওড়নী নাগরা পরে। কেমন বেণী বাঁধে।

—খুব সুন্দর, না?

—তোমার চেয়ে নয়।

চন্দনের কথায় চম্পার দুনিয়াটা অমনি ভ'রে ওঠে যেন। খুশীয়ালির রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। চম্পা বলে—সত্যি?

—সত্যি।

আর যৌবনের ধর্ম-ই এই, চন্দনের সপ্রশংস দৃষ্টিতে চম্পা যে-ই জানলো যে সে সুন্দর, অমনি যেন সে আরো অনেক সুন্দর হলো। এই সৌন্দর্য আগেই এসেছিলো। কবে যে কৈশোর ও যৌবন দুই-ই মিলিত হলো। দুই-ই সানুরাগ অঞ্জলিতে পূর্ণ করে দিলো তার,

দেহ, তা জানতো না চম্পা। চরণের সে চপলতা কবে যে নয়নের নীলাঞ্জন ছায়াতে মিশিয়ে রহস্যময় করলো কটাক্ষ, তা-ই বা কে জানতো! সমস্ত শরীর ভরে উঠলো। যেন মঞ্জরিত হলো লতা। অযত্নে বাঁধা চুল, তারই বা শোভা কত! গরীব মেয়ের লাল আঙ্গিয়া নীলা ওড়না—তাতেই চম্পা কত সুন্দর! মুগ্ধ চন্দন চেয়েই থাকে কিছুক্ষণ। লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় চম্পা। চন্দন বলে—অমন কৃপণ হ'লে কেন চম্পা? কত দিন দেখিনি বল তো?

এতক্ষণে চম্পা সহজ হয়েছে। সকৌতুকে হেসে হেসে বলে—ছিলে কোথায়? মনে ছিলো এ গাঁয়ের কথা?

—ছিলো না? জানো না ত, সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলাম প্রয়াগজী। পথে সাহীসড়কে ডাকুর হাতে পড়লো আমাদের গাড়ী। সাহেব ছিলো পেছনে। সড়কী বিঁধলো আমার কাঁধে। মরেই যেতাম হয় তো, যদি না সাহেব এগিয়ে এসে গুলী চালাতো ঝটাপট। কিন্তু মনে হলো—যদি তোমাকে আবার না দেখতে পাই?

—কোথায় লেগেছিল চোট?

—এখন আরাম হয়ে গিয়েছে।

—তবু দেখি?

ঈষৎ-গম্ভীর হয়ে চম্পা নিরীক্ষণ করে দেখে। এত দিনের অদেখা। তবু এমন সহজ ভাবে কাঁধে হাত দিয়ে দেখতে, এমন করে কাছে আসতে এক চম্পাই পারে। চন্দনের মনে হয় চম্পার মতো এমন দোসর তার কেউ নেই। এই সহজ বন্ধুত্বের জন্ত যেন কৃতজ্ঞ লাগে তার। ঠিক এই কথা হয়তো বলতে চায়নি, তবু এই সব কথাই কেন যেন এসে পড়ে! চন্দনের মমতার চারিপাশে যেন পাহারা ছিলো। এসব কথা ভাবতে বা কইতে মানা ছিলো। এখন চম্পার নৈকট্যে সহজেই অপসারিত হলো সেই বাধা।

চন্দন বলে,—তুমি কি বুঝবে চম্পা? আমার মনে কত কথা, আমি সব বলতে পারি না। শিকার করতে জঙ্গলে চলেছে সাহেব। ঢোলপুরের রাজার জঙ্গলে। রাজার হাতীতে সাহেব, পিছনের হাতীতে আমি, সাহেবের বন্দুক নিয়ে। হঠাৎ সামনে পড়লো গুলবাঘ। ঝাঁপিয়ে পড়লো গাছ থেকে। সাহেবের বন্দুকে নিশানা ছুটে গেল, থাবায় চোট খেয়ে জানোয়ার লাফিয়ে এলো। আমার খেয়াল ছিলো এ রকম কিছু একটা হতে পারে। দাদা শিখিয়েছিলো শিকারের বুলি। জানি চোট খেলে শেরের চাইতে গুলবাঘ কিছু কম নয়। কিন্তু হাতী যে ভয় পেয়ে অমন বিগড়ে যাবে আর সব ভুলে গিয়ে অমন ছুটবে পাগল হয়ে, সেকথা দাদা বলেনি। এক নিমিষে কি হয়ে গেল, আমি গেলাম পড়ে। জখমী বাঘ আমার বুকের ওপর। সাহেব জাতটা আমি বুঝি না চম্পা। এ সাহেব ছোকরা। অতি বদমেজাজী। এখন দেখি যে না, ভীতুও বটে। ভয়ে ক্ষেপে গিয়ে আমাকেই হয়তো সে গুলী করতো, যদি না মাহুত তার হাতী সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সাহেবকে না হুঁসিয়ার করতো। গুলবাঘার সঙ্গে লড়াইয়ে আমি যখন বেকায়দায় আটকে গিয়েছি, জানোয়ার আমাকে কবজা করেছে তখন ছুটে এলো জৌনা আলি। আমার দোস্ত। আমাকে বাঁচাতে তার তরোয়াল জানোয়ারকে বিঁধলো ঠিকই, কিন্তু আমার মাথাটাও বাঁচলো না। কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা চম্পা, সব যেন আঁধার হয়ে গেল, কিন্তু তোমার কথা আমার সেই সময়ও মনে হলো।

এতক্ষণে আকাশে বৃষ্টি থেমেছে। পাতা থেকে জল ঝরছে টুপটাপ রূপোলী ছন্দে। আকাশ সবটুকু জল ঢেলে দিয়ে এতক্ষণে ম্লান মেঘের ওপর রামধনুর রাঙা হাসিটুকু ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ে আছে মাটির দিকে। আকাশের পূর্ণতা শূন্য হলো। আর চম্পার মনটা যেন এতদিন ধরে পিপাসী নদীর বৈশাখী বুকের মতো শূন্য হয়েছিলো। এতক্ষণে সেই হৃদয় ভরে উঠেছে। ছলছল করছে কানায় কানায়। অনেক ক্ষোভ অনেক দুঃখ চম্পারও ছিলো। তার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি। চন্দনের মা তাকে কত অপমান করেছে। অনেক দুঃখে চম্পার মনটা শুধু চন্দনকেই স্মরণ করেছে। তারা দু'জনে গৈবীনাথের মন্দিরের পাশে কদম গাছের একটি শিশু চারা আবিষ্কার করেছিলো। সেই গাছে ফুল এসেছে গত বছর। দেখে চম্পার মন কেমন করছে। তাদের বাড়ীর পেছনে জামগাছে এবার কালো মেঘের মতো ফল ধরেছিলো। চুরি করে সেই জাম দু'জনে বসে খেতো এই গাছের তলায় বসে। সেই কথা মনে করে চম্পা এবার এক আঁচলা জাম একটাও খায়নি। সব ছড়িয়ে দিয়েছিলো গাছের তলায়। কাঠবেড়ালীরা দল বেঁধে খেয়ে গেল। সেই হরিণশিশু? চম্পার চোখের সামনে সে বড় হলো। এবার শীতকালে সেই হরিণকে সে মন্থর চালে এক হরিণীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। আবার হরিণীর ডাক ডেকে সেই হরিণকে ভুলিয়ে এনে তীর সন্ধানে মারলো ঐ আহীরদের ছেলে গোপাল। গোপাল হয়েছে চিড়িমারা। তিতির, বটের, হরিয়াল, হরিণ, জ্যান্ত ধরতে পারে না। মেরে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে সাহেবদের তাঁবুতে। চার পা খড় দিয়ে বাঁধা, রশির দোলা টানিয়ে সেই হরিণকে নিয়ে গেল গোপালরা কয় ভাই। ঝুলে পড়া মাথা, আর নিমীলিত চোখ। সেই হরিণকে দেখে চম্পা, দুঃখে ক্রোধে কত কেঁদেছে একা একা। চন্দন থাকলে গোপালকে নিশ্চয় শাস্তি দিতো।

এ হলো কারণের কথা। উপলক্ষ্য ধরে মন কেমন করা। কিন্তু তা ছাড়াও কত সময় যে এমনি মনটা কাঁদতো, হু হু করতো, উদাস লাগতো। ক্ষেত কুড়িয়ে গম তুলে টুকরি ভরছিলো চম্পা একদিন। এমনি রাঙা বিকেল। অঘ্রাণের বাতাসে শীত করে। কালো কম্বলের মোটা ওড়না টেনে নিয়ে সে কুলো দিয়ে ঝাড়ছিলো গম—হঠাৎ কানে এলো বিয়ের গান। পালকি নয়, ছোট্ট নালকি করে বৌ চলেছে ভিন্ গাঁয়ে। বর পাশে পাশে লাঠি হাতে জুতো পায়ে যাচ্ছে। মেয়েরা গান গেয়ে এগিয়ে দিতে চলেছে গাঁয়ের সীমা পর্যন্ত। ভিন্ পাড়ার মেয়ে। মেয়েরা একটানা করুণ বিলম্বিত সুরে গাইছে—

'সীতা মৈয়া কী মাতা রোয়ে, রোয়ে জনারাজ
চলে দুলহন কো দুলহনীয়া—
সীতা মৈয়া রোকে কহে বর লাও গে লৌটকে
চলে দুলহন কো দুলহনীয়া॥

গানের সেই করুণ সুর শুনে সেদিন চম্পার মনটা সহসা চন্দনের কথা মনে করেই খারাপ হয়েছিলো। চম্পার চোখের জল গাঁয়ের মানুষ কোন দিনও দেখেনি। সেদিনও সকলকে লুকিয়ে চম্পা

মুখ নিচু করে কেঁদেছিলো। দুই চার ফোঁটা অভিমানী অশ্রু শুষে গিয়েছিলো মাটিতে। মনে হয়েছিলো কত দিন হলো কোথায় চলে গিয়েছে চন্দন। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কত শহর, কত মানুষ, কত দূর-দূরান্তের পথ। আবার এ-ও মনে হয়েছিলো, তার মতো মেয়ে, যে অবাঞ্ছিত, যাকে কেউ চায় না, তার এই সব কথা মনে হওয়া বোধ হয় একান্ত বিলাস। এমনি ধারা সব কথা ভেবে হাতের গম তার মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো অজান্তে। আঁধার এসেছিলো আস্তে করে নেমে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর হিম হয়ে গিয়েছিলো।

আজ চম্পা চন্দনকে সে সব কথা বলে না। সেই সব দুঃখের চেয়ে আজকের সুখ অনেক বড়। আর চম্পা অন্য পাঁচজনের মতো নয়। সে সব ছোট ছোট সুখ দুঃখ খুঁটিয়ে বাঁচে না। প্রত্যাগত এই বন্ধু হৃদয়ের প্রেমের প্রতিশ্রুতিটা এত বড় সম্পদ, যা তার ছেঁড়া ওড়নীর আঁচলে বেঁধে সে অনেক দুঃখ অপমানকে তুচ্ছ করে জয়ী হয়ে উঠতে পারে, সুন্দর ও সতেজ হয়ে উঠতে পারে, এ কথা চম্পা বোঝে।

চন্দনের এত দিনে খুব শান্তি বোধ হয়। তৃষ্ণা ছিলো, আকুতি ছিলো, ব্যাকুলতা ছিলো। সেই সব তৃষ্ণা তার শান্ত হলো চম্পার কাছে এসে। চম্পার পরিপূর্ণ সুখে ভরা মুখখানার দিকে চেয়ে চন্দন বুঝতে পারে এত দেশ ঘুরে, এত মানুষ দেখে, এত জীবন দেখে তবু তার মন ভরেনি কেন। অবাধ্য মন সেই বৃহত্তর জীবনের থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছিলো। প্রত্যাখ্যান করে চলেছিলো সব সুখ। তার তৃষ্ণার পানীয় এইখানে মেপে রেখেছেন। এই নিঃসঙ্গ, সুন্দর এক গরীব মেয়ের মধ্যে এক সরোবর টলটলে গভীর ভালোবাসাতে ডুবে না গেলে তার শান্তি নেই। বুঝে তার যেন অবাকও লাগে। চন্দন বলে—কি, এখনও বলবে ভুলে ছিলাম?

মাথা নাড়ে চম্পা। আর কখনো সে তা বলে? মনে মনে বলে আমি কি বেইমান?

সহসা কোনো কথা মনে ক'রে একটু হাসে চন্দন। গুন-গুন করে বলে—

—লোভে চন্দন চম্পক মালা
কান মেঁ কুণ্ডল নৈন বিশালা

চম্পা হাসে। চোখ ছল ছল করে সেই শৈশব স্মৃতিতে। বলে—

—বাজন বাজে বড়ানুরাগা
চলেঁ রামরাঘবকে বরাত রে!

দু'জনেই হেসে ফেলে। তাদের প্রিয় ও পরিচিত আকাশ যেন জলহীন ছলছলে মেঘমাখা মমতাময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। রামধনু রং-মাখা সন্ধ্যামণি যেন পরম স্নেহে লুটিয়ে দেয় তাদের দু'জনকে ঘিরে। বড় সুন্দর হয় ছবিখানি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনে একজনের লাল আঙিয়া আর পীলা ওড়নী ঢাকা পুষ্পিত পলাশ ফুলের গাছের মতো মদির যৌবন, যেন প্রথম নিজেকে আবিষ্কার করে সে জন বিস্মিত হলো। বিস্মিত হয়ে চুপ করে রইলো। আর একজনেরও ঈষৎ সহাস মুখে, মুগ্ধ অথচ গভীর দৃষ্টি। গান দিয়ে যদি এই ছবিখানিকে মঞ্জুস করা যেতো তো সে গানের কথা হতো—বড়ে ভাগসে সজন পাওয়ে। কিন্তু গানের কথা ও সুর এখানে অনুপস্থিত। তবে এই ছবিখানিকে আরো সুন্দর কেমন করে করা যায়? কি ভেবে, চম্পা ও চন্দনের পরিচিত আকাশখানা, নিজের বুকে এক ঝাঁক হীরামণ উড়িয়ে দেয়। স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার প্রিয় পাখীর মতো সুন্দর সেই হীরামণগুলি কিচ মিচ্ ক'রে উড়ে যায়। হীরে-চুনী-পান্নার মতো ঝিকমিকিয়ে সই পাখীর সার মিলিয়ে যায় সান্ধ্য গগনের স্নেহময় কোলে। আর সম্পূর্ণ হয় ছবিখানি। [ক্রমশঃ।

জীবন-ছড়া

চণ্ডী সেনগুপ্ত

জীবনটা এক মাধুর্যময় ছড়া
দাঁড়ি কমা সেমিকোলন ভরা
লালটুকটুক ছবি দেখার সুখে
হঠাৎ যখন তুমি আসো বুকে।

জীবন-ছড়ার মাঝে মাঝে যতি
তখন আমার মনের ঘরে তোমার আরতি
তখন আকাশ আর্তসুরে ভিক্ষা ক'রে আলো
আমার দেহে ছড়ায় এসে সকাল জমকালো।

জীবন-ছড়ার ছন্দে নূপুর বাজে
ফেলে-আসা সে এক মায়ার সাঁঝে
সন্ধ্যাবেলার উদাস পুরবীতে
কে ধরা দেয় ভুলের সুরভিতে?

জীবন-ছড়ার দুই দিকে দুই ঘর
মধ্যি শুধু মধ্যিখানের চর।

(উপন্যাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

—অরুণেশ ভাবছিলো, সেই যেদিন 'রডডেনডন গুচ্ছ' দিয়ে এলো ইন্দ্রাণীর হাতে, সেদিন শেষ-মুহূর্তে যে দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছিলো ওর সঙ্গে সে দৃষ্টি কত সুন্দর, কত অনুরাগপূর্ণ, যে দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে ও উদ্দীপ্ত হ'য়ে ছেলেমানুষের মত দৌড়ে ফিরেছিলো, কিন্তু তারপর আবার কী ঘটলো ইন্দ্রাণীর—এমন নির্দয় বিরূপতার কী কারণ ঘটলো! কিন্তু, কারণ ঘটেছিলো, ইন্দ্রাণীর 'লেটার' পাওয়ার সংবাদ বহন ক'রে যেদিন চিঠি এলো, সেদিন সন্ধ্যায় মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন রমেন, দুপুরে অফিসে বসেই খবরটা পেয়েছিলেন উনি, চাপরাশী যখন রমেনের লাঞ্চ নিতে দুপুরে এসেছিলো, সেই সময় তার হাতে কলকাতার চিঠিখানা দিয়ে দিয়েছিলেন সর্ব্বাণী। সে সংবাদে রমেনদের অফিসের বাঙালী অবাঙালী প্রত্যেকেই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেশবশংকর বাবু ছেলেমানুষের মত হৈ-চৈ ক'রে আনন্দ জ্ঞাপন করেছেন, এবং অফিসের সবাইকে ডেকে ডেকে এ শুভসংবাদ জানিয়েছেন। এবং বাড়িতে গিয়েও চা খাওয়ার টেবিলে গল্প করেছেন খুব। এ গল্পে চোখ-মুখ উজ্জল ক'রে যোগ দিয়েছে অরুণেশ আর নীলা। শেলিও মনে মনে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা না ক'রে পারেনি কিন্তু যেহেতু ও গেলো বছর শুধু ইংরিজীর জন্যই বি-এ পাশটা করতে পারেনি এবং ঐ একফোঁটা ছেলেমানুষ ইন্দ্রাণী ইংরিজীতে ফার্ষ্ট হ'য়ে একেবারে লেটার পেয়ে বসে আছে, তাই কেমন এক ধরণের পরাজয়ের গ্লানি বোধ করছিলো ও, মুখ নামিয়ে নীরবে চা খেয়ে যাচ্ছিলো, আর তরুবালা চা ঢালতে ঢালতে বড় মেয়ের লজ্জারুণ মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে গম্ভীর গলায় শুধু বললেন, বাঃ বেশ ভাল খবর!

সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে মিসেস তালুকদারের সঙ্গে ম্যাশিং করতে করতে মিসেস তরুবালা বিশ্বাসের চোখে পড়লো, মিনার্ভা বুক সপ থেকে বই-এর ভারে একেবারে কুঁজো হ'য়ে বাপের সঙ্গে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে এলো।

ভাবলেন, আজ ওর সঙ্গে কথা বলে দু-এক মিনিট অপব্যয় করা চলতে পারে, ডাকলেন, শোনো! ইন্দ্রাণী মুখ তুললো, রমেনও।

মিসেস তরুবালাকে দেখতে পেয়ে রমেন অস্ফুটে বললেন, ইনুমা, আমার হাতে বই দিয়ে তুমি এগিয়ে যাও, দেখো উনি কেন ডাকছেন।

না বাবা, আমার হাতেই থাক্—বই-এর বোঝা হাতে নিয়েই ইন্দ্রাণী তরুবালা বিশ্বাসের সামনে এলো।

তোমার নামটা যেন কী? ইন্দ্রাণী খুব অবাক হ'য়ে তাকালো কিন্তু খুব সংযত গলায় উত্তর দিলো, ইন্দ্রাণী।

পাশে দাঁড়ানো মিসেস তালুকদার প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি কে? মেয়েটিকে যেন দেখেছি মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, দেখবেন বৈ কি, সিমলের রাস্তা আর ক'টা—ওঁদের অফিসের এ্যাকাউণ্টস অফিসার রমেন বাবুর মেয়ে। ওকে বাহবা দিতে হয়, বেশ ভাল ফল করেছে এবার ম্যাট্রিকে, ইংরিজীতে নাকি ফার্ষ্ট হয়েছে—

আচ্ছা! মিসেস তালুকদারের কণ্ঠে সুস্পষ্ট বিস্ময়। মিসেস তরুবালা আবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে কিছুটা যেন দয়া ছিটোলেন চোখ দিয়ে, তা বেশ, বেশ, এসো একদিন আমাদের বাড়ি, মিষ্টি খাইয়ে দেব, বাবা বুঝি এসব বই পুরস্কার দিলেন তোমাকে? তা বেশ, বেশ, হঠাৎ ব্রেক কষলেন তরুবালা, অনেক দয়া দেখিয়েছেন উনি।

যেতে যেতে অনুচ্চ কণ্ঠে মিসেস তালুকদার বললেন, মেয়েটি খুব ইংরিজী প'ড়ে বোঝা যাচ্ছে, একদিনে একরাজ্যের বই কিনে ফেলেছে।

একটু পরিহাসের সুরে উত্তর দিলেন তরুবালা, সব বই কী আর পড়বে মিসেস তালুকদার, বেশীর ভাগই শোভাবৃদ্ধি করবে আলমারীর। মিসেস তালুকদারের জবাবটা আর শোনা গেলো না।

ইন্দ্রাণী ফিরে এলো বাবার কাছে, গোধূলির অম্লান আলো কেমন যেন হঠাৎ ম্লান মনে হচ্ছে ওর কাছে। আসার সময় সারাপথ গল্পে গল্পে এসেছিলো, যাওয়ার সময় একেবারে চুপ। ওর কানে বারে বারে অনুরণিত হচ্ছে দুটি কথা ইংরিজীতে নাকি ফার্ষ্ট হয়েছে, আর, সব বই কি আর পড়বে মিসেস তালুকদার? সেদিন রাত্রে বিনিদ্রচোখে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে ইনা। আর নিজের দুর্ব্বলতার জন্য নিজের ওপর যত ক্রোধের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে, তত অদৃশ্য আক্রোশের জাল বুনে চলেছে অরুণেশের বিরুদ্ধে। তরুবালা হাতের নাগালের বাইরে, কিন্তু অরুণেশ তো আছে।

সকালে রাতজাগা রাঙাচোখ দেখে সর্ব্বাণী উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, 'কি রে তোর মুখের চেহারা অমন কেন? কাল নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলেছিস? দেখি কাছে আয় তো, কপালটা দেখি—

না মা, কিছু হয়নি—তাড়াতাড়ি মা'র চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলো ইন্দ্রাণী, ওর মনে হচ্ছিলো, ওর বুকের রুদ্ধ আক্রোশের আন্দোলন এখনও শান্ত হয়নি সম্পূর্ণ, কাছে গেলে, মা যদি টের পেয়ে যান।

ক্যাথলিক ক্লাবের চৌদ্দ নম্বর স্যুইটে সন্ধ্যে কাটিয়ে এলো ইন্দ্রাণী, সকালে সর্বাণী বাড়ি ফিরে এসে অরুণেশের আসার কথা বলতেই—ইন্দ্রাণী মনে মনে ঠিক করে ফেললো বিকেলে ও বাড়িতে থাকবে না, মার সঙ্গে হাতে হাতে খাবার দাবার সবই বানালো কিন্তু বিকেল পাঁচটা বাজার আগেই ও চলে গেলো চৌদ্দ নম্বর স্যুইটে। সেখানে ওর সমবয়সী এক পাঞ্জাবী মেয়ে আছে, ভীনা কাপুর, মাঝে মাঝে ইনা যায় সেখানে। মেয়েটি অন্যান্য-পাঞ্জাবী মেয়েদের মত খুব একটা উৎকট আলট্রা মডার্ণ নয়, সেজন্য ওর সঙ্গ ইন্দ্রাণীর সহনীয়। তাছাড়া ওর উৎসাহ এবং আন্তরিকতায় পাঞ্জাবীদের মামুলী আদব কায়দার অ-আ-ক-খ জেনে নিয়েছে ইনা, পনেরো নম্বর স্যুইটে সুরীন্দর স্বরূপ নামে আর একটি পাঞ্জাবী মেয়ে আছে, সে ইন্দ্রাণীর থেকে সামান্য কিছু বড় হবে, প্রায়ই সর্বাণীর কাছে উলের প্যাটার্ণ তুলতে আসে, সেই সূত্রে আলাপ। রোজই ইন্দ্রাণীকে একাধিক বার ওদের বাড়িতে আসতে বলে, একদিন সন্ধ্যের পর গিয়েছিলো ইনা সুরীন্দর স্বরূপের বাড়িতে, গল্পে গল্পে রাত হয়ে গিয়েছিলো সেদিন, যখন ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালো ও, তখন সুরীন্দর রাতের খাওয়া খেয়ে যাওয়ার জন্য ওকে হাত ধরে টানাটানি, আরে বহিনজী! খানা তো খানা! যত ও অস্বীকার করে তত হাত ধরে টানাটানি করে সুরীন্দর আর বলে, খানা তো খানা বহিনজী!

শেষকালে ওর বাবা মা পর্যন্ত যখন বললেন, তখন ইনাকে সম্মতি দিতেই হলো। কালো ঝুলের মত খানিকটা সরষে শাক দিয়ে তিনটে তন্দুলের রুটি কোনমতে গিলে তারপর ও বাড়ি ফিরেছিলো, রুটি আদপেই পছন্দ নয় ইনার, ভাতই ভালবাসে ও, তবু অত পেড়াপীড়ি করলে না খেয়ে আর করা যায় কী! কিন্তু, তার পরদিন দুপুরে ভীনা কাপুর এসে হাজির, বহিনজী! কাল তুমনে এ কেয়া কীয়া, একদম সত্যনাশ কর দিয়া—

ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো, কিঁউ? তারপর সমস্ত শুনলো ও ভীনা কাপুরের কাছে,—হাত ধরে টানাটানিই করুক আর পা ধরে সাধাসাধিই করুক কখনও খেতে হয় না ওরকম। কাল রাত্রে ওরা তিন জন আধপেটি রয়ে গেছে, কারণ ওদের রাতের বরাদ্দ মাফিক রান্না হয়ে গিয়েছিলো, ওরা তারপর আর কিছু পাকাবে না।

আজ সকালে সুরীন্দর নাকি ভীনার কাছে এসে বাঙালীদের এটিকেট সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আগে নেমন্তন্ন না করলে হাজার মাথা কুটলেও খেতে হয় না। সমস্ত শুনে ইন্দ্রাণী স্তম্ভিত, বললো, আগে নেমন্তন্ন না করলে খাওয়া উচিত নয়, এ নিয়মটা এক পক্ষে ভালই—খুব খারাপ নয়, ওটা মানলাম, কিন্তু তাহলে বাড়িশুদ্ধ সবাই মিলে—খানা তো খানা—বলে অমন হাত ধরে টানাটানির অর্থটা কী?

ভীনা খিল-খিল করে হেসে উত্তর দিয়েছিলো, পাঞ্জাব সে ঐসী রেওয়াজ হ্যায় বহিনজী!

ইনা বাড়ি ফিরতেই সর্বাণী ধমকের সুরে বললেন, অরুণেশ এসেছিলো, ডেকে পাঠালাম, তবু এলিনে কেন?

আমি এসে আর কী করতাম—আবছা গলায় বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো ইনা। রমেনও মেয়ের আচরণের প্রতিবাদ করে অনুযোগ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মেয়ের কাঠখোট্টা উত্তরের পর ঠিক সর্বাণী পথে এলো না। চুপ করেই রইলেন। সিঁড়ির বাঁক ঘোরার মুখে ইন্দ্রাণীর কানে এলো, সর্বাণী আনন্দের সুরে বলছেন, দেখো, মিসেস বিশ্বাসের আভিজাত্যের উৎকট দম্ভ দেখে আমি মনে মনে বরাবর হেসেছি, অর্থকে পরমার্থ মনে ক'রে কী হাস্যকর গর্বই না উনি ক'রে বেড়ান, ওঁর আচরণে আমার কষ্ট হয়নি, করুণা হয়েছে। আজ দেখলাম ওঁর সত্যিকার গর্বের জিনিষ আছে বৈ কি, সে হলো ওঁর ছেলে অরুণেশ, এমন সুন্দর সুকুমার মনের আর সুকুমার চেহারার ছেলে যাঁর, তাঁর আর কী লাগে পৃথিবীতে? আজ সকালে পথে যখন আমাকে ডেকে বললো, মাসীমা, আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেন না? তখন আমার মনে হয়েছিলো এত মিষ্টি গলার মাসীমা ডাক আমি যেন আর কখনও শুনিনি, তারপর বাড়ি আসতে আসতে এ কথাও ভেবেছিলেম—যার মুখের মাসীমা ডাক অমন, তার মুখের মা ডাক না জানি আরো কত মিষ্টি, এখন আলাপ ক'রে দেখলেম, স্বভাব তার চেয়েও মধুর।

ইন্দ্রাণীর খেয়াল হতে দেখলো, ও সেই সিঁড়ির বাঁকেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষিপ্র পায়ে পরের ধাপে পা বাড়ালো কিন্তু অরুণেশের নাম আবার বাবার গলায় শুনেই ফ্রেমে আঁটা ছবির মত দাঁড়িয়ে গেলো।

রমেন বললেন, ও মা, তুমি অরুণেশের কথা জানো না বুঝি? ও হয়েছে ঠিক ওর বাবার মত—স্বভাবে, বিদ্যায়, ইংরিজীতে ফার্ষ্ট ক্লাশ তো পাবেই, খুব সম্ভব ফার্ষ্ট ও হবে। ওর প্রফেসারদের কাছ থেকে সেই রকম আভাসই পেয়েছেন মিঃ বিশ্বাস। মাস তিনেকের মধ্যেই বিলেত রওনা দিচ্ছে অরুণেশ, অক্সফোর্ডে পড়বে।

: বিলেতে চলে যাচ্ছে অরুণেশ। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। সেই ভাল। যোজন যোজন ব্যবধানই ভাল, অরুণেশের সর্বনেশে কণ্ঠস্বর আর কানে আসবে না তাহলে, ও তো কণ্ঠের স্বর নয়, ও শুধু যাদু—সে স্বর ওকেই সম্মোহিত করেনি শুধু এক ডাকে ওর মাকেও মজিয়েছে। কিন্তু, চলেই তো যাচ্ছে অরুণেশ, কত সাগর-উপসাগর পেরিয়ে সেই সুদূরে চলে যাচ্ছে, তার আগে একদিন একটি বার শুধু এক মিনিটের জন্য...

নিচের সিঁড়িতে মা'র পায়ের পরিচিত শব্দ পেতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে ছুট দিলো ইন্দ্রাণী। একেবারে নিজের শোবার ঘরে এসে ঝপ ক'রে শুয়ে পড়লো। উত্তেজনা কিছুটা কমলে ইন্দ্রাণী ভাবলো, নীলাই বা আজ এলো না কেন? কী হলো নীলার? তবে কি অরুণেশ—বেসামাল মন নিয়ে আরো একটা রাত অনিদ্রায় কাটালো ইন্দ্রাণী।

পরদিন বিকেলে নীলা এসেই একটু কৈফিয়তের সুরে বললো, কাল ভাই সিনেমায় গিয়েছিলেম, তাই আসা হয়নি, তা বলে পড়ায় ফাঁকী দিইনি আমি, দু দিনের বাংলা টাস্ক একদিনে করে এনেছি। ইন্দ্রাণী নীলার পাশের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর খাতা রেখে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ফট ক'রে প্রথমেই প্রশ্ন ক'রে বসলো। তোমার দাদা বিলেত যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, তুমি জানতে না বুঝি? পাশপোর্ট হয়ে গেছে কবে! যেদিন পাশপোর্ট এসেছে, সেদিন থেকে আমার মন যে কী খারাপ—জানলার বাইরে চোখ রাখলো নীলা।

নীলার বাংলা খাতার একেবারে প্রথম পাতায়, প্রত্যেক খাতার প্রথম পাতাটা বাদ দিয়ে নীলার লেখা অভ্যেস, অরুণেশের হস্তাক্ষর

—প্রায় আধ পাতা কবিতা লেখা। ও লেখা ভুল হবার যো নেই ইন্দ্রাণীর, যেন শিলালিপির মত মুদ্রিত হ'য়ে আছে ওর অন্তরে। নীলার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়া শুরু করে দিয়েছে ইন্দ্রাণী, পড়া শেষ হলো। এমন ক'রে কেন লিখেছে অরুণেশ,—কিসের নেশায় যেন বালি খোঁড়া—অথচ জল নেই—আর জল নেই যদি, তবে তৃষ্ণার অনুভূতি কেন? এত দুঃখ অরুণেশের, এত দুঃখ। —শেষের লাইনের ধীবোচ্চারিত প্রার্থনার উপমাটা আবার ভাবলো মনে মনে—দুটি ক্লান্ত চোখ তুমি ভোরবেলার জানলার মত আস্তে খুলে ধরো। আমি রাত্রি-দিন পথে—

ইন্দ্রাণীর মুখে এক কোঁটা রক্ত নেই। হৃৎপিণ্ডের দ্রুত আওয়াজ নিজে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। জানলা থেকে চোখ সরিয়ে নীলা বললো, ইনা, দেখো তো ভাই, আজকের রচনাটার ষ্টার্টিং ঠিক হয়েছে কি না—কথা শেষ হওয়ার আগেই অরুণেশের লেখা কবিতাটা দেখে ফেললে নীলা, ও মা! দাদা আবার আমার খাতায় কী লিখলো? দেখি—দেখি—নীলা খাতাখানা হাতে নিয়ে পড়া শুরু ক'রে দিলো। গড় গড় ক'রে কবিতাটা প'ড়ে নিয়ে বললে, কি জানি, মানে-টানে তো কিছু বুঝলেম না—দাদা মন খারাপ হলেই কবিতা লেখে, কিন্তু আমার খাতায় তো কোনোদিন—কথা থামিয়ে একটু যেন গভীর চিন্তা করতে লাগলো নীলা। নিজের ফ্যাকাশে মুখটা মুখ ঘুরিয়ে নীলার চোখের থেকে আড়াল ক'রে খুব আবছা গলায় ইন্দ্রাণী বললো, তাই বুঝি—? নীলা মনে মনে চিন্তা করতে করতেই কিছুটা আত্মগত ভাবে বললো।

কি জানি, দাদার যে হঠাৎ হঠাৎ এত মন খারাপ হয় কেন বুঝিও না আমি, কাল সকালে কত লাফালাফি করতে দেখলাম, আমাদের সিনেমা দেখার জন্ত টাকা দিলো, হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে আমাদের এগিয়ে দিলো সিনেমা-হল পর্য্যন্ত—তারপর কী-ই যে হলো, রাত আটটায় বাড়ি ফিরে দেখি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে দাদা। উঠলোও না, খেলোও না, মা যখন ডাকাডাকি লাগালেন, বললো, কোনো বন্ধুর বাড়ি থেকে হেদম খেয়ে এসেছে; কিন্তু সকালেও দাদাকে খুঁজে দেখিনি, তার মধ্যে কখন যে আবার আমার খাতার পাতায় কবিতা লিখলে—মুহূর্ত দুই থেমে নীলা প্রশ্ন করলো, ইনা, তুমি দাদার কবিতার মানে বুঝেছো?

ইন্দ্রাণী বেসামাল মনটাকে প্রাণপণে গোছাবার চেষ্টা করে খুব অস্ফুটে বললো, না তো ভাই—

সে কী, তুমিও বুঝলে না? আমি ভেবেছিলাম—ইনার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে কথা শেষ করলো নীলা,—বোধ হয় বি-এ ক্লাশে না পড়লে এসব কবিতার মানে বোঝা যাবে না?

তাই হবে বোধ হয়—যেন কতদূর থেকে কথা ক'টি বললে ইন্দ্রাণী। ইনার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো নীলা, ইনা ভাই, তোমার কী শরীর ভাল নেই? ইন্দ্রাণী চমকে উঠলো, ইন্দ্রাণীর চমক দেখে নীলা অবাক হলো আরো। চেষ্টা ক'রে ইনা সচেতন হলো, সকাল থেকে মাথাটা ধরে আছে ভাই, তাই শরীরে তেমন জুত নেই—নীলার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসলো ইন্দ্রাণী।
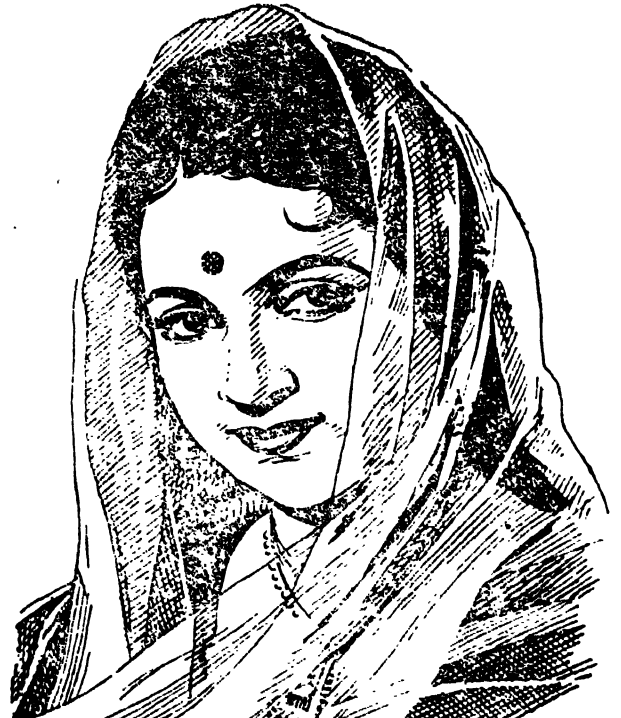
তাহলে আজ আর প'ড়ে দরকার নেই, চল, বাগানে গিয়ে গল্প করি—

হ্যাঁ তাই চল। খাতাটা আজ বরং থাক আমার কাছে, বাস আমি দেখে রাখবো—

ঠিক আছে। দুই বন্ধু উঠলো।

গল্প মানে, আজ শুধু দাদার গল্পই করে চললো নীলা। যে কোনো কারণেই হোক, দাদার মন কাল থেকে ভাল নেই, তাই ওরও ভাল নেই। আজ সকালে দাদার মন খারাপ নিয়ে অনেক ভেবেছে ও, অত যে ভাল লেখাপড়ায়, তার মন খারাপ হয় কিসে? ও তো ভেবে পায় না, ফেল করার কোনো চিন্তা নেই কিছু, তাছাড়া ইচ্ছে মতন পকেটমানি পায়—কোনো দিন মাকে খোসামোদ করতে হয় না ওর মত—তবে এত মন খারাপ আর মুখভরা অন্ধকার যে দাদা কোথা থেকে জুটিয়ে নিয়ে আসে! দাদার গল্প করতে করতে নীলা বলে ফেললো, জানো ভাই ইনা, দাদার বোধ হয় বিয়ে হবে শীগগির—

বিয়ে? ইনার কণ্ঠ চিরে কথাটা যেন বেরিয়ে এলো।

কেন, তুমি অত আশ্চর্য হ'লে কেন?

না, মানে—এত অল্প বয়সে তো আজকাল কেউ বিয়ে করেন না—ইনা শব্দ ক'রে হাসতে চেষ্টা করলো।

তা অবশ্য ঠিকই বলেছো ভাই, কিন্তু মা দাদার বিয়ে না দিয়ে কিছুতেই দাদাকে বিলেত পাঠাবেন না, রোজই কথা কাটাকাটি চলছে এই নিয়ে বাবার সঙ্গে—

ও! ইন্দ্রাণীর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

নীলা ঠোঁট টিপে হেসে বললো। আমার এক খুড়তুতো মামা বছর কয়েক আগে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন, যাওয়ার আগে দিদিমা নাকি মা কালীর পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে মেম বিয়ে যেন কিছুতেই না করেন। পাশ করেও যখন মামা এলেন না, তখন খবর নিয়ে জানা গেলো, মামা ওখানেই একটা কার্যে চাকরী নিয়ে মেম বিয়ে করে বসে আছেন, তাই মার এত ভয়।

ইন্দ্রাণী নিরুত্তর। নীলা আবার বললো। বাবার একদম মত নেই, বলেন, বিয়ে করে গেলে পড়াশুনো ভাল হবে না, তাছাড়া অক্সফোর্ডে রেসিডেনসিয়াল ছাত্রদের অত কিছু ভয় নেই,—নিজের পায়ে না দাঁড়ানোর আগে, আজকাল কিছুতেই বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তা বাবার কথায় মা কানও পাতছেন না। অক্সফোর্ডের ছাত্রদের দু তিনটে মেম বিয়ের নজির সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।

নীলা থামলে ইন্দ্রাণী যেন ভীরুগলায় প্রশ্ন করলো। আর তোমার দাদা কী বলেন?

দাদা? খিল খিল করে হেসে উঠলো নীলা—দাদা মার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলো সেদিন—মা, কবিরাজী বিষ্ণুতেলের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, এলো বলে, চুপচাপ করে বসে বেশ করে কয়েক দিন মাথায় মাখো দিকিনি, না হলে যদি আবার মধ্যমনারায়ণের দরকার হয়ে পড়ে।

ইন্দ্রাণী হাসলো, নীলা হাসিমুখে বলে চললো—দাদাটা ভাই এমন দুষ্টু, এখান থেকে ওখান থেকে রাজ্যের কনের ফটো এনেছে, মার সামনেই ফটো দেখে দেখে এমন মজার সব রিমার্ক করবে—খুটকী, ফুটকী, ভেটকী, লজ্জাবতী, কলাবতী, অহী, হস্তী, একজনের নাকটা একটু খাড়া বলে, তাকে বললো গণ্ডারণী, একজনকে খাণ্ডারণী, আবার একজনের মুখের হাঁ-টা একটু বড় বলে তাকে বললো হিপ্‌পো, মা তো দাদার কথা শুনে হেসেই বাঁচেন না, আমরাও। একটি খুব সুন্দরী মেয়ের ফটো এনেছে, খুব বাচ্চা-বাচ্চা দেখতে, মা সেটা দাদার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, একে তো তুই আর অপছন্দ করতে পারবিনে, চমৎকার সুন্দর দেখতে!

দাদা ফটোটা নিয়ে বেশ একটু সময় দিয়ে দেখলো, মা ভাবলেন, একে নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে দাদার, দাদা করলো কী, ফটোটাকে চিঠি বিলির মত অন্যফটোগুলির মধ্যে টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললো, মা, নীলুর কাজুবাদাম আর টফির শেয়ারের আর লোক বাড়িও না বাপু, মুখের আবদেরে ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওর এখনও ঝিনুক বাটি দিয়ে দুধ খাওয়ার বয়েস পেরোয়নি, আবার সবাই মিলে হাসাহাসি, তারপর, যে ফটোখানা হাতে তুললো দাদা তার স্বাস্থ্য একটু বেশীরকম ভাল, সে ফটোটা হাতে নিয়ে মার গা ঘেঁসে বসে পড়লো দাদা, বললো,—মা, এঁকে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, এঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দাও, ঠাকুরমাকে দেখিনি বলে মনে মনে ভাবি একটা দুঃখ ছিলো আমার, এ্যাদ্দিনে সে দুঃখটা ঘুচবে, তোমাকেও বৌমা বলে ডাকতে শিখিয়ে দেব'খন—শুনে মা ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন আর আমরা তো গড়াগড়ি।

ইন্দ্রাণীও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নীলা মনে মনে কী ভাবলে কে জানে! বলে বসলো, সেদিন আমাকে ক্ষেপাবার জন্য দাদা তোমার সঙ্গে অমন করে কথা বলছিলো ভাই, না হ'লে দাদা লোক খুব ভাল।

সত্যি? চোখ বড় করে আবার হেসে উঠলো ইন্দ্রাণী।

এক ঘুমের পর শোওয়া বদল করতে গিয়ে সর্ব্বাণীর চোখে পড়লো, মেয়ের ঘরে আলো জ্বলছে, ইনা শুনি? কাল সকালে বই শেষ হবে—মার কথায় সম্বিত ফিরলো ইন্দ্রাণীর: বই! কোথায় বই! ওতো নীলার বাংলা খাতাটার প্রথম পাতা খুলে বসে আছে।

সর্ব্বাণীর কণ্ঠস্বরে রমেনের হাল্কা ঘুম গেলো ভেঙে, ঘুম ঘুম গলায় বললেন, ইনু দেখছি বই পড়ার নেশায় তার মা-বাবা সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো—তারপর গলাটা একটু উঁচুতে তুলে বললেন, ইনু আর রাত জেগো না মা—শরীর বড্ড খারাপ হবে। ইনা শুয়ে পড়বে বলে আলো নিবোতে উঠে দাঁড়ালো, ও যেন আচ্ছন্নের ঘোরে বসেছিলো এতক্ষণ, দাঁড়ানো অবস্থায় খাতার প্রথম পাতায় চোখ পড়লো আবার: সর্ব্বনাশ, এ কী ও করে বসেছে! অরুণেশের লেখার নিচে, গুটি গুটি কী যেন লিখে বসেছে ও। লেখাটা পড়ে চোখ একেবারে স্থির হয়ে গেলো ইন্দ্রাণীর, রাতের নির্জন ঘরেও, মুখ রাঙা হলো, কান গরম হলো, চোখের পাতা কাঁপলো, লজ্জার একটা মস্ত ঢেউ গলা পর্যন্ত লাফিয়ে উঠলো; হাত বাড়িয়ে পাতাটা ছিঁড়তে গিয়ে আবার থেমে গেলো ইন্দ্রাণী—যদি নীলা কিছু ভাবে? পা টিপে টিপে এসে ওর ঘর থেকে ওর মা-বাবার ঘরে যাওয়ার মাঝখানের খোলা দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিলো। খাতাটা সামনে টেনে নিয়ে খুব সন্তর্পণে বসলো ইনা। নিজের লেখায় আর একবার চোখ

ফেলতেই ওর হৃৎপিণ্ডটা যেন ধক্ ধক্ করে উঠলো। আর দেরী না করে লেখার অক্ষরগুলি খ্যাঁচ-খ্যাঁচ ক'রে কাটতে লাগলো। সমস্ত কাটাকুটি সুনিপুণ ভাবে শেষ ক'রে খাতা বন্ধ ক'রে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো ইন্দ্রাণী। শোওয়ার পর, ওর লেখা দু-একটা শব্দ মনে ক'রে আবার লাল হলো ইন্দ্রাণী। তারপর নিজের মনেই হাসলো: চেষ্টা করলে ও তাহলে হয়তো একদিন কবিতা লিখতে পারবে। আস্তে আস্তে লঘু মেঘের মত হালকা তন্দ্রা নামলো ইন্দ্রাণীর চোখে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে ইন্দ্রাণী—অরুণেশের কত গল্প শুনেছে আজ নীলার কাছে, তার মধ্যে কোনটা মনে ক'রে হাসছে কে জানে! কিম্বা ওর মন বিহার করছে হয়তো কোনো সোনালী স্বপ্নলোকে।

পরদিন বিকেলে যখন খাতা ফেরৎ দিলো, নিজেই নিজের কাটাকুটি নীলাকে দেখিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়ে দিলো ইন্দ্রাণী, ভাই, তোমার জন্য একটা বাংলা প্রশ্ন ভুলে ওখানে লিখে ফেলেছিলেম, তারপর কেটে দিয়েছি, প্রশ্নটা আবার লিখে দিয়েছি খাতার শেষ পাতায়।

নীলা হেসে বললো, তাতে আর কী হয়েছিলো, দাদা ও পাতায় লিখলে কী হবে, খাতা তো আমারই। তা পর আমার রচনাটা কেমন হয়েছে?

এক লাইন না পড়েই ইনা ব'লে দিলো, খুব ভাল, তারপর এদিক সেদিক তাকালো কয়েক বার, মন ওর স্থির হয়নি এখনও, যে কোনো মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যেতে পারে, এমনই যেন মনের অবস্থা।

খুব ভাল কমপ্লিমেণ্ট শুনে নীলার চোখ-মুখ ঝকমক্ ক'রে উঠলো, ওর রচনা প'ড়ে এত বড় সার্টিফিকেট ইন্দ্রাণী এর আগে আর দেয়নি।

নীলা বাড়ি ফিরলো যখন, সিমলার সন্ধ্যে তখন শুরু হয়েছে সবে। গেট থেকেই ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসা স্তিমিত আলোর দেখতে পেলে ওর দাদা ওর ঘরের সামনের ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। অরুণেশের দাঁড়ানোর কারণটা মনে হতেই হেসে ফেললো নীলা, বেখেয়ালে ওর খাতায় কয়েক লাইন কবিতা লিখে ফেলে অরুণেশের অস্বস্তির আর সীমা নেই কাল থেকে, কাল খাতাট ইন্দ্রাণীর কাছে রেখে এসেছিলো ব'লে অনুযোগ করেছে খুব—বুদ্ধি ক'রে আমার লেখা পাতাটা ছিঁড়ে আনতে পারলিনে? বুদ্ধি আর তোর কবে হবে নীলা?

গটগট্ ক'রে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর খাতাটা খুলে বাঁ হাত দিয়ে চেপে রেখে ফস ক'রে প্রথম পাতাটা ছিঁড়ে ফেললো নীলা, অরুণেশ বারান্দা ছেড়ে ততক্ষণ ঘরে এসে পড়েছে, দাদার দিকে পাতাখানা বাড়িয়ে দিয়ে নীলা হাসিমুখে বললো, 'এই নাও দাদা তোমার দুর্বোধ্য কবিতা, বাপ রে! একটা লাইন যদি মানে বুঝেছি আমি।

অরুণেশ হাত বাড়িয়ে পাতাখানা নিয়েই কাটাকুটির ওপর চোখ রাখলো। নীলা দেখলো সেটা, বললো, ইন্দ্রাণী ভুলে বাংলার একটা প্রশ্ন ওখানে লিখে ফেলেছিলো—তারপর কেটে দিয়েছে।

অরুণেশ কোনো উত্তর না দিয়ে বালবের একেবারে নিচে এসে পাতাটা চোখের সামনে তুলে ধরলো একবার।

: না, এমন হিজিবিজি ক'রে কেটেছে ইন্দ্রাণী, কোনো একটা অক্ষরও স্পষ্ট হলো না। দাদার প্রয়াস দেখে হাসলো নীলা, ও প্রশ্ন জেনে তোর আর কী হবে দাদা? ও প্রশ্নটা আমার খাতার মধ্যে আবার ইনা লিখে দিয়েছে। অরুণেশ কিন্তু একবারও খাতার মধ্যে লেখা প্রশ্নটা দেখতে চাইলে না। বোনের কথার উত্তরে হেসে বললে শুধু, পাগল নাকি! বাংলা প্রশ্ন দেখে আবার কী হবে? আমি আমার লেখাটাই আবার পড়ছিলাম একটু।

রাতের খাওয়ার টেবিলে ছেলেকে অনুপস্থিত দেখে তরুবালা উদ্বিগ্ন হলেন খুব। নিচ থেকেই অনুচ্চ কণ্ঠে—খোকন, খোকন করে ডাকাডাকি লাগিয়ে দিলেন। ঘড়ির সময় দেখে এ বাড়ীর সকলে খাওয়ার টেবিলে এসে উপস্থিত হয়। চার বেলাই তাই। কেউ দু-এক মিনিট আগে পরে। মার গলা শুনে ঘড়িতে একবার চোখ ফেলেই তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে কপাটের খিল খুলে ক্ষিপ্র পায়ে নীচে নেমে এলো অরুণেশ—ওর জন্য প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সবাই বসে আছেন ভেবে ও মনে মনে লজ্জা বোধ করলো খুব।

দাদা, দরজা আটকে কী করছিলি রে? ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি? নীলার প্রশ্ন।

হুঁ—বলে দু হাত তুলে চোখ দুটো একবার কচলে নিয়ে ধপ করে নীলার পাশের চেয়ারে অরুণেশ বসে পড়লো। অরুণেশের মুখের ভাব অতি প্রফুল্ল। নিয়ম মাফিক বোনেদের সঙ্গে খুনসুটি করে খেতে লাগলো ও। দরজা বন্ধ করে অরুণেশ মস্ত একটা দুরূহ কাজে ব্যাপৃত ছিলো এতক্ষণ। মেম্লোর কোন বাড়ি থেকে একটা পাওয়ারফুল লেন্স যোগাড় করে, টেবিল লাইটের বাল্‌বটা বদলে

হ্রুদ' পাওয়ারের বাল্‌ব লাগিয়ে, ইন্দ্রাণীর কাটাকুটি হিজিবিজি থেকে একটি একটি করে অক্ষর উদ্ধার করছিলো। দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় দেড় লাইন উদ্ধার হয়েছে—তাতেই ও উত্তপ্ত, কাটাকুটির কয়েদ থেকে আর যদি বাকী শব্দগুলো নাও খালাস হয়, তাতে কোনো দুঃখ নেই ওর। কিন্তু, সব লাইন পড়তে পারার পর, ওর মনে হয়েছিলো, শেষের শব্দ ক'টি বাদ পেলে ওর জীবনে যেন মস্ত ফাঁক থেকে যেতো। ছেলের সহজ প্রফুল্লতা দেখে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন তরুবালা। ছেলের মুখ কালো দেখলে, ওঁর সামনে গোটা পৃথিবীটাই কালো হয়ে যায়। মা'র পক্ষপাতিত্বে মেয়েরা অনেক ক্ষেপায় মাকে। মুরগীর তন্দুরীর রোষ্টের আর একটা টুক্‌রো ছেলের থালায় তুলে দিতে দিতে তরুবালা বললেন, পরশু তোর কী হয়েছিলো খোকন? বাইরে থেকে খেয়ে এসে পেট ব্যথা করছিলো বোধ হয়, না?

মা'র কথার উত্তরে ঘাড় নাড়লো অরুণেশ, তার পর দু আঙুল দিয়ে আলগোছে মুরগীর ঠ্যাংটা নীলার পাতে তুলে দিয়ে উচ্ছল গলায় বললো,—নে নীলা, তুই খা বাপু ঠ্যাংটা, যে ভাবে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিস আমার পাতের দিকে, আমার আর হজম হবার উপায় নেই। নীলা প্রতিবাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলো, আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবে না দাদা, আমি তোমার পাতের দিকে কখন তাকালাম?

পাছে নীলা আবার ওর থালায় পট করে তুলে দেয় সেজন্য বাঁহাত দিয়ে থালা আড়াল করে অরুণেশ বললো। না রে নীলা, মনের আনন্দে তুই চিবো ঠ্যাংটা, আমার পেটে আর একটি কোঁটা জায়গা নেই—শেলি অরুণেশের উল্টো দিকে বসেছিলো। কারি বোলটা শেলির দিকে ঠেলে দিয়ে অরুণেশ স্মিতমুখে বললো, শেলি তুই বাকীটুকু শেষ করে ফেল, ভাল করে খেয়ে দেয়ে এই এক মাসের মধ্যে শরীরটাকে একটু সবলা করে নে দিকিন, না হলে পৃথুলা হস্তিনীর পাশে নেহাৎ একেবারে হেলে সাপ বনে যাবি যে। পৃথুলা হস্তিনী মানে, গিরীনের মাতা মিসেস তালুকদার, তাঁর মেদবহুল চর্বির খাঁজগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সশব্দে হেসে উঠলেন সকলে। শেলি বাঁহাতে জলের গ্লাস তুলে মা-বাবার চোখ আড়াল করে ভাইকে ভেঙালো। অভয়শংকর বাবু ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকন, কাল তোমার সুটগুলোর ট্রায়াল দিয়ে এসো, আর তোমার ট্রপিকাল সুটের কোটটা বোধ হয় একটু আঁটো হয়েছে, ওটাও সঙ্গে করে নিয়ে যেও অলটার করার জন্য। আমি জানতিপ্রসাদকে বলে রেখেছি।

না বাবা, ট্রপিকালের কোট একদম ঠিক আছে, সেদিন কোটের নিচে দুটো সোয়েটার পরেছিলাম বলে অমন দেখাচ্ছিলো—উত্তর দিলো অরুণেশ, তরুবালার জন্য সকলে অপেক্ষা করছিলেন। পেট ভরে গেছে বলে অরুণেশ ফ্রুট সেলাড খায়নি। তরুবালা ফ্রুটসেলাড খাওয়া শুরু করেছিলেন, অরুণেশ বাঁহাতে নিজের কাচের বাটিটা তুলে মার বাটির মধ্যে উপুড় করে দিলো। চামচটা মুখ থেকে নামিয়ে তরুবালা, খোকন, কী হচ্ছে—কী হচ্ছে—বলে উঠলেন, তখন অরুণেশের সবটুকু ঢালা হয়ে গেছে। তরুবালা নিশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

দেখলে ছেলের কাণ্ডখানা! কিন্তু তরুবালার অত্যধিক মিষ্টান্ন-প্রীতির খবর সকলেই জানেন, সেজন্য তরুবালার কপট অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো সকলেই, মুখ ধুয়ে অরুণেশ ঘরে এসেই কপাটে খিল দিলো। টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে ছেঁড়া পাতা আর লেন্স নিয়ে আবার বসলো টেবিলে। আরো ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায়, সব কটা অক্ষর ধরা দিলো ওকে। গুপ্তধন আবিষ্কার করলেও এর চেয়ে বেশী বোধ হয় আনন্দ হয় না। উদ্ধারলিপিটা হাতে তুলে নিলো অরুণেশ, গুন-গুন করে গেয়ে চললো ওর মন, একবার, দুবার, এমনি করে অনেক বার—

ফিরে ফিরে এসে কা'কে যাও ডাক দিয়ে
সে কী আমি, সে কী আমি—
যে আমি এখন প্রাণের পসরা নিয়ে
তোমার তীর্থগামী।

অনেক পরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো অরুণেশ। বাইরে তন্দ্রাহারা জ্যোৎস্না। কাচের জানলা দিয়ে চাঁদের বিচ্ছুরিত রেখাগুলি অরুণেশের স্বপ্নময় কপালে প'ড়ে লুটোপুটি খেলতে লাগলো।

সেদিন প্রহরশেষের আলোয় প্রখ্যাত কামনা দেবীর মন্দিরে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হ'য়ে গেলো অরুণেশের। অরুণেশের ফটো তোলার হাত নেহাৎ মন্দ নয়। শেলি-গিরীন প্রসপেক্ট হিলসের এদিকে ওদিকে যুগলে নানান ভঙ্গিমায় ফটো তুলবে বলে অরুণেশকে ওদের সঙ্গে ধরে নিয়ে এসেছে। এসেই প্রসপেক্ট হিলসের মাথায় মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকেছে ওরা, কামনা দেবীকে প্রণাম জানাতে। অরুণেশ সূর্যের দিকে লেন্স দিয়ে একটা ফটো তোলার ইচ্ছেয় এদিক সেদিক দেখতে দেখতে মন্দিরের পশ্চিম কোণে এসেই—বিজাতীয় পোষাকে সজ্জিতা ইন্দ্রাণীকে প্রথমে চিনতেই পারেনি, আজ ভীনা কাপুরের একান্ত আগ্রহে ওর একপ্রস্থ সালোয়ার-কামিজ আর চুন্নী পরে ওর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলো। ভীনার শাড়ি পরার সখ খুব, দুদিন ইনার শাড়ি পরে বেরিয়েছে, অতএব—ওকেও পরতে হবে। মন্দিরের পশ্চিম চাতালে একটা দোলনা টাঙানো আছে, একটা রেক্‌ট্যাঙ্গল সেপের পিঁড়ির দুপাশে দুটো দুটো চারটে ফুটো ক'রে শক্ত কাছির মত মোটা রজ্জু দিয়ে বাঁধা। এতক্ষণ ভীনা দোল খেয়েছে—দোল দিয়েছে ইনা, এখন ইন্দ্রাণী দোল খাচ্ছিলো। ইনা ভয় পাচ্ছিলো ব'লে খুব বেশী জোরের সঙ্গে ভীনা কাপুর এক একটা ঠেলা দিচ্ছিলো আর খিল খিল ক'রে হেসে বলছিলো—

বহিনজী, হাত মাত্ ছোড়্‌না! পানি পিয়াস পেয়েছে ভীনার, দোলনায় প্রচণ্ড একটা ঠেলা দিয়ে প্রায় মন্দিরের চূড়ো পর্য্যন্ত তুলে ও ছুট লাগালো মন্দির সংলগ্ন কূপের কাছে, ওখানে কুয়োর পাড়ে একজন লোক সর্বদাই বসে থাকে যাত্রী-যাত্রিনীদের হাতে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য। এ কূপের জলের খ্যাতিও সুদূর প্রসারিত, এ জল ভক্তি ভ'রে খেলে নাকি সমস্ত রোগ নিরাময় হয়। দোলনার দুরন্ত বেগে ইন্দ্রাণী অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে নিচের দিকে তাকাতেই অদূরে পোর্টেবল ক্যামেরা কাঁধে অরুণেশকে এদিক পানে আসতে দেখে ফেললো। বিজাতীয় পোষাকের লজ্জায় অদ্ভুত আশ্চর্য একটা ধ্বনি নির্গত হলো ওর কণ্ঠ থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তিতে একটা হাত ছেড়ে দিলো ও। শক্ত রজ্জু ঘুরে গেলো

ধাঁই করে আর ইন্দ্রাণী সবেগে শূন্য থেকে নেমে আসতে লাগলো। ততক্ষণে অরুণেশ দেখে ফেলেছে ইন্দ্রাণীকে। বল লোফার মত লাফ দিয়ে এসে অরুণেশ ইন্দ্রাণীকে একেবারে লুফে নিলো। আর তারপর, যখন ধীরে ধীরে চাতালে ইন্দ্রাণীকে দাঁড় করিয়ে দিলো অরুণেশ তার বহু আগেই দাঁড় করাতে পারতো ও। নিবিড় আলিঙ্গনে ইন্দ্রাণীকে কয়েক মুহূর্ত বেঁধে রেখেছিলো অরুণেশ, ইনার ভীরুবুকের আওয়াজ অনুভব করছিলো নিজের বুক দিয়ে। আলিঙ্গনমুক্ত ক'রে দাঁড় করালো যখন ইন্দ্রাণীকে তখন মনে হলো রক্ত গোধূলির যেন সবখানি রং চুরি করে নিয়েছে ইনার কপোল, কপাল। ইন্দ্রাণী মুখ নত ক'রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে অদূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার মত যেন স্তব্ধ মৌনতায় দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্লিক্। শব্দ শুনেই মুখ তুললো ইন্দ্রাণী, দেখলো ওর এই ভঙ্গিমা অরুণেশের ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেলো, শুধু ফটোই নয়, ওর এই বিজাতীয় পোষাকের ফটো। অরুণেশের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল গলায় বললো, ছিঃ, ছিঃ, এটা কী করলেন আপনি? তারপর সন্ত্রাসে চোখে ঘাড় ফিরিয়ে ভীনা কাপুরকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু দেখতে পেলো না ওকে। ভীনা জল খেয়েই ফিরেছিলো, দেরী করেনি। দোলনার কাছে বরাবর আসতেই আলিংগনবদ্ধ অবস্থায় অরুণেশ আর ইন্দ্রাণীকে দেখে ফেললো।

: আরে বাবা! ইনা বহিনজী এত না পেয়ার করছে! পেয়ারের আদমিকে ভি আজ এখানে আসতে বলেছে ইনা বহিনজী, তা তো বাতায়নি ওর কাছে। ঝট করে সামনের বিস্তারিত পাথরের খাঁজে আড়াল করলে নিজেকে। ইন্দ্রাণী ভীনা কাপুরকে না দেখে এক দিক দিয়ে একটু অস্থির হলো বটে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হলো। আবার শব্দ হলো ক্লীক্। ওর ঘাড় ফেরানো ভঙ্গিমা ধরা পড়লো এবার।

না-না-না—মুখ ঘুরিয়ে প্রতিবাদ করতেই ইন্দ্রাণীর চোখে পড়লো ওর দিকে লেন্সের মুখ রেখে ক্যামেরা এ্যাডজাষ্ট করছে অরুণেশ। দু হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঢেকে ইন্দ্রাণী বলে উঠলো, না-না-না—সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনলো ক্লীক্। বিমূঢ় ইন্দ্রাণী চোখ থেকে হাত নামিয়ে মুহূর্ত দুই অরুণেশের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরলো, ভিজে ভিজে গলায় বললো, এ কী হচ্ছে। অরুণেশ হাত নামিয়ে ক্যামেরাটা চামড়ার খাপে রেখে দিলো। ঠোঁটে দুষ্টুমীর হাসি চেপে রেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে রইলো। অরুণেশের চোখের চাউনি অনুসরণ ক'রে আবার টকটকে রাঙা হয়ে গেলো ইন্দ্রাণীর মুখ, মেয়েদের শরীর নিয়ে যে কী দারুণ লজ্জা। দোপাট্টা অর্থাৎ চুন্নীটাকে দু হাত দিয়ে নিচের দিকে বিস্তার করতে করতে অস্ফুট আবছা গলায় বললো, আমি এবার যাই—সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে চলতে শুরু করলো ইন্দ্রাণী।

দাঁড়াও! যেও না—এমন সর্বনেশে কণ্ঠস্বর কেন অরুণেশের, ছুটে পালাতে গিয়েও পারলো না ইন্দ্রাণী, ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ইনার চূর্ণকুন্তল হাওয়ায় কাঁপছে—মনও কাঁপছে একটু একটু। অরুণেশ মুখে সেই দুষ্টুমীর হাসি নিয়েই এলো ইন্দ্রাণীর একেবারে সামনে। ব্রীড়াময়ী আরক্তিম ইন্দ্রাণীকে দেখে আরো একটু ইন্দ্রাণী, কোন ডাকটা লোভনীয় তোমার? ইন্দ্রাণী, ইনা না ইনু?

: সর্বনাশ! কেন ও পাতাটা ছেঁড়েনি তখন! কী হবে! অত কাটাকাটি লেখাও পড়ে ফেলেছে অরুণেশ! হে ভগবান, আমি আমার মুখখানা এখন কোথায় লুকাই? ইন্দ্রাণীর প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা। অরুণেশের তবু মায়া হলো না। মনে মনে হেসে আরো অস্ফুট গলায় বললো, অত লজ্জা কেন পাচ্ছো ইন্দ্রাণী, ভয় নেই, শেষের লাইনটা পড়া হয়নি আমার—আত্মসমর্পণের পর মানুষ যখন অনুগ্রহ ভিক্ষে ক'রে, অরুণেশের চোখে ঠিক সেই রকম চোখ রাখলো ইন্দ্রাণী।

আর কত নির্দয় হওয়া যায়, নিষ্ঠুর খেলা আর যায় কত? অরুণেশ হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো ইন্দ্রাণীকে। মন্দিরের দক্ষিণ কোণ থেকে শেলির গলা শোনা গেলো, খোকন! কোথায় গেলি তুই? লাইট চলে গেলে ফটো আর তোলা হবে কখন? তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে ভাবতে লাগলো খোকন।

: কী কাণ্ড! মনেও তো নেই—ফিল্মগুলি তো সবই খরচ করে বসে আছি। সামনের ঢালু পাথরটা দোল খেয়ে নেমে গেছে যেখানে, ইন্দ্রাণী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে সেখানে আত্মগোপন করলো। অরুণেশ ফিল্ম ফুরোনোর কথা ভুলে গিয়ে ইন্দ্রাণীর বিদ্যুৎগতির দিকে তাকিয়ে হাসলো।

শেলি ও গিরীন মন্দিরের পশ্চিম কোণে এসে পড়েছে, অরুণেশকে ঢালু পাথরটার দিকে অমন স্থির হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে শেলি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, কী হলো রে তোর? অত ডাকাডাকি ক'রে ফিরছি, শুনতে পাসনি?

অরুণেশ মুখ ফিরিয়ে সুন্দর হাসলো।

লাইট লক্ষ্য করছিলাম, আজ দেরী হয়ে গেছে, এ আলোয় আর ফটো উঠবে না।

শেলি ক্ষুণ্ন গলায় বললো, সে কী! অত ব্যবস্থা ক'রে তোকে নিয়ে এলাম—একটু টাইমিং দিয়ে ফটো তোল না খোকন। বোনের মুখ দেখে খোকনের কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু তখন আর উপায় কী! ওদের পোজ নিতে বলে একটা ফটো তোলার ভাণ করলো অরুণেশ, তারপর আন্তরিকতার সুরে বললো, আজ আর হবে না রে শেলি, তোকে কথা দিচ্ছি সামনের শনিবার আবার নিশ্চয়ই আমি আসব। আজ চল বাড়ি ফেরা যাক—অরুণেশ বড় বড় পায়ে চলতে শুরু করলো। পেছন থেকে গিরীন ডাক দিলো, দাঁড়াও না হে, অত তাড়াহুড়ো লাগিয়েছো কেন? একসঙ্গেই ফিরবো আমরা। শেলিও হাঁকলো, এই খোকন দাঁড়িয়ে যা।

অরুণেশ তখন অনেকটা দূরে চলে গেছে, মুখ ঘুরিয়ে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলো, তোরা আয়, আমি নিচে আছি। আনন্দের এমন উত্তরঙ্গ উত্তেজনায় কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়? লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগলো অরুণেশ। শেলি কিন্তু ভাই-এর বিবেচনায় খুশিই হলো। গিরীনের হাতে হাত ধরা দিয়ে ঘেঁসা-ঘেঁসি ক'রে খুব ধীরে ধীরে উৎরাই নামতে লাগলো দুজনে। পথ ছেড়ে অরুণেশ সংক্ষিপ্ত উপপথ দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলো নিচে।

সোজা রাস্তাটা সর্পিল বাঁক খেয়েছে যেখানে, সেখানে টিনের চালা দেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির কয়েকখানা ঘর, প্রথম কুটীরের আঙিনায় বাচ্চা বাচ্চা দুটো চিনে শিশু ডাংগুলি খেলছে। ডাংগুলি মেরে নাপেলরঙা গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ বার করছে, এক মাত্যম্ চা-রোটি, দু মাত্যম্ দুধ রোটি, তিন মাত্যম্ গোস রোটি···। কুতকুতে চোখ, ফোলা ফোলা গাল আর আধো আধো ভাষায়—মাত্যমের ত্য যুক্তাটা খুব সুর ক'রে টেনে পরের ম টা পট্ করে উচ্চারণ করছে। বাঃ! ভারি সুন্দর তো! অরুণেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

অভাবনীয় অনেক কিছুই ঘটে যায় এই পৃথিবীতে। জিতেন্দ্রনাথের উঁচুগলার আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, মীনুদিদি শীগ্‌গির শুনে যা—মীনাক্ষী দৌড়ে এলো, কী দাদু ?

দেখ্, তোর মাষ্টারমশাই লাখোপতি হয়েছে—দাদু ওর সঙ্গে তামাসা কচ্ছেন না কিছু বলছেন, মীনাক্ষী প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলো না। কেমন একরকম বোকা-বোকা চোখে ফ্যাল-ফ্যাল করে দাদুর দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

কি যে বিশ্বাস হলো না কথাটা—জিতেন্দ্রনাথ তাঁর সামনের খোলা খবরের কাগজটা টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়ানো মীনাক্ষীর দিকে হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন। সুপ্রিয়র আবক্ষ ফটোটাই আগে চোখে পড়লো মীনাক্ষীর। সামনের দিকে স্বল্প ঝুঁকে যেন কিছু নিরীক্ষণ করছে, অবিকল সেই নিজস্ব ভঙ্গিমায় ফটোখানি উঠেছে, ঠোঁটে চাপা হাসি।

কি দিদি, বিশ্বাস এবার হলো তো? দাদুর কণ্ঠস্বরে মীনা তাড়াতাড়ি ফটোর থেকে চোখ সরিয়ে ফটোর ওপরের হেডিংগুলির ওপরে চোখ রাখলো। বড় বড় করে লেখা বাঙালীর সৌভাগ্যলাভ। এবারের ডার্বির ফার্স্ট প্রাইজ উইনার শ্রীসুপ্রিয় সোম তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। ছোটো ছোটো অক্ষরে আরো লেখা ছিলো কিছু। আর না পড়েই মীনা টেবিল থেকে খবরের কাগজের ওপরের পাতাটা প্রায় ছোঁ দিয়ে নিয়েই ছুট দিলো ঘর থেকে। মীনাক্ষীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের—দিদাই, দিদাই—ডাক্ কানে এলো জিতেন্দ্রনাথের। একটু পরেই শিশিরকণাকে সঙ্গে নিয়ে মীনাক্ষী কাগজ হাতে ক'রে আবার ঘরে ঢুকলো। খুশি উপচে পড়া গলায় বললো, মাষ্টারমশাইকে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে হয়, না দাদু ?

জিতেন্দ্রনাথ হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, সে কী মীনু, আমরা খাওয়াবো কী? ওই তো এখন সবাইকে খাইয়ে বেড়াবে। সুপ্রিয় এখন লাখোপতি, নাও শুধু এক'লক্ষের নয় তিন লক্ষের—বুঝেছিস দিদি!

শিশিরকণা হাসিমুখে বললেন, হোক লক্ষপতি, আগে ওকে খাওয়াবো। মিনুর পাশের খবর দিয়ে গেলো যেদিন, তখন আমরা বাড়ি ছিলাম না, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে গিয়েছিলাম, দর্শন ক'রে বাড়ি ফিরলুম যখন—তখুনি চলে গেল সুপ্রিয়। ওকে বলে দিয়েছি আমি, আর একদিন এসো, তোমার খাওয়া তোলা রইলো।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের ঘটনা মনে পড়ে পাঁশুটে হয়ে গেলো মীনাক্ষীর মুখ। ওর মন বললো: আর যদি কোন দিনই সুপ্রিয় না আসে, সত্যি সত্যি যদি চৌকাঠ না ডিঙোয় ওদের—। আর যদি—

জিতেন্দ্রনাথ কাগজ পড়তে পড়তে বললেন, চমৎকার সহজ সুন্দর ছেলেটি! ওর প্রশস্ত ললাট দেখেই বুঝেছিলাম, এ কপাল পাথরে চাপা হ'তেই পারে না। ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি ভাল লেগেছিলো সেদিন, এমন একটা সহজাত দক্ষতা আছে ওর স্বভাবে, পাঁচ মিনিটের আলাপেই ওকে যেন না ভালবেসে পারা যায় না।

মীনাক্ষীর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেলো। চোখের জল লুকোবার জন্য ঘর ছেড়ে চলে গেলো তাড়াতাড়ি। নিজের পড়ার নির্জন ঘরে এসে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলো। আরো অনেক দিন ওর কান্না পেয়েছে—কেঁদেছে, কিন্তু সে ছিলো দুঃখের কান্না। খুব যখন অস্থির হয়েছে মন, ও ওর লুকোনো জায়গা থেকে তখন বার্ণলের মলমের টিউবটা বার ক'রে স্থির চোখে চেয়ে থেকেছে সেটার দিকে, পেয়েছে সান্ত্বনা। কিন্তু আজকের কান্না যেন হারানোর শঙ্কার কান্না: লাখোপতি সুপ্রিয় আর আসবে না ওর কাছে, তার নাগাল ও আর কোনো দিন পাবে না। সুপ্রিয়র সঙ্গে সেদ্ধ-পোড়া ভাত ভাগাভাগি করে খাওয়ার ভাগ্য হলেও হ'তে পারতো কিন্তু রাজভোগের অংশীদার হওয়ার ভাগ্য ওর কোনোদিন হবে না। অদূরে সুবর্ণবালার পায়ের শব্দ কানে যেতেই, চোখের জল নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি একটা বই খুলে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলো। সুবর্ণবালা সুপ্রিয়র লাখোপতি হওয়ার সংবাদ শিশিরকণার কাছে শুনলেন এবং মীনাক্ষী ওঁকে জানানোর দরকার মনে করেনি বলে মনে মনে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হ'লেন মেয়ের ওপর। সশব্দে ঘরে ঢুকলেন সুবর্ণবালা। মেয়ের বই ঢাকা মুখের দিকে খরদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে একটু যেন চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোর মাষ্টার তিন লাখ টাকা পেয়েছে, সে খবরটা আমাকে দিলে কী ক্ষেতিটা হতো শুনি ?

মীনাক্ষী নিশ্চুপ।

আ মলো যা, মুখে কী কুলুপ লাগিয়েছিস নাকি? ঝাপটা দিয়ে উঠলেন সুবর্ণবালা। মীনাক্ষী নিরুত্তর। সুবর্ণবালা মেয়ের ওরকম স্থির ভঙ্গি দেখে ভেতরে ভেতরে টগবগিয়ে উঠলেন। মেয়ের আড়াল করা মুখের দিকে আবার অগ্নিদৃষ্টি হানলেন একটা মনে মনে বললেন—যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর,—আপন ভাল তো পাগলেও বোঝে,—এ মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি,—আবার ফেটে পড়বার উপক্রম করেই অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে ব্রেক কষলেন সুবর্ণবালা তারপর আশ্চর্য নরম গলায় মেয়েকে শুধোলেন, তোর মাষ্টারের ঠিকানা জানিস ?

মা'র নির্লজ্জ প্রশ্নে নির্বাক আর থাকতে পারলো না মীনাক্ষী, রুক্ষ গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো, জানি না।

সুবর্ণবালা মেয়ের ভাবভঙ্গিতে একেবারে যেন ক্ষেপে গেলেন, তিক্ত গলায় বললেন, তা জানবে কেন? জানো কেবল ন্যাকামী করতে।

শব্দ ক'রে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সুবর্ণবালা।

[ক্রমশঃ

পথের কথা বলতে একঘেয়ে লাগে। কিন্তু পথের ওপর দিয়ে যারা চলে তাদের কাছে পথ সব সময়ই নতুন রূপ নিয়ে আসে। এক পা বাড়ালেই চার পাশের চেহারা বদলে যায়। মোড় ফিরলেই দেখা দেয় নতুন জগৎ। অপ্রত্যাশিত যত বিপদ এসে পথের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দেয়।

এমনি এক বিপদ এলো। এক খাড়া পাহাড়ের চূড়োয় উঠে পথ শেষ হলো। শেষ মানে, সেখান থেকে অন্ততঃ তিরিশ ফুট নিচে নামতে হবে।

তিয়েলিং বললেন, কোমরে দড়ি বেঁধে নামতে হবে। তাছাড়া কোনো উপায় নেই। সঙ্গী শেরপারা সবাই জানে ঐ পদ্ধতি। তারা অভ্যস্ত। শুধু জানে না শান্তনু, কিশোর আর লালী।

পাহাড়ের চেহারা দেখলে ভয় হয়। যেন পথিককে ভয় দেখাবার জন্যেই সে একটা হিংস্র সিংহের মত মাথা তুলে খাড়া হয়ে আছে।

শেরপারা কোমরে দড়ি বেঁধে তৈরী হলো। ওপর থেকে এক একজনকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। নীচে নেমে সে দড়ি খুলে ফেললো। এই ভাবে নামলো শান্তনু, নামলেন তিয়েলিং। লালী কিছুতেই রাজী নয়। কোমরে দড়ি পরায় তার আপত্তি। কিন্তু উপায় কি? শেষ পর্যন্ত পরতে হলো তাকে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

শূন্যে ঝুলে নামতে নামতে মাঝে মাঝে শুধু পর্বতগাত্রে পা ঠেকে। সেই অবস্থায় চীৎকার করে উঠলো লালী। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মাটিতে পা পড়তেই সে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। এবং উল্লাসে সকলকে ছাপিয়ে উঠলো। বাধা জয় করার পরে এমনই হয়, যে আনন্দ ভীতুরা কোন দিনই পায় না।

কিছু দূর যাবার পর তিয়েলিং বললেন, সামনে ঐ যে কালো পাহাড়ের একটা পাঁচিল দেখছো, ঐটা পেরুলেই আমরা একটা ছোট উপত্যকায় গিয়ে পড়বো, তার পরেই—তিয়েলিং চুপ করলেন।

তার পর কি? ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে শান্তনু।

তার পর, তোমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান মিলবে, বললেন তিয়েলিং।

মনে মনে লাফিয়ে উঠলো শান্তনু। সে বললে, তার মানে, আপনি বলছেন সোনালি ঝরণা দেখতে পাবো?

হ্যাঁ, তাই।

হুররে, হুররে, তিনজনই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

সারা দিন পথশ্রমের পর সন্ধ্যার আগেই ওরা তাঁবু খাটাতে লেগে গেল। তুষার-ঝড় ঠেকাতে পারে তেমন ভাবেই তাঁবুর দড়ি-দড়া শক্ত করে বাঁধা হলো।

রাত্রে আহারের পর সবাই বিশ্রাম করছে, লালী আর কিশোর বলে উঠলো, লামাজী, এবার সেই গল্পটা শুরু করুন। তিয়েলিং প্রস্তুতই ছিলেন। শুধু ওদের আগ্রহ আছে কি না দেখছিলেন।

তিয়েলিং বলতে আরম্ভ করেন। গতকাল আমরা চুংপোকে রাজার কাছে বিচারের জন্য ধৃত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই না?

চুংপোর দিক থেকে বলবার কিছু ছিল না। কেন না, ঘটনাটা সত্যি। জমিদারের লোক এবং গ্রামের দু'-একজন চাষী স্বচক্ষে দেখেছে যে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে মিমি যাচ্ছে। তার করুণ মুখ ভয়ে বিবর্ণ, তবুও সেই রহস্যময় ঘোড়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব সাক্ষ্যের পরে প্রমাণিত হলো যে ঘোড়াটি চুংপোর তৈরী।

শয়তান ছেলেটাকে এখনি কয়েদখানায় পুরে রাখা হোক, রাজা বাজখাই আওয়াজে ফেটে পড়লেন। তিনি আরও বললেন, তিনজন অশ্বারোহী মিমিকে খুঁজে আনবার জন্যে এখনি বেরিয়ে পড়ুক।

চুংপো বন্দী হয়ে রইলো এমন এক জেলখানায় যার দেয়ালগুলো সব চেয়ে মোটা, লোহার দরজাটা সব চেয়ে মজবুত আর পাঁচিলগুলো সব চেয়ে উঁচু। তাছাড়া কয়েদের রক্ষী যারা তারা নাকি যমদূতের মত, চেহারায় এবং স্বভাবে। সকলে আন্দাজ করলো এতটুকু ছেলের জন্যে এত কাণ্ড! চুংপোর বাপ-মা কাঁদতে কাঁদতে ভাবলো। আহা, বাছা চুংপো ওখানে আর বাঁচবে কতক্ষণ! তারা রাজাকে অনুরোধ করে বললে, দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন, যেন সময় মত ওকে খাবারটা দেওয়া হয়। কিন্তু খাবার দেওয়ার ভার যার হাতে সে আবার ভীষণ নিষ্ঠুর, আর জল যে দেয় সে কানে শুনতে পায় না। যেটুকু শোনে তা-ও ভুল বোঝে।

সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ, চুংপো কী কষ্টেই আছে ঐ জেলের ক্ষুদে ঘরে। ভয়েই হয়তো কাঠ হয়ে গেছে রে। উঁহু, ছোট হলে কি হবে, চুংপোর বুকখানা ছিল ইস্পাতের মত, ভয়ে দোমড়াবার মত নয়।

তিন দিন পরে যখন জেলখানার লোক গিয়ে রাজাকে বললে যে চুংপো বেশ সুস্থই আছে, তখন রাজা খুব অবাক।

হয়ে গেলেন। মনে মনে দুঃখও পেলেন একটু, লোকের কষ্ট দেখলে তিনি মজা পেতেন।

দেশের লোক সবাই এটা জানতো। রাজার সেই দিন খুবই মন খারাপ যেতো যেদিন তিনি একজনকেও শাস্তি দিতে পারতেন না। সেই জন্তে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে সবচেয়ে হিংস্র মেজাজের লোক পুষতেন তিনি। তারা রাজার রকম শাস্তির ব্যবস্থা করতো গরীব আর নিরীহ প্রজার উপর রাজা বলতেন গরীব সাজা ওদের যেমন সখ, বেত মারাও আমার তেমনি সখ। এইটাই তার বিচার।

যাই হোক, রাজা কার কাছে শুনলো, চুংপোর কাছে এক যাদু-তুলি আছে, সে তুলি দিয়ে যা কিছু আঁকবে তাই জীবন্ত হবে।

এই খবর এতো দেরিতে জানাবার অপরাধে মন্ত্রীকে সাত বার ওঠ-বোস করতে হলো। যাই হোক, খবরটা যখন পেলেনই তখন তো তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদু-তুলি যদি সত্যিই হয় তাহলে তা দিয়ে তো রাশি রাশি ধনরত্ন পাওয়া যেতে পারে। রাজার মনের জিভে জল এসে গেল।

অবিলম্বে তিনি চুংপোকে বললেন, আমায় ধনরত্নের ছবি এঁকে দাও দেখি, আর সেগুলো সত্যি করে দাও।

চুংপো বুক ফুলিয়ে বললে, মহারাজ, আমার দ্বারা ওকাজ হবে না।

ঝন্ ঝন্ ন্ ন্···করে উঠলো রাজার আশে-পাশের তিরিশটা তলোয়ার।

তবুও রাজা ধৈর্য হারালেন না। তিনি বললেন, আচ্ছা, সোনার একটা সিংহাসন আঁকো তো?

ওটাও হবে না আমার দ্বারা মহারাজ, তেমনি নির্ভীক ভাবে বললে চুংপো।

আবার তিরিশটা অসি ঝনৎকার করে উঠলো। রাজা বললেন, সোনার ইট আঁকো, সোনার তালগাছ আঁকো, সোনার ফটক, সোনার হাতী—সোনার যা খুশি তোমার আঁকো। আমার কথামত কাজ করলে তোমায় আমি ছেড়ে দেবো। আর তা না হলে···

চুংপো তবুও অটল। একটুও কাঁপলো না সে। অত্যাচারী ঐ রাজার ওপর তার মন বিষিয়েছিল।

কিন্তু রাজা এবার ধৈর্য হারালেন। রাগে ফুলতে থাকেন তিনি। কোমরবন্ধনী ছিঁড়ে গেল, মুকুট কাঁপতে লাগলো মাথায়।

দাঁতে দাঁত পিষে তিনি গর্জন করে ওঠেন, শয়তানকে জেলে দাও, হত্যা করো, ওর তুলি কেড়ে নাও। কই, কে আছো?

পারিষদ জল্লাদ অনেকেই ছিল সেখানে। তারা নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়লো চুংপোর ওপরে। কেড়ে নিল তার হাত থেকে তুলিটা, তারপর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল। আরো অন্ধকার এক কয়েদে পুরে চাবি দিল।

তুলিটা হাতে নিয়ে রাজা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তুলিটা তো মন্দ নয়, হুঁ ভরি হবে সোনা আছে এর গায়ে। কই দেখি হে কাগজ আর রং আনো তো?

দিকে দিকে ছুটলো একশো জন লোক। বড় বড় পাকানো কাগজের তাড়া এসে পড়লো। নানান রং গুলতে বসে গেল অনেকে। সেই রং রাখা হলো একশোটা বাটিতে।

রাজা বললেন, সোনালি রং চাই সবচেয়ে বেশি। আমি যখন আঁকবো, সোনা দিয়ে ছাড়া আর কোনো রং আমি পছন্দ করি না।

একটা বড় গামলা ভর্তি করে রাখা হলো সোনালি রঙে। রাজা তুলি ধরলেন, গোটানো কাগজ টান করে ধরে রইলো সাত জন গোমস্তা। তিনজন জোয়ান পাখা চালাতে লাগলো রাজার মাথার ওপর।

রাজার কপাল ঘেমে উঠলো। গরমে না চিন্তায় কে বলবে?

কি আঁকবেন রাজা? এ বিদ্যা তো তাঁর জানা নেই। মনে মনে আপশোষ করেন আহা, এতদিন যদি শিখতুম একটু এই ছবি আঁকাটা! এখন আর উপায় নেই। রাজসভার সবাই অপেক্ষা করছে। কিছু একটা আঁকতেই হবে। মনে জোর আনেন। আপনার ওপর বিশ্বাস চাই, তিনি না রাজা। কি এমন শক্ত কাজ এটা? সবচেয়ে সহজ হবে যেটা একটা সোনার লাঠি আঁকা, তাই আঁকবো।

তাই আঁকলেন তিনি। কিন্তু সোজা রেখা টানা তো সহজ নয়, তুলি চললো আঁকাবাঁকা হয়ে ঢেউখেলানো কাগজের ওপর।

তারপর সেই ছবি জীবন্ত হলো বটে, কিন্তু সোনার লাঠি হলো না, হলো একটা মস্ত মোটা কুৎসিত সাপ। সেই কুৎসিত সাপের গায়ে ছবিতে যেমন রং পড়েছিল ঠিক তেমনি হলো। সোনালি ছোপও কিছু ছিল। কিন্তু তার ফোঁস-ফোঁসানিতে সবাই সন্ত্রস্ত। কে জানে কা'কে কখন ছোবল দেয়। তখন সবাই মিলে তাকে লাঠি শাবল বল্লম দিয়ে পিটতে লাগলো।

রাজা আপশোষ করেন, কেন একটু ছবি আঁকা শিখিনি, হায় হায়···!

তারপর রাজা আঁকলেন একটা আম। আমটা আঁকবার দোষে আঁকা-বাঁকা তো হলোই, তার কোনো বাহার রইলো না। যা-ই হোক, কাগজ থেকে সত্যিকার রূপ নিয়ে সেটা যখন দাঁড়ালো, তখন রাজার মনে পড়লো সোনালি রং দেওয়া হয়নি। তা যেন হলো কিন্তু সবচেয়ে যা ত্রুটি হয়েছে, তা হচ্ছে আমের গোড়াটা মজবুত করে আঁকা হয় নি। তারই ফলে টলটল করতে করতে আমটা দাঁড়াতে পারলো না। শব্দে তার পতন হলো এবং সেই সঙ্গে সব চেয়ে হিংস্র জেলখানার সেই রক্ষীটাও মরলো চাপা পড়ে।

মন্ত্রী বললে, রাজা মশাই, কাছের জিনিসের বিপদ অনেক, তার চেয়ে এমন কিছু আঁকুন যা দূরে থাকে।

তার মানে? রাজার বুঝতে দেরি হয়। মন্ত্রী বললে, এই যেমন অনেক দূরের পাহাড়, গাছ—

ঠিক বলছে। রাজা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পাহাড় তো হবেই, ওটা আঁকতে খুব পারবো। উঁচু-নিচু ঢেউ খেলিয়ে দিলেই হলো, আর খোঁচা-খোঁচা পাহাড়ের চূড়ো তা তো জলের মত সহজ। তারপর সেই পাহাড়দের হিমালয়ের দিকে ছেড়ে দিলেই হলো। তবে, তার মধ্যে একটা সোনার পাহাড় আঁকবো, সব চেয়ে বড় হবে সেটা।

এলো মস্ত বড় কাগজ, এলো বাটি-বাটি রং। রাজা বিপুল উদ্যমে ধরলেন যাদু-তুলি। তারপর আঁকা-বাঁকা রেখা টেনে চললেন হরদম। মন্ত্রী বললে, দু'-চারটে গাছ-গাছড়া দিলে মন্দ হয় না। তাও আঁকলেন রাজা কালির পোঁচ দিয়ে।

একজন পারিষদ বলে উঠলো, কতকগুলো মানুষ দিলে কেমন হয়?

মানুষ? রাজার তখন ঝোঁক চেপে গেছে। তিনি তেমনি কালির পোঁচড়া দিয়ে এঁকে ফেললেন অনেকগুলো মানুষ। যেগুলো আনাড়ি হাতের আঁকা, তাই না হলো মানুষ না হলো জন্তু। জীবন্ত হবার পর তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলো পাহাড়ের গায়ে গায়ে। অনেকে বলে, সেইগুলোই নাকি পরে ইয়েতি হয়েছে, যারা জন্তু নয়, মানুষও নয়।

যাই হোক, সোনার পাহাড়টা আঁকলেন সামনে। সেটাকে এতো উঁচু করলেন আর এতো নোংরা করলেন যে, জীবন্ত হতে সেটা সোনার ত হলোই না। শুধু পাথর আর পাথর। তার কোনো গড়ন নেই, বাহার নেই। তা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নড়বড়ে পাথর অনেকগুলো এলোমেলো সাজালে যা হয় তাই হলো। একটু পরেই হুড়মুড় করে পড়লো বিরাট আওয়াজ করে। আর একটু হলেই রাজা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরতেন। তা হলো না, কিন্তু রাজবাড়ীর আধখানা গেল গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে।

তিয়েলিং একটু থামতে লালী জিগ্যেস করে বললে, চুংপোর কি হলো?

রাজপুরীতে আর্তনাদ উঠতে তখন রাজার চৈতন্য হলো। তিনি বললেন, ঢের হয়েছে, এ সব আমার দ্বারা হবে না বুঝতে পাচ্ছি। এখখুনি নিয়ে এসো সেই ক্ষুদে শয়তানটাকে।

চুংপোর হাতে তার সর্বনেশে তুলিটা গুঁজে দিয়ে রাজা বললেন, ভাল চাস তো, এখখুনি একটা সোনার ড্রাগন এঁকে দে। নইলে তোর ঘাড়ের মুণ্ডু নামিয়ে দেওয়া হবে।

চুংপো বড় করে আঁকলো একটা ড্রাগন। সোনা-রং দিয়ে দেহটা ভরিয়ে দিলে। তারপর সেটা জীবন্ত করতেও তার দেরি লাগলো না।

বিরাট ড্রাগন, চকচক করছে তার সোনার মত গা। তার নিঃশ্বাসে আগুন ঝরতে লাগলো। ঝলসে গেল রাজপুরী। মস্ত বড় হাঁ দিয়ে এক গ্রাসে সে খেয়ে ফেললো রাজাকে। যে যেখানে ছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। অনেকে গেল ড্রাগনের পেটে, আর কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচলো।

তারপর? তারপর চুংপো তুলিটি জামার ভাঁজের মধ্যে নিয়ে বেরুলো। তার মনে পড়লো মিমির কথা—তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

রাত আর বেশি নেই। আজ এই পর্যন্ত থাক। এই কথা বলে তিয়েলিং সে রাত্রের মত চুপ করলেন। পূবদিক ফর্সা হচ্ছে তখন। [ক্রমশঃ।

ঋষি বিশ্বামিত্রের শিক্ষা

শ্রীপুলতা কর

খুব বেশী ক্ষমতা থাকলেও অহঙ্কার করা উচিত নয়। বল ও দর্পের অবশ্য পতন হবে, এই নিয়ে মহাভারতে একটি মজার গল্প আছে।

তোমরা বিশ্বামিত্র ঋষির নাম শুনেছ? অহঙ্কার ও দর্পের ফলে তাঁর কেমন পতন হয়েছিল, তাই নিয়ে এই গল্প।

বিশ্বামিত্র চিরকালই ঋষি ছিলেন না। প্রথমে তিনি ছিলেন কান্যকুব্জ দেশের রাজা। ধন, ঐশ্বর্য্য, সৈন্যবল কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। রূপ-গুণের তাঁর তুলনা ছিল না। কিন্তু অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর একটি বিশেষ দোষ ছিল।

ক্ষমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তিনি সব লোককে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। বিনয়, ধৈর্য্য এসব গুণ তাঁর চরিত্রে একেবারে ছিল না। তাঁর আদেশ মেনে সব লোক চলবে এই ছিল তাঁর ধারণা। কেউ যদি তাঁর আদেশ অমান্য করত ত তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন।

রাজা বিশ্বামিত্র খুব শিকার করতে ভালবাসতেন। একদিন তিনি সৈন্য-সামন্ত দলবল নিয়ে ঘোর বনে শিকার করতে গেলেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বন তোলপাড় করে অসংখ্য বাঘ, ভালুক হাতি, হরিণ মারতে মারতে রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্য-সামন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁরা রাজধানীতে ফিরে যাবার জোগাড় করতে লাগলেন।

এমন সময় বিশ্বামিত্রের সেনাপতি সভয়ে বললেন—মহারাজ, আমরা রাজধানীতে ফিরে যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি। ঘোর বনে এসে পড়েছি, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন কি করব পরামর্শ দিন।

রাজা বিশ্বামিত্র বললেন—আমরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ক্ষিদেয়, তেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠেছি। খুঁজে দেখ, যদি কোন ঋষির আশ্রম পাও ত সেখানে চল। ঋষিরা সব সময় অতিথি সৎকার করেন। তারপর রাজধানীতে ফেরবার পথ খুঁজো।

রাজার কথা শুনে সেনাপতি দলবল নিয়ে বনের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ খুঁজতেই বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম পেয়ে গেলেন।

তখন রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেকালে ঋষির আশ্রমে অতিথিদের সম্মান দেবতার সম্মানের তুল্য ছিল।

বশিষ্ঠ ঋষি এই সব মাননীয় অতিথিদের দেখে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর শিষ্যেরা সবায়ের পা ধোবার জল, বসবার আসন এনে দিলেন।

রাজা বিশ্বামিত্র পথ হারিয়ে ফেলেছেন শুনে, বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—মহারাজ, রাত গভীর হয়েছে। এখন এই বনের মধ্য থেকে পথ খুঁজে বার করা কঠিন। আজ রাতের মত আমাদের আশ্রমে থেকে যান। কাল সকালে আমার শিষ্যেরা রাজধানীর পথ চিনিয়ে দেবে।

বিশ্বামিত্র ভাবলেন—এই ঋষির আশ্রমে যে খাবার খাব আর যে বিছানায় শোব তাতে আমাদের খুবই কষ্ট হবে। রাজকীয় ঐশ্বর্য্যে আমরা অভ্যস্ত, সে সব আর এই গরীব ঋষি কোথায় পাবে!

কিন্তু কি আর করা যায়? উপায় যখন নেই তখন রাজী হতেই হবে। এই ভেবে বিশ্বামিত্র বললেন—তাই হবে বশিষ্ঠ ঋষি! আপনার আতিথ্য স্বীকার করলাম। আজ রাত এখানেই কাটাব। বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখের ভাব দেখে মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনাদের সেবার কোন ত্রুটী হবে না।

এখন বশিষ্ঠ ঋষি পাতার কুঁড়ে ঘরে থেকে কয়েকটি শিষ্য নিয়ে পূজা-অর্চনা করে আর ছাত্রদের পড়িয়ে অতি সাধারণ ভাবে দিন কাটাতেন বটে কিন্তু তাঁর আশ্রমে একটি মহা মূল্যবান জিনিষ ছিল। এই জিনিষটি হল একটি স্বর্গের গরু, তুষারের মত সাদা তার গায়ের রং, কুচকুচে কালো দুটি ডাগর চোখ, কোমল তার দেহের গড়ন। বশিষ্ঠ ঋষি এই কামধেনুকে দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। একে তিনি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করতেন। আদর করে নাম দিয়েছিলেন নন্দিনী। নন্দিনীর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, বশিষ্ঠ ঋষি তার কাছে যখন যা চাইতেন তখন তাই পেতেন। স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে এমন কোন জিনিষ ছিল না, যা নন্দিনী দিতে পারত না। বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে এসে নন্দিনীকে ডাকলেন। নন্দিনী ছুটতে ছুটতে কাছে এল। বশিষ্ঠ তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—নন্দিনি, মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁর দলবল নিয়ে আমার অতিথি হয়েছেন। তুমি তাঁদের সেবার আয়োজন এখনি করে দাও।

নন্দিনী ঠিক মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত। নন্দিনী বলল—বাবা, কিছু ভাববেন না। আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে সে তিন বার হাম্বারব করে চীৎকার করে উঠল। অমনি এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। প্রথম হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার খাবার উপযুক্ত হাজার হাজার সোনার পাত্রে ভরা রাজভোগ, মিষ্টান্ন, ফল বার হয়ে এল।

দ্বিতীয় হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার শোবার উপযুক্ত হাজার হাজার দামী মখমলের বিছানা বার হয়ে এল। তৃতীয় হাম্বারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে হাজার হাজার দাস-দাসী রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর দলবলের সেবা করবার জন্ত বেরিয়ে এল।

তখন বশিষ্ঠ ঋষি রাজা বিশ্বামিত্রকে ও তাঁর সৈন্য-সামন্তদের সেই সব রাজভোগ খাবার জন্ত ও তারপর মখমলের বিছানায় শুয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্ত অনুরোধ করলেন।

এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে গেলেন।

শ্রান্ত-ক্লান্ত তাঁরা পরম আনন্দে সেই রাজভোগ খেলেন। সেই ফুলের মত নরম বিছানায় শুয়ে অগাধে ঘুমিয়ে শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করলেন।

পরদিন ভোর হল। রাজা বিশ্বামিত্র ঘুম ভেঙ্গে উঠেই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সাজ-পোষাক পরে আশ্রম ছেড়ে রাজধানীর দিকে চললেন। বশিষ্ঠের শিষ্যেরা পথ দেখিয়ে দেবার জন্ত সঙ্গে চললেন।

যাবার সময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষিকে বললেন—হে ঋষি, কাল আপনি যে ভাবে অতিথি সৎকার করেছেন, যে অমৃতের মত খাবার খাইয়েছেন, যে সুন্দর নরম বিছানায় শুইয়েছেন, তার জন্ত কি বলে যে ধন্তবাদ দেব জানি না। এখন যাবার সময় আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আপনার ওই কামধেনু নন্দিনীকে আমাকে দান করুন। কাল রাতে ওর অদ্ভুত সব ক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ওর বদলে আপনি যত টাকা চান দেব, আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি।

বিশ্বামিত্রের অনুরোধ শুনে বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—মহারাজ, অতিথি দেবতার মত সম্মানের পাত্র। অতিথি যা চান তাঁকে তাই দেওয়া উচিত, কিন্তু তবুও আপনার এই অনুরোধ রাখতে পারলাম না। তার কারণ আপনাকে বলছি শুনুন। কামধেনু নন্দিনীকে আমি দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। প্রায়ই আমার আশ্রমে রাজা-মহারাজা এসে অতিথি হন। তাঁদের সেবা করবার জন্ত যে রাজভোগ আর যে সব বিলাসদ্রব্য দরকার হয়, সে সব আমি নন্দিনীর কাছ থেকে পাই। তাছাড়া আমাকে প্রায়ই বড় বড় যজ্ঞ করতে হয়, তাতে দেবতা, ঋষি, রাজা, মহারাজা ও সাধারণ লোক সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। সে সব জিনিষ নন্দিনী আমাকে দেয়। নন্দিনীকে দান করলে আমার অতিথি সৎকার করা ও যজ্ঞ করা দুই-ই বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং কেন আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না, সে কথা আপনি বুঝবেন এবং আমায় ক্ষমা করবেন। আর ধার্ম্মিক ঋষিরা কখনও টাকার লোভে ভোলে না, একথা আপনি জানেন। সুতরাং আপনার অর্দ্ধেক রাজত্বের লোভে আমি নন্দিনীকে দেব না, তা বুঝতেই পারছেন।

এই বলে বশিষ্ঠ ঋষি চুপ করলেন। বশিষ্ঠ ঋষির কথা শুনে রাজা বিশ্বামিত্র রাগে জলে উঠলেন। দেশ-বিদেশের রাজারা পর্য্যন্ত তাঁর আদেশ অমান্ত করতে সাহস পায় না। আর সামান্ত একজন গরীব ঋষি কি না তাঁকে অগ্রাহ্য করছে!

বিশ্বামিত্র কঠোর সুরে বললেন—ওই কামধেনু নন্দিনীকে দিতেই হবে। আমি শেষ বার অনুরোধ করছি। যদি ভাল বোঝেন ত দিয়ে দিন। নয়ত আমার সৈন্তেরা জোর করে এখনি ওকে ধরে নিয়ে যাবে। আপনি কি আর আমার সঙ্গে ক্ষমতায় পারবেন?

বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—আমি গরীব ঋষি, আমার কি আর

ক্ষমতা। তবে স্বেচ্ছায় নন্দিনীকে আমি দেব না। ইচ্ছা হয় ত জোর করে কেড়ে নিতে পারেন।

এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র আরও রেগে উঠলেন। এত বড় স্পর্দ্ধা গরীব ঋষির যে, সে তাঁর সৈন্যবল অস্ত্রবলকে ভয় পায় না।

চীৎকার করে বললেন—সেনাপতি, সৈন্যদের বল নন্দিনীকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যাক। ওর বাছুরকেও মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাক।

রাজার আদেশ শুনে সেনাপতি সেনাদের হুকুম দিলেন। সেনারা ছুটে এসে নন্দিনীকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে টানতে লাগল। লাঠির আঘাতে নন্দিনীর তুষারের মত সাদা শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু তবুও সে এক পা-ও নড়ল না।

কাতর স্বরে কাঁদতে কাঁদতে নন্দিনী বশিষ্ঠকে বলল—বিশ্বামিত্রের সৈন্যেরা এ ভাবে আমায় মারছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনি এদের কিছুই বলছেন না! তবে কি আপনি আমাকে স্নেহ করেন না? আমি কি আপনার মেয়ে নই?

এত দিন ধরে মানুষ করেও আপনার কি আমার উপর কোন স্নেহ নাই? আমি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে যাই, এই কি আপনি চান?

বশিষ্ঠ ঋষি নন্দিনীর অভিমান ভরা কথা শুনে বললেন—মা নন্দিনি, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করি, সে কথা তুমি ভাল ভাবেই জান। আমি তোমাকে আশ্রম থেকে যেতে দিতে চাই না। কিন্তু রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্য দিয়ে জোর করে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমি গরীব ঋষি, অস্ত্রবল, সৈন্যবল নেই। কেমন করে তোমায় রাখব, তাদের বাধা দেব? তাছাড়া ঋষিদের ধর্ম্মই হল ধৈর্য্য আর ক্ষমা। তেজ দেখালে তাদের অধর্ম্ম হয়।

বশিষ্ঠ ঋষির কথা শুনে নন্দিনী বলল—বাবা, আপনি তাহলে আমাকে যেতে দিতে চান না। বুঝলাম আপনি আমাকে স্নেহ করেন। এখন চেয়ে দেখুন কার সাধ্য আপনার নন্দিনীকে কেড়ে নেয়।

বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—নন্দিনি, ঐ দেখ তোমার বাছুরকে বিশ্বামিত্রের সৈন্যেরা দড়ি বেঁধে টানছে লাঠি দিয়ে মারছে। সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদছে। পার ত ওদের অত্যাচার থামাও। ওরা তোমার উপরেও যে রকম অত্যাচার করছে, যে ভাবে তোমাকে মারছে এ-ও দেখতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে বুঝছ?

বশিষ্ঠের কথা শেষ হতে না হতে এক অদ্ভুত ব্যাপার আরম্ভ হল, নন্দিনীর শরীর বাড়তে বাড়তে বিরাট পাহাড়ের মত হল, আর সেই শরীর থেকে প্রচণ্ড আগুনের হল্কা বেরোতে লাগল। তার দুই চোখ প্রকাণ্ড বড় হয়ে দুটো আগুনের গোলার মত হল। সেই চোখ থেকেও ঝলকে ঝলকে আগুন বেরোতে লাগল।

তারপর নন্দিনী ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। বাঘের ডাক সে ডাকের কাছে হার মেনে যায়। সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সেজে লক্ষ লক্ষ তেজস্বী সেনা নন্দিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারা বাইরে এসেই বিশ্বামিত্রের সেনাদের ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্রের সেনারা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তবুও একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

কিন্তু কি সাংঘাতিক বিক্রম নন্দিনীর সেনাদের! খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিশ্বামিত্রের সব সেনাদের হারিয়ে দিল। এমন ভীষণ ভাবে বিশ্বমিত্রের সেনারা মার খেল যে তারা নন্দিনীকে আর তার বাছুরকে ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। রাজা বিশ্বামিত্রও ছুটে পালাতে লাগলেন। পিছনে পিছনে নন্দিনীর সেনারা তাড়া করে চলল। খানিকটা ছোটবার পর বিশ্বামিত্র ও তাঁর সেনারা সভয়ে চেয়ে দেখল যে, নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে ঘিরে ফেলেছে আর পালাবার উপায় নেই। এখনি বুঝি প্রাণে মেরে ফেলে। বিপদে পড়ে রাজা বিশ্বামিত্র বুঝলেন রাজা হয়ে অহঙ্কার করার ফল, বল ও দর্প দেখানর ফল কি রকম বিষময় হতে পারে। যে বশিষ্ঠ ঋষি আশ্রয় দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন, ক্ষমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁর শত্রুতা করার ফল কেমন সাংঘাতিক হল।

কিন্তু এখন আর ভেবে কি ফল! নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে বন্দী করেছে। প্রাণে মারবার জন্য তীর-ধনুক উঁচু করে ধরেছে। আর এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা সবাই মারা যাবেন।

প্রাণের ভয়ে রাজা বিশ্বমিত্র আর তাঁর সেনারা থর থর করে কাঁপতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন।

রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রাণ ভয়ে কাঁদতে দেখে দয়ালু ঋষি বশিষ্ঠ বললেন—মা নন্দিনি, তোমার সেনাদের বারণ করে দাও, তারা যেন এঁদের প্রাণে না মারে। আমি ঋষি, ক্ষমাই আমার ধর্ম্ম।

নন্দিনী সেনাদের বলল—সৈন্যরা এই রাজাকে আর তাঁর সেনাদের প্রাণে মেরো না। কিন্তু প্রাণে না মেরেও এমন ভাবে মার যাতে এদের শিক্ষা হয় যে ঋষির আশ্রমে এসে অহঙ্কার ও দর্প দেখান চলে না।

নন্দিনীর কথা শুনে সৈন্যেরা ভীষণ ভাবে বিশ্বমিত্র ও তাঁর শিষ্যদের মারতে লাগল। তখন বিশ্বামিত্র ও সৈন্যেরা কাঁদতে কাঁদতে বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা চাইলেন, প্রাণ-ভিক্ষা চাইলেন।

দয়ালু ঋষি বললেন—নন্দিনী তোমার সৈন্যদের চলে যেতে বল।

নন্দিনী তখন আগের মত আবার ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সব সৈন্য তার মুখের মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেল। নন্দিনীর প্রকাণ্ড আগুন-জ্বলা শরীরও শান্ত হয়ে গেল। সে আগের মত সুন্দর স্বর্গের গরুর রূপ ধরল।

বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহারাজ, আপনি সৈন্যদের নিয়ে রাজ্যে ফিরে যান। আমার থেকে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। আপনি শরণাগত, তা ছাড়া অতিথি। শুধু অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বল ও দর্প দেখাতে চেয়েছিলেন বলেই এই কষ্ট সইতে হল।

আমি আপনাকে একটিমাত্র উপদেশ দিচ্ছি। যতই বড় রাজা হোন, অহঙ্কার, বল ও দর্পের বশ হবেন না। অহঙ্কারীর যে পতন হয়, তা ত দেখতেই পেলেন।

বশিষ্ঠের কথা শুনে লজ্জায় অনুশোচনায় বিশ্বামিত্রের মন ভরে উঠল। বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করে তিনি বললেন—ঋষি, আজ থেকে আমি রাজ্য ত্যাগ করলাম। বনে গিয়ে হাজার বছর তপস্যা

করে ঋষি হব। আপনার কাছে এসে বুঝলাম, ঋষির ক্ষমতার কাছে রাজার সৈন্যবল, ধনবল, তেজ, গর্ব্ব, কত মিথ্যা।

তার পর বিশ্বামিত্র সেনাপতিকে বললেন—সেনাপতি, সৈন্যদের নিয়ে দেশে চলে যাও। প্রজাদের বল, রাজা বিশ্বামিত্র রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এই বলে বিশ্বামিত্র রাজবেশ ছেড়ে সন্ন্যাসীর পোষাক পরলেন। এমনি ভাবে এক দিন বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে রাজা বিশ্বামিত্রের অহঙ্কার ও গর্ব্বের পতন হয়, আর তিনি রাজ্য ছেড়ে ঋষি হন।

ফাউ

শ্রীবিনয় চক্রবর্ত্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: বোকা হবি কেন, বাজারে গিয়ে জিনিষটা কিনে ফাউটা শুদ্ধ চেয়ে নিয়ে আসবি।

পৃথিবীতে এই ফাউ পাওয়া যায় অনেক কিছুরই। ফাউ কথা বলারও স্বভাব আছে অনেকের। কাজেই ফাউ নিয়ে এক কলম লিখলে নিশ্চয়ই আপনারা ক্ষেপে ফেলবেন না আমাকে। তবে ফাউ নিয়ে লেখাটা ফেলনা নয়।

শোনা যায়, এক পয়সা সের হিসেবে চার সের বেগুন কিনে এক ভদ্রলোক এক সের বেগুন ফাউ পেয়েছিলেন। তাই শুধু ফাউ নিয়েই ফিরতে চেয়েছিলেন। তার সে ইচ্ছে সফল হয়েছিল কি না সেটা আমার জানা নেই। তবে এ থেকে মালুম করুন, ফাউয়ের জন্য মানুষের ফালতু দরদ কত! বাড়তির জন্য বাড়াবাড়ি কেমনতর!

কবিগুরুর সাহিত্যে অমর কাবুলিওয়ালাদের চড়া সুদে টাকা খাটানোতে জুড়ি কম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তাদের আসল চাইতে কুসীদ বা সুদের তাগাদা কত অম্লমধুর। পাওনা ছেড়ে ফাউয়ের জন্য তাদের ক্ষেপর দালালির তুলনা মেলা ভার!

হরেক রকম ফাউয়ের কথা আমরা অনেকেই জানি। নতুন জামাইদের কাছে ফাউ হল শ্যালিকার ঝাঁক। ঠাকুর্দা, দিদিমাদের কাছে আদরের ফাউস্বরূপ নাতি-নাতনী। বরের মায়ের কাছে ফাউ যৌতুক। আগে যেমন রাজপুত্রেরা রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করে ফাউ পেতেন অর্দ্ধেক রাজত্ব। বর্ত্তমান কালে হোমরা-চোমরারা সরকারী ফাউ পান পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী। পুলিশ, মিলিটারীরা অশোকচক্র এবং সাহিত্যরথীরা আকাদেমী আওয়ার্ড বা নিদেনপক্ষে একবার রবীন্দ্র-পুরস্কার।

কিছুকাল আগেও হবুবরের যোগ্যতার পরিমাপ ছিল শুধু চাকুরীর মাইনেয় নয়, তার উপরির বহরেও বটে। প্রাচীনেরা তাই বাবাজীদের কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে জিগ্যেস করতেন: বাবাজীর চাকুরীতে উপরি আছে ত? রেল, আদালত এবং পুলিশ বিভাগের চাকুরিয়াদের তাই দাম ছিল বহু, মান বহুতর। আজ অবশ্য তেমন ভাবে কারও উপরির খবর নেওয়া শিষ্টাচার হয় না। তবে এ কথা ঠিক, পরোক্ষভাবে ফাউ কিছু পেলে আমাদের অনেকেরই গোসা কাটে এবং অপর পক্ষের হয় কাম ফতে।

ফাউ বা বাড়তি পাওয়ার জন্য আমাদের উৎসাহের নেই অন্ত, আকাঙ্ক্ষার নেই অবধি। তাই প্রতি বছরের সুরুতে সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারের জন্য কাড়াকাড়ি কম নয়। চাকুরীর সমাপ্তিতে ফাউ পেন্সন দীর্ঘায়ু বৃদ্ধদের কাছে নয় কম উপভোগ্য। যেমন রেলওয়ের চাকুরিয়াদের কাছে ফ্রি রেলপাশ বা বেসরকারী কল-কারখানায় বাৎসরিক বোনাস কর্মীদের কাছে নয় কম আকর্ষণীয়। তাই আমাদের মনে ফাউয়ের প্রতি মমত্ব অসীম, মায়া অনন্ত। ফাউ পেতে তাই আমরা ফাঁক খুঁজি। অতিরিক্তের জন্য হই অতি আয়াসী।

অধুনা বিজ্ঞাপন হিসেবে কখনও কখনও ফাউ জিনিস পান ক্রেতারা। সাবান বা গন্ধতেল দু'-এক বোতল কিনলে কখনও মেলে নয়নাভিরাম সাবানদানী বা মনোলোভা চিরুণী। 'এরোপ্লেনে চাপলে যাত্রীরা পান ব্রেকফাষ্ট, ডিনার এবং রঙ্গীন এয়ার ব্যাগ। বাটার জুতোর দোকানে পূজোর সময় শিশুরা পায় বেলুন বা চকলেট। পাঁজিতে এবং দৈনিক পত্রে উপহারস্বরূপ পাওয়া যায় এমন বিজ্ঞাপন বিরল নয়। দৈনিক খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাই থাকে হরেক সাপ্লিমেণ্ট। মাসিক পত্রিকার ষাণ্মাসিক এবং বার্ষিক গ্রাহকেরা কখনও তাই পান ফ্রি ডাকমাশুল। এতে ব্যবসার চলন বাড়ে, বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর আকর্ষণ হয় দুর্নিবার।

ফাউ পেতে এবং দিতে মজা অনেক। তবে ফাউ কথারও আনন্দ কম নয়। আসর জমানর জন্য কথার মালা গাঁথতে হলে অনেক অনেক ফাউ কথা চাই। তবে ফাউ কথা এবং বাজে কথার ফারাক অনেক। ফাউ কথা সময়-বিশেষে বিরক্তি আনে কিন্তু বাজে কথা বক্তার প্রতি শ্রদ্ধা কমায়। ফাউ কথা তাই কখনও ভাল লাগতে পারে কিন্তু বাজে কথা কখনও নয়। সুরসিক লোকের ফাউ কথাও তাই পারে ফুল ফোটাতে। পারে বা হৃদয় ভরাতে।

অনেক আগে রাজা, মহারাজা, বাদশা, শাহজাদা ফাউ কথা শুনবার জন্য করতেন গুণী ব্যক্তির নিয়োগ। তাদের আদর করে তাঁরা বলতেন বয়স্য বা সভাসদ এবং চলতি কথায় তাঁরা ছিলেন ভাঁড়। মজার মজার ফাউ কথা বলে তাঁরা তাঁদের মনোরঞ্জন করতেন। দিতেন গৌড়জনে আনন্দরস। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মোগলসম্রাট আকবরের সভায় বীরবল এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের নাম আসে মনে। সে যুগে ভাঁড়ামি বা ফাউ কথার মাধ্যমে তাঁরা নির্ভেজাল স্থূল আনন্দের জন্য হাস্যরস পরিবেশন করতেন, তার প্রমাণ আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

বর্ত্তমান যুগ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা নিক্তি মেপে মেপে কথা বলতে ভালবাসি। বর্ত্তমান সভ্যতার শিক্ষা হচ্ছে সংযম এবং বিবিক্ততা। তাই আমাদের বর্ত্তমানে কথার ফুলঝুরিতে যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির গভীরতার মূল্য অনেক। ফাউ কথার স্থান একদম নেই বললেই চলে। আবার ফাউ বলার ফ্যাসাদও পদে পদে নয় কম। অতএব আর যা কিছু ফাউ আসুক ক্ষতি নেই কিন্তু ফাউ কথা বলে ফক্কিকারি করা আমাদের উচিত নয়।

নাইটিংগেল

চীনদেশের রাজার রাজবাড়ী পৃথিবীর নামকরা জায়গা ছিল রাজার বাগানে ছিল হরেক রকমের ফুল। ফুলগাছের চারিদিকে রূপোর ঘণ্টা বাঁধা থাকত পথচারীকে সাবধান করার জন্য। বাগানের সীমা যে কোথায় শেষ হয়েছে, তা কেউ ধারণা করতে পারত না। বাগানের শেষ প্রান্তে ছিল অনেক বড় বড় গাছ, তাদের শাখা-প্রশাখা সমুদ্রের উপর পড়েছিল। গাছগুলির পাশেই ছিল

গভীর নীল সমুদ্র। সেই গাছগুলির শাখাতে একটি নাইটিংগেল পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। তার সুমিষ্ট স্বরের ধ্বনি শুনে সকলেই মুগ্ধ হত।

যাত্রীরা বিভিন্ন দেশ হতে রাজার মহানগর দেখতে আসত। মহানগর রাজবাড়ী, বাগান দেখে আনন্দ পেত। বিশেষ করে তাদের মধ্যে কেউ যদি নাইটিংগেল পাখির গান শুনতে পেত, তবে তার আনন্দের সীমা থাকত না। দেশে ফিরে গিয়ে রাজার রাজ্যের কথা সকলকে বলত। কেউ আবার রাজবাড়ী সম্বন্ধে বই লিখত।

পৃথিবীর লোক বইগুলি পড়ে রাজবাড়ীর কথা জানতে পারল। একদিন একটি বই চীনদেশের রাজার হাতে পৌঁছাল। রাজা বার বার পড়েন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে মাথা নাড়েন। কিন্তু বইয়ের শেষভাগে এমন কিছু পড়লেন, যা তাকে অবাক করে দিল। কথাগুলি ছিল এই, নাইটিংগেল পাখি সবচেয়ে ভাল।

প্রধান মন্ত্রীর ডাক পড়ল। মন্ত্রীর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত! তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই, সে উত্তর দিত, ফুঃ! তাকে দেখে রাজা বলতে আরম্ভ করলেন, নাইটিংগেল নামে এক ছোট পাখি আমার রাজ্যে আছে। তার গান আমার রাজ্যের সম্পদ। এর আগে কেউ তার সম্বন্ধে আমাকে জানায়নি কেন? আমি চাই তাকে রাজসভায় নিয়ে এস এবং আজ সন্ধ্যায় পাখি আমার সামনে গান করবে। সমস্ত পৃথিবী যে বিষয় জানে, আমি সে বিষয়ে অজ্ঞ।

মন্ত্রী উত্তর দিল, আমি তাকে খুঁজে বা'র করব।

কোথায় তাকে পাওয়া গিয়েছিল? প্রধান মন্ত্রী বড় বড় ঘরের মধ্যে দিয়ে, রাস্তার মধ্যে দিয়ে দৌড়তে লাগল। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল, তারা পাখি সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারলো না। বাধ্য হয়ে রাজার কাছে ফিরে গেল এবং রাজাকে বলল, লেখক নিশ্চয় বাজে কথা বইএ লিখেছে। আপনি এই বাজে কথা বিশ্বাস করবেন না।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, যে বই আমি পড়েছি, সেই বই জাপানের রাজা পাঠিয়েছেন। সেইজন্য এই কথা কখনও মিথ্যা হতে পারেনা। আমি পাখির গান শুনতে চাই। আজ সন্ধ্যায় পাখি নিয়ে রাজসভায় হাজির হবে। আমার ইচ্ছা যদি পূর্ণ না হয়, তবে রাজসভার সভ্যদের শাস্তি দেওয়া হবে।

ভয়ে প্রধান মন্ত্রী উপরতলা, নীচতলা, রাস্তার মধ্যে দিয়ে দৌড়াতে লাগল। রাজসভার সভ্যরা মন্ত্রীর সঙ্গী হল। অবশেষে রান্নাঘরের একটি ছোটমেয়ের সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটি বলল, ও! নাইটিংগেল! তাকে ভাল ভাবে জানি। কি সুন্দর গান গাইতে পারে। প্রত্যেক দিন খাবার টেবিলে যা গুঁড়াগাড়া অবশিষ্ট থাকে, আমার মার জন্য নিয়ে যাই। আমার মা সমুদ্রের ধারে থাকে। ফিরে আসবার সময় সমুদ্রের ধারে গাছগুলির নীচে বিশ্রাম করি। সেই সময় পাখির মিষ্টি গান শুনি। তার গান এত সুন্দর যে আমার চোখে জল আসে।

মন্ত্রী মেয়েটিকে মিনতি করে বলল, রান্নাঘরের ছোট মেয়ে আমি তোমাকে রান্নাঘরে বড় কাজ দেবো। পাখির কাছে আমাদের নিয়ে চল। পথে যেতে যেতে গরুর ডাক, ব্যাঙের ডাক শুনতে পেলো। কিছু পরে সেই ছোট্ট নাইটিংগেল পাখির গান বাতাসে ভেসে এল।

ছোট মেয়েটি বলল, ঐ দেখুন। গাছের উপরে তাকান। ঐ ছোট্ট পাখিকে দেখুন। মন দিয়ে গান শুনুন।

রান্নাঘরের ছোটমেয়েটি পাখিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাদের মহামান্য রাজা তোমার গান শুনতে চেয়েছেন।

পাখি উত্তর দিল, আনন্দের সঙ্গে রাজাকে গান শোনাব।

রাজসভায় পাখিকে নিয়ে যাওয়া হল। রাজসভার মধ্য জায়গায় একটি দাঁড় বসান ছিল, সেখানে পাখিকে বসতে দেওয়া হল রাজসভার সভ্যরা এবং সেই ছোট মেয়েটি উপস্থিত ছিল। প্রত্যেকে সুন্দর কাপড় পরে এসেছিল। প্রত্যেকে সেই ছোট পাখিকে লক্ষ্য করেছিল। কিছু পরে রাজা পাখিকে গান আরম্ভ করবার জন্য মাথা নাড়ালেন। এত মিষ্টি করে গান গাইল যে রাজার গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকের রসিকবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কারণ তার স্বরের ধ্বনি প্রত্যেককে মুগ্ধ করেছিল। রাজা পুরস্কার দিতে চাইলেন কিন্তু পাখি নিতে রাজী হোল না। পাখি বলেছিল, রাজার চোখে জল দেখেছি। রাজার চোখের জলের বিশেষ দাম আছে কারণ রাজার মনের ভাবের রূপ দিয়েছি। সেইজন্য এই পুরস্কার আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

অনুবাদক—বকুল ঘোষ।

বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

এনাক্ষী আজ কড়া ধমক খেয়েছে বাপের কাছে। মায়ের উপর রাগে সমস্ত শরীর তার জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা যতক্ষণ আছেন বাড়ীতে, মুখটি বুজে থাকতে হবে নয়ত একটু ট্যাঁ ফুঁ করলে বাবার যে মূর্ত্তি দেখতে হবে, সে চিন্তা ক'রতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হোল তার। বাবার রাগের সময় মুখ বুজে চড়-চাপড়, ধমক-ধামক হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ, এ তারা সব ভাইবোনেই বুঝেছে। মুখ দিয়ে কথা বার হয়েছে কি বীরেন বাবুর চড়টাও বড় হ'য়ে পড়েছে পিঠে, কিংবা চোখের দিকে তাকিয়ে কেঁদেই ফেলেছে তারা। এমন দিনটি অবশ্য এনাক্ষীর কল্পনায় অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সেই ইংরাজী আর অঙ্ক পরীক্ষার পর থেকে। মনে মনে অস্থির হ'য়ে উঠেছে সে। বাবা অফিসে বেরিয়ে যাক না, তারপর মাকে একচোট নেবে সে। সব কথা বাবার কাছে পুট্-পুট্ ক'রে নালিশ করা বের করাচ্ছে এনাক্ষী।

বাবার গলার সাড়া পেয়ে মাথা নীচু ক'রে বইয়ের পাতায় চোখ নামাল। এনা, মীনা, দ্বিতীয়বার আর ডাকার প্রয়োজন হয় না। ছেলে-মেয়েরা যে যেখানে থাকে বাবার একডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে আসে কাছে। এনাক্ষীও ফ্রকের কোণা মুখে পুরে এক কোণে এসে দাঁড়াল। বড় হয়েছে কিন্তু সহবৎ শেখেনি এখনও। সব সময় জামার ঝুল মুখে পুরে কামড়াবে। বকাবকিতেও শোধরাতে পারা গেল না। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মা আর একটা বিস্ফোরণের আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু না, সামলে নিয়েছে। হঠাৎ বাপের চোখে চোখ পড়তেই মনে প'ড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জামার ঝুলটা ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে ঝুলটা টান করতে লেগে গেল। ভারীমুখে বীরেন বাবু মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন—তোর বুকলিষ্টটা দে। অফিস ফেরত বই কিনে আনব। আর এনা—

বেচারী এনার ততক্ষণে প্রাণ উড়ে গেছে। আধ ঘণ্টাও হয়নি একচোট বকুনি খেয়েছে। বাবার ডাকে মুখটা নীচু ক'রে আঙ্গুলে ফ্রকের ঝুল জড়াতে লাগল।—তাকা আমার দিকে—বাপের আদেশে তাকাতে গিয়ে ভ্যাঁ ক'রে কেঁদেই ফেলল সে।

হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে চোখ দুটো লাল ক'রে ফেলল।—পরীক্ষায় ফেল করবি আবার কিছু বলতে গেলেও উল্টে কান্না। কেন, আগে মনে থাকে না? মেয়ের জল-টসটসে দুটো লাল চোখের দিকে তাকিয়ে তখন আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন বীরেন বাবু। আর সাথে সাথেই রান্নাঘরের বারান্দা থেকে মা এনাক্ষীকে আদর-মাখান মুখে ডাকলেন এনা, শোন। আয় আমার কাছে আয়। মায়ের ডাক কানে যেতেই এনাক্ষীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। রাগে চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে তার।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই সেই কান্নাভেজা কোমল, দুঃখী-দুঃখী চেহারাটা কিছুতেই আর চেষ্টা ক'রেও মনে আনতে পারছে না দোতলার সুহাস। রেলিং ঝুঁকে নীচের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অভ্যাসটা ভাল নয় তবু নিজেকে শোধরাতে পারে না। নীচের তলায় যখনই কোন কারণে চেঁচামেচি গণ্ডগোল কানে যায়, মেয়েদের মত অমনিই রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে সুহাস। এজন্যে বাড়ীর লোকের কাছে ধমক খায়, নীচের তলারও কারো চোখ পড়ে গেলে কথা শোনাতে ছাড়ে না। আর কেউ নয়, মীনা কিংবা মীনার মায়ের নজরে পড়লে তারা নিজেরা কিছু বলতে আসে না। আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বলে, কি যে সে এত উঁচু থেকে সুহাস শুনতে পায় না, তবে খুবই যে বিরক্ত হয়েছে সে তাদের অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে অবশ্য সরেই যায়।

কিন্তু একটু পরেই হয়ত কানে আসে, কি হয়েছে মা কিংবা কি রে দিদি, কে অসভ্যের মত তাকিয়ে আছে? তার পরেই নীচে থেকে চীৎকার ভেসে আসে এনার—মাসিমা ও মাসিমা। সুহাসের মা আগে আগে বুঝতে না পেরে সাড়া দিতেন। বলতেন, কি রে ডাকছিস কেন?

ঝগড়ার সুরে এনা বলত—ডাকছিস কেন কি! ছেলেকে শাসন করতে পারেন না? পরের বাড়ীর দিকে অসভ্যের মত তাকিয়ে থাকে?

আজ-কাল আর সুহাসের মা সাড়া দেন না। বরং এনার গলা পেলেই ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে সুহাসকে ধমকের সুরে ডাকতে থাকেন।

তিনি যে এ বিষয়ে সুহাসকে শাসন করছেন সেটাই বোঝাবার জন্য। ঝগড়াটা তাই আর গড়ায় না। কিন্তু সুহাস কিছুতেই নিজেকে শাসনে রাখতে পারে না। তেমন কিছু কানে গেলে বই উল্টে রেখে ঠিক রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তবে আগের সেই অগাধ কৌতূহলও আর নেই। আজ-কাল তেমন আর মজা ও পায় না। দুদিন পর এ-ও হয়ত থাকবে না। আজ কিন্তু সকাল বেলায়ই বীরেন বাবুর রাগারাগি কানে গেছে। কা'কে যেন খুব ধমকানি দিচ্ছেন। কা'কে বকছেন কে জানে? ও সব একঘেয়ে হয়ে গেছে। ভদ্রলোক নিজের ছেলেমেয়েদের ধমক-ধামক দিয়ে কি যে আনন্দ পান, বইটা তুলে পড়ায় মন বসাতে চেষ্টা করল। ছোট বোন শুক্লা কি কাজে ঘরে ঢুকে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল—জান দাদা, এনাক্ষী না ফেল করেছে? ওর বাবা ওকে কি বকছে। মেরেছেও।

তখন তখনই আশ্চর্য্য, সুহাস বই ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে নীচের শূন্য উঠোনটার দিকে শূন্য চোখেই তাকিয়ে রইল সে। এখন আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, চোখেও দেখা যাচ্ছে না কাউকে। সবাই বোধ হয় ঘরে। এনাক্ষীও। এ মেয়েটি সম্বন্ধে তার অহেতুক একটা কৌতূহল কেন যে মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে। আজ মাস আষ্টেক হোল তারা এসেছে, এই ক' মাসে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সব সময়ই চোখে পড়ছে মেয়েটিকে। একটি কিশোরী মেয়ে। কাপড় পরলেই যেন মানায়, তবু ফ্রক ছাড়বে না। ঝগড়া করছে যখন, মনে হয় দুনিয়াতে ঝগড়া ছাড়া কিছু জানে না। বাড়ীতে কাক চিল বসতে পায় না। আবার যখন বাপের ধমক খেয়ে কাঁদে, উপর থেকে এমন অসহায় মনে হয়, কষ্টই হয় সুহাসের সে সময়। ছোট ভাইকে যখন পিটছে হিংস্রতায় যেন জানোয়ারকে ও ছাড়িয়ে যায়, মাকে ভেংচি কাটছে, দিদির চুল টেনে পালাচ্ছে, সব সময়ই একটা চরম কিছু করা চাই-ই। প্রথম প্রথম মেয়েটার কাণ্ড কারখানা একটা ছেলেমানুষী দুষ্টামী মনে করে সুহাসের বেশ ভাল লাগত। ক্রমশঃ কিন্তু মনে হচ্ছে আসলে মেয়েটা ভয়ানক হিংসুটে, ঝগড়াটে, বদরাগী, জেদী। সুহাসের মনে একটু সন্দেহ ছিল বোধ করি লেখাপড়ায় চৌখস। বোঝা গেল তাও নয়। সর্ব্বদিক দিয়েই একটা ব্যতিক্রম। তবু এ মেয়েটি সম্বন্ধে সুহাসের অসীম কৌতূহল। চৌদ্দ-পনের বছরের একটা উঠতি বয়সের মেয়ের এ সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখতে সুহাসের ভাল লাগে। আর তাই সে রেলিং ঝুঁকে তাকিয়ে থাকে নীচে।

* * * *

মলিনা দেবী কাছে এসে এনাক্ষীর হাত ধরে টানতে লাগলেন। সান্ত্বনার স্বরে বললেন—পরীক্ষায় ফল খারাপ হোলে গুরুজনরা ও-রকম একটু বকেই। তাই ব'লে তুই মুন্নির মত কাঁদছিস? এত বড় দিদি হ'য়ে? ঐ দেখ মুন্নি কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তোর দিকে।

মার হাত থেকে ঝটকা মেরে হাত টেনে নিল এনাক্ষী। নাকি সুরে বলল—যাও যাও। তুমিই ত যত নষ্টের মূল। সব কথা বাবার কাছে নালিশ করা চাই। তোমাকে আমি বারণ করে দিয়েছিলুম না? বলতে বলতেই আবার দু'চোখ জলে ভরে এলো। মলিনা দেবী পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—বোকা মেয়ে! পরীক্ষার ফল বাপ-মায়ের কাছে লুকোতে আছে না কি? এবার মনোযোগ দিয়ে পড়, সামনে বার সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠবি।

মায়ের এ সব ছেঁদো কথা শোনার মত ধৈর্য্য কিংবা মন কোনটাই ছিল না এনাক্ষীর। কান্নাবোজা গলায়ই তেড়ে উঠল সে—তখন একশবার বললুম একজন মাষ্টার রেখে দাও। ইংরেজী অঙ্ক

কিচ্ছু বুঝি না। তখন শুনলে না। ওদিকে ফেল করলে শাসনটি ঠিক আছে। উঠে চলে আসছিল কিন্তু ওপর দিকে চোখ পড়তেই চোখের জল বাষ্প হয়ে উবে গেছে।

মলিনা দেবী বললেন—দেখি এবার বলে-কয়ে একজন মাষ্টার রাখতে পারি কি না। কিন্তু এনাক্ষীর গলার স্বর শুনে ঘরে না ঢুকে আবার বারান্দায়ই বেরিয়ে এলেন।

এনাক্ষী চিৎকার করে বলছে—লজ্জা করে না পরের বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকতে! অসভ্য, বদমাস ছেলে। বলতে বলতে ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠতে লাগল।

মলিনা দেবী ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে এনাক্ষীকে বাধা দিতে সিঁড়িমুখী দৌড়ে গেলেন, কিন্তু মেয়েটার নাগাল পেলেন না। ছি, ছি, কি সব বলে আসবে কে জানে! লজ্জায় রাগে সরে যেতে ইচ্ছে হোল তাঁর। উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন মেয়েকে। একটুক্ষণ পরই এনাক্ষী গর-গর করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

সন্ত্রস্ত হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কি বলে এলি তুই উপরে? ছি ছি তোর জন্য কি কারো সাথে সদ্ভাব রাখার উপায় নেই? ফেল করেও তোর লজ্জা হয়নি আবার রাগ দেখাতে যাস সবার উপরে? মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে পড়ল এনাক্ষী। আর মলিনা দেবী নীচে থেকেই সুহাসের মাকে ডাকতে লাগলেন—দিদি, ও দিদি—

মায়ের গলা পেয়েই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো এনাক্ষী, তারপর টানতে টানতে মাকে ঘরের দিকে নিয়ে চলল। ঝগড়ার সুরে বলল—আবার দিদিকে কেন? বলবে বুঝি এনাক্ষী যা বলে এলো তার জন্য কিছু মনে করবেন না? যা বলে এসেছি ঠিকই বলেছি, তুমি আবার কোন লজ্জায় ওদের সাথে কথা বলতে যাও?

মলিনা দেবীর আর সহ্য হোল না। ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন মেয়ের গালে। চাপা স্বরে বললেন—হতচ্ছাড়ী মেয়ে! নিজের স্বভাব মন্দ বলে দুনিয়াশুদ্ধ লোককে তুই মন্দ দেখিস? ছাড় তুই, আমার হাত ছাড়। চড় খেয়ে তক্তপোশটার উপর চুপচাপ বসে রইল এনাক্ষী। একটা অসভ্য ছেলেকে সামনাসামনি অসভ্য বলাতে অপরাধ কোথায় বুঝে উঠতে পারল না। গালে হাত বুলোতে বুলোতে ছোট ভাই তপুর দিকে তাকিয়েই কি কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। তারপরই দৌড়ে মার কাছে। মলিনা দেবীর মেজাজ তখনও ধাতস্থ হয়নি! আবার এনাকে দেখে ঝেঁঝে উঠলেন—রান্নাঘরে আবার কি? কাজের সময় এখন বিরক্ত করতে আসিস না। বেরো। এনাক্ষী ভেংচি কেটে উঠল মাকে—বেরো বললেই বেরুবো নাকি। তপু ফাষ্ট হয়েছে, টাকা ফেল, আমরা মিষ্টি খাব।

এনাক্ষীর কথার ধরণই এ রকম। কত বার বুঝিয়েছেন মেয়েদের, এমনি রুক্ষ ভাষা কানে অত্যন্ত খারাপ শোনায়। যেন সর্ব্বদাই একটা যুদ্ধং দেহি ভাব মেয়ের। বহু বার বলে বলে নিজেই হতাশ হয়ে ছেড়েছেন। মেয়ে নিজে থেকে না শোধরালে তার সাধ্য কি ও মেয়েকে শায়েস্তা করেন! আজ মীনা, তপু, দিপুর আনন্দোজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে এনার চেহারাটাই বার বার চোখের উপর ভেসে উঠছিল। বাপের বকুনি খেয়ে যখন কাঁদছিল তার মায়া হচ্ছিল মলিনা দেবীর। কিন্তু বীরেন বা[...] সামনে থেকে মেয়েকে টেনে আনার সাহস তাঁর ছিল না। তা[...] কর্ত্তা বেরিয়ে যেতে এনাক্ষীকে কাছে টেনে আদর করে ওর দুঃ[...] ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ-ও জানতেন কোন ব্যাপারেই বেশিক্ষণ মুখভার করে থাকা স্বভাবই নয় মেয়ের। তবু এনাক্ষীর চোখের জল দেখে সে মুহূর্ত্তে বেদনায় প্রাণটা মুচড়ে উঠেছিল তার। সহজে কাঁদবার মেয়ে ত ও নয়? কিন্তু সাধ্য কি ওর সম্বন্ধে দু'মিনিট ওর নিশ্চিন্ত থাকার। একেবারে হাড়জ্বালান মেয়ে। কি যে ব'লে এসেছে ওপরে কে জানে?

এনাক্ষীকে পেছনে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—ফেল করে ফের মিষ্টি খাওয়ার কথা বলতে লজ্জা করে না তোর? ও তুই বলেই পারিস, অন্য মেয়ে হোলে এতক্ষণ লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেত।

এনা ফের ভুরু কুঁচকে মুখভঙ্গি করে বলল—বা রে বা, ফেল করেছি বলে কি মুখ গোমড়া করে সারা দিন বসে থাকব নাকি, না কাঁদতে বসব? ও তোমার মন খারাপ হয়েছে, তুমি মুখভার করে বসে থাকগে। এখন টাকাটা ত ফেল।

—টাকা আমার কাছে এখন নেই। যা, বেরো।

—ইস, নেই! বললেই হোল? শীগ্‌গির বের কর।

মলিনা দেবী এবার কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ লাল করে বললেন—দেখ এনা, ভাল হচ্ছে না। একটু আগে যে মার খেলি, তবু লজ্জা নেই?

—না, আমার লজ্জা নেই। তুমি টাকা দাও। লোকের বাড়ীতে দেখেছি, ছেলে-মেয়েরা পাশ করলে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া আনন্দের ধুম পড়ে যায়। আর আমাদের বাড়ী সবই উল্টো। একজন প্রথম হয়েছে, একজন তৃতীয় হয়েছে, তবু সব গোমড়ামুখ।

এ অদ্ভুত কথার কি উত্তর দেবেন মলিনা দেবী? এ উল্টো মেয়েকে কি করে সোজাপথে বোঝাবেন? সবটাই যে এনাক্ষীর জন্য, সে বোধ কি ওর আছে? মীনা, তপু, দিপুও যে উচ্ছ্বাসের মাঝে হঠাৎ এনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ-বিষণ্ণ হয়ে উঠছে, সে খেয়াল অবশ্য এ মেয়ের থাকার কথা নয়। অতটুকু ছেলে দিপু, সে পর্য্যন্ত এনাক্ষীর কান্না দেখে ঘরের কোণায় মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে। মলিনা দেবীর কাছে এসে বলেছে—মা, বাবাকে বকতে তুমি বারণ কর মা! ছোড়দি' যে কাঁদছে। এখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দুয়ারে তপু দিপুকে দেখতে পেলেন। এনাক্ষীর সহজ ভাব ফিরে আসাতে ওরাও যেন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। মুচকি মুচকি হাসছে দু ভাইয়ে। ওদের হাসিমুখ দেখে সেকেণ্ড খানেক কি ভাবল এনাক্ষী, তার পর ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল—দেবে না ত? আচ্ছা ঠিক আছে। আমার দু' টাকা জমেছে, আমি খাওয়াব। মলিনা দেবী হাত ধুয়ে এ ঘরে এলেন। কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বললেন—দিচ্ছি, দিচ্ছি, বাপ রে বাপ! এ মেয়ের পাল্লায় পড়লে—কথা শেষ হোল না। ততক্ষণে এনাক্ষী ছুটে বেরিয়ে গেছে বাইরে। দৌড়ে সামনের বারান্দায় এগিয়ে গেছেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন—এনা ভাল হচ্ছে না, ভাল হচ্ছে না। আবার তুই দোকানে দৌড়োচ্ছিস? ফিরে আয়, শীগ্‌গির ফিরে আয়। তপুকে টাকা দে, তপু কিনে

আনবে। মায়ের কথায় একবার পেছন ফিরেছিল, তার পরই গলির মোড়ে উধাও।

* * * *

এনার ফ্রক গলির মোড়ে উধাও হোতেই সামনের ঝুল-বারান্দা থেকে নিজের ঘরটায় ফিরে এলো সুহাস। এনার দোতলায় ওঠা দেখেই সামনের ঝুল-বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিল সে। কি যেন সব গড়গড় করে বলে গেল মাকে, এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল না, তবু মন্তব্যগুলো যে মোটেই শ্রুতিমধুর ছিল না যে, এত দূরে থেকেও গলার স্বরে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। বলতে কি, একটু একটু ভয়ই হচ্ছিল সুহাসের। যদি সোজাসুজি তাকেই যাচ্ছেতাই করে অপমান করে যেত সে, ভয়ে একরকম পালিয়েই এসে বসে আছে এখানে, তাহলে নিজের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই সে দেখাতে পারত কি? এনা ফিরে যেতে মনে মনে কত যে স্বস্তি ফিরে পেয়েছিল, মনে করে নিজের দুর্ব্বলতায় হেসেই ফেলল সুহাস। বাপ রে, ও মেয়ের পাল্লায় পড়লে রক্ষা ছিল না আজ। হেসে বইটা খুলে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে স্বগতোক্তি করল—কি আশ্চর্য্য মেয়ে বাবা!

মা যে ঘরের সামনে বসে কুটনো কুটছিলেন সে খেয়াল ছিল না। গৌরী দেবী মুখ বাড়িয়ে বললেন—কা'র কথা বলছিস রে সুহাস? ঐ নীচের তলায় এনাক্ষীর? তারপর ছেলের সাড়াশব্দ না পেয়ে নিজেই আবার বললেন—সত্যি অদ্ভুত মেয়ে! হেসে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটু আগে আমাকে কি বলে গেল জানিস? সুহাস ঘর ছেড়ে বারান্দায় মার কাছ ঘেঁসে এসে বসল। হেসেই বলল—কি?

—বলে গেল, আপনার ছেলের চোখ আমি গেলে দেব মাসীমা! পরের বাড়ীর দিকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব। আর তাকাবি কখনও? উচ্ছ্বসিত হোয়ে মায়েতে ছেলেতে হেসে উঠল। সুহাস হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল—দেখ মা, আমি অবাক হই মেয়েটার রূপান্তর, ভাবান্তর দেখে। এই চোখভরা আগুন, বাপ রে! ওপর থেকে যে চোখের দিকে তাকালে আমার পর্য্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার মুহূর্ত্ত পরেই দেখ বাপের ধমকে এমন ক'রে কাঁদছে, কষ্টই হয় সে সময়। রাগছে যখন ছোট ছোট ভাই দুটোকে কি মারধরই না করে, আবার পর মুহূর্ত্তেই দেখ আদরে আদরে বেচারাদের একেবারে প্রাণান্ত! দুটো শক্তিই সমান কাজ করছে।

গৌরী দেবী বললেন—অথচ দেখ, ভদ্রলোকের আর পাঁচটি সন্তানই কিন্তু বড় শান্ত-শিষ্ট। সব মায়ের মত হয়েছে। বাপের মেজাজ পেয়েছে একমাত্র ঐ মেজোটি। এই নিয়েই সেদিন এনার মা কত দুঃখ করছিলেন। সুহাস আস্ত ঝিঙা ছুঁ'কাক করতে করতে বলল—কি বলছিলেন? গৌরী দেবী বড় মেয়ে শুকুকে ডেকে বললেন—দেখ, ত শুকু, উনুনে কয়লা দিয়ে এসেছিলাম ধরল না কি? তারপর আলু ছাড়াতে ছাড়াতে ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। একটু তাচ্ছিল্যমাখা সুরে বললেন—বলছিলেন, মেয়েটার স্বভাব দিনকে দিন এমন বিশ্রী হোয়ে উঠছে যে, মনে আর শান্তি নেই তাঁর। এই সব দুঃখ কর'ছলেন আর কি। নূতন কোরে আর কি বলবেন? চোখের উপরই ত দেখতে পাই সব· অতবড়, ধিঙ্গী মেয়ে, মা বলে বলে হয়রাণ, তবু ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরবে না

৭০

দিনের মধ্যে পাঁচবার খাওয়া-পোশাক, বিস্কুট-লজেন্স নিতে দোকানে দৌড়চ্ছে। আগে ভাবতাম বাপ-মায়ের দরকার। বাপ অবশ্য রাশভারী লোক। ভয়ও ক'রে ছেলেমেয়েরা যমের মত। তা সে কতক্ষণ? ভদ্রলোক ত দেখি সেই সাড়ে নয়টায় বেরিয়ে যান আর ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে সাতটা। ততক্ষণ ত অবাধ স্বাধীনতা। অত বড় মেয়ে ভাল দেখায় না বাপু! মায়ের বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সুহাস একটা গাছাড়া উত্তর দিল। বলল—থাকে একেকটা মেয়ে একটু ধরণের।

উঠে দাঁড়াতেই এনার গলার সাড়া পেয়ে এক পা বাড়াতে গিয়ে বাধা পেয়ে ফের বসে পড়তে হোল। গৌরী দেবী সার্টের ঝুল টেনে বসিয়ে দিয়েছেন ছেলেকে। হেসে বললেন—চোখ দুটো তোর সত্যিই যাবে। লজ্জা নেই? সুহাস অনুনয় ক'রে বলল—একটু দেখি মা, বেশ মজা লাগে। গৌরী দেবী গম্ভীর হ'য়ে বললেন—ছিঃ। বড় হ'য়েছিস এখনও কোন কাণ্ডজ্ঞান হোল না? এ কি মেয়েলী স্বভাব হচ্ছে দিনকে দিন? যা পড়তে যা।

অগত্যা পড়ার ঘরেই ঢুকতে হোল সুহাসকে। পর পর দুটো বছর একই ক্লাসে র'য়ে গেল এনাক্ষী। মাষ্টার থাকা সত্ত্বেও। আর এই ফাঁকে মীনাক্ষীর স্কুলের গণ্ডি পার হ'য়ে কলেজে যাতায়াত সুরু হয়েছে। তপু দু' ক্লাস উঁচুতে উঠে এনাক্ষীকে ধরে ফেলেছে। দিপুও এগিয়ে গেছে দু' ধাপ। শুধু এনাক্ষীই যেই তিমিরে সেই তিমিরেই। দোহদার সুহাসেরও এবার ফাইন্যাল ইয়ার।

আগের সেই অশোভন কৌতূহল আর নেই। একদম গেছে বলা যায় না, তবে অনেকটাই গেছে। এখন যেটুকু আছে ও-টুকু আর অস্বাভাবিক বলা চলে না। ওটুকু অনেকেরই থাকে। গত বছরেও প্রমোশনের দিন বীরেন বাবুর ধমক-ধামক কানে গেছে সুহাসের। কিন্তু এ বছর যেন বড় বেশি চুপচাপ। এবারও যে এনাক্ষীর কপালে প্রমোশন জোটেনি, সে খবর আগেই পেয়েছে সে। সকাল থেকেই একটা ধমকের আশঙ্কায় সুহাস নিজেই যেন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছিল। কিন্তু না, কিছুই কানে গেল না। ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সুহাস। নিজের ঘরে টেবিলের উপর দু হাতের ভর রেখে মুখ চেপে এ সবই চিন্তা করছিল। আচমকা একটা বড় প্রমোশন পেয়ে এনাক্ষী যে হঠাৎ বড় বেশী বড় হোয়ে গেছে এ যেন সহ্য হচ্ছিল না সুহাসের। সত্যি তাই। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে সেটা কিছু নয়, কিন্তু সেই উচ্ছল চাপল্যে সর্ব্বদাই প্রাণচঞ্চল একটা ঘূর্ণী আচমকা যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে সুহাসের। মাত্র দুটি বছরে কেউ যে এমনি বেমালুম পাল্টে যেতে পারে, যেন চোখে না দেখলে বিশ্বেস হয় না। এ পরিবর্ত্তন যে হঠাৎ একটা ওলোট-পালোটে এসে গেছে, তা নয়। ধীরে ধীরে সব কিছু সইয়ে সইয়ে, কাউকে তেমন আশ্চর্য্য না করে দিয়েই আস্তে আস্তে পাল্টে গেছে এনাক্ষী। এখন আর দু'চোখ দু'কান পেতে রেখেও অস্বাভাবিক কিছু চোখে ঠেকে না, কানে আসে না। বড় বেশী শান্ত-লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে গেছে যেন। কিন্তু সব চেয়ে যা আশ্চর্য্যকর, তা হচ্ছে সুহাসের নিজেরই মন। এনাক্ষীর সেই ঝগড়া, সেই হিংসুটেপণা, সেই দৌরাত্ম্যপণা, যা দেখে বিরক্তিতে রাগে কত সময় তার ভ্রূ কুচকে উঠেছে, সেই যেন ভাল ছিল। একটা স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারকে কে যেন বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে, এনাক্ষীকে দেখলে আজ-কাল তার এমনি একটা ভাব মনে পড়ে যায়। আর তাই মায়ের মুখে এনাক্ষীর প্রশংসা মনই খারাপ হ'য়ে যায়, মাকেও তখন সহ্য হয় না, মনে পড়ে মায়ের আগের উক্তিগুলি। কিন্তু এটাই ত নিয়ম। শান্ত, … মেয়েদের প্রশংসাই ত প্রাপ্য। তার মনের উক্তিগুলোই … ব্যতিক্রম।

* * * * *

এই আড়াই বছরে একই বাড়ীর বাসিন্দা হোয়েও এনাক্ষী… পরিবারের কারো সাথেই বলতে গেলে তেমন আলাপ পরিচয় হয়… সুহাসের। সুহাস এমনিতেই একটু অমিশুক, তাছাড়া ত… সমবয়সী কেউ নেইও ত ও পরিবারে। সুতরাং আজ-কাল কা… অকাজে ছুটে ছুটে আসে মীনাক্ষী। শুক্লাও অমনি দিনে পনর ব… নামছে নীচে। এক সাথে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করে একই কলে… ভর্ত্তি হয়েছে দু'জনে, এত দিনে তাই বন্ধুত্বটা জমে উঠেছে খুব… সুহাস ঠিক বন্ধুত্বের পর্য্যায়ে না উঠলেও বোনের বন্ধু হিসেবে অনেক সহজ হ'য়ে উঠেছে মীনাক্ষীর কাছে।

বিকেলে আজ আর বেরোয়নি। বন্ধুদের ট্রামে তুলে দিয়ে তাদে… সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা বলছিল মায়ের সাথে। মীনাক্ষী এলো এমনি… মাসীমা মাসীমা, হৈ-হৈ করতে করতে এসে থমকে দাঁড়ি… পড়ল। সুহাস এ সময় বাড়ীতে, ভাবতে পারেনি নিজে… উচ্ছ্বাসের জন্য বড়ই লজ্জিত হোয়ে উঠল। কিন্তু বড়ই সপ্রতি… মেয়ে মীনাক্ষী। হেসে বলল—বা রে মাসীমা, মিষ্টি কোথায়… উত্তরটা দিল সুহাস। মৃদু হেসে বলল—বা রে, মিষ্টি ত আপ… আনবেন, এমন খালি হাত কেন?

—বা রে, আমি কেন মিষ্টি খাওয়াব? সুহাসও গম্ভীর গলা… বলল—বা রে, কেন খাওয়াবেন না? গৌরী দেবী মজা দেখছিলেন… এই সুশ্রী সপ্রতিভ মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করেন তিনি। মনে… কোণায় একটা আশাও পুষে রেখেছেন। মনে মনেই থাকেনি ত… মেয়েকে বলেছেন ও। আর শুক্লার মুখ থেকে সে কথা মীনাক্ষীদে… পরিবারে কানে যেতে কতক্ষণেরই বা ওয়াস্তা। আড়ালে মীনাক্ষী… বৌদি বলে ঠাট্টাও সুরু করেছে। কেবল খুব সাবধানে সুহাসে… কান এড়িয়ে এমনিতেই বিয়ের নামে নানান অজুহাত, তার ও… মীনাক্ষীর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব শুনলে কি জানি, লজ্জা… বোধ করি যেটুকু কথাবার্ত্তা বলত তাও বন্ধ করবে। গৌরী দে… তা চান না। বরং সুহাস আর মীনাক্ষীকে আলাপ করতে দেখে… একটা শান্তি পান। এমন মেয়েকে সুহাস কিছুতেই অপছ… করতে পারবে না। বুঝে-সুঝে নিক না। দুজনের কথা শু… মজাই পাচ্ছিলেন। হেসে বললেন—এ বলছে কেন খাওয়া… ও বলছে কেন খাওয়াবেন না, বেশ মজা! আর সত্যি কথাই … মীনাক্ষী শুধু শুধু মিষ্টি খাওয়াতে যাবে কেন? তোর বোনে… বিয়ে, এত বড় একটা শুভ সংবাদ, মীনাক্ষী নিশ্চয়ই দাবী কর… পারে মিষ্টি খাওয়ার, মীনা, আমি তোমার দলে। জোরে হে… উঠলেন।

মায়ের সাথে সুহাসও হাসল। বলল—বেশ কথা, বোনে… বিয়ে, শুভ সংবাদ সন্দেহ নেই, মিষ্টিমুখ করানর মতই সং…

তবু মীনাক্ষী দেবীর দিক থেকে ও ত মস্ত সুসংবাদ আছে। মিষ্টিমুখ করাবার মতই শুভ সংবাদ।

তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছে না মীনাক্ষী। ভুরু কুঁচকে মৃদু হেসে বলল—বুঝতে পাচ্ছি না। কি সংবাদ বলুন ত?

মনে করতে পাচ্ছেন না?

ঠোঁট কামড়ে চিন্তার ভাণ করল—না ধরতে পাচ্ছি না।

গৌরী দেবী হেসে বললেন—অত বাধার মধ্যে না রেখে পরিষ্কার করে বলই না বাপু!

—আচ্ছা পরিষ্কার করেই বলি। যার দু'দুটো ভাই প্রথম হয়ে উঁচু ক্লাসে ওঠে, তার কাছে মিষ্টি খাওয়ার আবদার আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। কি বলেন পারি না?

মীনাক্ষী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—তা নিশ্চয়ই পারেন। সে ব্যবস্থাও হবে। কিন্তু আগের ব্যাপার আগে। আমি যখন জানিয়েছি আমারটা মিটে যাক, তারপর চলুন আপনি নীচে, এ উপলক্ষে তবু আপনার পায়ের ধূলা পড়বে।

গৌরী দেবী ছোট একটু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—এনার খবর শুনে মনটা বড় খারাপ হোয়ে গেল! বেচারী এত খেটেও—কথাটাকে আর শেষ করলেন না।

সুহাস মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—ক' সাবজেক্টে ফেল করেছে আপনার বোন?

—দু' সাবজেক্ট।

—কি কি?

—অঙ্ক, ইংরেজী।

আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন বিষণ্ণ ও ভারী হ'য়ে উঠল। গৌরী দেবী আবার বললেন—শুকু বলছিল, এনাক্ষী নাকি আর পড়বে না। সত্যি না কি?

মীনাক্ষী বলল—সত্যি মাসীমা, আমরা সবাই বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম, এমন কি বাবা বললেন, স্কুলে না যেতে চাস, বাড়ীতেই অঙ্ক আর ইংরেজীর দুটো মাষ্টার রেখে দি, প্রাইভেটে পড়। তাতেও আপত্তি। আর একবার 'না' করলে ও মেয়েকে 'হ্যাঁ' করায় কার সাধ্যি। বাবাকে যে অত ভয় করে তবু সোজা জবাব, না, আমি আর পড়ব না।

কথার মাঝখানে হঠাৎ সুহাস বলে উঠল—সে কি, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে করবে কি?

এনাক্ষীর প্রসঙ্গ উঠে পড়াতে ভারী অস্বোয়াস্তি বোধ করছিল মীনাক্ষী। বোন ফেল করেছে, লজ্জাটা যেন তারই, প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য সুহাসের কথার উত্তরে হেসে বলল—করবে মাথা আর মুণ্ডু। তার পর গৌরী দেবীর দিকে তাকিয়ে বলল—তারিখ কবে ঠিক হোল মাসীমা?

গৌরী দেবী বললেন—সবে মেয়ে পছন্দ ক'রে গেল, দেনা-পাওনার কথা কিছুই ঠিক হয়নি, তারিখের এখনই কি?

মীনাক্ষী আবার কল-কল ক'রে উঠল। ভুরু উঁচিয়ে বলল—কি চাপা মেয়ে বাবা! বলে শরীর খারাপ, কলেজ যাব না। আমিও তাই বিশেষ করে কলেজ গেছি। এসে শুনলাম, 'শুক্লাকে আজ দেখতে এসেছিল। কই মাসীমা, আপনিও ত কিছু বলেননি। গলায় মৃদু অনুযোগের সুর মেশাল।

—এ আর বলাবলির কি আছে রে, কথাবার্ত্তা অনেক দিন থেকেই ত চলছে, সে ত জানিসই, আজ ওরা এসে মেয়ে দেখে গেল। সুহাসেরই বন্ধু।

এসব কথা কিছু ভাল লাগছিল না সুহাসের। মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে মীনাক্ষীর কথায়। এনাক্ষী পড়া ছেড়ে দেবে? করবে কি ঘরে বসে? করার মধ্যে ত মার ঘরকন্নায় সাহায্য করা। এমনিতেই হাবে-ভাবে মীনাক্ষীকেই তার ছোট বোন বলে ভুল হয়, এর ওপর সংসারের চাকায় মাথা গলালে ও-মেয়ের বুড়ী হোতে আর কত দিন? ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মত না থাকলে...

মীনাক্ষী বলছে—হ্যাঁ, সুহাসদা', বন্ধুর নাম কি, দেখতে কেমন? বলুন না সব খুলে। শুকপুড়ী বলে আমি কিছু জানি না।

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুহাস। পা বাড়িয়ে মীনাক্ষীর থমকানো মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—নাম মধুময় চ্যাটার্জ্জী। দেখতে নামের মতই সুন্দর। আর সব মায়ের কাছেই শুনুন।

মীনাক্ষীর অন্যমনস্ক চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গৌরী দেবী মেয়েকে ডাকলেন—শুকু, চা হোল না তোর এখনও? তার পর বললেন—সুহাসের ঐ পাগলামি, কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হয়ত কোন কথা মনে পড়ে গেছে, সাথে সাথে মুখ গম্ভীর, গলা ভারী। তুমি কিছু মনে কোর না মীনাক্ষী!

সত্যি ক'রে মীনাক্ষী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েই পড়েছিল। গৌরী দেবীর কথায় শুষ্ক গলায় বলল—না, না, মনে করার কি আছে? আমি যাচ্ছি শুকুর কাছে, ওখানেই চা খাব। সুহাসের সামনের বারান্দা দিয়েই ওপাশে রান্নাঘর। চায়ের পেয়ালার ঠুং-ঠাং শব্দ কানে আসছে। মুখ ফিরিয়ে একবার শুক্লার দিকে তাকিয়ে আড়চোখে সুহাসের ঘরের দিকে তাকাল। তক্তপোশটার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে চোখের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে কি ভাবছে। কি ভাবছে? মনের প্রশ্নটা মুখেই বেরিয়ে গেল, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সেই মনখারাপটুকু আর নেই।

—কি ভাবছেন?

ধড়ফড় করে উঠে বসল সুহাস। ব্যগ্র-ব্যাকুল গলায় বলল—শুনুন, শুনুন, এই মুহূর্ত্তে আপনাকেই ডাকব ভাবছিলাম। আর সুহাসের সেই গলার স্বরে চোখের ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মীনাক্ষী। সেকেণ্ডখানেক যেন চেতনাহীন হয়ে পড়েছিল, তারপরেই নিজেকে যতটা সম্ভব সহজ করে তুলতে চেষ্টা করল। বুকের উথাল-পাথাল ঢেউকে দমন করে মুখ বাড়িয়ে একটু হাসির ছোঁয়া তুলে বলল—হঠাৎ কি ব্যাপার বলুন ত? একটা নির্জ্জন-ঘরে সুহাস তাকেই ডাকবে ভাবছিল। ভেবেছেও। সে'ও ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে। তবে কি অব্যক্ত কথা আজ ব্যক্ত করবে সুহাস? বুকের ধুকপুকানি কিছুতেই থামতে চায় না। তবু এসব ক্ষেত্রে জোর করেই স্বাভাবিক হতে হয়। কাঁপা গলায় তাই মীনাক্ষী একটা হাল্কা ভাষাই ব্যবহার করল—আমাকে আবার হঠাৎ ডাকবার প্রয়োজন হোল কেন?

আর এ মুহূর্ত্তে সত্যিই সুহাসের কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। নইলে নীচের তলার একটা অপরিচিত যুবতী সম্বন্ধে তার এই বেয়াড়া রকম সম্বন্ধেও কি করে বলতে পারল—দেখুন, আপনার ছোট

ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভুতোদা পট্ পট্ করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

"তিনমাস ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে। বিমল হন্ত দন্ত হয়ে দৌড়ে এল—

"আহা হা করছেন কি ভুতোদা।"

ভুতোদা : "করব না তো কি?"

বিনয় : দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে?

ভুতোদা : তার মানে!

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভুতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে) : হ্যাঁ : যতসব কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিমল : সে কি ভুতোদা? গাছ যে মানুষেরই মত, সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মানুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি!

ভুতোদা : বাঃ বাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে ?

ভুতোদা : তাই বলেই কি আমায় মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই ! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙ্গতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্যগুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিষারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে ?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল: এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভুতোদা : কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

DL/P. B-X52 BG

বোনকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মানে, এই একটু বুঝিয়ে দেখতাম, আর যদি রাজী হয় আমি নিজে যত্ন নিয়ে পড়িয়ে ওকে যেমন কোরে হোক প্রমোশন পাইয়ে দিতামই দিতাম। একটা উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে নিজেকে এমনি ভাবে উন্মুক্ত কোরে দিয়ে ভারী লজ্জায় পড়ে গেল সে। ছি, ছি, তার এই ব্যগ্র মনোভাবকে যে কেউ একটা মানে হিসেবেই নেবে। আম্‌তা-আমতা গলায় ভারী বিব্রত স্বরে বলল—মানে, ছেলেমানুষ, এ বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে করবেই বা কি, তাই একটু বুঝিয়ে দেখতাম, এ কথাটুকু যে আরো বেমানান হোল, উপলব্ধি করে একেবারে ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। সত্যিই ত বাপ, মা, দিদি যেখানে হার মেনে গেল, সেখানে সে একজন অপরিচিত হয়ে কি বোঝাবে?

থেমে থেমে মীনাক্ষী উচ্চারণ করল—আপনি এনাকে পড়াবেন? একটা চোখবোজা অন্ধকারকে যেন আস্তে আস্তে ছুঁতে পারছে মীনাক্ষী। কিন্তু কি আশ্চর্য, এ-ও কি সম্ভব? শুধু মাত্র দৃষ্টি ছুঁইয়ে দুটো পরস্পর-বিরোধী মনের এমনি যোগাযোগ। এনাক্ষীর মনটাকে একটু একটু যেন বুঝতে পারছিল সে। একটা সহজ সরল মেয়েলী মনকে বুঝতে খুব কষ্টকর নয় অন্ত একটি মেয়ের কাছে। কিন্তু সুহাস? এ তার ধারণার অতীত ছিল, আর তাইত সে নিজেকে সুহাসের সঙ্গে জড়িয়ে কত মধুর কল্পনা কত রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। ইন্ধন যোগাচ্ছিল শুক্লা।

একজোড়া দৃষ্টির সামনে এনাক্ষী যে নিজেকে কত পরিবর্তিত করে ফেলছে, সব লক্ষ্য করেছে সে। মনে মনে হেসেছে। মেয়েদের এই হঠাৎ বড় হওয়ার উপলব্ধিটা যেন লজ্জাবতী লতার মত। একটুতেই বুজে, কুঁকড়ে আসে। অমন দুর্দান্ত মেয়েটা সুহাসের দৃষ্টির সামনে যেন এতটুকু হয়ে যায়। ঝুঁকে-পড়া সুহাসের চোখে কত সময় তিরস্কার, কত সময় কৌতুক, কত সময় অনুযোগ, অনুরোধ, কোন সময় বা স্রেফ মজা উপভোগ করা সব লক্ষ্যে এসেছে তার এনাক্ষীর দৃষ্টি অনুসরণ করেই। কিন্তু কৈ, কোন দিন সে চোখে অনুরাগ দেখেছে বলে ত স্মরণ হচ্ছে না? কিংবা হয়ত তারই চোখের ভুল, যাকে সে অনুযোগ, অনুরোধ বলে ভেবেছে, অনুরাগে তাই ভরে উঠেছিল। শুধু যার জন্যে সেই বুঝেছে, অন্যে কি এর বুঝবে, তারই মত অন্য মানে করে ভুল বুঝবে।

অনেকক্ষণ পরে কথাটাকে শেষ করল মীনাক্ষী—দেখুন বুঝিয়ে, আমরা ত হার মেনে গেলাম। রাজী যদি করতে পারেন, সত্যিই একটা অসাধ্য সাধন করবেন। আড়চোখে সুহাসের লজ্জিত বিব্রত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিজের মনকে ছুঁতে চাইল মীনাক্ষী, কিন্তু কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারছে না। দুঃখ না, আনন্দ না আশাভঙ্গ কিছুই নয়, শুধু যেন বিশ্বজোড়া একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

ও-ঘরে এনাক্ষী কাপড় কুঁচিয়ে রাখছিল আলনায়। মলিনা দেবী বারান্দায় বসে ছোট মেয়ে মুন্নিকে জামা পরিয়ে দিচ্ছিলেন, মীনাকে দেখে বললেন—কলেজ থেকে এসেই অমনি ওপরে ছুটেছিস। নে, মুখ-হাত ধুয়ে নে, এনা চা করে দিক।

মীনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মায়ের গা ঘেঁষে এসে বসল। আদুরে গলায় বলল—তুমি আজকাল এনাকে বেশি ভালবাসছ মা! কেন? লক্ষ্মী মেয়ে বলে? প্রথম সন্তান মীনাক্ষীর উপর মা বাবা উভয়েরই টানটা বেশি। বড় হয়েও তাই আদরে আব্দারে ছোট ভাইবোনদের সে ছাড়িয়ে যায়।

মেয়ের কথায় হেসে ফেললেন মলিনা দেবী। মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যি, ছোটবেলায় তুই ছিলি শান্ত-শিষ্ট, এনা একটা ডাকাত। বড় হোয়ে দুজনেই উল্টো হয়ে গেছিস। যত বড় হচ্ছিস তোর চঞ্চলতা আরো বাড়ছে আর এনা তোর ছোটবেলার স্বভাবটা পাচ্ছে। মায়ের কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ল মীনাক্ষী। —আচ্ছা মা, আমি'ত ছোটবেলায় বোকা ছিলুম, কিচ্ছু বুঝতুম না, তাই চুপচাপ থাকতুম, বড় যত হোতে থাকলাম একটু একটু বুদ্ধি পাকতে আরম্ভ করল, চঞ্চলতাও বাড়ল। কিন্তু তোমার ঐ বুদ্ধিতে পরিপক্ক ডাকাত মেয়েটা হঠাৎ এমন শান্ত-শিষ্ট হয়ে উঠল কেন বলত?

ছোট মেয়ের মুখে পাউডারের পাফ বুলোতে বুলোতে মলিনা দেবী বললেন—তোর যত পাগলামি কথা! বড় হওয়ার সাথে সাথে ও নিজে থেকেই হয়, ছোট মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে উঠলেন এবার। মীনাক্ষী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—ছাই জান তুমি। তাহোলে ত আমার আরো শান্ত-শিষ্ট আরো লক্ষ্মী হওয়া উচিত ছিল, হয়েছি? তারপর উঠে গিয়ে এনার হাত থেকে কাপড় কেড়ে নিয়ে টানতে টানতে তাকে বারান্দায় নিয়ে এলো। মা'র দিকে ফিরে বলল—এনাকে জিজ্ঞেস কর না। হঠাৎ ও তার শান্ত-শিষ্ট মেয়ে হয়ে উঠল কেন?

এনা থতমত গলায় বলল—বা রে, এ সব কি হচ্ছে? ছাড় কাপড় ছাড়, কাজ করতে দেবে না?

রাখ তোর কাজ। হঠাৎ অত শান্ত-শিষ্ট লেজবিশিষ্ট হয়ে উঠলি কেন তাই বল আগে?

ভুরু কুঁচকে এনাক্ষী বলল—এ আবার একটা প্রশ্ন না কি? এর কোন উত্তর আছে? থাকলে মা যা বলেছেন ঐ উত্তর। সবাই ত এক ছাঁচে ঢালা নয়। সাধারণ মেয়েরা বড় হওয়ার সাথে সাথে নিজে থেকেই সংযত হয়।

তেড়ে উঠল মীনাক্ষী—তার মানে আমি অসংযত? মাঝখানে মলিনা দেবী বাধা দিলেন—কি পাগলামি আরম্ভ করেছিস বলত? শুধু-শুধু ঝগড়া করছিস মীনা, হয়েছে কি তোর?

রহস্যভরা গলায় মীনাক্ষী বলে উঠল—হুঁ হুঁ, বাবা আমার চোখকে ফাঁকি দিবি তুই?

মলিনা দেবী এবার উঠে দাঁড়ালেন, পা বাড়িয়ে বললেন—সর, যাই, কলেজ থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চা-খাবার না খেয়ে বাজে বকতে আরম্ভ করেছিস! সর দেখি, চায়ের জল চাপিয়ে আসি। মায়ের হাত ধরে ফের বসিয়ে দিল মীনাক্ষী। স্পষ্ট স্বরে বলল—তোমার দস্যি মেয়েকে লক্ষ্মী করেছে ঐ ওপরতলার সুহাস।

মলিনা দেবী এবার হেসে ফেললেন—কি যে মাথামুণ্ডু বকিস ছাই, কোন কথার যদি কোন মানে থাকে! তাছাড়া ওদের সাথে কি বিচ্ছিরী ব্যবহার করেছে এনা, চিন্তা করলে এখনো লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল মীনাক্ষী—সত্যি মা, সত্যি!

আচ্ছা এনাকেই জিজ্ঞেস কর। তারপর এনার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল—এই এনা, মিথ্যা বলবি না।

এতক্ষণ হাতের কাজ বন্ধ করে দিদির কথাই শুনছিল এনাক্ষী। এবার মায়ের কাছ ঘেঁসে এসে বসল। সহজ সোজা পথই জানে সে। সত্যিই ত এ বিষয়ে তার নিজের ত কোন সন্দেহ নেই? তবে আর বলতে বাধা কি? কিন্তু আশ্চর্য্য! দিদিও লক্ষ্য করে এসেছে বরাবর। হেসে বলল—সত্যি মা, ভারী আশ্চর্য্য! ভদ্রলোক সর্ব্বদা একজোড়া দৃষ্টি দিয়ে যেন আমায় শাসন করছেন। ইদানীং যখনই ঝগড়াঝাঁটি করে কিংবা অকারণে চেঁচামেচি করে, তপু দিপুদের মারধর করেছি হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়ে, সাথে সাথে ভারী লজ্জা পেয়ে গেছি মা! ছেলেটি যেন চোখ দিয়ে তিরস্কার করছে। অনেক সময় ঘেন্নাও দেখেছি চোখে। অদ্ভুত মা, চোখ দিয়ে কেউ ঘেন্না ছোটাতে পারে?

মলিনা দেবী এনাক্ষীর আলগা চুলগুলোকে একটা উঁচু করে খোঁপা বেঁধে দিলেন। হেসে বললেন—একটা কথা মনে পড়ে গেল।

তারপর মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোর ছেলেবেলার কথা।

এনাক্ষী মীনাক্ষী চোখ নাচিয়ে বলল—কি মা কি? মার মুখে তাদের ছোটবেলার কথা শুনতে কি যে আনন্দ!

মলিনা দেবী বললেন—মীনা, তুই তখন বছর পাঁচেকের। একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়েছিলি। উনি চোখ গরম ক'রে তাকাতেই আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে নালিশ জানালি মা, বাবা আমাকে মেরেছে। উনি ওদিক থেকে আদর ক'রে বললেন কি দিয়ে মেরেছি মা মণি তোমাকে?

মীনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—তুই বললি, চোখ দিয়ে মেরেছ ত তুমি আমাকে।

উচ্ছ্বসিত হোয়ে হেসে উঠল সবাই। হাসি থামিয়ে মীনাক্ষী এক সময় ছাড়া গলায় বলল—হ্যাঁ ভাল কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। এনা, তোকে একবার ওপরতলার সুহাসদা ডেকেছিল, শুনে আসিস।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বারান্দায় সুহাস ডেক-চেয়ারটায় গা এলিয়ে পড়ে ছিল। কাল শুক্লার মুখে একটা খবর শুনে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেছে সে। নিজের মন আর দৃষ্টি দুটোকেই যেন ছুঁতে পারছে না। মন যা চায় দৃষ্টিতে ঠিক তার উল্টোটাই ফুটে উঠতে পারে? সে কি করে সম্ভব? শুক্লা বলেছে এনাক্ষী নাকি তার চোখে তিরস্কার ফুটে উঠতে দেখেছে, ঘৃণা করতে দেখেছে, তাই সে তার পূর্ব্ব-স্বভাব আস্তে আস্তে বদলাতে চেষ্টা করেছে। বলেছে নাকি একজোড়া দৃষ্টি যদি অহরহ এমনি অনুসরণ করতে থাকে কি রকম অস্বোয়াস্তি লাগে বলুন ত শুকুদি'! বুঝি আপনার দাদা আমার ভালর জন্য অমনি করছেন, তবে সেটা অনেক দেরিতে বুঝেছি আগে ত কত গালাগালি করেছি আপনার দাদাকে।"

মনে মনে হাসল সুহাস। কি সব অবচেতন মন-টন আছে, তাইতেই বোধ করি খারাপটা খারাপই লেগেছে। মনে যখন হয়েছে এইতেই ওকে মানায়, অবচেতন মন হয়ত তখন বলছে না, ওকে ভাল দিকেই টানতে হবে। আর তাইতেই চোখের ভাষায় সেই ছায়াই পড়েছে। কি সব মনস্তত্ত্ব ব্যাপার! ও সব ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে এটা ঠিক, ওর ভাল ভাবতে নিজের ভাল লাগে। আর তাইতেই ত এনাক্ষীর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার সংবাদে অতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

কানে এলো অতি মৃদু গলা—শুকুদি', আপনার দাদা নাকি আমায় ডেকেছেন? কেন?

শুকুর অবাক গলা শুনল—সে কি? দাদা শুধু শুধু তোকে ডাকতে যাবে কেন?

একটা হাসির ঝলক কানে এলো সুহাসের—আমিও ত তাই বলি, হঠাৎ কিসের তলব?

বিড়-বিড় শুনল সুহাস—দাদা ত মোটে তোকে চেনেই না, কি জানি, আর এই বারান্দায়ই আছে।

চোখ বুজে মনে মনে ভারী আনন্দ উপলব্ধি করছিল। শুক্লা বলল—দাদা, তুমি নাকি এনাকে ডেকে পাঠিয়েছ?

হুঁ। এসেছে নাকি?

এনাক্ষী এক পা এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারটার হাতলে হাত রাখল—হ্যাঁ। আমি এসেছি। কোথাও আড়ষ্টতা কিংবা স্বাভাবিক যুবতী-সুলভ লজ্জা দেখল না সুহাস এনাক্ষীর কথায় কিংবা চেহারায়। এ মেয়েই কি ইদানীং চোখে চোখ তুলে পর্য্যন্ত তাকাতে পারত না? নিজের ডেকচেয়ারটা পেছনে ঠেলে সামনের চেয়ারটা

দেখিয়ে বলল—বোস। তারপর শুক্লার অবাক চাউনির দিকে তাকিয়ে তরল গলায় বলল—বাড়ীতে এক জন মান্তগণ্য অতিথি এলো, এক কাপ চা খাওয়াবি না?

এনাক্ষী হাত তুলে বাধা দিল—না, মা, শুকুদি'! চা আমি বেশি খাই না। তার পর সোজা সুহাসের মুখের দিকে চোখ রেখে—কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না, কেন আমায় ডেকেছিলেন। বলছি। লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছ কেন?

শুক্লা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবছিল, দু'জন অপরিচিত মানুষ ঠিক এমনি ভাবে, এমনি ভঙ্গিতে, এমনি বিষয়ে কি ক'রে কথা বলতে পারে! যে জানে, নয় ত যে কেউ ওদের চোখ-মুখ দেখে কিছুতেই বিশ্বেস করবে না ওরা আজই প্রথম মুখোমুখী হোল। বলতে গেলে প্রথম পরিচয়। আচমকা চায়ের কথাটা মনে হোল। ঠিক। তা ছাড়া দাদাটা এনাক্ষীর মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, কেমন জানি অস্বোয়াস্তি লাগতে লাগল। ঘরে পা বাড়িয়ে বলল—তখন থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, বোস না।

বসার ইচ্ছে থাকলে কারো অনুরোধের অপেক্ষা না করে নিজেই বসত সে। আর না বসবে যদি, তবে কারো কথাতেই নয়। সেটুকু বুঝে হাসল সুহাস। স্নিগ্ধ হেসে বলল—লেখাপড়া ছাড়ছ কেন?

অল্প শব্দ করে এনাক্ষীও হেসে উঠল—ভারী আশ্চর্য্য ত! আমার লেখাপড়া নিয়ে আপনি দেখছি ভারী চিন্তিত! তা ছাড়া দেখলেন ত, একই ক্লাশে পড়ে আছি তিন বচ্ছর। ভাল লাগে?

সুহাস এবার অভিভাবকের সুর টেনে আনল গলায়—তাতে কি হয়েছে। সবার মেধা ত এক নয়। পড়। পড়া ছেড় না। ঠোঁটের কোণায় হাসিটা তখনও মিলোয়নি, এনাক্ষী চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল—বাবা, মা, দিদিদের মত আপনিও নিশ্চয়ই আমার ভাল চাইছেন, কিন্তু তাদের যেমন নিরাশ করেছি, আপনাকেও তেমনি হতাশ করতে হচ্ছে। চেষ্টা ত করলাম, ও হবার নয়। ও পাট তুলেই দিলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুহাস—আমার কথা শোন এনা! এত বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়ে এটুকু বোঝ না, আজকালকার দিনে লেখাপড়াটা কত দরকারী? লক্ষ্মীটি! পড়া ছেড় না। আমি তোমায় পড়াব। আর শুধু পড়ান নয়, গ্যারাণ্টী দিয়ে পাশ করাবই করাব। রাখবে আমায় মাষ্টার? রাখবে?

এমন লক্ষ্মীটি? হঠাৎ কেমন বুক ধড়ফড় করে সুহাসের চোখে-মুখে তাবায় কোনখানেই আর সংযত ভাব দেখছিল না সে। দুটো মিনতি-মাখান চোখ নিয়ে যেন ভিক্ষুকের মত হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। ও দুটো চোখের দিকে আবার চোখ তুলে তাকানর সাধ্যি নেই আর এনাক্ষীর। বুকের উথাল-পাথাল ঢেউকে কষ্টে দমন করল সে, অস্ফুট স্বরে শুধু বলতে পারল—আমি এবার যাই।

মুহূর্ত্তে চোখের দৃষ্টি পাল্টে গেল সুহাসের। ভরাট গলায় বলল—না যাবে না। আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও।

তার পর হঠাৎ এনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে মমতায় ভরে উঠল মন। বেচারী মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পাচ্ছে না, থর-থর কাঁপা হাতটা পিঠের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আঁচলটা টেনে আনল সামনে। এক মুহূর্ত্ত চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, তার পর আবছা স্বরে বলল—আমি ভেবে দেখি। একটু আগেও সহজ, স্বচ্ছন্দ ছিল। ঝোঁকের মাথায় আবেগের তাড়নায় অমন করে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলা মোটেই উচিত হয়নি। এখন একটা বাণবিদ্ধা হরিণীর মতই ছটফট করছে এনাক্ষী। তার চোখের আড়াল হোতে পারলে যেন বাঁচে।

মায়া হোল সুহাসের। হেসে বলল—আচ্ছা বেশ, ভেবেই বোল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না।

আস্তে ডাকল—এনা! এনাক্ষী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার কি বলবে সুহাস? এর পরে ও কি আর বলবে? আর বেশি শুনতে তার যে গা কাঁপছে, চোখ ঠেলে কান্না আসছে। না, না, আর সে শুনতে চায় না। মত ত সে জানিয়েছে। আবার কি? সে কি তার চোখের ভাষায় আজো তার মনকে বোঝেনি?

কোন কথা নয়, সুহাস এগিয়ে এসে এবার এনাক্ষীর দুটো মুঠি চেপে ধরল। আবেগ-কাঁপা গলায় বলল—নিজের মনকে ছুঁয়েছ এনা? এত কাল আমার চোখ দিয়ে তুমি নিজেকে চিনেছ, এবার তোমার চোখ দিয়ে আমায় চিনে নাও।

হঠাৎ পায়ের শব্দে দুজনেই চমকে উঠেছে। সুহাস চমকে হাত ছেড়ে দিয়েছে। পর্দ্দার ওপাশে শুক্লা চায়ের কাপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এনাক্ষী একটা ঝড়ের মতই পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। সুহাস বলছে—আরে চা-টা খেয়ে যাও।

কিন্তু এনাক্ষী ততক্ষণে উধাও! অদম্য এ প্রাণবন্যাকে কি দিয়ে ধরবে এনাক্ষী? ঝড়ের দাপট একটা রুদ্ধ ঘরের সব কিছু যেন উলোট-পালোট ক'রে দিয়ে গিয়েছে তার! ভাষা নয়, ভঙ্গি নয়, শুধু মাত্র দৃষ্টি দিয়ে একজন তাকে তার মনের মত তৈরী ক'রে তারপর ভিক্ষুকের দীনতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি জানে না এনাক্ষী তারই উপযুক্ত হোতে চেষ্টা করেছে এত কাল? আশ্চর্য্য! এনাক্ষী নিজে কি জানত? আজ এ মুহূর্ত্তের আগে? না জানত না। না কি মনে মনে জানত নিজেকে, চিনত। কে জানে! এখন সে চিনেছে, এখন যে জেনেছে সে ত মিথ্যে নয়। একটা রঙ্গীন প্রজাপতির মতই যেন উড়তে উড়তে এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের দুয়োরে। দু' হাত দু' দরজার কাঠে রেখে কেমন লজ্জা-লজ্জা সুরে বলল—না মা! লেখাপড়া বাদ দেওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। চেষ্টা করতে দোষ কি? কাল থেকে স্কুলেই যাই। পড়াশোনাতে লজ্জা কি মা!

"লোকে বলে, এই ত দুনিয়া! কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতের জন্ত! মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নূতন কিছু কি সে কল্পনা করিবে না! উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে! যাহা বিগত তাহা মৃত, কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে।"—শরৎচন্দ্র।
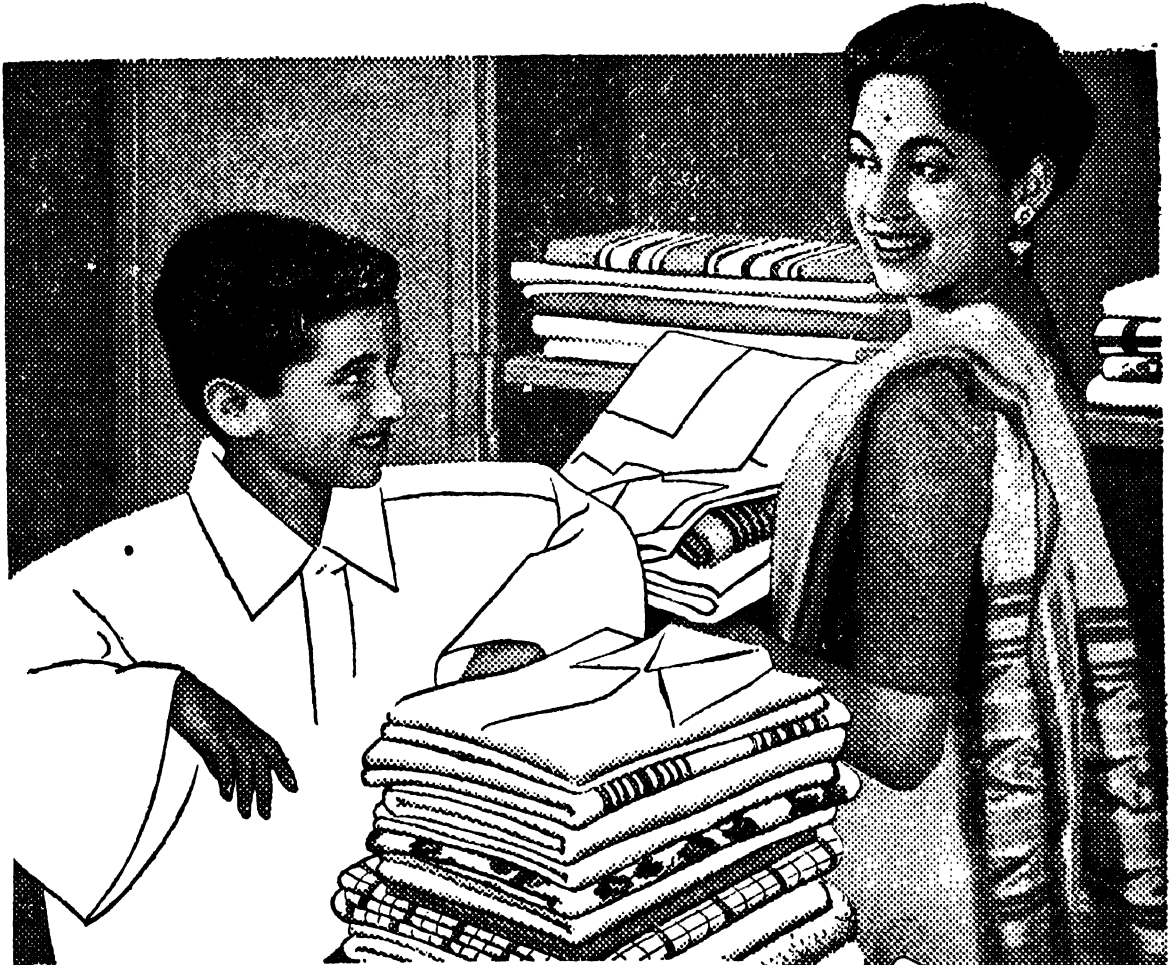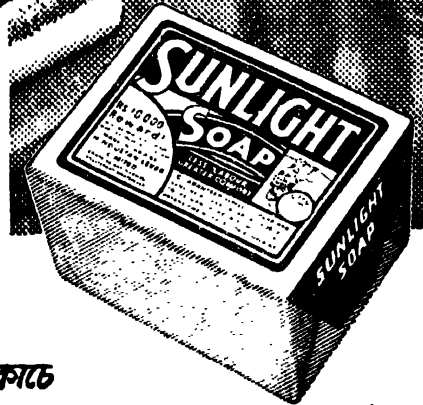
[*Osamu Dazai's* "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

প্রথম অধ্যায়

সাপ

অস্ফুট কাতরোক্তি কানে এল। এই তো মা খাবার ঘরে বসে স্যুপ খাচ্ছিলেন, এরই মধ্যে কি হ'ল আবার? স্যুপে কিছু পড়েছে ভেবে জিজ্ঞেস করলাম—চুল?

না, বলে মা নির্বিকার ভাবে আর এক চামচ স্যুপ মুখে দিলেন। সেটুকু শেষ হ'লে ঘাড় কাৎ করে রান্নাঘরের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে চেরী গাছটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন এবং ঐ অবস্থায় আরও এক চামচ স্যুপ ঠোঁটের ফাঁকে চালান করে দিলেন। 'মহিলা-পত্রিকা'য় বহুবর্ণিত স্যুপ খাওয়ার পদ্ধতি হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে প্রথায় মা স্যুপ খান, তাকে পাখীর ডানা ঝাপটানোর সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে না।

আমার ছোট ভাই 'নাওজি' একদিন রঙের মাথায় বলেছিল—নামের সঙ্গে খেতাব জোড়া থাকলেই কিছু আর অভিজাত হওয়া যায় না। প্রকৃতিদত্ত একখানি মাত্র সংজ্ঞা নিয়েও বহু লোক যথেষ্ট মার্জিত হয়, আবার আমাদের মত অনেকে খেতাবমাত্র সম্বল করে চণ্ডালেরও অধম বনে গেছি। যেমন ধর ইয়াসীমাকে (ওর ইস্কুলের এক সহপাঠী কাউণ্ট) দেখে রাস্তায় যে কোন দালালের চেয়েও বেশী অশ্লীল লাগে কি না? হতভাগা তার কোন আত্মীয়ের বিয়েতে মার্কিণী ডিনার জ্যাকেট পরে এসেছিল। পোষাকটার যদি বা কোন অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু খাবার টেবিলে সে যেভাবে ভারী ভারী শব্দের ধাঁধা তৈরী করে বক্তৃতা চালালো, তাতে আমার রীতিমত গা ঘুলিয়ে উঠছিল। এই জাতীয় সস্তা বাহাদুরির সঙ্গে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। ইউনিভারসিটি ঘিরে যেমন "উচ্চ শ্রেণীর নিবাসে"র ছড়াছড়ি, অভিজাত বলতে তেমনি "উঁচুদরের ভিখারীর" দলকে বোঝায়। যথার্থ নীল রক্ত যাদের গায়ে আছে, তারা ইয়াসীমার মত হামবড়াই করে না। আমাদের পরিবারে একমাত্র মা হলেন খাঁটি সোনা। তাঁর মধ্যে একটা কিছু আছে, যা আমাদের নাগালের বাইরে।

স্যুপ খাওয়ার ব্যাপারটাই ধরা যাক্ না কেন? আমরা শিখেছি প্লেটের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে, চামচটাকে কাৎ করে স্যুপে ডুবিয়ে মুখে তুলতে। মা কিন্তু মাথা খাড়া রেখে, সোজা হয়ে বসে বাঁ হাতের আঙুলগুলি টেবিলে ভর দিয়ে প্লেটের দিকে না তাকিয়েই স্যুপ খান। এত দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন ভাবে মা চামচে স্যুপ তোলেন যে, পাখীর ঠোঁটের সঙ্গে দিব্যি তার তুলনা চলে। চামচটাকে মুখের আড়াআড়ি ধরে আলগোছে ঠোঁটের ভেতর তরল পদার্থ টিকে চালিয়ে দেন। তারপর চারিদিকে আনমনা দৃষ্টি বুলিয়ে পাখীর ডানা ঝাপটানোর মত চামচটাকে ফট-ফট করে ঝেড়ে নেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এক ফোঁটা স্যুপও বাইরে পড়ে না; চুমুক দেওয়ার শব্দ তো হয়ই না, এমন কি প্লেটের ওপর চামচ নামিয়ে রাখার শব্দও হয় না। হয়ত তথাকথিত ভদ্রসমাজের নির্দিষ্ট চাল-এর সঙ্গে মায়ের স্যুপ খাওয়ার ধরণটুকু মেলে না, কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য কম নয়। এটুকুই যেন সবচেয়ে খাঁটি মনে হয়। বাস্তবিক প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাওয়ার চেয়ে মায়ের মত সোজা বসে খেলে স্যুপটাতে যেন অনেক বেশী স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু নাওজির ভাষায় উঁচুদরের ভিখারী হওয়ার দরুণ মায়ের মত অনায়াসে স্যুপ খাওয়া আমার হয়ে ওঠে না। ভদ্র সমাজের চলতি রেওয়াজ মত গোমড়া মুখ প্লেটের ওপর ঝুঁকিয়েই খাই।

সাধারণতঃ টেবিলি-ভদ্রতা বলতে যা বোঝায়, শুধু স্যুপ কেন, যাবতীয় আহার্য্যের প্রতি মায়ের ভঙ্গীটাই তার থেকে আলাদা। মাংস পাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুরি-কাঁটার সাহায্যে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেন, তারপর কাঁটাটিকে ডান হাতে নিয়ে খুশি মনে একটির পর একটি টুকরোর সদ্ব্যবহার করেন। আবার আমরা যখন শব্দ না করে মুরগীর হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে হিমসিম্ খাচ্ছি, ততক্ষণে মা দিব্যি নির্ব্বিকার ভাবে হাড়টি হাতে তুলে নিয়ে মাংসতে কামড় বসান। এ ধরণের অভব্য আচরণ কেবল যে ভাল লাগে তা নয়, কেমন যেন প্রীতির উদ্রেক করে। নির্ভেজাল পদার্থ অন্যরকম হতে বাধ্য।

আমি অনেক সময়ে ভেবেছি যে, আঙুল দিয়ে খেলে খাবারের স্বাদ বেশী ভাল লাগবে, কিন্তু খাই না, কারণ আমার মত উঁচুদরের ভিখারী মায়ের নকল করতে গেলে আসল ভিখারীর মত দেখাবে।

আমার ভাই নাওজি বলে, মায়ের সঙ্গে আমাদের কোন তুলনাই হয় না। মাঝে মাঝে নকল করতে গিয়ে নাকাল হয়েছি, একথাও ঠিক। একবার শরৎকালে আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ীতে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাতে মা আর আমি বাগানের মধ্যে

পুকুরপাড়ের আটচালায় বসে চাঁদের শোভা দেখছিলাম। হঠাৎ মা কাছাকাছি একটা প্রস্ফুটিত পুষ্পঝাড়ের কাছে গিয়ে সাদা সাদা ফুলের মধ্যে থেকে হাসতে হাসতে আমায় ডাক দিলেন—

কাজুকো, বলতো তোমার মা এখন কি করছেন ?

ফুল তুলছেন।

মা এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন, হুঁ, হুঁ !

আমি অনুভব করলাম তাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা করার মত এমন একটি খাঁটি বস্তু আছে, যার অনুকরণ করা অসম্ভব।

সকালে সুপ খাওয়ার গল্প করতে বসে কোথায় সরে এসেছি, সে কথা থাক, কিন্তু সম্প্রতি একটা বইয়ে পড়লাম, ফরাসী রাজতন্ত্রের যুগে সম্ভ্রান্ত মহিলারা রাজোদ্যানে অথবা যাতায়াতের পথের বাঁকে নিজেদের হাল্কা করতে আদৌ দ্বিধাবোধ করতেন না।

এ ধরণের সহজত্ব ভারি ভাল লাগে আমার এবং আমি অবাক হয়ে ভাবি, মা বুঝি সেই মহিলাদের শেষ নিদর্শন।

যাই হোক, আজ সকালে সুপ খেতে খেতে মায়ের অস্ফুট চিৎকারে চমকে গিয়ে যখন প্রশ্ন করলাম, 'চুল' কি না, মা জবাব দিলেন না।

নুণ বেশী হয়েছে ?

রেশনে পাওয়া মার্কিণী টিনের চালানী মটরশুঁটি দিয়ে আজকের সুপটা আমি পাতলা করেই রেঁধেছিলাম। রাঁধুনি হিসেবে নিজের ওপর আস্থা আমার নেই, যদিও প্রত্যেক মেয়ের অবধারিত শিক্ষা-তালিকার মধ্যে রান্নাও পড়ে। সেই কারণেই মা বলছেন খারাপ হয়নি, তবু সুপের জন্য আমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

গম্ভীর ভাবে মা বললেন—সুপটা চমৎকার হয়েছে। সেটুকু শেষ করে সামুদ্রিক শাকজড়ানো ভাতের মণ্ড খেলেন।

সকালে খেতে আমার কোন দিনই ভাল লাগে না, বেলা দশটার আগে ক্ষিদেও পায় না। আজ সকালে সুপটা কোন মতে গলা দিয়ে নামল বটে, কিন্তু আর কিছু খেতে চাওয়া ঝকমারি। কয়েকটা মণ্ড প্লেটে নিয়ে চপষ্টিক দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলু-ভাতে বানিয়ে ফেললাম। চপষ্টিকে সামান্য একটু তুলে, মায়ের চামচ ধরার মত মুখের আড়াআড়ি ভাবে ধরে, তাই দিয়ে পাখী খাওয়ানোর মত মুখের মধ্যে ঠেলে দিলাম। খাবার নিয়ে আমি এই কাণ্ড করছি, ইতিমধ্যে মা নিঃশব্দে উঠে সকালের সূর্য্যের আলোয় তপ্ত দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে আমার খাওয়া দেখলেন।

কাজুকো—ওভাবে খেও না। সকালের খাওয়াটা সবচেয়ে তৃপ্তি করে খাওয়া উচিত।

মা তোমার তৃপ্তি হয় ?

আমার কথা ছেড়ে দাও, এখন আমি সেরে উঠেছি।

কিন্তু আমার তো কোন অসুখই করেনি ?

মা, না। ম্লান হেসে মা ঘাড় নাড়লেন।

পাঁচ বছর আগে ফুসফুসের রোগে আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলাম। সে রোগ অবশ্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বাধিয়েছিলাম। স্নায়বিক দুর্বলতা এবং মনঃপীড়াই মায়ের বর্তমান অসুস্থতার কারণ। তাঁর একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল আমার নিয়ে।

আঃ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

কি হল ? এবার মায়ের প্রশ্ন করার পালা।

পরস্পরের চোখে চোখ পড়তে দু'জনেই পূর্ণ সহানুভূতি অনুভব করলাম। আমি হেসে উঠতে মায়ের মুখেও হাসি ফুটল।

দুশ্চিন্তা আমার মনকে নাড়া দিলেই এ ধরণের শব্দ আমার অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বছর ছয়েক আগে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ঘটনাগুলি হঠাৎই ছবির মত মনের মধ্যে ভেসে ওঠে এবং আমি টের পাবার আগেই মৃদু আর্তনাদ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের মুখে ঐ করুণ শব্দটুকুর কারণ কি ? আমার মত অতীতের কোন দুশ্চিন্তা নিশ্চয়ই তাঁকেও ঠিক এই মুহূর্তে নাড়া দেয়নি। না, কিন্তু কারণ একটা আছেই।

মা—এক্ষুণি তুমি কি ভাবছিলে ?

ভুলে গেছি।

আমার বিষয় ?

না।

নাওজির বিষয় ?

হাঁ, তারপর ক্ষণিকে আত্মসম্বরণ করে এক পাশে মাথা হেলিয়ে বললেন—বোধ হয়।

আমার ভাই নাওজি ইউনিভারসিটিতে পড়তে পড়তেই যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে ওরা তাকে চালান করে দেয়। আমরা তার কোন খবর পেতাম না এবং যুদ্ধ বিরতির পরও আজ অবধি সে নিখোঁজ। মা ধরে রেখেছেন ছেলের
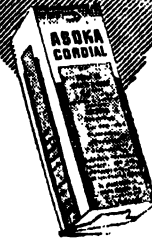
সঙ্গে তাঁর এ জীবনে দেখা হবে না। অন্ততঃ মুখে তাই বলেন কিন্তু আমি একবারও হাল ছাড়িনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।

ভেবেছিলাম, তার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি, কিন্তু তোমার ঐ সুস্বাদু সুপটা তার কথা মনে করিয়ে দিল। এ ভাবনা আর যেন সইতে পারি না। এখন মনে হয়, ওর দিকে আমার আরও অনেক বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল।

হাইস্কুলে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাওজির দারুণ সাহিত্য-প্রীতির উদ্রেক হয়। সেই অবধি সে দায়িত্বজ্ঞান-হীন জীবন যাপন করতে সুরু করে। মায়ের দুঃখের সীমা রইল না। তার এ-ধরণের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতা সত্ত্বেও মা সুপ খেতে খেতে তার কথাই ভাবছিলেন। রাগে আমি খাবারটুকু জোর করে মুখের মধ্যে পুরে দিলাম, আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল।

সে বহাল তবিয়তেই আছে। খাসা আছে নাওজি। ওর মত হতভাগাদের মরণ নেই। যারা সৎ, যারা সুন্দর, যারা বিনয়ী তারাই আগে ভাগে খতম হয়ে যায়। মাথায় লাঠির বাড়ি মারলেও তোমার নাওজি মরবে না।

মা হাসলেন—তার মানে তুমিই বোধ হয় আগে যাবে।

আমার ঠাট্টা করলেন মা।

আমি কেন মরব? আমি মন্দ, আমি কুৎসিত। আশীটা বছর হেসে-খেলে কাটিয়ে দেব।

সত্যি? তাহলে তোমার মা নব্বই বছর বাঁচবেন বল?

ঘাবড়ে গিয়ে আমি বললাম—নিশ্চয়ই। হতভাগারা বহুকাল বাঁচে, সুন্দরেরা অল্প বয়সে মরে। আমার মা সুন্দরী, কিন্তু আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। কি যে বলব ভেবে পেলাম না। চটে গিয়ে বললাম—কেবল আমায় ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা না? নীচের ঠোঁটটা থর-থর করে কেঁপে উঠল, চোখের জল সামলানো দায়!

সাপের গল্পটা করা উচিত কি না বুঝতে পারছি না। দিন চার পাঁচ আগে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা বাগানের বেড়ার খোঁটায় লুকনো বারো-তেরটা সাপের ডিম খুঁজে পায়। তাদের বিশ্বাস যে, ডিমগুলো বিষাক্ত সাপের। ভেবে দেখলাম, বারোটা সাপ যদি সারাক্ষণ বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়, তবে আগে থেকে সাবধান না হয়ে বাগানে ঢোকা দায় হবে। বাচ্চাদের বললাম—ডিমগুলো পুড়িয়ে ফেলা যাক, কি বল? বাচ্চারা হৈ-হৈ করে আনন্দে নাচতে নাচতে আমার সঙ্গে চলল।

ঝোপের কাছে এক রাশ খড়কুটো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে একটার পর একটা ডিম ছুড়ে দিলাম। বহুক্ষণ গেল, তবু সেগুলো পুড়ল না। বাচ্চারা বেশী করে ডাল-পাতা দিয়ে আগুনটা উস্কে দিল। তবু ডিমগুলো যেমনকার তেমনি রয়ে গেল। রাস্তার ওধারের বাড়ীর মেয়েটি বেড়ার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কি?

সাপের ডিম পুড়োচ্ছি। ভয় করে, পাছে বিষাক্ত সাপে বাড়ী ছেয়ে যায়।

ডিমগুলো কত বড়?

ধবধবে সাদা হাঁসের ডিমের সাইজের।

তাহলে ওগুলো ঢোঁড়া সাপের ডিম। বিষাক্ত নয়। কাঁচা ডিম পোড়ে না, জানো তো?

কি যেন মজার স্বাদ পেয়েছে, এই ভাবে হাসতে হাসতে চলে গেল মেয়েটি।

আধ ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলল—কিন্তু ডিমের অবস্থা যে-কে সেই। আমি বাচ্চাদের আগুনের তাত থেকে টেনে এনে ডিমগুলো প্লাম গাছের গোড়ায় পোঁতবার বন্দোবস্ত করলাম। কতকগুলো নুড়ি যোগাড় করে সমাধির ব্যবস্থা হল। হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে বাচ্চাদের বললাম—এস একটু প্রার্থনা করে নিই—কেমন?

বাচ্চারা আমার কথামত হাত জোড় করে পেছন দিয়ে বসে পড়ল। সব সেরে আমি বাচ্চাদের সঙ্গ ত্যাগ করে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম। সিঁড়ির মাথায় মটরলতার মাচানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মা বললেন—এ কি নিষ্ঠুরতা?

আমি ভেবেছিলাম, ওগুলো বিষাক্ত সাপের ডিম হবে বুঝি, কিন্তু তা নয়, একেবারেই ঢোঁড়াসাপের ডিম। যাই হোক, ওদের ভাল করে সমাধি দিয়েছি। দুঃখ করার আর কোন কারণ নেই। মনে মনে ভাবলাম, কি কুক্ষণেই না মা আমায় ধরে ফেললেন।

কুসংস্কার নয়, তবে দশ বছর আগে, আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ীতে বাবার মৃত্যুর পর থেকে সাপ সম্বন্ধে মায়ের মনে কি এক আতঙ্ক আছে। ঠিক বাবা মারা যাবার আগে একটা ছোট কালো সুতো বিছানার পাশে পড়ে থাকতে দেখে মা অন্যমনস্ক ভাবে সেটাকে তুলে ফেলে দিতে গিয়ে দেখেন সুতো নয়, সাপ। ঘরের পাশে বারান্দা মত পথ দিয়ে সাপটা পিছলে বেরিয়ে গেল। শুধু মা আর আমার ওয়াদা মামা দেখেছিলেন। তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে রইলেন, পাছে শেষ মুহূর্তে বাবার শান্তির ব্যাঘাত হয়। সেইজন্য আমি আর নাওজি সে সময়ে সে ঘরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কিছুই টের পাইনি।

কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—সেদিন আমি বাগানে পুকুরপাড়ে সব ক'টা গাছে সাপ জড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তখন আমার উনত্রিশ বছর বয়স, দশ বছর আগে ছিল উনিশ, নেহাৎ কচি খুকিটি তো নয়! দশটা বছর পার হয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু সেদিন যা যা ঘটেছিল, আজও সে সব কথা আমার মনের মধ্যে পরিষ্কার আঁকা আছে, ভুল হবার যো নেই। পুকুর-পাড়ে ঘুরে ঘুরে পুজোর ফুল তুলছিলাম। আজালিয়া (azaleas) ঝাড়ের কাছে আসতে মগ্‌ ডালের আগায় জড়ানো একটা সাপ চোখে পড়ল। গা'টা শিউরে উঠল। সেখান থেকে এগিয়ে কোরিয়া গোলাপের একটা ডাল কাটতে গিয়ে দেখি, সেখানেও সাপ। পাশাপাশি সারণের গোলাপ, পেপল, ক্রস, উইসটেরিয়া; চেরিগাছ সর্বত্র, প্রত্যেকটি ঝোপে, গাছের ডালে একটা করে সাপ। খুব যে ভয় পেলাম, তা নয়। ভাবলাম আমার মত এই সাপের গুষ্টি বাবার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পরে বাগানের এই সাপেদের কথা ফিসফিস করে মাকে বললাম। তিনি শুধু এক পাশে মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন—যেন কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন। মুখে অবশ্য কোন মন্তব্য করলেন না।

একথাও ঠিক যে, এই দুটি ঘটনার পর থেকে সাপের প্রতি

মায়ের বিতৃষ্ণার সূত্রপাত হয়। এর থেকে এদের সম্বন্ধে মায়ের মনে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও আশঙ্কা বাসা বাঁধে।

আমায় সাপের ডিম পোড়াতে দেখে নিশ্চয় তাঁর মনে অমঙ্গল-আশঙ্কা জাগে। এ কথা খেয়াল হতেই নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার গুরুত্ব বুঝলাম।

হয়ত বা এতদ্দ্বারা আমি মায়ের কোন অমঙ্গলই ডেকে এনেছি—এই দুশ্চিন্তার হাত বেশ কিছুকাল এড়াতে পারিনি। এবং এত সব ঘটনার পর সুজয়ের স্বল্পায়ু হওয়ার মন্তব্য করে আবোল-তাবোল কথা দিয়ে চাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস চোখের জলে শেষ করলাম। পরে প্রাতরাশের বাসনপত্র সরাতে গিয়ে একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করলাম, যেন একটা কাল সাপ মায়ের আয়ুর প্রতি নিশানা রেখে আমার বুকের ভেতর বাসা বেঁধেছে। সেদিনই বাগানে একটা সাপ দেখলাম। সকালটা ভারি সুন্দর, স্নিগ্ধ দেখে রান্নাঘরের পাট সেরে, একটা বেতের চেয়ার মাঠে টেনে নিয়ে বসে বসে উল বুনতে সাধ হল। চেয়ার হাতে বাগানে পা দিতেই ক্যানার ঝাড়ের পাশে একটা সাপ নজরে পড়ল। প্রথম কথা মনে হল ফিরে যাই, গাড়ী-বারান্দায় চেয়ার টেনে সেখানেই বোনা নিয়ে বসলাম। বিকেলে বাগানের ওধারে গুদোমের লাইব্রেরী থেকে মারী লরেন্সিনের এক ভল্যুম ছবির বই আনতে গিয়ে দেখি, একটা সাপ মন্থর গতিতে মাঠ পেরিয়ে চলেছে। সেই সকালের সুন্দর, সাবলীল সাপটাই পরম শান্তিতে চলেছে। বুনো গোলাপের ছায়ায় এসে, মাথা খাড়া করে আগুনের শিখার মত ভয়ঙ্কর জিভ বের করে নাড়তে লাগল। কি যেন খুঁজছে মনে হল, কিন্তু একটু পরেই মাথা নীচু করে পরম ক্লান্তিভরে মাটিতে পড়ে গেল। মনে মনে বললাম—নিশ্চয় সাপিনী! তখন পর্য্যন্ত তার সৌন্দর্য্যটাই আমার চোখে পড়ছিল; গুদোম থেকে ছবির বইখানা বের করে ফেরার পথে সাপের জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম, কিন্তু সে ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সন্ধ্যেবেলা মায়ের সঙ্গে চা খেতে বসেছি, বাগানের দিকে চোখ পড়তে দেখি, পাথরের সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে আবার সেই সাপ সন্তর্পণে আত্মপ্রকাশ করছে!

মা-ও লক্ষ্য করছিলেন—ঐ কি সেই সাপ? বলতে বলতে দৌড়ে আমার পাশে এসে, আমার হাত ধরে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। চট করে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আমার কাছে ধরা পড়ে গেল।

আমি বললাম—অর্থাৎ সেই ডিমেদের মা?

অতিকষ্টে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

নিঃশব্দে দম বন্ধ করে আমরা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাপটা অলস ভাবে পাথরের ওপর গুটিয়ে শুল এবং তার পরেই নড়তে সুরু করল। এলোমেলো গতিতে, দুর্বলভাবে সিঁড়ি পেরিয়ে ক্যানার ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ফিস-ফিস করে বললাম—সকাল থেকে এটা বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। হতাশ ভাবে বললেন—ঠিক তাই হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি বেচারা ডিমগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কি বলব ভেবে না পেয়ে বোকার মত হেসে উঠলাম। অস্তগামী সূর্য্যের আভা মায়ের চোখ দুটিতে গাঢ় নীলের ছায়া ফেলেছে। ঈষৎ ক্রোধের ভাব ফুটে মুখখানা এমন অপরূপ হয়েছে যে, ছুটে গিয়ে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। এইমাত্র যে সাপটাকে আমরা দেখলাম, মনে হ'ল মায়ের এখনকার চেহারার সঙ্গে তার কোথায় মিল আছে। কেন যে অনুভব করলাম কুৎসিত সাপটা আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, শেষ পর্য্যন্ত সে একদিন বিষাদময়ী মা সাপটিকে আত্মসাৎ করবে।

মায়ের নরম, সুগঠিত কাঁধের ওপর হাত রাখলাম। সেসময়ে আমার শরীরের ভেতর যে দারুণ আলোড়ন বয়ে গেল, তা বোঝাবার ভাষা আমার জানা নেই।

যে বছর জাপান বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে, সে বছর ডিসেম্বর মাসে আমরা নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ইজু (Izu)-তে চিনা-প্যাটার্ণের এই বাংলোয় উঠে এলাম। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মায়ের ছোট ভাই 'ওয়াদা'মামা, বর্ত্তমানে ইনিই মায়ের একমাত্র রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়—আমাদের সম্পত্তির তদারক করছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষে মামা মাকে জানালেন, দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে, আগের মত বাবুয়ানা আর চলবে না। আমাদের বাড়ী বিক্রি করে চাকর-বাকরকে জবাব দিয়ে দিতে হবে; সুতরাং দেশে-গ্রামে ছোট্ট একখানা বাড়ী কিনে দু'জনে নিরিবিলিতে থাকাই ভাল। টাকা-পয়সা সম্বন্ধে মা শিশুর চেয়েও অজ্ঞ ছিলেন, কাজেই ওয়াদামামার এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি যেমন ভাল বোঝেন, সেই ব্যবস্থাই করতে বলে দিলেন। নভেম্বর মাসে মামার কাছ থেকে এক জরুরী ডাকের চিঠি এল, ভাইকাউন্ট কাওয়াটা (Viscount Kawata)র বাড়ী বিক্রির খবর নিয়ে। বাড়ীর ভিৎ যথেষ্ট উঁচু, চার পাশের দৃশ্য ভাল, আধ একর আন্দাজ ধানের জমি আছে। এ ছাড়া জায়গাটা প্লাম ফুলের জন্য বিখ্যাত। শীতে উষ্ণ, গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকে।

ওয়াদামামা চিঠির শেষ দিকে লিখেছিলেন—আমার বিশ্বাস, জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হবে। তবু ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। কাল একবার আমার আপিসে আসতে পার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মা, তুমি যাবে?

অতি দুঃখে মৃদু হেসে মা জবাব দিলেন—যাব বৈ কি! ডেকেছে যে!

দুপুরের পরেই মা রওনা হলেন। আমাদের পুরনো ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে গেল এবং সন্ধ্যে আটটা আন্দাজ মাকে ফিরিয়ে আনল।

আমার ঘরে ঢুকে ডেস্কে ভর দিয়ে এমন ভাবে বসে পড়লেন যে, মনে হল এখুনি বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

সব ঠিক হয়ে গেল। এইটুকুই শুধু বললেন।

কি ঠিক হয়ে গেল?

সব।

কিন্তু চমকে উঠলাম—বাড়ীটা একবার চোখের দেখাও দেখলে না?

ডেস্কের ওপর কনুই তুলে, হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা উত্তর দিলেন—তোমার ওয়াদামামা বলছেন জায়গাটা ভালই। মনে হচ্ছে চোখ খোলবার ফুরসৎ

পাব না, তার আগেই সেখানে গিয়ে উঠতে হবে। এতক্ষণে মাথা তুলে মৃদু হাসলেন, মায়ের মুখখানা অত্যন্ত কাতর ও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ওয়াদামামার প্রতি মায়ের অন্ধ বিশ্বাস দেখে বিমূঢ় ভাবে আমি উত্তর দিলাম—তা তো বটেই।

তাহলে তুমিও চোখ বুজেই থেকো।

এবার আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম, কিন্তু হাসি থামতেই রাজ্যের অন্ধকার মনের ওপর চেপে এল।

এর পর থেকে প্রতিদিন কুলিরা এসে বাড়ী বদলের জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করে। মামা একদিন নিজে এসে বিক্রির মালপত্র-গুলোর ব্যবস্থা করে গেলেন। আমাদের ঝি 'ওকামী' আর আমি জামাকাপড় গোছান, আবর্জনা বাগানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা, এ ধরণের কাজে ব্যস্ত রইলাম।

মা কিন্তু মোটেই সাহায্য করতে রাজী হলেন না। নিজের ঘরে এটা-ওটা করে কাটালেন।

একদিন আমি সাহস সঞ্চয় করে, একটু রাগের মাথায় জিজ্ঞেস করে বসলাম, ব্যাপার কি? তোমার কি 'ইজু'তে যেতে ইচ্ছে নেই না কি? একান্ত উদাস ভাবে জবাব দিলেন—না। যাত্রার তোড়জোড় করতে দিন দশেক কেটে গেল। এক সন্ধ্যায় আমি আর ওকামী কিছু বাজে কাগজ, খড় ইত্যাদি বাগানে নিয়ে পোড়াচ্ছি, এমন সময় মা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং নিঃশব্দে জ্বলন্ত আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। একটা ঠাণ্ডা পশ্চিমা হাওয়া উঠেছিল—ধোঁয়াটা মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম, মায়ের এমন রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারা বহু কাল চোখে পড়েনি। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—মা, তোমায় তো মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না?

হাসিমুখেই জবাব দিলেন—ও কিছু নয়। তার পর আবার নিঃশব্দে ঘরে ফিরে গেলেন। সে রাত্রে আমাদের বিছানা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল বলে ওকামী একটা সোফায় শুল। আমি আর মা প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে আনা বিছানা মায়ের ঘরে পেতে শুলাম। মায়ের দুর্বল কণ্ঠস্বরে ভয় পেলাম। মা বললেন—কেবল তোমার জন্যেই যাওয়া। তুমি আছ বলেই আমি ইজুতে যেতে রাজী হয়েছি।

অভাবনীয় এই মন্তব্যে ঘাবড়ে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলাম—আর ধর যদি আমি না থাকতাম?

হঠাৎ মা কেঁদে ফেললেন—আমার পক্ষে সবচেয়ে সোজা রাস্তা ছিল মৃত্যু। তোমার বাবা এখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, এখানে মরতে পারলে কোন দুঃখ ছিল না। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা কান্নায় জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্চারণ করলেন।

এ পর্য্যন্ত মায়ের এমন অসহায় রূপ কোন দিন আমার চোখে পড়ে নি, এমন ভাবে কান্নায় ভেঙ্গেও পড়েন নি। বাবার মৃত্যুর সময় না, আমার বিয়ের সময় না, সন্তান পেটে নিয়ে যেবার তাঁর কাছে আসি তখনও না, হাসপাতালে যখন মরা ছেলে হ'ল, তখনও না; পরে যখন অসুখ হয়ে দীর্ঘকাল শয্যা নিই তখনও না। এমন কি নাওজি যখন অত্যন্ত অন্যায় কাজ করে তখনও মাকে এত কাতর দেখিনি। বাবার মৃত্যুর পর এই দশ বছর ধরে মা ঠিক বাবার জীবিতকালের মতই শান্ত-স্বচ্ছন্দ ভাবে কাটিয়েছেন, নাওজি আর আমি সেই সুযোগে খুশি মত বেড়ে উঠেছি, কখনও কিছুতে মাথা ঘামাই নি। এখন মায়ের টাকা ফুরিয়েছে, এতটুকু অসন্তোষ প্রকাশ না ক'রে সমস্ত টাকা আমাদের দুই ভাই-বোনের জন্য খরচ করেছেন। আজ সংসার গুটিয়ে সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় অজানা এক ছোট্ট বাড়ীতে নতুন করে সংসার পাততে বাধ্য হয়েছেন। মা যদি কৃপণ হ'তেন, আমাদের বঞ্চিত করে, আর পাঁচ জনের মত গোপন অর্থাগমের উপায় চিন্তা করতেন, তাহলে আজ সংসার উল্টে গেলেও মরণকে এমন আকুল ভাবে ডাক দিতেন না। জীবনে আজ প্রথম আবিষ্কার করলাম অর্থাভাব কি মারাত্মক, শোচনীয় অসহায় অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। বুকের ভেতর তোলপাড় হয়ে গেল। কিন্তু এত উদ্বেগেও চোখে জল এল না। আমার মনের এই অবর্ণনীয় অবস্থাকেই বোধ হয় মানব-জীবনের মর্য্যাদাবোধ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেইখানে ছাতের দিকে চেয়ে অনড় অচল ভাবে শরীরটাকে পাথরের মত শক্ত করে শুয়ে রইলাম।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, পরদিন মায়ের শরীর বেশ খারাপ হল। এটা-ওটা নিয়ে দেরী করতে লাগলেন যেন, এবাড়ীতে প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁর কাছে অমূল্য—কিন্তু ওয়াদামামা এসে জানালেন, ইজুতে চলে যেতে হবে। প্রায় সব জিনিষই আগে রওনা হয়ে গেছে। স্পষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে মা কোটখানা গায়ে দিলেন, তারপর কোন কথা না বলে ওকামী এবং আমাদের বাকী চাকরবাকর—যারা আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল—তাদের দিকে ফিরে মাথা হেলিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন।

ট্রেনটা অপেক্ষাকৃত খালিই ছিল, আমরা বসার জায়গা পেলাম। মামার যেন আনন্দ উছলে উঠছে—গুন-গুন করে 'নো' পালার গান ভাঁজছেন। এদিকে মায়ের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ দুটি নীচু করে উদাসীন ভাবে বসে আছেন। নাগাওকায় (Nagaoka) মিনিট পনেরো যাবার পর নেমে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। ছোট্ট একটা গ্রামের দিকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের চড়াই উঠে গেছে—তার শেষ প্রান্তে চীন ষ্টাইলে তৈরী সুন্দর একটা বাংলো চোখে পড়ল। উঠে একটা দম নেবার আগেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর জায়গা। ভেতরে ঢোকবার আগে একটু থেমে মা বললেন—সত্যি তাই। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর দৃষ্টিতে প্রসন্নতা নেমে এল। আত্মপ্রসাদে গদগদ হ'য়ে মামা বললেন—প্রথম কথা হল বাতাসটা ভাল, যাকে বলে বিশুদ্ধ বায়ু।

মা হেসে ফেললেন—তাই তো, চমৎকার প্রাণজুড়নো হাওয়া! আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

ভেতরে গিয়ে টোকিও থেকে আমাদের যে জিনিষ পত্র এসেছিল—সেগুলো পেলাম। বাড়ীর সামনেটা প্যাকিং কাঠের বাক্সের পাহাড় জমেছে। মামা আনন্দে একেবারে দিশাহারা হয়ে আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন—একবার বাইরে চেয়ে দেখ—কি অপরূপ দৃশ্য!

তখন বিকেল প্রায় তিনটে, শীতের সূর্য্য বাগানে ময়দানটার

গায়ে স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। ময়দান থেকে এক ধাপ সিঁড়ি গ্রাম গাছে ঘেরা ছোট একটি পুকুরের দিকে নেমে গেছে; তারপর আছে কমলা লেবুর বাগান। একটা মেঠো রাস্তার পাশে ধানক্ষেত, আঙুর-ক্ষেত, সবশেষে—দূরে সমুদ্র চোখে পড়ে। বসার ঘরে বসে সমুদ্রকে ঠিক আমার বুক বরাবর উঁচু মনে হ'ল।

নিস্তেজ গলায় মা বললেন—ভারী স্নিগ্ধ দৃশ্য! অত্যধিক খুশি গলায় আমি সায় দিলাম—নিশ্চয়ই বাতাসের গুণ। টোকিও'র সূর্য্যের আলোর সঙ্গে এখানকার আলোর কত তফাৎ দেখেছ? যেন রেশমী কাপড়ে ছেঁকে সূর্য্য তার রশ্মি আমাদের কাছে চালান করে দিচ্ছে।

নীচের তলায় দু'খানা বড় বড় ঘর—একখানা চীনা-প্যাটার্ণের বৈঠকখানা, আর একখানা বসার ঘর, এছাড়া রান্নাঘর, বসার ঘর, স্নানের ঘর, খাবার ঘর সবই আছে। দোতলায় বিদেশী কায়দার একটি ঘরে প্রকাণ্ড এক বিছানা।

গোটা বাড়ীটা এই, তবু আমার মনে হল আমাদের দুজনের পক্ষে বাড়ীখানা কিছু নিন্দের নয়। এমন কি, নাওজি ফিরে এলেও বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

সে গ্রামে একটিমাত্র হোটেল, মামা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে সেখানেই গেলেন। শীগ গিরই তিন জনের মত কিছু খাদ্য এসে পড়ায় তিনি বসার ঘরেই বেশ গুছিয়ে নিয়ে খেতে সুরু করে দিলেন। মামার সঙ্গে হুইস্কি ছিল, তার সাহায্যে আহার্য অনায়াসে পাকস্থলীর পথ খুঁজে নিল। উছলে ওঠা খুশির তোড়ে তিনি এবাড়ীর প্রাক্তন মালিক ভাই কাউন্ট কাওয়াটার সঙ্গে চীন অভিযানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করলেন। মা নামেই খেতে বসলেন এবং আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিস-ফিস করে বললেন—আমি একটু শুতে চাই।

আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে থেকে বিছানাটা টেনে বের করে মায়ের সঙ্গে ধরাধরি করে পেতে ফেললাম। তাঁকে দেখে কেমন যেন বুকটা ছাঁৎ করে উঠতে থার্মোমিটার বের করে তাপ নিয়ে দেখি ১০২° ডিগ্রি।

মামা পর্য্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। যাই হোক, তিনিই গ্রামের মধ্যে ডাক্তার খুঁজতে বেরোলেন। মাকে ডাকাডাকি করতে তিনি জ্বরের ঘোরে মাথা নাড়লেন মাত্র।

মায়ের ছোট হাতখানি নিজের মুঠিতে চেপে ধরে কেঁদে ফেললাম। মা আমার এত দুঃখী, এত মর্মান্তিক দুঃখী; না গো আমরা দু'জনেই দুঃখী মানুষ। আমার কান্না আর থামতে চায় না। কাঁদতে কাঁদতে মনে হল মায়ের সঙ্গে আমিও এই মুহূর্ত্তে মরণকে বরণ করে নিই। আর কিসের আশায় বাঁচা, নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে আমাদের বাঁচবার অর্থ ঘুচে গেছে।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে মামা এক গ্রাম্য ডাক্তার নিয়ে এলেন। ভদ্রলোককে যথেষ্ট বৃদ্ধ বলেই মনে হ'ল। সেকেলে পোষাকী জাপানী কাপড় গায়ে ছিল।

নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। যাই হোক, হ'লেও ভয়ের কিছু নেই। অনিশ্চিত মন্তব্য করে মাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে গেলেন।

পরদিনও জ্বর নামল না। মামা আমার হাতে দুই হাজার ইয়েন্ (জাপানী ডলার) দিয়ে বলে দিলেন হাসপাতালে পাঠাতে হ'লে টেলিগ্রাফ করে তাঁকে খবর দিতে। সেদিনই তিনি টোকিওতে ফিরে গেলেন। প্রয়োজনীয় যৎসামান্য বাসন-পত্র বের করে সামান্য ভাতের কাথ তৈরী করলাম। মাত্র তিন চামচ মুখে দিয়ে মাথা হেলিয়ে মা আর দিতে বারণ করলেন। দুপুরের আগে আবার ডাক্তার এলেন। এবার পোষাকের ঘটা কিছু কম, তবু হাতের দস্তানাজোড়া ভোলেন নি।

আমি প্রস্তাব করলাম হয়ত বা মা'কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। ডাক্তার বললেন—না, তার দরকার হবে না। আজ একটা কড়া ইন্‌জেকশন দেব, তাহেই জ্বরটা নেমে যাবে। আগের দিনের মত তাঁর আজকের কথাতেও বিশেষ ভরসা পেলাম না। কড়া ইন্‌জেকশন দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

বিকেলের দিকে মায়ের মুখখানা টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠল—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘাম হ'ল। সম্ভবতঃ এ সেই আশ্চর্য্য ইন্‌জেকশনের গুণ। রাত্রে মা'য়ের জামা ছাড়িয়ে দিচ্ছি, মা বলে উঠলেন—কে জানে—হয়ত উনি মস্ত বড় ডাক্তার।
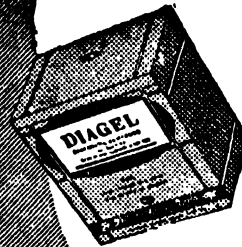
জ্বরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এল। আনন্দের আতিশয্যে দৌড়ে গ্রামের হোটেল থেকে বারোটা ডিম কিনে আনলাম। কয়েকটা নরম সেদ্ধ ক'রে মাকে খেতে দিলাম। মা তিনটে ডিম আর একবাটি ভাতের কাথ খেয়ে ফেললেন।

পরদিন সেই ডাক্তার আবার তাঁর জমকালো পোষাক পরে এসে উপস্থিত হ'লেন।

তাঁর ইনজেকশনের গুণের কথা শুনে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। ভাবখানা ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম। তারপর সযত্নে মাকে পরীক্ষা করে আমার দিকে ফিরে বললেন—এখন তোমার মা সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর যা ইচ্ছে করে খেতে দাও।

এমন মজা করে কথা বলেন ভদ্রলোক যে হাসি চেপে রাখা দায়। দোর পর্য্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে দেখি, মা দিব্যি বিছানায় ওপর উঠে বসেছেন। নিজের মনেই বললেন—সত্যি ভদ্রলোক বিচক্ষণ ডাক্তার বটে! আমার আর একটুও অসুখ নেই। মুখের ওপর ভারী একটা খুশির ভাব ছেয়ে আছে।

মা গো, দরজাটা খুলে দিই? বাইরে বরফ পড়ছে। ফুলের পাঁপড়ির মত বড় বড় বরফ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। জানালা খুলে দিয়ে মায়ের পাশে বসে সেদিকে চেয়ে রইলাম। আবার যেন আপন মনেই বললেন—আর আমার কোন অসুখ নেই। তোমার পাশে গিয়ে এই ভাবে যখন বসি, তখন মনে হয় এত দিন যা ঘটে গেছে, সে সব স্বপ্ন। সত্যি বলছি—বাড়ী বদলের কথা ভাবতেও আমার খারাপ লেগেছিল, অসহ্য মনে হয়েছিল। আমাদের নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাসায় আর একটা দিন, এমন কি আধখানা দিন বেশী থাকতে পেলে আমি বর্ত্তে যেতাম। ট্রেণে উঠে অবধি আধমরা অবস্থা, এখানে প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত্ত ভাল লাগার পরেই বুকের ভেতরটা টোকিওর জন্ম কেঁদে উঠল। তারপর সব শূন্য ঠেকল। সাধারণ কোন রোগ আমার নয়। ঈশ্বর যেন আগের আমাকে মেরে ফেলে, সম্পূর্ণ নতুন করে প্রাণ দিলেন।

সেদিন থেকে আজ অবধি আমরা দু'জন পাহাড়ের গায়ে এই নিরালা কুটীরে দিন কাটাচ্ছি। আমরা রান্না করি, বারান্দায় বসে উল বুনি, চীনা ঘরে বসে বই পড়ি; এক কথায় বলতে গেলে বিশ্বসংসারের বাইরে একান্ত বৈচিত্রহীন জীবন যাপন করি। ফেব্রুয়ারিতে সারা গ্রামখানা প্লাম্ ফুলে ছেয়ে গেল। মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বাতাসহীন শান্ত দিন একটির পর একটি করে পার হয়ে গেল। মাসের শেষ অবধি ফুলেরা গাছের ডাল আলো করে রইল। যতবারই কাচের সব দরজা খুলে দিই, ততবারই সারা বাড়ী ফুলের গন্ধে মেতে ওঠে।

মার্চ্চের শেষে প্রতি সন্ধ্যায় একটা বাতাস কোথা থেকে ছুটে আসে। আমি আর মা গোধূলি বেলায় চা খেতে বসলে পাঁপড়ির দল জানালার ভেতর দিয়ে উড়ে এসে আমাদের পেয়ালায় পড়ে। এখন এপ্রিল মাস, বারান্দায় বুনতে বসে আমাদের চাষবাসের কথা হয়। মা আমায় সাহায্য করতে চান। হঠাৎ মায়ের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, আমরা মরে আবার ভিন্ন মানুষ হয়ে বেঁচে উঠেছি। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে যীশুর মত পুনর্জন্ম সম্ভব নয়। মা বলেছিলেন অতীতকে তিনি ভুলে গেছেন, অথচ আজই সকালে স্যুপ খেতে বসে 'নাওজি'র কথা মনে করে কেঁদে উঠেছিলেন। আমার মন থেকেই কি আর অতীতের ক্ষতের দাগ মিলিয়ে গেছে? তা নয়।

উঃ! আমি সোজাসুজি মনের কথা উজাড় করে সমস্ত লিখতে চাই। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, পাহাড়ী এই বাড়ীতে যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজিত, তা মিথ্যা, ছদ্ম। মা ও আমার বিশ্রামের এই স্বল্প অবকাশ যদি ভগবানের ইচ্ছা বলেই ধরে নিই, তবু আসন্ন বিপদের কালো ছায়া যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, সে চিন্তার হাতও যে এড়াতে পারি না। মা খুশির ভাণ করে, কিন্তু দিন দিন তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন। আর আমার বুকের ভেতর যে কাল সাপ বাসা বেঁধেছে, মায়ের আয়ু নিয়ে সে দিনে দিনে বেড়ে উঠছে, আমার সমস্ত প্রতিকূল চেষ্টা ব্যর্থ করেই সে পরিপুষ্ট হচ্ছে। এমন যদি হ'ত যে, বিশেষ কোন ঋতুর সঙ্গে এর আবির্ভাব হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেত। সাপের অতগুলো ডিম পোড়াবার কথা আদৌ যে মনে এসেছে, তা' থেকে আমার মানসিক অবস্থা অনুমান করে নেওয়া শক্ত নয়। আমার প্রতিটি কাজ মায়ের দুঃখ বাড়াবার এবং তাঁর শক্তি ক্ষয় করার পক্ষে যথেষ্ট।

ভালবাসা—একবার কলম দিয়ে যখন শব্দটা বেরিয়ে গেছে, তারপর আর এগুনো চলে না। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্পনা রায়

যে পাখী ফেরে না আর

শ্রীউমাপদ রায়-চৌধুরী

বহু দূরে সমুদ্র-নিভৃতে নারিকেল-বীথি ঘেরা দ্বীপের আকাশে
হলুদ ডানায় রাঙা রোদের সুরভি এক ঝাঁক নীড়-ভোলা পাখী,
নিরুদ্দেশ প্রান্তিক সঙ্গীত জীবনের ক'টি দিন; দিগন্ত বাতাসে
নরম পালকে মাখা জ্যোৎস্না-পরাগ—চ'লে যায় আর ফেরে না কি!

এক দিন ফিরে-আসা নতুন বন্দরে রৌদ্রময়ী কী পাষাণ মাটি,
উত্তল বাদামী বুকে ধূসর স্বপন পালছেঁড়া ভঙ্গুর মাস্তল
শুনেছে কি ঋজু কোনো নক্ষত্রের গান প্রাণ-ধর্ম শুধু সত্য খাঁটি!
চিত্তের চৈতালী দিনে তবু তো খোঁপায় ঝরোঝরো শিরীষের ফুল।

ছায়াঘন দ্বীপ সেথা' একটি পৃথিবী দু'জনার একান্ত নিরালা,
নিঃসীম তরঙ্গ-ছলোচ্ছল—সন্ধ্যায় মালতী-যূথী পাপড়ি-শিথিল
অনেক প্রান্তর ধূ-ধূ পার হ'য়ে থেমেছে সেখানে দু'টি ডানা নীল—

দুর্লভ মানস-তীর্থ চির-কল্লোলক কোথা কোন্ অধিত্যকা-পার,
জারুলের বন-শেষে বিদায়ের চাঁদ তার পর রক্তিম প্রত্যূষ
শিশিরের সুরে হেথা ভিজে ঘাস-মাঠ, পেয়েছে কি প্রেম নিষ্কলুষ
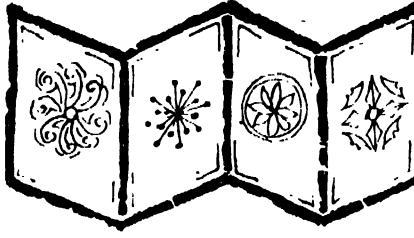
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

গান্ধীজির উত্তর—৩

বিড়লা হাউস,
নূতন দিল্লী,
২, ৪, ১৯৩৯,

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৩১শে মার্চের এবং তাহার পূর্ব্বেকার পত্র দুইটি পাইয়াছি। তুমি স্পষ্ট কথা বলিয়াছ এবং নিজ অভিমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্যই আমি তোমার পত্রগুলিকে পছন্দ করি।

যে অভিমতগুলি তুমি প্রকাশ করিয়াছ তাহা আমার এবং অন্যান্যদের মতের এতই পরিপন্থী যে, একটা মীমাংসার সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মতবাদকে সুস্পষ্টভাবে দেশের লোকের নিকট উপস্থাপিত করা উচিত। আর যদি সততার সহিত উহা করা হয়, তাহা হইলে মত-সঙ্ঘর্ষের পরিণতি গৃহযুদ্ধ কেন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধ রহিয়াছে তাহা অন্যায় নহে, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাবই অন্যায়। সময়ের দ্বারাই ইহার প্রতিকার হইবে, কালই শ্রেষ্ঠতম নিরাময়চারী। যদি আমাদের মধ্যে সত্যকার অহিংসা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহযুদ্ধ ত নহেই, তিক্ততার সৃষ্টিও হইতে পারে না।

সকল দিক বিচার করিয়া আমি এই অভিমত পোষণ করি যে, তোমার মতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে লইয়া এখনি একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তোমার গঠন করা উচিত। তোমার কার্য্যক্রম নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়া তাহা আগামী এ, আই, সি, সির সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত। উক্ত কমিটি যদি তোমার কার্য্যক্রম গ্রহণ করে তাহা হইলে তোমার পক্ষে কাজ চালাইয়া যাওয়া সহজ হইবে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে। অপর পক্ষে, যদি কমিটি তোমার কার্য্যক্রম স্বীকার না করে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে পদত্যাগ করিয়া কমিটিকে তাহার সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া উচিত। তখন তুমি অবাধে, তোমার নিজের পদ্ধতিতে, দেশবাসীকে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া বলিতে পারিবে। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের কথা না ধরিয়াই আমি এই পরামর্শ তোমাকে দিতেছি।

এখন তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিই। যখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব পেশ করা হয়, তখন আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। মথুরা দাস সে সময়ে রাজকোটে ছিলেন। তিনি একদিন সকালে আমার নিকট এই সংবাদ আনিলেন যে, পুরাতন নেতাদের প্রতি আস্থাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব পেশ করা হইবে। আমার সম্মুখে তখন প্রস্তাবের খসড়াটি ছিল না। আমি বলিয়াছিলাম যে,, যতদূর দেখিতেছি তাহাতে ভালই হইবে, কারণ, সেবাগ্রামে আমাকে বলা হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রপতি-পদে তোমার নির্ব্বাচন তোমার প্রতি ততটা আস্থাজ্ঞাপক নহে, যতটা পুরাতন নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক বিশেষ করিয়া সর্দ্দারের প্রতি। ইহার পর মৌলানা সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য যখন আমি এলাহাবাদ যাই, তখনই আমি প্রস্তাবটির আসল খসড়াটি দেখি।

আমার মর্য্যাদার প্রশ্ন এখানে উঠে না। উহার কোনও নিজস্ব মূল্য নাই। আমার মনোভাব সম্পর্কে যদি সন্দেহ পোষণ করা হয়, আমার নীতি বা কার্য্যক্রম যদি দেশবাসী অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে মর্য্যাদার নাশ অবশ্যই হইবে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের কার্য্যের সমষ্টিগত ফলের গুণ বা দোষ অনুসারেই ভারতের উত্থান বা পতন হইবে। ব্যক্তি যতই বড় হউন না কেন, তাঁহার নিজস্ব কোনও মূল্য নাই—তাঁহার মূল্য এই কোটি কোটি নর-নারীর প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠির বিচারে। সুতরাং এ প্রসঙ্গ আলোচনার বিষয়-বহির্ভূত করা যাউক।

তোমার মতে, এখনকার মত দেশ আর কখনও অহিংস হয় নাই। আমি তোমার এই অভিমত পুরাপুরি অস্বীকার করি। যে বায়ু আমি নিঃশ্বাসে লইতেছি, তাহার মধ্যেও আমি হিংসার গন্ধ পাইতেছি। কিন্তু সেই হিংসা এখন একটি সূক্ষ্মরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস নিম্নস্তরের হিংসাবাদ। হিন্দু এবং মুসলমানগণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদ সেই হিংসারই প্রকাশ। আমি আরও উদাহরণ দিতে পারি।

কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতির পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। আমার মনে হয়, দুর্নীতি বাড়িতেছে। এ বিষয়ে পুরাপুরি তদন্তের অনুরোধ আমি গত কয়েক মাস ধরিয়া করিয়া আসিতেছি।

এই পরিস্থিতিতে অহিংস গণ-আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ আমি লক্ষ্য করিতেছি না। চরমপত্রের পশ্চাতে যদি উপযুক্ত কার্য্যকরী শক্তি না থাকে, তাহা হইলে উহা একেবারে মূল্যহীন।

কিন্তু পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ বলিয়াছি এখনও সেরূপ বলিতেছি আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং তজ্জন্যই সম্ভবত: অতি সাবধানী এবং ভীরু হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু তোমার আছে যৌবন এবং যৌবন-জাত বেপরোয়া আশাবাদ। আমি আশা করি, তোমার পন্থাই ঠিক, আমার পন্থা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হউক। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেসের অবস্থা যেরূপ তাহাতে তাহার পক্ষে উদ্দেশ্য সিদ্

হওয়া অসম্ভব। উহার পক্ষে যথার্থভাবে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তোমার ভবিষ্যদ্বাণী যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমার আসন এখন পশ্চাতে, সত্যাগ্রহী নেতারূপে আমার দিন চলিয়া গিয়াছে।

ক্ষুদ্র রাজকোট ব্যাপারটির উল্লেখ করিয়াছ বলিয়া আমি আনন্দিত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা উহার দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্পর্কে যে পন্থা আমি গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি আদৌ অনুতপ্ত নহি। আমি অনুভব করিতেছি যে, উহার বিশেষ জাতীয় মূল্য আছে। রাজকোটের জন্য আমি অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন বন্ধ করি নাই। কিন্তু রাজকোট আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। উহা আমাকে পথ দেখাইয়াছে। স্বাস্থ্যের জন্য আমি দিল্লীতে আসি নাই। অনিচ্ছায় আমি দিল্লীতে আছি এবং প্রধান বিচারকের রায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। বড়লাট আমার নিকট তাঁহার শেষ তারবার্ত্তায় যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সফল করিবার জন্য যতক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ না করা হয়, ততক্ষণ দিল্লীতে থাকা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। হয়ত আমি কোনওরূপ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন না-ও হইতে পারি। আমি যদি সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তিকে তাহার কর্ত্তব্য সমাধা করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া থাকি, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করা হইল কি না তাহা দেখিবার জন্য দিল্লীতে অবস্থান করিতে আমি বাধ্য। যে দলিলের অর্থ সম্পর্কে ঠাকুর সাহেব সন্দেহের অবকাশ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাষ্য করিবার জন্য প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করার মধ্যে আমি কোনও অন্যায় দেখি না। প্রসঙ্গতঃ জানাইতেছি যে, প্রধান বিচারকরূপে নহে, বড়লাটের বিশ্বাসভাজন দক্ষ আইনজ্ঞরূপ স্যার মরিস দলিলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। বড়লাটের মনোনীত ব্যক্তিকে বিচারকরূপে স্বীকার করিয়া আমার মনে হয়, আমি শালীনতার এবং জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছি এবং উহাপেক্ষা যাহা আরও প্রয়োজনীয়, এ-বিষয়ে আমি বড়লাটের দায়িত্ব বাড়াইয়া দিয়াছি।

আমাদের মধ্যে যে ভীষণ মতানৈক্য আছে, সে-সম্পর্কে আলোচনা করিলাম বটে কিন্তু এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তদ্দ্বারা আদৌ ক্ষুণ্ণ হইবে না। এই পার্থক্যের মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে, আমার বিশ্বাস তাহা আছে, তাহা হইলে, পার্থক্যজনিত ধাক্কা উহা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। —বাপু।

নেতাজীর পত্র—৪

জিয়ালগোড়া পোঃ,
জেলা মানভূম, বিহার,
৬ই এপ্রিল, ১৯৩৯।

প্রিয় মহাত্মাজী,

আমার মেজ দাদা শরৎকে এক পত্রে আপনি উভয় পক্ষের নেতাদের মধ্যে এক প্রাণখোলা আলোচনার পরামর্শ দিয়াছিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার পথ পরিষ্কার হয়। ইহা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের পরামর্শ এবং অতীতে যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, আমি এ-বিষয়ে যথাসাধ্য করিতে রাজী আছি। এ-বিষয়ে আমার দ্বারা কিছু করা উচিত মনে করেন কিনা এবং উচিত মনে করিলে, কি করা উচিত—সে সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাইবেন কি? আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এই ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টায় আপনার প্রভাব এবং ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট কার্য্যকরী হইবে। আমরা ঐক্যসাধনের সকল আশা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আপনি কি সমগ্র শক্তি নিয়োগে শেষ চেষ্টা করিবেন না? এখনও দেশবাসী আপনাকে কি দৃষ্টিতে দেখে তাহা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপনি কোনও দলের পক্ষপাতিত্ব করেন না। সুতরাং যুধ্যমান দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জনসাধারণ এখনও আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, আপনার উপদেশটি নৈরাশ্যের মন্ত্রণা। ঐক্যের সকল আশা উহা নির্ম্মূল করিবে। বিভেদ হইতে উহা কংগ্রেসকে রক্ষা করিবে না, উপরন্তু ঐরূপ সঙ্কটের জন্য পথ সহজ করিয়াই দিবে। বর্ত্তমান অবস্থায় একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেওয়ার অর্থ দলগুলিকে এখনই বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেওয়া। উহা কি এক মারাত্মক দায়িত্ববোধ নহে? আপনি কি এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন যে, একযোগে কাজ অসম্ভব? আমাদের পক্ষের অভিমত এই যে, তাহা আমরা মনে করি না। "ক্ষমা করা এবং ভুলিয়া যাওয়ার জন্য" আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। একই আদর্শের জন্য একযোগে কাজ করিতে আমরা ইচ্ছুক। আমাদের সকলের মধ্যে এক সম্মানজনক আপোষ মীমাংসার জন্য আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি। আমি ইতিপূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি এবং লিখিয়াও জানাইয়াছি যে, কংগ্রেসের সংগঠন এখন যেরূপ আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার বিশেষ রূপ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা না থাকায়, সর্ব্বদলীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইবে। এই কমিটিতে যথাসম্ভব সকল দলের প্রতিনিধির স্থান থাকিবে।

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি এইরূপ সর্ব্বদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পক্ষপাতী নহেন। আপনার এই বিরোধিতা কি নীতির দিক দিয়া (যেমন, আপনার মতে একযোগে কাজ অসম্ভব) অথবা উহা কি আপনার এই অভিমতের জন্য যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীবাদীদের (আমি এই বাক্যাংশটির ব্যবহার এইজন্য করিলাম যে, উহাপেক্ষা উত্তম শব্দ পাই নাই এবং এজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন) প্রতিনিধিত্ব অধিক থাকা প্রয়োজন? শেষের কারণটি সত্য হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাহা জানাইয়া দিন। তাহা হইলে সমগ্র বিষয়টির পুনর্ব্বিবেচনার এক সুযোগ আমি পাইতে পারি। আর পূর্ব্বের কারণটি সত্য হইলে, এই পত্রে আমি যাহা জানাইতেছি তাহার আলোকে আপনার উপদেশটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনর্বিবেচনা করুন। হরিপুরা কংগ্রেসে যখন আমি ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দিবার জন্য সমাজতন্ত্রবাদীদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম তখন আপনি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ কার্য্যের পশ্চাতে আপনার সমর্থন ছিল। তাহার পর কি পরিস্থিতির এতই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহার ফলে আপনি এখন একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন?

আপনি আপনার পত্রগুলিতে আমাদের দুইটি দল সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরের একান্ত বিরোধী। আপনি আপনার মন্তব্যটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলেন নাই। আপনি যে বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কার্য্যক্রমের ভিত্তিতে না ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপিত, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। আমার মতে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটা, নিতান্ত সাময়িক। ঝগড়া এবং মারামারি করিতে আমরা যেমন পারি, আমাদের মতানৈক্য ভুলিয়া যাইতে এবং হস্তমর্দ্দন করিতেও আমরা তেমনই পারি। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক কংগ্রেসের ইতিহাসে, স্বরাজ্যবাদী কাহিনীটির কথাই ধরুন না। যতদূর আমি জানি, কিছুকাল বিরোধের পর, আপনার সহিত দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলালজীর সম্পর্ক যতদূর সম্ভব মধুর হইয়াছিল। গ্রেটবৃটেনে বিপদের সময়, বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি সব সময়েই ঐক্যবদ্ধ হইয়া একই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়া কাজ করিতে পারে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে, যেমন ফরাসী দেশে, প্রত্যেকটি মন্ত্রিসভাই সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা। বৃটিশ এবং ফরাসীদের তুলনায় কি আমরা কম দেশপ্রেমিক? যদি আমরা তাহা না হইয়া থাকি, তাহা হইলে সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করিয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারিব না কেন?

আপনি যদি মনে করেন যে, ব্যক্তিগত বিষয় নহে, কার্য্যক্রমের ভিত্তিতেই আপনার বিরোধিতা, তাহা হইলে এই বিষয়ে আমি আপনার মতামত জানিতে চাহি। আমাদের কার্য্যক্রমের সহিত আপনাদের কার্য্যক্রমের পার্থক্য কোথায় এবং তাহা কি এতই গভীর যে, একযোগে কাজ সম্ভব নহে? আমি জানি যে, আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। কিন্তু আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্রের জবাবে বলিয়াছিলাম যে, আমার মতে, আমাদের মধ্যে যত বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে তাহাপেক্ষা অনেক বেশী বিষয়ে মতৈক্য রহিয়াছে। ত্রিপুরীর ঘটনা সত্ত্বেও আমি এই মত এখনও পোষণ করি।

স্বরাজের বিষয়ে আমার চরমপত্র সম্পর্কিত অভিমত সম্পর্কে আপনার পত্রগুলিতে বলিয়াছেন যে, অহিংস গণসত্যাগ্রহের উপযোগী আবহাওয়া এখন নাই। কিন্তু আপনি কি রাজকোটে অহিংস গণসংগ্রাম সুরু করেন নাই? অন্যান্য দেশীয় রাজ্যেও কি আপনি তাহাই করিতেছেন না? এই দেশীয়রাজ্যগুলির অধিবাসীরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ। বৃটিশ ভারতের আমরা অধিকতর শিক্ষার এবং অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারি—অন্ততঃপক্ষে উহাদের তুলনায়। ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে যদি দেশীয়-রাজ্যগুলিকে সংগ্রাম করিতে দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে বৃটিশ ভারতের আমাদিগকে তাহা দেওয়া সম্ভব নয় কেন?

গান্ধীবাদীদের সমর্থনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে জাতীয় দাবীর প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল, তাহার কথা ধরুন। যদিও উক্ত প্রস্তাবটিতে সুন্দর সুন্দর অস্পষ্ট বাক্যাংশ আছে এবং কয়েকটি বড় বড় আদর্শের ফাঁকা বুলি আছে, তথাপি উহার সহিত চরমপত্র দান এবং আগামী সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা সম্পর্কে আমার অভিমতের বহু সাদৃশ্য আছে। আপনি কি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন? যদি তাহা করেন, তাহা হইলে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আমার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

এবার আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে বলিব। ইহার প্রধান অংশটিতে (শেষাংশটির কথা বলিতেছি) দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ ওয়ার্কিং কমিটি আপনার বিশ্বাসভাজন—পুরা বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ আপনার ইচ্ছানুসারে উহাকে গঠন করিতে হইবে। আপনি যদি একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন এবং ঐরূপ কমিটি গঠন করা হয়, তাহা হইলে লোকে বলিতে পারে যে, উহা "আপনার ইচ্ছানুসারে" গঠিত হইয়াছে! কিন্তু ইহা কি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, উহা আপনার বিশ্বাসভাজন হইবে? এ, আই, সি, সির সভায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া একথা বলিবার স্বাধীনতা থাকিবে কি যে, আপনি একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের উপদেশ দিয়াছেন এবং নূতন কমিটি আপনার বিশ্বাসভাজন? অপর পক্ষে আপনি যদি এরূপ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরমর্শ দেন যাহা আপনার বিশ্বাসভাজন নহে, তাহা হইলে আপনি কি পন্থ প্রস্তাবকে কার্য্যকরী হইতে দিবেন—আপনার নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা হইলে আপনি কি ন্যায়সম্মত কার্য্য করিবেন? সমস্যাটির এই দিকটি আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। পন্থ প্রস্তাবটি যদি আপনি স্বীকার করেন তাহা হইলে শুধু যে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে আপনার ইচ্ছা জানাইতে হইবে তাহা নহে, ঐ একই সময়ে, আপনার বিশ্বাসভাজন হয় এমন এক কমিটি গঠন-সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হইবে।

পন্থ প্রস্তাবের গুণ সম্পর্কে এখনও আপনি কিছু বলেন নাই। আপনি কি উহা সমর্থন করেন? অথবা আপনি এমন একটি সর্ব্ববাদিসম্মত প্রস্তাবের পক্ষপাতী, যাহা কমবেশী আমাদের পরামর্শানুযায়ী হইবে, যাহাতে আপনার নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হইবে, আপনার নেতৃত্বে পুরা বিশ্বাস জানান হইবে এবং যাহাতে বিরোধমূলক ধারাগুলি সংযোজিত থাকিবে না? আরও, পূর্ব্বোক্ত পন্থ প্রস্তাব পাশ হইবার পর, ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাটি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? আমি পুনরায় এই প্রশ্ন করিতেছি, কারণ, বর্ত্তমান কংগ্রেস শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে আপনারই রচনা এবং সেজন্য এ—সম্পর্কে আপনার অভিমত আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে। এ-সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন আছে এবং তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি: পন্থ প্রস্তাবটিকে কি আপনি আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন? যদি তাহাই মনে করেন, তাহা হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিব এবং তাহাও বিনাসর্ত্তে। আমার সাংবাদিক বিবৃতিতে এই প্রশ্নটি সম্পর্কে কয়েকটি পত্রিকা সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সমালোচনার ভিত্তি হইতেছে এই যে, আমার পক্ষেপদত্যাগ করা উচিত। এ সম্পর্কে আপনার অভিমতের এবং আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবশেই সম্ভবতঃ ঐরূপ মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কয়েকটি সংবাদপত্রে যেরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ আপনিও সেইরূপ মনে করেন যে, পুরাতন নেতাদের কর্ত্তৃত্বের আসনে পুনরায় বসান উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব—কার্য্যকরী রাজনীতিতে ফিরিয়া আসুন, কংগ্রেসের চাবি আনার সভ্য হউন এবং ওয়ার্কিং কমিটির ভার গ্রহণ করুন। এরূপ উক্তির জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। কাহারও

প্রতি আঘাতের অভিপ্রায় না লইয়াই আমি ইহা বলিতেছি। আপনার অনুচরগণের, এমন কি আপনার বিশিষ্ট, প্রিয় অনুচরগণের সহিত আপনার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। এমন লোক বহু আছেন। আপনার জন্য সব কিছু করিতে পারেন কিন্তু উঁহাদের জন্য নহে। আপনি কি একথা বিশ্বাস করিবেন যে, গত রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সময় কয়েকটি প্রদেশে কয়েক জন গান্ধীবাদী আমার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, পুরাতন নেতাদের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া? আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যদি এ বিষয়ে না পড়ে তাহা হইলে, পুরাতন নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের সমর্থন পাইতে থাকিব। ত্রিপুরীতে পুরাতন নেতারা চাতুর্য্যের সহিত সরিয়া পড়িয়াছিলেন এবং অধিকতর চাতুর্য্যের সহিত আমাকে আপনার বিরোধিতার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। (কিন্তু আপনার সহিত আমার কোনও বিবাদ ছিল না)। পরে তাঁহাদের বিরাট জয় এবং আমার পরাজয় হইয়াছিল। আসল ব্যাপার এই যে, উহা তাঁহাদের জয় বা আমার পরাজয়ের সূচক নহে। উহা আপনারই জয়ের সূচক (আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও)! কিন্তু উহা যথার্থ জয় নহে, কিছুটা আত্মসম্মান বিক্রয় দ্বারা উহা লাভ হইয়াছে।

কিন্তু আমি অবান্তর প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছি। আপনি যাহাতে প্রত্যক্ষরূপে, খোলাখুলি ভাবে কংগ্রেসের পরিচালনা করিতে পারেন, সেজন্য আমি আপনার নিকট আবেদন করিতে চাহিয়াছিলাম। উহা দ্বারা সকল সমস্যা সহজ হইয়া যাইবে। পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিরোধিতার অনেকখানি—উহার বিরুদ্ধে বিরোধিতা নিশ্চয়ই আছে—আপনা হইতেই তখন অবসান হইবে।

আপনি যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আমার একটি বিকল্প পরামর্শ আছে। আমাদের দাবীমত স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রাম, বৃটিশ সরকারকে একটি চরমপত্র দিয়া শুরু করুন, এই আমার অনুরোধ। তাহা শুরু করিলে, আপনি যদি চাহেন, তাহা হইলে, আমরা সানন্দে দায়িত্বের পদগুলি হইতে সরিয়া দাঁড়াইব; আপনি যাঁহাদের বিশ্বাস করেন বা পছন্দ করেন, তাঁহাদের হস্তে ঐ দায়িত্বের পদগুলি স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু একটি মাত্র সর্ত্তে—স্বাধীনতা-সংগ্রাম পুনরায় শুরু করিতেই হইবে। আমার ন্যায়, জনসাধারণও উপলব্ধি করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে আমাদের নিকট যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ সুযোগ একটা জাতির জীবনে কচিৎ আসে। সেইজন্য সংগ্রাম পুনরারম্ভে সহায়তার জন্য আমরা যে কোনওরূপ আত্মত্যাগ করিতে রাজী আছি।

যদি শেষ পর্য্যন্ত আপনি বলেন যে, সর্ব্বদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি অচল, আমাদের সম্মুখে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হইতেছে একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি এবং আপনি যদি চাহেন যে আমার পছন্দমত ব্যক্তি লইয়া উক্ত কমিটি গঠন করা আবশ্যক, তাহা হইলে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত আপনি আমার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করুন। ইতিমধ্যে সেবা ও আত্মত্যাগের দ্বারা যদি আমরা আমাদের নীতির ন্যায্যতা প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা হইলে কংগ্রেসের নিকট আমরা ধিক্কৃত হইব এবং স্বভাবতঃ ও ন্যায়তঃ দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে আমরা বিতাড়িত হইব। বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের অর্থ এ, আই, সি, সির আস্থাজ্ঞাপক ভোট। আপনি যদি আমাদিগকে আপনার আস্থাজ্ঞাপক ভোট না দেন অথচ আমাদিগকে একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে বলেন, তাহা হইলে আপনি-পন্থ প্রস্তাবকেই কার্য্যে পরিণত করিবেন।

পুনরায় আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া জানান, নীতির দিক দিয়া আপনি সর্ব্বদলীয় ক্যাবিনেট (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠনের বিরোধী, না আপনি উক্ত ক্যাবিনেটে পুরাতন নেতাদের সংখ্যাধিক্য চাহেন বলিয়া বিরোধিতা করিতেছেন। ২৫শে মার্চ্চের প্রথম চিঠিতে আমি এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম।

এই পত্র শেষ করিবার পূর্ব্বে আমি দুই একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে জানাইতেছি। আপনি পত্রে জানাইয়াছেন যে, যাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি হইবে না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশা পোষণ করিতেছি। প্রসঙ্গতঃ একথা কি আমি বলিতে পারি যে, জীবনে একটি বিষয়ে আমার গর্ব্ববোধ আছে—আমি ভদ্রলোকের সন্তান এবং নিজে ভদ্রলোক। দেশবন্ধু দাশ আমাদের প্রায়ই বলিতেন—"রাজনীতি অপেক্ষা জীবন বড়।" সেই শিক্ষা আমি তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়াছি। শৈশব হইতে যে ভদ্রতার আদর্শ আমার মনের মধ্যে গাঁথা রহিয়াছে এবং আমার মনে হয়, যাহা আমার রক্তে আছে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হইলে, আমি আর একদিনও রাজনীতিক্ষেত্রে থাকিব না। মানুষ হিসাবে আপনি আমাকে কি চোখে দেখেন, তাহা জানিবার উপায় আমার জীবনের সামান্য অংশই দেখিয়াছেন। আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার বিরুদ্ধে কত গল্পই না আপনাকে শোনাইয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক মাস আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার বিরুদ্ধে মুখে মুখে একটি সুকৌশলী অথচ ভীষণ প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে। বহুপূর্ব্বেই আমি এ বিষয় আপনার গোচরীভূত করিতাম কিন্তু প্রচারের বিষয়বস্তু এবং কাহারা প্রচার করিতেছে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রচারের বিষয় সম্পর্কে পরে আমি জানিতে পারিয়াছি, যদিও আমি এখনও জানিতে পারি নাই কাহারা এই কার্য্য করিতেছেন।

পুনরায় আমি অবান্তর প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। একটি পত্রে আপনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি যাহাই করিনা কেন, "ভগবান আমাকে পথ দেখাইয়া চলিবেন।" বিশ্বাস করুন মহাত্মাজী, সকল দিবসব্যাপী আমি একটি প্রার্থনাই করিতেছি—আমার দেশের এবং দশের মুক্তির পথ-সম্পর্কে আমি যেন আলোক পাই। প্রয়োজন এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে আমি যাহাতে নিজেই দৃঢ়তার সহিত সম্মুখীন হইতে পারি, সেজন্য শক্তি ও অনুপ্রেরণার প্রার্থনা আমি করিয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, একটা জাতি বাঁচিতে পারে যদি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসত্তা দেশের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই নৈতিক (বা আধ্যাত্মিক) "হারাকিরি" সহজ নহে। দেশের প্রয়োজন উপস্থিত যখনই হইবে তখনই যেন তাহার সম্মুখীন হইতে পারি, সে শক্তি ভগবান যেন আমাকে দেন।

আশা করি আপনার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে থাকিবে। আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছি। সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের—সুভাষ।

সাত্যকি

১১

দল বেঁধে ছেলেরা চলল পিক্‌নিক করতে। সমস্ত দিন একসঙ্গে মনের খুশীতে কাটাতে পারবে ভেবে ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ কোন শাসন নেই, নেই পড়া না পারার ভয়। ওদেরই মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাবছে, যদি সারা বছরই এ রকম আনন্দ করে কাটানো যেত।

একটা বাগান-বাড়িতে এসে পৌঁছলুম।

বড়লোকের সখের বাড়ি। দেখেই বোঝা যায়। এক দিকের কোণ উঁচু করে ইট দিয়ে গোল করে ঘেরা জায়গায় জায়গায়। আর তার মাঝখানে মৌসুমী ফুলের বাহার। কাঁটালিচাঁপার গাছগুলিও সুন্দর করে লাগানো। গেট থেকে সোজা বাড়ি পর্যন্ত নুড়ি-ছাওয়া পথ। পথের দু'ধারে লম্বা লম্বা পামগাছের সারি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুকুর। তার ওপর সেতু। দুটো ডিঙ্গি নৌকাও বাঁধা আছে ঘাটে, দেখা গেল।

এমন সুন্দর জায়গায় এসে ছেলেরা মহানন্দে ছুটোপুটি আরম্ভ করে দিল। দলে ছিলেন দুজন প্রবীণ শিক্ষক। তাঁরা প্রথমে বাধা দিতে চেয়েছিলেন। পরে ছেলেদের উৎসাহ দেখে তাঁরা নিরস্ত হন। শুধু সাবধান করে দিলেন, যেন কেউ ফুল না ছেঁড়ে কিংবা কোন গাছপালার ক্ষতি না করে।

বড় দেখে একটা গাছের নীচে রান্না চাপান হয়েছে। ছোট ছোট দলে ছেলেরা বিভক্ত হয়ে এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ নৌকা বাইতে চাইল। মালীর সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষক মহাশয় তাদের অনুমতি দিলেন।

বেলা যে দেখতে দেখতে কেমন করে কেটে গেল, বোঝা গেল না। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলুম। মনে বিগত দিনের ছবি ভেসে উঠছিল। আমিও এদেরই মতো এক দিন ছোট ছিলুম। এমনি দৌরাত্ম্য করতুম। বড়রা কখনো হাসিমুখে সহ্য করতো, কখনো বা করতো না। যখন করতো না তখন হয় বকুনি, নয়তো মার খেতুম। তবু ভাল লাগত। তখন ভাবতুম বড়দের কত মজা। আমাদের মতো পড়া দেবার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না। যেমন যখন ইচ্ছে, তখন বাড়ি আসে। আর আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হলেই ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড হতো বাড়িতে। আহা, যদি আবার কোন দিন এই ভাবনা বিহীন দিনগুলির দেখা পাই!

কী অলস পরিকল্পনা! নিজের মনেই হাসি পাচ্ছিল। কানাই ওদিকে একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাদিন ও সেই ছেলেটিকে নিয়ে কাটাল। কখনো ওকে গুলতি তৈরী করে দিচ্ছে, কখনো বা ওর সঙ্গে মার্বেল খেলছে। কানাইও যেন একটা ছোট ছেলে হয়ে পড়েছে।

ফেরবার পথে কানাই বলল, শঙ্করকে দেখতে বেশ, না?

—কোন্ শঙ্কর? আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

—বা রে! যে বাচ্চা-ছেলেটার সঙ্গে আমি সারাদিন কাটালুম সেই তো শঙ্কর। কানাই অনুযোগ করল।

—ও!

কানাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, হ্যাঁ, ছেলেটা বেশ দেখতে। তোমার যদি ওরকম একটা থাকতো!

কানাই সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, ধ্যেৎ, কী যে বলো।

বুঝলাম কানাই ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলেছে। আর এই একই কারণে ওর বিয়ের প্রস্তাব করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে যাবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম।

বাড়ি ফিরে এসে আর বাইরে যেতে ভাল লাগল না। বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পামা এসে একবার জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে না কি?

মাথা নেড়ে বললুম, না।

—তবে শুয়ে পড়লে যে?

—এমনি।

পামা নিশ্চিন্ত মনে তার কাজ করতে চলে গেল। কি যেন ভাবছে পামা! সেই কাল রাত থেকে ওকে একটু গম্ভীর-গম্ভীর দেখছি। পরিহাসের সুরে আর কথা-কাটাকাটি নেই, নেই কাছে এসে সোহাগ জানানো। আজ ও শুধু শরীর খারাপ কিনা জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল। অন্য দিন হলে কাছে এসে বসতো, কপালে-বুকে হাত রেখে দেহের তাপ পরিমাপ করতে চেষ্টা করতো। কিছুই করলো না দেখে ওকে একবার ডাকতে ইচ্ছা হলো। তার পরই ভাবলুম, স্বেচ্ছায় যখন ও আসেনি তখন ওকে ডাকা মানে ওর অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া। মেয়েদের তোয়াজ করার পক্ষে আমি নই। তাতে ওরা পেয়ে বসে। আমি আরামের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলুম।

বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মহিম ডাকছে, নয়ন ফিরেছো নাকি গো ?

মহিমকে এনে মাদুরের এক দিকে বসতে দিলুম। পা মুড়ে থাগিয়ে বসে মহিম জিজ্ঞাসা করলো, তার পর কখন ফেরা হলো ?

—এইতো এলুম।

—আবার বিরক্ত করলুম না তো ?

—না না। কি যে বলেন ! চা খাবেন ?

—চা ? তা মন্দ নয়। কিন্তু তার জন্তে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। বৌমা, ও বৌমা !

পামা মাথার ঘোমটা একটুখানি টেনে বেরিয়ে এলো আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে।

মহিম বললো, দু' কাপ চা কর তো বৌমা ভাল করে। খুব ভাল যেন হয়, বুঝলে ?

মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে পামা বেরিয়ে গেল।

—তার পর খবর কি বলুন ? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—খবর আর কি ভায়া ! শিব বাবুর মেয়েকে দেখতে যাওয়া তাহলে ঠিক, কী বলো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—তা বলি, কানাই ছোকরা গেল কোথায় ? তাকে দেখছি না যে ?

—কানাই একটু বাইরে বেড়াতে গেছে।

চায়ে একটা নরম চুমুক দিয়ে মহিম বলল, আঃ। মহিম চলে যাবার পর হ্যারিকেনের পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে হিসেবের খাতা খুলে বসলুম। কত দিন যে হিসাব লেখা হয়নি। নোট-বই থেকে সব পাকা খাতায় তুলতে লাগলুম। কানাইকে হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে। ওর যখন আলাদা সংসার হচ্ছে তখন ওর খরচপত্র আলাদা করে দেওয়াই ভালো। একমনে কাজ করতে শুরু করলুম।

আমার একাগ্রতা ভাঙিয়ে দিয়ে কানাই বলল, কি অত হিসাব করছো ?

—এই অনেকদিন খাতা লেখা হচ্ছে না, তাই।

—রাখো তুলে ওসব। যত বাজে ঝক্কি ঝামলা বাপু।

—সে কি, কানাই ? তুমি হিসেব বুঝে নেবে না ?

—হিসেব বুঝে নেব ? মানে ?

আমাকে নিরুত্তর দেখে কানাই আবার বলল, ও বুঝেছি ! আমাকে আলাদা করে দিতে চাও। কিন্তু কেন ?

—তোমার ভালোর জন্তে।

—আমার ভালো-মন্দ বোঝার বয়েস কী আমার হয়নি ?

—হয়েছে। কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, কানাই। তুমি জান যে আমার আর পামার সঙ্গে বিয়ে করার পর তুমি বাস করতে আর পারো না ?

—কেন পারি না ?

—আমরা বিবাহিত নই বলে।

—তবে এদ্দিন কী করে কাটিয়ে এলুম?

—তুমি একলা ছিলে আর কিছুদিনের মধ্যেই তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে তোমার থাকাটা পছন্দ করবে না।

—তা হলে বিয়ে বন্ধ থাক।

কানাই রাগ করে উঠে চলে যাচ্ছিল। পামা এসে তাকে আবার বসাল। তার দুটি হাত ধরে বলল, রাগ করো না, ঠাকুরপো। উনি ঠিক কথাই বলেছেন। তোমাকে আর তোমার বৌকে আমি কাছে রাখতে পারলে খুবই খুশী হতুম। কিন্তু আমি যে অসামাজিক জীব। নরকের কীট। আমার ছায়া পর্যন্ত মাড়ানো পাপ। তুমি দেখো, ঠাকুরপো, বিয়ের পর ঠিক তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।

কানাই গুম হয়ে বসে রইল। সমাজ ব্যবস্থায় পামার স্থান কত নীচে বোধ হয় সেই কথাই ও ভাবছিল। মানুষ কতই না অসার সংস্কার মেনে চলে। আবার সংস্কার ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে না। দুঃখের আগুনে মন পুড়িয়ে নিলে নাকি মন শুদ্ধ হয়। পামা কত লাঞ্ছনা, কত দুঃখ, কত অপমানই না সহ্য করেছে; বেদনার আগুনে পুড়ে ওর মনও তো শুদ্ধ হয়েছে, পবিত্র হয়েছে। কৈ কেউ ওকে সে-মর্যাদা দেবে? আসলে ওর যে একটা মন আছে, সে-খবরই কেউ রাখে না। শুধু রাখে পামার দৈহিক সৌন্দর্য্যের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত।

আজ আমাদের পরিবারে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে কে? কাকে দোষ দোব? আমি তো পামাকে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু ও রাজী হয় নি। বোধ হয় পামা বিবাহিতা, বোধ হয়েছিল বাগদত্তা। সংস্কারের অন্ধকার গলিতে পামাও হোঁচট খাচ্ছে। আমাকে বিয়ে করতে ওর বিবেকে বাধছে। অথচ বাধাটা যে কী এবং কোথায় তা জানার সৌভাগ্য এখনো আমার হলো না। এক এক সময় মেয়েরা এমন যুক্তিহীনভাবে জেদী হয়ে ওঠে যে রাগ হয়।

রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি কানাইকে বললুম, চল, চল। খেয়ে নি। রাত অনেক হলো।

কানাই জেদ ধরলো পামাকেও বসতে হবে আমাদের সঙ্গে। বিব্রত হলো পামা। বরাবর আমাদের খাওয়া হয়ে যাবার পর ও খেয়েছে। কানাই নাছোড়বান্দা। তার পীড়াপীড়িতে পামাকেও বসতে হলো আমাদের সঙ্গে।

১২

রবিশস্যের শেষ দানাটা পর্যন্ত চালান করে দেবার পর মাঠের কাজ আর আপাতত রইল না। বাইরের দিকে নজর ফেরাতে হবে। মহাজনদের মাল কলকাতা থেকে আনতে হবে। বাঁধা ঘর যেগুলি আছে, তাছাড়াও অন্যান্য জায়গায় ঘুরতে হবে অর্ডার সংগ্রহের জন্য। খরচ বাড়বার আগেই আয় বাড়িয়ে ফেলার পক্ষপাতী আমি। খরচ কমাতে আমি চাই না।

সিভিলসাপ্লাই ডিপোতে এক দিন সকালবেলা লরী নিয়ে গেলুম। গিয়ে দেখি বিরাট লাইন পড়েছে। একটা গাড়ী একটু এগুচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচটা গাড়ী সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এক জোটে হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে। পুলিশ অসহায় দর্শকের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছে আর লাঠি হাতে গোঁফে তা' দিচ্ছে। কম করে একশ' লরীর লাইন।

ওজন হবার যন্ত্র পর্য্যন্ত পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর এজেন্ট, চালান পাশ, মাল তোলা আর চেকিং থেকে বেরুতে বেলা বারোটা বেজে গেল। এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা এখানে ভিড় করি। কেবল রেট লাভজনক বলে। দিনে তিনটে ট্রিপ করতে পারলে, লাভ মোটামুটি ভালই হয়। কিন্তু সব দিন দুটোর বেশী তিনটে ট্রিপ হয়ে উঠে না।

সেদিন সুদাসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। অনেক কথার পর সুদাস বলল, তোমাদের সঙ্গে যাই চল। আয়ের নতুন রাস্তা করে দি।

সুদাসের আয়ের রাস্তা করে দেবার প্রস্তাব কানাই ভালমনে নিতে পারেনি। ভয়ে ভয়ে সে বলল, নয়ন, ওকে বিদেয় করো। আমাদের যা হচ্ছে, তা দিয়েই চলে যাবে। ও শয়তানটাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

—ভয় পাবার কী আছে? অভয় দিয়ে আমি বলি।

—তুমি জানো না। ও সব করতে পারে।

—দেখা যাক না ওর দৌড়। আমরা যা ভালো বুঝব, তাই করবো। ওর কথামতো যে চলতে হবেই, তার তো কোন মানে নেই?

যা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই হলো। সুদাস শেষ পর্যন্ত মাল চুরি করার পরামর্শ দিলো। বস্তা ফুটো করে, কিছু কিছু মাল সরিয়ে ব্ল্যাক করার কথা বলামাত্র কানাই গর্জে উঠল, যা বলেছেন বলেছেন। আর ভবিষ্যতে কখনো আমার সামনে এ রকম কথা বলবেন না। মাল কমতি আমরা করতে শিখিনি আর শিখতেও চাই না।

সুদাস চুপ করে রইল। তার পর সব উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে বলল, বড়লোক হতে হলে এ ছাড়া সহজ রাস্তা আর নেই, কানাই। লরী করে অনেকেই তো বড়লোক হয়েছে। আর তোমরা, বড়লোক হওয়া তো দূরের কথা, দু'দিন লরী বন্ধ থাকলেই উপোস করবে। অবশ্য আমার কথামতো চলো আর নাই চলো, আখেরে বুঝতে পারবে যে আমি কোন খারাপ মতলব নিয়ে এ কথা তোমাদের বলিনি। আমি তোমাদের ভাল চাই বলেই এ প্রস্তাব করেছি।

—নোংরা কিছু করে, বড়লোক হতে আমরা চাই না।

—দেখ, নোংরা কোন জিনিসকে বলছ, তা জানি না। আসলে টাকা করার রাস্তা—মানে তোমাদের ব্যবসায়ে আর পাঁচজন যা করছে—কখনোই খারাপ হতে পারে না। থাক্ গে। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে ও সব আলোচনা না করাই ভালো।

আলোচনা বন্ধ করে সুদাস অন্য চাল চালল, আজ সন্ধ্যের দিকে চল 'মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবে' যাওয়া যাক।

কানাই জুয়া খেলতে ভালবাসে। ওর মন জয় করতে হলে জুয়ার কথা বলা ছাড়া আর কোন রাস্তা যে নেই সুদাস তা জানে এবং জানে বলেই 'মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবের' নাম করতে সাহস পেল।

ক্লাবে যখন পৌঁছলুম তখন দেখি আসর পুরা দমে জমে উঠেছে। কেউ আমাদের দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন মনে করল না। ঘরের ভিতর কেবল নম্বর গোণার আওয়াজ।

কাগজের চাকতি নিয়ে আমরাও খেলায় যোগ দিলুম। কয়েক রাউণ্ড পরেই আমার সব হার হয়ে গেল। আমি সব কিছুই তাড়াতাড়ি করি বলে কোন কিছুই জিততে পারি না। জুয়াতে জিততে হলে ধৈর্য্য দৃষ্টি আর বুদ্ধি থাকা দরকার। আমার তা কানাকড়িও নেই। কানাই দেখি অনেক চাকতি জমিয়ে ফেলেছে। লাল, নীল, সবুজ অনেক চাকতি।

হেরে গিয়ে আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে বসে বসে রাস্তার লোক চলাচল দেখতে লাগলুম। বারান্দায় যে দুজন পাহারা দিচ্ছিল, তারা দেখি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। কি ব্যাপার, আমি বুঝতে পারলুম না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘরের ভিতর এসে দেখি, খেলা পুরোদমে চলছে। মালিকের সঙ্গে কী ফিস-ফিস করে পাহারাদাররা কথা বলছে। সুদাসকে খুঁজে পেলুম না। কিছু একটা গণ্ডগোল কোথাও হয়েছে মনে করে আমি কানাইকে এক পাশে ডেকে এনে কাগজের চাকতিগুলি ভাঙিয়ে নিতে বললুম।

হঠাৎ ঘরের ভিতরকার বাতি সবুজ হয়ে গেল। মালিক সকলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, খেলা বন্ধ করে দিন সব। আসুন একটু গান-বাজনা করা যাক।

কিন্তু গান-বাজনার অবসর আর পাওয়া গেল না। সদর্পে হলো পুলিশের আবির্ভাব। দেখতে দেখতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হলুম সবাই।

পুলিশের গাড়ী করে থানায় এলুম। নাম-ধাম লেখা হলো। কিন্তু জামিন না পেলে ছাড়া পাওয়া যাবে না। অতএব কাল কোর্ট না খোলা পর্য্যন্ত পুলিশের আতিথ্য স্বীকার করতেই হবে।

হাজত-বাস জীবনে প্রথম বলে কেমন যেন খারাপ খারাপ লাগছিল। কত নীচু শ্রেণীর লোকের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে। চোর, জোচ্চোর, পকেটমার। হয়তো খুনেও আছে এর মধ্যে। গা ঘিন-ঘিন করে উঠল ঘৃণায়। কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছিলুম না। একটা অবুঝ লজ্জা পেয়ে বসেছে।

দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলুম বসে বসে। কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে। অতএব কাল কোর্ট না খোলা অবধি ভেবেও কিছু হবে না। হঠাৎ সুদাসের কথা মনে পড়ল। সুদাস কী করছে এখন। না বলে কয়ে ও গেলই বা কোথায় ?

কানাই আমার পাশে চুপ চাপ বসে আছে। কোন কথা বলছে না। বোধ হয় ভাবছে ওর জন্তেই আমার এ দশা। যার জন্তেই হোক, হাজতে যখন ঢুকে পড়েছি, তখন কার দোষ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কী হবে ! তার চেয়ে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করা অনেক বেশী বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দরজা খুলে গেল হাজতের। আমি আর কানাই থানা অফিসে এলুম। সুদাসের চেষ্টায় অবশেষে আমাদের জামিন হয়ে গেল।

একগাল হেসে সুদাস বলল, গাল দিচ্ছিলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ ?

—না, না। গাল দোব কেন ? অবাক হয়েছিলুম তোমায় না দেখে। আমি বিরস বদনে বললুম।

—আরে ভাই, আমি কি ছাই জানি যে পুলিশ আসছে ? বাইরে বেরিয়েছিলুম সিগারেট কিনতে। দোকানী বলল, কর্তা, বাঘের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর নিমিষেই সব গ্রেপ্তার হয়ে গেল সবাই। আমি তাই আর ক্লাবে না গিয়ে, সোজা উকিল বাবুর বাড়ি গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে ওঁকে ধরে নিয়ে এলুম। নাও, সিগারেট খাও।

এই এক রাত্রিতে অনেক অভিজ্ঞতা হলো। তাহলে সুদাস একেবারে অমানুষ নয়। সামাকে জামা-কাপড়ের লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে বলে, যেটুকু রাগ ওর ওপোর ছিল, তা আর রইল না। বরঞ্চ ভাবলুম, আমার যেদিকে নজর নেই, ও সেদিকে আমার নজর ফিরিয়ে দিয়ে ভালই করেছে। হয়তো সামার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমি এখন আরো একটু বেশী নজর দিতে পারব। কৃতজ্ঞতা বোধ হলো।

কানাই কথা কইল না আর।

কিন্তু কথা বলুক আর নাই বলুক, কামদেবপুরের শিব বাবুর মেয়েকে দেখতে যেতে এক কথাতেই সে রাজী হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি ওর সুবুদ্ধি হবে আমি ভাবতে পারিনি।

মেয়ে দেখার তামাসা আমরা করতে যাইনি। বংশাবলীর পরিচয়ও ওঁরা—মানে পাত্রীপক্ষ—জিজ্ঞাসা করে আমাদের বিব্রত করলেন না। মেয়ে এমন অসাধারণ কিছু নয়। মোটামুটি ভালই। অতএব পাকা কথা আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিলুম।

মহিম যৌতুকের কথা তুলতেই আমি বাধা দিয়ে বললুম, আমাদের দাবী-দাওয়া কিছু নেই।

শিব বাবু খুশী হলেন। তবু তিনি বললেন, দেখুন, সবাইতো চায় নিজের মেয়েকে যথাসাধ্য দিতে। আমিও যতটুকু পারি দোব। তাতে আমি বাদ সাধবো না। তবে আমার জামাইকে আমি একটা উপহার দেব সেটা কিন্তু নিতেই হবে। বুঝতেই পারছেন আমার এই একটা মাত্র মেয়ে। সে উপহারটা যে কি, তা আমরা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করলুম না।

সামা সব শুনে খুশী হয়ে বলল, ঠাকুরপো, এবার আমার পাওনাটা মিটিয়ে দাও।

কানাই খুবই অবাক হয়ে বলল, বৌদি, তোমার পাওনা ?

—বা রে মশাই, এত দিন যে সেবা করলুম, তার বুঝি কোন দাম নেই ?

খুব একচোট হেসে কানাই বলল, ও বাব্বা। তা আবার নেই। কী চাই বলো?

—না থাক। এখন কিছু বলব না। বিয়ের পরে বলব, কেমন?

—বেশ তাই হবে।

১৩

মাত্র আর কয়েক দিন বাকি বিয়ের। এর মধ্যে কত কাজ পড়ে রয়েছে। বাড়ি খুঁজতে হবে, জিনিসপত্র জোগাড় করতে হবে, আরো কত কী।

হাতে হাতে সবাই মিলে অবশ্য সাহায্য করছে। শ্রীমন্ত সেদিন ঘরের সন্ধান দিয়ে গেল। দুটো মাত্র ঘর। ভাড়া আঠারো টাকা। তাও আবার ওলাইসিঁথিতে। এখান থেকে বেশ দূর। তা হোক। যদি ভাল হয়, তবে আপাতত ও দুটোই নিয়ে নিতে হবে।

ঘর দেখতে গেলুম সকালবেলা। আলো থাকতেই ঘর দেখা ভাল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। কানাইকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলুম। ঘর দেখে আমার পছন্দ হল। ভাড়া অবশ্য একটু বেশী। কিন্তু উপায় কী। আগাম জমা দিয়ে এলুম।

সুদাস গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে এসেছে। পামা তাই গোছগাছ করতে ব্যস্ত। উৎসবের সাড়া পেয়ে সমস্ত বাড়ি যেন কাজে মেতে উঠেছে। কেউ বসে থাকতে চায় না। সবাই একটু-না-একটু কাজ করে আনন্দ পায়। আমাদের বাড়িতে কোন ছোট ছেলে-মেয়ে নেই। অথচ পাড়ার দু-চারটে ঠিক এসে জুটেছে।

কারা-কারা বরযাত্রী যাবে সব ঠিক করা হয়ে গেছে। এখন বাকি রইল বাতির ব্যবস্থা করা। বৌ-ভাত কানাই-এর নতুন বাড়িতে করাই আমার ইচ্ছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঠান রয়েছে সেখানে, জলেরও অভাব নেই।

কিন্তু পামা এ-প্রস্তাবে মন-খুলে সায় দেয় নি। এখানে যে বৌ-ভাত হওয়া ঠিক নয়, তা সে জানে। অথচ অন্য কোন বাড়িতে বৌ-ভাত হোক, তা-ও সে চায় না।

সন্ধ্যের দিকে পামাকে একলা পাওয়া গেল। তাকে যখন সব বুঝিয়ে বললুম, তখন সে শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ পরে আমার আরো কাছে সরে এসে বলল, আমি যদি ক'দিন অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকি, তবে কী এখানে বৌ-ভাত হতে পারে না?

—তা কেন তুমি যাবে, পামা। নিজের বাড়ি থাকতে ওরকম করে কষ্ট করার কী দরকার?

—তুমি বুঝছ না কেন গো? নতুন-বৌ এলে কে তাকে বরণ করবে? কে তার দেখা-শুনা করবে, বলো তো? ও বাড়িতে তো কোন আসবাবপত্র নেই, মেয়েদের যা-যা দরকার তাও নেই। আর তা ছাড়া, থাকলেই বা কী? একটা মেয়ে ছেলে কাছে না থাকলে নতুন-বৌ ভারী অসুবিধেয় পড়বে।

—বুঝলুম। আচ্ছা, শ্রীমন্তর মেয়েকে বলব ক'দিন ওবাড়িতে কাটিয়ে যাবে। তা হলে হবে তো?

আসলে পামার খুব ইচ্ছে নতুন-বৌকে কাছে রাখার। বুঝতে পারছি। কিন্তু এ কি এক অবুঝ ছেলেমানুষিতে যে পেয়ে বসেছে পামাকে। যদি কেউ কোন কটু কথা তাকে বলে? কিংবা যদি কদর্য ইঙ্গিত করে পামার চরিত্র নিয়ে? সে আঘাত পামা কখনো সহ্য করতে পারবে না। যাতে কোন দিন তাকে কারুর কাছ থেকে কোন কথা শুনতে না হয়, তাই জন্যে তাকে আমি এতদিন সন্তর্পণে আগলে রেখেছি। পামার আব্দার আজ রাখা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর নয়।

—এই, শোনো। আমি অন্য কথা পাড়ি, তুমি কী দেবে কানাই-এর বৌকে বলো তো?

—কী আবার দোব। আমার কী আছে? অভিমান করল পামা।

—আমি তো জলজ্যান্ত বেঁচে আছি'।

—তাই তো আমিও বেঁচে আছি।

—তা হলে হুকুম কর, কী আনতে হবে।

—কিছু আনতে হবে না। যা দেবার, তা আমার কাছেই আছে।

—ও!

—রাগ হলো বুঝি?

না না। রাগ করবো কেন? তুমি যে লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কী কোন কিছুর অভাব থাকে?

—থাকে নাই তো।

—কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যে একটা জিনিসের শোচনীয় অভাব দেখতে পাচ্ছি?

—সেটা কি?

—বুদ্ধি।

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ঘাট মানছি। তুমি যা বলবে তাই হবে।

আদরে আদরে আমাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল পামা। শাড়ীর আঁচল দিয়ে আমার কপাল মুছে দিয়ে বলল, কী রকম সুন্দর আমরা দিন কাটাচ্ছিলুম, আর কী হয়ে গেল, না?

পরিবর্তনের স্রোতের এক পাশে দাঁড়িয়ে অনুশোচনা করা চলে, কিন্তু প্রবহমান স্রোতের গতিবেগ তাতে বিন্দুমাত্র রুদ্ধ হয় না। কার মানসিক তটে কতখানি ভাবনার পলিমাটি পড়ল, কার অনুভূতিতে কতখানি ভাঙন ধরল, তা নিয়ে মাথা'ব্যথা নেই সময়ের। আজ যা আছে কালও তাই থাকবে—এটা সবাই চায় না। দুঃখী চায় না, আজকের দুঃখ কালও থাক। অসুস্থ মানুষ চায় কালই সুস্থ হতে।

আমাদের জীবনের আসন্ন পরিবর্তন প্রসন্নচিত্তে পামা গ্রহণ করতে অপারগ। তাই বলে যে পরিবর্তন হবে না, সেটা তো কোন কাজের কথা নয়?

লোকজনের ভীড় আর বিয়েবাড়ির স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে কানাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

যৌতুক দিলেন বটে শিব বাবু। আমাদের সকলের কল্পনার বাইরে। জামাইকে তিনি উপহার একটা দেবেন বলেছিলেন এবং সেটা যে পাঁচটনি বেডফোর্ড হবে, তা আমরা ভাবিনি। ধন্য ধন্য করল বরযাত্রীরা। দিল আছে বটে—বলল অভ্যাগতেরা।

আশাতিরিক্ত উপঢৌকন কী কারো মনে ঈর্ষার বীজ ছড়িয়ে দেয়নি? নিমন্ত্রিতেরা কি সবাই প্রসন্নমনে ফিরে গেল? দেখছিলুম আর ভাবছিলুম।

তখন সানাই-এ বাজছিল মালকোষ। [ক্রমশঃ।
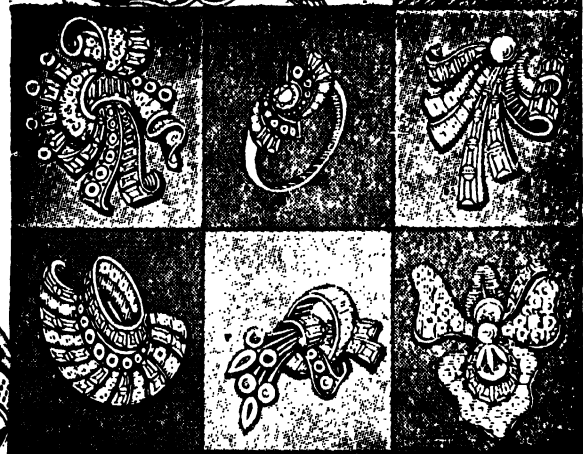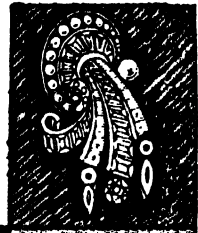
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস্
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

ভবানী মুখোপাধ্যায়

চব্বিশ

আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা, জার্মাণী ও ইংরাজের মন কষাকষি ক্রমশঃই প্রবলতর হয়ে উঠেছে, বার্ণার্ড শ' এদিকে মাথা ঘামাবার অবসর পাননি। কাউন্ট হেনরী কেসলার একটা আবেদন জানিয়ে বললেন—আমরা হলাম সেক্সপীয়র, গ্যয়টে, নিউটন, লাইবনিৎস প্রভৃতির সাংস্কৃতিক বংশধর, ইংলণ্ড ও জার্মাণীতে কত সাংস্কৃতি কমিল, অতএব লড়াই কেন বাধবে? এই সূত্র থেকে উভয় দেশের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ঘটে বিজ্ঞপ্তি এবং ইস্তাহারের মাধ্যমে। ইংলণ্ডের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি রচনার ভার পড়ল বার্ণার্ড শ'র ওপর। বার্ণার্ড শ' কিন্তু বুঝলেন সেক্সপীয়র ইত্যাদির প্রতি উভয় দেশের একটা শ্রদ্ধা আছে বলেই লড়াই বন্ধ করা যাবে না, তাছাড়া জার্মাণরা ভাবে সেক্সপীয়র একজন জার্মাণ, ইংরেজরা কিছুই ভাবে না। বার্ণার্ড শ তাই তাঁর ইস্তাহারে লিখলেন জার্মাণ নৌবহর দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কিছু নেই, ইংলণ্ড এই ব্যবস্থাকে মানব সভ্যতা সংরক্ষণের এক প্রচণ্ড প্রচেষ্টা মনে করে। এর ফলে সেক্সপীয়র নিউটন প্রভৃতির সাংস্কৃতিক নাতি-প্রণাতিরা সেই ইস্তাহারে স্বাক্ষর দানে সম্মত হলেন। ঐ লাইনটি উঠিয়ে দিতে হবে—এই তাঁদের দাবী। বার্ণার্ড শ' অবস্থাটা বুঝলেন, তিনি ১৯১৩-র মার্চে এবং ১৯১৪-র জানুয়ারী মাসে যথাক্রমে The Daily Chronicle এবং The Daily News এ এই বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখলেন।

বার্ণার্ড শ' যুদ্ধবিরোধী ছিলেন মনে-প্রাণে, তিনি জানতেন, পৃথিবীতে যতদিন হিংসা-কুটিল মানুষ থাকবে ততদিন এই ধরণের যুদ্ধ-বিরোধ বন্ধ করাও সম্ভব নয়।

বার্ণার্ড শ' যুদ্ধ-নিবারক নানা রকম প্রস্তাবও দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করলেন। বলা বাহুল্য, তা উপেক্ষিত হ'ল, এমন কি, কেউ কেউ উপহাস করে বললেন—বৈদেশিক দপ্তরে বার্ণার্ড শ' থাকলে পনের দিনেই যুদ্ধ বাধতো, বার্ণার্ড শ' জবাবে বলেছিলেন, আমি বৈদেশিক দপ্তরে নেই বলেই ত'—আঠার মাসেই যুদ্ধ লাগলো। বার্ণার্ড শ'র কাছে যে-কোনো রকমের যুদ্ধ মানে একটা নিদারুণ অভিশাপ। বার্ণার্ড শ'কে একজন একদা প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি Commonsense about the War লিখতে গেলেন কেন?

বার্ণার্ড শ' জবাবে বললেন, কারণ আমি চিরদিনই যুদ্ধকে ঘৃণা করে আসছি। (I have always loathed war)

কিন্তু বার্ণার্ড শ' বা তাঁর মত আরো কেউ পছন্দ করুন আর নাই করুন, পৃথিবীর অনেক লোক যুদ্ধে আনন্দ পায়, যুদ্ধই তাদের ধ্যান-জ্ঞান। যুদ্ধে অসংখ্য নর-নারীর অকারণ মৃত্যু হয় এবং যুদ্ধের ফলে বিকৃত অর্থনৈতিক চাপে সমাজের আর্থিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে, এ সবাই জানে। তবু যুদ্ধের আনন্দে রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে—চোরাকারবারি সবাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ভয় আছে, তবু জয়ও আছে। যুদ্ধ প্রতিরোধের সার্থক উপায় আজো আবিষ্কার করা যায়নি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখের The New Statesman and Nation নামক পত্রিকার অতিরিক্ত ক্রোড়পত্রে বার্ণার্ড শ' লিখিত Commonsense about the War প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ক্লি ফোর্ড সার্প বার্ণার্ড শ'র বক্তব্য বিষয়ের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে তাঁর পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধি পাবে; তাই তিনি অকুতোভয়ে বার্ণার্ড শ'র রচনার একটি কথাও পরিবর্ত্তন না করে প্রকাশ করলেন।

বার্ণার্ড শ'র সমালোচক এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এইচ, জি, ওয়েলস এই প্রবন্ধ পাঠে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে লিখলেন Shaw is like an idiot child screaming in a Hospital.

জন গলসওয়ার্দি বললেন, এই প্রবন্ধ বিকৃত রুচির পরিচায়ক, কারণ এ যেন কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে।

কিন্তু লেবর পার্টির নেতা কীয়র হার্ডি বার্ণার্ড শ'কে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠি সমগ্র বিষবাষ্পকে একটি ফুঁয়ে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। তিনি লিখলেন—Its inspiration is worth more to England than this war has yet cost her in money I mean. When it gets circulated in popular form and is read as it will be hundreds of thousands of our best people of all classes it will produce an elevation of tone in the national life which will be felt for generations to come. (এই প্রবন্ধের অনুপ্রেরণার মূল্য যুদ্ধ বাবদ ইংলণ্ড যে অর্থ ব্যয় করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এই প্রবন্ধ যখন সুলভ আকারে প্রচারিত হবে তখন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব শ্রেণীর অসংখ্য সৎমানুষের মনে এক উন্নত সুর সৃষ্টি করবে এবং পুরুষানুক্রমে তা উপলব্ধি করা যাবে।) এই সব কিছুর উত্তরে বার্ণার্ড শ' শুধু একটি কথা বললেন—"We must tell the truth unashamed like men of courage and character—"

সমালোচকদের মতে বার্ণার্ড শ'র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসিক কর্ম Common sense about the War রচনা এবং প্রকাশ করা। The New Statesman and Nation পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা

৭৫,০০০ কপিতে পৌঁছাল। এই প্রবন্ধ বিস্মৃত হওয়ার অনেক পরে সাংবাদিকরা তার উল্লেখ করে বার্ণার্ড শ'কে অনেক কটূক্তি করেছেন। বার্ণার্ড শ' কিন্তু এই কারণে একটুকু ক্ষুণ্ণ হননি, তিনি জানতেন, এই বিষয়ে তাঁর বিচারবুদ্ধিই চূড়ান্ত। বার্ণার্ড শ' বলতেন—"You may demand moral courage from me to any extent, but when you start shooting and knocking one another about, I claim the coward's privilege and take refuge under the bed. My life is far too valuable to be machine gunned". (আমার কাছে তোমরা নৈতিক সাহস দাবী করতে পারো, কিন্তু তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে হানাহানি সুরু করো তখন আমি ভীরুর সুযোগ গ্রহণ করে বিছানার নীচে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। মেশিনগানের আক্রমণে মরার চাইতেও আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশী।)

Common sense about the War পড়া থাকলে হয়ত এত হৈ-চৈ হত না, অধিকাংশ বিদগ্ধ মানুষ এই নিবন্ধ পড়েননি, তাঁরা এর ওর মুখে শুনেছেন যে ভীষণ ইংরাজ-বিরোধী এবং যুদ্ধ-বিরোধী রচনা। ফলে সবাই মিলে আক্রমণ সুরু করল। শ' লিখেছিলেন, বেলজিয়ান ঘটনাবলী একটা অজুহাত মাত্র বৃটিশের যুদ্ধে নামার, এবং সেই অজুহাত অতি দুর্বল এবং জোলো। শ' বলেছিলেন, প্রতিটি সেনাদলের সৈনিকরা যদি বুদ্ধিমান হত, তাহলে যে যার দলের কর্তাকে হত্যা করে বাড়ি ফিরে আসতো, যুদ্ধরত দেশের মানুষরা যদি এর মর্ম বুঝতো, তাহলে তারা কিছুতেই যুদ্ধের খরচ দিত না। জার্মাণীতেও যুদ্ধবাজ Junkers (দেশোয়ালী মুরুব্বি) আছেন, যেমন আছেন ইংলণ্ডে। ইংরেজরা ভণ্ড—আত্ম-গরিমা প্রচার ও শত্রুপক্ষকে গালাগাল দেওয়াটা যুদ্ধজয়ের পথ নয়। স্যার এডওয়ার্ড গ্রে (বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব) ইংলণ্ডের মনোভংগী যদি পূর্বাহ্নে পরিষ্কার ভাবে জানাতেন, তাহলে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা চলত।

বার্ণার্ড শ' রচিত Common sense about the War গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এক দেশপ্রেমিকের বক্তব্য, ঝুটাচালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু এমন কুৎসিত কুৎসা ও কলঙ্ক বার্ণার্ড শ'র বিরুদ্ধে প্রচারিত হতে লাগল, যার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এ যেন এক দিকে গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম আর অপর দিকে জার্মাণী, অষ্ট্রীয়া, তুর্কী এবং বার্ণার্ড শ'। সংবাদপত্রে আন্দোলন উঠল, বার্ণার্ড শ'র নাটক বয়কট করো। পুরাতন বন্ধুরাও তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। রয়্যাল ন্যাভাল ডিভিশন থেকে এক সন্ধ্যায় হার্বার্ট এ্যাসকুইথ বলেছিলেন—The man ought to be shot।

বার্ণার্ড শ'র কাছে প্রতিদিন অজস্র পত্র আসতে লাগল, গালাগাল আর তিরস্কারে পূর্ণ সেই চিঠিগুলিতে বাড়ি ভরে গেল। একদিন এক সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে অভিনেতৃবর্গ বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে একত্রে ফটোগ্রাফ তুলতে রাজী হলেন না, এমন কি, আমেরিকায় পর্য্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া পৌঁছালো।

বেলজিয়ানরা কিন্তু বার্ণার্ড শ'র ওপর চটেনি, তারা তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনলো জার্মাণীর বিরুদ্ধে বক্তব্য গুছিয়ে লেখার জন্য। বার্ণার্ড শ' তার ফলে লিখলেন—An Open Letter to President Wilson—১৯১৪ ৭ই নভেম্বর তারিখের The Nation পত্রিকার সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। এই প্রবন্ধ পাঠে উড্রো উইলসনের মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটলো তা জানা যায় না। এই সব ব্যাপারে বার্ণার্ড শ'র অভিমতাদি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আর্কিবাল্ড হেনডারসন, তাঁর মত অতি তীব্র। তিনি বলেছেন একদিন ঐতিহাসিকরা স্বীকার করবেন যে বার্ণার্ড শ'র রচনা কি ভাবে উইলসনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষতঃ দি লীগ অব নেশন্স, ফ্রীডম অব দি সিস, ভার্সাই চুক্তি, চতুর্দশ দফা চুক্তি এবং জার্মাণদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা বার্ণার্ড শ'র মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।

জার্মাণরা বার্ণার্ড শ' লিখিত Common sense নিজেদের প্রচার কার্য্যে ব্যবহার করলেন। যদিচ কোনো সমালোচক বার্ণার্ড শ'র এই কীর্তি অত্যন্ত সাহসিক এবং Ton Payne-র সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বা সেণ্টজন আর্ভিন প্রভৃতি জীবনীকারদের মতে বার্ণার্ড শ'র পরবর্তী কার্য্যাবলীতে মনে হয় তিনি কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসনের রচিত জীবনী বার্ণার্ড শ'র জীবনকালে প্রকাশিত, এই বিষয়ে স্বয়ং বার্ণার্ড শ'ও কোনো মন্তব্য করেননি। বৃটেনের লোকজন তাঁকে শত্রু মনে করলেও সরকার তাঁকে নিরাপদ নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এমন কি তাঁকে যুদ্ধ কালে সমরক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন।

উপন্যাস লেখক এ, ই, ডব্লু, ম্যাসন যুদ্ধের সময় গুপ্তচর বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, তিনি বার্ণার্ড শ'কে অনুরোধ জানালেন যে, জার্মাণ অপপ্রচারের জবাবে মূরদের মধ্যে প্রচারের জন্য কিছু লিখুন। এর ফলে বার্ণার্ড শ' লিখলেন An Epistle to the Moons, বার্ণার্ড শ'র এই নিবন্ধ নাকি মূরদের শান্ত করেছিল।

এই কারণেই কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে Common sense about war নিয়ে এত হৈ চৈ কিসের?

১৯২৪-এ বার্ণার্ড শ' প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—আমি কোনো দিনই সরকারের বিরোধিতা করিনি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জানতেন আমি তাদেরই দলে। আমি দেখেছি যে আমেরিকানরা বা যে সব ইংরেজরা সেই সময় আমেরিকায় ছিলেন, যথা হেনরী আর্থার জেমস, তাঁদের ধারণা যে আমার মনোভংগী পরাজিতের ভঙ্গী, ফরাসীরা যাকে বলে Defeatist। ইংরাজরা কিন্তু আসল খবর রাখতেন, তা নইলে আমাকে গুলী করে মারা হত। ১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দে বার্ণার্ড শ' অপেক্ষা অনেক লঘু পাপে অন্য দেশে অনেক স্বাধীনচেতা মানুষের গুরুদণ্ড হয়েছে।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস একটি চমৎকার উক্তি করেছেন—মলিয়েরের মত এই ব্যক্তির হৃদয়ে করুণার ক্ষীরধারা প্রবাহিত, কিন্তু তুর্গেনিভের নিহিলিষ্ট নায়কের মত সংকটকালে কি জীবনে কিংবা নাটকে যেখানে বৈপ্লবিক মনোভংগীর চরম অভিব্যক্তির প্রয়োজন সেখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে তিনি দুর্বল।

অবশ্য মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের পুত্রের মৃত্যুতে বার্ণার্ড শ' কিঞ্চিৎ আবেগ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠির কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি।

বার্নার্ড শ' হেসকেথ পীয়রসনকে পরে লিখেছিলেন—"তুমি যদি এখন Common sense about the war ঠাণ্ডা মাথায় পড়ো তুমি অবাক হয়ে যাবে এই যে, কেন কিছু লোক এই নিবন্ধ পড়ে ক্ষেপে উঠেছিল, বিশেষ করে যারা এক ছত্রও পড়েনি তাদের রাগটাই বেশী, এরা কিন্তু জেনেছিল Junker কথাটি গালাগাল হিসাবে গ্রহণ না করতে আমি সাবধান করে দিয়েছি। য়ুরোপের আসল Junker হলেন স্যার এডওয়ার্ড গ্রে। আসল কথা হল, যে হেতু আমি জাতে আইরিশ, আমার মনোভংগী বৃটিশ-বিরোধী, তাই বৃটিশের তরফ থেকে আমার বক্তব্য পেশ করাটা অনেকের কাছে অসহ্য মনে হয়েছে।

যুদ্ধের পর লর্ড মরলীর চিঠিপত্র প্রকাশ হওয়ার পর সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে ভাইকাউণ্ট গ্রে এবং লণ্ডনের আরো অনেকেই কাইজারের কাছাকাছি যেসব মানুষ ছিলেন তাদেরই সমতুল্য অপরাধী। ক্লার্ক হ্যারিস বলেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেই বার্নার্ড শ' হয়ত কিছু গোপনতথ্য জেনেছিলেন, এডওয়ার্ড গ্রে প্রভৃতির সম্পর্কে। জানা অসম্ভবও ছিল না কারণ বড় মহলের ব্যক্তিদের কাছে কোনো খবরই গোপন থাকে না। কিন্তু ক্লার্ক হ্যারিসের মনে হয়নি যে পৃথিবীকে ধ্বংস করা বা দুর্গতি থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে তিনি একটা আপোষ-রফা, করেছিলেন নিজের বিবেকের সঙ্গে, যেমন করেছেন তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে, এই বিষয়ে হয়তো তাঁর সমগোত্রীয়ের সংখ্যা অধিক, কিন্তু তাই বলে তাঁকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি চেষ্টারটনকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তাঁর মতবাদ নির্দিষ্ট এবং সুদৃঢ়, যুদ্ধের আগে, মধ্যে এবং পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। আমার মতে বার্নার্ড শ' বার বার রঙ বদলেছেন, যদিও তিনি বহুরূপী নন।'

বার্নার্ড শ'র প্রতি ইংলণ্ডবাসীর অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও ঘৃণা বেড়ে উঠল জার্মাণ সাবমেরিণের ধাক্কায় Lucitania নামক যাত্রিবাহী-জাহাজ ডোবার পর। বার্নার্ড শ' বলেছেন—আশ্চর্য, যে সব মানুষ এতদিন কোনো রকমে ঠাণ্ডা মাথায় ছিল, তারাও ক্ষেপে উঠল, কিম্ আশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্! সেলুনের নিরীহ যাত্রীদের হত্যা করা! ততঃকিম্! এই আন্দোলন সুরু হল। কিন্তু যা ঘটলো তা শুধুমাত্র এই কথায় ঠিকমত ব্যক্ত করা যায় না। যদিও এই দুর্ঘটনার তিন জন বিখ্যাত বলি আমার সুপরিচিত বন্ধুদের অন্যতম তবু সমস্ত ব্যাপারটি আমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল। ...আমার বরং আত্মতৃপ্তি হল এই ভেবে যে, বে-সামরিক মানুষ তবু জানলো যুদ্ধের স্বাদ কেমন, এতদিন তারা যুদ্ধটা বৃটিশ ক্রীড়া-কৌশলের অন্তর্গত চমৎকার খেলা মনে করত।'

Lucitania ডুবি সংক্রান্ত বার্নার্ড শ'র উক্তি The New Statesman পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ক্লিফোর্ড সার্পকেও সন্ত্রস্ত করে তুলল, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বার্নার্ড শ' অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু মিঃ সার্প Lucitania জলমগ্ন হওয়া সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র বক্তব্য প্রকাশ করতে স্বীকৃত হলেন না। এই কারণে বার্নার্ড শ' মনে এতটুকু ক্ষোভ বা জ্বালা রাখেননি, পরে ক্লিফোর্ড সার্পের দুর্দশার সময় বার্নার্ড শ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু New Statesman পত্রিকায় ১৯৩১ এর আগে আর কোনো দিন লেখেন নি। ১৯৩১এ আবার একটি মহাযুদ্ধের সূচনা, বার্নার্ড শ' আবার যুদ্ধ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত লিখতে সুরু করলেন The Nation পত্রিকায়।

' বার্নার্ড শ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু আলফ্রেড সুটরোকে বলেছিলেন —"জার্মাণরা যখন Rheims Cathedral এ গোলা ছুঁড়েছিল তখন আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে গোলন্দাজের মাথা গুঁড়ো করে দিই। লক (L. T. Locke) আমার সামনেই বসেছিল, সে আমার প্রস্তাব সমর্থন করে এবং আমার ন্যায়-বুদ্ধির প্রশংসা করে—"

Lucitania জলমগ্ন হওয়ার পর Dramatist Clubএর এক লাঞ্চে লক, হেনরী, প্রভৃতি সদস্যরা বার্নার্ড শ'র মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তার পর এক রকম বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বিনা নোটিশে বার্নার্ড শ'কে সদস্যপদ থেকে বিতাড়িত করা হল। বার্নার্ড শ' তাঁদের জানালেন যে, এই পদ্ধতিটা আইনগত নয়, কারণ তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়নি, তবে হাঙ্গামা না বাড়িয়ে তিনি স্বয়ং খরিত্যাগ করবেন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে।

গ্রানভিল বার্কারও পদত্যাগ করলেন। ইস্রায়েল জানগউইলও পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন, বার্নার্ড শ' বাধা দিলেন। জানগউল ড্রামাটিষ্ট ক্লাবে নারীসদস্য গ্রহণের স্বপক্ষে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন। আরো কেউ কেউ হয়ত ক্লাবের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এই সুযোগে তাঁরাও পদত্যাগ করলেন।

ডব্লু, জে, লক নম্র স্বভাবের অতি শান্ত ভদ্রলোক ছিলেন, সেই মানুষও বার্নার্ড শ'র রক্তপান করার জন্য ক্ষেপে উঠেন। বার্নার্ড শ' বলেছেন—"জন্ম এবং মেজাজে লক ছিলেন পাকা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান। এই সময়ে আমি একদিন লেখক-সমিতির কমিটি মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম, সহসা কোথাও কিছু নেই লক চীৎকার করে উঠল—বার্নার্ড শ'র সঙ্গে এক ঘরে বসতে আমি রাজী নই। তার পর দরজাটি সশব্দে বন্ধ করে চলে গেল। জ্যাক স্কোয়ার আমার মুখে চুণকালি লেপে দেওয়ার প্রস্তাব ছেপে প্রকাশ করল। তবে এই জাতীয় যুদ্ধকালীন হিষ্টিরিয়ার শীগগিরই অবসান ঘটল, জ্যাক স্কোয়ার আর লক দুজনেই এসে হাত বাড়িয়ে সেকহ্যাণ্ড করল। আমিও হস্ত প্রসারিত করলাম। আমার কাছে যুদ্ধ-জ্বর আর জ্বর সংক্রামক মহামারীর মত। এই সময় যে সব রোগী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে, তা রোগশয্যায় শায়িত রোগীর প্রলাপের মতই উপেক্ষণীয়।

পরে অবশ্য ড্রামাটিষ্টস ক্লাব বার্নার্ড শ'কে আবার ডিনারে সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু মনে এতটুকু বিদ্বেষ পোষণ না করলেও, বার্নার্ড শ' অজুহাত দর্শন করে সেই নিমন্ত্রণ এড়িয়ে গেলেন। বার্নার্ড শ' এই উপলক্ষে একটি চমৎকার কথা বলেছেন—"Any one who is a pioneer in art is hated by the old gang and should not join their clubs, as it enables them to expel him, and to that extent places him in their power."

বার্নার্ড শ' বলেছেন, কোথায় সব মুছে গেল, আমার বিরুদ্ধে এই সব চক্রান্ত আর অভিযোগ, অনুযোগ একদিন মিলিয়ে গেল, সেই ক্লাবও হয়ত উঠে গেছে, হেনরী জোনস শেষ পর্যন্ত রেগে ছিল, সে আর কিছুতেই মিটমাট করেনি, এ তার একতরফা লড়াই, আমি

বার বার হাত বাড়িয়ে এগিয়েছি ও হাত সরিয়ে নিয়েছে, আর একজন এইচ, জিওয়েলস্, তবে তার ব্যাপার আলাদা। মরার সময় ওয়েলস একখানি ছোট কাগজে অতি কষ্ট করে লিখেছিল, আমার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ভাবে কোনো আক্রোশ নেই, সে কাগজটুকু কোথায় আছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে Testimonial Matineeর এক কমিটি হয় জে, এইচ, বার্নসকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে। জোন্স্ যেই দেখলেন সেই কমিটিতে বার্ণার্ড শ'ও আছেন, তিনি পদত্যাগ করলেন, বার্ণার্ড শ' তাঁর মতে a freakisn homunculus germinated outside lawful procreation (আইনগত জন্মবিধির বাইরে কৃত্রিম পদ্ধতিতে যার জন্ম, যেমন গ্রীক উপকথার পারাকেলসুস)

এর জবাবে বার্ণার্ড শ' বললেন—সন্দেহাতীত ভাবে আমি আমার প্রখ্যাত পিতার পুত্র, এবং আমার জননীর সম্পত্তি ও পিতৃঋণের আইনগত অধিকারী।

জোন্সের এই আক্রমণাত্মক রচনার প্রকাশককে জোন্স্ আশ্বাস দেন, রচনাটি প্রকাশ করিলে বার্ণার্ড শ' তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করবেন না। বার্ণার্ড শ' এই কথা শুনে বললেন—এ কথা জেনে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি যে, লেখকের আশ্বাস না পেলে প্রকাশকরা এই মানহানিকর রচনা প্রকাশে সাহসী হতেন না, জোনস বলেছিল, আমার বন্ধুত্ব নির্ভরযোগ্য, এটা সে ঠিকই বলেছে।

পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ রাখার জন্ত যুদ্ধশেষে বার্ণার্ড শ' রাজনীতিক ও কূটনীতিবিদদের কাছে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভার্সাই পীস কনফারেন্সে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। বার্ণার্ড শ' ব্যঙ্গ করে বলেছেন, এ যেন লণ্ডনের মাছির বিকিন উপসাগরের ধ্যানমগ্ন তিমিমাছের কানের কাছে গুঞ্জন করা।

U. S. A. সমরাস্ত্র সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে যে সভা ডাকা হয়, বার্ণার্ড শ' তাতে যোগদান করতে রাজী হননি। বলেছিলেন—সমরাস্ত্র সীমিত করলে যুদ্ধ নিরোধ করা যায়, এই ধারণা ভুল, পথের ধারের কুস্তার-লড়াই-এর প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ।

বার্ণার্ড শ' কোনো দিন হাউস-অব-কমন্সের সভায় উপস্থিত হননি, দর্শক হিসাবে কিন্তু ১৯২৮-এ জেনেভায় লীগ অব নেশনসের সভায় হাজির হয়েছিলেন। সমগ্র অধিবেশন তাঁর কাছে Dull এবং Stupid বলে মনে হয়েছে। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—In the atmosphere of Geneva patriotism perishes ; a patriot there is simply a spy who can not be shot;

কিন্তু যুদ্ধের পর রাশিয়ার সংবাদে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে লিখেছিলেন, রাশিয়া থেকে সুসংবাদ এসেছে, ঈশ্বর বহুরূপে প্রকাশিত হয়ে পরিপূর্ণ হয়েছেন। আমাদের জন্ত হাতের মুঠায় অনেক বিস্ময় রেখেছেন।

[ক্রমশঃ।

না, তুমি যেয়ো না চলে

গোপাল ভৌমিক

না, তুমি যেয়ো না চলে
এই অনুরোধ
বার বার যদিও জানাই
তোমার বধির কানে
সে কথা যাবে না জানি,
যেহেতু যখন বাজে
বিদায়ের করুণ সানাই
তখন ফেরার কথা শুধু বাতুলতা।
সব কিছু জানে মন
তবু সে জানায় কাতরতা।

না, তুমি যেয়ো না চলে,
হোক সে ক্ষণিক দাবী,
সুর তার অনেক গভীর
জানি বলে
বার বার এক দাবী করি ;
জানি তাকে পায়ে দলে
তোমার আগের কোটি মানুষের মত,
হয়তো বা দেবতার মত তুমি যাবে চলে।
হতাশার ক্ষোভ নিয়ে আমার পৃথিবী
নিজেকে ডুবিয়ে দেবে কল-কোলাহলে।

না, তুমি যেয়ো না চলে,
কে একথা বলে আর কে-ই বা না বলে !
তবু সব চলে যায়,
থাকবার যারা থাকে পড়ে ;
পৃথিবী বলে না শেষ কথা
সাইক্লোন কিংবা বালিঝড়ে।
যখন মরুর ঝড় কেঁদে কেঁদে বলে,
না, তুমি যেয়ো না চলে,
তখন ছ' চোখ ফিরে অন্ত কোনখানে
দেখে ফুল সমারোহ, ধরা দেই গানে।
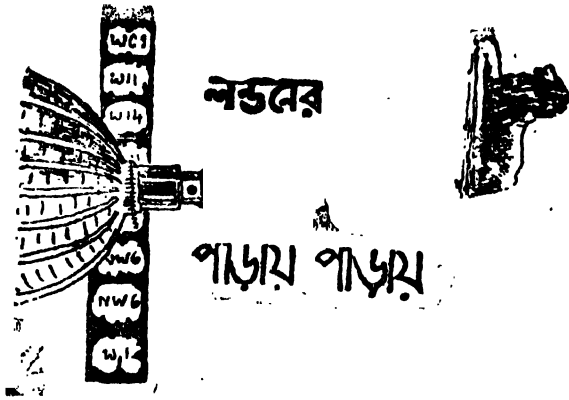
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হিমানীশ গোস্বামী

If there are five empty seats and I say the bus is full, the bus is full.

—Conductor of a London bus

এবারে লিণ্ডফিল্ড গার্ডনস।

বেলাদি' বাড়ী বদল করলেন, ঐ রাস্তারই পাশের বাড়ীতে গেলেন আমরা চলে এলাম পশ্চিম থেকে উত্তর লণ্ডনে। এবারে বাড়ীটি হ'ল বড় একটি ফ্ল্যাটের অংশ।

পাড়ার নাম হ্যাম্পস্টেড।

পাহাড়ী অঞ্চল—প্রচুর গাছপালা চারদিকে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পাওয়া যায়, সবচেয়ে বেশি স্নো পড়ে, কুয়াসা সবচেয়ে কম হয়।

এ পাড়া নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। একশো বছর আগে এ দিকটায় লোক-বসতি প্রায় ছিল না। লোক বসতি ছিল না তার কারণ এখনো কলের জলের ব্যবস্থা হয়নি। এক বালতি জলের দাম তখন এ পাড়াতে ছিল এক শিলিং। ডাকাতেরা ঝোপে

আমরা সব কিছুরই বিরোধী

ঝাড়ে লুকিয়ে থাকত—পথিকদের আক্রমণ করত। এর জঙ্গল থেকে চোর-ডাকাতদের খুঁজে বার করা বেজায় কঠিন কাজ ছিল।

এই পাড়ায় চোর-ডাকাত ছিল আর ছিলেন এক কনষ্টেবল। এই কনষ্টেবলটি কখনো একটি চোরও ধরেননি। না খেয়ে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি জীবনে একটি চোর না ধরলেও ইনি অন্য অনেক কিছুই ধরেছেন, বন্দী করেছেন। ইনি গাছপালা, দৃশ্য, গরু-ঘোড়া এ সমস্ত তাঁর তুলি এবং ক্যানভাসের সাহায্যে ধরে রেখেছেন। তার প্রমাণ এখনও আছে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি এবং টেট আর্ট গ্যালারিতে।

এঁর নাম জন কনষ্টেবল। বেঁচে থাকার সময়ে তাঁর ভাগ্যে সম্মান এবং টাকা জোটেনি। এখন তাঁর ছবির দাম হাজার হাজার পাউণ্ড। শিল্পীরা মরে না গেলে যে তাঁদের সম্মান হয় না ইনি তার জলন্ত উদাহরণ। এখনও অনেক শিল্পী হ্যাম্পস্টেডে থাকেন তাঁদেরও অনেকের ধারণা মরে গেলে তাঁরাও বিখ্যাত হবেন। তাঁদের ছবি দেখে অনেক সমালোচক বলেছেন তাঁদের মরাই উচিত। হ্যাম্পস্টেডে শিল্পীরা বেড়েই চলেছেন। প্রতি পাঁচজন হ্যাম্পস্টেডের লোকের মধ্যে একজন হ'লেন শিল্পী।

এই অবস্থা সমস্ত দেশে হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ত। সুখের কথা, ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র শিল্পীদের এমন প্রাদুর্ভাব নেই। হ্যাম্পস্টেডের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শিল্পীদের আধিপত্য। এই শিল্পীরা ছেঁড়া পোশাক পরেন (একজন শিল্পীবন্ধু বলেছেন এঁরা নতুন পোশাক থাকলে ছিঁড়ে নেন।) দাবা খেলেন, কফী খান, জাঁ পল সার্ত্র এবং ডিলান টমাস সম্পর্কে আলোচনা করেন, এভরিম্যান সিনেমা হলে ত্রিশ বছরের পুরোনো ভাল ছবি দেখে প্রবন্ধ লেখেন (তা ছাপা হয় না), বন্ধুদের পড়ে শোনান, বন্ধুরা প্রতিটি কথা ভুল প্রমাণ করেন—প্রতিটি মতই অগ্রাহ্য বলে মন্তব্য করেন। এই রকম বাধা পেলে তাঁরা আরো উৎসাহিত হন, আরো সমালোচনা লেখেন। কিন্তু একবার প্রশংসা করলে এঁদের সবাই সমালোচককে অনার্য্য লোক বলে গালমন্দ করেন। এঁদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই ন্যায় বিচার হয় না। এঁদের কেউ যদি বিখ্যাত না হন তাহলে সেটা হল সমাজের অন্যায় বিচারের ফল, আর যদি কেউ বিখ্যাত হন তাহলেও সেটা যে অন্যায় বিচারের ফলেই হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় এঁদের নেই।

এঁরা সমস্ত প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী। গুচো মার্কসের মত whatever it is, we are against it মন্ত্রে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা নেগেটিভধর্মী। এক কথায়, এঁরা ইনটেলেকচুয়াল। সমস্ত হ্যাম্পস্টেড ইনটেলেকচুয়ালে ভর্তি। কিন্তু আমাদের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হেইসের মধ্যে আধ আউন্সও ইনটেলেকচুয়াল হবার ক্ষমতা ছিল না। ইনি টাকা বুঝতেন, এবং টাকা তাঁর ছিল। টাকা ছাড়া আর অন্য কোন রকম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকা পছন্দ করতেন না।

মিসেস হেইসের বয়স ছিল প্রায় ষাট। জাতে ছিলেন ইহুদী। এঁর ছেলে ইহুদী নাম হেইস পছন্দ করত না বলে নাম বদলে করেছিল হলফোর্ড। হলফোর্ড ছিল ডাক্তার। হলফোর্ড এ বাড়ীতে থাকতো না—কিন্তু তার প্রচুর বই ছিল। বাড়ীর দুটি বড় তাক ভর্তি বইগুলিতে ছিল রুচির পরিচয়।

পিকাসো এবং মনত্রেয়ান, রেনোয়া এবং স্যুরা প্রভৃতি শিল্পীদের সম্পর্কে বড় বড় বই। তা ছাড়া বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে নানা ধরনের বই।

এই ফ্ল্যাটটি ছিল বেসমেণ্টে। একতলা এবং দোতলায় অন্যেরা থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। লণ্ডনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই রীতি। আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। আমাদের দেশে প্রতিবেশীরা সমস্ত রকম ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য—যেমন, আপনার বেতন কত, স্ত্রীর বয়স কত, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার না ডেকে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করান কেন, আপনি কাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলেন, রবিবার সকালে যে ভদ্রলোক ডাকতে এসেছিলেন আপনাকে তাঁর নাম কি, ঠিকানা কি, তিনি কত মাইনে পান—ইত্যাদি এ সমস্তেরই জবাব দিতে হয়। লণ্ডনে এ সমস্তের জবাব দিতে হয় না। কেউ বিপদে পড়লে কিন্তু লণ্ডনের প্রতিবেশীরা সজ্জন হয়ে ওঠে।

লণ্ডনে একটা ব্যাপার খুব লক্ষণীয় হ'য়ে উঠছে। একবার যে বাড়ীতে ভারতীয়রা যায় সে বাড়ীতে আস্তে আস্তে ভারতীয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমে এমন হয় যে, শেষ পর্যন্ত সে বাড়ীটার সমস্তই ভারতীয় লোকজনে ভরে যায়। এটা কেমন করে হয় বলছি। একটি বাড়ীতে দশখানা ঘর, প্রায়ই লোকেরা উঠে যায়—উঠে যাবার আগে বাড়ীর লোকেরা জানতে পারে ঘর খালি হবে। ভারতীয়টি যদি জানতে পারে যে একটি ঘর খালি হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার ভারতীয় বন্ধুকে বলবে একটি ঘর খালি আছে—সে ল্যাণ্ডলেডিকেও বলবে যে, তার বন্ধু খুবই ভদ্র, সে আসতে চায় এই বাড়ীতে। ল্যাণ্ডলেডির কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়—কারণ সে যখন একজন ভারতীয়কে ঘর ভাড়া দিয়েছে, অন্য একজনকে ভাড়া দিতে আপত্তি কি? এই ভাবে আস্তে আস্তে এক একটা বাড়ী ভারতীয়রা অধিকার করতে আরম্ভ করে। যে বাড়ীতে প্রচুর ভারতীয় সে বাড়ীতে ইউরোপীয়ান বা অ্যামেরিকান কেউই থাকতে চায় না। কারণ প্রতি ঘর থেকে পেঁয়াজ-লংকা রসুনের গন্ধ সমস্ত বাড়িটিকে ভ'রে তোলে। বিশেষ ধরনের ফুলপ্রুফ নাক না হ'লে সে গন্ধ সহ্য করা কঠিন। এইরকম বাড়ীতে ভারতীয়রা থাকে। প্রত্যেকের আলাদা ঘর হ'লেও তারা নিজেদের মধ্যে নানা রকম মামা কাকা ভাই দাদা খুড়ো সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়। খুব বন্ধুত্ব হ'য়ে যায় পরস্পরের মধ্যে।

খুব যেমন বন্ধুত্ব হয়, তেমনি শত্রুতাও হয়। প্রথমে গলায় গলায়, পরে আদায়-কাঁচকলায়। একত্র থাকতে থাকতে নানা রকম আর্থিক আদান-প্রদান চলে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ধার করার চেষ্টা করে। এই সব বাড়ীতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা ভারতীয়দেরই কেবল পরিচয় পান। অনেকে লণ্ডনে বছরের পর বছর থাকেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একটি অভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। তাঁদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় ইংরেজদের কেমন লাগল? তাঁরা উত্তর দেন: ইংরেজ তো কোলকাতার অফিসের সায়েব, সেই তো ইংরেজ। লণ্ডনে ইংরেজ টিংরেজ দেখিনি—তবে হ্যাঁ, বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবীতে লণ্ডন ভরা।

লণ্ডন ভরা—কথাটা ঠিক নয়। তবে রেলওয়েতে বা কাউন্টি কাউন্সিলে আজকাল প্রচুর ভারতীয় কেরানিগিরি করেন। প্রচুর লোক লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের কাজ করেন। শুনেছি প্যাডিংটন ষ্টেশনের একজন বাঙালী ইনফরমেশন কাউণ্টারে বসেন—বাঙালীরা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, দাদু, বলতে পারেন অক্সফোর্ডের টিকিট কোত্থেকে কিনব?

বাঙালী দাদু দু'পাটি দাঁত দিয়ে নিজের জিভটাকে কামড়ে ধরেন, তারপর বলেন, ঐ তো ঐ দিকে পথ লেখা আছে—আর আমাকে বাঙলায় কথা কওয়ান কেন মশাই? ইংরেজদের খাচ্ছি ওদের ভাষায় কথা না কইলে চাকরি যাবে।

কিন্তু চাকরি গেলেই বা কি, ন্যাশনাল-ইনশিওর‍্যান্স আছে না? চাকরি গেলেই যেমন আমাদের দেশের অনেকে রাস্তায় বসে পড়েন, সারাদিন ভিক্ষে করেন, ইংল্যাণ্ডে চাকরি গেলেই কিন্তু রাস্তায়-রাস্তায় বসবার জো নেই। প্রথমত গবর্মেণ্ট থেকে তাকে কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়—তাতে ভিক্ষে করতে হয় না। এটা তার প্রাপ্য—এটা হ'ল ইনশিওর‍্যান্স। কিন্তু এতেও যদি না চলে, তাহ'লে আছে ন্যাশনাল অ্যাসিসট্যান্স, এরাও প্রচুর সাহায্য করে থাকে লোকদের।

ভারতীয়দের বাড়ী দখল সম্পর্কে আমার জানা একটি ঘটনার কথা বলছি। সে বাড়ীতে জন-কুড়ি ভারতীয় থাকত—অন্য কোন জাতের লোক ছিল না। কি কারণে একটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে ল্যাণ্ডলেডির গোলযোগ হওয়ায় ল্যাণ্ডলেডি ছাত্রটিকে চলে যেতে বলেন বাড়ী থেকে। ব্যাপারটা অন্য ভারতীয়রা শুনলো—শুনে ল্যাণ্ডলেডিকে অনুরোধ করলো যে নোটিশ প্রত্যাহার করা হ'ক। ল্যাণ্ডলেডি কর্ণপাত না করাতে কুড়ি জন ভারতীয় এক সঙ্গে নোটিস দিল ল্যাণ্ডলেডিকে।

বাড়ী বদলের দিন সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। প্রায় একশো জন ভারতীয় জমা হয়েছে বাড়ীর সামনে। প্রত্যেক ভারতীয় তাদের চার-পাঁচজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাড়ী বদলানোতে সাহায্য করবার জন্য। প্রচুর ট্যাক্সি জমায়েত হয়েছে বাড়ীর সামনে। হৈ চৈ করে জিনিষপত্র নামানো হয়েছে। চারিদিকে প্রতিবেশীরা মজা দেখছে। দু একজন পুলিসও জুটে গিয়েছে কী হয় দেখবার জন্য। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত বাড়ীটাতে নেমে এসেছিল কবরের গাম্ভীর্য। একটি ভাড়াটে নেই, কেবল ল্যাণ্ডলেডি।

পুলক জামা ইস্তিরি করা শিখছে

কোনও কোনও ল্যাণ্ডলেডি ভাল যে হন না তা নয়। তাঁরা ভাল, কিন্তু ভারতীয়দের অভ্যাসের কথা তাঁরা জানেন না বলে রাগ করেন। ইংরেজদের গতিবিধি প্রায় মাপা। তাঁদের গতিবিধির যেটুকু বৈচিত্র্য আছে তাতেই তাঁরা খুসি। ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁরা পাল্লা দিতে পারেন না। বিশেষত ল্যাণ্ডলেডিরা একটু বেশি মাত্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে কাতর হয়ে পড়েন। ইংরেজদের ধারণা যে মানুষের বেশি বন্ধু থাকার প্রয়োজন নেই—এক-আধজন যদি থাকে ভাল, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ভারতীয়দের বন্ধু প্রচুর—আর বন্ধুদের কাজই হ'ল বাড়ীতে আসা, এসে হৈ চৈ করে গল্প করা এবং এগারোটা বারোটার লোকে ঘুমিয়ে পড়লে বিনা কারণেই ফোনের ঘণ্টা বাজিয়ে জাগানো। কোন কোন ল্যাণ্ডলেডি সামান্য আওয়াজও সহ্য করতে পারেন না। রেডিও যদি জোরে বাজানো হয় তাহ'লে তাঁরা সেটাকে অপরাধ মনে করেন। অথচ খুব জোরে রেডিও না বাজালে আমরা রেডিও রাখবার অর্থই খুঁজে পাই না। একটা আইন এদেশেও আছে যে রেডিও এত জোরে খুলে রাখা চলবে না, যাতে প্রতিবেশীদের এতে অসুবিধে মোটেই না হয়। আমাদের দেশে যেমন প্রতি সহরে চার পাঁচটা রেডিও থাকলেই চলে যায়, ইংল্যাণ্ডে তা চলে না। সেখানে এমন কি পাশের ঘরের রেডিও শোনা যায় না এমন আস্তে বাজানো হয়।

আমাদের নতুন বাড়ীটি ভালই হ'ল। তবে ফার্ণিচার প্রায় কিছুমাত্র ছিল না। সমস্তই ভাঙা এবং কোনক্রমে ব্যবহার করা চলে। একটা টেবিলের পা এমন নড়বড়ে ছিল যে সে টেবিলের উপর কিছু রাখা চলত না। অন্তত সে টেবিলে খাওয়া কিছুতেই চলত না। হঠাৎ ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। সে কথা বলাতে মিসেস হেইস বলতেন টেবিল ওমনিই হয়। আস্ত টেবিল লণ্ডনের কোন ল্যাণ্ডলেডিই দেয় না।

ল্যাণ্ডলেডিকে বললে কোন অভিযোগের প্রতিকার হয় না যে তার প্রমাণ বহু বার পেয়েছি। নিজেদেরই সারিয়ে নিতে হয় পয়সা খরচ করে। আমাদের এবারে ইলেকট্রিক হীটার ব্যবহার করতে হল—কারণ গ্যাস হীটার নেই এ বাড়ীতে। একটা ঘরে কয়লা দিয়ে ঘর গরম করতে হয়। কয়লা প্রথমত পাওয়া কঠিন। একটি কয়লাওয়ালার কাছে নাম লেখাতে হল। তারা কয়লা দিয়ে গেল গাদা খানেক। সে কয়লা সমস্তই ভিজে। আমি আর রন্টু (পিসতুতো ভাই বয়স ৯ বছর) দুজনে মিলে মাঝে মাঝে লোহার শিক দিয়ে কয়লা ভাঙতাম বাগানে। বৃষ্টি পড়লে সেখানে ছাতা নিয়ে যেতে হত। সেখানে বসে আস্ত কয়লাকে টুকরো টুকরো করতে হত। এর ফলে অর্দ্ধেক কয়লা গুঁড়ো হ'য়ে ছিটকে বাগানের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হত। বাকী যা থাকত এক বালতি বোঝাই করে এনে জ্বালবার ব্যবস্থা করতে হ'ত। এজন্য শুকনো কাঠ বাড়ীতে মজুদ রাখতে হত। এই শুকনো কাঠের টুকরো প্যাকেটে করে দোকান থেকে কিনে আনতাম। একটা ছোট প্যাকেট কিনতে পাঁচ ছ পেনি খরচ পড়ত। এই কাঠ কিন্তু সহজে জ্বলত না। এই কাঠ জ্বালানোর জন্য আবার প্রয়োজন হ'ত খবরের কাগজ।

কিন্তু সব সময়ে খবরের কাগজে কাজ হ'ত না। কেরোসিন ব্যবহারও করে দেখেছি। তা ছাড়া আর একরকম জ্বালানি বাজারে পাওয়া যেত, খয়েরের মত দেখতে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি পোড়ে আর বেশ তাপও হয়। প্যাকেটে ছ'টা ঐরকম খয়ের থাকে, দাম ছ' পেনি। প্যাকেটে লেখা থাকে যে প্রতিবার আগুন ধরাতে একটি কিংবা দুটি খরচ করলেই হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই হয় না।

কম পক্ষে চারটে করে খয়ের পোড়াতে হয়।

কয়লা ধরাতে সময় লাগে অন্তত এক ঘণ্টা। কয়লা যখন ধরে আসে তখন বড় ভাল লাগে। কিন্তু তখন কয়লার আগুন উপভোগের সময় নেই।

হাত ধুতে হবে। সারা হাতে কয়লার দাগ, মুখে কয়লার দাগ। চান করলেই ভাল হয়। রোজই প্রায় চান করতে হ'ত।

এরকম আগুনের কোন অর্থ বুঝি না। কারণ কয়লা জ্বালিয়ে বেশ আরাম করছি হয় ত—এমন সময় টেলিফোন এল পুলক চক্রবর্তীর। ওর কাছে যেতে হবে বেলসাইজ স্কয়ারে। সেখানে কী এক পার্টি হ'চ্ছে কনটিনেণ্টাল ক্লাবে। অত কষ্টে তৈরি করা আগুনকে ফেলে যেতে হয়, নিবিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না।

এরকম বাড়ীতে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'চ্ছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া। লেপ গায় দিয়ে।

যে ইলেকট্রিক হীটার ছিল এ বাড়ীতে তার উত্তাপ এত কম যে হীটারের ইঞ্চি তিনেক দূরে হাত না রাখলে একটুও গরম লাগত না।

পুলক চক্রবর্তী যেখানে থাকত সে বাড়ীতে থাকত সাধারণত ইউরোপের ছেলে-মেয়েরা। পুলক যে ঘরে প্রথমে গিয়েছিল সে ঘরে আরো দুজন লোক থাকতো।

তারা জার্মান বা ইটালিয়ান নয়।

তারা ইউরোপের লোক নয়। তাদের আবাস চীন দেশে। তাদের সঙ্গে পুলকের হ'ল বন্ধুত্ব।

ঐ চীনে ছেলে দুটি রোজই তাদের গেঞ্জি শার্ট ইত্যাদি সাবান দিয়ে কাচতো, শুকুতো এবং ইস্তিরি করতো।

লণ্ডনে ধোবার খরচ প্রচুর। একটা শার্ট ধুতে দেড় শিলিং পর্যন্ত লাগে। আমাদের এক টাকার সমান। অতএব নিজে ধুয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভাল। এর জন্য ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যায়। কোন কোন দোকানে প্রচুর ওয়াশিং মেশিন রাখা হয়—সেখানে গিয়ে আধ ঘণ্টায় পাঁচ ছ সের ওজনের জামা-কাপড় আড়াই শিলিং খরচ করে ধুয়ে আনা যায়। তারপর শুকিয়ে ইস্তিরি করে নিলেই হয়। অনেকেই এটা করে থাকে।

চীনেরাও তা করতো।

একদিন পুলক চীনে ছেলে দুটিকে বললো, ভাই, তোমরা আশ্চর্য কাণ্ড করছ—এমন সুন্দর ধোয়া আর ইস্তিরি এত দেশ ঘুরলাম কিন্তু কোথাও দেখিনি। আর বোধ হয় এজন্মে কোথাও দেখব না।

চীনে ছেলে দুটি বিনয়ের অবতার। তারা বলে, এ তো খুব সোজা—সবাই করতে পারে, এমন কি তুমিও করতে পার। পুলক আরও বিনয়ের সঙ্গে বলে, না আমি কিছুতেই পারব না—আমার

দ্বারা জামা কাপড় ধোওয়া হবে না। চীনেরা ভরসা দেয় হবে হবে। একদিন তারা পুলকের পুরনো জামা ইত্যাদি ধুয়ে নিয়ে এল ওয়াশিং মেশিনে। পুলক দেখলো।

চীনেরা বললো, এবারে ইস্তিরি করা শিখে নাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ কেমন করে আমরা করি। পুলক তাও দেখলো।

তারপর দিন থেকে রোজ চীনেরা পুলকের সমস্ত জামাকাপড় ধুয়ে দেয়। ইস্তিরি করতে শেখায়।

কিন্তু পুলক কিছুতেই শিখতে পারে না।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ে অথবা দাড়ি কামায় আর মাঝে মাঝে ইস্তিরি দেখে। পুলক ইস্তিরি করা কিছুতেই শিখতে পারেনি। প্রায় তিন মাস চীনারা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেয়। তার পর তারা বাড়ী ছেড়ে দেয়।

লণ্ডনের ধোপাঁরা কাপড় কাচতে বড় দেরি করে।

এদের দোকান আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশি নয়। সাত দিনের কমে সুতির কাপড়-জামা পাওয়া যায় না। কখনো চোদ্দ দিনও লেগে যায়। এই ধোপা দোকানদারেরা খুব গম্ভীর মুখ করে থাকে। কোথাও তাদের হাসতে দেখিনি। ইংল্যাণ্ডে সমস্ত দোকানেই দোকান-কর্মচারীদের হাসবার নিয়ম—এমন কি মাংসের দোকানদার পর্যন্ত হেসে জিজ্ঞেস করবে, এ দেশ ভাল লাগছে? আমাদের দেশের আবহাওয়া নিশ্চয় তোমাদের ভাল লাগে না?

কিন্তু ধোপাদের হাসতে দেখিনি। এরা হাসে না, কিন্তু এদের রসিকতাবোধ আছে। এরা অন্যের শার্ট, অন্যের রুমাল —বিশেষ ক'রে অন্যের তোয়ালে প্যাকেটে ভরে দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার রক্ষার আইন-কানুনে ইংল্যাণ্ডের বাতাস ভারি, কিন্তু জামা-কাপড়ের বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শার্ট পরে—পরতে বাধ্য হয়।

শার্ট নতুন কিনেছ, ধোপা দিয়েছ? এই কথাটি আমাদের মধ্যে খুব পরিচিত ছিল। কেউ নতুন শার্ট কিনলে তাকে জব্দ করবার জন্য খুব সহানুভূতির সঙ্গে বলা হ'ত, ভাই, তোমার ধোপা বড়ই অসৎ তো!

কেন?

ঐ যে শার্টটি পরে আছ, ওটা তো তোমার নয়—তোমার ও রকম রুচিই হবে না—ব্রাউন রঙের ষ্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট তোমাকে মোটেই মানায় না।

মানায় না—বটে?

এ রকম মানায় না।

তুমি জেনে রাখো, এই শার্ট আমি নিজের পয়সায় এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিনেছি।

মাপ করো ভাই। আমি জানতাম না।

একবার খুব মজা হয়েছিল। সাধনের প্যাকেটের সঙ্গে অন্য কোন এক ভদ্রলোকের প্যাকেট সুদ্ধ বদলে গিয়েছিল।

তিন দিন সে রেগে ছিল। বৃজ খেলেনি, বন্ধুদের খাওয়ায়নি—এমন কি রান্না করেনি পর্যন্ত। তার পর সে একটা কাঁচি দিয়ে সমস্ত জামা কেটে ফেলে ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়। কারণ, ঘটকের গলার মাপ ষোল ইঞ্চি, আর ধোবার দেওয়া শার্টগুলির প্রত্যেকটি চোদ্দ ইঞ্চি।

ধোবার দোকানে বলেও কোন ফল হয়নি। তারা বলেছিল, নম্বরে মিলে যাচ্ছে অতএব এ নিশ্চয়ই সাধনের জামা। সাধন বলেছিল, না এ জামা আমার নয়, যে কোন গাধাই সেটা বুঝতে পারবে।

কিন্তু দোকানদার বুঝতে পারেনি।

রুচি হয়নি।

সে জামা কিনল এবারে—নাম তার টেরেলাইন। এ জামা ধোবাকে দিতে হয় না। বাড়ীতে মেসিনে পাঁচ মিনিটে কাচা যায়, দু ঘন্টার মধ্যে শুকিয়ে দেয়।

এই জামার ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তুলোর প্রাধান্য কমছে। এর পর বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকনা সবই এ দিয়ে তৈরি হবে হয়ত।

লোকে যত এই নতুন জিনিসের জামা ব্যবহার করছে তত ধোবারা কম টাকা পাচ্ছে—আর ততই ধোয়ার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এর পর হয়ত একটা জামা ধোয়ার খরচ দিয়ে একটা জামাই কেনা সম্ভব হবে। লোকেরা বাড়ীতে যত কাপড় ধুচ্ছে ততই সাবানের বিক্রি বাড়ছে।

বিশেষ করে গুঁড়ো সাবানের।

আর প্রচুর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে সাবানের গুঁড়োর। সব সাবানের গুঁড়োতেই সমান কাজ হয়—সমান পরিষ্কার হয়। একটু কম বেশি হ'লেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু সাবান কম্পানীরা বিজ্ঞাপন দেয়, আমাদের সাবান দিয়ে ধুলে সাদার চেয়েও সাদা হয়। অন্য একটি কম্পানী বিজ্ঞাপন দেয় কেবল সাদাতে আর চলবে না, এর সঙ্গে প্রয়োজন উজ্জ্বলতার। অন্য একটি কম্পানী বিজ্ঞাপন দেয়, ঔজ্জ্বল্য আরো স্থায়ী করে আমাদের সাবানের ফেনায়।

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় একটা জিনিস—ইংরেজরা বেশি সাবান ব্যবহার করছে—অতএব তারা পরিষ্কার জাত। কথাটা সত্যি। আর একটা জিনিস মনে

পুলিশ ও বব

হয় যে ইংরেজরা সাবানের জন্য যত খরচ করছে তার চাইতে বেশি খরচ করছে বিজ্ঞাপনের জন্য।

অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ করছে কম্পানিরা কোটি কোটি টাকা। এই টাকা দিচ্ছে ক্রেতারাই। অর্থাৎ ক্রেতারা একটা জিনিসের জন্য দাম বেশি দিচ্ছে। অথচ কোন জিনিস বিক্রি করতে হ'লে বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে সাবান বিক্রির ব্যাপারে তারা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

বাসে, টিউবে বিজ্ঞাপন, রেডিওতে টেলিভিশনে সর্বত্র বিজ্ঞাপন। অধিকাংশই সাবানের।

সাবানের গুঁড়োর দাম মাঝে কমিয়ে দেওয়া হয়। যার দাম দু শিলিং প্যাকেট, তার দাম একটি কোম্পানি হঠাৎ এক শিলিং দু পেনি করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোম্পানি তাদের সাবানের দামও কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দেখা গেছে তাতেও তাদের লাভই থাকে।

লিগুফিল্ড গার্ডনসে বেলাদি' হ'লেন আমাদের প্রতিবেশী। একদিন দেখি বেলাদি' দু-একটা জিনিস কেমিষ্টের দোকান থেকে কিনেছেন। তার মধ্যে একটা টিউব—সান ট্যান লোশনের।

ইউরোপে এই জাতীয় লোশনের বিক্রি খুব বেশি। যাঁরা রৌদ্রস্নান করেন বাগানে বা সমুদ্রের ধারে তাঁদের গা যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য আগে থেকে এই তৈলাক্ত পদার্থটি মেখে নিতে হয়। কিন্তু ভারতীয়দের এ জিনিস বিশেষ প্রয়োজন হয় না—কারণ ভারতীয়রা ইংরেজদের মতো অত সূর্যের আলোয় চান করবার পক্ষপাতী নয়। তাই ওটা দেখে অবাক হলাম। বললাম, বেলাদি', রৌদ্রস্নান করেন নাকি আপনি?

—কৈ না! কে বললো?

—আপনার কাছে সানট্যান লোশন দেখছি কি না তাই! ঐটে গায়ে মেখে সায়েব-মেমেরা সমুদ্রের ধারে মড়ার মত পড়ে থাকে।

বেলাদি' বললেন, এক্ষুনি কেমিষ্টের দোকানে দিয়ে এসো না ফেরত এটি।

বেলাদি' টুথপেষ্ট মনে করে কিনেছিলেন ওটি। এরকম ভুল প্রায়ই হয়। দোকানে সাজানো জিনিস থাকে, নিজে তুলে নিতে হয়, দাম দিতে হয়, সাধারণত—টুথপেষ্ট মনে করে সানট্যান লোশন আনা মোটেই অসম্ভব নয়।

কিন্তু কেমিষ্টের দোকানে গিয়ে ডিম চাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি বৈ কি। তাও ঘটেছিল আমাদের বন্ধু ইসমতুল্লা আনসারির ভাগ্যে। ও কিনতে বেরিয়েছিল ডিম—এসেছে দু সপ্তাহ হল লাখনৌ থেকে।

ফিঞ্চলী রোড টিউব ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই বাঁদিকে দু একটা দোকানের পর হল কেমিষ্টের দোকান—আর তার পাশেই মাংস ডিম ইত্যাদির দোকান। দোকানের শোকেসে রয়েছে ডিম—সাজানো।

ও ভুল করে ঢুকে পড়েছে কেমিষ্টের দোকানে। কেমিষ্টের দোকানে খাতা পেন্সিল ক্যামেরা রবারের বল, ডায়েরী, সুটকেস, ফিল্ম এ সমস্ত পাওয়া যায়—কিন্তু কোন কারণে ইংল্যাণ্ডে এরা ডিম বিক্রি করে না। এরা হলুদ, দারচিনি, লঙ্কাগুঁড়ো পর্যন্ত বিক্রি করে। কিন্তু ডিম নয়। কেমিষ্টদের দেখলে মনেই হয় না এরা ডিমের নাম শুনেছে কখন।

আনসারি একটি মহিলা শপ অ্যাসিষ্ট্যান্টকে বলেছে, গোটা ছয়েক ডিম দাও তো?

ডিম? তুমি ডিম চাও?

আনসারি জবাব দিয়েছে: চাই বই কি—আলবত চাই। আমি ডিম কিনতে এসেছি—ডিম কিনব, তুমি ডিম বেচবে।

না, আমি ডিম বেচব না। পাশের দোকানে যাও, ওদের কাছ থেকে ডিম পাবে।

আমি ডিম কিনব এবং এখান থেকেই কিনব। না কিনে নড়ব না।

ভদ্রমহিলা বললেন, পয়সা দাও আমি দিচ্ছি। পয়সা নিয়ে পাশের দোকানে গিয়ে চারটে ডিম কিনে এনে আনসারির হাতে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, এর পর থেকে যখন ডিম কিনতে আসবে তখন ঐ দোকানে যেও।

আনসারি ভুল বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠেছিল লজ্জায়।

খুব সাবধানী লোক আমাদের দুলুদা। (দেবব্রত চক্রবর্তী) দুলুদাও একটি কেমিষ্টের দোকানে গিয়েছেন—তিনি কিনবেন এক টিউব দাড়ি কামাবার সাবান। দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, উইথ ব্রাশ অর উইদাউট ব্রাশ? (অর্থাৎ যে সাবানের টিউব নেবে, সে সাবান হাত দিয়ে গালে সোজাসুজি ঘষতে পারো—ব্রাশের প্রয়োজন নেই একেবারে—অথবা যে সাবানে ব্রাশের প্রয়োজন হয়, তেমন টিউবও আমরা রাখি।)

দুলুদা ভাবলেন, উইথ ব্রাশ—অর্থাৎ এরা টিউবের সঙ্গে ব্রাশও বিক্রি করবার তালে আছে। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, অফ কোর্স, উইদাউট ব্রাশ!

বাড়ীতে এসে জল দিয়ে ব্রাশ দিয়ে দুলুদা যত চেষ্টা করেন, কিছুতেই ফেনা হয় না। অবশেষে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। প্যাকেটের উপর লেখা আছে: ব্রাশ ব্যবহার করতে হয় না। উইদাউট ব্রাশ!

কোলকাতায় যে জিনিস প্রত্যেক বাড়ীতে আছে তা লণ্ডনের প্রায় কোন বাড়ীতেই নেই—জিনিসটা কি? আরসোলা? ছারপোকা? এগুলো দেখতে পাওয়া যায় না বটে তেমন, কিন্তু একেবারে অদৃশ্য নয়। জর্জ অরওয়েল লিখেছেন তাঁর বইতে যে টেমস নদীর উত্তরে কোন কারণে ছারপোকা নেই—কিন্তু দক্ষিণ দিকে আছে। এর কারণ কি জানা যায় না। টেমস ত ঐটুকু একটা নদী, সেজন্য ছারপোকাদের কী অসুবিধে হয় বুঝি না। কোলকাতার যে জিনিস প্রত্যেক বাড়ীতে আছে সে হ'ল সমতল ছাদ। লণ্ডনের ছাদ সমতল নয়। তার উপরে বসা যায় না, আড্ডা মারা যায় না।

লণ্ডনে কোলকাতার মত ছাদ করা হয় না, তার কারণ হ'ল স্নো।

স্নো যাতে পড়ে পড়ে ছাদের উপর জমে না যায় সেজন্য ছাদ এমন করে তৈরি যে স্নো কিছু জমে গেলেই পড়ে যায় আপনা-আপনি। আমাদের দেশের করুগেটেড টিনের চালের মত।

ছারপোকার কথায় মনে পড়ে গেল একটি বাঙালীর কথা। লিণ্ড ফীল্ড গার্ডনসে আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতো সে। তার কাজ ছিল নানা বিষয়ে ফেল করা। শুনেছি সে ভাল রান্নাও করত।

একদিন সে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে বললো, বড় বিপদে পড়েছি, পাউণ্ড দুয়েক চাল হবে? আমি রান্না ঘর থেকে এক পাউণ্ড চাল এনে দিলাম। দু পাউণ্ড দেবার মত চাল ছিল না।

রাত তখন দশটা।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে এসে বললো, খানিকটা মাখন পেলে ভাল হত।

মাখন তাকে দিলাম খানিকটা।

আরো একটু পর এসে বললো, গোটা চারেক আলু যদি···।

তাও দেওয়া গেল।

সে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করল। বিনয়ের অবতারের মত অনেকটা কথাবার্তা বললো। আরো বললো পরদিন সকালেই সমস্ত সে ফেরত দিয়ে যাবে।

কথা রাখেনি সে। তার পর থেকে ওর কথা মনে হলেই আরশোলার কথা মনে পড়ে। টিপে মারতে ইচ্ছে করে। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, আলোচনা করেছি। আমার এক বন্ধু বলেন এর জন্য দুঃখের কিছু নেই। একজন বাঙালী ধার নিয়ে শোধ দেননি এটাই স্বাভাবিক—অর্থাৎ বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক। আর যদি সে লণ্ডনে যায় তাহ'লে সে তার বাঙালী বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। অতএব এগুলো সহ্য করতেই হবে। মণি পালিতেরও একই অভিজ্ঞতা—তিনি প্রচুর ধার দিয়েছিলেন বহু বাঙালীকে, কিন্তু তারা খুব কমই শোধ দিয়েছে! আমরা পরে দেখেছি বাঙালীদের মধ্যে এমন এক একজন কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেন, মামা দাদা দিদি সম্পর্কে পাতান এবং নানা সুবিধে করে নেন। ওঁরা ইংরিজি খাদ্য মুখে তুলতে পারেন না বলে প্রায় রোজই ভারতীয়দের ফ্ল্যাটে ঘুরে বেড়ান যদি কিছু খাদ্য জোটে এই আশায়, ওঁরা ধার করেন—দেশে স্ত্রী না খেয়ে আছে ছেলেরা পকেট কাটা ধরতে বাধ্য হচ্ছে এ সমস্ত কথা বলেন। এ বিষয়ে এক ওস্তাদের কথা বলছি। এঁর বহু ছদ্মনাম—কখনো ইনি প্রভু বসাক, কখনো উষা রায়। অনেক বাঙালী সযত্নে বাঙালীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন—কিন্তু এই প্রভু বসাক বা উষা রায় জাতীয় লোক যে এজন্য অনেকখানি দায়ী সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই প্রভু বসাক বা উষা রায়ের এক দু পাউণ্ডে চলত না, ইনি দশ পাউণ্ডের কম ধার করতেন না, এবং তারপর সে মুখ আর দেখা যেত না। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতেন, এই জোচ্চোরটি কোথায় আছে জানি না। শুনেছিলাম কার কাছ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড ধার করে জাহাজে করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। এখন তিনি কি ভাবে লোকেদের কাছ থেকে ধার করছেন জানতে ইচ্ছে হয়।

কিছু কিছু বাঙালী এখনো ভাল আছেন এটাই ভরসার কথা।

কৃষ্ণ মেনন একবার ছাত্রদের সভায় বলেছিলেন, তোমরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূতের মত। তোমরা যা করবে তার ফলেই নির্ভর করবে আমাদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক। আমরা যারা মাইনে করা রাষ্ট্রদূত তাদের চেয়ে ছাত্রদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

দায়িত্বহীনতা আমাদের প্রচুর। এ গুলোর নানারকম উদাহরণ দেওয়া যায়।

ইংরেজদের একটা গুণের কথা জানি, সেটা হল তাদের ব্যবসায়িক সততা। তারা কথার দাম দেয়, খারাপ জিনিষ দিলে তা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু ভারতীয় দোকানে ঠিক তার উল্টো দেখতে পাই। কোন জিনিস খারাপ দোকানদারেরা ইচ্ছে করেই দেয়, অতএব তা ফেরৎ দেয় না! আমাদের প্রায় প্রতিটি খাদ্যে ভেজাল আমরা খাচ্ছি। ক্ষতি আমাদের যে দেহের হচ্ছে তা নয়, জাত হিসেবে আমরা ভেঙে গিয়েছি বলেই এর বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক প্রতিরোধ নেই। তাই একে বলা চলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

যে ইংরেজ দোকানদার হাসিমুখে খারাপ কোন জিনিষ ফিরিয়ে দেয়, তখন হয়তো কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু এটা তার পক্ষে একটা ইনভেষ্টমেণ্টও বটে। ক্রেতা সেই দোকানে নিশ্চিন্ত মনে জিনিস কিনতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজ সৎ বলেই যে এটা করে তা নয়। ইংরেজ জানে, এর ফলে তার লাভই বেশি হবে। কেবল সে নয়, তার ছেলেও যাতে সে ব্যবসা বজায় রাখতে পারে সেজন্য সে ছেলেদেরও সততাই শিক্ষা দেয়। ব্যবসার জন্যই সততার প্রয়োজন।

আমার দু-একজন বন্ধু লণ্ডনে হঠাৎ একটা বিরাট একটি ব্যবসার সুযোগ জুটিয়ে ফেলে। কার্পেট তৈরি করবার জন্য বাজে উল কেনা হয়—বাজে উল ফেলা যায় না, সেগুলোও বিক্রি হয়। হিসেব করে দেখা গেলো দশ বারো হাজার টাকা খরচ করলে ত্রিশ হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু দশ বারো হাজার টাকা ছিল না, অতএব হাজার পাঁচেক টাকা অগ্রিম চাওয়া হল।

যে কম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করার কথা তারা বললো, আগে জিনিস ডেলিভারি দাও পরে দাম দেব। বিল অফ লেডিং দেখিয়েও টাকা পাওয়া যাবে না বলে তাঁরা জানালেন, কারণ ইতিপূর্বে আর একটি ভারতীয় কম্পানি উলের সঙ্গে পাটের ভেজাল দিয়ে তাদের আশী হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে—অতএব তাঁরা রিস্ক নিতে রাজি নন।

আমরা লিণ্ডফিল্ড গার্ডনসে বেশ কিছুদিন ছিলাম—অথচ মিসেস হেইসকে চান করতে দেখিনি। এ ব্যাপারে খুব অবাক হতাম, বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি নিজেই একদিন বললেন যে তিনি পাবলিক বাথে নিয়মিত চান করেন। বাড়ীতে সুন্দর চানের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাইরে গিয়ে চান করেন কেন জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন তাঁর বয়স বেশি হওয়াতে তিনি পেনশন পাচ্ছেন গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে। যাঁরা বৃদ্ধ বয়সের পেনশন পান তাঁরা
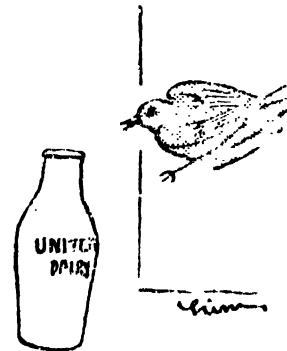
দুধের বোতল ও টিট পাখি

সাধারণ স্নানাগারে কোনো খরচ না দিয়ে চান করতে পারেন এবং সোম থেকে বৃহস্পতিবার এই চার দিন বিনা খরচে যে কোন সিনেমা হলে ঢুকতে পারেন। মিসেস হেইস প্রচুর সিনেমা দেখতেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সিনেমা দেখা নয়, বাড়ীতে আগুন জেলে খরচ না করবার জন্ত।

সাধারণ স্নানাগার লণ্ডনে প্রচুর আছে। আমাদের একটি পোল্যাণ্ডের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পিকাডিলি পাড়ায়—নাম তার বব। বব সমস্ত রাত পিকাডিলিতে ঘুরে বেড়াত—তার সামান্ত কিছু পয়সা ছিল তাতে হোটেলে থাকা যেত না। অতএব সে দুপুর বেলা ছ' সাত পেনি খরচ করে চানের টবে গরম জলে ঘুমিয়ে নিত ঘণ্টা কয়েক। স্বাস্থ্য তার খুব ভাল ছিল—এবং পিকাডিলিতে সমস্ত রাত ঘুরেও তার কোন রকম অসুবিধে হত বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া পিকাডিলির খুব কাছেই কভেণ্ট গার্ডেন—সেখানে সাক সক্তীর পাইকারী বাজার—রাত্রি বারোটার পর গ্রাম থেকে আসে লরিতে করে শাক সবজী ফল ফুল ইত্যাদি। সেখানে তার সঙ্গীর অভাব হয় না। মাঝে মাঝে এর ওর বোঝা বয়ে দিয়ে তার দু' চার শিলিং আয়ও হয়েছে—কিন্তু সে বেআইনী ভাবে। তার বোঝা বওয়ার অধিকার নেই। বোঝা বইতে হ'লে ইউনিয়নের কাছে আবেদন করতে হবে। তারা বিদেশীকে কাজ করতে অনুমতি দেবে না। আর বব নিয়মিত কাজ করতে চাইতও না। অনিয়মই ছিল তার কাম্য। দু' একবার ইংরেজ "টেডি বয়"দের সঙ্গে তার ঘুষোঘুষিও হ'য়েছে।

ববের সবচেয়ে ভাল লাগে ইংরেজ পুলিস। রাত দুটোর সময় পুলিসের সঙ্গে ববের দেখা ট্রাফালগার স্কয়ারে। এখানে কি করছ—বাড়ী যাও! পুলিস বলে চলে গেছে। আর কিছু বলেনি। পরদিন সেই পুলিসের সঙ্গে একই জায়গায় একই অবস্থায় দেখা। কী হে, তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী নেই।

—হুঁ বাড়ী নেই, বটে? আমার সঙ্গে এস।

বিনা আপত্তিতে বব পুলিসের সঙ্গে যায়। থানাতে শোবার বন্দোবস্ত নাকি খুব ভাল।

দু'-চারদিন জেলও খেটেছে।

ছেলেটি কি ভাবে পোল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনে এসেছিল জানি না। তার কোন পরিচয় সে জানতো না। তার মাথা হয়ত খুব সুস্থ ছিল না। কিন্তু এই রকম ছেলেরা লণ্ডনের দুবৃত্তদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। লণ্ডনের নানারকম দুর্বৃত্ত আছে। বিশেষ করে সোহো অঞ্চল দুর্বৃত্তদের ঘাঁটি আছে। এই সব দলে পৃথিবীর সবাইকে পাওয়া যায়। এরা বন্দুক রিভলভার পছন্দ করে না। বিশেষ করে দাড়ি কামানোর ক্ষুর এদের খুব প্রিয়। এতে কারুও হয় না' পুলিশ এই অস্ত্রকে বে-আইনী বা অস্বাভাবিক মনে করতে পারে না। তবে লণ্ডনের এই আণ্ডারওয়ার্ল্ড অধিকাংশ লোকেদের অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে না। ভারতীয় ছাত্ররা সাধারণত সন্ধ্যের পর এ পাড়ায় আসে না, যদিও কাছেই লণ্ডন ইউনিভার্সিটি। আমাদের এক বন্ধু দেবব্রত চন্দ্র সোহোর ভেতর দিয়ে না গিয়ে প্রায়ই আধ মাইল বেশি হাঁটতো। সে বলতো, গোলমাল থেকে দূরে থাকাই ভালো। আমরা বহুবার সোহোর মধ্যে গোলমাল দেখবার আশায় গিয়েছি, কিন্তু কোনদিনই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। বোধ হয় একেবারেই পড়েনি বললে ভুল হবে।

একদিন সোহো স্কয়ারের মধ্যে পার্কে সন্ধ্যের কিছুপরে দেখেছিলাম দেবব্রতকে।

দেবব্রত বলেছিল, সব বাজে কথা না রে? কই কেউ তো ক্ষুর নিয়ে তাড়া করল না?

[আগামীবারে সমাপ্য]

EGYPT MIGHT IS TUMBLED DOWN

(M. E. Coleridge)

(১)

মানব-মনের মাঝে হয়েছে বিলয়
মিশরের শক্তি যত, যত পরিচয়,
তেমনি পতন হ'ল গ্রীসের ট্রয়,—
রোম আর ভেনিসের গর্ব হ'ল ক্ষয়।

(২)

তবু তথা আজো আছে শিল্পী কবিগণ,
আছে জেগে জীবন মাঝে কতো না স্বপন।
অসার অস্পষ্ট, যেন ব্যর্থ অলীক,
আর আছে জেগে যত মানবের মন।

অনুবাদিকা—কুমারী শুক্লা মুখোপাধ্যায়

এসো নববর্ষ

মধুচ্ছন্দা দাশগুপ্তা

তুমি শুধু দ্বারে মোর এসেছো।
(তবু) ফুটেছে অজানা ফুল, ঝরেছে কত বকুল
সুরভি ছড়িয়ে গেছে বীথিকায়
কোকিলা মুখরা হয়ে, ডেকে গেছে মুহু, মুহু
বসুমতী পুলকিতা গীতিকায়

হে নূতন পুরাতনে টানো অবগুণ্ঠন
নব রূপে এসো মোর গৃহে আজ
যেমন এসেছে কলি মল্লিকা ডালে ডালে,
যেমন পরেছে ধরা নব সাজ
(তবু) তুমি শুধু দূর হতে হেসেছো।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৭। দেখতে দেখতে সেই সময়টি এল, যখন স্তন্যপান বন্ধ হয়ে যায় শিশুদের, এবং হামা টেনে আর তারা চলে না। বালকৃষ্ণ এখন ধীরে ধীরে চলেন, পায়ের পাতায় ভর দিয়েও হাঁটতে পারেন, ননী চুরিও করেন।

যিনি পরমানন্দ-কন্দ তিনি যে-ক্ষেত্রে প্রকট করছেন তাঁর বাল্য-লীলার কৌতুক, সে-ক্ষেত্রে কি আনন্দের জন্ম না হয়ে যায় ?

২৮। একদা—

নিজের ঘরখানি নির্জন দেখে, চুরি করতে ঢুকেছেন ছেলে। চুরি করলেন…আগের দিনের ননী-জ্বালানো ঘি। চুরি করতে গিয়ে, মণিস্তম্ভে যেই না দেখা নিজের প্রতিবিম্ব, অমনি থামা। ভয়ে ভয়ে ছায়াটিকে তখন ছেলে বললেন ভাই, ভাই, বলিসনি ভাই মাকে আমার, তোর জন্যও ভাই ভাগ রেখেছি আমি, খা ভাই। কল কল করে বকে যাচ্ছেন চোর, আর আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলেন মা।

২৯। তারপরে যেই ছেলের কাছে রঙ্গ করে এগিয়ে গেলেন মা অমনি ছেলে সপ্রতিভ। নিজের প্রতিবিম্বটিকে দেখিয়ে দিয়ে মাকে বলে উঠলেন—

মা মা, দেখ কে এসেছে। ননী চুরি করতে এই মাত্র ঘরে এসে ঢুকল। লোভ হয়েছে চোরের। বারণ করছি, কিছুতেই শুনছে না। রাগ করছি, ও আমার উপর চোখ রাঙাচ্ছে। আমার তো আর লোভ নেই ননীর উপর।

৩০। আর একদিন—

কার্য্যান্তরে গেছেন জননী। ইত্যবসরে ননী চুরি করছেন ছেলে। হঠাৎ দৈবগতিকে মা এসে উপস্থিত। ছেলেকে দেখতে না পেয়ে যেই তিনি ডাক দিয়ে উঠেছেন—

ও কৃষ্ণ, বাপ আমার কোথায় গেলি তুই, কি করছিস রে ? অমনি ভয়ে শুকিয়ে গেল ছেলের মুখ, বন্ধ হয়ে গেল ননী চুরি। জিরিয়ে জিরিয়ে মাকে বললেন—

মা, মা, আমার কাঁকনের মাণিকখানা আগুনের মত জ্বলছিল কি মা,…একদম পুড়ে যাচ্ছিল আমার হাত। ননীর ভাঁড়টার ভিতর তাই হাত ডুবিয়ে জুড়িয়ে নিচ্ছিলুম জ্বলুনি।

৩১। কর্ণরম্য বাক্য শুনে মায়ের ঠোঁটে অভিনয় করে উঠল বিস্ময়। বলেন—

আয় আয় এদিকে আয়। তারপরে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—

দেখি তো বাছার আমার কী হয়েছে। দেখি তো একবার হাতখানা। পুড়লো কেমন করে ?

পুজার ফুলের মত হাতখানিকে বাড়িয়ে দিলেন ছেলে। আর মা সেই হাতের উপর মিঠি দিতে দিতে বললেন—

আহা, হা, সত্যিই তো, বাছার আমার হাতখানি আগুন হয়ে গেছে গো ! দি এবার, দূর করে ফেলে দি মাণিকখানা। ভারী দুষ্ট, এই পদ্মরাগ মণিটা। তারপরেই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মায়ের সে কী খেলা !

৩২। আর একদিন—

ফুলের কলির মত কচি-কচি হাত ঘুরিয়ে ছেলের সে কী চোখ মাজার ঘটা ! তারপরে দুচোখ ছাপিয়ে টপটপ করে চোখের জল ফেলার সে কী কায়দা। হুঁ হুঁ হুঁ করে সে কী ঠোঁট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার লহর ! মুখের একটি বাক্যিও বোঝে কার সাধ্যি !

কী হয়েছে ছেলের ?

না, মা তাঁকে বকেছেন। ননী-চুরি-চুরি খেলা খেলছিলেন ছেলে, আর মা কি না তাঁকে বকেছেন !

আচ্ছা আর কাঁদতে হবে না গো, আয় আয় তোর মুখ মুছিয়ে দি। তোরই তো এই এই সব…বলতে বলতে ননী-চোরাকে গলায় তুলিয়ে মায়ের সে কী চোখ ছলছলে আদর !

৩৩। আর একদিন—

পূর্ণ-জ্যোৎস্না-বিধৌত মণিময় অঙ্গন। ব্রজপুরপুরন্ধ্রীদের সঙ্গে বসে সভা জমকিয়ে শুভালাভ করছিলেন মা যশোদা, পাশেই খেলা করছিলেন ছেলে। এমন সময় আকাশের চন্দ্রটির উপর নজর পড়ল কৃষ্ণচন্দ্রের। আর যায় কোথায় ?

পিছন দিক্ থেকে গুটি গুটি এগিয়ে এলেন ছেলে। মাথার ঘোমটা সরিয়ে তুলতুলে হাত দুখানি দিয়ে মায়ের মাথার বেণী ধরে…এক টান। চুল খুলে দিয়ে মায়ের পিঠে এই মারেন কিল তো সেইই মারেন কিল। সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে ছেলের কী কান্না, আর কী আধো-আধো বুলি—

দে মা, আমায় দে মা—স্নেহে ভিজে যায় মায়ের প্রাণ। অরুণ হয় দুনয়ন। পাশের সখীদের দিকে তিনি মিনতির চোখে চান।

৩৪। বিনয়ের প্রণয়ে গলে গেলেন সখীরা। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়ে নিলেন তাঁরা। নিজেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে ছেলে সামলিয়ে বললেন—

বাছা, তুমি কি চাও ? ক্ষীর চাই ?

না।

খুব ভালো দই ?

না, না।

চাচি তবে ?

না, না।

তাহলে ছানা ?

না, না।

তবে তোমার কী ইচ্ছে ?

ননীর ঘি দাও,···ঘন।

ও মা, এই কথা! বেশ আমরা দেব। এবার আর ঠোঁট ফুলিও না। মায়ের উপর এত রাগ ফলাবে না···কেমন ?

ঘরের ঘি আমায় ভালো লাগে না।

···এই না বলে, অঙ্গুলির পাপড়িগুলিকে ঊর্দ্ধমুখিন্ করে কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন জ্যোৎস্নায় ভরা আকাশের চন্দ্রটিকে।

৩৫। সখীরা মুখচাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। এক সখী বলে উঠলেন—

"ওরে বাপ আমার! ওটা কেন ননীর ঘি হতে যাবে ? ওটা একটা বালিহাঁস ; আকাশপথের পদ্ম-সায়র পার হয়ে যাচ্ছে।"

কি"···ঐ বালিহাঁসটা চাই, এনে দাও, আমি খেলব। ও পারে না পালিয়ে যায়।"

৩৬। এই বলতে বলতে উৎকণ্ঠায় ছটফটে হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মাটিতে নাচাতে লাগলেন তাঁর জোড়া-পা। মায়ের সখীদের 'গলা জড়িয়ে জড়িয়ে কেবল চেঁচাতে লাগলেন—

"দাও, দাও···"

ছেলের কান্না আর থামে না। আগের চেয়ে অনেক বেশী কান্না। বাল্যের আবেশভরা কান্না। আর এক সখী তখন বললেন—

"এই এঁরা তোমায় ঠকিয়েছেন। ওটা রাজহাঁস নয়। ওটি আকাশের মাঝখানে অমৃতের রশ্মিভরা চাঁদ।"

তাহলে ঐটিই আমায় দাও। আমার খুব ইচ্ছে করছে। আমার সঙ্গে ও খেলা করবে। নিয়ে এস এক্ষুণি, দাও দাও।

৩৭। বলতে বলতে আরও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল কৃষ্ণচন্দ্রের কান্না। ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন মা যশোদা। বললেন—

ওটি ননীর ঘি-ই বটে। রাজহাঁস নয়, অমৃত-রশ্মিও নয়। কিন্তু ওটিতো দুলাল তোমাকে দেওয়া চলবে না। ঐ দেখ, দৈবযোগে ওর গায়ে গরল লেগে গেছে। তাই ওটি খেতে খুব ভালো হলেও, এখানে কেউ ওটি খায় না।

৩৮। বিস্ময় ফুটে উঠল কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তরে—মা মা গরল লাগল কেন ওতে ?

কেন মা ?

মায়ের মনে হল, যাক আগের আবেশ কেটে গেছে ছেলের; তাঁর কথায় শ্রদ্ধা হয়েছে কৃষ্ণের গল্প শোনবার আগ্রহে। এক রস থেকে আর এক রসে তাহলে ঢলে পড়েছেন তাঁর ছেলে। তাই, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে জননী তখন মিষ্টি হাসে মিষ্টি ভাবে বললেন—

৩৯। বলি তবে শোন,—একটি সাগর আছে। তার নাম ক্ষীর।

কৃ। মা, কী রকমের দেখতে সেটা ?

মা। দুধ দেখেছিস তো ? সেই দুধে ভর্তি সেই সাগর।

কৃ। আচ্ছা মা, কত গরু দোয়া হল যে ঐ সাগর জন্মাল ?

মা। ওরে সোনা, গরুর দুধ নয়।

কৃ। আমাকে ঠকাচ্ছিস মা, গাই না হলে বুঝি দুধ হয় ?

মা। যিনি গরুর মধ্যে দুধের সৃষ্টি করেছেন, তিনি বিনি-গরুও দুধ তৈরী করতে পারেন।

কৃ। তিনি কে ?

মা। তিনি ভগবান, জগৎ-কারণ।

কৃ। সে আবার কে ?

মা। ওরে ছেলে, তিনি ভগবান। তাঁর নাম 'ভ···গ' তিনি চলতে পারেন না। 'ভগবানে'র গ নেই, তাহলে 'ভবান্';···ওরে তুই যে আমার সেই।

কৃ। হুম বাবা, এবার মা তুই সত্যি কথা বলেছিস। ও মা, গল্প বল।

মা। পুরাকালে সুর আর অসুরদের মধ্যে ঝগড়া হয়। অসুরদের মোহিত করতে হবে, তাই এক দিন ভগবান মন্থন করলেন দুধ-সাগর। এক প্রকাণ্ড পাহাড়, মন্দর পাহাড় তাঁর নাম, তিনি হলেন মন্থন-দণ্ড। রজ্জু হলেন সর্পরাজ বাসুকি। এক দিক থেকে অসুরেরা, অন্য দিক থেকে সুরেরা টানতে লাগলেন সাপের দড়ি।

কৃ। মা, যেমন করে গোপীরা দই মথে ?

মা। হাঁ গোপাল, ঠিক্ সেই রকম। আর মইতে মইতে সেই দুধ সাগর থেকে উঠল গরল,···কালকূট তার নাম।

কৃ। মা, দুধে কি করে গরল হবে ? সে তো সাপেদেরি হয়।

মা। বাছা, সেই গরল কালকূটটিকে যখন মহেশ্বর পান করে ফেলছেন, তখন তার যা ছিটেফোঁটা পড়ল, সেই ফোঁটাগুলোকেই খেয়ে ফেলেছিল সাপেরা। তাতেই সাপেদের বিষ হল। তাই বলছিলুম, দুধেও যে গরল থাকে সেটা ভগবানেরই শক্তি।

কৃ। হুঁ, মা ঠিক্ ঠিক।

মা। আকাশে ঐ যে ননীর ঘিয়ের ফোঁটাটাকে দেখছিস উনিও উঠেছিলেন সেই সাগর থেকে। তাই ওঁর গায়ে লেগে গেল গরলের বাকিটুকু। ঐ দেখ, ঐ যে কালোদাগ···সকলেই ওর নাম রেখেছে 'কলঙ্ক'।···তখন ঘরের ঘি-ই খাও বাছা, ওটি নয়।

গল্প শুনতে শুনতে কৃষ্ণের চোখে ঘুম নেমে এল। লীলানিদ্রায় পুত্রের তনুখানি অবশ হয়ে পড়েছে দেখে জননী যশোদাদেবী তাঁকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন বহুমূল্য বিছানায়। কর্পূরের ধূলির মত ধবল সেই শয়নতল। শুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে মা যশোদা ঘুম পাড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণকে।

৪০। পরের দিন সকালে সূর্য্যদেব ওঠেননি তখন আকাশে, দধি-নবনীত-ইত্যাদি হাতে নিয়ে ছেলের ঘুম ভাঙাতে এলেন জননী। কৃষ্ণের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—"জাগো রে, দুলাল আমার জাগো। মরে যাই, মরে যাই, কাল বাছার আমার খাওয়া হয়নি, এবার ওঠো।"

ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে গন্ধসলিল দিয়ে মুখকমলখানি ধুইয়ে দিলেন মা। তার পরে ছেলেকে কোলে বসিয়ে দেখিয়ে দিলেন সোনার পাত্রে সাজানো নবনীতাদি খাদ্যসামগ্রী। বললেন—"যেটা মুখে রোচে, খাও।"

বললেন বটে জননী কিন্তু পুত্রের অভ্যাস যাবে কোথায় ? স্তন্যপান ত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে পান করতে আরম্ভ করে দিলেন মায়ের স্তন।

৪১। কিছুক্ষণ দুধ খাইয়ে মা বললেন—"তুই তো ননী খেতে ভালবাসিস। ননীটুকু এখন খেয়ে ফেল্।"

কৃ। না মা, ও-সব আমি খাব না। কাল রাত্তিরে আমি

তোকে মিথ্যে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার খিদে ছিল না।

মা। তুই যদি ঘুমিয়ে পড়িস, তাহলে কে আমার ঘরে ঢুকে চুরি করবে ননী?

কৃ। মা মা, কবে আবার আমি তোমার ননী চুরি করলুম? মা, তুই মিথ্যে কথা বলছিস। মিষ্টি মিষ্টি ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি কথা। মায়ের মন গলাতে, মন রাঙাতে মন ভোলাতে আর কতক্ষণ?···এই রকমের বাল্যলীলা চলে লীলা-বালকের—অনন্ত খেলা, আর সে খেলা কত পরিপাটি!

৪২। একদিন,—বালকৃষ্ণ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন গোশালার চাতালে। হঠাৎ এমন সময় লাফ দিয়ে দৌড়ল এক বাছুর। দেখাও যেই অমনি দৌড়ে গিয়ে বাছুরটাকে ঝাপটে ধরে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিলেন ছেলে। তার পরে নিজের দু'হাঁটুর মধ্যে বাছুরটাকে না চেপে ধরে, দু হাত দিয়ে তার গলা না জড়িয়ে নিজের মুখের পদ্মফুল দিয়ে সে কী সুন্দর করে বাছুরের মুখ বোলানোর ঘটা, সে কী হাসি দেওয়ার ঘটা বাছুরকে!

দেখেন, আর মায়ের প্রাণ আনচান করে ভয়ে আর কৌতুকে।

নিজস্ব গরুর গোয়ালে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শ্রীকৃষ্ণ যেই মলে দিয়েছেন একটা কচি বাছুরের ল্যাজ, অমনি বাছুর দৌড়। নিজেও যেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেছেন, অমনি ছেলের খসে পড়ে যায় কটিতটের ধটি। আর পরাও যেই, অমনি যেন একটি মুহূর্তেই চুরি হয়ে গেল দেখুন্তীদের মন। নগ্ন কৃষ্ণের মধ্যে তাঁরা চকিতে অনুভব করলেন অনাবৃত এক মূর্ত্ত ব্রহ্মকে।

তার পরে আঙিনার পাঁক তুলে তুলে নিজের গায়ে মাথায় সে কী উৎসব! মৃগমদে যেন সংলিপ্ত হয়ে গেল নীল গা। দেখুন্তীদের আর পাত্তা পড়ে না চোখের। তাঁরা নয়ন ভরে দেখতে থাকেন দুনয়নের অভিরামকে, সুন্দরকে। সুন্দরে কি অসুন্দর কখনও থাকে?

কোনো কোনো দিন বাইরে বেড়াতে বেরোবেন ছেলে। ছেলেকে সাজাতে বসেন মা। নিখুঁৎ করে ছেলের মাথায় বেঁধে দেন ছোট একটি উষ্ণীষ। বেছে এনে কোমরে পরিয়ে দেন পীতবাস। গোরোচনা দিয়ে কপালে আঁকেন তমালপাতার তিলক। কাজল পরাচ্ছেন চোখে, ছেলের আর তর সয় না। "দাঁড়া বলছি, ঐ ভাখো, কুলোকের দৃষ্টি আবার না পড়ে"···বলতে বলতে গাঁয়ের মায়ের মত নন্দরাণী নিজের বুকের কাছে টেনে নেন তাঁর ত্রৈলোক্যমোহন ছেলেকে আর মুখামৃত দিয়ে পুজো করেন ছেলের মস্তক। পুত্রের কণ্ঠে দুলিয়ে দেন অতি চমৎকার একটি বাঘনখ, সোনা দিয়ে বাঁধানো, শ্রোণীতে পরিয়ে দেন মহার্হ মণির এক লহর কিঙ্কিনীমাল্য। এইবার তাহলে ধড়াচুড়ো পরে পুরের বাইরে খেলতে বেরোতে পারেন বালকৃষ্ণ···আভীরিণীদের পদ্ম-আঁখির আঙিনায় আঙিনায়।

৪৩। তার পর একদিন—ব্রজপুরের শ্রেষ্ঠ রমণীরা একত্রে উপস্থিত হয়ে গেলেন মহামহিমাময়ী ব্রজরাণীর সমীপে। তাঁরা সকলেই জানতেন, যে-ছেলের উদয়ে অধিষ্ঠান করেন জয়, যিনি সর্বদাই সদয়, সে-ছেলের ধৃষ্ট খেলায় পৃথিবীর মানুষ যে মজবে, সে-খেলার যে সর্বত্র বিজয় হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? এই জ্ঞান থাকার দরুণ তাঁদের মনে দুঃখের উদয় না হলেও কতই না যেন তাঁরা ব্যথা পেয়েছেন, এই ভাব দেখিয়ে তাঁরা এলেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে মায়ের কাছে।

৪৪। এলেন তাঁরা সকলে। ওষ্ঠে কৌতুক, অধরে ভালবাসা, সারা মুখে হাসি। বললেন—

—"রাণী মা এ ছেলে আপনার—ভবিষ্যতে ভারী দুরন্ত হয়ে উঠবেন। এখন তো সবে দুটি পাতা গজিয়েছে, তাতেই এই; ভুবন কাঁপিয়ে তুলেছেন। বাড়লে পরে আরও লীলা বাড়বে। তখনই পাড়াকে পাড়া লোপ করবার চেষ্টায় আছেন, না জানি এর পরে আরও কি করে বসবেন?"

—"গো-দোহনের আগেই ইনি বাছুরের দড়ি খুলে দেন। বাছুরগুলো দুধ খেয়ে নেয় সব। যদি কেহ তখন ওর সামনে গিয়ে রাগ দেখান, তাহলে তক্ষুণি উনি এমন একটি মিষ্টি হাসি হাসেন, যে লোপ পেয়ে যায় রোষ।"

—গহন অন্ধকারে রাণীমা, আমরা অতি যত্নে লুকিয়ে রেখে দি ননী ঘি ইত্যাদি সমস্ত। কিন্তু আপনার ঐ ছেলেটি কি করেন জানেন? ঘরে ঢুকে নিজের রূপের আলোয় ঘরের আঁধার দূর করে দিয়ে ঘরের কোথায় কি আছে সমস্তই বের করে ফেলেন।"(৩৮)

—"কী ছড়াছড়ি মা, কী আলসেমি আপনার ছেলের! খাবেন তো নিজে এই এতটুকু, আর গাছের বাঁদরগুলোকে ডেকে এনে খাওয়াবেন এই এতখানা। তৃপ্তিমস্ত বাঁদরগুলোও যদি আবার না খান তাহলে রেগে ভাঁড় ভেঙে সব মাটিতে ছড়িয়ে দেন আপনার কুমার।"

—"তাহার যেখানে হাত পৌঁছয় না, সেখানে পিঁড়ের উপর পিঁড়ে চাপিয়ে সিঁড়ি বানান। তার পর তার উপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সিকে থেকে চুরি করেন দই, ননী, মাখন, ছানা। যদি কেহ মানা করলেন তো রক্ষে নেই, এক পলকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন সমস্ত।"

···"আর মা রঙ্গ করে যদি একবার ওঁর হাত ধরেছে কেউ অমনি হাত মটকিয়ে পিটান। তারপরে দূরে দাঁড়িয়ে দুরন্ত গর্জ্জন। আবার বলেন কি না···দাঁড়াও দেখাচ্ছি, ঘর পুড়িয়ে তোমার ছেলেদের আমি তাড়িয়ে দেব।"

···"কেউ যদি বা বলে ফেলেছেন,···'ইনি চোর মহাশয়' তাহলে সে কী রাগ, মা, আপনার এই দুষ্টুটির। রেগেই খুন। একেবারে ধৃষ্ট হয়ে ওঠেন। বলেন···'তুমিই চোর। এ বাড়ী তো আমার বাড়ী, এ বাড়ীর সমস্তই তো আমার।

—"কেউ যদি না নিজের বাস্তুটিকে মোলায়েম করে মাটির প্রলেপ দিয়েছেন, বা ছবিটির মত করে কলি ফিরিয়েছেন তা হলে দেখুন গিয়ে, ঐ আপনার ছেলেটি সেখানে গিয়ে ধুলো ছড়াচ্ছেন বালি ছড়াচ্ছেন, নোংরা পাতা ছড়াচ্ছেন।···রাণীমা, ঘরের শুদ্ধি আর রইল ড়া। আপনার সামনে আমাদের এই কেষ্ট ঠাকুরটি সুশীল বালকটি হয়ে থাকেন। আর আমাদের বাড়ীতে যেই উপস্থিত হন অমনি উনি হয়ে ওঠেন সাক্ষাৎ চোর, ধার্ষ্ট্যমির অন্ত থাকে না, একমুখ খরখরে কথা, মহারাণী, মহা-লুভী।

৪৫। ব্রজরমণীগণ এতক্ষণে এই যেন নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যা রোষ দেখিয়ে ঐ হেন বাক্যবাণ বর্ষণ করছেন, ততক্ষণে বালকৃষ্ণের নয়নে ছলছল করে উঠেছে মিথ্যা-অশ্রু। যিনি ···

নবোৎসবে মাতিয়ে রাখেন জগৎকে, তিনিও তখন এই কূট আলাপের বৈয়র্থ্য দেখাবার অভিলাষে মুখখানি তাঁর তুললেন। যদিও নীতির দিক্ দিয়ে তিনি অপরাধী, তবুও যেন কোনও অপরাধই তিনি করেননি, এমনি একটি ভাব দেখিয়ে, সবকিছু ধামা-চাপা দেবার উদ্দেশ্যে মধুর মধুর স্বরে বললেন—"মা, মা, এঁদের মধ্যে একজনও আমায় ভালবাসেন না। এঁদের স্নেহ নেই। একটুও না। এঁদের কথায় এতটুকুও সত্যি নেই। এঁরা একদম মিথ্যুক। এঁদের সমস্তই মিথ্যে। এঁরা মানুষ নন। ওঁদের ছেলেরা অনেক নতুন নতুন খেলা জানে, তাই তাদের সঙ্গে আমার এত ভাব। তারা এক নিমিষে মায় আপন হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে দেখা করতে আমি রাত পোহালেই তাদের বাড়ী যাই। এঁরা আমায় যেতে দেখেছেন কিনা, তাই জোর করে এখানে মিথ্যে কথা বলতে এসেছেন। বিশ্বাস করিসনে মা ওঁদের কথায়। এই আমি বলে রাখছি মা, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আর যাব না আমি কোনো দিন তাদের বাড়ীতে। বলতে বলতে ছেলের মুখ কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল ভয়ে। না জানি আবার কি করে বসবেন? কিন্তু ব্রজেশ্বরী লীলা-বালকটিকে কোলের কাছে টেনে নিলেন, আর নিজের মুখ-চোখের ভাব গোপন করে হাসতে হাসতে ব্রজ-বনিতাদের বললেন—

৪৬। "আহা, আপনারাই তো দেখছি মিথ্যেবাদী, আর আমার গোপালই তো দেখছি সত্যিবাদী। এ বেচারী তো কোনও অপরাধই করেন নি।"

আর এঁকে কিন্তু আপনারা বকবেন না যেন।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সকলে, চলল, প্রীতি-কথা। শ্রীরোহিণীদেবীও এসে পড়লেন। তারপরে তিনি যখন বান্ধবীদের কপালে পরিয়ে দিলেন তিলক, তখন সম্মানিত সেবা পেয়ে সানন্দে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ব্রজবনিতারা।

৪৭। তাঁরাও গেলেন, আর জন-নীতি-পণ্ডিতা শ্রীকৃষ্ণজননীও শিক্ষা দিতে বসলেন তনয়কে। কোলে বসিয়ে বললেন—"ওরে ছেলে, তুই বড় লুভী। দুষ্টুপানা করতে হয় নিজের ঘরে করিস। ওসব নিজের ঘরেই শোভা পায়। দেখায়ও ভালো। পরের ঘরে গিয়ে অত সব দুষ্টু-দুষ্টু খেলা—ওরে নীলমণি, সে কি তোকে মানায়? তুই আমার কত সুন্দর ছেলে, বাইরে গিয়ে এমন খেলা আর খেলিসনে যেন। খেলতে হয় নিজের আঙিনায় খেলবি।"

৪৮। এমন সময়ে ব্রজরাজ এসে পড়লেন সেখানে। এসেই দেখেন তাঁর আত্মজটির, তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সুহৃদটির যেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে প্রতাপ। কই, শরীর তো কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। তাই বাণীতে অতি মাধুর্য্যের রস মিশিয়ে কৃষ্ণকে ডাক দিয়ে বললেন—আয়, এদিকে আয়, আমার কোলে আয়।

মাতৃঅঙ্ক থেকে জনকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। বাপের কণ্ঠ জড়িয়ে মুখ টিপে টিপে বললেন—মা আমায় কেন ··মিথ্যি মিথ্যি ··বকছে?

৪৯। এই না শুনে ঘোষাধীপ জিজ্ঞাসা করলেন—হয়েছেটা কি? তখন সেই আশ্চর্য্য ছেলে—বুদ্ধিতে যিনি গুপ্তনিধি মায়ের দিকে চোখ বাঁকিয়ে চাইলেন। বললেন—

মা, তুই মা বল না কী হয়েছে ঝটপট। ব্রজরাণী তখন কথকথার মত করে, ফলিয়ে বলে গেলেন ঘোষ-বউদের মধুধারার মত সমস্ত কথা।

৫০। মনের ভাব গোপন করে ব্রজরাজ তখন অনুযোগের সুরে মহিষীকে বললেন—তোমারই অপরাধ হয়েছে সব চেয়ে বেশী। আমার ছেলে, তাকে হতেই হবে নিষ্পাপ, বুদ্ধিমান, বিনয়ী। সব সময়েই দেখেছি, গোপবধূরা কৃষ্ণের নিন্দা করেন। মিথ্যে নিন্দা। নিন্দে রটিয়ে রঙ্গ করেন। ওঁদের স্বভাব ঐ। পরের মণি দেখলে মাৎসর্যে ওঁরা ভরে ওঠেন। তাঁদের কথায় তুমি বিশ্বাস কর? আশ্চর্য! বলেই ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কোলেই থাক, আর কারো কোলে যাসনি। বলাও শেষ হয়নি, আর পিতৃ-অঙ্ক থেকে মাতৃ-অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কৃষ্ণ। মায়ের কোলে চড়বার জন্যে ছেলের সে কী আঁকপাঁক তারপর মায়ের কোলে গুছিয়ে বসার সে কী কায়দা! রাজদম্পতী তো হেসেই সারা।

৫১। দনুজদমনের জননীর সঙ্গে কিছুক্ষণ সহর্ষ হাস্যালাপ করে ব্রজরাজ উঠতে যাবেন, এমন সময় একটা কথা হঠাৎ তাঁর মনে জাগল। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। মহিষীর কাছে প্রস্তাব করলেন—"দেখ রাণী, কৃষ্ণ একলাই বেরোয়। প্রবল বলরামও সঙ্গে থাকে না। দুজনেরই একা-একা ঘোরাফেরা করাটা ভাল নয়। তাই ভাবছিলুম আমাদের এখন নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে কতকগুলি পরিচালক। খেলার সহচর হওয়া চাই, সেনাচতুরও হওয়া যাই। সব সময়েই তারা সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে দুজনের। কি বল?"

বিচার শেষ হয়ে গেলে ব্রজরাজ সেই দিনই কৃষ্ণ-বলরামের সেবায় নিযুক্ত করে দিলেন কয়েকটি ধী-সচিব এবং গুটিকয়েক বালক-দল। [ক্রমশঃ।

এ মাসের প্রচ্ছদপটে প্রাকৃতিক শোভা সমন্বিত অলকানন্দার একখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ'ল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করেছেন শ্রীবিকাশ মিত্র।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডালাণ্ডা হাউসটা ছিল গোয়েন্দা অফিস এবং প্রেসিডেন্সি জেলের মাঝের হল্টিং ষ্টেশনের মতন। প্রথমে গ্রেপ্তার করা হত তখনকার,—বোধ হয়,—Section 52 Cr. P. C. অনুসারে। তাতে ১৫ দিন রাখার পর প্রেসিডেন্সি জেলে ডিফেন্স অ্যাক্ট বা রেগুলেশন থি,তে আটক রাখা হত সাধারণত এক মাস—কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রি বা 44 cell-এ। তার পর ডিফেন্স অ্যাক্ট ওয়ালাদের সাধারণত বাইরে গ্রামে অন্তরীণ করা হত। রেগুলেশন থ্রি ওয়ালাদের তার পরেও জেলেই আটক রাখা হ'ত,—এবং তখনকার দিনে আসামী ও পুলিশ, সকলেই মনে করতো, তাদের সারা জীবন আটক রাখা হবে।

৫২ ধারার প্রথম ১৫ দিন কীড ষ্ট্রীট ও ডালাণ্ডা হাউসে কাটতো—কীড ষ্ট্রীট প্রথম সম্ভাষণ-আপ্যায়ন,—আর ডালাণ্ডায় বিশ্রাম। যারা পুরো স্বীকারোক্তি করতো,—যারা আধা স্বীকারোক্তি করতো,—এবং যারা স্বীকারোক্তি না করেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ত,—সব রকম লোকই ডালাণ্ডায় আসতো।

স্বীকারোক্তি করার ঢং করে কিছু বলা এবং কিছু চেপে যাওয়া, এই হল আধা স্বীকারোক্তি। এই চালাকি করতে গিয়ে বেসামাল হয়েও অনেকে পুরো স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হ'ত। গোয়েন্দা অফিসাররা প্রায় প্রত্যহই ডালাণ্ডা হাউসে আসতো কারো না কারো সঙ্গে দেখা করার জন্যে। শুনেছিলুম, দু'-চারটে সেলের দরজা দিনের বেলা খোলা রাখা হ'ত, বন্দী যখন খুসী বাইরে বেরুতে পারতো।

ঠাকুরের স্বীকারোক্তির পর অনেক লোক ধরা পড়েছে, তার মধ্যে অনেকে স্বীকারোক্তি করায় আরো অনেক লোক ধরা পড়ছে,—আবার তাদের অনেকে স্বীকারোক্তি করছে, এই রকম একটা হুড়োহুড়ি তখন চলছিল এবং গোয়েন্দা-অফিসে হুড়হুড় করে মাল আমদানী হচ্ছে, আসামাত্রই হুড়দাড় করে ঠেঙ্গানো চলছে, বাসি মাল ডালাণ্ডায় পাচার করে টাটকা মালের জায়গা করা চলছে, একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার চলছে।

খিস্তির কথা লিখেছি, পড়ে এক বন্ধু বললেন, বিপ্লবীদের নাকি জাত মেরে দিয়েছি। তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, জাতমারার এখনো অনেক বাকি, এখনও জাত আধমারাও করতে পারিনি। আমি গরীব দুখিয়া বলেই যে আমারই ওপর খিস্তি চলেছে, তা নয়, সে সময় যারা ধরা পড়েছে, তাদের সকলেরই ঐ হাল। ফেরারীদের ওপর আক্রোশ সব চেয়ে বেশী। ভবিষ্যুক্ত ভদ্র টর্চার—বাজে কথা।

বিপজ্জনক ফেরারী ভুপেন্দ্রকুমার দত্ত রিভলভার সহ রাস্তায় ধরা পড়েছিলেন, ডজন দেড়েক পুলিশের সঙ্গে মরিয়া হয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে জখম হয়েছিলেন, অজ্ঞান হয়েছিলেন,—পাছে স্বীকারোক্তি করতে হয় বলে' লালবাজার লক-আপে গলায় ফাঁসি লাগিয়েছিলেন আত্মহত্যা করার জন্যে—ফাঁসি কেটে নামিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পরবর্তী কালে তাঁর স্মৃতিকথায় (বিপ্লবের পদচিহ্ন) লিখেছেন :

"হিন্দুস্থানী একটি পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার চুল ধরে টানতে শুরু করলো···জানি তো মারবে,—চুপ করে রইলাম।

"সাহস পেয়ে চারিদিক থেকে গাল পাড়তে শুরু করলো। মার হয়ত সহ্য হত—গাল সহ্য হয় না।"

তারপর তিনি চীৎকার করে ধমক দিলেন,—তাঁর কেস কোর্টে যাবে বলে তাঁকে আর মারতে বারণ করা হল, মার বন্ধ হল।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন,—"নিজেকে বাঁচাবার জন্য অপরের সর্বনাশ করা—বিপ্লবীর ধর্মত্যাগ,—বিপ্লবীর জাতিপাত।—অথচ কার নামে না রটেছে ? জীবন চ্যাটার্জির নামে পর্যন্ত—যে জীবনকে আমি নিজের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। অনুশীলনের অমৃত সরকার—পরে শুনেছি, এঁদের নামে যা কিছু রটেছে, সবই মিথ্যা। আত্মসম্মান অনাহত রেখেই এঁরা উৎরেছেন।

(অন্যত্র)—"শুনেছিলাম ডালান্ডা হাউসের কথা। এক বন্ধুকে শীতের রাতে জলে চুবিয়ে রেখেছিল স্বীকারোক্তি করাবার জন্যে।—অমর ঘোষ (অতুলদার ভাই—না, ব) অন্নদা মজুমদার (অমৃতবাজার পত্রিকার অ্যাসিষ্টাণ্ট এডিটর—না, ব) অরুণ গুহ, জীবন চ্যাটার্জি—আরো কত বন্ধুকে কীড ষ্ট্রীট পুলিশ অফিসে অমানুষিক মার মেরেছে,—দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সর্বক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছে,—তার উপর হাত পা বেঁধে রাতের পর রাত রুল দিয়ে পিটিয়েছে। জীবন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ধরা পড়েছেন, সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে তিন চার জনে মদ খেয়ে এসে শেষ রাত অবধি ঘরের এদিক থেকে ওদিকে ঠেলে ঠেলে ফেলে টেনিস খেলেছে। আরো যা করেছে, ভদ্রলোকের মুখের ভাষায় তা বেরোয় না।"

এই যে চারজনের নাম এক সঙ্গে লেখা, এইখানে, অনেক

নিখুঁত
কেশতৈলের
সন্ধান
পেয়েছেন কি ?
আপনি যদি এমন কোন কেশতৈলের সন্ধানে থেকে থাকেন—যা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হবে, যাতে কোন কৃত্রিম রং থাকবে না আর মাথায় যা স্বাভাবিক তেলের যোগান দেবে, তাহলে নিশ্চিতই আপনি খুঁজে নেবেন
Keo-Karpin
কেয়ো-কার্পিন
॥ সক্রিয় ভেষজ কেশতৈল
চুলে নতুন জীবন দেয় ॥
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ

দাদার মুখে শুনেছি, ভূপেন বাবু তাঁর এক বন্ধুর স্বীকারোক্তি ঢাকা দিয়েছেন। অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্যে এরকম সহানুভূতি অসম্ভব নয়।

স্বীকারোক্তির সম্পর্কে ভূপেন বাবু লিখেছেন, "একদিন দুপুরের পরে ডাক পড়লো জেলের ফটকে। দেখি দশ-বারোজন বন্ধুকে জেলের বিভিন্ন স্থান থেকে ও অন্যত্র থেকে নিয়ে এসেছে সনাক্ত করার জন্যে। তার মধ্যে আছেন অধ্যাপক শরৎ ঘোষ (যাদুদার বন্ধু—টালায় যিনি ছোট লাঠি খেলা শেখাতে আসতেন—না· ব·), অধ্যাপক বিপিন দে, সাংবাদিক সুরেন সিংহ এবং আরো কয়েকজন। চোখ-মুখের অবস্থা প্রায় কারো সুবিধার নয়।···আমরা যখন সবাই একত্র জড়ো হয়েছি, এক জনকে ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "সব স্বীকার করেছ কেন?"—"কি করব? দেখুন, অমুক বাবু সব বলে দিয়েছেন।"

"এই অমুক বাবুও সেখানে হাজির ছিলেন।···বন্ধুরা সবাই নীরব—আমিই একা কথা বলছি। কাজেই হিলের নজর পড়েছে আমার দিকে।···তখন এক হাতে আমায় ধরলো, এক হাতে বন্ধুটিকে ধরলো, নিয়ে গোল্ডির কাছে হাজির করলো।"

অবস্থাটা নেহাৎ ভবিষ্যযুক্ত নয়। সব কথা বলে দিয়ে অনেক লোকের গ্রেপ্তারের কারণ হওয়ার পরও রাজবন্দী হয়েছেন অনেকেই। এমনি এক জন রাজবন্দী ছিলেন অনুশীলনের যোগেশ চ্যাটার্জি, যিনি '৫৮ সালে দিল্লীতে অশোক সেনের পতাকাতলে ৩০০ ভূতপূর্ব বিপ্লবীর প্রদর্শনী করেছিলেন, কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার সার্টিফিকেট ও অ্যাডভারটাইজমেন্টের সাহায্যে।

বসন্ত চ্যাটার্জির খুনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলে, তিনি তাঁদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ধরা পড়ে সব স্বীকার করে' রেগুলেশন থ্রিতে জেলে আটক রাজবন্দী হয়েছিলেন। জেলে তাঁর দলের অন্য রাজবন্দীরা তাঁকে একঘরে' করেছিলেন, তিনি মনমরা ভাবে একা একা বেড়াতেন। ভূপেন বাবুই তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর সঙ্গে মিশে তাঁকে rehabilitate করেছিলেন।

যাই হোক, ডালণ্ডা হাউসে আমাকে যে খোপে পুরলো, তার কাছেরই এক খোপে ছিল করালী। পায়খানার নাম করে সকলে বেরোতে আরম্ভ করেছে দেখে আমিও বেরোলুম এবং করালীর পাশে পাশে চললুম—পেছনে পাহারাও চললো। বেশ একটু দূরে একটা টিনের চালায় একসঙ্গে অনেকগুলো পায়খানা—দু'সারি ছোট ছোট খোপ। দু'জনে পাশাপাশি দুই খোপে ঢুকলুম। এমনি আরো অনেক জোড়া পাশাপাশি খোপে ঢুকলো—চাপা গলায় গুঞ্জরণ শুরু হল।

দু' মিনিট না যেতেই পাহারা হাঁক দিলে, জলদি করো। তাড়াতাড়ি দুই চারটে কথা বলে এবং জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সে গোড়াতেই মার এড়িয়েছে—বন্দুক-পিস্তলের কথা চেপে গিয়ে আর কতকগুলো কথা বলেছে—তার মধ্যে পাড়ার কথা খুব কম। সে তখন সবেমাত্র বি-এ পাশ করেছে—কলেজ, হাডিঞ্জ ও হিন্দু হোষ্টেল, সতীশ চক্রবর্তী, এবং হারুদের বাড়ীর ফেরারীদের কথাই প্রধান। একজনের কথা বললো, সে যা-কিছু জানতো সবই বলে দিয়েছে। করালীকে কীড ষ্ট্রীটে থাকতে হয়নি।

সন্ধ্যার সময় সেলের গরাদের ফাঁক দিয়ে মাত্রের থালা দিয়ে গেল,—কি, তা মনে নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে গেছে, ঘুম আসছে না; এমনি ছটফট করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লুম। আবার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে ভোরে উঠে পায়খানা যাওয়ার পালা। এমনি করে দেখা হল প্রায় সকলের সঙ্গে,—কিন্তু কথা বলার সুযোগ হল না। ওরা একটু একটু তফাতের সেলে ছিল, ওদের পায়খানা যাওয়ার অন্য সঙ্গী ছিল।

দু'-একদিন পরে একদিন দুপুরে বারান্দায় চেঁচামেচি শুনে গরাদের ফাঁক দিয়ে নাক বাড়িয়ে আড়চোখে দেখি,—হারু সেলের বাইরে বারান্দায় এসে এক পাহারাদারের গড়গড়ায় মুখ লাগিয়ে ফাজলামি করে টান দিয়েছে, আর সে চেঁচাচ্ছে, তার গড়গড়া নষ্ট হয়ে গেছে বলে। হারু দাঁত বার করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে!

রোজ দশটার সময় সাঙ্গোপাঙ্গ বেষ্টিত···সাহেব আসেন, এবং প্রত্যেক সেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যান,—"You are remanded till tomorrow." তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট—"till tomorrow" সাহেব। অর্থাৎ রোজ আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তবে পর্বত মহম্মদের কাছে যায় না, মহম্মদই পর্বতের কাছে আসেন।

আমার সেলের এক পাশে থাকতেন হরিশ দাশগুপ্ত, আমাদেরই আর এক সেন্টারের লোক। তখন তিনি থাকতেন নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে, পরে তিনি হাতীবাগানে হীরেন দত্তদের দরুণ বাড়ীতে স্পোর্টিং গুডসের দোকান করেছিলেন—এখন দোকান বেশ বড় হয়েছে।

তাঁর এক সহকর্মী ললিত বসাকও ছিলেন, এবং আর একজন ছিলেন এক বলাই রায় (কর্মকার) যিনি নাকি যা কিছু জানতেন, সবই বলেছিলেন। তাঁদের জুয়েলারীর দোকান ছিল, এখন দোকানও বড়, এবং বেশ বড় লোক তিনি।

কয়েক দিন পরে একদিন পঞ্চাননের সঙ্গে পায়খানায় মেলবার এক সুযোগ ঘটে গেল। তিনিও বললেন আমাদের 'একজনের' কথা—যা জানতো, সবই বলে দিয়েছে। গয়না গলানোর কথাটা সে জানতো না, তাই পুলিশ জানতে পারেনি। পঞ্চাননকে যখন কীড ষ্ট্রীটে নিয়ে যায়,—তখনই দেখে আশ্চর্য হন যে, আমাদের ঐ 'একজন' 'freely' ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, অফিসার তাকে সিগারেট দিচ্ছে, সে সিগারেট খাচ্ছে।

সে পঞ্চাননকে বললে, সবই পুলিশ জানতে পেরেছে, সুতরাং শুধু শুধু মার না খেয়ে, যা জান সব বলে দাও। সেই পঞ্চাননের জখম হাতটার দাগ দেখিয়ে দিলে, এবং সেই হাতটাকে পুলিশ রুল দিয়ে পিটলে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চানন কিছু চেপে, কিছু বলে রেহাই পেলে।

শুধু তাই নয়,—পঞ্চানন বললেন, আমার সামনে অফিসাররা সতীশ চক্রবর্তীর সন্ধানে কোথায় যেতে হবে তার পরামর্শ করলে, এবং আমাদের ঐ 'একজনকে" গোঁফ-দাড়ীর পরচুলো পরিয়ে মোটরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়ার পর পঞ্চাননের অফিসার বললে, এই সব ছেলে নিয়ে বিপ্লব করবে? হুঃ।

যাই হোক, পঞ্চাননকেও কীড ষ্ট্রীটে রাখেনি। হরিশ দাশগুপ্তকে যখন কীড ষ্ট্রীটে ঠেঙাচ্ছে, তিনি চপ করে

খাচ্ছেন দেখে এক ফাঁকে পাহারার কনেষ্টবল তাঁকে বলে দিলে,—'রোতা নেই কাহে ? চিল্লায়কে রোও, কমতি মারেগা।' তারপর তিনি চেঁচাতে শুরু করলেন, এবং তাঁর মনে হল, সত্যিই কিছু সুফল পেলেন। পঞ্চানন যখন যুগল দত্তদের আহিরীটোলার বাড়ীতে ছিলেন, তখন হরিশ বাবু এবং ললিত বাবু অনেকদিন তাঁর হাত 'dress' করেছিলেন। এর ফলে তাঁর সঙ্গে আমার একটু আত্মীয়তা বোধ জন্মেছিল। সে সম্ভাব আজও আছে।

গোয়েন্দা অফিসারদের কাজটার প্রকৃতি একই, কিন্তু একজন অ-পরিচিত বয়স্ক ভদ্রলোককে প্রথম সাক্ষাতেই মার এবং নোংরাভাষায় গাল দেওয়ার মতন 'এলেম' সকলের থাকে না। তার জন্তে বাছাবাছা মার্কামারা ছোটলোক অফিসার থাকে। উদ্ভট অকথ্য অত্যাচারের ব্যবস্থাও তাদের স্বাধীন মস্তিষ্কের আবিষ্কার। এদের মধ্যে আবার 'পাজির শিরোমণি' বলে কারো কারো খ্যাতি আছে। তাদের হাতে যারা পড়ে, সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ হয় তাদের। এরা কিন্তু চাকরীর সবচেয়ে ওপরের ধাপে উঠতে পারে না। তার জন্তে অন্তপ্রকার 'এলেম' দরকার।

যাই হোক,—১০ দিন ডালাণ্ডা হাউসে till tomorow থেকে, এক দিন বিকেলে এক কালো গাড়ী-বোঝাই হয়ে ঢুকলুম প্রেসিডেন্সি জেলে কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রী বা 44 cellএ। সে হচ্ছে নির্জ্জন কারাবাস।

জেলের ফটকে ঢুকে একটা খাতায় নাম-ধাম লেখা হল, তারপরে আর একটা ফটক খুলে জেলের মধ্যে নিয়ে খানিক দূরে ৪৪ ডিগ্রীর ফটকে ঢুকলুম। সেখানে একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের টেবিলে আবার নাম-ধাম লিখিয়ে নিয়ে চললো। চওড়া একটা রাস্তার বাঁ দিকে বরাবর দেওয়াল, আর ডানদিকে পর পর ৪৪টা সেলের সারি। মাঝে আর একটা গেট ও দেওয়াল দিয়ে সেলের সারিটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, এবং সে গেটেও এক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পাহারা আছে।

আমরা যত এগোচ্ছি, আমাদের আগে আগে একজন কয়েদী মেট ডানদিকের সেলের কপাটগুলো বন্ধ করতে করতে চলেছে, এবং আমরা পার হয়ে গেলে আবার কপাটগুলো খুলে দিচ্ছে আর একজন। অর্থাৎ বন্দীরা যাতে কারো মুখ দেখতে না পায় তার নিখুঁত ব্যবস্থা। যে কপাটগুলো বন্ধ করা এবং খোলা হচ্ছে, সেগুলোই সেলের কপাট নয়। সেলের গরাদে দেওয়া দরজায় তালা বন্ধ আছেন বন্দীরা—তার বাইরে আর একটা সেলের মতন ছাদহীন জায়গা আছে, তার নাম অ্যান্টিসেল,—লোহার কপাটগুলো সেই অ্যান্টিসেলের।

বন্দীরা দিনরাত্র সেলের মধ্যে তালাবন্ধ থাকেন—সকালে মুখ ধোওয়া বা স্নান করবার জন্তে একবার পনেরো মিনিট, আর বিকালে "Exercise"এর (বেড়ানোর) জন্তে আর একবার পনেরো মিনিট বন্দীকে সেই অ্যান্টিসেলে বার করা হয়। কিন্তু এক সেল বাদ দিয়ে এক সেল, এই ভাবে দুবার তাঁদের বেরোতে দেওয়া হয়, যাতে পাশাপাশি সেলের বন্দীরা কথাবার্ত্তার সুযোগ না পায়। আবার লোহার কপাটগুলোর মাঝে একটা ঢাকনা দেওয়া ফুটো আছে, যাতে বাইরে থেকে ওয়ার্ডাররা ঢাকনা সরিয়ে ফুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখতে পারে বন্দী কি করছে।

সেলগুলো এতটা চওড়া, যাতে দুখানা খাট পাশাপাশি রাখা যায় ; আর তার পিছনে আর একখানা খাট আড়াআড়ি রাখা যায়, এতটা লম্বা। তিনখানা খাটের মত জায়গায় একখানা খাট চটের তোষক কম্বল বালিসসহ দরজার মাঝ পর্য্যন্ত দখল করে আছে,—পাশে আর একটা খাটের মতন জায়গা আছে নড়'চড়ার মতন,—এবং সেখানে আছে একটা জলের কুঁজো একটা এনামেলের থালা ও মগ,—এবং পিছন দিকে আর একখানা খাটের মতন জায়গায় আছে দুটো আলকাতরা মাখানো চুপড়ি,—মলমূত্র ও শৌচক্রিয়ার জন্তে। গরাদের বাইরে আছে এক বালতি জল। পিছনের দেওয়ালের উপর দিকে, একটা ঘুলঘুলি জানালা।

ব্যবস্থা দেখে অঙ্গ জল হয়ে গেল। তখনও জানি না, কতদিন ঐখানে ঐভাবে রাখবে। আমার আসার আগে যাঁরা এসেছেন, যাঁদের অনেককে ঐভাবে ঐখানে অনেক দিন রেখেছে, এবং তাঁরা কেউ পাগল হয়ে গেছেন, কেউ আত্মহত্যা করেছেন, সকলেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। তার ফলে কিছু কিছু সুব্যবস্থা হয়েছে, আমি এসেছি সেই সুব্যবস্থার আমলে।

ডালাণ্ডা থেকে খাইয়ে নিয়ে এসেছিল। কাজেই শুয়ে পড়লুম। মনে হতে লাগলো, ইহলোক সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর যে সব ভদ্রলোক পরলোকে (অবশ্য নরকে) যান, তাঁদের সেখানে ঠিক এমনি ব্যবস্থা। অতঃপর একমাত্র সঙ্গী অশরীরী চিন্তা—অস্পষ্ট, এলোপাতাড়ি, দম-আটকানো! ক্রমে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাতটা কখন কেটে গেল, জানতে পারলুম না—ভোরের আগেই পাশের cellএর দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেথর এল কয়েদী মেটের সঙ্গে—টুকরী খালি দেখে যথোচিত পরামর্শ দিয়ে গেল। পরামর্শ গ্রহণ করে রাখলুম। বেলা ৯টায় ও বিকেলে আর দুবার এল।

সকালে অ্যান্টি সেলে বার করে দিলে। মুখ ধুয়ে একটু পায়চারী করে নিলুম। চার কদম হাঁটলেই দেওয়ালে নাক ঠুকে যায়, কাজেই সে প্রায় ঘুরপাক খাওয়াই হল। ১৫ মিনিটেই আবার তালাবন্দী।

তারপর এল চা! তোরঙ্গর ডালার মতন একটা টিনের ট্রেতে আধখানা পাউরুটীতে মাখম লাগানো সাজানো, আর প্রকাণ্ড এক বালতি চা। এক পিস মাখন রুটী এবং প্রায় এক মগ চা গরাদে গলিয়ে দিয়ে গেল। খেয়ে পেট ভরে গেল। বুঝলুম Defence of India Actএ পড়েছি, এবং ভদ্রলোক হয়েছি!

তারপর এক আওয়াজ এল "সরকার সেলাম"। এক কয়েদী মেট এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসছেন, তিনি এলে হাতের চেটো দুটো বুকের দুপাশে রেখে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। মনে হল, ডাকাতদের "hauds up" order, পাছে কেউ গুলিটুলি করে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রূপ দেখে এবং দেখিয়ে চলে গেলেন।

ঘরটার নম্বর মনে নেই, ২৩।২৪ হতে পারে। মেঝের টালি খোদাই করে লেখা আছে Prithi Sing Transportation for life Lahore Conspirary case—1915. কেমন যেন একটু ভাল লাগলো! যেন একটু সাধুসঙ্গ পেয়েছি!

আপনারা মুচকি হাসি হাসবেন না। ঘটনাচক্র একটু

ভিন্নভাবে ঘুরলে আজকের ৪৪ ডিগ্রীর প্রত্যেকেরই ঐ অবস্থা হতে পারতো। পানের দোকানের পাশে দড়ির আগুন ঝোলে—যে না সে বিড়ি-সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চলে যায়—দোকানদার কিছু বলে না, কারণ সে জানে, যে ধূমপায়ীরা তার দোকানের কাছ দিয়ে মাঝে মাঝেও হাঁটে, তারা সকলেই তার potential খদ্দের—কোনো দিন কিছু না কিছু কিনতে পারেই। বোমা তৈরির পরামর্শমাত্র করেও তো আন্দামান-ফেরতের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, এবং শুধু তারই জোরে নেতা হওয়া যায়। যাক্—

দুপুরের খানা এল—যে ট্রাঙ্কের ডালায় পাঁউরুটি এসেছিল, সেই ট্রাঙ্কভরা ভাত, আর বালতি বালতি ডাল, ঘ্যাঁট, মাছের ঝোল আর ডিমসিদ্ধ। যেন লাটসাহেবের মেমের বিয়ে!

গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে গলিয়ে আমার এনামেলের থালা আর মগ ভরে যা দিয়ে গেল, মনে হল দু'বেলার খোরাক। কিন্তু সব খেয়ে ফেললুম। অনেক দিনের খিদে!

বাইরের বালতির জল দিয়ে গরাদের ফাঁকে হাত গলিয়ে থালা মগ ধুয়ে রেখে শুয়ে পড়লুম। বস্তুতান্ত্রিক পোড়া-পেট প্রচুর বস্তু সংগ্রহ করে ঠাণ্ডা হল, এবং ঘুম আসতেও লজ্জা হল না।

বেশ খানিক ঘুমিয়ে উঠে পেটের অবস্থা দেখে চিন্তা হল—হজম তো করা চাই! খুব কতকগুলো ডন-বৈঠক দিয়ে হাঁপিয়ে আবার শুলুম। তার পর বিকেলে ১৫ মিনিট অ্যান্টিসেলে ঘুরপাক খাওয়া হল। তার পর সন্ধ্যার আগে আবার রাত্রের খাওয়ার পালা।

বড় বড় লাল লাল মোটা মোটা পোড়া দাগওয়ালা রুটি—দুখানা নিলুম। ডালটা ডাল—আধমগ নিলুম, আর তার সঙ্গে এক হাতা মাংস। চেহারাটা দেখে ভক্তি হচ্ছিল না, কিন্তু খেতে ভালই লাগলো।

চব্বিশ ঘণ্টার এই প্রোগ্রাম দিনের পর দিন চলতে লাগলো। এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যখন-তখন ডন-বৈঠক করি। দিনের পর দিন ঐ একই মুখগুলো কলের পুতুলের মতন আসে যায়, আর একটাও মুখ দেখার উপায় নেই—আমিও যেন কলের পুতুল বনে গেছি।

ইতিমধ্যে এক দিন এক মেটের হাতে একগাদা বই সমেত ওয়ার্ডার এসে বললে—ইচ্ছা হলে এর থেকে একখানা বই নিতে পার—পড়বার জন্যে—হপ্তায় একখানা করে বই জেল-লাইব্রেরী থেকে দেওয়া হয়।

বই দেখলুম মহান টাইপের—অমিয় নিমাই চরিত, অমিতাভ, ডাক্তার চুণীলাল বসুর খাদ্য—এই তৃতীয় বইটাই নিলুম। ছোট বই, এক নিঃশ্বাসে পড়া হয়ে গেল। সাত দিন ধরে সেইটেরই চর্বিত-চর্বণ করলুম—প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। খাদ্য সম্বন্ধে অত চমৎকার বাংলা বই কিন্তু আর হয় না। খাদ্য সম্বন্ধে, পরিপাক প্রণালী সম্বন্ধে আমার অদ্যাবধি ঐ বিদ্যাতেই চলে যাচ্ছে। ৪৪ ডিগ্রীর নীট লাভ?

এক দিন ওয়ার্ডার এক কয়েদী সঙ্গে করে এসেছে, কয়েদীর হাতে এক মোটা চুল-ছাঁটা ক্লিপ। ইচ্ছে করলে চুল ছাঁটতে পারি কিন্তু মাথা ও দাড়ি ঐ ক্লিপ দিয়ে মুড়িয়ে দেবে আগাগোড়া আর কিছু নয়। আমি বললুম, দরকার নেই। চলে গেল। চুল-দাড়ি বড় হতে লাগলো। ঠেসে খাই, আর যখন-তখন ডন-বৈঠক করি—ওজনও বাড়তে লাগলো। কত দিন এভাবে থাকতে হবে জানা নেই বলে,—যখন এই প্রশ্নটা মনে হয়, তখনই মনটা অস্থির হয়ে ওঠে—আর আবার কসে ডন-বৈঠক করে হাঁপিয়ে চিন্তাটাকে তাড়াই।

দেওয়ালের গায়ে একটা মশা রক্ত খেয়ে গোল হয়ে বসে আছে,—তাকে ধরতে চেষ্টা করি,—সে উড়ে যায়, কিন্তু একটু ঘুরে গিয়ে আবার বসে—একটু গুরুভোজন হয়েছে—আমারি মতন। ডন-বৈঠক দিতে পারে না। একবার ধরে ফেলি। সরষের মতন এক ডেলা জমাট রক্ত আমার আঙুলে আটকে যায়,—আর মশাটা উড়ে পালিয়ে যায়। বাহাদুর!

অমিয় নিমাই চরিত আর অমিতাভ পড়া হয়েছে—দু বার পড়তে ইচ্ছে করে না, তবু ৭ দিন ধরে চোখ বুলোই। চটের গদিতে গোঁজা একটা বড় আলপিন আবিষ্কার করলুম—দেওয়ালে আঁচড় কেটে নামটা লিখলুম। আলপিনটা যথাস্থানে রেখে দিলুম। সময় কাটে না ডন-বৈঠকই চলে।

হঠাৎ একদিন গেটে ডাক পড়লো—বার-তারিখ ভুলে গিয়েছিলুম—Interment order পেলুম—দেখলুম ৪৪ ডিগ্রীতে ১ মাস হয়ে গেছে।

"Wheras in the openion of the Government you.....have acted, is acting or is about to act in a manner prejudicial to public safty, the Government is pleased to direct that you shall proceed directly to Krishnagar, Dist. Nadia, and report yourself to the S. P., etc. etc.—হুকুম অমান্য করলে জেল হবে।

এই বাঁধা গণ্ডির মধ্যে পুলিশ সাহেবের নির্দেশমত স্থানে থাকা এবং নানা বিধি-নিষেধের সর্তের ফিরিস্তি। order-এর সঙ্গে রাহা-খরচ দিয়ে স্রেফ ছেড়ে দিলে। পুলিশ সাহেবের কাছে হাজির হওয়ার সময় নির্দেশ করা হয়েছে ট্রেনের টাইম দেখে,—এবং ছাড়া হয়েছে সে টাইমের ঘণ্টা দুই আগে। সম্ভবত পিছনে চর থাকবে, পথে কারো সঙ্গে দেখা করি কি না, তা দেখবার জন্যে। সুতরাং আলিপুর থেকে হেঁটেই শিয়ালদায় যাবো স্থির করে রওনা দিলুম।

সারা পথ লক্ষ্য রাখলুম। ধর্মতলা স্ট্রীটে তালতলার মোড় পার হয়েও মনে হল না পিছনে কেউ আসছে। সুতরাং Henghton-এর ক্যামেরার কারখানায় ঢুকে পড়ে টালার অতুল দাসের সঙ্গে দেখা করে খবরটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। শরীর এতটা ভাল হয়েছিল যে, অতুল বাবু দেখে রীতিমতন বিস্মিত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগরে যখন পৌঁছলুম, তখন অনেক রাত। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে যেতে যেতে এক বাঙালী হাওলদারকে দেখে পুলিশ সাহেবের খোঁজ নিলুম। আমার প্রয়োজনের কথা শুনে তিনি বললেন, এত রাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই,—আজ কোতোয়ালী থানায় শুয়ে থেকে কাল সকালে সাহেবের কাছে গেলেই হবে।

কোতোয়ালী থানার বড় দারোগা একটা টুলের দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ওতেই রাতটা কাটিয়ে দিন। তাই হল—পথে কিছু খাবার খেয়ে নিয়েছিলুম, রাতটা কেটে গেল।

সকালে পুলিশ সাহেবের কাছে গেলুম,—তিনি I B officer-এর হাতে আমাকে সঁপে দিলেন—বিকালে আমাকে নিয়ে তিনি রওনা হবেন শান্তিপুরে।

বিকালে প্রচণ্ড ঝড় উঠলো,—সব চেয়ে বড় আশ্বিনে ঝড়, যাতে পদ্মায় অসংখ্য নৌকা ডুবেছিল,—একখানা লঞ্চকে উড়িয়ে নিয়ে একটা চরের মাঝখানে কাৎ করে ফেলেছিল। দেশে কলাগাছ প্রায় নির্মূল হয়েছিল,—অসংখ্য বড় বড় গাছ পড়ে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে পথঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ঝড়ের রাতে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন পঞ্চানন—তিনি যাচ্ছেন রাণাঘাটে। ঘটনাচক্রে দুজনে থানায় একরাত সারারাত গল্প করে কাটানো হল। পরের দিনটা গেল গাছ কেটে রাস্তা সাফ করতে। পঞ্চানন বড় লাইনে রাণাঘাট চলে গেলেন। আমাকে ছোট লাইনে যেতে হবে, সুতরাং আর এক দিন থাকতে হল। আই-বির লোক হোটেল থেকে ভাত খাইয়ে আনলো।

দিদি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিলেন গোড়া থেকেই এবং শেষ পর্যন্ত কর্তারা দেখা করার অনুমতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু সে একটা রসিকতা—দেখা করার তারিখ ছিল আমাকে জেল থেকে বার করে দেওয়ার পরের দিন। অর্থাৎ দিদি যখন একবার সেণ্ট্রাল জেল, আর একবার প্রেসিডেন্সি জেলের ফটকে ঘুরে পাত্তা পাচ্ছেন না, তখনই চলছে ঐ ঝড়, মাথার ওপর গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ছে। ভাগ্নীজামাইকে সঙ্গে করে জল-ঝড়ে ভিজে নাস্তানাবুদ হয়ে আমার দেখা না পেয়ে বাড়ী ফিরেছেন।

প্রথমে গোয়েন্দারা দিদির পিছনে লেগেছিল, আপনি সব জানেন, সবাই বলেছে, অমুক বলেছে, "হারু বলেছে", (দিদির ভাষা) তখন বুঝলুম, আঁটকুড়ীর ব্যাটারা ধোঁকা দিচ্ছে।

যাই হোক, তারপর থেকে দিদি তাদের পেছনে লাগলেন, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি কারো সাথে মিশতে দোব না, ও আমার কথার অবাধ্য হবে না, ইত্যাদি। সে কথায় আমল না দিয়ে ওরা দিদির কাছে জেনে নিয়েছিল, শান্তিপুরে ছোট ভগ্নীপতির বাড়ীর কথা এবং তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল আমাকে সেখানে রাখার।

ভগ্নীপতি যোগানন্দ গোস্বামী (উড়ে গোঁসাই পাড়ার আত্তি গোঁসাই) সপরিবারে কলকাতায় চলে আসার বন্দোবস্ত করছিলেন, আমি যাওয়ার পর তাঁরা চলে এলেন, শুধু তাঁর বৃদ্ধা মা থেকে গেলেন।

মস্ত চৌহদ্দির মধ্যে মস্ত প্রাচীন ভাঙ্গাচোরা বাড়ী, প্রচুর ফল-ফুলের গাছ, ভাঙ্গা পাঁচিল, ইটের গাদা, এবং বড় বড় দাঁড়াস ও গোখরো সাপের আড্ডা।

শান্তিপুরে শুধু ওঁরাই রাঢ়ী শ্রেণীর গোস্বামী, আর সব গোস্বামী বারেন্দ্র শ্রেণীর। ওঁদের পূর্বপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে পুরীতে গিয়েছিলেন, ওঁরা এখনো পুরীতে গেলে জগন্নাথের পাণ্ডারা এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেয়, প্রসাদ এবং ভোগ দিয়ে যায়। ভগ্নীপতির সঙ্গে পরে আমি পুরী গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি।
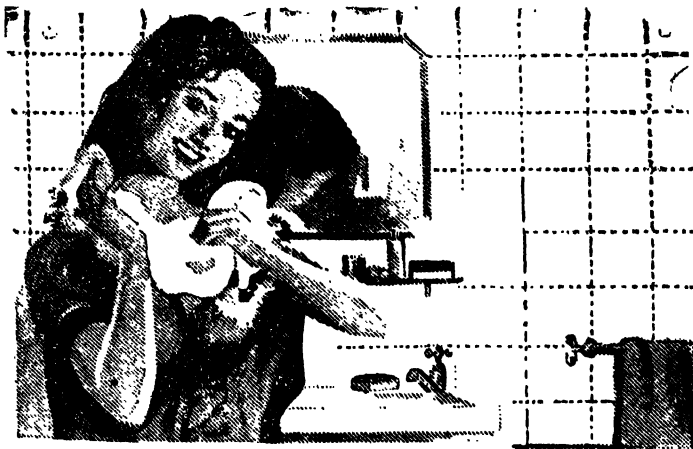
তাই ওঁদের নাম উড়ে গোঁসাই। এমনি নাম দেওয়া শান্তিপুরের একটা রেওয়াজ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদের বলে, বোধ হয়, "চাকফেরা" গোঁসাই। আর এক গোঁসাইদের নাম "আতাবুনে।" এমনি আরো নাম আছে। এক রায়েদের নাম আছে 'পাঁটা রায়'!

যোগী প্রোফেসর শ্যামসুন্দর গোস্বামী আমার ভগ্নীপতির জ্ঞাতি-ভাই, পাশেই বাড়ী। আমি যখন গেছি তখন তিনি হবিষ্যি খান, ইট মাথায় দিয়ে কম্বলে শয়ন করেন, বাড়ীর বাইরের প্রকাণ্ড বৈঠকখানার দর-দালানে থাকেন।

ইণ্ডিয়ান আর্টের একটা ছবি ছিল দেখেছেন? "গন্ধে উদাস হাওয়ার মত ওড়ে তোমার উত্তরী, কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী?" তখন শ্যামসুন্দর গোস্বামীর চেহারা ছিল তেমনি ফিনফিনে ফাইন!

সকালে সহরের এক প্রান্তে থানায় রোজ একবার হাজিরা দেওয়ার আদেশ পালন করতুম, আর শ্যামসুন্দর গোস্বামীর দুই ছোট ভাই গৌর আর নিতাই এবং আমার ভগ্নীপতির খুড়তুতো ভাই ফটিকের সঙ্গে গোপনে exercise করতুম। আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিল গৌর আর ফটিক, নিতাই আরো ছোট।

ওদেরই এজমালি মদনমোহনের মন্দিরের পুরোহিত রাধানাথের সঙ্গে নাটমন্দিরে দশ-পঁচিশের আড্ডায়ও যোগ দিতুম। দিনটা কেটে যেতো। রাত্রে হত অশান্তি—বাড়ীর বাইরে যাওয়ার আদেশও ছিল না, সে কথাও ওঠে না—ঘরের বার হতেও ভয় করতো।

মলজার গিরিনদার আত্মীয় খগেন ও রাজেন ব্যানার্জি, দুই ভাই, অন্তরীণ হয়েছিলেন ফুলিয়ার কাছে তাদের পরিত্যক্ত পৈত্রিক বাড়ীতে। তাঁরা থানায় হাজিরা দিতেন সপ্তাহে একবার কি দুইবার—মাঝে মাঝে দেখা হত, নিষেধ সত্ত্বেও আলাপও হয়েছিল। খগেন মুক্তির পর সেক্রেটারী টিকেনসনকে ধরে রেলে, বোধ হয় মুঙ্গেরে, Labour Inspector এর চাকরী পেয়েছিলেন। এখন তিনি একজন বড় অফিসার, হয়ত রিটায়ার করেছেন।

শান্তিপুর মতিগঞ্জের কানাইদার ছোটভাই বলাইদা—সঞ্জীব ব্যানার্জি বোধ হয়—ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ শিখে ১৫ সালে দেশে ফিরছিলেন বিনা পাসপোর্টে, এবং ধরা পড়ে Ingress into India Act এর বন্দী হয়ে কিছুদিন জেলে থেকে বাড়ীতে অন্তরীণ হয়ে এসেছিলেন। চমৎকার গৌরবর্ণ জোয়ান, প্যাণ্টের ওপর বুট চড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে থানায় হাজিরা দিয়ে আবার এক দৌড়ে ফিরে আসতেন—দেখবার জন্তে পথে লোক দাঁড়িয়ে যেতো। এখন তিনি সনাতন ছা-পোষা বাঙ্গালী।

হিন্দু হোষ্টেলের রাম ভট্টাচার্য শান্তিপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির পুত্র। তাঁর দাদার সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলুম—পরে রামবাবু হোম-ইণ্টার্ণ হয়ে আসার পর দেখা হল। গোপনে একদিন তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেলুম।

আলিপুর বোমার মামলার নিরাপদ রায়ের বাড়ী বাগ-আঁচড়া গ্রামে। তিনি আন্দামানে কয়েক বছর দণ্ডভোগ করে ফিরে এসে গেঞ্জি বা মোজার কল নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গোপনে একদিন তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল।

দিদি ইতিমধ্যে একদিন ভাগ্নীজামাইকে সঙ্গে নিয়ে কর্তাদের কাছ থেকে হুকুম নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা বলা ও শোনা হল। দিদি দেখা করে যাওয়ার পর লেখালেখি শুরু করলুম বাড়ী বদলের জন্তে—নানা অসুবিধার দোহাই দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীতলাপাড়ার কাছে পাঁটা রায়দের বাড়ীর পাশে শিব ব্যানার্জিদের বাড়ীর একাংশ ভাড়া করা হল। সেখানে চলে গেলুম। সেখানেও বাড়ীর অন্য অংশে শিববাবুর মা দারোগা ইন্সপেক্টরকে বলে কয়ে থেকে গেলেন। শিববাবু তখন বিদেশে চাকরী করেন

ক্রমে খগেন রাজেনও লেখালেখি করে শান্তিপুরে এলেন—তাঁদের জন্তে ভাড়া করা হল রথতলায় এক বড় দোতলা, যেখানে আগে বোধ হয় কনসার্টের ক্লাব ছিল। সে বাড়ীর পিছন দিকে একটু জায়গা ছিল। ক্রমে সেখানে ভেল দিগদিগ খেলা শুরু হল গোপনে। কুবীর ডাক্তার ও হাবু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কুবীর ডাক্তারের ছোটভাই রাম্বু, পোষ্টমাষ্টারের ছেলে (ছাত্র বে-আইনী) এরা ছিল ভেলদিগদিগের দলে।

ভগ্নীপতির বাড়ীর পাশে রজনী মল্লিকের নাতি প্রভাস মল্লিক (ডাক নাম পিলু) তখন ফার্ষ্ট ক্লাশের ছাত্র। তাকে হারমোনিয়ামে আঙুল টিপে টিপে "শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা" গানটা শিখিয়ে শেষ পর্যন্ত রিক্রুট করে ফেলেছিলুম। তারপরের রিক্রুট হল তার বন্ধু সারদা ব্যানার্জি—শ্যামবাজারের (শান্তিপুরের) দিকে বাড়ী। সে তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

[ক্রমশঃ।

বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

খৃষ্টানুসরণ

'খৃষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘ' নামে স্যামুয়েল ষ্টোক্স এক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি লাহোরের বিশপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের উপদেশ নিয়েছিলেন।

পরম প্রভু বিশ্বত্রাতা যীশুখৃষ্ট এই মর্তভূমিতে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, ঠিক সেই জীবনকে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এই সংঘের ভ্রাতৃবৃন্দ। খৃষ্টোপম জীবন যাপনের আনন্দে সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্প ছিল ভ্রাতৃগণের প্রধান সংকল্প। নিজস্ব বলতে কিছুই কারো থাকবে না। যীশু সব চেয়ে ভালোবাসতেন দরিদ্রদের,—দরিদ্রের সেবাই ছিল এই সংঘের প্রধান আকর্ষণ ও কর্তব্য। সাধু ফ্রান্সিসের প্রথম ভক্তগণের মতো এই সংঘের সভ্যরাও দরিদ্রের ভ্রাতা হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলেন।

এই নূতন ভ্রাতৃসংঘের আরম্ভে স্যামুয়েল ষ্টোক্স আর ব্রাদার ওয়েষ্টার্ণ এই দুজন পূর্ণসদস্য হলেন। ওয়েষ্টার্ণ ছিলেন কেম্ব্রিজ মিশনের একজন তরুণ সভ্য,—ষ্টোক্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বহুদিন থেকে দারিদ্র্যের ব্রত-বন্ধনে স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িয়েছিলেন। সাধু সুন্দর সিং ও উইলিয়ম ব্র্যাঙ্ক এই সংঘের সদস্য না হলেও একই রিক্ততার ও সেবার আদর্শে এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

এই ভ্রাতৃসংঘে যোগ দেবার জন্তে আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু উপর্যুপরি ম্যালেরিয়ার ভুগে ভুগে আমার দেহের তখন এমনই দুরবস্থা যে, মনের হতাশাকে মনে চেপে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যীশুখৃষ্টের নামে বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের এই কঠোর পথে যাঁরা পা বাড়ালেন, এই তরুণ বীরদের প্রতি আমার অন্তরের সমস্ত শুভকামনা ধাবিত হোলো। বিশপ লিফ্রয়ের আন্তরিক উৎসাহ ও আশীর্বাদও তাঁরা লাভ করলেন। এই ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠায় তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন,—পাঞ্জাবের খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে এমন একটি সংঘের উদ্বোধন তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে তিনি মনে করেছিলেন। লাহোর গির্জার এক বিশেষ উপাসনা-অনুষ্ঠানে তিনি ভ্রাতৃবৃন্দকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করলেন, খৃষ্টানুসরণের বন্ধুর পথযাত্রায় তাঁদের হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

উত্তর-পাঞ্জাবের পাহাড়ীদের সারা অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন ষ্টোক্স, তাদেরই সেবায় তিনি উৎসর্গ করলেন নিজেকে। কিন্তু কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁকে লোকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না, তাঁর সেবাব্রতের ভুল অর্থ করেছে তারা। তারা ভাবছে নিজের ব্যক্তিগত পারমার্থিক উন্নতিই তাঁর লক্ষ্য। এই ভুল-বোঝাবুঝি ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, সেবাব্রতী ষ্টোক্স নিত্য অনুভব করতে লাগলেন, দিনে দিনে নিরর্থক হয়ে উঠছে তাঁর প্রয়াস।

তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের যা ধারণা তা গোপন করত না তাঁর পাহাড়ী বন্ধুরা। তারা বলত,—তুমি তো বিত্তহীন সংসারবন্ধনহীন সাধু,—তোমার পক্ষে পুণ্যসঞ্চয় আর শক্ত কী? তোমার মুক্তির পথে বাধা কোথায়? কিন্তু আমরা গরীব সংসারী লোক, প্রলোভন আর পাপ নিয়েই আমাদের ঘর। সংসার প্রতিপালনের জন্তে রুটির জোগাড় করতেই আমাদের দিন যায়, ধর্মের কথা ভাববার সময় কোথা আমাদের? তোমার মোক্ষ তো হাতের মুঠোয়, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই পাপ পৃথিবীর পাকে আমাদের ঘুরতে হবে।

দিনে দিনে ষ্টোক্স উপলব্ধি করতে লাগলেন যে ভারতের গৃহসংসারহীন পথচারী সাধারণ সাধুদের এরা যে চোখে দেখে, সেই চোখে তাঁকেও এরা দেখছে। এই সব সাধুরা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়ায়,—নিতান্ত কর্তব্যবিমুখ আলস্যে। যদি বা কেউ ধ্যান তপস্যা করে, তা শুধু নিজেরই আত্মার উন্নতির উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্বার্থপর আত্মশোধন তাঁর লক্ষ্য নয়, বৃহৎ সংসারের সেবার মানসেই তিনি সংসার-নিগড়ে বাঁধা পড়েননি। অসামাজিক তিনি, কিন্তু সমাজ কল্যাণেই তাঁর খৃষ্টোপম আত্মদান,—এ কথা তিনি বুঝাবেন কেমন করে? ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনের জন্ত তাঁর কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই,—কিন্তু তাঁর নিঃসম্বল সন্ন্যাসী-জীবন দেখে বিপরীত ধারণাই করছে লোকে।

ষ্টোক্সের জীবনে এ এক নিদারুণ সমস্যা। দিন রাত্রি এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, যীশুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এই সমস্যার সমাধান। এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই তাঁর মনে প্রতিভাত হোলো। উত্তর-ভারতের পার্বত্য অধিবাসীদের সেবায় জীবনোৎসর্গের সংকল্প তাঁর,—তিনি স্থির বুঝলেন এই অধিবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে এদেরই মতো তাঁকে সাংসারিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই পাহাড়ীদের মধ্যে তিনি

বাস করবেন এদের সমাজেই তিনি বিবাহ করবেন,—তবেই না সুখে দুঃখে এদের একাত্ম হবেন তিনি।

টোক্‌স যদি এই পথ, গ্রহণ করেন তাহলে খৃষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘ ভেঙে যাবে—এই কথা ভেবে আমার মন খুব খারাপ হোলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে সায় দিতে হোলো আমাকে। বিশপ কিন্তু কিছুতেই টোক্‌সের যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না এবং তীব্র আপত্তি জানালেন। টোক্‌সের সিদ্ধান্তের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে প্রথম থেকেই তাঁকে সমর্থন করলেন সুশীল রুদ্র।

শেষ পর্যন্ত টোক্‌স শৈলপালিকা এক রাজপুতানী মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা ভারতীয় খৃষ্টান ছিলেন। বহু বছর পূর্বে চা-বাগানের কাজে একজন চীনা খৃষ্টান কোটগড়ে আসেন ও এই রাজপুত পরিবারে বিবাহ করেন। টোক্‌সের স্ত্রী এই চীনা খৃষ্টানের পৌত্রী। টোক্‌সের সন্তান-সন্ততির ধমনীতে তিনটি বিভিন্ন জাতির রক্তধারার সংমিশ্র।

টোক্‌সের এই বিবাহের পিছনে আরো একটি প্রেরণা ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত খৃষ্টান। নিজেদের খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে ইউরোপীয়ানরা ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবিদ্বেষমূলক যে দুর্ব্যবহার করত, তা দেখে দেখে পীড়িত হয়েছিল টোক্‌সের চিত্ত। স্বাজাত্যবোধের অহমিকা ও বর্ণবিদ্বেষের কালিমা ইউরোপীয়ান ভারত প্রবাসীদের এমনই এক অদ্ভুত মানসিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল যে এমন কি মৃত্যুর পরেও ভারতীয় ও অভারতীয় খৃষ্টানের মরদেহের সমাধি পাশাপাশি রাখা নিষেধ ছিল বহুক্ষেত্রে। শাদা-কালোর এই বিভেদ সবচেয়ে প্রকট ছিল পাঞ্জাবে, এই বিভেদ মৃত্যুরজ্জুর ফাঁস পরিয়েছিল খৃষ্টান সমাজের কণ্ঠে। বলিষ্ঠতম উপায়ে টোক্‌স এই রজ্জুর বন্ধনকে ছিন্ন করেছিলেন, মানবাত্মার এই অবমাননার বিরুদ্ধে উদারতম বিদ্রোহ তিনি ঘোষণা করেছিলেন ভারতীয় নারীকে জীবনসঙ্গিনী করে, ভারতীয় সংসারকে আপন সংসার বলে গ্রহণ করে। তিনি মনে ভেবেছিলেন, এ যদি তিনি না করেন তাহলে প্রভু যীশুর প্রতি তাঁর কর্তব্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। যীশুখৃষ্টের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির সম্মুখে কে বা ইহুদী, কে বা গ্রীক, কে বা আর্য, কে বা বর্বর, কেই বা স্বাধীন আর কে-ই বা দাস। তাঁর সমদৃষ্টিতে সকলেই সমান, সকলেরই অন্তরে তাঁর অধিষ্ঠান।

ভারতীয় নারীকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করার পিছনে টোক্‌সের অতি মহান উচ্চাভিলাষ ছিল। খৃষ্টান বিবাহের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিনি, কিন্তু এ কথা স্থির উপলব্ধি করেছিলাম যে তাঁর এই বিবাহ নিতান্ত সহজ বিবাহ নয়, সমাজ-কল্যাণের এক মহান প্রেরণায় এ তাঁর জীবনব্যাপী আত্মপরীক্ষার ব্রত। তাই এই ব্রত পালনের পথে তাঁকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাতে আমি দ্বিধা করিনি। ইতিমধ্যে আমি স্থির বুঝেছিলাম যে, এ যুগের মানব-সংস্কৃতির কুৎসিততম শত্রু বর্ণবিভেদ, যীশুর পবিত্র ক্রুশচিহ্নের অঙ্গে পাপের কালোছায়া এই বর্ণবিদ্বেষ।

টোক্‌সের বিবাহের ফলে খৃষ্টানুসরণ সংঘ ভেঙে গেল। এই সংঘকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি। টোক্‌সের সংসার প্রবেশ সংঘের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত, এই আঘাত আপন বুকে অনুভব করলেন আমাদের বিশপ। অন্যান্য অনেকেও গভীর দুঃখ পেলেন এই ঘটনায়। কিন্তু আজ যখন দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন মনে হয় মানুষের আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বুঝি অতি বিচিত্রভাবে আপন উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন। ভ্রাতৃসংঘের নিয়ম-শৃংখলার দৃঢ় বন্ধন ঈশ্বর যেন হঠাৎ খসিয়ে দিলেন। এই আশ্চর্য মুক্তির ফলেই সুন্দর সিং-এর মতো সাধু খৃষ্টের প্রতি আত্মনিবেদিত জীবনকে সারা বিশ্বের সেবায় বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কী পাশ্চাত্য কী প্রতীচ্য, বিশ্বের সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন সাধু সুন্দর সিং। খৃষ্টপ্রেমের অকুণ্ঠ বিতরণের বিনিময়ে দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেম তিনি অর্জন করেছিলেন। সংঘের বন্ধনে যদি তিনি বাঁধা পড়তেন, তা হলে এ হোতো না। কোনো সংঘ বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার মানুষ ছিলেন না সুন্দর সিং। তিনি ছিলেন একলা পথিক, এক যীশুর পথ-প্রদর্শনকেই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই পথে তিনি ছিলেন অকুতোভয় নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী।

সংঘের অপর সদস্য ব্রাদার ওয়েষ্টার্ণের মুক্তিও মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। বিশিষ্ট কর্মপথে তিনি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, সংঘের মধ্যে থাকলে তা সম্ভব হোতো না। যে কাজ তিনি ছাড়া আর কেউ পারত না, সেই কাজের ভার ঈশ্বর তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন, ঈশ্বরেরই মহা উদ্দেশ্য সাধন হয়েছিল তাঁর জীবনে। ব্রাদার ওয়েষ্টার্ণ এখন দক্ষিণ-ভারতে টিনিভেলির বিশপ, বিরাট এক ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের তিনি সেবক। এই সমাজের অধিকাংশ লোকই অতি দরিদ্র। যাদের মঙ্গলাকাংখায় নিত্য নিয়োজিত তাঁর জীবন, তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাপ্রীতি তিনি লাভ করেছেন।

কয়েকটি ক্ষুদ্র কথায় স্যামুয়েল টোক্‌স সাধু সুন্দর সিং ও অন্যান্য বন্ধুগণের জীবন-কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আমার সেদিনের অন্তর-জীবনের কাহিনীই আমি উদ্‌ঘাটিত করতে চেষ্টা করছি। ভারতে আমার মর্ম-অভিযানের এঁরাই ছিলেন নেতা, দৈহিক কারণে অবিলম্বে এঁদের তীর্থযাত্রায় আমি যোগদান করতে না পারলেও এঁদের জীবন ও এঁদের পন্থায় আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। এঁদেরই কল্যাণে জীবন্ত যীশুর ধ্যানরূপ আমি ভারতভূমিতে উপলব্ধি করেছি, এঁদেরই আদর্শে আমি আনন্দিত আবেগে শেষ পর্যন্ত সেবা ও কল্যাণের সত্য পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।

সংসারীর জীবনের চেয়ে সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর জীবনকে ভারতীয়েরা বড়ো বলে মনে করে। এই মনে করাটা স্বাভাবিক নয়। ভারতবাসীর এই ধারণার পরিচয় টোক্‌স অনেক আগেই পেয়েছিলেন, আমি অতো শীঘ্র বুঝতে পারিনি। বিবাহিত জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন মহত্তর,—এই ধারণা আমি মিথ্যা এবং হীন বলে মনে করি। স্বামিস্ত্রীর সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনকে হেয় করলে খৃষ্টের বাণীকেই অবজ্ঞা করা হয়। মানবপুত্রের আদিম সৃষ্টির মূলে নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক, এই সম্পর্ক পবিত্র। বিবাহ বন্ধন এক অতি পবিত্র ধর্মবন্ধন, সংসারজীবন এতো পবিত্র যে যীশু বলেছেন যে পৃথিবীর শিশুরা স্বর্গোদ্যানের কুসুম কোরক।

আমি নিজে বিবাহ করিনি। আমার অবিবাহিত জীবনযাত্রা নিয়েও লোকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহ করব কি করব না, কোন্ পথে প্রভুর নির্দেশ আমি ভালো ভাবে পালন

করতে পারব? তখন আমার মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে আমাকেও আশু মতিস্থির করতে হবে। তার পর অবশ্য বহু বৎসর কেটেছে। স্যামুয়েল স্টোক্স যে ভুল ধারণার সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতভূমিতে আমার সুদীর্ঘ নিত্য-পর্যটনায় ঈশ্বরের আশীর্বাদে এমনি ভ্রান্ত ধারণার সম্মুখীন আমাকে কোথাও কখনো হতে হয়নি।

এ সব ঘটনা কুড়ি বছর আগেকার কথা। খৃষ্টান-জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই কুড়ি বৎসর আমার কেটেছে। সিমলার পার্বত্য-অঞ্চলে স্যামুয়েল স্টোক্স, সুন্দর সিং ও সুশীল রুদ্রের সঙ্গে অতিবাহিত দিনগুলি কুড়ি বৎসরের ব্যবধানের প্রান্ত থেকে স্পষ্টতর রূপে আমার চোখে ফুটে উঠেছে। স্পষ্টতর ভাবে আমি উপলব্ধি করছি যীশুর পারমার্থিক রাজ্যের এক অপূর্ব বিধান, যে বিধানের কথা তিনি অতি সহজ স্বচ্ছ উপমায় ভক্তের প্রাণে গেঁথে দিয়েছেন। প্রভু বলেছেন,—যবের শুষ্ক শীর্ষ মাটিতে ঝরে পড়ে, তাই শস্য জন্মায়। সে মুকুল ঝরে না, সে মুকুল একাকী। যে মুকুল ঝরে, সেই আনে ফলের সমারোহ।

স্টোক্স এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ খৃষ্টানুসরণের যে প্রাথমিক পরীক্ষার বীজ বপন করেছিলেন, তারই ফলে শ্যামলা ভারতভূমিতে সঞ্জাত হয়েছিল মহার্ঘ ফসল। স্টোক্সের বিবাহের পর খৃষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু সে মৃত্যুতে ছিল পুনর্জীবনের আশীর্বাদ। এই ভ্রাতৃসংঘের আদর্শ-বীজ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন রূপের নানা প্রেমাশ্রয়-তরু। দক্ষিণ ভারতের থিরুপতুরে ও যুক্তপ্রদেশের আলমোড়ায় অবস্থিত খৃষ্ট-আশ্রমগুলি এই নবজীবনের নিদর্শন। এই মানব সমাজে যারা আশাহত, যারা দুর্গততম তাদের সেবায় জীবনোৎসর্গের আহ্বান নিত্যকাল প্রভু খৃষ্টের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে চলেছে, সেই আহ্বানে সাড়া দেবার মতো ভক্তসংখ্যাও বিরল নয়। তার প্রমাণ পুণার খৃষ্ট-সেবা-সংঘ ও অনুরূপ নানা প্রতিষ্ঠান, নিখিল ভারতের কোণে কোণে যারা ছড়িয়ে আছে।

মানবপুত্রের এই আহ্বান কতো ভাবে আমাদের কানে বাজে, কতো রূপে তিনি আবির্ভূত হন ভক্তের চিত্তমন্দিরে! সেই আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ ভক্তের ইন্দ্রিয়, সেই আবির্ভাবের আহ্বানে বিনিদ্র ভক্তের হৃদয়। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রজনীর নিবিড় অন্ধকারে চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো তাঁর প্রকাশ। তপ্ত দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত পরিব্রজ্যার মধ্যে তাঁর উপস্থিতি, হয়তো বা শান্ত প্রত্যূষের অরুণিমায় হয়তো বা ম্লান গোধূলির ধূসরতায় তাঁর স্পর্শ। আশামর্মরিত নিত্য-প্রতীক্ষিত অন্তর নিয়ে দৃঢ় মেখলায় বসন সম্বৃত করে প্রিয়-আহ্বানে কান পেতে থাকে অভিসারিকা। পরম প্রভুর কর্ম-আহ্বানে তেমনি সর্ববন্ধন মুক্ত নিত্য প্রস্তুত প্রতীক্ষা আমাদের, আমরা এই খৃষ্টপথের পথিক দল।

অ্যালবার্ট স্কুইট্জার

সংশয়-সমস্যার ভার তখনো আমার মাথা থেকে নামে নি। এক দিকে আমি 'সাধনা করছি কী ভাবে আমার জীবন-যাত্রাকে খৃষ্টের পদ-চিহ্নের মধ্যে বিলীন করতে পারি, অন্য দিকে তাঁর ইচ্ছার আন্তরিক নির্দেশকে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে হেঁট মুখে মান্য করতে পারছি না। ঠিক এমনি সংকটক্ষণে ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ আমি লাভ করলাম। মহান খৃষ্টান অ্যালবার্ট স্কুইট্জারের আত্মিক সম্পর্ক আমি লাভ করলাম। এই সম্পর্ক আমার ভাগ্যে এক অতি মহার্ঘ সম্পদ।

দিল্লী খৃষ্টীয় সমাজের আওতায় আমি তখন পদে পদে নানা জটিল সমস্যা, নানা দুর্বোধ্য প্রশ্ন, নানা নিরুপায়-বিহ্বলতা। বদ্ধ ঘরে ঝটিকার আঘাতে যেমন করে রুদ্ধ দ্বারের অর্গল ভাঙে, ঘুচে যায় ধূলি-জঞ্জালের মালিন্য,—ঠিক তেমনি করে সমুদ্র পার থেকে অ্যালবার্ট স্কুইটজারের বিজয়ী স্পর্শের আঘাত আবেষ্টনীর কারাগার থেকে মুক্তি দিল আমার মনকে। প্রথমে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে অ্যালবার্ট স্কুইটজারের সঙ্গে আমি পরিচিত হই, এবং পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে নিবিড় বন্ধুত্বের দুর্লভ আনন্দ আমি লাভ করি।

'ঐতিহাসিক যীশুর সন্ধানে' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনি হয় যে একটি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে জীবনের সম্যক দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। আমারও ক্ষেত্রে এইরূপই হয়েছিল। এই পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদটি পড়ে আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল স্কুইটজার যেন তাঁর রচনার মাধ্যমে আমার নিভৃত আত্মাকে স্পর্শ করেছেন।

গসপেলের ঐতিহাসিক অংশাবলী আমি অত্যন্ত নিবিষ্ট আগ্রহের
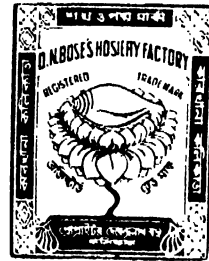
সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলাম,—আমার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যেই বিশেষ করে খৃষ্টজীবনীর এই দিকটি নিয়ে আমাকে বেশি করে পড়াশুনা করতে হয়েছিল। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ সমূহও আমি সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে পাঠ করছিলাম। কৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি হিন্দু অবতারের সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পকাহিনীর অন্ত নেই। আমার কেবলই মনে হোতো আমার ধর্মগ্রন্থেও যীশুখৃষ্টের জীবনীর মধ্যেও কল্পকাহিনী মিশে নেই কি?

তা যদি হয়, তাহলে খৃষ্টজীবনীর কতোটা সত্য আর কতোটা কল্পনা, কতোটা পুরাণ আর কতোটা ইতিহাস? যীশুখৃষ্ট কি নিছক পৌরাণিক চরিত্র না ঐতিহাসিক জননায়ক? অনুসন্ধিৎসু খৃষ্টভক্তের কাছে এ সমস্যায় সমাধান কোথায়?

এ শুধু বুদ্ধিবাদী সমস্যা নয়, এ আত্মার সংশয়। রক্তে আমার ম্যালেরিয়ার বিষ, রুগ্ন দুর্বল দেহ, স্তিমিত শক্তি! মানসিক দুর্বলতার পক্ষে প্রশস্ত অবস্থা। সেই সময়ে বারে বারে সংশয়ের প্রেতচ্ছায়া মনকে আক্রমণ করে, আচ্ছন্ন করে সুস্থ স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টিকে। কেমব্রিজে যখন ছিলাম তখনো এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। কিন্তু কেমব্রিজে থাকতে অধ্যয়নের যে ব্যাপক সুযোগ ছিল এখানে তা নেই। এখানে গবেষণার উপকরণ নেই,—যা বই হাতের কাছে আসে তাই পড়ি, তার বেশি কিছু পড়ার সুযোগ মেলে না। সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই না।

খৃষ্টজীবনীর ঐতিহাসিকতা বা পৌরাণিকতা নিয়ে এই যে প্রশ্ন,—এমনি আরো নানা প্রশ্ন নানা অসুবিধা আসে। আমার অজ্ঞ কাজের মাঝে মাঝে তারা ভিড় করে, বিভ্রান্তি আনে সদা সর্বদা। উত্তরহীন এই সব প্রশ্ন মনের মধ্যে গোপন ক্ষতের মতো জমা হয়, বহির্বাস্তবের সঙ্গে আমার আত্মার যোগসূত্রকে শিথিল করে দেয়। জ্ঞানের যেখানে অভাব, বিশ্বাসেরও সেখানে দৈন্য আর নৈতিক সমস্যা সেখানে প্রবলতর।

সাধু জনের সুসমাচারে একটি অনুচ্ছেদ আছে, যেখানে তাঁর ভক্তবৃন্দকে খৃষ্ট বলছেন, অল্পকাল তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, আবার অল্পকাল তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না।

আমার খৃষ্ট-নিবেদিত সমগ্র জীবনে প্রভুর এই বাণী এক আশ্চর্য সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো সময়ে তাঁর স্পর্শ আমার অন্তরের এতো নিকটে আমি অনুভব করেছি যে তাঁর উপস্থিতির কোনো বাহ্যিক সাম্যের প্রয়োজন হয়নি,—উপহাস করতে পেরেছি সমস্ত সংশয়কে। তাঁর প্রথম ভক্তজনের মতোই আমি তখন বলতে পেরেছি, প্রভু, স্পষ্ট আপনার বাক্য, প্রহেলিকা-হীন প্রবাদবিহীন। তাতেই আমি বিশ্বাস করেছি যে ঈশ্বর-প্রেরিত আপনি।

আবার কোনো কোনো সময়ে অন্ধকার যেন নেমে এসেছে, স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছে মেঘাবরণের বাধা, সংশয়ের তরঙ্গ বিক্ষোভের মাঝখানে আমার বিপন্ন আত্মা বিশ্বাস ও আশার যুগল নোঙরের জন্য ক্লিষ্ট প্রার্থনা করেছে।

দিল্লীতে অবস্থান কালে সুশীল রুদ্র আমার পরম সহায় ছিলেন, তাঁর স্নেহ প্রীতি আমার মহা অবলম্বন ছিল, কিন্তু এইরূপ বিপন্ন বিশ্বাসের মুহূর্তে সরাসরি ভাবে তিনিও আমাকে কোনোরূপ সাহায্য করতে পারতেন না। তাঁরও নিজের মনে নানা প্রকার সংশয় ছিল। খৃষ্টের প্রতি প্রদীপ্ত প্রেম সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধিবাদী মন আমারই মতো দোলায়িত হোতো নানা প্রশ্নে। অপর পক্ষে যখনই সাধু সুন্দর সিং-এর সংস্পর্শে আমি আসতাম তখনই তাঁর শিশুসুলভ আস্থা ও বলিষ্ঠ সাহস আমার মনকে নির্মল আনন্দরসে পরিপ্লুত করত। সুন্দর সিং ছিলেন গ্যালাহাডের মতো পুণ্যহৃদয় খৃষ্টান নাইট, ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপ সর্বদা জাগরূক থাকত তাঁর অম্লান দৃষ্টিতে।

নানা সংশয়ে আমার মন যখন বিচলিত তখন ঈশ্বরের এক অমূল্য উপহারের মতো অ্যালবার্ট স্কুইটজারের এই গ্রন্থটি আমার হাতে এল। খৃষ্ট-জীবনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি সংক্রান্ত নিউ টেস্টামেন্টের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে গভীর গবেষণা করেছেন, এ পর্যন্ত প্রকাশিত খৃষ্ট-জীবনীর সমস্ত খ্যাত অখ্যাত গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন, যীশুর প্রতি প্রতি যুগের বিরুদ্ধতা ও প্রতি যুগের বিশ্বাসকে তিনি বিচার করে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানব সমাজের প্রতি যীশুর দাবী অকুণ্ঠ আনুগত্যের দাবী।

আমার অব্যবস্থিত চিত্তের প্রতি এই ঘোষণার মূল্য সেদিন ছিল অপরিসীম। তাঁর এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছিল। খৃষ্ট বিবরণ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা যুক্তি ও নানা ব্যাখ্যার অবসানে তিনি সমস্ত পাণ্ডিত্য পরিহার করে একনিষ্ঠ সাধুর অন্তরের ভাষায় এই পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন।

অ্যালবার্ট স্কুইটজার বলেছেন, খৃষ্ট জীবনের সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব ইতিহাসের কাঠামোর উপর দাঁড় করালে সে জীবনের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করা যাবে না। সেই ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্র হবে বিবর্ণ নিষ্প্রাণ। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীরা যে বাস্তবতার খাঁচা তৈরী করেছেন তার মধ্যে খৃষ্টচরিত্রকে বন্দী করা অসম্ভব। কেন না, খৃষ্ট কোনো নির্দিষ্ট যুগের কোনো নির্দিষ্ট যুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ নন। সর্বকালের সর্বধারণার কেন্দ্রে তিনি বিরাজমান। তিনি নীতিশিক্ষক নন, তিনি মানব বিবেকের সাম্প্রতিক অনুশাসক নন। তিনি মানবজাতির সর্বযুগের একচ্ছত্র সম্রাট, মানবাত্মার সর্বসমর্পিত আনুগত্য তাঁর দাবী। যেখানে তাঁর চৈতন্য স্পর্শ, সেখানেই তাঁর অনির্বচনীয় লীলা। এই লীলা তাঁর আগমনীর সংকেত। খৃষ্ট যে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে এক অলৌকিক যুগ! সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা খৃষ্টের আবির্ভাব।

স্কুইটজার প্রশ্ন করেছেন, খৃষ্টকে আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করতে সত্যই কি আমরা চাই? তাঁর নয়নজ্যোতিকে ধ্রুবতারা করে আমরা সর্বত্যাগী হয়ে শুধু তাঁরই অনুগামী হতে কি চাই তাঁর প্রথম শিষ্যবৃন্দের মতো? তর্কবাদী বলে, খৃষ্টের আশু পুনরাবির্ভাবের আশায় তাঁর প্রথম প্রথম মনোনীত প্রেরিতগণ ভুল করেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত বাস্তবের গভীরে যে সত্য বিরাজমান ইতিহাসের নিকষে উজ্জ্বল রেখায় তা কি প্রমাণিত হয়নি? তাঁর আবির্ভাবের পর অতিবাহিত হয়েছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী পার; ইতিহাসের প্রতি যুগে কোন্ বিচিত্র চুম্বক আকর্ষণে তাঁর প্রতি

ধাবিত হয়েছে নরনারীর আত্মা, আনন্দিত আত্মসমর্পণের আকুল আবেগে? সর্বভূতে সর্বকালের মানবহৃদয়ে অবিনশ্বর তাঁর স্পর্শ, এই কালজয়ী রহস্যের মূল কোথায়? একটিমাত্র সহজ স্বীকৃতিতে এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন। স্বীকার করি তিনি নিত্য আবির্ভূত, চির-উদ্ভাসিত, পরম সত্য তিনি।

মানব-ইতিহাসের এই মহান পুরুষ যীশু খৃষ্ট, বাস্তবতার পথে পথে তাঁর সন্ধানের সমাপ্তিতে অ্যালবার্ট স্থইটজার তাঁর আশ্চর্য গ্রন্থে বলেছেন:

প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনে যীশুখৃষ্ট আবির্ভূত হন, নামহারা পরিচয়হারা রূপে, যেমন একদা হ্রদ প্রান্তে তিনি পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন। সেদিন ওরা তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেনি। আমরাও কি চিনতে পারি? সেদিনের মতো আজও তিনি আমাদের আহবান করেন, বলেন, অনুসরণ করো আমাকে। এ যুগের মানুষের যা কর্তব্য, সে কর্তব্যের আহ্বান তিনি ধ্বনিত করেন আমাদের হৃদয়ে। এই নির্দেশ রাজ আজ্ঞা,—এ আজ্ঞার প্রতিপালন মানবাত্মার ঐতিহাসিক অঙ্গীকার। তাঁর আজ্ঞা যারা পালন করে, তারা পণ্ডিতই হোক আর মূর্খই হোক, তাঁর নির্দেশিত পথে শত যন্ত্রণা শত বঞ্চনার মধ্যেও তারা তাঁর নিত্য-উদ্ভাসিত মূর্তির দর্শন লাভে ধন্য হয়। তাঁর অবর্ণনীয় লীলারূপকে তারা চিনতে পারে।

স্থইট্‌জার সেই চিরন্তন প্রভু যীশুখৃষ্টের সামনে আমাকে আবার এনে উপস্থিত করলেন, আমার জীবনের সংশয়-কালিমা মুক্ত প্রতিটি ভাস্বর মুহূর্তে যে প্রভুকে আমি চিনেছি, যে প্রভুকে আমি ভালোবেসেছি। আমার মনে হোলো আমার নিভৃত অন্তরের গোপন কথাটি যেন পাঠ করেছেন স্থইট্‌জার, সেই কথাটিই উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে তুলে ধরেছেন আমার ধূসর দৃষ্টির সামনে।

স্থইট্‌জারের এই গ্রন্থ অপর একটি দিক থেকেও আমার মনকে অনুরূপ নাড়া দিয়েছিল। যীশুর ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্র অংকন-মানসে তিনি খৃষ্টীয়-সমাজের প্রথম শতাব্দীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। সে যুগের খৃষ্টভক্তগণের অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ ও লীলাবিভূতির প্রতি বিশ্বাসকে তিনি অল্প কথায় এড়িয়ে যেতে চান নি। যীশুর আশু পুনরাবির্ভাবের কথা ধর্মগ্রন্থের যেখানে যেখানে লেখা আছে, সেই সব লেখাগুলি তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন। খৃষ্টের প্রথম শিষ্যগণ অলৌকিককে যে ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, স্থইট্‌জার পরম যত্নে সেই অলৌকিক পটভূমিকা রচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

স্থইট্‌জারের এই রচনা পড়তে পড়তে আমিও আমার প্রথম জীবনে ফিরে গেলাম, ফিরে গেলাম আমার পিতা-মাতার কাছে, তাঁদের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসের আবেষ্টনীর মধ্যে। আমার পিতার ধর্ম-বিশ্বাসের কথা আমাকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হোলো, তার সঙ্গে আমার ধর্ম-বিশ্বাসের যোগসূত্র আমি রচনা করলাম।

আমার পিতামাতার বিশ্বাসের সঙ্গে আক্ষরিক ভাবে একান্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতি পত্রে আমার পিতৃদেব আমাকে লিখতেন যীশুর প্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎবাণী অচিরে সত্য হতে চলেছে, [illegible] নেই। সেই আবির্ভাবের পথ চেয়ে তিনি বসে আছেন। শিশুর মতো সারল্য নিয়ে আমার পিতা বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে এক লহমায় প্রকৃতির সব নিয়মকে তিনি বদলে দিতে পারেন।

আমার পিতার ছিল শিশুজনোচিত আস্থা। সেরূপ আস্থার অধিকারী না হয়েও আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, এই বাস্তব সংসারের কেন্দ্রে এক অলৌকিক আনন্দ জগৎ বর্তমান। কেন না, সেই আনন্দের আস্বাদ আমি পেয়েছি। এই মনুষ্য-ভাণ্ডার মাঝখানে এক আত্মিক জীবনের প্রত্যাশা আমি করতাম, যে জীবনের এপার ওপার জুড়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, ঈশ্বরের পরম সৃজন করুণায় যে জীবন নব নব জীবনে অনুরাগ। আত্মার এই অবিনশ্বর অসীমতা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না আমার মনে।

আমার পিতৃদেবের বাহ্যিক চেহারাতেও প্রভু যীশুর দেহচিহ্ন ছিল। খৃষ্টোপম চরিত্র প্রকাশ পেত তাঁর মুখমণ্ডলে। মুক্তিদাতা পরম প্রভু খৃষ্টের চরণে তিনি তাঁর সমস্ত বিশ্বাসকে সরল শিশুর মতো অকিঞ্চন হয়ে সমর্পণ করেছিলেন। এই চিরবিশ্বস্ত আত্মদানে রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁর চরিত্র, অপূর্ব-সুন্দর হয়েছিল তাঁর অন্তঃকরণ। খৃষ্টের পুনরাবির্ভাবকে আন্তরিক অর্থে নিয়ে তিনি যে ভুলই করুন না কেন, সমস্ত ভ্রমকে তিনি জয় করেছিলেন বিশ্বাস দিয়ে আশা দিয়ে প্রেম দিয়ে। তাঁর খৃষ্ট-নিবেদিত জীবন যে উচ্ছলিত আনন্দ, অপরিম্লান আশা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তিতে পরিপ্লুত ছিল, সেই আনন্দ, আশা ও ভক্তিকে আমার জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করতে যেন পারি, এই কামনাই ছিল আমার।

আমার পূর্বজীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে আমি পুনর্বার একে একে স্মরণ করতে লাগলাম। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার সংযোগে মর্মমূলে বিশ্বাসের যে ভিত্তি রচিত হয়েছে, সেই ভিত্তির সুদৃঢ়তা আমি আবার ধীরে ধীরে পরীক্ষা করে দেখলাম। কেন না, বিশ্বাসের এই ভিত্তির উপরেই আমাকে নূতন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমার ধর্মের মর্মমন্দির,—ভিত্তিমূলের প্রস্তরকাঠিন্যে কোনো সংশয়ের দুর্বলতা থাকলে চলবে না।

আরো একটি বিষয়ে আমি অ্যালবার্ট স্থইট্‌জারের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সাহায্য লাভ করেছিলাম। তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণে

আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। সমস্ত জীবন দিয়ে প্রতি মুহূর্তের কর্ম দিয়ে স্বইট্জার নিঃশংক নিঃসংকোচে প্রত্যক্ষ যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, সঙ্গীতবেত্তা হিসাবে তাঁর ছিল দেশজোড়া খ্যাতি। কিন্তু শিক্ষকতা বা সঙ্গীতস্রষ্টার লোকরঞ্জক বৃত্তি পরিত্যাগ করে তিনি ডাক্তারী পড়লেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সভ্য মানুষের অত্যাচার যে দেশের ললাটে গাঢ় থেকে গাঢ়তর কালিমা লেপন করেছে,—চিকিৎসকরূপে সেবার বৃত্তি নিয়ে সেই গভীর মধ্য আফ্রিকায় তিনি যাত্রা করলেন। আফ্রিকার বিষুবরৈখিক অঞ্চলে ওগুই নদীর ধারে তিনি উপস্থিত হলেন ও ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

প্রতীচ্য সভ্যতার আওতায় সুদূর প্রান্তে আফ্রিকার আদিবাসিগণের এই নগণ্য জনপদে স্বইট্জার রোগী ও মুমূর্ষুদের সেবায় তাঁর খৃষ্ট-নিবেদিত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। খৃষ্টের পথে জীবনকে পরিচালিত করেছেন তিনি সমস্ত পার্থিব পাথেয়কে পরিত্যাগ করে।

আফ্রিকার উষ্ণ-মণ্ডলের গভীর অরণ্যের উদার নির্জনতায় খৃষ্টের উপস্থিতিকে অন্তরের একান্ত নিকটে অনুভব করেছেন স্বইট্জার। ঈশ্বরের অলৌকিক নির্দেশ আজও তাঁর প্রতিদিনের কর্মধারাকে পরিচালিত করছে, আনন্দ-অভিষিক্ত করছে তাঁর প্রতি মুহূর্তের সেবাব্রতকে। যীশুর নামে অবজ্ঞাত দীন-দরিদ্রের সেবায় তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে দান করেছেন,—এই দানের আনন্দ তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনকে এক অনির্বচনীয় গৌরবে ভূষিত করেছে।

স্বইট্জার মনে করেন,—খৃষ্ট শুধু কোনো এক অতীত মনুষ্যচরিত্র নন, তাঁর পরিচয় শুধু প্রাচীন নথিপত্রের অধ্যয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি যুগের মানবাত্মার মন্দিরে তিনি বিরাজমান। তবু তাঁকে সন্ধান করতে হয় যুগে যুগে। এ সন্ধান সহজের পথে নয়,—যতো যুগ অতীত হচ্ছে, ততোই পথ হচ্ছে বন্ধুরতর, সন্ধানের বেদনা হচ্ছে তীব্রতর। প্রতি যুগে মানবসমাজের বীর অভিযাত্রীর দল তাঁর সন্ধান করে, তাঁর স্পর্শ পায়, পরম ভক্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁকে অর্জন করে। কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারাও এই অভিযাত্রীরা আবদ্ধ নয়, তাঁর সন্ধান, তাঁর পরিচয়, দেশে দেশে। দেশাচারের লোকাচারের সমস্ত অর্গল তিনি ভেঙেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পরমোপলব্ধির যে সন্ধানী তাকেও হতে হয় সর্ববন্ধন হীন। তিনি আসেন,—সমস্ত বিচার তর্ক ও দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে তিনি আসেন, মনুষ্যচেতনার আপাত পরাজয়ের অন্ধকারের প্রান্তে আসন্ন বিজয়-প্রভাতের জ্যোতির্ময় বিভা ফুটে ওঠে তাঁর চরণস্পর্শে। তিনি মানব-সংস্কৃতির দিগন্ত অতিক্রমের পথ, তিনিই পথের প্রদর্শক। তাঁর মৃত্যুতে নবজীবনের সংকেত। তাঁর জীবনদান পুনরুজ্জীবনের অংকুর।

পরবর্তীকালে ইউরোপে গিয়ে কিছুদিন অ্যালবার্ট স্বইটজারের সঙ্গে একত্র বসবাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার মনে হয়, সাধু সুন্দর সিং ও জাপানের কাগাওয়া ছাড়া স্বইটজারের মতো এতো ঘনিষ্ঠ খৃষ্টানুসরণের অধিকারী আর কেউ এ যুগে হননি। তাঁর প্রেমোচ্ছ্বাসিত আত্মত্যাগের কাহিনীর সঙ্গে আজ সমস্ত পৃথিবী পরিচিত; তাঁর অননুকরণীয় খৃষ্টভক্তির কথা আজ কারো অজানা নয়। যে যীশুকে তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পূজা করে চলেছেন, তাঁর প্রত্যক্ষরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্বইটজারের চরিত্রে, যে চরিত্রে শিশুর সারল্য-সৌরভ নিত্য বিকশিত।

স্বইটজারের গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে আমি একটি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলাম। বাল্যকালে পিতৃগৃহে যে ধর্মশিক্ষা আমি পেয়েছিলাম, তার পিছনে ঈশ্বরের অবশ্যই কোনো অভিপ্রায় ছিল। সেই শিক্ষার স্মৃতি আর স্বইটজারের এই গ্রন্থ একত্রে আমার মনকে উদ্বেলিত করে তুলল। যতো সামান্য যতো অকিঞ্চিৎকরই হোক না আমার জীবন,—প্রত্যক্ষ যীশুর সন্ধানে আমিও কি পথে বার হতে পারি না? প্রাচীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অন্তরে যে অলৌকিক বিশ্বাস ছিল, আমার কর্মে ও প্রার্থনায় সেই বিশ্বাসকে কি পুনর্জাগরিত করতে পারি না? যুগে যুগে মানুষের যেখানে বেদনা, মানবাত্মার যেখানে নিপীড়ন, সেইখানেই খৃষ্টের আবির্ভাব। মানবভাগ্যের সেই বেদনা বঞ্চনার মধ্যেই আমি আমার প্রভুকে সন্ধান করব। শুধু মুখের মন্ত্রে নয়, তাঁর প্রিয় কার্য্যের যন্ত্র হয়েই আমি তাঁর উপাসনা করব। তাঁর নামে জীবনকে উৎসর্গ করব সর্ব মানবের সেবায়। সেই হ্রদের ধারে তাঁর প্রথম শিষ্যরা প্রভুকে যেমন দেখেছিল, প্রভুর কথা যেমন শুনেছিল, আমিও কি আমার প্রভুকে উপলব্ধি করতে পারব না তেমনি করে,—সর্বস্বহারা হয়ে সেবাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে? আমিও কি শুনতে পাব না তাঁর অমোঘ-অমৃত বাণী,—বৎস, অনুসরণ করো আমাকে!

যন্ত্রণা-শিহরিত এই যুগ, রোগজর্জর এই পৃথিবী। সংশয় আর বেদনা, অবিশ্বাস আর রোদন। খৃষ্টজন্মের প্রথম শতাব্দীতে প্রথম ভক্তগণের অন্তর পুণ্য আত্মার যে অপূর্ব গুণাবলীতে মণ্ডিত ছিল, সেই ভক্তি, সেই বিশ্বাস, সেই সারল্যকে আবার এ যুগে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবেই একমাত্র মঙ্গল। এ আমি স্থির বুঝেছিলাম, আমাদের আবার সেই প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টান হওয়া প্রয়োজন।

শিশু উত্তেজনা ও স্বল্প অভিজ্ঞতার ফলে খৃষ্টের আদিম ভক্তমণ্ডলী পুনরাগমনের সমস্যাটির নিতান্ত সহজ সমাধান করেছিলেন। আমার সরল বিশ্বাসী পিতার মতো তাঁরাও প্রভুর কথার নিতান্ত আক্ষরিক অর্থ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব মিথ্যা নয়। পাপ-কলুষিত মৃত্যু-বিধ্বস্ত ধরণীতে খৃষ্টের অলৌকিক অতীন্দ্রিয় স্পর্শে নবপ্রাণের ও নবপুণ্যের সঞ্চার,—এই বিশ্বাস খৃষ্টবিশ্বাসীর হৃদয়-কেন্দ্রের চিরঞ্জীব বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই সাধুগণের সুসমাচার। এই ধরণী শতকলুষ সত্ত্বেও ঈশ্বরের রাজ্য,—এই রাজ্যের ঘোষণা করেছেন ঈশ্বরপুত্র মহামানব যীশু। যীশুখৃষ্টের সমসাময়িক ভক্তগণ প্রভুর অতীন্দ্রিয় লীলার প্রকাশ দেখেছিলেন স্বচক্ষে,— প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁরা এই অলৌকিক স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। সেই স্বর্গরাজ্যের প্রত্যক্ষ পুণ্যের অধিকারে তাঁরা ব্যাধিজর্জরকে সুস্থ করেছিলেন, অন্ধকে করেছিলেন চক্ষুষ্মান্। প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নের উত্তরও ছিল, কেন না প্রভু খৃষ্ট ছিলেন সর্বদা কাছাকাছি। ঈশ্বর-রাজ্যের দ্বার ছিল সামনাসামনি।

খৃষ্ট সন্নিহিত ভক্তগণের অধুনা-বিরল বিচিত্র উদ্দীপনার পরিচয় সাধুজন লিখিত সুসমাচারের শেষের দিকের বর্ণনায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। এমন স্পষ্ট ভাবে চিত্রটি অংকিত হয়েছে যে, সমস্ত ত্রুটি

যেন ফুটে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। সমুদ্র-তীরে প্রিয় শিষ্যগণকে যীশুর শেষ দর্শনদানের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

এই কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল যে, যীশুর প্রিয় শিষ্য মারা যাবেন না, যত দিন না প্রভু আসেন তত দিন প্রতীক্ষা করবেন। সেই জন্মে যীশুর তরুণ পথযাত্রিগণের কাছে প্রকৃত কাহিনী স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়েছিল। জন সেই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন,—কিন্তু যীশু বলেননি যে, প্রিয় শিষ্য মরবেন না। তিনি শুধু অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন,—আমি যদি ইচ্ছা করি যে এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমাদের কি?

আমরা আমাদের মনশ্চক্ষে কল্পনা করতে পারি, খৃষ্টের শেষ প্রত্যক্ষ শিষ্য তাঁর নশ্বর জীবনাবসানের দিনটি পর্যন্ত বৃদ্ধ কণ্ঠে তরুণ শিষ্যদের কাছে খৃষ্টের অলৌকিক জীবনী শোনাচ্ছেন। পরম প্রভুর এই জীবনী তিনি শুনিয়েছেন শত সহস্র বার যত দিন না মৃত্যু এসে কণ্ঠরুদ্ধ করেছে। প্রভু আসবেন, প্রভু আবার মরদেহে অবতীর্ণ হবেন, এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করা শক্ত নয়, এই বিশ্বাসের বলেই বাহ্যিক জগতের নিগড় শিথিল হয়,—যেখানে প্রভু যীশু নিত্যকাল অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই অনন্ত রাজ্যের আহ্বানে আকুল সাড়া দেয় বিশ্বাসী-আত্মা।

যীশুখৃষ্ট অবিলম্বে আবার মরদেহে পৃথিবীতে পুনরাবির্ভূত হবেন, প্রভুর প্রথম ভক্তগণের মধ্যে অটুট ছিল এই বিশ্বাস। খৃষ্টীয় সমাজে প্রথম যুগে এই বিশ্বাস যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা বোধ হয় ঈশ্বরেরই মঙ্গলময় অভিপ্রেত। সে যুগের খৃষ্টবিশ্বাসী নরনারীরা ছিল অতি সরল, অতি দীনহীন, কোনো বিরাট ঐতিহ্য ছিল না তাদের পিছনে। অবিশ্বাসী পুরুষ শক্তির হাতে যে প্রচণ্ড অত্যাচার তারা সহ্য করেছিল, সেই সহ্য করবার শক্তি তারা পেয়েছিল কোথা থেকে? প্রভু আবার আসবেন, আসার দেরি নেই,—এই ধ্রুব আস্থাই সেই দীন খৃষ্টানের বুকে দিয়েছিল বল। যে কল্পনা নিতান্ত সহজ, যে আশা নিতান্ত বাস্তব; সে সংকেত নিতান্ত প্রত্যক্ষ তাই তখন প্রয়োজন ছিল, তাই সব অত্যাচারের অগ্নি পরীক্ষাতেও দ্রব হয়নি তাঁদের অবিচলিত খৃষ্টপ্রেম। সেই বিশ্বাসকে নিতান্ত স্থূল বিশ্বাস বলে অতীতের সেই অকুতোভয় খৃষ্টপথযাত্রীদের হেয় করবার অধিকার আমাদের নেই।

বৃদ্ধ জন উপদেশ দিয়েছেন, পৃথিবীকে প্রেম কোরো না, আকৃষ্ট হোয়ো না পার্থিব বস্তুনিচয়ের প্রতি। যদি কোনো ব্যক্তি এই নশ্বর পৃথিবীকে ভালোবাসে, পরম পিতার প্রেম থেকে সে বঞ্চিত হয়। কেন না পৃথিবীর যা কিছু সঞ্চয়—দেহের বাসনা, ইন্দ্রিয়ের লালসা ও মরজীবনের গর্ব,—এ সব পৃথিবীরই, ঈশ্বরের নয়। এই পার্থিব ফুরায় ফুরায়, জুড়ায় জীবনের বাসনা কামনা,—কিন্তু ঈশ্বরের কার্য যে করে সে চিরদিন জীবিত থাকে সে শিশুগণ, মনে রেখো,—শেষের প্রহর উপস্থিত।

শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজছে। এ যেন জীবন-মৃত্যুর এক চরম সন্ধিক্ষণ,—আর দেরি নেই,—যাব কি যাব না, নেব কি নেব না তোমার আশীর্বাদ, চলব কি চলব না তোমার আদিষ্ট পথে। নিঃশংক নিঃসংশয় করতে হবে মনকে এই মুহূর্তে। সংযত করতে হবে মেখলা, জ্বালতে হবে অভিসারের বন্ধুর পথের হৃদয়-প্রদীপ, খৃষ্টধর্ম গ্রন্থের মূলে এই অবিলম্ব আত্মপ্রস্তুতির সুরটি বাজছে। নানা-সুরের ঐক্যতান এই গ্রন্থ, কিন্তু তার মধ্যে মূল সুরটি হৃদয়তন্ত্রীর প্রধান ঝংকারের মতো। এই ঝংকার ঘুম ভাঙায়, ঘুচিয়ে দেয় অলস স্বপ্নের মায়াজাল। খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব স্বপ্ন নয় কল্পনা নয়—পরম সত্য। জীবনের যে কোনো মুহূর্তে সে সত্যের পরম প্রকাশ, ক্রুসের যূপকাষ্ঠে যে সত্যকে হত্যা করা যায়নি। এই ক্রুসের যারা অনুবর্তক তাদের প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। কে জানে কখন প্রভু আবির্ভূত হবেন, বলবেন, অনুসরণ করো আমাকে। এই আহ্বান হয়তো বা মধ্য রাত্রির তিমিরান্ধকারকে ভেদ করে কানে বাজবে, হয়তো বা সেই হ্রদতীরের প্রত্যূষের মতো নবোদিত সূর্যের আনন্দ-বীণায় ধ্বনিত হবে সে আহ্বান। একান্ত অপ্রতীক্ষিত মুহূর্তে স্পন্দিত হবে তাঁর চির প্রতীক্ষিত পদধ্বনি।

এই প্রতীক্ষার পরম অবসানে নবজীবনের সূচনা। পৃথিবীর আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ, নবজীবনের বাসনা কামনা মানবাত্মাকে পঙ্গু করে রাখে। কিন্তু সেই আহ্বান যার প্রাণে বাজে, সে পঙ্গু গিরি উল্লংঘনের শক্তি লাভ করে এক মুহূর্তে, অপসৃত হয় তার সর্বপ্ল ভার। তার অন্ধকার হৃদয়-কন্দরে মহাজীবনের নব উদ্দীপনার আলোকবর্তিকা মুহূর্তে জ্বলে। তার আর কিছু থাকে না, কিছু সে সঞ্চিত রাখে না পৃথিবীর জঞ্জাল, তার সব কিছু গ্রহণ করেন প্রভু খৃষ্ট।

দুর্বলতা ও সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার ক্লিষ্ট অন্তরে আলবার্ট সুইটজারের গ্রন্থ সেই আলোক-বর্তিকাটি স্থাপন করল। তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণ আমাকে ঠেলে দিল দীন দরিদ্রদের মধ্যে, যারা সর্বহারা ও ভাবাহারা তাদের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধ করল আমার আত্মার কথা। আমি আমার বইপত্র ফেলে আবার পথে বার হতে শুরু করলাম, ঘুরতে লাগলাম গ্রামে গ্রামে। সরল গ্রামবাসীদের সাহচর্যে মানবজীবনকে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। ক্রমে আমার মন ধীরে ধীরে একনিষ্ঠ বিশ্বাসের গৌরবে নিষ্কলুষ হয়ে উঠল। আমার হৃদয়ের মাঝখানে ভক্তি ও বিশ্বাসের বর্তিকাটিতে পরম মঙ্গলময় পিতা আপন হাতে অমলিন ও আশা-প্রোজ্জ্বল শিখাটি জ্বেলে দিলেন। যে আহ্বানের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম, সেই আহ্বান আমার প্রাণে এসে মন্দ্রিত হোলো। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ :—নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব-জাতীয়তার সাধকেরা তাঁহাদের সাধনায় এই সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা যাঁহারা বোঝেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাঁহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ বাঙালী প্রত্যক্ষ বাঙলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।—বিপিনচন্দ্র পাল।

ভাটা পড়ার পরেই জোয়ার আসে। তেমনি ক'লকাতা মাঠের হকি লীগের সমাপ্তির সংগে সংগে বাইটন কাপের খেলা বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই সুরু হয়েছে। যদিও এখনও এর শেষ হয়নি। এবারকার বাইটন কাপের প্রতিযোগিতায় সর্বসমেত ৪১টি দল যোগদান করেছে। এর মধ্যে বহিরাগত ১৭টি দল আছে। বাইটন কাপের ইতিবৃত্ত ও পর্য্যালোচনা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করব। এবার ক'লকাতার মাঠের হকি খেলার একটা সামগ্রিক আলোচনা করছি।

হকি

এ বছরের প্রথম ডিভিসন হকি খেলাগুলি দেখে মনে হয়েছে, কলকাতায় হকি খেলার মান ক্রমশঃ নিম্নমুখী। খেলোয়াড়দের অনুশীলন, অধ্যবসায় যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি দেশের তরুণ খেলোয়াড়দের তৈরী করার ভার একান্তভাবে ক্লাব কর্তৃপক্ষদের। এ বিষয়ে যদি এখন থেকে ক'লকাতার ক্লাবগুলি তৎপর না হয় তা হ'লে ভারত অলিম্পিকের যে হকিতে একচ্ছত্র সম্রাট—সেই সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়াতে হবে। পথ করে দিতে হবে হয় পার্শ্ববর্তী—পাকিস্থান বা অন্য কাউকে।

এবার চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জ্জন ক'রল ক'লকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল মহামেডান স্পোর্টিং। চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য মহামেডান দলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে, অপর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্ট-বেঙ্গল দলের কাছে। নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ ইষ্ট-বেঙ্গল দল মহামেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলায় যথেষ্ট ভাল খেলেও জয়লাভ করতে পারেনি। পেনাল্টি বুলির অপব্যবহার, তাছাড়া বহু সুযোগের অপব্যবহার এ খেলায় জয়লাভ করতে দেয়নি।

প্রথম ডিভিসনের ১৯টি ক্লাবের মধ্যে সত্যাই মহামেডান দল ভালই খেলেছে। অপরাজয়ের গৌরব নিয়ে এবারকার লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ সত্যাই প্রশংসনীয়। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহামেডান দল গতবারে রাণার্স আপ লাভ করেছিল। এটাই মহামেডান দলের প্রথম লীগবিজয় নয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৫ সালে মহামেডান দল লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করে। এবারকার সমস্ত প্রতিযোগিতায় খেলায় মাত্র তিনটি খেলায় মহামেডান দল অমীমাংসিত ভাবে শেষ করেছে। মহামেডান দলের পরই সামগ্রিক ভাবে ভাল খেলেছে ইষ্টবেঙ্গল দল।

এবার সর্ব্বাপেক্ষা হতাশ করেছে কলকাতার অন্যতম খ্যাতনামা দল মোহনবাগান। গতবার পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি চার বার মোহনবাগান দল লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করে এসেছিল। তাই অনেকেই আশা করেছিলেন, এবারও লীগবিজয়ী হয়ে হকি লীগের খেলায় [illegible] নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে। কিন্তু মোহনবাগান দল ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর খেলার মধ্যে শিথিলতা প্রকাশ পায়। এর পরই ইষ্টার্ণ রেলদল ও মহামেডান দলের কাছে পরাজয় বরণ করায় লীগ পাল্লার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে।

কলকাতা মাঠে যে সমস্ত খেলোয়াড়রা হকিকে তার স্ব-আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই খেলার মধ্যে ফুটে উঠেছে অনৈপুণ্য। তাঁদের স্বাভাবিক ক্রীড়াকৌশল তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। ভোলা চক্রবর্ত্তী, হরিপদ গুই, ক্লডিয়াস, গুরুং, পিয়ারা সিং, কারো খেলাই চোখে লাগে না। দিন দিন তাদের খেলা নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন অনুশীলন ও অধ্যবসায় খেলোয়াড়দের মধ্যে।

প্রথম ডিভিসন থেকে এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যাচ্ছে ক'লকাতার অন্যতম খ্যাতনামা দল ভবানীপুর ও তালতলা। গত কয়েক বছর আগেও ভবানীপুর কলকাতার হকি মরশুমে যে আলোড়ন ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো তা দর্শকরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হননি। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ভবানীপুর দলের। ফুটবল থেকে নেমে যাওয়ার পরই হকি থেকে নেমে যাওয়ায় মনে হচ্ছে ভবানীপুর দলের একে একে নিবিছে দেউটি। ভবানীপুর দল এবারকার প্রতিযোগিতার প্রথম ১২টি খেলায় যখন মাত্র ১টি পয়েন্ট সংগ্রহ করল তখনই তারা অনুমান করলো এবারকার প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্বন্ধে। এবং অত্যন্ত হতাশ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালো। অপর দল তালতলা ১৮টি খেলার মধ্যে মাত্র ৭টি পয়েন্ট লাভ করেছে। শেষ পর্য্যন্ত তালতলা এবং উয়াড়ী দলের মধ্যে নেমে যাওয়ার পাল্লায় বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্য্যন্ত ৮টি পয়েন্ট পেয়ে এবারকার মত উয়াড়ী দল প্রথম ডিভিসন লীগ থেকে নেমে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই লাভ করে।

আগামী বারে প্রথম ডিভিসন খেলার গৌরব অর্জ্জন করলো আদিবাসী ও ঝাড়খণ্ড ক্লাব। দ্বিতীয় ডিভিসনে এবার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভের গৌরব অর্জ্জন করলো আদিবাসী দল। আদিবাসী দলের ক্রমোন্নতি সত্যাই প্রশংসার দাবী রাখে। আদিবাসী দল ১৬টি খেলার মধ্যে ২৯ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জ্জন করলো। অপরপক্ষে ঝাড়খণ্ড ক্লাব '১ পয়েন্ট পিছিয়ে যেতে অর্থাৎ ২৮ পয়েন্ট লাভ করে রাণার্স আপ লাভ করলো। আগামী বারে এই দুইটি দলকে প্রথম ডিভিসন হকি লীগের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে।

আন্তঃ-কলেজ হকি

আন্তঃ-কলেজ হকি লীগের খেলায় ২৩টি কলেজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এবারকার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ। এবার নিয়ে মোট পাঁচ বার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ আন্তঃ-কলেজ হকি লীগের খেলায় বিজয়ীর গৌরব অর্জন করলো।

তিনটি গ্রুপের মধ্যে একটিতে সেণ্ট জেভিয়ার্স, একটিতে স্কটিশচার্চ ও অপরটিতে বি, ই, কলেজ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। এবার এই তিনটি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ানকে নক-আউট প্রথায় খেলিয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্কটিশচার্চ কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করায় বি, ই, কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার্সের খেলায় সেণ্ট জেভিয়ার্স দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে।

অথ ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ

ষ্টেডিয়াম নিয়ে মাসিক বসুমতীর পাতায় ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করেছি। কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম কিংবা একক ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন সর্ব্বাগ্রে আলোচনার কথা ষ্টেডিয়াম হওয়ার আশার কথা।

কলকাতার নবনির্ব্বাচিত মেয়র বি, কে, ব্যানার্জ্জি ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে সবিশেষ আগ্রহী হয়েছেন। বর্তমানে যে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে দাবী কমিটি গঠিত হয়েছে তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন শ্রী বি, কে, ব্যানার্জ্জি। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতায় ষ্টেডিয়াম হোক্, এই দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে বাংলা দেশের তরুণ ছাত্ররা। এই ষ্টেডিয়াম-যজ্ঞের হোতা ছাত্র-সম্প্রদায়। তারা যে ভাবে এগিয়ে এসেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। তরুণদের দাবী কোনমতেই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না বলে মনে হচ্ছে।

বার বার ষ্টেডিয়ামের কথা উঠেছে। পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই কোন অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে সমগ্র উত্তেজনার যবনিকা পতন ঘটেছে। সন্তোষের মহারাজা, আজ থেকে দীর্ঘ দিন আগে কলকাতায় ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনের উপদেশ অনুভব করেছিলেন। রাজা, মহারাণী, ক্রীড়াজগতের দিকপালেরা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রত্যেকেই সবিশেষ চেষ্টা করেছেন কলকাতায় ষ্টেডিয়াম তৈরী হোক। ক্রীড়ামোদীরা রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে মুক্তিলাভ করুক। খেলা দেখার সত্যকার নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করুক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় ষ্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি!

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী।

কলকাতার মতন এত বড় শহরে একটা ষ্টেডিয়াম নেই, একথা অন্য কোন রাজ্যের তরুণেরা হয়তো কল্পনা করতেই পারে না। ফুটবলের পীঠভূমি, হকির তীর্থক্ষেত্র—সেখানে ষ্টেডিয়াম নেই, এর চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

কলকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতা-সুলভ ব্যবহার সত্যই আশ্চর্য্যজনক! তবু আশার কথা, রাজ্য সরকার শ্রী ঘোষকে পাঠিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াতে। শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, উন্নত ধরণের ষ্টেডিয়াম গঠনের জন্য কারিগরী সাহায্যের জন্য। শোনা যাচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার দর্শক যাতে খেলা দেখতে পারেন, তার উপযোগী করে একটি কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম গঠন হবে।

অধরা

(Browning's "Love in a life" অবলম্বনে)

তপতী চট্টোপাধ্যায়

মন যে আমার ছুটে বেড়ায় চাই গো তোমায় চাই
প্রতিধ্বনি উছলে ওঠে কই গো তুমি কই
আড়াল থেকে ডাক দিয়ে যাও তাই তো আমার চাওয়া
ডাক দিয়ে তাও লুকিয়ে বেড়াও যায় না তোমায় পাওয়া।
জীবন-কমল-কোরক 'পরে
তোমার চরণ-চিহ্ন পড়ে
সে যে আমায় হাতছানি দেয়
তাইতো পরাণ ছোটে,
তোমার পদধ্বনির পরে
আমার এ মন লোটে।

আসবে যখন তুমি আমার হৃদয়-কমল 'পরে
এমন হবে আলোয় আলো তোমার স্পর্শ ভরে,
তোমার পায়ের অলক্তরাগ কমল হয়ে ফুটে
থরে থরে উঠবে ভরে আমার বক্ষপুটে।
তোমার অলক-তরঙ্গভার
হিয়ার মম পুষ্পিত হার
পূর্ণ করে জীবন মম
মেলবে আঁখির তারা,
নীরব তোমার মৌন হাসি
সকল ক্লান্তিহরা'।

কিন্তু আমার হিয়ার আলো কই গো আমার প্রেম
শ্রান্ত পথে ক্লান্ত চরণ খোঁজে যে বিশ্রাম,
মনকে বলে প্রবোধ দিয়ে
শান্ত করে আমার প্রিয়ে
বলে আমায় খুঁজবে বলে তাইতো তোমার বাঁচা

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বিবাহিতা স্ত্রী পার্ব্বতী সখী

শ্রীঅমিয়রাণী দাস

ইহা বিংশ শতাব্দীর নয় বা উনবিংশ শতাব্দীরও নয়। ইহা যুগের প্রথমাবস্থা হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সংসার-সৃষ্টির ও প্রাণিসৃষ্টির যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি। শুধু মানব সমাজে নয়, পশু-পাখী কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও এই ব্যবধান আছে। সঠিক জন্মতালিকা দেখিলে তাহাতেও হয়ত দেখা যাইবে যে, এই দুইটি পরস্পরের সংখ্যা প্রায় সমভাগে আছে। হয়ত ইহা স্বয়ং ভগবানেরই ইচ্ছা।

এই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে কে বড়, তাহা আজ পর্য্যন্তও গবেষণায় সঠিক ভাবে বলা যায় নাই। কেহ বলেন পুরুষ, কেহ বলেন স্ত্রী; কিন্তু অনেকের হিসাবে পুরুষ বড় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেবাদিদেব মহাদেব হইতে সংসারের সৃষ্টির নিকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায় যে, পুরুষ জাতির দৈহিক বল বেশী এবং ঐ বিক্রমেও পুরুষজাতি বড় বলিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীজাতির যে বল তাহা দৈহিক নয়, সেইজন্যই সাধারণ চক্ষে স্ত্রীজাতির শক্তির পরিচয় সহসা ধরা পড়ে না। স্ত্রীজাতির শক্তির পরিচয় দেয় পুরুষের ভিতর দিয়া। সেইটি কম শক্তির পরিচয় নয় বরং পুরুষজাতি হইতে অধিক বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

তর্ক হিসাবে বা সত্যিকার হিসাবে যদি গুণাগুণের বিচার করা যায়, তবে মনে হয় কোন জাতিই কম নয়। দুই জনেরই সমশক্তি। তর্ক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, যদি পুরুষ বড়ই হয়, তবে ঐ থাকিবে তবে পুরুষ তাহার নিকট আসিতে পারে না। হইতে পারে পুরুষ জাতি দৈহিক বলে শক্তিমান; কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিতে স্ত্রীজাতির জন্ম, গঠন ও জীবন।

কবিগণ স্ত্রীজাতিকে শক্তিজাতি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তাহার কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে, যাহার দরুণ স্ত্রীজাতিকে ঐ শক্তিজাতির নামে পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কারণ উল্লেখ না করিয়া কবিদের আখ্যা লইয়াই ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীজাতি, শক্তি-জাতি। তাহার যে শক্তি আছে, তাহা পুরুষ-জাতির নাই।

বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হয় না। সেই বীজ যে জীব-পুরুষের নিকটই থাকিবে, এই যুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছেন বর্ত্তমানে বিজ্ঞানিগণ। জীব-পুরুষের বীজ ছাড়াও যে প্রাণীর সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ স্ত্রী ছাড়া সন্তান প্রসব হয় কি না তাহা আজ পর্য্যন্তও বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা পড়ে নাই বা ভবিষ্যতে পড়িবে কি না তাহাও সন্দেহের কথা। এই বিষয়ে যেখানে প্রাণিসৃষ্টির প্রথম সূত্রশক্তিতে স্ত্রী-জাতির শক্তি পুরুষ-জাতি হইতে অধিক বলিয়া মনে হয়, সেইখানে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবন মাধ্যমে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে শক্তিতে কম, তাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

একটি জীবনের মধ্যে কয়টি শক্তি আসিতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, সেইখানে চারটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—মস্তিষ্কের, দেহের, মনের ও অন্তরের (ঐশ্বরিক) *। এই চারটি শক্তির মধ্যে দৈহিক শক্তিতে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে কম হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য তিনটিতে হয় বেশী, নয় ত পুরুষ জাতির সমভাবে আছে, কম নয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও এমন অনেক নজীর আছে যে, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে জীবন-শক্তিতে কম নয়, তাহার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে, পুরাণে ইত্যাদিতে রহিয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষজাতি হিসাবে বলা হইল। এখন বক্তব্য হইবে ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া, জাতি ছাড়িয়া যদি ব্যক্তিগত হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ বলা যায়, তাহা হইলে সাধারণত বিবাহিত ব্যক্তিদের বিষয়ই বলা যায়। স্ত্রী বলিতে বুঝায় বিবাহিতা এবং পুরুষ বলিতে বুঝায় যুবকের পরবর্ত্তী জীবন। ঐ স্ত্রী প্রথমাবস্থায় কন্যা বা বালিকা, দ্বিতীয়াবস্থায় স্ত্রী, তৃতীয়াবস্থায় গৃহিণী ও চতুর্থাবস্থায় হন সর্ব্ব সাধারণের বৃদ্ধ-মা। আর পুরুষ বালক অবস্থা হইতে যুবকে পরিণত হয়, তার পর তৃতীয়াবস্থায় হয় সংসার-কর্ম্মী, চতুর্থাবস্থায় সর্ব্বজনের উপদেশকারী বৃদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। সেই জন্যই স্ত্রী বা পুরুষ বলিলে বিবাহিত বলিয়া সাধারণত ধরিয়া লইতে হয়। স্ত্রী হিসাবে তাহার প্রথম জীবন বা প্রথমাবস্থার কথা উঠে না এবং পুরুষের কথাতেও প্রথম দুই অবস্থার কথা উঠে না।

বিবাহিত জীবনের স্ত্রী ও পুরুষের কথাই হইবে এখানে আলোচ্য বিষয়। কারণ, সেই সময় হইতে দুই জনেরই আসল জীবনের কাজ আরম্ভ হয়। জীবনের ধারার কার্য্যসূচনা, জীবনের গঠন ও

---

* যদি এ বিষয়ে কেহ ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন, তবে এই পত্রিকার মারফতে জানাইলে বাধিত হইব।

পরিচালন সম্পর্কে প্রয়োজনমতে সংসারী হইয়া, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের কর্ত্তব্য-পথ বাছিয়া লইতে হয় সেই সময় হইতে।

বিবাহ বস্তুটি কি, তাহার আলোচনায় অনেক আছে, তবে এখানকার আলোচনা তাহা নহে। দুইটি বিবাহিত জীবনের পরস্পরের সম্পর্কের বিষয় লইয়া হইবে আলোচনার বিষয়। যখন "বিবাহ" বলিয়া কথা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে ইহা সংসারের মনুষ্য-সমাজ ব্যতীত অন্যের নয়।

বিবাহের পর বালিকা হয় স্ত্রী, তার পর হয় মা, সন্তানের জননী। ঐ সন্তান যত দিন না বয়স্ক হয়, তত দিন থাকে মায়ের কাছে, লালিত পালিত হয় মায়ের আদর-যত্নে, শিক্ষা পায় মায়ের গুণের। বয়স্ক হইলে থাকে না ততটা মায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বয়স্ক সন্তানগণ পাইয়া থাকে তখন মায়ের শুভ আশীর্ব্বাদ। সন্তানগণের বিবাহ হইলে মা পাইয়া থাকেন কিছু মানসিক বিশ্রাম, যদি তাহারা থাকে ভাল পরিবেশে। নচেৎ মা পাইয়া থাকেন আরও বেশী মনের কষ্ট। সন্তানের সঙ্গে মায়ের ঘনিষ্ঠতা থাকে সন্তান বয়স্ক বা বিবাহ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তত দিন থাকে সন্তানের উপর মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম। সন্তান যখন বড় হয়, বুদ্ধি হয়, স্কুল ও সামাজিক শিক্ষা পায়, তখন আর মায়ের উপর ততটা টান থাকে না, আস্তে আস্তে সরিয়া পড়ে মায়ের কাছ হইতে। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় শিথিল হয় তখন হইতে। বিবাহের পর মেয়ে সন্তান যায় তাহার স্বামীর কাছে, আর পুরুষ সন্তান যায় উপার্জ্জনের উপায়ে স্থানান্তরে। মা থাকেন তখন গৃহিণী হইয়া নিজের স্বামীর পার্শ্বে। প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগই দেখা যায় যে, পুরুষ সন্তান কার্য্যোপলক্ষে তাহার স্ত্রী-সন্তানাদি লইয়া থাকে অন্য স্থানে, মা থাকেন তখন কোন এক দূর দেশে। কেন এমন বিশ্রী বা নিয়ম, সেই-ই হইয়াছে সংসারের স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম।

যদিও পুরাণে আছে যে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,' গুরুজনদের মধ্যে জননী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক হিসাবে। স্ত্রী পুরুষের কর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের ধারা পরীক্ষা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাস্তব জীবনে পুরুষের নিকট তাহার মায়ের কর্ত্তব্য থাকে সংক্ষিপ্ত, ঘনিষ্ঠতা থাকে জীবনের একাংশ, সম্পর্ক থাকে ভক্তি ও আধ্যাত্মিক হিসাবে।

মেয়ে সন্তান কাটায় তাহার মায়ের কাছে। তাহার জীবনের প্রায় এক-পঞ্চম ভাগ সময়, আর পুরুষ সন্তান থাকে তাহার এক-চতুর্থাংশ সময়। বাকী জীবন কাটায় নূতন জীবনের সঙ্গে—স্ত্রী ও পুরুষ হিসাবে বা স্বামি-স্ত্রী হিসাবে। সন্তান যতদিন থাকে মায়ের কাছে, ততদিন থাকে তাহার আদর, শিশুবাৎসল্য ভাব, মনের কোমলতা।
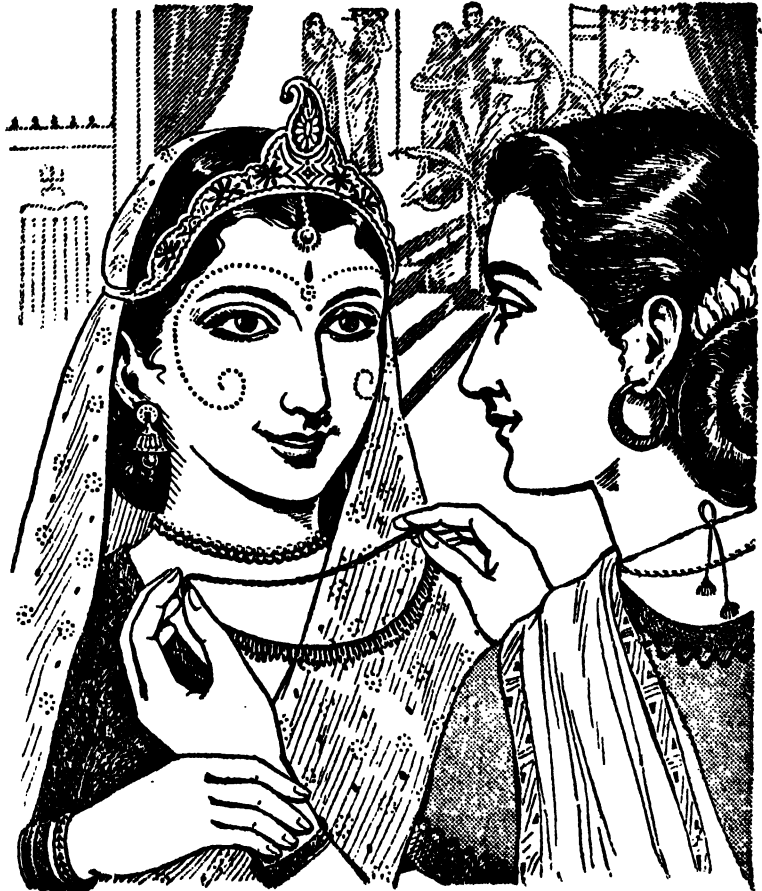
তার পর যখন হয় বয়স, পাইয়া থাকে নূতন জীবন ধারণের প্রণালী, তখন থাকে না তাহার সেই শিশুসুলভ চরিত্র। জীবন নির্ব্বাহের ধারানুযায়ী সময়ে হইয়া উঠে উগ্র, সময়ে হইয়া থাকে কোমল, জীবন পরিকল্পনা ও পরিচালনার সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই জীবনের মধ্যে কে বেশী করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে চায় বা চেষ্টা করে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়; সেই ধারা চলিয়া থাকে এক দুই বৎসর নয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত।

বিবাহের পর নূতন জীবনের সঙ্গে মিলিত হইয়া, জীবনের মান বজায় রাখিয়া, উভয় জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া, নিজেদের সন্তানের উপর কর্ত্তব্য পালন করিয়া, জীবনের প্রায় তিন অংশ সময় চালিয়া নেওয়া যে কাহার পক্ষে হইতে পারে, কোন শক্তিতে সে সেই ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। এই বিষয়ে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ইহা পুরুষের পক্ষে কঠিন, ইহা স্ত্রীজাতি ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে অসম্ভব। সেই সময়ে, সেই বয়সে, মা থাকেন না সঙ্গে। তখন স্ত্রী হইয়া থাকে মায়ের পুরুষ সন্তান—স্বামীর জীবনের সঙ্গী। তাহাকেই দেখিতে হয় স্বামীর জীবনের সুখ, লইতে হয় স্বামীর কষ্টের অংশ, করিতে হয় স্বামীর ঔরষ-জাত সন্তানের শুশ্রূষা। নৌকার হালের মত রাখিতে হয় তাহার লক্ষ্য। মায়ের হাত হইতে লইয়া যায় স্ত্রী তাঁহার পুত্রের সমস্ত ভার। এই স্ত্রী-জীবন যে কত কষ্টের, তাহা সেই স্ত্রী-জাতিই কেবল বুঝে। মা তাঁহার পুত্র সন্তানকে গড়িয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়া থাকেন। সেই জন্যই বিবাহিত পুত্র সন্তানের নামের সঙ্গে থাকে না মায়ের নাম, থাকে তাঁহার স্ত্রীর নাম। ইহা আজিকার নয়, পুরাণেও পাওয়া যায় ইহার সাক্ষ্য। শিবের নাম উচ্চারণ করিতে মুখে আসে পার্ব্বতীর নাম, যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুনের নামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে রহিয়াছে তাঁহাদের স্ত্রী দ্রৌপদীর নাম, রামাবতারের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ জীবনী ব্যাখ্যা রহিয়াছে সীতাদেবীর। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের শ্রীমা সারদা দেবী, মহাত্মা গান্ধীর জীবনীর শ্রেষ্ঠ অংশে রহিয়াছে কস্তুরী বাঈ গান্ধীর জীবন। শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই একই ধারা, জীবনের কর্ম্ম হিসাবে, ধর্ম্ম হিসাবে, পুরুষের নামের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত থাকে তাঁহার স্ত্রীর জীবন। ইতিহাসের পাতা পড়িলে পাওয়া যায় ইহার অনেক দৃষ্টান্ত। মায়ের নামের চাহিতে স্ত্রীর নামই পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে বেশীর ভাগে। পুরুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর বিষয়ে একাগ্রতা দেখাইয়াছেন দুইজন, দিল্লীর মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ আর ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড। স্ত্রী-জীবনের ইতিহাসে থাকিবে এই দুই মহানের আদর্শ চিরস্মরণীয়।

মেয়ে ও স্ত্রী-জীবনের সার কি? সংসারের উপর সত্তা কোথায়? তাহার নিজের অস্তিত্ব হিসাবে কি আছে? মায়ের বাড়ীতে মায়ের আদর, স্বামীর ঘরে স্বামীর কর্ম্ম ও ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তা। তাহার নিজের বলিয়া থাকে কেবল নাম, স্বামীর নামের সঙ্গে স্ত্রীর নাম, কর্ত্তব্য হয় স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের মিলন রাখা। স্বামীর ঘরের সুখ-সুবিধার আশা ও ক্ষমতানুযায়ী ব্যবস্থা করা ও সাহায্য করা, স্বামীর সন্তানদের লালন-পালন করা, স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সেবা শুশ্রূষা করা। স্ত্রীর নিজের জীবনের অস্তিত্ব থাকে ঐ সব কাজের মধ্যে, নিজের সুখ আনন্দ সব ছাড়িয়া দেয় স্বামীর জীবনের মধ্যে, স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় স্বামীর জীবনের মাধ্যমে।

পুরুষ সন্তানের কাজে কাছে তাঁহার মায়ের বা তাঁহার স্ত্রী-জীবনের মূল্য কতটুকু, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে পুরুষ বা স্ত্রীর মূল্য কতটুকু, এই দুই জীবনীর পৃথক ভাবে যুক্ত ভাবে আর কেহ ঘনিষ্ঠতার ভাবে কেহ আছে কি না, তাহা লিখিত বিষয়গুলি হইতেই স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, কাহার শক্তি কতটুকু—পুরুষের না স্ত্রীর?

একটি নির্জ্জলা ভ্রমণ কাহিনী

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

কাকদ্বীপের উদ্দেশ্যে ডায়মণ্ডহারবারের পথে। দু'দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর, সবুজ আর সবুজ—দূরের ধূমায়মান বনরাজিতে বিলীন হয়েছে নীল আকাশের কোলে। ধানকাটা সারা হয়ে গেছে—খড়ের গোড়াগুলো খালি কাস্তের দস্যুতায় নিষ্করুণ ভাবে জর্জরিত হয়ে অপহৃত-সর্ব্বস্ব হওয়ার লজ্জায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে আছে মাঠে। মাঝে মাঝে দু'টো-একটা কড়াইশুঁটি আর খেঁসারীর ক্ষেত—খেলাঘরের যেন নয়নবিমুগ্ধকর সবুজ আর চমৎকার নীল অথবা সাদা রংএর ছোট্ট অথচ অপূর্ব্ব ফুল বুকে নিয়ে!

দূরের নারকেল গাছগুলো যেন বেড়া দিয়ে রেখেছে এই সব খেলার মাঠকে, ঢুকতে দেবে না কাউকে। তাই মাথা তুলে আছে আকাশে অষ্টপ্রহর নাড়ছে, মাথা অনবরত, না, না, না, প্রবেশ নিষেধ, নিষেধ নিষেধ।

পাকা রাস্তার বাঁ হাতে সরু রেলের লাইন পথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেই চলেছে। মাঝে মাঝে ইষ্টিশান—সবই যেন খেলাঘরের। আর ডানহাতে রাস্তার সঙ্গে পাল্লা রেখে চলেছে সরু খাল একটানা তিরতিরিয়ে টলটলে জল নিয়ে। দু'-একখানা শালতি বাঁধা রয়েছে এখানে-ওখানে।

মাঝে মাঝে গ্রাম অর্থাৎ কয়েকটা চালাবাড়ীর সমষ্টি—চাষীরা সেই জলের ধারে আঁটি করে বাঁধা খড় আছড়ে ধান বার করছে। সোনারং-এর খড়ে গাদা আলো করে রেখেছে এক এক জায়গাকে। নিকোনো নিটোল উঠোনে ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে চাষী-বৌ।

একটিমাত্র বাঁশ ফেলা পুলের ওপর দিয়ে করছে কেউ কেউ আনাগোনা বড় রাস্তায়। ভারী সুন্দর লাগে দেখতে—একটার পর একটা ছবি যেন, খালি ছবি। যাদের ভালবাসি তাদের এনে দেখাতে ইচ্ছে করে, একা দেখে তৃপ্তি হয় না মনটা কেমন কেমন করে। মাঝে মাঝে হাটা রাস্তার ধারে, তরিতরকারী আর ডাব—ডাবের রাজত্ব যেন!

কথা ছিল ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে হল্ট করা হবে একেবারে কিন্তু বিধি বাম। একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে বাস বিগড়ে বসল। যাক্। তবু সামনে গ্রাম রয়েছে একটা ডানহাতি। নেমে পড়া গেল। অন্য দিকে মাঠ আর মাঠ, কেবল মাঠ।

ঐ ছোট গ্রামে ঢুকে ছায়াদেরো ঐ শান্তির নীড়ে যাবার লোভ সামলাতে পারা গেল না। কিন্তু হায়! বাঁশের পুল পেরোন হবে কেমন করে? বাঁশের পুলের কাছে সকলকে জড়ো হ'তে দেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল একদল বৌ, গিন্নী, ছেলেমেয়ে। একটা কালো রং-এর গলায় ঘুঙুরবাঁধা কুকুরও বেরিয়ে এসে এই অনধিকার প্রবেশোদ্যত অদৃষ্টপূর্ব্ব আধুনিকাদের দেখে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল।

একজন হাসিখুশী বর্ষীয়সী এগিয়ে এসে বলল, এসো না মা, এসো।

কি করে যাব?

কেন? এই পুল পেরিয়ে?

ওরে বাবা, মরে যাব—সবাই চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে।

কেন, ভয়টা কি? এই তো আসবে সড়্‌সড়্‌ ক'রে, বলে এক নিমেষে সে-ই সড়্‌সড়িয়ে এপারে এসে হাজির হ'ল। তখন দু'-চার জনের সাহস হল—হিলতোলা স্লিপার সকলের পায়ে—তাই হাতে নিয়ে বাঁশে পা ঘষটে ঘষটে দু'-চার জন কায়ক্লেশে উৎরালোও কোনরকমে। ওপারে বৌঝিরা তো হেসে অস্থির—ছেলেমেয়েগুলো তো দুয়ো-দুয়ো সূচক হাততালিই দিতে আরম্ভ করল। বীররস জাগলো তখন সকলের মনেই, সবাই তৎপর হ'ল তখন বংশবিহারে।

সুষমা মজা করল সব চেয়ে বেশী—আদ্ধেক পথ গিয়ে আর এগোতেও পারে না, পেছোতেও না—রীতিমত কান্না সুরু—ঝপাৎ ক'রে ওর হাতের কাচবসানো লক্ষ্ণৌই স্লিপার পড়ে গেল জলে।—হায়, হায়, হায় করে ও-ও বুঝি পড়ে এইবার! সকলের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লেগেছে।

ওপারের একটি বছর দশেকের মেয়ে এসে উদ্ধার করল ওকে—হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে।

বাবাঃ, বাঁশের পুল পেরোন এত! এ যে মহা প্রস্থানের পথ যে বাবাঃ!

ওপারের ওরা বড় সমাদর করল। এসো মা, বসো মা—এই যে চিঁড়ে কোটা হ'চ্ছে, খাওসে—ছেলেদের ডেকে ডাব চিরে দিই মা, বোসো—ইত্যাদি অনর্গল ব'লে। কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিকোন উঠোন, ঘরদোর, ঢেঁকিশাল!

দড়ির দোলনায় শুইয়ে রাখা খোকা আর নিকোন উনুনের পাড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা বেড়ালটা পর্য্যন্ত যেন আনন্দের উৎস এক একটি। উঠোনে বিছোন ধান শুকুচ্ছে—দাওয়ার উঁচু চৌকিতে বসে তিনমাথা এক হয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধ—নলিতে, কে গো। বলে সাড়া নিল।

একটা বিরাটকায় তেঁতুল গাছ ঝুঁকে পড়ে পাহারাওলার মত দৃষ্টিতে যেন বাড়ীটার অভিসন্ধি দেখবার জন্ত উন্মুখ হয়ে আছে—তাই বাড়ীর এক পাশটা কি ছায়াশীতল।

বসব বসব করা হচ্ছে এমন সময় ড্রাইভার ডাক দিল আমাদের, এখনই যেতে হবে—কাজেই সেই সহৃদয় আতিথেয়তার সুযোগ গ্রহণে পূর্ণচ্ছেদ ফেলে উঠতে হ'ল—ও মা, সে কি কথা মা, চললে এক্ষুণি?

হ্যাঁ, আসব আবার—আবার আসব বলে বেরোন হল।

সুষমার ভিজে ড্যাবড়েবে মূল্যবান জুতো একটি ছেলে উদ্ধার করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। এবার ওরা একটু দূরে একটা 'অনায়াসে' পার হবার পুলে নিয়ে গেল আমাদের—তাতে তিন্‌টে বাঁশ আছে—এখান দিয়ে মাল যায় কি না তাই এটা এত চওড়া, বলল গিন্নী।

বাবা! এত চওড়া! পুল পার হতেও আমাদের পৌষ মাসে গায়ে ঘাম বেরোল।

আবার যাত্রা। বেলা তখন অনেক। আবার সেই মোহের অঞ্জন মাখিয়ে দেওয়া দিগন্তবিসারী মাঠ আর মাঠ দু'দিকে—আর মাঝে মাঝে গ্রাম—দৃষ্টিসুখকর প্রসন্নময়।

কথা হল যে এবার যে হাটটা পাওয়া যাবে সেখানে থেমে একটু চা-টা খাবার চেষ্টা দেখা যাবে। কাজেই—সামনে ডান হাতি খালের ধারে একটা চালা—একটা সাইনবোর্ড কাত মেরে রয়েছে, তার উপর কি যেন লেখাও রয়েছে তাতে।

এতগুলি জীব নিয়ে বাসকে থামতে দেখে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ল এদিকে—ও মা! দু' মিনিটের মধ্যে যে সেই চালাখানার চালে উঠল একটা লোক! নীচে দাঁড়াল আর একজন—সাইনবোর্ডখানা ঠিক করে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—আদর্শ হিন্দু হোটেল—অনেক খদ্দেরের সমাগম সম্ভাবনায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা সাইনবোর্ডের এই কপাল ফেরা।

বীণাদি' তখন গল্প সুরু করলেন—এটা কি রকম হোটেল জানেন?

কি রকম? কি রকম? সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

তখন বীণাদি' আরম্ভ করলেন—ঐতো একখানা চালাওলা ঘর দেখছেন, একটা ঢালা বিছানা ওতে পাতা আছে নির্ঘাৎ—তাতে একটা কোল-বালিশের মত লম্বা মাথার বালিশ। যে হোটেলে যাবে, ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করবে—কাত্ না চিৎ?

সে আবার কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি।

কাত মানে কাত হ'য়ে শোবে, না চিৎ মানে চিৎ হ'য়ে শোবে।

এ কথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ?

স্থানাভাব। কাৎ হ'য়ে শুলে এক আনা ভাড়া, চিৎ হ'য়ে শুলে দুই আনা।

জানবে কি ক'রে, কে কখন চিৎ হচ্ছে?

সারা রাত ম্যানেজার কাম পাহারাদার বসে থাকবে আর চেঁচাবে—২নং চিৎ—৵০, ১০নং চিৎ—৵০, এই রকম আর কি—

হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে নামা হ'ল বাস থেকে। খালটা আগাগোড়া গেছে, এখানে ওপারে যাবার জন্ত বাঁধানো পাকা সাঁকো একটা। সাঁকোর ওপরেই নানান নিধি, ডাব তো আছেই—ভেতরে চায়ের দোকান দুটো-চারটে, কিন্তু যারা করছে চা আর যাতে ক'রে করছে, তা দেখেই চা-তেষ্টা গলাতেই মেরে ফেলতে হ'ল।

এখানেও চিঁড়ে কোটা হচ্ছে কিন্তু কলে—হাঁ-হাঁ করে আগুন জ্বলছে আর পাহাড় পাহাড় চিঁড়ে কোটা হ'য়ে যাচ্ছে নিমেষে—আমাদের এদিকে কখনও দেখা যায় না এ-সব, ধানের রাজত্বে ভিন্ন ব্যবস্থা।

একটু পরে আবার বাসে ওঠা। কিন্তু গাড়ী যে ষ্টার্ট নেয় না আর—কি মুস্কিল!

ভিড় জমে গেল এবার। হাটের ভিড়, চারিদিকে বাসের—

নানা মন্তব্যের পর সাব্যস্ত হ'ল যখন এটা বাস নয় গরুর গাড়ী, তখন অপমান আর সইতে না পেরেই বোধ করি অচল বাস সচল হ'য়ে উঠল।

ডায়মণ্ডহারবারে যখন পৌঁছান গেল, তখন পাঁচটা।—নামলাম।

সামনে গঙ্গার সে কি রূপ! সেই প্রলয়ঙ্করী গঙ্গার দিকে তাকালে ভয় করে—আবার বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হ'য়ে যায়—কত জল, কত জল! আর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে যেন তীরভূমি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে চলেছে গঙ্গা, সর্ব্বনাশী রাক্ষসী! মনে হয়, সব গিলে খাবে, সব!

কত যত্নে, কত অর্থব্যয়ে বাঁধবার সংযত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল পাগলীকে—কিন্তু সে অট্টহাসি হেসে টুকরো টুকরো করে অবহেলে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েছে সে বাঁধন—তাথৈ তাথৈ করে নাচছে আবার!

ওই দূর দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে সূর্য্য, লাল টুকটুকে, বর্ণনা করা যায় না এমন রং নিয়ে—ওপার থেকে এপার পর্য্যন্ত সিঁদুর ঢালা একটা হিলিবিলি কাটা পথ—যেন স্বর্গে যাবার ঢেউখেলান সিঁড়ি।

এমনি অদ্ভুত, এমনি ভাবার অতীত, এমনি আকাঙ্ক্ষার বস্তু—কিন্তু দূর থেকে উপভোগ্য, কাছে যাবার নামে ভয়!

কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে এদিকে—কাকদ্বীপ চলুন, কাকদ্বীপ চলুন, সকলে পীড়াপীড়ি করলেও খামখেয়ালী বাসের ওপর নির্ভর করে তা চলে না কিছুতেই, অতএব ফেরা।

শীতের সন্ধ্যা, দেখতে না দেখতে অন্ধকার কখন এসে যেন ঘিরে ফেলল মাঠ, পথ, চারিধার—শুধু দূরের গ্রামে গ্রামে একটা আধটা টিমটিমে আলো আর কাছে দূরে জোনাকীর মিটমিটানি ছাড়া অন্ধকার, সব অন্ধকার!

একটা বিরাট গাছতলায় এসে ঘ্যাঁ—চ করে থেমে পড়ল বাস। —তবু গাছতলায়!

তারপর আর চলে না—ড্রাইভার, মিস্ত্রী গলদঘর্ম, তবু চলে না—কিছুতেই না—এদিকে রাত ঘন হয়ে আসছে—এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা কেটে চলল, বাস চলে না।

লোকালয় অনেক দূরে—এখান থেকে হেঁটে আশ্রয় খোঁজাও পাগলামী। পাবলিক বাস যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তাইতে চড়ে বারুইপুরে যেতে পারা যাবে এখান থেকে ২১।২২ মাইল—তারপর বাস বদলে বেহালা, সেখান থেকে এসপ্লানেড, তারপর গন্তব্যস্থল। নানা ভজকট—আমাদের বাসে জিনিষপত্রও রয়েছে—তার ওপর এই তেপান্তরের মাঠে ড্রাইভার আর মিস্ত্রী বেচারীকে ফেলে যাওয়া সে ও যেন কেমন। তাই যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ করে বসে থাকতে থাকতে রাত সাড়ে ন'টা।

লাষ্ট পাবলিক বাসও চলে গেল বোধ হয়। বাড়ীতে কি ভাবনা সব ভাববে—আর রাতে যে আর ফেরা যাবে না, তাও স্থিরনিশ্চয়—তখন নাকে কান্না আরম্ভ হল প্রায় সবাইকার।

রাতে না ফিরলে কার বাড়ীর লোক যে কি করবে—ভাবনায় কার বাড়ীর লোক হার্টফেল পর্য্যন্ত করবে, তারও ফিরিস্তি শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা আর বলতে বলতে মুখ ব্যথা করতে লাগল।

দূরের টিমটিমে আলোগুলো সব নিবতে লাগল একে একে। অচিরেই হয়ত সবই নিববে শুধু করাল মুখ ব্যাদন ক'রে চু দিন থেকে এগিয়ে আসবে অন্ধকার আর শুধু অন্ধকার।

আশে-পাশে দু'-চার জন করে লোক জমেছে। কৌতূহলী হ'য়ে দেখছে, উঁকি-ঝুঁকি মারছে। গুন্ গুন্ করছে। একটা টর্চ্চের আলো ফেলতে ফেলতে মাঠ পেরিয়ে দুটো লোক এল, যমদূত।

যাদের গায়ে গয়না ছিল তাঁরা সব খুলে রুমালে বেঁধে বুকের মধ্যে রাখল। গয়না পরার সখ কেন হ'য়েছিল এই ধিক্কার দিতে দিতে।

কি করা যায়? কোথায় যাওয়া যায়?

রাণুদি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকদেরই অনেক ইতস্ততঃ করে (সম্বোধনটা কি করবেন অনেক ভেবে ভেবে ঠিক করে ইলিশ মাছের নৌকোর মাঝিদের· যা ব'লে সম্বোধন করা হয়, রাণুদি বেছে নিলেন সেই সম্বোধনই) কত্তা ও কত্তা, এখানে বাবুদের বাড়ী আছে? (ভেবেছিলেন রাণুদি যখন কোন উপায়ই হবে না তখন অন্ততঃ কোন ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে রাতটুকুর মত আশ্রয় নেবেন)।

না।

কত দূরে আছে?

এখান থেকে দু কোশ, আড়াই কোশ।

দমে গেলেন রাণুদি,' জিজ্ঞাসা করলেন আবার।

কাছাকাছি গ্রামের নাম কি?

মোল্লার ঠেস।

রাণুদি, চুপ। অন্য সকলের অভিযোগ প্রবল হ'য়ে উঠেছে এবার। কেন পাবলিক বাস ধরা হোল না আগে।

হায় রে! খারাপই যদি হ'ল বাস সেই আদর্শ হিন্দু হোটেলের কাছেই কেন হ'ল না বীণাদি'র সেই কাত্ ।/০ আর চিৎ ৵৹ দিয়েও না হয় কোন বালিশে মাথা গোঁজা যেত। অথবা সেই অতিথিবৎসল গিন্নীর বাড়ীর সামনেই বা কেন হল না—এই খপ্পরে পড়ার থেকে যে বাঁশের পুল পেরোন ঢের ভাল ছিল।

হায় হায় করতে করতে বাজল' সাড়ে দশটা। বাইরের অন্ধকার আর কৌতূহলী সেই কত্তাদের কেন্দ্র ক'রে কত উদ্ভট ভয়ংকর কল্পনা যে পাগল ক'রে দিতে লাগল মনকে!

আর আশা নেই—কিচ্ছু নেই—বড় করে নিঃশ্বাস পড়ল বুক থেকে রাণুদির।

কিন্তু হয়ত সকলের মনের আকুল প্রার্থনায়ই একখানা বাস আসতে দেখা গেল—গ্যারেজে ফিরছে।

রোঁধে, রোঁধে, রোঁধে—সকলে ছিটকে পড়ে বাস থেকে দাঁড়ান হ'ল রাস্তায়—যদি না থামে! যদি না থামে!

ড্রাইভার হকচকিয়েই থামাল নিশ্চয়—ডাকাত পড়ল নাকি! আমাদের জিনিষপত্রের কথা মিস্ত্রী আর ড্রাইভারকে ঝড়ের বেগে বুঝিয়ে দিয়ে দয়ামায়া আর না ক'রে ডাবল ফেয়ার সিঙ্গল জার্নি ক'রে বারুইপুর।

সেখানেও সার্ভিস বন্ধ হ'য়ে গেছে—তবে ঐ ভাগ্যিস গ্যারেজে ফেরার নিয়মটা আছে—তাই যাত্রা বেহালা—আবার সেখান থেকে এসপ্লানেড—কিন্তু তারপর? বাড়ী ফেরবার লাষ্ট ট্রেণও তো হাওড়া ছেড়ে ব্যাণ্ডেল পৌঁছে বাসি হ'য়ে গেছে! একলা দোকলা হ'লে না হয় আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ওঠা যায়, এত রাত্তিরে অশোভন

দিলওয়ারা মূর্তি

—অসিত রায়
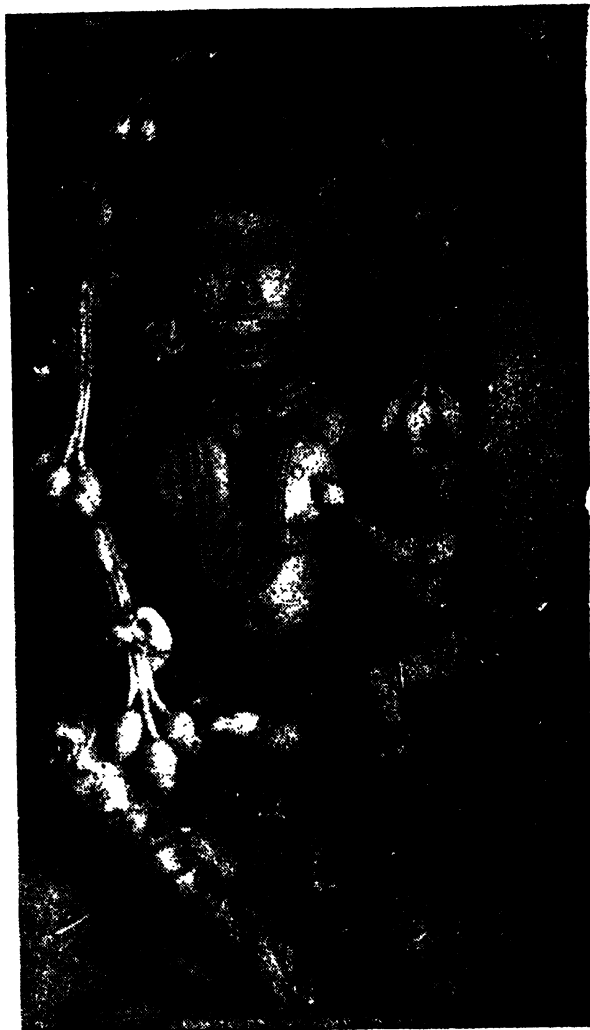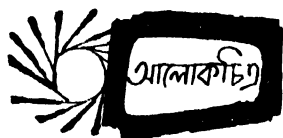
ফতেসাগর লেক (রাজস্থান)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

—রতন দাশগুপ্ত

অবতরণ
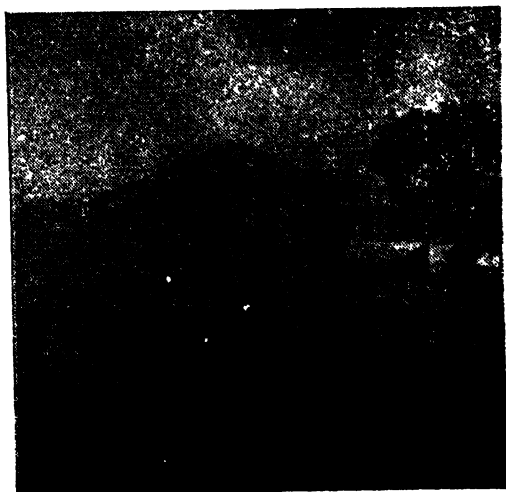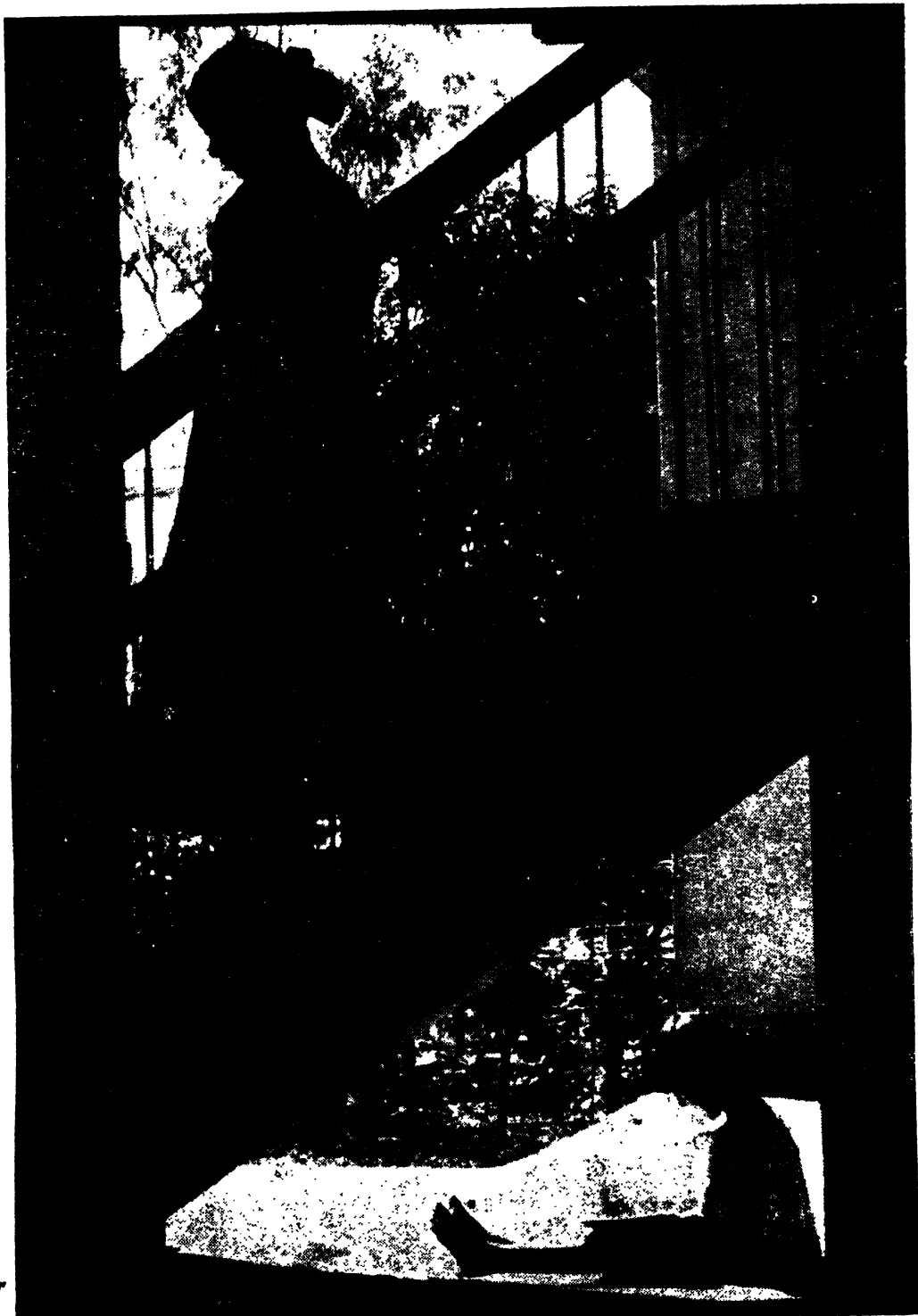
সাজসজ্জা

—নীরেণ অধিকারী

খসরুবাগ (এলাহাবাদ)

—কমলেশ দ

ভিক্টোরিয়া

—অমিতকুমার সরকার

খাদ্যের লোভে

—বন্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

হ'লেও। কিন্তু এই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। যতই বলা হোক খাব না, শোব না—শুধু তোমাদের বাইরের ঘরটাতেই বসে বসে রাতটুকু পুইয়ে নেব—তারা কি তা শুনবে?—কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে যত রাত্তিরই হোক খাবার হয়ত মিলবে কিন্তু শোওয়া? এই প্রচণ্ড শীতের রাত্তিরে? একটা মাত্র লোক এলেই বা শুতে দেবার বাড়তি বিছানা থাকে ক'টা বাড়ীতে? কিন্তু এসপ্লানেডে এক দঙ্গল মহিলা দাঁড়িয়ে থাকা তো যায় না। প্রথমে ঠিক হ'ল হাওড়া ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে দেওয়া হবে রাত—কিন্তু বড় দৃষ্টিকটু লাগে সেটা—

রাণুদি' বললেন। চলুন বউবাজারে আমাদের ব্যাঙ্কে—সেখানে বসে বসেই না হয় কাটিয়ে দেব রাতটা। তবু একটা আশ্রয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের দারোয়ান তো চেনে না আমাদের। খুলবে কেন গেট অত রাত্তিরে? কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে।

তবু চেষ্টা—আর সাড়ে বারটা তো বেজে গেছে, আর রাত কতটুকুই বা—না যদি গেট খোলে দারোয়ান তখন দেখা যাবে, বলে আবার পাড়ি সেই বউবাজারে।

যা ভাবা গেছে তাই···নেপালী দারোয়ান হতভম্ব—তালাবদ্ধ গেটের ওপার থেকে সে কোন কথায় কান দেবে না।

রাণুদি তখন ম্যানেজারকে ফোন করে অনুমতি নিতে বললেন দারোয়ানকে। সে রাজী হয়ে ভেতরে গেল।

ভাগ্যক্রমে বাঁশরী বলে একজন কর্মচারী কার্য্যগতিকে সেদিন বাড়ী যেতে না পেয়ে তেতলায় শুয়েছিলেন। দারোয়ান বুদ্ধি করে নিয়ে এল তাঁকে। সব শুনে গেট খোলালেন তিনি।

ব্যাঙ্কের পথের ওপরের বড় হল ঘরটা হ'ল ফার্নিচারের শো-রুম।

রাতের মত ওখানেই থাকতে হবে। কারোরই আর দাঁড়াবার মত ক্ষমতা ছিল না—দারোয়ানের খাটিয়ায়, টুলে, সিঁড়িতে যে যেখানে পেয়েছে বসে পড়েছে ইতিমধ্যে।

শো-রুমের ভেতরে আবার একজন দরজা বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে—কুম্ভকর্ণ। দরজা ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে যাবার যোগাড় বাঁশরীর আর দারোয়ানের।

অনন্তকাল পরে জাগলেন অবশেষে মুচুকুন্দ।

তখন আর কথাবার্ত্তা নয়—সেই সযত্নসজ্জিত চক্‌চকে নয়ন-বিমুগ্ধকর বহু মূল্যবান সোফায় আর গদী পাতা খাটে ওঠা বিনা বাক্যব্যয়ে।

বাঁশরীর আতিথেয়তার তুলনা হয় না অত রাত্রেও। চা-খাবারের ব্যবস্থা করলেন সঙ্গে সঙ্গে চেনা দোকানের দোকানদারকে জাগিয়ে।

তারপর বাকী রাত। শো-রুমের নিশ্চল আসবাবগুলোর ওপর সচল সচল মডেল হয়ে। কাচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিশাচর দু-চার জন—পুলিশ ও—হয়ত বিস্ময়ে দেখছিল দাঁড়িয়ে। দুচোখের পাতা একও করিনি আমরা। এই অভিনব অভিজ্ঞতা, অভাবনীয় ভাবে রাত্রি যাপন—বাড়ীর সকলের দুশ্চিন্তার কথা ভেবে তা সম্ভব ছিল না।

রাণুদি' একেবারে সামনেরই সোফাটাতে শুয়েছিলেন—রাস্তার ওপারে এক অতিপরিচিতা ফিল্মষ্টারের বিরাটকায় ছবি আলোর নিচেই। ভাবছিলেন যার ছবি সে কি স্বপ্নেও ভাবছে তার ছবির দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে রাত কাটাচ্ছে কেউ! রাণুদি' তাকিয়েছিলেন বটে কিন্তু ভাবছিলেন অনেক কথা। ভাবছিলেন উচ্চশিক্ষিতা, অতি আধুনিকা, রোজগেরে হলেও মেয়েরা মেয়েই, বেপরোয়া হওয়ার উপায় নেই, হওয়া যায় না—নানা জুজুর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় সর্ব্বদা, বাড়ীতে বকুনি খাওয়ার ভয়েই তো কাঠ হয়ে রয়েছে ক'জন!

সবাই চুপচাপ। মাঝে মাঝে একজন হয়ত বলছে—কি ঘুমোতে পারে বাবা সব, এর মধ্যেও ঘুমুচ্ছে? তখন সবাইকার একসঙ্গে সারা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, এ অবস্থায় ঘুমুচ্ছে এ অপবাদ সহ্য করতে সকলেই নারাজ। অমনি আবার এর ওর নাম ধরে ডাকাডাকি হাসি, খানিকটা গল্প একটু; আর রাণুদি'কে ক্ষেপানো ও কর্ত্তা ও কর্ত্তা, বাবুদের বাড়ী আছে এখানে? এ গ্রামের নাম কি কর্ত্তা? মোল্লার চেঁক। মোল্লার চেঁক—হাসি আর হাসি এখন।

ভোর চারটেয় আবার বাঁশরী। পত্রপাঠ হ্যারিসন রোডে গিয়ে ট্রাম ধরে হাওড়া ষ্টেশন।

তারপর সারা ট্রেণ কার কি মনে হচ্ছিল তার ইতিহাস আর কার বাড়ী গিয়ে কি হবে, তারই ভাবনা আর ভয়।

কবিবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন রাণুদি'কে—কাকদ্বীপে কি দেখলেন? কাক? না দ্বীপ?

দুই-ই উত্তর দিলেন রাণুদি'।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ মাংস খুবলানোর আশঙ্কা আর অথৈ সমুদ্রে একটু দ্বীপ।

ভুল

কাজলী চট্টোপাধ্যায়

হয়তো ভুল করেছি আমি,
হয়তো একই ভুল তুমিও করেছ।
সেই ভুল যদি সত্যই ভুল হয়
তা'হলে, রবি শশী তারা ভুল।
ভুল 'বউ কথা কও' পাখির গান,
সাগরের প্রতি তটিনীর অনুরাগও
ভুল, আর তুমি আমি, এ জীবন-যৌবন সবই ভুল।

কিন্তু ভুল নয় হৃদয়ের সুতীব্র আবেগ
চোখের কোণে ভীরু স্বপ্নের এলোমেলো মেঘ।
ভুল নয়, বিদ্যুতের চঞ্চল প্রেক্ষণা,
হরিণীর কালো চোখে মৃত্যুহীন জন্মের উৎসব
বিনিদ্র বসন্ত রজনীতে।
ওগো ভুল নয়,—
এই জীবন-যৌবন ভুল নয়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

এগারো

ফুলতলায় গাঙের উপর হোটেল। টাপুরেঘাটা অল্পদূর সেখান থেকে। জগা বলাই ও হর ঘড়ুই এইখানে উঠেছে। রেটটা কিছু বেশি এই হোটেলে, জনপ্রতি এক সিকি এক এক বেলায়। তবে পেট চুক্তি। এবং তামাক ও মাখবার তেল ফ্রী। কোন খদ্দের রাত্রে থাকতে চাইলে একটা মাদুরও দেবে, সে বাবদ কিছু লাগবে না।

রেটের কথা শুনে হর ঘড়ুই আগু-পিছু করছিল। বলাই হাত ধরে টানে: এসো দিকি। মা বনবিবির আশীর্বাদ থাকে তো তিন জনের তিন সিকি নিয়েও ওদের জিনে যেতে দেবো না। তিনটে পাতা করতে বলো ঠাকুর মশায়। দেখা যাক।

বামুন ঠাকুর মালিকের কাছে এই তদ্বির ব্যাপার বলে থাকবে কিছু। এর পরে দেখা গেল, খাওয়ার সময়টা খুদ তিনি সামনের উপর দাঁড়িয়ে। বলাইর আরও রোখ চড়ে যায়। ভাত দিয়ে ঠাকুর ডাল আনতে গেছে, ইতিমধ্যে মুণ সহযোগে সমস্তগুলো ভাত সাপটে দিয়ে সে বসে আছে। বাটিতে ডাল ঢেলে দিয়ে আবার ভাত আনতে গেছে, বাটির ডাল চোঁও করে এক চুমুকে মেরে দিল। এক খদ্দের নিয়েই নাস্তানাবুদ বামুন ঠাকুর। মালিক রাগে গরগর করছে। বলে: খাড়ি-মুসুরি দশ পয়সা সের হয়ে গেছে। আর ডাল পাবে না বাপু!

হর বলে, কোন হোটেলে তো এ নিয়ম নয়। ভাত আর ডাল নিয়ে কেউ কষাকষি করে না। খদ্দের সব ভেগে যাবে এমনধারা করলে।

হোটেলওয়ালা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, তাদের ডালে মাল থাকে কতটুকু? বড় জোর মালসাখানেক ডাল রাঁধে; আর বড় গামলায় ফ্যানে-জলে গুলে রেখে দেয়। গামলার ফ্যানে হাতা কয়েক ডাল ঢেলে আচ্ছা করে ঘুঁটে দেয়। ব্যস, হয়ে গেল। তারা কি জন্য দেবে না, অমন ডালে খরচাটা কি?

বলাই তাড়াতাড়ি বলে, যাকগে, ডাল কে চায়! ভাত হবে তো? আর মুণ? মুণ না হলেও চলবে, শুধু ভাতই সই।

মুণ-ভাতই চলল। হোটেলওয়ালা চমৎকৃত হয়ে দেখছে। জগার আনন্দ ধরে না। হাঁ, বাহাদুর বলি বলাইকে। স্বষ্টিছাড়া রেট সত্ত্বেও লোকটার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। হাসি চেপে জগা জিজ্ঞাসা করে, অমন এক নজরে কি দেখেন মশাই?

লোকটা বলে, চোখে তো ওর বাইরেটা দেখছি। টিপে দেখতে ইচ্ছে করছে, চামড়ার নিচে বোধ হয় এক কুচি হাড়মাস নেই—শুধুই খোল। তুলো ভরার আগে পাশবালিশের খোলের মতন।

সেই পয়লা দিনের পর থেকে হোটেলওয়ালা লোকটা আর অমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ঘোরাফেরার মধ্যে এক একবার উঁকি দিয়ে যায়। চোখ মেলে ব্যবসার ডাহা সর্বনাশ দেখতে ভয় করে বোধ হয়।

খাওয়ার পরে পয়সা মিটিয়ে নেয়, এবং পানের খিলি দেয় খদ্দেরদের। সেই সময় জিজ্ঞাসা করে, ক'দিন আছ আর তোমরা?

জগা ভালমানুষের মতো বলে, কাজ মিটলে তবে তো যাওয়ার কথা! পনের-বিশ দিন লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। ভয় নেই, যে ক'দিন আছি, তোমার হোটেল ছেড়ে অন্য কোনখানে নড়ছি নে।

আমি তো মুণ-ভাত খাওয়াচ্ছি, অন্য সব হোটেলে দেদার ডাল দেয়, তবু যাবে না? ঐ রসময় চক্কোত্তির ওখানে যাও। বড় বড় মাছের দাগা—

জগা বলে, উঁহু, তুমি যে মানুষ ভাল। তোমার ঘরের দাওয়াটা আরও ভাল। ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। শুয়ে সুখ আছে।

সেই রাত্রে শুতে গিয়ে মাদুর খুঁজে পায় না। গেল কোথা?

হোটেলওয়ালা বলে, দেখ কোন দিকে পড়ে আছে। বাতাসে হয় তো বা গাঙের কোলে নিয়ে ফেলেছে। কি করব, বাড়তি মাদুর মানুষে ক'টা রাখতে পারে বলো?

হর ঘড়ুই তখন বলে, ধুলোর উপর শুইয়ো না দাদা। বের করো মাদুর। আজকেই শেষ। সকালবেলা আমরা চলে যাচ্ছি।

ঠিক? তুমি মুরুব্বি মানুষ—কথা দিচ্ছ কিন্তু। ছোঁড়াগুলো কখন কি বলে, ওরা বললে বিশ্বাস করতাম না।

হ্যাঁ, বলছি আমি। নিশ্চিন্ত হয়ে মাদুর বের করো দাদা! ঢোলক আজ বিকেলেই পাবার কথা। হয়ে উঠল না। ছাউনির কাজ রাতের মধ্যে শেষ করে রাখবে, ভোরবেলা দিয়ে দেবে।

হোটেলওয়ালা বলে, পুরানো লোক তুমি, অনেক দিনের

ভালবাসাবাসি। এ-রকম খদ্দের হোটেলে কোন আক্কেলে এনে তুললে বলো তো?

খাইয়ে দেখেছি নাকি? হেসে উঠে হর ঘড়ুই বলল, আচ্ছা, এবারে কাউকে যখন সঙ্গে আনব, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে পরখ করব আগেভাগে।

বড্ড হাওয়া হোটেলের পিছন দিককার দাওয়ায়। মাদুরের উপর পড়ে আছে তাই, নয়তো মাদুর সত্যি সত্যি উড়িয়ে নিয়ে ফেলত। ক'টা রাত পাশাপাশি ঝাটিয়ে গেল তিন জনে। জগা-বলাই অসাড় হয়ে ঘুমোয়। ঘড়ুইয়ের মগজের ভিতর নানান মতলব—এক এক সময় অধীর হয়ে ওঠে, চুপচাপ থাকতে পারে না, ঘুমন্ত জগা-বলাইর গা ঝাঁকিয়ে তাদের কাছে অতীত আর ভবিষ্যতের কথা শোনায়। বন কেটে বসতির শুরু—এই তো ক'বছরের কথা। কী হয়ে গেল তারপর দেখতে দেখতে! আরও হবে, শহর কলকাতা জমে উঠবে দেখো বাদা অঞ্চলের মধ্যে।

সকালবেলা উঠে জগন্নাথ ছুটল ঢোলের দোকানে। পয়সা চুকিয়ে দিয়ে জিনিষটা শুধু নিয়ে আসা। বলে, তোমরা ঘাটে চলে যাও। যদি একটু দেরি হয়ে যায় টাপুরে-মাঝিকে বলে কয়ে রাখবি বলাই। নৌকো ছেড়ে না দেয়।

ঘাটে গিয়ে বসেছে বলাই। আছে বসে তো আছেই। এই আসছি বলে হর ঘড়ুই পথের পাশে এক দোকানে ঢুকে পড়ল। পাটি-মাদুরের দোকান। জগারও দেখা নেই। নতুন ছাউনির পর ঢোলক কি রকমটা দাঁড়াল, পরখ করতে গিয়ে হয়তো সে দোকানেই বোল তুলতে বসে গেছে। কিছু বিচিত্র নয়। কেউ যদি দু-চার বার বাহবা দেয়, বাস, হয়ে গেল আজকের মতন টাপুরে ধরা। দোকানের উপরেই গান-বাজনার আসর। জগাকে বিশ্বাস নেই, জগা সব পারে।

ঘাটের উপরে এক দোকান। ভাল দোকান—বিড়ি খিলি-পান বাতাসা মুড়ির-মোয়া সমস্ত মেলে! দোকান চালাঘরে—কিন্তু ভিটে মাটির উপরে নয়। খানিকটা উঁচুতে বাঁশ ও গরানের ছিটের মাচা; মাচার উপরে মালপত্র ও দোকানদার; উপরে খড়ের চাল। কোটালের সময় গাঙের জল বেড়ে মাচার নিচে ছলছল করে। দোকানের সামনে খুঁটি পুঁতে চেরা-বাঁশের বেঞ্চি মতো করে রেখেছে, জন পাঁচ-ছয় বসে আছে বেঞ্চিতে—বিড়ি খাচ্ছে, পান খাচ্ছে। টাপুরে-নৌকোর চড়ন্দার এরা সব এবং বলাইও বসেছে এই জায়গায়। নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। উঠে পড়েছে বেশির ভাগ। এদেরও ডাকছে। বলাই একনজরে চেয়ে পথের দিকে। সোজা পথ—বাঁকচুর নেই। উদ্বেগের বশে এগিয়েও দেখে এসেছে বারকয়েক।

টাপুরে-নৌকোর ভাড়া: দরদাম করতে হয় না। একেবারে বয়ারখোলা অবধি যাবে তো চার আনা। তবে ঠিক অর্ধেক পথ কুমিরমারি কিন্তু দশ পয়সা। তেলিগাতি এক আনা, গরলগাছি তিন আনা। গলুয়ে দাঁড়িয়ে এক জনে হাঁক পাড়ছে: বয়ারখোলা কুমিরমারি গরলগাছি ছাড়ে নৌকো, ছাড়ে-এ-এ-এ—

এবং ছেড়েও দিল টাপুরে। কাছি খুলে হাল-দাঁড় বেয়ে চলে গেল মাঝ-গাঙ অবধি। বেঞ্চির উপরের চড়ন্দারেরা নড়ে না—গুলতানি করছে, নতুন করে বিড়ি ধরাচ্ছে আবার। হাঁ, আসছে এইবার—বলাই ঠাহর করে দেখে, মানুষটা জগন্নাথ না হয়ে যায় না। আসছে বাতাসের বেগে, দৌড়ানো বলা চলে। কাছাকাছি এলে দেখা যায়, ঢোলক বলছে পিঠের দিকে—ঢোলকের আংটার মধ্যে চাদর গলিয়ে পৈতের মতন কাঁধের উপর আর বগলের তলা দিয়ে নিয়ে গেছে।

ছেড়ে গেল নাকি রে?

বলাই বলে, নতুন বউ হয়ে পালকি থেকে নামলে দেখছি! যা বললে, আর বোলো না। লোকে হেসে খুন হবে।

বেকুব হয়ে গিয়ে জগাও হাসতে লাগল। তা বটে, পুরানো কায়দা টাপুরেওয়ালাদের। ছাড়ছি বলে মুখে মুখে চেঁচালে চড়ন্দারে গা করে না। ঘাট থেকে সত্যি সত্যি ছেড়ে খানিকটা আগু-পিছু করতে হয়। তখনও এমন কিছু চাড় নেই, সে তো এই বুঝতে পারছ নৌকার লোকগুলোর ধরণ দেখে।

গাঙের দিকে তাকিয়ে জগা অবাক হল: এক-পো ভাঁটি নেমে গেল, এখনো চড়ন্দার ডাকে! বয়ারখোলা আজ পৌঁছতে হবে না, গরলগাছি কি কুমিরমারি অবধি বড় জোর। আর দেরি কিসের মাঝি? ছাড় এবারে।

ছইয়ের ভিতরের লোকগুলো কলরব করে ওঠে। মনের মতো কথা পেয়েছে। ঠিক কথা, সত্যি কথা, ছাড়ো এখুনি। কেউ বাকি থাকে তো সে লোক কালকে যাবে। দু-এক জনের জন্যে এত মানুষ কষ্ট পাবে, সেটা হতে পারে না।

মাঝি চেনে জগাকে। এ অঞ্চলের গাঙে খালে যাদের গতায়াত, জগাকে চিনবে না এমন কে আছে? চড়ন্দারে চেঁচামেচি করছে, ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল—অন্য কেউ নয়, জগা এসে আবার ফোড়ন দিচ্ছে তার ভিতরে। রাগ করে বলে, দেরি তো তোমাদের জন্যে জগা। তুমি এসে গেলে, তোমাদের হর-ব্যাপারির এখনো পাত্তা নেই। যাবে ফেলে তাকে? তাই চলো। ধ্বজি তুলে ফেল ওরে ছোঁড়া। দাঁড়ে চলে যা।

জগা বলাইকে বলে, ঘড়ুইটা কোথা পড়ে রইল? আমি ভাবছি, ব্যস্তবাগীশ মানুষ—নৌকোর মধ্যে আগেভাগে গিয়ে বসে আছে।

বলাই বলে, আসছিলাম দুজনে। মাদুরের দোকান দেখে ঘড়ুই ঢুকে পড়ল। বলে, এগুতে লাগ, একটা শীতলপাটি নিয়ে যাচ্ছি।

পায়ে পায়ে তারা নদীর খোলে গিয়ে দাঁড়াল। জগা বলে, ছেড়ে দাও মাঝি, আর কাজ নেই। শীতলপাটি কিনতে গেছে—দোকানসুদ্ধ সওদা করে আনতেও তো এতক্ষণ লাগে না।

এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। নৌকো ছাড়বার মুখে এ ধরনের কথাবার্তা হামেশাই হয়ে থাকে। শেষ মুখটায় ধ্বজি পুঁতে নৌকোর কাছি তার সঙ্গে জড়িয়ে রাখে। রাগের বশে ধ্বজি একবার বা তুলেই ফেলল, পরক্ষণেই আবার পুঁতে দেয়। এক চড়ন্দারের ভাড়া চার-চার আনার পয়সা ছেড়ে যাওয়া সহজ কথা নয়।

এমন সময় দেখা গেল, হর ঘড়ুই বিড়ির দোকানের ধারে এসে গেছে। হাত উঁচু করেছে সেখান থেকে।

মাঝি হাঁক দিচ্ছে: চলে এসো, চলে এসো—

জগা তেড়ে ওঠে: কোথা ছিলে এতক্ষণ শুনি?

হর হাঁপাচ্ছে। কাঁধের শীতলপাটি দেখিয়ে বলে, সওদা,

করলাম। আগে মনে ছিল না, দোকানের সামনে এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

জগা বলে, ওরে আমার লাটসাহেব! বড্ড পয়সা হয়েছে। নাত্তির অন্নপ্রাশন দিয়ে উঠলে সেদিন, তার উপরে আবার এখন শীতলপাটি!

ও:দের মধ্যে চলিত বিশেষণের দুটো-একটা প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল। বলাই ত্বরিতে জগার মুখে হাত চাপা দেয়: চুপ, চাষামি করবে না এখন। মুখ দিয়ে ভাল কথাবার্তা বলো।

নৌকোর গলুয়ের একজন ভিতরের দিকে ইঙ্গিত করে চাপা গলায় বলে, ভাল লোকেরা আছেন, চুপ চুপ—

কাদা ভেঙে বাকী ক-জনে এবার উঠে পড়ল। বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। নৌকো বেশি জলের দিকে গেলে কাদা ছাড়িয়ে তবে পা তুলে নেবে। জন কুড়িক চড়ন্দার আগেভাগে চড়ে বসে আছে। একটা ছইয়ের নিচে অতগুলো মানুষ—সোরগোলে গাঙে তো তুফান উঠবার কথা। কিন্তু কী তাজ্জব, ধ্যানে বসে আছে সকলে যেন। অথবা মানুষগুলোকে কেউ বুঝি খুন করে নৌকোর উপর ফেলে দিয়েছে। জ্যান্ত মানুষ—বিশেষ করে জোয়ানযুবা যেগুলো আছে, এমনধারা চুপচাপ থাকে কেমন করে? তামাক খাচ্ছে, তা-ও অতি সাবধানে। হুঁকো টানার ফড়ফড় আওয়াজ যেন অতিশয় লজ্জার ব্যাপার।

ভাল করে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা মালুম হল জগার। কাড়ালে দুটো মেয়েমানুষ। দুটো মাত্র মুশলের ভয়ে বাঘের দোসর এতগুলো মরদ ঠাণ্ডা। দুই বা বলি কেন—একজনে ঘোমটা টেনে জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বিনোদিনী—বিনি বউ—গগন দাসের পরিবার বিনি বউ কিছু নয়—মুশল হল অপরটি, চারু। কী সুন্দর গোলগাল পরিপুষ্ট হয়েছে! কাপড়-চোপড়েও দিব্যি বাহার। জোয়ান পুরুষদের সামনে কমবয়সি মেয়ের লজ্জা করা তো উচিত, তা সে-ই তো দেখি নাটার মতন বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে এক নৌকো মানুষ জব্দ রেখেছে। টাপুরে-নৌকোর মেয়েমানুষ চড়ন্দারও যায়। কেনাবেচা করতে যায় ফুলতলায়, আবার তল্লাটের বউ-ঝিরা বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করে। দরগা ও ঠাকরুনতলায় পুণ্য কর্তে চলেছে, এমনও আছে। এরা সে দলের নয়—চেহারা এলাকপোশাক ও চালচলনে বোঝা যাচ্ছে আবাদ এলাকারই নয় এরা। উত্তরের ভদ্র অঞ্চল থেকে আসছে। আদম পুরুষেরাই—যার নেই মূলধন সেই আসে বাদাবন। শূন্য হাতে এসে আস্তে আস্তে জমিয়ে নেয়। কাঙালি চৌধুরি যেমন একদিন বনকরের বাবুদের চক্রোত্তি-রাঁধুনি হয়ে এসেছিল। আশায় আশায় এসেছে যেমন ঐ গগন, এবং গোপাল ভরদ্বাজও বটে। পুরুষেরা আসে, কিন্তু বাইরের ভদ্র অঞ্চলের মেয়েলোক এই প্রথম বোধ হয়। তাই দেখে তাদের সামনে বাদার জোয়ানপুরুষেরা ভদ্র হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

বিরক্তি ভরে জগা ছঁইয়ের বাইরে বসে পড়ল। আকাশ মেঘে ভরা, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির জল ঝরঝর করে ভিজিয়ে দিয়ে গাঙের জলের উপর দিয়ে বনের মাথার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একবার এই হয়ে গেল, বাঁকটা না ঘুরতেই ফের সেই কাণ্ড। তা হোক, বৃষ্টিতে বারম্বার চান করবে তবু ছইয়ের ভিতরের ঐ ভেড়ার পালের মধ্যে নয়।

চলেছে, টাপুরে-নৌকো চলেছে। ছপ-ছপ দাঁড় পড়ে একটানা, মচমচ আওয়াজ ওঠে দাঁড়ের বাঁশ-দড়িতে। অতল নিঃশব্দতার মধ্যে ঐ যা এক ধরনের আওয়াজ। জগা আর পারে না, ক্ষেপে গিয়ে বলে ওঠে, বাক্যি সব হরে গেল—তোমাদের হল কি আজকে মাঝি? ভূত দেখেছ না বেলে-সিঁদুর খাইয়ে দিয়েছে কেউ? (বেলে-সিঁদুর সঠিক জানিনে, খেলে নাকি মানুষের বাকশক্তি উপে যায় একেবারে)

মাঝি বলে, বকবক করে হবে কি? গরানগাছির খাল নিয়ে ভাবনা, শেষ-ভাটায় একেবারে জল থাকছে না। কোমর ভর কাদা।

দাঁড়িদের স্ফূর্তি দিচ্ছে: সাবাস ভাই। জোর জোর এমনি মেরে দিয়ে ওঠ। কুমিরমারিতে জোয়ার করে দাও। নয়তো সারা রাতের ভোগান্তি।

আবার চুপচাপ। জগা তখন হর ষড়ুইকে নিয়ে পড়েছে: তোমার জন্যে দেরি। মাছের পয়সার বড্ড গরম—উঁ, শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না?

হর গলা বাড়িয়ে জবাব দেয়, পাটি আমার নয়। বড়দার।

জগা বলে, বটে! আমাদের কিছু বলে না, চুপি চুপি তোমার কাছে ফরমাস করল।

হুড়োহুড়ির মানুষ তোমরা। ঠাণ্ডা মাথায় দেখেশুনে বাছগোছ করে কেনা পোষায় তোমাদের? ধরো, এই একখানা পাটি পছন্দ করতে বিশখানা অন্তত পেড়ে ফেললাম। শলা সরু-মোটা হালকা-ভারী আছে, বুনুনি ঘন-পাতলা আছে, অনেক কিছু দেখে নিতে হয়। হুঁ-হুঁ, সোজা নয়।

বলাই বলে, ওসব কিছু নয়। বড়দার লজ্জা করেছে আমাদের বলতে। ঘড়ি ঘড়ি খালে নেমে ডুব দেয়, গরম কি রকম বুঝতে পারো না? জল লোনা হোক যাই হোক পানকৌড়ির মতো ডুবুতেই হবে।

জগা বলে, আর সেই মানুষ, এদিকে দেখলি তো, বাড়ির চিঠি না খুলে উনুনে দেয়। খুলে পড়লে মন পাছে নরম হয়ে গিয়ে কিছু পাঠাতে ইচ্ছে করে। বড়দা বলে মস্ত কবি—কিন্তু এক এক সময় চামার বলতে ইচ্ছে করে।

হর ষড়ুই তাড়াতাড়ি চাপা দেয়: থাক থাক। ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যাচ্ছে, অকথা-কুকথা মুখের আগায় আনবে না।

ভাল রে ভাল! মুখ খুললেই ত্রস্ত হয়ে ওঠে অন্য সকলে। কোন বেখাপ্পা কথা কখন বেরিয়ে পড়ে!

দীর্ঘক্ষণের এত রাস্তা তবে কি বোবা হয়ে কাটাতে হবে? জগা তা পেরে উঠবে না, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যা-ই বলুক। তখন দাঁড়িদের বলে, হাতে মুখে চালাও ভাই সব! দাঁড় মারো, গীত ধরো ঐ সঙ্গে একখানা—

চাপা গলায় হর ধমক দিয়ে ওঠে: থামো। ওঁরা সব যাচ্ছেন, গীত আবার কি জন্য এর মধ্যে?

বাঃ রে, ওঁরা যাচ্ছেন বলে মুখে তালাচাবি এঁটে থাকতে হবে? আমার দ্বারা পোষাবে না। তোমাদের সরম লাগে তো আমিই ধরছি গান—

দাঁড়িদের উদ্দেশ করে আবার বলে, গান গাইবে না তো

পিয়ার্স
...সুন্দরী
নারীদের
ঐতিহ্য
PEARS
TALCUM
PEARS
TRANSPARENT
SOAP
"পিয়ার্স" নামটী সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়ার্সে
তাদের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়ার্স সাবানের সাহায্যে
তাঁদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়ার্স আসল
গ্লিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিশুদ্ধ এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম পিয়ার্স ট্যালকম্
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিশুদ্ধতা।
আপনার সৌন্দর্য্য
চর্চ্চায় নিয়মিত
পিয়ার্স ব্যবহার করুন
PSTP. 3-X52 BG
এ অ্যাণ্ড এফ পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্ত্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

দোয়ারকি করো আমার সঙ্গে। ফাঁকা গাঙের উপর একলা গলায় জুত হবে না।

ঘাড় কাত করে গালে বাঁ-হাত চেপে ধরে আঁ-আঁ-আঁ করে জগা তান ধরল।

বলাই কনুই দিয়ে গুঁতো দেয়: আঃ, কি হচ্ছে?

ফিক্ করে হেসে ফেলে জগা বলে, শুনতে পাচ্ছিস না? গান—

গান নয়, কানের ফুটোয় মুগুর মারা। কি ভাবছে বলো দিকিনি মেয়েছেলে। ষাঁড়ের মতন না চেঁচিয়ে গানই ধরো তবে সত্যি সত্যি।

জগা বলে, গানের তুই কি জানিস রে? গান হলেই বুঝি নাকি-কান্না! নানান সুরের গান আছে। আজকে এই চেঁচানো গানে আমার মন নিচ্ছে।

আরম্ভ করে দিল মার-মার কাট-কাট রবে, কানে তালা ধরিয়ে দেবার মতলব। কিন্তু কিছু দখল আছে বিত্তাটায়—সুরটা এক সময় মোলায়েম হয়ে উঠেছে, তাল-মাত্রাও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে গানের ভিতরে। প্রতিহিংসার ভাব তেমন আর উগ্র নয়। আবেশে এমন কি চোখও বুঁজে গিয়েছে, হাতের চেটোয় থাবা দিচ্ছে নৌকোর উপরে। ছইয়ের বেড়ার গায়ে ঢোলক, বলাই পা ঘষে ঘষে গিয়ে পেড়ে আনবার তালে আছে সেটা।

খসখসানি আওয়াজ পেয়ে জগা চোখ মেলল। চারু ছইয়ের বাইরে চলে এসেছে। এসেছে সামনের উপর। স্বহস্তে শাসন করতে এলো নাকি? অন্তের কথার হল না তো ঐ পরিপুষ্ট হাতে জোর করে তার মুখ চেপে ধরে গান থামিয়ে দেবে?

গান আপনা-আপনি থেমে গেছে ততক্ষণে। তাজ্জব কাণ্ড! জগন্নাথ বিশ্বাসের সঙ্গে লাগতে এসেছে—যত বলবানই হোক—বেটাছেলে নয়, মেয়ে একটা। পরক্ষণে আচ্ছন্ন ভাবটা ঝেড়ে ফেলে শুরু করবে আবার প্রবল কণ্ঠে—আগেভাগে মেয়েটাই বলে ওঠে, খাসা হচ্ছিল—থামলেন কেন?

আরো আশ্চর্য, আপনি-আপনি করে কথা! জগা যেন মান্যবান মানুষ, খাতির দেখিয়ে তেমনি ভাবে বকছে! এ তল্লাটে এ সব চলে না। হলে কি হবে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভদ্র অঞ্চল থেকে। উৎকট লাগে জগার। নীরস কণ্ঠে সে বলে, গানের এই খানটায় আমি থেমে যাই।

সে কি গো? মাঝখানে থেমে পড়লে ভাল লাগবে কেন?

আমার এই নিয়ম।

নগেনশশী নিয়ে চলেছে এদের। অথবা চারুই অপর ছুটিকে টেনে হিঁচড়ে বাদাবনে নিয়ে যাচ্ছে। নগেন ডাকে, চলে এসো চারু, ওদিকে কি? ওদের সঙ্গে কি বচসা লাগিয়েছ।

চারু কানেও নিল না। অভিমানে কণ্ঠ একটু বুঝি থমথমে হয়ে যায়! আমি না এলে ঠিক আপনি সারা করতেন। বেশ, যাচ্ছি আমি ভিতরে।

আমার গান সারা হয়ে গেছে।

চারু তর্ক করে, কক্ষণো হয়নি! যা-তা বোঝালেই হবে?

বিনোদিনী এবারে রাগ করে ওঠে। কি হচ্ছে চারু? চলে আসবি কিনা, তাই বল।

চারু বলে, একটা গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ থাকে বউদি, লোকে যা বলে ঠিক তার উল্টোটি করবে।

নৌকোসুদ্ধ মানুষ থ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কোথাকার মেয়ে এসে উঠেছে, একটুও সঙ্কোচ নেই জগা হেন পুরুষকেও মুখের উপর ট্যাক-ট্যাক করে শুনিয়ে দেয় বলে, বেশ, তবে আমি বলছি গান আর গাইবেন না আপনি ঐখানে শেষ।

গাবোই না তো!

এটা কি হল? একমত হয়ে গেলাম যে তবে! আমি এক কথা বলব, আর ঘাড় হেঁট করে তাই আপনি মেনে নেবেন?

জগন্নাথ বলে, আমার উল্টোপাল্টা রীত। লোকের কথা কখনো শুনি, কখনো শুনি নে। এবারটা শুনব।

বিনি বউ আবার ডাকে, ওরে চারু, চলে আয়—

যাচ্ছি বউদি! গানটা পুরো শুনে তবে যাবো।

কিন্তু গান আর হল না কিছুতে। চারুও নাছোড়বান্দা, গান না শুনে নড়বে না। শাড়ি সামলে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে গেল সামনে। বসেই রইল। থাকো বসে, বয়ে গেল। সারা বেলাভর বসে থাকো না, কি হয়েছে!

চারু রাগল অবশেষে: বড্ড যাচ্ছেতাই মানুষ আপনি না গাইলেন তো বয়ে গেল। মেঠো গান বই তো নয়। এর চেয়ে ভালো ভালো গান কত আমরা শুনেছি!

উঠে ফরফরিয়ে চলল। ছইয়ের নিচে গেল না আর, উঠল গিয়ে ছইয়ের ছাতে। উঠবার ধরনই বা কি, খুঁটিতে পা ঠেকিয়ে তড়াক করে উপরে উঠে পড়ল। কী গেছো মেয়ে রে বাবা! সার্কাস দেখিয়ে বেড়ায় নাকি? ছইয়ের উপরে উঠেই কিন্তু একেবারে চুপ—মন্ত্র পড়ে কে যেন পাষাণ করে দিয়েছে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। মাঠের দূরপ্রান্ত অবধি সবুজ রঙে ঢাকা এতটুকু ফাঁক নেই কোনখানে। উল্লসিত কণ্ঠে সহসা চারু কথা বলে ওঠে, জঙ্গল ঐ নাকি মাঝি? বাদাবন?

জগন্নাথ উপযাচক হয়ে সামাল করে, নৌকো টলছে—জলে পড়ে গেলে চিত্তির। জঙ্গলের স্ফূর্তি বেরিয়ে যাবে তখন।

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে চারু বলে, কিছু হবে না। ভাল সাঁতার জানি আমি।

সাঁতারের ফুরসৎ দেবে না। কুমিরে ধরবে কিম্বা কামটে কাটবে। কেটে নেবে যখন, বেশ সুড়সুড়ি লাগবে। তারপরে দেখা যাবে, পুরো একটা পা-ই পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝি বলল, ছইয়ের উপর অমন করে দাঁড়ায় না বুনডি। বসে বসে দেখ।

অনেক পথ গুণ টেনে গরলগাছির খালের কাদায় নৌকো ঠেলে ঠেলে অনেক কষ্টে কুমিরমারি পৌঁছানো গেল। বড় গাঙের মধ্যে উজান বাওয়া চলবে না। বাতাসও মুখড়। নৌকো চাপান দেওয়া ছাড়া গতি নেই। আরও খান দুই বাঁক গিয়ে দোখালার ভিতর কোন গতিকে যদি ঢুকে পড়া যেত, খালে খালে যা-হোক করে এগুতে চলত। হল না হরর দোষে। তার ওই নীলকমলপাটি পছন্দ করতে গিয়ে।

জগা বলে, বয়ারখোলায় কাজ নেই, কুমিরমারি নেমে আমার হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব। তোমাকেও হয়, হাঁটতে হবে আমার সঙ্গে।

ব্যাপার-বাণিজ্যে দু-চার পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করে হর বড্ড ই খানিকটা বাবু হয়ে পড়েছে। বলে, জানো না তাই। পথ এখনো হয়েছে নাকি? বনজঙ্গল জল-জাঙাল—

তোমার জন্তে এত লোকের ভোগান্তি। ছাড়ছিনে তোমায়। হাঁটতে না পার, পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে তুলব।

হর চুপ করে যায়। কথায় কথা বাড়ে। ভদ্র অঞ্চলের মানুষ নৌকোয় যাচ্ছে, তাদের সামনে আরও না জানি কী বলে বসে। বাঁক ঘুরতেই ছোট ছোট টিনের চালা। কুমিরমারির হাট। হাটের নিচে ঘাটের ধারে নৌকো কাছি করল। থাকতে হবে বেশ খানিকক্ষণ। জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ভাঁটার টান যতক্ষণ না ধরছে। এক প্রহর রাত্ত হবে তো বটেই।

নেমে পড়ছে সব চড়ন্দার। মরা গোনে জল বড্ড নেমে গিয়েছে। নিকানো উঠানের মতো নদী-চর তক তক করছে। ছোট ছোট মাছ কাদার উপর ছাপ কেটে সর সর শব্দে ছুটোছুটি করছে এদিক-সেদিক। পা চাপালে কাদার মধ্যে বসে যাচ্ছে। নোনা কাদা আঠার মতন লেপ্টে যাবে, কাদার ভারে পা উঁচু করে তোলা দায়। জোয়ার বলে তবু তো অনেক দূর অবধি নৌকো উঠে এসেছে।

নামতে হবে গো এবারে। নেমে খেয়ে-দেয়ে চরে-ফিরে বেড়াওগে এখন। টানের মুখ ঘুরলে সেই সময় এসো।

চারু নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। যারা নেমেছে, তাকিয়ে তাদের দুর্গতি দেখছে। মুখেই এত ফড়ফড়ানি—কাদায় পা দিতে হবে, আঁতকে উঠছে সেই শঙ্কায়। সাপের মুখে পা দিতেও তো মানুষে এমন করে না। তা নামতে না চাও তো থাকো নৌকোর খোপে আটক হয়ে, অন্ত সকলে নেমে যাক, থাকো পড়ে একা একা। কার দায় পড়েছে, কে পিঠ দিচ্ছে দুর্গা ঠাকরুণের সিংহের মতন—সেই পিঠের উপর পা রেখে কাদা পার হয়ে উনি ডাঙায় উঠবেন। আর যে পারে পারুক, জগা বিশ্বাস নয় কখনো। তার দিকে তাকায় কেন বারম্বার, ভেবেছে কি? বাঁধন-আঁটা নিটোল দেহটার শোভা দেখছে। দেখ তাই, আর কিছু প্রত্যাশা কোরো না। মাথায় কাপড় দেওয়া অপর মেয়েলোকটি দিব্যি তো নেমে এলো। আর নবাবনন্দিনী, দেখ, নাকি-নাকি বুলি ছাড়ছে: সবাই চলে যাচ্ছ যে বউদি, একা-একা আমি পড়ে রইলাম—। যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে রেখেছে ছইয়ের বাঁশের সঙ্গে। কাদায় নামবে না তো তড়াক করে লাফিয়ে পড়ো এই জগন্নাথের মতো। কাদা তো বড় জোর হাত আষ্টেক জায়গায়—আট হাত লাফাতে পারো না, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবে আর শাসন কিসের অত?

এক দল পশ্চিমা কুলি রাস্তায় মাটি ফেলছে। বেলা পড়ে এলো, কাজ করছে তবু এখনো। আর কত কাল লাগবে রে বাপু! মাটি ফেলাটা হয়ে গেলেই পায়ে-হাঁটার অন্তত সোজা পথ পাওয়া যায়, গাঙে-খালে ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে না। খালের উপর পুল হবে। পুলের জন্ত ইটকাঠ লোহালক্কড় এসে পড়েছে। খাল-ধারে পাহাড়-প্রমাণ তক্তা গাদা দিয়ে রেখেছে। আরে আরে, কি করছে দেখ ছোঁড়া ক'টা—চার-পাঁচটা তক্তা কাঁধে বয়ে এনে কাদার উপর ফেলল। তক্তার উপর পদারবিন্দ রেখে ঠাকরুণের ডাঙায় ওঠা হবে। আবদার তো বেড়েই চলবে এমনি ধারা তোয়াজ হলে।

এত বন্দোবস্ত সত্ত্বেও মেয়েটা যেন গলে গলে পড়ছে। চারু নয়, নাম হওয়া উচিত ছিল ওর নবনীবালা। নৌকোর কাঙালে দাঁড়িয়ে বলছে, হাত ধরো না গো কেউ তোমরা। নামি কেমন করে তক্তার উপরে?

তা-ও চার-পাঁচ মরদ এগিয়ে এসেছে হাত ধরে নামাবার তরে। রকম দেখে জগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। হঠাৎ সে-ও ছুটল—তার সঙ্গে পারবে কে? ছুটে সকলের আগে চলে গেল। কাঙালের এপাশে ওপাশে হাতগুলো উঁচু হয়েছে চারুকে নামিয়ে আনার জন্ত। সকলের উঁচুতে উঠে আছে জগার ইস্পাতের মতো কঠিন কালো হাতখানা।

জগার বিক্রম, লম্ফ দিয়ে কাদা পার হওয়ার সময় সকলে জেনে বুঝে নিয়েছে। চারুও বুঝেছে। আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াল সেই মানুষ। হাতে হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে জগা মেয়েটার হাত অমনি মুঠোয় পুরে হেঁচকা টানে এনে ফেলল তক্তার উপরে নয়—তক্তার পাশে কাদার ভিতর। আর কেউ হলে সে টানে কাদার উপর গড়িয়ে পড়ত, শক্ত মেয়ে তাই সামলে নিল কোন গতিকে।

ছুঁচো কাঁহাকা—বজ্জাতের বেহদ্দ! রাগে গরগর করতে করতে চারু দু-হাতে একতাল কাদা তুলেছে জগাকে ছুঁড়ে মারবে বলে। কোথায় জগা? চক্ষের পলকে অত দূরে ঐ নতুন রাস্তার আড়াল হয়ে গেল। কিম্বা ধোঁয়া হয়ে আকাশেই উড়ে গেছে হয়তো।

ছুটতে ছুটতে চারুও রাস্তার উপর গেল। নতুন মাটি ফেলে অনেক উঁচু করেছে—চতুর্দিক সেখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। গেল কোন দিকে? যে চুলোয় গিয়ে থাকে, থাকুক না আপাতত পালিয়ে। নৌকো ছাড়বার সময় হলে আসতে হবে বাছাধনের। শোধবোধ সেই সময়।

হর বড্ড ই ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ? পায়ে পায়ে কত পথ মেরে দিল তারা এতক্ষণ। একা নয়, জগা আর বলাই। আমাকেও টেনেছিল। আমি কারো গোলাম নই বাপু, স্বাধীন ব্যবসা আমার। দেরি হল কিম্বা তাড়াতাড়ি পৌঁছলাম, আমার কি যায় আসে? আমি কেন কষ্ট করতে যাই?

মানুষ অবাক হয়ে যায়: বলো কি গো? রাস্তার একটুখানি নিশানা হয়েছে কি না হয়েছে—জলে নেমে খালই পার হতে হবে তিন-চারটে—

হর বলে, এক পহর ঠায় বসে থেকে তারপর নৌকোয় শতেক অঞ্চল ঘুরে যাওয়া—এর চেয়ে জল ঝাঁপানো কাদা মাখা অনেক ভাল ওদের কাছে। যতক্ষণে নৌকো বয়ারখোলা যাবে, ওরা খেয়েদেয়ে পুরো এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠবে তার ভিতরে।

ধোপদুরস্ত কামিজ-পরা নগেনশশীর সঙ্গে হর এবার পরিচয় করছে: বাবু মশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথা? ভেবেছিলাম কুমিরমারিতে শেষ। নতুন চৌকি বসে গেল, কুন্তঘাটা হল, বাবু লোকের আনাগোনা বেড়ে গেছে—মা-লক্ষ্মীরা এসে পড়ে এবারে গেরস্থালি পাতাবেন। আরও নাবালে যাচ্ছেন এঁদের সব নিয়ে? কোথায়?

[ক্রমশঃ।

অধস্তন পৃথিবী

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

[কোনও এক প্রাচীন বা আধুনিক প্রতিষ্ঠান বা সমাজ কিংবা কোনও ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশ্লেষণ এইখানে করা হয় নি। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক মনে করে নিলে আমি পাঠকদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।]

আসামীদের কাছ হতে ছিনিয়ে নেওয়া গামছা ও কাপড়ের খুঁট দিয়ে একের বাহুর সঙ্গে অপরের বাহু বেঁধে তাদের গরু-ভেড়ার মত তাড়াতে তাড়াতে চিৎপুর রাস্তার মোড়ে এসে শান্ত্রিদল সহ প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফিরে ঘটনাস্থলটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তখনও পর্য্যন্ত বস্তীবাড়িগুলির মধ্য থেকে মধ্যে মধ্যে ইট-পাটকেল ও সোডাওয়াটারের বোতল সাঁ-সাঁ করে ছুটে এসে কচুরী গলির ডান দিককার দ্বিতল কোটাবাড়ির দেওয়ালের উপর পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল।

সামনের ট্রামরাস্তার উপর দিয়ে দুই-একখানা ট্রাম তখনও যে না চলছিল তা-ও নয়। কিন্তু তার ভিতরকার যাত্রীরা প্রায় সকলেই ছিল এই অঞ্চলেরই লোক। নির্ব্বিকার চিত্তে তারা গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাহিরের তামাসাটা দেখে নিল মাত্র। আশে-পাশের দোকানদার এবং পথচারীদের দেখলেও মনে হয় তারাও রাস্তার সাধারণ পথিক এবং ট্রামের যাত্রীদের মতই নির্ব্বিকার। এইরূপ ঘটনা প্রাত্যহিকই এখানে ঘটে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাদের নিকট এইরূপ ছোটখাটো ঘটনা গা'-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা'ছাড়া এখানে শান্ত্রী পুলিশ ও জুয়াড়ীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে। তাদের এই হারজিতের মধ্যে জনসাধারণের আসে-যায় কি। এই স্থলে তারা নির্ব্বিকার দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব 'পাড়ার গুণ্ডা' পাড়ার কারুরই ক্ষতি করে না। তবে তারা খামকা পরের ব্যাপারে জড়িয়েই বা পড়বে কেন? শুনা গিয়েছে যে, প্রাচীন ভারতে রাজায় রাজায় যুদ্ধের সময়েও কৃষকরা মনের আনন্দে ভূমি কর্ষণ করে যেতো। এরাও তো সেই প্রাচীন ভারতীয়দেরই বংশধর। তারা যদি তাদের বংশের ধারা এই ভাবে বজায় রাখে তাহলে সেই জন্ত দোষ দেওয়া যায় না।

এদের এইরূপ মনোবৃত্তি প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাঁরা সদলবলে বড়ো রাস্তার উপর এসে নিজেদের কতকটা নিরাপদ মনে করলেন। এমন সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি সামনের কোটা-বাড়ি হতে ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে আসছে। রুমাল দিয়ে মুখটা চেপে রাখলে তাকে একজন ভদ্রলোক ব'লেই মনে হলো। কিন্তু তা সত্ত্বে প্রণব বাবু ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলেন। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মুখের উপর হতে রুমালটি সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, আরে এ আমি! আমি প্রণব বাবু! চিনতে পারছেন না আমাকে?

প্রণব বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, ভদ্রলোক তাঁর খুবই পরিচিত এক ধনী ব্যক্তি। স্থানীয় মনোরমা থিয়েটারের তিনি একজন মালিক। এছাড়া স্থানীয় একটি কলেজে তিনি প্রফেসারীও করে থাকেন। জনসমাজে ভদ্রলোকের নানা কারণে সুনাম আছে। তাঁকে এই ভাবে একটা বেশ্যাবাটী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চিরঞ্জীব বাবুও কম আশ্চর্য্য হননি। কারণ ঐ বাড়ীটার ঘরে ঘরে যে মধ্যশ্রেণীর বেশ্যা নারীগণ বাস করে, তা উভয়েরই জানা ছিল।

'আপনারা খুব আশ্চর্য্য হচ্ছেন, না'? প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আজ্ঞে—এই বাড়ীটা আমার নিজের হলেও এখানে আমি ভাড়া আদায় করতে আসি নি। এমন কি থিয়েটারের জন্ত কোনও একট্রেসের সন্ধানেও এখানে আমি আসি না। উষাকে চেনেন তো? আমাদের থিয়েটারের উষা। গত দশ বছর হলো দুজনে স্বামি-স্ত্রীর মত এইখানে থাকি। তাই প্রতিটি সন্ধ্যেয় এইখানে ঘণ্টা দুই তিন আমাকে কাটিয়ে যেতে হয়। এখানে বেশীক্ষণ আপনাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া নিরাপদ নয়। আপনারাও বেশীক্ষণ আর এখানে অপেক্ষা করবেন না। আপনাদের মহলে মেলামেশা আমার বহু দিনের। তাই বলছি এখান থেকে চলে যান এখুনি। শান্ত্রীদের মধ্যে মিছামিছি বেশী ক্যাস্যুয়েলটি হলে কর্তৃপক্ষ আপনাদের ট্যাক্টলেশ বলে অভিহিত করে কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন। তা' ছাড়া ভেতরে আরও ব্যাপার আছে। সব কথা আপনাদের এখানে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আচ্ছা, তাহলে চলি আমি—

ভদ্রলোক ত্বরিত গতিতে পাশ কাটিয়ে রাস্তার ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সবেগে আর একখানা ট্রাম-গাড়ী এসে পৌঁছল। এদিকে ভদ্রলোকের উপদেশের মধ্যে যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল তা অভিজ্ঞ অফিসার প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই আর ঘটনাস্থলে দেরী না করে ট্রামটাকে থামিয়ে আসামী ও শান্ত্রীদের নিয়ে তারা ঐ গাড়ীর সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় উঠে পড়ে থানার দিকে এগিয়ে চললেন।

২

জোড়াসাঁকো থানার ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ অফসার মহীন্দ্র বাবু অফসার-ইন্‌চার্জের নিদিষ্ট কামরায় বসে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর জন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এই দিন সরকারী ও বে-সরকারী এই উভয়বিধ কাজে তাঁকে বহুক্ষণ থানার বাহিরে কালাপহরণ করতে হয়েছিল। মাত্র এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি থানায় ফিরে থানার অন্যান্ত অফিসারদের নিকট হতে ঘটনাটি সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। ব্যস্তভাবে তিনি থানার জাবেদা খাতার

পত্রটা উল্টাতে উল্টাতে দেখলেন, তাতে লেখা আছে যে, ৫টা পঁচিশ মিনিটে আত্মারাম নামে জনৈক ব্যক্তির নিকট হতে চিরঞ্জীব বাবুর উপর কচুরী গলির গুণ্ডাদের হামলার বিষয় অবহিত হয়ে প্রণব বাবু কয়েক জন সিপাহীশাস্ত্রী সহ ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে গিয়েছেন। এর পর একটু ভেবে নিয়ে তাঁর মুখের চুরুটে আরও দুই-একবার টান দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন যে, ইতিমধ্যেই ঐ ঘড়িতে সাতটা বেজে গিয়েছে। এই সময় থানার হেড জমাদার মোহন সিং কখন এসে থানার বড়বাবুর কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। সহসা মোহন সিংকে আফিস-ঘরে এসে উপস্থিত হতে দেখে বড়বাবু মহীন্দ্র রায় ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেয়া মোহন সিং! উনলোককো কচুরী গলিসে আপমিয়েঁ! লোককো পাকড়ানে কোন বোলা! এক রোজ হাম নেহি থানেমে হাজির নেহি রহে তো কুছ না কুছ ঝামেলা আ যাতি। যেতনা সব কাম দেখানেওয়ালা ছোকরা অফিসারকো পাকড় পাকড় বড়া সাব মেরি শির পর ডাল দিয়া হ্যায়। তুম উনলোককো সমঝায়কে মানা কর দেনে নেহি শেখা!'

মোহন সিং জমাদার হলেও একজন পুরাতন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বহুকাল যাবৎ সে এই থানায় জমাদাররূপে বাহাল আছে। এই এলাকার হালচাল সম্বন্ধে সে বিশেষরূপে অবহিত। তাই এই থানার অফিসার মাত্রই প্রতিটি দুরূহ ব্যাপারে একবার তার সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়। এ-ছাড়া নবীন অফিসারদের কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় এবং তাদের কোথায় যাওয়া উচিত বা কোথায় তাদের যাওয়া অনুচিত, সেই সম্বন্ধে পরোক্ষ ভাবে তাদের বুঝিয়ে দেবার ভার বড় বাবু এই হেড জমাদারের উপরই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কচুরী গলির কোনও ব্যক্তির কোনও কার্যের জন্য তাদের উপর এই থানা থেকে কেউ অকারণে হস্তক্ষেপ করে, তা বড় বাবুর ন্যায় হেড জমাদার মোহন সিং-ও পছন্দ করেনি। তাই সে অভিযোগের স্বরে বড়বাবুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলে উঠলো, 'ক্যা করে সাব, ইনলোক বাত তো থোড়াই শুনতে লেকেন উঁহা বড়িয়া কুছ গোলমাল হো গ্যায়া হোগা। নেহি তো উনলোক এতনা ঘড়ীমে জরুর লোট আ যাতে। হামলোককেভি তুরন্ উধা যানে চাহী।'

জমাদার মোহন সিং-এর ন্যায় বড়বাবুও প্রণব বাবু ও চিরঞ্জীব বাবুর নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর বিরক্ত হলেও তাদের উপর রাগ করার তাঁর কোনও হেতু ছিল না। এ ছাড়া অধীনস্থ অফিসারদের উপর তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্যসহ বেশ কিছুটা স্নেহও ছিল। তাই প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি গর্জন করে উঠে মোহন সিংকে থানার বাকী সিপাহীদের তৈরী করতে আদেশ দিয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, 'নাঃ, দেখছি ব্যাটাদের বড্ড আস্কারা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা যে আমার বিনানুমতিতে তারা আমার অফিসারদের মারধর করতে সাহস করে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি আমি মজা বেটাদের।'

থানার ইনচার্জ অফিসার মহীন্দ্র বাবু টেবিলের ড্রয়ার থেকে গুলীভরা পিস্তলটা বার করে উঠে দাঁড়ানো মাত্র সেখানে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু আসামী ও শাস্ত্রীদলসহ উপস্থিত হয়ে বলে উঠলেন, 'থানায় ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল স্যার! আমরা সকলে সোজা থানাতেই ফিরে আসছিলাম কিন্তু চিরঞ্জীব বাবু এবং তৎসহ কয়েকজন সিপাহী এবং দুই তিন জন আসামীও আহত হয়েছিল। সেইজন্য হাসপাতালে আগে গিয়ে এদের আঘাতজনিত ক্ষতগুলিতে

পাটি ধরিয়ে তবে থানায় ফিরতে পারলুম। চিরঞ্জীব বাবুর সাহায্যের জন্ত থানা হতে বেরুবার আগে ঘটনাটি সম্বন্ধে আমি থানার জাবেদা খাতাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখে রেখে গিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই ঘটনাটার বিবরণ এতক্ষণে এই খাতা থেকে পড়ে জেনে নিয়েছেন। ব্যাপারটা হয়েছিল, স্যার—

ব্যাপারটা হুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওখানে কি হয়েছিল এতক্ষণে তা জানতে আমার কিছুই বাকি নেই, প্রণব বাবু। আমি যেখানেই বসে থাকি না কেন, এলাকার প্রতিটি খবর আমি ঠিক সময়েই পেয়ে যাই; খবরটা পেয়েই আমি সব কাজ ফেলে থানায় ফিরে এসেছি, হাতের গুলীভরা পিস্তলটি পুনরায় টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রাখতে রাখতে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, 'কিন্তু চিরঞ্জীব বাবুরও আমাকে না বলে অত কম লোক নিয়ে কতুরী গলির মত জায়গায় জুয়া ধরতে যাওয়া উচিত হয়নি।'

জুয়াড়ী আসামীদের সর্দ্দার মিঠুরাম নীরভাবে থানার বড়বাবুর কথাগুলি এতক্ষণ ধরে শুনছিল। এইবার সে সাহস পেয়ে বলে উঠলো, 'হুজুর লোক খবর ভেজনে হামলোক থানেমে চলা আতি। লেকেন দেখিয়ে না, হুজুর! ইন নয়া বাবু লোক কেতনা জুলুম জুটমুট হামি লোককো পর কর চুকা, আজ।' জুয়াড়ী সর্দ্দারকে এই ভাবে তাঁর নিকট নির্লজ্জের মতন আপ্যায়িত জানাতে দেখে বড় বাবু মহীন্দ্র বাবু ধৈর্য্যহারা হয়ে তাদের উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, চুপ রহো কমবখতকো বাচ্ছা। এতনা সাহস হুয়া তোমরা যে মেরি অফসার লোককে বদনমে তুম হাত ডালা হ্যায়। এতনা রূপেয়া বানায়া যে তুম লোক বরাবর থানেভর আদমীয়োকে মুলুকে রাখেঙ্গে! এহি বাত, তুম সমঝ হো তো তোমরা সারা বস্তী হ্যাম অভি আগসে জ্বালায় দেঙ্গা। ভুলো মাত যে হামকা নাম মহীন্দ্র বাবু হ্যায়। আউর এ ভি খেয়াল রাখো যে পুরানো জমানা বদল যাতা। উসি সাথ তোমলোককে পুরানো চাল ভী ছোড়নে পড়েগা। আজ চিএা করে ভি তো তুম্‌লোককো হাম বাঁচানে নেহি সেকৃথা। যাও অভি সবকই তুম লোক থানেকে লক্‌ আপ'মে। এই মোহন সিং। লে যাও ইলোককো হাজতমে।'

থানার বড় বাবু মহীন্দ্র বাবুর শেষ কথা কয়টি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল। সত্য সত্যই তিনি একটি যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করতে পারলো যে পুরানো যুগ তার দোষ-গুণ সহ শীঘ্রই বুঝি বিদায় নেবে এবং তার পরিত্যক্ত স্থল অধিকার করবে নিজস্ব দোষ-ত্রুটী সহ একটি নূতন যুগ। প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবুরা যে সেই অনাগত যুগের অগ্রদূত মাত্র, তা বুদ্ধিমান বড়বাবু মহীন্দ্র রায়ের বুঝতে বাকি থাকে নি। নানা কারণে তাদের পুলিশি কার্য্য সম্বন্ধে নূতন চিন্তাধারা তিনি মনে মনে পছন্দ না করলেও তাদের কার্য্যে সক্রিয় ভাবে বাধা দানের তিনি কোনও দিনই প্রয়োজন মনে করেন নি। তাই তাদের ঐ সকল আদর্শজনিত কার্য্যের জন্ত বিপদ উপস্থিত হলে তিনি তাদের ঐ সব বিপদ থেকে বারে বারে মুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছেন।

বড়বাবুর আদেশ মত জমাদার মোহন সিং আসামিগণকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলে স্মিত হাস্তে বড়বাবু প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে তার সামনের চেয়ার হু'খানায় বসতে অনুরোধ করে দরজার সিপাহীকে তাদের ও নিজের জন্ত কয়েক কাপ চা আনিয়ে দেবার জন্ত আদেশ দিলেন। তারপর চায়ের কাপটি সেখানে নিয়ে আস মাত্র তা পান করতে করতে তাঁরা ঐ দিনের মামলা সংক্রান্ত আলোচনা সুরু করে দিলেন।

'যাক্, ঝামেলা যখন বাধিয়েছো তখন তার সম্মুখীন হতেই হবে,' স্মিত হাস্তে বড়বাবু প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'এখোন এসো কেস ক'টা একে একে লিখে ফেলা যাক।' 'হ্যাঁ, স্যার, বড় সাহেব থানা ভিসিট করতে আসার আগেই ওগুলো লিখে ফেল ভালো।' প্রণব বাবু আশ্বস্ত হয়ে বড়বাবুর কথার প্রত্যুত্ত করলেন, 'তবে এখোন অসুবিধে হচ্ছে এই আত্মারামকে নিয়ে ও লোকটা সময় মত পালিয়ে থানায় এসে খবর না দিলে চিরঞ্জীব বাবু আজ আর প্রাণ নিয়ে থানায় ফিরতে পারতেন না।'

'সত্যি স্যার!' সাহস পেয়ে এইবার চিরঞ্জীব বাবু বললেন 'যদিও লোকটা অন্তান্ত আসামীদের স্তায়ই ওখানে বে-আইনীভাবে জুয়া খেলতে এসেছিল তাহলেও মানবতার দিক থেকে বিচার ক ওকে আমাদের পক্ষে যে কোনও রকমে মুক্তি দেওয়া উচিত হবে।'

বড়বাবু মহীন্দ্র রায় ছিলেন একজন পুরাতন কর্ম্মদক্ষ এ অভিজ্ঞ অফিসার। মানবতা প্রভৃতি চোখাচুখি বুলির কোন দিনই তিনি ধার ধারেন নি। রাষ্ট্রীয় কার্য্যের সহিত এই সবে কতটুকু সম্পর্ক তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এই সব অকেজো ফাঁকা বুলিগুলির উর্দ্ধে উঠতে না পারলে আজ পুলিশ বিভা এতো নাম-ডাক তিনি কোনও দিনই অর্জ্জন করতে পারতেন না।

'দেখ চিরঞ্জীব! তুমি দেখছি কাজকর্ম্ম কোনও দিনই শিখ না,' বিরক্ত হয়ে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বললেন, 'একটা সিম্পিল পি ক্লামসি করে তোলার জন্তে একটা বিশেষ ন্যাক তুমি অর্জ্জন ক ফেলেছো। যতোই তুমি মানবতা এবং ঔচিত্য ও অনৌচিত্য কথা ভাববে ততোই একটা সামান্ত বিষয়কে তুমি জটিল ক জটিলতর করে নিজের এবং সেই সঙ্গে আমাদের জন্তও তুমি অকার বিপদ ডেকে আনবে। ট্রামে করে আসছিলে তো থানার দি স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করবার জন্য। আমরা ট্রাম থেকে নে পড়ে এই এজিলিটিটা না দেখালেই কি চলতো না? এই স ঝামেলা না বাধালে আজ একটু সিনেমা-টিনেমা দেখে আসা চ তো! এই সব ঝামেলা বাধিয়ে আবার মানবতার বুলি আওড় তোমাদের লজ্জাও করছে না? এদিকে আবার একজন ভা কাজ-জানা অফসার হয়েও প্রণব পর্য্যন্ত তোমার রায়ে রায় দি চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই কেসটা তো একটা খুবই সিম্পিল কে কতোকগুলি জুয়াড়ী রাস্তায় বসে জুয়া খেলছিল আর তাদে ম এই আত্মারাম নামে আসামীটাও ছিল একজন। ব্যস! এদের সকলে নামে একত্রে জুয়াখেলার একটা কেস লিখে দাও। এর প বাহির হতে কয়েকজন গুণ্ডা পুলিশদলকে আক্রমণ করেছি এই তো? এই সম্পর্কে আরও জনকতক লোককে ঘটনায় তোমরা সন্দেহক্রমে এখান-ওখান থেকে পাকড়াও করে এনে বেশ ঠিক আছে। তাদের নামে একটা রায়ট-টায়টের কেস লি রাখো। অবশ্য কেসটা কোর্টে পাঠানোর কোন সার্থকতা নেই আখেরে সমধিক প্রমাণের অভাবে তোমাকে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। এর পর তোমাদের ঐ পেয়ারের গরীব মজদুর আত্মারা নামে আরও একটা অতিরিক্ত মামলা তোমাদের

করতেই হবে। যে উদ্দেশ্যেই হোক পুলিশের আইন সঙ্গত হেপাজতী হতে অলক্ষ্যে সে পলায়ন করেছিল। এই বিশেষ অপরাধের জন্য উপরোক্ত রূপ অতিরিক্ত একটি মামলা আমরা তার নামে রুজু করতে বাধ্য। এ কেসটি অবশ্য তার বিরুদ্ধে খুবই টাইট কেস। তার বিরুদ্ধে যা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাতে করে আদালতের বিচারে ওর সাজা হয়ে যাওয়ার কোন বাধাই নেই।

'এ্যাঁ! বলছেন কি স্যার'? এক রকম আঁতকে উঠে চিরঞ্জীব বাবু বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ! ও না বলে আমাদের হেপাজত হতে পালিয়েছিল বটে; কিন্তু এতে ওর উদ্দেশ্য বা মোটিভ ছিল তো অতীব ...'। 'কি বাজে বকছো, চিরঞ্জীব বাবু!' টেবিল থেকে একটা আইনের কিতাব উঠিয়ে নিয়ে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বললেন, 'সাধারণ ভাবে অপরাধ প্রমাণের জন্য তার পিছনে যে একটা উদ্দেশ্য বা মোটিভ থাকে তা সর্ব্বাগ্রে যে প্রমাণ করা প্রয়োজন তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই পুলিশ হেপাজতী থেকে পলায়নরূপ অপরাধ সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যে ধারাটি সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে মোটিভ বা উদ্দেশ্য-বাক্যটি কি কোথায় লেখা আছে? দেশের আইনপ্রণেতারা যদি তোমার এই মানবতার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্য তো আমরা দায়ী হতে পারি না? ভুলে যাবে না যে দেশের আইন দয়া-দাক্ষিণ্য বা কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য কোনও অধিকার আমাদের এখনও দেয়নি। যাও যাও। এইবার এদের বিরুদ্ধে যথাযথ ভাবে কেস কয়টি চটপট লিখে ফেলো গে। এখুনি বড়সাহেব এসেই চাঞ্চল্যকর বিধায় এই সব মামলার স্মারকলিপি (ডাইরী)-গুলি এখুনি দেখতে চাইবেন। আমরা এখোন একটা নিদারুণ যান্ত্রিক যুগের মধ্যে বাস করতে সুরু করেছি। এখানে কোনও ভাবপ্রবণতার তিলমাত্র স্থান নেই। ইনসিডেন্ট বা ঘটনা, এখানে ঘটনা মাত্র। তাই এদের ঘটনারূপেই আমাদের মেনে নিতে হবে। এখানে দয়াপরবশ হয়ে যদি তুমি আত্মারামের বিরুদ্ধে মামলায় তাঁকে বাঁচাবার জন্য নিজ খরচে উকিল নিয়োগ করো, তা হলেও তুমি একজন পুলিশ অফিসার বিধায় তোমার পক্ষে সেই কার্য্য দণ্ডনীয় ও অমার্জ্জনীয় এক অপরাধ হবে। তবে সে এই মামলায় দণ্ডিত হওয়ার পর তুমি যদি তার ফাইনের টাকা কয়টা আদালতে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও তো সে কথা স্বতন্ত্র।'

বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের বিরুদ্ধে কার কিছু বলবার ছিল না, তবুও চিরঞ্জীব বাবুর মনে হলো চারিদিকে যেন অনাচার ও অবিচার ঘিরে রয়েছে। চিরঞ্জীব বাবুর চিন্তাধারার সঙ্গে প্রণব বাবুর চিন্তাধারারও এই দিন কোনও অমিল ছিল না। তাদের দুজনেরই এই সময় মনে হলো যে এই সব অবিচার অবিচার হলেও উহার বিরুদ্ধে প্রতিকার করার সাধ্য তাদের কারুরই নেই। এই সব আইন যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এখোন সকলেই নাগালের বাহিরে। একণে আইনের মূল কিতাবগুলির উপর মাথা খুঁড়ে ফিরলেও সেখান থেকে এই সম্পর্কে কোনও সদুত্তরই মিলবে না। অগত্যা তাঁরা দুজনেই বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর উপদেশ মত পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে এসে আসামীদের মুখের দিকে না তাকিয়েই তাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি একে একে লিখে ফেলতে সুরু করে দিলে। তবুও আত্মারামের বিরুদ্ধে 'পলায়নের' মামলাটি লিপিবদ্ধ করতে করতে চিরঞ্জীব বাবুর মুখ থেকে অলক্ষ্যে একটি শব্দ বার হয়ে এলো—উঃ কি অবিচার! চিরঞ্জীব বাবুর মুখে এই কথাটা বোধ হয় ঠিক এই সময়েই প্রণব বাবুরও মনে জেগে উঠেছিল। তাই অন্যমনস্কতার মধ্যেও চিরঞ্জীব বাবুর কণ্ঠনিঃসৃত আক্ষেপধ্বনিটি সহজেই প্রণব বাবুর কানে পৌঁছিয়েছিল। কিন্তু প্রণব বাবু দুনিয়ার হাল-চাল সম্বন্ধে চিরঞ্জীব বাবু অপেক্ষা অধিকতর রূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি ইসারায় তাঁকে চুপ করতে বলে পুনরায় আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করছিলেন। এমন সময় পিছন হতে কে একজন ভদ্রলোক এসে বলে উঠলেন, 'নমস্কার প্রণব বাবু! বাধ্য হয়েই আসতে হলো। একটু বিরক্ত করবো, স্যার'! প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু তাঁদের কলমের গতি থামিয়ে সচকিতে চেয়ে দেখলেন তাঁদের পরিচিত শ্রীব্রজহরি কলেজের অধ্যাপক এবং স্থানীয় মনোরমা থিয়েটারের মালিক শ্রীব্রজেন ঘোষ কখন তাঁদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

'আরে। ঘোষ সাহেব যে,' টেবিলের উপর হাতের কলমটি নামিয়ে রেখে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও থানায় এসে উপস্থিত! ব্যাপার কি, কিছু খবর আছে'? 'না না। খবর থাকবে আর কি? খবর দেওয়া আমাদের পেশা নয়'। ও সব বাজে ব্যাপারে কোন দিনই আমরা থাকিনি' একটু অপ্রস্তুতার সহিত প্রফেসার ঘোষ সাহেব বললেন, 'এই আপনাদের জন্যেই আজ থানায় আসতে বাধ্য হয়েছি। কচুরী গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাব না দেখালে আপনাদের কাছে আসবার আমার কোন দরকারই ছিল না! এখোন আমাকে থাকতে হয় ওই ওদের সঙ্গে ওদেরই ঐ পাড়াতে তো। তাই ওদের অনুরোধে আসতে হলো—একবার আপনাদের কাছে। যদি দয়া করে অন্ততঃ

এরা কেসের আসামী কয়টির জামীন দিয়ে দেন। তা ব্যক্তিগত ভাবে ওদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। তাই আমি নিজেই ওদের জন্ত জামীন হতে পারবো।'

প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু বহুক্ষণ নির্ব্বাক ভাবে প্রফেসার ঘোষের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মতন একজন নামকরা সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও এই সব গুণ্ডা বদমায়েসদের সহিত মেলামেশা তাহলে চলে। তাহলে কি এই সব গুণ্ডা জুয়াড়ীরাও অন্ত দিক হতে কিছু কিছু সদ্গুণেরও অধিকারী? যখন প্রফেসার ঘোষকে সোনার ঘড়ি এবং হীরার আংটী সহ অক্ষত শরীরে তাঁর রক্ষিতা উষার বাড়ীতে তারা প্রতিদিন যাতায়াত করতে দেয়, তখন তাদের মধ্যে মন্দের সহিত ভালো দিকও কিছু আছে বৈ কি? এ উপকারটুকুর জন্ত এরা প্রোঃ ঘোষের নিকট কোনও দিন একটি কপর্দকও দাবী করেনি। অধিকন্ত এই সব চোর গুণ্ডারা পাড়াপড়শীদের ভিন্ন পাড়ার বদমায়েসদের কবল হতে হামেসাই রক্ষা করে এসেছে। অন্ত দিকে প্রফেসার ঘোষকেও তাঁর পদস্খলন বা চরিত্রহীনতার জন্ত সবদিক বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই দাবী করা যায় না। রূপজীবিনী নারী উষাকে একনিষ্ঠ জীবন যাপনের সুযোগ দিয়ে প্রোঃ ঘোষ তাকে অধিকতর অধঃপতন হতে যে রক্ষা করেছেন, তা নিঃসংশয় চিত্তেই বলা যেতে পারে। আর ঐ হতভাগিনী নারী উষারাণীরও কি বহু সদ্গুণ নেই? আছে বৈ কি। তা না হলে কি সে শিল্পের পূজারী হয়ে এতো নাম করতে পারতো? সেদিনও তো প্রণব ও চিরঞ্জী বাবু ঐ নারীর অভিনয়-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবুর মনে হলো, যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে খুঁজে বার করতে পারলে পাঁক জঞ্জাল বা ডেবরিসের মধ্য থেকেও বহু মণিমাণিক্য তাহলে উদ্ধার করা যায়। এই সব জুয়াড়ী বদমায়েসরা ঐরূপ পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে থেকেও যে তখনও পর্য্যন্ত কয়েকটি গুণেরও অধিকারী থাকতে পারে, তা তখনও পর্য্যন্ত প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর কল্পনারও বাইরে ছিল। কৈ, যে অপকার্য্য তারা পেশারূপে গ্রহণ করেছে তার বাইরে তো তারা অন্ত কোনও অপরাধ করে না? বরং এমন বহু যৌনজ ও অযৌনজ অপরাধ আছে, যাকে তারা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণাই করে থাকে। তাদের সায়েস্তা করার জন্ত প্রতিশোধের মনোবৃত্তি নিয়ে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু তাদের ডেরায় মধ্যে মধ্যে হানা দিয়েছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কোনও ধর্ম্মযাজক বা সমাজসেবী তাদের দেহ ও মনকে উদ্ধার করবার জন্তে সেইখানে যাওয়ার কল্পনাও করে নি। প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু সব দিক ভেবে কারুর উপর রাগ তো করতেই পারলো না, বরং সকলেরই প্রতি তাঁরা প্রশংসোন্মুখ হয়ে উঠলো। মানুষের যদি বাঘ মারার অধিকার থাকে তাহলে বাঘেরও আত্মরক্ষার্থে ঘুরে দাঁড়াবার অধিকার আছে বৈ কি! পুলিশের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে তাদের উপর গুণ্ডাদলের প্রতি আক্রমণের মধ্যে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু আর যেন কোনও অন্যায় দেখতে পেলেন না।

'নিশ্চয়ই জামীন ওদের দেবো। এতে আপত্তি নেই আমাদের।' দ্বিধামুক্ত চিত্তে প্রোঃ ঘোষকে উদ্দেশ করে প্রণব বাবু বললেন, 'কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ দরিদ্র শ্রমিক আত্মারামকেও আপনাকে জামীনে নিয়ে যেতে হবে'। 'এ্যাঁ! এই আবার কি বুঝিলে ফেললেন আমাকে', সন্ত্রস্ত হয়ে প্রোফেসর ঘোষ উত্তর দিলেন, 'ঐ লোকটাকে তো আমি চিনি না, তার? না, মশাই। ও সব বাইরের লোকের ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথাই নেই'।

প্রোফেসার ঘোষ সাহেব সত্য কথাই বলেছিলেন। যে যুগে বন্ধুত্ব স্থাপনের সময় প্রথমেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে যে ঐ বন্ধুমত ব্যক্তির কতটুকু মানুষের উপকার করার ক্ষমতা আছে আর কতটুকুই বা তার অপকার করার ক্ষমতা আছে, সেই যুগে জন্মগ্রহণ করে শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিত প্রোফেসার ঘোষের পক্ষে এর চেয়ে অধিক উদারতা দেখানো সম্ভবও ছিল না। তাই প্রণব বাবু একবার পরখ করবার জন্ত সম্মুখে দণ্ডায়মান কচুরী গলির প্রখ্যাত গুণ্ডা সর্দার বিঠলরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া সর্দার! আত্মারামকোভী জামীনমে লে লেগা'। গুণ্ডা-সর্দার বিঠলরাম কিন্তু প্রণব বাবুকে এ বিষয়ে একেবারেই নিরাশ করলো না। সে খুশী হয়ে প্রণব বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলে উঠলো, 'জরুর বাবু সাব! উনকো জামীনমে লে লেঙ্গে। উনকো ইসি আপনকো বাস্তে হামি লোকই তো দায়ী হ্যায়। বেইমানী কাম হামলোক কভি নেহী করেগা, বাবু সাব!'

প্রোফেসার ঘোষ সাহেবের মত গুণ্ডা-সর্দার বিঠলরামও আত্মারামকে মাত্র এইদিনই দেখেছে। সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে গুণ্ডা-সর্দার বিঠলরামের এবংবিধ ব্যবহারের জন্ত দায়ী শুধু তাদের বেপরোয়া মনোভাব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার স্বভাবসুলভ বেপরোয়া মনোবৃত্তির সহিত যে যথেষ্ট দরদেরও ছোঁয়াচ ছিল তাতে অভিজ্ঞ অফসার প্রণব বাবুর কোনও সন্দেহই ছিল না। তাঁরা খুশী মনে তাকে বাহবা দিয়ে কি একটা কথা বলতে চাইছিলেন, এমন সময় দরজার সিপাহী ছুটে এসে সেলাম করে জানালে, 'হুজুর বড় সাহেব আগয়া।' এর সঙ্গে সঙ্গে বাহির হতে পাহারারত বন্ধুকধারী সেণ্ট্রির বন্দুক উঠানো ও নামানোর খটখট আওয়াজের সঙ্গে একটি মোটর গাড়ির দরজা খুলা ও বন্ধেরও একটা খটাখট আওয়াজ শুনা গেল। প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে দ্রুতগতিতে বড় সাহেব রমেশ বাবু থানার জুনিয়ার অফসারের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বড়সাহেবের পিছন পিছন তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্ত প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু এবং সেই সঙ্গে প্রোফেসার ঘোষ সাহেবও বড় সাহেবের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আসন গ্রহণ করার পর বড় সাহেব রমেশ বাবুর প্রোফেসার ঘোষের উপর প্রথম দৃষ্টি পড়লো। একটুখানি দাঁড়িয়ে উঠে উৎফুল্ল হয়ে বড় সাহেব বলে উঠলেন, 'হ্যালো প্রোফেসার ঘোষ! আপনি এখানে, ব্যাপার কি?' প্রোফেসর ঘোষ সাহেবের বক্তব্যটুকু ধীরভাবে শুনে নিয়ে বড় সাহেব রমেশ বাবু থানার বড়বাবুকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ, এ আবার কি? এ ভেরী ব্যাড কেশ, উঃ। পুলিশকে জুয়াড়ীরা ধরে পিটিয়ে দিলে। ডেপুটী সাহেব শুনলে তো রেগে আগুন হবেন। এ্যাঁ? আমি জানতে চাই কে ওখানে জুয়া চালাচ্ছিল। ওদের কাছ হতে ঘুষের পয়সা খেয়ে ওদের ধরতে গেলেই শুধু ওরা মারপিঠ করে থাকে। তা না হলে ওদের মর্য্যাল কোড অনুযায়ী ওরা শুধু ধরার জন্তে পুলিশের গায়ে হাত কখনই তুলবে না। আমার মনে হয়, এই সব ঐ চিরঞ্জীব বাবুরই কাজ। আমি এক্ষুণি ওকে

সাসপেণ্ড করে দেবো। সামনের সোমবারের সকালে আপনি ওকে জোড়াবাগানের রিপোর্টের রুমে হাজির করবেন। এখন আত্মারাম ছাড়া আর সকলকেই আপনারা জামিন দিয়ে দিন। এদের বিরুদ্ধে তো মাত্র ঐ জুয়ার পেটী কেস। আত্মারামের বিরুদ্ধে তো দেখছি সিরিয়াস কেস লেখা হয়েছে। ওর জামিন টামিন কিন্তু এখন হবে না। ও পালিয়ে থানায় এসে খবর দিয়েছে না হাতী করেছে। ও সব চালাকী তোমরা না বুঝো, আমি তো বুঝি। ও দৌড়ে এসে থানায় ওদের হয়ে খবর দিতে এসেছিল, যাতে ওদের সকলেরই বিরুদ্ধে না রায়ট কেস রুজু করা হয়। ওসব ভাঁওতায় আমি ভুলি না। আজ বিশ বছর চাকরী হতে চললো আমার। একটু ভুদির করবে যাতে আদালত থেকে অন্তত এ লোকটা না খালাস পায়।

বড় সাহেব রমেশ বাবুর পরিদর্শনের জন্য সব কয়জন আসামীকে ইতিমধ্যেই তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সকলের মত বড় সাহেবের উপদেশ ও আদেশ সম্বলিত বক্তব্যটুকু ঐ সকল আসামীদেরও কানে গিয়েছিল। গুণ্ডা-সর্দার বিঠলরাম আত্মারাম সম্পর্কীয় উপদেশটি শুনা মাত্র অবাক হয়ে মনে মনে আউড়ে উঠলো, হা রে খোদা। এই সব বুড়বাকদের তুমি আমাদের মত শেয়ানা করে তুলতে পারলে না? গুণ্ডা-সর্দারের একজন সাকরেদ আসামীরও কানে বড় সাহেবের শেষের আদেশটি প্রবেশ করেছিল। তাই সে-ও যেন একবার ভাবের আবেগে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, 'সব বেইমান হ্যায়। আর সকলের মত চিরঞ্জীব বাবুও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় সাহেবের উপদেশ ও নির্দেশ-বাণী শুনেছিলেন। নিজের যা কিছু অপমান তা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে তাঁর ঠোঁটের কোণে মাত্র একটা কথাই যুগিয়ে এলো 'এ কি বিচার না বিচারের প্রহসন!' কেবলমাত্র থানার বড় বাবু মরমে মরে গিয়ে মধ্যে মধ্যে চিরঞ্জীব বাবুর দিকেই মাত্র চেয়ে দেখছিলেন। বড় সাহেব রমেশ বাবু কিন্তু কে কি ভাবে তাঁর উপদেশ এবং নির্দেশবাণী গ্রহণ করছে, তা ভেবে দেখবারও প্রয়োজন মনে করলেন না। ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের এই সব আজেবাজে বিষয় ভেবে দেখবার জন্য পর্য্যাপ্ত সময়ও থাকবারও কথা নয়। তিনি তাড়াতাড়ি কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে মন্তব্য সহ দস্তখত করে যেমন বেগে প্রবেশ করেছিলেন তেমনি বেগে থানা থেকে বহির্গতও হয়ে গেলেন। পিছন পিছন স্বাভাবিক বেগে থানার অফিসারের দল তাঁদের শেষ অভিবাদন জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে তাঁর গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় তাঁরা একে একে থানার ভিতর ফিরে এলেন। ততক্ষণে থানার অধস্তন কর্মচারীর দল বড় সাহেব রমেশ বাবুর নির্দেশ অনুযায়ী এক আত্মারাম ব্যতীত অপর সকল আসামীকেই প্রোফেসার ঘোষ সাহেবের জামানতে জামীন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রত্যাগত অফসারদের গা ঘেঁসে আসামীরা একে একে থানা হতে এতক্ষণে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দিকে নির্ব্বিকার দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু সস্নেহে চিরঞ্জীব বাবুর কাঁধের উপর হাত রেখে বলে উঠলেন, 'বড় সাহেবকে কিন্তু কোনও প্রকারেই একজন্য দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর ধ্যান ধারণা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর এই ভুল বিবেচনার জন্য তাঁকে কোনও দোষই দেওয়া উচিত হবে না। যা কিছু দোষ তা আমার আর ঐ হেড জমাদার মোহন সিং-এর। মিছামিছি আমাদের কৃত দোষগুলি বড় সাহেব নির্ব্বিচারে তোমার উপর চাপিয়ে দিলেন। সত্যই চিরঞ্জীব, আমি এজন্য বড় লজ্জিত ও দুঃখিত। ঠিক আছে, যাওয়া যাবে আখুন তোমাকে নিয়ে সোমবারে তাঁর রিপোর্ট রুমে। যত বড়ই উঁরা বাঘ ভাল্লুক হোন উঁদের খপ্পর হতে তোমাকে বার করে আনবার মত্যেই ক্ষমতা তোমাদের বড়বাবুর আছে। হ্যাঁ, ভাইই—

নিজের জুনিয়ার অফিসারদের কাছে এমন প্রাঞ্জল ভাবে বড়বাবু স্বীকারোক্তি করবেন তা প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর ধারণার বাইরে ছিল। তাঁর সত্যবাদিতা এবং জুনিয়ার অফিসারদের প্রতি অদম্য স্নেহ ও কর্ত্তব্যবোধ সত্য সত্যই তাদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। সপ্রতিভ ভাবে 'না স্যার, ঠিক আছে' বলে উভয়ে তাঁদের প্রিয় বড়বাবুকে প্রণাম জানাবো মাত্র, তিনি স্মিতহাস্যে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখো সহরের উত্তরাঞ্চলে আজ আমার এক জরুরে গোছের আমন্ত্রণ আছে থানায় ফিরতে আজ আমার অনেক রাত হয়ে যাবে। ঐ জায়গাটার ঠিকানাটা মাত্র এই থানার সিপাহী করিমবক্সের জানা আছে। যদি একান্তই দরকার হয়ে পড়ে তা'হলে তাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে ডেকে পাঠাবে। আচ্ছা, এখন ভাই তা'হলে চলি আমি।

বড়বাবু থানা হতে বার হয়ে গেলে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ফিরে এলেন। বহুক্ষণ তারা চুপ করেই

বসে রইলেন, তারপর সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে চিরঞ্জীব বাবু বলে উঠলেন, দেখুন প্রণব বাবু! সত্যাই তা' হলে হিষ্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। কচুরীপল্লিতে গুণ্ডাদের আক্রমণের সময় যেমন একসময় আত্মারাম ছাড়া আমাদের হেপাজতে কিছুক্ষণের জন্য আর কোনও আসামীই অবশিষ্ট ছিল না, তেমনি থানাতেও এখোন এই হতভাগ্য অনুগত আত্মারাম ছাড়া আমাদের দ্বারা ধৃত আর একজন আসামীও অবশিষ্ট রইল না। এই কি হচ্ছে তা'হলে ঈশ্বরের চুলচেরা বিচার? আমার নিজের দুর্ভোগের কথা না হয় বাদই দিলাম।

'ঈশ্বরকে অকারণে আমাদের মধ্যে টেনে এনো না, চিরঞ্জীব', একটু হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'মানুষের জীবনটা হচ্ছে একটা বিরাট অঙ্কশাস্ত্র। ঠিক হিসেব মত চলতে না পারলে এই রকম গোলমাল ও ভুল বারে বারে হবে। আসলে আমাদের কাজকর্ম যুগোপযোগী না হওয়ার জন্যে বারে বারে আমরা বিপদে পড়ে থাকি। তাই আমার মনে হয় যে যুগের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুকাল আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত হবে। তবে দিন আগত ঐ, কিন্তু একথাও ঠিক যে, সাধ্যমত আমাদেরই ঐ আকাঙ্খিত যুগের আশু আগমনের সূচনা করে দিতে হবে। তবে এই জন্য কিছু কিছু বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা আমাদের মধ্যে মধ্যে সহ্য করতে হবে বৈ কি? আমরা তো কোন ছার, ভাই! পৃথিবীর প্রখ্যাত অবতাররা পর্য্যন্ত যুগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সকল ক্ষেত্রে সাহসী হন নি। শুনেছি, ঐ সব বরেণ্য ধর্ম্মগুরু ও অবতারদের প্রায় সকলেই অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস বলে যে, ঐ সময় ক্রীতদাস প্রথা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চালু ছিল। কিন্তু ঐ সকল অবতাররা বহু ভালো ভালো বাণী মানুষকে প্রদান করলেও ক্রীতদাস প্রথার বিলোপের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ধনী ভক্ত শিষ্যদের বিরাগভাজন হতে বোধ হয় কোন দিনই সাহস করেন নি। তাঁরা মনুষ্য সমাজকে প্রগাঢ়রূপে ভালবাসলেও তৎকালীন যুগের পরিবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করছিলেন বোধ হয়। যাঁরা তা করেন নি তাঁরা নিশ্চয়ই ঐ সময়কার জনসমাজের হাতে অযথাভাবে নিগৃহীত হয়ে বনবাসের জন্য গহন অরণ্যকেই বেছে নিয়ে থাকবেন। থাক এখনো এ সব তত্ত্বকথা, ঈশ্বর ও তাঁর অবিচারের কথা ভুলে এইবার মামলার ডাইরী ক'টা চটপট্ লিখে ফেলতে হবে আমাদের। তা' না হলে আমাদের আরও এমন সব অপমান সইতে হবে, যা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের ধারণার বাইরেই আছে।

[ক্রমশঃ।

বিদায়

তরুলতা ঘোষ

স্বপনের ঘোর ভেঙ্গে গেছে মোর—
যাই তবে চলে যাই,
বাসনার নীল আকাশের শেষে
রামধনু আর নাই।
নীল নভোপটে মেলে দেব পাখা,
দূরে চলে যাব রিক্ত বলাকা
অসীম শূন্যে খুঁজে দেখি যদি
শান্তির নীড় পাই।
বেদনা-বিধুর শূন্য হৃদয়ে
বিদায়ের গান গাই।

কানন-কুঞ্জে কুসুম-পুঞ্জে
ঋতু গেয়ে যায় গান,
ভাষা দিশাহারা সুর-সুরভিতে
বিবশ আমার প্রাণ,
নয়নের জল ঢালি তরুমূলে,
আশা করেছিনু পত্রে ও ফুলে
ললিত মাধুরী উঠিবে গো দুলে,
নিঃশেষে দিব দান—
বন্ধনহীন বন্যাধারায়
পুলকাঙ্কিত প্রাণ।

দূর-দূরান্ত ভ্রমণ-ক্লান্ত
শ্রান্ত বলাকা আমি,
ছায়া-সুনিবিড় আশ্রয় লাগি
তব শাখা 'পরে নামি,
মনে ছিল আশা সেথা গা'ব গান,
কুসুম-সুবাসে করে নেব স্নান,
গোপন-পুলকে ঢেলে দেব প্রাণ
পল্লবছায়ে থামি।
বহু আশা করে তব শাখা পরে
নীড় বেঁধেছিনু আমি।

শুষ্ক-শাখার সুখ আশ্রয়—
শ্যাম কিশলয় হারা
সে তো নিষ্প্রাণ কঠিন বাঁধন,
সে তো নির্মম কারা।
তাই তো আমার শাখা-নীড়ে আজি
করুণ-রাগিণী উঠিতেছে বাজি,
গোপনে ব্যথায় ঝরে পড়ে হায়
গলিত বেদনা-ধারা,
বহু দূরে তাই আমি চলে যাই
স্বপ্ন হোয়েছে সারা।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সরের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে... রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL
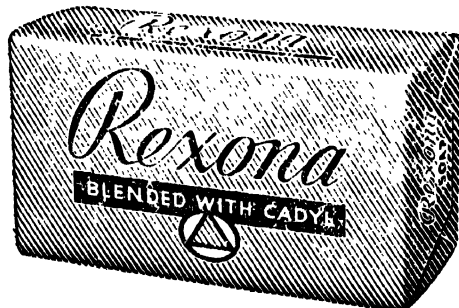
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্নলেখা দাশগুপ্তা

সমস্ত পার্টিটা মঞ্জুর কাছে এতোই অরুচিকর লেগেছিল যে, ও নিয়ে কথা বলতে ওর আর মন ছিল না। নইলে বলে না গেলেও এসে বলতো। বরং বলতো আরো রং চড়িয়েই—যদি ও রজতের এই রাজকীয় লাঞ্চ পার্টির রাজকীয় অপব্যয়ের উপর আর কিছু কারিগরি চালাবার শক্তি ওর ছিল না। তবু দু'চোখ বড় বড় করে তুলে মুগ্ধ-বিস্ময়ের ভাণ করে বর্ণনা দিত সেই পরমাশ্চর্য খাদ্য-তালিকার। দরজায় স্বাগত সম্ভাষণরতা মডেলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি হতে আরম্ভ করে প্রতিটি বিভিন্ন নারী-পুরুষের বিভিন্ন রকমের পোষাক-পরিচ্ছদের আর চলন-বলনের ব্যয়ের অঙ্কের। বলত, আহা তোরাই দেখলিনে! আমার এমন দুঃখ হচ্ছে, আপসোস হচ্ছে। এ্যাঁ বলব আর একদিন এমনি একটা পার্টির আয়োজন করতে? ওদের পক্ষে কি আর এমন। আমাদের পাঁচ সাত টাকা ওদের পাঁচ শত হাজার টাকা এক কথা তো—বলবো? দেখবি প্রতিটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে তোর কেবল মনে হবে—

'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী,
হে অনন্ত যৌবনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমার কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।'

যাবি দিদি? আমি বললে ভদ্রলোক ঠিক আর একদিন এমনি একটা পার্টির ব্যবস্থা করবেন। এতো ভালো না—একেবারে ভীষণ। তারপর লজ্জার রং মিশিয়ে থেমে থমকে যেন বলতে চায় না, ভেতরের আবেগ চেপে রাখতে পারছে না বলেই বলে ফেলছে, এমনি করে বলত রজতের কথা আর দেখত মৌরীর মুখের চেহারা বদল। ক্ষেপানোর এমন একটা বিষয় হাতে পেয়েও যে ছেড়ে গেল মঞ্জু, তা একেবারেই তিক্ত বোধে।

তবু কিন্তু মঞ্জুকে দেখা গেল একদিন রজতেরই হোটেলের করিডোর দিয়ে দ্রুত পায় প্রবেশ করতে এবং রজতের বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দিতে।

আজ ছুটির দিন দেখে সকাল বেলা বেরিয়েছিল সে তার এক বন্ধুর দেওয়া দুটো ঠিকানা নিয়ে টুইসনের খোঁজে। দু' জায়গা থেকেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে তাকে। ইয়োরোপীয় দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে পড়তে উপায় করার নানা সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করতে করতে পথ চলছিল মঞ্জু আর ক্ষুব্ধ ভাবে ভাবছিল, একটা বি, এ অনার্সের ছাত্রী সে, একটা সামান্য রোজগারের পথ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেও করে উঠতে পারছে না!

রত্না কিন্তু হঠাৎ করে একটা বেশ ভালো টুইশন পেয়ে গেছে। একটি এ্যাংলো মেয়েকে বাংলা শেখানো। সপ্তাহে তিন দিন। পঁচাত্তোর টাকা মাইনে। ও যদি এমনি একটা জোগাড় করতে পারতো। হঠাৎ পথের মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। রজতের সেই লাঞ্চে বহু ইয়োরোপীয়ান মহিলার ভিড় দেখেছে সে। তাদের ভেতর তো কারু বাংলা শেখার প্রয়োজন না থাক, সখ থাকতেও পারে। যদি না-ও থাকে তবে কথাটা মনে হচ্ছে না বলেই হয়ত নেই। বললে উৎসাহবোধ করতে পারে। বিশেষ করে কথাটা যদি আবার রজত বলে। হাঁ নিশ্চয়—রত্নার মতো একটা কাজ রজত ওকে ঠিক করে দিতে অনায়াসে পারে, এই মুহূর্তে পারে।

মঞ্জু যখন গিয়ে রজতের ঘরের মেহগনি কাঠের ভারি দরজার বন্ধ কপাটে টোকা দিয়ে দাঁড়ালো, তখন দশটা বেজে না গেলেও বাজে। এই কিছুক্ষণ হলো মাত্র বিছানা ছেড়ে সোফায় এসে বসে'ছল রজত। বয় লেবুর রস দেওয়া র' কফি দিয়ে গেলে বসে বসে তাতে গলা ভিজোচ্ছিল আর বিস্বাদ—বিস্বাদ যেন তার রাত ভো' স্পিরিট ঢালা জিবে মনে শরীরে, বিস্বাদ যেন তার পুরো জীবনটার প্রতি এমনি ভাবে প্রতিটা চুমুকের সঙ্গে মুখ বিকৃত করতে করতে বাঁ হাতে রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলোকে পেছন দিকে ঠেলছিল। এমনি সময় দরজায় টোকার শব্দ হলো। যে ভাবে ঝুঁকে বসেছিল তেমনি ভাবে বসে থেকে চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বিরস গলায় সাড়া দিল সে—কাম ইন—কাম ইন। মঞ্জু ভেতরে ঢুকে বেশ কয়েক পা ঘরের ভেতর এগিয়ে এলে মুখ তুলল সে। প্রথম মুহূর্ত্তটায় যে মঞ্জুকে কোন সম্ভাষণ করে উঠতে পারলে না রজত সেটার কারণ বোধ হয় অবিশ্বাস্য আনন্দ। তারপর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে আহ্বান জানালো—আরে এসো এসো।

মঞ্জু আরো কয়েক পা এগিয়ে এলে সম্ভ্রম ভঙ্গিতে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিল বসতে।

মঞ্জু বসলে সে-ও বসল মঞ্জুর মুখোমুখি কৌচে। টেবিলের উপরের টিনটা থেকে একটা সিগারেট টেনে বের করে দুই ঠোঁটের চাপে ধরে লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলল—'প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু, দিন যাবে আজ ভালো' কি বলো?

লাইটারের পলক আলোয় রজতের মুখের যা সব আগে মঞ্জুর চোখে পড়ল তা হলো, তার দুই চোখের কোল-গড়ানো গভীর কালি—সুর্মা-ঢালা কালি।

লাইটার নামিয়ে মঞ্জুর দিকে তাকালো রজত—কফি খাবে?

—না। কফির গন্ধ আমার ভালো লাগে না।

—বাঙ্গাল আর কা'কে বলে। আচ্ছা, চা আসছে। চা-ই খেয়ো। মঞ্জুর দিকে একটু ঝুঁকে বসল রজত—তারপর বলো দেখি শুনি, তোমার সে দিনের প্রার্থনায় জোর ধরেছিল?

হাসল মঞ্জু।

—অবশ্যি তুমি বলবে তোমার প্রার্থনায় জোর ছিল কি না তার পরখ তো হবে আমাদের দিয়ে। আশা হয় তোমার?

—হয়। হাসিমুখে জবাব দিল মঞ্জু। তবে প্রার্থনার ফললাভ তো হাতে হাতে হয় না কিন্তু একদিন না একদিন নাকি হয়ই। ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

—কবে অপেক্ষা?

সরল ভাবে 'হাঁ' বলতে গিয়ে রজতের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মঞ্জু।

হাসল রজত। ছেলেমানবি করছি। যেন আপনাকে আপনি বলে উঠে পড়ল রজত সোফা ছেড়ে। হাঁটাহাঁটি করতে করতে বললে—আমি তো জানি আমাকে ধমক দিয়ে নিজে তুমি বাড়ী ফিরে গিয়ে দিব্য পেট পুরে খেয়েছ। তাই তোমার প্রার্থনায় জোর না ধরলেও আমারটায় নিশ্চয়ই ধরেছিল। একে তো নির্জলা উপোস করেছিই। তার উপর জানতো, সাধনায় বসবার আগে সাধকরা সিদ্ধি গাঁজা ভাঙ্গ কারণ যা হোক একটা নেশায় বুঁদ হয়ে বসেন। তাতেও ত্রুটি রাখিনি আমি। আচ্ছা, সেদিন তোমার খুবই খারাপ লেগেছিল না?

—লেগেছিল।

—কিন্তু কেন?

—ভালো লাগছিল না বলে।

হেসে ফেলল রজত।—তোমার কি ভালো লাগে বলো?

—ভাবতে হবে।

—বেশ ভেবেই বল। বলল রজত।

—এতো তাড়াতাড়ি হবে না। মনে সর্বদাই তো কত চাওয়ার ভিড় লেগে রয়েছে কিন্তু যদি দৈববাণী হয়, 'বর নাও।' তখন কি আমরা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারি কি ছাই!

—পারো না?

—না। মাথা নাড়ল মঞ্জু। পারি না। আমি আকুল হয়ে ভেবে দেখেছি, খুঁজে পাইনে। সব চাওয়া কেমন যেন তুচ্ছ হয়ে উঠে চোখের উপর দিয়ে, একের পর এক করে মিলিয়ে যেতে থাকে। হাসল মঞ্জু। আপনারটাও ভেবে দেখতে সময় লাগবে। এটা ওটা একটা কিছু বলে ঠকে যেতেও তো পারি।

দৃষ্টিটাকে একটা কিছুর ওপর রেখে রজতকে অন্যমনস্ক ভাবে বসে বসে চুল পেছন দিকে ঠেলতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—কি ভাবছেন এতো?

—তোমাকে। তোমার কথা অনেক সময়েই আমি এমনি ভাবি। আচ্ছা মঞ্জু, তুমি কখনো কাউকে খুব ভেবেছ—ভীষণ ভাবে ভেবেছ?

তৎক্ষণাৎ টেনে টেনে জবাব দিল মঞ্জু—হাঁ—আ—আ।

—কে সে?

—বলবো?

—বলো।

—আমার নজরটা সব দিকেই সাংঘাতিক রকমের উঁচু। সাধারণ মানুষে আমার মন নেই। রাজা মহারাজাদের কাল তো কালিদাসের কালের মতো হারিয়েই গেল। অগত্যা মন্ত্রীদের মধ্যে যিনি মহামন্ত্রী তাঁর কথাই ভীষণভাবে ভাবি আমি। প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে মালা গাঁথা, প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে সে মালা আমার জলে ভাসানো। শীতে গাঁথি শ্বেতপদ্ম। বসন্তে কামিনী। বর্ষায় সন্ধ্যামালতী। গ্রীষ্মে ভাসাই কাশের গুচ্ছ। চোখের জলের চাইতে পবিত্র বারি নেই। তাই সে মালা রাতে চোখের জলে ভিজিয়ে রেখে ভোরে ভাসাই জলে। যেদিন আমার মালা আমার নিঃশ্বাসের, আমার চোখের জলের উষ্ণতা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁর গলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—সেইদিন ধন্য হবো আমি।

—এসো দিচ্ছি আমি মালা দেবার ব্যবস্থা করে।

—উহুঁ, তেমন দেওয়া নয়—দশের মধ্যে একজন হয়ে দেওয়া নয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ব্যর্থ হবে তবু আমার মালা, আমার মালা বলেই এসে প্রসন্ন হাস্যে গলায় না পরা পর্যন্ত সে মালা জলেই ভেসে যাবে।

—আচ্ছা, তোমার মালা তিনি তোমার মালা বলেই একান্তে গলায় পরলেন। কিন্তু তারপর করবে কি তাকে নিয়ে তুমি? সকালবেলা আলু-পটল মাছের ফর্দ হাতে বাজারে পাঠাবে?

—না। তাঁর রাজকাজই তিনি করবেন। শুধু দিনের কাজের শুরুতে চুপি চুপি কানের কাছে মুখ নিয়ে বলবো, রাজকাজে যাবার আগে আমার কথাটা একটু শুনে যেও গো।

হেসে উঠল রজত—তোমার রাজার কানে কানে বলা কথাটা কি, নিশ্চয়ই সেটা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে শোভন হবে না। কিন্তু তারপর?

—তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারিনে। রাজার রাজত্বের চেহারাই যাবে বদলে। ওঃ, আপনি ভাবছেন তো কি ধৃষ্টতা কি স্পর্দ্ধা মেয়েটার! কিন্তু শিক্ষিত নার্সের চাইতেও যেমন মঙ্গল ইচ্ছার জোরে আর হৃদয়ের জোরে মূর্খ মা সন্তানের পক্ষে অনেক বেশী মঙ্গলের হয়ে থাকেন, তেমনি রাজার রাজত্বের মঙ্গলের পক্ষেও সব চাইতে বেশী মঙ্গলের কাজ করতে পারে শুভ ইচ্ছার জোর, আর হৃদয় পারে না?

—রাজার গলায় মালা দেওয়া তোমার ঘটুক আর নাই ঘটুক—তুমি অনেক কাজ করবে মঞ্জু—নিশ্চয়ই অনেক কাজ করবে।

যেমন বসেছিল তেমন বসে থেকেই ডান হাতটা মঞ্জু রজতের দিকে বাড়িয়ে বললো, করবো একটা প্রণাম?

—আরে, কি পাগল! একেবারে ওপুড় হয়ে মঞ্জুর বাড়ানো হাতটা দু' হাতে মুঠো করে ধরল রজত।

ওয়েটার এসে প্রাতরাশ হাতে ঘরে ঢুকতে মঞ্জুর হাত ছেড়ে দিল রজত। হাতের ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ওয়েটার চলে গেল।

—এই এগারোটার সময় ভোরের খাওয়া? আমি এ সময়ই চা খাই। আজ নিশ্চয়ই তোমার উপোসের দিন নয়।

—না বলে এগিয়ে বসে ট্রেটা মঞ্জু টেনে নিল কোলের কাছে। তারপর ফলের ডিসটার ফল নামিয়ে খাবারগুলো কিছু কিছু প্লেটে তুলে নিয়ে নিজের জন্য রেখে বাকি সব ধরে দিল রজতকে।

—এটা কি হচ্ছে? আমি খেলে কি আনিয়ে নিতাম না। সকালে আমি শুধু চা খাই। ওদের দেবার নিয়ম, দিয়ে যায়।

—আচ্ছা আজ খান। ডিম-রুটির ডিসটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল—সকালে এমন না খাওয়াটা কিন্তু ভালো নয়। দুপুরে খান ক'টায়?

—একটা দুটো তিনটে।

—অ্যাঁ—দু'চোখ বড় করল মঞ্জু। আমার দিদির তত্ত্বাবধানে থাকলে দেখিয়ে দিত লিভার নষ্ট করা, আপনার এই খালি পেটে চা-কফি খাওয়া।

মাথা একেবারে এ কাত ও কাত করল রজত—স্বাস্থ্য খারাপ হয় এমন কাজ আমি কখনো করিনে। লিভারের উপর আমার মায়ার খবর তুমি কি জানবে? চা-কফি খাবার আগে দুখানা এরারুট-বিস্কুট খেয়ে নিতে আমার কোন দিনও ভুল হয় কিনা ডেকে জিজ্ঞাসা করো ওয়েটারকে। চামচে দিয়ে ডিমের পোচটা তুলে মুখে ফেলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল রজত। আচ্ছা মঞ্জু, সেই আশ্চর্য্য নীল চোখের ছেলেটি কে? যদিও তার চেহারায় আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু তার চোখের নীল রংটাই সেদিন আমার দৃষ্টি টেনেছিল সব চাইতে বেশী। কে সে?

হাতের টোষ্ট নামিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—কোথায় দেখলেন আপনি তাকে?

—কফি-হাউসে।

—আমার সঙ্গে?

—অবশ্যই।

—কখনোই কফি-হাউসে আমার সঙ্গে তাকে আপনি দেখতে পারেন না।

—তবে লেকে?

—তাও না।

—পার্কে?

—কোন পার্কে? তারপর রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—না তা-ও দেখেন নি। মিথ্যে বলছেন।

—মিথ্যে বলছি? এই চেহারার কারু সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই?

—তা আছে। কিন্তু কোথায় দেখলেন, তাই বলুন?

—সেদিন তুমি যখন না খেয়ে বেরিয়ে এলে আমি তোমার পেছন পেছন এসেছিলাম। তুমি দেখনি। একেবারে একরোখে চলেছিলে তো? হঠাৎ মস্ত একটা গাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে তোমায় নমস্কার জানালে, তুমি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে বলে উঠলে—'আরে, আপনি কোথা থেকে! ভারি মজা তো!' তখন আমি তোমাদের পেছনেই ছিলাম।

—তাই বলুন। আবার টোষ্ট হাতে তুলে নিল সে। গাড়ী থেকে নামলেও সে কিন্তু আপনাদের জগতের কেউ নয়। আমাকে বাঙ্গাল বলছিলেন তো, ইনি তার চাইতেও বাঙ্গাল। দেশ ছেড়ে এখানে এসেছেন দেশ ভাগেরও বহু পরে।

—তারপর?

—তারপর বাস করেন উদ্বাস্তুদের গোয়ালে। খান আকাঁড়া চালের ভাত আর কচুর তরকারী।

রজত ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনতে শুনতে যে একে একে তার ডিসের সমস্ত খাবার ওর ডিসে তুলে দিতে লাগল, মঞ্জুর লক্ষ্যে তা পড়ল না। সে খেতে খেতে নিজের ঝোঁকে বলে চললো—মনে আছে দিদির বিয়ের দিন সন্ধ্যায় খবর দিতে এসেছিলাম বিয়ে না হবার। আপনি এক ডিসভর্তি সুস্বাদু খাবার সামনে ধরে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত দিন তোমার খাওয়া হয়নি।' সেদিন এই ভদ্রলোকটির স্কুল তৈরীর কল্পনা পরিকল্পনা শুনতে শুনতে দিন এমনই গড়িয়ে গিয়েছিল যে, তার মধ্যাহ্নের খাদ্য-তালিকার প্রধান মেনু সেই অনবদ্য কচুর তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু সে তরকারী গলায় এমনই হুল ফোটাতে লাগল যে আমার পক্ষে দু' গ্রাসের বেশী তিন গ্রাস মুখে তোলা সম্ভব হলো না। শুধু এঁর ক্ষুধার্ত খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম।

—স্কুল কেমন চলছে তার? বেকনের টুকরোগুলো মঞ্জুর ডিসে তুলে নিজের প্লেট খালি করে রজত হেলে বসল সোফায়।

—স্কুল হয়ই নি।

—কেন?

সংক্ষিপ্ত ভাষণে নীলের স্কুল পরিকল্পনা কাজে পরিণত না হবার ঘটনা বলে খাওয়া শেষ করল মঞ্জু। তারপর টি-পট থেকে চা ঢেলে রজতের হাতে একটা কাপ তুলে দিয়ে নিজের কাপটা হাতে নিয়ে সোফায় পিঠ রাখলো সে-ও। বর্ত্তমানে ইনি এখন সাহিত্যিক নামলিপ্সু কোন এক ধনীর মজুরি করছেন। তার ঠাণ্ডা ঘরে মূল্যবান সিগারেট আর বিলিতি নক্সাতোলা কাপে চা খেতে খেতে নাম-শুদ্ধ লেখা বিলি করে চলেছেন। সামনে পূজোর মরশুম, তাই নাকি এখন তার নিঃশ্বাস ফেলবার সময় মিলছে না। বলেন, উপাদেয় খাবার খাই। গাড়ীতে যাতায়াত করি। ঠাণ্ডা ঘরে বসি—সম্রাটের মতো কাটছে দিনগুলো। বেচারা!

—এই সৌভাগ্যবান বেচারার নাম?

—কি? বলে রজতের দিকে তাকাতেই রজতের কৌতুকোজ্জ্বল চোখের সঙ্গে চোখ মিললে হেসে ফেলল মঞ্জু। তার নাম? তার নাম নীল। চা'টা ঢক-ঢক করে খেয়ে নিয়ে কাপটা রাখতে রাখতে বললো—যত বাজে কথায় সময় নষ্ট করছি। যে জন্য আসা তাই এখন বলা হলো না। আমি কিন্তু একটা বিশেষ দরকারে আজ আপনার কাছে এসেছিলাম।

—বেচারার সঙ্গে পরিচয় করা যাবে একদিন কিন্তু বিশেষ দরকারে এসেছিলে? কি বলোতো? অত্যন্ত উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করে মঞ্জুর দিকে ঝুঁকে বসল রজত।

—একটা কাজ চাই।

—কাজ? যেন 'কাজ' শব্দটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারল না রজত।

—হাঁ কাজ। একটা ছোটখাটো কাজের ভীষণ দরকার আমার। অবশ্য কলেজের ফাঁকে। আমার এক বন্ধু একটি এ্যাংলো মেয়েকে বাংলা শেখানোর চমৎকার কাজ জোগাড় করেছে। সেটা দেখেই আমার মনে এলো আপনার সে দিনের পার্টিতে বহু বিদেশিনী সমাবেশ দেখেছিলাম। এমনি একটা কাজ হয়তো জোগাড় হয়ে যেতে পারে আপনার কাছে এলে। আর শুধু বিদেশীরাই বা কেন, দেখলাম দেশীরাও তো প্রায় অনেকেই আপনারা—বাংলা জানেন না।

—আমরা বাংলা জানিনে!

—কোথায় জানেন। ইংরেজিতেই তো নিজেদের ভেতরও কথা বলছিলেন।

—সে কি জানিনে বলে ?

চুলের গোছা আঙুলে জড়াতে আর খুলতে খুলতে বিব্রত কণ্ঠে রজত বললো—মুসকিলে ফেললে দেখছি।

স্বভাব মানুষের সব কিছু ঠেলে আগে এসে দাঁড়ায়। এই করতে গিয়ে যে সে নিজের দরকারী কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে খেয়াল মঞ্জুর রইল না। বললো—জানেন, যাঁরা নিজেদের ভেতরও নিজের ভাষা ছেড়ে ইংরেজী ব্যবহার করেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। বলে ঠোঁটে মুখে একটা অবজ্ঞার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করল মঞ্জু। কিন্তু যাঁরা তা করেন না তাঁরাও অন্যভাষী হলেই সোজা চলে যান ইংরেজীতে। আজও এ কেন করে চলেছেন আপনারা ?

বিস্মিত কণ্ঠে রজত বললো—যাদের কথা তুমি শরীর থেকে আরশোলা ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো মুখ করে ঝেড়ে ফেলে দিলে, তারা কেন তাদের মায়ের মুখের কথা ছেড়ে অপরের মায়ের মুখের কথায় কথা বলে, এ তুমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে পারো। কিন্তু যারা বিদেশী তাদের সঙ্গে ইংরেজী বলা ছাড়া উপায় কি ?

—উপায় না বলা। আগবাড়িয়ে যদি কেউ নিজেদের ভাষায় কথা বলতে শোনে তবে সে তো তাদের মস্ত সুবিধার কথা। কষ্ট করে অপর ভাষা শিখতে বসবে তারা কেন ? জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে কোন শিক্ষাটা আমাদের। কিন্তু ইংরেজী না জানলে যেমন ইংরেজদের দেশে বসবাস অসম্ভব হয়, হিন্দি না জানলে হিন্দিভাষীদের রাজ্যে, তেমনি বাংলা না জানলে বাংলা দেশে চলাও অসম্ভব হবে—এই তো হওয়া উচিত—এই তো করে তোলা উচিত।

মঞ্জুর মুখের চার পাশে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দাঁড়ানো বিন্দু-বিন্দু উত্তেজনার ভিড় দেখতে লাগল রজত।

—কিন্তু আপনাদের ভেতরই যদি থাকে অবজ্ঞা থাকে অনাদর, তবে কি করে কি হবে ?

রজতকে আঙুলের টোকায় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে দেখে বলল—কি, হাতের ঐ সিগারেটটার ছাই ঝাড়ার মতোই ঝেড়ে ফেলে দিলেন তো কথাগুলোকে আমার একেবারে টাটকা টাটকা ?

—না। তুমি একথাই তো বলতে চাচ্ছ যে, প্রয়োজন হয় বলে প্রয়োজনের চাপেই আমরা শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় ভাষাগুলো শিখে থাকি। বাঙলা ভাষার পেছনেও একটা প্রয়োজনের চাপ বা তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে—আর কোথাও না হোক বাংলাদেশটুকুর মধ্যে নিশ্চয়ই। ঠিক। কি করতে হবে বলো ?

—আমি বলবো কি করতে হবে !

—তুমিই বলবে। আমার কাছে তো এ-সব অচেনা জগতের চিন্তা।

—তবে সে কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি উঠবো। বৌদিরা অপেক্ষা করবেন খাওয়া নিয়ে। যদি আপনার বান্ধবীদের কেউ বাংলা শেখেন তবে আমি শেখাতে পারি এবং বর্তমানে দেশের প্রয়োজনে নয়, নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই বলছি। পাছে রজত কথাটার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, তাই ব্যাগ খুলে দু' টুকরো কাগজ বের করে রজতের সামনে ধরে বললো, এই দেখুন না দু'-দুটো কাজের জন্য ঘুরে নিরাশ হয়ে তারপর আপনার কথা মনে পড়েছে, আপনার কাছে এসেছি। একটা টাকা রোজগারের উপায় না করতে পারলে চলবেই না যে।

রজত সোফায় বসেই হাত বাড়িয়ে পাশের দেরাজটা টেনে খুলল। তারপর তার ভেতর থেকে বের করল একটা চেক-বই আর একটা কলম। টেবিলের উপর লম্বা চেক-বইটা মেলে ধরে প্রথমে লিখল মঞ্জুর নাম। তারপর একটা টানা সই দিল নিজের। কাগজটা ছিঁড়ে কাগজ চাপা দিয়ে রাখল মঞ্জুর সামনে।

বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—কি এটা ?

—চেক। তোমার প্রয়োজনটা আমি জানিনে। অঙ্কটা তুমি বসিয়ে নিও।

চেকটা হাতে তুলে নিল মঞ্জু। কিছুক্ষণ নীরবে রজতের নাম সইটা দেখলে, তারপর চোখ তুলে বললো—পাঁচ দশ বিশ হাজার—বসাবো ?

—বসাও।

—কিন্তু তারপর আর যে কোন দিনও আমাকে দেখে দিন ভালো যাবার কথা আপনার মুখে আসবে না ?

—আসবে।

—আসবে ?

—হাঁ আসবে। তুমি রোজ এসো।

—এমনি সাদা চেক সই করে দেবেন একটা করে ?

—দেবো।

—তারপর ?

—তারপর যে দিন না পারবো সে দিন তুমি খাওয়াবে আমায়।

—আমি ? কিন্তু টাকা নিয়ে তো আমি জমিয়ে রাখবো না ?
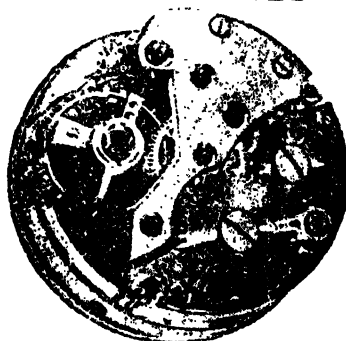
তখন আপনার এক সন্ধ্যার উপকরণ সংগ্রহের সাধ্যও যে আমার মত বিশটা মঞ্জুর হবে না।

—ছেড়ে দেবো।

—পারবেন না।

—পারবো। দেখো তুমি।

—শুভস্য শীঘ্রম্। আজ থেকেই। বার বার চেক কাটার দরকারটা কি। কেটে দিন একবারে। আপনার কিছু নয়।

হাসল রজত—না আমার কিছু নয়।

আজ সন্ধ্যায় আসবো আমি দেখতে। ঠিক?

উঠে মঞ্জুর সোফার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রজত তার তামাটে হাতের লম্বা লম্বা আঙুলে মঞ্জুর মাথাটা সস্নেহে একটু চাপড়ালো। তারপর দু-হাত পেছনে রেখে পায়চারী করতে লাগল ঘরের এ-মাথা ও-মাথা।

টেবিলের ওপর থেকে রজতের কলমটা তুলে নিয়ে ময়ূরের উল্টানো পেখমের মতো গোটা নয় দশ পেখমধরা নয়ের সারি চেকটার মধ্যে লিখে কলম বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু।

—নিলে না।

—কাজের খোঁজ নিতে আসবো। মনে থাকবে তো আপনার?

—থাকবে। সেই খোলা দেরাজটার ভেতর একসঙ্গে ভাঁজ করা সামনে যে দশ টাকার নোটের পাঁজাটা ছিল সেটা তুলে মঞ্জুর ব্যাগটা ওর হাত থেকে নিয়ে তার ভেতর ভরে দিতে দিতে রজত বলল—ধার দিলাম। কাজ পেয়েই শোধ দিও।

এ টাকা যে ওর পক্ষে এখন কি, জানে শুধু মঞ্জু। কিন্তু এ ঘর থেকে টাকা হাতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। এর চাইতে অসুন্দর দৃশ্য ওর ধারণা ও আর কোন দিন কিছু দেখেনি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

ব্যাগটা নিজ হাতে মঞ্জুর কাঁধে ঝলিয়ে দিয়ে রজত বলল—সব কিছু নিয়ে এতো অযথা ভাবতে নেই। বিশেষ করে তোমার মুখে চিন্তা মানায়, ভাবনা মানায় না একেবারেই।

প্রয়োজনের চেহারা এক এক সময় এমন দুর্দান্ত হয়েই দেখা দেয়, যখন অসুন্দরকে শুধু বুঝি চোখ বুজে আর ঢোক গিলেই এড়াতে হয়।

বাড়ীতে ঢোকার আগে টাকাগুলো ব্যাগ থেকে বের করে রুমালে জড়িয়ে বুকের ভেতর ঢোকালো মঞ্জু। কোথায় রাখবে, কে দেখে ফেলবে কে জানে! কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। সে টাকা আর মঞ্জু বেরই করল না জামার ভেতর থেকে। বিকেলে গা ধুতে গিয়ে মনের ভুলে গায়ের জামা খুললে ঘামে ভেজা রুমালশুদ্ধ টাকা পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর। টাকাটা তুলে হাতে নিয়েও কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে। যদি ও দেখতে না পেত, খেয়াল না করত! এই তো মৌরী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে তাড়া দিয়ে গেল তাড়াতাড়ি করবার জন্য। ও বেরুলেই তো সে এসে ঢুকতো। তার চোখেই তো পড়ত রুমালে জড়ানো এই টাকা। সেই তো উপুড় হয়ে তুলত। তারপর পাগল হয়ে উঠত না সে। ক্ষেপামি শুরু করত না সে! শুনত কোন যুক্তি? মানত কোন কারণ? রজতের এই দেওয়ার পেছনে কোন মতলব নেই, ওর এই নেওয়ার পেছনে কোন অমর্যাদা নেই—দুই ঠোঁটে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো বিদ্রূপের ঢেউ তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিত না কথাগুলোকে মৌরী ঢেউএর মাথারই বস্তুর মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্জু যেন যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, তার ত্রাস আর অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার আরাম এই দুই অনুভূতির উপর দিয়ে একবার সখের পদচারণা করে এলো।

[ক্রমশঃ।

মানসতীর্থে

বাণী পালচৌধুরী

হে যাত্রী মহান্,
চলেছো গতির পথ অবারিত করি, ভরে নিতে প্রাণ
বিরাট যজ্ঞের আহ্বানে,
অসীম লক্ষ্যের পানে
তাই বিস্তারিত পথ।

অরণ্যের নিঃসঙ্গ মর্ম্মরে
যে বাণী রাখিয়া গেলে অশরীরী স্বরে
উপল-নির্ঝরে
ক্ষীণ স্রোতস্বিনী বীচিভঙ্গ 'পরে
যে ধ্বনি রণিয়া উঠে আত্মহারা
সে তোমারই গতিহীন প্রাণধারা
মর্ম্মের নিবেদন অনন্তে।

সৃষ্টির অস্পষ্ট প্রভাতে
পটান্তরে, নিশ্ছিদ্র অন্ধ রাতে
পেয়েছিলো তোমার অন্তর
আদিদেবতার পরম নির্ভর
হে পথিক, তাই সেই বিচ্ছুরিত হর্ষে
দিব্যজ্যোতি অপ্রমেয় বিরাটের স্পর্শে
জীবনের প্রথম দীক্ষা।

তোমার চরণপাতের শতোত্তর চিহ্ন
করিবে না অপসৃত এ দীন মালিন্য?
করিবে না আর বার বীর্য্যে, তেজে, ক্ষেমে
প্রসারিত জগতের প্রেমে
পুণ্যপূত তব আশীর্ব্বাদ?

১৩৬৫ সালের উল্লেখযোগ্য বই

ভ্রমণ ও অভিযান

অকারণের পথ ৪-৫০	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	মিত্র ও ঘোষ
আজকের পশ্চিম ৪-৫০	ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	এশিয়া
জাপানে ৬-৫০	অন্নদাশঙ্কর রায়	এম, সি, সরকার
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ ৫-০০	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
নেপোলিয়নের দেশে ২-০০	দিলীপ মালাকার	ঐ
বিদেশ-বিভুঁই	দক্ষিণারঞ্জন বসু	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫-৫০	গোপালদাস মজুমদার (সম্পাদিত)	গোপালদাস পাব্লিশার্স
হিমতীর্থ ৩-৫০	সুকুমার রায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স

জীবনালেখ্য ও মনীষী প্রসঙ্গ

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ১-৫০	কুমুদরঞ্জন রায়	এস রায় এণ্ড কোং
কবি সুকান্ত ২-৫০	অশোক ভট্টাচার্য	সারস্বত লাইব্রেরী
কেশবচন্দ্র সেন ১-০০	যোগেশচন্দ্র বাগল	বঙ্গীয় সাঃ পঃ
ক্রীড়াজগতে দিকপাল বাঙালী ৩-৫০	অজয় বসু	দেবদত্ত এণ্ড কোং
দরদী শরৎচন্দ্র ৪-৫০	মণীন্দ্র চক্রবর্তী	বসুধারা
ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী ২-০০	আবদুল আজীজ আল আমান	জাগরণ প্রকাশনী
নজরুলকে যেমন দেখেছি ২-৫০	বেগম শামসুন নাহার	ভারতী লাঃ
নজরুল প্রসঙ্গে ৪-০০	মুজাফ্‌ফর আহমেদ	বিংশ শতাব্দী
বাবার কথা ৩-০০	উমা দেবী	মিত্রালয়
বাঘা যতীন ২-৭৫	শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়	আই, এ, পি
বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬-০০	দীনেশ চট্টোঃ (সম্পাদিত)	বিদ্যোদয়
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম) ৫-০০	অচিন্ত্য সেনগুপ্ত	এম, সি, সরকার
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ৩-০০	মণি বাগচী	শ্রীগুরু
ভারতের সাধক (৪র্থ খণ্ড) ৬-৫০	শঙ্করনাথ রায়	প্রাচী
রামমোহন ৪-০০	মণি বাগচী	জিজ্ঞাসা
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ২-৭৫	অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	আই, এ, পি
স্মরণীয়	সুশীল রায়	ওরিয়েণ্ট

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ৬-০০	দীপ্তি ত্রিপাঠী	নাভানা
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ৫-০০	ত্রিপুরাশংকর সেন	পপুলার লাইঃ
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ১০-০০	অসিতকুমার বন্দ্যোঃ	বুকল্যাণ্ড
কবিতার ধর্ম ও আধুনিক বাংলা কবিতার ঋতুবদল ৪-০০	অরুণ ভট্টাচার্য	জিজ্ঞাসা
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫-০০	মনজীদা খাতুন	ভারতী লাইব্রেরী
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র	যোগেশচন্দ্র বাগল	শ্রীগুরু
চলচ্চিন্তা ২-৫০	রাজশেখর বসু	মিত্র ও ঘোষ
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ৩-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ	পাইওনিয়র
ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ৫-০০	মোহিত পুরকায়স্থ	ফার্মা কে, এল
বঙ্গ প্রসঙ্গ ৫-০০	সুশীল রায় (সম্পাদিত)	পঃ প্রঃ ভবন
বর্বর যুগের পর ২-৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	কথামালা
বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র ৫-০০	অহীন্দ্র চৌধুরী	বুকল্যাণ্ড
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য়) ৫-০০	গোপাল হালদার	এ, মুখার্জি
রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫-৫০	বিমলকান্তি সমদ্দার	গুরুদাস
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ৭-০০	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	বিদ্যোদয়
সাহিত্যে ছোট গল্প ৮-০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ডি, এম
সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা ৫-০০	শৈলেন্দ্র সেনগুপ্ত	ফার্মা কে, এল

রম্যরচনা

অদ্য ও প্রত্যহ	নীলকণ্ঠ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
উপল-উপকূলে ২-২৫	নিমাইসাধন বসু	এ, কে, ঘোষ
একটি সুরের কান্না ২-৫০	ভারতপুত্রম্	সাহিত্য
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ৩-৫০	বাণী রায়	মুখার্জি বুক হাউস
ব্যান ও বন্ধ্যা ৩-০০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
ভেলকি থেকে ভেষজ ৬-০০	আনন্দকিশোর মুন্সী	ঐ
যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪-০০	বিক্রমাদিত্য	ঐ
লৌহকপাট	জরাসন্ধ	ঐ
সতুবন্তির গল্প ২-৫০	সতুবন্তি	ঐ
হরেকরকমবা	নীলকণ্ঠ	ঐ

রসরচনা

বানিয়ে বলছি না	প্রবুদ্ধ	বলাকা প্রকাশনী

ধর্ম ও দর্শন

দর্শন প্রসঙ্গ ৭-০০ ইন্দু মজুমদার আশুতোষ বুক ষ্টল
দর্শনের ভূমিকা ৬-০০ নীরদবরণ চক্রবর্তী এ, মুখার্জি
পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও
মার্ক্সীয় দর্শন ৫-০০ রবি রায় সিগনেট
স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন (বিনোবা) ১-৭৫ বীরেন্দ্র গুহ সর্বোদয়
হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা ৪-৫০ স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরি সত্যাশ্রম

সংগীত

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা ২-০০ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও
বীরেন্দ্র বন্দ্যো: এম, সি, সরকার
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের
স্থান ২-৫০ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ডি, এম

অভিধান

পৌরাণিক অভিধান ৭-০০ সুধীরচন্দ্র সরকার এম সি সরকার

রচনাবলী

প্রভাত গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ১০.০০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীভবন
বনফুল-রচনা-সংগ্রহ ৭.৫০ বনফুল মিত্র ও ঘোষ
মাইকেল-রচনাসম্ভার ১০.০০ প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত) ঐ
রচনা-সংগ্রহ (১ম খণ্ড) ১০.০০ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স

ইতিহাস

ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের
সাধনা ৪-০০ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য পপুলার
সম্রাট বাহাদুর শার বিচার ৩-০০ অপূর্বমণি দত্ত মিত্র ও ঘোষ

নানা নিবন্ধ

আধুনিক ইয়োরোপ দেবজ্যোতি বর্মণ বেঙ্গল পাব্লিশার্স
গণতন্ত্র প্রসঙ্গে ২.০০ অম্লান দত্ত মিত্রালয়
গ্রন্থাগার পরিচালনা ২.৫০ রাজকুমার চক্রবর্তী শ্রীগুরু
জেল ডায়েরী ৩.০০ সতীন সেন মিত্রালয়
টি বি সম্বন্ধে ৪.০০ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মিত্রালয়
নারীর উক্তি ২.৫০ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বিশ্বভারতী
পরমাণু শক্তি ৪.০০ অমলেন্দু দাশগুপ্ত
গোপালদাস পাবলিশার্স
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য
বেঙ্গল পাবলিশার্স
বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত ঐ

কবিতা

অমিল থেকে মিলে ১-৫০ মণীন্দ্র রায় এম, সি, সরকার
আলেখ্য ২-৫০ বিষ্ণু দে এম, সি, সরকার
আলোকিত সমন্বয় ২-০০ আলোক সরকার মিত্রালয়
জাতক ১-০০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ানা
ব্যঙ্গ কবিতা ৬-০০ বনফুল বেঙ্গল পাবলিশার্স
যে আঁধার আলোর অধিক ২-৫০ বুদ্ধদেব বসু এম, সি, সরকার
রক্তগোলাপ ২-৫০ বিমলচন্দ্র ঘোষ
শেষ সওগাত ৪-০০ নজরুল ইসলাম আই, এ, পি
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪-০০ সুনির্মল বসু মিত্র ও ঘোষ
সন্ধ্যামণি ৫-৫০ কালিদাস রায় এ, মুখার্জি
সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা ৪-০০ কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদিত) গ্রন্থগৃহ
স্বনির্বাচিত কবিতা ৪-০০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য আই, এ, পি

নাটক

অপরাজিত ১.৭৫ রমেন লাহিড়ী জাতীয় সা: প:
আকাশবিহঙ্গী ২.০০ অজিত গঙ্গো সেনগুপ্ত বুক ষ্টল
উটরোগ ২.০০ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো ডি এম
কবি ২.৫০ তারাশঙ্কর বন্দ্যো শ্রীগুরু
কালরাত্রি ২.০০ চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিংশ শতাব্দী
ক্ষুধা ২.৫০ বিধায়ক ভট্টাচার্য শ্রীগুরু
গৃহদাহ (শরৎচন্দ্র) ২.০০ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল গুরুদাস
চোর ২.০০ ছবি বন্দ্যো গোপালদাস পাবলিশার্স
ছায়ানট ২.৫০ উৎপল দত্ত পপুলার লাইব্রেরী
তিন সর্গ ১.৬২/২.০০ অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স
ত্রিনইন ১.০০ সুনীল দত্ত জাতীয় সাহিত্য প:
থানা থেকে আসছি ২.০০ অজিত গঙ্গো প্রকাশনী
নব একাঙ্ক ৩.৫০ মন্মথ রায় গুরুদাস
বহ্নিপতঙ্গ ২.০০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীগুরু
বারো ঘন্টা ১.২৫ কিরণ মৈত্র রাইটার্স কর্ণার
রাজলক্ষ্মী (শরৎচন্দ্র) ২.০০ দেবনারায়ণ গুপ্ত গুরুদাস
সকাল-সন্ধ্যার নাটক ৩.৫০ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মিত্রালয়

গল্পগ্রন্থ

অন্তরতমা বারীন্দ্রনাথ দাশ বেঙ্গল পাবলিশার্স
অপরূপা ৪.০০ শৈলজানন্দ মুখো ত্রিবেণী প্রকাশন
আনন্দনট ৩.০০ বিভূতি মুখো শ্রীগুরু
উত্তরণ ২.৫০ নরেন্দ্রনাথ মিত্র গুরুদাস
এক অঙ্গে এত রূপ ৩.০০ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নাভানা
এলাজি প্রমথনাথ বিশী বিশ্ববাণী
কাঠের ঘোড়া ২.৫০ কুমারেশ ঘোষ শতাব্দী
গল্পপঞ্চাশৎ ৮.০০ আশাপূর্ণা দেবী মিত্র ও ঘোষ
গল্পসঞ্চয়ন ৪.০০ প্রবোধকুমার সান্যাল শ্রীগুরু
চন্দ্রমল্লিকা ২.৫০ ভবানী মুখো এম সি সরকার
চৈত্রদিন ৪.০০ ননী ভৌমিক ন্যাশনাল বুক এ:
ছিলেন বাবুর দেশে ২.৫০/৩.০০ ধনঞ্জয় বৈরাগী আর্ট এণ্ড লেটার্স
জলপায়রা ৪.০০ প্রেমেন্দ্র মিত্র ত্রিবেণী প্রকাশন
দিবারাত্রি ৩.০০ বিমল কর শ্রীগুরু
দ্বন্দ্বমধুর ৩.৫০ মুজতবা আলী ও রঞ্জন
ত্রিবেণী প্রকাশন

বই	লেখক	প্রকাশক
প্রজাপতির রঙ ২.৫০	প্রবোধবন্ধু অধিকারী	নিউ স্ক্রিপ্ট
বরনারী ২.৫০	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	বিংশ শতাব্দী
বিয়ের প্রুফ বউ ২.৭৫	শিবরাম চক্রবর্তী	কথামালা
বিষপাথর ২.৫০	তারাশঙ্কর বন্দ্যো	শ্রীগুরু
মনোমুকুর	সমরেশ বসু	ক্লাসিক প্রেস
মহুয়া কথা	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	গুপ্ত প্রকাশিকা
মহুয়া মিলন	ধীরাজ ভট্টাচার্য	কারেন্ট বুক শপ
মায়াকুরঙ্গী ৩.৫০	শরদিন্দু বন্দ্যো	শ্রীগুরু
মেঘলা দুপুর ২.২৫	প্রতিভা বসু	এসো: পাবলিশার্স
মৃগশিরা ৩.৫০	হরিনারায়ণ চট্টো	শ্রীগুরু
রূপসীর শেষশত্রু ২.৫০	দীনেন্দ্রকুমার রায়	শ্রীগুরু
রূপের দায় ৩.৫০	অন্নদাশঙ্কর রায়	এম সি সরকার
সেই চিরকাল ৩.৫০	দেবেশ দাশ	মিত্র ও ঘোষ

উপন্যাস

বই	লেখক	প্রকাশক
অনমিতা ৪.০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	মিত্র ও ঘোষ
অন্ধ দিগন্ত ৫.০০	হরিনারায়ণ চট্টো	শ্রীগুরু
অরণ্যবাসর ৬.০০	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
আনোখীলাল পাখেটিয়া ২.৫০	বিক্রমাদিত্য	আই এ পি
আমার ফাঁসি হল ৩.৫০	মনোজ বসু	ত্রিবেণী প্রকাশন
উত্তরায়ণ ৪.০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যো	মিত্র ও ঘোষ
একটি আশ্বাস ৬.৫০	সুবোধ চক্রবর্তী	শ্রীগুরু
একটি স্বাক্ষর ৩.০০	রামপদ মুখো	এসো: পাবলিশার্স
কঙ্কপথ ২.৭৫	সুনীল সরকার	এশিয়া
কয়লাকুঠির দেশ	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কাঙ্গল গাঁয়ের কাহিনী ৪.৫০	শক্তিপদ রাজগুরু	গুরুদাস
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮.৫০	প্রমথনাথ বিশী	মিত্র ও ঘোষ
চায়না টাউন ৪.৫০	বারীন্দ্রনাথ দাশ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
চারপ্রহর ২.০০	মাহমুদ আহমদ	সাধারণ পাবঃ
জলতরঙ্গ ৪.০০	বনফুল	আই এ পি
ঝড় ও বিহঙ্গ	তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ডাকহরকরা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
তামসী	জরাসন্ধ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
তাঁপতাল ২.৭৫	লীলা মজুমদার	ঐ
তুমি সন্ধ্যার মেঘ ৫.৫০	শরদিন্দু বন্দ্যো	নিউ এজ
ত্রিযামা ৮.০০	সমরেশ বসু	ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
তৃতীয় ভুবন ৪.৫০	দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মিত্রালয়
দাঁড়ের ময়না ৩.৫০	পূর্ণেন্দু পত্রী	সাহিত্য
নক্ষত্রের রাত ৩.৫০	মতি নন্দী	আই, এ, পি
নীলদিগন্ত ৩.০০	নারায়ণ গঙ্গো:	গোপালদাস পাবঃ
নীলরাত্রি ৩.৫০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	আই, এ, পি
পার্ক ৪.৫০	সবিৎশেখর মজুমদার	প্রাচী
প্রদক্ষিণ	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ফানুসের আয়ু ৫.৫০	বিমল কর	কথামালা
বউড়ুবির খাল ৩.০০	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	শ্রীগুরু
বন্ধনহীন গ্রন্থি ২.০০	বাসন্তী বসু	বলাকা প্রকাশনী
বেগম ৩.০০	স্বরাজ বন্দ্যো:	ক্যালকাটা পাবঃ
বল্মীক ৪.০০	নারায়ণ সান্যাল	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
মৎস্যগন্ধা ৫.০০	অচ্যুত গোস্বামী	ডি, এম
মহারাণী ৩.৫০	বনফুল	ঐ
মন কেমন করে ৩.৫০	বিমল মিত্র	নিউ এজ
মন নিয়ে খেলা ৫.০০	ধীরাজ ভট্টাচার্য	এম, সি, সরকার
মনে মনে ২.০০	সত্যব্রত মৈত্র	মুখার্জি বুক হাউস
মৃগতৃষ্ণা	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মেঘ পাহাড়ের গান ২.০০	অনিলকুমার ভট্টাচার্য	ডি, এম
মেঘ ডম্বরু ৩.০০	প্রশান্ত চৌধুরী	বলাকা
মেঘের পরে মেঘ ৩.৭৫	প্রতিভা বসু	নাভানা
মৌসুমী ৩.০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	আই, এ, পি
মধুরে মধুর ৫.৫০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	এ, মুখার্জি
মধুমিতা ৪.৫০	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	বিদ্যোদয়
রূপসী রাত্রি ৫.০০	অচিন্ত্য সেনগুপ্ত	আনন্দ পাব্লিশার্স
রোয়াক ৩.৫০	দীপক চৌধুরী	এম, সি, সরকার
শতকিয়া ৮.০০	সুবোধ ঘোষ	আনন্দ পাব্লিশার্স
শেষ পর্যন্ত ৩.০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখো:	শিশির পাবঃ
সমুদ্র সফেন	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
সিন্ধুপারে ৭.০০	নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	নিওলিট
সুখদুঃখের ঢেউ	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	বেঙ্গল পাবলিশার্স
সোহাগপুরা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	শ্রীগুরু
সিন্ধুপারের পাখি ১.০০	প্রফুল্ল রায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
স্মৃতি ৩.০০	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	শ্রীগুরু
বেলোয়ারী ৬.৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল	মিত্র ও ঘোষ

শিশু-সাহিত্য

বই	লেখক	প্রকাশক
অথ ভারত কথকতা ২.২৫	শ্রীকথক ঠাকুর	বিদ্যোদয়
আলি ভুলির দেশে ২.০০	সুখলতা রাও	
আদ্দিকালের বদ্যিবুড়ো	জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	ক্লাসিক প্রেস
আধুনিক ম্যাজিক ২.০০	এ, সি, সরকার	মিত্রালয়
এ দেশ আমার (২য়)	দেবীপ্রসাদ চট্টো:	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
খুশির হাওয়া ১.৫০	নারায়ণ গঙ্গো:	অভ্যুদয় প্র: মন্দির
খেয়াল, খুশি অসম্ভব ৩.০০	অমিয় চক্র: (সম্পাদিত)	ঐ
চামড়ার কাজ	ননীগোপাল চক্র:	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (বনফুলের) ২.০০	বনফুল	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (হেমেন্দ্রকুমার) ২.০০	হেমেন্দ্রকুমার রায়	ঐ

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
(মানিক বন্দ্যো:) ২.০০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
ছোটদের শ্রীকান্ত ২.৫০ এম, সি, সরকার
ছোটদের রঙমহল ৩.৫০ সুনীল দত্ত সম্পাদিত জাতীয় সা: প:
ঝড়ের যাত্রী ১.৬০ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এসো: পাব্লিশার্স
জ্ঞান থেকে অজ্ঞান ১.৬০ বুদ্ধদেব বসু ঐ
নিশুতিপুর ১.৬০ প্রেমেন্দ্র মিত্র ঐ
পদ্মগোলাপ ২.০০ মনোজিৎ বসু মিত্রালয়
পারুল পারুল পারুলটি অমিতাভ সেন অক্ষর
প্রাণী ও প্রকৃতি বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল পাবলিশার্স
বনের ডাক ৫.০০ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ অরুণ দে
বাংলার ডাকাত (২য়) ২.৫০ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৃন্দাবন ধর
মায়ের বাঁশি ৪.৫০ বিমল ঘোষ (মৌমাছি) মিত্র ও ঘোষ
মামা ভাগ্নে ০.৭৫ শিবরাম চক্র: এম, সি, সরকার
মামাবাড়ি ১.৫০ অরবিন্দ গুহ অভ্যুদয় প্র: মন্দির
রঙিন রূপকথা ১.৬০ প্রবোধ সান্যাল এসো: পাবলিশার্স
সদাশিবের তিনকাণ্ড ১.৭৫ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিউ এজ
সহজ গল্প শ্রীলেখা গুপ্ত বেঙ্গল পাবলিশার্স
সাত রাজ্যি ১.৮০ সুকুমার দে সরকার অভ্যুদয় প্র: ম:
রংবেরং ৩.৫০ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ
রূপকথার ঝাঁপি ২.২৫ সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: আই, এ. পি

প্রাচীন সাহিত্য

কুমারসম্ভব বিহারীলাল গোস্বামী মিত্র ও ঘোষ

অনুবাদ

অভিসার (জাঁ পল সার্ত্র) শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী বেঙ্গল পাব্লিশার্স
কাশ্মীর প্রিন্সেস (কারণিক) বিমল দত্ত ঐ
ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা ৫-৭৫ শান্তা বসু আর্ট এণ্ড লেটার্স
চিড়িয়াখানার খোকাখুকু
(ভেরা চ্যাপলিনা) ৩-০০ প্রতিভা দাশগুপ্তা পপুলার
দু কুনকে ধান
(শিবশঙ্কর পিল্লাই) ৩-০০ ত্রিবেণী প্রকাশন
বাল্মীকি রামায়ণ ১২-০০ শিশিরকুমার নিয়োগী এ, মুখার্জি
মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ
(এ, এন, কাবানভ) ৭-০০ সমর রায়চৌধুরী ন্যাশনাল বক এ:
মাটির মানুষ (কালিন্দীচরণ
পাণিগ্রাহী) ২-৫০ সুধলতা রাও ত্রিবেণী প্রকাশন
সাগরে মিলায়ে ডন
(শলোখফ) ৬-০০ রথীন্দ্র সংকার ন্যাশনাল বুক এ:
সাহিত্য শিল্প প্রসঙ্গে
(মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিন) ৩.০০ ঐ

স্মৃতিকথা

খড়ির লিখন ২-৫০ সুকন্যা নিউ এজ
ছেলেবেলার দিনগুলি ৩-০০ পুণ্যলতা চক্রবর্তী নিউ স্ক্রিপ্ট
তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ (৩য়) ৬-৫০ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি. এম
যা বলো তাই বলো ৬-০০ শংকর নিউ এজ
রবি-তীর্থে ৫-০০ অসিত হালদার পাইওনিয়র বুক
স্মৃতিচিত্রণ পরিমল গোস্বামী প্রজ্ঞা প্রকাশন

কাজী নজরুলকে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

যা কিছু উপমা জানি সবই, মনে মনে
ভাবি। তবুও তুলনা তাঁর মেলে না, মেলে না।
আমি যে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য ছবি।

কখনো উপমা দিই—
তাকে,
স-গাণ্ডীব অর্জ্জুনের সাথে।
আবার কখনো বলি,
হলো না, হলো না।
কারণ, গাণ্ডীব নয়
হাতে তাঁর ছিল অগ্নিবীণা
প্রাণে ছিল আগ্নেয় উত্তাপ।
হঠাৎ কি জানি হল! কি যেন কি ভুল!
আগ্নেয় বীণার তারে
হাতের আঙুল
তাঁর
স্তব্ধ হয়ে গেল।

এখন নিশ্চিত জানি, কোন দিন আর
শুনবে না শুনবে না কেউ
কোন সুর
আগ্নের বীণার।
সে আজ নীরব কণ্ঠ। ভাষাহীন নিরুত্তর কবি
আজকে সবার কাছে। সে জীবন্ত
একখানা
অত্যাশ্চর্য ছবি।
তাই তো, এখন তাঁর
চারি পাশে যত সব বারোয়ারী পাপ
অক্ষত, বিকৃত হয়ে জমে ওঠে।
বিদ্রোহী এখন তাঁর
হারিয়েছে প্রাণের উত্তাপ।
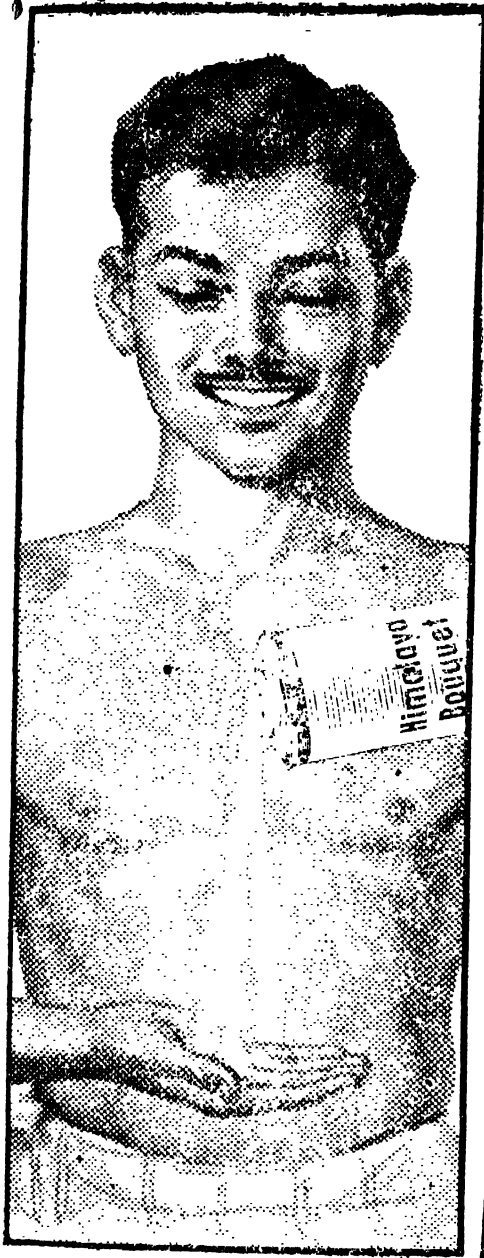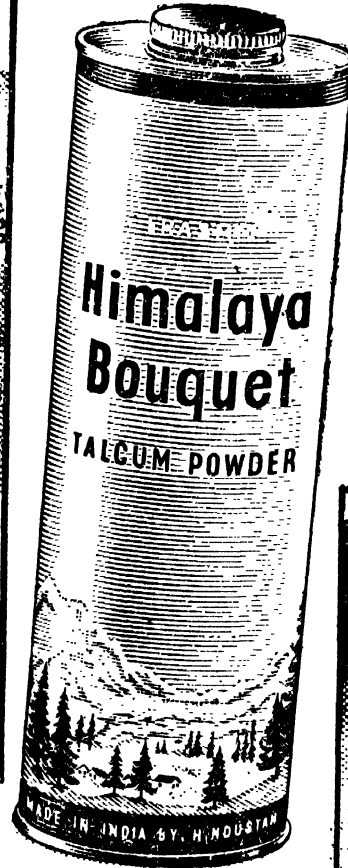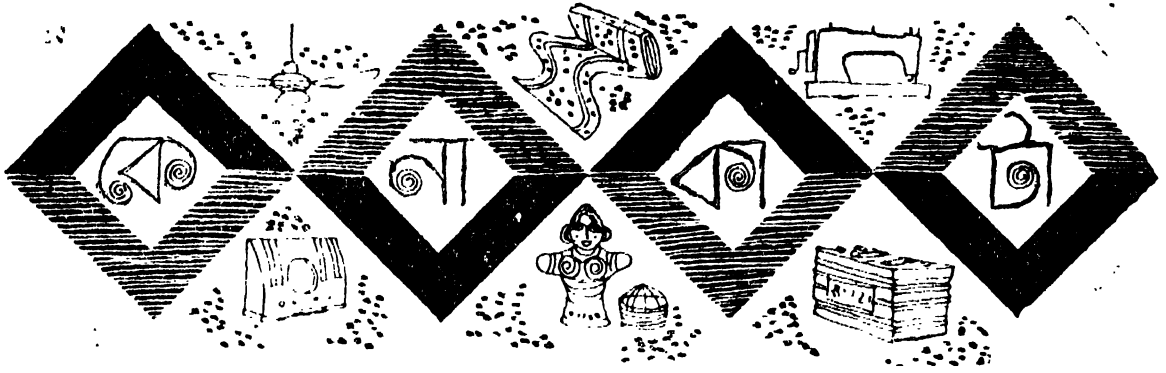
শিল্প ও কারিগরী যাদুঘর

শিক্ষা ও সমুন্নতির ক্ষেত্রে যাদুঘরের গুরুত্ব ও উপযোগিতা যে কতখানি, এ বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানপিপাসু মানুষের বিচিত্র চাহিদা মেটাবার একটি সুন্দর ব্যবস্থা যেমন গ্রন্থাগার, তেমনি অন্যতম প্রধান উপায় নিঃসন্দেহে যাদুঘর। আধুনিক শিল্পায়নের যুগে যে কোন দেশে শিল্প ও কারিগরী যাদুঘরের মূল্য তুলনায় নিশ্চয়ই আরও বেশী।

আমাদের একটি সাধারণ ধারণা—যাদুঘর হল কতকগুলি বিস্মৃত ও অচল বস্তুর সমাবেশ বা সংরক্ষণ ক্ষেত্রবিশেষ। কিন্তু বাস্তব উপযোগিতার দিকে তাকিয়ে এই ধারণা অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন যাদুঘরই একটি জীবন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে যা কিছু থাকুক জড় কি জীবন্ত, তাই মানুষের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করবে বরাবর। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনামূলক বিচার-নিরিখের সুযোগও দিয়ে থাকে এই যাদুঘর। শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান যুগে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলতে গ্রন্থাগার আর যাদুঘরকে বুঝায়। যাদুঘরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা লক্ষ্য—নানা দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সংগৃহীত ও সংরক্ষিত দ্রব্যাদির পর্য্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার এবং সাধারণ জীবন সমৃদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত জ্ঞান বিকাশ।

পশ্চিমী জগতে শিল্প ও শিল্প-বিজ্ঞানের যাদুঘর বহু কাল আগে থেকেই চলতি। সহজ কথায় যে সকল রাষ্ট্র শিল্প বিষয়ে সমৃদ্ধ ও অগ্রণী, সেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে একাধিক যাদুঘর। এই ধরণের যাদুঘর অবশ্য প্রথমে সংস্থাপিত হয় ইউরোপে, কিন্তু এক্ষণে সুদূর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই এর সংখ্যা অধিক। একমাত্র নিউইয়র্ক সহরেই বিভিন্ন রকমের বিজ্ঞান বিষয়ক বা শিল্পকলার যাদুঘর রয়েছে কুড়িটির উপর। এ ছাড়া আছে চারিটি উদ্ভিদ বিষয়ক যাদুঘর (বোটানিক্যাল গার্ডেন) ও সতেরটি ঐতিহাসিক যাদুঘর। আমেরিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত যাদুঘরখানি একটি মস্ত বিস্ময়—বিচিত্র তথ্য ও ইতিহাসের নজীর সম্বলিত এমন প্রকাণ্ড যাদুঘর বা সংগ্রহশালা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বৃটেন, জার্মাণী ফ্রান্স, রুশিয়া—ইউরোপের এই কয়টি জায়গা এবং অষ্ট্রেলিয়া জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষামূলক যাদুঘর বিদ্যমান আছে কোনও না কোন ধরণের।

এই প্রসঙ্গে শিল্পায়নে ব্রতী স্বাধীন ভারতের কথা আপনিই ওঠে। এত কাল অধীনতার নাগপাশে ভারত আবদ্ধ ছিল, এগিয়ে যাওয়ার পথে স্বভাবতঃই তার ছিল নানা বাধা ও প্রতিবন্ধক। এখন জাতীয় সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছেন এই দেশটিকে—দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ করার দাবী রাখছেন পৃথিবীর অপর অগ্রসর ও স্বাধীন জাতগুলির মতো। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অনেকটা বেশী। যে কোন শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক প্রয়োজন যেটি—সেই কারিগরী বিদ্যার্জ্জনের ব্যবস্থাও এরই ভেতর কিছু কিছু যে না হয়েছে তা' নয় কিন্তু উন্নত শ্রেণীর শিল্প-সংগ্রহশালা বা যাদুঘরের অভাব সেই থেকেই এ দেশে খুব প্রকট।

অবশ্য একটি আশার কথা—সরকারী উদ্যোগীপণায় সম্প্রতি কোলকাতা মহানগরীতে একটি শিল্প-যাদুঘর (বিড়লা শিল্প-কারিগরী যাদুঘর) স্থাপন করা হয়েছে। স্বতঃই ধরে নেওয়া যায়, শিল্প-যাদুঘর বা সংগ্রহশালা অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা থেকেই সরকারের (কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ) এই উদ্যম বা প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত আলোচ্য যাদুঘরের পরিকল্পনা কমিটির নির্দ্ধারণ মতে এতে সব সময় (১) কারিগরী বিষয়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, (২) মানব-সমাজের কল্যাণার্থ কারিগরী বিষয়ক অবদান এবং (৩) ভারতীয় শিল্প-কারখানায় আধুনিক কারিগরী পদ্ধতি প্রয়োগ—এ সকলের চিত্রাবলী অঙ্কিত থাকবে। নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত কয়েকটি কারিগরী বিষয় বেছে নিয়েছেন: বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও পরিচালনা, পরমাণবিক জ্ঞান, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং, চর্ম্মশিল্প, বয়ন ইঞ্জিনীয়ারিং পরিবহন, রসায়ন বিদ্যা আর খনি ও খনিজ সম্পদ। পরিকল্পনা কমিটির ঘোষণা অনুসারে এই যাদুঘরের উদ্দেশ্য এক কথায় দর্শকদের কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই নয়, তা ছাড়া আরও কিছু। বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পর্কে দর্শকমণ্ডলীর অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিই উহার মূল উদ্দেশ্য।

বিড়লা শিল্প ও শিল্পবিজ্ঞান যাদুঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিভাগীয় সচিব শ্রীহুমায়ুন কবীরের একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে এস্থলে। যাদুঘরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েই তিনি বলেন—যাদুঘর শুধু অতীতের দুষ্প্রাপ্য ধ্বংসাবশেষ-ভাণ্ডার মাত্র নয়। যাদুঘর সব সময়ই জীবন্ত থাকবে এবং চার পাশের জীবনের সংজ্ঞা গড়ে উঠবে। শিল্পকলার যাদুঘরে শুধু অতীতের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখলেই চলবে না, বর্ত্তমান শিল্পের গতি-প্রকৃতির নিদর্শনও সেখানে থাকা চাই। সময়ের সংগে পাল্লা দিয়ে চলার

জন্য প্রত্যেক বছর নতুন দ্রব্য আনতে হবে। অতীতের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত এবং বর্ত্তমান আন্দোলনের সংগে তার সম্পর্ক দেখবার জন্য মাঝে মাঝে ঢেলে সাজাতে হবে পুরনো জিনিষগুলি। মোটের উপর, নানা ধরণের চার্ট, ছবি, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য জিনিষের সাহায্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অগ্রগতি এবং অতীতের সংগে বর্ত্তমানের সংযোগ সংস্থাপনই হতে হবে যাদুঘরের প্রধান কাজ।

সরকারের পক্ষ থেকে শিল্প ও কারিগরী যাদুঘর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এবং দাবী রাখা হয়েছে, কার্য্যক্ষেত্রে এর সফল রূপায়ণ যদি হ'ল, তা' হলে নিশ্চয়ই আশার কথা। ভারতবর্ষ সবে শিল্পায়নে ব্রতী হয়েছে—অনেক বাধা রয়েছে তার অগ্রগতির পথে। এই মুহূর্ত্তে একটিমাত্র কারিগরী সংগ্রহশালা হলেই এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে দেশের অভাব মিটবে না। ভারতের শিল্পপ্রধান অপর অঞ্চলগুলিতেও অনুরূপ যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত না হলে নয়, আশা করা যেতে পারে, জাতীয় সরকারের এ বিষয়ে উদ্যম থাকবে আর জনসাধারণও সেই উদ্যমকে জোরদার করার জন্য তৎপরতা দেখাবেন।

কাঠের পোকা ও এর প্রতিকার

সাধারণ অবস্থায় কীট বা পোকার আক্রমণ থেকে কারও প্রায় রেহাই নেই, গাছেরও নয়। কীটবিধ্বস্ত হয়ে কত গাছের অকালমৃত্যু ঘটছে, কে রাখছে তার হিসাব! আমাদের বাসগৃহ সমূহেও কীট বা পোকার উৎপাত কম নয় বিন্দুমাত্র। গাছ কাটার পর যে কাঠ এনে সযত্নে আসবাবপত্র তৈরী হল, যা দিয়ে সাজানো হ'ল পছন্দমত নিজ নিজ গৃহখানি, পোকার মারাত্মক আক্রমণে সে শ্রী নষ্ট হয়ে যেতে পারে অল্পসময়েই। এই ভাবে কত সখের জিনিস কত গৃহস্বামীকেই না হারাতে হচ্ছে, অমনি বলা নিশ্চয়ই কঠিন।

অবশ্য একথা ঠিক—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে গাছের কাঠের পোকা দমনের ব্যবস্থাও নির্ণীত হয়েছে নানা ধরণের। এ-যুগে ঘরে কোন কাঠের জিনিস নেই, এমন প্রায় দেখা যায় না। গৃহ-নির্ম্মাণ থেকে সুরু করে গৃহসজ্জা অবধি সব ক্ষেত্রেই কাঠের প্রয়োজন একরূপ অপরিহার্য্য ভাবে। ঘরের কড়ি, বর্গা, খিলান দরজা-জানালা প্রভৃতি যেমন কাঠের হয়ে থাকে, তেমনি চেয়ার, টেবিল, আলমারী ইত্যাদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় কাঠেরই। সেজন্য ব্যবহৃত কাঠ বা কাঠের জিনিসটিকে অক্ষত ও মজবুত রাখবার খাতিরে প্রত্যেক গৃহস্বামীরই সর্ব্বদা সযত্ন নজর নিবদ্ধ না করলে নয়। পোকার আক্রমণের প্রতিকার বা প্রতিরোধ হিসাবে প্রথমেই তোলা যেতে পারে এইটি।

সাধারণ নিয়মানুসারে যে গাছ সারবান, তাতে কীটশ্রেণী সহজে আক্রমণ হয় না। গৃহের জিনিসপত্র যদি অসার কাঠে তৈরী হয়, তা হলেই বিপদের আশঙ্কা বেশি। সারবস্তু বলেই সেগুন, শাল ইত্যাদি কাঠ দিয়ে যাই তৈরী হোক না, তা-ই দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করবে। অন্ততঃ এসব শ্রেণীর কাঠ বা কাঠের তৈরী জিনিস পোকার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় না কিংবা কোন কাঠের পক্ষে এদের অঙ্গে দন্তস্ফুট করাই সাধ্যায়ত্ত নয়।

কিন্তু, গৃহে সংরক্ষিত সকল কাঠ বা কাঠের জিনিসই যে পোকার আক্রমণে অমনি অক্ষত থাকবে, সে নিশ্চয়তা মোটেই দেওয়া চলে না। সহরে যেমনই হোক, পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত বেশির ভাগ কাঠ বা কাঠের জিনিসই কীট-কবলিত হয়ে বিনষ্ট হয়। কাজেই গৃহস্বামীকে হুঁসিয়ার থাকতে হয় সর্ব্বক্ষণ, জেনে রাখতে হয়—এর সত্যি কি প্রতিকার, শোচনীয় অবস্থার কি প্রতি-ব্যবস্থা।

কাঠের কতকগুলি সাধারণ শত্রু—উই, ঘুণ, কড়া-পোকা ইত্যাদি। উইপোকা যে কাঠকে ধরে, দেখতে দেখতে ছারখার করে দেয় এর সকল শ্রী ও অস্তিত্ব। কারণ উইপোকার বংশ বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত, এদের দলবদ্ধ আক্রমণ বড় মারাত্মক। ঘুণ যে কাঠে আক্রমণ চালায়, বাইরে থেকে প্রথমে নজরে না পড়লেও সেই আক্রমণ ভয়াবহ। কত অসার কাঠ ও কাঠের জিনিসই এদের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হচ্ছে অবিরাম। ঘরে কোথা থেকে কি ভাবে যে এ সকল রিপু এসে হাজির হয়, বলতে পারা যায় না। তবে যত্নের অভাবে এবং কাঠের নিজস্ব দোষেই এই আক্রমণ হয়ে থাকে, এ বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে—কতকগুলি সারালো কাঠ যেমন মেহগনি, এ সকলে কখনই পোকার আক্রমণ হয় না। আবার, উইলো প্রভৃতি গাছের কাঠে সহজেই পোকারা আক্রমণ চালায়। ওক, ওয়ালনাট, বীচ প্রভৃতি কতকগুলি কাঠ বহু বৎসর পেরিয়ে যাওয়ার পর কীটবিধ্বস্ত হবার কারণ হয়। আমাদের দেশের নিমগাছেও পোকা সহজে আমল পায় না, এমনি দাবী চলে এসেছে।

কাঠের পোকার আক্রমণ রোধে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সহজেই। ঘরের জিনিসপত্রগুলি প্রায়ই ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা—এইটি অবশ্য করণীয়। ক্ষেত্র-বিশেষে আলকাতরা, কেরোসিন তৈল বা বিভিন্ন রঙ ব্যবহারেও উপকারিতা লক্ষ্য করা যায়। কীটনিরোধক তৈল জাতীয় পদার্থ আজকাল বাজারে অনেক রয়েছে। পোকার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য সে সবের নিয়মিত ব্যবহারও ফলপ্রদ। মোট কথা, এই ব্যাপারে সমগ্র দায়িত্বটা নিতে হয় গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রীকে। চেয়ার টেবিলের তলায়, দরজা জানলার ফাঁকে, ছবির কাঠামোতে সাধারণতঃ পোকার বাসা হয়। সে সব স্থানে নিয়মমত ডি-ডি-টি প্রভৃতি ছড়িয়ে দিলে উপকার না হয়ে পারে না।

বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয় প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা বশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা কাপুরুষতা। —শিবনাথ শাস্ত্রী

॥ মাসিক বসুমতীর এজেণ্ট-তালিকা ॥

বর্ত্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেণ্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এজেণ্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র কলিকাতা অঞ্চলের আনুমানিক পাঁচ শত বিক্রেতার নাম এই তালিকায় নাই।

॥ বাঙলা দেশ ॥

হাওড়া ●

শ্রীকাশীনাথ সাহা —আমতা
শ্রীঅলোককুমার চ্যাটার্জ্জী —বেলুড়

হুগলী ●

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘড়া —শেওড়াফুলি
শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী —মগরা ও ত্রিবেণী
শ্রীগঙ্গাধর দে —শ্রীরামপুর
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য —ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটী
শ্রীললিতমোহন দত্ত — হুগলীঘাট
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কুমার —সিঙ্গুর
শ্রীমণিভূষণ সিং —আরামবাগ
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী —নবগ্রাম, কোননগর

বর্দ্ধমান ●

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত —চিত্তরঞ্জন
মেসার্স বাগচী ব্রাদার্স —কুলটি
শ্রীভূতনাথ দাস —দাঁইহাট
শ্রীকৃষ্ণসাধন সরকার —পাণ্ডুগ্রাম
শ্রী এস, প্যাণ্ডে —বর্দ্ধমান
শ্রীজয়দেব মুখার্জ্জী —ওয়ারিয়া
শ্রী কে, সি, নাথ —পানাগড়
শ্রীরেণুপদ পাল —জে, কে, নগর
শ্রীতারাপদ রায় —বরবণি
শ্রীতপনজ্যোতি চ্যাটার্জ্জী —সীতারামপুর
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে —রাণীগঞ্জ
শ্রী বি, কে, আইচ —বর্দ্ধমান
শ্রীপঞ্চানন মোদক —কালনা
শ্রী এইচ, সি, ঘোষ —বার্ণপুর ও আসানসোল
শ্রীসুন্দরগোপাল সেন —গলসি
শ্রীসুশীলকুমার রায় চৌধুরী —জামুরিয়া

বীরভূম ●

শ্রীমাণিকচন্দ্র সাহা —রামপুরহাট
শ্রীমণিমোহন চন্দ্র —নলহাটী
শ্রীমন্মথকুমার ব্যানার্জ্জী —শিউড়ি

বাঁকুড়া ●

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র কর্ম্মকার —বিষ্ণুপুর
শ্রী বি, পাল —সোনামুখী
শ্রীদ্বিজপদ দাস —বাঁকুড়া

মেদিনীপুর ●

শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী —ঝাড়গ্রাম
মেঃ মিশ্র নিউজ এজেন্সী —কলাইকুণ্ডা
শ্রীভাস্করচন্দ্র পাল —গড়বেতা
শ্রী জে, এন, আচার্য্য —মহিষাদল
শ্রী আই, বি, ঘোষ —চন্দ্রকোণা রোড
শ্রীহরিসাধন পাইন —ঘাটাল
শ্রীমতী কনকলতা দেবী —খড়্গপুর
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী —মেদিনীপুর

মানভূম ●

শ্রীবিমলকান্ত রায় —কুমারধুবি ও বরাকর
শ্রীঅবনীমোহন দাশ —পুরুলিয়া

চব্বিশ পরগণা ●

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য —ইছাপুর
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস —কাকদ্বীপ
মেঃ বি, এল, সাহা এণ্ড সন্স —ব্যারাকপুর
শ্রী রায় নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী —টাকী

নদীয়া ●

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন —শান্তিপুর
শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক —নবদ্বীপ

মুর্শিদাবাদ ●

শ্রীঅহিভূষণ মালাকার —বেলডাঙ্গা
শ্রীবিশ্বনাথ দাস —ধুলিয়ান
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত —মুর্শিদাবাদ
শ্রীহরিপদ সাহা —জিয়াগঞ্জ
মেঃ ঘোষ লাইব্রেরী —বহরমপুর ও খাগড়া

মালদহ ●

শ্রী এম, এম, চক্রবর্ত্তী —হরিশচন্দ্রপুর
শ্রীসুনীলকুমার শেঠ —মালদা কোর্ট

কুচবিহার ●

শ্রীঅমূল্যরতন রায়গুপ্ত —দিনহাটা
শ্রীঅনিলরঞ্জন চক্রবর্ত্তী —কুচবিহার

জলপাইগুড়ি ●

শ্রী এ, ধর চৌধুরী —আলিপুরদুয়ার
শ্রীসতীশচন্দ্র বোস —মল-জংশন
শ্রী এস, এন, নন্দী —জলপাইগুড়ি
শ্রীমতিলাল সরকার —কালচিনি

দার্জ্জিলিং ●

শ্রী ডি, এন, বড়াল —কালিম্পং
শ্রীমতী শচীবাণী দেবী —শিলিগুড়ি টাউন

পঃ দিনাজপুর ●

শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জ্জী —বালুরঘাট

ত্রিপুরা ●

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য —আগরতলা

উত্তর প্রদেশ ●

মেসার্স মিকাডোস বেনারস নিউজ পেপার এজেন্সী —বেনারস
শ্রী এস, বি, মৈত্র —লক্ষ্ণৌ
শ্রীসুচারুমোহন গোস্বামী —নিউ দিল্লী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস —নিউ দিল্লী
মেঃ সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী —নিউ দিল্লী
মেঃ কিতাব ঘর —নিউ দিল্লী
মেঃ ইন্টারন্যাশানাল ষ্টোর্স —এলাহাবাদ

মধ্য প্রদেশ ●

মেঃ এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ভিলাই ও দুর্গ

উড়িষ্যা ●

শ্রী বি· দত্ত —রৌঢ়কেল্লা
মেঃ এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ব্রজরাজনগর
প্রতিমা নিউজ এজেন্সী —খুড়দা
শ্রীউদয়নারায়ণ দাস —অনুগুল

আসাম ●

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত —হাইলাকান্দি
মেসার্স শিলং স্পোর্টস —শিলং
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লোধ —কমলপুর
শ্রী পি, কে, চৌধুরী —শিলচর
শ্রীমতী কনকরাণী গাঙ্গুলী —তিনসুকিয়া
শ্রী এম· আর· ভট্টাচার্য্য —মাকুমজং
শ্রীচিত্তরঞ্জন ভায়েল —তেজপুর
মেঃ পি, এস, জৈন এণ্ড কোং —ইম্ফল
শ্রী জে, চক্রবর্ত্তী —গোয়ালপাড়া
মেঃ ন্যাশান্যাল লাইব্রেরী —ডিব্রুগড়
শ্রীআশুতোষ মিত্র —চবুয়া
শ্রী বি, চক্রবর্ত্তী —মোহনবাড়ী
শ্রীকালাচাঁদ বণিক —করিমগঞ্জ
শ্রীত্রিলোচন রায় —ধুবড়ী

বিহার ●

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী —রঘুনাথপুর
শ্রীপরিতোষ মুখার্জ্জী —ধানবাদ
শ্রীসুজিতকুমার সরকার —কাতরাসগড়
শ্রীমনোমোহন চ্যাটার্জ্জী —মজঃফরপুর
মেঃ ক্যাপিটাল বুক ডিপো —রাঁচী
মেঃ গয়া মিউজিক্যাল ষ্টোরস —গয়া
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার —কাটিহার
শ্রীরাধারমণ মিত্র —মুঙ্গের
মেঃ অমৃতলাল থ্যাকার এণ্ড কোং —ঝরিয়া
শ্রীরামব্রিজপ্রসাদ —লোহারদাগা
শ্রী এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জী —ধানবাদ
মেঃ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং —হাজারীবাগ টাউন
শ্রীদেবনারায়ণলাল —দিনাপুর
শ্রীবাচ্চু সিং —পাটনা
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ —সিন্দ্রি ও পাথারদিহি
শ্রীকরুণাসিন্ধু রায় —বেরমো
শ্রীকুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী —জামালপুর
শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস —বরজামদা
মেঃ ইউনাইটেড ডিষ্ট্রিবিউটর্স —টাটানগর

সাঁওতাল পরগণা ●

শ্রী জে, এন, সাহা —পাকুড়
শ্রীমন্মথনাথ দাস —বৈদ্যনাথধাম
শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র —মধুপুর

বোম্বাই ●

শ্রী জি, এম, ঘোষ চৌধুরী —বাইকুল্লা, বোম্বে

মাসিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিস্ময়!!

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে — ২৪৲
ষাণ্মাষিক " — ১২৲
প্রতি সংখ্যা " — ২৲

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক — ১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক — ৭·৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে — ১·৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ — ২১৲
ষাণ্মাসিক " " " — ১০·৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " — ১·৭৫

● মাসিক বসুমতী কিনুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন ●
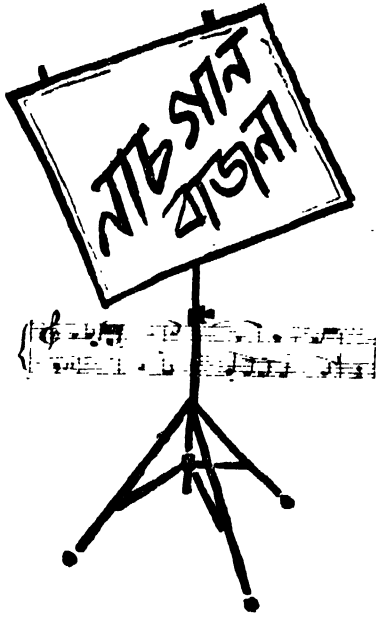
কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা

উনিশ শতকের ইয়ং বেঙ্গল দেশীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে অপরিচয় হেতু ও রেনেসাঁসের নতুন আলোয় প্রদীপ্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে তদানীন্তন দেশীয় সংস্কৃতির রূপ দেখে হতশ্রদ্ধ হয়েছিল। তদানীন্তন দেশীয় সংস্কৃতির একটি শাখা হোল কবিগান। পাশ্চাত্যের সমুন্নত সাহিত্যরস আস্বাদন করে নব্য বাংলা কবিগানকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তখনই কয়েকজন ঐতিহ্যসচেতন একে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন ও মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, রাজনারায়ণ বসু সাহিত্যের আসরে একে প্রতিষ্ঠা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক চেষ্টিত হয়েছিলেন। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাধনা"য় রবীন্দ্রনাথ "কবিগান" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা ও স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করবার প্রথম প্রয়াস পান। এর পর "নব্যভারতে"র পাতায় ব্রজসুন্দর সান্ন্যালকে কবিওয়ালাদের পরিচায়নে অগ্রসর হতে দেখি। বর্তমানেও অনেকে কবিওয়ালা ও তাঁদের কবিগানের বিষয়ে আলোচনা করছেন। আমরা এখানে কবিওয়ালাদের পরিচয় বা কবিগানের ব্যাকরণ নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই না। এ প্রবন্ধে কবিগানের ঐতিহাসিক সমুদ্ভবের পটভূমিকা ও তার সাংস্কৃতিক ভূমিকাটি নির্দেশ করবো মাত্র। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কবিগানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের তিন দশক পর্য্যন্ত কবিগানের সান্ধ্য আসর সরগরম হয়ে উঠত। হঠাৎ এমনি সান্ধ্য বৈঠকে গানের মাতোয়ারা হয়নি, ধীরে ধীরে অনিবার্য্য ঐতিহাসিক কারণে হয়েছে। দিনের কাজের শেষে রাতের আঁধারে চণ্ডীমণ্ডপে সাহিত্যের আসর—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত রীতি। তাতে পাঁচালী ঢঙে রামায়ণ গান, মঙ্গল গান চলতই। সে ধারাতেই কবিগান চলে এসেছে। এটা জিনিসটা নতুন কোনো সম্ভব নয়। সেই পুরনো ধারারই ক্ষীয়মাণ অবক্ষয়ী রূপমাত্র। কি ভাবে সেই ধারা কবিগানের রূপ নিল বুঝতে পারলেই কবিগানের স্বরূপটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মোগলরা বাঙালী সংস্কৃতির ভাবলোকে নতুন কোনো দিশা দেখাতে পারে নি, নতুন কোনো ভাব-উৎসের মুখ খুলে দিতে পারে নি। বাদশাহী বিলাসের সমারোহে নগরগুলোকে কেবল বিকশিত করে তুলেছিল। সেই বিলাসের রসদ জোগাতে গ্রামবাংলা ধন ও প্রাণের সম্পদে রিক্ততার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। শৃঙ্গার রসের রসিক নগরী নাগরীর স্বপ্নে দুলছিল। রাজনৈতিক দাবা নিয়ত বিদ্রোহে আক্রমণে চঞ্চল, তাই গ্রামবাংলার বুক সব সময় উপদ্রুত, সমাজের স্থিরাবধি অস্থিরতায় বিভ্রান্ত, আর সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণীচক্রে নীতির নিগড় খসে পড়ছিল, নগরের শৃঙ্গার রস তার বিভোল ছেড়ে অনাবৃত কালিমা নিয়ে দেখা দিয়েছিল গ্রাম্য সমাজে, বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তা দেখা দিল। জীবনধারণের নিষ্ঠুর সংগ্রামে ধর্মের মোহ ক্রমে দূর হচ্ছিল। রামানন্দের বৈরাগ্য পীড়িত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল,—

> বস্তুহীন বিগ্রহে সেবিয়া নহে কাজ।
> নিজ কষ্ট দায় আর লোক মধ্যে লাজ॥

শুধু দিনযাপনের গ্লানি ঐকান্তিক হয়ে উঠছিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" ওদিকে আরাকানের দূর প্রান্তে লৌকিক প্রণয়কাহিনীর প্রতি বাঙালী মুসলমান কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান কবিদের কণ্ঠে জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ পরিকীর্ণ বাস্তব কাহিনী ধ্বনিত হচ্ছে। সতের শতকের গোড়া থেকেই সজীব ভাবপ্রবাহ মন্দীভূত হয়ে আসছিল, পৌরাণিক কাহিনীর অনুবৃত্তি ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল, ভাবের ঘরে চুরি হওয়ার কাব্যরূপের বহিরাবয়ব সম্বন্ধে অতি মনোযোগের ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যের গতিবেগ আবরুদ্ধ হয়ে আসছিল। নগরের ছিদ্রপথে তার ক্ষীণ ধারা উচ্ছবিত হতে চাইছিল। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ায় সাহিত্য চর্চা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সাহিত্য চর্চার পক্ষে তাই রাজদরবার বা ধনস্ফীত নাগরিক সমাজ একান্ত হয়ে উঠছিল। আর এক দিকে লোলুপ ইংরেজ বণিকের পদ সঞ্চার—শায়েস্তা খাঁর আমলেই নির্বিঘ্নে বাণিজ্য চালাবার অধিকার লাভ, জব চার্ণকের নেতৃত্বে সুতানুটিতে ঘাঁটি স্থাপন, শোভা সিংহের বিদ্রোহের অরাজকতায় সাধু সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে সামরিক আশ্রয় স্থাপনের অনুমতিলাভ ও ফোর্ট উইলিয়াম গঠন, সুতানুটি গোবিন্দপুর কলকাতা এই তিনটি গ্রাম ক্রয় ও তাদের শাসন অধিকার লাভ, সেখানে নাগরিক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষার নতুন নিয়ম প্রবর্তন, এভাবে কলকাতা নিরাপত্তার সুরক্ষিত আশ্রয় হয়ে উঠে। শোভা সিংহের বিদ্রোহ ও বর্গীহাঙ্গামার তাড়নে লোক সমাগম অতি দ্রুত বেড়ে চলল, কলকাতার চারদিকে নতুন মানুষ ও নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি গড়ে উঠল। ১৭৫০-এ এখানে এক লক্ষ লোকসংখ্যা হোল। তারপর আচার্য্য যদুনাথ সরকারের কথায়—In 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world; কিন্তু—it was the beginning slow and unperceived of a glorious dawn.

এই রাত ভোরের ব্যাকুল প্রতীক্ষা করতে করতে অর্ধ শতাব্দী কেটে যায়, এই অর্ধ শতাব্দীতে—মিরজাফর মিরকাসিমের হাতফিরি

র ইংরেজের হাতে রাজ্যভার আসে, ক্লাইভের দ্বৈত শাসন নীতি ল, কে করে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন? অর্থপিপাসায় দেশিকান হবা সারা দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। এসবের পরিহাস -ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, গ্রাম্য সমাজ বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত, এক-তৃতীয়াংশ শানে পর্য্যবসিত হয়। কর্ণওয়ালিশের আমলের পর দেশে শান্তি-ঙ্খলার আবহাওয়া কিছুটা ফিরে আসে। মোট কথা, আঠার তকের ইতিহাস অবিমিশ্র ধ্বংস ও অবক্ষয়ের পীড়ন ও শোষণের তিহাস। বাঙালী জাতির প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে এসেছিল, তার ণ-প্রাণ দীন সাহিত্যিক প্রয়াসে জানান দিচ্ছিল কেবল আর জছিল নতুন পথ, নতুন আলো।

তদানীন্তন ইংরেজরা উন্নত য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রোজ্জ্বল আলোক বন করে আনেনি। তারা কলকাতা ও তার ধারে পাশে ট-কৌশল ও অর্থলালসার রক্তিম শোষণ, নীতিহীন জীবনের ক নতুন পরিবেশ গড়ে তুলেছিল—সমস্ত দেশের 'অন্ধকারে ই এক আলোর প্রমাদ। কলকাতার আদিবাসিন্দা ছিল নবৃত্তিজীবী নিম্নস্তরের অধিবাসী; আর কলকাতার বুকে যারা মায়েৎ হোল তাদের জীবনে শিক্ষাদীক্ষার স্রোতোপথ অবরুদ্ধ, াচীন সংস্কৃতিজাত জীবনাদর্শ বিনষ্ট, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাতন সামন্ততান্ত্রিক বংশগুলি অবলুপ্ত। শুধু অর্থের দৌলতে রাজে নতুন প্রতিষ্ঠা দেখা দিল। ঐতিহ্যহীন, রঙ্গরুচিবর্জিত, িক্ষাদীক্ষা হীন এই নব প্রতিষ্ঠিত বণিকধর্মী সমাজে সাহিত্য ও স্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সান্ধ্য আসরে যে রূপ নিয়ে দেখা ল, তা-ই হোল কবিগান।

কবিগানের রূপটা কেমন হবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ংস্কৃতিক পটভূমিকা থেকেই তার আভাস পাওয়া গেছে। াধুনিক চেতনার ক্রমসঞ্চার ঘটেছে অন্তর্লোকে, কিন্তু খনো আধুনিক জীবনবোধ ও কাব্যিক বিষয়ের নতুন দিগন্ত দ্ঘাটিত হয়নি, তাই কাব্য উপাদানের দিকে তারা ছিল পুরাতনের ভানুসারী। আর পুরাতন ভাবসম্পদ অন্তঃসারশূন্য হয়ে েছিল। আধিভৌতিক চেতনা, মানবিক কামনা বাসনা নির্বাধ য়ে দেখা দিয়েছিল। সূক্ষ্মতা ও শালীনতার আভিজাত্যও আশা রা যায় না, কেন না সেই কালটাই হোল ও কূল ভেঙেছে অথচ কূল গড়ে উঠেনি, এমনি একটা অস্থির রাষ্ট্র-সমাজ- সংস্কৃতির ঁন্তের কাল। তাই কোনো সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক উপাদানই ষ্টিশীল রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে না। আর বিরাট কাব্যের াকারও নিতে পারে না। তাই খণ্ড কবিতার রূপ নেবে। ন্ত কবিতাসৃষ্টি হতে পারে না সেকালে, তাই উপরি-উক্ত উপাদান উপকরণ মিলে মিশে যে জিনিসটা গড়ে তুলল তা হোল কবিগান, া কবিগান না হয়ে পারে না। সেটা গড়ে উঠল যেমন, তেমনি ড়া হতে লাগল। কবিপ্রতিভা অমনি পরিবেশে সান্ধ্য আসরে ময়মাস মত তৈরী করতে লাগল কবিগান।

কবিরা কারিগরের মত কবিগানকে কত বিচিত্র রূপে গড়ে ভেঙে, নানান উপকরণ জুড়িয়ে মিলিয়ে তৈরী করতে লাগলেন, রজনীকান্ত দাস মশায় তার ফিরিস্তি দিয়েছেন। তরজা, দাঁড়া কবি, খেউড় একদিকে, অন্যদিকে পাঁচালী, ঢপকীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা, আর একদিকে আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা তদানীন্তন কালের নানান স্রোতধারা মিলে মিশে এই বিচিত্র কারুকার্যে নিবসিত হয়েছিল। তরজা, দাঁড়া-কবি, খেউড়ের আধিভৌতিকতা, মানবিকতা; পাঁচালী, ঢপকীর্তন, কৃষ্ণযাত্রার ধারাহীন ভক্তিভাব ও ভার-হীন ধার্মিকতা; আর এই দুই ধারার খণ্ডরূপ নির্মাণ, সচেতন কারুকলা স্মরণীয়। তৃতীয় ধারাটির গান, বাজনা, সুরের কেরামতি, বিশেষ করে টপ্পার সংক্ষিপ্ত অবনমিত রাগসঙ্গীতের মধ্যমা গতি স্মরণীয় এখানেই আধুনিক গানের প্রথম সূচনা। আধুনিক গানের বাজনা ও সুরেরও। তখনকার দেওয়ান বেনিয়ান রাজারা এর পত্তন করেছিলেন। একটা উদাহরণ দিলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৭৯২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের "ক্যালকাটা ক্রনিক্যাল" মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ীর নাচগানের আসরের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেছেন, The only novelty that rendered the entertainment different from those of last year, was the introduction, or rather the attempt to introduce, some English tunes among the Hindoostanee music. শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র নিধুবাবুর টপ্পার মানবিক আবেদনের প্রাধান্য নির্দেশ করেছেন (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ আষাঢ় ১৩৬৩)। আর প্রথম দুধারার মানবিকতা, আধিভৌতিকতা, খণ্ডরূপ, সচেতন কারুকলা গুণগুলি নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত সমসাময়িক ঘটনারাজির বর্ণনাদীপ্ত হয়ে, মধুসূদনের হাতে প্রতীচ্যের সনেট, এপিষ্টল (পত্র কবিতা), লিরিকের সমুন্নত ভঙ্গী লাভ করে, হেমচন্দ্রের হাতে দেশপ্রেম আর

শ্লেষের কটাক্ষে অগ্রসর হয়ে, নবীনচন্দ্রের হাতে রোমাণ্টিক চেতনায় ভূমিষ্ঠ হয়ে বিহারীলালের হাতে আধুনিক গীতিকবিতার দীক্ষা লাভ করে আধুনিক কালের হাতে এসে পৌঁছেছে। অতএব প্রথম দুধারার মাঝে আধুনিক কবিতার যেমন উন্মেষ, তেমনি শেষ ধারার মাঝে আধুনিক গানের প্রথম উৎসার। এভাবে কবিগান একাধারে আধুনিক কবিতা ও গানের জন্মলগ্নে থেকে এক বীজ দুই মূলের মত উদ্ভিন্ন হয়ে প্রসারিত ও বিকশিত হয়েছে, তাই সে সার্থকনামা, কবিতা ও গানের সম্মিলনে সে কবিগান। যতই তার স্থূল, অমার্জিত, অশালীন, অনভিজাত রূপ হোক না কেন, আমাদের দেশের সাংস্কৃতির ইতিহাসে তার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথের তাই যথার্থ নির্দেশ,—বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। এই নষ্ট পরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ। বলা বাহুল্য, আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসেরও। —দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫২)

শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩ সালে এক কিশোর ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকে ভারতখ্যাত প্রবীণ গায়কদের মধ্যে ত্রয়ী তরুণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এত অল্প বয়সে সাধনার মাধ্যমে জনপ্রিয় হওয়া যায়! পরদিন হতে তিনি সুরু করলেন কণ্ঠসঙ্গীত—যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ রেখে। কিশোরটি হলেন আজিকার ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর ত্রয়ী তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কুমারগন্ধর্ব, ডি, ভি, পালুসকার ও শরাফৎ হোসেন। বলেন প্রসূনকুমার—

শ্রীপ্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বৎসর আগে বাবা শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যব্যপদেশে পাটনায় এসে স্থায়ীবাসিন্দা হলেন তথাকার। চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান আমার জন্ম হয় সেখানে ১৯২৬এর ১৫ই আগষ্ট। নিজেদের বাড়ী আছে এখনও বারাকপুর মহকুমার এড়িয়াদহতে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করি ১৯৪২ সালে, আই এস সি '৪৪ সালে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম বলে কলেজ থেকে নাম কেটে দেওয়া হয় সত্য কিন্তু যোগ দিই নাই। বি, এস-সির ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় অসুখ হল—তজ্জন্য ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়া হল না। গানের ঝোঁকও কিছুটা দায়ী ছিল এজন্য।

ছেলেবয়সে বাবা ও কাকাবাবুকে গান গাইতে শুনেছি। কিন্তু খুব গভীর ভাবে তাঁরা সাধনা করেননি। বড়িশ-বেহালার কন্যা মা শ্রীমতী অশ্রুমতী দেবী রাগ-রাগিণী ভালই বোঝেন—কিন্তু নিজে কখনও গান করেননি। তবে গান শুনতে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু বড়দাদা শ্রীপ্রণব ব্যানার্জ্জির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি গান শেখার উৎসাহ। '৩১ সালে বাড়ীতে এলো বেতারযন্ত্র আর দিদির পরীক্ষায় "মিউজিক" ছিল অতিরিক্ত বিষয়, তাই বাড়ীতে আসতেন গানের শিক্ষক। বেতারে গানের প্রতিটি প্রোগ্রাম শুনে ও মাষ্টার মহাশয়ের গান শেখান শুনে আমার মনে এল 'রাগ' ও 'তাল'এর জ্ঞান। দিদির গান গাওয়ার সময় 'ঠেকা'ও দিয়েছি কত দিন। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ার সময় এস্রাজ ও বাঁশী বাজানর চেষ্টা করতাম। কিছুদিন বাদে পাটনায় বাঁশী বাজিয়ে বলে একটু-আধটু নামও হল। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় এস্রাজ ও বাঁশীতে প্রথম হলুম।

নিজের গলায় গান গাইব—এ বোধ কোন দিন হয়নি। কিন্তু এর পত্তন হল ১৯৪৩ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবে ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলী খাঁ, ওঙ্কারনাথ পটবর্দ্ধন, নারায়ণ রাও ব্যাস প্রভৃতি দিকপালগণের সঙ্গীত শুনে। কিন্তু মোহিত হয়েছিলাম শুধু গানে নয়—তারুণ্যের উজ্জ্বলতায়—যখন শুনলাম কুমারগন্ধর্ব, ডি, ভি, পালুসকার ও শরাফৎ হোসেনের কণ্ঠস্বর। প্রায় প্রতিজ্ঞা করলাম যে গায়ক আমাকে হতে হবে। '৪৫ সালের শেষাশেষি গান আরম্ভ করে দিলাম এস্রাজ ও বাঁশীকে এক পাশে সরিয়ে রেখে—ঘোরাঘুরির ফলে গাইড ও শিক্ষকও পাই পণ্ডিত রামপ্রসাদ পাণ্ডেকে। কিছুদিন পরে এক বন্ধুর প্ররোচনায় কলিকাতায় হাজির হলুম কিন্তু বাড়ীর লোক হলেন অখুশী। এখানে চেষ্টা করলুম গ্রামোফোন কোম্পানীগুলিতে গান ও ফিল্মে অভিনয়ের জন্য। তাতে সুবিধা হল না। হঠাৎ সুযোগ হল শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহিত সাক্ষাতের। তিনি আমায় পাঠালেন রেডিওতে—'অডিশন' দিলাম কিন্তু জবাব না পেয়ে ফিরলুম পাটনায়। সেখানে '৪৬র সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'বেতার জগত'এ দেখি ১৫ মিঃ জন্য "প্রসুন ব্যানার্জ্জি" খেয়াল গানের জন্য নির্দিষ্ট

হয়েছেন। তাই আমি বা অন্য কেহ খোঁজ নেওয়ার জন্য এলাম কলিকাতায়। অনুসন্ধানের পর আমাকে গান গাইতে হল।

এর পর প্রখ্যাত তবলা বাজিয়ে শ্রীহীরু গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর গৃহে দেখা—তিনি পাঠালেন ডক্টর শ্রীযামিনীনাথ গাঙ্গুলীর কাছে। পুত্রস্নেহে স্বগৃহে রেখে দরদী শিক্ষক হিসাবে আমায় শিখিয়েছেন তিনি আর সেই সঙ্গে 'টিউশানী'রও ব্যবস্থা করে দেন। মধ্যে মধ্যে বেতার কেন্দ্র থেকে গান গেয়েছি। দু'বৎসর বাদে নিজ বাসস্থানে চলে আসি মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে। সেটা ১৩৪১ সাল। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম 'অলবেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স' ও পরে 'অল ইণ্ডিয়া তানসেন কনফারেন্স'এ যোগ দি। বলতে লজ্জা করে কিন্তু আমার demonstrationএ শ্রোতারা হয়েছিলেন খুব খুসী। এর পরেই 'ঝঙ্কার' ও 'সঙ্গীত' চক্রদ্বয়ে যোগদানের সুযোগ পাই। সেই সময় শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। ফিরলুম পাটনায়। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে গান গাওয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে আসতুম। পরে পাটনা কেন্দ্রে যোগদান করি। ১৩৪১ সালে শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। '৫০ সালে কলিকাতায় এসে তাঁর শিক্ষাধীন ছাত্র হলুম। তাঁর পরিচালনায় ও সাহচর্য্যে আমার প্রিয় খেয়াল ও ঠুংরীর উন্নত স্তর, বিভিন্ন রূপ, উচ্চতর শিক্ষা পাই। মনে হল যেন এত দিনে সঠিক সন্ধান পেয়েছি আমার সাধনা, আমার সঙ্গীতের চিন্তাধারা, আমার ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সফল সার্থক রূপায়ন করার জন্য। আর বেতারশিল্পী হিসাবে দিন দিন আমার লোকপ্রিয়তা বেড়ে গেল। মনের বাসনা হল পূর্ণতর। ১৩৫৭ সালে সঙ্গীতগুরু হিসাবে পেলুম ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ সাহেবকে। আমার ধারণা খাঁ সাহেব ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আজ তিনি ভারতীয় সঙ্গীতরাজ্যে যা দিয়ে যাচ্ছেন—তা ভারতবাসী পূর্ণ উপলব্ধি করবে ত্রিশ বৎসর বাদে। এত বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ আমরা পাব কি না জানি না। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। এঁর কাছে শিখলেও জ্ঞানপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে এখনও।

'ঢুলি' ফিল্মে আমার নেপথ্য সঙ্গীত আমার জীবনে এনে দিল এক বিরাট পরিবর্ত্তন। সুরকার রাজেন্দ্র সরকারের সাহচর্য্য—শ্রোতাদের নিকট আমার গাওয়া গানের উচ্চ-প্রশংসা—আর আমার নিজের দরদ দিয়ে গানগুলি গ্রহণ করা—'বহু ভট্ট'র নেপথ্য গায়ক হিসাবে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠা করল আমায়। এর পর হল 'আশা' ও আরও বহু ছবিতে কাজ করার সুযোগ। ক্ল্যাসিকাল গায়ক হয়েও দর্শকমধ্যে হল আমার প্রচুর পরিচিতি আর সুযোগ এসেছিল চিত্রে নায়ক হিসাবে অবতরণ কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে করেছি জীবন-পাথেয়—তাই বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালকদের নিরাশ করতে বাধ্য হয়েছি।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীতাসরে যোগদান করেছি। দিল্লী বেতারের 'জাতীয় প্রোগ্রামে' ১৩৫৮ সালের নভেম্বরে প্রথম যোগদান করি।

১৩৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তীষ্মদেব-ছাত্র শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ভারতখ্যাতা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী মীরা দেবীকে বিবাহ করি। 'রাব, এ, কানন, চিন্ময়দা' ও রাধিকাদা'র সাহচর্য্য আমার সঙ্গীত পরিবেশকে করেছে সুমধুর।

ভগিনী কল্পনা মুখার্জ্জি, ভ্রাতা প্রদ্যোৎ ব্যানার্জ্জি, বেলা রায় আমার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছে। আরও ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিই। বর্ত্তমানে আমি Calcutta Academy of Indian Music শিক্ষকতা করি।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত গানের আসরগুলিতে স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ না দেওয়া বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে আমার কাছে।

শেষে তিনি বলেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আজ লোকপ্রিয় হয়েছে যথেষ্ট—কিন্তু রসগ্রাহী শ্রোতার প্রয়োজনও রয়েছে সেই সঙ্গে।

গ্রামে

কেশব চক্রবর্ত্তী

আমি এখনই গ্রামে যাবো। সেখানে ডালপালা
দিয়ে একটি কুটীর গড়বো।
আর মাঠে সারি সারি বীজ বপন করবো।
আর কুটীরের সামনে, রঙ-বেরঙের ফুলের বাগান করবো।
আমি এখনই গ্রামে যাবো, সেখানে উষার ঘোমটা তুলেই স্বপ্ন খুলবে।
সেখানে প্রথম সূর্য্যের আলো পড়বে।
তখন আমরা সবাই,
বনবীথিকার ভ্রমরের মতো আপন মনে গান করবো।
আমি এখনই গ্রামে যাবো। সেখানে ঝিলের জলে স্নান করবো।
আর জলের ঢেউয়ের সাথে আপন মনে দোল খাবো।
সেখানে কর্পোরেশনের জলের যন্ত্রণা নেই।
সেখানে ভাড়াটেদের জলের চীৎকার নেই।
আমি এখনই গ্রামে যাবো,
সরকারী পল্লী উন্নয়নের সাথে হাত মিলাবো।
অথবা পল্লীজননীর পদপ্রান্তে বসে প্রীতির অর্ঘ দেবো।
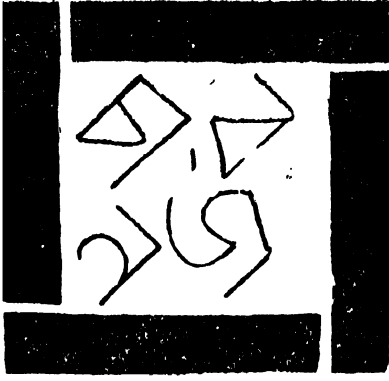
মৃণালিনী সেন

[বর্ষীয়সী যশস্বিনী কবি ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম বাঙালী বিমানারোহিণী]

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙলা কবিতার আজ বিপুল সমাদর। বাঙলা কবিতার রসাস্বাদনে বিশ্বের মানুষের মন-প্রাণ আজ ব্যাকুল। বাঙলা কবিতার সারমর্ম উপলব্ধি করার জন্যে পৃথিবীর কত মানুষ যে আজ উন্মুখ তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্বজোড়া অভিনন্দনে বাঙলা কবিতা আজ পরিপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের দেশে যে কবিতা জন্মায় তার প্রতি মর্ত মানবের আজ অসীম শ্রদ্ধা, জগত সাহিত্যের আকাশে আজ সগর্বে উড়ে চলেছে বাঙলা কবিতার বিজয় পতাকা।

এই যে সমাদর, এই যে প্রতিষ্ঠা, এই যে জয়যাত্রা—এ কোন পটভূমিকার উপর রূপ নিয়েছে? জগতের সাহিত্য-সভায় বাঙলা দেশের কবিতা সম্মানের আসন লাভ করেছে কোন একক প্রচেষ্টায় নয়, দু'-চারটি ভাষার কৌশলে শব্দচাতুর্যে নয়, কয়েকটি গুরুগম্ভীর বাক্যের সমাবেশে নয়—এ জিনিষ আজ সম্ভব হয়েছে বহু শিল্পীর, বহু স্রষ্টার, বহু সাধকের কল্যাণে, সম্ভবপর হয়েছে অসংখ্য কবির সাধনায়, হয়েছে সরস্বতীর অগণিত ভক্তের দুশ্চর তপস্যায়। যাঁদের অমূল্য অবদানে বাঙলা সাহিত্য এক নতুন পথের সন্ধান পেল, তাঁরা কালজয়ী, সকল কালের নমস্য।

এ কথাও অনস্বীকার্য নয় যে, বাঙলা কবিতার গঠনকর্মে, পুষ্টির ক্ষেত্রে, বিকাশের পথে সহায়তা করার জন্যে প্রাপ্য সম্মানে কেবলমাত্র বাঙলা দেশের ছেলেদেরই অধিকার নেই। বাঙলা দেশের মেয়েদেরও তাতে সমান অধিকার। সরস্বতীর সেবায় পুরুষের সঙ্গে নারীও সমান অংশ গ্রহণ করেছে। পুরুষের মতই নারীও সমান অংশে লাভ করেছে সরস্বতীর আশীর্বাদের উত্তরাধিকার।

সাধারণ পাঠক নারী-কবিদের কবিতা থেকেও অনুপ্রেরণা, নতুন পথের নির্দেশ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছু কম পান নি।

বাঙলার বরেণ্য নারী-কবিদের মধ্যে আজ "চারজন" এর মাধ্যমে যাঁর জীবন কাহিনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি তাঁর নাম মৃণালিনী সেন মহাশয়া। আজকের দিনের অশীতিবর্ষীয়া স্বনামধন্যা কবি মৃণালিনী সেন, প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে বাঙলা দেশের মহিলাদের মধ্যে প্রথম বিমান আরোহণকারিণী মৃণালিনী সেন ও কবি মৃণালিনী সেন পৃথক নন, অভিন্ন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট মৃণালিনীর জন্ম হয়। মৃণালিনীর পিতৃদেবের নাম স্বর্গীয় লাডলীমোহন ঘোষ। মাত্র তেরো বছর বয়সে মৃণালিনী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হন। মৃণালিনী ঘোষ হলেন মৃণালিনী সিংহ। পাকপাড়ার দেশবিখ্যাত অভিজাত সিংহ-পরিবারের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও সর্বত্যাগী নৃপ-তাপস কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালাবাবুর সুযোগ্য বংশধর যশস্বী ভূম্যধিকারী সাহিত্য-অভিনয়-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহধর্মিণী।

দুর্ভাগ্য সিংহ-পরিবারের বিবাহের দু' বছর পরেই ইন্দ্রচন্দ্র অত্যন্ত অকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। জীবনের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলে দিশাহারা হয়ে পড়লেন বালিকা মৃণালিনী আর সেই পঞ্চদশীর ভগ্নহৃদয়ে কবিতার জন্ম হ'ল। বিধবা মৃণালিনীর মধ্যেই তখন আর এক মৃণালিনী ফুটে উঠলেন, কবি মৃণালিনী। বিরহের তীব্রতার উপশম যেন খুঁজে পেলেন কবিতার মধ্যে, কবিতার মধ্যেই আকণ্ঠ ডুবে গেলেন মৃণালিনী, কবিতার মধ্যে তাঁর আকণ্ঠ নিমজ্জনের ফল প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হ'ল বাঙলা সাহিত্য, উন্নত হল, পুষ্ট হ'ল, সমৃদ্ধ হল। পর পর কয়েক বছরের ব্যবধানেই তাঁর লেখনী থেকে জন্ম নিল প্রতিধ্বনি, নির্ঝরিণী, কল্লোলিনী (গীতিকাব্য), মনোবীণা প্রমুখ কাব্যগ্রন্থগুলি।

প্রায় এগারো বছর কঠোর বৈধব্য জীবন যাপনের পর তিনি পুনঃপরিণীতা হলেন স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র সেনের সঙ্গে। স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে কবি মৃণালিনী দীর্ঘদিন ইউরোপে অতিবাহিত করেছেন। সমাজসেবার কার্যে, নারী জাতির সর্ববিধ উন্নয়নকল্পে, জনগণের সেবায় মৃণালিনীর উৎসাহ আন্তরিকতা ও কার্যাবলী যেমনই প্রশংসনীয় তেমনই সাধুবাদার্হ। কয়েক দিন পূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে পূজনীয় কেশবচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি ইনি জাতীয় গ্রন্থাগারে উপহার দিয়েছেন।

মৃণালিনীর কাব্যাবলীকে সাধারণতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম জীবনে প্রথম স্বামীর পরলোকগমনের ফলে যে নিদারুণ আঘাত বালিকা-বধূর মনে বিরহ বেদনাকে ঘনীভূত করে তুলেছিল তারই সম্যক্ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে প্রথম ভাগের কবিতাগুলির মধ্যে। দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকতে মৃণালিনীর কবিমন নারাজ, কর্মময় জগতে কর্মের মধ্যে দিয়েই আপন জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চান কবি মৃণালিনী। সকলের মত নিজেকেও কর্মের মধ্যে নিয়োজিতা রেখে জগতের সেবা করে যাওয়াই তাঁর মতে জীবনের মুখ্য কর্তব্য।

এই অশীতিবর্ষীয়া মহিলা-কবির আরও দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রেভারেণ্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়

[কলিকাতার বিশপ ও ভারত-ব্রহ্ম-সিংহল-পাকিস্তানের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ]।

অধ্যবসায়, সততা, সেবাব্রত, ধর্মপ্রবণতা, মানবতাবোধ, সহৃদয়তা ও প্রচারবিমুখতা যাঁহার মধ্যে দেখা যায়, নিঃসন্দেহে তিনি দশের মধ্যে এক বছর মধ্যে স্বতন্ত্র গতানুগতিকতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যবান। কলিকাতার বিশপ এবং ভারত, বর্মা, সিংহল,

পাকিস্তান, এর মেট্রোপলিটান প্রথম ভারতীয় রেভারেণ্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদেরই একজন।

রেভারেণ্ড মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ সালের ২৩শে মে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম বংশবাটী ও মাতুলালয় বলাগড়। তিনি ১৯১০ সালে কলিকাতা সেণ্টপলস বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, ১৯১২ সালে সেণ্টপলস্ কলেজ হইতে আই, এ ও ১৯১৪ সালে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুই বৎসর ভাগলপুর টি, এন, স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং ১৯১৭ সালে বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরবর্ত্তী দুই বৎসর আগ্রা সেণ্ট জন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর তিনি ১৯১৯ সালে দিল্লী সেণ্ট ষ্টিফেন্স বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া সাত বৎসর তথায় অবস্থান করেন। ১৯২৬ সালে দিল্লী ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি উহার অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত থাকেন।

ছাত্রজীবন হইতে রেঃ মুখোপাধ্যায় যাজকবৃত্তি (Priesthood) গ্রহণের জন্য নিজেকে যথোপযোগী গঠনে প্রয়াসী হন। দীর্ঘ দশ বৎসর কৃচ্ছ্রসাধন, মানসিক গঠন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মপুস্তক পঠনে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পর ১৯২৪ সালে দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি যাজক হিসাবে পরিগণিত হন। ইহার বার বৎসর পরে তিনি এক বৎসরের জন্য দিল্লী কেমব্রিজ মিশনের অস্থায়ী প্রধান হিসাবে কার্য্য করেন। তৎপরে উহার অর্থ-বিষয়ক সচিবরূপে দুই বৎসর থাকার পর প্রথম ভারতীয় হিসাবে ১৯৩৯ সালে পাকাপাকিভাবে উহার সর্ব্বোচ্চ পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি মনে করেন যে, Rev. Canon U. King এর শিক্ষা তাঁহাকে উক্ত পদের উপযোগী করিয়া তোলে। ১৯৪৪ সালে লাহোরের সহকারী বিশপ ও ১৯৪৭ সালে দিল্লীর বিশপ হিসাবে কার্য্য করিয়া তিনি কলিকাতার বিশপ ও ভারত-বর্ম্মা-সিংহল-পাকিস্থানের মেট্রোপলিটনরূপে ১৯৫০ সালে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রথম ভারতীয় হিসাবে উক্ত দুই পদে তাঁহার নিয়োগ বাঙ্গালীর বিশেষ গর্ব্বের বিষয় বলিয়াই মনে হয়। সুশৃঙ্খল কর্ম্মধারা, সুমধুর ব্যবহার, সুদৃপ্ত আলাপ-আলোচনা, সুষ্ঠু বাচনভঙ্গী ও নিরলস সাধনা—তাঁহার মেধা ও প্রতিভাকে বিশ্ববন্দিত করিয়া তোলে। তাই কানাডার টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় সাদরে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন Doctor of Divinity উপাধিতে আর গত বৎসরে লণ্ডন সহরে রেঃ মুখোপাধ্যায়কে সম্মানিত করা হইল Doctor of Divinity Lauelceth শীর্ষক ধর্মীয় জগতের সর্বোচ্চ সম্মানে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আর্চ বিশপ অফ ক্যাণ্টারবেরী ও বিশ্বের অন্যান্য মেট্রোপলিটানগণ। অরবিন্দনাথ ছাত্রবয়সে হকি, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি উর্দ্দ ভাষাও দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি কয়েক বার য়ুরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

সিমলার পাইনবংশের দুহিতা শ্রীমতী প্রণয়প্রতিমা দেবীকে অরবিন্দনাথ বিবাহ করেন। জননী ৺বসন্তবালা দেবীর কথায় সৌম্যমূর্ত্তি রেঃ অরবিন্দনাথ বলেন যে, মাত্র সাড়ে তিন বৎসর বয়সে পিতৃদেব অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়কে হারাই—তাই তাঁর কথা বিশেষ মনে পড়ে না। কিন্তু দৃঢ় শৃঙ্খলপরায়ণা ও বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্না

রেভারেণ্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়

মা আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে মানুষ করেছিলেন নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে বাবার সামান্য পুঁজি সম্বল করে—আর তাঁর অগাধ ভগবৎ সাধনার উপর নির্ভর করে। ডাক্তারী কলেজে পড়ার সময় বাবা যখন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন—তখন রক্ষণশীল হিন্দু-পরিবার তাঁকে গ্রহণ করতে পারেনি—কিন্তু পরিবারের ছোট্ট বধূটি সেদিন অভয় দিয়েছিলেন আর সাহস যুগিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। জীবনের প্রথম থেকে আমাদের মানুষ হওয়া পর্য্যন্ত মা কি কষ্টই না করেছিলেন! শেষের কথাগুলি বলার সময় তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন আর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর, অকপটে স্বীকার করি আমাকে রীতিমত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বিচারপতি বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[নিরপেক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যব্রতী আইনবিদ]

ঠিক দেখলুম কি? ভুল দেখলুম না তো? কিন্তু তা কি করে হয়—অথচ নিজের চোখকে অবিশ্বাসই বা করি কি করে? ধীরে ধীরে আমার মনটা পরিণত হল এক রণাঙ্গনে—আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে থাকে এই ঠিকে আর ভুলে। কিছুকাল পর এই সংগ্রামের হল সমাপ্তি যখন তিনি নিজেই বলতে লাগলেন তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা—তিনি বললেন, আগে রাত তিনটের সময় এই টেবিলে আমার দেখা যেত। এখন একটু দেরী হয়—তবে চারটের পর বিছানায় আর আমাকে পাওয়া যায় না, ভোরে পদব্রজে আমি বেড়াতে যাই, তারপর বাড়ী ফিরে আসি ট্রামে চড়ে জাষ্ট লাইক এ কমন ম্যান। পঞ্চাশ পেরিয়ে এসেছি তবে

এখনও আমি অনায়াসে অন্ততঃ সিকি মাইল দৌড়তে পারব। বুঝলুম চোখ আমায় ভুল করে নি, ঠিকই দেখেছে কোন এক সকালে একটি ট্রামে একটি নির্দিষ্ট যাত্রীর দিকে চোখ পড়ে যাওয়ায় চোখ দুটো থমকে গিয়েছিল, ভাল করে লক্ষ্য করতে না করতেই ট্রাম ছেড়ে দিয়েছিল, সেই অল্প দেখার মধ্যেই যাত্রীটিকে এ বিষয়ে সেদিন মনে মনে যে অনুমান করেছিলুম তাঁর কথা শুনে বুঝলুম অনুমান আমার অভ্রান্ত, শিয়ালদহের নিকটবর্তী বৈঠকখানা বাজার অঞ্চলে একটি বাড়ীতে নানাগ্রন্থ শোভিত একটি কক্ষে বসে কোন এক রবিবারের সকালে যাঁর সঙ্গে তাঁরই জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র করে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলছে, আমি তাঁকেই দেখেছি। দেখেছি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেখেছি কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীবিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাশয়কে। মানুষে মানুষে মিলে একদিকে যে জটিলতার উদ্ভব তার অবসানকার্যেই তাঁর, নিরপেক্ষতা ও সত্যের আসনে যিনি সমাসীন, মানুষের সকল দ্বন্দ্ব সমস্যার মীমাংসা করার জন্যে যিনি শপথ গ্রহণ করেছেন, মানুষের কর্মকে উপলক্ষ্য করে যাঁকে এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁর গতিবিধি তো মানুষের জগতের মধ্যেই, তার থেকে দূরে নয় সাধারণ মানুষের পরিচিত সীমার মধ্যেই তাঁর পদক্ষেপণ। মানুষকে নিয়েই তাঁর কারবার, মানুষে মানুষে যুক্ত হয়ে কখনো কখনো যে জটিলতা গড়ে তোলে তারই সমাধান করার ভার যাঁর উপর ন্যস্ত—তাঁর চলার পথ হবে মানুষের কাছেই, মানুষের আশেপাশে, মানুষের মধ্যেই। তাইতো সেদিন বিচারপতি বিনায়কনাথকে ট্রামে দেখলুম, সকলের সঙ্গে চলেছেন যেন তাঁদেরই একজন, তাদের পর নন। তাদের কথা শুনতে শুনতে, তাদের ভাষা বুঝতে বুঝতে, তাদের চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে করতে।
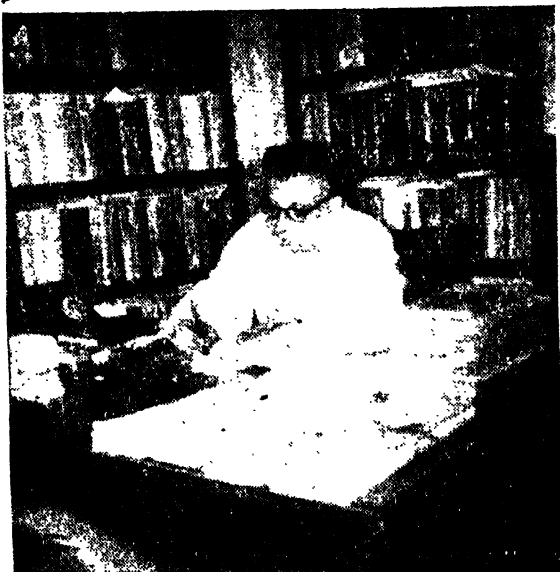
বিচারপতি বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিনিবাস চব্বিশ-পরগণার বারাসতে। প্রপিতামহ বারাসত কোর্টের মোক্তার স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহ চাইবাসার উকীল স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতৃদেব আলীপুরের উকীল স্বর্গীয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র পরিবারটি এক কথায় আইনজ্ঞের পরিবার, এঁরা ছাড়াও পরিবারের আরও অনেক সদস্য আইন ব্যবসার মধ্যেই কালাতিপাত করেছেন। পূর্বপুরুষদের যে অনলস সাধনা তিলে তিলে সমৃদ্ধির অভিমুখে এগিয়ে গেছে, সেই সাধনারই সফলতা, বিকাশ, ও পূর্ণতা দেখা দিল উত্তরপুরুষের মধ্যে। আইন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের বীজ বিনায়কনাথের রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে ছড়িয়ে রয়েছে, আইনজ্ঞ মহলে তিনি যশস্বী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য হবেন না তো হবেন কে?

বারাসতে আদিনিবাস হলেও জন্মেছেন কৃষ্ণনগরে। ১৯০৬ সালের ২৪এ জুন তারিখে। মায়ের নাম শতদলবাসিনী দেবী। এঁর পিতামহ তৎকালীন নগর-জীবনে বিশিষ্ট পুরুষ বাঙলার স্মরণীয় নাগরিক পরলোকগত রায়বাহাদুর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বিনায়কনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৩ সালে বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হিসেবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন, সেখান থেকে আই, এ পাশ করলেন ১৯২৫ সালে। এর পর অসুস্থতা বশতঃ এক বছর পড়াশুনা করতেই পারেন নি, সেই জন্যে ১৯২৭ সালের পরিবর্তে ১৯২৮ সালে বি, এ পাশ করলেন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। ১৯৩০ সালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩১ সালে, য়্যাডভোকেট হিসেবে গৃহীত হলেন ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে।

ছাত্রজীবনে দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের প্রতি বিনায়কনাথের প্রবল অনুরাগ, পরবর্তীকালে তাঁকে দেখা গেল খ্যাতিমান আইনজ্ঞরূপে—কিন্তু তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় শুধু এইটুকুই নয়। ইতিহাস ও আইনের অনুরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রেও তাঁর দক্ষতা কম নয়। রীতিমত টোলে অধ্যয়ন করে সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থের টোলের ছাত্র ছিলেন বিচারপতি বিনায়কনাথ। ১৯২২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত উপরোক্ত শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছেন অপরিসীম নিষ্ঠা সহকারে। কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৮ সালে।

আইনজ্ঞ হিসেবে ইনি গোড়া থেকেই সহকারী ছিলেন প্রতিভাধর আইনজ্ঞ স্বর্গীয় বীরেশ্বর বাগচীর। (স্বনামধন্য ডাঃ সতীনাথ বাগচী ও অধ্যাপক হরিদাস বাগচী এঁরই ভ্রাতা) গুরুর প্রতি তিনি যে কতখানি শ্রদ্ধাশীল তা সেদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনার মধ্যেই বোঝা গেল। ১৯৪০-এ বীরেশ্বর বাগচী মহাশয়ের স্বর্গলাভ। এর পর দু'বছর এঁকে দেখা গেল প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তীর সহকারী হিসেবে। কুশলতা, নিপুণতা ও তীক্ষ্ণতাকে মূলধন করে বিনায়কনাথের সাধনার ধারা এগিয়ে চলতে থাকে সিদ্ধির অভিমুখে। আপন প্রতিভার অবর্ণনীয় ঔজ্জ্বল্যে গৌরবের সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হলেন বিনায়কনাথ, চতুর্দিক

প্রমোদিত হ'ল কীর্তিমান বিনায়কনাথের আইনজ্ঞ-খ্যাতির মধুর সৌরভে। অবশেষে ১৯৫৭ সালের শেষ মাসটিতে উকীল বিনায়কনাথের নাম ঘোষিত হ'ল বিচারপতিরূপে। বিনায়কনাথের সঙ্গেই শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীউমাচরণ সাহা মহাশয়দ্বয়ও বিচারপতিপদে নিযুক্ত হলেন, এঁরা তিনজন বিচারপতিপদে নিযুক্ত হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আরও দু'জনের নাম বিচারপতিরূপে ঘোষিত হ'ল, তাঁরা হলেন শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীঅজিতনাথ রায় মহাশয়দ্বয়।

১৯৩৯ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য) শাখার অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন বিনায়কনাথ। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ইনি ছিলেন কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কৌঁসুলী। ডিসেম্বর ১৯৫৭ থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানার পরিচালক সমিতির ইনি অন্যতম সভ্যের পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। ১৯৫৯ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষের আসনে ইনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের ইনি একজন আণ্ডার সেক্রেটারী এবং কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কর্মজীবনে বার অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারীপদেও এঁকে দেখা গেছে।

সেদিনকার আলোচনার ফাঁকে বিনায়কনাথের কাছে তাঁর নিজের বিচারকজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু জানতে চেয়েছিলুম। তিনি জানালেন যে, আজকাল জজদের প্রতি তাঁদের দৈনন্দিন কাজের সময় বাড়াবার চাপ পড়ছে এবং স্বভাবতঃই তাঁদের ছুটীর পরিমাণও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে—অভিজ্ঞ বিচারক বিনায়কনাথের অভিজ্ঞতাজাত অভিমতে এই নিয়ম থেকে দুটি কুফল দেখা দিতে পারে, প্রথমতঃ জনসাধারণ ভাবতে পারেন যে এতাবৎকাল তাহলে বিচারকরা আপন আপন কর্মে শৈথিল্য দেখিয়ে এসেছেন যতক্ষণ কাজ করার কথা ততক্ষণ তাহলে তাঁরা কাজ করতেন না, এটি একজন বিচারকের কাছে সম্মানের দিক থেকে অত্যন্ত হানিকর। দ্বিতীয়তঃ, একটি লোকের তার যতখানি সামর্থ তার চেয়ে বেশী কাজ যদি তাকে দিয়ে করানো যায়—তাহলে সেই বাড়তি কাজের নমুনাটুকু স্বভাবতঃই নিরেশ হবে। বিনায়কনাথ বলেন, দেখুন সাধারণতঃ হাইকোর্টে আপীলের মোকদ্দমা আসে দু'টি স্তর অতিক্রম করে (মুন্সেফ কোর্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট) অর্থাৎ হাইকোর্টে অধ্যায়টি হচ্ছে সেই মামলার তৃতীয় স্তর বুঝে দেখুন পর পর দুটি কোর্টে যে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে আছে সেই মামলার নিখুঁত বিচার করতে গেলে কি পরিমাণ প্রস্তুতি ও অধ্যয়ন দরকার—হাইকোর্টের আগেকার লম্বা ছুটিগুলিই ছিল ঐ অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট অবসর। আইনজগতের সঙ্গে বিনায়কনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছরব্যাপী। বিচারশালার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়ায় তার কাছ থেকে জানা গেল যে, অসংখ্য আইনজীবীর মধ্যে কেউ কেউ কেউ গতানুগতিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে স্পন্দন নেই, নতুনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই। কেউ কেউ স্থূল রসেই মজে আছেন আবার কেউ কেউ সত্যিকারের সাধনায় আত্মমগ্ন। জিগ্যেস করলুম—আইনজগত সম্বন্ধে বাইরে থেকে তো নানারকম গলদের কথা শোনা যায়, এর সত্যতা কতখানি—বিনায়কনাথ বললেন, গলদ তো সব জগতেই আছে, সুতরাং এ জগতে যে নেই এ কথা জোর করে বলা যায় না; তবে এর কারণ জানেন? প্রধান কারণ অর্থসঙ্কট, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ছেলেরা উকীল হয়ে আসে, মক্কেলের পক্ষে কাজ করে যায়, অনেক কিছুর ভারই তার উপর ন্যস্ত হয়—বেচারারা ভুল করে বসে, তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় হিসেবে হয় ঠিকে ভুল ফলে এমনি করেই বাইরের জগতে আইনজগত সম্বন্ধে এক প্রতিকূল মতের সৃষ্টি হয়। আরও একটি প্রশ্ন করেছিলুম তাঁকে আজকের দিনে সরকার পক্ষ থেকে দেশের আইনের উন্নতিকল্পে যে প্রচেষ্টা চলছে আপনার মতে তা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বা কতদূর বা আদৌ সার্থক কি নয়? বিচারপতির কাছ থেকে উত্তর আসে—বিচার বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতি অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের জন্যে সরকার ল কমিশন করেছেন, এঁরা সার্থক হয় তো এখনও হয়ে উঠতে পারেননি—তবে চেষ্টা করে চলেছেন, ঐ কমিশন থেকে এযাবৎ একটিমাত্র রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে, রিপোর্টটি অনুধাবন করলে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে, অভাব-অভিযোগগুলির প্রকৃত স্বরূপ তাঁদের কাছে অনুদ্ঘাটিত নয়; তা ছাড়া এই মহৎ কার্যে এখনও পর্যন্ত তো তাঁদের কোন রকম ঔদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি?

দেশীয় পণ্ডিত সমাজের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন বাঙালীর নমস্য বাণীসেবক, পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণম্য গুরুদেব পূজনীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তাঁরই প্রপৌত্র স্বর্গীয় পঞ্চানন ভট্টাচার্যের কন্যা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন বিনায়কনাথ। সে আজ তেত্রিশ বছর আগের কথা। বিংশ শতাব্দী তখন পঁচিশটি বছর অতিক্রম করে ছাব্বিশে পা দিয়েছে।

ডাঃ শ্রীনীহারকুমার মুন্সী

[প্রখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী]

পেশার সঙ্গে সমাজসেবা চিকিৎসককে এনে দিয়েছে শ্রেষ্ঠ আসন—তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত চাই সুগভীর জ্ঞান, শিষ্টাচার, মানবতাবোধ আর আর্ত্ত আতুরের সেবা—নিজের সুসজ্জিত চিকিৎসাগারে কথা ক'টি বললেন ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী।

১৯০৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী নীহারকুমার টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ছিল কালিহাতি গ্রামে—বাবা ৺নীরদকুমার মুন্সীর কর্মক্ষেত্র রাজশাহীতে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে। দাদামহাশয় ছিলেন বিন্দুবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৺গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী। ১৯২০ সালে নীহারকুমার রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২২ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই, এস-সি পাশ করে কলকাতায় কারমাইকেল (বর্তমানে আর, জি, কর) কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এক বছর হাউস সার্জেন ও এক বছর রেজিষ্ট্রার হিসাবে কাজ করে ১৯৩১ সালে ইংল্যাণ্ড গমন করেন। মুরফিল্ড চক্ষু হাসপাতালে দু' বছর দশ মাস অবস্থান করে তিনি D. O. M. S ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে কারমাইকেল কলেজে (আর, জি, কর) জুনিয়ার

ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী

চক্ষুচিকিৎসক হিসেবে যোগদান করে পরে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের Prof. of Opthalmology ও বিভাগীয় প্রধান হন। এ ছাড়া চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ইসলামিয়া ও ডাঃ এম, এন, চ্যাটার্জ্জি চক্ষু-চিকিৎসালয়ে তিনি যুক্ত ছিলেন বা আছেন।

ছাত্রজীবনে তিনি সুবিখ্যাত প্রধান শিক্ষক ৺চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ও গৃহশিক্ষক শ্রীমাখনলাল সাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন আর বাড়ীতে মা হিরণ্ময়ী দেবীর অসীম ধৈর্য্য, বাবার সুকঠোর নীতিবোধ ও সততা এবং জ্যাঠামশায় ৺অভয়কুমার মুন্সীর ঔদার্য্য তাঁর মানসিক গঠনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে তিনি নানাব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন—তাই ক্রমশঃ তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও কলেজের তৎকালীন ছাত্র ৺সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে সমাজসেবক-সঙ্ঘ গঠন করেন। তাঁর পরিবারে কেউই চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু এ বিষয়ে রাজশাহীর সার্জ্জেন ৺ডাঃ উপেন্দ্র রায়চৌধুরী ও প্রখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ৺ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব তাঁর উপর ছায়াপাত করে।

১৯৩৫ সালে আসামের চিকিৎসক ৺সুরেশ রায়ের কন্যা ও কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ডাঃ সুনীল রায়ের ভগিনী শ্রীমতী অরুণা দেবীকে ডাঃ মুন্সী বিবাহ করেন। নীহারকুমারের অনুজ হলেন শ্রমিকনেতা শ্রীসুনীল মুন্সী।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ডাঃ মুন্সী নিজের পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। চক্ষুর গঠন হয়েছে সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার দ্বারা—আর চক্ষু মানুষকে সাহায্য করে ভগবানের সৃষ্টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে ও সূক্ষ্ম কর্ম্ম সম্পাদনে। তাই নীহারকুমার আকৃষ্ট হয়েছেন চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভে—আর দৃষ্টিহারাদের পুনঃ দৃষ্টিলাভে সহায়তা করতে। বিলাতে তিনি প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক অধ্যাপক ফষ্টার মুর, স্যার ডিউক এল্ডার, স্যার জন পারসনস্ প্রভৃতির প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ও সহপাঠীদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার জন্য ডাঃ মুন্সী, শ্রীরমেশ মজুমদার (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ উমাপ্রসন্ন বসু (বেঙ্গল ইমিউনিটি), শ্রীনদীয়া অধিকারী (বেঙ্গল কেমিক্যাল), শ্রী কে. দাস, সেন, শ্রী বি, কে, বসু প্রভৃতির সহায়তায় Science Club গঠন করেন ১৯৪০ সালে। বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছে রাজ্যসরকার, জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতির আর্থিক সাহায্য আর জনসাধারণের সহানুভূতি। এর মুখপত্রের "বিভার হুগলী", "কলিকাতার স্বাস্থ্য" ইত্যাদি বিশেষ সংখ্যাগুলি সরকারী ও বেসরকারী মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কলিকাতায় আগত ছাত্রদের চিকিৎসার অসুবিধা দূরীকরণে সেবাব্রতী ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী কয়েকজন ছাত্রসহ নিজের বাড়ীতে ১৯৫২ সালে Students Health Home সৃষ্টি করেন। কয়েক বছরের মধ্যে এটি জনসাধারণের ও সরকারী সাহায্য লাভে সক্ষম হয়েছে। কলিকাতা করপোরেশন নামমাত্র খাজনায় জমির, "আন্তর্জ্জাতিক ছাত্রপরিষদ" যদুপাকির ও পিকিংস্থ এশিয়ান ষ্টুডেন্টস স্যানাটোরিয়াম প্রতি বছর পঞ্চাশটি ভারতীয় ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৫৪ সালে ডাঃ মুন্সী চীনদেশের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ডাঃ নির্ম্মলেন্দু রায়, ডাঃ মোহিনীকান্ত মজুমদার, ডাঃ অমিয় সেন, উড়িষ্যার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মনসাচরণ মালাকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮ সাল থেকে ডাঃ মুন্সী ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্য এবং ১৯৫৩—৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির বঙ্গীয় শাখার সভাপতি ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি অটোমোবাইল এসোঃ অব বেঙ্গলের সভাপতির আসনে সমাসীন।

যাহারা দুঃখ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ তাহারা কোনদিনও জাতির দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁহারা ভগীরথের মত তেজোময় দুর্দ্ধর্ষ-গঙ্গা-প্রবাহ চালিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সহজে ও অল্পায়াসে সেই দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন নাই। পদে পদে পরাজিত ও বিফল হইয়াও তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন, সহস্র বিঘ্ন-বিপদের মধ্যেও শির উন্নত করিয়া রহিয়াছেন। —আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বোম্বাইয়ের ছায়াছবির বাজারে প্রযোজক হিসেবে চিমনলাল বি, দেশাইয়ের নাম যথোচিত বিশিষ্টতার দাবী রাখে, এক কথায় চিমনলাল বোম্বাইয়ের তখনকার দিনে পহেলা নম্বরের প্রযোজকদেরই একজন। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্র বি, দেশাই। আমরা কলকাতায় ফিরে আসবার পর মধুর কাছে সুরেন্দ্র রীতিমত আসা-যাওয়া শুরু করলেন। যাতায়াত ঘনিষ্ঠ থেকে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল। এই প্রসঙ্গে, আজ দীর্ঘ বিশ বছর বাদে একটি মজার কথা মনে পড়ছে, এই তরুণ ভদ্রলোকটিকে বুলবুল অর্থাৎ তাঁর ডাকনামে ডাকা হোত। তিনি আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাবার পরেই আমার বেশ মনে পড়ে মধুকে জিগেস করতুম যে বুলবুল যার নাম সঙ্গীতে তার তো একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা উচিত তা এই বুলবুল গান গাইতে পারে তো? এই রকম মজা করতুম প্রায়ই। কোথায় চলে গেল সেই সব দিনগুলো, কোথায় মিলিয়ে গেল সেই সব পরিবেশ, কোথায় হারিয়ে গেল সেই অসংখ্য চেনামুখ—কাল এগিয়ে চলছে যথানিয়মে তার সঙ্গে তালে তাল রেখে চলতে মানুষ বাধ্য—যে সেই বাধ্যতাকে মানতে চায় না বা পারে না—তাকেই ঠকতে হয় সব চেয়ে বেশী। যারা মিলিয়ে গেল, যারা মিশিয়ে গেল, যারা হারিয়ে গেল তারা আসন পেল স্মৃতির স্বর্ণসিংহাসনে। স্থূলত্বের দিক দিয়ে তারা অবলুপ্ত, সূক্ষ্মত্বের দিক দিয়ে তারা মৃত্যুঞ্জয়ী।

মধুর কাছে দেশাইয়ের আসা-যাওয়ার পিছনে আত্মগোপন করেছিল একটি প্রস্তাব, যথাসময়েই প্রস্তাবটির হ'ল আত্মপ্রকাশ। "অভিনয়" ছবিটি দেশাইয়ের মনে ছায়াপাত করেছিল গভীরভাবে, সেই থেকেই মধুর কাছে তার আসা-যাওয়ার সূত্রপাত। মধুর কাছেই শুনলুম যে এখন তার ইচ্ছে যে মধু বোম্বাই গিয়ে তাদের সাগর মুভিটোনের পক্ষে একটি চিত্রনির্মাণে হাত দেয়, ছবিটি বাঙলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই তোলা হবে। স্বভাবতঃই সাগর মুভিটোন থেকে ছবি তুললে আমাদের বোম্বাইতে বাসা বাঁধতে হবে, কলকাতার বাস তুলতে হবে। কলকাতা ত্যাগ মানেই চৌরঙ্গী প্লেসের বাড়ী ছাড়া। এই বাড়ীতে প্রায় ছ'টি বছর আমাদের কেটেছে, আমাদের দ্বৈত জীবনে এর প্রভাব অনতিক্রম্য, এ বাড়ীর গুরুত্ব আমাদের কাছে যে কতখানি তা বর্ণনার অতীত, তা উপলব্ধির বিষয়। আমাদের জীবনের কত হাসি, কত গান, কত কথা, কত কাহিনী, কত টুকরো টুকরো ঘটনার সারিবদ্ধ স্মৃতি এই বাড়ীর ঘরে ঘরে, এখানে-সেখানে, আনাচে-কানাচে, প্রতিটি ইট-পাথরে অঙ্গাঙ্গীভাবে একীভূত হয়ে গেছে। এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ আমাদের পক্ষে যে কতখানি কষ্টকর তা আমরা ছাড়া যিনি জানেন তিনি স্বয়ং অন্তর্যামী ছাড়া কেউ নন। এই বাড়ীতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমার একান্ত পরিচিত, কতকালের আপন, চিরকালের চেনা। এ বাড়ী ছাড়তে হবে—এই চিন্তাই যে আমার মনের সমস্ত উদ্দীপনাকে দমকা হাওয়ার মত ফুৎকারে একেবারে নিবিয়ে দিল। আমাদের যে সব মঞ্চাভিনয় ও চিত্রাভিনয় সাধারণের অনাবিল স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত হয়েছে—

সবই এই বাড়ী থেকেই, আর একটি চিন্তারও ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটল আমাদের হর্ষবিষাদগ্রস্ত মনে—কলকাতা ছাড়া মানে আমাদের মঞ্চাভিনয় প্রচেষ্টারও ইতি মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আমাদের যে অপরিসীম অনুরাগ—তার সেইখানেই শেষ রঙ্গমঞ্চের সেবা করার সৌভাগ্য থেকে আমাদের হতে হবে বঞ্চিত, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে সুবোদ্ধা জনমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা-নমস্কার জানাবার যে সুযোগ এতকাল ধরে পেয়ে এসেছি—এবার তো তাও হারাতে হবে।

আবার এদিকে উভয় ভাষায় ছবি করার বাসনাও অন্তরে প্রবল, বিশেষ করে হিন্দী ছবির নির্মাণে অসাধারণ আগ্রহ। উভয় ভাষায় এবং বিশেষ করে হিন্দীতে ছায়াছবি তোলার একটা অদম্য বাসনা মনের মধ্যে লুকিয়েছিল, দেশাইয়ের সঙ্গে

স্বর্গীয় ধীরাজ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী সাধনা বসু
"কুমকুম"-এর একটি দৃশ্যে

যোগাযোগের এবং তার প্রস্তাবের ফলে সেই বাসনাটাই যেন শাখা-প্রশাখায় একটা বিরাট বিশাল রূপ নিল। বোম্বাই যাওয়াই আমরা ঠিক করলুম। মধু একা যেতে চাইল না, সে চাইল সসম্প্রদায়ে যেতে, ছবি সে হিন্দীতে করবে, সাগর মুভিটোনের পক্ষেই, তবে সেই ছবিতে স্পর্শ থাকবে তার নির্বাচিত কুশলীদের কুশলী হাতের, সেই ছবিতে মিশিয়ে থাকবে তার নির্বাচিত কুশলীদের কর্মকৃতিত্বের স্বাক্ষর, ছবির প্রথম দৃশ্যটি থেকে শেষ দৃশ্যটি পর্যন্ত গৃহীত হবে তার নির্বাচিত কুশলীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সে চাইল তার সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে যেতে—শিল্পীদের, কলাকুশলীদের, শিল্পনির্দেশক, সুর-সংযোজক এবং সহকারীদের। আমার মনে আছে, এই প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনার সে কি সমারোহ, মধুর সঙ্গে এ বিষয়ে অপর পক্ষের তখন কথাবার্তার সে যে কি ব্যস্ততা তা ভাবলেই বিস্ময় মনের মধ্যে জন্ম নেয় আজও। চিঠিপত্র হার মানল, ট্রাঙ্ককল চিঠির শূন্য স্থান পূর্ণ করল তুলনামূলক সুবিধা ও সময় সংক্ষেপণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আমাদের মধ্যে এক কথায় তখন ব্যস্ততার সমারোহ, জীবনীশক্তি যেন তখন বেগপ্রাচুর্যের জয়গান আর কর্মোদ্যম যেন দ্রুততার নিদর্শন।

অবশেষে মধুর প্রত্যেকটি প্রস্তাব মেনে নিলেন প্রযোজকবর্গ। সে যা চেয়েছিল, তাই সরবরাহ করতে তাঁরা হলেন প্রতিশ্রুত, তার প্রতিটি সর্ত্ত তাঁরা মেনে নিলেন সম্পূর্ণরূপে। নির্মিতব্য ছবি হিসেবে নির্বাচিত করা হল—"কুমকুম দি ডান্সার" যার সৃষ্টি হয়েছে শ্রীমন্মথ রায়ের লেখনীর মাধ্যমে।

আগেই বলেছি, ছবিটি উভয় ভাষাতেই (বাঙলা ও হিন্দী) তোলার কথা হয়েছিল অর্থাৎ গল্প একটি হলেও দেখা যাচ্ছে ছবি হচ্ছে দুটি। একটি কাহিনীর ভারতীয় দুটি পৃথক ভাষায় চিত্রায়ণ। এই দুটি ছবিতেই নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত শক্তিধর অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য, সেকালের অপরিহার্য চিত্রনায়ক। স্মৃতির টুকরোতে এই প্রসঙ্গ (বিশেষ করে ধীরাজের প্রসঙ্গ) যখন লিখে চলেছি তখন মনের মধ্যে বিগত কালের অজস্র স্মৃতির মন্থনে একটা অনন্যসাধারণ আনন্দ জন্মেছে ঠিকই, সেই সঙ্গেই যাদের ঘিরে সেই সব কাহিনীর সৃষ্টি, যাদের স্পর্শে সেই সব কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে, যাদের কল্যাণে সেই কাহিনীগুলি অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে অমরত্বের আসনে তাদের অনেকেই আজ পার্থিব দেনা-পাওনা, হিসেব-নিকেশ সব চুকিয়ে এক অজানা মহাশূন্যের উদ্দেশে যাত্রা করল, কায়িক উপস্থিতি তাদের কোনদিন ঘটবে না এই পার্থিব পৃথিবীর বুকে, ধরণীর অনিত্য এই খেলাঘরের হাসিতে, কান্নায়, আনন্দে, বেদনায়, হর্ষে, বিষাদে অংশগ্রহণ করতে তাদের আর দেখা যাবে না—এই বিরাট দুঃখ সমস্ত আনন্দকে ছাপিয়ে উঠে মনকে তীব্রভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই তাদেরই মধ্যে নিঃসন্দেহে ধীরাজ অন্যতম। স্মৃতির টুকরোয় গত যে কিস্তিতে ধীরাজের নামোল্লেখ করা হয়েছে তখনও সে জীবিত। স্বপ্নেও ভাবি নি যে এত আকস্মিক ঘটবে তার জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি। তার আত্মার শান্তি হোক।

উভয় ভাষাতে গৃহীত কুমকুম মুক্তিলাভ করল ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে।

বিংশ শতাব্দী তখন উনচল্লিশটি বছর অতিক্রম করে চল্লিশের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্টারে ডাকবাংলো

প্রথিতযশা সাহিত্যশিল্পী শ্রীমনোজ বসুর 'বৃষ্টি বৃষ্টি' শীর্ষক উপন্যাসটি বহুজন-সমাদৃত। 'ডাকবাংলো' এই উপন্যাসটিরই নাট্যরূপ। বর্তমানে ষ্টারে সগৌরবে অভিনীয়মান।

এক ডাক্তারের ইতিহাসের গবেষণারত পুত্র এর নায়ক ও এক আত্মভোলা ঐতিহাসিক গবেষণায় নিমগ্ন সমাহিত সুধীর কন্যা এর নায়িকা। নায়ক ও নায়িকার পিতার আদিনিবাস একই গ্রামে। বৃষ্টির বেগ বৃদ্ধিতে বাধ্য হয়ে নায়িকা ইরা আশ্রয় নেয় নায়ক অরুণাক্ষের বাড়ীতে। এই ভাবেই উভয়ের প্রথম দিনের প্রথম পরিচয়। অরুণাক্ষের বাবা অনুজাক্ষ নির্বাচনপ্রার্থী। কিন্তু মনোনয়নপত্র পাওয়ায় তাঁর প্রবল বাধা হল তিনি কাশীশ্বরের পৌত্র যে কাশীশ্বর ইংরেজের চর বলে খ্যাত এবং গ্রামের সকলের ধারণা যে নির্দোষ, সত্যপরায়ণ ও দৃঢ়চেতা রামনিধির ফাঁসির মূল তিনিই—এই রামনিধিই নায়িকা ইরার বাবা বিশ্বেশ্বরের পিতামহ। বিশ্বেশ্বরের লেখা 'ভারত ও ইংরেজ' গ্রন্থে তিনি অবশ্য কাশীশ্বরের কলঙ্কমোচন করেছেন। কাশীশ্বরকে তিনি আগাগোড়াই রামনিধির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠে বিশ্বেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হন অনুজাক্ষ তিনি স্বগ্রামে নির্বাচন কেন্দ্রে বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে যান সেখানে গবেষণার উপকরণ স্বরূপ দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত বহু কাগজপত্র বিশ্বেশ্বরের হাতে সমর্পণ করেন সেইগুলি দেখতে দেখতে বিশ্বেশ্বর আবিষ্কার করেন যে কাশীশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভুল, তিনি ইংরেজকে সাহায্য না করলে ইংরেজের সাধ্য ছিল না জনপ্রিয় রামনিধির কেশস্পর্শ করে। সপুত্র অনুজাক্ষ সেদিন বিশ্বেশ্বরের বাড়ী এসেছেন ইরার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কিন্তু সেইদিনই বিশ্বেশ্বর জানালেন যে সত্যের প্রকাশ তিনি করবেনই, কাশীশ্বরের প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন না করলে তাঁর ঐতিহাসিক সাধনার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। স্বভাবতঃই মিত্রতার অবসান। বাসগৃহ অনুজাক্ষের হস্তগত হওয়ায় তাঁর দ্বারা অপমানিত হতে পারেন এই আশঙ্কায় স্ত্রী-কন্যা নিয়ে পৈত্রিক ভিটেয় ফিরে গেলেন বিশ্বেশ্বর। এর পর অরুণাক্ষের মায়ের দ্বারা প্রেরিত তাঁর পিতৃদেব (অরুণাক্ষের মাতামহ) গোবিন্দ ঘোষের প্রচেষ্টায় অরুণের সঙ্গে ইরার বিবাহ। পথিমধ্যে আবার এক ঝড়বৃষ্টির রাতে ঘটনাচক্রে সস্ত্রীক অনুজাক্ষের সঙ্গে নবদম্পতির সাক্ষাৎ এক ডাকবাংলোয় এবং পুত্রবধূদর্শনে অনুজাক্ষের মন থেকে সকল বিরোধের সূত্রনাশ।

এদিকে সারা নাটক জুড়ে আরও দুটি বিশেষ ধরণের চরিত্রের সন্ধান মেলে। এই দুই পরিবারের সঙ্গে তাঁদের সমান যোগাযোগ (অবশ্য বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে একটু বেশী নিবিড়) এবং এই প্রসঙ্গে এঁদের উল্লেখও বিশেষ ভাবে করণীয়। এঁরা দু'জন হচ্ছেন যুগচক্র পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর সহকারী। এই সম্পাদকই বিশ্বেশ্বরের গ্রন্থের প্রকাশক।

নাটকটি রসিকমহলে যথোচিত সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি. নাটকটির পরিণতি জানার জন্যে দর্শকচিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনোজ বসুর মনোজ্ঞ কাহিনী ও কৃতী নাট্যকার এবং সুখ্যাত সাহিত্যিক দেবনারায়ণ গুপ্তর সার্থক নাট্যরূপদান ও পরিচালনা এই দুয়ে মিলে এক অপরূপ রস সমৃদ্ধ নাট্যসম্ভারের সৃষ্টি করেছে। নাটকটি মূলতঃ তিনটি ধারায় বয়ে চলেছে—একটি বিশ্বেশ্বরকে ও তৎপরিবারকে কেন্দ্র করে, একটি অমুজাক্ষ ও তৎপরিবারকে কেন্দ্র করে এবং আর একটি কৃতান্তকে কেন্দ্র করে, লক্ষ্যণীয় এই, তিনটি ধারা সমান তালে তাল রেখে চলেছে অসমতার চিহ্ন কোথাও ধরা পড়ে নি। শিল্পকলায়, রসরুচিতে, প্রয়োগ নৈপুণ্যে, চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনাসমাবেশে নাটকখানি এক অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। কি রচনায়, কি প্রযোজনায়, কি পরিচালনায়, কি অভিনয়ে এক কথায় সারা নাটকটিতে এক অনুপম ছন্দোযুক্ত আন্তরিকতাপূর্ণ প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়, কৃত্রিমতার, আড়ষ্টতার, অসারতার লেশমাত্র নেই। নাটকটির উত্তরোত্তর সাফল্য আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

নায়ক নায়িকা ভূমিকায় দুটির রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে আশীষকুমার ও সন্ধ্যা রায়। বিশ্বেশ্বর ও অমুজাক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যথাক্রমে ছবি বিশ্বাস ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক কৃতান্ত ও তদীয় সহকারী পঞ্চাননের ভূমিকায় দেখা গেছে যথাক্রমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপকুমারকে। এঁরা ছাড়া আরও যে সব শিল্পী ভূমিকালিপিতে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমাংশু বসু, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় শীকণ্ঠ গুপ্ত, প্রীতি মজুমদার, নকুল দত্ত, শৈলেন ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, সাধনা রায়চৌধুরী, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকটির সুরসংযোজনা ও নৃত্যপরিকল্পনা করেছেন যথাক্রমে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মিতা চট্টোপাধ্যায়।

রঙমহলে—এক মুঠো আকাশ

"এক মুঠো আকাশ" এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাকে নতুন করে কিছু বলা অনাবশ্যক। স্মরণ থাকতে পারে অল্পকাল এই সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীর পাতায় প্রথম প্রকাশ লাভ করে। ধনঞ্জয় বৈরাগী ছদ্মনামের অন্তরালে শক্তিমান নাট্যবিদ ও সাহিত্যিক তরুণ রায় এর রচয়িতা। আজকের যুব সমাজের চারিত্রিক অধোগতি নৈতিক মানের ক্রমাবনতি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের পায়ে আত্মসমর্পণ প্রমুখ সমাজের একাধিক ঘন দুর্যোগের এক বাস্তব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উপন্যাসটির মাধ্যমে। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ বর্তমানে প্রভূত খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে রঙমহলে। আজকের দিনের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বিষবাষ্পের প্রভাব আর তারই ছায়াপাত ঘটছে অপরিপক্ক শিশু মনে, যাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যে অপেক্ষা করে আছে আগামী দিনের সোনালী সকাল তারা আজকের এই কাল-রাত্রিতে সর্বনাশা রূপোর কাঠির স্পর্শে তিলে তিলে বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর তরুণ সম্প্রদায়কে এই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে, সহায়তা করছে মানুষের মুখোসপরা কতকগুলি দানব—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে জগতে করতে পারে না—এমন কোন কাজ নেই।

আজকের দিনের এই ক্ষয়িষ্ণু, ঘুণধরা সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে অপরিসীম পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন রচয়িতা। এর কাহিনী কাগজ-কালি কলমে লেখা বলে সময় বিশেষে মনেই হয় না, দরদ, অনুভূতি, হৃদয় দিয়ে লেখা বলে মনে হয়। তাঁর নাট্যরূপদানও যথাযথ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। নাটকটি আবেগে সমৃদ্ধ, গতির দিক দিয়ে বেগবান, স্বতঃস্ফূর্ত। নাটকটির সব চেয়ে বড় সম্পদ নতুনত্ব। আঙ্গিকে বিন্যাসে, প্রয়োগ কুশলতায় সকল দিক দিয়েই নাটকখানি যেন এক মালিন্যহীন নতুনত্বের দৃপ্ত জয়ধ্বনি। নাটকখানির অন্তর্নিহিত আবেদন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যে কোন দর্শকের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হবে। উৎকর্ষে, ঔজ্জ্বল্যে বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে, শোভনতায় ইত্যাদির সমন্বয়ে সমগ্র নাটকখানি এক প্রভাববান বলিষ্ঠ রসসৃষ্টিরই নামান্তর মাত্র। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলার আছে গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে "এক মুঠো আকাশ" নামকরণের তাৎপর্য লেখকের দ্বারাই বিশ্লেষিত হয়েছে মূল উপন্যাসে এবং সেই অধ্যায়ে তদনুযায়ী যথোপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু নাটকের ধর্ম অনুসারে উপন্যাসকে অনেক অদল বদল করতে হয়, এই কাহিনীটির যখন নাট্যরূপ দেওয়া হ'ল তখন যে অংশে গ্রন্থের নামকরণটি বিশ্লেষিত হয়েছে সেই অংশটিও বাদ দেওয়া হয়েছে, ফলে উপন্যাসের মধ্যে যে পরিবেশের সাহায্যে নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে, নাটকে তা হয় নি, সেই অংশটিই নাটকটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; ফলে সেই পরিবেশটিও এখানে অনুপস্থিত (যার সাহায্যে নামকরণের অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে) এবং সবিনয়ে বলছি আগাগোড়া নাটকের মধ্যে ঐ নামকরণের কোন অর্থই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে তরুণবাবু দৃষ্টি দিলে আমরা খুশী হতুম। বাঙলার সুবোদ্ধা প্রাণবন্ত রসিকসমাজে এই যুগোপযোগী নাটকটি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হোক এই কামনাই করি। যাঁদের কেন্দ্র করে এই কাহিনীর সৃষ্টি, যাদের অধঃপতন সারা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, যাদের ক্রমনিম্নগামিতা তরুণ রায়ের শিল্পিমনকে ব্যথিত করে তুলেছে এই নাটকটি দেখে তারা অর্থাৎ পতনোন্মুখ যুবশক্তি যদি আত্মসচেতন হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন তা হলে তার চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছু থাকতে পারে না।

কেষ্ট ও গৌরীর অর্থাৎ নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তরুণ রায় স্বয়ং ও তাঁর সুযোগ্যাসহধর্মিণী শ্রীমতী রায়। বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে দেখা দিয়েছেন রবীন মজুমদার, নবগোপাল লাহিড়ী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পিকলু, সমরকুমার, মিণ্টু, কেতকী দত্ত, কবিতা সরকার, শীলা পাল, শুক্লা দাস, প্রভৃতি। এঁরা ছাড়াও অন্যান্যাংশে ভূমিকাগ্রহণ করেছেন কার্তিক সরকার, গোপাল মজুমদার, সুনীত মুখোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, বলীন সোম, আশা দেবী ইত্যাদি শিল্পিবৃন্দ।

এই প্রাণস্পর্শী নাটকটি দর্শক সমাজে উপহার দেওয়ার জন্যে আমরা রঙমহলের অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ এবং তরুণ রায়কে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি।

দীপ জ্বেলে যাই

ত্যাগ, সেবা ও করুণাই বাঙলা দেশের নারী সমাজের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য, এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যেই বাঙলা দেশের নারীত্বের বিকাশ। বিশেষ করে সেবাধর্ম নারীত্বের প্রধান অঙ্গ। যশস্বী সাহিত্য শিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় এই চিরকালের সত্যটিই নতুন করে দেখা দিয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে "নার্স মিত্র" অন্যতম। স্মরণ থাকতে পারে, বহুকাল আগে মাসিক বসুমতীতেই এই গল্পটি প্রকাশলাভ করেছিল। বর্তমানে শ্রীঅসিত সেনের সুপরিচালনায় ঐ গল্পটিই "দীপ জ্বেলে যাই" নাম নিয়ে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সমারোহে প্রদর্শিত হচ্ছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে কেবলমাত্র কুশলী সাহিত্যিক বললে ভুল করা হয় এক অতুলনীয় অভিনব অনুভূতি সম্পদের তিনি অধিকারী। নারীর একটি রূপ তিনি অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে এখানে ফুটিয়েছেন। নারীজীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিণতির এক নিখুঁৎ চিত্র এখানে উদ্‌ঘাটিত। যে সব জীবনে দীপ নিভে যায় সেই নিভে যাওয়া দীপ আবার জ্বলে ওঠে যে কল্যাণময়ীদের মঙ্গলস্পর্শে সেই মমতাময়ীদের জীবনের সবকটি দীপ যদি এক এক করে নিভে যায় তখন তাদের জীবনদীপ আবার জ্বালিয়ে দেবে কে? তাদের জীবনের শুষ্কভূমির উপর করুণাধারার মত হবে কার আবির্ভাব হৃদয়ের সেই শুকনো মরুভূমির উপর কি এক ফোঁটা জলের মতও পড়বে না কারোর সহানুভূতি, অনুকম্পা বা সান্ত্বনার চিহ্ন? এই প্রশ্নটিই লেখক এখানে উত্থাপিত করেছেন পাঠক সাধারণের দরবারে।

নায়িকা রাধা মিত্র এক মানসিক চিকিৎসালয়ের এক প্রধান শুশ্রূষাকারিণী। মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে তাপস এল চিকিৎসার জন্যে। আপন প্রণয়িনীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে তার এই অস্বাভাবিক অবস্থায় ডাক্তার বিধান দিলেন, যে সাধারণ ওষুধ পত্তর তো চলবেই তা ছাড়াও শুশ্রূষাকারিণীকে অভিনয় করতে হবে প্রেমিকার আর রোগীর সুস্থতা লাভে সাধারণ ওষুধ পত্তরের তুলনায় সেই অভিনয়ই সহায়তা করবে সব চেয়ে বেশী। রাধা মিত্রের উপর তাপসের ভার পড়ল, রাধা সে ভার নিল না, তাপসের আগে দেবাশীষ এসেছিল, এক অবস্থা, অভিনয় করতে করতে রাধা অনেক পরে বুঝতে পারল যে অভিনয়ের সীমা তো তার কাছে অতিক্রান্ত তখন সে চরম সত্যের মুখোমুখী। কিন্তু দেবাশীষকে তো সে পেল না, দেবাশীষও দিতে পারল না তার প্রেমের মূল্য, সেইজন্যেই আর অভিনয়ের মধ্যে যেতে চাইল না রাধা। যাঁর হাতে তাপসের চিকিৎসার ভার পড়ল তিনি তাকে সামলাতে না পারায় সেই রাধাকেই নিতে হ'ল তার চিকিৎসার ভার। তাপস সেরে উঠল তারপর? তারপর রাধার আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হ'ল। তাপসকে ডাক্তার জানালেন যে রাধা তাকে আসলে ভালবাসেনি, তাকে সারাবার জন্যে অভিনয় করেছিল মাত্র। তাপস কথাটা বিশ্বাস না করলেও ঘটনাচক্রে করতে বাধ্য হল। কিন্তু রাধার মনের প্রকৃত ভাষা একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া কেউই বুঝতে পারল না। এদিকে ক্রমান্বয়ে মানসিক আঘাতের ফল রাধা মিত্র নিজে হয়ে পড়ল মানসিক ব্যাধিগ্রস্তা। সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থায় তাপসের পরিত্যক্ত কামরায় সে স্থান নিল, শুশ্রূষাকারিণী হিসেবে নয় শুশ্রূষাপ্রার্থিনী হিসেবে। গল্পাংশটি যথোচিত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। পরিচালক সেন যথাযথ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণও উচ্চাঙ্গের। সুর যোজনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলা-কৌশলে, অভিনয় সম্পর্কে এবং কাহিনীর গভীরতার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে দীপ জ্বেলে যাই একখানি যুগোপযোগী, প্রাণস্পর্শী ও সার্থকনামা ছায়াছবি। কাহিনীর সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলির যথোচিত বিকাশে ঘটনাটির সুবিন্যাসে, রূপালী পর্দার বুকে গল্পের মূল বক্তব্যের সম্যক-প্রস্ফুটনে ছবিটি সর্বতোভাবে সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করেছে।

এই ছবির যা সবচেয়ে বড় সম্পদ তা হচ্ছে সুচিত্রা সেনের অনবদ্য অভিনয়, শ্রীমতী সেন রাধার চরিত্রটিকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, শ্রীমতী সুচিত্রার অভিনয় সমস্ত ছবিটিকে নানা দিক দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী অন্যান্যাংশে অবতীর্ণ হয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায় পরিতোষ রায়, চন্দ্রা দেবী, নমিতা সিংহ, কাজরী গুহ, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে সবশেষে একটি কথা বলতে হচ্ছে যে ছবিটির গতির দিকে পরিচালক দৃষ্টি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। ছবিটির গতি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বলতে বাধ্য হচ্ছি, অত্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে।

তোমরা দেখিতেছি সবাই সমান। যেমন সঙ্গীতে, তেমনই অন্যান্য সকল বিষয়ে। তোমরা বুঝিবার চেষ্টামাত্র কর না। তোমরা বল আমাদের দেশের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, দর্শনশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রই নয়। আমরা ইয়োরোপের সকল জিনিষই বুঝিবার এবং আদর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিও না যে, ভারতবর্ষের জিনিষকে আমরা অশ্রদ্ধা বা অনাদর করি। আমাদের কাব্য, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র যদি পড়, তবে দেখিতে পাইবে যে আমরা 'হিদেন' নই। সেই অচিন্ত্য অনির্বচনীয় ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তোমাদেরই মত,—চাই কি, কোন কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান তোমাদের চেয়েও গভীরতর ও নিবিড়তর।

—দ্বারকানাথ ঠাকুর

◎ দেশে-বিদেশে ◎

বৈশাখ, ১৩৬৬ (এপ্রিল-মে, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর (কলিকাতা) গলিতে নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত একাডেমী ভবনের উদ্বোধন।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) : কেরল শিক্ষা বিল অনুযায়ী কেরলে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সরকার-বিরোধী সভা বা আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ।

৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল) : বমডিলা ত্যাগ করিয়া তিব্বতী ধর্ম্মগুরু দালাই লামার খেজং উপস্থিতি।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল) : অগ্নিযুগের বিপ্লবী নায়ক ও দৈনিক বসুমতীর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

খালের জলের বিরোধ সম্পর্কে পাক্-ভারত অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৫ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল) : দালাই লামার নিকট মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পত্র (সীল করা) প্রেরণ।

দুর্গাপুরে ডি. ভি. সি. কর্ম্মচারীদের সভায় ডি. ভি. সি'র সদর দপ্তর স্থানান্তরকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল) : দিল্লীর অদূরবর্ত্তী হিসার জেলায় পাক্ বিমান কর্ত্তৃক পুনরায় ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন।

ভারতের সমগ্র পূর্ব্ব সীমান্ত সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত।

লোকসভায় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক সমূহ জাতীয়করণের কম্যুনিষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

৭ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল) : মুসৌরীতে সদলবলে দালাই লামার উপস্থিতি এবং বিড়লা ভবনে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা।

লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—কোনপ্রকার পাঞ্জাবী সুবা (পাঞ্জাবী ভাষী রাজ্য) গঠিত হইতে দেওয়া হইবে না।

স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত পন্থ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া উইলিংডন নার্সিং হোমে (দিল্লী) ভর্ত্তি।

৮ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল) : সংসদীয় সরকারী ভাষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ—কেন্দ্রে ইংরেজীর স্থলে হিন্দী ও রাজ্য সমূহে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুপারিশ।

৯ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) : ভারত কর্ত্তৃক আমেরিকার নিকট পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী।

১০ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল) : তিব্বত প্রসঙ্গে মুসৌরীতে দালাই লামার সহিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর জরুরী বৈঠক।

বিবাহে যৌতুক দেওয়া ও লওয়া নিষিদ্ধ করিয়া লোকসভায় আইন সচিব শ্রীঅশোককুমার সেন কর্ত্তৃক বিল উত্থাপন।

১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল) : কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার শ্রী বি. কে. সেন কর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ।

মুসৌরীতে উচ্চপদস্থ তিব্বতী উপদেষ্টাদের সহিত দালাই লামার বৈঠক।

১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল) : জলের নিদারুণ অভাবে আর. জি. কর হাসপাতালে (কলিকাতা) অচলাবস্থার উদ্ভব।

আগরতলার অনতিদূরে হরিয়ারছড়ায় সশস্ত্র পাকিস্তানীদের হানা ও ভারতীয় পুলিশের সহিত গুলী-বিনিময়।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের বৈঠক।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল) : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় ১৩ জন হতাহত।

১৪ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল) : পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র জলের জন্য হাহাকার—আসানসোলে এক টাকায় এক বালতি জল বিক্রয়।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল) : কলিকাতা কর্পোরেশনের নলকূপ ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীগণ (কয়েকজন অফিসার ও ১ জন কাউন্সিলার সমেত ১৮ জন) বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল) : সরকারী শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতীক ধর্ম্মঘট ও অনশন।

১৭ই বৈশাখ (১লা মে) : আসামের পাথারিয়া বনাঞ্চলে পাক্ সশস্ত্র বাহিনীর পুনরায় গুলীবর্ষণ।

ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনার্থ লোকসভায় বাণিজ্য ও শিল্পসচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিল উত্থাপন।

১৮ই বৈশাখ (২রা মে) : কলিকাতার বিড়লা পার্কে ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী যাদুঘরের (সংগ্রহশালা) উদ্বোধন।

রিষড়ায় কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই কর্ত্তৃক ভারতের প্রথম পলিথিন কারখানার উদ্বোধন সম্পন্ন।

১৯শে বৈশাখ (৩রা মে) : কলিকাতায় 'বিশ্ব মিলন উদ্দেশ্যে বিশ্ব কংগ্রেস'-এর উদ্যোগে ভারত পাকিস্তান পুনর্মিলন মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান।

দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্র সরোবর (লেক) ময়দানে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট পরিকল্পিত ষ্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত।

২০শে বৈশাখ (৪ঠা মে) : হাওড়া জেলা শাসকের ভবনের সম্মুখে শ্রমিক-বিক্ষোভকালে পুলিশের লাঠিচালনা—২৪ জন আহত ও ৩১ জন গ্রেপ্তার।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক ভারত-পাকিস্তান যৌথ প্রতিরক্ষার পাকিস্তানী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

২১শে বৈশাখ (৫ই মে) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যনীতির জন্য রাজ্যের বিভিন্ন বাজার হইতে চাউল উধাও।

ভারতে তিন লক্ষ সেবা সমবায় গঠনের জন্য রাজ্যসভায় সরকারী ভাবে খসড়া পরিকল্পনা পেশ।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে) : নদীয়ার ফাজিলনগরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১১জন নিহত ও ১৫ শত গৃহ ভস্মীভূত।

২৩শে বৈশাখ (৭ই মে) : মাথাই প্রসঙ্গে তদন্ত রিপোর্টের উপর শ্রীনেহরুর মন্তব্য—শ্রীমাথাই (প্রধান মন্ত্রীর ভূতপূর্ব্ব বিশেষ সচিব শ্রী এম ও মাথাই) সরকারী পদমর্য্যাদার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

রাওয়ালপিণ্ডির নিকট গুলীবর্ষণে ভারতীয় 'ক্যানবেরা' বিমান ধ্বংসের জন্ত পাকিস্তানের নিকট ভারতের ক্ষতিপূরণ দাবী।

২৪শে বৈশাখ (৮ই মে): কলিকাতা ও হাওড়া এলাকায় এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ ও রাজ্য-সরকারের খাদ্য দপ্তরের অফিসারগণ কর্ত্তৃক যুগপৎ চাউলের মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ অভিযান চালনা।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে): দেশের সর্ব্বত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নব নবতিতম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন।

লোকসভার বাজেট অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্ত মুলতুবী।

২৬শে বৈশাখ (১০ই মে): হাওড়া পৌর এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট উদ্ভব।

নয়াদিল্লীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ।

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে): কলিকাতার প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

২৮শে বৈশাখ (১২ই মে): উত্তেজিত জনতার উপর নাগপুর ষ্টেশনে পুলিশের লাঠিচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে): খালের জলের বিরোধ-মীমাংসায় নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউজেন ব্ল্যাকের বৈঠক।

৩০শে বৈশাখ (১৪ই মে): সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—"খালের জল সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের সর্ব্বশেষ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে।"

ভারত সরকার কর্ত্তৃক শিলিগুড়ি-মালদহ নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে): কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না কর্ত্তৃক পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলি আপাততঃ বন্ধ না করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

উড়িষ্যায় কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তুতির জন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ-পত্র পেশ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জীর পদত্যাগ।

বহির্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): অসুস্থতা নিবন্ধন মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেসের পদত্যাগ।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): তিব্বতে বিদ্রোহীদের সহিত চীনা সৈন্যদের অব্যাহত প্রচণ্ড সংগ্রাম।

৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): পিকিং-এ চীনের গণ-কংগ্রেসের (তৃতীয় জাতীয় কমিটি সম্মেলন) অধিবেশন সুরু।

ম্যাক্সিকোর বিমান দুর্ঘটনায় ২৬ জন আরোহী নিহত।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল): পাক্ প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ কর্ত্তৃক নিরাপত্তার নামে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কর্ত্তৃক মিঃ ডালেসের স্থলে পররাষ্ট্র সচিব পদে মিঃ ক্রিশ্চিয়ান হার্টারকে নিয়োগ।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল): মন্ত্রিসভা সহ 'আজাদ কাশ্মীর' প্রেসিডেণ্ট সর্দ্দার মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁর পদত্যাগ।

৯ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) তিব্বত প্রসঙ্গে ভারতীয় 'সম্প্রসারণবাদীদের' বিরুদ্ধে চীনের হুঁসিয়ারী।

১০ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল): পাক্ প্রেসিডেণ্ট জেঃ আয়ুব খাঁর নূতন আদেশক্রমে অযোগ্যতার জন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের দণ্ডের ব্যবস্থা।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): চীনের রাষ্ট্রপতিপদে মাও সে-তুং-এর স্থলে মার্কসীয় তত্ত্ববিদ লি শাও-চী নিযুক্ত। প্রধান মন্ত্রীর পদে পুনরায় চৌ এন-লাই-এর নিয়োগ।

জার্ম্মান প্রসঙ্গে ওয়ারশ-এ ওয়ারশ চুক্তিভুক্তি দেশসমূহের (রুশিয়া সহ) পররাষ্ট্র পরিষদের বৈঠক এবং এই বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রণে গণ-চীন প্রতিনিধির উপস্থিতি।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল): তিব্বতের পাঞ্চেন লামা ভারত পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত।

দুর্গম গিরিপথে তিব্বতী উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): নেপালের রাজা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক ভীমনগরে কোশী বাঁধের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন।

১৮ই বৈশাখ (২রা মে): ব্রহ্মে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্ত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উ নু কর্ত্তৃক অহিংস আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

করাচী বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে পাক্ সামরিক শাসনের নিন্দা এবং অবিলম্বে পাকিস্তানে গণপরিষদ গঠন ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্ত্তনের দাবী।

২০শে বৈশাখ (৪ঠা মে): ইঙ্গ-মার্কিণ জঙ্গী বাহিনীর সহযোগিতায় করাচীতে পাকিস্তান, ইরাণ ও তুরস্কের বৃহত্তম বিমান মহড়া।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে): তিব্বতের প্রশ্নে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত বাদ-প্রতিবাদ হওয়ায় 'পিকিং ডেলী'র দুঃখ প্রকাশ।

কেনিয়ায় বন্দী শিবিরে মাউ মাউদের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চরম অত্যাচার।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে): রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—"পুনরায় যুদ্ধ বাধিলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।"

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে): জার্ম্মাণ প্রসঙ্গে জেনেভায় প্রাচ্য-প্রতীচ্য চতুঃশক্তি (রুশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) পররাষ্ট্র সচিবদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আরম্ভ।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে): পূর্ব্ব পাকিস্তান আইন সভার ঘটনাবলী সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট—ক্ষমতার লড়াই-ই পূর্ব্ব পাকিস্তানে শাসন ব্যবস্থা বিপর্য্যয়ের কারণ।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে): করিমগঞ্জ সীমান্তে নবোদ্যমে পাক্ সমরসজ্জার আয়োজন।

'ক্যানবেরা' বিমান ধ্বংস সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ ও ক্ষতিপূরণের দাবী পাকিস্তান কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য।

নেহেরুর রাজনীতি

"যিনি ভুল করিয়াছেন, তিনি পদত্যাগ স্বেচ্ছায় করিবেন না—অধিকন্তু আপনার অন্যায় কাজের সমর্থনচেষ্টা করিবেন। পণ্ডিত নেহেরু অস্বীকার করিতে পারেন নাই প্রস্তাবানুসারে যে ভূমি হস্তান্তর হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্তানেরই লাভ হইয়াছে—"It was some what in favour of Pakistan in regard to the territory gained although not much territory was involved." পাকিস্তানেরই লাভ হইয়াছে। তবে সে লাভ অল্প। পাকিস্তান যেমন অল্পে তুষ্ট হইতে পারে না—পণ্ডিত নেহরুও তেমনই পাকিস্তানকে অল্প দিয়া তুষ্ট হইতে পারেন না। কাজেই বেরুবাড়ী দিতে হইবে। ইহাই পণ্ডিত নেহরুর দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত। সুতরাং ভারতবাসীকে সাবধান হইতে হইবে। সাবধান হইবারও অনেক উপায় আছে :—(১) লোকসভায় প্রতিনিধিদিগকে নির্দ্দেশ দিতে পারা যায়—তাঁহারা যেন বেরুবাড়ী—ভারতের সূচ্যগ্র ভূমি দিতে সম্মত না হ'ন। (২) তিনি যে অসঙ্গত কাজ করিয়াছেন, সে জন্য প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বলা। (৩) তিনি পদত্যাগ না করিলে তাঁহার সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব লোকসভায় উপস্থাপিত করিয়া বহুমতে তাহা গ্রহণ করা। এ সকলের কোন্ উপায় ভাল সে সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের মত জানিবার প্রয়োজন নাই। মানুষ কি ভাবে আর কি হয় বলা যায় না। পার্ণেল একদিন আইরিশ নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন। ফল—কি হইয়াছিল? ভগবানের বিচার সূক্ষ্ম।"

—দৈনিক বসুমতী।

কথা উঠিতে পারে

"যাহা হউক, ভারত-পাক শীর্ষক সম্মেলনে রাজী না হইয়া পণ্ডিত নেহরু কেবল সঙ্গত কাজই করেন নাই, ভারতের জনসাধারণকেও উদ্বেগ ও আশঙ্কা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। কারণ, পাক প্রধান মন্ত্রীর সহিত শান্তি ও বন্ধুতার আলোচনার মাধ্যমে আমাদের উদার এবং বিশ্ব-মৈত্রীর সাধক প্রধানমন্ত্রী ভারতের আবার কোন অঞ্চল দান করিয়া আসেন কিনা, কে বলিতে পারে? কথাটা স্বভাবতঃই উঠিতে পারে বেরুবাড়ী সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক অভিমত শুনিয়া। আলোচ্য সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের আপত্তির উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সুপ্রীম কোর্টে বেরুবাড়ীর সম্বন্ধে আইনের প্রশ্ন উত্থাপিত করার উদ্দেশ্য কেবল আইনের গণ্ডগোল এড়ান। কিন্তু বেরুবাড়ী পাকিস্তানকে দান করার কথা ঠিকই আছে। অর্থাৎ বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে খুসী করিবার জন্য বেরুবাড়ী হস্তান্তর করিতে বদ্ধপরিকর।"

—যুগান্তর।

চুরি! চুরি!!

"পাকিস্তান নব-উৎসাহে বিদ্যা প্রচারে, বিদ্যা বিতরণে লাগিয়া গিয়াছে। সেই সংবাদ আমরা বহুদিন হইতেই পাইয়া আসিতেছি। তবে সেই বিদ্যাটা যে-সে বিদ্যা নয়, একেবারে বিদ্যার সেরা, চুরি-বিদ্যা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা "জনাব আইয়ুব খান একবার ঢাকা গিয়া পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন কলিকাতার লেখকদের পুস্তকাদি পাঠ না করেন। আমরা তাঁহার উপরোক্ত উক্তিটির প্রসঙ্গেই বলিয়াছিলাম—কলিকাতায় প্রকাশিত পুস্তক না হয় নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু কলিকাতায় প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থ গ্রন্থকারের বিনা অনুমতিতে বেমালুম চুরি করিয়া যে পাকিস্তানের পুস্তক ব্যবসায়ীরা ছাপাইতেছে, তাহার প্রতিকার কি? সম্প্রতি কলিকাতার পুস্তক পাকিস্তানে কি ভাবে ছাপা হইয়া বিক্রয় হইতেছে, তাহাই ঢাকা আদালতে আনীত এক মামলায় প্রকাশ। কলিকাতার প্রকাশক এ টি দেবের প্রখ্যাত অভিধান (১) English to Bengali (২) Bengali to English,—ঢাকা, ময়মনসিংহ ও লাহোরের পুস্তক ব্যবসায়িগণ বিনা অনুমতিতে হুবহু ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে স্ফীত হইতেছে। ঢাকা জেলা জজ মিঃ এম ইদ্রিস বাদী এ টি দেবের অভিযোগ অনুযায়ী পাকিস্তানের ৫টি বিদ্যা বিতরণকারী পাবলিশার্সের উপর উপরোক্ত দুইটি অভিধান প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া এক সাময়িক ইনজাংসন জারী করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত মামলার ফল যাহাই হউক, চুরি বিদ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে এইরূপ মামলা দায়ের করিয়া কলিকাতার উক্ত প্রকাশক কর্তব্যই করিয়াছেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

তিব্বত সম্মেলন

"পরম সুবিধাবাদী পার্টির উদ্যোগে কলিকাতায় এক তিব্বত সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। আচার্য্য কৃপালনী এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ উহার উদ্যোক্তা। ভারতের উপর পাকিস্থানী আক্রমণে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্য কিন্তু দেখা যায় নাই। সম্মেলনে দলাই লামার প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। কলিকাতায় এই সম্মেলনে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজনীতি ছিল রাজায় রাজায় বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা। ব্যক্তিবিশেষের বন্ধুত্ব, স্বার্থ এবং শত্রুতার উপর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সুখশান্তি এবং জীবনধন সব কিছু নির্ভর করিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে গণচেতনার যুগে এই রাজনীতি বন্ধ হইবে, রাজায় রাজায় বন্ধুত্ব বা শত্রুতার উপর গোটা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিবে না, তার স্থান গ্রহণ করিবে জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব, এই বন্ধুত্ব অসম্ভব করিয়া তুলিবে ঠাণ্ডা এবং গরম উভয় প্রকার যুদ্ধ। কতকগুলি মতলববাজ এবং বিদেশীয় ভাড়াটিয়া লোক যদি এই ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চায় তবে তাহাদিগকে আমরা দেশের শত্রু বলিয়াই অভিহিত করিব। বাঙ্গলাদেশে এই সম্মেলনের অধিবেশনে আমাদের আরও আপত্তি আছে। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর জন্য শান্তিনিকেতনে চীন সংস্কৃতি ও চীনাভাষা চর্চ্চার ক্ষেত্র চীনা ভবন স্থাপন করেন। যে বাঙ্গলা দেশ ভারত-চীন মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই বাঙ্গলা দেশে ঐ বন্ধন ছিন্ন করিবার ছুরিকা উদ্যত করিতে দেওয়া খুব ভুল হইবে।"

—যুগবাণী।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা পরিকল্পনা

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্যের ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দিবার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় সরকারের বার্ষিক ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে সরকারের উদ্যোগে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহরাঞ্চলে এই ব্যবস্থা পৌরসভাগুলির উপর ন্যস্ত। তাহাদের এই বিষয়ে ঔদাসীনতা সর্ব্বজনবিদিত। এই কারণে সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমতাবস্থায় সরকারের এই আদর্শ পরিকল্পনাটিকে সকলেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবে! এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে বহু শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান বেকার সমস্যার যুগে বহু শিক্ষিত বেকারের বেকারত্ব ঘুচিবে। ইহার ফলাফল অবশ্যই—যাঁহাদের উপর ইহার পরিচালন ভার অর্পিত হইবে তাঁহাদের সততা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করিবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষানীতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। সরকারের শিক্ষা বিভাগ বর্ত্তমানে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করায় জনসাধারণ অশেষ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছেন। সামান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একখানি পুস্তক "কিশলয়" পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার! উহা নাকি চাহিদা অনুপাতে ছাপা হয় না। গ্রামাঞ্চলে উক্ত পুস্তকের দর্শনও মিলে না। ফলে গ্রামবাসীদের একখানি "কিশলয়" আনিতে কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাইয়া লম্বা লাইন দিতে হয়।"

—বর্ত্তমান ভারত (হুগলী)।

একটি আবেদন

"বর্ষা সুরু হইয়াছে। সেই সঙ্গে পথচারীদের অবস্থাও হইয়াছে শোচনীয়। ইহারও কারণ আছে। পথে-ঘাটে জল জমিয়া যায়—জীপ-লরী মোটরকার নির্বিবাদে তাই কাদা ছিটাইয়া চলিয়াছে। মশার উপদ্রব অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে—অথচ কোন প্রচেষ্টা নাই—কোন কার্যক্রম নাই সকলেই যেন জড়-পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য বছরের মতন বর্তমান বছরেও মানুষ দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইবে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের দুর্দৈব ক্রমবর্দ্ধমান। করলার কচুরীপানার উল্লেখ পুর্ব্বেই করা হইয়াছিল। অদ্যাবধি ঐ আবর্জনা পূর্ববৎ রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ হয়তো বা আরও অবর্ণনীয় বর্ষণের অপেক্ষায় আছেন—তাহা হইলে বিনা পরিশ্রমে কচুরী-পনা ভাসিয়া যাইবে। পরিশ্রম (কায়িক) করিতে হইবে না। মশা জমিতেছে তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের করিবার কিছুই নাই। প্রকৃতির কল্যাণে কচুরীপানা পরিষ্কার হইবে এবম্বিধ আশায় কর্ত্তৃপক্ষ অপেক্ষমান থাকিতে পারেন কিন্তু মশার উপদ্রব ও পথ ঘাটের অব্যবস্থা কিরূপে দূরীভূত হইবে? করদাতাদের বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কলে জল নাই, মশার উৎপাত, অল্প বর্ষণে পথে জল জমিয়া যায় এতৎসত্ত্বেও যদি অধিক সুখ কাম্য হয় তাহা হইলে 'নান্যঃ পন্থা!"

—বার্ত্তা (জলপাইগুড়ী)।

আসানসোলে সরকারী দরদ

"আসানসোলে জলকষ্ট যেমন চরমে উঠিয়াছে খাদ্য-সঙ্কটও তেমনি প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের আসানসোলের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, আসানসোল বাজারে কনট্রোল দরে চাউল একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। খোলা বাজারে মোটা চাউল ২৬৲ টাকা দরে এবং সরু চাউল ৩০৲ টাকা দরে বিক্রয় করা হইতেছে। মডিফায়েড র‍্যাশন দোকানে চাউল একেবারে দেওয়া হইতেছে না। নিম্নমধ্যবিত্ত ও গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থায় এই দরে চাউল কিনিয়া সংসার প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। আসানসোল প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল সরবরাহ করিবার জন্য সরকারের নিকট গণদরখাস্ত সহ দাবী করিয়াছেন। আসানসোল প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আসানসোলের দারুণ জলকষ্টের প্রতিকারের দাবীতে বিগত কয়েক বৎসরই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে এবং এ বৎসরও কয়েকটি গণ-অভিযান পরিচালিত হইয়াছে। বিধান সভায় প্রজা সোস্যালিষ্ট সদস্যবৃন্দ আসানসোলের জলকষ্ট নিবারণের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিবার দাবী করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি দান ছাড়া সরকার হইতে এ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। বর্ত্তমানে আকাশছোঁয়া চাউলের দর সত্ত্বেও সরকার এখনো উদাসীন! আসানসোলের ন্যায় শিল্পনগরীতে এবং উহার শস্যহীন পল্লী অঞ্চলের খাদ্যাভাবের অবস্থা পুর্ব্ব হইতে জানা সত্ত্বেও সে বিষয়ে সরকারের কোন দায়িত্ববোধ নাই।"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

সমবায়িক সমাধান

"কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে যৌথ চাষ লইয়া সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছে, পণ্ডিতজী মহোৎসাহে যৌথ চাষ চালাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন। এমন কি যদি কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয় তাহাও তিনি গ্রাহ্য করেন না। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে অবশ্য সুর একটু নরম হইয়াছে। সমবায়িক কৃষি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে সার্ভিস কোপারেটিভ খুলিয়া যৌথ চাষের বনিয়াদ গঠনের কথা বলা হইয়াছে। কংগ্রেস দল শুধু কৃষিতেই সমবায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তাহারা শিল্পকে ও সমবায়িক করিতে চান। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতিকে যথোচিত ক্ষমতা দিয়া দেশকে পুনর্গঠন করাই বর্ত্তমানে কংগ্রেস দলের লক্ষ্য ও সাধনা। সমবায় ভারতবর্ষে নূতন নহে। যদি কংগ্রেস দল এই রূপে সমবায় সমিতি হাজারে হাজারে খোলেন তবে বলিবার কিছুই থাকে না। কিন্তু পণ্ডিতজী সব কিছুরই সমবায়িক সমাধান চান। এখন দেখা যাক সমবায়িক সমাধান কি? আমাদের মতে প্রথমে স্থানীয় লোকেরা তাহাদের সমস্যাগুলি বাহির করিয়া, নিজেরই সমাধানের উপায় বাহির করিবেন ও স্বেচ্ছায় একযোগে কাজ করিয়া সমস্যাগুলির সমাধান করিবেন। রাষ্ট্র কেবল তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, রাষ্ট্র কোন কাজের সূচনা করিবে না, উদ্যোগ স্থানীয় লোকের নিকট আসিবে। ইহাকেই বলে বিকেন্দ্রীকরণ; কারণ ইহাতে ক্ষমতা স্থানীয় লোকের হাতে বিচ্ছুরিত হইবে। কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা

গঠিত প্ল্যানিং কমিশনের কোন পরিকল্পনাকে সাহায্য করাকে সমবায়িক সমাধান বলা চলে না। যত দিন না স্থানীয় লোকের পরিকল্পনা রচনা ও সম্পাদনে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে তত দিন সমবায়িক সমাধানের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।" —জনমত (ঘাটাল)।

প্রসঙ্গক্রমে

"সহরের বাজারগুলির নরকসদৃশ অবস্থার প্রতি পৌর কর্তৃপক্ষের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁহারা করেন নাই। একে ত রাস্তা ও ড্রেণের অবস্থা সঙ্গীন, তাহার উপর যদি নিত্য অজস্র আবর্জ্জনা ড্রেণ অবরুদ্ধ করিয়া, রাস্তার অধিকাংশ দখল করিয়া দিবারাত্র বিরাজ করে তাহা হইলে সহরের স্বাস্থ্য কি ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, কলেরা, বসন্ত মহামারী আকার ধারণ করিবে না, পথচলা কষ্টসাধ্য হইবে না? পৌরপতি আশ্বাস দিয়াছিলেন যে পৌর উপবিধি সংশোধন করিয়া বাজারের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য বিহিত ব্যবস্থা শীঘ্রই অবলম্বিত হইবে। সে আজ কয়েক মাস পূর্ব্বের কথা। আজ পর্য্যন্ত কোন সাড়া-শব্দ ও বিষয়ে পাওয়া যায় নাই। কয়েকবার পৌরপতি স্বয়ং বাজারগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরপতি যদি ভাবিয়া থাকেন পরিদর্শন করিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে তাহা হইলে বলিতে হয় ঐ কথায় আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে, করদাতা ও সহরবাসীর কোনো লাভ হইবে না।" —বর্দ্ধমান বাণী।

তৃষ্ণার জল ও আমলাতন্ত্র

"মহকুমার চারিদিকে সামান্য পানীয় জলের জন্য হাহাকার। এই লজ্জাকর বেদনাময় আর্ত্তনাদের মধ্যে আমলাতন্ত্রের এক অব্যবস্থা এবং রেষারেষির গোপন ইতিহাস আমরা পাইয়াছি, যাহার ফলে পানীয় জলের জন্য সরকারী বরাদ্দ অর্থ খরচ না হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় নাই। 'রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই' বিভাগটি পূর্ব্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে ছিল কিন্তু গত ১৯৫৭ সালের ১লা নভেম্বর হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে পাবলিক হেলথের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে গেল। আরম্ভ হইল গোলমাল। সেই সময়ের এবং তাহার আগের কাজের বকেয়া কোন টাকা ঠিকাদারেরা আজও পায় নাই, কেন না দপ্তর গেলেও হিসাব নাকি হস্তান্তর হয় নাই। কেবল তাহাই নহে ১৯৫৮ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৯ সালের মার্চ পর্য্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে ৩১টি কুয়ার মঞ্জুর হইয়াছিল, টাকাও আসিয়াছিল। '৫৮ সালের এপ্রিল মাসে কয়েকটির ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হইল, কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যে একটিরও কাজ হয় নাই। স্কীম মঞ্জুর করা ও টাকা দেওয়ার মালিক পাবলিক হেলথ কিন্তু কোন গ্রামে হইবে এবং গ্রামের কোনখানে হইবে তাহার ব্যবস্থার মালিক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। স্থান নির্ব্বাচন না হওয়ার জন্য কাজ হয় নাই, দরিদ্র গ্রামবাসীদের পানীয় জলও জোটে নাই। অথচ দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ হইতে এই মহকুমার জন্য পাবলিক হেলথ বিভাগের কেবল বেতন বাবদ মাসিক খরচ ছয় শত টাকা! অন্য সব খরচা ধরিলে মাসে হাজার টাকা। উদাহরণস্বরূপ আমরা ঝাড়গ্রাম মহকুমার নাম করিলাম। সারা জেলাতেই এই অব্যবস্থা। উলুখড়ের প্রাণ যাইবে তাহাতে অনুতাপের কিছু নাই, তবে রাজত্ব ভালই চলিতেছে স্বীকার করিতে বাধ্য।" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

শুভ বিবাহ

"উত্তরপাড়া রাজ-পরিবারের শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শমীন্দ্রনাথের সহিত পাকুড় পরিবারের শ্রীশ্রীতকুমার সুকুলের জ্যেষ্ঠ কন্যা শুচিস্মিতার শুভ বিবাহ উপলক্ষে উত্তরপাড়ার রাজেন্দ্র বিশ্রামে এক মনোজ্ঞ প্রীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে এবং বিবাহ বাসরে যে সকল বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও ক্রীড়াবিদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অথবা নব দম্পতির সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করিয়া শুভেচ্ছার বাণী প্রেরণ করিয়া প্রীতি অনুষ্ঠানটিকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তোলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণান, ভারতের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, মহারাজাধিরাজ, শ্রীউদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর, বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী, মহারাজকুমার সদয়চাঁদ মহতাব ও মহারাজকুমারী, লালগোলার রাজারাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শিল্পী প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, পাইকপাড়ার শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীজীবাণীতোষ ঘটক, শ্রীনির্ব্বাণীতোষ ঘটক, শ্রীপ্রিয়তোষ ঘটক, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমতী সুধারাণী দাস, শ্রীযুক্ত প্রদোষকুমার বাজপেয়ী ও রাজকুমারী রমা বাজপেয়ী, মহিষাদলের বধূরাণী তটিনী দেবী (গর্গ), রাজকুমারী রেণু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোঃ, আই-সি-এস, কবি নরেন্দ্র দেব, মহিষাদলের কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গ, ব্যারিষ্টার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার রাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীমতী সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য্য ও বিচারপতি ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলিপুরের ব্যবহারজীবী শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন এম-এল-সি, শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা শ্রীনীতীশ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, কাশীপুরের শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, চকদীঘির রায়বাহাদুর নিত্যানন্দ সিংহরায়, শ্রীপ্রভানাথ সিংহরায়, শ্রীপশুপতি সিংহরায়, শ্রীসুনীলকুমার সিংহরায়, শ্রী ও শ্রীমতী সারদা দাস, শিল্পী শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের শ্রীবলাইচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ গোস্বামী, তেলিনীপাড়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পৌরপতি প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর শেঠ, ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান অধিনায়ক শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া পৌর সহ-সভাপতি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিজয়কুমার মুখোঃ, ও শ্রীরবীন্দ্র গোস্বামী (পৌর সদস্যবৃন্দ), ডাঃ অমল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পাঁচু বসু ও ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (২), ডাঃ নীলকণ্ঠ ঘোষাল, ডাঃ বারীন রায় ও ডাঃ চিন্তু রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, শ্রীবলাইলাল মুখোপাধ্যায়

(ডিভেডোর) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি পি সি সি সদস্য শ্রীমুরারি মিত্র, পোদ্দার কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, সাংবাদিক শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রীবিজয় রায়, সলিসিটর আরাধন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভবানীমোহন মতিলাল, এডভোকেট শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধীরা মুখোপাধ্যায় সকলকে আদর অভ্যর্থনাদি করেন।

শোক-সংবাদ

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভারতের সুপ্রবীণ বিপ্লবী নায়ক দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরোধা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪ঠা বৈশাখ সন্ধ্যায় ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বারীন্দ্রকুমারের জীবনেতিহাসের সঙ্গে তদানীন্তন বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পুণ্যশ্লোক ঋষি রাজনারায়ণ বসু এঁর মাতামহ, যুগঋষি শ্রীঅরবিন্দ এঁর অগ্রজ। ১৮৮০ সালের ৫ই জানুয়ারী ইংলণ্ডে এঁর জন্ম। যৌবনের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি সুখ ও ভোগের সহজ পথ ত্যাগ করে যাঁরা অতিবাহিত করেছেন বিপ্লবের দুস্তর পথে স্বাধীনতার অনবদ্য তপস্যায় দেশের সর্বাঙ্গীন জাগরণকল্পে বাঙলার সেই সমস্ত সন্তানদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার অন্যতম। আন্দামানের দ্বীপান্তরবাস শেষ করে দেশে ফিরে এসে বারীন্দ্রকুমার প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পথ ত্যাগ করেন এবং কিছুকালের মধ্যেই দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন; "বিজলী"র সঙ্গেও বারীন্দ্রকুমারের যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। কেবলমাত্র বিপ্লবের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রশিল্পে এবং পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও বারীন্দ্রকুমারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। শেষ জীবনেও তাঁর লেখনী সচল ছিল। একাধিক আত্মজীবনীমূলক তথ্যপূর্ণ সুপাঠ্য গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত বারীন্দ্রকুমার দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকের আসনে সমাসীন ছিলেন। আমরা বিপ্লবীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্যার উষানাথ সেন

[illegible]সোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার (বর্তমানে প্রেস ট্রাষ্ট [illegible]) ম্যানেজিং ডিরেক্টার ভারতীয় রেডক্রসের ভূতপূর্ব [illegible] ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সাংবাদিক স্যার উষানাথ সেন [illegible] বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ভারতের সাংবাদিক-জগতে এক বিরাট আসনের অধিকারী ছিলেন স্যার [illegible]নাথ, সংবাদিক জগতের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপগুলি [illegible] সম্পাদনার ক্ষেত্রে উষানাথের অবদান অনেকখানি। [illegible] কর্মপরিচালন পদ্ধতির নবগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে [illegible] ভারত সরকারের চীফ প্রেস অ্যাডভাইসার ছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগ অফ নেশানস ইউনিয়নের অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদও কিছুকাল তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৪ সালে এঁকে বৃটিশ সরকার 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

চন্দ্রকুমার সরকার

বর্ষীয়ান বাস্তু-বিদ্যাবিশারদ ও খ্যাতিমান স্থপতি চন্দ্রকুমার সরকার ৫ই বৈশাখ ৮৬ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি-সমাজে ইনি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং দেশে উক্ত শিল্প দুটির উন্নয়নকল্পে এঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা এঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে ইনি লোকমান্য তিলকের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁর দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন। ইনি বারাণসী ও ব্রহ্মদেশেও দীর্ঘদিন কর্মসূত্রে অবস্থান করেন। দেশের ও বিদেশের বহু সুরম্য অট্টালিকা, জলাধার, চলার পথ এঁর অনবদ্য সৃজনী প্রতিভার পরিচয় বহন করছে।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুখ্যাত কবি, 'দীপালি' ও 'মহিলা'র প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৭শে বৈশাখ ৬৮ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে লোকান্তরিত হয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ৺বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় এঁর পিতামহ। ইনি সবসমেত প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থের রচয়িতা। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, কিশোর-সাহিত্য, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই এঁর সমান দক্ষতা ছিল। দীর্ঘকালব্যাপী দীপালির সম্পাদনার ক্ষেত্রেও ইনি যথোচিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। বসন্তকুমারের মৃত্যুতে বাঙলাদেশ অমায়িক সদালাপী নিরহঙ্কারী প্রভৃতি নানাবিধ গুণের অধিকারী একজন যথার্থ বাণীসেবককে হারাল।

হেমন্তকুমারী দেবী

বিগত ১১ই বৈশাখ ১৩৬৬ সাল (ইং ২৫শে এপ্রিল ১৯৫৯) শনিবার সকাল ৫।৪৫ মিনিট সময়ে স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল বাগচীর সহধর্মিণী হেমন্তকুমারী দেবী তাঁহার ৭ নং চৌরঙ্গী টেরেসস্থ বাসভবনে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। ইনি শ্রীরামপুরের স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় নন্দলাল গোস্বামীর কনিষ্ঠা কন্যা ও স্বর্গীয় রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। ইনি ধার্ম্মিকা, দানশীলা, পরোপকারিণী ও ভক্তিমতী ছিলেন। গৃহিণী হিসাবে ইনি আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। বহু দুঃস্থ পরিবার তাঁহার নিকট নিয়মিত সাহায্য পাইত। মৃত্যুকালে ইনি তিন পুত্র, তিন কন্যা, দুই জামাতা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[illegible] নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(স্কেচ)

জননী

—শ্রীমহিতোষ বিশ্বাস অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমাদিগকে কত সময়ে বলিয়াছেন—"আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক উহার এক-চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মা'র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না! কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে এ কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু-আধটু দৃষ্টি পড়িত তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হকৃগে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মা'র দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম!"

শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্ত্তি সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। ঐ দিন হইতে তিনি যেন দৈবশক্তি প্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্ব্বদা ভক্তি-বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া জীবন্ত অধ্যাত্মশক্তি সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীর-মনরূপ যন্ত্রটিকে শ্রীশ্রীজগদম্বা কত যত্নে ও কি অদ্ভুত উপায়-অবলম্বনে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঐরূপ ঘটনা সকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

জার্মাণীতে প্রথম ভারতের মুক্তিকামী

ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইতেছে। ১৯১১ অব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে জার্মাণীর হালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইনষ্টিটিউট গ্রীষ্মের দরুণ বন্ধ হইলে আমি আমার অধ্যাপক প্রফেসর ডক্টর ফর্‌ল্যাণ্ডারের (Vorlander) নিকট হইতে একখানা পত্র লইয়া হামবুর্গে গমন করি। তথাকার কলোনিয়াল ইনষ্টিটিউটের ল্যাবরেটরীতে অধ্যাপক ফয়েগটল্যাণ্ডার (Voegtlander) আমাকে বিভিন্ন প্রকার উপনিবেশিক পদার্থ—যথা চা, কফি, কোকো, তৈলবীজ, লাক্ষা এবং সেই সকল উৎপাদনের উপযোগী মাটি পরীক্ষায় অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করেন।

ঐ সময়ে হামবুর্গে আমার পরিচিত কেহ ছিলেন না। এজন্য হালের ভারত-হিতৈষিণী মহিলা লেখিকা ফ্রাউ আনা মেরী সিমন (Frau Anna Marie Simon) তাঁহার ভগিনীপতি হ্যার নিদেমায়ারের (Herr Niedemayer) নিকট একখানা পরিচয়-পত্র দিয়া দেন। হ্যার নিদেমায়ার তৎকালে কলিকাতার জার্মাণ এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক (Deutsche Asiatische Bank, যাহা কলিকাতায় ডাচ এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক নামে বর্ণিত হইত), শ্রোডার স্মিথ (Schroeder Schmidt) প্রভৃতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে তাঁহার এবং তাঁহার বিদুষী পত্নীর উদার মধুর বাক্যালাপ ও আদর আপ্যায়নে আমি সবিশেষ মুগ্ধ হই এবং তাঁহাদের অনুরোধে তৎপরে সপ্তাহে দু-একবার তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনায় নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই।

হ্যার নিদেমায়ার কয়েক দিন পর আমাকে লইয়া জার্মাণীর শ্রেষ্ঠ ষ্টীমার কোম্পানী হামবুর্গ-আমেরিকা লাইনের জেনারেল ম্যানেজার হ্যার আলবার্ট বালিনের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচিত করেন, হ্যার বালিন জার্মাণীর একজন বিরাট কর্মবীর পুরুষ ছিলেন। জার্মাণীর সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, জার্মাণ ভাবধারার সুপ্রসার, এবং শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য অহর্নিশি কার্য করিতেন। তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে আমাকে সম্বর্ধনা করিলেন এবং প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার পত্নী এবং একমাত্র পালিতা কন্যার সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিলেন। এরূপ একজন আভিজাত্য গৌরবের অধিকারী সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ দীনা ভারতমাতার একটি দীনতম ছাত্রকে কেন এত সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন, তাহা তখন উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

প্রত্যাবর্তন কালে গাড়ীতে হ্যার নিদেমায়ার বলিলেন, হ্যার বালিন প্রাচ্যের পরপদানত জাতি সমূহের তরুণদিগের সঙ্গে নিয়তই সাগ্রহে মেলামেশা করেন। তাঁহাদের দুঃখ-দৈন্যের প্রতি তিনি সবিশেষ সহানুভূতিশীল। তাঁহার বাটীতে চীন, মিশর, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যার্থী, ব্যবসা প্রতিনিধি এবং সর্বশ্রেণীর লোকজন আগমন করেন। তিনি তাঁহাদের পিতৃভূমির অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন এবং কি ভাবে দেশের মঙ্গল হইতে পারে, সে-সব বিষয়ও আলোচনা করেন।

সত্বরই এক দিন নিদেমায়ার তাঁহার গাড়ী নিয়ে অপরাহ্ণ ৪টায় ল্যাবরেটারী ছুটি হওয়ার প্রাক্কালে যাইয়া আমাকে লইয়া বালিনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

ল্যাবরেটরী হইতে বালিনের বাটী নিকটেই, শহরের মধ্যস্থলে। আলষ্টার হ্রদের তীরে আলষ্টারডাম (বর্তমানে 'বালিনডাম') নামক সুরম্য স্থানে অবস্থিত।

চা ও জলযোগের পর হ্যার বালিনই আলোচনা আরম্ভ করিলেন, রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিলেন। প্যারিসে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা, ম্যাডাম কামা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবিগণ সম্বন্ধেও বিবিধ তথ্য জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন, কিন্তু আমি যাহা উত্তরে বলিলাম, তিনি তাহা হইতে সঠিক তথ্যই অবগত ছিলেন।

সান্ধ্য ভোজেও ফ্রাউ বালিন আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। বহু দুরূহ রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। আমি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিলাম যে, তিনি জাতীয়তাবাদী ভারতীয় দল গঠনের প্রয়াসী। হ্যার নিদেমায়ার গাড়ীতে বলিলেন যে, হ্যার বালিন নব্যতুর্কী নায়ক এনভার বে (পরে পাশা), মিশরের জাতীয়তাবাদী ফরিদ বে এবং অন্যান্য দেশের মুক্তিকামী যুবকগণকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করেন। আমরা ভারতীয়গণ যদি গোপনে ভারতে কিছু অস্ত্রাদি প্রেরণ করিতে অভিলাষী হই, তবে তিনি হ্যার বালিন হইতে সাহায্য লইয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ঐ দিনের আলোচনার পর হইতে হ্যার বালিনই আমাকে ল্যাবরেটরীতে ফোনে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সত্বরই ত্রিপোলী নিয়ে ইটালী তুরস্ককে আক্রমণ করিল। বালিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে? তাঁহার সঙ্গে আলোচনায় জ্ঞাত হইলাম যে গ্রেট বৃটেনই ইটালীকে এই কার্যে প্ররোচিত করিয়াছে যেন জার্মাণী দু দিক রক্ষা করার চেষ্টায় বে-কায়দায় পড়ে, ইটালীর সঙ্গে জার্মাণীর মিত্রতা আবার নব্য তুর্কী দলকেও জার্মাণী সুগঠিত করিতেছে, এই যুদ্ধে জার্মাণী হয় ইটালীকে নয় তুরস্ককে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বালিন ও নিদেমায়ার ইংরাজ এবং ফরাসীর দুই শত বৎসরের ইত্যাকার রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিলেন, আমার মনে হইল যেন তাঁহারা উক্ত দুই জাতির প্রাধান্য খর্ব করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত।

হ্যার বালিন ছিলেন জার্মাণ নেভি লীগের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং পৃথিবীতে জার্মাণ-প্রভাব বিস্তার সমিতির প্রেসিডেণ্ট। জাতিতে তিনি ইহুদী ছিলেন। কিন্তু জার্মাণ কাইজারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কাইজার তাঁহাকে মন্ত্রিভাবে ক্যাবিনেটে গ্রহণ করার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই। তিনি সর্বদাই বলিতেন যে, তাঁহার "দীনসেবা" পিতৃভূমি এবং কাইজারের জন্য আমরণ অব্যাহত থাকিবে। সেইরূপই ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডের "আমারোঙ্গনে" (Amarongen)

চলিয়া গিয়াছেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র তিনি রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

১৯১১ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একদিন মিশরের ফরিদ বে ও অন্য কয়েকজন মিশরীয় যুবকের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন। হামবুর্গে তখন মনিষ্ট (Monist) কংগ্রেস হইতেছিল। দুই জন আইরিশ বিপ্লবীর সঙ্গেও তিনি আমাকে আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেন। ঐ কংগ্রেস উপলক্ষে যেমন শান্তিকামী এবং 'এসপারেন্টো' (Esperanto) ভাষা প্রচারকামী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন, তেমনই নানা দেশের বিপ্লবীরও আগমন হইয়াছিল। হার বালিন একদিন মনিষ্ট নামক বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর আর্ণেষ্ট হ্যাকেল (Ernest Hackel) নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রাসায়নিক ওষ্টওয়াল্ড (Ostwald) প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধিকে সান্ধ্যভোজে সম্বর্দিত করেন, তাহাতে দেশবাসী ভাবিল বালিন শান্তিকামী হইতেছেন।

ত্রিপোলীর যুদ্ধ

ত্রিপোলীর যুদ্ধ সম্পর্কে হার বালিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। নব্য তুর্কী দল (Young Turks) কিছুতেই ত্রিপোলী ইটালীর হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত ছিল না। এই সময়ে দিল্লীর ডক্টর আনসারী (পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী যাঁহার বাটীতে প্রায়শঃ আশ্রয় গ্রহণ করিতেন) ত্রিপোলী যুদ্ধ লইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহা অবগত হইয়া হার বালিন বিশেষ উল্লসিত হইলেন। কারণ আনসারী তুরস্কের আহত সৈনিকগণের সেবার জন্য "রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটি" গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইটালীর বিরুদ্ধে এমন কি ইংরাজ নীরবে ইটালী কর্তৃক তুরস্কের অবমাননা সহ্য করিতেছিলেন বলিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধেও জালাময়ী বক্তৃতা দিয়া ভারতের মুসলমানদিগকে "রোমের বাদশাহের" রাজ্য রক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন।

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সাহায্যার্থ একদল স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাহার উদ্যোগ বন্ধ করেন। ইহাতে স্থানে স্থানে মুসলমানগণ বিশেষ উত্তেজিত হয়। এই সকল সংবাদ লণ্ডনের সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া হার বালিন জিজ্ঞাসা করেন যে মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ইংরাজ-বিরোধী দল গঠনের মত যুবক সংগ্রহ করা সম্ভবপর কি না।

বালিনের রজত-জয়ন্তী ১৯১২ অব্দে বালিনের "হামবুর্গ আমেরিকা" লাইনের কর্তৃভার গ্রহণের ২৫ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার সহকর্মী, বন্ধু বান্ধব ও শুভানুধ্যায়িগণ একটি রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠান করিতে উদ্যোগী হন। হার বালিন এই কার্যে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, কিন্তু উদ্যোগিগণ ভাবিলেন যে, ইহা মামুলী সৌজন্য প্রকাশ মাত্র। তাঁহারা সোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জার্মাণ কাইজারকেও উৎসবে উপস্থিত হইতে সম্মত করাইলেন। হার বালিন অতি বিনীত ভাবে এই অবাঞ্ছিত ব্যাপার হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য কাইজারের নিকটও নিবেদন করিলেন। কাইজার তখন তাঁহাকে অভিজাতশ্রেণীভুক্ত করার জন্য "হার ফন" (Herr Von) উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব দিলেন। বালিন সসম্মানে তাহা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কাইজারের অটোগ্রাম সম্বলিত একখানা ফটো পাইবার আকাঙ্খা জ্ঞাপন করিলেন। দেশবাসী তাঁহার এই বিনম্র আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন।

জুবিলী উৎসবের অনুষ্ঠাতাগণ কিছুতেই উৎসবের আয়োজনে বিরত হইলেন না। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাদের সকল উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। হার বালিন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাসহ একখানা ছোট সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িয়া অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিলেন। এক পক্ষকাল তাঁহাদের কোন সংবাদ দেশবাসী পাইল না। উৎসবের নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হওয়ার ১০ দিন পর জার্মাণীর তৎকালীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'উলফ ব্যুরো' প্রচার করিল যে হার বালিন হামবুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তিনি গৃহে উপনীত হইয়া পুনরায় এক বিনীত টেলিগ্রামে কাইজারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই নিরাড়ম্বর অ্যালবার্ট বালিন।

গুপ্তদল গঠনের প্রস্তাব

অক্টোবরের প্রথম দিনেই হার বালিন এবং হার নিদেমায়ার পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন যে যদি আমি কতিপয় ভারতীয় বন্ধুসহ একটি গুপ্ত দল গঠন করিতে পারি, তবে তাঁহারা কোন কোন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। এমন কি, অস্ত্রাদি প্রেরণ করিবারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু আমি উৎসাহ প্রদর্শন করিলাম না। কারণ ১৯০৬ অব্দে অতি নগণ্য কারণেই তৎকালীন 'গোলামখানা' স্কুলে ধর্মঘট বাধাইয়া ছাত্রজীবনে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি। গঠনমূলক কার্যের মধ্যে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য বিতরণ, সন্তান সমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবশেষে সহকর্মী ও অর্থের অভাবে দারুণ অশান্তি ভোগ করিয়াছি। সর্বশেষ নিজের উন্নতিসাধন মূলমন্ত্র লইয়াও কত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের রক্তসম অর্থ লইয়া জার্মাণীতে আসিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া শিক্ষার দিকে আশাতীত সাফল্যও লাভ করিয়াছি। আশা ও আকাঙ্খা 'ডক্টরেট' লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিব, এর মধ্যে বৈপ্লবিক কার্যে ওতঃপ্রোতভাবে নিযুক্ত হইলে নিজের ও পরিবারের প্রতি দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সুতরাং আমি ইতস্তত করিলাম।

১৯২২ অব্দে আমার বাচনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের সুযোগ সুবিধার বিষয় অবগত হইয়া অন্য কয়েকজন জাতীয়তাবাদী যথা দাদা চান্দ্রী কেয়াসাম্প, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ হার বালিনকে পত্র দিতে বলিলেন। বালিন তাঁহাদের আকাঙ্খা মতে কয়েকটি প্যাকেট রিভলবার ও পিস্তল ভারত উপকূলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সে সকল কলিকাতার প্রোভার স্মিথ কোম্পানীর বেনিয়ন বরানগরের

নারায়ণচন্দ্র দত্ত আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য প্রভাসচন্দ্র দেব (বি, এ) প্রমুখ সদস্যগণকে দিয়াছিলেন।

কিন্তু তখন দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিকার হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত বিপ্লবিগণ ব্যতীত সাধারণ স্বদেশকর্ম্মিগণ বৈপ্লবিক কার্যের দিকে দৃষ্টি দিবার আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিলেন। নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই যে বৃটিশ জাষ্টিস মাটি ফুড়িয়া বাহির হইয়াছে, তাহার প্রচার করিতেছিলেন। যদিও স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকা ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দেওয়াকে বাংলার পুনর্বার অঙ্গচ্ছেদ (Re-partition of Bengal) বলিয়াই দৃঢ়কণ্ঠে অভিমত প্রকাশ করিতেছিল, তথাপি ধীরপন্থী নায়কগণ সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। স্বদেশী যুগের উগ্র "সঞ্জীবনী" পত্রিকা পাঠে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লর্ড হার্ডিঞ্জের সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত জ্ঞাত হইতাম।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের ধীরপন্থী নায়কগণকে নানা ভাবে পকেটভার করার সুযোগ দিতে লাগিলেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলারী আমলের বহিস্কৃত ছাত্রদিগকেও ভর্তি করিয়া লইলেন, জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই শিক্ষা বিভাগে কর্ম-সংস্থান করিতে সক্ষম হইলেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল, দেশে শান্তির হাওয়া বহিতেছে। বিপ্লববাদী বা উগ্রপন্থী বন্ধুগণও পত্রে জানাইলেন যে, দেশের পরিবর্তন হইয়াছে, সুতরাং অধিক সংখ্যক প্যাকেট অস্ত্র ভারতে প্রেরণ করা হইল না।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

১৯১৩ অব্দে চীনে নব্যচীন দল ডক্টর সান ইয়াৎ সেনের নায়কত্বেই প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লব চালাইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া আমরা উল্লসিত হইলাম, ভাবিলাম "দিন আগত ঐ", এশিয়ার কালঘুম ভঙ্গ হইবে, কোটি কোটি নরনারীর মহাদেশ গাঝাড়া দিয়া উঠিবে, হয়ত বা এই গা ঝাড়াতেই ভারতবর্ষও নড়িয়া উঠিবে।

সহসা আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা ভারত-হিতৈষিণী ফ্রাউ সিমন আমাকে ফোনে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার ভগিনীপতি হ্যার নিদেমায়ারের এক পত্র দেখাইলেন, পত্র বিশেষ জরুরী, আমাকে পথখরচ দিয়া অবিলম্বে হামবুর্গ পাঠাইবার নির্দেশ তাহাতে রহিয়াছে। আমি পরদিন প্রথম গাড়ীতেই হামবুর্গ যাত্রা করিলাম। বৃদ্ধা ফ্রাউ সিমন ট্রেণ ভাড়া ব্যতীত হোটেল চার্জের জন্য অর্থ দিয়াছেন, নিদেমায়ারকে একখানা টেলীও করা হইয়াছে, অপরাহ্ণ ২টায় হামবুর্গ ষ্টেশনে পৌছিয়াই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্য করিলাম যে, প্লাটফর্মে হ্যার নিদেমায়ার স্বয়ং উপস্থিত। তিনি 'আলষ্টারডামে' হ্যার বালিনের বাটীতে আমাকে লইয়া গেলেন। হ্যার বালিন অগোণে বাথরুমে যাইয়া আমাকে হাত-মুখ ধুইয়া আসিতে বলিলেন, তারপর টেবিলে মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্য পরিবেশন করাইলেন। হ্যার বালিন ব্যতীত তথায় অন্য এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পোষাকে মনে হইল 'লেডি অফিসার'—নাম গেয়র্স বাওয়ার। তাঁহারা তিন জন শুভ্র ফেনিল বিয়ার পান করিতে লাগিলেন।

হ্যার বালিন বলিলেন যে, এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত। চীনের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কয়েকজন আইরিশ বিপ্লবী চীনদেশে যাইতেছেন, আমরাই প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি এ সময়ে দুই-চারি জন বন্ধুসহ তাঁহাদের সহযাত্রী হইলে বিশেষ ভাবে বিপ্লবের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন, এ জন্যই আপনাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। এমন কি, ভাষার অসুবিধাও যে কিছু নয়, কারণ নব্যচীনের কর্মবীরগণ ইংরেজী এবং জার্মাণ ভাষায় দক্ষ; তাহাও বলিলেন।

বালিনের প্রস্তাব শোনামাত্র আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইউনিভার্সিটির অবকাশকাল পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া আমার গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছি। আশা করি, ১৯১৪ অব্দেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বহু-আকাঙ্খিত 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইব। এই সময়ে আমি অকস্মাৎ সব বন্ধ করিয়া চীন যাত্রা করিব? আমার খাদ্য এবং ছুরি-কাঁটা অচল হইল। মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিল আমার চক্ষুর সমক্ষে বিপুল স্নেহের আধার আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবের সৌম্য মূর্তি, অন্তরে জাগিয়া উঠিল ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূগণের সাশ্রুনয়নে বিদায়দানের করুণ দৃশ্য। বাল্যকাল হইতেই আমি ছিলাম অসহিষ্ণু, উচ্ছৃঙ্খল এবং বিচারবুদ্ধি-বিবর্জিত অর্বাচীন। যখন জ্ঞান লাভের সময় তখন জ্ঞান বিস্তারের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার শূন্য রাখিয়াছি। আবার, কি উন্মাদ হইব? আবার কি আত্মীয়-স্বজন সকলকে হতাশ করিব? আমার পিতৃতুল্য অধ্যাপক আমার গবেষণা পরিচালনা কার্যে নিত্য উৎসাহ দিয়া আমাকে অগ্রসর করিতেছেন। আমিই তাঁহার প্রথম হিন্দু ছাত্র (ভারতীয়)। আমা দ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির আশা তিনি পোষণ করেন, তাঁহাকেও প্রতারিত করিব?

না, কিছুতেই না, আমি অসম্মত হইলাম, পরিষ্কার বিনীত ভাষায় বলিলাম, 'আমা হতে এই কর্ম হবে না সাধন।'

আমার আরও একটি কথা যুগপৎ মনে উদয় হইল, তাঁহারা কি আমাকে গুপ্তচরে পরিণত করিতে প্রয়াসী? আমার দেশসেবা, দেশমুক্তির কামনার কি এই দক্ষিণা?

হ্যার বালিন অন্তর্যামী। তিনি বলিলেন, হ্যার ভট্টাচারিয়া! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। বিপ্লবের সাক্ষাৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে নব্যচীন নায়কগণের নিকট আপনাকে প্রেরণ করিতে চাই। আইরিশ বন্ধুগণের বিশেষ অনুরোধেই আমরা এই ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি সেখানে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুগণের সঙ্গে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, ইত্যাদি বহু কথা তিনি বলিলেন। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম, সর্বাগ্রে আমায় 'ডক্টরেট' পাইতে হইবে, ইহার জন্যই আমার বিস্তৃত পরিবারের সকলে উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ১৯০৬ অব্দের মত অবিমৃষ্যকারিতায় পুনরায় হতবুদ্ধি করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হইবে।

হ্যার নিদেমায়ার এ সময়ে কথা বলিলেন। তিনি আমাদের পরিবার, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্রাউ সিমনের নিকট হইতে বিশেষ ভাবেই সকল তথ্য জ্ঞাত আছেন। ফ্রাউ সিমনের গৃহে বহু

ভারতীয় ছাত্র সম্বর্ধিত হইয়াছে। তাঁহার বাটীতে ভারতীয় ভোজ্যে বন্ধুগণ পরিতৃপ্ত হইয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর তুকারাম লাডডু, ডক্টর হরিশ্চন্দ্র, অধ্যাপক গুনে, ডক্টর সোরাবজী, (ইনি পরে নাম পরিবর্তন করিয়া ডক্টর তারাপোরওয়ালা নামে কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে অধ্যাপনা করেন) এমন কি বর্তমানে বম্বে ষ্টেটের গভর্ণর শ্রীপ্রকাশও সিমন-পরিবারে আদৃত হইয়াছেন। সুতরাং ফ্রাউ সিমন যেমন আমাদের পারিবারিক বন্ধন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, নিদেমায়ার ততটা না হইলেও কতকটা জ্ঞাত ছিলেন। তিনিই আমার পক্ষ ধরিয়া বার্লিনকে বুঝাইলেন। বলিনের আজ দুই বৎসর পর সম্ভবতঃ প্রতীতি হইল যে, আমার দেশপ্রেম প্রকৃত নহে। দেশোদ্ধারের চেষ্টা আমি বাম হস্তে করিতে ইচ্ছুক, দক্ষিণ হস্ত নিয়তই আত্মোন্নতি ও পরিবারের উন্নতির জন্ত কর্মে রত থাকিবে।

নিদেমায়ারের বাটীতে নৈশভোজন সমাপ্ত করিয়া রাত্রি ১১টার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে যাত্রা করিলাম এবং পরদিন প্রাতে ৬টায় হালে পৌছিলাম। হালে পৌছা পর্যন্ত আমার উদ্বেগ ঘুচে নাই।

তৎপরে স্থার বার্লিনের সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে এরূপই মনে হইতেছিল, কিন্তু খৃষ্টমাসে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। অধ্যয়ন শেষ হইলে বার্লিনের সাহায্যে অনেক কার্য উদ্ধার হইবে, এই কথাও মনে জাগিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ

১৯১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। সে সময়ে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জার্মাণীতে ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে আমরা বার্লিনে ভারতে বিপ্লব সংঘটনের জন্ত যে দল বাঁধি তাহার প্রেসিডেণ্ট পদে স্থার বার্লিনকেই নির্বাচিত করা হয়। বার্লিন তখন বার্লিনেই ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সহ আমি স্থার বার্লিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বার্লিন দীর্ঘকাল বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফরাসী ভাষায় আলোচনা করেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রত্যাবর্তন কালে বীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিরাট প্রতিপত্তিশালী পুরুষের সঙ্গে কি ভাবে আমার পরিচয় হইল। সকল বিবরণ শুনিয়া তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিলেন। কারণ তাঁহারা প্যারিসে থাকিয়া দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কোন প্রকারে সামান্ত অস্ত্রশস্ত্র ভারতে প্রেরণ করিতে পারিতেন আর আমি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কিছু করিতে পারিলাম না, ইহা যে আমার পক্ষে গর্হিত অপরাধ হইয়াছে, তাহা বলিলেন। ১৯১২ অব্দে আমি যখন প্যারিসে তাঁহার দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন আমারই মত আর একজন সংসারী বিপ্লববাদী সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র ছাত্র ডক্টর তুকারাম কৃষ্ণ লাডডু। বীরেন্দ্রনাথ তখন অনুপস্থিত ছিলেন। ম্যাডাম কামা, সর্দারসিংহ রাওজি রাণা, জ্ঞানচাঁদ বর্ম্মা প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লববাদীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করি। তিনি বলিলেন, তখন যদি তোমরা ম্যাডাম কামার নিকট স্থার বার্লিনের প্রস্তাব ব্যক্ত করতে তবে আমরা কয়েকজন অধ্যাতকর্মী পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থাই করতে পারতাম যে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিভিন্ন উপকূলে পৌছে আমাদের ভারতে অবস্থিত সহকর্মী দলের শক্তি বৃদ্ধি করতো।

তিনি আমাকে ডক্টর উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষার জন্ত নিন্দা করিলেন। এমন কি হেলায় সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করায় অপরাধী এবং বিশ্বাসঘাতক পর্য্যন্ত বলিয়া মুখ ভার করিলেন!

তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন, সুতরাং তাঁহার বিষন্নতা সত্বরই কাটিয়া গেল।

স্থার বার্লিন আমাদিগকে সতর্ক করিলেন যে তিনি বা জার্মেণ গভর্ণমেণ্ট আমাদের বিপ্লবী দল "ভারত বন্ধু জার্মাণ সমিতি"র পশ্চাতে আছেন, এই কথা যেন প্রচার না হয়। কারণ কোন দেশেই গভর্ণমেণ্ট অন্ত দেশে বিপ্লব বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হয় না। যদিও প্রত্যেক দেশই নিয়ত এরূপ চেষ্টা এক একটি তথাকথিত কমিটি দ্বারা করান, যেমন ইংল্যাণ্ডের বাক্সটন কমিটি। দিবারাত্রি বালকান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বালকান যুদ্ধে প্রতিনিয়তই বাক্সটন কমিটির লর্ড বাক্সটনের গতিবিধি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও তিনি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে বিপুল অর্থরাশি সহ উপস্থিত থাকিয়া বুলগেরিয়াকে জার্মাণীর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধা দিতেছিলেন। অবশেষে জার্মাণ বন্ধু জনৈক তরুণ কর্তৃক তিনি নিহত হইলে বুলগেরিয়া জার্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করে।

মাঝে মাঝে বীরেন্দ্রনাথ সত্তাশিব রাও, ধীরেন সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভ্রাতা) কেরসাম্প মনসুর আহম্মদ এবং অন্তান্ত সহকর্মী সহ আমি স্থার বার্লিনের বাটীতে উপস্থিত হইতাম। তিনি ভারতে বিপ্লব সৃষ্টির সম্পর্কে নানারূপ পরামর্শ দিতেন।

আয়র্লণ্ডের উপকূলে স্যার রোজার কেইসমেণ্ট (Sir Rojer Casement) যে সশস্ত্র যুদ্ধজাহাজ লইয়া অবতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হয়। বিচারে কেইসমেণ্টকে ফাঁসী-রজ্জুতে প্রাণ দিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে আর যাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে আমার পরিচিত ডে কুটিন (De-Curtin) নামক একজন বিপ্লবী ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হয়। একজন ডে কুটিনকে আমি বার্লিনের বাটীতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি ছিলেন শতকরা ১০০ ভাগ দেশপ্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী। আমরা বার্লিন ত্যাগ করার পূর্ব অকস্মাৎ এক মোটর ধাক্কায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সহাস্যে বলেন, আপনারা যে পথের যাত্রী আমরাও সে পথের। আপনাদের গাড়ী এবং কুরিয়ার (Courier) আমাদের পরিচিত, কারণ বহুবার এই গাড়ী আমরা পেয়েছি।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, স্থার বার্লিন স্যার রোজার কেইসমেণ্টকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনি আমাদের পরম হিতৈষী ছিলেন। ১৯১৯ অব্দে যুদ্ধের আবহাওয়ার পরিবর্তন হইলে আমি ফ্রাউ বার্লিনকে এক পত্রে তাহার মৃত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তিনিও একখানা পত্র লিখিয়া স্বামীর আত্মহত্যার কাহিনী জ্ঞাপন করেন। তিনি এবং তাঁহার পালিতা কন্তা উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। একটি মাত্র বিবাহিতা দৌহিত্রী বর্তমানে অষ্ট্রীয়ার ইন্সব্রুকে (Innsbruck) আছেন। ইন্সব্রুক রাশিয়ার অধীন।

বেরুবাড়ী—আইনের চোখে

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য)

বেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রশ্নটির তিনটি দিক রয়েছে: (১) আইনগত, (২) রাজনৈতিক ও (৩) নৈতিক বা নীতিগত। প্রথমোক্ত বিষয় থেকে দুটি কথা ওঠে: (ক) ইহা কি সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে এর সমাধান নির্ভর করবে র‍্যাডক্লিফ ও বাগে রোয়েদাদের ব্যাখ্যার উপর। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট—বাগে রোয়েদাদের পূর্বে পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোন বিরোধ তোলে নি। আলোচ্য বিষয়ে র‍্যাডক্লিফ যে রোয়েদাদ দেন, তা বেশ পরিষ্কার। পাকিস্তানের যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকতো যে, তার অঞ্চলের একটি অংশ ভারতে চলে গেছে, ঐ অবস্থায়ও সে বিরোধ তুলতো না, এমনটি ভাবাই যায় না। আমরা গ্রাম্য ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের বিবৃতি পেয়েছি। ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সকল ব্যাপারটা সম্পর্কেই এই ভদ্রলোক অবশ্য ওয়াকিবহাল থাকবেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, তিনটি পরিকল্পনা (১৯১৬, ১৯২৩ ও ১৯৪৭ সালে রচিত) অনুসারে পাকিস্তানের এক একর জমিও ভারতের দখলাধীন নেই। বাগে রোয়েদাদের আগে বেরুবাড়ী সম্পর্কে পাকিস্তান কেন কোন দাবী ওঠায় নি, সে প্রশ্নের জবাব এইখানেই রয়েছে। কোন বিরোধ ছিল না বলেই বাগের পক্ষে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসার কারণ ঘটে নি। সুতরাং বাগে রোয়েদাদের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় এ কখনই হতে পারে না।

(খ) সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন যদি এইটি না হলো, তা হলে এ নিশ্চয়ই ভারতভূমির একাংশ পাকিস্তানকে প্রত্যর্পণের প্রশ্ন। গত ৩০শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রশ্নটি যখন উত্থাপিত হয়, সে সময়ে পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে আমি আমার অভিমত প্রকাশ করি। আমি বলি যে, ভারতের সংবিধান অনুসারে এরূপ হস্তান্তর চলতে পারে না। ভারতের কোন একটি অংশকে বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তে প্রত্যর্পণের অধিকার রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান মন্ত্রীর নেই। এমন কি, এ কার্য্য সম্পাদনের জন্য বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টও কোন আইন প্রণয়নের অধিকারী নহেন। পরে অপর আইনজীবীদের প্রকাশিত অভিমত সংবাদপত্রে পাঠ করে আনন্দ পাই। ৩০শে ডিসেম্বর আমি যে বক্তব্য পেশ করি, তাঁরা সকলেই তার সঙ্গে একমত হন। আলিপুর বারের একজন অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী জানুয়ারীর মাঝামাঝি আমার অভিমতেরই অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। পরে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্যান্য আইনজ্ঞদের মুখেও একই অভিমত প্রকাশিত হয়। এ প্রশ্নে আমরা কিন্তু একে অন্যের সাথে পরামর্শ করি নি। অথচ আমাদের সব ক'জনার একই মত হয়ে দাঁড়ায় যাতে আমাদের ব্যক্ত অভিমতটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই প্রমাণিত হয়।

সংবিধানের ৩নং ধারায় পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের অধিকার বিশ্লেষণ করা আছে। আইনের একটি সুবিদিত সূত্র রয়েছে, যার অর্থ—যে আইন সুস্পষ্ট, সেখানে নতুন কোন ভাষ্যের অবকাশ নেই। আইনের শাসনের ক্ষেত্রে পরিষ্কার কথা যেটি, সে হচ্ছে—আইনসভা যেখানে সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপার নিষ্পত্তির এক বা ততোধিক পদ্ধতি স্পষ্টভাবে নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অপর যে কোন পদ্ধতিই বর্জ্জন করতে হবে বরাবর। সংবিধান দ্বারা স্পষ্ট ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে পার্লামেন্ট কোন আইন প্রণয়নে সক্ষম নহেন। ভারতের একটি অংশকে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তে হস্তান্তরকল্পে আইন প্রণয়নের অধিকার সংবিধানে পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়নি।

(২) রাজনৈতিক: ব্যাপারটি যেক্ষেত্রে ভারতের একটি আভ্যন্তরীণ সমস্যা, সে অবস্থায় এর সমাধান খুব সহজেই হতে পারে। ইহা বেশ স্পষ্ট যে, নিজের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ও তথ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আলোচ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। তিনি ভাবেন যে, তাঁর ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু সংবিধান অনুসারে চলতে পারে—অবশ্য এ খুব একটা বেশিরকম কল্পনা, তবু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইন সভার মতামত না নিলেই নয়। আবার বলতে হয়, এই বিষয়টিও সংবিধানের ৩নং ধারায়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রধান মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, তাঁর ধারণা ছিল যে, এই হস্তান্তরে পশ্চিমবঙ্গের সম্মতি রয়েছে।

অথচ আমাদের মুখ্য মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ কখনই এতে সম্মতি দেয় নি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার মতামত সুবিদিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানকার আইন সভা এক বাক্যে উক্ত হস্তান্তরের বিরোধিতা জানিয়েছেন। এমনটি মনে করা চলে না যে, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ নুন আমাদের সংবিধানের ৩নং ধারাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিও ভুল ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন। এই অবস্থাধীনে কোন চুক্তি হলেও সেটি নাকচ হয়ে যায়। আর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এমন ক্ষেত্রে আপন আপন দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করলেও কাউকে দোষ দেওয়া চলে না।

এ ছাড়া আমার ধারণা—প্রধানমন্ত্রী একমাত্র জরুরী অবস্থাতেই ভারতের নামে কাজ করতে পারেন। অন্যথা এরূপ ক্ষেত্রে তাঁকে পার্লামেন্টের মতামত গ্রহণ করতেই হবে। চুক্তি অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের ভেতর পত্র-বিনিময় হয় নি, এমনটি কিছুতেই ভাবতে পারা যায় না। আমি মনে করি, আলোচ্য প্রসঙ্গে স্ব স্ব দেশের অভিমত জানবার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পাক্ প্রধানমন্ত্রীর হাতে সময় ছিল প্রচুর। বলতে কি, সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামত না নিয়ে এ ধরণের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কোন জরুরী কারণই ছিল না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সামনে।

বলা হয়েছে যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চুক্তিটি যদি কার্য্যকরী করা না হয়, তাহলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। আমি বুঝি যে, দেশের কল্যাণের মতামত নেবার সময় যেখানে নেই, সেক্ষেত্রে—অন্যভাবে বলতে গেলে জরুরী অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের নাম করে যা কিছু করবেন, তা কার্য্যকরী করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।' এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

প্রধান মন্ত্রী যদি ঘোষণা করেন যে, তথ্য ও আইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তিনি চুক্তিটি করেছেন, সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হবার কি কারণ থাকতে পারে? মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, ভুলের স্বীকৃতিতেই মহত্ব। প্রধানমন্ত্রী যদি আবশ্যক ঘোষণাটি করেন, তা হলে আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা তাঁর ক্ষুণ্ন হবে না। পক্ষান্তরে বিভিন্ন জাতি বলবে: "এই একজন মহাপুরুষ যিনি মনুষ্যসুলভ ভুল করতে পারেন কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করার সাহস তাঁর আছে এবং দেশের সংবিধান-বিরোধী কোন কিছুই তিনি করবেন না।" নেপোলিয়নের মতো একজন পরম প্রতিভাবান ব্যক্তি—ইতিহাসে যাঁর জুড়ি নেই, তিনিও ভুল করেছিলেন, যার জন্য তাঁর সাম্রাজ্যের বিলোপ পর্য্যন্ত ঘটেছিল।

মিউনিক চুক্তির সঙ্গে এই চুক্তির তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু কোনরূপ তুলনাই হয়ত সম্ভবপর নয়। স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁর 'দি গ্যাদারিং ষ্টর্ম' গ্রন্থের 'দি ট্র্যাজেডি অব মিউনিক' ('মিউনিকের সর্বনাশ') শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন—সর্বোপরি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিরক্ষায় বৃটেনের কোনরূপ চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা ছিল না কিংবা কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল না তাঁর দিক থেকে, এমন কি বেসরকারী ভাবেও। কিন্তু জার্মাণী যদি চেকোশ্লোভাকিয়াকে আক্রমণ করে, সে ক্ষেত্রে তার উপর যুদ্ধ অভিযান চালানোর স্পষ্ট দায়িত্ব চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সের ছিল। এরূপ বলা হয় যে, ঠিক মুহূর্তে ফ্রান্স নিজের বাধ্যবাধকতা অনুসারে কাজ করেনি। এই বিরোধ প্রামাণিক গ্রন্থ-রচয়িতা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে এইরূপ বলেন: "চেকোশ্লোভাকিয়া যদি আত্মসমর্পণে (জার্মাণীর নিকট) অস্বীকার করে থাকে আর তার পরিণতিই যদি হ'ল যুদ্ধ, সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পক্ষে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত ছিল। তবে চেকরা যদি চাপে পড়ে আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়ে থাকেন, সে অবস্থায় ফ্রান্সের মর্য্যাদা টিকে গেলো।"

তৎপরে তিনি যথারীতি বলেন, "আমরা এই ব্যাপারটির (প্রতিরক্ষা) বিচারের ভার ইতিহাসের হাতেই ছেড়ে দেব।"

স্পষ্টই মিউনিক চুক্তির সমর্থনে বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বপক্ষে কিছু বলবার রয়েছে কিন্তু বেরুবাড়ী চুক্তির সমর্থনে বলবার মতো কিছু আছে কি? বেরুবাড়ী ভারতেরই একটি অংশ। আমাদের সংবিধানের তপশীলেই এইটি স্পষ্ট করে বলা আছে। বর্তমান চুক্তি অনুষ্ঠানের আগে পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোন দাবী পেশ করে নি। সুতরাং দেশের জনগণের মতামত না নিয়ে এই যে চুক্তিটি হয়েছে- মিউনিক চুক্তির সঙ্গে একই পর্য্যায়ে এ দাঁড়াতে পারে না। সেই কারণেই একটি অচল চুক্তি অনুসারে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে বলে বলা হচ্ছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি উহা কার্যকরী করতে নারাজ হন, সেক্ষেত্রে তাঁর আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা ব্যাহত হওয়া সম্ভব নয়।

(৩) কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—বিষয়টির নৈতিক বা নীতিগত দিক। এক্ষণে এইটি ছয় ভাগে-সমর্থিত হয়েছে যে, ভারত দালাই লামাকে এদেশে আশ্রয় দিয়েছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী সুন্দর ভাষায় বলেছেন—কোন অবস্থাতেই ভারত দালাই লামাকে চীনের হস্তে তুলে দিবে না। ভারত যে স্বাধীনতা অর্জনের পর একজন উদ্বাস্তুকে আশ্রয় মঞ্জুর করেছে, এ সত্যি একটি চমৎকার কাজ, একটি বিরাট অনুষ্ঠান। নিজের যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য রয়েছে, তার সঙ্গে মিল রেখেই হয়েছে এই ব্যবস্থা। কাহিনী চলতি আছে—ভারতের এক মহান নৃপতি একটি বাজ পাখীর আক্রমণ থেকে একটি পারাবতকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের দেহ-মাংস বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আক্রান্ত পারাবতটি রাজার নিকট আশ্রয় চাইলে পরই এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। আমার ধারণা যে, আমাদের প্রধান মন্ত্রীর এই একটি কাজেই ভারতের মর্য্যাদা অনেকগুণে বর্ধিত হয়েছে। নেপোলিয়ানের পতনের পর তিনি যথেষ্ট সম্ভ্রম ও সাহস নিয়ে পত্র মারফত যখন আশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন, গ্রেট বৃটেনও তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেনি—হতে পারে তিনি ছিলেন বৃটেনের পরম শত্রু। সেদিনে গ্রেট বৃটেনের উত্তর ছিল সেণ্ট হেলেনা।

দালাই লামাকে আশ্রয়দানের পরিণতি আমাদের প্রধান মন্ত্রী বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। চীনের এ অসন্তুষ্টির কারণ ঘটাতে পারে—আমি বলি না যে, ঘটাবেই। এই নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব বাধতে পারে অথচ সেদিন মাত্র দুটি রাষ্ট্রই 'পঞ্চশীল' স্বাক্ষর করেছে। পরিণতি জেনেও আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভারতের পক্ষে কাজ করার জোর সাহস দেখিয়েছেন এবং আশ্রয় মঞ্জুর করেছেন দালাই লামাকে। তিনি এ-ও বলেছেন যে, মহান লামার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

দালাই লামা একজন মহান্ ধর্মীয় নেতা ও তিব্বতের রাজা। আলোচ্যক্ষেত্রে অবশ্য তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আশ্রয় চেয়েছেন এবং ভারত তা দিয়েছে। বেরুবাড়ীর আট হাজার নরনারীর প্রতি আমরা কি একই নীতি সম্প্রসারিত করতে পারি না? প্রায় বারো বছর আগে এই হতভাগ্যরা পাকিস্তানে তাদের পৈতৃক ঘর-বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়। তারা ভারতে চলে আসে এবং আশ্রয় চায়। ভারত সে সময় তাদের আশ্রয় দেয়। ছিন্নমূল হতভাগ্য এই মানুষগুলি থাকবার ঠাঁই পেয়ে ঘরদরজা ও কুঁড়ে তৈরী করে নিয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ আমাদের ভারতের নাগরিক বলেই নিজেদের ভাবছে। তারা এ-ও ভেবে নিয়েছিল যে, পাকিস্তানের দুর্ব্যবহার তাদের আর পেতে হবে না। তারা কঠোর শ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করে চলেছে। ভারতের প্রতি রয়েছে তাদের আনুগত্য। তারা ভোটাধিকারও পেয়েছে এবং গত সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেও। এতে তারা যে ভারতের নাগরিক, সেইটি পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে। এক্ষণে, তাদের একথা কি বলা ঠিক হবে—পাকিস্তানে ফিরে যাও? ভারত তোমাদের যে আশ্রয় দিয়েছিল, এখন আর তা দেবে না? মানবতার দিক থেকে দালাই লামার ব্যাপার ও এ ব্যাপারটির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে কি? আমি অবশ্য কোন পার্থক্য দেখি না। এই মস্ত নৈতিক প্রশ্নটি উঠেছে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমারা যেন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাই।

একথা যদি ধরেও লওয়া গেল যে, সংবিধানের উপযুক্ত সংশোধন মারফত আবশ্যক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়া হয়েছে, এ-ও যদি ধরা গেল যে, একটি অচল চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভারত রক্ষা করতে পারলো না বলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের

প্রধান মন্ত্রীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তখনও জিজ্ঞাসা ওঠে—আপনি কি ভাবে এই বিরাট নৈতিক প্রশ্নটির সমাধান করছেন? প্রশ্নটি হলো—কতকগুলি মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার পর যাদের কাছ থেকে তারা পালিয়ে এসেছিল, তাদের হাতেই আবার প্রত্যর্পণ করা।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, ভারতের খাতিরে বেরুবাড়ীকে উৎসর্গ করা প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটি যদি পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে পাকিস্তান সন্তুষ্ট হবে। কিন্তু তোষণ নীতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে কখনই কাজ হবে না। ইহা খুবই স্পষ্ট। গত বারো বছরে যা ঘটেছে বলে আমরা জানি, তা থেকেই এ ধারণা সন্দেহাতীত হয়। আমাদের স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত পন্থ যা বলেছেন এবং দেশরক্ষা সচিব শ্রীমেননের যে উক্তি—এক ইঞ্চি পরিমিত ভারতীয় জমির উপরও বিদেশী আক্রমণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন না, এর পর জেনারেল থিমায়া সেদিন বলেছেন যে, ভারতের সৈনিকরা পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, একথার পরও বেরুবাড়ী হস্তান্তরের কোন কৈফিয়ৎ থাকতে পারে কি? পারে বলে অন্ততঃ আমি মনে করি নে।

সুতরাং বাংলার জনগণ এই প্রশ্নটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত ও বদ্ধপরিকর হয়েছে। বেরুবাড়ী পাকিস্তানকে কোন অবস্থাতেই দেওয়া হবে না। পাকিস্তান তার যা ইচ্ছে হয়, করুক।

আমি আবার এ বিষয়ে বিশ্বের জীবিতদের ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য লেখকের কয়েকটি স্মরণীয় কথা উদ্ধৃত করব: অপর জাতিগুলির সঙ্গে আচরণে মন্ত্রীদের প্রথম করণীয়—সংঘর্ষ ও যুদ্ধ এড়িয়ে চলা আর সর্ববিধ আক্রমণ পরিহার করা—সে জাতীয় কারণেই হোক, কি আদর্শগত লক্ষ্য থেকেই হোক্। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বদেশের জনগণ যাঁদের নিকট থেকে তাঁরা ক্ষমতা পেয়েছেন, তাঁদের রক্ষার নিমিত্ত সর্বশেষ উপায় হিসাবে এইটি যেখানে সঙ্গত ও অপরিহার্য্য মনে হবে কিংবা যে স্থলে মনের সঙ্গে চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট বোঝাপড়া হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বাদ দিলে হবে না। অবস্থা তেমনি অনিবার্য্য হয়ে যদি দাঁড়ায়, তা হলে বলপ্রয়োগ চলতে পারে।

ভারত যদি এই নীতি অনুসারে কাজ করলো, একটি বৃহৎ, মজবুত ও সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর সে দাঁড়াতে পারবে। এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই ভারত আপন কর্মধারা স্থির করুক, আর তাতে করেই সে সমগ্র বিশ্বকে টেনে আনতে পারবে নিজের দিকে।

মনের আকাশ

সুপ্রিয়া

খুব বেশী দূরে নয়,
এক দিন চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা উঠেছিল ফুটি
খুব কাছাকাছি।
মনের আকাশে লাগে তার
এ আলোর ঝলকানি
নীরব নিথরের মাঝে বহে চলে শুধু
না-বলা ঈথারের বাণী।
ঈথারের বিদ্যুৎস্পর্শে উঠেছিল ভাসি
একটুকু হাসি
দুজনার মুখে।
এক কলি গান আর একটুকু ছোঁয়া
দুজনারই প্রাণে এনেছিল
বসন্ত রাগিণী।
একখানি বাঁকা চাঁদ আর একটি কবিতায়
কালো আঁখির স্বপ্নালু মায়া
আর শুভ্র রজনীগন্ধা
মনের আকাশকে ভরিয়ে দিয়েছে
পরিপূর্ণ আলোর অতল ছায়ায়।
হঠাৎ থেমে গেল গান
এলো বুঝি বিচ্ছেদ-প্রহর
নিবে গেলো আলো
কবিতাও হ'ল না পূর্ণ।

আচম্‌কা ঝড়ের দুর্ব্বার ঘূর্ণিতে
মনের আকাশে নেমে এল
ঘন কালো মেঘ।
কালো মেঘের অন্ধকারে ঝড়ের ঝটকায়
চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা হয়ে গেল লীন
মনের পেয়ালা গেল ভেঙে
স্বপ্ন গেলো টুটে।
থামলো ঝড়, কালো মেঘ গেল দূরে সরে
মনের আকাশ ঘিরে চলছে
শুধু থমথমে হাওয়া।
হাওয়ার আস্ফালনে
ঝড়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে
চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা কিন্তু রয়েছে
ঠিক সেই ভাবে
যেমন দুজনে উঠেছিল ফুটে
জীবনের প্রথম সন্ধ্যায়।
হায়, নেই শুধু আলো আর গান
শুধু নেই ঈথারের অদৃশ্য পুলক
নেই তবু একটু ছোঁয়া আর একটি কবিতা
মনের আকাশ হারিয়েছে সব মধুরতা।
মনের আকাশ ঘিরে রয়েছে শুধু
হিসাবের খাতা।

শিক্ষা ও শিক্ষায়তন

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়

১

শিক্ষায়তন

প্রতিষ্ঠান মাত্রেই আজকাল বিরোধ-বিশৃঙ্খলা ও ধর্মঘটাদি প্রায় লেগেই আছে। বিশেষ করে শিক্ষায়তনগুলিতেও তার ধারা প্রবহমান হতে চলেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আকারে বৃহৎ হতে বৃহত্তর হতে গিয়ে প্রকারে সংগতি রেখে চলতে পারছে না; দিনের পর দিন স্থানে-স্থানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার্থী বা শিক্ষাসেবী-কর্মী সাধারণের নানাদিক দিয়ে বোঝা-পড়াতেই কাল কেটে যাচ্ছে, কাজ এগুচ্ছে অল্পই; সমস্যার সমাধান কোথায়, অনেকেই তা ভাবছেন। কম-বেশি এমন ঘটনার আভাস যখন প্রায় প্রতিষ্ঠানের পিছনেই ধূমায়িত, তখন এটিকে সাধারণ সমস্যার মতো ধ'রে নিয়ে সমাধানেরও সূত্র-নির্ণয় করা আবশ্যক সাধারণ ভাবেই।

মনে করা যাক, 'নিখিল জ্ঞানায়তন' একটি বহুদিনকার শিক্ষাপীঠ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যা চর্চা হয়ে থাকে সর্বত্রই; কিন্তু বিদ্যার সঙ্গে প্রত্যহের জীবনযাত্রাকেও সুগ্রথিত ক'রে সর্বাঙ্গীন শিক্ষায় মানুষকে বিকশিত করে তোলবার লক্ষ্য গ্রহণ করেছিল এই 'জ্ঞানায়তন', এবং এই মর্মে তাকে বিশেষ ভাবের একটি আশ্রমের আবাসিক রূপও দেওয়া হয়েছিল প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই। কালের ধারায় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গঠন-কাঠামোটি দাঁড়িয়েছে এসে এইরূপ: ১। সর্বোচ্চ প্রতিনিধি-পরিষদ ২। ব্যবস্থাপক সমিতি ৩। বিদ্যাসমিতি ৪। প্রাক্তন-মণ্ডলী। এ ছাড়া আরেকটি সংস্থাও এর মধ্যে এক পাশে গড়ে উঠেছে। সেটি শিক্ষা-সেবক-সংঘ; শিক্ষক বা অশিক্ষক যিনিই হোন, কর্মীমাত্রেরই এটি সাধারণ মিলনকেন্দ্র। প্রস্তাবিত সমাধান-চেষ্টার সূত্রটি নিহিত রয়েছে শেষোক্ত এই সংঘেরই মধ্যে। এজন্য এরই কথা আজ বিশেষ ক'রে আলোচনার বিষয়।

দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির বিদ্যার দিকের ব্যবস্থার জন্য সক্রিয় রয়েছে একটি বিশেষ মণ্ডলী—'বিদ্যাসমিতি'; অনুরূপ ভাবে এর দিন-চর্যার দিকটিরও দেখা-শুনা প্রয়োজন, কিন্তু সেজন্য কোনো বিশেষ মণ্ডলীর ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। অপর পক্ষে, বিশৃঙ্খলা ঘনীভূত হচ্ছে দিনচর্যার দিক থেকেই বেশি। দিনচর্যা হচ্ছে দিনের চিন্তা-ভাবনা ও কাজ-কর্মের সুবিহিত উদ্‌যাপন ব্যবস্থা। 'জ্ঞানায়তনে' এই দিকের বিশৃঙ্খলা বিদ্যাচর্চার দিকটাকেও দিনে দিনে ব্যাহত করে তুলছে। স্বতঃই মনে হয়, 'বিদ্যাসমিতি' আছে বলেই পড়াশুনা ও পরীক্ষাবাহিত পাশের কাঠামো তবু একটা কিছু খাড়া রয়েছে, কিন্তু, সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা পরিবেশ ব্যবস্থার জন্য তেমনি একটি সমিতির অভাবেই কি তবে অন্য দিকে ভাঙন লাগল? পরিবেশের দায়িত্ব-রক্ষার স্বেচ্ছা-আরোপিত আদর্শ নিয়েছে সেখানে শিক্ষাসেবী-সংঘ। কিন্তু কার্যত নৈমিত্তিক উৎসবাদি অনুষ্ঠানেই তাঁদের কাজকর্ম রয়েছে সীমাবদ্ধ। পরিবেশের এই দিনচর্যাগত নিত্য অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও বর্তায় অস্থায়ী এক নিজস্ব সংবিধানে লিখিত আদর্শ অনুসারে, স্বভাবত সাধারণ কর্মীদের সংস্থা এই 'শিক্ষাসেবী সংঘে'র উপরেই। সে স্থলে, কথায় থাকলেও, কাজে সেই দায়িত্ব রক্ষার সুষ্ঠু পরিচয় কিন্তু তেমন সুগোচর নয়। এখন, পরিবেশের দায়িত্ব রক্ষা বলতে কথাটা কতদূর যায়, সেটুকুতে অবহিত হওয়া আবশ্যক। কেন না, দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি যখন ক্ষুদ্রতর ছিল, সেদিন সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বিদ্যা ও জীবন সমন্বয়ী অখণ্ড আদর্শেই প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যাচর্চামূলক ছোটখাট সাপ্তাহিক রচনা পাঠ সভার পাশাপাশি জীবনচর্চামূলক মাসিক শিক্ষার্থী সম্মিলনীর ব্যবস্থাটিও প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠান এখন বড় হয়ে গেছে; কেবল বয়সে বা সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী সমাজই নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশটিও বদলেছে এবং বেড়েওছে। সুতরাং এখনকার আয়োজনও সবদিকে এর অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ছোটোই কি আর বড়োই কি, স্থানীয় লোকসমাজ সমগ্রভাবে সমতালে মূলতঃ এইরূপ সর্বাঙ্গীন চর্চার অনুকূল ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত হয়ে না চললে, কোনো দিকটাই সুপরিণত হয়ে উঠবার নয়; তাতে দু-একদিকের কাজ চলাটাও ক্রমে অচল হয়ে আসে; বিশেষ করে এ কথাটা ক'জনে সেখানে ভাবছেন, তাও আজ প্রতিষ্ঠানের হালচালে স্পষ্ট বোঝবার উপায় নেই।

পাঠ্যনির্বাচন, প্রতিদিনের পড়াশুনা, সাময়িক পরীক্ষা, পাশ-ফেল,—এ সবের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন সেখানে "বিদ্যা-সমিতি"। কিন্তু আদর্শে বা উদ্দেশ্যে যা-ই বিজ্ঞাপিত থাকুক, স্বভাবচরিত্র সমন্বিত জীবনযাত্রার দিকটায় কার্যত উদাসীন হ'তে হ'তে আজ এই 'নিখিল জ্ঞানায়তনে'ও শেষে পাশ-ফেল-এর অর্থাৎ ডিগ্রি-কেন্দ্রিক মামুলি লক্ষ্যেতেই এসে ঠেকেছে বিদ্যাচর্চার যা-কিছু উদ্যম। এর প্রতিক্রিয়া সমূলে প্রতিষ্ঠানের আদর্শধ্বংসী। সেই প্রতিক্রিয়াকে রোধ করতে পারে এবং একই কালে বিদ্যাচর্চাকে বোধ, চরিত্র ও ব্যবহারের সঙ্গে সুসংগত ক'রে সর্বাঙ্গীন শিক্ষাকে জীবনে সর্বতোভাবে সার্থক করতে পারে,—'বিদ্যা-সমিতি ও 'শিক্ষাসেবী সংঘ'-এর সহযোগমূলক যুক্ত-ব্যবস্থাই তার একমাত্র উপায়। এই জন্যই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই দুটি-সংস্থারই সমমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তাই যদি হয়, 'শিক্ষাসেবী সংঘে'র-ও কাজ হবে তখন, 'বিদ্যাসমিতি' কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর মতো প্রতিষ্ঠানের সকলের আচারানুষ্ঠানের রীতি-নীতিক্রম নির্ণয় করা এবং প্রতি মাসে বড়োদের নিকট থেকে সংগৃহীত প্রত্যেকটি পরিবার ও ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীদের দিনচর্যা-লিপি,—অর্থাৎ বিদ্যাবিবরণী-রূপ প্রগ্রেস রিপোর্ট-এর মতো চার্ট একটি পূরণ ক'রে বড়রা যা দেবেন সেগুলি (ক্রমে সম্ভবমতো বড়দের নিজেদের চার্টও) পরীক্ষা করা। সে সঙ্গে কর্তৃপক্ষেরও রীতি হবে,—'বিদ্যাসমিতি' পরিচালিত বিদ্যাপরীক্ষার নম্বরের সহিত সমান গুরুত্ব দিয়ে 'শিক্ষাসেবী সংঘ'—পরিচালিত এই দিনচর্যালিপি পরীক্ষার নম্বর মিলিয়ে দু'দিকের যাচাই-করা ফলের উপর নিম্ন থেকে সর্বোচ্চ মানের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরই শেষ পাশ-ফেল নিরূপণ করা।

মনে রাখা দরকার, শিক্ষা জিনিষটি যেমন একটি সাধনা, তেমনি শিক্ষা একটি বিজ্ঞানও। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবে এ বিষয়টির অনুধাবন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। নম্বর-দেওয়ার বৈজ্ঞানিক রেকর্ডের ভিত্তিতে বিদ্যার দিকটা যদি চলতে পারে, তবে সেখানে ঐ পদ্ধতিক্রমেই আচার-ব্যবহারের অঙ্গ-অর্ধাংশও

সমান ভাই নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ। অতএব এটা অবাস্তব কিছু নয়। পরন্তু এরূপ দিনচর্যার চার্ট-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলেই আশা করা চলে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা এর পর থেকে 'জ্ঞানায়তনে' এসে আর কিছু না হোক, অন্তত বিদ্যার মতোই পাশের নম্বরের অনিবার্যতার দায়ে পড়ে হলেও, মনন এবং আচার-ব্যবহার সমৃদ্ধ চরিত্রবানকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়রূপে জানাবে এবং শুরু থেকে শেষাবধি, বিদ্যায় ও জীবনযাত্রায় দুদিক দিয়েই সমভাবে উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত থেকে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে চলবে। তখন সেই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা যেমন তাদের বিদ্যার উন্নতিলাভের সহায়ক হবে, তেমনি সুনিয়মিত সেই পরিবেশে সংযত ও নিবিষ্ট-চিত্তের বিদ্যানিষ্ঠাও জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তুলবে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আজ-কাল যেমনই দেশে দারিদ্র্য বাড়ছে, জীবনে মানুষ ছন্নছাড়া হচ্ছে, তারই পাশে তেমনিতর স্কুল কলেজের এলাকায় বাড়ি ঘর, আসবাবপত্র, বই খাতা, সংগ্রাম, পরীক্ষা, ও প্রাইভেট মাষ্টারী কত না বহিরঙ্গীয় দিকে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাকেন্দ্রিক বিষয়গুলির বাহুল্য দেখা দিয়েছে এবং তা বেড়েছে ব্যয়বহুল ছন্দছাড়া রূপে; সবই ভালো, এবং অনেক কিছুরই প্রয়োজন না আছে এমনও নয়, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিদ্যার মান, এবং তৎসঙ্গে অনুরাগ এবং নিষ্ঠা যে সেই পরিমাণেই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এইটিই ভাববার বিষয়! একে তো জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে এসব বহিরঙ্গীয় আড়ম্বরের সংগতি থাকার প্রশ্ন একটা আছে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার কথাও মনে রাখতে হয়। সময় বুঝে কাজের বহর বাড়ানো কমানোর কথাটাও হঠাৎ অবান্তর নয়—তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। ছাত্রছাত্রীদের মন আজ এমনিতেই বাইরের বহু বিষয়ের আকর্ষণে বহুদিকে বিক্ষিপ্ত; বিষয় ও ব্যবস্থা প্রাচুর্যের প্রভাবে পড়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রেও মনের নিবিড়তা ও একাগ্রতা তাদের বাড়ছে না কমছে, সেটাও দেখবার বিষয়। এক কথায় বিদ্যায় মন বসছে না, এইটেই দাঁড়াচ্ছে সমস্যা। ব্যক্তি আছে, বিষয় আছে, ব্যবস্থারও কার্পণ্য দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অভাব দেখা যাচ্ছে একটি জিনিসের; সেটি হচ্ছে সাধনার বিষয়ে মন বসানোর উপায়—এক কথায় আছে সবই,—নাই শুধু সব দিকে সামঞ্জস্য রাখা নিয়মিত মনোযোগ ও যত্ন।

মনোযোগ ও যত্ন দ্বারা বহির্বিষয়কে অন্তরে আয়ত্ত করা যায়। বিষয়ে সহজ অনুরাগ ও অধিকার স্বভাবতঃ যাঁরা জন্ম থেকেই পেয়ে থাকেন তাঁদের কথা আলাদা। যাঁরা তা থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত, তাঁদের জন্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য হলেও, কৃত্রিম উপায়ের পথ একটি থাকে—সেই পথই হচ্ছে শিক্ষা বা মনোযোগ ও যত্নের পথ। বিদ্যার ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই যত্ন ও মনোযোগের প্রত্যাশা আমরা করি, কিন্তু প্রক্রিয়ার দিকে কিছুই বিশেষ করি না, উপদেশ দিয়েই খালাস,—তাদের উপরই আর-সবটা ছেড়ে দিই। অথচ দেখা যায়, স্বভাবে যাদের সে-জিনিস নেই, সমাজে তাদের সংখ্যাই বেশি। এবং শিক্ষারও প্রয়োজন হয় মেধাবীদের চেয়ে এই সাধারণদের জন্যই বেশি মাত্রায়। এই সহজ সংস্কারবর্জিতদের মন বিদ্যায় সংযুক্ত করাতে হলে, শুধু বিদ্যার দিকে পড়াশুনার বিশেষ একটি ক্ষেত্রেই নয়, উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে এমন কি খেতে-শুতে—সব দিক দিয়েই সর্ববিষয়ে তাদের সর্বসময়ে মনোযোগ ও যত্নের অভ্যাসে অভ্যস্ত করানো দরকার। কেন না,—বিশিষ্ট শিক্ষাচার্য বলছেন,—"যার নাম শেখা, তারই নাম শিক্ষা। ইহাও জানি, অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ পুনঃপুনঃ করিয়া কর্ম শিখি। মানুষের এই যে শক্তি দ্বারা কর্ম অভ্যাস হইয়া যায়, দেহের বৃত্তিবিশেষে পরিণত হয়, যে কর্ম ইচ্ছাপূর্বক যত্নপূর্বক করিতে করিতে অনিচ্ছাকৃত ও অযত্নকৃত হইয়া পড়ে, সে শক্তি হেতু মানুষ পশুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। (যোগেশ বিদ্যানিধি, শিক্ষাপ্রকল্প, পৃঃ ২০)

প্রাত্যহিক অভ্যাসের দ্বারা মন স্বভাবতই নিষ্ঠাবান না হ'লে সেই বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা বিদ্যাসাধনাও চিরদিনই এমনি ব্যাহত হবে, তাতে আশ্চর্য নেই। এইজন্যই কেবল বিদ্যায় উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রেও, বিদ্যার্থী ও তার পরিবেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা আবশ্যিক রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, বিদ্যাকে যাঁরা জীবনের লক্ষ্য না করে লক্ষ্যলাভের একটি উপায়-স্বরূপ মাত্র দেখে থাকেন, সেই জীবনধর্মীদের অখণ্ড-দৃষ্টিতে জীবনযাত্রার সংগতি শিক্ষাটাই, নিছক পুঁথিগত বিশেষ শ্রেণীর বিদ্যার চেয়ে, মহত্তর মনে হবে। তাঁদের কাছে দিনের প্রতিটি চলাফেরাই হবে বিশেষভাবে মূল্যবান। সুতরাং তাঁরা স্বভাবতই 'বিশেষ-বিদ্যা'র চেয়ে সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রাকেই 'একমাত্র-বিদ্যা'রূপে সাধনা করবেন, যার মধ্যে বিশেষ-বিশেষ বিদ্যাও এক একটি বিশেষ স্থান পাবার কথা। তাঁদেরই অভিমত এই যে, "বিদ্যার জাহাজ, ও জ্ঞানের ভাণ্ডার হওয়া অপেক্ষা সুচরিত্র-অভ্যাস লক্ষ গুণে শ্রেয়ঃ। সদাচার ও সদ্ব্যবহার যাবতীয় ধর্মের মূল।"—(যোগেশ বিদ্যানিধিঃ শিক্ষাপ্রকল্প পৃঃ ৭।)

দেখা যাচ্ছে, বিশেষ-বিদ্যা বা সর্বাঙ্গীন-জীবন যে—লক্ষ্য হয়েই যিনি দেখুন না কেন, শিক্ষায়তনে জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে বিদ্যার ব্যবস্থা সংগতিপূর্ণ হওয়া চাই,—একথা স্বতঃসিদ্ধ।

এখন কথা হচ্ছে চরিত্র বা জীবনযাত্রার এই দরকারী ব্যবস্থাটি সমাজে চালু করবার ভার গ্রহণ করবেন কে, এবং কি-ভাবেই বা তিনি চালু করবেন। একের নয়, এক্ষেত্রেই প্রয়োজন আজ,—সকলের। প্রতিষ্ঠানের কোনো-বিশেষ এক-শ্রেণীর কর্মীও নন, পরিবেশের সর্বাঙ্গীন বিশুদ্ধিতার জন্য শিক্ষকশ্রেণী ছাড়াও, নানাক্ষেত্রের নানাশ্রেণীর কর্মি-সমাবেশে গঠিত সর্বাঙ্গীন-সমাজের পরিচালনায় চলবে প্রতিষ্ঠানের এই সর্বাঙ্গীন জীবন। নানাদিক থেকে নানা অভিজ্ঞতার সাহায্য দিয়ে নানাজনে ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক-কর্মী-সম্বলিত এই গোষ্ঠীজীবনটিকে রচিত, নিয়ন্ত্রিত ও সেবাসমৃদ্ধ ক'রে বিচিত্র ঐশ্বর্যে দশ দিকে প্রসারিত ক'রে তুলবেন। তাহলেই দেখা যাচ্ছে 'জ্ঞানায়তনে'র বিশেষ ক্ষেত্রেও আসে এই বিশেষ কাজে 'শিক্ষাসেবী-সংঘে'রই দায়িত্বের কথা। এবং সেই দায়িত্বের মূল্যবিচারে স্বতই পরিস্ফুট হয় প্রতিষ্ঠানের 'ব্যবস্থাপক-সমিতি'তে 'শিক্ষাসেবী সংঘে'রও প্রতিনিধি থাকার গুরুত্ব। কিন্তু এই আবশ্যিক গুরুবিষয়েই দেখা যায় 'জ্ঞানায়তনে'র গঠনতন্ত্রে অস্বীকৃতির ফাঁক পড়ে আছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, স্বীকৃতি আছে প্রতিনিধিসভা এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে বাইরের লোকের, এবং পরিবেশ-পরিত্যাগী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর আর ডিগ্রিধারী বর্তমান শিক্ষকশ্রেণীরও। এই গঠনতন্ত্রই সাক্ষ্য দিচ্ছে কোন্ বিশেষ-বিশেষ কোঠার এসে ঠেকেছে এখানে মানুষের মূল্য। চাকুরিসূত্রে ক্লাসের

প্রত্যক্ষ-সংস্রব-ছাড়া হয়েও বহু মানুষ আছেন পরিবেশের মধ্যে,—প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয় নানা কাজে। জীবনযাত্রা প্রণালীর মূল্য আজ শিক্ষায় যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই স্বীকৃত হত, তবে ভালমন্দ-প্রভাব সাধারণের দিক থেকেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর প'ড়ে থাকে ব'লে, শিক্ষক ব্যতিরিক্ত সাধারণ কর্মী ও অভিভাবকদেরও অবধি প্রতিনিধিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠানের সকল সংস্থায় স্বীকৃত হত। তাঁরাও তাতে স্বগৃহ ও স্বসমাজে থাকার কর্তব্যের মতোই প্রতিষ্ঠানে বাস করার ও কাজ করার সমশ্রেণীর দায়িত্ব উপলব্ধি করবার তাগিদ ভিতর থেকে পেতেন এবং উপযুক্ত হয়ে চলবার কিছু-কিছু চেষ্টাও হয়তো আপনা থেকেই তাঁরা করতেন। সেই ব্যবস্থা না থাকাতে, এক-পাখাওয়ালা পাখির মতো বিদ্যা এখানে জীবন-নিরপেক্ষ হয়ে, উড়তে গিয়ে ধূলোয় গড়িয়ে এগোবার উপক্রম করছে। অথচ, ইতিহাসের নজির ঘাঁটলে দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানেই একদিন প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে সাধারণ-কর্মীদেরও পক্ষে প্রতিনিধিত্বের সেই সুযোগ ব্যবস্থিত ছিল; 'শিক্ষক-সভা' বলতে শিক্ষক ও সাধারণ সকলেরই সম অধিকারের একটি ঢালাও-ক্ষেত্র বোঝাত। কর্মীমাত্রেই তখন ছিলেন 'শিক্ষক'-নামাঙ্কিত। এতদূর ছিল এখানকার স্বীকৃতির পরিধি। এখন মহোচ্চ-ডিগ্রিধারী হলেও চাকুরীতে ছাপমারা 'শিক্ষক' না হলে 'বিদ্যাসমিতি'তে প্রবেশাধিকার পাবার উপায় নেই। সাধারণ কর্মীর স্বীকৃতি তো কোন্ দূরের কথা। ঠিক এই অবস্থায় একটা কথা ভেবে দেখবার আছে যে, গোড়া থেকে বিদ্যার সঙ্গে জীবনযাত্রার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে, কার্যত শুধু বিদ্যার একটা দিক মাত্র সরকারী স্বীকৃতিতে ব্যবস্থিত রেখে জীবনযাত্রার অন্য দিকটাকে বেসরকারী ভাবে এমনি শিথিলতার পথে গড়াতে দিলে সেটাতে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতারই পরিচয় বাড়ানো হয় কি না। বলা বাহুল্য, বিদ্যানিরপেক্ষ জীবনযাত্রার কথা এ-আলোচনার উদ্দেশ্য নয় মোটেই। তবে আশু-আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, জীবনযাত্রামানের দায়িত্ব এড়ানোর ফল এখনই অবিদ্যারূপ ধ'রে এসে বিদ্যার ঘাড়ে চাপছে,—এইজন্য এদিক দিয়ে প্রস্তুত হওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাত্রেরই অবিলম্বে প্রয়োজন, আর সেই প্রয়োজনেই, শুধু শিক্ষক আর ছাত্রসম্প্রদায় নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজের সাধারণের সক্রিয় যোগ অবশ্যম্ভাবী। তাঁদের সকলেরই মধ্য থেকে পরিচালক-সমিতিতে সদস্য গ্রহণ ক'রে, বোধে ও ব্যবহারে বিদ্যা ও জীবনের সংগতির ব্যবস্থা করা শ্রেয়ঃ।

এই বিচারে দেখতে গেলে, স্বতঃই প্রতিভাত হবে যে, আজ কোনো মতে খুঁড়িয়ে চলতে থাকলেও সমগ্র 'জ্ঞানায়তন'-প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম কল্যাণ ও গৌরবের বিষয় হচ্ছে একান্তের অবহেলিত 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'ই। কেন না, প্রতিষ্ঠানকে আপনার নীড় ব'লে সকলেই যাতে অনুভব করেন ও পরস্পর সেই অভিন্নসত্তায় আবদ্ধ থেকে এর জন্য কাজ করতে প্রত্যেকে আনন্দ পান, প্রত্যক্ষ সেই সংঘজীবনটির বিকাশের ক্ষেত্র হচ্ছে এই 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'। উচ্চতম থেকে নিম্নতম,—সকল কর্মীই এখানে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনমত-প্রকাশের সমান অধিকারী—এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বদিকের গত-আগত-ও খুঁটিনাটি সর্ববিষয়েই তাঁদের সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পারার কথা কর্মীদের মতো অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজের স্থায়ী-বাসিন্দাদের পর্যন্ত এই 'সংঘে'র অন্তর্বর্তী ক'রে গ্রহণ করলে ভালো হয়। প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে এঁদের সকলকে পারিবারিক সভ্যের অংশ নিতে বলতে হলে মতামত প্রকাশের এই সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র একটা-কোথাও তাঁদের জন্য কিছু থাকাই চাই। এইটিই হচ্ছে 'শিক্ষাসেবী সংঘে'র মুখ্য সার্থকতা। সে সঙ্গেই থাকা চাই হৃদ্যতা-বৃদ্ধির জন্য সামাজিকতা-প্রসারের আয়োজন। উৎসবানুষ্ঠান খেলাধূলা, ভ্রমণ, বনভোজন, বক্তৃতা, পাঠসভা, অভিনয়, জলসা সুখে দুঃখে পারস্পারিক সহায়তা ও সেবাশুশ্রূষা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যৌথ মেলামেশা ও চিন্তাধারা বিনিময়ের সাহায্যে এই সামাজিকতার প্রসার হতে পারে। কিন্তু নিত্যকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয় চার্ট-পরীক্ষার প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই তখন দেখা যাবে 'স্বীকৃতি'র কার্যকরী আসল দায়িত্বের ঝামেলা রয়েছে কোন্‌খানে। এই কাজটির স্বীকৃতি পেলে পাড়ায় পাড়ায় ও ছাত্রাবাস সমূহে আঞ্চলিক কর্মিগণ 'শিক্ষাসেবী সংঘে'র পক্ষ থেকে নিজ নিজ অঞ্চলে শাখা স্থাপন ক'রে চার্ট পরীক্ষার কাজ চালাবেন। শুধু পরিবার বা ছাত্রাবাস থেকে সোজাসুজি ঘর পূরণ ক'রে চার্ট পাঠিয়ে দিলেই চলবে না, অভিভাবকদের দেওয়া সেই নম্বর আঞ্চলিক শাখার সভ্যদের দ্বারাও পরীক্ষিত হওয়া চাই, তারপরে তা আসবে 'সংঘে'র কেন্দ্রীয়-সমীক্ষাগারে; সেখান থেকে অনুমোদিত হ'য়ে যাবে তা দপ্তরাধ্যক্ষের অফিসে। সেখানেই বিদ্যার নম্বরের সহিত যাচাই হবে সে-নম্বরের পারস্পরিক প্রভাব ও উপযোগিতা। কে কি ভাবে চলে-ফিরে, শুধু ঘরোয়া ব্যক্তিগত দিক থেকে নয়, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানবাসীর সামাজিক বিচার থেকে অভিমত এ ভাবে চোলাই হয়ে এলে তার মূল্য হবে। সে অনুযায়ী সকলের জীবনযাত্রা এবং বিদ্যাসাধনায় একই সঙ্গে এর দ্বারা পরিশুদ্ধ ও উন্নত হতে পারবে, তাতে সন্দেহ নাই। এই সূত্রে বাড়ির অভিভাবক এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকদের কাজের পরিচয় পরস্পর অজানা থাকবে না। ভাল কাজ মন্দ কাজ,—সকলেরই সব-কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা পাবে। কোন পক্ষই কোনো পক্ষের উপর অযথা দোষ চাপিয়ে রেহাই পাবেন না। সাধারণ ত্রুটি-অভাব-অভিযোগাদি সমবেত সকলের উদ্ভাবিত সুচিন্তিত উপায়ে ও সহযোগী ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে নিশ্চয়ই নিরাকৃত হবে।

২

শিক্ষাসেবীসংঘ

সাধারণ সমস্যার শিক্ষাসেবী-সংঘ আলোচনার ক্ষেত্র বিশেষ একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠানের কাল্পনিক উদাহরণের অবতারণা করার সার্থকতা এই যে মূল সমস্যাটির গুরুত্ব সাধারণের কাছে এতে সুগম হবে। জীবনযাত্রার দায়িত্ব-নিরপেক্ষ বিদ্যাচর্চার রেওয়াজই আজ ঘরে-বাইরে পুরাদমে চলছে; তেমনি, আর সকল স্থলে দুর্গতিও যা ঘটছে তার তো কথাই নেই, কিন্তু যেখানে আটঘাট-বাঁধা হয়ে হাতের মুঠোয় রয়েছে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী-অধ্যাপক-কর্মী ইত্যাদির সমগ্র দিনযাত্রার হাল, চোখের উপরে চলছে সকলের চলাফেরা সেখানেও চোখ ফেরালে মিলবে আজ একই ধারায় অনুবর্তন ইতিহাস। সুতরাং সকলে বুঝতে পারেন সমস্যাটা কত

শক্ত, সংক্রামক এবং গভীর ভাবে ব্যাপক, আর সেইজন্যই সমাজের সকলে মিলে কত শীঘ্র তার সমাধান চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

সমস্যা সমাধানের জন্য যে উপায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটি কেবল চিরাচরিত মতে ছাত্র ও শিক্ষককেন্দ্রিক নয়, তাঁরা তো আছেনই, তৎসহ অভিভাবক এবং কর্মীদেরও এতে ডাক পড়েছে—এক কথায় প্রস্তাবটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সহযোগযুক্ত সাধারণ পরিবেশ-কেন্দ্রিক। যৌথ চেষ্টায় অঞ্চলে অঞ্চলে সর্বাঙ্গীন-শিক্ষানুকূল সামাজিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ হল তার সার কথা। একদিকে এজন্য চাই সমাজ-সংস্থারূপ একটি সুগঠিত সাধারণ জনমণ্ডলী, জ্ঞানায়তনের সীমাবদ্ধ আবাসিক ক্ষেত্রে যাকে বলা হয়েছে 'শিক্ষাসেবী-সংঘ' অন্যদিকে চাই তারই সামাজিক কৃত্য—ঘরে ঘরে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা বা দিনচর্যার সংগঠন ও তদনুযায়ী চার্ট সংগ্রহ ও তা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

শুধু শিক্ষকদের উপর শিক্ষার ভার সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার মধ্যে আসলে দায়িত্ব এড়ানোর ভাব কতটা থাকে, তাও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। বর্তমান সামাজিক বিপর্যস্ত অবস্থায় সবদিকেই সকলে বানচাল। বস্তুত, শিক্ষকমণ্ডলীও সামাজিক লোকবিশেষ; জীবিকা এবং জীবনের নানা দায়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত অনেকেই তাঁরা শিক্ষাকেই একমাত্র জীবন সাধনার বিষয় করে নিতে পারছেন না, নিলেও অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছেন না। জীবনসংগ্রামে যুঝে যুঝে আপনার ব্যক্তি ও পরিবারগত সীমাবদ্ধ সত্তাকে বজায় রাখবার বা বাড়াবার জন্য সমাজের আর দশজনের মতোই তাঁদেরও থাকতে হয় ব্যস্ত। সমাজের কাজে আসা নেহাৎ যেটুকু না হলে নয়, অনেকেই আগে তাঁরা কর্তব্যহিসাবে ক্লাসের রুটিন মাফিক সেইটুকুতেই দৃষ্টি রাখেন নিবদ্ধ; শিক্ষকতা এতে জাতীয় সাধনার মর্যাদা হারিয়ে ব্যবসার ছাপ নিতে চলেছে—এটা আদর্শ বা কাম্য না হতে পারে, কিন্তু বাদানুবাদের পারে এটাই আজকের বাস্তব অবস্থা। জাতির দ্বিতীয় জন্মদাতা এই শিক্ষকসমাজের মর্যাদা ও সর্বাঙ্গীন ভরণপোষণের যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন থেকে সমাজ যখন হাত গুটিয়ে নিয়েছে, তখন শিক্ষকরাও দেখা যায় নিজেদের সাংসারিক সর্বাঙ্গীন দায় নির্বাহ করতে নিজেরাই অল্পবিস্তর উদ্যোগী হয়ে চলেছেন। এর পরিণতিতেই তাঁরাও এরূপ বৈষয়িক হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, চাকুরির হিড়িকেও এপথে বেনোজলের মতো ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়েছেন অনেক লোক,—শিক্ষার আদর্শ বা সাধনায় যাঁরা স্বভাবতই উদাসীন। তাই ব্যাপারটা এখন পক্ষাপক্ষে দোষারোপের ব্যাপার নয়; সময়ের ফের বলেই বাস্তবকে গ্রহণ করা ভালো। এর মধ্যে কাজের কথাটা হচ্ছে এই যে,—শিক্ষক-সমাজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিজের দায়েই এ অবস্থায় ব্যবস্থাভার নিতে হবে এখন অভিভাবক-মাত্রকেই; এবং পারিপার্শ্বিক সমাজকেও সমষ্টিগত-ভাবে এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় কল্যাণার্থে জাতির ভাবী বুনিয়াদ মজবুত করবার জন্য। শিক্ষার ইমারতকে সর্বাঙ্গেই উন্নতিকর কার্যধারায় সমুন্নত রাখতে দশে মিলে দেখে শুনে যথোচিত সাহায্য দান করা চাই;—'ভূদান'-'জীবনদানে'র চেয়ে এ দান আরো সামগ্রিক, মৌলিক ও জরুরি। কারণ, এ মাটির জমি নয়, এ যে 'মানব জমিন'। এই দানেরই প্রয়াস কার্যকরী রূপ নেবে,—কি আবাসিকে আর কি-বা শহরে-মফঃস্বলে, সর্বত্রই আঞ্চলিক পাড়ায়-পাড়ায় সংগঠিত 'শিক্ষাসেবী-সংঘ' ও তার পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে দিন-চর্যার চার্ট-পরীক্ষার কাজে। নিজ-নিজ পাড়ার দায়িত্বশীল ছেলেমেয়ে, অভিভাবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমবায়ে যদি পাড়ার সকলের দিনচর্যার দায়িত্বপালনের কাজটি সত্যই দৃঢ়নিষ্ঠায় সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয় তবে দেশের ভাবী নাগরিক ছেলেমেয়েদের এরূপ 'বয়ে যাওয়া'র দিন যে ফিরে যাবে, এ কথা নেহাৎ আকাশ-কুসুমের পোষকতা নয়, কেন না, জাতীয় আন্দোলনের প্রারম্ভ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের ও গান্ধীজির সংগঠনী প্রেরণার যুগেও এই ধরণের অনুকূল নজির পাড়াগাঁয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল-অবধি কিছু-কিছু পরিদৃশ্যমান হয়েছিল। তেমনি হবার আবহাওয়া সৃষ্টি করা চাই আগে। পঞ্চ বা ষষ্ঠ—কোনো 'বার্ষিকী পরিকল্পনা'র ছাপের অপেক্ষায়ই এ কাজ প'ড়ে থাকবার নয়।

পাশকরা পেশাদারী শিক্ষকেরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন ক্লাশ নিয়ে;—পাশ-অপাশ সবারই আপোষে কাজ করার নূতন স্থান হবে এই প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'। শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষার সঙ্গে যাঁরাই সংশ্লিষ্ট থাকবেন, তাঁরাই শিক্ষাসেবী নামের অধিকারী; আর ঠিক মতো তাঁরা তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড়দের সমাজেরও আবহাওয়া ফিরে গেছে; ঘরের থেকে, পাড়ার থেকেই পূর্বোক্ত সংগঠক কর্মীদের উদ্যোগে নূতন ধরণের আনন্দময় এক সুনির্মল শিক্ষাজীবন গড়ে উঠেছে—স্কুল-কলেজ আশ্রম য়ুনিভার্সিটি ইত্যাদি বনেদী বা সরকারী শিক্ষালয়গুলি তখন কেবল সাহিত্য-বিজ্ঞানীদের টেকনিক্যাল এডুকেশনের স্থান নিয়েছে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষ ফরমূলা বা 'সূত্রে'র এবং 'আঙ্গিকে'র (কৌশলের) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানটুকু বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে বুঝে নেবার স্থান বিশেষ হাওয়াতেই তাদের সীমাবদ্ধ মূল্য দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা চলছে স্কুল-কলেজের বাইরেই। অগোচরে সেখানেই গড়ে উঠেছে ঘরে ঘরে যে নূতনতম এক বিশ্ববিদ্যালয়, তার নাম গৃহভারতী। আর বলতে গেলে এই 'গৃহভারতী'র আচার্য, উপাচার্য হবেন অন্য কেউ নন,—অভিভাবক পিতামাতা; এমন কি, নিরক্ষর মায়েরাই কার্যতঃ নেবেন ভার মানুষ-গড়ার; সে কাজে আপরিক বিদ্যা তত নয়, যত বেশি আবশ্যক হবে দায়িত্ববোধ ও দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠা। যেমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন মহীয়সী মহিলা বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই আরো মনে হয় কবির কথা কত সত্য—"না জাগিলে আজ ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না।" রাষ্ট্রীয় জাগরণের এক পালা চুকিয়েছি, কিন্তু মানুষের বুনিয়াদী পালার আসর তেমন জমছে কৈ? তন্দ্রাঘোরে দাপাদাপি করি, জাগরণ নয়, অনেকটা এর ঘুমের ব্যারামেরই নানা প্রতিক্রিয়া মাত্র। ঘরে ঘরে মায়েদের কাছ থেকে মানুষ যখন দৈহিক জীবনের অন্নের সঙ্গে মানসিক জীবনের অন্নস্বরূপ সর্ববিষয়ে যত্ন ও মনোযোগের সুসংগত অভ্যাসে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বাস্থ্যে ও মনুষ্যত্বে সুপ্রতিষ্ঠ হবে সকল মানুষ। এজন্য পিতামাতা বিশেষ করে মায়েদেরই বেশি উদ্‌যোগী করে তোলা চাই।

এমনিতেও দেখা যায়, দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৫।৭ ঘণ্টার মেয়াদ হচ্ছে স্কুল-কলেজে, বাকি ১৭।১৮ ঘণ্টার বড় পর্বটাই ছেলে

মেয়েদের কাটছে ঘরে বা বাইরে-বাইরেই। সুতরাং সেখানকার পরিবেশ ও শিক্ষার সম্ভাবনা কিছুমাত্র উপেক্ষণীয় হতে পারে না। এতদিন ঘরে বাইরের সেই মহৎ সম্ভাবনা শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত উপেক্ষা পেয়ে এসেছে বলেই ছাত্রছাত্রী তথা সমাজেরও পক্ষে এই দুর্গতিভোগ অনিবার্য হয়ে এসেছে। প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী সংঘে' সম্মিলিত হয়ে সাধারণ সকলে দেশকে এই দুর্গতি থেকে শুধু বিপদমুক্ত করতে পারেন তাই নয়, তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান এক গৌরবময় ভূমিকা নিয়ে জাতিগঠনে নিজেদেরও নূতন মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই আত্মশক্তির উন্নত চেতনা ও অভিজ্ঞতাই হবে প্রতিষ্ঠান বা সমগ্র সমাজের প্রকৃত প্রাণশক্তি। আজ সেই শক্তির উদ্বোধনই দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনের পরিবেশে একান্ত কামনার বিষয়।

কিন্তু এ-ও জানা কথা, কামনা হলেই হয় না, কাজে লাগবার উপযোগিতা দেশ-কাল-পাত্রানুসারে সে কামনা নিজের মধ্যে বহন করে কি না সেটাই আসল কথা। কোনো দিক দিয়ে অনুপযোগী হলে কামনায় কান দেবার লোক মিলবে না, যদি বা তা মিলে, সে অনুসারে কাজ করবার লোক মিলবে ক'জনা, তা বলা কঠিন। এজন্যই বলে বলে অনেকের অনেক কামনাই উবে যায়, কিন্তু লোকসাধারণকেই তার জন্য দায়ী করা সব সময় ঠিক হয় না। তবে দেখা যায়, সকলেই যে প্রথমে একযোগে সব কাজে যত্নশীল হয়, তাও নয়; অনেক ক্ষেত্রে নূতন কিছু প্রবর্তনায় সমাজের ক্ষুদ্র একদলই অগ্রণী হয়ে ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের দায় ঘাড় পেতে নেন এবং সেই করেই কাজের পত্তন করেন। জেল, ফাঁসি, কবর চাপায় তাঁরা তলিয়ে গেলেও তাঁদের মৌলিক ধারাটি তল পড়ে না। ক্রমে সেই মণ্ডলীই এক এক স্তরে আত্মপ্রসারের দ্বারা স্বাঙ্গীকৃত করেন বৃহৎ সমাজকে। দেশে এই অগ্রণীদের জাত আজ নেই এমন হতে পারে না,—আছে তাঁরা,—নানা কারণে আছেন সুপ্ত হয়ে; স্বাধীনতার প্রথম ধাপ জয় করে দিয়ে তাঁদেরই পূর্ব-একধারা জাতিকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন মহত্তর সম্ভাবনাময় উত্তুঙ্গ পথে। অতঃপর যথাযোগ্য ভাবে প্রমাণ দিয়ে দিয়ে ধাপে ধাপে সে-পথ অতিক্রম করে মানবমহিমার মিলন-মন্দিরে আমাদের যথাস্থানে পৌঁছতে হবে। এই সংগঠন ও উত্তরণের কাজে প্রধানত সুপ্ত সেই দায়িত্ববোধী অগ্রণীদের ভরসাতেই দেশব্যাপী চার্ট-পরীক্ষক 'শিক্ষাসেবী সংঘ' প্রসারের এই আন্তরিক কামনাটির বহিঃপ্রকাশ।

আর এক ক্ষেত্রেও কিছু কাজের প্রত্যাশা থাকে,—সেটি সরকারী দপ্তর। সেখান থেকে অনেক কিছু পরিকল্পনাই আজ চালু হচ্ছে। অঞ্চলে অঞ্চলে এই প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী সংঘ' বিস্তারের সার্থকতা তাঁদের বিচারের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারলে তাঁরাও এই প্রচেষ্টায়, শুধু প্রোৎসাহ নয়, একে যথোচিত প্রগতি দান করতে পারেন। তবে কিনা, সাধারণ হোক, ছাত্রসমাজ হোক, আর শিক্ষক কিম্বা সরকারী মহল যেদিকেরই লক্ষ্য-মূল খুঁজে দেখা যাক,—দেখা যাবে সকলেরই নিগূঢ় ঝোঁক আজ—টাকার উপর। টাকা চাই, আর তারই জন্য চাই ডিগ্রি এবং চাকরি;—এই হচ্ছে শিক্ষার মোদ্দা কথা। এ লক্ষ্য ভোলাতে পারে এমন পরিবর্ত এখন আর-কিছুই নেই ধারে-কাছে। ডিগ্রির জন্যই যেটুকু বিদ্যার দায়। সেই দায়-সারা কাজে শেষাবধি, চুরিচামারি, ঘুষ, জালিয়াতি, মারপিট, রাহাজানি, খুনখারাবি যে-উপায়েই হোক, পড়াশুনার পরিবর্ত-হিসাবে স্বাগত করা হচ্ছে সকল পথকেই। আবার এর পাল্টায় শুনা যাচ্ছে, কোন্ প্রদেশে নাকি ঃপ্রতি আইন হচ্ছে,—ছাত্র ফেল করলে সরকারকে জরিমানা গুণে দিতে হবে মাষ্টারদের পকেট থেকে। কিন্তু সমাধানটা কি এতই সহজ? 'ফেল-করা'দের নিয়ে ঝামেলা আছে; ভাববার কথা এই যে, 'পাশ-করা'রাই কি নির্ভরযোগ্য? যে-যোগ্যতার মান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ ক'রে বেরুবেন এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই যোগ্যতার বলে এঁরা রাজ্য পরিচালনার যে-সব পদ অধিকার করবেন তার ফলে দুদিন বাদে এঁদের হাতে প'ড়ে গোটা রাজ্যের দশাটা হবে কী? তখন যে জরিমানার উল্টো ফেরে পড়বেন সরকার নিজেই। তবিল থেকে ক্ষতির খেসারত গুণতে হবে তাঁদের পদে-পদেই; সে দূরদৃষ্টি সজাগ থাকলে, এভাবে একশ্রেণীর উপরেই শিক্ষার দায়িত্ব আরোপ ক'রে দিয়ে তাঁরা দায় সারতেন না। ছ'-সাত ঘণ্টার জন্য কাছে পেয়ে শিক্ষকরা যতই ভালো পড়ান, আর যতই কড়াকড়ি ক'রে পড়া আদায় করতে লেগে থাকুন, বাড়ির ১৮ ঘণ্টার খবরদারি করা তাঁদের পক্ষে কতদূর সাধ্য, সেটা সহজেই অনুমেয়। সেই ১৮ ঘণ্টারই ফাঁকে দশ দিকের প্রতিক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে উড়োমনের পাকা-দখল কায়েম করে চলেছে,—পড়াশুনা বা কোনো নিষ্ঠাসাধ্য গভীর বিষয়ই কোনোদিন তার কাছে আমল পাবে না। বিষয়ে মন না বসলে কেবল উপদেশের তাগিদেই কাজ হবার নয়, ঘরে-ঘরে সে তো প্রমাণিত হয়েই চলেছে। কেবল অভিভাবক, বা, পাড়াপড়শীর,—বিক্ষিপ্তভাবে কারো কথাতেই কিছু হবার নয়। অথচ ঘরে-ঘরে প্রত্যেকেরই এবং দেশেরও প্রধান সম্বল এই ছাত্র-ছাত্রীদল। তাদের চরিত্র ও বিদ্যার যথোচিত উন্নতি না হলে, সকলেরই পক্ষে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা। এই দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীন মনোযোগ ও যত্ন অভ্যাস-বিধায়ক 'শিক্ষাসেবী-সংঘে'র সারবত্তা যদি কিছুমাত্র বিবেচিত হয়, তবে সকলেরই একযোগে সংঘবদ্ধ হয়ে একাজে লাগতে হবে। কে শুনবে, কে না শুনবে, বলা না গেলেও, এর সারবত্তা বিবেচনার জন্যই সকলের গোচরে প্রস্তাবটি বলে রাখার কাজ সেরে রাখা গেল, এই সার্থকতাটুকুই আপাতত যথালাভ।

ছোটোরা স্বভাবতঃ এমনিতেই চঞ্চল আর বহির্মুখ। তার উপর আজ ঘরে-বাইরে চারিদিকে যে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি, এর আকর্ষণ তাদের উপর দুর্বার; তারা যদি বেসামাল হয়, কাজ যত কঠিনই হোক তাকে সামলাবার দায়িত্ব প্রধানতঃ বড়দের; কারণ, সংসারে তাঁরাই এসেছেন আগে, আর পরিস্থিতির জন্য দায়ীও অনেকটা তাঁরাই। তাঁদের দায়িত্ব ছোটোদের যথোচিত পরিচালনা ও প্রতিপালন দ্বারা সংসারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাওয়া। সত্যই তাঁরা ছোটোদের কতখানি আপনার এবং কতটা তাঁরা দরদী ও দায়িত্বশীল, তারই সত্যতা-প্রমাণের আহ্বান এনেছে এই 'শিক্ষাসেবী-সংঘে'র প্রবর্তনা। এর মধ্যে অভিভাবক, শিক্ষক, পাড়াপ্রতিবেশী ও সরকার—সকলেরই কর্তব্যের দায় আছে, একথা কোনোমতেই ভোলবার বা এড়াবার নয়। ভিতরের চাঞ্চল্য ও বাইরের বিষয়-প্রাচুর্যকে আজ ঠিক মতো ব্যবস্থার কাজে লাগিয়ে ছোটোদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তেমনি বিপুলবিচিত্র ভাবে বিকশিত ক'রে তোলবার দিন আজই; এই আধুনিক-কালের

সুযোগের দিকটাও আমাদের স্বাগত ক'রে নিলে, সবই আবার তেমনি মঙ্গলকর হবে। টাকা পয়সা, জমিজমা, মানসম্মান, মুরুব্বি,—সব কিছুর চেয়ে বড়ো মূলধন হচ্ছে মানুষ। মূলধনকে ঠিক মতো না খাটিয়ে দেউলে-সাজা বুদ্ধিমান বা অধ্যবসায়ীর পরিচয় নয়।

আর, যাদের জন্ত এত কথা, বড়দের ভাবী স্থান অধিকারী আজকের এই ছোটরা যখন একবার ভেবে দেখবেন যে তাঁরা জাতির কতখানি, এবং কী সম্পদের উৎস তাঁরা, আর সেজন্ত কী তাঁদের দায়িত্ব, তখন নিজেদেরই উন্নতির সহায়ক এই 'সংঘে'র সাফল্যের কাজে তাঁদের স্বাগত-সহযোগ ক্রমে অফুরন্ত হয়ে শক্তি জোগাবে। কিন্তু তার আগে বুদ্ধিব্যবস্থা ক'রে কাজের কথাগুলি তাদের শোনানো চাই; বড়দের কাজ হবে ধৈর্য ধ'রে সহ্য ক'রে ছোটদের ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বের সম্বন্ধে ছোটদের সচেতন ও অভ্যস্ত ক'রে তোলা। এ কাজে পরাঙ্মুখ হলে জাতির ক্ষয় অনিবার্য, অগ্রসর হলে জাতীয় উন্নতি অবধার্য।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

তিনটি চিত্রিত পুতুল

উত্তর চিৎপুর রোডের
অন্ধকার কৃষ্ণ পটভূমিতে
কড়া রঙের ছোপ দিয়ে আঁকা
লাল নীল সবুজ শাড়ীপরা
দাঁড়িয়ে আছে তিনটি চিত্রিত পুতুল।
—চমকে উঠল চাবুক-খাওয়া মন।

অনুজ্জ্বল গ্যাসের আলোর থাম ঘেঁসে
ট্রামের তার চলে গেছে টলতে টলতে
দোকান-পশরার বিচিত্র সম্ভারের পাশ দিয়ে।
সেখানে তামাকের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে ফুলুরিভাজার গন্ধ—
বাজনার দোকানের শিরীষের আঠা তৈরীর গন্ধে মিশেছে
ফুলের দোকানের বেল-চাঁপার গন্ধ।
ট্রাম চলেছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঝমর ঝমর শব্দ তুলে,
জলে উঠে সরে যাচ্ছে বেলোয়ারি চুড়ির রঙ-ঝলসানো দোকান—
তারই মধ্যে মধ্যে এক একটা সরু সরু কানা গলি—
অবচেতন মনের কানা ইচ্ছের মতন।
আর সেই অবচেতন মনের অন্ধকারের পাকে জড়ানো গুটিপোকার
প্রজাপতি হওয়ার স্বপ্নের মতন—
সেই গলির অন্ধকারের পটভূমিতে আঁকা হ'য়ে আছে—
লাল-নীল-সবুজ শাড়ী-পরা তিনটি চিত্রিত পুতুল।

তাদের ঠোঁটে রঙ, চোখে কাজল, বেণীতে রঙিন ফুল,
তবু তাদের দৃষ্টিতে দিশাহারা বিহ্বলতা—
তরঙ্গায়িত দেহবল্লরীর অস্থির কম্পন তাদের আঙুলে আঙুলে
—নীরব—নিথর তিনটি চিত্রিত পুতুল।
উত্তর চিৎপুর রোডের এক অন্ধকার গলির ছায়ায়।

যেন অন্ধকারের সমুদ্র ঠেলে সামনে আসতে পারছে না তিনটি রক্তপদ্ম,
তিনটি রক্তিম হৃদয়ের অন্তিম বাসনা হারিয়ে গেছে রাত্রির হতাশায়,
তিনটি জীবনের রঙিন মোমবাতি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে অতলান্ত খাদে,
যেন মেঘনা পদ্মা বুড়ীগঙ্গার তিনটি হারিয়ে যাওয়া ঢেউ
আছড়ে পড়েছে ঐ গলির অন্ধকারের সমুদ্রে।

জানি ঐ অন্ধকার সমুদ্রে জোয়ার এসেছে অনেক বার,
অনেক বৈশালী উজ্জয়িনীর রাজগৃহ বারাণসীর
আম্রপালী শ্যামা সুলসা শালবতী পদ্মাবতীর দল
ভাসিয়ে দিয়েছে সুরভি কামনার মদির মালিকা যৌবনের উদ্দাম স্রোতে,
যাদের চোখে জ্বলত নীলকান্তমণির রক্তিমাভ জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ,
অধরে স্ফুরিত হত পদ্মরাগমণির কঠিন রক্তিমা,
যাদের টঙ্ক-বিচূর্ণিত মনঃশিলার তুলনা রক্তবর্ণ চীনাংশুকের বহ্নিতে
দগ্ধ হয়ে যেত শ্রেষ্ঠিনন্দনের রত্নের ভাণ্ডার।

জানি এই অন্ধকারের জোয়ার হয়তো কোনো দিনই নিঃশেষ হবে না,
ছড়িয়ে যাবে গঙ্গার তীর থেকে মহানগরীর দক্ষিণে পূর্বে উত্তরে
রাজপথের কণ্ঠে-উপকণ্ঠে বিষামৃতের জ্বালা-মধুর যন্ত্রণা ঢেলে দিতে,
—জানি হয়তো ঐ তিনটি চিত্রিত পুতুল চিরদিনই আঁকা থাকবে
নিশীথের কৃষ্ণপটে উত্তর চিৎপুরের অন্ধকার গলিতে—
যেখানকার অন্ধকারের সমুদ্র ঠেলে ঠেলে ডুবে যাবে তিনটি রক্তাক্ত কুসুম,
তিনটি রঙিন মোমবাতির বিমর্ষ আলো গলে গলে নিবে যাবে
অনন্ত জিজ্ঞাসায়
তারপর—আবার দাঁড়াবে আরো তিনটি চিত্রিত পুতুল
যাদের ঠোঁটে রঙ, চোখে কাজল, বেণীতে রঙিন ফুল,
তবু যাদের দৃষ্টিতে দিশাহারা বিহ্বলতা,
আর দেহবল্লরীর কম্পনে কম্পনে মুক্তির পিপাসা।

সাহিত্যে ও শিল্পে চিরন্তনতা

জ্যোতির্ময় রায়

সাহিত্যের মূল্যবিচার সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, না তারমধ্যে একটা সর্বকালীনত্ব আছে, তা নিয়ে অনেক বাস্তববাদীর মনে একটা প্রশ্ন আছে। এতকাল সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং সত্য ও শিব যেহেতু নিত্যবস্তু, কাব্যরসও গণ্য হয়েছে কালমালিন্যের ঊর্দ্ধে। আধুনিক বাস্তববাদীরা ধোঁয়াটে সংজ্ঞায় বিশ্বাসী নয়, তারা বস্তুটাকে লোকোত্তর থেকে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে এনে বাস্তব ব্যাখ্যায় পরিচ্ছন্ন করে দেখতে চান। তাঁরা বলেন সাহিত্য হল সমাজসঞ্জাত বস্তু—সংঘাতের ভেতর দিয়ে সময়ের সঙ্গে সমাজের কাঠামো বিবর্তিত হচ্ছে এবং সেই বিবর্তনই নিয়ন্ত্রিত করছে সমাজ-মানসের সত্য, কল্যাণ এবং রসবোধকে—অর্থাৎ সত্য শিব সুন্দর সময়োচিত। রুচি-কল্যাণ-রীতি নীতি এবং রসবোধই যখন পরিবর্তনশীল তখন একযুগের কাব্য অন্যযুগে 'মমি'এর মতো মৃত জীবনের সাক্ষ্য দেবে মাত্র। অনেকে এমন কথাও বলেন, যে-সাহিত্যের সৃষ্টি আদর্শবাদের আওতায়, যার ভিত পরমমূল্যের আধ্যাত্মিক অবস্থায়—যখন জানা গেল পরম বলে কিছুই নেই, সবই পরিবর্তনশীল, তখন এই নব চেতনার আলোতে অজ্ঞতাপ্রসূত সেই আনন্দলোক অর্থহীন হয়ে যেতে বাধ্য।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য্য সত্য বলেই মনে করি, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার এ-জাতীয় প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যাঁরা জীবন-দর্শনের পরিবর্তন দিয়েই প্রাক্তন এবং প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্যকে বাতিল করতে চান—অর্থাৎ যাঁরা গাণিতিক নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেন এক জীবনদর্শনে পুষ্ট সাহিত্য সম্পূর্ণ বিপরীত-পন্থী জীবনদর্শনের জগতে গিয়ে পড়লে কোনো আবেদনই তার থাকতে পারে না, মূল ভিত ধ্বসে গেলে কাঠামো দাঁড়াবে কিসের ওপর—তাঁদের জবাবটা খুব সহজেই দেওয়া যায়। প্রকৃতির চরিত্র মানুষের বিশ্লেষণ বা তত্ত্ব আবিষ্কারে নির্ভরশীল নয়। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেলে বস্তুর পতন পদ্ধতি পাল্টে যাবে না, পদার্থ-বিজ্ঞানের পূর্ব্বতন ধারণা অনুযায়ী বস্তু ও শক্তির বিচ্ছেদ আধুনিক মতে লোপ পেয়ে গেছে, তাতে প্রাকৃতিক হালচাল কিছু বদলে যায়নি। তা বলে তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্তন মানুষের জীবনে নিষ্ক্রিয় এমন কথা আমি বলছি নে। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এ খুবই বড় কথা, প্রকৃতিকে আয়ত্তে যাঁরা প্রয়োজনে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। সাহিত্যিকের কারবার কি ভাবে ঘটছে তার বিচার-বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে নয়, তার বিষয়বস্তু মানুষের মৌলিক ভাবাবেগের বিভিন্ন বিকাশ নিয়ে—নৈসর্গিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল ঘটনা নেহাৎই তার কাছে অবলম্বন মাত্র। স্বাভাবিক প্রয়োজন আর বৈজ্ঞানিক এ দু'য়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এই অবলম্বন তার বৈজ্ঞানিক এ দুয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এই অবলম্বন তার রসসৃষ্টির যেখানে যতটুকু অংশ জুড়ে বসে ততটুকুর মূল্য যে স্থায়ী নয় সে কথাও সত্যি।

বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন চলছে, নিমেষের জন্যে তা বন্ধ হলে বিশ্বটা রবীন্দ্রনাথের বাঁশির মতোই চেঁচিয়ে উঠতো 'হারিয়ে গেছি আমি' বলে। এই পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে হেরাক্লিটাস পাওনাদারদের দেনা অস্বীকার করার মতো বাতুলতাও করে বসেছিলেন—সত্যোপলব্ধির প্রথম উচ্ছ্বাসে তার প্রয়োগের এ জাতীয় বাড়াবাড়িও হয়ে গেছে। পরিবর্তনও কতকগুলো অপরিবর্তনীয় বিধি মেনে চলে বলেই নিজেকে এবং বহির্জগতকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে আমাদের চিনে নিতে হয় না। প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন চলছে তা পরিমাণগত, এই পরিমাণগত পরিবর্তনই পুঞ্জীভূত হয়ে একদিন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। যাঁরা রসসৃষ্টি এবং রসবোধের আপেক্ষিক চিরন্তনতায় বিশ্বাসী নন, তাঁদের মতে সেই গুণগত পরিবর্তন আমাদের সমাজমানসে এসে গেছে, যদিও এখনও তাকে আমূল বলা চলে না। যদি প্রশ্ন করা যায়, প্রাচীন মহাকাব্য পড়ে আজও আমরা রস পাই কেন? তাহলে তাঁদের জবাবটা হয়ে পড়ে অজানা রকমের। আমরা রস যে পাইনে সেটাও নাকি বুঝি না, 'ওটা' নাকি বিশুদ্ধ সাহিত্যরস নয়; ঐতিহাসিক কৌতূহল, পুরাতনের প্রতি মোহ, ইত্যাদির মুখরোচক একটা মিশ্রিত পানীয় মাত্র। আনন্দ পেয়েও যদি স্বীকার করতে হয় পাইনি, তবে সেক্ষেত্রে তর্ক না তোলাই শ্রেয়ঃ। তবে এটা দেখা যায় কাব্যের মূল্য বিচারে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিক মনের আজও কোনো বৈষম্য ঘটে নি। বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, শেক্সপীয়রকে আজও আমরা মহাকবি বলে গণ্য করি—কালপ্রবাহে অপরিবর্তিত এই অভিমত রসবোধে মিলেরই পরিচায়ক।

সাহিত্যের কারবার মানুষের চিত্তবৃত্তি নিয়ে, অতএব সেখানে পরিবর্তনের প্রভাব কতটা পড়ে, সেটাই আগে বিচার্য্য। সেদিক দিয়ে মানুষ যেদিন থেকে আবেগকে ব্যক্ত করতে পেরেছে উপযুক্ত ভাষায়, তারপর থেকে আজ অবধি তার চিত্তধর্মে পরিবর্তন ঘটেছে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রেম-ঈর্ষা-স্নেহ-দ্বেষ কাম-ক্রোধ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, বদলেছে শুধু আবেগগুলোকে উদ্রিক্ত করবার উপকরণ আর উদ্রিক্ত আবেগের প্রকাশভঙ্গি। এককালে যে ভাষা বা ভঙ্গিতে মনে প্রেম সঞ্চারিত হতো আজ হয়তো তা ক্রোধ বা হাস্যরসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপকরণ ও পারিপার্শ্বিকে এ ধরণের ভ্রান্তিকারী পরিবর্তন হয়েছে অসংখ্য কিন্তু সে পরিবর্তন মানুষের আদি চরিত্রকে স্পর্শ করেনি—কবে করবে, আজও তা আমাদের ধারণাতীত। পশু বিবর্তিত হয়ে মানবীয় স্বাতন্ত্র্যে পৌঁছতে প্রয়োজন হয়েছে কল্পনাতীত কাল—মানুষ দেহে বা মনে বিবর্তিত হয়ে কবে চরিত্রান্তরকারী অন্য কোনো স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে বা মোটেই করবে কি না সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো সম্বল আজও আমাদের হাতে জমা হয়নি। ক্রমবিবর্তনে বানর মানুষ হয়েছে আবার বানর বানরই থেকে গেছে, অতএব আকৃতি-প্রকৃতিতে নতুন শ্রেণী উদ্বোধক পরিবর্তন আসবেই, জোর করে বলা চলে না। যদি কোনো দিন আসে তবে সেদিন হয়তো আজকের চিত্তবৃত্তির চাহিদা তখনকার চিত্তধর্মের কাছে একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে। এমন কি, অনুক্রমের যোগসূত্রটুকু কোথাও ছিন্ন ও লুপ্ত হলে আমরা

যে তাদের পূর্ব্বপুরুষ সেটাই আবিষ্কার করতে হবে গবেষণা দ্বারা। কিন্তু আমার কথা এই, বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের বয়সটা নিতান্তই নগণ্য এবং তার মূল আকৃতি-প্রকৃতির ওপর পরিবর্ত্তনের প্রভাবটা শীতলতামুখী সূর্য্যেরই মতো নির্ভাবনায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহিত্যের সমধিকত্বায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা অত-বড় জৈব বিপ্লবের দোহাই দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, সমাজসঞ্জাত বস্তুসমাজ বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত হতে বাধ্য। যুক্তি তাদের গ্রাহ্য হতো কাব্য বা শিল্পের এক মাত্র অবলম্বন হতো যদি সমাজের পরিবর্ত্তনশীল বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ সেখানে উপকরণ মাত্র, তাই এই উপকরণের স্বল্পতা সর্বকালীন শিল্পের একটি প্রধান লক্ষণ। শিল্প উপকরণ সংগ্রহ করে দুটো তহবিল থেকে, এক প্রকৃতির আর মানুষের। প্রকৃতির তহবিল থেকে যে উপকরণ সংগৃহীত হয় সে দেয় অমরত্ব, মানুষের তৈরী তহবিল থেকে যতটা আসে সে করে তোলে ততটা অনিত্যধর্মী। আদি যুগল-শিল্পের অভ্যুদয় প্রকৃতির দেওয়া উপকরণকে অবলম্বন করেই। সুর আর চিত্রে মানবনিয়ন্ত্রিত উপকরণ আশ্রয় পায় কিন্তু এক মাত্র অবলম্বন হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাকে দেশগত জাতিগত বা কালগত করে তোলার মতো প্রতিপত্তি ছড়াতে পারে না। যন্ত্রসঙ্গীত সঙ্গীতের সর্বকালীনত্ব এবং সার্বভৌমিকত্বের অবিসম্বাদী পরিচয়। এই সুরলোকে বিভিন্ন স্থান-কালের বিভিন্ন ভাব-ভাষা ঢং-চাল আশ্রয় নিয়ে আমাদের রুচিকে যতই বিভ্রান্ত করুক আপাত বিচারে তাকে যতই দেশ বা কালগত মনে হোক মৌল সত্তায় সর্বকালীনত্ব তার অক্ষুণ্ণই থাকে। কেউ হয়তো বলতে পারেন সঙ্গীতে আবার সার্বভৌমিকত্ব কোথায়, জাপানি গান বা বাজনায় তো তার হাসি বা বিরক্তির উদ্রেক হয় মাত্র। তা হবারই কথা। সঙ্গীতের রসটাই সার্বজনীন, ভাষাটা নয়। বিজাতীয় ভাষাও হাসির কারণ হয় কিন্তু সেই ভাষার দেওয়াল ডিঙিয়ে অন্তরস্থ ভাবের মুখোমুখী দাঁড়ানো মাত্র তাকে অন্তরের আত্মীয় বলে চিনে নিতে মুহূর্ত দেরি হয় না— শাব্দিক কৌতুকের সুড়সুড়িটুকুও হয় তখন অন্তর্হিত। ভাবই সার্বভৌমিক কিন্তু ভাষাটা নয়। প্রত্যেক শিল্পেরও তেমনি একটা আনন্দবাহী ভাষা আছে যার সঙ্গে অপরিচয় আনন্দলোকের পথ রোধ করে থাকে। এ রকম আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে স্বজাতীয় শিল্প-কলায়ও সার্বজনীনতার সাক্ষাৎ মিলবে না। প্রতি শিল্পের উন্নত স্তরের ভাষা বিশেষ একটা শিক্ষার দাবি করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা যামিনী রায়ের ছবিও বহু লোকের কাছে অর্থহীন বা হাস্যকর। কিন্তু যখনই দেখা যায় কোনো শিল্পের ভাষার সঙ্গে একবার পরিচিত হলে তার বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ এক জাতীয় আনন্দ যে-কোনো লোকের মনেই সঞ্চার করতে পারে, তখন মানতেই হবে সব শিল্পের মৌল শিল্পত্বেই সার্বভৌমিকত্ব বর্তমান। ব্যাপ্ত ভাবে মানবচিত্তে এই ঐক্য আছে বলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই জাতীয় কতকগুলো শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। অবিশ্যি কোনো কোনো শিল্পের ভাষায় স্বভাবতই একটা সার্বজনীনতা বিদ্যমান, যেমন চিত্রকলায়।

চিত্রের উপকরণ রং আর আকৃতি-প্রকৃতির ভাণ্ডারের এই দুটি উপকরণই নিত্য বস্তু। কালোপযোগী অভিব্যক্তি এবং পরিবর্ত্তনশীল সমাজোপকরণ যতই তাকে আশ্রয় করুক তা গৌণই থেকে যায়— সেখানে আনন্দলোক সৃষ্টি করে যেখানে বা বর্ণবিন্যস্ত বস্তুসত্তা। বস্তুসত্তার রূপায়ণ সার্থক হলে চিত্র চিরন্তন হয়েই বেঁচে থাকে। গুহাবাসীর চিত্রও অতি আধুনিক চিত্রসমালোচকের নয়নকে নন্দিত করার ক্ষমতা রাখে—গুহা থেকে অভ্যর্থনা করে তাকে এনে আসন দিতে হয়, সভ্যজগতের সুউন্নত চারুকলার আসরে। মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র বা অজন্তার গুহাচিত্র আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা, আধুনিকতম বিষয়বস্তুর পাশে অণুমাত্র ম্লান মনে হবে না। মহাকাব্যের কিছুটা অংশের রস সময়ের সঙ্গে ফিকে হয়ে যায় কিন্তু মহাচিত্রের রূপ কার্তিকের যৌবনের মতোই কালস্পর্শহীন। এ দিক দিয়ে শিল্পের জগতে চিত্রের সর্বকালীনত্ব এবং সার্বভৌমিকত্ব সর্বাধিক।

সঙ্গীত এবং চিত্রকলার বিষয়বস্তু এবং রীতিপদ্ধতি সমাজজীবন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, তবু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূল্য পরিবর্তিত হয়ে যায় না। কারণ এ দুটি শিল্পের কোনটিরই সমাজজীবনের উপকরণকে সবিস্তারে বা স্থূলভাবে অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা নেই। পরিবর্ত্তনশীল উপকরণ সূক্ষ্ম হতে গিয়েই সময়ের ঊর্দ্ধে চলে যায়। কাব্যেও এ গুণ বর্তমান, যদিও সঙ্গীত বা চিত্রের মতো অতখানি নয়। কাব্যে চিত্তবৃত্তি তার প্রকাশের অবলম্বন হিসেবে সমাজ-জীবন থেকে যদিও উপকরণ আহরণ করে তথাপি পুরোপুরি বস্তুনির্ভরশীল নয়—বিশেষ করে লিরিক কবিতায়, পরিবর্তনশীল উপকরণের নির্য্যাসকে শাব্দিক ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিতময়তার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করাই তার ধর্ম। উপাখ্যান-কাব্যের উপাখ্যানভাগকে ম্লানিমার হাত থেকে বাঁচায় তার ছন্দের ঝঙ্কার, শাব্দিক ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিতময়তার আনন্দলোক। কিন্তু উপন্যাস বা গল্প-সাহিত্যের বেলায় সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোই সবিস্তারে মুখ্য অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় চিত্তবৃত্তিকে সাড়া দেবার। গল্পের অবাধ আতিথেয়তায় তাৎকালীক সমাজ-জীবনের রীতিনীতি সমস্যা সব এসে ভিড় জমিয়ে বসে কথাশিল্পের আসরে, তাতে করে সমসাময়িকের অভ্যর্থনায় অভিনবত্বই দেখা দেয় কিন্তু পরবর্তীকালের পাঠকের কাছে তার রূপ ও রস বহুলাংশেই ফিকে হয়ে যায়—কারণ তখনকার সমাজ-জীবনের রীতিনীতি হয়তো গেছে পাল্টে, সেদিন যা ছিল সমস্যা তা হয়ে এসেছে সহজ, তাই অত জাঁকিয়ে অত কথা বলার কোনো সার্থকতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু এই পরিবর্তনশীল ঘটনার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্তবৃত্তির কতকগুলো অপরিবর্তনীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এবং তারই জোরে গল্প-সাহিত্য সময়ের পিচ্ছিল পথে চলে পড়লেও একেবারে গড়িয়ে যায় না। পল্লী-সমাজের সমস্যাগুলো একালের, কিন্তু রমা-রমেশের সম্পর্কের মাধুর্য্যটুকু সর্বকালের।

কবিতা এবং কথাশিল্পের তফাৎটা হোমিওপ্যাথিক আর এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মতো, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে বস্তু তার স্বাদ-গন্ধ-রূপ হারায় বটে কিন্তু বৈশিষ্ট্যটুকু তার পুরোমাত্রায় বজায় থাকে সূক্ষ্মতম সত্তায়, এ্যালোপ্যাথিক-এ বস্তুর স্থূল অস্তিত্বের অংশও অনেকটা পরিমাণেই থেকে যায় এবং গ্রহণকালে আপাতরুচিতে সেই স্থূল অস্তিত্বটাই স্বাদ-বিস্বাদের' অবতারণা করে। কিন্তু একবার উদরস্থ হলে মূল ক্রিয়ায় দুটোই সমান। জীবন প্রবাহের উপকরণের নির্য্যাস

নিয়ে গড়ে ওঠে কবিতা আর কথাসাহিত্যের অবলম্বন তাদেরই স্থূল প্রকাশ—যার বহিরঙ্গের ওপর পড়ে কালের ছাপ। তবু বিগত যুগের কথাশিল্পেও মনটাকে একবার প্রবেশ করতে দিলে রস আমরা সেখানেও পাই, তবে কিনা সেটা অবিচ্ছিন্ন এবং অনাবিল নয়, পরিবর্তিত সমাজ-জীবনের উপকরণগুলো প্রতিপদে রসবোধকে ব্যাহত করতে চায়। কিন্তু শিল্পমাত্রেরই এমন একটা গুণ আছে, যা আমাদের ব্যক্তিসত্তাকে সাময়িক ভাবে স্তম্ভিত করে মনটাকে তুরীয় অবস্থায় উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে—অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে বিচ্ছিত্তি রস। মানুষের মৌল চিত্তবৃত্তির প্রবাহে আজও কোথাও ছেদ পড়েনি বলেই যে কোনো কালের সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ তার বাহু বিস্তার করে এসে স্পর্শ করতে পারে যে কোনো কালের মনকে—সমধর্মের এ এক অপূর্ব সম্প্রসারণ ক্ষমতা যা আপাতবৈষম্যের বাধাকে অতিক্রম করেও আত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে। রূপকথার অলৌকিক নর-নারী বা জীব-জন্তুর মধ্যেও সমধর্ম চিত্তবৃত্তির পরিচয় যেইমাত্র পাই, অমনি আত্মমনের প্রক্ষেপণ দিয়েই সেই কল্পলোককে আমরা আপনার করে তুলি এবং তা থেকেও আনন্দ পাই প্রচুর। চিত্তবৃত্তিতে মিল পাওয়ামাত্র কল্পনাই সাহায্য করে মনকে অতিক্রান্ত বা অনাগত যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। প্রগতিশীল সাহিত্যের অনাগত কালের কল্পনায় যদি আমরা আনন্দ পাই তো বিগতদিনের সত্যের সংস্পর্শই বা আমাদের আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করবে না কেন? দুটোর কোনোটাই উপস্থিত ভাবনে সত্য নয়।

সাহিত্যে চিরন্তনতার সবচেয়ে বড় পরিচয় তার সার্বজনীনতায়। ভাষার প্রাচীর ঘেরা জাতীয় আয়তনে আবদ্ধ থেকেও সুযোগ পাওয়ামাত্র অনুবাদের গবাক্ষপথ দিয়েও সে তার আত্মীয়তা ঘোষণা করে বিশ্বমানবের সঙ্গে। যা সার্বজনীন তা-ই সর্বকালীন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিচিত্র পরিবেশ যে ঐক্যে দাগ কাটতে পারেনি কালের বৈচিত্র্য ও তাকে যুগবৈষম্যের রেখায় বাঁধতে পারবে না। তাই কথাশিল্পকেও স্বল্পায়ু আমি বলব না, বলব তার বহিরাঙ্গিক যৌবন দীর্ঘ নয়! মানুষ যত কাল মানুষ থাকবে তত কাল তার সৃজিত কোনো সার্থক শিল্পকর্মের মৃত্যু নেই, যৌবনোচিত রূপ-রস কম বেশী ফিকে হয়ে যেতে পারে মাত্র।

মন

নীহাররঞ্জন হালদার

ট্রেণ চলে, প্লেন চলে আর চলে মন;
মনের সমান দ্রুত কে করে ভ্রমণ?
হাজার মাইল দূরে—শত্রুর দেশ
কলের বোতাম টিপে কর তুমি শেষ!
মন বলে, সব মিছে
আমি যদি ধাই পিছে
সব কিছু হয়ে যাবে ছাই;
মনের সমান জোর আর কারো নাই।
কতো দিন কতো কথা!
মাঝে মাঝে নীরবতা গড়ে ওঠে সুমধুর মিতালি।
দেখিবে তাহার শেষে
সুগোপনে কেঁদেছে সে
মন যবে হয়ে যায় খালি।
দেখা-শোনা ভালো-বাসা,
জানা নেই তার ভাষা;
কতো ব্যথা মনে জাগে
বিদেশেতে বিদায়ের আগে!

জানি না কিসের তরে
বেদনায় আঁখি ঝরে
নাহি বুঝি তার কোন মানে।
হয়তো তাহার মন দেখেছে সবুজ বন
উষর মরুর মাঝখানে।

মনের জোরেই ত সে রকেটে চড়বে,
চাঁদের সোহাগ-টিপ কপালে পরবে।
মনের নাবিক হয়ে কতো উদ্‌ভ্রান্ত
কতো বাধা পার হলো কতো মরু-প্রান্ত
মনেতে ভরসা রাখি
প্রিয়জনে দূরে ছাড়ি
কতো জনা কতো দূরে দিয়েছেন পাড়ি;
বারে বারে পরাজয়,
প্রতিকূলে স্রোত বয়,
তবু ত বিলীন নয় লক্ষ্যের পথ;
জেগেছে কেবল মনে নূতন শপথ।

মন—মন—মন, হে আমার মন,
তুমি ছাড়া এ জগতে কে আছে আপন?
আমার কথার মানে
একজনা ভালো জানে
সাগর যে ছয় বারে পাড়ি দিয়েছেন,
হয়তো তুমিও জানো,—বীর সে মিহির সেন।
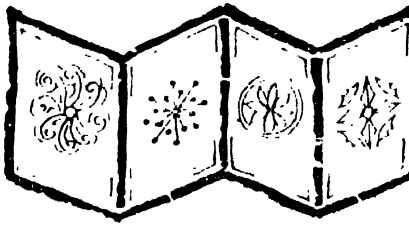
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৬

জিয়ালগোড়া পোঃ,
জেঃ মানভূম, বিহার,
১০ই এপ্রিল, ১৯৩৯।

প্রিয় মহাত্মাজী,

তারবার্তা এবং সংক্ষিপ্ত পত্র ব্যতীত আমি আপনাকে চারিটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র দিয়েছি—যথা, ২৫শে মার্চ্চ (২৬শে মার্চ্চ ডাকে ফেলা হয়), ২৯শে মার্চ্চ, ৩১শে মার্চ্চ এবং ৬ই এপ্রিল। পত্রগুলিতে সাধারণভাবে কংগ্রেসের বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। পত্রালাপ দীর্ঘ এবং বিলম্বিত হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। একটিমাত্র দীর্ঘ পত্রের মধ্যে সকল কথা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু দুইটি বাধার জন্ত তাহা হয় নাই। প্রথমতঃ একটি দীর্ঘ এবং সম্পূর্ণ পত্র লিখিতে গেলে শরীর মনের উপর চাপ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ আপনার পত্রে উল্লিখিত নূতন নূতন বিষয়গুলি সম্পর্কেও আমার পক্ষ হইতে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন। আশা করি এইটিই আমার শেষ পত্র হইবে। যে বিষয়ে আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে, এই পত্রে আমি সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব। ইহা ভিন্ন, আমার পূর্ববর্ত্তী পত্রগুলির মূল বক্তব্যগুলির পুনরালোচনা করিয়া, আপনার নিকট শেষ আবেদন জানাইব।

(১) দুর্নীতি এবং হিংসা

আমি যদি আপনাকে ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে চরমপত্র দেওয়া এবং সত্বর জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার আপনি বিরোধী, কারণ আপনি মনে করেন যে, আমাদের মধ্যে যথেষ্ট দুর্নীতি এবং হিংসাত্মক মনোভাব প্রকট। গত কয়েক মাস যাবৎ ওয়ার্কিং কমিটিতে এই দুর্নীতির বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়া আসিতেছি এবং আমার মনে হয় এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত—পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, আমার মতে, উহা (দুর্নীতি) এত ব্যাপক নহে যে, পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্ত সত্বর সংগ্রাম আরম্ভ করা তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিবে। অপরপক্ষে, আমরা যদি নিয়মতান্ত্রিকতার পথে আরও দীর্ঘকাল গা ভাসাইয়া চলি, জনসাধারণ যদি আরও দীর্ঘকাল যাবৎ উচ্চ পদের সুখ-সম্ভোগের মোহে আচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে আরও অধিক পরিমাণে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। আরও, আমি একথা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান কালের ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া আমি এ দাবী করিতে পারি যে, নৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে উহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই আমরা ন্যূন নহি বরং কয়েক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতও বটে। সুতরাং দুর্নীতির বিভীষিকা আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে না। অধিকন্তু, দেশের মুক্তির জন্ত আরও আত্মত্যাগের ও দুঃখকষ্টভোগের আহ্বান দুর্নীতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক হইবে এবং প্রসঙ্গতঃ উহা আমাদের মধ্যে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি চুপিসাড়ে প্রবেশ করিয়া থাকিলে বা পদাধিকার করিয়া থাকিলে, জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহাদের মুখোস খুলিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। তুলনামূলক ভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই যখন ধুরন্ধর কূটনীতিজ্ঞগণ ঘরের শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্ত বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব থাকা সম্পর্কে, আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রে উক্ত মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করি। কংগ্রেস-সদস্যগণের তথা কংগ্রেসের সমর্থকগণের মধ্যে, মোটের উপর, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন হিংসার ভাব অল্পই। অন্ততঃপক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা হিংসার ভাব অধিক নাই—এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। এবিষয়ে আপনার মতের সমর্থন আমি কেন করি না, সে সম্পর্কে যুক্তি দেখাইয়াছি; তাহা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব বর্ত্তমানে হয়ত আছে, যাহার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিতেছে এবং যাহা কংগ্রেস সরকারগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইতেছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। উহা হইতে আমাদের এই অভিমত পোষণ করা ঠিক হইবে না যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে বা তাহাদের সমর্থকদের মধ্যে হিংসার মনোভাব বাড়িয়াছে। যে সকল রাজনৈতিক দলের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই, যেমন মুসলিম লীগ,—তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভাবে এবং কর্ম্মে অহিংস হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম মুলতুবী রাখা কি মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়া হইবে না?

(২) পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে আমি আপনার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, যে-রূপে উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপিত এবং শেষ পর্যন্ত পাশ হইয়াছিল, সেই রূপটি আপনি সমর্থন করেন কি না অথবা কম-বেশী আমাদের নির্দ্দেশানুযায়ী উহারই একটি সংশোধিত রূপ আপনি পছন্দ করিতেন যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমেই পাশ হইতে পারিত। আমি আরও জানিতে চাই যে, আপনি পন্থ প্রস্তাবটিকে আমার প্রতি

অনাস্থাসূচক বলিয়া মনে করেন কি না। আপনার অবগতির জন্ম আমি উক্ত প্রস্তাবটির মূল খসড়াটি এবং তাহার একটি সংশোধিত খসড়াও উদ্ধৃত করিলাম।

মূল খসড়া

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল বাদানুবাদ চলিতেছে এবং যে জন্ম কংগ্রেস মহলে এবং দেশের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্ম কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা আবশ্যক।

"অতীত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মূল নীতিগুলি কংগ্রেসের কার্য্যসূচীকে প্রভাবিত করিত, বর্ত্তমান কংগ্রেস সেই নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আস্থাজ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করিতেছে যে, সেই মূল নীতিগুলির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা চলিবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীকে তাহা যেন প্রভাবিত করে। গত বৎসর যে-ওয়ার্কিং কমিটি কাজ চালাইয়াছিল তাহার কর্ম্মক্ষমতায় এই কংগ্রেস আস্থাজ্ঞাপন করিতেছে এবং তাহার যে কোনও সদস্যের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকিলে, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

"আগামী বৎসর সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে মনে করিয়া এবং একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই সেই সঙ্কটে কংগ্রেসকে এবং দেশকে উপযুক্ত নেতৃত্বের দ্বারা জয়যুক্ত করিতে পারেন মনে করিয়া, কংগ্রেস ইহা অত্যাবশ্যক মনে করে যে, তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য রাষ্ট্রপতিকে এই অনুরোধ করিতেছে যে, গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই যেন তিনি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন।"

সংশোধিত খসড়া

"রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল বাদানুবাদ চলিতেছে এবং যেজন্য কংগ্রেস মহলে এবং দেশের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্ম কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা আবশ্যক।

"অতীত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মূল নীতিগুলি কংগ্রেসের কার্য্যসূচীকে প্রভাবিত করিত, বর্ত্তমান কংগ্রেস সেই নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আস্থাজ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করিতেছে যে, সেই মূল নীতিগুলির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা চলিবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীকে তাহা যেন প্রভাবিত করে। এই কমিটি গত বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্যক্ষমতায় আস্থাজ্ঞাপন করিতেছে।

"আগামী বৎসর সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে ভাবিয়া, এই কংগ্রেস মনে করে যে, অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব এবং সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।"

(৩) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল

গত ৩১শে মার্চ্চের পত্রে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহা ঐ সময়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং সাংবাদিক জল্পনা-কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই করিয়াছিলাম। আমার তৎকালীন এই ধারণা হইয়াছিল যে, সি, এস, পির প্রকাশ্য নেতারা মনস্থির না করিয়াই চলিতে থাকিবেন এবং তাহার পরিণামে ভবিষ্যতে এক নতুন নীতি অনুবর্ত্তন করিবেন, যেমন, পুরাতন নেতৃত্বকে সমর্থনের নীতি। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তাহা হইতে আপনার মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত যে, সমগ্র সি, এস, পি পুরাতন নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে চলিয়া যাইবে। সেই জন্যই আমি আপনাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, সি, এস, পির উপরের তলার নেতারা যাহাই করুন না কেন, ঐ দলের এক বৃহদংশ আমাদের সহিত কাজ করিয়া যাইবেন। ত্রিপুরীতে এই নেতাদের নিরপেক্ষতার নীতির প্রতিক্রিয়া তাঁহাদের দলের উপর বিরূপ হইয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলাম বলিয়াই আমি ঐরূপ বলিতে পারিয়াছিলাম। কয়েকটি প্রদেশ এই নেতাদের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সাধারণ সভ্যদের অনেকেই তাহা করিয়াছিলেন। অনেকে আবার নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুরোধে অথবা নৈতিক চাপে নেতাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। আপনাকে পত্র লিখিবার পর যে সংবাদ আমি পাইয়াছি তাহাতে সি, এস, পির নেতাদের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গনের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

(৪) একদলীয় বনাম সর্ব্বদলীয় ক্যাবিনেট

এ-সম্পর্কে আপনার যুক্তিগুলি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি এবং বিচার করিয়াছি কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-পর্য্যন্ত আমার মত-পরিবর্ত্তন হয় নাই। হয়ত আপনার আরও যুক্তি আছে যাহা আপনার অভিমত আমার পক্ষে স্বীকার করার সহায়ক হইতে পারে। আপনার মূল বক্তব্য এই যে, প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ এতই গভীর যে, আমাদের পক্ষে একযোগে কাজ করা অসম্ভব। হরিপুরা কংগ্রেসে আপনি আমাদের সহিত একমত ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে একযোগে কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাহার পর হইতে কি এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার ফলে একযোগে কাজ সম্ভব নহে? আর, আপনার মতে, আমাদের মধ্যে মূল বিষয়ে মতানৈক্যগুলিই বা কি কি?

আমি জানিতে চাই, একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনার প্রতিবাদ কি নীতিগত না আমার ২৫শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে উল্লিখিত ৫০-৫০ আনুপাতিক হারের জন্য? ঐ পত্রে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমি সাতটি নাম উল্লেখ করিব আর সর্দ্দার প্যাটেল করিবেন সাতটি, আপনার সমর্থনের জন্য। কিন্তু আপনি যদি উপরিউক্ত অনুপাত স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনার পক্ষেও ঐ চৌদ্দটি নামের প্রস্তাব করা সমভাবেই সম্ভব। আপনি যদি পূর্ব্বোক্ত অনুপাত স্বীকার না করেন এবং যদি মনে করেন যে, সর্ব্বসম্মত সর্ব্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠনের পথে তাহা অন্তরায়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন। বিষয়টি তাহা হইলে পুনর্বিবেচনার সুযোগ আমি পাইতে পারি।

(৫) শ্রীশরৎ বসুর প্রতি উপদেশ

২৪শে মার্চের পত্রে আপনি আমার ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন : "সুতরাং আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, হয় তোমরা সকলে এক বৈঠকে সমবেত হইয়া প্রাণখোলা আলোচনা-মাধ্যমে একটা বোঝাপড়া কর অথবা বিষের অনুপ্রবেশ যদি এতদূর হইয়া থাকে যাহার ফলে তাহা বাহির করা অসম্ভব হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।" আপনার পরবর্তী পত্রগুলিতে কিন্তু এই যুক্তির অনুধাবন করেন নাই। আমি আপনাকে একাধিক বার লিখিয়াছি যে, আমাদের দিক হইতে, কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপনের জন্ত চরম চেষ্টা করিতে আমরা প্রস্তুত। আমি আরও বলিয়াছি যে, আমাদের পক্ষে, আমাকে লইয়া এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আপনাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে করেন না। ইঁহারা মনে করেন যে, যুদ্ধমান দলগুলিকে আপনি ঐক্যবদ্ধ করিতে পারেন। আমি আরও বলিতে পারি যে, একমাত্র পুরাতন নেতৃবৃন্দকে এবং তাঁহাদের অনুগামিগণকে আপনি গান্ধীবাদী মনে করিবেন—ইহার কোনও যুক্তি নাই। আপনি যদি আমাদের কয়েকটি ভাবাদর্শ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সমগ্র কংগ্রেসকেই গান্ধীবাদী মনে করিতে পারেন।

আমার বিকল্প প্রস্তাবগুলি

(ক) আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে, মুক্তিসংগ্রাম পুনরারম্ভের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে যে কোনরূপ আত্মত্যাগ প্রয়োজনবোধে দাবী করিতে পারেন—এমন কি বর্তমানে যে সকল পদাধিকার আমাদের আছে তাহার পরিত্যাগও। মুক্তিসংগ্রাম পুনরারম্ভ করিলে, তাহা বিনাসর্তে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

(খ) আপনি যদি মনে করেন যে, সংগ্রাম এখন আরম্ভ করা সম্ভব নয় এবং আপনি যদি পুরাতন নেতৃত্বকে পদাধিকার দিতে চান, তাহা হইলে আমার অনুরোধ এই যে, আপনি চারি আনার কংগ্রেস-সভ্য হউন এবং ওয়ার্কিং কমিটির পরিচালন-ভার নিজের হাতে গ্রহণ করুন। উহা দ্বারা কতকগুলি বাধা দূর হইবে, যে বাধাগুলি দূর হইবার আদৌ সম্ভাবনা থাকিবে না যদি আপনি নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া পুরাতন নেতৃত্বকে গদীনসীন করেন।

(গ) আমার এই প্রস্তাবও যদি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হয় এবং আপনি যদি আমাকে একদলীয় ক্যাবিনেট গঠনের জন্ত পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে আমার অনুরোধ এই যে, আগামী কংগ্রেস পর্য্যন্ত আমার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করুন। আপনি আস্থাজ্ঞাপক ভোট দিলে, আপনার "গোঁড়া" অনুগামিগণও এ, আই, সি, সিতে আমাকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন। উহা দ্বারা ভাঙ্গন এড়ান এবং নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে। গত ৬ই এপ্রিলের চিঠিতে আমি আপনার নিকট সবিনয়ে জানাইয়াছি যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবানুসারে শুধু যে আপনার ইচ্ছানুসারেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইবে তাহা নহে, উহা আপনার বিশ্বাসভাজনও হওয়া চাই। একবার যদি এই প্রস্তাবটি অনুধাবন করেন, তাহা হইলে আপনার পুরাপুরি বিশ্বাসভাজন নয়, এমন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে পরামর্শ দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

(ঘ) আপনি যদি তিনটি প্রস্তাবই বাতিল করেন, তাহা হইলে আর একটিমাত্র পথই খোলা থাকিবে—আপনাকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পুরা দায়িত্ব লইতে হইবে। আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর আমার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিবার ভার আমার উপরই থাকিবে।

(৬) আপনার মৌনতা

আপনার এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, আমার অনুরোধেই আপনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। কেন ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলাম তাহার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ত্রিপুরীতে পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়াইয়াছিল এবং কংগ্রেসীদের মধ্যে বিভেদ এত গভীর হইয়াছিল যে, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ঐক্যরক্ষার একমাত্র আশাস্থল আপনিই ছিলেন। তখন ভাবিয়াছিলাম যে, সমগ্র পরিস্থিতিটি নিরপেক্ষ এবং শান্ত মন লইয়া বিচার করা আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য। পন্থ-প্রস্তাবের সমর্থকগণ তখন দিল্লীর দিকে ছুটিতেছিলেন। তখন আমি স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিলাম যে, ত্রিপুরীর ঘটনাবলী সম্পর্কে একতরফা একটা ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহারা আপনাকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিবেন। সেই জন্তই আমি আপনাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ত্রিপুরী সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাটি অর্থাৎ এ সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনীগুলি শ্রবণ না করিয়া আপনি যেন কোন সাংবাদিক বিবৃতি না দেন বা কোনও উক্তি না করেন। আমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্ত আপনার নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, সমগ্র দেশ কংগ্রেসকে গৃহযুদ্ধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এবং ঐক্য পুনঃস্থাপনের জন্ত আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ভগবান না করুন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি সেই সময় আসে, যখন আপনার দৃষ্টি পক্ষপাতদুষ্ট হইবে, তখন ঐক্যের সকল আশা ধূলিসাৎ হইবে। এবং সম্ভবতঃ আমরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইব।

এখন আমি অনুভব করিতেছি যে, আপনার মুখে চাপা দেওয়া আর আমার পক্ষে উচিত হইবে না। আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার মৌনতা ভাঙ্গা উচিত অথবা আপনি যদি মনে করেন যে, ত্রিপুরী সংক্রান্ত সকল কাহিনীগুলিই আপনি শুনিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি আপনার খুশিমত বিবৃতি দিতে পারেন। আমি শুধু আপনাকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, কংগ্রেসের সকল দল (মাত্র পুরাতন নেতৃত্ব নহে) আপনার সম্বন্ধে কি ভাবে এবং আপনার নিকট কি আশা করে, তাহা স্মরণ রাখিবেন।

পরিশেষে আমি বলিতে বাধ্য যে, ৭ই তারিখে সহসা রাজকোট যাইবার প্রাক্কালে দিল্লী হইতে যে তারবার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। ৭ই সকালে আমার পক্ষে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিড়লা হাউসে টেলিফোন করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্ত কতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের পত্রালাপে কোনও ফল হইতেছে না ; প্রাণখোলা, মুখোমুখি আলোচনা দরকার। ঐ দিনই একটু বেলায় আমার ডাক্তার বিড়লা হাউসে আপনাকে টেলিফোন করিয়াছিলেন। অপর প্রান্ত হইতে শ্রীমহাদেব দেশাই তাঁহাকে জানান যে, এখানে আসিবার জন্ত আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

অন্ততঃপক্ষে আগামী দিনের পূর্বে অর্থাৎ ৮ই পূর্বে আপনি দিল্লী ত্যাগ করিবেন না। রাজকোট আপনাকে সরাইয়া লইয়াছে,—এজন্য আমি দুঃখিত। আমি শুধু এইমাত্র আশা করিতে পারি যে, রাজকোটের নিকট যাহা আশীর্বাদ স্বরূপ হইবে তাহা যেন কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক না হয়। ফেব্রুয়ারীতে রাজকোট যদি আপনাকে সরাইয়া লইয়া না যাইত, তাহা হইলে ত্রিপুরীর ইতিহাস অন্যরূপ হইত। ঐ সঙ্কট হইতে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার ছিল কিন্তু আমার নিকট হইতে এবং অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও আপনাকে পাওয়া গেল না। যখন আপনি ঠাকুর সাহেবকে চরমপত্র দিয়াছিলেন তখন যদিও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমগ্র দেশ আপনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি আপনার দেশের এক বিরাট অংশ মনে করিয়াছিলেন এবং এখনও মনে করেন যে, রাজকোট রাজ্যের অধিবাসীদের কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়াও আপনি রাজকোট সংগ্রাম কয়েক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে পারিতেন।

(সার মরিস্ গায়ারের রায়দান সম্পর্কে আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে চাই যে, তিনি উহা ব্যক্তিগত ভাবে স্বাক্ষর করেন নাই, করিয়াছেন ভারতের প্রধান বিচারক রূপে)।

আমার পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, এখানেই থামা উচিত। আশা করি ভ্রমণে কোনওরূপ কষ্টবোধ করেন নাই এবং স্বাস্থ্যেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছি।

প্রণামান্তে— আপনার স্নেহের সুভাষ

গান্ধীজীর উত্তর—৪

প্রিয় সুভাষ, রাজকোট, ১০।৪।৩৯

তোমার ৬ তারিখের পত্র এইখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাণ খুলিয়া পারস্পরিক আলোচনার জন্য বিরোধীদের এক বৈঠকের প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর এত ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহার ফলে আমি জানি না উহার এখন কোনও মূল্য আছে কি না, বৈঠক হইলে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি শপথবাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং তাহার ফলে তিক্ততা বাড়িয়াই যাইবে। বিভেদ অত্যন্ত ব্যাপক এবং অবিশ্বাস অত্যন্ত গভীর। মিলনের কোনও পথই আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমার মনে হয় একটি মাত্র পথ আছে এবং তাহা হইতেছে এই মতপার্থক্য স্বীকার করিয়া প্রতি দলের নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করিয়া যাওয়া?

আমার বোধ হইতেছে, যুধ্যমান দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক যোগে কাজ করাইবার ক্ষমতা আমার আদৌ নাই। আমি এই আশা করিতে পারি যে, তাঁহারা শালীনতা বজায় রাখিয়া নিজ নিজ নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি তাঁহারা তাহাই করেন, তাহা হইলে দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমি ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যতই আমি তাহা পড়িতেছি ততই উহার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। প্রস্তাব-রচনাকারীদের উদ্দেশ্য ভালই ছিল। কিন্তু বর্তমান সমস্যার মীমাংসা উহার মধ্যে নাই। সুতরাং নিজ বুদ্ধিমতে তুমি উহার ব্যাখ্যা করিও এবং কোনওরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া কাজ করিয়া যাইও।

তোমার উপর একটি ক্যাবিনেট চাপাইয়া দিতে আমি পারি না, দিব না। তোমার উপর ক্যাবিনেট চাপাইতে দিও না। তোমার নির্বাচিত ক্যাবিনেট এবং তোমার নীতি এ, আই, সি, সি, সমর্থন করিবে এমন কথাও আমি দিতে পারি না। উহা অবদমনেরই সমতুল্য হইবে। সদস্যগণ নিজ নিজ বিচার বুদ্ধিমত কার্য্য করুন। তুমি যদি ভোট না পাও, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অধিকাংশ সদস্যকে নিজ মতানুবর্ত্তী করিতে পারিতেছ ততক্ষণ বিরোধিদলের নেতারূপে কাজ করিয়া যাও।

তুমি কি জান না যে, যেখানে যেখানে আমার প্রভাব আছে, সেখানেই আমি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছি? ত্রিবাঙ্কুর এবং জয়পুর তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে আসিবার পূর্ব্বে রাজকোট আন্দোলনও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, বাতাসে আমি হিংসার গন্ধ পাইতেছি। অহিংস আন্দোলনের উপযোগী আবহাওয়া আমি দেখিতেছি না। রামদুর্গের শিক্ষা কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? আমার মতে, উহা অসম্ভব ক্ষতিসাধন করিয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, উহা পূর্ব্বকল্পিত ছিল। উড়িষ্যার রণপুরের ন্যায় এখানেও কংগ্রেসীরাই দায়ী। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, আমরা দুইজনে একই বিষয়কে দুইটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেছি এবং এমন কি, বিপরীত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতেছি? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি করিয়া আমরা মিলিত হইতে পারি? ঐক্ষেত্রে আমাদের বিভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। সামাজিক, নৈতিক এবং পৌরশাসনের ব্যাপারে অবশ্য আমরা মিশিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারি। অর্থনৈতিক দিকটির কথা আমি এখানে উল্লেখ করিতে পারি না। কারণ, ঐ বিষয়েও যে আমাদের মতানৈক্য আছে তাহা আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের নিজ নিজ মত ও পথানুসারে যদি আমরা কাজ করিয়া যাই তাহা হইলে আমরা দেশের সেবা ভালভাবেই করিতে পারিব। জোড়াতালি দিয়া জোরপূর্ব্বক একটি সর্ব্বদলগ্রাহ্য নীতি এবং কার্য্যসূচী প্রস্তুত করিয়া তাহা বিভিন্ন বিরোধী দলকে দিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা উহা শ্রেয়ঃ হইবে।

দিল্লী হইতে তারবার্ত্তায় আমি তোমাকে জানাইয়াছিলাম যে, ধানবাদ যাইতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। রাজকোটকে অগ্রাহ্য করিবার সাহস আমার নাই।

ভাল আছি। কস্তুরবা ভীষণ ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। আজ লইয়া পাঁচদিন হইল। অসুখ যখন সুরু সবেমাত্র হইয়াছিল, তখনই আমি তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।

আমার ইচ্ছা এই যে, স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ফলাফল ভগবানের উপর ছাড়িয়া দাও এবং তদ্দ্বারা তোমার স্বাস্থ্যরক্ষা কর। তোমার পিতার সম্বন্ধে উল্লেখ আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কেহই আমাকে তোমার বিরুদ্ধে লাগায় নাই। সেবাগ্রামে তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবশেই। তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, পুরাতন নেতৃত্বের মধ্যে তোমার একটি ব্যক্তিগত শত্রু আছে, তাহা হইলে তুমি ভুল করিতেছ। ভালবাসা জানিও। —বাপু

অচিন্ত্য অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১১

সামান্য ক'দিনের অসুখে জগন্নাথ মারা গেলেন। শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন শচী দেবী।

নিমাই বললে, 'মা, চোখ চাও। আমাকে দেখ। আমি যত দিন আছি তত দিন তোমার সব আছে। তুমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। হরি-হরি বলো।'

হরি শব্দের দুই মুখ্য অর্থ। এক, সর্ব-অমঙ্গল হরণ করে; দুই, প্রেমে মনোহরণ করে। আর কৃষ্ণনাম? 'কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনামসম।' অশ্বমেধযজ্ঞের ফল কি? সর্বপাপবিনাশ। কিন্তু সর্বকর্ম অনুষ্ঠানেই ত্রুটিবিচ্যুতির ভয়, উচ্চারণে স্বরভ্রংশের ত্রুটি, নিয়মে ক্রমভঙ্গের ত্রুটি, দেশকালপাত্র প্রসঙ্গে বস্তু ও দক্ষিণাদির ত্রুটি। সমস্ত ত্রুটির প্রতিকারের উদ্দেশে 'অচ্ছিদ্র-মন্ত্র' পাঠের নির্দেশ। এই অচ্ছিদ্র-মন্ত্র আর কিছু নয়, হরিনাম-সঙ্কীর্তন। 'মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্তনং তব।' নামের ফল শুধু পাপনাশ নয়। আরো আছে। নামের ফল চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব। আর প্রেমের আবির্ভাবে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। সাত্ত্বিক ভাব আট রকম। স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ আর প্রলয়। তাছাড়া আর কী লাভ? 'অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥' প্রেমের উদয়ে ঘুচে যায় সংসারবন্ধন, দূরে যায় দুর্বাসনা। একমাত্র কামই তো হৃদ্‌রোগ, নামে সেই রোগের অন্তর্ধান।

কল্মষ কি? ভক্তিবিরোধী কর্মই কল্মষ। যে কর্মের উদ্দেশ্য শুধু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি তাই ভক্তি-বিরোধী। হয় পার্থিব ভোগ দাও, নয় স্বর্গ দাও, নয় বা মোক্ষ এই কামনায়ই তো ধর্মানুষ্ঠান। তাৎপর্য স্বসুখসাধন বা স্বদুঃখনিবৃত্তি। যতক্ষণ মনে ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা, ততক্ষণ ভক্তি নেই। ভক্তি তো আত্মসুখ নয় কৃষ্ণসুখ। ভক্তি তো আত্মপ্রীতি নয় কৃষ্ণপ্রীতি। ভজ্ ধাতু থেকে ভক্তির উৎপত্তি। আর ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। সেবার উদ্দেশ্য শুধু সেব্যের প্রীতিসাধন। সুতরাং ভক্তি মানে কৃষ্ণকে সুখী করা। কিসে কৃষ্ণ সুখী? মমত্ববুদ্ধিতে। কৃষ্ণ আমারই, আমারই একলার, আমি ছাড়া কৃষ্ণের কেউ নেই। কৃষ্ণ আমারই লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য। আমার লালন-পালন-অনুগ্রহের বস্তু। কৃষ্ণে আমার ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই না বা স্বসুখবাসনা। শুধু প্রেমাত্মিকা সেবা। ভক্তপক্ষপাতিত্বই ভগবানের গুণ।

'আমার দিকে তাকাও।'

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

মন্দ-মন্দ হাসি নিমাইয়ের কটাক্ষে আর সেই দৃষ্টি যার উপর গিয়ে পড়ে তার সর্বশোক দূরে পালায়। শোকের মূলই হচ্ছে কল্মষ। সে কল্মষ, সে ভক্তি-বিরোধী কর্মের বাসনা বিধ্বস্ত হয়। আর তার তখন ব্রজপ্রেমে নিমজ্জন। গৌরের কথা বলবে কি, বলতে উদ্যোগ করা মাত্রই, কুশল-পটলী অর্থাৎ সর্ববিধ মঙ্গলের অভ্যুদয় ঘটবে।

শুন মাতা! মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বরের যে দুর্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিব হেলে॥

কিন্তু ক্রোধে একেবারে তপ্ত তাণ্ডব। সংসারের অবস্থা বুঝতে চায় না, একটা জিনিসের আবদার

করেছে কি, তখুনি তা মেটানো চাই। নইলে ঘর-দুয়ার ভাঙা ঝড়ের আকার ধারণ করবে নিমাই।

গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছে, মাকে বললে, 'মা, মালা-চন্দন দাও। গঙ্গাপূজা করব।'

প্রমাদ গণলেন শচী। বললেন, 'বাবা, একটু অপেক্ষা কর, মালা নিয়ে আসি।'

'নিয়ে আসি! এখন তুমি আনতে যাবে?' নিমাই, এগারো-বারো বছরের ছেলে, রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। 'এতক্ষণ আনোনি কেন? কী করছিলে ঘরে বসে?'

দ্রুত শব্দে ঘরে ঢুকল নিমাই। যত গঙ্গাজলের কলসী ছিল একের পর এক ভাঙতে লাগল। ছোট-বড় যত ঘট ছিল ঘরে, কোনোটার মধ্যে বা তেল নুণ বা ঘি, সকলের গায়ে মারতে লাগল লাঠির বাড়ি। যত সিকা ছিল, বড়ি বা মশলাপাতির, সব ছিঁড়তে লাগল টেনে-টেনে। শুধু সিকা নয় হাতের কাছে যত কাপড় পেল একটাও আস্ত রাখল না। তারপর আর যখন ভাঙবার জিনিস নেই তখন আক্রোশ গিয়ে পড়ল খোদ ঘরের উপর, তার দরজা-জানলার উপর। ঘর-দোর ভেঙেও ঠাণ্ডা হল না। সামনে যে গাছ ছিল তাকেই পিটতে লাগল নিয়মের মত। গাছ গেছে, এবার মাটিকে প্রহার করো। লাঠির ঘায়ে জর্জর হল পৃথিবী।

জননী শচী দেবী ভয় পেয়ে গৃহের উপান্তে গিয়ে লুকোলেন।

ভঙ্গন-যজ্ঞ সাঙ্গ করে নিমাই দাঁড়াল অঙ্গনে। অতৃপ্ত রোষে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল। কনক-অঙ্গ কালি হয়ে গেল মুহূর্তে। বৈকুণ্ঠপতি ধরিত্রীকে শয্যা করলেন।

চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণ।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গন॥

শচী দেবী মালা আনালেন। নিদ্রিত পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হাত রেখে ধীরস্বরে বললেন, 'ওঠ বাপ ওঠ, এই ছাখ মালা এসেছে। যা এবার গিয়ে ইচ্ছেমত পূজো কর।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নিমাই। ছি ছি, ঘরদোরের এ কী হাল করেছি! লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

শচী দেবী বললেন, 'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে। তোর আপদ-বালাই কেটে গেছে।'

ভাল হইল বাপ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥

সংসারের এত অযথা অপচয় করল নিমাই, তবু জননীর আপশোষ নেই। ক্রীড়াময় চঞ্চল বালকের জন্যে আবার রান্নার আয়োজন চলল। গোকুলনগরে যশোদাকে কত সহ্য করতে হয়েছিল কৃষ্ণচাপল্য। আমিও সহ্য করি।

গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরল নিমাই। তুলসী-জল দিয়ে বিষ্ণুপূজা করল। খেয়ে-দেয়ে হৃষ্টমনে পান চিবুতে বসল।

শচী দেবী কাছে এসে ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করে লাভ কি? এ সব তো তোমার নিজের জিনিস। নিজের জিনিস কি কেউ নষ্ট করে?'

মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

'ঘরে আর কিছু নেই, কাল খাবে কি?'

'কৃষ্ণ খাওয়াবেন।'

প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পোষণ।

সন্ধ্যের দিকে মাকে নিভৃতে ডাকল নিমাই। দু' তোলা সোনা মার হাতে দিয়ে বললে, 'কৃষ্ণ পাঠিয়ে দিলেন। এ দিয়ে যত দিন চলে, সংসার খরচ করো।'

'সে কি!' অবাক হয়ে গেলেন শচী: 'এ সোনা তুই কোথায় পেলি?'

নিমাই উত্তর করে না। পাশ কাটিয়ে চলে যায় হাসতে-হাসতে।

এ কি বিপদের মধ্যে এনে ফেলল। শুধু একবার নয়, যখনই অভাব হয় সংসারে, সম্বল-সঙ্কোচ হয়, নিমাই সোনা নিয়ে আসে। কার সোনা কোথা থেকে আনে কে বলবে! ধার করে, না, এ কি কোনো অমানুষী বিভূতি! ভাঙাতে ভয় পান শচী। কিন্তু না ভাঙালেই বা চলবে কেন? যাকে সোনা দিয়ে পাঠান বাজারে, তাকে বলে দেন, পাঁচ-দশ ঠাঁই দেখিয়ে-শুধিয়ে তবে ভাঙাবি। আমার ভারি ভয় করছে।

ভয়ের কিছু নেই, নিমাইই সব ধরে আছে, আচ্ছাদন করে আছে।

ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিল কৃষ্ণ। মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি? জীবের পালন-পোষণের ব্যাপারে ইন্দ্র কি করবে? সুতরাং ভয় পেয়ে ইন্দ্রকে পূজো করবার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বয়ং ঈশ্বর বলে ইন্দ্রের গর্ব, তাই কৃষ্ণাধীন গোপেদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হল

দেবরাজ। প্রলয়ঙ্কর মেঘসমূহকে আদেশ করল, প্রবল বেগে বর্ষণ করো, বিধ্বস্ত করো গোপরাজ্য। বাচাল বালক, অবিনীত, পণ্ডিতমানী, অজ্ঞ, মর্ত্য কৃষ্ণকে অবলম্বন করে গোপেরা আমার পূজা বন্ধ করেছে, এ অপমান অসহ্য। বনবাসী গোপের ধনৈশ্বর্য বেশি হয়েছে বুঝি? ওদের ঐশ্বর্যমদ নিশ্চিহ্ন করে দাও।

মেঘসমূহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে এল দিগ্বিদিক ছেয়ে। ছুটে এল প্রচণ্ড প্রভঞ্জন। বিদ্যুন্মালায় উজ্জ্বলীকৃত হয়ে ছুটে এল বজ্র। জল আর শিলা ঝরতে লাগল অবিচ্ছেদে। গোপগোপীরা প্রথমে গৃহমধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করল কিন্তু ক্রমে সমস্ত পৃথিবী পরিপ্লাবিত হলে, উচ্চাবচ সমস্ত স্থান একাকার হয়ে গেলে তারা বাতে ও শীতে কাঁপতে-কাঁপতে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। বলতে লাগল, 'হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ, হে ভক্তবৎসল, কুপিত ইন্দ্রের থেকে এখন আমাদের রক্ষা করা তোমারই কর্তব্য।'

'আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ হতে দিইনি, তাই ইন্দ্র আমাদের ধ্বংস করতে অকাল প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই এই অত্যুগ্র অতিবাতসহ শিলা-জল বর্ষণ।' কৃষ্ণ অভয় দিল সকলকে। 'আমি নিজ ক্ষমতায় এর প্রতিকার করব। যে সব দেবতার সদ্‌ভক্তি আছে তারা গর্বভরে কখনো নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবে না। কিন্তু ইন্দ্রের মোহ জন্মেছে। আমি অভিমান ভঙ্গ করি, অসাধুর তাতে বিনয়ই উৎপন্ন হয়। আমিই গোষ্ঠের শরণ্য ও নাথ, গোষ্ঠই আমার পরিবার, আমিই আত্মযোগ দ্বারা এই গোষ্ঠ রক্ষা করব, এ আমি নিশ্চয় করছি।'

বালক যেমন অনায়াসে একহাতে ছাতা মেলে ধরে তেমনি অবলীলায় সাত বছরের কৃষ্ণ বাঁ হাতে গোবর্ধনগিরি উত্তোলন করল। দক্ষিণ হাত দক্ষিণ কটিতে রেখে দাঁড়াল বঙ্কিম হয়ে। গোপগোপীদের সম্বোধন করে বললে, 'সমস্ত লোকজন শকট গোধন নিয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করুন। আপনারা ভয় করবেন না যে আমার হাত থেকে পাহাড় পড়ে যাবে। বাত ও বৃষ্টি থেকে আপনাদের উদ্ধার করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।'

যথাসুখে ব্রজবাসীরা ভৃত্য পুরোহিতসহ সমস্ত উপজীবীদের নিয়ে গিরিকন্দরে আশ্রয় নিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করে কৃষ্ণ সাত দিন পর্বত ধরে রইল, মুহূর্তের জন্যেও স্থান থেকে বিচলিত হল না। কৃষ্ণের বিক্রম দেখে ইন্দ্রের মোহ দূরীভূত হল, ভ্রষ্টসঙ্কল্প হয়ে মেঘসমূহকে প্রত্যাহার করল। বাতবর্ষণ থেমে গেল, নির্মেঘ আকাশে দেখা দিল সূর্য। ব্রজবাসীরা স্ত্রী-পুত্র ধনসম্পত্তি গো-শকট সব কিছু নিয়ে বেরিয়ে এল একে-একে। সকলে স্তব করতে লাগল, ইন্দ্রের গর্বাপহারী গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। 'পিতাগুরুস্ত্বং জগতামধীশ'— এই বলে ইন্দ্রও শরণ নিল কৃষ্ণের।

সকলের সমক্ষে কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধনকে তার পূর্বস্থানে নামিয়ে রাখল।

'এই অনাথ ছেলেটাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম।' শচী দেবী কেঁদে পড়লেন গঙ্গাদাসের কাছে। 'একে যদি তুমি একটু যত্ন করে লেখাপড়া শেখাও—'

'নিশ্চয়ই শেখাব।' গঙ্গাদাস মহা খুশি। 'নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনি কিছু ভাববেন না। এর বাপ নেই বলে কোনো বিঘ্ন হবে না।'

টোলে সর্বোত্তম প্রথম ছাত্র নিমাই। বয়েস আর কত হবে? তেরো-চৌদ্দ। ঢের-ঢের বুড়ো-বুড়ো ছেলেরাও পড়ছে সেই টোলে, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি। কিন্তু বিদ্যায় নিমাই সর্বপ্রধান। সর্বক্ষণ ডুবে আছে বিদ্যারসে। স্নানে ভোজনে পর্যটনে সর্বত্র শাস্ত্রকথা। সকলকে তর্কে নামাও। তারপরে পরাস্ত করো। অন্য টোলের ছাত্র হলে তো কথাই নেই। পায়ে পড়ে যুদ্ধ করবে। স্নানের ঘাটে হলেও ছাড়বে না। এ ঘাট থেকে ও ঘাটে ভেসে যাবে। এমন কি দরকার হলে সাঁতরে গঙ্গা পার হয়ে চলে যায় ওপারে, সূত্র স্থাপন করে নিজের ব্যাখ্যা আবার নিজেই খণ্ডন করে আসে।

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব-মনোহর॥
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন।
কি বা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন॥
যেই দেখে সেই এক দৃষ্ট্যে রূপ চায়।
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়॥

অদ্বৈত আচার্যের আশ্রিত কমলাকান্ত। কমলাকান্তর উপরই অদ্বৈতের ব্যবহারিক বিষয়ের ভার। কমলাকান্তই অদ্বৈতের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখে। অদ্বৈতের সঙ্গে কমলাকান্ত এসেছে নীলাচলে। অদ্বৈতের তখন কোথায় তিন শো টাকার মত ঋণ ছিল, অদ্বৈতকে না জানিয়ে কমলাকান্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে চিঠি লিখে পাঠাল টাকা চেয়ে। লিখে পাঠাল, অদ্বৈত স্বরূপত: ঈশ্বরতত্ত্ব, দৈবে তার কিছু ঋণ হয়েছে—তিনশোর মত টাকা পেলে তার ঋণ পরিশোধ হয়, রাজা যদি অনুকূল হন।

চিঠি প্রতাপরুদ্রের কাছে পৌঁছুবার আগেই কি ভাবে কে জানে গৌরাঙ্গের হাতে এসে পড়ল। এ কি অন্যায় কথা। পত্রে অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে, তাতে না হয় কিছু দোষ নেই, কেননা, 'আচার্য দৈবত ঈশ্বর,' কিন্তু তাই বলে দৈন্য জানাবার কী হয়েছিল? যে ঈশ্বর সে কি দরিদ্র? অদ্বৈতের দারিদ্র্যের ইঙ্গিত করে কমলাকান্ত তার ঈশ্বরত্বকে খর্ব করেছে। এ অপরাধের শাস্তি বিধেয়।

মহাপ্রভু তাঁর সেবক গোবিন্দকে বললেন, 'আজ থেকে কমলাকান্তকে এখানে আসতে দেবে না।'

'দ্বারমানা' হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে কমলাকান্ত ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য আনন্দিত। বললে, 'কমলাকান্ত, এ দণ্ড তোমার প্রতি প্রভুর অসীম অনুগ্রহ। স্নেহ না থাকলে কি এমন দণ্ড কেউ দেয় কখনো? তাই এ তোমার দণ্ড নয়, এ প্রসাদ। তুমি ভাগ্যবান।

কমলাকান্তকে ডেকে পাঠালেন গৌরাঙ্গ।

দণ্ডিতকে আবার ডেকে পাঠালেন। অদ্বৈত অনুযোগ করতে লাগল, 'এর উপর আবার দর্শন দিচ্ছেন কমলাকান্তকে!'

মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

'কমলাকান্ত দু ভাবে আমাকে বিড়ম্বিত করেছে।' বলতে লাগল আচার্য, 'প্রথমত আমাকে না জানিয়ে রাজার কাছে অর্থভিক্ষা করেছে; দ্বিতীয়ত, আমি ঈশ্বর নই অথচ আমার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছে।'

প্রসন্নবরদ মূর্তিতে তাকিয়ে রইলেন মহাপ্রভু। এ তো অদ্বৈতের অভিযোগ নয়, কৃপালুর প্রতি প্রণয়কোপ। যে দণ্ডার্হ তার প্রতিও করুণার উৎসার। যে বিতাড়িত তাকেও আবার নিমন্ত্রণ।

'ও রকম করো কেন?' মহাপ্রভু কমলাকান্তকে বললেন, 'এতে আচার্যের লজ্জা ও ধর্মহানি হয়না? নিজের অভাব জানানোই তো লজ্জা আর রাজার ভিক্ষা গ্রহণ করাই তো ধর্মহানি। শোনো, বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর রাজার মত বিষয়াসক্ত আর কে আছে? আর চিত্ত যদি মলিন হয় কৃষ্ণস্মরণ হয় না। আর কৃষ্ণস্মৃতির স্ফূর্তি যদি না হয় তা হলে জীবন অর্থহীন।'

প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিস্ফল জীবন॥

শুধু কৃষ্ণভজন করো। অন্য কামনা করেও যদি কেউ কৃষ্ণভজন করে, কৃষ্ণরসে কাম ধুয়ে যায়। কাচের অন্বেষণ করতে-করতে ধ্রুব পেয়ে গেল পরমরত্ন। পিতৃসিংহাসন পাবার জন্যে কৃষ্ণকে ডেকেছিল, কৃষ্ণ এসে দাঁড়াতে আর সিংহাসনের বাসনা রইল না। বললে, আমি কৃতার্থ, আমার আর অন্য বরের প্রয়োজন নেই।

কৃষ্ণ তো বলতে পারতেন, তুমি সিংহাসন চেয়েছ, সিংহাসন নিয়েই তুষ্ট থাকো, আমাকে চাইছ কোন হিসেবে? কিন্তু না, কৃষ্ণকৃপার এই তো বৈশিষ্ট্য। না চাইলেও দিয়ে দেন যা সত্যিকার চাইবার। ছেলে মাটি খাচ্ছে দেখতে পেয়ে মা তার মুখের মাটি ফেলে দিয়ে মিষ্টি পুরে দেন—এও তেমনি। বিষয়সুখের জন্যে কৃষ্ণভজনা করছে, অমৃত ছেড়ে বিষ, এ তো মূর্খের আচরণ। কৃষ্ণ তো সর্ববিজ্ঞ, তিনি মূর্খতাকে অনুমোদন করবেন কেন? সর্বকামনার আচ্ছাদক, সর্বকামনার পরিপূরক নিজ পাদপল্লব দিয়ে দেবেন। 'আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।' 'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥' সাধক প্রার্থনা না করলেও যা সত্যি প্রার্থিতব্য, সেই দুর্লভ সেই অপ্রাপ্য সেই অগোচর বস্তুই তাকে দিয়ে দেন বাসুদেব। 'কামলাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥'

রায়-স্বরূপের গলা ধরে মহাপ্রভু কাঁদছেন আর বলছেন, বান্ধব, আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা শোন। আমার কৃষ্ণ সর্বচিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।

'শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর। আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তহর।' যে আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা কণামাত্র শুনবে তার এই মাধুর্যের লোভে সব কিছু ছাড়তে হবে, লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহ-গেহ-ভোগ-তৃষ্ণা। নিষ্কিঞ্চন যোগী হয়ে ভিক্ষা মেগে খেতে হবে। কায়ক্লেশে জীবন ধারণের জন্যেই তো ভিক্ষা, দেহ না থাকলে কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করব কি করে? গোপীরা আর কী তপস্যা করেছিল? শুধু নেত্র ভরে কৃষ্ণরূপমাধুরী পান করেছিল আর নিজেদের নয়নমন-তনুকে শ্লাঘা করেছিল অনুক্ষণ। 'কান্তাভাব সাধ্যশিরোমণি।' যে রাগমার্গে থেকে শুধু অনুরাগে কৃষ্ণকে ভজনা করে তারই কাছে কৃষ্ণমাধুর্য সুখলভ্য। 'কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, তার কৃষ্ণ-মাধুর্য সুলভ।'

মুরারি গুপ্তের সঙ্গেই নিমাইয়ের বেশি ঝগড়া। শিশুজ্ঞানে নিমাইয়ের সঙ্গে তর্কে নামতে চায় না মুরারি, আর তারই জন্যে নিমাইয়ের আক্রোশ! আমি শিশু!

'যাও, যাও, বদ্যির ছেলে, রুগী-পত্তর নিয়ে থাকোগে।' নিমাই গঞ্জনা দিয়ে ওঠে, 'লতা-পাতা ঘাঁটো গে যাও। এ ব্যাকরণ শাস্ত্র, এতে তোমার কফ পিত্ত-অজীর্ণের কথা লেখা নেই। যাও ফিরে যাও, তোমার রুগীদের নিয়ে পড়ো গে।'

রুদ্র-অংশ মুরারির হঠাৎ চটে ওঠার কথা। কিন্তু মুরারির কি হয়েছে, নরম হয়ে গিয়েছে।

বেশ, যখন বলছ এত করে, ধরো তর্কের সূত্র ধরো। অর্থ বলো, আমি তা খণ্ডন করব এবং যখন আমার যুক্তিতে তোমার আস্থা হবে তখন দেখবে তোমার প্রথম অর্থই আবার প্রতিষ্ঠিত করেছি নতুনতরো যুক্তির জোরে। বেশ তো, এ পদ্ধতি উভয়ত।

কেউ কারু সঙ্গে এঁটে উঠছে না। তখন হঠাৎ নিমাই মুরারির পায়ে হাত রেখে স্পর্শ করল।

শিহরভরা সর্বাঙ্গে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মুরারি। প্রাকৃত মানুষ নয় এই পুরুষ। তা না হোক, কিন্তু মুরারি কি জানে কার প্রভাবে তার এত পাণ্ডিত্য! এত চাতুর্য-প্রাচুর্য!

'মুরারি, কৃষ্ণ ভজনা করো।' দিনের পর দিন বলছেন মহাপ্রভু।

'কৃষ্ণ?' দ্বিধায় জড়ানো মুরারির কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়, সর্বরসময় নির্মল প্রেম।'

'তুমি বলছ, কৃষ্ণকে ধরব?'

'হ্যাঁ, কৃষ্ণ বিনা উপাসনা নেই। কৃষ্ণই বিদগ্ধ-মধুর রসিকশেখর।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ—' মহাপ্রভুর প্রতি গৌরববুদ্ধির বলে শেষ পর্যন্ত রাজি হল মুরারি। বললে, 'আমি তোমার কিঙ্কর, কত আর তোমার আদেশ লঙ্ঘন করব। কালই দীক্ষা দিও আমাকে।'

ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসল মুরারি। সমস্ত রাত কেঁদে কাটাল। তার রঘুনাথের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে রাম, রঘুনাথ, তোমাকে আমি কেমন করে ছাড়ব? তোমার চেয়ে আমার কাছে আর কেউ বড় নেই, কারুর হতে নেই। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না কিছুতেই। যদি তোমাকে ছাড়তে হয় তা হলে আজ রাত্রেই যেন আমার প্রাণ যায়।'

পরদিন সকালে উঠে কাঁদতে-কাঁদতে মহাপ্রভুর পায়ে এসে পড়ল মুরারি। বললে, 'তোমার বাক্য লঙ্ঘন করি এ আমার সাধ্য নয় অথচ আমার রামত্যাগও অসাধ্য। এখন তবে উপায় কী! একমাত্র উপায় আমার মৃত্যু। আমাকে এখুনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে দাও।'

মহাপ্রভু মুরারিকে তুলে নিলেন ধুলো থেকে। আলিঙ্গন করে বললেন, 'গুপ্ত, তুমি ধন্য। আমার কথায়ও তোমার মন টলল না, তোমার সুদৃঢ় ভজনকে সাধুবাদ করি। তুমি শ্রীরামকিঙ্কর হনুমান, তুমি কেন আমার কথায় তোমার রঘুনাথকে ত্যাগ করবে? তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখবার জন্যেই আমি তোমাকে কৃষ্ণভজনের কথা বলেছিলাম। তোমার রামই তোমার তত্ত্ববস্তু।'

মুরারি রাম বলুক, রাম ভজুক, তুমি দেহ ধরেছ কি করতে, যদি না কৃষ্ণ বলো! 'একই বিগ্রহ ধরে নানাকার রূপ।' আর তোমার এই দেহই সেই বিগ্রহের মন্দির। এই দেহের মধ্যেই সেই আনন্দ-সন্দোহের বাসা।

হেন দেহ পাইয়া না হইল কৃষ্ণে রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে॥

[ক্রমশঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ

[বেদব্যাসকৃত সটীক মহাভারতের একক বঙ্গানুবাদক]

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস লিখিত মহাভারতের ষাট লক্ষ শ্লোকের মধ্যে এক লক্ষ পেয়েছিল এই মর্ত্ত্য ভূমি। যুগ যুগ ধরে মরলোক রসাস্বাদন করেছে পঠনে বা শ্রবণে এই অমৃতময়ী লেখনীসম্ভার। কিন্তু ঋষিদের ভাষা সংস্কৃতের হতে লাগল রূপান্তর সারা আর্য্যস্থানে—উদ্ভব হল বিভিন্ন ভাষাভাষীদের। যুগপৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা, দর্শন ইত্যাদির আধার মহাভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ইদানীং কালে বর্দ্ধমানের মহারাজা ছাব্বিশ বছরে, তের জন পণ্ডিতের সহায়তায় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ সতর বছরে, সতের জন পণ্ডিতের মাধ্যমে পুণার ভাণ্ডারকর সমিতি সতের জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় মূল ও অনুবাদ করেলেন—কিন্তু একক প্রচেষ্টায়—বিশ বছর দশ মাস সতের দিনের পরিশ্রমে—এক লক্ষ শ্লোকের মূল, তৎরচিত নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা আর শেষে মূলের পাঠান্তর—বর্ত্তমান শতাব্দীর এক অসাধ্যসাধন ও সুমহান অবদান। এই দুরূহ কর্ম্মসম্পাদনায় হোতা হলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়—তিরাশী বৎসর বয়স্ক যে মহামানবকে প্রথম দর্শনে আমার প্রণতি জানাতে তিনি উচ্চারণ করলেন স্বস্তিবাচন।

৺গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার ও ৺বিধুমুখী দেবীর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিদাস ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামে ১৮৭৬ সালের ২৪শে অক্টোবর রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। নব ভারতের নৈমিষারণ্য কোটালিপাড়া পরগণার কল্যাণে আমরা পেয়েছি রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শশিকুমার শিরোমণি, আশুতোষ তর্করত্ন দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি নৈয়ায়িককে, নীলকণ্ঠ তর্কবাগীশ, সীতানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি স্মার্তকে, কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি বৈয়াকরণিককে, কালিদাস বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি আলঙ্কারিককে, গঙ্গাধর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি জ্যোতিষীকে। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর যজুর্বেদীয় কাশ্যপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর জ্যেষ্ঠ সহোদর যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ হলেন শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে পিতামহের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে পাঠশালায় বাংলা—এগার বৎসরে কলাপব্যাকরণ ও টোলে সন্ধিবৃত্তি—পরে ব্যাকরণ পড়া শেষ করেন। পনের বৎসর বয়সে গ্রামের আর্য্যশিক্ষা সমিতিতে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে শব্দাচার্য্য উপাধি ও ছ'শ টাকা পান। সেই সময় তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্য রচনা করতেন এবং কংসবধ নাটক রচনা করেন। আঠার বছরে সংস্কৃতে 'জানকীবিক্রম' নাটক, 'বিয়োগ বৈভব' খণ্ডকাব্য ও 'বৈদিকবাদ-মীমাংসা' ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন, ক্রমশঃ তিনি কাব্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা পিতার নিকট পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ, আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ, ঢাকা সারস্বতসমাজের পুরাণশাস্ত্র উপাধি পরীক্ষা, স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষা, সাংখ্যরত্ন উপাধি, সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি প্রভৃতিতে অশেষ-

গুণপণার পরিচয় দিয়ে বৃত্তিলাভ করেন। ১৩২৩ সালে কাশীধামস্থ ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল তাঁকে 'মহোপদেশক' উপাধি দেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাগ্মিতাও প্রকাশ পায়। যখন তিনি স্মৃতিপাঠরত, তখন সেনদিয়া গ্রামে অম্বিকাচরণ মজুমদারের মায়ের শ্রাদ্ধবাসরে শশধর তর্কচূড়ামণির তন্ত্রশাস্ত্রখণ্ডন বক্তৃতার বিরুদ্ধে এবং পরে চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার রমণীমোহন রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধের সভায় মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ও জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের সঙ্গে সমস্যাপূরণ বিষয়ে আলোচনায় বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিকট সমাদৃত হন। ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসে এক অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মহাভারতের পাঠক হিসাবে এক দিনে এর পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৩১২ সালে কোটালীপাড়ার আর্য্যবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে পরের বছর অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে কলকাতায় আসেন। সেই সময় কালীঘাটে শ্বশুরালয়ে থেকে তিনি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচার করতে আরম্ভ করেন। ১৩১৪ সালে তিনি নকীপুরের জমিদারগৃহের পুরোহিত, ও সভাপণ্ডিত এবং স্থানীয় টোলের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এখানে থাকার সময় তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে নানাবিধ কীর্ত্তিকাহিনী শুনতেন এবং 'বঙ্গীয় প্রতাপ' নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। এর

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

পর রুক্মিণীহরণ মহাকাব্য ও স্মৃতিচিন্তামণি ব্যবস্থাগ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপুরে থেকে কলকাতায় বই ছাপাতে অসুবিধা হওয়ায় ১৩২৭ সালে তিনি একটি মুদ্রণাগার স্থাপন করেন।

১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে ডক্টর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে তিনি পুরী থেকে বসবাস আরম্ভ করেন। কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী ও স্যার দেবপ্রসাদের উৎসাহ উদ্দীপনায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বেদব্যাস প্রণীত সটীক মহাভারতের মূল, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা ও সর্বনিম্নে মূলের পাঠান্তরসহ বঙ্গানুবাদ ১৩৩৬ সালের ৩রা শ্রাবণ আরম্ভ ও ১৩৫৭ সালের ১১'শ জ্যৈষ্ঠ সমাপ্ত করেন। আদিপর্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ১লা পৌষ ও স্বর্গারোহণ পর্বের শেষ খণ্ড মুদ্রিত হয় ১৩৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাগজের অভাব ও ১৩৪৬ সালের দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ সাত বছর কাগজ বন্ধ থাকে। ৫৫১তম খণ্ডে সম্পাদিত গবেষণামূলক অনুবাদে আছে ১০০ উপপর্ব, ২১৬০ অধ্যায় ও এক লক্ষ শ্লোক (হরিবংশ সহ), এই দুরূহ কর্মে তিনি ব্যয় করেছেন দেড় লক্ষ টাকা—তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার দিয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার আর জনসাধারণ দিয়াছেন ছ' হাজার টাকা।

সাংসারিক অভাব-অনটন, অর্থাভাব, স্ত্রীর ও মায়ের মৃত্যু, পর পর মারাত্মক বসন্ত ও কলেরায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রাত্যহিক পূজার্চনার পর প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা মহাভারতের অনুবাদ কর্মে মগ্ন থাকতেন।

প্রথম আরম্ভের সময় তিনি প্রায় ছ'শো জনকে মহাভারতের গ্রাহক হিসাবে পাবার নিশ্চয়তা পান। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী বেদান্তরত্ন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের কাজ সমাপ্ত হ'ল, তখন পুরোন গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই পরলোকে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিভিন্ন সময়ে বারটি মূলগ্রন্থ, পাঁচটি অমুদ্রিত মূলগ্রন্থ ও চৌদ্দটি মুদ্রিত টীকাগ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে রুক্মিণীহরণ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে এবং তৎপ্রণীত 'বঙ্গীয়প্রতাপ', ও 'মেবার প্রতাপ' নাটকদ্বয় মিনার্ভা ও ষ্টার মঞ্চে সু-অভিনীত হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পর তাঁর মত সংস্কৃতে বহু গ্রন্থকার ভারতে আর দেখা যায় না।

সারা বাঙ্গালার সংস্কৃতের বিশিষ্ট অধ্যাপকদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর ছাত্র এবং বিভিন্ন স্থান থেকে এ পর্য্যন্ত তিনি এগারটি উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর প্রথম দুই ছেলে শশিশেখর ও হেমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তৃতীয় যোগেশচন্দ্র ছিলেন জিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ও চতুর্থ ভবেশচন্দ্র করেন অধ্যাপনা।

অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বীর আদর্শ ও নিষ্ঠা অতুলনীয়! আয়ব্ধকর্ম সুসম্পন্ন হওয়ায় আজ তিনি আনন্দিত—বংশের সংস্কৃত শিক্ষাধারা অব্যাহত রাখায় মহাকবি সন্তুষ্ট কিন্তু বিগত ত্রিশ পুরুষের এই গরিমা কি ভবিষ্যতে বজায় থাকবে? আসার সময় মনে হ'ল বাংলা তথা ভারতের এই কৃতী সন্তানের হৃদয়ে যেন এই চিন্তাই বার বার ছায়াপাত করছে।

ডাঃ শ্রীশিবপ্রসন্ন মিশ্র

[বিশিষ্ট স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ]

"প্রত্যেক চিকিৎসাধীনা রোগিণীকে তোমার মাতা বা ভগিনীর ন্যায় দেখিবে ও তাদের সহিত সেই মত ব্যবহার করবে—নিজের মা বা বোন অসুস্থা হলে তোমার যেরূপ মানসিক অবস্থা হয়—রোগিণীর আত্মীয়স্বজনেরও ঠিক সেই রকমই। সেই জন্যে শেষোক্ত জনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে—আর চিকিৎসাজীবনে অর্থলোভ করিবে না"—বাবার দেওয়া উপদেশবাণী আজও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র

স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ শ্রীশিবপ্রসন্ন মিশ্র। নিজের চিকিৎসাশালায় প্রকৃত অর্থাভাবগ্রস্তা দুঃস্থা রোগিণীদের প্রায়ই তিনি চিকিৎসা করে থাকেন বিনা দক্ষিণায়।

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যশোহর জেলার সামটা গ্রামে শ্রীসতীনাথ মিশ্র ও শ্রীমতী রামলতা দেবীর বড় ছেলে শিবপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয়ও সেই গ্রামেই। বাবা সতীনাথ বাবু ১৯০৫ সালে আবিষ্কার করেন চক্ষুরোগের জগদ্বিখ্যাত ঔষধ 'পদ্মমধু'। এঁরা হলেন কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণবংশ। বাঙ্গালায় আসেন সম্রাট আকবরের সময়। শিবপ্রসন্ন গ্রামের স্কুলে, যশোহর জেলা স্কুলে ও মিত্র ইনঃ-এ কিছুদিন পড়িবার পর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় কুলটি বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা ও স্কটিশ চার্চ

কলেজ হইতে ১৯২৯ সালে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কারমাইকেল (বর্ত্তমানে আর-জি-কর) মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে পড়ার সময় তিনি বরাবর পদক ও ধাত্রীবিদ্যায় বৃত্তিলাভ করে ১৯৩৫ সালে এম, বি, পাশ করেন। পরে সেখানে দু বছর দু মাস রেসিডেণ্ট হাউস সার্জ্জেন হিসাবে যুক্ত থেকে ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন। সেখানে দশ মাসের ভিতর L. R. C. P. M. R. C. S. ও M. R. C. O. G. তে উত্তীর্ণ হয়ে এডিনবরায় গমন করেন কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ভারতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। আর, জি, কর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম M. R. C. O. G. এখানে এসে তিনি উক্ত কলেজেই প্রথমে প্রসূতিবিভাগে রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন, পরে ভিজিটিং সার্জ্জেন ও বর্ত্তমানে অধ্যাপকরূপে কাজ করছেন। এছাড়া তিনি অস্থায়ী ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট (১৯৪২), ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল (১৯৫৭) ও অধ্যক্ষ (১৯৫৮) পদে বৃত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি F. R. C. O. G. হন। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর লেখনী চালনায় মুগ্ধ হইয়া নিউইয়র্ক মেডিক্যাল কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা ডাঃ রিকি (Ricei) ডাঃ মিশ্রকে নিজের লেখা কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। ১৯৫২-৫৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি আর, জি, কর কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ছাত্রমহলে, অধস্তন-কর্ম্মচারীমহলে, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে ও আর্ত্ত-আতুরদের মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা, সুমধুর ব্যবহার, পরিচালন-দক্ষতা ও দরদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

নিজের পেশা ছাড়াও সমাজসেবী হিসাবে শিবপ্রসন্ন এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। প্রথম বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান I. N. A. C. ১৯৪৫ সালে কয়েকজন সহকর্ম্মীসহ ডাঃ মিশ্র গঠন করেন। ১৯৪৬ সালে ডাঃ সুবোধ মিত্র, ডাঃ মিশ্র ও অন্যান্য কয়েকজন মিলে R. W. A. C. প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনেহরু এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কলিকাতায় দাঙ্গায় পাঞ্জাব, দিল্লী, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমাজ-সেবার কাজে সরকারী ও বেসরকারী মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। ডাঃ মিশ্র প্রতিটি স্থানে দলের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি ষ্টুডেণ্টস হেল্থ হোম, রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে কার্য্যকরী ভাবে জড়িত আছেন।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন এবং বর্ত্তমানে খেলার মাঠে ও বিশিষ্ট মঞ্চাভিনয়ে তিনি নিয়মিত দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ ছাড়া ছবি তোলা ও রঙীন মৎস্য-পালন—তাঁর অবসর বিনোদনের অন্যতম অঙ্গ।

ভারত বিভাগের পর তাঁর স্বগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় তিনি আর সেখানে যেতে পারেন না—কিন্তু বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় যেখানে কেটেছে—সেই বাড়ী, বাগান, পাঠশালার কথা আজও তাঁর মানসচক্ষে উদিত হয়—আর যে গৃহে দিকপাল সাহিত্যিক ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিথি হতেন—যে স্থানে সুবিদিত মধুসূদন কিন্নরের ঢপ প্রথম সুরু হয়—সেই সুন্দর, সুসজ্জিত, জেলে-আসা গ্রামের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ মিশ্রের প্রাণস্পর্শী বেদনাবোধ সমগ্র অন্তরকে অভিভূত করে তোলে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার

[অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক]

সংবাদপত্রকে বলা হয় Fourth Estate. কারণ সমাজ গঠনে, জাতি গঠনে, দেশ গঠনে ও জনমত গঠনে ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু সুপরিচালিত সংবাদপত্রের পিছনে থাকেন একদল নিরলস প্রচারবিমুখ কর্ম্মী—যাঁহাদের দেশাত্মবোধ রাজনৈতিক নেতাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম বা হীন নয়। এইরূপ একজন হইলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও বর্ত্তমানে অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার।

৺রামচন্দ্র সরকার ও ৺রাধারাণী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে উড়িষ্যার জাজপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃভূমি রাণাঘাট কিন্তু ডাক বিভাগে চাকুরীর জন্য পিতার সহিত তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বহু স্থানে অবস্থান করেন। দাদামহাশয় ৺কৃষ্ণকান্ত সরকার কটক সহরের একজন বিশিষ্ট বাসিন্দা ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালে বিহার শরীফ স্কুল হইতে প্রবেশিকা, ১৯১৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজ ও ১৯১৮ সালে ইংরাজীতে অনার্সসহ সেণ্ট পলস কলেজ হইতে যথাক্রমে আই, এ ও বি, এ পাশ করেন। ১৯২১ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চাকুরী করার জন্য মধ্যে চারি বৎসর পড়াশুনা বন্ধ রাখেন।

বিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ অল্পবিস্তর সাংবাদিকতার প্রতি অনুরক্ত হন। সুযোগ পাইয়া তিনি ১৯২৩ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রুফ রীডার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে উহার সহঃ-সম্পাদক ও ১৯২৮ সালে এ্যাসিস্টাণ্ট এডিটর ১৯৫৩ সালে তিনি প্রথম অস্থায়ী সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

মার্কিণ সরকারের ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ১৯৫৮ সালে দুই মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। তথায় সুবিখ্যাত সংবাদপত্রগুলির দপ্তরে তাহাদের উন্নততম কর্ম্মপদ্ধতি লক্ষ্য করেন কিন্তু উহাদের সংবাদ পরিবেশন (Display oF News) তাঁহার ভাল লাগে নাই। তাছাড়া ভারতবর্ষের সংবাদ খুবই কম প্রকাশিত হয়। সেই সময় ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের ব্যবস্থাপনায় তিনি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার

আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করেন। এই কেন্দ্রগুলির বেদান্ত চর্চা আমেরিকার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য হইয়াছে এবং পরমপুরুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবসাধনা তাঁহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা শ্রীসরকার লক্ষ্য করেন। তিনি মনে করেন যে, তথায় ভারতের বেদান্ত চর্চার প্রসারের প্রচারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল উক্ত মিশনগুলি হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা একেবারে পরিবর্ত্তিত জীবনযাত্রা যাপন করিয়া থাকেন। ফিরিবার পথে তিনি দুই সপ্তাহ ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করেন কিন্তু যুদ্ধোত্তর গ্রেট ব্রিটেন তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করে নাই।

বর্ত্তমান বৎসরে তিনি পশ্চিম জার্ম্মাণ সরকারের নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। তথাকার সংবাদপত্র সমূহ আকারে এদেশীয় সংবাদপত্রাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র কিন্তু তদ্দেশীয় ভাষা আয়ত্ত না থাকায় শ্রীসরকার সংবাদ পরিবেশনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। তিনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্ম্মাণীর বিদেশীয় আর্থিক সাহায্যে পুনরুত্থান। আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু জার্ম্মাণ জাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পরিশ্রম, বুদ্ধি ও আবালবৃদ্ধ-বনিতার কর্ম্মতৎপরতায় তথাকার বেকার সমস্যা নিশ্চিহ্ন। আজ জার্ম্মাণী শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতের বাহিরে যদি কোন উন্নত দেশ দেখিতে হয়, তবে প্রথমেই জার্ম্মাণী পরিদর্শন প্রয়োজন। কারণ, অল্প সময়ে একটি পতিত দেশ ও জাতি কি ভাবে সর্ব্বদিকে উন্নয়নের পথে আগুয়ান হইয়াছে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পশ্চিম জার্ম্মাণী।

যতীন্দ্রনাথ আকাশবাণী হইতে "আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে" প্রায়ই বক্তৃতা দিয়া থাকেন। "মাসিক বসুমতী" যে বিবিধ রচনাসম্ভারে আজ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা শ্রীসরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার কাছে ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মান্না

[প্রাক্তন ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুবিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়]

সম্মান ও জয়ের উচ্চ শিখরে উঠেও অহমিকাকে দূরে ঠেলে নিজের নিরভিমান ব্যবহার ও মধুর স্বভাবে লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে জয় করেছেন এমনি এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন সুবিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মান্না।

হাওড়া জেলার বাঁটরা গ্রামে ১৯২৪ সালে শ্রীমান্না জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীফণীন্দ্রনাথ মান্না। ছোটবেলা থেকেই শ্রীমান্নার ফুটবল খেলায় বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কলকাতার রিপণ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পড়তে আসেন। তাঁর খেলার খ্যাতি তখনই এখানে ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, এর কিছুদিন আগেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে Wallace Regiment-এর বিরুদ্ধে খেলে তিনি সকলের মনে সাড়া জাগিয়ে দিলেন। কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ গ্রহণ করতে থাকেন এবং পরিশেষে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। ১৯৪২ সালে তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন। তাঁর উন্নত ধরণের খেলা ক্রমেই দর্শকদের চিত্ত জয় করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে তিনি লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সহঃ-অধিনায়ক মনোনীত হন এবং ইংল্যাণ্ডে বহু প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যোগদান করে বিশ্বের দরবারে নিজেকে তুলে ধরেন। অলিম্পিকে যদিও ভারতীয় দলের পরাজয় ঘটেছিল তবু মান্নার ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মান্না

পরলোকগত রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ মান্নাকে অভিনন্দন জানিয়ে ব্যাকিংহাম রাজপ্রাসাদে এক চা-এর আসরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৫২ সালে তিনি হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। তাছাড়া বাংলাদলের সুদীর্ঘ কালের অধিনায়ক শৈলেন মান্না, এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রাশিয়ায় আমন্ত্রণমূলক খেলায় ভারতীয় দলকে পরিচালনা করেন। ভারতের ফুটবল খেলার ইতিহাসে ঐতিহ্যময় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের স্রষ্টাকারী মোহনবাগান দলে তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে খেলে আসছেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর প্রিয় দল বহু বার লীগ ও আই, এফ, এ শীল্ডে জয়যুক্ত হয়েছে।

তিনি রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড়। দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করাই শুধু তাঁর কাজ। দীর্ঘ খেলোয়াড়-জীবনে তাই সুষ্ঠু পরিচয় তিনি সব সময়েই দিয়ে এসেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ ফ্রিকিক ভারতের যে কোন গোলরক্ষকেরই আতঙ্ক। বহু বার তাঁর ফ্রিকিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলা নিষ্পত্তি হয়েছে; এমন কি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপও। তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে কোন খেলাটি জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা বলে মনে হয়েছে, প্রশ্ন করায় তিনি জানান, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলাটি তাঁর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজনাপূর্ণ খেলা।

ভারতীয় ক্রীড়াজগতের বহু যশ ও কীর্তির অধিকারী শ্রীমান্না বিশ্বের নানা প্রান্তে খেলেছেন। লক্ষ লক্ষ দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা তাঁকে সব সময়েই উৎসাহ দিয়েছে। তিনি খেলেছেন—ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং কলম্বো, বার্ম্মা, পাকিস্থান ইত্যাদি স্থানসমূহে। তাছাড়া ভারতে আগত বৈদেশিক দলগুলির বিরুদ্ধে ত খেলেছেনই, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মধুর স্বভাবে ও মিষ্ট ব্যবহারে তিনি সকলেরই প্রিয়। বর্তমানে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার একটি বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বহু যুদ্ধে জয়ী সেনাপতি শৈলেন মান্না ক্রীড়াঙ্গনে খেলোয়াড় হয়ে হয়ত আর নামবেন না, তবে তাঁকে খেলার মাঠেই দেখা যাবে এবার অন্যরূপে। আই, এফ এ ও মোহনবাগান কর্তৃক মনোনীত হয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড চলেছেন ফুটবল কোচিং শিক্ষা করতে। আমরা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম যে মানব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার পরিকল্পনা করিল অথবা নিজের প্রয়োজন মত জমি বন্দ্বছা চিহ্নিত করিয়া লইল, তখন আয়তক্ষেত্র (Rectangle) আকারেই করিল। তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবুদ্ধি তাহাকে এইরূপ আকার নির্ব্বাচন করিবার জন্যই প্রণোদিত করিল। এই কারণে দেখা যায় আয়তক্ষেত্রই মানবের চক্ষে সুন্দর দেখায়। হয়ত উহা চক্ষুর পেশী ও ধমনীর উপর অনুকূল ক্রিয়া করে। আমরা চক্ষুর সম্মুখে সচরাচর যে সমস্ত জিনিস দেখি, অথবা যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই আয়তক্ষেত্র আকারের যথা—দরজা, জানালা টেবিল, আলমারী, খাট, কপাট, চৌকাট, বই, কাগজ, ছবি, বাক্স, খামপোষ্টকার্ড, দীঘি, খেলার মাঠ প্রভৃতি। এ সমস্ত জিনিস আমরা গোলাকার ত্রিকোণাকার বা সমচতুর্ভুজ কল্পনা করি না তাহার কারণ তাহতে সুন্দর দেখাইবে না বলিয়া মনে করি। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কিরূপ অনুপাতে হইলে অধিক সুন্দর দেখায় ইহাও মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে অন্যান্য আকারের জিনিসও উদ্ভাবিত হইয়াছে বটে।

মানব সাধারণতঃ একটি জিনিসকে মনে মনে দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখে এবং একটি ভাগের সহিত অন্য ভাগের কোনও বিষয়ে পার্থক্য হইলে তাহা অসুন্দর বলিয়া মনে করে। এই কারণে দেখা যায় সামঞ্জস্যের কল্পনা সৌন্দর্য্যবুদ্ধির একটি ধর্ম। আমাদিগকে কেহ যদি একটি কলসীর চিত্র আঁকিতে বলে তাহা হইলে আমরা তাহা একেবারেই আঁকিতে আরম্ভ করি না। আমরা প্রথমতঃ কলসীটির দৈর্ঘ্যানুসারে একটি লম্বা (vertical) রেখা আঁকিয়া তাহাতে কলসীটির মুখ গলা ও পেটের স্থানে একটি করিয়া সমান্তরাল (horizontal) রেখা টানি এবং গলা ও পেটের মাপ দুই দিকে সমান ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া একদিকে যে স্থানে যেরূপ ভাবে বাঁকাইয়া রেখা টানি অন্যদিকেও তদ্রূপ ভাবে টানি অর্থাৎ লম্বরেখায় কাগজটা ভাঁজ করিলে যেন দুইটা দিক সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া যায়। অবশেষে ভিতরের রেখাগুলি রবার দ্বারা মুছিয়া দিই। একটি মানুষের ছবি আঁকিতে গিয়া যদি আমরা একটি হাত একটি চোখ ও একটি কান বিশিষ্ট মানুষ আঁকি তাহা সুন্দর হইবে না, অঙ্গহানি হইলেই সৌন্দর্য্য হানি হয়। কোটের একদিকে একটা পকেট আছে এবং অন্য দিকে পকেট নাই, একটি পায়জামার একদিকের পা তিন ফুট লম্বা ও অন্যদিকের পা দেড় ফুট, অথবা একদিকের রঙ সাদা অন্য দিকের রঙ লাল, একটি নারীর একদিকের কানে একটি কুণ্ডল এবং অন্য দিকের কানে একটি ফুল সৌন্দর্য্য বিধান করে না কারণ এখানে সামঞ্জস্যের অভাব। অসামঞ্জস্য হাস্যেরও কারণ হইয়া থাকে।

এইবার একটি অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দেখুন, এখানেও দেখা যায় আমরা উহাকে দুইটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমান ভাগে কল্পনা করিতেছি। সৌধটির একদিকে যদি একটি পুতুলের পরী, সিংহ বা সৈনিক থাকে তাহা হইলে অপর দিকেও তদ্রূপ একটি করিয়া থাকিতে হইবে। একদিকে একটি সৈনিক, অন্যদিকে একটি গাধা একদিকে একটি চূড়া অন্যদিকে একটি গম্বুজ, এক দিকে একটি গোলাকার থাম অন্য দিকে একটি ত্রিকোণাকার থাম থাকিলে সৌন্দর্য্যহানি ও হাস্যের কারণ হয়। শুধু একই প্রকারের জিনিস হইলেই চলিবে না, একই মাপেরও হওয়া চাই। একদিকে একটি বৃহদাকার সিংহ এবং অন্যদিকে একটি ইঁদুরের মাপের সিংহ বসাইলে চলিবে না। ইমারতের মধ্যেও একটা সঙ্গীত থাকে যাহাকে architectural harmony বলে।

একই জিনিসের নিয়মিত বিন্যাস সৌন্দর্য্যের কারণ হয়। রাস্তার দুইদিকে অথবা পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে যদি সমান্তরাল গাছ থাকে তাহা হইলে সুন্দর দেখায়, একই রকমের গাছ হইলে আরও সুন্দর দেখায় এবং একই মাপের গাছ হইলে আরও সুন্দর দেখায়। একই রকম পোষাকে সজ্জিত একটি সৈন্যের সারি সুন্দর দেখায়, তাহারা একসঙ্গে একই রূপ পদক্ষেপে চলিলে ভাল দেখায়। কিন্তু সারিগুলির প্রত্যেকটিতে যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য না থাকিয়া কোনওটিতে ১০ জন, কোনওটিতে ৩ জন, কোনওটিতে ৭ জন এইরূপ বিভিন্ন সংখ্যার হয় অথবা একটি সারির মধ্যে একজন সৈন্যের পরিবর্ত্তে একটি ষাঁড় বা মহিষ রাখা হয় তাহা সুন্দর দেখাইবে না। একই ছত্রের মধ্যে ছাপা বা হস্তলিখিত ছোট বড় অক্ষর ভাল দেখায় না। বাড়ির মধ্যে সিঁড়িগুলির ব্যবধান একই মাপের না হইয়া ৫, ৬, ৭, ৮ ইঞ্চি প্রভৃতি বিভিন্ন মাপের হইলে শুধুই যে উঠানামার পক্ষে অসুবিধাজনক হয় তাহাই নহে, চোখেও ভাল দেখায় না। পুকুরের শানবাঁধান ঘাটের একদিকে একটি বসিবার স্থান থাকিলে অন্যদিকেও তদ্রূপ একটি থাকিতে হইবে।

রঙও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য একটি জিনিস। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জিনিস হইতে মানবের মনের মধ্যে রঙের অনুভূতি জাগিতে লাগিল। তাহারা রঙ চিনিতে লাগিল এবং তাহাদের নামকরণও করিতে লাগিল, শুধু তাহাই নয় তাহারা রঙে রঙ মিশাইয়া বিভিন্ন নূতন নূতন রঙের পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে ফিকা ও গাঢ় রঙের স্তরও উপলব্ধি করিতে লাগিল। কোন জাতি কোন রঙটি পছন্দ করে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলা যায় না তবে মানব সাধারণতঃ মিশ্র রঙ অপেক্ষা মৌলিক রঙটাই অধিক পছন্দ করে। আবার কোন রঙের পাশে কোন রঙটি দিলে মানায় অর্থাৎ দেখিতে সুন্দর হয় তাহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের যেমন বাদী সুর থাকে রঙেরও পরিপূরক রঙ আছে যথা হলুদ ও নীল। সাধারণ ভাবে দেখা গিয়াছে পরিপূরক রঙ পাশাপাশি থাকিলে ভাল দেখায়।

অতঃপর কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের সৌন্দর্য্যের কথা মানব প্রথমতঃ সাতটি স্বর উপলব্ধি করিতে পারিল যাহাকে আমরা সা রে গা মা পা ধা নি বলি। তৎপরে তাহারা আরও পাঁচটি বিকৃত স্বরেরও উপলব্ধি করিতে পারিল। ক্রমশঃ তাহারা তিনটি গ্রাম আবিষ্কার করিল যাহাকে আমরা উদারা মুদারা ও তারা বলি। তৎপরে তাহারা বাদী সম্বাদী ও বিবাদী স্বরের সম্বন্ধ ও পার্থক্য বুঝিতে পারিল। তার যন্ত্র সা অর্থাৎ সুরে বাঁধিয়া তবলা মধ্যম পর্দায় বাঁধিলে শ্রুতিমধুরত্বের ব্যাঘাত হয় না কারণ মধ্যম একটি বাদী স্বর কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তবলাটি কোমল ধৈবতে বাঁধিলে শ্রুতিমধুরত্ব নষ্ট হইয়া যায় কারণ উহা বিবাদী স্বর। বিভিন্ন সুর যন্ত্রকে বিভিন্ন সুরে বাঁধিয়া কয়েকজন গায়ক যদি

একসঙ্গে বিভিন্ন সুরে গান গাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে যেরূপ অবস্থা হয় তাহা কল্পনা করা যায় না। এইরূপে কণ্ঠসঙ্গীত ও বাদ্যসঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হইল এবং ভারতবর্ষে ছয় রাগ, ছত্রিশরাগিণী, তান, মান, লয়, গমক, একুশ মূর্চ্ছনা, উনপঞ্চাশ কূটতান প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

কণ্ঠ সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্যাও পরিপূরক হিসাবে তালেরও সৃষ্টি হইল। সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগের নাম তাল এবং এই নির্দিষ্ট নিয়মে বিভাগ মাধুর্য্যের কারণ হয়। একটি রাগিণীতে বেসুরা পরদা লাগাইলে যেমন রাগিণী কাটিয়া যায় তালেও নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে তাল কাটিয়া যায় এবং মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। গানের রাগিণীতে রাগিণীতে মিশ্রণ চলে যথা ছায়ানট, কিন্তু এক প্রকার তালে আর এক প্রকার তাল মিশাইলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং কোনও তালই থাকে না। ঝাঁপতালের সহিত ধামার মিশাইয়া ঝাঁপ-ধামার নামক কোনও তালের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাল-যন্ত্র বিষয়ে দেখা যায় অন্যান্য দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে সমস্ত তাল-যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের আওয়াজেরও একটা পৃথক মিষ্টত্ব আছে যথা—পাখোয়াজ, খোল, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি।

কবিতার রাজ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই এখানেও নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা এবং বিভিন্ন স্থানে শেষাক্ষরের মিল প্রভৃতি সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে। কবিতাতেও সেই তালের খেলা। অক্ষর সংখ্যার ছন্দ যাহাকে সংস্কৃতে বৃত্ত বলা হয় তাহাতে বিভিন্ন ছন্দে যদি বিভিন্ন সংখ্যক অক্ষর দেওয়া যায় অথবা মাত্রা সংখ্যায় ছন্দ যাহাকে সংস্কৃতে যতি বলে তাহাতে যদি বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা দেওয়া যায় তাহা হইলে মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্যবুদ্ধি সম্বন্ধে আমরা এত কথা বলিলাম বটে তথাপি দেখা যায় অধিকাংশক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা ও অনুশীলন সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সেজন্য বিভিন্ন দেশের লোকের বিভিন্ন বিষয়ের সৌন্দর্য্যজ্ঞান কতকগুলি ব্যাপারে বিভিন্নরূপ হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের ইমারতের style বা রীতি বিভিন্ন প্রকার। পাশ্চাত্যদেশের মহিলার গাউন পরা ও ভারতীয় নারীর শাড়ি পরা বিভিন্ন রকমের। রঙ পছন্দ সম্বন্ধেও রুচি বিভিন্নরূপ দেখা যায়। আবার একই সমাজে বয়সের তারতম্য অনুসারে রঙের রুচির তারতম্য দেখা যায়। একটি শিশু চড়া লাল রঙের জামা পরিয়া আসিলে বেমানান দেখায় না, কিন্তু একজন বৃদ্ধ একটা লাল জামা গায়ে দিয়া একটা আসরে উপস্থিত হইলে সকলের উপহাসের পাত্র হইয়া উঠে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐরূপ। আমরা ভারতবাসিগণ হারমোনিয়মের যে পরদার পরে যে পরদা বাজাইলে বেসুরা হইয়া গেল বলিয়া মনে করি অন্য দেশে হয়ত সেইটাই মধুর বলিয়া গণ্য হয়। একজন বিলাতী মেম গান গাহিতে থাকিলে আমরা মনে করি তিনি নাকী সুরে কাঁদিতেছেন, পক্ষান্তরে বিলাতিগণও আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি-করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন, একদেশের লোকের নিকট অন্য একটি দেশের সঙ্গীত প্রথমতঃ উৎকট মনে হয় বটে কিন্তু সেই দেশের সঙ্গীত দীর্ঘকাল শুনিতে শুনিতে তাহাতেই রুচি আসিয়া যায়। আরও দেখা যায় একটা style বা রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য রকম রীতি সুন্দর বলিয়া গৃহিত হয়। যথা সেকালের গহনা ও এ কালের গহনা। নাচের ভঙ্গী সম্বন্ধেও। বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিভিন্নরূপ।

তবে বাস্তব সৌন্দর্য্যবোধ বিষয়ে কবিগণের কল্পনাকে বাদ দিতে হইবে। একটি আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন শাণপ্রাংশু মানব যদি সহসা সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় তাহা হইলে আমাদিগকে মূর্চ্ছা যাইতে হইবে।

মার্জ্জিতরুচি মানব সুন্দর জিনিসই দেখিতে চায়—এবং মধুর শব্দই শুনিতে চায় এবং তদ্বারা তাহার মনও সুন্দর হইয়া উঠে। তাই উপনিষদের কথায় বলিব—

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রা।

হে শ্রমিকবৃন্দ!

'হে ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায়! তোমাদেরই নীরব, নিরলস পরিশ্রমের ফলে ব্যাবিলন, পারস্য, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনোয়া, বাগদাদ, সমরখন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড পর পর খ্যাতি ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আর তোমরা? তোমাদের কথা কে ভাবে? যাহারা বুকের রক্ত দিয়া জগতের সর্ববিধ উন্নতির উপকরণ যোগাইতেছে, তাহাদের সুখ্যাতি করিবার জন্য কে মাথা ঘামায়? কাব্য, সংগ্রাম বা ধর্মের ক্ষেত্রে জগৎজয়ী বীরগণের প্রতিই সকলের দৃষ্টি। বহু লোকের উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কাপুরুষও অনায়াসে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে। ঘোর স্বার্থপর ব্যক্তিও নিঃস্বার্থ আচরণ করিতে পারে। কিন্তু সকলের দৃষ্টির অগোচরে সামান্য কাজেও যে ব্যক্তি ঐ প্রকার স্বার্থশূন্যতা কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারে সে-ই যথার্থ ধন্য। হে ভারতের চিরপদদলিত শ্রমিকবৃন্দ! তোমাদের কর্ম বাস্তবিকই এই পর্য্যায়ের। তোমাদের অভিবাদন করি।'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ফুলওয়াড়ী —অরুণকুমার দত্ত

কাজল-দিঘী —আশুতোষ সিন্‌হা

॥ আলোকচিত্র ॥

সুপ্তি —সুকুমার রায়

মেক-আপ —বিশু চক্রবর্তী
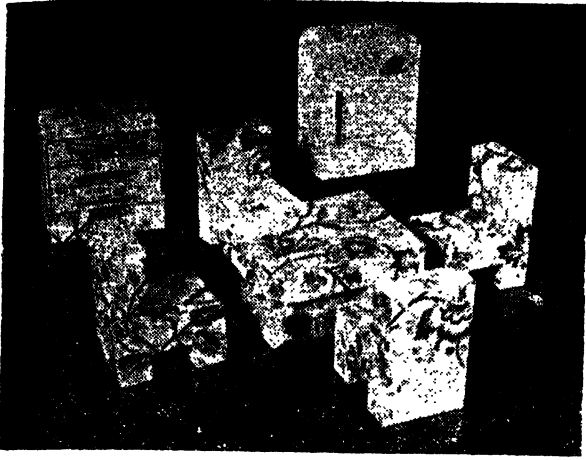
ড্রইং রুম (সিগারেটের প্যাকেটে তৈরী)

—শিল্পী রবীন রায়-চৌধুরী (সন্তোষ)

—অনিলকুমার ঘোষ

কাঙ কার আনন্দে

—তুষারকান্তি দত্ত

—অমিয়প্রসাদ চক্রবর্ত্তী

সিমলায় তুষারপাত —শান্তি গুপ্ত

মৎস্যজীবি —সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

(উপন্যাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

কী বিচিত্র প্রত্যাশাই না মানুষের মনের অন্দরে ধুকধুক করে! কাল সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মীনাক্ষীর মন শুধু একটা প্রশ্নই বিশ্লেষণ করে ফিরেছে: সুপ্রিয় কী ওর কাছে আর আসবে? মীনাক্ষীর শিথিল ওষ্ঠ অস্ফুটে উচ্চারণ করেছে—না। সেই সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিধ্বনি করেছে ওর অন্তর, না-না-না। তবু, কাকডাকা ভোরে উঠেছে মীনাক্ষী, আর সদরের কবাট যতবার আওয়াজ তুলেছে—ততবারই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেছে ও। তারপর দুপুর হলো, দুপুর গড়ালো, বিকেল হলো, রাত্রি কাটলো, একটি ভীরু উন্মুখ মন তার ক্ষীণতর প্রত্যাশাকে প্রাণের উত্তাপে জীইয়ে রাখলো দীর্ঘ সাতটা দিন, লম্বা সাতটা রাত। আর তার পরদিন দীপ্ত মধ্যাহ্নে এসে সুপ্রিয়র বার্তা বিন্যাস করলো ওর বান্ধবী সুমনা। সুমনাকে একান্তে নিজের ঘরে ডেকে এনেছিলো মীনাক্ষী, কিন্তু ঘর যেন ওর পছন্দ হলো না।

চল না বারান্দায় বসেই গল্প করিগে, ঘরে বড্ড গরম,—হতাশ হ'লেও আপত্তি করেনি মীনা। একটা বিরাট ব্যগ্রতার ভাব মুখে নিয়ে সুবর্ণবালা মেয়ের ঘরের দিকে আসছিলেন। সুমনাকে নিয়ে মীনাকে বেরিয়ে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, এখুনি চললে নাকি সুমনা?

না, মাসীমা, ঘরে বড্ড গরম।

এসো, এসো, দক্ষিণের বারান্দায় বসো এসে, ভারি মোলায়েম ঠাণ্ডা এখানে—পরম সমাদরে মেয়ের বান্ধবীকে ডাক দিলেন সুবর্ণবালা।

শুধু তাই নয়, ওঁর পক্ষে যত দ্রুতগতিতে চলা সম্ভব ততখানি ক্ষিপ্রপায়ে নিজের ঘর থেকে ওঁর দুপুরে গড়ানো শীতলপাটিখানা এনে বিছিয়ে দিলেন। ওখানে বারান্দার এক কোণায় বসে শিশিরকণা মহাভারত পড়ছিলেন। কোনো বাধা-বিপত্তি না ঘটলে এসময়টা শিশিরকণা মহাভারতই পড়ে থাকেন। কাকীমা, আপনিও পাটিতে উঠে বসুন, আরাম পাবেন—সুবর্ণবালা বললেন শিশিরকণাকে।

শিশিরকণা হাসিমুখে বললেন—না বৌমা, তোমরাই বস। গরমের দিনে ধোওয়া-মোছা সিমেন্টই আমার ভাল লাগে বেশি—তারপর মীনা সুমনার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস মা তোমরা সব বস।

মীনা ভেতরের অস্থির চাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো, সুমনার হাত ধরে টেনে পাটির ওপরে দুজনে বসে পড়লো। সুবর্ণবালার আচরণে মনে মনে বেশ বিস্মিত হলেন শিশিরকণা। প্রথমতঃ সুবর্ণবালার দুপুরের টানা ঘুমে কেউ ব্যাঘাত ঘটালে তার আর রক্ষে ছিলো না, মায়ের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে স্ফীতি দেখে এনাক্ষী একদিন দুপুরের ঘুমের মৃদু প্রতিবাদ করতে গিয়ে বকুনি খেয়েছিলো খুব। আর দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মের দুপুরে গড়ানো ওর শীতলপাটিখানি উনি প্রাণ ধরে কাউকে কখনও হাতই দিতে দেন না, নিজেই শীতলপাটিখানি গামছা ভিজিয়ে ভিজিয়ে মোছেন, সেই পাটি নিজের হাতে বিছিয়ে মীনার বান্ধবীকে বসতে দিলেন এবং নিজেও না ঘুমোতে গিয়ে বসলেন সেখানে। অবাক লাগে বৈ কি! মীনাক্ষীর অস্থিরতা আরো বাড়লো, মার সামনে মাষ্টারমশাইর কথা জিগ্যেস করাও যায় না, আবার থেমে থাকাও যেন যায় না। কিন্তু সুবর্ণবালাই শুরু করলেন।

তোমাদের মাষ্টারমশাই আজ-কাল তোমাদের ওখানে আসে-টাসে?

ও মা! সুপ্রিয়দা'র কথা বলছেন? রোজ আসেন, একটি দিন বাদ যায় না।

রোজ এসে এখন করে কী? পরীক্ষার পরও পড়ায় নাকি তোমাকে? সুবর্ণবালার সুর পেঁচালো।

সুপ্রিয়দা' দাদার বন্ধু তো, তাছাড়া এখন আবার সুপ্রিয়দা' পড়াবেন কী মাসীমা? এক মাসে আমাদের বাড়ি থেকে যে টাকা পেতেন, একবেলায় তার চেয়ে বেশি খরচ করেন সুপ্রিয়দা'। রোজই বিকেলে বের হবার মুখে ফিরপোতে হয় চা, না হলে ফিরবার মুখে ডিনার খাচ্ছি।

রোজই বেড়াতে যাচ্ছো বুঝি তোমরা? সুবর্ণবালার প্রশ্ন।

রোজ, জানিস মীনা, নাইস একখানা বুইক কিনেছেন সুপ্রিয়দা', রোজ সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমরা ঐ বুইকে চেপে বেড়াই। একটু ঝাঁকি নেই, এক কোঁটা শব্দ নেই, গ্র্যাণ্ড গাড়িখানা হয়েছে। আজ বিকেলে তোর এখানে আসবো আমার প্রোগ্রাম ছিলো, কিন্তু সুপ্রিয়দা' শুনে বললেন—অসম্ভব, বিকেলের ট্রিপে তোমাকে আমি বাদ দিতেই পারিনে, তুমি সকালে দুপুরে যখন যেখানে খুশি যাও কিন্তু বিকেলে নয়। মীনাক্ষী ঠোঁট খুলেই আবার মুখ বন্ধ করে ঢোক গিললো একটু।

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন সুবর্ণবালা, তোমাদের বয়সী সব মেয়েদের সঙ্গেই বুঝি খুব ভাব তোমাদের মষ্টারমশাইর? শিশির কণার বসার দূরত্বটা দেখে নিয়ে সুমনা সপ্রতিভ উত্তর দিলো, আপনি সেকথা জানলেন কী করে মাসীমা? কিন্তু সব চেয়ে সুপ্রিয়দা'র বেশি ভাব হয়েছে মেজর জেনারেল চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে, না ভুল বললাম, তার চেয়েও বেশি হ'য়েছে জাষ্টিস মিত্তির মেয়ের

নক্ষে। সুপ্রিয়দা' তৈরী বাড়ি কেনার জন্ম দালাল লাগিয়েছিলেন, তা শুনে মিস মিত্র বলেছেন,—তোমার আর বাড়ি কিনে দরকারটা কী? বাবাই যখন অত বড় বাড়ি যৌতুক দিচ্ছেন আমাদের বিয়েতে। মিস মিত্রের বুদ্ধিতে খুব খুশি হয়েছেন সুপ্রিয়দা'—সুবর্ণবালার ঠোঁটের হাসি একেবারে ফিকে হ'য়ে গেলো, বিরসমুখে জিগ্যেস করলেন, বিয়ের দিনও কী ঠিক হয়ে গেছে নাকি?

—না, দিন বোধ হয় এখনও ঠিক হয়নি, তাহলে দাদার কাছে শুনতাম।

তা সে মেয়ে দেখতে কেমন? দেখেছ নাকি তুমি? সুবর্ণবালার জলদ গলা এবার শিশিরকণার কানে পৌঁছুলো, মহাভারত পাঠ বন্ধ করে হাসিমুখে শুধোলেন, বউমা, কোন মেয়ের কথা জিগ্যেস করছো সুমনাকে?

সুবর্ণবালা বাঁকা হেসে বললেন, মীনুদের মাষ্টারমশাই বড় বড় সব জায়গায় এখন টোপ ফেলছে কি না বিয়ের জন্ত—তাই জিগ্যেস করছিলুম।

আহা, ভগবান করুক, তাই হোক বাছার, অমন চমৎকার ছেলেটি যেন অকূলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো, মানী শ্বশুর পেলে হিমালয় পর্বতের আড়াল পাবে বাছা—কাকীমার আশীর্বাণীতে মনে মনে ভয়ানক চটলেন সুবর্ণবালা, কিন্তু বিরক্তি চেপে সুমনাকে উদ্দেশ্য করে একটু বেশি ঝোঁক দিয়ে বললেন, তা যা-ই বল সুমনা, টাকাকড়ি হলো যেনো জল, ও তুদিনের কিন্তু সৌন্দর্য হলো চিরদিনের—কথা বলতে বলতে মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলেন সুবর্ণবালা, তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, তা, তোমার সেই মিত্রর মেয়ে দেখতে কেমন?

সুমনা মুখের চেহারা নিরীহ ক'রে বললো, খুব সুন্দরী না-ও হতে পারে, কিন্তু দেখতে অদ্ভুত সুন্দরী লাগে। বড়লোকের বউ-ঝিয়েরা তো নানান কেতায় সাজগোজ করে, ঠিক স্নানের পরমুহূর্ত ছাড়া ওদের বিউটি কোনোমতে ধরার যো নেই!

খুব বুঝি গালে ঠোঁটে রং চড়িয়ে পদ্মিনী সেজে বসে থাকে দিন-রাত? কথা শেষ করে সুবর্ণবালা মেয়ের সাধারণ আটপৌরে শাড়িপরা চেহারাখানির দিকে গর্বমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকালেন। উত্তরে নীরবে একটু একটু হাসলো সুমনা। চিরচঞ্চলা স্রোতস্বিনী যেন হঠাৎ গতিবেগ রুদ্ধ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে, শুধু চোখ দুটিতে কিসের একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা জেগে রয়েছে এখনও। মেয়ের চোখের ভাষা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলেন না সুবর্ণবালা, অপরিস্ফুট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন, নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন: মীনুর মস্ত সুন্দরী মেয়ে আর পেতে হয় না। আর সুমনা বিদায় জানিয়ে যখন বাড়ি যাওয়ার জন্ম উঠে দাঁড়ালো, তখনও মীনাক্ষী মৌন রইলো, আর সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে যখন তার বান্ধবীকে একা পেলো মীনাক্ষী, তখন ওর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হলো, বুকের আলোড়ন এত প্রচণ্ডতর হলো যে তা ঢাকবার প্রাণান্তিক তাগিদে ও ওর বান্ধবীকে সামান্ত কোনো কুশলও জিগ্যেস করতে পারলে না, সাধারণ সৌজন্তটুকুও দেখাতে পারলে না!

আরো সাত দিন কাটলো মীনাক্ষীর। তারপর আরো দুদিন। মনে মনে ভাবে মীনাক্ষী, সেদিন সুমনার সব কথা কান পেতে শুনলো ও আর মনে মনে শুধু সহ্ করলো, প্রশ্নের কোনো ভাষা কেন ও খুঁজে পায়নি? একটা প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই ওর মন এখন আকুলি-বিকুলি ক'রে ফিরছে: মাষ্টারমশাই আমার কথা কিছু বলেননি সুমনা?—মাষ্টারমশাই আমার কথা কিছু—। সারাদিন এই প্রশ্নটা ওকে যেন শুধু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় আর নিস্তব্ধ রাত্রে ওর অতন্দ্র চোখের পাতায় সেদিনের সেই আবেগতপ্ত সুন্দর মুহূর্তগুলো অবিরত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে আর তারপর নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মীনাক্ষী।

সেদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার মুখে আবার এলো সুমনা, ওকে দেখে মনে হলো অনেক সময় দিয়ে আর অনেক মন দিয়ে আজকের বেশভূষা সম্পন্ন করেছে ও। মীনাক্ষীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্ম অনুমতি প্রার্থনা করলো ও সুবর্ণবালার কাছে, মাসীমা, আজ আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব, মীনাক্ষীকে আমি নিতে এসেছি, আবার আমি নিজে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে যাব।

উৎসবটা কিসের শুনি? বার তিনেক সুমনার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন সুবর্ণবালা।

এই আমার পাশের উপলক্ষ্যে—একটু আমতা-আমতা করে বলে শেষ করলো সুমনা, যা না পাশ—তার জন্ম আবার উৎসব—বাবার যেমন কাণ্ড! মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠানোর জন্ম একটা মৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠেলে তুললো সুবর্ণবালাকে। কিন্তু ঐ একফোঁটা মেয়ের জেদের সঙ্গে আজ আর পেরে উঠলেন না সুবর্ণবালা। মীনাকে—সুমনার সঙ্গে যেতে রাজি করাতেই সুবর্ণবালার অনেক শক্তি খরচ করতে হলো, ঠিক যে সম্ভাবনা মনে করে সুবর্ণবালা মেয়েকে পাঠাতে এত উৎসাহী ঠিক সেই কারণ স্মরণ করেই মীনাক্ষী এত অনাগ্রহী। শেষ পর্যন্ত সাধারণ একখানা আকাশী রংএর শাড়ি পরে আর মাথার চুলে দুবার চিরুণী বুলিয়ে টান করে একটা হাতখোঁপা বেঁধে সুমনার সঙ্গে গেলো মীনাক্ষী। বাড়ীর রাস্তাটা পেরিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিতেই অদূরে দাঁড়ানো একটি মোটর গাড়িকে সুমনা হাতছানি দিয়ে আহ্বান করলো। গাড়ি এসে দাঁড়ালো সামনে, মীনা তীব্র প্রতিবাদ করলো, আবার গাড়ি চেপে অনর্থক খরচা করা কেন? বাসেই দিব্যি যাওয়া যাবে। দ্রুত হাতল ঘুরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে তাগিদের সুরে বললে সুমনা, চটপট্ উঠে পড় মীনা, মেলাই দেরী হয়ে গেছে তোকে খোসামদ করতে করতে। দেরী দেখে বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছে। আর আপত্তি করলো না, মীনা গাড়িতে উঠে বসলো, গাড়িখানা যে বাড়ির গাড়ি, অন্যমনা মীনা তা খেয়াল করলে না আদৌ। সারা পথ মীনাক্ষী একেবারে অদ্ভুত নিস্তব্ধ। হঠাৎ একটা স্বপ্নের নেশা ওকে এখন পেয়ে বসেছে যেন, যেন নিস্তব্ধতার প্রতিটি মুহূর্ত ও সেই সোনালী স্বপ্নের নেশায় মাতাল হ'য়ে থাকতে চায়, স্বপ্নের নেশায় তৃপ্তি এত, এত সুখানুভূতি?

মীনা! নাম, এসে গেছি আমরা—

টুটে গেলো দিবাস্বপ্ন। সুন্দর আধুনিক ডিজাইনের একখানা বাড়ির গাড়ি বারান্দার নিচে এসে থেমেছে। কিছুটা আচ্ছন্নের মত মীনা সুমনার পেছন পেছন গাড়ি থেকে নেমে এলো, তারপর চোখ বিস্ফারিত ক'রে তাকিয়ে রইলো এল্ প্যাটার্নের বাড়িখানির দিকে, এ আমরা কোথায় এলাম সুমনা?

চল্ চল্—খুশীর ফোয়ারা যেন মুক্তি পেলো সুমনার গলায়, বুঝলিনে, এটা সুপ্রিয়দা'র বাড়ি। নিজেই বাড়ি কিনে ফেলেছেন সুপ্রিয়দা', আর সুপ্রিয়দা'র প্রেরিত গাড়ি চেপেই আমরা এলাম—মাসীমা যদি কোনো আপত্তি তোলেন, সেজন্য আগে বলিনি।

আবার এক ঝাঁক ভ্রমর গুন্-গুন্ শুরু করলো মীনাক্ষীর মনে—আছে, আছে, সুপ্রিয় ওরই আছে। এদিক সেদিক তাকিয়ে মীনা উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে বান্ধবীর পাশে পাশে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। সুমনা পাশে না থাকলে, ও ছুট দিয়ে সিঁড়ি পার হ'য়ে ওপরে উঠে যেতো কখন। বাড়ি সাজানোর ব্যাপারে ভারি সুন্দর শিল্পিমনের পরিচয় দিয়েছে সুপ্রিয়। সিঁড়িতে শুধু রঙীন তেলরঙের পাখির আর ফুলের ছবি। সেদিকে চেয়ে চেয়ে মীনাক্ষীর ঠোঁটের কোণায় একটা ছোট্ট হাসির ঢেউ উঠলো। ওপরের টানা বারান্দা পার হ'তে হ'তে অনেকের উচ্ছল কলগুঞ্জন কানে এলো। আর তারপরই মীনাক্ষী দেখলো ওরা ডাইনিংরুমের উন্মুক্ত কবাটের সামনে ভেতরে বিরাট ডিম্বাকৃতি আকারের টেবিলকে ঘিরে ওর অচেনা মেয়ে-পুরুষ সবাই ব'সে আছে, কী অজস্র তাদের জৌলুস আর কী অনর্গল তাদের কথার ঝংকার! ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো মীনা। ভ্রমরকুল হুল ফুটিয়ে উড়ে গেলো ডানা মেলে। টেবিলের দৈর্ঘের একদিকের মাঝখানের চেয়ারে সুসজ্জিতা মেয়েদের মধ্যমণি হয়ে আসীন সুপ্রিয়। সুপ্রিয়র দিকে ঝুঁকে সকলের কথা বলার আগ্রহী ভঙ্গি দেখে প্রথম দৃষ্টিপাতেই মনে হয় যে সুপ্রিয়ই সেখানে বিশেষ ব্যক্তি। আর মেয়েরা এমন চোখের চেহারা ক'রে সুপ্রিয়র বক্তব্য শুনছে যে, এ তো কথা নয়, এ যেন মহাপুরুষের বাণী।

সুপ্রিয় কথা থামিয়ে মীনাক্ষীর আধখানা মুখ পর্যন্ত চোখ তুলে বললো, শুধু তোমাদের জন্য চা খেতে আমরা বিলম্ব করছি, শীগ্‌গির চটপট বসে পড়ো। একবার চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হলো মীনাক্ষীর সঙ্গে। সুপ্রিয়র মুখের ভাবে কিছু পেলো না মীনাক্ষী। সুমনার হাতের আকর্ষণে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে এসে বসলো ওরা। চা-পর্ব্ব শুরু হলো। যন্ত্রচালিতের মত একটু-আধটু খেয়ে চলেছে মীনাক্ষী, আর অপাঙ্গে আলাপমগ্ন উজ্জ্বল সুপ্রিয়কে বারে বারে দেখছে।

'দুয়ো···দুয়ো···দুয়ো' শুধু এ দুটো শব্দে ওর মন ওকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। খাওয়ার মাঝখানে বয় এসে সেলাম দিয়ে একটা কার্ড সুপ্রিয়র হাতে দিলো। কার্ডের ওপরে ছাপার হরফে লেখা সুনীল বসাক, বি-এস-সি, গ্লাসগো। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত বিচিত্র একটা নীরব হাসি ফুটি-ফুটি করে মিলিয়ে গেলো সুপ্রিয়র। কার্ডখানা বয়ের হাতে ফেরৎ দিয়ে মন্থর গলায় বললো, সাবকো কহেনা, আপকা কুছ গড়বড় হোগিয়া, আপকা সাথ সোম সাবকা বিলকুল জানপহছান নেহি হ্যায়—কার্ড হাতে নিয়ে বয় আবার সেলাম দিয়ে চলে গেলো। দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে হচ্ছিলো সুপ্রিয়র, ওর জবাবে সুনীল বসাকের গোল মুখখানি আরো কতখানি গোল হয়, ছোটো দুটি চোখে আরো কতখানি ছায়া ঘনায়—তা দেখার, কিন্তু না, না দেখেই ও তা বেশ কল্পনা করতে পারছে। বন্ধু অরুণেশের কথা বারে বারে মনে পড়লো, আহা! আজ যদি অরুণেশ এখানে থাকতো! যে মেয়েটির সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে সুপ্রিয় ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলছিলো, তার সাজের দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলো মীনাক্ষী, কানের দুপাশ ঝাঁ-ঝাঁ।

সজ্জায় মার্কিণীদেরও হারিয়েছেন তিনি। ও মেয়ে হয়ে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না, আর ও মেয়েটি কিনা এত অসংখ্য পুরুষের সামনে ঐ পোষাক প'রে অনায়াস ভঙ্গিতে বসে হেসে হেসে কেবল গল্প করছে সুপ্রিয়র সঙ্গে। তারপর চোখে পড়লো মীনার, সজ্জায় প্রতিটি মেয়েই মার্কিণী শুধু ওর বন্ধুনী সুমনা ছাড়া। সুমনার বেশভূষা চটকদারী হলেও অতখানি প্রমোশন পায়নি এখনও। ভরা পেয়ালা শেষ হলো, কিন্তু সৌজন্যসূচক এমন বাজে গল্পের কী শেষ নেই! এত তীব্র অস্বাচ্ছন্দ বোধ করছে মীনাক্ষী। আনন্দ! আনন্দ! এত অজস্র আনন্দের হাট বসেছে এখানে, কিন্তু ও ওর হৃৎপিণ্ডের রক্তক্ষরণের পরিমাপ চেষ্টা করছে যেন নীরবে, আর, প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ ফেটে আসা অশ্রুটাকে ঠেকিয়ে রাখছে; তাই চায়ের আসরের কোনো উচ্ছ্বাস আলোচনাই ওর কানে পশলো না। আর, তারপর, সবাই যখন চেয়ার ছেড়ে ডাইনিং হলের এক দেয়ালের হাতে-আঁকা অনবদ্য একখানি ছবির নিচে দাঁড়িয়ে আলোড়ন তুলে নানান ভাষায় তারিফ করতে লাগলো, আর সুপ্রিয় সেই পাশে বসা মেয়েটির একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কী একটা কথা বলে গলা মিলিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠলো, তখন পেছনে দাঁড়ানো মীনাক্ষী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

এই রংখুশির মেলায় ও শুধু নিষ্প্রভ প্রাণহীন পুতুলই নয়, ওর উপস্থিতি অবাঞ্ছিত, হাস্যকর। এই আনন্দের হাটে ওর প্রবেশ নিষেধের অদৃশ্য বিজ্ঞপ্তি যেন সর্ব্বত্র ঝুলছে।

ঃ দুয়ো···দুয়ো! আবার ওর অন্দর মহলের সিংহ দরজায় ঢাকের বাড়ি দিলো কে যেন! নিঃশব্দে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে এলো মীনাক্ষী। কোনো শব্দ না তুলে পাগল-পায়ে নামতে লাগলো নিচে। রিভলভিং ষ্টেজের মঞ্চ ঘুরে গেলো যেন। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যেন সুপ্রিয় মীনাক্ষীর অস্তিত্ব অনুভব করছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের বাইরে চলে এলো সুপ্রিয় আর তারপরই পেছনের ঘোরানো সিঁড়িতে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো সুপ্রিয়র সুদীর্ঘ শরীর। সদর দরজার কাছে পৌঁছে মীনাক্ষী দেখলে, হাত দুখানি জড়িয়ে বুকের ওপর রেখে পা দিয়ে দরজা আটকে ঋজুভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রিয়। মুখে মিটি মিটি দুষ্টুমীর হাসি। চোখের জলের দুরন্ত প্লাবনটা কিছুতেই আর রোধ করতে পারলে না মীনা, তাড়াতাড়ি দুহাত তুলে মুখ ঢাকলো। সরে এলো সুপ্রিয়, নিজের দুহাত দিয়ে মীনাক্ষীর চোখ থেকে হাত দুখানি নামিয়ে কৌতুকের সুরে বললো, ছিঃ ছিঃ মীনা, এমন বোকা তুমি! একটু দুষ্টুমী করছিলেম তোমার সঙ্গে—মীনাক্ষীর হাত ধরে সামনে আকর্ষণ করতেই, ওদের সামনে ছুটে এলো সুমনা, সুপ্রিয়দা', আমার অভিনয় সাফল্যের বকশিস? তারপর হাসতে হাসতে যেন কৌতুকে ফেটে পড়লো সুমনা।

তুই তো ভারি ইয়ে রে মীনা, তোকে বাড়ি থেকে কায়দা করে এনে সুপ্রিয়দা'র কাছে পৌঁছে দিলেম, আর তুই আমাকে না বলে পালাচ্ছিলি? ওদের একলা থাকার সুযোগ দিয়ে আবার

ছুট লাগালো সুমনা, কিন্তু ঘর পার হবার আগেই সুপ্রিয় ডাক দিলো।

সুমনা, শোনো, শোনো। ভেতরে যাওয়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসুচোখে তাকালো সুমনা।

মলয়কে বলো যে এদিকটা যেন সে ম্যানেজ করে নেয় অর্থাৎ সম্মানিত অতিথিদের সমাদরে বিদায় জানায় যেন, আমি এখন মীনাক্ষীকে পৌঁছে দিতে চললাম। সুমনা বান্ধবীর উদ্দেশ্যে চোখ টিপে একটু হেসে নিয়ে উত্তর দিলো। ঠিক আছে সুপ্রিয়দা', আমি দাদাকে বলে দেব।

মৌন মীনাক্ষীর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলো সুপ্রিয়। গাড়ি চললো। আস্তে হাত ছাড়িয়ে গাড়ির এক পাশ ঘেঁসে বসলো মীনাক্ষী।

এ কী! এমন গিরি-সাগর ব্যবধান কেন রচনা করলে মীনা?

সুপ্রিয় সরে এসে বাঁ-হাত বিছিয়ে মীনাক্ষীর কাঁধে হাত রাখলো। মীনাক্ষী মুখ ঘুরিয়ে পথের চলমান পথিকদের খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলো, হো হো করে হেসে মীনাক্ষীর চিবুক ডান হাত দিয়ে ধরে মীনাক্ষীর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলো সুপ্রিয়, চোখের দীঘির বাঁকে বাঁকে অনেক জল জমেছিলো, আবার শুরু হলো প্লাবন, মীনাক্ষীর কাঁধে আবেগের সঙ্গে একটু চাপ দিয়ে সুপ্রিয় স্মিতমুখে বললো, মীনাক্ষী, মীনা! শোনো, কেঁদ না লক্ষ্মীটি, আমার দুটো কথা আগে শুনে নাও—আমি একটা দিন তোমার কাছ থেকে আত্মগোপন করেছিলেম, সমাজের আর একটা পিঠ দেখার জন্য শুধু দেখলাম, কী অদ্ভুত পৃথিবী! কী আজব সমাজ! নিচুগলির মানুষ আমি, চাল নেই, চুলো নেই, ঘর নেই, দুয়ার নেই, সেই মানুষ রাতারাতি হয়ে গেলেম সমাজের মুকুটমণি, শুধু তাই নয় মীনা, অনেকের আশা-ভরসার পাত্র পর্যন্ত। বলোতো মীনা, কী অদ্ভুত মজাদার দুনিয়ায় আমরা বাস করছি!

মীনাক্ষী নিরুত্তর। চোখের দীঘির কানা থেকে জল অল্প নিচে নেমেছে। সুপ্রিয় তাকিয়ে আছে মীনাক্ষীর দিকে। যেন হিমে ভেজা ভোরবেলার শিউলী ফুলের মত শান্ত মুখখানি। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেলো সুপ্রিয়র। মুখ টিপে হেসে পকেট থেকে একটা ভারি ওজনের মুখখোলা খাম টেনে বার ক'রে মীনাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো, নিজেকে এমনভাবে ধরে না রাখলে তোমার মা'র কাছ থেকে এমন একখানি অপূর্ব সুন্দর চিঠি আর এমন আশ্চর্য সম্মান পেতেম কী করে? একেবারে অদ্বিতীয় আমি, আমার দ্বিতীয় নেই। এমন কোনো বিশেষণ নেই বাংলা ভাষায় যা নাকি আমার নামের আগে পিছে জোড়া লাগাননি তিনি। প্রথমেই আমার কন্দর্পকান্তি দিয়ে শুরু করেছেন আর একেবারে শেষ পাতাটায়, আমার প্রতি তোমার অতল অদৃশ্য টান আর আমার বিরহে তোমার ক্লান্ত ছটফটানির কয়েকটা হালকা টান আছে—নাও পড়ে দেখো, অন্ততঃ শেষের পাতাটা শুধু পড়ো।

মীনাক্ষী এবার নিজস্ব ভঙ্গিমায় খিল-খিল ক'রে হেসে উঠে চিঠিখানা সুপ্রিয়র হাত থেকে নিয়ে সুপ্রিয়র পকেটে রেখে দিলো। মীনাক্ষীর অপরূপ মুখখানি হাত দিয়ে তুলে ধরে গুনগুনিয়ে বলল সুপ্রিয়, এমন ভোরের আকাশের আভা যে মুখখানিতে, এমন স্নিগ্ধ স্বপ্নমাখা চাউনি যে চোখ দুটিতে, এর তুলনা আর কোথাও মিললো না মীনাক্ষী! অসহ্য আনন্দে মীনার মুখ রামধনু রঙে রাঙা হয়ে গেলো। সুপ্রিয় পেছনফেরা পাঞ্জাবী ড্রাইভারের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে মীনাক্ষীর আরো কাছে সরে এলো। মীনাক্ষীর কাঁধে আরো একটু চাপ দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে অস্ফুট গলায় বললো, তা হলে মীনা কি ঠিক করলে? ফ্যানসুদ্ধ ভাত খাবে না ভাতের ফ্যান্ গালবে?

লজ্জায় পুলকে ড্রাইভারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সুপ্রিয়র প্রশস্ত কাঁধে মুখ লুকোলো মীনা।

সিমলার কালীবাড়ির প্রখ্যাত স্টেজে সংঘমিত্র ক্লাবের পরিচালনায় 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অভিনয় শুরু হবার মিনিট কুড়ি বাকী এখনও। সংঘমিত্রের সদস্য এবং সদস্যারা সকলেই নিঃশব্দে ব্যস্ত, তবে ব্যস্ততাটা বিশেষভাবে প্রকট। বাড়তি অসংখ্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে অডিটোরিয়ামে তবু যেন তিল ধারণের স্থান নেই। প্রায় হাজার লোকের ভিড়। রমেন সর্বাণীরা যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন আর জায়গা বিশেষ নেই। রমেনকে স্ত্রী-বন্ধু নিয়ে এগোতে পিছোতে দেখে কেশবশংকর বাবু অনুচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, এদিকে চলে আসুন—দ্বিতীয় সারির প্রথম সোফায় বসেছিলেন কেশবশংকর, তার পরেই আর একটা ছোটো সোফায় অরুণেশ তারপরের বড় সোফাটার এক পাশে বসেছিলেন মিসেস তরুবালা বিশ্বাস। সে সোফায় আরো দুজনের জায়গা খালি রয়েছে। নীলা আর শেলি গ্রীণরুমে। কেশবশংকর বাবু তরুবালার পাশের জায়গা নির্দেশ করে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তোমরা ওখানে গিয়ে বসো আর খোকন—খোকনকে জায়গা ছাড়ার কথা বলার আগেই সোফা ছেড়ে সরে এসে দাঁড়িয়েছে ও। বিব্রত রমেন অরুণেশের সোফায় বসতে বারে বারে অস্বীকার করলেন। কেশবশংকর বাবু উদাত্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি বসে পড়ুন রমেন বাবু, ইয়ংম্যানদের খুঁজে টুঁজে নিয়ে জায়গা যোগাড় করে বসা ভাল। তরুবালা স্বামীর এ-হেন আচরণে মর্মান্তিক চটে গেলেন। ছিলাপরা ধনুকের মত ভুরু দুটো বঙ্কিম হলো মিসেস বিশ্বাসের। একটু ইতস্ততঃ করে সর্বাণী, ইন্দ্রাণী এগিয়ে এলেন লম্বা সোফাটার দিকে।

সেই ভুরু বাঁকানো অবস্থায় চোখে বিরক্তি-মিশ্রিত তাচ্ছিল্য দৃষ্টি হেনে তরুবালা বিশ্বাস খর গলায় বললেন—এখানে বসবে কী করে তোমরা? এ জায়গা মিসেস তালুকদারের জন্য রাখা আছে এবং পাছে ওরা কাণ্ডজ্ঞানহীনা হয়ে কেউ একজন বসে পড়ে, সেজন্য ঐ গলাতেই দ্রুতলয়ে শেষ ক'রলেন।

মিসেস তালুকদার ঠেসাঠেসি করে সকলের সঙ্গে বসতে পারেন না—স্ত্রীর কথা কানে না গেলেও, তরুবালা যে ওঁর পাশের খালি জায়গাটা ছেড়ে দিলেন না, সেটা বুঝতে পেরে কেশবশংকর তাঁর বিরাট শরীরটা নিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনারা এখানেই বসুন, আমরা পেছনে গিয়ে বসছি। এবার রমেন শুধু বিব্রতই বোধ করলেন না, খুব বেশি রকম লজ্জিত হলেন। সে লজ্জার দায় উদ্ধার করলেন সর্বাণী, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, ঐ যে মিসেস গুপ্তার পাশে জায়গা রয়েছে আমরা সেখানেই গিয়ে বসছি—কেশবশংকরকে লক্ষ্য

করে কথা ক'টি বলে দ্রুত ও পাশে যাওয়ার জন্ম চলতে শুরু করলেন সর্ব্বাণী, ইন্দ্রাণীও চললো। মালতী গুপ্তা বসেছেন দ্বিতীয় সারির ওদিকের কর্ণারে। প্রথম সারির মাঝখানে হিমাচল প্রদেশের দুজন বিশেষ অতিথির সঙ্গে বসেছেন মিঃ গুপ্ত। হিমাচল প্রদেশের প্রধান অতিথিদ্বয়কে আজকের অভিনয়টি ইংরিজীতে ইণ্টারপ্রেট করবার ভার নিয়েছেন উনি। নৃত্য-নাট্যে বোঝাবার ব্যাপার খুব কমই থাকে, ঘটনাটার জিষ্ট বলে দেওয়া আর কি। সামনে ভয়ংকর ভিড়। সর্ব্বাণী মেয়েকে নিয়ে পেছন দিক দিয়ে ঘুরে চললেন। গতকাল মালতী গুপ্ত দুপুরে এসে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সর্ব্বাণীদের ওখানে কাটিয়ে গেছেন, শুধু তাই নয়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে পাঞ্জাবীদের একটি বিশেষ প্রিয় খাবার 'বাটোরা' স্বহস্তে বানিয়ে সর্ব্বাণীদের খাইয়েছেন। কালকের দিনটা ভারি আনন্দে কেটেছে ওঁদের। সর্ব্বাণীর কাছে আগের দিনের প্রস্তুত পিঠা মজুত ছিলো, সে পিঠার নাম ভারি মজার—পরচিত্তহারিণী। অফিস-ফেরৎ মিঃ গুপ্ত স্ত্রীকে নিতে এসেছিলেন, সেই রকম কথাই ঠিক ছিলো আগে থেকে। এই পিঠার নাম নিয়ে চায়ের টেবিলে হাসির ঝড় তুলেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে কত মজার মজার পিঠার নাম স্মরণ হয়েছিলো চায়ের টেবিলে তার পর। তার পর অতীতের কত কাহিনী উদ্গীরণ হলো—মিঃ গুপ্ত ছোটো ভাইকে পাহারা রেখে ছোটোবেলায় তাক্ বেয়ে পাটিসাপ্টা চুরি করতে গিয়ে তাকের আলগা তক্তা খ'সে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কি ভাবে চিৎপটাং হ'য়ে পড়ে গিয়েছিলেন আর তার পর পিঠা খাওয়ার বদলে পিঠে কেমন ঘা কতক খেয়েছিলেন, সে ঘটনা বর্ণনা ক'রে হেসে আর বাঁচেন না মিঃ গুপ্ত। মালতী-সর্ব্বাণী জয়েণ্টলি ষড়যন্ত্র ক'রে একটি শান্ত ঠাণ্ডা মেয়ের টিফিন থেকে আমের আর আনারসের আচার চুরি ক'রে খেয়েছিলেন। হীরের কুচির মত অসংখ্য অতীত কাহিনী ঝিকমিকিয়ে উঠেছিলো কাল চায়ের পেয়ালায়। বিদায়কালে মিঃ গুপ্ত সহাস্যে বললেন: বান্ধবী পেলে তোমার মুখের অনাবিল আনন্দের আলো যখন এ ভাবে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, তখন বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগটা আরো ঘন ঘন করলেই তো পার। তার পর, সপ্তাহে এক দিন ক'রে কে কবে কার কাছে যাবে, সেই ব্যবস্থার রফা হলো মালতী-সর্ব্বাণীর মধ্যে। পেছন দিক থেকে প্রায় তৃতীয় সারির কাছ বরাবর এসে সর্ব্বাণী হাসিমুখে অস্ফুটে ডাক দিলেন, মালতী!

মিসেস গুপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে বান্ধবীকে দেখে চোখের তারা নাক পর্যন্ত নামিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন। তার পর মুখের ভাব হাসি হাসি ক'রে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, সা—বি, দেরি করিস নে আর, শীগ্গির চেয়ার দেখে বসে পড় তোরা—এত দেরী ক'রে আসতে হয় কখনও? মুখ ঘুরিয়ে বাঁ পাশে বসা মিসেস আয়াঙ্গারের সঙ্গে আগের মতই কথা বলতে লাগলেন মিসেস গুপ্ত। বিমূঢ়-বিস্ময়ে তৃতীয় সারির আরম্ভেই সকন্যা সর্ব্বাণী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অবশ্য সর্ব্বাণীরা নিয়মমাফিক আসতে পারেননি, একটু দেরী ক'রে ফেলেছেন ঠিকই। মিসেস রে'দের জন্য ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন, একসঙ্গে মিট ক'রে কালীবাড়ীর হলে আসার কথা হয়েছিলো ওঁদের। আজ মিঃ রে'র এক মাসতুতো বোন ও ভগিনীপতি দিল্লী থেকে মাত্র সাত দিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন। কথা ছিলো তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সবাই একসঙ্গে হ'য়ে আসবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিঃ রে'দের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতে হলো, বোন-ভগিনীপতি দুজনেই শারীরিক কিছু অসুস্থ বোধ করছেন। সেই জন্য সর্ব্বাণীদেরও দেরী হ'য়ে গেলো। কিন্তু তাই বলে বান্ধবী মালতী তার পাশে জায়গা থাকা সত্ত্বেও। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো একজন ভলেণ্টিয়ারের আহ্বানে। পাশ ফিরে দেখলেন একজন ভলেণ্টিয়ার দুটো হাতলবিহীন চেয়ার হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর তার একটু দূরে অরুণেশ দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখে। বোঝা গেলো অরুণেশই ভলেণ্টিয়ারকে বলে বলে চেয়ারের ব্যবস্থা করেছে। ভলেণ্টিয়ারের অনুরোধে যন্ত্রচালিতের মত একটু সরে গেলেন সর্ব্বাণী, ইন্দ্রাণী আগেই দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, সেই সারিতে পাশাপাশি দুটো চেয়ার পেতে দিলে ভলেণ্টিয়ার। সর্ব্বাণী ব'সে পড়লেন কিন্তু ইন্দ্রাণী বললো, আপনি ও চেয়ারখানা নিয়ে যান, চেয়ার আমার লাগবে না। ভলেণ্টিয়ারটি বিনীত গলায় প্রতিবাদ জানালো।

না, নিয়ে যান বলছি, এখানে চেয়ার পেতে লোক চলাচলের অসুবিধে করবেন না—ইন্দ্রাণীর কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে ভলেণ্টিয়ার হকচকিয়ে চেয়ার নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। সর্ব্বাণীও বাধা দিতে গিয়ে মেয়ের গলা শুনে চুপ করে গেলেন। মেয়ের জেদের সঙ্গে উনি সবিশেষ পরিচিত। তাছাড়া বান্ধবী মালতীর রহস্যময় ব্যবহারের ঘোর যেন তখনও উনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আস্তে আস্তে বিশ্লেষণের স্বচ্ছ আলোয় প্রতিভাত হলো সব সর্ব্বাণীর কাছে। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী-জায়ার আচরণ স্মরণ ক'রে একটা নিশ্বাস ফেললেন সর্ব্বাণী। মঞ্চপর্দা উঠে গেলো। সর্ব্বাণীর চিন্তার দিক্‌পরিবর্তন হলো কিছুটা। মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলেন দৃশ্য এবং দৃশ্যপটে।

দেয়াল ঘেঁসে আরো অনেকের সঙ্গে একেবারে ঋজুভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী। অডিটোরিয়ামের উজ্জ্বল আলো নিবে ছায়া-ছায়া অন্ধকার ঘনালো, তারপর ফিকে হলো আরো, অরুণেশ কখন এসে যেন দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণীর পাশে। বৃষ্টি থেমে যাওয়া অথচ আবার যেন এখনি বৃষ্টি নামবে আকাশের মত ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অরুণেশ। সকলের কান বাঁচিয়ে খুব অস্ফুটে ডাকলো, ইন্দ্রাণী! তখন ষ্টেজে অর্জ্জুন বলছে,—'অহো কী দুঃসহ স্পর্দ্ধা!' অরুণেশের মনে হলো পাশ ফেরা ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ চিরে এ শব্দ চারটে বার হ'য়ে এলো, কণ্ঠস্বর তো নয় যেন ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করলো। অথচ পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতনটুকু পর্যন্ত যেন বোঝা যায় না। এর আগে আর একদিন এমনি গ্লানিকর ঘটনার সামনে উপস্থিত ছিলো অরুণেশ। সেদিন ইন্দ্রাণীর অসহিষ্ণুতা উত্তেজনায় ধিকি-ধিকি করে জ্বলে উঠেছিলো ওর দু' চোখের মণিতে, মুখের রেখায়। সে ছবি এতটুকু ম্লান হয়নি অরুণেশের কাছে। মা'র আত্মপ্রসাদের এমন স্থূল প্রকাশ নিয়ে অনেক ভেবেছে অরুণেশ, প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধেও ভেবেছে অনেক। মাকে একলা পেয়ে কত দিন অরুণেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে এগিয়ে গেছে, কিন্তু ওর বক্তব্যের বিন্দুমাত্র উচ্চারণ না করে দু'-চারটে বাজে কথা বলে আবার ব্যথিত-গম্ভীর মুখে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে আর নিজের ভীরুতাকেই নিঃশব্দে তারপর গালাগাল দিয়েছে। মার কাছে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আর্জি পেস করতে গেলেই কী একটা অদ্ভুত লজ্জা ও সঙ্কোচে কণ্ঠরোধ হয়েছে বার বার।

নিজের নির্জন ঘরে এসে অনেক বিশ্লেষণ করেও সঠিক কারণ অনুমান করতে পারেনি অরুণেশ। ওর প্রতি মায়ের অন্ধ ভালবাসাই ওর কণ্ঠরোধ করছে নাকি কথার ফাঁকে ওর গোপন প্রেম প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকা ?

এক হাত দূরে দাঁড়ানো পাথরের ইন্দ্রাণী. অস্থিরতার বিক্ষুব্ধতার কোনো একটা ঢেউও ওঠেনি ওর মুখের রেখায়, শরীরের ভঙ্গিমায়। দু'চোখে উদগ্রীব ব্যাকুলতা নিয়ে তাকিয়ে আছে অরুণেশ পাষাণ-প্রতিমার দিকে। সেদিন অপরাহ্নের আভায় ওর নিজের চোখের আলো দেখেছিলো ও ইনার দুই চোখে, সে আলো নিবতে পারে না—নিববার নয়, বিশ বছরের অরুণেশ তা মন দিয়ে জানে, বুক দিয়ে বোঝে, তবে কী ও ভুল দেখেছিলো ? না, ভুল ওর হয়নি। নিয়তি ওর জীবনটা কী আশ্চর্য ভাবেই না নিয়ন্ত্রিত করছে ! ও আর ইন্দ্রাণী কাছাকাছি হলেই নিয়তি তার নিষ্ঠুর হাতের থাবা মেলছে ওদের মাঝখানে, টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিচ্ছে একজনকে আর একজনের কাছ থেকে। প্রেমের কিশলয় জেগে উঠলেই সমূলে কঠিন কর্কশ পায়ে নিষ্পিষ্ট করছে। নিজের মনও নিঃশব্দে যেন যাচাই করে চললো অরুণেশ। না, এই ভাঙা-গড়ার অদ্ভুত সমস্যা থেকে ওদের আর রেহাই নেই। এক হাত দূরে অন্ত আর এক মূর্তিতে দাঁড়ানো ইন্দ্রাণী ক্রমে ক্রমে ঝাপসা হয়ে একেবারে যেন মিলিয়ে গেলো অরুণেশের চোখে। অরুণেশ বিস্ফারিত চোখে দেখলো, সেখানে শুধু একটানা না অক্ষরটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বড় হ'তে লাগলো ক্রমশঃ। স্ফীত হতে হতে না শব্দটা ওর সামনে এসে সজোরে ধাক্কা দিয়ে গেলো ওকে। ও যেন সংক্ষুব্ধ সাগরের মধ্যে নির্জন দ্বীপে রয়ে গেলো একাকী। কুড়ি বছরের অরুণেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ঝাপসা চোখে বেরিয়ে এলো কালীবাড়ির অডিটোরিয়াম হল থেকে। অডিটোরিয়ামের বাইরে এলেই কি সব কিছুর বাইরে আসা যায় ? একটা অসহ্য রাত্রি বাইরে বিস্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিলো যেন। তারপর কখন ও পা বাড়ালো, গেটের কুণ্ডলী-পাকানো কুকুরটিকে মাড়িয়ে চলে গেলো, কিছুই খেয়াল নেই। সমস্ত চেতনায় শুধু অন্ধকার, ধূসর, সবুজ, অসহ্য অন্ধকার !

'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের তিন দিন পর কেশবশংকর অফিস থেকে যখন ফিরলেন, তখন সিমলার আশ্চর্য সুন্দর বিকেল শেষ হয়ে গেছে। লাঞ্চের পর একটা জরুরী মিটিং কল করতে উনি বাধ্য হ'য়েছিলেন। একজন কর্মচারী তার নিজের অপরাধের প্রমাণযুক্ত কতকগুলি অফিসিয়াল রেকর্ড পোড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। সেই সব ব্যাপারের বিলি-ব্যবস্থা ক'রে কেশবশংকরের অফিস থেকে বেরুতে অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। তারপর ম্যালেও মৌতাতে মজে গিয়েছিলেন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, খেয়াল যখন হলো তখন হাতঘড়িতে চোখ ফেলে দেখলেন বিলম্ব হ'য়ে গেছে প্রচুর। দেরী হলে বাড়ি ফিরে আর কাউকে পান না, ইভনিং-ওয়াকে বেরিয়ে যান সবাই। বাবুর্চি বৈজুরাম খালি বাড়িতে মনিবকে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে চা-খাবার পরিবেশন করে, বয় দিলারাম সাবের আহ্বান শোনার জন্ম অনেক বেশি উৎকর্ণ হয়ে থাকে, কিন্তু তবু, সেদিন বয়-বাবুর্চির অসংখ্য গলতি ওঁর চোখে পড়বেই। এ নিয়ে কখনও কিছু বলেননি উনি বৈজুরাম-দিলারামকে। কিন্তু, সাবের না বলা মুখের রেখায়, কপালের খাঁজে যে বিরক্তি ফুটে ওঠে, তার জন্ম ওরা সভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মেমসাবের আগমনের দণ্ড গুণতে থাকে। আজ ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হওয়ার চেয়ে আনন্দিত বেশি হ'লেন, হাসিমুখে বললেন—

একটা মজার খবর শুনেছো তরু, আমাদের রমেন বাবুর স্ত্রী সর্বাণী দেবী ফিলোজফিতে ঈশান-স্কলার। তরুবালার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়েও কেশবশংকর খুশিমুখে বলে চললেন।

দিল্লী থেকে মিঃ রে'র বোন আর ভগ্নীপতি এসেছেন—মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস রুদ্র। মিসেস রুদ্র ছিলেন সর্বাণী দেবীর ক্লাশমেট। সস্ত্রীক এবং সবোন ভগিনীপতি ম্যালিং এ বেরিয়েছেন মিষ্টার রে, আমাদের পরিচিত প্রায় সকলেই ছিলেন সেখানে। সাহেব সিং-এর দোকান থেকে রমেন বাবু ও সর্বাণী দেবী কি যেন ওষুধ কিনে বেরিয়েছেন। বান্ধবীকে চিনতে পেরে মিসেস রুদ্র হৈ-হৈ করে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলেন, তারপর সব প্রকাশ হয়ে গেলো—একেবারে অচল অনড় হয়ে স্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে গেলো কেশবশংকরের। স্ত্রীর একেবারে সামনে এসে—সংশয়ী গলায় প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তরু, তোমার সেই পুরোনো মাথার যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে বুঝি ? তরুবালা নীরস গলায় তবু ছোটো উত্তর দিলেন, না। তরুবালার এ সময় বাড়িতে বসে থাকার আর মুখভারের কি কারণ ঘটতে পারে, মনে মনে তাই চিন্তা করতে করতে কেশবশংকর পাশের ঘরে জামা-কাপড় ছাড়তে গেলেন। বছর দু'য়েক আগে তরুবালার দূর সম্পর্কের এক ভাই ইতিহাসে ঈশান-স্কলার হয়েছিলো। সে খবর যখন উনি ষ্টেটসম্যান মারফৎ পেলেন, কাগজে ঈশান-স্কলারের পিতৃপরিচয় পড়েই উনি হিসেব করে দেখলেন, ছেলেটি সম্পর্কে ওঁর ভাই হয়। তখন কিছুদিন ওঁর গল্প শুধু গরম হয়ে থাকতো অদেখা ভাই-এর ঈশান-স্কলারশিপের আলোচনায়। একদিন অফিস-ফেরৎ কেশবশংকর পাশের ঘর থেকে স্ত্রীর আলোচনার কিছু অংশ শুনে ফেলেছিলেন।

: যাকে এডুকেশন এ্যাটমসফিয়ার বলে, সে হলো গিয়ে আমার বাপের বাড়িতে। যে ঘরেই আপনি ঢুকবেন, দেখবেন স্তূপীকৃত বই খাতা টেবিলে ছড়ানো আর তার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে হয় আমার কোনো ভাই না হলে কোনো বোন। আর ফলও সব করছে তেমনি, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলোতে ফার্স্ট সেকেণ্ড ছাড়া হয় না কেউ! এই তো আমার ভাই অভিজিৎ এবার ঈশান-স্কলার হয়েছে—ষ্টেটসম্যানে দেখেছেন নিশ্চয়ই ? ফটো দেখে মনে হয় যেন এখনও ষোলো বছর পেরোয়নি ওর। গদগদ হয়ে আরও কিছু বলতেন মিসেস তরুবালা বিশ্বাস কিন্তু কথার মাঝখানে ঘরের অনেকের মধ্যে কে যেন একজন জিগ্যেস ক'রে বললেন, আপনার নিজের ভাই ?

মনে মনে চটলেন তরুবালা। কথার মাঝখানে এ ধরণের সওয়াল সিমলার সমাজে কেউ করেন না। খুড়তুতো ভাই বলতে গিয়ে গলায় দ্বিধা জাগলো। কারণ, পরিচিতাদের মধ্যে অনেকে ওঁর পিতার পদবী জানেন। কিছুটা খতিয়ে গিয়ে তরুবালা জবাব দিলেন, না, নিজের ভাই নয়, মাসতুতো ভাই—তা অভু আমার নিজের ভায়ের চেয়েও অনেক বেশী। অভিজিৎকে অভু বলে তরুবালা। নিজের উক্তিতে অবশ্য একটু জোর পেলেন কিন্তু আগেকার কথার

পর্বটার যে আদৌ যোগাযোগ রইলো না, তা বিস্মৃত হলেন সম্পূর্ণ। পাশের ঘরে চা খেতে খেতে কেশবশংকর মুখ টিপে হাসলেন এবং অভ্যাগতরা বিদায় জানিয়ে চলে গেলে স্ত্রীর কাছে এসে সহাস্যে বললেন, তরু, অভিজিতের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ঠিক মাসতুতো না পিসতুতো, হিসেব কষে দেখো দিকিনি, গ্রামদেশের একটা মজার ছড়া আছে জানো তো? 'মামার ক্ষেতে বিয়োলো গাই, সেই সম্পর্কে মাসতুতো ভাই'—কথা শেষ ক'রে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন কেশবশংকর।

খুব বেশি সেদিন রাগ করতে পারেননি তরুবালা। আড়াল থেকে ওঁর কথা স্বামী কতখানি শুনেছেন তা জানেন না যখন, তখন চেপে যাওয়াই ভাল। চট ক'রে অন্য একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। কেশবশংকর রমেনদের বাড়ির সকলের প্রতিই একটি প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা করেন এবং নীলা যে ইভনিং ওয়াকের নাম ক'রে ইন্দ্রাণীর কাছে বাংলা শিখতে যায় সে খবরও সবিশেষ জানেন, প্রকাশ করেননি তা মেয়ের কাছে। ঐ এক ফোঁটা মেয়ে ইন্দ্রাণীর প্রতিভায় এবং ব্যক্তিত্বে মনে মনে ইন্দ্রাণীকে আন্তরিক স্নেহ করেন কেশবশংকর। স্ত্রীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাবার জন্যই ইন্দ্রাণীর পরীক্ষার খবর সেদিন বাড়িতে এসে বারে বারে উল্লেখ করেছিলেন এবং আজকেও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সর্বাণীর খবর ব্যক্ত করার পেছনে ঐ একই উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, কিন্তু স্ত্রীকে এমন থমথমে মুখে নির্বাক থাকতে কখনও দেখেননি কেশবশংকর। কোনো অশুভ সংবাদের আশংকায় বিচলিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্তন ক'রে ফিরে এলেন স্ত্রীর কাছে। উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তরু? একটু নড়ে চড়ে বসে তরুবালা ধরা-ধরা গলায় বললেন, তুমি, চা খেয়ে নাও, তারপর শুনো—কেশবশংকরের কপালে রেখা পড়লো কয়েকটা। হাঁক দিয়ে বৈজুরামকে ডেকে চা-জলখাবার এ ঘরে দিয়ে যেতে বললেন। স্ত্রীর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে শুধোলেন, কী ব্যাপার ঘটেছে তাড়াতাড়ি বল তরু, ভয়ানক অস্থিরতা শুরু হয়েছে—সেই আগের গলাতেই তরুবালা বললেন, খোকন কিছুতেই বিয়ে করবে না, শুধু এখনই নয়, ও নাকি জীবনেও বিয়ে করবে না।

হেসে ফেললেন কেশবশংকর। ও! এই কথা, আমি ভেবে মরছি না জানি কী কাণ্ড ঘটে বসেছে। তোমার মাথায় পোকা ঢুকেছে, না হলে খোকনের বিয়ের জন্য এমন করে ক্ষেপো তুমি? এই বয়েসে কোনো ছেলে আজকাল বিয়ে করতে চায় না কি?

এ কথায় তরুবালা কেঁদে ফেললেন, না গো, তুমি জানো না, খোকন বলেছে আজীবন ও চিরকুমার থাকবে আর—আর বলেছে ওর সিমলা ভাল লাগছে না, ও সাত দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে যাবে। যে ছেলে মা-বাবাকে ছেড়ে কতকালের জন্য বিলেত যাচ্ছে কে জানে, তার বাবা-মা-বোনেদের কাছ ভাল লাগছে না, তার ভাল লাগবে কলকাতার এই ভ্যাপসা গরমে শূন্য হোস্টেলবাড়ি, এমন মতি খোকনের কবে থেকে হলো! ফুঁপিয়ে উঠলেন তরুবালা। বৈজুরাম চা-খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকাতে তরুবালা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কেশবশংকর ছেলের কথা আর হাসি দিয়ে উড়োতে পারলেন না। চিন্তিতমুখে চায়ের পেয়ালা তুলে চুমুক দিলেন একটা, খোকন আজ গেছে কোথায়?

চোখের জল মুছে তরুবালা ভয়-ভয় ব্যস্ত গলায় বললেন, ও মা তাইতো! এতক্ষণ তো খোকনের ফেরা উচিত ছিলো, ওতো দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেই তোমার বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছে।

মানা করলে না কেন তুমি? ক'দিনই বা খোকন হাতের টিপ প্র্যাকটিস করেছে, ওতে কী পাখী মারা যায়? কেশবশংকরকেও ভাবিত হ'তে দেখা গেলো।

তরুবালা বললেন, নীলার কাছে খোকন বলেছে, কাল কিম্বা পরশু 'চুরুট-নালায়' ও লক্কড়বাঘ শিকার করতে যাবে, আর তুমি বলছো কিনা, ওতে কী পাখী মারা যায়? আমাদের কথায় কাজ হবে না, তুমি বাপু ছেলেকে 'চুরুট-নালা'য় যেতে মানা ক'রে দিও, আমার তো শুনে অবধি বুকে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। কেশবশংকর চিন্তিত মুখেই চা-জলখাবার শেষ করলেন। কলিংবেল তার অস্তিত্ব ঘোষণা করলো। একটু পরেই দিলারাম এসে সবিনয়ে জানালো,—টেলার জানকি-প্রসাদ এসেছে। দিলারাম মারফৎ টেলারকে বসতে ব'লে কেশবশংকর উঠে পড়লেন। খোকন না বললে কি হবে, ট্রপিকালের কোটটা একটু আঁটো-আঁটো হয়েছে, আজ টেলারকে বাড়ি আসতে বলেছিলেন সেজন্য সন্ধ্যের পর। খোকন এ সময়ের অনেক আগেই রোজ বাড়ি ফিরে আসে। এক মিনিট কি ভেবে নিয়ে কেশবশংকর ছেলের ঘরে চলে এলেন। ওয়ার্ডরোব খুলে দেখলেন, না, ট্রপিকালের কোট প'রে যায়নি খোকন, ওটা হ্যাঙ্গারেই ঝুলছে। ছেলের মাপ তো জানকিপ্রসাদের কাছে আছেই, কাজেই খোকনের গায়ের মাপ এখন না পেলেও কিছু এসে যাবে না। হ্যাঙ্গার থেকে কোট খুলে নিয়ে দু'পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেলেন কেশবশংকর, পকেটে কিছু আছে কিনা হাত গলিয়ে দেখতে লাগলেন। বাইরের পাশের দুটো পকেট ও বুকপকেট—তিনটেই খালি। কোটের ভেতর-পকেট থেকে কাল কাগজে মোড়া একগোছা ফটো বেরিয়ে এলো। কাগজের আবরণ উন্মোচন করতেই অদ্ভুত বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন কেশবশংকর। প্রথম ফটোখানা ফুলের বাগানের মাঝখানে বসা ইন্দ্রাণীর ফটো, তারপর একে একে আরো ছ'খানা ফটো দেখলেন, সব ক'খানাই সালোয়ার কামিজ পরা ইন্দ্রাণীর বিভিন্ন ভঙ্গিমার ফটো। ফটোয় চোখ রেখে অনেকক্ষণ একেবারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেশবশংকর। হঠাৎ খেয়াল হলো জানকিপ্রসাদকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন। দিলারামকে আবার ডাক দিয়ে বলে দিলেন—টেলারকে আর একদিন আসতে বলে দাও, ছোটো সাব এখনও ঘরেই ফেরেনি। দিলারাম আদেশ জানাতে চলে গেলো। ইন্দ্রাণীর বসা ফটোখানা ছাড়া বাকী আর ছ'খানা ফটো যথাস্থানে রেখে দিলেন। বসা ফটোখানা নিজের পকেটে ভরে ফিরে এলেন স্ত্রীর কাছে।

খোকন ফিরেছে? উদ্বেগ-ব্যাকুল গলা তরুবালার। চেয়ার টেনে স্ত্রীর খুব কাছাকাছি বসলেন কেশবশংকর।

শোনো তরু, আমি যদি তোমার ছেলেকে বিয়েতে মত করাতে পারি, তাহলে আমাকে কী খাওয়াচ্ছো বল? এ যেন ভূতের মুখে রামনাম শুনলেন তরুবালা। শুধু ছেলের মত করানোই নয়, পুত্রের বিয়ের পুরো সম্মতির সুর এত দিনে স্বামীর গলায় পেলেন। আনন্দে

অধীর হয়ে বললেন তরুবালা, তুমি যা যা খেতে ভালবাস এক মাস ধরে রোজ তাই খাওয়াবো—তারপর মুখ টিপে হেসে বললেন, ছেলে যখন আমার, তখন তোমাকে খাওয়াতে হবে বৈ কি!

ছেলেমানুষের মত উচ্ছল গলায় হেসে উঠলেন তরুবালা। স্বামীর কথায় প্রচুর আস্থা আছে। মুখ দিয়ে যখন একবার ওকথা বলেছেন তখন খোকনের মত আদায় করে ছাড়বেনই।

কিন্তু গলায় গাম্ভীর্য আনলেন কেশবশংকর, মনে পছন্দ করতে ছেলেকে ঢালা স্বাধীনতা দিতে হবে।

নিশ্চয়ই, আমি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছি ও বিষয়ে, ছেলেকে পারবো না?

মৃদু হাসলেন কেশবশংকর, বললেন, এ ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের প্রশ্ন ঠিক এক দাঁড়ায় না তরু, তুমি ভুলে যাচ্ছো সে কথা। যাই হোক, ধরো—ইতিমধ্যে খোকন যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে থাকে?

তরুবালা বললেন, তুমি হাসালে দেখছি! খোকনের কোনো মনোনীতা থাকলে অন্ততঃ তার একখানা চিঠিও তো আসবে কলকাতা থেকে? জানোই তো, চিঠির বাক্সের তালা আমি নিজের হাতে খুলি?

আহা, সিমলায়ও তো খোকনের মনোনীতা থাকতে পারে?

তরুবালা লঘুকণ্ঠে বললেন, সিমলায় থাকলে তো কথাই নেই, মেয়ের বাবার যাতায়াতের পয়সা খরচ হবে না। তোমার কথা আমি বুঝেছি, ছেলের বিয়েতে অত অমত শুনে তুমি মনগড়া ভাবনা ভেবে এসব কথা বলছো।

কেশবশংকর হাসলেন, তোমার যখন ছেলের বিয়ে দিতে ইচ্ছে নেই, তখন আর করা কী?

এবার তরুবালা ভুরু কোঁচকালেন, ব্যাপার কী বলতো? তুমি কি খোকনের টেবিলে কোনো চিঠি-ফিটি দেখে এলে নাকি? মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন কেশবশংকর।

তরুবালা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রগলায় বললেন, যাই, খোকনের আসার আগে আমিও দেখে আসি তাহলে।

বসো, বসো, ব্যস্ত হয়ো না—বাধা দিলেন কেশবশংকর। নিদর্শন আমি পকেটে করেই নিয়ে এসেছি।

তরুবালা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে ব্যস্ততার সঙ্গে স্বামীর দিকে হাত প্রসারিত করলেন। দেখি দেখি চিঠিখানা—কেশবশংকর বললেন, এবার তুমি হাসালে তরু, ছেলের লাভ লেটার বাবা লুকিয়ে পড়ে এমন তাজ্জবের কথা আমার জানাও নেই, শোনাও নেই, ওসব মায়েদের একতিয়ারে। তরুবালা হতাশ হয়ে আবার গুটিয়ে বসলেন।

তবে? কেশবশংকর স্মিতমুখে বললেন, চিঠি নয় ফটো।

দেখি দেখি? আগের মতই ব্যস্ততা ফুটে উঠলো তরুবালার কণ্ঠস্বরে। পকেট থেকে কাগজে-মোড়া ফটোখানা তরুবালার হাতে তুলে দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন কেশবশংকর। আবরণ সরাতেই একেবারে যেন রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তরুবালার মুখ। কেশবশংকর তরুবালার মনকে তার নিজের মুখোমুখি হবার সময় দিয়ে পকেট থেকে পাইপ বার করে ধীরে-সুস্থে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। হঠাৎ কি যেন মনে পড়লো তরুবালার, চেষ্টা করে মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বললেন, এ ফটো খোকনের টেবিলে থাকলে কি হবে, এ নিশ্চয়ই নীলার কাণ্ড! ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ওর ভয়ানক ভাব কি না, ওই ফটোখানা ভুলে টেবিলে রেখে গেছে। কেশবশংকর পাইপ থেকে ধোঁয়া উদ্গীরণ করে বললেন, আর ফটো যদি খোকনের কোটের বুকপকেটে থাকে, তাহলেও কি তুমি বলবে—নীলা ভুলে ফেলে গেছে ওখানে?

খোকনের বুকপকেটে! তরুবালার কণ্ঠ দিয়ে ধীরে ধীরে কথা ক'টি বার হলো। কেশবশংকর আবার সময় দিলেন তরুবালাকে। ইন্দ্রাণীর এই ফটোখানা অনেক হাঙ্গামা করে যোগাড় করতে হয়েছে অরুণেশকে। মিসেস রে নীলা ও ইন্দ্রাণীকে নিজের বাগানে বসিয়ে যুগ্ম ফটো তুলছিলেন একখানা। অরুণেশ একদিন বেড়াতে গিয়ে ফটোখানা দেখে ফেলে। তারপর, নীলার ফটোর পোজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একদিনের কড়ারে নেগেটিভখানা নিয়ে আসে মিসেস রে'র কাছ থেকে। সেই যুগ্ম ফটো থেকেই অরুণেশ ইন্দ্রাণীর আলাদা ফটো প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছে। অবশ্য যুগ্ম ফটোও প্রিন্ট করিয়েছে একখানা। নাহলে নীলার কাছে যদি মিসেস রে কোনো দিন ফটোর কথা তুলে বসেন, তাহলে বেমক্কা বিপদে পড়ে যাবে ও।

এক-পাইপ তামাক পুড়লো, তবু তরুবালা ফটো কোলে ক'রে একই ভাবে বসে আছেন!

কী হলো তরু? পাইপ থেকে ঠুকে ঠুকে ছাই বার করতে করতে প্রশ্ন করলেন কেশবশংকর। তবু নিরুত্তরে রইলেন তরুবালা।

ইন্দ্রাণীকে পছন্দ হচ্ছে না তোমার?

ওগো না—না—যেন কেঁপে উঠলেন তরুবালা।

আমরা রাজি হ'লে কী হবে, ওরা সম্মতি দেবে না।

ওরা মানে রমেন বাবু, সর্বাণী দেবীর কথা বলছো? নিঃসংশয়ের সুরে বললেন কেশবশংকর। নিশ্চয়ই মত দেবেন, অমত করবার কোনো কারণ তো খুঁজে পাচ্ছিনে আমি। বিয়ের পর খোকন বিলেত থেকে না ফেরা পর্যন্ত ইন্দ্রাণী ওঁদের কাছে থেকেই পড়াশুনো করবে। তরুবালার ভেতরে যেন অস্বস্তিকর ছটফটানি শুরু হলো, কী ক'রে মুখ ফুটে পরাজয় ঘোষণা করেন স্বামীর কাছে! কি ক'রে বলেন, রমেন-সর্বাণীর মতামতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে না, আরো একজন আছে, আরো একজন থেকে যায়—সে ইন্দ্রাণী। মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়ে ষ্টাডি করতে দেরী লাগে না। দু-চারবারের দেখাতেই উনি বুঝেছেন কী ইস্পাতের মত শক্ত এই ষোলো বছরের একফোঁটা ইন্দ্রাণী, কী উদ্দীপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ! যেদিন ফেয়ারওয়েল পার্টির পর ফটোতোলার জন্য আর সবাইকে আহ্বান করেছিলেন, সেদিন ঐ একফোঁটা মেয়ের ঠোঁটের বাঁকে অদ্ভুত বাঁকা হাসির খেলা দেখেছিলেন তরুবালা। এই মুহূর্তে সেই দৃশ্য স্পষ্ট ভেসে উঠলো তরুবালার মনের আয়নায়। এ সমস্যা এমন ভাবে দেখা দেবে ওঁর সামনে, এ যে একেবারে অকল্পনীয় তরুবালার কাছে! ছেলের হঠাৎ মন খারাপের কারণ, 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য না দেখেই বাড়ি ফেরা এবং না খেয়েই ওঁরা আসার আগে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়া, এবং অনেক ডাকাডাকি করেও কেন সেদিন পুত্রের কাছ থেকে সাড়া পাননি, একে একে সব স্বচ্ছ হ'য়ে ধরা

দিলো তরুবালার কাছে; আর কোনো কুয়াশা রইলো না। তরুবালার মন অসহ্য উদ্বেগে ছটফট করতে লাগলো। এ্যাকাউন্টেণ্ট-জেনারেল-জায়া, মিসেস তরুবালা বিশ্বাস, যিনি বেমলোর বাঙলোতে থাকেন, তিনি হেরে গেলেন ক্যাথলিক ক্লাবের সাত নম্বর স্যুইটের একফোঁটা ইন্দ্রাণীর কাছে? তরুবালার স্নেহান্ধ মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

: ওঁর জন্য ওঁর নাড়িছেঁড়া ধন অসুখী থাকবে—তাও কী হয়? ক্যাথলিক ক্লাবে যাওয়ার জন্য শাড়ি পাল্টাতে উঠলেন তরুবালা। স্ত্রীকে কাপড় ছাড়ার ঘরের অভিমুখে যেতে দেখে, তরুবালার উদ্দেশ্য আঁচ ক'রে ফেললেন কেশবশংকর। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, শোনো তরু, তোমার যাওয়া এখন ঠিক হবে না, কাল অফিসে আমি রমেন বাবুর কাছে কথাটা পাড়ি, তারপর যেও।

তুমি বুঝবে না, আমারই আগে যাওয়া দরকার—ড্রেসিংরুমের দিকে এগিয়ে আবার স্বামীর কাছে সরে এলেন তরুবালা।

এই নাও, ফটোখানা আগে ঠিক জায়গায় রেখে দাওগে, আর খোকন-নীলার গলা শুনছি, তুমি কিন্তু আমার যাওয়ার কথা জানিও না ওদের, কিন্তু তরুবালা গেট-পার হবার আগেই কেশবশংকর ছোট কন্যাকে ডেকে চুপি চুপি শুধোলেন, নীলা, তোর বান্ধবী ইন্দ্রাণী যদি তোর বৌদি হয়, কেমন হয় বল দেখি?

এর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না বাবা! লাফিয়ে উঠেই নীলা ভীরুসংশয় চোখে বাবার দিকে তাকালো, কিন্তু, মা কিছুতেই রাজি হবেন না, আমি জানি—

রাজি হবেন না কি রে? তোর মা এই বিয়ের প্রস্তাব করতেই তো ক্যাথলিক ক্লাবে এখন গেলেন।

সত্যি বাবা? আর এক লাফ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো নীলা, মেয়ের এক হাত টেনে ধরে রেখে কেশবশংকর হাসি-হাসি মুখে আবার বললেন, আর একটা নোতুন খবর শোন্, ইন্দ্রাণীর মা সর্বাণী দেবী ফিলোজফিতে ঈশান-স্কলার। যা, দাদাকে খবর ছুটো দিগে যা—ততক্ষণে নীলা অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে কেশবশংকর পাইপ ধরালেন। এই বিয়েতে তরুবালা এত সহজে সম্মতি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করতে নিজেই ক্যাথলিক ক্লাবে যাবেন, এতটা আশা করেন নি উনি। ক'দিন ধরে ছেলের মুখে হাসি নেই, খুশি নেই, খাওয়া নেই, স্ফূর্তি নেই, বোনেদের সঙ্গে রাগরঙ্গ নেই, মা-বাবার সঙ্গে কোনোরকম দুষ্টুমী নেই—কোনো কিছু আশংকার আঁচ ক'রে ক'রে হাঁপিয়ে উঠেছিলেনে কেশবশংকর। পাইপ মুখে দিয়ে প্রশান্তমুখে কেশবশংকর আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলেন।

[ক্রমশঃ।

সূর্য-কবি

আবদুল মজিদ

হে অফুরন্ত জ্যোতির উৎস,
তোমার রৌদ্র-করোজ্জ্বল সে এক প্রভাতে
প্রথম দেখলাম সুন্দরী এ পৃথিবীকে।
তোমার আলোর বিচ্ছুরণে
আমার কুঞ্জে-কুঞ্জে ফুটলো অসংখ্য কিশলয়;
সবুজ সবুজতর হ'লো।
প্রতিদিনই অজস্র আলোর উত্তাপ
অনুভূত হ'লো ধমনীতে।
তোমার আলোর কণিকা
আমার আকাশে আকাশে রচনা করে
অপরূপ ইন্দ্রধনু-সেতু।
উত্তাপের উত্তেজনায় ভুলে গেলাম
জঠরের নির্মম-ভ্রূকুটি।
তোমার আলোর আবীর মুঠি-মুঠি
ছড়িয়ে দিলাম আকাশে-আকাশে।
আলোর তীক্ষ্ণতীর কবিতা তোমার
বিদ্ধ করে আঁধার-ঈগল।
হে সবিতা সুন্দর,
তোমার সফেন সমুদ্র-তরঙ্গে অবগাহন করে
তৃপ্ত, মহাতৃপ্ত আমি।
নিত্য বিকিরণে এত আলো-প্রেম-তাপ
তোমার অন্তর দীপ্তি হবে না নিঃশেষ?
হে সুন্দর জ্যোতির্ময়, লহ মোর পূর্ব-প্রণাম।

গরীব

অশোকা দেবী

ফুটপাতে পড়ে থাকা জীবন,
করেছে অনেক আশা সে-ও।
নিবে গেছে ছোট দীপশিখা
ছোট হাওয়া লেগে।
অর্থহীন জীবনের পটে
এঁকে দেওয়া আছে—
ব্যর্থতার ছবি। কাঙালের
রুদ্ধ দ্বার তবু
কথা কয়, আধো-আধো স্বরে।
ক্লান্তিভরা কঠোর জীবন
মধুও ঢেলেছে অন্তরে।
হীনতার নাই যবনিকা—
তবু তারা সহিছে বেদনা
লাঞ্ছিত বিদ্বেষ পৃথিবীতে।
গভীর দুঃখের কল্পনায়
তারা কাঁদে।
ব্যর্থতার মন্দিরে
নিরাশার স্বপ্নের জাল বুনে।
দুঃখের চিতায়
জ্বলে-পুড়ে হয় ছাই
তবু সয়ে যায় নীরবেতে।

[*Osamu Dazai's* "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আগুন

সাপের ডিমের ব্যাপারের পর দিন দশেকের মধ্যে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল—ফলে মায়ের শোকবৃদ্ধি ও আয়ুক্ষয় সমান তালে এগিয়ে চলল।

এরই মধ্যে একদিন এক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। বাড়ীতে আগুন লাগানোর মত এমন অপকর্ম আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে এ ধারণা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আমার চারপাশে আর পাঁচজনের জীবন বিপন্ন করে, নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার সুযোগ নিজেই ডেকে আনলাম।

ছেলেবেলা থেকে এমন একটি "শিশুমহিলা" তৈরী হয়েছিলাম যে অনবধানতা থেকে অগ্ন্যুৎপাৎ হতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। একদিন অনেক রাত্রে হাত ধুতে উঠে বসার ঘরের পরদা পেরিয়ে এগুতে গিয়ে স্নানের ঘর থেকে আলো চোখে পড়ল। এমনি একটু দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সে ঘরের দরজার কাচ পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে—এতক্ষণে সশব্দে ফাটতে সুরু করল। পাশের দরজা দিয়ে খালি পায়েই ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তখন আমার নজরে পড়ল চুল্লীর পাশে স্তূপীকৃত জ্বালানিকাঠ দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

বাগানের প্রান্তে এক কৃষক-পরিবারের বাস—সেই বাড়ীর দরজায় প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিয়ে চেঁচাতে লাগলাম,—মিষ্টার নাকাই, আগুন! আগুন! দয়া করে উঠে আসুন, আগুন লেগেছে।

মিষ্টার নাকাই বোধ হয় সবেমাত্র শুয়েছিলেন, ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দিলেন—এক্ষুণি আসছি। আমি তাঁকে আবার তাগাদা দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে রাতের পোষাকেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

আমরা আগুন লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। পুকুর থেকে দুজনে বালতি ভরে জল তুলেছি, এমন সময়ে মায়ের ঘরের পাশের রেলিং-এর কাছ থেকে সাড়া পেলাম। জলভরা বালতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে মাকে ধরে ফেললাম, নইলে তখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। ব্যস্ত হয়ো না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুয়ে থাক। কোনরকমে তাঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আগুনের দিকে ছুটলাম। এবার আমি স্নানের ঘর থেকে বালতি বালতি জল মিষ্টার নাকাইকে এগিয়ে দিলাম, উনি জ্বলন্ত কাঠের বোঝায় ঢালতে লাগলেন। কিন্তু আগুনের এত জোর হয়ত ঐ ভাবে নেবানো যেত না।

নীচে 'আগুন আগুন' রব উঠল। হঠাৎ চার-পাঁচ জন চাষা আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতে হাতে বালতি বালতি জল চালু হয়ে গেল। আগুন নিবল। আর একটু দেরী হলে আগুন ঘরের ছাতে গিয়ে ঠেকত।

প্রথমেই মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ডের কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্তরাত্মা ধিক্কার দিয়ে উঠল। এতক্ষণে মনে পড়ল গতরাত্রে চুল্লী ঝেড়ে পরিষ্কার করে আধপোড়া কাঠগুলো নিবে গেছে ভেবে হাতের কাছে অজ্ঞোকরা জ্বালানিকাঠের স্তূপের কাছে রেখেছিলাম। এই তথ্য আবিষ্কার করে আমার চোখ ফেটে জল এল। চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুনলাম সামনের বাড়ীর মেয়েটি চেঁচিয়ে বলছে—কেউ নিশ্চয়ই চুল্লী ঠিকমত সাফ করে নি। জায়গাটা একেবারে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে।

গ্রামের মেয়র পুলিশের লোক, দমকল বিভাগের বড় কর্ত্তা সবাই এসেছেন। স্বভাবোচিত মৃদু হেসে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—খুব ভয় পেয়েছ মা! কি করে এমন হল?

আমারই দোষ। ভেবেছিলাম কাঠগুলো বুঝি একেবারে নিবে গেছে।

এর বেশী কিছু বলা তখন আমার সাধ্যের বাইরে। মাটির দিকে চোখ নীচু করে, বাক্‌শক্তি রহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম মনে হল পুলিশ আমায় এই দণ্ডে হাতকড়া পরিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে হঠাৎ খেয়াল হল আমার পায়ে জুতো নেই গায়ে ভদ্র পোষাক পর্য্যন্ত নেই। রাতকামিজ পরে কি লজ্জাকর অবিন্যস্ত চেহারা নিয়েই না এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি! দিশাহারা হয়ে পড়লাম। মেয়র মশায় দরদভরা কণ্ঠস্বরে বললেন—বুঝেছি। তোমার মা ভাল আছেন তো?

মা নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন, তাঁর ওপর মারাত্মক ধাক্কা গেল।

অল্পবয়সী পুলিশটির কথায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা—যাক গে বাড়ীটায় যে আগুন ধরেনি—এ এক ভরসার কথা।

ইতিমধ্যে মিষ্টার নাকাই পোষাক বদলে এসে প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন—ব্যাপার কি ? এত গণ্ডগোল কিসের ? খানিকটা কাঠ পুড়ে গেল, একে তো আর আগুন লাগা বলে না। বেচারা ভদ্রলোক আমার দোষ ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন।

মেয়র মশায় মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন—বটেই তো। এর পর পুলিশকে কয়েক মিনিট কি সব বুঝিয়ে আমায় বললেন—এবার আমরা আসি। মাকে আমার নমস্কার দিও।

সবাই এগিয়ে গেল, কেবল সেই পুলিশটি আমার কানের কাছে এসে ফিস-ফিস করে জানিয়ে গেল—আজকের ঘটনার কোন রিপোর্ট করা হবে না। সে চলে যাবার পর মিষ্টার নাকাই থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশটা কি বলে গেল ?

আমি উত্তর দিলাম, ও বললে কোন রিপোর্ট হবে না। প্রতিবেশী যারা এতক্ষণ ভিড় করেছিল, তারাও সম্ভবতঃ আমার জবাব শুনল। কারণ এর পরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যে যার ঘরে ফিরে গেল। মিষ্টার নাকাই আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপর ভস্মীভূত কাঠের স্তূপের পাশে। একাকী শূন্য মনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের জলের ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ভোর হয়ে আসছে।

আমি হাত-মুখ ধুতে গেলাম। মার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় পাচ্ছিলাম, স্নানঘরে চুল বেঁধে খানিক সময় নষ্ট করলাম। রান্নাঘরে ঢুকে রান্নার বাসনপত্র গুছিয়ে নিতে আরও কিছুটা সময় গেল, একটু হাল্কা বোধ করলাম।

তারপর পা টিপে টিপে মায়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, এরই মধ্যে জামা-কাপড় বদলে পরিপাটি হয়ে আরামচেয়ারে গিয়ে বসেছেন, মুখে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। আমায় দেখে হাসলেন বটে কিন্তু সে মুখ কাগজের মত সাদা। প্রত্যুত্তরে আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। চুপ করে তাঁর চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিক পরে মা বললেন, বিশেষ কিছু হয়নি—না ? শুধু ঐ জ্বালানি কাঠগুলোর জন্তেই তো—আমার সারা মন জুড়িয়ে গেল। ছেলেবেলায় রবিবারের ইস্কুলে শেখা বাইবেলের লাইন মনে পড়ে গেল, একটি সময়োপযোগী বাক্যের মূল্য রৌপ্যমণ্ডিত চিত্রে স্বর্ণময় আপেলের সমান। আমার এ-হেন মাতৃভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ দিলাম।

জলখাবারের পাট সেরে পোড়া কাঠ সাফ করার কাজে হাত দিলাম। গ্রামের সেই হোটেলে বুড়ি ওসাকি বাগানের দরজা ঠেলে ঢুকল—কি হয়েছিল ? আমি এইমাত্র খবর পেলাম। গতরাত্রে কি সব গোলমাল হয়েছিল ? বলতে বলতে ওর চোখে জল ভরে এল।

অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গীতে আমি উত্তর দিলাম, আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

লজ্জা পাবার কি আছে ? কিন্তু পুলিশ কি বলল ?

ওরা বলল সব ঠিক আছে।

আঃ বাঁচলাম। অকৃত্রিম খুশির ভাব ওর মুখে-চোখে ফুটে উঠল। কি করে পাড়া-প্রতিবেশীকে ধন্তবাদ জানান যায় আর আমার অপকর্মের জন্ত মাপ চাওয়া যায়, ওসাকির সঙ্গে সেই পরামর্শ করলাম। সে বুদ্ধি দিল যে, টাকাই এর সবচেয়ে ভাল দাওয়াই। কয়েকটা বাড়ীর নাম করে বলল, সেই সব বাড়ীতে আমি যেন টাকা নিয়ে গিয়ে মাপ চেয়ে আসি। বেচারী এর পরেও বলল—তোমার যদি একা ঘুরতে খারাপ লাগে, আমি বরং তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

বোধ হয় আমার একা যাওয়াই সবচেয়ে ভাল দেখায়, কি বল ?

একা পারবে ? পারলে সত্যি খুব ভাল হয়।

আমি একাই যাব।

পোড়া কাঠের জঞ্জাল সাফ করে, মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একশ' ইয়েনের কয়েকটা ছোট ছোট থলি বাঁধলাম। বাইরে লিখলাম—ত্রুটি স্বীকার করতঃ। প্রথমেই গ্রামের সদরে গিয়ে মেয়রের খোঁজ করলাম ; তাঁকে না পেয়ে অভ্যর্থনাকারিণী মেয়েটির ডেস্কের কাছে গিয়ে বললাম—আমার গতরাত্রের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু এর পর থেকে আমি ঢের বেশী সাবধান হব। অনুগ্রহ করে আমায় মার্জ্জনা করবেন এবং মেয়রের কাছে আমার অনুতপ্ত অন্তরের সংবাদ পৌঁছে দেবেন।

এর পর গেলাম গ্রামের মোড়লের কাছে। ভদ্রলোক নিজে দরজায় এসে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর অধরপ্রান্তে করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল কিন্তু কোন কথা বললেন না। কি জানি কেন আমি কেঁদে ফেললাম, অনুগ্রহ করে আমার গত রাত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কোন রকমে বিদায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড় দিলাম—আমার গাল বেয়ে অঝোরে কান্না ঝরে পড়ছিল। মুখ-চোখের এমন বিশ্রী অবস্থা হ'ল যে বাড়ী গিয়ে আবার নতুন করে প্রসাধন করতে হল। বেরুতে যাব, ঠিক সেই সময়ে মা এগিয়ে এলেন—এখনও শেষ হ'ল না ? এবার কার কাছে যাচ্ছ ? মুখ না তুলেই জবাব দিলাম—এই তো সবে সুরু।

তোমার এক শাস্তি হল। মায়ের মত এমন দরদ নিয়ে আমায় বুঝবেই বা কে ? তাঁর ভালবাসার জোরে মনে বল পেলাম এবং পরবর্ত্তী যাবতীয় সাক্ষাৎ নির্ব্বিঘ্নে চোখের জল না ফেলেই সঙ্গে করলাম।

সর্ব্বত্র সবাই আমার সহানুভূতি দেখাল, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল একমাত্র মিষ্টার নিশিয়ামার (Nishiyama) তরুণী স্ত্রী, বলছি তরুণী, আসলে বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায়—আমায় তিরস্কার করলেন, দয়া করে ভবিষ্যতে সাবধানে চলো। আমি যদ্দূর জানি, তোমরা বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছি। তোমাদের যেমন আনাড়িপণা। তাতে যে এত দিন আগুন লাগেনি সেই আশ্চর্য্য! দয়া করে এর পর থেকে খুব সাবধান হতে চেষ্টা করো। গতরাত্রে জোর বাতাস থাকলে সারা গাঁখানা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

নিশিয়ামা-গিন্নির তিরস্কারের মর্ম বুঝতে কষ্ট হ'ল না। তিনি যা বললেন তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এত রূঢ় কথার পরেও তাঁর প্রতি আমার মন বিরূপ হয়নি।

জ্বালানি কাঠ জ্বলবে এ আর বিচিত্র কি ! এই রকম পরিহাসের মধ্যে দিয়ে মা আমার অপরাধের বোঝা হাল্কা করতে চেষ্টা করলেও নিশিয়ামা-গিন্নীর কথাটাও না মেনে পারলাম না। বাস্তবিক হাওয়ার জোর থাকলে রাত্রে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। তাই যদি হ'ত

তবে আমার আত্মহত্যায়ও কোন ক্ষমা থাকত না, কারণ শুধু যে আমার সঙ্গে মাকেও শেষ করতাম তাই নয়, স্বর্গত পিতৃদেবের নাম পর্য্যন্ত কলুষিত হ'ত। জানি আজ বংশমর্য্যাদার মূল্য ভেঙ্গে গিয়েছে, এর ধ্বংস অবধারিত, তবু ধীরে ধীরে সুষ্ঠু ভাবে সমাপ্তি নেমে আসুক, এইটুকুই আমার প্রার্থনা। অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাতের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে মরেও আমি শান্তি পাব না।

পরদিন থেকে উঠে-পড়ে মাঠের কাজে লেগে গেলাম। মাঝে মাঝে মিষ্টার নাকাই-এর মেয়ে আমার সাহায্য করতে আসত। সেরাত্রের সেই লজ্জাকর ঘটনার পর থেকে কেমন যেন মনে হ'ত, আমার রক্তের রং গাঢ় হয়ে গেছে। আর দিন দিন আমার চেহারায় বিশ্রী জংলী ছাপ পড়ছে। যেমন ধরুন বারান্দায় মায়ের পাশে বসে উল্ বোনার সময় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, বরং মাঠে গিয়ে কোদাল কুপিয়ে নিলে নিজেকে বেশ সহজ মনে হয়। লোকে বলে শ্রমিকের কাজ। আমার পক্ষে এই কিন্তু প্রথম নয় যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়ে। সেখানে কুলির কাজ করতে হয়েছে। এই যে রবারসোল্ দেওয়া কাপড়ের জুতো পরে মাঠে কাজ করি, এটা যুদ্ধের সময় পাওয়া। জীবনে সেই প্রথম এ ধরণের জিনিষ পায়ে দিলাম কিন্তু বেশ আরাম লাগে। এই জুতো পায়ে দিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াবার সময় আমি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মত হাল্কা বোধ করি অথবা বন্ধনহীন জন্তুদের মাটিতে চরে বেড়ানোর অকৃত্রিম আনন্দের স্বাদ পাই। যুদ্ধের এই একটি মাত্র সুখের স্মৃতি আমার আছে। উঃ, যুদ্ধ কি বীভৎস ব্যাপার!

গত বৎসর কিছু হয়নি
তার আগের বছর কিছু হয়নি।
এবং তারও আগের বছরও কিছুই হয়নি।

যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই খবর-কাগজে এই মজার কবিতাটি বেরিয়েছিল। অবশ্য অনেক ঘটনাই ঘটেছিল, কিন্তু মনে করতে গিয়ে সেই একই উত্তর পাই, হয়নি কিছুই। যুদ্ধের কথা বলতে বা শুনতে আমার বিতৃষ্ণা আসে। জানি বহু প্রাণ নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সবই এই মারাত্মক ব্যবসার অঙ্গ এবং যুদ্ধের কথা শুনে শুনে এখন আমার একঘেয়ে লাগে, লোকে ভাববে এ আমার স্বার্থপরের মত কথা হ'ল। শুধু যখন আমায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে কাপড়ের জুতো পরিয়ে কুলির মত খাটিয়ে নিল, সেই সময়ে এর বীভৎসতা ছাড়াও অন্যান্য দিক আমার চোখে পড়েছিল। মুটে মজুরের কাজকে অনেক সময়ে ঘৃণার চোখে দেখেছি—কিন্তু এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার স্বাস্থ্য ফিরে গেল এবং এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, উপার্জ্জনের অসুবিধা যদি কখনও ঘটে, আমার মুটেগিরি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

একদিন, যুদ্ধ যখন দুঃসাহসিক মোড় নিচ্ছে তখন যোদ্ধার পোষাকপরা এক ভদ্রলোক আমাদের নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এসে আমার যুদ্ধে যাবার বাধ্যতামূলক এক পত্র দিলেন—তাতে যে কয় দিন আমার কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে তার তালিকা দেওয়া ছিল। আমি দেখলাম একদিন অন্তর আমায় তাচিকাওয়া (Tachikawa) পাহাড়ের নীচে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। চেষ্টা করেও চোখের জল রাখতে পারলাম না। কাঁদতে কাঁদতেই জিজ্ঞেস করলাম,—আমার জায়গায় আর কাউকে পাঠালে চলবে না?

ভদ্রলোক কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন—সৈন্য বিভাগে কাজ ঠিক হয়েছে—তোমাকেই যেতে হবে।

পরদিন বৃষ্টি পড়ছিল। পাহাড়ের নীচে সবাই জড়ো হয়েছিলাম, সেখানে এক অফিসার বক্তৃতা দিলেন। জয় অবশ্যম্ভাবী—এই দিয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন,—জয় অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে না চললে আমাদের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী বিপন্ন হবে এবং দ্বিতীয় ওকিনাওয়া সংগঠিত হ'তে পারে। তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কাজ অবশ্যই তোমরা সম্পন্ন করবে। দ্বিতীয়তঃ পরস্পরের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। কোথায় যে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে—এখবর কেউ জানে না। এখন থেকে প্রকৃত সৈনিকের মত তোমরা কাজ করবে এবং যা দেখবে তা কোনমতেই বাইরে কারুর কাছে প্রকাশ করবে না—এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করে দিতে আমরা সব রকম শক্তি প্রয়োগ করব।

আমরা প্রায় পাঁচশ' নরনারী পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে অঝোর বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে সব ভিজে গেলেও এই বাণী আমরা সশ্রদ্ধ অন্তরেই গ্রহণ করেছিলাম। এর মধ্যে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েও ছিল—বেচারীদের কচি কচি সব মুখ শীতে কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। বৃষ্টির জল আমার কোটের ভেতর দিয়ে ঢুকে গায়ের জামা ভেদ করে শেষে অন্তর্বাস অবধি জবজবে করে ভিজিয়ে দিল।

সেদিন সারাটা দিন পিঠের ওপর মাটির ঝুড়ি বয়েই আমার কাটল। পরদিন পাহাড়ের নীচে একদল শ্রমিকের সঙ্গে দড়ি টেনে টেনে কাটালাম। এই কাজটি আমার সবচেয়ে পছন্দ ছিল।

পাহাড়ে কাজের সময় দু' তিনবার আমার মনে হয়েছে ইস্কুলের ছেলেরা আমার দিকে কেমন যেন চেয়ে চেয়ে দেখে। একদিন মাটির ঝুড়ি কাঁধে চলেছি এমন সময়ে দু'টি ছেলে আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফিস্‌ফিস করে বলল—তোমার কি মনে হয় এ মেয়েটি গুপ্তচর?

খুব অবাক হয়ে পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম কথা কেন বলে ওরা?

সে গম্ভীর মুখ করে জবাব দিল—বোধ হয় তোমায় দেখে বিদেশী মনে হয়, সেইজন্য।

তাই নাকি? তুমিও কি আমায় গুপ্তচর ভাব নাকি? এবার একটু হেসেই সে জবাব দিল—না।

আমি তো জাপানী! বলে নিজের বোকার মত কথা শুনে নিজেই হেসে ফেললাম।

এক দিন সকালে ছেলেদের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ি টেনে টেনে জড়ো করছিলাম, এমন সময়ে এক অল্পবয়সী অফিসার ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে আঙুল নেড়ে আমায় ডাকল—এই তোমায় ডাকছি, এদিকে এস।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পাইন-বনের দিকে সে এগিয়ে চলল, আমি তার পেছন পেছন গেলাম—এদিকে তো ভয়ে, আতঙ্কে বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

কারখানা থেকে সদ্য চেরা স্তূপাকার এক কাঠের গাদার কাছে

এসে সে আমার দিকে ফিরল, প্রতিদিন এত ভারি কাজ করতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়। আজ শুধু এই চেরা কাঠ পাহারা দাও—কেমন? ঝকঝকে দাঁতের পাটি বের করে হাসল।

তার মানে এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?

এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা, গোলমাল নেই—কাঠের গাদার ওপর উঠে একটা ঘুম দাও। যদি একা—একা খারাপ লাগে—এই বইখানা পড়ে দেখতে পার। এই বলে একখানা বই পকেট থেকে বের করে সসংকোচে তক্তার ওপর ছুঁড়ে দিল। বই এমন কিছু নয় তবে পড়া যায়।

বই-এর নাম ছিল "ট্রাইকা", আমি তুলে নিলাম। অনেক ধন্যবাদ, আমাদের বাড়ীতে একজন আছে, খুব বই পড়তে ভালবাসে, এখন অবশ্য সে দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে।

সে আমার কথা ধরতে পারেনি,—তোমার স্বামী? দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে? কী কাণ্ড! সমবেদনায় মাথা নেড়ে বলল—যাই হোক, আজ তুমি পাহারা দাও, খাবার সময়ে আমি নিজে গিয়ে তোমার ভাগ নিয়ে আসব। এখন তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, চুপ করে বিশ্রাম কর। এই কয়েকটা কথা বলে হন-হন করে চলে গেল।

গাদার ওপর ব'সে প্রায় আধখানা বই পড়া হয়েছে, এমন সময়ে মচমচ জুতোর শব্দে বুঝলাম অফিসার আসছে। তোমার খাবার। একা-একা খুব খারাপ লাগছে না তো? খাবার বাক্সটা রেখে দিয়ে আবার হন-হন করে চলে গেল।

খাওয়া শেষ করে কাঠের স্তূপের ওপর লম্বা হ'লাম। বই শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। বেলা তিনটের সময় ঘুম ভাঙ্গতেই মনে হ'ল, ছেলেটিকে আগে দেখেছি—কিন্তু কোথায় কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। ওপর থেকে নেমে সবে চুলটা গুছিয়ে নিচ্ছি—আবার সেই মচমচ শব্দ কানে এল।

আজ এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ইচ্ছে হ'লে এবার বাড়ী যেতে পার।

আমি দৌড়ে গিয়ে বইখানা বাড়িয়ে দিলাম, ধন্যবাদ জানাবার জন্য মনটা আকুল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও কিছুই বলতে পারলাম না। চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, তার চোখে চোখ পড়তে, আমার চোখ জলে ভরে এল—তার চোখও শুকনো ছিল না।

নিঃশব্দে ঐ ভাবে আমরা বিদায় নিলাম। এর পর আমার কাজের জায়গায় ওকে আর কখনও দেখিনি। সেই একটিমাত্র দিন আমি ছুটি পেয়েছিলাম, তারপর থেকে আবার একদিন অন্তর তাচিকাওয়ায় গিয়ে নিজের ভাগের কঠিন পরিশ্রম সেরে আসতাম। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। কিন্তু আসলে কঠিন পরিশ্রমে আমার শরীর আগের চেয়ে অনেক শক্ত হ'ল এবং আজ অবধি মাঠে, ময়দানে শারীরিক পরিশ্রম আমায় কাবু করতে পারে না।

যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে বা শুনতে আমার অসহ্য লাগে, একটু আগে সেই কথাই বলেছিলাম—এখন দেখছি আমার জীবনের "অমূল্য অভিজ্ঞতা"র কথা সবই বলা হয়ে গেছে। কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতির মধ্যে এই ঘটনাটুকু বলতে আমার ভাল লাগে। বাদবাকী সবটা সেই কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ :—

গত বৎসর কিছুই হয়নি,
তার আগের বৎসর কিছুই হয়নি,
এবং তারও আগের বৎসর কিছুই হয়নি।

বললে বোকার মত শোনাবে—যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আমার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা হ'ল একজোড়া কাপড়ের জুতো। এই জুতোর কথায় প্রসঙ্গান্তরে চলে এলাম। যুদ্ধের অপূর্ব্ব স্মৃতিচিহ্ন এই জুতো পরে মাঠে ময়দানে ঘুরে ঘুরে মনের উদ্বেগ ও হৃদয়ের গভীর অশান্তি ভুলে থাকতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু মা আমার দিন দিনই রোগা হয়ে যাচ্ছেন।

সাপের ডিম।

আগুন।

মায়ের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভয়াবহ রকম খারাপ হয়ে চলেছে, এদিকে উল্টে আমি আবার দিন দিন নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত খটখটে শক্ত হয়ে উঠছি। মায়ের জীবনীশক্তি শোষণ করে মোটা হচ্ছি। এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে।

জ্বালানি কাঠ জ্বলে যাওয়ার হাস্যকর মন্তব্য ছাড়া এ পর্যান্ত আগুনের ব্যাপার নিয়ে মা আর একটা কথাও বলেন নি। আমাকে তিরস্কার করা দূরে থাক, করুণাই করে চলেছেন। কিন্তু তার মনে এই ধাক্কা আমার চেয়ে দশগুণ বেশী বেজেছে। অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে মা ঘুমের মধ্যে আর্ত্তনাদ করে ওঠেন, যেদিন বাতাসে জোর থাকে, সেদিন যত রাত্তেই হোক, বার বার বিছানা থেকে উঠে এসে সব ঠিক আছে কিনা দেখে যান। কোন সময়ে তাঁকে সুস্থ দেখায় না। কোন কোন দিন মনে হয় তাঁর যেন হাঁটতেও কষ্ট হচ্ছে। মাঠের কাজে আমায় সাহায্য করার কথা বলেছিলেন, আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও কুয়ো থেকে জল এনে দিলেন। পরদিন পিঠে এত অসহ্য যন্ত্রণা হল যে নিঃশ্বাস নিতে পর্যান্ত কষ্ট হচ্ছিল। তারপর শারীরিক পরিশ্রমের খেয়াল তিনি ছেড়ে দিলেন। থেকে থেকেই মাঠে নেমে এসে দেখে যেতেন আমি কি করছি।

আজ আমার কাজ দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন—লোকে বলে গ্রীষ্মের ফুল যারা ভালবাসে তাদের মৃত্যুও আসে গ্রীষ্মকালে—জানি না কথাটার কত দূর সত্যি!

আমি ফলের চারায় জল দিচ্ছিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। সবে গরম পড়ছে। মৃদুকণ্ঠে মা আবার বললেন,—হিবিস্কাস আমার অত্যন্ত প্রিয় ফুল, আমাদের বাগানে একটাও দেখি না।

ইচ্ছা করে নীরস কণ্ঠেই জবাব দিলাম, বাগানভরা ওলিয়েণ্ডার আছে।

ও ফুল আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। গ্রীষ্মের প্রায় সব ফুলই আমার ভাল লাগে, কিন্তু ওলিয়েণ্ডার বড় বেশী রংচঙে।

গোলাপ আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কিন্তু সে ফুল তো সারা বছরই ফোটে। কে জানে গোলাপ যাদের প্রিয় তারা হয়ত বছরে বার চারেক মরে।

দু' জনেই হেসে উঠলাম। হাসতে হাসতেই মা জিজ্ঞেস করলেন তুমি একটু বিশ্রাম করবে না? তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

কোন্ কথা? তোমার মৃত্যুর খবর হ'লে শুনতে চাই না।

মটরফুলের মাচার নীচে বেকে গিয়ে দু' জনে বসলাম। ফুলগুলো প্রায় শেষ হ'য়ে এল, বিকেলের রোদ পাতার ছাঁকনি দিয়ে মোলায়েম হ'য়ে এসে আমাদের কোলে জামা-কাপড় সবুজে রাঙিয়ে দিল।

অনেক দিন থেকে তোমায় একটা কথা বলি-বলি করছি, কেবল দু' জনেরই মন কখন হাল্কা পাব তারই অপেক্ষায় ছিলাম। বুঝতেই পারছ চট করে এসব কথা বলা যায় না কিন্তু আজ কেমন মনে হচ্ছে এখন হয়ত বলা চলে। শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে কথাটা শোন,—নাওজি বেঁচে আছে।

আমার সারা শরীর পাথর হয়ে গেল।

পাঁচ-ছয় দিন আগে তোমার ওয়াদা মামার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে ওর কোন কর্ম্মচারী দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর থেকে ফিরেছে। সে তোমার বাবার অফিসে দেখা করতে এসেছিল, হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ে লোকটি নাওজির সঙ্গে একই ইউনিটে কাজ করত। নাওজি ভাল আছে, শীগগিরই ফিরবে। একটা মস্ত খবর তার কাছে পাওয়া গেছে। লোকটি বলছে নাওজি দারুণ আফিংখোর হয়েছে।

আবার?

আমি তেতো খাওয়ার মত মুখ বাঁকালাম। হাইস্কুলে থাকতে নাওজি কোন এক ঔপন্যাসিককে নকল করে নেশা আরম্ভ করে। শেষ অবধি ডাক্তারখানায় এমন একটা মস্ত বড় দেনা করে বসে যা মাকে দু' বছর ধরে শোধ করতে হয়।

হ্যাঁ, আবার নেশা করছে বোঝা গেল। কিন্তু সেই লোকটি বলছে যে এখানে আসার আগেই নেশা তাকে ছাড়তে হবে, নইলে দেশে আসা তার বন্ধ। তোমার মামা বলছেন যে ভাল হয়ে ফিরলেও তার যে মনের অবস্থা তাতে এখুনি কোন চাকরি হওয়া সম্ভব নয়। আজকের দিনে টোকিও সহরে সুস্থ মানুষ কাজ করতে এসে বিগড়ে যায়। আর তার মত ছেলে—আধপাগলা ছেলে, সবে নেশা কাটিয়ে উঠেছে, ও তো দু' দিনেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে উঠবে। সে কি করে কি না করে, কিছুই বোঝা যায় না। নাওজি ফিরে এলে কোথাও যেতে না দিয়ে আমাদের এই পাহাড়ী জায়গায় ধরে রাখাই ভাল। এই গেল এক নম্বর।

আরও একটা কথা, তোমার মামা লিখেছেন যে, আমাদের সব টাকা ফুরিয়েছে, যেখানে যা পুঁজিপাটা ছিল, সবই প্রায় ফুরিয়েছে, আগের মত টাকা পাঠানো আর সম্ভব নয়। নাওজি এলে আমাদের তিন জনের মত খরচ পাঠানো তার পক্ষে অসম্ভব। তার প্রস্তাব হ'ল এই যে, যথাশীঘ্র সম্ভব হয় তোমায় পাত্রস্থ করা, নয় কারুর বাড়ীতে কোন কাজ জোগাড় করে দেওয়া উচিত।

ঝি-গিরি?

না, তোমার মামা আমাদের দূর সম্পর্কের জমিদার আত্মীয়ের কথা লিখেছেন—তার বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া করতে পার। তাতে তোমার খুব মন খারাপ বা সঙ্কোচ হবে না।

আর কোন কাজ করা যায় না?

তোমার মামার মত, আর যে কোন কাজ তোমার পক্ষে অসুবিধাজনক হবে।

অসুবিধা কিসের?

ম্লান হেসে মা চুপ করেই রইলেন।

আমি এলোপাথাড়ি চেঁচিয়ে উঠলাম—না, এ ধরণের কথা আমি অনেক শুনেছি। বুঝতে পারছি আমার পক্ষে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই—এর জন্য পরে অনুতাপ করতে হবে, তবু নিজেকে থামাতে পারলাম না—আমার পায়ের দিকে চেয়ে দেখ, এই বিশ্রী কাপড়ের জুতোর দিকে তাকাও। আমার দুচোখ বেয়ে কান্না ঝরে পড়ছে, হাত দিয়ে মুছে নিয়ে সোজা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমার ভেতর থেকে কে যেন ব'লে উঠল,—কখনও না, একাজ আর কখনও করব না।

কিন্তু যা বলতে চাইছি, তার সঙ্গে এ কথাগুলোর কোন যোগ নেই, কাজেই আমার অবচেতন মনের অন্তস্তল থেকে চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমিই একদিন বলেছিলে যে, আমার জন্য, শুধু আমার জন্যই তুমিই ইজুতে এসেছ? তুমি বলেছিলে আমি না থাকলে তুমি মৃত্যু বরণ করতে। শুধু সেই জন্য আমি তোমার পাশ ছেড়ে এক পাও নড়িনি। আর আজ আমার পায়ে কাপড়ের জুতো, কারণ তুমি যেসব তরকারি খেতে ভালবাস, আমি কেবল সেই সব ফসল ফলাবার কথাই চিন্তা করছি। আজ হঠাৎ যেই শুনলে তোমার নাওজি আসছে—অমনি আমি তোমাদের সুখের পথে কাঁটা হয়ে গেলাম। তুমি কি করে উচ্চারণ করতে পারলে—যাও ঝি-গিরি করগে যাও? অসম্ভব, এ সহ্য করা অসম্ভব! নিজের কানেই কথাগুলো যৎপরোনাস্তি কটু শোনাল, কিন্তু কোথায় যেন তারা বাস বেঁধেছিল, অজান্তে বেরিয়ে এল, থামাতে পারলাম না।

অবস্থা যখন পড়ে গেছে, তখন আমাদের দামী দামী জামা-কাপড়গুলো বেচে দাও না! বাড়ীটাই বা বেচব না কেন? আমি যা হোক কিছু তো করতে পারি। গ্রামের অফিসে চাকরী করতে পারি, মুটেগিরি করতে পারি। দারিদ্র্য এমন একটা কি ব্যাপার? যতক্ষণ তোমার ভালবাসা আছে, ততক্ষণ তোমার পাশে জীবন কাটিয়ে যাওয়াই তো আমার একমাত্র বাসনা। কিন্তু তুমি তো নাওজিকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাস। আমি চলেই যাব। নাওজির সঙ্গে আমার কোন দিন বনবে না, মাঝ থেকে তিনজনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আমরা দু'জন এতদিন একসঙ্গে আছি, তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধন তার মধ্যে ভেজাল নেই। এখন তুমি আর নাওজি, শুধু তোমরা দু'জনে থাক। আশা করি, তোমার জন্য অন্ততঃ সে তার চরিত্র সংশোধন করবে। আমার আর সহ্য হয় না, আমি চলে যাব। আমি আজই এক্ষুণি চলে যাব। যাবার জায়গার অভাব হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

কাজুকো! কঠোর স্বরে মা ডাকলেন। তাঁর মুখে এতখানি ব্যক্তিত্ব এর আগে কখনও দেখবার অবকাশ হয়নি। মুখোমুখি দাঁড়াতে আমার চেয়ে মাথায় যেন উঁচুই দেখাল।

ক্ষমা চাইবার ইচ্ছেয় বুক ফাটতে লাগল কিন্তু মুখ ফুটল না। বরং উল্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বললাম, তুমি আমায় ঠকিয়েছ মা, তুমি আমায় ঠকিয়েছ। নাওজি যত দিন আসেনি, তত দিন তোমার আমায় প্রয়োজন ছিল। আমি তোমার দাসানুদাস ছিলাম। এখন যখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আমায় দূর করে দিলে।

ফুঁপিয়ে উঠে আমি পরমুহূর্ত্তে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম।

তুমি অত্যন্ত নির্বোধ—রাগে, উত্তেজনায় মায়ের স্বর কেঁপে উঠল। আমি মাথা তুলে চাইলাম।

হ্যাঁ, আমি তো বোকাই। আমায় বোকা পেয়ে সবাই ঠকিয়ে নেয়। আমি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, না? দারিদ্র্যই বা কি, স্বাচ্ছল্যই বা কি? আমি ওসব বুঝি না। চিরদিন আমার মায়ের স্নেহটুকুই একমাত্র ভরসা, সেইটুকুই আমার জোর।

আবার আমি এমন নির্ব্বোধের মত কথা বললাম যার কোন মানে হয় না। মা হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন—চোখে জল। আমার ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাই, কিন্তু মাঠের কাজে হাতে ময়লা ছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপ্রস্তুত হয়ে দূরে সরে রইলাম। আমি এখান থেকে দূরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যাবই, আমার যাবার জায়গা আছে।

এই কথা বলতে বলতে কলঘরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাত-মুখ ধুলাম। ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়ে আর এক দফা কেঁদে নিলাম। সারা শরীরে যত কান্না জমে আছে সবটুকু উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হল। দোতলায় বিদেশী প্যাটার্ণের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা পর্য্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে কাঁদতে লাগলাম। তারপর আমার মন যত্র-তত্র চরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে ক্রমে দুঃখের ভেতর দিয়ে একটি বিশেষ মানুষের জন্ত মন আমার পুড়তে লাগল, তার মুখখানা একবার দেখতে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ডাক্তার যখন পায়ের নীচের চামড়া লোহা দিয়ে পোড়াতে বলেন, তখন যেমন পা এতটুকু না কুঁচকে ব্যথা সইতে হয়, আমার কেমন যেন তেমনি একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি হল। সন্ধ্যেবেলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মা আলোটা জেলে দিলেন। বিছানার কাছে এসে খুব মিষ্টি করে আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি বিছানার ওপর উঠে বসে দুই হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলাম। তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ফেললাম।

মৃদু হেসে মা জানালার পাশে একটা সোফায় বসে পড়লেন। জীবনে এই প্রথম তোমার মামার কথার অন্যথা করে এলাম। তার চিঠির উত্তরে আমি লিখলাম, আমার সন্তানদের ভার আমার ওপরেই সে যেন ছেড়ে দেয়। কাজুকো, আমরা আমাদের সব দামী পোষাক বেচে ফেলব। একটা একটা করে জামা-জামা সব বিক্রি করে আমাদের যেমন খুশি তেমনি খরচ করব। দরকারী যা ইচ্ছে তাই কিনব। বেশী বেশী খরচ করব আমরা। তোমায় আর মাঠে কাজ করতে দেব না। হোক না তরকারীর দাম চড়া, তবু আমরা কিনেই খাব। রোজ তুমি চাষার মত খাটবে, এরকম আশা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সত্যি বলতে কি প্রতিদিন মাঠে খেটে খেটে ইদানীং আমার শরীর খারাপ হয়ে আসছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই জন্যই আমি এত সামান্য কারণে অমন একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে বসলাম। তখন আমার মাথার স্থিরতা ছিল না, তার সঙ্গে শারীরিক চরম ক্লান্তি আর আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, সব মিলিয়ে আজ-কাল আমি সব কিছুকেই ঘৃণা করতে, প্রতিবাদ করতে শিখেছি। চোখ ফিরিয়ে আমি বিছানার ওপর বসে রইলাম। কাজুকো! বল।

তুমি যে তখন বললে, কোথায় যেন তোমার যাবার জায়গা আছে? টের পেলাম আমার ঘাড় অবধি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

মিষ্টার হোসাডা?

আমি এর কোন জবাব দিলামনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন—বহু কাল আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল—শুনবে?

বল। ফিস-ফিস করে জবাব দিলাম।

নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যখন তুমি স্বামী ত্যাগ করে ফিরে এলে, তখন আমি তোমায় একটা কথাও বলিনি। কারণ তার কাছে শুনেছিলাম, চিত্রকর হোসাডার সঙ্গে তোমার গভীর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কথা শুনে যৎপরোনাস্তি আঘাত পেয়েছিলাম। মিষ্টার হোসাডা বিবাহিত পুরুষ, সন্তানের পিতা। আমি জানতাম তোমার দিক থেকে যত ভালবাসাই থাক্ না কেন, এ প্রেম ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রেম? কি অন্যায় কথা! এ আমার স্বামীর মিথ্যে সন্দেহ ছাড়া কিছুই নয়।

বোধ হয় তাই। আমার ধারণা ছিল আজ অবধি মিষ্টার হোসাডার কথা তোমার মন থেকে মুছে যায়নি। তবে তুমি কোথায় যাবার কথা বলছিলে? মিষ্টার হোসাডা নয়।

সত্যি? তবে কোথায়?

মা, সম্প্রতি আমি এমন এক পথ আবিষ্কার করেছি, যেখানে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জানি, মানুষের ভাষা, জ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি, সামাজিক ব্যবস্থা সব আছে, কিন্তু এ সমস্তই কি অল্পবিস্তর পরিমাণে জীবজগতের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান নয়? বোধ হয় জন্তুদের ধর্ম্মবুদ্ধিও আছে। মানুষের গর্ব্ব সে বিশ্বজগতের অধিকর্ত্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য পশুদের সঙ্গে তার বিশেষ প্রভেদ নেই। কিন্তু মা, আমি এক উপায় চিন্তা করেছি, হয়ত তুমি বুঝবে না। এ শুধু মনুষ্য জাতিতেই বর্ত্তায়। সে হ'ল গোপন করার ক্ষমতা। এবার বুঝলে তো, আমি কি বলতে চাই? অপ্রস্তুত হয়ে মা মৃদু হাসলেন—তোমার গোপন কথা যদি মঙ্গল বয়ে আনে, তবে তার চেয়ে অধিক কাম্য আমার কিছুই নেই। প্রতিদিন সকালে আমি তোমার বাবার আত্মার কাছে প্রার্থনা করি—তুমি সুখী হও।

হঠাৎ মনে পড়ল, বাবার সঙ্গে 'নাসুনো' (Nasuno)-র গাড়ী করে বেড়াতে বেরিয়ে পথে এক জায়গায় নেমেছিলাম। শরতের মাঠ-ঘাট কি অপূর্ব্বই না লেগেছিল সেদিন! এ্যাষ্টর, পিংক, জেন্সিয়ান, ভেলেরিয়ান্ শরতের সব ফুলে ফুলে চারিদিকে কি শোভাই না হয়েছিল! বুনো আঙুরে তখনও রং ধরেনি।

পরে বাবা আর আমি 'বিওয়া' (Biwa) হ্রদে মোটর-বোট নিয়ে বেড়ালাম, আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। জলের মধ্যে আগাছায় যে-সব ছোট ছোট মাছেদের বাসা, তারা আমার পায়ে পায়ে খেলা খেল, আর কাকচক্ষু জলের তলে আমার পা দু'খানার ছায়া ফেলে ফেলে সাঁতরে বেড়ালাম। মায়ের আর আমার বর্ত্তমান আলোচনার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, কিন্তু হঠাৎই কেমন ছবির মত সবটুকু মনের মধ্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল! আমি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে মায়ের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম—মা গো, আমায় ক্ষমা করো, শেষ পর্য্যন্ত ঐটুকুই আমার মুখ দিয়ে বেরুলো।

আজ মনে পড়ে, সেদিন পর্য্যন্ত আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় দিনগুলির শিখা তখনও পুড়ে শেষ হয়নি। নাওজি দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর থেকে ফেরার পর আমাদের নরকবাস সুরু হ'ল। [ক্রমশঃ

অনুবাদ : কল্পনা রায়

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ত্রিশ

পল্লব এ পর্যন্ত আইরিনের ঘরে একদিনও যায় নি। পথে যেতে যেতে ভাবে: নাতাশা যে ওকে আইরিনের ঘরে একা যেতে মানা করেছিল, আইরিন কার কাছে শুনল? নিশ্চয় কাতিয়া কি মাশার কাছে। ওর ভারি দুঃখ হয় নাতাশার কথা ভেবে।

* * * *

আইরিনের ঘরটি নিচের তলায়—এক কোণে। একটা করিডোর দিয়ে যেতে হয়—পর পর চার-পাঁচটি ঘর পেরিয়ে। আইরিনের ঘরের সামনেই লেখা ওর নাম। দোরে ঘণ্টার বোতাম টিপতেই দোর খুলে গেল, কিন্তু দ্বারী কই?

ও একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরে ঢুকল। কী ব্যাপার? কেউ কোথাও নেই! কী সুন্দর ঘর! এক কোণে একটি কটেজ পিয়ানো। তার উপরে ফুলদানীতে গতকাল ওরই দেওয়া গোলাপ ফুল। পিয়ানোর পাশে একটি টিপয়ে রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো পল্লবের ছবি। তার সামনে একটি ওরই উপহৃত মোরাদাবাদী ধূপদানীতে দুটি ধূপ জ্বলছে। আর এক কোণে একটি বিছানা। আর এক কোণে একটি সোফা নীলরঙের। তার পাশেও একটি জাপানী ফুলদানীতে সাদা লিলি। আর এক কোণে একটি পরিপাটি ড্রেসিং টেবিল্ আয়না ও টুল। ঠিক মাঝখানে একটি চমৎকার টেবিল। ছবির মতন ঘরটি—ঢুকলেই শুধু চোখ জুড়িয়ে যাওয়া নয়, মনও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। গৃহের প্রত্যেকটি আসবাব শুধু যে বহুযত্নে নির্বাচিত তাই নয়, প্রত্যেকেই যেন গৃহিণীর রুচির সাক্ষ্য দিচ্ছে মৌন আত্মগৌরবে।

পল্লব খানিক পরে ঘাড় ফেরাতেই রূপালী হাসির বান ডাকিয়ে দুটি হাত পিছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। পল্লব ফিরে হেসে ওকে বাহুবন্ধনে বন্দী করে বলে: এমনি করে বুঝি ভয় দেখায়?

আইরিন সাভিমানে বলে: আদরের মানে বুঝি ভয় দেখানো? বেশ! আর দেখাব না। ছাড়ো।

পল্লব হেসে বলে: আমাদের শাস্ত্রে বলে—ব্যূহের মধ্যে ঢোকা সোজা, কিন্তু বেরুনো ভার।

আইরিন না হেসে বলে: আর আমাদের দেশে বলে—যে পাখী ধরা দিতে চায় না তাকে খাঁচার লোভ দেখানো বৃথা।

ভুল। অসীম চিরদিনই মাথা কুটছেন সীমার খাঁচা মধ্যে ঠাঁই পেতে। প্রমাণ—সৃষ্টি।

আর যে চায় অনাসৃষ্টি?

তার নাম অচেন: আমাদের ভাষায়—মোহিনী, রোমিওর ভাষায়—ইনকান্তাত্রীচে।*

আইরিন রাগ করে ঠোঁট ফোলায়: যা—ও!

পল্লব ওর ওষ্ঠে চুম্বন করে বলে: অমন করে লোভ দেখালে যাই কী করে বলো? রক্ত-মাংসের শরীর তো! বলেই থেমে: আমাদের দেশের এক গ্রাম্য কবি গেয়েছেন—বলে গুন-গুন করে:

আমি যে বেসেছি ভালো আমারি কি দোষ?
ঠাকুরাণী! ঠেকাইয়া বৃথা করে রোষ।

বলে মানেটা বুঝিয়ে দেয় ফরাসি ভাষায়।

আইরিন হেসে ওকে প্রতিচুম্বন করে বলে: আচ্ছা, এ যাত্রা ক্ষমা করলাম—কিন্তু আর অমন কোরো না, সাবধান!

কেমন?

পরের কথায় কান দিয়ে আমাকে দূরে সরানোর চেষ্টা—আর কেমন?

আমি বুঝি তাই করি?

করো না তো কী? আমি বুঝি টের পাই না ভাবো?

যথা?

বোসো, বলছি। ওরা পাশাপাশি সোফায় বসে। আইরিন বলে: য়ুসুফ এইমাত্র টেলিফোন করেছিল আমাকে।

য়ুসুফ? হঠাৎ?

বলল: তুমি তার সঙ্গে দিন কয়েকের জন্যে রোম যেতে রাজি হয়েছ, আমি যেন বাধা না দিই—এই তার মিনতি। ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে: কী? কথা কইছ না যে? আর একটা অছিলা খুঁজছ বুঝি?

অছিলা? কিসের?

আর কিসের? আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবার—আমাদের প্রেমকে যাচাই করতে। বলো তো—কাল সকালে কেউ দেয়নি তোমাকে এ-উপদেশ?

তুমি জানলে কী ক'রে?

তুমি ফ্রাউক্রামারের ওখান থেকে চলে যাওয়ার পরেই আমি যাই তাঁর কাছে পড়তে। তখন তোমার সঙ্গে তাঁর কী কী কথা হয়েছিল বলেছিলেন আমাকে। বলেই রাগ করে: যাও তুমি—যেখানে তোমার প্রাণ চায়।

পল্লব ওর কটি বেষ্টন ক'রে বলে: ভালোই হ'ল—কথাটা তুমিই তুললে। কিন্তু শোনো বলি। আমার এক বন্ধু—যার কথা তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে? যে রিতা ব'লে একটি ফরাসী মেয়েকে বিয়ে করেছে?

আছে। নাম মোহনলাল না?

সেই। ওরা আসছে রোমে—আজই সকালে তার চিঠি পেলাম। রিতার শরীর ভালো নয়। তাই ভাবছিলাম—যদি তুমি অনুমতি দাও তবে দিন কয়েকের জন্যে রোম ঘুরে আসি।

আইরিন ওর চোখের দিকে সোজা চেয়ে বলে: অছিলাটা খুঁজে পেয়েছ ভালো—মানছি।

অছিলা! মোটেই নয়।

আইরিন ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলে: পল! শেষে তুমিও? ...না, ছেড়ে দাও আমাকে। যাও—যাও যেখানে যেতে চাও। কেবল...নিজেকে সামলে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে: কেবল এ-মিথ্যে অজুহাতের কী দরকার ছিল? না, তোমার কোনো কথা শুনব না। আসল কথা—তুমি সময় চাইছ—না থাক, ঢের হয়েছে। যে ভালোবেসেও ভেবে অস্থির—এ প্রেম, না মোহ...আমাকে না বলে আগে রোম যাওয়া ঠিক করে পরে ঘটা করে অনুমতি চাইতে আসে—

---

* Incantatrice = enchantress

নিজের হৃদয়ের সাক্ষ্য না মেনে এক পাকাচুল বুড়ির উপদেশই করো শিরোধার্য—তার পক্ষে কী না সম্ভব? যাও তুমি রোমে—কিম্বা আর কোথাও গিয়ে চুপটি করে বসে দেখতে থাক একটি বৎসর—আমার প্রেমের জোয়ারে ভাটা আসে কি না।

পল্লবের মন কোমলতায় ছেয়ে যায়। ওকে আলিঙ্গন করে বলে: এমন কথা বলতে নেই, আইরিন! আমি নিজের মনকে অবিশ্বাস করলেও করতে পারি—কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমার কাছে স্বয়ংসিদ্ধ। না, শোনো লক্ষ্মীটি! আমার সত্যিই কিছু বলার আছে। কিন্তু তুমি এমন অধীর হলে কী করে বলব যা বলতে চাই? আমি তোমার কাছে আজ এসেছি প্রার্থী হয়ে—বিশ্বাস করো।

আইরিন রুমালে চোখ মুছে বলে: প্রার্থী? কিসের?

বলের।

বল?

হ্যাঁ বল। তবে যদি শুনতে না চাও, বলব না। যাব না কোথাও।

আইরিন আশ্বস্তস্বরে বলল: বলো, আমি শুনব অধীর না হয়ে—কথা দিচ্ছি। না, এখন আর চুপ করে গেলে চলবে না, বলতেই হবে।

পল্লব ওর হাত দুটি গালে ঠেকিয়ে বলে: শোনো আইরিন! আমি যা বলতে এসেছি বলতে বাধে—কেন না এ ধরণের কথা বলব ভাববার সময়ে এক রকম মনে হয়—কিন্তু বলতে যাবার সময় কেমন কুণ্ঠা আসে—মনে হয় যেন ছোটমুখে বড় কথা। তবু চেষ্টা করব সহজ ভাবে বলতে—না ফেনিয়ে—যদি—

হয়েছে, হয়েছে, বলো—আমি কথা দিচ্ছি—শান্ত হয়েই শুনব।

পল্লব ওর হাত দুটি নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে চলে: আমাদের দেশে বলে—নারী পুরুষের শক্তি। এদেশে এসে দেখি, নারী পুরুষের চিত্তরঙ্গিনী, সংসার-সঙ্গিনী। কিন্তু আমরা তাকে দেখি আরো বড় করে, বলি—সহধর্মিণী। কুসুম বলে এ যুগের পুরুষ—বিশেষ আমাদের মতন পরাধীন দেশের পুরুষ—তার কাছে আরো কিছু দাবি করে, চায়—সে হবে সহদেশিনী—মানে দেশের সেবায় সহায়, প্রেরণা—এক কথায় বলদাত্রী।

কুসুম? তোমার সেই দেশভক্ত বন্ধু?

বন্ধুর চেয়ে অনেক বড়। তাকে কী উপাধি দেব জানি না। শুধু বলতে পারি—তার কাছে আমি গভীর ভাবে ঋণী। তার স্তুতি করতেও আমার ভয় হয় পাছে ছোট করে ফেলি। ওর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে: যৌবনেই যে বড় চাকরি ছেড়ে স্বেচ্ছায় দেশের জন্যে, দুর্গতের জন্যে করল দুঃখবরণ—যে বিলাসের কোলে মানুষ হয়েও ব্রত নিল পরার্থনিষ্ঠার—এই আড়াই বছরের মধ্যেই দু বৎসর কাটালো জেলে—জেল থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ—তবু ভয়কে যে ভয় করে না—কে জানে হয়ত ফের জেলে যাবে দু-চারদিনের মধ্যে—

জেলে? মানে সে বিপ্লবী?

তাই। শোনো। কাল রাতে তার এক চিঠি পেয়েছি, তাতে সে আমাকে লিখেছে যে, আমার কাছে দেশ অনেক কিছু চায়, আমাকে গান গেয়ে দেশকে জাগাতে মাতাতে হবে। আরো লিখেছে, যে কথা বললাম এইমাত্র, যে আমাদের প্রত্যেকের সহধর্মিণীকে হতে হবে সহদেশিনী…এই সব বলে সুর নামিয়ে নিয়ে: ওকে আমি লিখে দিতে চাই—যদি তুমি অনুমতি দাও—যে তোমাকে সব কথা বলে রাজি করিয়েছি—তুমি হবে আমার সহধর্মিণী তথা সহদেশিনী। এত বড় ডাকে দেবে না তুমি সাড়া?

আইরিন দুহাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, পরে মুখ তুলে শান্তকণ্ঠে বলল: তুমি তোমার কথা বললে ঢাকাঢাকি না করে না পল, তোমার আন্তরিকতাকে অবিশ্বাস করবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু যে প্রশ্ন তুমি করেছ খোলাখুলি—তার উত্তরে আমারও যা যা মনে হয় বলব খোলাখুলি—কিছুই না ঢেকে। তারপরে তুমি যা বলবে—করব। কেবল একটা কথা। আমি যা নই আমাকে তাই ভেবো না ভাবতে ভালো লাগে বলে। যাক শোনো বলি।

বলে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আইরিন বলে চলে: সব আগে একটা কথা তোমাকে আমার বলতেই হবে—তুমি মনে আঘাত পেলে ক্ষমা কোরো আমাকে নিরুপায় বলে—কথাটা এই যে আমি স্বভাবে দেশভক্ত নই। দেশভক্তির নামে এত নিষ্ঠুরতা, লোভ, হীনতা, মিথ্যাচারের জয়ধ্বনি শুনে এসেছি ছেলেবেলা থেকেই…কিন্তু সে অন্য কথা। আমার বলবার কথা এই যে, আমার চোখে স্বপ্ন নেই বলব না, কিন্তু সে স্বপ্ন দেশের সেবা নয়। আবাল্য আমি চেয়েছি—শিল্পীর জীবন বরণ করতে, গানে সৃষ্টি করতে। নাতাশা উঠতে বসতে বলে—মেয়েরা গানে সৃষ্টি করতে পারে না, আমি চাই একথা অপ্রমাণ করতে। এখানে পারার কথা হচ্ছে না কিন্তু, আমি বলছি আমার দুরাশার কথা—দুরাশা বলছি এই জন্যে যে, হয়ত পারব না যা হতে আমার প্রাণ চায়। কিন্তু সে যাক, এবার তোমার কথায় আসি।

তোমাকে আমি কেন ভালোবাসলাম বলতে পারি না জোর করে—তবে একথা বলতে পারি যে, তোমার কণ্ঠ শুনে যখন আমি মুগ্ধ হই তখন থেকে কেবলই চেয়েছি—তুমি আমার সাথী হও সহশিল্পীরূপে। না, সবটা বলা হল না। আমি ঐ সঙ্গে চেয়েছি তোমাকে আমার জীবনের সহযাত্রীরূপে, বেদনায় ব্যথায় ব্যথীরূপে পথে পথের পাথেয়রূপে, আনন্দে নিত্যসাথীরূপে। দেশ—শুধু তোমার দেশ নয়, আমার নিজের দেশও—আমার কাছে, অন্তত এখন পর্যন্ত, জড়বস্তুই বলব। তোমাদের কাছে স্বদেশ জীবন্ত মা, আত্মার আত্মীয়া, আমার কাছে বড় জোর ভূমিখণ্ড—যে সুন্দর হলে চোখকে খুশি করে, অসুন্দর হলে—বিরক্ত। মুখ অমন কোরো না, লক্ষ্মীটি! নৈলে যা বলতে চাই বলব কেমন করে? আমাকেও একটু বুঝতে চেষ্টা কোরো।

করছি—কেবল একটা কথা: দেশকে নিষ্প্রাণ ভূমিখণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে করা তোমাদের পক্ষে এত কঠিন কেন? ইংলণ্ডেও তো প্রকৃতিপূজা আছে যার প্রধান পুরোহিত ওয়র্ডসওয়র্থ—Something far more deeply interfused.

জানি জানি। আমাদের দেশেও আছে। শুধু আছে নয়, এমন প্রচণ্ডভাবে আছে আমাদের মুজিকদের * মধ্যে যারা দেশ তো দেশ আইকনকেও পুজো করে, ভার্জিন মেরির সামনে ধূপদীপ

* Moujik—রুষ কৃষক।

জ্বালায়, ঘণ্টা বাজায়—এক কথায় সব কিছুর মধ্যেই দেখে যা খুঁই খুঁইমাত্তার আবির্ভাব। ডাইয়েভাস্কির বইয়ে ছত্রে ছত্রে পাবে এই মেটাব-ওয়র্শিপ—আমাদের অনেক বিপ্লবীর মনেও সে-ভাবের ছোঁয়াচ লেগেছে। আমার দাদারই এক বন্ধু ছিলেন এই জাতের বিপ্লবী—তিনি পাহাড়-নদীর সামনে ঠায় চেয়ে চেয়ে থাকতেন আর দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত—ইংরাজিতে যাকে বলে ট্রান্স। কিন্তু আমার মনে সে ভাবের ছোঁয়াচ কোনোদিনই লাগেনি যে—কী করব বলো? তাই বলছিলাম—আমি যা নই আমাকে তাই বলে কল্পনা করে আমাকে তোমার মানসী প্রতিমা দাঁড় করিয়ো না, কেন না, করলে শেষে মনে ঘা খাবে। তোমাকে আমি আনন্দ দিতেই চাই পল, ব্যথা দিতে নয়।

পল্লব চুপ করে রইল মুখ নিচু করে। আইরিন ওর গালে গাল রেখে কোমলকণ্ঠে বলে: আমাকে ক্ষমা কোরো পল, কিন্তু আমি যা পারি তার চেয়ে বেশি তো পারি না—উপায় কী? তাই তোমাকে শুধু বলতে চাই যে, আমি তোমার সহদেশিনী হতে পারব কি না জোর করে বলতে পারি না এখন। কেবল সত্যের অপলাপ না করে এইটুকু বলতে পারি যে আমি চেষ্টা করতে রাজি আছি—আর সে শুধু এইজন্যে যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, নৈলে তোমার মনের মতনটি হতে চাইবই বা কেন বলো? কিন্তু আমার নিজের কথা যদি বলো তবে আমাকে, বলতেই হবে যে, আমার প্রাণের কামনা তোমার সহদেশিনী হওয়া নয়—আমি চাই তোমার সহধর্মিণী হতে।

সহধর্মিণী?

হ্যাঁ। সহধর্মিণী কথাটা আমার কাছে এখনো—কী বলব? বড় জোর একটা সুন্দর কথা, রঙিন ছবি, তার বেশি নয়। ও আমার মন টানে না কারণ ধর্ম বলতে যে ঠিক কী বোঝায় আমি আজো জানি না। কল্পনা দিয়ে তাকে বুঝতে যে চেষ্টা করিনি তা নয়। করেছি—বহুবারই। কিন্তু কল্পনা তো বাস্তব নয়, উপলব্ধির কোঠায় পড়ে না, কাজেই ধর্ম আমার কৌতূহলের উদ্রেক করলেও মন টানতে পারে নি—অন্তত আজ পর্যন্ত। আমার মনকে টানে—তোমার ব্যক্তিরূপ, অর্থাৎ তুমি যা হ'য়ে উঠেছ তাই। এই তোমাকে—যাকে আমার প্রেমের চোখে দেখেছি, প্রেমের কানে শুনেছি, প্রেমের স্পর্শে চিনেছি—চাই আমি আজ আমার হৃদয়ের বেদীতে বসাতে: তোমার দেশ আমার কাছে অবান্তর। আমাকে ভুল বুঝো না—এটুকু অনুমান করবার কল্পনা শক্তি আমার কেন, তোমার বা তোমার আদর্শ বন্ধুর কাছে দেশ একটা জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু আমি যদি কোনো দিন তোমাদের দেশকে সে ভাবে দেখতে পারি—যদিও জানি না শেষ পর্যন্ত পারব কি না—তবে সে-পারাটা সম্ভব হবে শুধু তোমার জন্যে। অর্থাৎ তোমাদের দেশকে যদি পরে কোনো দিন ভালোবাসি—তো বাসব শুধু তুমি দেশকে ভালোবাসো ব'লে। আর আমার মনে হয়—এই-ই প্রতি প্রেমিকার মনের কথা। আদর্শবাদী পুরুষ আদর্শকে ভালোবাসে আদর্শের টানে, প্রিয়বল্লভা নারী সে-আদর্শকে বরণ করে শুধু বল্লভের টানে। তাই আমার মিনতি—তুমি আর যাই বলো না কেন একথা বোলো না যে, তুমি যা চাও আমাকে ঠিক তাই চাইতে হবে, তুমি যে-জন্যে চাইছ হবহু সেইজন্যে। যদি বলো তবে বুঝব—আমাকে তুমি ভালোবাসো নি, শুধু চেয়েছ নিজের ভাববিলাসের জোগানদার রূপে। জানি না আমার মনের কথাটা পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পেরেছি কি না—তবে মনে হয় তুমি যদি একটু খোলা মন নিয়ে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো, তবে বুঝতে পারবেই পারবে কোথায় আমাকে বাধছে। আইরিন অশ্রু গোপন করতে মুখ ফেরায়।

পল্লব ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: আমি বোধ হয় বুঝেছি তোমাকে···আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন খালি খালি লাগছে···ঠিক বুঝতে পারছি না—কী বলব এর উত্তরে···শুধু এই কথা ছাড়া যে আমাকে একটু সময় দাও।

আইরিনের মুখ শাদা হ'য়ে গেল: সময়? কী জন্যে?

পল্লব একটু ইতস্তত ক'রে বলল: আমি নিজের মনের সঙ্গে একটু মুখোমুখি হ'তে চাই—একেবারে একলা।

আইরিন ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

পল্লব ওর মুখ বুকের মধ্যে টেনে বলল: তুমি চোখের জল ফেললে আমার কী যে হয়, কেমন ক'রে বোঝাবো আইরিন? বলেছি—আমাকে শক্তি দিতে হবে তোমাকেই। তাছাড়া আমাকেও তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো, লক্ষ্মীটি! আমি··· আমি···মানে, তুমি আজ যা বললে তার জন্যে···আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আইরিন জলভরা চোখে পল্লবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল: আর আমিই কি প্রস্তুত ছিলাম তুমি যা বললে তার জন্যে? আমি তোমাকে ভালোবাসি জেনেও বললে কেমন ক'রে—সময় চাও নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে?

পল্লব কী বলবে ভেবে পায় না। আইরিন বলে: কিন্তু না, তোমাকে দোষ দেব না। হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ···জানি না। আমি এখন পরিষ্কার ক'রে ভাবতে পারছি না। ব'লে সুর নামিয়ে নিয়ে থেমে থেমে ফের বলে: হয়ত তুমিই ঠিক হয়ত এ ক্ষেত্রে এ ছাড়া উপায় নেই, কারণ কিসের টানে যে আমরা চলি কেমন যোগাযোগে যে কে কী ভাবে গ'ড়ে ওঠে কেউ কি জানে? তাই তোমার কথাই থাক, তুমি যাও যেখানে যেতে চাও—এমন কি যদি সোজা দেশে ফিরলে তোমার পক্ষে নিজের মনের সঙ্গে একলা মুখোমুখি হওয়া সহজ হয় তবে তাই করো, আমি তোমার পিছুটান হ'য়ে থাকব না।

পল্লবের বুকের মধ্যে ধ্বক ক'রে ওঠে: তার মানে? বিদায়?

আইরিন গাঢ় কণ্ঠে বলে: ছিঃ, অমন কথা বলে? পুরুষের বেলায় কী হয় কেমন ক'রে বলব? কিন্তু মেয়েরা কি এক কথায় বিদায় দিতে পারে পল? বলতে বলতে ওর চোখে ফের জল ভরে ওঠে: তুমি কী জানবে পল, তোমাকে আমি কোথায় বসিয়েছি? তা ছাড়া ওর কণ্ঠে ফুটে ওঠে উদাস সুর—তা ছাড়া আঁকড়ে ধরা আমাদের স্বভাব, তুমি কাছে থাকলে হয়ত তোমাকে আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরব, কে বলতে পারে? বলে চোখ মুছে শান্ত কণ্ঠে বলে: আমাকে আমার দুর্বলতার জন্যে ক্ষমা কোরো তুমি। যারা মুক্তি চায়, প্রেম হয়ত তাদের বল দেয় কিন্তু যারা বন্ধনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ না ক'রে পারে না তাদের প্রেম শক্তি দেয় না—রিক্তই করে।

পল্লব অধীর হ'য়ে ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে বলে: আমি এ পারব

না। কুকুমকে আজই লিখে দিচ্ছি যে এখান থেকে তোমাকে নিয়েই সোজা দেশে ফিরব। আর আগু-পাছু করব না।

আইরিন ম্লান শান্ত কণ্ঠে বলে: সে হয় না পল! একবার যখন মুখ ফুটে সময় চেয়েছ—সময় তোমাকে নিতেই হবে। আমি যাই হই—তোমার দুর্বলতার ফাঁক দিয়ে তোমার মনের দুর্গ দখল করব না, চোখের জল দিয়ে তোমাকে বাঁধব না। এমন কি, দূরে গিয়ে যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও···তাও মেনে নেব—যদিও দু' দিন আগেও কেউ যদি আমাকে বলত আমার ভালবাসাকে যাচাই করবে, তা হ'লে তাকে বলতাম: ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! তোমার নিজের পথেই চলো। কিন্তু তোমাকে সে কথা বলার সাধ্য আমার নেই···তোমাকে যে ভালোবেসেছি আমার দেহ-মনের প্রতি অণুটি দিয়ে। না, তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যা চাও তাই করব—তাতে যতই কেন না ব্যথা বাজুক। বলে ফের চোখ মুছে সোজা হ'য়ে ব'সে মুখে হাসি টেনে বলে: তা হলে য়ুসুফের সঙ্গে রোমেই যাচ্ছ—না, সোজা দেশেই ফিরবে?

দেশে! সে কি কথা?

আইরিন ম্লান হাসে: ক্ষতি কী? তুমি রোমে থাকলেও চোখের আড়ালে। দেশে থাকলেও চোখের আড়ালে, তাই বরং সেখানেই যাও না ফিরে—বিশেষ যখন তোমার আদর্শ বন্ধু এমন প্রাণকাড়া সুরে ডাক দিচ্ছেন?

পল্লব ওর হাতের পরে হাত রেখে বলে: তার উপর কেন অনর্থক রাগ করছ আইরিন? সে তো তোমার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে নি?

আইরিন কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই থেমে বলে: থাক্, তুমি বুঝবে না।

না, বলো। বলতেই হবে।

না, পল! তোমার মনে কেন আর মিথ্যে দুঃখ দেই? কেবল আমাকে একটা কথা দেবে?

কী কথা?

যে, যেখানেই থাকো না কেন, প্রতি সপ্তাহে আমাকে অন্তত একটি ক'রে চিঠি দেবে? আমি পথ চেয়ে থাকব।

পল্লব ওর হাত ধ'রে বলে: আমি যাব না।

আইরিন পল্লবের হাত চুম্বন ক'রে বলে: সে হয় না। এখন তোমাকে যেতেই হবে। তোমার বন্ধু-বান্ধবী ইতালিতে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।

তারা এখানে আসবে।

য়ুসুফকে কথা দিয়েছ?

টেলিফোন ক'রে দেব—সময় আছে।

যদি আমি তোমার বন্ধুর মনের মতন মেয়ে না হই? না, ঠাট্টা নয়। তুমি যাও—আমি প্রসন্ন মনেই বলছি। এত ভয় কিসের—যখন আমাদের এ ভালোবাসা সত্য? আগুনকে খাদই ভরায়, সোনা ভরাবে কী দুঃখে? ব'লে জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা ক'রে: কেবল চিঠি লেখার কথাটা এখনো দাও নি, মনে রেখো।

দেব—কেবল এক সর্তে।

কী?

কথা দাও যে, আমি ডাকলেই তুমি আসবে।

আইরিন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে: তুমি ডাকবে অথচ 'আমি আসব না, এ কথা কি তুমি সত্যি ভাবতে পারো যে কথা চাইছ?

পল্লব আইরিনের কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলে: আমি জানতাম—তুমি বুঝবেই বুঝবে।

বোঝা তো কঠিন নয় পল, কঠিন হ'ল অভিমানকে জয় করা। ব'লেই আইরিন ভেঙে পড়ে, পল্লবের কোলে মুখ ডুবিয়ে কেবল চাপা কান্নায় ওর দেহলতা থেকে থেকে কেঁপে ওঠে।

পল্লব ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে না, ওর পিঠে, মাথায়, চুলে হাত বুলোয়। ঘরের মধ্যে শুধু ঘড়ি করে টিক টিক টিক।

* * * *

আইরিন যখন মুখ তুলল তখন ওর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। পল্লব ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

আইরিন ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: আমাদের হাসি-কান্নাকে বেশি বড় ক'রে দেখো না। এমনিই মন আমাদের···শরতের আকাশ: এই আলোয় আলো, তার পরেই ঘনঘটা। তোমরা আমাদের কৃপাদৃষ্টিতে দেখ কি সাধে?

পল্লব ওর মুখ চেপে ধরে: নিজেকে অমন ক'রে ছোট করো না।

কিন্তু যে সত্যিই ছোট—

তোমার মতন যে ভালোবাসতে পারে সে ছোট?

আইরিন বিষণ্ণ হাসে: কোথায় ভালোবাসা পল? সত্যি ভালোবাসার এক মন্ত্র—'তুমি তুমি'। যে 'আমি আমি' করে সে মিথ্যে—দুর্বল ভালোবাসা।

তা হ'লে আমাকে ছেড়ে দেবার বল পেলে কোত্থেকে?

বল পাই আবার আমরা কোথায়? শুধু পাবার ভঙ্গি করি বৈ তো নয়।

ভঙ্গি করো?

নয় ত কী? ভাবো কি—ছেড়ে না দিয়ে যদি বেঁধে রাখতে পারতাম তা হ'লে তোমাকে চোখের আড়াল হ'তে দিতাম আজ?

চোখের আড়াল মানে কি মনের আড়াল?

কী জানি? কিসে কী হয় কেউ কি বলতে পারে? বলে একটু থেমে: আর তাই তো ভয় আসে পল! দিনের পর দিন শুধু উদ্বেগ থাকবে আমার সঙ্গী হ'য়ে—যদি নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হতে না হতে আমি তোমার পর হ'য়ে যাই···যদি তোমাকে পেয়েও হারাই?

পল্লবের বুকের মধ্যে কি একটা তার বেজে ওঠে, বলে: না—আমি যাব না—কিছুতেই না।

আইরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে: এখন আর হয় না—এখন তোমাকে যেতেই হবে—অন্তত কিছু দিনের জন্যে।

কেন শুনি?

কারণ—এখন যদি তুমি না যাও তবে সে হবে আমার তোমাকে জোর করে ধরে রাখারই সামিল—যার ফলে তোমার চোখে আমি ছোট হ'য়ে যাবই যাব। শ্রদ্ধার ভিৎ বিনা কি প্রেমের ইমারত গড়া যায় পল?

পল্লব কী বলবে ভেবে পায় না। আইরিন একটু পরে বলে:

এই মাত্র তুমি বলছিলে নারীকে তোমাদের শাস্ত্রে পুরুষের শক্তি বলে। আমার তখন কী মনে হয়েছিল বলব ?

কী ?

যে আমরা তোমাদের শক্তি হ'তে পারি কেবল তখন যখন তোমরা পাশে এসে দাঁড়াও। তোমরা ভার নিলে তবেই আমরা সবলা, নৈলে অবলা। এক কথায় : তোমরা দাঁড়াও নিজের পায়ে আমরা দাঁড়াই তোমাদের পায়ে—আইভিলতার মত—তোমাদের আঁকড়ে ধরে। ব'লে ঈষৎ ব্যঙ্গ হেসে : এই-ই হ'ল শক্তিময়ীর শক্তির নিজ মূর্তি, বুঝলে ?

পল্লব শান্ত দৃঢ় স্বরে বলল : আইরিন। আমি যাব না। কুঙ্কুমকে এখনি টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি, আর কুঙ্কুমকেও আজই লিখে দেব সব কথা খোলাখুলি—এই কথা বলে যে, দেশের কাজে আমাকে যদি ও চায় তবে তোমাকেও গ্রহণ করতে হবে। তোমাকে বিদায় দিয়ে আধখানা মন দিয়ে কী দেশের কাজ করব বলো ?

আইরিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নিবে গেল : বলল না পল, সে তুমি পারবে না। কারণ এখন হঠাৎ কুঙ্কুমকে সবকথা লিখে দিলে সে মুখ ফেরাবেই ফেরাবে—আমাকে তোমার 'শনি' ভেবে। তখন দেশের কাজে যোগ দেওয়ার পথও তোমার যাবে বন্ধ হয়ে। পুরুষ মানুষ বল পায় মেয়েদের কাছ থেকে নয়—ও একটা কথাই নয়—তোমরা বল পাও তোমাদের ধর্ম থেকে, আদর্শ থেকে, তপস্যা থেকে। এই সবই তোমাদের সর্বস্ব। তা ছাড়া আমাকে সেন্টিমেন্টাল দুঃখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তুমি সর্বস্বান্ত হও তা হ'লে মনে করো কি—আমাকে ধনী করা হবে ? মেয়েরা যতই দুর্বল হোক না কেন—যেখানে সত্যি ভালোবাসে সেখানে সব আগে ভাবে নিজের কথা নয়—যাকে ভালোবাসে তারই কথা। তাই তো যুগে যুগে নায়িকারা নায়ককে নিজে হাতে বর্ম পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে। পাঠিয়েছে কেন না তারা তাদের অন্তর-গভীরে একটি কথা জানতে : যে, বল্লভকে যদি নিজেদের জন্যে রণছোড় হ'য়ে প্রাণে বাঁচতে বলে তবে সে হবেই হবে অসুখী, আত্মধিক্কারে ম্লান, অবসন্ন—আর তখন এ অবসাদের কারণ হবে কে ? প্রিয়া, যার জন্যে সে কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছে। তার পরে কী হবে তাও সে প্রিয়া জানে—যে, অবসন্নকে নিয়ে ঘর করলে প্রসন্নতা আসতে পারে না, খতিয়ে জ'মে ওঠে শুধু আত্মগ্লানি : কী করলাম ? যাকে ভালোবাসি তার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিলাম নিজের সুখের জন্যে ? না পল—আইরিনের মুখে ফুটে ওঠে বিষণ্ণ হাসি—আমি তোমাকে মন থেকেই বলছি—যাও যেখানে যেতে চাও, নিজের মনের সঙ্গে হও মুখোমুখি, তোমার শুভার্থীদের, বন্ধু-বান্ধবদের, আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ নাও যদি চাও—আমার সুখ-দুঃখের কথা ভেবো না, হিসেব ক'রে দেখ—কিসে তোমার জীবন সার্থক হ'বে। যদি ভেবে-চিন্তে স্থির করো—তোমার যাত্রাপথে আমি তোমার সহযাত্রিণী—তোমার ভাষায়, সহদেশিনী হ'তে পারব না—তবে আমাকে জানিও, আমি তোমাকে পিছু ডাক দেব না—নিজে এগিয়ে আসতে।—না, এ মহত্ত্বের কথা নয়, শক্তিময়ীর অপরাজেয় শক্তির কথাও নয়—এ হ'ল দুই আর দুয়ে চারের কথা, অপ্রতিবাদ্য যুক্তির কথা : অর্থাৎ নিজের সুখের ব্যবস্থা করতে যদি আমি তোমাকে অসুখী করি, তবে তাতে ক'রে আমার সুখ হবে না, হবে শাস্তি। আত্মধিক্কারের মধ্যে বাঁচার চেয়ে গভীর বেদনাকে বরণ করাও শ্রেয়ঃ, কারণ সেখানে অন্তত আছে স্মৃতির সান্ত্বনা—এ নিঃসম্বলতার জগতে যার দাম কম নয়।

আইরিন উঠে দাঁড়ায়, পল্লবও। আইরিন জোর ক'রে হেসে বলে : ঐ দেখ—আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখবে কথা দিলে না।

পল্লবও জোর ক'রে হেসে বলে : লিখব—কেবল তুমিও কথা দাও—আমার চিঠির জবাব দিতে দেরি করবে না।

ধিক্! তোমাদের গীতার বাণী নিয়ে না কথায় কথায় গর্ব করো—মিছাম বর ? না, আমি চিঠি লিখবই কথা দেব না। বীরপুরুষ। এটুকুও পারবে না—সপ্তাহে একটি ক'রে চিঠি লিখে যেতে—আমার চিঠি পাও বা না পাও ?

ওর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসি ফুটে ওঠে। পল্লব ওকে আলিঙ্গন করে, আইরিন ওর বুকে মাথা রেখে খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বলে : এসো পল, একটা গান গাই দুজনে মিলে... কে জানে আর কখনো একসঙ্গে গাওয়া হবে কিনা—না না, অমন কথা বলব না আর, অমন মুখ কোরো না, লক্ষ্মীটি। এসো, খুশিমনেই বিদায় নিই—'ফিরে এসো' ব'লে অবশ্য। উচ্ছ্বাসের ইন্দ্রধনুবিলাস তো ঢের হ'ল, এবার মাটির মানুষ মাটিতে নামুক একটু।

পল্লবের মনের ভার একটু কমে আসে, সহজ হেসে বলে : তুমি বড় চমৎকার কথা বলো আইরিন। মজেছি কি সাধে ?

আইরিন আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে : এবার আমাকে ছোট করছে কে শুনি ? শুধু কথা ? তোমাকে গান শুনিয়ে শিখিয়েও কি মজাইনি ?

পল্লব হেসে ফেলে : একশো বার। তবে কি জানো ? তোমার তুলনা এক তুমি—যখন যেরূপ ধরো মনে হয় সেই তোমার সে রূপ। যখন গান গাও—গান করি তোমার কণ্ঠ, যখন হেলে দুলে চলো—ধ্যান করি তোমার দেহলতা, যখন কটাক্ষ করো—অনুভব করি তোমার বিদ্যুৎ, আবার যখন বিদায় দাও তখনো শুনি সেই সঙ্গে তোমার 'ফিরে এসো' বলা—যা এক তুমিই পারো—যেন গানের সুরে।

আইরিন ওর হাতে ছোট একটি চড় মেরে বলে : আর তুমিই বুঝি মুখচোরা ভালো মানুষটি। গান ভালোবাসলাম আরো কার জন্যে গো ?

এই দেখ—আর একটা রূপ—রহস্যময়ীর।

আইরিন কুপিত সুরে বলল ; "রহস্য ? তোমাকে বলি নি—তোমাদের গানের সুরে আমার হৃদয় কী ভাবে দুলে ওঠে ? না, তোমার কাছে তোমাদের দেশের কয়েকটি গান শিখতে গিয়ে আমার মন যে কোন্ রঙে রঙিয়ে উঠেছে—তুমি কী জানবে ? হয়েছে—এসো ঐ গানটি আর একবার গাই দুজনে—ওর শেষ স্তবকটির কয়েকটি মীড় আমার গলায় এখনো তুলতে পারিনি—ঐ তোমার—ব'লে ধীরে ধীরে বাংলায় উচ্চারণ করে : "প্রিয়, তোমার কাছে যে হার মানি"—কী সুন্দর গান—ভাবে, সুরে, তালে, দুলকি চালে। ব'লে ওকে টেনে নিয়ে যায় পিয়ানোর কাছে : তুমি দাঁড়িয়ে শোনো, আমি গাই, কেমন ? তুমি প্রথমেই ধোরো না কিন্তু—তোমার কণ্ঠ শুনলেই আমি সুর-তাল ভুলে যাই। একবার আমি একলা গেয়ে নিই, তারপর তুমি ধরবে—ডুয়েট ভঙ্গিতে, কেমন ?

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে ওর আনন্দদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে থাকে : এ কি সেই মেয়ে যে দু'মিনিট আগে ভেঙে পড়েছিল কান্নায় ? আইরিন পিয়ানোয় দু'-তিন মিনিট কর্ড দিয়েই সুর ধরে, কিন্তু পল্লব ওর সুরতালের ভুলচুকের কথা ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকে। কী অপরূপ মুখ, রঙ, চাহনি ! এই মেয়েকে ও বিদায় দেবে কেমন ক'রে—কী অপরাধে ?—ভারতবর্ষকে ভালোবেসে যদি ও পল্লবের 'সহদেশিনী' হ'তে না পারে এই ভয়ে ? মোহনলালের একটা প্রায়োক্তি মনে প'ড়ে যায় : মানুষ বড়, না দেশ ? কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কুসুমের কথা : First things must come first—আগে স্বাধীন হই, তারপরে ভাবা যাবে বিশ্বমানবের কথা। উত্তরে মোহনলালের তর্কযুক্তি মনে পড়ে : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' দেশের সেবা করতে পারে মানুষ তখনই যখন সে মানুষ হ'য়ে ওঠে : 'কিসের শোক করিস ভাই ? আবার তোরা মানুষ হ' : গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ। প্রত্যুত্তরে উদ্দীপ্ত মুখে কুসুম বলত—মনে পড়ে—কিন্তু মানুষ হবে কী করে শুনি যদি দাসত্বের চাপে আত্মসম্মান মারা পড়ে ? Putting the cart before the horse ? ও হয় না মোহন, হয় না। স্বাধীন দেশের লোকের মুখে যে-কথা সাজে পরাধীন দেশের মুখে সে-কথা সাজে না। জাতিই গড়ে উঠল না—আন্তর্জাতিকতার স্বপ্নে গা-ভাসিয়ে চললাম মহামানবের সাগরতীরে ! যা নয় তাই ! পল্লব গান শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

হঠাৎ আইরিন থেমে দুম্-দুম্ ক'রে পিয়ানোয় করতল দিয়ে বাড়ি মেরে বলে : তুমি কিচ্ছু শুনছ না ! যাও !

পল্লব চমকে বলে : কী ?—হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি বই কি।

ছাই শুনছ ! আমার এ-তালটায় কেবলই ভুল হয় আমি জানি। দুই-তিনের কদম তো আমাদের সঙ্গীতে নেই—কী যেন এ-তালটার নাম ? ঐ দেখ ভুলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—জাঁপতাল, না ?

ঝাঁপতাল। জ-র পরে হ জুড়লেই ঝ হয়—ঝ, ঝাঁপ, ঝাঁপ।

আইরিন রাগ করে বলে : ও আমি পারব না উচ্চারণ করতে।

পল্লব হেসে বলে : দুরদৃষ্ট বাংলা ভাষার। না, লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না। আমি শুনছিলাম বৈ কি।

ফের মিথ্যে কথা ? তুমি কিছু শোনো নি—ভাবছিলে আথাল পাথাল।

না না, বলে পল্লব ভয়ে ভয়ে, তোমার শেষ অন্তরাটির উচ্চারণ এখনো নিখুঁত হয়নি। আচ্ছা আমি গাইছি—গাও সঙ্গে সঙ্গে—কয়েক বার গাইলেই জিভের আড় কেটে যাবে।

আইরিন হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলে : আচ্ছা। আবার তুমি পিয়ানো ধরো, আমি দাঁড়িয়ে গাই। আমরা দাঁড়িয়েই ভালো গাই, জানো তো ?

পল্লব 'জানি' বলেই হেসে টুলে বসল পিয়ানো বাজাতে। আইরিনের নিখুঁত সরলতায় মন ওর আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। কী অপরূপ কিন্নরী-কণ্ঠ। একে বিদায় দেওয়ার কথা কি ভাবা যায় ? অথচ তবু ফিরে ফিরে মনে ধুয়োর মতন বাজে আইরিনের একটা কথা : যদি তোমাকে পেয়েও হারাই ?

আইরিন থেমে বলে : ফের অন্যমনস্ক ? ধরো।

পল্লব চমকে উঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ', বলেই ওর সঙ্গে ধরে :

প্রিয় ! তোমার কাছে যে-হার মানি—সেই আমার জয়।
প্রেমে জয় গরব সাধে যে—জয় নয় সে জয়ী নয়।
মানি তোমার কাছে যে পরাভব, সেথা আমারি জয়োৎসব,
পরের মুখে বিজয় রব চিত্তে বিঁধে রয় :
শুধু তোমার সাথে আমার নহে নহে সে পরিচয়।
প্রিয় তুমি যে বরদানে আমায় ভরেছ এ-হৃদয়,
তার প্রতিদানে সে নোয়াতে মাথা বাসে কি লাজ ভয় ?
তুমি বরণমালা দিয়ে আমারে নিরভিমান দুরভিসারে।
দেখালে আলো অন্ধকারে—নাই তো তার লয় :
দিলে দীক্ষা—প্রেমে জিতিলে হারি, হারিলে সেই জয়।

গানের শেষে পল্লব মুখ তুলতেই দেখে—আইরিনের চোখে জল ও উঠে দাঁড়াতেই আইরিণ ওর বুকে মাথা রেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে...

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

আইরিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছে, দোর খোলে।

নাতাশা ! কী ব্যাপার ?

পল্লব সকুণ্ঠে বলে : এই যে নাতাশা, এলে ভালোই হ'ল : আমি তোমাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম—মানে আজ রাতের ট্রেণে আমি রোম—

নাতাশা ম্লান হেসে বলে : জানি—সেই জন্যেই আমার আসা—য়ুসুফ তোমার ওখানে টেলিফোন করে না পেয়ে আমাকে টেলিফোন করছিল—তোমার নাকি এখন বিসমার্ক শ ত্রা সে—

ওহো ! দেখ দেখি—স্রেফ ভুলে বসে আছি—পাসপোর্ট অফিস—

হ্যাঁ—সেইজন্যেই—য়ুসুফ সেখানে থেকেই টেলিফোন করে বলল যে আজ শনিবার—একটার পরে অফিস বন্ধ। আজকে যদি যেতে হয়—এক্ষুণি যাও ছুটে ট্যাক্সি নিয়ে—এখন শ' বারোটা—আর দেরি কোরো না। বলেই থেমে : তুমি আজ রোম রওনা হচ্ছ, কাল সকালেও তো বলো নি ?

কাল জানতাম না—আজ সকালেই হঠাৎ যাওয়া স্থির হল—য়ুসুফ হঠাৎ এসে এমন ছেঁকে ধরল—

নাতাশা ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল : আজই ?

আইরিন বলল : নৈলে কি ও মিথ্যা কথা বলছে ?

নাতাশা ভ্রূকুটি করে বলল : না। মিথ্যা কথা কি এ জগতে কেউ কখনো বলে থাকে ? সবাই প্রতি পদে সত্যি কথা বলে বলেই না জগতের আজ এ অবস্থা।

পল্লব কুণ্ঠিত সুরে বলল : সত্যি বলছি নাতাশা, বিশ্বাস না হয় য়ুসুফকে জিজ্ঞাসা করো—

নাতাশা বাধা দিয়ে বলে : আমার বিশ্বাস করা না করায় কী আসে-যায় পল ? বলেই কেমন একরকম হেসে : ইতালি এ সময়ে বড় সুন্দর ! আইরিনকে নিয়ে যাও না।

আইরিন বলে : আমি ! তোর মাথায় কখন যে কী ভূত চাপে—

নাতাশা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে : কত আর অভিনয় করবি আইরিন! ব'লেই নিজেকে সামলে নিয়ে পল্লবের দিকে ফিরে : ফিরছ কবে?

আইরিন বলে : হয়ত না ফিরতেও পারে।

না ফিরতেও পারে? সে কি!

আইরিন বলে : সে কি—মানে?

নাতাশা বলে : তাও কি খুলে বলতে হবে না কি?

আইরিন লাল হ'য়ে উঠে বলে : বলা না বলা তোমার ইচ্ছা—কেবল ওকে জেরা করা কেন?

নাতাশার মুখও রাঙা হ'য়ে ওঠে : জেরা আবার কি? আমার বোনের সঙ্গে তার শোবার ঘরে এসে যে গলাগলি করে—তাকে জিজ্ঞাসা করার আমার অধিকার আছে।

আইরিনের মুখও লাল হ'য়ে ওঠে : না, কোনো অধিকার নেই—দিদি কি বোনের অভিভাবক নয়?

নাতাশা একথার জবাব মুলতুবি রেখে পল্লবকে বলে সরোষে : ওর কথা আমি ধরি না। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্ন আমার করবার আছে।

আইরিন বাধা দিয়ে বলে : না, কোনো প্রশ্ন নয়। ব'লেই ফিরে : পল, তুমি যাও, পাসপোর্ট আফিস—

নাতাশা বাধা দেয় : না, আমার কথার উত্তর দিয়ে তবে যাবে। ব'লেই পল্লবকে : শোনো পল, এদেশেও কুমারীর শোবার ঘরে যে-সে আসে না। তুমি যদি ওকে ছেড়েই যাবে তবে কি জিজ্ঞাসা। কবি—এতদিন ওকে নিয়ে শুধু খেলাচ্ছিলে?

দিদি! আর যা করে করো—শুধু আমার মাথা হেঁট কোরো না।

মাথা হেঁট—এর পরেও? যে-মেয়ের এতটুকুও আত্মসম্মান বোধ আছে—

আইরিন বাঁকা হেসে বলে : আত্মসম্মানের কথা তোমার মতন মেয়ের মুখেই মানায় বটে—যে—ব'লেই নিজেকে সামলে পল্লবের দিকে ফিরে : তুমি আর দেরি করলে পাসপোর্ট পাবে না পল! যাও এক্ষুণি।

পল্লব বলে : যাচ্ছি। ব'লে টুপি উঠিয়ে নিয়ে নাতাশার দিয়ে ফিরে : যাবার আগে কেবল একটা কথা ব'লে যাই নাতাশা! আমি আইরিনকে নিয়ে খেলাই নি। রোম থেকে ফিরেই আইরিনকে নিয়ে দেশে ফিরব—বিবাহ এখানেই হবে কিম্বা সেখানে—ওর যা ইচ্ছা।

নাতাশার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা দেখায়, আইরিনের দিকে ফিরে বলে : সত্যি কথা?

সত্যি হোক, মিথ্যা হোক—তোমার কী শুনি? ব'লেই পল্লবকে : যাও তুমি—আর পারো তো ওকে ক্ষমা কোরো—ও বড় দুঃখ পেয়েছে। হ্যাঁ, পাসপোর্ট নেওয়া হ'লে আজ এখানেই খেয়ো—আমার ঘরে, কেমন?

পল্লব বেরিয়ে যায়। নাতাশা দু' হাতে মুখ ঢাকে। [ক্রমশঃ।

অভিসারিকা

শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী

রাত্রির নিত্য অভিসার
বনানীর বুকে শান্ত আশার,
অরণ্যে অরণ্যে আর পাহাড়ের অবুঝ নীড়ে
শুধু ভয় পায় জন-অরণ্যের ভীড়ে ভীড়ে।

তাই—

রাত্রি নামে না হেথা অভিসারিকা
ওপারেই থাকে শুব্ধ আলোক-পরিখা।
বিজলীর থির-থির আলো
সারি সারি বলে যেন 'এই ভালো।'
মৃতের নিষ্প্রভ আঁখি
জীবনেরে দেয় ফাঁকি।

তবুও পরিখার ওপারে নিত্যই আসা চাই
যদিও হেথায় অভিসারিকার প্রবেশ নাই।
এ কথার কানাকানি আকাশে বাতাসে
মরুতে-মেরুতে-নভে হুতাশে হুতাশে।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৬

এ যেন দুজনে মিলে বালুর ঘর বাঁধা। কত ক্ষণস্থায়ী এর আয়ু, সে হিসেব কে করে? সে হিসেব চম্পা আর চন্দনের মনে নেই।

ঘরের ছেলে ঘরে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়েছে চম্মন। বড় দুঃখে স্বীকার করে গিয়েছে প্রতাপের কাছে, বে—না, আমি বুঢ়ঢা হয়ে গিয়েছি। আমার যা শেখাবার শিখিয়েছি তোমার ছেলেকে। ভাল ভাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। সেলাম লাগাতে আর স্যালুট বাজাতে শিখিয়েছি—পারেড কাওয়াজের কায়দাটা যদি ভাল করে রপ্ত করতো তাহলে রংরুট থেকে রেগুলার সিপাহী হতো ঐ হতভাগা। কিন্তু ঘাড় বাঁকা, বুনো ঘোড়ার সামিল! ড্রিল হাবিলদার সব রংরুটকে দাবড়াচ্ছে, তা ওর সহ্য হলো না। রেগে ফুঁসে বেরিয়ে এলো! আমি থেকে গিয়েছি প্রতাপ!

বাপের কথা শুনে প্রতাপ মনে মনে ভাবে, ছেলেকে ঐ স্বভাব দিয়েছ তুমি। আমার সঙ্গে ওর মিলটা কোনখানে?

মুখে বলে—তুমি আর কাজ করো না পিতাজী! তুমি-ও ছুটি করিয়ে চলে এসো!

চম্মন পাগড়ী-পরা মাথা নাড়ে। এ বড় দুঃখের কথা! তবু স্বীকার করতেই হয় যে বাপ আর ছেলের মিল কোনোখানেও নেই। ছেলে বোঝে কিছু টাকা জমিয়ে নিয়ে ঘরে বসে ঘি-মিঠাই খাও, মামলা করো। পুজো-ধ্যান করো! সে জীবনের কথা ভাবলে গায়ে জ্বর আসে চম্মনের। তার শরীর আজও শক্ত। দেহে আলগা চর্বি একটুকু নেই। কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না চম্মন। ফৌজীজীবনটা তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার স্বভাবটা-ও তো দিয়েছে বদলিয়ে। তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছে ছটফটানি, অস্থিরতা। ড্রিল পারেড আর উর্দি শুনলে লাফিয়ে উঠে ঘুমচোখে পায়ে পটি বেঁধে তৈরী হয়ে যাওয়া। নিজেকে কাজের মানুষ করে তৈরী করা আর সর্বদা দুই গোড়ালি মাটিতে বিঁধে নিষ্পলক কাজের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। কোন উন্নতি হলো না। সুবেদার ছেড়ে হাবিলদার হয়েও উঠতে পারলো না চম্মন। বেইমানী ক'রে তাকে ফিরিয়ে দিলো ক্ষেতী আর মাটিতে। তাই বলেই যে কিষাণ বনে যাবে চম্মন, তাই বা কেমন ক'রে হয়? চম্মন তা পারবে না।

চম্মন চলে যাবে নিশ্চিত জেনে প্রতাপ সংসারী লোকের মতো বাপের কাছে হিসাব দাখিল করতে বসলো।

—চাচাজীর দরুণ যে জমিটা ছিলো তাতে এ বছর অড়হর আর বুট দিলাম। বিযুণ দু'খানা লাঙল দিলো। বলদ আমার। গেঁহু এবার ভাল পাব না ব'লে মনে হয়। নতুন জমি এ বছর পড়ে থাকবে? তাই মনে করছি ভুট্টা দিয়ে দেব কিছু—

চম্মন এ সব সংসারী কথা শোনে না। হঠাৎ বলে—একটা সুন্দর মেয়ে দেখ।

—কি বললেন?

প্রতাপের দিকে চেয়ে হঠাৎ চম্মন রুখে উঠে। বলে—চোখ নেই? দেখতে পাও না? সুন্দর মেয়ে নিয়ে এসো বৌ ক'রে। ও ছেলেকে ঘরে রাখতে পারবে না!

চম্মন ছেলের বিস্মিত মুখের দিকে চায় না। বলে—ছুটি ফুরিয়ে গেল, আমি চলে যাচ্ছি। ছেলেকে এবার পাঠিয়ে দিতে দেরী করো না। তিপ্পান্ন নম্বর নেটিভ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি কানপুরে রয়েছে। হুইলার সাহেবের রেজিমেণ্ট বাবুকে আমার ডাক্তার সাহেব জানেন। ধ'রে ক'রে যে ক'রে হোক, আমি ঠিক ভর্তি করে দেব। জোয়ান ঘোড়া, জওয়ানীর মস্তিতে বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? তোমার ছেলের গরম বেশী, ঐ পারেড হাবিলদারের হুপটি না খেলে ও ঠিক থাকবে না।

চম্মন চলে গিয়েছে, আর স্বামীর জন্যে অপেক্ষা না ক'রে দুর্গা দাই লাগিয়েছে মেয়ে খোঁজবার জন্যে। দাই পান-তামাক আর গুড়ের নাগরী বেঁধে নিয়ে ভরসা দিয়ে গিয়েছে বর্ষাটা কাটলেই সে এমন একটি মেয়ে এনে দেবে, যার 'বদন উজালা, নৈন বিশালা, চম্পক বরণী গোরী।' এক বৌ ঘর আলো করবে।

সেই ভরসায় বুক বেঁধে রয়েছে দুর্গা। একটি সুন্দর মুখের মায়া দিয়ে ছেলেকে বাঁধতেই হবে। নইলে শান্তি নেই তার। এবার ছেলের মনও ফিরেছে কাজে, চাষে বাসে। ক্ষেতী দেখাশোনা করতে সে নিত্য যায় আর সাঁঝ কাটিয়ে ফেরে।

প্রথম যৌবন। বড় সুখ ভালোবেসে। শৈশবের দুই সাথী মাঝে কবে জোড়ী ভেঙে গিয়েছিলো। মনে মনে চম্পা ভাবে, ভালই হয়েছিলো। নইলে বুঝি এত ভালোবাসা যেত না।

নবীন প্রেম। নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ ভালোবাসা। চোখে চোখে চেয়ে কত সময় কেটে যায়। চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দন কেমন যেন হারিয়ে যায়। টান-টান বাঁধা চুল, স্বাস্থ্য-লাবণ্যে

ভরপুর এক কিষাণ-ঘরের গরীব মেয়ের এত ঐশ্বর্য ? বসেছে বয়াল গাড়ীর ছই-এ হেলান দিয়ে। জলে-ভেজা সবুজ ক্ষেতের পটভূমিকায় এই কালো ওড়নী আর লাল আঙিয়ার সাজে চম্পাকে মনে হচ্ছে যেন কোন গল্পকথার মেয়ে। কোনো রাজকন্যাই বা হবে। নইলে চন্দনের প্রেমে এমন ঐশ্বর্যময়ী সে হলো কেমন করে ? এমন সুন্দর ভঙ্গীটি চম্পার যেন এই সবুজ ক্ষেতী, নীল আকাশ আর পুবালী বাতাসে ধোওয়া দুনিয়াটুকু সে কিনে নিয়েছে। গমের শীষ ভেঙে সে ছলনা ভরে টোকা দেয় চম্পার গালে। বলে, —এত অহঙ্কার কিসের ? যেন মালকিন সাহেবা তুই !

—নিশ্চয় !

চম্পা একটু হাসে। বলে হাত ছড়িয়ে, সবটুকু দেখিয়ে—এই সব কিছু আমার, জানো ?

—আমাকে দাও কিছু। হাত পাতে চন্দন। সহজাত লীলা-বিভ্রমে রাধিকা হয়ে ওঠে চম্পা। চোখ টান করে বলে—চাও ? এই নাও দিলাম।

—কি দিলে ?

—এই, যা ছিলো আমার।

—সব দিয়ে দিলে ?

—নিশ্চয়। ভয় পাই না কি ? আমার কি ফুরিয়ে গেল ভাঁড়ার ?

মেঘ যখন ঘনঘোর হয়ে ঝেঁপে আসে, হু-হু বাতাসে সূচনা করে দুর্যোগ। তখন চম্পা আর চন্দন নির্ভয়ে চলে যায় গ্রাম ছাড়িয়ে। নির্জন অরণ্যের সীমান্তে। এখানে গাঁয়ের মানুষ কোন দিনও আসে না। বহু অপবাদ আছে এই মাঠটুকুর নামে।

কিন্তু সে ভয়ের কথা এদের মনে থাকে না। আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দেয়। বাজ গর্জে ওঠে। চম্পা আর চন্দনের গলার গান ভেসে যায় বাতাসে। দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটে চলে। চম্পার চেয়ে চন্দনের গলায় গান অনেক বেশী খোলে।

'বিছুড়ী জোড়ী মিল যাতি সৈঁয়া',—এই গানটি সে আহরণ করে এনেছে। এই গানটি বার বার শুনেও তৃপ্তি হয় না চম্পার। চন্দনও গলা ছেড়ে গায়। মুখে বৃষ্টির ঝাপটা নিতে নিতে চম্পা খুশীতে হাসে।

আবার কখনো কোনো আবেগ-মধুর দ্বিপ্রহর বা সন্ধ্যা। কথা নেই মুখে। দুটি-একটি কথা, তাও যেন সুরে বাঁধা মিঠি মিঠি বোল। দুজনে দুজনকে দেখা আর অবাক হয়ে যাওয়া। ভালবাসার প্রতিশ্রুতি—ভুলব না, কোন দিন ভুলব না। যখন যেখানে থাকি, যতদূরে থাকি।

—চম্পা, কোন দিন নয়।

তবু যেন বিশ্বাস হয় না। আবার ক্ষণিক বিরতি বাদে ভীরু প্রশ্ন—যদি আর দেখা না হয় ?

—চম্পা, তবুও নয়।

এবার গভীর সুখে নিজেকে এলিয়ে দেওয়া চলে গাছের গায়ে। চন্দন বলে—এত দেশে গেলাম, এত মানুষ দেখলাম, এত রকম জীবন কাটালাম, ভুলতে পারলাম কই চম্পা ? তুমি আমার মনে ছিলে।

—তবে কেন চলে গিয়েছিলে ?

এ কথার জবাব নেই। চন্দনের বড় কাছে চম্পা। এবার চম্পার অন্তরের মণিকোঠায় যে কথা মাথা কুটে মরেছে দিবা রাত্রি, তাই-ই ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করে—আমাকে ওরা নিয়ে যাবে, জানো ?

—কে বলেছে ?

—আমি জানি।

চন্দন হাসে। বলে—কেন ? তোমার সঙ্গে মিশলে আমার জীবনে দুঃখ আসবে ? কেন এসব কথা বিশ্বাস করো চম্পা ! আমি বিশ্বাস করি না। দেখো, আমি এবার কাজ করতে চলে যাব। আর তারপরে তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব।

—কোথায় ?

অবুঝ এক বালকের সঙ্গে যেন খেলা করছে চম্পা। চন্দনের গলায় কিন্তু কৌতুক নেই। চন্দন বলে—কত জায়গা আছে। দুনিয়াটা কি ছোট্ট ?

তা হয় না। দুনিয়া যত বড়ই হোক না কেন, এক দুনিয়ায় চম্পা আর চন্দনের ঠাঁই কোন দিনও হবে না। কিন্তু সেকথা বলে এই মধু মুহূর্ত্ত নষ্ট করে কে ? চম্পা তা করবে না। কেন করবে ? জীবনে সে কি ভালবাসা আর দরদ এমনই অঞ্জলি ভ'রে পেয়েছে ? যে ভবিষ্যতের কথা তুলে এই সময়গুলোকে সে আশঙ্কায় ভারাতুর করবে ? চন্দন যতই ভবিষ্যতের কথা বলে আর সুখস্বপ্নের ছবি আঁকে, চম্পা ততই বর্তমানের মুহূর্ত্তগুলোকে মুঠো ক'রে ধরতে চায়। চন্দন বলে—দুনিয়াটা তো এই সেঞ্জারনদীর ধারে ছোট্ট ডেরাপুর গাঁখানার মধ্যে কয়েদী নয় ? অনেক দেশ আছে। তুমি আর আমি সেখানেই চলে যাব চম্পা !

—তা হয় না।

—কেন ?

—না।

আসলে অতখানি সুখের স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় চম্পা। অত বড় কথা ভেবে কি হবে ? তা হ'লেই তো তার দুর্ভাগ্য কোন দিক থেকে ফণা তুলে ফুঁসে উঠবে আর জখম করবে চন্দনকে। অথচ সে কথা বললেই চন্দন হা-হা ক'রে হাসবে। ঐ রকম মানুষ চন্দন। সে ভাবে, সবগুলো কালো মেঘই বুঝি ঐ হাসির হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া চলে।

দুঃসাহসের দিন। বেপরোয়া জোয়ারের ঢেউ বুকে নিয়ে উত্তাল হৃদয়। কে জানে আজকের সত্যি কালই মিথ্যে হয়ে যাবে কি না নসীবের খামখেয়ালে। তাই আজ, এই মুহূর্ত্তটাই সত্যি। চন্দন বলে—রসুলাবাদে ঝলনের মেলায় যাবে চম্পা ? শোন, তুমি যেও ঐ বুড়ী কৌশল্যাদের সঙ্গে। আমিও যাব। ঠিক খুঁজে নেব।

—ইস্, গাঁ-শুদ্ধ মানুষ যাবে না ?

—গেলেই কি। আমি পরোয়া করি ? তুমি দলছুট হয়ে যেতে পারো না !

মেলা, লোকজন, বাজনা, বাতি, কাচের চুড়ি হাত ভ'রে পরবার লোভ, সবগুলো একসঙ্গে মনে করে চম্পার চোখ দুটো তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু চম্পা ক্ষণিক ভাবে। বলে—তার চেয়ে সেদিন আমি তুমি নৌকো নিয়ে ওপারে যাবো, কেমন ? কেউ থাকবে না গাঁয়ে। বেশ ভালো হবে।

ঝলনের রাত। এমন রাতে আকাশ ভরে তারা থাকতে পারতো। তারা নেই। মেঘলা আকাশ। টিপ-টিপ বৃষ্টি। তবু চম্পার মনের খুশীতে এ আকাশকেও পরম সুন্দর মনে হয়। বাতাসকে মনে হয় সুগন্ধে মদির। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কাৎ

হয়ে চেয়ে থাকে চম্পা। এমন রাতে তার চোখে ঘুম আসবে না। আজকের দিনটা তার মন এখনো ভরে রেখেছে।

আজ তারা দু'জনে চলে গিয়েছিলো বনে। ভয় হারিয়ে বনের নিগূঢ় অন্তরে পৌঁছে, সবুজ ঘাসের ওপর বসেছিলো। শ্যাম ও রাধার ঝুলনের দিনে তাদের মনও মেতেছিলো, দুলেছিলো তালে তালে। চন্দনের বুকে লীন হয়ে ভালবাসার প্রতিটি কথা নিজের বুক ভরে শুনেছে চম্পা। অস্থির হয়ে অশান্ত হয়ে চন্দন বলেছে—মনে হয়, তুমি যেন আমার ভেতরে আছ। চাইলেও যেন উপড়ে ফেলতে পারি না তোমাকে, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না চম্পা!

সে দুর্ভাগিনী। তার নিঃশ্বাসে বিষ। তার স্পর্শে মৃত্যু। তবু আজকের দিনে চম্পা সে কথা বলতে পারেনি। বলেছে—তুমি যাবে তোমার পথে। আমি আমার ভাগ্য নিয়ে থাকবো। তার চেয়ে বেশী আমি চাইতে পারি না। ভয় পাই।

—ভয় পাও, চম্পা? ভয় পেও না।

—কিন্তু চন্দন…

—দেখো। এইদিন ওদিন নয়। আমি একদিন তোমাকে এই সব কিছু থেকে উপড়ে টেনে নিয়ে চলো যাবো।

—তোমার বাবা, মা…

—কিসের কে চম্পা? আমি তো একবারই বাঁচবো। এই জীবনই যদি বৃথা চলে গেল—

—বেশ। বলে গম্ভীর হয়েছে চম্পা। দুজনেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। তার পর সময় চলে যায় দেখে নৌকো নিয়ে ফিরে এসেছে।

চম্পা ভাবে, ভাসলাম তো ভাল করেই ভাসব। ডুবলেও আফসোষ করবো না।

* * * *

'জা কো পিয়া চাহে ওহি সুসাগন'—প্রিয় যাকে কামনা করেছে সেই রমণীই সৌভাগ্যবতী—সেই প্রেয়সী। চম্পার যৌবন যেন অনাদরে মলিন ছিলো। সহসা একজনের প্রেমে সে যৌবন মুকুলিত হলো। চম্পার সেই বন্য অনমনীয়তা ঢাকা পড়লো লাবণ্য ও সুষমায়। এখন তার চলনে রাজহংসীর গরিমা। চোখে অতল রহস্য। কাজল বিনাই সে চোখ কালো। প্রসাধনের উপকরণ নেই। তবু গরীব কিসাণী-মেয়ের মামুলী পোশাকেই তাকে মানায় ভালো। যে গৌরবর্ণ রঙের এত কদর সে-ও যেন চম্পার উজ্জ্বল শ্যাম মুখখানির কাছে হার মেনে যায়। চন্দন বলে, 'লায়লী কো মজনুঁকে আঁখোসে দেখনা চাহিয়ে।' যারা তোমার মধ্যে রূপ দেখে না চম্পা, আমার চোখ দিয়ে তাদের দেখতে বলি।

না। একেই গাঁয়ের মানুষের মুখকে ভয় করে চম্পা। কথা ছড়ালে বড় জ্বালা।

তবুও কথা উঠলো। প্রথমে মুখে মুখে চুপে চুপে। তারপর ছড়িয়ে পড়লো কথা। মানুষে আগে দেখলো চন্দনকে। প্রতাপের জোয়ান ছেলে, যে নাকি এত দেশ-বিদেশ ঘুরে লায়েক হয়ে ফিরলো, সে কেন এই গাঁয়ের মধ্যে এমন আটকে রইলো, কোন আকর্ষণে পড়ে, ভাবতে সুরু করলো দু'-একজন। বুড়োরা অবিশ্যি প্রতাপের উঠোনে চওড়া হাতে চন্দনের পিঠ চাপড়ে তারিফ করলো যে হাঁ, বেটার মতো বেটা। এমনিধারা ছেলেই চাই। যে এত সাহেব দেখেশুনে, এত দেশ-বিদেশ ঘুরে, তবুও নিজের শিখাবৎ-সহবৎ ভোলেনি। নিজে জোয়ান, তবু পাকাচুলকে প্রাপ্য সম্মান দিতে জানে। তারা বলে গেল—হাঁ প্রতাপ এই ছেলের হাতের আগুন পেলে বাপ-দাদার মনটা শান্তি পায় বটে পরকালে। এবার ছেলের বিয়ে দাও।

ছেলের প্রশংসার জবাবে অন্দর থেকে কাঠকয়লার আঙ্গোঠি, আগ্রার মশহুর তামাক আর ছিলিম এলো। কিন্তু সকলে তো বিভ্রান্ত হয়নি। তারা দেখলো চন্দনের চাল-চলন। আর দেখলো চম্পাকে। দেখলো যে মেয়েটা আছে কি না আছে বোঝা যেত না এত দিন, সেই মেয়েই সহসা খাপখোলা ছুরির মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। কূলে কূলে ভরে উঠেছে যৌবন আর চলতে-ফিরতে লাস্য যেন উছলে পড়ছে।

কানে কানে কথা উঠতে দেরী হলো না দুর্গার কানে।

চম্পাকে অনেক ভরসা দিয়ে চন্দন তখন এলাহাবাদে গিয়েছে। চম্মনের পুরনো জিমায়েৎদার বুড়ো ম্যাকমোহন সাহেব এলাহাবাদে রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে চন্দন কাজের জন্যে আসবে কানপুর। সে চম্মনের নাতি। সেটাই একটা ছাড়পত্র বুড়োর কাছে। তা ছাড়া কাজ যদি পায়, তো সে ডাক্তার সাহেবের মুন্সী হবে। রংরুট হয়ে রেজিমেণ্টে ঢুকতে সে চায় না। এমন কি, রেজিমেণ্টের মুনসী হতে-ও তার আপত্তি নেই। তারপর চম্পাকে বিয়ে করে সে শহরে ঘর বাঁধবে। চম্পা তত দিনে নিশ্চয় ঘুরে আসবে লালার মায়ের সঙ্গে। যাচ্ছে তো দুই-তিন মাসের জন্যে।

চম্পা সেই আশায় বসে রয়েছে। নসীব তাকে শুধুই ঠোক্কর লাগাচ্ছে। এবার সে-ও নসীবকে দেখিয়ে দেবে।

তীর্থে যাবার সব ঠিকঠাক। লালা বৈজনাথের দোরে বয়াল-গাড়ী তৈরী। লোকজন জোগাড় হয়েছে। গাঁয়ে এমন ঘর নেই, যে ঘর থেকে দুই-একজন মানুষ জোগাড় না হয়েছে। ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান-দান ক'রে তীর্থ সুরু। পুষ্করে স্নান। আবার উত্তরে হরিদ্বার হৃষীকেশ। তীর্থযাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করে সকলেই এনে দিয়েছে লালার মার কাছে। সব টাকা নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে রেখেছে বুড়ী। পথের জন্য কিছু রসদ নেওয়া হয়েছে। কয়দিন ধরে যাওয়া-আসা কলহ কলরব আর হাঁকডাকে সরগরম রয়েছে মহল্লা।

যাবে বলে চম্পাও তৈরী। এমন সময় দুর্গা এলো বিদ্যুৎ ও বজ্রবাহী মেঘের মতো থমথমে মুখ করে। চম্পার ওপরে ফেটে পড়লো। তীব্র আর বিষাক্ত কথাগুলির ঘায়ে প্রথমটা কালো হয়ে গেল চম্পা। কিন্তু সে তার মায়ের মতো সহনশীল নয়। দুর্গা যখন বললো—সর্বনাশী, এবার নিঃশ্বাসের বিষে আমার ছেলেটার অনিষ্ট করবি ভেবেছিস?

চম্পা প্রথম আঘাতের ধাক্কা সামলে নিলো। তারপর জবাব দিলো—ক্ষমতা থাকে তো ছেলেকে কয়েদ করে রাখো। আমার ওপর হামলা করবার তোমার এক্তিয়ার কোথায়?

দুর্গা আশা করেনি চম্পা তার কথার জবাব দেবে। তাতেই সে আরো চটলো। একে সে স্বভাব-কলহপ্রিয়। তাতে সে আন্তরিক ক্রুদ্ধ হয়েছে। দুর্গার গলা এবার খুলে গেল—এই যে

তুই যাচ্ছিস আর যেন গাঁয়ে মুখ দেখাতে না হয়। হতভাগী, তুই বাজারে যা। রমজানী হ'। শহরের মানুষের কাছে রূপযৌবনের বেসাতী করগে যা! গাঁয়ের দশজনকে জ্বালাবি কেন?

কথা শুনতে শুনতে চম্পার মুখ-চোখে লজ্জায় অপমানে রক্ত ফেটে পড়তে লাগলো। দুর্গা যেতে যেতে ফিরে বিষ ঢেলে দিয়ে গেল—চিরদিনের মতো যা।

মনের বিষ ঢেলে দিয়ে দুর্গা কোনো শান্তি পেলো কি না তা চম্পা জানে না! তবে তাকে সর্বনাশী বিষকন্যা ব'লেই জানে দুর্গা। সে-ই যদি একবার ফিরে এসে দেখতো তাকে তবে নিশ্চয় সে ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করতো দুর্গা। যে মেয়ের মনে গরল, নিঃশ্বাসে মৃত্যু ও দুর্ভাগ্য, সে সামান্য কয়টা কথার ঘায়ে-ই এমন ক'রে লুটিয়ে থাকে মাটিতে? নিঃশ্বাস থেমে শরীর তার এমন হিম হয়ে যায়? চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে? এ কেমন বাৎসল্য দুর্গার, যে বাৎসল্য তাকে নিষ্ঠুর ও স্বার্থান্ধ ক'রেছে? এ কেমন মা, যার মন আর এক দুর্ভাগিনীর দুঃখে কাঁদে না? দুর্গা জানলো না সেই দিন সে অজান্তে চম্পাকে ঠেলে দিলো ভবিষ্যতের হাতে। চম্পা আর চম্পার রইলো না। দুর্নিবার কোনো আকর্ষণে চম্পার চারি পাশ থেকে গণ্ডী গেল ভেঙে। আর ভবিষ্যতের সুদূর প্রান্তে চম্পার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গারও সুখ-দুঃখ এক গ্রন্থিতে বাঁধা হয়ে রইলো।

আজ অবশ্য চম্পা-ও তা জানলো না। ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান ছাপিয়ে আর কোন কিছু দেখতে পেলো না চম্পা। সত্যিই তো, সে তো দুর্ভাগিনী-ই। মনে পড়লো ছোটবেলা থেকে কেমন ক'রে দুর্ভাগ্যের রাহুছায়াতে সে বড় হয়েছে। মনে পড়লো তার জন্মের সূচনাতে-ই তার পরিবারে নেমেছিলো অভিশাপ। মনে পড়লো তার সঙ্গে বিবাহের কথাতে-ই কেমন ক'রে অনেক কথা উঠেছিলো। মনে হলো সত্যিই তো, কোন মা কামনা করে যে তার ছেলের সর্বনাশ হোক? যদি চন্দনেরও কোন বিপদ হয়? চম্পার বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত মাথায় মনে হলো, এত দিন ধরে সে স্বার্থান্ধ হয়ে নিজের বঞ্চিত জীবনটার কথাই ভেবেছে। তাই চন্দনকে সে নিজের জীবনে টানতে চেয়েছে।

চম্পার মনে হলো, যদি কপালে থাকে সে রমজানী হবে। অথবা যা হয় হবে তার। কিন্তু চন্দনকে তার মধ্যে টানবে কেন? এই কি ভালবাসা? তার চেয়ে চম্পা চলে যাক লালার মা-র সঙ্গে। এত তীর্থ, এত দেবস্থান, সেখানে এত মানুষ রয়েছে- তার একলা জীবনের একখানা কিস্তি কি কোন ঘাটেই বাঁধতে পারবে না? তা কখনো হয়? চম্পা মনে মনে সংকল্প করলো, আর কখনো ফিরবে না সে। মা-কে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে; বড় দুঃখে হাসি পেলো তার। ক্ষীণ চাঁদখানির মতো হাসি ঠোঁটে লেগে রইলো। চম্পা ভাবলো, আমাকে নিয়েই মা-র যত ভাবনা ছিলো। আমি না থাকলে মা-ও দায়মুক্ত হতে পারবে।

আর কিসে কষ্ট হবে? চম্পা তার মনখানি নিয়ে সব ছুঁয়ে
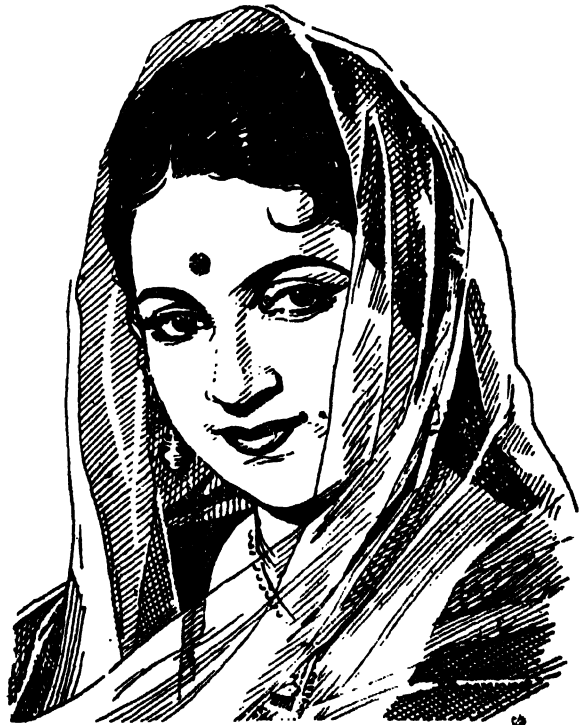
ছুঁয়ে দেখলো, অনেক দিন ধরে চন্দনের স্মৃতিজড়িত মাঠ, বন, বটগাছ আর নদী—এ সব জায়গায় মনটা শিকড় বেঁধেছে বটে। তবে সে বাঁধন উপড়ে ফেলতে হবে। সে না থাকলেও এই সবই থাকবে। এমনি সুন্দরই থাকবে।

আর কে রইলো? চন্দন? হ্যাঁ। তার কষ্ট হবে বটে প্রথমে। কিন্তু তার পরে সে-ও ভুলে যাবে। পালকিতে বৌ বসিয়ে নিজে ঘোড়া চড়ে পাশে পাশে আসবে। দুর্গার হাতে বৌ তুলে দিতে দিতে হয়তো তার একবার-ও মনে হবে না, এই মা যদি মাঝখানে না থাকতো তবে আজ চম্পা থাকতো তার পাশে। রাতে বৌয়ের মুখ থেকে ওড়নী সরিয়ে মুখখানা দেখে হয়তো চন্দন বলবে—'জা কো পিয়া চাহে ও-হি সুহাগণ।' তখন চন্দনের এমন কথা একবার-ও মনে হবে না, এই কথা সে আর একজনকে আর একদিন বলেছিলো। চম্পা কোথাও থাকবে না! না এ গাঁয়ে। না চন্দনের মনে।

সেই নিঃশেষ বিস্মৃতির কথা মনে করতে বুকখানা ভেঙে গেল চম্পার। তা যদি সত্যি হয়, তবে? তবে চম্পা সেদিনই মরবে। তারপর আর বেঁচে থাকবার কোন মানে হয়? চন্দন যদি চম্পাকে অমন করে-ই ভোলে, তাহলে চম্পা তার সমাধিতে কোন সামান্য সৌধ-ও চাইবে না। সে সমাধিতে কোন রক্তগোলাপ ও বুলবুল পরস্পরের প্রেমে আকুল হয়ে সৌরভ ও সঙ্গীত বিতরণ করবার দরকার নেই। তেমন সমাধিতে কাঁটাগাছই ভালো।

আকাশ-পাতাল ভাবে চম্পা। তারপর পিদিম জেলে হাত-আয়নাখানা ধরে। নিজেকেই দেখে। এই কপালে দুর্ভাগ্যের লিখন? কোথায় কোন আখরে লেখা?

চোখে ত পড়ে না। চোখে পড়ে একখানা অশ্রুলাঞ্ছিত অপরূপ মুখ। আয়নাখানা ত' মিথ্যে কথা বলছে না। সুন্দর মুখখানি এখন বেদনা-মলিন, চোখের দৃষ্টি আহত। এই মুখ আরো সুন্দর হতে পারে, যদি একজন পাশে থাকে। সে নেই বলে-ই তো জোর পাচ্ছে না চম্পা। সে নেই বলেই তো অসম্ভব সংকল্পে বুক বেঁধে চম্পা নসীবের কালোদরিয়ায় ঝাঁপ দিতে চলেছে।

তাকে-ও ধিক্কার দিলো চম্পা। সুখের ঘর বাঁধবে 'বলে কোথায় গেল চন্দন—এদিকে যে বাঁধা ঘর ভেঙে গেল, চম্পার সাধ্য কি একা এই দুরন্ত প্রতিকূল জোয়ার ঠেকায়?

চম্পা এত দিনে ভাসলো।

আজমীর পর্যন্ত আর পৌঁছয়নি চম্পা। চম্পাকে পথ ধরে বাজি ফেলছে যে বাজিকর, তার খামখেয়ালীর নিশানা কে করবে? আজমীর পৌঁছুবার আগেই সেই তীর্থযাত্রীর দলে ডাকাত পড়লো। অরক্ষিত পথ-ঘাট। রাজস্থানের মরুভূমি আর নির্জন বসতিবিরল ধূ-ধূ বিস্তৃতি ভারতের অন্যান্য ঠাঁই-এর মতোই দস্যুর উপদ্রবে ভীতি-সঙ্কুল। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে লাঠি ছাড়া অস্ত্র ছিলো না। অলঙ্কার ও অর্থ ছিলো বিস্তর। অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত দল ছত্রভঙ্গ হলো। কয়েকজন মাটি নিলো সেখানেই। চম্পাকে দস্যুরা ধরে নিয়ে গেলো। মাঝপথে বোঝা মনে হওয়াতে চোট দিয়ে ফেলে রেখে গেল তাকে। উদ্ধার করলো কোম্পানীর অমিজরিপের একটা দল। মেমসাহেব আর সাহেবের যত্নে সুস্থ হলো চম্পা কিন্তু গ্রামে আর সে ফিরলো না। ক্যাপ্টেন ও মিসেস টর্কের সঙ্গে এলো কানপুর। সেখানে এক রিসালার বাবুর মারফৎ চিঠি লিখিয়ে খবর আনলো লালা বৈজনাথের বাড়ী থেকে। চম্পা না কি ডাকাতদের দলের সঙ্গে চলে গিয়েছে। ছয় মাস কোন খবর না পেয়ে এই সেদিন মনের দুঃখে মরেছে চম্পার মা শোথ-জ্বর বিমারীতে ভুগে ভুগে। সে বাড়ী সম্পর্কে আর কোন খবর জানাবার নেই।

খবর জেনে চম্পা যেন বাঁচলো। বাঁধন কেটে নিশ্চিন্ত হলো। আর কিছু ভাববার নেই। রেজিমেন্ট বাজারের কাছে ঘরভাড়া নিলো। টর্ক সাহেবের বিবির কাছ থেকে যে টাকা মিলেছিলো, খানিকটা তাই দিয়ে আর খানিকটা নিজের যাদুকরী যৌবনের টানে সারেঙ্গীয়া জোটালো। চোখে ঝিলিক মুখে হাসি। গানে সুর কমতি পড়ে বা নাচতে তাল কাটে—সে দোষ যৌবনের বিভ্রম দিয়ে পুরিয়ে দেয় চম্পা। কটাক্ষের বাণ মুঠো-মুঠো ছুঁড়ে মারে। রাতারাতি ডাক পড়ে রেজিমেন্টে, রিসালায়। মাসে দু'-চারটে ডাক পেলেই চলে যায় চম্পার।

কি বাঙ্গালী বাবুরা, কি ফৌজী দিশী অফিসাররা বা দু'-চারজন ফিরিঙ্গী গোরা, চম্পার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হ'তে সকলেরই সাধ যায়। কিন্তু কোমরে বিছুয়া নিয়ে ঘোরে চম্পা। কথা কইতে সে নারাজ নয়, তবে মাঝখানে থাকে ঐ ছুরিখানার অস্তিত্ব। ২৬ ধারালো মেয়ে—ধরে যেতে দেরী হয় না।

এ এক জীবন! তেমন তেমন হয় তো বিঠুর অবধি চলে যায় চম্পা, তার সারেঙ্গীয়া নিয়ে। পেশোয়া প্রাসাদে কখনো সখনো গেলে সোনার বালাটা, রূপোর তোড়াটা, মিনে-করা পান-ডাবরটা মেলে।

সকলে বলে চম্পা বড় পয়সা চিনেছে। চম্পা ঘরে এসে হাসতে চায়। একদিন বলেছিলো না দুর্গা? যে রমজানী হবে চম্পা, বাজারে নাচ দেখাবে?

তাই হয়েছে চম্পা। এখন সে পুরোদস্তুর বাজারের মেয়ে। কানপুরে তাকে না জানে কে? সতীচৌরায় স্নান করে চম্পা। শিবচতুর্দশীতে ব্রাহ্মণকে পানফলের জিলিপী জলপানি দেয়। সে কারু চেয়ে কম যায় না।

দুর্গার কথা মনে করে হাসতে চায় চম্পা। কিন্তু ঘরে এলেই হাসিটা যেন কেমন করে নিবে যায় তার। জানালা দিয়ে চেয়ে গঙ্গা নয়, আর একটা নদী মনে পড়ে। আর একটা ঘর মনে পড়ে, একখানা মুখ মনে পড়ে। সেদিন আর ঘরে বাতি জ্বালে না চম্পা।

কানপুরের বাজার-মাতানো রমজানী চম্পার কেন যে সহসা ডেরাপুরে যাবার ইচ্ছে হলো!

গিয়েছিলো ক্যাপ্টেন ব্রাইটের বিবি ব্রিজদুলারীর কাছে। এই একটা জায়গাতেই বার বার যায় চম্পা। ব্রিজদুলারীকে ভালোবাসে বলে নয়। একটা কৌতূহল জন্মেছে তার মেয়েটার সম্পর্কে। আর সামান্য পরিচয়ের পর মনে একটা অবোধ্য করুণাও জেগেছে। ব্রিজদুলারী কি জানে, যে চম্পা তাকে মনে মনে করুণা করে? সম্ভবতঃ নয়। ব্রিজদুলারীকে কানপুরের সকলেই

চেনে, জানে। এই সাতান্ন সালে কানপুরে রেজিমেন্টে ভারতীয় সিপাহীরা আছে অনেক। আর ফৌজ ও ফৌজী-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বহু ভারতীয় রয়েছে। তারা ব্রিজদুলারীকে ঘেন্না করে। ঘেন্না করে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। কেন করে না, সে সব কথা চম্পা ভাসা-ভাসা শুনেছে। আর সব কথা উহ্য রেখে এই বলা চলে যে ব্রিজদুলারী যে-সাহেবের বিবি, সেই ব্রাইটকে কেউ দেখতে পারে না। নিজের আচরণে ব্রাইট সকলের ঘৃণ্য এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। রক্তে বেশ খানিকটা ভারতীয় ভেজাল আছে বাপের দিক থেকে। তার বাপ, ব্রাইট সিনিয়র হলো মাদ্রাজ পোর্ট থেকে চালাই হাত-ফেরতা গোরা। গোরা বললে ভুল বলা হবে। কোনো মাদ্রাজী কনকাম্মা এবং কোন প্রমোদপ্রিয় গোরার বিচ্যুতির ফলে সিনিয়র পৃথিবীতে আসে। বাপের কাছ থেকে কর্কশ লালচে চামড়া আর মায়ের কোঁকড়ানো কালো চুল নিয়ে। অরফানেজে বড় হয়ে রেজিমেন্টের ইংরেজ ক্লার্ক হয়ে জৌনপুর হল্ট-এ ম্যাকমোহনের বোনের সঙ্গে আলাপ। এমিলি মার্গারেট ম্যাকমোহনের সৌন্দর্য ছিল না। স্বভাবতঃ ভীরু হওয়াতে ব্রাইট সিনিয়র সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারলো তার ওপরে, ভারতে ফৌজী-ইংরেজদের বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে বিলেত থেকে যে সব মেয়েরা আসতো এমিলি তাদেরই একজন। তবে লক্ষ্ণৌ-এ লা মার্টিনিয়ার আর কলকাতায় ম্যাডাম জেনীর স্কুলে সেলাই ও বাইবেল-টিচার হয়ে বয়সটা কেমন করে ছাব্বিশ থেকে ছত্রিশ হয়ে গেল। বিয়ে আর হলো না। শাদা লেসের কলারে বুকটা ঢাকা আর খাড়া কুশ্রী কাঁধে 'He loveth best' লেখা ব্রুচ আঁটা। তবু এমিলির বুকেও যে পার্থিব সাধ-আহ্লাদের কামনা কিছু বেঁচে ছিলো, তার প্রমাণ হলো সহসা ভিক্টর আলবার্ট ব্রাইটের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে। ডিকেন্স এবং জর্জ ইলিয়ট পড়া ক্যান্টনমেন্ট-সমাজ বিস্ময়ে মূর্চ্ছা গেল স্মেলিং-সল্ট এবং নস্যিদান শুঁকে। ম্যাকমোহনকে প্রচুর সমালোচনা শুনতে হলো। অপমানে ম্যাকমোহনের খাড়া শিকারী গোঁফ ঝুলে গেল বটে, তবে তা একান্ত সাময়িক। পরক্ষণেই বোনের জন্যে চিন্তিত না হয়ে পারলেন না তিনি।

এমিলিরও বলবার ছিলো। সবটাই কিছু প্রেম নয়। আর জৌনপুরে সে ছিলো একলা। ব্রাইট ডুবে ছিলো ধার-দেনায়। এমিলি যে ভাইয়ের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা পাবেই, তা সে জানতো, এমিলির নীতিমূলক উপদেশ শুনতে ধৈর্য ছিলো না তার। এমিলির জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। ব্রাইট সিনিয়র তার সুযোগ নিলো নির্মম ভাবে। এমিলি পড়লো বিপদে। এক চূড়ান্ত অবস্থায় বিয়ে হলো তাদের। আট মাসের বিবাহিত জীবনে অনুশোচনা করতে করতে এবং ব্রাইটের স্বেচ্ছাচারী স্বভাবকে ঘৃণা করতে করতে ব্রাইট জুনিয়রকে পৃথিবীতে এনে মারা গেল এমিলি।

সিনিয়রের আর যাই হোক, বাচ্ছাকে মানুষ করবার ধৈর্য ছিলো না। কিছুদিন দুধ-ধাই আর তারপর লক্ষ্ণৌ-এ মিসেস ব্লুসের হোম। বাঁচবার কথা নয়। তবুও যে বাঁচলো ব্রাইট, সে শুধুই জীবনীশক্তির জোরে।

এখন অবশ্য অনেকেই কটূক্তি করে নেপথ্যে, বলে—ভগবান নয়, শয়তান ওকে বাঁচিয়েছে আমাদের জ্বালাবে বলে।

সিনিয়রের কপালে এমিলির ভাইয়ের টাকা জুটলো না। বেশী দিন সৎ-জীবনের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে পারলো না সে। রেজিমেন্টের ইউরোপীয় অফিসারদের রসদ সরবরাহের ভার নিয়ে কয়েক শো' টাকার গোলমালে পড়ে বরখাস্ত হলো সিনিয়র, উপযুক্ত কার্য্যকারণ না দেখিয়ে।

এমিলির ছেলে মিসেস ব্লুসের ওখানে টাকা বিনে কষ্টে থাকবে? সহ্য হলো না ম্যাকমোহনের। বোনের অনুতপ্ত হৃদয়ের চিঠিগুলো তাঁর কাছে জমা করা ছিলো। হাজার হলেও তাঁরই বোন! আর তাঁরই ভরসায় এসেছিলো ভারতে।

মিসেস ব্লুসের হোমে এবার টাকা আসতে লাগলো ম্যাকমোহনের কাছ থেকে। কিছুকাল পরে। বছর ছয়েক হবে—সিনিয়রের মৃত্যু-সংবাদ এলো বম্বের বন্দর থেকে। জনশ্রুতি শোনবার দিকে ঝোঁক ছিলো না ম্যাকমোহনের। তবু সংবাদ কানে এলো। জানতে দেরী হলো না যে, হঠাৎ বড়লোক হবার সব চেষ্টা বিফল হলে পরে সিনিয়র ঘুরে ফিরে পোর্ট-এর জুয়াড়ী-আড্ডা এবং অন্যান্য চোরাই মাল পাচার ও বেচা-কেনার কাজে ডুবেছিলো। ১৮২০ সাল। এ-দেশ ও-দেশের মনুষ্য-সমাজের আবর্জনা বোঝাই করে তুলে ভারত, চীন সিঙ্গাপুর—এই সব উপনিবেশের বন্দরে বন্দরে নামিয়ে দিয়ে যায় জাহাজগুলো। পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ,—ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ। স্বভাব-চরিত্র এবং জীবন-যাপনের রীতিনীতি কিন্তু একেবারে এক। জাহাজের উলকি-আঁকা খালাসী নাবিকদের সঙ্গে এদের দোস্তি। ভারতের কাঁচা মাল চলে যায়। বিলেত থেকে আসে সৌখিন সুগন্ধি, মদ, সিল্ক, কাচের জিনিষ। ভারতবর্ষে থাকতে হচ্ছে, সে ত' কাজের খাতিরে—এবং জাতীয়-কর্তব্য পালন করবার তাগিদে। তাই বলে এই যোগী, তান্ত্রিক, সতীদাহ, সাপ ও বাঘের দেশে এসে তো জীবন-যাপনের মান নামিয়ে ফেলা চলে না। আর স্বদেশে যার যেমন অবস্থাই হোক না কেন—এখানে এসে সকলেই বিশ-পঁচিশ জন চাকর-দাসী আর বিশাল বাংলো-বাড়ীতে পাক্কাসাহেব। দেশের হাজারটা জিনিষ তাদের প্রয়োজন।

তাই ভারতের বন্দরে বন্দরে—বম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতায় মাল-বোঝাই জাহাজ আসছে আর নামিয়ে দিচ্ছে মাল।

কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে কালো গা ভারতীয়-কুলী সেই মাল নামাচ্ছে গাঁঠরি-গাঁঠরি। চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে যে গোরা কুলী-কন্ট্রাক্টর তার জানা-জানতিতেই ছুটো-একটা গাঁঠরি চলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক! কিছু মাল চলে যাচ্ছে আর হাত-বদল হয়ে যাচ্ছে টাকা! সকলেই যে সেই চোরাই-মাল নিয়ে ধৈর্য ধরে ব্যবসা করছে, তা নয়। ব্রাইট-সিনিয়রের মতো যারা ফূর্তির পক্ষপাতী মানুষ—তারা হাতে টাকা নিয়ে সোজাসুজি চলে যায় কাঠের দোতলা ঘরে—সেখানে কেরোসিনের ডিবরি ঝোলে ছাদ থেকে, আর গলায় কালো সুতোয় ক্রশ-বাঁধা, হাতে নীল উল্‌কি আঁকা নানা জাতির মানুষ একই মাতোয়ালা ফূর্তির ভাষায় কথা কয়।

সে সব মানুষ শেষ অবধি একই পথ ধরে! কেউ শেষ হয়ে যায় পিঠে চাকু খেয়ে—দেহটা তার জেলে-ডিঙি করে নিয়ে দূর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। অথবা দাতব্য মিশনারী হোমে—রোগে ভুগে শেষ হয়ে যায় মানুষ।

ব্রাইট সিনিয়রের শেষ পরিণতিটার আসল কথা জানেননি ম্যাকমোহন। নোংরা অসুখ, না পিঠে-পেটে ছুরি, না আরো বিশ্রী কিছু! তবে কল্পনা করে নেওয়া চলে—গলায় কালো সুতো, বলিষ্ঠ লাল চেহারা, নোংরা এবং বদমাইস কোন পুরোন খালাসীকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিশ্চয় বলতো—He has gone the old old way ?

সিনিয়রের মৃত্যুতে নিশ্চিন্ত হয়ে ম্যাকমোহন জুনিয়রের দিকে তাকাতে সময় পেলেন। বোনের প্রতি অকরুণ হয়ে যে দিনগুলো গিয়েছে, সেগুলোর জন্যে তিনি ক্ষতিপূরণ করবেন। এমিলির ছেলেকে মানুষ করে তুলবেন। হাজার হলেও মাত্র আট বছর বয়স সে বালকের। বাপের ছেলে তো বটেই! কিন্তু সে কলঙ্ক-ই কি সব? তাঁর বোনেরও ছেলে তো? মায়ের জঠরে সে শিশু বড় হয়েছে! মায়ের সদগুণাবলীর কিছুই কি পায়নি? আর তাকে যদি ভিন্ন পথে, ভিন্ন শিক্ষায় মানুষ করা যায়, নিশ্চয় সফল হবেন তিনি। পর-জন্মে তাঁকে বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু এমিলি যেন তাঁকে ক্ষমা করেনি। স্বর্গেই কি যাবেন তিনি? না গেলে শান্তি পাবেন?

ব্রাইট জুনিয়র কিন্তু বাপের ওপরে-ও টেক্কা দিতে পারে। বস্তুতঃ এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ব্রাইট সিনিয়র যাদের মধ্যে পরে ভিড়েছিলো, যারা তাকে মুগ্ধ করেছিলো—সেই সব খালাসী ও বরখাস্ত জাহাজী-গোরাদের চরিত্রের সবটুকু নিষ্ঠুরতা, এবং পশুশক্তি সমবেত হয়েছিলো জুনিয়রের চরিত্রে। ম্যাকমোহনের নিরাশ হতে বেশী দিন লাগেনি।

ইতি—ব্রাইট-কথা। বর্ত্তমানে ক্যাপ্টেন ব্রাইটের অবস্থিতি কানপুরে। আর তার নিত্যসঙ্গিনী এক সুন্দরী উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থানী মেয়ে ব্রিজদুলারী। ব্রাইটের জীবনে ব্রাইট অনেক মেয়ে নাড়া-চাড়া করেছে। এই মেয়েটা টিঁকে গিয়েছে কেমন করে যেন শেষ অবধি।

ব্রিজদুলারীর চোখের নীচে কালি। পাণ্ডুর ফর্সা রঙ। সুন্দরী, কিন্তু নিরুত্তাপ ও মলিন। সর্বাঙ্গে গহনা। ব্রাইটের কোন কুৎসিত রুচি সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত হয়। তার বিবিকে সে সালঙ্কৃতা রাখতে এবং দেখাতে ভালবাসে।

ব্রাইটের সম্পর্কে যত অবিশ্বাস ও ঘৃণা আছে কানপুরের ভারতীয় ফৌজ ও ফৌজী-জীবনের মনে—সবটুকু ব্রিজদুলারীর ওপর এসে পড়েছে।

ব্রাইটকে ঘৃণা বা উপেক্ষা দেখাতে তারা ভয় পায়। কিন্তু ব্রিজদুলারীকে সুযোগ পেলেই উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য দেখিয়ে আঘাত করে।

ব্রাইটের কাছে কোন সুযোগ-সুবিধার দরকার হলে তারা আসে ব্রিজদুলারীর কাছে। ব্রিজদুলারী যথাসাধ্য চেষ্টা করে। মানুষগুলো পরিবর্তে তাকে কৃতজ্ঞতা জানায় শুধু মুখে। কিন্তু এতটুকু অন্তরঙ্গ হতে দেয় না তাকে।

তার সম্পর্কে চম্পার কৌতূহল হোলো। ব্রিজদুলারীও তাকে জানতে উৎসুক ছিলো। দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎকার এবং পরিচয় হয়েছিলো বেশ মনে রাখবার মতো এক পরিস্থিতিতে।

দু'টি মেয়ের মধ্যে যেমন হওয়া স্বাভাবিক, তেমনই ভাবে। সঙ্ঘর্ষের ভেতর দিয়ে। [ক্রমশঃ।

তোমার বৃদ্ধকালে

[When you are old কবিতার ভাবানুবাদ]
(W. B. Yeats লিখিত)

চঞ্চল যৌবনের শেষে প্রৌঢ়ত্ব এসেছে,
তোমার দেহের সীমানায়।
যৌবনের মসৃণ দেহরেখায় পড়েছে ভাঁজ
অকালে আঁখি ঘোর তন্দ্রায়।
সোনালী রেশমী চুল হয়েছে পট্টশুভ্র,
এমনি সময় একদিন আগুনের ধারে,
তুমি আমার বই পড়বে, তোমার মন
ছুটে যাবে বিগত যৌবনের দ্বারে।

তোমার এই মুখশ্রীকে কত জন
ভালবাসতো, দেহের সুষমায়
কত জন ছিল মুগ্ধ। প্রভাতে বিহঙ্গকাকলীতে
যেমন স্ফুর্ত্তিত হয় মন,
তোমার কথার ঝরণাধারায় কত জন
জেগেছিল পড়ে মনে সারাক্ষণ।
একজন শুধু একজন ভালবাসতো তোমায়,
তোমার মুখশ্রীকে নয়, আত্মাকে,
হৃদয় দিয়ে সে তোমায় ভালবাসতো।
যৌবনের মুখরবি আর এই বৃদ্ধকালের ছবি
সত্তা দিয়েই সে ভালবাসতো।

আজ শীতের সন্ধ্যায় আগুনের ধারে বসে
তাঁকে তোমার মনে পড়বে।
তার প্রেমময় মুখ, তার হৃদয়ের প্রেম,
তোমার মনে আজ, ঝরা ফুল হয়ে ঝরবে।
কিন্তু তবু তার প্রেম সে আজি অতি দুর্লভ।
সে যেন উঠেছে পর্ব্বত-চূড়ায়।
অস্তরবির মত সে মিলিয়ে যাচ্ছে,
তোমার যৌবন প্রেম তখনই ফুরায়।

অনুবাদক—শ্রীকল্যাণ সরকার

গুহ্যসূত্র

আজ ৩১শে ডিসেম্বর। বছরের শেষ দিন। রাত্তে বিছানায় শুয়ে বছরের হিসাব নিকাশ চলছে। অদৃষ্টের তাড়নার কথাই ভাবছি। বিছানা মানে, জাহাজের ভিতরকার দোলনা। উপর নীচে ছুটো। মোটা পাইপ দিয়ে সমুদ্রের তাজা হাওয়া আসছে। পাম্প করে পাঠানো হয়। পাশে অনেক ফোকর। ও দিয়েও ফুর-ফুর করে তাজা হাওয়া ঢুকছে। ওর ভিতরে সমুদ্রের দৃশ্য চোখে পড়ছে। ঝড়-তুফানের সময় ওগুলো বন্ধ করে দিতে হয়।

মনে পড়েছে পুরোন দিনের কথা। এ সেই বোম্বাই সহর। এখানে চাকুরী করেছি বহু দিন। সেই চাকুরী ছেড়ে আর্মিতে। আবারও সেই বোম্বাই। এখানকার এক খবরের কাগজ। মালিক ছিলেন একদা এক কাগজেরই হকার। রাত কেটেছে কোনো সময় কারও বাড়ীর বারান্দায়, দিনের অবিক্রী কাগজের পাতাগুলো পেতে। অতি দরিদ্র। অদ্ভুত চরিত্র! আরও অদ্ভুত তাঁর কপালের যোগাযোগ। ক্রমে ঢুকেছেন এক বইয়ের কারখানায় কম্পোজিটার হয়ে। মাইনে খুব কম। হৃদয়ে প্রেমের জোয়ার ঢেউ খেলে যায়। ওটা যথাসময়ে আসবেই। বাধা পায় না দারিদ্র্যে। বরং দুঃখের সময় বান ডেকে আসে। প্রেম জোরালো হয়। বুদ্ধিও ঘোরালো হয়। কথায় বলে—পিঁপড়ের বল, আর প্রেমিকের বুদ্ধি। দুটোই খুব বেশী। প্রেমে না পড়ে বুদ্ধি খোলতাই কম হয়। এত করেও কিন্তু বিয়ে হয়নি। প্রেম গভীর হলে তখন না কি তা ফস্কায়। "বাল্য প্রেমে অভিশপ্ত"—বলেছেনও এক মহিলা-বন্ধু। বুদ্ধির জাহাজ। নিজের হৃদয় চিরে তা দান করেছেন এক বন্ধুকে। নিজে রয়েছেন চিরকুমার। দূরের বন্ধু নিকট হলেন। বন্ধু পেলেন বান্ধবী। বন্ধু বান্ধবী সবাই এক বাড়ীতে, খুব অন্তরঙ্গ ভাবে কাছাকাছি। বান্ধবী হলেন নিকটতমা। ধন্য প্রেম! ধন্য প্রেমের বিচিত্র গতি!

"হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবে ক্ষুদ্র জলাশয়ও সমুদ্র হয়"—কে যেন বলেছেন। উনিও প্রেমের জাহাজে চড়ে বুদ্ধির সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছেন, চা খাইয়েছেন, দল গড়েছেন। নেতাদের 'দাদা' ধপে অজ্ঞান হতে হয়। তাও হয়েছেন। তারপরই ছাপাখানার মালিক, কাগজের মালিক, এবং কাগজকলেরও মালিক। মস্তিষ্কে গোবরের ন্যায় পদার্থ কম থাকলে ও থেকে অনেক কিছুরই মালিক হতে পারা যায়। সুতরাং অনেক কলকারখানা, আফিস আদালত, গাড়ী বাড়ীরও মালিক হয়েছেন ক্রমে। আমার এবং আমার মত অনেক হতভাগারাও মালিক হয়েছেন। ভদ্রলোক টাকার কুমীর এবং আজও কুমার। ছকে আঁটা টাকার ফাঁদ। ধনভাণ্ডার, অর্থভাণ্ডার, সাহায্যভাণ্ডার, দরিদ্রভাণ্ডার, দানভাণ্ডার ইত্যাদির ভাণ্ডার খুলেছেন হাজারে হাজার। দাতাকর্ণ আর কি! শেষে সমস্ত ভাণ্ডার গিয়ে এক ভাণ্ডারে জমত। সর্বদা চিনি চিনি হাসি। আর সব চাইতে মজার, তাঁর মনভুলানো মিষ্টি কথার তুবড়ী। দিনে-রাতে সে খৈ ফোটার বিরাম নেই। হাতে স্বর্গ পাইয়ে ছাড়েন আর কি। কিন্তু কাজের শেষেই হাত-পা ঝেড়ে খালাস। তখন স্মরণশক্তি কমে যায়। চিনতে পারেন কম। Bluff এর যাদুকর। কথা ও কাজে যার দুরন্ত ব্যবধান। সেই ঝানু পলিটিসিয়ান্! ওঁদের কথায় চোখ বুজে সায় দেওয়া যায়। দিতে হয়। কিন্তু মনে মনে বাদ দিতে হয় পারসেন্টেজ—আপনাদের খুশী মত।

না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বেতাল

কথার দাম যায়। তার চাকুরীর ভরসা কি? সুতরাং ও মায়া ছাড়তে হোল।

ননষ্টপ্ রিডিং

পূবে যুদ্ধের সবে সুরু। জাপানীরা যুদ্ধে নেমেছে। চালের বাজারে হঠাৎ আগুন। তিন টাকা থেকে এক লাফে সাত টাকায়। একেবারে ডবলেরও বেশী। চালের বাজারে চালের যুদ্ধ। কোথায় পৌঁছবে কেউ জানে না। মহাত্মা বলেছেন—নিউট্রাল। আমরা লোক দেব না। চার্চিলের সেই হুঙ্কার—"I know how to recruit." "তরবারি দিয়ে আমরা ভারত জয় করেছি, তরবারি দিয়েই আমরা তা দখলে রাখবো।" বাঙলায় Famine হলো। কবি যে তার আগেই গাইলেন—সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং—সেই সোনার বাঙলায় দুর্ভিক্ষ। কারণ, বাঙলায় যোয়ান হাত ছাড়া করা যায় না। বর্মার শিক্ষা। জাপান পুরো বর্মা জয় করেছে মাত্র সাত দিনে। বাঙলায় দুই নেতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ফেলে আসা ভারতীয় সৈন্য দিয়ে লিবারেশন আর্মি তয়ের হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার জন্য। সে খবর বৃটিশ জানে। সুভাষের নামে বাঙলার যোয়ান পাগল হয়ে যায়। সে-ও বৃটিশ জানে। পাগল তাই ওরাও হয়েছে। সুতরাং ধান চাল সব হাতের মুঠোয় পুরতে চায়। At any cost. তিন টাকা চালের মণ! একশ টাকা হলেও ক্ষতি নেই। সে টাকা দেবে গবর্ণমেণ্ট। উপরন্তু খরচা আরও লাভ। জুটে গেলেন কনট্রাকটার। সরকারকে সাহায্য করতে। চাল যোগাবার কনট্রাকট। সুরু হলো কর্ডন। চাল গিয়ে পৌঁছল আশীতে, আর শয়ে। বিজ্ঞাপনের চটক। যুবকদের ধরা হোল সেই ফাঁদ পেতে। ধরে ধরে পাঠান হোল পাহাড়ঘেরা ভারতের নিরাপদ পশ্চিম সীমা। কাটনী জব্বলপুর আর পিণ্ডি। বিজ্ঞাপনের মোহ, আর পোড়া পেটের টান। যুবতীরাও বন্দী হোল ওয়াকাইতে। ওরা অফিসারদের চোখের রঞ্জনী সুরমা। বার্ধক্যে রিজুভেনেশান। কাজে আনে উৎসাহ, আলস্যে দেয় উদ্দীপনা। সামনে যতক্ষণ অন্তহীন উৎসাহ Fatigueও কম। মনও বলে কানে। বাঙলা আর আসামে টাকা ছড়ানো হলো প্রতি ইঞ্চি মাটিতে বর্মা জয়ের পুনরাবৃত্তি ভারতে ঠাণ্ডা করতেই হবে। বাঙলা ও আসামে যুবকরা ঘুরে দাঁড়াতে পারে সুভাষের নামে, যদি ওরা জানে, সুভাষ আছে ফ্রণ্টে। ওদের "দিল্লী চলো" ধ্বনি রুখতেই হবে বিহারে। বাঙলা আসাম এত করেও যদি যায়। যাক।

চাল ধরার কনট্রাক্টে যাঁরা এগিয়েছেন সাহায্য করতে, তাঁরা সবাই উপর তলার প্যাসেঞ্জার। বসেছেন আরও উপরে ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে। নীচের তলায় হাহাকারের মরশুম। আরও নীচে পথের উপর। শিশু বৃদ্ধ নারী পুরুষের মিছিল। যত সব হতভাগার দল। গান ধরেছে—মা, ফ্যান দাও। একটু ফ্যান দাও মা, করে। এ যুদ্ধের বাজার। টাকা আয়ের সময়। সে কি ঐ গানের সময়?

টাকা চাই। আরও টাকা চাই। এখন শুধু টাকার গান চলবে। সুতরাং সে ভাতের ফ্যানের গান কারো কানে ঢুকলো না। ছড়িয়ে গেল অনন্ত শূন্যে। এবং আজও তা ঘুরে বেড়ায় হাওয়ায়।

হতভাগারা ফ্যান পায়নি আজও। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নাকি বাঙলাদেশ। সে তৈরী হলো শ্মশান। নৃত্য চললো প্রেতের। নর্দ্দাপ, ব্রিজিং।

এপ্রিল ফুল!

একদা এপ্রিল মাসে। এক ক্রিপস্ এসেছিলেন ভারতে। কী উদ্দেশ্য নিয়ে?

এক বাঙালী মস্তিষ্কের চিন্তাধারার প্লাবনে। সমস্ত শ্বেতহস্তী ভেসে চলেছে এশিয়া হতে। ওরা তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।

পুরোনো ইতিহাস। ডিসেম্বরে পার্ল হারবার ধ্বংস হোল জাপানের হাতে। শরৎ বসু চার দিন বাদে বন্দী। জানুয়ারী সুভাষের অন্তর্ধান, বৃটিশের কড়া পাহারায় কলা দেখিয়ে। পেশোয়ার কাবুলের পথে তিনি বার্লিনে। ফেব্রুয়ারী মার্চে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের পতন। অতি দ্রুত জাপানীরা এসে পৌঁছেছে ভারতের দ্বারপ্রান্তে। এসে হাঁক দিয়েছে।

প্যারীর পতনের পর। ইউরোপেও বৃটেনের চরমতম দুঃসময়। লণ্ডন বোমায় উড়েছে। রাজধানী শিফ্‌ট হয়েছে, তবু অফিসিয়াল স্বীকৃতি নেই। প্যারীর বেলায় ফরাসীরা স্বীকার করে ঠকেছে। সুতরাং বৃটিশ ঠকতে পারে না। (বৃটিশ রাজধানী সরিয়ে দিল কলকাতা থেকে দিল্লী। তারও স্বীকৃতি দিয়েছিল, পরে।) এদিকে জাপান, ওদিকে জার্মাণ। দুদিক থেকে সাঁড়াশী দিয়ে কোণঠাসা। ভারতের অসন্তোষ। ক্রিপসের ভারতে না এসে উপায় ছিল? যে ক্রিপস রুশকে লাগিয়েছে কাজে—জার্মাণীর বিপক্ষে।

চরমতম দুঃসময় বৃটেনের। চার্চিলের চুরুটের ধোঁয়া গোল্লা পাকায় শূন্যে। বাঙলা কি করে ঠাণ্ডা হয়, সেই চিন্তায়। গোল্লায় যাক্ বাঙলা! সুজলা সুফলা সোনার বাঙলার সেই গোল্লা টেনে আনলো দুর্ভিক্ষ। চার্চিলের মনোনীত পাঁচজন কনট্রাক্টর। ধান-চাল ধরে ধরে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কাজে মেতেছেন ওঁরা।

অতি দ্রুত ঘটে চলেছে ঘটনার সংঘাত। আবর্ত উঠেছে গভীর, গম্ভীর হয়ে।

এ-হেন পট ভূমিকায় ক্রিপস এলেন ভারতে। হাতে করে স্বাধীনতার সুবর্ণ সুযোগ! নেতাদের মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার মোয়া খাওয়ার কথা। স্বাধীনতার প্রস্তাব। কথায় বলে—'সেধো, সেধো, ভাত খাবি?' 'না, পাতা পেড়ে বসে আছি।' পাতা নিয়ে বসে রয়েছেন দলগুলো সব। ভাতের ধামা কাঁধে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছেন যিনি, তিনি ক্রিপস। কারো পাতে পড়েনি কিছু। 'ভাত খেতে পাবে সবাই। তার আগে কথা দাও। তোমরা কি জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চাও?' সবাই সমস্বরে কানে তালা লাগিয়ে, চোখে ঠুলি পরে—'না, না, না, না'।

'তবে ঐ যে সুভাষ আসছে জাপানী সেনা নিয়ে?'

(ওরা মনে করেছে নেতাজীও জাপানে। বার্লিন থেকে অদৃশ্য পথে আকাশের বুক চিরে পৌঁছেছে। ওখানে যে রাসবিহারীর চিন্তাধারা কাজ করেছে বহু দিন ধরে, বৃটিশ তা স্বপ্নেও ভাবেনি।)

কেউ বললো—ও ফিফথ কলামনিষ্ট। কেউ বললো—আমার হাতে রিভলভার দাও। আমি ওকে নিজ হাতে গুলী করবো। কেউ চাপালো উল্টো গাধার পিঠে। কেউ করলো নেতাজীর বহ্ন্যুৎসব। ভাতের ধামা ধামা-চাপা রইল। মহাসভায় পাতা ঝড়ে উড়লো। খিল্ খিল্ খিল চাপা হাসি হেসে ভোজের সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন যিনি, তিনি ক্রিপস।

শরৎ বসু আর যাঁরা তাজা খুন সরবরাহ করেছেন বুক চিরে স্বাধীনতার যুদ্ধে, তাঁরা সবাই জেলে পচছেন। ভাতের লোভে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁরা সবাই নেতা। পাওয়ার পাওয়ার লোভে। জেলের ভেতর বন্দী মানুষ। জেলের বাইরে প্ল্যান করে ডেকে আনা দুর্ভিক্ষ। আর এই পটভূমিতে ওঁরা চালিয়ে চলেছেন যা, তার নাম—আলোচনা। আ-লোচনা। আর অদ্ভুত! কেউ বলেন নি, রাজবন্দীরা বন্দী থাকতে আলোচনা চলতে পারে না কেনো। উচিতও নয়। আরও অদ্ভুত, ক্রিপস আজাদে ফিসির ফিসির, কানাকানী আলাপ—সুভাষের মৃত্যুতে মহাত্মার শোক প্রকাশ উচিত হয়নি।

'সুভাষের মৃত্যু হয়েছে বার্লিনে'—খবর রটায় রয়টার। আর মহাত্মার শোক প্রকাশ শরৎ বাবুর কাছে, সেই সংবাদ শুনে। ওরা লোক চেনে। তাই বেছে বেছে আমাদের কানে কানেই কথাটা বলেছে। কোন্ কথা কোথায় বলতে হয়। নার্ভ চেনে তার ভাল করে। সুভাষের মৃত্যুতে আমাদের শোক প্রকাশ করতে নেই। সে আজও আমরা তার অর্থ ভাবি না। ট্রেটর। সুভাষের মাথায় বৃটিশ তাড়ানোর প্ল্যান। আর আমরা তাড়িয়ে চলেছি তাঁকে। প্ল্যান করে। তাঁর প্ল্যান বানচাল। দুই বাঙালী ব্রেনের বিরুদ্ধে গলা চিরে চিরে গলা ফাটিয়েছি, তাই আমরা না নেতা নামে অভিষিক্ত হতে পেরেছি। ওঁকে চাপিয়েছি উল্টো গাধার পিঠে। প্রদক্ষিণ করাও সহর। দাহন কর সদর রাস্তার গাধার টুপি মাথায় দিয়ে। সর্বস্বত্যাগী সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সন্ন্যাসীর সম্মান কি আমরা দিইনি? ভূয়ো স্বাধীনতা প্রস্তাব। তার পেছনে করে আনা ন্যাশনাল আর্মির কবরখানা!

চার্চিল হেসে নিয়েছেন প্রাণপণে। মিশন শেষে ক্রিপস ফিরেছেন দেশে ব্যর্থতা নিয়ে? ইতিহাস বলে,—তাই।

কিন্তু ওঁর জমাট নাটিকা! জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা তার যবনিকায় ছিল—

"APRIL FOOL!"

কে?

ক্রিপ্‌স্? চার্চিল?

না, নেতারা?

নার্ভবিহীন নেতৃত্ব। চার্চিলের প্রেতাত্মা হাসছে—

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

থমকে গেছে যে দ্রুতগতি ইতিহাসের চাকা। ভারতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। মার্চে পৌঁছেই হল্ট। ক্রিপসের ভারতে না এসে উপায় ছিল? নেতারা বন্দী হলেন আগষ্ট। হিড়িকের মাঝে ধাক্কায় ধাক্কায় অনেক দরজায় গড়াতে গড়াতে ঠেকেছি এসে আর্মিতে।

ক্রিপ্‌স্ গিয়েছেন বিফলতা নিয়ে! তারই নাম এপ্রিল ফুল।

বর্ষ-বিদায়

কখন নিদ্রাদেবীর আকর্ষণ ঘটেছিল। ঘুমের মাঝে চার্চিলের প্রেতাত্মা। দুঃস্বপ্ন। অথচ চার্চিল আজও বহাল তবিয়তে বেঁচে।

হঠাৎ বিকট সুরের আর্তনাদ। দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটেনি? হাজার হাজার সাইরেন আর জাহাজের বাঁশী। বেজে উঠলো একসাথে। সমুদ্র ও সহর থেকে। জাপানীরা এসেছে বোমা ফেলতে। হঠাৎ মাঝরাতে অতগুলো বিকট আর্তস্বর হতচকিত করে দিয়েছে সবাইকে। কর্কশ সেই আর্তনাদ আজও আমার মর্মে মর্মে বাঁধা। উঠে বসেছি। শত শত সাইরেন আর বাঁশীর রেশ। ছুটে আসছে জাহাজ ষ্টীমার আর সহর থেকে তীক্ষ্ণ হয়ে। সে তরঙ্গে ডুবে গেছে সমস্ত পৃথিবী, বেরিয়ে এসেছি, জাপানী প্লেন থেকে বম্ব পড়ার আগেই।

আকাশের দিকে চেয়ে আছি। প্লেনের আওয়াজ শোনার আশায়। মাথার উপর সীমাহীন অনন্ত আকাশ। নীল, নক্ষত্র-খচিত। কিন্তু স্তব্ধ। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। প্লেন কোথায়? মাথার উপর মাঝ-আকাশে একখানা চাঁদ হেসে চলেছেন লুটোপুটি খেয়ে। আমাদের অবস্থা দেখে। তার রজতধারায় সমস্ত পৃথিবীর স্নানপর্ব চলেছে। খণ্ড খণ্ড রৌপ্য গলে গলে ঝরে ঝরে পড়েছে চাঁদ থেকে। সমস্ত সমুদ্রে। বর্ণনাতীত সে বোম্বাই সহরেও। সে-ও বাদ পড়েনি সে সুধাবৃষ্টি হতে।

বাঁশীর রেশ তখনো থামেনি। ট্রেন চলেছে সমানে। সমুদ্রে শীত কম। তবু সে নিঝুম। একমাত্র আওয়াজ ঐ সাইরেন আর বাঁশীর। একটানা আর বিকট সুরে। আকাশে চাঁদের চাঁদি নিয়ে খেলা। কিন্তু বাতাসের ঐ আমন্ত্রণ? ঘড়িতে রাত বারটা। জানা গেল, এ বর্ষ-বিদায়ের ধ্বনি।

পুরাতন, জীর্ণ ক্লান্ত, অশেষ দুঃখকর, অশুভ অভিশপ্ত দীর্ঘ বৎসরের বিদায়। আর নব বৎসরের সাদর আবাহনী। ওঃ! তাই এত সাইরেন আর বংশীধ্বনি। নমস্তে! বিদায়!

জাপানী টর্পেডো

সকালে সূর্য ওঠার আগেই জাহাজ চলতে সুরু করেছে। ধিকি ধিকি এঞ্জিন চলার শব্দ আসছে। জাহাজ চলেছে, কিন্তু খুব আস্তে; কারণ জলে শব্দ হবে না। শব্দ করার উপায় নাই। বর্মা জাপানের দখলে। আর ভারত মহাসাগরে জাপানী সাবমেরিনের অপ্রতিহত রাজত্ব। ওরা অনেক জাহাজ ডুবিয়েছে। বর্মা জয়ের পর। এখন অনেক জাহাজ এক সাথে ছাড়ে কনভয়ে। ডেষ্ট্রয়ার থাকে। ভারতের উপকূল বরাবর দক্ষিণে চলেছি। ক্রমে জাহাজ পূবে ঘুরেছে। কোন দিকে চলেছি? মনে হয়, এবারও সেই বর্মার জঙ্গল। সূর্য জাহাজের মাথায় ওঠেন, আর লেজের দিকে অস্ত যান। ক্রমে ভারতের উপকূলও অস্ত গেছেন, দুই-একদিন আগে। এদিক, ওদিক, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে যেদিকে তাকাও সমানে জল। শুধু জল আর জল

কূলকিনারা গাছ-পালা বা খড়-কুটা কচুরী পানা, কোথাও নজরে আসে না। কোনো চিহ্ন নেই। সব লেপে পুঁছে একাকার। এক কথায় অকূল পাথার। ভাসছি আমরা, আমাদের জাহাজখানা খোলামখুচি।

চার দিনের দিন। জাহাজের গতি আরও মন্থর। শব্দ আরও গম্ভীর। চারি দিক নিস্তব্ধ। চার পাশের জাহাজগুলো বহু দূরে দূরে, ওরাও তেমনি নিঃশব্দে চলেছে। দূর থেকে দেখা যায় মাত্র। কোনো কাজ নেই, নিশ্চিন্ত আরাম। খাও দাও ঘুমাও। তাস পেট, বই পড়ো আর গল্প করো। যা খুশী। কাল রাতে হাওয়া ছিল। জাহাজ দুলেছে। আছাড় খেয়েছে খুব। কি বিশ্রী আওয়াজ! কে যেন ধোপার পাটে আছড়েছে মনে হয়। সারারাত ঐ আওয়াজ শুনে কেটেছে। ঘুম হয়নি। ওরকম আছাড় খেলে ঘুম হয়ও না। সমুদ্রে মাঝে মাঝে হাওয়া হয় ঐ রকম। ঝড়-বর্ষা হলে ত' কথাই নেই। জাহাজ খুব দোলে। বমি হয়। তাই জাহাজের ঠিক মাঝখান বরাবর এক গোপন জায়গা খুঁজে পেয়েছি। ওখানে দোলা কম হয়। সী সিকনেস নেই। নতুবা এ-ওর ঘাড়ে হড়-হড় করে অন্নপ্রাশনের পদার্থ তুলছে। কিছু বলবারও নেই। কারণ, সকলকার ঐ এক অবস্থা।

সেদিন কি বার ছিল? মনে নেই। সকালে কার মুখ দেখে উঠেছি। তাও মনে পড়ে না। দুপুরের আহার সেরে সবে দোলনায় চেপেছি। মাথার কাছে ফোকর। খুলে দিতে এক ঝলক সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া। প্রাণ জুড়ায়। মাথাটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে, ওর ভিতর দিয়ে সমুদ্র দেখ। কি চমৎকার দৃশ্য! যেন একখানা ছবি। সমুদ্র আর আকাশে মেশামেশি। দুই অনন্ত এক সাথে। ঐ এক ঝাঁক উড়ন্ত মাছ। তা দুই তিন মাইল জায়গা জুড়ে ওরা ভেসে চলেছে। ওরা কি জানি কেন, উড়ে উড়ে জাহাজও পার হতে চাইছে। মনের আনন্দে ওরা জলের উপর দিয়ে বহু দূর উড়ছে। আবার জলে গিয়ে পড়ছে। জাহাজে ঠোক্কর খাচ্ছে অবিরত। ভ্রূক্ষেপ নেই। সাদা সাদা রূপোর মত গা। চকচক করছে। দেহ-সমান লম্বা গলা। ডেকের উপর পড়ছে। আর ছটফট করছে। খালাসীদের মজা স্ফূর্তি। ওরা সেগুলো ধরে থলেয় পুরছে। পরে রান্না করে খাওয়া হবে।

দেখতে দেখতে ঘুমও এসেছে। বিরাট একটা কাঁপুনী দিয়ে আমাদের জাহাজ থেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। বজ্রের আর্তনাদ কি এর চাইতেও কঠোর? সেই আওয়াজে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসেছি দোলনায়। এঞ্জিনের আওয়াজ থেমেছে। বদলে বেজে উঠেছে এলার্ম। সবগুলো এলার্ম একসঙ্গে বাজছে। এ হচ্ছে চরম পরিণতির এলার্ম। প্রস্তুত হও। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে—জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা, বন্দুক-পিস্তল। বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত ছেড়ে। চরম ডাকের প্রস্তুতির জন্যে এলার্ম। এখন নেওয়া চলবে শুধু মাত্র লাইফ্ জ্যাকেট। আর কিছুর মায়া করা চলবে না। তিলার্ধ সময় নেই। জাপানী টর্পেডো বসান দিয়েছে জাহাজের ঠিক মাঝখানটিতে।

আমাদের জাহাজখানা ছিল খুব বড় আর ভারী। টনের কথায় বলা ঠিক হবে না। নীচে থেকে উপর পর্যন্ত পাঁচতলা সমান উঁচু। সবের নীচে ওর নিজের কল-কব্জা। তার উপর রেশান, স্টোর, কর্মচারীদের বাসগা। তিনের তলায় গোলন্দাজ। আর চারের তলায় আমরা। এর মাঝখানে সাজান গোছান বিরাট ডাইনিং। পাঁচের তলায় কমাণ্ডারদের কেবিন। আর একেবারে উপরে নীরস গদ্যের ব্যাপার। বড় বড় কামান আঠাশ পাউণ্ডার। এ্যাক এ্যাক্ মানে এ্যান্টি এয়ার ক্রাফট্। রেডিও র‍্যাডার প্রভৃতির এ্যাসটেনা। আর আছে জাহাজের নাক। যা দিয়ে ভিতরে হাওয়া পাঠানো হয় পাম্প করে। দেখতে ঠিক যেন কান। অব্যর্থ ওদের লক্ষ্য। ভেঙ্গে সমান দুই টুকরো হয়েছে। জলে ক্রমাগত ডুবছে। রবার-নলে হাওয়া ভরে নিয়ে আমিও উপরে উঠছি সবার মতো।

উপরে উঠবার সিঁড়িতে পা দিয়েছি। অদ্ভুতপূর্ব সে দৃশ্য! করুণ, আর বীভৎস। আমাদের ক্যাপ্টেন বোর। ছুটো ঠ্যাং সিঁড়ির ধাপের উপরে দিয়ে মাথাটা ডেকের পাটাতনে, নীচের দিক দিয়ে শুয়ে আছেন। ওঁর মাথায় splinter লেগেছে। সেই অবস্থায় উপরে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়েছেন মনে হয়। আর মাথার খুলিটা দু ফাঁক হয়ে ঘিলুটার ছড়াছড়ি। কাপড়-চোপড়ে প্রচুর রক্ত। উরুতে না কোথায় আরও splinter লেগেছে। মস্তিষ্কের পদার্থ ছড়াছড়ি হয়েও যে লোকে বাকরোধ হয় না, তা দেখলাম এই প্রথম। ওই অবস্থাতেও তাঁর পিপাসা। "পানি দেও" "ওয়াটার ওয়াটার" বলে চীৎকার। কে কাঁকে পানি দেয়? চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা। সবাই নিজের নিজের প্রাণ পদার্থ হাতে নিয়ে পলায়নে তৎপর। কিন্তু যাবে কোথায়?

হুড়মুড় করে সবাই উপরে ধাওয়া করেছে। লক্ষ্য সেই লাইফবোট। চোদ্দখানা লাইফবোট ছিল এই জাহাজে। সাধারণতঃ পাঁচ ছয় খানার বেশী থাকে না। এই জাহাজে সব চেয়ে বেশী দেখছি। বড় বড় কমাণ্ডার চীফদের জাহাজ বলে সম্ভবত এই ব্যবস্থা। অতি বিষম এক মুহূর্ত। সব চেয়ে মূল্যবান এই মুহূর্তটুকু। একজনের অন্তিম শয়ান। তার শেষ প্রার্থনা এক ফোঁটা জল। তার জন্য কত কাকুতি। কিন্তু কে দেয়? সময় কোথায়? আপনার জীবনের চাইতেও কি ও মূল্যবান? এক লাফে এর পর উপরে উঠেছি। কিন্তু লাইফবোট কোথায়! একখানাও নেই। নামিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে সব কখানাই। শেষখানাও ছাড়ছে লোক-বোঝাই। অনেক হাল্কা কাঠ ছিল। লাইফবেল্ট ছিল। কিন্তু নেই। সব জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের প্রাণ বাঁচানর চেষ্টায় অস্থির। কে কাঁকে দেখে? কত সময় লেগেছে আমার উপরে আসতে? মাত্র এক পলক ওই ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়েছি। তার ভিতর এত কাণ্ড! জাহাজের কর্মচারীরা নীরবে দণ্ডায়মান সারিবদ্ধ ভাবে। জাহাজও ডুবু-ডুবু। জলের তলায় ঠাঁই পাতবার আশায় ও অতি দ্রুত নেমে চলেছে। উপরে এখনও হাজার হাজার প্রাণ—প্রাণের আশায় আকুলি বিকুলি ছুটাছুটি করছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে ছুটাছুটি। শুধু নিজের প্রাণটুকু নিয়ে একটুখানি বেঁচে থাকার আশায়। নিয়তির অমোঘ বিধান। কারও পরিত্রাণ নেই। এবার জাহাজ ডুববে। মাথার উপর সূর্য কিঞ্চিৎ হেলেছে। আর উপায় নেই কোনো। জলে ঝাঁপ দিতেই হবে। দেখাদেখি আরও অনেকে। আগে থেকে

রবার-নলে হাওয়া ভরে নিয়েছি। ওটা একটা করে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে জাহাজে ওঠবার সময়ে। ওটাই একমাত্র ভরসা। কোমরে জড়িয়ে নিয়েছি। সাঁতার কাটতে আর পাঁচ জনে আমাকেই আঁকড়ে ধরেছে। সুরু হোল জীবন-সংগ্রাম। সত্যিকারের জীবন-সংগ্রাম।

অকূল সমুদ্রের মাঝখানে। তিন-চার দিন কূল ছেড়ে এসেছি। সামনেও তিন-চার দিনে কূল পাবার কথা। যদি জাহাজ চলতো। যারা দেখাদেখি জলে ঝাঁপ দিয়েছে, বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী আর মাদ্রাজী। ওরা সাঁতার জানে না। ওরা নিজেরা পরস্পর জড়াজড়ি করেছে, ধরেছে, মরেছেও। ডুবেছে সবাই। আমাকেও ধরলো। সাঁতার জানলেও ও অবস্থায় ভুলে যায় সবাই। ভয়ে ভুলে যায়। ঝাপটাঝাপটিও করে সবাই বাঁচার আশায়। করে মরে। কিছু যা হোক ধরে বাঁচার আশা, আর সাঁতার জানলেই বা কি! অকূল সমুদ্রে সাঁতার কেটে বাঁচার আশা যে কতখানি? বিশেষতঃ হাঙ্গর কুমীরের দেশে? ওদের ঝাপটাঝাপটির হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়েছি বহু কষ্টে। মুখ তুলে দেখি, জাহাজের অস্তিত্ব ততক্ষণে বিলুপ্ত হয়েছে। এ কয় দিন যে ছিল সাথী, ডুবে যাবার সময় সে একগাছা খড়-কুটো বা দেশলাইয়ের কাঠিটা পর্যন্ত রেখে যায় নি যা ধরে বাঁচতে পারি। সবই সাথে নিয়ে ডুবেছে। সরে এসেছি আগেই। নতুবা আমাকেও টেনে নিয়ে যেত সমুদ্রের তলায়। ওর সাথী হব বলে।

শেষ প্রাণতরণী ছেড়েছে আমার চোখের সামনে। আর একটু আগে এলে ওতে আমার জায়গা হোত। বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি ক্যাপ্টেনকে দেখতে গিয়ে। কিন্তু সে-ও তো মুহূর্তমাত্র। আর সহজ মানবিকতাবোধ। হেলায় সুযোগ হারিয়েছি। সাঁতার কাটছি প্রাণপণে। শেষ তরণী কোথায় আছে? কিছুই দেখা যায় না। অল্প অল্প ঢেউ, চোখে-মুখে আছাড় খায়। হাত তুলে নাড়ছি। যদি ওরা দেখতে পায়। দয়া করে একটু তুলে নেয়। অকূল সমুদ্রে। লক্ষ্য বিহীন সাঁতার। ওদের সাথে লড়াই করেও খুব ক্লান্ত। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, হাঙ্গর আর কুমীরের আমন্ত্রণ। শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে আক্রমণ চালাবে। আর সাবড়ে দেবে। আচ্ছা, কয় মাইল জল পায়ের তলায়? সে কথা মনে হলে আজও প্রাণ খালি হয়ে যায়। কুমীরের ভয় তার কাছে অতি তুচ্ছ। অগাধ অপার সমুদ্র। আর আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ। হীনবল স্থলচর প্রাণী মাত্র। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কেটে বাঁচার আশা। হাঙ্গর কুমীর তিমির দেশে। আরও কত রকমের প্রাণী আছে, যারা মানুষ খায়। ওর তলায়, কে জানে! হায় রে জীবন!

ভারত মহাসাগরের মাঝখানে। জলের সাথে লড়াই চলছে প্রাণপণে। প্রাণের আশা ছেড়েছি। যতক্ষণ ভেসে থাকা যায়, সেই একমাত্র আশা। ততক্ষণে এ-ও আশা করছি হাঙ্গরের দল বেঁধে আগমন। ওরা জাহাজেই মহোৎসব চালিয়ে যাচ্ছে। নতুবা দুই-একটার দেখা এতক্ষণে মিলতো। এই ক্ষুদ্র দেহ। ওদের সবার প্রয়োজন হয়তো মিটবে না। দূর হতে তেড়ে আগমন। আর দেহ হতে এক খাবলা মাংস তুলে নেওয়া। দেহ থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। মনের আনন্দে লেজ নেড়ে নেড়ে তাই খাওয়া। রক্তে চার দিক ভাসছে। ছবিতে দেখেছিলাম। তারই প্রত্যক্ষ অনুভূতি আজ মিলবে। নাঃ! ওরা এড়িয়ে গেল। হয়তো দেখেনি। পরমেশ্বরের অসীম দয়া! শেষ তরণী দেখা গেল। সেই তরণী কাছে এলো। অথবা আমিই কাছে গেলাম। অথবা স্রোত বা হাওয়া আমাকে ঠেলে নিয়েছে। সে রহস্য আজও অজ্ঞাত: ভগবান শেষ পর্যন্ত সাহায্য পাঠালেন। কী প্রয়োজন ছিল?

প্রাণতরণী হাতের কাছে। প্রাণের ভার নিয়ে তিনিও ডুবু-ডুবু। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ভরা সে তরী।' সোনার ধানে নয়, প্রাণের ভারে। কাজেই কষ্ট করে আর নৌকোয় উঠতে দিলো না কেউ। কারণ ইঞ্চি কয়েক ডুবলে তিনিও মহাসাগরের তলার দিকে গিয়ে আসর জমাবেন। অনেক দড়ি ছিল তার চার পাশে। তখন তার মানে বুঝিনি। এখন ঐ ধরেই ঝুলে আছি। ভালো। অনেক সাঁতার কেটেছি। খুব ক্লান্ত। ঝুলেই রইলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একলা নয়, এই যা সুখ। আরও দুই-তিন জনা ঝুলছেন। শীতের সন্ধ্যা। ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর অসাড়, অবসন্ন। দড়ি ধরেও যে ঝুলবো, সে আশাও কম। আর বেশীক্ষণ আশা নেই।

পুরোপুরি অন্ধকার হতে তখনো বাকী। মাথার উপর দেখা গেল প্লেন। আমাদের না ওদের? ঘুর-ঘুর চক্কর দিল কয়েক। কি যেন দেখল। কি দেখল না। বলতে পারি না। চলে গেল প্রচণ্ড শীতে, সমুদ্রের জলে ভিজে কয়েক ঘণ্টা। আর জল খেয়ে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে, আমার তখন চরমতম অবস্থা! প্রাণ যায়-যায়। বেঁচে আছি, কি মরে আছি সে অনুভূতিও তখন লুপ্তপ্রায়। একখানা জাহাজ এসেছে। দড়িও ফেলেছে। কিন্তু আমার শরীর মন, সমস্ত সত্তা তখন আচ্ছন্ন, অবসন্ন। যখন জ্ঞান ফিরেছে, তখন জাহাজের নরম বিছানায়, গরম কাপড়ে জড়ানো, শুয়ে। কখন কি ভাবে জাহাজে উঠেছি, সে আমার জানবার কথা নয়। সিষ্টার খানিকটা গরম দুধ আর ব্রাণ্ডি দিলে মনে হোল, যমপুরীর দক্ষিণ দরজা দেখে ফিরে এসেছি। কিছুটা আরাম মনে হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছি ক্লান্তিতে।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৫২। পূর্বেও, যে যাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে, বাল্যসহচরেরা মিলিত হতেন কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে। কিন্তু অধুনা, শ্রীকৃষ্ণ যখন স-বলরাম স-বাল্যসহচর, ও স-বালবদাস দল বাঁধলেন খেলুড়েদের নিয়ে, তখন তিনি হয়ে উঠলেন রাজা আর অন্যান্য সকলেই যেন তাঁর মন্ত্রী। তারপর ব্রজপুরের প্রত্যেক অলিতে গলিতে ধূলো নিয়ে সে কী তাঁদের ধূলোট-খেলার ধূম! কী ছড়াছড়ি, মত্ততা! সঙ্গীদের মধ্যে কর-দণ্ডের চপল তাণ্ডব দেখিয়ে কৃষ্ণ যখন নাচতেন, নিজের গায়ে পরের গায়ে ধূলো মাখাতেন, ধূসর করে দিতেন সকলকে, তখন মনে হত শুঁড় উঁচিয়ে গজরাজের বাচ্ছাটি ঐ নাচছেন।

আর তাঁর খেলায় সঙ্গিনী হতেন ব্রজবালিকারা। নিঃসঙ্কোচে তাঁরা খেলতেন। সকলেই শিশু, একত্রে শুয়ে-বসে সবাই মানুষ। সঙ্গীদের যে চোখে দেখতেন শ্রীকৃষ্ণ, সেই চোখেই দেখতেন সঙ্গিনীদের, তাঁর চোখে যে সবাই সমান। সকলেই মহাখুসী হয়ে উঠতেন খেলায়।

কখনও কখনও ছেলের দলের আর মেয়ের দলের সঙ্গে কৃষ্ণের ঝগড়া লেগে যেত। তখন তিনি তাড়া লাগাতেন দুটো দলকেই। কিন্তু তাঁরাও কেউ কম যান না। উলটে তাঁরাও কৃষ্ণকে তাড়া মেরে বসতেন। কখনও হোঃ হোঃ করে হাসি, কখনও মুখ থমথমে ছেলেমানুষী রাগ। রাগতেন না কিন্তু কৃষ্ণ।

৫৩। নন্দ-দুলাল কখনও ধূলো জড় করে করে পাঁচিল ঘর গড় ইত্যাদি তৈরী করে বসতেন, কখনও আবার অন্যের গড়া ধূলোর পাঁচিল গড়া ইত্যাদি ভেঙে দিতেন। যাঁদের গড়া ভাঙতেন তাঁরাও আবার তাঁর গড়া ভাঙতেন। ফিরে আবার কৃষ্ণচন্দ্র বসে যেতেন ধূলোর গড় ইত্যাদি গড়তে। আবার নিজেই ভাঙতেন। এই রকমের ভাঙাগড়া গড়াভাঙা খেলা খেলতেন বালকৃষ্ণ, আর দিব্যলোক থেকে দেবতারা দেখতে থাকতেন সে কৌতুক। তাঁদের কৌতূহল বেড়ে যেত, আপনমনে তাঁরা বলতেন—যাঁর একটি কটাক্ষে না-জানি কত-শত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, স্থিতি হয়, লয় হয়, তাঁর আজ সে বিষয়ে যত্ন নেই এতটুকুও! তিনিই এখন ধূলি-দুর্গ ধূলি-ভবন গড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন! অতিশ্রান্ত হয়ে ঘামছেন, তবুও নাম নেই বিরামের। গগনপারের দেবতারা দেখতেন আর হাসতে থাকতেন আনন্দে।

৫৪। দীর্ঘ দিন ধরে ধূলোট চলত শ্রীকৃষ্ণের। ঘরে ফিরতেও তিনি ভুলে যেতেন। পথে পথে গলিতে গলিতে তিনি খেলতেন। আকাশে খেলা করে যে ঐ শিশুসূর্য তারই মতন সুখের আবেশে তিনি খেলতেন। খেলা দেখতে দেখতে ব্রজপুরের পুরবাসিনীদের মনে সঞ্চার হত মাতৃভাবের, আদরভরে তাঁরা বলতেন—আয় রে আয়, আমাদের নন্দদুলাল আয়। আমাদেরও আঙিনাটি ভারী সুন্দর, ভারী নরম। ছেলেদের নিয়ে খেলা করবি আয়। আহা কিছু খা মা।

শুনে একগাল হেসে বলে উঠতেন শ্রীকৃষ্ণ,—না, আমি আসব না। আমার যে এতটুকুও সময় নেই।

৫৫। কিন্তু তাঁরা কানেও নিতেন না কৃষ্ণের কথা। তাঁরা যে বিলাসময়ী মায়ের জাত। অধীর আগ্রহে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ফেলত। তাঁরা জোরজবরদস্তি করে কৃষ্ণের পদ্মের মত হাত দুখানিকে ধরে ফেলতেন; ধরে ঘরে নিয়ে তুলতেন কৃষ্ণকে,...লক্ষ্মী যেমন করে ঘরে তোলেন সৌভাগ্যকে। তার পরে ঘটা করে স্নান করিয়ে দিতেন, গা মেজে দিতেন কৃষ্ণের। চতুর্দ্দিকে যেন অঝোরে ঝরে পড়ত সীমাহারা এক স্নেহসার। দয়াবতীরা কৃষ্ণকে খাইয়ে দিতেন সর-ননী-ছানা। খাইয়ে-দাইয়ে সহচরদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন ঘরে।

৫৬। সেদিন ধূলোখেলায় মেতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। হঠাৎ তাঁর কী যেন কী খেয়াল হল। অনুরাগিণী ব্রজভূমির মাহাত্ম্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই হোক্ বা নিজের জঠরগত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিকে পবিত্র করবার উদ্দেশ্যেই হোক্, এক খামচা মাটি তুলে হঠাৎ তিনি পুরে দিলেন মুখে। আশ্চর্য্য, খেয়ে ফেললেন মৃত্তিকা! শ্রীবলরাম দেখে ফেললেন কীর্ত্তি। সহচরেরা সকলেই সুবোধ বালক। তাঁরা আর সহ্য করতে পারলেন না। গ্রহণ করলেন চরের বৃত্তি। তাঁরা যে সবাই শুভের চর, অশুভের চর; বলরাম তাঁদের সঙ্গে নিয়ে একদৌড়ে পৌঁছে গেলেন ব্রজরাণীর কাছে। বললেন—মা, মা, কৃষ্ণের লোভ কিছুতেই কমবার নয়। এই এক্ষুণি সে মাটি খেয়েছে। আমাদের কথা গ্রাহ্যই করছে না। যতই বলি খেও না খেও না, ততই তার প্রবল হচ্ছে লালসা।

৫৭। এমন কথা শুনতে ভাল লাগে কোন্ মায়ের? শুনেই তো মা একেবারে রেগে টঙ। দৌড়ে গিয়ে একগাছি লাঠি নিয়ে চললেন। চোখের উপর ভুরু বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়ে বললেন—ওরে অদান্ত ছেলে, মাটি খাচ্ছিস কী বলে? পৃথিবীতে চিনি-মিছরি কি কিছু মেলে না? মাটিতে কোন স্বাদ? পরের ঘরে ঢুকে, চুরি করে অপরাধ করে, সেদিন আমার ঠকানো হয়েছিল, এবার আর পার পাবে না। দোষ ঢাকা দেখাচ্ছি। আগে তো এমন ছিলি না? এই তোমার দাদা রয়েছে, এই তোমার সাথীরা রয়েছে, সবাই তো তারা সাক্ষী।

৫৮। জননীর ভয়ে কৃষ্ণ তখন অস্বীকার করলেন সমস্ত। অপরাধী হয়েও নিরপরাধীর মত ছল করে দু'নয়ন ভাসিয়ে ফেললেন অলীক নয়ন-জলে। যেন অনীতি দোষ খণ্ডনের জন্যেই বললেন—মা, কই, আমি তো মাটি খাইনি। এরা সবাই মিথ্যে কথা বলছে। যদি না বিশ্বাস হয় আমার মুখের ভিতর চাও, দেখ। ব্রজরাজমহিষী বললেন—বেশ, হাঁ কর দেখি?

বলতেই, নিখিল সৌভাগ্যবান শ্রীভগবান অনন্তগহন যাঁর উদর,

তিনি প্রথমে একটু হাসলেন, তারপর ব্যাদান করলেন তাঁর বদন। এবং সেই হাঁ-টির মধ্যে যশোমতী প্রথমে দেখতে পেলেন ভূর্লোক। সেই অচলা পৃথিবীতে কত পারাবার! সাগরঘেরা সপ্তদ্বীপ! তরী তীর মানুষ! গভীর গর্জ্জনে ছুটে চলেছে নদ-নদী! বিপুল তাদের দৈর্ঘ্য। কত কানন, কত উপবন! বাতাসে দুলছে লতা তরুগুল্ম। মৃগ, মৃগরাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দূর মেরুলোক পর্য্যন্ত কত পাহাড়!

তারপরে তিনি দেখতে পেলেন নাগলোক। নাগনায়কেরা উজ্জ্বল করে রয়েছেন পাতাল, কাছে বসে সেবা করছেন নাগ-নাগরীরা।

তারপরে যশোমতী দর্শন করলেন ভুবর্লোক। সেই অন্তরীক্ষ পথকে দিন করে রেখেছে কত তারকা, কত গ্রহ, কত নক্ষত্র!

তারপরে দেখলেন স্বর্লোক। গন্ধর্ব সিদ্ধ কিন্নর চারণ বিদ্যাধরেরা সেখানে বিরাজমান। বিদ্যার আধারভূত মরীচি আদি মুনিগণ তথায় ধ্যানলীন। তাঁদের দিব্য অস্তিত্বেই স্বর্গ এত শোভাময়, যশের এত আভাময়।

দেখলেন মহর্লোকাদি অন্য লোক। দেখলেন অধোগামী ও উর্ধগামী জীব নিকরের কায়ায় ভরা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড। তারপরে দেখতে পেলেন নিজেকে নিজের পতিকে, নিজের ছেলেকে, এমন কি সমগ্র ব্রজলোকটিকেও।

৫১। দেখেই,—

এ কি আমার ভ্রম না স্বপন?
এ কি দেবতার মায়া, না ইন্দ্রজাল?
না, না, এ কি আমার এই গোপালেরই ভ্রামক-শক্তি?

ভেবে কিছুই নির্ণয় করতে না পেরে যশোমতী ঘোর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর প্রণিধান করলেন অনন্তবেগময়ের বৈভব! কিন্তু এত দর্শন এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি কিছুই যেন ভুলতে পারলেন না। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল—যাঁর আমি অধীনা, যাঁর কাছে আমি আ-রতা, তাঁর কৃপাতেই আজ, আমার এই দর্শন হল। তিনিই আমার শরণ। তিনি অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য, মহান্। অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে তিনি নিশ্চয় মোহে ফেলতে পারেন মহেশ্বরকেও। এই প্রজ্ঞাই তাঁকে যেন জানিয়ে দিল, তাঁর নন্দনটি অতএব ঈশ্বর।

কিন্তু জননী শ্রীযশোদার মন চাইল কৃষ্ণকে পুত্রভাবে। ঈশ্বরভাব ও পুত্রভাব—দুই ভাবের শোভায় অতি ভারে তিনি যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। পুত্রভাবটিকে বিসর্জ্জন দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইলেন চরম ভাবটিকে। যেমন করে আঁকড়ে ধরে রইল তাঁর কোল—তাঁর লীলা-শিশুটিকে, তাঁর নন্দ-দুলালটিকে।

ইতি মৃৎভক্ষণ-লক্ষণো নাম পঞ্চমঃ স্তবকঃ।

ষষ্ঠ স্তবক

১। একদা,—বাল-ভগবান তখন শৈশব-কলায় কৌশলী হয়ে উঠেছেন, নন্দরাণীর সখ হল, নিজেই দধিমন্থন করবেন। যাবতীয় দাসী। তিনি তাদের কার্য্যান্তরে পাঠাতে চাইলেন, বললেন, যা তোরা—কিন্তু বললেই কি তারা যেতে চায়? শেষকালে হুকুম করলেন। হুকুমেরই জয় হল। হেরে পালালেন দাসীরা।

মা তখন বসলেন দই মইতে। আর নন্দ-দুলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন—দধিমন্থন।

শোভায় থরথর
সুন্দর মনোহর—
সেই দধিমন্থন।

নন্দরাণীর অমলকোমল দুখানি করপল্লব একবার টানে একবার ছাড়ে মন্থনদাম, তারপরে আরও জোরে, থামার আর নাম নেই! একটু একটু করে ভেরে আসে হাতের পাতা। তবুও এই আকর্ষণেরই কেমন যেন একটি মহিমা আছে। জাগায় আনন্দ! মণিবন্ধের বলনিতে তাই ঝঙ্কার দিয়ে নাটুকে নাচ নেচে ওঠে পান্নার গোছা-গোছা বালা, আর ঝঙ্কারের ললিত মুখরতায় ম্লান হয়ে যায়—পদ্মের পাপড়িকে ঘিরে ভ্রমরের নেশা ধরানো গুঞ্জন-গান। হাস্যজনক হয়ে ওঠে নন্দরাণীর দুখানি সেই ভোগের বাহুর ব্যবহারের বহর। দুটিই যেন দশুন-পণ্ডিত। ঘামে ভেসে যায় শ্রীযশোদার গা।

দই মইতে থাকেন মা।

আর তাঁর কপালের অলকগুচ্ছ লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে থাকে ললিত-ললিত। যে মণিহার কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর পীবর স্তনতট ঘিরে নেমে এসেছে, ঘন-ঘন আন্দোলিত হতে থাকে সেটি; দোলনের মিশ্রছন্দে সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকে তাঁর কঞ্চুলিকা।

তখন কী সুন্দর যে দেখতে হয় কানপাশার মণি-কিরণ মঞ্জরী! দু'কানের ঝকঝকে পাশ নেয়ে অবিচ্ছিন্ন ঝরে পড়ে সে লাবণ্যের সুধাধারা! মাধুর্যের আলো ছিটিয়ে আরো যেন মোহন করে তোলে নন্দরাণীর ঘাড় আর কাঁধ।

আর তখন মণি-মেখলা বাজতে থাকে রুণ্‌রুণ্‌। মঞ্জুলা ও পৃথুলা শ্রোণির শোভার গরবে গরবিণী সে। মণিমেখলা বেঁকে বেঁকে বাজতে থাকে রুণ্‌রুণ্‌।

দই মইতে থাকেন মা।—

শিথিল হয়ে যায় কবরীর শিল্প-বিন্যাস, চুল থেকে খসতে থাকে মণি আর ফুল; রাত্রির তারাদল যেন সোপান বেয়ে নেমে আসেন ধরণীতে।

আর একটা মস্ত হা-করা দধির ঘড়ায় দই মইতে থাকেন মা। ঘড়ার মধ্যে দুলে দুলে ফুলতে থাকে ঘন-ঘোর এক শঙ্খের সমুদ্র। ছলাৎ ছলাৎ উথলে উঠে ছিটকে পড়ে ঘোল সোনার শাড়ীর ভেসে যায় আঁচলা। আর সেই সঙ্গে মায়ের মনেও চলকাতে থাকে গর্ব। বলি, এমন নতুন ঢঙে আর কি কেউ তুলতে পারেন ননী! এত ননী? আঃ মরি মরি, তনয়টি আবার লুব্ধ চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, ঘামে ভেসে যায় নন্দরাণীর গা।

মায়ের চোখে চোখ পড়তেই বালকৃষ্ণের কেমন যেন হঠাৎ ছলছলে তরল হয়ে যায় মন। তাঁর সাধ হয়, মায়ের বুকের দুধ খাবেন। তাই নেই-কিদের অভিনয় করে বলেন—

মা মা, আর মই দিসনি মা। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর আমাকে কষ্ট দিসনি মা! আমি যে তোর দুধ খাব। বলতে বলতে মায়ের হাতের মন্থন-দণ্ডটিকে আঁকড়িয়ে ধরেন কৃষ্ণ। আ

সে কি যে আঁকড়ে-ধরা! উপস্থিত দাসীদের এক নিমেষেই যেন হয়ে যায়—মনোমন্থন।

২। কী অনন্ত রমণীয় চরিত্তির বাবা ছেলের! হেসে উঠলেন দাসীর দল।

ঐ এক রত্তি হলে হবে কি!

ব্রজরাণী তখন মন্থনদণ্ডটিকে বিসর্জন দিয়ে কোলে তুলে নিলেন তাঁর কৃষ্ণকে। কী কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো একমাথা চুল! দুধ দিতে লাগলেন মা।

এমন সময় শ্রীযশোদার কানে এল, কোথায় যেন সোঁ-সোঁ করে একটা শব্দ হচ্ছে। ঐ রে, ঐ বুঝি দুধ উথলোলো। নিজের ঘরের কাছেই উনুনে দুধ চাপিয়ে এসেছিলেন—পুত্রের জন্যে। বাতাস পেয়ে জ্বলে উঠেছে উনুন, গনগনে আঁচে সোঁ-সোঁ করছে দুধের কড়া! কৃষ্ণকে স্তন-ত্যাগ করিয়ে তিনি তখনি তাঁকে বসিয়ে দিলেন ঘরের ভিতর এবং ছেলে ফেলে চলে গেলেন দুধ সামলাতে।

নন্দদুলাল রেগেই লাল! নিমেষে এঁটে ফেললেন মতলব। তারপর উঠে পড়লেন সেখান থেকে। তাড়াতাড়ি। তার পরে শিলের নোড়া দিয়ে ফাটিয়ে দিলেন দই-এর বড় খোরা। ভাঙলেন তো বটে, কিন্তু রাগে আর ভয়ে তাঁরও মনখানি ভাঙতে লাগল। কারণ, চতুর্দ্দিকে তখন সাপের মত এঁকে-বেঁকে ছুটে চলেছে মাঠা-তোলা দই-এর শতধারা। ধুয়ে যাচ্ছে চৌকাঠ, এখন কি করা যায়?

নন্দদুলাল রঙ্গ করে লম্ফ দিলেন পাশের ঘরে। ঘরে লুকানো ছিল, মানুষের চোখে না পড়ে এমন স্থানে, নবীন নবনীতোলা ঘৃত। নব প্রযত্নে ননীর ঘি-টিকে নামালেন। একটু খেলেন, হাতের তেলোয় সংগ্রহ করলেন একটু। নিজে নিজেই যেন মন থেকে সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল রাগ। মা দেখলেই কিন্তু বিপদ! অতএব তিনি, যিনি দেব-দেবেন্দ্রাদি-বন্দিত নন্দদুলাল, তিনিও মায়ের ভয়ে ঘি-টিকে হাতে নিয়ে চরণ ফেলে পালালেন।

পলায়নের সপক্ষে ঘরের পাশেই ছিল পক্ষদ্বার। দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরের আঙিনায়। রঙ্গমঞ্চে দেখাবার মত কীর্ত্তি বটে নন্দদুলালের! আঙিনায় ছিল উদূখল। গম ভাঙবার সময় নয় তখন। তাই অধোমুখী ছিল। সেই উদূখলের পিঠে হস্তদন্ত হয়ে চড়ে বসলেন খলনিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ। এবং জননীর শুভাগমন-পথের পানে সাবধানী নয়ন হানতে হানতে খাওয়াতে লেগে গেলেন নবনীত, বাঁদর-ছানাদের।

৩। এদিকে নন্দরাণী জ্বাল থেকে দুধের কড়া নামাতে এসেছেন।

নিজের সৌভাগ্যমহিমায় জগৎজনের যিনি ত্রাণকর্ত্রী, তিনিও কড়া নামাতে নামাতে ভাবতে লাগলেন—

ভাগ্যদেবতার কী অপার করুণা! এমন ছেলে কি কারো ঘরে রয়েছে, না কেউ পেয়েছে? জন্মান্তরের পুণ্যের জোরেই আজ আমার এত মান, যশঃ। ভাবতে ভাবতে যশোবিভায় সৌন্দর্য্য-স্নাতা হয়ে উঠলেন শ্রীযশোদা।

দুধের কড়া নামিয়েই, কৃষ্ণকে কোলে তুলে নেবার জন্যে নন্দরাণী ফিরে গেলেন সেই ঘরে, যেখানে তিনি বসিয়ে রেখে এসেছিলেন তাঁর দুলালকে। গিয়েই দেখেন তনয় নেই। চমকে উঠল অন্তর। কোথায় গেল সে, অনুসন্ধান করলেন। তারপরে হঠাৎ তাঁর হৃদয়টিকে ব্যথিত করে দিয়ে তাঁর চক্ষু দুটি তাঁকে দেখিয়ে দিল, সামনে ভেঙে পড়ে রয়েছে দধি-গর্গরী; ঘোলের মোটা মোটা অজস্রধারা ছুটে চলেছে; ধারায় ভেসে গেছে ঘরের মেঝে, শাদা হয়ে গেছে, পিছল হয়ে গেছে। গুরুতর ব্যাপার! কী জোরেই না ভেঙেছে ঘড়া! খোলামকুচি হয়ে গেছে।

মায়ের বিস্ময় বলে উঠল, কী করে হল? হঠাৎ কেমন করে ভাঙল এত বড় ঘোলের ঘড়া? রীতি নির্ণয় করতে পারল না। তারপরে ফিরতেই বিস্ময়ের চোখে পড়ল, নোড়া!

এ আমার দুষ্টুটির কাজ ছাড়া আর কারো নয়।

…বিস্ময়-চিকুর হেসে উঠল মায়ের নয়নে। বাম হাতের ললিত তর্জ্জনীটি লটকিয়ে গেল নাসার শিখরে। চকিত অভিমানের আঘাত লাগা সত্ত্বেও মলিন হল না শুভ্রহৃদয়। বরং হৃদয়ের দয়া হল।

কৃত্রিম ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে যেই তারপরে নন্দরাণী ছেলের সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, অমনি তিনি দেখতে পেলেন—তাঁর ছেলেটি—তেজের প্রতাপ যাঁর অপ্রতিহত, চুরির লীলায় বালাই নেই যাঁর গর্ব্বের, তিনি সভয়ে লাফিয়ে নেমে চঞ্চল পায়ে ছুটে পালাচ্ছেন।

মায়ের বকুনিকে বড্ড ডর, না? পরাক্রমের অন্ত নেই, না। পাছু পাছু ছুটলেন জননী। কিন্তু জননীটি পটীয়সী মহীয়সী মহিষী হলে হবে কি; তিনি তাঁর শ্যাম রঙের দুধের শিশু মোহন দেবতাটিকে ডাকতে লাগলেন—

দাঁড়া, দাঁড়া, জগতের পয়লা ধূর্ত্ত, ওরে আর দৌড়স নি।

৪। মা যত ডাকেন, ছেলে তত পালায়। বাঁকা অভিমানে উঁচিয়ে উঠেছে ছেলের মন। দৌড়ন আর ফিরে ফিরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকান, মা আসছেন কি আসছেন না। যখনি দেখেন, ধেয়ে আসছেন মা, আলোয় ঝলমল করছে মায়ের গা, তখনি আবার নতুন করে অতি ভয় জাগে মনে। আবার কৃষ্ণ পালান। ঐ দেখ—

নন্দদুলাল তূর্ণ গতিতে দৌড়চ্ছেন, মায়ের দিকে মুহুর্মুহুঃ চকিত নয়নে চাইছেন, মনোহরণ ভঙ্গিমায় গ্রীবাখানি ঘুরোচ্ছেন। তার পরে ঐ দেখ কাণ্ড—পিছন দিকে চোখ দুটিকে নাচিয়ে নাচিয়ে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—হুঁম, ওঃ, আঃ, হাঃ কাতরাতে কাতরাতে যেন চেষ্টায় ঘটেছে কতই না ব্যাঘাত—হঠাৎ তিনি জমে গেলেন! ঢলে পড়লেন আঙিনায়। আর, কৃত্রিম ক্রোধে ভরা জননীর মন শীতল হয়ে গেল মুহূর্ত্তে।

৫। নন্দরাণী তখন বললেন—ওরে ধূর্ত্ত ছেলে, অমনি করে আর কত দৌড়বি, কোথায় যাবি? আর দৌড়সনি বাছা, জিরো।

কথাও বলছেন মা, আর তার নন্দদুলালও তৎক্ষণে হাত ফসকিয়ে নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে বলছেন—যদি মা আমায় না মারিস—আর হাত থেকে লাঠিটা যদি ফেলে দিস, তবেই আমি পালাব না…জোরে…দূরে।

মা। মার খেতেই যদি তোর এত ভয়, তাহলে আজ ঘোলের ঘড়া ভাঙলি কেন?

কৃ। সত্যি বলছি মা, আর আমি করব না, হাত থেকে মা লাঠিখানা ফেলে দে।

৬। পুত্রের কথা শুনে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন ব্রজরাণী। বাইরে ক্রোধের ভাণ ফলিয়ে যেই কাছে এগিয়ে গিয়ে ধরতে যাবেন তাঁর ছেলেকে, অমনি কৃষ্ণ টেনে দৌড়। পাছু পাছু দৌড়লেন মা। মায়ের দৌড়নি দেখে সত্যিই ব্যাকুল হল কৃষ্ণের মন। এবার বললেন—মা, তোর হাত থেকে ঐ ভয়ঙ্কর থরথরে লাঠিখানা ফেলে দে মা! আগে সত্যি করে বল আমায় মারবি না মা, তাহলে আমি তোর কাছে যাব। তুই তো বা আর পাপ করিস নি।

কচি কচি কাতর কণ্ঠের মিনতি শুনে ব্রজরাণী হাত থেকে শেষে ফেলে দিলেন লাঠি।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বালকৃষ্ণ দেখলেন, দৌড় বন্ধ করে এবার বললেন জিরোতে।

৭। কৌতুকের এই আতিশয্যটি দূর দ্যুলোকে বসে অবলোকন করছিলেন দেবতারা। প্রথমে তাঁদের মুখে ফুটে উঠল পরম বিস্ময়, তারপরে বিস্ময়ের হাস্য, তারপরে হাস্যের প্রীতির প্রসন্নতা। অহো অহো, করে তাঁরা মুখচাওয়া-চাওয়ি করে বলতে লাগলেন—অত্যাশ্চর্য্য, অত্যাশ্চর্য্য! অন্যের কথা ছেড়ে দিন। যে ভয় পরার্দ্ধযুগের অবসানে ব্রহ্মারও হৃদয়ে নিয়ে আসে পরম বৈকল্য, সেই ভয়ই আবার নিত্যকাল ধরে ভয় করে চলেছে যাঁকে, সেই তিনিই কি না অতি ভীত হয়ে পড়েছেন···মায়ের হাতে ঠ্যাঙ্গা দেখে! অত্যাশ্চর্য্য, অত্যাশ্চর্য্য!

৮। নন্দরাণীর তখন নিঃশ্বাসের বাতাসে ঘন ঘন কাঁপছে কঞ্চুলিকার অঞ্চল, শ্রমজলের কণিকায় অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে বদন-সরোজ। শিথিল হয়ে পড়েছে কুন্তলকলাপ; ঐ একটুখানি দৌড়োনতেই অবসন্ন হয়ে পড়েছে চরণ-কমল।

ধীরে ধীরে তিনি ছেলের হাতখানি ধরলেন। দীন-নয়নে কৃষ্ণ তখন বলে উঠলেন—মা, আর আমাকে মারবি না মা, বল্? আমায় কক্ষণো মারিসনে মা!

বলতে বলতে পুত্রের পদ্ম-আঁখি পূর্ণ হয়ে গেল অশ্রুকণায়। নবীন পদ্মের পাপড়ির মত দুখানি করতল দিয়ে ছেলের তখন সে কী চোখ-পোঁছবার ঘটা! কণ্ঠের সে কী আধ-আধ গুঞ্জন! ফোলা-ফোলা চাঁদমুখে সে কি সুধাবিন্দুর নিস্যন্দ! ভীত-ভীত সে এক অভিনব ক্রন্দন। বিলোকনীয় হয়ে উঠলেন শ্রীমান নন্দদুলাল।

মা তখন ঠিক করলেন—কিছুক্ষণ একে বেঁধে রাখতে হবে। যদি না বাঁধি, তাহলে যা রাগী ছেলে, কখন আবার কোথায় বনে জঙ্গলে রাগের ঝোঁকে পালাবে। সম্প্রতি ওকে বাঁধি। ছেলের মহিমা বোঝা ভার!

অতএব বিকশিত চারু-দন্ত রুদন্ত দুলালটিকে নিয়ে নন্দরাণী নিকটে এলেন উদূখলের। কখন আবার কি যে-করে বসবেন ছেলে। বন্ধনের বিহিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে তিনি ডাক দিলেন—

ওগো কুরঙ্গবতি, লবঙ্গবতি, বেশ নরম আর মোলায়েম দেখে এক গাছি পাটের দড়ি নিয়ে আয় তো···তাড়াতাড়ি।

৯। পট-দাম নিয়ে তাঁরা এলেন। জগতের যিনি অদ্বিতীয় বন্ধু, তাঁকেই বাঁধবার জন্যে এত যত্ন ব্রজেশ্বরীর! হাতের ভিতরে দড়ির কোমলতা অনুভব করে তিনি আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

দেখতে দেখতে আঙিনায় উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজপুরের কয়েকটি পল্লীবাসিনী। তাঁরা সকলেই যেন সম্পদের লীলাবনী, বাৎসল্যরসের সারমণি। তাঁদের ছেলেরাও এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। তারপর যা ব্যাপার ঘটল! সেটি এই—

পট্টদাম দিয়ে প্রথমে যেই কৃষ্ণের কটিদেশটিকে বেষ্টন করতে গেলেন ব্রজরাণী, দেখলেন দু'আঙুল কম পড়ে গেছে ঘেরে। আর একগাছি দড়ি আনিয়ে গিরো দিয়ে আবার জড়ালেন কটিদেশ, দেখলেন সে দড়িও ঘেরে কম পড়ে যাচ্ছে দু'আঙুল। আর একগাছি জোড়া দিলেন দড়ি। তাতেও সেই দু'আঙুল কম। ব্রহ্মের মত হ্রাস-বৃদ্ধি রহিত হয়ে রইল পট্টদাম।

১০। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠায় দেখতে লাগলেন পুরস্ত্রীরা। কিন্তু ব্রজরাণীর কোপাবেশ কিছুতেই কমছে না দেখে ক্রোধটিকে নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে পল্লীবাসিনীরা বলে উঠলেন—

ধন্যি মহারাণী ধন্যি। জগতে এমন ভাগ্যি আর কেউ কখনও করেননি। আশ্চর্য কাণ্ড! কৃষ্ণের কোমরে ঐ তো···সূতোর মত··· পড়ে রয়েছে সোনার মেখলা। ঐ তো অত ছোট। কিন্তু অবাক কাণ্ড, এখন ঘরের সমস্ত দড়ি দিয়েও···বাঁধন হোল না গো, ···কুলোলো না! বলেন কি মা-জননী, সারা দড়ি জুড়েও সেই দু'আঙুল কম! নিশ্চয়ই রহস্য আছে মা, রহস্য আছে। আর থাক্···এবার ক্ষান্তি দিন।

পল্লীবাসিনীদের ক্ষান্ত হল বচন, কিন্তু অনন্ত হল ব্রজরাণীর বিস্ময়। কৃষ্ণের কীর্ত্তিটি কতদূর গড়ায়, দেখতেই হবে, এই স্থির করে মুখে হাসি টেনে তাই বললেন, আমার ঘরে এই রকমের আর তো দড়ি নেই। আপনাদের যাঁর যাঁর ঘরে আছে, নিয়ে আসুন তো সেগুলো।

পুরস্ত্রীরা পল্লীবাসিনীরা দড়ি আনতে যে যাঁর ঘরে দৌড়লেন। রাগের মাথায় বা শত্রুতা করে বা ব্রজেশ্বরীর আদেশে ভয় পেয়েই যে তাঁরা দড়ি নিয়ে ফিরে এলেন তা নয়, আনন্দের পরম কৌতূহল এবং লোকাতীত চরিত্র দর্শনের উগ্র আগ্রহ, তাঁদের দড়ি হাতে ফিরিয়ে নিয়ে এল ব্রজরাণীর আঙিনায়। নন্দদুলালের কান্না তখনো থামেনি। শৈশব-নাট্যের পারিপাট্য দেখিয়ে তিনি তখনও অঝোরে ঝরাচ্ছেন নয়নকমলের জলকণা, চোখ ঘষতে কতই না যেন ব্যথা পাচ্ছে তাঁর পদ্মের মত কোমল হাত। তাই কাঁদছেন। কান্নাও এত মিষ্টি হয়! সেই কান্নার সারগাম কোমলের চেয়েও কোমল, সেই কান্নার অ আ ক খ যেন গদগদগদন-বাণী ভাস্বর!

[ক্রমশঃ।

পুণ্যে-পাপে দুখে-সুখে পতনে-উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরদিন যথানিয়মে শুরু হলো ওদের যাত্রা। একটু পরেই তিয়েলিং বললেন, আজকের আকাশটা বড় ভালো মনে হচ্ছে না। আকাশের রংটা যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। বৃষ্টি শুরু হলে আমি আশ্চর্য হবো না।

সত্যিই তাই, আধ ঘণ্টার মধ্যে ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। একে ঐ দুর্গম পথ, আপনা হতেই পা স্লিপ করে, তার ওপর আবার বৃষ্টি! একটা টাট্টু একবার পা হড়কে হুমড়ে পড়লো।

সকলেই আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ভয়ে। খুব সাবধানে হাঁটছে আর পথের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

ক্রমে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তিয়েলিং বললেন, বেশী দূর যাওয়া যাবে না এ-ভাবে।

উপায়? জিগেস করে শান্তনু।

কোনো জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বসে অপেক্ষা করতে হবে। বললেন তিয়েলিং।

কিন্তু, কোথায় বসবে তারা, দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত নেই। এদিকে একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছে। চোখের সামনে সমস্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

দৃশ্যপট যেন মুছে দিয়েছে কে। একটা ঘোলাটে পাংশু রংয়ের বাষ্প-যবনিকা যেন চারি দিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হঠাৎ একটা শ-শ-শ করে শব্দ ভেসে এল সবার কানে। শেরপাদের নেতা চীৎকার করে উঠলো, সাবধান! ধ্বস নামছে!

কোথায়? কোন দিকে? সকলের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে ঐ একই প্রশ্ন।

চোখের সামনে তিরিশ গজ দূরের জিনিস নজরে আসে না। দেখবেই বা কি করে? ওদের পায়ের তলার মাটি সরছে নাকি? যদি সরেই বা, যদি ওদের ঠিক ঐ জায়গাটি পাহাড়ের গা থেকে খসে নেমে যায়, তা হলেই কি? করবার কি আছে? আগে গেলেও বিপদ। পেছনে হটলেও বিপদ থাকতে পারে। তিয়েলিং বললেন, চওড়া রাস্তা ছেড়ে সরু পথটায় এসে দাঁড়াও, রক্ষা পেতেও পারি।

লালীর মনে হলো, যেন তার সর্বাঙ্গ পাথর হয়ে গেছে। কিশোরেরও বুক শুকিয়ে গেল। ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালো সকলে, যায় তো সকলেই মরবে একসঙ্গে।

আবার একটা আওয়াজ শশ-শ-শ। আকাশের দক্ষিণ দিকে মেঘের একটা ফাঁক দিয়ে এক ঝলক সূর্য্যালোক এসে পড়লো। সে আলোটা যেখানে এসে পড়েছে, গলানো রূপোর মত সেখানটা ঝক্‌-ঝক্‌ করে উঠলো। সেই আলোয় দেখা গেল প্রায় দু'শ হাত দূরে পাহাড়ের গা থেকে পাথর আর বরফের বিরাট একটি অংশ ঝরে যাচ্ছে নীচে। ক্ষীণ একটি আওয়াজ আর তার সঙ্গে মনে হলো, কী মোলায়েম ভঙ্গিতে নেমে চলেছে। সঙ্গে যা পড়ছে, তাকে নিয়েই নামছে। দু'হাজার ফুট নীচে এক বরফগলা নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে গেল ও-গুলো।

ওরা দেখলো এই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এ যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা।

কতক্ষণ যে এই ভাবে ছিল তা ওরা জানে না। তবে কুজ্ঝটিকা সরে গিয়ে আবার যখন রোদে ঝলমল করে উঠলো চারদিক, আর আকাশটা হয়ে গেল ঘন নীল, তখন ওরা বুঝলো যে ওরা নিরাপদ হয়েছে। অন্ততঃ তখনকার মত।

তিয়েলিং বললেন, মনে রেখো, আমরা বরফের রাজ্যে পা দিয়েছি। যে দৃশ্য তোমরা দেখলে, এ সব এখানকার নিত্য ঘটনা। এখানে আছে বরফনদী, আর আছে ছুটন্ত বরফের পাহাড়, যাকে বলে গ্লেশিয়ার। এরা হচ্ছে মৃত্যুর দূত। আমাদের জীবন এখানে অতি তুচ্ছ জিনিস। এক ফুৎকারেই তা নিবে যায়। আমাদের দেহের কতটুকু সামান্য উত্তাপ। এক নিমেষেই তা জমে হিম হয়ে যেতে পারে। বেঁচে থাকা এ রাজ্যের নিয়ম নয়। তাই তাকে গ্রাস করতে শত শত মৃত্যুদূত ছুটে আসে।

তিয়েলিং-এর কথাগুলি ওরা মন দিয়ে শুনছিল। চোখের সামনে ওরা দেখলো, তুষারধবল শিখরের পর শিখর। উঁচু-নীচু সারে সারে দাঁড়িয়ে। তাদের গায়ে অপরাহ্নের সূর্য্যালোক যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে।

ঐ হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। বললেন তিয়েলিং। কত কাছে অথচ কত দূরে। রূপকথার কত গল্প আছে ওকে ঘিরে। ঐ যে দেখছো বরফের ওপর সাদা ধোঁয়া, ওগুলো নাকি হিমপরীদের নিঃশ্বাস। মানুষের প্রাণের উত্তাপ নেই এখানে।

একটি মাত্র ছেলে এখানে এসেছিল। কত দিন আগে, কেউ তা জানে না। তার মা ঐ রূপোলি বাষ্প হয়ে তাকে নাকি ঘিরে ঘিরে থাকতো।

সেই সু-তিং, আশ্চর্য্য ছেলে ঐ সু-তিং। শুধু বরফের ওপর দিয়ে নেচে নেচে বেড়াতো। খেলা করতো তুষার নিয়ে, সাঁতার কাটতো হিমপ্রবাহের জলে। তবু সে জমে যায়নি। তার বুকে ছিল মানুষের হৃদয়। ছিল সেথায় ভালবাসা। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি সোনালি পরীদের সঙ্গে ছিল তার ভাব। দুষ্ট হিমপরীরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। দিনে দিনে সু-তিং বড় হলো। দীর্ঘ ঋজু পাইন গাছে উঠে যেত তর-তর করে বুনো ভালুকের মত। আবার তেমনি অবলীলাক্রমে তর-তর করে উঠে যেত পাহাড়ের খাড়া চূড়োয়। কী দুষ্টুই ছিল সু-তিং!

কাঞ্চনজঙ্ঘা তখন নাকি ছিল শুধু সোনার পাহাড়। তাই নাম হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। শুধু তাই নয়, সেখানে এক রাজার নাম শোনা যায় যার গুহায় গুহায় ছিল অপরিমিত সোনা। সেই সোনা দিয়ে সে তার সমস্ত প্রাসাদ মুড়ে রেখেছিল।

তোমরা বলবে, এই কনকনে ঠাণ্ডা বরফের দেশে এ কেমন রাজা! এ কেমন রাজ্য? প্রশ্ন করতে পারো। কিন্তু, যে সময়ের কথা বলছি, তখন হয়তো এমন মানুষ ছিল যারা বরফের রাজ্যেই বাস করতে পারতো। আজও ত চিরহিম মেরুদেশের কাছে এস্কিমোরা বাস করে। পৃথিবীতে কোনটাই বা অসম্ভব!

তিয়েলিং একটু চুপ করলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো দূরে কিসের ওপর।

লালী অধীর হয়ে বলে উঠলো, কই, লামাজী মাঝপথে থামলেন কেন? আপনি সুন্দর গল্প বলেন কিন্তু একটা আপনার দোষ, আপনি শেষ করেন না।

কিশোর বলল, ঠিক তাই। মিমি আর এর গল্পটা যেমন। ওদের শেষ পর্যন্ত কি হলো, তা আর বললেন না।

তিয়েলিং একটু হেসে বললেন, ও তাই নাকি? এটা আমার ভারী অন্যায় হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু, কি জানো, ওদের শেষটা আমারও জানা নেই। আমার মনে হয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ গল্পই শেষটা অজানা থেকে যায়। কি যেন একটা রহস্যে ঢাকা পড়ে যায় শেষটা। জোর করে শেষ করলেও একটা রহস্যের রেশ থেকে যায়। যাক, এখন আমি অন্য কিছু ভাবছি—ঐ যে নীচে একটা কি পড়ে আছে মনে হচ্ছে? শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে তোমরা কি একটু অনুসন্ধান করবে?

নিশ্চয়ই। কিশোর লাফিয়ে উঠলো। শান্তনুকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

ওরা দুজনে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলো নীচে। অনেকটা নীচে নামতে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল, একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। আর সেটা আর কেউ নয়, সেই শংকরীপ্রসাদের। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো ওরা, যখন দেখলো যে শংকরীপ্রসাদ কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যায় নি। পরীক্ষা করে তারা দেখলো, কোনো আততায়ীর পিস্তলের গুলীতে মারা গেছে।

এ অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে থাকার দরকার নেই, বললে কিশোর। চলো আমরা তিয়েলিংকে খবরটা দিই।

শান্তনু বললে, না, শংকরীপ্রসাদের দেহটা খুঁজে দেখতে হবে। আমাদের সেই নক্সাটা যদি পাওয়া যায়। তা ছাড়া অন্য কিছু গোপন তথ্যও পাওয়া যেতে পারে। এই বলে সে মৃতদেহের জামার মধ্যে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো। একটা ঘড়ি, কিছু কাগজপত্র, পেন্সিল, একটা বড় ছুরি। অক্সিজেনের সরঞ্জাম ইত্যাদি আছে দেখা গেল। তাছাড়া একটা ব্যাগ ছিল। সেটায় হাত দিতে যাবে এমন সময় গুড়ুম করে এক আওয়াজ! শান্তনুর মনে হলো তার কানের কাছ দিয়ে যেন একটা গুলী চলে গেল। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। শান্তনুর বুঝতে দেরী হলো না যে, তারা এখানে এসে একটা মস্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। আশে-পাশে একজন বা একাধিক শত্রু লুকিয়ে আছে।

চিন্তা করার সময় নয়। শান্তনু পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে নিল। তার পর আশে-পাশে তাকালো। দূরে একটা আঁকা-বাঁকা খাড়া কুৎসিত পাহাড়ের চূড়ো। ঠিক হাঙরের মুখের মত দেখতে। তার ধারে ধারে কালো কি এক গাছের ঝোপ-ঝাড়। ঐখানেই কোনো শত্রু লুকিয়ে আছে, আন্দাজ করলো শান্তনু। ঐ দিকে পিছন ফিরে পালানো কাপুরুষের কাজ, নির্বুদ্ধিতা ত বটেই।

শান্তনু পিস্তল সামনে ধরে এগুতে লাগলো, পিছনে কিশোর।

হাঙরমুখো শিলাখণ্ডের কাছাকাছি হতেই ওরা দেখলো দু জন যেন ঝোপের আড়াল থেকে সরে গেল একটা গুহার মধ্যে।

যাক, আততায়ীরা ভয় পেয়েছে, শান্তনু আশ্বস্ত হলো। সে একটা ফাঁকা আওয়াজ করলো। তারপর ওরা শত্রুদের অনুসরণ করলো গুহার মধ্যে। গুহার অভ্যন্তর ভিজে স্যাঁতসেতে আর অন্ধকার। শুধু একদিক থেকে দেখা গেল একটা আলোর আভাস। সেই দিকে অগ্রসর হতে ওরা এসে পড়লো একটা খোলা আকাশের মধ্যে। এখানে ওপরের জল চুইয়ে পড়ে পড়ে অসংখ্য থামের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সব থামের আশ-পাশ দিয়ে দেখা যায় নানা সুড়ঙ্গ-পথ। হাজার হাজার বছরের শ্যাওলা জমে আছে কোথাও। কোথাও বা জল বালু পাথরের জমে যাওয়া নানা আকারের বিচিত্র স্থাপত্য।

দুই বন্ধু বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগালো।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটবার পর, কিশোর বলে উঠলো, মিথ্যা অনুসন্ধান, শান্তনু, চলো আমরা ফিরে যাই।

ফেরবার রাস্তাই তো আমি খুঁজছি, কিশোর! শান্তনু বললে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে কাতর দুই বন্ধু বহির্গমনের পথ পেলো না। যেদিকেই যায় সেখানটাই নতুন মনে হয়। অপরিমেয় ক্লান্তিতে বসে পড়ে কিশোর।

এদিকে লালী অনেকক্ষণ ওদের আশায় পথ চেয়ে থাকে। কিন্তু বেলা যখন গড়িয়ে পড়লো তখন তার চোখ ভরে এলো জলে। সে কাঁদতে থাকে। তিয়েলিং সান্ত্বনা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, শংকরীপ্রসাদকে কেন্দ্র করে এ কী নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। বৃদ্ধ লামার কপালের চর্ম কুঞ্চিত হয়ে কয়েকটি চিন্তারেখা ফুটে উঠলো। না, এখনই কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। শেরপাদের ডাকলেন।

চার জন শক্ত-সমর্থ শেরপা বেরিয়ে পড়লো। হাতে তাদের আলো আর ধারালো কুকরি।

তারা জানতো, ওখানে ঐ হাঙরমুখ কুৎসিত শিলাখণ্ডের তলদেশে এক ভয়ঙ্কর গুহা আছে। লোকে তাকে কৃষ্ণগুম্ফা বলতো। তার মধ্যে যে প্রবেশ করবে, সে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওদের মনে হলো, নিশ্চয়ই ওর গহ্বরের পথ হারিয়ে ফেলেছে শান্তনু আর কিশোর।

আর তা না হলে কোনো হিংস্র ইয়েতির কবলে পড়েছে ওরা।

যাই হোক, তন্ন-তন্ন করে চারদিক খুঁজে দেখতে লাগলো। কিন্তু কোথাও ওদের কোনো চিহ্ন নেই। অবশেষে সতর্ক পদক্ষেপে তারা প্রবেশ করলো কৃষ্ণ-গুম্ফার গহ্বরে।

একজন শেরপার হাতে ছিল একটা শাদা নরম পাথর, যেটা দিয়ে খড়ির মত দাগ টানা যায়। গুহা-গহ্বরের দেয়ালে দেয়ালে সে শুধু দাগ দিয়ে যেতে লাগলো। পথ চেনার নিশানা।

বহুক্ষণ নিষ্ফল অন্বেষণের পর, তাদের কানে গেল অদ্ভুত আওয়াজ। মানুষের কথাবার্তা গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্ গম্ করে উঠছে।

সেই স্বর লক্ষ্য করে চলছে শেরপারা, হাতে ঝুলছে আলো! আর অন্য হাতে উদ্যত কুকরি।

কাছে গিয়ে তারা যা দেখলো, সে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য! কিশোর আর শান্তনু দুজনেই দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর তাদের ঘিরে আছে তিনটি বলিষ্ঠ চেহারা। আগন্তুক শেরপাদের দেখে তারা পিস্তল উঁচিয়েছে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

আকাশপারের দেশে

সুধাংশু ঘোষ

অমল পড়ছিল—'পৃথিবীর বহু স্থান হইতে "উড়ন্ত পীরিচ" দৃষ্ট হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অনেকের ধারণা, পীরিচগুলি মঙ্গলগ্রহ হইতেই আসিতেছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর অতি নিকটে আসিবে এবং পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইবে মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল, তখন সম্ভবতঃ অধিক সংখ্যক উড়ন্ত পীরিচ পৃথিবীর আকাশে উড়িতে দেখা যাইবে।' অমল ভাবল, ওদের একটায় চড়ে মঙ্গলে পাড়ি জমাতে পারলে বেশ হয়।

মাঠের ওপরে ছায়ায় ঢাকা গ্রাম। যেখানে অমলের দিদির বাড়ী। অমল চলেছে সরু পথ ধরে একা। প্রায়ই ত যায়। হঠাৎ অমলের চোখে পড়ল আকাশে বলয়-বেষ্টিত গম্বুজ। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে নেমে আসছে মাটির দিকে, যেন তাকেই লক্ষ্য করে। আশ্বিনের পরিষ্কার সূর্য্যালোকে ঝলমল করছে তার দেহ। অবাক হয়ে অমল চেয়ে রইল জিনিষটির দিকে; পালিয়ে যেতে ইচ্ছে থাকলেও, পা তার নড়ল না। এদিকে গম্বুজটি মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই একজন খেঁকাকায় ব্যক্তি অমলকে টেনে তুললে তার মধ্যে। অমল বুঝলে সে ধরা পড়েছে। তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে কে জানে! কিন্তু অমল ভয়ে চীৎকার করবার পূর্ব্বেই গম্বুজটি ভয়ানক বেগে সোজা আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ে গেল। অমলের দৃষ্টি হতে শ্যামল ধরিত্রী কখন সরে গিয়েছে। শুধু নীল আকাশ দেখা যায় বদ্ধ জানালা দিয়ে।

অমলের এবার মনে হল গম্বুজটি আর যেন উড়ছে না। কারণ, পৃথিবীর উড়ো জাহাজের মত গম্বুজটি গর্জ্জনও করছে না নড়ছেও না। এ যেন রূপকথার যাদু কার্পেট। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর আরোহীবাহী 'মিটিওর' উড়োজাহাজ অপেক্ষা এই গম্বুজে ওড়া অনেক আরামের। অমলের ভুল হয়নি—অমল উড়ন্ত পীরিচেই বন্দী।

উড়ন্ত পীরিচ ক্রমশঃই উঁচুতে উঠছে। তবুও অমলের মাথা ঘুরছে না। অমল জানে, পৃথিবীর বিমান-চালক ও আরোহীকে অনেক উঁচুতে উঠলে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে যতই উপরে ওঠা যায় ততই অক্সিজেনের অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু উড়ন্ত পীরিচটির নির্ম্মাণ-কৌশলই নিশ্চয় আরোহীকে সকল হাওয়ার স্তরেই শ্বাসকষ্ট হতে রক্ষা করে। এখন হতেই অমলের ধারণা হল, মঙ্গলের মানুষ পৃথিবীর মানুষ অপেক্ষা বিজ্ঞানে অনেক উন্নত। অমলের শ্বাসকষ্ট হয়নি অবশ্য, কিন্তু সে একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল, আর যখন চোখ মেলল, দেখল পীরিচটি আবার মাটি স্পর্শ করেছে। অমল এদিক ওদিক চেয়ে বুঝলে এ মাটি পৃথিবীর নয়, মঙ্গলের।

হ্যাঁ, মঙ্গলই ত', সেই মঙ্গলগ্রহ থাকে অন্ধকার রাত্রে, পৃথিবী হতে আকাশের গায়ে সাধারণতঃ লাল দেখায়। আর লাল দেখাত বলেই সুসভ্য রোমকগণ যুদ্ধের দেবতা মনে করে মঙ্গলকে ভয়ে পুজো করত। কারণ যুদ্ধ মানেই ত রক্তারক্তি, সব লালে লাল! মঙ্গলের সব কিছুই অমলের চক্ষে শুধু নূতন নয়, অদ্ভুতও ঠেকল। অমল এখন লক্ষ্য করল তার বন্দিকারীর, তার পরিবারবর্গের এমন কি কোন মঙ্গলবাসীর মাথায় একটুও চুল নাই। বিবর্তনের সঙ্গে নাকি প্রাণীর দেহ হতে চুলের ও লোমের পরিমাণ কমতে থাকে। যদি তাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে মঙ্গলবাসী পৃথিবীর মানুষ অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক, সুতরাং অধিকতর সভ্য ও প্রফেসর কার্মিভল-লোয়েল মনে করেন মঙ্গলে অতিশয় বুদ্ধিমান প্রাণীর অবস্থিতি খুবই স্বাভাবিক।

বিমানঘাঁটি হতে অমলকে যে মোটরগাড়ীতে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল তা বেশ ছোট এবং চলবার সময় সামান্য শব্দও করল না। রাস্তা রবারের ন্যায় পদার্থে তৈরী, পরিষ্কার, মসৃণ, কোথাও একটুও উঁচু-নীচু নয়। বাড়ীও ছোট, মঙ্গলের সব বাড়ীই ছোট এবং অপেক্ষাকৃত নীচু। বাড়ীগুলি ধাতুনির্ম্মিত এবং উজ্জ্বল কিন্তু তাদের উজ্জ্বলতা চক্ষুর পীড়াদায়ক নয়। কারণ প্রত্যেকেই নীলাভ, ধাতুর তৈরী হলেও বাড়ীগুলি শীতে অত্যধিক শীতল হয় না। কারণ সূর্য্য মঙ্গল হতে প্রায় চৌদ্দ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত হলেও মঙ্গলের উপরের বায়ুস্তর মাত্র বাট মাইল পুরু অথচ পৃথিবী ও সূর্য্যের ৯,২৫,০০০,০০ মাইল দূরত্বের মধ্যে প্রায় ৩০০ শত মাইলের বায়ুস্তর রয়েছে।

বাড়ীর প্রত্যেকে অমলকে ঘিরে দাঁড়াল। বেশ বোঝা গেল সকলেই খুব আশ্চর্য্য হয়েছে। গলিভারের মত অমল যেন অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছে—অবশ্য দেশটি লিলিপুটও নয় ব্রবডিংনাগও নয়। তবে মনে হচ্ছে এদের কারুর চেয়েই কম আশ্চর্য্যজনক নয়। বুদ্ধিমান বালক অমল বেশ শীঘ্রই মঙ্গলের ভাষা কতকটা আয়ত্ত

করে ফেললে, সারাটা মঙ্গলে একটি মাত্র ভাষা। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করতে অমলের কোনরূপ অসুবিধা হল না। শীঘ্রই অমলের নাম মস্ত খেলোয়াড় বলে মঙ্গলের সহরে, সহর ছাড়িয়ে দূর গ্রামেও পৌঁছে গেল। যাবেই না বা কেন? পৃথিবীর বালক হয়ে অমল অনেক উঁচু ও দূরপাল্লা লাফাতে পারে এবং সে মঙ্গলবাসী অপেক্ষা দ্রুত ছুটতে পারে। কারণ অমল শুধু মঙ্গলের যে কোন শিশু অপেক্ষা মাথায় উঁচু নয়—পূর্ণবয়স্ক কোনও মঙ্গলবাসীই পাঁচ ফিটের অধিক লম্বা নয়—পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক কম। যদি কেও পৃথিবীতে উচ্চে মাত্র দেড় ফুট লাফাতে পারে তাহলে সে মঙ্গলে কমপক্ষে চার ফুট লাফিয়ে উঠতে পারবে। পৃথিবীর সাধারণ খেলোয়াড় হয়ে অমল মঙ্গলে কতকগুলি রেকর্ড করে ফেললে!

উৎসুক দর্শকদের প্রশ্নবাণ এড়াবার জন্য গগুয়া এত দিন অমলকে বাড়ীতে রেখেছিল কিন্তু এখন অমল গগুয়ার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বাইরে যায়। গগুয়ার স্ত্রী যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা এবং বাচ্চাদের ব্যবহারও চমৎকার! অমল এদের সাথে মোটরে ঘুরে বেড়ায়। মঙ্গলে কত মজার জিনিষ। মঙ্গলে পৃথিবীর মত এত বেশী লোক নাই। বাড়ীগুলি প্রায়ই সবই একতলা। মাটির অভাব নেই বলে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা কলকাতার মত আকাশ দখল করবার হিড়িক মঙ্গলে নাই। সহর হউক বা গ্রাম হউক, বেশ সাজান—এখানে ওখানে মনোরম উদ্যান, দূর থেকে ছবির মত মনে হয়। অধিবাসিগণ বেশ সুশ্রী ও বলিষ্ঠ। মঙ্গলে লম্বা গাছ নাই বললেই চলে। সেখানে এক প্রকার শ্যাওলা খুব বেশী, মাঠে মাঠে শ্যাওলার চাষ হয়। ওই শ্যাওলাই মঙ্গলবাসীর প্রধান খাদ্য—পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণও আবিষ্কার করেছেন যে এক প্রকার শ্যাওলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। রাস্তাগুলি সবই সোজা। বালক-বৃদ্ধ নর-নারী সকলেই বেশ বিনয়ী। রাস্তায় মোটরযান আছে, তবে কোথাও ভীড় নাই। ধাক্কাধাক্কি নাই। পদচারিগণ ব্যস্ত বটে কিন্তু ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলে না—এরা শান্তিপ্রিয়, কেহ কলহপরায়ণ নয়। হাটবাজার আছে কিন্তু দরাদরি নাই। কোনও কোনও দোকানে মালিক নাই, তবে লোকেরা জিনিষ কিনে দাম একটি বাক্সে ফেলে দিচ্ছে—সেই বাক্স নিয়ে কেউ সরে পড়ছে না। রাস্তায় কচিৎ পুলিশের লোক দৃষ্ট হয়—অবশ্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য চৌমাথাগুলিতে পুলিশ আছে। উড়ন্ত পীরিচগুলি, অবশ্য যারা আকারে ক্ষুদ্র, রাস্তায় সাধারণ মোটরের মতই চলাফেরা করে। আকাশে ছোট-বড় অনেক পীরিচ, তারা অনেক রকমেরও, দূরপাল্লা ও কাছাকাছি উড়ে যাবার জন্য। মোটরযান ও উড়ন্ত পীরিচের অনেকগুলি কারখানাও অমল দেখল। একটি কারখানায় প্রতি দশ সেকেণ্ডে গড়ে একটি করে উড়ন্ত পীরিচ তৈরী হচ্ছে—আমেরিকায় ফোর্ড কোম্পানী গড়ে প্রতি সাত সেকেণ্ডে একটি করে মোটরকার তৈরী করে মাত্র!

প্রতি গৃহে কমপক্ষে একটি বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র রয়েছে। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে বিশেষ গোলমাল নাই, সুতরাং অমল ওখানে রেডিও শুনে ভারী খুশী। যখন পৃথিবীর পাশ দিয়ে উড়ন্ত পীরিচ উড়ে যায়, তখন তার আরোহিগণ স্পষ্ট শুনতে পায় পৃথিবীর বেতার প্রোগ্রাম। কিন্তু মঙ্গলবাসী অন্য কোন গ্রহের ভাষা জানে না—মঙ্গলবাসিগণ মনে করে সবগুলিতে না হলেও, বস্তুতঃ কতকগুলি গ্রহে তাদের মত মানুষ থাকা আশ্চর্য্য নয়। পৃথিবীর বেতার প্রোগ্রাম মঙ্গলবাসীর নিকট অবোধ্য। মঙ্গলে যে পশু দুধ দেয় দেখতে পৃথিবীর গরু-মোষের মত নয়, কিন্তু দুধ দেয় অনেক। মঙ্গলে চোর-ডাকাত নাই। মঙ্গলে রাজা নাই, সমগ্র মঙ্গলে একই শাসন এবং নির্ব্বাচিত শাসক। প্রত্যেক প্রান্তে স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমান এবং শাসকগোষ্ঠী নিজেদের জনসাধারণের সত্যিকারের সেবক ভেবেই শাসনকার্য্য চালায়। মঙ্গলবাসীরা মনে করে, তারা একটি উচ্চতর শক্তি দ্বারা পরিচালিত, তবে তারা কোনও ধর্ম্ম নিয়ে দলাদলি বা চেঁচামেচি করে না।

মঙ্গলবাসিগণ ভয়ানক শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করতে জানে। পৃথিবীর এটম ও হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক বোমাও তৈরী করতে পারে। তবে নিজেদের ধ্বংস করার জন্য তারা এরূপ ভয়াবহ সৃষ্টিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরী করতে চায় না। তারা আণবিক শক্তি দেশের মঙ্গলের জন্যই ব্যবহার করছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মঙ্গলের যান-বাহন কোথাও শব্দ করে না। কারণ এরা চলে আণবিক শক্তির সাহায্যেই। মঙ্গলবাসীদের ডুবো-জাহাজ নাই, এদের প্রয়োজনও নাই। মঙ্গলবাসীরা বলে, আমাদের গ্রহে শান্তি বিরাজিত এবং কোন গ্রহের প্রতি আমাদের লোভও নাই। বিশেষ করে সূর্য্য-পরিবারভুক্ত পৃথিবী আমাদের নিকটতম আত্মীয়। পৃথিবীর প্রতি মঙ্গলবাসিগণ সত্যই খুব বন্ধুভাবাপন্ন। তবে যে কোন গ্রহ থেকে মঙ্গলের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে সেই গ্রহের অধিবাসীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার ক্ষমতা মঙ্গলবাসীদের যথেষ্ট রয়েছে। মঙ্গলের ছেলে-মেয়েরা পারা থেকে সোনা তৈরী করতে জানে কিন্তু মঙ্গলে সোনা প্রচুর; সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরীর প্রয়োজন কোথায়? বাচ্চারাও এটম ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করার পদ্ধতি স্কুলে শেখে। কারণ বিজ্ঞানের প্রতি শাখার উপরই স্কুল হতেই তাদের কিছু কিছু দখল ঘটে। বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা এ-ও শেখে যে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে জীবের ধ্বংস অনিবার্য্য। মঙ্গলের স্কুল-কলেজে জীবকে, বিশেষতঃ মানুষকে, ভালবাসতেও শেখান হয়।

মঙ্গল আয়তনে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৭ মাইল, মঙ্গলের ৪২১৫ মাইল। মঙ্গলে সাগর আছে গভীর ও প্রশস্ত, নদীও ওখানে অনেক। মঙ্গলের মাটি লালচে, তবে বসন্তে মঙ্গলকে আকাশ হতে কতকটা সবুজ দেখায়। কারণ নূতন লতাপাতায় ও খাদ্য-শ্যাওলার প্রাচুর্য্যে মঙ্গল তখন ভরে ওঠে। মঙ্গলে মাত্র তিনটি ঋতু: শীত, বসন্ত ও শরৎ। অমলের ঘড়ি অনুসারে মঙ্গল নিজের কক্ষের উপর ২৪ঘণ্টা ও ৩৭½ মিনিটে একবার আবর্ত্তন সম্পন্ন করে। সেকেণ্ডে ১৫ মাইল বেগে মঙ্গল ৬৮৭ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে—পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসে ৩৬৫¼ দিনে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে। মঙ্গলের দুইটি চাঁদ—পৃথিবীর তো মাত্র একটি। একটি চাঁদ মঙ্গলকে ৩০ ঘণ্টার সামান্য একটু বেশী সময়ে একবার প্রদক্ষিণ করে কিন্তু অপরটি মাত্র ৭⅔ ঘণ্টায় এক পাক নিয়ে নেয়। ইহা ছাড়া আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণের জন্য মঙ্গলবাসী বেশ কয়েকটি

কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলের আকাশে সর্ব্বদাই উড়িয়ে রাখে। মঙ্গলে আবহাওয়ার পুর্ব্বাভাষে সামান্ত গরমিলও হয় না।

মঙ্গলে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালাও আছে—কয়ুচো ওদের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। মিষ্টি জলের ঝর্ণা ও অনেক মরুভূমিও আছে, তুষার-ক্ষেত্রও আছে। আকাশে মেঘও ওড়ে, বৃষ্টিও হয় সারা বছরই; বর্ষা বলে ঋতু নেই। মঙ্গলে অক্সিজেন নেই বললেই চলে। মঙ্গলের বাতাস নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাসেই প্রায় পূর্ণ। সামান্ত কার্বণ ও হাইড্রোজেন গ্যাসও আছে। মঙ্গলবাসীরা, এমন কি অমলও কিরূপে ঐ প্রায় অক্সিজেন শূন্ত বাতাস সেবন করে জীবিত আছে, ভেবে অমল কম আশ্চর্য্য হয়নি। গগুয়ার স্ত্রী অমলকে বললেন তোমাদের পৃথিবীতেও নিশ্চয় নানা প্রকারের আবহাওয়া আছে। পৃথিবীতেও বালুকাময় মরুভূমি ও তুষারভূমি কম নেই। মরুভূমি ও তুষারভূমির বৃক্ষ ও তৃণগুল্মাদির মধ্যেও অনেক পার্থক্য। আবার যে লোক পাহাড়-পর্ব্বতে থাকে তারা সমভূমিতে থাকতে কষ্টবোধ করে। আমরা এই আবহাওয়ায় থাকতে পারি এবং বেঁচে আছি। কারণ এখানে যা জন্মায় আমরা তাই খাই। তোমার কি এখানে শারীরিক কোন কষ্ট হচ্ছে?

নিশ্চয় না, অমল বললে।

কারণ কি? কারণ এখানে যা খাচ্ছ তাতে এমন পদার্থ আছে যা তোমাকে এখানকার আবহাওয়ায় বাঁচতে ও বাড়তে সাহায্য করছে এবং সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে ১৮০ ডিগ্রীর পার্থক্য থাকলেও তোমার বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না।

অমল বললে, মনে হচ্ছে মঙ্গলবাসীরা বিজ্ঞানে খুবই এগিয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানে আমাদের উন্নতির নমুনা ত তুমি স্বচক্ষে অনেক দেখলে। তোমাদের উঁচু বাড়ীগুলো আমাদের শক্তিশালী দূরবীণগুলো দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। দেখবে না কি? তোমাদের ঐ বাড়ীগুলো দেখলে মনে হয়, তোমরাও বিজ্ঞানে অনেক এগিয়েছ।

ভদ্রমহিলা অমলকে নিকটবর্ত্তী একটি মানমন্দিরে নিয়ে গেলে সেখানে একটি বৃহৎ দূরবীণের সাহায্যে—দূরবীণটির ব্যাস ৪০০ ইঞ্চি—পৃথিবীর বালক মঙ্গল থেকে দেখতে পেল পৃথিবীর বুকে একটি সু-উচ্চ অট্টালিকা। অমলের মনে পড়ল শিশু ভারতীর কল্পিত চিত্র—যাতে একটি শিশু অসীম আকাশের এক কোণে বসে গোলকাকৃতি পৃথিবীকে লক্ষ্য করছে।

অমল প্রশ্ন করলে, ওটা কি নিউইয়র্কের এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং?

নাম ত জানি না। গত বছর আমাদের জন দুই লোক এই বাড়ীর নিকটে কোথাও নেমেছিল কিন্তু নাম না জেনেই ফিরে এসেছে। কারণ, অত্যধিক সাহস দেখাতে গেলে ধরা পড়বার ভয় ছিল যে। বিদেশে সম্পূর্ণ অচেনা অজানাদের হাতে ধরা পড়া কি বিপজ্জনক নয়? এই ত সেদিন আমাদের জনৈকা মহিলা বৈমানিক পৃথিবীতে নেমে সেখানে একটি লিপিকা রেখে ফিরে এসেছে।

অমল বললে, ঐ চিঠি পড়েছি। পৃথিবীতে কেউ ওটা পড়তে পারেনি। ফিরে গিয়ে চিঠিটা পড়ে শোনাল।

অমল মঙ্গলে বেশ ছিল কিন্তু মাকে না দেখে আর কত দিন থাকবে? একদিন গগুয়ার স্ত্রী গলা জড়িয়ে ভারি গলায় বললে, তোমার কাছে কত আদর পাচ্ছি। মঙ্গলবাসীরা সবাই আমায় ভালবাসে। আমার আরও অনেক দিন মঙ্গলে বাস করতে ইচ্ছে। কারণ মঙ্গল শুধু সুন্দর দেশ নয়, অধিবাসীরাও বেশ শান্তিপ্রিয়। কিন্তু তবু মন চাইছে পৃথিবীতে ফিরতে। কারণ আমার মা সেখানে আমার জন্ত কত কাঁদছেন নিশ্চয়।

গগুয়ার স্ত্রী অমল চলে যেতে চাইছে শুনে খুব দুঃখিত হলেন কিন্তু দুঃখ চেপে বললেন, ভালবাসা—মা ও সন্তানের মধ্যে যে ভালবাসা—নিশ্চয় এখানে যা কিছু দেখছ সবার চেয়ে তা অনেক ঊর্দ্ধে। তারপর স্বামীকে ডেকে বললেন, অমল মার কাছে যেতে চাইছে। ওকে পৃথিবীতে রেখে এস।

গগুয়া উত্তর দিলে কিন্তু আমরা যে ওর ভাষা ভাল করে শিখতে পারিনি। পৃথিবীর ভাষা শেখবার জন্তেই ত ওকে এখানে নিয়ে আসা। যদি আমরা পৃথিবীকে ভাল করে জানতে চাই, এবং জানা উচিতও, তাহলে আমাদের উচিত ওখানকার অন্তত একটি ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করা।

অমলের কাছে আমরা ওদের একটি প্রধান ভাষা, ইংরেজী, কতকটা শিখেছি, অমলও আমাদের ভাষা বেশ শিখে ফেলেছে। এতেই আমাদের দুই গ্রহের মধ্যে প্রাথমিক সংবাদ আদান-প্রদানে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমরা স্বার্থপর নই। স্বার্থের জন্ত পৃথিবীর ছেলেটিকে কত দিন আর আটকে রাখবো?

এবারে অমল বললে, কিন্তু আমি যে এখনও যথেষ্ট বয়স্ক হইনি। যদি বলি মঙ্গলের ভাষা শিখেছি পৃথিবী লোকে আমাকে পাগল বলে উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, মা, আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে।

বৈজ্ঞানিক হয়ে উপযুক্ত যন্ত্র তৈরী কর, যার সাহায্যে পৃথিবী থেকে আমাদের সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে। পৃথিবীর থেকে সেই কথাবার্ত্তা শুনে আর তোমাকে অবিশ্বাস করবে না। আর পৃথিবীর লোককে বলো, ভুলো না যে, আমরা সৌর জগতের কোন গ্রহেরই শত্রু নই।

অমল ভারি গলায় বললে, তোমাকে ও তোমার উপদেশ কখনও ভুলব না মা!

* * * *

অমল যখন চোখ খুললে, দেখল মা তার মুখের উপর ঝুঁয়ে। মা বললেন, ঘুমের মধ্যে কি সব বকছিলে, অমল? অমল চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললে, আমি যে এক্ষুণি মঙ্গলে ছিলাম মা! মা অমলকে চুমু দিয়ে বললেন, বড় বৈজ্ঞানিক হবার চেষ্টা কর। চেষ্টা করলে মঙ্গলে হয়ত একদিন সত্যই যেতে পারবে।

নয়া পয়সার নয়া যাদু

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

নয়া পয়সার বাজারে নয়া পয়সার একটা খেলা না শিখলে চলে কেমন ক'রে বল? তাই তো আজ এখন একটা খুব মজাদার নয়া পয়সার ম্যাজিক শেখাচ্ছি। খেলাটা যদি ভাল ক'রে অভ্যাস ক'রে উপযুক্ত পরিবেশে দেখাতে পার, তবে যাঁরা দেখবেন তাঁরা খুবই অবাক হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

খেলাটাতে কী দেখানো হবে, তাই শোন আগে। প্রথমে

যাদুকর তার বাঁ হাতের চেটো খুলে দেখাবে তার দর্শকদের। এর পরে হাত মুঠো ক'রে ফুঁ দেবে আর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়বে :
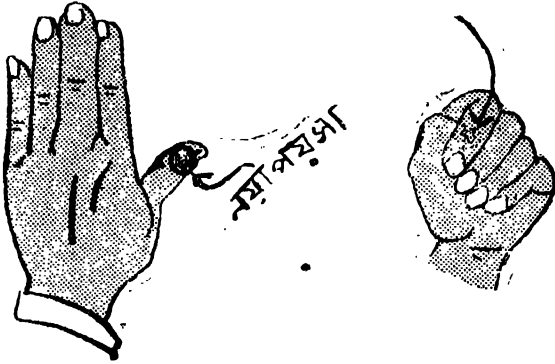
চিচিং ফাঁক,
চিচিং ফাঁক,
নয়া পয়সা আয়।
উই চিংড়ি,
ভুই চিংড়ি,
ব্রহ্মদৈত্য খায়।

মন্ত্র বলে হাত খুললে দেখা যাবে যে, যাদুকরের হাতে সত্যি সত্যিই একটা নয়া পয়সা এসে গেছে। এ দেখে কি দর্শকেরা অবাক না হয়ে পারবেন?

কেমন ক'রে এই খেলাটা ক'রবে তাই বলি এবার শোন। খেলা দেখানোর আগে গোপনে একটু ভেজা কাপড়কাচা সাবানের টুকরো লাগিয়ে রাখবে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখে আর এই সাবানের উপরে সেঁটে রাখবে একটি নয়া পয়সা। হাতের চেটো খুলে দর্শকদের যখন দেখাবে তখন নয়া পয়সা থাকবে পেছনের দিকে। কাজেই তাঁরা দেখতে পাবেন না। হাত মুঠো করার সময়ে বুড়ো আঙুলটাকে ক্ষণিকের জন্যে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেই আপনা থেকেই নয়া পয়সা খসে পড়বে মুঠোতে। হাত মুঠো করার সময়ে যদি হাতটা একটু আন্দোলিত করা যায়, তবে বুড়ো আঙুল ঢোকানো আর বের করা দর্শকেরা বুঝতে পারবেন না!

যাদুবিদ্যায় উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা জবাবের জন্ম উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ আমার সঙ্গে পত্রালাপ করতে পার A. C. Sorcar, Magician Post Box 16214, Calcutta-29 এই ঠিকানায়)

প্রান্তরের সুর

অশোককুমার চৌধুরী

আজও বুঝি বাজে সেই সুর…

ভোরের টুকটুকে লাল আলোর পর্দায় স্পষ্ট হল সিংহগড়। মারাঠা-মাতার অন্তর ভরে উঠল অদ্ভুত আনন্দে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ হয়ে এলো বর্ষণক্লান্ত মেঘের মত বিষণ্ণ-গম্ভীর। দূত ছুটল। মারাঠা-রাজা এলেন তাঁর ঘরে। এক মুহূর্তের জন্যে কি ভাবলেন মাথা। তার পর হঠাৎ দাবা খেলার আমন্ত্রণ জানালেন আগন্তুককে। আগন্তুক কৌতুক মনে করে খেলতে বসলেন। তার পর হেরে গিয়ে বললেন—কি বাজী চাও তুমি?

সিংহগড়। গম্ভীর সুরে কথাটা বলেই মুখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এ আদেশ রাখতেই হবে, মনে মনে বুঝলেন মারাঠা-রাজা। তবু তবু শেষ চেষ্টা করলেন,—কিন্তু ওটা যে এখনও মোগলদের হাতে।

তার জন্তেই ত আরও চাই, সিংহগড় আমার চাই-ই।

চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেলেন রাজপুরুষ। মনের আয়নায় খুঁজতে লাগলেন একটা মুখ, যে পারবে এই অসাধ্য সাধন করতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি···'তাক···কে', হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন মারাঠা পুরুষ, আবার ছুটল দূত। সেই ভাগ্যবান পুরুষ তখন কাজে ব্যস্ত, তাঁর ছোট ছেলের বিয়ে। রাজার ডাক পৌঁছল তাঁর কানে। ভেঙে দিলেন বিয়ে, ছুটে এলেন কর্ত্তব্যের ডাকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সারা রাস্তা চীৎকার করতে করতে এলো একটা 'কপারশিখ' পাখী। শুভাকাংখীরা বললেন, 'অশুভ লক্ষণ'। মারাঠাবীর হাসলেন—হোক, তবু কর্ত্তব্য বড়। এগিয়ে গেলেন তাঁর রাজার সামনে। অভিবাদন করে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে ধরলেন। 'আমার নয় ভাই, মায়ের প্রয়োজন'—রাজা বললেন।

কপালে পক্ষিশিখার মঙ্গলস্পর্শ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মারাঠা-রাজমাতা—'তুমি কি ওই সিংহগড় আমায় জয় করে দিতে পারবে'? এক মুহূর্ত্ত। না, তাও বুঝি না! ঘাড় নেড়ে মাথার শিরস্ত্রাণ রাজমাতার পায়ের কাছে রেখে বললেন—না, সিংহগড় আপনারই হবে।

—মারাঠার ধূসর, রুক্ষ, বন্ধুর পথে আবার উঠল ধুলোর ঝড়। চলেছে একদল পাহাড়ী যোদ্ধা। সামনে তাদের অধিনায়ক, ধীর, গম্ভীর, সদাহাস্যময়, অথচ কর্ত্তব্য-কঠোর। ওই দুর্গটা কাদের গো? মোগলদের না কি গো? ওতে কত লোক হবে গো? ওখানে যায় কি করে গো? এই রকম নানা প্রকার প্রশ্ন করছিল একটা চাষাভূষো মানুষ। এই হয়ত প্রথম দেখল অত-বড় দুর্গ, তাই অত কৌতূহল, সিংহগড়ের আশে-পাশের লোকেরা ভাবল!

—পাহাড়ী ঝর্ণাগুলোয় শেষ ঝিলিকটুকু কেটে মিলিয়ে গেল দিনের আলো। ঘনিয়ে এলো অন্ধকার, গাছের আড়ালে আড়ালে, ঝোপের ফাঁকে লুকিয়ে আছে তিনশো মারাঠা যোদ্ধা। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে বনের দিকে এগিয়ে এলো সেই চাষা। ফিস-ফিস করে সবাইয়ের কানে কানে কি কথা হল।

এখনও কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হবে। রাত গভীর হোক, ঘোড়ার ওপর চেপে চাপাগলায় বলে উঠল সেই চাষা। মাঘ মাস, প্রচণ্ড শীত, কাঁপন-ধরানো হাওয়া। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপ, তার নীচে তিনশো বীর, নির্ভীক, নির্ভয়। তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের বিষণ্ণ আভা তাদের কঠোর মুখগুলোকে আরও কঠোর করে তুলেছে।

এগিয়ে চলো সব, রাত্রির দ্বিতীয় যামের মাঝামাঝি আদেশ হলো। সিংহগড়ের দিকে এগিয়ে চলল তারা, তখন যদি সেখানকার কোন লোক তাদের দেখতো তা'হলে সেই নিতান্ত বোকা চাষীটাকে তাদের সর্দার দেখে সে নিশ্চয় ঘাবড়ে যেতো।

আলো-আঁধারীতে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশ-ছোঁয়া

দুর্গটা। মসৃণ, খাঁজহীন, প্রায় খাড়াই বিরাট পাঁচিলটা চকচক করছে চাঁদের আবছা আলোয়। কোন মানুষের পক্ষেই এ বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। নিয়ে এসো ওটা, আদেশ করলেন চাষারূপী মারাঠা বীর। খাঁচার মত একটা জিনিষ নিয়ে এলো ক'জন মারাঠা। খুলে দাও, খুলে দেওয়া হল খাঁচা। বেরিয়ে এলো চিত্রবিচিত্র যশোবন্ত। মারাঠা-বীর তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন নিজের মুক্তোর মালা, তারপর তার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল একটা দড়ির মই। মারাঠা-বীর আদেশ দিলেন, উঠে পড়।

অক্লেশে উঠতে আরম্ভ করল যশোবন্ত, গিরগিটীর মত। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের এ'ঘোরপাদ'গুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মসৃণ খাড়াই প্রাচীর বেয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, অত শিক্ষিত যশোবন্ত হঠাৎ কেন তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে নেমে এলো! অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হলো মারাঠাদের মধ্যে—না, না, আপনি যাবেন না সর্দারজী, এটা বিশ্রী সংকেত, তবুও কর্ত্তব্য-কঠোর মারাঠা-বীর। 'উঠে পড়, তা না হলে তোকে কাটব।' তিনি ভয় দেখালেন জন্তুটাকে—যশোবন্ত ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল দুর্গপ্রাচীরের ওধারে। শুধু ঝুলে রইল দড়ির মইটা।

এই, তুমি এদিকে এসো; মারাঠাবীর একজন বলিষ্ঠ, নির্ভীক মারাঠা-যোদ্ধাকে আদেশ করলেন, ভাল ভাবে বেঁধে এসো ওই মইটা।

আর একটু! আর একটু! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে তিন শ' লোক। দুর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে দু-একটা আলোর রেখা। গম্বুজে গম্বুজে তীক্ষ্ণচক্ষু প্রহরী। প্রাকারে প্রাকারে সশস্ত্র পাঠান প্রহরীর দল। খুব সাবধানে উঠতে হবে। একটু! আর একটু! হঠাৎ দাড়িওলা একটা মুখ ওপর থেকে মুখ বাড়াল, দেখতে পেল সেই যুবক মারাঠাকে। চীৎকার করতে গেল···করলেও চীৎকার—একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ মাত্র। মারাঠাবীরের অব্যর্থ লক্ষ্য তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে চিরদিন। দুর্গপ্রাচীর থেকে তার দেহটা ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ল—ধপ্।

যুবক বীর দড়ির মইটা ভাল ভাবে বেঁধে দেওয়ার পর, তিন জন বাছা বাছা যোদ্ধা নিয়ে সেই মইয়ের সাহায্যে দুর্গে ঢুকলেন মারাঠা-বীর। তাঁর মুখ পাগড়ীতে ঢাকা, হাতে তলোয়ার।

কিন্তু সেই দুর্গরক্ষকের চীৎকার ও পতনের আওয়াজ দুর্গ-রক্ষকদের সচেতন করে তুলল। গম্বুজে গম্বুজে জ্বলে উঠতে আরম্ভ করল মশালগুলো। কয়েক জন মোগল শান্ত্রী সেই মারাঠাবীরকে সামনে পেয়ে হত্যা করল। পড়তে পড়তে চীৎকার করে উঠলেন মারাঠাবীর; দুর্গ জয় করতেই হবে। তারপর তাঁর প্রাণহীন দেহটা ধপ করে মাটিতে পড়ল।

ইতিমধ্যে কিন্তু মারাঠা বাহিনীর দুর্গপথ খোলা হয়ে গেছে, ঢুকে পড়ল তারা, রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে চীৎকার করে উঠল 'হর, হর মহাদেও!' আকস্মিক আক্রমণে বিপর্য্যস্ত করে দিল এক হাজার দুর্গবাসীকে মাত্র তিন শ' সৈন্য। সৈন্যদের খড়ের ঘরগুলোয় আগুন দিয়ে দিল। তারপর জয়ধ্বনি দিল, 'হর, হর, মহাদেও'!

রাত্রি নিশীথে সেই আগুনের শিখা উজ্জল হয়ে উঠল। মারাঠা-রাজা দূর থেকে সেই আগুন দেখে মা'র দিকে চেয়ে বললেন, ওই দুর্গ এখন তোমার।

দুড়ুম! দুড়ুম! তোপধ্বনি হল সিংহগড় থেকে, এবার আর মোগল নয়, মারাঠারা করছে তোপধ্বনি। অন্তিম-শয়নে অভিভূত তাদের সর্দ্দারের মৃত্যুকে সম্মান জানাচ্ছে দুড়ুম! দুড়ুম!

সমস্ত মারাঠা জনতার মুখে কান্নার আভাস, কঠোর মারাঠা-রাজার চোখটাও জলে ভরে উঠল। সিংহগড় পেয়েছি কিন্তু সিংহ আমি হারিয়েছি, কান্না-ভেজা কণ্ঠে বললেন মারাঠারাজা, এক ঝাপটা হাওয়ায় কান্নার সুর উঠল বেজে।

আজও বুঝি বাজে সেই সুর ভগ্নদুর্গের প্রাকারে, শিলাপ্রাকারে, পর্ব্বতের কন্দরে, মহারাষ্ট্রের পথে-প্রান্তরে, হঠাৎ উদাস হওয়া চাষার মনে, পথচলা বাউলের অতীত-স্মৃতিমুখর গানে—মহারাষ্ট্র তোমায় ভোলেনি, তানাজী! ওগো মহাবীর তানাজী!

ভক্ত কবীর

বাসুদেব পাল

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে কবীর অন্যতম। কবীরের জন্মকাহিনী সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যথা:—কবীর ছিলেন এক ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র। ব্রাহ্মণকন্যা নিজের বৈধব্যের কলঙ্ক-কালিমা মোচন করবার জন্যেই সদ্যোজাত পুত্রকে কাশীর 'লহর-তালাব' পুষ্করিণীতে একটি পদ্মপাতায় শুইয়ে ভাসিয়ে দেয়। পরদিন অতি প্রত্যূষে নিমা নামে একজন জোলা-জাতীয় স্ত্রীলোক ও তার স্বামী নুরআলি ঐ পুষ্করিণীর ধার দিয়ে নিমন্ত্রণে যাচ্ছিল। সহসা নিমা তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে ঐ পুষ্করিণীতে জল পান করতে গিয়ে অকস্মাৎ এরূপ অভাবনীয় দৃশ্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ও স্নেহার্দ্র হ'য়ে উক্ত সদ্যোজাত কমনীয় শিশুটিকে স্ব-গৃহে নিয়ে গেল। অতঃপর জোলা-দম্পতি শিশুটিকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুটির নামকরণের জন্যে তারা একজন কাজীকে ডেকে আনলো। শিশুটির নাম-নির্ব্বাচনার্থে 'কোরাণ-শরিফ' খুলতেই সহসা কাজী সাহেবের দৃষ্টিপাত ঘটলো—'কবীর' শব্দের উপরে। সেই থেকেই শিশুটির নাম হ'লো, কবীর। কবীর আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, মহান, বৃহৎ বা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

কাশী হিন্দুপ্রধান স্থান। নিরু শেখের (কবীরের পালক পিতা) প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। কাজেই বালক কবীরের খেলার সাথী ছিল অধিকাংশই হিন্দু বালকেরা। কিন্তু তাদের খেলা সাধারণ খেলা ছিল না! ভগবৎ-পূজন ও ভগবানের নামকীর্ত্তনই ছিল তাদের খেলাধুলার বিষয়বস্তু।

কবীর জাতে জোলা বলে অনেকেই তাঁকে উপহাস করতো। কবীর কিন্তু তাতে আদৌ ক্ষুণ্ণ হতেন না। কারণ তাঁর কথায়:—

ধরণী আকাশ কী কারগাহ বানায়ী—
চন্দ্র সূরজ দুইনাল চালায়ী।

অর্থাৎ, এই পৃথ্বী ও নীল অখণ্ড আকাশকে ভগবান কারখানা বানিয়ে চন্দ্র-সূর্য্যরূপ 'মাকু চালাচ্ছেন অবিরত। কবীর লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু সরল জ্ঞান ও স্বচ্ছ বুদ্ধির বলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গভীর তত্ত্বের শাশ্বত-রূপকে সত্য ও মধুর করে তিনি প্রকাশ

করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় রাম-রহিম, কৃষ্ণ-করিম, কাশী-কাবা সবই একই! একের-ই ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন :—ময়দা জিনিষটি এক। কিন্তু তা থেকে আহার্য্য প্রস্তুত হয় বিভিন্ন প্রকারের। কবীরের সময়েই হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী হওয়ায় একের ধর্ম-প্রভাব অপরের উপরে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। মুসলমানগণ তখন দেশের শাসক। তাঁদের ধর্ম-প্রভাব ও গোঁড়ামির-প্রাবল্য রাজশক্তির বলে অত্যন্ত প্রকট। এ-হেন অবস্থায় দেশের সমাজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিজেদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সময়েই রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ 'এক ধর্ম-আলোড়ন তুলে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় করার এক মহান প্রচেষ্টার সূচনা দেখিয়েছিলেন।

কবীরের প্রভাব অনেক মহাপুরুষ ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আহমদাবাদের দাদু সাহেব কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কবীরপন্থী শিষ্যরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। হিন্দী রামায়ণ রচয়িতা তুলসীদাসও তাঁর বাণীমাধুর্য্যে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একদা বৃন্দাবনবাসিনী মীরা বাঈও কবীরের ভক্তিধারা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে মুগ্ধা হয়েছিলেন! গুরু নানক বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন করে অবশেষে কাশীতে উপস্থিত হয়ে কবীরের ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যাখ্যা শ্রবণে তন্ময় হয়েছিলেন। অযোধ্যার জগজীবন দাস কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎনামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া মালবদেশের বাবলাল বাবলালি সম্প্রদায়, বীরভান সাধু-সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, আলোয়ারের চরণদাস-চরণদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে কবীরের মহৎ উদ্দেশ্যকে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের ধর্ম্মব্যাখ্যার মূলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মের একটি সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা দেখা গেছে।

অপর দিকে মনকে পবিত্র, কলঙ্কমুক্ত না ক'রে কেবল বাহ্যিক গুরুগম্ভীর আড়ম্বরের প্রাবল্যতায় ঈশ্বর-দর্শন পাওয়া যায় না। এই বাণীই কবীর প্রচার করতেন। তিনি বলতেন,—

তীরথ-মে তো সব পানী হৈ
হো বৈ নহী কছু হায় দেখা।
প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,
বোলে নাহি বোলায় দেখা।

অর্থাৎ, তীর্থ তো খালি জল। আমি তাতে ডুব দিয়ে দেখেছি। ফল তো কিছুই হয় না? প্রতিমাকেও ডেকেছি, কোন সাড়া পাইনি!—

পুরাণ কোরাণ সববাত হৈ
য়া ঘটকা পরদা খোল দেখা।
অনুভব কী বাত কবীর কহৈ—
বহ সব হৈ ঝুঠী পোল দেখা।

পুরাণ-কোরাণ সব তো কেবল কথা। আমি পরদা খুলে তাদের আসল রূপ দেখে নিয়েছি! কেবল অনুভব করবার কথায় কবীর বলেছেন। আর সব মিথ্যা, নিছক ভ্রান্ত!

অকস্মাৎ মুসলমানগণ কবীরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিব্রত হ'য়ে রাজার কাছে নালিশ জানালো। দিল্লীর সম্রাট তখন সিকন্দরসা লোদী। তাঁরই আদেশে কবীরকে বন্দী ক'রে জৌনপুর দরবারে হাজির করা হ'লো। বজ্রগম্ভীর নিনাদে কবীরকে শুধোলেন সিকন্দরসা, 'তুমি হিন্দু না মুসলমান?'—সম্রাটের এ-হেন প্রশ্নের জবাবে ঈষৎ মৃদুহাস্যে কবীর বলেন,—

হিন্দু কহুঁ তো ম্যায় নহী, মুসলমান ভী নাহি।
পাঁচ তত্ত্বকা পুত্তলী গৈবী খেলে মাহি।

আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চভূতাত্মক পুত্তলিকা আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্যের খেলা খেলে চলেছে! তাই,—

হিন্দু ধ্যাবৈ দেহরা, মুসলমান হুঁ মসীত।
দাস কবীর তহাঁ ধ্যাবহী জঁহা দোনকী পরতিত।

হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যান করে। মুসলমান করে মসজিদে।—দাস কবীর সেইখানেই ধ্যান করে, যেখানে উভয়ের-ই প্রতীতি।

সিকন্দরসা লোদী সুচতুর, বুদ্ধিমান, কৌশলী-সম্রাট। অতএব তিনি সসম্মানেই কবীরকে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

কবীরের স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ। তিনি ছিলেন বনখণ্ডী বৈরাগীর কন্যা। তাঁদের এক পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। কবীর পুত্রটির নাম রেখেছিলেন 'কমাল' আর কন্যাটির নাম 'কমালী'। কমালী এক দিন কূপ থেকে জল আনতে গিয়ে কোন এক ব্রাহ্মণের জলের কলসীতে একটু জলের ছিটে লাগে। এতে উক্ত ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'য়ে কবীরের কাছে অভিযোগ করেন। কবীর সমস্ত ঘটনা হৃদয়ঙ্গম ক'রে, সহাস্যে ব্রাহ্মণকে বলতে থাকেন :—

পণ্ডিত তুম বুঝ পিয়পানী।
তোহে ছুৎ কহাঁ লপ্টানী?
জামাটিকে ঘরমে বৈঠে তামে সৃষ্টি সমানী।

হে পণ্ডিত, তুমি বুঝে-সুঝে জল খেও! এ জলে কোথা থেকেই বা ছুৎ লাগলো? যে মাটির ঘরে তুমি বাস করো, সেই মাটির সঙ্গেও তো সমগ্র পৃথিবীর সংযোগ রয়েছে! এই ভাবে কবীর সমাজশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মোল্লাদের মহামূল্য উপদেশ দান ক'রে, তাঁদের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করতেন!

একদা কবীর তাঁর প্রাণের জ্বালা জুড়াবার জন্যে কোন পরম-পুরুষের সন্ধানে তিব্বত, আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান, বুখারা, ইরাণ প্রভৃতি বহু দেশ পর্য্যটন ক'রে শেষে গোরকপুরের কাছে হিমালয়ের পাদদেশে 'মগহর' গ্রামে উপনীত হন এবং তথায়ই নির্জ্জনবাসে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেন। প্রবাদ আছে, কাশীতে দেহ রাখলে নাকি শিব হয়। তেমনি মগহরে মরলে মানুষ নাকি গাধা হয় পরজন্মে। তাই কবীর কাশী ত্যাগ ক'রে মগহরে বাস করতেই সুরু করলেন। শিষ্যদের তিনি বলেন, 'ভগবানের সাধন-ভজন না ক'রে কেবল স্থানমাহাত্ম্যে দেহ ত্যাগ ক'রে মুক্তিলাভ আমি চাই না। যদি আমার ভগবৎ-প্রেম অটুট থাকে তবে মগহর থেকেই আমার মুক্তিলাভ আমি আদায় ক'রে নেব!'

অবশেষে একদিন মগহরে এক নদীর তীরে পুষ্পশয্যা ক'রে কবীর তাঁর শেষের গান গাইলেন,—

গাউ গাউরী দুলহনী মঙ্গলচারা।
মেরে গৃহে আয়ে রাজারাম ভতারা।

অর্থাৎ, হে কন্যাযাত্রিগণ! তোমরা আমার বিবাহের মঙ্গলাচার গান করো। কারণ; আমার ভর্ত্তা রাজারাম আমার গৃহে এসেছেন! এই ব'লেই কবীর নিজের শরীরে বস্ত্রাচ্ছাদিত ক'রে বিছিন্ন

হ'য়ে গেলেন। তারপর সেই দেহের সংকার নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিস্তর বাকবিতণ্ডা সুরু হ'লো। হিন্দুরা দাহ করতে চায়। মুসলমানেরা চায় কবরস্থ করতে। কিন্তু, অকস্মাৎ বস্ত্রাচ্ছাদন উন্মুক্ত করতেই এক অত্যাশ্চর্য্য, অভাবনীয় ও অলৌকিক দৃশ্যের তীক্ষ্ণছটায় সমবেত ভক্তবৃন্দ পরম-বিস্ময়ে পাষাণবৎ দাঁড়িয়ে থাকল। সেই বস্ত্রের তলদেশে কবীরের শবদেহের পরিবর্ত্তে প'ড়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পরাশি।

সেই পুষ্প ভাগ ক'রে কতকগুলি পুষ্প হিন্দুগণ কাশীতে দাহ ক'রে, বর্ত্তমানের কবীর চৌরা—নামক স্থানে সেই ভস্ম সমাধিস্থ করে এবং অর্দ্ধেক পুষ্প মুসলমানগণ 'মগহরে' কবরস্থ করে।

সেই থেকেই কাশীর 'কবীর-চৌরা' ও 'মগহর' উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে চিরস্মরণীয় হয়ে বিরাজ করছে।

ঐতিহাসিকদের মতে:— কবীরের জন্ম—১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু —১৫১৮ খৃষ্টাব্দে।

গিবনের আত্মজীবনী

সুনীলকুমার নাগ

ইংরেজী ভাষায় ত বটেই এবং গোটা পৃথিবীর আত্মজীবনী—সাহিত্যের ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা গিবনের (Edward Gibbon 1737—1794) আত্মজীবনী।

গিবনের মৃত্যুর দু' বছর পর তাঁর এক বন্ধু এ বইখানা প্রকাশ করেন। কাগজ-পত্র ঘেঁটে দেখা গিয়েছিল যে, গিবন তাঁর আত্মজীবনীখানা ছটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখে রেখে গেছেন।

গিবনের বইয়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম কারণ, তাঁর জীবনের জানা ঘটনাগুলি হুবহু তাঁর আত্মজীবনীতে স্থান পেয়েছে দেখা যায়। কাজেই নিজের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলার বদনাম তাঁকে কেউ দিতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, গিবনের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি The Decline and Fall of the Roman Empire—এর যেমন তার ব্যক্তিত্বটি ফুটে এই আত্মজীবনীতেও সুরু থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত আমরা সেই ব্যক্তিত্বের আস্বাদ পাই। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা, জানবার অনন্যসাধারণ ইচ্ছা আর সেই সঙ্গে সব মিলিয়ে সাফল্যের মূলমন্ত্রস্বরূপ নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে সাঙ্গ করবার জন্য একটা অনড়, সুদৃঢ় ও স্থির প্রতিজ্ঞার পরশ আমরা এ আত্মজীবনীর সর্বত্র পাই। গিবনের আত্মজীবনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উনি যে ভাবে নিজে তাঁর বিরাট ইতিহাস একেবারে গোড়ার কথা থেকে আরম্ভ করে রচনা শেষ করা প্রকাশ করা এবং সে বইয়ের জনপ্রীতি, বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং নিজের নাম ধাম খ্যাতি প্রভৃতির কথা বলে গেছেন, খুব কম লেখকই সাধারণতঃ এ কাজ করে থাকেন।

একেবারে ছেলেবেলা থেকে ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত গিবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অক্সফোর্ড ছাত্রাবস্থায় গিবন একবার ক্যাথেলিক হ'য়ে যাবেন মনস্থ করেছিলেন। যাতে ক্যাথেলিক না হ'য়ে যান সেই জন্য ওঁর বাবা গিবনকে পাঠিয়ে দেন জেনেভায়। একেবারে বাল্য বয়স থেকেই গিবন নানা রকম বই পড়তে আরম্ভ করে দেন। কি পড়া উচিত না অনুচিত, এ কথা বলে দেবার কেউই ছিল না। গিবনের রুচি ক্রমশঃ ইতিহাসকেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে। "My indiscriminate appetite subsided by degrees into the historic line, and arrived at Oxford with a stock of erudition that might have puzzled a doctor,......এ হলো গিবনের যখন মাত্র পনেরো বছর বয়স। কাজেই রোমান সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক যে অজ্ঞাতসারে কত দীর্ঘ দিন ধরে তৈরী হচ্ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

ক্যাথেলিক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য বাবা গিবনকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। এখানে পাঁচ বছর থাকেন উনি। ফরাসী ভাষাটাও গিবন এই সময় ভালো ভাবে শিখে নেন। পড়াশুনাটাও একটা নিয়মের আওতায় আনবার চেষ্টা করলেন। অনেকে বলতেন, পড়ার সঙ্গে লিখে গেলে পঠিত বিষয় দীর্ঘ দিন মনে থাকে। কিন্তু গিবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকটা ডাঃ জনসনের মত। অর্থাৎ কি না লিখবার কোনই প্রয়োজন নেই—পর পর দুবার পড়লেই জিনিসটা ঠিক ঠিক মনে থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডে থাকবার সময়েই গিবনের জীবনে প্রথম প্রণয়ের সূচনা হয়। যদিও এ একটা নিতান্ত ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী, কিন্তু তবু সেদিনের কথা স্মরণ করে প্রৌঢ়, জ্ঞানবৃদ্ধ ঐতিহাসিক লিখছেন: I am rather proud that I was once capable of exalted sentiment.

স্থানীয় এক পুরোহিতের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে গিবনের প্রেম জন্মে। মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্য গিবন কম চেষ্টা করেন নি—কিন্তু বাবার অমতের জন্য শেষ পর্যন্ত এ বিয়ে হলো না।

কয়েক বছর গিবন সৈনিকের কাজ করেছিলেন। সৈন্য বিভাগ থেকে ছুটি পাবার পরই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন রোমে। রোমে এসে After a sleepless night, I trod, with a lofty step, the ruins of the Forum; each memorable spot, where Romulus stood, or Jully spoke, Q Caesar fell, was at once present to my eye. ১৭৬৪ খৃঃ-অব্দের পনেরোই অক্টোবর রোমে বসেই গিবনের মনে রোমান সাম্রাজ্যের একখানি ইতিহাস লিখবার প্রেরণা আসে।

রোম থেকে দেশে ফেরবার পাঁচ বছর পর ১৭৭০ খৃঃ-অব্দের নভেম্বর মাসে গিবন তাঁর The Decline and Fall of the Roman Empire লিখতে আরম্ভ করেন। বইখানা লেখা শেষ হয় ১৭৮৭ খৃঃ-অব্দের ২৭শে জুন। এ বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় সারা দেশে, সে সম্বন্ধে গিবন লিখছেন: I am at a loss to describe the success of the work......My book was on every table; nor was the general voice disturbed by the barking of any profane critic. গিবন তাঁর বইয়ের শেষ খণ্ড প্রকাশ করার পর আত্মজীবনীতে লিখছেন: Twenty happy years have been animated by the labour of my history; and its success has given me a name, a rank, a character in the world to which I should not otherwise have been entitled.
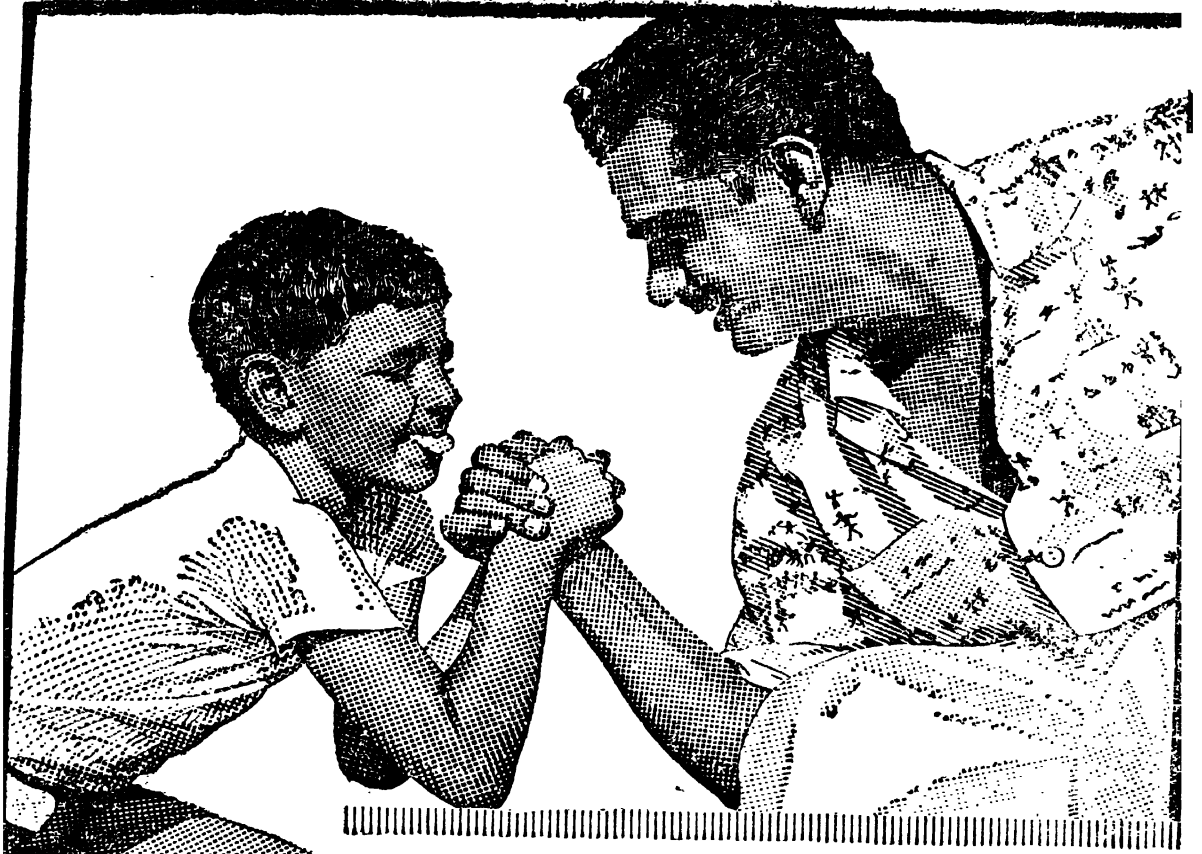
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP
হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
L. 278-X52 BG
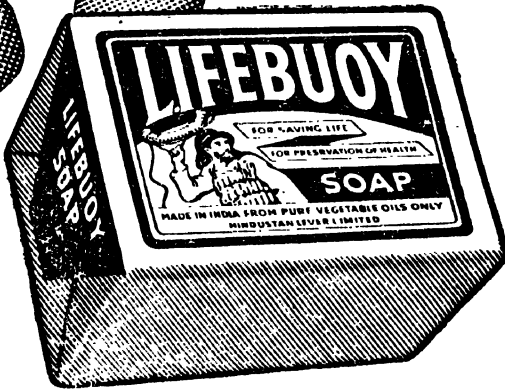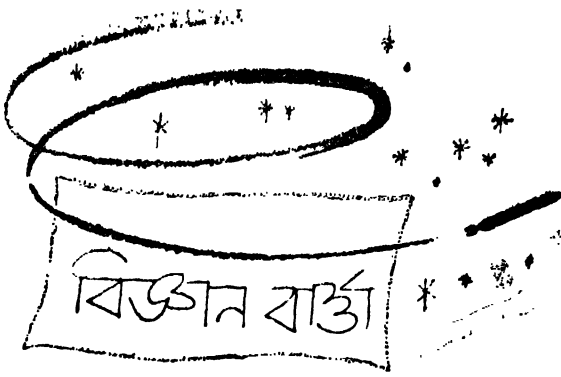
ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গোল্ড রাশের গল্প নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। পৃথিবীর এক অঞ্চলে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেল, অমনি দলে দলে লোক যাত্রা করলো সেই অঞ্চলের দিকে। উদ্দেশ্য স্বর্ণ আহরণ। এবার আর গোল্ড রাশ নয়—সোনার চেয়েও দামী হীরের কথা বলছি। আগামী যুগে একদল মানুষ হয়তো হীরের সন্ধানে মহাশূন্যে যাত্রা করতে পারে। আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী সম্প্রতি চাঁদের দেহে হীরের খনি থাকার সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছেন। এই বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ জি পি কুইপার (Dr. G. P. Kueiper) এবং তাঁর কর্মস্থল উইসকনসিনের ইয়ার্কেস (Yerkes) গবেষণাগারে। তিনি জানিয়েছেন যে, চাঁদের উপরে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ সমূহের কতকগুলি দেখতে অনেকটা বিরাট বড় আইসক্রীমের কোণের মতো এবং সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরের খনির যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। ন্যাশনাল অ্যাকাডামি অফ সায়ান্সের এক আলোচনা-চক্রে বিজ্ঞানী কুইপার তাঁর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে, চাঁদের দেহে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ সমূহকে প্রধানতঃ দু ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মুখ হলো বাটির মতো, সাধারণতঃ বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, মহাশূন্য' ভ্রমণকারী দেহপিণ্ড সমূহের আঘাতের ফলেই এই শ্রেণীর জ্বালামুখ সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্বালামুখ সমূহ হলো কোণাকৃতি। চাঁদের অভ্যন্তরের গ্যাসের বিস্ফোরণের ফলেই তাদের সৃষ্টি। এই বিস্ফোরণ যখন হয় তখন চাঁদ যথেষ্ট গরম ছিলো। টেলিস্কোপের দ্বারা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্বালামুখ সমূহের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণই ডাঃ কুইপারের আবিষ্কারের প্রধান ভিত্তি। অবশ্য হীরে যে সেখানে আছেই, তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। তার নিশ্চিত ধারণা অর্জনের জন্য মানুষকে প্রথমে চাঁদের দেহে অবতরণ করতে হবে।

* * *

বিজ্ঞানের কর্মধারা এবং প্রগতির সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করবার জন্য আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের চেষ্টার অন্ত নেই। এ বিষয়ে বিজ্ঞানকর্মীরা গভীর ভাবে চিন্তা করেন। প্রতিষ্ঠানগত ভাবে তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চান এবং বিজ্ঞানের কল্যাণকৃৎ পথে তাঁরা কি ভাবে কাজ করছেন, তা সকলের সামনে উপস্থিত করবার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহী। বিজ্ঞানের প্রগতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং মানব-কল্যাণে সেই সব সম্প্রসারিত জ্ঞানের প্রয়োগ। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানকর্মীরা সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিনিধিরূপে জ্ঞানের এই সম্প্রসারিত পথে কাজ করেন। সুতরাং মানব-কল্যাণে তাঁরা কি করছেন বা না করছেন, তার এক উপলব্ধি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা দায়িত্বও তাঁদের আছে। তার একটা খোলা দিক এ দেশে আমার চোখে পড়েছে—গবেষণা-মন্দির বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্বকে স্বীকার করে এগিয়ে যেতে চান। কিছুদিন আগে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ম অ্যাণ্ড হোম উইক পালন করা হোল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিজ্ঞানের বিভাগটি খুবই বড় এবং তাঁরা কৃষি-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রের নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। বছরে তাঁরা একটি সপ্তাহ ব্যয় করেন, কি করছেন তা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করার জন্য। এই সপ্তাহে তাঁদের সমস্ত গবেষণা-মন্দির জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকেরা এবং কৃষি-বিজ্ঞানের কর্মধারায় উৎসাহী লোকেরা এসে দেখে যান যে তাঁদের কল্যাণে বিজ্ঞানীরা কি ভাবে প্রকৃতির জটিল জ্ঞানভাণ্ডারের উন্মোচন ঘটাচ্ছেন। এর থেকে তাঁরা নিজেরা যা করছেন, তার পেছনে অবস্থিত মূল সত্যটি উপলব্ধি করবার পথের সন্ধান পান, তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রকৃতি-রাজ্যের মৌলিক জ্ঞানভাণ্ডারের সম্মেলন ঘটে। চারি দিক ঘুরে দেখে,—বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনে আস্থার ভাব জাগে,—সকলে বিশ্বাস করতে পারেন যে, তাঁরা যা করছেন তার উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের সত্যদৃষ্টি নিয়ে একদল কর্মীও কাজ করে যাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে এঁদের জ্ঞানভাণ্ডারের সহায়তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন না।

কর্ণেলে একটা সপ্তাহের শেষ পালন করা হোলো অভিভাবকদের দিন হিসাবে। এ আরেক ভাবে জনসাধারণের কাছে নিজেদের কর্মধারা উপস্থিত করার আয়োজন। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য এখানে পাঠাচ্ছেন,—কি ভাবে তারা এখানে থাকে, কি ভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারা এগিয়ে চলেছে তা একটি সপ্তাহ শেষে তাঁরা নিজেরা এসে দেখে যান। কিছু জানার থাকলে এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে অভিভাবকেরা তা জানতে পারেন। প্রশ্ন করে তাদের সন্দেহ এবং ঔৎসুক্য নিরসন করতে পারেন—সম্ভব হলে নতুন কিছু পরামর্শও দিতে পারেন। সকলের সঙ্গে এই রকম যোগাযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে মঙ্গলকর। এর মধ্যে দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে।

M. I. T অর্থাৎ ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন? কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে এক মর্যাদাপূর্ণ আসনের অধিকারী। 'মে' মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা দিন ছিলো তাদের 'ওপন হাউস' যে কোন লোক সেদিন তাদের শিক্ষা ও গবেষণা-মন্দিরের কর্মধারা ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। হঠাৎ সেদিন গিয়ে পড়েছিলাম বোষ্টনে—গিয়ে শুনলাম সেদিনই M. I. T-এর 'ওপেন হাউস'। অন্যান্য কাজ ফেলে চলে গেলাম M. I. T। জনসংযোগের দিন সেদিন—সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখার এবং তাদের কর্মধারা এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক সুযোগ ঘটনাচক্রে মিলে গিয়েছে, এ হারানো উচিত নয়।

আমার এতো কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের দেশেও প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং গবেষণ-মন্দিরের জনসাধারণের কাছে নিজেদের এই ভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা থাকা উচিত। বেশী নয়, বছরে একটা কি দুটো দিন তারা এই ভাবে জনসাধারণের জন্য আলাদা করে রাখতে পারেন। অনেকে হয়তো বলবেন—এতে অনেক অসুবিধা আছে। এর জন্য সময়ের প্রয়োজন, তাছাড়া জনসাধারণ সব সময় উৎসাহী না-ও হতে পারেন। আমার ক্ষুদ্র ধারণা কিন্তু অন্য,—মনে হয় বহু লোকই এতে উৎসাহী হবেন এবং স্কুল কলেজ থেকে ছাত্ররাও দল বেঁধে এসে খ্যাতনামা বিজ্ঞান-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেদিন শুধু গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার পরিচয় সকলের সামনে খুলে ধরা। নতুন কিছু করবার জন্য এবং দেখাবার জন্য সময় ব্যয় করবার দরকার নেই। যা আছে তাই কেবল একটু সাজিয়ে গুছিয়ে সকলের সামনে রাখা। প্রথমে হয়তো লোকসমাগম কম হতে পারে। কিন্তু মনে হয় ক্রমেই জনসাধারণ এতে উৎসাহী হয়ে উঠবেন এবং এই ভাবে গবেষণা-মন্দির এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে জনসংযোগ বেড়ে যাবে। সাধারণ লোক গবেষণা-মন্দির সমূহের কার্য্যকলাপের ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠবেন। এর সঙ্গে দেশের আর একটি মস্ত বড় উপকার হবে—এর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘটবে বিজ্ঞান-চেতনার সম্প্রসারণ।

'ওপেন হাউসে' আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। এরা নিজেদের কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান-দুনিয়াটাকে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরতে চায়—বিজ্ঞান-জগৎটাকে সঠিক ভাবে লোকের চোখের সামনে উপস্থিত করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের পেছনে প্রকৃতির কি অলৌকিক রহস্য বিরাজ করছে তা লোকের চোখের সামনে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত করা এবং বিজ্ঞান-রাজ্যের অজানা রহস্যের সঙ্গে লোককে পরিচিত করে দেওয়াই হলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

'ওপেন হাউসের' দিনে—নানা রকম পরীক্ষামূলক জনপ্রিয় বক্তৃতাবলীরও আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশেও 'ওপেন হাউস' জাতীয় কোন কিছু অনুষ্ঠান করতে হলে এদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে—কারণ ম্যাজিক দেখানোর স্বভাবটা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। বিজ্ঞানের কোন কিছু পরিবেশন করতে গেলে এমন কিছু আমরা উপস্থিত করতে চাই, যাতে লোকের তাক লেগে যায়। এই কলটা টিপলাম—একটা অদ্ভুত কিছু হয়ে গেল। লোকে বাহবা দিলো, আর পাঁচজনকে ডেকে এনে দেখাল। এর কিন্তু একটা অত্যন্ত খারাপ দিকও আছে। এর ফলে লোকে ভুলে যায় যে বিজ্ঞানের পরিবেশটা তার আপন পরিবেশ এবং কিছুটা তার নিজের হাতে গড়া পরিবেশ। বিজ্ঞানকে সে অলৌকিক ভাবে—সসম্ভ্রমে দূরে রাখে। বিজ্ঞান-চেতনার সম্প্রসারণ ঘটাতে গিয়ে এই ভাবে বিজ্ঞান পরিবেশ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ সাধারণ লোককে বিজ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্র থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোক বিজ্ঞানের আপন পরিবেশ সম্বন্ধে খুবই কম সচেতন—সুতরাং সেই অবস্থায় সরল সহজ সত্য পরিবেশন করার পরিবর্ত্তে ম্যাজিক দেখানোর প্রচেষ্টার ফলাফল খুবই মারাত্মক। সুতরাং মনে হয়, রাজসিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তে সাধারণ বিজ্ঞান-চেতনার সম্প্রসারণ এবং নিজেদের কর্মধারা ব্যাখ্যার দিকে যদি দৃষ্টি রাখা হয়, তাহলে মনে হয় 'ওপেন হাউস' দিন উদযাপনের জন্য কোন অসুবিধারই সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় এবং তার প্রস্তুতিতে সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কম।

* * * *

দেশের একটা খবর এদেশের পত্রিকাতে আমার চোখে পড়লো। নতুন করে তা আবার আপনাদের পরিবেশন করছি। রঙ প্রস্তুত করবার জন্য বোম্বাইয়ে এটিক ইনডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড (Atic Industries Private Ltd.) নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারখানা খোলা হয়েছে গত ১ই এপ্রিল। এর নির্ম্মাণে সময় লেগেছে দু' বছর এবং এর জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই কারখানায় নীল, কালো, বাদামী, অলিভ, হলদে, কমলা ইত্যাদি নানারকম রঙ প্রস্তুত করা হবে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং অতুল প্রোডাক্টস লিমিটেডের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটিক ইণ্ডাষ্ট্রিসের জন্ম হয়েছে। বহু প্রকার শিল্পসম্ভারের মধ্যে রঙ হলো একটি—যার জন্য স্বাধীন ভারতবর্ষকে অন্য দেশে সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং নতুন এই শিল্প প্রতিষ্ঠান যে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের মর্য্যাদা সম্প্রসারিত করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বারিঝরা আষাঢ়ে

কাকলী চট্টোপাধ্যায়

এবারেও আশা যে ছিল মনে
বারিঝরা আষাঢ়ে দু'টি রক্তগোলাপ মোরা
দেব দু'জনে।
দেবে তুমিও
দেব আমিও,
দেব দু'জনায় ভালোবেসে
দু'জনে ; বুঝি হ'ল না শেষে
হায়, সেই দেওয়া নেওয়া,—
নিরালায় দু'টি কথা কওয়া,
আজ মনে হয় তোমা হ'তে তুমি যেন মোরে
সরায়ে দিয়েছ বহু দূরে ;
তাই তো আমার দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত ঝড়ে।
হৃদয়-শাখার স্বপ্ন-বকুল পথপ্রান্তে ঝ'রে পড়ে।
এস সে ফুল কুড়িয়ে নিতে
আমায় দিতে।

শচীন বিশ্বাস

একটু কাঁদ। কেবল আমারই জন্যে একটু চোখের জল ঝরুক তোমার। তুমি পৃথিবীর মমতা দিয়ে ভরেছো। ভালবাসা পেয়েছো। আমি মমতা পেতে চাই, আর ভালবাসা।

আসলটা বুঝা যায়নি আমার। কেন না, আমার জন্যে এক জনও কেঁদেছে। আমার চলে যাওয়া তার চোখের জল টেনে এনেছে। আমি যেনো ভুলে চলে যাই।

ফুল নাই বা ফুটলো জীবনে। আচমকা একটা ফল ফলতে পারে না কি? আমি স্বপ্নের ফল দেখি। একটা মুহূর্তের জন্যেও পৃথিবী থমকে দাঁড়িয়ে আমার চলে-যাওয়া পথের দিকে কি তাকিয়ে থাকতে পারে'না? তুমি পৃথিবীর মমতা পেয়েছো, তুমি একটু স্তব্ধ হও।

আর তুমি একটু কেঁদো,—আমার জন্যে চোখের জল ফেলো।

হু-হু করে গভীর রাতের বাতাস বয়ে যায়। মহানগরীর পাঁচথানা বাড়ির উপর দিয়ে মাথায় ধাক্কা খেয়েও সে বাতাস এসে আছড়ে পড়ে এ বাড়ির জানলায়। বড় জানলাটা খোলা থাকলে ঘরের ভেতর ঢোকে বাতাস। ঘরের ভেতর ঢোকে আর খাতা-বই-পত্তরের পাতা উড়তে থাকে। আলগা পাতাগুলি ও পাশের দেওয়ালে গিয়ে জড়ো হয়। দেওয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডারের মাসগুলো ভীষণ ভাবে ছটফট করে। সময় যেন দ্রুত চলে যেতে চায়—আরও দ্রুত। মে মাসের আজ উনিশ আর বারটা দিনও অপেক্ষা ক'রে যেতে চায় না। ও-পাশের খাটের মাথার উপরে এবড়ো-খেবড়ো ক'রে গুটোনো মশারিটা এলোপাথাড়ি ওঠা-নামা করে।

গ্রীষ্মের গভীর রাতের বাতাস বয়ে যায়। এত বাতাসেও ঘাম মরে না গায়ের। কপালের প্রতিটা শিরা জেগে ওঠে। পেশীগুলো দপ-দপ করে। ঘাম জমে কপালে, নাকের ডগায় আর বুকে, পিঠে, ঘাড়ে। এত বাতাস, তবুও গুমোট-গরম কাটে না একটুও।

বিলাস ইজিচেয়ারের মধ্যে পড়ে পড়ে ছটফট করে ঘামে। তবুও ওঠে না।

বিলাস। শ্যামবাজারের বিখ্যাত মজুমদার-বংশের শেষ সলতে।

অবশ্য এখনও তার আলো দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কেন না, যেগুলো একবার জ্বলেছিলো তারা এখনও তেলে-জলে দপ-দপ করে ক্ষণিক আলোর রশ্মি বিস্তার করে আছে। দেবীশংকর মজুমদারের জীবন ও যৌবনের সার্থক উত্তরাধিকারের অভাব নেই, সেই জন্যই সর্বশেষ সন্ততির দিকে আজও কেউ বড় একটা তাকায় না। প্রয়োজন কোন দিন হবে ব'লেও মনে হয় না। অন্ততঃ বিলাসের তাই ধারণা। এ ধারণা তার কাছে অভিমানের হ'লেও মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয় বলেই বেঁচেছে বিলাস। না হ'লে বিলাস নামটি যখন একটা ব্যঙ্গ হ'য়ে উঠলো পাড়ায়, পাড়া থেকে বে-পাড়ায়, তখন দেবীশংকরের সর্বশেষ পুত্র হয়ে সহ্য করতে পারতো কি করে? সহ্য করতো না হয়ত। হয়ত অনেককে সে গুলী করে মারতো। কিন্তু তাকে ব্যঙ্গ করে কেউ মারা গেছে, এমন অপবাদ কেউ তাকে দিতে পারবে না। তার অতি-বড় শত্রুও না।

সে ব্যঙ্গের পাত্র। আশ্চর্য! মানুষের ঘৃণাকে কোন্ গুণ থাকলে উপেক্ষা করা যায়? ভেবে দেখা হয়নি বিলাসের, এত দিন সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর পেয়েও সে ভাবেনি। নিজের সম্বন্ধে এতটুকুও ভাবে'নি। অথচ সে তো ঠিক উঠেছিলো সূর্য্যের মত না হ'লেও তার ওঠার মধ্যে দীপ্তি ছিলো না কি? না হ'লে স্বপ্ন আর আশা ওর জীবনকে ঘিরে ধরবে কেন? কিন্তু বাড়তে না বাড়তেই মেঘে-ঢাকা সূর্য্যের দিকে লোকে যেমন ক'রে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়, তেমনি ওর দিকেও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়েছে। আর দেবীশংকরের ছোট ছেলে বিলাস নীরবে সহ্য করেছে সে অপমান। অবজ্ঞা।

অযত্ন-বর্ধিত চুলগুলি কপালে এসে আছড়ে পড়েছে। বিলাস গভীর মমতা ঢেলে নিজের চুলগুলি সরিয়ে দিলো। যেন নিজের চুল নয় এগুলি। এই ত সেদিনের কথা। মাত্র ক'টা দিন আগেও যদি আর একটা কপালে অমনি ভাবে চুল উড়তো স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকতো বিলাস। এই চেয়ে থাকাই তার বিলাস। মুখোমুখি চেয়ে থাকাই তার আভিজাত্য।

একটু কাঁদ। আমারই জন্যে একটু কাঁদ তুমি।

নড়ে-চড়ে বসলো বিলাস। মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটে যায় যা পরে ভেবে দেখলে নিজেরই কেমন বিশ্বাস হয়'না। এই বিলাসই কি এত অনুনয়—এত আর্তস্বর জীবনে কখনও শুনেছিলো? শোনেনি। যে ভারতী সেন ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো তার মুখেও শোনেনি। নন্দিতা নন্দীর মুখেও না। সেখানে শোনেনি, কেন না তাদের ছিলো জীবনের আশা—আর পাখি বসাকের মুখে শুনলো, কেন না এখানে মৃত্যুর হতাশা।

আমি আর থাকছিনে—থাকবো না। আর এ বিশ্বাস আমাকে বড় পীড়া দেবে যদি জানতে হয় আমি ছিলামও না। কোন দিন থাকতে চাইনি। তোমার বেদনার অশ্রুর মধ্যে আমি থাকার ভাষা শুনতে চাই। আমারই জন্যে তুমি একটু কাঁদ।

বিলাস চমকে ওঠে। কতো দিন পরে আবার ওদের কথা মনে পড়লো। ভারতী সেনকে মনে পড়লো। পাখি বসাকের পাশে। এর মধ্যে কি ভালগারিটি আছে? ভারতী শুনলে হয়ত বলবে, আছে। তুমি নোংরা, তাই আর একটি অভিজাত মেয়েকে বসিয়েছো ঐ নোংরা গলির মেয়েটার পাশে। এত সাহস পাও তুমি?

সাহস না পাবে কেন বিলাস? তুমি মেয়ে নও? পাখি কি মেয়ে নয়? মেয়ে। নারী। এই ত তার বড় পরিচয়। যে সুধা ঢালতে পারে। বিষও। সময়-বিশেষে বিষও সুধা। কেন না, আমি কি শুধু পুষ্টিই চাই, ক্ষয় চাইনে? ক্ষয় করতে না পারাটা যে আমাকে হতভাগ্য করে তোলে। সকলেই ক্ষয় করে। টাকা। দেহ। মন—

কি যা-তা বলছো বিলাস! তোমার শিক্ষা ব্যর্থ। ভারতী সেন নিশ্চয়ই নাক কুঁচকাবে।

ব্যর্থ? না ভারতী! কেন না এ শিক্ষা কেউ দেয় না। এ শিক্ষা আমার পেশীতে, রক্তে, আর থমকে মাথায় একটা টোকা দেয় বিলাস, আর এখানে, বুদ্ধিতে। ব্যাপারটা একটু নাটকীয় হয়। তা হোক। তবু যদি একটু বোঝে ভারতী সেন। বুঝলো না। ওর মত একটি ডালহেডেড মেয়ের পক্ষে অবশ্য বোঝবার কথাও নয়। ও ভয় পেয়েছিলো। বিলাসের ক্ষয় করার প্রবল বাসনা বুঝি বা ওর দেহের উপর এসে আছড়ে পড়লো হাউ নন্‌সেন্স। একটু ঠোঁটজোড়া এগিয়ে দিলে আর একটু বুকে মুখ গুঁজতে দিলেই কি ক্ষয়ের পথগুলো সব আলগা হয়ে পড়লো নাকি? তা হয় না কোন পুরুষের। বৈশ্বানর যে আপন অগ্নিতেজে দগ্ধ হয়েছিলো,—কেন? হ্যাঁ, তার বদলে যদি একটা চড় মারতো ভারতী সেন, খুসী হতো বিলাস। বুঝতো, না, ভারতী সেনেরও কিছু দেওয়ার আছে। কিন্তু তা ও করেনি। কেবল ভয়ে পালিয়ে গেলো। নিছক ভয়ে—বোকামি নিয়ে। বিলাস হাসলো, দেবকী হ্যাজ স্লেপ্ট এ্যাওয়ে ফ্রম মাই ক্যাটাল গ্র্যাস্‌প। ভালো হয়েছে। বেঁচেছে ভারতী সেন। এম-এ পাশ করে কোন বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ারকে বিয়ে করেছে। আজ এই মুহূর্তে একটিমাত্র প্রশ্ন তাকে করতে ইচ্ছে হয়, কেমন আছো ভারতী সেন!

ভারতী সেন হয়ত বলবে, খুব ভালো আছি বিলাস! গাড়ি-বাড়ি, গয়না-শাড়ি, সোসাইটি, আভিজাত্য,—আর স্বামীর সোহাগ, ছেলেপুলে আর কি?

এমন মেয়েকে জিজ্ঞেস করাও বৃথা। যে আর কিছু চায় না, তাকে ওর জায়গাতেই থাকতে দাও। কিন্তু এমন কি হয় না? হতে পারে না? সুখ সত্যিই নেই বিলাস, মাত্র এইটুকু বুঝেছি। কেন নেই একটু বলবে?

এমন হ'লে বেশ হয়। কিন্তু ওরা বলবে না। বলতে ভয় পায় ওরা। পাছে পেছনের টুকু হারায়। কিছু হারাতে রাজি নয় ওরা। কেন না পেয়েছে যে সামান্যই। ওটুকু হারিয়ে রিক্ত হওয়ার সাহস কোথায় সামান্য একটি মেয়ের? স্বার্থপর সে।

কিন্তু এই পাখি? একটু কাঁদো। আমারই জন্যে একটু চোখের জল ফেলো তুমি।

ওপাশের দেওয়ালে সেই থেকে হ্যাংগারটা, কেবলই খট-খট শব্দ করছে। যেন ওর চেতনা রয়েছে। ও যেন কিছুর সাক্ষী হতে চায়—বিলাসের বেদনার সাক্ষী থাকবে সে।

কিন্তু ও কি ভুলতে চাইছে কিছু? পাখি বসাক কে? পাখি নামটি ওর দেওয়া। বলেছিলো, তুমি পেছনের, তোমাকে ভুলতে পারিনি, কিন্তু ভোলা উচিত নয় কি? তাই তুমি পাখি। অলকা নামটা ভুলে যেতে হ'বে যে তোমার।

পাখি তখন মুচকি হাসে। কবেই তো ভুলে গেছি, তোমাকে পেয়ে ভুলেছি। তুমি তো সমাজের, তোমার ছোঁয়ায় আমি সমাজের স্পর্শ পাই। শিক্ষার আর আভিজাত্যের। অহংকার করি। অহংকার কর। কিন্তু সেদিন অমনি ক'রে ভেংগে পড়লে কেন? অমনি করে বললে কেন?

তারও জন্তে তুমি দায়ী। তুমি বদলী। আমার কথা তুমি না শুনবে কেন? জানবে না কেন আজও আমি অভিসম্পাত দিই বাবাকে? বাবাকে আর সমাজকে। আমার নিশ্বাসে যদি আগুন থাকে তবে ওরা পুড়বেই একদিন। ওরা জ্বলে-পুড়ে খাক হ'য়ে যাবেই; তুমি দেখো।

এইটি তার একমাত্র অহংকার। এ জীবনের সবই যখন ধুয়ে-মুছে গেছে, মান-সম্মান, সামাজিক মর্যাদা সব, তখন ঐ একটি মাত্র গর্ব। সচেতন জিঘাংসা। পাখি বলে, তুমি ক্ষয়ে যাচ্ছো, এতে আমি আনন্দ পাই। আমার কাছাকাছি তোমাকে দেখতে পাই বলে। বুঝছো?

ব্রেভো! বিলাস ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। আবেগে উচ্ছ্বাসে ওর মাথাটা টেনে আনে বুকের উপর। গন্ধতেলের একটা উগ্র ঝাঁঝ

লাকে লাগে। সেই জন্যেই তো ওদের থেকে তোমাকে এত বড় ক'রে দেখি। অথচ ভদ্রপাড়ার মেয়েরা এটা বুঝতে পারে না। তাল কেটেছে ননসেন্সগুলো। ওরা জাগাতে পারে না কোন পুরুষের চেতনাকে। কেবল জীবন দিতে চায়। আরে, একটা মাংসপিণ্ড হাতে নিয়ে বিলাস মজুমদারের কোন্ কর্মে লাগবে, বলো?

পাখি আবার হাসে। অদ্ভুত সুন্দর করে হাসে।

কিন্তু ওর জীবনেও বেদনা আছে। উপর থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই এতটুকু। সকলকে বলাও ত যায় না সে কথা। টাকা দিয়ে স্ফূর্তি করতে এসে কেই-ই বা ছিঁচকাঁদুনি শুনতে চায়? কেউ না। তেমন কাউকে পায়নি অলকা। অথচ সে বলতে চেয়েছে, শুনাতে চেয়েছে, ও তাদের ক্ষমা করেনি। ওর স্বামীকে আর সরকারের বড়ো অফিসার, ওর বাবাকে ও ব্যঙ্গ করে। ওর নির্বিকার সমাজকে ও অভিসম্পাত দেয়। মাত্র এইটুকুই ওর বক্তব্য।

বিলাস কিন্তু আরও জেনেছে। শুনতে বেশ ভালোই লেগেছিলো তার। বিলাস পাখি বসাকের মধ্যে নিজের জীবনের সমর্থন পায়। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, কেউ বন্ধু-বান্ধব, সমাজ-সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে জানলে ওর আনন্দ হয়। ও নিজেও তো তাদের কেউ নয়। জ্ঞান হওয়ার সংগে সংগেই নিজের ভেতরকার একটা মাতাল খেয়াল ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ধরা যে পড়েনি, বাঁধা যে পড়েনি, সংসারের আর পাঁচটা লোকের মত, এর জন্যে মনের গহন কোণায় কি বেদনা নেই? আছে হয়ত। কিন্তু আফশোস আর করে না ও। কেবল সে সাথী খোঁজে। নিজের জীবনের কাছাকাছি এক জনকে পেতে চায়। অলকাকে ঠিক এইজন্যেই ওর এত ভালো লাগে।

তাই শুনছে সে। মন দিয়ে শুনেছে অলকার জীবনের কয়টি কথা। সে-ও একদিন একজনের মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলো। ওর দেহ-মনে সেদিন জোয়ারের কল্লোল সুরু হ'য়েছিল। ফুলে ফুলে ফুলে উঠেছে ঢেউ। ঢেউ-এর পর ঢেউ, তাই দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলো পাড়ার কলেজে-পড়া সুকান্ত বসাক। অলকাকে সে কাছে ডেকেছিলো, কাছে নিয়েছিলো। বিখ্যাত পুলিশ-অফিসারের মেয়ে সে ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললো। সুকান্তর কাছে সে ভরসা পেয়েছে। পড়াশুনো পড়ে থাকলো। জীবনটাই যদি একজনের হাতে তুলে দিতে পারে সে, কি হবে ছাই কতকগুলো আজে-বাজে বুলি মুখস্থ করে?

এই জন্যেই ওর পড়াশুনো বন্ধ হ'লো। আর তাতে খুসিই হ'লো অলকা। মা-মরা মেয়ে অলকা বাবার কথা শোনেনি, দাদার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, বৌদির উপদেশকে করেছে ব্যঙ্গ। জীবনটা ও কোন ভাবেই গলা টিপে হত্যা করবে না। মিথ্যে হ'তে দেবে না ওর প্রেমকে।

সেই কথাটাই একদিন সে শুনিয়ে দিলো সুকান্তকে। আমাকে তুমি উদ্ধার কর। বাবা-দাদার সংসারে এক মুহূর্তও আমি থাকবো না। অলকা সুকান্তর বুকে মাথা রেখে আশ্রয় খোঁজে।

আচ্ছা, কেন? বিলাস উৎসাহ দেখায়।

সুকান্ত এমনিতে খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান। কিন্তু বিয়ে? বাবা মা কি এ বিয়ে স্বীকার করে নিতে পারবেন? একটু বেশ দমে যায় সে।

কিন্তু সে কথা অলকা শুনবে কেন? আর শুনলে যে তখন চলবে না অলকার।

বললাম, এখন তো পিছু-পা হ'লে তোমার চলবে না? আমাকে অত কাছে টানলে কেন তখন? একটু দূরে রাখলে তো পারতে? সুকান্তর মুখের একেবারে কাছে মুখ এনে অলকা ছোট ক'রে বলেছিলো, আমি যে মা হ'তে চলেছি।

বিলাস থম্‌কে চেয়ে থাকে অলকার মুখের দিকে। অলকা একটু থেমে বলে, তার পর এক দিন সুকান্তর হাত ধরে দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম, আর পেছনের সব ক'টা দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেলো। সুকান্তর মনে জোর ছিলো, সে বললো, ঠিক আছে তোমাকে নিয়ে আমি নতুন বাসা বাঁধবো। নতুন বাসায় কেবল তুমি আর আমি—কেমন?

বুকটা সেদিন যেন একটু কেঁপে উঠেছিলো অলকার। মাথার ভেতরটা একটু ঝিম-ঝিম করে উঠেছিলো বৈ কি। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ,—রহস্যের অন্ধকারে হাতড়ে অলকা কূল-কিনারা দেখতে পায়নি। এক ভরসা সুকান্ত। অলকা বললো, আমি ওর হাত ধরে অন্ধকারেই এগিয়ে চললাম। ভুললে চলবে কেন, আমি যে তাকে ভালবাসি।

একটু থেমে অলকা বললো, তা আলো জ্বলেছিলো বৈ কি? জ্বলেছিলো, কিন্তু তা কত দিন আর থাকলো? যে আলো এক দিন সামনে জ্বলেছিলো, দপ করে তা নিবেও গেলো। পৃথিবীটা মনে হলো বন-বন করে ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে। আর আমি সেই ঘূর্ণীপাকে ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়লাম সেখান থেকে যত দূরে তাকালাম—কোন স্থানেই আমার স্বামীকে দেখলাম না। সে তখন বাবার সুপুত্র হয়ে বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। বুঝলাম, আমাকে আর ভালো লাগে না সুকান্তর। কিন্তু বিলাস, ভেবে দেখো, তোমাদের ভালো লাগা যদি এমনি খেয়ালী হয়, আমাদের প্রাণটা কোথায় ঠাঁই পায়? বল? পাখি হাসি-হাসি মুখ করে বলেও মনে হয় সে যেন কাঁদছে। তার সারা দেহ-মন যেন অপরিসীম বেদনায় দুলে দুলে উঠছে। বাবার আশ্রয় থেকে আগেই বঞ্চিত হয়েছি। তোমাদের এমন সমাজ, আমাকে কোন বাঁচার পথই বাতলে দিতে পারলো না বিলাস! তাই এই পথ,—মৃত্যুর পথ ছাড়া আর কি-ই বা গ্রহণ করতে পারি বল? এই ভাবেই মৃত্যুর দিকে চলেছি।

এই অলকার কাহিনী। তার পর পাখি। বিলাস এমন কিছু মাথা ঘামায় না পাখির অতীত জীবন নিয়ে। ওর অভিশাপ আর ওর অভিমান দুটোই সমান হাসির ব্যাপার। ওর প্রেমের কাহিনীও সস্তা এক প্রেমের উপন্যাসের কাহিনীর মত। অন্য কেউ এ কাহিনী বলতে এলে মাঝপথেই বিলাস হয়ত থামিয়ে দিতো তাকে। কিন্তু পাখিকে সে থামাতে পারেনি। পাখিকে ওর নিজের চাইতেও অসহায় মনে হয়। কেবল সায়াপরা পাতলা অরগ্যাণ্ডির একটা ছোট ব্লাউজ গায়ে যে নারীদেহটা বিলাসের বুকের উপর পড়ে পড়ে সেদিন কেঁদেছিলো, তাকে দেখে বিলাসের মনে হ'য়েছিলো, পাখির বুকেও সত্যি যন্ত্রণা আছে। তাই সে পাখির পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো, আদর করে চুলগুলি নাড়াচাড়

ক'রেছিলো অনেকক্ষণ। সেই মোহাচ্ছন্ন তন্দ্রায় ঢুলু-ঢুলু রাতটা অনেক দিন মনে থাকবে বিলাসের।

বিলাস আবার একটু নড়ে-চড়ে বসতে চাইলো। দেহটা ভার—মাথা ভার হয়ে আছে। বিলাস ইজিচেয়ারেই পড়ে থাকে। বাতাস সমান তালে হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে—ঠিক আগের মতই। বিলাসের হঠাৎ মনে হলো, বাতাসে যেন কা' আর্তস্বর ভেসে আসছে। জগৎশুদ্ধ সবাই যেন একটু অশ্রুর জন্যে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে,—আমার জন্যে একটু কাঁদ তুমি। বিলাস যেন স্পষ্ট শুনতে পেলো একটি স্বর, জীবনে কোন মানুষই তো তোমাকে ধরতে পারলো না; একবার এই মানুষটির জন্যে যদি একটু কাঁদতে পার, জীবন তোমার ভরে যাবে।

তবুও পারে না বিলাস। কোন দিন কারো জন্যে তার চোখে জল আসেনি। কান্নার কথা শুনে মাঝে মাঝে হাসি পায় বিলাসের। টাকা দিয়ে স্ফূর্তি করতে গেছে সে। জ্বালা জুড়ুতে গেছে। কাঁদতে যায়নি। বোকা মেয়ে! তুমি কাঁদতে বল কা'কে? পাষাণের বুকে কি করুণা থাকে? বল?

করুণা! কথাটা কয় বার মনে মনে আওড়ায় বিলাস। কাকে সে করুণা করবে! করুণার পাত্র সে কি নিজেই নয়? কি পরিহাস! এক যন্ত্রণাকাতর নোংরা গলির হতভাগ্য মেয়ে বিলাসের কাছে চায় করুণা! একটু অশ্রুর জন্যে আকুতি জানায়। আর বিলাস সভ্য সমাজের ভদ্র মানুষ, তার জন্যে এতটুকুও করুণা দেখাতে পারলো না!

বিলাস ভেবে দেখলো পাওয়া যায় না। কেউ-ই পারবে না। ওখানে কি মনের ব্যবসা করতে কেউ যায়? যায় না। নতুবা ওর ঐ শেষ ক'দিনের কথা কয়টি তো আজও মনে আছে, এই তো আমাদের জীবন-বিলাস, অত্যাচারের ডিপো। কবে শুনবে আমি মরেছি। মরাই ভালো,—দৈহিক মৃত্যুই। মনের কথা ছেড়েই দাও। দৈহিক মৃত্যুই তাড়াতাড়ি চাই আমরা। যৌবন চলে গেলে যে বেঁচে থেকেও মরা আমরা। মরণ তার থেকে ভালো নয়?

কারো মুখে এমন ক'রে মরণের কথা শোনে নি বিলাস। ভারতী সেন মরতে চায়নি। শুক্লা চ্যাটার্জি মরতে চায়নি। মরতে চায়নি নন্দিতা নন্দীও। কুৎসিত চেহারা নিয়েও সে বেঁচেই থাকতে চেয়েছে। শুনা যায়, তারও জীবনে বিয়ের ফুল ফুটেছে। বিলাস ভেবে দেখে ঐ নন্দিতার জন্যে বরং একটু কাঁদা যায়। সেই তো সত্যিকার করুণার পাত্রী। রক্ত শরীরে রইলো, মাংস থরে থরে সাজানো থাকলো। যৌবন তার আলোর রশ্মি ছড়ালো অথচ জীবনে ছটফটানি এলো না! কী ব্যর্থ জীবন, কী সস্তা জীবন!

পুরুষ কি এমন জীবন সহ্য করবে? পুরুষ মাত্রেই নয় অবশ্য। ক্ষয়ে-যাওয়ার সাহস অনেকের থাকে না। রিক্ত হ'য়ে যাওয়ার আনন্দ অনেকে পায় না।

অথচ সে ক্ষয়ে গেলো। রিক্ত হলো। জীবন ধরে কেবল হারালো। ওকে তো অনেকেই দিতে চেয়েছিলো। যৌবনের যন্ত্রণার কাছাকাছি তো অনেকে আসতে চেয়েছিলো। ধরতে পারলো না বলেই তো ভারতী সেন পালিয়ে গেলো। শুক্লা চ্যাটার্জি পালিয়ে গেলো, কেউ অপমান করে গেলো, কেউ কাপুরুষ বলে অবজ্ঞা করলো। নন্দিতা তো রীতিমত গালাগালিই করেছে তাকে। ওর নাকি ব্যর্থতার বড়ো জ্বালা। বিলাসকে ধরতে পারলো না, বাঁধতে পারলো না বলে জ্বালা। এ-ও এক হাসির ব্যাপার। বিলাস সেদিন হাসতে হাসতেই বলেছিলো নন্দিতাকে, তোমার সম্পদ বলতে তো ঐ দেহটা। তাও আবার কুৎসিত বিড়ম্বিত—

রাগে ফেটে পড়েছিলো নন্দিতা।

বিলাস হাসতেই থাকে, কিন্তু তাতে এতটুকু আরামও যে তুমি দিতে পারনি নন্দিতা, তা যদি জানতে। কেউ-ই পারে না। তুমি কেন, কোন মেয়ে পারে না।

কেন পারে না? রাগে কাঁপছিলো নন্দিতা নন্দী।

ছেলেরা দেহ চায় না।

মন?

মন চায় না।

তবে?

যন্ত্রণা।

কী সাংঘাতিক তুমি বিলাস! নন্দিতা নন্দী সেদিন কেঁদেছিলো। রাগে দুঃখে অভিমানে। ব্লাউস ছিঁড়ে, শাড়ি ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করতে চেয়েছিলো। তাতেও রাগ পড়ে নি, জ্বালা মেটে নি। যা-তা ভাষায় বিলাসকে গালাগালি করেছিলো নন্দিতা নন্দী। এই তোমাদের স্বরূপ নন্দিতা। আবরণ আলগা করতে পেরেছো, এই জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিই।

নন্দিতা সেই যে পালালো আর আসে নি। কোন দিনও আসবে না জানে বিলাস। যার কাছ থেকে কিছুই পেলো না, কেনই বা ঘুরবে সে তার পেছনে পেছনে?

আর এক মেয়ে এই পাখি বসাক। আবার একটি আর্তস্বর শুনতে পায় বিলাস। জন্ম নিলাম—মৃত্যু হলো। মাঝের ক'টা দিন কারো মনে এতটুকু ছাপ পড়লো না আমার,—আমি থাকলাম না, ছিলাম না—দুই গাল বেয়ে তার অশ্রুর বন্যা নামলো। ফুলে ফুলে উঠলো তার সারা দেহটা। বড় কষ্ট, মৃত্যুর চেয়েও এ বড় কষ্ট, তুমি বুঝবে না বিলাস!

কাঁদ, আমার জন্যে তুমি একটু কেঁদো বিলাস! আমারই জন্য।

গভীর রাতের শান্ত পৃথিবী এখন ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। ঝির-ঝির—মৃদু মৃদু—শা-শির-শির বাতাস। একটু যেন মাদকতার স্পর্শ রয়েছে। তন্দ্রা আসে,—দেহ-মন ক্লান্ত হয়। মাথার শিরাগুলির দপ-দপ ভাব কেটে যায়। তন্দ্রা আসে।

ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছে পৃথিবী। বিলাস যেন অস্পষ্ট কা'র স্বর শুনলো। একটা যেন গানের কলি,—বেশ মিষ্টি।

—তোমরা শান্ত হও। তোমরা যারা ঘুমতে পার নি—তোমরা যারা যন্ত্রণা পাচ্ছো। পেয়েছো। যারা মানুষের মন পাও নি। তোমরা যারা নিজের মন পাও নি। তোমরা শান্ত হও। ঘুমোও। এ হাওয়া মায়ের স্নেহ, এ হাওয়া প্রেয়সীর প্রেম। সুধা। অমৃতের আস্বাদ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমই অমৃত। ঘুম মহাকালের অকৃপণ দান। তুমি নিজেকে এ দান থেকে বঞ্চিত ক'রো না, পৃথিবী স্নেহের হাত বুলোচ্ছে, প্রেমের স্পর্শ দিচ্ছে।

—তোমরা হতভাগা, তোমাদের কোন করণীয় নেই। পৃথিবীর

কোন প্রয়োজনেই তুমি এলে না। তুমি তোমার নিজের কোন প্রয়োজনেও আসনি। তবুও ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার জাগ্রত পেশীগুলি এখন শিথিল হোক। তোমার ভেতরকার যে অপদেবতাটি তোমাকে কোনো দিনও শান্তি দিলো না, সে কয়েক মুহূর্তের জন্যেও তোমার দেহ ছেড়ে চলে যাক।

পৃথিবী তোমার দেহ-মনে স্নেহের হাত বুলোচ্ছে, প্রেমের স্পর্শ দিচ্ছে।

তন্দ্রার আবেশে তুমি ঢলে পড়। তোমার জন্যে পৃথিবীর করুণা আছে, মমতা আছে। এই মহাকালের অকৃপণ দান—প্রকৃতির অকৃপণ দান। তুমি তো সুখ চাও না, যন্ত্রণা চাও। তুমি যে আনন্দ চাও না, বেদনা চাও। কিন্তু তুমি যে ঘুমও চাও। তোমার মন বলছে তুমি চাও। না হলে তুমি পাগল হয়ে যাবে যে! তুমি পাগল হয়ো না, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। স্নেহ-প্রেমের স্পর্শ লাগছে।

—অতীত ভুলে যাও। গত কাল বিস্মৃত হও। বেদনা ভুলে তুমি বিস্মৃতির কোলে ঢলে পড়ো।

কিন্তু কে কাঁদে না?

—কাঁদে। ওকে কাঁদতে দাও। ও যে তোমার থেকেও হতভাগা। ও কাঁদবে না? ও যে তোমার থেকেও দীন-রিক্ত। জীবনে সে কিছুই পায়নি, আরও পেতে চেয়েছিলো, তাই সে হতভাগা। ও পৃথিবীর সুখের আস্বাদ পেতে চেয়েছিলো, পায়নি বলে কাঁদছে। ওর অন্তরাত্মা মানুষের ঘুমন্ত ঘরের দরজায় দরজায় করুণা-ভিক্ষা করে ফিরছে। একটু ভালবাসা চায় সে। আর, মানুষকে সে ওর জন্যে একটু কাঁদতে বলে।

না, তুমি উত্তেজিত হয়ো না। তন্দ্রা তোমার ভেঙ্গে যাবে। তুমি ঘুমোও।

প্রকৃতির অকৃপণ দান ঝরছে।

নতুন বৌদি বিলাসকে এখনও বোধ হয় ভালো করে চেনেনি। এই তো সে দিন সে এ-বাড়ীর বধূ হ'য়ে এসেছে। এসেই সে হরে চাকরটাকে সকালের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বাবুর ধমকানি প্রত্যেক দিন সকালেই তার ভাগ্যে জুটে আসছিলো। বধূ সেদিন নিজের চোখেই দেখে ফেলেছিলো। সেই থেকেই তার এ নব পরিকল্পনা। বিলাস প্রথমত রাজি হয়নি। বাড়ির কারো সংগে তার যোগ থাকুক, এ সে চায় না। কিন্তু এ বধূটি ছাড়বার পাত্রী নয়। একটিই তো মাত্র দেবর—তারও মন সে পাবে না, কেন সে দূরে দূরে থাকবে? বিলাসকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছে। তবে অন্তত: সাড়ে আটটার আগে তার ঘরে যেন কোন প্রকারেই চা না আসে। কেন না তার আগে সে উঠতে পারে না।

নতুন বৌদি স্বীকৃত। কেন যে এই কিম্ভুতকিমাকার দেবরটিকে তার খুব ভালো লাগে! সে এ বাড়ির কেউ নয়। বাড়ির এক প্রান্তে এই নির্জন ঘরখানা তার পরিচিত। আর পরিচিত হয়ে চাকরটা কেন তার এ পালিয়ে থাকা। কেন সে আর সকলের মত নয়? বধূর কৌতূহল বাড়ে। কেমন যেন মমতাও হয়। সকলেই আছে, অথচ তার কেউ-ই নেই। এ কেমন কথা!

নিত্যকার মত আজও সে এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে হাসি-মুখে ঘরে ঢুকেছে। আর ঢুকেই সে থমকে দাড়িয়েছে দরজার পাশে। বিছানা খালি। মশারিটা খাটের উপর ঝলছে। বালিশ দুটো এদিক ওদিক ছড়ানো। সারা ঘরময় বই-খাতাপত্তর ছড়ানো। জলের কুজোটা আলগা হাঁ হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। মেঝেতে কয়টা সার্ট আর প্যান্ট লুটোচ্ছে। বধূর মনটা কেমন যেন বেদনায় ভরে যায়। কিন্তু সে আজ ফেরেনি না কি? সারা রাত কোথায় থাকলো সে?

কিন্তু না, ফিরেছে বিলাস। ওপাশের দরজার পাশ ঘেঁসে যে একটুখানি ব্যালকনি, ওখানে তার ইজিচেয়ারখানার মধ্যে পড়ে আছে বিলাস। অসাড়, স্পন্দনহীন লোকটা। দেখে মায়া হয় বধূর। সারা রাত সে এমনি ক'রে পড়ে আছে! মা গো! পুরুষ মানুষের বিয়ে না হলে কি ছন্নছাড়াই না তারা হয়!

চায়ের কাপ হাতে নতুন বৌদি আরও এগিয়ে এলো। দাঁড়ালো বিলাসের পাশে। সূর্য অনেকটা উঠে এসেছে। উঠে এসে ও পাশের কাচের জানলাটার উপর থমকে দাঁড়িয়েছে। আর তারই একটা লালচে আভা এসে পড়েছে বিলাসের মুখে, ঘরের পাশে। এ কি ক্লান্ত মুখের চেহারা! বৌদির বুকটা হাহাকার ক'রে ওঠে।

একটু ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত রাখতে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে বৌদির চোখে পড়লো দৃশ্যটা। দুই গালের পাশ দিয়ে দুই সারি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এসে থমকে আছে চিকের শেষ প্রান্তে।

এক পা পেছনে সরে বৌদি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস আপনা হতেই তার বুকের কাছটা থেকে বের হ'য়ে আসে, কতো অসহায় ও, আহা!

আকাশ ঃ মাটি

কৃতী সোম

তোমার স্বপ্নের দেশে যার কথা জাগে
সে তো নয় রাজপুত্র, আমি।
উজ্জ্বল হীরের মতো দীপ্ত অনুরাগে
তুমি তো প্রেমিকা এক, রামী।
তোমার যৌবন-চুক্তি মহামূল্য দান
কেন না তা স্বচ্ছ আর খাঁটি।
অথচ এখনো ভাখো, কত ব্যবধান
তুমি তো আকাশ, আমি মাটি।

(মোপাসাঁ অবলম্বনে)

বছর দুই আগেকার কথা।

বসন্তকালে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আহা, কি মধুরই না লাগে জনহীন পথে একা-একা ঘুরতে! যে কোনো সুখস্বপ্নের চেয়েও এ মনোরম। সমুদ্র-সৈকতে বেড়াবার কিংবা পর্বতশৃংগে আরোহণের সময় মৃদু-মন্দ বাতাসের সমাদর, তপ্ত সূর্যকিরণের চুম্বন হৃদয়-মন ভরিয়ে তোলে। এই পথচলা হয়ত দু'ঘণ্টার জন্যে, কিন্তু তারি মধ্যে কতো সম্ভব অসম্ভব, দিবাস্বপ্ন, রঙিন কল্পনা, রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগে পথচলা মানুষটির মনের গোপনে। বাসনা কামনা, আলো বাতাসের সংগে সংগে অন্তরে দোলা জাগায়, ব্যথাও বয়ে আনে। ভ্রমণের কল্যাণে ক্ষুধার মাত্রা যেমন বেড়ে যায় ঠিক তেমনি তৃপ্তির পাত্র কানায় কানায় ভরে ওঠে প্রকৃতির চিত্তহারিণী শোভার মুখোমুখি হয়ে। প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে যতো সম্বন্ধ ঘনীভূত হয় ততোই অনাস্বাদিত আনন্দে অন্তর হয় পরিপূর্ণ।

সেইণ্ট র‍্যাফেল থেকে ইটালী অভিমুখে যে রাস্তাটি এগিয়ে গেছে সেই পথেই আমি অগ্রসর হতে থাকি—না ভুল বলা হোলো, বরং বলা যায়, সেই অপরূপ সরণি দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম, যার বন্দনায় কবিরা মুখর হন সব সময়। অর্থাৎ সে পথটি এমনই সুন্দর যে, কবির কবিতায় ছাড়া অন্য কোথাও তার দর্শন পাওয়া সহজ নয়। কেনস থেকে মোনাকোয় যেতে ভুলেও কেউ এ দেশে পা বাড়ায় না, লোকগুলির মনোবৃত্তি দেখে করুণা হয়! এমন উদার আকাশ, ফুলে ফুলে ভরা গোলাপ, কমলা-বাগিচা—কিন্তু ওরা মিথ্যা অহমিকায়, নির্বোধের অবিবেচনায় অনায়াসে এড়িয়ে চলে প্রকৃতির নিবিড় সংগ। অজুহাত ওদের সুন্দর—অজ্ঞ আত্মম্ভরী মানুষের যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে।

প্রবহমান উপসাগরের একটি বাঁকে সহসা চোখে পড়লো কতকগুলি কুটীরকে—পাশাপাশি তারা যেন জটলা করছে। সংখ্যায় তারা চারটি কি পাঁচটি হবে, পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। এর পেছনে পাইনের জংগল তার গভীরতায় বিরাট দুটি উপত্যকায় পথের নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটি কুটীরের দরজার সামনে আমি অনিচ্ছাকৃত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ি। ধবধবে শাদা বাড়িটির গায়ে বাদামী রঙের কারুকার্য, গোলাপগুচ্ছ লতিয়ে উঠেছে ছাতের আলিসায়—কী সুন্দরই না দেখতে হয়েছে! পাশের বাগানটি স্বেচ্ছাকৃত অবিন্যস্ততায় নানাজাতের নানা আকারের ফুলে সাজানো। সামনের ল্যানটিও পরিচ্ছন্ন পরিপাটি—বারান্দার সিঁড়ির ওপর পাত্রে খচিত দ্রাক্ষালতা, জানলার ওপর থোকায় থোকায় আঙুর ফলে আছে। রক্তরাঙা মর্নিং গ্লোরিতে এই মনোরম বাড়িটির বাকী দেওয়ালগুলি সমাকীর্ণ। ওধারে পেছন দিকে প্রস্ফুটিত কমলাবীথি দূরের পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

কুটীরের দরজায় গিল্ট করা ছোট হরফের কথাগুলি আমি পড়লুম: ভিলা ত্ত অ্যানটান!

এ কোন কবিকুঞ্জ না পরীস্থান—আপন মনে প্রশ্ন করে উঠি। কোন অনুপ্রেরণায় এমন স্থান নির্বাচন সম্ভব হয়েছে, এই স্বপ্নের বাসভূমি রচনাই বা হয়েছে বাস্তবায়িত।

অদূরে পথের ধারে জনৈক শ্রমিক বসে বসে পাথর ভাঙছিলো। তাকে জিগগেস করায় জানতে পারলাম ওই কুটীরের মালিক হচ্ছেন স্বনামধন্য জুলি রোমেন—মাদাম জুলি রোমেন।

জুলি রোমেন! ছেলেবেলায় কতোই না শুনেছি বিখ্যাত এই অভিনেত্রীটির নাম। র‍্যাসেলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জুলি রোমেন। জনস্তুতি ও সমাদর এঁর মতো এতোটা আর কারুর ভাগ্যে তখনকার দিনে জুটেছে বলে আমার জানা নেই—বিশেষ করে সমাদর। ওঃ, কতো দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আত্মহত্যা কতো প্রতিযোগিতা না অনুষ্ঠিত হয়েছে শুধু ওই নারীটিকে কেন্দ্র করে! এখন এঁর বয়েস কতো হোলো? ষাট, না, সত্তর পঁচাত্তর হবে। জুলি রোমেন তাহলে এখানে, এই কুটীরে! গোটা ফ্রান্সে যে তীব্র আলোড়ন জেগেছিলো (তখন আমার বয়স বড়ো জোর বারো) এক কবি-প্রণয়ীর সংগে সিসিলিতে এঁর পলায়ন উপলক্ষ্যে—অতীতের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী আমি স্মরণ করি। ওই ঘটনার ঠিক আগেই অপর এক প্রেমাস্পদের সংগে হয়েছিলো ওঁর বিশ্রী রকমের কলহ। যাই হোক, উনি ওঁর নতুন প্রেমিকটির সংগে একদিন সন্ধ্যায় সরে পড়লেন। সে সময় রংগমঞ্চে খ্যাতি ওঁর ধরছিলো না! ঠিক ওই ঘটনার আগের সন্ধ্যায় অভিনয়ের সময়ে আধ ঘণ্টা ধরে একটানা অভিনন্দন জানিয়েছিলো যার জন্যে এগারো বার, এঁকে দর্শন দিতে হয়েছিলো গুণমুগ্ধ দর্শকদের।

ওঁর উধাও হওয়ায় খোঁজাখুঁজি চললো, ওঁরা সমুদ্র পার হয়ে কনক্ ডি-ওভ-এর কমলাকুঞ্জে—সেই প্রাচীন দ্বীপে পৌঁছলেন। জনশ্রুতি রটে গেল, হাত ধরাধরি করে উভয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন যেন বহ্নি-সাগরে!

সেই হৃদয়গ্রাহী কাব্য-রচয়িতা এখন পরলোকে। ওঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। বাস্তবিক ওঁর মনোরম মোহময় রচনায় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো, উনি অন্যান্য কবিদের সামনে অন্য এক জগতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

অপর প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকও বেঁচে নেই। তিনিও তাঁর প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের জন্যে যে অপূর্ব সুরের ঝংকার তুলেছিলেন, তার রেশ আজও জেগে আছে শ্রোতাদের কানে।

তিনিই—সেই নারীই এই কুসুমাস্তীর্ণ কুটীরে বাস করেন।

আর দ্বিধা না করে ঘণ্টাধ্বনি করলাম। বছর আঠারোর একটি লাজুক কদাকার পরিচারক এসে দরজা খুলে দিলো।

আমি আমার কার্ডের ওপর অতীত দিনের রূপশিল্পীটির অজস্র প্রশংসাবাণী লিখে শেষে আন্তরিক অনুরোধ জানালাম দর্শন দেবার

যা একমাত্র ভিমই করতে পারে!

ঝকঝকে, নিখুঁত পরিষ্কার মেঝে সুরুচীসম্মত জীবনযাত্রার পরিচায়ক। আপনার বাড়ীর মেঝে **ভিম** দিয়ে পরিষ্কার করে দেখুন—ময়লা আর তেলতেলে ভাব তাড়াতাড়ি উবে যাবে—আপনার বাড়ীর মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। অন্য কোন উপায়ে আপনি কখনই মেঝে এত পরিষ্কার করতে পারেননি।

আপনার বাড়ীর মেঝে আপনার গর্বের বিষয় করে তুলুন—সপ্তাহে একদিন মেঝে ভিম দিয়ে পরিষ্কার করা অভ্যাস করুন।

আপনার চিনেমাটীর বাসন, কাঁচের জিনিষ, রান্নাঘরের বাসনপত্র এবং বেসিন পরিষ্কার করার জন্যেও **ভিম** ব্যবহার করুন। সর্বদা **ভিম** হাতের কাছে রাখুন।

আপনার বাড়ীর জন্যে দরকার ভিম

VIM

VIM

for quick, spotless clean

HOW TO USE VIM

Sprinkle a little VIM on to a well-dampened cloth or direct on to the surface to be cleaned - which must first be dampened. Rub rinse and then dry.

V. 96-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত
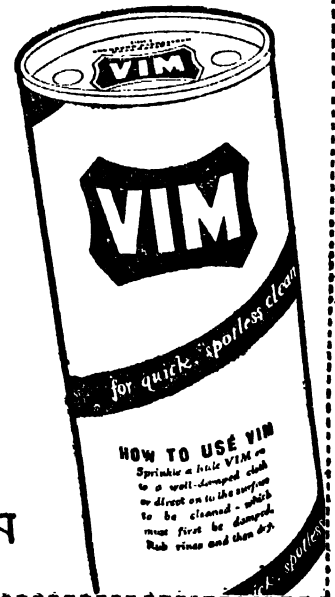
জন্যে। হয়তো আমার নাম তাঁর অজানা নয়, কাজেই এই সাক্ষাতে আপত্তি হবে না।

ভৃত্য ফিরে এসে আমায় একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পৌঁছে দিলো। দেখলাম, ঘরটির আসবাব-পত্র বিশেষ ফ্যাসান-দুরস্ত। সেগুলিকে আমার সম্মানে আবরণমুক্ত করে একটি মাঝারি চেহারায় ষোড়শী পরিচারিকা দাঁড়িয়ে ছিলো।

আমি আসন গ্রহণ করতেই ভৃত্যেরা অন্তর্ধান করলো, আমিও সাগ্রহে ঘরের প্রতিটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করতে থাকলুম। দেয়ালে ছবি টাঙানো রয়েছে তিনখানা। অভিনেত্রীটির একখানা, বিশেষ অভিনয়ের ভংগীতে গৃহীত, একখানা কবি-প্রেমিকের তৎকালীন সাজসজ্জায়, অপরটি অর্থাৎ তৃতীয়টি সেই সুরশিল্পীর, ক্ল্যাভিকর্ডের সামনে মানুষটি বসে আছেন।

ভদ্রমহিলার ছবিতে তাঁর রূপের প্রমাণ এখনও বিদ্যমান, কিন্তু ওই হাবভাব এখনকার দিনে সমালোচনার দাবী রাখে। ওঁর আকর্ষণীয় মুখশ্রী, নীল অক্ষিতারকা আপন মহিমায় উদ্ভাসিত, চিত্রকরের নৈপুণ্যও তাতে বড়ো কম নয়। ছবি তিনটি বিস্মৃত অতীতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মাঝে আগামী দিনের বংশধরদের দিকে যেন তাকিয়ে আছে।

দরজা খুলে একটি হ্রস্বকায়া নারী ঘরে ঢুকলেন, বার্ধক্যের চিহ্ন তাঁর ভ্রূ-যুগলে, মাথার কেশে পরিস্ফুট। এতো বয়সেও তাঁর সলজ্জ ভাবটি অটুট রয়েছে। হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে বললেন: ধন্যবাদ মঁসিয়ে! বিগত দিনের একটি নারীকে আজকের লোকের স্মরণ করা বড়ো কম কথা নয়। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।

আমি বললাম, তাঁর বাড়ির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গৃহস্বামীর নাম জানতে গিয়েছিলাম। এবং তাঁর পরিচয় পেয়ে কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারিনি।

আপনি আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছি মঁসিয়ে, জানালেন বৃদ্ধা: কেন না, এ ধরণের ঘটনা প্রথম ঘটলো। আপনার স্তুতিভরা কার্ডখানি হাতে পেয়ে আমি তো একেবারে চমকে উঠেছিলাম! সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে যেন কোন পরম বান্ধব আমায় আহ্বান জানাচ্ছেন। আমি তো বিস্মৃত—সম্পূর্ণরূপে জন-মনের অন্তরালে চলে গেছি। কারুর স্মৃতিপটে আমার কথা উদিত হয় না। আর এটাও জানি, যতো দিন না আমার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হচ্ছে এই ভাবেই চলবে। আমি মারা গেলে দিন তিনেকের জন্যে পত্রিকায়-পত্রিকায় জুলি রোমেনের জীবন-কথা ছাপা হবে, আলোচনা করা হবে তার সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী-উপকথা-কুৎসা—দু'-চারখানা বইও ছাপা হবে। ব্যস, সেইখানেই চিরতরে নেমে আসবে বিস্মৃতির যবনিকা। তার পরেই আমি শেষ হয়ে যাবো।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর আবার তিনি শুরু করেন: আর সেদিনের বেশি দেরিও নেই। কয়েক মাস কিংবা কয়েক দিনের ভেতরেই এই ক্ষুদ্র নারীটির সজীব দেহ শবে পরিণত হবে।

দেয়ালে টাঙানো নিজের ছবির দিকে তাকালেন জুলি রোমেন—আজকের এই বিশীর্ণ পরিণতির দিকে ব্যঙ্গ ভরে সে যেন চেয়ে আছে। পর মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো দাম্ভিক কবি এবং উৎসাহী সুরশিল্পীর দিকে। তারাও যেন বলছে: এই ক্ষয় কি প্রশ্ন করে আমাদের?

অবর্ণনীয় একটা বিষাদের ভারে মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে যায়—যারা আজ আর মরজগতে নেই এবং যারা অতীতের স্মৃতির সংগে ডুবন্ত মানুষের মত প্রাণপণে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের গভীর বেদনা আমাকে আবেগ-আকুল করে তোলে।

নাইস হতে মণ্টি কার্লো অভিমুখে ছুটে চলেছে কতো বিচিত্র যানবাহন—ঘরের ভেতরে বসে স্পষ্ট দেখতে পাই সুবেশা আনন্দমুখর আরোহীদের। জুলি রোমেন আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওই দৃশ্য দেখে অনুমান করলেন আমার চিন্তাধারা। স্মিতহাস্যে মৃদুস্বরে বললেন: কতোক্ষণের জন্যেই বা এই সুখের জীবন!

আমি বলি: আপনার জীবন নিশ্চয়ই খুব রমণীয় ছিলো।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলাটি। বললেন: প্রকৃতই সুন্দর ছিলো—ছিলো মধুর। আর সেইজন্যেই তো আমার এই আফশোষ।

অনুভব করলাম বৃদ্ধা তাঁর জীবনকথা স্বেচ্ছায় জানাতে পারেন, প্রয়োজন শুধু হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করা। গভীর সহানুভূতি ভরে সন্তর্পণে ব্যথা পাওয়া জায়গাটি যেমন ছুঁয়ে দেখতে হয়, সেই রকম মমতায় একে একে প্রশ্ন করে যাই। তিনিও অকপটে বলে যান তাঁর অতীত কাহিনী, তাঁর বর্ণোজ্জ্বল অস্তিত্বের কথা। সে যে কী অপরিসীম আনন্দ, কী অভূতপূর্ব সাফল্য—তার পরিচয় পাই তাঁর বর্ণনায়।

আচ্ছা আপনার পরম আনন্দ এবং চরম সুখের জন্যে কি আপনি থিয়েটারের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী?—প্রশ্ন করি আমি।

কখনোই নয়—তৎক্ষণাৎ উত্তর পাই।

হাসির আভাস জাগে আমার মুখে।

জুলি রোমেন বিষাদভারাক্রান্ত চোখ দেয়ালে বিলম্বিত ছবি দুটির দিকে ফিরিয়ে বললেন: ওই দুজনের কাছে সেজন্যে আমার যাবতীয় ঋণ!

কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, ওঁদের মধ্যে কার কাছে?

দু'জনের কাছেই মঁসিয়ে! সময় সময় মনের মধ্যে ওদের দুজনের বিষয়ে সংশয় জাগে, তা ছাড়া আজ পর্যন্ত আমি একজনের কথা ভেবে অনুতাপ করি।

তাহলে মাদাম, আপনার কৃতজ্ঞতা ওঁদের প্রতি নয়, ভালোবাসার কার্যকলাপের প্রতি। ওঁরা তো ছিলেন প্রেমের ক্রীড়নক।

তা হতে পারে। কিন্তু অপরূপ সেই ক্রীড়নক! আহা!

ভালোবাসা পাইনি, বা পাবার উপায় ছিলো না—এ কথা কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন? ধরুন কোনো সাধারণ মানুষ তার জীবনের সকল আশা-আকাংখা দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে—এক কথায় যথাসর্বস্ব দিয়েও কি আরো বেশি ভালোবাসতে পারত না? অবিজ্ঞি সুরসাধক এবং কাব্যের উপাসকরূপে এই দু'জন ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আপনার জীবনে দেখা দিয়েছিলেন।

চীৎকার করে উঠলেন জুলি—এখনো ওঁর মধুর কণ্ঠস্বরে রোমাঞ্চ জাগে। বললেন: না মঁসিয়ে, না। সাধারণ মানুষ হয়তো বেশি ভালোবাসতো, কিন্তু ওদের মতো করে পারতো না।

আহা, অপরূপ! প্রেমের রাগিণী এ পৃথিবীতে একমাত্র তারাই দিয়েছিলো, সে সুরে আমায় মাতাল করে তুলেছিলো তারাই! কথা এবং সুরের সম্পদের মাঝে তারা যা বাস্তবায়িত করেছিলো তা কোন্ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? পার্থিব, অপার্থিব অনুভূতি কাব্যে ও সংগীতে যদি মূর্ত না করতে পারে তাহলে তার পক্ষে ভালোবাসার সম্ভাবনা কোথায়? জানতো—নারীকে আনন্দে বিহ্বল করতে জানতো একমাত্র ওই মানুষ দু'টিই! গানে-কথায়-আচরণে ওরা তাকে সার্থক করতে পারতো। আমাদের বাসনা-কামনার মাঝে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার আধিক্য থাকলেই ওই কল্পনায় মন উর্দ্ধগামী হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবের পাকে পড়ে মন মাথা খুঁড়ে মরে এই পৃথিবীর ধুলোবালিতেই। ওদের ভালোবাসায় চিনেছিলাম ভালোবাসাকে, শিখেছিলাম ভালোবাসতে; তাইতো অন্যের পক্ষে আমার আরো বেশি ভালোবাসা সম্ভব হতে পারতো।

সহসা নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি—দুঃসহ বেদনা উৎসারিত হতে থাকে অশ্রুর আকারে। আমি সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে চেয়ে থাকি খোলা জানালা-পথে। কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়, আবার উনি শুরু করেন: জানেন মঁসিয়ে, সাধারণত মানুষের দেহের সংগে সংগে হৃদয় জরাগ্রস্ত হয়ে থাকে—কিন্তু আমার বেলায় তা হতে পারেনি। আমার এই শরীরের বয়স উনসত্তর হলেও হৃদয়ের বয়েস কুড়ি পেরোয়নি। এই যে ফুলের হাটে স্বপ্নের সাথে মিতালি পাতিয়ে নিঃসংগ পড়ে আছি—এর কারণ হচ্ছে ওই-ই!

দীর্ঘ সময় নীরবে কেটে যায়। উনি ইতিমধ্যে ভাবাবেগ সংযত করে নেন। এক সময় সহাস্যে বলতে থাকেন: প্রকৃতি-পরিবেশ যখন চিত্তহারী হয়ে ওঠে, তখন কি ভাবে আমি সময় কাটাই, সেকথা শুনলে আপনি হয়তো হাসবেন মঁসিয়ে! আমি নিজেই নিজের নির্বুদ্ধিতায় হাসি, করুণা করি নিজেকে।

দেখলাম, আর কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করা বৃথা, উনি রাজী হবেন না। অতএব উঠে পড়লাম।

উনি চেঁচিয়ে ওঠেন: সে কী! এতো তাড়াতাড়ি?

মন্টি কার্লোতে সান্ধ্য-ভোজন সেরে নেবার অভিপ্রায় জানালাম। উনি তৎক্ষণাৎ কিছুটা ভয়ে ভয়ে বলে ফেলেন: আমার সংগে খেতে কি আপনার আপত্তি আছে? আমি কিন্তু খুবই খুশি হবো।

দ্বিরুক্তি না করে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। খুশি হয়ে উনি ঘণ্টাধ্বনি করলেন। সেই অল্প বয়সী পরিচারিকাটি হাজির হতে তাকে নিম্নস্বরে কি সব আদেশ করলেন। তার পর আমায় জানালেন, তাঁর বাড়ির সব কিছু দেখাবেন।

খাবার-ঘরের সামনে বিশেষ ধরণের কাচে-ঢাকা বারান্দায় রাজ্যের গাছপালা; তারই অদূরে কমলাকুঞ্জ একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। লতাগুল্মের আড়ালে একটি নীচু আসন পাতা—গৃহের কর্ত্রী মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন—এ তারই নীরব সাক্ষী।

এর পর হাজির হলাম আমরা বাগানে ফুলের শোভা দেখতে। দিনের আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে, কোমল চরণে নেমে আসছে মনোরম উষ্ণ সন্ধ্যা—ঠিক এমন সময়েই পৃথিবীর সব কিছু মধুর বলে মনে হয়।

খাওয়ার টেবিলে এসে স্থান গ্রহণ করলাম আমরা, ঠিক অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পরই। এখানে কাটলো দীর্ঘ সময়—আয়োজনও হয়েছিলো খুবই সুন্দর। অন্তরংগতা গভীর হয় আমাদের মধ্যে, এক পাত্র মদের কল্যাণে উনি আরো অন্তরংগ হয়ে ওঠেন। ওঁর প্রতি অন্তরের অন্তস্তলে আমার গভীর সহানুভূতি জেগে ওঠে।

অবশেষে জুলি রোমেন কথা কইলেন। বললেন: চলুন বাইরে গিয়ে চাঁদ দেখিগে। চাঁদ আমার বড়ো প্রিয়—ওই পাগল-করা চাঁদ! আমার শ্রেষ্ঠ সুখের নীরব সাক্ষী একমাত্র ও—ওর মাঝেই অতীতের রমণীয় স্মৃতির সম্ভার সঞ্চিত হয়ে আছে, ওর দিকে চাইলেই তারা আমায় এসে ধরা দেয়। আর সময় সময় এই সন্ধ্যেবেলায় আমার নিজের জন্যে এমন একটি মধুর দৃশ্যের আয়োজন করি, তা যদি তুমি জানতে—না না, তুমি খুব ঠাট্টা করবে—সে কথা আমি বলবো না—আমি সাহস করি না—না না, কিছুতেই তোমায় তা বলবো না!

অনুনয় করি: দোহাই আপনার, থামবেন না! কি সে গোপন ব্যাপারটা? আমাকে বললে কিছু হবে না, প্রতিজ্ঞা করছি হাসবো না—এই শপথ করলুম!

তবু তাঁর দ্বিধা যায় না দেখে ওঁর হিম-শীতল ক্ষুদ্র হাত দুটি তুলে নিলাম; সুদূর অতীতের সেই প্রেমিক-যুগলের মতো গভীর চুম্বনে হাত দুটি প্লাবিত করে দিই। উনি অভিভূত হয়ে পড়েন···তারি

মাঝে জেগে থাকে সংকোচ। ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন: প্রতিজ্ঞা করছো তুমি হাসবে না?

হ্যাঁ করছি—শপথ করছি।

হাসি ফুটে ওঠে মুখে। আহ্বান জানান: তাহলে এসো।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। সবুজ পোষাক-পরা সেই কদাকার চাকরটা তাঁর চেয়ার সরিয়ে দেয়। উনি সেই অবকাশে ক্ষিপ্রকণ্ঠে কি যেন তার কানে কানে বলে দেন।

সসম্মানে সে উত্তর দেয়: হ্যাঁ মাদাম, এক্ষুণি।

উনি আমার হাত ধরে বারান্দা অতিক্রম করে চললেন। কমলাবীথি পথটি ভারি রমণীয়? চাঁদের রূপালি হাসি ক্ষীণ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বৃন্তাকার গাছগুলির শাখায়-পাতায়, মুকুলিত কমলা-সুরভি আকুল করে তুলেছে আকাশ-বাতাস। অদূরে ঝোপের অন্ধকারে অগণিত জোনাকিকে মর্ত্যের তারকা বলে মনে হচ্ছে।

আমি চেঁচিয়ে উঠি: অপরূপ! প্রেমের উপযুক্ত এই পরিবেশের তুলনা হয় না!

সহাস্যে জুলি বলেন: তাই নয়? তাই নয়? এখুনি দেখতে পাবে তুমি।

ওঁর ঠিক পাশটিতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বিড়-বিড় করে বলেন: এই সকল দৃশ্যের স্মৃতিই আমার জীবনে দুঃখভারাক্রান্ত করে তোলে। আজকালকার মানুষ তোমরা সে সব জিনিস স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, টাকা-আনা-পাইএর কারবারীদের পক্ষে তা সম্ভব নয় মোটেই। আমাদের সংগে—মানে আমার মতো বৃদ্ধা নয়, তরুণীদের সংগে তোমরা কথা কইতে পর্যন্ত জানো না। প্রেম আজ দেহের ক্ষুধায় পর্যবসিত হয়েছে; নারীদের পণ্য হিসেবে যদি তোমরা মনে না করে দাও প্রকৃত সম্মান সুন্দর ব্যবহার তবেই তো।

আমার হাতটা হাতে টেনে নিয়ে এক সময় উনি বললেন: ওই, ত্যাখো।

অপরূপ এক দৃশ্যের অবতারণা হতে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার নীচের দিকে গলিপথে চাঁদের আলো শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারি শেষ প্রান্তে অল্পবয়সী একটি পুরুষ ও নারী আলিংগনাবদ্ধ হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আরো অগ্রসর হলে দেখতে পেলাম উভয়ের হাত দৃঢ় আবদ্ধ—আর মাতাল করা জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করে তাদের দেখতে হয়েছে অপরূপ!

কয়েক মুহূর্তের জন্যে তারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, তার পরই আরো নীচের রাস্তায় দেখতে পাওয়া গেল তাদের। যুবকটির পরনে শাদা সাটিনের পোষাক, মাথায় চওড়া হ্যাট উটপাখির পালক লাগানো—সবই গত শতাব্দীর নিদর্শন। মেয়েটির সাজসজ্জায় রিজেন্সীর আমলের ছাপ।

ওরা দু'জনে আমাদের কিছুটা দূরে থেমে পড়লো, তারপর মধুর অভিবাদন জানিয়ে নিবিড় আলিংগনে আবদ্ধ হোলো।

হঠাৎ ওদের দুজনকে এ বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা বলে চিনতে পারলাম। সংগে সংগে সজোরে হেসে ওঠার অদম্য ইচ্ছা হতে লাগলো, বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করলুম। অপেক্ষা করতে থাকলাম পরবর্তী দৃশ্যের জন্যে।

এইবার প্রেমিকযুগল সেই সরুপথের প্রান্তে এগিয়ে যায়, আবার তাদের মূর্তি রমণীয় হয়ে ওঠে। দূরে বহুদূরে মিলিয়ে যেতে যেতে এক সময় স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মতো হারিয়ে যায় তারা।

আমিও আর অপেক্ষা করি না, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ি। ওরা যেন আর আমার দৃষ্টিপথে না পড়ে। সুদূর অতীতকে আহ্বান জানাবার জন্যে আমাকে অবলম্বন করে বৃদ্ধা এই রূপশিল্পীর অন্তরে হারিয়ে যাওয়া সুখের আলোড়ন জাগাতে এই যে মিথ্যা দৃশ্যের অবতারণার ব্যবস্থা—নিশ্চয় এ বহুক্ষণ স্থায়ী হবে। কাজেই আমি বিদায় নিই নীরবে বিশেষ তৎপরতার সংগে।

অনুবাদক—রমেন চৌধুরী।

খেয়াল

(সরোজিনী নাইডুর কবিতা)

আহা অনুপম বনের কুসুমটিরে
ধরেছিলে তুমি দুটি অঙ্গুলি দিয়ে,
উদাসীন ঠোঁটে ছুঁইয়ে অকস্মাৎ
কি খেয়ালে তুমি ফেলেছিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে?
জানলে না তুমি, কোনো দিন জানবে না—
এ বার্তা জানি সুগোপন প্রিয়তম!
নয় নয় তাহা এতটুকু বনফুল—
সে আমার মন, সে যে অন্তর মম।

দু' আঙুলে ধরে মদের পাত্রখানি
অবহেলা ভরে ছোঁয়ালে তোমার ঠোঁটে,
ছুঁড়ে ফেলে দিলে ক্লান্তিতে অবসাদে—
ভাঙা-ভাঙা কাচ ওই তো ধূলায় লোটে।
জানলে না তুমি, কোনো দিন জানবে না—
এ বার্তা জানি সুগোপন প্রিয়তম!
নয় নয় তাহা মদের পাত্র শুধু—
সে আমার প্রাণ, সে যে গো হৃদয় মম।

অনুবাদ—শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

"পিয়ার্স" নামটী সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক—মোলায়েম এবং ভাল পিয়ার্সে
তাদের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়ার্স সাবানের সাহায্যে
তাঁদের লাবণ্যের যত্ন নেন—পিয়ার্স আসল
গ্লিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিশুদ্ধ এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম পিয়ার্স ট্যালকম্
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিশুদ্ধতা।

আপনার সৌন্দর্য
চর্চ্চায় নিয়মিত
পিয়ার্স ব্যবহার করুন

PSTP. 3-X52 BG

এ অ্যাণ্ড এফ পিয়ার্স লিঃ লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

অপবাদে ভরা এ নাম, তবু সময় কাটায় সন্ধ্যায় প্রায় রোজই হাইড পার্ক কর্ণারের এক বেঞ্চিতে। বিচিত্র আবেষ্টনী! একঘেয়েমীর হাত থেকে বাঁচার সব চেয়ে সোজা পথ তার কাছে এটাই। ব্যক্তিস্বাধীনতা উগ্র রকমের। ছোট-ছোট টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে চলেছে বহু জনেই, নানান বিষয়ে শ্রোতার সংখ্যা নির্ণয় না করেই। ঋতু পরিবর্ত্তনের ঘোষণা করে চলেছে মোহময়ী নারীরা বেশভূষার মধ্য দিয়ে। দিনের আলো, রাতের অন্ধকার—বাধা বলে কিছু নেই। মাটীর নীচে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে সহজ মনে চলে যাওয়ার পথও পরিষ্কার। সুড়ঙ্গের অপর দিকে যাবার আগেই সাথী জুটে যায় অনেক সময়েই। দোকান বাজার সাজানো রয়েছে ঝলমল-করা আলোর মাঝে—ক্রেতার অভাবও নেই এখানে।

নরেন বসে আছে অনেকক্ষণ। সিনেমা যাওয়ার কথা—সময় শেষ হতে চলেছে তবু দেখা নেই ডরথির। হাইড পার্ক কর্ণারেই আলাপ। প্রথম দিনে ভয় যে ছিল না তা নয় কিন্তু প্রলুব্ধ করা রূপের জৌলুষ আর স্থান কাল আলোড়ন এনেছিল—ভয়কে ছাপিয়েই সামান্য পরিচয় ছাড়া আর কিছুই হয়নি সেদিন। মিথ্যা ভাবনা আনেনি কিছুই, বরং মন আরও চঞ্চল হয়েছে বিলম্ব হতে দেখে। বিদেশে এসে প্রেমের ছোঁয়াচ লাগার মত অবকাশ থাকলেও অবলম্বন মেলেনি এত দিন। আকস্মিক আকর্ষণ অনুভূতিকে তাই রাঙ্গিয়ে তুলেছে অনেকখানি। বাহুর বন্ধনে বিলিয়ে দিয়ে অনেকেই চলেছে পার্কের ভেতর দিকে—অন্তস্তলে

যাওয়ার কামনা সম্ভবতঃ। প্রকৃতির মোহিনী ছন্দের মধ্যে মায়াজাল ছড়িয়ে প্রকৃতি-বিলাসিনীরা মিলিয়ে দিয়েছে রূপ-যৌবন, মানুষের সাজানো কৃত্রিম আলো উপহাসের নীচে। প্রকৃতির অনুশাসন মানার চেষ্টাও নেই কোথাও এতটুকু। অসময়কে বিলাসিতা দিয়ে সময়োপযোগী করার প্রচেষ্টাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

মোহ কেটে যায় মিষ্টি ডাকে—কারো জন্য অপেক্ষা করছো বুঝি?

উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা হয় না ঐ মিষ্টি সুরের পরে বেসুরো তাল আনতে।

খুব মিষ্টি না হলেও বেশ সুন্দরী বলা চলে। বেঞ্চির ধারে এসে কখন বসেছে নরেন জানতেও পারেনি।

আবার প্রশ্ন হয়—অসুবিধা করলাম বসে?

—অসুবিধা হলেই বা শুনছে কে? পার্কের আসন তো আর আমার একার জন্য নয়?

—তা সত্য, তবু তারি মধ্যে সুখ-সুবিধা দেখার চেষ্টা করা মঙ্গল। আপত্তি না থাকলে বসতে পারি।

—আলাপেও আপত্তি নেই।

—বিদেশীরা সত্যিই সুন্দর! আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের এমন সম্মান দিতে জানে না।

বিদেশী সে নিজেও। আয়র্ল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছে নানান কারণে। লণ্ডনের সমাজের খাতায় নাম না উঠলেও পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে অনেকখানি। তাই বলে স্থায়িত্ব নেই বসবাসের। বহু জায়গায় আছে তার নাম ও থাকার কাহিনী। আপাততঃ ঘর ভাড়া করেছে লণ্ডনেই। দুপুর পর্য্যন্ত এক পোষাকের দোকানে থাকে বিকালের দিকে প্রায়ই আসে পার্কে। বেশি দূর নয়। হেঁটেই আসে আবার বেড়িয়ে ফিরে যায়। বাঁধন কোন নেই নেই, কোন বাধাও।

নরেন জিজ্ঞাসা করে, এই একক জীবন ভাল লাগে?

বোধ হয় শিহরণ আসে প্রশ্নের ঝাঁকে। উদ্দামতা প্রকাশ পায় রমণীর মুখে-চোখে।

জেনী বলে—একক জীবন ভুলব বলেই তো আসি বহুর স্পর্শে ঘেরা এই চঞ্চলতার মধ্যে। তাইতো নিজেই আলাপ করতে চাই অপরের সঙ্গে।

—ভয় করে না?

—ভয় তো যৌবনের। কিন্তু এককত্ব ঘোচাতে গেলে যৌবনকে উপঢৌকন দিতেই হবে।

—সে হলো প্রতিদানে উপহার। অথচ দান-প্রতিদানের কথা ওঠার আগেই তো হারাতে পার তোমার এত দিনের সাজিয়ে রাখা সম্পদ অজানিত অন্ধকারের আলিঙ্গনে।

—যৌবন চিরস্থায়ী কিছু নয়। হারাতে একদিন হবেই। ক'দিন আগে না হয় পরে। তখন আর সুযোগের অপব্যবহার করে

কি লাভ? এই ধর না তোমার কথা। তোমাদের আচার বিচার জানি না, না মানি তোমাদের ধর্ম্ম। তবু আলাপের লোভে পড়ে ভালবাসার খেলায় যদি তুমি চেয়ে বস আমার সকল সত্তাকে—যৌবনকে বাঁচিয়ে রাখব মনে করে প্রতিহত করব তোমার অগ্রসরকে। অমন যৌবন থাকার মূল্য কিছুই নেই।

—তা হয়তো সত্য। কিন্তু এ-ও তো হতে পারে, শুধু যৌবনকে বেচেই গেলে, মূল্য কিছু না পেয়েও।

—মূল্য পাবই, কেন না তার বিনিময়েই যে বেচা-কেনা। ধারের ব্যবসা অন্য সব কিছু নিয়ে হতে পারে কিন্তু নারীত্ব নিয়ে নয়। বলতে পার তবু থেকে যাব অচেনার রাজ্যে। যাক ও সব কথা। বল কার জন্য অপেক্ষা করছ?

—নাম বললেই কি চিনতে পারবে?

—নাম জানার উৎসাহ আমার এতটুকু নেই। সম্পর্কটুকু শুধু জানতে চাই।

—সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগই মেলেনি।

—তার মানে সূত্রপাত শুধু।

—তাও ঠিক বলা চলে না। এই প্রথম আলাপের অভিলাষ অথচ অপেক্ষমান অতিথির আরাধনা ব্যর্থ হতে চললো আর একজনের ভ্রান্ত পথচলার দোষে।

—আমারও যে এমন ভুল কোন দিন হয়নি তা কে বলবে? তাই এ ত্রুটি সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করে কোন লাভ নেই, বরং অনুরোধ করব আমাকে অন্ততঃ একবার আলাপের সুযোগ দেবার জন্য। সম্পর্কহীন আমিও—বিশ্বাস কিছুই আনতে পারিনি তোমার মনে। তবে অবিশ্বাসের কোন কথাও তো তুলতে পার না আমার বেলায়? বন্ধুত্ব কামনাই যদি উদ্দেশ্য হয়—বাধা কেন আসবে তোমার আমার অভিধানে?

নরেন কথার জোয়ারে ভেসে যায়। বাধা দিতেও পারে না আর। জেনি দূরত্ব কমানোর বাসনায় কাছে আসে।

আকাশের দিকে তাকালেও অন্ধকারের কথা মনে হয় না। কৃত্রিমতা মাটি ছেড়ে অত উঁচু পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পার্কের চারিদিককার রাস্তা পেরোলেই চোখে পড়ে ভরাটকরা গাছগুলো। মানুষেরই আনা আচ্ছাদন আড়াল করে রেখেছে প্রসারিত দৃষ্টিকে। তারই নীচে চেয়ার পাতা, বসতে হলে সময় অনুসারে অর্থ দিতে হয়। ভীড় নেই সেখানে। আমাদের মাঝে অমন সীমারেখা টানার ইচ্ছা হয় না। নরম ঘাসের উপর বসে পড়েছে সবাই প্রায়।

হাতের পরশ পেয়ে বিচলিত হবার আগেই শুনতে পায় জেনির কথা—তোমরা তো হাতের রেখা বিচার কর?

—যদি বলি তোমার ভাগ্যে ভারতীয় স্বামী আছে?

—অবাক হব না।

—সত্যিই পার কল্পনা করতে?

—বাস্তবতায় স্বীকার করতেও আপত্তি নেই।

—তোমার সাহস আছে।

—সাহসের পরিচয় কি পেলে?

—আমি তো পারতাম না।

—পরে দেখা যাবে। আপাততঃ প্রথম পরিচয়ের শুভক্ষণকে স্মরণীয় করার কি করছ বল?

—সাহস হয় না আমার, বাড়ীতে তোমায় নিয়ে যেতে।

—সাহস তোমার নেই, তা বুঝেছি।

—তার চেয়ে চল কোন সিনেমায়।

—সে তো হবে ছবি দেখা। আমাদের আলাপের মাঝে প্রয়োজন কি তৈরী করা কথাবিন্যাসের। তোমার তো বাড়ী নিয়ে যাওয়ার সাহস হয় না কিন্তু আমার হয়। যাবে আমার ঘরে?

—খুশীই হব।

—ক্লিওপেট্রা নই কিন্তু। রূপ-যৌবনের পরিচয় পেয়েছ, সেই সঙ্গে প্রলোভন-ভরা মনের দেখা পেয়েছ কি না তুমিই জান। তবু বলব, সে মাদকতা নেই, যাতে এণ্টনিওর মত সব কেড়ে নেওয়ার স্পর্দ্ধা করতে পারি।

বেঞ্চি খালি হয়ে যায় নিমেষেই। পড়ে থাকে মন-বিনিময়ের চিহ্ন—ভবিষ্যৎ রচনা করার প্রয়াস। ব্যস্ত কোলাহলের মাঝে হিসাবও থাকে না, কারা ক্ষণিকের চাহনীতে ভরিয়ে নিল নিজেদের সব কিছু ফাঁকগুলোকে, জীবনের স্বাদ বুঝতে শিখল বরফের মত জমাট হয়ে থাকা অব্যবহৃত মনের জানালা দিয়ে। অভ্যাস করা চলাফেরার মাঝে মাঝেও আসে আকস্মিক পরিবর্তন—সময় নেবার অবসর দেয় না—ভাসিয়ে দিয়ে যায় উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যায়। একের ব্যবসা অপরের সমস্যা এনে দেয়, তবু পরিতৃপ্তির খোঁজ মেলে না। আহ্বান দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয় না, তার পরের কথা ভেবে রসঘন গণ্ডী টানে ঠিকই।
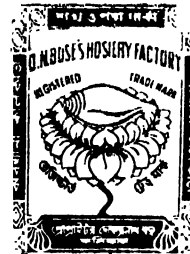
চলার ছন্দে ছিল তাদের পরিকল্পনা অথচ চলার আনন্দ মধুর থেকে মধুরতর হবার আগেই এসে যায় থামার ইঙ্গিত।

লোক-সমাগম ভালই বলা চলে। হাতের মধ্যে হাত রেখে চলতে গিয়ে দৃষ্টির অপব্যয় হয়। দরজার কাছে এসেও নরেন খেয়াল করতে পারেনি পথের নিশানা কিংবা পথিকের আনাগোনা।

অন্ধকার সামান্য একফালি গলি দরজার পরে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে আরও কয়েকটা বারান্দা। ব্যস্ততা যেন সকলেরই ওসব কাজেই—

চাবী খুলতে যেটুকু সময়। বিস্ময় কাটার আগেই আলো জ্বলে উঠে ভরিয়ে দেয় মনের অজানা জানার স্পৃহাকে।

সুন্দর করে সাজানো সে ঘর।

—বস!

নরেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে ওঠে—জেনী তুমি কোথায়?

—আমি আসছি। তুমি দয়া করে বস একটুখানি।

নানান ভঙ্গিমায় তোলা ছবি সারা ঘরময়। নিজেরই সৌন্দর্য্যের ওপর মোহ আছে বলতে হয়। ছোট টেবিলের মাঝে এক শিশুর ফটো। বিছানা ঢাকা রয়েছে রেশমের কাজ-করা চমৎকার এক চাদর দিয়ে।

এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে একক উপস্থিতি বোঝার মতন হয়ে উঠেছিল নরেনের কাছে।

ড্রয়ার টানতেই গুমরে ওঠে কাঠের পাঁজরগুলো। সে আওয়াজ পৌঁছায় গৃহস্বামিনীর কানেও।

স্বর ভেসে আসে—ভয় পেও না যেন।

নরেন ভাল করে দেখে। কালো এক রিভলবার। ভয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয় ডালা।

জেনী ঘরে ঢোকে। বলে—কি সত্যিই ভয় পেলে নাকি? দেখছ তো একা বাস করতে হয়। তাই বিপদের দিনে হাতিয়ার রাখা আর কি।

নরেনের জড়ত্ব যায় না তবু।

জেনী কাছে আসে। সোফায় বসিয়ে দেয়। নিজেও বসে। এরই মধ্যে পোষাক বদলে এসেছে। মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে মুখের চারিপাশে। ঝলমলানি লেগেছে সারা অঙ্গে।

—কি কথা, বলবে না বুঝি?

নরেনের কণ্ঠে অদ্ভুত এক স্বর!

—জেনী, আমার সন্দেহ হয়—

—থামলে কেন?

—আমি বরং যাই। আর এমন ভুল করব না।

জেনী বাধা দেয়—কিসের এত কুণ্ঠা তোমার?

সামনে পড়ে রয়েছে 'রিভেলীর' এক ছবি। সিনেমার কোন অংশ হয়তো। সমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রেমের খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে প্রণয়িযুগল। ভুলে গেছে সমাজ সংস্কার।

নরেন প্রশ্ন করে—সত্য জবাব দেবে?

—সত্য মিথ্যা যাচাই করবে কোথা থেকে?

—সে ভাবনা আমার। তুমি সত্য উত্তর দাও।

—তোমায় ছেড়ে দেবার ইচ্ছা যদি না থাকে আমার? তোমায় খুশী করতে যদি তোমার মনরাখা কথা বলি?

—সে তুমি বলবে না।

জেনীর চোখে-মুখে কিসের প্রতিচ্ছায়া!

বলে—যাকে সন্দেহ করছ তার ওপর আবার এতখানি বিশ্বাস!

জেনীর হাসি বিহ্বল করে তোলে নরেনকে। জেনী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নিজেই ইতিহাস রচনার চেষ্টা করে।

—তুমি কি শুনতে চাইছ জানি। ভাবছ আমি হয়তো তাদেরই একজন, যারা পরের মনোরঞ্জন করেই দিন কাটায়। চলার পথ মিথ্যা দিয়েই তৈরী—সম্মানের চেয়ে অসম্মানের বোঝাই বেশি।

নরেন বাধা দেয়—না আর শুনতে চাই না। শুধু বল তুমি আমারই মতন সাধারণ একজন।

জেনী উঠে যায়। পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসে ছোট্ট এক খাতা। অনেক লেখা—অনেক ছবি তার মধ্যে। নরেনের হাতে তুলে দেয় সে স্মৃতিময় চিহ্ন।

বলে—অবসর সময়ে পড় এ-খানা। সত্যকার পরিচয় পাবে আমার। তবে এটুকু জেন, কলঙ্কিনী হলেও স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য প্রলুব্ধ করি না মানুষকে। বন্ধুত্বই আমি চাই—চিরস্থায়িত্ব হলে খুশীই হব কিন্তু না হলেও আপত্তি নেই কিংবা না হওয়ার শোকে পিছিয়ে পড়ব না পথের পাশে প্রয়োজনের পায়ে কুড়ুল মেরে।

নরেন মুখ তোলে। জানায়—এ পরিচয়ের পরও তুমি আশা কর বন্ধুত্ব?

—আজই না হয় পরিচয়ের কথা উঠেছে। কিন্তু শুধু নারীত্বই যখন অতীতের ছবি ছিল, তখনও তো বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে পশুত্ব এসেছিল আমার ঘরে। ভোগ আর ত্যাগের মধ্যে ছিল না কোন ব্যবধান। সময় বসে রইল না। পড়ে রইলাম আমি আর আমার সেই আশা—বন্ধুত্ব।

আসন শূন্য হয় আবার। নরেন পাতা উলটাতে সুরু করে। ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হতে চায়। লেখাগুলো ক্রমশঃ বড় হতে আরম্ভ করে। সমস্ত স্নায়ু অকেজো হবার উপক্রম। পরিচয় পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পরাজয় আসে তার সকল শক্তি নিয়ে।

জেনী ফিরে আসে স্নিগ্ধ কোমলতা নিয়ে। স্নেহের ছায়া পড়ে তার মৃদু চাহনিতে। হাতে পানীয়-ভর্ত্তি গেলাস। তৃষ্ণার আগেই তৃষ্ণা হরণের আয়োজন।

নরেন এক নিঃশ্বাসে শেষ করে অনুরোধ ব্যতিরেকেই। নিষেধ-বাধা-নীতি, সময়কালে কোথায় ভেসে যায়, বোধ হয় স্রষ্টাও জানে না!

জেনী হাসতে হাসতে এগিয়ে দেয় আবার। বলে—কত খুশী হলাম তুমি নিজেই নিলে বলে।

নরেন আবেশে স্পর্শ করে স্নেহময়ীর মাধুর্য্যকে। উত্তর দেয়—আমায় ক্ষমা কর। তুমি সত্যই বন্ধুত্বের যোগ্য।

—কি তোমার এমন করেছি বন্ধু, যার জন্য এত অবিশ্বাস ঘুচে গেল এক লহমায়?

—উপহাস করছ?

—তোমার উপহাসও তো বুঝলাম না এখনও?

—উপহাস নয়, বিশ্বাস কর। কি হবে তোমার অতীত নিয়ে, কি করব তোমার ইতিহাস শুনে? তুমিই কি আমার

বাঁধতে চেয়েছ আমার সব কিছু শোনার পর? বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলেছি আমিই মিথ্যা পুরুষকারের দম্ভে। আর ভুল করব না।

—এত সহজে আত্মসমর্পণ করা কি উচিত হবে? আমার দক্ষ অভিনয় তোমায় হয়তো বিচলিত করেছে তোমার দুর্বলতাকে নাড়া দিয়ে। এটা তো মিথ্যা নয়, আমি পথচারিণী ঘরণী হবার অযোগ্য।

—অকূল পাথারে তোমার তরীতে দিয়েছ আসন। সে তরীর ছিদ্রের হিসাব নিয়েই বা কি হবে, আর বর্ণচ্ছটার সমালোচনা করেই বা কি লাভ? তরীর শীতল ছাউনি যে আছে, সুখনিদ্রার সকল সুবিধাটুকুও সে রয়েছে এটা তো মিথ্যা নয়।

—অনুতাপ করবে না তো পরে?

—তরী যদি ডোবেই ভয় পাব না তাতে। তুমি যে থাকবে সঙ্গে।

সময়ের হিসাব নেই। রাতের আলো-ছায়ার খেলা চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। পরিচিত প্রথম পর্ব্ব পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। দৃষ্টির আকর্ষণ সীমাবদ্ধ হয়েছে মনের সোপানে। অজানিত অজ্ঞতা শেষ হয়েছে কথার আলোড়নে।

জেনী বলে, রাতের আতিথ্যের নিমন্ত্রণ করব না প্রথম আলাপেই। তবে খুশীই হব যদি থাক। ভয় নেই, ক্লান্তিময় ক্লেদাক্ত রাত হবে না এ বরং স্বপ্নময় করে তুলব কল্পনার কাব্যজালে।

—না আজ থাক।

—সাহস হয় না নিশ্চয়ই?

—সত্যিই তাই। আলাপন প্রলোভনে আসতে আর কতক্ষণ।

—তবে যাও। কথা দাও আবার আসবে?

—আসব, যত দিন না অশোভন কিছু আসে আনাগোনায়।

—কি, পড়বে না আমার কথা?

—পড়ে তোমায় বিচার করতে চাই না। যা পেয়েছি, যা দেখেছি বা জেনেছি তাই যথেষ্ট আমার সংযোগ রাখার পক্ষে। মনে পড়ে, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি হাতের রেখা পড়তে পারি কি না। হাতের রেখা পরিবর্তনশীল—দিনের পর দিন রেখা বদলে যায় মনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। তাই বিচার করতে বসে, পুরানো রেখার সন্ধান করে কি লাভ? তোমার আগ্রহ এত তীব্র যে অন্তের অনুগ্রহ বড় হয়ে দেখা দিতেই পারবে না কোন দিন—তোমার নিজের তরফের দোষ-ত্রুটি তো পরের কথা।

কথা শেষ হয় সেইখানেই। নীড়ভাঙ্গা পাখীর মতন নারী বিদায়-ব্যথা ভুলতে চায় পুরুষকে অবলম্বন করেই। চিরাচরিত প্রথা ও পথ। দেশ কাল কোন বাধা আনতে পারে না। চোখের জলই পুরুষের পুরস্কার—এই দূরে চলে যাবার সন্ধিক্ষণে।

বাড়ী ছেড়ে পথে নেমে পড়ে নরেন। দূরে হাইড পার্কের সতেজ আলো চোখে আসে। ওরই পাশ দিয়ে যেতে হবে এবার শূন্যতা নিয়ে। ভরসা তবু—আগামী কালের পরিপূর্ণ আলোর ঝলকানি দেখা দিচ্ছে দিগন্তের কোলে। নারীত্বের পূর্ণ আবেদন ঐ হাইড পার্ক কর্ণারে—আবার নারীর জন্ম আতিথ্যে নিজেকে সম্মানিত করার সুযোগ দিয়েছে ঐ হাইড পার্ক কর্ণারই। হয়তো ওর নাম ছড়িয়েছে চারি দিকে, শুধু ঐ ভিন্নমুখী সত্তার জন্ম।

হাইড পার্ক কর্ণার—হাইড পার্ক কর্ণার।

হাইড পার্ক কর্ণারকে বিদায় জানিয়ে পিছন ফেরে নরেন রাতের আশ্রয় অভিমুখে। হাইড পার্কের আলো ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে যায়—দূরে অনেক দূরে এখন। ফিরবেও না আপাতত। পরের দিন আবার আসবে ফিরে—দেখা হবে—পরিচয় ঘন হবে। রথের চাকা চলবে ধীর গতিতে। এই ভাবেই যত দিন না রথ পৌঁছায় শিখর দেশে। চালক পাবে সেদিন যোগ্য পুরস্কার—চলার সঙ্গিনীই দেবে মাল্য, জয়ের শুভ নিশান।

অন্ধকারে উপবিষ্ট থ্রাসপক্ষী

[টমাস হার্ডির "The Darkling Thrush"-এর ভাব অবলম্বনে]

অর্দ্ধশায়িত দেহখানি ছিল ঝোপের বেড়ার দ্বারদেশে,
পৃথিবী ধূসর সেজেছিল যবে তুহিনাবরণ বেশে।
শীতের দিনের স্তিমিত আঁখিটি প্রাণহীন নিবু নিবু,
পাবক পরশ লভিবার তরে মিলিতেছে সবে কভু।
ছোট ছোট সব ডালপালাগুলি চোখের সুমুখে ভাসি,
ছিন্নবীণার তারসম তারা আকাশেতে পরকাশি।
পৃথিবীর এই স্পষ্ট প্রতীত অবয়বখানি যেন,
চলে-যাওয়া সেই শত বরষের শবদেহ গণি হেন।
আকাশে আকাশে মেঘেরা তাহার রচেছে সমাধি-গৃহ,
বায়ু গেয়ে চলে শোক-গাথা তার চলে গেছে যেন প্রিয়।
অঙ্কুর আর জন্মের সেই প্রচলিত প্রথা স্তব্ধ,
পৃথিবীর বুকে প্রতিটি প্রাণীই প্রাণহীন যেন ক্ষুব্ধ।
সহসা আমার মাথার উপরে প্রকাশিল এক কণ্ঠ,
খোলা ছিল তার প্রাণের দুয়ার মুখরিত ছিল ওষ্ঠ।
হৃদয় তাহার ভরেছিল উঠি আশা আনন্দ প্রীতিতে,
মুখরিত তাই করিল সহসা মধুর সন্ধ্যা-গীতিতে।
ক্রম ঘনায়িত অন্ধকারের পীড়ন করিতে দূর,
কণ্ঠে তাহার ঝরিল এমন আশা-আলোকের সুর।
ছোট ও প্রাচীন জীর্ণ-শীর্ণ পাখীটি ছিল গো ত্রস্ত,
ঝড়ের আঘাতে ডানা দুটি ছিল এলোমেলো বিস্রস্ত।
কাছে বা দূরের পার্থিব সব ছিল যে সবই গো নীরস,
আনন্দ-মুখর সংগীত তরে দেবে না প্রাণের পরশ।
(তবুও) প্রাণহীন এই পরিবেশ মাঝে ঝরিল মধুর কণ্ঠ,
তাহাতে ছিল গো আশার বারতা শুনাইল যাহা মিষ্ট।
হৃদয়-কুটীরে ছিল গো তাহার আশার নতুন বারতা,
(তাই) শুভরাত্রির বারতা জানাল আমার ছিল না জানা তা।
প্রকৃতির সাথে যোগ ছিল তার জেনেছিল তার হৃদয়ের কথা,
(আমি) পারিনি জানিতে ছিল জানা তার সুখময় আশা-বারতা।

অনুবাদক—শ্রীসুনীতিকুমার গুড়িয়া

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

মুবারিকা বিবি

শিবানী ঘোষ

একে একে দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে মুসাফিরের দল। তাদের দান করা হচ্ছে রুটি আর মাংস। আজ ঈদ। বছরের এই দিনটিতে শাহ্ মনসুর আগন্তুককে পরিতৃপ্ত করেন এই ভাবে। তাঁর একমাত্র কন্যা মুবারিকা বিবির তত্ত্বাবধানে দাসীরা রুটি আর মাংস দিয়ে আসে মুসাফিরের হাতে।

আজ বাজৌর দেশের ওপর ঘনিয়ে এসেছে চরম দুর্দিন! বাদশাহ্ বাবর ভারতবর্ষ জয় করার অভিপ্রায়ে রওনা হয়েছিলেন কাবুল থেকে। হঠাৎ যাবার পথে তাঁর শ্যেনদৃষ্টি পড়ল দুর্ভাগা এই দেশটার ওপর। এর অপরাধ, এর অধিবাসিবৃন্দ ইসলাম ধর্মের অন্ধ বিশ্বাস অনুকরণ করে না। তাই বাবর স্থির করেছেন, ভারতে যাবার পূর্বে তিনি নিশ্চিহ্ন করে যাবেন এর ইউসুফজাই অধিবাসীদের।

এই চরম দুর্দিনে সকলের মুখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে হাসি। তবু আজ বছরের পবিত্র দিন। শত দুঃখের মাঝেও তাই বিবি মুবারিকা অবহেলা করেননি তাঁর মুসাফির সেবার কাজে। তিনি দাসীদের হাত দিয়ে হাসিমুখেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাদের প্রাপ্য বস্তু।

হঠাৎ এক সময়ে চমকে উঠেছেন মুবারিকা বিবি। এ কি! দরজার এত কাছে এসে একজন মুসাফির এ ভাবে তাঁর পানে তাকিয়ে দেখছেন কেন? মুসাফিররা তো এমন বেয়াদপি কখনও করেন না? তিনি তাড়াতাড়ি মুখের ওপর নেকাবটা টেনে নিয়ে তাঁর এক দাসীকে বলেন—ফিরোজা, যা শীগ্‌গির রুটি আর মাংস দিয়ে আয় দরজার নিকট দণ্ডায়মান ঐ মুসাফিরকে। আর আসবার সময় বলে আসবি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মেয়েদের পানে তাকিয়ে থাকাটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, ভবিষ্যতে তিনি যেন এ কাজ আর না করেন।

রুটি ও মাংস নিয়ে চলে গেল ফিরোজা। মুসাফিরের হাতে সেগুলি দিয়ে ফিরে আসতে তার বিলম্ব হল কিছুক্ষণ। তার আসতে দেরি দেখে মুবারিকা বিবি বলেন—এতক্ষণ মুসাফিরের সাথে কি করছিলি ফিরোজা?

ফিরোজা বলে—তিনি কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন, তার উত্তর দিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল।

বিস্মিতা হয়ে মুবারিকা বিবি বলেন—প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন? কি প্রশ্ন?

—এই জিজ্ঞেস করছিলেন তোমার সম্বন্ধেই, মানে তোমার নাম কি, বয়স কত, তোমার মেজাজ কেমন, তুমি বিবাহিতা কি না, এই সব প্রশ্ন।

—ছি ছি ছি, মুখটা বিকৃত করে মুবারিকা বিবি বলেন—আমার সম্বন্ধে এই সব প্রশ্ন করছিলেন মুসাফির? তা তুই কি বললি?

ফিরোজা বলেন—যা সত্যি কথা তাই বললাম। বললাম তোমার নাম মুবারিকা, বয়স ষোল বৎসর, তোমার মেজাজ এমন শান্ত ও ধীর যা খুব কম মেয়ের মধ্যেই দেখা যায়। আর তোমার এখনও বিবাহ হয়নি এবং উপস্থিত তুমি কারও বাগ্‌দত্তা নও, সে কথাও বললাম।

—ছি ছি ছি, এ সব কথা বলে তুই মোটেই ভাল করিসনি ফিরোজা! কোথাকার কে একজন মুসাফির, তার কাছে আমার পরিচয় দেওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা এখন যা তুই।

চলে গেল ফিরোজা। বিবি মুবারিকা তখন একাকিনী বসে ভাবতে থাকেন ঐ মুসাফিরের কথা। উনি তার সম্বন্ধে এত প্রশ্ন কেন করলেন? তবে তাকে কি তাঁর মনে ধরেছে? ছি! ছি! ছি! ঐ আধবুড়ো লোকটাকে স্বামিরূপে কল্পনা করতেও যেন গা শির-শির করে।

বাজৌর দেশের অধিকর্তা মালিক আহ্‌মেদ, শাহ্ মনসুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বসে রয়েছেন একটি কক্ষে। বাবরের হাত থেকে ইউসুফজাইদের রক্ষা করা আর বোধ করি সম্ভব হবে না। তিনি যে মূর্তি নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে আর সাত দিনের মধ্যে এক মহাশ্মশান ভূমিতে পরিণত হবে এই বাজৌর।

—সালাম আলেকুম!

চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় মালিক আহ্‌মেদের। তিনি চেয়ে দেখলেন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বাবরের এক দূত। হঠাৎ তাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন আহ্‌মেদ। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি আছে?

বাবরের বার্তাবহ পুনরায় কুর্নিশ জানিয়ে বাদশাহের ফরমানটা এগিয়ে দিলেন মালিক আহ্‌মেদের দিকে। পত্রটি পড়ে চমকে উঠলেন বাজৌর-অধিপতি। তিনি পত্রবাহককে বললেন—আচ্ছা তুমি আসতে পার, এর জবাব আমি এখুনি সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পত্রবাহক চলে গেলে মালিক আহ্‌মেদ তাঁর সহকর্মী শাহ্ মনসুরকে বলেন—অত্যন্ত সাংঘাতিক এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন বাদশাহ্ বাবর।

—কি প্রস্তাব ?

—সে প্রস্তাব হচ্ছে তোমার মেয়ে মুবারিকা বিবির পাণিগ্রহণ করতে চান সম্রাট। শাহ, মনসুর গর্জে ওঠেন—অসম্ভব, এ হতেই পারে না।

মালিক আহ্‌মেদ বলেন—অসম্ভব বলে গর্জন করে উঠলে কোন ফল হবে না। তাতে বাজৌর অধিবাসীদের পক্ষে হবে আরও ক্ষতিকর! তার চেয়ে এই মর্মে বাদশাহ্‌কে পত্র লিখে দেওয়া যাক যে সম্রাটের সহধর্মিণী হতে পারে এরূপ মেয়ে শাহ, মনসুর বা অন্যান্য অধিকর্তাদের নেই। এই কারণে সম্রাটের অভিপ্রায় পূরণ না করতে পারায় তাঁরা দুঃখিত।

মালিক আহ্‌মেদের যুক্তি সকলেই সমর্থন করলেন সর্বান্তঃকরণে। কাজেই তখুনি পত্র চলে গেল বাবরের নিকট। কিন্তু পরদিন আবার এল সম্রাটের ফরমান। তাতে তিনি লিখেছেন, শাহ, মনসুরের মুবারিকা বিবি নাম্নী এক ষোড়শী কন্যা আছেন, এ খবর তিনি ভাল করেই জানেন। গত ঈদের দিন তিনি মুসাফিরের ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তাঁর গৃহে। সেখানে তিনি অন্তঃপুরের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন কুমারীকে এবং তাঁর দাসীর মুখে তিনি সব কিছুই অবগত হয়েছেন মুবারিকা বিবির সম্বন্ধে। পরে তাঁর পাঠানো রুটি ও মাংস নিয়ে তিনি চলে আসেন সেখান থেকে। সেই রুটি ও মাংস মনসুরের গৃহের পশ্চাদ্‌ দেশেযে দুটি প্রস্তরখণ্ড পড়ে আছে, তার মাঝে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি রেখে এসেছেন ওগুলি। কাজেই শাহ মনসুরের কন্যা নেই, এই বলে তাঁর চোখে মিথ্যে ধূলো দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এবং মুবারিকা বিবিকে যদি তিনি না পান তবে তিনি সমূলে উৎপাটন করবেন ইউসুফজাইদের।

সম্রাটের পত্র পাঠ করে অবাক হয়ে গেলেন সকলে। তাঁর কথা প্রকৃত সত্য কি না, তা যাচাই করবার জন্যে শাহ, মনসুর লোক পাঠিয়ে দিলেন তাঁর গৃহের পশ্চাদ্‌দেশে নিক্ষেপিত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে রুটী ও মাংসের সন্ধানে। খবর পাওয়া গেল এ কথা মিথ্যে নয়। এবং মুবারিকা বিবির কাছে লোক পাঠিয়েও যে সংবাদ পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল, বাদশাহ, বাবর মুশাফিরের ছদ্মবেশে সত্যিই দেখে গেছেন তাকে। তবে এখন উপায়? যদি ঐ মেয়েকে তাঁর হাতে না দেওয়া যায় তবে বাজৌর তথা ইউসুফজাইদের যে কি অবস্থা হ'বে তা সহজেই অনুমেয়। এখন এই চরম বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র শাহ, মনসুরের কন্যা মুবারিকা। তখন তাঁকে ধ'রে বসলেন সকলে। বাড়ী গিয়ে তিনি যাতে মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবরের সহধর্মিণী হতে রাজী করান, তবে এ এক চরম উপকার করা হয় বাজৌর-এর পক্ষে। আর তাঁর কন্যা যথার্থই

বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্না, কাজেই দেশের এই বিপদের কথা স্মরণ ক'রে তিনি এতে নিশ্চয়ই অমত করবেন না।

শাহ, মনসুর গৃহে ফিরে সেই দিনই একবার প্রবেশ করলেন কন্যা মুবারিকার কক্ষে। মেয়েটি তখন একাকিনী বসেছিলেন জানালার পাশটিতে। হঠাৎ পিতাকে ঘরে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে।

শাহ, মনসুর একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখেন মেয়ের মুখের পানে। রূপে গুণে অতুলনীয়া এমন মেয়ে বোধ করি সারা আফগানিস্তানে আর দ্বিতীয় নেই। যেমন স্থির, তেমনি বিচক্ষণ। কিন্তু এই মেয়েকেই আজ সঁপে দিতে হবে এক মোগলের হাতে। ইউসুফজাই হয়ে এ অপমান সে হয়ত স্বীকার ক'রে নেবে নিজগুণে কিন্তু তিনি পিতা হয়ে এ কথা মেয়েকে কেমন ক'রে জানাবেন ?

—বাবা, আমাকে কিছু বলবেন ?—ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মুবারিকা বিবি।

—হাঁ মা, একটা কথা বলতে এলাম তোমাকে। শুনেছো বোধ হয় কাবুল-অধিপতি বাবর ধ্বংস করে দিতে চান আমাদের এই বাজৌর দেশ এবং নির্বংশ ক'রে দিতে চান এর ইউসুফজাই জাতিকে। তা' এই দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করতে পার মা, একমাত্র তুমি।

—আমি ? বিস্মিতা হয়ে মুবারিকা পিতার মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—পিতা, আমি অবলা নারী, আমার কি এমন শক্তি আছে যে বাদশাহ, বাবরকে পরাজিত করবো ?

মনসুর বললেন—শক্তি দিয়ে নয় মা, তোমাকে সে কাজ করতে হবে হৃদয় দিয়ে। অবশ্য আজ তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি তা তোমার পক্ষে কেন সমস্ত ইউসুফজাইদের পক্ষেই একটা অপমানসূচক কথা। তবু এই বাজৌরের মুখের পানে চেয়ে তা তোমাকে মানতেই হবে মা !

মুবারিকা বললেন—আপনি দ্বিধা বোধ করছেন কেন পিতা ! আমি তো আপনার কথার কখনও অবাধ্য হইনি ? আমাকে যা বলবেন তা আমি হাসিমুখেই মেনে নেবো।

মৃদু হেসে মনসুর মেয়ের মাথায় দু'বার হস্ত সঞ্চালন ক'রে বলেন—আমার কথা তুমি যে হাসিমুখে মেনে নেবে তা আমি জানি। কিন্তু কথাটা বলতে যে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

—তবু বলুন পিতা !

শাহ মনসুর আর একবার স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন মেয়ের মুখের পানে। তারপর বললেন—সম্রাট বাবর তোমাকে সহধর্মিণীরূপে পেতে চান। যদিও এতে আমাদের কারও আন্তরিক মত নেই। তবু দেশের প্রতি চেয়ে তুমি এতে রাজী হও মা !

কথাটা শুনেই কেমন যেন শিউরে ওঠেন মুবারিকা বিবি। ইতিপূর্বেই তিনি ফিরোজার মুখে শুনেছেন সেদিনের সেই মুসাফিরই সম্রাট বাবর। তাঁর সেদিনের বেয়াদপি তিনি মোটেই ক্ষমা করতে পারেন নি। তা ছাড়া তাঁর যৌবনকাল গেছে উত্তীর্ণ হ'য়ে, আর স্ত্রীও আছে গুটি পাঁচেক। এ অবস্থায় তাঁকে স্বামিরূপে বরণ করতে অন্তর ছেপে ওঠে কান্নায়। তবু নিজেকে সংযত করে নিয়ে মুবারিকা বলেন, তাই হবে পিতা !

ব্যথিত কণ্ঠে শাহ, মনসুর বলেন—বেশ, তবে এর জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও মা !

পরদিন সকলের নিকট বিদায় নিয়ে শিবিকায় গিয়ে উঠলেন মুবারিকা। আজ আর বাধা মানছে না অশ্রু। ওড়নাঞ্চলে ঘন ঘন মুছতে হয় চোখ। আজ তিনি রাজনীতির দাবাখেলায় একটি ঘুঁটি ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁকে লোকে যে ভাবে চালিত করছে তিনিও সেই ভাবেই চালিত হচ্ছেন। তাঁর নিজস্ব সত্তা বলে আজ আর কিছু নেই। হায় বিধাতা ! শেষ পর্যন্ত এই কি ছিল তোমার মনের বাসনা !

এগিয়ে চলল শিবিকা। সংগে চলল তাঁর তিন জন দাসী। পশ্চাতে চললেন মালিক আহমেদ শাহ মনসুর প্রমুখ অধিকর্তাগণ। এবং তার পশ্চাতে চলল বাজৌরের অধিবাসিবৃন্দ।

শিবিকা এগিয়ে চলল থানা গ্রাম থেকে চাকদারা গ্রামের পথে। সেখানে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হ'য়ে তাঁরা গিয়ে পৌঁছালেন তাতাস গ্রামে। এখানে সাক্ষাৎ হ'ল সম্রাটের দলটির সাথে। তাঁরা এঁদের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন বাবরের শিবিরের দিকে। মালিক আহমেদ, শাহ মনসুর কুমারীকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলেন সেখান থেকেই।

বাবরের শিবিরে একটি তাঁবুতে অত্যন্ত আতিশয্যের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসানো হল মুবারিকা বিবিকে। সেখানে এসে জড়ো হলেন দেশের প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সহধর্মিণীগণ। তাঁরা প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন নববধূর রূপ দেখে। কিন্তু তাঁদের সাথে আলাপ করবার মত মনের অবস্থা তখন মুবারিকা বিবির ছিল না। তিনি নীরবে বসে থাকেন অবনত মস্তকে। তাই দেখে বিবি-বেগমরা মন্তব্য করেন রূপের সাথে এর অহঙ্কারও কিছু কম নেই। না হলে দু'-একটি মুখের কথাও কি খসতে নেই ? এর কোন উত্তর দিতে পারেন না মুবারিকা। শুধু ফুঁপিয়ে উঠতে থাকে তাঁর অন্তর। তাঁরা একে একে চলে গেলেন তাঁবু থেকে। তখন একজন দাসী এসে জানালো—আপনি প্রস্তুত থাকুন বেগম সাহেবা, এখুনি এখানে সম্রাট আসবেন।

দাসীর কথা শুনে চমকে ওঠেন মুবারিকা বিবি। বাদশাহ এখুনি আসবেন এখানে ? তাঁকে সে কেমন করে বরণ ক'রে নেবে স্বামিরূপে ? কিন্তু না, না, না। এখন একথা তার মনে আসছে কেন ? আজ সারা বাজৌর দেশ চেয়ে আছে তাঁর মুখের পানে। এ অবস্থায় তাঁর কাছে কামের বলি না হয়ে উপায়ই বা কোথা ?

—আসতে পারি বেগম সাহেবা ?

ধড়মড়িয়ে জাজিম ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানাল মুবারিকা। বাদশাহ বাবর মৃদু হেসে প্রবেশ করেন তাঁবুর মধ্যে। মুবারিকা তাঁকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অবনত মস্তকে। বাবর জাজিমের ওপর বসে বলেন—আফগানিয়া, বোস আমার পাশে।

মুবারিকা তবু দাঁড়িয়ে থাকেন অবনত মস্তকে। বাবর চেয়ে দেখেন তাঁর নেকাব-ঢাকা মুখের পানে। তারপর আবার বলেন—বোস আফগানিয়া !

এবারেও নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আফগান-রমণী। তখন বাবর উঠে তাঁর কাছে এসে মুখ থেকে সরিয়ে দেন নেকাবটি। মুবারিকা অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সঙ্কুচিতা হয়ে। বাবর একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তাঁর গোলাপের মত আরক্ত কোমল

মুখের পানে। তারপর আবার বলেন—আমার পাশে বসবে না আফগানি!

এইবার কম্পিত অধরে মুবারিকা বলেন—আমার একটা নিবেদন আছে।

বাবর অত্যন্ত সহানুভূতির কণ্ঠে বলেন—কি নিবেদন আছে বল না প্রেয়সি, তুমি অত ভীত হচ্ছ কেন?

মুবারিকা এইবার একবার সম্রাটের মুখের পানে চেয়ে পুনরায় নত করে নিলেন মাথা। তারপর ধীরে ধীরে খুলে ফেললেন তাঁর পরিধানের বোরখাটি। বহিরাবরণ হতে মুক্ত হয়ে তখন বেরিয়ে আসে স্বচ্ছ মসলিনে-ঢাকা তাঁর তন্বী দেহটি। বাবর হতবাক হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর অর্ধনগ্ন দেহের পানে। নেশা লাগে তাঁর চোখে। মুবারিকা তখন তাঁর দেহ সম্রাটের সমুখে এগিয়ে ধরে বলেন—জাঁহাপনা, আপনার বাজোর দেশের প্রতি যত ক্রোধ আজ তা আমার এই দেহের মধ্যে বিসর্জন দিয়ে ইউসুফজাইদের রক্ষা করুন।

বাবর সানন্দে তাঁকে বাহু আবেষ্টনে জড়িয়ে ধরে বলেন—তাই হবে আফগানি, ইউসুফজাইদের আর কোন অপকারই আমি করবো না।

তখন আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ে মুবারিকার চোখ থেকে। সত্যি তবে আজ বাজোর রক্ষা পেল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। কাঁপতে থাকে তাঁর অধর। বাবর সেই কম্পিত ওষ্ঠে এঁকে দেন তাঁর প্রীতির চুম্বন।

ক্রমশঃ নেমে আসে দ্বিপ্রহর। হয়ে আসে প্রার্থনা করার সময়। সম্রাট উঠে দাঁড়ান জাজিম ছেড়ে। মুবারিকা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পাদুকা এনে পরিয়ে দেন তাঁর পায়ে। তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে ওঠেন বাদশাহ। তাঁর চিবুক ধরে মাথাটা অল্প একটু তুলিয়ে দিয়ে আদর করে তিনি বলেন—তোমার প্রতি আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে তোমার দেশবাসীর অপকার তো দূরের কথা, তাদের যাতে সকল বিষয়ে উন্নতি ঘটে সেই চেষ্টাই আমি করবো।

সেই কথা শুনে মুবারিকার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে সমবেদনার অশ্রু।

দিনে দিনে মুবারিকার প্রতি ভালবাসা গভীর হয়ে ওঠে সম্রাটের। ইতিপূর্বে অন্য কোন মহিষীই তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারেন নি এঁর মত। আয়েসা, মাহাম, মাসুমা, গুলরুখ বা দিলদর এই পাঁচ বেগমের তুলনায় মুবারিকা যেন মূলে প্রভেদ। যেমন তাঁর স্বভাব তেমনি ব্যবহার। তাঁর চরিত্রের সাথে তুলনা করবার মত কোন রমণীই তাঁর চোখে পড়ে না।

সে'বার ভারতবর্ষ অভিযানে যাওয়া আর সম্ভব হল না বাবরের পক্ষে। তিনি বাজোর থেকেই ফিরে এলেন কাবুলে। কিন্তু কাবুলে এসে তাঁর অন্যান্য মহিষীদের রাগ গিয়ে পড়ল মুবারিকার প্রতি। কোথাকার একটি মেয়ে বুড়ো বয়সে সম্রাটের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠবে এ তাঁদের সহ্য হয় না। তাঁরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন ঐ নববধূটির ক্ষতি করতে। কিন্তু মুবারিকা আপন চরিত্রগুণে বুঝতে পারেন না তাঁদের শত্রুতা।

এদিকে আর একটা অসুবিধা বোধ করেন মুবারিকা বিবি। সম্রাট তাঁকে যত বেশী ভালবাসেন ততই তাঁর ছোট মনে হয় নিজেকে। সম্রাটের ভালবাসার প্রতিদান তিনি ঠিক মত দিতে পারেন না। কত বার তিনি তৈরী ক'রে রেখেছেন নিজের মন। কিন্তু সম্রাটের বিগত যৌবনের পানে তাকাতেই তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তখুনি। তাই এক একবার তাঁর মনে হয় সম্রাটের একটি সন্তান যদি তাঁর কোলে আসে, তবে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে তিনি পূরণ করে দেবেন এই অপরাধ। কিন্তু সত্যিই কি তিনি জননী হতে পারবেন কোন সন্তানের?

সেদিন সম্রাটের পাঁচ মহিষী প্রবেশ করলেন মুবারিকার ঘরে। তাঁর চিন্তান্বিত মুখমণ্ডলের পানে তাকিয়ে মাসুমা সুলতানা বেগম বলেন—কি ভাবছিস রে ছুঁড়ি?

লজ্জায় ঘেমে ওঠেন মুবারিকা। দিলদর বেগম বলেন—কি ভাবছিলি বল্ না লো?

মুবারিকা বলেন—আচ্ছা দিদি, আমার একটি সন্তান হবে কি না বলতে পারেন?

মাহাম বেগম বলেন—তা আবার হবে না? তোমার সন্তানই যে হবে ভাবীকালের সম্রাট, কাজেই তা না হয়ে কি থাকতে পারে?

তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে মুবারিকা বলেন—ছি! ছি! ছি! একি আপনি বলছেন দিদি, আপনাদের উপযুক্ত সন্তান থাকতে আমার সন্তান ভাবীকালের সম্রাট হবে কেন? আমি শুধু সম্রাটের প্রেমের প্রতিদান দেবার জন্যেই একটি শিশুর মা হতে চেয়েছি।

মাসুমা সুলতানা বেগম বলেন—তা সে যার জন্যেই চাও। তুমি শিশুর মা হতে চেয়েছো বলেই তো আমরা হাকিমকে বলে ওষুধ আনিয়েছি। তা নাও এটা খেয়ে নাও।

মুবারিকা হতবাক্ হয়ে চেয়ে থাকেন বেগমদের মুখের পানে। এঁরা এ খবর জানলেন কি করে! এর আগে তিনি এ কথা কাউকে তো বলেন নি? মাসুমা বলেন—ভয় নেই, এ বিষ নয়, তোমাকে মারবার ষড়যন্ত্র করে আমরা আসি নি।

—ছি! ছি! ছি! এ কি কথা বলছেন! মুবারিকা তাড়াতাড়ি বাটিটা নিয়ে নিঃশেষে পান করে নেয় ওষুধটুকু।

এবার হাসি ফুটে ওঠে বেগমদের মুখে। তাঁরা একবাক্যে বলেন—এবার তোমার কোলে নিশ্চয়ই সন্তান আসবে আফগানি, এতে আর কোন ভুলই নেই। বলেই তাঁরা হাসতে হাসতে বিদায় হন একে একে।

তাঁরা চলে যাবার পর হঠাৎ এক সময়ে ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে ফিরোজা। বাপের বাড়ীর লোক বলতে এই একটি মাত্র দাসীই আছে তাঁর সাথে। আপদে বিপদে অন্যান্য বেগমদের ষড়যন্ত্র থেকে সে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলে তার মনিব ঠাকরুণকে। সে এসেই সামনের উচ্ছিষ্ট বাটিটা দেখিয়ে বলে—এটা কি সাহজাদী?

মুবারিকা হেসে বলেন—জানিস ফিরোজা, আজকে সম্রাটের সব বেগমরাই এসেছিলেন আমার ঘরে। আমি সন্তানের জননী হতে চেয়েছি জেনে তাঁরা হাকিমের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে গেলেন আমাকে। আমি একটু আগেই তা পান করেছি।

—কি সর্বনাশ! চমকে ওঠে ফিরোজা।

বিস্মিতা হয়ে মুবারিকা বলেন—কিসে সর্বনাশ হল ফিরোজা ?

—উঃ শাহজাদী, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন খেতে গেলে বেগমদের দেওয়া ওষুধ ?

—কেন ওষুধে কি ছিল ফিরোজা ?

—আঃ শাহজাদী, তোমাকে ওরা আজ যে ওষুধ খাইয়ে গেল, তাতে আর কোন সন্তানই আসবে না তোমার গর্ভে। তোমাকে ওরা ওষুধ খাইয়ে করে দিয়ে গেল বন্ধ্যা।

—বন্ধ্যা! শিউরে ওঠেন মুবারিকা বিবি। তিনি বিস্মিতা হয়ে বলেন—সত্যি না কি ফিরোজা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব সত্যি, তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনেই তো আমি ছুটে এলাম তোমার কাছে। কিন্তু শয়তানীরা যে তার আগেই কাজ হাসিল করে চলে গেছে তা ভাবতেও পারি নি।

ফিরোজার কথা শুনে নির্বাক হয়ে বসে থাকেন মুবারিকা বিবি। আজ আর তিনি কিছুই ভাবতে পারছেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি আপন জাত-কুল-মান বিসর্জন দিয়ে বরণ করে নিলেন এক বিগতযৌবন পুরুষকে। তারপর একটি সন্তানের জননী হওয়ার আশাও তাঁর নির্মূল হয়ে গেল চিরতরে! হায় এর পর নারী হয়ে বেঁচে থাকার আর সার্থকতা কোথায়? মুবারিকা বিবি কাঁদবার শক্তিটুকু পর্যন্ত যেন হারিয়ে ফেলেন। তাঁর অন্তরে তখন শুধু প্রবাহিত হয়ে চলে দুঃখ-বেদনার তুফান ঝটিকা।*

মহিলা কবি চন্দ্রাবতী

শ্রীবহ্নি চক্রবর্ত্তী

অনেক বাঙ্গালী মেয়েই কবি হিসাবে বেশ নাম করেছেন। কিন্তু অনেক দিন আগে যখন বাঙ্গলা দেশে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল, তখন একটি বাঙ্গালী গ্রাম্যমেয়ে যে কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। অথচ এমনই দুঃখের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম, এ ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছাড়া আর বিশেষ কেউই এই প্রতিভাশালিনী কবির নাম শোনেননি।

এই মহিলা কবির নাম চন্দ্রাবতী। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার এক গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে চন্দ্রাবতীর জন্ম হয়। বাঙ্গলা দেশের পাড়াগাঁয়ের সাধারণ একটি গৃহস্থঘরে জন্ম নিয়েও চন্দ্রাবতী যে কবিপ্রতিভা ও চরিত্রবল দেখিয়ে গিয়েছেন তা' প্রত্যেক মেয়েরই জানা উচিত। চন্দ্রাবতীর জীবনী থেকে প্রত্যেক মেয়েরই অনেক কিছু জানবার ও শেখবার আছে।

মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল গায়ক ও রচয়িতা বংশীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (উপাধি চক্রবর্ত্তী) চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী ও তাঁর পিতা এক সঙ্গে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মনসাদেবীর ভাসান-গান রচনা করেন। এ ছাড়া চন্দ্রাবতী মলুয়া ও কেনারামের পালা নামে দুইটি গাথাকাব্য রচনা করেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী একটি রামায়ণ রচনা করেন। এ সমস্ত কাব্যই তিনি নিজের দেশের প্রচলিত ভাষায় রচনা করেছিলেন। সাধারণ প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় যে কত উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যেতে পারে, চন্দ্রাবতীর কাব্যগুলি তা'র নিদর্শন। চন্দ্রাবতীর রচিত পালাগীতি মলুয়া ও কেনারামের পালা বাঙ্গলার প্রত্যেক নারীরই পড়া উচিত। এত অল্প জায়গায় পালাগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মলুয়া পালাতে চন্দ্রাবতী একটি আদর্শ পতিব্রতা রমণীর ছবি অতি সাধারণ বর্ণনা ও প্রাঞ্জল ভাষার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মলুয়ার দুঃখে সবারই চোখে জল আসবে আবার সঙ্গে সঙ্গে মলুয়ার কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পতিভক্তি প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েরই অনুকরণীয়। কেনারামের পালায় বিখ্যাত দস্যু কেনারাম কি করে বংশীদাসের মনসাভাসান গান শুনে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল, তারই বর্ণনা করেছেন চন্দ্রাবতী। এই পালাটির ছত্রে ছত্রে পিতার প্রতি চন্দ্রাবতীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ রচনা করেন তাতে অনেক নতুনত্ব পাওয়া যায়। দেশপ্রচলিত অনেক কাহিনী তাঁর এই রামায়ণে স্থান পেয়েছে। রামায়ণ রচনায় প্রচলিত কৃত্তিবাস ও বাল্মীকির রামায়ণকে সর্বাংশে অনুসরণ না করে তিনি যে মৌলিকত্বার পরিচয় দিয়েছেন তা' তার নিজস্ব প্রতিভার পরিচায়ক। চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণটি পড়লে তাঁর গভীর সমবেদনাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েরই চন্দ্রাবতী রচিত এই কাব্য ক'টি পড়া উচিত। আমাদেরই মত একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে কি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাব্যগুলি সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা' প্রত্যেক মেয়েরই জানা উচিত।

চন্দ্রাবতীর নিজের জীবন বড়ই দুঃখময় ছিল। আর সেই দুঃখের ছায়া তাঁর কাব্যগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। মলুয়া, সীতা, এঁদের দুঃখ তিনি নিজের অন্তরের দুঃখ দিয়ে অনুভব করেছেন ও তাকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন। জয়চন্দ্র নামে একটি ব্রাহ্মণপুত্র চন্দ্রাবতীর ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মে। তখন বংশীদাস জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতীর বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললেন। কিন্তু হঠাৎ এই সময় জয়চন্দ্রের কি দুর্মতি হোল, তিনি একটি মুসলমান যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। এ খবরে চন্দ্রাবতী পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী বড় পিতৃভক্ত মেয়ে ছিলেন। তাই তিনি বংশীবদনের উপদেশ অনুসারে জগতের অন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ ক'রে একান্ত মনে শিবপূজায় রত হ'লেন ও রামায়ণ রচনা করতে শুরু করলেন। নিষ্ঠা ও চরিত্রবলে চন্দ্রাবতীকে রামায়ণ, মহাভারতের সীতা, সাবিত্রীর সঙ্গে এক আসনে বসান যায়। কিছুদিন পরে জয়চন্দ্র অনুতপ্ত হ'য়ে ফিরে এলেন চন্দ্রাবতীর কাছে। কিন্তু দুঃখে চন্দ্রাবতীর বুক ভেঙ্গে গেলেও পিতার অসম্মতি জেনে তিনি জয়চন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারলেন না। তিনি তাঁ'র পিতার সন্তুষ্টির জন্য অম্লানবদনে সবরকম দুঃখ সইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এখনকার দিনে এ-রকম দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। চন্দ্রাবতীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অনুতপ্ত জয়চন্দ্র জলে

* (1) Asiatic Quarterly Review, April 1901, An Afghan Legend.—Mr. Beveridge. (2) The Humayun-Nama of Gulbadan Begam—Mrs. Beveridge. (3) History of India (Vol. 1) —Erskine.

ডুবে আত্মহত্যা করলেন। এ আঘাত চন্দ্রাবতী সইতে পারলেন না। নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে একদিন তিনিও অকালেই পৃথিবীর মায়া কাটালেন।

এত অল্প বয়সে এ ভাবে চন্দ্রাবতীর মৃত্যু না হ'লে তিনি আরও অনেক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারতেন। জয়চন্দ্রের ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির ফলে এত বড় একজন প্রতিভাশালিনী বাঙ্গালী মেয়ের প্রতিভা প্রায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হোল।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ এখনও মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা অনেকেই মুখস্থ বলতে পারেন। আমরা আজ স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও ডিগ্রী নিয়ে গর্ব্ব অনুভব করি। কিন্তু স্কুল-কলেজে শিক্ষা না পেয়েও সাধারণ গ্রাম্য আবহাওয়াতে সেকালের মেয়েরা কত জ্ঞানী, গুণী ও আদর্শপরায়ণা হ'তেন, কবি চন্দ্রাবতীর জীবনী তা'র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পথে পথে

শ্রীসুনীতা দত্ত

শীতের বেলা হ'য়ে এল শেষ, সন্ধ্যাকাশে অস্তমান সূর্যের শেষ আলোকচ্ছটা—বাতাসে শিরশিরে ঠাণ্ডা। আকাশ ভরা মেঘ-স্তবকের দিকে তাকিয়ে খুশীর আনন্দ উছলে উঠল। বিকেল তখন পাঁচটা—আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু। উদ্দেশ্য পথে পথে ঘুরে বেড়ান—দৈনন্দিন জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য আনা।

২২শে জানুয়ারীর আসন্ন সন্ধ্যা আমাদের চোখে রঙিন হয়ে উঠল। আমরা দেখলাম মেদুর বৈকালের রক্তিম আভা—হু-হু হাওয়ায় নতুন খুশীর ইঙ্গিত, পথের বাঁকে বাঁকে জীবনের সাড়া। ছুটে চলেছে গাড়ী বর্ধমানের দিকে। মেঠো রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, আশে-পাশের স্তব্ধতাকে মুখর ক'রে আমরা এলেম বর্ধমানে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেম. ডাল, রোটী আর গোস্ত খেয়ে আবার গাড়ীতে। রাত তখন ঘন হয়ে এসেছে, বড় বড় গাছের ঝাঁকড়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলোর আলপনা। কলকাতার আকাশে চাঁদ দেখি কিন্তু এমন ভাল লাগাব মোহ কই খুঁজে পাইনে—এ যেন নতুন আবিষ্কার! ভাবে ভরা কবিতায় নতুন ছন্দের যোগ। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে ঢুল এল—ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে এল দুটো চোখ। আমি স্পষ্ট অনুভব করলেম, মনোবীণার দুটি তারে দুটি ঝঙ্কার। একটির সুরে ক্লান্তির আমেজ, অন্যটিতে নতুন মোহের লহরী। তাই সেই আধো-ঘুম আধো-জাগরণে অনেকখানি পথ পার হতে হতে দেখলেম, মিটমিটে আলো-জ্বলা কুঁড়েঘর, কেটে-নেওয়া ধানের স্তূপ, দু-একটা প্রায় ভেঙে পড়া পাকা বাড়ী, ভ্রাম্যমান মেঘস্তবকের খেলা—আরও কত কি! রাত তখন সাড়ে দশটা—অজয় নদীর ওপরে অসমাপ্ত বাঁশের সাঁকো পেরুলো আমাদের গাড়ী। আর তারপরেই একটু একটু ক'রে স্পষ্ট হ'ল ইলমবাজারের ছোট ডাকবাংলো। সবুজ ঘাসে-ঢাকা লনের মাঝে চারটি ঘরের বাংলো। চেয়ে চেয়ে দেখলেম নতুন আস্তানাটিকে। বাইরে তখন চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে নীল আকাশ। গাছে গাছে অর্ধস্ফুট কলি—গোলাপের হালকা মদির গন্ধ। অনেক রাত অবধি শুনলেম ঝিঁঝিঁপোকার অবিশ্রান্ত ঐক্যতান—দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে গেল—গাছে হঠাৎ ডানা ঝাপটে উঠল কোনো পাখী—তারপর আর মনে নেই—আমি ঘুমিয়ে পড়লেম।

২৩শে জানুয়ারীর সকাল এল ছুটীর সাড়া নিয়ে। সোনালী আলো কুয়াশা ভেদ করে এসে আমাদের স্বাগত জানলে। শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসে আর রাতের শেষ আঁধারে জাত কুসুমকলি চোখে নেশা ধরাল। শীতের হাওয়া এসে ঝরিয়ে দিয়ে গেল শুকনো মরাফুলের পাপড়ি। হালকা রোদের ফিকে গরমে আর ছুটীর আলসে আমেজে মন বুঝি আবার নতুন করে মুগ্ধ হল—হয়তো সেই জন্যেই ডাকবাংলোর সস্তা মোটা কাচের শ্রীহীন কাপের গঙ্গাজলের মত পাতলা চা-ও মন্দ লাগল না।

বেলা হ'ল—রোদও গরম হ'ল। সেই গরম রোদে আমাদের আলসেমি কেটে গেল—প্রসাধন সেরে আমরা সঙ্গে আনা কেক প্যাটিস খেয়ে বোলপুরের পথে পাড়ি দিলেম।

অনেক দূরে পড়ে রইল ইলমবাজার, আমরা দেখলেম ঘন শাল গাছের মাঝে পড়ে থাকা রাস্তা। আরও দেখলেম, গাছের ঝাঁকড়া মাথা ভরা সুন্দর, সতেজ, নবীন পত্র আর তারই তলে শুকনো ঝরা পাতার স্তূপ। ভাবলেম, এমন কেন হয়? শুকনো পাতার স্তূপে হাওয়া বইছে, কেমন যেন এক বিচিত্র দুঃখানুভূতিতে স্মরণ করলেম:

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়
ঝুমকো লতার চিকণ পাতা কাঁপে রে কার চমকে চাওয়ায়।
হারিয়ে যাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্মরণখানি,
আমের বোলের গন্ধ মিশে কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়?

ভাবছিলেম, পথচলার এই সুরটুকু থাকলে অনন্তকাল পথ চলতে পারি আর যাযাবর জীবন যদি এমনি মধুর হয়, আমি ছাড়তে পারি স্থায়ী নাগরিক জীবন। দূরে যখন নীল দিগন্তের শেষ প্রান্তে ভেসে উঠল বোলপুরের ধোঁয়াওঠা চিমনি, ঠিক সেই সময়ে গাড়ী থেমে গেল। দেখা গেল পেট্রলের ট্যাঙ্ক শূন্য। হঠাৎ যেন আমাদের মনটাও শূন্য হয়ে গেল। সমস্ত সৌন্দর্যবোধ স্তিমিত হ'য়ে এল, খবর এল তিন মাইলের মধ্যে নেই পেট্রলের দোকান। দুটি ছেলে যাচ্ছিল রায়পুরের দিকে সাইকেলে, তাদেরই একজন রাজি হ'ল সাইকেল দিতে। সেই সাইকেলে পেট্রল যখন এল, তখন বেলা প্রায় ১১টা।

মাঘের সূর্য ঠিক মাথার ওপরে, আমরা মুখ শুকিয়ে ফিরে এলেম বিশ্বভারতীর অতিথি-ভবন থেকে। জায়গা নেই। কিন্তু কপাল ভাল বলতে হবে, প্রায় শান্তিনিকেতনের পাশেই একটি আধপুরোন বাংলোয় আমরা জায়গা পেলেম। বাংলোর চারপাশে ধূ ধূ মাঠ, নিশ্চিন্ত আস্তানা পেয়ে বীরভূমের রাঙা মাটিতে আবার নতুনত্বের সাড়া পেলেম।

বিকেল চারটে। স্টোভে চায়ের গরম জল চেপেছে। পড়ন্ত রোদে অল্প ঠাণ্ডা—অনেক দূরে সূর্য প্রায় নেমে এসেছে দিগন্তে। তাস খেলতে খেলতে ভাবছিলেম, কি করি সারা সন্ধ্যে!

খুব ছোট জায়গা বোলপুর, দেখবার মধ্যে শান্তিনিকেতন, কিন্তু সে-ও তো কাল সকালের আগে হবে না। এমন সময়ে মাইকে গানের সুর ভেসে এল—আমরা মন স্থির করে ফেললেম। বোলপুরের

একমাত্র চিত্রগৃহ "বিচিত্রা"র সন্ধ্যেটা কাটালেম। কখন রাত এল জানতে পারলেম না। সাড়ে আটটায় ছবি শেষ হ'লে বেরিয়ে দেখি ফুটফুটে চাঁদের আলো। সেই স্বচ্ছ আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল, বড় ক্লান্ত—বিশ্রাম চাই।

নতুন জায়গায় নতুন মাধুর্য ব'য়ে আনল ২৪শে জানুয়ারী। আজ সরকারি ছুটীর দিন নয় কিন্তু তবু ছুটী—বেআইনী ছুটী। এই অবৈধ ছুটীটাকে পেয়ে আজ অনেকেই দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে, সৌন্দর্য আর কল্পনাকে উপভোগ করতে এসে দাঁড়িয়েছে, মাথা নত করেছে কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের লাল মাটীতে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল কল্পনার এমন বাস্তব রূপ কখনও দেখিনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর শিল্পিমনের সৃষ্টি-সৌন্দর্যের কি অবাধ মেলামেশা! "উত্তরায়ণের" সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করতে করতে ভাবলেম—কবিগুরু—

"ভাল তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা।
মিলি নিখিলের স্রোতে জেনেছিলে খুসী হ'তে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদি প্রাণহরা।
তোমার আপন ছিল এই শ্যাম ধরা।"

"উত্তরায়ণে" কবি থাকতেন। এখানে তাঁর সব ক'টি রচনা গ্রন্থাকারে আছে, সেই সঙ্গে অনুবাদও। ঘুরে ঘুরে মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখলেম।

তারপর এলেম সুন্দর সাজান বাগানে একটি ছোট্ট কৃত্রিম ঝিলে—তাতে ভাসমান দু'-একটি পদ্মকলি। সেই ঝিলের ঠিক মাঝখানে ডালপালা-ঘেরা ছোট্ট দ্বীপ। এ পার থেকে তাতে আবার একটি সেতু আছে, তার অপরূপ গঠন দেখে মনে হয় এক-একটি নিটোল পদ্মপাতা বুঝি পড়ে আছে এ পারের যাত্রীকে ওপারে পৌঁছে দেবার জন্তে। সেই দ্বীপে দাঁড়িয়ে কবির শান্তিনিকেতন দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, মনে মনে বললেম—কবি! যে মন আর চোখ নিয়ে তুমি এই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিলে, আমায় দাও তোমার সেই মন, সেই চোখ! নাম-না-জানা বিচিত্র ফুলের মাঝে আমার চোখ গেল হারিয়ে; সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ধ্বনিত হ'ল আনন্দ, বিস্ময়, তৃপ্তি, শান্তি। আবৃত্তি করলেম—কবি!

"তোমার সে ভাল লাগা মোর চোখে আঁকি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
আজি আমি একা একা দেখি দুজনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমারে তাকায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি!

বড় বড় গাছের তলায় শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। মাঝে মাঝে আসছিল তাদের হাসির শব্দ, আনন্দ যেন উছলে পড়ছে...। কি যে ভাল লাগল ওদের সহজ বেশভূষা—রূপের চটকে নয়, স্নিগ্ধ কল্যাণশ্রীতে মন যেন ভরিয়ে দেয়।

কলাভবনে ঢুকলেম গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে। ভাবগম্ভীর ভবনটি যেন শিল্পশ্রীতে ঝলমল করছে। নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রই এখানে বেশী। তাঁর সার্থক শিল্পসৃষ্টি মনকে ভুলিয়ে দেয়, চিরাচরিত বাস্তব পৃথিবী যেন স্বপ্ন হয়ে গিয়ে সত্য হয়ে ওঠে, কাল্পনিক জগত যাতে আছে রূপ রসের ইন্দ্রধনু—যা শুধু শান্তিতে ভরা।

তারপর ঘুরে ঘুরে ছাত্রাবাস দেখলেম; চীনাভবন, হিন্দীভবন কিছুই বাদ গেল না। আমার মনে হল প্রত্যেকটি ভবনের গঠনভঙ্গি যেমন আলাদা, তেমনি পৃথক তার ভাবগাম্ভীর্য।

আস্তানায় ফিরলেম সকলে, সারলেম দুপুরের খাওয়া। সূর্য পশ্চিমে যখন প্রায় যাব-যাব করছে আমরা এসে হাজির হলেম শ্রীনিকেতনের দ্বারে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা কারিগরি বিদ্যা হাতে-কলমে শেখে। তাদের তৈরী নানান জিনিস সাজান দেখলেম। এখান থেকে বাড়ীর কাছ বরাবর এসে আমরা হাঁটতে বেরোলেম। মেঠো পথে চোরকাঁটা ডিঙিয়ে অনেকখানি হাঁটলেম—ঠাণ্ডা হাওয়ায় সোঁদা মাটীর গন্ধ ভাল লাগার নেশায় মন যেন মাতিয়ে দিলে। তারপর ধীরে ধীরে বিশ্বচরাচর ঢেকে গেল পাতলা আঁধারে, ঘরে ফেরার আগেই হাল্কা চাঁদের আলোয় আকাশ ভরল।

দেড় দিন কাটালেম বোলপুরে। ২৫শে দুপুরে আবার পথকে আশ্রয় করে আমাদের গাড়ী ছুটলো। পথের পর পথ পেরিয়ে আমরা সিউড়ি এলেম যখন তখন দুপুর শেষ হ'য়ে বৈকালের আমেজ লেগেছে এই ছোট্ট সহরটির পথে-ঘাটে। কিছু চেষ্টা করতে হ'ল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ডাকবাংলোটির জন্তে। চমৎকার সাজান ছোট্ট বাংলো—সামনে একফালি ফুলের বাগান, ঘরগুলি আধুনিক আসবাবপত্রে মনোরম। শান্তিনিকেতন দেখে মন উচ্চতানে বাঁধা ছিল। মাটীর ঘরে খড়ের চালার কবিত্বময় পরিবেশ থেকে এক মুহূর্তে আধুনিকতম পরিবেশ! এ পরিবেশে এসে যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেল কলকাতাকে, যেখানে ঘরে ঘরে চকচকে পালিশকরা সোফা-কৌচ, মোজেকের ঝকঝকে মেঝে, ফ্যানের হাওয়া! তবু 'আমরা এই রকম জীবনযাত্রায়ই অভ্যস্ত—কবিঠাকুরের মত আমরা কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারি কই?

কিছু দূরেই কুলকুল করে বইছিল নাম-না-জানা নদীর ক্ষীণ স্রোত—তারই তীরে ঘুরলুম কিছুক্ষণ, তারপর কি যে খেয়াল হ'ল বীরভূম টকীজে গিয়ে টিকিট কিনলেম থিয়েটারের—সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! শুনলেম ছ'টায় থিয়েটার শুরু, নাম—সরমা! পৌণে ছটায় হাজির হ'য়ে দেখি—হা ভগবান! সবে লাইট ফিট করা হচ্ছে। কেঠো চেয়ারে বসে আছি ক'জনে, মাঝে মাঝে মশা তাড়াচ্ছি, আরশোলা মারছি, এমন সময়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলো একটা রাস্তার কুকুর, ঘেঁয়া-উঠা, বিশ্রী! সবাই মিলে তাড়ালুম তাকে। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে ৭টার কাছাকাছি। আলো লাগান হ'ল, এবার পর্দা খাটাবার পালা। দেখতে দেখতে মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠল, দিগন্ত পার হ'য়ে এল মাথার ওপর, ৮টা বাজল। এবার শুরু হ'ল রেকর্ডে গান। আমরা মনে মনে অধীর হয়ে উঠছি। সারা হলে জনা কুড়ি মাত্র লোক। সাড়ে ৮টায় থিয়েটার শুরু হ'ল অবশেষে। কেমন লাগল ব'লতে চাই না, শুধু বলি রাত সাড়ে দশটায় অসমাপ্ত নাটকের রসভঙ্গ ক'রে আমরা বাড়ী ফিরলেম।

২৬শের সকাল এল সমস্ত মাধুর্যটুকু মুছে নিয়ে। আজই কলকাতা ফেরার কথা—কাল থেকে আবার সেই পুরোন জীবন। কিন্তু আলস্য কাটিয়ে পথে বেরিয়ে খুব ভাল লাগল। শীতের সকালকে উপেক্ষা করে ছোট ছোট ছেলেরা মিছিল করে চলেছে তেরঙা পতাকা হাতে জাতীয়তা দিবস পালন করতে। সিউড়ি থেকে মেসেঞ্জোর বাঁধ অবধি একাধিক মিছিল চোখে পড়ল। অনেক ঘরেই দেখলেম পতাকা উড়ছে। মন থেকে দুঃখের সুরটা কেটে গেল।

চোখ-মন জুড়িয়ে গেল ময়ূরাক্ষীকে দেখে। সুদূর-বিস্তৃত নীল জল—শান্ত নিরীহ ঢেউ-এ ভরা। ঈষৎ কুঞ্চন জাগিয়ে বাতাস বইছে। তারই ওপর বাঁধ—বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এখানে দু'টি বাংলো আছে (বাংলা ও বিহার)। সে দু'টির অবস্থান যেমন সুন্দর, তেমনি মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমরা এখানে বেশীক্ষণ থাকিনি, একটু ঘুরে পথে বেরিয়েছি।

এর পর তাড়াহুড়ো ক'রে ছুটেছি। অনেক জনপদ, ছোট-খাট সহর পেরিয়ে তিনটে নাগাদ এসেছি আসানসোলে।

যাত্রা শেষ হ'ল রাত সাড়ে আটটায় কলকাতা পৌঁছে। ক্লান্ত দেহে বিগত তিনটি দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ভাবলেম—কর্মমুখর দিনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে তিনটি দিনের চিন্তা আমায় চিরদিনই আনন্দ আর বৈচিত্র্যের স্বাদ দেবেই—এ পাথেয় তো হারিয়ে যাবার নয়।

ভক্তকবি জয়দেব ও ভাগ্যবতী পদ্মাবতী

শ্রীপূরবী পাঁজা

এপারে কেন্দুবিল্ব, ওপারে শিবপুর। মাঝে অজয় নদ। যেন গোকুল আর মথুরা। মাঝে যমুনা। এপার হতে ওপার দেখায় যেন মথুরা। ওখানে যেন সেই কুঞ্জবন, সেই শুক-সারী পাখী, সেই বাঁকা শ্যাম বিরাজমান। বর্ষাদিনে জল পড়ে, বিদ্যুৎ দেয়, অজয়ের বান শন-শন করে ডেকে উঠে। ওপারের শ্যামল গাছপালার দিকে চেয়ে কবি দেখতে পান তমাল বিপিনে শ্যামছায়া, পূর্ণমেঘে মেদুর অম্বর।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান কেন্দুবিল্ব। এরই আশপাশকে নিয়ে একদিন গড়ে উঠেছিল ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আজও বিক্ষিপ্তভাবে ঘিরে আছে কেন্দুবিল্বকে। ধর্মমঙ্গলের কথা বাদ দিলেও কেন্দুবিল্ব আপনাতে আপনি বিকাশ।

মধ্যযুগের বাংলা, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা। নাই অশন বসনের ঘনঘটা, ছিল না বর্তমান যুগের দৈন্যের নিদারুণ নিষ্পেষণ। সাধারণ ভাত-কাপড়েই সন্তুষ্ট সকলে। অল্পেই সন্তুষ্ট সব। এমনি এক সাধারণ পরিবারে আবির্ভূত হন জয়দেব গোস্বামী। অজয়ের তীরে এক সাধারণ কুটীরে তাঁর বাস। সাধারণ জীবন যাপন। বাড়ীতে আছেন পদ্মাবতী আর আছেন আরাধ্য দেবতা রাধামাধব। কুটীরের অনতিদূরে রাধামাধবের মন্দির। পদ্মাবতী পূজার যোগাড় করেন, নৈবেদ্য সাজান, জয়দেব ভোগ দেন। নিজ হাতে পূজা না দিলে যেন জয়দেবের তৃপ্তি নাই, মনে শান্তি নাই, পূজার যোগাড় করতে না পেলে পদ্মাবতীও যেন মনে শান্তি পান না।

ত্রয়োদশ শতাব্দী। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব। সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা। প্রাণ মন তাঁর সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের চরণে। তাঁর উপর ভরসা থাকলে আবার চাই কি? তিনি যে পতিতপাবন দুঃখহরণ। তাঁর উপর ভক্তি থাকলে, তাঁকেই প্রাণ-মন সমর্পণ করলে তিনি যে নেমে আসেন ভক্তের বাড়ীতে।

স্ত্রী পদ্মাবতীও হিন্দুনারীর প্রতিমূর্তি! স্বামিসেবাই তাঁর পরম ধর্ম। পতিই পরম গুরু। নিজের হাতে স্বামিসেবা করতে তাঁর মত পুণ্যবতী আর কে আছে? তাই স্বামিসেবাতেই প্রাণ-মন সমর্পণ করেছিলেন তিনি। বাড়ীর প্রতিটি কাজ তিনি করতেন, আবার পূজা-অর্চনা, ব্রত-পার্বণ তাও তিনি বাদ দিতেন না।

স্বামী গিয়েছেন গঙ্গাস্নানে। এইমাত্র তাঁকে পুঁথি হতে তোলা হল। স্নান সেরে আসবেন। পদ্মাবতী নিজ হাতে তাঁর সেবা করবেন। তারপর প্রসাদ নিয়ে নিজে খেতে বসবেন—'কিন্তু এ কি! আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন!' আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন পদ্মাবতী। আজ আর স্নানে যাওয়া হয় নাই। পথে মনে পড়ল সেই শ্লোকটা। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। পদ্মাবতী সরলমতি। বুঝে না অত-শত লীলা। তাই বুঝলেন তিনি। তাই হবে হয়ত। এতে আর আশ্চর্য্যের কী আছে? চলে গেলেন খাওয়ার যোগাড়ে। তারপর খাইয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

পদ্মাবতী সেবায় মূর্তিমতী, কিন্তু এ কি! আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন জয়দেব। 'একি! পদ্মাবতী! আজ আমার আগেই খেতে বসেছ?' হতভম্ব হন পদ্মাবতী। 'এ কি দেব! এ কি তোমার বাক্য? এই মাত্র সেবা সেরে বিশ্রাম করতে গেলে!' জয়দেব বিস্মিত, পদ্মাবতী নিস্তব্ধ। পুঁথি লিখে সেবা সেরে এই ত বিশ্রাম করতে গেলে!

অবাক হলেন জয়দেব। মুহূর্তে চৈতন্য ফিরে আসে তাঁর, জয়দেব পাগলের মত ছুটে যান যেখানে অসমাপ্ত পদ পড়েছিল। দেখেন, হাঁ৷ সত্যিই, পুঁথি লেখা হয়েছে। তবে বুঝি তাঁর প্রাণের ঠাকুর এসেছিলেন তাঁরই বেশে? সেই অসমাপ্ত পদ পূরণ করতে, "দেহি পদপল্লবমুদারম্"। ছুটে যান পদ্মাবতীর নিকট। বলেন, 'পদ্মাবতি! তুমিই ভাগ্যবতী, তুমিই শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছ, তুমি সত্যিই তাঁর প্রসাদ পাবার অধিকারী! আমি অধম, আমি পাপিষ্ঠ, দাও দাও আমাকে তাঁর প্রসাদ খেতে দাও।' বসে যান জয়দেব পদ্মাবতীর সাথে।

জয়দেবের এই গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা আর পদ্মাবতীর এই পতিপরায়ণতা যুগ যুগ ধরে মানুষকে মোহিত করে আসছে। পৌষের শেষ দিন কেন্দুবিল্বে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। অজয়ের তুহিন জলে স্নান করে জয়দেব-পদ্মাবতীর রূপ দর্শন করে। রাধা-মাধবের মন্দিরে গিয়ে সকলে ধন্য হয়। আর সাথে সাথে মাথাটা আপনা আপনি নুয়ে পড়ে সেই পরম-পুরুষের দিকে।

জলযাত্রা

রুমা দেবী

নামটা শুনে আপনারা বিরাট একটা কিছু মনে করবেন না যেন। জলযাত্রা মানে বিদেশ যাত্রা, সাধারণত মানুষে মনে করে থাকে, আমি লিখছি সামান্য একটা যাত্রা। যাত্রার উদ্দেশ্য ভ্রমণ

এবং বনভোজন করে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ উপভোগ করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ-দুঃখ আছে, তার মধ্যে আমরা আনন্দ পেতে চাই সব সময়। আমাদের গন্তব্যস্থান একটি বিশেষ স্থান নয়, খ্যাতিও তার বিশেষ নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকর্তা সেখানে ঢেলে দিয়েছেন অকৃপণ হস্তে।

কটক সহর থেকে আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে প্রায় ৩০ জন। একটি বড় লঞ্চ ঠিক করা হল। ভ্রমণ ও বনভোজন করতে যাওয়াতে অনেকে একসঙ্গে না গেলে আনন্দ পাওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে সব রকম বয়সের ছিলাম। ছোট মেয়ে কয়েকটি ছিল, তাদের চেয়ে বড় ছেলে কয়েকটি ছিল, আমরা মেয়েরা ছিলাম, বয়স্ক ভদ্রলোক কয়েকজন ছিলেন, সব রকমের সমাবেশ, কারুরই অসুবিধা নেই, সকলেই পেয়েছে তাদের বন্ধু।

যাত্রার আগেই এক বাধার সৃষ্টি হল, সেইটাই আগে বলি। খুব ভোরে উঠে রওনা হবার কথা, মাঝ রাত্রি থেকে আরম্ভ হ'ল মুসলধারে বৃষ্টি। আমরা আশা করে রইলুম। সকালবেলায় নিশ্চয়ই বৃষ্টি থেমে যাবে, সকাল হ'ল, বৃষ্টি থামলো না, নিরাশ হয়ে বসে রইলাম, বৃষ্টি বোধ হয় আর থামবে না, যাওয়াও বোধ হয় আর হল না। দু'-তিন জন বন্ধু এসে বৃষ্টি দেখে ফিরে গেলেন, শেষ পর্য্যন্ত তাদের আর যাওয়াই হ'ল না। কিছুক্ষণ পর বেলা প্রায় ৮টার সময় বৃষ্টি খানিকটা কমে এল, বর্ষণমুখর প্রভাতবেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শান্ত হল। আমরা ষ্টিমারঘাটে যাবার জন্য সাইকেল-রিক্স ডাকতে পাঠালাম। রিক্সাওয়ালাও বেঁকে বসেছে, সাধারণতঃ ছয় আনাতে অতটা পথ যায়। সেদিন এক টাকার কমে যাবে না, আমরা তাতেই রাজি। ঘাটে এসে দেখি অন্য বন্ধুরাও এসে গিয়েছেন, সকলকে দেখে তখন মনে বেশ আনন্দ হল। লঞ্চ প্রস্তুত, সকলে ওঠা হল। খাওয়ার জিনিষপত্র, ষ্টোভ, চায়ের সরঞ্জাম, খিঁচুড়ির সরঞ্জাম সব ওঠান হল। গ্রামোফোন তাস ইত্যাদিও নেওয়া হয়েছিল। তার পর যাত্রা হল শুরু। আমরা যাচ্ছি নারাজ নামক একটি স্থানে। মহানদী ও কাটজুরি উড়িষ্যার দু'টি বিখ্যাত নদীর সংযোগস্থল ওটি। মহানদীতে আমরা চলেছি বেয়ে, সামান্য বৃষ্টি তখনও পড়ছিল। নদীর এক পারে সমতল ভূমি ও গাছ, অপর পারে দূরে পাহাড়। পথে একটি সুদৃশ্য শিবমন্দির পড়ে, নাম ধবলেশ্বর। ঐ অঞ্চলে খ্যাতি আছে, শিবরাত্রির সময় দলে দলে যাত্রী ওখানে যায় শিব দর্শন করবার জন্য। নদীর ধার থেকে বেশ উঁচু জায়গাতে মন্দিরটি অবস্থিত।

আমরা যেতে আরম্ভ করলাম, তাস খেলা শুরু হয়ে গেল। তারপর রসগোল্লা, ডিম, ডালমুট সহযোগে চায়ের পর্ব্ব আরম্ভ হল। বাড়ীতে তো সর্ব্বদাই মেয়েরাই চা খাবার রান্না-বান্না করে, এখানে এই সব কাজ পুরুষরাই করতে আরম্ভ করলেন। এই সব ব্যাপারে এখানে আমাদের ছুটি।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা নারাজে এসে পৌছোলাম। নদীর ধার থেকে খানিকটা উঁচুতে ডাকবাংলোটি অবস্থিত। বাংলোটি খুব সুন্দর, টেবিল-চেয়ার বারনিশ করা, সামনে গোল বড় বারান্দা, বাথরুম তিন-চারখানা ঘর, সুব্যবস্থা। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর, পাহাড় নদী গাছপালা সবের সমাবেশ। দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যাবে দূরের পাহাড়, সবুজ আকাশ, ইটের খাঁচা এসে বাধা দেবে না। সেই দিনটি ছিল মেঘলা, সেজন্য আরও সুন্দর লাগছিল।

রান্নার ভার দেওয়া হয়েছে ছেলেদের ওপর, সেজন্য আমরা বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে আঁকা-বাঁকা পথ, সেই পথ বেয়ে আমরা গল্প করতে করতে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বেড়াবার পর আমরা ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম। বেড়াবার পর নদীতে স্নান করা হল, যাঁরা সাঁতার জানেন, তাঁরা সাঁতার কাটলেন, খুব হৈ-চৈ করে স্নানের পর্ব্ব সমাধা হল। স্নানের পর এবার ভোজনের পালা, রান্না প্রস্তুত, মেঘলা দিন, খিচুড়ী পাঁপড় ভাজা, ডিমের তরকারি আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি ও চাটনি, ভূরিভোজন আর কি। সকলে খেতে বসা হবে, এমন সময় দেখা গেল আমার স্বামীর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করা হল। এমন সময় তিনি এলেন, হাতে প্রায় পাঁচ সের বড় বড় চিংড়ি মাছ, ব্যাপার দেখে তো সকলের চক্ষু স্থির। সবাই ক্ষুধার্ত্ত—মাছের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

উনি সোজা চলে গিয়েছিলেন প্রায় দুই মাইল দূর গ্রামে, সেখান থেকে মাছ জোগাড় করে এনেছেন। বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে ওঁর উৎসাহই সব চেয়ে বেশী। কাজেই সকলে হল ওর অতিথি, অতিথিদের মাছ খাওয়াতে না পারলে খাওয়ানোর অঙ্গহানি হবে যে। মাছগুলো বেসন দিয়ে ভেজে খাওয়া হল। রান্নার পক্ষে এটা সব চেয়ে শীঘ্র হয়ে গেল, খিচুড়ি দিয়ে টাটকা চিংড়ির মাছের পোরের ভাজা সুস্বাদুও খুব।

খাওয়া দাওয়ার পর তাস খেলা, গ্রামোফোনে গান শোনা, গল্প চললো কিছুক্ষণ। আর একজনের কথা এতক্ষণ বলাই হয়নি, সে আমাদের 'পপি', সেও এসেছে আমাদের সঙ্গে, তার আনন্দ সবচেয়ে বেশী। সাঁতার, বেড়ান সবের মধ্যে যোগ দিচ্ছিল সে-ও। বেলা গড়িয়ে এল, এবার ফেরার পালা। আমরা সব লঞ্চে এসে বসলাম। এতক্ষণে আমাদের খেয়াল হল দুইটি ছোট মেয়ের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের খোঁজ করবার জন্য লঞ্চ থেকে নামা হবে, এমন সময় দেখা গেল, দূর পাহারের ওপর তাদের ফ্রকের লাল ও নীল রং। তারা বুঝতে পেরেছে, আমাদের যাত্রার আয়োজন, তারা তাড়াতাড়ি নেমে আসছে। সন্ধ্যে নেমে এসেছে, আকাশের তারা ঝলমল করছে নদীর বুকে। এবার আমাদের যাত্রা বাড়ীর পথে।

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন। সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ।
সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এই অনন্ত সত্য
জগতের মূল ভিত্তি। —স্বামী বিবেকানন্দ।

রেক্সোনা প্রো, লিঃ, অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক ভারতে প্রস্তুত

R.P. 158-X52 BG.

বর্ষণসিক্ত মাঠে এবারকার প্রথম ডিভিসন খেলাগুলি বেশ জমে উঠেছে বলা যেতে পারে। মধ্যে মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু দু'-একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া এবারকার ফুটবল মরশুম এখনও বেশ শান্তিপ্রদ বলা যেতে পারে।

মোহনবাগান দল এ পর্য্যন্ত অপরাজিত থেকে লীগ কোঠার শীর্ষে আছে। ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং প্রত্যেকেই একটি করে খেলায় পরাজয় বরণ করেছে। গতবারের লীগবিজয়ী রেল দল ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের নিকট পরাজয় বরণ করেছে।

রাজস্থান দল এবারে মোটেই আশাপ্রদ খেলতে পারছে না— তবে বর্ষণসিক্ত মাঠে ইষ্টবেঙ্গল দল ৩-১ গোলে পরাজিত করে এবারকার লীগ মরশুমে চমকের সৃষ্টি করেছে।

মরশুমের প্রথম দিকে খেলার মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, তাতে আশা করা যাচ্ছে বিশেষ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলে এবারকার ফুটবল মরশুম দীর্ঘদিন বাদে বেশ জমে উঠবে আশা করা চলতে পারে। কারণ বড় বড় দলগুলির সংগে তরুণ খেলোয়াড়-পুষ্ট দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্যই প্রশংসনীয়।

তরুণ খেলোয়াড়পুষ্ট বালী প্রতিভা ও ইণ্টারন্যাশানাল দল দুটি লীগ কোঠার সর্বনিম্নে আছে। এই দলগুলির শক্তি কম হলেও বড় বড় দলগুলিকে এদের কাছ থেকে পয়েণ্ট নিতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। ১ই জুন পর্য্যন্ত কোন দলের স্থান লীগ কোঠার কোথায়, তা নিয়ে দেওয়া হইল।

	খে:	জ:	ড্র:	পরা:	প:	বি:	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১০	৮	২	০	১৩	১	১৮
ইষ্টবেঙ্গল	১০	৭	২	১	১৮	৭	১৬
ইষ্টার্ণ রেলওয়ে	৮	৬	১	১	১৩	৪	১৩
মহা: স্পোর্টিং	৭	৬	০	১	১৬	২	১২
বি· এন· আর	৯	৫	১	৩	১৩	১৩	১১
হাওড়া ইউনিয়ন	৭	৩	২	২	৭	৫	৮
রাজস্থান	৯	৩	২	৪	১০	১৩	৮
ওয়াড়ী	৮	৩	১	৪	৭	৭	৭
খিদিরপুর	১০	২	৩	৫	৫	৮	৭
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	৮	৩	১	৪	৬	১০	৭
এরিয়ান্স	৯	২	৩	৪	২	৭	৭
জর্জ টেলিগ্রাফ	৮	১	২	৫	৪	৮	৪
পুলিশ	৬	০	২	৪	১	৯	২
বালী প্রতিভা	৭	০	২	৫	৩	১২	২
ইণ্টারন্যাশনাল	৮	০	২	৬	১	১৩	২

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভা বসেছিল শিলং-এর শৈলাবাসে। দুদিনের অধিবেশনে কর্মকর্তা নির্ব্বাচনের পর্ব্ব ছাড়াও ১৯৬০ সাল থেকে ভারতীয় রেল দলকে সার্ভিসেস টিমের অনুরূপ মর্য্যাদা দান করেছেন আর 'কেরালা ট্রফি' ও 'নিজাম গোল্ড' কাপের খেলাকে প্রথম শ্রেণীর খেলা বলে মর্য্যাদা দান করেছেন। ডুরাণ্ড রোভার্স, আই, এফ, এ, শীল্ড প্রমুখ খেলাগুলির সময় নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এ ছাড়াও জাতীয় প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক বিভাগের পুনর্বিন্যাস ও নানা উপসমিতি গঠিত হয়েছে কিন্তু এবারকার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাদ গিয়েছে এ আলোচনার আসর থেকে। সেটা হল একই ব্যক্তি বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার সংগে যুক্ত থাকতে পারবেন কি না। আলোচনা না হওয়ার কারণ কিছু জানা যায়নি। শৈলাবাসে বোধ হয় ধামাচাপা বা বরফ চাপা পড়েছে ব্যাপারটির উপরে।

বাইটন কাপ

এবারকার বাইটন কাপের ফাইন্যালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দু'টি দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গিয়েছে। যোগ্যতর দল হিসেবে কিরকির কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দল ফাইন্যালে ইণ্ডিয়ান আর্মি টীমকে ২-১ গোলে হারিয়ে এবারকার বাইটন কাপ লাভ করেছে। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দল গতবারে বাইটন কাপের খেলায় রার্ণাস আপ লাভ করেছিল।

এবারকার বাইটন কাপের খেলা ঠিক মত জমে উঠতে পারেনি। তার কারণ কয়েকটি শক্তিশালী দলের খেলায় অংশ গ্রহণ না করা। যাই হোক, এবারকার খেলার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ভারতের সফরকারী ক্রিকেট দলের প্রথম টেষ্টের আলোচনা করব।

কিরকির ইঞ্জিনিয়ারিং দলটি সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত। এবার এরা চতুর্থ রাউণ্ড খেলার সুযোগ লাভ করে। চতুর্থ রাউণ্ডে পাঞ্জাব পোর্টসকে ১-০ গোলে, কোয়ার্টার ফাইন্যালে গতবারের বাইটন কাপবিজয়ী মোহনবাগান দলকে ৩-০ গোলে এবং সেমিফাইন্যালে কাষ্টমস দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যাল খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। গতবারের মাত্র ৬জন নামকরা খেলোয়াড় ছাড়া তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং দলের এ জয়লাভ প্রশংসনীয়। অপর পক্ষে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার রার্ণাস শক্তিশালী আর্মি দল ফাইন্যালে মোটেই আশাপ্রদ খেলতে পারেনি। এবারকার তালিকায় মোট ৪১টি দলের নাম ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনেক খ্যাতনামা দল অংশ গ্রহণ করেনি।

ক্রিকেট

ইংলণ্ডে সফরকারী ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দলটিকে নানান সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইংলণ্ডের ধুরন্ধর ক্রিকেট সমালোচকেরা নানান মতামত প্রকাশ করছেন, তা দৈনিক সংবাদপত্র মারফং পাঠকমাত্রই সবিশেষ অবগত আছেন। এই দলটির বিদেশ সফরকালীন সময় ভারতের নানান পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা হয়েছিল।

কয়েকটি কাউন্টি খেলায় ভারতীয় দল বেশ কৃতিত্বের সংগে খেলেছে। কাউন্টি খেলাগুলির বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, তাই এবার প্রথম টেষ্টের আলোচনা করব।

প্রথম টেষ্ট—নটিংহামের টেণ্টব্রীজ মাঠে ৪ঠা জুন থেকে প্রথম টেষ্ট ম্যাচের খেলা স্বরু হয়। নির্দ্ধারিত দিনের একদিন পূর্ব্বেই এ খেলার সমাপ্তি ঘটে। এই খেলায় ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৫১ রাণে পরাজয় বরণ করে।

এবারকার টেষ্টে ইংলণ্ড দলে প্রভূত খেলোয়াড়ের রদবদল হয়। তরুণ খেলোয়াড়দের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ দান করে ইংলণ্ড দল আশানুরূপ ফল লাভ করেছে। বেইলী, লেকার, গ্রেভনী, লক, টাইসন প্রভৃতি ইংলণ্ডের ধুরন্ধর খেলোয়াড়রা এবারকার টেষ্ট খেলায় নির্ব্বাচিত হননি। এঁদের পরিবর্ত্তে যে সমস্ত তরুণ খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উষ্টারশায়ারের অফ ব্রেক বোলার মার্টিন হর্টন, ল্যাঙ্কাশায়ারের টমি গ্রীন হফ এবং ইয়র্কশায়ারের ওপেনিং ব্যাটসম্যান কেন টেলরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাষ্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকমণ্ডলী মিডিল সেক্সের পেস বোলার এ্যালান মসকে দলভুক্ত করেছেন। ইংলণ্ড দলের এই রদবদল আগামী 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' দলের বিরুদ্ধে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা বলে ধরা যেতে পারে। অপর পক্ষে ভারতীয় সকলেই তরুণ খেলোয়াড়।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে 'টসে' জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান। কিন্তু সুরুতেই ইংলণ্ড দলের ব্যাটিং-বিপর্য্যয় ঘটে। মাত্র ৬০ রাণের মাথায় ইংলণ্ড দলের টেলর, মিণ্টন ও কাউড্রে তিনটি মূল্যবান উইকেট হারায়। এর পর অধিনায়ক মে, ব্যারিংটন ও হর্টন দলের পতন রোধ করেন। অধিনায়ক পিটার মের সেঞ্চুরী প্রথম দিনের খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পিটার মে সেঞ্চুরী করার কিছু পরেই আউট হয়ে গেলে গডফ্রে ইভান্স যোগদান করেন। বেপরোয়া ভাবে পিটিয়ে খেলে ৪২ মিঃ ৫০ রাণ তোলেন। এর পর ৭৩ রাণের মাথায় নাদকার্নির বলে উম্রিগড়ের হাতে ক্যাচ তুলে বিদায় গ্রহণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত দিনের শেষে ইংলণ্ড দল ৬টি উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রাণ সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড দল ৪টি উইকেটের বিনিময়ে আরও ৬৪ রাণ সংগ্রহ করলে ৪২২ রাণে ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হয়। এর পর ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামে। কিন্তু ভারতীয় দলের সূচনা খুব আশাপ্রদ হয়নি। ভারতীয় প্রথম জুটি রায় ও কণ্টাকটর উইকেটে ১০০ মিনিট টিকে খেলে মাত্র ৩৪ রাণ সংগ্রহ করেন। কণ্টাকটরের ব্যক্তিগত ১৫ রাণের মাথায় আউট হয়ে যান। শেষ পর্য্যন্ত দিনের শেষে ভারতীয় দল তিন উইকেটের বিনিময়ে ১১৬ রাণ সংগ্রহ করে। এর মধ্যে পঙ্কজ রায়ের ৫৪ রাণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঙ্কজ রায় যথেষ্ট ধৈর্য্য সহকারে ও সতর্কতার সংগে খেলে ৫৪ রাণ সংগ্রহ করেন। প্রথম টেষ্টে পঙ্কজ রায়ই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি নিজের উপর যথেষ্ট আস্থা রেখে ভাল খেলেছেন।

তৃতীয় দিনে ট্রুম্যান, মস আর ষ্ট্যাথামের মারাত্মক বোলিং-এ ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক গাইকোয়াড় এই বিপর্য্যয়ের মুখে ধৈর্য্য সহকারে উইকেটে টিকে থাকতে চেষ্টা করেন। তিনি ২ ঘঃ ৩৩ মিঃ কাল উইকেটে টিকে থেকে ৩৩ রাণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ভারতীয় অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান চান্দু বোরদে ট্রুম্যানের চাম্পার বলে হুক করতে গিয়ে হাতে আঘাত পাওয়ায় অবসর গ্রহণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দল ২১৬ রাণে পিছিয়ে থেকে 'ফলো অন' করতে বাধ্য হন। দিনের শেষে তিনটি মূল্যবান উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৬ রাণ সংগ্রহ হয়। তন্মধ্যে রায়ের ৪১ রাণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায়, পঙ্কজ রায় টেষ্ট ক্রিকেটে দু' হাজার রাণ করার গৌরব অর্জ্জন করলো।

একদিন বিরতির পর ৪র্থ দিনের খেলা স্বরু হোল। এই দিন ষ্ট্যাথাম মারাত্মক মারমূর্ত্তি ধারণ করলেন। মাত্র ৩১ রাণের বিনিময়ে ভারতীয় দলের ৫টি উইকেট লাভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত ৬১ রাণ যোগ করে ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ হয়। হাতে আঘাত পাওয়ার দরুণ বোরদে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি। ১৫৭ রাণে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি হয়।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস—৪২২—(পিটার মে ১০৬, ইভান্স ৭৩, হর্টন ৫৮ ব্যারিংটন ৫৬, গুপ্তে ১০২ রাণে ৪ উইকেট নাদকার্ণি ৪৮ রাণে ২ উইকেটে)।

ভারত ১ম ইনিংস—২০৬, (পি, রায় ৫৪, গাইকোয়াড় ৩৩, উম্রিগড় ২১, যোশী ২১, ট্রুম্যান ৪৫ রাণে ৪ উইকেট, মস ৩০ রাণে ২ উইকেট)।

ভারত—২য় ইনিংস—১৫৭, (পি রায় ৪১, মঞ্জরেকার ৪৪, গাইকোয়াড় ৩১, ষ্ট্যাথাম ৩১ রাণে ৫ উইকেট ট্রুম্যান ৪৪ রাণে ২ উইকেট)।

(এক ইনিংস ও ৫১ রাণে বিজয়ী)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে দেহটার সঙ্গে মনের অবস্থাও এমন হয় যে, মনে হয় না দেহটা আবার সুস্থ-সবল হবে, যেন ভাবতেই পারা যায় না সুস্থদেহের আরামটা ঠিক কি রকম। কিন্তু ব্যাধি সারে, আবার সুস্থদেহের আরাম ফিরে আসে,—আর তখন আবার যেন ভাবতেই পারা যায় না ব্যাধিগ্রস্ত দেহের অবস্থাটা ঠিক কেমন লাগতো।

ঠিক তেমনি,—দেড় মাস যন্ত্রণা, অপমান, নির্জন কারাবাস ভোগের পর অন্তরীণের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতায় খোলা হওয়ায় বেরিয়েই একথাটা ভুলতে বেশী দেরী হল না যে, ঐ দেড় মাস কী গভীর অন্ধকার আমার সমগ্র অন্তর বাহির জুড়ে জগদ্দলের মতন চেপে ছিল,—ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা দূরে থাকে, চিন্তারও খেই খুঁজে পেতুম না।

অন্তরীণে এসে অল্পদিনের মধ্যেই মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো—আগের ধারায় চিন্তা সুরু হল। মনে হল বিপ্লব প্রচেষ্টার এক অঙ্ক শেষ হয়েছে প্রথম ব্যর্থতায়,—এখনও যবনিকাপাতের অনেক দেরী,—নতুন অঙ্কে নতুন সাজে আবার বিপ্লবের শুভসূচনার উদ্বোধন হবে,—কবে, কেমন করে, জানি না—কিন্তু হবেই—তার জন্যে যেন প্রস্তুত থাকতে পারি।

অবস্থাটা ছিল অনুকূল দু'দিক থেকে। দারোগা আনন্দমোহন মিত্রের স্ত্রীর অনন্ত বা ঐ রকম কি একটা ব্রত,—থানাটা শান্তিপুরের এক সীমানার ধারে,—হাতের কাছে ব্রাহ্মণ নেই, আমি রোজ সকাল ৯টায় হাজিরা দিতে যাই—সুতরাং আমিই হলুম ব্রাহ্মণ,—সারা বৈশাখ মাস ডাব, সন্দেশ, পৈতে ও পয়সা প্রত্যহ পেলুম,—শেষ দিনে বোধ হয় একখানা কাপড়ও। অত্যন্ত নিরীহ ভদ্র এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে গোয়েন্দা বিভাগের শয়তানগুলো যে মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছে,—ভদ্রমহিলার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। মায়ের জাত তো!

বস্তুত সাধারণ লোকের ধারণাও সাধারণত এই রকমই। কিন্তু যারা কিছুটা ওয়াকিবহাল, তারা আমাদের ক্ষুদিরাম—কানাইলালেরই সগোত্র মনে করে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো,—আমি সত্যি কতটুকু, সে খোঁজে তাদের কোন গরজ ছিল না। বিশেষত শান্তিপুর বিপ্লব আন্দোলনের ঐতিহ্যেও দরিদ্র ছিল না। "যুগান্তর" পত্রিকা এবং আলিপুর বোমার মামলা সম্পর্কে যে কার্তিক দত্ত ছিলেন এক বিখ্যাত কর্মী, তিনি এই শান্তিপুরেরই ছেলে। ১৯০৭ সালে মুরারিপুকুরে বোমার আড্ডা খুলে যখন বারীন ঘোষ, উপেন ব্যানার্জি প্রভৃতি যুগান্তর পত্রিকার কাজ ছাড়েন, তখন থেকে "যুগান্তর" পরিচালনের ভার পড়ে তারানাথ রায়চৌধুরী (সিনিয়র—বসুমতীর ভূতপূর্ব ম্যানেজার জুনিয়ার তারানাথ নয়), নিখিল রায় মৌলিক, কিরণ মুখার্জি এবং কার্তিক দত্তের উপর। আলিপুর বোমার অন্যতম আসামী ছিলেন এই শান্তিপুরের কার্তিক দত্ত। হুগলি জেলার বিঘাটী গ্রামে এক ডাকাতি হয় এবং সেই মামলায় কার্তিক দত্ত সাজা পান। শান্তিপুরের পাশে বাঘ-আঁচড়া গ্রামের নিরাপদ রায়ের কথাতো আগেই বলেছি। তাঁর বোমার মামলায় ১০ বছর দ্বীপান্তর সাজা হয়েছিল।

সুতরাং বেমালুম আগের মতন ছেলে রিক্রুট করার ধান্ধা আবার দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্তরীণে পাঠাবার সময় গোয়েন্দা অফিসাররা ঠাট্টা করতো,—"যান,—সরকারী খরচে আবার দল গড়ুন গিয়ে।" আমরাও বলতুম, "আমরা ধর্মঘট করলে তো ইলিশিয়াম রো-তে ঘুঘু চরবে!"

যাই হোক, আমাদের সময়েই হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেশান্তও ডিফেন্স অ্যাক্টে আটক হয়েছিলেন। ফলে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁকে সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়, এবং তাঁর অবর্তমানে সরোজিনী নাইডু অধিবেশনে নেতৃত্ব করেন।

মহাত্মা গান্ধীও ঐ সময়েই ভারতে আসেন এবং চম্পারণে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সংগঠন করেন। '২০ সালে কিছু শাসন সংস্কার দিয়ে ভারতবাসীকে একটু ঠাণ্ডা করার পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সচিব মণ্টেগু ভারত পরিদর্শনে আসেন, এবং কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ তাঁর হাতে এক সম্মিলিত দাবী-পত্র পেশ করেন। আমাদের মনে পড়তো—"আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির।"

জেলে তখন রাজবন্দীরা সহনাতীত অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করছেন। কারাবাসের অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার সংশোধনের জন্যে, প্রধানত হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করে। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ৭৮ দিনব্যাপী হাঙ্গার ষ্ট্রাইক এবং জোর করে খাওয়ানোর বিরুদ্ধে ধস্তাধস্তি একটা ইতিহাস রচনা করেছে।

যাই হোক,—বছর তিনেক অন্তরীণ থেকে ১৯১৯ সালের

প্রথমে ফিরে এলুম। দেখলুম, পাড়ার সকলেই ফিরেছে। দিদি আগে থেকেই মনে মনে ভাঁজছেন এইবার একটা বিয়ে দিতে পারলেই এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

একদিন সকালে হঠাৎ দিদি বলছেন, জামাটা গায়ে দিয়ে একবার ও-ঘরে যা। আমার সন্দেহ হয়েছে, বললুম কেন ?

দিদি বললেন, দেখতে এসেছে। আমি যাবো না বলাতে দিদি বিপদে পড়ে জোড়হাত করে বললেন, একবার দয়া করে মানটা বাঁচাও, আর এ গুখুরি করবো না। একটু ভেবে নিয়ে গেলুম।

দেখি দুজন ভদ্রলোক এসেছেন। নাম জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, কাজকর্ম কিছু কর ? আমি—যা ঠিক করেছি, ব্যবসা করবো।

ব্যবসার কিছু জান ? আর মূলধন কত, কিসের ব্যবসা ?

ব্যবসা, করতে করতেই শিখবো, কিসের ব্যবসা করবো, তা এখনো ঠিক করিনি। আর মূলধন সংগ্রহ করতে পারবো এই বাড়ী বেচে।

ভদ্রলোকদের চক্ষু চড়কগাছ ! ছেলেটি ভাল, আর কলকাতায় বাড়ী—এই দুটি খুঁটির ওপর তাঁরা ভর করেছিলেন। এখন আমার কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। আমিও বীরদর্পে দিদিকে শাসিয়ে দিলুম ফের এমন কাজ করলে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাবো। দিদি একা-একা আধ ঘণ্টা ধরে গজর গজর করে ঠাণ্ডা হলেন।

তখন সারা দেশে একটা থমথমে ভাব—কোথাও কোনো আন্দোলন নেই। শুধু মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন রোজ বিকেলে একদল স্কুলের ছেলের প্রোসেশন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে poor students fund-এর চাঁদা তুলে বেড়ান। ছেলের দল স্বদেশী গান গেয়ে চলে, ২।৪ জন রাস্তার লোকও পেছন পেছন চলে। পথে কোথাও থানা পেলে প্রোসেশনটা সেখানেও ঢোকে এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দেয়। মৌলবী সাহেব থানার অফিসারদের কাছ থেকেও কিছু চাঁদা না নিয়ে হটেন না—বলেন, "ইস ফাণ্ডমে তুমলোক কেঁও নেহি চাঁদা দেগা ? ইয়ে কুছ বোম্বওয়ারি হ্যায় ?" পুলিস অফিসার তাড়াতাড়ি কিছু দিয়ে রেহাই পান। তর্ক করলে, ছেলের দল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে হারিয়ে দেয়।

মেছুয়া বাজারের রাস্তায় মার্কাস স্কোয়ারের সামনে প্রকাণ্ড একটা দোতলা ব্যারাকবাড়ীর এক খুপরীতে ছিল তাঁর আস্তানা। বাড়ীটাতে ২।৩ শো গরীব মুসলমানের বাস ছিল। নিঃসম্বল গরীব ছাত্রেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর কাছে সাহায্য পেত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই কাজ নিয়েই ছিলেন। এই একজন দরিদ্র একনিষ্ঠ স্বদেশী নেতা, সুরেন বাঁড়ুয্যে—বিপিন পালের মতই যাকে আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর মানুষই আন্তরিক শ্রদ্ধা করতো। তিনি ছিলেন বেপরোয়া স্পষ্টবক্তা।

রাজদ্রোহকর বক্তৃতা দিয়ে তিনি অ ক বার জেল খেটেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যখন এখানে মডারেট নেতারা এবং আফ্রিকায় গান্ধী সরকারকে রিক্রুটিংয়ে সাহায্য করছিলেন, তখন এক বিরোধী সভায় এক বক্তৃতায় মৌলবী সাহেব বলেছিলেন, যে ইংরেজের পক্ষে লড়াইমে যাবে, সে "বাপকা পুত নেহি—মুত কা মুত।" (অর্থাৎ তার জন্ম বাপের বীর্য্য থেকে নয়, প্রস্রাব থেকে) এই বক্তৃতার ফলে তাঁর দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল খেটে বেরিয়ে তিনি ঐ "স্বদেশী" কাজে আত্মনিয়োগ করেন—ভিক্ষা করে চাঁদা তুলে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করা।

রোজ বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আমি মৌলবী সাহেবের মিছিলের পিছনে চলতুম। মৌলবী সাহেব থাকতেন সামনে, কিন্তু তাঁর নজর থাকতো সব দিকে, এবং অনবরত প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতেন। কয়েক দিন তিনি আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন হঠাৎ আমাকে ধরে বলেন,—"এই—তুম সিআইডি হ্যায় ? পিছে পিছে কেঁও চলতা ?—যাও—সামনে যাও।" আমি অপ্রতিভ হয়ে সামনের সারিতে গেলুম, এবং ছেলের দলের সঙ্গে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে রেহাই পেলুম। এই ছিল তাঁর কাজের ধারা।

সকল বিষয় জানবার বোঝবার আগ্রহ তখন অসীম। রবিবারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যেতুম—প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা বড় ভাল লাগতো। বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলুম আচার্য ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বক্তৃতায়। শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে হানা দিয়ে আলাপ করলুম। তিনি "ধর্মজিজ্ঞাসা" পড়তে দিলেন। হিন্দু পৌত্তলিকতার আনুষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার অজস্র অদ্ভুত তথ্য ও কেলেঙ্কারীতে বইটা ঠাসা। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আরো কয়েকখানা বইও পড়লুম। শেষ পর্যন্ত আমাকে এক জুনিয়ার আচার্য দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতে ভিড়িয়ে দেওয়া হল। তিনি আমাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। আমিও যাওয়া বন্ধ করলুম।

করালীর সঙ্গে আমার তখন ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। তারা ছিল শাক্ত—এবং তার বাবা ছিলেন একজন তান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধক। আমি করালীর কাছে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে ওকালতী করে হিন্দু, শাক্ত, তান্ত্রিক-ধর্ম ব্যাখ্যাও শুনতুম এবং তাদের যুক্তিগুলো ব্রাহ্ম আচার্যের কাছেও হাজির করতুম। মজা হত এই যে, এই দুই পক্ষের সমস্ত যুক্তির মধ্যে নিজ নিজ স্বপক্ষীয় যুক্তির চেয়ে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোই হ'ত জোরালো,—আর আমার মনে দুই পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলোই ধীরে ধীরে শেকড় গাড়ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনকে অধিকার করছিল,—এই সব তথাকথিত আধ্যাত্মিক, পারত্রিক, অবাস্তব ব্যাপারগুলো আমার জীবনাদর্শের বাস্তব ইহলৌকিক ধান্ধা,—দেশের দুর্দশা, পরাধীনতার বিড়ম্বনা, স্বাধীনতার আদর্শ, বিপ্লব প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতির পক্ষে একেবারে অবান্তর। ফলত, দুনিয়ার সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার মোহ মন থেকে একেবারে মুছে গেল। মনটা যেন একটা ব্যাধিমুক্ত হয়ে পরম সন্তোষে গেয়ে উঠলো,—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

নিজেকে তৈরী হতে হবে—অজস্র ঘাটতি পূরণ করতে হবে। বর্তমানে সর্বপ্রধান কাজ লেখাপড়া। অবকাশরঞ্জিনী নাটক-নভেল নয়,—"নীরস" প্রবন্ধ—বই এবং মাসিকপত্র। বস্তুত, লোকে যাকে

সাধারণত নীরস বলে, সে সব বিষয়ের মধ্যেই আমি সবচেয়ে রস খুঁজে পেতুম। একটা নতুন কথা বুঝলে, নতুন কিছু শিখলে পড়া সার্থক মনে হত, আনন্দ পেতুম।

লেখাও অভ্যাস করা দরকার,—ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে। ১৯১৩/১৪ সালে লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট ডিবেটিং ক্লাবে আমি ছিলুম জুনিয়ারদের মধ্যে একজন উৎসাহী সভ্য, বাংলা প্রবন্ধ লেখক বা সমালোচনা লেখক। তার পর "অঞ্জলি" নামে হাতে-লেখা মাসিক বেরুলো—তাতেও লিখতুম। সে কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯ সালে আবার কাগজ বেরুলো—নাম "প্রাঞ্জলি"—এবং সম্পাদক করা হল আমাকে—দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে যে ঠিক সময়মত কাগজ বেরোবেই,—এটা সকলেই বুঝতো। কিন্তু সময়মত লেখা আদায় করা শক্ত—কাজেই একটা প্রবন্ধ, একটা কবিতা,—কিছু 'খবর' এবং কিছু 'চাটনী'—আমাকেই লিখতে হত।

লাইব্রেরীর অ্যানিভারসারী এল। অভিনয়ের জন্যে নবীন সেনের 'রৈবতক' এবং 'প্রভাস' থেকে কয়েকটা 'সিন' নিয়ে "অভিশাপ" নামে এক নাটক খাড়া করে অভিনয় করলুম। মহাভারতের রাজনীতি—ক্ষত্রিয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বাসা-বাসুকির ষড়যন্ত্র। আমি দুর্বাসা, এবং বন্ধুর দাদা নন্‌কুদা' বাসুকি। নর্থ সুবারবান স্কুলের চিরগম্ভীর হেডমাষ্টার আমার সঙ্গে আলাপ ও অভিনন্দন করলেন। কিন্তু দু'দিন পরে এক I B officerও বই-এর সন্ধানে এলেন। রৈবতক-প্রভাসের নাম করে তাঁকে হাঁকিয়ে দিলুম।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলো বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়েছে—নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারতন্ত্রী জারের শাসনের উচ্ছেদ করে বিপ্লবী বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহাযুদ্ধের অবসানের (নভেম্বর ১৯১৮) পর সেভার্স সন্ধিতে বিজয়ী বৃটেন-ফ্রান্স তুরস্কের রাজ্য ভাগাভাগি করে গ্রাস করে নিয়ে সুলতানকে ক্ষুদ্র এশিয় অংশটুকুতে কোণঠাসা করেছে। কিন্তু নবীন তুর্কীদলের নেতা কামাল পাশা বিদ্রোহ করে সেভার্স চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করেছেন—রুশিয়ার বলশেভিকরা তাঁকে মদৎ দিচ্ছে।

যুদ্ধের আগে ভারতে সৈন্য সংগ্রহের সময় বৃটিশ সরকার ভারতের মুসলমানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তুরস্কের সুলতানের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করা হবে না—কারণ মুসলমানরা তাদের ধর্মগুরু খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু এখন সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খলিফার হাড়ির হাল করাতে ভারতীয় মুসলমানেরা ক্ষেপে গেল—মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রভৃতির নেতৃত্বে তারা খিলাফৎ আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো—একটা বিদ্রোহের ঝড় আসন্ন হয়ে উঠলো।

আর এক দিকে,—ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদের জন্যে সরকার এক যথেচ্ছাচারী বে-আইনী আইন—(রৌলট আইন) পাশ করে পুলিসের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে সর্বসাধারণের অসন্তোষ জাগিয়ে তুললে।

ফলে একদিকে কলকাতার টাউন হলে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও সি আর দাশের নেতৃত্বে এক বিরাট সভা করে প্রতিবাদ করা হল,—এবং অনেক দিন পরে যেন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নব জীবনের সঞ্চার হল—ভয় কেটে গেল—উত্তেজনা বাড়তে লাগলো।

আর এক দিকে হল এক বিরাট ব্যাপার। মহাত্মা গান্ধী রৌলট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যে '১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সারা ভারত জোড়া হরতাল সংগঠিত করলেন। এই উপলক্ষে বিপ্লবী পাঞ্জাবের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা ফেটে পড়লো—অমৃতসরে—এবং দিল্লীতেও—জনগণ সরকারী ভবন, ব্যাঙ্ক, রেললাইন প্রভৃতি আক্রমণ করে ভেঙ্গে পুড়িয়ে একাকার করলো। সরকারও মার সুরু করলো বেপরোয়া। অমৃতসরে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা পর্যন্ত হয়েছিল।

১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সরকারের নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা হল, এবং জেনারেল ডায়ার সেখানে মেসিনগান চালিয়ে ১২০০ লোককে হত্যা করলে। তারপর চললো মার্শাল ল'র অত্যাচার। ফলত জনগণের অসন্তোষ হয়ে উঠলো প্রায় সার্বজনীন। উপায় কি?

মার্শাল ল'র আমলে এক এক গাঁ শুদ্ধ লোককে রাস্তায় বার করে পুরুষগুলোকে বুকে হাঁটানো হচ্ছিল। অসংখ্য লোককে প্রকাশ্য স্থানে খোঁটায় বেঁধে বেত মারা হচ্ছিল। নেতাদের সামরিক বিচারের প্রহসন করে দণ্ড দেওয়া হচ্ছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তার মধ্যে সত্যপাল কিচলুর সঙ্গে সরলা দেবীর স্বামী পণ্ডিত রামভূজ দত্ত-চৌধুরীও ছিলেন।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে এক চিঠি লিখে স্যার উপাধি বর্জন করেন। তাতে তিনি লেখেন, ভারতবাসীর অসহায় অবস্থা পাঞ্জাবে যেরকম নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে—তাতে সরকারী খেতাবে ভূষিত হয়ে চুপ করে বসে থাকার লজ্জা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব—আমিও ঐ লাঞ্ছিত অসহায় ভারতবাসীদেরই একজন,—এবং আমার স্থান তাদের পাশেই।

তাঁর ভাষাটা ঠিক মনে নেই—কিন্তু তার মর্মকথা ওই। সারা ভারত ধন্য ধন্য করে উঠলো। নতুন যুগে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জনগণের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। পরবর্তী কালে হিজলী বন্দী নিবাসে সরকারী গুলী চালাবার প্রতিবাদ সভায়ও রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব করেছিলেন।

কিন্তু আমায় কিছু একটা করতে হবে তো। বসে খেলে তো চলবে না, কিছু রোজগারের ব্যবস্থা দরকার। চাকরীর চেষ্টা বৃথা—কয়েকটা টাকার বিনিময়ে সমস্ত সময়, শক্তি, সম্মান খুইয়ে 'যেমন তেমন চাকরী ঘি-ভাত' বলে মামুলী সংসার ধর্মের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া পোষাবে না। সুতরাং ব্যবসাই কিছু করতে হবে, এবং তার জন্যে বাড়ী বিক্রিও করতেই হবে।

মন স্থির করে বাড়ী বেচে ফেললুম,—এবং কোটের inside পকেটে নগদ ১৮৫০০৲ টাকা নিয়ে হেঁটে কাশীপুর সাবরেজেষ্ট্রী অফিস থেকে বাগবাজারে এসে ট্রামে ড্যালহাউসী স্কোয়ারে টাটা ব্যাঙ্কে পুলিনের কাছে এসে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলুম। সে ১৯২০ সালের কথা,—তখন টাটা এবং কার্ণানী ব্যাঙ্ক নতুন হয়েছে, এবং পুলিন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক থেকে টাটা ব্যাঙ্কে Passing officer হয়ে এসেছে।

পুলিন অফিসে বসে অতি সন্তর্পণে কিছু কিছু share কেনাবেচা করতো। সে পরামর্শ দিলে,—আমি যদি share marketএ যাতায়াত করি এবং তাকে information এনে দিই,

তাহলে দু'জনে মিলে কিছু ব্যবসা করা যেতে পারে। তদনুসারে তার সঙ্গে কিছু দিন অল্পবল্প shareএর ব্যবসা করলুম, এবং লাভ লোকসান হেরফের করে টায়ে টায়ে টাকা বজায় রেখে তারই পরামর্শে ক্লেটে পড়লুম।

লোকে বলে, বাড়ী গেলে আবার বাড়ী হওয়া শক্ত। মাথা গোঁজবার ঠাঁই থাকা চাই। সুতরাং বরাহনগর কুঠিঘাটার কাছে এক বাড়ী এবং সিঁথিতে সাতপুকুরের বাগানের পিছনে কিছু জমি কিনলুম। বাকী টাকায় কিছু ছোট দোকানদারী ব্যবসা করাই স্থির করলুম। পয়সা নষ্ট করে ব্যবসা শিখতে হবে,—সুতরাং ছিল-দরাজী চলবে না। ভেবে চিন্তে শ্যামবাজারে প্রমথ মল্লিকের চক্রে রাস্তার ওপর একখানা ঘর খালি পেয়ে ভাড়া করে ফেললুম। তখনও টালায় থাকি।

বরাহনগরের বাড়ী মেরামত করে নিলামে কিছু ফার্নিচার কিনে ঘর সাজিয়ে তুলছিলুম। নিলামে যাওয়ায় নেশা হয়েছে,—কিন্তু ঘরের কিছু মাল না বেচে ফেলতে পারলে আর কিছু কেনা চলে না—এই হয়েছিল অবস্থা।

শান্তিপুরের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কারিগর তাঁতীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তারা পরামর্শ দিয়েছিল শান্তিপুরের কাপড়ের ব্যবসা করার। প্রথমে ঠিক করলুম তাই করবো। কয়েকশো টাকার দামী ধুতি, শাড়ী এবং চাদরও কিনে ফেললুম। কিন্তু কাপড়গুলো দুজন জুয়াচোরে ফাঁক করে দিলে।

একদিন রাস্তায় এক বেকার ভদ্রলোক সাহায্য ভিক্ষা চাইলে,—ছেলে মেয়ে নিয়ে অনাহার চলছে। একটি সিকি দিয়ে নাম-ঠিকানা জেনে নিলুম এবং দু-একদিন পরে আমার ঠিকানায় দেখা করতে বলে দিলুম। তার ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে দেখলুম—পাকপাড়ায় এক বস্তির একটা খোলার বাড়ীর ভাড়াটে—যা যা বলেছিল সব সত্যিই।

সুতরাং দুদিন পরে সে যখন আমার কাছে এল,—একটা নতুন চামড়ার সুটকেশ ভরে তাকে একগাদা দামী কাপড় দিয়ে বলে দিলুম—বড় বড় বাড়ী দেখে ঘুরে যদি রোজ একখানা কাপড়ও বেচে আসতে পারো, তাহলে এমন কমিশন দোব, যাতে তোমার চলে যায়। সে ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় হল।

কিন্তু সেই প্রথম দিন যে গেল, আর তার দেখা পেলুম না,—কোনো রকমেই ধরতে পারলুম না। তার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিই—শুনি সে কয়েক দিন অন্তর এসে কিছু খরচপত্র দিয়েই আবার চলে যায়। মনকে প্রবোধ দিলুম,—ব্যবসায় যাই হোক, কাজ তো কিছু হল!

বাকি কাপড়ের বেশীর ভাগ ধারে কিনলে টালার ফণী বুধুজ্যের ছোট ভাই পাগলা—আমাদের ছেলেবেলার একজন খেলার সাথী। বিক্রী তো হল,—দামটা না হয় পেতে একটু দেরীই হবে। কিন্তু কিছুতেই একটা পয়সা আদায় করতে পারলুম না। দূত্তোর বলে কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেললুম। ততদিনে ব্যবসায় আর একটা নতুন সূত্র পেয়েছি। সে কথা পরে বলছি।

এদিকে কংগ্রেস থেকে একটা অনুসন্ধান কমিটী তৈরী হল, পাঞ্জাবে সরকারী অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্তে। তাদের রিপোর্টও বেরুলো। ১৯২০ সাল শেষ হয়ে আসছে। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হল। আমেরিকা থেকে সত্ত প্রত্যাগত লালা লাজপৎ রায় হলেন সভাপতি।

কংগ্রেসের মূলপ্রস্তাব হল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ। উদ্দেশ্য পাঞ্জাব ও খিলাফৎ সংক্রান্ত অন্যায়ের প্রতিকার। খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানেরা পাছে হিংসার পথ অবলম্বন করে, তাই মহাত্মা গান্ধী তাদের কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলে টেনে নিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত আন্দোলনে পরিণত করার ব্যবস্থা করলেন।

বাংলার নেতারা মূল-প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব করে স্বরাজের দাবীটাও জুড়ে দিতে চাইলেন। কারণ স্বরাজ না হলে কোন অন্যায়েরই স্থায়ী প্রতিকার হবে না। গান্ধীজী এটা মেনে নিলেন।

প্রস্তাব অনুসারে স্কুল-কলেজ, আদালত বয়কট করতে হবে, বিলাতী কাপড় বর্জন করতে হবে, জাতীয় বিত্তালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সালিশী আদালত করে মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, চরকার প্রচলন করে খদ্দর উৎপাদন করে বস্ত্রসমস্যার সমাধান করতে হবে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে।

মহাত্মা বললেন, এই কার্যক্রম একটা বছর রীতিমত ভাবে চালাতে পারলেই স্বরাজ হয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্তে কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্র তৈরী করে কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে এবং কংগ্রেসের আদর্শেরও পরিবর্তন (creed change) করতে হবে। স্থির হল এদুটো ব্যবস্থা ডিসেম্বরে নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে করা হবে।

একটা বড় আন্দোলন আসছে বোঝা গেল, কিন্তু স্বরাজ-স্বরাজ যাই হোক, স্বাধীনতা যে অহিংসপন্থায় হতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সরকারবিরোধী একটা দেশজোড়া লড়াই তো বটে! দেখা যাক—

আন্দামান থেকে সত্ত-প্রত্যাগত শচীন সান্ন্যাল ছিলেন কলকাতা কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন। মহারাষ্ট্রীয় ডেলিগেটরা ভলান্টিয়ারদের মেরেছিল, তিনি থামাতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর মাথায়ও তারা লাঠির বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। ভলান্টিয়াররা পাল্টা মার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের থামানো হয়েছিল এই বলে যে, যদি মারতে হয়, তাহলে নাগপুর কংগ্রেসে গিয়ে মারবো।

তখন নববিধান ব্রাহ্মমন্দিরের পিছনে (মেছোবাজার ষ্ট্রীট) বোধ হয় পুলিন দাস থাকতেন। শচীন বাবুও বোধ হয় সেইখানেই উঠেছিলেন। আমি ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এলুম।

২০ সালের আগষ্ট মাসে নতুন শাসন সংস্কার (মণ্টেগু চেমসফোর্ড) ঘোষিত হয়েছে। বিপ্লবীরা মুক্ত হয়েছেন। বিপ্লবীদের তরফ থেকে লাজপৎ রায়কে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে সম্বর্দ্ধিত করা হল। সেই সভায় বসন্ত মজুমদার সর্বপ্রথম বৌদিকে (হেমপ্রভা মজুমদার) প্রকাশ্য সভায় হাজির করলেন। বৌদি কিন্তু একগলা ঘোমটা দিয়েই বসে থাকলেন, কোলে শিশু, বোধ হয় সুশীল। সুরেন ঘোষ (মধুদা), নরেশ চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হল।

আমি কংগ্রেসের ভিজিটারের টিকিট কিনেছিলুম। দেখে নরেশদা' বললেন, কেন? ঐ দশ টাকাতেই তো ডেলিগেটের টিকিট পাওয়া যেত—চাইলেই দিত। এই ছিল তখনকার কংগ্রেসের গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যে কেহই ডেলিগেট হতে পারতো শুধু ডেলিগেটের নাম ঠিকানা খাতায় লেখা থাকতো।

এই সময় জীবনও জেল থেকে মুক্ত হয়ে এল, টালায় তার মামার বাড়ীতে উঠলো। ওদিকে মামার দেশের (নদিয়া, ফরিদপুর) গোকগোপাল ভট্টাচার্য (জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সম্পাদক, বোস ইনষ্টিটিউটের অন্যতম বৈজ্ঞানিক গবেষক, পরিমল গোস্বামীর "স্মৃতিকথার" গোপালদা') কলকাতায় এসে ঐখানেই উঠেছেন জাগা অন্বেষণে। আসার পরে কয়েকদিনের মধ্যেই কাশীপুরে মামী আমাদের কম্পানীতে টেলিফোন ক্লার্কের কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন।

জীবনের মারফৎ আলাপ হল। নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে বেশ ভাল লাগলো এবং দু'-চার দিনেই বন্ধুত্ব জমে উঠলো। বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার দিকে তাঁর ছিল অসাধারণ ঝোঁক, এবং গ্রামে থেকেই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংক্রান্ত পুঁথিপত্রের সাহায্যে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বেশ একজন ছোট খাটো বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ। কীটপতঙ্গ বিশেষত মাকড়সাগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার ও নানা অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে তিনি "প্রবাসী"তে প্রবন্ধ লিখতেন,—এবং ছুরি-নরুণ সাহায্যে ঘড়ি মেরামতও করতেন।

আমি ব্যবসা করতে নেমেছি,—পদক্ষেপ নেহাৎ কম হয়নি,—কিন্তু ফল এপর্যন্ত হয়েছে অগ্রগতির বদলে ঘূর্ণপাকমাত্র—শুনে তিনি বললেন—কলকাতায় ঘড়ির কাজ প্রচুর—যদি ঘড়ি মেরামতের দোকান করেন, আমি সকালে-বিকালে গিয়ে বসতে পারি। —আমিও কাজ করবো, আপনি শিখে নিতেও পারবেন। উৎসাহের চোটে তাই স্থির করে ফেললুম।

নিলাম থেকে আলমারী-সোকেস কিনলুম, রাধাবাজার থেকে, একসেট যন্ত্রও নিলুম। এক সাইন বোর্ড বানিয়ে ফেললুম, গোপাল বাবু পরামর্শ দিলেন, রং ও তুলি কিনে দিলে তিনি সাইন বোর্ড লিখে দেবেন। সেই ব্যবস্থাই হল।

প্রথম দিন তাঁর সঙ্গে হাত লাগিয়ে বোর্ডটার জমি রং করা হল। পরদিন সকালে তিনি খড়ির দাগ দিয়ে নাম লিখে (নাম হল B. Narayan & Co.)—প্রথম অক্ষরটায় রং দিয়ে অফিসে চলে গেলেন—এবং বিকালে এসে দেখলেন, আমি লেখা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি—স্নানাহার হয়নি। এলেম এবং অধ্যবসায় দেখে তিনি খুব তারিফ করে বললেন,—স্বদেশী হাঙ্গামা ছেড়ে এই সব ব্যবহারিক কাজের পথ ধরলে আমি খুব কাজের লোক হতে পারি।

লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে অনেকগুলো নানারকমের ছোট বড় বিকল ঘড়িও যোগাড় করে ফেললুম। কিন্তু হঠাৎ সমগ্র পরিস্থিতি গেল বদলে—ঘড়ির দোকান হল না।

বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস গোপাল বাবুর দেশের লোক। আচার্য জগদীশ বসু তাঁকে অর্থ সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করেছেন, প্রত্যহ বৈকালে পুলিন বাবু বোস ইনষ্টিটিউটের কর্মীদের একটু করে লাঠি খেলা শেখাবেন—গবেষকদের ওপরও তাঁর হুকুম, সকলকেই বিকালে একবার লাঠি নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

গোপাল বাবু সেখানে গিয়ে পুলিন বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সাহায্যে Laboratory Assistant এর এক চাকরী জোগাড় করে ফেললেন। তাঁর আর দোকানে বসা সম্ভব হল না। দুত্তোর বলে বাড়ী থেকে কিছু ফার্নিচার নিয়ে দোকানে তুললুম—এই ব্যবসাই করবো। ভাগ্নীজামাইকে বসালুম দোকানে।

ইতিমধ্যে এসে পড়লো নাগপুর কংগ্রেস। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গেলুম ডেলিগেট হয়ে। জন পঞ্চাশেক বাছা বাছা ডেলিগেট চললেন, হাতে এক একটা মজবুত ছোট লাঠি। সেখানে মারাঠিদের সঙ্গে ঝগড়াও হল, তাদের রীতিমত মার দেওয়াও হল—কলকাতার জবাব দেওয়া হল।

নাগপুর কংগ্রেসে দুটো বড় বড় মূল কাজ হল,—(১) কংগ্রেসের আদর্শের (creed) পরিবর্তন,—আর (২) নতুন গঠনতন্ত্র। ব্যবস্থা হল,—কংগ্রেসের আদর্শপত্রে সই দিলে এবং বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিলে যে-কেহই কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে। এই ভাবে কংগ্রেস হবে সারাভারতব্যাপী জনসংগঠন। বিস্তারিত ভাবে গঠনতন্ত্র রচনার জন্যে কমিটি তৈরী হল।

আর,—কংগ্রেসের creed আগে ছিল—"Attainment of Self Government within British Empire by Constitutional means." পরিবর্তন প্রস্তাবিত হল—"Attainment of Swaraj by peaceful and Legitimate means." আপত্তি করলেন দুজন নেতা—বিপিন পাল ও জিন্না। বিপিন পাল বললেন,—"এতে সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী করে দেবে—আমাদের সর্বনাশ হবে।"

মহাত্মা জবাব দিলেন,—"এই বে-আইনী করার ভয়টা ভুল, এতে বে-আইনী কিছু নেই। আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকবো কি না,—সেটা একটা খোলা প্রশ্ন থাক—তার মীমাংসা নির্ভর করুক সরকারের ব্যবহারের ওপর।"

জিন্না বললেন "within British Empire" কথাটা তুলে দাও, ক্ষতি নেই,—কিন্তু তার স্থলে লিখে দেওয়া হোক, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বরাজ—কারণ তা না হলে কর্মীরা ও জনসাধারণ দিশেহারা হবে,—কেউ "within," কেউ "without" মনে করে কাজ করবে,—কাজে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা হবে। সরকার বে-আইনী ঘোষণা করে তো, আমরাও তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।"

মহাত্মা জবাব দিলেন, "আমরা যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেই যেতে চাই, একথাই কি ঠিক? একথা ঠিক করার সময় এখনো আসেনি—যখন স্বরাজ হবে, তখন জনগণ সেটা ঠিক করবে।" —প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

ফিরে এসে দেখি, দোকানের চেহারা যেমন ছিল, অবিকল তেমনি আছে। ফার্নিচারের ব্যবসায়ে আমার পাণ্ডিত্য নিলাম চেনা পর্য্যন্ত, ভাগ্নীজামাই ততোধিক পণ্ডিত—তিনি নিলামও চেনেন না।

দোকানের পিছনে চকের মধ্যে দুটো বড় বড় ডেকরেটর-এর ব্যবসা ছিল। দেখতে দেখতে মনে হল—এই ব্যবসাটা বেশ! একদিন স্থির করে ফেললুম—এই ব্যবসাই করতে হবে। [ক্রমশঃ।

শীতের পড়ন্ত বেলায়

মাধবী ভট্টাচার্য্য

একজন ভদ্রলোক। একজন ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলার বয়স অনুমান করে বলা যায় ত্রিবিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। চেহারাটা ক্ষীণ, রুক্ষ—স্বভাববিরুদ্ধ সংযমের টানে শ্রীহীন। গাল দুটো বসা। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। রঙটা ময়লার ধার ঘেঁসে গেছে। চেহারায় বাঁধুনী বলতে কোথাও কিছু নেই—সমস্তটাই শ্লথ, ঢিলে-ঢালা। চোখের দৃষ্টিটা এমনিতে মনে হবে উদাস, কিন্তু একটু নিরীক্ষণেই ধরা পড়বে সে দৃষ্টিতে রয়েছে জ্বালা—একটা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালা।

ভদ্রলোকটির বয়স অনুমান-সাপেক্ষ নয়। কেন না, সৌম্য, প্রশান্ত মুখখানার দিকে এক নজর তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় ভদ্রলোক এই সবে পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়েছেন।

মহিলাটি বসে আছেন। সামনে চায়ের পেয়ালা। পেয়ালার চা পেয়ালাতেই জুড়িয়ে যাচ্ছে। মহিলা বসে আছেন। বসে আছেন টেবিলের ওপর কুনুই-এর ভর দিয়ে বাঁ হাতখানা গালের ওপর রেখে। দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন জানালা পার করে অনেক দূরে।

দরজার সামনে বসে আছেন ভদ্রলোক। তাঁর সামনেও এক পেয়ালা চা। ধীরে ধীরে সেই চা তিনি আয়েস করে পান করে যাচ্ছেন। সর্বাংগে একটা আমেজী ভাব।

মধ্য প্রদেশের পাহাড় আর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ছোট একটি সহর, আর সেই সহরের উপকণ্ঠে একটি নির্জন সরাইখানা। সরাইখানার মালিক এক বৃদ্ধ গড়জাতি রাজপুত। মেয়ে তার রুক্মিণী। মা-মরা মেয়ে। বাপের আদরে, পাহাড় আর জঙ্গলের পরিবেশে বড় হোয়ে উঠেছে। যেমন পাহাড়ী, তেমনি বন্য।

ভদ্রলোকটির নাম অমিয় বাবু—অমিয়কুমার ঘোষ। উড়িষ্যার কোন এক জেলায় বাড়ী। জমি জরীপ সংক্রান্ত কাজ নিয়ে এখানে এসেছেন। আস্তানা নিয়েছেন এই সরাইখানাটিতে।

ভদ্রমহিলাটি সরকারী গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ নিয়ে এসেছেন। মাথা গুঁজবার দ্বিতীয় ঠাঁই না থাকায়, তাঁকেও এইখানেই অস্থায়ী ডেরা বাঁধতে হোয়েছে। ভদ্রমহিলার নাম মণিকা গুপ্ত।

শীতের এক পড়ন্ত বেলা। সেই পড়ন্ত বেলার আধো-অন্ধকার সরাইখানার নির্জন এক কক্ষে প্রায় পাশাপাশিই বসে রয়েছেন বাবু অমিয়কুমার ঘোষ—পঞ্চাশের কোলঘেঁসা এক প্রৌঢ়, এবং কুমারী মণিকা গুপ্ত, বি, এ—জীবনের ত্রিবিশটি বসন্তকে অন্ততঃ যিনি অসীম ঔদাস্যে উপেক্ষা করে এসেছেন।

অমিয় বাবু আয়েস করে চা পান কোরছেন আর আড়চোখে লক্ষ্য কোরছেন মণিকা দেবীর হাব-ভাব।

অনেকটা সময় কেটে গেল। অমিয় বাবুর চা-পান পর্ব শেষ হোল। নির্জন ঘরের অন্ধকার আর একটু ঘনীভূত হোয়ে এল। মণিকা দেবীর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বাইরের পৃথিবী দু' চোখ ভরে দেখে নিচ্ছেন।

এক সময় অমিয় বাবু উঠে দাঁড়ালেন। শব্দ করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। বৃথা, মণিকা দেবীর স্পন্দন নেই। অমিয় বাবু আর থাকতে পারলেন না। কণ্ঠস্বর এক পর্দা ওপরে তুলেই বললেন: আপনার চা জুড়িয়ে গেল মিস গুপ্ত!

চমক নয়। দীর্ঘশ্বাস। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণিকা দেবী বাইরের দৃষ্টিটাকে গুটিয়ে নিয়ে চায়ের পেয়ালায় কেন্দ্রীভূত কোরলেন। মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুট আওয়াজ বেরুলো ধন্যবাদ।

বৃষ্টি নামলো। পাহাড়ী বৃষ্টি। অমিয় বাবু কথা জমাবার জন্যে বোললেন: এ সময় এখানে বৃষ্টি হয়, জানা ছিল না তো?

অপর পক্ষে নীরব। বাইরের অজস্র বৃষ্টিধারার মধ্যে চোখের দৃষ্টি আবার কোথায় গিয়ে হারিয়েছে।

ঘরে ঢুকলো রুক্মিণী। গড়জাতের পাহাড়ী রাজপুতানী মেয়ে—তার সতেরো বছরের যৌবনকে দপ্‌দপিয়ে হাতের হ্যারিকেন লণ্ঠনটাকে উঁচিয়ে একবার দেখে নিলে ঘরের পরিবেশ, তারপর হাঁটুর একটু নীচে পর্য্যন্ত নামা ঘাঘরাটা ঝলমলিয়ে সোজা অমিয় বাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে এক কাপ চা ঠক করে নামিয়ে দিয়ে বোললে: এই নাও বাবুজী, তোমার চা।

প্রসন্ন হাস্যে অমিয় বাবু চঞ্চল হোয়ে উঠলেন।

—বাঃ, বাঃ, বাঃ, তাই তো বলি, রুক্মিণী নইলে মনের কথা আর এমন করে কে বুঝবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন: এই জঙ্গলে তোমার মতো একটি মেয়ের দেখা যে পাবো রুক্মিণী, এ কি আমি কখনো কল্পনাতেও আনতে পেরেছিলাম?

—নসীব তাহলে তোমার ভালই বল বাবুজী!

হেসে হেসে মণিকার দিকে একবার কটাক্ষ করে কথাটা বললে রুক্মিণী।

—হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে? অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ওঠেন অমিয় বাবু।

হঠাৎ এই সময় মণিকা দেবী চেয়ারটা সশব্দে পেছন দিকে ঠেলে, উঠে দাঁড়িয়ে গট্‌ গট্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মণিকা দেবীর এই চলে যাওয়াটা এমনই বেখাপ্পা আর বেয়াড়া ধরণের যে, অমিয় বাবুকে রীতিমত অপ্রতিভ হতে হল। কিন্তু খিল-খিল করে হেসে উঠলো রুক্মিণী। তারপর এক সময় বললে: বাবুজী ও বাঈটা ভাল নয়। ও একটা টঁড়াই।

—টঁড়াই? টঁড়াই কি ব্যাপার রুক্মিণী! অমিয় বাবু সহজ হবার জন্যে হেসে ফেলেন।

—তুমি হাসছ বাবুজী! তুমি জানো না টঁড়াই কি জিনিষ! চোখ-মুখ ঘুরিয়ে রুক্মিণী বলতে থাকে: টঁড়াই কাদের বলে জানো? টঁড়াই বলে সেই মেয়ে মানুষদের—যারা মন্তর-তন্তর জানে। পুরুষ মানুষ দেখলেই যাদের জিভ লক্‌ লক্‌ করে ওঠে। অন্ধকার ছাড়া যারা আলোতে বেরোতে চায় না। বেরোলেও—যাদের একমাত্র গন্তব্য স্থান শুন্‌ শান্‌ শ্মশান।

—বটে! তা' হোলে তো খুবই ভয়ের কথা! অমিয় বাবু কৌতুক ছলে বলেন।

—ভয়ের কথাই তো। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে রুক্মিণী: তুমি সাবধান!

—কেন, আমার ভয়টা কিসের ?

—বাঃ, ভয় তো তোমাকে নিয়েই। তুমি যে পুরুষ মানুষ—মরদ।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারেন না ভদ্রলোক—সংকুচিত হোয়ে পড়েন। স্বজাতীয়া মহিলা সংক্রান্ত আলোচনাটার এইখানেই ইতি টানবার ইচ্ছে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন: আজই তোমাদের দেশে এসে পৌঁছুলাম রুক্মিণী—কিন্তু দেখ কি বৃষ্টি! একটু যে বাইরে বেরিয়ে চারিদিক ঘুরে-ফিরে দেখবো—তার উপায় নেই।

রুক্মিণী অভয় দিয়ে বলে: এ বর্ষায় ভয় পাবার কিছু নেই বাবুজী! পাহাড় দেশের মেঘ—ও এখুনি সাফ হোয়ে যাবে।

—যাক্ বাঁচা গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন অমিয় বাবু: তা কোন দিকে যাওয়া যায় বলো তো রুক্মিণী! জংলী জায়গা। রাস্তা-ঘাটও চিনি না। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়বো। শেষটা হয়তো বাঘের মুখেই প্রাণটা যাবে।

বাইরের দিকে কানটা খাড়া করে কি একটা শোনবার চেষ্টা করে রুক্মিণী, তারপর বলে: তুমি একটু দাঁড়াও বাবুজী, আমি আসছি: আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—সে কি! তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে? বিস্মিত কণ্ঠে অমিয় বাবু প্রশ্ন করেন।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল রুক্মিণী। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে: যাবোই তো। পাহাড়-জঙ্গল দেশ। জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছেই, আর আছে টঁড়াই। একলা মরদ কি এমনি এমনি ছেড়ে দিতে আছে?

খিল্-খিল্ করে আর এক ঝলক হেসে ছুটে মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিস্ময় যতখানি, তার থেকে অনেক বেশী পুলকে নির্জন ঘরের মধ্যে অমিয় বাবু শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন।

পাহাড়ী রাত। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় মাঠ, বন, পাহাড় ভরে গেছে। চারিদিকে একটা নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যালোক।

অমিয় বাবু হেঁটে চলেছেন। পাশে রুক্মিণী। রুক্মিণী এক নাগাড়ে বকে চলেছে। অমিয় বাবু শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এক-আধখানা প্রশ্ন কোরছেন। রুক্মিণী বোঝাচ্ছে: এই যে এখন আমরা যে জায়গাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বাবুজী, এটা হোচ্ছে ভাল্লুকের আস্তানা। এখন অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কেন না ভাল্লুক এখন শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। ফিরবে সেই ভোরের দিকে।

অমিয় বাবুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে: আর এর মধ্যে যদি ফিরেই—তাতেই বা কি! আমরা তো আর ওর কোন ক্ষতি কোরতে যাচ্ছি না। ওই বা শুধু শুধু আমাদের কেন ক্ষতি কোরতে আসবে, না বাবুজী!

—হ্যাঁ। অন্যমনস্ক ভাবে অমিয় বাবু উত্তর দেন।

রুক্মিণী বলে চলে: বুঝলে বাবুজী, ভাল্লুক হোচ্ছে সব থেকে শান্ত জানোয়ার। ওর ডেরার ওপর গিয়ে হামলা না কোরলে, ও কাউকে কিছু বলে না। আচ্ছা বাবুজী, তুমি ভাল্লুক দেখেছো? আচমকা অমিয় বাবুর চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা করে রুক্মিণী।

চাকরী-জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেছে বনে-জঙ্গলে। অমিয় বাবু ঘাড় নেড়ে বলেন: দেখেছি।

—দেখেছ? সত্যি দেখেছো বাবুজী?

প্রশ্নের ধরণে এবার হেসে ফেলেন অমিয় বাবু। বলেন: হ্যাঁ, সত্যিই দেখেছি।

—আচ্ছা, কখনো সামনা-সামনি পড়েছ?

আবার হেসে ফেলেন অমিয় বাবু। বলেন: না। তা' পড়িনি।

—পড়োনি? সত্যিই পড়োনি? হঠাৎ এক বিচিত্র ধরণের কৌতুকে রুক্মিণীর চোখ দু'টো চক চক করে ওঠে। অমিয় বাবুর পথ আগলে ও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। অমিয় বাবু বিস্মিত হোয়ে ওর দিকে তাকান। রুক্মিণী এক পা এগিয়ে আসে। ঘন হোয়ে মুখোমুখী দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে নিয়ে আসে নিখাদ অতলে। বলে:—আজ একটা ভাল্লুক দেখবে বাবুজী—পাহাড়ী জংলী ভাল্লুক—একেবারে সামনাসামনি।

চার পাশে একবার সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন অমিয় বাবু। তারপর বলেন ফিস্ ফিস্ কোরে: কই, কোথায়?

অমিয় বাবুর চোখের দিকেই তাকিয়েছিল রুক্মিণী। এবারে খিল্-খিল্ করে হেসে ওঠে। তারপর সমস্ত শরীরে একটা হিল্লোল তুলে অমিয় বাবুর একখানা হাতকে নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে, ঢালু পথটা বেয়ে তন্বী রুক্মিণী তর্ তর্ করে এগিয়ে যেতে যেতে বলে: চলো, তোমাকে দেখিয়ে আনি।

ভারী দেহটা নিয়ে বিভ্রান্ত অমিয় বাবু অগত্যাই অনুসরণ করেন।

পথটা কিছুদূর নেমেই একটা বালির চরে ঠেকে গেছে। আর একটু নীচেই ছোট-বড় অজস্র পাথরের মাঝখান দিয়ে পথ করে বয়ে যাওয়া একটি শীর্ণ জলধারা। পাহাড়ী নদী এবং তার বালুচর। অমিয় বাবুর হাত ধরে রুক্মিণী তাঁকে সেইখানে টেনে নিয়ে আসে। নিজে গড়িয়ে পড়ে ভেজা-ভেজা নরম বালির চাদরে। হাত বাড়িয়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলে: এইখানে চুপটি করে বসে থাক বাবুজী! এখুনি ভাল্লুক আসবে—তুমি দেখতে পাবে।

রুক্মিণীর আকস্মিক বিচিত্র ব্যবহার প্রৌঢ় অমিয় বাবুর হিসেবের বাইরে। এতক্ষণ নির্বাক হোয়েই তিনি ছিলেন। এবার বললেন: ভাল্লুক না হয় দেখবো রুক্মিণী, কিন্তু—হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ করে যান ভদ্রলোক। এমন বিশ্রী আর বেয়াড়া ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা!

আবার খিল-খিল করে হেসে ওঠে রুক্মিণী। অমিয় বাবুর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া কোরতে কোরতে বলে: কিন্তু কি, বলো না বাবুজী, কি বলছিলে?

চাঁদের আলো পড়েছে পাহাড়ী নদীর জলে। সেখানে এক রাশ ঝিকিমিকি। চাঁদের আলো পড়েছে পাহাড়ী মেয়ের চোখে। সে চোখেও অজস্র প্রতিবিম্ব। কিন্তু অমিয় বাবু আর ওদিকে ফিরে তাকালেন না। সোজা নদীর ওপারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলেন:

না, এই বলছিলুম কি—ভিজে বালির ওপর শুয়ে পড়লে—ঠাণ্ডা ফাণ্ডা লেগে যেতে পারে তো ?

ভিজে ? ভিজে কোথায় দেখলে বাবুজী ! কী সুন্দর আর নরম বিছানা। তুমিও শুয়ে দেখো না বাবুজী ! অমিয় বাবুর অঙ্গুলগুলোকে মৃদু আকর্ষণ করে রুক্মিণী।

—আঃ রুক্মিণী ! প্রগলভা মেয়েটাকে শাসন করবার চেষ্টা করেন অমিয় বাবু।

—বোকো না বাবুজী ! তুমি বোকলে আমি কেঁদে ফেলবো। বোলেই পাশ ফিরে সরে এসে বাঁ হাতখানা দিয়ে অমিয় বাবুর একটা হাঁটুকে জড়িয়ে ধরে মুখখানা বালির মধ্যে গুঁজে দিল রুক্মিণী।

পাহাড়ী রাত আর পাহাড়ী নদী। সময়কে সঙ্গে করে স্রোত বয়ে চলেছে একটানা শব্দের সৃষ্টি করে, আর অসহ্য একটা নীরবতায় উন্মুখ চেতনা নিয়ে আড়ষ্ট হোয়ে বসে আছেন অমিয় বাবু।

আঃ, মেয়েটার কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই ! পাহাড়ী বোলে কি শালীনতার ছিটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট রাখতে নেই ?

নদীর ওপারে দৃষ্টি ঝাপসা। কুয়াসা জমতে সুরু কোরেছে। আকাশের মাথায় রয়েছে চাঁদ। সেই চাঁদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ঘন কালো মেঘ। ওটাকে দেখাচ্ছে একটা কেঁদো ভাল্লুকের মতো।

অমিয় বাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন। আলতো ভাবে রুক্মিণীর গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকতে চেষ্টা করেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাণ্ডটা ঘটে যায়।

বিদ্যুৎগতিতে উঠে বসে রুক্মিণী। দুই হাতে অমিয় বাবুর কণ্ঠ বেষ্টন করে সবলে তাঁকে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল। অস্ফুট বিচিত্র স্বরে কানে কানে বলে : বাবুজী, ভাল্লুক—পাহাড়ী জংলী ভাল্লুক—শিকার খুঁজতে বেরিয়েছিল—ভিলন্‌গীর পহেলী শিকার। সেই শিকার ওর মুখের সামনে এসে গেছে। তুমি বাধা দিও না বাবুজী— শুধু দেখে নাও— সামনাসামনি দেখে নাও।

সময় বুঝে মাথার ওপরের কেঁদো ভালুকটা প্রকাণ্ড একটা থাবা জমিয়ে বসলো চাঁদ মামার মুখে।

বিপর্যস্ত সময় গড়িয়ে চললো। গড়িয়ে চললো পাহাড়ী নদীর স্রোত—ভাল্লুকের মতো কেঁদো কেঁদো পাথরের তলাকার মাটী ক্ষয়িয়ে, গলিয়ে, ঝাঁঝরা করে।

—সেদিন রাত্রে সরাইখানার নির্জন ঘরে বসে অমিয় বাবু যখন মনে মনে আজকের সন্ধ্যার ঘটনাটা পর্যালোচনা করছেন—নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো রুক্মিণী। বিভ্রান্ত অমিয় বাবু উঠে দাঁড়ালেন। কিছু একটা বোলতে যাবেন—রুক্মিণী ঠোঁটে আঙুল তুলে ইংগিতে তাঁকে নীরব করে দিলে। তার পর নিঃশব্দে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, টেবিলের ওপর রাখা হ্যারিকেন-লণ্ঠনটাকে হাত দিয়ে নিবিয়ে, অমিয় বাবুর বুকের কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। অমিয় বাবু বোবা হয়ে গেছেন। তাঁর কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই। অত্যধিক স্নায়ুপীড়নে ইতিমধ্যেই তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন—কিন্তু রক্তের স্বাদ পেয়েছে বন্যব্যাঘ্রী—সে তাঁকে রেহাই দেবে কেন ? দু হাতে অমিয় বাবুর গলাটা জড়িয়ে ধরলো রুক্মিণী।
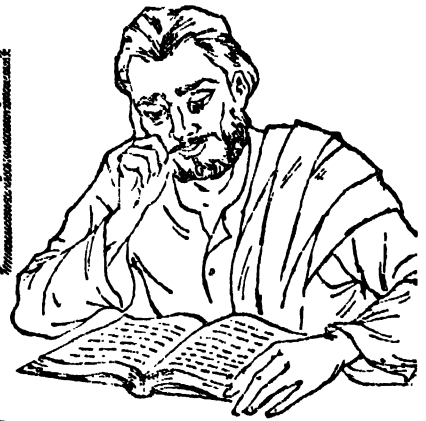
অমিয় বাবুর ঘরের দরজা খুলে রুক্মিণী যখন বেরিয়ে এল, মনে হোল একটা ছায়ামূর্তি যেন হন্ হন কোরে বারান্দার ওপাশের অন্ধকার কোণের দিকে গিয়ে অদৃশ্য হোয়ে গেল।

রুক্মিণীর পেছনে অমিয় বাবুও বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। ফিসফিসিয়ে ভীরুগলায় বোললেন: নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে এ ঘরে ঢুকবার সময় দেখেছে।

কে আবার! ওই টঁ্যাড়াই আউররাৎটা হবে। চাপা কণ্ঠে রাজ্যের বিদ্বেষ আর ঘৃণা ফুটিয়ে নিজের ঘরের দিকে রুক্মিণী পা বাড়ালো।

মণিকা গুপ্ত নামে একটি বাঙ্গালী মহিলা যে এই সহরে তাঁর সঙ্গে একই ছাদের নীচে বাস কোরছে—এ কথা অমিয় বাবু যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। রুক্মিণীই তাঁকে সর্বক্ষণ দখল করে আছে। অন্য দিকে তাকাবার তাঁর ফুরসৎই নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় একটু আগে অমিয় বাবু নদীর ধারে পায়চারী কোরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ পেছন ফিরতেই নজরে পড়লো—ঢালু পথটা বেয়ে তর তর কোরে নেমে আসছেন মণিকা দেবী। বিস্মিত অমিয় বাবু হাত উঠিয়ে নমস্কার কোরতে যাবেন, আকস্মিক ভাবেই পাশের একটা পায়ে-চলা পথের দিকে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেলেন মণিকা দেবী।

পরের দিন দুপুরেই কিন্তু মণিকা দেবীর আবির্ভাব—আর কোথাও নয়—একেবারে অমিয় বাবুর শয়ন কক্ষে।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম কোরছেন অমিয় বাবু, দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন মণিকা দেবী বিনা এত্তেলায়। অমিয় বাবু বিস্মিত হোলেও, সে ভাব কাটিয়ে, তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বোসে, দুহাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন: আসুন মিস গুপ্ত! বসুন। দরজার পাশেই চেয়ার। সেটা দেখিয়ে গলায় অন্তরঙ্গতার সুর এনে বোললেন: কি খবর বলুন তো মিস গুপ্ত! আপনার যে দেখা পাওয়াই ভার। সারাদিনটাই ডিউটি করেন নাকি?

মণিকা দেবী চেয়ারের ওপর বোসে অপ্রতিভের হাসি হাসেন।

—না, ডিউটি আর এমন কি। কথাটা অর্ধসমাপ্তই থেকে যায়। মণিকা দেবী হাতের নখ খুঁটতে থাকেন। অমিয় বাবু নীরবে একটা মাসিকের পাতা উল্টে যান।

এক সময় মণিকা দেবী উঠে দাঁড়ান। বলেন: আমি যাচ্ছি। নমস্কার। অমিয় বাবুকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা। অমিয় বাবু বেড়িয়ে ফিরছেন, সরাইখানার মুখেই মণিকা দেবী। ওঁর ভংগীটা প্রতীক্ষাপর! অমিয় বাবু কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—বাধা পড়লো।

—একটা কথা ছিল। প্রায় ফিস-ফিস শোনালো মণিকা দেবীর গলার আওয়াজ।

—বলুন। অমিয় বাবু ঘুরে দাঁড়ালেন।

—এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। একটু যদি—ভীরু আর কাঁপা-কাঁপা গলায় এই পর্য্যন্ত বোলেই থেমে গেলেন মণিকা দেবী।

—বেশ তো চলুন না আমার ঘরে। সপ্রতিভ কণ্ঠে আহ্বান জানালেন অমিয় বাবু।

—না, না, ওখানে নয়। ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানান মণিকা দেবী।

—তার চেয়ে ওই নদীর ধারটায়—আবার কথা হারিয়ে ফেলেন ভদ্রমহিলা।

—বেশ তাই চলুন।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। ভিতরের কৌতূহল আর উদ্বেগটাকে চাপা দেবার জন্যে চোখে-মুখে একটা নিরাসক্ত ঔদাসীন্য ফুটিয়ে পথ হাঁটছেন অমিয় বাবু। মণিকা দেবীর দৃষ্টি দূরায়ত, ভাবলেশহীন।

কখন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ঘন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, কখন দূরাগত পাহাড়ী নদীর কুলু-কুলু ধ্বনি, অনবরত পাথর আছড়ানো গর্জনে পরিণত হোয়েছে, কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা বনবীথি ধু-ধু বিস্তার বালুচরে রূপান্তরিত হোয়েছে—মণিকা দেবী তো নয়ই, অমিয় বাবুও যে এদিকে তেমন সচেতন ছিলেন—ওঁদের ভাব-ভঙ্গী দেখে অন্ততঃ একথা মনে করবার কারণ নেই। এমন কি, জলের প্রায় ধার ঘেঁসে দু'টি প্রাণী যখন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছেন—তখনো যেন চেনা-জানা এই চেতনার রাজ্য থেকে ওঁরা বেশ খানিকটা দূরে।

শান্তি ভঙ্গ করলো নিশাচর এক পাখী প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে।

অমিয় বাবু চমকে উঠে চার পাশের অন্ধকার পরিবেশটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর রুক্ষ স্বরেই বোললেন—এবার আপনার যা বলবার আছে বলুন। তাড়াতাড়িই বলে ফেলুন। বেশীক্ষণ এ জায়গায় থাকা নিরাপদ নয়।

মণিকা দেবী যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই ছিলেন। হঠাৎ দূরায়ত দৃষ্টিকে একটি সীমিত কুঞ্চিত রেখায় প্রসারিত কোরে বোলে উঠলেন: কেন বলুন তো, জায়গাটা হঠাৎ এমন বিপজ্জনক হোয়ে উঠলো?

অমিয় বাবু নির্বাক। মণিকা দেবীর কাছ থেকে এ ধরণের কথা তাঁর প্রত্যাশার বাইরে।

অতঃপর উত্তর-ত্রিরিশের কুরূপা মণিকা দেবী তাঁর বিচিত্র গ্রীবা সঞ্চালন ও পুরু ওষ্ঠাগ্রের তির্যক হাসি দিয়ে পঞ্চাশোত্তর প্রৌঢ় অমিয় বাবুকে আহ্বান জানালেন:—আসুন না একটু বসি। কাজ তো কিছু নেই।

সচকিত হোয়ে ওঠেন অমিয় বাবু।—না, দেখুন, আমার যথেষ্ট কাজ রোয়েছে। আমার এবার ফেরা দরকার।

—কাজ তো রুক্মিণীকে নিয়ে এবং দরকারটাও বোধ করি তারই সঙ্গে।

—তার মানে? কণ্ঠে জোর না পেলেও বিরক্তিটা অমিয় বাবু সুস্পষ্ট ফুটিয়ে তুললেন।

—মানেটা কি আমিই বোলে দিবো অমিয় বাবু?

স্খলিত বুকের ওপর হাত দু'টো জড়ো করে নিঃশব্দে অমিয় বাবুর মুখের পানে চেয়ে থাকেন মণিকা দেবী।

—দেখুন, আপনি অনর্থক অনধিকার চর্চা কোরছেন। আপনার মতো একজন ভদ্রমহিলার—

—পক্ষে যেটা একান্ত ভাবেই গর্হিত, এই তো? কথাটা সমাপ্ত করে বিচিত্র স্বরে হেসে ওঠেন মণিকা দেবী। তারপরই গম্ভীর হোয়ে বলেন: আচ্ছা, কোনটা গর্হিত, কোনটা গর্হিত নয়—সে জ্ঞানটা তো আপনারও থাকা উচিত। হাজার হোলেও আপনি একজন প্রবীণ, বিজ্ঞ ভদ্রলোক।

বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো ছাড়তে থাকেন মণিকা দেবী: আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, কোন কথা বোলতে আপনাকে আমি এখানে ডেকে এনেছি। একথাও হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন, কোন প্রয়োজনে আজ দুপুরে আপনার ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন যে কথা বোলতে পারিনি সংকোচে, এখন এই রাতের অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই কথাই বোলছি আপনার মুখের ওপর অসংকোচে—আপনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ কোরছেন। রুক্মিণীর মতো নিতান্তই একটা বাচ্চা বয়সে যে হয়তো আপনার স্ত্রীর কোলের মেয়ের বয়সী, তারই সঙ্গে কিনা আপনি—।

আচমকা থমকে থেমে পড়েন ভদ্রমহিলা।

—কিনা আপনি—কি? হা হা কোরে হেসে ওঠেন অমিয় বাবু।

—বোলতে পারলেন না তো। আবারো সেই সংকোচ? অমিয় বাবুর উচ্চহাস্য নদীর ওপারে প্রতিধ্বনিত হোয়ে ফিরে আসে।

আর কিছুক্ষণ অমিয় বাবুর মুখের ওপর জ্বলন্ত দুটো দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে মণিকা দেবী বলেন: আপনি যে এত হীন আর এত নীচ তা' আমার জানা ছিল না। বুড়ো হোলে লোকের ভীমরতি হয় শুনেছি—আপনারও তাই হোয়েছে।

বলেই আর দাঁড়ান না তিনি সেখানে। দ্রুত পা চালিয়ে বালির চড়া ভেঙ্গে ওপরে উঠতে থাকেন। অমিয় বাবুর উচ্চ হাস্য তৎক্ষণে নীরব হোয়ে গেছে।

সরাইখানায় ফিরে এই গল্পই অমিয় বাবু বেশ রসিয়ে রসিয়ে শুনাচ্ছিলেন রুক্মিণীকে। মণিকা দেবী সটান ভেতরে ঢুকে কোন ভূমিকা না কোরে বোললেন: হঠাৎ উত্তেজনার মুখে অনেকগুলো কথা আজ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, আপনি সেজন্যে আমাকে মার্জনা কোরবেন অমিয় বাবু! কথাগুলো বলার আমার সত্যিই ইচ্ছে ছিল না। অমিয় বাবুকে উত্তরের অবকাশ না দিয়ে, যে ভাবে এসেছিলেন মণিকা দেবী, সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন।

অমিয় বাবু মুচকি হাসলেন। দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি কোরলেন রুক্মিণী: বুড্ডী! ডাইনি!

কিন্তু একটু পরেই রুক্মিণীর মুখভাবের পরিবর্তন হোল। একটা কিছু আবিষ্কারের আনন্দে ওকে উজ্জ্বল দেখালো। ভ্রু নাচিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে বোললে: বাবুজী, আওরাৎটা একেবারে দিওয়ানা হোয়ে গেছে।

—সেটা কি ব্যাপার?

—মুহব্বৎ বাবুজী, মুহব্বৎ।

—কার সঙ্গে?

—তোমার সঙ্গে, আবার কার!

—বটে! তবে তো বড় বিপদ হোল দেখছি! একটা লোক ক'টাকে সামলাবো! পরিহাস-তরল কণ্ঠে অমিয় বাবু হাসতে থাকেন।

—হাসছো বাবুজী, বেশ! কিন্তু কথাটা আমার মোটেই মিথ্যে নয়। তুমি পরীক্ষা কোরে দেখতে পারো।

—পরীক্ষা! মুহব্বতের? ভড়কেই যান অমিয় বাবু।

—হ্যাঁ। একটা কাজ কোরবে বাবুজী?

অমিয় বাবু জিজ্ঞাসুভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

রুক্মিণী চট করে একবার উঠে গিয়ে বাইরেটা উঁকি মেরে দেখে আসে। তারপর ঘনিষ্ঠ হোয়ে কাছে বোসে বলে:—কাল বিকেলে ওই অউরাৎটাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে তুমি বেড়াতে যাও।

—না, না ও সব আমি পারবো না। প্রবল আপত্তি তোলেন ভদ্রলোক। আর তা' ছাড়া আমার সঙ্গে যাবেই বা কেন ও?

—যাবে বাবুজী, যাবে। তুমি একবার ডাকলেই যাবে। মিনতিতে গলে পড়ে মেয়েটা।—একবার ডেকেই দেখো না বাবুজী! আমার মাথার দিব্যি—তুমি একবার ওকে ডাক।

নারীচরিত্রের এই বৈচিত্র্যের সামনে দাঁড়িয়ে, অমিয় বাবু আপত্তি করবার ভাষা হারিয়ে ফেলেন।

বৈচিত্র্যের খানিকটা বাকী ছিল, কেন না পরদিন বিকেলে বেড়াতে যাবার মাত্র দায়সারা গোছের আমন্ত্রণ নিয়েই মণিকা দেবী চোখ-মুখ উজ্জ্বল কোরে বেরিয়ে এলেন।

অমিয় বাবুকে আজ কথায় পেয়েছিল। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং তাঁর ও মণিকা দেবীর এই জঙ্গল-পাহাড়ের দেশের এক নিভৃত সরাইখানার স্বল্পস্থায়িত্ব মিলনের সংগতি দেখিয়ে তিনি পথ চোলতে চোলতে একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন।

মণিকা দেবী আজ দিব্যি সেজে বেরিয়েছেন। অনভ্যস্ত হাতে মুখে পাউডারের প্রলেপ বেশ স্পষ্ট হোয়েই ফুটে বেরোচ্ছে। সাড়ী আর ব্লাউস—দু'টোই বহু আয়াস স্বীকার কোরে নির্বাচন করা, কিন্তু পরবার ধরণটা হাস্যকর ভাবে আনাড়ি। চ্যাটালো বুকটা ভয়ংকর রকমের বেপর্দা। অপাঙ্গে সেই দিকে চেয়েই চোখটা ফিরিয়ে নেন অমিয় বাবু। বক্তৃতার গতিতে যতি পড়ে। অদ্ভুত রকমের একটা গ্লানিতে মনটা রী-রী কোরে ওঠে।

মাঝ পথেই থমকে দাঁড়ান ভদ্রলোক। অসংযত কণ্ঠে বলেন: চলুন, এবার ফেরা যাক।

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন।

একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন "দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঃ যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক্ বললেন "আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"
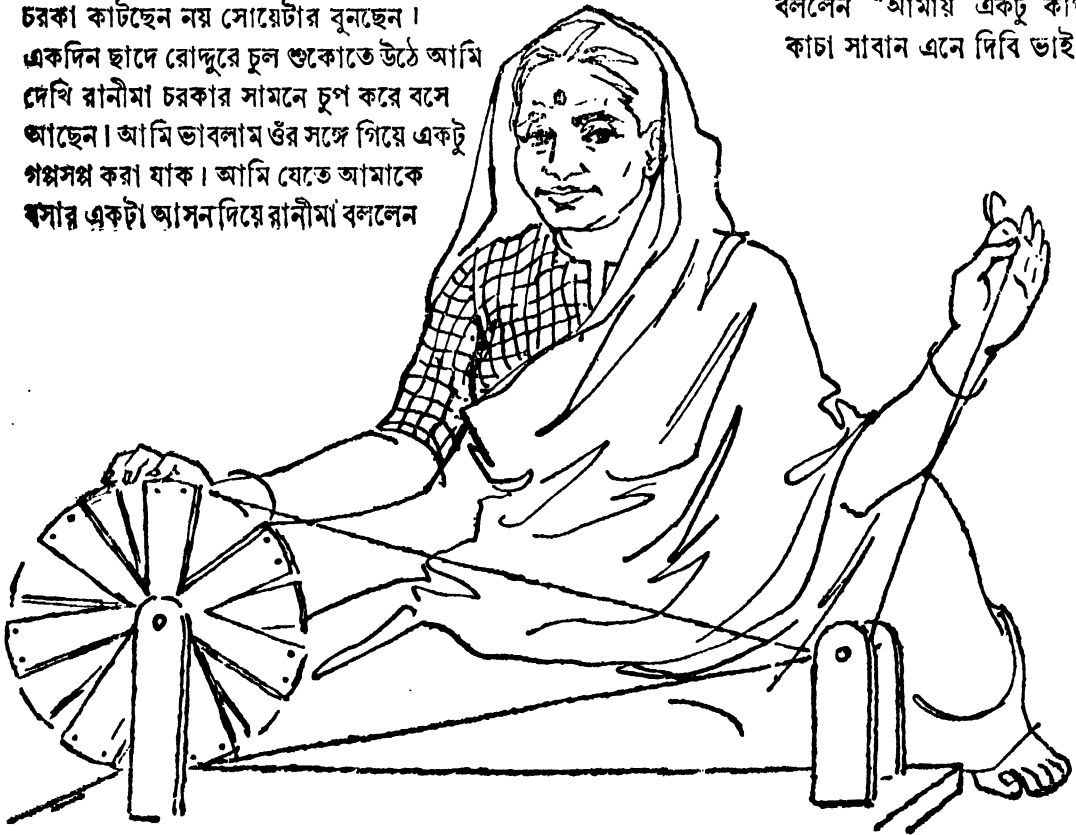
আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা।"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?" আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"
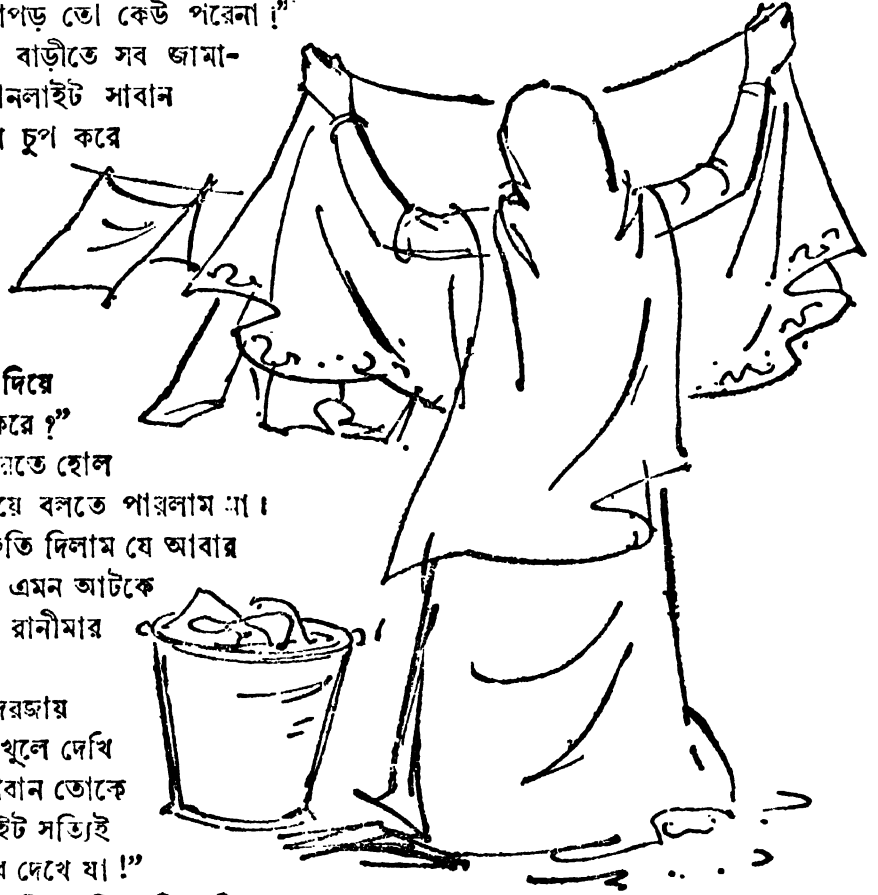
"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

SUNLIGHT SOAP

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

মণিকা দেবী এক মুহূর্ত ওঁর চোখের দিকে ফিরে দেখেন। তারপর বলেন : বেশ চলুন।

দিনগুলো বেশ ভালই কেটে যাচ্ছে অমিয় বাবুর। সরকারী কাজ—সে সামান্যই। হাতে রোয়েছে অফুরন্ত অবসর। আর রোয়েছে সরাইখানার নির্জন একটি কক্ষ আর তার অভ্যন্তরে পাহাড়ী একটি মেয়ের উদ্দাম সাহচর্য।

প্রথম প্রথম নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হোয়ে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। মনে হোয়েছিল, জেনে-শুনে একটা অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। ইদানীং সে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির হিসাব—সে তোলা থাক লোকালয়ের জন্যে। এখানে, এই বন্য পরিবেশে তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চোলবে।

মাথা তাঁকে মাঝে মাঝে কিন্তু ঘামাতে হোচ্ছে। না ঘামিয়েও উপায় নেই। হেতু—মণিকা দেবী। অথচ মজা এই, দু'জনেই দু'জনের ব্যবধান বাঁচিয়ে চোলতে সমান ভাবে উৎসুক।

মণিকা দেবী যদি এ পথে হাঁটেন—অমিয় বাবু দশ কদম তফাতে পাশ কাটান। নড়বড়ে খাবার টেবিলটা দু'জনের কেউই ব্যবহার করেন না, কোরলেও সময়টা দু'জনেই বদলে ফেলেছেন। তবু কি যে হয়। কখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো পাশ ফিরে তাকালেন অমিয় বাবু। দেখলেন এক জোড়া চোখের দৃষ্টি স্থির ভাবে তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ। হয়তো কোন রাত্রে রুক্মিণী এসেছে তাঁর ঘরে। বসেছে তাঁর শয্যার ওপর। মাথাটা এগিয়ে দিয়েছে তাঁর কাঁধে। রোমশ ভারী হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে উনি নিঃশব্দে জরীপ করে যাচ্ছেন তার সর্বাঙ্গ—হঠাৎ নজর গিয়ে পড়লো উঠোনের দিককার জানালাটার দিকে—যেখানে জ্বলছে এক জোড়া তীব্র চোখের দৃষ্টি—অমনি হাতটা সংকোচে গুটিয়ে নিতে হয়; ঠেলে সরিয়ে দিতে হয় রুক্মিণীকে। রুক্মিণীর চোখ বোজা। রোমাঞ্চিত দেহ আপত্তি ভরে হাতটাকে টেনে স্বস্থানে নামাতে চায়—কিন্তু অমিয় বাবুর আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হবার স্পৃহা নেই। ক্ষমতাও নেই।

বাইরে বেরিয়েও স্বস্তি নেই। মণিকা দেবীর চোখের দৃষ্টি তাঁকে অহরহ অনুসরণ কোরে চোলেছে।

কাজে গিয়ে সুখ নেই। ডেরায় ফিরে শান্তি নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে রুক্মিণীর হাত ধরে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে মনের এই অসহ্য অবস্থাকে একটু যে মুক্তি দিবেন ভদ্রলোক—তার পর্যন্ত অবসর দিচ্ছেন না ভদ্রমহিলা।

সৃষ্টিছাড়া এক দৃষ্টির দহনে পুড়ে পুড়ে শেষ হোতে লাগলেন ভদ্রলোক।

অবশেষে তিনি ছুটীর দরখাস্ত কোরলেন। কয়েক দিনের জন্যে স্থান পরিবর্তন একেবারেই অপরিহার্য হোয়ে উঠেছে।

সরকারী ছুটী মঞ্জুর হোল। ফ্যাসাদ বাধলো রুক্মিণীর কাছে ছুটী মঞ্জুর করাতে গিয়ে। কেঁদে, ককিয়ে, মাথার দিব্যি দিয়ে রীতিমত একটা বিয়োগান্ত নাটকের ব্যাপার কোরে তুললো মেয়েটা। শেষে বোললে : আমি জানি তুমি কেন যাচ্ছ। যাচ্ছ ওই বুড়ী ডাইনীর ভয়ে। আমি ওটাকে খুন করবো। ও তোমার লোহু খেতে চেয়েছিল—এবার আমি ওর লোহু খাবো।

অনেক কষ্টে রুক্মিণীকে শান্ত কোরতে হয় অমিয় বাবুর।

পরদিন সকালে অমিয় বাবু যাত্রা কোরবেন। জিনিসপত্র বাঁধা হোয়ে গেছে। বাইরে সরকারী জীপ অপেক্ষা কোরছে তাঁকে ষ্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে।

শেষ বারের মতো রুকমিণীর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে, অনেক 'কিরা' আর শপথ উচ্চারণ কোরে, অমিয় বাবু বেরিয়ে এসে জীপে উঠতে গিয়ে দেখেন—মণিকা দেবী ভেতরে বোসে সহাস্যে তাঁকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে : আসুন, বড্ড দেরী কোরে ফেললেন। মাইল পনেরো পথ তো ভাঙতে হবে।

অমিয় বাবুর বিস্ময় সীমা ছাড়িয়েছে। থতিয়ে বলেন : আপনি!

—হ্যাঁ, আমিও আজ ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছি। হাসিমুখেই বলেন মণিকা দেবী : ছুটি কি সহজে পাওয়া যায়? গবর্ণমেন্টের ব্যাপার। জানেন তো সব। তারপর ছুটি যদি বা পেলাম, ভেবে মরি—এতখানি পথ একা-একা যেতে হবে! নির্লোম ভ্রূ দুটো নাচিয়ে বলেন : কিন্তু কি বিচিত্র যোগাযোগ দেখুন! আপনিও ছুটি নিয়েছেন, আর ঠিক আমার সঙ্গেই একদিনে যাত্রা কোরছেন। কিন্তু আপনি আর দেরী কোরবেন না। গাড়ীতে উঠে পড়ুন। ড্রাইভারের দিকে একটু চেপে বোসে অমিয় বাবুর বসবার জায়গা কোরে দেন মণিকা দেবী। কলহাস্যে বলে ওঠেন : ট্রেণ মিস কোরতে চাই না বাপু!

নিঃশব্দে অমিয় বাবু গাড়ীতে ওঠেন। ড্রাইভার ষ্টার্ট দেয়। অমিয় বাবু সামনের উঁচু-নীচু পথের দিকে চোখ মেলে বসে আছেন। সরাইখানার দরজায় বাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রুক্মিণী। তার দুচোখে নির্বোধ দৃষ্টি। অমিয় বাবু আর ওদিকে ফিরে তাকান না।

একটি জার্মাণ কবিতা

(যোসেফ ফন আইশেনদর্ফ)

যেন মনে হয় আকাশ
পৃথিবীকে নীরবে করেছে চুম্বন,
আর পৃথিবী রক্তিমদ্যুতিতে
আকাশের স্বপ্নে হয়েছে বিভোর!
বায়ু বয়ে চলেছে প্রান্তরের উপর দিয়ে
কানে এসে লেগেছে তার মৃদু দোলা,

বনে বনে উঠেছে মৃদু-মর্মর
নক্ষত্রখচিত আকাশ হয়েছে উজ্জ্বল।
আর আমার হৃদয় মেলেছে
দূরান্তে তার পাখা
চলেছে উড়ে স্তব্ধ প্রান্তরের উপর দিয়ে
যেন সে চলেছে ফিরে ঘরে।

অনুবাদ—ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায় ও মানস রায়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হিমানীশ গোস্বামী

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের একটি গল্প আছে—সেটি এখন পৃথিবী বিখ্যাত। গল্পটির নাম ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড। একই লোকের কাহিনী। ওষুধ খেয়ে ডক্টর জেকিল হ'তেন মিষ্টার হাইড। ডক্টর জেকিল ভদ্র, কিন্তু মিষ্টার হাইড পিশাচ। একই মানুষের মনের মধ্যে এই দু'রকমের ভাবই আছে। ডক্টর জেকিল দয়ার অবতার, কিন্তু মিষ্টার হাইড খুনে। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়, একই লোক কেমন করে তার চেহারা পর্যন্ত ওষুধ খেয়ে পালটে ফেলতে পারে? কিন্তু যাঁরা লণ্ডনে অন্ততঃ এক বছর থাকেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তা সম্ভব। গ্রীষ্মকালের লণ্ডন প্রকৃতির রূপসাজ, ফুল গাছের সবুজ পাতায় মৌমাছির গুঞ্জনে, খোলা হাওয়ার থিয়েটারে, টেমস নদীর ধারে, হাইড পার্কে বা রীজেণ্টস পার্কের কনসার্টে, বিদেশী লোকেদের গল্পগুজবে হাসিতে লণ্ডনের একরকম সাজ কিন্তু শীতকালে লণ্ডন বদলে যায়। ডক্টর জেকিল যেমন বীভৎস হয়ে মিষ্টার হাইডের রূপ গ্রহণ করে লণ্ডন তেমনি হ'য়ে পড়ে।

ঠাণ্ডা, স্নো, তুষার-গলা জল, তার সঙ্গে ধুলো মিশে কাদার সৃষ্টি হয় কিন্তু সেগুলো সহ্য করা কঠিন নয়। সহ্য করা কঠিন লণ্ডনের কুয়াসা। সে কুয়াসা দার্জিলিঙের সাদা কুয়াসা নয়। লণ্ডনের কুয়াসার রঙ হলুদ। কুয়াসায় বাস থেমে যায়, ট্রেন চলা বন্ধ হয়, এয়ারোপ্লেন নামতে পারে না। এই ধোঁয়া আর কুয়াসার ফলে ফুসফুসের নানারকম ব্যাধি হয়, বহু লোক মারা পড়ে। কুয়াসা লণ্ডনের অভিশাপ। কুয়াসা হ'চ্ছে মিষ্টার হাইড। এই সময় দুর্বৃত্তেরা তৎপর হ'য়ে ওঠে, অন্ধকারের সুযোগে রাহাজানি হয় পুলিশ সেখানে নিরুপায়। খুব শক্তিশালী আলোও কয়েক গজ দূর থেকে দেখা যায় না। হঠাৎ কুয়াসায় আটকে পড়া বাসগুলি চলে ধীরে ধীরে—সামনে কণ্ডাক্টর মশাল জ্বেলে চলে। তাতে পথ দেখা যায় না, কিন্তু মশালটা একটু চোখে পড়ে।

এমন কুয়াসা বেশিক্ষণ থাকে না। সাধারণতঃ আট দশ ঘণ্টা বা একদিনের মধ্যেই চলে যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের কুয়াসা লণ্ডনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে প্রায় চার হাজার লোক মারা পড়ে দম বন্ধ হয়ে। এর স্থায়িত্ব ছিল তিনদিনের বেশি। গোরু, ভ্যাড়া, শুয়োরদের প্রদর্শনী হচ্ছিল তখন লণ্ডনের অলিম্পিয়া হলে (এভনমোর রোডের খুব কাছে)। কয়েকটি গোরু তাতে মারা পড়ে। হাজার হাজার গাড়ি লোকেরা রাস্তায় ফেলে চলে যায়, অফিসে লোকেরা দেরি করে আসে, কোন লোক বাড়ী থেকে বের হ'তেই ভয় পায়। এই ধরনের কুয়াসার নতুন নামকরণ হয়েছে smog—Smoke এবং fog এর সমন্বয়। Smokeই বেশি বলে মনে হয়। কুয়াসা সম্পর্কে প্রচুর কথা হ'য়েছে লণ্ডনে। চার্লস ডিকেন্স কুয়াসার অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন। টি. এস. এলিয়ট কুয়াসা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। আবহাওয়া বিশারদেরা কুয়াসার পূর্বাভাষ খবরের কাগজে, রেডিওতে প্রচার করেন। বার বার প্রচার করা হয় রেডিওতে: কুয়াসা আসছে···সাবধান।

কুয়াসা কেমন করে আসে? একবার তাও দেখেছিলাম। আমি এবং নটরাজ শর্মা শেফার্ডস বুশ থেকে বাড়ী ফিরছি হেঁটে। রাত্রি তখন বারোটা। দূরত্ব তিন মাইলের বেশি। বাস সমস্ত চলে গিয়েছে, টিউব বন্ধ হয় হয়। পরদিন ছুটি, অতএব নিশ্চিন্তে আমরা কোন এক বিষয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করতে করতে পথ হাঁটছিলাম। কিছুদূর এভাবে হাঁটবার পর নটরাজ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললো, ষ্টপ! ষ্টপ!
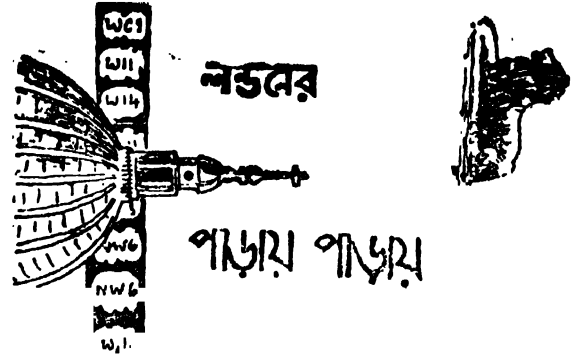
অর্থাৎ আমার মতামত তার সহ্য হচ্ছিল না। আমার মত গ্রহণীয় নয় একেবারেই, অতএব ষ্টপ! অর্থাৎ, অমন কথা বলা বন্ধ করো!

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটি ট্যাক্সি যাচ্ছিল—শর্মার উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে ষ্টপ! ষ্টপ! বলাতে ট্যাক্সি থেমে পড়ল। শর্মা হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল। এমন সময় এমন একটা কাণ্ড সে আশা করেনি। ট্যাক্সিতে গেলে দশ মিনিটে বাড়ী পৌঁছে যাব, এবং এত কম সময়ে তর্কের কোন মীমাংসা হবে না মনে করে দুজনেই দমে গেলাম। কিন্তু তবু আমরা ট্যাক্সিতে বসলাম! ট্যাক্সিওয়ালাকে হতাশ করতে ইচ্ছে হ'ল না।

কুয়াসা (খুব ঘন নয়)

ট্যাক্সিতে আমরা আধ মিনিট উঠেছি মাত্র, ট্যাক্সি অল্প একটু চলেছে হঠাৎ ট্যাক্সি একেবারে অ্যাবাউট টার্ণ! এজওয়ার রোড চওড়া ছিল—ড্রাইভার অতর্কিতে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়েছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার বললো: নেমে পড়—আমি যাব না।

নটরাজ আমাকে বলল, ব্যাটা মদ টেনেছে নিশ্চয়?

আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, নামব না।

ড্রাইভার বললো, ব্লাইমি। (কী বিপদ!) কুয়াসা আসছে—তার ভেতর দিয়ে গাড়ি যাবে না।

আমরা আবার ফুটপাথে দাঁড়ালাম। বলতে হয় পথে বসলাম, কারণ একটি ঘন কুয়াসার দেওয়াল আমাদের ঘিরে ফেলল। ট্যাক্সি ড্রাইভার পালিয়ে গেল বিদ্যুৎ গতিতে।

কুয়াসার দেয়ালটা এল আস্তে আস্তে। এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। আলোকিত জায়গাটি হঠাৎ এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। তর্ক ভুললাম।

এবার?

নটরাজ শর্মা উদ্বেগের সঙ্গে বললো, এবারে আর বাড়ীতে পৌঁছুনো যাবে না। কিছু দেখা যাচ্ছে না। এ কুয়াসা কখন যাবে কেউ কখনো বলতে পারে না।

আস্তে আস্তে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। লণ্ডনের ফুটপাথ কোলকাতার মত নয়, প্রতি দু ফুট দূরে সেখানে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয় না···ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যজনক বলেই এখানে উল্লেখ করলাম। অনেকেই এজন্য ইংরেজদের বুঝতে পারেন না। ফুটপাথে যদি গর্ত না থাকবে তাহলে আদৌ ফুটপাথ রাখা কেন? কিন্তু যে কোন পরিবেশে মানুষ নিজেকে মানিয়ে নেয়, অতএব গর্তহীন ফুটপাথকেও আমরা মানিয়ে নিয়েছিলাম। নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা হাঁটছি। সে পথের শেষ নেই বলেই মনে হল। আলো, ষ্টিভেনসনের ভাষায় glimmered like carbuncles—বোধ হয় মিনিট পোনেরো চলেছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল কথাবার্তার আওয়াজ।

এই রাত দুপুরে হঠাৎ তা অসম্ভব বলেই মনে হল। একটু এগিয়েই বুঝতে পারলাম যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক। একটা সারারাত খুলে রাখা 'স্ন্যাকবার' সেটি—তাতে প্রচুর লোকের সমাবেশ। প্রত্যেকেই বিস্বাদ চা খাচ্ছে আর কাশছে। কাশছে অবশ্য কুয়াসার জন্য। সেখানে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম আর বিস্বাদ চা খেতে লাগলাম। বিস্বাদ না হলে সম্ভবত ইংরেজরা সেটাকে চা বলেই মনে করে না।

সেখানে দু-চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ হল। বিপদে ইংরেজরা ভুলে যায় যে জাত হিসেবে তাদের গম্ভীর থাকবার কথা, আলাপ না করিয়ে দিলে কথা বলা উচিত নয়। তারা তখন প্রগলভ হয়ে ওঠে—কথা কইতে সুরু করে। খুব খারাপ আবহাওয়া, তাই নয়?—এক জন পঁয়তাল্লিশ বছরের যুবক জিজ্ঞেস করলো আমাকে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বা অনেক সময় পঞ্চান্ন বছর বয়সের লোকও বিলেতে ইয়ং ম্যান। আমি উত্তর দিলাম, না বেশ ভালই ত লাগে এই রকম আবহাওয়া। শুনে ইংরেজরা আর কথা বলল না। লণ্ডনের আবহাওয়াকে খারাপ না বললে যে চটে না সে ইংরেজই নয়।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভদ্রলোকের কাছে প্রচুর ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। বললাম, লণ্ডনটা নরকের সমান। এমন আবহাওয়া শয়তানেরই কেবল পছন্দ হ'তে পারে। এই শুনে ইংরেজটি বেজায় খুসি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাকিস্তানী? আমি বললাম, না আমি ইণ্ডিয়ান।

প্রায়ই এমন প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। পাকিস্তান ব্যাপারটা বহু ইংরেজ ঠিক বুঝতে পারে না। তাদের ধারণা ও-দুটি একই দেশ। ভারতীয় মানেই পাকিস্তানী, পাকীস্তানী মানেই ভারতীয়। আমরা বলি, তাই ছিল বটে কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন ভারতবর্ষ ছোট হ'য়ে গেছে—সমস্যা আরো বেড়েছে। সীমান্ত-সমস্যা, জলসমস্যা ইত্যাদি।

ঘন কুয়াসায় পথ চলা যায় না, অথচ বাড়ীতে পৌঁছুতেই হয়। আমি এবং নটরাজ বাড়ীর পথ খুঁজতে আবার চেষ্টা করলাম স্ন্যাকবার থেকে বেরিয়ে। কিন্তু হাঁটাই সার হল। কয়েক ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরলাম—একই পথ ধরে কত যে ঘুরপাক খেলাম তার তার সংখ্যা নেই। অবশেষে রাস্তার ধারের একটি বেঞ্চে শ্রান্ত হয়ে বসে বসে ঘুমুতে লাগলাম। পরদিন সকালে কুয়াসা কেটে যাওয়াতে দেখতে পেলাম আমরা বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে একটা কবরখানার কাছে বসে আছি। এই কবরখানাটির সামনে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউণ্ড।

কুয়াসার অনেক গল্প আছে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছাড়াও অন্য গল্প। গভীর কুয়াসায় গাড়ি সব আস্তে আস্তে চলেছে। একটি গাড়ি অন্য গাড়ির পেছনের আলো দেখে এগুচ্ছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ সামনের গাড়িটি থেমে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ—পেছনের গাড়িচালক তখন অস্থির হয়ে উঠছে—বলছে, কী হ'ল, এখানে হঠাৎ গাড়ি থামল কেন? উত্তর এলো। গাড়ি হঠাৎ থামেনি—আমি ইচ্ছে ক'রই থামিয়েছি, কারণ এটা আমার গ্যারাজ।

আর একটি গল্প আছে—কুয়াসায় দিগ্‌ভ্রান্ত একজনকে দেখে অন্য একজন অপরিচিত লোক বললো, আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি যাব প্যাডিংটন ষ্টেশনে।

—আমার হাত ধরে এসো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

নানা পথ ঘুরে প্যাডিংটন ষ্টেশনে পৌঁছে দিল লোকটা অতি সহজেই। অবাক হয়ে গেল লোকটি। বললে, আপনি নিশ্চয়ই এই ঘন কুয়াসাতেও স্পষ্ট দেখতে পান?

লোকটি উত্তর দিয়েছিল: না, তা নয়। এমন ভাবে যাওয়া আমার অভ্যেস আছে—কারণ আমি অন্ধ।

লণ্ডনের বেশি পাড়ায় আমি থাকিনি। ষ্ট্যানমোর, এজওয়ার, মিলহিল, টটেনহ্যাম, হ্যারিঙে, ইলফোর্ড, গ্রীনিজ, টুটিং, ক্ল্যাপাম, রিমেণ্ড, উইম্বলডন, ঈলিং হেন্ডন, কেন্টন, পপলার ইত্যাদি কত পাড়া যে আছে তার হিসেব নেই। লণ্ডনে সাড়াশ হাজারের বেশি রাস্তাই আছে—রাস্তাগুলির নাম প্রচুর পরিমাণেই বিদেশী। আবিসিনিয়া রোড, অ্যারিষ্টটল রোড, বাটাভিয়া রোড, ব্যাভেরিয়া রোড, বেঙ্গল রোড, বেরমুডা ষ্ট্রীট, বর্নিও ষ্ট্রীট তো আছেই, এমন কি মস্কো রোড পর্যন্ত আছে। মস্কো রোডটি বেজওয়াটার টিউব ষ্টেশনের কাছেই। সেখানে আমি জাহাঙ্গীর আংকেলসেরিয়ার সঙ্গে একটি ক্লাবে যেতাম। জাহাঙ্গীর জাতে পার্শি, ধর্মে কমিউনিষ্ট-বিরোধী।

অভিনয় করার দক্ষতা ছিল, বি, বি, সি-তে টেলিভিশনে কিছু অভিনয় করেছে। কিন্তু তার কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিজম সম্পর্কে এত ঘৃণা ছিল যে মস্কো রোডে কখনো যায়নি। ঐ রাস্তাটির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলবার জন্ত সে অপর দিকের ফুটপাথ দিয়ে যেত। আমরা তাকে এই ব্যাপারে খুব ঠাট্টা করতাম। বলতাম, জাহাঙ্গীর, একটি ফ্ল্যাট পাওয়া যাচ্ছে, দুখানি ঘর—ঠাণ্ডা জল গরম জল সব পাওয়া যায়, নিজস্ব ফোন আছে, কার্পেট দেওয়া মেঝে ভাড়া মাত্র তিন পাউণ্ড। ফ্ল্যাটটা নেবে?

জাহাঙ্গীর বলতো, নিশ্চয় নেব। কোথায়?

—মস্কো রোডে।

জাহাঙ্গীর তা শুনে মারতে আসত। বলতো, এমন ঠিকানায় আমি কিছুতেই থাকব না।

লণ্ডনের প্রতিটি পাড়ার বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আছে প্যারিসে বার্লিনে বা কোলকাতায়। কিন্তু চার্চ এবং মদের দোকান সর্বত্রই এক রকম মনে হয়েছে। চার্চগুলি সংখ্যায় এত বেশি কেন তার অর্থ প্রথমে বুঝতাম না, পরে বুঝেছি। চার্চগুলির মধ্যেও জাতিভেদ প্রচুর। ক্যাথলিক চার্চ, মেথডিষ্ট চার্চ, চার্চ অফ ইংল্যাণ্ড, প্রটেষ্ট্যাণ্ট ইত্যাদি নানা জাতের চার্চ আছে। কিন্তু মদের দোকানে যেমন বিক্রি কমছে বিশেষ করে বীয়ার, তেমনি চার্চেও লোকে কম যাচ্ছে। বেকার না হ'লে চার্চে যাবার কি প্রয়োজন আছে? চার্চে অবশ্য গিয়ে এককালে প্রচুর লোকে বিয়ে করত, এখন তা কমে যাচ্ছে। চার্চের বদলে হয় টাউন হলে। চার্চগুলির আয় হয় সব চেয়ে বেশি তখন, যখন দেশের লোকেরা বেশি মাত্রায় বেকার হয়। বেকার হ'লে লোকে দুর্বল হয়ে পড়ে, বলে, ভগবান আমাকে একটা চাকরী দাও। চার্চে গিয়ে রীতিমত প্রার্থনা শুরু করে। অবস্থা খুব খারাপ হ'লে হত্যে দিয়ে পড়েও থাকবে হয়ত কাতারে কাতারে লোক। ওজন্ত চার্চের যাঁরা মোহান্ত তাঁরা চান যাতে দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়। আয় তাহ'লে বেশি হয়। শিক্ষিত হওয়াটাও তাই চার্চ পছন্দ করে না। কারণ শিক্ষিতেরা বড় অসুবিধেজনক প্রশ্ন করে বসে।

একটি অসম্ভব জিনিস আমার চোখে পড়েছে। একজন লোক বিনা চিকিৎসায় বা কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এদেশে মারা পড়লে তা নিয়ে এমন হৈ-চৈ করে ওঠে লোকেরা যে তা একজন ভারতীয় হিসেবে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। এর ফলে গবর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে, গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমন যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা করে। এতে গণতন্ত্রের দুর্বল দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামান্য মানুষের অবহেলায় মৃত্যুর জন্য যদি গদি ছাড়তে হয় তাহ'লে সে দেশের লোকেরা নিতান্তই কিম্ভুত তাতে আর সন্দেহ কি। লোকেরা না খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে, বৃষ্টিতে, কাদায়, জলে বিনা চিকিৎসায় বহু লোক মরলেও আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট কেমন টিঁকে থাকে। এ যে শক্ত গভর্ণমেণ্ট তাতে আর সন্দেহ কি। ইংরেজদের উচিত আমাদের দেশে এসে এসব শিখে যাওয়া। আমাদের দেশের রীতিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা। কিন্তু ইংরেজের কি শেখবার মত সামান্য মাত্র বুদ্ধিও আছে?

লিণ্ডফীল্ড গার্ডন্সে আমরা প্রায় এক বছর ছিলাম। মিসেস রাইসের পোশাক বা চরিত্র ওর মধ্যে পরিবর্তন হয়নি। আমাদের ভাড়াটে হিসেবে পেয়ে তাঁর ভালই লাগত। কিন্তু তাঁর ছেলে হলফোর্ড হঠাৎ স্থির করল আমাদের ঐ বাড়ীতে সে অন্ত একটি ভাড়াটেকে আনবে। তারা নাকি আরো বেশি ভাড়া দিতে রাজি হ'য়েছে। আমরা নোটিস পেলাম অতএব। আমরা কালো ব'লে নয়। যারা টাকার দাম বোঝে তাদের কাছে কালো সাদার ভেদ না থাকারই কথা।

কালো সাদার সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে নতুন করে চিন্তা করা হ'চ্ছে। ফ্যাসিষ্ট মোসলের দল ব'লছে, বৃটেনকে সাদা রাখো। আন্দোলন করছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ তাদের মারতে হবে। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করতেও এরা উস্কানি দেয়।

খুবই খারাপ। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতীয়রা খুব আনন্দ পায়। দায়েবরা যে ভারতীয়দের কালো মনে করে না এতে তারা খুব প্রীত। নিগ্রোদের জন্ত খুব কম ভারতীয়ই সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলে। কালোবিরোধী আন্দোলন হ'লে ভারতীয়রা বড়জোর বলে, কী বিপদ মামাদের জন্য আমাদেরও কবে বিপদ হয় কে জানে!

মামা, অর্থাৎ কালো আফ্রিকান বা জামাইকান। বাঙালীর আবিষ্কার এই কথাটি ব্যঙ্গ করে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বলা হয়। সাধারণদের জন্য নাচ ঘরে ভারতীয়রা সহজে যেতে চায় না, তারা নাচের বিরুদ্ধে বলে নয়, বা তাদের মেয়েদের সঙ্গে মিশবার ইচ্ছে নেই বলে নয়, কারণ সে সব নাচ ঘরে আফ্রিকানদের যাতায়াত।

কেবল যাতায়াত নয়—আফ্রিকান ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজ মেয়েরা বেশি নাচতেও চায় কারণ সাধারণত তারা নাচতে জানে, ভারতীয়রা নাচতে জানে না তেমন।

কালোর বিরুদ্ধে আক্রোশ ভারতীয়দেরই বেশি, সেটা আমি বিশেষ করেই লক্ষ্য করেছি। দিল্লিতে চার জন আফ্রিকান ছাত্রও দেখেছিলেন আমাদের ঘোরতর কালোবিদ্বেষ।

আফ্রিকানদের মামা বলা তাই আত্মীয় সম্বোধনে নয়। কথাটি মাউ মাউ নামক আফ্রিকার অনুন্নত সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেই তৈরী।

লণ্ডনে গিয়ে যখন ল্যাণ্ডলেডি কালো রঙ বলে কোন ভারতীয়কে ফিরিয়ে দেয় তখন রাগ না করে এই কথাটি যেন মনে রাখেন।

বর্ণবিদ্বেষ আমাদেরও কম নয়। এর পর যে বাড়ীতে গেলাম এবং তারপর আরো পাঁচ বছর ধরে কোন কোন বাড়ীতে কেমন ভাবে ছিলাম তার ইতিহাস বলবার ইচ্ছে রইল। আপাততঃ আমার কাহিনী এখানেই শেষ করছি। কারণ অনেক কিছু বলা হলেও অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। অতএব আসলে কাহিনীর কোনদিনই শেষ হয় না। আমি দু'-একজন ভদ্রলোককে জানি তাঁরা ইংল্যাণ্ড আমেরিকা সম্বন্ধে দু' একটা কথা, কথাপ্রসঙ্গে না বলে পারেন না। একজন বলেন, যখন লণ্ডনে ছিলাম

MOSCOW ROAD W 2

আংকেল সেরিয়া

তখন খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। বলে একটি ঘটনা শোনান। তাঁর সঙ্গে বহুদিন এর আগে দেখা হ'য়েছে অথচ সেই আশ্চর্য ঘটনাটি আগে বলেননি। আগে তাঁর মনে পড়েনি। খুবই স্বাভাবিক। আমি কাহিনী বলতে গিয়ে দেখছি ব্লেনিম ক্রেসেণ্ট সম্বন্ধে হয়ত আরো অনেকখানি বলা যেত। এভনমোর রোডেও তো আরো কত কি ঘটেছে সেগুলো বলা হ'ল না। এভনমোর রোডের কাছাকাছি অলিম্পিয়া একজিবিশন হল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিনি। তা ছাড়া সুনীল চ্যাটার্জির ১১৩১ সালের বিশাল এক ফোর্ড গাড়িতে চড়ে লণ্ডনের পথে পথে নানা কাণ্ড করে বেড়ানো (দুর্ঘটনা করতে করতে বেঁচে যাওয়ার প্রায় পঁচিশটি ঘটনা দু' ঘণ্টায় ঘটেছিল), আর বাঁয়া বোসের নানারকম আজগুবী গল্প। বাঁয়া বোসের আসল নাম কেউ এখন জানে না—বয়স তাঁর পঞ্চান্ন—বছর চল্লিশেক বিলেতেই আছেন।

লণ্ডনের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল প্রায় অবাধ স্বাধীনতা। আর ভাল লেগেছিল এর ছটি গরম কাল আর ছটি বসন্ত কাল। ভাল লেগেছিল সন্ধ্যের ক্লাসগুলি। যেখানে টিচারদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল প্রচুর। ছাত্ররা ক্লাসে পাইপ এবং সিগারেট বা চুরুট খেতে পারত। এত বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া আমি আর কোথাও কল্পনা করতে পারি না।

ভারতবর্ষ থেকে যে ইংল্যাণ্ডে প্রতি বছর প্রচুর ছাত্র যাচ্ছে তার এই একটা কারণ। আরো অবশ্য অন্য কারণ আছে। আমাদের দেশের টিচারদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় আছে। কিন্তু একেবারে অহেতুক বোধ হয় নয়। বুঝতে না পারলে কানমলা, চাটি, বেঞ্চের উপর দাঁড়ানোর ব্যবস্থা আমাদের দেশে। অতএব ছাত্ররা বুঝতে না পারলেও বলে বুঝেছি। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নকল করতে না পারলে টেবিল চেয়ার ভাঙে। ইংরেজরা যে সবাই খুব শিক্ষিত হয় তা নয়, কিন্তু শিক্ষিত হতে তাদের বাধা নেই। স্বাধীন বৃত্তিগুলিকে দুমড়ে ভেঙে দেয় না তারা। আমাদের দেশে শিক্ষা বলে একটা জিনিস চলে—যা বিলিতিও নয়, এদেশীয়ও নয়। একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। সুকুমার রায় হয়ত একটা নামকরণ করতে পারতেন। তবে বিলেতে ক্লাসে সিগারেট চুরুট খাওয়ার জন্যই যে দেশের শিক্ষা ভাল তা বলছি না।
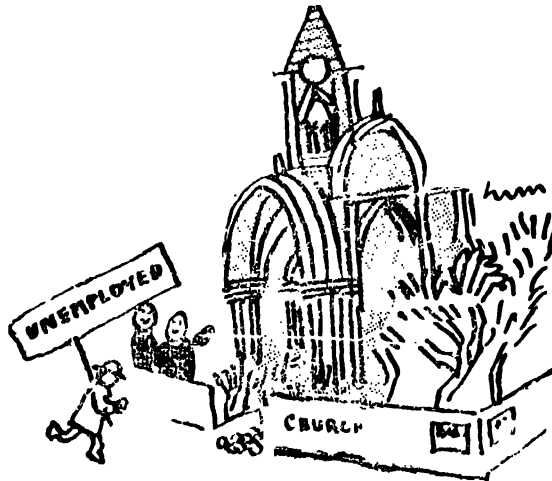
কিন্তু বিলিতি শিক্ষার দোষও আছে। আমাদের দেশে বিলি[তি] শিক্ষা চলবে না, কারণ আমাদের দেশের সমাজ অন্যরকম। তা[ই] অনেকেই বিলেত থেকে ফিরে এসে বেশ কষ্ট পান নানা ব্যাপারে দু' তিন বছর ওখানে থেকেই এখানে এসে কাঁটা-চামচ-ছুরি ছাড়া তাঁদের খাওয়া হয় না। বিলিতি খাবার যা অখাদ্য তাই শ্রেষ্ঠ ব[লে] এঁরা গ্রহণ করেন। তাঁরা রুটি মাখন দিয়ে মাংস সেদ্ধ খান বিলিতি নাচ নাচেন।

তবুও অধিকাংশ লোকেরই বিলেত দেশটা দেখা উচিত। বি[লেত] অ্যামেরিকা বা যে কোন বাইরের শিল্পে উন্নত দেশে থাকলে সে[ই] দেশ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়—সেই সঙ্গে ভারতবর্ষকেও চে[না] যায় ভাল করেই। ভারতবর্ষকে চেনবার জন্যই ভারতীয়দের বাই[রে] যাওয়া উচিত এবং বেশ কিছুদিন থাকাও উচিত। অবশ্য আ[ত্ম]সম্মান বজায় রেখেই সেটা করা উচিত। অনেকেই এখনো সা[হেব] দেখলে গদ গদ ভাব—সে অফিসের মেসেঞ্জারই হোক বা হোটেলে[র] ঝি চাকরই হ'ক। এই গদ গদ ভাবটি যতদিন না কাটবে ততদি[ন] আমাদের উন্নতিও হবে না, চরিত্রও গড়ে উঠবে না। ইংরেজদে[র] মধ্যে অনেকগুলি ভাল জিনিস আছে—যেমন আছে জার্মান[দের] মধ্যে, রাশিয়ানদের মধ্যে বা অ্যামেরিকানদের মধ্যে, সেগুলি নি[তে] হবে—নকল নয়, গ্রহণ করতে হবে। তবে ভ্রমণ সার্থক হয়।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী রূপের বীভৎসতা যেমন খুলে ধরতে হ[বে] তেমনি তাদের দেশের শিল্পপ্রিয়তা, সাহিত্য, মানবিকতা বোধকে প্রশংসা করতে হবে। নানাদিকে বিচার করতে হবে—না[না] সময়ে, নানা ভাবে। লণ্ডন বা প্যারিসকে বুঝতে চেষ্টা করতে [হবে] হবেই—যেমন বুঝতে হবে মস্কো ওয়াশিংটন বা পিকিংকে, কি[ন্তু] ভুললে চলবে না আমাদের স্থান কোলকাতায়, দিল্লিতে [বা] বোম্বাইতে—এই ভারতবর্ষে। বিলেত দেশটা সম্বন্ধে নানার[কম] লেখা বেরিয়েছে। নানা ভাবে নানা লোকে দেখেছেন—এ[ই] দেখা ফুরোয়নি, কোনদিনই ফুরাবে না। নতুন ঘটনা, নতু[ন] মানুষ নতুন ভাবে লিখবেন সে দেশের কথা। ইংরেজরা নিজেরা তাদের দেশ সম্পর্কে কত বই যে বার করে তা একজনের প[ক্ষে] পড়ে ফেলা সম্ভব নয়। নানা সমস্যার কথা, রাস্তার কথা, আ[লোর] কথা, রোগের কথা, কালোবিদ্বেষ কথা, বেকার সমস্যার কথা তারা নির্ভীক ভাবে অন্তত নিজেদের মত প্রকাশ করে। অন্য দলে বলে তার মতামত প্রকাশে বাধে না। হাইড পার্কে কনসারভেটি[ভ] থেকে আরম্ভ করে অ্যানার্কিষ্ট পর্যন্ত সবাই বক্তৃতা দেন। লোকে প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু বক্তাকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে না। এ দেশে মানুষের জন্য নানারকম ব্যবস্থা আছে—যেমন আছে কুকুরদে[র] জন্য। অনেকে অবাক হন এই ভেবে যে এদেশে কুকুর বিড়ালে এত খাতির কেন? তাদের জন্য এত খরচ না করে পূর্ব আফ্রিকা যে বৃটিশ প্রজা না খেয়ে মরছে বা ক্রীতদাসের মত অবস্থায় আ[ছে] তাকে বাঁচানো হয় না কেন? প্রশ্নটা ভাল এবং এমন প্র[শ্ন] করাও হয়। তার জন্য নানারকম কাগজ রয়েছে যেমন ডেলি ওয়ার্কার, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন বা নিউ ষ্টেটসম্যান। একথা বলা[র জন্য] তাদের কেউ দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দেয় না।

ইংরেজরা বক্তৃতা দিতে ভালবাসে, তার প্রমাণ পাওয়া যা[য়] সভা সমিতির বিজ্ঞাপনে। আমাদের দেশের মত সেখানে মে[...]

সভা প্রায় হয় না। সভাতে বক্তৃতা শুনতে গেলে সাধারণত টিকিট লাগে। সাধারণত বক্তাদের বক্তব্য বলে কোন বস্তু থাকে। আমাদের সভার সঙ্গে তুলনা করা ভুল। আমাদের সভা সমিতিতে প্রায় সময়েই উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না বিশেষ করে রবীন্দ্র জন্মতিথির সভাগুলিতে। শেক্সপীয়ারের দেশে শেক্সপীয়ার সম্পর্কে এত সভা হয় না, কারণ সেজন্য পড়াশুনা করতে হয়। একমাত্র বিশেষজ্ঞেরাই সেখানে বক্তৃতা দেন।

লণ্ডন সম্পর্কে এ সবই হয়ত পুরনো কথা—আমাদের কাছে লণ্ডন এখন অতি নিকটে। খুব কম লোক আজকাল পাওয়া যায় যাঁরা লণ্ডনে যাননি বা যাবার কথা ভাবছেন না।

লণ্ডনকে অবশ্যই ভোলা শক্ত। লণ্ডনকে পুরো চেনা যায়না, কিছু না কিছু রহস্য এর আছেই। যত বই-ই লেখা হোক, এর পুরো চরিত্র একদিনে ধরা পড়বে না। যেদিন পড়বে সেদিন লণ্ডনও পুরোনো হ'য়ে যাবে। তাই লণ্ডনকে চেনাবার উদ্দেশ্য আমি কিছু লিখছিনা—সে চেষ্টা করা বোকামি। লণ্ডনের ল্যাণ্ডলেডিদের আমি কিছু চিনেছি, তারই বর্ণনা করতে গিয়ে সে প্রসংগে কিছু অন্য কথা এসে গিয়েছে। ছয় বছর বাস করে দেড় বছর আগে লণ্ডন থেকে ফিরেছি—এখন মনে হয় (অস্কার হ্যামারষ্টাইনের প্যারিসকে বদল ক'রে) লণ্ডনকে শেষ যখন দেখেছি তখন তার হৃদয় ছিল উষ্ণ এবং আনন্দময়। তাকে যতই তারা বদল করুক না কেন আমি সেই ভাবেই তাকে মনে রাখব :

The last time I saw London
Her heart was warm and gay
No matter how they change her
I'll remember her that way.

সমাপ্ত

শুধু রাতটুকু পার হ'লে

কৃষ্ণ ধর

রাতটুকু পার হ'বে বলে'
সেই চিরদিনের অন্ধকারের মানুষগুলি
এক অন্ধ-যৌবন নদীর পারে জটলা করছিল
রাতটুকু পার হ'বে বলে।

সারাটা জীবন ওদের কাটল বঞ্চনায়,
এ ওর মুখের আদল ঠাহর করতে পারে না
সবই অন্ধকার,
এক বধির দৃশ্যের জগত।
কোনো শব্দও যেখানে পৌঁছয় না,
কোনো পাখির ডাকও না।
এক পাল বুনো মোষের মতো জমাট রাতের পাঁচিল,
ওরা এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

কোথায় কখন ভোর হ'ল
তার খবর ওরা রাখে না।
এক কবন্ধ অন্ধকারের পাশে শুয়ে আছে
যেন কতকগুলো জীবন্ত মানুষের শব।

একদিন কী ক'রে যেন টের পেল,
কারা যেন কেয়ী নৌকোয়
সেই টালমাটাল নদীটা পার হচ্ছে।
ওরা বললে : আমরাও যাবো,
আমাদের এই রাতটুকু পার করে দাও।
আমরা নদীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি
ঢেউয়ের কোলাহল কানে লাগছে।
আমাদের পার করো।

তারপর সেই রাত আর দিনের
নদীর ওপর তৈরী করল ওরা
বিশ্বাসের এক সেতু,
সেই পুলের ওপর দিয়ে
হাত ধরাধরি করে মানুষগুলি
নদী পার হ'ল।
সেখানে এক উজ্জ্বল দিন
অঢেল-খুশি নিয়ে বসে আছে,
ওরা এতদিন জানতেও পারেনি,
শুধু রাতটুকুর জন্ত।
বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো দিন
ওদের গ্রহণ করল,
ওদের জীবনের রাত এবার শেষ হ'ল
এক উজ্জ্বলতর দিনের আলোতে।
ওরা জীবনের ভিতরে গিয়ে বসল,
এক গলা আলোর ভিতরে।
মাথার ওপরে এক ঝাঁক পাখি
শিস্ দিতে দিতে উড়ে গেল,
ওরা বললে, এসো আমরা গান গাই।
অন্ধকারের মানুষগুলো তখন
গভীর বিশ্বাসে,
গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগল,
হৈ হৈ আনন্দে,
শুধু রাতটুকু পার হলেই
এতদিন, এত তার অফুরন্ত খুশি।
হে ঈশ্বর, আমরা বেঁচে গেছি,
আমাদের অন্ধকার ঘুচেছে,
শুধু রাতটুকু পার হ'য়ে।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পঁচিশ

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের প্রচণ্ড উত্তাপ সারা য়ুরোপকে দাবানলে জ্বালাচ্ছে, সেই দাবদাহের মধ্যে প্রশান্ত চিত্তে নীলকণ্ঠের মতো সেণ্ট লরেন্সের শান্তি নীড়ে সমাহিত হয়ে আছেন বার্ণার্ড শ'। Common sense about the war-এর জন্য একদিক থেকে আসছে গালাগাল আর অন্যদিকে আসছে শ্রমিক সভার প্রশস্তি-মূলক প্রস্তাব, সারা দেশ জুড়ে যেখানেই তাদের সভা হয়, তারা বার্ণার্ড শকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করে।

এমনই একদিনে হেসকেথ পীয়রসন বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি মেসোপটেমিয়া যাবেন তাই একবার দেখা করতে এসেছেন। কথায় কথায় শ' বললেন, সৈন্য জীবন কি রকম লাগছে তোমার?

পীয়রসন বললেন, ভালো নয়, তবে প্রতিবাদ করার সাহসও নেই।

শ' বললেন, ওদের অবশ্য ডিসিপ্লিনটা চমৎকার, কিন্তু 'সট' হল উলটো দিক। যুদ্ধ যে কেন হচ্ছে ওরা বোঝে না। একজনের পক্ষে অগ্নি নিরোধের জন্য যথাসাধ্য প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগলে আর প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? তখন সে আগুন নিভানোর চেষ্টা করবে। কে এই যুদ্ধ বাধালো, কার জন্য এই যুদ্ধ, এই সব বলে বা এই যুদ্ধ করাটাই অন্যায় এ সব কথায় যুদ্ধ থামানো যাবে না। আমরা সবাই জানি এটা অন্যায়, তবু আমাদের সকলকে আগুন নেবানোর কাজেই লাগতে হবে। তবে এ কথাও বলবো এ আগুন অনেক তাড়াতাড়ি নেবানো যাবে যদি দু'-চার জন রাজনীতিককে হত্যা করা যেত।

পীয়রসন প্রশ্ন করলো—এখন নতুন কি লিখছেন?

শ' জবাবে বললেন—শেখভের ভঙ্গীতে অবসর সময়ে একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছি। এ আমার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি। তোমার শেখভের নাটক পড়া আছে! অদ্ভুত নাট্যকার! একেবারে তোমার উপযুক্ত। থিয়েটার সম্পর্কে অপূর্ব জ্ঞান। শেখভ পড়ে মনে হয় যেন নাটক রচনায় আমার সবে হাতেখড়ি হয়েছে। একটা ধর্মমূলক রচনায় হাত দিতে হবে। হাতে সময় থাকলেই বাইবেল পড়ছি।

পীয়রসন বললেন—ছোটবেলায় যা পড়েছি ও-সব তাতেই আমার জীবনটা কেটে যাবে।

—এই বই ছোটদের বই নয়। যতক্ষণ না নভেল আর নাটক ইত্যাদি অসংখ্য ট্রাস পড়ে ক্লান্ত না হচ্ছ ততক্ষণ এই বই তুমি কি করে বুঝবে?

Heart break House নাটকের ভূমিকার শেষে বার্ণার্ড শ' লিখেছেন—You cannot make war on war and on your neighbour at the same time. War cannot bear the terrible castigation of comedy, the ruthless light of laughter that glares on stage.

এই নাটকটি আকারে সুদীর্ঘ, এই নাটকটি নাট্যকারের মতে শেখভীয় ভঙ্গীতে রচিত—a Fantasia on english themes in the russian manner—এই নাটকেই বার্ণার্ড শ'র পৃথিবী সম্পর্কিত হতাশা ও অবিশ্বাসের প্রথম অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। এইচ, জি ওয়েলসের মতো প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত বার্ণার্ড শ' বিশ্বাস রাখতেন যে মহাজাগতিক বিপর্যয় অবশ্য ঘটবে কিন্তু প্রগতি সুনিশ্চিত। কিন্তু এই কালের পর তাঁর বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এল, একেবারে অবশ্য ভাঙলো না, এই কারণেই বার্ণার্ড শ' আরো ঘনিষ্ঠ-ভাবে কম্যুনিজমের প্রতি অভিমুখী হলেন।

Heart break House যখন লেখা শেষ হল তখন বার্ণার্ড শ'র বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। Heart break House বার্ণার্ড শ'র চোখে দেখা ১৯১৩-র ইংলণ্ড। লাইট হাউসের সতর্ক-আলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ইংলণ্ডের তরণী এগিয়ে চলেছ পাহাড়ের গায়ে চূর্ণ হচ্ছে। হেকটর হুসাবি তাই—কাপ্তেন সট ওভারকে বলে—And this ship we are all in, this soul's prison we call England?

নাটকের মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধের পরিচয় আছে, কিন্তু অদ্ভুত এর ভূমিকা। নাটকটি লিখিত হওয়ার দশ বছরের আগে অভিনীত হয়নি, কারণ মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নাটকই ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে শুরু হল সুতীব্র উত্তেজনা।

W. H. Auden বলেন—For all his theatre about propaganda, his writing has an eflect nearer to that of music than the work of any of the so-called pure writers.

বার্ণার্ড শ'র ব্যবহৃত সংলাপের ছন্দ এবং সুর মাধুরী তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ়তর করেছে। Auden-এর উক্তি বার্ণার্ড শ'কে সঙ্গীতকার হিসাবে বিচারে সহায়তা করে। বার্ণার্ড শ'র সমসাময়িক বন্ধু, সতীর্থ ও শিষ্যবৃন্দের রচিত 'সমস্যামূলক' নাটকের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র মৌন প্রভেদ অনেকখানি।

শ'র পরিণত রচনায় সঙ্গীত একটি বিশেষ লক্ষণ। নাটকে তার উপস্থিতি পাদপূরণের প্রয়োজনে নয়। সর্বগ্রাসী সার্বভৌমত্বের দাবীতে। সমালোচকদের মতে এরই নাম sharian sonata

বার্ণার্ড শ'র এই জাতীয় সকল নাটকাবলীর অন্যতম Heart break House, আর এই নাটকে শেভিয়ান ভাববাদের প্রাধান্য বেশী। এই নাটকের উপ-নামকরণ a Fantasia in the russian manner on english themes দেখেই বোঝা যায় যে এই সময় বার্ণার্ড শ' প্রচুর পরিমাণে টলষ্টয় পড়েছেন, শেখভের নাটক দেখেছেন। Heart break house রচনার সময় The Light shines in darkness এবং The Cherry Orchard তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

বার্ণার্ড শ'র খেয়াল এবং রসিকতা থেকে মুক্ত Heart break House. নাটকটি পরিপূর্ণ ভাবে শেখভীয়, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, ভদ্র, সংযত, এরা ক্ষীয়মান বনেদী-বংশের নমুনা, তারা সবাই অকর্মা, নাটকের দৃশ্য গ্রামের বাড়িতে নাটকের ভঙ্গিমা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংলাপের বিচিত্র মালা সুরের সুতোয় বাঁধা। কিন্তু এই নাটকের শেখভত্ব বাহ্যিক, গভীর ভাবে বিচার করলে এই নাটক পরিপূর্ণ রূপে শেভিয়ান। The shewing up of Blanco Posnet নাটকে বার্ণার্ড শ' হয়ত টলষ্টয়ের Power of Darkness অনুসরণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু আসলে তিনি The Devil's Disciple নাটকই নতুন করে লিখেছেন। Heart break house-এ বার্ণার্ড শ' আপনাকে ইংরাজ শেখভ মনে করলেও আসলে তিনি Getting Married এবং Misalliance-এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই তিনটি নাটক নিয়ে একটি triology এবং Heart break House তার চূড়ান্ত পরিণতি।

আঙ্গিক ও বক্তব্যের দিক থেকে এই তিনটি নাটকে এর অখণ্ড যোগসূত্র রয়েছে। এই তিনটি নাটকই বিদগ্ধজনের জন্য রচিত। তিনটি নাটকেই আছে একই ধরণের আদি-রসাত্মক দুঃসাহসিকতা। তিনটিতেই ড্রইংরুমের কথাবার্তার ভিতর নাটক গড়ে উঠেছে এবং উঁচুতলার সমাজ সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র অপরিবর্তনীয় মনোভাব স্পষ্টতরো হয়ে উঠেছে।

Getting Married বা Misalliance এই দুটি নাটকের মঞ্চে এতটুকু সাফল্য ঘটেনি। তবে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন টেলিভিসনে প্রদর্শিত হয় Misalliance তখন তার অসীম জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেল, মনে হয়েছিল বার্ণার্ড শ' যেন বেতারে প্রচারের জন্য সদ্য এই নাটক লিখেছেন। শেখভের যে সব নাটকের আদর্শে বার্ণার্ড শ' এই Heart break House নাটক রচনা করেছিলেন মস্কো বা সেণ্ট পিটসবার্গের রঙ্গমঞ্চে তার যেমন সমাদর হয়েছিল বার্ণার্ড শ'র নাটকেরও সেই দুর্দশা ঘটেছিল লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে। শেখভ এই অসাফল্যে এমনই মনস্তাপ পেয়েছিলেন যে' আত্মহত্যা করতে সঙ্কল্প করেছিলেন, কিন্তু কোনো রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা বার্ণার্ড শ'কে হতাশ করতে পারতো না।

এই নাটক আমার স্বীথের লিরিক থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার কথা ছিল, এলেন ও'মালিকে এলি ডানের ভূমিকা দেওয়া স্থির হয়, এই আইরিশ সুন্দরীর বয়সটা কিঞ্চিৎ বেশী হওয়ায় নিগেল প্লে ফেয়ার ও আর্ণণ্ড বেনেটের মতে এই ভূমিকার জন্য অল্প বয়সী মেয়ে প্রয়োজন। কম বয়েসী মেয়ে খুঁজতে গিয়ে এত সময় লাগল

যে আলষ্টারের নাট্যকার জেমস ফাগান যখন কোর্ট থিয়েটারে এই নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব করলেন বার্ণার্ড শ' রাজী হয়ে গেলেন। ১৯২১এর ১৮ই অক্টোবর লণ্ডনে এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হল। ততদিনে ন্যু ইয়র্কে এই নাটক ১২৫ রজনী অভিনীত হয়ে·গেছে।

এই নাটক লণ্ডনে অসফল হল। প্রথম কারণ চরিত্র বণ্টনের ত্রুটি, দ্বিতীয় কারণ লণ্ডনের দর্শকের গ্রহণ ক্ষমতার অভাব। এই অসাফল্যে বার্ণার্ড শ' ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যা তাঁর পক্ষে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, কিন্তু কারণও আছে, বার্ণার্ড শ' এই নাটকটিকে তার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন, সেই কারণেই তাঁর দুঃখটা এত তীব্র হয়েছিল।

বার্ণার্ড শ'র ১২তম জন্মদিনে একটি নতুন নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ২৬শে জুলাই তারিখে দি আর্ট থিয়েটার ক্লাব—Too me to be good অভিনয় করলেন। প্রোগ্রামে হেসকেথ পীয়রসন একটি ছোট নিবন্ধে লিখেছিলেন—The main theme of too true to be good is the wretchedness of the rich, and the play is therefore a variation of development of Heart break House, ইত্যাদি।

এই Programme কেউ বার্ণার্ড শ'কে হয়ত পাঠিয়েছিলেন তিনি হেসকেথ পীয়রসনকে একটি পোষ্ট কার্ডে লিখলেন Why? বুঝতে না পেরে পীয়রসন লিখে পাঠালেন What? বার্ণার্ড শ' জবাব দিলেন—The Note পীয়রসন লিখলেন Oh, that! বার্ণার্ড শ' আবার লিখলেন Yes, এবার পীয়রসন লিখলেন God knows! সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন শ' He does not—পীয়রসন কি আর করেন লিখলেন—Nor do I.

বার্ণার্ড শ'র এই সংক্ষিপ্ত চিঠি লক্ষ্য করার মতো।

মিঃ ই. ষ্ট্রাউস Bernard Shaw's Art and Socialism নামক চমৎকার গ্রন্থে বলেছেন—Back to Methuselah আর Heart break House বার্ণার্ড শ'র সাহিত্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি!

বার্ণার্ড শ' নিজে বলতেন আমার কোন বইটা যে শ্রেষ্ঠ তা শেষ বিচারের (Judgement Day) দিন পর্যন্ত বলা যাবে না। আবার মাঝে মাঝে সোজাসুজি বলতেন। ফ্রাঙ্কহ্যারিসকে প্রদত্ত গ্রন্থে নিজে লিখেছিলেন Rightly spotted by the infallible eye of Frank Harris as my best play—" Back to Methuselah লেখার আগে পর্যন্ত বার্ণার্ড শ' Heart break Houseকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকার করতেন। বর্মার প্রধানমন্ত্রী থাকিন ন্যুকে একখণ্ড Back to Methuselah উপহার দিয়ে বলেছিলেন—এই আমার মাষ্টার পীস।

বয়সের সঙ্গে শ' ক্রমশঃই যে আকৃতি এবং জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতিতে যে তাঁর পিতৃদেবের মত হয়ে উঠছেন এটা বুঝে ছিলেন। বার্ণার্ড শ'র পিতৃদেব কার শ' সব কিছুতেই শ্লেষ করে বলতেন—everything was a pack of lies, Heart break House এক বৃদ্ধ কার শ'কে আদর্শ করে ওলড, টেসটামেণ্টের বৃদ্ধের মতো পৃথিবীর সব কিছুরই বিরোধী Captain Shotoverকে এঁকে ছিলেন। Captain Shotover সর্বদাই ব্যস্ত, আসলে পথের ধারে মদ্যপান করাটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম, বেরিয়ে এসে অপেক্ষারত মানুষের উদ্দেশ্যে বাণী নিক্ষেপ করে জবাবের জন্ত আর দাঁড়াতেন না।

Captain Shotover বলছেন It confuses me to be answered, it discourages me, I cannot bear the men and women, I have to run away, I must run away now,

তরুণদের সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র মনোভংগী Captain Shotover এর মুখ দিয়ে বলা হয়েছে—I see my daughters and their men living foolish lives of romance and sentiment and snubbery...I did not let the fear of death govern my life, and my reward was, I had my life—

সার্জেন্ট এই নাটক সর্বপ্রথম পড়েছিলেন। মদ্যপ মানুষকে তিনি চিরদিনই সইতে পারতেন না। Captain Shotoverকে পছন্দ না করলেও তার উচ্চারিত প্রতিটি কথা তাঁর ভালো লাগতো।

চেকোস্লোভাকিয়ান সৈনিকরা একটা চিঠিতে লিখতেন—Your work has always philosophical basement of our life, day by day, endeavouring to follow our great Irish teacher...

বলাবাহুল্য এই চিঠিতে শ' দম্পতি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু Heart break Houseকে গ্রহণ করার জন্ত মানুষ তখনও তৈরী হয়নি। জীবনের কঠোরতা, বিপদ, আতংক, মৃত্যু ইত্যাদির জালায় তারা এখন বিব্রত। জীবনের গভীরতার দিকে মানুষের তেমন আগ্রহ নেই, তারা চায় আনন্দ, হাসি এবং সরসতা। তারা চায় সব কিছু সহজভাবে গ্রহণ করতে, Shotoverএর বাণী শোনার মতো উপযুক্ত মনের অবস্থা নয় তখন। ক্লান্ত তরুণ দল প্রশ্ন করে —And who was Shaw to preach to us? তারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ফিরে এসেছে Arms and the Man পড়ে তারা আনন্দ পেয়েছে, তারা হাসতে চায়, দুঃখ ভুলতে চায়। গুরুগম্ভীর বিষয়কে বিষ মনে করে দূর পরিহার করতে চায়।

বার্ণার্ড শ' এই মনোভংগীতে কিন্তু বিভ্রান্ত হননি। তিনি জানতেন, জোয়ারের পর ভাটা আছে, এমন কি যে তরুণ লেখক তাঁকে এখন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছে, সেই লিটন ষ্ট্রাচীকেও তিনি প্রশংসা করছেন।

কিছু দিনের জন্য লেখনী থামালেন বার্ণার্ড শ'। এর প্রয়োজন ছিল। এখন একটা বড়ো নাটক লিখতে হবে যা অভিনয় করতে বারো ঘণ্টা সময় লাগবে। নাস্তিকতা, অবিশ্বাস এবং নিহিলিজম ইত্যাদির ভস্মাবশেষ থেকে বিংশ শতাব্দীতে যে নতুন ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠছে, এই নাটকের ভিত্তি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাটক অমর রচনা হবে এবং তাঁকে অমরত্ব দান করবে। Candida, Man and Superman এবং Heart break House এ সবই সেই নতুন নাটকের প্রস্তুতি। বার্ণার্ড শ'র মতে এই নতুন নাটক Exploit the eternal interest of the philosopher's stone which enables men to live for ever—

নীল সার্ফ অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য্য কাপড় কাচা পাউডার সার্ফে কাচা জামা-কাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত ঝকঝকে সাদা, এত সুন্দর উজ্জ্বল করে! সার্ট, চাদর, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু কাচার জন্যেই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফেণা—ঠাণ্ডা বা গরম জলে, ফেণার পক্ষে প্রতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফেণার এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়! বেশী পরিশ্রম নেই এতে! সার্ফে জামাকাপড় কাচা মানে ৩টি সহজ প্রক্রিয়া: ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনার পয়সার মূল্য এত চমৎকারভাবে ফিরে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মেনে নেবেন! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই পরখ করে দেখুন

সার্ফে জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

SU. 25-X62 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

Heart break House-এর যত ত্রুটীই থাকুক নাটক হিসাবে অপূর্ব। Captain Shotover বার্ণার্ড শ'র অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রের মাধ্যমে বার্ণার্ড শ' মানুষের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকে তিনি এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাই এই নাটকের শেষে এলি যখন বলে—This silly house, this strangely happy home, this agonising home, this house without foundations. I shall call it Heart break House—তখন পাঠক ও দর্শক নিজের মনে তার প্রতিধ্বনি পায়।

ছাব্বিশ

১৯২০, ২৭শে মার্চ…

সাউথ লণ্ডনে ডেনমার্ক হিলে বার্ণার্ড শ' মৃত্যুশয্যায় শায়িত বোন লুসীকে দেখতে গেলেন। এই ডেনমার্ক হিলের কাছেই জন্মেছিলেন রবার্ট ব্রাউনিং এবং রাসকিন তাঁর বাল্যজীবন কাটিয়েছেন।

লুসীর বয়স তখন ৬৭ বছর, বার্ণার্ড শ'র ৬৪। বার্ণার্ড শ' পৌঁছে দেখলেন, লুসী অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গীতে রোগশয্যায় পড়ে আছেন। বার্ণার্ড শ' কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর লুসী মৃদু গলায় বললেন—আমি এইবার মারা যাব। আর বেশী দেরী নেই।

বার্ণার্ড শ' সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলেন—না, না, ভয় কি, শীগ্‌গির সেরে উঠবে।

তারপর দুজনেই নীরব। চারিদিক নিস্তব্ধ। পাশের বাড়ীতে কে একজন অতি বিশ্রী ভাবে পিয়ানো বাজাচ্ছে। চমৎকার সন্ধ্যা, চার দিকের জানলা উন্মুক্ত। লুসী বার্ণার্ড শ'র হাত ধরে আছেন। সহসা মনে হল যেন তার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেছে। লুসীর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে।

বার্ণার্ড শ' সবিস্ময়ে ভাবলেন কি করা যায়! ডাক্তারকে ডাকা হল। বার্ণার্ড শ' বললেন—সম্ভবতঃ টিউবার কুলোসিসই মৃত্যুর কারণ। কিছু দিন আগে নিউমোনিয়া হয়েছিল, তার পরই টি, বিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন লুসী।

ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন—না, মৃত্যুর কারণ অনাহার টি, বি সেরে গিয়েছিল।

বার্ণার্ড শ' প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—সে কি! আমি একে খাওয়া-দাওয়া বাবদ যথেষ্ট টাকা দিই। অনাহারে মরবে কেন?

ডাক্তার তবু বললেন—না, অনাহারই একমাত্র কারণ।

মহাযুদ্ধের পর লুসীর ক্ষুধা একদম হ্রাস পায়, অনেক কষ্টে তাকে কিছু খাওয়ানো যেত। তার মনে এবং দেহে 'শেল-সক্' অর্থাৎ গোলা-বারুদের বিভীষিকা লাগে। বিমান আক্রমণের সময় বাগানে বিমান প্রতিরোধকারী এ্যান্টি এয়ারক্রাফট-এর বিস্ফোরণে ঘরের জানালা-দরজা, থালা-বাসন সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সেখান থেকে ডিভোনে পাঠানো হল কিন্তু আহারে অনিচ্ছা ঘুচলো না।

এই লুসী একদিন উদীয়মান লোক জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত বার্ণার্ড শ'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আর শেষ দিন পর্যন্ত সেই ভাই—বোনটির সমস্ত খরচ বহন করেছেন এমন কি শেষ সময়ে পর্যন্ত হাজির রথেকে স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলেন। সংসারের এই সর্বশেষ আত্মীয়

লুসীর নির্দেশ ছিল অন্ত্যেষ্টিকালে কোনো প্রার্থনা ব্যবস্থার আয়োজন না করা। বার্ণার্ড শ' ক্রিমেটোরিয়মে পৌঁছে দেখলেন লুসীর বন্ধুবান্ধবে সেই শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ। তাঁরা কেউ হয়ত বার্ণার্ড শ'কে চিনতে পারেন নি। এই জনতা একটা কিছু প্রার্থনা ব্যবস্থার জন্য জেদ করলেন। তখন বার্ণার্ড শ' বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে সেক্সপীয়রের Cymbelline থেকে উধৃতি দান করে বললেন—

Fear no more the lightning flash,
Nor the all-dreaded thunder-stone.

বহ্নিমান শবদেহের দিকে তাকিয়ে বর্ণার্ড শ' দেখলেন যে অতি ম্লান সেই আগুনের শিখা, কয়লার অভাব। হতাশ হলেন শ'। তিনি বলেছেন—Steady white light like that of a wax candle।

শ' পরিবারের এই মেয়েটির মাথার চুলের রং ছিল শাদা। বার্ণার্ড শ' জননীর ধারণা ছিল সে একদিন নাট্য-সম্রাজ্ঞীর সম্মান লাভ করবে, কিন্তু ভ্রাম্যমান পেশাদারী দলের হালকা ধরণের অপেরার ছোটখাটো ভূমিকা ভিন্ন আর কিছু পাননি লুসী। সারা জীবনটাই ব্যর্থতায় ভরা। আঘাতের পর আঘাত জীবনটাকে ভেঙে-চুরে বিপর্যস্ত করেছিল, আজ একান্ত আপন জন ছোটভাই বার্ণার্ড শ'র হাতটি ধরে শান্তির পারাবারে পৌঁছলেন।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন সেদিন ডেনমার্ক হিলে নিতান্তই Life-forceএর নির্দেশে তিনি গিয়ে পড়েছিলেন। বেশী যাওয়া আসা করতে পারতেন না, একরকম অবহেলিত ছিলেন। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—property, property, property, the real secret of my withdrawal from all human inter-course except with people I have actually to work with. ঐশ্বর্য্য আমাদের এমনই ভুলিয়ে রাখে যে, আত্মীয় স্বজনকে বিস্মৃত হয়ে, কাজ আর কাজের লোক নিয়েই আমরা কর্মজীবনটাকে ভরে রাখি। বার্ণার্ড শ'র জীবনেও তাই তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

হেসকেথ পীয়রসন যথার্থই বলেছেন শিল্পী এবং মহাপুরুষ এই দুই সত্তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, ফলে শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে, মহাপুরুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বার্ণার্ড শ' উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষা করে বলেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথকে এই হিসাবে বার্ণার্ড শ'র সমকক্ষ বলা চলে। মানসিক ভারসাম্য তিনিও শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। আর রেখেছিলেন ভলটেয়ার। তাই ১৯১৪—১৮-র মহাযুদ্ধের ফাঁকে শ' Heart break House রচনা করতে পেরেছেন আর মনে মনে পরিকল্পনা করেছেন Back to Methuselah মহানাটকের। Heart break House প্রথমটায় কাউকে পড়তে দেননি বার্ণার্ড শ' বন্ধুদেরও নয়, অথচ তিনি সব নাটক সবাইকে পড়ে শোনাতে ভালোবাসতেন। লী ম্যাথুজ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুরোধ জানিয়ে বললেন—আপনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্টেজ

সোসাইটিতে নাটকটি পড়ে শোনান। উত্তরে বার্ণার্ড শ' লিখলেন…

…এ একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। স্টেজ সোসাইটি যদি তার সদস্যদের নিয়ে At-home-এ আপ্যায়িত করতে চান, কোন সাফল্যের উৎসব উপলক্ষ্যে তাহলে একজন প্রখ্যাত লেখকের অপ্রকাশিত, অ-অভিনীত নাটক পড়ে শোনালে শ্রোতারা হয়ত গলাধঃকরণ করবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্য-প্রদর্শনের জন্য চাঁদা আদায় করে চাঁদা প্রদানকারীদের শুধু নাটক পাঠ করে শোনালে, পচা ডিম এবং মৃত বিড়াল ছাড়া লেখকের ভাগ্যে আর কিছুই জুটবেনা। সভ্যতা যখন সংকটাপন্ন তখন আমি আমার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করতে পারি। এ তোমার জানা আছে, কিন্তু সভায় অংশীদারদের ডেকে এনে তাদের বলা যে তোমাদের টাকা তছরূপ হয়েছে, সেই সভায় সভাপতিত্ব করা অতিশয় কঠিন।…

নাটকটি প্রযোজিত হয় বার্ণার্ড শ'র সেই ইচ্ছাও ছিলনা। লীলা ম্যাককার্থিকে শ' বলেছিলেন—We must be content to dream about it. Let it lie there to show that the old dog still bark a bit. বার্ণার্ড শ' বলতেন Captain Shotover হলেন কিং লীয়রের আধুনিক সংস্করণ। একজন বললেন, তার মানে?

বার্ণার্ড শ' জবাব দিলেন—"আমি কি করে জানবো? আমি ত লেখক মাত্র।"

১৯২১-এর ১১শে অকটোবর তারিখে আরনল্ড বেনেট লিখেছেন "গত রজনীতে শ'র Heart break House দেখতে গিয়েছিলাম। সাড়ে তিন ঘণ্টা অতি ক্লান্তিকর অবস্থায় কাটিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে দুবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

সারা সপ্তাহে বিক্রী মাত্র ৫০০ পাউণ্ড। ক্যাগান শেষ পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

এর পরেই বার্মিংহাম রেপারটরী থিয়েটার-এর ব্যারী জ্যাকসন যখন Heart break House মঞ্চস্থ করেন, বার্ণার্ড শ' ম্যাটিনী দেখতে গিয়েছিলেন।

স্যার ব্যারী জ্যাকসন বলেছেন—অভিনয়ান্তে বার্ণার্ড শ' বেশ খুশী হয়েছেন দেখে সাহস করে বললাম Back to Methuselah মঞ্চস্থ করার অনুমতি দিন।

বার্ণার্ড শ' ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এর কিছু আগেই ন্যুইয়র্ক থিয়েটার গিল্ড Back to Methuselah অভিনয় করেছেন।

বার্ণার্ড শ' স্যার ব্যারীর অনুরোধ শুনে শুধু বললেন—তোমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করা আছে?

ব্যারী জবাব দিলেন—সব ব্যবস্থা আছে।

বার্ণার্ড শ' হেসে বললেন—তথাস্তু।

বার্ণার্ড শ' এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, শেষ রিহার্সেলেও এসেছিলেন। অথচ তার কিছু দিন আগে আয়ার্ল্যাণ্ডে পড়ে গিয়ে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।

Saint Joan লেখার কালে বার্ণার্ড শ' কাউন্টি কেরীর পার্কনাসীলায় থাকতেন সেই সময় চীৎ হয়ে একদিন পড়ে যান, কাঁধে যে ক্যামেরা ঝোলানো ছিলো, সেটি পিঠে ঢুকে যায়। পিঠে প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গিছল।

সার্লোট বলেন—পিঠে এতবড় একটা গর্ত হয়েছিল যে, তার ভিতর অনায়াসে একখানি চিঠি ফেলা যায়। আইরিশ ডাক্তাররা কিছু করতে পারেন নি, বার্মিংহামের অস্থিবিশারদ ডাঃ এলমার ফেক্সি ১২ মিঃ চেষ্টা করে কোনো রকমে বার্ণার্ড শ'কে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় বার্ণার্ড শ' Back to Methuselah নাটকের রিহার্সেল দেখেছেন। [ক্রমশঃ।

বৈধব্য

সজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু দিন আগেতেও দেখেছি তো তাকে,
অলঙ্কৃতা, ঔদ্ধত্যের চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে।
কাঁকন কনকন, চোখে মায়া আঁকে,
সে এক অপূর্ব্বা নারী আপন কীর্ত্তিতে
দেহে তার বসন্তের উন্মাদ প্লাবন,
চোখে তার উজ্জ্বল বিরহী শ্রাবণ।

সেদিনও তো দেখলাম তাকে,
চিন্ময়ী-মৃন্ময়ী যেন নিঠুর আঘাতে।
মনে হ'ল পত্রশূন্য কোন বৃক্ষশাখে,
বহিছে হিমেল হাওয়া, পাখী নাই তাতে।

এর মধ্যে ঘটে গেছে বিরাট ভাঙন,
যে ছিল দ্বৈত-পূর্ণা, আজ সে একেলা।
দুটি প্রাণ এক ছিল, ছিল দুটি মন,
আজ নেই, বেলা গেছে, আজকে অবেলা।
বসন্ত দেহেতে তবু শীতের উল্লাস,
মনে হয় ব্যর্থ প্রেম ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

নারীত্বের ঔজ্জ্বল্যে যে ছিল উজ্জ্বল,
নিঠুর বৈধব্য তারে করেছে বিফল।
বিলাসিনী ছাড়ি আজ দেহের বিলাসে,
উপভোগ-মৌনা মন-স্থৈর্য্যের উল্লাসে।

শর্করা-শিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

আবশ্যক পণ্য-তালিকার মধ্যে শর্করা বা চিনির স্থান নিশ্চয়ই প্রথম পর্যায়ে। অন্ততঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য চিনি ও গুড় কিছু না কিছু চাই-ই। অন্য সব বাদ দিয়ে সকাল-বিকাল চা খেতে এর প্রয়োজন, দুধের সঙ্গেও এর সংমিশ্রণ না হলে হয় না। চিনি বা শর্করা-শিল্পের গুরুত্ব এই থেকে অবশ্য খানিকটা উপলব্ধি করা যায়।

একটি কথা আগেই বলতে হয়, বিশ্বের চিনি উৎপাদক কেন্দ্র হিসাবে ভারত মোটেই পিছিয়ে নয়। এই উপ-মহাদেশটিতে শর্করার মোট উৎপাদনের পরিমাণ কিছু দিন পূর্বেও ছিল ১১ লক্ষ টনের বেশী। ভারতের ভেতর উত্তর প্রদেশেই (প্রাক্তন যুক্ত প্রদেশ) চিনিকলের সংখ্যা তুলনায় অর্ধেক রয়েছে। তার পর ক্রমান্বয়ে বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের নাম করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা চলে, এখানে লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি আর বছরে চিনির প্রয়োজন কম পক্ষে ৭০ হাজার টন। চিনি বা শর্করা উৎপাদনেও এই রাজ্যে উদ্যম রয়েছে অনেকখানি।

এ কথা স্বীকার্য যে, চিনি বা শর্করার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাইরে থেকে প্রচুর চিনি আমদানীর প্রয়োজন হয় এখানে আজও অবধি। এই অবস্থার অবশ্য কতকগুলি কারণই রয়েছে। একটি মূল কারণ—এই রাজ্যটিতে শর্করা উৎপাদনের জন্য আবশ্যক পর্যাপ্ত ইক্ষুর অভাব।

খতিয়ে দেখা গেছে—এতদঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গ) যে ইক্ষু উৎপাদিত হয়, গড়পড়তা তার প্রতি দশ টন থেকে চিনি পাওয়া যায় এক টন। এভাবে এখানকার সমস্ত ইক্ষুটাই যদি চিনিতে রূপান্তরিত করা গেলো, তাহলে সেই চিনির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ২৫ কোটি পাউণ্ডের মতো। বিপুল চাহিদার তুলনায় এই উৎপাদনও যথেষ্ট বলা যেতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটা মস্ত প্রশ্ন—এখানে অন্য অনেক অঞ্চল থেকে ঘন বসতি, চাষের উপযোগী জমির অভাব স্বভাবতঃই এখানে বেশী। সেদিক থেকে ইচ্ছে করলেই রাতারাতি ইক্ষুর উৎপাদন বাড়াবার উপায় নেই। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার—এ সকল রাজ্যে ইক্ষুর চাষ খুবই অধিক, এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান উহাদের পর। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইক্ষুর ফসল পশ্চিমবঙ্গে যত বেশী অন্যত্র অনেক জায়গায় তেমনটি দেখা যায় না। এখানে এক একর জমি থেকে ইক্ষু উৎপাদিত হয় প্রায় ২০ টন।

শর্করার সঙ্গে ইক্ষুর সম্পর্ক একান্ত নিবিড় বলেই ইক্ষুর প্রসঙ্গে এত কথা। পশ্চিমবঙ্গে শর্করাশিল্পকে আরও ব্যাপক ও দৃঢ়-ভিত্তিক করতে হলে ইক্ষু চাই আরও বহুল পরিমাণে। চাষের জমি যেখানে ইচ্ছা মাত্র বাড়াবার উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে না পেলে নয়। প্রথমতঃ একটি পরীক্ষা চলতে পারে—একর-পিছু উৎপাদনের হার আরও কি ভাবে বর্দ্ধিত করা যায়, এই নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই জন্য উপযুক্ত সেচ ও সার সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা চাই। সরকারী দায়িত্বের কথা এইখানে আপনি উঠছে বিশেষ ভাবে।

পশ্চিমবঙ্গের সব অঞ্চলই ইক্ষু চাষের সমান উপযোগী নয়, উৎপাদনও সর্বত্র একই হারে হয় না। ইক্ষু চাষের কয়েকটি যথার্থ উপযোগী স্থান—বর্ধমানের কাটোয়া, কালনা প্রভৃতি এলাকা, মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা, বীরভূমের একটি বৃহত্তর অংশ আর পশ্চিম দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ। এই অঞ্চলগুলোতে ইক্ষুর চাষ বাড়াবার জন্যে আরও সংহত উদ্যম, ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা দরকার।

আরও একটি কথা, ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির সকল চেষ্টা যেমন থাকবে বা থাকতে হবে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের শর্করার বিপুল চাহিদা অন্য ভাবেও কিরূপে মেটানো যায়, না দেখলে নয়। এই রাজ্যের সীমানার ভেতর বহু অঞ্চলে তাল ও খেজুর গাছের চাষ আছে। আর এই গাছের সংখ্যাও অবশ্য কম নয়। তাল ও খেজুর গুড় আশানুরূপ পাবার জন্যে এই চাষও বাড়াতে হবে আরও বহুলাংশে—বাড়ানো সম্ভবপরও। বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা যদি থাকতো অব্যাহত ভাবে, তাহলে শর্করার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুরোপুরি স্বাবলম্বী না হোক আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে, এ নিশ্চিত।

পারিবারিক বাজেটের কয়েকটি দিক

বাজেট কথাটি বললে সাধারণতঃ সরকারী বাজেটের কথাই মনে হয়। কিন্তু সরকারী বাজেটের মতো পারিবারিক বাজেট বলেও একটি কথা আমরা জানি—পরিবারের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যার মূল্য এতটুকু কম বলা চলে না।

যে কোন বাজেটের মূল কথাই—অর্জিত বা লব্ধ আয়ের ঠিক অনুপাতে ব্যয়-বরাদ্দ। ব্যয়ের মাত্রা যেন কোন অবস্থাতেই আয়কে অতিক্রম করে না যায়। কি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বাজেট, কি জাতীয় বা সরকারী বাজেট—সবক্ষেত্রে এই নীতিটি প্রযোজ্য।

যেখানে এইটি অনুসরণ না করা হলো কিংবা অনুসরণের সত্যি সুযোগ না থাকে, সেখানেই গোলযোগ, সেখানেই অস্বস্তি।

আয় বুঝে ব্যয় করার দাবীটি অবশ্য বহু যুগ থেকেই চলে আসছে। এইটি অমূল্য শিক্ষাই বলতে পারা যায়—প্রতিটি মানুষ বা পরিবারকে সাধ্যমত মিতব্যয়ী হতে হবে, ব্যয়ের উপর চাই যথোচিত নিয়ন্ত্রণ। এর সঙ্গে বাজেট কথাটির যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ রকম। অথবা সহজভাবে এ-ও বলা চলে—বাজেটের মূল সত্যটি এরই ভেতর নিহিত।

একথা ঠিক বহু পরিবার রয়েছে, নিয়মিত ধারায় যেখানে জমা-খরচ রাখা হয়। সকলেই একই পদ্ধতিতে এইটি (জমাখরচ বা আয়-ব্যয়ের হিসাব) রাখেন, তেমন দাবী করা চলে না। এই ধরণের হিসেবী পরিবারের সংখ্যা আশানুরূপ যথেষ্ট নয়। কেন না, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' শ্রেণীর লোকও কিছুমাত্র কম নয় সংখ্যায়। পরন্তু বলা যায়, বেশির ভাগ লোক বা পরিবারই বেহিসেবী পর্য্যায়ে না পড়লেও সঠিক বাজেট করে চলতে অভ্যস্ত হয় নি এখন অবধি।

বাজেট করে চলার যে চিরন্তনী দাবী রাখা হয়েছে সামনে—ধনী-দরিদ্র মধ্যবিত্ত—কাউকে কিন্তু এর বাইরে ধরা হচ্ছে না। জীবনযাত্রার সর্ব্বস্তরে সকলের ক্ষেত্রেই আয়ের মধ্য থেকে ব্যয়-মিটানোর চেষ্টা নিতান্ত শ্রেয়ঃ। হিসেবের লাগামটি ছেড়ে দিলে রাজার দৌলতও ফুরিয়ে যেতে কতক্ষণ। 'গৌরী সেনের টাকা'তেও দীর্ঘদিন অমনি চলতে পারে না। মোটের উপর খরচের আগেই বাজেট করা চাই। জীবনের অপর সকল ব্যাপারে যেমন, এই ক্ষেত্রটিতেও সহজ অগ্রগতির জন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ প্রয়োজন। আর আয়ানুপাতিক ব্যয়—একটু আগেই বলা হল, যে কোন সুচিন্তিত বাজেট পরিকল্পনার ইহাই মূল কথা।

এ প্রসঙ্গে এ-ও বলতে হয়—বাজেট করতে যেখানেই চাওয়া হবে, কার্য্যারম্ভের আগে মনের ভিতরে কয়েকটি বিশেষ সূত্র গাঁথা না থাকলে নয়। মাস মাহিনার অঙ্কটি একদিকে রাখা হ'ল, অপর দিকে প্রথমেই ধরা চাই খরচের অপরিহার্য্য বড় বড় বিষয়গুলি। যেমন, বাড়িভাড়া, খাদ্য-ব্যবস্থা, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-সরঞ্জাম, ও স্কুল-কলেজের মাইনে, ঔষধ-পত্রের বিল, জীবন-বীমার প্রিমিয়াম—এগুলির ব্যয়-বরাদ্দ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ সকল দায় মিটিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে (মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে অবশ্য সে আশা বৃথা,) তখনই অন্যান্য খাতে ব্যয়-বরাদ্দের প্রশ্ন উঠতে পারে।

এমন অনেককে দেখা যায় যারা, কোনরূপ বাজেটের ধার ধারে না, যখন যে খরচের প্রয়োজন হয় বিনা ভ্রূক্ষেপে করে যান। অঢেল টাকা থাকলে এমন সাহস, কতক কাল চলতে পারে, কিন্তু আয় যদি সীমাবদ্ধ হয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেটি সত্য), সেখানে এমনি করতে চাইলে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে যথেচ্ছ খরচে উৎসাহী হলে, ঋণের বোঝা মাথার উপর চাপলেই। আসল কথা—অমিতব্যয়ী হলে কিছুতেই চলবে না, অমিতব্যয়িতা শেষ অবধি দুঃখকে ডেকে আনে। যতদূর সম্ভব আয় অনুসারেই ব্যয় করতে হবে, জানতে হবে মিতব্যয়ী হলেই বিপদের ঝুঁকি কম।

এ অনস্বীকার্য্য যে, পারিবারিক বাজেটের প্রচলন এদেশে ততখানি নেই, যতটা দেখা যায় অগ্রগামী দেশগুলিতে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এই নিয়ে চিন্তা-আলোচনা ও গবেষণা চলে আসছে প্রচুর। স্বাভাবিক অবস্থায় বাজেটের ধরণও হবে স্বাভাবিক—সেখানে ঋণ হতে পারে, এমন ভাবে ব্যয়-বরাদ্দ হলে চলবে না। আয়ের তুলনায় ব্যয়ের দাবীগুলি যদি অত্যধিক থাকে, সে ক্ষেত্রে হিসেব করে যে যে দাবীটি বাদ দেওয়া সম্ভবপর, সে কয়টি ছাঁটকাট করতেই হবে। অপ্রয়োজনীয় বা নিরর্থক খরচের অবকাশ যেন না থাকে, সেদিকে গোড়া থেকেই দায়িত্বশীল গৃহস্বামীর প্রযত্ন চাই।

ভুক্তভোগী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখে এসেছেন—সীমাবদ্ধ আয় যেখানে, সীমার বাইরে যেয়ে খরচের বাজেট বা আধিক ব্যয়-বরাদ্দ সেখানে করতে যাওয়াই নিতান্ত ভুল। অন্ততঃ এরূপ ক্ষেত্রে কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে বহুবার নিবিড়ভাবে না ভাবলে নয়। অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হলে ব্যবস্থাও অস্বাভাবিক নিতে হবে, এ প্রশ্নে অবশ্য দ্বন্দ্ব তুলে লাভ নেই। সরকারী ক্ষেত্রেও জরুরী অবস্থায় জরুরী বাজেট প্রণয়নের রীতি চলতি আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আয়-ব্যয় বা বাজেট-ব্যবস্থার মূল নীতিটি অনুসরণেই সর্বাংশে সমীচীন। মোটের উপর—আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেখানেই থাকছে, সকল রকম সৌখিন বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিবর্জন না করলে সেখানে চলতে পারে না।

আদর্শ-বাজেট কি ধরণের হতে পারে, বিশেষ ভাবে বিলেতের

মাসিক বসুমতীর এজেণ্ট-তালিকা

ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে

বর্ত্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেণ্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এজেণ্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

॥ বাঙলা দেশ ॥

দঃ কলিকাতা (বৃহত্তর) ●

শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য —টালিগঞ্জ
শ্রীফটিকচন্দ্র পাল —টালিগঞ্জ
শ্রীফুলচাঁদ তেওয়ারী —টালিগঞ্জ
মেঃ জাতীয় পুস্তকালয় —টালিগঞ্জ
শ্রী এ বি, দাস —লেক রোড মার্কেট
শ্রীভগৎ সিং —বালিগঞ্জ
শ্রীভাগীরথ মাইতি —গড়িয়াহাট
শ্রীভগীরাম —বালিগঞ্জ
মেঃ দামোদর লাইব্রেরী —বেহালা
শ্রীফটিকচন্দ্র পাল —টালিগঞ্জ
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মোদে —টালিগঞ্জ
শ্রীরাজবল্লভ সিং —বালিগঞ্জ
শ্রীসুকুমার ব্যানার্জ্জী —বালিগঞ্জ
শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্ত —চেতলা
শ্রীসুভাষচন্দ্র উকিল —বালিগঞ্জ
শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত —আলিপুর
শ্রীমাখনলাল নাথ —টালিগঞ্জ
শ্রীজীবনকৃষ্ণ সুর —টালিগঞ্জ

পূঃ কলিকাতা (বৃহত্তর) ●

শ্রীভগবৎ বারিক —বেলিয়াঘাটা
শ্রীবিমল সরকার —বেলিয়াঘাটা
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জ্জী —বেলিয়াঘাটা

হাওড়া ●

শ্রীকাশীনাথ সাহা —আমতা
শ্রীঅলোককুমার চ্যাটার্জ্জী —বেলুড়
শ্রী এস, বি, সিং —ফুলেশ্বর
শ্রীরামপৎ সিং —চেঙ্গাইল
শ্রীরামহরি নাথ —সাঁতরাগাছি
শ্রী পি, কে, সিংহ —বেলিলিয়াস রোড
শ্রী পি, জি, ঘোষ —জয়নারায়ণ সরকার লেন
শ্রী এম, দাস —পঞ্চাননতলা রোড
শ্রীমাতাদিন পাণ্ডে —চিন্তামণি দে রোড
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস —নরসিং দত্ত রোড

হাওড়া ●

মেঃ কৃষ্ণ বুক ষ্টল —মুরিগ্রাম
মেঃ জ্ঞানের সাথী —ক্ষেত্র মিত্র লেন
শ্রী জি ব্যানার্জ্জী —অন্নপূর্ণা লেন
শ্রী বি, ভট্টাচার্য্য —সারকুলার রোড
শ্রী বি, সি, শেঠ —রামগোপাল স্মৃতিরত্ন লেন
শ্রী বি, সি, পাল —জি. টি. রোড
শ্রী এ, এন, মল্লিক —শিবপুর

হুগলী ●

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘড়া —শেওড়াফুলি
শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী — মগরা ও ত্রিবেণী
শ্রীগঙ্গাধর দে —শ্রীরামপুর
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য —ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটী
শ্রীললিতমোহন দত্ত — হুগলীঘাট
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কুমার —সিঙ্গুর
শ্রীমণিভূষণ সিং —আরামবাগ
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী —নবগ্রাম, কোননগর
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ —গোঘাট
শ্রী বি, ভূষণ চ্যাটার্জ্জী —হরিপাল
শ্রীমুরারীমোহন মুখার্জ্জী —কোন্নগর
শ্রী পি, মুখার্জ্জী —শ্রীরামপুর
শ্রীপ্রভাত ব্যানার্জ্জী —চন্দননগর
শ্রী পি চন্দ্র —বাগী
শ্রীসুশীল চক্রবর্ত্তী —শ্রীরামপুর
শ্রী বি, সি, তালপত্র —উত্তরপাড়া
ডি, পি, ব্যানার্জ্জী —চন্দননগর

মুর্শিদাবাদ ●

শ্রীঅহিভূষণ মালাকার —বেলডাঙ্গা
শ্রীবিশ্বনাথ দাস —ধুলিয়ান
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত —মুর্শিদাবাদ
শ্রীহরিপদ সাহা —জিয়াগঞ্জ
মেঃ ঘোষ লাইব্রেরী —বহরমপুর ও খাগড়া

মালদহ ●

শ্রী এম, এম, চক্রবর্ত্তী —হরিশ্চন্দ্রপুর
শ্রীসুনীলকুমার শেঠ —মালদা কোর্ট

বর্দ্ধমান ●

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত —চিত্তরঞ্জন
মেসার্স বাগচী ব্রাদার্স —কুলটি
শ্রীভূতনাথ দাস —পাইহাট
শ্রীকৃষ্ণসাধন সরকার —ধাত্রীগ্রাম
শ্রী এস, প্যাণ্ডে —বর্দ্ধমান
শ্রীরেণুপদ পাল —জে, কে, নগর
শ্রীতারাপদ রায় —বরবণি
শ্রীতপনজ্যোতি চ্যাটার্জ্জী —সীতারামপুর
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে —রাণীগঞ্জ
শ্রী বি, কে, আইচ —বর্দ্ধমান
শ্রীপঞ্চানন মোদক —কালনা
শ্রী এইচ, সি, ঘোষ —বার্ণপুর ও আসানসোল
শ্রীসুন্দরগোপাল সেন —গলসি
শ্রীসুশীলকুমার রায়চৌধুরী —জামুরিয়া

নদীয়া ●

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন —শান্তিপুর
শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক — নবদ্বীপ
শ্রী এ, বি, মুখার্জ্জী —বনগাঁ
শ্রী এস, কে, চৌধুরী —রাণাঘাট
মেঃ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান —কৃষ্ণনগর
শ্রী এন, এন, ঘোষ —রাণাঘাট
শ্রী বি, কে, সাহা —আড়ঘাটা
মেঃ চাকদহ বুক ডিপো —চাকদহ
শ্রী বি, চন্দ্র দাস —রাণাঘাট

মেদিনীপুর ●

শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী —ঝাড়গ্রাম
মেঃ মিশ্র নিউজ এজেন্সী —কলাইকুণ্ডা
শ্রী জে, এন, আচার্য্য —মহিষাদল
শ্রী আই, বি, ঘোষ —চন্দ্রকোণা রোড
শ্রীহরিসাধন পাইন —ঘাটাল
শ্রীমতী কনকলতা দেবী —খড়্গপুর
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী —মেদিনীপুর

পঃ দিনাজপুর ●

শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জ্জী —বালুরঘাট

চব্বিশ পরগণা

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য —ইছাপুর
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস —কাকদ্বীপ
মে: বি, এল, সাহা এণ্ড সন্স —ব্যারাকপুর
শ্রী রায় নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী —টাকী
মে: এ, বি ষ্টল —দক্ষিণ-বারাসত
শ্রী বি, চৌধুরী —যাদবপুর
শ্রী বি, সি, ঘোষ —যাদবপুর
শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্য —বি, ডি, কলোনি
মে: বি এন, লাইব্রেরী —কাশীপুর
শ্রীকমলেন্দু দাশগুপ্ত —কল্যাণী
শ্রী ডি, এন, ভট্টাচার্য্য —যাদবপুর
শ্রী ডি, সি, পণ্ডিত —যাদবপুর
মে: ডি, জি, লাইব্রেরী —মধ্যমগ্রাম
শ্রী জি, সি, রায় —শ্যামনগর
মে: গ্রন্থ কুটীর —বজবজ
মে: গুহ ষ্টোর —ব্যারাকপুর
শ্রীহরিপদ ঘোষ —ব্যারাকপুর
শ্রীইন্দ্রপাল সিং —দমদম
শ্রী জি, এন, দাস —কল্যাণী
শ্রী জি, আর সিংহ —নৈহাটী
শ্রী জে, রায় —কসবা
শ্রী কে, সি, ব্যানার্জ্জী —বরাহনগর
শ্রী কে, জি, দত্ত —দমদম (নাগের বাজার)
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মা —হেষ্টিং ষ্ট্রীট
শ্রীলোকনাথ চন্দ্র —বজবজ
শ্রীমাখনলাল নাগ —বারাসাত
শ্রী এস, চক্রবর্ত্তী —বেলঘরিয়া
শ্রী এন, পি, সাউ —শ্যামনগর
শ্রী ইন, চ্যাটার্জ্জী —ব্যারাকপুর
শ্রী এন, লি, মুখার্জ্জী —ঢাকুরিয়া
শ্রী এন, কে, কুণ্ডু —বরাহনগর
মে: নবাবগঞ্জ নিউজ এজেন্সী —ইছাপুর
শ্রীনিমাইচন্দ্র দাস —দমদম
শ্রী এন, জি, দাস —যাদবপুর
শ্রী এন, এন, ঘোষ —ব্যারাকপুর
শ্রীরামনারায়ণ দীক্ষিত —বাটানগর
শ্রীরঞ্জিৎকুমার রক্ষিত —বরাহনগর
শ্রী এস, বি, রায়চৌধুরী —বেলঘরিয়া
শ্রী এস, বি, রায়চৌধুরী —খড়দাহ
শ্রীসন্তোষ ঘোষ —ভাটপাড়া
শ্রী এস, ডি, প্রসাদ সিং —ব্যারাকপুর
শ্রীসতীশচন্দ্র ভৌমিক —যাদবপুর
শ্রীরামচন্দ্র খান —দমদম
শ্রীসুধীর বিশ্বাস —হাবড়া
শ্রীশঙ্করপ্রসাদ দাস —দমদম
শ্রীসতু ভৌমিক যাদবপুর

চব্বিশ পরগণা

শ্রী এস চাকলাদার —খড়দাহ
শ্রীসুকুমার অধিকারী —বরাহনগর
শ্রীতারাপদ পাল —পাণিহাটি
শ্রীতাপস ব্যানার্জ্জী —কাঁচড়াপাড়া
শ্রীবুধনরাম —দমদম

বীরভূম

শ্রীমাণিকচন্দ্র সাহা —রামপুরহাট
শ্রীমণিমোহন চন্দ্র —নলহাটী
শ্রীমন্মথকুমার ব্যানার্জ্জী —সিউড়ি

মানভূম

শ্রীবিমলকান্ত রায় —কুমারধুবি ও বরাকর
শ্রীঅবনীমোহন দাশ —পুরুলিয়া

বাঁকুড়া

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার —বিষ্ণুপুর
শ্রী বি, পাল —সোনামুখী
শ্রীবিজয়পদ দাস —বাঁকুড়া

জলপাইগুড়ি

শ্রী এ, ধর চৌধুরী —আলিপুরদুয়ার
শ্রীসতীশচন্দ্র বোস —মল-জংশন
শ্রীমতিলাল সরকার —কালচিনি

দার্জ্জিলিং

শ্রী ডি, এন, বড়াল —কালিম্পং
শ্রীমতী শচীরাণী দেবী —শিলিগুড়ি টাউন
রামপ্রসাদ সেন —দার্জ্জিলিং

কুচবিহার

শ্রীঅমূল্যরতন রায়গুপ্ত —দিনহাটা
শ্রীঅনিলরঞ্জন চক্রবর্ত্তী —কুচবিহার

সাঁওতাল পরগণা

শ্রী জে, এন, সাহা —পাকুড়
শ্রীমন্মথনাথ দাস —বৈদ্যনাথধাম
শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র —মধুপুর

ত্রিপুরা

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য —আগরতলা

উড়িষ্যা

শ্রী বি, দত্ত —রৌঢ়কেল্লা
মে: এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ব্রজরাজনগর

বোম্বাই

শ্রী জি, এম, ঘোষ চৌধুরী —বাইকুল্লা, বোম্বে
এস, বি, মোদক —বোম্বে

মধ্য প্রদেশ

মে: এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ভিলাই ও দ্রাগ

আসাম

শ্রীসুনীলকুমার মজুমদার —বদরপুর
শ্রীসুশীল চক্রবর্ত্তী —ডিগবয়
শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত —হাইলাকান্দি
মেসার্স শিলং স্পোর্টস —শিলং
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ —কমলপুর
শ্রী বি, কে, চৌধুরী —শিলচর
শ্রীমতী কনকরাণী গাঙ্গুলী —তিনসুকিয়া
শ্রী এম, আর, ভট্টাচার্য্য —মাকুমজং
শ্রীচিত্তরঞ্জন ভায়েল —তেজপুর
মে: পি, এস, জৈন এণ্ড কোং —ইম্ফল
শ্রী জে, চক্রবর্ত্তী —গোয়ালপাড়া
মে: ভাপাভাল লাইব্রেরী —ডিব্রুগড়
শ্রীআশুতোষ মিত্র —চবুয়া
শ্রী বি, চক্রবর্ত্তী —মোহনবাড়ী
শ্রীকালাচাঁদ বণিক —করিমগঞ্জ
শ্রীত্রিলোচন রায় —ধুবড়ী
শ্রীরমেশচন্দ্র আইচ —কোকরাঝড়

বিহার

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী —রঘুনাথপুর
শ্রীপরিতোষ মুখার্জ্জী —ধানবাদ
শ্রীসুজিতকুমার সরকার —কাতরাসগড়
শ্রীমনোমোহন চ্যাটার্জ্জী —মজঃফরপুর
মে: ক্যাপিটাল বুক ডিপো —রাঁচী
মে: গয়া মিউজিক্যাল ষ্টোরস —গয়া
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার —কাটিহার
শ্রীরাধারমণ মিত্র —মুঙ্গের
মে: অমৃতলাল থ্যাকার এণ্ড কোং —ঝরিয়া
শ্রীরামব্রিজপ্রসাদ —লোহারদাগা
শ্রী এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জী —ধানবাদ
মে: চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং —হাজারীবাগ টাউন
শ্রীদেবনারায়ণলাল —দিনাপুর
শ্রীবাচ্চ সিং —পাটনা
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ —সিন্দ্রি ও পাথারদিহি
শ্রীকরুণাসিন্ধু রায় —বেরমো
শ্রীকুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী —জামালপুর
শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস —বরজামদা
মে: ইউনাইটেড ডিষ্ট্রিবিউটর্স —টাটানগর

উত্তর প্রদেশ

মেসার্স মিকাডোস বেনারস নিউজ পেপার এজেন্সী —বেনারস
শ্রী এস, বি, মৈত্র —লক্ষ্ণৌ
শ্রীসুচারুমোহন গোস্বামী —নিউ দিল্লী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস —নিউ দিল্লী
মে: সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী —নিউ দিল্লী
মে: কিতাব ঘর —নিউ দিল্লী
মে: ইন্টারন্যাশানাল ষ্টোর্স —এলাহাবাদ
মে: শ্রীকৃষ্ণ বুক হাউস —লক্ষ্ণৌ

অর্থনীতিজ্ঞ মহলে এই নিয়ে পর্য্যালোচনা হয়েছে বেশ কিছুটা। অবশ্য সকল পরিবারের জন্যেই একটি ধরাবাঁধা বাজেট থাকতে পারে না, যাকে বলা যেতে পারে আদর্শ বাজেট বা অনুকরণীয় বাজেট। এর প্রধান কারণটাই হল—সকল ক্ষেত্রেই ব্যয়ের চাহিদা একরূপ নয়, মাসিক আয়ও হয় না সকল পরিবারের হুবহু একই প্রকার। কেউ অপরকে বলে দিতে পারে না এই অবস্থায় সাংসারিক খরচটি ঠিক এমনি হবে ; গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর এবং সেই সঙ্গে পরিবারের লোকদের রুচি ও দায়িত্ববোধই এক্ষেত্রে বড় কথা।

যেমন দেখা যায়, এমন অনেক আছে, বাজে খরচা (হাত-খরচ) বলতে যাদের কিছুই তেমন নেই—পান, সিগারেট, চা-কফি কিম্বা সেণ্ট পাউডার এ সবের জন্য যারা তাগিদ অনুভব করে না। আর একটি শ্রেণীর নাম করা চলে, যাদের বাজে খরচার অবাধ নেই, চা সিগারেট ইত্যাদি প্রায় সর্বক্ষণ মুখে মুখে, সেণ্ট পাউডার ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রীও না চলেই নয়। একটি পরিবারকে হয়তো ছেলেমেয়েদের সর্বোত্তম শিক্ষাদানে প্রচুর অর্থ ব্যয়েও বদ্ধপরিকর দেখা গেলো, আবার অন্যত্র এও দেখা দেখতে পাওয়া বিচিত্র নয়, যেখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে রয়েছে একটা অনিচ্ছা বা ঔদাসীন্য কিংবা নিতান্ত সাধারণ চেষ্টা ও অর্থব্যয় মাত্র। পোষাক পরিচ্ছদ ও খাওয়া-দাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়ে থাকে কোন কোন পরিবারে, আবার অনেকগুলি পরিবারে এসব অত্যাবশ্যক খাতেও বেশ ভেবে-চিন্তে অর্থাৎ আয়ের দিকে তাকিয়ে খরচ করতে দেখা যায়। সামান্য ডাল-ভাতেই সন্তুষ্ট এমন পরিবারের যেমন অভাব নেই, অপর দিকে তেমনি কতকগুলি পরিবার দেখা যাবে, যাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় মাছ-মাংস দুধ ডিম এগুলি প্রায় থাকা চাই-ই।

বড় সংসার বা পরিবারেই একটি অভিযোগ বা পরিতাপের সুর শুনতে পাওয়া যায়—বাস্তবক্ষেত্রে তাদের বাজেট অচল অর্থাৎ আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় মিল বা সমতা নেই। বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে বলতে চেয়েছেন, এমনি যেখানে অবস্থা, সেখানে হয় খরচের বিষয়গুলি কাট ছাট করতে হবে, নয় তো পারিবারিক আয় বাড়াতে হবে যেমন করেই হোক। জীবনযাত্রার মান যতটা উন্নত রাখতে চাওয়া হবে, আয়ের পরিমাণও সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত করার ব্যবস্থা যদি না হলো, সেক্ষেত্রে বাজেট অর্থহীন না হয়ে পারে না। একা পুরুষের রোজগারে সুষ্ঠুভাবে সংসার চলা যেখানে কঠিন, নারীকেও সেখানে আগিয়ে আসতে হবে অর্থ উপার্জনের জন্যে, প্রসঙ্গতঃ এইটি বলতে হয়।

সর্বোপরি ঘরোয়া বা পারিবারিক বাজেটের সাফল্য নির্ভর করে পরিবারের কর্তা ও আর সদস্যদের শুভবুদ্ধি ও ঐক্যমতের উপর। যে কোন মোটা বাজেট বেলায় প্রত্যেকের মনের ভেতর পরিষ্কার বোঝাপড়া হওয়া চাই এবং সেটি আগেভাগেই। বাজেট করে চলার পরিবর্ত্তে জীবনে যথেচ্ছাচার ও অমিতব্যয়িতাকে স্থান দিলে সুখের আশা সুদূরপরাহত, এ ভুললে চলবে না।

ক্লান্ত বীণায়

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যর্থ প্রাণের ব্যর্থতা নিয়ে
কি হবে গো আজ গান গেয়ে ?
জীবন-যুদ্ধে হাল ভেঙে গেছে
দিকহারা আজ আমি নেয়ে।
ফিরে গেছ তুমি মুছে গেছে প্রেম,
মিটে গেছে সব ভালবাসা।
যা কিছু মোর নিয়ে গেছে হায়
অতৃপ্ত ঝড় সর্বনাশা।
তবুও বলছি শুনছ বন্ধু
হবে হবে শেষ এ ব্যথারই।
তাই গো এখনও ক্লান্ত বীণায়
শেষ করিনিকো দরবারী।
এমন দিনে যে তুমিও বন্ধু
আত্মগ্রাহীর গোপন বেশে
মিথ্যেই ঘুরে মরবে দেখেছি
নিজেকে কি পর করবে শেষে ?
তবুও ডাকছি শুনছ বন্ধু
ফিরে এসো তুমি আমার মাঝে।
তাপিত এ প্রাণ জুড়াও জুড়াও
ডুব দিতে হবে জীবন-সাঁঝে।

বেকার

বীথি বসু

বন্ধু, তুমি এ দুর্দ্দিনে
ঠিকানা দিয়েছ যার,
শতেক চেষ্টা করেছি তবুও
দেখা হয় নাই তার।
আমি যে বেকার, বড় ঘৃণা তাই
জেগেছে তাহার প্রাণে,
তাই বুঝি আর দেখিয়া দেখে না
বুঝি কোন অভিমানে।
মাথা নীচু ক'রে যাই আমি তাই
তবুও তাহার প্রাণ—
একটু গলে না, ভাবি আজ বসে
এই কি প্রীতির দান ?
সিক্ত-প্রাণের বিমুক্ত ভাষা
খুলিয়া বলেছি যারে,
রুদ্ধ-কারার গোপন ব্যথাটি
অর্ঘ দিয়েছি তারে।
প্রীতির আঘাতে স্মৃতিরে চেয়েছি
মেলে নাই কিছু মোর,
সকলে যেমন চাহিয়াছে বুকে
তেমনি চেয়েছি ভোর।
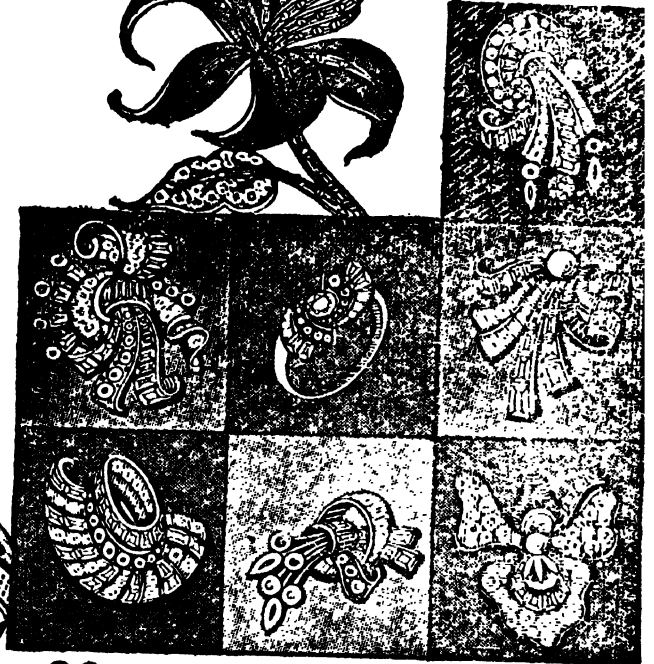
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
দোকানের পুরাতন ঠিকানা ১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

জন্মান্তর কি সম্ভব ?

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

জন্ম বলিতে সাধারণত উৎপত্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। যে বস্তু পূর্বে ছিল না তাহার সত্তা সম্বন্ধ (লাভ) বা পূর্বে বস্তুটি থাকিলেও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির দ্বারা যাহার জানিবার মত অবস্থা ছিল না, তাহারই (সেই বস্তুরই) ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জানিবার মত যোগ্য অবস্থা। পূর্বের মতটি অসৎকার্যবাদীর মত। এই মতের সমর্থক চার্বাক্, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি। দ্বিতীয় মতটি সৎকার্যবাদীর মত। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত * ইত্যাদি। পূর্বমতে উৎপত্তির পূর্বে ঘট কখনই ছিল না। দ্বিতীয়মতে উৎপত্তির পূর্বেও ঘটটি অনভিব্যক্ত অবস্থা বিশিষ্টরূপে ছিল। এই প্রবন্ধে জীবের জন্ম, জন্মান্তরই আলোচ্য ; অপরের উৎপত্তি আলোচনীয় নয়। আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জীবের জন্ম জানিতে পারিতেছি, সুতরাং এবিষয়ে সাধারণত সন্দেহ নাই ; কিন্তু জন্মান্তর অর্থাৎ এই বর্তমান জন্ম ব্যতীত পূর্ব ও পরজন্ম সম্ভব কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য। আবার জন্মান্তর বলিতে একই সন্তানের (ধারার) ভিন্ন ভিন্ন সন্তানী অর্থাৎ ব্যক্তির জন্ম এইরূপ, বৌদ্ধমত অনুসারে জন্মান্তর বুঝিলেও সন্দেহ দূরীভূত হইবে না। কারণ বৌদ্ধমতে সন্তানী ব্যতিরিক্ত সন্তানের পৃথক সত্তা না থাকায় আবার সন্তানী মাত্রই ক্ষণিক বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কাহারও জন্মান্তর নাই। অথচ জন্মান্তর লইয়া যে বাদানুবাদ তাহা এক স্থায়ী আত্মাকে সন্দেহ করিয়াই তাহার পৃথক্ পৃথক্ নূতন, পুরাতন জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে উদ্ভূত।

কেহ কেহ বলেন, 'জন্মান্তর নাই অর্থাৎ একটি জীবের এই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব কিছুর আরম্ভ, আর তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ।' এই মতের সমর্থকগণ লোকায়ত বা চার্বাক্ নামে প্রসিদ্ধ। এই নাম কোন ব্যক্তি বা দলের নাম নয়, কিন্তু যে মত লোকে আয়ত্ত অর্থাৎ ব্যাপ্ত তাহার নাম লোকায়ত। মোট কথা, যাহা অধিকাংশ লোকেই মানে তাহাই লোকায়ত মত। অধিকাংশ লোকেই শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে আত্মা মনে করিয়া তাহারই সুখবিধান ও দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করে।

আবার কেহ কেহ বলেন, এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত একজন আত্মা আছেন।

অপূর্ব দেহের সহিত সেই আত্মার সম্বন্ধকে তাহার (আত্মার) জন্ম বলে। এই বর্তমান দেহ ভিন্ন পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দেহের সম্বন্ধই জন্মান্তর। ইহা ন্যায়, বৈশেষিক সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতির মত। কিন্তু জন্মান্তর তবেই সম্ভব হয়, যদি দেহের অতিরিক্ত আত্মা থাকে ও দেহ-উৎপত্তি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহধারীর উৎপত্তি বিনাশ না হয়। দেহই আত্মা হইলে যে দেহের জন্ম বা মৃত্যু হয় ঠিক সেই দেহের পূর্বজন্ম সম্ভব নয়। যেহেতু আমরা কোথাও এরূপ দেখি না—সাবয়ব ঘট প্রভৃতির মধ্যে যে ঘট নষ্ট হইয়া যায়, সেই ঘট পুনরায় উৎপন্ন হয়। শরীরও সাবয়ব, সুতরাং তাহার পুনর্জন্ম সম্ভব নয়। আবার দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেহের ছায়া বা রূপ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়, আত্মাও যদি সেই ভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও তাহার জন্মান্তর সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে, দেহাদি-অতিরিক্ত আত্মা থাকিলে এবং তাহা অবিনাশী হইলে জন্মান্তর সম্ভব নতুবা জন্মান্তর অসিদ্ধ। এখন দেখা যাক এই দুইটি সম্ভব কি না।

পূর্বপক্ষ

দেহ-অতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। কারণ, সকলেই দেহকে আত্মা বলিয়া অনুভব করে ; দেহের অতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। দেহের মৃত্যুর পর দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ ভাবে বাহির হইয়া যাইতে বা জন্মের সময় দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায় না। সকলেই শরীরকে আমি বলিয়া বুঝে এবং তাহারই সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে নিজেকে সুখী, দুঃখী প্রভৃতি মনে করে। যেমন লোকে মনে করে আমি মানুষ, আমার নাম সুভাষ, আমি কলিকাতায় বাস করি, আমি খুব সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত মানুষ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, বা সুভাষ নাম, কলিকাতায় বাস প্রভৃতিও শরীর হইতে কোন অতিরিক্ত আত্মার সম্বন্ধে বুঝায় না। আর আমি বলিতে আত্মাকেই বুঝায় ; আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থকে লোকে আমি বলে না। সুতরাং এই দেহই আত্মা এবং তাহা চেতন। যেমন এই সাধারণ জলে বিদ্যুৎ পরিলক্ষিত না হইলেও যখন তাহা মেঘ-রূপে পরিণত হয় তখন তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে পঞ্চভূতের দ্বারা দেহ উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্চভূতে চৈতন্য না থাকিলেও দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হওয়ার কোন বাধা নাই।

উত্তরপক্ষ

যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে 'আমার শরীর' এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইত না। কারণ আমি বলিতে যখন আত্মাকে বুঝান হয়, আর সেই আত্মা যখন শরীর হইতে অভিন্ন, তখন "আমি শরীর বা মানুষ" এইরূপ ব্যবহারই সম্ভব, "আমার শরীর" এই ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে ? কেহ কি 'ঘটের ঘট, বা ঘটের কলস' এইরূপ ব্যবহার করে ? অথচ লোকে সকলেই 'আমার শরীর' এইরূপ ব্যবহার করে। যেখানে ষষ্ঠী ও প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হয় সেখানে ষষ্ঠ্যন্ত ও প্রথমান্ত পদার্থ দুইটি পরস্পর ভিন্নই হইয়া থাকে। আমার পিতা, আমার গৃহ ইত্যাদি। অতএব 'আমার শরীর কৃশ, স্থূল' ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা শরীর হইতে যে আত্মা অতিরিক্ত তাহা বুঝা যায়। যদি বলা যায় একই অভিন্ন বস্তুতে লোকে অনেক স্থলে গৌণ ভেদ ব্যবহার করে। যেমন রাহুর মস্তক, পাথরের প্রতিমা ইত্যাদি। রাহু ও মস্তক অভিন্ন বস্তু, পাথর ও প্রতিমা একই বস্তু। তথাপি লোকে রাহুর মস্তক, পাথরের প্রতিমা বলিয়া ভেদের ব্যবহার করে। সেইরূপ শরীর ও আত্মা অভিন্ন পদার্থ হইলেও 'আমার শরীর' এইরূপ গৌণ ভেদ ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না। যেখানে পরিষ্কার ভাবে সকলের অভেদ জ্ঞান থাকে সেখানেই গৌণ ভেদের ব্যবহার হয়। যেমন—রাহু ও মস্তক অভিন্ন বলিয়া সকলেরই জানা আছে, এইরূপ রাহুর মস্তক—এইরূপ গৌণ ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হয় ; কিন্তু দেহ ও

---

* অদ্বৈতবেদান্ত ভিন্ন অন্যান্য বেদান্তবাদীদের মতে কার্য সৎ। অদ্বৈতবেদান্তে যে সৎকার্যবাদের কথা আছে তাহা অসৎকার্যবাদ খণ্ডনের অভিপ্রায়ে। অদ্বৈতবাদী বাস্তবিক পক্ষে সৎকারণবাদী। তন্মতে কারণ হইতে কার্যের পৃথক্ সত্তা নাই।

আত্মা যে অভিন্ন, তাহা পরিষ্কার ভাবে সর্ববাদিসম্মতরূপে জানা নাই। অতএব এখানে দেহকেই অবলম্বন করিয়া 'আমার শরীর' এই ব্যবহার সম্ভব হইবে না। দেহ ও আত্মার অভিন্ন জ্ঞান অবিসংবাদিরূপে সকলেরই আছে—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও দেহকে আত্মা বলা যাইবে না। যথা—দেহকে আত্মা বলিলে প্রশ্ন হইবে যে, আত্মা চেতন বলিয়া দেহও চেতনসিদ্ধ হওয়ায় সাবয়ব দেহের প্রত্যেক অবয়বে এক একটি পৃথক পৃথক চৈতন্য আছে অথবা দেহের সমস্ত অবয়বে মিলিয়া একটি চৈতন্য। দেহ যে সাবয়ব তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি বল প্রত্যেক অবয়বে এক একটি পৃথক চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে এই দোষ হইবে যে একটি দেহে অনেক চৈতন্যের সমাবেশ হওয়ায়, বহু চেতন পদার্থের নিয়ন্তা ব্যতিরেকে ঐক্যমত না হওয়ায়, শারীরিক ব্যবহার যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। একজন চেতন যদি পূর্বদিকে যাইতে ইচ্ছা করে আর একজন যুবকও পশ্চিম দিকে যাইতে ইচ্ছা করিতে পারে। তাহার ফলে শরীরটি বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে নতুবা সকলের সমান বল হইলে শরীর আর কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারিবে না।

আর যদি বল শরীরের সমস্ত অবয়ব অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, নাড়ী, স্নায়ু, ত্বক প্রভৃতি সমস্ত অংশ মিলিয়া শরীরে একটি চৈতন্য উৎপন্ন হয়—তাহার উত্তরে বলিব—যেমন প্রদীপ, সলতা, তেল, অগ্নি মিলিত হইয়া একটি প্রকাশ-কার্য সম্পাদন করিলেও কোন একটি বা দুইটির অভাব হইলে আর প্রদীপ জ্বলে না, সেইরূপ শরীরের কোন একটি হাত বা পা কাটিয়া গেলে, তাহার অভাবে চৈতন্য নষ্ট হইয়া যাউক। অথচ বহু লোকের কাটা হাত ভাঙ্গা পা ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকে বা চেতনই থাকে। যদি বল শরীরের রূপ সমস্ত শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, শরীরের একাংশ নষ্ট হইয়া গেলে সেই অংশের রূপ না থাকিলেও অন্য অংশে যেমন রূপ থাকে সেইরূপ চৈতন্য ও সর্ব শরীরের গুণ বলিয়া শরীরের একাংশ নষ্ট হইয়া গেলে ও অপর অংশে চৈতন্য থাকিতে বাধা কি? তাহার উত্তর এই যে, মৃতশরীর যখন পড়িয়া থাকে, তখন তাহাতে রূপও থাকে; সেইরূপ চৈতন্যও থাকে না কেন? সুতরাং চৈতন্য, রূপের মত, দেহের গুণ নয় বা দেহের ধর্ম নয়—ইহা সিদ্ধ হওয়ায়, দেহ-অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিয়া চৈতন্যকে তাহার ধর্ম বা স্বভাব বলিতে হইবে। যদি বল, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত চৈতন্য থাকাই শরীরের স্বভাব, এই জন্য মৃতদেহে চৈতন্য থাকে না। ইহার উত্তরে বলিব—বস্তু নষ্ট (অদৃশ্য) না হওয়া পর্যন্ত যে ধর্ম বস্তুতে অনুভূত হয়, তাহাই তাহার স্বভাব হয়। যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা ইত্যাদি। বস্তু বিদ্যমান থাকিতে তাহার স্বভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং মৃতশরীর পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও যখন চৈতন্য অনুভূত হয় না, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, চৈতন্য শরীরের স্বভাব নয়।

পূর্বপক্ষ
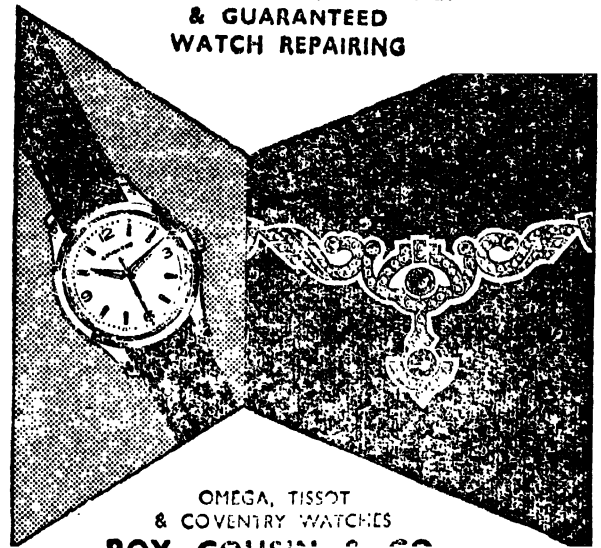
বস্তু অনুভূত হইলেও কোন প্রতিবন্ধক বশত অনেক সময় তাহার স্বভাবের অদর্শন দেখা যায়। যেমন উষ্ণতা ও দাহকতা বহ্নির স্বভাব কিন্তু সেই বহ্নি বিশেষ মণি বা মন্ত্রাদি যুক্ত হইলে বহ্নি থাকা সত্ত্বেও তাহার দাহকতা বা উষ্ণতা অনুভূত হয় না। কারণ বিদ্যমান সত্ত্বে যাহার জন্য কার্য উৎপন্ন হয় না—তাহাকে প্রতিবন্ধক বলে। বহ্নিরূপ কারণ থাকা সত্ত্বেও মণি বা মন্ত্র বশত দাহকার্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া দাহের প্রতি মণি প্রতিবন্ধক। সেইরূপ শরীরের স্বভাব চৈতন্য; কিন্তু মৃত্যু, মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তিরূপ প্রতিবন্ধক বশত মৃতাদি শরীরে চৈতন্য অনুভূত হয় না। এই ভাবে চৈতন্যকে শরীরের স্বভাব বলিলে কোন অনুপপত্তি না থাকায় শরীরের অতিরিক্ত আত্মার কল্পনা করা অনর্থক ক্লেশমাত্র।

উত্তরপক্ষ

কারণ বিদ্যমান সত্ত্বে, যাহার জন্য কার্য উৎপন্ন হয় না—অথচ যাহাকে পরিহার করিয়া কার্য উৎপাদন করা সম্ভব তাহাকেই প্রতিবন্ধক বলে। বহ্নি বিদ্যমান সত্ত্বে চন্দ্রকান্ত মণির সংযোগ বশত দাহ উৎপন্ন হয় না, সেই চন্দ্রকান্ত মণিকে সরাইয়া দিয়া বা সূর্যকান্ত মণির দ্বারা চন্দ্রকান্ত মণির শক্তি অভিভূত করিয়া বহ্নির দাহ-উৎপাদন করা যায় বলিয়া চন্দ্রকান্ত মণিটি প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু শরীর বিদ্যমান সত্ত্বেও মৃত্যু বশত শরীরের চৈতন্য উৎপন্ন হয় না—এই কথা বলিলে চৈতন্যের প্রতি মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক বলা যাইবে না। যদি এমন হইত, মৃত্যুকে দূর করিয়া বা অভিভূত করিয়া শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন হইত তাহা হইলে অবশ্য মৃত্যুকে চৈতন্যের প্রতিবন্ধক বলা যাইত। কিন্তু তাহা ত সম্ভব হয় না।

আজ পর্যন্তও কেহ মৃত-শরীরে চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারেন নাই। অতএব মৃত্যু চৈতন্যের প্রতিবন্ধক নয় কিন্তু শরীরের সহিত প্রাণের শেষসংযোগের ধ্বংসই মৃত্যু। আরও কথা এই যে, ভাবপদার্থ ভিন্ন যাহার অত্যন্তাভাবটি কার্যের প্রতি কারণ হয়, তাহার প্রতিযোগীকে প্রতিবন্ধক বলে। যেমন চন্দ্রকান্ত মণির অত্যন্তাভাব দাহের প্রতি কারণ হয় বলিয়া তাহার প্রতিযোগী চন্দ্রকান্ত মণিটি প্রতিবন্ধক হইতে পারিল। মৃত্যু হইতেছে প্রাণের শেষ সংযোগ ধ্বংস। ঐ ধ্বংসের প্রাগ্‌ভাবকে অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাগ্‌ভাবকে শরীরে চৈতন্যের প্রতি কারণ বলিলেও যেহেতু মৃত্যুটি প্রাগভাবের প্রতিযোগী আবার মৃত্যুর প্রাগভাবটি ফলত, শরীরের সহিত প্রাণের শেষ সংযোগরূপ ভাবপদার্থ হওয়ায়, তাহার প্রতিযোগী মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক পদার্থ বলা যাইবে না। আর মৃত্যুর অত্যন্তাভাবটি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহার প্রতিযোগীরূপেও মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক বলা যাইবে না।

পূর্বপক্ষ

দুই বা তাহার অধিক বস্তুর সংযোগে নূতন নূতন গুণ বা স্বভাব উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন চূণের সহিত হলুদের সংযোগ হইলে লাল রং উৎপন্ন হয়। কেবল দধি কফাদি বর্দ্ধক হইলেও শর্করাদি সংযুক্ত ঐ দধি জ্বরাদি নাশক ও পুষ্টিকারক হয়। আধুনিক চিকিৎসকগণ মানুষের শরীরের অংশবিশেষ অকর্মণ্য হইয়া গেলে অনেক সময় বানর প্রভৃতি পশুর অংশবিশেষ শরীরে সংযুক্ত করিয়া দেন। তাহার ফলে অনেক সময় তাহার (রোগীর) পূর্ব স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া যায়। বৃদ্ধের শরীরেও যৌবনের আবির্ভাব হয় ইত্যাদি। সেইরূপ কেবল শরীরে চৈতন্য না থাকিলেও প্রাণ, মন, বিশেষ স্নায়ু বা শরীরের কোন সূক্ষ্ম অংশ (যাহা মৃত্যুকালে থাকে না) প্রভৃতির সংযোগ বশত শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। মৃত্যুকালে শরীর হইতে ঐ প্রাণ প্রভৃতি বিযুক্ত হওয়ায়, কারণের অভাববশত চৈতন্য থাকে না ইহাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ইত্যাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ না থাকায় জন্মান্তরবাদ অসিদ্ধ।

উত্তরপক্ষ

চূণ বা হলুদে পূর্ব হইতেই লাল রংটি অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল; ঐ উভয়ের সংযোগরূপ অভিব্যঞ্জকের ফলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যদি চূণ বা হলুদে লাল রং না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সংযোগ বশত উহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারিত না। কারণ গুণ বা স্বভাব কখনও কেবল সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। গুণ দ্রব্যের ধর্ম এবং দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া গুণের প্রতি দ্রব্যকে অবশ্যই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি দ্রব্য গুণের প্রতিকারণ না হইত, তাহা হইলে চূণ ও হলুদের সংযোগের ফলে লাল রংটি ঐ চূণে বা হলুদে উৎপন্ন না হইয়া জলে বা মাটিতে উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে, লাল রংএর প্রতি চূণ এবং হলুদও কারণ। আর চূণও হলুদকে যখন লাল রংএর প্রতিকারণ বলিয়া স্বীকারই করিতে হইল, তখন তাহাদের সংযোগকে কারণ স্বীকার না করিয়া অভিব্যঞ্জক মাত্র স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আর এইরূপ দেখাও যায়—কুসুমে পূর্ব হইতে গন্ধ থাকে, গব্য ঘৃত সংযোগ করিলে সেই গন্ধ অভিব্যক্ত হয় বলিয়া গব্য ঘৃত বা তাহার সংযোগটি গন্ধের অভিব্যঞ্জক মাত্র। দধি শর্করার সংযোগ, মানুষ-শরীরে বানরের থায়র্ড গ্ল্যাণ্ড সংযোগ ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। শরীর বা মনে নানা প্রকার গুণ বা স্বভাব অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে। যথোচিত অভিব্যঞ্জক (Operation প্রভৃতি) দ্বারা সেই সব গুণ বা স্বভাবের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। কেবল সংযোগবশত কোন স্বভাব উড়িয়া আসে না। সুতরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির সংযোগ বশত যদি চৈতন্য উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ চৈতন্য, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বা প্রাণ প্রভৃতি বস্তুর এক বা ততোধিক বস্তুতে পূর্ব হইতে অনভিব্যক্ত ভাবে ছিল। সংযোগের ফলে অভিব্যক্ত হয়; বিয়োগের ফলে পুনরায় তিরোহিত হয়। কিন্তু শরীরে যে চৈতন্য থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য স্বীকার করিলে শরীরের বেলায় যে দোষ হয়, ইন্দ্রিয়পক্ষেও সেই দোষের আপত্তি হইবে। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্যপক্ষে আরও দোষ এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় পূর্বে বহু বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল; পরে যখন চক্ষু ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া যায়, তখন মানুষ পূর্ব প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুগুলি স্মরণ না করুক; কারণ চক্ষুরূপ আত্মা ত মরিয়া গিয়াছে। কর্ণ প্রভৃতি ত চক্ষু হইতে ভিন্ন। চক্ষুর অনুভূত বস্তু কর্ণ প্রভৃতি স্মরণ করিতে পারে না। অন্যের অনুভূত বস্তু অন্যে কখনও স্মরণ করে না। অথচ মানুষ পরে যখন চক্ষু হারায় তখনও চক্ষুর দ্বারা পূর্ব অনুভূত বস্তুর স্মরণ করে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন স্থায়ী কোন চেতন পদার্থ আছে; যাহা পূর্বাপর বিষয়ের অনুভব স্মরণ করিতে পারে।

চৈতন্য যে মনের ধর্ম নয়, তাহা একটু পরে দেখান হইবে। বাকি থাকিল প্রাণ। এখন দেখা যাক্ চৈতন্যটি প্রাণের ধর্ম বা স্বভাব কি না। প্রাণে চৈতন্য থাকে না। কারণ সুষুপ্তির সময় প্রাণ শরীরে সংযুক্ত থাকে অথচ ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না বা সুষুপ্তি কালে কোন জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য থাকে না। যদি বলা যায়—সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে নিজের সত্তা বা আনন্দ প্রভৃতি স্মরণ করে বলিয়া সুষুপ্তি সময়ে সামান্যভাবে চৈতন্য বা জ্ঞান থাকে, মনের সংযোগ না থাকায় বিশেষ জ্ঞান হয় না। প্রাণরূপ আত্মার সামান্য জ্ঞানের প্রতি শরীর সংযোগটি কারণ, আর বিশেষ জ্ঞানের প্রতি প্রাণে শরীর ও মনের সংযোগই কারণ। সুতরাং চৈতন্য প্রাণের ধর্ম হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিব, তোমাদের (পূর্বপক্ষীর) মতে প্রাণে চৈতন্য স্বীকার করায় প্রাণকে আত্মা বলিতে হইবে। কারণ আত্মা চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। অথচ জন্মান্তর স্বীকার না করায় প্রাণকে বিনাশশীল বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা প্রাণকে নিত্য স্বীকার করিলে শরীরের জন্মের পূর্বে বা পরে প্রাণের সত্তা থাকায় জন্মান্তর সিদ্ধ হইতে পারিবে। প্রাণ বিনাশী হইলে, বিনাশী ভাবপদার্থ মাত্রই উৎপত্তিশীল হয়, এবং উৎপত্তিশীল দ্রব্য সাবয়ব হয় বলিয়া প্রাণের উৎপত্তি এবং সাবয়বত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

সাবয়ব স্বীকার করায় পূর্বের মত প্রশ্ন হইবে যে প্রাণের প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য উৎপন্ন হয়, অথবা সমস্ত

অবয়বে একটি চৈতন্ত উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্ত স্বীকার করিলে এক শরীরে অনেক চেতনের সমাবেশ বশত পূর্বের মত শরীরযাত্রার অব্যবস্থা হইবে। আর সমস্ত অবয়বে একটি চৈতন্ত স্বীকার করিলে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য অবস্থায় প্রাণের এক বা একাধিক অবয়বের বিনাশ বশত চৈতন্তও নষ্ট হইয়া যাইবে। অথচ তাহা হয় না। সুতরাং প্রাণে চৈতন্ত নাই যদি বলা যায় সমস্ত বস্ত্রে একটি রূপ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; বস্ত্রের একাংশ ছিন্ন হইলে বা বস্ত্রে কিয়দংশ যোগ করা হইলে নূতন নূতন রূপ উৎপন্ন হয়; বস্ত্র কখনও নীরূপ হয় না; সেইরূপ প্রাণের সমস্ত অবয়বের একটি চৈতন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার (প্রাণের) একাংশ নষ্ট হইলেও চৈতন্ত নষ্ট হইবে কেন? যতক্ষণ প্রাণের একটি অবয়বও থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে চৈতন্ত থাকিবে; অথবা নূতন নূতন চৈতন্ত উৎপন্ন হইবে। সুতরাং চৈতন্তের একেবারে বিনাশের আপত্তি হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলিব যে, দ্রব্যের অবয়বের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে অবয়বী পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ পূর্ব-অবয়বী থাকে না নূতন অবয়বীই উৎপন্ন হয়। পূর্বে যে বস্ত্রে যতগুলি সূত্র ছিল, পরে এক-দুই বা অধিক সূত্র যদি সেই বস্ত্র হইতে বিচ্যুত হয় বা তাহাতে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঠিক পূর্ব-বস্ত্র আর থাকে না, নূতন বা অন্য বস্ত্রই উৎপন্ন হয়, মোট কথা, বস্ত্রটি ভিন্ন হইয়া যায়। বস্ত্র ভিন্ন হওয়ার ফলে তাহার রং-ও পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ অন্য রং তাহাতে উৎপন্ন হয়। দ্রব্য ভিন্ন হইলে তাহার গুণও অবশ্যই ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ প্রাণ সাবয়ব বলিয়া বাল্য যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থাতে তাহার অবয়বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়ায় অবয়বী রূপ প্রাণও ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন হয়—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অবয়বী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হওয়ায় তাহার চৈতন্যস্বরূপ গুণও ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন হইবে—ইহা অনস্বীকার্য। তাহা হইলে বাল্যে যে চেতন প্রাণরূপী আত্মা ছিলেন যৌবনে সেই আত্মা না থাকায়, পরন্তু ভিন্ন আত্মা উৎপন্ন হওয়ায় লোকে বাল্যের অনুভূত বিষয় বা ঘটনাকে যৌবনে স্মরণ করিতে পারিব না। কারণ বাল্যের প্রাণাত্মা ভিন্ন, যৌবনের প্রাণাত্মা ভিন্ন বলিয়া বাল্যে অনুভূত আত্মার বিষয়কে যৌবনের আত্মা স্মরণ করিতে পারে না। অথচ সকলেই বাল্য যৌবনের ঘটনা রোগাদি বিশেষ-প্রতিবন্ধক না থাকিলে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে স্মরণ করিয়া থাকে। এই স্মরণের নিয়ম বশত স্বীকার করিতে হইবে—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এক অপরিবর্ত্তিত স্থায়ী নিরবয়ব আত্মা থাকেন—যাহার ফলে পূর্ব-স্মরণ প্রভৃতি সম্ভব হয়। শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাবয়ব বলিয়া পরিবর্তনশীল হওয়ায় স্মরণের ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ইহারা আত্মা নয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রভাবতী বিশ্বাস

হে চিরপথিক, পথ চল, পথ চল।
দুটি নয়নের কাজল মায়ায়
ছি ছি বেদুইন, বাঁধিবে তোমায়
সুদূর ডাকিছে হাতছানি দিয়ে
চল চল তুমি চল।

ভুবন-ভরা সে রূপের মাধুরী
পান কর তুমি, দুটি আঁখি ভরি
পিপাসা মিটিবে; অমিয়-ধারাতে
প্লাবিবে হৃদয়তল।
অরূপ রতনে খুঁজে নেবে যদি
পথ চল, পথ চল।

ওই শোন তার বাঁশরীর ধ্বনি
ভুবন ভরিয়া উঠে রণি' রণি'
মধুর সে বাণী শুনিতে দেয় না
ধরণীর কোলাহল।
তোমার আশায়, ডাকে সে তোমায়
চল তার কাছে চল।

সারাটি জীবন যারে ফির খুঁজে
মরণের বেশে আসিবে সে নিজে
মিলন-সোহাগে ধন্য হবে যে
বিরহের আঁখিজল।
তীর্থরাজের চরণে ঢালিবে সকল তীর্থফল।
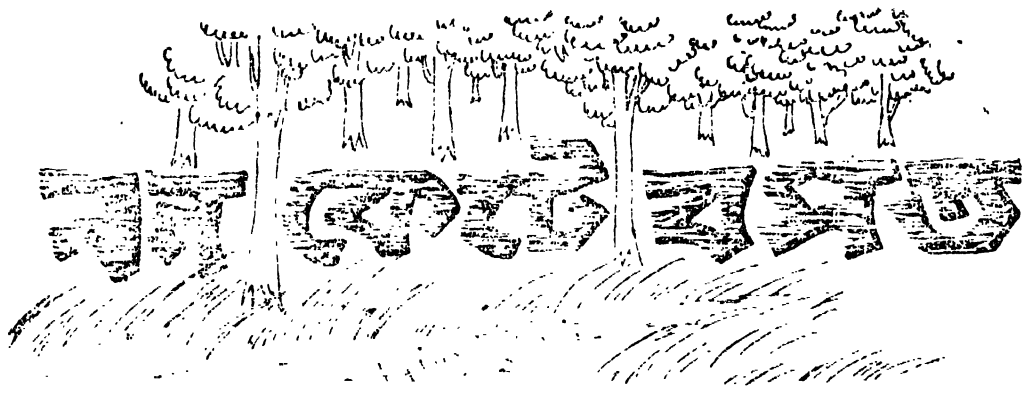
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

তেরো

চৌধুরিগঞ্জ অবধি রাস্তার নিশানা। জগা সেই রাস্তা ধরে চলেছে। চলা আর কি, একরকম দৌড়ানো। রাস্তায় বেরুলেই জগার এই কাণ্ড, ধীরে সুস্থে পা ফেলা কোষ্ঠিতে লেখে না। পিছনে বলাই, সে হাঁপাচ্ছে। আস্তে রে জগা, আস্তে। আবার ওরই মধ্যে রসিকতা করে নেয় একটু: এত ছুটছিস কেন রে? দজ্জাল মেয়েটার ভয়ে? উঁহু, সে পিছনে নেই। আস্তে চল।

উঁচু জায়গা হল তো বন-জঙ্গল, নাবাল হল তো জল। বনের গাছ-পালা কেটে নাবাল জমির উপর মাটি ফেলে হাত চারেক চওড় রাস্তা টেনে নিয়ে গেছে। সেই আরো বিপদ। কাটা গাছের গোড়াগুলো শূলের মতন পায়ে খোঁচা দেয়। নতুন তোলা মাটিতে ঠোক্কর লাগে পায়ে। জগার লাগে না, বোধ করি শহুরে ঘোড়ার মতন পায়ের তলায় লোহার নাল বাঁধিয়ে নিয়েছে। নয়তো ছোটে কেমন করে ঐ রাস্তায়? বলাই পারে না—রাস্তা ছেড়ে সে পাশে অপথে চলে যায়, জলে নেমে পড়। গোটা দুই-তিন খাল বাঁধা হচ্ছে, কাজ শেষ হয়নি এখনো। তা জগার কাণ্ড দেখ, তিলেক দ্বিধা না করে খালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তরতর করে সাঁতরে চলে গেল পানকৌড়ির মতন। রাস্তাটা করেছে কিন্তু নাকের সোজা। বারোবেঁকির প্যাঁচে প্যাঁচ যত ঘুরতে হত, সংক্ষেপ হয়ে গিয়ে বোধ করি তার সিকিতে দাঁড়িয়েছে। আর সত্যি সত্যি যখন পাকা রাস্তা হয়ে মোটর চলবে, তখন কুমিরমারি একেবারে ঘরের দুয়ারে। পলক ফেলতে না ফেলতে পৌঁছে দেবে।

সাঁইতলা পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিস্তর ক্ষণ আগে এসেছে তবু। নৌকো হলে দিনের মধ্যে আসা ঘটত না। জগা বলে, আলায় চল রে বলাই আগে। এত বেশি উতলা হয়ে পড়ল কেন বড়দা? পনের-বিশ হাত বাঁধ ভেঙেছে, তার মধ্যে আজব ব্যাপার কি হল? মাটির বাঁধ ভাঙবেই জলের তোড়ে। ধানকর নয় যে লোণা জল ঢুকে সবুজ ধানচারা রাঙা হয়ে মরে যাবে। চারা মাছ কিছু বেরোতে পারে, কিন্তু গুঁড়ো ডিমও ঢুকবে তেমনি জলের সঙ্গে। ভাঙনের মুখে গোটাকয়েক খোঁটা পুঁতে খোঁটার গায়ে খড় জড়িয়ে দিয়ে জলের টান রুখে দাও আগে। মাছ ঠেকাও। ধীরেসুস্থে মাটি এনে ঢালো তারপরে। ধানচাষীর মতন বুক চাপড়ে হাহাকারের কোন হেতু নেই।

আলায় একলা পচা। গগন বাঁধে গেছে লোকজন জোগাড় ক[...] নিয়ে। ভাঙা জায়গায় মাটি ফেলছে, আর খুঁজে খুঁজে দেখছে ঘো[...] হয়েছে কিনা অন্য কোথাও। অর্থাৎ কোনখানে ছিদ্র হয়ে গাে[...] জল চুঁইয়ে আসছে কিনা ভিতরে। মাটি ধুয়ে ধুয়ে ঐ সরু ছিদ্র এ[...] সময়ে বড় হয়ে নদীস্রোতের পথ করে দেয়। গোড়া থেকে সত[...] হলে আখেরে হাঙ্গামা ও খরচান্ত হয় না। বাঁধের আগাগোড়া চক্ক[...] দিয়ে বেড়াচ্ছে তাই গগন। পচা বাবু-মানুষ—পেটের দায়ে আ[...] যায় বটে কিন্তু জলকাদা মাখতে সে বড় নারাজ। আলার পাহার[...] রয়েছে সে। বলে, কালীতলার ঐ দিকটা চলে যাও জগা-দা। বে[...] দূর যায়নি, পেয়ে যাবে।

বলাই বলে, গিয়ে কি হবে? হাক্লান্ত হয়ে এসে আমরা [...] আর কোদাল ধরতে যাব না। পেট চোঁ-চোঁ করছে—ঘরে চা[...] জগা, ভাত চাপিয়ে দি গে। চালও বুঝি বাড়ন্ত! চাট্টি চা[...] দিয়ে দে পচা।

ভাত নামিয়ে লঙ্কা-তেঁতুল এবং গুড়-তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নি[...] এই তো দু-খানা তরকারি। চেষ্টা করলে মাছও মিলত, কিন্তু [...] সবুর সয় না। পরিতোষের খাওয়া সেরে গড়িয়ে পড়ল মাদুর পেতে[...] ঘুম তো নয়, কেউ যেন মেরে রেখে গেছে দৈত্যসম ছোঁড়া দুটোকে[...] ছুটোছুটি করে কত কাতর হয়ে পড়েছে, ঘুমের এই ধরন দেখে বো[...] যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে চোখ রগড়ে জগা উঠে বসল, ত[...] বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

ওঠ রে বলাই। কি হল? জাগবি নে মোটে তুই?

বলাইর পা ধরে ঝাঁকি দেয়। উঁ—বলে একবার চোখ [...] দরাজ মাদুর পেয়ে পা ছড়িয়ে সে পাশ ফিরল।

এক ছিলিম তামাক খাওয়ার দরকার মউজ করে। ঘুমের আ[...] যেটুকু হল, তাতে জুত হয়নি। তামাক আছে, কিন্তু গুড় শুকি[...] গিয়ে বিস্বাদ। তামাক টানছি না শুকনো লাউপাতা—সেঁ[...] লাগে না গলায়। ক'টা দিন ছিল না, সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে [...] এর মধ্যে।

বলাই ঘুমোক, জগা আলায় চলল। গগন ফিরেছে এতক্ষণে। আড্ডা জমবে, তামাক কত খাবে খেও না।

গগন দাসের আলা মেছোঘেরির আর দশটা আলার মতন [...]

অপূর্ব

সৌন্দর্যের

জন্যে...

হিমালয় বোকে

শ্রেষ্ঠ

প্রসাধন
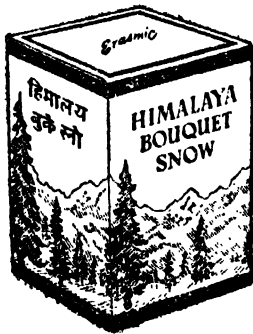
স্নিগ্ধ এবং সুগন্ধ হিমালয় বোকে স্নো আপনার ত্বককে মসৃণ এবং মোলায়েম রাখে। মখমলের মত হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার আপনার লাবণ্যর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার

HBS. 15–X52 BG

এরাসমিক কোং লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক
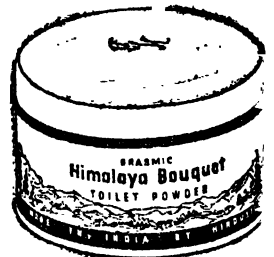
ছ-চালা ঘর। সাঁইতলা তল্লাটের মধ্যে ঘরের মতন ঘর বটে একখানা। বাহারটা আস্তে আস্তে জমেছে। তিন দিকে এখন মাটির দেয়াল। এক পাশের দাওয়া গরানের ছিটের জব্দ করে ঘিরে নিয়ে চৌকাঠ-দরজা বসিয়েছে। গগনের শোবার ঘর, খাতাপত্র এবং হাতবাক্স সেখানে। এই ঘরে তালা দিয়ে রাখে যখন সে বাইরে কোথাও যায়।

আলা চুপচাপ একেবারে। এ সময়টা এমন হওয়ার কথা নয়। কাদামাটি-মাখা জন তিন-চার পুকুরঘাটে হাত-পা ধুচ্ছে। জগা জিজ্ঞাসা করে, মাটি কাটছিলে তোমরা? কাজকর্মের কত দূর?

আজ শেষ হয়ে গেল।

বড়দা নেই?

আছে বই কি? হিসেবপত্র হল এতক্ষণ। পয়সা-কড়ি মিটিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে।

কামরায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে জগা হেসে উঠল: একা একা ধ্যানে বসেছ নাকি বড়দা? আলা ভোঁ-ভোঁ করছে, মানুষজনের কি হল?

সত্যি, হাসির ব্যাপার নয়। এত দিন সঙ্গে সঙ্গে আছে, এমন ধারা দেখা যায়নি আর কখনো। কামরার মাঝখানটায় টেমি জ্বলছে, রাঙা লাল কেরোসিনের ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। আলোর সামনে দু-হাতে মাথা চেপে গগন ঝিম হয়ে বসে। খাওয়ার সময়টাও আলো জ্বালে না, মাছের কাঁটা অন্ধকারে আন্দাজে বেছে ফেলে, সেই মানুষ অহেতুক কেরোসিন পোড়াচ্ছে। ভয় হল জগন্নাথের।

হল কি তোমার? কি ভাবছ?

গগন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, আয় জগা! মনটা মিইয়ে আছে। জলের নিচে যথাসর্বস্ব ঢেলে দিয়েছি। দু-চার পয়সা এদ্দিনে যা রোজগারপত্তোর হল, বাঁধের মাটি খেয়ে নিল সমস্ত। উল্টে পাঁচ-টাকার মতন দেনা। তার উপরে পিওন এসেছিল আজ আবার। কাল আমারই। বড় বড় পারশেমাছ খাইয়েছিলাম সেদিন, সেই লোভে পিওন নিত্যি নিত্যি আসতে লেগেছে। এসে মাথায় মুষল মেরে গেল।

চিঠি?

এদ্দূর আসছে, খালি হাতে আসে কি করে! সেদিন, এই ধরো, খামের চিঠি নিয়ে এলো। উনুনে দিয়ে অবসর হলাম। আবার আজ। আগের চিঠি বয়ারখোলায় তৈলক্ষের বাড়ি থেকে ঠিকানা কেটে এখানে পাঠায়। এবারে সরাসরি চলে এসেছে। তার মানে, এই আস্তানাও জেনে ফেলেছে। কেমন করে জানল, রোজ রোজ এত সমস্ত কি লেখে—দেখিই না খুলে। বুঝলি জগা, ঐ খোঁচাটাই হল কাল। চিঠি পড়ে ফেলে সেই থেকে মাথা ঘুরছে আমার।

জগার ভাল লাগে না। জুত করে এক ছিলিম তামাক খেতে এসে একঘেয়ে কাঁদুনি শুনবে এখন বসে বসে? সংসার জোটানোর কথাটা মনে ছিল না যে ফ্যাচাং আছে পিছনে? বলে, কবে ফুর্তি লাগাও বড়দা। মাথা ঘোরার জবর ওষুধ। মানুষজন দেখতে পাচ্ছিনে—কটা দিন ছিলাম না, তার মধ্যে মরে গেছে নাকি সমস্ত?

মাছের খাতা বন্ধ হবার দাখিল। মানুষ আসতে যাবে কোন কাজে এখন?

বলতে বলতে গগন কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে: বাদাবনের যেখোরে সত্যি সত্যি মেরে ফেলবি? এই তোর ধর্ম হল রে জগা?

জগা বলে, আমি ছাড়া আর লোক নেই?

বলাইটাকেও যদি রেখে যেতিস—

জগা-বলাই একই কথা। এ তোমার অন্যায় বড়দা। জগা তোমায় চিরকাল আগলে এক জায়গায় বসে থাকবে?

কিন্তু চালায় কে? দু-দুবার এর মধ্যে লোক বদলেছি। ছাগলের পায়ে যদি ধান পড়ত! বারোবেঁকি পার দিয়ে মাছ নিয়ে পৌঁছতে বেলা দুপুর করে গেলে। খদ্দের নেই আর তখন, মাটির দর। ব্যাপারিরা তাই মাল কিনবার গা করে না এখানে। লোকেও তেমন জাল নিয়ে বেরুচ্ছে না।

জগা উঠে দাঁড়াল বলে, বারোবেঁকি আর ক'দিন? তোমার রাস্তা—ডাঙার পথে আমরা এলাম। মাছ এর পরে এক দণ্ডে পৌঁছে দেবে। বেরিয়ে এসো দিকি। গানবাজনা হোক একটু। নয় তো পড়। কী ঘরের মধ্যে বসে প্যানপ্যানানি!

বাইরে এসে উচ্চকণ্ঠে বলাইয়ের নাম ধরে ডাকে। পচাকে ডাকে। রাধেশ্যামকে। খোল দেয়ালে টাঙানো। চাটি মেরে পাড়াময় জানান দিয়ে দিল। গগনকে বলে, জুত করে এক ছিলিম চড়াও দিকি বড়দা। তামাক না খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। ঘুম ভেঙেই তোমার কাছে ছুটেছি।

তামাক সেজে টানতে টানতে এসে গগন জগার হাতে হুঁকো দিল। হুঁকো দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলে ওঠে, দশটা টাকা কর্জ দিতে পারিস জগা?

জগা বলে, বড়মানুষ তুমি বড়দা। শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না। হর ঘড়ুই কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে তোমার জন্য শীতলপাটি বয়ে আনে। তোমার আবার টাকার কি টান পড়ল?

শীতলপাটির কথায় গগনের লজ্জা হয়। কৈফিয়ৎ দিচ্ছে ফলাও করে: সে এক কাণ্ড হল। দুপুরবেলা ঘুম হচ্ছে না, গরমে এপাশ-ওপাশ করছি। হর ঘড়ুই সেই সময়টা এলো। বলে, সামনে বোশেখ মাস, গরমের হয়েছে কি এখন? ফুলতলায় তোফা শীতলপাটি পাওয়া যাচ্ছে। চোদ্দ সিকের পয়সা তখন গাঁটে, পাশ ফিরতে গায়ে ফোটে। ঝড়াকসে বের করে দিলাম ঘড়ুইয়ের হাতে। আখের ভাবলাম না। আবার তা-ও বলি তখন তো জানি নে বাঁধ ভেঙে এক কাঁড়ি পয়সা গুণোগার যাবে। আর পিঠ পিঠ পিওন শালা এসে পড়বে। মাছ খেতে এসেছে! মাছ না দিয়ে নুড়ো জেলে দিতে হয় বেটার মুখে।

পরক্ষণেই আবার অনুনয়ের সুরে বলে, দশটা টাকা দিবি আমায় জগা? পিওন বেটা অনেক দূর থেকে আশামুখে এসেছিল। কিন্তু খাতা একমার বন্ধ এই ক'দিন—ভাল মাছ কোথা? ঘুসো-চিংড়ির ঝোল খেয়ে গেল বেচারা। কোটালের মুখে আবার আসতে বলে দিলাম। হয়তো বা রাত পোয়ালে এসে পড়বে। দশ টাকা তার কাছে দিয়ে দেবো মণিঅর্ডার করতে।

বলার ধরনে জগা অবাক হয়ে তার মুখে তাকায়: মুখেই তোমার যত ফড়ফড়ানি! বউয়ের জন্য মন কেমন করছে—উঁ?

গগন না-না করে না অন্য দিনের মতো। একটুখানি চুপ করে রইল, বলে ধরেছিস ঠিক। চিঠি পড়ে ফেলেই মুশকিল হল। বউ একা লেখেনি। আমার বোন লিখেছে। মেজো সরস্বতীও

লিখেছে। সেটা এক গোঁয়ারগোবিন্দ, সম্বন্ধ না থাকলেও ওটাকে শালা বলতাম। সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আমি নাকি পালিয়ে বসে আছি।

সজোরে নিশ্বাস ফেলল একটা। জগার হাত থেকে হুঁকো নিয়ে ফড়ফড় করে দ্রুত কয়েকটা টান দেয়। বলে, বউ আছে বোন আছে, ঘরবাড়ি বাগান-পুকুর পড়শী-কুটুম্ব সমস্ত নিয়ে দিব্যি এক সংসার রে! কেউ কি শখ করে সে জিনিস ছেড়ে আসে, বাইরে তাড়াবার জন্য সকলে ওরা উঠে পড়ে লাগল। আমি নড়ব না, ওরাও ছাড়বে না। গাঁয়ে জাগ্রত রক্ষেকালী ঠাকরুন, কালীভক্ত আমরা। তাঁর পাদপদ্মে রেখে চলে এলাম। ঠাকরুণ দেখেও আসছেন এত বছর। মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে ইদানীং একেবারে অচল অবস্থা নাকি, ঘন ঘন চিঠি হাঁটাচ্ছে। ধানাইপানাই করা মেয়েমানুষের স্বভাব—আমি আমল দিইনে। চিঠিই খুলিনে, দেখেছিল তো! নিজের একটা পেটই চলে না, বারো ঘাটে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, খুলে কি হবে?

জগার মনটাও কেমন হয়ে গেল আজ। কোন এক দূরদেশে গগন ঘরসংসার ফেলে এসেছে, টাকা পাঠানোর দরকার। সেই টাকার ধান্দায় কত জায়গায় ঘুরল, কত রকম চেষ্টাচরিত্র করছে—কিছুতে কিছু হয় না। আর জগার ট্যাঁকে টাকাপয়সা আপনি গড়িয়ে আসে। বাদাবনে তোমরা দেখ শুধু জঙ্গল—জঙ্গলে বাঘ-কুমির দেখতে পাও, আর শুলোর খোঁচায় পা জখম করে বাপ-বাপ বলে চেঁচিয়ে ওঠ। ভিতরের মজাটা জান ক'জনে? বাদার ঢোকবার মুখে টাকা দিয়ে লাইসেন্স করবার আইন। অদৃষ্টে কী ঘটবে ঠিকঠিকানা নেই, আগেভাগে গাঁটের টাকায় সরকার সেলামি দিয়ে যাও। আচ্ছা আইন রে বাপু! বাঘ-কুমির তো লাইসেন্স করে ঢোকে না, বিনা ট্যাক্সোয় খেয়েদেয়ে চরে বেড়িয়ে এই তাগাড় হচ্ছে। তাদের কায়দায় চলাচল করো লোকসানের ভয় নেই, যা-কিছু সওদা ষোলআনা লাভের অঙ্কে পড়ল। টাকা আর নোট কোথায় রাখা যায়, সেই তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ও-বছর গগনের এসে পড়বার আগে—গোলপাতা কাটতে গিয়ে কি হল? সরকারি খাতায় বেবাক শূন্য, বনকরের বাবুদের পান-খাওয়া বাবদ বারো কি তেরো টাকা সর্বসাকুল্যে। নিঃসাড়ে মাল বেরিয়ে এলো বিশ কাহন। বড়লোক হতে ক'দিন লাগে হেন অবস্থায়? মোটামুটি রকমের গেঁথে নিয়ে বোসো; তারপরে পায়ের উপর পা চাপিয়ে খাওদাও আর ফুর্তিসে ঢোলক বাজাও। শহরে পাক দিয়ে এসো মাঝে মাঝে দু-পাঁচ দিন। টাকা ফুরোতে চায় না। আর এমন কপাল জগার, মনিঅর্ডার করে কিছু যে হালকা হয়ে যাবে, ভুবন ঢুঁড়ে তেমন একটা লোক মেলে না। গগন বিদ্বান্ মানুষ—বাদার কাজ তাকে দিয়ে হয় না। তার কাজ ডাক্তারি কিম্বা মাষ্টারি। বড় জোর এক মাছের খাতা খুলে মাচার উপর হাতবাক্স কোলে নিয়ে ঝুড়ি প্রতি এক এক পয়সা উপার্জন। বিদ্যাই কাল হয়েছে, এর বেশি এ মানুষকে দিয়ে হয় না।

ছিলিম শেষ করে জগা উঠল। গগন বলে, যাস কোথা?

চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেললাম। পাড়াসুদ্ধ ঠিক মরেছে, নয়তো এমন নিঝঝুম হয় না। দেখে আসি বড়দা।

আর ঐ যে টাকার কথা বললাম। ন্যায্য সুদ দেবো।

হবে, হবে। সে তো কালকের কথা।

হন-হন করে সে বেরুল। পাড়ায় নয়, চলল উল্টো মুখো—কালীতলা যেদিকটায়। খানিক দূরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গেঁয়োবনের ভিতর ঢুকে পড়ে। কাটারি নিয়ে এসেছে গগনের রান্নাঘর থেকে। চিহ্নিত করা এক গাছ, তার গোড়ার মাটি খুঁড়ছে। এদিক-ওদিক তাকায়, আর নিঃসাড়ে মাটি তুলে রাশ করে। বেরুল মাটির ঘট একটা। ঘটের মুখ টাটি দিয়ে ঢাকা—আধাআধি টাকায় ভরতি। নোট নয়, রুপোর টাকা শুধু। মাটির নিচে কাগজের নোট নষ্ট হয়ে যায়, নোট ভাঙিয়ে টাকা করে ঘটের ভিতর ঢোকায়। আজকালকার টাকা—রূপা নামে মাত্র, খাদবস্তু বেশি। টাকার রং কালো হয়ে যায় দু-পাঁচ দিনে। তেঁতুল বা আমরুল-পাতায় ঘষে চকচকে করো, নয়তো বাজারে নিতে চায় না।

কম নয়, থোক কুড়ি টাকা নিয়ে এলো জগা। গগনের হাতে দিয়ে বলে, মেকি নয়, রংটা এই রকম। বাজিয়ে দেখে নাও বড়দা। সুদও সস্তা করে দিচ্ছি—এক পয়সা হিসাবে। বিশ টাকার দরুন পাঁচ গণ্ডা পয়সা খাতা থেকে রোজ ফেলে দিও। চুকে গেল। আসল যদ্দিন খুশি রেখে দাওগে, তাগিদ করব না। সুদটা ঠিক ঠিক দিয়ে যেও!

টাকা গগন বাজিয়ে দেখে না। গুণে নিল। কুড়িই বটে। চাইল দশ, দিয়ে দিল তার ডবল। সাক্ষাৎ কল্পতরু। এক দিনের সুদ এক পয়সা—এক রকম বিনা সুদেই বলা যায়। এমন হলে বাদা অঞ্চলের সবাই ঋণ করে হাতি কিনে বসে একটা। জগার ঔদার্যে গগন অবাক হল। খুশিতে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে বলে, আজকের দিনের সুদ কুড়ি পয়সা—নিয়ে নে সেটা নগদ—

থলি ঝেড়েঝুড়ে পয়সা গোটা আষ্টেকের বেশি হল না। তাই তো! তখন আর এক পন্থা মনে এসে গেল।

ডেকে এলি, তা আসে কই ওরা? গানবাজনা নয়, খেলা হোক এখন। খেলায় রোজগার করে তোর সুদ শুধবো। সুদই বা কেন, আসলের আধাআধি ঝেড়ে দিচ্ছি এখনই।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই চেঁচামেচি করে এলো: চলে আয় কোন কোন মরদের বেটা আছিস। পয়সা নিয়ে আসবি।

শেষ কথার মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার। জগা ইতিমধ্যে মেজের মাদুর বিছিয়ে ছক পেতে বসেছে। বলাই এলো। আরও জন

চার-পাঁচ—আজকে যারা জালে যায়নি। গাঁটে যাদের পয়সা তারা খেলবে, বাকি লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে সদুপদেশ ছাড়বে,—যে লোক জিতবে তুড়িলাফ দেবে তার পক্ষ হয়ে।

কুড়ি কুড়িটা টাকা গগনের হাতে এক সঙ্গে, অতিশয় উঁচু মেজাজ, আপাতত সে থোড়াই কেয়ার করে দুনিয়াটাকে। বলে, দশ টাকা এই আলাদা করে কাপড়ের খুঁটে বাঁধি। বাপের হাড় রে বাবা। পিওন এসে গেলে তখন গাঁট খুলব। বাকি দশ এই মুঠোয়—রণে এসো বাপধনেরা। দেখিস কি জগা—আধাআধি নয়, তোর পুরো দেনা শোধ করব। দেনা দাঁড়াতে দেবো না।

চলল ফড়খেলা। ক্রমেই গগনের মুখ শুকাচ্ছে। ধাঃ শালা! কি বিশ্রী পড়তা, উল্টোপাল্টা দানই পড়ে কেবল। টাকা সমস্ত খোয়া গেল, একলা জগাই তার মধ্যে আট টাকা পনের আনার মত জিতে নিল। বেটা সব দিকে তুখোড়, ফড়ের গুঁটিও যেন কথা শোনে ওর। এখন কি উপায়? কানে জল ঢুকলে আবার খানিক জল ঢুকিয়ে আগের জল বের করে ফেলে। ইতস্তত করে গগন শেষটা কোঁচার খুঁট খুলে বাকি দশ টাকা বের করে ফেলল।

তা-ও খতম। নেশা জমে গেছে তখন। ছাড়বি না কি রে জগা আর কিছু? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। বিশ কর্জ হয়েছে, না হয় পঁচিশই হবে। সবই তো চেটেপুঁছে নিলি তুই।

জগা চটে গিয়ে বলে, খোঁটা দেবার কি আছে বড়দা? চুরি-জোচ্চুরি করেছি? আইনদস্তুর খেলা খেলে জিতে নিইছি।

গগন বলে, তাই দেখলাম রে জগা, পয়সাকড়ি তোর পোষমানা। তোকে বিষম চেনা চিনে ফেলেছে। যার কাছে যা থাকুক, পায়ে হেঁটে যেন তোর গেঁজেয় গিয়ে উঠে বসে। তা পাঁচ টাকা না হোক, দুটো টাকা ছাড়। পিওন বেটাকে আসতে বলেছি—পোড়া অদৃষ্টে হবে না কিছু জানি—আরও একটুখানি চেষ্টা করে দেখা।

জগা উঠে দাঁড়াল তো গগন তার হাতে চেপে ধরে। জগা মুখ খিঁচিয়ে বলে, টাকার আমি গাছ নাকি—নাড়া দিলে অমনি ঝুরঝুর করে পড়বে?

এই তো জিতে নিলি এতগুলো টাকা। ধর্মপথেই জিতেছিল, আমি বলছি। বউ যা হোক, মায়ের পেটের বোন আমায় মিছে কথা লিখবে না। বড়লোক শালারা দেখাশুনো করত। কী নাকি ঝগড়াঝাটি হয়েছে—এক পয়সাও নেবে না শালার কাছ থেকে, না খেয়ে দাঁতে কাঠি দিয়ে পড়ে থাকবে। তা সে পারে, বড্ড জেদি মেয়ে। উঠিসনে জগা, বোস আর একটু। টাকা দিয়ে লোকসান কিসের তোর? খাতা রয়েছে, ভেরির মাছ বড় হচ্ছে—ঐ ক'টা টাকা তুলে দিতে পারব না?

হেন কালে মানুষের শব্দসাড়া উঠানে। খেলায় মগ্ন ছিল, নজর তুলে দেখেনি।

কারা গো?

হর খড়ুই শীতলপাটি ঘাড়ে নিয়ে আগে আগে আসছে। বলে, বাইরে এসে দেখ বড়দা, তোমার আপন লোকেরা সব এসে পড়ল।

বাদারাজ্যের ভিতর কুটুম্ব আসা একটা সমারোহের ব্যাপার। হুড়মুড় করে সবাই দাওয়ায় চলে এলো। জগার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। কী আশ্চর্য, কুমিরমারি অবধি টাপুরে নৌকোয় যাদের সঙ্গে এসেছে সেই দুটো মেয়ে লোক এবং পুরুষটি। তাদেরও যে সাঁইতলায় গতি, কে ভাবতে পেরেছে?

চারুর একেবারে চোখোচোখি পড়ল জগা। বিনি-বউকে চারু বলে, সেই লোকটা বউদি। চিনতে পারছ না—আমায় যে বাদার মধ্যে ফেলে দিল। দাদার কাছে এসে জুটেছে শয়তান।

যে জগা বাঘ দেখে ডরায় না, মেয়েলোকের মুখোমুখি সে জবুথবু হয়ে গেছে। চেহারায় মেয়েলোক, বয়সও কম বটে—কিন্তু পিত্তি জ্বালা করে কথাবার্তায়। নতুন জায়গায় পা দিয়েই সকলের সামনে তার সম্বন্ধে পয়লা উল্লেখ হল শয়তান বলে। নেহাৎ লোকে কি বলবে, নয় তো ছুট দিয়ে পালাত। তবে বউদি মানুষটি দেখা গেল মিটমাটের পক্ষপাতী। চাপা গলায় তাড়া দিয়ে ওঠে, ঝগড়া বাধাবিনে বলছি ঠাকুরঝি। চুপ কর। যেখানে পা দিবি সেইখানে গণ্ডগোল।

জগাকে ছেড়ে চারু তখন নিজের ভাই গগন দাসকে নিয়ে পড়ল: কী মানুষ তুমি দাদা! আমরা আছি কি মরেছি, চিঠি লিখে একটা খবর নাও না। জায়গা একটা বেছে নিয়েছ বটে! সত্যি সত্যি খুঁজে পাব, একবারও তা ভাবতে পারিনি।

নগেনশশী পিছনে পড়ে ছিল, পা টানতে টানতে দাওয়ার ধারে এসে দাঁড়ায়: হুঁ, খুঁজে পাব না! আজ মানষে চাঁদ-তারা তাক করে ছুটোছুটি করছে, এ তবু মাটির উপরে। খুঁজে পাবে না তো আমি সঙ্গে রয়েছি কি জন্যে? বিনিকে তাই বললাম, চোখ-কান বুঁজে আমার পিছু পিছু চলে যায়। হাজির করে দিলাম কি না বল এবারে।

গগন গরম হয়ে বলে, যা লিখেছ নগেনশশী, সেইটে অক্ষরে অক্ষরে করে ছাড়লে? ছি-ছি, গেরস্তঘরের মেয়েছেলে জঙ্গলে এনে তুলেছ; তোমার বোনকে নিয়ে এসেছ, আমি কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু আমার সোমত্ত বোনকে নিয়ে এলে কোন বিবেচনায়?

নগেনও সমান তেজে জবাব দেয়, তোমার বোনেরই তো গরজ বেশি। তার ঠেলায় ঠেকানো যায় না। তখন বিনি বলে, চলো মেজদা, পৌঁছে দেবে আমাদের। সাথী না জুটলেও একা-একা চলে যাবে চারু।

চারু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: আসব না? কাদের কাছে কোন্ ভরসায় রেখে এসেছিলে শুনি? এদ্দিন তবু চাট্টি চাট্টি ধান হয়েছে, ভেন-কুটে চলে গেছে এক রকম। এবারে খরায় মাঠ শুকনো, এক চিটে ঘরে উঠল না। বড়লোকের হাততোলা হয়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল দাদা।

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় নগেনশশীর দিকে। নগেন সরে গিয়ে হরর কাছে দাঁড়ায়। গগন বেকুব হয়েছে, ঠাণ্ডা করতে পারলে বাঁচে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, চলে এসেছিস সে তো ভালই। ক্ষেতখামারের এই হাল, আমি তা জানব কি করে? কুটুম্বর হাততোলা কেন হতে হবে? কাল সকালেই মণি অর্ডার হয়ে টাকা চলে যেতো। খবর আসতেই লাগল কত দিন!

জগা হঠাৎ কতকগুলো টাকা ছুঁড়ে দেয় গগনের দিকে। না বুঝে গগন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়।

তোমারই টাকা বড়দা। একটু আগে যা তোমার থেকে আমার ট্যাঁকে চলে এলো। ঘরে তোমার কুটুম—টাকা চইলে মচ্ছব হবে কি দিয়ে ?

দাওয়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে উঠানে। পৈঠা দিয়ে নামবার তাগত নেই, চারু সেই দিকে। ও যা বস্তু,—চোখ দিয়ে পোড়াচ্ছে—নাগালের মধ্যে পেলে কি করে বসে, ঠিক কি ?

অন্ধকারে যেন ঢেউ তুলে দিয়ে তার মধ্যে জগা ডুবে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। বাইরের সবাই চলে গেছে, আপন লোকেরা এইবার কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে। জগা আলাঘরের কানাচে এসে দাঁড়াস।

বোন বলছে, দাদা, কি করছিলে এই জনে ঘরের মধ্যে মিলে ?

ভারি মজাদার জবাব ভাইয়ের : নামগান হচ্ছিল।

কই, আওয়াজ পাইনি তো ?

বিড়বিড় করে হচ্ছিল। তাতে যা ভাব আসে, চেঁচামেচিতে তেমন হয় না।

দেয়ালে-ঝোলানো খোলখানা—জাঙাল ভুলে নিশ্চয় সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। বড্ড কাজে লেগে গেল খোলটা—পশার বাড়ল আত্মজনের কাছে। কিন্তু ফড়ের ছকগুটি কোন্ কায়দায় তিন জোড়া চক্ষুর সামনে থেকে বেমালুম সরিয়ে ফেলল, সেইটে এক দিন বড়দাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

চোদ্দ

ভোররাত্রে ডাকাডাকি, জগা কোথা ? বলাই কোথা রে ? সাড়া দিচ্ছে না ওরা ঘরের ভিতর থেকে। পচা জালে বেরিয়েছিল, হয়েছেও যা-হোক কিছু। তার স্বার্থ রয়েছে, তাকেই পাঠাল খাত্তা থেকে। অন্য কেউ এসে ঘুম ভাঙালে জগা কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে চাইবে, ভাবের মানুষ পচাকে কিছু বলবে না। মাছের আমদানি বড্ড কমে গেছে। সে-ও জগার দোষ। ফুলতলায় নিজে গেল, আবার জেজুড় করে নিয়ে গেল বলাইটাকে। দু-দিন বলে পুরো পাঁচ পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিল। মাছের নৌকো এদিকে কুমিরমারি পৌঁছতে দুপুর হয়ে যায়। ভাল খদ্দের তখন থাকে না, কিছু ছ্যাচড়া খদ্দের ঘোরাফেরা করে। ঐসব মানুষ ইচ্ছে করেই মেছোহাটে দেরি করে আসে। এসে হয়তো দেখে মাছই নেই তখন। যেদিন থাকে, সস্তা দরে পাওয়া যায়। বেশি থাকল তো বেশি সস্তা। কাঁচা মাল রেখে দেওয়া চলে না, দরদাম যা-ই হোক ছাড়তেই হবে। দর পাচ্ছে না বলে মাছ-মারাদেরও উৎসাহ নেই জলে নামার। খাত্তার কাজকর্ম তাই বসতে না বসতে চুকে গেছে। গাঙে একপো জোয়ার। এই যে দেরি হচ্ছে, সে কেবল জগারই জন্যে।

জগা চোখ মুছতে মুছতে সোজা গিয়ে ডিঙির গলুয়ে বোঠে ধরে বসল। অন্ত দিন খাত্তায় বসে একটি ছিলিম অন্তত তামাক খেয়ে তবে ঘাটে নামে। আজকে—ওরে বাবা, দাওয়ার কামরায় চারুবালা ঘাঁটি পেতে রয়েছে হয়তো। তা ছাড়া দেরিও হয়ে গেছে, মাছের ঝোড়া নিয়ে হর ঘড়ুই উঠে বসে আছে অনেকক্ষণ।

কাছি খুলে দে বলাই। গাঙ বদর বদর।

চারুবালা উপর থেকে ডাকছে, শোন, কানে যাচ্ছে না ও-লোকটা ? বোঠে একটু থামাওনা—

নাম থাকে মানুষের। নাম না-ই যদি জান, তবে কি তাচ্ছিল্য করে 'লোকটা' বলে ডাকবে ? বয়ে গেছে বোঠে থামাতে। বলাইকে বলে, তুইও ধর বোঠে। খালের এইটুকু উজান, কষে টান দে।

চারু বাঁধ থেকে খালের গর্ভে নামল। হাত উঁচু করে চেঁচাচ্ছে : শোন, ঝাঁটা নিয়ে এসো একগাছ। বাঁধা ঝাঁটা না পাও তো নারকেলের শলা। রান্নার জন্যে হাতা, খুন্তি আর কাঁটা এনো—

কর্দ বলতে বলতে আসছে। ভুট-ভাট-ভটাস আওয়াজ উঠছে কাদায় ; বাঁয়ে—হেই ভগবান, আর খানিকটা বাঁয়ে নিয়ে যেন জঞ্জাল মেয়েটাকে। বাঁয়ে বিষম দোপি—উপর থেকে কিছু মালুম হবে না। কোমর অবধি বসে যাবে, কাদার মধ্যে আটকে থাকবে। জনা চারেক মরদ-জোয়ান পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর কায়দায় টানাটানি করে তবে তুলবে। এই কাজটি করে দাও হে মা কালী। চারুবালার দুর্গতি দেখতে দেখতে আর বোঠের আগায় জল ছিটোতে ছিটাতে মনের খুশিতে ওরা গাঙে গিয়ে পড়বে। ভোরবেলাকার সুযাত্রায় দিনমানটা তাহলে কেটে যাবে ভালো।

গাঙে পড়ে জগা বলে, ঝাঁটা চায় কেন রে ?

বলাই হেসে বলে, পেটাবে যে রকম পিরীত তোমার সঙ্গে—শুধু-হাতে সুখ পাবে না, হাতের কাছে অস্তোর জুটিয়ে রাখছে।

হর ঘড়ুই বিষম ঘাড় নাড়ে : উঁহু, কি বলছ তোমরা। ভাল ঘরের মেয়ে—আমাদের আবাদ জায়গার রণচণ্ডী পেয়েছ নাকি ? কোস্তা দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল—ন্যাড়া কোস্তা, মাথা ক্ষয়ে গেছে। ঝাঁট দিতে দিতে ঝাঁটার কথা মনে হয়েছে বোধ হয়। রান্না করবার সময় অসুবিধা হয়েছে, হাতা-খুন্তির গরজ তাই।

আরও গদ গদ হয়ে বলতে লাগল, এসেছে কাল রাত্রে। সকালবেলা তুমি—দেখলে না জগা, ধুলোমাটি পোড়া-বিড়ি ম্যাচের

কাঠি কিছু আর নেই। লক্ষ্মীর অংশ হলেন ওঁরা তো, লক্ষ্মী-ঠাকরুনের পা পড়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কুমিরমারির গঞ্জে এসে মাছ সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। পয়সা হয় ঘড়ুইয়ের গাঁটে। ভরা জোয়ার। কিন্তু জগার ফেরবার গাড় দেখা যাচ্ছে না। হর তাগিদ দিচ্ছে: উঠে পড় তোমরা এবার। গোন বয়ে যায়, দেরি কোরো না।

জগা বলে, খাব না?

খাবে বই কি! মুড়ি কিনে নাও, আর বাতাসা। দানাদার কিনে নাও কিছু। কোঁচড়ে করে খেতে খেতে যাবে।

মুড়ি নয়, ভাত খাব।

উঁহু, ভাতের হাঙ্গামা কেন আবার এখন? ভাত খাবে সাঁইতলা গিয়ে। পুরো গোন তার উপরে পিঠেন বাতাস—ডিঙি তো উড়ে গিয়ে পৌঁছবে।

জগা বলে, হাঙ্গামা তো সেখানেই। উনুন জ্বালো, রাঁধো-বাড়ো, বাসন ধোও—হরেক ব্যাপার। এখানে কি, গদাধর ঠাকুরের হোটেলে ভাত বেঁধে বসে খাওয়ার মানুষ ডাকছে।

কিন্তু অন্য দিন তো সাঁইতলা গিয়ে রাঁধাবাড়া কর। হোটেলের ভাতে মন যায় না।

জগা এবারে রীতিমতো চটে গিয়ে বলে, জান তো ঘড়ুই, নিয়মের বাঁধাবাঁধি আমার সহ্য হয় না। দুটো দিন সাঁইতলা গিয়ে খেয়ে থাকি তো পাঁচটা দিন খেয়ে যাব গদাধরের হোটেলে।

জেদ যখন ধরেছে নিরস্ত করা যাবে না। হর ঘড়ুই হোটেলে গিয়ে তাড়া দেয়: হাত চালিয়ে ভটচাজ্জি। ভাত আর ডালটা নেমে গেলেই বসিয়ে দাও এদের দুজনকে।

জগা-বলাইও পিছু পিছু এসেছে। জগা বলে, উঁহু, মাছ খাব, মুড়িঘণ্ট খাব, অম্বল খাব।

বেশ, খাও ষোড়শোপচারে। বেগোন হয়ে যাবে, বুঝবে তখন ঠেলা।

তোমার কি ভাবনা ঘড়ুই? আমার ডিঙি আমি কি মাঝপথে ফেলে যাব? বেগোন হোক যা-ই হোক এমন কথা বলব না যে ঘড়ুই মশায় ডাঙায় নেমে গিয়ে দুটো বাঁক গুণ টেনে দাও।

গদাধর কাঁটা পাকাচ্ছে ফুটন্ত ডালে। কম পরিমাণ ডাল দিয়ে থকথকে ঘন করবার এই কায়দা। জগা বলে, খালের নাম কে যে বারোবেঁকি রেখেছে! সে বেটা শত্তুকে জানত না। গণে দেখেছি ভটচাজ্জি, বারো দুনো চব্বিশ বাঁকেও বেড় পায় না।

বলাই বলে, উঃ, বোঠে মেরে মেরে লবেজান। রাস্তাটা এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এবারে খোয়া ফেলে দিক। নৌকো ছেড়ে তাহলে গাড়ির কাজে লেগে যাই, জল ছেড়ে ডাঙার উপর উঠি।

ডালের কড়াই নামিয়ে দিয়ে গদাধর বলে, খোয়া ফেলা পর্যন্ত লাগবে না রে! বর্ষা কেটে গিয়ে রাস্তা খটখটে হয়ে যাক। ধানও পেকে যাবে তদ্দিনে। সাত রাজ্যি ঘুরে নৌকোয় এবারে ধান বওয়াবয়ি নয়। গরুর গাড়িতে। এর মধ্যেই সব গাড়ি বানাতে লেগে গেছে। কত গাড়ি নেমে যাবে দেখো মরশুমে। আমি ভাবছি, দু-জোড়া গরু কিনে গরুর গাড়ি করে ফেলি খান দুই। ভাড়া খাটবে।

বলাই পুলকে ডগমগ: করে ফেল ভটচাজ্জি, মুনাফা হবে। গাড়ি চালানোর মজা। ডাঙা-ডাঙা, ডাইনে-বাঁয়ে—খালি মুখের খাটনি। বাবুমানষের কাজ। বোঠে মারতে মারতে হাতে এমন কড়া পড়ে যায় না।

আদরমণি গগনের কথা জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তারের কি খবর?

জগা বলে, ডাক্তার এখন নয়, ঘেরিদার। মাঝে গুরুমশাই হয়েছিল।

আদর হেসে বলে, এর পরে আবার কোনটা ধরবে?

বলাই বলে, আর কিছু নয়। পরমস্ত মানুষ বড়দা। ছোটখাট এক খাতাও জমে উঠছে। হচ্ছে এবারে দুটো পয়সা।

জগা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, হতে আর দিল কই? নানান শত্রু। এক শত্রু চৌধুরিরা। নায়েব পাঠিয়ে চুরি করে ঘেরির বাঁধ ভেঙে নানান রকমে নাস্তানাবুদ করছে। তার উপর নতুন উৎপাত—বাড়ির মানুষজন এসে পড়েছে। নতুন ব্যবসা, এত ধকল কাটাতে পারবে কেন?

গদাধর বলে উঠল, হোটেলের প্রাপ্য এগারো টাকা ছ' আনা দিয়ে দিতে বোলো দু'-পাঁচদিনের মধ্যে।

জগা বলে, টাকা কেউ বাড়ি বয়ে দিয়ে যায়, শুনেছ কখনো? নিজে গিয়ে পড় একদিন, বন্দর পারো খাবা মেরে নিয়ে এসো।

বলাই বলে, টাকা না পাও আকণ্ঠ মাছ ঠেসে খেয়ে উশুল করে এসো খানিকটা।

জগা বলে, বন্ধুলোক তোমার তো! বড়দার বুদ্ধি মতোই গঞ্জের উপর যা-ই হোক জমিয়ে বসে আছ। বিপদে পড়েছে—জাঁতিকলের মতন দু'দিককার দাঁতে এসে আঁকড়ে ধরছে। এ সময়ে একবার চোখের দেখাও দেখে আসা উচিত। যেও ভটচাজ্জি, বুঝলে?

পনের

সাঁইতলা ফিরতে বেশ খানিকটা রাত হল সেদিন। বলাই বলে, আলা চুপচাপ, গানবাজনা নেই। বোধ হয় ওরা ফড় খেলছে।

জগা নজর করে দেখে বলে, খেলা হলে তো আলো থাকবে। নয় তো কোট দেখবে কেমন করে? গালে-মুখে হাত দিয়ে বসে আছে বড়দা। নয়তো কোনখানে যদি বেরিয়ে থাকে। কিন্তু রাত্তিরবেলা শখ করে বেরুবার মানুষ তো বড়দা নয়।

সোজা চলেছে ঘরের দিকে। বলাই হাত ধরে টান দেয়: এক্ষুণি ঘরে ঢুকে কি হবে? চলো, আমরা গিয়ে জমাই গে।

শুয়ে পড়ব। গা ব্যথা-ব্যথা করছে।

বলাই হি-হি করে হাসে: তা নয়। খাণ্ডারনি মেয়েটাকে ভয় লেগেছে তোমার। ঝাঁটা দিয়ে পেটায় নি তো এখনো, এর মধ্যে গা ব্যথা কেন?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জগা চলল। ঘরে গিয়ে সত্যিই গড়িয়ে পড়ে। বলে, তুই বসে বসে কি পাহারা দিবি? তুই চলে যা, আমি ঘুমোব।

আমি গিয়ে কি হবে? তুমি না হলে ফুর্তি জমে কখনো?

জগা চটে উঠল: ফুর্তি না হলে যেতে নেই? তোরা কেবল সুদিনের সাথী। বড়দা মানুষটা ঝিম হয়ে কোথায় পড়ে আছে—অসময়ে দুটো ভাল কথা বলে আসার মানুষ হয় না।

বলে পাশ ফিরে শুল জগা। আর কথাবার্তা বলবে না। একটুখানি বসে থেকে বলাই উঠল। দেখে আসা যাক গগনের দশা। আপন মানুষদের সঙ্গে কেমন মজায় ডুবে এমনিধারা নিঃসাড় হয়ে পড়ল।

নিঃশব্দ রাত। ফাঁকা আকাশের মধ্যে বাতাসও হঠাৎ কেমন স্তব্ধ—গাছের ডালপাতা নড়ে ফিসফাস শব্দটুকুও উঠছে না। গাঙে জোয়ার—ভাঁটার জল নামার যে কলকল শব্দ, তা-ও নেই এখন। আলার দিক থেকে—হাঁ, খোলের আওয়াজ আসছে বটে। বলে দিতে হবে না, বাজাচ্ছে বলাই। বাজনার ব্যাপারে যে একটু-আধটু জগার সাগরেদি করে, খোলে চাটি মেরে বোল তুলতে গিয়ে গালি খায়। জগা নেই আসরে, অতএব পরাণ জুড়িয়ে আজ সে বাজাচ্ছে। গানও যেন বাজনার সঙ্গে—ধড়মড়িয়ে উঠে জগা বাইরে চলে এলো। বিড়বিড় করে গান—কান পেতে থেকে একটু একটু শুনতে পাওয়া যায়। বাজনদার বলাই, এবং গায়েন মানুষও পেয়ে গেছে। জগাকে বাদ দিয়েই আসর জমাতে পারে ওরা। কোন দরকার নেই তবে আর জগার।

টিপিটিপি চলেছে সে চোরের মতো। দেখে আসা যাক—বলাই এসে বলবে, ততক্ষণের সবুর সয় না। সোজাসুজি বাঁধ ধরে না গিয়ে ঝুপসি জঙ্গলের আড়ে-আবডালে চলেছে। কেউ না দেখতে পায়। আলাঘরের খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। মালুম পাওয়া যাচ্ছে এবার—গগনের গলা। আরও আছে— কিন্তু ভিন্ন গোষ্ঠের গরুর মতো তার কণ্ঠ একেবারে ভিন্ন পথ ধরেছে। হায় মা বনবিবি, হায় মা রক্ষেকালী, তোমাদের মহিমায় বড়দাও কিনা গায়ক হয়ে উঠল! গান অবশ্য নয়—হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধেগোবিন্দ —নামগান। বিড়-বিড় করে গাইছে কতকটা মন্ত্রের মতো।

বলাই এলে জগা হাসিতে ফেটে পড়ল : দেখে এসেছি। চার জন দেখলাম আসরে। তুই ছিলি, বড়দা ছিল, আর দুটো কে রে?

একজন আমাদের পচা। পচা ওদিকে মুখ করে ছিল। আর ছিল বড়দা'র মেজো সম্বন্ধী, নগেনশশী তার নাম।

বলে গম্ভীর হয়ে যায় : প্যাঁচে ফেলেছে বড়দাকে। ফন্দের গুঁটি লুকিয়ে ফেলে কাল সেই যে নামগানের কথা বলেছিল, সেইটে হল কাল। পচা আগেভাগে গিয়ে গরুড় পক্ষীর মতো অন্ধকারে বসে আছে। আমায় দেখে বলল, এই যে, খোল বাজানোর মানুষ এসে গেল। আর সেই সম্বন্ধী বলে, রোজ নামগান কর, আজকেই বা হবে না কেন? লাগাও। পচা ধরল, সম্বন্ধী ধরল—বড়দা কি করে, তারও দেখি ঠোঁট নড়তে লেগেছে। আমার মুখে ওসব বেরোয় না, খোলটা কোলের মধ্যে টেনে নিলাম। তাই তো বলছি রে, বড়দা সুদ্ধ গান গায়। বাবার কী তাজ্জব রে বাবা!

বলাই বলে, সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়। বাইরে ঐ সম্বন্ধী, আর কামরার ভিতরে বউটা আর বোনটা টেমি জেলে বসে গান শুনছে, আর ভাটার মতন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। কি করবে বড়দা? একবার হয়তো একটু থেমেছে, চমক খেয়ে তক্ষুণি আবার হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করতে লেগে যায়। ভাল করে দেখিসনি তুই—বড়দার কণ্ঠে পাষাণ ফেটে যায়।

জগা বলে, ভুল করল বড়দা, আখের ভেবে দেখলি না। দেশে ঘরে বন্ধন রেখে এসেছে—হাতে টাকাপয়সা আসা মাত্তোর ওদিকে কিছু কিছু ছাড়লে তবে এই খোয়ার হত না। বেড়াল তাড়াবার ভাল ফিকির হল, মাছের কাঁটাকুটি দূরে ছুঁড়ে দেওয়া। দূর থেকে কামড়া-কামড়ি করুক, কাছ ঘেঁসে ঝামেলা করতে আসবে না। টাকা পাঠাতে বড়দা গাফিলতি করল, তার এই ভোগান্তি। সম্বন্ধী কালকেও আবার যেতে বলে দিল। বলে, গেরস্তঘরে সন্ধ্যার পর ঠাকুরের নাম, খুব ভাল কাজ করছ তোমরা। কখনো কামাই পড়ে না যেন।

জগা শিউরে ওঠে : আরে সর্বনাশ! একদিন দু-দিন নয়, রোজ রোজ এখন অতগুলো পাহারার মধ্যে বড়দাকে বাবাজি হয়ে বসে থাকতে হবে! বড়দা বাঁচবে না!

আজ ভোররাত্রেও আগের দিনের মতো। জগা সোজাসুজি ঘাটের উপর ডিঙি চেপে বসেছে। বলাই আলা ঘুরে আসছে। গগন ফর্দ লিখে দেবে, কত ঝোড়া মাছ যাচ্ছে কি রকম দরে কেনা।

এবং ঠিক আগের দিনের মতো বাঁধের উপরে চারু। আজকে আর কাপড়ে মাথন মা, সোনা কাদার মহিমা কাল খুব দিয়েছে। বাঁধের উপর থেকে চেঁচাচ্ছে, ঝাঁটা আর চাঙা-খুন্তি-কাঁটা। কাল ভুলেছ, আজকে ভুল না হয়। এমন ভুলো মানুষ কেন তুমি? জগার মুখে হাঁ-না কিছু নেই, লোহার মূর্তির মতো স্থির। কানে গেল কিনা বোঝা যায় না। পচা নেমে আসছে, সে যাবে। কুমিরমারির হাটবার আজ। ডিঙিতে এই দিনে কিছু ভিড় হয়। লোকে হাটবেসাতি করতে যায়, ঘোরাঘুরি করে নতুন মানুষজন দেখতেও যায় অনেকে। পচাকে ডেকে চারু বলে, কালা নাকি নৌকোর ঐ লোকটা? রা কাড়ে না। একগাছ ঝাঁটার কথা বলছি কাল থেকে—

জগা কালা নয়, সে তো ভাল মতোই বুঝে নিয়েছে সেদিন। ফুলতলার ঘাটে, টাপুরেনৌকার ভিতরে, এবং বিশেষ করে কুমিরমারিতে। এটা হল নিজের মনের ঝাল মেটানো কথা। আকাশে সূর্য ওঠেনি—নতুন দিনের সবে সূচনা—এর মধ্যে অকারণ গালিগালাজ শুনিয়ে মনটা খিঁচড়ে দিল একেবারে। ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে। পচা বলে, খেয়াল করে ঝাঁটা আনতে হবে আজ।

জগা গর্জন করে ওঠে, আনবি তো ধাক্কা মেরে ফেলে দেবো তোকে গাঙের জলে। মরদ হয়ে মেয়েমানুষের ঝাঁটা বইতে লজ্জা করে না?

পচা বলে, পুরুষে না আনলে মেয়েমানুষেই বা পায় কোথায়? বুঝে দেখ সেটা। দুটো দিন মাত্র ওরা এসেছে, ঠাট বদলে গেছে, এর মধ্যে আলাঘরের। মেয়েজাত হলেন লক্ষ্মী—লক্ষ্মীর চরণ পড়েছে আর লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠেছে। যাও না তো ও-মুখো, দেখে এসো একটিবার গিয়ে।

বলাই হেসে ওঠে : খবরদার জগা। দেখতে পেলে তোকেও কিন্তু ছেড়ে দেবে না। গানের গলা শুনেছে সেদিন নৌকোর মধ্যে! আলাঘরের সকলে আমরা নামগানে মাতোয়ারা হয়েছিলাম, তা-ও শুনল ঘরের মধ্যে প্রথম পা দিয়েই। বাবাজি করে তোকেও ঠিক আমাদের সঙ্গে বসিয়ে দেবে।

জগা বুক চিতিয়ে বলে, কে বসাবে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? টের পাবে আমার সঙ্গে লাগতে এলে। বলে দিস সেকথা।

বলাই বলে, বড়দাও অমনি করত। কী হাল হয়েছে এই দুটো দিনে! যেন এক ভিন্ন মানুষ। কিছু বলা যায় না রে ভাই, গায়ের জোরের কথাও নয়। কামরূপ-কামাখ্যায় পুরুষকে ভেড়া বানায়। পাহাড়ের নিচে শুনেছি, যত ভেড়া সারি সারি দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। হল কি করে?

[ক্রমশঃ।

শিকার কাহিনী

শ্রীকমলেশ ভাদুড়ী

শেষ অবধি এক কুরুক্ষেত্রের ব্যবস্থা হোল। জজ, মুন্সেফ, এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, ম্যালেরিয়া অফিসার কুদ্দুস সাহেব। তাঁকে নিতে হোল—কারণ তাঁর হাতে বিশাল ওয়েপন্‌ কেরিয়ার আছে। মোটর কেন, জীপও সে পথে যেতে পারে না। সামনের অজস্র নদীতে পুল নেই, নৌকাও নেই, তবে রায়জীর বড় ট্রাক্টর সাড়ে চার ফিট জল দিয়ে যেতে পারে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে যাবে আমাদের গাড়ীকে টেনে নদী পার করবার আর বালি বা কাদায় আটকে গেলে টেনে বার করবার জন্যে। সিংজীও কম যান না, তাঁর পাকানো হাতী মেঘনাদ, একটি তোটিয়া ঘোড়া ও একটি ভালো ঘোড়া থাকবে। গরুর গাড়ীতে রসদ আগেই রওনা করে দেওয়া হোল। এবার তোপখানার পালা। রায়জীর ফোর ণ ফোর মশার রাইফেল আর টু টু বোর রাইফেল, দোনলা শটগান আর রিভলভার। সিংজীর দোনলা আর তাঁর ভাইএর একনলা। আমার স্প্রীং ফিল্ড রাইফেল, আর অটোমেটিক বন্দুক অফিসারদের মধ্যে ডি-এস-পির বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, এস-ডি-ওর রিভলভার ও বন্দুক। জজের শুধু রিভলভার। মুন্সেফের কিছুই নেই। ওঁরা দু'জন আমাদের বন্দুক, গুলী ব্যবহার করবেন।

অস্ত্রশস্ত্র সমেত যখন আমরা দুপুর বেলায় গাড়ীতে উঠলাম, সে এক দেখবার জিনিষ। কিন্তু একটা হিসেবে ভুল হয়েছিল, প্রত্যেক হুজুর যে একটি করে আর্দালী নেবেন সেটা ভাবিনি। কাজেই তাদের রসদের কথা ওঠে নি। রায়জীকে চুপি চুপি বলতেই, তিনি অভয় দিলেন, যা রসদ আছে তাতেই কোনোমতে চলে যাবে—আর আমার মত শিকারী থাকতে ভাবনা! শিকার ক্ষেত্রে পৌঁছবার আগেই ঘুঘু মারতে মারতে যাবো। আর পৌঁছবামাত্র একটা শুয়ার বা হরিণ মেরে ফেললেই হবে।

কুদ্দুস সাহেব গাড়ী দিয়েছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া ধরায় আসতে পারেন নি। আফশোষ জানিয়েছেন। আর নিশ্চিন্ত হতে বলেছেন, মুসলমান ড্রাইভার আছে, কোনোই অসুবিধে হবে না। সে যে কোনো আহত জানোয়ারকে এক নিমেষে জবাই করতে পারে। আর—কাবাবও ভাল রাঁধতে পারে।

সহর ছেড়ে ওয়েপন্‌ কেরিয়ার ও ট্রাকটর নদীর ধারে এল। দেখি—এক ঝাঁক শামুকখোর পাখী বসে আছে। দেখতেও যেমনি বেয়াড়া মাংসেও তেমনি আঁশটে গন্ধ। ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে বলল, সাহেবের জন্যে কয়েকটা মেরে দিতে। একসঙ্গে তিনটে ফায়ার হোল। চারটে তৎক্ষণাৎ মরল, আর পাঁচটা আহত হয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ড্রাইভার, দেড়ফুট লম্বা এক ভয়ঙ্কর ছোরা নিয়ে—মরাগুলোকে জবাই করে, জ্যান্তগুলোকে করল।

পাখী তো হোল—এবার ফার্ষ্ট গীয়ার আর ফোর হুইল ড্রাইভে, বালি উড়িয়ে অন্ধকার করে আমরা নদীতে প্রবেশ করলাম। নদীতে মাত্র তিন ফিট জল ছিল, অক্লেশে সেটা পার হয়ে যেতে, ডি-এস-পি, প্রস্তাব করলেন, ট্রাকটর ফেরৎ যাক কোনো দরকার নেই। ওয়েপন কেরিয়ার স্বচ্ছন্দে এ সব নদী পার হবে, আর ট্রাকটরের বজ্রনিনাদে, একমাইল দূর থেকে পাখী আর জানোয়ার পালাবে।

এ কথা রায়জীর মনঃপূত হোল না। তিনি বললেন, কেন এই শামুকখোরগুলো ত পালালো না।

জজসাহেব রায় দিলেন যে—তাদের মৃত্যু এসে গিয়েছিল, তাই ওড়েনি। আসলে তুমি আমি কে মারবার! হঠাৎ সিংজী চেঁচিয়ে উঠলেন—হরিয়াল!

সত্যি—সামনে বটগাছে এক ঝাঁক হরিয়াল। ঠিক হোল, এস-ডি-ওই মারবেন। তাঁর নিশানও ভাল। এক ফায়ারে তিনটে পড়ল। আর আবার ড্রাইভার সেই ভয়ঙ্কর ছোরা নিয়ে ছুটল—জবাই করতে। পেছন পেছন মুনসেফ। গাছতলায় পৌঁছে মুনসেফ বললেন, পাখী তো মরে পাথর জবাই করে কি হবে। ড্রাইভার মুখ ভারী করে পাখী নিয়ে ফিরল

মুনসেফ ফিস ফিস করে রায়জীকে বললেন, ড্রাইভারের উচ্ছিষ্ট খাবেন না। আমাদের খেতে দেবে না। অর্থাৎ মুনসেফ গোঁড়া হিন্দু, জবাই মাংস খান না।

চলেছি—সামনে কিছুদূর মরুভূমির মত, সাদা ঝক্‌ ঝক্‌ করছে বড়দানা বালি, অভ্রকুচি মেশানো। গাড়ী আবার স্পেশাল গীয়ার ফোর হুইল ড্রাইভে, গর্জ্জন করতে করতে চলল। পারও হোল, না হলেও ভয় নেই—সঙ্গে ট্রাক্টর আছে। সামনের গ্রামে একটি লোক, হাত তুলে গাড়ী থামিয়ে চীৎকার করে বলল, সে দু'আনা পয়সা দেবে, তাকে সাহার্সা পৌঁছে দেওয়া হোক। ড্রাইভার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। আবার চললাম।

কুশীর অসংখ্য ধারা বইত আগে, এখন তারই মরা খাতগুলো রয়ে গেছে। স্রোত নেই, কোনোটায় এক হাঁটু, কোনোটায় এক কোমর জল। না থেমেই চললাম গোরহো নদী পার হয়ে। এই গোরহো দশ বছর আগে অবধি কুমীরের ডিপো ছিল, এখন কেবল ধূ-ধূ বালি আর মধ্যে এক হাঁটু জল। গোরহো পার হয়ে শুকনো ধুলোর বালির রাজ্য শেষ করে, যখন আমাদের গন্তব্য মহিষি গ্রামের তিন-চার মাইল কাছাকাছি এলাম, তখন সবারই গায়ে ঘ্যাঁতলানো, টাটানো ব্যথা, আর ধুলোয় নাক-চোখ জ্বালা করছে। এ জেলায় এতদিনে পথ তৈরী আরম্ভ হয়েছে, এখনো সুগম পথ নেই। ১১৩৪এর ভূমিকম্প আর সেই সময় কুশী আগমনের পূর্ব্বে খুব ভাল পথ অবশ্য ছিল। এখান থেকে আরম্ভ হোল বর্ত্তমান কুশী রাজ্যের সীমা। শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্য থেকে শাস্ত্র আলোচনা করতে পায়ে হেঁটে মহিষি গ্রামে এসেছিলেন। মণ্ডন মিশ্র আর উভয়ভারতীর গ্রামে—তারা দেবীর মহাপীঠস্থানে।

মহিষিতে মন্দির আছে। দেবীর কাল পাথরের মূর্ত্তি। পুকুর খুঁড়তে গেলে অনেক মূর্ত্তি ও স্তম্ভ বেরোয়। আর্য্য সভ্যতার অসংখ্য শ্মশানের মধ্যে মহিষিও একটি। জ্ঞান সভ্যতা, সম্পদ, সুখ, আনন্দ—মানুষের, গোষ্ঠীর, সমাজের, দেশের ক্ষণিকের জন্যে আসে। আর ক্ষণপ্রভার মতই মিলিয়ে যায়।

শঙ্করের ও ব্রাহ্মণদের বাতিল করা অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি মন্দিরের বাইরে হিন্দু দেবতাদের ছদ্মবেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে খুব ফুল, সিঁদুর আর প্রণাম পাচ্ছেন মেয়েদের।

আর একবার শিকার করতে গিয়েছিলাম এখান থেকে বহু দূরে উত্তর পশ্চিমে, বাংভোজা জেলার সীমানায়। সেখানেও এক চতুর্মুখী বিগ্রহ দেখেছিলাম। সেবার চার বন্ধু ছিলাম। এক তেপান্তরে রাত্তির হয়ে গেল, আমরা ক্লান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে পৌঁছাই। সেখানে এক মন্দিরে রাত্রির মত আশ্রয় নিই। মন্দিরটি বহুকাল আগের তৈরী। পাশে ছোট দরদালান, বোধ হয় যাত্রীনিবাস ছিল। বর্ত্তমানে সেখানে গ্রামের মোড়লের দুটি বলদ আর দুটি মহিষ থাকে। সারা দিন ঘুরোয় আর রাত্রি গভীর হলেই বাঘের মত পরের ফসলে গিয়ে পড়ে। ভোর হলে ফেরে। ফলে তাদের গতিবেগ উচ্চৈঃশ্রবার আর সাইজ ঐরাবতের। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, গো-পালক তখন পশুদের দড়ি খুলছে। বললে—ঐ কোণের খড়ের গাদার ওপরে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারি। তার পরই লাইট ব্রিগেডের চার্জ্জের মত, চারটি পশু হুঙ্কার দিয়ে ভীমবেগে ঊর্দ্ধপুচ্ছে ষ্টার্ট করল। সবচেয়ে মাতব্বর মহিষটার পিঠে গো-পালক। ভোরবেলায় ফিরে আসা মহিষদের গর্জ্জনে ঘুম ভাঙল। বেরিয়ে দেখি, চমৎকার ইদারা, পরিষ্কার জল, পাশেই কল্কে ফুল, ধুতুরা আর সাদা গোলাপ। চারদিকে সবুজ শস্যের শোভা, যেন একখানি মস্ত বড় কার্পেট বিছানো রয়েছে। কেবল উত্তর-পশ্চিম দিকে কাশের জঙ্গল, যতদূর দেখা যায়।

বহুদূরে—সোজা উত্তরে গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ আর উত্তর-পূর্ব্বে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভোরের আলোয় ঝলমল করছে। মন্দিরের দরজা খোলা, দূর থেকে গ্রামের পুরোহিত এসেছেন, পুজোয় বসেছেন, স্বেচ্ছার কাজ। আমিও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ভিজা গায়ে ভিজে আণ্ডারওয়্যারে, পুজো করতে মন্দিরে ঢুকলাম। পুরোহিত অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার বর্ব্বরোচিত বেশের দিকে তাকালেন, তার পর কি ভেবে মুখ ঘুরিয়ে পুজোয় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর পুজো শেষ হবার পর, ঘুরে বসে আমায় অঙ্গন্যাস প্রভৃতি করতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। পুজোর শেষে তাঁকে নৈবেদ্যর জন্য আধ সের চিনি, শিকারের ঝোলা থেকে দিয়ে খুশী করলাম, গল্প শোনার উদ্দেশ্যে। পুরোহিতের পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ এ বিগ্রহের পূজা করেছেন, কিন্তু কেউই মন্দিরের বা বিগ্রহের ইতিহাস জানতেন না। পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করায় বললেন, মূর্ত্তি হ'ল শিবের।

বললাম তা কি করে হয়! চতুর্ম্মুখ, দাড়ি আছে, গলায় উপবীত, হাতে জপের মালা আর কমণ্ডলু হংসবাহন, এ তো ব্রহ্মার মূর্ত্তি। ব্রহ্মার মূর্ত্তি কদাচিৎ দেখা যায়। আর এত সুন্দর আর বড়, কালপাথরের নিখুঁত মূর্ত্তি, আমি ত দেখিনি!

•

অন্যমনস্ক হয়ে অন্যবারের শিকারের কথা ভাবছিলাম। সবাই, এই অঞ্চলের নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে এসে উদাস বোধ করছিলেন। এমন সময় ড্রাইভার একটা জলামত জায়গার সামনে গাড়ী থামালো। কতটা জল আর পাঁক আছে দেখার জন্যে। ট্রাক্টর খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল, তবে তার গর্জ্জনার শোনা যাচ্ছিল। ড্রাইভার জুতো খুলে জলে নেমে দেখল, জল এক হাঁটুর কিছু বেশী তবে নীচে নরম, পেছল কাদা। যাই হোক, আবার ফোর হুইল আর স্পেশাল গীয়ার দিয়ে মস্ত মাতঙ্গের মত গাড়ী প্রায় দুশ গজ জলার ভেতর যেতে, ফুট বোর্ড ছাড়িয়ে জল উঠল। গাড়ী ক্রমশঃ পাঁকে বসছে, সাইলেন্সারে জল ঢুকে, এঞ্জিন থামবার মত অবস্থা, তখন হাফক্লাচ আর ফুল এক্সিলেটার দিয়ে রাখতে গাড়ী আবার খানিকটা এগিয়ে গেলে, জল প্রায় এককোমর হল। মাঝ জলায় এঞ্জিন বন্ধ হল বলে। কিন্তু ট্রাক্টর এসে পড়ল আর সামনে গিয়ে তারের মোটা কাছি দিয়ে টানতে লাগল। গাড়ী কাদা, সলিল মথিত করে আকর্ষিত হোল। রায়জীর অহঙ্কার দেখে কে। যেন তিনিই টানছেন, বললেন, দেখ দাদা। বলতে বলতেই, ট্রাকটরও থামার উপক্রম। গিয়ার নিউট্রাল রেখে, স্পীডে এঞ্জিন চালু রাখা হল একবার বন্ধ হলে ওখানে আর ষ্টার্ট হবে না।

কি অবস্থা! সামনে পেছনে দুশ' আড়াইশ' গজ জলা আর দু' পাশে কয়েক মাইল জলা। দুই বছর আগেও সুন্দর শালবন ছিল, আর তার মধ্য দিয়ে কুশীর ছোট শাখা পুরানী নদী ছিল। হঠাৎ 'কৌষিকি' মহারাণীর, কি ইচ্ছা হল, তিনি পুরানীর খাত দিয়ে আর জল নেবেন না, অবিলম্বে বালী দিয়ে পুরানীর মুখ বন্ধ করে, এক অতি লম্বা জলার সৃষ্টি করেছেন।

এদিকে অবস্থা সঙ্গীন, মহিষি তো কাছে, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমরা সকলেই ক্ষুধ-তৃষ্ণায় কাতর। রাংজী সিংজীর মুখ শুকিয়ে গেছে, তাঁরা চুপি চুপি পরামর্শ করছেন উদ্ধারের উপায়, ড্রাইভার গজগজ করছে পেট্রল পোড়ায়। মা ভৈঃ—মহিষি থেকে আমাদের লোকেরা ট্রাকটর, লরীর গর্জ্জন শুনতে পেয়েছে। দেখা গেল বিশাল কালো মেঘের মত মেঘনাদ মহিষির দিকের শালবন থেকে বের হচ্ছে। চার চার ফুট লম্বা দুটি দাঁত, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠছে। পেছন পেছন আমাদের লোকজন, আর্দ্দালী ও গ্রামবাসী ছেলেরা। মেঘনাদ জলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে এল। স্থির করলাম, গাড়ী মাথা দিয়ে ঠেলবে, পেছন থেকে। আর সামনে থেকে ট্রাকটর টানবে। মেঘনাদ মাহুতের ইসারায় গাড়ীর বডির নীচে দাঁত দুটি ফিট করে, গাড়ীটা আগে পাঁক থেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর ট্রাকটরের টান মারার সঙ্গে সঙ্গে কপাল দিয়ে গাড়ীকে ঠেলতে লাগল। জল ভেদ করে, পাশে ঢেউএর মত কাদা উঠতে লাগল। আর মধ্যে মধ্যে চাকা স্লিপ করে ফোয়ারার মত জল ফেলে গাড়ী এগিয়ে চলল। জলা থেকে গাড়ী বের হল। বার হতেই মেঘনাদ গাড়ী ছেড়ে দিয়ে, শুঁড় উঁচু করে ভীম বৃংহণ করে উঠল। আনন্দে অধীর হয়ে বন্ধু সিংজী গাড়ী থেকে নেমে তাঁর হাতীকে আদর করতে গেলেন। আর হাতীও আহ্লাদ করে বসে পড়ল তাঁকে পিঠে নেওয়ার জন্যে। বন্ধু হুজুরদের অনুমতি ক্রমে, হাতীর পিঠেই চললেন। আগামী কাল বিকেলের মধ্যে যাতে জলার মধ্যে মোটর যাবার মত পথ কঞ্চি, ডালপালা আর খড় কাশ পেতে তৈরী থাকে তার বন্দোবস্ত করা হল।

নালা, খন্দ, মাঠ দিয়ে সর্টকাট করে হাতীর পিঠে সিংজী, আগেই মহিষি ডাকবাংলায় পৌঁছলেন। আর আমরা প্রায় দেড় মাইল পথ, চার মাইল ঘুরে, পৌঁছতে দেখি ডাকবাংলায় মেলা বসে গিয়েছে। কয়েকটি পেট্রোম্যাক্স আর কারবাইড জ্বলছে। গ্রামের ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা তামাসা দেখতে এসেছে।

গাড়ী থেকে নামলাম সবাই, অবস্থা সত্যিই কাহিল আর মেজাজ

খারাপ। চা-খাবার খেয়ে শুয়েই পড়লাম। ওদিকে 'তাস' আরম্ভ হল।

অন্ধকার থাকতে ঘুম ভেঙে গেল। জলায় হাঁসের খোঁজে চললাম, একলাই। আবছা অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে একলা চলেছি, গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে জল পড়ছে আর হু-হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে। মিনিট আষ্টেকের ভেতর জলার ধারে গিয়ে দেখি ঘন কুয়াশায় জলা আচ্ছন্ন। আর সেখান থেকে আসছে বহু বিচিত্র ধ্বনি। একটা ঢিপির আড়ালে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছি—দেখি সামনেই মাত্র ত্রিশ গজ দূরে এক ঝাঁক চখা অল্পজলে বসে আছে। ঢিপির পাশ থেকে নীচু হয়ে, রাইফেল জলের সমান্তরাল করে নিশান নিয়ে ট্রিগার টিপতেই, সামান্য ফট্ করে শব্দ হোল, আর সামনের চখা নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজে পড়ল, তার পেছনেরটা একবার ক্যাঁও—করেই স্থির হয়ে গেল। পাখী দুটো হাতে নিয়ে দেখলাম প্রথম চখাটির মাথা ফুটো করে, বুলেট দ্বিতীয়টির বুকে প্রবেশ করেছে।

সূর্যোদয়ের একটু পরেই আরো তিনটে হাতী এল, মেঘনাদ ত' আছেই। সব চেয়ে বড় হাতী পবনকুমারে চড়লেন জেলাজজ ও রায়জী। মেঘনাদে আরোহণ করলেন এস-ডি-ও এবং ডি-এস-পি সেজ হাতীতে মুন্সেফ আর সিংজী। হাতীতে উঠবার আগে মুন্সেফ চুপি চুপি আমায় বললেন, মিঞা ড্রাইভার যাকে আমি সঙ্গে নিচ্ছি, সে যেন ভাল পাখীগুলো আর হরিণগুলোকে জবাই করবার সুযোগ না পায়। সব চেয়ে ছোট একটি থুরথুরে হাতীতে চড়ে আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম, পড়ে গেলে খুন হবো না। কোন হাতীতেই হাওদা নেই, শুধু গদী। ড্রাইভার আমার পেছনে বসল।

গ্রামের বাইরে যেতেই শস্যক্ষেত থেকে একটি দুর্লভ পাখী "ককৃশ্বিকাণ্ট" উড়ল। তৎক্ষণাৎ ডি-এস-পি এবং এস-ডি-ও একসঙ্গেই ফায়ার করলেন। পাখী পড়ল। কিন্তু কার শটে? হাওয়া গরম, বিদ্যুতের ঝলক, থমথমে ব্যাপার। ড্রাইভার নেমে, পাখী তুলে আনতে, ছোট ছুরী দিয়ে আঘাতের স্থান চিরে পাঁচটি ছররা পেলাম। তিনটি, চার নম্বর ও দু'টি বি, বি ছররা। দু'রকমই রয়েছে। হাওয়া ঠাণ্ডা হল, বিদ্যুৎ মিলিয়ে গেল, আর সকালবেলাকার পনের কুড়ি মিনিট সময় নষ্ট হোল।

এক ঘণ্টা পরে বোঁচা নদীর তীরে পৌঁছলাম। সবাই হাতী থেকে নেমেছি, এমন সময় আমার অভ্যস্ত চোখে পড়ল। জলের ওপার ঘেঁসে তিনটি বিন্দু আর তার পেছনে কয়েকটি কাঁটা—স্রোতেও স্থির—এক জায়গায় রয়েছে। অর্থাৎ মানুষখেকো কুমীর জলে ঘাপটি মেরে রয়েছে। কাউকে কিছু না বলে—ব্রোঞ্জ পয়েণ্ট বুলেট রাইফেলে ভরে, তিনটি বিন্দুর—সামনেরটি নাক আর পেছনের দুটি চোখ পেছনটায় ফায়ার করলাম। জলের মধ্যে যেন বোমা ফাটল। বুলেট কুমীরের চোখে ঢুকে, মাথার খুলির খানিকটা হাড়—নদীর পাড়ে ফেলে, বোঁ করে ওপরে উঠে গেল। আর দানবীয় শক্তিতে জল মথিত করে, চাপা, ক্রুদ্ধ গাঁ গাঁ শব্দ করে কুমীরটা ডুব মারল। এস-ডি-ও ভাবলেন, ফসকাল, বললাম, এখন খানিকটা উজিয়ে গিয়ে উঠবে আহত কুমীর বেশীক্ষণ জলের নীচে থাকতে পারে না, উজিয়ে যেতে চেষ্টা করে। মিনিট খানেকও হয় নি, প্রায় দুশ' গজ উজিয়ে কুমীরটা ওপারের কাছে উঠল। নিমেষে 'হাইভেলোসিটি মশরুম' বুলেট ওর ঘাড় আন্দাজ করে ফায়ার করলাম। ডিগবাজী খেয়ে আবার ডুব মারল। কঠিন প্রাণ বটে! মুন্সেফ আর সিংজী একটি নৌকো নিয়ে কুমীরের পেছনে ধাওয়া করলেন। পাড় দিয়ে তাঁদের হাতী চলল। বড় কর্তারা রায়জীসহ নৌকোয় পার হয়ে গেলেন। হাতীরা সাঁতার দিল। ওপারে আবার সবাই হাতীতে চললেন। আমি এপারেই হাতীর পিঠে, নদীর পাড় দিয়ে, দক্ষিণ দিকে চললাম।

মাইল পাঁচেক গিয়ে কাশের জঙ্গল আর মধ্যে মধ্যে সরু নালার মত, অল্প গভীর জল, কুমীর অসংখ্য ধারা। বরফের মত ঠাণ্ডা। জলের তলে সাদা বালি চক্ চক্ করছে। ছোটবড় রকমারি মাছ ছুটোছুটি করছে। হাতী থামিয়ে মাছ দেখছি, এমন সময় মাহুত চাপা গলায় বলল, সামনে "একার" (দলছাড়া দাঁতাল বনওয়ার) আমার মনে হল, ছোট মহিষ বললাম তাই, তবু মাহুত জিদ্ করায়, পাঁচটা রাইফেল্ড শ্লাগ ভরা, অটোমেটিক গান তুলে ভাল করে দেখতে লাগলাম। কারণ এরকম ক্ষেত্রে কখনো কখনো ঝোপের ভেতর মানুষ, আর গরু মোষ খুন হয়। ইতিমধ্যে বনওয়ারটি বনে প্রবেশ করল।

খানিকটা এগিয়ে আধাঙ্গা প্রভৃতি ছোট হাঁস আর ময়ূরের মত সুন্দর কিন্তু পেখমহীন, অতি সুস্বাদু "কারণ" পাখী (প্যাড ফাউল) পেলাম।

এখানে কিছু গোয়ালা অনেক গরু মহিষ নিয়ে কাশের জঙ্গলে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আর ট্রাকটরের কল্যাণে পড়তি গোচর ভূমি আর কোথাও নেই। সেজন্যে এইখানে দুধ বিনা পয়সায় খাওয়া যায়। এই গোয়ালা আর গরু মহিষের জন্যে, যতই ভাল লক্ষ্য হোক না কেন, শিকার একেবারে পরিষ্কার নজর না হলে দুর্ঘটনা হতে পারে। তাই মধ্যে মধ্যে চকিতে হরিণ দেখা গেলেও গুলী চালালাম না। উদ্‌বিড়াল (ভোঁদড়) মারার চেষ্টা করলাম, কারণ, পাখী মরে যেই জলে পড়ে অমনি টুপ করে নিয়ে জলে ডুব মারে। দু'বার মিস করলাম। চলমান হাতীর পিঠ থেকে, অব্যর্থ লক্ষ্য সেই দাবী করতে পারে, যে ভূমিকম্পের সময় জল ভরা গ্লাস হাতে নিয়ে বেড়াতে পারে, না ফেলে।

বেলা তিনটে আন্দাজ, গোটা ত্রিশেক সুখাদ্য পাখী নিয়ে, ঘাটের কাছে ফিরে দেখি মুন্সেফ ও সিংজী কুমীর উদ্ধার করে, গোরুগাড়ী যোগাড় করে রওনা হবার উপক্রম করছেন। একটু পরেই, ডি-এস-পি আর এস-ডি-ও একটা বড় হরিণ নিয়ে এলেন। আবার তাতে দু'জনের গুলী। এবার সঙ্গে লোকেদের আনা বাস্কেটে, খাওয়ার সব সরঞ্জাম ছিলই, ষ্টোভ জেলে দুধ গরম করে, কফি, রুটী, মাখন, জ্যাম প্রভৃতি খেয়ে তৃপ্তি করে সিগারেট ধরিয়েছি আর—জজ ও রায়জীর অপেক্ষা করছি, এমন সময় কয়েকটি গোয়ালা মহিষির দিক থেকে লাঠি ঘাড়ে করে উচ্চৈঃস্বরে গাইতে গাইতে আসছিল:

'বেলন পর বেলা রোটা,
দ্যাখি উঁচা, হাকিম মোটা'।

আমাদের দেখেই চুপ হয়ে গেল। স্ফূর্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বেচারীদের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তারা দুজন হাকিমকে, বয়েল গাড়ীতে মহিষি পৌঁছে দিয়ে আসছে—বয়েল গাড়ীও আসছে, পেছনে আছে।

ব্যাপার এই যে, হাতীর পিঠ থেকে জজ সাহেব আর রায়জী একটা দাঁতাল বনশুয়ারের ওপর ফায়ার করেন, গুলী ঠিকমত লাগেনি, সামান্য আহত ক্রুদ্ধ দাঁতাল ভীষণ ভাবে হাতীকে আক্রমণ করে আর তার বড় দাঁত দুটি হাতীর গোদা পায়ে এমন গেঁথে দেয়, যে হাতী ক্ষেপে শুঁড় দিয়ে আট-দশ মণ ভারী দাঁতালকে তুলে আছাড় মারে। দাঁত দুটি দাঁতালের ভেঙ্গে হাতীর পায়েই থেকে যায়। হাতী যন্ত্রণায় ক্ষেপে শুঁড় দিয়ে মাহুতকে ধরার চেষ্টা করতে থাকে, না পেয়ে পাগলের মত উত্তরে তার গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে। পথে একটি শুকনো আমবাগান ছিল, তার নীচু ডালে আঘাত লাগার সম্ভাবনায় মাহুত ডাল ধরে উঠে যায়। রায়জী মাহুতের অনুকরণ করতে গিয়ে, হাতে-মুখে ডালের আঘাত পেয়ে নীচে পড়ে যান আর পা মচকে যায়। জজ সাহেব বুদ্ধি করে গদীর ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন, ফলে তাঁর কোথাও চোট লাগেনি। তাঁর দেহ ডালে আটকে যায় আর অজ্ঞান হয়ে হাতী থেকে পড়ে যান। নীচে কাদা থাকায় কেউ খুন হননি। হাতী আর মাহুত ফেরার। খবর শুনে গয়লাদের গানের অর্থ বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। অবিলম্বে রওনা হলাম। মহিষি ফিরে দেখি স্থানীয় ডাক্তার তাঁদের ওয়েপন্ কেরিয়ারে তুলে, ট্রাক্টরের ড্রাইভার দিয়ে চালিয়ে সাহার্সা চলে গেছে। যাবার সময় কোনো অসুবিধে হয়নি। ঝাউ আর কাশ বিছিয়ে, জলায় পথ ঠিক করাই ছিল।

আমাদের খাবার তৈরী ছিল, বললাম ট্রাক্টর চড়ে আমি সাহার্সা রওনা হচ্ছি। দেখব, যাতে ভোরবেলাতেই ওয়েপন্ কেরিয়ার তাঁদের নেবার জন্যে এসে যায়। সাহার্সা হাসপাতালে গিয়ে দেখি, জজ আর রায়জীর জ্ঞান ফিরে এসেছে, তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি। রায়জীর মুখ-হাত ব্যাণ্ডেজে মোড়া, পায়ে স্প্লিণ্ট। জজ সাহেবের শুধু উদরদেশে ব্যাণ্ডেজ।

আমরা গাড়ী আর ড্রাইভার নিয়ে রাত এগারোটায় মাধীপুরায় বাড়ী ফিরলাম। গাড়ী পেট্রল ভরে আবার মহিষি চলল, ভোরবেলায় সেখানে পৌঁছতে হবে।

ফুল ফোটানোর গান

অশোক ভট্টাচার্য

কিসের স্পর্শ খুঁজে বেড়াই সারাটা দিন—
সারাটা পথ কার সন্ধানে হাঁটি?
সে কী জীবন না মৃত্যু!

বৈশাখের রোদ মানি না, মাঘের রাত কাটাই
খোলা আকাশের নিচে। তবু তাকে পাই না।
যাকে পাই না
কিসে মন ভারী করে থাকে?

রাতের চাঁদোয়া খসে পড়ে।
ঝিঁঝিঁঝিঁ বাতাসে
পাখি তার ভোরের গানে সুর চড়ায়।
দূরে কাছে ধীরে ধীরে কোলাহল জাগে—
ব্যর্থ তবু, অ সময় ঘরে ফিরে আসি।

ধূসর শহরের পিচ-গলা পথে ক্লান্ত আমি
দেহ টেনে টেনে পথ চলি। বেলাশেষে
পার্কের বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম নিই—
অঞ্জলি ভরে জল করি পান। তারপর শুরু
আবার সে দৃপ্ত অভিযান। কিন্তু, কিসের বাসনা বল
আমার এ বুকে, সে কি ভালোবাসা?
মরা গাছে ফুল ফোটানোর গান।

ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না।]
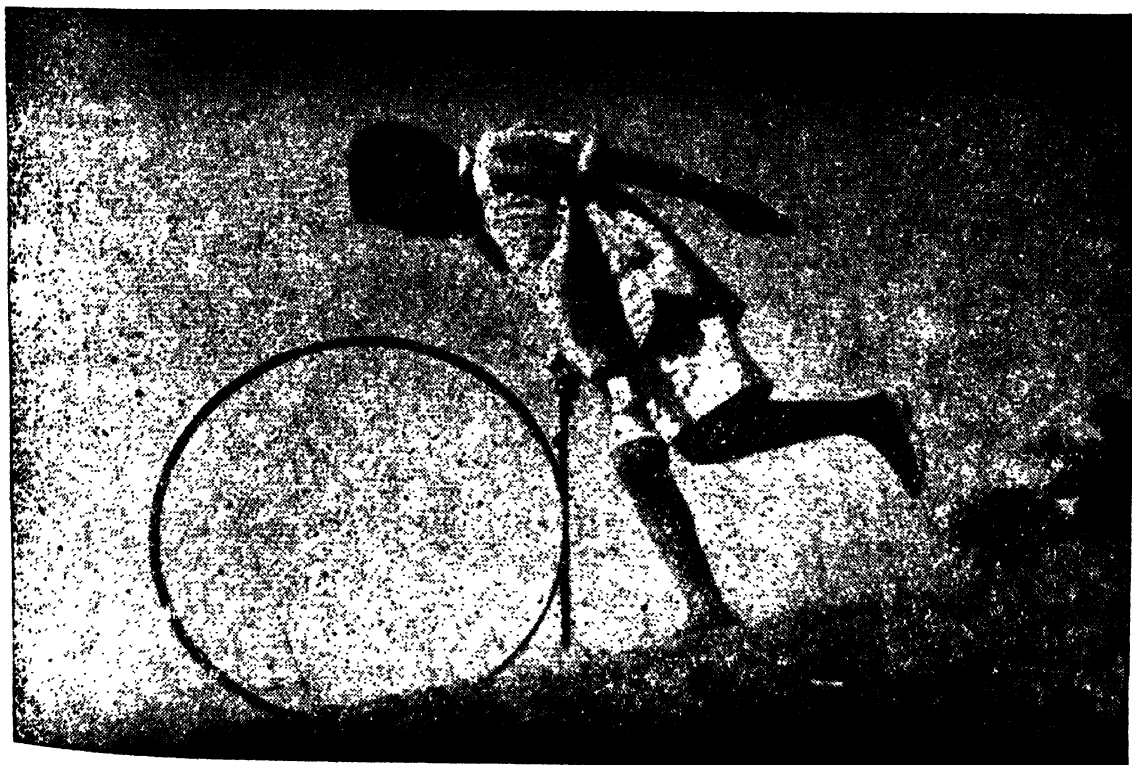
-বিভাষ মিত্র

কেবল খেলা
—রামকিঙ্কর সিংহ

জল থেকে ডাঙ্গায় —রামকৃষ্ণ (মেদিনীপুর)

সূর্য্যপ্রণাম —সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

পারাপার

—বি, দাশ (পুরুলিয়)

অজয় নদী (বীরভূম)

—নিমাইরঞ্জন গুপ্ত

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রবিতীর্থে

রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের মনীষী, সর্বকালের কোবিদ, সর্বকালের প্রণম্য। ভারতীয় সনাতন সভ্যতার তিনি ধারক, বাহক, প্রচারক, শাশ্বত সংস্কৃতির তিনি বাণীমূর্তি, নবচেতনার তিনি জন্মদাতা, তাই তাঁর দেহান্তের পূর্বে যেখানেই ঘটেছে তাঁর বহু আকাঙ্খিত উপস্থিতি, সেই স্থানই ভরে উঠেছে এক মাহাত্ম্যে, উদ্ভাসিত হয়েছে আলোয়, পরিণত হয়েছে তীর্থে। এই রবীন্দ্রতীর্থের তীর্থঙ্করদের মধ্যে যাঁদের স্থান সকলের পুরোভাগে তাঁদের মধ্যে ভারতের প্রবীণ শিল্পাচার্য সুকবি শ্রীঅসিতকুমার হালদার অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে বসে জীবনের দীক্ষালাভ করেছিলেন যে জীবন-পথিকের দল অসিতকুমার তাঁদেরই একজন তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য বন্ধনেও অসিতকুমার আবদ্ধ। শিল্পীর মাতামহী ছিলেন কবির সহোদরা। শিল্পীর জন্মও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতেই, সুতরাং সকলদিক থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছের মানুষ হিসেবেই পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল অসিতকুমারের। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নিজের চোখে দেখা বিগত দিনের ঘটনাগুলিকে স্মৃতির পাত্র থেকে সাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন অসিতকুমার উপরোক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে। শান্তিনিকেতন থেকে অসিতকুমারের বিদায়গ্রহণের পূর্বমুহূর্তটি পর্যন্ত এই গ্রন্থে অসিতকুমার সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের গোড়ার দিকের প্রায় সমগ্র ইতিহাস এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া হালদার পরিবারের ও ঠাকুর পরিবারের বহু কীর্তিমান পুরুষ ও কীর্তিমতী মহিলাদের সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনাও গ্রন্থের অন্যতম সম্পদবিশেষ। অসিতকুমার শিল্পী, তাঁর তুলি কথা কয়, কিন্তু কলমও তাঁর নীরব নয়। তাঁর ভাষা, বর্ণনভঙ্গী, রচনাশৈলী যথোচিত প্রতিভার, স্বাক্ষর বহন করে। গ্রন্থটিকে ঠাকুর পরিবার, হালদার পরিবার, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতনে আগত বিদেশী অধ্যাপকগণ, অভ্যাগতবৃন্দ, বিচিত্রার কাহিনী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসার অবসান বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। অসিতকুমারের শিল্পময় বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন মূর্তিতে দেখা দিচ্ছেন। শান্তিনিকেতন যেন আবার ফিরে গেছে তার সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে, আলোচ্যমান ঘটনাগুলির যেন পুনরভিনয় হচ্ছে পাঠকদের চোখের সামনে। তবে কয়েকটি গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ বিশেষভাবে চোখে পড়ে, ভারপ্রাপ্তগণ এ দিকে একটু অধিক মনঃসংযোগ করলে আমরা খুশী হতুম। অসিতকুমারের আঁকা বহুজনের রেখাচিত্র গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করে। অসিতকুমারের পরিকল্পনানুযায়ী প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সর্বাঙ্গসুন্দর তথ্যবহুল, সুরচিত গ্রন্থটি ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করুক এই আমাদের কামনা। প্রকাশক—অঞ্জনা প্রকাশনী, ১৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র

একথা আজ নতুন করে বলতে হবে না যে, শরৎচন্দ্রের চমকপ্রদ জীবনের প্রথমার্ধের অনেকগুলো দিন অতিবাহিত হয়েছে ব্রহ্মদেশে। সাহিত্যিকরূপে বাঙলা দেশে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করার আগে শরৎচন্দ্র বর্মার প্রায় স্থায়ী বাসিন্দাই হয়ে গিয়েছিলেন। বর্মা, সেখানকার মানুষ, সেখানকার জীবনধারা, সেখানকার ভাব কল্পনাও তাঁর সাহিত্যে নানা পরিবেশের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে। তবে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাসের খুঁটিনাটি ঘটনা সংক্রান্ত বিশদ ধারাবাহিক বিবরণ খুব বেশী জানা যায়নি—যা জানা গেছে তা খুব বিস্তারিত নয়, উপরোক্ত গ্রন্থখানি সেই অভাব পূর্ণ করবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থটির মাধ্যমে লেখক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসু ও সন্ধানী ব্যক্তিদের কৌতূহল নিরসন করে বাঙালীর ধন্যবাদ লাভ করার দাবী রেখে গেছেন। যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন সেখানে শরৎচন্দ্রের কর্ম-জীবনের সতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথের কলানুরাগই তাঁকে শরৎচন্দ্রের মনের একটি বিশেষ স্থানে উপনীত করেছিল, লেখক দীর্ঘদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন, ব্রহ্মদেশে বাস করা কালীন শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটে যাওয়া এমন অনেক ঘটনা, কাহিনী আছে যা হয় তো সাধারণে সুবিদিত নয়। সেই সকল তথ্যগুলি গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থটিতে ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বর্মা সম্বন্ধেও তথ্যাদি এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি শরৎচন্দ্রের প্রতি লেখকের অসীম শ্রদ্ধার ছাপ বইটির প্রতিটি পংক্তিতে ফুটে ওঠে। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

বাঙলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র

সকল দিক কেন্দ্র করা বাঙলার ও বাঙালীর নব জাগরণের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর অবদান অসামান্য। সৃষ্টির, প্রগতির ও অগ্রগমনের এক অভিনব চেতনা বাঙালীর জনজীবনে যে কি অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল তা বর্ণনার অতীত। বাঙলার দিকপাল সন্তানদের কল্যাণে ঐ সময় দেশের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক, অভিনয় প্রভৃতির ক্রমোন্নয়নের ফলে জাতীয় সংস্কৃতি ভরে উঠল এক মহিমান্বিত দীপ্তিতে। জাতীয় সংস্কৃতির এই ব্যাপক জয় যাত্রাই দেশের শ্রীবৃদ্ধির নামান্তরমাত্র। এই দিকপাল সন্তানদের মধ্যে নট-ভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ জাতির নমস্য। বাঙলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের পাতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি বিশেষ স্বাক্ষর। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে অভিনয়জগতে যে ধারার সূত্রপাত হল গিরিশচন্দ্র সেই ধারার প্রথম পুরুষ। বাঙলা নাট্য বিবর্ধনে তাঁর অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে উপরোক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে মনোজ্ঞ, সারগর্ভ, তথ্যপূর্ণ আলোচনা পরিবেশন করেছেন তাঁরই প্রদর্শিত পথের আর একজন বরণীয় পথিক বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা, নাট্যবোদ্ধা নটসূর্য্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ লেকচারার হিসেবে তিনি যে সুচিন্তিত ভাষণ দেন, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই বক্তৃতামালার গ্রন্থরূপ। অহীন্দ্র চৌধুরী এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ, ব্যাপক জয়যাত্রা সম্পর্কে আলোকপাত করে সুপ্রাচীনকালের এক ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে তুলে ধরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে লেবেদেফের আবির্ভাবের পর ও গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে শহরের বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহী ধনবান ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়, সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষণায় বাঙলাদেশের রঙ্গমঞ্চ কি ভাবে তিলে তিলে গড়ে উঠে সমৃদ্ধির আলোকধারায় স্নাত হয়েছে সে সম্পর্কে আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনায় লেখক অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ যাত্রা, গাজন, পাঁচালি পালাগান প্রমুখ লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গগুলিরও সুদীর্ঘকালের এক ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকের অভূতপূর্ব শ্রমস্বীকারের নিদর্শন, নানাবিধ তথ্যের সমষ্টি এই জ্ঞানপ্রসূ গ্রন্থটি কেবলমাত্র নাট্যরসিকদেরই তৃপ্ত করবে না, গবেষকমাত্রেই এই গ্রন্থের যথোচিত মূল্য দিতে কার্পণ্য করবেন না বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। এই জাতীয় গ্রন্থের যত সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। পরিশেষে জাতীয় দরবারে এই গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার জন্যে নটসূর্যকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

সাহিত্যে ছোটগল্প

সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টিতে ছোটগল্পের অবদান অনন্যসাধারণ। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙলাসাহিত্যের যে ব্যাপক প্রভাব তার জন্যে বাঙলা ছোটগল্প অনেকখানি দায়ী, শুধু বাঙলাদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বহু দিকপাল সাহিত্যসেবকের আবির্ভাব ঘটেছে। ভারতবর্ষকে ছোটগল্পের জন্মভূমি বলে অভিহিত করলে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট হতে হয় না, এ কথাও অনস্বীকার্য যে ইয়োরোপীয় ছোটগল্প সাহিত্যের জন্মদাতা ভারতীয় ছোটগল্প সাহিত্য। প্রাচীনকাল থেকে ছোটগল্পের আনুপূর্বিক ইতিহাস ইতঃপূর্বে ফ্রান্সে ও মার্কিণমুলুকে রচিত হলেও আমাদের দেশে ঠিক ঐ জাতীয় গ্রন্থ এতাবৎ কাল রচিত হয় নি বললেই চলে। আনন্দের কথা, বাঙলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সুখ্যাত অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের এই অভাব মোচন করলেন। তাঁর এই বিরাট ও মহৎ প্রচেষ্টায় তিনি জয়লাভ করলেন—এ কথাও আমরা অনায়াসেই বলতে পারি। গ্রন্থটি লেখকের প্রাণপাত পরিশ্রমের নিদর্শন! যুগের পর যুগ ধরে অসংখ্য ঘটনার প্রবাহের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময়কে সাক্ষী রেখে মানুষের ধ্যান-ধারণার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পও কি ভাবে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হতে লাগল তারই এক আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস কুশলী সাহিত্যিকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে। ছোটগল্পের এই ইতিহাস গ্রন্থটিকে যুগের ইতিহাস বলে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশীয় ছোটগল্পের ক্রমবর্ধনের এরকম তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, বিস্তারিত ইতিহাস সাহিত্য সমাজে পরিবেশন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠক সমাজের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ লাভ করবেন—এ বিশ্বাস আমরা মনে মনে পোষণ করি। এই সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থটি পাঠকমহলে যথোচিত সাড়া জাগাক ও সমাদর-লাভ করুক—এই আমাদের প্রার্থনা। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—আট টাকা মাত্র।

এক অঙ্গে এত রূপ

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক বিশেষ পুরুষ। বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। তাঁর সাতটি ছোটগল্প একত্রিত করে উপরোক্ত গ্রন্থটির সৃষ্টি। গল্পগুলি অচিন্ত্যকুমারের সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষরে উদ্দীপ্ত। তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর জীবনশিল্পী, জীবনস্পর্শী ও জীবনপূজারী গল্পগুলি এই সত্যই প্রমাণিত করে। গল্পগুলি অভিনবত্বে মণ্ডিত, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, বর্ণনায় প্রাণবন্ত। জীবনের এক-এক দিকের প্রতি লেখক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের অতুলনীয় বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বলিষ্ঠ প্রাণের তিনি নিত্য উপাসক তাই জীবনকে জটিলতার রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধার করতে তিনি যেন কৃতসঙ্কল্প। সর্বোপরি দেখা যায় অচিন্ত্যকুমার সন্ধানী, জীবনের এক দুর্বার রহস্যের উৎস সন্ধানে তাঁর লেখকচিত্ত ব্যাকুল। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে জীবনের গহন অন্তর্লোকে বাসা বাঁধতে সমর্থ হওয়ায় জীবনরহস্যের অনেকগুলো মূলসূত্রের উৎস যেন অচিন্ত্যকুমারের কাছে আর দুরধিগম্য নয়। প্রচ্ছদের বর্ণ নির্বাচন ও কেবলমাত্র অক্ষরের সাহায্যে প্রচ্ছদচিত্র পরিকল্পনায় শ্রীবিনয় সাহা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণ ও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ। দাম—তিন টাকা মাত্র।

সিন্ধুপারে

অনেক বছর আগে বাঙলা সাহিত্যের দরবারে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সুশান্ত সা'র অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল তার

স্মৃতি মিলিয়ে যাবার নয়। সুশান্ত সা'র সর্বাঙ্গীণ অভিনবত্ব লেখক প্রখ্যাত আইনজীবী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্তকে সাহিত্য জগতে এক বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আলোচ্য উপন্যাসটি সুশান্ত সা'র পৌত্র বিকাশকে কেন্দ্র করে লেখা। ডাক্তারি পাস ক'রে অতিরিক্ত অধ্যয়নের জন্যে বিকাশ বিলেত চলে যায় দেশে স্ত্রী ও শিশুপুত্র রেখে। বিলেতেই সে রয়ে গেল দেশে আর ফিরে এল না, এখন বিলেতে তার জীবন কি ভাবে কাটল, কি পরিবেশে, কি ধরণে—তারই ইতিবৃত্ত উপরোক্ত উপন্যাসটির আলোচ্য। উপন্যাসটি আগাগোড়া চিঠির আকারে লেখা। বিলেত জীবনকে কেন্দ্র করে বিকাশের আত্মকাহিনী অকপটে কোন কিছু না লুকিয়ে খোলাখুলি ভাবে সে চিঠির সাহায্যে জানিয়ে যাচ্ছে তার বোন বুলাকে। চরিত্র সৃষ্টি, ঘটনাবিন্যাস, বর্ণনভঙ্গী নীরদরঞ্জনের দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। একটি ভারতীয় উচ্চশিক্ষা লাভার্থে বিলেত গেল, সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হ'ল, ধীরে ধীরে সেই মেয়ের আকর্ষণ তার কাছে অনতিক্রম্য হয়ে উঠল তারপর ঘনিষ্ঠতা পরিণত হল বিবাহে—এ দিকে তার অতীত জীবন, তার ঘর-বাড়ী, সমাজ, তার সাধ্বী অনুরক্তা স্ত্রী, প্রাণাধিক শিশুপুত্র সব মুছে গেল তার মন থেকে। এই ঘটনাগুলি যে ভাবে ধারানুযায়ী সাজানো হয়েছে এবং কাহিনীর গতি যে ভাবে লেখক পরিচালিত করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। উপন্যাসটির আরও একটি কৃতিত্ব আছে—মানবতার দিক দিয়ে এর আবেদন অনস্বীকার্য। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে দীর্ঘ জীবনের জবানবন্দীরই ফাঁকে ফাঁকে প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠছে একান্ত আপনজনদের প্রতি চরম অবিচারের জন্য অনুশোচনা, দেশের প্রতি একটা অদ্ভুত টান, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে দেখার এক অদম্য ব্যাকুলতা, হৃদয়ধর্মের দিক দিয়ে এর আবেদন অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও লণ্ডন ও ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধীয় বহু তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে, লণ্ডনের ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও লেখক আলোকপাত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে এই উপন্যাসটিই অল্পকাল আগে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রী[illegible] চৌধুরী। প্রকাশক—নিউ-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ কলেজ রো। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সমুদ্র সফেন

আন্দামান—"যত হতভাগ্যের অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়"—প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই নামটি রীতিমত আতঙ্কের বস্তু ছিল। ভারতের সঙ্গে সংলগ্ন এই দ্বীপপুঞ্জটিই যেন আকুল আগ্রহে, পরম স্নেহে হাত বাড়িয়ে ললাটে অপরাধের শাস্তি চিহ্ন আঁকা হতভাগ্যদের কোলে তুলে নিত, বুক দিয়ে রাখত তাদের আগলে। দেখতে দেখতে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্দামানের বুকে নতুন স্পন্দন এল, আস্তে আস্তে যেন নতুন জীবনের সন্ধান পেল, মনপ্রাণ যেন ভরে গেল নব নব স্বপ্নে। সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দামানও এগিয়ে চলল। তার রূপ, তার অঙ্গসজ্জা, তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী, তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার চিন্তা-কল্পনা-ভাবধারা সব কিছুই পরিবর্তনের ছোঁয়ায় ক্রমেই উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে। যতদূর জানি, এ যাবৎ সাহিত্যে আন্দামান একরকম অনুপস্থিতই ছিল বর্তমানে যশস্বী সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কল্যাণে আন্দামান সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকায় পরিণত হল। আলোচ্য উপন্যাসটি আন্দামানকে কেন্দ্র করে লেখা। একদিকে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, অন্যদিকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখনীর চমৎকারিত্ব—এই দুইয়ের সম্মিলনে এক মর্মস্পর্শী অতুলনীয় সাহিত্যের জন্ম হল। তাঁকে কেবলমাত্র লেখক বললে বললে ভুল হবে এক অভাবনীয় অনুভূতি সম্পদেরও তিনি যোগ্য অধিকারী আর এই অনুভূতির উদাত্ত আলোকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের জীবন, তার প্রেমের স্বরূপ, তার ভাবধারার বৈচিত্র্য—এই সত্যের প্রতিষ্ঠাই আমরা দেখতে পাই এই উপন্যাসের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে। ইন্দুমতী, মহাদেব, থ মিন, মা-শাইন, হেওয়ার্ড প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখকের অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টির কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। সেদিন অপরাধীদের কোলে তুলে নিত আন্দামান, আজও আর এক ধরণের হতভাগ্যদের আশ্রয় দিচ্ছে আন্দামান। এই আন্দামান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার কৌতূহল থাকাটা আশ্চর্যের নয় যাঁরা সেই কৌতূহল পোষণ করেন এই উপন্যাসটি পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই পৌরাণিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ, ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আন্দামানের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা সংযোজিত হয়ে সাহিত্য পাঠকদের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেও সহায়তা করেছে। শ্রীকানাই পাল প্রচ্ছদ চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, দাম—সাড়ে চার টাকা মাত্র।

কথাকলি

বাঙলাদেশের শক্তিমান সাহিত্যিকদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। ছোট গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যকে যাঁরা ক্রমেই সমৃদ্ধির পথে অগ্রগমনে সহায়তা করছেন অক্লান্তভাবে, রমাপদ চৌধুরী তাঁদেরই একজন। উপরোক্ত গ্রন্থটি রমাপদ চৌধুরীর কয়েকটি সার্থকনামা ছোট গল্পের সংকলন। প্রতিটি গল্প লেখকের সৃজনীশক্তির পরিচায়ক। গল্পগুলি সুখপাঠ্য, উচ্চাঙ্গের ও ভাবসমৃদ্ধ। এদের আবেদন স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও জোরালো রমাপদ চৌধুরীর কল্পনা অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা যথোচিত বৈশিষ্ট্য বহন করে। নতুন চশমা, ঈর্ষা, রায়, পরজ বসন্ত, উদবাস্তু, দুঃখের স্বাদ, মূর্খ, পঙ্গু, দুটি বোন প্রমুখ গল্পগুলির মধ্যে নতুন চশমা, পরজ বসন্ত, উদবাস্তু, দুঃখের স্বাদ, দুটি বোন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী

জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী অন্যতম। যদিও গোড়ার দিকে রক্তকরবী দুর্বোধ্য বলে অভিহিত হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যও এই যে এর অবর্ণনীয় আবেদনে পাঠক-পাঠিকা সাড়া না দিয়েও থাকতে পারেন নি। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন আঙ্গিকে এর সমালোচনা করেছেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে দেখেছেন, বিভিন্ন ভাব অবলম্বন করে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। রক্তকরবীকে কেউ বলেছেন গীতি নাট্য, কেউ বললেন

রূপক, কেউ বা সঙ্কেতধর্মী, কেউ বা বাস্তব, বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের ফলে রক্তকরবীর সম্বন্ধে এক ধোঁয়াটে ধারণার সৃষ্টি হল, আশার কথা সে ধারণা এখন ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। প্রেমবাদের সঙ্গে যন্ত্রবাদের, দেবশক্তির সঙ্গে পশু শক্তির, উন্মুক্ত প্রাণের জয় গানের সঙ্গে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলের দারুণ সংঘর্ষ রক্তকরবীর প্রধান উপজীব্য। একদিকে শক্তি ও সম্পদের প্রতি মানুষের কুৎসিত লোলুপতার অন্যদিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলে মানুষের প্রাণের আবেদন ব্যর্থ হতে চলেছে, স্বাভাবিকতা মরে যেতে বসেছে, সহজতা লোপ পেতে বসেছে, এ অবস্থায় মানুষকে মুক্তি দিতে পারে প্রেম, সঙ্গীত, যৌবন। মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যে কতখানি গভীর তারই প্রমাণ মেলে রক্তকরবীতে। রক্তকরবীর মধ্যে মৃত্যুর যে অম্লান আলেখ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এক কথায় তা অনবদ্য। কবির মতে মৃত্যুই মানুষকে অন্ধকার থেকে নিয়ে যায় আলোয়, মৃত্যু মোচন করে জীবনের জড়ত্ব, মৃত্যু মানুষকে দেয় পূর্ণতা। অধ্যাপক, বিভাস রায়চৌধুরী বাঙলাদেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী পুরুষ। উপরোক্ত গ্রন্থটি রক্তকরবী সম্বন্ধে তার আলোচনার গ্রন্থরূপ। রক্তকরবী সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। সমগ্র নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাব, মর্মার্থ, মূলসূত্র অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। লক্ষ করবার বিষয় যে গ্রন্থটি অযথা ভাবে ভারাক্রান্ত নয় যতটুকু বলা দরকার ঠিক ততটুকুই বলা হয়েছে ফলে আলোচনাগ্রন্থ হিসেবে বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। সাহিত্যরসিক এবং ছাত্রছাত্রী এই উভয় সম্প্রদায়ই এই গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরীর সুন্দর বিশ্লেষণে রক্তকরবীর নাট্য ও সাহিত্যরস আস্বাদনে সাধারণ পাঠক সফলকাম হবেন বলে আশা করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পরিচিতি' গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। প্রকাশক—শ্রীদীপঙ্কর রায়চৌধুরী, ১২।৮ সেলিমপুর রোড, কলকাতা—৩১, প্রাপ্তিস্থান, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম দু'টাকা মাত্র।

জেলডায়েরী

সত্য, ন্যায় ও বিবেকের সেবায় যাঁদের জীবন অতিবাহিত, আরামশয্যা ছেড়ে ত্যাগের কঠিন পথে যাঁরা পা ফেলেছেন, দেশের সর্বৈব কল্যাণকামনায় ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাঁদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে নি তাঁরাই আদর্শ নেতা। ভারতের এই বরণীয় সন্তানদের মধ্যে সতীন্দ্রনাথ সেন অন্যতম। দেশবাসীর তিনি নমস্য। সকলেই অবগত আছেন যে মাত্র চার বছর আগে ১৯৫৫ সালের ২৫শে মার্চ জেলের মধ্যে কতখানি ঔদাসীন্যের মধ্যে, উপেক্ষার মধ্যে, অবিচারের মধ্যে এই শ্রদ্ধেয় নেতাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আজীবন সর্বতোভাবে দেশ ও জাতির সেবা করে এসে বিপ্লবী বীরকে মৃত্যু বরণ করতে হল অসহায় বন্দী অবস্থায়। ১৯৫৪ সালের ১লা জুন অর্থাৎ যেদিন তিনি বন্দী হন সেইদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জেলের মধ্যে কি ভাবে তাঁর দিন কেটেছে উপরোক্ত ডায়েরী পাঠে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে খুঁটিনাটি পর্যন্ত জানা যাবে। দেশকে আর জাতিকে সতীন্দ্রনাথ যে কতখানি ভালবাসতেন, দেশীয় ও জাতীয় মঙ্গলকর্মে নিজেকে তিনি, কতখানি নিয়োজিত রেখেছিলেন বা আরও রাখতে চেয়েছিলেন দেশগত ও জাতিগত কল্যাণে তিনি কতখানি উৎসুক ছিলেন ডায়েরীর প্রতিটি ছত্র সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। এই দেশপ্রীতি তাঁর অন্তিমমুহূর্ত পর্যন্ত অম্লান ছিল। পাকিস্তান সরকারের মদগর্বী নীতি, অজ্ঞতা, ভ্রান্ত পথাবলম্বন, হঠকারিতা ও রাজ্যশাসনে সর্বতোভাবে অক্ষমতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই ডায়েরীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এই মূল্যবান ডায়েরীটিকে গ্রন্থরূপে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রকাশক নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদভাজন। সতীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী গ্রন্থে সন্নিবেশিত হ'লে গ্রন্থের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত। দেশের মুক্তিযজ্ঞের অন্যতম বরেণ্য ঋত্বিকের অন্তিমকালীন আত্মবিবরণী এই গ্রন্থটি বাঙলার ঘরে ঘরে যথাপ্রাপ্য সমাদর লাভ করুক এই আমাদের কামনা। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

থেরেসা

বিশ্বসাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। পৃথিবীর সকল কালের স্মরণীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে এমিল জোলা অন্যতম। থেরেসা তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির এক অসামান্য নিদর্শন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জোলা মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন, উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবন সন্ধানী রূপটি ফুটে ওঠে, জীবনের গোপন রহস্যের আবরণ তিনি উন্মোচন করেছেন প্রকাশ্য আলোয়। মানুষের নিজের অজ্ঞাতে তার অবচেতন মন ভিতরে ভিতরে কাজ করে যায়, এই ক্রিয়াশীলতাই জীবনস্পন্দনের নামান্তর। উপরোক্ত উপন্যাসটিকে তারই বিশ্লেষণাত্মক কাহিনী আমরা বলতে পারি। উপন্যাসটির অনুবাদে যথাযথ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও শ্রমস্বীকার অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর অনুবাদও উচ্চাঙ্গের, গ্রন্থে মূল গ্রন্থকারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজিত হয়ে গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক—রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

'ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।'

—কাজী নজরুল ইসলাম।

কবি ও গীতিকার নজরুল ইসলাম

বাংলার প্রতিভাবান কবি নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। শৈশবকালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁর বাল্যজীবন দুঃখের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। ১৩১৬ সালে দশ বৎসর বয়সে গ্রামের মক্তব হ'তে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন এবং পরে ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। পুলিশ সাবইন্সপেক্টার কাজী রফিকুদ্দিন সাহেবের চেষ্টায় তিনি ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর হাইস্কুলে এবং পরে ১৩২০ সালে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হন। তিন বৎসর অধ্যয়ন করার পর ১৩২৩ সালে তিনি ৪৯নং বাংগালী পল্টনে যোগ দিয়ে করাচী গমন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই কাব্য চর্চা করতেন। একজন পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের সাহায্যে তিনি ফার্সি কবিদের বিখ্যাত কাব্যগুলি পড়েন এবং 'রিক্তের বেদন' গল্পসমষ্টি লেখেন এবং দেশে ফিরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'মুক্তি' নামক তাঁহার একটি গাথা-জাতীয় দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি অবিরাম গান, কবিতা, নাটক ও গল্প লিখতে থাকেন। তাঁর সম্পাদিত ধুমকেতু, লাঙল প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। রাজদ্রোহমূলক কবিতা প্রকাশ করে তিনি এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর নির্ভীক জবানবন্দীতে বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। জেলখানায় তাঁর রচিত 'শিকল পরার গান' রচিত হয়—

'এ শিকল পরা ছল মোদের
এ শিকল পরার ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করব রে বিকল।' ইত্যাদি

প্রথম যৌবনে বিদ্রোহী কবিতা লিখে তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে তাঁর যে কাব্যস্ফূরণ হয়, তাঁর অদম্য প্রাণশক্তির বলে কাব্যধারা বন্যার আকার ধারণ করে এবং মোসলেম ভারতে সেগুলির প্রকাশে সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষা ও ছন্দ নামক কবিতায় কবি প্রতিভা সম্বন্ধে সত্যবাণী উচ্চারণ করেছেন—

'অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ! অগ্নিসম দেবতার দান
উর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।'

আজ পর্যন্ত কোন কবি বা সংগীত রচয়িতা এককভাবে এতগুলি গান রচনা করতে সক্ষম হন নাই। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও এত গান রচনা করেন নাই। সংগীত রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। অসংখ্য শ্যামা সংগীত ও নাটক রচনাতেও তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অগ্নিবীণা, বিষের-বাঁশী, সর্বহারা, সঞ্চিতা, ভাঙার গান, বুল বুল, সিন্ধু-হিন্দোল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রবীন্দ্র যুগে যে কয়জন কবি নিজেদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নিজেদের স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ

হয়েছেন, নজরুল তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্র যুগে নজরুল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিভায় ভাস্বর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নজরুলের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় অন্যত্র। পল্লী, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে তিনি যে বস্তুনিষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার প্রভাব হ'তে মুক্ত হয়ে যে একটি স্বতন্ত্র কবি পরিচিতি গড়ে তুলেছেন, সেইটাই নজরুলের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। এ ছাড়া জাতিগত বৈষম্যের প্রকাশ কবির সার্থক রচনাকে অনবদ্য করে তুলেছে আলোড়িত করেছে সমাজচেতন ও সংবেদনশীল কবিচিত্তকে। জগতে আজ অযৌক্তিক অসাম্যের উগ্রতা সর্বত্র। কৃত্রিম বিভেদের প্রাচীর মাথা তুলে সর্বত্র বিদ্যমান এবং এরই ফল স্বরূপ আজ মানুষে মানুষে বিষম বিচ্ছেদ, দুস্তর ব্যবধান। মানুষের মধ্যেই আজ এক দল আক্রমণকারী, আর একদল আক্রান্ত; একদল নিপীড়ক আর একদল নিপীড়িত। এ বেদনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

'এই ধরণীর যাহা সম্বল
বাসে ভরা ফুল, রসে ভরা ফল
সুরসাল মাটি, সুধা সম জল, পাখীর কণ্ঠ গান,
সকলের এতে সম অধিকার, এই তার ফরমান।'

যাঁরা আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থকেন্দ্রিক, পাশবিক বলের সহায়তায় যাঁরা মানুষের অস্থির উপর সৌধ নির্মাণ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না, কবির বিক্ষোভ তাদেরই বিরুদ্ধে, ইতিপূর্বে এমন বিক্ষোভের সুর ও অপরাজেয় বিদ্রোহের রূপ কখনও বাংলা ভাষায় দেখা যায়নি, দেখা যায়নি কখনও দুর্বার যৌবনের জয় ঘোষণা। এই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের পিছনে আছে সব রকম অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতনের নির্মম অভিযান। তাই এ সবের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ, তাই তিনি বিদ্রোহী কবি বলে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব কাল বাংলা দেশ ও ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলনের যুগ। সেই সময়ে কবি জাতীয় আন্দোলনকে দিয়েছেন অভূতপূর্ব প্রেরণা তাঁর গানে।—

'কাঁদিবনা মোরা যাও কারা মাঝে
যাও তবে বীর সজ্ঞ হে,
ঐ শৃঙ্খলই বরিবে মোদের
ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ অঙ্গ হে!
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি
আহুত যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু মুসলিম চলেছি আমরা
গাহিয়া তাদেরই বিজয় গান।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আরম্ভ—এই কুড়ি বৎসর কালই নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টির যুগ এই যুগে বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টির অজস্রতায় যুগশ্রেষ্ঠ এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সৃষ্টিশীল। এই কাব্যমুখর যুগে দেখা দিলেন কবি নজরুল তাঁর জনজাগরণের বাণী নিয়ে, গণজাগরণের গান নিয়ে।

দেশাত্মবোধের বলিষ্ঠ প্রভাব তাঁর কবিতায় ও গানে লক্ষ্য করা যায়। দেশাত্মবোধের আদি গুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ভেদবুদ্ধির ঊর্দ্ধে দেশসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হতে এবং এক মায়ের সন্তানরূপে গণ্য করবার উদাত্ত আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। জাতীয় জীবনের সঙ্কটময় কালে কবি দেশনেতা ও দেশ কর্মীদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত কবিতায়,—

'দুর্গমগিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা, সাবধান!
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।'

বিদ্রোহ, বিপ্লব ও যৌবন শক্তির জয় ঘোষণার অন্তরালে, সাহিত্য সৃষ্টির মূলে দেখা যায় তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়। তরুণ দলের অগ্রগতির সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানে,—

'চল চল চল! চল চল চল!
ঊর্দ্ধগগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল।
চল চল চল।

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চলরে নওজোয়ান শোনরে পাতিয়া কান
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান!
ভাঙরে ভাঙ আগল চলরে চলরে চল।
চল চল চল।'

কেবল যৌবন শক্তির নয়, দেশের সব রকম শক্তিরই উদ্বোধন সংগীত গেয়েছেন কবি। শ্রমিক, কৃষক, নারী ও ছাত্র সমাজ জুগিয়েছে কবি মানসে অফুরন্ত কাব্য ও সংগীতের প্রেরণা। শত দুঃখ দৈন্য ও লাঞ্ছনা জর্জরিত মানুষকে শুনিয়েছেন তিনি আশার বাণী, কোথাও তাঁর কাব্যে বা সংগীতে নৈরাশ্যের বিলাপ ধ্বনিত হয়নি। সব জায়গায় তিনি শুনিয়েছেন উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের বাণী। কবি কণ্ঠে ছাত্র জীবনের মর্মবাণীধ্বনিত হয়েছে এক অপরূপ ভাষায়;—

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল।

আমরা রচি ভালবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গপথের আভাব দেখায় আকাশে ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল।'

জাতিভেদ প্রথা, ছুৎমার্গ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবি গেয়েছেন সমাজ সংস্কৃতি মূলক গান,—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া!
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা একজাতিকে একশ' খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।'

ঈশ্বরানুভূতিও কবির কাব্য প্রেরণা হতে বাদ যায়নি;—

'বহু পথে ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথ হারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগো দেবতারা।'

ভূতের ভয় নাটকে কবি রূপকের মাহাত্ম্যে দেশের নির্য্যাতিত জনগণকে জানিয়েছেন জাগৃতির আহ্বান, তাঁর গানের মাধ্যমে,

'মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভয়ে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়।' ইত্যাদি—

মানবাত্মার নানা আকুতি, বেদনা, ও বিচিত্র অনুভূতি নানা সুরে, ছন্দে, কাব্যে ও গানে কোমলে কঠোরে কতভাবে রূপায়িত হয়েছে তার অন্ত নেই। দাসত্বের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কার নির্যাতন ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে কবি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বিদ্রোহ। জাতীয়তা ও বীররসের সঙ্গে সঙ্গে কবি গেঁথেছেন অজস্র গানের মালা, যা আজও মহানগরীর প্রমোদকক্ষ হতে সুদূর পল্লীগ্রামের কুঁড়েঘর পর্যন্ত সমভাবে জনপ্রিয় ও আদৃত। কাজী নজরুল ইসলামের গানের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে গীতিকারদের সবার আগে নজরুল ইসলামের নামই মনে পড়ে কারণ, তাঁর গান যে নানা সম্পদে সমৃদ্ধ। এই ভাবের সঙ্গে সুরের ও বাণীর সমন্বয় সাধন কবি মানসের শক্তিশালী প্রতিভার পরিচায়ক। বাংলার মুসলমান সমাজে সংগীত বিমুখতা ভেসে গেল তাঁর অজস্র গানের বৈচিত্র্যে ও ভাব বন্যায়। তিনি বহুগান রচনা করেছেন নূতন সুরে, নূতন ছন্দে। বাংলা ভাষায় গজল গানেরও তিনি প্রবর্তক। এ ছাড়া তিনি বৈদেশিক ভাষা সহযোগে ও সুর সংযোগেও রচনা করেছেন অজস্র বাংলা গান। তাঁর বহু গান রেকর্ড সংগীত ও সিনেমা চিত্রের জন্য তিনি রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি অন্যের রচিত বহু গানে সুর যোজনা করেছেন—তাঁর নিজস্ব সুর। একদিকে তিনি যেমন প্রতিভাবান কবি অপরদিকে তেমনই গীতিকার ও সুদক্ষ সুরশিল্পী।

কেবল নজরুলের গান নয়, বাঙলা গানের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙলা গান কোনদিনই সুরসর্বস্ব নয়। এ গান কোনদিনই সুরসর্বস্ব নয়। এ গানে কথা বা পদই প্রধান, সুরের সঙ্গে থাকে তার অপূর্ব সঙ্গতি। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে আমরা রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, বাউল-দরবেশের গান, আগমনী ও বিজয়া গান, আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান প্রভৃতি যে গানই হোক না কেন, তার পদগুলি সর্বদাই সুরের সঙ্গে ভাব ও কাব্যরসের সঙ্গতি রেখে চলেছে। তাই বাঙালীর গান শুধু গানই নয় সাহিত্য রসেরও খোরাক। কবিকৃতির মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব ছিল বলেই রবীন্দ্র যুগের পরিপূর্ণ প্রভাবের মধ্যেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নজরুলের কবিকৃতিতে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়েছেন। জনপ্রিয়তায় তিনি কবিগুরুকেও ছাড়িয়ে গেলেন, সবাই স্বীকার করে নিল তাঁকে গণজাগরণের কবি বলে। কবি লিখলেন,—

'মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।'

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তিনি দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন একথা অনস্বীকার্য্য। আজ যদি তিনি সুস্থ দেহে থাকতেন তবে কবিকৃতির নব বিবর্তন হয়ত দেখতে পেতাম। কাব্য সাহিত্য ও সংগীত জগতে হয়ত আরও নূতন সৃষ্টি দিয়ে অর্ঘ্য সাজাতে পারতেন, ভরিয়ে তুলতে পারতেন ফুলের সাজি নূতন নূতন ফুলে, কিন্তু তা আর সম্ভব হ'ল না তাঁর অসুস্থতার জন্য।

আরবী ও ফারসী সংগীত থেকে তিনি একাধিক সুরসৃষ্টি করেছেন। বিশেষ ক'রে গজল গানে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সংগীত-জগতে। গজল গান বাঙলার সংগীত-জগতে এক অমূল্য সম্পদ। কেবল তাই নয়, শ্যামা সংগীত রচনায়ও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বাঙলা সংগীতে নজরুলের অকৃপণ দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। স্বরলিপি সহযোগে তাঁর গানগুলিকে শাশ্বত ক'রে রাখা দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সেই সঙ্গে নজরুল সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা কবিকে স্মরণীয় করার ব্যবস্থা করাও দেশবাসীর কর্ত্তব্য। কবির গান সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি বাঙালী জনসাধারণের একান্ত আপনার, একান্ত অন্তরঙ্গ গীতিকার। তিনি তাঁর গানকে সহজবোধ্য ক'রে রচনা করেছেন। সেই জন্যই নজরুলের গান এত প্রিয়।

তাঁর হাসির গান বাঙলা সাহিত্যের এক বিরাট সম্পদ।

'চর্ম্মকার আর মেথর চাঁড়াল ধর্ম্মঘটের কর্ম্মগুরু!
পুলিশ শুধু করছে পরখ কার কতটা চর্ম্মপুরু!
চাটুয্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত বাড়ী!

বোট,কাগজী ভোজপুরী কয় বাঙালীকে, 'হৎ ছুঁইয়ে!'
(কোরাস):—দে গরুর গা ধুইয়ে।

বাঙালী চাকুরি-জীবীর সম্বন্ধে তাঁর হাসির গান—

'নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরী অধীন আমরা বাঙালী বাবু।
পায়ে গোদ গায়ে ম্যালেরিয়া,
বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু।
ঢিলে ঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি বয়ে দুটি নিট পিটে পায়ে,
আফিসে বসিয়া কলম পিশিয়া
ঘরে এসে খাই সাবু।'

চা-প্রীতি বিষয়ক আর একটি গানে প্রচুর হাস্য রসের খোরাক জোগান হয়েছে।

'চায়ের পিয়াসী পিপাসিত চিত্ত আমরা চাতক দল।
দেবতারা কন সোমরস যারে, সে এই গরম জল।
চায়ের প্রসাদে চার্ব্বাক মুনি ঋষি বাক রণে হল পাশ
চা নাহি পেয়ে চারপেয়ে জীব চর্ব্বণ করে ঘাস।
লাখ কাপ চা খাইয়া চালাক
হয়, সেই প্রমাণ চাও কত লাখ?
মাতালের দাদা আমরা চাতাল, বাচাল বলিস বল।'

ইত্যাদি—

শ্যালক নামক মধুর সম্পর্কিত ব্যক্তিটি তাঁর ব্যঙ্গ মধুর গানে হাস্য রসের ও শালা শব্দের নানা অর্থের প্রয়োগ নৈপুণ্যে মধুর হয়ে উঠেছে,—

'শালায় কোথায় পাই—
গিন্নীর ভাই পালিয়ে গেছে গিন্নি চটে কাঁই।
আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কাঁদিছেন সদাই।
* * * *
খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলুম সম্মুখে আটশালা,
আটশালাতে মোর শালা নাই বসেছে পাঠশালা
গো-শালাতে গরু বাঁধা, আমার শালা নাই।
খুঁজতে গেলাম শহর, দেখি শালার ছড়াছড়ি।
পান শালাতে পান করে যায় মাতাল গড়াগড়ি,
ধর্ম্মশালা অতিথশালা শালার অন্ত নাই।
হাতীশালা, ঘোড়াশালা রাজার ডাইনে বাঁয়ে,
হঠাৎ দেখি যাচ্ছে বাবু দোশালা গায়ে,
দো-শালা ত চাইনে বাবা, একশালাকে চাই।
দশশালা ব্যবস্থা ঝুলে গরীব চাষীর ভাগ্যে,
দিয়াশালাই পেয়ে ভাবি, শালাই পেলাম যাকগে।
চাইনু শালা, মুদিদিল গরম মশালাই॥
ঢেঁকি শালায় ঢেঁকি শুয়ে পাকশালাতে ছাই,
হায়! শালায় কোথায় পাই॥'

কাব্যে যাঁরা ভাবের গভীরতা চান, তাঁদের জন্য নজরুল নন। তিনি মূলত যৌবনের কবি, তাই তিনি গেয়েছেন যৌবনের জয়গান। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মত অনবদ্য শিল্পরূপ, পরিমিত বোধ ও ছন্দাদি সম্বন্ধে সচেতনতা না থাকলেও নজরুল যে তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যৌবনের কবি, সহজপ্রাণ ধর্ম্মের কবি, দুঃখী নিপীড়িত জনগণের মুখপাত্র কবি, বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতা বাঙলার কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কালীপদ লাহিড়ী।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82820—শ্যামল মিত্রের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"মন মেতেছে" ও "সূর্য্যমুখী সূর্য খোঁজে।"

N 82821—"গীতালি গীতাঞ্জলি" ও "একটি ফুলের মত"—আধুনিক গান দু'টি মিষ্টি সুরে পরিবেশন করেছেন কুমারী বাণী ঘোষাল।

N 82822—দু'খানি আধুনিক গান—"কালো মেঘে ডম্বরু" ও "ওগো শকুন্তলা" গেয়েছেন খ্যাতিমান শিল্পী সুবীর সেন।

N 82823—কুমারী পূরবী দত্তের সুরেলা কণ্ঠের সুন্দর দু'খানি আধুনিক গান—"আজ মনের মাঝে" ও "হারিয়ে গেল জীবন।"

N 82824—তালাত মামুদের গাওয়া মধুর দু'খানি গান—"তুমি সুন্দর যদি নাহি হও" ও "যেথা রামধনু ওঠে।"

N 82825—নবাগতা মঞ্জুলা সেনগুপ্তের মধুক্ষরা কণ্ঠের আধুনিক গান—"সূর্য্যমুখী সোনামুখী" এবং "খেলা যদি সারা হলো।"

N 76083 to N 76085—রেকর্ডগুলিতে "দেড়শো খোকার কাণ্ড" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলম্বিয়া

GE 24943—শ্রীমতী গীতা দত্তের (রায়) কণ্ঠে আধুনিক গান—"ধ্যানিতে চেয়েছ তুমি" ও "মাটির ভুবনে যদি।"

GE 24944—"তুমি মধুর অঙ্গে" এবং "ওগো আমার নবীন সাথী"—গান দু'খানি অতুলপ্রসাদী, সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 24945—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি মধুর আধুনিক গান—"ঘুম নামে পথের ছায়ায়" ও "হাতে কোন কাজ নাই।"

GE 30420 এবং GE 30421—রেকর্ড দুটিতে "জল জঙ্গল" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫৩)

শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

কোন কোন শিল্পী সঙ্গীতকে নিয়েছেন জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে—তার জন্য তাঁরা দৃকপাত করেন না অভাব, অসুবিধা অর্থাগম ইত্যাদির প্রতি। এইরূপ একাগ্রতাই তাঁদের উপস্থাপিত করে জনসমক্ষে পূর্ণরূপে আর শ্রোতারা তাঁদের গ্রহণ করেন প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে। শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আমি তাঁদেরই একজন বলে মনে করি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নিজের কথায় বলি:—

শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

"১৯০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় মামার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করি। বাবা ৺কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় শেয়ার মার্কেটে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আমাদের পরিবারে গানের চর্চা বরাবর ছিল। ছেলেবেলা থেকে আমিও গানের দিকে ঝুঁকে পড়ি। সেইজন্য মেজকাকা এ্যাডভোকেট শ্রীপান্নালাল চট্টোপাধ্যায় আমায় কেবল উৎসাহ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি—আমার মায়ের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে চুপিচুপি আমায় গান শেখাতেন।

বারাকপুর মহকুমার আলমবাজারে আমাদের নিজবাড়ী। সে বাড়ীতে বরাবর গানের আসর বসত। বরাহনগরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅমূল্যধন দত্তকে প্রথম আমার শিক্ষাগুরু হিসাবে পাই।

সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া আমি রিপণ কলেজিয়েট স্কুল থেকে বরাহনগর ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই ও সেখান থেকে ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তারপর কিছুকাল নানারকম কাজকর্ম্ম করি। কিন্তু গান শেখার আগ্রহে পড়াশুনা বা কাজকর্ম্মে ঠিকমত মনযোগ দিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে একদিন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের গৃহে গানের আসরে আসফাক্‌-হোসেন ও তাঁহার দুই মামা মুস্তাক হোসেন খাঁ ও স্বর্গত আসাক্‌ হোসেন খাঁর গান শুনিয়া মুগ্ধ হই। ইহার কিছুদিন পর আসফাক্‌ হোসেন সাহেবের ছাত্র হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকি। আর দুইজনের নিকট বহুদিন শিখিবার সুযোগ পাই। শ্রী বড়ালের উৎসাহ ও সাহায্য আমার সঙ্গীত সাধনার অন্যতম পাথেয়। মধ্যে কিছুকাল সেনী ঘরোয়ানার ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছে ধ্রুপদ ও ধামার শিক্ষা করি।

এইসঙ্গে আর একজনের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি হলেন স্বনামধন্য ৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার স্নেহধন্যে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সদালাপী, বন্ধুবৎসল শ্রীহীরু গাঙ্গুলী ও আমি একত্রে কতদিন সঙ্গীত-সাধনা করেছি মন্মথ বাবুর গৃহে। হীরু বাবুর ন্যায় এমন উচ্চমনা শিল্পীকে বন্ধুরূপে পাওয়া খুবই আনন্দের কথা।

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের ১৩৩৭ সালের অধিবেশনে আমি প্রথম শিল্পী হিসাবে যোগ দিই। তাহাতে আমার গাওয়া উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শ্রোতাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। এ ছাড়া বাংলা ও বহির্বাংলার বহু সঙ্গীতাসরে আমি অংশ গ্রহণ করেছি। ১৯২৯ সালের ৫ই এপ্রিল প্রথম আমি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে গান করি। বিগত কয়েক বৎসর কলিকাতায় বহু সঙ্গীত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে। এগুলি বাঙ্গালী শিল্পীদের একাধারে উপকার ও অপকার করিতেছে। উপকার হয়—কারণ কয়েকজন সত্যকারের প্রবীণ গুণীর সমাবেশ হয়—যাঁদের গাওয়া গান থেকে তরুণ শিল্পীরা অনেক কিছু শিখতে পারেন— আর অপকার হয়—কারণ এই সব আসরে সমাগত কিছু সংখ্যক অবাঙ্গালী নূতন শিল্পীদের পরিবেশিত গান দোষমুক্ত হয় না।"

পরিচ্ছন্ন অথচ অল্পসজ্জিত শিল্পীর গৃহে ক্রমশঃ উপস্থিত হতে লাগলেন তাঁহার শিক্ষাধীন ছাত্রবৃন্দ আমাদের আলোচনাও শেষ হয়ে এসেছিল তাই বিদায়ান্তে চলে এলাম।

গীতাপাঠ

শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎপীড়িতের উপর কৃপায়, তোমার যদি চোখেই আসে জল,
ছাড়োই যদি নিজের দাবী, ভীরুর মত থাকতে দেহের বল।
ধন্য তোমায় বলবে লোকে, উল্টোবে না পরের পাতা আর
পড়বে গীতা, পালিয়ে গিয়ে, খুলবে শুধু প্রথম পরব তার।
নিত্য মানুষ হত্যা করার এখন যদি পেশাই তোমার হয়,
সাংখ্য যোগই দেখবে পড়ে "আত্মা অমর মরার পরেও রয়"।

সিঁদ কাটো বা পকেট মারো, কর্ম্ম সবই কর্ম্মযোগেই পাবে,
"স্বভাব তাহার কর্ম্ম করায়" বেকুব নিজে কর্ত্তা বলে তারে।
ধর্ম্ম মানো নাই মানো আর সভায় যদি তাগ লাগাতে চাও
গীতার থেকে দু'-চার শ্লোক নিজের মতে ব্যাখ্যা করে যাও।
বেকার হয়ে ছাড়তে হলে, অপোগণ্ড আত্ম-পরিজন,
রাজার হালে থাকতে মঠে, থাকার যদি বোকাই প্রয়োজন,

ভক্তিযোগে মুক্তি পাবে, শিষ্যগুলোর পড়িয়ে যাবে সেটি
উইল লিখে তোমার নামে জুটবে এসে দেখবে কতো বেটী।

দেশে-বিদেশে

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ (মে-জুন, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): কলিকাতার ইডেন উদ্যানস্থিত রঞ্জি ষ্টেডিয়ামে সাড়ম্বরে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবের নয় দিবসব্যাপী অধিবেশন সুরু।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): প্রিন্সেপ জাহাজ ঘাটের (কলিকাতা) নিকট ডক-শ্রমিকের উপর পুলিসের গুলীচালনা—১ জন নিহত ও ২৫ জন আহত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে): পুলিশ-জনতা সংঘর্ষের ফলে হাওড়া-ব্যাণ্ডেল ও তারকেশ্বর লাইনের সমস্ত ট্রেণ তিন ঘণ্টাকাল আটক।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): শিক্ষা আইন ব্যর্থ করার জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হইলে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে করা হইবে বলিয়া কেরল সরকারের সতর্কবাণী।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে): কাটিহারের নিকট ট্রেণ (নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস) দুর্ঘটনায় ১ জন নিহত ও ৩০ জন আহত।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২১ শে মে): কলিকাতা ও সহরতলীতে অভাবনীয় ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে ৮জন নিহত ও শতাধিক আহত।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের নেতৃত্বে উড়িষ্যার তিনজন সদস্য সমম্বিত কোয়ালিশন (কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ) মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ।

মুসৌরীতে তিব্বতী রাষ্ট্রগুরু দালাইলামা কর্তৃক ২৫০০তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২৩ শে মে): বিডন স্কোয়ারে (কলিকাতা) পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ রাজনৈতিক (কংগ্রেস) সম্মেলনের তিনদিবস ব্যাপী অধিবেশন সুরু। উদ্বোধন—কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সভানেত্রীত্ব—শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৪ শে মে): পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে দুই দলের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ—১৫ জন আহত।

রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিসের লাঠিচার্জ্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): মহাজাতি সদনে কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ৭৪ তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে): কলিকাতা পৌরসভায় একটী প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির সময় কংগ্রেসী কাউন্সিলরদের অকস্মাৎ সভাকক্ষ ত্যাগ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ৬১তম জন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে পালন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): ভারতীয় রেলওয়েসমূহের চীফ ইনস্পেক্টারের রিপোর্ট—১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে রেল দুর্ঘটনায় ৮০ জন নিহত ও ৫৬১ জন আহত।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): প্রথম ভারতীয় নৌবাহিনী অভিযাত্রী দলের সাফল্যের সহিত নন্দাকোট শৃঙ্গের শীর্ষে (২২৫০০ ফুট) আরোহণ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): বার্ত্তাজীবী সাংবাদিকদের বেতনের হার সম্পর্কে বেতন কমিটির সুপারিশ (ভারত সরকারের অনুমোদিত) প্রকাশ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে): রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): জীবনবীমা কর্পোরেশন-মুন্দ্রা লেনদেন ব্যাপারে ভিভিয়ান বসু তদন্ত বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশ।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): ভারত ইন্স্যুরেন্সের অর্থ সম্পর্কে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে রামকৃষ্ণ ডালমিয়া দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত—দিল্লীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের রায়।

দিল্লী কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির পদত্যাগ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পশ্চিম-বঙ্গ খাদ্য-উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে তুমুল উত্তেজনা—চাউলের মূল্যনিয়ন্ত্রণে সরকারী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্ল সেনের স্বীকৃতি।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্ম্মাণ সাপেক্ষে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্তৃক ফরাক্কার নিকট গঙ্গা-ভাগীরথী মোহনায় দীর্ঘ খাল খননের প্রস্তাব।

শ্রী সি, রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কংগ্রেসী শাসক দলের বিরুদ্ধে জাতীয় বিরোধী দল ('স্বতন্ত্র দল') গঠনের সিদ্ধান্ত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): রাজ্যের সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে দার্জ্জিলিংএ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার দীর্ঘ আলোচনা।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): কেরলে কম্যুনিষ্ট শাসনের উচ্ছেদকল্পে কেরল কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম পর্য্যায়ে ১২ই জুন 'মুক্তি দিবস' পালনের আহ্বান।

কলিকাতা পৌরসভায় কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কট সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): করিমগঞ্জে শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জ্জীর সভাপতিত্বে ভারত-পূর্ব্ব পাকিস্তান সমস্যা সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন সুরু।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন): পশ্চিমবঙ্গে সেবা সমবায় ও যৌথ খামার পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য আবশ্যক আইন প্রণয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিব ও অফিসারদের সহিত দার্জ্জিলিংএ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বৈঠক।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৮ই জুন): কেরলে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের ব্যবস্থাকল্পে বিধান সভায় আইন-বিধি গৃহীত।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন): ভারত পাকিস্তান খালের জল বিরোধ মীমাংসা চেষ্টায় বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক বিপাশা নদীর জলাধার নির্ম্মাণের নূতন প্রস্তাব।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): জম্মুর স্পেশাল জেলে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার সহিত কাশ্মীরে সফররত ভূদান নেতা আচার্য্য বিনোবা ভাবের সাক্ষাৎকার।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১১ই জুন): গুলীবর্ষণ বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া করিমগঞ্জ সীমান্তবর্ত্তী হরতকিটিলায় পাকসৈন্যদের পুনরায় গুলীবর্ষণ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন): কংগ্রেস সহ কেরলের বিরোধী দলগুলির সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে রাজ্যের (কেরল) বিভিন্ন স্থানে আংশিক হরতাল।

পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীবি, বি, ঘোষের সহিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের জরুরী বৈঠক।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন): কেরলের এর্ণাকুলাম জেলায় বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ:—আই, এ পরীক্ষায় ৩৮.৩ ও আই, এস-সিতে ৫০.১ জন উত্তীর্ণ।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): ত্রিবান্দ্রম (কেরল) জেলায় দুইটি স্থানে পুনরায় পুলিশের গুলীবর্ষণ—নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক সৈন্য আহ্বান।

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে সরকারী অগণতান্ত্রিক খাদ্যনীতির প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' উদ্‌যাপিত।

বহির্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): খালের জলের বিরোধ প্রসঙ্গে করাচীতে পাক্ প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খানের সহিত বিশ্বব্যাঙ্ক প্রেসিডেণ্ট মিঃ ইউজেন ব্ল্যাকের বৈঠক।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): আণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রসঙ্গে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের নিকট রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের নূতন প্রস্তাব পেশ।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): ব্রহ্ম-থাইল্যাণ্ড-লাওস সীমান্তে পুনরায় চিয়াং বাহিনীর হামলা ও বর্ম্মী বাহিনীর সহিত সংগ্রাম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): তিব্বতে বিদ্রোহ চালনার জন্য বিদেশ (সাম্রাজ্যবাদী) হইতে সাহায্য সংগ্রহ সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব তিব্বত সরকারের বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগ।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে) মে: ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেসের মৃত্যু।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ১২ দিনের জন্য আলবেনিয়া সফরে যাত্রা।

মিঃ ডালেসের মৃত্যুর দরুণ জেনেভা চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন (জার্ম্মাণ প্রসঙ্গে) দুই দিনের জন্য স্থগিত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): শ্রী বি, পি, কৈরালার নেতৃত্বে নেপালের সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত সরকারের শপথ গ্রহণ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): 'জুপিটার' নামক মার্কিণ ক্ষেপণাস্ত্রে মহাশূন্য পর্য্যটনান্তে দুইটি বানরীর জীবন্ত প্রত্যাবর্ত্তন।

পূর্ব্ব পাকিস্তান গভর্ণরের অর্ডিন্যান্সে ছয় মাসের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভা বন্ধ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): মস্কো-এ ভারত-সোভিয়েট নূতন অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশিত বিবরণ—বর্ত্তমানে পৃথিবীর জন সংখ্যা ২৮০ কোটি—তন্মধ্যে চীন ৬৪ কোটি এবং ইহার পরই ভারত ৪০ কোটি।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): নিরাপত্তার নামে সুদানে দুই জন মন্ত্রীসহ ১৮ জন অফিসার গ্রেপ্তার।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): অযোগ্যতার জন্য পূর্ব্ব পাক্ সরকার কর্ত্তৃক ৭ জন অফিসারকে শাস্তিদান।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): কমনওয়েলথভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সিঙ্গাপুরের অভ্যুদয়—বামপন্থী পিপলস একশন পার্টি কর্ত্তৃক নূতন সরকার গঠন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): লাওস পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জেনেভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সেলুইন লয়েড ও রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ আঁদ্রে গ্রোমিকোর বৈঠক।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): তিব্বতীদের মৌলিক মানবিক অধিকারে চীনা হস্তক্ষেপ হইয়াছে বলিয়া আন্তর্জ্জাতিক আইনবিদ্ কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): বৃটিশ অভিযাত্রী দলের আমাদেবলাম শৃঙ্গ (২২,৩০০ ফুট) জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ—দুইজন সদস্যের মৃত্যু।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): তিন দিবসব্যাপী নেপাল সফর উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর কাটমাণ্ডু উপস্থিতি।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন): তিব্বত ও অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কাটমাণ্ডু-এ প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি, পি, কৈরালার সহিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) আলোচনা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): ইয়েমেনী সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ইয়েমেনের প্রধান বন্দর হোদিদা ও অন্যতম বৃহত্তম সহর তায়াজ দখলের সংবাদ।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কাশ্মীরের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রটি গ্রহণ ক'রেছেন শ্রীবিভাস মিত্র।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

বনাম

কলকাতা পুলিশ

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

যে সকল মামলা সম্বন্ধে এই কাহিনীগুলিতে বলা হয়েছে উহার সব কয়টিরই তদন্ত-কার্য্য কলিকাতার আরক্ষা পুঙ্গবদের দ্বারা সমাধা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে কয়েকটি বিষয়ে কলিকাতা পুলিশ বহুকথিত ইংলণ্ডীয় স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ, যে সকল তদন্ত-কার্য্য য়ুরোপীয় "ববি"গণ অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের সাহায্যে করে থাকেন সেইরূপ তদন্ত-কার্য্যই ভারতীয় পুলিশকে করে যেতে হয়েছে ঐ সকল আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকেই। বস্তুতপক্ষে বেতার-যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈজ্ঞানিক পন্থা এই দেশের স্বাধীনতার পরই মাত্র প্রকৃতপক্ষে গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু লণ্ডন পুলিশ জনসাধারণের নিকট যে সহযোগিতা বহুকাল পূর্ব্ব হতেই পেয়ে এসেছে, সেইরূপ স্বয়ংক্রিয় সহযোগিতা ভারতীয় পুলিশ বহু দিন পায় নি। এ'ছাড়া কলিকাতা পুলিশের অপর আর এক অসুবিধাও আছে। কারণ তাদের অনেককেই এই শহরে মানুষ হয়ে ও লেখাপড়া শিখে এই শহরের পুলিশেই ভর্ত্তি হতে হয়েছে। শহরে অগণিত পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাজ করার সুবিধার ন্যায় অসুবিধাও অনেক থাকে। এই কারণে তাদের মুহুর্মুহুঃ লভ ও ডিউটির মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে ডিউটিকে। এ-ছাড়া এদের পুরাতন ট্রেনিং স্কুলগুলিতে পুলিশি আইন-কানুন, ড্রিল, প্যারেড ও ডিসিপ্লিন শেখানো হলেও পুলিশি তদন্ত রীতি কোনও দিনই শিখানো হয়নি। এই তদন্ত-কার্য্য তাদের শিখে নিতে হয়েছে ট্রেনিং স্কুলের বাহিরে এসে তৎকালীন সুদক্ষ দেশীয় অফিসারদের নিকট হতে। এই সকল পুরাতন অফিসারগণ গুরু পরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জ্জন করতেন, সেই জ্ঞান আবার তাঁরা দিয়ে যেতেন এই বিভাগের নবাগত অফিসারদের। এই জ্ঞান কর্তৃপক্ষের অগোচরে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, কিন্তু উহার সবটুকু বহুদিন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এখানকার এই সকল শিক্ষাগুরুদের নবাগতদের শিক্ষিত করে তুলতেও বেশ কিছু বেগ পেতে হতো। কারণ ইহাদের অধিকাংশই ছিল সুশিক্ষিত সহরের যুবক। বহু প্রকার চিত্ত-প্রস্তুতির কারণে এই সকল আত্মাভিমানী যুবক আপন আপন ধারণা অনুযায়ী কাজ করতে চেয়েছে। এই জন্য তাদের এই সব বদ্ধমূল ধারণা বদলে তাদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে তাদের ঐরূপ শিক্ষা দিতে গুরুদের বহু সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে।

—কিন্তু এতো অসুবিধার মধ্যেও কলিকাতা পুলিশ যেরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তা বিলাতী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পুলিশের কৃতিত্বের তুলনায় কম তো নয়ই বরং উহাদের অতুলনীয়ই বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ পুলিশের পিছনে যেরূপ খরচ-খরচা করেছেন, তাঁরা সেইরূপ খরচ-খরচা তাঁদের ভারতীয় পুলিশের জন্য কোনও দিনই করেন নি। এই সকল স্বল্প বেতনভোগী ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারদেরই বরং তদন্ত-কার্য্যে সাফল্যের জন্য এবং জনসাধারণের উপকারার্থে নিজেদের পকেট হতেই পয়সা খরচ করে বদান্যতা দেখাতে হয়েছে।

ভারতীয় কৃষ্টি অনুযায়ী এই সকল পুরাতন অফিসারগণ তাঁদের সহকারীদের তাঁদেরই মত তদন্তকার্য্যে শিক্ষিত করে তোলা তাঁদের শুধু কর্ত্তব্য নয় ধর্ম্ম মনে করতেন। এই জন্য প্রতিটি তদন্তকার্য্যে এঁরা নবাগতদের তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। এই নবাগতরা শুধু দেখে যেতো তাঁরা কেমন করে কি করছেন এবং কি-ই বা তাঁরা করছেন না। বহুক্ষেত্রে তাঁরা নবাগতদের জিজ্ঞাসা করেছেন, 'বলতো এইবার কি করতে হবে?' নবাগতগণ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁরা বলে দিতেন, এইরূপ করলে এই এই অসুবিধা আছে। নচেৎ এই এই সুবিধা হয়—বুঝলে? এই ভাবে কলিকাতা পুলিশ তাদের যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা তা পুঁথিগত ভাবে পায় নি, সুদক্ষ ও অভিজ্ঞদের কাছেই তারা ঐ তদন্ত-কার্য্য শিখেছে হাতে কলমে।

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে অধুনাতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে কলিকাতা পুলিশ এত বেশী দক্ষতা দেখাতে পারে কি করে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, কলিকাতা পুলিশ যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর নির্ভর না করে তাঁরা নির্ভর করেছেন উহাদের ব্যবহার চাতুর্য্যের উপর। স্বল্প লাইন দ্বারা যে ব্যক্তি অধিক এফেক্ট প্রকাশ করতে সক্ষম সে-ই প্রকৃত আর্টিষ্ট। তাই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেও নিজেদের তৈরী অতি সাধারণ (Simple) যন্ত্রপাতিই তাঁরা তদন্ত কার্য্যে ব্যবহার করেছেন। তবে যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে তাঁরা নির্ভর করেছেন, নিজেদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ংলব্ধ সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যকালে জনৈক আমেরিকান জেনারেল বন্ধুগণ সহ কলিকাতায় এসে কালীঘাটের মন্দির পরিদর্শনে যান। মন্দির কর্তৃপক্ষ অবশ্য জুতা খুলে তাঁদের প্রাঙ্গণে ঘুরাফিরা করার জন্য কোনও আপত্তি করেন নি। তাঁরা বেষ্টনীর দুয়ারের নিকট জুতা খুলে রেখে প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে দেখলেন যে, জেনারেল সাহেবের মূল্যবান 'সু' জোড়াটি অপহৃত হয়েছে। মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে জেনারেল সাহেব কলিকাতা পুলিশের য়ুরোপীয় কমিশনারের নিকট জুতা চুরি সম্বন্ধে অভিযোগ জানানো মাত্র পুলিশ বিভাগে তোলপাড় সুরু হয়ে গেল এবং তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ত্বরিত গতিতে ঐ জুতা উদ্ধার করে দিতে না পারলে বিদেশীয়দের নিকট কলিকাতা পুলিশের মান ইজ্জতের সমধিক হানি হবার সম্ভাবনা। এই তদন্ত-কার্য্যে বিশেষ করে আমারই ডাক পড়েছিল। আমাকে কমিশনার সাহেবের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে, তিনি বললেন, 'লণ্ডন পুলিশ এই জুতা তিন ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করতে পারত, তুমি কতক্ষণে উহা উদ্ধার করতে পারবে?' উত্তরে আমি তাঁকে জানালুম, 'স্যার, ঐ জুতা পূর্ব্ব দিন বেলা তিনটা আন্দাজ সময় অপহৃত হয়েছে। তাই তিন ঘণ্টায় উহাদের খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, কারণ ইতিমধ্যেই বহু দেরী হয়ে গিয়েছে। আমি অন্ততঃপক্ষে ছয় সাত বা নয় ঘণ্টা সময় চাই।' কমিশনার সাহেবের মনে কি ছিল জানি না, তিনি আমার উত্তরে বরং খুসী হয়েই বলে উঠলেন, 'বেশ বেশ সে তো ভালই। এখন সকাল দশটা—আচ্ছা, তাহলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটা সুখবর পাব আশা করি।'

এর পর লালবাজার হতে সোজা আমি ভবানীপুর থানায় চলে এলাম। সেখানে এসে দেখলাম ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই জুতা-চুরি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত, কারণ তাঁরই এলাকাধীন স্থানে এই

অপকার্য্যটি সাধিত হয়েছে। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক ক'টার সময় এই চুরিটে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?' উত্তরে হতাশ হয়ে তিনি জানালেন, 'ঠিক দুইটার সময়। তিনটায় আমেরিকান মিলিটারী পুলিশ এসে কেস লিখিয়েছে।' 'হুঁ তাহলে ঠিক হয়েছে,'—আমি উত্তর করলাম, 'আপনি এক কাজ করুন এক্ষুণিই। জন দশবারো জমাদার ও পুরানো অভিজ্ঞ সিপাহী এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন। তারা একটা হতে তিনটা পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে সময়ে চুরি হয়েছে ঐ সময়ে মন্দির ও উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরাফিরা করে যে কোন ব্যক্তিকে ভ্যাগাবণ্ড বা জুতা-চোররূপে সন্দেহ হবে, তাদের সব ক'জনকেই ছাঁকা জালে মাছ ভুলার ন্যায় ধরে ধরে থানায় নিয়ে আসুক।' অফিসার-ইন্-চার্জ্জ ভদ্রলোকের নানা কারণে আমার উপর আস্থা ছিল। তাছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তি বিধায় আমাকে সাহায্য করা ছিল তাঁর এক অন্যতম কর্ত্তব্য। তিনি সানন্দে বাছা বাছা দশ বারো জন জমাদার সিপাহীকে অনুরূপ আদেশ সহ ঐ সময়ের মধ্যে মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্ত মনে ও স্থির মস্তিষ্কে একটি পুঁটুলী হাতে নিয়ে থানায় এসে দেখি, প্রায় ত্রিশ জন অনুরূপ ব্যক্তিকে ধরে এনে থানার একটা পৃথক কামরায় জমা করা হয়েছে। আমি ঐ নির্দ্দিষ্ট কামরায় এসে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ওদের মধ্য হতে মাত্র এগারো জন ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে বাকি সকলকে মুক্তি দিতে বলে থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে এসে বসলাম। এই ঘরে আমার সঙ্গে করে আনা পুঁটুলীটি ইতিপূর্ব্বেই আমি রেখে গিয়েছিলাম। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল, আমি পুঁটুলী খুলে ভাল ভাল আনকোরা নূতন মরক্কো ও অন্যান্য কেদারের দশ বারো পাটি জুতা বার করে ঘরের একপাশে দেওয়ালের ধারে জড়ো করে রাখছি। সকলে জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে তাকালে, আমি তাদের কথা বলতে বারণ করে পাশের ঘর থেকে আমার বাছাই করা এগারো জন ব্যক্তিকে এই ঘরটিতে এনে দেওয়ালের এমন এক ধারে সারিবন্দী ভাবে তাদের দাঁড় করাতে বললাম, যেখান হতে উল্টো দিকে রাখা জুতা কয়টি সহজেই তাদের নজরে পড়তে পারে। এইভাবে ঐ এগার জন সন্দেহমান ব্যক্তিকে দেওয়ালের পাশে সারবন্দী ভাবে দাঁড় করানো হলে, আমি কিছুক্ষণ ছুতা করে একটি কাগজ দেখতে লাগলাম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমি তাদের হাবভাব যে লক্ষ্য না করছিলাম তা'ও নয়। এর পর আমি মুখ তুলে অন্যমনস্ক ভাবে অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্দেহমান প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখের দিকে চেয়ে দেখতে থাকি। হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ল এদের এক ব্যক্তির মুখ-চোখের দিকে। লোকটি ঘন ঘন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে ঐ নূতন জুতা জোড়া কয়টির দিকে বারবার চেয়ে দেখছিল। ঐ স্থানে অতগুলি জুতা দেখে খাদ্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যেমন বুভুক্ষু মানুষকে উতলা করে ঠিক তেমনি করে ঐ জুতা-সন্ধানীকে উতলা করে তুলেছে। কারণ, জুতা-চুরি করে করে (অভ্যাস জনিত) তার ব্রেনের 'সেট-আপ' আপনিই এমন হয়ে গেছে যে, সহজেই তার মানুষের পায়ের দিকেই আগে নজর পড়ে। এই অবস্থায় তার চক্ষু চক্চকে হয়ে উঠবে এবং মুখে নাল পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্যেরই বা কি আছে। আমি ধীরভাবে উহার অপরাপর সঙ্গীদের মুখাবয়বের সহিত উহার মুখ চোখের তুলনা করে বুঝলাম যে, আমি কোনও ভুল সিদ্ধান্তে আসি নি। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে রেখে বাকি সকলকে বললাম, 'যাও তোমরা। যা কিছু দোষ এই লোকটির ; তোমরা কোনও অপরাধ করো নি।' ঐ সকল ব্যক্তিদের বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি নিভৃতে সেই জুতা-চোরটিকে বললাম, 'বাপু জুতা-চোর! দেখচো তো এতগুলো লোকের মধ্য হতে আমি তোমাকেই কেমন চিনে নিলাম। এতেই বুঝতে পারছো যে, আগে থেকে আমাদের এ খবর জানা ছিল যে, তুমি ঐ দিন ঐ ফৌজী সাহেবের জুতা দু'টো মন্দির হতে চুরি করেছো, তা না হলে কি অতগুলো লোকের মধ্যে শুধু তোমাকেই বেছে নিতে পারতাম ? দেখলে তো শুধু তোমকেই বেছে নিয়েছি। এখন এতটা যখন জা'নি তখন এ'ও জানি তুমি কোথায় ও-দু'টো বিক্রয় করে এসেছ। এখন তুমি নিজেই যদি দোকানটা দেখিয়ে দাও তা'হলে আর আমাদের ইন্ফরমারকে কষ্ট করে সেই বেলগেছে থেকে ডেকে আনতে হয় না। কেন মিছামিছি অপ্রীতিকর (?) ব্যাপারের সৃষ্টি করবে তার চেয়ে নাও একটা বিড়ি টিড়ি খাও, আর শান্তশিষ্ট ছেলের মত সেই দোকানটা দেখিয়ে দেবে চলো।' জুতা-চোর মহাশয় সত্য সত্যই আমাদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার এ'ও মনে হয়েছিল যে, ঐ চোরাই জুতা কোথায় আছে তা ঐ ইনফরমারের সাহায্যে আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি। একটু এদিক ওদিক চেয়ে কিন্তু-কিন্তু করতে করতে জুতা-চোরটি অনুযোগ করে জানালো, 'হাঁ হুঁজুর সবই যখন আপনারা জেনে গেছেন, তখন আপনাদের আমি আর কষ্ট দেবো না। তবে একটা কথা, এ তল্লাটের সেয়ানারা সব আমাকে একজন বড়দরের চোর বলে জানে ও খাতির করে। আমি যে জুতা-চোর তা জানাজানি হলে সকলের কাছে আমার বড় বদনাম হবে। চলুন, স্যার আমি দূর হতে সেই সিনাম্যানটার দোকানটা দেখিয়ে দেবো। খুব সম্ভবতঃ এর মধ্যে সে ও-দু'টো বিক্রী করতে পারে নি।' আমি উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ এক ট্যাক্সি ডেকে অপরাধীকে নিয়ে ঐ দোকানের নিকট যাই এবং ঐ দোকান হতে দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সামনে অপহৃত জুতা জোড়াটি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এর পর আমেরিকান জেনারেল সাহেব ঐ জুতা দু'টো আপন দ্রব্য বলে সনাক্ত করে স্বীকার করেছিলেন যে, চুরির পর এত শীঘ্র চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করতে য়ুরোপীয় বা ব্রিটিশ পুলিশ কম ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়েছেন।

এইখানে সাধারণ মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সহিত আমাকে গুরুপরম্পরায় অর্জ্জিত অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতে হয়েছিল। এই সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা ছিল যে, জুতা-চোরগণ একক চোর হয় এবং তারা দলবদ্ধ চোর নয়। ভারতীয় অপরাধী সমাজে ইহা এক অতি ছোট ও নোংরা কাজ বিধায় একে অপরের অজ্ঞাতে এই প্রকার চুরি করে থাকে। এইজন্য একজন জুতা-চোর যেখানে কর্ম্মরত থাকে, সেইখানে অপর এক জুতা-চোর প্রায়ই বিচরায় পর্য্যন্ত না। এদের একজন অপর জনকে এই ছোট কাজে লিপ্ত দেখলে উভয়েই লজ্জিত হয়ে উঠে। এইজন্য এরা পরস্পর পরস্পরের

অগোচরেই দূরে চলে গিয়ে পৃথক কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়। এ'ছাড়া বড় বড় চোরদের মনের যে 'গাট' থাকে জুতা-চোরদের তা থাকে না। তারা স্বভাবতঃই ভীরু প্রকৃতির ও সরল স্বভাবের হয়ে থাকে। এইজন্য আমি তদনুরূপ বাক্‌বিন্যাসই তার উপর প্রয়োগ করেছিলাম। আমার এবংবিধ কৃতকার্য্যতার ইহাও একটি অন্যতম কারণ।"

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে কিরূপ সরল ভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে কলিকাতা পুলিশ কার্য্য করতে সক্ষম। কিন্তু এইস্থলে লণ্ডন পুলিশে হুলুস্থূল পড়ে যেতো। তাঁরা প্রথমেই ঘটনাস্থলে এসে ঐভিড়ের মধ্যে পদচিহ্ন সংগ্রহের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করতেন। তারপর তাঁরা বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও হদিস না পেলে ছুটে যেতেন মোডাস অপারেণ্ডাই ব্যুরোতে বা অপরাধীদের কার্য্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় রেকর্ড অফিসে। এই কার্য্য-পদ্ধতি অফিসে বিভিন্ন অপরাধীদের বিভিন্ন কার্য্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় সহস্র সহস্র কার্ড র‍্যাকের বিভিন্ন খোপে বা পিজিয়ন-হোলে রক্ষিত আছে। এইখানে কোন্ অপরাধী কত লম্বা, কার চুলের রঙ কিরূপ, কোন ব্যক্তি নেংড়া বা খঞ্জ, ইত্যাদি সংবাদও নথিভুক্ত আছে। সাধারণতঃ অপরাধীদের অপপদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে উহাদের নাম ধাম সম্বন্ধে অভিহিত হওয়া যেতে পারে।

এইরূপ বিবরণ সম্বলিত বহু কার্ড পর্য্যবেক্ষণ করে তাঁরা সম্ভবমত প্রায় আট নয়টি অপরাধীর নাম ধাম বিবরণ ও উহাদের বন্ধুবান্ধবদের নাম সংগ্রহ করে ঐ অপহৃত জুতার বিবরণ সহ ঐ সকল সংবাদ তৎক্ষণাৎ গেজেটে ছাপিয়ে উহা ভ্যান, মেল বা লোক মারফৎ প্রতিটি থানায় পাঠিয়ে কিম্বা টেলিফোন বা রেডিও যোগে ঐ সকল থানায় এই সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করতেন। তার পর একে একে তাদের পাকড়াও করে অকুস্থলের লোকজনদের এবং ফরিয়াদীকে সনাক্তিকরণ মিছিলের (Test Identification Parade) সাহায্যে তাদের সনাক্ত করাবার চেষ্টা করতেন। এরপর লণ্ডন পুলিশের অপর একদল হয়ত প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে ঐ জুতার বিবরণ সহ ছুটতেন সারা লণ্ডন শহর বা শহরতলীর সন্দেহমান জুতার দোকান বা উহার গ্রাহকদের সন্ধানে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে ঐ জুতা কোনও এক ক্রেতা ইতিমধ্যেই কিনে নিয়ে দেশের বিরাট জনসমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকবে কিংবা 'বামাল-গ্রাহক'গণ উহা অন্য কোনও এক নিরাপদ স্থানে ত্বরিত গতিতে পাচার করে দিয়ে থাকবে। এ'ছাড়া এই সকল সুচতুর ধনী বামাল-গ্রাহকগণের দিকে দিকে চর আছে এবং তারা চোখ কান খুলে রেখেই ব্যবসা চালায়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে তাদের সাবধান হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এর পরও যদি কোন দোকান হতে মাত্র উহার বিবরণের সাহায্যে ঐ জুতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তাহ'লে উহা যে ফরিয়াদীর জুতা তা প্রমাণ করা হবে এক সমস্যার বিষয়। কারণ, ঐরূপ জুতা বাজার সমূহে সকলের কাছেই নির্বিচারে বিক্রয় করা হয়। তখন পুলিশকে দেখতে হবে ঐ জুতার সুকতলায় ফরিয়াদীর পায়ের অনুরূপ চিহ্ন পড়েছে কি'না? অন্যথায় তাঁরা ঐ জুতার তলদেশ-সংলগ্ন মৃত্তিকা চেঁছে বার করে রাসায়নিক পরীক্ষার পর প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে, ঐ মাটির কেমিক্যালের সহিত ঘটনাস্থল বা ফরিয়াদীর গৃহপ্রাঙ্গণের মাটির কেমিক্যালের সাদৃশ্য আছে। ফরিয়াদীর পায়ের একটি লোম দৈবক্রমে ঐ জুতার মধ্যে পাওয়া গেলেও হয়ত তাঁরা ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতেন ঐ চুলটির দ্রব্যগুণ ফরিয়াদীর পায়ের অন্যান্য চুলের অনুরূপ। এই সম্পর্কে ফোরেন্সিক সায়েন্সের সাহায্যে ঐ জুতো জোড়াটির বর্ণচ্ছটার সহিত ফরিয়াদীর গৃহের অন্যান্য জুতা বা দ্রব্যের বর্ণচ্ছটার তুলনা করেও হয়ত তাঁরা প্রমাণ করতেন যে, ঐ জুতা ঐ ফরিয়াদীরই। কোনও প্রকারে বিবিধ-বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ জুতাটি ফরিয়াদীর অপহৃত দ্রব্যরূপে কথঞ্চিত প্রমাণ করার পর তাঁদের এইবার অবগত হতে হবে, ঐ জুতা অপরাধীমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চুরি করে ঐ দোকানে বিক্রয় করেছে। অবশ্য ঐ জুতার কোনও স্থানে ভাগ্যক্রমে যদি তাদের কোনও একজনের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়, ত'হলে সে কথা স্বতন্ত্র। তবে মসৃণ দ্রব্য নয় বলে ঐরূপ কোনও ছাপ না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু ঘর্ম-সিক্ত হস্তে জুতা ও কাগজ প্রভৃতি স্পর্শ করিলে উহাতে আঙ্গুলের ছাপ সন্নিবেশিত হওয়াও অসম্ভব নয়। সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে ঘটনার অব্যবহিত পরেই অপরাধী ধরা পড়লে তারা একটি স্বীকৃতি দিলেও দিতে পারে। কিন্তু বহুদিন বা বহুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে তাদের মনোবল অটুট হয় এবং তারা কোনও স্বীকৃতি প্রদান করে না। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যাদির চোর ও উহার গ্রাহক; উভয়েই প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অপরাধসমূহ অস্বীকার করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সোপর্দ্দীকরণের পর বিচারের সময় ডিফেন্স হতে একটিমাত্র কথা বলা হয়, 'হাঁ, এ কথা সত্য; জুতায় আসামীরই অঙ্গুলিটিপ পাওয়া গিয়েছে।' কিন্তু ঐ আসামী ঐ দিন সকালে হয়তো জুতা কিনতে গিয়ে ঐ জুতাটি সে পরীক্ষা করেছিল এবং সবিশেষ পছন্দ না হওয়ার কারণে সে আর উহা কিনে নাই। ঐ সময়ই তার আঙ্গুলের ছাপ ঐ জুতায় বর্ত্তিয়ে থাকবে। ঐ জুতার গ্রাহকটিও সমধর্ম্মীয় ব্যক্তিবিধায় অপরাধীটিকে সমর্থন করে বলবে যে, তার ঐ উক্তি সর্ব্বৈব সত্য, উপরন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে সে এও বলবে যে, পূর্ব্বদিন জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ঐ জুতা তাকে বিক্রয় করেছে এবং দস্তুরমত খাতাপত্রে এই সম্পর্কে লিখে উচিত মূল্যে সে উহা ক্রয় করেছে। বহু দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার অভাবে এইরূপ জুতা বিক্রয় করে থাকে, সুতরাং সে এই বিষয়ে একান্তরূপে নির্দ্দোষ।

এইরূপ অবস্থায় আদালতের বিচারে উভয় আসামীরই সন্দেহাতীত প্রমাণের অভাবে মুক্তি পাওয়াই স্বাভাবিক। এইবার এই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় এবং প্রাচীন ভারতীয় তদন্ত-পদ্ধতির এবং সোপর্দ্দীকরণ রীতির তুলনামূলক আলোচনা করলে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় পুলিশ সরল, সহজ ও অকাট্য সাক্ষ্য প্রয়োগ করে এই উভয় আসামীর বিরুদ্ধেই মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম। উপরোক্ত ভারতীয় তদন্তরীতি অনুধাবন করলে এই সত্যটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে। এই ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বলে থাকেন যে, আসামী তাঁর নিকট একটি বিবৃতি দেয় এবং ঐ বিবৃতি অনুযায়ী সে ঠিক যে স্থানটি হতে ঐ জুতা চুরি গিয়াছিল, সেই স্থানটি তো সে দেখিয়ে দেয়ই এবং উপরন্তু সে তাকে ঐ চীনাম্যানের দোকানেও নিয়ে গিয়েছিল এবং ঐ আসামীর বিবৃতি অনুযায়ী দু'জন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে সে ঐ দোকান হতে ঐ জুতা-জোড়া উদ্ধার করতে পেরেছে। তদন্তকারী অফিসারের এই বিবৃতির সহিত ফরিয়াদীর এবং তৎসহ তল্লাসী-সাক্ষীদ্বয়ের বিবৃতির দ্বারা

অপরাধীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহজে প্রমাণ করা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিচারকের মনে মাত্র এই প্রশ্ন উঠবে যে, চোর নিজে ঐ দোকান না দেখিয়ে দিলে ঐ অপহৃত জুতা ফিরে পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং চোর নিজে না চুরি করলে সঠিকভাবে ঘটনাস্থানটিই বা সে দেখিয়ে দিতে পারে কি করে? এবং চোর নিজে যখন ঐ দোকান ঐ দোকানীকে দেখিয়ে দিয়েছে তা'হলে ঐ দোকানীও নিশ্চয় ঐ দ্রব্য তার নিকট হতে কিনেছে। এবং ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট ঐরূপ দামী য়ুরোপীয় জুতা যখন দোকানী কিনেছে তখন সে চোরাই দ্রব্যরূপেই তা তার নিকট হতে কিনেছে। এইভাবে আমরা আরও দেখতে পাবো যে ভারতীয় পুলিশ সাক্ষ্য পর্য্যন্ত নিজস্ব পন্থায় মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে পরিবেশন করতে সক্ষম। এই স্থলে আমরা দেখতে পাবো যে, য়ুরোপীয় পুলিশ কামান-বন্দুকের সাহায্যে যে সাফল্য অর্জ্জন করেন, ভারতীয় পুলিশ তার চেয়েও অধিক সাফল্যলাভ করে থাকেন রিক্তহস্তে। তাই আজও প্রবীণ ভারতীয় পুলিশরা য়ুরোপীয় পুলিশদের কার্য্য-পদ্ধতিকে উপহাস করে বলে থাকেন যে, তাদের কার্য্যসমূহ 'মশা মারতে কামান দাগা'র সমপর্য্যায়ে পড়ে। এইরূপ সাফল্যের সম্পর্কে যদি কেহ চান্সের কথা তুলেন তা'হলে আমি বলব যে, উভয় পদ্ধতিতেই চান্সের ভাগ থাকে প্রায়ই সমান। তবে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় তদন্তরীতি অতি সরল এবং য়ুরোপীয় তদন্তরীতি অতীব বক্র এবং উহা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। যে সাফল্য ভারতীয় পুলিশ তদন্তের সারল্যের কারণে বিনামূল্যে অর্জ্জন করে, সেই সাফল্য য়ুরোপীয় পুলিশকে অর্জ্জন করতে হয় বহু রাষ্ট্রীয় মুদ্রার বিনিময়ে! যাঁরা অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় পুলিশ আসামী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিবৃতির উপর যত নির্ভরশীল তত নির্ভরশীল তারা অপরাধ সম্পর্কীয় সূত্রের উপর নয়; তাঁদের সময় ও অর্থের এইরূপ অযথা অপচয়ের দিকটাও ভেবে দেখতে আমি অনুরোধ করি। ভারতীয় আদালত সমূহে প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরাধীর স্বীকারোক্তির ফলেই মামলা বিশেষের কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করে কি কেউ নিজের মৃত্যুবাণ নিজে বাতলে দেয়, ভারতীয় পুলিশ শুধু তাদের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মবোধ এনে তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করে না, তাদের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মবোধ এনে তাদের শুধরেও দিয়ে থাকেন। তবে আইনের দাস তাঁরা তাই আদালতে এদের পেশ করতে তাঁরা বাধ্য। এর পর যদি আদালত তাদের শোধরাবার সুযোগ না দিয়ে জেলে পাঠায় তা'লে ঔচিত্য বা অনৌচিত্যের যা কিছু দায়িত্ব তা রাষ্ট্রের (ব্রিটিশ প্রবর্ত্তিত) আইন সভার। কারণ য়ুরোপের ন্যায় ভারতীয় আদালতসমূহও বাঁধাধরা আইনের দাস মাত্র; কিন্তু প্রাগ্-ব্রিটিশ ভারতীয় গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও অন্যান্য আদালতসমূহ এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ব্যবস্থাই আবহমানকাল হতে করে এসেছেন। এ সম্পর্কে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ভারতীয় পুলিশ অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে (তাঁদের ব্রিটিশ শাসকদের অজ্ঞাতেই) প্রাচীন ভারতীয় রক্ষিবর্গের ঐতিহ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির অধিকারী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মাধ্যমে এসে উহা বিকৃতরূপে প্রকাশ পেলেও অধিকাংশ ভারতীয় পুলিশই অপরাধীদের প্রতি অতীব সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিতে থাকেন।

এইবার ভারতীয় পুলিশ-সুলভ অতীব সহজ তদন্ত-প্রণালী অনুযায়ী কিরূপে অপর একটি দুরূহ মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছিল তা নিয়ে বিবৃত করা হল। ঘটনাটি ভারতীয় পুলিশের অসীম ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

কোন এক জজ্ সাহেবের বাড়ী হতে তাঁর এক পুত্রবধূর মূল্যবান স্বর্ণ-হার চুরি যায়। আমাকে বিশেষ করে এই মামলার তদন্তে পাঠানো হয়েছিল। আমি জজ্ সাহেব মহাশয়ের বাটীতে আসিলে তিনি সাদরে আমাদের তাঁর উপরের বৈঠকখানায় বসিয়ে জানালেন, 'এ মশাই, পাকা পেশাদারী বাইরের চোরেরই কাজ। কি আশ্চর্য্য, আমার মত লোকের বাড়ীতেও দিন দুপুরে চুরি! তা দেখুন, কি করতে পারেন। বাপ্‌রে বাপ্! এ তো এক ভীষণ কাণ্ড!' জজ্ সাহেব আরও হয়ত অনেক কথা আমাদের শুনাতেন কিন্তু ইত্যবসরে পাশের ঘর থেকে খবর এলো যে তাঁকে টেলিফোনে কে ডাকছে। তিনি চলে গেলে আমি ও আমার সহকারী নিম্নস্বরে এই চুরি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলছিলাম এমন সময় আমাদের লক্ষ্য পড়লো একটি উড়িয়া চাকরের দিকে। সে দুয়ারের এপারের বারান্দার ধারে ঘর ধোয়ার অছিলায় জল শুদ্ধ বালতি হাতে দুয়ারের ফাঁক দিয়া আমাদের বারে বারে দেখে যাচ্ছিল; আমি এই দেখে নিম্নস্বরে আমার সহকারীকে জানালাম, ঐ লোকটাকে তো সুবিধের মনে হচ্ছে না, দাঁড়াও দেখি। এর পর ঐ উড়িয়া চাকরটিকে কাছে ডেকে আমি বললাম, 'আয় এদিকে আয়। তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন? এঁ্যা: তোকে তো আমরা ধরতে আসি নি! বোস্ বোস্, এইখানে বোস্। হ্যাঁরে তোর দেশ কোথায়, আছে কে কে তোর সেখানে?' আমতা আমতা করে ভৃত্যটি জানালো যে তার দেশ কটক জিলার অমুক গ্রামে দেশে তার নাবালিকা স্ত্রী ও একটি শিশুকে সে রেখে এসেছে। তার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কথা শুনে আঁতকে উঠে আমি বলে উঠলাম, 'এঁ্যা বলিস কি রে? বাড়ীতে তোর সেই বালিকা বধূ ও ঐ একরত্তি পুত্র আছে, আর তুই এমন একটা কাজ করে বসলি। আহা আহা, তাই তো কি করা যায় বল দিকি এখন। তা তো'কে তা'হলে তো একরকম করে বাঁচিয়ে দিতেই হবে। তোকে তো বাপু দেখলে ভালো লোকই মনে হয়, তা তুই—' এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ভৃত্যটি এমন একটি পরিস্থিতিতে এসে পড়লো যে সে অপরাধ স্বীকার করে আমার পা জড়িয়ে ধরে বারে বারে তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে থাকলো। ঠিক এই সময় জজ্ সাহেব সেইখানে এসে পড়ে তাঁর ঐ ভৃত্যটিকে ঐ অবস্থায় দেখে আমাদের অনুযোগ করে বললেন, 'আরে মশাই, আপনারা আবার ওকে নিয়ে পড়লেন কেন? ও'লোক খুবই ভালো ওকে ছেড়ে দিন। ওর উপর আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। যারে, ভজু যা, বাড়ীর ভিতরে কাজ করগে যা।' উত্তরে আমি জজ্ সাহেবকে বললাম, 'না ও কিছু জানে না। তবে ও একটা লোকের ঠিকানা জানে, তার বাড়ীটা শুধু দেখিয়ে দেবে। এক্ষুণি ওকে নিয়ে আমরা আবার এখানেই ফিরে আসছি।' এর পর আর জজ্ সাহেবকে কোনও প্রতিবাদ করবার অবসর না দিয়েই আমরা ঐ উড়িয়া ভৃত্যকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এর পর ঐ ভৃত্যটি আমাদের চিৎপুর রোডে এনে সেখানকার এক সারি পোদ্দারের দোকানের মধ্যে একটি অর্গল বদ্ধ দোকান দূর হতে দেখিয়ে বললে

যে, সে ঐ স্বর্ণ-হারটি চুরি করে এনে ঐ দিনই ঐ দোকানে এক শত টাকা মূল্যে তা বিক্রয় করেছে। এবং সে ঐ দিনই বিক্রয়লব্ধ এক শত টাকা স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন ও তাদের ভগ্নপ্রায় কুটির মেরামত করার জন্যে দেশের ঠিকানায় মনি অর্ডার করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, আমার সকলেই বেউর্দীতে তদন্তরত ছিলাম। আমি সহকারীর জিম্মায় উড়িয়া ভৃত্যটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ নাগরিকের বেশে পার্শ্ববর্ত্তী দোকানের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ্ঞে মশাই এই দোকান তো বন্ধ দেখছি, কিন্তু এর মালিকের বাসার ঠিকানা বলতে পারেন?' এই সব কয়টিই দোকানীই ছিল এক দলেরই দলী, তাদের ব্যবসায়ই হচ্ছে চোরাই গহনা কিনে ত্বরিত গতিতে তা গালিয়ে ফেলা। এই কারণে এই স্থানের কোনও দোকানীই—ঐ ভদ্রলোকের ঠিকানাটা জেনেও তা বলতে চাচ্ছে না বুঝে আমি ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলাম, 'এই মুস্কিলে পড়া গেলো মশাই। ভদ্রলোকের মাতাঠাকরুণ ওঁর স্বগ্রামে মারা গেছেন। আমি তাঁর সেই গ্রাম থেকেই তাঁকে খবর দিতে এসেছি।'—'ও: তাই নাকি,'—এই কথা শুনে এঁদের একজন বলে উঠলেন, 'চলে যান শীগ্‌গির তা'হলে। ওঁর ঠিকানা হচ্ছে অমুক লেনের অত নম্বর বাড়ী।' এই কথা শুনা মাত্র আমরা ত্বরিত গতিতে ভদ্রলোকের ঐ ঠিকানায় এসে তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি সুরু করে দিলাম। কিন্তু সেই ভদ্রলোক ছিলেন একজন অত্যন্ত চালাক ব্যক্তি। সহসা তাঁর নাম ধরে ডাকায় বোধ হয় তিনি সন্দেহই করে থাকবেন। ওদিকে ঐ বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটিয়ারাও আমাদের বিশেষ আমল দিতে চান না বলেই মনে হল। অতগুলো ঘরের এক একটিতে এক একটি পরিবার বাস করে। কোন ঘরটিতে যে ঐ ভদ্রলোক থাকেন তা প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। এদিকে আমাদের খোঁজা-খুজির বহর দেখে ভদ্রলোকটিও হয়ত গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়তে পারেন। আমি তখন আর অপেক্ষা না করে ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে মশাইরা দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? শীগ্‌গির অমুক বাবুকে ডেকে দিন। আমি চিৎপুর রোড থেকে আসছি, তাঁর দোকানে আগুন লেগেছে।' আগুন লাগার বার্ত্তা কানে যাওয়া মাত্র ভদ্রলোকটি কোণের একটি ঘর থেকে নগ্ন পদ ও গাত্রেই বেরিয়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'এঁ্যা; কি বললেন আগুন লেগেছে?' বলা বাহুল্য তিনি আঁৎকে উঠে বেরিয়ে আসা মাত্র আমরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে উঠলাম, 'আজ্ঞে না আমরা পুলিশ। দেখুন তো, চেনেন ঐ উড়িয়া ভৃত্যটিকে?' এরপর ভদ্রলোকটিকে একজন পশ্চাদাগত সিপাহীর জিম্মা করে দিয়ে ভদ্রলোকের কক্ষে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে বললাম, 'আজ্ঞে, ভয়ের কিছু নেই। ঐ চোরটা এ সব কিছু না জানিয়েই একটা গহনা এঁকে বিক্রী করে গিয়েছে। গহনাটা আপনি আপনার আলমারী থেকে বার করে দিন, তা'হলেই যা কিছু গণ্ডগোল তা চুকে যাবে।' এর পর আরও একটু বুঝিয়ে বলাতে ভদ্রলোকের স্ত্রী গহনাটি তাঁর আলমারী থেকে বার করে এনে আমাদের হাতে ঐ বাটীরই দুই জন সাক্ষীর সামনে তুলে দিয়েছিলেন।

এইখানে ভারতীয় পুলিশদের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানসহ সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় পুলিশ জানে, প্রথমেই অপরাধীমস্ত ব্যক্তিকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে কোনও ফল হয় না। তার সহিত অপরাধের সম্পর্ক রহিত কথাবার্ত্তা প্রথমে বলা দরকার। এইরূপ কথাবার্ত্তার মধ্যে তার মানসিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পর তার চিত্তপ্রবৃত্তি (Predisposition) অনুযায়ী তার প্রতি প্রয়োজনীয় বাক্যবিন্যাস প্রয়োগ করলে তবেই সে তার এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে অপরাধ-সম্পর্কীয় এক স্বীকৃতি প্রদান করবে। ছাড়া ভারতীয় পুলিশ ইহাও অবগত আছে যে, ভারতীয় সমাজে কোনও কোনও পুরুষরা অপরাধ-প্রবণ হলেও তাদের স্ত্রীরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ঘৃণাই করে এসেছে। এইজন্য এক শ্রেণীর অভ্যাস, অপরাধীরা তাদের আপন আপন স্ত্রীর অজ্ঞাতেই অপকর্ম্ম করে থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীটির স্ত্রী সরল বিশ্বাসে এই ভাবে পুলিশকে সাহায্য করেছিল। অপরাধীটি তার স্ত্রীকে যথা সময়ে সাবধান করে দিতে পারলে অবশ্য সে এইরূপ সাহায্য পুলিশকে করত না। কারণ একজন ভারতীয় স্ত্রী স্বামীর জীবন ও মান রক্ষার জন্য যে কোনও কার্য্য করতে প্রস্তুত। ইহাও ভারতীয়সমাজ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিক। এই কারণে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সহিত ঐ রক্ষিপুঙ্গব তাঁর স্বামীকে অগ্রেই তাঁর স্ত্রীর সন্নিধান হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে, যে রীতিতে ইঙ্গস্থানীয় পুলিশ তদন্ত করে সেই রীতিতে ভারতে তদন্ত-কার্য্য করা হয় নি। ইহার কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আমি বলেছি। এইজন্য ভারতীয় পুলিশকে অপরাধী ও তাদের গোষ্ঠীয়দের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি তো জানতে হয়েছেই, উপরন্তু ভারতীয় নিরাপরাধ সভ্য সমাজেরও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত হ'তে হয়েছে। কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়া মাত্র তদন্ত-কার্য্য সুরু হলে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ যে বিশেষ কার্য্যকরী তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন বহু অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যাহার খবর পুলিশের কাছে ছয়মাসের পর কিংবা এক বৎসর পরে পৌঁছিয়েছে। এই ক্ষেত্রে এমন কোনও সূত্রের সন্ধান প্রায়ই পাওয়া যায় নি যার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশের নিজস্ব তদন্তরীতিরই প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। তবে ভারতীয় পুলিশ বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল না হলেও প্রয়োজন মত তারা সকল ক্ষেত্রেই তদন্ত-কার্য্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পদ-চিহ্ন'শাস্ত্র এই দেশেরই প্রাচীন বংশানুগত্য ডিটেকটিভগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট। আঙুলের টিপ-চিহ্ন শাস্ত্রও সর্ব্বপ্রথম এই দেশে সৃষ্ট হয়ে এই দেশেই সর্ব্বপ্রথম চালু করা হয়। বঙ্গীয় ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরো পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ব্যুরো। উক্ত বিজ্ঞানদ্বয় সহ, অপপদ্ধতি বিজ্ঞান, ফোরেন্সিক শাস্ত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধ-তদন্ত সম্পর্কীয় আধুনিক বিজ্ঞান সমূহের সাহায্য অধুনাকালে য়ুরোপীয় পুলিশের ন্যায় ভারতীয় পুলিশও গ্রহণ করে থাকে। তবে তাদের এই সকল শাস্ত্রকে ভারতের উপযোগী করে ঢেলে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় পুলিশ তদন্ত-কার্য্যে নিজেদের মূল পদ্ধতি আজও ত্যাগ করে নি। আমি এই কাহিনীসমূহে যে সকল বিখ্যাত মামলার তদন্ত ও উহাদের বিচারের কাহিনী বিবৃত করবো তাহাদের প্রায় সব কয়টির তদন্ত, অধিক ক্ষেত্রেই ভারতীয় নিজস্ব তদন্ত-পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে।

—আগামী সংখ্যায়—

পাগলা হত্যা মামলা

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

সুপরিচালনাই বলুন, অনবদ্য অভিনয়ই বলুন বা কলা-কৌশলের চমৎকারিত্বই বলুন—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ছবির সাফল্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে দর্শকদের ভাল লাগার উপর, দর্শকদের নির্বাচনের মধ্যেই ছবির সাফল্যের চাবিকাঠি। সকল দিক দিয়ে ছবি পূর্ণ হওয়া সত্বেও যদি সে দর্শকদের দরবারে গৃহীত না হয়—ভেবে দেখুন তা হলে—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ছবি ব্যর্থ। ঈশ্বরের করুণায় কুমকুম দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সমাদর পেল—অভিজ্ঞ সমালোচকের দলও কুমকুমকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না। দর্শক-সমাজে ঠাকুরের আশীর্বাদে, বিপুল সমাদরে গৃহীত হ'ল কুমকুম। আমাদের জীবনকে বেষ্টন করে সেই একই কর্মের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তাতে লাগে না কোন পরিবর্তনের ছোঁয়াচ।

বলতে বাধা নেই, সম্মান, খ্যাতি, যশ সেই সময়ের মধ্যেই আমি যা পেয়েছিলুম তা ধারণার অতীত, আমাকে দর্শক-সমাজ যে এত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তা আমি ইতঃপূর্বে ভাবতেই পারি নি। আমার মত একজন নগণ্য শিল্প-উপাসিকার প্রচেষ্টা যে দর্শক-সমাজকে তৃপ্তি দিতে পারবে—এ আমি সত্যি বলছি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি কিন্তু আজও বুঝতে পারি না কেন—কি কারণে—কি জন্যে—ওই সম্মান, ওই খ্যাতি, ওই যশ আমার মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে নি, খুব যে আমায় আকর্ষণ করেছে তাও মনে হয় নি, আমার মনে খুব একটা রেখাপাত করতে পেরেছে বলেও বোধ হয় না, কিন্তু দর্শকের মতামতের উপর আমার সুগভীর আস্থা তাতে বিন্দুমাত্র কমে যায় নি, আমার সম্বন্ধে দর্শকের সুচিন্তিত মতামত আমি আশীর্বাদের নামান্তর বলেই ভেবে এসেছি। বৈচিত্র্যের মধ্যেই জগতের সৌন্দর্য, এ-ও বোধ হয় সেই শাশ্বত সত্যের একটি উদাহরণ বিশেষ। আজ প্রৌঢ়ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেও কিছুতে আমার বোধগম্য হচ্ছে না কেন সেদিন সাধারণের দেওয়া সম্মান আমার মনে রেখাপাত করতে পারে নি, এই রহস্যের সূত্রসন্ধানে এখনও আমার মন মাঝে মাঝে মেতে ওঠে। নিজেকে সরিয়ে রাখার স্পৃহা আমার বাল্যকাল থেকে, এক কথায় চিরকাল যে কোন ব্যাপারে নিজে সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত থেকে, ওতঃপ্রোত ভাবে তার সঙ্গে মিশে থেকে আশ্চর্য ভাবে নিজেকে তারই মধ্যে থেকে আবার সরিয়ে রাখা আমার স্বভাবই বলুন ইচ্ছাই বলুন বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলুন। স্নায়বিক চঞ্চলতাও এর জন্যে কম দায়ী—এমন কথাও জোর দিয়ে আমি বলতে পারি না; বোধ হয় সেই জন্যেই আমার মনে হয়, সাধারণ দর্শক আমাকে সশরীরে খুব বেশী একটা দেখতে পেতেন না। বহুজনের সম্মিলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার স্পৃহা আমার মধ্যে ছিল সমধিক, আর সেই স্পৃহার বিকাশে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করল আমার স্নায়বিক চাঞ্চল্যবোধ। আমাকে যাঁরা স্নেহ করেন, আমার যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার অভিনয়ের যাঁরা উৎসাহদাতা, সেই সাধারণের মাঝখানে নিজেকে মিশিয়ে দেবার অজস্র সুযোগ এসেছে আমার জীবনে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন স্থান থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মারফৎ অজস্র আমন্ত্রণ এসেছে আমার কাছে, জানি না সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার মন উন্মুখ হয়েছে কি না। তবে এটুকু বেশ জানি যে যদি বা কখনও সাধারণের আমন্ত্রণে আমি সাড়া দিতে গেছি সঙ্গে সঙ্গে আমার কণ্ঠরোধ করেছে আমার আবাল্য-লালিত নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার স্পৃহা। আমার মধ্যে বিশেষভাবে তখন জেগে উঠল এক অস্বাভাবিক স্নায়বিক চাঞ্চল্য-বোধ। কিন্তু সেদিনের আমির সঙ্গে আজকের আমির আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ধ্যান ধারণা, চিন্তা কল্পনা, স্বপ্ন দৃষ্টি, ভাবভঙ্গীর দিক দিয়েও সেদিনকার সাধনার সঙ্গে আজকের সাধনার কোনও মিলই পাওয়া যায় না, আজকের সাধনার কাছে সেদিনের সাধনা শুধু স্মৃতি শুধু ইতিহাস, শুধু পিছনে ফেলে আসা যুগ তাই সেদিনকার সাধনার এই আচরণ আজকের সাধনার মনে জন্ম দেয় এক অবর্ণনীয় অনুশোচনার, আজকের সাধনা ভাবছে যে সেদিনকার সাধনার এই আচরণ বোকামী ছাড়া কিছুই নয়, ভ্রান্তির পরিচায়ক সেদিনকার সাধনার সেই আচরণের জন্যে আজকের সাধনা সবিশেষ অনুতপ্ত। সত্যি কি ভুলই না করেছি তখন? আজ তার জন্যে অনুতাপ করছি, কিন্তু এই অনুতাপের পূর্বাভাস যদি সেদিন পেতুম এবং সেই অনুসারে যদি চলতে থাকতুম তা হলে নিশ্চয়ই আজ আমাকে বেদনার বাণে বিদ্ধ হতে হোত না। এই প্রসঙ্গে আজ সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে বাবাকে "Chautaux Marine"-এ সে সময়ে তিনি আমাদের কাছেই ছিলেন। সাধারণ্যে আমি যাতে যথেষ্ট মেলামেশা করতে পারি সেজন্যে বাবার সে কি আগ্রহ, কি তৎপরতা, কি ব্যাকুলতা যা ভাবলে আজ দু'চোখ দিয়ে ক্রমাগত জলের ধারা নামতে থাকে। আমার বেশ মনে আছে, সাধারণ্যে মেলামেশার বাসনা আমার মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বাবা প্রায়ই বলতেন, "পোষ্টপনমেন্টস আর দ ওয়ার্স্ট মিসটেক ওয়ান কুড মেক সাধনা"—শুধু মনে আছে বললেই ভুল হয় কথাটি যেন কর্ণকুহরে চিরকালের জন্যে স্থায়িত্ব নিয়েছে।

আমার প্রকৃতির একটি দিকের দ্বারোদ্ঘাটন করলুম আপনাদের সামনে কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই বিবরণী থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে আমি মিশুকে নই। সাধারণ্যে মেলামেশা করতে

আমি সংকোচবোধ করতুম কিন্তু তাই বলে এ ধারণাও আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় যে, লোকের সঙ্গে আমি মিশতুম না। তবে কি জানেন, সবই একটা নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে। রামায়ণ মনে করুন, গণ্ডীর মধ্যে সীতার পরম শান্তি কোন ভয় নেই, যেমন ভাবে ইচ্ছে চলাফেরা করতে পারেন, গণ্ডীর বাইরে পা দিয়েছেন কি সাঙ্ঘাতিক বিপদ, আমার বেলায়ও কথাটা নেহাৎ অপ্রযোজ্য নয়। আমার বন্ধু-বান্ধবী অনেকেই ছিলেন, সংখ্যার দিক থেকেও তাঁরা নগণ্য নন, তাঁদের সঙ্গে আমার মেলামেশাও ছিল যেমনই গভীর তেমনই নিবিড়। কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি—গণ্ডী—সবই সেই সীমার মধ্যে, সীমা অতিক্রমণ তো বাস অমনি সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সঙ্কোচের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ। সেই বন্ধুদের কথাও কি আজ কম মনে পড়ছে, তাঁদের কেন্দ্র করে কতগুলো দিন যে কি আনন্দের মধ্যে কেটেছে তা যত ভাবছি অলস মুহূর্তগুলো যেন তত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মৃত, তাঁরা তো আজ সর্বপ্রকার ধরা-ছোঁওয়া, আসা-যাওয়া, যোগাযোগের উর্দ্ধে, তবে যাঁরা আজো ইহলোকে বর্ত্তমান সেই সব দিনগুলোর সাক্ষী হিসেবে—কালের চক্রে তাঁরা কে কোথায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছেন তার না আছে ঠিকানা, না আছে নিশানা না আছে সঠিক সন্ধান।

Chautaux Marine এ আমরা ছাড়া চিত্রজগতের আরও বহু জন বাস করতেন। প্রখ্যাত প্রযোজক পরিচালক মিঃ কার্দার, স্বনামধন্যা গায়িকা ও অন্যতম প্রথম মহিলা প্রযোজিকা পরিচালিকা জদ্দন বাঈয়ের নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আর হ্যাঁ-হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। একটি মেয়ের কথা, তখন সে বালিকামাত্র, কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে উপনীতা। সমুদ্রের দিকে মুখ করা আমার বারান্দা থেকে সেই ফ্রক পরা মেয়েটিকে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে প্রায়ই খেলতে দেখতুম। সে দৃশ্য তো আমার চোখের সামনে ভাসছে। তার নাম উল্লেখ করা মাত্রই আপনারা তাকে চিনতে পারবেন, কারণ চলচ্চিত্র-জগতের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসেবে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও আজ সে সুপরিচিতা। পূর্বোক্তা জদ্দন বাঈয়ের মেয়ে সে। তার নাম শ্রীমতী নারগিস। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপুর সংসার

দিকপাল সাহিত্যশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিধর্মী লেখনীর অনবদ্য নিদর্শন অপু-কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে এইবার সমাপ্তির রেখা পড়ল। অপুর মাতৃবিয়োগ পূর্ববর্তী ছবি অপরাজিততে দেখান হয়েছে। এখানে, এই ছবিতে ছবির প্রথমাংশে কলকাতার এক ভাড়াটে বাড়ীর অন্যতম বাসিন্দা, জীবিকান্বেষী এবং গৃহস্বামীর শিকার হিসেবে অপুকে দেখানো হচ্ছে পরবর্তী অংশে দেখছি বন্ধু প্রণবের এক বোনের বিবাহোপলক্ষে বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে বাড়ীতে অপু গেল ও ঘটনাচক্রে পাত্রীকে সেই বিয়ে করে নিয়ে গেল—এবং শুরু হ'ল তাদের মধুময় দাম্পত্যজীবন, তারও পরবর্তী অংশে দেখছি সন্তানের জন্ম দিয়ে

অপর্ণার লোকান্তরযাত্রা ও সেই সংবাদে অপুর মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়, এবং সে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে, বছর পাঁচেক বাদে অনেক অনুসন্ধান করে প্রণব তাকে খুঁজে পায় বহু দূরে কোন একটি স্থানে উদাসনয়ন অপুকে, অপুর মুখমণ্ডল তখন গোঁফ-দাড়িতে ভর্ত্তি। পুত্রের সম্বন্ধে অপু যেন কেবলমাত্র টাকা পাঠিয়েই খালাস। অপর্ণার মৃত্যুর জন্তে পুত্রকেই সে দায়ী করে, প্রণব খুব দক্ষতার সঙ্গে অপু-নন্দন কাজল সম্বন্ধে অপুর চেতনার গভীরে ঘা মারে; সর্বশেষ অংশে দেখছি শ্বশুরালয়ে অপুর আগমন ও অনেক সাধনার পর সদা পলায়নপর পুত্রের সঙ্গে পিতার বহু আকাঙ্খিত মিলন ও পুত্রকে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে অপুর যাত্রা।

অপু-কাহিনীর অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণের লেখনীজাত একটি লাইন আজ বার বার আমাদের মনে পড়ছে—"গতিই জীবন, গতির দৈন্তই মৃত্যু"—যাঁরাই তাঁর কাছে স্বাক্ষরের জন্তে খাতা পেশ করতেন তাঁদের প্রত্যেকের খাতাতেই (আমরা যতদূর জানি) বিভূতিভূষণ এই কথাটিই লিখে দিতেন। গতির উপাসক বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির পরিণতি-অধ্যায়ের চিত্রায়ণে গতির অভাব যে কতখানি ব্যাপক ভাবে ঘটতে পারে, তা বলে বোঝানো যায় না। তবে সে বিষয়ে যাঁরা মনে মনে জিজ্ঞাসা পোষণ করেন, "অপুর সংসার" তাঁদের সেই জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ উত্তর। লীলা কই? অপুর যে চরিত্রের বিভূতিভূষণ রূপ দিয়েছেন, সেই চরিত্রের সার্থক বিকাশে লীলার আবির্ভাব অপরিহার্য, লীলাকে বাদ দেওয়ার ফলে অপু-চরিত্রের সম্যক প্রস্ফুটন অসম্পূর্ণ, অপু-চরিত্রে লীলার প্রভাব অসামান্ত। অপু-চরিত্রের উপর সবচেয়ে অবিচার করা হয়েছে অপুকে দিয়ে ঐ চড়টি মারিয়ে। ঐ পরিবেশে চড়টি মারানোর ফলে ছবির গুরুত্ব, সম্ভ্রম, মর্যাদা যে তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারে? চিত্রপরিচালক ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের আর একটি পরিচয় আছে তিনি শিল্পী, শিল্পিমনের অধিকারী একজন শিল্পীর দ্বারা এ জিনিষ যে কি করে সম্ভব হ'ল স্বীকার করছি সত্যিই তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। প্রহারকে যদি শোকের অভিব্যক্তি বলে মেনে নিতে হয় তা হ'লে সব চেয়ে অপমান করা হয় মানুষের আত্ম-অনুভূতিকে। পৃথিবীর মধ্যে অপুর সব চেয়ে প্রিয় অপর্ণা তার মৃত্যু অপুর কাছে নিজের মৃত্যুরই নামান্তর। সচরাচর মনুষ্যসমাজে আমরা দেখে থাকি যে এই অবস্থায়, আকস্মিকভাবে এই সংবাদ শ্রবণে মানুষ হতবাক হয়ে পাথরের মত হ'য়ে যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অবশ হ'য়ে যায়—সে হ'য়ে যায় বিমূঢ়, প্রাণ খুলে তখন সে কাঁদতেও পারে না—সে অবস্থায় তার মনে প্রহার-প্রবৃত্তির উদয় অস্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, ষ্টেশনে অপুর কাছে অপর্ণার শেষ বিদায়দৃশ্যটি পরিকল্পনা ও পরিবেশন হৃদয়কে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। এই দৃশ্যটিকে সাফল্যের স্বাক্ষর বলা যায়।

সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত—পরিচালিত এই ছবিতে সুরকাররূপে দেখা গেল পণ্ডিত রবিশঙ্করকে আলোকচিত্র গ্রহণে অসামান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন সুব্রত মিত্র। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন আমরা জানাই।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উভয় শিল্পীরই এই প্রথম চিত্রাবতরণ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্যে অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর চড় মারার দৃশ্যে অভিনয়ে সব চেয়ে ব্যর্থতা বরণ করলেন সৌমিত্র। ঐ দৃশ্যটিতে তাঁর অভিনয় অতি পীড়াদায়ক আর যথেষ্ট কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট। অপর্ণার ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর, প্রণবের ভূমিকায় নবাগত স্বপন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিনয় করে চরিত্রটির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এ ছাড়া ধীরেন ঘোষ, ধীরেশ মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, শেফালিকা, বেলারাণী, আশা প্রভৃতি শিল্পীদের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে। ছবিটি নায়কপ্রধান এবং ছবিটিকে one man show বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষুধার পাঁচ শ' সাত রজনী অতিক্রম

বাঙলাদেশে একটি নাটকের পেশাদারী ভাবে একটানা মঞ্চাভিনয়ের সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করল "ক্ষুধা" অল্পকাল আগে পাঁচ শ' সাত অভিনয়-রাত্রির অতিক্রমণে। এর আগে আর কোন নাটক একই মঞ্চে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এতকাল ধরে একটানা অভিনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নি। সে জন্তে ক্ষুধার সাফল্য নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। এই উপলক্ষে বিশ্বরূপায় এক প্রীতি উৎসবের সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও পৌরপ্রধান শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শ্রদ্ধাভাজন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীহেমেন দাশগুপ্ত। সভান্তে অভিনয় শুরু হয়। ঐ দিন ঐ উৎসব উপলক্ষে বিশ্বরূপায় সাহিত্য জগতের, অভিনয় জগতের ও মহানগরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সুধীর আগমন ঘটেছিল। অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপার অন্যতম কর্ণধার শ্রীরাসবিহারী সরকার সকলকে স্বাগত জানান ও অভ্যাগতদের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেন। এই অনুষ্ঠানের কয়েক দিন পরে বিশ্বরূপার চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষেও এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হয় সেদিন সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে দেখা গিয়েছিল যথাক্রমে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে ও শ্রীশম্ভু মিত্রকে। ক্ষুধা নাটকটিকে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি সেই জন্তেই এবারে বিশদ আলোচনা থেকে বিরত রইলুম। তবে এ কথা বার বার বলি—ক্ষুধার মত যুগোপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ নাটকের জয়যাত্রা পরোক্ষ ভাবে জাতীয় জয়যাত্রা। সংস্কৃতির পূজারী বাঙালী উচ্চশ্রেণীর এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোপহার আবেদনে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন না, ক্ষুধার বিজয়বৈজয়ন্তীই প্রমাণ। বাঙালীর জাতীয় জীবনের কল্যাণকল্পে ক্ষুধার অন্তর্নিহিত বক্তব্য আবেদন ও আদর্শ এবং কর্তৃপক্ষের শুভপ্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যপূর্ণ ও জয়যুক্ত হোক—সর্বাঙ্গীন ভাবে আমরা এই কামনাই করি।

"ধর্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমই ধর্ম।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ফাঁকি !

"পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যব্যাপী হরতালের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া মন্ত্রীরা কি গত বৃহস্পতিবার হরতাল পালন করিয়াছিলেন? রাষ্ট্র-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে কেহই প্রায় ঐ দিন নিজ নিজ দপ্তরে আসেন নাই। মন্ত্রীদের মধ্যেও অধিকাংশ অনুপস্থিত ছিলেন; কয়েকজন আবার একবার করিয়া হাজিরা দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। একমাত্র পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় যথারীতি দপ্তরে হাজির ছিলেন। একা কুম্ভের উপর নকল বুঁদিগড় রক্ষার ভার পড়িয়াছিল কেন কে বলিবে? অন্ততঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অবস্থার কোন কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। অনেকে বলিতেছেন, অবস্থা অনেকটা 'বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর' গোছের। কর্তা দিল্লী, তাই কাজে ফাঁকি দিবার লোভ কেহই নাকি সামলাইতে পারেন নাই।"

—দৈনিক বসুমতী।

উপদেশামৃত

"কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম গয়া রাজেন্দ্র-আশ্রমে কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় বক্তৃতাকালে বলেন, কংগ্রেসকর্মীদের উচিত, অপরের দোষ দেখানোর চেয়ে নিজেদের দোষ সংশোধনেই বেশী অবহিত হওয়া। কেননা, তাঁহার মতে, সরকারী মহল অপেক্ষা অনেক কংগ্রেসী আছেন, যাঁহারা দশগুণ বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত। শ্রীজগজীবন রামের এই ভাষণের লক্ষ্য কাহারা জানি না। নিশ্চয় তিনি এই হিতবাক্য কেরালা কংগ্রেসীদের উদ্দেশে বলেন নাই। আর সরকারী মহলের তুলনায় যে কংগ্রেসীদের মধ্যে তিনি দশগুণ দুর্নীতিপরায়ণতার সন্ধান পাইয়াছেন, নিশ্চয় সে তালিকায় তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ধরেন নাই! প্রকৃষ্ট সমালোচনা ত তাহাকেই বলে, যাহা সংশ্লিষ্ট মহল ছাড়া আর সকলেরই মর্মভেদ করে।"

—যুগান্তর।

জনকল্যাণী সরকার

"উপর হইতে দেখিলে দীঘি নিস্তরঙ্গ, কিন্তু তাহার তলায় শৈবালদাম প্রচ্ছন্ন থাকে, অনেক পঙ্ক, পিচ্ছিল ক্লেদ। সমাজেরও অদৃশ্য-গোপন স্তরে স্তরে অনেক গ্লানি, বঞ্চনা আর বিড়ম্বনা, হতাশা আর পাপ জমিয়া আছে, আমরা সব সময় টের পাই না। দীঘিতে মাঝে মাঝে বুদ্‌বুদ্‌ ফুটিয়া উঠে, তাহার অন্ধকার অন্তস্তলের খবর দিয়া চকিতে মিলাইয়া যায়। সমাজজীবনের ও নীচের মহলের দুই-একটা খবর জানাজানি হইয়া আমাদের চকিত বা স্তম্ভিত করিয়া তোলে। কেহ ধিক্কার দেয়, কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কর্তব্যের ওইখানেই শেষ। মীরা মুখোপাধ্যায় নামে এক রমণীর যে কাহিনী গত বৃহস্পতিবার আদালতে শুনা গিয়াছে, তাহা লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার ইতিহাস। আপাতদৃষ্টিতে কলঙ্কিনী এই নারী মহানগরে এক ঘৃণ্য পরিবেশে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দায়ে অভিযুক্ত হয়। আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া সে কি ভাবে তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার মর্মস্পর্শী বিবরণ দেয়। দুই নাবালক পুত্রের ভরণপোষণের জন্যই তাহাকে লজ্জাকর জীবন যাপন করিতে হইয়াছে, সে কথা সে অকপটে বলে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাহিনী একা মীরা মুখোপাধ্যায়ের নয়, কলিকাতার ইটের পাঁজরে আর রাজপথের পাথরে এমনই বহু স্বামি-পরিত্যক্তা নারীর করুণ কান্না হয়ত চাপা পড়িয়া আছে। ইহারা বিষপান করিয়াছে, কিন্তু নীলকণ্ঠ হইতে পারে নাই, অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে বিরাট একটা ফাঁক আছে, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। মীরা মুখোপাধ্যায়কে যে বিচারক মুক্তি দিয়াছেন তিনিও বলিয়াছেন, পাপপথ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পন্থা সে হয়ত খুঁজিয়া পাইবে না। বিচারকের এই আশঙ্কাকে মিথ্যা করিয়া তোলার দায়িত্ব সমাজের এবং সরকারের, জনকল্যাণের ভার যাঁহারা লইয়াছেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

হুঁসিয়ার

"কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এই ভাবে শ্রীনেহরু মানুষের মন তৈরী করার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে ভারতের গণতন্ত্র ও সংবিধানকে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আঘাত করিতে চায় তাদেরই সাহায্য করা হয় মাত্র এবং শ্রীনেহরুর উপরেও এই আঘাত যে পড়িবে তাহা তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন অথবা তিনি স্বেচ্ছায় ভারতের রাজনীতিতে এই দুর্দৈব ডাকিয়া আনিতেছেন। কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষের ফলে শ্রীনেহরু নিজহাতে এই ভাবে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন তৈরী করিতেছেন। তাই আমরা বলি, পরিস্থিতি অতীব জটিল করিয়া তোলা হইতেছে। অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবার পূর্বেই শ্রীনেহরু ও কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে আমরা হুঁসিয়ার হইতে বলি। আপনাদের নিজেদের তৈরী সংবিধানকে, আপনাদের নিজেদের প্রতিশ্রুত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নিজহাতে আঘাত করার পথ আপনারা পরিত্যাগ করুন— ইহাই আজ সমগ্র ভারতের দাবী।"

—স্বাধীনতা।

কেরলে কংগ্রেস

"সংবাদে প্রকাশ, কেরলে শিক্ষা বিল নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই অশান্তিতে কংগ্রেস, পি, এস, পি, মুসলিম লীগ ও ক্যাথলিক দল অংশ গ্রহণ করেছে। বিলের উপকারিতা বা অপকারিতা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। কারণ একদল এটাকে ভাল মনে করে দেশের মঙ্গলের জন্য এই আইন চালু করতে চলেছে। অপর দল এটাকে মন্দ বলে আইন চালু না করার জন্য কম্যুনিষ্ট সরকারকে চাপ দিচ্ছে। তারা ধুয়ো তুলছে এটা চালু হলে দেশের চরম সর্বনাশ হবে ইত্যাদি। আজ সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হয়েছে কংগ্রেস কেরলে মুসলিম লীগ ও ক্যাথলিক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে। ধর্মের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা ভারতের চরম সর্বনাশ করেছে। তাদের সঙ্গে হাত মিলাবার কথা কংগ্রেসীদের নয়। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল। মুসলিম লীগ চায় ভারতের ভিতরে গোলমাল লাগিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে কোন সুযোগ ঘটিয়ে নিতে। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের বুকে মানুষ হয়ে ভারতের

অন্নজলে বড় হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান ভারতের বুকে ছুরি বসিয়ে বিভক্ত করেছে। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রতি বেইমানী করেছে, সেই বেইমানীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন চালাচ্ছে না নিজের খেয়াল-খুশি মত তারা কাজ করছে, সেটা জানবার বিষয়। যদি নির্দেশ না নিয়ে তারা এই আন্দোলন চালাচ্ছে তবে তাদের কাছে কৈফিয়ৎ করা হোক, কেন তারা বেইমানীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে।"

—গ্রামের কথা (দুবরাজপুর)

খাদ্যসঙ্কট

"কয়েক বৎসরের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে এদেশে অজন্মা বা শস্যহানি স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে অথচ খাদ্য-সঙ্কটের স্থায়ী প্রতিকার পাওয়া যাইতেছে না এবং যাঁহারা উৎপাদক তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছেন। জমির মালিক আজ রাষ্ট্র বা সরকার। সরকার যেমন তাঁহার অধীনস্থ চাকুরিয়াদের মাহিনা ছাড়াও ভবিষ্যতের আপদ বিপদের জন্ম প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন অনুরূপভাবে খাদ্য বা খাদ্য উৎপাদকদের জন্যও প্রতি গ্রামে প্রভিডেণ্ট গোলা বা সঙ্কটত্রাণ গোলা স্থাপন করত উৎপাদকদিগকে আপদ বিপদে রক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। প্রতি গ্রামে উৎপাদকদের জন্ম প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডস্বরূপ স্থায়ী ধর্ম্ম বা সর্বোদয় গোলা বা সঙ্কটত্রাণ গোলা স্থাপিত হইলে শুধু উৎপাদকেরাই খাদ্যসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে না, তদ্দ্বারা পল্লীর অন্যান্যেরাও খাদ্যসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে।"

—প্রলাপ (মেদিনীপুর)

জানিতে চাহি

"পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ম হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানে স্থানে গ্রাম্য মাতব্বরগণ এখনও তাহাদের পূর্ব্ব-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া হরিজনদের উপর নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও সরকারী কর্মচারিগণের অসহায়তার ফলে অজ্ঞ হরিজন ভোটারগণের ভোট লইয়া নানারূপ কারসাজি করা হইয়াছে। রাজনৈতিক দলের খপ্পরে পড়িয়া দলীয় প্রচারে সাহায্য করা হইয়াছে ও পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। গুস্করা, খণ্ডগ্রাম ও ভাতাড় থানার নারায়ণপুর হইতে এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ অযোগ্য অসাধু সরকারী কর্ম্মচারী সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহাই আমরা জানিতে চাই।"

—বর্দ্ধমান।

সত্যের অপলাপ

"বকরি ঈদ ১৮ই জুন বৃহস্পতিবার। এই ঈদ উপলক্ষে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন পড়িবে যদি কোন দোকানী ইচ্ছা করেন তিনি ঐ দিন খুলিয়া ঈদের সওদা সাধারণে সরবরাহ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে বর্ত্তমান বৎসরের ঈদের বিরতি লইতে মুসলিম হইতে বহু হিন্দু দোকানীরা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। আবার কলিকাতায় বহুসংখ্যক দোকানীরা ঈদের বিরতির নাম করিয়া "জামাইষষ্ঠীর" মরশুমের এক দফা কেনাবেচা করিয়া লইয়াছেন। ঈদের প্রতি শ্রদ্ধার দোহাই দিয়া জামাইষষ্ঠীর জন্য ছুটির দিনে দোকান খুলিয়া সাধারণের গাঁটের পয়সা শোষণ করিয়া লইবার দোকানীদের এই ফন্দি একেবারে নূতন! দোকান আইনের নিয়মাবলীর বিধানে জামাইষষ্ঠীর জন্য কোন বিরতি নাই। কাজেই বকরি ঈদের দোহাই দিয়া জামাইষষ্ঠীর বিরতি লইয়া দোকান খুলিয়া কেনাবেচা করা কত অশোভন বা সত্যের অপলাপ সাধিত হইয়াছে, ইহা যাঁরা এই কাণ্ড করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে সকলেই জানেন যে ঈদের নাম করিয়া জনসাধারণ ও শ্রমিক ঠকাইবার কিরূপ অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করিয়া সাধারণের চোখে ধূলা দিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যাঁরা ঈদের নামে জামাইষষ্ঠী করিয়াছে তাঁরা ঈদের পূর্ব্বদিন বা ঈদের দিনে দোকান খুলিবেন না। কারণ তারা সরকারী খতে লিখিয়া দিয়াছেন পরবর্ত্তী সপ্তাহে ছুটির সঙ্গে পূর্ব্বের কর্ত্তিত ছুটি অবশ্য কর্ম্মচারিগণকে দিবেন। যাঁহারা বিরতি লইয়া আসেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মালিক বিরতিতে অতিরিক্ত খাটুনির মজুরী বা ছুটি শ্রমিকগণকে দেন না। এবং ঐ সব আদায় করা যে বিধান আছে তাহা সম্পূর্ণ অচল ও মালিকের অনুকূল। এই অপকৌশল বন্ধ হওয়া সঙ্গত।"

—দোকান-শ্রমিক (কলিকাতা)।

পরীক্ষায় অপূরণীয় অপচয়

"গতবার আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৫১জন পাস হইয়াছিল। এবার শতকরা ৬২জনকে ফেল করান হইয়াছে। পাশাপাশি আই-এস-সি পরীক্ষার হার কিন্তু ৫১জন। কে ইহার রহস্য ভেদ করিবে? ছেলেরা না পড়িলেও পাস করাইতে হইবে, এমন কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু দুই বৎসর কাল খরচ বহনের পর এই শোচনীয় ফলের জন্ম কৈফিয়ৎ দাবী সকলেই করিতে পারেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের পাসের যোগ্য বলিয়া যে সব প্রফেসার সুপারিশ করেন, এবং যে সব প্রিন্সিপাল টেষ্ট পরীক্ষান্তে ইহাদের উপযুক্ত বলিয়া ছাড়পত্র দেন, তাহাদের শতকরা ৬২জন ফেল হয় কেমন করিয়া? একথার কোনই জবাব নাই। ফাইন্যাল পরীক্ষায় তো কলেজের এই সব প্রফেসার ও প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়েরাই খাতা দেখেন। টেষ্টে তাঁহারা যাহাদের উপযুক্ত সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, দু'-এক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রম হইতে পারে, কিন্তু শতকরা ৬২জন সম্বন্ধেই বা তাঁহাদের মারাত্মক ভুল হইয়াছিল কি করিয়া? আর যদি তাঁহারা টেষ্টে অনুপযুক্তই ঠাওরাইয়া থাকেন, তবে তো না পাঠাইলেই অভিভাবকদের আর সমধিক অর্থদণ্ড হইত না? আজ যদি কর্ত্তৃপক্ষের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম দেখাইবারই ইঙ্গিত থাকে, তবে তো পরীক্ষার্থী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই কতক আটকানো উচিত। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়েরও দুর্নাম বন্ধ হয়, অভিভাবকদেরও অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া চারুকলা বিভাগের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হওয়া কি ঠিক? পেটের ভাতের জন্ম বিজ্ঞানের চাহিদা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু জাতির মর্য্যাদার জন্ম সাহিত্য ও

সংস্কৃতির দিকটা উপেক্ষা করা যায় না। তা'ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী সংস্থা যত দিন না বাড়িতেছে, তত দিন এদিকে উপেক্ষা বুদ্ধি খুঁই ক্ষতিকর নহে কি? সমাজ আজ অন্নাভাবে মুমূর্ষু। অভিভাবকেরা অতিকষ্টে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ জোগাইতেছেন।"

—পল্লীবাসী (কালনা)

সেটেলমেণ্ট

"কৃষিপ্রধান অঞ্চল আমাদের এই মহকুমায় জমিজমার মালিকানা স্বত্বাস্বত্ব সাধারণের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, জীবন-মরণ সমস্যা পর্য্যায়ভুক্ত বলিলেও চলে। এ-হেন বিভাগের কার্য্যকলাপ আগস্ত হইতে যেন এক ভীষণ অবন্দোবস্ত রাজত্বের কাণ্ড কারখানার মতই চলিতেছে। এরকম মানুষ এতদ্দেশে বোধ হয় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে এই ত্রিতাপদগ্ধ সংসারে সেটেলমেণ্টের খর তাপে তাপিত হইয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ করেন নাই। মাঠের কার্য্যারম্ভ হইতে ধারার পর ধারার কার্য্যক্রমে অতিক্রম করিতে করিতে এখন ৪৪ ধারা ও ৪৪১ ধারায় ও ৪৪২ ধারার বিচার ব্যাপার এমনভাবে হইতেছে যে জনসাধারণ উহাকে অশ্রুধারার মতই মনে করিতেছে। বিশেষ ঐ ধারার বিচার কালের নোটিশ জারি ও নকল পাওয়ার ব্যাপার নাকি অসহনীয় অবস্থার উদ্রেককর। প্রকাশ, নকল পাইতে ২।১ মাস বা ততোধিক সময়ও প্রায় লাগিয়া যায়। আর সে নকল যদি জেলায় হয়ত ২।৩ মাস বা ততোধিক সময়ও যায়। জরুরি ফি দিয়া ও তদ্বিরে মাসাধিক সময়ের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা হয়। সাধারণের ধারণা যদৃচ্ছামত অনর্থক অর্থব্যয় জন্য, রামের জমি শ্যামের নামে বা কমবেশী করা হইয়াছে এবং পিতা-পুত্রের পদবী ভুল লেখা হইয়াছে, ইত্যাকার কার্য্যাদিও যাহা অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করা যাইতে পারে তাহার জন্যও পক্ষ সাধারণকে প্রায় ইচ্ছাকৃত ভাবে একাধিক বার হায়রাণ হইতে বাধ্য করা হয় যে তাহা সহ্যাতীত-প্রায়। এমনি ঘটনার অভিযোগ আছে যে, প্রথমে বা সরজমিনে যে নাম বা যাহা লেখা হইয়াছিল তাহার রদবদল হইয়াছে বা খাতার পাতাটাই বদল হইয়া গিয়াছে কোন অজ্ঞাত ব্যবস্থার হস্তস্পর্শে। সর্ব্বোপরি আছে পুকুর চুরির মত কথা। কাঁথি অফিস হইতে গোটা দুই হাতে লেখা রেকর্ড ভলিউম উধাওর কথা, যাহা লোকে বিশ্বাসই করিতে চায় না, প্রকাশ তাহা সত্যই হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে এই বিভাগে কি দুর্নীতির ব্যাপার চলিতেছে ও কত দুর্নীতিপরায়ণ লোক ইহার মধ্যে রহিয়াছে! সেইজন্য মনে হয়, বিভাগের কর্ম্মচারীরা অধিকাংশই কি নিজেদের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন?" —নারায়ণ (কাঁথি)

পাঠ্যপুস্তক ও ব্যবসা

"এ বৎসর এত বেশী সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়াছে যে উহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের হরেক রকম বই দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। নূতন পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের ধাক্কা অভিভাবকগণকে বিব্রত করিয়াছে। কোন কোন স্কুলের পড়ায় দেখা যায়, একখানি বইর হয়ত আংশিক পড়া হইয়াছে বা বইটির পড়ায় অনেক অসমাপ্ত রহিয়াছে নূতন সেসনে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ উহা পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নূতন বই চালু করিতেছেন। ইহাতে অভিভাবকবৃন্দের মনে একটা বিতৃষ্ণা ভাব জাগিতেছে এবং ছেলে-মেয়েদের পুস্তক সংগ্রহ যেন সমস্যারূপেই দেখা দিয়াছে। দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর পুস্তকলেখকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। পুস্তক প্রকাশকগণ স্কুলে স্কুলে ক্যানভাসার পাঠাইয়া বইগুলি যত বেশী তদ্বির করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের বইগুলিও সেই মত মনোনীত হইয়াছে দেখা যায়। বই মনোনয়ন লইয়া যেন একটি ব্যবসা চলিতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও যেন উহার প্রসারলাভ ঘটিতেছে। কিছু সংখ্যক শিক্ষক নাকি এ বৎসর প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় দ্বারা ব্যবসায়ী নীতি অনুসরণ করিয়াছেন জানা যায়। ইহাতে শিক্ষার পরিবর্ত্তে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জনের পথই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।"

—নীহার (কাঁথি)।

শোক-সংবাদ

প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী

বাঙলার বর্ষীয়ান শিল্পপতি প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ব্যবসায়ী হিসাবে ক্ষুদ্র পরিসরে জীবন শুরু করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অক্লান্ত সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীকালে ইনি শ'ওয়ালেস প্রমুখ একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টারের আসন গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন ও ভারতের একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিল্পপতি হিসেবে বহুজনের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। সমাজোন্নয়নে এঁর দান কম ছিল না, বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এঁর দানে পুষ্ট হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা ছিলেন।

নির্মলাবালা ঘোষ

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় পরিমলকান্তি ঘোষের সহধর্মিণী এবং বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের জননী নির্মলাবালা ঘোষ মহাশয়া গত ২২-এ জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। ইনি অতিশয় ধর্মপ্রাণা ছিলেন, অপরের দুঃখ-কষ্ট এঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করত, সমাজোন্নয়নেও জনহিতকর মহৎ প্রচেষ্টায় প্রতি এঁর সহানুভূতি ও আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। শোভাবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত চৈত্র সংখ্যায় (১৩৬৫) শ্রীমতী আশা রায়ের "বৌদ্ধ পঞ্চশীল" নিবন্ধটি সুলিখিত। তবে কয়েকটি বিষয় আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি। আধুনিক Political মার্কা 'Panch Sila' নয়—বৌদ্ধশাস্ত্রে দশটি শীলের উল্লেখ আছে। পালনীয়—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। বর্জনীয়—সুরাপান, অপরাহ্ণ ভোজন, নৃত্য-গীত, উচ্চাসন গ্রহণ এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ধারণ। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের ভিতরই এই দশ বনাম পঞ্চশীল এমন কি আরও অধিক সংখ্যক শীলাচরণের বর্ণনা আছে। বুদ্ধ-জন্মের হাজার হাজার বছর আগে হিন্দু বনাম আর্যধর্মের শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছে। স্মৃতি-গ্রন্থ বলতে—গীতা, ভাগবত, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদিকে বুঝায়। এ সব গ্রন্থে অহিংসা থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধশাস্ত্রে যত শীলের উল্লেখ করা হয়েছে, এ ছাড়াও আরও বহু পালনীয় ও বর্জনীয় লৌকিক শীল-জ্ঞানের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। বস্তুত পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ ও বৌদ্ধ পালনীয় পঞ্চশীলের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অতএব শীলতত্ত্বের দিক থেকে উহা 'সর্বপ্রথম ভগবান বুদ্ধেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত' এরূপ উক্তি ঠিক নয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিতত্ত্ব একেবারে বর্জিত। আছে—"জীবের আত্যন্তিক দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য একমাত্র নির্বাণতত্ত্ব।" কেবলমাত্র 'শীল' সাধনাই 'অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, শান্তি, শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি আনয়ন' করতে সমর্থ হয়। শীল-সাধনা লৌকিক বা ব্যবহারিক সত্য সাধনার প্রতীক। পারমার্থিক সত্য সাধনার আশ্রয় যে শীলসাধক নয়—এ কথা শক্তিশালী বৌদ্ধ লামা-যোগীরাও (অবশ্য 'God-King' নয়) স্বীকার করবেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যোগাচার আছে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা নির্বাণ মুক্তির জন্য ধ্যান, প্রজ্ঞান, প্রণিধি, পরিমিতা ইত্যাদির অনুশীলন বা সাধনার প্রয়োজন স্বীকৃতিও আছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে রোহিতাশ্ব বগগে ও বিশুদ্ধ মার্গে এই সাধন প্রণালীর উল্লেখ আছে। অবশ্য সব সাধনই গুরুমুখী। পুঁথিগত নয়। বৌদ্ধধর্মেও এর ব্যতিক্রম নাই। মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রৌত মত—"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মকে জানাই সংসার নিবৃত্তির কারণ। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। 'হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ' কি করে বৌদ্ধধর্মে হল—এ দুর্বোধ্য। অধ্যাত্ম রাজ্যের তত্ত্ব অনন্ত। হিন্দুধর্ম যে সকল তত্ত্বলাভ করেছে তন্মধ্যে—ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বা আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক তত্ত্ব, অদ্বৈত ও দ্বৈততত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিতত্ত্বের স্থান বৌদ্ধধর্মে নেই। যদিও হিন্দু-শীল ও বৌদ্ধ-শীল একাকার হয়ে গিয়েছে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ঐ নির্বাণ মুক্তি ও হিন্দুধর্মের ব্রহ্মসাযুজ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সালোক্য মুক্তি এক জাতীয় নয়। নির্বাণের লক্ষ্য—জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি। হিন্দু চায়—বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি। 'আবৃতং জ্ঞানমেতেন···কামরূপেণ···দুষ্পূরেণানলেন চ।' গীতা, ৩।৩৯। বিষয় বাসনা জ্ঞানকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা পরা-জ্ঞানকে আবৃত করে রেখেছে। এই কাম বা কামনা বা বিষয়তৃষ্ণাকে জয় করতে পারলেই সমস্ত দুঃখের শান্তি হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নিবৃত্তির পরে আর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে দুঃখ-নিবৃত্তিই একমাত্র চরম তত্ত্ব নয়। দুঃখ নিবৃত্তির অতীত হয়েও হিন্দু চায় সুখ। অবশ্য উহা এই জগতের Materialistic 'সুখ' নয়, উহা "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদম্"—সুখ তথা ভগবৎপ্রেম-বাসনা সুখ। অতএব 'পরিপূর্ণ বিকাশ' বা 'Fulfilment of Hinduism' শুধু মাত্র ভাব প্রবণ উচ্ছ্বাস বা কৈতববাদ ছাড়া আর কী হতে পারে? হিন্দুধর্ম একটি Democratic ধর্ম। মহাদেশের মত এটিও একটি মহাধর্ম। অন্য সব শুধু ধর্ম। ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ বা creed নিয়ে হিন্দুধর্ম তথাকথিত Religion নয়। এ ধর্মের ব্যাপ্তি ও প্রসার কল্পনাতীত। এ ধর্মে আছে স্বাধীন চিন্তাবাদ ও যুক্তিবাদ। আছে—আস্তিক্যবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, সবিশেষ ব্রহ্মবাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদ, চার্বাকীয় নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্ম বিশাল হিন্দুধর্মের একটি অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে—অবশ্য কারণটা Political. পরিশেষে, 'মানবের জীবন-মরণ সুখদুঃখের দুর্জ্ঞেয় হেতু পরম্পরায় জটিল সমস্যার সকল সমাধান যদি কোথাও হইয়া থাকে, তাহা ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গেই হইয়াছে।' এ উক্তি অতি উচ্চ-প্রশস্তি বাচক—সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু দর্শনের কষ্টিপাথরে এই অত্যুক্তির স্বর্ণ-মেখলা থেকে বহু অসঙ্গতির খাদ নির্গলিত হবে। অতএব লেখিকা বেদান্তদর্শন, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পাতঞ্জল দর্শন এবং মহাভারতের অন্তত শান্তিপর্বটা পাঠ করুন; তবে বিচারসহ প্রকৃত 'মার্গ' উপলব্ধি করতে পারবেন।

—হেম সমাজদার, মহাজাতিনগর কলোনি, কলিকাতা—২৮।

জানতে চাই

আপনার কাছে বিনীত নিবেদন এই যে,—(১) আপনার সম্পাদিত "মাসিক বসুমতী" বেশ ভাল মাসিক পত্রিকা। আমি বইখানি এইখানে শ্রীপার্বতীশঙ্কর রায়ের নিকট হইতে লইয়া পড়ি। ইহাতে শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর লিখিত "আনন্দ-বৃন্দাবন"এর বাংলা অনুবাদ পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইয়া থাকি। শুনিলাম, পুস্তকাকারে

ঐগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। (২) বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত যাবতীয় ভক্তিমূলক গ্রন্থের একখানি Catalogue দয়া করিয়া আমার নিকট পাঠাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমি কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ যথা—বাংলা পদ্যে শ্রীমদভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তমাল, নীলাচলে শ্রীমৎ চৈতন্যদেব ইত্যাদি বৈষ্ণব সাহিত্য ও শ্রীগৌ শ্রীকৃষ্ণ পদাবলী সাহিত্য যাহা আপনারা ছাপাইয়াছেন তাহা আমাদের রাজবাড়ীর লাইব্রেরীর জন্য কিনিবার ইচ্ছা পোষণ করি। আমাদের Superintendent, Jambari Estate (Sri Jagannath Dhabal Deb)-এর নামে আমাদের এষ্টেট হইতে "দৈনিক বসুমতী" নিয়মিত ভাবে লওয়া হয়। (৩) একটি কবিতা, আমার স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—উষার বর্ণনা ১ম লাইন "প্রভ্রষ্টদ্যুতিতারকা স্ফুটহটী···উষা করোতু·ন্নতিম্ (বা মঙ্গলম) উষা যাত্রার সময় উহার প্রয়োজন হয়। আপনাদের শর্মাচার্য্য মহোদয় অবশ্য জানেন, মনে করি। আর একটি কবিতা "হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতনুঃ। ইতি যস্য মতিঃ পরমার্থগতিঃ স নরো ভবসাগর-মুত্তরতি।" এই শ্লোকটি কোনখানে আছে দয়া করিয়া সন্ধান দিলে বাধিত হইব। আপনার মাসিক বসুমতী একাধারে বহু বিষয়-সমন্বিত, বাল বৃদ্ধ-মহিলা সকলেরই উপযোগী খাদ্য উহাতে সন্নিবেশিত। বর্ত্তমানে উহা যে অতুলনীয় তাহা অনস্বীকার্য্য —প্রণত—শ্রীহৃষীকেশ পাল। (M. A. B. T. Guardian Teacher to the Raj Estate for past 3 decades)

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, ছেলেবেলা থেকেই আমি 'মাসিক বসুমতীর' নিয়মিত পাঠক। প্রতি মাসেই বসুমতীর জন্য উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করি শুধু আমি নয়, বাড়ীর অনেকেই। কিন্তু এক বছরের উপর রোগশয্যায় বসুমতীর জন্য ব্যগ্রতা যেন আরো বেড়ে গেছে। দিলীপকুমার রায়ের 'ভাবি এক, হয় আর,' সুলেখা দাশগুপ্তের 'বর্ণালী,' নীলিমা দাশগুপ্তের 'ইন্দ্রাণীর প্রেম, সুখপাঠ্য। বাণি দেবীর 'বাস্তিঘর' কি আর বের হবে না? হিমানীশ গোস্বামীর 'লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়' অনেক বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। দিনগুলি মোর কোথায় গেল! সাধনা বসুর 'স্মৃতির টুকরো' মনটাকে দূরের অতীতে টেনে নিয়ে যায়, আনন্দের সংগে বিষাদের সংমিশ্রণে মন এক অদ্ভুত অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে—এ যেন sweetest song telling of saddest thoughts. আমার এ রোগশয্যার সহচর আমার মত আরো অনেকের প্রাণে আনন্দের উৎস হয়ে উঠুক। —জীতেন চক্রবর্ত্তী, ওয়ার্ড বি—১, কাঁচড়াপাড়া টি, বি, হাসপাতাল, নদীয়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am now sending Rs. 15/- towards next one year's subscription and have to request you to kindly continue sending me copies of Monthly Basumati from the month of Baisakh.—Mrs. Kamala Ganguly, Balajinagar, Madras.

Please accept my half yearly subscription of M. Basumati—Mrs. Suprova Chowdhury M. A. D, Litt.—Delhi

I am remitting herewith the subscription of Monthly Basumati for the year 1366, kindly arrange to send the magazine.—Arati Rani Sinha—Allapalli P. O. Dist. Chanda.

বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠালাম। বিলম্বের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন—শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, জব্বলপুর।

Sending Rs. 7/8/- by M. O. as six monthly subscription from Baisakh. Please continue Masik Basumati—Mrs. Kanak Maitra, M.A.—Kanpur.

Remitting Rs. 15/- only towards yearly subscription for the Monthly Basumati for the year 1366 B. S.—Hena De, Berhampore, Murshidabad.

বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাসের বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Gouri Gupta, Dhanbad.

Reading Basumati reminds me of my childhood days in Bengal. Kindly renew subscription for another year.—Mahasveta Dutta, Sholapur (Bombay State).

বিশেষ কারণবশতঃ টাকা পাঠাইতে দেরী হইল। সেজন্য ক্ষমা করিবেন।—Bina Dutta, Ahmedabad.

আপনাদের সহিত সুদীর্ঘ কালের সম্পর্ক আরও ৬ মাস বাড়াইতেছি—মাধবী ঘোষ, কলিকাতা।

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। বৈশাখ থেকে পাঠাবেন—শ্রীমত্যা লতিকা বিশ্বাস, নৈহাটী মিত্রপাড়া।

বৈশাখ মাস হইতে এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—অপর্ণা ত্রিবেদী, Churchgate, Bombay.

নতুন বৎসরের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭॥০ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী অপর্ণা সান্যাল, হাজারিবাগ।

বৈশাখ ১৩৬৬ হইতে ১ বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—মায়া দাশগুপ্ত, Assam.

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের অগ্রিম মূল্য ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীসাবিত্রী বাজপেয়ী, মুর্শিদাবাদ।

Remitting half-yearly subscription of my monthly Basumati from Baisakh to Aswin.—Nilima Bose—Thanjhora Tea Estate.

Kindly continue to send Masik Basumati for a further period of one year.—Mrs. Lilabati Mukherjee.—Kanpore.

Sending herewith Rs. 7·50 N.P. as subscription for the monthly Basumati for six months from Baisakh to Aswin—Sm. Alo Sen Gupta. B. A.—Bombay.

অত্র বার্ষিক দেয় ১৫৲ পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে সংখ্যাগুলি সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।—Sm. Lakshmi Rani Devi, Midnapore.

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। মায়ের তক্তপোষের পাশে নীচে মাদুর পাতা হয়েছে। মা শোবার উদ্যোগ করছেন। আমি যেতেই বললেন, "এস, এস, আমার কাছে এসে বস। একে একটু মিষ্টি দিয়ে জল খেতে দাও ত সরলা, সারা দিন খেটে আবার এই ছুটে আসছে।" আমি জল খেতে আপত্তি করলুম, কিন্তু তা কানেও তুললেন না; বললেন "দেহের প্রতি একটু নজর রাখতে হয় মা, সুমতি তিন ছেলের মা হয়েই যেন বুড়ী হয়ে গেছে।" মা তাঁর আমবাতের কথা তুলে বললেন, "এ কি হল মা, লোকের হয় যায়, আমার যেটি হবে সেটি আর ছাড়তে চায় না। ঠাকুর 'ব বলতেন 'যত লোকে রোগ, শোক, পাপ, তাপ নিয়ে কত কি করে এসে ছোঁয় সেই সব এই দেহে আশ্রয় করে,' তাই ঠিক মা—আমারও বোধ হয় তাই হবে। ঠাকুরের তখন অসুখ, কে সব ভক্তেরা (দক্ষিণেশ্বরে) মায়ের (কালীর) ওখানে পূজো দেবে বলে জিনিষপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কাশীপুরে জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দেখেছ, কি অন্যায় করলে? জগদম্বার জন্যে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে।' আমি ত ভয়ে মরি, ভাবি—এই ত অসুখ, কি জানি কি হবে। এ কি বাপু, কেন ওরা এমন করলে! ঠাকুরও তখন বার বার তাই বলতে লাগলেন। কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে বললেন, 'দেখ—এর পর ঘর ঘর আমার পূজো হবে। পরে দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোন চিন্তা কোরো না।' সেই দিনই 'আমার' বলতে শুনলুম। কখনও 'আমার' বলতেন না। বলতেন 'এই খোলটার,' বা আপনার শরীর দেখিয়ে 'এই এর।' সংসারে কত রকমের লোক সব দেখলুম। ত্রৈলোক্য আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহ রাখার পর (দক্ষিণেশ্বরের) দীনু খাজাঞ্চী ও অন্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। আত্মীয় যারা ছিল তারাও মানুষ-বুদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। নরেনও কত বলেছিল, 'মায়ের ও টাকাটা বন্ধ কোরো না।' তবু করলে। তা দেখ, ঠাকুরের ইচ্ছায় অমন কত সাত গণ্ডা এল, গেল। দীনু ফীনু সব কে কোথায় গেছে। আমার ত এ পর্যন্ত কোন কষ্টই হয় নি। কেনই বা হবে? ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না।"

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

রাষ্ট্রভাষা বিজ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি

শ্রীপুলিনবিহারী বসু

ভারতীয় ভাষাসমস্যার মূলে প্রধানতঃ তিনটি প্রশ্ন (১) ভারতে কোনও জাতীয় ভাষা সম্ভব কিনা (২) সর্ব্বভারতের সংযোগ সাধনের জন্য এবং কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য কোন ভাষা গ্রহণীয় (৩) প্রাদেশিক শাসন ও শিক্ষা কোন্ ভাষায় হইবে?

জাতি হিসাবে ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব কোনও দিন ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। হয়ত একটা জাতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে। সাফল্যের আশা কতটুকু বা গৃহীত ব্যবস্থা আমাদিগকে সত্যই কোন পথে লইয়া যাইতেছে সে আলোচনা বর্ত্তমানে না করিলেও ভাষা আন্দোলনে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। কারণ, ভাষাগত ঐক্য সাধন শাসক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গৃহীত উপায়গুলির মধ্যে একটি।

যাঁহারা এক ভারতের স্বপ্নে বিভোর তাঁহারাও এই অবিসংবাদিত সত্য স্বীকার করিবেন যে, ভারতে বিভিন্ন জাতি বাস করে। ভারতীয় মহাজাতি বিভিন্ন জাতির সমষ্টি মাত্র। এই সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক একটা ঐক্যের ভাব থাকিলেও পার্থক্যের অভাব নাই। ধর্ম্মাচরণে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে এমন কি জীবন যাপন প্রণালী ও আদর্শে এই পার্থক্য স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। এই সব পার্থক্যের মধ্যে ভাষা একটি। ভারতে একটি জাতীয় ভাষা প্রচলিত হইলে এই সব ভাষার পরিণতি হয় অবলুপ্তি না কথিত ভাষারূপে অবস্থিতি। আইনের বলে ইহা কি সম্ভব হইবে? এই সমস্ত ভাষাই বহু পূর্ব্বে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই ভারতে বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি তাহাদের আছে।

ভাষাগত ও অন্যান্য পার্থক্য একদিনের সৃষ্টি নয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তি স্থানীয় প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য, বহির্দেশ হইতে আগত নূতন নূতন জাতির সহিত সংমিশ্রণ ইত্যাদি নানা কারণে এই পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই বলেন যে, সংস্কৃত আমাদের আদিভাষা। যখন সেই এক আদিভাষা হইতে এতগুলি বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে তখন ইহা মনে করিলে অস্বাভাবিক হইবে না যে, আজ যদি সর্ব্বভারতের জন্য একটি ভাষা গৃহীত হয় তাহাও কালক্রমে বিকৃত হইতে হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইবে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানও এই পার্থক্যের জন্য অনেকটা দায়ী। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বহু অবাঙ্গালী এই বাঙ্গালাদেশে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়াও এই দেশের নামটা ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না এবং বাঙ্গালীরাও বহু হিন্দী কথা হিন্দীভাষীদের মত বলিতে পারেন না। অহম্ থেকে হাম্, হামি, আমি ইচ্ছাকৃত নয়, বৈশিষ্ট্যের ফল। অতীতে যেমন এক ভাষা হইতে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহারই পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত। আজ যদি বাহুবলে এক ভারতীয় জাতি ও এক ভাষার সৃষ্টি হয় কাল সেই একত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ! যাহার স্থায়িত্ব সন্দেহের বিষয় তাহা গড়ার চেষ্টা নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র।

আশার চশমা চোখে পরিয়া ভবিষ্যতের দিকে না তাকাইয়া নগ্নচক্ষু বর্ত্তমানের উপর নিবদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ। আশার চশমা পরিয়া দেখিলাম, দেশ ভাগ করিলে হিন্দু-মুসলমানের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে আর চারিদিকে বিরাজ করিবে চিরশান্তি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই দ্বন্দ্ব হাঙ্গামা হইতে যুদ্ধের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে আর শান্তির মাধুর্য্যে মানুষ হারাইতেছে মনুষ্যত্ব, নারী হারাইতেছে নারীত্ব; চতুর্দ্দিকেই উৎপাটিত ছিন্নমূল মানুষ—যাহাদের পক্ষে জীবন ধারণ হইয়াছে গ্লানি ও অপমানকর। দশ বৎসরের স্বাধীনতা ভারতবাসীকে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা বর্ত্তমানের ভাষায় আঞ্চলিকতা হইতে কতটা মুক্ত করিয়াছে এবং জাতীয়তায় কতটা অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা নগ্নচক্ষু দিয়া দেখিলে এবং ভাব ও সংস্কার-বর্জ্জিত মন দিয়া বিচার করিলে এই কথাই বলিতে হয় যে, এক ভারতীয় জাতি আজও সুদূরের আশা ও কষ্টকল্পনার বিষয় এবং একজাতীয় ভাষা অসম্ভব।

কিন্তু জাতীয় ভাষার অভাবে সর্ব্বভারতের জন্য একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। কারণ, এই ভাষা দ্বারা ভারতের বিভিন্ন জাতির সংযোগ সাধিত হইবে এবং ইহাই হইবে কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা। এই ভাষাটি এমন হওয়া চাই যাহা প্রদেশগুলি নিজ স্বার্থে ও প্রয়োজনে যতদূর সম্ভব অল্প আয়াসে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে।

ভাষা সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা সকলেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতেছেন যে, প্রাদেশিক শাসন ও শিক্ষা প্রদেশের মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শাসন ও শিক্ষা যে কারণে আপত্তিজনক, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শাসন ও শিক্ষা ঠিক সেই কারণেই আপত্তিজনক। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য সব ভাষাই বিদেশী। হিন্দীভাষীর পক্ষে ইংরাজী যেমন বিদেশী ভাষা, বাংলাও তেমনই বিদেশী ভাষা; মাদ্রাজীর পক্ষে ইংরাজী ও হিন্দী দুই বিদেশী ভাষা। হইতে পারে, একটা বিদেশী ভাষার সঙ্গে নিজ মাতৃভাষার সম্বন্ধ নিকটতর কিন্তু তাহার বৈদেশিকতা ক্রমে লোপ পায় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশভাষী বিভিন্ন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং সৃজনী শক্তি বিকাশের জন্য শাসন ও শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার যে অপরিহার্য্য এবং মাতৃভাষা ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে এইটুকু বলিতে চাই যে, মাতৃভাষায় শাসন ও শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা হইবে পরাধীনতার শৃঙ্খল। স্বেচ্ছায় কি কেহ এই অধিকার বর্জ্জন করিবে এবং পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হইবে?

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কোনটাও এত উন্নত নয় যে তাহার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্ভবপর। শিক্ষার খাতিরে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে বহুদিনের জন্য ইংরাজী বর্জ্জন অসম্ভব। অতি ঘোর ইংরাজী-বিদ্বেষীরাও বলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজী আবশ্যিক হওয়া উচিত। সুতরাং আপাতত শিক্ষার্থীকে দুইটি ভাষা শিখিতেই হইবে—মাতৃভাষা ও

ইংরাজী। কিন্তু ইংরাজীকে চিরকাল এই উন্নত স্থানে বসাইয়া রাখিলে চলিবে না। শাসনকার্য্যে ইংরাজীর ব্যবহার বন্ধ হইলে তাহার গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য হইবে যত শীঘ্র সম্ভব শাসনকার্য্যে মাতৃভাষার পূর্ণ প্রচলন এবং তদ্দ্বারা মাতৃভাষার উপর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধীরে ধীরে ইংরাজীর উচ্ছেদ।

ইংরাজীর আর একটি দিক আছে। ইহা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সহিত আদান-প্রদান সম্ভবপর এবং পৃথিবীর প্রকৃষ্টতম ভাষার কয়েকটির মধ্যে ইহা অন্যতম।

চীন জাপান প্রভৃতি দেশে যাহারা ইংরাজীভাষী নয়, তাহারা বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ সাধনের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করে। ইংরাজী ভাষার এই গুরুত্ব আমাদের উপর নির্ভর করে না; আমাদের শত বিদ্বেষে তাহার এই গুরুত্ব কমিবে না এবং গৌরবও ক্ষুন্ন হইবে না।

যখন দেখিতেছি যে, দুইটি ভাষা মাতৃভাষা ও ইংরাজী আমাদিগকে শিখিতেই হইবে এবং এই দুইটি দ্বারা যখন আমাদের সব উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখন কেন্দ্রীয় শাসন ও সর্ব্বভারতের জন্য আর একটি ভাষার প্রয়োজন কি ? অথবা আর একটি বোঝা লোকের মাথায় দিতে যাই কেন ?

হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষা করিবার ব্যগ্রতায় আমাদের রাজনৈতিকগণ অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে হিন্দী শিখিতে বাধ্য করিতেছেন। ফলে তাহাদের মস্তিষ্কের উপর কি কঠিন চাপ পড়িতেছে এবং প্রকৃত শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তিনটি ভাষা শিখিতে আমাদের যে শক্তি ও সময় নষ্ট হয় তাহা অন্য শিক্ষায় প্রয়োগ করিয়া তাহাদের এবং শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি বোধ হয় বেশী কাম্য।

এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, ভারত সরকার প্রদেশের শাসন ও শিক্ষায় প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারে সম্মত আছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য তাঁহারা হিন্দী ব্যবহার করিতে চান। সুতরাং আমাদের তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে। এখন প্রশ্ন—কেন্দ্রে হিন্দী বনাম ইংরাজী এবং কেন্দ্রীয় ভাষার ব্যবহারের সীমা নির্দ্ধারণ।

কেন্দ্রীয় ভাষা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হইবে যে, তাহার রাজনৈতিক গুরুত্ব জনসাধারণের মনকে যেন ভারাক্রান্ত করিয়া না তোলে। প্রদেশের শাসনকার্য্যে প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত হইলে জনগণ অনেকটা ভাষাগত স্বাধীনতা পাইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ও রাজনীতির ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যে, তাহাদের এই স্বাধীনতা যতটা সম্ভব ক্ষুন্ন না হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদিগকে যে কোনও ভারতীয় ভাষায় বক্তৃতা দিবার অধিকার দিতে হইবে, আইনসভার দায়িত্ব হইবে তাহার সঠিক অনুবাদ করা। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহিত পত্রাদি বিনিময় ও আলাপ-আলোচনা কেন্দ্রীয় ভাষায় করিবেন কিন্তু প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকারের ভাষায় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জনসাধারণের জন্য যাহা প্রচার করিতে হইবে তাহা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় দুই ভাষাতেই হওয়া চাই। ফেডারেল কোর্টে নিজ মাতৃভাষায় বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার সকলের থাকিবে। অর্থাৎ এইরূপ সুযোগ ও ব্যবস্থা সর্ব্বদাই রাখিতে হইবে—যাহাতে কেন্দ্রীয় ভাষা অনভিজ্ঞ লোকও কেন্দ্রীয় শাসন ও আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এক কথায় কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে ভাষার ব্যাপারে সর্ব্বদাই একটা নমনীয় ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দীকে কেন্দ্রীয় ভাষা করিলে এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন আরও বেশী। কারণ প্রাদেশিক ভাষায় শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে বহু অহিন্দীভাষীর হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

এইবার প্রশ্ন, হিন্দী কি ইংরাজী ? হিন্দীর পক্ষে যুক্তি এই (১) স্বাধীন ভারতে ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করাই উচিত (২) ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে হিন্দী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা এবং বহুলোকের বোধগম্য; সুতরাং হিন্দীই একমাত্র গ্রহণীয় ভাষা। এই যুক্তির প্রথমাংশ বিশ্লেষণ করিলে বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, স্বাধীন জাতি জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে, আমরা স্বাধীন কিন্তু আমাদের কোনও জাতীয় ভাষা নাই; সুতরাং আমরা একটি প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহার করিব। জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার সংমিশ্রণে এই যুক্তির উৎপত্তি। এই যুক্তি এক দলের প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দেয় অন্য দলকে জাতীয়তাকে বিসর্জ্জন দিতে বলে এবং দুই দলের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন বিরোধের সৃষ্টি করে। সেই বিরোধের আভাস পাইয়াও হিন্দী-সমর্থকগণ যুক্তির অসারতা স্বীকার করিতেছেন না, সর্ত্ত, সীমা ইত্যাদি আরোপ করিয়া তাঁহাদের পুরাতন সিদ্ধান্ত স্থির রাখিতে চান।

যুক্তির দ্বিতীয়াংশ হিন্দী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। দলীয় শাসনে সংখ্যা দ্বারা নীতি নির্দ্ধারিত হয় সত্য কিন্তু ধর্ম্ম, ভাষা, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে সে নিয়ম অচল। সেই জন্যই সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য রক্ষাকবচ। এই যুক্তি জাতীয় আধিপত্য বিস্তারের বা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের যুক্তি এবং ইহার মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা শক্তিই বেশী। যদি অহিন্দীভাষীরা স্বেচ্ছায় হিন্দী গ্রহণ করেন, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এক ভোটের পার্থক্যে হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ায় হিন্দীভাষীদের শক্তিরই পরিচয় পাই আমরা।

তারপর হিন্দী বহুলোকের বোধগম্য। কিন্তু এই বোধগম্যতা এক অতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাময়িক একটা প্রয়োজনের কথা কোনওরূপে বুঝিতে পারি বা বুঝাইতে পারি। কোনও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা দূরের কথা, সব সময়ে মনের ভাব প্রকাশ করিতেও পারি না। নগরবাসীর কতকাংশ সম্বন্ধে ইহা হয়তো প্রযোজ্য নয় কিন্তু সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে ইহার কোন ব্যতিক্রম আছে কি না সন্দেহ! হিন্দীর প্রকারভেদে আমাদের বোধগম্যতাও কম-বেশী হয়। যে হিন্দী আমরা বলি বা বুঝি তাহা আমাদেরই সৃষ্ট একটি কথিত ভাষা, যাহার সহিত প্রকৃত ভাষার সম্পর্ক খুবই কম।

মধ্যে মধ্যে হিন্দীর সমর্থনে কতকগুলি ব্যবহারিক সুবিধার কথা শুনি। সেগুলি যে কি, তাহা কোথাও স্পষ্ট শুনি নাই। ভাষা-কমিশনের রিপোর্টে হিন্দীভাষীদের সুবিধাগুলি বুঝিতে পারি কিন্তু অহিন্দীভাষীদের সুবিধা কি, তাহা বুঝিলাম না।

ভাষা হিসাবে হিন্দী ও ইংরাজীর তুলনা নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজী গ্রহণে আমাদের প্রধান আপত্তি, ইহা আমাদের জাতীয় ভাষা নহে।

দুই শত বৎসরের ইংরাজ শাসন ইংরাজীকে যে আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা করিয়াছে অন্ততঃ জাতীয় ভাষার ঠিক নিম্নেই যে তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইংরাজ-বিদ্বেষ আমাদের থাকিতে পারে কিন্তু ইংরাজী বিদ্বেষের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বহু বিষয়ে এই ভাষার অবদান অনস্বীকার্য্য।

ইংরাজী বনাম হিন্দী এই বিতর্কে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, একটির সমর্থন ভাবপ্রবণতায় অপরটির সমর্থন ব্যবহারিক সুবিধায়।

ঐক্যের জন্য অনেকে হিন্দী সমর্থন করেন। ঐক্য ভাষা বা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে না। সর্ব্বাত্মক ঐক্য মানুষে মানুষে হয় না, জাতিতে জাতিতেও হয় না। ঐক্যের উৎপত্তি উপলব্ধি ও অনুভূতি হইতে গড়িয়া উঠে এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া। ঐক্যের জন্য চাই এক দেশ, এই উপলব্ধি এক ভাষার কোনও প্রয়োজন নাই।

হিন্দী সমর্থকগণের নিকট আর একটি নিবেদন—হিন্দী রাষ্ট্রভাষায় উন্নীত হইয়া যে ঔদ্ধত্য, অসহিষ্ণুতা ও কোনও ক্ষেত্রে যে নীচতা দেখাইয়াছেন ভারতীয় ঐক্যের উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া, তাহা অন্ততঃ এখনও বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

সনাতন গোস্বামীর গৃহত্যাগ

উমাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

বান্দার বিশেষ অনুরোধ উজীর সাহেব, আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখুন—এই পদমর্য্যাদা, বিপুল ঐশ্বর্য্য এসব কি শুধু মাত্র একটা আদর্শের জন্য ছেড়ে যাওয়া উচিত?

আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাচ্ছি না কোতোয়াল সাহেব, সেদিন রামকেলি গ্রামে আমি আমার সব হারিয়ে ফেলেছি। সেই তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। এই যে দেখছেন দেহটা—এটাও তাঁর সম্পত্তি, এটাকে তাঁর চরণে ফেলে দিয়ে আমি ঋণমুক্ত হতে চাই।

মাফ করবেন উজীর সাহেব, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনি জানেন না—গৌড়েশ্বরের অমাত্যরূপে এঁর সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি অনেক কথাই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, সরস্বতীর মানসপুত্র কেশব কাশ্মীরীর শোচনীয় পরাজয়—শুনেছিলাম পরাজিত পণ্ডিতের অলৌকিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত। পরাজিত পণ্ডিত সাশ্রুনয়নে সরস্বতীর ধ্যান করে বলছেন—মা, শেষে তুই একটা বালকের দ্বারা আমায় পরাজিত করলি! সরস্বতী উত্তরে বললেন, ওরে, এই পরাজয়ই তোকে অমর করে রাখবে। দুঃখ করিস না, আমি নিজেই যে তাঁর কাছে নিত্য পরাজিতা, তুই আমার পুত্র আর তিনি—তিনি আমার স্বামী, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তখন বিশ্বাস করিনি। তারপর সেদিন রামকেলি গ্রামে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে ছদ্মবেশী আমাদের দু'ভাই-এর হাত দুটি ধরে যখন তিনি বললেন, ওরে তোরা যে আমার ব্রজের সাথী, কেমন করে ভুলে রয়েছিস? আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হতে অনুভব করলাম—আমি সম্পূর্ণ রিক্ত—নিঃস্ব। যাক, অনুগ্রহ করে আপনি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন কোতোয়াল সাহেব!

আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। নবাব যদি ঘুণাক্ষরেও এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন তবে আমার প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। আবার এ-ও আমি ভুলতে পারছি না উজীর সাহেব যে, আপনার নিকট আমি অনেক উপকৃত। আপনার অনুগ্রহে আমার এই পদোন্নতি। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আর আপনিও জানেন সাকর মল্লিক জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, আপনাকে আমি এমন উপায় বলে দেব যে সকলেই জানবে সাকর মল্লিক মৃত। এই নিরপরাধ বন্দীকে মুক্তি দিলে আপনার পুণ্যই হবে—তাছাড়া আমি অর্থ দিয়ে আমার মুক্তির মূল্য দেব। আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

নিভৃত কারাগারে, গভীর নিশীথে কথা হচ্ছিল এক বন্দীর সঙ্গে কারারক্ষী কোতোয়ালের। বন্দী হিন্দু, তাঁর সর্ব্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ, পোষাক-পরিচ্ছদও তদনুরূপ।

ধর্ম্ম ও অর্থ একসঙ্গে প্রাপ্তির সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না, তাই কোতোয়ালের পক্ষে এ লোভ সংবরণ করা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। সে একটু ভেবে উত্তর দিল—তাই ত! আমি ঠিক অর্থের কথা ভাবছি না—আমি ভাবছি আপনি আমার ভূতপূর্ব মনিব—যদি কোনরকমে আপনার একটু উপকার করতে পারি। বলুন কি উপায় আপনি স্থির করেছেন?

বন্দী চারি দিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, কাল সন্ধ্যায় আপনার লোক আমাকে গঙ্গার তীরে ছেড়ে দিয়ে এসে প্রচার করবে যে সান্ধ্যকৃত্য করতে যাবার সময় হস্ত-পদ-শৃঙ্খলিত বন্দী গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে—উদ্ধারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে বন্দী খরস্রোতে ভেসে গেছে। আমি নদী পার হয়ে বনপথে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করব। কেউ দেখবে না—কেউ জানবে না। আপনি শুধু এই পত্রখানা আমার ভৃত্য ঈশানকে দেবেন, তবেই সে আপনার হাতে নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

কোতোয়াল একটু হেসে উত্তর করল, টাকার লোভ আমার নেই মল্লিক সাহেব, তবে আপনি ত' জানেন, সাধারণ প্রহরীরা বড় গরীব তাই—।

বন্দী বুঝতে পারলেন যে ওষুধ ধরেছে, তাই তিনিও একটু হেসে বললেন, তা ত' নিশ্চয়ই—তাদের জন্য আমি আরও দু' হাজার টাকা দেব—আপনি আর দ্বিধা করবেন না।

কোতোয়াল এদিক-ওদিক চেয়ে ফিস-ফিস করে উত্তর দিল, তা আপনার অনুরোধ কেমন করে অবহেলা করি? তবে একথাই স্থির—কাল সন্ধ্যায়—

গৌড়েশ্বরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অমাত্য সাকর মল্লিক চলেছেন অজানার পথে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে। পরিধানে শতচ্ছিন্ন মলিন বসন, স্কন্ধে ততোধিক মলিন কন্থা আর সঙ্গে চলেছে পুরাতন ভৃত্য ঈশান। সে জানে না কোথায় চলেছে তার প্রভু, কোন মুরলীর মোহন তান তাঁকে এমন করে পাগল করেছে!

প্রভুর কষ্টে তার চোখে জল এলো। কয়েক দিন আগেও যাঁর একটি অঙ্গুলি হেলনে সারা গৌড়ে একটা ভূমিকম্প হয়ে যেত—স্বয়ং গৌড়েশ্বর ছিলেন যাঁর হাতের ক্রীড়নক—তিনি কি না চলেছেন দিনের পর দিন কণ্টকাকীর্ণ বনপথে, পদব্রজে—অনাহারে—অর্দ্ধাহারে! কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে যখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়েন, ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে আর টেনে নিয়ে যেতে পারেন না, তখন হয়ত কোন বটচ্ছায়ায় বসে পড়ে বলেন, ঈশান, বৃন্দাবন আর কতদূর? আর কি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—আমার ঋণ কি শোধ হবে না? ওগো প্রভু! তুমি আমায় শক্তি দাও। চোখ মুছতে মুছতে প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়ে ঈশান ভিক্ষায় চলে যায়।

মুহূর্ত্তের জন্যও সনাতন ভুলতে পারেন না যে তিনি পলাতক রাজবন্দী। ধরা পড়লে জীবনে আর তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে না। ঋণ শোধ হবে না, তাই তিনি সযত্নে বর্জ্জন করে চলেন রাজপথ আর জনবহুল লোকালয়। বেছে নেন শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য। কোন দিন ভিক্ষা জোটে—কোন দিন বা জোটে না।

এ ভাবে কয়েক দিন চলার পর তাঁরা পাতড়া (বঙ্গ-বিহার-সীমান্তে) পর্ব্বতের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন। স্থানটা অতি ভয়ঙ্কর এক ভূঞার জমিদারী। ধনরত্ন নিয়ে কোন পথিক এ পথে চলা-ফেরা করতে পারত না। সনাতন এ সংবাদ জানতেন কিন্তু তিনি নিরুপায়—প্রকাশ্য রাজপথে চলার উপায় নেই, তাছাড়া এখন তিনি কপর্দ্দকশূন্য ভিখারী ব্রাহ্মণ; তাই ভয়েরও বিশেষ কারণ নেই।

দু'দিন ভিক্ষা জোটেনি—শরীর অবসন্ন—আর চলতে পারেন না। ঈশান প্রভুকে এক গাছতলায় বসিয়ে চলে গেল ভিক্ষার সন্ধানে। আজ কিছু জোটাতেই হবে। এদিকে ভূঞা কোন রকমে জানতে পেরেছে যে তার জমিদারীতে এসেছে দু'জন নিরস্ত্র গৌড়ীয়—আর তাদের নিকটে আছে আটটি মোহর। শোণিতের লোভে শার্দ্দূলের মন যেমন নেচে উঠে তেমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠল ভূঞা। কোন ছলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আটকে রেখে রাত্রের অন্ধকারে কার্য্য শেষ করতে হবে।

মতলব স্থির করে সে সনাতনের কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল ও তার আতিথ্য গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাল। তার ইঙ্গিতে এলো নানারকম উপাদেয় আহার্য্য। সনাতন কিছুই গ্রহণ করলেন না, শুধু বললেন আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—এক মুষ্টি আতপ তণ্ডুলই আমার পক্ষে যথেষ্ট এবং তা-ও আমার ভৃত্য ভিক্ষা করে সংগ্রহ করেছে। আপনি যদি একান্তই আমায় অনুগ্রহ করতে চান তবে একজন লোক সঙ্গে দিয়ে পর্ব্বতটা পার করে দিন—আমি কৃতার্থ হব, দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করব।

ভূঞা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বলল, আপনারা স্নানাহার করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যায় আমার লোকেরা আপনাদের যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে, তখন ভূঞা সেখানে দু'জন প্রহরীকে রেখে প্রস্থান করল।

গৌড়েশ্বরের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য সনাতন—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কূট। তাঁর মনে সন্দেহের একটা কালো-ছায়া উঁকি মারতে লাগল—কেন এই অতিরিক্ত সৌজন্য, অসাধারণ ভক্তি! তিনি ঈশানকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশান, তোর সঙ্গে ধন-রত্ন কিছু আছে?

প্রভুর এই কণ্ঠস্বর ঈশানের পরিচিত—তাঁর চোখের এই অতলস্পর্শী দৃষ্টি বহু বার দেখবার সুযোগ তার হয়েছে! সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল প্রভু, যদি আপনার সেবায় প্রয়োজন হয় তাই সাতটা মোহর সঙ্গে এনেছি—আমার অপরাধ নেবেন না।

সনাতন তখন ধীরভাবে বললেন মূর্খ, এরই জন্য আজ আমাদের জীবন বিপন্ন। জানিস না অর্থই অনেক সময় অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়ায়, দে আমাকে। ঈশান তার উত্তরীয়ের প্রান্ত থেকে সাতটা মোহর বের করে প্রভুর চরণে রাখল।

কোন রকমে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাপন করে সনাতন সেই জমিদারের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ভাই, তোমার সৌজন্যে আমি পরম পরিতৃপ্ত হয়েছি—আশীর্ব্বাদ করি চৈতন্যে মতি হোক—এখন দয়া করে আমার সঞ্চিত এই সাতটা মোহর গ্রহণ করে আমাকে পর্ব্বত পার করে দাও। তাঁর বদন প্রশান্ত, ভাবে ভাষায় অভিযোগের কপটতার লেশমাত্র নেই—সরল, স্বচ্ছ নীল আকাশের মত।

সেই ভূঞা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল—সেখানে মিথ্যা বা ভীতির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না—শান্ত, সৌম্য, সুন্দর। তখন সে নতজানু হয়ে তাঁর পা দুখানি ধরে বলল, ঠাকুর তুমি কি মানুষ? আমি তোমার হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলাম আর তার বিনিময়ে তুমি করলে আমায় অযাচিত আশীর্ব্বাদ—আমার হাতে তুলে দিলে তোমার সারা জীবনের সঞ্চয়! বল ব্রাহ্মণ, এ শিক্ষা তুমি কোথায় পেয়েছ?

সনাতন তাকে আলিঙ্গন করে উত্তর দিলেন, ভাই! আছেন। আছেন—এ জগতে শুধু একজনই আছেন যিনি শিক্ষা দিতে পারেন।

কে তিনি ঠাকুর? তিনি কি তোমার চেয়েও মহৎ?

মহত্ত্ব আমি কোথায় পাব ভাই! তবু যদি বিন্দুমাত্রও আমার মধ্যে দেখে থাক তবে জেনো—এ তাঁরই অপার করুণার এক কণা। যাক ভাই! দয়া করে আমায় পর্ব্বতটা পার করে দাও।

আমি তোমায় পাতড়া পর্ব্বত পার করে দেব কিন্তু ব্রাহ্মণ, তার আগে আমায় প্রতিশ্রুতি দাও তুমি আমায় সংসারসাগর পার করে দেবে—আমি মহাপাপী।

ভয় কি ভাই—তিনি যে পাপীদের সব চেয়ে বড় আপনার জন—আর তাঁর তরণীতে সকলেরই সমান অধিকার। সময় হলে আমি তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

নিশাযোগে ভূঞার সাহায্যে পাতড়া পর্ব্বত পার হয়ে পরদিন

প্রভাতে সনাতন আবার ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে আর কোন ধনরত্ন অবশিষ্ট আছে কিনা।

ঈশান ভীত-কম্পিত ভাবে উত্তর দিল আছে—আর একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট আছে। আর সেটি সে রেখেছে একান্ত ভাবে প্রভুর সেবার জন্য—যদি কখনও তেমন সময় উপস্থিত হয়।

সনাতন একটু হেসে ঈশানকে আলিঙ্গন করে বললেন ঈশান, বন্ধু আমার! ভাই আমার! স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন আমার চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে—তোমার সেবারও আর প্রয়োজন হবে না। প্রার্থনা কর, আমিই যেন সকলের সেবা করতে পারি।

ঈশানের মুখে কোন কথা বেরুল না—সে' তার প্রভুর পায়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সনাতন তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ভাই, তুমি দীর্ঘ দিন আমার সেবা করেছ, প্রতিদানে আমি দিয়েছি শুধু কাচ—এবার ঘরে ফিরে গোবিন্দের সেবা কর, তিনি দেবেন তোমায় কাঞ্চন—আর সেই হবে তোমার পাথের।

ঈশান তার প্রভুকে ভালরকমই জানে, তাই আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ও কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু দিয়ে সে জানাল তার বিদায় সম্ভাষণ।

* * * *

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ। নির্জ্জন অন্ধকার বনপথে মাঝে মাঝে শুধু শোনা যায় বন্যপক্ষীর কর্কশ চিৎকার। এক সুঠাম সুবেশ যুবক দ্রুত অশ্বারোহণে এগিয়ে আসছিল। তার পোষাক পরিচ্ছদে প্রতীয়মান হয় যে, যুবক একজন হিন্দু—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো এক করুণ ক্রন্দন। সে ঘোড়া থামিয়ে ইতস্তত দেখতে লাগল—এই অন্ধকার রাত্রে শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন বনে কে কাঁদছে! তাড়াতাড়ি মশাল জ্বেলে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে সে দেখতে পেল—এক ধূলি-ধূসরিত ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত পথিক গাছতলায় পড়ে কাঁদছে আর বলছে ওগো প্রভু, আর বুঝি দেখা হ'ল না। ঋণ বুঝি আর শোধ করতে পারলাম না। উঃ, বৃন্দাবন আর কতদূর!

যুবক ধীরে ধীরে সেই অবসন্ন পথিকের কাঁধে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কার সন্ধানে চলেছ পথিক? কে তোমার মহাজন—কার কাছে তুমি ঋণী?

হঠাৎ সস্নেহ স্পর্শ পেয়ে, দরদভরা কণ্ঠস্বর শুনে সনাতন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, কে তুমি ভদ্র, আমার প্রভুর করুণাধারার মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ! আমাকে বাঁচাও—আমি আজ তিন দিন উপবাসী, এক মুষ্টি অন্ন আর রাত্রের মত একটু আশ্রয় আমায় ভিক্ষা দাও। আমাকে যে বাঁচতেই হবে—প্রভুর অনুমতি ব্যতীত মরবারও যে আমার অধিকার নেই।

যুবক সেই অবশ পথিকের একখানা হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল তার প্রাসাদে, তারপর নারায়ণ নির্ব্বিশেষে তাঁর সেবা করল।

পরদিন প্রভাতে যাত্রার পূর্ব্বে পথিক গেলেন সেই সহৃদয় যুবকের নিকট বিদায় নিতে—তাকে আশীর্ব্বাদ করতে। তার কক্ষে প্রবেশ করেই সনাতন চমকে উঠলেন। আনন্দে চিৎকার করে বললেন এ কি! কে তুমি? আমি কি ঠিক দেখেছি—তুমি, শ্রীকান্ত!

যুবকও ভাল করে লক্ষ্য করে পথিককে চিনতে পারল। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল একি দাদা তুমি! শেষে ভিখারীর বেশে তুমি আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছ? এ-ও কি তোমার পরীক্ষা নাকি? হলেও তুমি ত তা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ আর তা যদি হয়েই থাকি, তাও ত তোমার আশীর্ব্বাদেই দাদা! আমার বেশ মনে আছে, যেদিন তোমারই প্রদত্ত রাজকর্ম্ম নিয়ে বিদেশে যাত্রা করি সেদিন তুমি আমাদের স্বামিজীর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলে—শ্রীকান্ত, সব সময় মনে রেখো অতিথি নারায়ণ আর অতিথিসেবাই গৃহস্থের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। দাদা, অনেক দিন পরে তোমায় পেয়েছি আর ছেড়ে দেবো না—কিন্তু দাদা তোমার এ বেশ—এ চেহারা কেন?

শ্রীকান্ত ভাই—আমায় যে যেতেই হবে, আমার ব্রত ভঙ্গ করবার চেষ্টা করো না ভাই! আমি যে সব সময় আমার প্রভুর ডাক শুনতে পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি করুণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে বলছেন—রূপ, সনাতন! তোরা যে আমার ব্রজের সাথী—কেমন করে ভুলে রয়েছিস? ওরে আয়, আয় তোরা, না এলে যে আমার লীলা পূর্ণ হবে না—কাজ সারা হবে না।

যুবকের চোখে জল এলো—সে কম্পিত কণ্ঠে বলল দাদা, আমি তোমায় ধরে রাখব না কিন্তু কয়েক দিন এখানে থেকে সুস্থ হয়ে যাও।

ভাই, আমাকে আর মায়ায় বেঁধো না, তাছাড়া আমি পলাতক রাজবন্দী। আমাকে আশ্রয়দানের বিপদ নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই।

আবার পরীক্ষা দাদা? যেদিন এক সহায়-সম্বলহীন যুবক তোমার দ্বারে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিনও তাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলে—তারপর দিয়েছিলে তাকে আশাতীত পুরস্কার—সম্প্রদান করেছিলে তোমার প্রাণের পুত্তলি কনিষ্ঠা ভগিনীকে।

আমার নির্ব্বাচনে ভুল কিছুই হয়নি ভাই—আশীর্ব্বাদ করি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল হয়ে দীর্ঘজীবী হও। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও ভাই!

কিন্তু দাদা, পশ্চিমের এই প্রচণ্ড শীতে কেমন করে তোমার প্রভুর কাছে পৌছুবে? অনুমতি কর অন্তত একখানা শীতবস্ত্র তোমাকে দিই। আর কিছু না হোক ছোট ভাই-এর প্রণামী হিসাবে তা তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে। একথা বলেই শ্রীকান্ত কক্ষান্তর থেকে নিয়ে এলো একখানা বহুমূল্য ভোটকম্বল, তারপর সনাতনকে প্রণাম করল।

চৈতন্যে মতি হোক, বলে সনাতন তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন ও সুরু করলেন তাঁর যাত্রা। এ স্নেহের বন্ধন আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না।

শ্রীকান্ত সাশ্রুনয়নে তাঁর পথের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবল—কে সেই নররূপী নারায়ণ, যিনি গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্যকে করেছেন সর্ব্বহারা পথের ভিখারী—আকাশচুম্বী মহীরুহকে নিয়ে এসেছেন তৃণের চেয়েও নীচে—তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম!

বারাণসী—শঙ্করের মহিমামণ্ডিত, বরুণা অসি প্রক্ষালিত পুত তীর্থস্থান। দ্বিতীয় কৈলাস। এই বারাণসীতে এসে সনাতন লোকমুখে শুনলেন এক নবাগত অলৌকিক সন্ন্যাসীর কথা—যাঁর চম্পক বরণ ভেদ করে ফুটে উঠে নীলকান্ত মণির জ্যোতি, যিনি রূপে কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর, বিদ্যায় সরস্বতীর চেয়েও বড়, প্রেমে স্বয়ং শ্রীরাধা। সনাতনের বুঝতে দেরী হল না যে, ইনিই তাঁর হারানিধি—সেই প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর, দীনের ঠাকুর। কিন্তু এই বিশাল সহরে কোথায় তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন! তিনি নিজে দেখা না দিলে কে তাঁকে দেখতে পারে, নিজে ধরা না দিলে কে তাঁকে ধরতে পারে? তিনি দিন-রাত তাঁকে খুঁজে বেড়ান—কখনও বিশ্বনাথের মন্দিরে, কখনও অন্নপূর্ণার চত্বরে—কখনও বা জনাকীর্ণ রাজপথে কিন্তু কোথাও খুঁজেও পেলেন না তাঁর হারানিধিকে।

দিনের শেষে অবসন্ন সনাতন গাছতলায় শুয়ে শুয়ে ডাকেন—ওগো ঠাকুর, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—আমার সব চেষ্টা কি ব্যর্থ হবে? আমি যে অনেক দীনদুঃখীকে কথা দিয়ে এসেছি তোমাকে তাদের সামনে তুলে ধরব—তোমার মহামন্ত্র তাদের বিতরণ করব। ওগো, তারা ত জানে সাকর মল্লিক মিথ্যা কথা বলে না?

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন প্রভাতে তিনি চন্দ্রশেখরের বাড়ীর সামনে এক গাছতলায় বসে বসে ভাবছেন—ঠাকুর, ধরা যদি দেবে না তবে কেন দেখা দিয়েছিলে, কেন দিয়েছিলে দুটি বাহু—আর যদি দেখাই দেবে না তবে এ চোখ দুটি এখনও অন্ধ করে দাওনি কেন?

এমন সময় চন্দ্রশেখর সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে আবার ভিতরে চলে গেলেন। ভাগ্যবান পুরুষ চন্দ্রশেখর! যিনি চঞ্চল গোবিন্দকে অন্তত একদিনের জন্যও অচঞ্চল করতে পেরেছিলেন—স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁর গৃহে অন্তত কয়েক দিনের জন্যও অতিথি হয়ে অবস্থান করেছিলেন!

গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন, কই কোন বৈষ্ণবকে ত দেখতে পেলাম না প্রভু! মহাপ্রভু হতাশার সুরে উত্তর করলেন কেউ আসেনি—তবে আমার মন আজ এত চঞ্চল কেন? নিশ্চয়ই আসবে—আমার প্রিয় কেউ আসবে।

অল্পক্ষণ পরে আবার চন্দ্রশেখরকে আদেশ করলেন ভাল করে খুঁজে দেখতে। ব্যাকুল হয়ে বললেন নিশ্চয়ই কেউ এসেছে—আমায় ডাকছে—আমি যে আর থাকতে পারছি না—যাও, যাও।

চন্দ্রশেখর আবার ঘুরে এসে বললেন প্রভু, কোন বৈষ্ণব ত আসেন নি—তবে গাছতলায় একজন দরবেশ বসে আছেন। মহাপ্রভু একটু ইতস্তত করে সেই দরবেশকে ভিতরে আনতে অনুরোধ করলেন।

চন্দ্রশেখরের আমন্ত্রণে সনাতন ধীরে ধীরে অঙ্গনে প্রবেশ করলেন—তারপর ভিক্ষুকের সামনে উন্মুক্ত হল অফুরন্ত রত্নের ভাণ্ডার—যুগ-যুগান্তের তৃষিত চাতক পেল নব জলধরের সন্ধান। সনাতন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন মহাপ্রভুর শ্রীচরণে।

দীর্ঘ দিন পরে সনাতন ক্ষৌরকর্ম্ম করলেন—করলেন প্রাণভরে গঙ্গাস্নান। শুদ্ধ হল তাঁর মন—দেহে ফিরে এল নূতন শক্তি। চন্দ্রশেখর তাঁর জন্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন নূতন পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় কিন্তু তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে সেই সিক্ত বসনেই চললেন মহাপ্রভুর পশ্চাতে তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে।

তপন মিশ্র এই নবাগত অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন—নিয়ে এলেন নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয়। সনাতন তাঁকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন—মহাত্মন! যদি এই ভিক্ষুককে একান্তই বস্ত্র দানে বাসনা, তবে দেও তোমার নিজের পরিত্যক্ত একখান ছিন্ন বসন। তপন মিশ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন গোঁসাই! তুমিই পেয়েছ চৈতন্যের প্রকৃত করুণা।

বহুজনের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে সনাতন চলেছেন মাধুকরী করতে—পরিধানে শতছিন্ন মলিন বহির্ব্বাস—স্কন্ধে বহুমূল্য ভোটকম্বল। যাবার পূর্ব্বে তিনি মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলে আশীর্ব্বাদ করে একটু হাসলেন।

এই ইঙ্গিত ধরতে না পারলেও সনাতন বুঝলেন এ তাঁর সহজ সরল হাসি নয় কিন্তু বুঝতে পারলেন না কি তাঁর অপরাধ—কোথায় তাঁর ত্রুটি। এ ভাবে বিষণ্ণ চিত্তে গঙ্গায় মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করলেন। উঠে যাবার সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল বহুমূল্য ভোটকম্বলখানার প্রতি, তিনি শিউরে উঠলেন। নিজেকে শত শত ধিক্কার দিলেন—কেন এতদিন তাঁর খেয়াল হয়নি যে তাঁর অঙ্গে এখনও রয়েছে বিলাসিতার পঙ্কতিলক। ভিখারীর এই বিলাসিতা শুধু মাত্র অশোভন নয়—অপরাধ। সেই কম্বলখানা তখন তাঁর কাছে মনে হল উদ্যতফণা বিষধর কালসাপের মত। এবার তিনি বুঝতে পারলেন কেন মহাপ্রভু হেসেছিলেন। কিন্তু বিনা গাত্রবস্ত্রে বারাণসীর প্রচণ্ড শীতে কেমন করে দেহ ধারণ করবেন! তারপর মনে স্থির করলেন যে যদি শীতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দেহপাত হয় তথাপিও তিনি উহা আর স্পর্শ করবেন না।

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন আশার আলোক। অদূরে এক বৃদ্ধ গৌড়ীয় তার শতছিন্ন মলিন কন্থাখানি শুকোতে দিয়ে বসে আছে। তিনি ধীরে ধীরে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ভাই, আমার একটা উপকার করবে?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে উত্তর দিল বাবাঠাকুর, আমি নিজেই ভিখারী—এ পর্য্যন্ত কেউ ত আমার কাছে কোনো উপকার চায়নি? বল কি তোমার প্রার্থনা—যদি সম্ভব হয় নিশ্চয়ই করব।

তখন সনাতন আরও কাছে এসে ধীরে ধীরে তার হাত দুটি ধরে সকাতরে বললেন ভাই, আমার প্রার্থনা অতি সামান্য, দয়া করে আমার এই কম্বলখানা নিয়ে তোমার কাঁথাখানা আমায় দাও।

বৃদ্ধ এবার গম্ভীর হয়ে গেল—অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়ে তাঁকে বলল বাবাঠাকুর! আমি অতি দরিদ্র, মূর্খ আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি পণ্ডিত, অতি সম্ভ্রান্ত—আমি ত তোমার পরিহাসের যোগ্য নই?

সনাতন বৃদ্ধের কাঁধে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বললেন, আমায় বিশ্বাস কর আমি তোমায় পরিহাস করছি না। এই কম্বলটা আমার কাছে বিষধর সাপের মত মনে হচ্ছে, আমি আর এটা বহন

করতে পারছি না। তোমার পায়ে পড়ি, দয়া করে এটার বদলে তোমার কাঁথাখানা আমার দাও।

এবার তাঁর আন্তরিকতায় বৃদ্ধের আর কোন সন্দেহ রইল না। তাই সে বলল, তোমায় যা ইচ্ছা কিন্তু দেখো বাবাঠাকুর, পরে আবার চোর বলে ধরিয়ে দিয়ো না যেন।

সনাতন একটু হেসে জবাব দিলেন চোর! ভাই আমি যে নিজেই এক চোরের সন্ধানে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সুদূর গৌড়দেশ থেকে বারাণসী পর্য্যন্ত ছুটে এসেছি। তার দেখাও পেয়েছি কিন্তু ধরতে পারছি না।

তা দেখা যখন পেয়েছ—ধরা সে নিশ্চয়ই পড়বে।

না ভাই, তুমি জান না সে অতি পাকা চোর—আর শুধু এ জীবনে নয়। জন্মজন্মান্তর থেকে সে চুরি করে আসছে। কত নারীর, কত পুরুষের কত কি যে সে চুরি করেছে তা বলে শেষ করা যায় না।

তা হোক—তোমার এত চেষ্টা এত কষ্ট কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। সে যত বড় চোরই হোক না কেন, তোমার হাতে তাকে ধরা দিতেই হবে।

তোমার আশীর্ব্বাদ ভাই, বলে সনাতন সেই কাঁথাখানা একবার মাথায় ঠেকালেন, তারপর বহুমূল্য রত্নের মত বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কবির ভাষায় বলতে গেলে 'দরিদ্র পাইল যেন ঘটভরা হেম'। তিনি মনে মনে বললেন—প্রিয় আমার, তুমি আমার শেষ বিষয়কণ্টক উৎপাটিত করেছ।

বৃদ্ধ সেই বহুমূল্য কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বেশ আরাম উপভোগ করল, তারপর বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বলল বাবা, তুমি নিজেও পাগল আর তোমার মত কত পাগলই না সংসারে সৃষ্টি করেছ!

আনন্দে সনাতন আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, গেয়ে উঠলেন আর এক পাগল সন্ন্যাসীর অমৃতময় মহামন্ত্র—আধিব্যাধির মহৌষধি।

'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।'

সেদিন আর মাধুকরী করা হল না। অনেক দিন উপবাসে কেটেছে, নয় আরও একদিন কাটবে কিন্তু এ অপার আনন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন না করে থাকতে পারলেন না। দ্রুতপদে চলে এলেন চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে।

মহাপ্রভু তখন ভিক্ষায় যাবার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় সনাতন তাঁর চরণে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ওগো ঠাকুর! ওগো প্রভু! এবার আমি তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদন করলাম—তুমি আমায় গ্রহণ করো।

মহাপ্রভু বিস্মিত হয়ে দেখলেন ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে সনাতনের অঙ্গে রয়েছে একখানা শতছিন্ন মলিন কন্থা! তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন সনাতন, আমার প্রাণের দোসর, এবার ত তোমায় আমায় মিলনে আর কোন বাধা নেই!

তাঁর নীলনলিন নয়নযুগল জলে ভরে উঠল।

পুণ্যভূমি ভারত

যদি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্ম্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এইখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্ব্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্ব্বাণ করিতে যে অমৃত-সলিলের প্রয়োজন, তাহা এইখানেই বর্ত্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

পশ্চিম আকাশের অস্তগামী সূর্য, শুধু একটু ম্লান রক্তিমাভা, তার আলোয় অন্ধকারের প্রথম স্পর্শ। তার নেই দাহ, শুধুই মৃদু উত্তাপ। নেই চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য, শুধুই ক্লান্তিহরা স্নিগ্ধ আলো। তবু ক্ষণিকের জন্যও উপযুক্ত পাত্রে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজের প্রকাশ দেখা যায়, একটি প্রচণ্ড শক্তির আবেষ্টন সর্বাঙ্গে অনুভূত হয়। সন্ধ্যার অস্তাচল-আরূঢ় ম্লান রবিই প্রভাতের প্রশান্ত মিহির, দ্বিপ্রহরের রুদ্র ভাস্কর এই কথাটিই নতুন করে মনে পড়ে যায়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যেদিন হাসি-কান্নার রঙ্গভূমিতে প্রথম নেমেছিলেন আমরা তখনও রূপ নিইনি। এমন কি, আমাদের জন্মদাতারাও তখনও বোধ হয় কল্পনা, তখনও ইচ্ছা হয়েই ছিলেন। তারপর দিনে দিনে শশিকলার মত বেড়ে উঠলেন তিনি, বাল্য কৈশোরের নানা রঙ্গ সেরে যৌবনের প্রথম উচ্ছাসের আমেজে ভরপুর হয়ে আছেন। তিনি তখন শিক্ষক, রসিক, নাট্যলক্ষ্মীর দীনভক্ত। তখন চলেছে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। তারপর একদিন এলো সেই বিশেষ দিন, যে দিনটির কথা জন্মলগ্নেই বিধাতাপুরুষ তাঁর ললাট-লিপিতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন—তাঁর জীবনের মহাক্ষণ। সে পরম লগনকে তিনি হেলা করেননি আর তাই দিকে দিকে সেদিন জয়ডঙ্কা বেজেছিল। সেদিনকার আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

আমরা যখন ধরণীর আলোক দেখলাম শিশিরকুমার তখন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের প্রবল তেজে দেদীপ্যমান। তিনি নিজেই বলেছেন ১১২৯ পর্যন্ত তাঁর কোন নাটকই অসফল হয়নি। তাঁর সেই অপ্রতিহত বিজয় অভিযানের কিছু কিছু হয়ত অবোধ আমরা মা'র কোলে বসে দেখেছি। দেখেছি কিন্তু বুঝিনি; বুঝিনি কারণ বোঝার বয়স সেটা নয়, তখন মায়ের স্নেহ-আদরের দাম পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি। অবশ্য বয়স্ক হলেও যে বুঝতাম এমন কোন কথা নেই, কারণ বোঝার চোখ সকলকার থাকে না।

তারপর বয়স যখন বাড়ল, বোঝবার সময় যখন হ'লো, তখন শিশিরকুমার আর সাধারণ পর্যায়ের মানুষ নন, তিনি তখন উপকথার দেশের মানুষ। তাঁর সবকিছুতেই তখন একটি অতিমানবীয় স্পর্শ লাগতে সুরু করেছে। তাঁর কথা তাঁর চলন, তাঁর বলন, এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও তখন এমন সব কথা মুখে মুখে চলতে সুরু করেছে যাতে তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক বলেই মনে হয়েছে।

তখনকার দিনে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের হাতে আজকালকার মত এত সহজে পয়সা আসত না। অনেক খোসামোদ, অনেক দরবার করে তবে দু'-চারটে পয়সা পাওয়া যেতো। কাজেই থিয়েটারের সব চেয়ে কমদামী টিকিট এক টাকা পয়সা পাওয়াও কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। তাছাড়া থিয়েটার বায়োস্কোপের উপর গুরুজনরা মোটেই খুসী ছিলেন না; ওসবে নজর গেলে ছেলেরা উচ্ছন্নে যায়। তাই থিয়েটার দেখা আর বিশেষ হয়ে উঠত না। মাঝে মাঝে গুরুজনদের সঙ্গে এদিক-ওদিক থিয়েটার দেখিনি এমন নয়, আর তার মাঝে শিশিরকুমারের অভিনয়ও দু'-একবার দেখেছি।

অবশ্য বিচার করে দেখবার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি, তবু যখনই তাঁর অভিনয় দেখেছি, তখনই মনে হয়েছে অন্যদের থেকে যেন পৃথক তিনি। অল্প দামের সীটে পেছনে বসে কদাচ কখনো তাঁর গলা যদি কানে না-ও পৌঁছে থাকে, কি বলতে চাইছেন বুঝতে কষ্ট হতো না। আর তাতেই মনে হতো সত্যিকার বড় অভিনেতা নিশ্চয়ই, নইলে অন্যরা যেখানে হৈ-চৈ করে চেঁচিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে একটি চরিত্রকে পুরোপুরি খাড়া করতে পারে না, সেখানে কত সহজে কত সামান্য পরিশ্রমে পুরো চরিত্রকে চোখের সামনে জীবন্ত করতে পারতেন। তাই কুড়ি-পঁচিশ বছর পরেও আলমগীরের স্বপ্নদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভাসে, আজও যেন দেখতে পাই বন্দী আলমগীরকে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে রামের সেই ব্যাকুল কথা—কার কণ্ঠস্বর!

আরো বড় হলাম, বুদ্ধির বিকাশ ঘটল কিনা জানি না, তবে মনের ভিতর আধুনিকতার নানারকম প্যাঁচ খেলতে শুরু করল। বুঝি না বুঝি বিদেশী কিছু কিছু লেখা পড়ে পণ্ডিতম্মন্য বনে গেলাম। তখন মনে হল, শিশিরকুমারের অভিনয় ঠিক স্বাভাবিক নয়, তাঁর প্রয়োগরীতি সেকেলে বস্তাপচা, তাঁর শিক্ষাদানের রীতি অচল হয়ে পড়েছে। সে যুগটি নবনাট্য আন্দোলনের শুরুর যুগ, নবান্নর যুগ, গণনাট্য-সংঘের প্রসারের যুগ। আমাদের মত তরুণদের বোঝানো হয়েছিল আর আমরা বুঝেও ছিলাম যে, বাংলার নাট্য আন্দোলনের নতুন মোড় ঘুরছে।

কোন কিছুর অগ্রদূত হবার একটি আনন্দ আছে, আছে উন্মাদনা, আছে উচ্ছ্বাস। এই তিনটির একত্র সমাবেশ আমাদের মধ্যেও হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নতুন কিছু করার মোহটি চলে গেল, দেখলাম নতুন বলে যাকে ধরতে গেছি সেটি আসলে নতুনই নয়। ভুলটি ভাল করেই ভেঙে দিলেন শিশিরকুমার—নবান্নরই সমশ্রেণীর দুঃখীর ঈমান প্রযোজনা করে। দেখা গেল যাঁকে বাতিলের দলে ফেলা হয়েছিল তিনি সেদিনও সকলের আগে।

যাঁদের আমাদের চেয়ে জ্ঞানী মনে করতাম, হঠাৎ তাঁদের জ্ঞানের পরিমাণ ও গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল। থিয়েটারের বিষয়ে বিদেশী লেখকদের লেখা বই কিছু কিছু পড়তে শুরু করলাম, তার থেকে এই বোধটুকুই জন্মাল যে, নাটক সম্বন্ধে যত আলোচনাই করা যাক না কেন, নাটকের অভিনয়ের মূলসূত্র তা থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ভাবে নাটক পড়ার, অভিনয় দেখার ও সম্ভব হলে অভিনয় করার।

এবার থেকে সেই প্রচেষ্টাতেই রত হলাম। দেশী বিদেশী বহু নাট্যকারের বহুরকম নাটক পড়লাম আর তার থেকে আরো বিপদে পড়তে হলো। এতদিন পর্যন্ত একটি ভাসা-ভাসা ধারণা

ছিল যে, বক্তব্যের উপরই নির্ভর করে নাটক, একই কথা বার বার বললে বক্তব্যের মাধুর্য নষ্ট হয় আর বক্তব্যবিহীন নাটক নাটকই নয়। অবশ্য বক্তব্য বলতে, কেন জানি না, বুঝতাম—প্রগতিশীল বক্তব্য। কিন্তু পৃথিবীর বহুবিখ্যাত নাটকের মধ্যে অদ্ভুত রকম মিল নজরে পড়ল আর আমাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের মূল কথাকে বক্তব্য বলে স্বীকার করাও কঠিন ছিল। তাহলে কি সেগুলো ভাল নাটক নয়? তাহলে ভাল নাটক বলব কা'কে?

মনের মধ্যে যখন এই রকম দোটানা, তখন আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ একজন এসে বললেন—ওহে, শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করবে? মনে হলো যেন উত্তর এবার পাওয়া যাবে। শিশিরকুমারের বিরুদ্ধবাদীরা আর যাই বলুন, নাটক সম্বন্ধে যে তাঁর পড়াশুনার অভাব ছিল এমন অপবাদ অতি বড় নিন্দুকেও দিতে পারত না। তাই এক কথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে গেলাম।

কোন বিখ্যাত লোককে কাছে থেকে দেখতে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূরের মানুষ কাছে এলে দূরত্বের মোহজাল কেটে গিয়ে রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শে কল্পনার স্বপ্নমন্দির ভেঙে যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাই বোধ হয় বলেছিলেন যে, "ইয়ারো" না দেখাই ভালো। অবসরকালে মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন আমাদের না দেখা "ইয়ারো"র কথা মনে করলেই ক্লান্তি দূর হবে। (কথাগুলো স্মৃতি থেকে বলছি, কাজেই আক্ষরিক সত্য না-ও হতে পারে, তবে ভাবটি মোটামুটি বোধ হয় ঠিকই আছে।)

শিশিরকুমারের কাছে গেলে যে আশাভঙ্গ হবে এটি ধরেই নিয়েছিলাম আর নিয়েছিলাম বলেই খুব বেশি আশাহত হইনি। মনের মধ্যে অনেক দিন আগে যে অতিমানবীয় কথাটি বাসা বেঁধেছিল, সেটির অভাবই প্রথম চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত রুচিবান একটি মানুষকে, যাঁর ঘর বই-এ ঠাসা। ইজিচেয়ারে বসে চুরুট হাতে, মোটা চশমা চোখে এই মানুষটিই যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু কথা বলতে বলতে চোখের বিদ্যুৎ যখন ঝলসে উঠেছিল তখন বুঝতে পেরেছিলাম—touch of madness তাঁর ভিতরেও আছে।

প্রথমেই বলেছিলেন—নাটক পড়-টড়? আমতা আমতা করে বলেছিলাম—একটু একটু। খুশি মনে বলেছিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়বে। নাটক যত পড়বে ততো ভাল বুঝবে। তারপর নাটক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের মালিনী পড়েছ? মাথা নেড়েছিলাম, অবশ্য তাতে হ্যাঁ, কি না বোঝায় তা বোঝা যায় না, আমাদের মধ্যে একজন বলেছিল—পড়িনি তবে অভিনয় করেছি। খানিকটা যেন অবাক হয়েছেন এই ভাবে আবার হেসে বলেছিলেন—বলো কী হে, তোমার তো খুব সাহস দেখছি? রবীন্দ্রনাথের বই-এর মধ্যে মালিনীর কদরই সবচেয়ে কম, অথচ তুমি তা অভিনয় করেছ। তা পড়নি কেন? সেই চটপট জবাব দিয়েছিল—বুঝতে পারি না। হেসে উঠেছিলেন—বুঝতে পার না কেন? বেশ, পড়ে শোনাচ্ছি। বই নিয়ে এসে বলেছিলেন—এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি, অথচ এর কোন খোঁজই রাখে না কেউ।

সেদিন তাঁর পড়া শুনে আর তাঁর ব্যাখ্যা থেকে নাটকের রস গ্রহণ সহজ হয়ে গিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম বক্তব্যই নাটকের মূল কথা নয়, মূল কথা সুষ্ঠু বিন্যাস আর চরিত্র সৃষ্টি। এই দুটি গুণের সঙ্গে নটের অভিনয়কলা আর সুপ্রয়োগরীতি যদি মেলে তাহলেই নাটক শ্রেষ্ঠ নাটক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সেদিনের পর বহুবার বহুভাবে শিশিরকুমারের সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয়েছে। মঞ্চে তাঁর দিনের পর দিন অভিনয় দেখেছি; তার পরও বহুবার আমাদের তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথম দর্শন থেকেই তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে তার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তার সবটাই আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মোটামুটি উনিশ শ' ছাপ্পান্ন শেষ দিক থেকে আটান্ন সালের শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে তারই কিছু কিছু অংশ এখনো আমাদের কাছে আছে।

উনিশ শ' আটান্ন সালের জুন মাস নাগাদ নাট্যরসিক ও নাট্যামোদী একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলবার জন্য তিনি নব্য বাংলা নাট্যপরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পুরোনো নাটক পাঠ, নাটক সম্বন্ধে আলোচনা ও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে বর্তমান যুগের বাঙালী নাট্যরসিকদের পুরোনো যুগের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের ইচ্ছা তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে যে-সব আলোচনা করতেন তিনি সেগুলো সবই লিখে রাখবার চেষ্টা করেছি। প্রথম প্রথম সঙ্গে সঙ্গে লেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষের দিকে এত কথা বলতেন যে, সঙ্গে সঙ্গে লেখা বাতুলতার নামান্তর মাত্র হয়ে দাঁড়াত। তাই পরে স্মৃতি থেকে লিখেছি। তার ফলে হয়ত অনেক সময় কোন কোন কথা একটু-আধটু অদল-বদল হয়ে গেছে। তবে যতদূর সম্ভব তাঁর মুখের কথাই লিখে রাখতে চেষ্টা করেছি। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ঠিক মত বুঝতে না পেরে ভুল করেছি। তার জন্য দোষটা আমাদের।

অনেক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী সম্বন্ধে শিশিরকুমারের মতামত কৌতূহলোদ্দীপক মনে হবে। বাঙলা দেশের কোন কোন মনীষীর কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি, তাঁদের সম্বন্ধেও শিশিরকুমারের কাছ থেকে অনেক কথা জানা গিয়াছে। আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলা দেশের তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের আচার-ব্যবহার আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধেও কিছুটা আলোকপাত করবে বলে মনে হয়।

তবে শিশিরকুমারের জীবনী-গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা আমরা করছি না বা শিশিরকুমারের নাট্যজীবনের মূল্যায়নের দায়িত্বও এখন নয়। এসব কাজের জন্য উপযুক্ত পাত্র অনেকেই আছেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষ শিশিরকুমারের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর তাঁরই কথার সাহায্যে কিছুটা আলোকপাত।

তাঁর কোন কোন কথা স্পষ্টতঃ অতিভাষণ দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তিনি কথাগুলি বলতেন তা' বিবেচনা করলে বোধ হয় তাঁর এ দোষ অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। তিনি বলতেন আমাদের মত বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছে, যাদের গুরুর অনুকরণ করার স্পৃহা অত্যন্ত উগ্রভাবে বর্তমান; তাছাড়া থিয়েটার এমনই একটা জায়গা যেখানে, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের মতে

বশিষ্ঠেরও পদস্খলন হয়, কাজেই কোমলমতি তরুণ-তরুণীরা যাতে পথ না হারায় তার জন্তই অনেক সময় অনেক কথা হয়ত কিছুটা রেখে-ঢেকে বলতেন।

আমাদের কথা হয়ত একটু বেশী বলা হয়ে গেল, কিন্তু শিশিরকুমার সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবার অধিকার স্থাপন করবার জন্তই এত কথা বলতে হলো। অধিকারী বিবেচনা করলে হয়ত বলবার অধিকার আমাদের কিছুই নাই, তবু তাঁর স্নেহ আমরা পেয়েছিলাম এবং সেই স্নেহের দাবীতে এই লেখাগুলি প্রকাশ করছি।

শিশিরকুমারের কথা বলার আগে বোধ হয় সে সময়কার বাংলা রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বর্ণনা করা অন্যায় হবে না। শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণের সময়কার অবস্থার সঙ্গে আজকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবস্থার বেশ একটা মিল আছে। মাত্র এক যুগ আগে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের নেতৃত্বাধীনে বহু-বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী জনসাধারণকে আনন্দদান করতেন। অথচ আজ তাঁদের প্রায় কেউই আর রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন না। সেদিনও রঙ্গমঞ্চের এইরকম অবস্থা। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুকুমার, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ প্রথম যুগের দিকপাল অভিনেতারা তখন গত হয়েছেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু তখনও জীবিত, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অবতরণ আর বিশেষ করেছেন না। সেই যুগের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দানীবাবুই তখন নিয়মিত অভিনয় করছেন। কিন্তু গিরিশযুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তখন স্বপ্নকথায় পর্যবসিত হয়েছে।

গিরিশযুগে সাধারণ অভিনেতারাও পরবর্তীযুগের বহু সুপরিচিত অভিনেতার চেয়ে ভাল অভিনয় করতেন। কথাটা শিশিরকুমার নিজেই বলেছেন। কিন্তু মিলিতভাবে অভিনয়ের উন্নতির কোন প্রচেষ্টা তাঁরা কখনও করেননি। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলতেন—এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিনয়ের মান অবশ্য খুবই উন্নত ছিল, কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে কোন রকম উন্নতির চেষ্টা তাঁদের ছিল না। এমন কি, অনেক সময় যদি মনোমত দর্শকসমাগম না হ'তো তাঁরা অভিনয় সংক্ষেপ করে কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে শেষ করতেন। অভিনয়ে একটি ভোলেরও প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা। প্রথম যুগের বিখ্যাত অভিনেতারা অবশ্য এ ভোলে আবদ্ধ থাকতেন না। কিন্তু পরবর্তীযুগের প্রায় সকলেই এ ভোলের ফেরে পড়ে গিয়েছিলেন। এমন কি, দানীবাবুও তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, লোকে তার ক্ষমতার কথা জানে বলেই তাকে সমীহ করেই চলে, কিন্তু অক্ষম যখন তার ক্ষমতার কথা বলে তখন সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই ক্ষমতার প্রকাশ করে। সেইজন্য অক্ষমের ক্ষমতা প্রকাশ একটি ভোলেই হয়। শক্তিশালীর সে ভোল মেনে চলবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তারাই ভোল বেঁধে দেয়। শিক্ষক-ছাত্রর গ্রহণযোগ্য করেই শিক্ষা দেন, কেতাবী শিক্ষায় সে হিসাব থাকে না, কাজেই সেখানে মুড়ি-মিছরির একই দর হয়ে পড়ে। মিছরির অবশ্য তাতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু বিপদে পড়ে মুড়ি। দুর্বল অভিনেতারা তাই ভোলের বাঁধনে পড়ে হাঁসফাঁস করত আর সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের অবনতিই ঘটত।

অল্প বয়স থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই দুর্বলতা শিশিরকুমারের নজরে পড়েছিল। পরীক্ষার পড়ার দিকে তাঁর ঝোঁক না থাকলেও কবিতা ও নাটক জাতীয় অপাঠ্য বইয়ের উপর ঝোঁক ছিল খুবই বেশি। তাছাড়া অভিনয়, নাট্যপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধেও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। সে সময়ের বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রায় সব নাটকই তিনি দেখেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতার অভিনয়কলাও তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। যার ফলে দীর্ঘ আটচল্লিশ—পঞ্চাশ বছর পরেও বিভিন্ন অভিনেতার বাচনভঙ্গীর নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারতেন। এতদিন পরে যদি অতকাল আগের কথা মনে থাকে, তবে সেই সময় আরো কত বেশি মনে ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

স্কটিশ কলেজে ছাত্র থাকাকালীন শিশিরকুমার সর্বপ্রথম জুলিয়াস সিজার নাটকে ব্রুটাসকে রূপায়িত করেন। কিন্তু যতদূর জানা যায়, সে সময় প্রয়োগের কোন দায়িত্ব বোধ হয় তাঁর উপর অর্পিত হয়নি। পরিচালক হিসাবে শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব যতদূর জানা যায়, নবীন সেনের কুরুক্ষেত্রের নাট্য রূপায়ণে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এর পর নাট্য-পরিচালক ও নট হিসাবে শিশিরকুমারের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হতে থাকলো।

ইতিমধ্যে এম-এ পাশ করে শিশিরকুমার তদানীন্তন মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ)এ ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনার কাজ নেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অধ্যাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নোট-পড়ানো তিনি পছন্দ করতেন না আর সেজন্য ছাত্ররা তাঁর কাছে অনুযোগও করত। অধ্যাপনার কাজে লেগে থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার প্রধান অধ্যাপক হওয়া অসম্ভব ছিল না। শোনা যায়, তিনি যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আশুতোষ তাঁকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন এবং তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন। অধ্যাপনার কাজে খুব বেশি চাপ না থাকায় তাঁর পক্ষে অন্য কাজ করে অধিক অর্থোপার্জন করাও সম্ভব ছিল, আর তিনি তা' করতেনও। তবু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন। তাঁর রক্তে যে তখন অভিসারের ডাক এসেছে! কানুর বাঁশী শোনার পর রাধা কি আর ঘরে থাকতে পারে!

শোনা যায়, ইনষ্টিটিউটে তাঁর নাট্য-প্রয়োগের কাজে তিনি অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন। বিনয় বাবু তাঁকে অভিনয় করা ও করানোর কাজে উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জীবিত থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বোধ হয় সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতরণ সম্ভব হতো না। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন—You are wasting yourself, Sisir, your true vacation is on the stage. কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে অবতরণের ঔচিত্য সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করলেন শিশিরকুমার, তখন গুরুদাস বাবু তৎকালীন রঙ্গালয়ের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে বলতে পারেননি যে, তুমি নেবে যাও শিশির! বরঞ্চ বোধ হয় বারণই করেছিলেন।

আজকে বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকেও, শিক্ষিত বাঙালী তার আত্মীয়-স্বজনের কাউকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গণ্ডী পেরিয়ে যাওয়া

পছন্দ করে না। কাজেই আরও চল্লিশ বছর আগেকার কথা সহজেই অনুমেয়। অথচ আশ্চর্যের কথা, সেই সময়েও শিশিরকুমারের মাতা তাঁর কৃতী সন্তানের এই জাতিচ্যুতির কথা জেনেও কোন আপত্তি করেননি, বরং তাঁকে আশীর্বাদই করেছিলেন। শিশিরকুমারই বলতেন যে, যত রাত করেই ফিরুন না কেন তিনি, তাঁর জন্য জেগে বসে থাকতেন মা।

মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, পদের মোহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ করতলগত আমলকের মত ত্যাগ করে, নিশ্চিন্ত বর্তমানকে ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বুকে নাট্যকলার উন্নতির মন্ত্র মুখে নিয়ে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে সেই যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি আর কোন দিনও পিছন দিকে ফেরেননি। বার বার বাধা পেয়েছেন, বার বার সাফল্যের তুঙ্গ শিখর থেকে চরম অসাফল্যের মধ্যে হারিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু কখনো হার মানেননি।

ম্যাডান কোম্পানীর চাকরীতে ঈর্ষাতুর সঙ্গীদের চেষ্টায় নিজের ইচ্ছামত উন্নতি করা সম্ভব হয়নি বলে চাকরী ছেড়ে দিতে বাধেনি তাঁর। একজিবিশনে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয় করার পর যখন তাঁর অভিনয়খ্যাতি, পরিচালনখ্যাতি আর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল আর সেই খ্যাতির সুযোগ নিতে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ যখন আইনের ফাঁকে কৌশলে সীতার অভিনয়ের স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন তখন যেমন অদম্য উৎসাহে অজানা অচেনা যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে রাতারাতি নাটক লিখিয়ে অভিনয় করেছিলেন, তেমনি অল্পকাল আগে জরাজর্জর ভগ্নদেহে 'নব্য বাংলা নাট্যপরিষদ' স্থাপন করে আমাদের উপর যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব চাপিয়ে, সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের "মালিনী"র রিহার্সালের কাজ নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন এবং দিনের পর দিন যৌবনের শক্তি নিয়ে সুপরিচিত ও অপরিচিত অভিনেত্রী-অভিনেতাদের একই ভাবে অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য শেখাতে চেয়েছেন।

উৎসাহের আধিক্যে ভাঙা হাতের কথা ভুলে গিয়ে, বয়সোচিত দৌর্বল্যের কথা ভুলে, প্রায়ান্ধ দৃষ্টির কথা বিস্মৃত হয়ে যেভাবে তিনি লাফালাফি করতেন তাতে তাঁর পরিচিতেরা কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে এই ভেবে সশঙ্কিত হয়ে পড়তেন তিনি কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। যে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাঁর সেই ক্ষমতার পরিচয় জীবনের প্রায় শেষ দিনটিতে পর্যন্ত দিয়ে গেছেন।

শিশিরকুমার ছিলেন চির আশাবাদী; বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না তাঁর। তবে তিনি এ কথাও বিশ্বাস করতেন যে, নতুন নতুন পথ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, একথাও তিনি জানতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, উপযুক্ত অর্থাভাবের জন্য কোন এক বা একাধিক সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের পক্ষেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না। এ কাজের জন্য প্রয়োজন সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাতীয় নাট্যশালার। সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় তিনি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি জানতেন সরকারী লালফিতার চাপে অনেক সদিচ্ছা লোকচক্ষুর অন্তরালে আস্তে আস্তে লোপ পায়। এই জাতীয় নাট্যশালা সরকারের অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠলেও তার দায়িত্ব থাকবে পুরোপুরি নাট্যরসিক মহলের হাতে। তাঁর থিয়েটার যাবার পর এই জাতীয় নাট্যশালার কথাই বার বার বলতেন তিনি।

কিন্তু একলা অরণ্যে রোদন সার হয়ে পড়েছিল। বহু জনে তাঁর মতের যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন প্রতিশ্রুতিই কার্য্যকরী হয়নি, বার বার এই ভাবে আশাহত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আর আমাদের মনে হয় এই হতাশাই তাঁর মহাপ্রয়াণকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিশিরকুমারের সৃষ্ট যে চরিত্রটির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের মিল সব চেয়ে বেশি তা বোধ হয় বাংলাদেশের আর এক দুর্ভাগ্য প্রতিভা মাইকেল-মধুসূদন দত্তের চরিত্র। সেই জন্যই বোধ হয় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাইকেলকেই সব চেয়ে ভালো করে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। বিরূপ নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ যে হয় না এ খবর শিশিরকুমারের অজানা ছিল না। তাই নিজেই দুঃখ করে বলেছেন, হাজার বছরে এমন একজন লোক আসে যাকে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মনায়করা পথ ছেড়ে দেয়, সে সৌভাগ্য আমার নয়। তবু দৈবের কাছে হার স্বীকার করেননি কখনো, কর্ণের মত মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধই করেছিলেন।

অনেকের মুখেই শোনা যায়, শিশিরকুমার যে সম্মান পেয়েছিলেন সে সম্মান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী পাননি। কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়, হয়ত, হয়ত কেন, দেশবাসীর প্রীতির দানে তাঁর ভাণ্ডার ভরে উঠেছে, কিন্তু তিনি রাজোচিত স্বভাবের অধিকারী, মুষ্টিভিক্ষার দানে তাঁর মন উঠবে কেন? অছাড়া সাধারণ পাঁচ জনের মত ভাণ্ডার ভরে রাখতে তো শেখেননি তিনি। তিনি তো কেবল দিয়েই গেছেন, যে ভাবে তিনি দিয়েছেন তাতে কুবেরের ভাণ্ডার ফুরোতেও দেরী লাগে না, এ তো সামান্য মানুষ। একদিন যাঁরা তাঁর দান নিয়েছেন তাঁরা তাঁকে বেহিসাবী বলতে পারেন, মূর্খ বলতে পারেন, কিন্তু অস্বাভাবিক বলেন কি করে?

মানুষ হিসাবে শিশিরকুমারকে বিচার করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কাজেই সে চেষ্টা করবো না। শুনেছিলাম তিনি দর্পী, তিনি দাম্ভিক। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁর স্নেহাতুর রূপটাই দেখেছি। অযাচিত অপ্রাপ্য স্নেহের দানে আমাদের মন ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি তা অমূল্য।

শিশিরকুমারের পঞ্চভূতের নশ্বরদেহ প্রকৃতির বুকে মিলিয়ে গেছে কিন্তু নাট্যাচার্য অমর হয়ে রইলেন আমাদের মধ্যে। যতদিন বাঙালী জাতি থাকবে, বাঙলা ভাষা থাকবে, বাঙলার থিয়েটার থাকবে, তত দিন শিশিরকুমার স্থির অবিনশ্বর ধ্রুবতারার মত বাঙালী-মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

শিশিরকুমারের অমরত্ব প্রশ্নাতীত হলেও সাধারণ মানুষ তাতে খুশি হতে পারে না। তারা চায় স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু। তাই আজ নানাদিক থেকে প্রস্তাব আসছে, শিশিরকুমারের নামে রাস্তার নামকরণ করা হোক, বা শিশিরকুমারের নামে পার্কের নামকরণ হোক বা

শিশিরকুমারের নামে অধ্যাপক নিযুক্ত হোক বা শিশিরকুমারের চিতাস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হোক।

এই ধরণের স্মৃতিচিহ্নের উপর শিশিরকুমারের মোহ তো ছিলই না উপরন্ত ছিল বীতরাগ। তিনি বলেছেন যে, তাঁর মত দেখতে হবে কি না হবে এমন একটি মূর্তি খাড়া করে বছরে একদিন মালা দিয়ে যাকে তাকে দিয়ে শ্রাদ্ধ না করাই সমীচীন। রাস্তার নামকরণেও তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। বলতেন, শ্রদ্ধার নামে লাথি মারানোর দরকার কি? যে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে একদিন তিনি নাট্য-উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই অধ্যাপকের পদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করলেই কি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হবে তাঁকে?

একদিন যেমন গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ নিয়ে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছিলেন, তেমনি শিশিরকুমারের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিতে পারলেই বোধ হয় তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়, অবশ্য আজকালকার দিনে ঠিক শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের সমশ্রেণীর মানুষ পাওয়া কঠিন, কাজেই তাঁরা যে কাজ একলা করেছিলেন সে কাজ পাঁচজনে করতে হবে। তাছাড়া যুগটাও গণতন্ত্রের, এখন কাজ করতে হলে পাঁচজনের সাহায্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শিশিরকুমারের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টিই বোধ হয় তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হতো। তাঁর শেষ কথা বলতে গেলে, জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টির প্রস্তাব। কাজেই শিশিরকুমারের নামে কলকাতায় জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টি করার চেষ্টাই বোধ হয় আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে।

হয়ত কোন দিন আমাদের জাতীয় সরকারের টনক নড়বে, আমাদের রাজ্যে রাজ্যে সৃষ্টি হবে জাতীয় নাট্যশালার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্বতের মূষিক প্রসবের মত বাঙলা নাটকের উন্নতি কতদূর হবে তা সহজেই কল্পনীয়। বাংলা দেশে রসিক লোকের অভাব বোধ হয় এখনও ঘটেনি, আর বাংলা দেশের আকাশে যতই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসুক, আজও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হাত পাতলে খালি হাতে যে ফিরতে হয় না এ কথা আমরা বিশ্বাস করি। নাট্যাচার্যের স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব কেউ নিলে জাতির ঋণ শোধের দায়িত্বই নিয়ে ধন্য হবেন একথা বলা যায়।

নাট্যাচার্যের কথা শুনে নতুন কোন মানুষ যদি এগিয়ে এসে তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তাহলেই আমাদের কর্তব্য কিছুটা পালন করা হয়েছে বলে মনে করবো। অকারণ যে স্নেহ আমরা পেয়েছিলাম তার প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, তবু গুরুকৃত্য পালন করে অন্ততঃ স্নেহের ঋণ শোধের চেষ্টা করছি। [ক্রমশঃ।

ত্রয়ী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মনে রেখো মহাপ্রলয় তিমিরে জীবন মৃত্যুহারা,
আগুনের রস শুষে শুষে বাঁচে মরুতে খেজুর চারা।
মনে হয় পাহাড় চিবুই,
গ্রহপিণ্ড গুঁড়ো করি দাঁতে।
সূর্যশিখা ফুঁ দিয়ে নিবুই,
ব্যোম চেটে খাই তমিস্রাতে।

ঢোকে ঢোকে নোণা সমুদ্র
খরস্রোতা ক্ষ্যাপা নদ-নদী,
গিলে খাই ঝঞ্ঝা মরুভূর
গতিময় কাল নিরবধি।

পিয়ে মধু বিশ্ব-কুসুমের
এ কঙ্কালে বানাই মৌচাক।
বাজাই প্রচণ্ড প্রলয়ের
বজ্র দিয়ে আকাশের ঢাক।
একের সাধ্য নেই দুই হ'তে পারে।
একে একে তিন হয় প্রেমের পাথারে।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, একটি পোষ্টকার্ড হাতে এসে পড়ল।

মহাশয়েষু,

পত্র পেলাম। আমি কিছুদিন কলিকাতার বাহিরে ছিলাম তাই উত্তর দিতে দেরী হোলো। আগামী শনি ও রবিবার, ২২শে ২৩শে মার্চ আমি বাড়িতে থাকিব। বিকালে কার্যবশতঃ বাহিরে থাকিতে হইবে। সকালে ১২টার মধ্যে আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইতি—

শিশিরকুমার ভাদুড়ি

পুঃ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ২০শে ও ২১শে মার্চও ওই সময়ে আসিলে নিশ্চয়ই দেখা হইবে।

শিঃ

সেদিন ছিল মংগলবার। অজিত চিঠিখানি দেখে বলল—সেও আমার সংগে যাবে, শুধু তাই নয়—যেতে হবে নিকটতম বৃহস্পতিবারেই

চিঠিখানি দেখে একটু ধাঁধায় পড়েছিলাম। ভাবলাম শিশির বাবু হয়ত ভুলক্রমে মার্চ মাস লিখেছেন, কারণ ফেব্রুয়ারীতে ঐ দিন-তারিখগুলি হুবহু মিলে যায় আবার মার্চের পাতা তুলে দেখি ২০, ২১, ২২, ২৩ একই বার। তবু আমরা ভোর না হতেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম ঐ নিকটতম বৃহস্পতিবারেই।

নাম বলব না, পথে বেরুতেই কিন্তু এক ভদ্রলোক আমায় ভীষণ চমকে দিলেন। বললেন—যাচ্ছ যাও কিন্তু শিশির বাবুর অর্দ্ধচন্দ্র তোমাদের কপালে আছে। এও বললেন—সাবধান! শিশির বাবু 'লৌহমানব' কাউকে রেয়াত করে কথা বলেন না।

নিরুৎসাহিত হলেও গাড়ি চাপলাম।

দমদম থেকে ওঁর বাড়ি পৌছুলাম—তখন আটটা। একটি যুবক পড়ছিলেন—তিনি সংবাদ দিলেন। প্রায় দু' মিনিটের মধ্যেই শিশির বাবু দ্বিতল থেকে নামলেন। সিঁড়িতে পা দেবার পূর্বেই তিনি আমাদের জন্ত একটু বিশেষ ধরণের কণ্ঠস্বর পাঠিয়ে দিলেন যেন। আমরা তটস্থ হয়ে বসলাম।

তিনি চেয়ারে বসতে বললেন—কি দরকারে আসা হয়েছে—অমিয় কার নাম?

কণ্ঠস্বরে কল্পনাতীত গাম্ভীর্য। ভয় পাবারই কথা। ক্ষণকাল আমরা মৌন হয়েই রইলাম।

শিশির বাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন—বলো কি প্রয়োজনে আসা হয়েছে। আবার যেন মেঘ গর্জন করে উঠল।

সভয়ে কি নির্ভয়ে বলি এই চিন্তা তখন মনে তুফান তুলেছে আর কি দিয়ে কথা শুরু করি তারও দিশা পাচ্ছিলাম না যেন।

মাথা চুলকে সবিনয়ে বললাম—হেমেন বাবুর একটা বইয়ে আপনার কথা খুব অল্প টুকরো টুকরো পড়েছি। ভেবেছিলাম উনি হয়ত দ্বিতীয় পর্বে আপনার জীবন কাহিনী বিস্তৃত লিখবেন। কিন্তু ওঁর দ্বিতীয় পর্বে আপনাকে পেলাম না। দ্বিতীয় বইটি আপনার নামেই কেবল উৎসর্গ হয়েছে।

—তুমি কি হেমেনের বাড়ি গিয়েছিলে? প্রশ্ন করলেন উনি।

—ওঁকে চিঠি দিয়েছিলাম, অবশ্য দেখা পাইনি। তাই আপনার কাছে এলাম। যদি আপনার জীবন কাহিনী—

—পাড়ার লোকের কাছে আমার জীবন কাহিনী বলতে যাবো কেন? সূচনায় শিশির বাবুর মুখ থেকে এরকম কথা শুনে সত্যিই এবার খুব ঘাবড়ে গেলাম। এর পর তিনি দশ পনেরো মিনিট ধরে আমাদের একটু টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে দিলেন না। সাইক্লোন বইয়ে দিলেন নিজেই।

সিঁথির চৌরাস্তার মোড়ে শিশির বাবুর বাড়ি। যদি কেউ ভেবে থাকেন একটু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব, তিনি আমাদেরই মত অবাক হবেন। দ্বিতল। আপনার আমার মতই বাড়ি। সেখানে আভিজাত্য বা মুন্সিয়ানা খুঁজে পাবেন না কেউ-ই।

চুরুটটা নিয়ে বসলেন চেয়ারে। মোটা কাচের চশমার ভিতর দিয়ে পুংখানুপুংখরূপে দেখে নিলেন আমাদের আপাদমস্তক।

সেই পড়ুয়া ছেলেটি গোপনে বাইরে দাঁড়িয়ে, বাসন মাজতে মাজতে একটি স্ত্রীলোক তফাৎ হতে আড়ে আমাদের দেখছিল। হয়ত ভাবল ওরা, এ দুটোর আজ মরণ পাখা উঠেছে!

সোজা কথা সাফ কথা শিশির বাবু বললেন—আমি কাজের মানুষ, বাজে কথা পছন্দ করি না। আমার কাছে যদি কাজের কথা থাকে চটপট বলো। হাতে আমার পাঁচটা কাজ আছে। আমায় পড়াশুনো, ষ্টাডি করতে হয়, রিহার্সাল দিতে হয়, পাঁচটা চিঠি লিখতে হয়, আড্ডা দিতে পারব না। সত্তর বছর হ'ল আর তোমাদের সংগে আড্ডা মারার বয়সও নেই।

আমি অভিনয় করি, কাহিনী লিখি, প্রযোজনা করি। এই বিষয়ে কিছু জানতে চাও তো বলো। যদি বইয়ের নাম চাও দু-একটা বইয়ের নামও দিতে পারি।

আমি হতবাক। অজিত তখন নতমুখে বসে আছে। শিশির বাবু মুখ ঘুরিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন—কি কি অভিনয় দেখেছ?

বললাম—আপনার শেষ অভিনয় দেখি প্রফুল্ল। সম্মিলিত অভিনয়।

—সম্মিলিত অভিনয় আবার অভিনয় নাকি। সম্মিলিত অভিনয় হয় না যেমন হয় না সম্মিলিত ক্রিকেট খেলা। তবে ওরা বলে, "অভিনয় করি। ভাল টাকা দেয়। জীবনে সঞ্চয় করতে পারলাম না। আমাকেও তো বাঁচতে হবে।

অজিত বলল—আপনার শেষ অভিনয় দেখি চন্দ্রগুপ্ত। আমি সীতার কথাও বললাম।

উনি বললেন—থাক সে কথা।

ভাবলাম শিশির বাবুর কোপ বোধ হয় একটু প্রশমিত হয়েছে। চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ ওঁর জন্ত সামান্ত নিয়ে গিয়েছিলাম। অর্পণ করে কিছু বলবার আগেই বললেন—না না, এ সব সন্দেশ-টন্দেশ আমি পছন্দ করি না। তোমরা কেন যে এ সব আনো! মনে হল সেগুলি এক্ষুণি বুঝি আবর্জনাকুণ্ডে ফেলে দেবেন।

বললেন—বাজে বকে কি হবে? তোমাদের মত যদি বিশ জন

আসে অত সময় কোথা আমার? তাছাড়া মধ্যে মধ্যে আমার বাইরে যেতে হয়।

হুজুগে মেত না। আমরা বড় হুজুগপ্রিয়। কে কোথায় কি একটা কাজ করল অমনি আমরা তাকে মাথায় তুলে নাচি। আমাদের দেশের যুবকদের কোন সুচিন্তা পরিকল্পনা নেই। শুধু উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়।

আবার সব যে এই সই নেয়, আচ্ছা এই সই নেওয়ার কি মূল্য আছে বলতে পারো? দু' বছর, পাঁচ বছর, আট বছর পরে কেউ আর সইয়ের খোঁজ রাখে? তবু খাতা নিয়ে সইয়ের জন্যে সামনে ধরে—এ সব কি?

শিশির বাবুর অভিমানী আর ক্রুদ্ধ মন বারে বারে আমাদের প্রতিহত করে, নতুন কিছু বলতে কইতে পারি না। অথচ যেটুকু সময় পেয়েছিলাম বাড়ি থেকে ভেবে গিয়েছি এক রাশ কথা।

শিশির বাবু বললেন—আজ বাঙলার সব চেয়ে দুর্দিন। বাঙ্গালীর ছেলের আজ একটি চাকরী পাবার উপায় নেই, তবু এটাই তার নিজের দেশ। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষার উন্নতি হয়নি এক ফোঁটা। শুধু হয়েছে শিক্ষা সংকোচন। ছোট ছোট ছেলেদের পড়ার পথ বন্ধ করে শুধু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাইনে চার টাকা, ছ'টাকা।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষা আহরণের এ রকম বন্দোবস্ত আছে কি বলতে পারো? আমার অন্ততঃ জানা নেই। সব দেশে কিশোররা বিনামূল্যে শিক্ষা পায় শুধু তাই নয়, বাধ্যতামূলক ভাবে। আর আমাদের দেশ!

পাঞ্জাবে মাদ্রাজে যা পারেনি, বোম্বাইয়ে যা হয়নি তা হ'লো পশ্চিমবংগে। হিন্দী জোর করে তাদের শিখতে হ'বে।

বাঙালীর সর্বনাশ সামনে। তোমরা যা সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ প্রতিকার করছ না কেন? তোমরা সংযত হও সংযমী হও। দেশে ছেলে নেই এমন কথা বলছি না, কিন্তু ঐ 'কমু'র দলে ভিড়ে মাটি হয়ে গেছে।

একেবারে অচেনা পরিবেশের মধ্যে এরকম নির্ভেজাল অভিনব আলোচনা চলতে পারে আমাদের কল্পনায় তা আসেনি। আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, সত্যি কথা অস্বস্তিও বোধ করছিলাম বেশ। উভয়ে এই ফাঁকে ভেবেছিলাম এখানে কোন কথা না বলাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে।

সত্তরের আরকে জয়ান এই মানুষটি কিন্তু তেজীয়ান সাতাশের মতই। ভাবলে বিস্ময় হয় ঐ বয়সেও মাইকেল এবং রামের ভূমিকায় তাঁকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সত্তর আমাদের কাছেই আসে সত্তর।

মনে হ'ল চুরুটটা হয়ত নিবে গেছে। কিন্তু শিশির বাবু টান দিয়ে বললেন—পড়ো ভাল করে। যদি অভিনয় করতে চাও, যা অভিনয় করবে সেই চরিত্র ভাল করে বুঝতে হবে প্রথমে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। 'সত্যি নাটক'—সেই বই নির্বাচন করতে হবে।

বললেন—সবই হুজুগে। বারোয়ারী সার্বজনীন পুজো—ঠিক যেন থিয়েটারও তাই। আরে বাপু, ভক্তি থাকে পুজো করো, ভক্তি না থাকলে পুজো করো না।

হঠাৎ বললেন—এতদূর থেকে যখন সময় আর পয়সা নষ্ট করে এসেছ দুটো প্রশ্ন কর, সাধ্যমত জবাব দেব।

—আপনি কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখছেন?

এই প্রশ্নে তিনি বললেন—তখনকার দিনের চেয়ে এখন বেশী নাটক হয়। তখন পয়সা পাওয়া যেত না, এখন পয়সা পাওয়া যায়। তখনকার দিনে একাংক নাটক ছিল না কে বলে? তবে তোমরা মনে কর রিভলভিং ষ্টেজ মানে কি না কি! মূঢ়রা বোঝে না যে, রিভলভিং ষ্টেজ মানে—ছোট ষ্টেজ। শিশির বাবু এই সময়ে হাত দু'টি সুন্দর করে কেমন ছোট দেখালেন।

নাটকের উপযোগী নয়, অথচ সাজাহান, টিপু সুলতান, এই দু'টো নাটক অভিনয় হয়। সব চেয়ে মজা ১৮৮০ সালে যে নাট্য প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব ছিল আজ তারা এমন অভিনয় করছে যে নাটকটির মধ্যে নাটকীয় পদার্থ কিছু নেই। বিশটা চরিত্র আর বিরাট ব্যাপার নিয়ে অভিনয় হয় না, তবু তাই হচ্ছে।

শিশির বাবু বললেন—তোমাদের নতুন করে কি আর বলব, সবই তো পুরনো কথা। অন্য দেশে যে রিভলভিং ষ্টেজ নেই তা বলছি না। তাড়াতাড়ি এবং বিশেষ কোন দৃশ্যের জন্য মঞ্চ ঘোরান প্রয়োজন হয়, কিন্তু তা নিয়ে সর্বসর্বদা কাজে লাগানো কোথাও হয় না।

একটি কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি। শিশির বাবু একবার বললেন—আজকাল সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না কেন জানো? তাতে দেশের কথা নেই বলে।

আমরা তো পূর্বেই কথা বন্ধ করে বসেছিলুম এবার নাট্যাচার্য নিজে একেবারে থেমে গেলেন।

ভাবলুম আমরা আসব জেনে আমাদের জন্য বরাদ্দ যতগুলি কথা ছিল তা তিনি সবই নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

শিশির বাবু উঠে পড়লেন। বললেন—এখন তাহলে উঠি?

আমাদের উঠে পড়তে দেখে তিনি বললেন—আবার এসো, কল্যাণ হোক।

অতি অল্পক্ষণ বড় জোর আধ ঘণ্টা প্রবল প্রতিভাধর মানুষটির সান্নিধ্য পেয়েছিলুম কিন্তু সেই স্মৃতিটুকু এমনই বৈচিত্র্যময় আমি তো নয়ই, অজিতও কোন দিন ভুলতে পারবে কি না সন্দেহ!

৮ই যে গিয়েছিলাম মহাজাতি সদনে। সেদিন ভাবতেই পারিনি আমাদের জন্য এক মর্মান্তিক সংবাদ প্রতীক্ষা করছে। সর্বজনপূজ্য মহান শিল্পী আমাদের প্রিয় নাট্যাচার্য সে দিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন মঞ্চের আঙিনায়। আমরা দেখেছিলাম আলমগীরকে। আজ ব্যথিত মর্মাহত। আলমগীর আর নেই শুধু তাঁর শূন্য সিংহাসন পড়ে আছে। কালের এ এক করুণ বিচার!
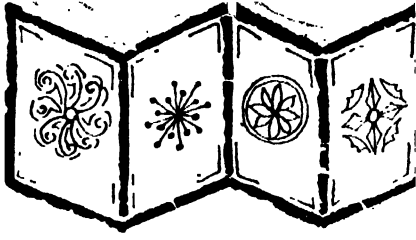
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেন মহাকবিযুগলের পত্র-বিনিময়

Rangoon, 11 York Road.

ভাই গিরীশ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬।

২০ বৎসর বয়সে পলাশীর যুদ্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি সিরাজদ্দৌলা লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন পলাশীর যুদ্ধ লিখি তখন সিরাজের শত্রুচিহ্নিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন।

আমি নব যুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোকসঙ্গীত প্রথম সংস্করণ পলাশীর যুদ্ধে দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কিনা বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।

তোমার গীতাবলীর সহিত তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহার একখণ্ডও পাঠাইতে গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম। এই সুদূর প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অদ্ভুত জীবন যেন সুখশান্তিতে শেষ হয়।

স্নেহাকাঙ্খী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

১৬ নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
৭ই মার্চ্চ ১৯০৬

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সহৃদয়েষু—
ভাইজী!

তোমার পত্র পেয়ে আমার পত্রের উত্তরের আনন্দে নয় সত্যই আনন্দ হয়েছে। তার বিশেষ কারণ, যখন তোমার সঙ্গে হামেশা দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল তখন তোমার প্রতি আমার যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আমি ভুলিতে পারি নাই, কিন্তু যখন বহুদিন তোমার কোন সংবাদ পেলেম না, আর কোথায় আছ, তাহাও জানতেম না তখন আমার মনোভাব আমি আপনি বুঝতে পারলুম। আমি অনেক দিন হ'তে মনে করি যে আমার ছন্দের সম্বন্ধে তোমার সহিত একটা বাদানুবাদ করব কিন্তু আমার স্বভাব কাল যা করলে হয়, আজ তা করব না। এ রকম প্রকৃতির লোকের কাল বড় শীঘ্র হয় না। আমার মনোগত ইচ্ছা সাহিত্য সম্বন্ধে এই দূর হতে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই, কিন্তু কতদূর হয়ে উঠবে ঈশ্বর জানেন। তুমি আমার সিরাজদ্দৌলার প্রশংসা করেছ, আমি তোমার একটি প্রশংসা করি, তোমার "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজদ্দৌলার চিত্র অন্তরূপ হলেও তোমার স্বদেশ-অনুরাগ ও সেই দুর্দান্ত সিরাজদ্দৌলার প্রতি অসীম দয়া রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ পায়। আমার ধারণা, অনেক দেশানুরাগী লেখকের তুমি আদর্শ। আমার উপর তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা, এ আমার গুণে নয়, এ আমি সম্পূর্ণ বুঝি তুমি তোমার মাহাত্ম্য! লেখা ও ব্যবহারে তুমি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। তোমার পত্রখানি আমি সকলকে দেখাই, তারা আনন্দ করে কিনা জানি না। কিন্তু আমার বড় আনন্দ হয়।

তুমি আমার বই কিনে পড়েছ; আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'তে তুমি জানো, আমি একটা 'বাউণ্ডুলে' তুমি আপনার গুণে আমায় ক্ষমা কর। কেমন আছ? পরিবারবর্গ কেমন? উত্তরে আমায় সংবাদ দিও। আমি হাঁপানিতে ভুগছি। ঈশ্বরের কৃপায় যদি আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার মনে হচ্ছে তিন দিনেও তোমার সঙ্গে আমার কথা ফুরোবে না। তুমি জানো কি না জানি না, আমার বন্ধুবান্ধব বড় কম, সে অন্য কারো দোষে নয়, আমার দোষে। আমি মনে মনে তোমায় পরম বন্ধু বলিয়া জানি। এ পত্রখানি আমার হাতের লেখা নয়, আমার হাতের লেখা পত্র আমি না পড়ে দিলে মানুষের সাধ্য নাই যে পড়ে। যার হস্তাক্ষর সে আমার সন্তানের তুল্য। আমার সঙ্গে বসে লেখে। আমি যে যে কথা বললুম, তাহা আমার অন্তরের কথা, এই লেখকই তার সাক্ষী। আমি সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় তোমার সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু যে কটাক্ষ করেছেন—তারই প্রতিবাদ লিখছিলেম কিন্তু এই লেখকই আমায় নিবৃত্ত করে। এর নাম অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অবিনাশ আমায় একটি উপদেশ দিলে; বললে—মশাই স্বভাবকবির "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য আর সিরাজদ্দৌলার ওকালতি দুইটিতে বিস্তর প্রভেদ, আপনি সে সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে কাব্যের সম্মান বৃদ্ধি না করে, ওকালতির সম্মানই বেশী বাড়াবেন।

আমার "পলাশীর যুদ্ধ" সম্বন্ধে বক্তব্য ছিল, যা ইতিপূর্ব্বে বললেম—তোমার সিরাজের প্রতি স্নেহ ও তোমার দেশানুরাগ। শ্রীমান্ নিখিলনাথ রায় ও সমাজপতি আমার এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আজ রাত হয়েছে শুইগে। শরীরটে বড় ভালো নয়। ছন্দ নিয়ে একটা বাদানুবাদ করব শাসিয়ে রাখলুম। কাজ এ বাউণ্ডুলে দ্বারা কতদূর হবে তা ঈশ্বরকে মালুম। ইতি।

স্নেহপ্রাপ্ত
গিরিশ

Rangoon, York Road,
২৩শে মার্চ ১৯০৬

ভাই গিরিশ,

তোমার ৭ই মার্চের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি যেরূপ ভোলানাথ তুমি যে আমার পত্রের উত্তর দিবে, আমি কখনো মনে করিয়াছিলাম না। অতএব এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমার ধন্যবাদ বলিব কি? তাহার অর্থ তো বুঝি না, আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর।

পৌরাণিক কাল বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব এখন কলিকাত-রেঙ্গুনের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়া তোমার ছন্দ সম্বন্ধে একটা লড়াই চলিবে কি না বড় সন্দেহের কথা। আমি একজন চিররোগী। শীঘ্র যে কলিকাতা যাইব, সে আশা নাই। তুমিও কলিকাতার রঙ্গালয়ের রঙ্গপূর্ণ বৃহৎ উদরটি লইয়া সমুদ্রের এপারে আসিবে তাহাও অসম্ভব। আমার বোধ হয় এ জীবনে তুমি 'মহারাষ্ট্র পরিখা'র বাহিরে, কলিকাতার পাঁচ রকমের আনন্দ ও পাঁচ রকমের দুর্গন্ধ ছাড়িয়া কখনও যাও নাই। যদি একবার মহারাষ্ট্র দুর্গের বাহিরে এই ব্রহ্মদেশে আসিয়া যুদ্ধ দাও, তবে একবার ছন্দ লইয়া যুদ্ধ করি, ব্রহ্মদেশ প্রকৃতই Land of Pagodas and Palms দেখিবার যোগ্যস্থান। তোমাকে একবার এখানে পাইলে তালা চাবি দিয়া দুই মাস বন্ধ করিয়া রাখিয়া একখানি নাটক লিখাইয়া লই। আমার বিশ্বাস, রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভার পূর্ণ স্ফূর্তি হইতেছে না।

কেবল সিরাজদ্দৌলা নহে, তোমার যখন বহি বাহির হয়, আমি তাহা কিনিয়া আনিয়া আগ্রহের সহিত পড়ি। শুনিয়াছি, অনেক "সাহিত্যসিংহ" অন্যের লেখা বাঙলা বহি পড়েন না। কেবল নিজের বহিই পড়েন। অনেকের বহির পাঠকও বোধ হয় নিজে গ্রন্থকার। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র লোক, আমার সে বড়মানুষী নাই। তোমার "গীতাবলী"র একখণ্ড আনাইয়া তোমার জীবনীটি পড়িলাম। ঠিক কথা, তোমার বন্ধুবান্ধব বড় কম। তুমি পীঠস্থান কলিকাতায় এক জীবন বলিদান করিলে। কিন্তু কলিকাতায় অল্পলোকেই বোধ হয় তোমাকে চিনে ও আমার মত তোমায় শ্রদ্ধা করে।

সুরেশের (সমাজপতি) দ্বারা অক্ষয় বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন ঐরূপ ভাবে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বা চওড়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—তিনি লিখিয়াছিলেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম মার্সম্যান্। তথাপি বাঙালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছিলাম অক্ষয় বাবু তাহার পর আমাকে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র ছাপাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে পলাশীর যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিষচক্ষে পড়িয়া এক জীবনে অশেষ দুর্গতিভোগ করিয়াছি। পত্রখানি ছাপাইলে আমার আরও দুর্গতি বাড়িবে মাত্র।

ভাল, আমার কুরুক্ষেত্রখানি কি তুমি অভিনয় করাইতে পার না? তাহার যাত্রা হইয়া তো শুনিতেছি কলিকাতা ও সমস্ত বঙ্গদেশ কাঁদাইতেছে।

হাতের লেখা সম্বন্ধে আমিও তোমার কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার বিয়া হইত না।

ভরসা করি এখন ভালো আছ। গীতাবলীর ছবিতে দেখিলাম যে শরীরটি একেবারে খোয়াইয়াছ এবং মূর্তিখানি গণেশের মত করিয়া তুলিয়াছ। এখন কোন নূতন খেয়াল লইয়া নিজে নাচিবার ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টায় আছ।

অমৃতবাবুকে ২ খানি পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই। দেখা হইলে বলিও। ভায়া, বোধ হয় এখন স্বদেশী রসের রসিক।

তোমারই
নবীন

১৩ নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
২৩শে এপ্রিল ১৯০৬

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সমীপেষু
ভাইজী,

তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ "মীরকাসিম" লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। "কুরুক্ষেত্র" ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না। সুন্দর নাটক হয় নিশ্চয়, কিন্তু এখন ভেসে যাবে। এখনো স্বদেশের মৌখিক অনুরাগ খুব উচ্চ। যতদূর নাটক হোক বা না হোক, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের এইরূপ মৌখিক ঝাঁঝ এখন সাধারণের প্রিয়। মহাভারতের যেরূপ প্রকৃত ব্যাখ্যা তোমার কুরুক্ষেত্রে হয়েছে, তা যদি সাধারণে বুঝতে পারত, তাহলে প্রকৃত নীতিশিক্ষা ও কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান শুরু হোত। বুঝতো ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যতীত উপায় নেই। সময় ঘুরচে—মহাভারতের দিন সত্বর ফিরবে। কাব্যখানি নাটকাকারে পরিণত করার ইচ্ছা আমার রহিল। দু'টি প্রশ্নের উত্তর হ'ল। দেহের অবস্থা নিজ দেহের অবস্থায় অনুভব করো।

তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করবো যুদ্ধ আর কিছু নয়, গৈরিশী ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ, "গৈরিশী ছন্দ" বলে যে একটা উপহাস আছে তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবন্ধ ব্যতীত আমরা ভাবা কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও, ভাবা কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্যে ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক কোন ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী লঘু ত্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাঙলায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমনই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয় যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্ত্তা, সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা যাউক কোন ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হইয়া অধিকাংশ কথা হয়।

"দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বাঝিয়াছে করী।"

লঘু ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক সময় মিলিত হয়।

"বিরস বদন রাণীর নিকট যায়।"

এ সওয়ায় পয়ার লঘু ত্রিপদীর এক-এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ

পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এস্থলে নাটকের চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময় সময় সরল যতি থাকে না!

"বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।"

এরূপ হাস্যোসাই হবে। বাঙলাভাষার ক্রিয়া "হইয়াছিল", প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নেই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চ স্বরে সহজেই উঠবে। সে সুবিধা চৌদ্দর কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময়ে তার প্রয়োজন। তাই তো পাতনামা করিলাম। যদি তুমি দুই-এক ঘা তীর ছাড়, আমিও দু-একটা কাটান তীর ছাড়ব। তবে যদি তোমার ফুরসৎ না হয়, শরীর ভালো না থাকে, যুদ্ধে আহ্বান করি না। "আম গেলে আমসি, যৌবন গেলে কাঁদতে বসি।" যতদিন তোমার সঙ্গ করা অনায়াসসাধ্য ছিল ততদিন তা উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন এই দূরদেশ ব্যবধানে কথা কইতে ইচ্ছা করে। তোমার তো পত্র লিখতে ক্লান্তি নেই। যদি মাঝে মাঝে লেখ, শোবার সময়ে পাঠ করে শুতে যাই। তোমার সমস্ত কুশল সংবাদ প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
গিরিশ।
১৩ নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।
২০শে জুলাই, ১৯০৬

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

ভায়া,

তুমি আমার যুদ্ধের আহ্বান ঠিক বুঝতে পারো নাই। যুদ্ধে আপোষে অস্ত্র পরীক্ষা করবার আমার ছিল, হারজিতের প্রতি কখনো আমি লক্ষ্য রাখি নাই। যাই হোক, তোমার শরীর অসুস্থ এ সম্বন্ধে কথার আর প্রয়োজন নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আস্তে আস্তে সময়ানুসারে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিলে ভাষার কোন না কোন উপকার হইতে পারে। এই তো যুদ্ধের কথা।

সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনও আছি। মীরকাসিম লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, এখন আবার পরের কাজে পড়িয়াছি। "মীরকাসিম" সম্বন্ধে বাজারে সুখ্যাতি শুনিতে পাইতেছি। আর যে কয় রাত্রি অভিনয় হইয়াছে, লোকেরও যথেষ্ট ভীড়। ব্রাহ্মরা পর্যন্ত সন্তুষ্ট। এ আমার সামান্য ভাগ্য নহে। আমার ছেলে দানী, মীরকাসিমের অংশ লইয়াছিলাম, তাহার সুখ্যাতি একবাক্যে।

মীরকাসিম ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি, তবে কতদিনে প্রুফ দেখিয়া উঠিতে পারিব, তাহা আমার আমীরী মেজাজের উপর নির্ভর। তুমি তো জান "Never do to day what you can put off till tomorrow"—আমার মটো। এইতে যতদিনে ছাপা হয়। তবে অবিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক তার কল্যাণে নেহাৎ আমীরীতে চলবে না। মীরকাসিম ছাপা হইলেই আমার 'বলিদান' ও 'বাসবের' (বিক্রমাদিত্য) সহিত পাঠিয়ে দিব।

আমি তো হাঁপে ভুগছি। তোমায় কোন বন্ধু আশ্রয় করেছে? আমার এক দানীর কথা বললুম, আর তো কারো কথা বলবার খুঁজে পাই না। তোমার পরিবারবর্গ ছেলেপুলের আনুপূর্বিক সংবাদ লিখবে। সকলের শুভ-সংবাদ শুনলে মনটা একটু খুশী হবে, ভাববো, যা হোক একটা বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু শান্তিতে কাটায়। বোধ হয় বুঝতে পেরেছ যে, এ পত্রের লৌকিক উত্তর নয়। বন্ধুবান্ধব তো বেশী নাই—এ একজনের সঙ্গে তবু কথা কই। কবিগিরি—কাজটা কি বুঝলে? আমি কি বুঝিছি বলি—একটু দৃষ্টি খোলে তাতে একটু আনন্দও আছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি খুলে আপনার পেটের ময়লা দেখে ঘোর অশান্তি হয়। মনে হয়, বুড়ো হলুম, তবু স্বভাব শুধরোলো না। ইতি—

স্নেহাস্পদ
গিরিশ

Rangoon, 11 York Road,
"Palm Grove", ২৭।৮।০৬

ভাই গিরিশ,

তোমার ২০এ জুলাইয়ের পত্র পাইয়াছি। আমি কিছু অসুস্থ ছিলাম। তুমিও মীরকাসিম লইয়া ব্যস্ত, তাই এতদিন উত্তর লিখি নাই। সংবাদপত্রেও দেখিতেছি যে, মীরকাসিমের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে। তুমি ক্ষণজন্মা লোক, এই বয়সেও যেন তোমার প্রতিভা দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমার অনুরোধ, তুমি সাত দিনে এমন না করিয়া, কিছু বেশী দিন সময় লইয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্ম্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকুরী-বিভ্রাট, উকীলি-ডাক্তারি-বিভ্রাট, বিচারবিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি Comico-tragic নাটক লিখিয়া দেশরক্ষা কর। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনটা স্থায়ী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে যে স্বদেশ লইয়া কাঁদিয়াছি, এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাহা শুনিয়াছেন এবং দেশের হৃদয়ে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি যেরূপ স্থায়ী ও বর্দ্ধিত করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। নীলদর্পণের মত এই একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে। উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অভিনীত হইয়া দেশে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্ম্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবনব্রত উদ্‌যাপন কর। তুমি এই বহিখানিতে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গদ্যের সহিত চালাইবে। আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যতদূর পারি তোমার উচ্চ রচনায় আমি সাহায্য করিব। আমার অনুরোধটা রক্ষা করিবে কি? আমরা এরূপ পেড়াপেড়ির দরুণ বঙ্কিম বাবু আনন্দমঠ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃতফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপূজায় সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।

দানীবাবাজীর মীরকাসিমের অভিনয় এত ভালো হইয়াছে

শুনিয়াছি, বড় সুখী হইলাম। বাবাজীর অভিনয় দেখিয়া বহুপূর্ব্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম যে অভিনয়ে বাবাজী পিতার যোগ্যপুত্র হইবেন।

আমার আর ছেলেপুলে কি? যদিও শ্রীভগবান একটি ক্ষুদ্র সৈন্যের প্রতিপালনভার আমি দরিদ্রের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন আর উহাই আমার জীবনের এক সান্ত্বনা—আমার নিজের এক সন্তান মাত্র। নির্ম্মলকে তুমি কলিকাতায় বড় ভালোবাসিতে এবং তাহার গানের প্রশংসা করিতে। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে এক বৎসর কলিকাতায় শিক্ষানবিশী করিয়া, নির্ম্মল এখানে ব্যবসায় করিতে গত বৎসর আসে। আমিও Extension of service অস্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে এখানে আসি। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে—নির্ম্মল প্রথম মাসেই ১২০০ টাকা পায় এবং এই দেড় বৎসর যাবৎ তাহার আয় ১২০০৲ হইতে ২০০০৲। তাহার মাসিক ব্যয়ই প্রায় ১৫০০৲। তাহার এই আশাতীত কৃতকার্য্যতা শ্রীভগবানের কৃপা, আমার পিতার পুণ্যফল। শ্রীভগবানের অসীম দয়ায় আমার পিতৃত্ব ঘুচিয়া এখন দ্বিতীয় পুত্রত্ব অবস্থা। কি আশ্চর্য্য, এই মাত্র ৪ বৎসরের বড় নাতনী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল—"তাতা, তাতা, এই গ্রন্থাবলী নেও"—দেখিলাম—"গিরিশ গ্রন্থাবলী।" স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

York Road, Rangoon

১২।১০।০৬

ভাই গিরিশ,

তুমি এই নির্ব্বাসিতের সপ্রেম বিজয়ার আলিঙ্গন গ্রহণ করিও। বাড়ীতে পূজা, কিন্তু পুত্র দুইটি বড় মকর্দ্দমায় আবদ্ধ হওয়াতে এ বৎসর বাড়ী যাইতে পারি নাই। পূজা—এই নির্ব্বাণের দেশে নিরাপদে কাটাইয়াছি। ইহার মধ্যে আনন্দ যাহা—তোমার পাঁচখানি নাটক পূজার উপহার পাইয়া অনুভব করিয়াছি। কিন্তু এ অপব্যয় কেন? তুমি তো মহাপুরুষ কখনো আমাকে তোমার কোন বহি উপহার পাঠাও নাই। আমি বরাবর তোমার যখন যে বহি বাহির হইয়াছে কিনিয়া পড়িয়াছি। আমিও কখনো তোমাকে উপহার পাঠাই নাই, কারণ তুমি পড়িবে না। যাক মীরকাসিম নূতন পড়িলাম। অন্য বহি সকল আর একবার এই নিরানন্দের সময় পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। 'ভ্রান্তি' ও 'বলিদান' আমার বড়ই ভালো লাগিল। 'স্বর্ণলতা'র পূর্ব্বে কি পরে হতভাগিনী বাঙলার অধঃপতনের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর দেখি নাই। একজন 'রুদ্রসেন' নাম দিয়া সেক্সপীয়রের ওথেলোর অনুবাদ করিয়াছেন। তুমি উহা একবার পড়িয়া দেখিবে কি? ভরসা করি তাহাতে তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তোমার অমিত্রছন্দের তারতম্য কি বুঝিতে পারিবে।

মীরকাসিমও সিরাজদ্দৌলার সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইল। তবে মীরকাসিমের প্রস্তাবনা (plot) অধিকতর জটিল। ভাল, ইঁহারা উভয় যে এরূপ দেবচরিত্র ও দেশহিতৈষী (Angel and Patriot) ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি কিছু থাকে সে সকল একটা পরিশিষ্টে দিলে ভালো হয়।

উপহারের সঙ্গে তোমার কোন পত্র পাই নাই। ভরসা করি, তাহার কারণ শারীরিক অসুস্থতা নহে। আবার কি কোন নাটকী নেশায় পড়িয়াছ?

তোমার ভ্রান্তি নাটকের ফটোটাও কি ভ্রান্তি? এক-একটা ফটো যেন নিতান্ত ভ্রান্তিই বোধ হইল। আপনি মহাপুরুষ বলিয়া মূর্ত্তিটাও এক-এক সময়ে এক রকম হয়। স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

পুঃ—ফাউন্টেন পেনের কল্যাণে লেখাটাও আগাগোড়া তোমার ফটোর মত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিল। ক্ষমা করিও।

13 Bosepara Lane,
Calcutta
16th October 1906.

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন

ভায়া,

ঠিক ধরেছ, শরীরের অসুখের দরুণ পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। সহজ উত্তর সহজেই দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু তোমার ফরমাস সম্বন্ধে দু'কথা বলব ও দু'কথা জিগেস করব, এই জন্যেই শরীরের আরাম অপেক্ষা করছিলেম, সে অবধি আর সে আরাম পাই নাই। পুরীতে হাওয়া বদল করতে গেলেম, শয্যাগত হয়ে ফিরে এলেম। লাভের মধ্যে জগন্নাথ দর্শন হয়েছে। ব্যামো আমার পুরোনো কুটুম। হাঁপানি। পয়সা ব্যয় করে তার পরিচর্য্যা হচ্ছে।

নির্ম্মলের উন্নতিতে আমি আশ্চর্য্য হই নাই। তোমার টেবিলে আমার পাশে সেই বালককে এখনো আমি দেখছি। সে যে Mathematics তখন পারত না, তার মানে Drudgery করা তার স্বভাবসঙ্গত নয়। তোমায় বলা বাহুল্য Mathematics এর সার অংশ লইয়া আইনের তর্ক করিতে হয়। সে তর্কে অবশ্যই নির্ম্মল সম্পূর্ণ পটু হইয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে তাকে আশীর্ব্বাদ করলেম। তাকে জিজ্ঞাসা কোর এ বুড়োকে কি তার মনে আছে?

সাত সমুদ্র তেরো নদীর জল খেয়ে তুমি যে তোমার পুত্রের কল্যাণে এরূপ সুখী হয়েছে, এ তোমার বন্ধুমাত্রেরই আনন্দের বিষয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এ সুখ বুড়ো-বুড়ীতে অবাধে ভোগ কর। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করে এমন তাজা প্রাণ কি করে রেখেছে? আমার ধারণা সচরাচর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যে রূপ দেখি, তাদের সংসর্গে যদি পনেরো দিন বাস করতে হয় তা হলে পাগল হয়ে যাই। কোন কাজের কথা বলবার শক্তি নাই।

তোমার প্রস্তাবিত নাটক যদি ভগবান আমার দ্বারা লেখান আপনাকে ধন্য জ্ঞান করব। কিন্তু লেখবার আমি কতদূর যোগ্য, তা বিশেষ ভাবনার বিষয়।

তোমার বই যে আমি পড়ি না—এমত নয়। কিন্তু পড়ব পড়ব করে অনেক সময় পড়া হয় না। অনেক দেখলে শুনলে বটে কিন্তু আমার জোড়া আলসে-কুঁড়ে দেখেছ কি না সন্দেহ! পিঠে চাবুক না পড়লে আমি নড়বার বান্দা নই। তোমার পত্রের উত্তর লিখব কল্পনা করেছি, এমন সময় তোমার পত্রের উত্তর এল। সমুদ্র ব্যবধানে যদি মনে মনে কোলাকুলি হয়, তুমি নিশ্চয় জেন, সে কোলাকুলি হয়েছে। আর এক মজার কথা, আমার হাওয়া বদলাবার প্রয়োজন, তাই ভাবছিলাম, রেঙ্গুন যাব। অনেকেই যেতে পরামর্শ দেয়, তবে 'রাধা নাচবে কি না জানি না।' সকাল সকাল শুতে চললুম, প্রস্তাবিত নাটক সম্বন্ধে আমার অনেক কথা আছে, একটু সুস্থ হয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো। নমস্কার। স্নেহাকাঙ্ক্ষী

গিরিশ

১২

হে প্রাণপ্রিয়, আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, আমাকে আলিঙ্গন করো, নয়তো মর্দন করো পদতলে। নয়তো অদর্শনে রেখে মর্মাহত করো। হে প্রেমলম্পট, যা করলে তুমি সুখী হও, তাই করো নির্বিচারে। কেন না তোমার সুখই আমার একমাত্র কাম্য যেহেতু তুমিই আমার একমাত্র। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

যদি চিত্ত স্থির না হয়, নির্জিত না হয় তবে তপস্যায় কি দরকার? আর যদি চিত্ত হরিস্মরণে না মগ্ন হয় তবে চিত্ত স্থির হবে কি করে? আর যদি চিত্ত আর্দ্র না হয় তবে আর হরিস্মরণে প্রয়োজন কি? আর যদি কামনা ক্ষয় না হয় তা হলে চিত্তই বা আর্দ্র হবে কি দিয়ে?

বিদ্যা কি? হরিভক্তিই বিদ্যা। বেদাদিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের নাম বিদ্যা নয়।

কীর্তি কি? ভগবৎপরায়ণ বলে খ্যাতির নামই কীর্তি। দান বা সেবা থেকে যে খ্যাতি তা কীর্তি নয়।

শ্রী কি? কৃষ্ণপ্রেমই শ্রী। ভূয়িষ্ঠ ধনজনগ্রামও বিত্ত নয়।

দুঃখ কি? ভক্তের বিরহই দুঃখ। হৃদ্‌ব্রণের যন্ত্রণাও দুঃখ নয়।

মুক্ত কে? ভক্তসামীপ্যে যার অবস্থিতি, প্রেমভক্তিতে যে প্রীতিমান, সিদ্ধদেহের প্রতি যার আস্থা, হরিনাম শুনে যার চিত্ত সরসদ্রব, সে।

গান করবে কি? ব্রজকেলি।

এই বিশ্বে শ্রেয় কি? সাধুসঙ্গ।

স্মরণীয় কি? নাম।

অনুধ্যেয় কি? শ্রীকৃষ্ণচরণ।

স্থেয় কি? তার মানে, বাস করবে কোথায়? ব্রজধামে।

শ্রবণের আনন্দী কি? বৃন্দাবনলীলা।

উপাস্য কে? রাধাকৃষ্ণ।

বলো বলো, আরো বলো। রসে যারা অনভিজ্ঞ তারা নির্বাণ বিল্বফল চুষুক, আমরা রসতত্ত্ববিদ, আমরা কেন তা করতে যাব? মদনমন্থরা গোপরামা নয়নাঞ্চলে যে শ্যামামৃত পান করেছে, আমরা তার অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করব।

ষোল বছর বয়স, গঙ্গাদাসের টোল ছেড়ে নিজে টোল খুলল নিমাই। নিজের বাড়িতে জায়গা নেই, মুকুন্দসঞ্জয়কে ধরল। তোমার চণ্ডীমণ্ডপ আছে, সেইখানে একটু স্থান দাও না, একটা বিদ্যার মন্দির তুলি।

নবদ্বীপে কত বড়-বড় পণ্ডিতের টোল, এই কোমলকান্ত কিশোরের স্পর্ধা কি নতুন টোল চালাবে। তবু, কি জানি কেন, রাজি হল মুকুন্দসঞ্জয়। যিনি ধন দিয়েছেন তিনি যদি আমার গৃহে বিদ্যার সমাজ বসান আমি তো কৃতকৃতার্থ।

'আমার ছেলেরাও কিন্তু পড়বে।' আবদার করল মুকুন্দ।

'তা আর বলতে।' সায় দিল নিমাই।

কিন্তু শিখবে কি? লোকে দেখবে, শাস্ত্র আর ব্যাকরণ, কিন্তু, প্রস্তরের নিচে নির্ঝর, শিখবে আসলে ভক্তির মধুরিমা।

ভগবান একই বস্তু কিন্তু জ্ঞানী যোগী আর ভক্ত — তিন জনের তিন রকম অনুভব। একজন আম দেখল, আরেকজন আম শুঁকল, তৃতীয় ব্যক্তি আম খেল। সব চেয়ে বেশি জিতল কে? নিঃসন্দেহ, তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তিই ভক্ত।

জ্ঞানী অনুভব করে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে, যোগী অনুভব করে ভগবানের অংশস্বরূপ পরমাত্মাকে আর ভক্ত অনুভব করে ভগবানের সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ বিগ্রহস্বরূপকে। নির্বিশেষ ব্রহ্মে রূপ নেই লীলা নেই বিলাস নেই। পরমাত্মায় রূপ আছে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে লীলাও আছে কিন্তু জীব সম্বন্ধে সে নিস্পৃহ, উদাসীন, সাক্ষিমাত্র। কিন্তু ভক্তের ভগবানে জীব লীলাবিনোদ বৈচিত্র্য, অখণ্ড

আনন্দঘন আস্বাদ। ভক্তের অনুভাব ভিতরেও ভগবান বাইরেও ভগবান জানে।

জ্ঞানীর কাছে দুধ শুধু শাদা, যোগীর কাছে দুধ শাদা আর তরল, কিন্তু ভক্তের কাছে দুধ শাদা, তরল আর মধুর।

তোমার কাছে পড়া মানে কৃষ্ণসেবার পাঠ নেওয়া। কৃষ্ণসেবার জন্যে যে বেগবতী বলবতী বাসনা তার নামই প্রেম 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' প্রিয়ের প্রীতিবিধানই প্রিয়োপাসনার তাৎপর্য। যদি প্রিয়ের কাছে নিজের জন্যে কিছু চাই তা প্রিয়ত্বপরিপন্থী। তা হলে তা প্রিয়ের জন্যে সাধন নয় নিজের জন্যে প্রসাধন। 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।' যারা মোক্ষ চায় তাদের কি কৃষ্ণে মমতা আছে? মমত্ববুদ্ধি ছাড়া প্রেম কোথায়? তুমি আমার আপন জন অনুভাব এই তীব্রতা না এলে তোমাকে ভালোবাসি কি করে? তুমি আমার সখা। তাই তো আমি তোমার কাঁধে চড়ি, চড়তে সাহস পাই, মুখের ফল মিষ্টি লাগলে সেই উচ্ছিষ্ট ফলই খাইয়ে দিই তোমাকে। তারপর তোমাকে যখন গোপালরূপে বাৎসল্য করি তখন তোমাকে তাড়ন-ভর্ৎসন করতেও ছাড়ি না। তারপর আবার তোমার সঙ্গে মধুর হই। আর এই মাধুর্যেই আমার আস্বাদের আধিক্য। উজ্জ্বলতম সমৃদ্ধি। জ্ঞানে-যোগে কামে-মোক্ষে এই সমৃদ্ধি কোথায়? তাই মধুমত্তম রসই হচ্ছে প্রেম।

বনমালী ঘটক শচী দেবীকে এসে বললে, 'ছেলের এবার বিয়ে দাও।'

'না, না, ছেলের এখন বিয়ে কি!' শচী দেবী কথা মোটে গায়ে মাখলেন না: 'ছেলে আমার আরো বড় হোক, বিদ্বান হোক।'

বনমালী বললে, 'যে পাত্রীর সন্ধান এনেছি তার জুড়ি তুমি পাবে না নবদ্বীপে।'

শচী দেবী তবু কান পাতলেন না।

'বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী। একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। রূপে-শীলে কুলে-মানে অদ্বিতীয়া। নিমাইয়ের সঙ্গে অপরূপ মানাবে।'

তবুও প্রশ্রয় দিচ্ছেন না শচী।

রাস্তায় নিমাইয়ের সঙ্গে বনমালীর দেখা। নিমাই শুধোল: 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'তোমাদের বাড়িতে।'

'কেন, কি ব্যাপার?'

'তোমার মাকে তোমার বিয়ের কথা বলতে। হাতে একটা খুব ভালো সম্বন্ধ ছিল তার হদিস দিতে।'

'তা মা কি বলল?' মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

'শ্রদ্ধা করে কথাই কইলনা। উড়িয়ে দিল এক-বাক্যে।'

গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে নিমাই মাকে জিগগেস করলে, 'বনমালী আচার্যকে ফিরিয়ে দিয়েছ কেন?'

এ কী ইঙ্গিত! উৎফুল্ল চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'হাঁ, আমি তো এখন গৃহস্থ। তাই আমার গৃহধর্ম পালন করা উচিত।' নিমাই বললে, 'আর গৃহিণী ছাড়া গৃহধর্ম কোথায়?'

বনমালীকে ডেকে পাঠালেন শচী দেবী। বনমালী বল্লভ মিশ্রকে খবর দিলে।

বল্লভ লাফিয়ে উঠল। 'সেই পরম পণ্ডিত সর্ব-গুণের সাগর বিশ্বম্ভর আমার জামাই হবে? কিন্তু বনমালী, আমি যে নির্ধন, পাঁচটি হরীতকীর বেশী যে আমি দিতে পারবনা।'

'দিতে হবেনা তোমাকে।'

গঙ্গায় যাচ্ছে লক্ষ্মী আর টোল থেকে ফিরছে নিমাই, পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মুহূর্তে 'পূর্বসিদ্ধ ভাব' মনে পড়ে গেল দুজনের। নিমাই শ্রীকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মী। আর তাদের স্বাভাবিক ভাব কান্তাভাব। 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' ব্রজের প্রীতিই কেবলা প্রীতি। কান্তাভাবের সেবা প্রেমানুগা। তাতে আছে নিষ্ঠা, পরিচর্যা, মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তা, গৌরববুদ্ধির হীনতা, নির্বিচার অনুগতি। কান্তাভাবেই মধুরতার সর্বাতিশয়।

শুভদিনে গোধূলিসময়ে বিয়ে হল। চারদিকে 'দেহ-দেহ' রব পড়ে গেল। পড়ে গেল হরিধ্বনি। গন্ধে মাল্যে চন্দনে কজ্জলে উজ্জ্বল হয়ে বসল দুজনে। কেউ বললে, হর-গৌরী, কেউ বললে রতি-মদন, কেউ বা শচী-ইন্দ্র। কেউ বা রাম-সীতা, কেউ বা রাধা-মাধব, কেউ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ।

মা-শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। যিনি লক্ষ্মীর ধব বা পতি তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ বিদ্যা। বিদ্যা বা সরস্বতীর যিনি পতি তিনিই মাধব। লক্ষ্মীর মত সরস্বতীও বিষ্ণুর পত্নী। শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যার নাম

মধুবিদ্যা। যে বিদ্যায় আনন্দচিন্ময়রসের আস্বাদন করা যায় তা মধুবিদ্যা নয় তো কি। মধুবিদ্যায় যিনি অবগম্য তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ, ধী, বুদ্ধি। যিনি মৌনের সাহায্যে বুদ্ধির ধবন বা দূরীকরণ করেন তিনিই মাধব। অর্থাৎ স্বল্পফলদায়ী কর্ম থেকে যিনি জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন তিনিই মাধব। ধব-শব্দের আরেক অর্থ বস্ত্র। বস্ত্র শরীরকে আচ্ছাদন করেই শরীরের শোভা বিস্তার করে। তেমনি যিনি মা-কে বা শ্রীরাধাকে ঢেকে রেখেছেন আলিঙ্গনে, সেই নিত্য লীলাপরায়ণ শ্যামসুন্দরই মাধব। মা-শব্দের অর্থ হ্লাদিনী বা আনন্দিনী শক্তি। সেই শক্তিই শ্রীমতী।

মুখে করবে মাধবের নাম, মনে করবে মাধবের ধ্যান আর সকল কাজে স্মরণ করবে মাধবকে। মাধবই পরমানন্দ, তাকেই বন্দনা করো—তাঁরই কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু যায় গিরিলঙ্ঘনে। তিল-তুলসী দিয়ে এই দেহ মাধবকে উৎসর্গ করে দাও আর বলো, হে মাধব, তোমাকে বার বার মিনতি করছি, তোমার দয়া যেন আমাকে না ছাড়ে।

আর নারায়ণ কে?

নর থেকে উদ্ভূত বলে নার। তাই নার অর্থ জীবসমূহ। অয়ন অর্থ আশ্রয়। সমগ্র জীবসমূহের আশ্রয় বা আলয় বলে নারায়ণ। নার-শব্দের আরেক অর্থ জল। জলে অর্থাৎ কারণ-জলে অবস্থান করেন বলেও নারায়ণ। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। অধীশ, অখিললোকসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণই সর্বধাম—জগদ্ধাম। অনাদিরাদি-র্গোবিন্দ, সর্বাশ্রয়, সর্বকারণকারণ। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও আদি, নারায়ণেরও মূল, নারায়ণেরও অবতারী। নিখিল শক্তির অধিষ্ঠানই শ্রীকৃষ্ণ।

গোবিন্দ কে?

গো অর্থ গরু, গো অর্থ পৃথিবী, গো অর্থ ইন্দ্রিয়। আর বিন্দ ধাতুর অর্থ পালন। যিনি গো-পালন করেন তিনিই গোবিন্দ। বিশ্বের পালনকর্তা বলেও গোবিন্দ। সর্বইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলেও গোবিন্দ। পরিকরবর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে আনন্দে পালন বা পোষণ করেন বলেও গোবিন্দ।

শচীর গৃহ পদ্মগন্ধে ভরে উঠল, দূরে গেল দারিদ্র্যের মালিন্য। আনন্দের বিদ্যুৎ খেলতে লাগল অন্ধকারে। বুঝি কমলা এসেছে দীনের আলয়ে। দীন কে? নিরুপম লাবণ্যের আহ্লাদমূর্তি নিমাই, মেঘমালিন্যের লেশমাত্র নেই। কোটি কন্দর্পের রূপকেও যেন হার মানিয়েছে। ব্যক্ত হয়েও যে ব্যক্ত নয় তাকে বোঝে এমন শক্তি কার? নিমাই নিজেকে জানাচ্ছে না বলে লক্ষ্মীও মুখ ঝেঁপে আছে। না জানালে জানে এমন সাধ্য কার? যার প্রতি কৃপা হবে শুধু সেই পাবে জানবার অধিকার। 'যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে।'

বিদ্যারসে কখনো নিমাইয়ের পরিহাস কখনো বা অটল নিটোল গাম্ভীর্য। নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত নেই যে দুদণ্ড তার টোলে এসে না বসে, শুনে না যায় তার আখ্যান-ব্যাখ্যান। বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিখ্যাত কেউ উপেক্ষা করতে পারে না নিমাইকে। সাহস নেই কোথাও দন্তস্ফুট করে। বিদ্যার নিশ্ছিদ্র স্তম্ভ। কিন্তু যখন বিদ্যার আসনে নেই তখন চাপল্য-তারল্যের প্রতিমূর্তি। শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গায় লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে, কখনো বা রাজপথে ছুটোছুটি করছে। এত বড় পণ্ডিত, আর অধ্যাপক, তার এ কী লঘু-চিত্ততা! কে কার কথা শোনে! গালমন্দ করলেও নিমাই চটে না। বরং উল্টে সে নিজেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, বিশেষত যাদের বাড়ি শ্রীহট্ট, যাদের কথায় পূর্বাঞ্চলের টান। আর নবদ্বীপে শ্রীহট্টের লোক তো কিছু কম নয়।

'তুমি যে ঠাট্টা করো তোমার বাড়ি কোন জেলায়?' শ্রীহট্টীরা পালটা আক্রমণ করে।

প্রশ্ন শুনে আবার নিমাইয়ের পরিহাস।

লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে শ্রীহট্টীরা, নিমাই ছুট দেয়। সাধ্য কি তার সঙ্গে পাল্লা দেয় কেউ। অনুপায় হয়ে শ্রীহট্টীরা আর্জি করে দেওয়ানে। তদন্তে দারোগা-পেয়াদা আসে, কিন্তু তারাও নিমাইয়ের পক্ষ হয়ে হাসে। বলে, এ আবার একটা মামলার বিষয় নাকি?

কিন্তু এত বিদ্যায়ই বা হল কি, কি বা হল এত সারল্যের ভূমিকায়?

কৃষ্ণরস কই?

'হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ॥'

কৃষ্ণই সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয়, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তার কথা কই?

সাধন-ভক্তির থেকেই রতির উদয়, সেই সাধন-ভক্তি

কোথায় ? শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠানই সাধন-ভক্তির অঙ্গ, তাও ত দেখি না। ও সব অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হলে রতির আবির্ভাব। রতি গাঢ় হলেই প্রেম। যাতে চিত্ত স্নিগ্ধ হয়, কৃষ্ণে আত্যন্তিকী মমতা জন্মে রতির সেই প্রগাঢ়তাই প্রেম। প্রেম যখন চিত্তকে দ্রবীভূত করে তখন তা স্নেহ। স্নেহে ক্ষণকালিক বিচ্ছেদও সহনাতীত। স্নেহ থেকে মান। মাধুর্যকে নবীনতর আস্বাদ করবার চেষ্টায় যখন অদাক্ষিণ্য ধারণ করে তখন তা মান। মান যদি বিশ্বাস করে যে প্রিয়জন এই অদাক্ষিণ্য মোচন করবেই তখনই তা প্রণয়। প্রণয় থেকে রাগ। মিলনের আশায় যখন দুঃখ ও সুখ বলে অনুভূত হবে তখনই তা রাগ। রাগের বৃদ্ধি অনুরাগ। প্রিয়জনকে যখন বারে-বারে নিত্য-নতুন বলে আস্বাদ হবে, প্রতি দর্শনেই সে অভূতপূর্ব, তখনই অনুরাগ। অনুরাগে সমস্ত চিত্ত যখন বিভোর, টইটুম্বুর, তখনই তা ভাব। আর ভাবের পরমকাষ্ঠা মহাভাব।

এসব লক্ষণ কোথায় নিমাইয়ে ?

মুকুন্দ দত্ত কেমন কৃষ্ণগীত গাইছে। যে শুনছে সেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাঁদছে কেউ হাসছে কেউ বা উদ্দাম নৃত্য করছে। কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ বা হুঙ্কার করে মালসাট মারছে, কেউ বা মুকুন্দের দু'পা ধরে লুটিয়ে পড়ছে। ওসব কিছুতেই যেন নিমাইয়ের মনোযোগ নেই। মুকুন্দ তার সহপাঠী, পথে দেখা হলেই তার সঙ্গে শুধু ব্যাকরণের তর্ক চালায় নিমাই। যে অদ্বৈতসভায় মুকুন্দের গান হচ্ছে তার ধার দিয়েও সে হাঁটে না। শ্রীবাস পণ্ডিত যার শ্রবণে কীর্তনে আনন্দ, যে নিজের ঘরে কীর্তন করে ও শ্রবণ করে গিয়ে অদ্বৈতসভায় তার সঙ্গে দেখা হলেও নিমাই শাস্ত্রের ধাঁধা জিগগেস করে, জিগগেস করে ব্যাকরণের ফাঁকি। কৃষ্ণকথা মুখেও আনেনা। সবাই কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে উৎসুক কিন্তু নিমাইয়ের কাছে কেবল ভাষাতত্ত্বের কচকচি। এই মিথ্যা বাক্যে কারু রুচি নেই। ঐ 'ফাঁকি' আসছে রে, দূর থেকে নিমাইকে দেখে সকলে কেটে পড়ে।

একদিন অমনি পালিয়ে যাচ্ছিল মুকুন্দ।

'ও আমাকে দেখে পালায় কেন ?' পাশের লোককে জিগগেস করল নিমাই।

'গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে বোধ হয়,' বললে পার্শ্ববর্তী।

'ওদিকে গঙ্গা কোথায় ?'

'তবে বোধ হয় অন্যত্র কাজ আছে।'

'না, না, আমাকে দেখে পালাচ্ছে।' বললে নিমাই, 'দেখা হলে আমি শাস্ত্র-ব্যাকরণ বলব কৃষ্ণকথা বলবনা, তাই এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে। 'ওহে মুকুন্দ পণ্ডিত'—গলা তুলে হাঁক দিল নিমাই।

মুকুন্দ শুনেও শুনলনা, বেরিয়ে গেল হনহন করে।

'আমার থেকে পালিয়ে পালিয়ে এমনি থাকবে কদ্দিন ?' মুকুন্দের উদ্দেশে হেঁকে বললে নিমাই, 'কদিন পর এমন বাঁধনে বাঁধব ছেড়ে যেতে পথ পাবে না। দেখবে বৈষ্ণব কাকে বলে। দেখবে এ বৈষ্ণবের ঘরের দরজায় "অজ ভব" দাঁড়িয়ে আছেন পাহারায়। দেখবে—'

যারা শুনল তারা রুষ্ট হল নিমাইয়ের উপর। কী স্পর্ধা, ব্রহ্মা আর শিবকে দ্বারস্থ করে! দেবদেবী মানেনা নিমাই। নিমাই নাস্তিক।

শ্রীবাসেরও সেই আক্ষেপ। আহা, নিমাই যদি বৈষ্ণব হত কত সুখের হত। বিদ্যার নেশাই ওর কাল হল। বিদ্যার তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই ওর কাছে লোভনীয় হল না। এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু সারশস্যশূন্য, কৃষ্ণে রতি নেই একবিন্দু। 'মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি। কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥' সকলে মনে মনে প্রার্থনা করে, হে কৃষ্ণ, নিমাই অধ্যয়ন ছেড়ে তোমার রসে মত্ত হোক, নিরবধি প্রেমভাবে ভজনা করুক তোমার। 'কেহো বলে, হেন রূপ হেন বিদ্যা যার। না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার॥'

সমস্ত নদীয়া তখন ধন-পুত্ররসে মত্ত, কিন্তু শ্রীবাস আর তার তিন ভাই—শ্রীরাম, শ্রীপতি আর শ্রীনিধি—রাতে নিজগৃহে উচ্চস্বরে কীর্তন করে একত্র। কীর্তনের গোলমালে পাষণ্ডীরা ঘুমুতে পারে না। বাপু, ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কৃষ্ণনাম করলে হয়না, প্রমত্ত হয়ে নাচতে কাঁদতে লাফাতে-ঝাঁপাতে হবে ? দাঁড়াও, তোমাদের বাড়ীঘর গঙ্গায় টেনে নিয়ে ফেলব, সবংশে তাড়িয়ে দেব নবদ্বীপ থেকে।

জীবের কৃষ্ণহীনতা দেখে বুক ফেটে যায় শ্রীবাসের। দীনদয়ার্দ্র নাথ, কবে আসবে তুমি, কবে জাগবে তুমি, অলোককাতর আমরা, কবে দেখব তোমাকে ?

একদিন পথের মধ্যে নিমাইয়ের সঙ্গে শ্রীবাসের দেখা। সশিষ্য চলেছে হন-হন করে। শ্রীবাসকে

দেখে নিমাই দ্রুত একটা নমস্কার করল। শ্রীবাস বললে, 'কি হে উদ্ধতের চূড়ামণি, চলেছ কোথায় ?'

নিমাই কোনো উত্তর দিলনা। মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

শ্রীবাস বললে, 'কি ছার বিদ্যার লোভে দিন কাটাচ্ছ ? বিদ্যায় কি হবে যদি কৃষ্ণভক্তি না হয় ? 'পড়ে কেন লোক—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে।' কত্তই তো পড়লে কিন্তু পেলে কী ? যদি কিছু পেতে চাও তো কৃষ্ণভজন শুরু করো। 'ডেকে সর্বথা ব্যর্থ না গোঙাও কাল। পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।'

নিমাই দাঁড়াল না। চলে যেতে যেতে বললে, 'পণ্ডিত ধৈর্য ধরো, তোমার কৃপায় তাও নিশ্চয়ই হবে একদিন।'

তারপর সেদিন আবার গদাধরের সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা।

গদাধর পালিয়ে যাচ্ছিল, নিমাই ছুটে গিয়ে তার দুহাত চেপে ধরল। 'কি হে পণ্ডিত, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যাও। মুক্তির লক্ষণ কাকে বলে ?'

কিছু না বলেও ছাড়ান নেই। আমতা-আমতা করতে লাগল গদাধর। বললে, 'আত্যন্তিক দুঃখ-নাশই মুক্তির লক্ষণ।'

আর যায় কোথা। নিমাই গদাধরকে পেড়ে ধরল। ব্যাখ্যার এমন সব দোষ ধরতে লাগল যে গদাধরের সাধ্য নেই তা খণ্ডন করে। সাধ্য নেই ধূলিজালের মধ্য থেকে মুক্তির পথ দেখে।

'বাবা, পালাতে পারলে বাঁচি।' মনের গোপনে মিনতি করতে লাগল গদাধর।

ছেড়ে দিল নিমাই। বললে, 'আজ ছেড়ে দিলাম বটে কিন্তু কাল আবার ধরব।'

সবাই অদ্বৈতসকাশে গিয়ে নালিশ করে, 'কই, তোমার কৃষ্ণ কই ?'

হুঙ্কার করে ওঠে অদ্বৈত। 'আসছে, আসছে, ধৈর্য ধরো, নদীয়া শহরেই আছে সে প্রচ্ছন্ন হয়ে। কী হয় দেখবে সকলে চোখ খুলে—দুই চোখে সে দেখা আর শেষে কুলিয়ে উঠবে না। 'করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর। তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥ আর দিন কথো গিয়া থাক ভাই সব। এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব॥'

পিতৃকার্য করে গয়া থেকে গৌরাঙ্গ যখন ফিরে এল তখন তার সর্ব অঙ্গে প্রেমবিকার। শচী মাতা মনে করলেন তার বায়ুরোগ হয়েছে, আত্মীয়-বন্ধুরাও তাঁকে সমর্থন করল। কেউ বললে, ডাব-নারকোলের জল খাওয়াও, কেউ বললে শিবাদি-ঘৃত মাখাও এবং কেউ বললে বেঁধে রাখো দড়ি দিয়ে। শ্রীবাসকে ডাকা হল—তোমার কী মনে হয় ?

তুলসী প্রদক্ষিণ করছে গৌরাঙ্গ। শ্রীবাসকে দেখে কাঁদতে লাগল গৌরাঙ্গ, কম্প আর রোমহর্ষ হতে লাগল সর্বাঙ্গে। শ্রীবাসকে নমস্কার করতে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে উদ্দেশ করে বললে, 'সবাই বলছে আমি বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছি, আমাকে বেঁধে রাখতে চাইছে। তুমি কী বুঝছ ?'

'তোমার শরীরে মহাভক্তিযোগের আবির্ভাব হয়েছে।' গদগদস্বরে বললে শ্রীবাস, 'মহাকৃষ্ণ-অনুগ্রহ।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গৌরাঙ্গ। বললে, 'তুমিও যদি বলতে আমার বায়ুরোগ হয়েছে তাহলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করতাম।'

'আহা, তোমার যেমন বাই তাহা আমি চাই।' শ্রীবাস বললে যুক্তকরে।

আর গদাধর ?

গদাধর ছায়ার মত ফিরতে লাগল গৌরের সঙ্গে। সেবায় ঢেলে দিল মন-প্রাণ। নীলাচলে এসেছেন মহাপ্রভু, সেখানেও গদাধর। নীলাচল ছেড়ে যাচ্ছেন বৃন্দাবন, গদাধরও সঙ্গ নিয়েছে।

বাধা দিলেন মহাপ্রভু। বললেন, 'গদাধর, তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস নিয়েছ, নিয়েছ টোটাগোপীনাথের সেবা। তোমার নীলাচল ছাড়া চলবে না।'

প্রভুর আদেশ কোনদিন লঙ্ঘন করেনা গদাধর, আজ কি হল কে জানে, বললে, 'না, থাকব না নীলাচলে, প্রভুহীন প্রাণহীন নীলাচলে। যাঁহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাক রসাতল॥'

'ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই।' প্রভু প্রবোধের সুরে বললেন, 'গোপীনাথের সেবা করবে কে ?'

'জানি না। তোমাকে দর্শনই আমার গোপীনাথের সেবা।'

'তুমি যদি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করো লোকে আমাকে নিন্দে করবে।' প্রভু বললেন অনুনয়ের সুরে, 'আমার উপর দোষ আসুক তুমি কি তাই চাও ?'

'সব দোষ আমার। যদি তুমি সঙ্গে না যাও
মি একা-একা চলে যাব।'

মহাপ্রভু সঙ্গে নিলেন না গদাধরকে। দলছাড়া
াধর একা-একা চলল।

ফটকে তাকে ডাকালেন মহাপ্রভু। বললেন,
তুমি শুধু নিজের সুখ চাও? আমার সুখ চাওনা?'

অশ্রুভরা চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর।

'বলো, আমি যাতে সুখী হই তা চাওনা তুমি?
ুমি নিজের সুখ চাও বলেই আমার সঙ্গে থাকতে চাও
হর্নিশ। যদি আমার সুখ চাইতে—'

গদাধর মাথা নত করে রইল।

'চাও আমার সুখ? যদি আমার সুখ চাও
নীলাচলে ফিরে যাও। আর কোনো কথা বোলো
না।' বলে মহাপ্রভু দ্রুতপায়ে নৌকোয় গিয়ে
উঠলেন।

নৌকো ছেড়ে দিল।

নৌকোর উদ্দেশে ছুটতে পারলনা গদাধর।
পা উঠলনা। ছিন্ন তরুর মত পড়ে গেল মূর্চ্ছিত
হয়ে।

[ক্রমশঃ।

নীল পাখি

জয়ন্তী সেন

কালকে সে এসেছিল—সেই পাখি যার ডানা নীল
অনেক সাগর ছেনে—অথবা সে আকাশের রঙ
জমাট মোমের মত জমা করে ডানার পালকে,
আমাদের ছোট মাঠে নীল পাখি এসেছিল কাল।
ঢেউ-এর ফেনার মত সাদা বুক—অথবা সে মেঘ,
সুখবতী মন কারো খেয়ালের স্রোতে ভেসে চলা
চোখের সুদূরে জ্বলে লাল তারা—ইসারার মত।
হয়তো কোথাও কোন দিশাহারা দ্বীপের জগতে
নীল ঢেউ ঘেরা মাটি, নীল ছায়া আকাশ ঝরানো
আলো দিয়ে নীড় বেঁধে তার পর নূতন আবেগে
অনেক পৃথিবী ঘুরে আমাদের ছোট মাঠে এসে
সারা বেলা ইসারায় বলে গেল আলোর ঠিকানা—
যে আলোর অভিসারে তারা নিয়ে রাতের বিলাস।
আমার দু' হাতে তাকে ধরি নাই, মনের নদীতে
সুদূরের নীল ছায়া ঝরেছিল সোনালী বেলায়।
নিমেষের রূপকথা শেষ হলে হঠাৎ আকাশ
হারানো শিশুর মত টেনে নিল আদরের হাতে।
দিন কাটে তারপর—ছোট মাঠে সকাল দুপুর
বিকেলের রেশটুকু জলে আর কত বার নেবে।
তবু স্মরণের পাতা বার বার খুলে কত ভাবি
কালকে সে এসেছিল—সেই পাখি, যার ডানা নীল।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বাঙলা তথা ভারতের গর্ব ও গৌরব বিশ্ববন্দিত
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে
তাঁর একখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ'ল। চিত্রখানি বিখ্যাত
সাহিত্যিক শ্রীপরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত।
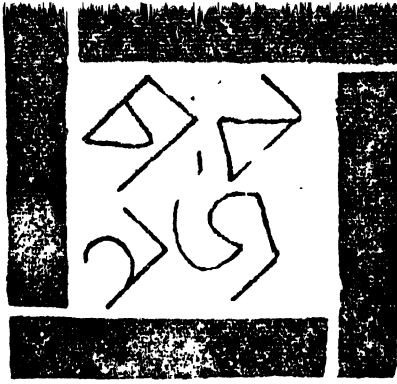
ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত

(প্রখ্যাত হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ)

ছাত্রজীবনে আর্থিক অনটন সত্ত্বেও সুপ্রসন্ন ভাগ্য তদুপরি গভীর আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই অল্প সময়ের ব্যবধানে এনে দিল নাম, যশঃ, অর্থ ও পশার। ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্তর সম্বন্ধেই এই কথাগুলি বলছি।

বরিশাল জিলার গৈলা নিবাসী ৺উমাচরণ গুপ্ত ও ফুলশ্রী গ্রামের কন্যা ৺আসমানতারা দেবীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠতম যোগেশচন্দ্র ১৯০২ সালের ১৭ই নভেম্বর স্বগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন বড়লাটের খাস দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে বাবা উমাচরণ ছিলেন অন্যতম। ঐ সময়ে বাবার সঙ্গে উত্তর-ভারতের সিমলা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ঘুরে তিনি উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত করেন। যোগেশচন্দ্র গৈলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৯২০ সালে প্রবেশিকা ও কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে ১৯২২ সালে আই, এস, সি পাশ করেন। অর্থাভাবের জন্য কলেজ পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারেন নি এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে পাঠাভ্যাস করেছেন। পরে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (আর, জি, কর) ভর্ত্তি হন এবং ১৯২৮ সালে সসম্মানে এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে 'হাউস-ফিজিসিয়ান' এর পরে রেজিষ্ট্রারের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি বেঙ্গল ইম্যুনিটিতে কর্ম্মপ্রার্থী হন, এবং সেখানকার অন্যতম পরিচালক ও তাঁহার অধ্যাপক ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু চাকুরীর জন্য চেষ্টিত হন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যোগেশচন্দ্রকে নিরাশ হইতে হয়। ইতিমধ্যে পথে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ জ্যোতিষী একদিন ডাঃ গুপ্তকে ডেকে বলেন যে, তিনি তিন মাসের মধ্যে বিদেশে যাবেন—তিন বছর পরে ফিরিয়া ক্রমশঃ পশার জমিয়ে তুলতে পারবেন আর বর্ত্তমানে চাকুরী পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ভাগ্যের পরিহাস মনে করেই যোগেশচন্দ্র বৃদ্ধের কথাগুলি অগ্রাহ্য করেন। কয়েক দিন পরে বন্ধু ডাঃ গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় জার্মাণী থেকে সেখানকার Deutche Akademie-তে বৃত্তিলাভের জন্য তাঁহাকে একটি আবেদনপত্র পাঠাইতে লিখেন। আবেদন পাওয়া মাত্র আকাডেমী রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজী, সি, ভি, রমণের একটি সার্টিফিকেট অবিলম্বে পাঠাতে অনুরোধ করেন। মহাসমস্যা উপস্থিত হল—কারণ চার জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গেও কোন পরিচয় যোগেশচন্দ্রের ছিল না। একদিন সাহসে ভর করে তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সার্টিফিকেট পান "I know Dr. B. M. Gupta, the brother of Dr. J. C. Gupta". ঐ প্রশংসাপত্রই তাঁকে এনে দিল উক্ত আকাডেমী থেকে জার্ম্মাণ সরকারের বৃত্তি। সেই সময় ৺ডাঃ তারক দাস ভারতীয় ছাত্রদের সুযোগ সুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত

১৯৩১ সালের আগষ্টে তিনি জার্ম্মাণী পৌঁছান এবং অক্টোবর মাস হইতে কোলোন (KOLN) বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, কিন্তু সেখানকার সরকারী হিসাব বিভাগ তাঁহার বৃত্তি পাওয়া সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর Kuske সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে Guest-Professor করে দেন। কয়েক মাস পরে অবশ্য তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়া হয়। সেখানে প্রথম বছরে তিনি Prof. Eppingerর অধীনে Medical Clinic & Pharmacology Instt.এ ও দ্বিতীয় বছরে সম্পূর্ণ কার্ডিওলজী শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরের বছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোত্তম রচনা হিসাবে ফার্ম্মাকলোজীর উপর ডক্টরেট পান। অধ্যাপক এপিনজারের আন্তরিক সাহায্য ও শিক্ষাদানের কথা ডাঃ গুপ্ত আজও সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেন। এই স্থানে থাকাকালীন অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি হাইডেলবার্গ, লিপজিগ, ও ব্যাডনাউহিম্-এ ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করেন। এই সময় জার্ম্মাণ জাতির ভাগ্যবিধাতারূপে হিটলারের অভ্যুদয় হয়। ফলে হিটলারের তিনটি আদেশ ডাঃ যোগেশচন্দ্রের উপরও জারী

...রা হল—(১) ইহুদী সহকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করায় ইন-...রেক্টর অধ্যাপক Epingerকে সদলে চাকুরী ছাড়তে হয়—(২) ...প্রতিষ্ঠিত Vinisection সরকারী আদেশে বন্ধ করা হয়—(৩) Winter Hilpe" (গরীবদের জন্য প্রথম রবিবার উপবাস) আদেশ ...ড়েন। বিদেশাগত শিক্ষার্থী হিসাবে ডাঃ গুপ্ত রেহাই পান। ...ক্ষা শেষে তিনি য়ুরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করে ১৯৩৪ ...লে দেশে ফিরিয়া আসেন। ডাঃ রায়ের পরামর্শানুযায়ী তিনি ...রমাইকেল কলেজে বিনা বেতনে জেনারেল মেডিসিন ও Stomach Juice পরীক্ষা করিতে থাকেন। এ ছাড়া তিনি মধ্য ...লিকাতায় নিজস্ব চিকিৎসালয় খোলেন। কিছুকাল পরে ডাঃ ...প্তের তোলা একটি রোগীর ইলেক্ট্রো ক্যার্ডিওগ্রাম সম্বন্ধে ...র্দেশ ডেনহাম হোয়াইট ও অধ্যাপক V. R. Vrehodge বিরূপ ...ন্তব্য করেন। আইনজ্ঞের পত্র পাইয়া Prof. Vrehodge ডাঃ ...প্তের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তদানীন্তন ছোটলাটের ...দেশ নিয়ে ১৯৩৬ সালে শৈলেশ চন্দ্রকে মেডিকেল কলেজের ...ধ্যাপক হিসাবে নূতন পদে গ্রহণ করেন। নানা অসুবিধার ...ধ্যে সেখানে দু' বছর থাকেন। ১৯৪০ সালে আর, জি, কর ...লেজে কার্ডিওলজী বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন ও ...সেখান থেকে ১৯৫৫ সালে পি, জি, (বর্ত্তমানে S.S.K.M.) ...াসপাতালে Director of Cardiology রূপে যুক্ত হন।

১৯৩০ সালে তিনি শ্রীমতী আশালতা দেবীকে বিবাহ করেন। ...শালতা ৮তটিনী দাশ ছিলেন ডাঃ গুপ্তের খুড়তত বোন।

পিয়ানো বাজান ও খেলাধুলা দেখা তাঁহার অবসর বিনোদনের উপায়-বিশেষ।

শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী

[কলিকাতা পুলিশের সদর কার্য্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার]

লোকে ভাবে এক আর হয় এক। যিনি একদিন রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতেন, ঘটনাচক্রে দেশের আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের কঠোর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হ'লো প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই। স্বাধীন নাগরিকদের ধনসম্পত্তি মান ও প্রাণরক্ষা কল্পেই যিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন আজও নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা না করে, তাঁকে ঠিক সাধারণ পর্য্যায়ে ফেলতে পারি না। স্বাধীন রাষ্ট্রে পুলিশ জনসাধারণের সেবকমাত্র। এ উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের ভিত্তিতে যিনি পুলিশ বাহিনীকে গড়ে তুলতে চাইছেন এবং একে রূপায়িত করছেন প্রতিদিনের কার্য্যে ও প্রচেষ্টায়, এমনি একজন পুলিশ অফিসার হচ্ছেন কলিকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার্স-এর ডেপুটি কমিশনার শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী।

যাঁকে কলেজ-জীবনে একদিন বৃটিশের হাজতে যেতে হয়েছিল সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার অভিযোগে এবং এজন্যে বৃটিশ আই-বিদের প্রধান কার্য্যালয়ে তিন দিন হাজত বাস করতে হয়েছিল (অবশ্য তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী বি, এম সেনের প্রচেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত বৃত্তি বন্ধ হয়নি), তাঁকেই যে একদিন আবার পুলিশ বিভাগে চাকরি গ্রহণ করতে হবে, বোধ হয় শ্রীবাগচী কখনও স্বপ্নেও এ ভাবেন নি, একেই বলে অদৃষ্ট। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার হয়ে পুলিশ বিভাগে চাকুরী গ্রহণ খুব সম্ভব এরও প্রথম পথ প্রদর্শক বিষ্ণু বাবুই। সাধারণতঃ ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যাপক সমাজ আশা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার হ'লে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্ততঃ অধ্যাপক কিম্বা অধ্যক্ষ হয়ে তিনি শিক্ষা বিভাগের উন্নতি বিধান করবেন কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর জীবনে হয়েছে ব্যতিক্রম।

শ্রীবাগচীর জীবনে মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগ এসেছিল। নোয়াখালীর নারকীয় দাঙ্গার অব্যবহিত পরে সাহায্য ও উদ্ধারকার্য্যের সহায়তা করবার জন্য তৎকালীন লীগ সরকার তাঁকে নোয়াখালীতে নিযুক্ত করেন। শ্রীবাগচী দিনের পর দিন নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সঙ্গে অতিবাহিত করেন। মহাত্মা গান্ধী বাগচীকে খুব স্নেহ করতেন। আজ একথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানি না কিন্তু এই নোয়াখালী দাঙ্গার কার্য্যের সময় শ্রীবাগচীর সরকারী চাকুরী যাবার উপক্রম হয়েছিল। এ সময় তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকার সাহায্য ও উদ্ধারকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

অবিভক্ত বাঙ্গালার প্রধানমন্ত্রী তখন ক'লকাতা হত্যাকাণ্ডের নায়ক কুখ্যাত শহীদ সরাবর্দ্দি সাহেব। মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে সেবারের মত শ্রীবাগচী লীগের মহিমায় শহীদ হ'তে পারলেন না। এবারে এই কর্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মদক্ষ পুলিশ অফিসারের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা পরিবেশন করা বা বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। শ্রীবাগচী একজন আদর্শ অফিসার।

শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী

১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই শ্রীবিভূপদ বাগচী তৎকালীন নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর থানা এলাকার আলমপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি বর্ত্তমানে পূর্ব্ব পাকিস্তানে পড়েছে। শ্রীবাগচীর আদিনিবাস নদীয়া জিলার করিমপুর থানা এলাকার দোগাছি গ্রামে। পিতা শিক্ষাবিদ শ্রীসত্যচরণ বাগচী। বহুকাল নদীয়া জিলার শিকারপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করে অবসর গ্রহণ করেছেন। শিশুকাল থেকেই শ্রীবাগচীর জীবনে তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেবের প্রভাব পড়ে। নদীয়া জিলার শিকারপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩০ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। তারপর ভর্ত্তি হলেন এসে রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে। সেখান থেকে ১৯৩২ সালে প্রথম বিভাগে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে শ্রীবাগচী চলে এলেন ক'লকাতায় এবং ভর্ত্তি হলেন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে বি-এ ক্লাসে। গণিতশাস্ত্রে অনার্স সহ ১৯৩৪ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে উত্তীর্ণ হন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯৩৬ সালে এম-এ পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এখানেই শ্রীবাগচীর কলেজীয় জীবন শেষ হ'লো। ১৯৩৮ সালে জুনিয়র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং সাবডেপুটির চাকুরী গ্রহণ করেন। তারপর অভিবক্ত বাঙ্গালার কয়েকটি স্থানে কার্য্য করে ১৯৪৬ সালে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে নোয়াখালীর নারকীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত পরে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্য ও উদ্ধারকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে কার্য্য করেন প্রায় এক বৎসর। এই সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু নেতার সংস্পর্শে আসেন। দিনের পর দিন শ্রীবাগচী নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে দাঙ্গাপীড়িত আর্ত্তজনগণের সেবা ও সাহায্য করেন নিরলস ভাবে। বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী হয়েও তিনি মানুষের যে কর্ত্তব্য তা বিস্মৃত হননি। মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালী সফরের সময় শ্রীবাগচী তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই দিনগুলির কথা শ্রীবাগচী আজিও স্মরণ করেন বিশেষ ভাবে। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবের সঙ্গে দিনের পর দিন অতিবাহিত করা সকলের ভাগ্যে হয়ে উঠে না। এদিক থেকে শ্রী বাগচী ভাগ্যবান—এ কথা অবশ্যই বলতে হবে।

তারপর দেশ বিভাগের পর শ্রীবাগচী চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে এবং ১৯৪৮ সালে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার হিসেবে যোগদান করলেন, 'রাইটার্স বিল্ডিংস'এ। তারপর পশ্চিম-বঙ্গের পুনর্ব্বাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিবের কার্য্যও তিনি কিছুদিন করেন। ১৯৪৯ সালে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং এসিষ্ট্যাণ্ট-সেক্রেটারী হিসাবে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন বিভাগে কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময় সর্ব্বভারতীয় চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ আসে শ্রীবাগচীর। তিনি ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের জন্য নির্ব্বাচিত হলেন ১৯৪৯ সালে এবং আবু মাউণ্ট শিক্ষা-শিবিরে ছয় মাস শিক্ষালাভ করেন। ১৯৫০ সালে চার মাস তিনি খড়্গপুরের মহকুমা পুলিশ অধিকর্ত্তা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মে মাস পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জিলার পুলিশ সুপার ছিলেন। তারপর চলে গেলেন দার্জ্জিলিং-এর পুলিশ-সুপার হয়ে। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত দার্জ্জিলিং-এ থেকে কলকাতায় চলে আসেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি-কমিশনার হ'য়ে এবং ১৯৫৮ সালের মে মাসে কলিকাতা পুলিশের সদর কার্য্যালয়ের ডেপুটি-কমিশনারের গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি তিনি কলিকাতার নাগরিকদের ধন, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার গুরু দায়িত্বভার বহন করে চলেছেন নিরলস ভাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীবাগচী সদালাপী, নিরহঙ্কার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত। "Plain living and high thinking"-এর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীবিভূচরণ বাগচী। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি যে ভাবে জীবন-যাপন করেন তা শিক্ষিত-সমাজে আদর্শস্থল এবং যুবকদের অনুপ্রেরণার একটি জলন্ত উদাহরণ। আমরা আশা করবো শ্রীবাগচী চিরদিনই যেন এমনিভাবে দেশের ও দশের সেবা করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

[অমৃতবাজার পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক]

শুনেছিলাম, মানুষটির মেজাজ নাকি সর্ব্বদা চড়া—মুখাবয়ব নাকি সব সময় গুরুগম্ভীর—আর হাস্য-পরিহাসের ধার দিয়েও নাকি যান না। এই মনোভাব নিয়েই কয়েক দিন পূর্ব্বে দেখা করি কলিকাতার উপকণ্ঠে গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে গৃহদেবতার মনোরম মন্দিরসহ আপন গৃহে সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। খানিকটা পরিচয়ের পরই প্রকাশ পেল নরম মেজাজের—সরল প্রকৃতির—রসবেত্তা সাংবাদিক ও অমৃতবাজার পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্বরূপ।

ফরিদপুর জেলার কালামৃধা গ্রামের ৺বামনচন্দ্র চৌধুরী ও শেরপুর জমিদারীর সেরেস্তাদার ৺গগনচন্দ্র রায়ের কন্যা স্বর্গগতা মনোরমা দেবীর বড় ছেলে রবীন্দ্রনারায়ণ ১৩১০ সালের ১৭ই শ্রাবণ স্বগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজে তিনি ভর্ত্তি হন। কিন্তু দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের জন্য ১৯২১ সালে কলেজ ছেড়ে দেশের কাজে লিপ্ত হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘর, বাবার বড় ছেলে—তাই শ্রীচৌধুরী স্থির করেন যে কলিকাতার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত National Medical School থেকে চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করে গ্রাম্য চিকিৎসক হবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর উপর পড়ল এক বিরাট সংসার প্রতিপালনের ভার, নিজের ছোট ছোট ভাইবোনেদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব। তাই পড়ার আগ্রহকে স্তিমিত রেখে চাকুরী খোঁজা আরম্ভ হল। ১৯২২ সালের ১১শে সেপ্টেম্বরে কুড়ি টাকা বেতনে অমৃতবাজার পত্রিকায় Copy Holder হলেন। তখন সম্পাদক ছিলেন ৺গোলাপলাল ঘোষ। কিছুদিন পরে হলেন প্রুফ রীডার—১৯২৪ সালে উক্ত পত্রিকার সহঃ-সম্পাদক। সেই সময় তাঁকে রিপোর্টারের কাজও করতে হয়েছে। ১৯৩৫ সালে কর্তৃপক্ষ

শ্রীচৌধুরীকে এক নূতন পদে বসালেন কর্মদক্ষতার প্রতিদানে—দীর্ঘ ২৫ বৎসর সুনিপুণভাবে সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন রবীন্দ্রনারায়ণ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকরূপে। বিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে সাংবাদিকতার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল রবীন্দ্রনারায়ণের মধ্যে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল তাঁর পরবর্তী জীবনে। ১৯২৩ সালে ফরওয়ার্ড কলেজের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সেখানকার কর্মাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যোগ দেন নাই। অমৃতবাজারে রাত্রে কাজ হওয়ায় দিনের অবসরে কর্মসংস্থানের জন্য ১৯২৪ সালের মধ্যেই তিনি "বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির"-এর স্বত্বাধিকারী পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষাৎকারে পঁচিশ টাকা বেতনে একটি পদ লাভ করেন। কিছুকালের মধ্যে সতীশ বাবু শ্রীচৌধুরীর দক্ষতায় তুষ্ট তাঁর বেতন কুড়ি টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে ইংরাজী "দৈনিক বসুমতী"র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ দেন, তখন শ্রীচৌধুরী "পত্রিকা"র কাজটি ছেড়ে দেন। ঐ বছর 'ফরওয়ার্ড' কাগজ পুনরায় তাঁকে আহ্বান করেন। ইতিমধ্যে রাত্রের কাজে অসুবিধা হওয়ায় 'পত্রিকা' কর্তৃপক্ষ পঁচাত্তর টাকা বেতনে রবীন্দ্রনারায়ণকে রাত্রিকালীন সম্পাদক হিসাবে পুনর্নিয়োগ করেন।

শ্রীচৌধুরীর কর্তব্যনিষ্ঠার একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। ১৯৩০ সালে নির্বাক ছবি দেখানোর মাঝখানে একটি শ্লাইড দেওয়া হল "Gandhi-Irwin Pact Signed." দর্শক রবীন্দ্রনারায়ণ তখুনি উঠে পড়লেন—বাগবাজারে কাগজের দপ্তরে পৌঁছলেন—সম্পাদক গোলাপলাল ঘোষকে জানালেন মনের কথা। পরদিন সোমবার, বন্ধের দিন—হঠাৎ পাঠকেরা পেলেন দু' পাতার 'পত্রিকা'—গান্ধী আরুইন চুক্তির কথা জানলেন। এতবড় খবর—পূর্ণ একদিন দেশের লোক জানতে পারবে না—সাংবাদিক রবীন্দ্রনারায়ণের চিন্তার বাইরে ছিল!

১৯৩৪ সালে তাঁরই উদ্যোগে 'পত্রিকা'র রবিবারের সাহিত্য-বিভাগ হল—পর পর এল শিশু-বিভাগ, মহিলা-বিভাগ, সিনেমা-বিভাগ, খেলাধূলার পাতা।

রবীন্দ্রনারায়ণ "মাসিক বসুমতী"র শুধু একজন পুরাতন অনুরাগী পাঠকই নন—"বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির"-এর স্মৃতিবিজড়িত বহু ছোট ছোট ঘটনার কথা আমায় বললেন তিনি—একজন ভূতপূর্ব কর্মী হিসাবে।

Life & work of J. M. Sengupta (বাজেয়াপ্ত), Ploughboy to President (V. J. Patel), Mahatma Gandhi & India struggle for Swaraj, Motilal Nehru প্রভৃতি পুস্তক সমূহ শ্রীচৌধুরী সঙ্কলন করেন।

১৩৩০ সালে ৺গিরিজাকুমার চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যলতা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। বাগান করা ও সব রকম পুস্তক পাঠের মধ্যে তিনি অবসর বিনোদন করেন। শেষে সাংবাদিক শ্রীচৌধুরী অনুযোগের সুরে বলেন, "আজ সাংবাদিকরা ঘড়ির কাঁটার কাজ পছন্দ করেন—কিন্তু প্রকৃত সাংবাদিক হলে হবে প্রতিটি
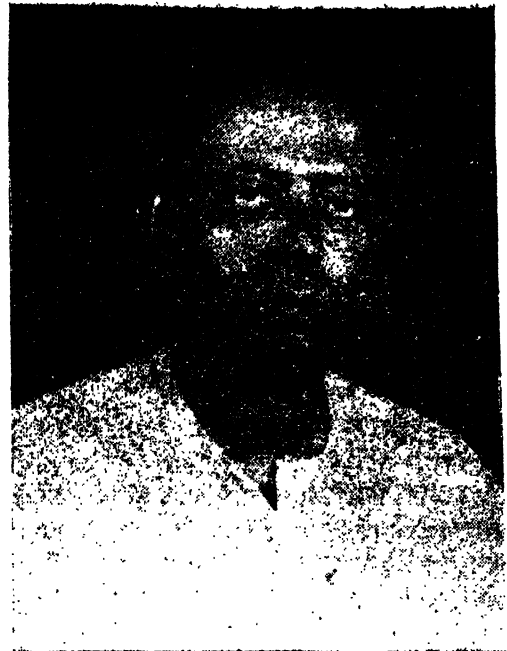
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

বিভাগের কাজ জানা—প্রচুর পড়াশুনা—আর নিজের সত্তাকে কর্তব্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। তাতে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র যুগপৎ হবে জনপ্রিয় ও লোকরঞ্জক।"

শ্রীআবদুস সাত্তার

[পশ্চিমবাঙলার বর্তমান শ্রমমন্ত্রী]

১৯১১ সালের ৩রা মার্চ বর্দ্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত টোলা গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে গ্রাম্য পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি লাভ করে বৈদ্যপুর হাইস্কুলে তিনি ভর্তি হলেন। ১৯২১ সালে দেশময় যে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হল বৈদ্যপুর গ্রামেও তার ঢেউ এসে পৌঁছুলো। ১০ বৎসরের কিশোর সাত্তারের প্রাণও সে খবরে উতলা হয়ে উঠলো; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন দেশের সেবা করবো। তখন থেকেই তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল বিভিন্ন স্বদেশী-সভায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় পরিষদের নির্বাচনে তাঁকে স্বরাজ্য দলের প্রার্থীর অনুকূলে কাজ করতে দেখা গেল। ১৯২৫ সালে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তিনি বর্দ্ধমানে ছুটলেন মহাত্মা গান্ধীকে দেখা ও তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে। আস্তে আস্তে তিনি স্বপ্ন করতে লাগলেন কি ভাবে দেশসেবা করবেন। ১৯২৬ সালে মেদিনীপুরের বন্যায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে বন্যার্ত্তদের সেবার জন্যে যে সঙ্কটত্রাণ সমিতি গঠিত হল, সাত্তার সাহেব নিজের অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে সমিতিকে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনকে বর্জ্জন করার জন্যে তিনি বৈদ্যপুরে একটি আন্দোলন সুসংগঠিত করে দেশকে তাঁর কর্মদক্ষতার কথা জানিয়ে দিলেন। ঐ বৎসরই বৈদ্যপুর স্কুল থেকে ম্যাট্রিক

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্দ্ধমান রাজকলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। কলেজে পড়াকালীন তিনি বর্দ্ধমানের কংগ্রেস নেতা শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার সান্নিধ্যে এলেন। ১৯৩০ সালে যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় সাত্তার সাহেব তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকেই সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

তাঁর তেজস্বিনী বক্তৃতায় ইংরেজ সরকার পর্য্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং সভা-সমিতিতে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করার জন্যে কালনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারী করলেন। কিন্তু তিনি মহকুমা শাসকের সে আদেশ মানলেন না, বৈদ্যপুর রাসতলায় শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি আইন অমান্য করে বক্তৃতা করায় গ্রেপ্তার হন। বিচারে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। সাত্তার সাহেব জরিমানা দিলেন না, ফলে তাঁর কারাদণ্ডের মেয়াদ হল আড়াই মাস। এর পর ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তাঁকে সাড়ে চার মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই জেলের ফটকের কাছে আবার তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হল, এবার কারাদণ্ডের মেয়াদ হল ৬ মাস।

১৯৩৫ সালে তিনি সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলেন এবং ১৯৪০ সালে কোলকাতার ল' কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমান আদালতে ওকালতিও করেন। '৩৫ সালে তিনি বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তারপর সভাপতিও নির্ব্বাচিত হন এবং ঐ পদেই আসীন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। '৩৫ সালে বর্দ্ধমান টাউন হলে স্যার নলিনী চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে ক্যানেল করের বিরুদ্ধে যে সভা হয়, তাতে সাত্তার সাহেব এমন বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে স্যার নাজিমুদ্দিন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্যার নাজিমুদ্দিন সাত্তার সাহেবের মতের পরিবর্ত্তনের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। দেশে যখন মুসলিম লীগের আধিপত্য তখনও সাত্তার সাহেব পাকিস্থান সৃষ্টির বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্রীআবদুস সাত্তার

সাত্তার সাহেব ১৯৩৭ সাল থেকে এ আই সি সির সভ্য নির্ব্বাচিত হয়ে আসছেন; '৪২ সালে বোম্বাইয়ে এ আই সি সির বৈঠকে যোগদান করে মহাদেব দেশাইয়ের শোকসভায় বক্তৃতা করার জন্যে বর্দ্ধমানে এলেন কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলো, বিচারে এক মাস জেল হল; কিন্তু নিরাপত্তা আইনে তাঁর জেলের মেয়াদ গিয়ে দাঁড়ালো ১৫ মাসে। কংগ্রেস যখন বৈধ হ'ল জেল থেকে ফিরে এসে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এই সময় থেকে বর্দ্ধমান জেলা বোর্ড, স্কুল বোর্ড এবং বহু স্থানীয় জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত হলেন। ১৯৫০ সালে অস্থায়ী পার্লামেন্টের তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে লোকসভায় কালনা-কাটোয়া কেন্দ্র থেকে নিকটতম প্রার্থীকে ২২ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্ব্বাচিত হলেন। '৫৭ সালের নির্ব্বাচনে তিনি কেতুগ্রাম কেন্দ্র থেকে বিধানসভার আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নিকটতম প্রার্থীকে ১১ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রমাণ করে দিলেন যে, কেন্দ্রের শতকরা ৭৫ জন হিন্দু তাঁদের কাছেও তিনি কত প্রিয়। তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী যে এই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রমমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ দলমত নির্বিশেষে সকলের জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। শ্রমমন্ত্রী হিসেবে তিনি মনে করেন—মেহনতী জনতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করাই তাঁর কাজ, কাজেই যে কোন শ্রমিক তিনি যে ইউনিয়নেরই অন্তর্ভুক্ত হোন না কেন, তার অভিযোগের প্রতিকার করতে তিনি বা তাঁর দপ্তর সকল সময়েই সচেষ্ট। শ্রমদপ্তরকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে তাঁর চেষ্টারও অন্ত নেই। শ্রমদপ্তর থেকে এখন 'লেবার গেজেট' 'শ্রমিক বার্ত্তা' প্রকাশিত হচ্ছে, শ্রমিক আইনগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। সাত্তার সাহেবের সভাপতিত্বে রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়েছে শুধু কলকারখানার শ্রমিক বা সওদাগরী অফিসসমূহের কর্ম্মচারীদের জন্যেই নয়, দোকান কর্ম্মচারী ও কৃষিশ্রমিকদের জন্যেও আজ আইন তৈরী হচ্ছে। শ্রমিক নেতা হিসেবে সাত্তার সাহেবের এক সময় যে খ্যাতি ছিল সে অভিজ্ঞতাকে তিনি এখন কাজে লাগাচ্ছেন।

সাংবাদিক হিসেবেও সাত্তার সাহেবের খ্যাতি কম নয়। ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত তিনি 'বর্দ্ধমান কথা' কাগজের সম্পাদক ছিলেন; তাঁর পরিচালনাধীনে 'বর্দ্ধমানবাণী' ও জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সাত্তার সাহেব বলেন, 'যে জনসেবার পথে পা দিয়েছি তাকে মনে করি আমি বৃন্দাবনের পথ, এ পথ শেষ না হাওয়া পর্য্যন্ত তাতেই আমি চলবো, এই পথে চলাতেই আমার আনন্দ।'

শেষ মুহূর্ত্তে শ্রমমন্ত্রী শ্রীসাত্তার 'মাসিক বসুমতী'র কথা তুললেন। বললেন পরিষ্কার—'মাসিক বসুমতী আমার কাছে খুব প্রিয়। আমি আগ্রহ নিয়ে বহু-প্রচারিত এ সাহিত্যপত্রটি নিয়মিত পড়ে থাকি। অবসর বিনোদনের প্রচুর খোরাক আমি এতে পাই এবং এই পত্রিকাটির আরও উন্নতি হবে, এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।'

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১১। [illegible] ক্রোধের ভণিতা করে ব্রজরাণী তখন কলাকৌশল সহকারে সমস্ত দড়িগুলিতে গিরো বাঁধলেন। একটি একটি করে প্রত্যেকটিতে। আগে জড়ানো দড়িটির সঙ্গে নূতন দড়িটিকে জুড়ে দিয়ে কৃষ্ণের কটিতটে যেই পাক দিয়ে গিরো বাঁধতে গেলেন ব্রজরাণী, অমনি গহনঘন এক আন্তর কৌতুকে বিলসিত হয়ে উঠল পল্লীবাসিনীদের হৃদয়। হরিণের মত বিলাসী চোখ করে তাঁরা হাসতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বালক-সখার দল বন্ধু-কৃষ্ণের কান্না দেখে যেই তাঁদের ঝক্‌ঝকে দাঁত চমকিয়ে সমবেদনার কান্না জুড়েছেন অমনি সকলে দেখলেন,···যত দড়ি কিন্তু সেই দু-আঙুল কম !!

ব্রজরাণীরও তখন দর্শনীয় দশা। তিনি পুনর্বন্ধনের উপায় চিন্তা করতে বসলেন। চিন্তার শ্বাসন-সমীরণেই যেন বেগে বেসামাল হতে লাগল তাঁর বক্ষঃস্থল, কিশলয়ের মত শ্রীঅঙ্গ থেকে ঝরে পড়তে লাগল শ্রমজলের শিশির, কবরীভার থেকে খসে পড়ল মালতীর মাল্য।

ব্রজরাণী বুঝতে পারলেন, এত রাগ দেখিয়েও তিনি কেবল ফল পেয়েছেন কপালের ঘাম, নিষ্ফল হয়েছে তাঁর সমস্ত প্রয়াস। তবুও উপায় চিন্তা করতে লাগলেন কৃষ্ণকে বাঁধবার।

এবার খেলার রাগ জ্বলেছে মায়ের মনে। অদ্ভুত শিশুটিকে পুনর্বার বাঁধতে গেলেন ব্রজরাণী।

আর আভীর-সুন্দরীরা ? কী সুন্দর তাঁদের ভ্রুকুর ভঙ্গিমা ! তাঁদের রাঙা-রাঙা চোখগুলি নীথর হয়ে গেল ; গলে গেল, ঝরে গেল ঘরের প্রতি তাঁদের মানসিক শ্রদ্ধা ; সমস্ত বিষয়ে পূর্ণলুপ্ত হয়ে গেল সংস্কার ; যেন বন্ধনরজ্জুশূন্য হয়ে গেল তাঁদের ভবনগুলিও।

১২। কেউ কি কখনও চৈতন্যকে বাঁধতে পেরেছেন ? না।

আনন্দকে ? না।

জ্ঞানকে ? না।

তেজঃকে (মহঃকে) না।

তাহলে ব্রজরাণীই বা কেমন করে বাঁধবেন চিদানন্দজ্ঞান মহোময় বপুখান্ ঐ তাঁকে ? তথাপি—যাঁর অন্তর নেই যাঁর বাহির নেই, অথচ যিনি আনন্দে ও তেজে অন্তরে বাহিরে সমান, যিনি পূর্ণ, যিনি অপরিচ্ছেদবান্ যাঁর পূর্ব্ব নেই, পর নেই ;—তাঁরি কৃপাশক্তি আজ বিজয়িনী হলেও ভাবতে লাগল, আহা মা কি আমায় কখনও বাঁধতে পারেন রাগ করে ?

১৩। তাই বন্ধন প্রসঙ্গে জননীর পরিশ্রমলুলিত অঙ্গখানি নিরীক্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সঞ্জাত হল করুণ-রস। ওরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে পারে দুটি গুণ, ভক্তের পরিশ্রম, ও নিজকৃপা, অন্যথা নেই। যতক্ষণ এই দুয়ের অনুৎপত্তি ঘটেছিল ততক্ষণ দু আঙুল কমই ছিল রজ্জু, কিন্তু সম্প্রতি দুটিরই যেই আবির্ভাব ঘটল, অমনি নন্দদুলাল স্বীকার করে নিলেন জননীর উত্তত পুনর্বন্ধন।

১৪। সিদ্ধার্থা হলেন ব্রজরাণী। সহচর বালকদের বললেন—আমি এখন আসি। তোমরা এঁকে দেখো। নিজে যেন নিজের বাঁধন কেটে না পালায়। যদি পালায়, আমায় ডেকো। আঙিনায় থেকে উঠে ঘরের ভিতর চলে গেলেন ব্রজরাণী। মা-ও গেলেন আর কৃষ্ণের চাঁদ-মুখ থেকে কলঙ্কের মত ক্রন্দনটিও মিলিয়ে গেল শূন্যে। এবং অতি প্রসন্ন মুখে বাণী বেরুল—মায়ের দেওয়া বাঁধন তবে আর এক কাজে লাগাই।

দূরে দাঁড়িয়েছিল দুটি তরুশ্রেষ্ঠ। কুবের-পুত্র 'নলকুবর' ও 'মণিগ্রীবের' তারা মূর্ত্তরূপ। ভগবানের পরমপ্রিয় ভক্ত নারদ যিনি একদা শাপচ্ছলে খণ্ডন করেছিলেন মদিরার বিক্ষেপ—সেই নীতি-প্রণেতা পরম যোগীন্দ্রের বচনামৃতকে সত্যসত্যই সত্য-প্রতীত করবার উদ্দেশ্যে এঁরা দু জনে লাভ করেছিলেন ঐ অভিশপ্ত তরু জন্ম।

হঠাৎ কৃষ্ণের খেয়াল হল, ঐ দুটি তরুকে তিনি অনুগ্রহ করবেন। অতএব হামাগুড়ি দিয়ে, ধীরে ধীরে উদূখলটিকে টানতে টানতে তিনি চলতে লাগলেন তরু দুটির দিকে।

১৫। পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন বালক-সহচরেরা।

বহু প্রাচীন তরু দুটির একটি মাত্র মূল, সদসতের মত ; পৃথক্ পৃথক্ দুটি কাণ্ড যেন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড ; সামবেদ যজুর্বেদের মত অজস্র তাদের শাখা ! ব্রজরাজের কীর্তি-প্রতাপের মত বহুদূর তাদের বিস্তার ; মহাসারবান যেন পাহাড় যেন মেঘ, মহাস্থূল ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাটের যেন বিগ্রহ। ভীমানুজ ও কার্ত্তবীর্য্যের একই অর্জ্জুন নামের মত এ দুটিরও নাম অর্জ্জুন। নকুল ও সহদেবের মত এ দুটিও যমজ।

সেই যমলার্জ্জুনের দিকে কৃষ্ণকে যেতে দেখে বালক-সহচরদের মনে দুলে উঠল সংশয়।

তবে কি কৃষ্ণের অসহ্য হয়ে উঠেছে রৌদ্রের তাপ, তাই আশ্রয় নিতে চলেছেন তরুমূলে ? বিতর্কের মধ্য পথেই স্ফার নেত্রে তাঁরা দেখতে পেলেন তরু দুটির মূলের মধ্যস্থলে উপবেশন করলেন কৃষ্ণ, তির্য্যক ভাবে স্থাপন করলেন উদূখলটিকে। তারপরে এতটুকুও আয়াস না করেই সেই খলনিহন্তা অপূর্ব চিত্রচরিত্র আশ্চর্য্য বালক নীচের দিকে লম্বা হয়ে ঝুঁকে পড়েছে যাঁর চূর্ণকুন্তল, অম্লান যাঁর শ্রীঅঙ্গের লাবণি, উদূখলের এক সংঘট্টনেই সমূলে উন্মূলিত করে ফেললেন যমলার্জ্জুন তরুদ্বয়কে।

১৬। কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করলে যেমন বাসনা ও পাপ···দুই-ই সমুন্মূলিত হয়ে যায় তেমনি হল সেই তরুদ্বয়ের দশা। মড়মড় করে লাফিয়ে উঠল এক দুর্দ্দান্ত ধ্বনি। সে ধ্বনিতে যেন নির্বাপিত হয়ে গেল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড-বিবরবর্ত্তী শব্দগ্রাম। প্রলয়মেঘ-নির্মুক্ত মহাবজ্রের ভৈরবরবের অনুকরণ করতে করতে ভেঙে পড়ল যমলার্জ্জুন !

দু' দুটো বিরাট মহীরুহের পতন হল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকে বালকসহচরেরা দেখতে পেলেন—দুটি গাছের মাঝখানে তিনি বসে রয়েছেন, পটরামে পূর্ববৎ বাঁধা রয়েছেন উদূখলে. বিরাট ভৈরব রবেও এতটুকু ঘটেনি তাঁর মানসিক উদ্বেগ, এতটুকুও চমকিত হন নি ভয়ে, মুখে হাসি, স্থির তাকিয়ে রয়েছেন তরুদ্বয়ের মূর্ত্তিমন্ত যুগল আত্মার মত, পরম তেজস্বী দুটি দিব্যপুরুষের দিকে।

এবং তারপরে তাঁরা অবাক হয়ে শুনলেন,—অভিশাপমুক্ত দিব্য পুরুষ দুটি স্তব করছেন তাঁদের নন্দদুলাল কৃষ্ণকে।

জগদ্বন্ধনমোচক হয়েও যিনি আজ বন্ধন স্বীকার করেছেন মাতৃবাৎসল্যের।

নিত্যমুক্ত হয়েও যিনি আজ বদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ হয়েও যিনি আজ ননীচুরির অপরাধে অপরাধী সেই তাঁদের নন্দদুলাল কৃষ্ণকে।

১৭। ধ্বনিত হয়ে উঠল স্তব,—

"জয় জয় সচ্চিদানন্দ-ঘন, ঘনঘটামেদুর, জয় হে জয় হে জয় হে!

হে দুরবগাহ লীলাময়, লীলার শ্রেষ্ঠ সাধন-পথে তুমি অবতরণ করেছ ধরাধামে। হে নব-নবীন, তোমার চাতুর্য-চটুল ভুজবল,··· সংগ্রামে ঘটিয়েছ দানবদের পরাভব। বেণ-বলের কণামাত্র দিয়ে তুমি উৎখাত করেছ মহান্ যমলার্জ্জুন।

হে অদ্বিতীয়, অসীম অশেষ তোমার কৃপা। হে কৃপণজন-বৎসল, সাধারণ মনুষ্যের মতই তুমি আজ ধরায় প্রকাশ করেছ ললিত-বিলাস। ব্রজপুরের তুমি মঙ্গলাবতার। তোমার আনন-আভায় ব্যথা পায় আকাশের চাঁদ। বিম্বফল ও বাঁধুলি ফুলের মত ঐ রুচির অধরের মাধুর্য্য ছড়িয়ে তুমি অলঙ্কৃত করে রেখেছ ধরাতল। অকারণ কৃপা-কৃপাণে তুমি অনাদি অবিদ্যার উচ্ছেদ করে দাও বলেই আনন্দিত হয়ে ওঠেন মতিমানেরা। বিষয়াতীত তোমার লীলা-সমুদ্র, সেথায় স্নান করে আত্মময়ী প্রজ্ঞা। যাঁরা পারমহংস্য পথের পথিক একমাত্র তাঁরাই চেনেন তোমার পায়ের পথটিকে। তোমার গুণগুলিকে কণ্ঠাভরণ করে রেখেছেন কমলাসন-শিতিকণ্ঠাদি দেবগণ।

হে গণনাতীত লোকোত্তরপ্রভাব! হে প্রভাবহুল! হে বহুললিতবিহার! যুগচতুষ্কে আপনিই অবতীর্ণ হয়েছেন অংশরূপে। আপনার নাম ও রূপ নক্ষত্রের মত অগণেয়। নির্মল যশোমহিমায় আপনি শুভ্রায়িত। আপনিই দান করেন বিশ্বের আকাঙ্ক্ষিত অভিমানের বিষয়গুলিকে। হে অখিললোকনাথ, হে প্রভু, নমস্তে, নমস্তে! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি ছাড়া আর কে রয়েছে, কোথায়? হে পরমপুরুষ, কে না ভোলে তোমার কুহকে? কার হৃদয় না আতুর হয়ে ওঠে তোমার দুর্ঘট-ঘটনের চতুরতায়?

হে মনোরম! হে মূর্ত্তানন্দ নন্দনন্দন! হে নন্দনবন-বিহারীদের মৌলিমুকুটমহামারকত! ছন্দে ছন্দে কে গাঁথতে পারে তোমার যশোমাল্য? মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত আনন্দময় রূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত আকারময় রূপে তুমি বিদ্যমান। তুমিই আনন্দ তোমার ভক্তের, অধ্যাত্মবিদের। অতএব তোমার ঐ চৈতন্তমকরন্দ-মন্দাকিনীর অশ্রান্ত-ধারা-মেদুর চরণারবিন্দে চিরলগ্ন হয়ে থাকুক আমাদের উভয়ের রতি। এবং অসীম কৃপায় হে প্রভু, দূর করে দাও অরতি।

হে আর্ত্তজনের বন্ধু, আমাদের অন্য কোনো প্রার্থনা নেই, একমাত্র প্রার্থনা···ত্বৎ-পাদপঙ্কজ-নিষেবি সঙ্গ। আমাদের পক্ষে আজ প্রসাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুনীশ্বর নারদের অভিশাপ। অতএব মহৎ-প্রসঙ্গের সমাদর অনিবার্য।

আমাদের বাণী তোমার স্তুতিগীতে লীন হোক, আমাদের মন তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে সমাহিত হোক, আমাদের কর্ণ তোমার কীর্ত্তিশ্রুতিতে অচঞ্চল হোক, হে হৃষীকেশ, আর কত চাইব, আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ সেবারসের মহনীয়তায় রসিক হোক।

দেবর্ষি নারদ, যিনি তোমার চরণকমলের মধুকর, তাঁর অভিশাপ আজ বর হয়ে আমাদের প্রভূত অনুগ্রহ করেছে। সেই প্রসাদটুকু পেলে আমরা কি চতুর্নেত্রে দেখতে পেতেম সেই আশ্চর্য্য-বালকের খেলা, যাঁর লীলার একটি কণিকায় বিধৃত রয়েছে সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড?

হে ভগবন, বর্ণনাতীত আপনার জননীর সৌভাগ্য। তাঁর মহা-মহা সৌভাগ্য যে তিনি আপনাকে বেঁধেছেন। সেই সৌভাগ্য-কণিকার শতাংশের একাংশও ইহলোকে লাভ করেননি ব্রহ্মা, শিব, এমন কি ইন্দ্র ও মহর্ষিরাও।

হে সুমন, জ্ঞানীদের, সর্ববেদবিধানজ্ঞের ও যোগৈকনিষ্ঠচিত্তদের সুখলভ্য নন আপনি। ইহলোকে আপনি তাঁদেরই নিতান্ত সুখলভ্য, যাঁদের রতি পূর্ব-নিবেদিত হয়েছে আপনাতে, যিনি আজ নর-শিশুর আকারে নন্দাত্মজরূপে লীলাখেলার বিভোর।

১৮। অতএব হে প্রভু, আমাদের উভয়কে অনুজ্ঞা করুন, কী এমন মনস্কামনা করি আপনার চরণে, যার প্রভাবে আপনার চরণপদ্মের আধারেই শাশ্বত রতি বহন করতে করতে, এবং যথোচিত প্রারব্ধ ফল উপভোগ করতে করতে কালাতিপাত করতে পারি আমরা দুজনে?

১৯। অবসান হল বন্দনার। অতঃপর দুজনেই নিজেদের অন্তর্হিত করে নিয়ে প্রস্থান করলেন উত্তর দিকে।

আর সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপমুক্ত যমলার্জ্জুনের ঘোর পতন শব্দে ত্রস্ত হয়ে উঠল নিখিল গোকুল, যেন বধির হলেন স্বর্গের দেবতারা, দিঙ্নাগেরা,—পাতালের নাগিনীরা। বালক-বৃদ্ধ-নরনারীর এমন কি ব্রজেশ্বরীরও যেন শুকিয়ে গেল রস। কয়েক জন অধীর হয়ে দেখতে দৌড়লেন। দৌড়লেন বটে, কিন্তু তাঁদের পুরোভাগে যেন ধেয়ে চলল বিতর্ক, কেমন যেন নৃত্য-পরাঙ্মুখ হতে চাইল তাঁদের হৃদয়, যেন তাঁদের হৃদয়ের উপর চড়ে বসল পরম শঙ্কা।

২০। তাঁরা এসে দেখলেন,—দুটি মহাদ্রুম পড়ে রয়েছে। যেন বালকৃষ্ণ ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছে ধরণীদেবীর দুখানি হস্ত, যেন পাতালের বিবর থেকে যুগপৎ ঊর্দ্ধে লাফিয়ে উঠে দুদিকে পালাতে চাইছে দুটি প্রকাণ্ড অজগর সর্প, যেন ভগবন্নিপাতিত আদিদৈত্য মধু-কৈটভের এ দুটি সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি।

আর দুটি গাছের মাঝখানটিতে দেখলেন বসে রয়েছেন তাঁদের বালমুকুন্দ···অষ্টনিধির যেন অন্যতম নিধি মুকুন্দ। এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই, এতটুকুও বিঘ্ন নেই, এতটুকুও ভয় নেই, বরং তিনিই যেন ধরণীদেবীকে দান করছেন অভয়। বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁদের ঠোঁটে, বললেন—

কী আশ্চর্য্য, কী আশ্চর্য্য! ঝড় নেই, বাদল নেই, দু-দুটো মহার্জ্জুন গাছ হঠাৎ মড়মড় করে উপড়ে পড়ে গেল মাটিতে? এ যে একেবারে প্রলয়কাণ্ড! দু দিক থেকে দুটো পড়েছে। একদিকে যেন ভয়, অন্যদিকে যেন ব্যথা। আর তার মধ্যে বসে রয়েছেন আমাদের শিশুটি যেন পটে-আঁকা এক টুকরো নতুন মেঘ! বাড়ছেন! বলতেই হবে এ আমাদের কপালের জোর। আশ্চর্য্য, এতটুকুও আকুল হয়ে পড়েনি ছেলে! মহাপ্রাচীন এই দুটি গাছ তবে কি জরার প্রকোপে মূল থেকেই ঝরে গেল? না আপন বিস্তারের ভারে আপনিই নিপাত গেল? তা তো মনে হয় না। দুটিরই মূল সরস রয়েছে, শিকড়গুলিও তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি স্থূল। কী করে এমন যে হয়? [ক্রমশঃ।
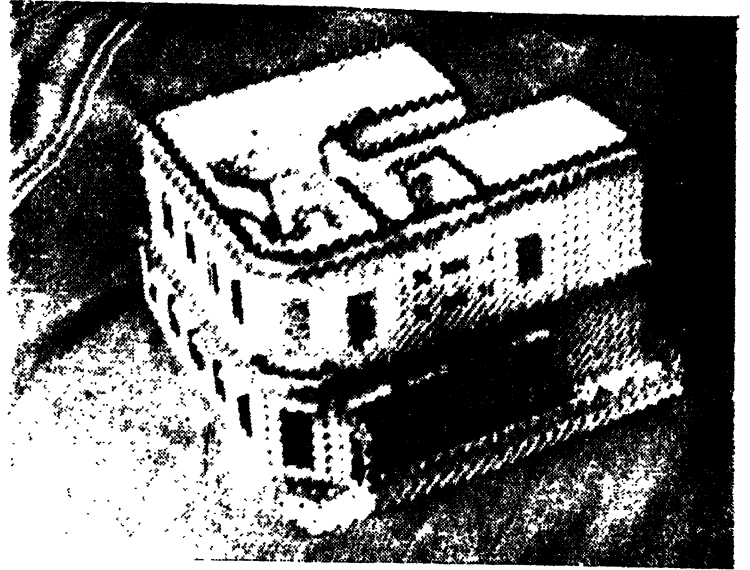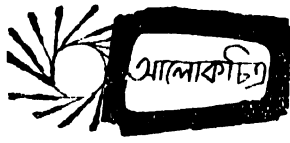
বোতামের বাড়ী

—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—বিমল হোড়

ভাস্কর্য

—মীরেন অধিকা

একাকী

ঘুরন্তী —বিশ্বজিৎ সেন

মায়া —শচীন (জামশেদপুর)
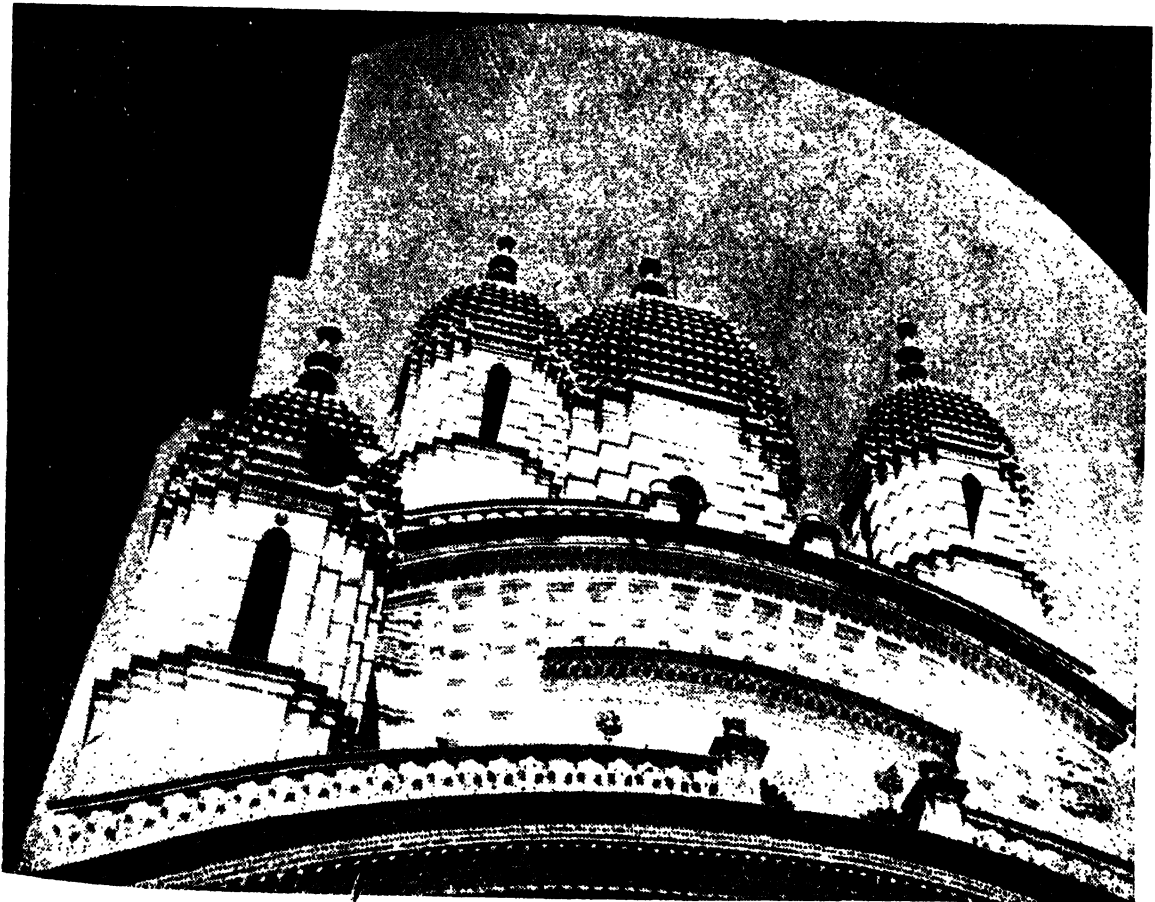
চিত্র-চরিত্রে বর্ণবোধ ও সাম্যদর্শন

শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

স্বভাবে ভাবিত হ'য়ে সৃষ্টি হ'ল রূপ, রস, গন্ধ ভরপুর বিধাতার বৈচিত্রময় জগৎ। সৃষ্টির সেরা জীব রূপমুগ্ধ মানুষ পেল তার স্বাদ, গন্ধ। প্রকাশভঙ্গিতে বেরুল অস্ফুট স্বর, তা বুঝল যে যার আপনে। গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভূত হ'ল মানব-চেতনামূলে, কি করে সবাই সবাইকে জানাবে আপন মনের কথা ও ব্যথা। পেল প্রকৃতি-সহায়তা,—একই দৃশ্য দেখে সকলে হাসে কাঁদে। একই ঘটনায় সকলে চমকিত বা আতঙ্কিত হয়। 'একরূপে' বহুর মিল কিন্তু 'এক' যে কি বস্তু তা তারা জানে না। যাত্রা সুরু হ'ল অজানা সন্ধানে জানবার প্রয়াসে। ঘাত-প্রতিঘাত মধ্যে ঠেকে ঠকে পৌঁছাল এসে এক সীমানায়, প্রকৃতি বলে দেয় ইঙ্গিতে বিশ্বপ্রকৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে। সবাই যে, যার রুচি, বিদ্যা বুদ্ধি সামর্থে ব্রতী হ'ল একের সাধনায় বিভিন্ন পথের পথচারী হ'য়ে। পেতে চায় সহজ—সুন্দরকে প্রকৃতি সাহায্যে। চলার পথে সঞ্চয়িত বস্তুসহ সমবেত হ'ল সম্মেলনে। সর্ব্ববাদিসম্মত যাহা গ্রহণ করে গঠন হল সমাজ ও গ্রহণ-বর্জ্জনরূপ-প্রকৃতি, যাহা নাকি গড়ে তুলবে কালে শিল্প-চরিত্র। রং-এ ভরপুর প্রকৃতি শিখাল বরণ করে গ্রহণ করতে আর প্রাণের গুঞ্জন সুর আলপনার ছন্দে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে। রূপমুগ্ধ প্রাণের আবেগ প্রকাশ হল আলাপে,—সুর শব্দে। হৃদয়তন্ত্রী সুর-ঝঙ্কারে স্ফূর্ত্ত হল বাণী, কণ্ঠে এল স্বর। চেতনামূলে হল বোধোদয় সরস ও নীরস। রূপ, রসসম্ভারপূর্ণ বরণ-ডালায় বরণ করল সরস্বতীকে, কণ্ঠে হল তার আসন। ইনিই বাগ্‌দেবী, বীণাপাণি সরস্বতী, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রূপসজ্জায় সজ্জিত প্রকৃতি শিখাল প্রকাশ করতে রূপ বর্ণনায় জীবনের অভিব্যক্তি শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে। রসস্বাদে মাতোয়ারা হয়ে চাইল রূপকে স্পর্শ করতে। বিদ্যা চিনাল বস্তু অবস্তু, দর্শন পেল দিব্য-দৃষ্টিতে সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি,—সৌন্দর্য্য, যার জ্যোতি ঘুচায় এক নিমেষের অজ্ঞান-অন্ধকার।

কিন্তু কেমন করে রূপায়িত হবে জীবন্ত সত্য জীবনগতিছন্দে, অনুসন্ধিৎসু মন সুরু করল যাত্রা রহস্য উদ্‌ঘাটনে। সাধনায় পেল পথের সন্ধান রূপ ও শব্দে।

রূপ, রস, গন্ধ প্রেমস্পর্শনে রূপকার,—চিত্রশিল্পী আর শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রেমাকর্ষণে শব্দকার,—কথাশিল্পী ব্রতী হল সৌন্দর্য্য উপাসনায়, হ'ল বোধোদয় ছন্দোবদ্ধ গতি-ভঙ্গিমায়; পেল পরিচয় সৌভ্রে। হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখে বোধ ও বোধব্য বেদীমূলে সৃষ্টির শেষ পরিণতি (Perspective) পরিপ্রেক্ষিতরূপ ত্রিভুজ প্রতীকে করল বোধন ঘটস্থাপনে, পূজার অর্ঘ, ভাব ও ভক্তি। ভাব, পুষ্প; ভক্তি,—চন্দন; ভাব ভাষায় প্রকাশ, ভক্তিরূপে প্রকাশ। ভাব বিশ্বাস ও রূপ বিলাস। ভাব অপ্রত্যক্ষ, রূপ প্রত্যক্ষ; ভাবে রূপ দর্শন আর রূপে ভাব কথন। এ যুগ কাল্পনিক ভাববিলাসের যুগ নয়, বিজ্ঞানময় বাস্তবধর্ম্মী রূপ বিলাসের যুগ; তাই বিশ্বকে ফুলে ফলে সুশোভন করে রূপকার। বাস্তবে জীবন্ত সত্য রূপায়িত করবার গুরুদায়িত্ব রূপকারের উপর ন্যস্ত।

রূপমুগ্ধ তার হৃদয়সর্ব্বস্ব উজাড় করে সাজায় পূজা-অর্ঘ, রসসম্ভার বরণডালা। আবাহন সঙ্গীত সুর-গুঞ্জনে মুখরিত করে আকাশ-বাতাস। সেই সুরমূর্চ্ছনায় মানুষ জাগে, ঘুমায়; হাসে, কাঁদে। শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, কাব্য, উপনিষদ একই সুর, তাল, মান, লয় বিভিন্ন প্রকাশ। সব কিছুই বিভিন্ন ধারায় বর্ণ-বিকাশ বা রূপবিলাস। স্থান, কাল, হেতু—অবস্থাভেদে মানুষে এল কামনা, চাইল ভোগ-বিলাস। পূজার অর্ঘ—উপচারে ভোগ্যবস্তু সন্ধানে প্রলুব্ধ মূঢ়-মন গাহিল বেসুরা সঙ্গত। সঙ্গীত হার মেনে হারাল সঙ্গতি। দ্বিধা হল সৃষ্টি। অভেদ পুরুষ-প্রকৃতি হল ভেদ। ভোগলিপ্সামত্ত অসুরে পরিণত হ'ল সুরলোক, প্রকৃতি বিরূপ ষড়রিপু প্রকোপে। বর্ণ বিবর্ণ হ'ল ভাব হ'ল স্বভাবহারা অভাব প্রকাশে। অভাবের অর্থ ঘটাল অনর্থ। মানবধর্ম্মে ধর্ম্মিষ্ঠ, সৌন্দর্য্য পূজারী ভাব, ভাষায়, আচার, ব্যবহারে এবং কর্ম্মে কুরূপ ও কদর্যের দ্বারস্থ হয়ে জড়সর্ব্বস্ব হ'ল কদর্যরূপে। সেদিন হতে মানুষ যন্ত্রপুত্তলিকার মত মানবধর্ম্ম কুরূপে ও কদর্যে ব্যবহার করে আসছে এবং আমাদের সম্মুখে জীর্ণ, ভবিষ্যৎ শূন্য দেউলিয়া 'বর্ত্তমান' জয়যাত্রা সুরু করেছে দিগ্বিজয়ে। অতীতের ঘুণধরা, মরিচাপড়া কাঠামো আজ রং-শূন্য মৃতপ্রায়। মনুষ্য-সমাজ আজ কুরূপ, কদর্যপূর্ণ জীবন যাপনে আপত্তি জানায় না, তার মূল কারণ, মনের দেয়ালে হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতারূপ ঝুল, কালি, আলকাতরা প্রলেপে রং গেছে লুপ্ত হ'য়ে, রং আর ধরে না। মৃতকল্প—ভাবঘোর পরিত্যাগ ক'রে জীবন্ত সত্য জীবন গতিছন্দে রূপায়িত করবার জন্য প্রকৃতির কড়া তাগিদ্।

বিশ্ববাসী বিপরীতগামী প্রগতি-স্রোতে গা ভাসিয়ে, কস্তুরী মৃগের মত ছুটেছে আজ দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। জানে না নিজেরই মধ্যে সেই রূপ, রস, গন্ধে ভরপুর সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি;—সৌন্দর্য্যরূপ বিরাজমান। প্রকৃতিস্থ হলেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ প্রতিবিম্বিত হবে হৃদয়-দর্পণে। এ-হেন বিপর্য্যয়ে যদি জাতিকে জাগাতে হয় তবে মনের ভিতর বাহির সকল মলিনতা দূর ক'রে বর্ণ বিকাশ করতে হবে। আজকের বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রথম চাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো মেরামত। কাঠামোতে আছে কর্ত্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রবৃন্দ।

তদানীন্তন বিজাতীয় প্রাণহীন মামুলী নীতি-বিধানে,—কর্ত্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গের অধীনে শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষকমণ্ডলীর অধীনে ছাত্রবৃন্দ। এটা পুরাপুরি মেনে চললেই শিষ্টাচার পালন করা হ'ল, ব্যতিক্রমে বিপরীত। কথাটা সঙ্গতই বটে, কিন্তু স্বদেশে স্বজাতীয় নীতি-সাম্য ভ্রাতৃত্বের প্রীতিবন্ধন পরিবর্ত্তে মমত্ববোধ-শূন্য কর্ত্তৃত্বরূপ বিজাতীয় নীতিবৈষম্য হুকুম তামিল হুমকী আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও জাতিজাগরণে অগ্রদূত সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্য্যের পূজারী ত্যাগনিষ্ঠ হৃদয়বান শিক্ষাব্রতী শিক্ষক এবং সৌন্দর্য্যের আধার অনাঘ্রাত পবিত্র হৃদয়-কুসুম আত্মবলিদানে দৃঢ়নিশ্চয় ছাত্রমনোবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্র তৈরী না ক'রে দাসমনোবৃত্তি-সম্পন্ন মেরুদণ্ডহীন ক্ষুদ্র স্বরবদৌর্ব্বল্যে পরশ্রীকাতর স্বার্থান্বেষী প্রতিদ্বন্দ্বী কেরাণী তৈরী কারখানায় পরিণত করেছে।

চিত্র-শিল্পের গঠন-পরিচর্য্যায় ত্রিধারা সমন্বিত - হলুদ, নীল আর লাল মূল তিনটি বর্ণ, গোত্র সাম্য পরিচয়ে স্বজাতীয় নীতির অর্থবোধ।

হলুদ—দেহ অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গ; নীল,—শিরা উপশিরা অর্থাৎ শিক্ষকমণ্ডলী। লাল,—রক্তপ্রবাহ অর্থাৎ ছাত্রবৃন্দ। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের ত্রিধারা-সমন্বিত প্রচেষ্টার মূলে শিল্পীর গঠনমূলক রুচিবোধের উৎস,—সার্ব্বজনীন ভাবধারায় সার্ব্বজনীন অর্থবোধ ও বর্ণবোধে সার্ব্বজনীন প্রাম উন্নয়ন করা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে যাহা সত্য, একটি গোটা রাষ্ট্রের পক্ষেও তাহা অকাট্য সত্য।

সংবিধানে—রাষ্ট্রপরিচালকগণ,—দেহ, কর্ম্মিগণ,—শিরা উপশিরা; সমগ্র দেশবাসী,—রক্তপ্রবাহ। এই রক্ত যদি দূষিত ও দুর্ব্বল হয় তবে সুবৃহৎ হরফে বিজ্ঞাপনী অভয়বাণী ও নীতিবাক্য শুনিয়া দেশবাসীকে সুস্থ ও শান্ত রাখা সম্ভব নয়।

আজকের বর্ত্তমানে যুগোপযোগী সার্ব্বজনীন ভাবধারায় জীবন-বিজ্ঞান শিক্ষায় কোন্ কথার কি অর্থ, কোন্ বর্ণের কি রূপ-বর্ণনা তার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুশীলন ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। চিত্র-শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্য সবকিছুর কার্য্যকরী অর্থবোধ ও বর্ণবোধ একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য, কাব্য রচনায় যথার্থ অর্থ প্রযুক্ত না হলে জীবনের সহিত সম্পর্ক-রহিত হবে। চিত্রশিল্পে বর্ণব্যঞ্জনায় কোন বর্ণের কি গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি তাহা সম্যক জানা না থাকলে ব্যবহৃতক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তার পরিবর্ত্তে দাসমনোভাবপূর্ণ পরিবেশে শান্তির আসনে শ্রান্তি আসবে, শ্রান্তিতে অবসাদ এনে জড় করে ফেলবে। প্রয়োজন মনুষ্যোচিত সার্ব্বজনীন চরিত্র গঠন। নিষ্ঠা সহকারে চিত্রশিল্প মাধ্যমে রূপ বর্ণনায় স্বরূপকে আঁকতে আঁকতে স্বভাব প্রকটিত হয়ে সার্ব্বজনীন চরিত্র গঠিত হয়।

বিশ্বশিল্পী রচিত, চিত্রিত বিচিত্রিত জগৎ সংসারে আমরা আত্মপরিজন, প্রতিবেশী সহ আবহমান বাস করে আসছি এবং নানা প্রচেষ্টায় পরস্পর মিলিত হতে পারছি না। কেন না, পরস্পর পরস্পরকে সবর্ণে ও সগোত্রে চিনি না বা জানি না বলে। আজকের দিনে দেশজোড়া সার্ব্বজনীন উৎসবের হুড়োহুড়ি কিন্তু সার্ব্বজনীনতার অর্থ কদর্থে ব্যবহৃত হয়ে গর্ব্বখর্ব্বজনীনতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। তবু আমরা গরীয়ান্, সুমহান! বলি কম কি সে?

কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য্য প্রারম্ভে বিশেষ আমন্ত্রণে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সমবেত হয় বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে গরমিল দেখা দেয় ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্দেশ্য পণ্ড করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করতে হলে সর্ব্বপ্রকার গরমিলের কথা ভুলে কোথায় আমাদের সাধারণ মিল ও মিলনসূত্রটি কি, তাহা জানবার জন্য আগ্রহী হ'তে হবে এবং স্বরূপ সত্তার সন্ধান করতে চাই চলার পথে বাধা-বিপত্তি দমনকারী চরিত্রের শিষ্টাচারপূর্ণ মজবুত কাঠামো। আমরা সকলেই শিল্পী, সৌন্দর্য্যের উপাসক, একথা স্মরণ রাখতে হবে। আমরা যে যা কাজ করি তাহার ভিতর যে অঙ্কন ও বর্ণন বিধি আছে তাহা খুঁজে বাহির করতে হবে।

মার্জ্জিত রুচিবোধে কর্ম্মের বিষয়বস্তু ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে প্রাণরজ্জু কোথায়। যাহাতে আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে, চিন্তায়, কল্পনায়, আচার-ব্যবহারে, আকার ও প্রকারে সত্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, সৌন্দর্য্য বিকাশ হয়, তারই নক্সা দেখে পড়ে সচেতন হ'য়ে পথ অতিক্রম করতে হবে।

জড়—চিন্তা, কার্য্য, ক্ষুধা অতিক্রম করতে না পারলে বস্তু লাভ করা সম্ভব নয়। চারু চিত্রশিল্পে বর্ণবিধান জড় অতিক্রমণের পথে পূর্ণ সহায়তা করে ও সকল বৈষম্য দূরীকরণে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। চিত্রচরিত্রে যে সমতা বা একত্ব তাহা যুক্তিপূর্ণ বর্ণবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিরহস্য একই বর্ণবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই প্রকৃতিপুঞ্জে বিভিন্ন রূপ ঐকৈক্যতানে শান্ত সৌম্য প্রশান্তমূর্ত্তিতে বিরাজমান। সৌন্দর্য্য উপাসনায় মানব-চেতনা-মূলে বর্ণবোধ উদয় হলে বিজ্ঞান লাভ হবে। বিজ্ঞানময় জীবনে সৃষ্টির বিচিত্র রহস্য বর্ণব্যঞ্জনায় ঐক্যতান, সাম্যদর্শনে একেন্দ্রীভূত হ'য়ে সকল সমস্যা লয় প্রাপ্ত হবে।

"What is really essential to the modern conception of a state which is also a nation, is merely that the persons composing it should have, generally speaking, a consciousness of belonging to one another, of being members of one body, over and above what they derive from the fact of being under one government, so that if their government were destroyed by war or revolution, they would still tend to hold firmly together. When they have this consciousness, we regard them as forming a 'nation', whatever else they lack."

—*Sidgwick*

আফ্রিকার সিংহ

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

"সিংহ মশাই, সিংহ মশাই
মাংস যদি চাও।
রাজহংস খেতে দেব
হিংসা ভুলে যাও।"

আমার জীবনে সিংহ শব্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, একেবারে ছোট কালে হাসিখুশী ছড়াছবির পাতায় অনুস্বর (ং) শিক্ষার সময়। তখন সুর করে মুখস্থ করেছি, সিংহ বা হিংসা কোনটিকেই ভাল করে বুঝি নাই। গ্রামের পাড়ার রাম বাবুর বাড়ীতে দুর্গা-পূজার, আর দীনু দাসের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় সিংহের মাটির মূর্ত্তি দেখেই চিনতে পেরেছিলাম যে ওগুলি সবই সিংহ। সহরে সার্কাস পার্টি এলো, বাবার জামার কোণ শক্ত করে ধরে বসে গ্যালারীর উপর থেকে আফিঙ-খাওয়ানো নিস্তেজ সিংহের খেলা দেখে তৃপ্ত হতে পারিনি, যেমন তৃপ্ত হ'তে পারিনি কৃষ্ণনগরের কুমোরদের তৈরী আলমারী সাজানো সিংহ দেখে। আলীপুরের চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখেছি, সে-ও ঐ সার্কাসের আর আলমারী সাজানো সিংহেরই রূপান্তর। একটি সামান্য নড়াচড়া করে, অপরটি পাথরের মত নিশ্চল—যেমন দেখেছি রাজবাটীর বৈঠকখানায় 'ষ্টাফকরা' সিংহ বা পুরীর মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পাথরের তৈরী সিংহ। নড়াচড়া না করলে, না ডাকলে, সেটা সিংহ হ'ল কেমন করে! তাই বলে কলিকাতা নিউ এম্পায়ারে আমার ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে (Lady and the Lion খেলাতে) যে সিংহ দেখানো হয়েছিল সেটাও আসল সিংহ নয়, যতই ডাকুক আর নড়াচড়া করুক না কেন। হিংস্র না হলে মন তাকে সিংহ বলে মানতে রাজী নয়। রাজভোগ খাবার লোভে হিংসা ভুলে গেলে সে সিংহের সিংহত্ব থাকে না। আবার শুধু দৈবের উপর নির্ভর করে থাকাও কাপুরুষতার লক্ষণ। উদ্যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মীকে লাভ করতে পারে। বীর্য্যবান, পৌরুষসম্পন্ন লোকেরাই সিংহ উপাধি পায়। বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্রকে লোকে পুরুষসিংহ মনে করতো, ইদানীং কালে সর্দ্দার প্যাটেল সিংহ বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

সিংহ কথাটাই শক্তিমত্তার পরিচায়ক। অনেক দিন আগে মালয়ের জঙ্গলের প্রান্তে এক ছোট্ট দ্বীপ দখল করতে গিয়ে ইংরেজ-সৈন্যরা বেশ প্রখর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল—তাই দ্বীপ দখল করে নাম দিয়েছিল City of the Lions সিংহপুর, আজ যা সিঙ্গাপুর নামে পরিচিত। তারপর থেকেই ঐ সিংহপুর (সিঙ্গাপুর) বৃটিশসিংহেরও প্রবল প্রতিরক্ষা-ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজরা ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী হয়েও, শৌর্য্য-বীর্য্যে পৃথিবীতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন, তাঁদের রাজত্বে সূর্য্য অস্ত যায় নি। কাজেই তাঁদের প্রতীক চিহ্ন 'সিংহ' যথাযোগ্যই বলা চলে।

আমরা আফ্রিকাতে এসে সত্যিকারের সিংহের চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছি। আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ, এ দেশের রাজা শুধু বৃটিশসিংহ নয়—সত্যিকারের জঙ্গলের রাজা পিঙ্গলজটাধারী পশুরাজ সিংহ। আফ্রিকার জঙ্গল আর আফ্রিকার সিংহ তাই আজ জগৎপ্রসিদ্ধ। অনেক সময়ে মনে হয়—এই গভীর বনভূমিতে কত রকম জন্তু-জানোয়ার আছে। হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী, বাঘ, আরও কত শত পশু যাদের আয়তন সিংহের চাইতেও অনেক বড়, যাদের গায়ের শক্তি সিংহের চাইতেও বেশী, কাজেই আদিম নীতি 'জোর যার মুলুক তার' অনুযায়ী এই রাজ্যের অধিকর্তা সিংহ অপেক্ষা হাতী, গণ্ডারেরই হওয়া উচিত ছিল। 'জোর যার মুলুক তার' নীতি আদিমকালের হলেও, বর্ত্তমানের সভ্য সুসংস্কৃত বিংশ শতাব্দীতেও তার পরিবর্ত্তন দেখছি কোথায়? নইলে পূর্ব্ব-পশ্চিম সর্ব্বত্র মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্য এত ঘটা কেন? নরঘাতী বোমা ফাটানোর আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা হচ্ছে কেন চারদিকে? যদি গায়ের জোরই পৃথিবীতে বড় কথা হ'ত তবে আজ জঙ্গলের রাজা হ'ত ঐ হাতী অথবা গণ্ডার। যদি বুদ্ধি বা কৌশলই শ্রেষ্ঠত্বের মান নির্দ্দেশ করতো তবে জঙ্গলের রাজা হত বানর, শৃগাল বা কাক। যদি ক্রুরতাই এর মাপকাঠি হত তবে জঙ্গলের রাজা হ'ত আজ বিষধর গোখুরা সাপ বা অজগর।

হিংস্রতাই যদি প্রাধান্যের মাপকাঠি হত তবে বাঘ বা বন্যমহিষই ঐ স্থান অধিকার করতো। ব্রাহ্মণত্বলোভী বিশ্বামিত্র শত চেষ্টা করেও বশিষ্ঠের নিকট স্বীকৃতি পান নাই,—তাঁর শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়েও কোন ফল হয় নাই—কিন্তু সর্ব্বশেষে ক্ষমাগুণ প্রমাণিত করে তিনি 'ব্রাহ্মণ' নামে স্বীকৃতি পান। 'দাঁতের বদলে দাঁত নেব' এটাই বড় কথা নয়। ক্ষমাগুণ চাই। শক্তিমান যখন অশেষ ক্ষমতাশালী হয়েও ক্ষমাগুণের অধিকারী হয়, ন্যায় বিচার করে, দুর্ব্বলের রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে, তখনই সে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা পায়। ভারতের নীতিশাস্ত্রেও সেইরূপ উল্লেখ আছে। দুই পক্ষ অসি-যুদ্ধ করা কালে হঠাৎ এক পক্ষের অস্ত্র ভেঙ্গে গেলে তাকে অনুরূপ নূতন অস্ত্র না দেওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখাই হ'ল ভারতীয় নীতির লক্ষণ। নিদ্রিত লোককে ছুরিকাঘাত করা, বিষবাষ্প দিয়া যুদ্ধ করা, আণবিক বোমা দিয়া সারা জগৎকে উজাড় করে দেওয়া, এটা আধুনিক কালের ব্যাপার। পিতাকে বন্দী করে, ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ, শত্রুপক্ষের উৎকোচ নিয়ে আমবাগানে নিজের নবাবকে বিশ্বাসঘাতকতা করা এটা ভারতে ঘটলেও অভারতীয় ঘটনা। আজকালের যুদ্ধে অসি অপেক্ষা মসীই বেশী চলেছে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ে এই নীতিজ্ঞানের অভাবই চক্ষুতে পড়ে বেশী।

জঙ্গলের রাজত্বে সিংহ পশুরাজ। তার যেমন গায়ে জোর

ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি

সত্যিকার Lions' Club-এতে সভ্য হতে চাঁদা দিতে হবে না। প্রাণ দিলেই যথেষ্ট।

আছে—হিংস্রত্ব আছে—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাগুণও আছে। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সিংহ জঙ্গলের পশু শিকার করে। সে কখনও দুর্বল ছাগল হত্যা করে না—তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটা দরকার তার চাইতে বেশী হত্যা করে না। বাঘ যদি একটা হরিণ খায় সে দশটা হরিণ মারতে দ্বিধা করে না—পাইকারী ভাবে নিরপরাধ হত্যাই শক্তিমান ব্যাঘ্রকে সমাজে উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করেছে। "কাজের সময় কাজী কাজ ফুরোলে পাজী"—বা উপকারীকে খেয়ে নিয়ে বাঘ জঙ্গলে দুর্নাম রটিয়েছে। সিংহ উপকারীকে ভোলে না। জঙ্গলের হাতীও তার প্রবল স্মৃতিশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ—কিন্তু এই দুইয়ের এই মনে রাখা ব্যাপারে অনেক স্বর্গ-মর্ত্ত্য পার্থক্য আছে। সিংহ তার বন্ধুকে ভুলে না, আর হাতী তার শত্রুকে ভুলে না। জঙ্গলের ইতিহাস নিলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

একবার একদল শিকারী জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে একটা হাতীকে গুলী করে,—হাতীটা গুলীবিদ্ধ হয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অনেক বছর পর শিকারীদল আবার যখন জঙ্গলে আসে তখন ঐ হাতীটা তার সেই পূর্ব্বেকার গুলীকরা শত্রুটিকে চিনতে পেরে দৌড়ে এসে তাকে শুঁড় দিয়ে ধরে পায়ে মাড়িয়ে হত্যা করে চলে যায়। হাতী কখনও ভুলে না Elephant Never Forgets কথাটা

সিংহ-মহিষীরা আহার সেরে নিচ্ছেন, স্বামী কোথায় রাজকার্য্যে গিয়েছেন

প্রবাদে পরিণত হয়েছে। সিংহের সম্বন্ধেও তেমনি গল্প আছে—সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল, জঙ্গলের লোক এণ্ড্রোক্লিস সেটা খুলে দিয়ে যে উপকার করেছিল সিংহ তা ভুলে যায়নি। উপকারীকে ভুলে যাওয়া রাজোচিত গুণ নয়। বহু বৎসর পর পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র ঐ সিংহের খাঁচাতে এণ্ড্রোক্লিসকে হত্যার জন্য পাঠিয়ে দিলে সিংহ সেই উপকারী বন্ধুকে স্বীকৃতি দিয়ে তার পশুরাজ আখ্যার সম্যক পরিচয় দিয়েছিল। সবলের পক্ষে ক্ষমাগুণ সর্ব্বাগ্রে প্রযোজ্য। হাতে বন্দুক আছে—যাকে তাকে গুলী করলাম। তামাসা দেখার জন্য ঢিল ছুড়লাম কিন্তু ভেকের দল তাতে প্রাণ দিল—এটা অনুচিত। তোমাদের প্রবল অস্ত্রশস্ত্র আছে—তোমরা বোমা ফাটিয়ে পৃথিবীর আকাশ বিষাক্ত করবে কেন? আমরা নির্দোষ নিরীহরা দলে দলে মরবো কেন? এই পৃথিবী সকলের সমান—আমাদের বুদ্ধ, আমাদের গান্ধী সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।

সিংহ জঙ্গলের প্রাণী কিন্তু আমাদের মানবের সমাজ-জীবনের সঙ্গে এদেরও অনেক মিল আছে। বাড়ীতে কর্ত্তা বাজার করে আনেন, আর গিন্নী তাকে রান্না করে খাবার তৈরী করে পরিবেশন করেন। বাড়ীর কর্ত্তা না খেলে গিন্নীরা তা খান না। জঙ্গলের শিকার যেমন হরিণ, জেব্রা বা জিরাফ বা মহিষ তাড়া করে আলাদা করে বের করে এগিয়ে নিয়ে আসে পুরুষ-সিংহ। আড়ালে লুকিয়ে থেকে সিংহী তা দেখতে থাকে, পরে সুযোগ বুঝে স্বহস্তে সেটিকে বধ করে। সিংহী নিজে বধ করলেও সিংহ মশাই নিজে না খাওয়া পর্য্যন্ত সে উহা স্পর্শ করে না। সিংহ খেয়ে গেলে তারপর সিংহীরা দল বেঁধে খেতে আরম্ভ করে। এক পুরুষ-সিংহের এক বা একাধিক স্ত্রী-সিংহ থাকতে দেখা গেছে। বড় বড় লোকদের যেমন মোসাহেব থাকে, আজ-কাল যাদেরকে 'স্যাটেলাইট' বললে সহজে বুঝা যায়। সিংহদলের 'স্যাটেলাইট' হ'ল শৃগালদল (black-backed jackals) সিংহ-সিংহী উদরপূর্ত্তি করে খেয়ে যখন দূরে বিশ্রাম নিতে যায়—তখন ঐ উচ্ছিষ্টভোজী মোসাহেব-দলের আবির্ভাব হয়। অন্যের কষ্টার্জ্জিত খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ নিয়ে তখন ওই শৃগালদলের মধ্যে মারামারি বাধে। ধাঙড়দলও এসে হাজির হয় ঐ খাবার টেবিল পরিষ্কার করতে—তারা হাড়-গোড় পরিষ্কার করে দিয়ে দল বেঁধে চলে যায়। সত্যিই শকুনিরা ওদের বাকী অংশ, গলিত দূষিত, দুর্গন্ধময় সব অংশ খেয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে সমাজের ধাঙড়ের কাজ করে যায়।

আফ্রিকাতে প্রায়ই কালমাথা শকুনি (griffon vulture) এবং এক জাতীয় সারস (Marabau stork)কে এই ধাঙড়ের কাজ সারতে দেখা যায়। পুরুষ-সিংহ সাধারণতঃ লম্বায় (নাকের থেকে লেজের ডগা পর্য্যন্ত) নয় ফুট হয় এবং এদের দেহের ওজন হয় ৩০০ থেকে ৫০০ পাউণ্ড। স্ত্রী-সিংহ লম্বায় ফুটখানেক ছোট হয়। পুরুষ-সিংহের গলায় বড় বড় কেশর থাকে, যার জন্য তার অন্য নাম "কেশরী"। স্ত্রীসিংহ দেখতে বাঘের মত। তবে অল্পবয়সে পুরুষ-সিংহেরও কেশর থাকে না—তৃতীয় বৎসরে কেশর জন্মাতে আরম্ভ হয় আর ৫।৬ বছর বয়সে সেগুলি বড় হতে থাকে। সিংহী দেখতে বাঘের মত হলেও বাঘের গায়ে জেব্রার মত ডোরাকাটা থাকে অথবা ফুল-ফুল ছাপ থাকে কিন্তু সিংহীর গা সমস্তটা ধূসরবর্ণ

রং। সিংহ-শিশুর গায়ে কিন্তু বাঘের গায়ের মত ডোরা-রা ছাপ থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, ঐ দাগ বড় হলে য়ে যায়। কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা আসলে পুরুষে একই শ্রেণীভুক্ত ছিল। সিংহীরা দুই বৎসরে একবার সন্তান প্রসব করে এবং দুটি থেকে চারিটি করে বাচ্চা একসঙ্গে য়। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের তুলনায় এদের জন্মসংখ্যা খুবই —এরা ভগবানের নিয়মেই 'পরিবার পরিকল্পনা' করে নিয়েছে, ইন করতে হয়নি।

প্রসংগতঃ এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে সিংহ কি মানুষ না? জিম কোরবেট তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে (The Man-ters of Kumaon) লিখেছেন—"হিসাব করে দেখা গেছে যে টি বাঘের নয়টি বাঘ নরখাদক হয়েছে আঘাত পেয়ে, আর মটি হয়েছে বৃদ্ধ হয়ে।" সিংহের বেলাতেও তাই হয়ত শিকারীর ী, সজারুর কাঁটা, হরিণের বা বনমহিষের শিং-এ আঘাত পেয়ে হ তার স্বভাবসিদ্ধ কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলেছে নতুবা বৃদ্ধ য় গেছে, নিজের গৌরবময় বলবান ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে, ত ক্ষয়ে গেছে—তখন সে মানুষ খেতে আরম্ভ করে। কেউ উ মনে করেন, হঠাৎ মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ, চিতাবাঘ সিংহ নরখাদক হয়ে উঠে। কোরবেট সাহেব লিখেছেন যে, খাদক বাঘ বা সিংহরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে নরখাদক হয় না। বা-মা মানুষ খেয়েছে, ছোটবেলায় তার সন্তানরাও সঙ্গে সঙ্গে মাংস ভোজন করেছে—কিন্তু উত্তরকালে ঐ সব সিংহকে কখনও মাংস খেতে দেখা যায়নি—এমন প্রমাণ অসংখ্য আছে। মোট কথা হ দুর্বলকে হত্যা করে নিজের মর্যাদা নষ্ট করতে চায় না। সে মুখ যুদ্ধ করে জেব্রা জিরাফ বনমহিষ হত্যা করে, তাকে অন্ধ

জঙ্গলের বৈঠকখানায় ছয়টা সিংহ আরাম করছে

করে হত্যা করে। বাঘের মত পেছন থেকে পালিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করে না। সেদিন দুই জন লোক সাইকেলে আসার পথে হঠাৎ সিংহের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ভয়ে দু'জনেই সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সিংহের মুখের সামনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে বিমর্ষমুখে নীচু হয়ে বসে থাকে। সিংহ ঐ নিরীহ বিপদগ্রস্ত মানবদেহীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলো। তাদেরকে কিছু না বলেই চলে গেল—দুর্বল, নিরস্ত্র, আশ্রয়প্রার্থী, অসহায়কে অভয় দিয়ে রক্ষা করে সিংহ তার রাজোচিত গুণ প্রকাশ করলো। আফ্রিকাতে সব সিংহই কি প্রজাদের প্রতি রাজকর্তব্য, রাজোচিত ন্যায়নিষ্ঠ ভাবে পালন করছে? নইলে সেখানে এত চাঞ্চল্য কেন?

বৈশালী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

তিন হাজার বছরেরও আগের কথা। সূর্যবংশে ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর রাণী ছিলেন অলম্বুষা। এই গর্ভে বিশাল নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মে। এই রাজা বিশালই ছিলেন বহুবিশ্রুত বৈশালীর প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণে আবার ই নগরী বিশাল ও বিশালা নামেও অভিহিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে মহারাজা বিশাল কিন্তু ইক্ষ্বাকুর পুত্র ছিলেন না। ইক্ষ্বাকুর াই দিষ্টের ২১তম বংশজ রাজা তৃণবিন্দের পুত্র ছিলেন তিনি। ভাগবতেও বিশালরাজের মাতার নাম 'অলম্বুষা' রূপে বর্ণিত হয়েছে। ইনি ছিলেন বিষ্ণুপুরাণ মতে পরমা সুন্দরী অপ্সরা। শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে জানা যায়, সরস্বতী-তটবাসী বিদেহ মিথি নামে এক রাজা ছিলেন। গোতমরহুগণ তাঁর পুরোহিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন দেব বৈশ্বানরের ভক্ত। কোনো এক দিন এঁরা বৈশ্বানরের অনুসরণ করতে করতে সদানীরা নদীর তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। বৈশ্বানর অবস্থান করায় রাজা মিথিও সদানীরার তীরে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা যেখানে বসবাস করতে লাগলেন, সে ছিল সদানীরার পূর্বপার। সেই থেকে ঐ দেশের নাম হল বিদেহ অথবা মিথিলা। কালক্রমে এই স্থান পূর্ব ও পশ্চিম-মিথিলায় বিভক্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণযুগের এই মিথিলার পশ্চিম অংশই পরে বৈশালী নামে খ্যাত হয়েছিল; আর বৈদিক যুগের সদানীরা নদীই বর্তমানে গণ্ডকী নাম ধারণ করেছে। রাজা বিশালের প্রতিষ্ঠিত বলে এই নগরকে "রাজা বিশাল-কা-গড়"ও বলা হত।

বরাহ, মার্কণ্ডেয়, নারদীয় পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণে বৈশালীর প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথা লিপিবদ্ধ আছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখা যায়, দেব ও দানবেরা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করবার জন্য এখানে বসে মন্ত্রণা করেছিলেন। তা' ছাড়া দানবমাতা তেজস্বিনী দিতি আপন পুত্রদের নিঃশত্রু করবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের বধোপযোগী পুত্র কামনায় ঘোর তপস্যা করেছিলেন। আর তাঁর তপস্যার স্থান ছিল শ্যাম-নিকুঞ্জঘেরা পরম-রমণীয় এই বৈশালী। অবশ্য ইন্দ্রের চাতুরীতে দিতির তপস্যা ব্যর্থ হয়ে যায়।

রামায়ণ অনুসারে রাজা বিশাল হতে বংশানুক্রমিক দশম এবং শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে সপ্তম নৃপতি ছিলেন সুমতি। ইনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক। মহারাজ দশরথের অনুমতি নিয়ে

মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসদের নিধন করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় (জনকপুরে) যাইতেছিলেন, সেই সময় ঋষিবর তাঁদেরকে অনেক নদীর নিখুঁত পরিচয় দিয়েছিলেন। শুনিয়েছিলেন, গঙ্গা, যমুনা, শোন ও কৌশিকী নদীর কথা। ঋষিরা বর্তমান হাজীপুরের নিকট গঙ্গায় নৌকা চড়ে পার হয়ে বর্তমান রামচৌড়া নামক স্থানে অবতরণ করেন। আর এর ঠিক পাশেই গণ্ডকী নদী গঙ্গাবক্ষে মিলিত হচ্ছে। এই গণ্ডকী নদীর তটোপরে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন বৈশালীর অভ্রভেদী সুরম্য সৌধরাজি। বৈশালীর দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যে নদীতটোপরে এই সুপ্রাচীন বৈশালী বিরাজিত ছিল তা'র কথা রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেননি আর ঋষিও অনেক নদীর পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু গণ্ডকী নদীর নাম পর্যন্ত করেননি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন, হয়তো তখন গণ্ডকী নামের উৎপত্তি হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে অবশ্য ইহা জানা যায় যে, সদানীরা নদী কোশল ও বিদেহকে আলাদা করছে আবার রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যে সরযূকে কোশলরাজ্যের পূর্বসীমা বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ বেবর অনুমান করেন যে বর্তমানের সরযূ অথবা গণ্ডকীই প্রাচীন কালের সদানীরা। এই নদীর বিস্তার ছিল ৭০।৮০ মাইল।

বিশালনগরের পূর্বে ছিল পূর্ব-বিদেহ আর পশ্চিমে ছিল পশ্চিম-বিদেহ ও কোশলরাজ্য—এই উভয় রাজ্যই ছিল বৈদিক-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। আর বৈশালী এদের মাঝখানে অবস্থিত থাকায় অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। আর তাছাড়া তিনটি রাজ্যেই একই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। সেই সময় বৈশালীর রাজা ছিলেন সুমতি। ঋষি বিশ্বামিত্রের উদ্ধৃতি হতে জানা যায়, বৈশালীর সকল রাজাই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বীর্যবান ও সুধার্মিক ছিলেন।

প্রাচীন যুগের বৈশালীকে কেন্দ্র করে কতকগুলি পুরাণ-কাহিনী আজও অম্লান হয়ে আছে। এই স্থান কামাশ্রম নামে খ্যাত ছিল। আজ হতে চার হাজার বছর পূর্বে শিব-দুর্গার এই মিলনক্ষেত্রে মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এই স্থানই ছিল দিতির পুত্র মরুতের জন্মস্থান। এই মরুৎ ও অন্যান্যদের দ্বারা মন্দর পর্বতকে দণ্ড করে পূর্বসাগর মন্থন করা হয়েছিল। গঙ্গা ও গণ্ডকী সঙ্গমে অবস্থিত বৈশালীকেই পৌরাণিক "গজকচ্ছপের" যুদ্ধক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আজ হতে খৃঃ-পূঃ ২৩০০ বছর পূর্বে মহেন-জো-দরোর সভ্যতার শেষভাগে অথবা প্রাক্-আর্য্য সভ্যতার সময় উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশ কোনো রাজাদের দ্বারা শাসিত হত না। বস্তুতঃ নির্বাচিত মনুরাই তখন দেশ শাসন করতেন। খৃঃ-পূঃ ২৩০০—২১০০ শতাব্দীর মধ্যে ৬ জন মনুর বিবরণ পাওয়া যায়। আবার সকল মনুই একই বংশোদ্ভূত ছিলেন। পুরাণ অনুসারে বলা চলে, মনু তাঁদের পরিবারের সময় ও ঘটনার কথা বৈশালীকেই কেন্দ্র করে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। আদিপিতা মনুর পরে রাজা নাভাগের বংশধরেরা রাজত্ব করতে থাকেন সমগ্র উত্তর-ভারতে। আর এঁদের বিংশতিতম বংশজ রাজা তৃণবিন্দের পুত্র অলম্বুষা নামক অপ্সরার গর্ভজাত রাজা বিশালই ছিলেন এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। যা' হোক, এই স্থানে মনুদের যে সব কাহিনী ছড়িয়ে আছে তাদের আলোচনা করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আদিমনুর প্রপৌত্র ছিলেন বিখ্যাত রাজা উত্তানপাদ। এঁরই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে উত্তম নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁর সাথে বাভ্রব্য পরিবারের বেহুলার বিবাহ হয়। এই বেহুলা ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। মহারাজ উত্তম তাঁকে খুবই ভালবাসতেন কিন্তু বেহুলার স্বামীর প্রতি কোনো অনুরাগ ছিল না। ফলে মহারাজ তাঁকে নির্বাসিত করেন। এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। বিশালা নগরে সুশর্মন নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর স্ত্রীকে বলাকা নামে এক রাক্ষস চুরি করে নিয়ে যায়। তখন তাঁর মুক্তির আশায় ব্রাহ্মণ মহারাজ উত্তমের দ্বারস্থ হলেন। বলাকার কবল হতে মহারাজ বাহুবলে ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করলেন। বলাকা তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আবার ঠিক এই সময়ই নির্বাসিতা রাণী বেহুলা ও পাতালের নাগরাজ কপতকের দ্বারা হৃতা হলেন। রাণীর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, তাই নাগরাজের কন্যা নন্দা তার মায়ের মঙ্গলার্থে রাণীকে লুকিয়ে রেখে নিজে বোবার ভাণ করে রইল। এই সংবাদ পেয়ে উত্তম অবিলম্বে বন্ধু বলাকার সাহায্যে পাতাল হতে বেহুলাকে উদ্ধার করলেন। এর পর হ'তে উভয়ে মনের সুখে বাস করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে এঁদের এক পরমসুন্দর পুত্র জন্মে—তিনি পৌরাণিক ইতিহাসে দ্বিতীয় মনু নামে খ্যাত।

মহারাজ উত্তানপাদের ন্যায় এই বংশে আরও একজন রাজা ছিলেন, তাঁর রাণীর নাম ছিল গিরিভদ্রা। আনন্দ নামে তাঁদের এক পুত্র জন্মে। এই আনন্দই ষষ্ঠ মনুরূপে পরিচিত। উগ্ররাজ-কন্যা বিদর্ভার গর্ভে উরু নামে তাঁর এক পুত্র জন্মে। অঙ্গাদি প্রখ্যাত রাজারা ছিল তাঁর পরবর্তী বংশধর। এইরূপে প্রথম মনুর কয়েক পুরুষের মধ্যে ঋষভ এবং তাঁর পুত্র ভরত রাজত্ব করেন। ঋষভ হিমবর্ষের রাজা ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে ভরতকে রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর প্রধান আশ্রম ছিল বৈশালীর উপরে গণ্ডকী নদীর তীরে। সেই স্থানটির নাম ছিল শালগ্রাম। মহারাজ ভরতও যথাসময়ে পুত্র সুমতিকে রাজ্য দিয়ে এই আশ্রমে সন্ন্যাস-জীবন অতিবাহিত করেন। পুরাণযুগের এই সব স্মৃতিকথা আজও তাকে অমর করে রেখেছে।*

---

* বাল্মীকি রামায়ণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, মার্কণ্ডেয়, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, ডাঃ এস, সি, সরকার এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নাদির প্রবন্ধ ও পুস্তক।

"কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, কি রাজনীতিক— সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গল স্থাপনের একটিমাত্র সূত্র বিদ্যমান।—সে সূত্র হইতে এইটুকু জানা যায় যে 'আমি ও আমার ভাই এক।'" —স্বামী বিবেকানন্দ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

যীশুখৃষ্ট ও নবযুগ

আমার সমগ্র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিন এল, যেদিন শেষ পর্যন্ত কেমব্রিজ মিশন ভ্রাতৃসংঘকে পরিত্যাগ করব বলে আমি মন স্থির করলাম। স্থির করলাম, কোনো বিশপের অধীনে নির্দিষ্ট ধর্মযাজকবৃত্তি আর আমি করব না, জীবন-তরণীকে অজ্ঞাত সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব বৃহত্তর ও মহত্তর পৃথিবীর সন্ধানে। ধৈর্যহীন হঠকারিতার সঙ্গে এই পন্থা আমি বেছে নিইনি। মানসিক অস্থিরতা ও সংশয়ের মধ্যে বহু বৎসর কেটেছে। সম্মুখে অগ্রসর হয়েও শারীরিক কারণে আমি নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে পশ্চাদপদ হয়েছি। কিন্তু সুদূরতটে আমার জীবন-প্রভুর সেই প্রত্যূষ মুহূর্তের ডাক বারে বারে আমার কানে বেজেছে,—প্রাণের মধ্যে ঝংকৃত হয়েছে সেই আহ্বান, চলো চলো, অনুসরণ করো আমাকে। শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়েছি সেই আহ্বানে।

আমার জীবনের এই পরিবর্তন সামান্য একটা ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনার বিবরণ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তার পূর্বে যতোদিন আমার অন্তরের অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে আমি কাটিয়েছি, সিদ্ধান্ত এবং সংশয়ের দোলায় দুলেছি, ততোদিন আমার পরম প্রভু যীশুখৃষ্টের যে মূর্তি আমার অন্তর-দর্পণে অহরহ প্রতিফলিত হয়েছে, সেই মূর্তির পরিচয় আমি দিতে চাই। খৃষ্টের এই প্রতিকৃতির কয়েকটি প্রধান রেখা অ্যালবার্ট স্যুইটজারের গ্রন্থে স্পষ্টরূপে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি আমার নিজেরই দেখা। সেই মূর্তি আমার অন্তর্দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল, সেই মূর্তির বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে কোন পথে আমি চলেছিলাম, কেন নিরাপদ আশ্রয়কে পরিত্যাগ করে অপরিচয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, কে আমাকে জীবনের সবচেয়ে বৈপ্লবিক সংকল্প গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর যখন আমি দিল্লীতে ছিলাম, তখন দেখিছি এই ভারতবর্ষের চেহারা ঠিক যেন উনিশ শতাব্দী পূর্বেকার রোমক সাম্রাজ্যের মতো। বাহিরে এক বিরাট নিশ্ছিদ্র সাম্রাজ্যবাদী শান্তি, অস্থিরতার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না সেই কঠোর শান্তির রাজত্বে। কিন্তু এই শান্তি নিতান্ত বাহ্য। মাটির নিচে আগ্নেয়গিরির গহ্বরে যেমন লাভা-প্রবাহ ফোটে, তেমনি এই শান্তির গোপন কন্দরে এক মহা অশান্ত অন্তর্জ্বালা ভীষণ প্রদাহে টগবগ করে ফুটছে, কোথাও কোথাও মাটি ফেটে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে দুরন্ত আবেগে। লোকমুখে এর নাম জাতীয় আন্দোলন,—কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই আক্ষেপের শক্তি ও বিস্তার নিতান্ত আন্দোলনের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আমি স্থির বুঝেছিলাম, এক বিরাট মহাদেশব্যাপী মানবসমাজ এক অন্তর্গূঢ় সাধনার আবেগে মথিত হচ্ছে, সে সাধনা নূতন রূপে নূতন ধারায় আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা।

মানবতার এই আত্মসন্ধানের নিগূঢ় আবেগ বাইবেলের আদ্য গ্রন্থে সুস্পষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। সৃষ্টিপূর্বের নিরাবয়ব অন্ধকার বিশৃঙ্খলার রাজ্যে পরমাত্মার অনন্ত সৃজনী শক্তির কী অনির্বচনীয় প্রকাশ! 'সেই চরাচরবিহীন অন্ধকার-সমুদ্রে পরমেশ্বরের স্পর্শ জাগল, ঈশ্বর বললেন, আলোকের জন্ম হোক। আলোকের জন্ম হোলো।'

রোম সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান্তি ও শৃঙ্খলার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু গ্যালিলিও সমগ্র মধ্য প্রাচ্য তখন বিস্ফোরণের নিগূঢ় আবেগে স্পন্দিত হচ্ছিল। সেই সময়ে খৃষ্টের আবির্ভাব হোলো। মানব-সমাজের এই অন্তর্বিপ্লব গ্যালিলিতে ধর্মের পথে অগ্রগতি খুঁজে পেল। ন্যাজারেথের তরুণ সূত্রধর যীশু তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি মেলে মানবমনের এই বিশাল উদ্বেলন প্রত্যক্ষ করলেন, লক্ষ্য করলেন সমাজের মধ্যে নব নব শক্তির সদ্য জাগরণ। অকুতোভয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে—সেই আন্দোলনকে পরিচালনা করলেন ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে।

যীশু একলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন জননেতা, নিঃসঙ্গ পথিক নন। ঈশ্বররাজ্যের ঘোষণা তখনই ধ্বনিত হয়েছিল আর্তমানবের অন্তর-অন্ধকারে। ঈশ্বর আসবেন, যুগে যুগে মানবাত্মার বিপদে তিনি যেমন এসেছেন, উদ্ধার করেছেন সৃষ্টিকে, তেমনি আবার তিনি আসবেন। গ্যালিলির দিকে দিগন্তের পথে প্রান্তরে সর্বমানুষের মন এই আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। হাটের পথে বা সান্ধ্য সভায় গ্রামের চাষীরাও এই আশার কথা আলোচনা করত।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যীশু। এক বিপুল যুগনাট্যের অবতারণা করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন উৎসুক

প্রাণের সেই মহা সুসংবাদ,—তিনি আসছেন, মুক্তির আর বিলম্ব নেই। ডাক দিয়েছিলেন তিনি অবজ্ঞাত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে। গ্রামের কৃষক আর হ্রদের ধীবরদের মধ্য থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর তরুণ শিষ্যগোষ্ঠী। যীশু ছিলেন সমর্থ যুবা, তাঁর শিষ্যরাও ছিলেন বলিষ্ঠ তরুণ, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। মনুষ্যহৃদয় কর্ষণ করবে তারা, তারা হবে—মনুষ্যভাগ্য-জলধির নিঃশংক ধীবর।

শুরু হোলো যীশুর অভিযান। অন্ধ পেল দৃষ্টি, রোগী পেল পরিত্রাণ। অবমানিত দরিদ্রের কানে ধ্বনিত হোলো মুক্তির মহাশ্বাস। ঈশ্বরের নবরাজ্যের স্বর্ণসিংহদ্বার ঐ বুঝি দেখা যায়!

ঐ বুঝি নবজীবনের ইশারা। তরুণ ভক্তগণের বাঁধনছেঁড়া উন্মাদনা। পুরাতনের অর্গলকে তারা খসায়, সংস্কারকে তারা পাশে ছুঁড়ে ফেলে জয়যাত্রার উন্মুক্ত পথ থেকে। জীবনে লেগেছে নব জোয়ার, চেতনার ও আদর্শের নব নব রূপ তারা সৃষ্টি করে চলে। ঈশ্বররাজ্যের আনন্দসুধা অন্তর পরিপূর্ণ করে উপছিয়ে পড়ে,—প্রাচীনের ছিন্নভিন্ন জীর্ণ বসনকে পরিত্যাগ করে উৎসবের নবীন রঙিন পোষাকে সজ্জিত হয় মানুষ। যৌবনের অমিত বলিষ্ঠতায় মুক্তির এই অভিযানে সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যীশু।

এই বিপুল আনন্দনাট্যের প্রদীপ্ত চলিষ্ণুতার মধ্যে প্রথম বেদনার ছায়া পড়ল, যখন মূঢ় শিশুর মতো তথাকথিত পণ্ডিত আর ফরীশীর দল কোনো আহ্বানে কর্ণপাত করল না, প্রাচীন জীর্ণ ধারণাকে আঁকড়ে ধরে মুখ ফিরিয়ে রইল অন্ধকারে, নবজীবনের উদ্ভাসিত ক্রীড়াঙ্গনে জনগণের সঙ্গে এসে যোগ দিল না। বারে বারে তাদের ডাকলেন সাধু জন, ডাকলেন প্রভু যীশু নিজে,—কিন্তু ঈশ্বর-রাজ্যের পরম সত্যের আহ্বান তাদের নিরুদ্ধ অন্তরে কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের স্তূপ পাথরের মতো তাদের বুকে বসে আছে। জাতিভেদের সংকীর্ণতায় তারা আবদ্ধ, তাদের অনড় চৈতন্য ঘিরে সূচিভেদ্য পৌরাণিক অন্ধকার, সেই অন্ধকারে নবারুণের আলোক-স্পন্দন জাগে না। অন্ধ প্রজার অন্ধ রাজার মতো তারা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, মূর্খ আত্মাদরে ভাবে যে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি বুঝি তাদের হাতেই আছে। সে চাবি চিরকালের মতো তাদের বজ্রমুষ্টি থেকে কবে খসে পড়েছে তা তারা জানেও না।

কিন্তু যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যৌবনের অকুতোভয় অভিযানে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। মৃত অতীতের মলিন চীর খসে পড়েছে তাঁদের দৃপ্ত অঙ্গ থেকে। তাঁরা নবীন যুগের প্রতিভূ। ঈশ্বরের রাজ্যে নূতন শক্তি নবোন্মাদনার স্ফুরণ লক্ষ্য করে যীশুর উল্লাসের অবধি নেই। এই নবযুগের বাতাসকে দুরন্ত ঝটিকার মতো দিকে দিগন্তরে বিস্তৃত করতে যীশু চান, এই নবযুগের নবীন বিশ্বাসীদের তিনি সাগ্রহে আহ্বান করেন। একথাও তিনি বলেন, 'যারা দুর্দম, স্বর্গরাজ্য তাদেরই, শক্তির দ্বারা এই রাজ্যকে জয় করতে হয়।' খৃষ্টের এই বাণী যৌবনের প্রতি যৌবনের আহ্বান। সম্মুখে জীবন-মরণের লড়াই, হয় জয় না হয় পরাজয়, হয় আলোক না হয় অন্ধকার।

যীশু খৃষ্ট নব বিশ্বাসের যে অভিযানে আগুয়ান হলেন, সেই অভিযানে অন্তরপ্লাবী আনন্দ ছিল পাথেয়। মৃত্যুপণ জীবনলীলা এই অভিযান, এ যেন এক বিবাহ-উৎসব। বাঁশী বাজছে, চলেছে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা। এসো এসো, বিলম্ব কোরো না কেউ। ধ্বনিত হচ্ছে আশার গান, চোখ কান বন্ধ করে উপবাসী মন নিয়ে দূরে সরে থেকো না কেউ। আজ উৎসব-ভোজের দিন, উপবাসের দিন নয়।

উপবাস করতে হবে বৈ কি, সইতে হবে অনেক যন্ত্রণা। আত্মাহুতির যন্ত্রণা-শিহরিত আসন্ন মুহূর্তও যীশু তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এই বেদনা এই আত্মদান ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠারই ভিত্তি। কিন্তু সেজন্য দুঃখ নেই, ভয় নেই। সুখ আসুক দুঃখ আসুক, যন্ত্রণা আসুক আনন্দ আসুক, ভাগ্যে জুটুক আহার বা অনশন, ভক্তের কণ্ঠে নিত্য ধ্বনিত হোক পিতার নাম, স্বর্গরাজ্যের মতো মর্তভূমিতেও প্রতিষ্ঠিত হোক পরম পিতার সিংহাসন। ত্রিভুবনে বিস্তৃত হোক তাঁর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য।

এই নাটকের পরমতম ঘটনা, শ্রেষ্ঠতম সংলাপ যীশুর একটি কথা একটি ডাক। পিতা বলে তিনি ডেকেছিলেন ঈশ্বরকে, এই ডাকই নবযুগের নববিধান। নিপুণ সুরকার যেমন তাঁর বীণাযন্ত্র একটি রাগিণী বারে বারে বাজান, খেলাচ্ছলে রাগিণীর মধ্য থেকে অমৃতসঙ্গীতের সৃষ্টি করেন তেমনি যীশু নানা ভাবে নানা মূর্ছনায় ঐ 'পিতা' নামটি উচ্চারণ করেছিলেন, এক অনন্ত গৌরবে মহিমান্বিত করেছিলেন ঐ নাম।

যীশু অপেক্ষা এই আহ্বানের মহত্তর অধিকারী কে? তাঁর মতো করে ঈশ্বরকে পিতা বলে আহ্বান করতে আর কে পারে? যীশুরই মধ্যে শিশু মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, যে শিশু নির্ভীক ও নিত্য বিস্ময় দৃষ্টি মেলে ঈশ্বরের সৃষ্টির দিকে তাকায়, যে শিশু সরল যে শিশু সত্যকাম, অকুণ্ঠ আস্থা ও সহজ সাহসে যে শিশু স্রষ্টার চরণে প্রণমিত। যে শিশু তার সহজাত অনুভূতি দিয়ে জানে যে এ সংসার সুন্দর, কেন না এ সংসার তার পিতার সৃষ্টি। পিতার প্রাসাদে সে জন্মেছে, কতো বিচিত্র হর্ম্য, কতো মনোরম প্রকোষ্ঠ এই প্রাসাদে, এ কী মনোরম তার আশ্রয়! পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় ও প্রেমে আপ্লুত তার হৃদয়, স্থির বিশ্বাসে সে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে।

পরমপিতাকে যীশু যেমন জানেন তেমন আর কেউ জানে না। পরমপিতার মহিমা যীশু যেমন প্রকাশ করতে পারেন, তেমন আর কেউ পারে না। যীশুর এই শক্তির মূলে রয়েছে তাঁর আশ্চর্য জন্মরহস্য। যীশু ও তাঁর পিতা, তাঁরা দুজনে এক। পরম-পিতার সাক্ষাৎ পুত্র তিনি, এ কোনো তত্ত্বকথা নয়, এ কোনো পণ্ডিতের তর্কের বিষয়বস্তু নয়, এ উপলব্ধির কথা। তিনি পরম-পিতাকে ধ্যানোপলব্ধি করেছেন, পরমপিতার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন তাঁর অস্তিত্ব, কী চরিত্রে, কী ইচ্ছায়, কী সাধনায় যীশু ও পরমেশ্বরের মধ্যে কোনো অনৈক্য নেই।

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যীশু জগৎ-সংসারের সম্মুখে পরমেশ্বরের যে রূপ প্রকাশ করেছেন তার তুলনা নেই। সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে পূর্বযুগের সমস্ত ধারণা ও সংস্কারকে দূর করে এক

পরমাশ্চর্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছেন যীশু। মানব ভাবনায় এই যে পরিবর্তন,—এ পরিবর্তন এতো মৌলিক, এতো উদার অথচ এতো সহজ! খৃষ্টীয় ধর্ম পূর্বতন ধর্মবিকাশের চর্বিত চর্বণ নয়, এই ধর্মে মানব-ইতিহাসের এক নবীন অধ্যায়ের সূচনা।

কেন না, যীশু খৃষ্ট ঘোষণা করেছিলেন,—ঈশ্বরের চরিত্র শিশু-চরিত্রের মতোই সরল, অন্তর যাদের পবিত্র তারা তাদের ধ্যান-দৃষ্টিতে ঈশ্বরের শিশুরূপই দেখতে পায়। শিশুর মতো নিষ্কলুষ যার চরিত্র, সেই লাভ করে ঈশ্বর-সান্নিধ্য। ঈশ্বরের রাজ্যে সেই পায় প্রবেশাধিকার। এই রাজ্যের নামই স্বর্গরাজ্য। যীশু বলেছেন,—'যতোদিন না তোমাদের মনের পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যতোদিন না তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতো হও, ততোদিন কিছুতে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে না।' পাছে লোকে না বোঝে তাই এই উপদেশ তিনি বারে বারে দিয়ে বলেছেন,—ছোট হও, অবনত হয়ো নিজেকে; যে ঐ ক্ষুদ্র শিশুটির মতো অবনত, সেই পাবে স্বর্গরাজ্যে সর্বোচ্চ স্থান। আবার তিনি বলেছেন,—'ঐ ক্ষুদ্র শিশুর মতো না হলে সে স্বর্গরাজ্য লাভ করবে না, সে করবে না আর কিছুতেই।'

আমরা সকলেই জানি, শিশুদের মধ্যে সংস্কারের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। অর্গল ভাণ্ডার সরলতা শিশুদের মধ্যেই আছে। ঈশ্বরের সত্তার কেন্দ্রেও এই সংস্কারবিহীন সারল্য। আধুনিক যুগের বিরাট বস্তুতান্ত্রিক প্রগতি যেমন বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি সরল সূত্র থেকে বিসর্পিত হয়েছে, তেমনি এই অসীম আধ্যাত্মিক জগৎও ঈশ্বরের অতি সহজ ও অবিনশ্বর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যকে যীশু মানবজীবনের বাস্তবতার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেছেন।

যীশু এই আশ্চর্য সত্য প্রচার করেছেন যে, যেমন স্বর্গরাজ্য তেমনি ঈশ্বর। স্বর্গরাজ্যে সরল শিশুদের প্রবেশাধিকার সর্বাগ্রে। ঈশ্বরও এই শিশুরই মতো সরল। শিশুরই মতো তিনি সহনশীল, শিশুরই মতো তিনি আত্মসমর্পিত। তিনি নত, তিনি নম্র। ভক্তের হৃদয়কে তিনি যখন যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁর নম্রতার অন্ত নেই। ভক্তের জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করে থাকেন, অনন্ত সহিষ্ণু এই প্রতীক্ষা। তাঁর সবচেয়ে বিদ্রোহী সন্তানদেরও তিনি শাসন করে বশে আনতে চান না। প্রেমেই তাঁর শাসন, প্রেমেই তাঁর জয়।

বিপথগামী সন্তানের প্রতি তাঁর কী আশ্চর্য মধুর ব্যবহার! কী প্রেম, তিতিক্ষা! পুত্র আবার গৃহে ফিরে আসছে এই সংবাদ পেয়ে পিতা ছুটে বার হলেন পথে। এখনো অনেক পথ বাকি, পিতা সেই পথ পার হলেন দৌড়তে দৌড়তে। স্নেহালিঙ্গনে পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। না, না পুত্র, অপরাধ স্বীকার করতে হবে না, অনুতাপ করতে হবে না, যা ঘটেছে তা মৃত অতীত, অতীতকে ভুলে যাও।

সত্যই যীশু বলেছেন, অনুতপ্ত পাপী যেদিন পিতৃগৃহে ফিরে আসে সেদিন স্বর্গরাজ্যে মহা উৎসবের দিন।

ঈশ্বরের অনুকম্পার সীমা নেই, ক্ষমার সাগর তিনি। এই ক্ষমার কণাটুকু মাত্র মানুষ তার হৃদয়ে ধারণ করুক। যীশু বলেছেন,—

'যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদের কল্যাণ করো। যারা তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে, তোমাকে অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো। তবেই তুমি পরমপিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে। ভালো ও মন্দ, উভয়েরই মাথায় ঈশ্বরের সূর্য কি ওঠে না? সৎ ও অসৎ, উভয়েরই শিয়রে ঈশ্বরের বর্ষা কি ঝরে না? পরমেশ্বর সর্বত্রুটিহীন, সর্বদোষহর তিনি। তোমাকেও হতে হবে তোমার পিতারই মতো।'

এমন সহজ ভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সব কথা বলতে যীশুর পূর্বে আর কোনো মানব-সন্তান সাহস করেনি। কিন্তু ঈশ্বরের এই যে সহজ সরল প্রেমবিহ্বল চরিত্র, এই চরিত্র নিয়েই সৃষ্টির মর্মমূলে তিনি আসীন। তিনি উপলব্ধি-পারের দূর-দূরান্তর উদাসীন সৃষ্টিকর্তা নন। একটি পাখীর মৃত্যু-বেদনা তাঁর প্রাণে স্পন্দিত হয়, একটি মানুষের মাথার একটি চুল তাও তিনি গুণে রেখেছেন। তাই যখন নশ্বর মানুষ তার অন্তরাত্মার অমোঘ আহ্বানে পুরাতনকে বর্জন করে নবীনের অভিযানে আগুয়ান হয়,—সে আহ্বান ঈশ্বরেরই আহ্বান। সেই আহ্বান সৃষ্টির প্রথম বাণীর প্রতিধ্বনি, যে বাণীর নির্দেশে চরাচরব্যাপী অন্ধকারের গর্ভে আলোকের জন্ম হয়েছিল। সে আহ্বানে যারা অবিশ্বাস করে, তা ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রতিভাকে অস্বীকার করে, আলোককে অস্বীকার করে অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে; আলোকই দেয় ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ। এই ভবিষ্যৎকে ভয় করতে নেই। সৃজনধর্মী আবেগে এই ভবিষ্যতের পথে আগুয়ান হতে হয়।

ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলার ছেদ নেই। পুরাতনকে তিনি নবীন করেছেন, মৃতকে তিনি সঞ্জীবিত করছেন পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে। মানুষের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান নিত্য-আগুয়ান শিশুমন আছে সেই মন তাঁর আপন মনের আবেগে স্পন্দিত হোক, এই তাঁর অভিলাষ। এই শিশুমন নিয়ে যখন তাঁকে পিতা বলে ডাকি, তখনই তাঁর মনে মন মিলাই, তখনই তিনি চরিতার্থ হন।

ঈশ্বরের এই পরম-শুভ নব-আহ্বানের প্রমাণ যদি আমরা চাই, দার্শনিক তত্ত্ব ও তর্কের বাগাড়ম্বরে যীশু সেই প্রমাণ দেননি। প্রমাণ তাঁর জীবন। ঈশ্বরের বাণীই তাঁর জীবন। তাঁর জীবন দিয়েই তিনি তাঁর পরমপিতার সেই আহ্বানের সত্য প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর নিজের পার্থিব জীবনে প্রতি মুহূর্তের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই পরীক্ষার পথে কোনো বাধা কোনো বিপদকে তিনি মানেননি। এই পরীক্ষায় চরম আত্মনিবেদনের অটল সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন। মানুষকে কোনো মহৎ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে হলে সে বিশ্বাসের জন্য জীবন নিবেদন করতে হয়। যীশু তা করেছেন।

যীশুর এই দৃঢ় প্রত্যয় আর সাধারণ মানুষের সুলভ ভরসাবাদ এক নয়। তিনি জানতেন, জীবনের প্রতি মুহূর্তে জানতেন, যে চরম মূল্য তাঁকে দিতে হবে। তবু ঈশ্বরপুত্র হয়েও অন্তরে অন্তরে তিনি মানুষ, তাই আশংকাকেও তিনি গোপন করতে চাননি। চরম যন্ত্রণার মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর নির্ভীক আত্মাও শিহরিত হোলো,—পরমপিতার উদ্দেশ্যে আর্ত নিবেদন

ঘনিত হোলো,—'হে পিতঃ, তোমার দ্বারা সকলই সম্ভব, এ পানপাত্র সরাও তুমি আমার মুখের সামনে থেকে।'

আবার বেদনার অবসানে শক্তি যখন ফিরে এল তখন তিনি মহান কর্তৃত্বের সঙ্গে পিটারকে বললেন, 'খাপের মধ্যে পুরে ফেলো তোমার তরবারি। যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, তার পানীয় আমি পান করব না।'

এক নিঃশ্বাসে শেষ চুমুক পর্যন্ত পান করলেন যীশু।

ধর্মগ্রন্থে শ্বেত পাথরের পাত্র ভাঙার একটি কাহিনী আছে। তখন নিস্তার সপ্তাহের প্রায় অবসান, যীশুর চরম আত্মদানের ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সেই আসন্ন প্রহরে যীশুর মনোভাবের পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে মেলে। মহার্ঘ গন্ধদ্রব্যপূর্ণ শ্বেত পাথরের রুদ্ধ পাত্রটি চূর্ণ করে এক নারী যীশুর মস্তকে সুগন্ধি তৈল মাখিয়ে দিল। পাত্রটি চূর্ণ হবার সঙ্গে যীশুর মনে হোলো তাঁরও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। সুগন্ধি আসব লাভ করতে হলে যেমন নিরুদ্ধ প্রস্তর-পাত্রকে চূর্ণ করতে হয়, তেমনি তাঁর মরদেহকেও চূর্ণ করতে হবে। তবে না তাঁর অন্তর-সুরভি ব্যাপ্ত হবে দিকে দিকে। ভক্ত নারীর এই অবদান লক্ষ্য করে যীশু বললেন,—'আহা, এ আমার প্রতি অতি সৎকার্য করেছে, আমার দেহে এই সুগন্ধি তৈল ঢেলে আমার সমাধির উপযোগী কাজ করেছে।' বিরক্ত ভক্তরা অস্ফুটস্বরে অনুযোগ করল, এ যে অপব্যয়! এই অপব্যয় কথাটি যীশুর মর্মে গিয়ে বিঁধল। না, না, অপব্যয় নয়। তাঁর দ্বিধাহীন আত্মদান, তাও অপব্যয় নয়। নারী তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাটি বুঝি ঠিক বুঝেছে! স্পর্শকাতর অন্তরের কোমল অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছে তাঁরই অন্তরের বেদনা। কিছু না ভেবে মুষ্টিমাত্র সঞ্চয় না করে উদার হাতে সব কিছু বিলিয়ে দেওয়া, এ তো অপব্যয় নয়—ঈশ্বরপুত্র যীশু দান করেছেন তাঁর জীবন, বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সত্তা, ক্রুশের কাষ্ঠে চূর্ণ করেছেন তাঁর দেহ—পুরুষের বলিষ্ঠতায় আর নারীর অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যে।

ঈশ্বরও কিছুই রাখেন না। তাঁর উদার কল্যাণ-আশীর্বাদ তাঁর অসীম করুণা তিনি আত্মহারা আনন্দে মনুষ্যসমাজে বিতরণ করেন, এই সত্য যীশু পার্থিব নরনারীর প্রাণে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। যীশু যেন কবি, যীশু যেন শিল্পী, সমগ্র জীবন ধরে শিল্পধর্মী প্রেরণায় তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, অবিশ্বাসীর অনমনীয় প্রস্তর-কঠিন মনকে ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শলাভের উপযোগী নমনীয় করে গেছেন! যে মন অনড় নিষ্প্রাণ, সেই মনকে তিনি আপন প্রশ্বাস-ফুৎকারে সঞ্জীবিত করেছেন, সেই মনকে আপন শিল্পাঙ্গুলি স্পর্শে গঠন করেছেন, ভাস্কর যেমন অবয়বহীন জড়পিণ্ড থেকে রূপসৃষ্টি করে। কবি যেমন কাব্য রচনা করে, শিল্পী যেমন বীণায় তোলে সুরের লহরী, তেমনি তিনি রচনা করেছেন মহান্ জীবনকাব্য, তেমনি মানবভাগ্য জুড়ে তিনি বহিয়েছেন অনির্বচনীয় সুর-মন্দাকিনী। যীশুর এই সৃষ্টিলীলা আমরা বাস্তব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করিনে, অন্তর দিয়ে অনুভব করি। মানবভাগ্যে খৃষ্টজন্মের সুফল দেখে বিস্মিত হই।

ঈশ্বরের কল্যাণ স্পর্শ কেবল মাত্র কোমল নয়, অন্যায়ের মুখোমুখি এই স্পর্শ বজ্রকঠিন। যীশুর প্রেম শিথিল ভাবালুতা নয়। এ প্রেম কখনো বা ব্যথার মতো, যন্ত্রণার মতো। মধ্য আফ্রিকায় অ্যালবার্ট সুইটজারকে বহু সময় তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত দিয়ে শল্যচিকিৎসা করতে হয়। সেই আঘাত কেবল মাত্র ক্ষত সৃষ্টি করে না, ক্ষতের গভীরে প্রবেশ করে ব্যাধির মূলকে নির্মূল করে ক্ষতকে সারিয়ে তোলে। ঈশ্বরের করুণাও একই প্রকারের। এই করুণা বেদনাকে ধ্বংস করবার জন্যেই বেদনা হানে। এই ক্ষত পরম বন্ধুর বিশ্বস্ত ক্ষত।

ঈশ্বরের এই কঠোর প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন সাধু পল। হিব্রুগণের প্রতি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—'প্রভু যাকে প্রেম করেন তাকেই তিনি শাসন করেন,—যে পুত্রকে তিনি গ্রহণ করেন, তাকেই তিনি প্রহার করেন। ঈশ্বরের শাসনকে যদি সহ্য করো, তাহলেই হবে ঈশ্বরের পুত্রোপম। পিতা যাকে শাসন করেন না, এমন পুত্র কোথায়?'

যীশুও বলেছেন,—'যে সমস্ত তরু তাঁর পিতা রোপণ করেননি, সেই সব তরুকে নির্মূল করতে হবে। এই সংসারে অন্যায় ও পাপের উৎস চেতনার গভীর অন্ধকারে, পাপের রহস্যকে যুক্তিতর্কের সোজা কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না।' আশ্চর্য উপমার সাহায্যে প্রভু খৃষ্ট এই পাপের অবসানকে চিত্রিত করেছেন। গর্ভিনী নারীর প্রসব-যন্ত্রণার আনন্দময় অবসানকে তিনি চিত্রিত করেছেন, শুষ্ক তৃণকে পরিত্যাগ করে হেমন্ত-ক্ষেত্রের সোনার ফসল সংগ্রহের ছবি তিনি এঁকেছেন, বীজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফলের জন্মের গান তিনি গেয়েছেন।

যীশুর প্রাণ ছিল কবির প্রাণ, তাঁর প্রকৃতিতে ছিল কবির অনুভূতি। নিজেরই অজ্ঞাতে কখনো তাঁর মন হোতো হর্ষোল্লাসে উৎফুল্ল, কখনো বা হতাশ বিষণ্ণতায় ম্রিয়মাণ। এইখানেই তাঁর মানবত্বের পরিচয়, মানুষেরই দুঃখ-সুখে আপ্লুত ছিল তাঁর হৃদয়। তাঁর সৃজনী-প্রতিভা ছিল বিশাল, নির্ভীক দ্রুততার সঙ্গে সঙ্গে যে আকাশচুম্বী সৃষ্টি তিনি করে গেছেন, একমাত্র শিল্পীর দুর্দমনীয় আবেগেই তা সম্ভব। যে আশ্চর্য দূরদৃষ্টির ফলে তিনি মানব-ভাগ্যকে প্রদীপ্ত ভবিষ্যতের পথে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন, সেই দৃষ্টি জ্বলন্ত শিখার মতো। সে দৃষ্টিশিখার দিকে চোখ রেখে আমাদের ইন্দ্রিয় বুঝি বিস্ময়াঘাতে অনড় হয়ে যায়। কিন্তু সেই অনড়ত্বে প্রাণ সঞ্চার করেন তিনি। তিনি দেখেন, তিনি কাজ করেন, মানব ঐতিহ্যকে তিনি গঠন করেন নূতন রূপে।

শিষ্যবৃন্দের প্রত্যাবর্তনে তাদের সঙ্গে জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে যীশু বললেন,—'আকাশ থেকে বজ্র যেমন খসে পড়ে, তেমনি আমি শয়তানকে খসে পড়তে দেখেছি।' ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন,—'পৃথিবী ও স্বর্গের একেশ্বর হে পরমপিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, কেন না যারা প্রবীণ, যারা তথাকথিত জ্ঞানী, তাদের কাছে না প্রকাশ করে শিশুর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছ তুমি।'

আবার এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন মুহূর্তে তাঁর মনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাঁর ক'টি কথায়,—'আমার মনে দুঃখের শেষ নেই, মৃত্যুতে যে দুঃখের সমাপ্তি।'

কখনো হতাশা, কখনো আশা, কখনো আনন্দ, কখনো বিষণ্ণতা—মনের এই আলো-অন্ধকারকে যীশু আমাদের কাছে ঢেকে রাখেন

না। শিশুর মতো সরল তাঁর হৃদয়। যখন যা তিনি অনুভব করেন, তা তিনি অকপটে প্রকাশ করেন। তবে মনের দাসত্ব তিনি করেন না। সঙ্গীতশিল্পী যেমন প্রতিটি ঝংকারকে আয়ত্ত রাখে, তেমনি আপন মনের প্রতিটি অনুভূতি তাঁর আয়ত্তাধীন। নিপুণ গীতকারের মতো ছোট-বড়ো বাদী-সম্বাদী প্রত্যেকটি স্বর ব্যবহার করে তিনি মহাসঙ্গীত সৃজন করেন। জীবনের সর্বপ্রকার অনুভূতি দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ করেছেন নিজের জীবন, এমন কি যখন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তখনো কোনো বেদনা-নিবারক ঔষধ তিনি চাননি। তিনি ঘোষণা করেছেন,—'মানুষ যাতে জীবন লাভ করে, বিচিত্রতর বিস্তৃততর জীবন, তাই আমি এসেছি।'

চরিত্রের এক অপূর্ব ভারসাম্য ছিল যীশুর। কখনো আনন্দ কখনো বেদনা,—কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলেছে আত্মা। জীবনের যা গভীর ঐশ্বর্য,—তার মহার্ঘতা নেই, তা সরল তা মৌলিক। এই গভীর ঐশ্বর্যের কথা যীশু তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন,—তাই তাঁর বাণী চিরকাল মানুষের অন্তরে জাগরূক থাকবে। সেই জন্যে তাঁর বাণী ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েও সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তর স্পর্শ করে। মানবহৃদয় তার মহার্ঘতম মুহূর্তে যে বাণীর প্রত্যাশা করে, সে বাণী যীশু খৃষ্টের বাণী।

শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ খৃষ্টবাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই আমাকে বলতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বৃদ্ধ দার্শনিক ও ঋষি,—যৌবনকালে তিনিও ছিলেন সার্থক কবি। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন, তাঁর পরিচিত আমরা সকলেই তাঁকে বড়দাদা বলে ডাকতাম। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ছিল তাঁর বিশিষ্ট অন্তর-ভূষণ! তা ছাড়া তাঁর মন ছিল শিশুর মতো। দার্শনিক হিসেবে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, বিদ্যা ছিল অসীম। বৃদ্ধ বয়সে তিনি প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা স্তব্ধ হয়ে বারান্দায় বসে থাকতেন,—পাখী আর কাঠবিড়ালীরা নির্ভয়ে তাঁর আশেপাশে খেলা করত। এই ভাবে নিস্তব্ধ ধ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর মরজীবনকে পরিসমাপ্তির পথে নিয়ে চলেছিলেন। এই শেষ জীবনে প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে নীরব সাধনায় তিনি কালাতিপাত করতেন,—এই সাধনায় তাঁর আত্মা ঈশ্বর-সামীপ্য লাভ করত।

প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সারল্য ও বিনয় ছিল তাঁর অন্তর-ভূষণ, যখন যে কথা তিনি বলতেন সে কথায় সত্য উদ্ভাসিত হোতো। প্রতিদিন সূর্যাস্তকালে সারা দিনের মতো সামান্য আহার সাঙ্গ করে তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকতেন। সারাদিন যতো প্রকার চিন্তা তিনি করতেন দিনান্তে সেই সব চিন্তাকে তিনি গ্রথিত করে আমার হাতে দিতে ভালো বাসতেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি কেবলই 'সারমন অন দি মাউন্ট' পাঠ করতেন ও এই খৃষ্টোপদেশের সারাৎসার নিয়ে আলোচনা করতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'যীশুর এই উপদেশাবলী আমার খাদ্য আমার পানীয়। যীশুর বাক্য এতো সরল সে শিশুও তা বুঝতে পারে, কিন্তু আবার অন্তর্নিহিত অর্থে সে বাক্য কতো গভীর। উপনিষদের মতো পৃথিবীর মুষ্টিমেয় মহাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত যীশুর এই বাক্য। কতো বড়ো স্পর্দ্ধাভরে যীশু বলেছিলেন, আমার বাক্য কখনো মুছে যাবে না। কতো বড়ো সত্য কথা তিনি বলেছিলেন। সত্যই অবিনশ্বর তাঁর বাক্য। দিনের পর দিন তাঁর বাণী নিয়ে আমি চিন্তা করি, গভীর রাত্রের নিদ্রাহীন প্রহরে তাঁর বাণী আমার অন্তরে এসে বাজে। তাঁর বাণীর ব্যাখ্যার জন্যে কোনো টীকার প্রয়োজন নেই, অথচ তাদের অন্তর্গূঢ় অর্থেরও কোনো সমাপ্তি নেই। যীশুর বাণীতে সেই সত্যের স্ফুলিঙ্গ আছে যা মানুষকে চিরদিন পথ দেখায়, মৃত্যুর অন্ধকারকেও অপনোদন করে।'

যীশুর যে বাণীটি দ্বিজেন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তা হোলো এই,—

'অন্তর যাদের পবিত্র তারা ভাগ্যবান, কেননা, ঈশ্বরের দর্শনলাভ তারা করবে'।

এই বাণীর পরম সম্পূর্ণতা তাকে চরম তৃপ্তি দিত,—তিনি বারে বারে এই বাণী উচ্চারণ করতেন। আর একটি বাণীও তাঁর অনুরূপ প্রিয় ছিল,—"ঈশ্বরের রাজ্য তোমারই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত।" এই বাক্যটি যখনই তিনি আমার সামনে উচ্চারণ করতেন, তাঁর শ্রদ্ধা-বিস্ময়ঘন কণ্ঠে এই বাক্য যেন অচিন্ত্যপূর্ব রহস্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেত। ঈশ্বরের রাজ্য কোনো বাহ্যিক বাস্তব রাজ্য নয়, মানুষের মনোরাজ্যই সেই রাজ্য,—প্রতি মানুষের হৃদয়কন্দরেই ঈশ্বরের সিংহাসন—এই সব কথা বারে বারে বলতে গভীর আনন্দ লাভ করতেন বড়দাদা।

গভীর দার্শনিক উপলব্ধি ও নিবিড় কবিচিত্তের সহযোগে দ্বিজেন্দ্রনাথ খৃষ্টবাণীর মধ্যে নূতন অর্থ ও নূতন ইঙ্গিতের সন্ধান পেতেন। তাঁর ভাষ্য ও আমার ধারণার সঙ্গে কখনো কখনো মিলত না;—কিন্তু তিনি তর্ক করতেন না, শান্ত ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলতেন যে যীশুর মতো মহাপ্রভুর বাণীর গভীরত্ব অপরিসীম। কোনো মানুষ এক নিঃশ্বাসে ঘোষণা করতে পারে না,—তাঁর বাক্য আমি সব বুঝে নিয়েছি। যীশুর বাণী অমৃত-নির্ঝরিণী—পিয়াসী মানব যুগে যুগে সে নির্ঝরিণীর পানীয় গ্রহণ করে। প্রতি যুগের মানুষ প্রতি বার নূতন করে এই সত্য—উৎসের সম্মুখে অঞ্জলি পাতে,—এবং মানুষের পরম প্রয়োজনের তৃষা যতোদিন না নিবৃত্ত হবে ততোদিন যুগে যুগে মানুষ এই মন্দাকিনীর তীর্থসলিলে পূত হবে।

যীশুর জীবনে যখন ক্রুশের আঘাত পড়েছিল তখন তিনি যৌবনের শীর্ষদেশে। যৌবনাবস্থাতেই তিনি আত্মদান করেছিলেন। মধ্য বয়সের দীর্ঘ ছায়া তাঁর জীবনপথে পড়েনি। তাই তাঁর প্রতি বাক্যে যৌবনের স্পর্শ। এইখানেই ক্রুসের সবচেয়ে বড়ো বেদনা,—এই ক্রুস যৌবনকে হনন করেছিল, মানবপ্রেমিক কবিকে হনন করেছিল। দৈব বক্তার কথা যীশুর বেদনায় চরিতার্থ হয়েছিল,—'লক্ষ্য করো আমার বেদনার চেয়ে গাঢ়তর বেদনা আর কোথাও আছে কি না!'

যীশুর আনন্দ-বেদনা বিকশিত যৌবনের প্রখর ইন্দ্রিয়োপলব্ধির বেদনা। এই জন্যেই এতো আনন্দ তিনি বিচ্ছুরিত করেছিলেন,

এতো বেদনা তিনি সহ্য করেছিলেন। বৃদ্ধ বৈরাগ্যসাধকের মতো তিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে রুদ্ধ রাখেননি,—পরিত্যাগ করেননি "পান-ভোজনের" পরিতৃপ্তি। জীবনের বর্ণরূপ সুষমার প্রতি তিনি পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। তীরের মতো তীক্ষ্ণ ছিল তার বাস্তব বিচারবুদ্ধি, উদাসীনতা দিয়ে এই বুদ্ধিকে তিনি আবিল করেন নি। মানসিক স্বাধীনতার অমর ঘোষণা তিনি করেছেন,—'সত্যই তোমাকে মুক্তি দেবে, মিথ্যাই বন্ধন।' যীশু সেই নিত্যকালের নির্ভীক যৌবনের প্রতিভূ, যে যৌবন অকুতোভয় আত্মবিশ্বাস অকল্পনীয় বাধার সম্মুখীন হয় এবং আত্মার অপরাজেয় বীর্যে সব বাধা জয় করে। অন্যান্য বিশ্বধর্মের যাঁরা প্রবর্তক, নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরাও মহান পুরুষ, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকের পৃথিবীতে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করেছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের অবসানে বৃদ্ধবয়সে দেহরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু যীশুর চরিত্র এক অনতিক্রমণীয় ঊর্ধ্বতায় প্রতিষ্ঠিত,—চিরন্তন যৌবনশ্রীর সিংহাসনে তাঁর আসন।

প্রতিযুগের সাধারণ মানুষ খৃষ্টচরিত্রের এই উত্তুঙ্গ উচ্চতাকে নিজের সাধারণ খর্বতার স্তরে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে,—তাঁর বাণীর নির্ভীক মহত্বকে শৃঙ্খলিত করতে চেয়েছে আপন সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার কারাগারে। কিন্তু খৃষ্টকে বাঁধা যায় না, মানুষের চিত্তকন্দরের অসম্ভবের নিযুক্ত প্রেরণাকে তিনি জাগ্রত করেন। বারে বারে যুগে যুগে তিনি ঘোষণা করেন,—বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিবলে অসম্ভবকে সম্ভব করো, বিশ্বাসের আকর্ষণে স্থাণু পর্বতকে করো চলমান।

'প্রথম স্বর্গ ও প্রথম মর্তের অবসানের পর এক নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী আমার চোখে প্রতিভাত হোলো।'—খৃষ্ট বাণীর এই সঙ্গীত নব নব যুগের মানুষকে নব নব কর্মের অভিযাত্রায় উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, অনন্ত সুরনির্ঝরে অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর বুকে জাগিয়েছে চলিষ্ণুতার ছন্দিত স্পন্দন।

যীশু খৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ধর্মপ্রবর্তক, এই তাঁর আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে আমি ইউরোপে থাকতে ততো বুঝিনি যতো বুঝেছি প্রাচ্যদেশে এসে। মানবসমাজে বুদ্ধের প্রসন্ন প্রশান্তিরও সত্য প্রয়োজন আছে—এই প্রয়োজন জ্ঞানবৃদ্ধের। কিন্তু যীশুর প্রেমোন্মাদ আহ্বান যৌবনের ভাষা। এই বাণী ঝটিকার মতো বেগবান, বিদ্যুতের মতো প্রখর,—মানুষকে চলিষ্ণুতায় অণুপ্রাণিত করতে হলে এই আহ্বানের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায়ের প্রতি বিক্ষুব্ধ ঘৃণারও স্থান আছে, যে ঘৃণা যৌবনের বলিষ্ঠতা থেকেই সম্ভব। আত্মম্ভরী ফরাসীদের যীশু যে ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন যে ভাষা বিক্ষুব্ধ ঝটিকার মতো ভয়ংকর, সে বিচারে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এই ভয়ংকর ভর্ৎসনার শেষে যীশু আবার বুকফাটা বিলাপ করেছেন, ক্রোধ তখন অশ্রুজলে ধুয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজলের সঙ্গে তিনি বলছেন,—

'হা জেরুসালেম! ঈশ্বর যে সব সত্যদ্রষ্টাদের তোমার কাছে প্রেরণ করেন তাদের তুমি পাথর ছুঁড়ে হত্যা করো। কুক্কুটী যেমন তার শাবকদের পক্ষের নিচে একত্র করে, তেমনি আমি কতোবার তোমার সন্তানদের একত্র করবার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু তুমি তাতে সম্মত হলে না। তাই দেখ, আজ উচ্ছিন্ন বিধ্বস্ত মরুময় তোমার গৃহ।

যীশুর মানসিক উত্তেজনা ক্রোধ দিয়ে আরম্ভ, করুণায় তার অবসান। মানবাত্মার প্রতি তাঁর মহার্ঘ মঙ্গলময় দান প্রথমে ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুতের মতো আঘাত করে, পরে তা শান্ত বর্ষাধারায় স্নেহে করুণাপ্লাবনে প্লাবিত করে। তখন পরিচ্ছন্ন হয় ধরিত্রী, মেঘবিহীন নীলাকাশ ঝলকিত হয় সূর্যের উজ্জ্বল দাক্ষিণ্যে। হৃদয়ের গভীরতর কন্দরকে পবিত্র করার জন্য দুঃখের বন্যাবেগ তর প্রয়োজন, সেই সঙ্গে প্রয়োজন আনন্দ ও আশ্বাসের ব্যথা প্রলেপ।

খৃষ্টচরিত্রের বিশিষ্ট গুণ সাহস, বীরত্ব, অকুতোভয়তা। এই গুণ মানব-অন্তরের গভীর গুহাদ্বারে আঘাত করে, আবার অন্তর আকাঙ্ক্ষাকে অসীম উচ্চতার প্রতি আকর্ষণ করে। খৃষ্টচরিত্রের এই মৌলিক মহিমা ধর্মগ্রন্থের মূল সূত্র। খৃষ্টমহিমা এক সর্বজয়ী বিপ্লবের দুরন্ত প্লাবন যা প্রাচীন জীর্ণতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যার মতো তা পুরাতনকে বিধ্বস্ত করে। ঈশ্বরের নবীন রাজ্যের অমৃত সুধাধারাকে প্রাচীন পাত্রে অবরুদ্ধ রাখা যায় না। সেই পাত্র চর্ম নির্মিতই হোক আর প্রস্তর নির্মিতই হোক, বিস্ফোরণের মতো চূর্ণ হয় তার আবরণ।

খৃষ্টের চিত্র অত্যন্ত বীভৎস বিকৃতভাবে মাঝে মাঝে চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্র অনুসারে তিনি রক্ষণশীল নীতিবাদী, সাবধানী ধর্মপরায়ণ ও অসহ্য রকমের শান্তসন্ত্রস্ত। এই চিত্র মিথ্যা, এই চিত্র ইতিহাসকে বিকৃত করে। এইরূপ বৈশিষ্ট্যহীন দুর্বল চরিত্র কখনো পৃথিবীর অন্যায়ের শক্তিকে পরাভূত করতে পারত না, যুগে যুগে যৌবনের উদয়কে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারত না।

নবজন্মের বীজকে সংস্কারের খোসা সর্বত্র বন্দী রাখতে চেষ্টা করে। সেই আচ্ছাদনকে বিদীর্ণ করে জীবন নবারুণের আলোকে চোখ মেলে। প্রাচীনের জীর্ণ আবরণ সর্বদাই চেষ্টা করে মানুষের অভিযাত্রী আত্মাকে অনড়তার কারাগারে বন্দী করে রাখতে। কিন্তু প্রতি যুগে নূতন করে যীশু এসে উপস্থিত হন। তিনি আসেন আমাদের সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

"A great city is that which has the greatest men and women. If it be a few rugged huts it is still the greatest city in the whole world."

—*Whitman.*

সাত্যকি

১৪

ঠিক আমি যা আশঙ্কা করেছিলুম, তাই হোল শেষ পর্যন্ত। বৌভাতে সামাজিক গণ্ডগোলের সূত্রপাত করলো পামার উপস্থিতি। অথচ এতে পামার দোষ কতটুকুই বা।

নিমন্ত্রিতেরা জলস্পর্শ করতে অস্বীকার করলেন। আমাদের শত অনুরোধ, অনুনয় তাঁদের টলাতে পারলো না। এই অভ্যাগতদের মধ্যে কতজন যে খাঁটি চরিত্রের অধিকারী, কে তা বলবে? কে তার হিসাব করবে?

চোখের জল ফেলে পামা বাড়ির বাইরে চলে গেল। পামার সামাজিক মূল্য স্বীকৃত হলো না। ওর ত্যাগ, সেবা, স্নেহ কেউ দরদ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলো না।

কানাই দুঃখিত হলো। দুঃখিত হলুম আমরা সবাই।

কখন সুদাস অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে, টের পাইনি। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় সুদাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম—দেখলে তো, তোমার সম্মান ওদের কাছে কতটুকু? কেউ তোমার হয়ে একটা কথাও বললে না। অন্ততঃ নয়নের উচিত ছিলো, তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসা।

পামার উত্তর শুনতে পেলুম না। পরে সুদাসের আরো কথা থেকে বুঝতে পারলুম যে, পামা ছিল নিরুত্তর। সুদাস বলে চললো, এ রকম ভাবে অপমানিত হবার চেয়ে আমার সঙ্গে চলে চলো। আমি তোমায় রাণীর মতো করে রাখব।

পামা বলল, সুদাস বাবু, আমায় একটা অনুগ্রহ করবেন?

উৎসাহে ঝলমল করে উঠল সুদাস, আরে, আদেশ কর। এত কুণ্ঠা কেন?

—আপনি এবার যান। আর কখনো এখানে আসবেন না।

—তুমি আমায় যেতে বলছ?

—হ্যাঁ। নিরুত্তাপ গলায় পামা বলল।

এত সহজে এমন মর্মান্তিক কথা শুনতে হবে, সুদাস বুঝি জীবনে কখনো কল্পনাই করেনি। জীবনে যে নারীর মূল্য কেবলমাত্র টাকা দিয়ে মেপেছে, সে হৃদয়াবেগ কী জিনিস, তা জানবে কেমন করে? সুদাস যখন দেখলো পামার মন কোন কিছুর বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সে অন্য রাস্তা ধরলো। সমাজের ওপর বিষিয়ে দিতে চাইলো পামার মন। ভেবেছিলো সামাজিক আঘাতে নিশ্চয়ই ওর মন ভেঙে পড়বে। তাই আমার ওপর দোষ চাপিয়ে দিলো অনায়াসে। আমি দায়িত্বহীন। পামার প্রতি উদাসীন। তার সম্মান আমি যথাযথ রাখতে পারি না। আমি তাকে বাড়ির রাঁধুনী কিংবা ঝি'র চেয়ে বেশী মর্যাদা দি' না। পক্ষান্তরে সুদাস পামাকে রাণীর মর্যাদা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

বেশ খানিকক্ষণ সুদাস ঘর থেকে বেরুল না। আমি আমার উপস্থিতি জানাবার জন্যে গলাখাঁকারি দিলুম। ওরা কেউ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হোল না। কারণ কোন পক্ষ থেকেই ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পামা বললো, কৈ গেলেন না?

মরিয়া হয়ে সুদাস বললো, আমি যাবার জন্যে আসিনি। যাই তো তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

সুদাসের সীমাহীন স্পর্ধায় আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলুম। অসহায় একটা মেয়ের ওপর তাহলে সে বলপ্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। এ কেমন মানুষ? ভালবাসা দিয়ে যাকে পাওয়া গেল না, তাকে জোর করে পাবার প্রবৃত্তি হয় কেন? দেহ কি মনের খিদে মেটাতে পারে? সুদাস কী মারাত্মক ভুলই না করল। সে যে আর কোন দিন পামার মন জয় করতে পারবে না, তাতে আর আমার কোন সন্দেহ রইলো না। সুদাসের চাওয়া দেহ-সর্বস্ব। যে—রাস্তা দিয়ে গেলে পামার মন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারতো, দুর্ভাগ্যক্রমে সুদাস সে-রাস্তা মাড়াল না। আমি তা হলে জিতেছি। সুদাসের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। নিজেকে এমন শোচনীয় ভাবে সুদাস হারিয়ে দেবে ভাবতে পারিনি। পেশা ওর দালালী। একটা দালালের পেশাগত যে বাক-চাতুর্য, ধৈর্য্য আর সংযম থাকে সুদাসের তা নেই বোঝা গেল।

আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করলুম না। পামার মন নিয়ে যে পরীক্ষা আমি করেছিলুম, তাতে পামা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর পর আমি এক্ষুণি যদি নিজের উপস্থিতি না জানাই, তবে সুদাস একটা কিছু করে ফেলতে পারে। সুদাস এখন একটা আহত বাঘের মতোই হিংস্র হয়ে উঠেছে।

পায়ের আওয়াজ তুলে আমি ঘরের ভিতর ঢুকতেই দুজনে সচকিত হয়ে উঠল। সুদাসের ঔদ্ধত্যে তখন স্পষ্ট অসহায় লজ্জার ছাপ। আমি সহজ সুরে বললুম, আরে সুদাস যে! পামাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলে বুঝি?

আমতা-আমতা করে সুদাস বললো, এই—ইয়ে, মানে—

ঘরের মধ্যে যে গুমোট হাওয়া জমেছিল, সেটা কাটিয়ে দেবার জন্যে পামাকে বললুম, এক গ্লাস জল দাও তো।

পামা জল গড়িয়ে আনতে গেল রান্নাঘর থেকে। এই অবসরে সুদাসকে আমি বললুম, তা হলে, সুদাস, তুমি হেরে গেলে?

অবাক হয়ে গেল সুদাস।

ধনের দালাল সুদাস এখনো বুঝে উঠতে পারছে না আমি কী করে ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছি। ওর চোখে প্রথমে ফুটে উঠল বিস্ময়, তারপর ঈর্ষা আর তারো পরে লজ্জা। মাথা নীচু করে রইল সুদাস।

এ অবস্থায় পরাজিতের মনে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। তবে সমবেদনায় ভেঙে পড়তেও ইচ্ছে হলো না। নিজের শক্তির ওপোর অগাধ বিশ্বাস ছিলো সুদাসের। কোনদিন কোন মেয়ের কাছে সাকি হার স্বীকার করেনি। তাই হেরে যাওয়া কী জিনিস সুদাসের তা জানতে বাকী ছিল। আজ যখন বুঝতে পারলো পামাকে লোভ দেখিয়ে বশীভূত করা সম্ভব নয়, তখন আর তার কৌশল বদলাবার সময় ছিল না। বড় দেরীতে সুদাস তার ভুল বুঝতে পারলো। ভালবাসার বেলায় যে-কোন ভুলই খুব ক্ষতিকর। সব মেয়েই যে এক রকম হবে, সে মেয়ে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তার কোন মানে নেই। আহা, সুদাস যদি এটা আগে একটু বুঝতে পারতো।

পারলেই বা। কী আর হোত? আমাকে না হয় আর একটু সতর্ক হতে হোত। আরো তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হতো পামার মনের ওপোর। যে স্বভাবতই গম্ভীর অথচ পরিহাস-নিপুণা তার সঙ্গে সাদামাটা সুদাস পাল্লা দিতে পারবে কেন?

জল খাবার পর পামাকে বললুম, তুমি শুয়ে পড়। আমি আসছি। চলো সুদাস, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

—না না। রাত অনেক হয়েছে। তোমার আর কষ্ট করে যেতে হবে না। সুদাস তাড়াতাড়ি বললো।

বুঝতে পারলুম, সুদাস আমার সঙ্গ এখন এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচে। কোন কথা বলতে রাজী নয়। মনে মনে সে যে কী প্যাঁচ কষছে বুঝতে পারলুম না। সাঙ্ঘাতিক কিছু আবার করে বসবে না তো? অবশ্য আজকের মতো যা হবার হয়ে গেছে। তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। যদি এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পামার দৈহিক কোন ক্ষতি করে বসে? আজকাল তো প্রায়ই এসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া, ছুরি দিয়ে দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারি না, এ আবার কী ধরণের ভালবাসা যে, বাঞ্ছিত জনকে না পেলে তার কোন ক্ষতি করতে হবে! এটাকে মনের কোন বিকার হয়তো বলা চলে। কী জানি! আমি মনস্তাত্বিক নই। হয়তো মনস্তত্ত্ববিদেরা এর কোন মানে খুঁজে বার করতে পারেন। যাই হোক, পামাকে মোট কথা সাবধান করে দিতে হবে।

সুদাস চলে যাবার পর ভারী মন নিয়ে পামার কাছে ফিরে এলুম। এতো রাত হয়ে গেছে, অথচ ঘুম আসছে না। পামা আমাকে দেখে উঠে বসল। হাঁটুর ওপোর থুতনি রেখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু অন্যমনস্ক হবার ভাণ করলুম। কোন রকমেই পামার সঙ্গে আর সুদাসের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি আমার হলো না। বেশ বুঝতে পারছি, পামা আমার পরীক্ষার ব্যাপার অনুমান করে ফেলেছে এর মধ্যে। নইলে যে-কোন পুরুষ এতক্ষণে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলত।

—তুমি তা হলে জিতে গেলে, না? পামা তির্যক হেসে বলল। আমি আগে বুঝতে পারি নি, কেন সুদাসকে তুমি এত প্রশ্রয় দিতে। আজ বুঝতে পারলুম।

—কী বুঝলে তুমি?

—বুঝলাম, মেয়েদের তোমরা বাজারের পণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবো না।

—তা হলে ভুল বুঝেছ।

—মেয়েরা যে স্বাভাবিক অনুভূতি নিয়ে জন্মায়, তাহলে সেটাও ভুল, কী বলো?

—কী অনুভূতি নিয়ে মেয়েরা জন্মায় জানি না। তবে এটুকু জানি যে, মেয়েরা সত্যিকারের কাউকে ভালোবাসলে, তার প্রতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

—পরিবেশ কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করতে সময় সময় বাধ্য করে।

পামাকে আর ঘাঁটাতে সাহস হলো না। হয়তো বিগত জীবনের কথা মনে পড়বে। আর একবার যা হারিয়ে গেছে, যা কোন দিন কোন অবস্থাতেই ফিরে আসবে না, তা মনে পড়লেই কাঁদতে বসবে। ওকে দুঃখ দিতে মন চাইল না। এমনিতে আজ ও অনেক দুঃখ পেয়েছে। আশ্চর্য্য এক অনুকম্পায় ছেয়ে গেল মন।

—তুমি ঘুমোও। আমি পামাকে বললুম, আমি একটু কাজ সেরে নি। অন্য সময় তোমার কথার উত্তর দেওয়া যাবে।

উত্তর ওর জানা আছে। মর্মান্তিক ভাবেই জানা আছে। পরিবেশ কেমন করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করায়। আমার উত্তরের অপেক্ষায় ওকে থাকতে হবে না।

ভোর হবার একটু পরেই কানাই-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম। কানাইকে সাহায্য করা আমার উচিত। তাছাড়া ওর আত্মীয় বলতে, বন্ধু বলতে আমি ছাড়া আর কে আছে? ঘর-সংসার গুছিয়ে দেবার জন্যে অবশ্য স্ত্রীলোকের সাহায্য ছাড়া চলবে না। তবু একজন পুরুষমানুষের উপস্থিতি মনের জোর অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। আর কিছু না হোক পরামর্শ দেবার মত একজনকে চাই-ই চাই। অনেক সময় নিজের মনের কথা কাউকে শোনাতে পারলেও শান্তি পাওয়া যায়।

কানাই উপহার পাওয়া লরীটার তদারক করছে দেখে খুশী হলুম। নতুন বৌ নিশ্চয় দিন কয়েক বাদেই বুঝতে পারবে যে সে বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় একটা সতীন সঙ্গে করে এনেছে। তখন নিশ্চয়ই তার আর লরীটাকে ভালো লাগবে না।

আমাকে দেখে কানাই হাসিমুখে এগিয়ে এলো।

—নয়ন, গাড়ীটার একটা নাম দাও।

—নাম তো যা হয় একটা দিলেই হোল।

—না না। নামকরণের জন্যে দস্তুরমতো আমি ঘটা করব।

—সে কি! আমি কানাই-এর উদ্ভট খেয়াল দেখে অবাক হলুম।

—তুমি বুঝতে পারছো না, নয়ন! খাবার দাবার তো অনেক বেঁচে গেছে। তাই দিয়ে আজই আমি একটা উৎসবের আয়োজন করতে চাই। বাড়তি খরচা তো আর লাগছে না। মাঝখান থেকে যাদের যাদের বলা হয়নি, তাদেরও নিমন্ত্রণ করা যাবে এই উপলক্ষে।

আমি ওর বুদ্ধির প্রশংসা করে চললুম, বেশ তো। এটা উত্তম প্রস্তাব। খাবারের সদ্গতি করতে আমি কোনদিন পেছপা হইনি। লাগাও ধুম ধাড়াক্কা।

—সে তো হোল। কিন্তু আসল কাজটা কর। একটা নাম ঠিক কর।

—নামের জন্যে ভাবনা কি? 'দীনবন্ধু' 'পথের সাথী', এরকম যা হয় একটা দাও।

—উঁহু। ও সব বস্তাপচা নাম চলবে না। আমাদের জীবনের সঙ্গে মিল আছে, এমন একটা নাম দাও।

—সেটা ভাই, ভেবে বলতে হবে।

—ভাবো এক্ষুণি।

—আরে এক্ষুণি ভাবা যায় নাকি? আমি অসহায়ের মতো বলি। জীবনে এরকম অবস্থায় কখনো পড়তে হবে জানলে দু'-চারটে নাম না হয় আগে থেকে বানিয়ে রাখা যেত। কোনদিন কেউ নামকরণের জন্যে আমার সাহায্য এ ভাবে চাইবে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। নাম দেয় নামী লোক। আমি তো অতি সাধারণ একটা লরীওয়ালা। অহঙ্কার একটু হোল মনে মনে।

কানাইকে অভয় দিয়ে বললুম, তুমি জোগাড় যন্ত্র করে ফেল উৎসবের। আমি তোমার লরীর একটা অসাধারণ নাম দোব। যার মানে বলতে বলতে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে কানাই কয়েক জায়গায় নিমন্ত্রণ করার পর বললো, চলো আমাদের পুরানো বাসায় যাওয়া যাক।

বাড়িতে এসে কানাই পামার কাছে বসে পড়ে বললো, বৌদি, আমার ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, কালকের ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না। আমি খুব অসহায় ছিলুম বলেই তোমায় চোখের জল ফেলে আমার বাড়ি থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। আমি আজ একটা উৎসবের আয়োজন করেছি। উৎসব আর কিছুই নয়, আমি বিয়েতে যে লরীটা পেয়েছি, তার নামকরণ করা হবে। তুমি হবে প্রধান অতিথি। ভয় নেই, আজ তোমাকে কেউ কিছু বলার স্পর্ধা দেখাতে পারবে না।

—কেউ কিছু বললে, তার মুখ আটকাবে কেমন করে, ঠাকুরপো? পামা বিষণ্ণসুরে জানতে চাইল।

—সে ভার আমার ওপোর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, বৌদি! আমি জান কবুল করলাম তোমার কাছে। দেখে নিও, তোমার ঠাকুরপো আজ তার কথা রাখতে পারে কি না পারে। দৃঢ় গলায় কানাই পামাকে আশ্বাস দিলো।

—ঠাকুরপো, কিছু মনে করো না। আমাকে আর কিছুর মধ্যে জড়াতে চেও না। তুমিও দুঃখ পাবে, আমিও পাবো। তুমি জানো না আমি কী দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি। ভাল হবে জেনে যে জিনিসে হাত দিতে চাই, তাই মন্দ হয়ে দাঁড়ায়।

—তার জন্যে তুমি তো দায়ী নও, বৌদি!

—কাউকে আমি দায়ী করতে চাই না, ভাই! আমি শুধু এ-জীবন থেকে মুক্তি চাই।

মুক্তি চাই বললেই—

আমি এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা ছিলুম। কানাইকে বাধা দিয়ে বললুম, কানাই যখন এত করে বলছে তখন আজকের দিনটা অন্তত কানাই-এর আব্দার তোমার রাখা উচিত। পামা, চলো আমরা সবাই মিলে সকলের স্বাস্থ্য পান করে বিগত দিনের জ্বালা ভুলে যেতে চেষ্টা করি।

কানাই আমার দিকে চেয়ে রাগতস্বরে বললো, স্বাস্থ্যপান আজ সকলের সঙ্গে বৌদি করতে পারবে না। অন্তত আমি তা হতে দেবো না।

—বেশ বেশ। তোমরা নিজেরা ঠিক কর কী করবে। আমি ওতে আর নেই। আমাকে নাম ঠিক করতে বলেছ। আমি নাম ঠিক করে পামাকে দিয়ে দোব? পামা নামকরণ করে দেবে।

আমি ওদের রেখে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম কাজের সন্ধানে।

শেষ পর্যন্ত কানাই পামাকে হাজির করলো নামকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে। সভাপতি হলো মহিম হালদার। লোকজন বেশী নয়—জন তিরিশেক হাজির হলো। বেশীর ভাগ মহাজন আর লরীওয়ালা। তা ছাড়া দর্শক হিসাবে মজা দেখতে এলো কুড়ি-পঁচিশ জন। আর কোথাও কখনো লরী নামকরণের উৎসবানুষ্ঠান হয়েছে কি না জানি না! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্যে আরো বেশী সংখ্যক লোক দর্শক হিসাবে উপস্থিত হবে এ আশাই করছিলুম।

পুরোহিত স্তোত্র পাঠ করা শেষ করবার পর, নামকরণের জন্যে পাঁচটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হলো।

লরীর বনেটের সামনের দিকে সিঁদুরগোলা দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে পামা ভয়ে-ভেজা গলায় ঘোষণা করলো, নাম দিলুম, 'ঐরাবত'।

সঙ্গে সঙ্গে নারকেল ভাঙার আওয়াজ মিশলো শাঁখ আর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে। ধূপধুনা গুগ্গুল চারদিকে একটা পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো। হৈ-হৈ করে জয়ধ্বনি দিলো উপস্থিত সকলেই।

কানাই-এর অনুরোধে পামা সবাইকে মিষ্টি দিলো। আমি আশঙ্কা করছিলুম, হয়তো বৌভাতের রাতে যে কুৎসিত দৃশ্য অভিনীত হয়েছিলো আজো তাই হবে। কিন্তু দেখলুম আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি কানাইয়ের। এটা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। কানাই পামাকে দিয়ে প্রমাণ করাতে চাইলো যে সমাজরক্ষকেরা নিজেদের অহমিকা বজায় রাখবার জন্যে যে-দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো, ব্যবহারিক জীবনে তার কোন দামই নেই। যারা পামার উপস্থিতি সহ্য করতে পারেনি, আজ তারাই নিঃশব্দে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে তারই হাত থেকে মিষ্টি নিয়ে খেতে আপত্তি করলো না।

পামাকে লালপাড় গরদের শাড়ীতে অতি সুন্দর মানিয়েছিল। ওকে দেখে যে-কোন লোকের মনে হবে যে বড় একজন মোটরচড়া সমাজসেবিকা—যে অবসর বিনোদনের জন্যে একটা কিছু করার দরকারে সমাজ কল্যাণের পথ বেছে নেয়। আহা, প্রাণের তাগিদে ক'জনই বা কাজে হাত লাগাতে চায়! তাই যদি হোত তবে দেশের অবস্থা কত আগেই না ভাল হয়ে যেত। যার অংশে যতটুকু পড়েছে, সে যদি ততটুকুই ভাল ভাবে করতো, তবে পঞ্চবার্ষিকী কল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণ কত সহজেই, কত কম খরচেই না হোত। যদি ইঞ্জিনিয়ার কাজে ফাঁকি না দিতো, অথবা ঠিকাদার কমদামের মাল না চালাতে চেষ্টা করতো।

সভার কোন জায়গা থেকেই যখন কোন গোলমাল দেখা গেল না, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। সুদাস এক অবসরে আমায় চুপি চুপি বলে গেল, যাক পামার সমাজ-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। আর কোন ভয় নেই।

ভয় নেই বললেই তো আর ভয় চলে যায় না!

সবাই চলে যাবার পর পামাকে মহিম বললো, শোন বৌমা, বৌভাতের রাতে যে অভদ্র ব্যবহার পেয়েছো, তার জন্যে মন খারাপ করো না। আমরা সবাই তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

পামা ঘোমটা শুধু একটুখানি টেনে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কানাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে সৌজন্যসূচক দু-চারটে কথা বলে আমরা—আমি আর পামা ফিরে চললুম বাড়ির দিকে।

মৌনী পামা অত্যন্ত ভয়াবহ। আজ এতদিন ধরে ওকে দেখছি, কখনো, হাজার দুঃখের মধ্যেও, হাসি ছাড়া কথা বলেনি। আমার অক্ষমতা ওর কাছে প্রচণ্ড কৌতুক। কখন কখন আমাকে রাগানো ওর বিলাস। ওর মানসিক পরিবর্তন আমায় দারুণ ভাবিয়ে তুলল।

হঠাৎ গলা পরিষ্কার করে পামা আমায় বললো, রাগ করোনি তো?

আমি বুঝতে পারলুম, কেন এ প্রশ্ন পামা আমায় করল। কানাইয়ের লরীর নাম আমি যা ঠিক করেছিলুন, পামা তা রাখেনি। ও নিজের ইচ্ছে মতো একটা নাম দিয়েছে। নিশ্চয় ওর কোন মতলব আছে ভেবে আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি।

—না। রাগ করবো কেন? তা ছাড়া, তোমার দেওয়া নাম খুব সুন্দর হয়েছে। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি।

কৃতজ্ঞতায় ওর চোখ ছলছল করে উঠল। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ নীচু হয়ে প্রণাম করলো।

আমার বিব্রত ভাবকে আমল না দিয়ে পামা বলে চললো, তুমি তো কৈ জানতে চাইলে না, কেন আমি তোমার দেওয়া নাম পাল্টে দিয়েছি? তুমি জানতে না চাইলেও আমার বলা দরকার হয়ে পড়েছে। তুমি তোমার দেওয়া নামের যে মানে করেছ, তা তোমাদের জীবনে খাপ খায় না। ঠাকুরপো বিয়ে করে সংসারী হল। তুমিও মনে মনে সংসারী হতে চাও, কেন না আমাকে তুমি বহুবার অনুরোধ করেছ। ঘর ছেড়ে তোমরা বাইরে যাও, কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন বাদে ফিরবার জন্যেই। কিন্তু ভাবোতো সত্যিকার 'অনিকেত' কে? তুমি তো ঐ নামই আমায় বলতে বলেছিলে?

পামার মানসিক দ্বন্দ্ব অদ্ভুত ভাবে ওর যাবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে বসেছে। ও আজ কেবল দুঃখের কথাই আমাকে বলবে। আর বলে শান্তি পাবে। যদি এভাবে ও শান্তি পায়, পুরানো ঘটনা ভুলে যেতে চায়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কাউকে না কাউকে মনের কথা খুলে বলা দরকার। তাতে পুঞ্জীভূত বেদনার খানিকটা উপশম হতে পারে।

কিন্তু ভুল ভাঙল পামার পরের কথায়।

—তোমার জিনিষপত্র কোথায় কী আছে দেখে নাও। পামা আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিলো।

—সে সব যে বোঝবার তাকে বোঝাও গে। আমি কোন দিন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আজও ঘামাতে পারব না। আমি পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলুম।

বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না পামাকে। আমাকে এক গ্লাস মিছরির সরবত এনে দিলো। তারপর সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজালো। ঘরের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সে যখন মন দিলো, তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলুম। একটা জরুরী মাল পৌঁছে দিতে হবে কলকাতায়।

গোলা থেকে মাল বোঝাই করতে করতে ভাবছিলুম, এবার যখন আমাদের দুটো লরী হল, তখন একটা সমবায় সমিতি করে পরিবহন ব্যবসাটাকে আরো বাড়িয়ে দিলে কেমন হয়। কানাইকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা। তাহলে 'সিণ্ডিকেটওয়ালা'দের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দেওয়া যাবে।

ঝড়ুয়া চালান হাতে নিয়ে ফিরে এলো। মাল তোলা বেশ তাড়াতাড়ি তা হলে শেষ হয়েছে বলতে হবে। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে কলকাতার দিকে এগুতে লাগলুম। আবার সেই নিশুতি রাত। হায়েনার থেকে থেকে বিশ্রী হাসি। হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গিয়ে রাস্তা পিছল হয়ে গেছে, ধারে ধারে অনেক জায়গায় জল জমেছে গর্তে, কাদায় ভর্তি জায়গায় গাড়ীর চাকা একবার পড়লে তুলতে বেশ বেগ পেতে হবে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে বেশ আসছিলুম। পথের ধারে দেখি গঙ্গুরাম ঠেলাঠেলি করছে তার একটা লরী। চাকা পিছলে যাচ্ছে। রাস্তার উঠাতে পারছে না। আমি নিজে থেকেই গাড়ী থামিয়ে এগিয়ে এলুম ওর দিকে।

—কী ব্যাপার, ভায়া? নীচে কী জহরৎ খুঁজতে নেবেছিলে নাকি? আমি ঠাট্টা করে বলি।

—না ভাই! একটা গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে এই হাল হয়েছে। গঙ্গুরাম আমায় বলল।

—খেজুরপাতা দাও চাকার তলায়- নইলে চাকা উঠবে না।

—তুমি একটু তোমার গাড়ী দিয়ে ঠেলে দাও না, ভাই! সকাতরে অনুরোধ করলো গঙ্গুরাম।

—আরে বাপস। আমার বোঝাই গাড়ী। বোঝাই গাড়ী নিয়ে আমি 'রিসক' নিতে পারবো না, ভাই!

—তব তুম জাহান্নমসে যাও। একেবারে রাষ্ট্রভাষা ছাড়ল গঙ্গুরাম।

'জয় রামজীকি' বলে গাড়ী ছাড়লুম।

'জাগুলিয়া' চেক-পোষ্টে এসে গাড়ী থামিয়ে আমি একবার গ্রেট কালীতারা কেবিনে ভাদুড়ী মশায়ের কাছ থেকে একটা বোতল নিয়ে চললুম পামার উদ্দেশ্যে। গ্রেট কালীতারা কেবিনের জমজমাট জনতাকে পেছনে ফেলে যেতে এতটুকু মায়া আমার হোল না।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখি দরজা খোলা। আশ্চর্য হয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি সন্ধ্যাদীপ তখনো জ্বলছে! এমন তো কখনো হয় না! পামা কোন দিন এরকম অবিবেচনার কাজ করেছে বলে তো মনে পড়লো না? পামা! পামা! বলে নিজের অজান্তেই আমি জোরে চীৎকার করে উঠলুম। 'কা-কস্য-পরিবেদনা'! কেউ নেই, কোথাও নেই। মাথা আমার ঝিম-ঝিম করে উঠল।

শোবার ঘরের মাঝখানে একটা জলচৌকির ওপোর চাবির গোছা চাপা দেওয়া একটা চিঠি পেলুম। মিটমিট করে জ্বলা হ্যারিকেনটার পলতে আরেকটু বাড়িয়ে পামার লেখা চিঠিটা পড়তে লাগলুম:

"শ্রীচরণেষু,

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন কতই না বদলে যায়! কাল যা সত্য ছিল, সুন্দর ছিল, আজও তাই তা থাকবে—এ আশা করা যায় বটে, কিন্তু আশা আশাই থেকে যায়।

প্রথম যেদিন তোমার হাত ধরে এ বাড়িতে উঠি, তখন আস্থা ছিল, বল ছিল, ছিল বিশ্বাস। আজ আমি চলে যাচ্ছি, এখনো তোমার ওপোর সবটুকু দোষ চাপিয়ে দিয়ে যেতে মন সায় দিচ্ছে না। কোথায় যাবো জানি না। কিন্তু যেতে আমায় হবেই তোমার শক্তির জোরে তুমি আমায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছ। সুদাস বাবু তোমার বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে নাজেহাল। আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেখানে, যে-সমাজে আমার স্থান নেই, সেখানে, সে-সমাজে আমার মন আর সমাজমুখী হয়ে উঠতে পারলো না। আমার আফশোষ রয়ে গেল।

তুমি আমার জন্যে কত কী করেছ। কিন্তু যা করে উঠতে পারোনি, হয়তো সেটা একান্তই তোমার দোষ নয়, সেটার প্রতি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সুদাস বাবু ঠিকই বলেছেন; তুমি অন্তত আমার হয়ে বৌভাতের দিন কিছু একটা করতে পারতে। আচ্ছা, দুটো সান্ত্বনার কথাও কী বলতে পারতে না?

ঠাকুরপো বুদ্ধি করে আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলো। আর তুমি? ওগো, তোমার ওপোর যে আমার অগাধ বিশ্বাস ছিলো!

নামকরণের দিন তুমি অদ্ভুত একটা নাম দিলে লরীটার—'অনিকেত।' মানে বললে, গৃহহীন। আমি তা মেনে নিতে পারি নি। তাই তোমার দেওয়া নাম বদলে দিয়েছি। আমায় ক্ষমা করো।

আজ আমার যেতে কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্যে, কানাই ঠাকুরপোর জন্যে। জানি না কোথাও আবার আমার ঠাঁই হবে কি না। তবে আবার আমার ঠাঁই দিয়ে কী হবে? আমি তো তোমার ভাষায় 'অনিকেত।' নিকেতনহীন পথই আমার সম্বল, তাই পথের মেয়ে পথেই বেরিয়ে পড়লাম।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নাও—পামা"

চিঠিটা পড়ে অনড় হয়ে বসে রইলুম। চাবির গোছায় হাত বুলিয়ে দেখলুম কী ভীষণ ঠাণ্ডা! আমার চটিজোড়া, গামছা, বিছানা পরিপাটি করে সাজানো। মনে হলো কে যেন আমার জন্যে ঘর সাজিয়ে প্রতীক্ষা করছে!

কী হোল? পামার হঠাৎ এ ধরণের মতিগতি কেন হল? আমি তো ওকে ভালবাসি! আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাল্লায় ও অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমাকে একবারও জানাবার দরকার মনে করলো না? কী নিমকহারাম মেয়েরা?

আবার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরে এলো। মেঝেটা কী সুন্দর পরিষ্কার আর ঝকঝকে। হ্যারিকেনের চিমনি অদ্ভুত ভাবে সাদা।

নাঃ! আমি আর ভাবতে পারলুম না। একটানে বোতলের ছিপি খুলে গলার মধ্যে নির্ভেজাল মদ ঢেলে দিতে লাগলুম। বুক জ্বলে গেল। এ জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি পামার স্মৃতি, তার স্পর্শ বিলুপ্ত হয়ে যেতো? যদি যেতো বিগত দিনের সব হাসি-কান্নার মুহূর্তগুলি এমনি করে পুড়ে খাক হয়ে। যে জীবন কামনা করেছিলুম অথচ পাইনি আর কখনো পাবো না বলে জানি, সে জীবনের কথা যদি আর ভাবতে না হোত!

যাক সব শেষ হয়ে। যাক নিঃশেষ হয়ে চেতনা লোপের পরম বন্ধু। জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে চাই, অনাগত ভাবে অভ্যর্থনার আশায় নয়, বর্তমানকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে। জীবনের পাত্র শূন্য হতে আর কতটুকুই বা বাকী!

শেষ

"আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশ অনেক ঘুরিয়াছি, জগতের সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূল ভিত্তিস্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও কাহারও আবার মানসিক উন্নতি-বিধান, কাহারও বা অন্য কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূল ভিত্তি স্থাপিত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পাগলা হত্যার মামলা

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

যে সকল মামলা কলিকাতা তথা ভারতীয় পুলিশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, "পাগলা মার্ডার কেস" বা পাগলা হত্যার মামলা উহাদের মধ্যে এক অন্যতম। এই মামলাটি সম্পূর্ণরূপেই পারিবেশিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে আদালতে সোপর্দ্দীকৃত হয়। মানুষ মিথ্যা কথা বললেও, পরিবেশ মিথ্যা বলে না। তাই এই হত্যাকাণ্ডটির কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও এই মামলার একজন আসামীর প্রাণদণ্ড এবং দুই জন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সম্ভব হয়েছিল। এই থেকে বুঝা যাবে, কিরূপ ধৈর্য্য ও চাতুর্য্যের সহিত এই মামলা তদন্ত ও সোপর্দ্দীকৃত হয়েছিল। এই মামলার তদন্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাধা করা হলেও এই তদন্তরীতি পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। তাই মহাধর্ম্মাধিকরণ জাষ্টিস খোন্দকার সাহেব হাইকোর্টের সেসেন কোর্টে উহার রায়-দান প্রসঙ্গে এই সুললিত তদন্তকে পুলিশি তদন্তের জয়যাত্রারূপে অভিহিত করেছিলেন।

এই মামলা সম্পর্কিত ঘটনা ও উহার তদন্ত জনসাধারণের মনকেও কম আলোড়িত করে নি। কারণ, এই মহাতদন্তে পুলিশের ন্যায় জনসাধারণেরও বহু ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ ঘটনার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঐ হতভাগ্য নিহত ব্যক্তি ও উহার হত্যাকারীর বিষয় জনসাধারণ আজও ভুলে নি। উত্তর-কলিকাতার গৃহে গৃহে এই ঘটনাটি আজও আলোচিত হয়ে থাকে। এই ঘটনার নায়িকা ছিল এই শহরের এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী। এই নারীর অদম্য ভালবাসা একাধারে নিহত ব্যক্তি ও তাহার হত্যাকারীর উপর পড়ে। ইহাই ছিল এই অভাবনীয় ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ। তাই বহু বৎসর ধ'রে বহু সাহিত্যিকও ঐ ঘটনাটির সদ্ব্যবহার করেছেন। উপরন্তু এই মামলার তদন্তে পুলিশ বিশেষরূপে জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্যলাভ করেছিল। তাই মামলাটিকে এই সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত একটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

এইবার মূল ঘটনা সম্বন্ধে বিবৃত করা যাক। এই সময় আমি শ্যামপুকুর থানায় একজন অফিসাররূপে কর্ম্মবহাল ছিলাম। ঐ দিন তারিখ ছিল ১১৩৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। সকাল আটটার সময় আমরা থানার অফিস-ঘরগুলিতে নিজ নিজ কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করছি, এমন সময় কলিকাতা করপোরেশনের ওভারসিয়ার বাবু বিনয়কুমার রায় হন্তদন্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব হতেই পরিচয় ছিল। বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরে ব্যাপার কি মশাই! আপনার আবার কি হল?' ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে আসেন নি। তিনি চোখ দুটি বড় বড় করে বলে উঠলেন, 'সাংঘাতিক কাণ্ড মশাই, জীবনে এ আমি দেখিনি। মুণ্ডুটা পর্য্যন্ত কেটে নিয়েছে!' এক সঙ্গে আমাদের সব কয়জনেরই হাতের কলম থেমে গেল। ঘটনাটি তাঁর নিকট শুনা মাত্র আমি হবিলদারকে একজন জমাদার ও দশজন কনেষ্টবল তৈরি করবার জন্য আদেশ দিয়ে, ত্বরিত গতিতে সংবাদ-বহিতে প্রাথমিক সংবাদরূপে তাঁর নিম্নোক্ত বিবৃতিটি লিখে নিলাম।

"আমি একজন করপোরেশনের ওভারসিয়ার। সকাল ছয়টার সময় আমি প্রতিদিনের মত এই দিনও মেথরদের কাজে খবরদারী করতে বার হই। ঘুরতে ঘুরতে আমি বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীটে এসেছি, এমন সময় আমাদের ঝাড়ুদার মোহন সম্মুখের মেথর-গলি হতে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, 'বাবু বাবু, ভিতরে একটা মুণ্ডুকাটা লাস পড়ে রয়েছে।' আমি সাহস করে ঐ গলির ভিতর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটি মুণ্ডহীন দেহ দেওয়ালের ভিতর একটি গর্ত্তে ঢুকানো রয়েছে। এর পর আমি মোহনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে আপনাদের খবর দিবার জন্য ছুটতে ছুটতে থানায় এসেছি।"

উপরি-উক্ত প্রাথমিক সংবাদটি থানায় নথিভুক্ত করে আমি ইনেস্পেক্টার সুনীল রায় এবং অন্যান্য অফিসারদের সহিত ত্বরিত গতিতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কোনও গুরুতর অপরাধের তদন্তে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন যথাসম্ভব ঘটনাস্থলে গমন, তা না হলে বিলম্বের কারণে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হয়ে যায়। ঐ সময় অধুনাকালের ন্যায় থানায় থানায় যন্ত্রশকট দেওয়া ছিল না। এই জন্য নিজ খরচায় ট্যাক্সি করেই আমরা ঘটনাস্থলে গমন করি। তা'ছাড়া অধিক অফিসার সঙ্গে নেওয়ার একটি কারণও ছিল। কারণ, ঘটনাস্থলে এমন অনেক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে, যার জন্য এক একজন অফিসারকে এক এক দিকে বিদ্যুৎগতিতে পাঠানোর দরকার হতে পারে। এইজন্য সদল বলে মাত্র পাঁচ বা ছয় মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছিয়েছিলাম।

ঘটনাস্থলটি ছিল একটি অপরিসর মেথর-গলিতে। এই অখ্যাত (পরে প্রখ্যাত) গলিটি কুমারটুলি অঞ্চলের বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট হতে নির্গত হয়ে দুই সারি বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগের মধ্য দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। এর অপর মুখটি ধ'রে কিছুটা দূর এগিয়ে গেলে শোভাবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে এমন একটিও দরজা ছিল না, যেখান দিয়ে কেহ এই গলিতে বেরিয়ে আসতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে এক করপোরেশনের মেথর ও ঝাড়ুদার ছাড়া এই মেথর-গলি বা সুয়ার্ড-ডিচ অপর আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হবার কথা নয়।

এই মেথর-গলিটা দিয়ে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে আমার মনে হল যে, এই গলিটার সহিত একমাত্র সিঁদেল চোরগণ ব্যতীত আর কারও পরিচয় থাকবার কথা নয়। এইজন্য যেতে যেতেই আমি

ইনেসপেক্টার রায়কে বললাম, 'দেখুন আমার মনে হয় হত্যাকারী একজন সিঁদেল চোর বা ডাকাতও বটে।' বিস্মিত হয়ে আমাকে সুনীল বাবু বললেন, 'এ কি বলছো তুমি? যে সিঁদেল চোর সে তো খুনে-ডাকাত কখনও হয় না? এই সম্পর্কে বিলাতী বইগুলো তো অন্য রকম বলে।' এই সম্বন্ধে কয়েকটি বিলাতী কেতাব আমারও পড়া ছিল। কিন্তু তাদের সহিত সব কয়টি বিষয় আমি একমত হতে পারিনি। কারণ ঐ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। তাই উত্তরে আমি বললাম, 'দেখুন সিঁদেল চোর, ডাকাত ও খুনে আমার মতে এক শ্রেণীরই তিনটি উপশ্রেণী। কারণ এরা সকলেই বস্তু কিংবা ব্যক্তির উপর বলপ্রকাশ করে থাকে। এইজন্য যে সিঁদেল চোর সে খুনও করতে সক্ষম। তালাভোড়রা নিষ্প্রয়োজনে আঘাত না হানলেও প্রয়োজন হলে আঘাত হানে। এইজন্য উহাদের মধ্যবর্ত্তী অপরাধী বলা হয়ে থাকে। ডাকাতরা একাধারে দরজা-জানালা বা দেওয়াল ভেঙে সম্পত্তি অপহরণ করে এবং প্রয়োজন হলে ভয় দেখায় বা খুনও করে। তবে একজন নির্ব্বল চোর, অর্থাৎ যে কোনও বস্তু কিংবা ব্যক্তি, কারও উপর কোনও অবস্থাতেই বলপ্রকাশ করে না, সে সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধী। এইজন্য এরা কখনও হত্যাকার্য্য করবে না। এই কারণে আমার মনে হয় যে, এমন ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ড করেছে সে এই অঞ্চলে সাল বা সিঁদেল চোরের কার্য্যের জন্য এই গলিটি পূর্ব্বে ব্যবহার করেছে।'

এই ভাবে কথোপকথনের মধ্যে আমরা মূল ঘটনাস্থলে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গলির তলদেশ হ'তে প্রায় চারি ফুট ঊর্দ্ধে একটি বাটীর পিছনের দেয়ালের ভিতরকার একটা গর্ত্তে উপুড় অবস্থায় একটা মুণ্ডহীন দেহ রাখা রয়েছে। মস্তকটি বেশ যত্ন-সহকারে স্কন্ধদেশ ঘেঁসে পেঁচিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে। ঐ মৃতদেহের নিম্নে কোনও রক্ত দেখা না গেলেও উহা হতে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দুইটি রক্তের চাপড়া দেখা যায়। সতর্ক দৃষ্টির সাহায্যে আমরা ঐ স্থানের বাটীর দেওয়ালেও রক্তের ফোঁটা দেখতে পেলাম। বেশ বুঝা গেল, এইস্থানেই ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং তার ফলে রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠে দেওয়ালের গায়ে লাগে। এর পর এই মৃত-দেহটিকে ধরাধরি করে তুলে ঐ গর্ত্তের মধ্যে ঘুসটে রাখা হয়। কিন্তু এই ভারি মৃতদেহটি অত উপরে তুলে রাখার জন্য একাধিক লোকের প্রয়োজন। এইজন্য আমরা ঐ সময়েই বুঝে নিই যে, হত্যাকারী একজন নয়, তারা নিশ্চয় দুই তিন বা ততোধিক ব্যক্তি।

এইবার কেহ কেহ ঐ দেহটি নীচে নামিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কিন্তু আমি ও সুনীল বাবু এই সম্বন্ধে একমত হতে পারলাম না। এইজন্য আমরা ফটোগ্রাফার, প্লানমেকার ও ফিঙ্গার ও ফুট প্রিণ্ট এক্সপার্টের জন্যে অপেক্ষা করা সমুচিত মনে করলাম। বলা বাহুল্য, আমরা ঘটনাস্থলে রওনা হবার পূর্ব্বেই এই তিন ব্যক্তিকে সোজা ঘটনাস্থলে আসবার জন্য ফোনে বলে দিয়েছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ এক্সপার্টত্রয় অকুস্থলে উপস্থিত হলে আমরা প্রথমেই ঐ গর্ত্তসহ মৃতদেহটির একটি আলোকচিত্র তুলবার বন্দোবস্ত করলাম। কারণ তা না হলে জজ ও জুরিগণ প্রয়োজনবোধে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে হয়ত আপন আপন ধ্যান-ধারণা বশতঃ বলে বসতেন যে, ঐ অপরিসর গর্ত্তে অত বড় একটি দেহ প্রবেশ করিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। আমার বেশ মনে পড়ে, এই সম্পর্কে আমার সহকারীদের ঐ সময় আমি বলেছিলাম, 'আমাদের প্রতিটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে তাদের কথা ভেবে যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা না হলে আমাদের সকল পরিশ্রম এক দিন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।'

এইখানে ফটোতোলা কার্য্যের পর ঐ গর্ত্ত, মৃতদেহ, অদূরস্থ রক্তের চাপ এবং দুই পার্শ্বের বাটীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ গলিটির আরও দুই-তিনটি ফটোও আমরা উঠিয়ে নিলাম। এর পর প্লানমেকার এসে উপরোক্ত প্রতিটি পদার্থের পারস্পরিক দূরত্ব দেখিয়ে অতি সাবধানে ঐ গলির পরিধি ও দৈর্ঘ্যের মাপসহ ঐ গর্ত্তেরও একটি প্ল্যান এঁকে নিলেন। এ ছাড়া সম্যক আলোকের অভাবে ফটো তোলায় অসুবিধা হওয়ায় আমরা কুমারটুলির বিখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মণি পাল মহোদয়দের ডাকিয়ে এনে ঐ গর্ত্ত ও গলিটির একটি প্রাণবন্ত পেন্সিল স্কেচও তাঁদের দ্বারা আঁকিয়ে নিই। এই দুই ভদ্রলোক সানন্দেই বিনা পারিশ্রমিকে এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এর পর সাবধানে আমরা ঐ মৃতদেহটিকে নামিয়ে এনে উহা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে থাকি। আমরা প্রথমে রক্তের চাপের উপর বা অন্য কোনও স্থানে কোনও ফিঙ্গার বা ফুট প্রিণ্ট পড়েছে কিনা তা খুঁজতে চেষ্টা করি; কিন্তু কোথাও ঐরূপ একটি টিপচিহ্ন আমরা পাইনি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, হয়ত কোন বাড়ীতে হত্যাকাণ্ড করে মাথায় করে কিংবা শকটে তুলে দেহটি ঘটনাস্থলে আনা হয়েছে। কিন্তু যদিও দেওয়ালে রক্তের ফোঁটা সন্নিবেশিত থাকায় ঘটনাস্থল সম্বন্ধে আমরা দ্বিমত ছিলাম না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ গলির বাইরের রাস্তার উপর শকটাদির চাকার চিহ্ন আবিষ্কার করতেও চেষ্টা করি। কিন্তু কোথাও ঐরূপ কোনও চিহ্ন আমরা খুঁজে পেলাম না। এর পরে দেহটিকে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, উহার বক্ষে দুইটি গভীর ক্ষত আছে। এবং তদুপরি উহার উভয় পায়ের টেণ্ডন বা শিরাও কেটে দেওয়া হয়েছে। দেহটি পুরাপুরি নগ্ন থাকলেও তলদেশ হতে আমরা একটি রক্তসিক্ত গেঞ্জি ও একটি পৈতা আবিষ্কার করি।

এই মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমে আমাদের বার করতে হবে, এই নিহত ব্যক্তিটি কে? নিহত ব্যক্তিটির নাম, ধাম ও পরিচয় বার না করতে পারলে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা তো শক্ত হবেই, উপরন্তু এই মামলাটিও সম্যকরূপে প্রমাণ করা যাবে না। এক্ষণে মৃতের দেহাবয়বের ও উহার সন্নিকটে প্রাপ্ত পৈতাটি পরিলক্ষ্য করে মাত্র আমরা এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, লোকটি একজন ২৭ বা ২৮ বৎসরের দেশীয় ব্রাহ্মণ যুবক, কিন্তু সে একজন দেশবালী, মাদ্রাজী, উড়িয়া কি বাঙ্গালী তা বুঝা গেল না। এখন আমাদের প্রথম সমস্যা হল, মৃতব্যক্তির পরিচয় বার করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা মৃতদেহের পায়ের ও অঙ্গুলির ছাপগুলি সযত্নে সংগ্রহ করতে থাকি। কারণ, বহু ক্ষেত্রে যারা নিহত হয়, তারাও সৎ ব্যক্তি থাকে না। এদের কেহ কেহ বিবিধ অপরাধ করায় তাদের অঙ্গুলি ও পদচিহ্ন গৃহীত হয়ে পুলিশী দপ্তরে রক্ষিত আছে। অনেক সময় প্রকৃত অপরাধী না হলেও এরা মাতলামী গোলমাল বা মারপিট করার অপরাধে থানা সমূহে ধৃত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে এদের জামীনের কাগজে এদের সহির বদলে

টিপসহি পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোনও দলিল প্রভৃতিতে এদের দস্তখতের বদলে অঙ্গুলের টিপ পাওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু দেহ পুড়িয়ে ফেলার পর ঐ সকল চিহ্ন পরে প্রয়োজন হলে আর আমরা পাবো না, সেই হেতু আমরা পূর্ব্বাহ্নেই ঐ গুলি সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। অনেক সময় নিহত ব্যক্তিদের পদ-চিহ্ন তাদের ব্যবহৃত জুতার সুখতলাতেও সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। পরে যদি আমরা ঐ নিহত ব্যক্তির একজোড়া জুতা আবিষ্কার করতে পারি, তা'হলেও ঐ সুখতলার উপর অঙ্কিত পদচিহ্নের সহিত এই মৃতের পদ হতে সংগৃহীত চিহ্নের তুলনা করে বলে দিতে পারবো যে, ঐ মৃত ব্যক্তিটিই ছিল জুতার অধিকারী।

এর পর ইনেসপেক্টার রায় দেহটি আরও পরিদর্শন করে দেখলেন যে, মৃত ব্যক্তির একটি পা কুশ-পা, এবং উহার বাম বাহুর উপর একটি ফুলের উল্কিচিহ্নও আছে। এ'ছাড়া আমরা মৃত দেহের বক্ষে ও বাহুতে প্রচুর লোম দেখতে পেলাম! কিন্তু এইখানেই আমরা ক্ষান্ত হইনি। আমরা মৃতদেহের ওজন, দৈর্ঘ ও প্রস্থের মাপও গ্রহণ করতে ভুললাম না। কারণ কে বলতে পারে যে সখের কারণে বা চুরি করার জন্ত কোথায়ও তার দেহের ওজন গৃহীত হয়নি। এ'ছাড়া অন্ত কোথাও হতে মৃতব্যক্তির জামা প্রভৃতি উদ্ধার করে উহাদের মাপ হতে আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে, ঐগুলির অধিকারী ঐ মৃতব্যক্তিই। এইজন্ত আমরা একটি ভাল দর্জ্জিকে ডাকিয়ে এনে ঐ মৃতব্যক্তির দেহানুযায়ী কোর্টের ও সার্টের এক একটা মাপ তুলেও নিই। এই ভাবে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য্য সমাধা করে মৃতদেহের বিভিন্ন অবস্থার আরও দুইটি আলোক-চিত্র গ্রহণ করে আমরা আমাদের পুলিশ সার্জ্জেনকে ডেকে আনবার জন্ত ট্যাক্সি সহ একজন জুনিয়ার অফিসারকে পাঠিয়ে দিলাম। কারণ সঠিকভাবে কোন্ সময় হতভাগ্য লোকটি নিহত হয়েছিল তা তদন্তের কারণে আমাদের আশু জানা দরকার। ডাক্তার সাহেব অনতি-বিলম্বে ঘটনাস্থলে এসে মৃতের দেহের কাঠিন্য ও রক্তের জমাট পরীক্ষা করে বলে দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে গতকাল সন্ধ্যা নয়টা আন্দাজ সময়ে নিহত করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইনেস্‌পেক্টার রায় নিজে একজন ডাক্তার না হলেও স্বকীয় অভিজ্ঞতা প্রসূত ইতিপূর্ব্বেই খুনের সময়রূপে ঐ সময়টাই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

এর পর ধরাধরি করে আমরা মৃতদেহটি রাস্তার উপর এনে হাজির করলাম। স্বভাবতঃই প্রথম হতে একটি বিরাট জনতা সেখানে জড় হয়েছিল। এক্ষণে এই জনতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে উঠল। আমরা জনতা অপসারিত ত করিইনি বরং চাইছিলাম যে, আরও অধিক সংখ্যক লোক এসে মৃতদেহটি দেখে যাক। বস্তুতপক্ষে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ নিকট ও দূর হতে আগত বহু নাগরিককে আমরা ঐ মৃতদেহটি দেখে যাবার সুবিধে করে দিলাম। এই খুন সম্পর্কিত সংবাদ ইতিমধ্যে শহরের নানা দিকে রটে গিয়েছিল। এইজন্ত বিশেষ করে নিখোঁজ ব্যক্তিদের আত্মীয়রা দলে দলে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহাদের মধ্যে কেহই ঐ মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারলো না। এই কারণে স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে স্বভাবতঃই ধারণা হবার কথা যে, ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ অঞ্চলের কোনও বাসিন্দা ছিল না। কিন্তু শান্তিরক্ষীদের মন কখনও চিত্তপ্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত রাখা উচিত নয়। এইজন্ত আমরা তখনও পর্য্যন্ত কোনও স্থির অভিমত মনের মধ্যে পোষণ করিনি।

এর পর আমরা ঐ মেথর-গলিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর একবার পরিদর্শন করি। কিন্তু খুন সম্পর্কে কোনও প্রমাণ বা চিহ্ন আমরা আর একটিও পাই নি। তবে নিকটে অপর একটি প্রাচীরের গর্ত্তের মধ্যে আমরা একটি কুকুরকে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় শায়িত দেখি। সম্ভবতঃ আসামিগণ ব্যতীত এই একটি মাত্র জীব ঐ বীভৎস হত্যা দেখে থাকবে, কিন্তু এই ভীত ও ত্রস্ত কুকুরটি মূক বিধায় সে আমাদের কোনও উপকারেই আসিল না।

আমরা প্রথমে এই কুকুরটির মালিক সম্বন্ধে খোঁজ খবর করবো মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু করপোরেশনের মেথর মোহন আমাদের জানিয়ে দিল যে, ঐ কুকুরটির কোনও মালিক নেই এবং সে উহাকে প্রতিদিনই ঐ গলিতে ঘুরাফিরা করতে দেখেছে। কুকুরটিকে ঐ স্থানেরই একজন পুরাতন বাসিন্দারূপে বুঝে আমরা তদন্তের এই সম্ভাব্য পথটি তখনই পরিত্যাগ করি।

এর পর আমরা অকুস্থলের প্রায় প্রতিটি বাড়ীর বাসিন্দাদের এই খুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তারা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনও সংবাদ দিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে ঐ হত্যাকাণ্ড রাত্রিযোগে ঐ নিরালা গলিতে সমাধা হওয়ায় এই সম্পর্কে তাদের পক্ষে কোনও খবর না রাখা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

ঐ দিন ঐ মুণ্ডহীন দেহটি পরিদর্শন করে মাত্র এইটুকু জেনেছিলাম যে, মৃতব্যক্তি জনৈক ২৭ বা ২৮ বৎসরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। এবং উহাকে সম্ভবতঃ পূর্ব্বরাত্রে আট বা নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে নিহত করা হয়ে থাকবে। ঐ মৃতদেহ সংলগ্ন যজ্ঞোপবীত (পৈতা), রক্তের অসম্পূর্ণ জমাট এবং মৃতদেহের হাতের ও পায়ের চেটো সহ দেহাবয়বের স্বরূপ প্রভৃতি হতে আমরা এই কয়টি সিদ্ধান্তে আসি। এই দিন তদন্ত সম্পর্কে আর কোনও সফলতা লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে পরে মৃতদেহের লোমাকীর্ণ বাম বাহুতে উল্কিদ্বারা উৎকীর্ণ একটি বেলফুল আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। মৃতদেহের বাহুর ঐ উল্কি-চিহ্ন হতে একদিন তাকে সনাক্ত করানো সম্ভব হবে বুঝে আমরা মৃতদেহটি কলিকাতার পুলিশ মর্গে পাঠিয়ে দিই। এই সম্পর্কে ঐ পুলিশ মর্গের রক্ষককে আমরা আরও অনুরোধ জানাই যে, শব-ব্যবচ্ছেদের পর যেন ঐ দেহটি তাদের বরফ-যুক্ত ঠাণ্ডা ঘরে অন্ততঃ পনের দিন রক্ষা করা হয়।

এর পর যথারীতি মৃতদেহের পোষ্টমর্টমের জন্ত পুলিশ সার্জ্জেনের নিকট প্রয়োজনীয় নথীপত্র পাঠিয়ে আমরা তখনকার মত একটা অক্ষমতার গ্লানি নিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে থানায় ফিরে এলাম। প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করতে করতে এই দিন রাত্রি নয়টা বেজে গিয়েছিল। এইজন্ত তদন্তসম্পর্কীয় পরবর্তী কার্য্যক্রম সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতেই আমরা যে যার নির্দ্দিষ্ট বাসভবনে বিশ্রামের জন্ত ফিরে এলাম।

পরদিন ৬ই সেপ্টেম্বর—প্রত্যূষে ভোর ছটার সময় আমরা যে যার কোয়াটার হতে নেমে থানার অফিসে এসে পুনরায় এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্তরত হলাম। ইতিমধ্যে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ হতেও দুইজন অফিসার আমাদের সাহায্য করবার জন্ত এসে গিয়েছিলেন। ইনেস্‌পেক্টার সুনীল রায়, আমি স্বয়ং এবং তাঁরা—

এই চারজন অফিসার দস্তরমত সেখানে একটি রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বসিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, টিমওয়ার্ক ভিন্ন এই সকল দুরূহ তদন্তের সমাধা করা দুঃসাধ্য ছিল। আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল তিনটি, যথা,—প্রকৃতপক্ষে খুনী কে? কে খুন হলো? এবং কখন কোথায় বা কিরূপে এই খুন সমাধা হলো? ঐ সময় কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগে উন্নত ধরণের কার্য্যপদ্ধতি কেন্দ্র এবং ফোরেন্সিক ল্যাবোরেটারী স্থাপিত হয় নি। এইজন্ত ঐরূপ আলোচনার জন্ত আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতাসমূহই একমাত্র সম্বল ছিল। তবে যতটা বৈজ্ঞানিক সাহায্য পাওয়া যায় ততটাই সুবিধা। এইজন্য দুই জন গোয়েন্দা অফিসারকে আরও তদন্তের জন্য বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ও সুনীল বাবু পোষ্টমর্টমের রিপোর্টের অপেক্ষায় থানায় উপস্থিত থাকলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় দেহব্যবচ্ছেদ সমাধা হবার পর আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত পোষ্টমর্টম রিপোর্ট থানায় এসে পৌছল; এই রিপোর্টের সারবস্তুর একটি অনুলিপি নিম্নে উদ্‌ধৃত করা হলো।

"মৃতব্যক্তির বয়স অনুমান সাতাশ বা আটাশ। পাকস্থলীর পাচ্যমান খাদ্যের স্বরূপ ও রক্তের জমাট প্রভৃতি হতে বুঝা যায় যে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ আট বা নয় ঘটিকায় ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। অধিকন্তু ইহাও জানা গিয়াছে যে, প্রথমে ঐ মৃতব্যক্তির বক্ষে ছুরিকাঘাত করা হয়। ঐ সময় মৃতমজ্ঞ ভাবে সে পতিত হলেও তার মৃত্যু হয় নাই। ইহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি কেটে নেওয়া হলে সে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বরণ করে। অর্থাৎ তার মুণ্ডটি তার জীবিত অবস্থাতেই কর্ত্তন করা হয়েছিল। বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গিয়েছে যে মুণ্ডটি তার মৃত অবস্থাতে কর্ত্তন করা হয় নি।"

এইবার আমরা বুঝতে পারি যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সনে রাত্রি ৮ বা ৯ ঘটিকায় ঐ মেথর-গলিতে একজন ২৭ বা ২৮ বৎসর বয়স্ক যুবককে জোর করে বা ভুলিয়ে নিয়ে এসে প্রথমে ছুরি দ্বারা আহত ও পাতিত করা হয় এবং তাহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি কর্ত্তন করে তাহার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা আরও একটি বিষয়েও বিবেচনা করি। ঐ ভারি মৃতদেহটি মাত্র একজনের পক্ষে দেওয়ালের ঐ গহ্বরের মধ্যে ন্যস্ত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নিশ্চয় একাধিক ব্যক্তি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিল। এই তথ্যটি হতে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, হত্যাকাণ্ডটি দুই তিন বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই সকল বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সম্মুখে মূল তিনটি প্রশ্নই অমীমাংসিত রয়ে গেল। যথা—খুন হলো কে? কে বা কারা খুন করল? এবং কি উদ্দেশ্যে তারা এই খুন করলো? এই তিনটি বিষয় অবগত হওয়া মাত্র যে, এই খুনের কিনারা করা সহজ হয়ে উঠবে তা একজন সাধারণ মানুষও বোঝে, কিন্তু এই দুরূহ তথ্য তিনটির সমাধান কে আমাদের করে দেবে? কোনও এক অজ্ঞাত বিষয়-বস্তু অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হতে হলে গবেষকগণ গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকটি সম্ভাব্য পরিসংজ্ঞা কল্পনা করে নিয়ে থাকেন। তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণাকার্য্য এই নিয়মেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তদন্তকারী রক্ষিগণ এক একটি করে প্রতিটি থিওরী অনুসরণ করে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন। একটি থিওরী কিছুটা দূর অনুসরণ করে যদি বুঝা যায় যে, সম্মুখে আর পথ নেই বা উহা বন্ধ, তা'হলে তাকে ফিরে এসে দ্বিতীয় এক থিওরী অনুযায়ী তদন্তের কার্য্য করে যেতে হয়েছে। এমনি-করে একটির পর একটি থিওরী পর্য্যালোচনা করে রক্ষিগণ পরিশেষে দেখতে পান যে, তাদের একটি থিওরী অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ফলপ্রদ হতে চলেছে। অর্থাৎ ঐ অপরাধ সম্বন্ধে তাঁরা যা অনুমান বা থিওরী করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি মিথ্যা নয়, সত্য। এইজন্য এই হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে তদন্তের সুবিধার জন্ত প্রথমে আমরা নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি থিওরী তৈরি করে নিই। বলা বাহুল্য, যে সকল তথ্য বা ডাটা আমরা পরিদর্শন ও অনুমান দ্বারা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম উহাদের উপর নির্ভর করেই আমরা ঐ সকল থিওরী সৃষ্টি করি।

(১) নিহত ব্যক্তি হয়তো নিকটস্থ কোনও জমিদার বা ধনীর বাড়ীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ছিল এবং তার নিয়োগকর্ত্তারা ধনীই হবে, তা না হলে রাঁধুনী রাখবে কি করে? এদেশে ব্রাহ্মণদিগকেই রাঁধুনী নিযুক্ত করা হয়। চাকররূপে তাদের নিয়োগ প্রায়শঃ করা হয় নি। পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা হতে আমাদের এই সত্য জানা আছে। অতএব এই থিওরী অনুসারে নিহত ব্যক্তি যে রাঁধুনী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঐ জমিদার বা ধনী ব্যক্তির কোনও বিধবা বা অনূঢ়া কন্তার সহিত হয়তো ঐ নিহত ব্যক্তির প্রেম হয়ে থাকবে। ঐদিন রাত্রে বাড়ীর লোকেরা এই গোপন প্রেম ধরে ফেলে ঐ রাঁধুনী বামুনকে তাদের বাড়ীতে বা ঐ মেথরগলিতে হত্যা ক'রে চার পাঁচ জন মিলে দেহটাকে রাত্রে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই থিওরী অনুযায়ী আমরা সম্মুখ এবং বিপরীত, এই উভয় প্রকার তদন্ত সুরু করি। আমরা চর লাগিয়ে জানতে চেষ্টা করি যে, অকুস্থলে কেহ এইরূপ অবৈধ প্রেমের ব্যাপার অবগত হয়েছে কি না বা এইরূপ গুপ্ত-প্রেম সম্বন্ধে পাড়ায় কোথায়ও কখনও কানাকানি বা জানাজানি হয়েছে কি না? ঐ খুন যদি কারও বাটীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে তা'হলে ঐখানে প্রভূত রক্ত পড়বে এবং এই রক্ত তারা গোপনে ধুয়ে বা মুছে ফেলে দেবে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানবার চেষ্টা করি, কেউ কারও বাড়ীর সম্মুখের নালা বা নর্দ্দমার জল অস্বাভাবিক ভাবে লোহিতাভ দেখেছে কি না? আমরা করপোরেশনের মেথরদের জিজ্ঞাসা করতে থাকি, কেউ রক্তমাখা ন্যাকড়া কোথাও পড়ে থাকতে দেখেছে কি না? যদি আমরা উপরোক্তরূপ কোনও সংবাদ পেতাম তা'হলে বুঝে নিতাম যে, আমাদের উপরোক্ত থিওরীটিই সত্য এবং উহাকেই আমরা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত করে—ঐ বিশেষ পথেই আমরা তদন্তরত থাকতাম। কিন্তু তথ্য-তল্লাস ও অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এইরূপ কোনও সন্ধানই পাই নি। ব্যর্থমনোরথ হয়ে আমরা তখন নিম্নোক্তরূপ আমাদের দ্বিতীয় পরিসংজ্ঞা বা থিওরী অনুযায়ী তদন্ত সুরু করে দিই।

(২) নিহত ব্যক্তি হয়তো কোনও এক দুর্ব্বৃত্ত অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তির ভ্রাতা। পৈতৃক সম্পত্তি হতে চিরতরে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ঐখানে বা অন্ত কোথাও তাকে হত্যা করে, পরে সহকারীদের সাহায্যে তাকে এইখানে এনে ফেলে রেখে

গিয়েছে। ইহা সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে, ঐ নিহত ব্যক্তি কোনও এক ভদ্র ধনী পরিবারের পুত্র ছিল। কিন্তু ঐ নিহত ব্যক্তির দেহটার এবং হাতের ও পায়ের চেটো পরিদর্শন করে বুঝা গেল যে ঐ ব্যক্তির ধনীর ঘরে বর্দ্ধিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তার পায়ের চামড়া স্থূল ও কর্কশ এবং বিকৃত দেখা গিয়াছে। এই থেকে নিহত ব্যক্তিকে বরং একজন ভবঘুরে বা অধঃপতিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলেই প্রতীত হয়। এইজন্য এই থিওরী বা পরিসংজ্ঞাটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

(৩) হয়তো নিহত ব্যক্তি একজন অসৎচরিত্র যুবক। কোনও স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে তার কোনও এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকপ্রবর স্বয়ং কিংবা লোক মারফৎ তাকে নিহত ক'রে ঐখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই ব্যাপারে আমরা পুলিশ সার্জ্জেনকে শবব্যবচ্ছেদের সময় তার যৌনদেশ পরীক্ষা করে জানাতে অনুরোধ করি যে, ঐ নিহত ব্যক্তির কোনও যৌন-রোগ ছিল কি না। এবং নিকটস্থ বেশ্যালয় সমূহে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধবসহ হামেসা কোনও বেশ্যা-গৃহে গমন করত কিনা, তা'ও আমরা অবগত হতে চেষ্টা করি। এইরূপ দুই-একটি ঝগড়া-ঝাটির সংবাদ আমরা কয়েক স্থানে পাই বটে; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে বিবাদীরা বহাল তবিয়তে জীবিত আছে। এইরূপ কোনও এক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হ'য়েছে বলে একদিন জানা যায়, কিন্তু ঐ বেশ্যা-নারী এবং দালালেরা মৃতদেহটি ঐ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নয় বলে বিবৃতি দেয়।

(৪) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক ব্যবসায়ী বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এবং তাকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধিকার হতে বঞ্চিত করবার জন্য এই ভাবে হত্যা করেছে। এই থিওরীটি বিশ্বাস করলে বুঝে নিতে হবে যে নিহত ব্যক্তি অপুত্রক বা আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী বিহীন।

উপরোক্ত থিওরী অনুযায়ী অনুসন্ধান করে ঐরূপ কোনও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাইনি। বড় বাজারে ঐরূপ এক নিখোঁজ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সংবাদ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তদন্তে জানা গেল যে নিরুদ্দেশের সময় ঐ ব্যক্তির বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। তদুপরি মৃত যুবকের দেহাবয়ব ও আকৃতিও এই থিওরীর পক্ষে অনুকূল ছিল না।

এই সকল কারণে এই সকল থিওরী সম্পর্কীয় তদন্ত আপাতত স্থগিত রেখে আমরা নিম্নোক্ত থিওরী বা পরিসংজ্ঞা অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(৫) হয়তো বা সে কোনও রাজনৈতিক দলাদলি বা শ্রমিক-বিভ্রাটের কারণে নিহত হয়ে থাকবে। কিন্তু নিকটে কোনও কলকারখানা ছিল না এবং তার চেহারা হতে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হলো না। এইজন্য ঐ বিষয়ে কোনও তদন্ত আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিলাম।

(৬) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও পুরানো চোর বা তস্কর ছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কিংবা দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার কিংবা অপরের হিস্যা আত্মসাৎ করার জন্য তার দলের অপরাপর ব্যক্তিরা তাকে ঐ ভাবে হত্যা করে ঐ স্থানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই সম্পর্কে আমরা রক্ষিপুঙ্গবদের তাদের কোনও জানা চোর বা 'ইনফরমার' ঐদিন হতে নিখোঁজ হয়েছে কি না সেই সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য অনুরোধও করেছিলাম, কিন্তু কোনও স্থান হতেই এইরূপ কোনও সংবাদ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

যদিও উপরোক্ত কয়টি থিওরী বা পরিসংজ্ঞার উদ্ভাবক আমি নিজেই ছিলাম, তাহলেও পরিপূর্ণভাবে উহাদের কোনটি, আমার নিজেরই মনঃপূত হচ্ছিল না। কারণ একটি বিষয় পুনঃপুনঃ আমার মনোমধ্যে আঘাত হানছিল; সাধারণতঃ মৃতদেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, যাতে তাকে কেউ সনাক্ত না করতে পারে। বহুদূর হতে মৃতদেহ ঐ স্থানে নীত হলে মুণ্ড কর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এইজন্য স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে নিহত ব্যক্তি ঐ স্থানেরই কোনও বাসিন্দা ছিল। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই মত সম্পর্কে আমার মন সায় দেয় না। কারণ হত্যাকারী এমন এক বিজাতীয় ঘৃণার সহিত এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছিল যে, প্রথমে সে তাকে ছুরিকাঘাত করেও যথেষ্ট মনে করে নি। সেইজন্য মুণ্ডটি কেটে নেওয়ার পরও মৃতদেহের দুইটি পায়ের শিরা পর্য্যন্ত কেটে রেখে গিয়েছে। এই কয়টি তথ্য হতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হত্যাকারী একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি তো বটেই, অধিকন্তু সে মানব-মনের একজন অসাধারণ অবস্থার সন্ততি। এই ধরণের ব্যক্তি প্রেম ঘটিত ব্যাপারে কোনও এক ভদ্র নারীর সহিত নিশ্চয়ই জড়িত থাকবে না। তাহলে কি ঐ নিহত ব্যক্তি এবং উহার হত্যাকারী, এই উভয় ব্যক্তিরই যাতায়াত হামেসা বেশ্যাপল্লী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল? এই সকল বিষয় চিন্তা করে ইনেসপেক্টার সুনীল রায়কে আমার অভিমত জানালে তিনি আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণেই সমর্থন করেছিলেন। এইজন্য পরদিন হতে সোনাগাছি প্রভৃতি বেশ্যাপল্লীর প্রতিটি গৃহে আমরা জোর তদন্ত চালাতে শুরু করে দিলাম।

এই ভাবে তদন্ত করতে করতে সত্য সত্যই একদিন আমরা অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান পেলাম। এই সময় সোনাগাছি অঞ্চলের অম্বিকা নামক এক বাসিন্দা একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রদান করলো। বস্তুতঃপক্ষে অম্বিকার বিবৃতি আমাদের তদন্তের মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সাক্ষী অম্বিকার বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অতুল বাবু ওরফে পাগলা নামক এক ব্যক্তিকে চিনতাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাড়ী ফিরবার সময় আমি তাকে ভীত ও ত্রস্তভাবে সোনাগাছি অঞ্চলের একটি বাটীর রোয়াকে মণীন্দ্র বাবু নামক পাড়ার এক মাতব্বর ব্যক্তির নিকট বসে থাকতে দেখেছিলাম। ঐ সময় উহাদের চতুর্দ্দিক ঘিরে কয়েকজন গুণ্ডা ব্যক্তি তাকে বকাবকি করছিল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললো, মনে রাখিস, আমি যে সে লোক নই। আমি হচ্ছি খোকা! আমার নাম শুনেছিস তো? আমি তোকে খুন তো করবোই, 'সেই সঙ্গে তোর নাকও কেটে নেবো।' উত্তরে পাগলা বলছিল, আমাকে আপনি এবারকার মত মাপ করুন। আমি জীবনে আর ঐ স্ত্রীলোকটির ত্রিসীমানাতেও যাব না।' মণীন্দ্র বাবু মধ্যস্থতা করে এই সময় লোকটিকে অনুরোধ জানালো, আচ্ছা যাকগে যাক। এবারকার মত ওকে মাপ করে দিন। মণীন্দ্র বাবুর অনুরোধে ঐ লোকগুলো পাগলাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলে

পাগলা আমার পাশে পাশে চলে গরাণহাটা ষ্ট্রীটের দিকে এগুতে থাকলো। আমরা কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ঐ খোকা নামক ব্যক্তি গৌরবর্ণের অপর আর এক ব্যক্তির সহিত একটি বাড়ীর রোয়াক হতে পাগলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খোকা পাগলার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ওই গৌরবর্ণের লোকটিকে হুকুম করলো এই জলদী গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়। ব্যাপার বেগতিক বুঝে আমি সরে পড়েছিলাম। কিন্তু গৌরবর্ণের লোকটি আমার পথ আগলে বলে উঠলো, তুই শালা যাস কোথায়? আমি প্রতিবাদ করে তাকে বললাম, গালি দেন কেন, মশাই। উত্তরে সেই লোকটি বলে উঠলো, আর একটা মাত্র কথা কইলে তোকেও খুন করবো। এই সময় খোকা ওই লোকটিকে বললো, ওকে এখন যেতে দে, ওকে পরে ঠিক করা যাবে অখন। তুই তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে আন। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে আমি ফিরে গিয়ে ঘটনাটির কথা মণীন্দ্র বাবুকে জানিয়ে আসি। এর পর বাড়ী ফিরবার পথে আমি দেখতে পাই যে খোকা ওই গৌরবর্ণের লোকটি এবং আরও চার পাঁচ ব্যক্তি পাগলাকে একটি ট্যাক্সিতে বসিয়ে গরাণহাটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ট্যাক্সিটির নম্বর নেবার কথা একবারও আমার মনে আসেনি।"

ভারতীয় পদ্ধতিতে তদন্তরীতির নিয়ম প্রথমে সাক্ষীকে বিনাবাধায় তার বক্তব্য বিষয়ে বলে যেতে দেওয়া। তার পর তাকে জেরা করে সে যা বলেনি বা বলতে পারে নি তা বার করে নেওয়া। এইজন্য প্রথমে একদল সৌম্যমূর্তি রক্ষী হাস্যালাপ দ্বারা সাক্ষীদের প্রারম্ভিক বিবৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু ওই প্রথম রক্ষীর পক্ষে সহসা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়; সেই হেতু জেরার জন্য পরে গম্ভীর মূর্তিতে অপর একজন রক্ষীকে আসরে অবতীর্ণ হতে হয়। এইজন্য ভারতীয় অফিসারদের অভিনয়-চাতুর্য্যেও শিক্ষিত হতে হয়েছে। এ'ছাড়া মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি অনুযায়ী তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশেরও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এইজন্য ভারতীয় অফিসারগণ সমাজ-বিজ্ঞান ও লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। প্রথম অফিসারটি বন্ধুভাবে সাক্ষীদের কিছুটা তাঁবে রাখে, দ্বিতীয় অফিসার গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তার কাছ হতে কথা বার করে।

এই ভাবে ভারতীয় পন্থায় আমরা ওই অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষীর নিকট হতে যে সকল বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করি তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত প্রশ্নোত্তর হতে বুঝা যাবে।

"প্রঃ—হুঁ, তুমি যে সত্য কথা বললে তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কয়েকটা কথা আরও তোমাকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো। এখন সত্যি করে বলো কবে ও কোথায় তোমার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয়েছিল?

উঃ—আজ্ঞে, যখন কিছুটা বলেছি, তখন বাকিটাও বলবো। পাগলার সঙ্গে আমার এই পাড়াতেই এখানে ওখানে দেখা হতো। তার ভালো নাম ছিল অতুল বাবু। এসব পাড়ার মেয়েরা তাকে আদর করে পাগলা বলতো। লোকটা বাবু ভালো তবলা বাজাতো। তবলচিরূপে এপাড়া ওপাড়া, সব পাড়াতেই সে নাম করেছিল।

প্রঃ—আচ্ছা! তোমার তো সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তুমি কি শোননি যে সম্প্রতি ঐ পাড়ায় কোনও সুন্দরী নারীর সঙ্গে তার ভালবাসা জন্মেছিল? এইরূপ কোনও গল্প কি সে তোমায় কখন বলে নি?

উঃ—আজ্ঞে, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না। তবে তার সঙ্গে আমার সাধারণ ভাবে জানাশুনা ছিল। এ পাড়ার মেয়েরা তাদের গুরুজী বা ওস্তাদের সঙ্গে ঐরূপ কোনও কাজ করে না। এতে ঐ সব মেয়েদের মত তাদের ওস্তাদদেরও বদনাম হয়। এইজন্য ঐরূপ কোনও ঘটনা ঘটলেও লজ্জার খাতিরে সে তা আমার নিকট গোপন করেছে।

প্রঃ—আচ্ছা, তুমি তো অনেক বার পাগলাকে দেখেছো। কিন্তু নগ্ন অবস্থায় তার মুণ্ডহীন দেহটা দেখে কি তুমি তাকে সনাক্ত করতে পারবে? তুমি যে তাকে কিছুটা স্নেহ করতে তা তো বুঝতেই পারছি। এখন পূর্ব্ববন্ধুত্বের খাতিরে তার উপর তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে; এখন তুমি যদি তার কোনও প্রেমাস্পদ নারীকে খুঁজে বার করতে পারো তা'হলে ভাল হয়। হয়তো তারা তাকে বহুবার নগ্নগাত্রে দেখে থাকবে। সেইজন্য তাদের পক্ষে নগ্নগাত্র মৃতদেহটি যথাযোগ্য ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

উঃ—আজ্ঞে, অধিকাংশ সময়েই আমরা তাকে ধুতি, জামা ও চাদরে আবৃত দেখেছি। তাকে নগ্নগাত্রে ভালোরূপে না দেখলে তার মৃতদেহ সনাক্ত করার অসুবিধা আছে স্বীকার করি। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে অতীতে তাকে নগ্নগাত্রেও বহুবার আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। ইদানীং পাগলা অতিরিক্ত মদ্যপান করতে আরম্ভ করেছিল। কয়েক বার মাত্রা ছাড়িয়ে তাকে জ্ঞানহারা ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় রাজপথে গড়াগড়ি যেতে আমরা দেখেছি। এইজন্য তাকে ভর্ৎসনা করে ও পথ থেকে উঠিয়ে নিকটের কোনও নারীর বাড়ীতে এনে আমরা তার শুশ্রূষাও করেছি। এই সময় আমরা তার সারা দেহ ও বাহু লোম দ্বারা আবৃত এবং তার বাম বাহুতে উল্কি দ্বারা ফুল-চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে দেখেছি। তার শরীরের গঠনসহ ঐ সকল চিহ্ন হতে তার মুণ্ড না থাকলেও তার দেহ আমরা সকলেই সনাক্ত করতে পারব।"

সাক্ষী অম্বিকার উপরোক্ত বিবৃতিটি আমাদের অনেকটা আশ্বস্ত করলো। আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ সাক্ষীর ন্যায় সোনাগাছি অঞ্চলের বহু নারীও পাগলার মৃতদেহটি ঐ একই কারণে সনাক্ত করতে পারবে। বলা বাহুল্য যে, মৃতদেহটি সত্যই কাহার তা প্রমাণ করতে না পারলে এই খুনের কিনারা করা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে পুলিশমর্গের বরফ-ঘরে আমরা মৃতদেহটি রক্ষা করায় এই কয়দিন উহা অবিকৃত অবস্থাতেই ছিল। এই কারণে আমি প্রস্তাব করলাম যে এখনই ঐ পাড়ার বাড়ী বাড়ী তদন্ত করে কোন্ কোন্ নারীকে পাগলা গান শেখাতো বা তাদের কার কার বাড়ীতে সে তবলা বাজাতো তা জেনে ঐ সকল নারীদের পুলিশমর্গে নিয়ে গিয়ে তাদের সাহায্যে ঐ মৃতদেহটি সত্যই পাগলার কি'না তা অবহিত হওয়া যাক। কারণ তারা যদি বলে যে ঐ মৃতদেহ আদপেই পাগলার নয়, তাহলে তখনই বুঝে নিতে পারবো যে আমরা এই কয় দিন ভুল পথেই তদন্ত চালিয়ে এসেছি। এইরূপ অবস্থায় অনর্থক আর সময় নষ্ট না করে আমরা তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য আর এক পথে তা পরিচালিত করতে পারবো। কিন্তু ইনেস্‌পেক্টার সুনীল বাবু এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন যে এই পাড়াতে

যখন আসাই হয়েছে তখন সাক্ষী মণীন্দ্রকে খুঁজে বার করে তার বিবৃতিটি নিয়ে যাওয়া উচিত। সনাক্তকরণের পর্ব্ব বরং আরও দুই একদিন পরে করলেও চলবে। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বললেন যে তার অন্তরাত্মা তথা ইনিষ্টিংক্ট বলছে যে এইবার আমরা ঠিক পথেই তদন্ত সুরু করেছি।

বস্তুতঃপক্ষে অভিজ্ঞতা হতে আমরা দেখেছি যে, ইন্‌টেলিজেন্স বা বুদ্ধিবৃত্তি ভুল করলেও সহজাত বুদ্ধি (ইনিষ্টিংক্ট) বা প্রেরণা কদাচিৎ ভুল করেছে। স্ব স্ব ব্যবসায়ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী সাহায্যে আসে এই প্রেরণা। প্রত্যেক প্রফেশনাল ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রফেশনের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রেরণা লাভ করে থাকে। সকল প্রফেশনের লোকেরাই স্ব স্ব প্রফেশন বা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পৃথক পৃথক ইনিষ্টিংক্ট অর্জ্জন করেছে। এমন অনেক ডাক্তার আছে যারা দূর হতে রোগীকে দেখে বলে দিতে পারে যে তার রোগ কি। এমন অনেক পুষ্পবিক্রেতাকে আমি জানি যে খরিদ্দারদের দেখে বলে দিতে পেরেছে, সে ফুল কিনবে কি না। এবং কিনলেও সে তার দাম দেবে কত? বহুদিন একই প্রফেশনে নিযুক্ত থাকলে মানুষ এইরূপ পেশাগত ইনিষ্টিংক্ট লাভ করে। এমন বহু পুরাতন পুলিশ-অফিসার আছেন, যাঁদের নিকট দশ বার জন গৃহ-ভৃত্যকে দাঁড় করিয়ে দিলে তাঁরা বলে দিতে পারেন যে এদের মধ্যে ঐ লোকটিই চুরি করেছে। এ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তাদের একমাত্র উক্তি হয় যে তাদের মন বা ইনিষ্টিংক্ট এই কথা বলেছে। পরে প্রমাণিতও হয়েছে যে ঐ পৃথকীকৃত ভৃত্যটিই মাত্র ঐ চুরির জন্য দায়ী ছিল। বহুদিনের অভিজ্ঞ ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি লোকেরা প্রায়ই এই সহজাত প্রেরণা লাভ করে। কারণ মানুষের অন্তঃস্বভাব তাদের মুখের ভাব, চালচলন ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা পরিস্ফুট হতে বাধ্য। কিন্তু ঐগুলি এতো সূক্ষ্মভাবে পরিস্ফুট হয় যে সাধারণ দৃষ্টিতে সকল মানুষের নজরে পড়ে না। তবে যে সকল পুলিশ-অফিসার পুলিশী-কার্য্যকে চাকুরীরূপে গ্রহণ না করে প্রফেশন বা পেশারূপে গ্রহণ করে, তাদের চক্ষে ঐগুলি নিজেদের অজ্ঞাতেই ধরা পড়ে।

এই সকল কারণে পরবর্ত্তীকালে এই সকল কর্ম্মদক্ষ পুলিশ-অফিসারদের মধ্যে যারা পুলিশী-কার্য্যকে নিজেদের স্ত্রীপুত্র-কন্যা —এমন কি নিজেদের প্রাণের চেয়েও ভালবেসে ফেলে তাদের মধ্যে ঐরূপ এক প্রেরণা জন্মায়। এইরূপ অবস্থায় কোনও একটি ঘটনা দেখে বা শুনে তারা বলে দিতে পারে যে ঘটনাটিতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলেম ভারতে এবং বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে গোয়েন্দাগিরী করা ছিল এক শ্রেণীর নাগরিকদের প্রফেশন বা ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এই একই কারণে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঐরূপ সহজাত বুদ্ধি দেখা যেতো। এইজন্য ভারতীয় পুলিশ আজও পর্য্যন্ত তাদের ঐ সকল পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুকরণে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রেরণার উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল থাকে।

এই সকল কারণে আমি অভিজ্ঞ অফিসার ইনসপেক্টার সুনীল বাবুর মতেই মত দিই। বস্তুতঃপক্ষে রক্ষিপুঙ্গব সুনীল বাবুর মধ্যে আমি পুলিশী তদন্ত সম্পর্কীয় বহু অতীন্দ্রিয়তা (Hiper Sensibility) লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর চক্ষু ও কর্ণ আমি সামান্য একটু সন্দেহের উদ্রেক হওয়া মাত্র শিকারী মানুষের ন্যায় সতেজ হয়ে উঠতে দেখেছি। এই জন্য আমি তাঁর উপদেশ মত মণীন্দ্র বাবুকে খুঁজে বার করে তার একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিতে মনস্থ করলাম। এই মণীন্দ্র বাবু ছিলেন এই পাড়ার একজন শক্তিমান ব্যায়ামবীর। এইজন্য তাঁকে খুঁজে বার করতে আমাদের কিছুমাত্রও দেরী হয় নি। তাঁর বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল, পিতার নাম শ্রী···পাল। ×নং···রাস্তায় আমি সপরিবারে বাস করি। আমার পেশা···। এই দিন (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) আমি ঐ রাস্তায় অতো নম্বরের বাড়ীর রোয়াকে সন্ধ্যা আন্দাজ সাত বা সাড়ে সাতটার সময় বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় পাগলা দৌড়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ে বলে উঠলো, কর্ত্তা, রক্ষে করো আমাকে। তুমি ছাড়া আর কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ওদিকে তার পিছু-পিছু খোকাও তার সাত আট জন সাকরেদসহ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। খোকা চেঁচিয়ে উঠে বললো, আজ আর কারোও সাধ্য নেই যে ওকে বাঁচায় আমার কবল হতে। ওকে আমি অনেক বার সাবধান করেছি "কিন্তু ও কোনও কথা আমার শুনেনি। কালও ও গোপনে মলিনার ঘরে গিয়েছিল।—না, আজ আর আমি ওকে কিছুতেই ছাড়বো না। আমি তখন খোকাকে অনুরোধ করে বললাম, আরে ভাই! এবারকার মত ওকে ক্ষমা করে দে। আর ও কক্ষণো মলিনার ত্রিসীমানাতেও যাবে না। মলিনার সঙ্গে তোর প্রকৃত সম্পর্ক কি, তাও নিশ্চয়ই জানে না। আমার মধ্যস্থতায় খোকা একটু শান্ত হয়ে বললে, আচ্ছা। আপনার কথা মত আজ ছেড়ে দিলাম ওকে। কিন্তু পরে ওর কপালে কি আছে তা আমি বলতে পারছি না। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে পাগলা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে সরে পড়লো। ঐ সময় সেখানে পাগলার বন্ধু অম্বিকাও এসে গিয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, পাগলা ও অম্বিকা একসঙ্গেই গরাণহাটার দিকে প্রস্থান করলো। এর পর খোকাও তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঐ একই দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার প্রায় আধ ঘণ্টা পর অম্বিকা হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাকে জানালো যে খোকা ও তার সাকরেদরা পাগলাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

এই পর্য্যন্ত বলে মণীন্দ্র বাবু চুপ করলেন। বেশ বোঝা গেল, তাঁর আরও কিছু বলবার ছিল। কিন্তু বলি-বলি করেও তিনি তা আমাদের বলতে চাইছিলেন না। আমরা তখন চতুরতার সহিত কয়েকটি প্রশ্ন করে তাঁর নিকট হতে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলাম।

প্রঃ—"পাগলাকে আপনি কত দিন পূর্ব্ব হতে চেনেন? আর ঐ খোকাবাবু! খোকাবাবু লোকটা কে? সে থাকেই বা কোথায়? আপনি এই খোকার পরিচয় কতটুকু জানেন? তাড়াতাড়ি এই সংবাদ কয়টি দিলে আমাদের উপকার হয়। আমরা তা'হলে এখুনি খোকাকে গ্রেপ্তার করে তার বাড়ীতে খানাতল্লাস করতে পারি।"

উঃ—"পাগলার পিতৃমাতৃ পরিচয় আমি জানি না। তবে শুনেছি তার এক ভাই যশোহরে ডাক্তারী করেন। তার ভালো নাম ছিল অতুল বাবু। লোকটি ভদ্রবংশজাত হলেও খুনীমত অধঃপাতিত হয়ে এই পাড়াতেই এখানে ওখানে বাস করে। এই পাড়ার

নারীদের বাটীতে বাটীতে উৎসবে ও জলসায় সে তবলা বাজাতো। তবলা সম্বন্ধে সে একজন গুণী ছিল। সে যে চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিল তা আমি বলবো না। বরং সে চরিত্রবানই ছিল। তবে চরিত্রবানরাই একনিষ্ঠ হয়ে একটি নারীর সঙ্গে বসবাস করতে চেয়েছে। এইজন্য আমার মনে হয়, সে মলিনাকে গান শিখাতে গিয়ে ভালবেসে ফেলেছিল। তবে তাকে এই পাড়ার সকল মেয়েরাই পাগল বলে ডাকতো। শুধু তাই নয়, তাকে তারা ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। এ ছাড়া পাগলা সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ আমি দিতে পারবো না। এই তো গেল পাগলার কথা। এইবার খোকার কথা বলবো। এই খোকা হচ্ছে—স্যার, একজন জেলখারিজ গুণ্ডা। কিছু দিন যাবৎ পুলিশের নজর এড়িয়ে সে কলকাতায় ফিরে এসেছে। এখন তার এই পাড়াতেই আনাগোনা বেশী। আমি শুনেছি, সে মাঝে মাঝে মলিনার ঘরে এসে রাত্রিবাস করে। এই মলিনা হচ্ছে একজন নূতন চিত্রাভিনেত্রী। ৩৫নং ইমামবাড়ী থানাদার লেনে সে থাকে।"

"প্রশ্ন—পাগলাকে তো আপনারা প্রত্যহই দিনে ও রাত্রে এই পাড়াতেই দেখতেন। ঐ দিন সন্ধ্যা হতে এখন নিশ্চয়ই আর তাকে আপনারা এ পাড়ায় দেখেননি। তবু ওই ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও আপনারা কেউ থানায় গিয়ে এই সম্পর্কে সংবাদ দিলেন না কেন? তা'হলে কি বুঝতে হবে আপনার সঙ্গে খোকার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল?"

উঃ—"আজ্ঞে না না, তা নয়। পাড়ার কেউ কেউ হিংসা করে আমাকে মণি গুণ্ডা বলে। আমি একটু ব্যায়াম-ট্যায়াম করি কিনা, তাই লোকের এতো হিংসা। তবে কি জানেন? কোনও গুণ্ডালোক রাতবিরেতে এসে এখানকার মেয়েদের উপর জুলুম করলে সেই সব বাড়ীর বাড়ীওয়ালীরা চাকর মারফৎ আমাকে খবর পাঠায়। আমি তখন ঐ সকল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের ঘাড়ে ধরে বার করে দিয়ে তাদের রক্ষে করি। সপরিবারে এই পাড়াতেই আমি বসবাস করি, তাই ওদের পড়শী হিসেবে ওদের উপর আমার কর্তব্য করি, এই যা। তা না হলে থানা হতে পুলিশ আসতে আসতে এদের অনেকেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা বলে এই সব জেল-খারিজ খুনে গুণ্ডাদের সঙ্গে কে পেরে উঠবে বলুন? এদের কি কোনও বাড়ী-ঘর আছে যে আপনাদের তা জানাবো? অন্য দিকে এই সব ব্যাপার থেকে আমারই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এই বাড়ীওয়ালী মায়েরা একটু ভক্তি-টক্তি আমাকে করে, তাই তাদের কাছে যা যা শুনেছি তাই আপনাকে জানালাম।"

প্রঃ—"হুঁ, এক্ষণে বুঝতে পারলাম আমি সব। এখন এই মামলাতে আর কোনও সংবাদ তুমি আমাদের দিতে পার কি না বলো।"

উঃ—"আজ্ঞে। আর একটা কথা আমার জানা আছে। পরে শুনতে পেলাম পথ হতে একবার মুক্তি পেয়ে পাগলা এই পাড়ার 'নাকি-বীণা' নামে একটি নারীর বাড়ী ঢুকে পড়ে আশ্রয় ভিক্ষে করে। কিন্তু তারা তাকে আশ্রয় তো দেয়ই নি বরং খোকার হুমকীতে ভয় পেয়ে চাকর দিয়ে তারা তাকে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন একথা তারা স্বীকার করবে কিনা জানি না। কারণ এ পাড়ার কেউ সহজে এসব ঝামেলাতে জড়াতে চাইবে না।"

এ পাড়ার ভদ্র পরিবারের লোকেরা হচ্ছে সংখ্যালঘু। এ জন্য এখানকার সাক্ষীদের চরিত্র সম্বন্ধেও কিছুটা তদন্তের প্রয়োজন হয়। কারণ আমাদের যাবতীয় তদন্ত করে যেতে হবে তাদের কথা ভেবে যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা' না হলে একটি মাত্র ভুলের জন্য আমাদের যাবতীয় পরিশ্রম একদিন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়ে যেতে পারে। কোনও এক সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা পূর্ব্বেই আমাদের জেনে নিতে হয়েছে। অবশ্য সমাজের বিভিন্ন স্তর আছে এবং উহার প্রতিস্তরের মানুষেরই একটি নিজস্ব মূল্য আছে। একথা স্বীকার্য্য হলেও সাক্ষী সমাজের কোন স্তরের ব্যক্তি, তা জুরীদের পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়ে দেওয়া ভালো। অন্যথায় বিচারের সময় বিপরীত তথ্য প্রকাশ পেলে বিচারকমণ্ডলীর ভ্রান্ত ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়।

আমরা সংবাদ নিয়ে জানলাম যে, মণীন্দ্র বাবু হামেসা এখানকার নারীদের সংস্পর্শে এলেও নিজে তিনি একজন সাধু চরিত্রেরই লোক। এছাড়া এ-ও জানা গেল যে, এই ব্যায়ামবীরকে পল্লীর গুণ্ডাশ্রেণীর লোকরা রীতিমত ভয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজে জেল-খারিজ খোকা গুণ্ডার ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি প্রাণভয়ের কারণেই ঘটনাটি পুলিশের নিকট জানাতে পারেন নি। মণি বাবুর মত সাহসী ও শক্তিমান ব্যক্তিও যার ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত, সে যে একজন সহজ ব্যক্তি নয়, তা আমরা মণি বাবুর কথোপকথন হতে বুঝে নিতে পারলাম। এই সঙ্গে আমরা এ-ও বুঝতে পারলাম যে, এখানকার ভীতা ত্রস্তা নারীরাও এই একই কারণে ঐ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোনও বিবৃতিই প্রদান করবে না। সকল দিক বিবেচনা করে সহকারীদের দূরের একটি মোড়ের নিকট অপেক্ষা করতে বলে আমি এবং সুনীল বাবু ছদ্মবেশে হত্যা সম্পর্কে কিছুটা গোপন তদন্তে মনোনিবেশ করলাম। [ক্রমশঃ।

"Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riots there, undigested, all your life. We must have life-building, man-making, character-building, assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library." —*Swami Vivekananda.*

(উপন্যাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

তরুবালাকে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন মিসেস অনীতা রে। অনীতা বসেছিলেন ট্রেটব্যাঙ্কের একেবারে সামনের লনে। সবে-নামা সন্ধ্যের আলোয় সামার-হিলের সাজসজ্জা দেখছিলেন। তরুবালা ড্রইংরুমে যেতে নারাজ। একটা লন-চেয়ারে বসে বললেন, "এখানেই বসি মিসেস রে, বেশ ভাল ওয়েদার আজকে"—

"বেশ তো"—তরুবালার পাশে বসে অনীতা অনুচ্চগলায় বয়কে ডাক দিলেন। দ্রুতগলায় বাধা দিলেন তরুবালা, আজ আর কিছু খাওয়া চলবে না মিসেস রে—

শুধু এককাপ কফি নাহলে একটু কোকো—

না না, আজ একেবারে কিছু না। একটা অনুরোধ করবো আপনাকে, যদি একটু কষ্ট করে—

ঠিক এই গলায় আর এত দ্রুতলয়ে তরুবালা কখনও কথা বলেন না, অন্ততঃ অনীতা মিসেস বিশ্বাসের এ কণ্ঠস্বর কখনও শোনেন নি। চোখ বড় করে অনীতা তাকালেন তরুবালার মুখের দিকে, চোখের দিকে—মিসেস বিশ্বাসের যে পরিতৃপ্ত মুখের চেহারা দেখতে অভ্যস্ত অনীতা—তা নয়, একেবারে অন্যরকম। যেন মেঘে মেঘে থমথমে হয়ে উঠেছে তরুবালার মুখ, আর চোখে যেন কেমন ছটফটে একটা অস্বস্তির ছায়া। সুস্মিত মুখে অনীতা বললেন, আপনি অমন করে কেন বলছেন মিসেস বিশ্বাস, বলুন না কী করতে পারি আপনার জন্য—তরুবালার চোখের ছটফটে ছায়াটা আরো যেন চঞ্চল হলো, আরো ব্যাকুল। অনীতার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের বক্তব্যটা আবার যেন গুছোতে লাগলেন, শুনেছেন বোধ হয়, আমি খোকনের বিয়ে দিয়ে তারপর ওকে বিলেত পাঠাবো—

তরুবালার কথায় অনীতা হাসিমুখে বললেন, বা রে! সেদিন আমাকে কত মেয়ের ফটো দেখালেন আপনি, আমি ভাবছি, অনীতার কথা কেটে তরুবালার হাঁফধরা গলা বলে উঠলো, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে খোকনের বিয়ে দেব—অনীতার চোখ দুটি আরো বড় হলো। চোখের মণিতে ভর করলো অনেকটা অবিশ্বাস, কিছুটা বিস্ময় আর ছিটেফোঁটা কৌতুক। অনীতাকে নিরুত্তর দেখে তরুবালা আগের গলাতেই বলে উঠলেন, আপনি কী বলেন? ইন্দ্রাণী কেমন মেয়ে? আপনার তো ওবাড়িতে অনেক যাতায়াত—

এক মুহূর্ত বিরতির পর অনীতা বললেন, "অত্যন্ত চমৎকার মেয়ে, সব মিলিয়ে এত ভাল মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না"—

—কথা শেষ করলেন অনীতা, কিন্তু যেন শেষ হলো না। অনীতার কণ্ঠের এই দ্বিধাটুকু তরুবালার কানে এড়ালো না। ভুরু দুটি নিজের অজ্ঞাতসারেই সর্পিল হলো, মুখে ছায়া ঘনালো,

"আপনি কী খোকনকে ইন্দ্রাণীর অযোগ্য মনে করছেন?"

তরুবালার গলার জোরালো অভিমানকে চাপা দিয়ে সজোরে হেসে উঠলেন অনীতা, "কী-ই যে বলেন মিসেস বিশ্বাস,... অরুণেশ! অরুণেশের তো তুলনাই মেলে না—সেদিন আমার কাছ থেকে ফটোর নেগেটিভ নিতে এসে গল্প করছিলো; ওর কথায় আর ব্যবহারে আমি আর উনি তো মুগ্ধ একেবারে। ভারি ভাল, ভারি সুন্দর মনের ছেলে আপনার অরুণেশ।"

তরুবালার সর্পিল ভুরু একেবারে সোজা, মুখের ছায়া একেবারে নেই, আনন্দ-আপ্লুত কণ্ঠস্বরটা কিন্তু হোঁচট খেয়ে গেলো জিভের আগায় এসে, তাকে সরিয়ে অনুসন্ধানী গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো, "কিসের নেগেটিভ নিলো খোকন আপনার কাছ থেকে?"

"ঐ, নীলার আর ইনার একখানা ফটো তুলেছিলুম বাগানে, নীলার নাকি অত ভাল ফটো আর ওঠেনি। অরুণেশ নীলার ফটো এনলার্জ করবে ব'লে নেগেটিভখানা নিয়ে গিয়েছিলো।"

"ও!" তরুবালার কণ্ঠের ছোট্ট শব্দটা যেন লাফ দিয়ে বার হয়ে এলো। অনীতার চোখের দৃষ্টি চট ক'রে একবার তরুবালার মুখের চারি পাশ ঘুরে এলো, "আমাকে তাহলে ঘটকী হ'তে বলছেন?" অনীতার গলায় হাল্‌কা সুর।

"শুধু ঘটকী হ'লে চলবে না, বরের ঘরের পিসি ক'নের ঘরের মাসী হ'তে হবে, কোমর বেঁধে খাটাখাটুনী করতে হবে কিন্তু আপনাকে—" অনীতার মত হালকা সুরেই কথা শুরু করেছিলেন তরুবালা কিন্তু কথার শেষে গলাটা যেন হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠলো। আবার চকিতে অনীতার দৃষ্টি তরুবালার চোখ-মুখ জরীপ করলো। উঠে দাঁড়ালেন অনীতা, "চলুন না, দুজনেই একসঙ্গে যাই, একেবারে বিয়ের তারিখ ঠিক ক'রে ফিরবো।"

"না, আজকে আপনি একলাই যান, কথাবার্তা পাকা হ'য়ে গেলে তারপর আমি যাবো—হ্যাঁ ভাল কথা মিসেস রে, যদি ইন্দ্রাণীর বাবা-মা মেয়ে ছোটো ব'লে আপত্তি তোলেন, বলবেন, ইন্দ্রাণী বিয়ের পর ওঁদের কাছে থেকেই পড়াশুনো করবে, —খোকন বিলেত থেকে না ফেরা পর্যন্ত ওঁদের কাছেই থাকবে ও আর না, আর কিছু নয়—একেবারে বিয়ের কথা পাকা করে আসা চাই কিন্তু মিসেস রে!"

হাঁফ-ধরা গলাটাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই বোধ হয় তরুবালা তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে লনের এক পাশে এগিয়ে এসে পাইচারি শুরু করলেন। বিস্মিতা অনীতা কাপড় বদলাতে

ভেতরে চলে গেলেন আর ভাবতে লাগলেন—কত কিছু যে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু দুই আর দুই-এ কিছুতেই যেন আর চার হয় না! আর, অনীতা রায়ের শরীরটা যেই পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে ক্যাথলিক ক্লাবের পথ ধরলো, শুক্লবালা পাইচারি বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসে পড়লেন। কেবলই একটা কথা পাক খেতে থাকলো ওঁর মনে। উনি নিজে গেলেই ভাল করতেন বোধ হয়, ক্যাথলিক ক্লাবের গেট থেকে ফিরে না এলেই পারতেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এলেন অনীতা রায়। বললেন, রমেন শর্ব্বাণীর কোনো অমত নেই, এ বিয়েতে সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছেন ওঁরা, অবশ্য রমেন প্রথমে এত ছোটো বয়সে মেয়ের বিয়ে নিয়ে একটু কিন্তু-কিন্তু করছিলেন, কিন্তু অনীতা যখন শুক্লবালার জবানীতে বললেন—বিয়েটা এখন হয়ে যাক, ইন্দ্রাণী যেমন পড়ছে তেমনি আপনাদের কাছে থেকেই পড়বে, তারপর বি-এ পাশ করার পর আসবে শ্বশুরবাড়ি, তত দিনে অরুণেশও বিলেত থেকে ফিরে আসবে পড়াশুনো শেষ করে। এ কথায় সানন্দে সায় দিয়েছেন রমেন শর্ব্বাণী। তাহলে বিয়েটা কবে হলে সুবিধে হয় এই নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হলো, এই আলোচনার মাঝখানেই পাশের ঘর থেকে ইন্দ্রাণী মা বলে ডাক দিলো। শর্ব্বাণী সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন এবং তার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এলেন শুকনো মুখ করে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে নীরস গলায় বললেন,—ইনুর এখন একেবারে বিয়েতে মত নেই। রমেন স্ত্রীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে ভাবতে লাগলেন। কারণ, ইন্দ্রাণীর বয়েস যত অল্পই হোক্, বিয়ে নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে ওঁরা নাকি কেউই পারবেন না, ওঁদের অন্তরের ধর্মে তা বাধে। অনীতা তারপর বলেছিলেন,—চলুন মিসেস রায়, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমি নিজে একটু কথা ক'য়ে দেখি। কিন্তু, ওঁরা সবাই পাশের ঘরে এসে দেখলেন, ইন্দ্রাণী সে ঘরে নেই, তারপরের ছোটো ঘরেও না, বারান্দাতেও না। ভৃত্যকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেলো—মিস্ সাব যাওয়ার সময় বলে গেছে, মা'জী পুছলে যেন বলে দেওয়া হয়, ও ভীনা কাপুরজীর কাছে বেড়াতে গেছে। রমেন বাবু এবং শর্ব্বাণী দু'জনে যেমন লজ্জিত হ'য়েছেন তেমনি বিব্রত, বারে বারে আপনাকে বলতে বলেছেন, কথাটা এখন পাকা হ'য়ে থাক, বিলেত থেকে অরুণেশ ফিরে আসার পরই বিয়েটা হবে।

: দাদা আর স্নান করবে কত? বাথরুমের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে নীলা। ওর মনের অসহ্য উল্লাসটা যেন একটা আহ্লাদে পাখি হ'য়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। দাদাকে যেমন ক'রে হোক এ বিয়েতে মত করাতেই হবে, কিছুতেই কোনো আপত্তি শোনা হবে না দাদার—উঃ!—কী যে মজা হবে তাহলে—ইনা যদি আমার বৌদি হয়, কী মজা! কী মজা! নীলার মনটাই যেন হাততালি দিতে শুরু করলো। তর-তর ক'রে নিচে নেমে গেলো নীলা। নাঃ! দিদিটা এখনও আসেনি, কী যে এত বেড়ায় দিদি বুঝিও না আমি—সিমলায় আবার দেখার কিছু আছে নাকি! আনন্দ-পাখিটার ডানার ঝাপটে নীলা বেচারি অস্থির, ও আর করে কী—ডেকে ডেকে পরিচারক পরিচারিকাদের সুসংবাদটা বিলাস করলো, তারপর আবার লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরে। বাথরুমের কবাট আল্গা দেখেই চঞ্চল পায়ে দাদার ঘরে ছুট দিলো, "হুঁ, হুঁ, দাদা, কী খাওয়াচ্ছো বল? তোমার বিয়ে একদম পাক্কা। এবার এক ঠোঙা কাজুবাদামে চলবে না, এক-ঝুড়ি চাই—"

ক্লান্ত অরুণেশ চোখ বন্ধ রেখেই মিন-মিন ক'রে বললো, "তবে তো একঝুড়ি তালের খোঁজ করতে হয়, সিমলায় কি ও ফল মিলবে?"

"আহা, চোখ খোলোই না দাদা—" চেয়ারের পেছন ধরে বার কয়েক অরুণেশকে ঝাঁকি দিয়ে দিলো নীলা।

ও, ভারি তো দুটো তিতির মেরে এনেছো, এমন চেহারা ক'রে বসে আছো চেয়ারে যে মনে হচ্ছে যেন সুন্দর-বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বুঝি মেরে এলে তুমি—চোখ বুজেই উত্তর দিলো অরুণেশ, কাল দেখিস চুরুটনালার জঙ্গল থেকে কেঁদো বাঘ শিকার ক'রে কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরবো। বিয়ের কথায় দাদা মোটেই আমল দিচ্ছে না দেখে, নীলা চেয়ারের বাজু ছেড়ে অরুণেশের গলা জড়িয়ে ধরলো, দাদা লক্ষ্মীটি, এ বিয়েতে রাজি হ'য়ে যা, আমার কী যে মজা লাগছে!

আঃ নীলা, গলা ছাড়, বিশ্রাম করতে দে আমাকে। ড্রয়ারে টফি আছে, যা নিগে যা। অরুণেশের গলা ছেড়ে দিয়ে বাষ্পরুদ্ধ গলায় নীলা বললো, আমার কোনো একটা আব্দার রাখবে না, আর তোমার কেনা টফি আমি খাব, আমার বয়ে গেছে। রোজ রোজ এক ক্রোশ ঠেঙিয়ে বাংলা শিখতে যেতে হবে না, বাড়িতে বসে বসে মজা করে শিখতে পারবো, ইন্দ্রাণী আমার বৌদি হবে এত ভাগ্য কী আমি করেছি না কি?

কে? কে বৌদি হবে? চোখ খুলে ইজিচেয়ার থেকে একেবারে পিঠ-টান করে বসলো অরুণেশ।

ইন্দ্রাণী। মা তোমার সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিয়ের প্রস্তাব তুলতে ক্যাথলিক ক্লাবে গেছেন—নীলার গলায় অভিমান। অবিশ্বাসের হাসি হাসলো অরুণেশ, বললো, কী আজে-বাজে বকছিস নীলা! মা যাবেন ক্যাথলিক ক্লাবে—নীলা জোর দিয়ে উত্তর দিলো, বাবা আমাকে নিজে ডেকে খবরটা দিলেন, বাবা বুঝি মিছে কথা বলবেন? অরুণেশ ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে বোনের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোধগম্য করবার চেষ্টা করতে লাগলো। দাদার মুখের ভাবের অন্য অর্থ করলো নীলা, আরো অনেক বেশি জোর দিয়ে বললো দাদা, তুই রাজি হয়ে যা লক্ষ্মীটি, এমন মেয়ে আর হয় না। তুই তো একদিন বাজে বাজে কথা বলে শুধু চটিয়েই দিলি ইন্দ্রাণীকে, না হলে একদিন ভাল ক'রে আলাপ করলেই দেখতিস এমন মেয়ে আর হয় না। শব্দ ক'রে হেসে উঠলো অরুণেশ।

না দাদা হাসিস না, সত্যি সত্যি বলছি আমি। অরুণেশ কৌতুক গলায় বললো, তোর সেই ডেঁপো বন্ধুকেই বিয়ে করতে হবে শেষকালে?

নীলা ক্ষুব্ধ গলায় বললো, অল্প বয়েসে অনেক বেশি জানা খুবই আশ্চর্যের দাদা, তাকে ডেঁপো বলে না।

বোনের মুখের চেহারা এক পলক দেখে নিয়ে অরুণেশ সহাস্যে বললো, আহা, বোস না নীলা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বসে বসে তোর বন্ধুর গুণাবলী দাখিল কর দিকিন, আমি ভেবে-চিন্তে দেখি ও আমার ক'নে হতে পারে কি না। নীলা ঘরের কোণ থেকে একটা মোড়া হিড়-হিড় করে টেনে এনে দাদার সামনে মুখোমুখি বসেই বললো, জানিস দাদা, ইন্দ্রাণীর মা মানে মাসীমা ফিলোজফিতে

ঈশান-কন্যার, এ সংবাদে অরুণেশও মনে মনে কম বিস্মিত হলো না, কিন্তু মুখের ভাব সহজ রেখেই চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বললো, ইন্দ্রাণীর মা'র গুণ নিয়ে আমার কী হবে ?

না, মানে, মাসীমার কথা এমনি বললুম, ইন্দ্রাণীও কি ডিগ্রিতে কিছু কম যাবে না কি মনে করিস ? ইংরিজীতে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছে।

আচ্ছা, এক হলো, থামিসনে তুই নীলা, তোর বন্ধুর গুণাবলী দাখিল করে যা।

অমন সুন্দর মুখ বাঙালীদের মধ্যে চোখেই পড়ে না !

আচ্ছা তুই, তারপর ? এমন সময় সিঁড়িতে তরুবালার পায়ের শব্দ হলো। ঐ যে, মা এসে গেছেন—মোড়া ছেড়ে উঠে দৌড় লাগালো নীলা। চেয়ারে বসা অরুণেশের বুকে যেন বেতালা মাদল বাজতে লাগলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বের হবার আগের রাত্রিতেও এমন বেতালা বাজেনি। আর নীলা মায়ের ঘরের দরজায় ঢুকেই বেগ থামিয়ে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়েছেন তরুবালা, কী করুণ আর বিষাদ-বিধুর মায়ের মুখ ! অভিমানিনী নীলা নিঃশব্দে ফিরে এলো মায়ের ঘর থেকে। নিজের ঘরে বিছানা আশ্রয় ক'রে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে উপাধান ভিজিয়ে দিতে লাগলো। দাদার কথার সুরে অনেক ভরসা পেয়েছিলো নীলা, বুঝলো, দাদা ইন্দ্রাণীকে বৌদি করে এনে দিতে রাজি হলে কী হবে, ইন্দ্রাণী ওর বৌদি হ'তে রাজি নয়। বান্ধবীর প্রতি গোপন অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো নীলা। এর পর, সবিস্তারে সব শুনলেন অভয়শংকর। নীলা শেলির মারফতে অরুণেশের কানেও সব কিছুই এসে পৌছুলো।

পরদিন অপরাহ্ণ বেলায় রামদয়াল ইন্দ্রাণীর হাতে একটা মুখ-বন্ধ করা সাদা খাম দিলো। খামটা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলো, চিঠিখানা ওর হাতে দিতে কে বললে ?

রামদয়াল সবিনয়ে জানালো, যে, সাব ওর হাতে চিঠিখানা দিয়েছে, সেই বারে বারে বলে দিয়েছে যে, চিঠিখানা যেন শুধু মিস সাবের হাতেই দেওয়া হয়।

ও আচ্ছা—বলে চিঠি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো ইন্দ্রাণী।

: নিঃসন্দেহে অরুণেশের চিঠি এখানা। অরুণেশ ওকে চিঠি লিখেছে, অরুণেশ···অরুণেশ, নিশ্চয়ই অরুণেশ। খুলবো না। যথাশক্তি দিয়ে মনের দুয়ারে কপাট দিয়ে দিলো ইন্দ্রাণী। ও-খাম আমি খুলবো না—খুলবো না—খুলবো না। টেবিলের ড্রয়ার টেনে বন্ধ খামখানা ঠেলে একেবারে ভেতর দিকে রেখে ঝপাং করে বন্ধ করে দিলো ইন্দ্রাণী। আবার তখুনি অর্দ্ধেক খুলে আবার বন্ধ করলো। আবার খুললো।

: নিজের শক্তিতে বিশ্বাস থাকলে কালির অক্ষর কী করতে পারে ওকে ! খামখানা বার করে ফস্ করে একটানে ছিঁড়ে ফেললো মুখটা। বার হলো চিঠি। ভাঁজখোলার আগে ওর হাত কাঁপলো নাকি ?

: না, ও কিছু নয়।

"ইন্দ্রাণী,

তোমার কাছে এই আমার প্রথম চিঠি। লিপিটিকে অন্ততঃ লাবণ্যলিপি করার প্রয়াসে এক প্রহর রাত্রি খরচ করলুম—কিন্তু আজ বাগ্‌দেবী আমার প্রতি নিতান্তই অকরুণ, টেবিলের ওপর, এপাশ-ওপাশ সবটুকু এলোমেলো কাগজে ভরে গেলো কিন্তু, আমার মনোমত একটা সম্বোধনও আমার কলমের মুখে এলো না।

তবু মনের কথা জানাবো তোমাকে। যে বয়েই হোক, শুরু করি।

আজ সন্ধ্যে থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত আমি যেন অনুকূল-প্রতিকূল দুই বিপরীত স্রোতে ভেসে বেড়িয়েছি। আজ বারে বারে বাল্যের দেখা দু'খানি ছবির কথা মনে পড়েছে। ছোটবেলায় চার পয়সা বাক্সআলাকে দিয়ে কাচের ঢাকা বাক্সের ছবি দেখবো বলে বড় সেই গোল চোঙায় চোখ রেখেছিলাম। বাক্সের মালিক পয়সাটা পকেটে রেখে তার স্বভাব অনুযায়ী চিত্রবিন্যাস শুরু করে দিলো।

: রামরাজাকে রাজ্য দেখো···সীতা মায়ীকি প্রসন্নতা দেখো। আমি দুখানা ছবি দেখেছিলাম, ঝকঝকে সোনার সিংহাসনে সীতাকে পাশে নিয়ে রামরাজা বসে আছেন, সে ছবির জৌলুস বর্ণনায় কাজ নেই, সে বয়েসে অন্ততঃ আমার চোখে মনে হয়েছিলো—এমন সুন্দর ছবি আমি আর দেখিনি, রাম-সীতার দিব্যকান্তি, ওঁদের আশ্চর্য সুন্দর ঝলমলে ভূষণ, রামের পৌরুষ, সীতার মুখের প্রসন্ন দীপ্তি,—হঠাৎ ঘুরে গেলো ছবি—ঘুটঘুটে কালো রঙের একখানি ছবি, আকাশের পুঞ্জীভূত কালো কালো মেঘগুলিই যেন সমস্ত ছবিটাকে কালো করে দিয়েছে। সেই আশ্চর্যসুন্দর বসন-ভূষণে সাজানো প্রসন্ন দীপ্তিময়ী সীতা—একেবারে রিক্তা এ ছবিতে, ক্রুর কর্কশ রাবণ রাক্ষস এক হাতে কী নির্দয়ভাবে জাপ্টে ধরেছে সীতাকে আর এক হাতে ততোধিক নির্দয়ভাবে পক্ষচ্ছেদ করছে জটায়ুপক্ষীর, আকাশ থেকে ক্রমান্বয়ে পক্ষের ছিন্ন অংশ পড়ছে আর তার সাথে তাজা তাজা লাল রক্ত। এ কী অদ্ভুত ভীষণতা ! এক মুহূর্তের বেশি আমি সে ছবিতে চোখ রাখতে পারিনি, বাকী ছবিগুলি না দেখেই ছুটে ঘরের ভেতর পালিয়ে এসেছিলেম। সেদিন সেই বাক্সআলাটাকে একটা নিষ্ঠুর কসাইয়ের চেয়েও বেশি সাংঘাতিক মনে হয়েছিলো আমার। অমন সোনা-রঙা ঝলমলে অদ্ভুত সুন্দর ছবির পর এই কিম্ভুত কিমাকার কষ্টের ছবি। একটু পরে দেখালে কী হতো ! যার এতটুকু সামঞ্জস্য, এক বিন্দু সঙ্গতিবোধ নেই, তাকে ও ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে—তাই বোধ হয় তখন ভেবেছিলো আমার মন। কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে বাস্তবে অহরহ এমনি ঘটে থাকে এবং ঘটছে। বেশ তো শিকারের খেলায় মেতে গিয়েছিলেম আমি। সেই অভিনয়ের পরদিন থেকে এ ক'দিন আমি আমার শরীর ও মন দুটোকেই তাড়িয়ে ফিরেছি পাখির পেছনে। তারপর অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি ক'রে একটি কি দুটি পাখির হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে বাড়ি ফিরেছি অসহ্য ক্লান্তি নিয়ে। আর বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এসেছি, হৃৎপিণ্ড কি রক্তাক্ত হয় শুধু গুলীতেই ?

কালও সন্ধ্যের পর মৃত্যুর মত ক্লান্তি নিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছি চেয়ারে, নীলা ছুটে এলো। দাদা কী মজা ! ইন্দ্রাণী আমার বৌদি হবে, মা বিয়ে ঠিক করতে নিজে ক্যাথলিক ক্লাবে গেছেন। কথাটা বিশ্বাস করতে সময় লাগলো একটু, নীলা বাবার জবানী উল্লেখ করায় আর সংশয় রইলো না। তখুনি মনে হলো, আমার কোনো পুণ্যফলে কোনো দেবতা যদি

আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে বর দিতে চাইতেন, আমি এ ছাড়া আর কি চাইতেম? আর তারপরই সিঁড়িতে মায়ের পায়ের ধ্বনি শুনলাম—কিন্তু বড় যেন ঢিলা-ঢালা-শ্লথ পায়ের ধ্বনি। নীলা ছুটে গেলো। আমি একলা ঘরে বসে বসে শুনতে লাগলাম নিজের বুকের শব্দ। নীলা আর ফিরলো না দেখে বুঝতে আমার আর কিছু বাকি রইলো না।

তারপর সবই শুনে ফেললাম, যে সুরভি ফাল্গুনীকে সাড়ম্বরে স্বাগতম জানানোর জন্ম প্রস্তুতি শুরু করেছিলো মন, অকস্মাৎ অজস্র হিম ঝরিয়ে কে যেন সমস্ত বসন্ত-প্রাণ নিমেষে লুপ্ত ক'রে দিলো, মনের সাতরঙা স্বপ্নটা যেন ক্ষুব্ধ চিল হ'য়ে ক্রুদ্ধ ঝাপট লাগিয়ে হঠাৎ উধাও হলো শূন্যে। মনে হলো 'প্যাগডাইসূত্র' আর অসংখ্য বার মনে পড়লো বাল্যের দেখা সেই ছবি দুখানির কথা।

কিন্তু, এটাই ঠিক ইন্দ্রাণী! তোমাকে পেয়েছি বলেই তোমাকে হারাতে চাইনে। স্থির চিত্তে ভেবে দেখলেম, তুমি যদি এখন সম্মতি দিতে, তাহলে তোমার নিষ্ঠার প্রতি আমার বোধ হয় শ্রদ্ধাবোধ কমে যেতো। খাওয়ার টেবিলে বাবা মাকে পুরো আশ্বাস দিয়েছেন—তুমি ভেব না শুক, কাল বিকেলে আমি নীলুকে নিয়ে ইনামায়ের সম্মতি আদায় ক'রে তবে বাড়ি ফিরবো। আমার চিঠিলেখা শুধু এইজন্ম,...মুস্কিল হলো এই—আমার বাবাকে তুমি বোধ হয় তেমন চেনার সুযোগ পাওনি ইন্দ্রাণী, আমার নিজের বিশ্বেস, বাবার কথায় কিছু যাদু আছে, বাবার কথায় না করতে আমি কাউকে এ পর্যন্ত দেখিনি। কিন্তু, আমি এ ভাবে পেতে চাইনে তোমাকে। অনেক দিনের অনেক ছোট বড় অভিযোগ তোমার মনে জমে জমে পাহাড় হ'য়ে গেছে—সেগুলি ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলে তোমার খোলা পরিপূর্ণ মনখানি আমি চাই।

আমার স্বপ্নের এক মহলা প্রাসাদ তত দিনে হ'তে থাকবে সাত মহলা। আমি আছি, আমি থাকবো ইন্দ্রাণী, আমার সাত মহলার সাতটা দরজাই তোমার জন্ম খোলা রইলো।

- অরুণেশ।"

সমাপ্ত

তিমিরাভিসার

(Last ride together. R. Browning.)

জেনেছি জেনেছি আমি প্রিয়তমে,
প্রতীক্ষার দীর্ঘ দিন গিয়েছে হারিয়ে
নিষ্ফল সন্ধ্যায়। কোন ক্ষোভ নেই;
হৃদয় গাহিছে আজি তোমার মধুর নাম
আকাশে বাতাসে। ভরিছে পেয়ালাখানি
স্মৃতির সৌরভ নিয়ে। ফিরায়ে দিয়ো না
তারে। নিয়ে যাও আর যত আকুল
কামনা হৃদয়ের বৃন্ত 'পরে ফুটেছিলো
রজনীগন্ধার সম। শুধু মোরে
দিয়ে যাও—একবার—তোমার
পরশসুধা রজনীতিমির মাঝে
দ্বৈত-অভিসারে।

অধর বাঁকিল তার। গভীর-কাজল
আঁখি রিক্ত করি মাধুর্যের শেষ বিন্দু
রাঙিয়া বঙ্কিম রাগে নির্নিমেষ নির্ভাবন
চেয়ে থাকে মোর মুখ পানে।
হৃদয়ের তটপ্রান্তে প্রাণের হরিণ নির্বাধ-
বিস্ময়ে স্থির। 'তাই হবে'—চকিতে হরিণ
পেলো জীবনের স্বাদ পরম আশ্বাসে
প্রিয়জন-মুখে। অস্তিত্বকামনা মোর হারায়নি
অনাদর-ভীড়ে। মোর স্বর্গ হ'তে বিদায়ের
ক্ষণ আসেনি এখনও; প্রেম-পাত্র রিক্ত নয়;
আরো আছে দোসর রাত্রির কোলে
নিঃশ্বাসনিবিড়-স্পর্শ। কে বলিতে পারে
পৃথিবীর পরমায়ু-কথা? শেষ যদি হয়ে
যায় এ রজনী সাথে।

প্রতীচ্য গগনবক্ষে তরঙ্গিত মেঘমালাসম,
সহস্র আশীষ ভারে আনমিত বরতনু—ভাস্বর
কিরণ যেন গোধূলি-লগনে, মেশে আসি
জোছনার সাথে উদার আকাশে। সেই
শুভক্ষণে, প্রেমের পুলকে রাঙি, কামনার
দীপশিখামাঝে, সাথে লয়ে মেঘমেদুরতা,
দূর-অস্তাচল-পারে তপনের রক্তরশ্মি-লেখা,
নিঃশব্দ অরুণোদয়, তারকার জ্যোতি,
ধীরে ধীরে নেমে এলো মোর বক্ষে
সভয়-আনন্দে দেহভারহীন বেতস-ব্রততী
রচিতে অক্ষয় স্বর্গ।

যাত্রা হ'লো সুরু। দূরে ফেলে
হতাশার আবর্জনা, পুলকে জাগিল
আশা অন্তর-আকাশে। জীবনের
লেন-দেন—কী পেয়েছি আর
কী পাইনি—লাভ ক্ষতি, টানাটানি,
মিলনবিরহ মুছে ফেলে, ভাবনারে
দিয়ে নির্বাসন, পরম লগনে জাগি
প্রিয়তমা পাশে।

এ জীবনমাঝে অক্ষমতা-অভিশাপ
আমারই ত নয় শুধু? হাজার জীবনে

তার বিষাদের ছায়া। কত দেশ এলো
কত নদী গেলো। মোরা শুধু রহি
কাছাকাছি চেতনাবিহঙ্গ-সম নীলাকাশ-মাঝে।
মনে হ'লো জীবন-সাধনা কভু ব্যর্থ নয়।
ব্যর্থ নয় আকুল কামনা। যা কিছু
সেধেছি মোরা সে ত এক অতি
ক্ষুদ্র ভগ্ন-অংশ ভাগ—অজানা
বৃহৎ। শুধু জানি অতীতের
লুব্ধ আশা বাঁচিয়ে রেখেছে তার
শিশু-বর্তমানে অন্তর-মাধুর্য দিয়ে।
কেন জানি মনে হলো এইখানে এই ক্ষণে
হারানো সে প্রেম ফিরিতে পারে ত কভু?

ভাবনার সত্যরূপ দিয়েছে কি
কেউ আপনার হাতে? তৃষিতহৃদয়
পেয়েছি কি তার আপন-প্রিয়ারে
বিনা-আকর্ষণে? কর্মের বারিধি-মাঝে
কতক্ষণ থাকে চিন্তার তরঙ্গ? শারীর-
পাষাণে বন্দী মানববিহঙ্গ কোথা যেতে
পারে? কাছে পেয়ে দয়িতের তনুদেহ;
নীরবে হেরেছি তার গতিস্নাত পীনোন্নত
পয়োধর। সাম্রাজ্য রয়েছে সেথা,
কে পৌঁছিতে পারে? কত যোদ্ধা হারায়েছে
প্রাণ। অস্থির কবরে শোভে বিজয় নিশান।
জীবনের বিনিময়ে পাষাণ ফলকে লেখা
শুষ্ক নামখানি এই কি সান্ত্বনা? কামনার
ধন সাথে রজনীতিমির-মাঝে
এই অভিসার, মোর কাছে অতি শ্রেয়তর।

অভিসারলিপি কে বুঝিতে পারে?
কবির ভাবনা, প্রাণ পায় ছন্দের বন্দনে
জানি। অনুভূতি-গাথা মধুর সুন্দর
হয় কবির লেখনীস্পর্শে। হয়ত
অনেক কিছুই আছে নয়ত বিশেষ
কিছুই নয়। শুধু বল দেখি কবি,
তুমি কি পেয়েছো কভু সুন্দরের
প্রাণস্পর্শ? বুঝি বা বেদনা-গভীর প্রাণে
জ্বেলে রেখে দীনতার দীপ চলেছে
মৃত্যুর পানে? তাই যদি হয়,
জেনে রাখো ছন্দের সাধনা নয়,
প্রাণের সাধনা এই আনন্দের
অভিসার, প্রিয়তমা-পাশে।

হায় রে ভাস্কর! তোমার
সাধনা ব্যর্থ! আরাধ্যা দেবীর রূপ
পায়নি প্রকাশ অক্লান্ত শ্রমের শেষে।
হের আজি প্রেয়সী মোদের মধুপদে
অতিক্রমে ক্ষীণ স্রোতোধারা।
কোনো ক্ষতি নেই যদি তোমার বিবর্ণ
দৃষ্টি না বুঝিতে পারে?
সঙ্গীতসাধক! নীরস সঙ্গীত-লিপি
নিয়ে কেটে গেলো সাধনার দিন।
কী পাইলে বলো? প্রশংসার স্তোকবাণী?
সঙ্গীতের রূপ কোথা? সে যে এক
অরূপ সাগর। তোমার সঙ্গীত-শিশু
ডুবে গেলো গভীর অতলে।
দিয়েছি যৌবন আমি। পেয়ে গেছি
তাই অভিসার-অধিকার, হোক তাহা
মুহূর্তের তরে।

নিয়তির কথা কে বলিতে পারে?
কে জানিত হায় এই ক্ষণে ভরিয়া উঠিবে
হৃদি সহস্র আশীষে? করে নাই কেউ
হেন অঙ্গীকার? এ জীবন থেকে
অনন্ত-যাত্রার ক্ষণে মানব যাত্রীরা ভাবে
এ জীবনকথা। মনে পড়ে দূর স্মৃতি সম
কবে কোন অজানা লগনে লক্ষ্যে পৌঁছেছিলো
তার অনন্ত কামনা। বিজয়ের পুণ্যস্পর্শ
লভেছিলো কবে কার অন্তরের গৃহলক্ষ্মী।
অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগে আকুল পরাণে।
সভয় আনন্দে চুপ করে রহে
প্রাণের হরিণ। মধুময় ধরণীর ধূলি;
পুলকিত নভতল অনিন্দ্য সুষমারাগে।
সে স্বরগ আর এ প্রেয়সীর স্পর্শলোভ
ছুটেছে বিহঙ্গ মোর অনন্ত আকাশ-মাঝে
ধূমকেতু সম।

নির্বাক বঁধুরে ঘিরে রচেছে
স্বপন মোর দূর নভোচারী। জীবনের
শীর্ষোপরি অক্ষয় অনিন্দ্যধাম, যেথা
থেকে ক্ষণে ক্ষণে ঝরে পড়ে জীবন-চেতনা।
প্রাণ্তযার কালে, সেই যদি স্বর্গ হয়
তবে তাও মিশে গেছে কাঙ্ক্ষিত
দেহেরে ঘিরে। উর্দ্ধ পানে চেয়ে
আছি শঙ্কিত হৃদয়ে, কামনার
আতুর অঞ্জলি, শুধু যেন জীবনে মরণে
পাশাপাশি রাখে অচিহ্নিত ধাবমান
স্রোতোরাগে। মুহূর্তে মুহূর্তে যেথা
জন্ম লভে নতুন জীবন, তারি কোনো
প্রান্তে রাগে দ্বৈতভাবহীন একক জীবন।

অনুবাদিকা—সুকুমারী দাশ।

[*Osamu Dazai's* "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

তৃতীয় অধ্যায়

চন্দ্রমল্লিকা

অতঃপর এমন অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হ'লাম, যেখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব। প্রচণ্ড ঝড়ের পর সাদা মেঘের দল যে ভাবে আকাশের গায়ে এলোমেলো ছুটে বেড়ায়, তেমনি আমার বুকের ভেতর বেদনার তরঙ্গ উথাল-পাথাল করে ফেরে। মারাত্মক এক অনুভূতি, অজানা এক আতঙ্কে আমার নাড়ীর গতিতে ছন্দপাত হয়, নিঃশ্বাস ক্রিয়া ব্যাহত করে বুকের ভেতরটা নিঙড়ে ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে চতুর্দ্দিক অন্ধকারে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসে, আর মনে হয় যেন আমার আঙুলের প্রান্ত-পথে সারা দেহের শক্তি নিঃশেষে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি বিশ্রী একঘেয়ে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আমি যা করি তাতেই মন খারাপ হয়ে যায়। আজ আবার বেতের চেয়ারখানা বারান্দায় টেনে নিয়ে বসলাম—ইচ্ছে গত বসন্তে সুরু করা সোয়েটারখানা এবার শেষ করব। হাল্কা গোলাপী রং-এর সঙ্গে গাঢ় নীল উল মিলিয়ে জামা বুনছি। বছর কুড়ি আগে, আমি তখনও ইস্কুলে পড়ি, সেই সময়ে মা আমায় একখানা স্কার্ফ বুনে দিয়েছিলেন—গোলাপী উলটা তারই স্কার্ফের শেষের দিকে ছোট টুপির মত করে বুনেছিলেন, সেটা পরে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে নিজেকে মনে হত ক্ষুদে শয়তান। আমার ইস্কুলের বন্ধুরা যে সব স্কার্ফ গায়ে দিত, আমারটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙ বলে ওটা আমার দু'চক্ষের বিষ ছিল। ঐ স্কার্ফ গায়ে দিয়ে কারুর সামনে বেরুতে এত লজ্জা হ'ত যে বহু দিন ব্যবহার না করে দেরাজে ফেলে রেখেছিলাম। সম্প্রতি বসন্তকাল পড়তে হঠাৎই আমি ওটা খুলতে বসলাম, মৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সদিচ্ছা নিয়ে, নিজের জন্ত একখানা সোয়েটার বুনব স্থির করলাম। কি জানি কেন, ঐ ফিকে রঙটা আমার সুসঙ্কল্পের পথে অন্তরায় হওয়ায় আবার উলটা বাক্সবন্দী হ'ল।

আজ অন্ত কাজের অভাবে হঠাৎ বের করে বুনতে বসলাম। বুনতে শুরু করে খেয়াল হ'ল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গাঢ় রঙের পাশে উলের রংটা চমৎকার খুলেছে, রঙের এমন অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ সামঞ্জস্য ভাষায় বোঝান শক্ত। আকাশের রঙের সঙ্গে এ-হেন সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা এর আগে কখনও বুঝিনি। অবাক হয়ে ভাবলাম, বিচিত্র রঙের শোভন সংগতি কি অপরূপই না হ'তে পারে! আকাশের ধূসর নীলিমার সঙ্গে ফিকে গোলাপীর যোগাযোগ, দুটি রঙকেই ফুটিয়ে তুলেছে। আমার হাতে সে উল জীবন্ত হয়ে উঠল, যেমনা আকাশ মখমলের মত নরম। ফরাসী চিত্রকর মনে'র (Mone't) একখানা ছবির কথা মনে এল, কুয়াশার মধ্যে একটি গির্জ্জা; জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলাম সুরুচি কা'কে বলে, মনে মনে উলটাকে ধন্যবাদ দিলাম। শীতের তুষারাচ্ছন্ন আকাশের নীচে ঐ রঙ যে কত অপূর্ব্ব দেখাতে পারে সে জ্ঞান ছিল বলেই মা ফিকে গোলাপী পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় আমি তখন বুঝতে পারিনি। চিরদিন নিজের খুসীমত চলেছি, মা কোন দিন বাধা দেবার চেষ্টাও করেননি। এত কাল ধরে আমায় কখনও বোঝাতে চাননি, শুধু অপেক্ষা করেছিলেন, কবে নিজে থেকে আমার চোখ খুলবে। ভাবলাম, আমার মায়ের মত এমন মা আর কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ ভয় আর আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, তবে কি নাওজি আর আমি দু'জনে মিলে মাকে অবধারিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছি? যতই ভাবি ততই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় ভবিষ্যৎ আমাদের জন্ত দুর্দিন বয়ে আনছে। আঙুলগুলি অসাড় হয়ে এল, কোলের ওপর বোনার কাঁটা দুটো পড়ে গেল। মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। চোখ বুজেই মাথা তুলে নিজের অজান্তে চেঁচিয়ে উঠলাম মা গো!

ঘরের কোণে ব'সে বই পড়তে পড়তে মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি হ'ল?

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। অহেতুক উঁচু গলায় জবাব দিলাম—শেষ অবধি গোলাপগুলো ফুটল, জান মা? আমি এইমাত্র লক্ষ্য করলাম—এত দিনে ফুটল তবে!

বহু কাল আগে ফ্রান্স কিম্বা ইংল্যাণ্ড এরকম অনেক দূর থেকে ওয়াদামামা এই ফুল এনেছিলেন। আমাদের নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে তুলে এনে আমি এখানে পুঁতেছিলাম। সকালেই আমি একটা ফুল দেখেছি, কিন্তু বর্ত্তমান অপ্রস্তুত ভাব কাটাতে বেশ একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বললাম—এইমাত্র দেখেছি। ঘোর বেগুনি রং-এর এই ফুলগুলিতে কেমন যেন দম্ভ ও শক্তির প্রকাশ আছে।

শান্ত কণ্ঠে মা উত্তর দিলেন,—আমি জানি, তোমার কাছে এ-সবের মূল্যই আলাদা।

বোধ হয়, আমার জন্তে তোমার দুঃখ হয়?

না, আমি শুধু বলতে চাই, এ তোমারই উপযুক্ত উচ্ছাস। ঠিক যেমনটি তুমি রান্নাঘরে দেশলাই-বাক্সের গায়ে রেনোয়া'র ছবি সাঁটো, কিম্বা পুতুলের জন্ত রুমাল তৈরী কর। বাগানে গোলাপের কথা তুমি এমন ভাবে বল যেন কোন জীবন্ত মানুষের বিষয় বলছ।

আমার নিজের কোন ছেলে-মেয়ে নেই বলেই বোধ হয়। এ আমি কি বললাম? কোলের ওপর বোনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে অপ্রস্তুত ভাবটা লুকোতে চাইলাম। মনে হল টেলিফোনে কোন পুরুষ মানুষ রুক্ষ স্বরে আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করছেন—এ আর বেশী কথা কি? ও মেয়ের বয়সের গাছ-পাথর আছে? উনত্রিশ বছর তো হ'ল।

কোন কথা না বলে মা আবার বইয়ে মন দিলেন। কিছুদিন যাবৎ মা মুখের ওপর দিয়ে একখানা পাতলা জালের ঢাকনা পরে থাকেন। সেই জন্তেই বোধ হয় কথা কওয়া আরও কমে গেছে। আসলে নাওজির কথায় মা ঐ ঢাকা পরতে সুরু করেছেন।

কয়েক সপ্তাহ আগে ও প্রশান্তসাগর থেকে ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে ফিরেছে। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় কোন খবর না দিয়েই, কাঠের ফাটকখানা দড়াম্ শব্দে বন্ধ করে দিয়ে নাওজি বাগানে ঢুকল।

কি কাণ্ড! বলিহারি তোমাদের পছন্দ! বাড়ীর গায়ে একটা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দাও না কেন "চীনাভবন, চাওমিয়েন?"

প্রথম দর্শনে এই সম্ভাষণ। গত দু'-তিন দিন হল জিভে একটা ব্যথা হয়ে মা শয্যা নিয়েছেন। জিভের ওপর কিছু দেখতে পেলাম না, কিন্তু মা বললেন, নাড়াতে গেলেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এ কয় দিন খুব পাতলা স্যুপ খাচ্ছিলেন। ডাক্তার ডাকতে চাইলে মা বাধা দিলেন, জোর করে হেসে বললেন—ডাক্তার আমায় দেখে হাসবেন।

তুলি করে জিভের আগায় লুগোল মাখিয়ে দিলাম—কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। মায়ের অসুখে বিপন্ন বোধ করছি—ঠিক এই সময়ে নাওজি এল।

মায়ের বিছানায় মিনিট খানেক ব'সে বালিশে মাথা হেলিয়ে দুটো সম্ভাষণের কথা বলল। ব্যস ঐ পর্য্যন্ত—পরমুহূর্ত্তে লাফিয়ে উঠে বাড়ী দেখতে বেরিয়ে গেল। আমি পেছন পেছন গেলাম।

মাকে কেমন দেখলে? বদ্‌লে গেছেন, না?

বদলেছেন বৈ কি, রোগা হয়েছেন খুব। অনেক আগেই এ দুনিয়া ছেড়ে মায়ের চলে যাওয়া উচিত ছিল। আজকের এই দুনিয়াতে মায়ের মত লোকের বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে আমার মত হতভাগারও বুক ফেটে যায়।

আমায় কেমন দেখছ?

তোমার চেহারা রুক্ষ হয়ে গেছে। মুখ দেখে মনে হয় জন দু'-তিন পুরুষ-বন্ধু জুটেছে। এখানে ধেনোমদ পাওয়া যায়? আজ রাত্তে মাতাল হব ঠিক করেছি।

গ্রামের হোটেলে ঢুকে হোটেলওয়ালীর কাছে ভাই-এর নাম করে ধেনোমদ চাইলাম, কিন্তু সে বলল এক্ষুণি পারবে না দিতে, ফুরিয়ে গেছে। নাওজিকে একথা বলতে রাগে ওর মুখ কালো হ'য়ে গেল—এমন আমি ওকে আগে কখনও দেখিনি, এ যেন অচেনা মানুষ।

দূর বোকা! ওদের কি করে সায়েস্তা করতে হয়, তুমি জান না। হোটেলের ঠিকানা জেনে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঐ পর্য্যন্ত। ওর জন্ত অপেক্ষা করে নিরাশ হ'লাম। নাওজির প্রিয় খাবার সেঁকা আপেল, ডিমের মামলেট আগলে বড় আলোখানা জেলে বসে রইলাম। হোটেলের মেয়ে ওসাকী রান্নাঘরের দরজায় মাথা গলিয়ে জিজ্ঞেস করল—মাপ করবেন। এটা কি উচিত হচ্ছে? তিনি তো সেদিকে বসে বসে জিন্ টান্‌ছেন। ওর ডানাবড়া চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

জিন—মানে মেথিল এলকহল?

না মেথিল নয় ঠিক, কিন্তু অনেকটা তাই।

খেলে অসুখ করবে না তো?

না, কিন্তু তবু••

তা হলে থাক্ গে।

মাথা নেড়ে ঢোঁক্ গিলে ওসাকী চলে গেল।

মাকে জানালাম ওসাকীর ওখানে মদ খাচ্ছে।

মায়ের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল—আফিং ছেড়েছে নিশ্চয়ই। খাও খেয়ে এস। আজ আমরা তিন জন একঘরে শোব। নাওজির বিছানা মাঝখানে দিও।

আমার বুক ঠেলে কান্না এল।

অনেক রাতে ধপ ধপ করতে করতে বাবু বাড়ী ফিরলেন। ঘরজোড়া মশারি ফেলা ছিল—আমরা তিন জনে ভেতরে ঢুকলাম।

শুয়ে শুয়ে বললাম—তোমার দক্ষিণ-সাগরের গল্প মাকে শোনাও না?

বলার মত কিছু নেই—একেবারে কিছুই না। ভুলেও গেছি সব। জাপানে ফিরে ট্রেনের জানালা দিয়ে ধানক্ষেত দেখতে ভারী ভাল লাগছিল। ব্যস। আলো নেবাও, ঘুমুতে পারছি না।

অগত্যা আলো নিবিয়ে দিলাম। গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্না মশারি ভেদ করে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ছে। পরদিন সকালে বিছানায় শুয়ে সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে নাওজি সিগ্রেট টানছে। যেন এই প্রথম খেয়াল হ'ল মা অসুস্থ—শুনলাম তোমার জিভে কি একটা ব্যথা হয়েছে! মৃদু হেসে মা চুপ করে রইলেন।

আমি ঠিক জানি, এ তোমার মনের রোগ। খুব সম্ভব রাত্তে হাঁ করে ঘুমোও। বড্ড অসাবধান তুমি—একখানা জালি-ঢাকা মুখের ওপর পরে থেকো। রিভানলের (Rivanal) জলে ডাক্তারখানায় শোধন করা এক টুকরো কাপড় ভিজিয়ে ঢাকাটার ভেতরে নিও।

আমি সজোরে প্রতিবাদ করলাম—এ তোমার কোন দেশী ডাক্তারী?

এর নাম সৌখিন চিকিৎসা।

আমি জানি ঢাকনা পরতে মা'র খুব খারাপ লাগবে।

মা মুখের ওপর কোন জিনিষ বরদাস্ত করতে পারেন না। চশমা পর্য্যন্ত না। চোখ ফুলে ব্যথা হলে [illegible]

রাখতেও মায়ের আপত্তি, মুখের ঢাকা পরা তো দূরের কথা। মাকে জিগ্যেস করলাম—মা তুমি পরবে?

সোৎসাহে মা জবাব দিলেন—পরব বই কি।

আমি তো হাঁ! নাওজির আদেশ পালন করার জন্য মা যেন বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন।

জলখাবারের পর নাওজির নির্দেশমত বিভানলের জলে ভিজিয়ে খানিকটা গজ-কাপড় মুখঢাপা দেওয়ার মত ভাঁজ করে মার কাছে নিয়ে গেলাম। বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে ঢাকাটা নিয়ে কানের পিছনে দড়ি টেনে বেঁধে নিলেন। তারপর ছোট অসহায় বালিকার মত শুয়ে রইলেন।

সেদিন বিকেলে টোকিওতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা দরকার—এই অজুহাতে মায়ের কাছ থেকে দুই হাজার ইয়েন (জাপানী মুদ্রা, ডলারের প্রায় সমান) নিয়ে নাওজি রওনা হ'ল।

এর পর দশ দিন কেটে গেছে, কিন্তু তার ফেরার কোন লক্ষণই নেই। প্রতিদিন মুখে ঢাকা বেঁধে মা তার অপেক্ষা করেন। তিনি আমায় বোঝালেন—ওষুধটা বাস্তবিকই ভাল, ব্যথাটা অনেক কম। আমার মনে হয়, মা ঠিক বলছেন না। বিছানা থেকে উঠেছেন বটে, কিন্তু খাওয়া দারুণ কমে গেছে, ক্বচিৎ কখনও কথা কন। মায়ের জন্য আমার চিন্তার অবধি নেই, এবং নাওজি কেন এত দেরী করছে ভেবেই পাই না।

নাওজি যে ঔপন্যাসিক উয়েহারার (Uehara) সঙ্গে হৈ-চৈ করে টোকিওর পাগলকরা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়েছে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এসব কথা মনে এলে নিজের জীবন আরও দুর্বিষহ ঠেকে। গোলাপের কথাপ্রসঙ্গে উত্তেজিত হওয়া, বা সন্তানের অভাব স্বীকার করার মত লজ্জাকর ঘটনা যখন আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে—তখন আমি যে ক্রমশঃ নিজের ওপর সংযম হারাচ্ছি—এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। নতুবা এ ধরণের ত্রুটি আমার দ্বারা কখনই সম্ভব হত না। একটা হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বোনাটা পড়ে গেল। নিজেকে নিয়ে কি করা যায়, ভেবে পেলাম না। কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি বেয়ে তেতলার বিদেশী প্যাটার্নের ঘরের দিকে উঠে গেলাম।

এ ঘরখানায় নাওজি থাকবে। চার-পাঁচ দিন আগে মা আর আমি এই ঠিক করে মিষ্টার নাকাই-য়ের সাহায্যে ধরাধরি করে নাওজির আলমারী ও বই, কাগজ, অসংখ্য অন্যান্য জিনিষে বোঝাই করা কাঠের বাক্স, আমাদের আগের বাড়ীতে তার যা কিছু ছিল, সব সে ঘরে এনে ফেললাম।

টোকিও থেকে ফিরে এই আলমারী, বইয়ের বাক্স, কোথায় কি রাখতে চায় সেই মত ব্যবস্থা করলেই হবে,—এই ভেবে আমরা অপেক্ষা করে রইলাম। ঘরের অবস্থা যা দাঁড়াল, তাতে সেখানে নড়াচড়া দুঃসাধ্য হ'ল। একখানা খোলা কাঠের বাক্স থেকে অন্যমনস্ক ভাবে তার নোটবইখানা তুলে নিলাম। মলাটের গায়ে লেখা—"চন্দ্রমল্লিকা পত্রিকা"। যে সময়ে নাওজি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেশা করত—এ তার সেই সময়ের নোটবই বলে মনে হ'ল।

এ কী মরণ-বরণ দহন-জ্বালা!

বেদনায় তাড়নায় 'অসহ যন্ত্রণা' কথাটুকু পর্য্যন্ত উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়। মানব-ইতিহাসে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অতলস্পর্শী এ নরক যন্ত্রণার হাত হ'তে মুক্তি পাবার প্রয়াস কর না।

দর্শন? মিথ্যা! ধর্ম? মিথ্যা! আদর্শ? মিথ্যা! সুশৃঙ্খলা? মিথ্যা! সততা? মিথ্যা! শুচিতা? মিথ্যা! সর্বৈব মিথ্যা! লোকে বলে উসিখিমার মটর ফুলের বয়স সহস্র বৎসর এবং কুমানোর মটরফুলের বংস শত শত বৎসরেরও অধিক। শুনেছি উসিখিমার মটর লতা নয় ফিট এবং কুমানোর লতা পাঁচ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। ঐ মটর ফুলের শোভায় আমার মন-প্রাণ নেচে ওঠে।

সে-ও তো কারও সন্তান! তারও প্রাণ আছে।

যুক্তি, একমাত্র যুক্তির প্রতি অনুরাগ, মানবাত্মার প্রতি দরদের একান্ত অভাব।

অর্থ ও নারী। যুক্তির সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে ত্বরায় অন্তর্হিত হয়।

ডাক্তার ফাউষ্টের তেজোদ্দীপ্ত এক উক্তি আছে—নারীর স্মিত-হাস্যের তুলনায় ইতিহাস, দর্শন, পাণ্ডিত্য, ন্যায়, রাজনীতি, অর্থনীতি আদি বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখা সকলই তুচ্ছ।

দম্ভের আর একটি নাম পাণ্ডিত্য। মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা, মানুষ না হওয়া।

গোটের সামনে শপথ করে বলতে পারি, আমার মধ্যে অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা সুপ্ত আছে। নির্ভুল বাক্যবিন্যাস, রসের মাত্রাবোধ, পাঠককে অভিভূত করার মত করুণ রসের অবতারণা—অথবা ত্রুটিহীন, অসামান্য এক উপন্যাস, উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যা পড়া যায় উদাত্তকণ্ঠে—(অথবা চলচ্চিত্রের আবহবার্ত্তা) এমন কিছু লেখা আমার দ্বারা অসম্ভব নয়, যদি না লজ্জা এসে বাধা দেয়।

আসলে প্রতিভার এই সচেতনতা ঘিরে কেমন যেন চাপল্যের ভাব আছে। পাগলেই শুধু গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে উপন্যাস পড়ে। এসব ক্ষেত্রে শোকযাত্রার বিশেষ পোষাক পরার রীতি চালু করা উচিত। দারুণ কিছু লেখার দম্ভ যতক্ষণ না থাকে, ততক্ষণই ভাল। আমার উপন্যাস হবে এলোমেলো। ইচ্ছে করে জঘন্য লেখাই লিখব আমি, বন্ধুর মুখে ফুটে উঠবে অনাবিল আনন্দ—মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে অতল তলে তলিয়ে যাব। আঃ—বন্ধুর সেই আনন্দবিহ্বল রূপ দেখে প্রাণ জুড়াবো।

অত্যন্ত বাজে লেখা ও কুচরিত্রের ছেলে-ভোলানো বাঁশি বাজিয়ে যে বলব 'জাপানের শ্রেষ্ঠ নির্বোধ এখানে উপস্থিত—আমার তুলনায় তোমরা সবাই ভাল—তোমাদের মঙ্গল হোক'—এ কোন্ ছলনা!

বন্ধু, আত্মতৃপ্ত মুখে তুমি যখন বল—'ঐ তো ওর বদযোগ। আহা! কি দুঃখের কথা।'—তুমি জান না তখন লোকে তোমার ওপর প্রসন্ন হয়।

জানি না, কে মন্দ নয়।

ক্লান্তিকর এই দুশ্চিন্তা।

টাকা চাই।

টাকা না পেলে—

ঘুমের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু!

ডাক্তারখানায় হাজার ডলার ঋণ হয়ে গেছে। আজ এক বন্ধকের দোকানে কেরাণীকে বাড়ীতে ঢুকিয়ে আমার ঘরে এনে

জিগ্যেস করলাম—এখানে বন্ধক দেওয়ার মত দামী কিছু চোখে পড়লে তুলে নিয়ে যেতে পার। এখন আমার টাকার বিশেষ দরকার। ঘরের মধ্যে আলগোছে চোখ বুলিয়ে কেরাণীটা বেহায়ার মত বললে —এ মতলব ছেড়ে দিন বাবু, এ আসবাব তো আর আপনার নয়। আমিও ক্ষেপে উঠলাম—বেশ ঠিক আছে। আমার নিজের হাত-খরচের টাকায় যা যা কিনেছি, তাই তবে নিয়ে যাও।

টুকিটাকি অজস্র জিনিষ তার সামনে স্তূপ করে দিলাম—যার কোন বন্ধকী মূল্য নেই।

জিনিষের তালিকা—প্লাষ্টারের তৈরী একখানা হাত—ভেনাসের দক্ষিণ হাত। ষ্টাণ্ডশুদ্ধ ডালিয়া ফুলের আকারে শুভ্র একখানা হাত। চক্ররেখাবিহীন অঙ্গুলিপ্রান্ত, রেখাবিহীন করতল সমন্বিত এই তুষারশুভ্র সুকুমার হাতখানিকে লক্ষ্য করে বেদনা ও লজ্জায় দর্শক এমন অভিভূত হয় যে, ভেনাসের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তার পরিপূর্ণ নগ্নতা যে মুহূর্তে একজন পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়, ভেনাস সসঙ্কোচে দেহের ভঙ্গী পরিবর্তন করে। বিস্ময়ের রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় আবক্তিম অবস্থা, অপরিসীম লজ্জার তাড়না এবং নগ্নতার বেদনা—একাধারে সমস্ত অনুভূতি যেন ঐ হাতখানির মধ্যে পরিস্ফুট।

ভাস্কর্য্যের এ অসামান্য নিদর্শনটির জন্য কেরাণী যৎসামান্য পঞ্চাশ সেন (জাপানী তাম্রমুদ্রা) দিতে রাজী হল।

অন্যান্য জিনিসের তালিকা,—প্যারীর সহরতলীর এক বিরাট মানচিত্র। প্রায় এক ফুট বেড়ের সেলুলয়েডের লাট্ট। বিশেষ এক রকম কলমের মুখ—যা দিয়ে সুতোর চেয়েও মিহি লেখা যায়। দারুণ সস্তায় পাচ্ছি ভেবে এককালে আমি এসব কিনেছিলাম।

কেরাণীটা হেসে বলল—এবার তবে আসি। দাঁড়াও—বলে জোর করে একরাশ বই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাত্র পাঁচ ইয়েন উদ্ধার হল। সর্ব্ব-সাকুল্যে আমার মূল্য প্রায় এই রকম দাঁড়ায়। হাসির কথা নয়।

কয়েক জন আমায় সমালোচনা করে আমার কাজকে সমর্থন করে বলেন—অধঃপতনই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। এর চেয়ে আমার মরতে বললে অনেক বেশী খুশি হই। সে অনেক সোজা রাস্তা। কিন্তু মানুষ কখনও বলে না—মর।

অর্ব্বাচীন, পণ্ডিত ভণ্ডের দল। বিচার? এখানে তুমি শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের সন্ধান পাবে না। মনুষ্যত্ব? তুমি অত্যন্ত নির্বোধ। আমি জানি, তোমাদের স্বার্থপর সুখের কারণে স্বগোত্রীয় মানব বলি হয়। সে যে মৃত্যু। একমাত্র রায় সেখানে—মৃত্যু। এ ভিন্ন এর কোন অর্থ হয় না। প্রতারণা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মধ্যেও কোন ভদ্রলোক নেই। নির্বোধ, ভূত, প্রেত, কৃপণ, উন্মাদ, হামবড়ার দল, কেবল বড় বড় কথা বলে, মেঘের ওপর থেকে নাক উঁচু করেই আছে।

মর। শুধু ঐ কথাটি স্বীকার করতে পারলে আমার ভাষ্য পাওনা থেকে অনেক বেশী লাভ হয়। যুদ্ধ, জাপানী যুদ্ধ, জীবন-মরণ সমস্যার যুদ্ধ। এ রকম মরিয়া কাজের ভেতর আত্মসাৎ করে নিয়ে মারবে? ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না, বরং নিজের হাতে মরা ভাল।

মিথ্যা কথা বলার সময়ে মানুষ গম্ভীর হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান নেতাদের কি দারুণ গাম্ভীর্য্য! ছিঃ!

যাদের দেখে সম্মানের কোন প্রশ্ন ওঠে না, আমি তাদের মধ্যে বাঁচতে চাই।

যে সময়ে আমি অসামান্য বুদ্ধিমান হবার ভাণ করতাম, তখন সবাই ধরে নিত, সত্যি আমি তাই। যখন অলস ভাবে দিন কাটিয়েছি, তখন সবাই বলল 'অলস'। যখন তাদের বোঝালাম, উপন্যাস লেখা আমার আয়ত্তের বাইরে, সবাই ধরে নিল, হয় ত তাই। মিথ্যে কথা বলতে সুরু করলাম, সবাই বলল, 'মিথ্যেবাদী'। যখন মস্ত বড়মানুষী চাল দেখালাম, লোকে বলল—'বড়লোক'। ঔদাসীন্যের ভাণ করতে, সবাই ধরে নিল—লোকটা 'বৈরাগী'। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে বেদনায় কাতর হ'লে লোকে বলল—ওটা ছলনামাত্র।

দুনিয়ার বাঁধন আলগা হয়ে এসেছে। তবে কি মোট-কথা এই দাঁড়ায় না—যে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার গতি নেই? এত যন্ত্রণার মধ্যেও আত্মহত্যার কথা মনে হ'তে হু-হু করে কেঁদে উঠলাম।

একটা গল্প আছে, বসন্তের কোন সোনালী সকালে দু'-তিনটি সদ্য মুকুলিত প্লাম ফুলের শাখায় হিডেলবার্গ (Heidelberg)-এর এক তরুণ ছাত্রকে মৃত অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়।

মা, লক্ষ্মীটি আমায় গাল-মন্দ কর।

কেন?

সবাই বলে আমার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব আছে।

বলে না কি? দুর্বলচিত্ত? আমার মনে হয় না, সেজন্যে তোমায় বকবার আর কোন কারণ আছে। মায়ের ভালমানুষীর কোন সীমা নেই। তার কথা মনে হলেই আমার চোখে জল ভরে আসে। আমার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

দয়া করে আমায় ক্ষমা করো। এই একবার অন্ততঃ আমায় ক্ষমা করো।

(নববর্ষের কবিতা)

অসংখ্য বৎসর
তবু তো ঘোচে না আঁধিয়ার
ছোট্ট বকের ছানা
বাড়তে তাদের নেই তো মানা
হায়! কেমনে পায় দেহের এমন পূর্ণতা!

মর্ফিন্, এট্রোমল্, মার্কোপেন, ফিলিপিন, প্যান্টোপন, পাবিনল, পানোপিন, এট্রোপিন।

আত্মমর্য্যাদা কি? আত্মমর্য্যাদা। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন যাঁরা, আমি তাঁদেরই একজন, আমার মধ্যে কত সদ্গুণ আছে—এ ধারণা ভিন্ন মানবজাতি, বা কোন প্রকৃত মানুষের পক্ষে জীবনধারণ দুর্বিষহ হয়।

আমি মানুষকে ঘৃণা করি, তারাও আমায় ঘৃণা করে।

বুদ্ধির লড়াই।

গাম্ভীর্য্য—নির্বুদ্ধিতার প্রতীক।

যাই হোক, বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে ছলনার আশ্রয় নিতেই হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ঋণ-ভিক্ষা করে লেখা একটি চিঠি।

তোমার উত্তর।

দয়া করে উত্তর দাও। এমন উত্তর যেন, আমার মন খুশি হয়ে ওঠে। অপমানের আশঙ্কায় আপন মনে দগ্ধে মরছি। অভিনয় নয়। আক্ষেপই নয়।

প্রতিদিন, প্রতিদিন তোমার উত্তরের অপেক্ষায় কাটে; অহোরাত্র ভয়ে কাঁপতে থাকি।

আমায় ধুলো মাখতে বলো না। দেওয়ালগুলো আমায় দেখে চাপা হাসি হাসে। গভীর রাত্রি বিছানায় ছটফট করে কাটে। আমায় অপমান করো না। বোন আমার।

এ অবধি পড়ে আমি 'চন্দ্রমল্লিকা পত্রিকা' বন্ধ করে কাঠের বাক্সের কাছে ফিরে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে জানালা খুলে দিলাম এবং বৃষ্টিধারায় ধোঁয়াটে বাগানের দিকে তাকিয়ে সে-সব দিনের কথা ভাবতে বসলাম।

তারপর ছয় বছর পার হয়ে গেছে। নাওজির এই নিদারুণ লেখাই আমার বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কারণ। না, একথা আমার বলা উচিত নয়—আমার মনে হয় জন্মের সময় থেকেই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমার কপালে লেখা ছিল। নাওজি যদি নেশা না-ও করত তবুও কোন না কোন দিন আর কোন কারণে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটত। ডাক্তারখানায় ঋণ করে নাওজি প্রায়ই আমায় উত্যক্ত করত। আমার তখন সত্ত বিয়ে হয়েছে, কাজেই টাকা-পয়সা নিয়ে যা খুসি করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তাছাড়া স্বামীর টাকা এভাবে লুকিয়ে ভাইকে দেব, ভাবতে খুব খারাপ লাগত। আমার বাপের বাড়ীর ঝি 'ওসাকী'র সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের বালা, হার, দামী পোষাক ইত্যাদি বিক্রি করাই স্থির করলাম। শেষ চিঠিতে নাওজি লিখেছিল—আমার অত্যধিক লজ্জা ও মানসিক উদ্বেগের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করা বা টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব নয়। ওসাকীর মারফৎ ঔপন্যাসিক উয়েহারা জিরোর ঠিকানায় টাকা পাঠিও। আশা করি ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ অন্ততঃ নামের পরিচয় আছে। মিষ্টার উয়েহারার মন্দ লোক বলে বাজারে বদনাম আছে, আসলে ভদ্রলোক ঠিক সে রকম নন, তার ঠিকানায় টাকা পাঠাতে দ্বিধা করো না। তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে টাকা পেলেই আমায় ফোন করে জানিয়ে দেবেন—কাজেই সেই রকম ব্যবস্থা করো। মায়ের কাছ থেকে অন্ততঃ আমার এই নেশার কথা গোপনে রাখতে চাই। তিনি জানবার আগেই আমি নিজেকে সংশোধন করতে চাই। তোমার টাকা দিয়ে ডাক্তারখানার ধার শুধব। তারপর স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে আমাদের পাহাড়ী বাসায় গিয়ে উপস্থিত হব। সত্যি আমার এ রকম একটা ইচ্ছে আছে। যে দিন আমি ঋণমুক্ত হব, সে দিনই নেশা ছেড়ে দেব। ঈশ্বরের কাছে শপথ করছি—দয়া করে আমায় বিশ্বাস করো। মাকে জানিও না, আর টাকা মিষ্টার উয়েহারার কাছে পৌঁছে দিও।

চিঠির মোট বক্তব্য এই। ওসাকীর মারফৎ মিষ্টার উয়েহারার কাছে টাকা পৌঁছলো বটে, কিন্তু বরাবরের মত এবারও নাওজির প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হল। স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আশায় আমাদের বাংলোয় সে গেল না, বরং তার নেশার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে ক্রমেই মারাত্মক অবস্থায় দাঁড়াল। টাকার তাগিদে তার চিঠির ধারা উদ্বেগের এমন রূপ নিল, যাকে আর্তনাদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতি চিঠিতে আমি নেশা ত্যাগের শপথ নিলাম, এর পরেই এমন এক হৃদয় বিদারক শপথ ক'রে যে চিঠির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারি এবারেও মিথ্যা বলছে, তবু নিজের আর একখানি গহনা ওসাকীর হাতে তুলে দিই, টাকাটা মিষ্টার উয়েহারার কাছে ঠিকই পৌঁছয়।

মিষ্টার উয়েহারা কেমন লোক ?

বেঁটে, কালো, বিশ্রী বলে ওসাকী কিন্তু আমি যে সময়ে যাই, বেশীর ভাগ দিনই তিনি সে সময়ে বাড়ীতে থাকেন না। তাঁর স্ত্রী আর বছর ছয়েকের কচি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, স্ত্রী যে খুব সুন্দরী তা নয়, কিন্তু ভারী মিষ্টি আর বুদ্ধিমতী। তাঁর মত মহিলার হাতে টাকা তুলে দিতে ভাবনা হয় না।

বর্তমান আমি'র সঙ্গে সেদিনের আমি'র যদি তুলনা কর, তবে দেখবে অসম্ভব, কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাবে না। উচ্ছৃসিত আমার তখন আকাশে ঠেকত এবং অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ছিল আমার গতি। তা সত্বেও দারুণ ভয় পেলাম, আমায় শোষণ করে যে পরিমাণ টাকা এক একবারে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাতে রীতিমত দুঃস্বপ্নের মত মনে হল। একদিন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে হেঁটেই চললুম মিষ্টার উয়েহারার বাড়ীর উদ্দেশে।

মিষ্টার উয়েহারা নিজের ঘরে বসে খবর-কাগজ পড়ছিলেন। জাপানী পোষাকে তাঁকে একাধারে বৃদ্ধ ও তরুণ দেখাচ্ছিল। যেন জীবনে কখনও দেখিনি এমন এক জীবের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে রেশন আনতে গেছেন। ঈষৎ নাকি-সুরে কেটে কেটে কথাগুলি বললেন। আমায় দেখে স্ত্রীর কোন বন্ধু বলে ভুল করেছিলেন। নাওজির বোন বলে নিজের পরিচয় দিতে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। শরীরের ভেতর দিয়ে না জানি কেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত ব'য়ে গেল।

বেরুলে হয় না ? কথাটা বলেই, উত্তরের অপেক্ষা না করেই, একখানা ক্লোক গায়ে চাপিয়ে নিয়ে, নতুন এক জোড়া চটি পায়ে আমার আগে-ভাগে বারান্দা পেরিয়ে রওনা দিলেন।

আশু শীতের সন্ধ্যা। হিমেল হাওয়া মনে হ'ল সোজা নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসছে। মিষ্টার উয়েহারা হাওয়া বাঁচাতেই যেন দুটো কাঁধ তুলে নিঃশব্দে হাঁটছেন। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে তাঁর পেছনে চলেছি।

টোকিও থিয়েটারের এক তলায় গিয়ে ঢুকলাম। লম্বা সরু ঘরখানায় চার পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে খদ্দেররা নিঃশব্দে বসে মদ খাচ্ছে।

মিষ্টার উয়েহারা মদের পেয়ালার বদলে গেলাসে ঢেলে খেনোমদ খেলেন। আর এক গেলাস আনতে বলে আমায় খেতে অনুরোধ করলেন। দু' গেলাস খেয়ে নিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু তফাৎ বুঝলাম না।

মিষ্টার উয়েহারা নিঃশব্দে খেনো আর সিগ্রেট চালাতে লাগলেন। জীবনে প্রথম এমন জায়গায় পা দিয়েও আমার কিন্তু মোটেই খারাপ লাগছিল না। বরং ভালই লাগল।

ভাল মদ খাওয়াতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু—

বলুন।

মানে তোমার ভাই। সে যদি মদের দিকে ঝুঁকত তবে ভাল হত। বহু কাল আগে কোন সময়ে আফিং-এর নেশা আমারও

ছিল, আমি জানি লোকে একে কত হীন চোখে দেখে। মদ প্রায় একই জাতীয় পদার্থ, কিন্তু তার প্রতি মানুষের আশ্চর্য্য পক্ষপাত দেখি। আমার ইচ্ছে আছে, তোমার ভাইকে মদের নেশা ধরাব। তুমি কি মনে কর?

আমি একবার এক মাতাল দেখেছিলাম। নববর্ষের দিন বাড়ী বাড়ী দেখা করতে বেরুব এমন সময়ে আমাদের গাড়ীর ভেতর কুৎসিত লাল মুখওয়ালা একটা লোক দেখলাম, নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে আমাদের ড্রাইভারের বন্ধু। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। ড্রাইভারের মুখে শুনেছি, লোকটা পাঁড় মাতাল। গাড়ী থেকে হিঁচড়ে বের করে তার কাঁধ দুটো ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে লোকটার শরীর এমন ভাবে ভেঙ্গে মুচড়ে পড়ে গেল, যে মনে হল—হাড়গোড় বুঝি কিছু নেই।

আর সারাক্ষণ কি যেন বিড়-বিড় করতে লাগল। সেই প্রথম আমি মাতাল দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

জান বোধ হয় আমিও মাতাল?

না, সে কথা সত্যি নয়। আমি আসল মাতাল দেখেছি। তার চেহারাই ভিন্ন।

এই প্রথম ভদ্রলোক মন খুলে হাসলেন।

তাহলে হয়ত তোমার ভাইকে মদের নেশা ধরানো যাবে না, তবু মদ ধরলে ওর উপকার হবে। চল এবার ওঠা যাক।

দেরী করতে চাও না আশা করি।

তাতে কিছু এসে যায় না।

সত্যি বলতে এ জায়গাটা বড্ড বেশী ভিড়। ওয়েট্রেস,—বিল আনো।

অনেক খরচ হল? খুব বেশী না হলে আমার কাছেও তো কিছু আছে।

তবে বিলটা তুমিই চুকিয়ে দাও।

অতটা না-ও থাকতে পারে। ব্যাগের ভেতর চোখ বুলিয়ে মিষ্টার উয়েহারাকে আমার টাকার আন্দাজ দিলাম।

এ টাকায় আরও দু' জায়গায় মদ খাওয়া চলে, বোকা মেয়ে কোথাকার! ভ্রূ কুঁচকে বলেই ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

আর কোথাও যাবেন মদ খেতে?

উনি মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন—না যথেষ্ট হয়েছে। তোমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকি। তুমি বাড়ী যাও।

অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গে একতলা থেকে উঠে এলাম। মিষ্টার উয়েহারা আমার এক ধাপ ওপরে ছিলেন। হঠাৎ পেছন ফিরে আমার অধর স্পর্শ করলেন। ঠোঁট শক্ত করে চেপে তাঁর চুম্বন গ্রহণ করলাম। তাঁর প্রতি বিশেষ কোনে আকর্ষণ আমার আসেনি, কিন্তু সেই সময় থেকে আমার গোপন কথার সূত্রপাত। মিষ্টার উয়েহারা সিঁড়ি বেয়ে তর-তর করে উঠে গেলেন, আমি ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করলাম, মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ফাঁকা। বাইরে বেরিয়ে নদীর হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

মিষ্টার উয়েহারা আমার জন্ত একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালেন, কোন কথা না বলেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পুরনো নড়বড়ে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে মনে হল, এই মুহূর্তে সমুদ্রের মত বিশালরূপিণী সমুদ্রের দ্বার আমার চোখের সামনে খুলে গেল।

একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে মন খারাপ করে বসে আছি, হঠাৎ কি মনে হতে বলে ফেললাম,—একজন আমায় ভালবাসেন।

জানি, হোসাডা না? তুমি কি তাঁকে ভুলতে পার না?

এ কথার কোন জবাব দিলাম না।

যখনই আমার স্বামীর সঙ্গে গোলমাল হত, তখনই এই কথা উঠত। মনে ভাবলাম—সব শেষ।

এ যেন পোষাকের জন্ত ভুল করে কাপড় কেনা, একবার কেটে ফেললে জোড়া দেওয়া চলে না। সবটা ফেলে দিয়ে নতুন করে কাপড় কিনতে হয়।

এক রাতে স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, আমার পেটের সন্তানটি কার? হোসাডার? ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ থর-থর কেঁপে উঠল। এখন বুঝতে পারি সে সময়ে আমি এবং আমার স্বামী দু'জনেই কত ছেলেমানুষ ছিলাম। সহজ প্রেম কথাটার তাৎপর্য্য আমাদের জানা ছিল না। মিষ্টার হোসাডার ছবির সম্বন্ধে এমন অন্ধ ভক্তি ছিল যে, চেনা-শোনা সবাইকে বলে বেড়াতাম অমন লোকের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য থাকলে জীবনে প্রতিটা দিন অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভরে ওঠে। তাঁর মত রুচি যাঁর নেই, তেমন মানুষকে বিয়ে করা অর্থহীন। কাজে কাজেই সবাই ভুল বুঝত, আর আমি স্নেহ ভালবাসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম বলেই নিঃসঙ্কোচে সবার সামনে বলে বেড়াতাম আমি হোসাডাকে ভালবাসি। এ ধরণের মন্তব্য কখনও প্রত্যাহার করার চেষ্টা পর্য্যন্ত না করায় ব্যাপার জটিল হয়ে দাঁড়াল। সেই কারণেই দেহের মধ্যে ঘুমন্ত ক্ষুদ্র মানব-শিশুর প্রতিও আমার স্বামীর মনে সন্দেহ জাগে। দু'জনের মধ্যে কেউই বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা তুললাম না, অথচ দিনে দিনে আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠল। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে এলাম। মৃত শিশুর জন্মের পর অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলাম, স্বামীর সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক শেষ হ'ল।

আমার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী ধরে নিয়ে নাওজি গলা ফাটিয়ে নিজের মরণ কামনা ঘোষণা করল—কান্নায় তার মুখ বিকৃত হল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তারখানায় আর কত ঋণ আছে? ধারণাতীত এক বিরাট টাকার অঙ্ক আমার কাছে সে স্বীকার করল। পরে শুনেছিলাম সে মিথ্যা বলেছিল, আসল অঙ্কটা তারও তিনগুণ।

আমি স্বীকার করলাম, তোমার মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে দেখা হয়েছে? চমৎকার মানুষ! মাঝে মাঝে তিন জনে মিলে বারে আড্ডা দিতে বেরুলে মন্দ হয় না! ধেনোমদ এত সস্তা, আমার কোন ধারণাই ছিল না। এতে তোমার অরুচি না হলে খরচ পোষানো আমার পক্ষে কঠিন হবে না। ডাক্তারখানার টাকার জন্ত ভেবো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েই যাবে।

মিঃ উয়েহারার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং তাঁকে আমার ভাল লাগে শুনে নাওজির তো গদগদ অবস্থা! সে রাতে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে ভদ্রলোকের বাড়ী ধাওয়া করল।

নেশাটা বোধ হয় মনের রোগ। মিষ্টার উয়েহারার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম। ভাই-এর কাছ থেকে তাঁর লেখা বই ধার করে পড়তে সুরু করলাম। পড়া হলে মন্তব্য করতাম—এমন লেখক আর হয় না। আমি ভদ্রলোকের লেখার একজন সমঝদার,

এ কথা আবিষ্কার করে নাওজি তো অবাক! খুশির চোটে আমায় ওঁর আরও সব উপন্যাস জোগাড় করে দিতে লাগল। নিজের অজান্তে আমি মিষ্টার উয়েহারার গুণগ্রাহী হয়ে উঠলাম, তাঁর সমস্ত উপন্যাস মন দিয়ে পড়ে নাওজির সঙ্গে সমালোচনা করি। প্রায় প্রতি রাত্রে নাওজি মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে মদের আড্ডায় চলে যায়। ক্রমে ক্রমে সে মদের নেশায় মশগুল হয়ে এল। নাওজিকে না জানিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তারখানার ধারের কি হবে? এক হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ চুপ করে মা বসে রইলেন; তারপর মুখ তুলে ম্লান হেসে জবাব দিলেন উপায় কি? মাথায় তো কিছুই আসছে না। জানি না কত বছরে এ বোঝা নামবে। যাই হোক, প্রতি মাসে সামান্য কিছু করে শোধ করতেই হবে।

এর পর দু'বছর কেটে গেছে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রমল্লিকা। নাওজির পক্ষেও কথাটা সত্যি, আজ অবধি ওর উদ্ধারের সব রাস্তা বন্ধ, কি করে কি করা যায়, এ ধারণাই ওর নেই। মৃত্যুর আশাতেই সে নিশ্চয় রোজ মাতাল হয়। নিজেকে নষ্ট হতে ছেড়ে দিলে আমিই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম, কে জানে! বোধ হয় তাহলে নাওজির পক্ষে সহ্য করা সহজ হত।

নাওজি নোট বইয়ে লিখেছে—কি যে মন্দ নয় তা তো জানি না। এই কথা পড়ে নিজেকে আমার কাকাকে, এমন কি আমার মা জননীকেও যেন বিশ্বাস করতে পারি না। বোধ হয় এখানে ভ্রষ্ট কথাটির সংজ্ঞা মায়ার বন্ধন মাত্রই হবে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

চাঁদ ও চীনেমাটি

বড় রাস্তার ধারে ঐ যে সরু গলি—
যার সামনে ফুটপাথের উপর লোহার চৌকো ঢাকা দেওয়া
গঙ্গাজলের কল—
ঐটেকে ওরা তুলে ফেলল অবলীলায়,
ধুতে বসল কাচের গেলাস আর সস্তা দামের চীনেমাটির বাসন।
আকাশে তখন চাঁদ জ্বলছে।
গ্যাসের বাতির চেয়েও অনেক জোরে আর অনেক দূরে জ্বলছে চাঁদ,
তার আলো ওদের গায়ে ছড়িয়ে গেছে—
ছড়িয়ে গিয়ে ঝিকঝিকিয়ে উঠছে চীনেমাটির চক্‌চকে প্লেটে।
ওরা অনেক রাত্রে কাজ করতে বসেছে পথের ধারে
চায়ের দোকানের সামনে—কাঁচা-বয়সের দু'টি ছেলে—
যাদের মুখের ফ্যাকাশে রঙে ভীতিজনক অস্বাস্থ্যের আশঙ্কা,
ঐ সামনের অন্ধকার আঁকা-বাঁকা গলির মতনই
যাদের ভবিষ্যৎ সর্পিল ও অন্ধকার,
যাদের গায়ে এই শীতের রাত্রেও ছেঁড়া গেঞ্জী,
রঙ উঠে যাওয়া বোতামখসা ছেঁড়া প্যাণ্ট পরনে,
ঐ কাঁচা বয়সের ফ্যাকাশে রঙের দুটি ছেলে—
যারা এত রাত্রেও হাসি'হাসি মুখে কাচের ও
চীনেমাটির বাসন ধুচ্ছে,
নিশীথপ্রায় শীতের রাত্রের কুয়াশা ছড়ানো চাঁদের আলোর তলায়।

ওদের বয়সী অনেক ছেলেই এখন ঘুমোচ্ছে
আরামে লেপের তলায়—বাতি জ্বেলে অনেক পড়ার শেষে—
যারা জানে মিশরের পিরামিডে কারা থাকে
ঐ হলদে মলমল ছড়ানো প্রেতমূর্তির দল
সুগন্ধি মশলার ঝাঁঝে যাদের দেহ জরজর হ'য়ে আছে,
আর যাদের গলায় দুলছে ফিকে সবুজ পাথরের ঘষা মালা।
যেখানকার উদ্দাম প্রপাতের কাছে নরম কাদায়
জল-হস্তীর দল পা ডুবিয়ে আরামে চোখ বুঁজে আছে।

এদের বাসন ধোয়ার টুং-টাং শব্দ মিশে গেছে ওদের পড়ার সুরে
যখন ওরা পড়েছে—কোথায় কোনো সিংহল দেশের আরক্ত চুণি
গোলাপের চেয়েও লাল আর ঝকঝকে—
কোথায় গজমুক্তার মালা শাদা হাঁসের ডিমের মতন বড় বড়
কোথায় নীলা-পাথরের দ্যুতি সমুদ্রের সুনীলতার চেয়েও প্রগাঢ়
আর কোথায় নলবনে দুরন্ত হাওয়ার জল-ফড়িং-এর মাতামাতি।
ওদের কানে যায় না এ সব কথা—
ওরা জানে আর এক সেট বাবু ব'সে আছে পিপাসার্ত হ'য়ে
জানে দোকানের মালিকের চড়া মেজাজ
আর চেনে দু-একটা পয়সার বখশিষ—
যা ওদের কাঁচা বয়সের সমস্ত স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েছে—
জীবিকার দায়ে রোগা হাতে ফ্যাকাশে মুখেও যারা খুশি।

ওরা চায়ের চীনেমাটির বাসনগুলি ধুয়ে ট্রেতে থাক দিয়ে সাজাল,
তারপর একটু আড়াল হয়ে দু-জনে দুটো বিড়ি ধরাল—
আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল চাঁদের দিকে—
ছাই ঝরিয়ে দিল নীচের মাটিতে
তারপর ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে বলল শীতের প্রকোপের কথা,
আর আমি পাড়ার লোক—আমাকে দেখে লজ্জায় হেসে ফেলল
আর ওদেরফ্যাকাশে মুখের হাসি দেখে কান্নায় বুক আমার ভেজে গেল।

শেরপারা হাতে আলো আর কুকরি নিয়ে ঢুকলো সেই অন্ধকার গুহায়। কাছে গিয়ে তারা যা দেখলো, সে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য! কিশোর আর শান্তনু দুজনেই দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাদের ঘিরে আছে তিনটি বলিষ্ঠ লোক। আগন্তুক শেরপাদের দেখে তারা পিস্তল উঁচিয়েছে।

শেরপাদের দেখে কিশোর, শান্তনু দুজনেই আশ্বস্ত হলো। পিস্তলগুলো অগ্নিবর্ষণ করার আগেই তারা চিৎকার করে বলে উঠলো: মারবেন না! ডু নট ফায়ার অ্যাট দেম। ওরা আমাদের লোক।

কিছুক্ষণ ধরে সেই স্তিমিত অন্ধকার গুহামধ্যে সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপরে, কথা বললো প্রথমে শান্তনু। সে বললে, আমাদের নিয়ে কি করতে চান আপনারা?

তোমাদের উদ্দেশ্যটা আগে শুনতে চাই, বললে ওদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি। তার মুখখানা দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন, চোখ দুটো অগ্নিস্রাবী—আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তোমরাও যদি সেই মতলবে এসে থাকো তাহলে তোমাদের এখানেই থেকে যেতে হবে।

শান্তনু বললে, অনুগ্রহ করে বলবেন কি, আপনাদের উদ্দেশ্য কি? আমাদের তরফ থেকে বলতে পারি, আমরা অন্তত স্বর্ণখনির সন্ধানে বা পরশমণির সন্ধানে এখানে আসিনি।

তবে? অপর পক্ষ থেকে প্রশ্ন এলো।

শান্তনু বললে, আমরা পর্যটকের উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি। আমাদের লক্ষ্য বলতে এক কথায় বলতে পারি, সোনালি ঝরণা।

অপর পক্ষের একজন একটু হেসে বললে, এতো কষ্ট করে সোনালি ঝরণা দেখতে শুধু কেউ আসে কি না আমরা জানি না। এ কথা বিশ্বাস করাও শক্ত!

শান্তনু বললে, বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ওপর নির্ভর করে। তবে আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ লামাজি আছেন। তিনি ত মিথ্যা বলবেন না?

কোন্ লামা? নাম কি?

তিয়েলিং।

তিয়েলিং-এর নাম শুনে ওরা একটু চুপ করে থেকে একটু দূরে সরে গেল এবং সেখানে চাপা গলায় কিছুক্ষণ পরামর্শ করে ফিরে এল। সেই বয়স্ক লোকটি বললে, তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি দুটি সর্তে। প্রথম, আমাদের কাজে তোমরা কোনো বাধা দেবে না। দ্বিতীয়, শংকরীপ্রসাদের হত্যার কথা তোমরা প্রকাশ করবে না।

শান্তনু বললে, শংকরীপ্রসাদের মৃত্যুতে আমরা খুশি হয়েছি, আপনারা তাকে হত্যা না করলেও আমার হাতে সে নিহত হতো।

ও! তোমাদের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছিল?

শান্তনু তখন সবিস্তারে শংকরীপ্রসাদের কথা বললো এবং ওদের কাছে যা শুনলো, তা আরো চমকপ্রদ! ওরা আটজনের একটি দল এই অভিযানে বেরোয়। তারপর, লক্ষ্যস্থলের যতই কাছাকাছি আমরা হয়েছি ততই শয়তান হয়ে উঠেছিল সে। লোভের কবলে পড়ে আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টায় সে পর পর তিন জনকে হত্যা করেছে। সুযোগ পেলে আমরা তিন জনও থাকতাম না। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, তাকেই সরে যেতে হলো।

শান্তনু বললে, তাহলে, আর কি বলার প্রয়োজন আছে যে আমরা আপনাদের দুটি সর্তেই রাজি?

সকলেই একবার হেসে উঠলো এবং তাদের বাঁধনগুলো খুলে দেওয়া হলো।

কিশোর এতক্ষণে বলে উঠলো, তাহ'লে আমরা এখন বন্ধু, তাই নয় কি?

সকলে বলে উঠলো, নিশ্চয়ই। প্যাক্ট হয়ে গেল।

শান্তনু বললে, আমাদের কিন্তু এখনি যেতে হবে ক্যাম্পে। আমাদের এক বোন আছে আর লামাজি আছেন। ওরা আমাদের জন্যে এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনারাও কিন্তু আসবেন, চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো।

মোষ্ট, গ্ল্যাডলি, বলে উঠলো এরা। একজন বললে, সোনালি ঝরণা দেখবেন না? এখান থেকে সহজে যাওয়ার পথ আছে।

তাই নাকি? হুররে···! শান্তনু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। দেখবো, নিশ্চয়ই দেখবো। কিন্তু সবাই মিলে··· এই বলে শেরপাদের নিয়ে শান্তনু, কিশোর ওপরে উঠতে লাগলো ক্যাম্পের উদ্দেশে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

দূর থেকেই ওরা চিৎকার করে উঠলো, লালী, লালী, দারুণ দুঃসহ সুসংবাদ!

লালীর মুখখানা ভারী, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে শান্তনু বললে, খুব কান্না হয়েছে, বুঝতে পাচ্ছি···কিন্তু, এবারে আর কান্না নয়। একেবারে হাসি। কয়েক ঘন্টা পরেই আমরা সোনালি ঝরণা দেখতে যাবো।

রাখো তোমাদের সোনালি ঝরণা, মুখ বেঁকিয়ে বললে লালী। এমন জানলে কে আসতো তোমাদের সঙ্গে!

কেন, কি হয়েছে?

বেশ ফূর্তিতে মশগুল হয়ে আছ, আর আমাদের কাল থেকে কী দুশ্চিন্তায় কাটছে!

ও, এই কথা! আমরা আসতে পারলে তবে তো, ঐ শেরপাদেরই জিগ্যেস করো না। সে এখন থাক, পরে বলবো। কিছু খাবার আর চায়ের জোগাড় করো দেখি, তিন জনকে নিমন্ত্রণ করে এলুম। চল কিশোর, লামাজির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

লামাজি সব বৃত্তান্ত শুনেও বিশেষ বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, এখানে এ ধরণের ঘটনা বিরল নয়। মানুষের অর্থলোভের হিংস্রমূর্তি কত অনর্থই যে করেছে! লোভ তার প্রসারিত হাত দুটি হিংসায় কলুষিত করে কত রক্ত যে ঝরিয়েছে, কত প্রাণ বিনষ্ট করেছে, কে তার পরিমাণ করবে? ভগবান বুদ্ধের অপার আশীর্বাদে তোমরা ফিরে এসেছ।

আর একটা সুসংবাদ আছে লামাজি, বললে কিশোর। ঐ গুম্ফার মধ্যে দিয়েই সহজ পথ আছে, সেটা আমরা জেনে এসেছি।

তা হবে, বললেন তিয়েলিং। ওটা আমার জানা নেই।

যথাসময়ে ভূগর্ভ থেকে তিন জন অতিথি এসে হাজির হলো। তিন জনই ভারতীয়, বাঙালী নয়। দুজন বোম্বাই, একজন উত্তরপ্রদেশের লোক। ওঁরা ঐ নির্বান্ধব জনহীন প্রদেশে মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। চা-পানের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। লালী অনেক দিন পরে অপরিচিত অতিথিদের পরিবেশন করলো।

সেই দিন দুপুরে অনেকগুলি মানুষের একটি দল ঢালু পথে পা বাড়ালো। কিন্তু দৈব-দুর্য্যোগের কি এখনও শেষ নেই? হঠাৎ আকাশ আচ্ছন্ন হলো মেঘে। কুয়াশার মত পাতলা মেঘ। বৃষ্টি এলেই বিপদ, নামার পথ পিছল হলে সে মারাত্মক হয়।

যাই হোক, প্রকৃতি তাঁর চরম অভিশাপের মধ্যেও আশীর্বাদ রেখে দেন। তা না হলে পৃথিবীর যত দুর্গম স্থান আজও মানুষের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যেত।

গুম্ফার অন্ধকার সর্পিল পথে কিছু দূর যেতেই একটা গর্জন শ্রুতিগোচর হলো।

শংকরীপ্রসাদের দলের একজন যিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন তাঁর নাম মিঃ কাপুর। তিনি বললেন, আমরা ঝরণার নিচে দিকে যাচ্ছি বলেই এতো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ঝরণাকে মাঝপথ থেকে দেখায় সব চেয়ে ভাল। আর একজন মন্তব্য করেন। ওরা যতই এগুচ্ছে ততই গর্জনের শব্দও বাড়ছে। এদিকে পথের দুপাশে সেই সুড়ঙ্গপ্রায় গহ্বরের রূপও অপূর্ব! জলের ফোটার সঙ্গে চুণ বা সিলিকা জাতীয় পদার্থ জমে জমে ক[illegible] লক্ষ স্তম্ভের মত সৃষ্টি করেছে। ওপর থেকে সেগুলি ঝুলছে। কতকগুলি মাটি স্পর্শ করেছে, কতকগুলি করেনি। সেগুলির আকার আ[illegible] গঠন কী বিচিত্র!

কতক্ষণ চলার পর তীব্র আলো হঠাৎ যেন ঝলসে উঠলো ওদে[র] চোখে। শান্তনু বললে, সুড়ঙ্গর শেষ হলো। আমরা বাইরে এ[সে] পড়েছি। এ আকাশের আলো।

তিয়েলিং বললেন, না শান্তনু, ভুল করছো, সামনে চেয়ে দেখ।

সত্যিই তাই পর্বতগর্ভের সুড়ঙ্গ তখনও শেষ হয়নি। কি[ন্তু] সেখানকার একটি রন্ধ্রপথ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা আলোকোজ্জ্ব[ল] জলধারা। শান্তনু আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। তিয়েলি[ং] বললেন, "এটিও একটি প্রস্রবণ, ধবলগিরির বুক থেকে নেমে আসছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে সত্যিই সুড়ঙ্গের শেষ হলো। ওরা যেখানে দাঁড়ালো, তার মাথায় আকাশ। সেখান থেকে দূরে দেখা গেল একটি সরু সোনার সুতো ঝুলছে—ওপরে নিকষ-কালো পাথরে[র] পর্বতশৃঙ্গ, নিচে নিম্নে নীলাভ কুয়াশা। তিয়েলিং মন্ত্রমুগ্ধের ম[ত] দাঁড়িয়ে পড়েন। লালী, কিশোর, শান্তনু বসে পড়ে···একদৃষ্টি[তে] তাকিয়ে আছে সকলে। বাক্যহীন।

কথা বলার প্রয়োজন কোথা? সবার মন তখন চোখে[র] তারায়!

অস্ফুট ভাষায় শুধু শান্তনু বললে, সোনালি ঝরণা, সোনালি ঝরণা···!

একটি স্বর্ণরশ্মি যেন স্বর্গচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে, সাবলী[ল] গতিতে, নিচে, অনেক নিচে যেখানে সে মুছে গেছে কুয়াশার অস্পষ্টতায়। মন-প্রাণ ভরে দেখলো ওরা।

মিঃ কাপুর বললেন, শুনেছি ওটা জল নয়, জল ছাড়া অন্য কিছু, এই যেমন সত্যিকার সোনাও হতে পারে।

সেটা কি করে সম্ভব? রাও বললে। গলিত সোনার টেম্পারেচার কত? বরং এটা হতে পারে যে স্বর্ণরেণু মিশ্রিত জল।

কাপুর প্রতিবাদ করে, তাও সম্ভব নয়। ওটা লাইটের কোনো অদ্ভুত প্রতিফলনের জন্যেই ওরকম দেখায়। আসলে হয়তো ওটা জলই।

তিয়েলিং এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন। শুধু তার গুঞ্জন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। উনি বললেন, কোনো ব্যাখ্যাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যেটি বিশ্বাসযোগ্য সেটি আমার কাছে শুনুন।

আসলে, ওটি কোনো সাধারণ ঝরণা নয়। অনেক কাল আগের কাঞ্চনমালা। কাঞ্চনজঙ্ঘার একমাত্র আদরের দুলালী কাঞ্চনমালা··· কাঞ্চনজঙ্ঘার কটিদেশে ছিল নিকষ-কালো কষ্টিপাথর আর পরশ-শিলার বেষ্টনী। স্তবকে স্তবকে গেঁথে রেখেছিল তারা হিমাদ্রিরাজের ঐ শৃঙ্গটিকে। রাজা কাঞ্চনজঙ্ঘার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে আছে সোনার স্তূপ। স্বর্ণময়ী কাঞ্চনমালা ছিল উচ্চতম শিখরের একটি কক্ষে। কত রাজা, কত রাজপুত্র এলো তার পাণি প্রার্থনা করে···কিন্তু কেউই পারলো না তাকে লাভ করতে। দলে দলে তারা প্রাণ দিল, তাদের অস্থিপঞ্জর পড়ে আছে ঐ রুক্ষকঠিন শিলারাশির কন্দরে কন্দরে।

তারা এসেছিল স্বর্ণের আকর্ষণে। তারা চেয়েছিল কাঞ্চনমালাকে আত্মসাৎ করতে, তাকে লোভের কঠিন নখর দিয়ে ধরতে···

কাঞ্চনমালা শুধু শিউরে উঠতো। মেঘলোকে ঢেকে রাখতো তার লজ্জাকে...

শেষে এলো এক পৃথিবীর কুমার...দুঃসাহসের কঠিন বর্ম তার সর্বাঙ্গে...মৃত্যু পণ করে সে উঠলো ঐ মসৃণ শিলাগাত্র বেয়ে। সে বললে, ভালবাসা দিয়ে' আমি জয় করবো মৃত্যুভয়কে, কোনো বাধাই মানি না আমি।

শিলার পাঁজরে পাঁজরে তৃণ গজালো, তার পা রাখবার জন্যে। শেষে জয়ী হলো সে, কাঞ্চনমালার হাতে দিল একটি রক্তগোলাপ। দুহাতে বেষ্টন করলো সে কাঞ্চনমালাকে। বললে সোনা চাই না, স্বর্ণদ্যুতি চাই। আমি চাই তোমাকে, নিয়ে যাব পৃথিবীতে।

কোমল হয়ে গলে গেল কাঞ্চনমালা, প্রেমের স্পর্শে কি যে উত্তাপ আছে কে জানে! গলে তরল হয়ে ঝরে পড়লো...আজও পড়ছে। আজও নামছে সে পৃথিবীতে।

তিয়েলিং চুপ করলেন। যেন ধ্যানস্থ। সবাই নির্বাক!

তার পর? তার পর আর নেই।

শুধু আছে শান্তনুদের ফিরে আসার পালা। সেটা কল্পনা করেই নিতে হবে। ওরা ফিরে এলো কলকাতায়, নিরাপদেই ফিরেছিল। শান্তনুর ব্যাগ ভর্তি হয়েছিল নানান পাথরে—তার কয়েকটি দেখা গিয়েছিল খুবই মূল্যবান। তাতে ছিল অকল্পিত কয়েকটি জীবের জীবাশ্ম।

তিয়েলিং ফিরে গিয়েছিলেন তার আস্তানা সেই বৌদ্ধমঠে, আর যাদের কথা না বললেও চলে, সেই শংকরীপ্রসাদের দলের তিন জন, কাপুর, রাও আর পাণ্ডে এঁরা এঁদের স্বর্ণখনির অভিযান ত্যাগ করে শান্তনুদের সঙ্গে ফিরেছিলেন। শান্তনুর সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

সমাপ্ত

গ্লাস অদৃশ্য করার যাদু

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

সেবার টৌকিওতে থাকাকালে একটা মজার খেলা দেখিয়ে বন্ধুমহলে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলাম। সবার চোখের সামনে একটা কাচের গ্লাসকে বেমালুম অদৃশ্য করে দেওয়ার যাদু। দিনটা ছিল মেঘলা-মেঘলা, মাঝে মাঝে ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। পথঘাট ভেজা আর বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজও মেশানো ছিল বাতাসে। দু'-তিনজন জাপানী সাংবাদিক বন্ধু এসেছিলেন দেখা করতে। তাদের সঙ্গে গল্প করছিলাম হোটেলের খাবার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে। আসাহী সিমুনের অন্যতমা রিপোর্টার মিস কিওকো কথা প্রসঙ্গে আমাকে অনুরোধ জানালেন একটি ম্যাজিক দেখানোর জন্য। আমি তাঁদের একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিলাম একটি একশ ইয়েন মুদ্রা আর সেটিকে রাখলাম টেবিলের উপরে। আর একজনের হাত থেকে নিলাম একটি খবরের কাগজ। এই কাগজ ঠোঙ্গা পাকিয়ে নিলাম আর কাচের গ্লাসটাকে উপুড় করে নিয়ে ঠোঙ্গা দিয়ে ঢাকা দিলাম সেটিকে। এর পরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মুদ্রার প্রতি। আর কাগজের ঠোঙার মোড়া
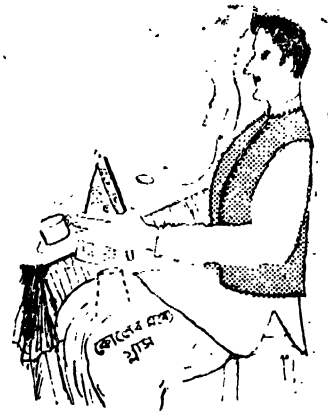
গ্লাস (ঠোঙ্গাসুদ্ধ) তুলে এনে তাই দিয়ে চাপা দিলাম মুদ্রাটাকে। হোকাস-পোকাস-হোকাস-পোকাস বলে যেই মাত্র ঠোঙ্গাসুদ্ধ গ্লাসটা (?) তুলে নিলাম তখন সবাই কী দেখলেন বলতো? মুদ্রা অদৃশ্য হয়ে গেছে? না মোটেই তা নয়! যেমনকার মুদ্রা তেমনি পড়ে আছে। তাই তো! তবে কি ম্যাজিক ব্যর্থ হল? একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি বন্ধুদের বললাম যে আমার মন্ত্র কখনও বিফলে যায় না। হয়তো বা মুদ্রার বদলে অন্য কোনও কিছুর উপরে এ মন্ত্র কাজ করে থাকবে। কিসের উপরে? কাগজের ঠোঙাটা খুলতে দেখা গেল তার ভেতরে গ্লাস নেই। কাণ্ড দেখে সবাই হলেন হতবাক্। এত বড় একটা গ্লাস চোখের সামনে থেকে কেমন করে উধাও হল?

খুবই সহজ একটি কৌশল প্রয়োগ করেছিলাম। সেদিন আমার পরা ছিল ধুতি। আর আমি বসেছিলাম টেবিলের এক ধারে। কাগজের ঠোঙার ভেতরে গ্লাস ঢাকা দেবার পরে যখন আমি সবার দৃষ্টি মুদ্রাটির দিকে আকর্ষণ করি, তখন সবার অগোচরে ঠোঙ্গাসুদ্ধ গ্লাসটাকে টেনে আনি টেবিলের ধারের দিকে আর সেই অবসরে গ্লাসটাকে ফেলে দিই কোলের উপরে—কোঁচড়ের ভেতরে তা নেয় নিরাপদ আশ্রয়। বলা বাহুল্য যে, এ কাজ আমি করেছিলাম বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আর আমার চোখ ছিল দর্শকদেরই উপরে, শুধুমাত্র বাঁ হাতেই সেরেছিলাম এই গ্লাস লোপাটের কাজ। ধুতি পরা না থাকলেও যে এ খেলা আমি দেখাতে না পারতাম এমন নয়। তখন আমাকে কোলের উপরে বিছিয়ে নিতে হত একটি বেশ বড় সাইজের রুমাল বা ঝাড়ন। খেলা শেষ হবার পরে সকলের অলক্ষ্যে কোল থেকে গ্লাসটাকে সরিয়ে ফেলাটাও কিছু কম অভ্যাসের কাজ নয়।

যারা যাদুবিদ্যা বিষয়ে উৎসাহী, তারা আমার সঙ্গে জবাবের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ পত্রালাপ করতে পার A. C. SORCER, Magician, Post Box 16214, Calcutta—29 এই ঠিকানায়।

অভিশপ্ত সুর বার্কারোল

দেবব্রত ঘোষ

ফরাসী সুরকার জ্যাকি অফেনব্যাখ-এর নাম ইউরোপের সঙ্গীতানুরাগী ও বিদগ্ধ সমাজে আজকের দিনে সুপরিচিত না হলেও একেবারে অপরিচিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর রচিত অপূর্ব সুরসমৃদ্ধ লঘু অপেরাগুলি ইউরোপের সঙ্গীত-রসিক মহলে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কালের কষ্টিপাথরে তারা হয়ত যুগোত্তীর্ণ হতে পারেনি, তবে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন জার্মাণীর কোলন সহরের এক সম্ভ্রান্ত জার্মাণ-ইহুদী পরিবারে জ্যাকি অফেনব্যাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল জ্যাকব লেভি এবার্ষ্ট। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ভায়োলিন সেলো শিক্ষার জন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে আসেন। পরে এই প্যারী নগরীই তাঁর জীবনের কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় ও তিনি ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

অফেনব্যাখ তাঁর সুদীর্ঘ সঙ্গীতময় জীবনে বহু জনপ্রিয় অপেরায় সুর-সংযোজনা করে গেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—"পেপিটো" "লা বেলে হেলেন" "বারবে ব্লু", "লা গ্রাণ্ডে ডাচেস ডি জেরোলষ্টাইন", "জেনেভিয়েভ ডি বারবাঁ", "ম্যাদাম ফাঁবরা" প্রভৃতি। তবে জীবনের শেষভাগে "টেলস অব হফম্যান" অপেরায় সুর সৃষ্টি করে তিনি যে প্রভূত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন সেকালের ইউরোপে তাঁর তুলনা মেলা ভার! অথচ বড়ই দুঃখের বিষয়, অফেনব্যাখ তাঁর সংগীত-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই অপেরার সফলতা দেখে যেতে পারেন নি। কারণ যে মূল সুরটিকে ভিত্তি করে তিনি "টেলস অব হফম্যান" অপেরায় সুর সংযোজনা করেছিলেন সেই সুরটি ছিল অভিশপ্ত। ফলে উক্ত সুরের অভিশাপেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অফেনব্যাখকে অষ্টাদশ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত জার্মাণ আইনজ্ঞের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত "টেলস অব হফম্যান" অপেরায় সুর সৃষ্টির ভার দেওয়া হয়। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি প্রথম দিকে কয়েক বৎসর আগে শোনা একটি বিস্মৃতপ্রায় গানের মিষ্টি সুরকে ভিত্তি করে "টেলস অব হফম্যান" অপেরার আবহ সঙ্গীত রচনা করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বহু চেষ্টা করেও অফেনব্যাখ কিছুতেই সেই পুরোনো গানের পুরো সুরটি মনে আনতে পারলেন না। এমন কি, সুরকারের নামটি পর্য্যন্ত তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

এদিকে থিয়েটার কোম্পানী নতুন অপেরার জন্য ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগলেন। কাজেই বাধ্য হয়ে একদিন অফেনব্যাখকে হারানো সুরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হল ইউরোপের দেশে দেশে। বিখ্যাত সুরকার ও পুরনো সংগীত স্বরলিপি বিক্রেতাদের দোকানে ঘুরে ঘুরে তিনি খোঁজ করতে লাগলেন তাঁর ঈপ্সিত সুরটির। কিন্তু কেউ তাঁকে সন্ধান দিতে পারল না সেই হারানো সুরের। অবশেষে ভগ্নোৎসাহ হয়ে তিনি ইউরোপের সংগীত-নগরী ভিয়েনায় এসে উপস্থিত হলেন। এবারে ভাগ্যলক্ষ্মী যেন কিঞ্চিৎ করুণা বর্ষণ করলেন তাঁর উপর। ভিয়েনার এক পুরনো স্বরলিপি বিক্রেতা অফেনব্যাখ-এর কাছে হারানো সুরের কয়েকটা লাইন শুনে তাঁকে জানালেন এর রচয়িতা রুড্‌লফ্ জীমার। তবে তিনিও সুরকারের কোন সন্ধান দিতে পারলেন না। অফেন্‌ব্যাখ্ সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে যেন সামান্য আশার আলো দেখতে পেলেন। তাই আবার উৎসাহিত হয়ে তিনি নবীন উদ্যমে জীমারের খোঁজ করতে লাগলেন।

প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অফেন্‌ব্যাখ্ জীমারের সন্ধানে এসে উপস্থিত হলেন মার্কিণ মুলুকে। এখানে অনেক খুঁজেও তিনি জীমারের কোন হদিশ করতে পারলেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে আবার তাঁকে ফিরে যেতে হল প্যারী নগরীতে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন গভীর রাত্রে অফেন্‌ব্যাখ্ থিয়েটার ফ্রাঙ্কাইজ থেকে অনুষ্ঠান সেরে বাড়ী ফিরছেন। পথঘাট জনবিরল থাকায় তাঁর ব্রুহুম্‌ গাড়ীখানি যেন হাল্কা হাওয়ার ভর দিয়ে পাখীর মত উড়ে আসছিল। হঠাৎ রাস্তার মোড়ের মাথায় তাঁর গাড়ী ধাক্কা মারলো একজন পথচারীকে। ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে লোকটি একেবারে ছিটকে পড়লো পথের ধারে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থামিয়ে অফেন্‌ব্যাখ্ ছুটে গেলেন আহত লোকটির কাছে। তারপর কালবিলম্ব না করে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লোকটিকে গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে এলেন। বেচারী—কোন ভবঘুরে হবে বোধ হয়। আনমনা হয়ে পথ চলছিল। তাই এই বিপত্তি! মাথাভর্ত্তি একরাশ অযত্ন বর্দ্ধিত চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে শতছিন্ন পোষাক। যাই হোক, অফেনব্যাখের সেবা-যত্নের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে। রোজকার মত সেদিনও অফেনব্যাখ গভীর রাত্রে অনুষ্ঠান সেরে বাড়ী ফিরেছেন। ঘরে ঢুকতেই অবাক হয়ে তিনি শুনতে পেলেন তাঁর পিয়ানোয় কে যেন বাজাচ্ছে সেই বহু-আকাঙ্খিত সুরটি—যার সন্ধানে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি সহর দীর্ঘদিন ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন। আরো অবাক হলেন যখন তিনি দেখতে পেলেন যিনি পিয়ানো বাজাচ্ছেন তিনি আর কেউ নন, গাড়ীর ধাক্কায় আহত সেই ভদ্রলোকটি। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য—অপ্রত্যাশিত! এক অব্যক্ত পুলকে অফেন্‌ব্যাখ-এর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

উত্তেজিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ সুর আপনি কার কাছে শিখেছেন?

কারো কাছে নয়। এ সুর আমারই রচনা। আমার নাম রুড্‌লফ্ জীমার।

কী বললেন—আপনার নাম রুড্‌লফ্ জীমার?

আজ্ঞে হাঁ। মৃদু হাসি ফুটে উঠল বক্তার মুখে। কথাটি শেষ হতে না হতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে অফেনব্যাখ জড়িয়ে ধরলেন জীমারকে। ভগবানের অসীম করুণা, তাই আপনার দেখা পেয়েছি। আমি যে সুদীর্ঘ আট বৎসর ধরে ইউরোপ, আমেরিকার সহরে সহরে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অফেনব্যাখের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন জীমার। তার পর অনেক কথা হল দু'জনে। জীমার অফেনব্যাখের সব কথাই মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু প্রার্থিত সুরটির স্বরলিপি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না। বললেন—সুরটি অভিশপ্ত। আমি চাই না আমার মত আপনারও সুখের সংসারে আগুন লাগুক। কারণ ওই সুরটি রচনা করার পর থেকেই আমার স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুনাম, সামাজিক মর্য্যাদা সব কিছু নষ্ট হয়েছে। এমন কি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীকে পর্য্যন্ত আমি হারিয়েছি শুধু ওই সর্বনাশা সুরের অভিশাপে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

এবার অফেনব্যাখ বাধা দিয়ে বললেন—দেখুন ও-সব একেবারেই বাজে কথা। সুর কখনো অভিশপ্ত হতে পারে না। আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ওই জাতীয়

কোন ঘটনাবলী। অবশেষে অফেনব্যাখ্-এর পীড়াপীড়িতে জীমার কথা দিলেন স্বরলিপিটি সম্পূর্ণ করে দেবেন। বাড়ী ফিরে যাবার দিন বিদায় বেলায় তিনি অফেনব্যাখ্‌কে বলে গেলেন দিন দশ-বারো বাদে তাঁর বাড়ী থেকে স্বরলিপিটি আনতে। অফেনব্যাখও সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

কথামত দিন দশ-বারো বাদে একদিন সকালে প্যারীর কুখ্যাত মমার্ত্র অঞ্চলে জীমারের বাড়ীতে গেলেন অফেনব্যাখ। দরজার কড়া নাড়তেই এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ এসে দরজা খুলে দিলেন। অপ্রসন্ন মুখ। অফেনব্যাখের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন—গতকাল রাত্রে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে জীমার মারা গেছেন। জীমারের এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে অফেনব্যাখ যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে একটু প্রকৃতিস্থ হলে তিনি শেষবারের মত জীমারকে দেখার জন্ত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, জীমারের বিছানার উপর সেই অভিশপ্ত স্বরলিপিটা পড়ে আছে। তার এক কোণে ছোট্ট করে তাঁরই নাম লেখা—জ্যাকি'অফেনব্যাখের জন্ত। তার পর অফেনব্যাখ, স্বরলিপিটা হাতে করে সেদিন ছেলেমানুষের মতই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এলেন। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, তাঁরই খামখেয়ালীর জন্ত একটি অমূল্য প্রতিভার এই ভাবে অকালে জীবনাবসান হল। একথা আর কেউ না জানলেও তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, জীমারের স্বরলিপির মূল সুরটিকে ভিত্তি করে অফেনব্যাখ টেলস অব, হফম্যান অপেরার জন্ত যে অপূর্ব্ব সুরসমৃদ্ধ সঙ্গীতের সৃষ্টি করলেন তার নাম দেওয়া হল "বার্কারোল" (Barcarole)। কিন্তু আগেই বলেছি এই অপেরার অভাবনীয় মঞ্চসাফল্য তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর অফেনব্যাখের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে লিঁয়ো ভেলিবীর পরিচালনায় টেলস অব, হফম্যান অপেরা প্যারী নগরীতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্যারীর পর ভিয়েনায়। ভিয়েনার রিং থিয়েটারে প্রথম অনুষ্ঠান-রজনীতে বার্কারোল বাজাবার সময় হঠাৎ এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় দেড় হাজার নর-নারী প্রাণ হারান ও সেই সাথে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটিও ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনায় ভীত হয়ে পরবর্ত্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার আর কোন সুরকার বা বাদক বার্কারোল বাজাতে রাজী হননি।

এর পর বার্কারোল-এর অভিশাপে চীনদেশেরও বহু সুরকার প্রাণ হারিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশের মাঞ্চু রাজবংশে জুসাই * নামে এক সম্রাজ্ঞী ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি একবার কয়েকজন ইতালীয়ান ভাস্করের মুখে বার্কারোল শুনে এতই মুগ্ধ হন যে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন চীনা সুরকারদেরও এই সুর বাজাতে হবে। চীনা সুরকারেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও চৈনিক বাদ্যযন্ত্রে বার্কারোল বাজাতে পারলেন না। ফলে রাজরোষে পড়ে প্রতিদিনই দু'-চারজন করে সুরকার প্রাণ হারাতে লাগলেন। এই ভাবে চীনদেশের প্রায় আটশো সুরকার বার্কারোল বাজাতে না পেরে প্রাণ হারান।

কিছুদিন বাদে জুসাই-এর মৃত্যু হলে সান ইয়াৎ সেন-এর নেতৃত্বে চীনদেশে নব প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি নব প্রজাতন্ত্রে প্রথমেই আইন করে বার্কারোল বাজান নিষিদ্ধ করেন। ১১০৮ সালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। যতদূর জানা যায়, এখনো পর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার সুরকারদের মধ্যে অফেনব্যাখের বার্কারোল্ ভীতি পুরোমাত্রায় বজায় আছে এবং তারা কখনো মনের ভুলেও এই সুরটির নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন না।

* পার্ল বাকের 'ইম্পিরিয়াল ওম্যান' দ্রষ্টব্য।

নামের শক্তি

শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্য

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দারোয়ান এসেছে শরণাগতবৎসল ঠাকুরের কাছে। মহাবীরের চেহারাখানা যতই দর্শনীয় হোক, মুখখানা কিন্তু যেন কোন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেমন শুকিয়ে গেছে।

অনুমতি পেয়ে সে সবিনয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে আপনার বিপদ বৃত্তান্ত নিবেদন করল। দিগ্বিজয়ী এক মস্ত'বীর পালোয়ান এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারই আহ্বানে তাকে শীঘ্র এক শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষা যদি সম্ভ্রম-সম্পর্কিত হয় তবে সে বড় সংকট। মন্দিরের দারোয়ান তাই বিপদভঞ্জন করুণাঘন-মূর্ত্তি ঠাকুরের শরণ লওয়া ছাড়া আর গতি দেখিনে।

ঠাকুরের ব্যবস্থা—'খাওয়া কমতি করে দিবি। বেশী করে মহাবীরের নাম নিবি। দিবারাত্র নাম স্মরণ চাই।'

ও দিকে দিগ্বিজয়ী পালোয়ানের দিস্তা দিস্তা ডাল-রুটীর বরাদ্দ, দুবেলা কসরৎ আর মুগুর ভাঁজার বহর দেখে ত দেশের লোকের চক্ষুস্থির! এমনধারা পালোয়ানের সাথে দারোয়ানজীর লড়াইটা নিতান্ত ছেলেখেলা হবে, এইটাই তাদের সুস্পষ্ট অভিমত।

যথাসময়ে দুই পালোয়ান গুরুকে স্মরণ করে নামে মাটিতে নেমে পড়ল। এমন একখানি লড়াই দেখবার জন্ত লোক কম হয়নি। এ কথা বলা বাহুল্য। বিশেষ করে এই বিস্ময়কর দিগ্বিজয়ীর বীরত্বের খ্যাতি ইতিমধ্যে প্রসার লাভ করেছিল—স্থানীয় এলাকায় কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। দারোয়ানজীর প্রতি সকলেরই অনুকম্পাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল, ওরই সাথে কারো কারো কিছুটা স্বাভাবিক সহানুভূতির খাদ মেশানো—সে যেন আরো রোগা হয়ে গেছে, যদিও চেহারাটা আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোরালো হয়ে উঠল। দিগ্বিজয়ী বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার ধারণা ছিল আজকের লড়াইয়ের যশভাগটা করতলগত করেই সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। কিন্তু তার শান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীটির চিত্তের দার্ঢ্য নির্ভীক লড়াই প্রচেষ্টা সুরু থেকেই তাকে শঙ্কিত করে ফেলেছে। রুদ্ধশ্বাস দর্শকদের সম্মুখে দিগ্বিজয়ী দারোয়ানজীকে মাটিতে এক আছাড় দিয়েছে। কিন্তু নীচু হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করবার মুহূর্ত্তে সে এক ক্ষিপ্র কৌশল প্রচেষ্টায় দিগ্বিজয়ীকে ধরাশায়ী করে চোখের পলকে তার বুকে চেপে বসল। এক অপ্রত্যাশিত আনন্দাতিশয্য সকল দর্শককেই অভিভূত করল। অবসর সময়ে ধীর পদক্ষেপে বিজয়ী বীর এল ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুরের চরণ বন্দনায়, যেন তার যশভার যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চায়। ঠাকুর সস্নেহ দৃষ্টিপাতে তার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করলেন। কিন্নর-বিনিন্দিত কণ্ঠে সদানন্দময় পুরুষ শুধালেন—'কি রে, নামের কত শক্তি দেখলি?'

কৃতজ্ঞতাভরাচিত্ত কৃতাঞ্জলি বীর শ্রীপাদপদ্মাভিমুখে অবনত হল।
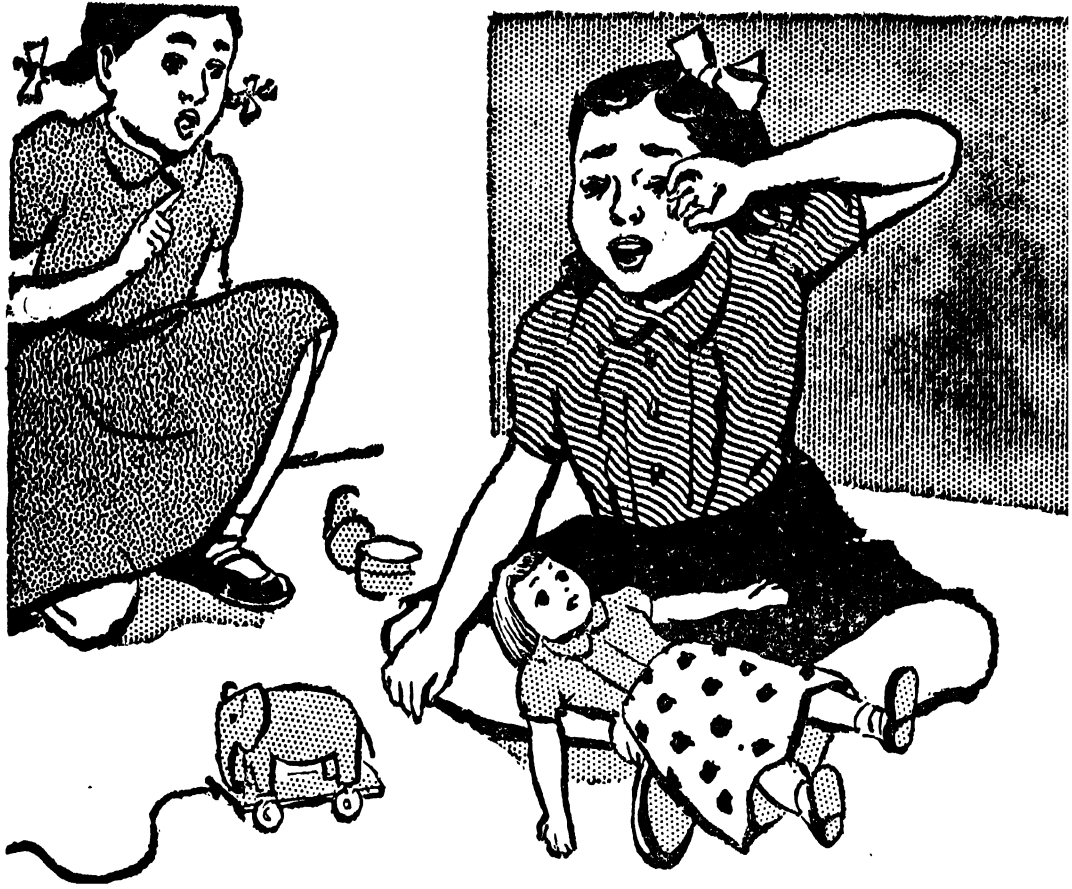
ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিমু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি-যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিমু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিমুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিমু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা নিন্টুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিন্টুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম

"ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারণ আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দ্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

S. 2588-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।
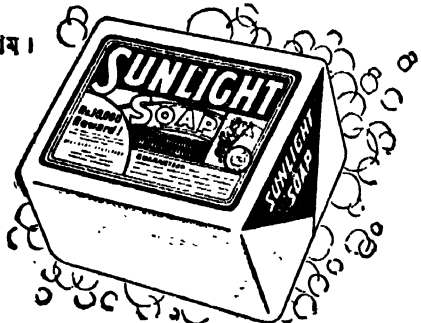
না-জানা-কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বেতাল

আমাদের কায়দা

যুদ্ধের জন্য বাঙলা থেকে ঝেঁটিয়ে লোক নেওয়া হয়েছে ১৯৪৩ সালে। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব থেকেও এসেছে। কিন্তু বাঙলা থেকে যে ভাবে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, অন্যদেশে তার তুলনা মেলে না।

মধ্যবিত্তের এক সংসার। পোষ্য আছে। অথচ জমিও নেই, চাকুরীও নেই। কাজও মেলে না কিছু। সংসার চালানো ভার। ত্রিশ টাকার বিনিময়ে তখন এম-এস-সি মেলে প্রচুর।

সেদিন হাঁড়ি উনুনে চড়বে, কিন্তু হাঁড়িতে কিছু চড়বে না, জল ছাড়া। কোনো উপায় নেই। কর্তার এক পুত্র মাঠ থেকে গরু ধরে খোঁয়াড়ে দিয়ে এলেন। কিছু রোজগার হোল। চাল এলো শুধু। সেদিন বেশী পয়সা দরকার, কয়েকটা গরু মাঠ থেকে দড়ি খুলে দাও। ওরা খুঁটার সাথে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। ঐ খুঁটা কেন্দ্র করে চার পাশে ঘোরে, ঘাস খায়। গরু ক'টা তাড়িয়ে দূরের কোনো হাটে নিলেই পয়সা আসবে ঢের। কি আর করা যাবে। এমনি করে যাহোক দিন গুজরান চলেছে। এলো ওয়ার। ওয়ার বেঁচে থাকুক। সর্বনাশা সে ওয়ার ঢুকলো বাঙলা দেশে। কানা-খোঁড়া সবই গিয়ে ভর্তি হোল তাতে।

কর্তার দ্বিতীয় পুত্র একটু বিকৃতাঙ্গ নিয়ে জন্মেছেন। খোঁড়া। কানা-খোঁড়া এক গুণ বাড়া। ভর্তি হয়েছেন লড়াইয়ে। বর্মা ফ্রন্টে তখন জাপানীদের বম্বিং চলেছে পুরো মাত্রায়। জঙ্গলে ইউনিট পড়ে রয়েছে। মাসের শেষ দিন। পরদিন পে-ডে। হাজার লোকের মাইনে হবে। প্রায় ৮০ হাজার টাকার মত। এসে জমা হয়েছে কোয়ার্টার গার্ডে। জঙ্গলের লড়াইয়ে লোহার সিন্দুক থাকে না। ভারী বাক্স। টাকা থাকে রাইফেলের কার্তুজের খালি বাক্সে, নয়তো কাঠের বাক্সে। জমা থাকে গার্ডের কাছে, যেখানে সমস্ত আর্মস্‌ও থাকে। এক দিন দুদিনের মামলা। বিলি হয়ে যাবে টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে। অবশিষ্ট যা থাকবে, ফেরত যাবে।

জঙ্গলের যুদ্ধ। গুলী, বারুদ, বন্দুক, পিস্তল, ষ্টেনগান আর কার্টিজ প্রচুর। চারদিকে ছড়ানো। হিসেবের তিন গুণ বেশী। পাখী, বাঘ, ভালুক যা খুশী শিকার করো। তার পর ছুঁড়ে ফেলে দাও রাইফেল জঙ্গলে। কে পরিষ্কার করে। আছে অপর্যাপ্ত। অবশ্য অর্ডার পুঁতে ফেলার বা নষ্ট করে দেওয়ার। তাতে পরিশ্রম হয়। এখনও পড়ে আছে বর্মার জঙ্গলে প্রচুর। টাকাটা থাকে তালাবন্ধ হাল্কা বাক্সে। গার্ডরুমে। গার্ডরুম মানে, টেন্ট বা তালপাতার কুঁড়ে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠেছে। জাপানী বম্বার। রাইফেলটা হাতে নিয়ে সবাই করেচে পাকড়ো। ওর তখন গার্ডে ডিউটি। ও গেল সবার শেষে, ধীরে-সুস্থে। সম্ভবত ক্যাশবাক্সটি গচ্ছিত নিয়ে সবার অলক্ষ্যে। বোমার সমান জায়গায় পুকুর জমে, আর পুকুর থাকলে তা ভরাট হয়। বোমা পড়লো গোটা-কয়েক। সব তছনছ হয়ে গেল। ক[...] বাঁচলো, কত মরলো। ঘণ্টা দুই বাদে আবার সাইরেন। এব[...] ক্লিয়ারেন্স। সবাই ফিরে আসছে। কে বাঁচলো, কে মরলো, জ[...] হোলো, তারই হিসাব চলেছে। ও তখনো ফেরেনি। সম্ভব মরেছে, অথবা আহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে অনে[...] রাতে নিখুঁত অবস্থায়। ক্যাশ সামলাচ্ছিল।

পরদিন খোঁজ পড়ল টাকার বাক্সর। মাইনে দিতে গিয়ে টাকার বাক্স নেই। শান্ত্রীরা পাহারা দিয়েছে। সুতরাং ওরা অর্থ[...] শান্ত্রীরা কেউ কিছু জানে না। সে টাকার কোনও পাত্তা পাও[...] গেল না। ও-সি দেখলেন অনেক ঝঞ্ঝাট। ফ্রন্ট-লাইনে যত ব[...] অফিসার, কড়া হলে হাতের তেলোয় প্রাণ। রাতে-বেরাতে প্রাণ সবার হাতে। তার হদিশ পাওয়া যায় না পরে। কার[...] সবার হাতেই অস্ত্র নানা রকমের। সুতরাং রিপোর্ট গে[...] বোমায় ঐসব টাকা জলে-পুড়ে গেছে। আরও টাকা দরকা[...] সৈন্যদের মাইনে। কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা বুদ্ধিমানে[...] কাজ। আবার টাকা এসেছে। তাই ভাগ করে দেওয়া হয়ে[...] সবাইকে।

মাসখানেক পরে। ঐ সিপাহীর ছুটী হয়েছে—লংলিভ [...] মাস। পুরো টাকাটা মাটী খুঁড়ে বাড়ী এনেছে। এখন অভ[...] নেই। ইটের দাম টাকা-টাকা। বাড়ী করে ফিরে গেল চিটাগ[...] ওখানে হাজিরা দিয়ে হারিয়ে গেল জনারণ্যে, এক বোমা পড়[...] রাতে। পাত্তা পাওয়া গেল না। ক্যাজুয়ালটী হলে তার রিপে[...] যায় না। যায় দু-তিন বছর বাদে, লড়াই শেষে। বাড়ীতে টা[...] allot করা থাকলে, তা ঠিক যায় মাসের পর মাস। তারপর ন[...] লেখানো এয়ার ফোর্সে। অবশ্য নাম-ঠিকানা পালটে। সেখানে allotment করে সুযোগ বুঝে পালায়। ভর্তি হয় গিয়ে অন্য[...] সেখানেই আছে, অথবা আবারও ভর্তি হয়েছে allotment ক[...] সে সংবাদ জানা নেই।

জাপানী ফ্রন্টে কি ভাবে টাকা আর লোক ফর্দাও করে ঢা[...] হয়েছে, এ তার নমুনা। মালপত্র? আমরা তখন বায়নাগে[...] রেষ্ট ক্যাম্পে। একটা বড় ষ্টুডিয়ো ছিল ওটা। ওর পিছ[...] ডোবার জলে এখনো দেখতে পাবেন হয়ত হাজার বস্তা চাউল ও[...] আটা পচে সার হয়ে আছে। সারপ্রাইজ ষ্টোর চেকিংয়ের স[...] ওগুলো পিছনের দরজা দিয়ে ওখানে গিয়ে জমত। আর সিভি[...] লোক ফ্যানের অভাবে মরেছে। পাচার করার মতলবেই সারপ্লাস ষ্টক টানা হোত। সাপ্লাই থেকে আসবার পথে [...] রাস্তাতেই অনেক সময় বিক্রী হয়ে যেত।

ঐ পুকুরে আজও পাবেন রিভলভার আর রাইফেল। জাপা[...] লড়াইয়ে বৃটিশের ইজ্জতের কাপড়ে ধরে টান পড়েছিল সেইদি[...] আবার কি তা আসবে ফিরে?

জাপানী স্নাইপার

আয়তন আর লোকসংখ্যার তুলনায় জাপান পৃথিবীর ক্ষুদ্র[...] শক্তি। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ শক্তিজোটের বিরুদ্ধে [...] ওদের এই লড়াই। ওরা পা দিয়েছিল বৃটিশের লেজে। স[...] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর ওরা দিয়েছিল আমাদের সিংদরজায়—ভারতের পূর্বসীমান্তে।

জাপানের শক্তির উৎস কোথায়? দ্বারে পৌঁছে উঁকি মেরে ওরা ঝুঁকি নিয়ে ফিরে গেলই বা কেন?

তীর আর ধনুক, বর্শা আর তরবারি। আগেকার যুদ্ধের ধারা। সে বহু আগেকার কথা। পুরাকালের স্মৃতি-বিস্মৃতির যুগে। প্রস্তরের পরের যুগে। তার পরে, বহু পরে কালের ফেরে এসেছে রক্তখাদী আগ্নেয়াস্ত্র। গুলী বারুদ, কামান, বন্দুক আর টোটার ঘটা। অটোমেটিক সিষ্টেমে গুলী ছুটবে তোড়ে। পৃথ্বিরাজের সময়ে প্রথম আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ঘটেছে ভারতে মুসলমানের হাতে। আর আজকাল ট্যাঙ্ক, ফাইটার, বম্বার, এ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফ্‌ট বা এ্যাক্‌এ্যাক্‌, ভারী কামান, মটার, ডেষ্ট্রয়ার, সাবমেরিন, টর্পেডো ইত্যাদি বহু রকম মারণাস্ত্রের প্রয়োগ, প্রয়োজন আর উদ্বোধন ঘটেছে। সম্প্রতি এসেছে এটম্‌ বম্ব আর হাইড্রোজেন বম্ব! ইণ্টার কণ্টিনেণ্টাল ব্যালিষ্টিক মিসাইল, সংক্ষেপে আই-সি-বি-এম। জাপানী যুদ্ধে এ সব তৈরী বা প্রয়োগের অবসর কোথায়? অত লোকজনই বা কোথায়? বর্মায় আমরা চালিয়েছি মেশিন গানে জলের ধারায় গুলী। তার জবাবে ওরা কি দিয়েছে জানেন? তীক্ষ্ণ ফলার ছোট ছুরি। গুলীর অপোজিটে ছুরির যুদ্ধ—লড়াইয়ের সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্ত্তন। পূর্ব্বের ধারা, আর তাৎপর্যপূর্ণ। ওরা জিতেছেও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। খুব ছোট ছুরি, এমন কি বেয়নেটের মতও নয়। তবু প্রাণবন্ত। কারণ ওতেই সাবাড় হয়েছে বৃটিশ আর আমেরিকার বড় বড় ডিভিশান এবং ডিভিশানের পর ডিভিশান। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সমেত। এক ডিভিশানে যার সৈন্য থাকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বা তারও বেশী।

গুলীর যুদ্ধ। জাপানী যুদ্ধশাস্ত্রে ওটা তৃতীয় শ্রেণীর। মানে, থার্ড ক্লাশ। গুলী করে নরহত্যা? রামঃ। সে যে কোন বর্ব্বর করতে পারে। বর্ব্বর যুগের পুরোনো কায়দায় ওস্তাদী কোথায়? যে মানুষের হাতে রয়েছে দূরপাল্লার রাইফেল আর মেশিনগান, ষ্টেনগান আর রিভলভার। বরং ছুরি দিয়ে সেই মানুষ মারতে পারায় বাহাদুরি আছে। আর একখানা মাত্র ছুরি দিয়ে অনেক বেশী মানুষ মারাতেই আসল ওস্তাদীর পরিচয়। সেখানে একটি গুলীতে মরবে মাত্র একজন। কিন্তু সতর্ক হবে অনেক বেশী। আশে-পাশে বহুদূর ওর শব্দ থাকে ছড়িয়ে। সবাই দেখে যাবে সে ঢাক পিটানোর সংবাদ—শত্রু এসেছে সন্নিকটে। আর ছুরির লড়াই অতর্কিতে। রাতের আঁধারে। পাশের লোকই টের পাচ্ছে না, কে মরছে। ঘুমন্ত অবস্থায় গলার নলীতে ছুরি টেনে যাওয়া, আরামও আছে। উভয় পক্ষেরই। হাতের সুখ তো আছেই। যারা মরে, আরামে মরে। ওরা মরতেই তো জঙ্গলে এসেছে। ঘুমন্ত চার পাঁচ শত লোক রাতারাতি সাবাড় হয়ে যেতে পারে একখানা মাত্র ছুরির কায়দায়। স্নাইপারের ছুরি চলেছে অক্লান্ত ভাবে। পাশের বন্ধু অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। টেরই পেলেন না, পাশের বন্ধুর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে অতি নাটকীয়ভাবে। এমন কি, পরমুহূর্তে নিজের মৃত্যুও টের পেলেন না শেষ পর্যন্ত! শ্বেত অফিসাররা খুব চালাক। ওরা থাকে ঠিক মাঝখানে—সবার কেন্দ্রস্থলে। যা ঘটবে, পাশ দিয়েই
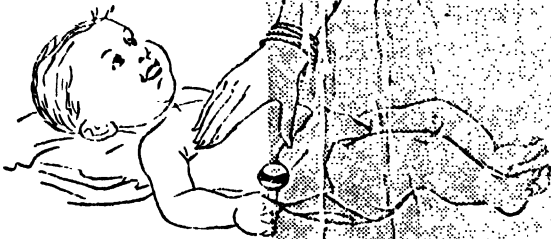
ঘটে যাক। মাঝখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঠিক বেঁচে যাওয়া যাবে। কিন্তু সকাল বেলায় দেখা গেল, শ্বেত কৃষ্ণ সবারই এক গতি করে রেখেছে স্নাইপার। এই তো যুদ্ধ! খাঁটি বৈষ্ণবী যুদ্ধ আর পূর্বের ধারা।

মনে করা যাক, খবর এসেছে—পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ এই ফ্রণ্টে। মানে, জঙ্গলের কয়েক শ' মাইল যায়গা জুড়ে যুদ্ধের কভার-আপ্। বৃটিশ, আমেরিকান আর ভারতীয় সেনা বার্মার জঙ্গলে। এবার টেণ্ডার ডাকা হবে। কে কত কম সৈন্য, যন্ত্রপাতি লটবহর নিয়ে এই বিরাট সৈন্যকে রুখ্‌তে যাবে। ওদের ছোট দেশ, কম সাপ্লাই আর লোকও গোণাগুণতি। তুলনায় মিত্রপক্ষ ঘিরেছে চারদিক থেকে। অগুণতি সৈন্যসংখ্যা আর তেমনি সাপ্লাই। টেণ্ডার পড়েছে—কেউ পাঁচ শ', কেউ হাজার বা কেউ দু-হাজার নিয়ে ওই পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য রুখবে। ডাক পড়লো টেণ্ডারদাতাদের। ওদের শুনানী হোক ধৈর্য ধরে জেনারেলদের কাছে। কার যুদ্ধের কায়দা-কানুন কি রকম। তারই বর্ণনা, আর প্ল্যান। বিবেচনা করে একজনের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ভার। সে হয়তো নগণ্য একজন সেপাই। ওদের লড়াই থেকে বেঁচে ফিরে এলে প্রমোশন পেয়ে যাবে। মাত্র হাজার বীর সঙ্গে নিয়েছেন সেপাইজী। বেশিও কমে পড়ে পঞ্চাশে মাত্র এক। পঞ্চাশ হাজারের সুশিক্ষিত আর কামান বন্দুকের যন্ত্রপাতির ডিভিশানের সাথে লড়তে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ঐ ছুরি, গোটা কয়েক রাইফেল, হাতবোমা আর ডিনামাইট। রসদের জন্যে পিছনে আটা বা চালের গাড়ী নেই। ভাত জলে ফুটিয়ে শুকিয়ে থলে করে রাখা আছে। খাবার সময় ঐটা নদীর জলে ভেজালে আবার ভাতে পরিণত হবে। বরাবর ওঁরা জিতেছেনও ঐভাবে লড়াই করে। যারা কামান, বন্দুক, গাড়ী ঘোড়া রসদ বোঝাই, আর ওয়ারলেস্, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, রেঞ্জ ফাইণ্ডার আরও মালামাল নিয়ে এলো লড়তে, তারা জাপানী ছোট ছুরির কাছে জান কোরবান্ দিয়ে মহান্ এশিয়ার মান বাঁচিয়েছে। অনেকের কাছেই মনে হবে হয়তো ছোট কলকেয় বড় তামাকের গল্প। কিন্তু এ নির্ভেজাল খাঁটী সত্য।

এখন চলে কলামের যুদ্ধ। পেন বা কালির কলম নয়, ফিফ্‌থ কলাম—পঞ্চম বাহিনী। আমাদের ভাষায় লাইন। তবে পাত্ত পাত্তার লাইন নিশ্চয়ই নয়। জাপানী ফিফথ কলাম আসলে ইনটেলিজেন্ট। ওরা নারীবাহিনী। হাঁড়ির খবর নাড়ী চিরে বের করে। আর পেছনের লাইনগুলো সবই স্নাইপার। মানে গুপ্তচর আর গুপ্তঘাতকের সমবায়। পর পর অনেক। এদের যুদ্ধের ধারাও রীতিমত অদ্ভুত! আর নূতন।

সেই হাজার সৈন্যের কিছু এসেছে সামনে—ফার্ষ্ট লাইন বা ফ্রণ্ট লাইন। ওরা ফ্রণ্ট বরাবর মাটীতে গর্ত কেটে তলা দিয়ে বসিয়ে যাচ্ছে ডিনামাইট। ছোট গর্ত। কিন্তু মাটীতে কোনো চিহ্ন নেই। একটু গুঁড়ো বা ধুলো বা দাগ কিছুই নয়। এমন কি একটা ঘাসের পাতা কাটার চিহ্ন খুঁজলেও আপনি পাবেন না কোথাও। অর্থাৎ জঙ্গলে লোকের পদার্পণ ঘটেছে কস্মিনকালে, বা কারুকার্য্য করা রয়েছে আপনার পায়ের তলায়, সে সন্দেহের অবকাশ ওরা দেবে না। তার আগেই প্লে জমজমাট ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে খতম হবে। ডিনামাইট বরাবর কোথাও কাল সূক্ষ্ম তার ঘাসের ভিতর চলে গিয়েছে। ঐ তারে পায়ের চাপে বা ভারী গাড়ীর চাকার চাপে ডিনামাইট ফাটবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতী ঘোড়া, লোক লস্কর, মোটর গাড়ী, কামান বা ট্যাঙ্ক সবাই মিলে শূন্যে উঠবেন মাটী ছেড়ে। আর পরক্ষণে ধূলোয় পড়ে ধূলোর সাথে মিশে যাবেন গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে। প্রথমে লঘিমা পরে অণিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য ইত্যাদি ঐশ্বর্য প্রাপ্তি।

ওরই কয়েক মাইল পরে ছড়ানো রয়েছে জাপানী লড়াইয়ের দ্বিতীয় লাইন। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। পূরো মিত্র-সৈন্য চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, সামনের দিকে লক্ষ্য রেখে। পায়ের তলায়ও নজর দিতে হচ্ছে মাঝে মাঝে ডিনামাইটের ভয়ে। আর সামনে নজর শত্রুর জন্য। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দূরে একটা গাছের ডাল নড়ে উঠছে সামনের দিকে। দিন দুপুরে গাছের ডালে ভূত নাকি? কিন্তু মিলিটারীর ভূতে বিশ্বাস নেই। 'শুয়ে পড়ো সব। জমি নিয়ে।' কেউ বললে—'জাপানী হতে পারে।' অতএব চালাও গুলী। ঠাঠ—ঠাট—ঠ—ঠ—ঠ—গুলী চলেছে মেসিন গানের সেই গাছকে লক্ষ্য করে। বেশ কয়েক ঝাঁকে। তারপর চুপচাপ কেটে গেল দুই-এক ঘণ্টা। আর কিছুই নড়ছে না। জাপানীরা মরেছে মনে করে সবাই উঠেছি ধূলো ঝেড়ে। 'ওঠো সব, চলো।' আবার চলতে সুরু করেছি। কয়েক পা যেতে না যেতেই, ও মা, ওটা আবার কি? আর একটা গাছও নড়ছে যে! জাপানী? সুতরাং শুয়ে পড়তে হোল। শত্রুর দেখা পেলেই শুতে হবে, সেই রকমই শিক্ষা আমাদের! কারণ গুলীটা তখন বুকের ভিতর দিয়ে রাস্তা না করে মাথার উপর দিয়ে রাস্তা বানাবে। সবাই শুয়ে শুয়ে মেশিন গানের গুলী চালাচ্ছি মনের আনন্দে। গাছের ডাল-পাতা সমেত কেটে কেটে পড়ছে, দেখতে পাচ্ছি। দেখে আর গুলী চালিয়ে সুখও আছে। বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন খালি করা গেল; এর পর জাপানীরা নিশ্চয় মরেছে। মরা উচিতও। সুতরাং এবার উঠে চলা সুরু হোল। কিছুদূর যেতে আবার তাই। এবার অন্য একটা গাছ। ওরা সব গাছে থাকতেই ভালবাসে? আচ্ছা মজাতো? আবার শুয়ে পড়ো এবং চলুক মেশিনগান। কয়েকটা ম্যাগাজিন খালি করে ভাবছি। জমিতে কারো দেখা নেই। মাথার উপর আকাশ! সেখানে ওদের প্লেন নেই। অথচ ওরা শুধু গাছেই বসে থাকে কেন?

এই ভাবে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিনের শ্রাদ্ধ করতে করতে আমরা অগ্রসর হচ্ছি মনের আনন্দে। গুলীও খতম। জাপানীরা মরে নি? মরেছে নিশ্চয়! আমাদের হাজার হাজার গুলী খরচা করেও ওদের মৃত্যু হবে না? ওরা কি অমর? অথবা অশরীরী? ভাবতে ভাবতে চলেছি। হঠাৎ একটা আওয়াজ এলো উপর হতে। গাছের উপর স্বয়ং মহাপ্রভু বসে আছেন। এবং একজন মাত্র। আমাদের বৃটিশ অফিসারটিকে উনি ততক্ষণ সাবাড় করেছেন তাঁর রাইফেলের গুলীতে। আমাদের ওপর ওঁর দয়া হোল কেন? এতক্ষণে বহু লোক এই গাছের তলা দিয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলেনি। সব ভারতীয় সৈন্য। ওদের জীবনের মূল্য কতটুকু? সে কথা না বলাই ভাল। নিজের জীবন দিয়ে কচুবন সাফ! সাদা রঙের অফিসার চাই। কাঁধে অন্তত তিনটে ষ্টার। অর্থাৎ

ক্যাপ্টেন। ওদের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। লড়াইয়ের কী পয়েন্টগুলো আর সঙ্কেত সমস্ত ওর হাতে। ওকে মারতে পারলে ভারতীয় সৈন্য অসহায় ও ছত্রাকার হয়ে পড়বে। ওর হাল্কা রাইফেলটা ও তুলে নিয়েছে। সাদা চামড়ার বক্ষস্থলের ভিতরকার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে একটা মাত্র আওয়াজ—ক্লিক্! অব্যর্থ ওদের হাতের টিপ। গোরা ধরা নিয়েছে পাকাপাকি ভাবে। এবার বুনো শিয়ালের মহোৎসব! জঙ্গলের শব সৎকার!

সদ্য তরুণ ক্যাপ্টেন। বেচারার জন্যে আজও আমার দুঃখ হয়। বিয়ে করেই চলে আসতে হয়েছে লড়াইয়ে। শিক্ষার পরই ছেড়ে দিয়েছে একেবারে বর্মার জঙ্গলে। একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তার মুখ দেখাও ভাগ্যে ঘটলো না। এক নম্বর ইণ্ডিয়ান হেটার। এবং তার ফলেই জলদী প্রমোশন। ছাদের তলার মৃতদেহ শয়ান। তারই ওপর গাছের মগডালে বসে আছেন মহাপ্রভু। আমরাও তো অনেক আগে ঐ গাছের তলা দিয়ে এসেছি। কিছুই দেখতে পাইনি। বুঝতেও পারিনি কিছুই। আমাদের জীবনকে ও ক্ষমা করছে। ক্ষমাসুন্দর জীবন! আমাদের জীবনের চাইতে ঐ সাদা জীবনের মূল্য অনেক বেশী। তা ওরাও বোঝে। তাই হেরফের। ততক্ষণে আমাদের 'উপরওয়ালাকে' সাবাড় করে গাছ থেকে নামানো হয়েছে। গাছের ডালে আষ্টেপৃষ্ঠে গাঁটছড়া বাঁধা। নিজে বেঁধে রেখেছে নিজেকে। দরকার মত চার হাত-পা'ই ব্যবহার করতে পারবে—অর্জুনের মতো। সারা গায়ে ওভার অল—ক্রোটন পাতার রঙের আলখাল্লা। আর মাথায় একটা ছোট টুপী! মুখেও রঙ্।

দড়ি কেটে ওকে গাছ থেকে নামানোর বেলায় দেখা গেছে গাছে গাছে গাছকয়েক সরু তার। গোছা করে দুই হাতের কাছে বাঁধা। তারের অন্য প্রান্ত সোজা চলে গিয়েছে যথাক্রমে ডানদিকের ও বামদিকের কয়েকটা গাছে। সেখানেও মগডালে বাঁধা। শত্রুর দিকে। আমরা যে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিন মেশিনগানের গুলীর শ্রাদ্ধ করে এসেছি, সে এই তার ধরে টান দেওয়ার ফলে। আসলে এই একটি মাত্র লোক প্লে করেছে চমৎকার ভাবে অনেকের ভূমিকায়। অনেকখানি যায়গা ও সময় জুড়ে।

কালো চামড়ার দাম ওরা দিয়েছে অনেক কম। সাদা চামড়ার দাম আছে, অন্তত ওদের কাছে। কিন্তু তাঁরা আসেন সবার শেষে এবং কালোর সাথে মিশে। সে পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হতো। অনেকে সাদা মুখে কালিও মেখেছে জাপানীর হাতে তার শ্বেত পরিচয় ঢাকতে। ওদের নামের ক্যাপ্টেন মেজর পরিচয়ও মুছে দেওয়া হয়েছে জঙ্গলে, বাক্স পেটরা থেকে। জাপানীদের নজর এড়ানোর জন্যে। সাদাকে গুলী করার পরই ওরা আত্মহত্যা করে ধরা পড়ার ভয়ে। যুদ্ধের সময় জাপানী ধরা পড়েছে খুবই কম, শেষের দিকে ছাড়া।

দলের কমাণ্ডার থাকেন সবার পিছনে। তাঁর হাতেই লাইন্স অব কমুনিকেশানের (L of C) সমস্ত ভার, খবরাখবর ও যোগাযোগের ব্যবস্থা। কোথায় এবং কে শত্রু এবং কে মিত্র। কোথায় কি ভাবে খাদ্য, পানীয়, অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য আর পেট্রোল ইত্যাদি মিলবে। কোথায় এয়ার ফোর্স, কোথায় নেভী, কার কি সংকেত। তারই ম্যাপ আর সাংকেতিক ভাষা। কিন্তু তা ডিকোড করবে কে? খাদ্য, জল, বিশ্রাম ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে এরা তখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। সব জলও ত আর খাওয়া যায় না। শত্রুর বিষ অথবা বিষাক্ত জীবাণু মিশ্রিত থাকতে পারে। অবশ্য প্রাণ নিয়ে এ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে এর পর তৃতীয় লাইনও পার হতে হবে।

মিত্রসৈন্য রিক্রুট হয়েছে কোটি কোটি। ওর শেষ নেই। বাঘে খেয়েও ফুরতে পারে না, তো জাপানীরা। চারিদিক দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলেছে। কয়েক দিন কেটেছে জঙ্গলে। অবশ্য যদি মিত্রপক্ষের গুলীতে না পড়েন দূর থেকে ভুল করে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই চলেছে জঙ্গলের বুক চিরে। অলস মধ্যাহ্নে সবই নীরব, নিস্তব্ধ। নির্জন, নির্বান্ধব। কোথাও কিছু নেই। সবাই চলেছে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ সামনে থেকে নেমে এসেছে চার পাঁচটা ভূত। ভূত, না যমদূত? উড়ে এলো? ধরেছেও চকচকে বেয়নেটখানা ঠিক আপনার নাকের ডগায় বজ্রকঠোর দৃষ্টিতে। নির্জন স্থানে হঠাৎ ভূত দেখলে আপনার ভয় হয়? ওরা পালালো থতমত খেয়ে। সোজা পিছনে মুখ করে দৌড়। কারণ, শাস্ত্রেই বলেছে যঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু যাবে কোথায়? সবাই উপুড় হয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে ওখানে। ঐ দেখুন। তাজ্জব ব্যাপার! সবই কি ভৌতিক? দৌড়তে গিয়ে ওরা সব মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কেন? আবার কি হোল? দেখা গেল, কতকগুলো সূঁচ মুখ ধারালো স্টিলের ফলা মাটিতে পোঁতা রয়েছে কাত করে। লম্বা ঘাসের ভিতরে বলে দেখা যায় না। এদিকে আসতে গেলে পায়ে লাগে না। কিন্তু পেছন ফিরে দৌড়তে গেলে সোজা বিঁধে যাবে হাঁটুর নীচে। সামনে ভূত দেখে ওরা পালাতে বাধ্য হয়েছে পিছনে। তাই এই অবস্থা। অবশ্য হঠাৎ ভূত দেখতে পেলে সাহস বুদ্ধি কিছুই থাকে না। কারো নয়। সে জাপানীরাও জানে।

যাই হোক, সংখ্যার জোরে ওদের শেষ পর্যন্ত সাবাড় করে দেওয়া হোল। কিন্তু সেই ভূতেরা উড়ে এলো কোথা হতে? গাছ থেকে পড়লো? ওরা গাছই ভালবাসে। আরও সামনে যেতে দেখা গেল একটা উইয়ের ঢিবি। তা মানুষ-সমান উঁচু। একটা ছোট গাছ উঠেছে তার ভিতর দিয়ে ডালপালা মেলে। ঢিবিটার একেবারে কাছে গিয়ে দেখুন একবার ভাল করে। উইয়ের ঢিবিই বটে। বর্ষার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে ঢিবিটা বেশ পুরোনো মনে হচ্ছে আপনার। তা হবেই। আপনি ঠকেছেন। ওটা উইয়ের ঢিবিই নয়। জাপানী স্নাইপারের হাতে তৈরী কৃত্রিম কারুকার্য। আর ওর ভিতরটা একেবারে ফাঁপা। কয়েক জন স্নাইপার ওতে আত্মগোপন করে থাকে। এক পাশে ছোট গোল একটা ফোকর দরজা। তার ওপরে কাদামাখানো চটের টুকরো ঝোলানো। কাদার প্রলেপে ঢিবির উপরকার সিমিলি বজায় থাকে। সেই কাদামাখা চটের ওপর একখানা ছোট তাজা ডালও টেনে এনে বাঁধা, সেই ছোট গাছটায়। যাতে কোনরকমে কৃত্রিম বলে সন্দেহ না আসতে পারে কারো মনে। ছোট ছোট ফুটো দিয়ে ওরা দেখে মিত্রসৈন্যের গতিবিধি। তারপর সময় বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতর্কিতে। বিশেষ করে রাত্রিকালে।

নির্জন বনে হঠাৎ যমদূতাকৃতি ভূত দেখাতে পিছন ফিরে পলায়ন খুবই স্বাভাবিক। এবং তার পরই মুখ থবড়ে পতন। তাছাড়া ও অবস্থায় আর কি করণীয় থাকতে পারে? বাকীটা বলার প্রয়োজন

থাকে না। ওদের কোমরে থাকে সেই চকচকে ধারালো ফলার ছুরিখানা। প্রত্যেকে তখন চীৎকার জুড়েছে পড়ে গিয়ে সাহায্যের আশায়। সাহায্য দিলো স্নাইপার। সেই ছুরিখানা দিয়ে প্রত্যেকের গলার নলীতে। একটা করে পোঁচ। তারপর সম্মুখ সমরে পতনের ফলাফল—অক্ষয় স্বর্গবাস। দেহটা অবশ্য টেনে নিয়ে হেঁচড়া-হেঁচড়ি করবে শেয়ালে আর বুনো জানোয়ারে। তা হোক। ওটুকু দুঃখ সইতেই হবে। তাছাড়া আর উপায় কি?

বেঁচে থাকলে বাপের নাম বজায় থাকবে, কিছুটা ভরসা করা চলে। কিন্তু বেঁচে থাকলে এখানে সে ভরসাও কম। ওরা বাপের নামও ভুলিয়ে ছাড়ে। কারণ এখনও কয়েকটি লাইন পার হতে বাকী। এবার চতুর্থ লাইন পার হতে হবে। বেঁচে থাকা বাকী সৈন্যরা এগিয়ে গেলো এবং এক যায়গায় জড়ো হয়েছে। ওরা খাদ কেটে তার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ উপর দিয়ে গুলী আর বোমার টুকরোরা যত খুশী যাতায়াত করুক। কিছু বলার দরকার নেই। রাত্রে তিনজন সেন্ট্রি পালা করে পাহারা দিচ্ছে। যাতে কেউ না আসে ওদের ওই ঘুমের সময়। আর একজন বেশী থাকে, সে স্বয়ং গার্ড কমাণ্ডার। বন্দুকের মাথায় বেয়নেট চড়িয়ে এককোমর বা বুকসমান খাদের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকে বাইরের দিকে। দুই ঘণ্টা পর আর একজনকে তুলে দেওয়া হয়। সে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে থাকবে। অমনি করে সমস্ত রাত। কিন্তু বর্মার জঙ্গলে, রাত একটা থেকে সাড়ে তিনটা সৈনিকের পক্ষে কালরাত্রি। জঙ্গল আর ঘন অন্ধকার। লোকজন নেই। নিঝুম। রাত্রি যেন কানে কানে কথা কয়। বাইরের দিকে একা একা দাঁড়িয়ে জেগে রয়েছে শুধু সেন্ট্রি। নির্জন যমপুরীর পাহারা যেন। ঐ সময়ে ভূত আর দুই একটা বুনো জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। যে কোন শাস্ত্রীর পক্ষে ঐ সময়টাই মারাত্মক। এক মারাত্মক ঘুমের নেশায় পেয়ে বসে। ঝিমোন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পক্ষে একান্ত, এবং অনিবার্য। জাপানীরাও তা জানে।

আশা করি, আশ-পাশ দিয়ে একটি শেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাবেন। শাস্ত্রী দুই একবার তাড়া দিয়েছে। একটা আধটা ঢিলও ছুঁড়েছে। ওটা পালিয়ে গেছে। খানিক বাদেই আবার দেখা দিয়েছে। এবং আশে-পাশে পাঁয়তারা কষছে। এ এক আচ্ছা উৎপাত! শত্রু নয় যে, গুলী করবে। গুলীর শব্দে পুরো ঘুমন্ত লোক জেগে উঠবে। নিকটে শত্রু থাকলে দশ পনের মাইলের ভিতর তারাও জেগে যাবে শত্রুর অস্তিত্ব কোন দিকে। সবাই শশব্যস্ত হবে। খুবই risk গুলী করায়। ও ততক্ষণ ফেলে আসা বাড়ীর কথাই হয়তো ভাবছে। স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়েছে। মাথাটা ঝুঁকেছে কয়েকবার বেয়নেটের দিকে, রাইফেলের মাথায় লাগান মাথাটা এক একবার কাত হচ্ছে দেখে শেয়াল ভাবছে, এই সুযোগ। কখন সে শাস্ত্রীর পেছনে এসেছে শাস্ত্রী টেরই পেল না। ঠিক ৮১০ হাত দূর থেকে এক লাফে ওরই ঘাড়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতের দুই আঙ্গুলে চেপে ধরেছে ঠিক গলার নলীটা। ডান হাতে চকচকে ধারাল ছুরিখানা বের করে সেখানেই বসিয়ে দিয়েছে এক টান। অন্য কোথাও নয়। গলার নলীটা খালি ওদের লক্ষ্য। শাস্ত্রী ছটফট করে কাত হয়ে পড়েছে মাটিতে। শব্দ করার উপায় নেই। গলার নলীতে ছুরির পোঁচ। পরের শাস্ত্রীকে জানিয়েও গেল না যে, তারও টার্ণ এসেছে। ততক্ষণে উপরের চামড়ার আবরণটা টান মেরে ফেলে শেয়াল নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। পাণ্ডব শিবিরে অশ্বত্থামার রাতের অভিযান চললো এর পর। বাকী তিনজন শাস্ত্রীরও ওই দশা করে ও ঢুকেছে সমস্ত ঘুমন্ত খাদের ভিতর। পর পর সব খাদেই নির্বিবাদে ওর ক্ষুরের কারিকুরি চালিয়ে গেল রাতারাতি মনের আনন্দে। কার্য সমাধা হলে ও চলে গেল আপন স্থানে। সকালে উঠে দেখা গেল, বীভৎস কাণ্ড। সমস্ত খাদেই লোকগুলো শুয়ে রয়েছে তখনো গলা কাটা অবস্থায়। খবর দেবার জন্যেও কেউ বেঁচে নেই।

কি ভাবে যে কী হয়ে গেল, কেউ তার হদিশ পেলো না। শুধু নির্দেশ এলো সব যায়গায়, সেন্ট্রি পোষ্ট ডবল করতে হবে। সেও ছয় মাস পরে। দুটো করে সেন্ট্রি-পোষ্ট, একটা আর একটার বিপরীত দিকে। দুজন সেন্ট্রি ঘুরবে চক্রাকারে, একে অপরের বিপরীত মুখে। ফলাফল সেই একই। স্নাইপার ও দুটোকে এক সাথে সাবাড় করে কি জানি কোন কায়দায় ফেলে। আবারও নির্দেশ এলো শাস্ত্রীসংখ্যা তিনজনের যায়গায় ছয় জন হবে একই পোষ্টে এবং একজনের হাতে থাকবে যথারীতি রাইফেল। আর একজনের হাতে থাকবে ব্রেন গান। রাইফেল-ম্যান আগের মতই ঘূর্ণায়মান। দুদিক থেকে দুজন ঘুরতে ঘুরতে এক যায়গায় গিয়ে দেখা হবে। আবার সেখান থেকে পিছন করে পূর্বস্থানে ফিরে আসবে। দ্বিতীয়বার চলতে হবে বিপরীত দিকে। কিন্তু জাপানী স্নাইপারের কাছে হাজারো জারি-জুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত এটম বোমাই দিয়েছে এ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি। ওটার যদি আবিষ্কার না হোত?

এ পর্যন্ত গুলীর কারবার মাত্র ঐ এক যায়গায়। সেই তৃতীয় লাইনে। সে-ও একটা কি দুইটা মাত্র। স্নাইপার ধরা পড়েছে নদীতেও। কুমীরের পোষাকপরা অবস্থায় নদীর জল থেকে তোলা হয়েছে দিনের বেলায়।

ব্যবসাদারী অর্গানাইজেশনে বৃটিশ। কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞানে রাশিয়া। আর যুদ্ধকৌশলে জাপান। জঙ্গল-যুদ্ধে এরা পৃথিবীর অদ্বিতীয়। এই যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল। যুদ্ধের কৌশলে জার্মাণরা শ্রেষ্ঠ। বস্তুত যুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণায় ছিল জাপানীরা শিল্পেই শ্রেষ্ঠ। এই যুদ্ধে নিম্নতম লোকসংখ্যা নিয়ে ওরা দেখিয়েছে, ট্যাকটিক্যাল ওয়ার ফেয়ারের নমুনা। বিশ্বের সেরা সেরা লড়িয়ে শক্তির সঙ্গে।

এই হোল ওদের লড়াই। বৃহৎ শক্তি জোটের বিরুদ্ধে এক ক্ষুদ্র প্রাচ্য শক্তির প্রাণবন্ত লড়াই। কিন্তু ওরা দিয়ে গেল কেন, বোমা পড়ার আগেই?

ঘোষণা

ন্যাশনাল একো

মডেল ৭৩০

* নতুন 'ম্যাগনি-ব্যাণ্ড' টিউনিং !

* ৪১ মিটার-ব্যাণ্ডে বিশেষভাবে ব্যাণ্ডস্প্রেড !
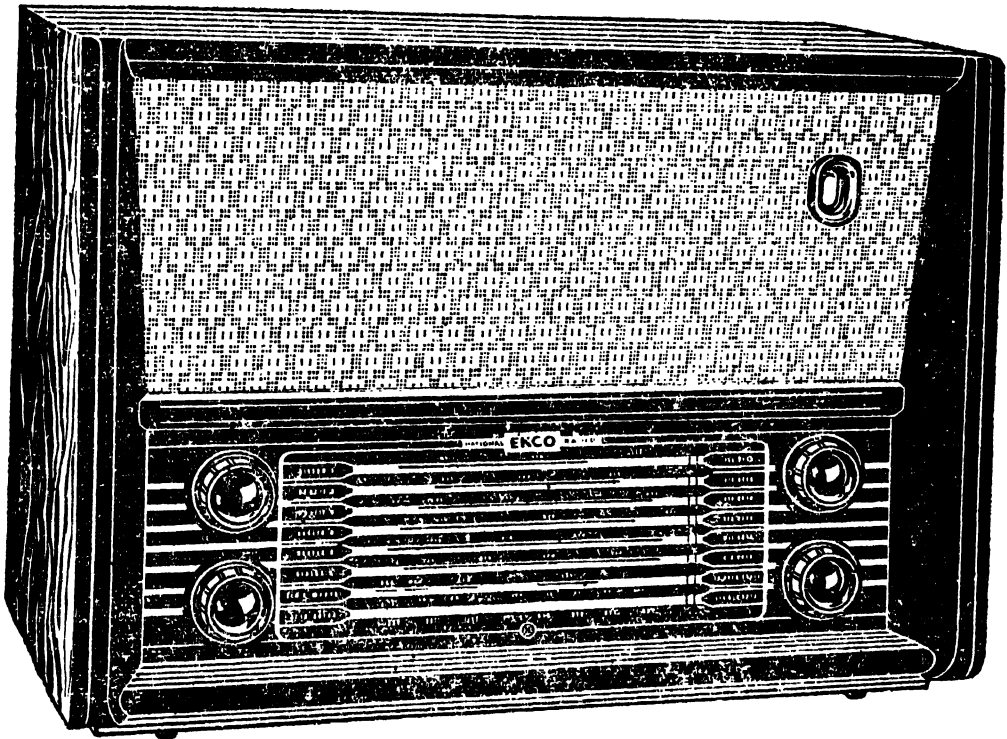
মডেল এ-৭৩০ : ৬ ভালভ, ৮-ব্যাণ্ড, এসি। মডেল ইউ-৭৩০ : এসি/ডিসি। ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের ক্যাবিনেট।

দাম ৪৯৫৲ টাকা নীট

স্থানীয় কর স্বতন্ত্র

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা—

এগুলি মনস্থনাই জন্তু

ছোটখাটো স্টেশন ধরতেও আপনাকে আর সময় নষ্ট করতে হবেনা—ন্যাশনাল-একোর নতুন মডেল ৭৩০ 'ম্যাগনি-ব্যাণ্ড' টিউনিং সংযুক্ত ! ৪১ মিটার-ব্যাণ্ডে আছে গুরুত্বপূর্ণ বহু স্টেশন, আর বিশেষ ব্যাণ্ডস্প্রেড ব্যবস্থার ফলে সহজেই সুস্পষ্টভাবে সেসব স্টেশন ধরা যায় !

আজই আপনার কাছাকাছি অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো বিক্রেতার দোকানে গিয়ে নতুন মডেল ৭৩০ দেখে আসুন !

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড

GRA

৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪। ফ্রেজার রোড, পাটনা। ১১১৮ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ। ৩৬।৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর। যোগবিয়ান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী। রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ।

GRA 9117

জন্মান্তর কি সম্ভব ?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

পূর্বপক্ষ

সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাবয়ব বস্তুর এক বা একাধিক অবয়বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে যে সেই বস্তুটি ভিন্ন হইয়া যায় বা তাহা নষ্ট হইয়া নূতন একটি বস্তু উৎপন্ন হয়—ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেহেতু কোন এক পরিচিত মানুষের একটি আঙুল কাটিয়া গেলে বা তাহার শরীর একটু মোটা হইলে তাহাকে লোকে পূর্ব ব্যক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝে না; কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিয়াই বুঝে। একটি বস্ত্রের কিয়দংশ ছিন্ন হইলেও লোকে সেই বস্ত্র বলিয়া মনে করে। একটি পর্বতের অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও লোকে সেই পর্বত বলিয়া বুঝে। যদি বলা যায় প্রতিক্ষণে অবয়বের পরিবর্তন বশত অবয়বী বস্তুও পরিবর্তিত হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ। তবে যে লোকে 'ইহা সেই পর্বত' ইত্যাদি রূপে অনুভব করে তাহা পূর্বাপর বস্তুর সাদৃশ্য বশত ভ্রান্তি। পূর্ববস্তুটি (পূর্বক্ষণের পর্বত) বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার সাদৃশ্য পরক্ষণে উৎপন্ন বস্তুতে থাকায় ভ্রম বশত লোকে 'উহা সেই বস্তু' বলিয়া মনে করে। যেমন দীপের শিখাগুলি পরিবর্তিত হইলেও 'সেই এই দীপশিখা' এইরূপ ব্যবহার হয়। সুতরাং কোন অবয়বীই স্থায়ী নয়।

ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব অবয়বীর সহিত পরবর্তী অবয়বীর সাদৃশ্যটি কিয়দংশে অথবা অধিক অংশে। যদি বল কিয়দংশে সাদৃশ্য, তাহা হইলে সব বস্তুর সহিত সব বস্তুরই কিয়দংশে সাদৃশ্য থাকায় সব বস্তুকে সব বস্তু বলিয়া লোকের ব্যবহার হউক। অগ্নিকে 'ইহা সেই জল' বলিয়া প্রতীতি হউক। আর অধিক অংশে সাদৃশ্য স্বীকার করিলে পূর্ববর্তী পরবর্তী অবয়বীর যেমন প্রত্যেক ক্ষণে পরিবর্তন হইতেছে সেইরূপ সেই অবয়বীর অবয়বেরও প্রত্যেক ক্ষণে পরিবর্তন হয়, ইহা বস্তুর স্বভাব স্বীকার করিতে হইবে, তাহার ফলে পূর্ব অবয়বী ও পরবর্তী অবয়বীর অধিক সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব বলিয়া সাদৃশ্য বশত 'সেই বস্তু' বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। আর শেষ অবয়ব (পরমাণু) নিত্য বলিয়া সাদৃশ্য থাকিবে এরূপও বলা যায় না। কারণ শেষ অবয়ব নিত্য কি না তাহা নিশ্চয় করা যায় নাই। নিত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির ভেদ বশত তাহাদের সংযোগেরও ভেদ থাকায় পূর্ব-অবয়বী ও পরবর্তী অবয়বীর অধিকাংশ সাদৃশ্য থাকিবে না। শেষ অবয়বগুলির সংযোগকে অবয়বীর প্রতি কারণ স্বীকার করিতে হইবে। বিনা সংযোগে কেবল পরমাণুগুলিই অবয়বীর প্রতি কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সাদৃশ্যের দ্বারা পূর্বাপর অবয়বীর একত্বভ্রান্তির উপাদান করা যাইবে না।

অতএব বলিতে হইবে যে সাবয়ব বস্তু প্রত্যেক ক্ষণে পরিবর্তিত হয় না; কিন্তু এক সময় উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থায়িত্ব অনুসারে স্থির থাকিয়া শেষ সময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাবে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই ভাবে প্রাণটিও পিতার শরীরাংশ রূপ উপাদান হইতে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে শরীর মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া চেতন জীবাত্মারূপে পরিণত হয়। তারপর তাহার স্থায়িত্ব অনুসারে স্থায়ী হইয়া অবশেষে মরিয়া যায়। মৃত্যুর পর তাহার আর জন্ম অসম্ভব। কারণ সাবয়ব বস্তুর পুনর্জন্ম কোথায়ও দেখা যায় না। পিতার প্রাণাংশই পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া জন্মের পর শিশু সন্তানের মাতৃস্তন্য পানে প্রবৃত্তি, মৃত্যু ভয় ক্রমে ক্রমে ক্রীড়া কৌতুক, রাগ, দ্বেষ, হর্ষ সুখ দুঃখ, প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি গুণ সকল উদ্ভূত হয়। উপাদান কারণের গুণ উপাদেয় কার্যে উদ্ভূত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার গুণ ঘটে; সূত্রের গুণ বস্ত্রে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পিতা শৈশবে মাতৃস্তন্য পান করিয়াছিলেন, ক্রীড়া কৌতুক ভয় প্রভৃতির দ্বারা আবিষ্ট হইতেন; যৌবনে নানা প্রকার শারীরিক কার্য ও বুদ্ধির কার্য করিয়াছিলেন। এই ভাবে মাতার কার্যও বুঝিতে হইবে। পিতা ও মাতার ঐ সকল অধিকাংশ সংস্কার সন্তানে অনুস্যূত হয় এবং পিতা বা মাতার প্রাণে যে চৈতন্য গুণ আছে, তাহা হইতে সন্তানের প্রাণরূপ আত্মাতেও চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সন্তানের জন্ম মাত্রেই তাহাতে পিতা-মাতার বাল্য, যৌবন প্রৌঢ়াবস্থার সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয় না কেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। যেহেতু উপাদানের গুণ উপাদেয়ে উৎপন্ন হইবার প্রতি কালও একটি কারণ। সেই কালের ভেদ অনুসারে পিতা মাতার সংস্কারগুলি সন্তানে ক্রমে ক্রমে বাল্য যৌবনাদি অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এই ভাবে পিতা-মাতার সংস্কারের ফলেই জীব সেই সেই স্বভাবের অনুসরণ করে। বানরশিশু তাহার পিতা-মাতার সংস্কারের বলেই, জন্ম মাত্রে বৃক্ষ-শাখা ধারণ, মাতার উদরে কৌশলে সংলগ্ন থাকা ইত্যাদি স্বভাব প্রাপ্ত হয়। হংসশিশু ডিম্ব হইতে প্রসূত হইয়া জলে সন্তরণ করিবার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায়, বুদ্ধিমান পিতা মাতার সন্তান বুদ্ধিমানই হয়। বোকার সন্তান প্রায়ই বোকা হয়। বিদ্বানের গৃহে জন্মিয়া বিদ্বান হয়; মূর্খের গৃহে মূর্খ হয়। তবে যে অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ মূর্খ পিতার সন্তান বিদ্বান হয় বা বিদ্বান পিতার সন্তান মূর্খ হয়; চোরের সন্তান সাধু হয়। সৎ ব্যক্তির সন্তান দুষ্ট হয় বা একই পিতার নানা সন্তান পরস্পর বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাহার কারণ এই যে, সন্তানের জন্মদান কালে পিতা ও মাতার যেরূপ চিন্তা বা সংস্কার প্রভৃতির উদয় হয়, সন্তানের স্বভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। একথা আধুনিক অনেক মনীষী বলিয়া থাকেন। আরও কথা এই যে, দেশ, কাল, সঙ্গ পরিবেশ প্রভৃতি কারণেও একই ব্যক্তির সন্তানগণের পরস্পর বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। সঙ্গের দোষ গুণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দেশের আবহাওয়া প্রভৃতির ফলে যে জীবের স্বভাবের বিপর্যয় হয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

চিকিৎসকগণ বলেন মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা রাষ্ট্রের বিপ্লবের সময় যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের যেমন শরীরের নানারূপ বৈকল্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বভাবেরও বিপর্যয় হইয়া থাকে। যেমন দৃষ্টান্ত অনুসারে বলা যাইতে পারে, যখন ভারত পরাধীন ছিল, তখন অধিকাংশ বালক-বালিকা ভীতু হইত, কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে বালক-বালিকারা সাহসী হইতেছে। যদি বল, পিতামাতার প্রাণাংশ সন্তানরূপে যখন উৎপন্ন হয়, আর সেই চেতন প্রাণ, শরীর মনের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রাণে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, তখন মাতাপিতার শরীর ও মনের সহিত সংযুক্ত থাকাকালে যে প্রাণ

মাতাপিতার দৃষ্ট বিষয়ের অনুভব করিয়াছিল ; সেই প্রাণ বা প্রাণাংশ যখন সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কালক্রমে সন্তানের শরীর-মনের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হওয়ার ফলে মাতা বা পিতার অনুভূত বিষয়ের (নিজের জন্মের পূর্ব ঘটনার) স্মরণ করে না কেন ? তাহার উত্তরে বলিব—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা যাঁহারা স্বীকার করিয়া জন্মান্তরবাদ মানেন, তাঁহাদের মতে জীবের পূর্বজন্মের ঘটনা স্মরণ হয় না কেন ? তাঁহারা যেমন বলেন, মৃত্যুরূপ প্রবল প্রতিবন্ধক বশত পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না অথচ বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে সকল স্তন্যপান, ক্রীড়া, কৌতুক, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি সংস্কার, তাহাদের উদ্বোধ হয়। সেইরূপ আমাদের (জন্মান্তর-স্বীকারকারীর) মতে মাতা বা পিতার শরীর হইতে প্রাণাংশের বিচ্ছেদই, সন্তানের পক্ষে মাতা-পিতার অনুভূত বিষয়ের স্মরণ না করার হেতু। মাতা-পিতার শরীর হইতে প্রাণাংশের বিচ্ছেদ হইয়া সেই প্রাণাংশ যখন সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার মাতা-পিতার বাঁচিয়া থাকার সংস্কার, মৃত্যুভয়, সুখ, দুঃখ, অভিলষিত বস্তুর ইচ্ছা বা তাহার উপায়ের ইচ্ছা সাধনের অন্বেষণ ইত্যাদি সংস্কার সকল প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাঁহাদের অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না। কতকগুলি সংস্কার আবার সন্তানের নিজ পুরুষকারের অধীন। যেমন, বিদ্যা, ধন প্রভৃতির অর্জ্জনজনিত সংস্কার। এই জন্য মূর্খ পিতার সন্তানও বিদ্বান হয় বা চোরের সন্তান সাধু হয় ইত্যাদি। সুতরাং প্রাণই আত্মা, চৈতন্য প্রাণের ধর্ম। অতএব বর্তমান জন্ম ভিন্ন জন্মান্তর নাই। কারণ যে মাতা বা পিতার প্রাণাংশ হইতে সন্তানের জন্ম হয়, সেই মাতা বা পিতা ভিন্ন ব্যক্তি, আর সন্তান ভিন্ন ব্যক্তি। মাতা বা পিতার মৃত্যুর পর আর সেই মাতা বা পিতৃরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন না। মৃত্যুই তাঁহাদের সব শেষ। আর যে সন্তান মাতা-পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিল, সে তাহার পূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। সন্তানের মাতা বা পিতা সন্তানের পূর্বেই জন্মিয়াছিলেন। তাঁহারা সন্তান হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া এক আত্মার দুই বার বা ততোধিক জন্মস্বরূপ জন্মান্তর সিদ্ধ হইল না। অতএব জন্মান্তরবাদটি আকাশ-কুসুম কল্পনা।

পূর্বে যে ভাবে বলা হইল তাহা দ্বারা সামঞ্জস্য হইয়া যাওয়ায় জন্মান্তরবাদের সাধক যুক্তি ও খণ্ডিত হইয়া যায়। অর্থাৎ জন্মান্তরবাদীরা বলেন—জীব জন্মগ্রহণ করিয়া যে মাতৃস্তন্য পানে প্রবৃত্ত হয়—তাহার কারণ কি ? এই জন্মে সে ত শিখে নাই ? শিশু মাতৃক্রোড় হইতে হঠাৎ কোন কারণে নীচে পতিত হইবার উপক্রম কালে ভয়ে মাতার বস্ত্রাঞ্চল বা নিজের গলদেশে রক্ষিত সূত্র ধারণ করিয়া কম্পিত হয় কেন ? এই জন্মে পূর্বে আঘাতাদি জনিত দুঃখ অনুভব করে নাই ; যাহার ফলে পতনের উপক্রমে ভীত হইতে পারে। পশুশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতার নিকট হইতে পলাইয়া যায় কেন ? মাতার কঠিন জিহ্বার স্পর্শজনিত তাহার গাত্রচর্ম ছিন্ন হওয়ার ফলে যে দুঃখ হয়, তাহা ত সে এই জন্মে অনুভব করে নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, পূর্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত এইরূপ হইতে পারে না বলিয়া জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য ইত্যাদি যুক্তি সকল হেয়। যেহেতু স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি প্রভৃতি, যে জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া সম্ভব হইতে পারে—তাহার যুক্তি আমরা পূর্বেই দিয়াছি। অতএব জন্মান্তর অসিদ্ধ।

উত্তরপক্ষ

অনিত্য পদার্থ মাত্রেরই প্রত্যেক ক্ষণে পরিণাম হয়—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা কিছুকাল পরে বা পূর্বে পরিণাম হয় বর্তমান ক্ষণে পরিণাম হয় না বা কতকগুলি ক্ষণে পরিণাম হয়, আবার কতকগুলি ক্ষণে পরিণাম হয় না কেন ? তাহার কারণ কি বলিতে হইবে। ইহার কারণ স্পষ্টভাবে কেহই বলিতে পারিবেন না। যেহেতু যে কারণ তিনি দেখাইবেন, তদ্বিষয়েও ঐ প্রশ্ন উঠিবে যে ঐ কারণটি তাহার পূর্বে কেন উপস্থিত হইল না। মোট কথা যে ক্ষণে বস্তুর ধ্বংস হয়, ঠিক সেই ক্ষণের পূর্বেই তাহার কারণগুলির উৎপত্তি হয় একথা বলা যায় না। কারণগুলি তাহার পূর্বক্ষণে উপস্থিত হইলেও তাহাদের উৎপত্তি তাহার পূর্বে যাহিভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন কোন ঘটে মুদ্গরের আঘাত করিলে, সেইক্ষণে তাহার অবয়বের ক্রিয়া জন্য পূর্বস্থান হইতে অবয়বের বিভাগ, তার পর পূর্বসংযোগ নাশ, তাহার পরক্ষণে ঘটের নাশ হয়। আর স্বাভাবিক ভাবে যে ঘটের বিনাশ হয়, তাহা ঘটের সত্তালাভের পর হইতে প্রতিক্ষণে তাহার অবয়বের পরিণাম হইতে থাকে, সেই পরিণামের ফলে একদিন ঘট অদৃশ্য হইয়া যায়। সুতরাং বৌদ্ধদের মত প্রত্যেক ক্ষণেই বস্তু নষ্ট হইয়া নূতন নূতন বস্তু উৎপন্ন না হইলেও ঘট প্রভৃতি বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরতার যোগ্য ক্ষণ হইতে অদৃশ্য হইবার যোগ্য ক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত একরূপ স্থায়ী থাকে তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। এতক্ষণ স্থায়ী থাকিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায় না। লোকে প্রত্যক্ষ দেখাও যায় যে একটি অট্টালিকা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। একখানি বস্ত্র ছিন্ন হইতে এককালে অদৃশ্য হয়। এই যুক্তি অনুসারে সাবয়ব প্রাণ ও জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ইহা স্বীকার্য। এইরূপ হইলে বাল্যকালের অন্তে যৌবনে সেই বাল্যের প্রাণরূপ অবয়বী যে আর থাকে না, তখন এক নূতন অবয়বী প্রাণ উৎপন্ন হয়—ইহা আমরা অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি। অতএব প্রাণ উৎপত্তির পর হইতে স্থায়ী থাকিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়, তাহার পূর্বে পরিবর্তিত হয় না—পূর্বপক্ষীর এই কথা হেয়। সাবয়ব বস্তু মাত্রেরই স্বভাব এই যে, প্রত্যেক ক্ষণে তাহার পরিণাম হয়। সুতরাং যৌবনে প্রাণরূপী আত্মা বাল্যের প্রাণাত্মা হইতে ভিন্ন হওয়ায় বাল্যের ঘটনা স্মরণ হইতে পারিবে না—এই পূর্বোক্ত দোষ থাকিয়াই যাইবে। যদি বল বাল্যের অবয়বী ও যৌবনের অবয়বী ভিন্ন হইলে বাল্য ও যৌবনের শরীর পরস্পর ভিন্ন হওয়ায় 'সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ জ্ঞান হয় কিরূপে ? তাহার উত্তরে বলিব ঐ উভয় অবয়বী ভিন্ন হইলেও তাহাদের বহু অবয়ব অপরিবর্তিত থাকায় অধিক সাদৃশ্য বশত লোকের 'সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্তিবশতই হইয়া থাকে। আর বাল্য ও যৌবন শরীরে অবয়ব বিশেষ কেন অপরিবর্তিত থাকে—এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে—ইহা বস্তুর স্বভাব। অর্থাৎ সেই অবয়বগুলি চিরকাল অপরিবর্তিত না

হইলেও তাহাদের পরিবর্ত্তনের কাল-মাত্রাটি একটু বিলম্বে হয়, ইহা সহজেই অনুমিত। যেমন আকাশের পরিবর্ত্তন, পৃথিবী অপেক্ষা অতিবিলম্বে হয়—ইহা অনুমানগম্য। অথবা যেমন সিকতারাশি অপেক্ষা পর্বতরাশির পরিবর্ত্তন অধিককাল সাপেক্ষ। ইহা বস্তুর স্বভাব। স্বভাবের উপর অভিযোগ করা চলে না। অগ্নি কেন উষ্ণ? জল কেন শীতল? এইরূপ প্রশ্ন অনর্থক। যদি বল—এই যুক্তিতে আমরাও (পূর্বপক্ষী) বলিব অবয়বী প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের অবয়ব অনেক বিলম্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকায় পূর্বাপর প্রত্যভিজ্ঞা ১ স্মরণ প্রভৃতির অনুপপত্তি হইবে না। ইহার উত্তর এই যে—একটি মাত্র অবয়বই অপরিবর্ত্তিত বলিয়া প্রমাণিত না হওয়ায়, দুই, তিন বা ততোধিক অবয়বকে অপরিবর্ত্তিত স্বীকার করিলে প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য থাকায় পূর্বকথিত ২ দোষের আপত্তি হইবে। আর সম্মিলিত অবয়বে একটি চৈতন্য স্বীকার করিলেও দোষ হয় এই যে, তাহারা অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও তাহাদের সংযোগ অপরিবর্ত্তিত না থাকায় চৈতন্যের বিনাশ হইয়া যাইবে। আর তা ছাড়া প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলে, সকলের সম্মিলনে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার যুক্তিও পূর্বে দেখান হইয়াছে। ৩

যদিও বা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে—অবয়বী প্রাণ পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহার কোন একটি অবয়ব মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকে; আর সে চেতন বলিয়া বাল্য, যৌবন অবস্থার ঘটনা যৌবন বা বার্দ্ধক্যে স্মরণ হওয়ার কোন বাধা থাকে না। তাহা হইলেও বলিব যে, না এরূপ হইতে পারে না। কারণ অপরিবর্ত্তিত অবয়বে একটি চৈতন্য আর পরিবর্ত্তিত অবয়বগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য রূপ অনেক চৈতন্য থাকায় সেই পূর্বদোষের আপত্তি হইবে। আর যদি বল—অপরিবর্ত্তিত অবয়বটিতেই চৈতন্য থাকে অন্যান্য পরিবর্ত্তিত অবয়বে চৈতন্য থাকে না। তাহার উত্তরে বলিব একটি মাত্র চেতন অবয়ব ও অন্যান্য অচেতন অবয়ব সমূহ; এইরূপ বিজাতীয় অবয়বের দ্বারা একটি অবয়বী প্রাণ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বলা যায় জলও পৃথিবীর দ্বারা এক অবয়বী উৎপন্ন হয় বলিয়া, জলও পৃথিবীর মধ্যে বৈজাত্য থাকিলেও ভূতত্বরূপ সাজাত্যও থাকায় যেরূপ বিজাতীয় অবয়ব সমূহের দ্বারা অবয়বী উৎপন্ন হইতে পারে। সেইরূপ চেতন ও অচেতন রূপে প্রাণের অবয়বে বৈজাত্য থাকিলে ও ভূতত্ব বা প্রাণতত্ত্ব রূপ সাজাত্য থাকায় তাহাদের দ্বারা এক অবয়বী প্রাণ উৎপন্ন হইবে—এ বিষয়ে আশ্চর্য কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—সেই একটি অবয়বেই যখন চৈতন্য আছে, আর অন্যান্য অবয়ব অচেতন এবং শরীর বা মনও অচেতন (এই পক্ষে মনকেও অচেতন স্বীকার করিতে হইবে) তখন শরীর বা মনের সংযোগ ব্যতিরেকেও তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে সুষুপ্তির সময় এবং পিতার শরীর হইতে (বীর্য মধ্যে) বিযুক্ত হইবার কালে ও সেই প্রাণাংশে চৈতন্যের উপলব্ধি হউক। কারণ যে বস্তুর যে গুণটি স্বাভাবিক সেই বস্তু উৎপন্ন হইবার পর বা তাহার সত্তাকালে সেই গুণটির অভিব্যক্তির নিমিত্ত অপর কাহারও সংযোগাক অপেক্ষা করে না। প্রাণের যে অবয়বটিতে চৈতন্য থাকে তাহা সন্তানের শরীরে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় নাই, কিন্তু পিতা বা মাতার প্রাণ হইতে আসিয়াছে, বলিতে হইবে। তাহার ফলে সেই প্রাণাংশটিতে পূর্ব হইতেই (সন্তানের শরীরে আসিবার পূর্বে) চৈতন্য ছিল বলিয়া উহা পিতৃ শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়াও চেতন হউক। কিন্তু তাহা জানা যায় না। চূণ ও হলুদের সংযোগে যে লাল রং উৎপন্ন অভিব্যক্ত হয় তাহা সেই চূণ ও হলুদে পূর্বে অনভিব্যক্ত ছিল; আর ঐ সংযোগটিও লাল রং-এর আশ্রয়ীভূত বস্তুদ্বয়ের সংযোগ এবং ঐ সংযোগের ফলে চূণ ও হলুদরূপ উভয় দ্রব্যেই লাল রং উৎপন্ন হয়। কিন্তু তোমাদের মতে (পূর্বপক্ষীর মতে) সেই অপরিবর্ত্তিত প্রাণাবয়বেই চৈতন্য থাকে, অন্যান্য অবয়বে চৈতন্য থাকে না বা শরীর ও মনেও চৈতন্য থাকে না। সুতরাং সেই অচেতন শরীর মন বা অন্যান্য প্রাণাবয়বরূপ বিজাতীয় বস্তুর সংযোগে অপরিবর্ত্তিত অবয়বে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে; আর যদিও বা তাহা হয় তাহা হইলে শরীর, মন বা অন্যান্য অবয়বেও চৈতন্য উৎপন্ন হউক; শরীর, মন প্রভৃতিতে ঔপাধিক চৈতন্য স্বীকার করিলে ঐ অপরিবর্ত্তিত প্রাণাবয়বে স্বাভাবিক চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে যে দোষ হয়, উহা একটু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরও কথা—সেই অপরিবর্ত্তিত একটি অবয়ব নিরবয়ব অথবা সাবয়ব। নিরবয়ব হইলে তাহার সহিত শরীর বা মনের সংযোগ হইতে পারে না। যেহেতু সাবয়বের সহিত সাবয়ব দ্রব্যেরই সংযোগ হয়। সাবয়বের সহিত নিরবয়বের বা নিরবয়বের সহিত নিরবয়বের সংযোগ অসম্ভব।

আর ঐ অপরিবর্ত্তিত অবয়ব সাবয়ব বলিলে ব্যাঘাত দোষ হইবে। সাবয়ব অথচ অপরিবর্ত্তিত ইহা বিরুদ্ধ কথা। সাবয়ব হইলে পরিবর্ত্তিত হইবে। অপরিবর্ত্তিত হইলে নিরবয়বই হইবে। অতএব কোন প্রকারেই প্রাণরূপ অবয়বী বা প্রাণের অবয়বে চৈতন্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বিনশ্বর প্রাণকে অবলম্বন করিয়া মাতা-পিতার সংস্কার বশত সন্তানের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি, মৃত্যু ভয় প্রভৃতির উপপত্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদ খণ্ডনই অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হইল। প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, মৃত্যু ভয় প্রভৃতি চেতনেরই ধর্ম। অথচ প্রাণ অচেতন। কাজেই সেই সন্তানের প্রাণে কিরূপে মাতা-পিতার সংস্কার গুণ উৎপন্ন হইবে? অতএব দেশ, কাল, সঙ্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া ইত্যাদির দ্বারা স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও সেই স্বভাব দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন ইত্যাদিতে থাকিলেও ইহাদের কোনটিতে চৈতন্যসিদ্ধ না হওয়ায় এতদতিরিক্ত চেতন আত্মা অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে। তাহার ফলে জন্মান্তরবাদও অনস্বীকার্য।

পূর্বপক্ষ

শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইহারা আত্মা না হইলেও মনই আত্মা, মনের অতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। আমরা যাহা কিছু অনুভব বা স্মরণ করি, সবই মনের দ্বারাই করি। মনকে বাদ দিয়া কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব মনেই জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

১ সংস্কার সহকৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

২ বহু চেতনের ঐকমত্য না থাকায় শরীর নষ্ট হইবে অথবা কোন কর্ম নিষ্পন্ন হইবে না।

৩ মনের চৈতন্য পরে খণ্ডিত হইতেছে।

তবেই দাঁড়াইল, চেতন মনই আত্মা। 'আমি রাম,' 'আমি শোকার্ত্ত, আনন্দিত'। আমি জানি। আমি স্মরণ করি। ইত্যাদি জ্ঞানগুলি মনেই উৎপন্ন হওয়ায় মন আত্মা। অবশ্য এই মন উৎপন্ন বিনাশশীল। পিতার শরীরাংশ রূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তিম কালে একেবারে মরিয়া যায়। কাজেই জন্মান্তর অসিদ্ধ। বর্ত্তমান জন্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। উহাই ইহার (মনের) চরম পর্যবসান।

চৈতন্যটি মনের ধর্ম হইলেও সেই চৈতন্যের অভিব্যক্তির জন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের অপেক্ষা আছে। এই কারণে পিতার শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া পুত্রের শরীর সংযোগের পূর্বে তাহার চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না। অতএব মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা বা নিত্য আত্মা অসিদ্ধ হওয়ায় জন্মান্তরবাদ টিকিতে পারে না।

উত্তরপক্ষ

মনকে আত্মা ও চেতন স্বীকার করিলে প্রশ্ন হইবে এই যে— উহা (মন) যখন অনিত্য, তখন সাবয়বই হইবে। কারণ, নিরবয়ব দ্রব্যের বিনাশ হইতে পারে না। অবয়বের বিভাগ প্রভৃতি হইয়াই দ্রব্যের বিনাশ হয়। নিরবয়বের পক্ষে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মন সাবয়ব হইলে তাহার প্রত্যেক অবয়বে এক একটি চৈতন্য অথবা সমস্ত অবয়বে একটি চৈতন্য ইত্যাদি পূর্বোক্ত দোষের আপত্তি হওয়ায় চৈতন্যকে মনের ধর্ম বা স্বভাব বলা যাইবে না। অতএব জড় মন আত্মা হইতে পারে না। আত্মা যে চেতন তাহা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। আর মনকে যদি নিরবয়ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাহা নিত্য হইবে। নিত্য হইলে জন্মান্তরবাদ প্রমাণিত হইয়া যাইবে। আর এমনও বলা যায় না যে—'মন নিত্য, কিন্তু তাহার চৈতন্যটি শরীরের সহিত সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয়, শরীরের বিনাশ হইলে তাহার চৈতন্যও নষ্ট হইয়া যায়। তখন মনটি জড় হইয়া অবস্থান করে। আর জন্ম হয় না।' যেহেতু মনকে নিত্য স্বীকার করিলে এবং চৈতন্যকে তাহার আগন্তুক (শরীর সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন) ধর্ম মানিলে প্রশ্ন হইবে এই যে অনাদি মনের সহিত বর্ত্তমান শরীরের সংযোগ 'কি কারণে হইল? বিনা কারণে শরীরের সংযোগ হইতে পারে না। বিনা কারণে শরীরের সংযোগ স্বীকার করিলে এই জন্মের পূর্বে এবং পরে ও বিনা কারণে শরীর সংযোগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, আর তাহার ফলে জন্মান্তর অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আর শরীরের সহিত সংযোগের কারণ স্বীকার করিলে—ধর্ম অদৃষ্ট ইত্যাদি সেই কারণ হওয়ায়, শরীর ব্যতিরেকে কর্ম সম্ভব নয় বলিয়া বর্ত্তমান শরীর সংযোগের পূর্বেও কর্মের আশ্রয়স্বরূপ শরীর স্বীকার করিতে লইবে। সুতরাং তাহাতেও জন্মান্তর অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। অবশ্য মনকে নিত্য চেতনবান স্বীকার করিলে তাহাই আত্মা হইবে। তবে কেবল নামমাত্রে বিবাদ। ফলতঃ নিত্য চেতন একটি বস্তু সিদ্ধ হওয়ায়—আত্মবাদীরা তাহার নাম দেন আত্মা। আর মনোবাদীরা তাহার নাম দেন মন। এইরূপ স্বীকারে বিশেষ বিবাদ নাই। কিন্তু মন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলেও দেখা যাইবে যে কাম, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, উদ্বেগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মনের ধর্ম বলিয়াই স্বীকার্য। আর এই বৃত্তিগুলি বা গুণগুলি উৎপত্তি-বিনাশশীল—ইহা আমরা অনুভব করি। বৃত্তি বা গুণ অনিত্য বলিয়া তাহার আশ্রয়ও অনিত্য হইবে। কারণ অনিত্য গুণের আশ্রয় পদার্থ অনিত্যই হইয়া থাকে। যেমন গন্ধ প্রভৃতি গুণের আশ্রয় পুষ্পাদি নিত্য বস্তুর ধর্ম বা গুণ অনিত্য হয় না। যেমন আত্মার আনন্দ প্রভৃতি। সুতরাং কাম, ক্রোধ, লোভ, স্নেহ প্রভৃতি অনিত্য গুণের আশ্রয়—মনটি অনিত্য হইতে বাধ্য।

যদি বলা যায় আশ্রয়ীভূত পদার্থ নিত্য হইলেও তাহার গুণ অনিত্য হইতে পারে। যে গুণগুলি সংযোগ, বিভাগ বা শব্দাদি জন্য হয় সেইগুলি অনিত্য। যেমন আকাশ নিত্য অথচ ঢাক, ঢোল কাঠির সংযোগে আকাশে অনিত্য শব্দস্বরূপ গুণ উৎপন্ন হয়। অথবা যেমন আত্মা ও মনের সংযোগে আত্মাতে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিয়মে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গুণগুলি অনিত্য হইলেও তাহার আশ্রয়ীভূত মন নিত্য হইতে বাধা কি? ইহার উত্তরে বলিব, আকাশ যে নিত্য তাহা ত সিদ্ধ হয় নাই। বরং ঐ অনিত্য শব্দ গুণের দ্বারা আকাশ সাবয়ব এবং তাহার ফলে অনিত্যই হইবে। আর আত্মার সহিত মনের সংযোগ সম্ভবই নয় বলিয়া তাহার ফলে আত্মাতে অনিত্য গুণের উৎপত্তির সম্ভাবনাই নাই। আত্মা নিরবয়ব, মন সাবয়ব; সাবয়বের সহিত নিরবয়বের সংযোগ হইতেই পারে না। আর যদি বা আত্মার ও মনের সংযোগ স্বীকার করা যায় এবং সেই সংযোগকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে আপত্তি হইবে এই যে, একক্ষণে আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান বা ইচ্ছা উৎপন্ন হউক যেহেতু জ্ঞান বা ইচ্ছার কারণ, আত্মা ও মনের সংযোগ রহিয়াছে। কারণ থাকিলে কার্য অবশ্যম্ভাবী। আরও দোষ হয় এই যে, আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়া তাহার সহিত সর্বদা মনের সংযোগ থাকায় আত্মাতে সর্বদা জ্ঞান, ইচ্ছা, স্নেহ প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হউক, এমন কি সুষুপ্তিতেও কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি হউক। অথচ তাহা হয় না, বলিয়া নিত্য বস্তুতে অনিত্য গুণের উৎপত্তিস্বীকার করা যাইবে না। আরও কথা এই কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বিকারাত্মক গুণ যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহা বিকারী হওয়ায় অনিত্যই হইবে। বিকারের আশ্রয়ীভূত পদার্থ বিকারী, কাজেই অনিত্য হয়, যেমন দধি, মদ্য প্রভৃতি। যাহা বিকারের আশ্রয় নয় তাহা নিত্য, যেমন আত্মা। সুতরাং প্রত্যক্ষের (মানস প্রত্যক্ষ) দ্বারা অনুভূত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ প্রভৃতি গুণ বা বৃত্তির আশ্রয়ীভূত মন অনিত্যই হইবে। অনিত্য হইলে তাহা সাবয়বই হইবে। কারণ অনিত্য দ্রব্য সাবয়ব হয়। আর সাবয়ব হওয়ায় পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ৪ তাহাকে চৈতন্য সিদ্ধ হইতে পারিবে না। অতএব মনও অনাত্মা। আরও কথা এই যে, কোন ক্রিয়ার প্রতি করণ এবং কর্ত্তার অপেক্ষা থাকে। এইরূপ জ্ঞান

---

৪ প্রত্যেক অবয়বে পৃথক পৃথক্ চৈতন্য থাকিলে অনেক চেতনের ঐকমত্যের অভাব বশত কার্য সম্পন্ন হইবে না। সমস্ত অবয়বে এক চৈতন্য স্বীকার করিলে কোন একটি অবয়ব নষ্ট হইলে, চৈতন্যেরও বিনাশের প্রসঙ্গ হইবে, ইত্যাদি।

প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রতি সাধারণভ মনকে করণ স্বীকার করায় তদতিরিক্ত একজন কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। এক মনই করণ এবং কর্ত্তা হইতে পারে না। এই জন্ম মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার্য। আরও একটি যুক্তি এই যে—"আমার মন ভাল নয়" আমি কিছুতেই অন্ত পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছি না ইত্যাদি—ব্যবহার হইতে বুঝা যায় মন হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে আমরা আমি বলিয়া ব্যবহার করি।

এই ভাবে বুদ্ধিকেও আত্মা বলা যায় না। কারণ মন ও বুদ্ধি প্রায়ই একটি পদার্থ। কিঞ্চিৎ ভেদ স্বীকার করিলেও আমার বুদ্ধি মোটা, তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম, সে বুদ্ধিমান, ইত্যাদি ব্যবহার হইতে বুঝা যায় আত্মা বুদ্ধি হইতেও অতিরিক্ত। আর যে যে যুক্তিতে মনের চৈতন্য খণ্ডিত হইয়াছে, সেই সেই যুক্তিতে বুদ্ধিরও চৈতন্য খণ্ডিত হইবে। অতএব আত্মা এতদ্‌ভিন্ন স্বীকার্য।

পূর্বপক্ষ

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি হইতে আত্মা অতিরিক্ত হউক তথাপি তাহা নিত্য কেন হইবে? সেই আত্মা অনিত্যই হউক। অনিত্য হওয়ায় জন্মান্তর সিদ্ধ হইবে না। অথবা সেই আত্মা যদি নিত্যও হয়, তাহা হইলেও নিত্য ভাব পদার্থের উৎপত্তি না থাকায়, আত্মার জন্মই সিদ্ধ হয় না; জন্মান্তর ত দূরের কথা। কাজেই সর্বপ্রকারে জন্মান্তরবাদ অলীক।

উত্তরপক্ষ

আত্মা যে চেতন, তাহা সর্বজনপ্রসিদ্ধ। অচেতন বস্তুকে কেহ আত্মা বলিয়া বুঝে না। অনিত্য বস্তুমাত্রই যে অচেতন, তাহা পূর্ব বহু যুক্তির দ্বারা দেখান হইয়াছে। অনিত্য বস্তুতে কোনরূপেই চৈতন্য থাকিতে পারে না। ঘট, পট ইত্যাদি সাবয়ব, অনিত্য বস্তু চেতন নয়। এইরূপ আত্মাকে সাবয়ব, অনিত্য স্বীকার করিলে তাহা অচেতন হইয়া পড়িবে। অতএব আত্মাকে নিত্য, নিরবয়ব স্বীকার করিলে তাহার চৈতন্য অথবা তাহা চৈতন্যস্বরূপই সিদ্ধ হয়। বস্তুত আত্মার গুণ বা ধর্মই চৈতন্য—এই মত যুক্তিযুক্ত নয়। যেহেতু গুণবদ্ দ্রব্যমাত্রই বিকারী, অনিত্য হওয়ায়, চৈতন্যগুণবান্ আত্মার অনিত্যতার আপত্তি হয়। সগুণ দ্রব্য নিত্য হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আরও কথা এই যে, আত্মা চেতন অর্থাৎ চৈতন্যগুণবিশিষ্ট হইলে, সেই চৈতন্যের দ্বারাই আত্মার প্রকাশ হয়—ইহা বলিতে হইবে। আর তাহা বলিলে আত্মা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য হওয়ায় তাহার (আত্মার) মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া যাইবে। যেহেতু যাহা দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশ্য তাহা মিথ্যা, অনিত্য। এইরূপ আত্মাও অনিত্য হইয়া পড়িবে। আত্মা অনিত্য হইলে পূর্বযুক্তি অনুসারে তাহার চৈতন্য সিদ্ধ হইবে না। এই সব কারণে নিত্যজ্ঞানস্বরূপই আত্মা প্রতিপাদিত হয়।

যদি বল জ্ঞান মাত্রই অনিত্য, কোন জ্ঞানই নিত্য নয়—ইহা অনুভবসিদ্ধ। যেমন ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান; আমি ইহা জানিব। তাহাকে জানিয়াছিলাম ইত্যাদি অনুভবের বলে সমস্ত জ্ঞানই অনিত্য। ইহার উত্তর এই যে—ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান— ইত্যাকারক জ্ঞানগুলি বিশেষ জ্ঞান—ইহারা অনিত্য। কিন্তু নির্বিশেষ জ্ঞান নিত্য। কখনও তাহার অভাব পাওয়া যায় না। যেহেতু নির্বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এই ভাবে জ্ঞানের প্রাগ্‌ভাব বা ধ্বংসকে জানিতে হইলে, জ্ঞানের দ্বারাই জানিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানের জন্মের পূর্বে বা বিনাশের পরেও জ্ঞানের সত্তা থাকায় জ্ঞান সামান্যের অভাব কোন কালেই উপপাদন করা যায় না বলিয়া নির্বিশেষ বা সামান্যজ্ঞান নিত্য। যদি বল— একটি জ্ঞানের দ্বারা অন্য এক জ্ঞানের প্রাগভাবাদি জানা যাইবে। তাহার উত্তর এই যে প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকিলে তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া, যে জ্ঞানের দ্বারা অন্য জ্ঞানের প্রাগ্‌ভাব জানা যায়, সেই জ্ঞানকে প্রাগভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের জ্ঞানের সত্তা কালে থাকিতে হইবে এবং তাহার ধ্বংসকাল পর্যন্তও থাকিতে হইবে। তাহার ফলে ঐ প্রকাশক জ্ঞানকে স্থায়ী স্বীকার করিতে হইবে। আবার ঐ স্থায়ী জ্ঞানের প্রাগভাব বা ধ্বংসকে যে জ্ঞান প্রকাশ করিবে তাহাকে তদপেক্ষা স্থায়িতর স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত একটি অনাদি ও অনন্ত জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। আর তাহাই আত্মা। আর যে কেহ কেহ বলে আমাদের সুষুপ্তির সময় কোন জ্ঞানই থাকে না বলিয়া নিত্যজ্ঞান অসিদ্ধ। ইহাও যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। যেহেতু সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম' 'কিছুই জানিতে পারি নাই"—এই প্রকার সুখ বা অজ্ঞানের স্মরণ করে। অনুভব ভিন্ন স্মরণ হয় না। অতএব অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অনুভবরূপ জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। যদি বল সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া যে লোকে সুখের স্মরণ বা অজ্ঞানের স্মরণ করে। সেই অনুমানের ফলে সুষুপ্তিতে জ্ঞান সামান্যের অভাব এবং দুঃখ প্রভৃতির অভাবই সিদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ এই ভাবে অনুমান হয়। যথা:—সুষুপ্তি কালের পূর্ব ও পরবর্ত্তী কাল দুইটি মধ্যবর্ত্তী কালযুক্ত যে হেতু ঐ দুই কাল পূর্বাপর কাল।

যেমন যে রাত্রিতে আমি জাগিয়া থাকি, সেই রাত্রির পূর্বাপর কাল দুইটি মধ্যবর্ত্তী কালযুক্ত। এই ভাবে সুষুপ্তির কালের অনুমান। তার পর সুষুপ্তি কালটি আত্মমান যেহেতু তাহা কাল। এই ভাবে সুষুপ্তিকালীন আত্মা জ্ঞানসামান্যের অভাবমান যেহেতু তৎকালে জ্ঞানের কারণ ছিল না। এইরূপে সুষুপ্তি কালে আত্মাতে জ্ঞানের অভাব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিব সুষুপ্তিকালে যে জ্ঞানের কারণ থাকে না— তাহা জানিলে কিরূপে? যদি বল জ্ঞানের অভাব হইতে জ্ঞানের কারণের অভাবের দ্বারা জ্ঞানের অভাব, আবার জ্ঞানের অভাবের অনুমানরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বশত—এইরূপ অনুমান অসিদ্ধ। সুতরাং সুষুপ্তিকালেও কোনরূপে জ্ঞানসামান্যের অভাব প্রমাণিত করা না যাওয়ায়, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, দিন, রাত্রি, মাস বৎসর ইত্যাদি কালের অতীত এক নিত্য জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। আর তাহাই আত্মা। যদি ও এই আত্মার স্বরূপও জন্ম অসিদ্ধ—তথাপি বর্ত্তমান জন্ম আমরা অনুভব করিতেছি বলিয়া বলিতে হইবে নূতন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির সহিত সেই আত্মার একটা কোনরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে; আর এই বর্ত্তমান জন্মটি যখন দেখা যাইতেছে, তখন ইহার কারণরূপে কর্ম বা অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কর্মের ফল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা প্রায়ই সকলের অনুভবসিদ্ধ। সেই কর্ম নিজ আত্মার কর্ম বলিতে হইবে। কারণ অপরের কর্মের দ্বারা কেবল

অপরের ফল হইতে দেখা যায় না। এই হেতু বর্ত্তমান জন্মের শরীর হইতে শরীরের কারণ কর্ম, আবার এই জন্মের কর্ম হইতে এই এই শরীর উৎপন্ন হয়—এইরূপ বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। সুতরাং এই জন্মের কারণীভূত কর্মগুলির জন্য পূর্ববর্ত্তী শরীর স্বীকার করিতে হইবে। তাহাই পূর্বজন্ম। আবার তাহার জন্য তাহার পূর্বজন্ম স্বীকার্য। এইরূপে অনাদি জন্ম বা সৃষ্টি অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় জন্মান্তরবাদ অপরিহার্য। আবার এই জন্মের কর্মের ফলে আগামী জন্ম অবশ্যম্ভাবী। যতদিন না জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কর্মের ক্ষয় হয়, ততদিন জন্মধারা আবর্জ্জনীয়।

পূর্বে দেখান হইয়াছে যে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, কাজেই উহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতে ভিন্ন। আর আত্মাকে সর্বব্যাপক বলিতে হইবে। কারণ যদি আত্মা মধ্যম পরিমাণ হন তবে সাবয়ব হওয়ায় (মধ্যম পরিমাণ বস্তু সাবয়বই হয়) অনিত্য হইয়া পড়ে, আর সাবয়ব বস্তু চেতনও হয় না। অতএব আত্মা মধ্যম পরিমাণ নহে। অণুপরিমাণও বলা যায় না। অণু বলিলে সমস্ত শরীরে সুখ প্রভৃতির অনুভব যুগপৎ হইতে পারে না। যেহেতু অণু আত্মা শরীরের এক অংশেই যুগপৎ থাকিতে পারে বলিয়া যে অংশে আত্মা থাকিবে সেই অংশেই সুখ হইতে পারে, অন্য অংশে সুখ হইবে না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে শীতল জলে স্নান করিলে বা শরীরে চন্দন অনুলেপন করিলে যুগপৎ সর্বশরীরেই সুখ হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা অণু নয়। সুতরাং অবশেষে দাঁড়াইল আত্মা বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বস্তুর কোন কর্ম বা ক্রিয়া সম্ভব নয়; সেরূপ দেখাও যায় না। বস্তুত নিরবয়ব পদার্থের ক্রিয়া হয় না। আত্মা যখন নিরবয়ব, চৈতন্যস্বরূপ তখন তাহার পক্ষে বাস্তবিক কর্ম, জন্ম, ভোগ প্রভৃতি সম্ভব নয়। অথচ আত্মার জন্ম, কর্ম, ভোগ প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। এই জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জন্ম, কর্ম প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান বশতই হইয়াছে। অবশ্য মিথ্যাজ্ঞান মাত্র হইতেই জন্ম হয় না কিন্তু মিথ্যা জ্ঞান হইতে কামনা, কামনা হইতে কর্ম, কর্ম হইতে জন্ম, জন্ম হইতে ভোগ ইত্যাদি হইতেছে। আবার অপরের কর্মের দ্বারা অপরের ফলভোগ হয় না ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রাম খাইলে শ্যামের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং যাহার কর্ম, তাহারই জন্ম বলিতে হইবে। এই যুক্তি অনুসারে প্রত্যেক আত্মার জন্ম দেখিয়া নিশ্চয় করা যায় যে এই জন্মের কারণরূপে প্রত্যেক আত্মার নিজ নিজ কর্ম অবশ্যই ছিল। আবার কারণটি কার্যের পূর্ববর্ত্তী হয় বলিয়া এই জন্মের কারণরূপ কর্ম এই জন্মের পূর্বে ছিল। আবার শরীর ব্যতিরেকে কর্ম সম্ভব নয় বলিয়া, এই জন্মের কারণীভূত কর্মগুলির সাধনরূপ পূর্ব শরীরও বর্তমান শরীরের পূর্বে হইয়াছিল। আত্মার সহিত কল্পিত শরীরের সম্বন্ধই আত্মার কল্পিত জন্ম। কারণ আত্মার বাস্তব জন্ম বা কর্ম যে সম্ভব নয় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। অতএব দাঁড়াইল যে বর্তমানে জন্মের কারণরূপে কর্ম, সেই কর্মের কারণরূপে বর্তমান জন্মের পূর্বজন্ম; এইরূপ সেই পূর্বজন্মের কারণরূপে তাহার পূর্বজন্ম অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। আবার বর্তমান জন্মেও অনেকে নূতন কর্ম করা হইতেছে। তাহারও ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বর্তমান জন্মের পর আগামী জন্মও অনুমানসিদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে কর্মের কারণ কামনা, কামনার কারণ মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং যতদিন মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত না হইতেছে, ততদিন জীব কামনা বশত কর্ম করিতে বাধ্য, আর কর্ম করিলে জন্মও অবশ্যম্ভাবী। এই মিথ্যাজ্ঞান আবার যথার্থজ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। সর্বত্রই ইহা আমরা দেখিতে পাই যে, যে বিষয়ের যথার্থজ্ঞান হয় সেই বিষয়ের মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। যেমন দড়ির যথার্থজ্ঞান হইলে দড়ির মিথ্যাজ্ঞান রূপ যে সাপের জ্ঞান তাহা চলিয়া যায়। প্রকৃত স্থলে আত্মার মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ কামনা ও কর্ম। সুতরাং আত্মবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানের দ্বারাই আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; অন্য কোন কারণের দ্বারা আত্মার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না—ইহা যুক্তিসিদ্ধ।

মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহার কার্য কামনাও চলিয়া যাইবে, আর কামনা নিবৃত্ত হইলে কর্মও সম্ভব হইবে না। কর্ম না হইলে আর জন্মও সম্ভব নয়, সুতরাং আত্মার যথার্থজ্ঞান যতদিন না হয় ততদিন জন্ম অবশ্যম্ভাবী। এই বর্তমান জন্মই সকলের শেষ জন্ম নয়। কারণ সকলের আত্মবিষয়ক যথার্থজ্ঞান নাই, বহুলোক আত্মার স্বরূপের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করে না, জ্ঞান ত দূরের কথা। আর পশু প্রভৃতির ত আরও দূরের কথা। অতএব আত্ম-সাক্ষাৎকারবান ব্যক্তি ভিন্ন সমস্ত জীবেরই ভবিষ্যৎ জন্ম সিদ্ধ হওয়ায়, আর পূর্ব পূর্ব জন্মও অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় জন্মান্তরবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাহার ফলে মানুষের ধর্মের উপযোগিতাও সিদ্ধ হইল। বর্তমান জন্মে ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে সুখ হইবে। অধর্মের ফলে দুঃখ হইবে। জন্মান্তর না থাকিলে এই জন্ম যদি শেষ জন্ম হয় তাহা হইলে ধর্মের কোন উপযোগিতা থাকে না। যে ধর্ম অনুষ্ঠান করিল সে ত আর থাকবে না, ফলভোগ করিবে কে? আবার বিনা শরীরে সুখ-দুঃখ ভোগও হয় না। অতএব বর্তমান ধর্মের ফলে ভবিষ্যৎ শরীর অবশ্যই স্বীকার্য।

সমাপ্ত

"সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়মনোবাক্যে যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যতই হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্বলক্ষণ! বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ধারাবাহিক রচনা
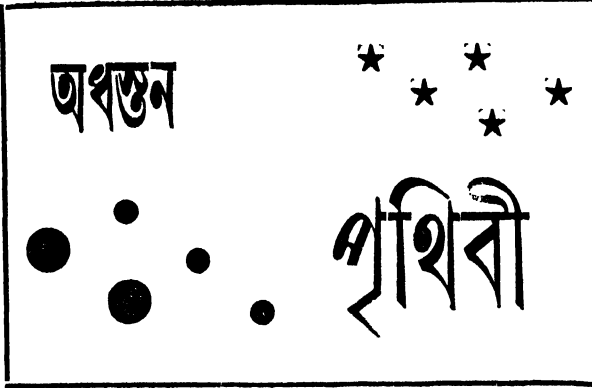
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

জোড়াবাগানের রিপোর্ট-রুমে পুলিশের উপনগরপাল (ডেপুটি পুলিশ কমিশনার) প্রত্যহ ঠিক দশটার সময় উপস্থিত হয়ে তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন থানাদারদের নিকট হতে তাঁদের স্ব স্ব এলাকার যাবতীয় সংবাদ গ্রহণ করে তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় হুকুমনামা জারী করে থাকেন। এই দিনও তিনি ঠিক এই সময় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানিতে এসে 'রাজকীয় ক্রাউন লাঞ্ছিত' ঘূর্ণায়মান রকিঙ চেয়ারটিতে উপবেশন করেছেন। তাঁর সম্মুখের প্রশস্ত টেবিলখানার ডান পার্শ্বে রক্ষিত একটি চেয়ারে বসে শহরের সহ-নগরপাল (এসিসটেণ্ট কমিশনার) বিভিন্ন থানার অফসারদের দ্বারা সমাধিত বিবিধ মামলা সমূহের তদন্ত সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে দিচ্ছিলেন। এক একটি থানা তাদের আসল নাম সহ ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি আক্ষরিক নামেও পরিচিত। তাই যথাক্রমে ক থানার পর খ থানা খ থানার পর গ থানার অফসারদের ভিতরে যাবার জন্য ডাক পড়ছিল। সেই ডাক অনুযায়ী এক এক জন অফসার কাগজপত্র পেশ করার পর ঐ রিপোর্ট-রুম হতে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন অফসার তাঁর ডাইরীপত্র সহ সেই ঘরটির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

এই বিস্তীর্ণ রিপোর্ট-রুমের একাংশ একটি কাঠের পার্টিশনের দ্বারা পৃথককৃত করে অপর একটি অপরিসর কক্ষের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই ঘরখানির ভিতর রক্ষিত একটি লম্বা টেবিলের দুই পার্শ্বের চেয়ার ক'খানি অধিকার করে বিভিন্ন থানার অফসাররা তাঁদের ডাক আসা পর্য্যন্ত কাগজপত্র ও স্মারকলিপি সহ অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের কেউ কেউ কাঠের পার্টিশনের মধ্যকার কয়েকটি ছিদ্রপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ঐ রিপোর্ট-রুমের ভিতরকার আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হতেই এই সকল ছিদ্র তাঁরা তৈয়ারী করে রেখেছিলেন। সহসা ছিদ্রপথ হতে মুখ সরিয়ে সহকর্ম্মীদের উদ্দেশ করে এঁদের একজন নিম্নস্বরে বলে উঠলেন, 'উহুঁ সুবিধে মনে হচ্ছে না।' ডেপুটি সাহেবের চশমা কপালে উঠে গিয়েছে। ওদিকে বড়সাহেব (এসিসটেণ্ট কমিশনার) তাঁকে শান্ত না করে তাঁর ক্রোধে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। আরও একটা ক্যাসুয়েলটি বোধ হয় হলো। খেলে আর কি—

উপনগরপালের চশমা চোখের উপর হতে কপালে উঠলে বুঝতে হবে যে সেই দিন কারণে বা অকারণে নিশ্চয়ই তিনি কাউকে না কাউকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত (সাসপেণ্ড) করবেন। কমপক্ষে জরীমানা প্রভৃতি বিভাগীয় শাস্তি দ্বারা এঁদের কাউকে না কাউকে তাঁর হাতে নাজেহাল হতেই হবে। এই সকল বিষয়ে আইনসম্মত ক্ষমতা তাঁর অসীম। নির্ম্মম নিয়মতান্ত্রিকতার নামে এই ক্ষমতা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে! তাঁদের এই ক্ষমতা অন্যায় ভাবে প্রযুক্ত হলেও কারুর কিছু বলবার বা করবার নেই। এমন কি, ডেমক্রসীর যুগেও পৃথিবীতে এই ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাত হতে আজও পর্য্যন্ত কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও বিচারের নামে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে এঁরা আজও পর্য্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা তাঁদের নিকট হতে কেড়ে নিলে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রই টেঁকে থাকতে পারে না। তাই বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন ছাঁচে গড়ে উঠলেও তাকে তার অধীনস্থ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের হাতে অতীতের রাজকীয় ক্ষমতা দিতেই হবে। পূর্ব্বকালীন রাজাদের ন্যায় এদের কেউ ভাল হলে রাষ্ট্রে মঙ্গল অন্যথায় উহার সর্ব্বনাশ। রাজতন্ত্র উপরতলা হতে বিদায় নিলেও নীচের তলায় উহার ক্ষমতা আজও অপ্রতিহত। রাজতন্ত্র ধনতন্ত্র সমাজ বা সাম্যতন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ রাষ্ট্রযন্ত্র আজও এঁদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। এর চেয়ে বোধ হয় রাজতন্ত্রই ভালো ছিল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রাজতন্ত্রই পৃথিবীর এক স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ অবদান! এই রাজতন্ত্র কখনও কোনও দেশ বা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেনি। বরং তাদের উহা একীভূত ও সম্মিলিত করে রেখেছিল। অন্য দিকে বিবিধ ইজিমের পাল্লায় পড়ে জাতির মধ্যে জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায় গড়ে দেশ ও জাতিকে টুকরা করে দিচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একদা দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণ জাতি ও সুসভ্য কোরিয়ান জাতির কথা বলা যেতে পারে।

এই সহকর্ম্মী কর্ত্তৃক প্রদত্ত দুঃসংবাদটি কানে যাওয়া মাত্র উপস্থিত অফসারদের অনেকেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এসে একে একে ঐ ছিদ্রপথে দৃষ্টি প্রসারিত করে ভিতরের ব্যাপার বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। এই সময় রিপোর্ট-রুমের ভিতর জনৈক জুনিয়ার অফসারের উপর তাঁর কাযের গাফলতির জন্য তর্জ্জন-গর্জ্জন চলছিল আর সেই অফসারটি পার্শ্বে তাঁর থানার ভারপ্রাপ্ত অফসার অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বকুনী-ঝকুনীর প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলেন। তাই এঁদের মধ্যে যাঁরা উঠে এলেন না তাঁরা তাঁদের অন্তরাত্মাকে তাঁদের কর্ণকুণ্ডলীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে রিপোর্ট-রুমের ভিতরকার উচ্চনাদ সমূহ কর্ণপটাহের দ্বারা ধরে নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

এই সময় সহসা তাঁরা শুনতে পেলেন, ডেপুটি সাহেব বিরক্তি সূচক স্বরে 'খ' থানার সেকেণ্ড অফসার হীরালাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তাহলে তুমিই এই মামলাটির তদন্ত করেছিলে? আচ্ছা! ঐ নম্বরের বাড়ীর সামনে একটা গ্যাসপোষ্ট দেখেছিলে? উঁ, কি বললে, দেখোনি। আচ্ছা, ঐ বাড়ীর কাছাকাছি কোনও ডাষ্টবিন দেখেছো? তা'হলে তুমি তা-ও দেখোনি! তুমি একটি ওয়ার্থলেশ অফসার দেখছি। তুমি এই মামলার এই এই সাক্ষীকে তা'হলে জিজ্ঞাসাবাদ করোনি, এঁ্যা? ভুল পথে তুমি এতো দিন

তদন্ত চালিয়ে এসেছো, আমি এখানে বসে বসেই যে সব খবর পাই, তুমি সরজমীন তদন্ত করেও তা জানতে পারো না। মিছামিছি একটা নির্দ্দোষী লোককে তুমি চালান দিতে চাও।'

এর পর তিনি একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চশমার তলা দিয়ে ঐ থানার বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি বড়বাবু এঁর কাছ হতে তদন্তের ভার নিজে নিয়ে নিন। হাঁ, ভালো করে এই সকল ছেলে-ছোকরাদের আপনারা কাজ শেখান না কেন? আমি চাই না যে আমার অফসারদের বিরুদ্ধে কেউ কমপ্লেন করে। আচ্ছা, আপনারা এখন যেতে পারেন।'

সহ-নগরপালকে সাধারণ ভাষায় বড় সাহেব বলে সম্বোধন করা হয়। এককালে তাঁরাও ক্ষমতায় ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এক্ষণে আরও ঊর্দ্ধতন আফসার ডেপুটি সাহেবদের আওতায় পড়ে তাঁদের ক্ষমতা কথঞ্চিৎ কমে গেলেও অধস্তন অফসারদের নিকট উহার তারতম্য উনিশ-বিশ মাত্র। নীচেওয়ালাদের নিকট উহাদের উভয়েরই দহন বা দাহশক্তি তখনও পর্য্যন্ত প্রায় সমান ছিল। অন্য সময় হলে তিনি ডেপুটি সাহেবের এইরূপ এক মন্তব্যকে সমর্থন করে অফসারদের শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি ডেপুটি সাহেবের এই উপদেশবাণীটুকু চুপ করে বসে গলাধঃকরণ করলেন মাত্র। এঁর কথা হতে তিনি কি বুঝলেন তা বুঝা গেল না। তবে অলক্ষ্যে তাঁর ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে তা নিমিষে আবার মিলিয়ে গেলো। এর পর তিনি ডেপুটি সাহেবের দিকে না তাকিয়েই প্রথামত বলে উঠলেন—'নেকষ্ট ম্যান। জলদী—'

রিপোর্ট-রুমের দরজার বাইরেই পরের থানার অফসার মুলুকচাঁদ বাবু তাঁর ডাক পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রলোক ঐ অফিস-ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বতন থানা-অফিসারদ্বয় ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে আসছিলেন। দরজার নিকট তাঁদের ব্যস্ততাসূচক অস্বাভাবিক গতির জন্য তাঁদের দুইজনের মাথা দুইটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। কিন্তু এজন্য এদের কারুর অভিযোগ বা প্রতি-অভিযোগ করবারও সময় ছিল না। একবার মাত্র মুলুকচাঁদ বাবুর চলার পথের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে 'খ' থানার বড়বাবু সুধীর ঘোষ তাঁর সহকারী অফসার হীরালাল বাবুর সঙ্গে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলেন। এর পর তাঁরা সেখানে উপবেশন করা মাত্র তাঁদের সহকর্মীদের একজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'আজকের মতন চাকরী তা'হলে আপনাদের রইলো। কিন্তু কি নিয়ে এতো চেঁচামেচি হচ্ছিল ওখানে?'

নির্ব্বিকার চিত্তে হাতের কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে কয়েকটি মামলার আসামীদের নামে চালান লিখতে লিখতে 'খ' থানার বড়বাবু সুধীর ঘোষ উত্তর করলেন, 'দূ-উ-র, ওসব হুমকী আমরা

বুঝি। সোজাসুজি বললেই হয় যে, এই আসামীটিকে ছেড়ে দাও। তা না বলে ধমকে আমাদের কাছ হতে খুশীমত তিনি কাজ আদায় করবেন। কোনও এক দিক হতে এ সম্বন্ধে তাঁকে ধরাধরি হয়েছে আর কি? যাকগে, কর্ত্তার ইচ্ছেই কর্ম্ম হবে। এতে পাপ যা কিছু তা ওনাদেরই, আমাদের আর কি!'

'খ' থানার সেকেণ্ড অফিসার ছিলেন একজন নবীন যুবক অফিসার। স্বকীয় ধ্যান-ধারণা মত সততার সহিত তিনি ঠিক পথেই তদন্ত করেছিলেন। এমন কি, এই মামলার আসামীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণও তিনি পেয়েছিলেন। এই জন্য তাঁকে আদালতে সোপর্দ্দ করবার জন্য তিনি ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেছিলেন। ডেপুটি সাহেবের কাছে এই জন্য তাড়া খেলেও তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এই বিষয়ে ডেপুটি সাহেবকে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কেহ ভুল বুঝিয়ে থাকবে। তখনও পর্য্যন্ত এই তরুণ অফসারের ধারণা ছিল যে, এঁরা ভুল করলেও অন্যায় করেন না। এক্ষণে তার বড়বাবুকে এইরূপ এক উক্তি করতে শুনে অবাক হয়ে সে বলে উঠলো, 'সে কি স্যার! কি বলছেন আপনি! তা'হলে সব জেনে-শুনেও আপনি এই রকম একটা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবেন?'

'আরে থামো হে ছোক্‌রা' 'খ' থানার বড়বাবু সুধীর ঘোষ স্নেহসূচক স্বরে উত্তর করলেন, 'জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে হলে তোমাকেও এইরূপ অন্যায়ের সঙ্গে বারে বারে আপোষ করতে হবে। দেখলে না, আমাদের অতোবড়ো দুর্দ্ধর্ষ বড়ো সাহেব পর্য্যন্ত চুপ করে গেলেন।' সামান্য দারোগার পদ হতে শনৈঃ শনৈঃ উঠে তাঁকে বড়সাহেব হতে হয়েছে ব'লে এসব প্যাঁচ তাঁরও জানা আছে। এই ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? অপর দিকে ডেপুটি সাহেবকেও সব কথা না জেনে দোষ দেওয়া যায় না। এমনও হতে পারে যে, আরও জবরদস্ত কোনও মহল থেকে অনুরোধের নামে তার উপর এই ব্যাপারে আদেশ এসেছে। এই সম্ভাব্য মহল স্বয়ং হারবার্ট সাহেব হতে পারেন।

টেবিলের এক কোণে একটি বেঞ্চির উপর ক্ষুণ্ণ মনে বসে জোড়াপুকুর থানার থার্ড অফসার চিরঞ্জীব বাবু এতক্ষণ নিবিষ্টমনে এঁদের এই সব কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এইবার 'খ' থানার বড়বাবু সুধীর ঘোষের কথায় সায় দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ স্যার! আমাদের বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু এবং আমাদের থানার সেকেণ্ড অফসার প্রণব বাবুও এই একই কথা বলেন। তাঁদের এই সব যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বারে বারে আমি প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ঐ-সব কথায় আমার মন সায় দিতে চায় না।'

'আঃ, তোমরা দু'জনেই দেখছি ছেলেমানুষ! এই সবে তো কলেজ থেকে বের হয়ে এসেছো। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে বৈ কি', নির্ব্বিকার চিত্তে সুধীর বাবু উত্তর করলেন, 'কলেজে এ-জন্য তোমাদের যা লার্ণ করেছো তা এখানে আনলার্ণ করতে হবে। বুঝলে? যাক, ও-সব কথা। এখন বলো, তুমি এখানে এসেছো কেন?'

চিরঞ্জীব বাবুকে তার গাফলতির জন্য ডেপুটি সাহেবের নিকট পেশ করবার জন্য বড় সাহেব তাঁর থানার বড়বাবুর উপর আদেশ করেছিলেন। চিরঞ্জীব বাবু তাঁদের হুকুম অনুযায়ী ঠিক সময় মতই রিপোর্ট-রুমে এসে গিয়েছে, কিন্তু যে তাকে ঐ সাহেবদের কাছে পেশ করবে, সেই বড়বাবুরই তখনও পর্য্যন্ত দেখা নেই। কাল রাত্রে তিনি কোন নিমন্ত্রণ পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তিনি থানায় বা রিপোর্ট-রুমে এসে উপস্থিত হতে পারেন নি। এই জন্য বেশ একটু চিন্তিত মনেই চিরঞ্জীব বাবু প্রত্যুত্তরে 'খ' থানার বড়বাবুকে বললেন, 'আমাকে আজ রিপোর্টে বড়সাহেব পুটআপ করবার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু যিনি আমাকে ওখানে পুটআপ করবেন, সেই বড়বাবু তো এখনও এলেন না! ওদিকে আমাদের সেকেণ্ড অফসার প্রণব বাবু কটকে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার আগে তিনিও ফিরতে পারবেন না। থানায় এখোন আমি একাই আছি। এদিকে তো আমাদের থানার ডাক পড়লো বলে। এখোন কি করা যায় বলুন তো স্যার!

চিরঞ্জীব বাবুর আশংকা অমূলক ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিপোর্ট-রুম হতে বড় সাহেব ডেকে উঠলেন, 'নেক্সট্ ম্যান। ঙ থানা—আ।' বড়বাবুর হাঁক-ডাক অনুসরণ করে দরজার সিপাহীটিও চেঁচিয়ে উঠলো। হুজুর! 'ঙ' থানাকো ডাক হুয়া। 'ঙ' থানার বড়বাবু গরহাজির থাকায় আর দেরী না করে 'চ' থানার বড়বাবু কাগজপত্রসহ রিপোর্ট-রুমে ঢুকে পড়ামাত্র হন্তদন্ত হয়ে জোড়াপুকুর থানার বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। চোখ দুটি তাঁর তখনও পর্য্যন্ত লাল টকটক করছে। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তখনও পর্য্যন্ত তাঁর সারা অঙ্গে লেগে আছে। আর দেরী না করে তিনিও কাগজপত্রসহ রিপোর্ট-রুমে ঢুকে পড়লেন।

'ইউ আর লেট্' ভীষণভাবে খেঁকরে উঠে ডেপুটি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন? কোনও কাগজপত্র আপনার আজ আমি দেখবো না। দূর করে ফেলে দেবো ওগুলো। আমি আপনাকে সাসপেণ্ড করবো।'

'হাঁ তাই করবেন স্যার!' বিনীত ভাবে মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, আপনার দেওয়া ন্যায্য শাস্তি আমি মাথা পেতেই নেবো। কিন্তু এখোন এই সব আসামী ও কাগজপত্রের তো একটা সুরাহা করতে হবে।'

নিয়ে এসো ওগুলো এদিকে, অধিকতর বিরক্তির সহিত মহীন্দ্র বাবু প্রদত্ত কাগজগুলির উপর হুকুমনামা জারী করতে করতে ডেপুটি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় তুমি এতোক্ষণ ছিলে, এতো দেরীতে এখানে আসা হলো কেন?'

'হাঁ, স্যার, সেই কথাই আপনাকে এখোন বলবো', নিশ্চিন্ত ভাবে মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, 'স্যার, আপনি জানেন যে ফ্যামেলী এখানে রেখে আমার সেকেণ্ড অফসার কটকে সাক্ষী দিতে গিয়েছে। এখোন হঠাৎ আজ সকালে তাঁর স্ত্রী সন্তান-সম্ভাবনা হয়ে উঠলেন, তাঁর বাড়ীতে অন্য কোনও পুরুষ লোক নেই। তাই আমাকেই তাঁকে হাসপাতালে দিয়ে আসতে হলো। আর একটু দেরী হলে ভদ্রমহিলাকে তাঁর সন্তানসহ বাঁচানো সম্ভব হতো না।'

এর পর আর কারুর কোনও কথা বলা চলে না। বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে ডেপুটি সাহেব বলে উঠলেন, 'তা এতোক্ষণ তা বলোনি কেন?' বিজয়গর্বে মাথা উঁচু করে বড়বাবু উত্তর দিলেন, 'আপনি তো তা জিজ্ঞাসা করেন নি আমাকে!' ডেপুটি সাহেবকে বেশ একটু অপ্রস্তুত করে দিয়ে মহীন্দ্র বাবু যেমন বেগে রিপোর্ট-রুমে

প্রবেশ করেছিলেন, আগোছাল কাগজপত্রগুলি গুটিয়ে নিয়ে তিনি তেমনি বেগেই সেই ঘর হতে বার হয়ে এলেন। নিয়ম মত বিদায়ের পূর্ব্বে পুলিশী প্রথামত গোড়ালির সহিত গোড়ালি ঠুকে আওয়াজ তুলে সেলামটুকু করবার সময় ব্যতীত আর একটু সময়ও তিনি সেখানে অতিবাহিত করার প্রয়োজন মনে করলেন না। কিন্তু ত্বরিতগতিতে পাশের ঘরে ফিরে এসে সেখানে চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর অপেক্ষায় উপবিষ্ট দেখে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। অস্ফুট স্বরে তাঁর মুখ হতে বার হয়ে এলো, তাইতো! চিরঞ্জীব বাবুকে তো আজ পুট-আপ করা হলো না! কিন্তু ততক্ষণে রিপোর্টের কাজ-কর্ম্ম সেরে ডেপুটি সাহেব অন্য কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেখানে একাকী বসে আছেন বড় সাহেব রমেশ রায়। বড় রিপোর্টের পর তিনি সেখানে এইবার ছোট রিপোর্ট বসাবেন। এই ছোট রিপোর্টটি তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা দেখানোর জন্য সম্প্রতি সৃষ্টি করা হয়েছে। তা ছাড়া তিনি এই জোড়াবাগানের প্রাসাদোপম বাটীর দ্বিতলে সপরিবারে বাস করেন। একটু দেরী করে উপরে উঠলেও তাঁর ক্ষতি নেই। অগত্যা বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু চিরঞ্জীব বাবুকে বড় সাহেবের এই ছোট রিপোর্টই পেশ করে দিলেন। 'কেন এঁকে বড় রিপোর্টে পেশ করা হয়নি,' চিরঞ্জীব বাবুকে সেখানে দেখা মাত্র বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু চীৎকার করে বলে উঠলেন 'আমি জানতে চাই কচুরীগলিতে জুয়া বন্ধ হবে কি না? জানো, আমি জোড়াবাগানে একটা সিংহ বসে আছি। এখান হতে হুঙ্কার দেবো আর আমার অধীনস্থ দু'টা থানা কেঁপে উঠবে থর-থর-থর, চালাকী পেয়েছো তোমরা?'

'যাক্‌গে স্যার! এবারের মত ওকে আপনি মাপ করে দিন, অনুরোধের স্বরে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বড় সাহেবকে বললেন, কচুরী গলির ভার আমি নিজে নিলাম। আমি কথা দিচ্ছি জুয়া ওখানে বন্ধ হবে।' 'দেখুন এখানে আমি শাসন করতে এসেছি। কাউকে মাপ করবার জন্যে এখানে আমি আসিনি', পুনরায় চীৎকার করে উঠে বড় সাহেব বললেন, 'পেলে কিন্তু আমি কাউকেই ছাড়বো না, তা সে যতো বড়ো লোকই হোন না কেন'। কিন্তু বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর অনুরোধে পরিশেষে বড় সাহেবকে চিরঞ্জীব বাবুকে মাফ করে দিতে হলো। মহীন্দ্র বাবু এই সে দিনও ছিলেন বড় সাহেবেরই এক সমপর্য্যায়ের সহকর্ম্মী। ভাগ্যগুণে বড় সাহেব রমেশ বাবু আগে প্রমোশন পেয়ে বড় সাহেব হয়ে বসেছেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের দোষ-গুণ ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সচেতন ছিলেন, তাই বড়সাহেবের পক্ষে চিরঞ্জীব বাবুকে যা বলা যায় তা বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুকে বলা যায় না। আসলে মহীন্দ্র বাবুর সহিত কচুরীগলির সম্বন্ধ বড়সাহেবের অজানা ছিল না। আপাততঃ তিনি ঝি'কে মেরে বৌকে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীটা বেছে নেওয়া সমীচীন মনে করেছিলেন। এইজন্য বড়বাবুর শেষ কথাটি শুনে আশ্বস্ত হয়ে তিনি চিরঞ্জীব বাবুর সহিত বড়বাবুকেও ক্ষমা করে উঠে গেলেন। শাসনকার্য্যের বিবিধ প্যাঁচের মধ্যে ইহাও যে একটি প্যাঁচ মাত্র ছিল তা কিন্তু নবীন অফিসার চিরঞ্জীব বাবুর মনের অগোচরেই রয়ে গেল।

যতক্ষণ বড়সাহেব রিপোর্ট-রুমে উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণ চিরঞ্জীব বাবু সেখানে শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বড়সাহেব স্থান পরিত্যাগ করা মাত্র তাঁর চোখ দু'টো হতে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো। ক্ষোভে ও অপমানে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। তাঁর এই অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে পার্শ্ববর্ত্তী 'খ' থানার নবীন অফিসার হীরালাল বাবু তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষাই তাঁর মুখে এলো না। অবস্থা বুঝে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু এগিয়ে এসে চিরঞ্জীব বাবুর পিঠের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে সান্ত্বনার স্বরে বলে উঠলেন, 'আরে এতে আপশোষ করার কি আছে। এসো, আমরাও থানায় ফিরে নীচেওয়ালা অফসারদের আর দশজন পাবলিককে বিশটা গাল পেড়ে দেবো আখুন। এতে আমাদের মনের শান্তি ফিরে আসবে এবং সেই সঙ্গে রাত্রে ভালো ঘুমও হবে। দশটা গাল খেয়েছি বিশটা গাল দেবো। এতে আমাদের বরং দশটা লাভ থেকে যাবে। এসো, মন খারাপ না করে চলে এসো।'

চক্ষুলজ্জা ও আত্মসম্মানের অভাব নৈতিক অসাড়তার অন্যতম কারণ। এই দুইটির অভাব ঘটলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে তখন পশুরও অধম হয়ে উঠে। যার নিজের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই সে পরের আত্মসম্মানের মর্য্যাদা কখনও দিতে পারে না। নির্দোষ জনসাধারণকে ঝুটমুট গাল দেওয়া অপরাধেরই সামিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবিবেচক উর্দ্ধতন অফসাররাও এই অপরাধের জন্য দায়ী কিনা তা বিবেচ্য। কারণ, অধস্তন অফসারদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধের অভাব ঘটিয়ে তাঁরা তাঁদের জনসাধারণের বন্ধু না করে শত্রুই করে তুলে থাকেন। কিন্তু এই সকল কথা এই সকল ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের বুঝিয়েই বা দেবে কে? সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করার জন্য তাদের এই সব তত্ত্বকথা কারুর পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভবও ছিল না। অগত্যা অফিসাররা সকলে ম্লান হাসি হেসে একে একে রিপোর্ট-রুম পরিত্যাগ করে যে যার থানায় ফিরে আসতে সুরু করে দিলেন। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার। বিশ্রামের লালসায় তাঁদের সারা অঙ্গ ভরপুর হয়ে উঠেছে। অবশ্য যদি অন্য কোনও মামলার সংবাদ তাঁদের এই কষ্টার্জ্জিত বিশ্রামটুকুর ব্যাঘাত না ঘটায় তবেই। আজকের মত যেন তাঁদের সকলেরই চাকরী রইলো। অক্ষত শরীরে তাঁরা যে যার বাসায় ফিরে যেতে পারছেন! তাই তাঁদের পা যেন আর চলে না। [ক্রমশঃ।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সাতাশ

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন, বার্ণার্ড শ' Back to Methuselah নাট্য-চক্র একেবারে অন্তরের প্রেরণায় লিখেছেন। তাঁর The Philanderer নাটক জ্যাক গ্রীনের তাগিদে রচিত, সে মঞ্চস্থ করতে পারেনি। মিসেস সিডনী ওয়েব 'ফিলানডারার' নাটকের উৎকট-যৌনক্ষুধা পীড়িত নারীতে বিরক্তি প্রকাশ করে বার্ণার্ড শ'কে বলেন আধুনিক যুগের অ-রোমান্টিক কঠোর শ্রমী বাস্তব রমণীর ছবি আঁকুন, তাঁর আগ্রহে শ' লিখলেন Mrs. Warren's Profession, সেনসর তার কণ্ঠরোধ করল। পুরাতন এ্যাভিন্যু থিয়েটারের দরজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তাই মিসেস হর্ণিমান ও ফ্লোরেন্স ফারকে বাঁচানোর জন্য লেখা হল Arms and the Man, জ্যানেট আচার্চ-এর জন্য লেখা হল Candida। এলেন টেরীও রিচার্ড ম্যানসফীলডের জন্য লিখিত হয়েছিল The Man of Destiny এঁরা কেউ শেষ পর্যন্ত এই নাটকে অভিনয় করেন নি। সিডনী ওয়েব নামকরণ করেছিলেন You Never Can Tell নাটকের, সিরিল ম্যাডের জন্য এই নাটক লিখিত হয়, কিন্তু ভূমিকা বণ্টনের দোষে, রিহার্সেলের পর এই নাটক তখন অভিনীত হয়নি। টেরীস ও ম্যানসফীলডের জন্য The Devils Disciple লিখিত হয় এবং আমেরিকায় এই নাটক বিরাট সাফল্যলাভ করে। ফরবেস-রবার্টসনের জন্য Caesar and Cleopatra লিখিত হয়, হ্যামলেট অভিনয়ের পর এই নাটক তাঁর খ্যাতিবৃদ্ধি করে। প্রথম পৌত্রের জন্মের পর এলেন টেরী বার্ণার্ড শ'কে বলেন যে পিতামহীর জন্য কে আর নাটক লিখবে, এই কথায় বার্ণার্ড শ Captain Brassbound's Conversion নাটক রচনা করেন। Pygmalion নাটক রচিত হয় মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের জন্য। ভেড্রার্ণে—গ্রানভিল বার্কারের জন্য John Bulls Other Island ও Androcles and the Lion লেখা হয়। Apple Cart লিখিত হয় স্যার ব্যারী জ্যাকসনের জন্য। সুতরাং এই সব নাটকের একটিও বার্ণার্ড শ' স্ব-ইচ্ছায় লেখেন নি। লিখেছিলেন অনুরুদ্ধ হয়ে, প্রয়োজনের খাতিরে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস প্রশ্ন করেছেন যে তাগিদে না পড়লে কোনো দিন বার্ণার্ড শ' এই সব নাটক লিখতেন কি না সন্দেহ। Man and Superman, Heart break House, এবং Back to Methuselah এই তিনখানি নাটক বার্ণার্ড শ' অন্তরের তাগিদে রচনা করেছিলেন। অবশ্য বার্ণার্ড শ'র সব নাটকই সাফল্য অর্জন করেছে, এখনও সেগুলি মঞ্চস্থ হলে দর্শকের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে, কত দিন করবে সে কথা শুধু মহাকালই বলতে পারেন!

Man and Superman নাটকে বার্ণার্ড শ' creative evolution বা সৃজনীমূলক বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত করেছেন, তাঁর Back to Methuselah নাটকও এই সৃজনীমূলক বিবর্তনের আর এক অভিব্যক্তি।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভগিনী লুসীর মৃত্যুর পর বার্ণার্ড শ'র জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্ক Back to Methuselah নাটক রচনা শেষ হয়, বার্ণার্ড শ' এই নাটক Metabiological pentateuch অর্থাৎ জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। এমন এক বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে নাটকের পরিকল্পনা করাই কঠিন, লেখা আরো শক্ত সন্দেহ নেই। সুতরাং বার্ণার্ড শ'র নিজের মতে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, সে কথা অপরে অবশ্য স্বীকার করতে নারাজ। এই নাটক অভিনয় করতে তিনটি রজনীর প্রয়োজন। এমন একটি নাটকের প্রযোজনা করতে প্রচুর অর্থ, প্রচণ্ড সাহস এবং অপরিসীম উৎসাহের প্রয়োজন।

Heart break House নাটকের অভিনয় দেখে যখন অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত বার্ণার্ড শ' ফিরছেন তখন স্যার ব্যারী জ্যাকসন ষ্টেশনে অপেক্ষারত বার্ণার্ড শ'কে অনুরোধ করলেন এই নাটকাভিনয়ে অনুমতির জন্য। বার্ণর্ড শ' সেদিন বলেছিলেন—তোমার পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে ত?

স্যার ব্যারী জাকসন তাঁকে আশ্বস্ত করায়—বার্ণার্ড শ' বললেন, তথাস্তু। কাজ সুরু হল, রিহার্সেলে হাজির থাকতেন বার্ণার্ড শ'। শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করেও তিনি যথাসময়ে হাজির হতেন। প্রায় দু'মাস লাগল এই নাটকের মহলা শেষ করতে। ড্রেস রিহার্সেলের সমস্ত অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেন বার্ণার্ড শ'। ১৯২৩-এর ৯ই থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত তিন দিনে নাটক অভিনয় হল, শেষ যবনিকাপতনের পর অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, তারপর করতালি এবং প্রশংসাধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হয়ে উঠল। 'The Times' পত্রিকার সমালোচক "মিঃ শ' যখন এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে যে ভাবে অভিনন্দিত করা হল তা সাধারণ গ্যালারীর অভিনন্দন নয়—চাপা আবেগের সংক্ষিপ্ত, আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত উচ্ছ্বাস। কোনো রঙ্গমঞ্চে এমনটি আর দেখা যায়নি। বার্ণার্ড শ' সাধারণতঃ এই জাতীয় উচ্ছ্বাসে সাড়া দেন না, এই দিন তিনি একটু বক্তৃতাও দিলেন, বললেন—লেখক হিসাবে আমার স্থান কোথায় তা জানি, লেখকের স্থান রঙ্গমঞ্চে নয়। রঙ্গমঞ্চ শিল্পীদের আসন, তাঁরা লেখকের সৃষ্টিকে প্রাণদান করেন, রূপদান করেন, এঁরাই লেখকের সৃষ্টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। আমি আমার নাটকের অভিনয় দেখলাম,

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।

তাঁরা একে সঞ্জীবিত করার আগে তারা ছিল, কিন্তু শিল্পীরা তাদের প্রাণ দিলেন। একটি প্রশ্ন করার আছে, আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া বার্মিংহামের অধিবাসী কেউ কি দর্শকদের মধ্যে আছেন? এ আমার জীবনের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমি গত চারদিনে পাঁচটি অপূর্ব অভিনয় দেখেছি, আশ্চর্য কাণ্ড বার্মিংহামেই তা ঘটলো। আমি জানি, এই ধরণের নাট্য অভিনয়ের পক্ষে পৃথিবীর এক অসম্ভব অঞ্চল হিসাবেই বার্মিংহামকে জানি। তাই প্রশ্ন করি আপনারা কি এখানে আগন্তুক, না তীর্থযাত্রী, না এর ভিতর দু'-একজন বার্মিংহামবাসী আছেন? আশ্চর্য, নাট্যকার ও লেখক হিসাবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বার্মিংহামে ঘটলো ··· দর্শকজনের সহযোগিতা ভিন্ন এই বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব ছিল না।"

ন্যু ইয়র্কের গ্যারিক থিয়েটারে Back to Methuselah প্রথম অভিনীত হয় ১৯২২-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী। সপ্তাহব্যাপী অভিনয়, কিন্তু আমেরিকান দর্শকের কৌতূহল অপরিসীম হলেও এক সপ্তাহ ধরে রাতের পর রাত অভিনয় দেখার অপরিসীম ধৈর্য্য তাঁদের নেই। এই নাটক জমলো না. অসফল অভিনয়ের জন্য থিয়েটার গিল্ড প্রতিষ্ঠানকে প্রায় বিশ হাজার ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হল। এই দুঃসংবাদে বার্ণার্ড শ' বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর জন্য কারো ক্ষতি হয়, এ তাঁর কাছে দুঃখকর। থিয়েটার গিল্ডের অন্যতম কর্মকর্তা লরেন্স লাংনার তাঁকে বোঝালেন, ন' সপ্তাহের অভিনয়ে বিশ হাজার ডলার ক্ষতির অর্থ বিচার করে দেখলে সার্থক হয়েছে, গ্যারিক থিয়েটার আয়তনে ছোট, যদি এর দ্বিগুণ আকারের কোনো প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যেত তাহলে ক্ষতির চাইতে লাভই হত। সুতরাং এই লোকসানকে ক্ষতি হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া এই ক্ষতিপূরণ হবে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম আমরা তৈরী করেছি তা আবার ব্যবহার করা যাবে, থিয়েটার গিল্ড-এর জন্য চিন্তিত নয়।

বিশ হাজার ডলার লোকসান দিয়ে কোনো সম্প্রদায়ই নাট্যকারকে এই ভাবে আশ্বাস জানিয়ে পত্র দেয় না। তাই আমেরিকান ম্যানেজার মী সুবার্ট বার্ণার্ড শ'কে যখন অনুযোগ করে লিখেছিলেন, আপনার দাবী কিঞ্চিৎ বেশী। তখন বার্ণার্ড শ' জবাব দিয়েছিলেন—আমার নামের দামই দশ হাজার ডলার। থিয়েটার গিল্ডের ত্রিশ হাজার ডলার ক্ষতি হওয়ার কথা, সেই জায়গায় তাঁদের মাত্র বিশ হাজার ডলার ক্ষতি হয়েছে, তাহলে লাভ হল দশ হাজার ডলার। শুধু আমার নামের গুণ!

বার্ণার্ড শ'র অন্যান্য নাটকাবলীর মত Back to Methuselah রচনাকালে অনেক বার পরিবর্তিত হয়েছে। ২৫শে জুলাই ১৯১৮ তারিখে তিনি লিখেছেন—আমি একটি নাটক লিখেছি যার দুটি অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতিকাল হাজার বছর; এখন কিন্তু মনে করছি প্রতিটি অঙ্ককে স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকে রূপায়িত করব।

Back to Methuselah নাটক সম্পর্কে লরেন্স লাংনার বার্ণার্ড শ'র কাছ থেকে এমন অনেক সুবিধা লাভ করলেন যা আর কেউ পায় নি। এই বিষয়ে অবশ্য নেপথ্য থেকে সাহায্য করেছিলেন, শ'-গৃহিণী সার্লোট। সার্লোটের মতামতের একটা বিশেষ মূল্য বার্ণার্ড শ' চিরদিনই দিয়েছেন। Back to Methuselah এক সঙ্গে পাঁচটি নাটকের মালা, যেন পাঁচনরী হার, লাংনার এটিকে ছোট করতে চাইলেন, The Tragedy of Elderly Gentleman অংশটি তিনি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়ে বললেন—এটা অতি বিলম্বিত অংশ, শ্রোতাদের কাছে এটা বিশেষ ভার মনে হয়।

অতি কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে এই কাটছাঁটের প্রস্তাব নিবেদন করলেন লাংনার। বার্ণার্ড শ' এই জাতীয় প্রস্তাব শুনলে চিরদিনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। সেন্ট জন আর্ভিন বলেছেন, তিনি ল্যাংনারকে উপদেশ দিলেন, তুমি নিঃশঙ্কে কেটে বাদ দিয়ে অভিনয় করো।

উত্তরে লাংনার বললেন—ন্যু ইয়র্কে বার্ণার্ড শ'র জনৈক ভক্ত মহিলা আছেন, তিনি প্রতি রজনীতে এক খণ্ড নাটক হাতে নিয়ে উপস্থিত থাকেন, কোনো অভিনেতা ভুল করে এক লাইন বাদ দিলেও তিনি বার্ণার্ড শ'কে তা লিখে পাঠান।

বার্ণার্ড শ' লাংনারের প্রস্তাব শুনে এই বিষয়ে তাঁর যে নিজস্ব নীতি আছে তা বলতে সুরু করলেন—

সার্লোট বললেন—তোমার Elderly Gentleman কি বলতে চান তা হয়ত মার্কিণ শ্রোতারা শুনতে রাজী নন। জন নক্স সম্পর্কে একটা সুদীর্ঘ অংশ আছে, ইংরাজ শ্রোতারাও হয় তাঁর বিষয় কিছুই জানেন না—

লাংনার এই কথা সমর্থন করলেন। তখন বার্ণার্ড শ' এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং লাংনারের আশাতীত অংশ বাদ দিতে রাজী হলেন। লাংনার বলেন, সবটা বাদ দিলেই নাটকটি আরো সুসংবদ্ধ হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডারউইন লিখেছিলেন—The thinking few in all ages have complained of the brevity of life, lamenting that mankind are not allowed time sufficient to cultivate Science, or to improve their intellect—আর দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় হিসাবে বিধান দিয়েছিলেন সপ্তাহে দুবার গরম জলে স্নান। বার্ণার্ড শ'রও ধারণা মানুষের জীবন অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। তবে দীর্ঘ জীবন লাভ করলে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হবে তা নয়, তাঁর ধারণা বেশী দিন যদি বাঁচে তাহলে অন্ততঃ তাদের নিজের অবস্থার উন্নয়নে কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হয়, জীবনের স্থায়িত্ব কম বলেই মানুষের এই চিন্তা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। জীবনের অভিজ্ঞতার উপর মানুষের আচরণ নির্ভরশীল নয়, তার স্থায়িত্বের প্রত্যাশায় তার সমগ্র কর্মসূচী নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘ দিন ধরে বার্ণার্ড শ' কোনো ত্রাণকর্তার (Prophet) বিষয় নিয়ে নাটক লেখার চিন্তা করছিলেন। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খাইয়ে এমন এক সংগ্রামী সৎপুরুষের চরিত্র চিত্রণ করবেন যা অবিস্মরণীয় হবে। বার্ণার্ড শ'র মানসিকতার দিক থেকে এই দিক থেকে আদর্শ চরিত্র হবেন ধর্মগুরু মহম্মদ। ফরবেস-রবার্টসনের জন্য এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। সেনসর সংক্রান্ত পার্লামেন্টারী কমিটির কাছে এই প্রস্তাব নিবেদনও করেছিলেন। কিন্তু তুর্কী রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে সম্ভাব্য প্রতিবাদের আশঙ্কায় মহম্মদের জীবনকে

নাট্যরূপ দেওয়ার বাসনা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু প্রফেটের পরিকল্পনা তাঁর মাথা থেকে নামলো না, Back to Methuselah চরিত্রের Elderly Gentlemanই—এই প্রফেট, a truly wise man, for he founded a religion without a Church। The Adventures of the Black Girl—গ্রন্থে লেখক স্বয়ং উপস্থিত, আর Saint Joan-এ কসেন এই প্রসঙ্গই তুলেছেন। কিন্তু Prophet চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা অতিশয় বিপজ্জনক, পশ্চিমে যীশুচরিত্র নিয়ে নাটক লেখা চলে না, পূর্বাঞ্চলে মহম্মদ-চরিত্র নিয়ে নাটক লিখলে গুপ্ত ঘাতকের ছুরি বুকে বিঁধবে। তাই বার্ণার্ড শ' Saint Joan নাটকে হাত দিয়েছিলেন।

লামার্ক এবং সামুয়েল বাটলারের কাছ থেকে একটি বিশ্বাস বার্ণার্ড শ'র মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, মানুষ যদি দৃঢ়চিত্তে কোনো বিষয় মনে মনে চিন্তা করে তাহলে তার সব বাসনা পূর্ণ হয়। সামুয়েল বাটলারের Life and Habit গ্রন্থে এই তত্ত্ব আছে। যা কিছু অশুভ তার সমস্যা মানবমনে একটা নিদারুণ সংশয় উদ্রেক করে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান তাহলে পৃথিবীতে এত বেদনা, জ্বালা, দারিদ্র কেন? তিনি ত সব কিছুই দূর করতে পারতেন। তিনি সর্বজ্ঞ, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে এত পাপ, অনাচার, অশুভ, অভাব ও দারিদ্রে-পরিপূর্ণ পৃথিবী কেন সৃষ্টি করলেন? সাধারণ মানুষ যে প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, যে সমস্যার সমাধান নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বার্ণার্ড শ' আজীবন সেই প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে বেড়িয়েছেন।

বার্ণার্ড শ' ব'লছেন, অতীতে সভ্যতা বার বার ধ্বংস হয়েছে, তার কারণ প্রাচীন পৃথিবীর বাসিন্দারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করেনি, যাঁরা ধনী তাঁরা সহজাত প্রবৃত্তি বশে কেবল প্রার্থনা জানিয়েছেন আমাদের আহার দাও, পানীয় দাও, কারণ কাল আমরা মারা যেতে পারি (Let us eat and drink ; for to-morrow we die) আর যারা দরিদ্র তারা কেঁদেছে—হে ঈশ্বর! আর কত কাল কত দেরী? অথচ এর অবরুণ উত্তর ঈশ্বর তাদেরই সহায়তা করেন যারা নিজেকে সাহায্য করে। এর অর্থ এই নয় যে মানুষ যদি সমাধান খুঁজে না পায় তাহলে আর কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না। বানর সৃষ্টি আশাজনক হয়নি বলেই উন্নততর সৃষ্টি নরের আবির্ভাব ঘটেছিল, নর যদি আদর্শ মাফিক নয় নরোত্তম সৃষ্টিতে বাধা কি?

বার্ণার্ড শ'র সমালোচকদের মতে তিনি এই ভাবে তাঁর শিল্পি-সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, মতবাদকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন শিল্পকে পাশে সরিয়ে। তিনি বার বার বলেছেন যে মানুষকে উন্নততর এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন করার বাসনা যদি না থাকতো তাহলে তিনি কোনো দিন এক লাইনও লিখতেন না। Back to Methuselah নাটকের শেষ খণ্ডে তিনি শিল্পকে আবার স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বার্ণার্ড শ' আজন্ম-সংস্কারক, তাই তিনি ক্রিয়েটিভ এভল্যুশনের কোনো ত্রুটী ধরতে পারেন নি। সংস্কারক মাত্রই আশাবাদী, ধর্ম এই আশাবাদের ভিত্তি—We fail, We die, it does not matter ; the ends we strive for will be attained at last by those who come after us. The individual is of no account.

যাঁরা শান্ত এবং স্নিগ্ধ দর্শনের পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে ১৮৯০ যুগের প্রবন্ধই যথেষ্ট, বার্ণার্ড শ'র আর কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই। Man and superman (১৯০১-৩) এবং Back to Methuselah (১৯১১) নাটকে বার্ণার্ড শ' যা বলতে চেয়েছেন তার ভিত্তি অ-বৈজ্ঞানিক। এর কৈফিয়ৎ হিসাবে বার্ণার্ড শ' অন্যত্র বলেছেন—a passion of which we can give no account whatever—তাই Man and superman-এ তিনি Life-Force সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছেন অন্য আকারে নতুন রূপে সেই কথা আরো বিস্তারিত করেছেন Back to Methuselah নাটকে। এই বার ভঙ্গীতে দ্বৈতভাব, এখানে জীবন (Life) এবং পদার্থ (Matter) এই দুটি দিকই বাস্তবতার ভিত্তি মূল। জীবন যখন পদার্থে প্রবেশ করছে তখনই এই মহাজাগতিক (cosmic) নাটকের সূত্রপাত, তারপর সে তরকারি, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি পরিচিত বস্তুর আকৃতি লাভ করে। প্রথমতঃ জীবন পদার্থের দাস, ইতিহাসও তাই বলে। কিন্তু পরম মানুষ এই দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তির (নির্বাণ) জন্য সচেষ্ট হয় এবং পদার্থ থেকে মুক্তির নামই মৃত্যু। আবার সে জীবনের নির্মল স্রোতে ফিরে যায়।

সমালোচকদের মতে এই দুটি নাটকই দার্শনিক বক্তব্য হিসাবে অসার্থক। এই নাটকের মধ্যে বিপরীতমুখী উক্তি এবং প্রচুর ফাঁক আছে। চেষ্টারটন বলেছেন। এরই নাম রক্তহীন আড়ম্বর। না জন্মে এর মাঝে থাকলে ভালোই হত। বার্ণার্ড শ' Back to Methuselah নাটকে যে কথা মনোহর ভঙ্গীতে বলতে চেয়েছেন তাঁর চেয়ে একজন তরুণতর লেখকের কাছে তাই এক অসহনীয় Brave New World হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। (চেষ্টারটন আলডাস হাক্সলীর বিখ্যাত উপন্যাসটির কথাই উল্লেখ করেছেন)—

বার্ণার্ড শ'র মতবাদ যে দীর্ঘ জীবনই পরম মানুষের পক্ষে অনুকূল অবস্থা, সে কথা কিন্তু সর্বদা সত্য নয়, কীটস ছাব্বিশ বছর বেঁচেছিলেন, তাঁর চেয়ে আরো অনেক দিন এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন এমন কবির অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা যে পরমাশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন একথা জানা যায় না। যে মেথুশেলার কথা বার্ণার্ড শ' বলেছেন তিনি নাকি ৯৬৯ বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘজীবী মানুষটি কি মহৎ কর্ম করেছিলেন কিংবা কি পরম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা কেউ বলে না। তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভিত্তি বাদ দিলে এই নাটকের কিছু থাকে না তবু নাটক হিসাবে Back to Methuselah উপাদেয়। প্রথম খণ্ডের আদম ও ইভের কাহিনী চমৎকার!

এই নাটকের প্রতি নাট্যকারের অসীম মমতার কথা আগেই বলেছি। তিনি আগে বলতেন Man and Supermanই আমার শ্রেষ্ঠ নাটক, কিন্তু পরে বলেছেন Back to Methuselah আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি এই নাটক রচনার পর বলতেন আমার শক্তি নিঃশেষিত। অথচ তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ষট্টি বছর। এর পর ১৯২৩এ তিনি Saint Joan নাটক রচনায় হাত দিলেন।

আটাশ

প্রতিমা গড়ে পূজো করতে হলে একটা মন্দিরের প্রয়োজন, সেইখানেই দেবতা প্রতিষ্ঠা করে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে সমারোহ করা চলে। স্যার ব্যারী জ্যাকসন, বার্মিংহাম রেপার্টরী থিয়েটারের

অধ্যক্ষ স্থির করলেন ম্যালভারণেই এমন একটি কেন্দ্র স্থাপনা করা যাক, সেই কেন্দ্রে বার্ণার্ড শ'র নাটকাভিনয় করা যাবে। Back to Methuselah নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় করে ইতিমধ্যেই তিনি বার্ণার্ড শ'র বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, সুতরাং সহজেই তাঁকে রাজী করা গেল, ম্যালভারণ জায়গাটি বার্ণার্ড শ' পছন্দ করতেন, তাছাড়া তিনি ভাবলেন এইখানে অতীতের বিশেষতঃ শৈশবের সঙ্গীত ও শিল্পের যে ইন্দ্রজাল স্পর্শলাভ করেছিলেন, আবার তার স্পর্শলাভ করবেন। সেই আনন্দ বা স্বপ্ন লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন।

তখন বার্ণার্ড শ'র বয়স বাহাত্তর পার হয়ে তিয়াত্তরে পৌছেচে, তাই ম্যালভারণ উৎসব প্রাণে একটা নতুন আনন্দ ও উৎসাহ দান করল, প্রতি বছরই একখানি করে নাটক লিখবেন, বাকী পঁচিশ বছরে পঁচিশ খানা—(শ'র বিশ্বাস ছিল তিনি শতায়ু হবেন) আশা ছিল যে এখানে যাঁরা আসবেন তাঁরা প্রাণে সমান আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভ করবেন। জীবনের প্রথম দিকের সমসাময়িক ঘটনার স্পর্শ লাভ করবেন। এত দিনে সারা জগৎ বার্ণার্ড শ'র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, ঘনিষ্ঠতার ফলে—তাদের আগ্রহ আরো বাড়বে হয়ত।

উৎসবের উপযোগী নাটকের ব্যাপারে বার্ণার্ড শ'র অভিসন্ধি দ্বিবিধ। জনপ্রিয় সরকারকে হাস্যাস্পদ করার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। বার্ণার্ড শ' রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের সম্পর্কে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর ধারণা মানুষ এবং রাজনীতিকদের যা কিছু খারাপ তাই এর মধ্যে প্রতিফলিত। এর ফলেই রচিত হল তাঁর Apple Cart নাটক। তাঁকে ঘিরে যে সমস্ত কুৎসা প্রচলিত হয়েছিল তার জবাব দেওয়া আর এক উদ্দেশ্য। তাই এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিং ম্যাগনাস জ্ঞানী এবং চতুর সম্রাট! রাণী উন্নতমনা মহিমময়ী রমণী। তবু রাজা অপর এক পরমা সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট। সার্লোট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেলকেও এই নাটকেই তিনি রূপায়িত করলেন।

ম্যালভারণে এই নাটক অভিনীত হওয়ার পর বার্ণার্ড শ'র স্ত্রী সার্লোট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেল উভয়েই বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেন। মিসেস বার্ণার্ড শ' নাকি বলেছিলেন—Fools who came to pray remained to scoff.

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল আগে থেকে সংবাদ পেয়ে বার্ণার্ড শ'কে বলেছিলেন, এক খণ্ড বই আমাকে দাও, পড়ে দেখি। এডিথ ইভান্স ওরিনথিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তিনি তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে নিয়েই রসিকতা করা হয়েছে।

জবাবে বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন—ইতিহাসের পাতায় বিষাক্ত গালগল্প ও কুৎসায় অঙ্কিত হয়ে থাকতে চাই না। পৃথিবী আমাদের কথা জেনে হাসুক। হাসি-তামাসার মধ্যে কুৎসিত কালিমা থাকার চেয়ে মনোহর সরস রসিকতা থাকা বরং ভালো।

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল এক খণ্ড বই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, বার্ণার্ড শ'কে এই সব 'mischievous vulgarity and untruthfulness' মুছে ফেলতে অনুরোধ জানালেন, নতুন করে লিখতে বললেন। লোকে বলবে অ-মানুষিক অহংকারে তোমার সাধারণ জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু যে বার্ণার্ড শ' একদা টলষ্টয়কে এক বিচিত্র রসিকতা করে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। তিনি বললেন—'better to have splendid fun than dirty fun.

আশ্চর্য, সার্লোট বা প্যাট্রিক ক্যামবেল-এর মধ্যে কোনো রসিকতা খুঁজে পাননি।

ম্যালভারণে অভিনয় হওয়ার পর সমালোচকরা উচ্চ প্রশংসায় গগন মুখরিত করে তুলল, কেউ বলে চমৎকার, অপূর্ব প্রহসন! উঁচু ধরণের রসালাপ। তাঁকে যেন আবার নতুন করে আবিষ্কার করা হল। ওরিনথিয়া চরিত্র-চিত্রণের সবচেয়ে বড় লাভ হল এই যে, বার্ণার্ড শ'র জীবনের গোপন রহস্য জানার জন্য জনসাধারণের আগ্রহ বর্ধিত হল। যেখানেই তিনি যেতেন, সেখানে রিপোর্টাররা ছোটে গোপন তথ্য সংগ্রহের আশায়। সব জেনে-শুনে বার্ণার্ড শ' প্রসন্নচিত্তে এসবের প্রশ্রয় দিতেন।

স্নানরত, সূর্যালোকসেবী, নগ্নদেহ, মুষ্টিযোদ্ধা বা চিত্রতারকার সঙ্গে আলাপরত নানা ভঙ্গীতে নানা বিচিত্র পোষাকে তাঁর আলোকচিত্র সর্বত্র প্রকাশিত হতে লাগল। যৌনজীবন, শিশু-জীবন, যুব-জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' নানা কথা বলতে সুরু করলেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস যখন জীবনী লেখার প্রস্তাব করলেন তখন বার্ণার্ড শ' সানন্দে to reveal everything সব কথা খুলে বলতে রাজী হ'লেন। বার্ণার্ড শ' সদম্ভে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে বললেন, লণ্ডনে এসেই তিনি যে পাঁচখান উপন্যাস লিখেছিলেন তাতে যে যৌন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন পনেরটি ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েও মানুষ সেই জ্ঞান অর্জন করে না। তাঁর সব অভিজ্ঞতাই আছে এবং যৌন সম্পর্কিত যা কিছু জ্ঞাতব্য তা তিনি জেনেছেন। যেদিন থেকে উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ কেনার মত অর্থ উপার্জন করেছেন সেই দিন থেকেই অভিজাত পরিবারের মহিলা থেকে সুরু করে অভিনেত্রীরা পর্যন্ত তাঁর পিছনে লেগেছে।

যখন এলেন টেরীকে লেখা পত্রাবলী প্রকাশ করতে রাজী হলেন বার্ণার্ড শ', তখন একেবারে চরম পর্য্যায়ে উঠলো। এলেন টেরীর ছেলে গর্ডন ক্রেগ ভীষণ আপত্তি করেছিলেন এই সব পত্র প্রকাশে। 'ডেলী-একসপ্রেস' পত্রিকার রিপোর্টারকে এবং আরো অনেককে শ' বলেছিলেন যে তিনি কোনো দিনই এলেন টেরীকে লেখা পত্র প্রকাশে অনুমতি দেবেন না। এতদ্দারা বার্ণার্ড শ'র জীবনের আর এক দিক উদ্‌ঘাটিত হল। আরো যে সব অভিনেত্রীদের চিঠি লেখা হয়েছিল তাঁরা এগিয়ে এলেন সেই সব চিঠি নিয়ে, সেগুলির বক্তব্য আরো অন্তরঙ্গ, আরো স্পষ্ট। বার্ণার্ড শ' তাঁদের নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন।

এই সব কলরব ছাপিয়ে সেই Life force-এর বাণী যেন বার্ণার্ড শ'কে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে Fiddlesticks! what a frightful bag of stage tricks। কনষ্টেবল কোম্পানীর জন্য ১৯৩০-এ বার্ণার্ড শ' তাঁর গ্রন্থাবলীর একটা বিশেষ সংস্করণের ব্যবস্থা করছিলেন, সেই সময়ে এই কথাটাই আরো গভীর হয়ে বাজলো। প্রথম জীবনের রচনা পড়তে বসে বার্ণার্ড শ'র সেদিন মনে হয়েছিল তিনি মোটেই বয়সে বাড়েন নি, সেই মহামানব ভ্যানডালিয়র লী তাঁকে যেন সমস্ত বিষয়বস্তু দিয়েছেন আর পিতৃদেব কার শ' তাঁকে দিয়েছেন রসজ্ঞান। উভয়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি সেই চিরন্তন শিশু। [ক্রমশঃ।

আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকে শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।

এখন চুরি-নিরোধক ক্যাপ এবং নূতন লাল লেবেলযুক্ত বোতলে পাওয়া যায়।

এক্ষণে লাল মোড়ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

সান্ধ্যস্নানান্তে মঞ্জু পোষাকটা এমন ভাবেই করলে যেন বাড়ীতে থাকার আর পড়াশুনা করতে বসারই বোঝায়। আবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যদি শাড়ী কাপড়টার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়, যায় না এ ভাবে একটু পার্কটায় ঘুরে আসা ? তবেও যেন কেউ আপত্তি তুলতে না পারে। ছুটির দিন সমস্ত সকাল দুপুর বাইরে বাইরে কাটিয়ে ফের সন্ধ্যায় স্পষ্ট করে বেরুবার জন্যই বেরিয়ে পড়বে বাড়ী থেকে, এতো সাহস মঞ্জু মৌরীর কাছে রাখে না। এখন বেরুতে হলে একটু ফাঁকি দিয়েই বেরুতে হবে। আজ একেবারে এক্ষুণি না বেরুলে যে তার চলতো না তা অবশ্যি নয়। কাল সকালে কলেজে যাবার আগে সে অনায়াসে জয়াদের বাড়ী টাকাটা পৌঁছে দিয়ে যেতে পারতো ; তার পক্ষে সুবিধেও ছিল সেটাই। আজকের সন্ধ্যার পড়াটা নষ্ট হতো না। কিন্তু প্রথমত টাকাগুলো বয়ে বেড়াতে হচ্ছে বুকে করে, দ্বিতীয়ত দুঃসময়ে কারু হাতে প্রত্যাশার অতিরিক্ত টাকা তুলে দিতে পারার ভেতর যে একটা আনন্দ আছে সেই আনন্দটা কিছুতেই বিলম্ব সইতে চাইছিল না। তৃতীয়ত ওর ভেতরে এমন একটা চঞ্চলতা ছিল যে ওকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। এতোগুলো টাকা ওকে কেউ এভাবে দিতে পারে ও ইচ্ছেমতো টাকা তুলে নেবার জন্য দিতে পারে সাদা চেক—ওকে দেবার জন্য একজনের এমন হাত বাড়িয়ে আসতে দেখার নতুন স্বাদটা কেবলি ওর হাত-পায়ের ভেতর চঞ্চলতার ঢেউ তুলে তুলে বয়ে যাচ্ছিল।

চমকলাগা ঘটনার প্রথম পর্যায়ে মানুষের অনুভূতিটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তার কাজ আরম্ভ হয় কিছু পরে। রজতের চেক দেওয়া, সেটা দেখা, পড়া, টাকার অঙ্ক লিখবার শূন্য সাদা জায়গায় নয়ের সার বসিয়ে যাওয়া থেকে, রজতের ওর ব্যাগে টাকা ভরে ওর কাঁধে নিজের হাতে ঝুলিয়ে দেওয়ার সময়গুলো পর্যন্ত মঞ্জুর সমস্ত অনুভূতিটাও ছিল ভোঁতা হয়ে। কিন্তু তারপর দুপুর বেলা যখন বিছানায় শুয়ে তার চোখ বুজবার অবসর মিলল তখন জীবনের এই নতুন আস্বাদনটা যে তার মনকে আন্দোলিত করে চলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তা যতই জানুক মঞ্জু, এমন না-গোণা টাকা রজত দিয়ে থাকে। তার এই দেওয়ার মধ্যে কোন বিস্ময় নেই, কোন নতুনত্ব নেই। বিস্ময় যদি থেকে থাকে তো রয়েছে ওর এই নেওয়ার মধ্যে,—যতই জানুক সে কথাটা জানলে মৌরী পায়রার মতো গলার কণ্ঠনালী ফুলিয়ে তুলে প্রশংসার ভঙ্গিতে যে মাথা নাড়বে তার সবটাই নির্ভেজাল শ্লেষ বিদ্রূপ পরিহাস শিকারীর শিকার ধরবার পদ্ধতির প্রতি তারিফ। মন এতো ওটা এটা সেটা জানার ধার ধারে না। বরং উল্টোটা জানতে চায় না, জানতে অস্বীকার করে। কে কি রকম মানুষ তার চাইতে বড় কথা মনের কাছে মানুষের কোন ব্যবহারটা তার কাছে কেমন লাগে। বদরাগী মানুষের অহেতুক মেজাজ কী আমাদের মেজাজ খারাপ করে তোলে না ? মুখ খুললেই মুখ আলগা কথা বলা লোকের অশ্লীলতা কী আমাদের মার্জিত রুচিকে পীড়িত করে না ? তোষামোদকে মিথ্যা জেনেও কী মন খুসী হওয়া থেকে বিরত থাকে ? মিথ্যাচরিত্রের মানুষের মিথ্যাচরিত্রের কথা জেনেও তার মিথ্যা ভালোবাসার কথা শুনতে কী আমরা ভালোবাসিনে ?

সত্যি মনের কাজ অত চরিত্র বিচার করে হয় না। যে ব্যবহারের যে কাজ তাই করে চলে। উত্তেজিত হবার মতো হলে করে তোলে উত্তেজিত। চঞ্চল করে তোলার মতো হলে করে তোলে চঞ্চল। সুন্দর হলে করে মুগ্ধ। ভালো লাগার হলে যায় ভালো লাগিয়ে দিয়ে। তাই সব জানা সত্ত্বেও এমন দেওয়ার যে স্বাদ মঞ্জুর মনে কিছু এলোমেলো হাওয়া বয়ে আনলই। চুলগুলো সামনে এনে, বুকের উপর ফেলে মুখ নিচু করে জটমট্ শুদ্ধ বিণুনী পাকিয়ে চললো সে।

একটা মস্ত সবুজ রং-এর শুকনো তোয়ালে ভিজে ঘাড়ের দুদিক দিয়ে চাদরের মতো ঝুলিয়ে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মৌরী। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে কানের পেছনের জল মুছতে মুছতে বললো, জানিস মঞ্জু, ল'টা দস্তুর মতো ইনটারেষ্টিং সাবজেক্ট। পড়ছি আর বিষয়টা যেন আমাকে পেয়ে বসছে। 'আইনের চক্ষে চক্ষুলজ্জা নেই' কথাটা কি সুন্দর! একজন আইনজ্ঞ কাউকে পেলে বসে বসে তার কাছে পাঠ নিতাম।

মনোযোগী শ্রোতা নীরবে কথা শুনে চলতে পারে কিন্তু অন্যমনস্ক শ্রোতার মনোযোগ বোঝাতে অবান্তর কথায় যেতে হয়। বিণুনীতে আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে মঞ্জু বললো, চক্ষুলজ্জা না থাকা কথাটাকে তোর সুন্দর কথা মনে হলো। তোর নিদারুণ মাত্রা-বোধটা তো চক্ষুলজ্জারই রূপান্তরিত চেহারা।

আপত্তি জানালো মৌরী, কখনোই নয়।

জানে মঞ্জু কখনোই যে নয়। তবু কথা বলতেই হবে তাকে। নইলে এক্ষুণি ওর দিকে তাকিয়ে মৌরী জিজ্ঞাসা করে বসবে, কি ভাবছিস অত ?

বললো কেন নয় ?

—মাত্রাবোধটা হলো রুচিবোধ সৌন্দর্য্যবোধ এ একেবারে ভেতরের বস্তু। চক্ষুলজ্জাটুকু তো নিতান্ত একটা দু চোখের পাতার ব্যাপার। সত্যিকারের সংস্কৃতির তার দরজা পর্যন্ত কখনো গিয়ে দাঁড়াতেই হয় না।

—তবু দরজা-জানালার পর্দার মতোই দরকারী জিনিষ ঐ চোখের দু পাতার লজ্জাটুকু বা তার চাইতে দরকারী। টুকু বলেই ঐটুকুও না থাকলে তার বন্ধুত্ব ভয়াবহ।

তক্ষুণি মাথা কাত করে স্বীকার করল মৌরী—সে নিশ্চয়। আর আমি এদিক দিয়ে কথাটা বলিওনি। ল'জার্ণালে এই আইনের চক্ষে চক্ষুলজ্জা না থাকার উপর এমন কয়েকটা ইনটারেষ্টিং দৃষ্টান্ত পড়লাম না, তুই শুনলে—

গল্প শোনার জন্য মঞ্জু শীতের মধ্যরাতে লেপ ছেড়ে উঠে আসতে পারে কিন্তু এখন আর পোনেরোটা মিনিটও সে দিতে পারে না। এই মিনিট কটাই বাইরের সন্ধ্যার শেষ আলো আলো ভাবটার উপর আর যতটুকু অন্ধকার ঢেলে দেবে, তাতেই বেরুবার কথা বললে দু চোখ কপালে তুলবে মৌরী—এই রাতে! তা বলুক না মঞ্জু ঘরের কোণের পার্কটার কথা।

হঠাৎ একেবারে মৌরীর কাছে গিয়ে তার চুলের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে তাকাতে তাকাতে বলে উঠল মঞ্জু—দিদি তোর মাথার পাকা চুল না কি?

—যাঃ।

—হ্যাঁ, দেখলাম যে!

—কোথায়? মৌরী আয়নার একেবারে কাছে এগিয়ে গিয়ে চুলের ভেতর ফাঁক করে দেখতে দেখতে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো—পাকলেই বা কি।

মঞ্জু ততক্ষণে মৌরীর চুলের সামনেটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিয়ে বললো—না, ভিজে চুলে বাতির আলো পড়ে চক্ চক্ করে উঠেছিল। কিন্তু পাকলেই বা কি মানে? কেন অসময়ের সব কিছু মিষ্টি লাগার মতো অসময়ের পাকা চুলও মিষ্টি নাকি?

হেসে উঠল মৌরী। ঘাড়ের তোয়ালে নামিয়ে রেখে চিরুণী হাতে নিয়ে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বললো—বেশ মিষ্টি। কাঁচা-পাকায় মেশানো নয়, একদম সাদা, নয়তো একদম সোনালি চুল আমার অপূর্ব লাগে। পিসিমার মাথার সোনালি চুলগুলো তো আমার দস্তুরমতো লোভের বস্তু। কেটে নিয়ে গুছি বানাতাম যদি আমার চুলের রং অমনি করে তুলতে পারতাম। মনে মনে স্থির করে রেখেছি, পিসিমার ঐ চুল আমি রেখে দেবো। তার পর এক দিন ঐ রং তো ধরবেই চুলে।

উসখুস করছিল মঞ্জু। মৌরীর কথা শেষ হতেই উপুড় হয়ে খাটের তলা থেকে চটিজোড়া বের করে এনে পা ঢোকাতে ঢোকাতে বললো—এত দিন বলিসনি কেন? কত অমন সোনালি চুলের গুছি জোগাড় করে দিতাম। তার পর ব্যাগটা হাতে নিয়ে মৌরীর দিকে আর তাকালো না সে।—এই কাছেই এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা বই নিয়ে এক্ষুণি আসছি রে। বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে বারান্দা দিয়ে লম্বা হাঁটা দিলো।

আর মঞ্জু চলে গেলে আয়নার দিকে তাকিয়ে ফের চুল আঁচড়াতে গিয়েও বাতির আলোয় রূপালী ঢেউ খেলে চলা সাদাচুলের দিকে তাকিয়ে হাতের চিরুণী নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মৌরী—হাঁ, সে সত্যি বসে আছে 'উত্তর ত্রিশে'র দিনগুলোর জন্য। যৌবন পার হয়ে 'উত্তর ত্রিশে'র কবির ভাষায় বলে উঠবে সে, বেঁচেছি—যৌবন পার হয়ে এসে বেঁচেছি আমি। বেঁচেছি আমি নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত থেকে, ক্ষণিক আকস্মিক হাওয়ায় আন্দোলিত হওয়া থেকে। একটি মুহূর্তের একটি অনুভূতি আর মনকে আমার কানে ধরে নাচাতে পারবে না। আর আনন্দকে খামখা মন-খারাপের হাওয়া

এসে মলিন করে তুলবে না। আজ আমি ভাব-উচ্ছলতাকে বাঁধতে পেরেছি বুদ্ধির দৃঢ়তায়। অনুভূতির সঙ্গে মিলে গেছে আমার পর্য্যবেক্ষণ। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ শক্তি এখন আমার দখলে। জেনেছি আমি আজ তাদের সুমিত প্রয়োগ—বেঁচে গেছি আমি। সোনালি রংধরা চুলে কপাল-টানা খোঁপা থাকবে তখন তার মাথায়। চোখে থাকবে পুরু কাচের চশমা। মুখে থাকবে মধ্য বয়সের গভীর গম্ভীর একাগ্রতা—এইরূপ এই বুদ্ধি, এই বয়সের জন্ম বসে আছে সে। কিন্তু তার মধ্যে এ কে! সুদর্শন! একেবারে আচমকা ঘরে ঢুকে সুদর্শনকে পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে একটা আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেবারে চমকে পেছন ফিরল মৌরী। যেন সুদর্শনের উষ্ণনিঃশ্বাসে ওর ঘাড়ের অলকগুচ্ছকে দুলিয়ে দিল—শুধু তাই নয়, ঠিক প্রথম দিনের মতো দুরন্ত সাহসে ওর লম্বা ঘাড়ের উপর চেপে ধরলো সে তার চাপা ঠোঁট। হাতের চিরুণী ফেলে দিয়ে ক্ষুব্ধ ভাবে গিয়ে চেয়ারে বসে রইল মৌরী ঠিক আত্মজার অবাধ্য ব্যবহারে অসন্তুষ্ট অভিভাবকের মতো। যুক্তি মানে না, ভালো মন্দ নিজেও বোঝে না—কেউ বোঝালেও শোনে না—এমন কারু সঙ্গে ঘর করার মতোই অপূর্ব আরাম এই নির্বোধ মনটাকে নিয়ে ঘর করা।

একসঙ্গে এমন ভাঁজকরা এক পাঁজা টাকা জয়ার মা শীগগির দেখেন নি। কথা তো নয় যেন একটা কাগজ ছেঁড়া ফ্যাস-ফ্যাসে আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে—কত টাকা এখানে?

তাই তো! কত টাকা এখানে জানে না তো মঞ্জু। গুণে দেখেনি তো সে। গুণে দেখবার কথা মনে হয়নি তো তার। জয়ার মার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গেলার আন্দাজ সময় নিতেই হলো মঞ্জুকে। এতে আছে, আচ্ছা দিন আর একবার দেখে দিচ্ছি ভালো করে। যেন যতই গুণে আনা যাক, টাকা কারু হাতে দেবার সময় সামনা-সামনি আর একবার গুণে তবেই দিতে হয়। জয়ার মার হাত থেকে টাকা নিয়ে গুণতে গুণতে এতক্ষণে ওর চৈতন্য হলো, টাকা গুণে না আনার মতো একটা বোকামিই যে সে করেছে তা নয়। একসঙ্গে এতোগুলো টাকা এনেও করেছে আরো একটা বোকামি। তার বোঝা উচিত ছিল দশ-পাঁচ করে এনে হাতে দিতে পারার সংখ্যার ভেতর হঠাৎ এই পাঁজা-ভাঁজ টাকা স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ডেকে আনবে, এ টাকা কোথায় পেলো সে বা কে দিল তাকে এ টাকা। আর এ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে জয়ার মা যে কি না কি ভেবে বসবেন তাই বা কে জানে?

হলোও ঠিক তাই। তার জিজ্ঞাসার জবাবে মঞ্জুর আটকে যাওয়া বিব্রত ভাবটা জয়ার মার দৃষ্টি এড়ালো না। 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।' ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কোন বিপজ্জনক পথে অজ্ঞাতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে না তো মঞ্জু। তার মতো বুড়ো মানুষটাই কি প্রথম বুঝে উঠতে পেরেছিলেন কিছু! তার ভদ্র মন তো ইচ্ছে করে এ পথ বেছে নিয়েছিল না—এমন কি অনিচ্ছা করেও নয়। অজ্ঞাতে গিয়ে পড়েছিলেন, ঠিক অন্ধকারে গিয়ে খানায় পড়ার মতো পড়েছিলেন। উপার্জ্জনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি মেয়েকে নিয়ে নানা ভাবে। পারেন নি। মুদী বাকী দেওয়ার বিস্তৃত জালে জড়িয়ে ফেলে যখন প্রতিদিনের অন্ন তার দয়ার উপর নির্ভর দাঁড় করালো তখন কোথা দিয়ে যে কি ঘটে চলতে লাগলো প্রথমে কি তিনিই তা বুঝে উঠতে পেরেছিলেন। আর শুধু কি তিনিই—এখানকার দু'দিককার রাস্তার ফ্ল্যাটগুলোর বহু ঘর তো ঠিক তারই মতো না, না বুঝতে বুঝতে গিয়ে এই একই লোকের ফাঁদে পা দিয়ে আজ পাঁকে মুখ থবড়ে পড়েছে। মুদীর ব্যবসাটা মুদী দোকান নয়, আসল ব্যবসা তার পাড়ার অভাবী ঘরগুলোকে ধার দিয়ে, বাকী দিয়ে তাদের তরুণী কন্যাদের খপ্পরে এনে ফেলা—বুঝেছিলেন কি তিনি কিছু। এতো কিছু বোঝবার মতো শক্তিও ছিল না তার। চারটে শুধনো হাড় তখন তার দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুধু ধুঁকতো। তারপর খাদ্য পেয়ে, পথ্য পেয়ে শরীরের রক্তকণিকাগুলো যখন বল ফিরে পেয়ে সতেজে শরীর ময় চলা ফেরা করতে করতে তাকেও দেয়াল—নির্ভর ছেড়ে শিঠটান করে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তখন তার সেই মরতে মরতে বেঁচে ওঠা রক্তকণিকাগুলো বেঁচে থাকার কথা ছাড়া কোন কথাই শুনতে চাইলে না। আর সেদিনই তিনি প্রথম জানালেন মানুষ বাঁচার দায়ে সব সম্ভ্রম সব বৃত্তি বলি দিতে পারে। তবু তারও মধ্যে বড় প্রশ্ন ছিলেন তিনি নিজে নন, সন্তান। এক সন্তানকে বলি দেওয়ার জন্য মন প্রস্তুত করেছিলেন তিনি আর এক সন্তানের দিকে তাকিয়ে। তাই মঞ্জুর লোকটাকে চড় মেরে তাড়িয়ে দিলে—আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি একূল ওকূল দু'কূল যাওয়ার চরম আতঙ্কে। সব দায় নেবার মঞ্জুর দেওয়া ভরসায়ও কোন ভরসা কোন বল পাননি। কিন্তু আজ মঞ্জু তার সব চাইতে বড় বল। আজ মঞ্জু তার ফের সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারার সম্ভবনাময় স্বপ্ন। দয়া ধর্ম দান উদারতায় আজ আর বিশ্বাস নেই জয়ার মার। একমাত্র জৈব দুর্বলতার কারণ ছাড়া কোন কারণ বিশ্বাস করেন না পুরুষের দয়ার।

আজও অর্থনৈতিক জগতের একচ্ছত্র অধিপতি পুরুষ। সে ছাড়া কে দেবে মঞ্জুকে টাকা। আর তাই যদি হয় তবে তার দুর্বলতার ভিতের উপর পা না রাখলে তার মুঠো এতটুকুও খুলবে না—এতটুকুও না। আকুল উৎকণ্ঠায় বলে উঠলেন তিনি—কে দিলে মঞ্জু তোমায় এ টাকা, কে দিলে?

বুঝলো মঞ্জু সবই বুঝলো। মৌরীর ধারণা রজতের মতো লোকেরা এই এক মতলবেই যা করে সব করে। জয়ার মার অভিজ্ঞতা আরো বেশী, তাই তাঁর ধারণা সবাই, সবাই তাই। রজত বলে পুরুষের জগতে কোন আলাদা জাত নেই। এই কি সত্য বলে মেনে নিয়ে মঞ্জুর রজতের হাত থেকে টাকা নেওয়ার অপমানে মুখ নিচু করতে হবে?

না—দুর্বলতার দেওয়া মাত্রই নোংরা এই যদি তার বিশ্বাস হতো তবে যদিও রজত ধার শোধ দেওয়ার কথা বলেই টাকা দিয়েছে, মঞ্জুও শোধ দেবার কথা মনে রেখেই টাকা নিয়েছে—তবুও এ টাকা মঞ্জু গ্রহণযোগ্য মনে করতো না। তাহলেও সত্য বলা যায় না। জয়ার মার দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু খাওয়ার অভিনয় করলো মঞ্জু—যেন বলবার ইচ্ছে ছিল না, তবু বলতে হচ্ছে এমনি ভাবে বললো—মার না ইয়া মোটা একটা হার ছিল। বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার বেড়ে একটা মোটার পরিমাপ দেখালো সে।

মনের ভেতরটা যেন শান্তিতে একবার চোখ বুজে নিল জয়ার মার। তবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—সেটা তুমি লুকিয়ে বিক্রি করে এলে নাকি ?

ঠিক আছে। এতক্ষণে গুছিয়ে বসে গুছিয়ে বলে চললো মঞ্জু। না, বিক্রি করতে যাবো কেন ? রেখে টাকা এনেছি। সামনের মাসেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। ও হাঁ—ভালো কথা, আপনাকে বলাই হয়নি যে আমি একটা টুইশনের কাজ পেয়ে গেছি। আর একটাও হয়ত সামনের মাসে পেয়ে যেতে পারি। একটা হলে পঁচাত্তোর টাকা পাবো। দুটো হলে পাবো পঁচাত্তোর পঁচাত্তোর করে দেড়শ'। (ভেতরে ভেতরে রজতের সাহায্যে এমন দুটো কাজ পাওয়া কিছুই যে অসম্ভব কথা নয়—হলেও হয়ে যেতে পারে এবং পঁচাত্তোর পঁচাত্তোর দেড়শ নয়, একশ একশ করে দু'শ টাকাও মাইনে হতে পারে। ইউরোপীয়ান মহিলারা এমনি মাইনেই দেয়। এই একটা উত্তেজনায়ও মঞ্জুর বুকটা যেন বার কয় দ্রুত তালে চলে নিল। যেন এ সংসারটার বেকার গৃহস্বামী সে।) বললো কাজ এ মাসে হলেও মাইনে পাবো তো সেই সামনের মাসে। এ মাসটা চলতে হবে তো আমাদের। বাড়ীভাড়া জমে আছে, আরো কত কি জমে আছে। সামনের মাসে মাইনে পাবো, এ টাকা থেকেও হয়তো থেকে যাবে—নিয়ে আসবো হার ছাড়িয়ে। জানতেই পারবে না কেউ। না রে জয়া ? জয়ার দিকে তাকালো সে। ঘরের মাঝখানে একটা মোড়ায় বসেছিল জয়া। কিছু জড়িয়ে আনা কোঁচকানো মোচড়ানো একটা পুরোনো কাগজের পাতা টান করে নিয়ে বসে নিবিষ্ট মনে যেন সে কি দেখছিল। মঞ্জুর সম্বোধনে চোখ তুলল। মঞ্জু বললো—সিন্দুকের ভেতর মরা সাপের মতো পড়ে থাকে তো বিড়ে পাকিয়ে। মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার বিবর থেকে বেরিয়ে এসে যদি মানুষের কাজে এসে যেতে পারে, তবে ওরই নিজেকে ধন্য মনে করা উচিত, নয় জয়া ?

জয়া যেমন হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল। কোন সাড়া এলো না তার কাছ থেকে।

মঞ্জুর কাজ হয়ে যাওয়ার কথা শুনে এক দিকে যেমন খুশীর অন্ত রইল না জয়ার মার, অপর দিকে তেমনি পরীক্ষার বছর দু'দুটো মাষ্টারি করলে মঞ্জুর নিজের পড়ার যে ক্ষতি হবে সে কথা ভেবে খুশীর অনেকটাই যেন উবে গেল তার। তক্তপোষের তলা থেকে তোরঙ্গটা টেনে বের করে টাকাটা তুলে রেখে দাওয়ায় গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ আগে ধরিয়ে রেখে যাওয়া ধোঁয়া ওঠা উনোনটার অসমান কয়লাগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে দিয়ে ওদের জন্ত চায়ের জল চাপালেন উনোনে। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সক্ষোভে যেন বলে চললেন আপন মনে কত কি। তার ভেতর একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে কানে এলো মঞ্জুর—নিজের মেয়ের সর্বনাশ তো করে বসে আছিই। আবার না অন্যের মেয়ের ভবিষ্যৎটাও নষ্ট করি।

জয়ার দিকে তাকালো মঞ্জু। মার এ জাতীয় কথা সহ্য করতে পারে না জয়া। শোনা মাত্র কখনো ওঠে তার মুখ একেবারে সাদা হয়ে, আবার কখনো ওঠে সে দুরন্ত ক্ষেপে। জয়াকে বাঁচিয়ে কথা বলতে পারেন না জয়ার মা। সে সতর্কতা বোধও তাঁর নেই। কিন্তু মার কথা জয়ার কানে গেছে মনে হলো না। এতক্ষণ তার দৃষ্টিটা ছিল হাতের কাগজের দিকে, এখন দৃষ্টিটা পাঠিয়ে দিয়েছে সে বাইরের অন্ধকারের দিকে। সে আজ-কাল শূন্য-দৃষ্টিতে বসে বসে কেবল ভাবে আর ভাবে। কি ভাবছে জিজ্ঞাসা করলে ততোধিক শূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্জু চৌকি থেকে উঠে গিয়ে মেঝেতে বসে ওর পিঠের ওপর হাত রাখল। কি খবর আছে এই সাত বাসি খবরের পাতায় দেখি।

—খবর নয় ছবি দেখছি।

—কিসের ছবি ? উঁকি দিল মঞ্জু।

পত্রিকাটা তুলে দিল জয়া মঞ্জুর হাতে।

ছবিটা মঞ্জুর না-দেখা নয়। বহুদিন আগে বেরিয়ে গেছে কাগজে। পতিতাবৃত্তি বন্ধের প্রতিবাদে পতিতাদের নীরব প্রতিবাদের ছবি। রাস্তা পরিক্রমা করে এসে মাঠের ওপর বসে আছে এক মাঠ মেয়ে, ঘোমটায় মুখগুলো প্রায় আবৃত করে নিয়ে।

আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল জয়া ঘরে মঞ্জুকে চমকে দিয়ে বাইরে বসে থাকা মাকে চমকে দিয়ে। তারপর যেন তার সেই পাগলা হাসি থামতে চায় না আর। দেখলি ছবিটা ?

যেন ছবিটা সত্যি হাসি পাওয়ার, এমনি ভাব দেখিয়ে জয়াকে খুশী করতে হাসল মঞ্জুও।

আর তক্ষুণি গম্ভীর হয়ে গেল জয়া। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল—হাসলি যে তুই ? হাসিটা মুখের ভেতর—সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে জয়ার পিঠে হাত বুলোতে লাগল মঞ্জু—এমনি হেসেছি আমি।

—এমনি হাসবি কেন ?

আমতা-আমতা করল মঞ্জু—ঠিক এমনি নয়। তোকে হাসতে দেখে হেসেছি।

—আমি কেন হেসেছি তুই জানিস ?

—না তো !

—তবে কারণ না জেনে পাগলের মতো হাসতে গেলি কেন ? তুই কি পাগল ?

—সত্যি অর্থ হয় না ; কিন্তু এক এক সময় কারণ না জানলেও কাউকে ভীষণ হাসতে দেখলে হাসি এসে যায় না ?

ঠাণ্ডা হলো জয়া। আমি হেসেছি কেন জানিস ?

সাংঘাতিক একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রইল জয়া মঞ্জুর দিকে।

ক্ষীণ ভাবে মাথা নেড়ে মঞ্জু বললো—না।

—কি করে জানবি। খাচ্ছিস, পরছিস সুখে আছিস। কিন্তু চিন্তা করবার যে কত কি আছে তোরা ভেবে দেখিস না। কেউ ভেবে দেখছে না। আচ্ছা এই দেখ—কাগজটা মেঝেতে পেতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—এটা দেখার পর সেই থেকে আমি কেবল ভাবছি—বলে হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল জয়া।

দুই ঠোঁট এক করে বসে রইল মঞ্জু, যদি এই চুপ করে থাকার ভেতর জয়া বিষয়টা ভুলে যায় সেই অপেক্ষায়।

কিন্তু আশ্চর্য্য! সুশৃঙ্খল চিন্তায় ফিরে এলো জয়া তার পূর্ব-বক্তব্য। বললো—আমি কেবল ভাবছি, এরা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসেছে। কিন্তু পুরুষগুলো কি নির্লজ্জ যে—এই ছবিটা নিয়ে সবার চোখের উপর ঘোমটা ছাড়া ঘুরছে ! গালের দু'পাশের, কপালের, দু চোখের তলার কালো রেখাগুলো আরো গভীর দেখাতে লাগল জয়ার।

এবার পত্রিকাটা টেনে নিয়ে আবোল-তাবোল ভাঁজ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল মঞ্জু টেবিলের উপর। আদেশের সুরে বললো—জয়া, এ সব নিয়ে আর কখনো মাথা ঘামাবে না তুমি। আমি যেমন এ জগতের নই তুমিও তেমনি এ জগতের কেউ নও।

আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল জয়া—আমি নই এ জগতের?

—না তুমি নও এ জগতের। পড়াশুনা আরম্ভ করতে হবে তোমার, পরীক্ষা দিতে হবে—তোমাকে।

—কি করে? কি করে পরীক্ষা দেবো আমি? যেন কেঁদে উঠল জয়া—আমার কিছু মনে থাকে না—কিছু না।

—মনে না থাকলেই যদি পড়াশুনা না হয় তবে আর কি। আমি ছেড়ে দিই পড়া। কারণ আমারও কিছু মনে থাকে না। এই তো এই মাত্র দেখলি গুণে আনা টাকাও দিতে গিয়ে ফের গুণে দিতে হলো। ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে বৌদি দিদিরা বলেন, আমার নাকি জুড়ি মেলা ভার।

—না, না, ব্যাকুলভাবে মাথা নেড়ে উঠল জয়া। তোর ভুলে যাওয়া এক জিনিষ নয়। মাথাটাকে এক এক সময় আমার ফাঁকা বেলুনের মতো মনে হয়—মনে হয় যেন শূন্যে উড়ে গেল বলে—মরে গেলাম বলে।

জয়ার মা চা আর মুড়ি ভাজার বাটি নামিয়ে রেখে গেলেন। মঞ্জু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভাজা মুড়ি মুখে ফেলে চলে গেল একেবারে অন্য কথায়—দাবা খেলা জানিস?

—দাবা? দু চোখ বড় করলো জয়া।

—হ্যাঁ দাবা! দিন রাত হাবি-জাবি ভাবলে মাথা এমনি শূন্য মনে হয় সবারই। দাঁড়া, দাবা খেলা শিখিয়ে দেবো তোকে। দেখবি মনের একাগ্রতা কেমন বেড়ে যাবে। অন্য কোন কথা মনে আসবে না। নে চায়ের কাপ নে। জয়ার হাতে কাপ তুলে দিল মঞ্জু। টেবিলে বসে থাকা জয়কে ডাক দিল—চলে এসো জয়, তোমার চা খাবার নিয়ে এখানে। টেবিলের সামনে সেই প্রথম থেকে বই নিয়ে বসেছিল জয়। শুধু বসে নয়, মঞ্জু জানে সে পড়ছিলও। স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না সে, তার বই নেই। তার খাতা নেই তবু সে পড়ছিল—কোন দিকে মন না দিয়ে পড়ছিল। শুধু ওর প্রথম ঘরে ঢোকার সময় একবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। তারপর এতক্ষণের ভেতর সে তার বই-এর পাতা থেকে চোখ তুলেছিল মাত্র আর একবার—দিদির অসুস্থ হাসি শুনে। মঞ্জুর সাদর আহ্বানে হাসি মুখে চা আর মুড়ির বাটি দু'হাতে নিয়ে উঠে এসে বসল সে মেঝের উপর। তার দিকে তাকিয়ে মঞ্জুর মনে হলো, ফ্রন্টে যুদ্ধরত সৈনিকের মুখের সতর্কতা সন্দেহ অবিশ্বাস আতঙ্কের মতো যে রেখাগুলো সে প্রথম এসে জয়ের মুখে দেখেছিল, সে রেখাগুলো যদিও আজ মিলিয়ে গেছে তার মুখ হতে, তবু এখনও সেখানে যুদ্ধশান্তির শান্ত স্পর্শ লাগেনি। বহু জীবন জিজ্ঞাসার ভেতরটা যেন তার উদ্বেলিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা নিয়ে সে কারু কাছে যায় না—যাবে না। যার জবাব খুঁজে বের করাটা রেখে দিয়েছে সে নিজের জন্য।

যেদিন ফ্রন্টে শান্তি ঘোষিত হয়েছিল সেদিন হাতের অস্ত্র নামাতে পেরেই কি শান্ত হতে পেরেছিলেন রেমার্ক? পারেন নি। হয়তো শান্ত হতে পেরেছিলেন কিছুটা শুধু মাত্র সে দিন, যেদিন 'অলকোয়াইট' শেষ করে হাতের কলম নামিয়ে দিলেন। সুকান্তের মুখের অশান্ত রেখায় হয়তো শান্তির ঢিলে ভাব আসতো তখন, যখন তার কলম ছুটে চলতো—

> কলম বিদ্রোহ আখনি তুমি?
> রক্তে কিছু পাওনি শেখার?···
> কলম বিদ্রোহ আজ—
> ···এতো বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
> দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
> স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
> শুনছো? শুনছো উদ্দাম কলরব—

শুধু বুঝি তখনই তার মুখের তীরের মতো রেখাগুলো দাঁড়াত স্থির হয়ে।

এই কিছু বেশী টাকা জয়ার মা'র হাতে দিয়ে আসতে পেরে দিন-ন-চলা বেকার গৃহস্বামীর কিছু দিন নির্ভাবনায় কাটাবার মত সংস্থান করে উঠতে পারার আরামবোধ করতে লাগল মঞ্জু। মাথাটাই যেন হাল্কা মনে হতে লাগলো তার। সে খেয়াল করলে না, এ টাকা ক'টা আর কাজ পাওয়ার একদিনের একটা ভিত্তিহীন অনিশ্চিত আলোচনায় যতটা হাল্কাবোধ করা যায়, তুলনামূলক বিচারে তার হাল্কাবোধের পরিমাণটা অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। আসলে ঐ টাকা নয় একটা কাজ হওয়ার ভরসাও নয়—সে যা সম্ভাবনা রয়েছে তো রয়েছেই। আর যদি না হয়? মন তাতেও আর অন্ধকার দেখছে না—এই হলো আসল কথা। রক্তত আছে, এমন একটা হিসাব, তার অবচেতন মন হিসাবের খাতায় ধরে বসে আছে এবং যে অসহায়বোধ সে করছিল তা এখন আর সে করছে না। "আছে"—পেছনের এই থাকার জোরের মত জোর আর কিসে?

টেবিল ঝেড়ে, বইপত্র গুছিয়ে এমন সুশৃঙ্খলায় পড়াশুনা আরম্ভ করে দিল মঞ্জু, বিস্মিত হয়ে গেল মৌরীও। যার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, নিষ্ঠাও তার চোখেই সবার আগে ধরা পড়ে। খুসী হয়ে উঠল মৌরী—হ্যাঁ এ ভাবে পড়লে আমি বলছি, ঠিক তুই একটা ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে যাবি।

জানে না—মঞ্জু জানে না, ফার্স্ট ক্লাশ না সেকেণ্ড ক্লাশ, কি সে পাবে। সে জানে পড়াশুনো তাকে ক'রতে হবে। যত কিছুই করুক, তার ভেতরে এ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে, তাকে পথভ্রষ্ট হ'তে হবে। বড় হ'তে হবে তাকে, অনেক বড়। কাজ ক'রতে হবে তাকে—অনেক কাজ। আর এই সবের একমাত্র পাথেয় হ'লো অর্থপুঁজি নয় বিদ্যার পুঁজি। এ পুঁজি তার সঞ্চয়ে সঞ্চয়ে ভ'রে তুলতে হবেই। কিন্তু বর্তমান সময়টা মঞ্জুর ওপর নিয়ে এসেছিল একটা অশান্ত হাওয়ার ঢেউ। যেমন বৈশাখ নিয়ে আসে সঙ্গে ক'রে ঝড়। ঠাণ্ডা হয়ে বসবার অবসর মিললো না তার। সময়ের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের আঁক-কষা নির্ভুল হিসাবের মত দুর্ভাগ্য মানুষের—তার জন্মপত্রিকায় তেমন নির্ভুল আঁক হয় না। যদি হ'তো তাহ'লে এমন আয়োজন ক'রে পড়তে না বসে মঞ্জু তৈরী হ'তো সামনের দুর্দৈবের জন্যে। [ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেন

এ্যাপোলো

স্পার্টার রাজা টিনডেরিয়াসের পত্নী লীডার রূপের সীমা নেই। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, দেশ বিদেশে আলোচনা চলে তাঁর রূপের, এমন কি অলিম্পাসের দেবতারাও লীডার সৌন্দর্য্যের কথা আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন অলিম্পাসের দেবীদের মধ্যেও এমন রূপ দুর্লভ। তাঁদের কথা শুনে দেবীরা হিংসায় জ্বলে মরেন।

অবশেষে দেবরাজ জিয়ুসের কানেও গিয়ে পৌঁছল লীডার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি, লীডার রূপের কথা শুনে জিয়ুসের বাসনা হল তাঁকে দেখতে। এমন সুন্দরী যে নারী সে ত দেবভোগ্যা। দেবতাদের উপভোগের জন্যই না তার সৃষ্টি। জিয়ুস তাঁকে দেখতে যাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু তাঁর এই মনের কথা তিনি মনেই লুকিয়ে রাখলেন। কারণ দেবরাণী হেরা তাঁর ইচ্ছার কথা জানলে মহা অনর্থের সৃষ্টি করবেন।

ভয়ানক ঈর্ষাপরায়ণা দেবী এই হেরা। দেবরাজ মর্ত্যের কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না তিনি। স্বর্গ-মর্ত্ত জুড়ে এক বিষম আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। হেরার এই মানবীসুলভ ঈর্ষার কথা জিয়ুস জানেন। এর আগে দু'-একবার মর্ত্যের নারীর প্রতি দুর্বলতার ফলে তাঁকে ভুগতেও হয়েছে। তাই তিনি এখন বিশেষ সাবধান হয়েছেন।

জিয়ুস সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। অবশেষে একদিন সে সুযোগ মিলেও গেল। সুযোগ পেয়ে হেরার অগোচরে চুপে চুপে তিনি হাজির হন স্পার্টায়, রাজা টিনডেরিয়াসের প্রাসাদে। সেখানে তিনি স্বচক্ষে দেখেন রাণী লীডাকে। সত্যিই অপরূপা সুন্দরী তিনি। তাঁকে দেখে জিয়ুস মুগ্ধ হন। লীডার সঙ্গলিপ্সায় অধীর হয়ে ওঠে তাঁর চিত্ত। কিন্তু লীডা তখন রাজা টিনডেরিয়াসের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধা। রাজার সাথে এক বিচিত্র কেলিতে মেতে উঠেছেন তিনি। অদৃশ্য জিয়ুস গোপনে দেখেন সে দৃশ্য।

প্রেমকেলি সমাপনান্তে রাজা তৃপ্তচিত্তে বিদায় চান রাণীর কাছে। রাজসভায় তাঁর অনেক কাজ বাকী। রাণী লীডাও তৃপ্ত হয়েছেন তাঁর সঙ্গ পেয়ে। তিনি রাজাকে বিদায় দেন তখনকার মত। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হন প্রমোদ উদ্যানের দিকে। সরোবরে স্নান শেষ করে তিনি আবার নূতন সজ্জায় ভূষিত হয়ে মিলিত হবেন রাজার সঙ্গে, তারপর আবার মন্মথক্রীড়ায় মেতে উঠবেন তাঁরা।

রাণী যান সরোবরের দিকে, সখীরাও সাথে আসতে চায়, কি মনে করে তাদের বারণ করেন লীডা। তিনি একাই যাবেন অবগাহনে, প্রিয়সঙ্গের নিবিড় সুখে তাঁর মন এখনো আহ্লাদিত। অপরের সাহচর্য্যে তাঁর প্রয়োজন নেই। একা একাই জলকেলি করবেন তিনি।

লীডা উপস্থিত হন সরোবরের তীরে। তারপর ধীরে ধীরে পা ডুবান জলে। শীতল জলের স্পর্শ তাঁকে আবিষ্ট করে। তাঁর মনে হয় তিনি যেন নূতন করে অনুভব করেছেন প্রিয়সঙ্গ, আপন মনে একা একাই জলকেলিতে রত হন তিনি। এমন সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তীরের দিকে। তিনি দেখেন সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন এক অপূর্ব সুন্দর জ্যোতিষ্মান পুরুষ।

তাঁকে দেখে বিস্মিত হন লীডা। অসময়ে তাঁর প্রমোদ সরোবরের তীরে কে এই সুন্দর পুরুষ! তিনি জল ছেড়ে তাড়াতাড়ি তীরের দিকে অগ্রসর হন, তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে সেই অপরিচিত পুরুষ হাসতে থাকেন মৃদু মৃদু, অপরিচিতের এই ধৃষ্টতায় বিস্মিত হন রাণী লীডা। রাণীর প্রমোদ উদ্যানে কি সাহসে ঢুকেছে এই অজানা মানুষটি। সে কি জানে না তিনি কে? স্পার্টার রাজমহিষীকে দেখে সমীহ করে না এমন দুঃসাহসী কে এই অপরিচিত?

রাণী ক্রোধভরে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে যান। কিন্তু এই অপূর্ব সুন্দর পুরুষটির মধ্যে কি যেন এক মহিমা লুক্কায়িত আছে যা তাঁকে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে দেয় না। তিনি ভালো করে তার দিকে তাকান, দেখেন যে অপরিচিত তখনো তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

লীডার স্মরণ হয় তাঁর স্বল্প অঙ্গাবরণের কথা। তাও জলে ভিজে তাঁর দেহের সঙ্গে মিশে গেছে। তিনি লজ্জিত হন মনে মনে। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কে? আর কেনই বা আমার এই প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করেছেন?

সেই অপরিচিত পুরুষ তখন রাণীকে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে তিনি দেবরাজ জিয়ুস, দেবসভায় রাণী লীডার অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতেই অলিম্পাস ত্যাগ করে স্পার্টায় এসেছেন। তিনি বলেন যে, রাণী লীডাকে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেবরাজকে মুগ্ধ করেছে, রাণী লীডার নিবিড় সঙ্গ কামনা করেন তিনি।

জিয়ুসের কথা শুনে চমকিতা হন লীডা। তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দেবরাজ। আর তিনি কামনা করছেন তাঁর, এক মর্ত্তের মানবীর সঙ্গ, তিনি বিচলিত বোধ করেন। কি উত্তর দেবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না লীডা।

জিয়ুস আবার তাঁকে জানান, তাঁর কামনার কথা। লীডার মত রূপ দেবলোকেও দুর্লভ। দেবরাজ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে পাবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্ত।

তাঁকে কি উত্তর দেবেন, ঠিক করে উঠতে পারেন না লীডা। দেবরাজ জিয়ুসের মহিমান্বিত মূর্ত্তি তাঁকেও আকৃষ্ট করেছে। আর তা ছাড়া মর্ত্তের মানবীর পক্ষে দেবরাজের সঙ্গ পাওয়া ত' ভাগ্যের কথা। কিন্তু তাঁর মনে হয় তাঁর স্বামীর কথা। একটু আগেই স্বামীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধা ছিলেন তিনি। স্বামিসাহচর্য্যের পরিতৃপ্তি এখনো তাঁকে ঘিরে আছে। তবে কি করে আবার তিনি দেবরাজের আলিঙ্গনে নিজেকে ধরা দেন। কোন উত্তর দেন না লীডা। অবনত বদনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন তিনি।

জিয়ুস বুঝতে পারেন তাঁর দ্বিধার কথা, কিন্তু তিনি তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছেন লীডার সঙ্গ লালসায়। তাই লীডার সব দ্বিধাকে দূর করতে তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি তাঁকে পরিবর্ত্তিত করেন এক রাজহংসীতে আর নিজেও এক রাজহংসের রূপ ধারণ করেন।

এই পরিবর্ত্তনে লীডা প্রথমে হতচকিতা হয়ে যান। কিন্তু তারপরেই তিনি বুঝতে পারেন দেবরাজ জিয়ুসের কৌশল। মানবীরূপে জিয়ুসের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে তাঁর দ্বিধা আছে বলেই দেবরাজ তাঁকে মরালীতে রূপান্তরিত করেছেন। যাতে নতুন রূপে জিয়ুসের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে তাঁর আর কোন সঙ্কোচ না থাকে। এই সময় রাজহংসবেশী জিয়ুস আবার আহ্বান জানান লীডাকে। লীডাও এবার আনন্দের সাথে সাড়া দেন তাঁর আহ্বানে।

তারপর মরাল আর মরালী সেই সরোবরে এক অভিনব ক্রীড়ায় মেতে ওঠে। তাদের পক্ষ বিধূননে সরোবরের জল হয় আলোড়িত। তারা কখনো পাশাপাশি ভেসে চলে, কখনো চঞ্চুতে চঞ্চু ঠেকিয়ে পরস্পরকে আদর করে। আবার কখনো বা একের উপর দেখা যায় আরেক জনকে।

লীডার সাথে দীর্ঘকাল কাটিয়ে অবশেষে দেবরাজ জিয়ুস ফিরে যান দেবলোক অলিম্পাসে। রাজহংসী থেকে পুনরায় মানবীতে রূপান্তরিতা হয়ে লীডাও ফিরে আসেন প্রাসাদে রাজা টিনডেরিয়াসের কাছে। টিনডেরিয়াস তাঁকে সাগ্রহে বাহুপাশে টেনে নেন। লীডাও ধরা দেন তাঁর বাহুবন্ধনে। কিন্তু তাঁকে সেদিন যেন কেমন আনমনা মনে হয়।

এর পরেই লীডা গর্ভবতী হন। এবং যথাসময়ে তিনি দুটি ডিম্ব প্রসব করেন। এরই একটি ডিম্ব থেকে জন্ম হয় হেলেনের।

জন্মাবধি হেলেন অনুপমা সুন্দরী, শিশু হেলেনকে যে দেখে সেই বিস্মিত হয়। মর্ত্তলোকে এ সৌন্দর্য্য একেবারে কল্পনাতীত। এত রূপ ত দেবলোকেও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট হেলেন তাঁর পিতামাতার নয়নমণি। তাঁদের আরো সন্তান আছে বটে, কিন্তু তারা কেউই হেলেনের মত তাঁদের প্রিয় নয়। অবশ্য এজন্ত তার ভাই-বোনেরা কেউই হেলেনকে ঈর্ষা করে না। হেলেন তাদেরও সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্রী। এইভাবে সকলের আদর আর ভালবাসার মধ্যে হেলেন বড় হতে থাকে।

হেলেনের বয়স যত বাড়তে থাকে তার রূপের খ্যাতিও ততই বেড়ে চলে। শিশু হেলেনের স্বর্গীয় রূপ সকলকে করত বিস্মিত ও মুগ্ধ। বালিকা হেলেনের অনুপম রূপ ও লাবণ্য এবার পুরুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করল। হেলেনের যে রূপ এর পর অগণিত লোকের হৃদয় হরণ করেছে, অসংখ্য লোকের সর্বনাশ করেছে, বিভিন্ন রাজ্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে, হেলেনের বালিকা বয়সেই তার সূচনা দেখা গেল।

হেলেনের বয়স যখন সবে দশ, তখনই তাঁর রূপের আগুনে পুড়ে মরতে দেখা দিল প্রথম পতঙ্গ—গ্রীক-বীর থিসাস।

নানা দুঃসাহসিক এবং বীরত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনের জন্ত থিসাস ছিলেন দেশের সর্বত্র বিশেষরূপে খ্যাত। যৌবনে অনেক দুর্দান্ত দস্যু এবং অত্যাচারীকে দমন করে সকলের শ্রদ্ধা এবং সম্মান অর্জন করেছেন তিনি। কিন্তু থিসাসের এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল। নারীর প্রতি আকর্ষণ তাঁর অসীম, নারী বিশেষতঃ সুন্দরী নারীর সন্ধান পেলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যেমন করেই হোক তাকে পেতে চেষ্টা করতেন, এর আগেও এ্যারিএডেন, এণ্টিওপি এবং এনেস্সাকে তিনি হরণ করে এনেছেন।

এথেন্স নগরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ বীর থিসাসের বয়স তখন পঞ্চাশ। রাজকার্য্য থেকে কিছুদিনের মত অবসর নিয়ে বন্ধু পেইরীথুসের সাথে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি। গ্রীসের বিভিন্ন নগরী রাজ্যগুলি দেখে বেড়াচ্ছেন তাঁরা।

থিসাস বিভিন্ন নগরী দেখেন আর তুলনা করেন তাঁর প্রিয় এথেন্সের সাথে তাঁর সাধের এথেন্সকে তিনি যেমন সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন তেমন আর কোন নগরকেই তাঁর মনে হয় না। এথেন্স হল সব নগরীর সেরা। তার সাথে আর কারুরই তুলনা চলে না।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে দুই বন্ধু অবশেষে একদিন এসে হাজির হলেন স্পার্টায়, স্পার্টায় তখন উৎসব শুরু হয়েছে আর্টেমিস আর্থিয়ার মন্দিরে। থিসাস আর পেইরীথুসও যান আর্টেমিসের মন্দিরে উৎসব দেখতে।

তাঁরা যখন মন্দিরে গিয়ে পৌঁছুলেন তখন উৎসব বেশ জমে উঠেছে। সবাই উৎসবে মত্ত। থিসাস এবং পেইরীথুসকেও তারা সাদরে আমন্ত্রণ জানায় তাদের সাথে উৎসবে যোগ দিতে।

থিসাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন তাদের উৎসব—এবার শুরু হয় বালিকাদের নৃত্য। কুমারী বালিকারা নানা ভঙ্গীতে নাচতে থাকে মন্দির-প্রাঙ্গণে। অন্যান্যদের সাথে থিসাস এবং পেইরীথুসও তাদের মনোহর নৃত্য দেখতে থাকেন।

হঠাৎ তাঁদের চোখ গিয়ে পড়ে অপরূপ সুন্দরী এক বালিকার ওপর। কুমারীদের সাথে সেও নাচছে। কিন্তু তার পাশে অপর সবাইকে যেন মলিন বলে মনে হয়। থিসাস বিস্মিত হন বালিকা হেলেনের রূপ দেখে।

এ যেন অপরূপ এক ফুলের কুঁড়ি। কুঁড়িই যদি এত সুন্দর হয় তবে ফুল না জানি কত সুন্দর হবে, থিসাস ভাবেন মনে মনে। তাঁর জীবনে অনেক সুন্দরী নারী তিনি দেখেছেন। অনেক

নারীকে তিনি বাহু বলে জয় করেছেন কিন্তু এমন রূপ তাঁর চোখেও আর আগে কখনো পড়ে নি।

বালিকা হেলেনের রূপের আগুন প্রৌঢ় থিসাসকে দগ্ধ করল। হেলেনকে পাবার জন্য তিনি হলেন ব্যাকুল। বন্ধু পেইরীথ্যুসকে তিনি জানালেন তাঁর মনের কথা।

পেইরীথ্যুসও হেলেনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মনেও জ্বলে উঠেছে কামনার আগুন। দুই বন্ধুর মধ্যে পরামর্শ চলে। ঠিক হয় তাঁরা উৎসবক্ষেত্র থেকে হেলেনকে হরণ করে নিয়ে যাবেন। তারপর তাঁর ওপর তাঁরা দুজনে বাজী রাখবেন। বাজীতে জিনি জিতবেন হেলেনকে তিনিই লাভ করবেন।

থিসাস আর পেইরীথ্যুস সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। তারপর এক সময় শিকারী বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃত্যরতা হেলেনকে হরণ করে দুই বন্ধু পালাতে থাকেন। উৎসবমত্ত জনতা এই আকস্মিক বিপর্যয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা ভাল করে অপহরণকারীদের অনুসরণ পর্যন্ত করতে পারে না, দেখতে দেখতে দুই বন্ধু হেলেনকে নিয়ে তাদের চোখের আড়ালে চলে যায়।

তারপর হেলেনের ওপর বাজী রাখেন দুজন। দুজনেরই মনে আশা বাজীতে বোধ হয় সেই জিতবে, শেষ পর্যন্ত হেলেনকে পান থিসাস।

বালিকা হেলেন এতক্ষণ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দুই প্রৌঢ়ের বাজী ধরা দেখছিল। হেলেনকে ওরা হরণ করে এনেছে উৎসবক্ষেত্র থেকে। ওদের ব্যবহারে সে বিস্মিত হয়েছে বটে কিন্তু ভয় পায়নি। ভয় তার কখনই করে না। নতুন কিছু ঘটলে সে ঔৎসুক্য অনুভব করে মাত্র। তাতে সে ভীত বোধ করে না।

আর আজকের ব্যাপার খুব নতুন কিছুও ত' নয়। সে ত' মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করেছে তাকে দেখে পুরুষ কেমন বিস্মিত কেমন মুগ্ধ হয়। তার মনে হয়েছে তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন বন্দনা জানাচ্ছে তাকে। সে ভাল করে বুঝতে পারে না ঠিকই কিন্তু এ অনুভূতি তার আগেই জন্মেছে। ঐ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আগুনের ঝিলিকও সে আগে লক্ষ্য করেছে কি? কি জানি হেলেন ঠিক মনে করতে পারে না। তবে আজ সে অনুভব করে থিসাসের চোখে যেন জ্বলছে কিসের আগুন। হেলেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে থিসাসকে কৌতূহলী চোখে।

থিসাসও ভালো করে দেখেন হেলেনকে, দশ বছরের বালিকা কুমারী হেলেন। কি সুন্দর, কি সুন্দর! থিসাস বলেন মনে মনে। এ যেন দেবী এফ্রোদিতির মোহিনী মূর্তি বালিকারূপে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সম্মুখে। থিসাস আবার মুগ্ধ হন, আর মনে মনে আনন্দিত হন নিজের সৌভাগ্যে।

কিন্তু প্রবীণ থিসাসের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল, বালিকা হেলেন অপরূপা সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তখনো দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। থিসাস অচিরেই বুঝতে পারেন তাকে এখনো অপেক্ষা করতে হবে। হেলেনকে তখন তিনি নিয়ে যান এ্যাফিডনীতে তাঁর মা এ্যাথ্রার কাছে। মার হাতে তিনি সমর্পণ করেন হেলেনকে। মাকে বলেন, অতি সঙ্গোপনে হেলেনকে লুকিয়ে রাখতে। কেউ যেন না জানতে পারে তার কথা। তারপর এ্যাফিডাসের ওপর তাদের রক্ষার ভার দিয়ে পেইরীথ্যুসের সাথে থিসাস আবার বেরিয়ে পড়েন দেশ ভ্রমণে। বন্ধু পেইরীথ্যুসকে তিনি কথা দিয়েছেন তাঁকেও তিনি সুন্দরী কন্যা জোগাড় করে দেবেন। তারই খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়েন দুই বন্ধু।

এদিকে হেলেনের ভাইরাও তাঁদের অপহৃতা ভগিনীর খোঁজে বেরোন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা এটিকায় এসে উপস্থিত হন। তাঁরা জানতে পারেন থিসাস হেলেনকে এখানেই কোথায়ও লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁরা সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন হেলেনের কথা। কিন্তু কেউই বলতে পারেন না, থিসাস তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন।

অবশেষে একাডেমাসের কাছে তাঁরা হেলেনের খোঁজ পান। বোনকে উদ্ধার করতে হেলেনের ভাইরা এফিড্‌নী আক্রমণ করেন। থিসাস নেই। কে ঠেকাবে তাঁদের! এফিড্‌নী দখল করে হেলেনকে উদ্ধার করে বিজয় গর্বে তাঁরা ফিরে যান স্পার্টায়, আর সাথে বন্দিনী করে নিয়ে যান থিসাসজননী এ্যাথ্রাকে। পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয় এ্যাথ্রাকেও। জীবনের অবশিষ্টাংশ হেলেনের ক্রীতদাসীরূপে কাটাতে হয় তাঁকে।

রাজা এডোনিয়াসের কন্যা কোরেকে অপহরণ করতে যেয়ে পেইরীথ্যুস প্রাণ হারালেন। বন্ধুকে হারিয়ে থিসাস এথেন্সে ফিরে দেখলেন হেলেনকে তার ভাইরা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন, এবং ক্রুদ্ধ এথেনীয়ানরা তাঁকে করেছে রাজ্যচ্যুত। হৃতরাজ্য অপমানিত থিসাস দেশত্যাগ করে স্কাইরোসে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে রাজা লাইকোমিডিসের হাতে প্রাণ হারালেন। এই ভাবে হেলেনের প্রথম অপহরণকারী থিসাসকে লাঞ্ছিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হল।

হেলেনকে উদ্ধার করে তাঁর ভাইরা আবার ফিরে এলেন স্পার্টায়, তাঁদের নয়নের মণি হেলেনকে পেয়ে রাজা টিনডেরিয়াস এবং রাণী লীডা যেন প্রাণ ফিরে পান। আবার পিতৃগৃহের নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে থাকেন হেলেন।

দেখতে দেখতে বালিকা হেলেন কিশোরী হয়ে ওঠেন, কিশোরী হেলেন হন যুবতী। যে দেখে সেই বিস্মিত হয়। আর ভাবে মর্তের মানবী এমন দেবদুর্লভ রূপ কোথা থেকে পেল গো!

তাঁর রূপের খ্যাতি আর কেবল স্পার্টার ক্ষুদ্র প্রান্তরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তা ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রীসে, সমস্ত গ্রীসে আলোচিত হয় তাঁর রূপের কথা। সবাই বলে এমন রূপ আর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

সারা গ্রীসের বীর এবং রাজাদের কানে পৌঁছায় হেলেনের খবর। তাঁরাও শোনেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেলেনের রূপের খ্যাতি। শোনেন আর একে একে হাজির হন স্পার্টায়। এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন রাজা টিনডেরিয়াসের প্রাসাদে।

স্পার্টায় এসে তাঁরা দেখতে পান হেলেনকে। তাঁকে দেখে তাঁদের মনে হয় যে এতদিন যা শুনেছেন তা সত্যি নয়। সবাই তাঁর রূপের প্রশংসাই করেছে কিন্তু তিনি যে এত সুন্দর তা ত কেউ বলে নি! নারী যে এত সুন্দরী হতে পারে এ ত তাঁরা নিজেরাই কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁদের মনে হয় বিধাতা যেন বিশ্বের সব সৌন্দর্য্যকে তিলে তিলে আহরণ করে তিলোত্তমা-রূপে গড়েছেন হেলেনকে। তাঁরা আবার দেখেন হেলেনকে। বার বার দেখেন। আর যত দেখেন ততই মুগ্ধ হন।

হেলেনকে লাভের আশায় মিনেলাস, ডায়োমিডি, ফিলোকটেটস, ইডোমেনাস, মেরিওণ, পেট্রোক্লাস, এ্যাজাক্স, এণ্টিলোকাস, ওডিসিয়াস আদি গ্রীসের তিরিশ জন শ্রেষ্ঠ বীর একে একে এসে হাজির হন স্পার্টায়। তাঁরা সবাই সাথে করে এনেছেন বহুমূল্য সব উপহার। মহার্ঘ উপহার দিয়ে তাঁরা জয় করতে চান রাজা টিনডেরিয়াসের হৃদয়।

রাজা টিনডেরিয়াস পানিপ্রার্থীদের তাঁর প্রাসাদে বাস করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর রয়েছে সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু পানিপ্রার্থীদের এই বিপুল সমাগমে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবেন সমাগত এই বীরদের মধ্যে যাঁকে তিনি কন্যা হেলেনের স্বামিরূপে মনোনীত করবেন। এক জনকে তাঁকে নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু তাতে অন্য সবাই বিক্ষুব্ধ হবেন। তখন তাঁরা যদি সমবেত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন তাহলে তিনি গ্রীসের রাজাদের সম্মিলিত এই আক্রমণকে ঠেকাবেন কি করে? টিনডেরিয়াস অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তিনি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন সবাইকে। কিন্তু কারো উপহারই তিনি গ্রহণ করতে সাহসী হন না।

এই বিপদ থেকে কি ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, চিন্তা করতে থাকেন টিনডেরিয়াস। কিন্তু ভেবে ভেবেও কোন উপায় তিনি বের করতে পারেন না। এই সময় একদিন ওডিসিয়াস এসে তাঁকে বলেন যে তিনি যদি তাঁর ভাই ইকেরিয়াসের কন্যা পেনিলোপির সাথে তাঁর বিবাহ দিতে সম্মত থাকেন তাহলে তিনি তাঁকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। রাজা টিনডেরিয়াস সাগ্রহে গ্রহণ করেন তাঁর প্রস্তাব।

তখন অডিসিয়াস তাঁকে জানান তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি বলেন, সমবেত পানিপ্রার্থীদের কাছে রাজা প্রস্তাব করুন যে, তাঁর কন্যা হেলেন যাঁকে পছন্দ করবেন তাঁর সাথেই হেলেনের বিবাহ হবে। তবে গ্রীক বীরদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে হেলেনের মনোনয়ন তাঁরা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন। এবং হেলেনকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যদি কেউ হরণ করে নিয়ে যায় তবে তাঁরা সম্মিলিত ভাবে অপহরণকারীকে সাজা দেবেন এবং হেলেনকে উদ্ধার করতে তাঁরা তাঁর স্বামীকে সাহায্য করবেন।

ওডিসিয়াসের কথামত টিনডেরিয়াস সমবেত বীরদের কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে তাঁরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে শপথ করলেন যে, হেলেনের মনোনয়নকে তাঁরা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেবেন এবং তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কেউ অপহরণ করলে তাঁরা সম্মিলিত ভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে কা'কে পছন্দ করবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না হেলেন। এঁরা সবাই গ্রীসের নামজাদা বীর। রূপে গুণে কেউই কম নন। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর স্বামী হবার উপযুক্ত। অনেক চিন্তার পর গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ধনী রাজা এ্যাগামেমননের ভ্রাতা কুমার মিনেলাসকে তাঁর স্বামিরূপে বরণ করলেন হেলেন। বিপুল সমারোহের মধ্যে মিনেলাসের সাথে হেলেনের বিবাহ হল। নবদম্পতিকে তাঁদের শুভকামনা জানিয়ে সমবেত বীররা স্পার্টা ত্যাগ করলেন।

এর কিছুদিন পরেই রাজা টিনডেরিয়াস মারা যান। পুত্র ক্যাষ্টর আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাই টিনডেরিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা মিনেলাসই হন স্পার্টার রাজা, সুন্দরী রাণী হেলেনকে নিয়ে পরম সুখে দিন কাটতে থাকে তাঁর।

ঝাড়ুদারের বউ

[একটি মেথর মেয়ের জীবনের রোমান্স ও ট্রাজেডী]

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

লারি কেঁদে কেঁদে দুচোখ লাল করেছে। শাশুড়ীর গঞ্জনা আর সহ্য হয় না। কারণে অকারণে কি বকুনিটাই না দেয়। সেই কোন সক্কালে মুখে জলটুকু পর্য্যন্ত না দিয়ে ঝাড় হাতে বের হয় লারি।

শীতের প্রভাত কুয়াশায় ছেয়ে থাকে চারদিক, রাস্তায় ঝাড়ু চালাতে হাত আর উঠে না। অবশ হয়ে যায়। আজ ঠাণ্ডাটা বড় বেশী, গায়ের চোলী ওড়না হিমবরফ হয়ে শরীরের রক্ত জমিয়ে দিচ্চে। মাঝে মাঝে লারি আবক্ষ লম্বা ঘোমটা তুলে এদিক ওদিক চাইছে। লারি এগিয়ে চলল ঝাড়ু লাগাতে লাগাতে পাকা সড়ক ধরে। কাহার-বস্তির দু-চারটে বউ উঠে বেরিয়ে পড়েছে কাজে, বাসন মাজতে হবে তাড়াতাড়ি বাবুদের বাড়ীতে। সবারই অফিস আছে। বড় কাহার ছেলেটা পাড়ার আরো দু-চারটে ছেলে-মেয়ে জমিয়ে ঘরের দোরে রাস্তায় খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়েছে। অর্দ্ধনগ্ন ছেলেমেয়েগুলো অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে গোল হয়ে বসেছে। লারি আগুনটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে, সে যদি ঐ গরম আগুনটার পাশে বসতে পেত, ঐ লাল লকলকে অগ্নিশিখাতে হাত-পাগুলো একটু সেঁকে নিতে পারত। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে ঝাড় চালাতে লাগল। এদিকে এক ঝাপটা। ওদিকে এক ঝাপটা। যা ময়লা তাতে আসে সেটুকুই জমিয়ে নেয়। নিখুঁতভাবে ঝাড়ু চালাবার মত তার মনের অবস্থা নয়। লম্বা বাঁশের শলার ঝাড়ুটা দিয়ে যেন সে রাস্তাটাকে পিটিয়ে চলেছে, তার লাল মোটা মলিন ঘাঘরাটা চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটাচ্ছে আর উঠছে।

চলতে চলতে লারি সিদ্ধির ছোট দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। সিদ্ধির ছোট কাঠের দোকানের দরজা খুলে গেছে। দুহাত উঁচু কয়লার চুলাটাতে এরই মধ্যে কয়লার আগুন গনগন করছে। আর বড় কালো কেটলীটার জল ফুটছে টগবগ করে। দু-চার জন খদ্দিদার এসে জুটে গেছে, লারি হাতের কাজ স্থগিত রেখে দোকানটার দিকে চেয়ে রইল। সিদ্ধি দোকানদার চট করে চা ভিজিয়ে ফেলেছে ছোট ছোট চীনামাটির পেয়ালাতে ধূমায়িত চা ঢেলে দিয়ে এক এক পেয়ালা খরিদ্দারের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে আর পকেটে দু, দু আনা পয়সা ফেলছে। লারি লুব্ধ নয়নে চেয়ে রইল ওই ধূমায়িত গরম চায়ের পেয়ালার দিকে। আহা, সে যদি ঐরকম একটা পেয়ালায় এখন একটু গরম চা খেতে পারত। আঃ তার শরীরটা কেমন তাজা হয়ে উঠত তা হলে, কিন্তু তার অদৃষ্টে কি এই সুখ আছে? কি জন্যই না নিয়ে এসেছে সে। শুধু ঝাড়ু লাগাও, আর ঝাড় লাগাও, আর বাকী সময়টা শাশুড়ীর গঞ্জনা, আর ঘরের কাজ।

লারি চায়ের ষ্টল থেকে চোখ ফিরিয়ে মন দিল নিজ কাজে, তাড়াতাড়ি ঝাড় চালিয়ে ছুটল বড় সাহেবের বাংলোয়। সেখানকার কাজ শেষ করে যাবে কোর্টে ঝাড় লাগাতে, বারোটায় সব কাজ শেষ করে ফিরবে বাড়ী, একথা ভাবতে ভাবতে মনটা একটু খুশী হয়ে উঠে।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে উঠছে, বাড়ীতে গিয়ে দানাপানি পেটে পড়লে শরীরটা একটু তাজা হবে। খুশী মনে এগিয়ে চলে লারি, ঝম্ ঝম্ করে বেজে উঠে পায়ের পারজোড়। লারি জলদি চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারী লাল ঘাঘরাটাও দুলতে থাকে ত্রস্তে, মুখে একহাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা মুছে, লারি ঘোমটা তুলে, এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলল। রাস্তা নির্জন দেখলে কখনও বা গানের এক দু কলি গেয়ে উঠে। তার বয়স খুব বেশী হলে আঠারো-উনিশ। সংসারের দুঃখকষ্ট ওর মনের রস এখনও নিঃশেষ করে শুষে নিতে পারে নি। অকালে দু'-চারটে শিশুর জননী হয়ে তার জীবন এখনও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, তাই শাশুড়ীর গঞ্জনা খেলে এখনও মুখে হাসি ফুটে, মিঠে গলায় দু-এক লাইন গান গেয়ে ফেলে।

আজ চার বছর হল বিয়ে হয়েছে লারির, স্বামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়। স্বামী রেলের ঝাড়ুদার, বেশ মাইনে পায়। সন্ধ্যেয় মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে, বেশীর ভাগ রাতই মাতাল হয়ে এসে মাস্তলামী করে। যেদিন ঝাড়ুদার কিষাণের মেজাজটা থাকে বিগড়ে, সেদিন রাত্রে এসে যদি দেখে লারি ঘুমিয়ে পড়েছে তবে মেজাজটা যায় আরো খিঁচড়ে, ঘুমন্ত লারির গায়ে পা দিয়ে একটা ঠোক্কর দিয়ে বলে, এই বেগম-সাহেবা উঠ, মজাসে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে কেমন, আর আমি শালা, খেটে খেটে মরি। চা জলদি আন, রুটি গরম করে নিয়ে আয়, ঠাণ্ডা খাবার দিলে লাথি লাগাবো জোরসে।

লাথির নামে লারির চোখের ঘুম ছুটে যায়, আচমকা লাফিয়ে উঠে ঠোক্কর খেয়ে, চোখ কচলাতে কচলাতে উনুনে ফুঁ দিতে থাকে। ধোঁয়ায় আর মনের জ্বালায় চোখের জল ঝরতে থাকে। সারাদিন খেটেখুটে একটু আরামে ঘুমাবে, সে উপায়ও নেই। মাসের মধ্যে দু-চার দিন তার লাথি খাবার সৌভাগ্য ঘটে। লারির মনটা এক এক দিন বিষিয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে মা'র কাছে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু শাশুড়ী মাগী যেতে দেবে না, বলে, ঘরের কাজকর্ম্ম কে করবে?

কোন কোন দিন কিষাণের মেজাজটা বেশ খুশী থাকে, ফার্ষ্ট ক্লাশ,

সেকেণ্ড ক্লাশের ধনী আরোহীদের কামরা ঝেড়ে দু-চার আনা বকশিষ পেতে পেতে টাকা দেড় টাকায় পৌঁছে যায়। খুশীমনে বাড়ী ফিরে। সেদিন লারির অদৃষ্টটা ভাল থাকে। কিষাণের মিষ্টি কথায় আদরে লারি অন্য জগতে চলে যায়।

এমনি এক সুলগনে কিষাণ খুশীমনে বাড়ী ফিরে দেখে, লারি একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত মলিন শয্যায় শুয়ে আছে। মাথার লম্বা ঘোমটাটা অভ্যেসমত এখনও মুখের উপর পড়ে আছে বাক্সের ঢাকনার মত।

কিষাণ ধীরে ধীরে ঘোমটা সরিয়ে দেয়। সারা দিনের কর্ম্মক্লান্ত ঘুমন্ত শ্যামল মুখখানা কিষাণের মন মায়ায় ভরে তুলে। ধীরে ধীরে লারির লাল-নীল কাচের চুড়িভরা সুগোল হাতখানা টেনে ডাকে, লারি, ও লারি, ওঠ্, চল্ সিনেমায় যাবি ?

প্রথম যেন লারি বুঝতেই পারে না কিষাণের কথা। মিষ্টিগলায় কিষাণ ডাকছে, সে বিশ্বেস করতে পারল না। চোখ রগড়িয়ে লারি ভাবে, সে স্বপ্ন দেখছে, কিষাণের হাতের এক ধাক্কা খেয়ে লারি লাফিয়ে উঠে লাথি খাবার ভয়ে। কিন্তু রুদ্রমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে দেখে হাসিমুখ।

আশ্বস্ত হয়ে চলে উনানের কাছে ঝমঝমাঝম করে, কিষাণ হাতটা টেনে ধরে বলে, কোথায় যাচ্ছিস বল, সিনেমায় যাবি ? খুব ভাল খেলা আছে।

খুশীতে লারির চোখে-মুখে হাসি ঠিকরে পড়ে। ধপ করে বসে যায় কিষাণের পাশে। মেহেদী-রাঙ্গানো হাতে কিষাণের হাত ধরে বলে, সত্যি যাবে ?

সত্যি নয়ত মিছে নাকি ? এই দেখ কতকগুলো পয়সা উপরি পেয়েছি, বলে লারির হাতের উপর ঢেলে দেয় কিষাণ।

স্বামীর মিষ্টিকথায়, ব্যবহারে লারি যেন স্বর্গে উঠে যায়। তাড়াতাড়ি কিষাণকে খাইয়ে পোষাক পরতে সুরু করে। বিয়ের পর কিষাণ-তাকে একটা বড় বড় গোলাপফুল-ছাপ দেওয়া রঙ্গীন টিনের বাক্স কিনে দিয়েছিল। লারির কোমরে একটা শিকলে তার চাবি ঝুলানো থাকত। লারি সেই চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলে তার বিয়ের লাল টুকটুকে ঘাঘরাটা ও নকল জরির বর্ডার-দেওয়া ফুলতোলা ওড়নাটা বের করলে।

লারির গায়ে সহরের হাওয়া লেগেছে, সে দেখেছে বড় সাহেবের মেয়ে মাথার মাঝখানে সীঁথি কেটে কি সুন্দর দুদিকে দুটা বেণী করে। আজ সে-ও অমনি করে দুটা বেণী দুদিকে ঝুলিয়ে দিল। কপালের মাঝখানে একটা বড় কুঙ্কুম-ফোঁটা দিলে।

কিষাণ অবাক হয়ে বসে বসে লারির সাজপোষাক দেখছিল। ছোট একখানা কামরা, তারই এক কোণাতে একটা উনান, একপাশে একটা মাটির ভিট ; তাতে খানকতক বাসন উপুড় করা আছে। ঘরের চাল থেকে একটা বাঁশ লটকানো আছে, তাতে সকালে সব বিছানা চাদর ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখে। আর এক কোণায় দুটা পেরেকে রশি বাঁধা, তাতে কিষাণের ও লারির ব্যবহার্য্য কাপড়-জামা রাখা আছে।

দেয়ালে একটা সস্তার আয়না টাঙ্গানো। পাশে একটা কেরাসিন কাঠের বাক্সের উপর দুটা চিরুণী, এক টুকরা রঙ্গীন সাবান। দুটা চুলের ফিতা। দু-চারটে ক্লিপ পড়ে আছে। কিষাণের সামনে পোষাক পরতে লারির লজ্জা করতে লাগল, তাই কিষাণের একটা ধুতি বাঁশে ঝুলিয়ে আড় করে সে সযত্নে প্রসাধন করতে লাগল।

এত দিন কিষাণের চোখে লারি একটা ঘাঘরা-ওড়নার পুঁটুলিই ছিল। আজ কুঁড়ে ঘরে সামান্য একটা কেরাসিন লণ্ঠনের মৃদু আলোতে লারির সুঠাম ঋজুদেহ অপরূপ হয়ে দেখা দিল কিষাণের সামনে। অবাক হয়ে গেল কিষাণ।

তারা দুজনে যখন সিনেমার সেকেণ্ড শোর জন্য রাস্তায় নেমে পড়ল, তখন কে বলবে এই দম্পতি দিনের সেই নীল কুর্ত্তা আর আঙ্গিয়া পরিহিত কিষাণ! আর মোটা লাল ঘাঘরা পরিহিতা ঝাড় হাতে লারি!

দুজনে নিরালা রাস্তায় হাত ধরে চলল, বড়রাস্তায় উঠে হাত ছেড়ে পাশাপাশি যেতে লাগল। কিন্তু সেদিন রাতে লারি আর কিষাণের মনে যে মধুর অনুভূতি খেলে গেল, সে অনুভূতি তারা জীবনে আর কোন দিন খুঁজে পেল না।

গড্ডলিকা প্রবাহে দিন কেটে চলেছে দুজনের। কিষাণের আয় আজ-কাল অনেক বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মদের পরিমাণ। কিষাণের মনের গতির সঙ্গে তাল রেখে লারি চলতে পারছে না। যতি ভেঙ্গে যাচ্ছে।

কখন কখনো কিষাণের আদর সোহাগে লারি মনে করে সে ভূস্বর্গে আছে। আর কখন কখন লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মনে হয় সে নরকে ডুবে আছে। শাশুড়ী মরেও না তরেও না। বসে বসে খেয়ে খেয়ে এই মোটা জবরদস্ত হয়েছে। তার জিভের যোগান দিতে লারি হয়রাণ হয়ে উঠল।

সেদিন লারি অকারণে শাশুড়ীর বকুনি খেয়ে বলে ফেললে, সারাদিন ত খেটে মরছি, তবু কেন বকে চলেছ ?

শাশুড়ী তেড়ে উঠে বললে, হারামজাদী, আবার মুখকরা শিখেছিস ? যা বলব তাই করবি, নয়ত নোড়া দিয়ে মুখ থেঁতো করে দেব।

লারি অঝোরে কাঁদতে থাকে। তার দুঃখের কাহিনী কা'কে বলবে ? স্বামী বলতে যাকে বুঝায়, সে তো রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে। লারি কাঁদতে কাঁদতে ঝাড়ু চালায় আর মুখে বিড়বিড় করে বলে, কি জন্মই না এনেছি আমি! শাশুড়ীর বকা আর স্বামীর মার খেতে খেতে মরলাম। মাঝে মাঝে লারির সেই রাতটার কথা মনে পড়ে, যেদিন দু'জনে সেজে-গুজে সিনেমায় গিয়েছিল। আহা সিনেমাটা কি সুন্দর! শুধু ভাল ভাল সুন্দর পোষাকে সেজে-গুজে নাচ আর গান। আর পিয়ার সঙ্গে মিলন। এক একদিন হাতের ঝাড়ু চালানো দু-চার মিনিট বন্ধ রেখে লারি সিনেমার কথা ভাবে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

কিষাণ যেন ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। একদিন লারি বললে, চল না সিনেমায় যাই। কিষাণ ধমকে বললে, পয়সা যেন সস্তা দেখেছিস, যা রান্না করগে ভাল করে।

লারিতে যেন কিষাণ আর কোন মাধুর্য্য খুঁজে পায় না। লারি তার কাছে ভ্যাপসা হয়ে উঠেছে, যেন পান্তা ভাত।

লারির রুটিনবাঁধা জীবন চলেছে, সকাল ছয়টা থেকে বারোটা আর তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছয়টা অবধি বড় সড়কে ঝাড় চালানো

আর বড় বড় দু'-চারজন অফিসারের বাড়ী কাজ করা, তা ছাড়া রান্নাবান্না বাসন মাজা সব ত আছেই।

পুলিশ জমাদারের বাড়ীতে লারির ডিউটি পড়েছে মাসেক যাবৎ। তার ননদ ও বাড়ীতে কাজ করে। ননদ এখন আঁতুড়ঘরে, তাই লারি তার বদলে সে বাড়ীতে কাজ করছে। বাড়ীর গিন্নী কয়েক দিন হল বাপের বাড়ীতে চলে গেছে। লারি দু'বেলা কাজ করে। জমাদার ভারি মিষ্টি কথা বলে মাঝে মাঝে লারির ওড়নাতে ঢেলে দেয় উদ্বৃত্ত রুটি তরকারী মিঠাই, এসব নিয়ে চলে যায় লারি ঝম্‌ঝমাঝম্ করে পায়েল বাজিয়ে।

সন্ধ্যার সময় জমাদার প্রায়ই উঠানে পায়চারী করে, তার খাকী হাফপ্যান্ট আর চওড়া চামড়ার বেল্টটা যেন তার ভুঁড়ির পরিধিটা বেষ্টন করতে পারছে না ভাল ভাবে। গোল কালো মুখখানাতে মস্ত একজোড়া গোঁফের নীচে দাঁত বের করে হাসে, আর কুৎকুতে চোখ দুটো দিয়ে কেমন সাপের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অস্বস্তি লাগে লারির।

শীতের সন্ধ্যা, চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, লারি তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ী ফিরছিল। এমন সময় জমাদার হাঁক দিয়ে বললে, রুটি-ভাজি নিয়ে যা।

মুখের ঘোমটা আরো টেনে সঙ্কুচিত ভাবে লারি ওড়না তুলে ধরলে জমাদারের সামনে। জমাদার ওড়নায় রুটি ঢালতে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলে, বললে, লারি, তুই রোজ আমার কাছে আসবি, পা টিপে দিবি, আমি তোকে অনেক জামা কাপড় পয়সা দেব, তোর দুঃখ থাকবে না।

লারি হাত ছিনিয়ে ছুটে পালিয়ে এল। এই শীতের সন্ধ্যায়ও তার শরীর দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। পরের দিন জমাদারের বাড়ী যেতে লারির আর পা ওঠে না, কোনরকমে ভয়ে সে কাজ করে এল। সেদিন জমাদার আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু প্রায়ই তাকে নানা প্রলোভন দেখাতে লাগল।

ঝাড়ু চালাতে চালাতে লারি কোন কোন দিন ঘরের ভিতরটা চেয়ে দেখে, মাঝখানে দুটো টেবিল চেয়ার, এক পাশে একটা লোহার খাটে সাদা ধবধবে বিছানা, কেমন পরিষ্কার ফিটফাট। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের ছিন্ন মলিন শয্যার কথা মনে পড়ল। আহা, ঐ দুধের মত সাদা নরম বিছানায় শুতে না জানি কত আরাম! কিন্তু আরামের জীবন ত ভগবান লারির জন্য রাখেন নি, নইলে লারি মেথরের ঘরে জন্ম নিবে কেন? লারি ছেড়ে দিল ননদের বদলী কাজ।

কিন্তু ঘরেও লারির মন টেকে না, ঘরের আবহাওয়া যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। প্রায়ই অপরিচিত লোক আসছে যাচ্ছে, শাশুড়ী তাদের সঙ্গে ফিস-ফিস করে কি কথাবার্ত্তা বলে, লারিকে দেখলেই চুপ হয়ে যায়।

কিষাণ ত তার সঙ্গে কথা বলা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে, সেদিন নিজের থেকেই কিষাণ লারিকে ডেকে বললে, তুই বড় শুকিয়ে উঠেছিস, যা তোর মার কাছে কয় দিন থেকে জিরিয়ে আয়। লারির ভিতরটা কেমন এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠে। কিন্তু দুদিনের ভিতরই সে সমবয়সী মেথর-বৌর কাছ থেকে খবরটা জানতে পারল। কিষাণ আবার বিয়ে করবে তারই আয়োজন চলছে। লারির হাত থেকে টুকরী আর ঝাড়ুটা খসে পড়ল মাটিতে, তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, সে ধপ করে মাটিতে বসে গেল।

হতভাগিনী লারির চোখের সামনে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। খুব বাজনা বাজিয়ে হলদি লাগানো হল কিষাণকে, লারি ঘরের পেছনে বসে তার পোষা ছাগলছানাটাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে। ভগবান শুধু ঝাড়ু লাগাবার জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নি। স্বামী মাতাল হোক, যাই হোক, তবু ত এত দিন তার নিজস্ব একারই ছিল, সেই মাতাল স্বামীকেও কেড়ে নিতে চলেছে আর একজন। যে নতুন আসবে সে স্বামীর সোহাগিনী হবে। আর তাকে হতে হবে তাদের দাসী। মন যোগাতে হবে নতুন বৌ-এর।

লারির চোখের জল আর বাঁধ মানে না। দু'দিনেই লারির মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে। চুলগুলো রুক্ষ হয়ে উড়ছে, তেলের আর আঁচড়াবার অভাবে। জাতে মেথর হলেও সে নারী, সে অষ্টাদশী। তার শ্যামল মুখখানাতে একটা কোমলতা আছে। কালো চোখের দৃষ্টি সুন্দর সরল, কিন্তু সেই শ্যামল মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে দুঃখের আওতায়। তার মুখের দিকে চাইবার, দুঃখিনীকে সমবেদনা জানিয়ে সস্নেহে কাছে টেনে নেবার কেউ নেই।

কিষাণ বিয়ে করে ফিরে এসেছে, বউ ফর্সা, সুন্দরী। কিষাণ ভোসওয়াল থেকে একশ টাকা মুজরা দিয়ে বাঈজী আনিয়েছে, রাত্রে নাচ-গান হবে। আসর বসেছে চাঁদোয়া খাটিয়ে। নতুন বৌকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। মেথরদের বড় জমাদারের মেয়ে সে। কাজেই সবাই তাকে একটু খাতির করছে। লারি বর-কনেকে দূর থেকে দেখতে লাগল, তার চোখে একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। আসরের চারদিকে গ্যাসলাইট জ্বালিয়ে উজ্জ্বল করা হয়েছে, কিষাণ হাসিমুখে নতুন পোষাক পরে সব তদারক করছে। মেথরবৌরা সাজগোজ করে মুখের ঘোমটা কমিয়ে এক পাশে বসে আছে বাঈজী নাচ দেখতে। অনাদৃতা লারির খোঁজ কেউ করলে না। তাদের জাতে ত এমন হয়েই থাকে, তিন চারটে বিয়ে না করলে মরদ আবার কি? এ কি সহরে বাবু যে এক বউর আঁচল ধরে থাকবে? লারির ভাগ্য ভাল, তবু ত চার বছর একা স্বামীর ঘর করেছে।

এত সব যুক্তি লারির মন মানে না। দুঃখে রাগে গুমরাতে থাকে। সে দূরে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, আসরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে।

বাঈজীর নাচ-গান আর নূপুর তবলার আওয়াজ শুনতে শুনতে হঠাৎ বহুদিন পূর্ব্বের সেই সিনেমা-রাতের কথা লারির মনে হল, গানের লাইনটা মনে পড়ল, "পিয়া মিলন কো যানা হায়"। কিন্তু হায়, তার পিয়া কোথায়? সে তো নতুন নিয়ে মশগুল, লারির দু'চোখে আবার জলের ধারা নামে।

নতুন বৌকে দেখতে দেখতে হিংসায় রাগে লারির বুক জ্বলতে

লাগল। লাখির চোখের সামনে ক্রোধের পলকে ভেসে উঠল একটা ঘর। পুলিশ জমাদারের মোটা গোঁফের নীচে বাঁকা হাসি। চোখে-মুখে একটা লোলুপতা, গা শিউরে উঠল। নতুন বৌর দিকে চেয়ে চেয়ে লাখি ভাবতে লাগল, হ্যাঁ, সে প্রতিশোধ তুলবে। কিষাণ যেমন নতুন বৌকে নিয়ে আনন্দে মশগুল হবে তেমনি সে-ও তার জীবনের সুখের পথ বেছে নেবে।

লাখির দু'চোখে আগুন বেরুতে লাগল। সে উঠল, নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলল। কোমর থেকে চাবি বের করে গোলাপ-ফুলওয়ালা টিনের বাক্স খুলে তার সুন্দর ঘাঘরাটা বের করে পরল। রুক্ষচুল সামনে টেনে নিয়ে বাঁধল। লণ্ঠন তুলে নিজের মুখখানা আয়নাতে দেখে ধীরে ধীরে লাখি বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

কিছুদূর গিয়েই লাখি তার সযত্নে পালিত ছাগশিশুর ম্যা-ম্যা ডাক শুনতে পেল। থমকে দাঁড়াল। একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন ছেয়ে গেল। সে ফিরে ছুটে চলল তার কুঁড়েতে। দেখতে পেল দরজাটা ঈষৎ খোলা। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে তার ছাগশিশু অসহায় ভাবে ডাকছে ম্যা-ম্যা। লাখি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে তুলে নিল। তারপর তার মলিন পরিত্যক্ত বিছানায় বসে পড়ল। নধর ছাগশিশুটি পরমানন্দে লাখির কোলে আরামে চোখ বুজল। আর লাখি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ব্যর্থ রোষে, ক্ষোভে।

মেয়েদের ক্যাম্পে থাকা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

ঢং ঢং ঢং—ঢং ঢং—না, না, মন্দিরের কি গির্জ্জার ঘণ্টা নয়—স্কুলেরও না—ক্যাম্পের।

ক্যাম্পের ঘণ্টা পড়ল, পতাকা অভিবাদন করবার। সকালবেলা উঠে এরই জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিচ্ছিল মেয়েরা তাড়াতাড়ি—এখন কেউ বা চুল কেউ বা কাপড় ঠিক করতে করতে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল পতাকার সামনে।

'জয় হিন্দ' ব'লে অভিবাদন শেষ ক'রে মেয়েরা লাইন করে চলল মাঠে—সুরু হ'ল দিনের রুটিন। ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রীরা ব্যায়াম শিক্ষা দেবেন এখন মেয়েদের। ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, শুধু হাতে ব্যায়াম অথবা কুচকাওয়াজ চলবে কিছুক্ষণ।

কি উৎসাহ মেয়েদের—লাফাচ্ছে, নাচছে, ঘুরপাক খাচ্ছে—ছন্দোবদ্ধ সচল ফুলের মালার মত হয়ে অঙ্গ সঞ্চালন করছে—কখনও দাঁড়াচ্ছে সবুজ গালচে বিছানো মাঠে শাদা শাদা ফুলের জীবন্ত স্তবক হয়ে। দেখছি ওদের সজীবতা, ওদের চঞ্চলতা, ওদের আনন্দ, ওদের প্রাণশক্তি।

কে বলবে এই মেয়েগুলিই আমাদের বিদ্যালয়ে ক্লাসে ক্লাসে বসে থাকে। কোলকুঁজো, বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হয়ে, ঝিমানো ঝিমানো চোখে নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে তখন দুনিয়ার ক্লান্তি
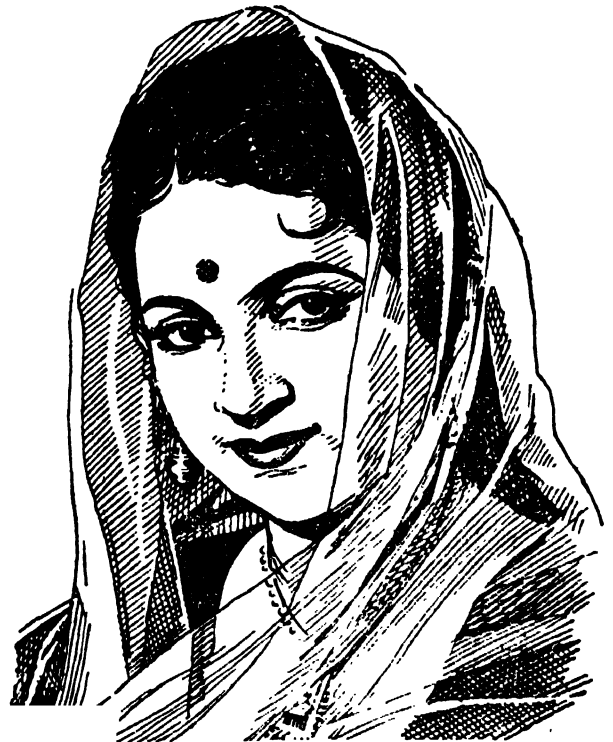
আর অবসাদ মাখানো থাকে, যেন ওদের দেহে-মনে সমগ্র সত্তায়। সেই মেয়েগুলিই·····

ওদের চা খাবার ঘণ্টা পড়ে—তবুও আরেকটু ব্যায়াম করতে পারলেই ওরা খুসী হয়—কিন্তু উপায় নেই—সব বাঁধা নিয়মের ছকে—একটি মিনিট এদিক ওদিক হবার উপায় নেই ক্যাম্পে—তাই মাঠ ছেড়ে এবার আসতে হয় খাবার ঘরে।

জলখাবারের থালা, চায়ের কাপ-ডিস নেবার ভঙ্গী—খাবার ভঙ্গী—পরে পরিষ্কার করে ধুয়ে এনে গুছিয়ে রাখার ভঙ্গীর ওপর নম্বর পাবে ওরা।

কি তৎপরতা, কি নিখুঁত ক'রে কাজ করবার প্রচেষ্টা ওদের! আর ঠেলাঠেলি নেই—আগে নিজে নেব এ অভিসন্ধি নেই পিছনের জনকে এগিয়ে দিতেই ব্যস্ত ওরা। আর অন্যত্র। এই মেয়েরাই করে ঠেলাঠেলি চীৎকার—আগে এগিয়ে দাঁড়াবার জন্য অসভ্যতা। আশ্চর্য্য লাগে। কোন যাদু মন্ত্রে যেন ওরা ক্যাম্পে ঢোকা মাত্র শিখে নিয়েছে যে এটা নিয়মের রাজত্ব। অথচ এখানে কেউ নিয়ম চাপিয়ে দিচ্ছে না ঘাড়ে। কি ভাল, লক্ষ্মী আমাদের মেয়েরা! অথচ এদের নিয়মে আনতে হিমসিম খেয়ে যাই আমরা স্কুলে—কেন?

চা খাবার পর ক্লাস। না, না, নীরস পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, 'দেখো মেয়েরা, ছিঃ, ছিঃ, তোমরা কিছু জান না', করে আরম্ভ করা ক্লাস নয়। ভেড়ার গোয়ালে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে বসে গলদঘর্ম হবার মত ক্লাসও নয়। যা শুনতে ভাল লাগে—যেমন ভাবে শুনতে ভাল লাগে স্বচ্ছন্দে আরামে বসে, তাই শোনার ক্লাস। গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানভাণ্ড উজাড় করে দেওয়া—ছবি, আবৃত্তি, গান, অভিনয়, ড্রইং ও নানা উপকরণের সাহায্যে। শেখাকে শেখা বলেই মনে হয় না—শুধু আনন্দ, শুধু উৎসাহ, শুধু অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে কৌতূহল জাগানো বিষয়ে অনুরক্তি বাড়ানো।

কোথা দিয়ে কেটে যায় পুরো একটি ঘণ্টা, হুঁস থাকে না মেয়েদের—শিক্ষয়িত্রীরও। আর স্কুলে? ৪৫ মিনিটের পিরিয়ডেই প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন! দারোয়ান ঘণ্টা দিচ্ছে না—টুলে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মনে মনে দারুণ অস্বস্তি, অশান্তি—ছাত্রীদের, শিক্ষয়িত্রীদেরও।

ক্লাস শেষ হলে আলপনা আঁকা বা মাটির কাজ অথবা ড্রইংএর ক্লাস আরম্ভ হয়। বারান্দার ভাগে ভাগে বসে পড়ে মেয়েরা, মনের মাধুরী ফুটিয়ে তুলতে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে। কত সৌন্দর্য্যজ্ঞান, কত সম্ভাবনা-সমুজ্জ্বল কোরক ওদের মধ্যে! সুযোগ-সুবিধা সহানুভূতির অভাবের গুমোট হাওয়ায় তা আলোর মুখ দেখে না কোন দিন অথবা দেখলেও অকালে শুকিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি সমস্ত মন দুমড়ে ওঠে হাহাকারে।

হাতের কাজ শেষ হলে জাতীয় সঙ্গীত ও অন্যান্য স্বদেশী গান অভ্যাস করে মেয়েরা। সবেতে সমান উৎসাহ, সমান আনন্দ ওদের।

এর পর বাগানে খানিকটা কাজ করে, ঘর-দোর পরিষ্কার করার কাজ সেরে স্নান করতে যায় মেয়েরা। যে দলের ওপর যেদিন ভার থাকে সেই দল রান্নাবান্না করে রেখেছে ইতিমধ্যে। খেতে বসে ওরা। নিজেরাই ঠাঁই করে—নিজেরাই ভাগে ভাগে পরিবেশন।

খাওয়ার পর বাধ্যতামূলক শোওয়ার ব্যবস্থা এক ঘণ্টা। তার পর সুরু হয় ফার্ষ্ট-এড ও নার্সিং-এর ক্লাস। প্রত্যেক মেয়েটির মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি সেবাকাঙ্ক্ষিনী নারী—এই সময় তা বোঝবার মেয়েদের শেখবার আগ্রহ ও রোগীকে শান্তি দেবার উপায়গুলি জেনে নেবার আন্তরিকতা দেখে।

এই ক্লাসের পর আরম্ভ সেলায়ের ক্লাশের। অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে সহজে যে সব সেলাই শেখা যায় তাই শেখানো হয় ক্যাম্পে। তারপর আধ ঘণ্টা ওদের নিজেদের বই বা খবরের কাগজ পড়বার সময় দেওয়া হয়।

রোদও পড়ে আসে ওদিকে—তখন ওরা মাঠে গিয়ে লাঠিখেলা শেখে। সামান্যতম হলেও আত্মরক্ষার উপায় কিছু শিখতে হবে বৈ কি মেয়েদের! যে হাত আলপনা আঁকে, সে হাত লাঠি চালাতেও সক্ষম, এ দেখে আশায় মন ভরে যায় কত যে!

এর পর চুল বেঁধে গা ধুয়ে মেয়েরা ফল আর দুধ খেয়ে নেয় তাড়াতাড়ি। শ্রম—শ্রমের পর ক্ষয়পরিপূরণ—বিশ্রাম ও খাদ্য দিয়ে—এসত্য ক্যাম্পে মেনে চলা হয় সব সময়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ইঞ্জিন চালিয়েই চলি—তাকে বিশ্রাম দেওয়া, তেল দেওয়ার কথা ভেবেও দেখি না সব সময়, আমরা দেখলেও উপায় থাকে না হয়ত তাই যেন ভাববার দরকারই নেই এমনি ভাবে থাকি—তাই আমাদের কাজে প্রাণ থাকে না, উৎসাহ থাকে না, সৌষ্ঠব থাকে না—করতে হয় তাই করি এমনি একটা ভাবই শুধু থাকে।

ক্যাম্পে প্রতিদিন নানা বিশিষ্ট লোকের আগমন হয় বিকেলের দিকে। মেয়েরা বসে—তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষামূলক বক্তৃতা বা কাহিনী শোনে প্রত্যহ। এই সব লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হয়—তাদের অহেতুক লজ্জা, জড়তা কাটিয়ে উঠে, সপ্রতিভ, চটপট হয়ে ওঠে চলায় ফেরায়, কথাবার্ত্তায়—প্রেরণা পায় তাঁদের মত হবার—আত্মপ্রত্যয় সুদৃঢ় হয়ে।

—বিকেলের চা ও জলখাবার মেয়েরা অতিথিদের সঙ্গে বসে খায়। তারপর সাধারণতঃ সিনেমা বা ম্যাজিক লণ্ঠন দেখানো হয়—আবার মেয়েরা নিজেরা গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ করে। কিম্বা দিদিরা তাদের গল্প বলেন কি তারাই গল্প শোনায়। এতে মেয়েদের বলার ক্ষমতা বাড়ে, সঙ্কোচ কাটে—নিজেকে প্রকাশ করবার প্রেরণা ও উৎসাহ আসে।

রাতের খাওয়া হয় এর পর—একটু ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়ানো হয় তারপর—সব শেষ পতাকা নামিয়ে শুতে যাওয়া। শোবার আগে কিন্তু রোজনামচা লেখা চাই প্রত্যেক মেয়ের।

এই হল রোজকার মোটামুটি রুটিন ক্যাম্পে—সুবিধা অসুবিধা অনুসারে এর অদল বদল করা হয় সব সময়ই অবশ্য।

বাইরে যাওয়া এবং গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করা ক্যাম্পের রুটিনের মধ্যেই পড়ে—যেদিন তা করা হয় সেদিন ভেতরের রুটিন কিছু কিছু বাদ পড়ে বাধ্য হয়ে। এই বাইরে বেরোনর মেয়েদের সব থেকে আনন্দ উৎসাহ।

ক্যাম্পের এক একটি কাজের এক একজন ভারপ্রাপ্ত দিদিমণি থাকেন অবশ্য—তাঁদের নিরলস দৃষ্টি ও পরিশ্রমে ক্যাম্পের সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়—কিন্তু তাঁরা নিজেরা কিছু না করে মেয়েদের দিয়েই সব কাজ করান—এইটাই নিয়ম ক্যাম্পে।

কিন্তু ক্যাম্পে কি হয় না হয় তার বিবরণী দেখার জন্তেই শুধু এ প্রবন্ধ লিখছি না। ক্যাম্প করে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেটুকু প্রকাশ করবারই আগ্রহ আমার।

ছেলেমেয়েদের বর্তমান কালের সমাজ-জীবনে খাপ খাওয়াবার জন্য মাঝে মাঝে ক্যাম্পে থেকে শিক্ষা লাভ করবার প্রয়োজন যে কত বেশী, তা সব সময় অনুভব করেছি ক্যাম্পে থেকে।

স্কুলে মেয়েদের সঙ্গে ভাল ভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ সুবিধা আমরা পাই না—কার মধ্যে কী সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে—হৃদয়বার্তা, সেবা, সুশীলতার, সৃজনী প্রতিভার দিক দিয়ে তাদের চরিত্রের বিভিন্নমুখী ধারাগুলির সন্ধান পাওয়াও যায় না স্কুলে—পাইকারী হিসাবে মেয়েদের দেখি আমরা স্কুলে—প্রধানতঃ ভাল করে লেখাপড়া করলে দু'-একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমষ্টির চাপে ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য চোখেই পড়ে না। ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও বিদ্যালয় পরিচালনার ত্রুটি ও শিক্ষয়িত্রীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এবং ঔদাসীন্য অবশ্য অনেক পরিমাণে দায়ী এজন্য।

কিন্তু ক্যাম্পে প্রত্যেকটি মেয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করবার সুযোগ-সুবিধার অন্ত নেই। সেখানে ব্যষ্টি হিসাবে তাদের দেখা হয় প্রত্যেকটি ব্যাপারে। আত্মবিশ্বাসবোধ তাই সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে এখানে। ক্লাসে যে মেয়ে লাষ্ট বেঞ্চে বসে থাকে মুখ লুকিয়ে এখানে তার মধ্যেও দেখেছি অকুণ্ঠভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার আগ্রহ আত্মপ্রত্যয়ে সমুজ্জল ও আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হয়ে।

ক্যাম্পে শুধু কাজ কাজ আর কাজ—বাজে সময় কাটাবার ফুরসৎ নেই একটুও, প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব প্রত্যেকের ওপর নজর। সময়ের মূল্যবোধ। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ এখানে আসতে বাধ্য। তারপর একসঙ্গে থাকা নানা রকমের মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার অভ্যাস পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করে নেওয়া দোষগুণ বিচার না করে, অন্যের দেখে নিজেকে সংশোধিত করে নেওয়া মিলে-মিশে কাজ করে গঠনমূলক মনোবৃত্তির উন্মেষ করা ইত্যাদি, অনেক কিছুই অভ্যাস হয়ে যায় আপনা থেকে।

স্কুলে আমরা হাজার নীতি উপদেশ দিয়েও সভা সমিতিতে দাঁড়িয়ে মঞ্চ কাঁপিয়ে ফেলেও যা পারি না ক্যাম্পে থাকার ফলে সেগুলি অভ্যাসে পরিণত হয় অতি সহজে।

ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি নারীসুলভ সুকুমার বৃত্তিগুলিরও বিকাশ হয় এখানে। একের পর এক। ঠেলাঠেলি ধ্বস্তাধ্বস্তি না করে প্রত্যেকটি কাজ একজনের পর একজনকে করে যেতে হয় মুখ বুজে। আমি আগে সুবিধা নেব, অন্যে মরুক, এ প্রবৃত্তি জাগবার কোন সুযোগই নেই ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে মেয়েরা চোখ-কান খুলে রেখেছে সর্বদা—তটস্থ হয়ে আছে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না দেখবার জন্য—তাই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে না ওরা, প্রাণ আছে ওদের চলায় ফেরায় কথায় বার্তায়।

সমবায় প্রথায় থাকতে থাকতে সহজ কর্তব্যজ্ঞান জেগে ওঠে ওদের মধ্যে আপনা আপনি। একজন একজনের প্রতি সহানুভূতিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। ক্যাম্প শেষ হলে তাই ওদের বড় দুঃখ, বন্ধুদের ছেড়ে থাকবে কেমন করে!

স্কুলে দেখি আজ-কাল বড় যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে মেয়েরা—সবই করতে হয়, তাই কোন রকমে করার পর্য্যায়ে এসে পড়েছে—প্রাণ নেই, উৎসাহ নেই, শ্রদ্ধা নেই অব্যবস্থিত চিত্ততায়, অবহেলায়, অশ্রদ্ধায়, অবিশ্বাসের প্রকাশ সর্বত্র।

ক্যাম্পে সব সময় দেখেছি মেয়েরা বড়দের সামান্যতম নির্দেশটুকুও পালন করবার জন্য কত তৎপর—ধন্য হয়ে যাওয়া তার যেন তাদের বড়দের আদেশ পালনে। স্কুলে সেই মেয়েরাই যেন গা এলিয়ে দিয়েছে—নির্দেশ আদেশ করলেই রাগ-রাগ ভাব—পালন না করতে পারলেই বাঁচে—পড়াটুকু শুনেই যেন উদ্ধার করে দিচ্ছে আমাদের। লিখে নিতে ব'লে, পড়া জিগ্যেস করে আমরা যেন অপরাধ করছি—মনের এমনি ভাব প্রকাশ করা দৃষ্টি তাদের চোখে।

বড়দের মেনে চলা—এবং মেনে চলে গর্ব্ব ও আত্মপ্রসাদ লাভ আজ-কাল উঠে যাচ্ছে যেন জগৎ থেকে—মেনে চলাটাই নিজেকে ছোট করা এবং আত্মাবমাননা। এমনি একটা ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে যাচ্ছে আমাদের ছোটদের মনেও। ক্যাম্পে কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব জেগে উঠতে দেখেছি, এটাই আশ্চর্য্য!

তারা কাজ করতে পারে, তাদের ওপর বিশ্বাস করে কাজের ভার দেওয়া হ'চ্ছে, এ যেন যাদুমন্ত্রের মত কর্মশক্তি প্রকাশের প্রেরণা। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়াটুকুর ওপরই জোর দিই—অন্য কোন দিক দেখি না—তাই তার ফল শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রের মত বই মুখস্থ করতে পারে যারা তারাই উৎরে যায় বিদ্যালয়ে—আর সকলের অবস্থা কাহিল হ'য়ে পড়ে। আমার মনে হয়, দারুণ অর্থসংকটের দরুণ যে নিদারুণ অভাব আমাদের, তার ফলে খাদ্য বস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুতে বঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে এবং বঞ্চিতদের অভিভাবকদের থেকে আমাদের ছোটদেরও দেহ-মনে আপনা থেকেই একটা ক্লৈব্য এসে পড়ছে—তাই কোন কিছুতেই আর প্রাণ থাকছে না, আস্থা থাকছে না।

ক্যাম্পের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাছাড়া পেট ভরে খেতে পাওয়াটা একটা বিশেষ কারণ। স্কুলে ক'টা ছেলে-মেয়ে ঠিকমত খেয়ে আসতে পায়? শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরও সেই অবস্থা। তাই ভাল লাগানো ও ভাল লাগার ধর শূন্য হ'তে বাধ্য। পুষ্টিকর রুচিকর আহারে পরিতৃপ্ত মেয়েদের দেখে একথা ক্যাম্পে আমার বেশী করে মনে হয়েছে।

আমি শুধু মেয়েদের কথাই বললাম—ছেলেদের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথাগুলি প্রযোজ্য।—আমাদের দেশের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের, বিশেষ ক'রে মেয়েদের, ক্যাম্পে পাঠানোর উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ তো নেই-ই, আছে অজ্ঞতাপ্রসূত সন্দেহ, অনাস্থা, অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য।

এদেশে এসব নতুন বলেই এরকম হয়—দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অভিভাবকরাও বুঝবেন, ছেলেমেয়েদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করবার সুযোগ দিলেই শিক্ষা দেওয়া হয় না—শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ আছে অসংখ্য। ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া তাদের মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

সহরের কারসাজী

ভুতোদা: আহাহা কি রান্না! কি স্বাদ! কিরে বিমলা বল বল।

বিমল: সত্যিই অপূর্ব রান্না! আমাকে আর একটু মাছের ঝোল দিনতো।

বিনয়: আমাকেও। আর একটু চচ্চড়ী। সত্যিই ডালনা, মাছ, তরকারী, মাংস সবই অপূর্ব।

ভুতোদা: ভাগ্যিস সেদিন মেনিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তানাহলে এই পোড়া সহরে কি এমন রান্না খাওয়া যায়।

মেনিদি ৪ মাস আগে তোমার মধুপুরের বাড়ীতে খেয়েছি সে রান্নার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মেনিদি: কি যে বল ভুতো। এত বিরাট সহর-এত লোকজন; এখানে ভাল রান্নার আর অভাব কি?

বিমল: আপনাকে যে এত ভাল ভাল হাতের রান্না খাওয়ালাম!

ভুতোদা: ছ্যা:! এ সহরের লোকজনের তাড়াহুড়ো করেই জীবন কেটে যায়। রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করবে কখন?

বিনয়। তার মানে?

ভুতোদা: সবসময় পথে ঘাটে প্রান হাতে করে চলা। মেনিদি, সেদিন তোমার বাড়ী আসার জন্য প্রান হাতে করে তো এক বাসে উঠে পড়লাম। গাদাগাদি ভীড়। চৌরঙ্গীর কাছে, আমার পেছনের ভদ্রলোক পিঠে খোঁচা খেয়ে হাত ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন" আপনি আমার পায়ের ওপর উঠে দঁাড়িয়েছেন ৯ টা ৪৫ মি: এখন সোয়া দশটা দয়া করে যদি নামেন তাহলে আমি অফিস যেতে পারি।

বিমল: হ্যা: হ্যা: হ্যা:

ভুতোদা: হাসছিস কি! এরকমভাবে বাঁচলে কখনও ফাইন আর্ট বাঁচে? রান্না খাওয়া এগুলো ফাইন আর্ট। অনেক সময় লাগে, অনেক যত্ন লাগে। মেনিদি, যদি এই পোড়া শহরে বেশিদিন থাকেন, তাহলে এরকম রান্না করতে পারতেন?

বিনয়: কেন না? তাড়াহুড়ো তো আমরা করছি। রান্না তো করে মেয়েরা, তাদের আর তাড়াহুড়ো কোথায়?

ভুতোদা: ইকনমিক্স পড়েছিস? ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা জানিস। যারা খাবে তারা যদি ভাল খাবার না খায় তাহলে তারা রান্না করে, তাদের ভাল খাবার করার উৎসাহ থাকে?

আর সারাদিন বাসে ট্রামে আফিসে দৌড়ঝাঁপ করে আর ভাল খাবার সম্বন্ধে ভাবার উৎসাহ কোথায় ?

বিমল: আপনি বলতে চান যে এখানে ভাল রান্না হতে পারেনা ?

ভুতোদা: হয় তো হতে পারে কিন্তু আমাদের মধুপুরের মত নয়। ওখানে দৌড়ঝাঁপ নেই লোকে মনের আনন্দে খায়, মেয়েরা সব সময়ই নতুন নতুন খাবারের কথা ভাবে। এই মেনিদির রান্নাই দ্যখনা।

মেনিদি: কেন বারে বারে আমার রান্নার কথা বলছো ভুতো। রান্না সম্বন্ধে আমরা কি সহরের কাছ থেকে কম শিখেছি ?

বিমল: দেখুনতো মেনিদি। নতুন জিনিষতো সহরেই আগে আসে তারপর যায় মফস্বল গ্রামে। ইলেকট্রিক গ্যাস' এ্যালুমিনিয়াম সবইতো সহরে প্রথম এসেছিল।

বিনয়: আপনি রান্নাবান্নার কথা বলছেন তো "ডালডার" কথাই ধরুননা। "ডালডা" এখন সহরে গ্রামে লক্ষ, লক্ষ পরিবারে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু "ডালডা" প্রথম এসেছিল কোলকাতা সহরেরই বাজারে।

ভুতোদা: তুমিও কি "ডালডা" ব্যবহার কর নাকি মেনিদি:

মেনিদি: নিশ্চয়ই। আজকের সব রান্নাই তো "ডালডা"য় হয়েছে।

ভুতোদা এ্যাঁ: ! ডাল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মাছ, মাংস, সবই "ডালডা"য় ? আমিতো জানতাম "ডালডা"য় শুধু ভাজা-ভুজিই হয়।

বিমল: কেন ভুতোদা আপনাকে তো আমরা আগেই বলেছি যে "ডালডা" সব রান্নার পক্ষেই ভাল এবং পুষ্টিকর। সেইজন্য এখন লক্ষ লক্ষ বাড়ীতে "ডালডা" ব্যবহার হচ্ছে।

ভুতোদা: ও: সেইজন্যে ! মেনিদি, আমি তাই ভাবছিলাম যে তোমার মধুপুরের বাড়ীর রান্নাটা এত বেশী ভাল হয়েছিল কেন। এতক্ষণে বুঝলাম

মেনিদি: আমার মধুপুরের বাড়ীতেও সব রান্নাই "ডালডায়" হয়। তুমি যেদিন খেয়েছিলে সেদিনও সব রান্নাই "ডালডায়" হয়েছিল।

বিমল: কি ভুতোদা, আর সহরের নিন্দে করবেন।

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

এই অবাঞ্ছিত নতুন জীবনটার সঙ্গে আপোষ করতে চাইলো সুমিতা। দুঃসহ পরিবেশকে চাইলো সহনীয় করতে। কিন্তু যা হবার নয় তা কোন কালে হয় না,—তাই ওর জীবনগ্রন্থির জটগুলো দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগলো।

সেদিন সকালে চিঠি লিখছিলো সুমিতা, সোমনাথকে। কখন নিঃশব্দে অসীম এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলো, বুঝতে পারেনি।

—বাবাকে চিঠি লিখছো বুঝি?

চমকে উঠে সুমিতা ফিরে চাইলো ওর দিকে,—অস্ফুট স্বরে বললো হ্যাঁ।

—বেশ তো, যা লেখবার লেখ, আরও গোটাকতক কথা ওর সঙ্গে লিখে দাও।

—কি কথা? শুষ্ক কণ্ঠে শুধালো সুমিতা।

—এই কথা, মানে আমি বলতে চাইছি—ঐ তোমাদের লাল-কুঠির কথাটা। অত বড় বাড়ীটা শুধু শুধু বসিয়ে রেখে কি হবে? তখন তুমি থাকতে, সে ছিলো অন্য কথা। এখন দিদিমা থাকতে চান এক পাশে থাকুন, বাকি অংশটা ভাড়া দিলে প্রায় দু'-তিন হাজার টাকা মাসে ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। আজকালকার বাজারে ওটা নষ্ট হতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তুমি বেশ করে গুছিয়ে কথাগুলো লিখে দাও ওঁকে, বুঝলে?

—বাবাকে ওসব লেখা মিথ্যে। কুণ্ঠিত ভাবে বললো সুমিতা, তিনি কারুর মতামত নিয়ে কাজ করেন না, প্রয়োজন মনে করলে নিজেই করবেন বাড়ীর ব্যবস্থা।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছো কথাটা। সাধু সেজে ভণ্ডামি করে বেড়ায় যে লোক, সাংসারিক দায়িত্ব-জ্ঞান সে পাবে কোথায়? কিন্তু আমাদের তো ওসব মেনে নেওয়া চলবে না। ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সব কিছু বিচার করে চলতে হবে। বেশ তো সাধুগিরি করছেন, তাঁর এখন আর বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজন কি? একটা শুধু সই করে দিলেই সব কিছুর দায়িত্ব থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেবো, নিশ্চিন্ত মনে তীর্থবাস করুন। যত খুসি নেড়ানেড়ি নিয়ে হৈ-চৈ করুন, আর কিসসুটি বলতে যাবো না—বুঝলে? মাত্র একটি নাম সইয়ের ওয়াস্তা।

কথার জবাব দিলো না সুমিতা। গলাটা যেন কে ওর চেপে ধরেছে, চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে এলো। সিগারেট বার করলো অসীম, বিয়েতে যৌতুক পাওয়া সোনার সিগারেট-কেসের ভেতর থেকে। দু-ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটি চেপে ধরে এ পকেট সে পকেট খোঁজে রূপোর লাইটারটাকে।

—কি হোল? পাচ্ছি না তো লাইটারটা! দেখেছো তুমি?

সুমিতার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে, বিরক্ত ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলো অসীম,—মাই গড! সন্ন্যিসি বাপের ছোঁয়াচ লেগেছে বুঝি? কারণাও কিছু ঘাড়ে চাপিয়েছে দেখছি, শুধু আসলের বেলাই লবডঙ্কা!

সিগারেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সুমিতার একখানি হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে সগর্জ্জনে বললো অসীম—তোমার ঐ প্যান্-প্যানে স্বভাবটা পালটাও মিতা, ওটা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে। কথায় কথায় রাঙাপানি ঝরিয়ে অসীম হালদারের মন ভিজোতে পারবে না, ওসব ন্যাকামি বাদ দাও। সত্যি যা দিয়ে মন ভেজানো যায়, পারো তো সেইটে করবার চেষ্টা করো।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো অসীম।

কি একটা কাজে এদিকে এসেছিলেন সুদামের মা যমুনা দেবী। সুমিতাকে নিশ্চল ভাবে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে ঘরে এসে বললেন—কি হয়েছে রে মিতু? অমন করে বসে কেন? কা'কে লিখছিলি চিটি? বাবাকে বুঝি? তা বসে কেন রে? শেষ কর চিঠিখানা?

দর-দর করে চোখের জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো সুমিতার দুটি গাল বেয়ে। দশটি আঙুল ঢাকা দেবার চেষ্টা করলো চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখখানাকে। দু'হাতে জড়িয়ে ওকে নিজের বুকে টেনে নিলেন যমুনা দেবী।

—ও মা! এ কি কাণ্ড রে? কেঁদে ভাসিয়ে দিলি? বলি হলো কি? বাবার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? না ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? বলোতো সোনামুখি কোন্‌টা সত্যি?

যমুনা দেবীর গলাটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ওঁর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদলো সুমিতা।

—ওকে নিজের ঘরে হাত ধরে নিয়ে গেলেন তিনি। ঝিকে ডেকে বললেন—যা তো, ছোটমার চুল বাঁধার বাক্সটা নিয়ে আয়, আমি আজ চুল বেঁধে দেব। মেঝেয় কার্পেট বিছিয়ে সুমিতাকে নিয়ে বসলেন তিনি।

ঝি নিয়ে এলো একটি চন্দনকাঠের বাক্স। ওর থেকে সোনা-বাঁধানো চিরুণি বার করে সুমিতার একরাশ ঢেউখেলানো চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন তিনি,—চুলগুলোতে কি তেল দিস না, এত রুখু হয়ে আছে কেন রে? সদুর মাকে বলবি, ভালো করে তেল মাখিয়ে দেবে।

সুমিতা জবাব দেয় না সে কথার। সে তখন স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলো সুদামের ফটোখানিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো—দামীদা' কবে ফিরবে কাকীমা? ওর চিঠি ঠিকমত পাচ্ছেন তো?

বড় জাকে বড়দি বলতে পারেনি সুমিতা, চিরকালের ডাক কাকীমা পাল্টে বড়দি বলা কিছুতেই সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। অসীমও অত ছোট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়নি, আর ক'দিন বা ওদের সঙ্গ?

—না, নিয়মিত চিঠি-পত্তর আর পাই কই? মাসখানেক হল একখানা পেয়েছি, তোদের বিয়েতে যোগ দিতে পারলো না বলে দুঃখ জানিয়েছে। ফিরতে ওর এখনও বছরখানেক দেরী হবে, একটা পরীক্ষা এখনও বাকি কি না। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন যমুনা দেবী।

সোনার চিরুণি দিয়ে মস্ত বড় খোঁপা বেঁধে সোনার কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে বললেন তিনি—কি চমৎকার মানিয়েছে দেখতো? রোজ আসবি আমি চুল বেঁধে দেব, তেল নেই, জল নেই, কি হাল করেছিলি চুলগুলোর বল দেখি?

ওদের দু জনকে চমকে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো অসীম। মহা বিরক্তি ভরে চেঁচিয়ে বললো—আঃ, কখন থেকে যে ডাকাডাকি করছি ছ'টায় পার্টি আছে, দু জনের যেতে হবে অলকাপুরীতে। এদিকে দিব্যি আড্ডা জমাচ্ছো এখানে বসে। বাঃ চমৎকার ঢাকেশ্বরী খোঁপা হয়েছে তো? ছি, ছি, বৌদি, ঐ সেকেলে খোঁপা বেঁধে ও পার্টিতে যাবে না কি? হাঃ, হাঃ, হাঃ, করে বিদ্রূপপূর্ণ ঘরকাঁপানো হাসি হেসে বললো অসীম—তা বেশ, তা বেশ, অলকাপুরীর নামকরা নাচিয়ে মেয়ে সুমিতাকে একেবারে পাড়াগাঁয়ের কলসী কাঁখে বৌ সাজিয়েছ, মন্দ লাগছে না!

সলজ্জ ভাবে মাথায় কাপড় টানতে টানতে বললেন যমুনা দেবী—ও মা, তোমরা পার্টিতে যাবে? তা তো জানতুম না! খুলে ফেল রে মিতা, ঠাকুরপো যেমন বলে, তেমনি করে চুল বাঁধ।

—আমি এই খোঁপা বড় ভালোবাসি কাকীমা, এ খোঁপা বেঁধে যাওয়া কিছু মাত্র বেমানান হবে না। নরম গলায় জবাব দিলো সুমিতা।

—এই যে বেশ বোল-চাল শিক্ষা হয়েছে মিতা দেবীর! চমৎকার! এর কৃতিত্বটুকু অবশ্য আমার বৌদিরই পাওনা, কি বলো?

যমুনা দেবীর শান্ত দুটি চোখে ফুটে উঠলো বিস্ময়। ঈষৎ আরক্ত মুখে দেবরের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি হঠাৎ অত চটে যাচ্ছো কেন ঠাকুরপো! মিতা তো কিছু অন্যায় বলেনি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে ভালো করে শিখিয়ে দাও বৌদি, কি করে আমার ওপর টেক্কা মেরে চলতে হবে। এ আমি অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম, যতটা বোকা ঠাউরেছো আমায় ঠিক ততটা আমি নই।

—আর নয়! আর নয়! মাপ করো এইবার, কান্নাভরা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো সুমিতা, অসীমও ছুটলো ওর পেছনে। ভাবগতিক ভালো নয়; কিট তো হয়েই আছে। সবলে সুমিতার একখানি হাত চেপে ধরে ওকে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো খাটের ওপর। তারপর খানিকটা অডিকোলন ওর মাথায় ঢেলে দিয়ে, পাখার রেগুলেটরটা শেষ পয়েণ্টে ঘুরিয়ে দিয়ে, গলার স্বর মোলায়েম করে বললো অসীম—কিছু মনে কোরো না রাণী, ব্যবসার ঝামেলার জন্যে আজ মেজাজটা বড় গরম ছিলো! বিশ্বাস করো, ও সব কথা সত্যিই আমি বলতে চাইনি। এবারে ওঠো, তৈরী হয়ে নাও লক্ষীটি!

বারান্দা থেকে ভেসে এলো মস-মস জুতোর আওয়াজ আর দামী সিগারেটের গন্ধ, তারপরই ভারি কণ্ঠস্বর, আসতে পারি? দুলে উঠলো ঘরের পর্দাটা।

—আরে কে ও, অনিল নাকি, সত্যি সত্যিই কুটুম বনে গেছো দেখছি! এসো, এসো—

পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো অনিল। সুমিতা খাট থেকে নেমে এসে ওকে প্রণাম করে গেলো পায়ের ধুলো নিতে।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অনিল। আরে একি একি? ঘটা করে আজ আমায় আবার পেন্নাম কেন রে? বোস বোস! ওর হাত ধরে সোফায় বসিয়ে নিজে পাশে বসলো অনিল।

—তারপর কেমন আছিস? বল। অনেক দিন তো যাসনি ওদিকে! কি হে অসীম, ওকে যে একেবারে হারেমের বিবিসাহেবা বানিয়েছো দেখছি, বাইরে বেরুতে টেরুতে দাও না, না কি? তোমাদের দুজন কারুরই তো আর পাত্তা মেলে না!

গলায় টাইটা বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিলো অসীম। ব্যবসায়ী মানুষ কুলি-মজুর খাটিয়ে পেটের ভাত যোগাড় করতে হয়, সময় কোথায় বলো আড্ডা মারবার? মিতা কেন ঘরের কোণ ছেড়ে নড়তে চায় না সে কথা তাকেই জিজ্ঞেস করো। সারাক্ষণ খালি ঐ বুড়ি জায়ের পাশে বসে কি যে কথা কয় বুঝি না! এই খানিক আগেই এই নিয়ে আমার সঙ্গে একতরফা হয়ে গেলো।

—তাই নাকি? এমন গিন্নি মেয়ে হয়েছিস তুই? নাচ-গান সব কি বাতিল হয়ে গেছে?

—চিরকালই কি আর ও-সব ভালো লাগে ছোট মামা? ম্লান মুখে জবাব দিলো সুমিতা।

—তারপর? অনিলের সর্বাঙ্গে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে বললো অসীম—তারপর? তোমার খবর কি শুনি? সাজে-পোষাকে, চোখে-মুখে তো হাসিখুসি উপচে পড়ছে, বলি ব্যাপারখানা কি? মোটা রকমের দাঁও টাও জুটিয়েছ বোধ হয়?

ওর সাজে-পোষাকে সত্যিই ছিলো আজ বিশেষত্ব! দামী নীলাভ স্যুট পরনে, আঙুলে মূল্যবান হীরের আংটি। গায়ে ভুর-ভুরে সেণ্টের গন্ধ, আঙুলের ফাঁকে চাপা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট! চোখে-মুখে জ্বলছে ওর খুসির আলো!

—দাঁও? তা একরকম তাই বটে! হাতের আধপোড়া সিগারেটটা ছাইদানীতে চাপতে চাপতে বললো অনিল। খোলাখুলিই বলি তাহলে, সামনের সপ্তাহে বিয়ে করছি শুকতারাকে।

বাড়ীতে হাঙ্গামা নয়, মানে সাতপাকের বিয়ে নয়, স্রেফ লেখাপড়া সকালে, আর সন্ধ্যেবেলায় গ্রাণ্ড হোটেলে একটা পার্টি! বাব্বাঃ, তোমাদের বিয়ের হাঙ্গামা দেখে, ও সাতপাকের বিয়েতে আতঙ্ক ধরে গেছে, ছ'মাস হয়ে গেলো গায়ের ব্যথা যেন মরতেই চায় না!

—শুকতারাকে বিয়ে করছো? কেন হে, আর পাত্রী জুটলো না? ভুরু তুলে বললো অসীম।

—জুটবে না কেন হে, জোটাইনি। এক লাইনেই আছি দুজনে, কেউ কাউকে দুষতে পারবে না, বুঝলে না? দুজনেই রোজগার করবো, ভালোই চলবে। তবে মুস্কিল এই যে, মা বড় কোঁস-কোঁস করছেন,—ইচ্ছে ছিলো অর্দ্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যে বাগাবেন ছেলের জন্যে। কিন্তু এইটুকু বোঝেন না যে রাজকন্যে এই লক্ষ্মীছাড়া অভিনেতার গলায় মালা পরাবে কোন দুঃখে? যাক্—মনে হয়, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। ছবিটা কিন্তু আচ্ছা ভোল্ পালটেছে রে মিতা, জামাইবাবু ওর কানে যে কি মন্তর ঝেড়ে গেছেন, দিন-রাত্ত দেখো ঠাকুরঘরে কি সব বিড়-বিড় করছে, আর লম্বা লম্বা উপদেশ ছড়াচ্ছে!

—আরে আমাকেও ও আসে হিতকথা শোনাতে? বলে অভিনেত্রী বিয়ে কোরো না ছোড়দা, সুখ পাবে না! শোনো কথা! —আমি বলি তোর ঘাড়ে জামাইবাবু ভূত চাপিয়েছেন, সে ভূতটা কি এবার আমার ঘাড়ে নামাতে চাস? বেশ আছি বাবা, কেন জ্বালাচ্ছো, আমার মাথায় ঢুকবে না।

কলকণ্ঠে হেসে উঠে বললো সুমিতা—ভূতটার কাছে ছোট মাসী নিশ্চয়ই ভালো কিছু পাচ্ছে, আমার কাছে সেটাকে পাঠিয়ে দাও না ছোট মামা! আর শুকতারাকে বিয়ে করছো শুনে সত্যিই ভালো লাগছেও, ঠিক তোমারই মত!

মনোমত কথাটার ধাক্কায় সোফা থেকে স্প্রিংএর মত ছিটকে উঠে সামনের টেবিলটাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে বসলো অনিল। ফুলদানীটা লাফিয়ে আছড়ে পড়লো মেঝেতে। এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা শোনালি মিতা! আরে সেই জন্তেই তো তোকে অত পেয়ার করি রে! তা না, মা আছেন হুতুম প্যাঁচার মত মুখ করে, বোন আসছেন খৃষ্টান পাদ্রীদের মত সুসমাচার হাতে করে, বাপ রে বাপ, বাড়ীতে বিয়ের খবর দিয়েছি না মরা খবর শুনিয়েছি···বুঝতে পারছি না! তাদের অবশ্য বলিনি এসব কথা, শুনলে ব্যাচারী মন খারাপ করবে!···হ্যাঁ ভালো কথা, জামাইবাবু শীগগির আসছেন, বিষয়-সম্পত্তির কি-সব ব্যবস্থা করবেন, চিঠি দিয়েছেন ওঁর অ্যাটর্ণিকে খবর দিয়ে রাখতে!

একটা স্বস্তির বাতাস লাগলো যেন সুমিতার অন্তরে! কার্পেটে গড়াগড়ি দিচ্ছে ফুলদানীটা, ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিকে! সেগুলো গুছিয়ে তুলে নিয়ে ফুলদানীতে গুঁজে রাখতে রাখতে হাসিমুখে বললো সুমিতা—বাবাকেই তো চিঠি লিখছিলাম ছোট মামা, যাক্ তাহলে ওটা আর শেষ করবো না, ভালোই হল, তাঁর আসার খবরটা পেলাম!

—ওঃ, আসছেন তা হলে, অ্যাদ্দিনে সুমতি হয়েছে! খবরটা বেশ শ্রুতিমধুর বটে! তবে আমি একেবারে বাস্তবধর্ম্মী কি না, ও-সব শ্রুতিমধু, বা দৃষ্টিমধুতে আমার লোভ নেই, আমি চাই একেবারে মধুভাণ্ডটি লুঠ করতে। বুঝেছো চাঁদ, ও খবর টবরে মন আমার টগবগিয়ে উঠবে না, যতক্ষণ না সেই আসলটি—ছ'আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গিতে টোকা মেরে, ভুরু নাচিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসলো অসীম।

টেবিলের ওপর ফুলদানীটা বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলো সুমিতা।

—যাচ্ছো কোথায়? ওকে মুখিয়ে উঠলো অসীম, কাপড়টা ছাড়বে কখন? সময় তো পেরিয়ে গেলো!

অসীমের এমন বিকৃত মুখভঙ্গী অনিল দেখেনি আগে! মিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তার ধরণটাও যেন কেমন ধারা! নাঃ, মনটা আজ-কাল একটুতেই কেন খারাপ হয়ে যায়, মাথায় রক্ত যেন গরম হয়ে ওঠে!. সুমিতার দিকে ফিরে চাইলো অনিল, ম্লানমুখে সে দাঁড়িয়েছিলো দরোজার পাশে, হঠাৎ নজরে পড়লো—এই ক'টা মাসে বড্ড যেন রোগা হয়ে গেছে ও। চোখের কোলে কালি পড়েছে।

বিবেকের আর অনুশোচনার কাঁটা দুটো খচ্-খচ্ করে উঠলো বুকের ভেতর!

—যা'রে মিতা, কাপড় ছেড়ে আয়! স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললো অনিল,—তোমাদের কোথাও বেরুবার কথা ছিলো বুঝি,—তা তো জানি না, মিছিমিছি দেরী করিয়ে দিলাম!

—আরে না, না, দেরী আর কি? এই তো মোটে ছ'টা—সাড়ে ছ'টায় গেলেই চলবে! অলকাপুরীতে মাসীমার ওখানে নেমন্তন্ন! কেন তোমাদের ডাকেন নি?

—ঐ যাঃ! সত্যিই তো, একেবারে ভুলে গেছি, আজকাল কি সাংঘাতিক ভুলই যে ঘাড়ে চেপেছে আমার! ওদিকে শুকতারা হয়তো রেডি হয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে! আচ্ছা আমি চলি তাহলে—

চঞ্চল পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, অসীমের হো হো হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে ফিরে চাইলো ওর মুখের দিকে অনিল, হাসিটা যেন শোনালো অবিকল হায়েনার হাসির মতো!

পরের সপ্তাহের শনিবারে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সামনে জমেছে একটি কৌতূহলী জনতা। ছবির মানুষরা আসছে পার্টিতে। তাদের দর্শন করে মানবজন্ম সার্থক করার সুতীব্র লালসা নিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে পুণ্যপিপাসুর দলটি অপরাহ্ণ কালে। লাল, কালো, সাদা, সবুজ নানা রং-এর চকচকে মটোরে চড়ে আসছেন, সিনেমা-আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারা! আরো আসছেন ওদের যাঁরা আকাশে ওড়ান, পাতালে ডোবান ওদের ঘরকন্নার অভিনব খবর পরিবেশন করে জনসাধারণকে তাক্ লাগিয়ে দেন, সেই সব সিনেমাপত্রের সম্পাদক ও রিপোর্টাররা। এ ছাড়াও এসেছেন বন্ধু-বান্ধবী, শিল্পী আর সাহিত্যিকবৃন্দ।

অনিলকুমার আর শুকতারা সেন-এর বিয়ের খবরটা বেশ মুখরোচক ভাষায় অনেক আগেই বার করেছিলো সিনেমা-পত্রিকাগুলো। তার সঙ্গে ছিল ওদের নানা ভঙ্গিমার ফটোগুলো।

ঝিমিয়ে-পড়া বাজারটাকে ওরা বেশ জাঁকিয়ে তুলেছিলো, সত্যি-মিথ্যে মেশানো গরম গরম, নিত্য-নতুন খবরগুলো পরিবেশন করে!

এমন জমকালো ভোজসভায় শুধু আসেনি অনিলের কোনো আপনজন, একমাত্র অসীম ছাড়া।

সুস্মিতা আসতে পারেনি, অসুস্থ বলে! তবে অলকাপুরীর মাসীমা, একাই একশো হয়ে সবাইকে আদর-আপ্যায়ন করছেন, এমন সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলা যাদের সহায়, তাদের আবার ভাবনা কি! শুকতারা পরেছে রক্ত-রং বেনারসীর সঙ্গে মানিয়ে হীরে-চুনির গহনা! আজ আর ওকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে এই সেই লাস্যময়ী অভিনেত্রী শুকতারা সেন! ওর চন্দনআঁকা কপালের ঊর্দ্ধভাগে ঝলছে মুক্তোর সীঁথি থেকে ঝলন্ত হীরের ধুকধুকিটা। পাতলা আসমানী ওড়নার অবগুণ্ঠনে বধূবেশে ওকে দেখাচ্ছিলো কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মতো!

প্রমোদোৎসবের ঝড়-তুফান বইছে যেন বনেদি হোটেলটিকে মাতামাতি করে! এক কোণে একটি টেবিলের ধার ঘেঁসে বসেছিলো অনিরুদ্ধ, আর পম্পিয়া। দুজনের হাতে দুজনার হাত বাঁধা!

—এবারে আমাদের বিয়ের পালাটা চুকিয়ে ফেলা যাক, কি বলো? হাতের চাপ দিয়ে বললো অনিরুদ্ধ।

—রিন্-রিন্ ঝিন্-ঝিন্ শব্দের ঝঙ্কার তুলে হেসে উঠলো পম্পিয়া—

—আর, এত তাড়া কিসের অনি? বিয়ে হলেই তো সব শেষ হয়ে গেলো, যা কিছু রোমান্স তা তো ঐ বিয়ের আগেই! কেমন দুজনকে পাবার জন্যে দুজনের ছটফটানি, আবার হারাই-হারাই ভয়, তার পরেই হয়তো ক্ষণিক মিলনের রোমাণ্টিক পরিবেশ—এই তো বেশ। ওর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে জবাব দিলো পম্পিয়া।

ওর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলো অনিরুদ্ধ, হাসলো একটু। তারপর আস্তে আস্তে হাতখানা সরিয়ে নিলো!

একটু দূর থেকে ওদের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলো রতনলাল, তার পাশে বসেছিলো অসীম। দুজনের হাতে ফেনিল পানপাত্র। এক চুমুকে পাত্রটি শেষ করে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রতনলাল—কি হে, এরই মধ্যে উঠে পড়লে? আরো কয়েক পেগ চলুক না! জড়িয়ে জড়িয়ে বললো অসীম!

—না:! আর নয়, নতুন ক্যাডিলাকখানার ট্রায়াল দিতে হবে, একেবারে বেহুঁস হবার উপায় নেই আজ, বুঝলে কি না। বলতে বলতে পম্পিয়ার দিকে এগিয়ে গেলো রতনলাল—আপনি একাই এসেছেন নাকি মিস রাও? রাজাবাহাদুর আসেন নি? বললো রতনলাল।

—তাঁর আজ শরীরটা যে গোলমাল বাধিয়েছে, তাই তো একা আসতে পারলাম। তা না হলে কি বুড়োর হাত থেকে ছাড়া পাবার যো আছে? বাব্বা:, যক্ষির মত আগলে বেড়ায়, আমার যেন সাত রাজার ধন একটি মাত্র মাণিক ওঁর! কলকণ্ঠে হেসে, সোফায় গড়িয়ে পড়লো পম্পিয়া।

ওর সুরে সুর মিলিয়ে হেসে উঠলো রতনলাল।

—তা ওঁর ভয়টা কিছু অমূলক নয় মিস রাও! ও মণি-মাণিক্যের চেয়েও আপনি মূল্যবান, অনেকের কাছেই! কি বলেন মিষ্টার বাসু?

—হতে পারে। একটু হেসে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—চলুন না মিস রাও, নতুন ক্যাডিলাকখানার আজ ট্রায়াল দিতে যাবো,—ভারি আরামদায়ক গাড়ীখানা। যেমন রাজহাঁসের মতো গড়নটা, তেমনি তুলতুলে নরম সিটগুলো চড়লে আরো মজা, যেন হাওয়ার সমুদ্রে ভেসে চলেছি। আপনিও চলুন না মিষ্টার বাসু, বেশ ফুটফুটে চাঁদনী রাতটা পাওয়া গেছে।

—না, এখন তো আমার যাবার উপায় নেই মিষ্টার ক্ষেত্রি, জরুরি কাজ আছে আমার, পরে একদিন দেখবো আপনার রাজহাঁসটাকে।

—স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো পম্পিয়া। হাসি-খুসিতে চুলবুলিয়ে বললো,—চলুন, চলুন মিষ্টার ক্ষেত্রি! আঃ! কি ওয়াণ্ডারফুল প্ল্যানটা বাতলেছেন আপনি,—তার পর অনিরুদ্ধর কাঁধটি এক হাতে চেপে ধরে দুলিয়ে দিয়ে আদুরী ভঙ্গীতে বললো—তুমি দিন দিন বড্ড বাজে হয়ে যাচ্ছো অনি! এমন সুইট ইভনিংটা কি কাজ করবার জন্যে? আঃ, কি আলোর বন্যা, শুধু ভেসে যাওয়ার রাত আজ, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।

—আপাততঃ মামলার স্রোতে ভাসছি পম্। সে জন্য আর নতুন করে ভাসবার ইচ্ছে নেই। মৃদু হেসে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—তবে আর কি করা যাবে? আসুন মিস রাও! হাতে হাত জড়িয়ে বেরিয়ে গেলো ওরা দু জন। অনিরুদ্ধকে যাবার সময় হাত নেড়ে পম্পিয়া বাই, বাই, করে যেতে ভোলেনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরালো অনিরুদ্ধ!

—কি দিতে বলবো তোমায়? বিয়ার? রাম? হুইস্কি? না জিন?

একটু যেন চমক লাগলো অনিরুদ্ধর, কারণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো সে। কখন অসীম এসে যে দাঁড়িয়েছে পাশে, বুঝতে পারেনি। ওর প্রশ্নের জবাবে বললো,—নাঃ, কোনটাই নয়। বরং এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো?

—বলো কি? ঠাণ্ডা জলে কি মনের জ্বালা কমানো যায়? মন জুড়োবার অব্যর্থ ওষুধ হলো যে ঐগুলো, যেটা হোক একটা নিয়ে বসো। পাঁচ মিনিটেই দিল্ খোলসা হয়ে যাবে।

—আপাতত মনটা আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে অসীম, আর সে সম্পূর্ণ সুস্থ। কাজেই কোনো দাওয়াই-এর প্রয়োজন তার হচ্ছে না। মৃদু হাস্যের সঙ্গে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—মাই গড! তোমাকে কলা দেখিয়ে পালালো ওরা আর তুমি এখনও বলবে, তোমার মন সুস্থই আছে? আর তা যদি বলো, তবে আমি বলবো, তুমি একটা আস্ত পুরুষমানুষই নও। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বুঝেছো হে? যাকে চাও, নিজের পুরুষত্ব জাহির করো তার কাছে। একটা মেয়েমানুষকে বশে আনবার জন্তে খুব বেশী শক্তি খরচ করতে হয় না, একটু চাই কলাকৌশল, ব্যস, সব ঠাণ্ডা। কথা শেষ করে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে বোতলটা টেবিলের ওপর সশব্দে বসিয়ে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলো অসীম।

—তোমার মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ অসীম! তবে আফশোষের কথা এই যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে কথার বীজগুলো যদি ছড়াতে, তাহলে খুব উত্তম ফসল লাভ হতো, কিন্তু এটা একেবারে যাকে বলে পতিত জমি, বাক্যবীজগুলো তোমার ঐ মাঠেই মারা গেলো। আচ্ছা, চলি ভাই, একটা জরুরি কেশ রয়েছে হাতে। উঠে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধ। দু' পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। একটু ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বললো—তোমার ঐ গায়ের জোরে দখল-করা মেয়েমানুষ সম্পত্তির ওপর আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র লোভ নেই অসীম! আমি হচ্ছি মনের ব্যাপারী। ফুলের মতো সুন্দর মনের ওপরই আমার আকর্ষণ বেশী। সে রকম কিছুর সন্ধান পাও তো জানিও। প্রাণখোলা হাসির ঝড় তুলে অসীমের হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো অনিরুদ্ধ।

—হোপ্‌লেশ! শালা একেবারে মেয়েমানুষ বনে গেছে। বিকৃত স্বরে বললো অসীম।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাসীমা হি-হি করে হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—কার কথা বলছো অসীম?

—আবার কার? ঐ অনিরুদ্ধটার। বিলেতে যাবার আগে তবু মনুষ্যত্ব বলে ওটার কিছু ছিলো, কিন্তু এই ঘুরে আসবার পর দেখি একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছে—কতকগুলো বড় বড় ফাঁকা বুলিতে পেটটা বোঝাই করে এনেছে, আর যখন তখন ওগরাচ্ছে সেগুলো।

—সাচ্চা বাত! আমিও ভাবছিলাম তাই, অসীমের পিঠ চাপড়ে বললেন মাসীমা। কত ছেলেমেয়ের ভোল ফিরলো এই মাসীমার আখড়ায়, শুধু হল না কিছু ঐ ছোকরার! মদ নয়, কত ভালো ভালো মেয়েদের লেলিয়ে দিলাম, কিছুতেই কিছু নয়? একেবারে কলির শুকদেব ঠাকুর! তবে মন্দের ভালো বলতে হবে, পম্পিয়ার দিকে যেন ঝোঁক পড়েছে একটু! দেখি আবার কতদূরের জল কতদূরে যায়!

—হল না, মাসীমা হল না, আপনার টোপ গিলেছে একেবারে রাঘব বোয়ালে; রুই-কাতলার জন্যে ও টোপ নয়! একটু হিসেবে ভুল হয়েছে আপনার। মুচকে মুচকে হেসে, ঢুলু ঢুলু চোখ চেয়ে বললো অসীম।

—মাই গড! তাই নাকি? ব্যাপারটা কি খুলেই বলো না ডারলিং! ড্যাবা-ড্যাবা চোখে চমক খেলিয়ে শুধোলেন মাসীমা।

—বিশেষ কিছু নয়। ঐ রতনলালের নতুন সওদা করা ক্যাডিলাকে চড়ে এই চাঁদনী রাতে একটু হাওয়া খেতে গেছে পম্পিয়া রাও। তা আমি বলি কি, ঠিকই করেছে সে, ঐ নিরিমিষ বোষ্টমটার সঙ্গে হাঁপিয়ে উঠেছিলো ব্যাচারী! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ওটা পুরুষও নয় মেয়েমানুষও নয়, একেবারে যাকে বলে ক্লীবলিঙ্গ! কোনো মেয়েই বেশী দিন সইতে পারবে না ওকে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি!

—যাক্ বাঁচালে আমায়! ধড়ে প্রাণ এলো এতক্ষণে। আমি ভেবেছিলাম বাইরের কেউ ছোঁ মারলো বুঝি? রতনলাল তো আমাদের ঘরের লোক, পাওনা-কড়ি আমার মারবে না। কিন্তু অসীম, মাত্র পাঁচ হাজার ঠেকিয়ে তুমি যে চুপচাপ মেরে গেলে হে, বাকিটার কি করছো?

দাঁড়ান, দাঁড়ান! সবুর করুন, মেওয়া ফলতেও পারে, আবার না-ও পারে। আমি পেলাম কি? যে তার ভাগ দেব? শীগ্‌গির আসছে সন্নিসি ব্যাটা, দেখি কি করে? মোটারকম আদায় হয়ত আপনার মুঠোও ভরবে। আর তা না হলে ঐ মৃগীরুগীর দাঁতকপাটি যদি শুধু বরাতে আমার ঠক্ ঠক্ করে, তাহলে আপনার কপালেই বা ঝন-ঝন বাজবে কোথা থেকে বলুন?

—তা বটে! তা বটে! ঠিক আছে। যখন আসছেন সোমনাথ বাবু তখন নিশ্চয়ই এবার সব লিখে-পড়ে দিয়ে যাবেন! ঐ তো একটা মেয়ে, প্রচুর সম্পত্তি আছে শুনেছি, ভাগীদারও নেই কেউ! বুঝছো অসীম!

চোখ নাচিয়ে বিজ্ঞের হাসি হাসলেন মাসীমা।

—আরে চুপচাপ বসে কেন? ইটালী, ফরাসী, স্পেন, সব কিছু আনতে বলো, প্রাণ খুলে তোমার শুভলাককে রিসিভ করি!

—বেশতো অর্ডার দিন! হাসিমুখে বললো অসীম!

নিজেই গেলেন মাসীমা। পছন্দ করে আনলেন, বেশ কয়েক বোতল দামী দামী মাল, বেয়ারার কাঁধে চাপিয়ে!

আর সঙ্গে করে আনলেন, অলকাপুরীতে নতুন ভর্ত্তি হওয়া কয়েকজন ছেলে-মেয়েকে! লাখপতি, ক্রোড়পতির ছেলেমেয়েরাই মাসীমার সঙ্গে বসে পান করবার অধিকার পায়। কিছুদিন যেতে না যেতে ওরা মোটা অঙ্কের বাজি রেখে মদ্যপানের পাল্লা দিতে সুরু করে! এটা নাকি উঁচুমহলের দামী ফ্যাসান! বাজি রেখে তাসের পুকার, ফ্লাশ, আর ব্রিজ খেলাও চলে অলকাপুরীতে! সকল ক্ষেত্রেই বেশীর ভাগ বিজয়িনী হন মাসীমা। টাকার তোড়া নামিয়ে রেখে, শূন্য হাতে, কিন্তু আহ্লাদে পূর্ণ মন নিয়ে ফিরে যায় ধনীর দুলাল-দুলালীরা!

মাসীমার কাছে হেরেও সুখ!

নিজের হাতে মদ ঢেলে সকলকার গেলাস পূর্ণ করে দিলেন মাসীমা।

সকলে গেলাস ঠোকাঠুকি করে অসীমের সৌভাগ্য কামনা করলো!

তারপর হু-হু করে খালি হতে লাগলো বোতলগুলো।

অর্কেষ্ট্রায় বাজছে ইংরিজি প্রেমের গান! কেউ কেউ জুতো ঠুকে তাল দিচ্ছেন বাজনার সঙ্গে। কোথাও কপোত-কপোতী সম, নিরালায় মুখোমুখি বসে বিমুগ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকারা! বিয়ের আগের পূর্ব্বরাগ নয়, নিত্য-নতুন প্রেমের হাটের ফেরী ওরা! যত দিন দুজনে দুজনার মনে রং ছড়াতে পারে তত দিনই চাইবে পরস্পরকে, তারপর আবার হয়তো দেখা যাবে ওদের সঙ্গী বদল হয়েছে!

আগেকার দিনের হতাশ প্রণয়ীরা বিষ খেতো, লেকের জলে ডুবে মরতো, এখন আর সে সব ফ্যাসান চলে না,—দু'-চারদিন বড়জোর মদের লেকে হাবুডুবু খায়, তারপরই চাঙ্গা হয়ে উঠে নতুন মুখের সন্ধান করে!

—চারি দিকে পানোৎসব চলেছে! শুধু আজ ওসবের প্রয়োজন নেই নব দম্পতির! ওরা যেন সব পেয়েছির দেশ খুঁজে পেয়েছে! পরিতৃপ্তির বিমল আভা ঠিকরে পড়ছে ওদের দৃষ্টিপ্রদীপ থেকে! হাতে হাত রেখে পরম শান্তির কোলে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে বসেছিলো ওরা দুজন! আজ যেন ওরা নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র আর ওদের সামনে একটি খিচুড়ী-সোসাইটির অভিনয় হচ্ছে।

ওদের চোখে আজ এ অভিনয় একেবারেই অর্থহীন রসহীন বোধ হচ্ছে, এ সবের প্রয়োজন আজ ওদের ফুরিয়েছে!

ক্লিক-ক্লিক—মাঝে-মাঝে জ্বলে উঠছে ফ্লাশলাইট। ফটো নিচ্ছেন সাংবাদিকেরা, আলোকচিত্রশিল্পীরা।

ডিনারের শেষে আবার চললো পানোৎসব।

জমজমাট পার্টি ভাঙার মুখে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালো সুমিতা।

—আমি এসেছি ছোট মামা!

—চমকে উঠে চাইলো অনিল সুমিতার দিকে। যেন ফিরে এলো ওর মনটা কোন দূর-দূরান্তর স্বপ্নলোক থেকে।

—এত দেরীতে এলি মিতু? শরীর এখন ভালো তো! একটু হেসে বললো অনিল।

—হ্যাঁ, এখন একটু ভালো বোধ করছি। বিকেলে বড্ড মাথাটা ধরে ছিলো, ভেবেছিলাম আসতেই পারবো না, কিন্তু বড্ড খারাপ লাগছিলো তাই চলে এলাম। নিস্তেজ গলায় বললো সুমিতা।

—কিন্তু এমন সাদামাটা বেশ কেন ভাই? এ তো বিয়েবাড়ীর সাজ নয়, এ যেন শ্রাদ্ধ-বাড়ী যাওয়ার সজ্জা।

যেন কি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে আসল শুকতারা। ঠোঁট চেপে বাঁকা হাসি হেসে বললো—তোমার দিদিমা, মাসীমা কেউ তো এলেন না, তুমি যদি বা মনে করে এলে, এমন উদাসিনীর বেশে কেন ভাই ?

স'ত্যিই উদাসিনীর বেশে এসেছে সুমিতা! লালপাড় সাদা ঢাকাই শাড়ী পরনে। সদ্য স্নান-করা ভিজে চুলের রাশ ছড়ানো পিঠে। হাতে অল্প কয়েকগাছি সোনার চুড়ি, আর অঙ্গে নেই কোনো অলঙ্কার। মুখখানি ম্লান বিবর্ণ, তবুও কি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়! শান্ত পবিত্র শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন ওর সর্ব্বাঙ্গ থেকে। সে রূপের আলোয় ম্লান হয়ে গেছে বহু প্রসাধন বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিতা অন্যান্য রূপসীদের রূপপ্রভা। তারা সকলেই নির্ব্বাক দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলো ওর দিকে।

—শরীরটা ভালো ছিল না কি না, তাই এমনিই চলে এলাম—স্মিতহাস্যের সঙ্গে জবাব দিলো সুমিতা। তার পর কাপড়ের চাপা সরিয়ে বার করলো একটি ভেলভেটের কেস। কেসটি খুলে শুকতারার মণিবন্ধে পরিয়ে দিলো একটি হীরের ব্রেসলেট, তার মাঝে ছোট্ট ঘড়ি আঁটা। আর অনিলের আঙুলে পরালো একটা হীরের আংটি।

—এ কি! এ কি! করেছিস কি মিতু? বাপ রে, এ যে দেখছি বহু টাকার ব্যাপার! ব্যস্ত ভাবে বললো অনিল।

—না না, এমন আর কি! ও তো আমার ঘরেই ছিলো, ব্যবহার হয় না, তাই—লজ্জিত ভাবে জবাব দিলো সুমিতা।

শুকতারা নিজের হাতটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলো, বেশ খুশি হয়েছে মূল্যবান উপহারটি পেয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে সুমিতার গলাটি জড়িয়ে ধরে বললো—কি চমৎকার জিনিষটি! ভারি পছন্দ হয়েছে আমার! বোসো ভাই, তোমায় খাবার দিতে বলি।

—শুধু এক গ্লাস সরবত খাবো। আজ আর কিছু নয় ভাই! খাওয়া আমার পাওনা রইলো, বললো সুমিতা শুকতারার হাতটা চেপে ধরে।

একটু দূরের কোণঘেঁষা সোফায় বসে ঝিমুচ্ছিলেন মাসীমা। ড্রিঙ্কের মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছে, মদ্যপানের কম্পিটিসনে বাজি অবশ্য জিতেছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা উঠে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে সুমিতার পাশে। শুধু অসীম ছিলো মাসীমার কাছে। হঠাৎ সামনে চাপা ভীড় আর মৃদু গুঞ্জনের আওয়াজে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। ঢুলু-ঢুলু চোখে চেয়ে শুধোলেন—ব্যাপারটা কি হে? কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হল নাকি?

—না, ঠিক তা নয়—দেবীর আবির্ভাব হয়েছে ওখানে—মানে সুমিতা দেবীর—অবজ্ঞার হাসির সঙ্গে জবাব দিলো অসীম।

—অ্যাঁ কি বললে? মিতা? বলো কি অ্যাঁ?

ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন মাসীমা। টলতে টলতে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সুমিতার সামনে।

ফুলো রাঙা চোখ দিয়ে সুমিতার আপাদ-মস্তক লেহন করে হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে ওকে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। —তাই তো বলি, এ কি হতে পারে? মিতু আসবে না তা কি হয়? অ্যাঁ, সে কি না এসে পারে? ও মাই সুইট গার্ল ও মাই ডারলিং, তোর জন্তে যে এতক্ষণ এই বুকটা খাঁ-খাঁ করছিলো··· জড়িত কণ্ঠে প্রলাপ, বিলাপ করতে করতে সুমিতাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলেন মাসীমা।

—কি পান করছো মাই ডারলিং? তোমার গ্লাসে ওটা কি? শেরি? অর বিয়ার? না, না, ও তেমন ভালো নয়—আমি দিচ্ছি সব চেয়ে সেরা মাল, তোমাকে আজ খাওয়াবো। হ্যাঁ আলবৎ খাবে, আমার সঙ্গে বসে এক গেলাসে খাবে ডারলিং! সুমিতাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে বললেন মাসীমা।

তড়িৎ গতিতে এগিয়ে গিয়ে সুমিতার এক হাত চেপে ধরলো অনিল। ওকে ছেড়ে দিন মাসীমা, ও আজ বড় অসুস্থ, মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো অনিল।

—অসুস্থ? তাতে কি? খুব ভালো দাওয়াই দেব, ওসব রোগ-বালাই পড়পড়িয়ে পালাবে! হো-হো করে হেসে উঠলো আশে-পাশে ছিলো যারা।

—মাসীমাও যোগ দিলেন ওদের হাসিতে—ঠিক বলিনি? কি বলো ভাই তোমরা? হা, হা, হা, হা, হি, হি, হি, হি, হাসতে হাসতে বিষম খেয়ে হেঁচকি তুলতে লাগলেন তিনি। সোরগোল পড়ে গেলো ঘরে। নিয়ে আয় জল, পাখা? পাখা তো নেই—ঠাণ্ডা করা ঘর, বিজলী-পাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই। রুমাল নেড়ে সবাই হাওয়া করতে লাগলো মাসীমার মাথায়। সুস্থ হয়ে রুমালে চোখ মুছে এ-দিক ও-দিক চাইলেন মাসীমা—মিতা! মিতা কৈ?

তাই তো সুমিতা তো নেই! গোলমালের ভেতর কখন সে চলে গেছে!

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন সরু গলায় টিপ্পনী কাটলো—পাখী উড়ে গেছে!

—কে বললে এমন কথা? শুয়োর, গাধা, রাস্কেল,—ইডিয়ট ব্লাডি অ্যাস 'কোথাকার! দু' কোমরে হাত দিয়ে গর্জ্জন করতে লাগলেন মাসীমা,—নোংরা মাতাল সব। মাতলামী করবার জায়গা না জোটে তো ডাষ্টবিনে যা, জাহান্নমে য', এখানে কেন?

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে যেতে লাগলো। অসীম এগিয়ে এলো এক গ্লাস রাম হাতে নিয়ে। মাসীমার হাতে তুলে দিয়ে বললো—যেতে দিন মাসীমা, ও-সব নোংরা ঘেঁটে কাজ কি? বরং আরেকটু—

—ইয়েস! ইয়েস ডারলিং!

ফেনিল পাত্রটিতে চুমুক দিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন মাসীমা। পাত্রটি নিঃশেষ করে সোফায় মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে, ক্লান্ত ভাবে বললেন তিনি—আরেকটু ঢালো ডিয়ার! গরম করে দিয়েছে মাথাটা হ্যাবলা মাতালগুলো,—এই যে,—এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে, মাসীমা ও-সব নেড়ি-কুত্তার ঘেউ-ঘেউ-তে কান দিচ্ছেন কেন? আপনার মর্ম্ম ওরা জানে কি?" গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে-ঢালতে বললো অসীম।

—তা বটে! তা বটে! আহ্লাদে মাথা দোলালেন মাসীমা।—কয়েক পেগ শেষ করে চক্ষু বিস্ফারিত করে চারি ধারে চেয়ে জড়িত কণ্ঠে বিস্ময়োক্তি করলেন, মাই গড! একেবারে শূন্য পুরী যে! বানের জলে ভেসে গেলো না কি সব?

[ক্রমশঃ।

ব্যবহার করুন

হিমালয় বোকে ট্যালকাম পাউডার

সারাদিন সতেজ থাকার জন্যে

* এত সুগন্ধ
* এত কম খরচ
* সারা পরিবারের পক্ষেই আদর্শ

এরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

HBT 19-X52 BG

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৭

দিনটা ছিলো কোনো এক পরবের। বুঝি বা শিবরাত্রির পরদিনই হবে। ব্রিজদুলারী আর চম্পা দুজনেই এসেছিলো সতীচৌড়ার ঘাটে স্নান করতে। ঘাটে পুরোহিত বসে থাকেন ছাতার তলায় চৌকি পেতে। চোখ বুঁজে গঙ্গামাতার স্তব গাইতে গাইতে তিনটে ডুব দিয়ে উঠে এলো চম্পা গঙ্গাজলে বড় একটি ঘটি ভরে নিয়ে। তামার ছোট একটি ঘড়া। গঙ্গার শাদা বালিতে মেজে তাকে সোনার মতো ঝকঝকে করেছে চম্পা। ঘটের কানায় কানায় জল। চম্পার দেহে-ও যৌবন ভরা-ভরা। একটি করে সিঁড়ি ভেঙে ওঠে চম্পা আর শীতের আমেজ লাগা ঠাণ্ডা বাতাসে তার চুল ঝাপটায়। পুরোহিতের সামনে ঈষৎ নিচু হয়ে প্রণামী নামিয়ে দিলো চম্পা একটি রুপোর সিক্কা টাকা। মনে যেন গর্বও ছিলো। এত জন তো দিচ্ছে। কই, এই সাতাশ সালে এমন করে এক টাকা দিতে পারে কে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নিচু হয়ে দিচ্ছিলো প্রণামী, সে মুখ তুলে তাকালো। তাকিয়ে একটা নয় দুটো টাকা দিলো ব্রাহ্মণকে। অমনি অন্যান্য পুণ্যার্থিনী মেয়েদের মধ্যে ছোট ছোট গলায় গুঞ্জন উঠলো। সোজা কথা তো নয়! একটা ঢেবুয়া পয়সা, তামায় লোহায় মিশাল দেওয়া, তাই যদি পায় ব্রাহ্মণ দিনে চারটে, ছ-টা, তো তার দিন চলে যায়। এক মণ চাল এক টাকা, চল্লিশ সের আটা এক টাকা—তিন টাকা সকাল বেলা এমন বসে বসে পাওয়া পরম সৌভাগ্য।

চম্পা অধর দংশন করলো অপমানে। ততক্ষণে তাদের দুজনকে ঘিরে এসেছে ভিখারীর দল। অন্ধ কিশোরীটি বসে আছে সিঁড়ির ওপরের চবুতরায়। তাকে তার মা বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে সকালে। সে শুধু বলছে—সুরদাসকে দয়া কর! বলছে আর ঝুঁকি দিয়ে গেয়ে উঠছে একই গানের কলি।

—বসো মেরে নৈনন নন্দলাল!

তীক্ষ্ণ মিষ্ট সেই কিশোরকণ্ঠ। গানের ঝুঁকির শেষে সে উৎসুক মুখ তুলে তাকাচ্ছে সামনের দিকে। ওপাশে ভিখারীদের কলরব শুনে সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আজকে তার চাদরেও পড়বে ঢেবুয়া, পাই, আধলা! আর যদি আট-দশ পয়সা কামাই হয়, তো মা তাকে দোকান থেকে পুরী-জিলাপী খাইয়ে নিয়ে যাবে। মুখ তুলে তাকাচ্ছে অন্ধ বালক। আর দুই অন্ধ চোখের ওপর সকালের আলো ধুয়ে যাচ্ছে।

চম্পা মনে মনে অপমানে জ্বলে যাচ্ছে। আজ তার কাছে বেশী টাকা নেই। সব পয়সা, আধলা, পাই। একটি টাকা আছে, সে অন্ধবালককে দেবে, মনে মনে মেনে রেখেছে। এই অপরিচিতা গর্বিতার ব্যবহারে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সুরদাসের সামনে এসে চম্পা বালকের হাতে একটি টাকা দেয়। আর অমনি ব্রিজদুলারীর দাসী এসে দাঁড়ায়। বলে—বিবি তোকে দুটো টাকা দিলো। ধর, সুরদাস!

বড়লোকের দাসী! তার অহংকার কতো! চম্পার দিকে চেয়ে সে চোখ ঘোরায়। বলে—আজ বিবি দান করবে কত! পঞ্চাশ টাকা।

চম্পা না বলে পারে না—কে তোর বিবি?

—ব্রাইটের বিবি ব্রিজদুলারী। কানপুরে তাকে না জানে কে?

চম্পা গ্রামের মেয়ে। বিঁধে বিঁধে কথা কয়ে জ্বালা দিতে সে জানে! সে বললো—ও! উঠতে লাগলো সিঁড়ি ভেঙে, আর বলতে লাগলো—তবে তো হাজার টাকা দান করা উচিত। যার যত পাপ, সে ততো দান করবে। যার পুণ্য আছে সে কি পুণ্যের লোভে এমন কাঙাল হয়ে বেড়াবে?

শরসন্ধানে ভুল হয়নি। ঠিকই বিঁধেছে! ব্রিজদুলারীর মুখ অপমানে রাঙা হয়। নিষ্প্রাণ, বিষণ্ণ এক মর্মর-প্রতিমা যেন সজীব হয়। কথা কইতে চেয়েও কয় না সে। ত্রস্তে মুখ নিচু করে সতীদের স্মৃতিছত্রীতে জল ঢালে, মিঠাই-ফুল দেয়।

কেন এমন হয়? আজ দু'দিন ব্রাইট ঘরে নেই। গেছে ভগবানপুর। প্রতি রাত্রির সে তাণ্ডব, সে অত্যাচার দেহে বহন করে মরে যায় ব্রিজদুলারী। সর্বাঙ্গে সোনার গহনা, সে-ও তো ব্রাইটের একটা বর্বর অহংকারের পরিচয়। ব্রাইট যে তার বিবিকে কত ভালবাসে তাই দেখাতে চায়। ব্রিজদুলারী কি জানে না, যে ব্রাইটেরে প্রতি মানুষের ঘৃণা ও অবিশ্বাস, সবটাই তাকেও চিরতরে কলঙ্কিত করেছে। তাকে-ও সকলে ঘৃণা করে।

কিন্তু আজকের সকালটি যে তার ভালো লেগেছিলো? ভালো লেগেছিলো আজ স্নান করতে। মনটা ছিলো প্রসন্ন। কোনো এক শুভ সংবাদের প্রত্যাশা যেন মনটাকে সোনালী করেছিলো। আর ঐ যে মেয়েটি, ও তো চম্পা! চম্পার নাচ সে দেখেছে বটে ক্যান্টনমেন্টে। আজ ঐ তরুণী মেয়েটিকে দেখে বড় ভালো লেগেছিল তার। ব্রাহ্মণকে পয়সা দিতে দিতে এখনও ভেবেছিলো সে, যদি মেয়েটি তার সঙ্গে ভাব করে তো বেশ হয়।

হলো কই? তার নির্বোধ দাসী কি বললো, আর ঐ চম্পা

অমন করে রেগে উঠলো? ব্রিজদুলারীর মনটা নিমিষে ভারী হয়ে গেল। চোখ নিচু করে সে জল দিতে দিতে চললো। আর পয়সার প্রত্যাশায় একটি ছোট ছেলে, বুঝি বা ব্রাহ্মণই হবে, বলতে লাগলো—এইখানে সতীরা স্বর্গে গিয়েছেন। আগুনের শয্যায় বসে, স্বামীর পা বুকে ধরে। স্বর্গ থেকে রথ এসেছে। সতীকে নিয়ে গিয়েছে। এখন সতীরা অনন্তকাল স্বর্গসুখ করছেন।

চম্পা এমন সুযোগ ছাড়ে না। বলে—বাচ্চা! মিছে কথা বলিস না। কোম্পানী কানুনের অনেক পরেও আমার গাঁ ডেরাপুরে এক নির্বোধ মেয়েকে কেশবরামের মামা সতী করেছিলো। সে শুধু চেঁচিয়েছিলো আর কেঁদেছিলো ভয়ে। আমাদের গাঁয়ের সব বুড়ো-বুড়ীরা দেখতে গিয়েছিলো। কোথায় ছিল রথ? কোথায় ছিলো স্বর্গ?

বালক হেসে বলে—তবে তুমি জল দিচ্ছ কেন?

—দিচ্ছি এই জন্যে যে, বড় জ্বলে-জ্বলে মরেছে বেচারীরা! এখন একটু ঠাণ্ডা হোক। জানিস না তুই? যে রাত্তির বেলা এখান থেকে কান্না আর চীৎকার শোনা যায়? সেইজন্যে দিচ্ছি। পুণ্যের দরকার কি আমার? আমি তো আর পাপী নই?

ব্রিজদুলারী আহত ও পাংশুমুখে তাকায়। বলে—বহিন, তুমি না মান, অন্য যারা মানে, তাদের ছোট করো না।

—আমি কারুর বহিন নই। বলে বিজয়িনীর মতো ভেজা শাড়ীর আঁচল ঝাপ্টে চলে যায় চম্পা। ঘরে আসে সম্পূরণের জন্যে মিষ্টি কিনে। বলে—বুঢ়া, খাও। তারপর বলে—তোমাদের বিবি-সাহেবাকে আজ ঠোক্কর লাগিয়ে এলাম।

আদ্যোপান্ত শুনে সম্পূরণ বলে—শোন্ চম্পা, তুই ভুল করলি।

—কেন?

—ওর সঙ্গে ভাব কর তুই।

—ওর সঙ্গে?

সম্পূরণ হাসে। বলে—ও খুব দুঃখী। তুই কথা কইলে এক মিনিটেই ভাব করবে। জানলি?

—তা আমি ভাব করবো কেন? বুঢ়া, কি মতলব?

—কি মতলব?

চম্পা হাসে। বলে—বুঢ়া, তোমার মতলব আমি বুঝি না? রাত-দিন তুমি জমায়েত করছ! রিসালা আর ক্যান্টনমেন্টের লোক আসছে! বাজারে গরম গরম গল্প উড়ছে।

—দেখে এলি?

—নিশ্চয়! আমার চোখ নেই? তুমিও তার মধ্যে আছ।

সম্পূরণ বলে—মতলব নিশ্চয় আছে। কোন মতলব নেই, এমনিই তোকে আগলে বসে আছি? তোকেও টানব।

—কেন, বুঢ়া?

সম্পূরণ টেনে টেনে শক্ত হাতে খাটিয়ার রশি বাঁধে। তারপর বলে—কিছু কাজের কাজ করবি চম্পা! একটা জীবন তোর। টাকা-পয়সার অভাব নেই। যদি একটা ভাল কাজ করতে পারিস তো জানবি তোর ভাগ্য!

—আমার ভাগ্য?

—হ্যাঁ, চম্পা! যারা ভাল কাজ করে এ দুনিয়ায়, তাদেরই ভগবান এমনি একলা পাঠায়। এক জীবনে তুই কত গহনা পরবি? কত শাড়ী পরবি? কত মিঠাই খাবি? তাতেই কি সুখ?

—বুঢ়া, তুমি আমাকে সুখের কথা বলো না। কাজ যা বলো, করে দেবো। কেন করবো না?

—তো, ঐ মেয়েটির সঙ্গে ভাব কর্। মিশে যা ওর ঘরদোরে। আমি তোকে বলি চম্পা……অনেক কথা চম্পাকে বললো সম্পূরণ। বললো—আমাদের কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বিশ্বাসী মানুষের বড় প্রয়োজন এখন। তোর মতো সুযোগ কার আছে চম্পা? আর ব্রিজদুলারী যে ওদের মধ্যে রয়েছে! তুই মিশতে পারিস, ভাবগতিক বুঝতে পারিস, তবে ধরা দিবি না, জানলি?

—কিন্তু কি আশ্চর্য কথা শোনালে বুঢ়া, তা কি সম্ভব? তা কখনো হয়?

—হয় না? হতেই হবে। ধর্ম গেল, জাত গেল, সবই নাশ হয়ে গেল! আমাদের নবাবকে ওরা রাজ্য ছাড়িয়েছে। আর ফৌজের ওপর কি অত্যাচার! রুখে আছে সবাই। আর ফৌজও হাত হয়েছে। ক্ষেপে আছে। জানলি?

—বুঢ়া, তুমি কেমন করে জানলে?

সম্পূরণ সে কথার ঠিক জবাব দিতে পারে না। একটু ভাবে। বলে—কেমন করে জানলাম? বলতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চয় জানবি যে, মস্ত একটা টালমাটাল আসছে। যতো রাজা আর সর্দার, তারা আমাদের হাতী-ঘোড়া রসদ দেবে। ফৌজ আসবে হাতিয়ার নিয়ে। সবাই মিলে একজোটে রুখে উঠলে। পাহাড় ধ্বসে যায় তো এ তো কয়টা মাত্র শাদা মানুষ। তাদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারবো না?

চম্পা চিবুকে হাত রেখে ভাবে। তারপরে বলে—ওরা রাজা, ওরা সরকার, তো চালাবে না চাবুক?

—হাঁা, জরুর চালাবে। তবে ক্ষেতীজমি নেই, পেটে শুধু ভুখা আর পিঠে চাবুক! এমন আর বেশী দিন চলবে না।

সম্পূরণের কাছে শুনে চম্পা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্রিজদুলারীর সঙ্গে আলাপ করলো। উঠে এলো তার কুঠিতে নিঃসংকোচে। বললো—বড় টাকার দরকার আমার। একটা বালা রেখে দেবে আমাকে টাকা? কুড়ি টাকা?

ব্রিজদুলারী আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্রাইট ঘরে নেই, জেনে-শুনেই এসেছে চম্পা। আজ যে কি মনে আছে তার। ব্রিজদুলারীর দাসী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মনে ভাবে যে, সেদিন বাইরে পেয়ে অপমান করেছিলো চম্পা। আজ ঘরে পেয়ে ব্রিজদুলারী নিশ্চয় ফিরে অপমান করবার সুযোগ হারাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য হয় সে ব্রিজদুলারীর ব্যবহার দেখে। চম্পাকে চৌকিতে বসিয়ে আপ্যায়ন করে ব্রিজদুলারী। বলে—পান খাবে? তামাক খাও?

—না!

আলগোছে সুগন্ধি এলাচি সুপারি তুলে নেয় চম্পা। তারপর একটু হেসে বলে—সেদিন ঘরে ফিরে আমার ওপর রাগ করেছিলে?

—না তো! দুঃখ হয়েছিলো।

এবার দু'জনেই হাসে। আর পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে দু'জনের

মিলিত হাসি শুনে দাসী বিমর্ষ হয়ে পানের পিচ ফেলে মাথা নাড়ে। প্রহরা-নিরত সিপাহীটিকে বলে—মেয়েমানুষটার সরমও নেই, শরীরে যেন মানুষের রক্তও নেই! ছি! বাজারের একটা রমজানী, তোকে অপমান করলো সেধে, আর তুই তাকেই ঘরে ডেকে…

ব্রিজদুলারীর প্রাসাদে দাসীর কানে, হাতে, পায়ে ভারী রূপোর গহনা। সে দিকে চেয়ে সিপাহীটি বলে—বিবিকে বলে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দাও না! একটিবার ঘুরে আসি চার দিনের জন্যে?

—ওর পা ধরে কেঁদে পড়লেই হবে। আমি জানি তো?

—মঞ্জুর করাবে ছুটি?

—নিশ্চয়! মেয়েটা বোকা তো! আমরা সবাই ওকে ধরে ঐ সুবিধেটুকু আদায় করে নিই!

তবে এত নিন্দে কেন ওর?

—কাজ আদায় হয়ে গেলে কে মনে রাখে ওকে? ওকে সবাই ঘেন্না করে। ধর্ম নেই যার…

সেদিনকার আলাপেই সূত্রপাত হলো এক অভিনব ঘনিষ্ঠতার। ব্রিজদুলারী একদিন পালকী চড়ে উপস্থিত হলো চম্পার ঘরে। গাছের ছায়ায় বসে চম্পার সঙ্গে তার দেশ-ঘরের গল্প করতে খুব ভালো লাগলো। আর এজীবন যে সে সহ্য করতে পারছে না, তা-ও জানলো চম্পা।

চম্পা বললো—চলে গেলেই পার?

—সাহস হয় না। বলে ম্লান হাসলো ব্রিজদুলারী। বললো—যাবার জায়গা কোথায়? আমাকে কি আমার বাপ-ভাই আর ঘরে ঢুকতে দেবে?

—দেবে না?

—না।

সেদিন আর কথাবার্তা হয় না। ঘরে ফিরে ব্রাইট যখন জানে, এতক্ষণ সে কাটিয়ে এসেছে চম্পার ঘরে, অভ্যাস বশত গালি দিয়ে ওঠে না। বা মারে না। বরঞ্চ বলে—মেয়েটা বেশ। কি রকম টাকাপয়সা নেয় তা জানো?

—না। আর সে সব কথা তুমি ওর সম্পর্কে ভেব না।

ব্রিজদুলারী কোন দিনও এমন জবাব দেয় না, তাই ঈষৎ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে ব্রাইট। পরে শীষ দিয়ে বলে—আচ্ছা!

সেদিন ব্রাইট রাত্রির জন্তে অপেক্ষা করে না। যেমন পরুষ, তেমনই বর্বর হয় সে! আজ বলে কি, যেদিন, যখনই ব্রিজদুলারীর মধ্যে সে কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোন নিজস্ব মতামত, কোন স্বতন্ত্র সত্তার আভাসমাত্র দেখেছে, সেদিনই সে এমনই বর্বর হয়েছে। মনটাকে তো হাতে ধরা যায় না। দুই হাতের মধ্যে ধরা যায় যে দেহটাকে, তাকেই নিষ্পিষ্ট করে ব্রাইট গোটামানুষটাকে ভেঙে-চুরে দেয়। আর সত্যি-সত্যিই দেহে-মনে পরাজিত হয়ে অবসন্ন পড়ে থাকে ব্রিজদুলারী। মনে হয় ভেঙে চুরে মরে গিয়েছে সে। এর চেয়ে কোনো মৃত্যু ভয়ঙ্কর হতে পারে না।

এখন ব্রিজদুলারী যেন তবু সান্ত্বনা পায়। মনে হয় চম্পার সঙ্গে মিশে সে এতটুকু আলোর সন্ধান পেয়েছে। একেবারে সে একাকী নয়।

চম্পার প্রাঙ্গণে তাই আবার একদিন এসে নামে ব্রিজদুলারীর পালকী। ব্রিজদুলারী স্বল্প কুণ্ঠিত, হেসে বলে,—আজ আমার উপবাসের দিন। তাই তুই প্রহর সময় কাটাতে এলাম।

সম্পূরণ চম্পার কৃতিত্ব দেখে বড় খুশী হয়। ব্রাইটের বিবিকে একেবারে মাটির উঠোনে এনে ফেলেছে সে! পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নিভৃতে চম্পার কাছে বসে ব্রিজদুলারী নিজের মনখানি মেলে ধরে। চম্পার উঠানে একটা আমগাছ। কোনো প্রতিবেশীর ছাগলছানা সেখানে আলোছায়ায় লাফালাফি করে। কাজ করতে করতে চম্পা সুডোল হাতটি বাড়িয়ে এক মুঠো যব বাজরা ছিটিয়ে দেয় মাটিতে। নেমে এসে কটা পায়রা সেই খাবার খায় খুঁটে খুঁটে। চম্পার ঘরের পাকা দেয়াল, শানের মেঝে আর উঁচু খড়ের চাল। সেই চাল দিয়ে দুটো কাঠবেড়ালী ওঠে আর নামে। ব্রিজদুলারীর মনে হয়, এমন শান্তি সে অনেক দিন দেখেনি। এত অবসর কোথাও নেই। কেন যেন তার চম্পাকে বিশ্বাস করতে সাধ যায়। বলতে সুরু করে তার কথা। বলে—খুব ছোট গ্রাম আমাদের সিধারণ। আর ছোট গ্রামের ঠাকুরসাহেব আমার বাবা। শুনেছি আমার শৈশবে বিয়ে হয়েছিল। আমি বিধবা। তবে সে আমার মনে পড়ে না। বলে—দাদা পরদাদা সবাই সাহেবদের নিমক খেয়েছে। বাপও তাই বড় সাহেবদের ভক্ত। বেশ কেটে যাচ্ছিলো আমার জীবন। এমন সময় গ্রামে সাহেব তাঁবু ফেললো। সে তিন বছর হলো।

তার পর ঢোঁক চেপে গলা পরিষ্কার করে। চম্পার দিকে চেয়ে যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমন সানুনয় সুরে বলে—আমি বড় সুন্দর ছিলাম! আর জওয়ানীর অল্প বুদ্ধি ছিলো। বিপদ দেখেও আমি বুঝতে পারিনি।

তার পর আর কিছু বলে না। কেমন যেন হয়ে যায় ব্রিজদুলারী। পান ও তামাকে কালো ঠোঁট দংশন করতে থাকে। যা বলে না তা যেন চম্পাকে বুঝে নিতে অনুনয় করে। আর সেই অব্যক্ত কথা যেন চম্পাও শুনতে পায়। বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, এক অনভিজ্ঞ কিশোরীকে ছিঁড়ে উপড়ে এনেছে ব্রাইট। ছিন্নমূল সে গ্রামের মেয়ে এখানকার জীবনে বেঁচে আছে মাত্র—কিন্তু বাঁচবার আনন্দ তার হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই কি? এত অলঙ্কার, এত ঐশ্বর্যেও কি কিছুই ভরেনি তার? না, আরো কথা আছে?

ব্রিজদুলারী বলে—আমার বাপ ভাই খুব খুসী। ফৌজে তাদের সুযোগ সুবিধে আছে। অন্য ফৌজী সিপাহী তাদের মানে। সাহেবও তাদের দিয়েছে অনেক।

—আর তুমি?

চৌকা জ্বালিয়ে আগুনটা দেখে চম্পা। বলে—তুমি সুখী হয়েছ?

ছোট একটি ছুরি নিয়ে ব্রিজদুলারী সুনিপুণ হাতে কুচিয়ে কাটে শাক-শবজী। বলে, হয়েছি তো!

চম্পার বলতে ইচ্ছে যায়, তবে কেন তোমার স্বভাবগৌর বর্ণ এমন পাণ্ডুর? কেন তোমার চোখের নিচে নিরন্তর কালিমা? কেন এক শোকের বিষণ্ণ বিভ্রান্তি তোমার মুখে? দৃষ্টি যেন সর্বদা আহত। তবে সে কথা মুখে কিছু বলে না। বলে—তবে গ্রামে যেতে বাধা কি?

—তুমি বুঝবে না। আমার সঙ্গে তারা কি খাওয়া-দাওয়া করবে? আমাকে শাদী, গাওনা, ক্রিয়াচৌমায় ডাকবে?

না ডাকবে না। তা জানে চম্পা। শায়ে দুটো-একটা কথা বলে উঠে পড়ে ত্রিজদুলারী। চম্পা বলে—ভালো লাগে তো বসো না। ভয় কি?

—তুমি বুঝবে না। বলে ত্রস্তে চলে যায় সে।

ত্রিজদুলারীর সঙ্গে কথা কয়েই এক দিন চম্পার ডেরাপুরে যাবার ইচ্ছে হলো। আসলে মনে মনে ছিলো চন্দনের খবর নেবার ইচ্ছা। ত্রিজদুলারীর সঙ্গে তখন তার খুব ঘনিষ্ঠতা। আরো অনেক কথা বলেছে ত্রিজদুলারী। বলেছে—আমার জীবনটার সবটাই পাপের। তবু তারই মধ্যে একটা খাঁটি মানুষ আমি দেখেছিলাম চম্পা। মুক্তি পাবার একটা সুযোগ আমার হাতের মধ্যে এসেছিলো। বড় দয়ার শরীর তার, মনে বড় দয়া-মায়া। আমাকে দেখে সে দুঃখ পেয়েছিলো। কেন কে জানে?

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সে। বলে—আমি আজও বুঝতে পারি না যে সে কেমন করে বুঝেছিলো। অথচ তখন আমার কুঠি, দাসী, সোনা-চাঁদি কিছুর অভাব নেই। তবু দেখ চম্পা, সে ঠিকই বুঝলো যে আমার সুখ নেই। আমি সাহেবকে বলেছিলাম যে আমি তার কাছে উর্দ্দু শিখবো। সেই সময়ই সে একদিন বললো, এত দুঃখের মধ্যে থাকবার দরকার কি? কেন থাকবে তুমি? চলে এসো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। সে তৈরী ছিলো। কিন্তু আমি সাহস পাইনি চম্পা! সাহস পাইনি আর সেই একটা ভুলের জন্যে জীবনটা আমার বরবাদ হয়ে গেল। একেবারে।

—আর ফিরে যেতে পারো না? আবার ফিরে গেলে হয় না?

চম্পার সমব্যথী প্রশ্নের জবাবে ত্রিজদুলারী মাথা নেড়েছিলো। না তা হয় না। আর সেই বিষণ্ণ মুখখানার দিকে চেয়ে চম্পার মনে হয়েছিলো হতাশার বেদনা এত গভীর, এমন সর্বব্যাপী, যে তার কূল-কিনারা নেই। শুভ মুহূর্ত একবার এসে চলে গেলে কি তাকে আর পাওয়া যায় না?

সম্ভবতঃ তার পরেই তার মনও খারাপ হয়ে গেল। সেই ভাঙাঘর আর সেই ছোট নদী তার জীবনের অনেক দিনের স্মৃতিবিজড়িত সেই গ্রামখানি দেখতে বাসনা হলো।

সম্পূরণকে তাই একদিন বললো সে—চল বুঢ়া! তোর চম্পা কোন্ বাগানের ফুল, দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ডেরাপুর গ্রামে ফিরে এসেছে চম্পা, ফিরে এসেছে রাণী হয়ে, দাসী সঙ্গে নিয়ে, টাকা পয়সা খয়রাত করতে এসেছে, এ কথা জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই। এ যেন রূপকথার গল্প হয়ে গেল। যে মানুষ বেঁচে আছে কি মরে আছে, তাই কেউ জানতো না। সে এসেছে এমন জাঁকজমক দিয়ে?

চম্পার ভাঙাঘরে এখন বুড়ী কৌশল্যার পরিবার পরিজন শুধু আছে। সেখানে কেমন করে থাকবে চম্পা? গ্রামের মানুষ ভেঙে এলো সেই ভাঙা উঠোনে। হ্যাঁ, চম্পাই বটে। কৌশল্যার নাতিকে টাকা দিচ্ছে তার মায়ের ভাঙাঘরখানি সেরে নিতে। ছোটবেলার সাথীসহেলীর খবর নিচ্ছে। বসেছে জৌনপুরী গালিচার আসনে। পান খাচ্ছে খাঁটি চাদির ডিবে থেকে। দুই হাতে সাত আটটা আংটি ঝলকাচ্ছে। পায়ে নাগরা জুতো। নাগরার ওপর ভারী চাঁদির তোড়া।

আর কথায় বার্ত্তায় বা কি রইস ভাব! দেখে-শুনে মানুষের তাজ্জব লেগে গেল! তাজ্জব দেখতে কেশবরাম নিজেই এলো। মায়ের নাম করে গৈবীনাথের মন্দিরে মোহর দিলো চম্পা। গাঁয়ের দশ জনে টাকা দিয়ে বাঁধিয়ে দিচ্ছে পণ্ডিতজীর ঘর। সেখানে ছেলেরা পড়বে সকালে আর সন্ধ্যায় পুরাণ পড়বেন পণ্ডিতজী! ছোটবেলায় পণ্ডিতজীর বেত চুরি করে ভেঙে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে চন্দন কত বার, আর চম্পা তাকে সাহায্য করেছে। আজ সে কথা ভুলে চম্পা এক মোহর প্রণামী দিলো এই শুভকাজে।

আর অনেক দিন আগে, তাদের সকল সম্পত্তির সঙ্গে যে বাঁধানো ইঁদারা কিনে নিয়েছিল লালা, সেই ইঁদারা ফিরে কিনলো চম্পা। গ্রামের দশজনের সামনে সে মোহর দিলো দু'টি কেশবরামের হাতে। বললো—একটুকু পিয়াসের জল ভরতে মা আমার বড় কষ্ট পেয়ে গিয়েছে। এই ইঁদারা দেখবে আমার ধর্মভাই। কৌশল্যা নানীর নাতি! দেখবে কি, যে কোনো দুখিয়ারী যেন জল নিতে কষ্ট না পায়।

সব হলো, শুধু যার জন্যে আসা, তার কোনো খবর পেল না চম্পা। আর যাকে দেখাবে বলে আসা, সেই দুর্গার সঙ্গে দেখা হলো না। প্রতাপসিংহের বৌ দুর্গার গর্ব কি আজও ভাঙে নি?

দেখা হলো। দেখা হলো এমন পরিবেশে, এমন করে, যে তেমন করে দেখতে চম্পা চায়নি। চন্দনের বাপকে দেখলো বটে রাস্তায়। অকালে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে। রগের দুই পাশে পাক ধরেছে চুলে। কিন্তু শুধু তাই-ই নয়। কোথায় যেন হেরে গিয়েছে মানুষটা। পায়ে সে পেতলের ফুলবসানো ভারী নাগরা আজও আছে। কিন্তু সে মদগর্বিত ভঙ্গী কোথায় চলনে? কিসে, কেমন করে হেরে গেল মানুষটা?

কৌশল্যার নাতির বাচ্চা মেয়ে ছিলো চম্পার সঙ্গে। সম্পূরণকে লুকিয়ে তার হাত ধরে বেরিয়েছিলো চম্পা। কৌশল্যার নাতি বলে গিয়েছে—চম্পাবহিন, প্রতাপ সিং রেগে গিয়েছে জানো? তার ইঁদারা থেকেই জল নেয় মানুষ। তুমি ইঁদারা দিচ্ছ গ্রামকে, তাতে তার অপমান হয়েছে।

—হ্যাঁ, তিন্তাসের জলের সঙ্গে তার বৌ জিভ দিয়ে আগুনের হলকা দিয়ে দিতো, সেটা তো আর হচ্ছে না! রাগ তো হবেই!

ঘুরতে ফিরতেই চোখে পড়লো আকাশের শরীর মতো এই চম্পা এসেছে তাদের গেরস্থালীতে। বাচ্চা মেয়েটির মনে হচ্ছিলো এই সুন্দর মেয়েটির আঙুল ধরে হাঁটতেও না জানি কত গরব! মনের খুসীতে সে কথা কইছিল আর দেখছিল চম্পার গহনা! এমনি সময় চোখে পড়লো চম্পার।

সেই বটগাছ। তার গায়ে হেলান দিয়ে কপালে হাত রেখে ওপারের দিকে দিশা করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে! মাথায় কাপড় নেই। রুক্ষচুল উড়ছে। পাশে গামছা নিয়ে ঘড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বালক ভৃত্য।

অনেক দিন বাদে দেখা। তবু চিনতে ভুল হয় না। ছোট মেয়েটি বলে—ঐ হলো প্রতাপসিংহের বৌ। [illegible]

সে-ই করে। রোজ আসে আর এমনি করে চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে ঘরে চলে যায়। ওর ছেলে আর ঘরে আসবে না জানো?

মানুষের গলা শুনে দুর্গা এদিকে তাকাল কি? চকিতে পিছু ফিরলো চম্পা। তবু এক মুহূর্ত দু'জনে দু'জনকে দেখল। দুর্গার বিস্মিত দৃষ্টি বেদনায় ভারী। মুখে-চোখে কপালে সুগভীর দুঃখের রেখা। হতাশা আর দুঃখের কালিমা। কোথায় সে গর্বিত নিষ্ঠুর দুর্গা?

দুর্গা দেখলো একখানা তরুণ সুন্দর মুখ। সমব্যথায় কাতর, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক. বুঝি বা কিছু বলতে চায়।

হায়, কোথায় গেল চম্পার পূর্বসঙ্কল্প? সে না বলতে চেয়েছিলো, চেয়েছিলো যে দেখ দুর্গা আমি রমজানী হয়েছি। তুমি পুণ্যবতী, সফল হয়েছে তোমার কথা। দেখ আজ আমিও ঐশ্বর্যে তোমার সমতুল হয়েছি। আজ কি তোমার গর্ব করা সাজে?

সে কথা বলতে পারছে না চম্পা। সে চলে যেতে চাইছে এই হতাশ বিকৃতার সামনে থেকে। কিন্তু পারছে কই?

—চম্পা!

কানে হাত চাপা দেয় চম্পা। এমন গলায় তাকে যদি ডাকে চন্দনের মা তবে সে কেমন করে চলে যায়?

—চম্পা শোন্!

ছুটে নেমে এসেছে দুর্গা। বৃন্দাবন ছাপা শাড়ীর আঁচল মাথা ছেড়ে ধুলোয় পড়েছে চম্পার সামনে, দাঁড়ায় দুর্গা। বলে—চম্পা, আমার চন্দন কোথায়?

মাথা নাড়ে চম্পা। বলে—চাচী, আমি জানি না।

—তুই জানিস চম্পা!

দুরাশায় জ্বল-জ্বল করে দুর্গার চোখ। বলে—তুই এসেছিস শুনে থেকে আমি একটি বার দেখা করতে চাইছি। তুই বল্ চম্পা। কোথায় আছে সে?

—আমি জানি না।

—জানিস না?

এবার হাহাকার করে ওঠে দুর্গার রিক্ত কণ্ঠ। বলে—ফিরে দে চম্পা, মায়ের ছেলে মার কাছে ফিরে দে, তারপর আমিই তোর হাতে আবার দিয়ে দেব তাকে। আমি ধরে রাখব না।

সব সংকল্প ভেঙে গিয়েছে। চম্পা দুর্গার দুটি হাত ধরে। বলে—চাচী, তুমি তার মা। আমি তার নাম করে কসম খাচ্ছি, আমি তোমার ছেলের কোন খবর জানি না। যদি জানতাম—

রূঢ় হচ্ছে জেনেও না বলে পারে না চম্পা। বলে—যদি জানতাম তুমিও ধরে রাখতে পারতে না, তা হলে হয়তো বা নিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি জানি না।

এবার দুর্গা জ্বলে ওঠে। সেই তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে দেয় তার কণ্ঠ। সে বলে—মিথ্যা কথা বলছিস তুই! আমি জানি না, যে তুই বাজারে নেমেছিস আর তাকে-ও টেনে নামিয়েছিস সেই সঙ্গে? কোন্ মন্তরে যাদু করেছিস সর্বনাশী! যে সে ছেলে মা ভুলে গেল, বাপ ভুলে গেল, আর এলো না?

তবু চম্পা জ্বলে ওঠে না। আর আঘাত দেয় না। আজ বড় দুঃখে তার ক্ষীণ হাসি আসে। সে বলে—দুর্গাচাচী, তুমি পুণ্যবতী। তোমার কথা সত্যি হয়েছে। হ্যাঁ, আমি ভেসে গিয়েছি, বে-দিশা হয়ে গিয়েছি। কিন্তু যা ক্ষতি করেছি, নিজের করেছি। কোনো দুখিয়ারীর ছেলেকে আমি কেড়ে নিইনি। সে পাপ আমি করিনি।

চলে আসে চম্পা। এত দিনের মধ্যে আজকে প্রথম সে শূন্যঘরের মেঝেতে শুয়ে কেঁদে নেয় খানিক। কাঁদে তার চিরদুঃখিনী মায়ের জন্যে। কাঁদে আর এক হতভাগিনীর জন্যে, যে দুরন্ত অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে ছেলেকে দেশান্তরী করে পলে পলে তিলে তিলে পুড়ে মরছে। আর কাঁদে নিজের দুঃখে। এইখানেই শেষ হলো এক অধ্যায়। আর কোন দিন ফিরে দেখবে না সে চন্দনকে। শৈশব থেকে যৌবন অবধি চম্পার সবটুকু যে নিয়ে গিয়েছে, আর যে খেয়ালী ছেলে আবার বে-দিশা হয়ে হারিয়ে গিয়েছে।

কেঁদেকেটে সে উঠলো। পরদিন শম্ভুচরণকে বললো—বুঢ়া চল।

—কাজ খতম?

—খতম না শুরু, জানি না।

যাবার কালে গ্রামখানিকে যত দূর দেখা গেল ফিরে ফিরে দেখলো চম্পা। যেন মনে মনে জানলো এই হলো শেষ দেখা।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। তারও পরে সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে বিঠুরে দেখা হলো আবার চন্দনের সঙ্গে। চম্পা ও চন্দনের সে বিচিত্র সাক্ষাৎকার দিয়েই এ কাহিনীর মুখবন্ধ। কিন্তু শুধু পুনর্মিলনে নয়। সেই দিনেই নিজের অজানতে ইভান্স আকৃষ্ট হলো তার প্রতি। নানার প্রাসাদে সে উৎসব ফুরোল। কিন্তু আসরে প্রবেশ করেছিলো চম্পা মশাল হাতে, প্রদীপ জ্বালাতে।

আসরের সে বাতি শুধু সন্ধ্যার, শুধু প্রমোদের। কিন্তু অনভিজ্ঞ দর্শক ইভান্স নিজের হৃদয়েও সেই প্রদীপ থেকে জ্বালিয়ে নিলো একটি শিখা। সে জানতো না যে আগুনের খেলায় মেতে যদি নিজেও জ্বলতে শুরু করে কেউ, তবে সে আগুন নেবানো যায় না।

বিঠুর থেকে ফিরলো চম্পা। আর তাকে অনুসরণ করে কানপুরে এলো ইভানস। শুরু হলো আর এক অধ্যায়। অগ্নিগর্ভ লক্ষ্মৌবনের পটভূমিকায়।

[ক্রমশঃ।

"Europe, the centre of the manifestation of material energy, will crumble into dust within fifty years, if she is not mindful to change her position, to shift her ground and make spirituality the basis of her life and what will save Europe is the religion of the Upanishads."

—Swami Vivekananda

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

ষোল

যা বলেছিস অন্নদাসী—ঘর করছে এতকাল, মানুষটা চিনবে না? রাধেশ্যামের গায়ের ব্যথা কিছুতে মরে না। খোঁড়া ডান পা খানাও ভাল হচ্ছে না। ঘরে বসেই যখন দু-বেলা দু-পাথর জুটে যাচ্ছে, ব্যথা মরতে যাবে কেন? ভাল হয়ে গেলেই তো জাল-হাতে বেরুতে হবে রাত্রিবেলা। মাছ মারো, মাছ না মিলল তো উপোস করো। সেই পুরানো ঝামেলা। দিব্যি আছে এখন। অন্নদাসী সকালবেলা বাড়ির পাট সেরে ছেলেটাকে রাতের জল-দেওয়া ভাত চাট্টি খাইয়ে দিয়ে চৌধুরিগঞ্জের আলায় চলে যায়। ভরদ্বাজের খাওয়া-দাওয়ার পর নিজে খেয়ে কাঁসরভর্তি ভাত-তরকারি নিয়ে ঘরে আসে। সন্ধ্যার পর বেরোয়, রাত্রে আবার ভাত নিয়ে আসে দুপুরবেলার মতো।

আছে ভালো রাধেশ্যাম। একটা মুশকিল, অন্নদাসী চলে যাবার পর একেবারে চুপচাপ বসে থাকা। বাচ্চাটা ট্যাঁ-ভ্যাঁ করলে তাকে একটা-দুটো চড়চাপড় দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। মন টেঁকে না ঘরের মধ্যে এমন ভাবে। ভেবেচিন্তে এক কাজ করে। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সেও বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। বউ টের পাবে না, ফিরে আসতে তার অনেক রাত্রি হয়। পায়ে-পায়ে রাধেশ্যাম চলে গেল গগনের আলায়। নাম-গানের আসরে গিয়ে বসল। অবাক! বুড়ো হর ঘড়ুই অবধি ইতিমধ্যে গৌরভক্ত হয়ে পড়েছে। 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম গৌরনিতাই রাধেশ্যাম'—বলছে সকলে বিড়বিড় করে। হারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে আসরের একদিকে—এও ভারি তাজ্জব। গগন কত বড়লোক হয়েছে বোঝ তবে—অবহেলায় অকারণে কেরোসিন পোড়াচ্ছে। আর সেই আলোয় দেখা যায় ভাববিহ্বল গগন এবং আশেপাশে একগাদা মানুষ। বনরাজ্যে হাঙ্গামা তো কথায় কথায়। মেছোঘেরি হবার পরে কোন আলা অরক্ষিত দেখলে রে-রে করে আলায় পড়ে লোকজন পিটিয়ে শড়কিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে এখনো মাছ লুঠ করে নিয়ে যায়। আর সেদিকে তত সুবিধা হচ্ছে না বলেই নিশিরাত্রে টিপিটিপি ভেড়ির খোলে জাল ফেলে। ডাকাত না হতে পেরে চোর। সেই সব লোকই পরম শান্ত ভাবে গৌরাঙ্গ-ভজন করছে কেমন দেখ: ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম—রাধেশ্যাম ভাবছে, তা মন্দ কি! ঘরেও তো একলা চুপচাপ থাকা, এখানে আধেক চোখ বুঁজে চুপ করে থাক, পরকালের পুণ্য লাভ হবে।

তাছাড়া নগদ লভ্যও কিছু আছে, আসর ভাঙবার মুখে সেটা জানা গেল। গুড়ে-চালা চিঁড়ে-ভাজা, কোন দিন বা মুড়ি-ফুলুরি। আবার এক একদিন হরির লুঠ দেয়, লুঠের বাতাসা কুড়িয়ে কণিকা পরিমাণ মাথায় দিয়ে দিব্যি কুড়মুড় করে চিবানো যায় অনেকক্ষণ। শুধুমাত্র পরলোকের আশাতেই, অতএব, ভক্তদল এসে জমায়েত হল না। কিন্তু গগন দাস কল্পতরু হয়ে দু-হাতে টাকা উড়াতে লাগল, পোড়ো-টাকা পেল নাকি কোনখানে? মা রটন্তী-কালিকা নতুন-আলার চাল ফুঁড়ে টাকার বৃষ্টি করে গেছেন?

আলা থেকে ঘরে ফিরে গিয়ে রাধেশ্যাম যথারীতি মাদুরের উপর গিয়ে পড়ে। অন্নদাসীর ফিরবার দেরি আছে তখনো। ফুলতলার নৌকো রওনা করে দিয়ে তবে ভরদ্বাজ রাঁধতে বসেন। রাঁধাবাড়া শেষ করে তিনি খাবেন, উচ্ছিষ্ট মুক্ত করে এঁটো-বাসন সরিয়ে রেখে রান্নাঘর গোবরমাটি দিয়ে পেড়ে তবে তো ফিরবে বাড়িতে। রাধেশ্যাম ঘুমোয় ততক্ষণ। বড় সজাগ ঘুম—বউয়ের পায়ের শব্দ পেলেই জেগে উঠে কাতরাতে আরম্ভ করে। অন্নদাসী এসে কাঁসরের ভাত-তরকারি পাথরে বেড়ে রাধেশ্যামকে দেয়। অল্প চাট্টি কাঁসরে থাকে, সেগুলো ব্যঞ্জন দিয়ে মেখে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে বসিয়ে গালে পুরে পুরে খাওয়ায়।

একদিন গণ্ডগোল হল। ভাত মেখে বাচ্চাকে তুলতে গিয়ে দেখে, নেই। কোথায় গেল? রাধেশ্যামকে জিজ্ঞাসা করে, তুই কোথা গো?

অ্যাঁ, ছিল তো শুয়ে—

অন্নদাসী এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখে বলে, কোথাও তো নেই। ছেলের খোঁজ জানো না—তুমি ছিলে কি জন্যে তবে ঘরে?

রাধেশ্যাম বলে, ঘুম এসে গিয়েছিল। বুঝি কি করে যে হারামজাদা সেই ফাঁকে অমনি কানে হেঁটে রওনা দেবে।

বাদারাজ্যে শিয়াল নেই যে ঘুমন্ত বাচ্চা শিয়ালে মুখে করে নিয়ে যাবে। আর হল বড়-শিয়াল—কিন্তু পাড়ার মধ্যে এসে টু শব্দ না করে ছেলের টুঁটি ধরে সরে পড়বে, তেমন চোরাই স্বভাবের তারা নয়। গেল কোথায় তা হলে?

রাধেশ্যামও খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—বিষম কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়—ঘরের বাইরেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে এলো একবার। অন্নদাসী চরকির মতন পাক দিচ্ছে ঝগড়াঝাটির সময় আপাতত নয়, ভাঁটার মতন বড় বড় চোখ বুজিয়ে ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে যাচ্ছে শুধু। বাঁধ অবধি চলে গিয়ে হাঁক পড়েছে, তুষ্টু তুষ্টু রে—

শিরোমণি সর্দারের বউ সুবোধবালা সাড়া দিয়ে উঠল : ফিরলি নাকিরে বউ? কী কাণ্ড, ওরে সে কী কাণ্ড!

বলতে বলতে এদের উঠানে চলে এলো। কাঁধের উপর তুষ্টু। ঘুমুচ্ছে। নেতিয়ে আছে একখানা ন্যাকড়ার মতো।

তুষ্টু তোমার কাছে দিদি! তুমি নিয়ে গিয়েছিলে? আর দেখ, আমরা দাপাদাপি করে মরি।

সুবোধবালা গালে হাত দিয়ে বলে, বলিহারি আক্কেল তোদের দিদি। ঘরের মধ্যে বাচ্চা রেখে দু'জনে বেরিয়ে পড়েছিস। দুয়োর হা-হা করছে।

অন্ন বলে, দুজনে যাব কেন? তোমার দেওর ছিল। তার জিম্মায় রেখে আমি চৌধুরি-আলায় যাই। পেটের জ্বালায় না গিয়ে উপায় তো নেই?

শিরোমণি আর রাধেশ্যামে ভাই ডাকাডাকি। বয়সে কে বড় কে ছোট এই নিয়ে বিরোধ আছে। হিসাব ও তর্কাতর্কি হয় মাঝে মাঝে। অন্নদাসীর স্বার্থ, নিজের মরদের কম বয়স বলে জাহির করা। রাধেশ্যাম তাই হল সুবোধবালার দেওর।

অন্নদাসী বলে, তোমার দেওর সেই থেকে নড়ে বসতে পারে না। আমিও ছাড়ন-পাত্তোর নই দিদি। জালে যাবে না তো ছেলে ধরো।

সুবোধবালা বলে, নড়তে পারে না তো ঘর ছেড়ে চলে গেল কেমন করে? তুইও যেমন দিদি—পুরুষ বলল, আর সেই কথায় অমনি গেরো দিয়ে বসলি।

রাধেশ্যাম না-না—করে ওঠে : ছিলাম বই কি! আলবৎ ছিলাম, তুমি দেখনি। ঘুমুচ্ছিলাম।

সুবোধবালা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, যা চেঁচান চেঁচাচ্ছিল, মরা মানুষও খাড়া হয়ে উঠে বসে। বিছেয় কামড়েছিল পাছাতে—কান্না শুনে ছুটে এসে দেখি এই বৃত্তান্ত। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাছার উপার মাথা-তামাক ডলে ডলে তবে জ্বালাটা কমল। তার পরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে তুমি ঘুমিয়েছিলে—আমি কানা কি না, পর্বতের মতন দেহখানা আমার ঠাহরে এলো না।

ছেলে দিয়ে সুবোধবালা চলে গেল। এইবারে এতক্ষণে বোঝা-বুঝি ষোল-আনা—রাধেশ্যাম সেটা বুঝতে পারছে। মাদুরের উপর পড়বে না কি ধপাস করে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে মোক্ষম ঘুম? তাতে খুব সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। আঁস্তাকুড়ে গিয়ে দাঁড়ালে যমে রেহাই করে না, টেনে খাড়া তুলে বসিয়ে অন্নদাসী কথা শোনাবে। তার চেয়ে উল্টো চাপ দিয়ে সে-ই আগেভাগে শুনিয়ে দিক।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রাধেশ্যাম বলে, এত রাত অবধি কোনখানে থাকা হল ঠাকরুনের? কি কর্ম করা হচ্ছিল?

অন্নদাসী এক মুহূর্ত হকচকিয়ে যায়। শেষে বলে, ভাত এনে এনে মুখের কাছে ধরি কিনা, মুখে তাই ট্যাঙস-ট্যাঙস বুলি হয়েছে। যার ভাত এনে খাওয়াই, সে মানুষটার খাওয়া শেষ না হলে চলে আসি কেমন করে?

রাধেশ্যাম বলে, সাত জন্মের ভাতার কি না তোর, সামনে বসে আদর করে খাওয়াস। সেই শোভাটা দেখবার জন্য মরি মরি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পায়ের দরদে বেশি দূর পারলাম না। ফিরে এলাম। ফিরতে হল জিরিয়ে জিরিয়ে। তার ভিতরে এত সব কাণ্ড!

মোটামুটি একটা কৈফিয়ৎও হয়ে দাঁড়াল। অন্নদাসী বিশ্বাস করল। রাস্তটা বেশি হয়েছে বটে, পুরুষমানুষের ক্রোধ অসঙ্গত নয়। দোষ ভরদ্বাজের, গড়িমসি করে রাত করলেন। উনুন ধরিয়ে অন্নদাসী ডাকাডাকি করছে—কাজকর্ম নেই, বসে রয়েছে, তবু রান্নাঘরে আসেন না। মতলব করে কি না কে জানে? রান্না শেষ হবার পর খেতে বসতেও যেন অকারণ দেরি করলেন। অন্যা নিয়ম তখন, সবাই ঘুমুচ্ছে। গা ছমছম করছিল অন্নদাসীর। ভয় ঠিক নয়। জন্তগুলো মরদ দৈত্যের মতন পড়ে রয়েছে, চেঁচালে তড়াক করে লাফিয়ে উঠবে—ভয়ের কি আছে? তবু যেন কী রকম! সতর্ক নজর রেখে নিজের ভাতগুলো গবাগব গিলেছে তার পর। বাকি ভাত-তরকারি কাঁসরে তুলেই সাঁ করে বেরিয়ে পড়েছে। এসেছে বাতাসের বেগে। এসে তো এই সমস্ত এখন।

চেঁচামেচিতে নিজের রাত করে ফেরাটা পাড়ার মধ্যে বেশি চাউর হবে। অন্নদাসী চেঁচাল না। ভাত টিপে টিপে তুষ্টুকে খাওয়াচ্ছে। এর মধ্যে একবার ছড়া কেটে উঠল :

এক গুণ ব্যান্নোনের তিন গুণ ঝাল,
নির্গুণ পুরুষের বচন সার।

এই সামান্য কথায় রাধেশ্যামের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ার কথা নয়। শুয়ে পড়ে সে পাশ ফিরল। পাশ ফিরতে নজর পড়ল, বাড়া-ভাত পড়ে আছে, ভাতের দু-পাশে তরকারি দু-খানা। গগনের আলায় মুড়ি-ফুলুরি অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে। ভাত দেখে রাগের নিবৃত্তি করে সে উঠে বসে। দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে ভুট্টুর মুখ ধোয়াচ্ছিল অন্নদাসী। ভিতরে এসে সে চোখ পিটপিট করে দেখে। ছেলে শোয়াতে শোয়াতে মধুর এক মন্তব্য ছাড়ল: অন্নদাসীর পুরুষ অন্নদাস।

সেই রাত্রেই। আরও অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বেড়ার গায়ে আস্তে আস্তে টোকা দেয় কে যেন। দু-বার এক সঙ্গে। একটুখানি থেমে রইল। আবার। রাধেশ্যাম একবার ঘুমালে তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে গেলেও বোধ হয় জাগবে না। অন্নদাসীর ঠিক উল্টো, গাছের পাতাটি পড়লে চোখ মেলে উঠে বসবে। উঠে পড়ে সে বাইরে চলে এলো।

কে গ্যা? কোন ড্যাকরা, হাড়হাবাতে—

ফিসফিস করে ভরদ্বাজ বলছে, আমি রে আমি। একটা দরকারে পড়ে এলাম।

রাত্রিটা সুমুখ-আঁধারি। এইবারে চাঁদ দেখা দিচ্ছে আকাশে। বাবলাতলার গাছের গুঁড়ির সঙ্গে একেবারে সেঁটে গোপাল ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে আছেন।

অন্ন বলে, আপনি যে সালতি ছাড়া চলেন না ঠাকুরমশায়। পায়ে মাটি ফোটে। পায়ে হেঁটে কষ্ট করে এসেছেন, বলে ফেলুন দরকারটা।

রাধেশ্যাম আছে কেমন?

বড্ড ভালবাসেন মানুষটাকে! আমার সঙ্গে মোটেই তো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, রাত দুপুরে তাই খবর নিতে ঘর-কানাচে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলতে বলতে অন্নদাসী ফিক করে হেসে ফেললে। বলে, তাড়াতাড়ি সেরে নিন। মানুষটা এমনি ভালো। ভস-ভস করে ঘুমুচ্ছে। জাগলে কিন্তু কুম্ভকর্ণ।

ভরদ্বাজ সকাতরে বলেন, তোর যেমন মতি হয় রে অন্ন—আমি কিছু বলতে যাবো না। কাঠ-কাঠ উপোস দিচ্ছিলি, আমার কে কোন কথা বলতে গিয়েছিল? কানে শুনেই আমি মানুষ দিয়ে চাল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই বাজারে ফেলে ছড়িয়ে নিজে তুই ভরপেট খাচ্ছিস, যতগুলো খাস তার দেড়া বাড়ি নিয়ে আসিস। চাল এত দিস যে হাঁড়ি উপচে পড়ে যায়। বিনা ওজর-আপত্তিতে আমি বেঁধেবেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। বল্ সে সমস্ত কথা।

অন্ন বলে, আপনার বড্ড দয়া ঠাকুর মশায়।

কিন্তু দয়া শুধু একতরফে হলে তো হবে না! বিবেচনা করে দেখ। ব্রাহ্মণ-সন্তান বউ-ছেলেপুলে ছেড়ে পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নোনা জল খেয়ে পড়ে আছি। আমিই কেবল সকলের দেখব—আমার মুখ পানে কেউ তাকিয়ে দেখবে না?

অন্নদাসী বলে, সরে পড়ুন ঠাকুর মশায়। ঐ যা বললাম—আমাদের মানুষটা ভালো, কিন্তু বড্ড সন্দেহের বাতিক। আমি রান্না করে আনি বলে আপনাকে জড়িয়ে আজকেই নানান কথা বলছিল। উঠে এসে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে যদি দেখতে পায়, বন-কাটা হেসো দিয়ে মুণ্ডু দুটো কন্ধ থেকে নামিয়ে নেবে উঃ, পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকেছেন—এত সাহস ভাল নয়।

পাড়ায় হবে না, আলার মধ্যে নয়, তা কোন দিকে যাবো সেটা তো বলে দিবি—

অন্নদাসী দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে।

ভরদ্বাজ অধীর হয়ে বলেন, আহা, বলে যা একটা কথা। কষ্ট করে এদ্দুর থেকে এলাম।

অন্নদাসী বলে, মাছ-মারা লোক ফিরছে ঐ। গেঁয়োবনের ভিতর ঢুকে যান, শিগগির। নয় তো দেখে ফেলবে।

গোপাল ভরদ্বাজ সন্ত্রস্ত হয়ে বাঁধের দিকে তাকান। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় অনেক'দূর অবধি নজরে আসছে। কই, মানুষ কোথা? হয় তো বা এই সময়টা মানুষ বাঁধের নিচে নেমে পড়েছে। নায়েব মানুষ, সদর ফুলতলা থেকে আসছেন—চিনে ফেললে নানান কথা উঠবে। ফুড়ুৎ করে জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাপখোপ থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু উপায় কি?

অন্নদাসী ঘরে ঢুকে পড়েছে ওদিকে।

সতের

শীত পড়ি পড়ি করছে। সুসময় এখন মানুষের। ক্ষেতে ধান পাকে। সাই বিয়োয় ঘরে ঘরে। নতুন গুড় ডালকলাই রকমারি তরিতরকারি পাইকারেরা দূর-দূরন্তর থেকে নিয়ে এসে কুমিরমারির হাটে নামায়। কাঠুরে আর বাউলেরা দলে দলে জঙ্গলে ঢুকে বোঝাই কিস্তি নিয়ে ফেরত আসে। মাল ছাড় করে দিয়ে রমারম খরচ করে দু-হাতে। ভারি জমজমাট হাট এই সময়টা।

হাটের মধ্যে ঘুরছে জগা, কিনছে এটা-ওটা। হঠাৎ তৈলক্ষের সঙ্গে দেখা। বয়ারখালার সেই তৈলক্ষ। বলে, তোমায় খোঁজাখুঁজি করছি জগন্নাথ। কোন বনবাসে গিয়ে রয়েছ, কেউ সঠিক বলতে পারে না। যাত্রার দল খুলছি, মনের মতো বিবেক জোটানো যাচ্ছে না। কী গাঙে গাঙে বোঠে বেয়ে মরছ! চলে এসো। এইসা গলা তোমার—গেরুয়া আলখাল্লা পরে বিবেক হয়ে আসরের উপর দাঁড়ালে ধন্য-ধন্য পড়ে যাবে।

জগার হঠাৎ জবাব জোগায় না। পুরানো দিন মনে পড়ে। বাপমা-মরা ছেলে গানের নেশায় বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। কচি-কচি চেহারা তখন, রাধা সাজত। আসর ভাঙবার পর একবার এক গৃহস্থবাড়ির বউ তাকে দোতলার উপর ডেকে নিয়ে পায়েস খাইয়েছিল। তারপর এক নতুন পালা খুলল অভিমন্যু বধ। উত্তরার পাঠ দিল জগাকে। অভিমন্যু সমরে যাচ্ছে, সেই সময়টা তার হাত ধরে ফেলে গান:

যেও-না যেও-না নাথ করি নিবেদন
দাসীরে বধিয়া যাও, বিচার এ কেমন—

অভিমন্যুর হাত ছেড়ে দিয়ে তারপরে উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম চতুর্দিকে ফিরে ফিরে গানের একটি মাত্র কলি কেঁদে কেঁদে গাওয়া: ও তুমি যেও না যেও না, ও তুমি যেও না যেও না···। আসরের মধ্যে সেই সময় একটা সূঁচ ফেলে দিলে বোধ করি শব্দ পাওয়া যেত।

তৈলক্ষ বলে, তাই বলছিলাম। চলো জগা আমাদের

বয়ারখোলায়। কায়েমি হয়ে না থাকতে চাও, একজন বিবেক তৈরি করে দিয়ে তারপরে তুমি চলে এসো। আটকে রাখব না। দু'বেলা ছটো ষোল আনা দিবে, তেল-তামাক আর নগদ পনের টাকা। গায়ে ফুঁ দিয়ে এমন রোজগার ছনিয়ার মধ্যে কোনখানে হবে না।

জগা এর মধ্যে সামলে নিয়ে বলে, ক্ষেপেছ? সকলে মিলে ঘেরি বানালাম। অজ্জি বনে মানবেলা হয়েছে। জন্ত-জানোয়ার আগে চরেফিরে বেড়াত, এখন মানুষ। যতই হোক, নিজের কোট—জোর বড ওখানে আমার! কোট ছেড়ে কোনও জায়গায় যাচ্ছিনে। তবে একদিন গিয়ে দল কেমন হল দেখে আসতে পারি।

ফেরার পথে ডিঙির উপর বসে ঐ যাত্রাদলের কথা হচ্ছে। বলাই বলে, গান-পাগলা মানুষ তুই। একটু যেন মন পড়ে গেছে।

জগা বলে, দূর! আরও কিছু মানুষ জমুক—দল করতে হলে আমরা সাঁইতলাতেই করব। তৈলঙ্ককে বললাম, নেহাৎ যদি দায় ঠেকে যায় তো একদিন দু-দিন থেকে তালিম দিয়ে আসতে পারি। তার বেশি হবে না।

সাঁইতলার ঘাটে ডিঙি লাগল। ডিঙিতে কখনোসখনো শোওয়ার প্রয়োজন হয়। ছইয়ের নিচে সেজন্য একটা মাদুর গোটানো থাকে। কাঁধে সেই মাদুর এবং হাতে পোঁটলা পচা তরতর করে নেমে পড়ল।

জগা দেখল পাছ-গলুই থেকে: মাদুর নিয়ে চললি কোথা রে? নৌকোর মাদুর?

ও, তাই তো! এতক্ষণে যেন হুঁস হল পচার। মাদুর যেন হেঁটে গিয়ে তার কাঁধে উঠে পড়েছে। বেকুবির হাসি হেসে মাদুর নামিয়ে বাঁধের উপরে পচা দাঁড় করাল। আঁটি-বাঁধা ঝাঁটার শলা ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আড়াল করে বস্তুটা বের করে নেবার মতলব ছিল, কিন্তু জগার নজরে পড়ে যায়।

উ, এই তোর কাণ্ড! যা মানা করলাম, তাই। ঝাঁটা কিনে তাই আবার মাদুর জড়িয়ে রেখেছে, আমি যাতে না দেখতে পাই।

পচা আপাতত নিরাপদ। মুখ ফিরিয়ে আসা দূরত্বটা দেখেও নেয় একবার বুঝি। তাড়া করলে ছুটবে।

জগা বলে, আমরা হাটে ঘুরছি, সেই ফাঁকে তুই চারুবালার কেনাকাটা করছিলি। আমায় লুকিয়ে আমারই নৌকোয় তার গওনা নিয়ে এলি।

বলাই বলে, কি করবে? তুমি যে ভয় দেখালে, ধাক্কা মেরে গাঙে ফেলে দেবে। সামনাসামনি পারে না বলে গোপন করে।

নির্লজ্জ পচা দু-পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, নামায় ফেললে ক্ষতি নেই। কুমিরে কামটে না খায় তো সাঁতরে ঠিক ডাঙায় উঠে যাবো। ঝাঁটা ফেললে মুশকিল। সারা হাট খুঁজেপেতে এই ক'টা নারকেলের শলা পাওয়া গেল। ফেলে দিলে আবার কোথা পেতাম এ জিনিস?

জগা বলে, ঐ ঝাঁটা তোর পিঠের উপর দেয় যেন! কালীতলায় সেদিন আমি পাঁচ পয়সার ভোগ দিয়ে আসব। আছে তাই তোর অদৃষ্টে। কামরূপের কথা বলছিনি বলাই, আমাদের সাঁইতলাতেও ভেড়া বানিয়ে ফেলছে। মেয়েমানষের ভেড়া দেখ ঐ একটা। ঐ পচা।

পচা দৃকপাত করে না। কাঁধে ঝাঁটার আঁটি, হাতে পোঁটলা—চারুর হাতা-খুন্তি সম্ভবত পোঁটলার মধ্যেই—বীরদর্পে সে আলার অভিমুখে চলল।

অনতিপরে জগাদের ঘরের সামনে পচা এসে ডাকে, বলাই—

হাটের ঘোরাঘুরিতে খিদে আজ প্রচণ্ড। রাতও হয়ে গেছে। উনুন ধরিয়ে বলাই ভাত চাপিয়ে দিয়েছে।

জগা বলে, পথে দাঁড়িয়ে কেন রে পচা? ঘরে উঠে আয়।

পচা বলে, না, তুমি গাল দেবে।

ডাকিনী গুণ করেছে, মরণদশা ধরেছে তোর। গাল দিয়ে আর কি করব? বোস ঘরে এসে।

পচা ঘরের ভিতরে এলো, বসল না। বলে, খোল বাজাবার মানুষ নেই। একবার আয় বলাই। বিনি খোলে নামগান খোলতাই হয় না।

জগা বলে, কাল দিয়েছিল খেয়ালখুশি মতো, তা বলে রোজ রোজ যেতে যাবে কেন? তুই দাসখত দিয়েছিস, তুই পা চেটে বেড়া ওদের—অন্য মানুষ ডাকিস কেন?

বউঠাকরুন বলে পাঠালেন, গৃহস্থর একটা ভাল-মন্দ আছে। বাদা জায়গা—শুধুমাত্র জন্তু-জানোয়ার নয়, কত লোক এসে বেঘোরে মারা পড়ে, তাঁরাও সব রয়েছেন। ঠাকুরের নামে দোষদৃষ্টি ছেড়ে যায়। তাই বললেন, আরম্ভ হয়েছে যখন, কামাই দেওয়া ঠিক হবে না। রাত হয়ে গেছে বলে আজ না হয় কম করেই হবে।

বলাই বলে, আজকে তুই যা জগা। শুনিয়ে আর বাজনা কাকে বলে। আমার ঐ হাত থাবড়ানোয় ওদের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। তোর বাজনা শুনলে দশা পেয়ে পটাপট ওরা উপুড় হয়ে পড়বে।

জগা বলে, রক্ষে করো! সুখের আলা বাঁধলাম সকলে মিলে, আলার মটকায় বাজ পড়ল। বজ্জাতগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসছে।

পচা রাগ করে বলে, বাজ পড়েছে, না আর-কিছু হয়েছে, চোখে দেখ এসো গিয়ে। ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, পরের মুখে ঝাল খাবে কেন? দোমুখো বলাইটা—ওখানে ভাবে গদগদ, এখানে তোমার কাছে ফিরে এসে কুচ্ছো করে। এসেছে মেয়েরা দুটো-তিনটে দিন, শ্রীছাঁদ এর মধ্যে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। ঝকঝকে তকতকে ঘর-উঠোন—এক কণিকা ধূলোময়লা থাকতে দেয় না। ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছিল, সেই উঠোন লেপেপুঁছে কী রকম করে ফেলেছে—সিঁদুরটুকু পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। পানের পিক পোড়া-বিড়ি আগে তো যেখানে-সেখানে ফেলতাম, এখন মালসা পেতে দিয়েছে, যা-কিছু ফেলবে মালসার ভিতরে।

জগা বলে, বলছি তো তাই। বিড়ি খাবো না, পানের পিক ফেলব না, হাসিমস্করা করব না, চোখ বুঁজে খালি হরেকৃষ্ণ হরেরাম করব—সে কাজ আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

বলাইকে বলে, মেয়ে মানুষের সামনে গিয়ে তুই গদগদ হোস, এখানে আর চক্ষুলজ্জা কিসের? চলে যা তুই।

যাবার মুখেও পচা বলে, গেলে পারতে কিন্তু জগা! দেখে খুব ভাল লাগবে।

জগা কালোমুখ করে বলে, চেপে এসে বসেছে, সহজে নড়বে না। একে একে সকলকে নিয়ে নিচ্ছে। যাবোই তো বটে। গিয়ে পড়ব একদিন। ভেঙেচুরে সমস্ত তছনছ করে দিয়ে আসব।

ঐ একটা দিনেই বলাইর চক্ষুলজ্জা ভেঙেছে। ডিঙি ঘাটে বাঁধা হলে সে সোজা গিয়ে ওঠে আলায়। জগা একলা পাড়ার মধ্যে ঘরে গিয়ে ওঠে। পচা সেই একটা দিন বার কয়েক বলেই দায় সেরে গেল। এক সঙ্গে তো ঘোরাফেরা—ইতিমধ্যে মত পালটাল কি না, একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করার পিত্যেশ নেই। আনাড়ি লোকগুলোর আসরে বলাই বাজিয়ে মস্ত হয়েছে। বন-গাঁয়ে শিয়াল রাজা। সেই আমোদে মত্ত হয়ে আছে। জগনাথকে নিয়ে যাওয়ার কি গরজ আর এখন? সে হাজির হলে বরঞ্চ পশার-হানি ওদের।

নামগান আগে মিনমিন করে হচ্ছিল, গানের ভিতরে হুঙ্কার ফুটে ওঠছে ক্রমশ। অর্থাৎ দল ভারী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং গানের সম্পর্কে ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে। গানের পরে এক একদিন বারম্বার হরিধ্বনি। হরির লুঠ—হরিধ্বনির পর উঠানে বাতাসা ছড়িয়ে দেয়, কাড়াকাড়ি করে লোকে বাতাসা কুড়ায়। বলাই ক'খানা বাতাসা হাতে ঘরে ফিরে বলে, নাও জগা, প্রসাদ নাও বাদাবনে বসত, বড়-মেজ-ছোট কোন দেবতাকে চটানো চলবে না। হাত পেতে একখানা বাতাসা নিয়ে—একটু গুঁড়া মাথায় দিয়ে এক কণিকা জিভে ঠেকিয়ে বাতাসাখানা জগা ফিরিয়ে দেয় আবার।

মজা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আলা থেকে ঘরে ফিরতে এখন রাত দুপুর। নামগানের পর গল্পগুজব চলে বোধহয়। রান্না শেষ করে জগা বসে থাকে, আর গর্জায় মনে মনে। তাদের গড়ে-তোলা সাঁইতলা ঘেরিতে একঘরে করেছে তাকে সকলে এমন কি বলাই অবধি। সকল গোলমালের মূলে চারুবালা সর্বনেশে মেয়ে রে বাবা!

শেষটা একদিন জগা রাগ করে বলে, ভক্ত হয়ে পড়েছিস; ঠাকুরের নামে তো রাত কাবার করে ফিরিস। কাঁহাতক বসে আমি ভাত পাহারা দিই? এবার থেকে আমি খেয়ে নেবো।

বলাই সঙ্গে সঙ্গে হাত দু-খানা ধরে বলে, তাই কোরো; খেয়ে নিয়ে তুমি শুয়ে পোড়ো। নয়তো আমার মরা মুখ দেখবে জগা। হাঁড়িতে ভাত রেখে দিও। নিয়ে থুয়ে আমি খাব।

নতুন ব্যবস্থায় ভাল হল বলাইর। জগা না খেয়ে আছে, আগে তাই তাড়াতাড়ি ফেরার চাড় ছিল একটা। এখন নির্ভাবনা; জগা ঘুমিয়ে থাকে। খুটখাট আওয়াজ হল একটু ভেজানো ঝাঁপ খোলার। ভিতরে এসে কপকপ করে ভাত খাচ্ছে। বাইরে গিয়ে জল ঢেলে আঁচিয়ে এলো। ঘুমের মধ্যে এই সমস্ত জগা স্বপ্নের মতন টের পায়। সমস্তটা দিন গাঙে খালে আর কুমিরমারির গঞ্জে কাটে। বড়দাকে জপিয়েজাপিয়ে এই বাদা এলাকায় নিয়ে এলো—সেই বড়দার পক্ষেও কি উচিত নয় রাত্রে জগার ঘরে একটিবার এসে খোঁজখবর নেওয়া! গাঁর অঞ্চল থেকে বড়দার আপনজনেরা এসে মিলেছে—আমে-দুধে মিশেছে, আঁটির আর কি গরজ এখন? শেষ রাত্রে উঠে চোখ মুছতে মুছতে মাছের ডিঙি নিয়ে কুমিরমারি ছুটুক, এই ছাড়া অন্য কোন গরজ নেই।

সেদিন ঘাটে ফিরে ডিঙি বাঁধতে বাঁধতে জগা ওয়াক-ওয়াক করে। বমি করে ফেলবে এমনি ভাব। ক্রস্ত বাঁধে উঠতে উঠতে জগা পিছন ঘুরে তাকায়।

ঐ যে ওল-চিংড়ি খাওয়াল গদা ঠাকুর, ক-দিনের পচা চিংড়ি, আর কি রকমের ওল কে জানে? পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে সেই থেকে।

বলাই বলে, ওল-চিংড়ি আমিও তো খেলাম—

বলেই তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয়। অবিশ্বাস করা হচ্ছে, ক্ষেপে উঠবে জগা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলাই বলে, গুচ্ছের খেতে গেলে কি জন্যে? আমি ডাল দিয়ে খেয়েছি, ওল খেতে পারি নে, ওলের নাম শুনলে আমার গাল ধরে। তুমি ওক টেনো না অমন করে, গলার নলি ছিঁড়ে যাবে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় এক্ষুণি।

আজকে আর যাসনে তুই। আমি রাঁধতে পারব না এই অবস্থায়।

বলাই বলে, রান্না আবার কি! তোমার খাওয়াদাওয়া নেই। একলা আমি। গদাধরের খাওয়ানোর চোটে তোমার ঐ অবস্থা, আমারও গলায় গলায় হচ্ছে। চাট্টি মুড়ি-চিঁড়ে চিবিয়েও থাকতে পারি। আমাদের ঘরে না হোক, বড়দা ওখানে মুখের কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি বাটি ভরে এনে দেবে।

জগা আগুন হয়ে বলে, খাওয়াটা ভাবলি শুধু, আমার দশা দেখছিস নে। বমি করতে করতে মরে যাচ্ছি—

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির —রতন দে

—ডাঃ রামজীবন ঘোষ

খোকা-খুকু

—মানিক রায়

—মধু বসাক
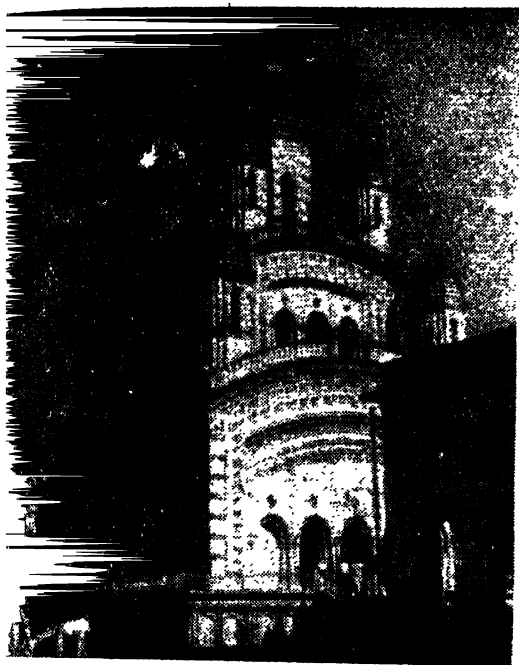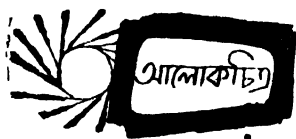
মিষ্টিমুখ —বিত্ত চক্রবর্তী

দিন আগত ঐ —বি দাশ

বালুকাবেলায় —সচ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
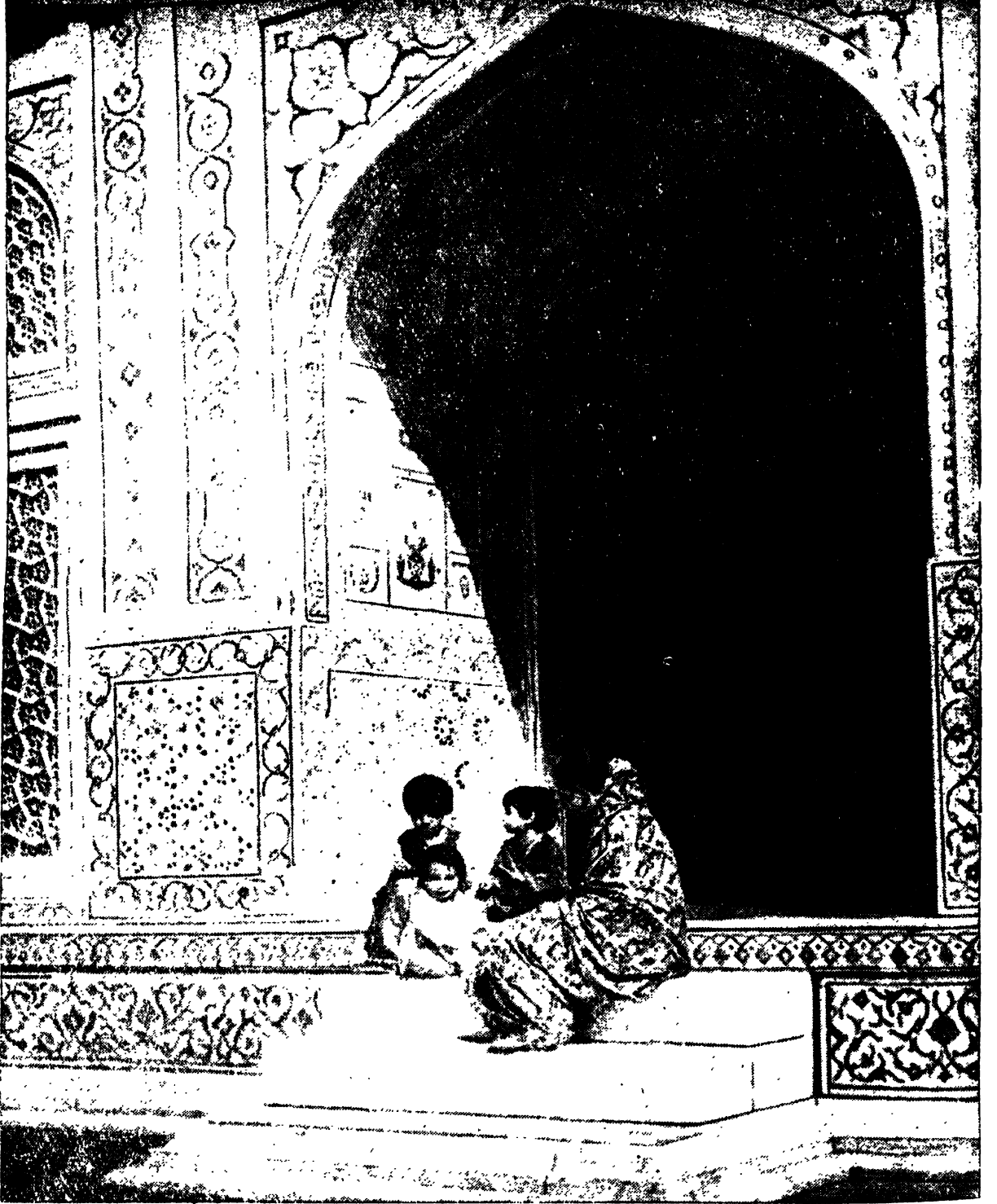
সমাধি (ইদ্-মুদ-উল্লার) —অসিত রায়

বলাই বলে, আমি যেতাম না। মাইরি বলছি। যাওয়া যায় [illegible] হেন অবস্থায় একলা মানুষ ঘরে ফেলে। কিন্তু না গেলে ঠাকুরের [illegible]ম বন্ধ। যাব আর চলে আসব। রীতরক্ষে করে আসি। রোজ [illegible]য়ম মতো করে এসে মাঝখানে একদিন বন্ধ করা যায় না। কোন [illegible] নেই, শুয়ে পড়গে জগা। ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি তো,—তিনিই ভাল করে দেবেন।

বুঝিয়েসুঝিয়ে বলাই যথারীতি আলামুখো হাঁটল। ছাই হয়েছে [illegible]গার, অসুখের ভান করে বলাইটাকে পরখ করে দেখল। পরীক্ষার [illegible] দেখে ঝিম হয়ে গেছে। অভ্যাস বশে তামাক সেজে নিয়েছে, [illegible] টানবার মেজাজ নেই। কলকে নিভে গেল না টানার দরুন। [illegible] করে উপুড় করল কলকে মেজের উপরে। বাদা অঞ্চলে [illegible] বড় গুণীন আছে—মন্তোর পড়ে আঁকচোখ কেটে বাধবন্ধন [illegible]। কিন্তু মেয়ে জাত যেন তাদেরও বড় গুণীন—মন্তোর পড়ে [illegible], আঁকচোখ কাটে না, এমনি-এমনি মায়া করে ফেলে।

আসি বলে তো বলাই চলে গেল। নামগানও আজ তাড়াতাড়ি [illegible] হয়ে গেছে, তবু ফিরছে না কেন? কি করে না জানি নিঃশব্দ আলার ভিতর বসে বসে? পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে, জগা [illegible]লেছিল। ঠিক উল্টো, ক্ষিধের পেটের নাড়ি চনমন করছে। সে [illegible] রেঁধে রাখে, রাতদুপুর অবধি প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়ে এসে রাঁধা [illegible] ফয়তা দেন। রোজ রোজ কেন এ রকম হবে? আড্ডা [illegible] দিয়ে বলাই আজ রাঁধাবাড়া করুক, এই সব ভেবে [illegible]লেছিল অসুখের কথা। রাত বাড়ছে। পিছনের বনে রাত্রিচর কোন [illegible] দল ছটোপাটি লাগিয়েছে, ঝপাস-ঝপাস করে পড়ছে ডালের [illegible]পর। দুত্তোর, কত আর দেরি করব,—উনুন ধরিয়ে জগা ভাত [illegible] দিল। ভাত আর ঝিঙে-ভাতে। ন্যাকড়ায় বেঁধে চাটি ডালও [illegible] দিল ওর ভিতরে। ভাত ঢেলে নিয়ে খেতে বসল, বলাইয়ের [illegible] নিশানা নেই। মরেছে নাকি? অসুখ জেনে গেছে, [illegible]ড়াতাড়ি ফিরে আসবার কথা,—তা দেখি অন্য দিনের চেয়ে বেশি [illegible] আজকে। তাই দেখা গেল, জগা যদি সত্যি সত্যি মরে যায়, [illegible]লেকের তরে ওদের আড্ডা বন্ধ হবে না। গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে, বলাই আসার আগেই খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বে। রাত্রের মধ্যে কথা বলবে না, সকালবেলাও না—এক ডিঙিতে যাবে, তবু মুখ তুলে তাকাবে না তার দিকে।

খাওয়া শেষ হবো-হবো, হঠাৎ শোনা যায় শাঁখের আওয়াজ। ঘোর জঙ্গলের ভিতরে শঙ্খধ্বনি শুনতে পাবে ভর সন্ধ্যাবেলা। বাদার নৌকোয় গৃহস্থর রীতকর্ম করে। গাঁয়ে-ঘরে দায়ে-বেদায়ে নিয়মের তবু ব্যত্যয় আছে, কিন্তু বনবিবি দক্ষিণরায়ের এলাকায় নীতিনিয়ম মেনে ষোলআনা শুদ্ধাচারে থাকতে হয়। মা এবং বাবা কোপের কোন কারণ খুঁজে না পান। কিন্তু মেছোঘেরির আলার মধ্যে শঙ্খধ্বনি—হেন কাণ্ড কে কবে শুনেছে? মেয়েমানুষ এসে পড়ে ক'টা দিনের মধ্যে নিজস্ব গাঁ-ঘর বানিয়ে তুলল!

শাঁখ বাজিয়ে নতুন কি একটা শুরু হল এই রাত্রে। চুলোয় যাকগে। বলাইয়ের যে ভাত রেঁধেছিল, জগা সেগুলো ঘেরির জলে ফেলে দিয়ে এল। আছে থাক। ভাত রাঁধবার চাকর-নফর কে রয়েছে, খাবে তো ফিরে এসে কষ্ট করে রেঁধেবেড়ে খাক।

ভাত ফেলে এসে জগা শুয়ে পড়ল। শাঁখ বাজছে, আর উলু পড়ছে তার সঙ্গে। উলু দেবার মানুষ জুটেছে বাদায়। উলু-উলু, উলু-উলু—দীর্ঘ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জলের উপরে জঙ্গলের ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিয়ের [illegible] আজকে আলায়, রাত কাবার করে দেবে মনে হচ্ছে। আবার উঠে পড়ল জগা। উনুনে জল ঢালল, রান্নার কাঠ যা আছে জল ঢেলে আচ্ছা করে ভিজিয়ে দিল। রাঁধবে তো বন থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে নিয়ে এসো যাদুমণি। ভিজে উনুনও ধরানো যাবে না, ডেলা সাজিয়ে তার উপরে হাঁড়ি রেখে কাজ সারবে। এত অধ্যবসায় থাকে তো পেটে পড়বে ভাত। নইলে উপোস।

শুয়ে পড়ে ভাবছে এই সব। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে জ্যোৎস্না। বাঁধের উপরে মানুষজন কলরব করতে করতে যাচ্ছে, ঘাড় তুলে জগা তাকিয়ে দেখল। পাড়া ঝেঁটিয়ে গিয়েছিল যে আলায়! জালে বেরুবে আজ কখন—আলার স্ফূর্তিতে কালকের দিন অবধি পেট ভর থাকবে তো?

বলাই ফিরছে! আর সর্বনাশ, মেয়েটাকে গেঁথে নিয়ে এসেছে যে!

ও লোকটা, তুমি গেলে না কেন? লক্ষ্মীপুজো হল, সবাই গিয়েছিল। ওঠো, মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ নাও উঠে।

বয়ে গেছে শত্রুর কাছ থেকে হাত পেতে প্রসাদ নিতে। জগা তো ঘুমিয়ে আছে। ঘোরতর ঘুম। বলাই তাড়াতাড়ি বলে, অসুখ করেছে, ভেবো না। রেখে যাও, পাতোরটা কাল দিয়ে আসব।

ঘুম থেকে জগাকে ডেকে তুলতে চায় না বলাই। সন্ত্রস্ত। জগা যেন দৈত্যদানো বিশেষ, উঠেই অমনি তোলপাড় লাগিয়ে দেবে চারুবালার সঙ্গে। চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জগা দেখছে। পিতলের

রেকাবিতে পুজার প্রসাদ রেখে চারুবালা চলল, পিছু পিছু বলাই আলা অবধি এগিয়ে দিতে চলল। তা বেশ হয়েছে। বলাই আবার যখন ঘরে ফিরবে, তাকে এগুতে আসবে না চারুবালা? এবং তারপরে চারুবালা যখন যাবে? চলুক না সারারাত্রি ধরে এই টানাপোড়েন!

বলাই ফিরে এসে এক ঘটি জল ছড়ছড় করে পায়ে ঢেলে জগার পাশে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাত রান্না করা আছে কি না, দেখল না একবার তাকিয়ে। ভাতের গরজই নেই তার। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ে বুঝি।

তখন জগাকেই কথা বলতে হয়: শাঁখ পেলো কোথা রে?

জুটিয়ে নিয়েছে। কাঠুরের নৌকো কালীতলায় নেমে মানসিক শোধ দিচ্ছিল। শাঁখের ফুঁ শুনে চারুবালাও গিয়ে পড়েছে। অনেক বলেকয়ে কিছু দাম ধরে দিয়ে শাঁখটা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিল মানবেলায় গিয়ে তারা আবার কিনে নেবে। শাঁখ জুটে গেল, তখন ঝোঁক হল, গেরস্তঘরে লক্ষ্মীপুজো করলে তো হয়। দিনটাও আজকে বিষ্যুৎবার। এর পরে হপ্তায় হপ্তায় ফী বিষ্যুৎবারে পুজো করবে।

জগা বলে, শাঁখ হল, ফুল-নৈবিদ্যিও না হয় জুটিয়েছে। কিন্তু বামুন নইলে তো পুজো হয় না। বামুন পেল কোথা? তুই গলায় জালের সুতো ঝুলিয়ে পৈতে করে নিলি নাকি?

বলাই বলে, লক্ষ্মীপুজো শিবপুজো বিনি বামুনে হলে দোষ নেই। হপ্তায় হপ্তায় বামুন পাবে কোথা? কিন্তু পয়লা দিন আজকে বামুনের হাত দিয়েই ফুল ফেলেছে।

হেসে উঠে বলে, জাত-বামুন রে ভাই। একেবারে জাত-গোখরো। চারুবালা খবর রাখে সব, ওর সঙ্গে চালাকি চলে না। বলে, কাছেই তো বামুন রয়েছে—চৌধুরিগঞ্জের গোপাল ভরদ্বাজ। বলে-কয়ে তাঁকেই এনে দাও তোমরা। সে কী কম হাঙ্গামা! প্রথমটা রাজি হয়ে শেষে বিগড়ে গেল: জরুরি কাজ আছে, ভেড়ি সংক্রান্ত ব্যাপার। এক পা নড়তে পারবো না এখন আলা ছেড়ে। পচা দুই পা জড়িয়ে একেবারে ঠুঁশ হয়ে পড়ল তো তখন অন্য এক ছুতো; বলি, নৈকষ্য কুলীন আমি, সেটা জানিস? কার নামে পুজোর সঙ্কল্প হবে, কোন্ জাত কি গোত্র, কিচ্ছু জানিনে। গেলেই হল অমনি! মুখ চুণ করে সবাই ফিরল। চারুবালাও তেমনি মেয়ে। বলে, আমি যাচ্ছি নিজে—গিয়ে মুখোমুখি জবাব দেবো। সকলে মিলে দল হয়ে গিয়ে পড়লাম চৌধুরি-আলায়। চারু বলে, ঠাকুরমশায়, জাতজন্ম যত-কিছু মানবেলায় গিয়ে। বাঘ হরিণ সাপ শুয়োরের মধ্যে জাত-বেজাত নেই, বাদাবনে মানুষেরও তেমনি জাত নেই। বলতে পারেন, পৈতেওয়ালা খুঁজি কেন তবে? সে আমার বউদিদির জন্যে, আর কাছে-পিঠে আপনি রয়েছেন বলে। বউদিদি সারা দিন উপোসি আছে, আপনি পুজো করে এলে খুঁতখুঁতানি গিয়ে মনের সুখে সে প্রসাদ পাবে। রাত্তের বেলা সেই জন্যে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ঠাকুরমশায়! মেয়েটা যা তুখোড়, তোকে কী বলব জগা! মিষ্টি কথায় নায়েবকে একেবারে জল করে দিল। শান্তি দিল না, বাঁধ ধরে পায়ে হেঁটে নতুন আলায় এসে পুজোআচ্চা করল। এর পরে ফী বিষ্যুৎবারে এসে এসে পুজো করে যাবে, কথা দিয়ে গেছে।

জগা বলে ওঠে, কী কাণ্ড রে বাবা! আলা তবে আর রইল কোথা? আমাদের সাধের আলা ষোলআনা এখন গেরস্তবাড়ি।

জগন্নাথের উষ্মা বলাই ধরতে পারে না। পুলকিত কণ্ঠে আরও সে ফলাও করে বলে, বিস্তর ক্ষমতা ধরে মেয়েটা। অমন দেখা যায় না। এই ধরো বাদা-জায়গা—পুজোর কোন অঙ্গে তা বলে খুঁত রাখেনি। মালসার মধ্যে টিকে ধরিয়ে ধুনো দিয়েছে। সেই বরাপোতা থেকে গাঁদাফুল জোগাড় করে এনেছে। ঘর ভরে আলপনা দিয়েছে—পদ্ম আর লক্ষ্মীর পা। লক্ষ্মীঠাকরুন পা ফেলে ফেলে উঠোন থেকে ঘরে উঠে বসেছেন, তারই যেন ছাপ পড়ে গেছে।

বিরক্তিতে জগার মুখে জবাব আসে না। বলাই ঘুমুতে লাগল। জগা ভাবছে। ভারি বিপদের কথা হল যে! ভাবতে গিয়ে দিশা পায় না। একচক্ষু হরিণের মতো এতকাল শুধু একটা দিকের বিপদ ভেবে এসেছে। চৌধুরিগঞ্জের শত্রুতা। অনেক আগে থেকে জমিয়ে আছেন তাঁরা—মাছের এলাকার শাহান-শা বলা যায়। অন্য কারও আসার পথে কাঁটা ছড়ান। কিন্তু এটা ছিল জানা ব্যাপার—এরাও সদাসতর্ক এইজন্য, কাঁটা যতই ছড়িয়ে দিক খুঁটতে খুঁটতে এগিয়ে যাবে। চৌধুরিদের ডরায় না, কিন্তু গাঁ-গ্রাম থেকে মেয়েছেলেরা এসে পড়ে ঘরগৃহস্থালী বানিয়ে গগনকে সকলের থেকে আলাদা মানুষ—ভদ্রমানুষ করে তুলবে, এটা কে কবে ভাবতে পেরেছে?

ঘুম হয় না, ছটফট করছে। নানান রকম মতলবের ভাঙাগড়া। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়। সন্ধ্যারাত্রে মিথ্যা করে অসুখের কথা বলেছিল, রাতদুপুরে অসুখ করেছে সত্যিই। সর্বাঙ্গ জ্বলছে রাগে। রাগ মেয়েলোক দুটোর উপর। বিশেষ করে ঐ চারুবালা—সকলের বড় প্রতিপক্ষ সে-ই এখন। অনুকূল চৌধুরির চেয়েও বড়। রাগে রাগে বাইরে চলে এলো। বাঁধ ধরে চলল কয়েক পা।

নতুন আলা নিঃশব্দ। ঘুমুচ্ছে ওরা বিভোর হয়ে। জগা চোরের মতন টিপিটিপি এগোয়। যাবে আলায় উঠান অবধি—লক্ষ্মীর পা এঁকেছে যেসব জায়গায়। পা ডলে ডলে মুছে দিয়ে আসবে আলপনা। রাগের খানিকটা শোধ দিয়ে তার পরে যদি ঘুম হয়।

বাঁধের উপর রাধেশ্যাম। আশ্চর্য, খোঁড়া পা দেখি পরিপূর্ণ আরাম হয়ে গেছে। হনহন করে চলেছে। খানিকটা পিছনে অন্নদাসী। অন্নদাসী হেঁটে তার সঙ্গে পারছে না।

জগাকে দেখতে পেয়ে রাধেশ্যাম বলে, ভাল হয়েছে। চলো দিকি আমাদের সঙ্গে। হাতে লাঠি? বেশ হয়েছে, নিঃসম্বলে বেরুতে নেই। বউকে বললাম, বাড়ি থাক। তা শুনল না। পুলক কত! বাচ্চাটাকে সেই সন্ধ্যেবেলা সুবোধবালার কাছে দিয়ে রেখেছে। রাতদুপুরে এখন মজা দেখতে চলল। [ক্রমশঃ।
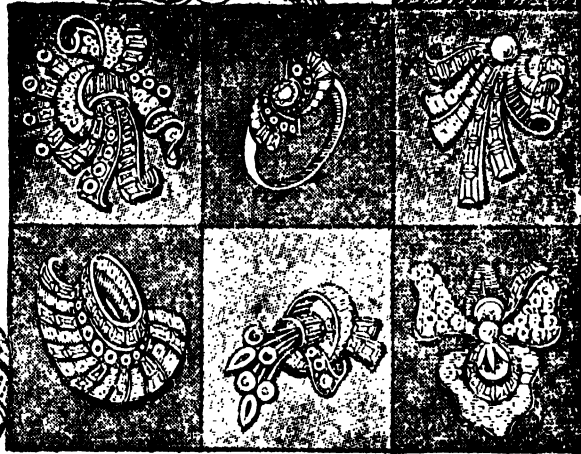
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম,বি,সরকার এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/পি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৫৫৬৬
দোকানের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
D.B.

প্রেতলিপি

রজত সেন

হেমন্ত আর একবার আয়নায় তার গিলে-করা পাঞ্জাবী আর কোঁচানো ধুতি পরীক্ষা করল, রুমালে আর একটু এসেন্স ছড়ালো, তরুণ গোঁফে আঙুল বুলালো, ভাবল : বোধ হয় বার কয়েক কামালে ঘন হবে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টুনকী তাকে পরীক্ষা করছিল। হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, কি রে! যাবি নাকি?

ফ্রকের প্রান্তটা আঙুল দিয়ে গুটাচ্ছিল টুনকী, চোখ ছলছল করে উঠল, বলল, আমায় নিয়ে যাবে দাদা? নিয়ে চল না, মা-কে বলে আসব?

তবে চ, কিন্তু তাড়াতাড়ি কর, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, তৈরী হয়ে আয়।

টুনকী দৌড়ে গেল মা'র কাছে।

অনেক কষ্টে ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে হেমন্ত, কলেজের এক প্রোফেসরের কাছে ইংরেজী পড়তে যায়। দিন কয়েক আগে তার বাবা প্রোফেসরের মাইনেটা তার হাতে দিয়েছিলেন ওঁকে দেবার জন্যে, দু'দিনেই টাকাটা কেমন করে যে উড়ে গেল কিছুতেই হিসেব করতে পারছে না সে। হয়ত ভদ্রলোক তার বাবার কাছেই হাজির হবেন, বলা যায় না! হেমন্ত অস্থির হয়ে উঠল, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল, দরজার দিকে কান আর চোখ রেখে ঘন ঘন টান দিতে লাগল।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনতেই সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল সে। ঘরে ঢুকল আগে তার মা-সুরবালা, পিছনে টুনকী।

কোথায় যাবি তোরা? জিজ্ঞেস করল সুরবালা।

আমি ত যাচ্ছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি।

মিথ্যে কথা। বলল টুনকী তার লম্বা বেণী দুলিয়ে, দাদা যাচ্ছে কাটলেট খেতে।

সে তোকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলাম!

সুরবালার ছোটোখাটো গড়ন, শরীরের শক্ত বাঁধুনী; কমনীয়, সুকুমার মুখ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুটি চোখ, ঘরের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি?

বাবার বৈঠকখানা থেকে আসছে! আচ্ছা মা, সব সময়ে একটা দামী নেকলেশ পরিয়ে রাখ কেন? রাস্তায় ঘাটে—

তুই ত সংগে আছিস।

চল রে টুনকী, বলল হেমন্ত।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সত্যিই হেমন্ত ওকে রেস্তরাঁয় নিয়ে গেল।

কি খাবি বল্?

মাংসের কাটলেট, বলল টুনকী। অনেক কষ্টে আনন্দ চেপে রাখল সে, দশ থেকে এগারোয় পড়েছে; এটুকু বোঝে—বেশী হাসলে দাদা তাকে বেকুব বা লোভী ভাবতে পারে; বাতির আলোয় হীরে-বসানো লকেট ঝলমল করতে লাগল।

কাটলেট এসে গেল, আড়চোখে তাকাতে লাগল টুনকী।

নে, আর দেরী কিসের?

ছুরি-কাঁটা চলতে লাগল।

কাটলেট শেষ হবার পর হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, আর কি খাবি?

একটা চপ।

চপ এল, আবার চলল ছুরি-কাঁটা।

বিল চুকিয়ে ওরা এল রাস্তায়। হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, পার্কে যাবি? ছুটো আইসক্রীম খেয়ে বাড়ি—

চল।

বড় পার্ক। চারিদিকে লোকের ভীড়; ছুটো আইসক্রীম কিনে ওরা পার্কের মাঝখানে এগিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট বসা যাবে, আইসক্রীম খেতে খেতে ওরা কোন্ জায়গায় বসবে তাই ভাবছিল, হেমন্ত একটু জোরে পা চালাল, টুনকী পিছনে; হঠাৎ হেমন্তর বয়েসী একটি ছেলে কোথা থেকে একেবারে টুনকীর কাছে এসে পড়ল, মুখ ফিরাবার আগেই ছেলেটি দুটি হাত বাড়িয়ে চোখের নিমেষে ওর নেকলেশ খুলে নিয়ে দৌড়, টুনকীর হাত থেকে আইসক্রীম-লাগানো কাঠিটা মাটিতে পড়ে গেল, চীৎকার করে উঠল সে, কি হল? কি হল? হেমন্ত এগিয়ে এল, টুনকী তখনও চ্যাচাচ্ছে; কি হল বল না?

ঐ যে! ঐ লোকটা পালাচ্ছে আমার নেকলেশ নিয়ে। এতক্ষণে কেঁদে ফেলেছে সে।

হেমন্ত তাকিয়ে দেখল—ছেলেটি দ্রুত পায়ে পার্কের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, চোর, চোর! বলে জোরে চীৎকার করে উঠল সে। লোক জড় হয়ে গেল অনেক; আরও অনেক হৈ-চৈ বিশৃংখলা। হেমন্ত হঠাৎ ছুট দিল গেটের দিকে, তার সংগে ছুটল আরও কয়েকজন; টুনকী চোখের জল সামলে অজস্র প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করল।

হেমন্ত ফিরে এল, বলল, পালিয়েছে!

পুলিশে ডাইরী করে এসো হে! একজন বয়স্ক লোক উপদেশ দিল।

কি হবে বলুন? বলল হেমন্ত।

তা অবশ্য বলতে পারি না; তবে হতে পারে কিছু! দামী নেকলেশ, বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়তে পারে।

ট্যাক্সী করে থানায় গেল হেমন্ত, সেখানে ডাইরী করে বাড়ি ফিরল; নিচের বৈঠকখানায় তার বাবা তারিণী বাবু মক্কেলদের সংগে কথা বলছিলেন; তাঁকে খবরটা দেবার সাহস হল না তার, উপরে এসে মা-কে বলল; সুরবালা একবার মাত্র ছোট একটি আর্তনাদ করে চুপ করে গেল। সত্যিই, আমারই ভুল হয়ে গেছে—ওটা পরতে দিয়ে ওকে; লকেটের হীরের দামই প্রায় হাজার দেড়েক টাকা!

ইস্! ও কি আর পাওয়া যাবে? বলল হেমন্ত।

টুনকী আর এক পশলা চোখের জল ফেলল।

কাঁদিস না! কাঁদলে কি ফিরে আসবে? আর একটা গড়িয়ে দেব'খন, আমার নেকলেশটা পরতে দেব তোকে, খবরদার! বাবুকে বলিস না যেন!

মা, আমি যাচ্ছি প্রোফেসরের বাড়ি।

যা।

হেমন্ত বই গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

লেকের কাছে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল সে, চায়ের দোকান ক'টা পেরিয়ে একটু নির্জন জায়গায় জলের ধারে এসে বসল হাত-পা ছড়িয়ে, আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরাল।

প্যান্ট আর ছিটের সার্ট-পরা একটি ছেলে এসে দাঁড়াল হেমন্তের পিছনে, ঝাঁকড়া চুলের মধ্য আঙুল ক'টা ঢুকিয়ে বলল, কতক্ষণ?

মুখ তুলে তাকাল হেমন্ত, হাসল ; এই ত! মিনিট পাঁচেক, বোস।

ছেলেটি বসল ; বয়স উনিশ-কুড়ি হবে ; সার্টের আস্তিন গুটানো, ডান হাতে ঘড়ি ; বুকপকেট থেকে চিরুণী নিয়ে মাথা আঁচড়ালো।

হেমন্ত সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল ; অন্য ছেলেটি একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে বাঁ হাতে দেশলাইটা একবার ঝাঁকুনী দিল। ডান পা-টা লম্বা করে পকেট থেকে নেকলেশটা বার করে হেমন্তর কোলের উপর ছুঁড়ে দিল, অস্পষ্ট বাতির আলোর সোনা আর পাথর চকচক করে উঠল ; দু'হাতে নেকলেশটা চেপে ধরল হেমন্ত।

অন্য ছেলেটি অনুচ্চ গলায় হেসে উঠল, জিজ্ঞেস করল, কি রে ঘাবড়ে গেলি না কি ?

না, আমায় দিলি কেন ? নে, রাখ তোর কাছে।

ছেলেটি নেকলেশ ঢুকিয়ে রাখল পকেটে, পা গুটিয়ে নিল, সিগারেট ধরাল।

একটু দূরেই ছেলে আর মেয়ের মিলিত হাসির শব্দ শোনা গেল ; লেকের জলে ঘাঁই মারল একটা বড় মাছ, ভাঙ্গা চাঁদের ছায়া ঢেউ-এর ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল জলের চারদিকে।

চাই-ই-ই গরম মুড়ি ! মুড়ি দেব না কি বাবু ?

মোটর ছুটছে, আর হাওয়া ছুটল।

কানু !

কি বলছিস ?

কাল ওটাকে ঝেড়ে দিতে পারবি ত ?

তবে কি ?

দেখিস যেন—

চুপ কর।

বাড়ি ঢুকবার আগে হেমন্ত দেখতে পেল ইংরেজীর প্রোফেসর হিমাংশু রক্ষিত উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছেন তাদেরই বাড়ির দিকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল ; মাইনের জন্যে একেবারে বাড়ি ধাওয়া করতে হল স্যর ? টাকাটা মারা যাবে ভাবছিলেন না কি ?

চাদরটা গুছিয়ে নিয়ে প্রৌঢ় অধ্যাপক কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুযোগ পেলেন না !

মাষ্টারদের অবস্থা কি আজ-কাল এতই খারাপ হয়ে গেছে ?

যদি বলি টাকার জন্য আসিনি, তোমার খবর নিতে এসেছি, এক সপ্তা তোমায় কলেজে দেখিনি, বাড়িতেও পড়তে আসনি, ভাবলাম—হয়ত—

চুপ করুন, মশাই, আমায় এমন গভীর ভালবাসবার কোনো কারণ নেই,—যদি না আপনার অন্য কোনো মতলব থাকে ; যান বাড়ি যান, [illegible]।

একটু ইতস্তত: করে প্রোফেসর রক্ষিত বললেন, ভদ্রলোকের ছেলে মনে-প্রাণে যে এমন অধঃপাতে যায়—সেটা তোমাকে দেখেই বুঝতে পারলাম। কয়েক মাস লক্ষ্য করেছি তোমায় ভিতরটা তোমার পোকায় খেয়ে গেছে ! এক পা সরে দাঁড়ালেন তিনি, চাদর দিয়ে নাক ঢাকলেন—যেন কোনো অকথ্য দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছে ; তোমার বাবাকে বলতে এসেছিলাম—তোমার পেছনে যেন অযথা আর পয়সা নষ্ট না করেন, পড়াশুনো তোমার হবে না।

গলার শব্দে তেমন জোর ছিল না, উত্তেজনাও নয় ; কিন্তু হেমন্ত আজ এই প্রথম অনুভব করল—একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কি গভীর ঘৃণা করতে পারে ! এমন ঘৃণা তাকে সাপের মত জড়িয়ে ধরল, দংশন করল তার সমস্ত শরীরে ; বুদ্ধিমান, শিক্ষিত লোকের ঘৃণা এমনই, যে-লোককে তুমি হত্যা করতে পার, কিন্তু তবু সে-ঘৃণার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই। মুখ তুলে দেখল হিমাংশু রক্ষিত চলে যাচ্ছে আর একটি কথাও না বলে, আর একবারও তার দিকে না তাকিয়ে।

আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকল সে, বৈঠকখানায় তখনও কয়েকজন মক্কেল, কাজ সেরে তার বাবার উপরে যেতে এগারোটা বাজে। খাবার-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল টেবিল খালি। উপরে এল সে ; টুনকী তখনও পড়ছে শিক্ষয়িত্রীর কাছে, তাকে স্কুলে দেওয়া হয়নি, মেয়ে বড় হচ্ছে, চোখের বাইরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, আজকাল ঘটছেও। পর্দার বাইরে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে হেমন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাইশ-তেইশ বছরের পরিচ্ছন্ন মেয়েটি চোখ খুলে তাকাল ; হেমন্ত বলল, নমস্কার !

নমস্কার !

কেমন আছেন ?

ভাল। এমন সুন্দর হাসতে হেমন্ত কোনো মেয়েকে দেখেনি।

প্রায় ন'টা বাজে, আজ অনেকক্ষণ পড়াচ্ছেন ?

কালো ফিতে-বাঁধা নিকেলের হাত-ঘড়িটা একবার দেখল মানসী, বলল, হ্যাঁ, এবারে উঠতে হবে। অংকগুলো করে রাখবে সব, কেমন ?

টুনকী ঘাড় নাড়ল।

মানসী দাঁড়াল, হাত-ব্যাগটা তুলে নিল টেবিল থেকে; পিঠের উপর আঁচলটা তুলে দিল; জামার নিচে ফিতে দেখবার দ্বিতীয়বার সুযোগ পেল না হেমন্ত; দীর্ঘ-দেহ, সুঠাম শরীর আর পুজোর প্রাংগণে ধূপ আর ফুলের গন্ধের মত মধুর অথচ বিচ্ছিন্ন, অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায় না; একবারও অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে পর্দাটা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

সিঁড়ির কাছে হেমন্ত ডাকল, দাঁড়ান।

প্রথম ধাপে পা দেবার আগেই ঘুরে দাঁড়াল মানসী। আর হেমন্তর মনে হল এ একটি আসল মেয়ে, তাই তাদের ব্যবধান এত দুস্তর, এত দুরূহ; রাস্তায় কুড়ানো ঘৃণা তাকে আবার আকণ্ঠ চেপে ধরল; আমাকে দেখছি আপনি মানুষ বলেই গণ্য করেন না!

কথাগুলি নিষ্ক্রান্ত হবার আগে তার জিভটা পুড়ে গেল; কিন্তু বুঝতে পারল কাছে যাবার রাস্তা এটা নয়, এটা ভুল পথ, দূর-পথ! কোনো দিন আপনি আমার সংগে একটি কথা বলেন নি, একটিবার তাকাননি আমার মুখের দিকে, আমি কি এতই ঘৃণ্য?

মানসীর চোখে বিস্ময় দেখা দিল, আর কিছুই নয়; তেমনি প্রশান্ত হাসল সে। তেমনি দূর, তেমনি বিচ্ছিন্ন হাসি; আপনি ঘৃণ্য কি প্রশংসার যোগ্য—সেটা বিচার করবার আমার কোনো দিন প্রয়োজন ঘটেনি, এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আপনার সংগে কথা বলবার বা মুখের দিকে তাকাবার কোনো প্রয়োজনও নয়, চাকরীর নিয়ম-কানুনের মধ্যে ওগুলো পড়ে না, আচ্ছা! মানসী নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে; আর হেমন্তর বুকের মধ্যে অন্য একটা মানুষ নিঃশব্দে চীৎকার করে উঠল, যাবেন না। দাঁড়ান এক মিনিট।

মানসীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল; হেমন্ত আচ্ছন্ন মন দিয়ে অস্ফুট ভাবে বুঝতে পারল, তার পোষাক, চেহারা, বাবার টাকা এবং প্রতিপত্তি, তাদের বাড়ি এবং গাড়ি—এ-সব-কিছু সত্ত্বেও হিমাংশু রক্ষিত আর মানসী মিত্রের ব্যবধান সে সংক্ষিপ্ত করতে পারবে না।

অনেকক্ষণ সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দাদা, তুমি খেতে যাবে নাকি? আমি যাচ্ছি।

আমি পরে যাব, তুই খেয়ে নে।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

খেতে যা না।

টুনকী নেমে গেল নীচে। সে গেল তার ঘরের দিকে; মা'র ঘরের দরজা বন্ধ, জাফরীর ছিদ্র দিয়ে নীল আলো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা অসহ্য ঘৃণা আর রাগে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার, পাগলা কুকুরের মত লাফাতে লাগল হৃৎপিণ্ড। আজও রাধিকা বাবু আর তার মা প্লানশেটে আত্মার সঙ্গে কথা বলছে, দরজায় কান পাতল সে। অস্পষ্ট হাসির শব্দ শোনা গেল; তার গালে যেন চাবুক মারল কেউ। রাধিকা বাবু তার বাবার তান্ত্রিক বন্ধু, হেমন্তর পিঠ চাপড়ে একদিন বলেছিল, তুমি বাচ্চা ছেলে, এ সব তুমি কি বুঝবে হে! একে বলে প্রেতলিপি।

রাধিকারমণকে সে পাঠিয়ে দেবে প্রেতলোকে। ঘৃণা আর নপুংসক রাগে তার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল।

লেকের অন্ধকারে জলের ধারে হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, কত পেলি?

—বাইশ শ, তাহলে তোর ভাগে পড়ল এগারোশ, দশ টাকা ট্যাক্সী-ভাড়া, কানু তার পাতলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা বার করল, নে এগারো শ নব্বই টাকা। সব এক শ টাকার নোট।

ফিতের-বাঁধা টাকাটা হেমন্ত ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

লেকের শান্ত জল, মৃদু বাতাস, পশ্চিম আকাশে ভাঙা চাঁদ; আর পকেটে অনেক টাকা, এবার? এবার কি করা যায়?

কানু বলল, যাবি এক জায়গায়?

কোথায়?

চল্ না, কত দিন আর বোকা হয়ে থাকবি? একটু অভিজ্ঞতা হোক।

কিসের অভিজ্ঞতা? হেমন্ত সিগারেট বার করল।

চল্ না।

ট্যাক্সীতে হেমন্ত বলল, একটা লোককে মারতে হবে।

কোন লোক? খুলে বল।

বলব, ফেরবার সময়।

কেমন মার?

যেন আর হেঁটে আমাদের বাড়ি না আসতে পারে।

এক সরু গলিতে ট্যাক্সী থামানো হল। হেমন্তর সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে গেল, কানু ধাক্কা দিয়ে তাকে নামালো ট্যাক্সী থেকে।

এর দু'মাস পরে ঠিকানা খোঁজ করে করে একটি পঁচিশ ত্রিশ বছরের মেয়ে একেবারে তারিণী বাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল; রাত্রি আটটা হবে, দু'-একজন লোকও রয়েছে ঘরে।

মেয়েটি নমস্কার করল হাত তুলে, বলল, আপনার নামই কি তারিণী বাবু?

সবাই তাকাল এক সংগে; পোষাকটা যথাসম্ভব ভদ্র করবার চেষ্টা রয়েছে, তবু কোথায় যেন একটা অসম্পূর্ণতার ইংগিত থেকে গেছে, চুলের বাঁধনটা আর একটু আলগা হলে যেন ভাল হত; সাড়িটা জমকালো নয়, তবু যেন ওকে ঠিক মত মানায় নি; রং ধুয়ে ফেলার পর পাতলা ঠোঁট দু'টি বিবর্ণ দেখাচ্ছে; পাউডারের প্রলেপেও চোখের চার-পাশের কালো দাগ ঢাকা পড়েনি; চোখে ক্লান্তি, শরীরের ক্লান্ত ভংগিতে যৌবনের কিছু আভাস, ধ্বংসের পরে তখনও কিছু ক্ষয়িষ্ণু মাধুর্য!

আপনার নামই কি তারিণী বাবু? গলার স্বরে কোনো সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই।

হ্যাঁ, বসুন।

না, বসব না, একটু দরকার ছিল আপনার সংগে।

তারিণী বাবু অপেক্ষা করতে বললেন।

মেয়েটি সারি সারি আলমারির বই দেখতে লাগল।

চেয়ার সরাবার শব্দ হল, তারিণী বাবু দাঁড়িয়েছেন; গায়ে ফতুয়া, কোঁচাটা পেটের কাপড়ে ঢুকানো; মাঝারি আকারের লোক, মাথায় পাতলা চুল—রগের দু'পাশে প্রায় সবই সাদা; মোটা, কালো ফ্রেমের চশমার ভিতরে অসাধারণ ধূর্ত চোখ দুটি অনেক কিছুই দেখতে পেল, অনেক কিছুই বুঝতে পারল; চলুন, আমরা বাইরে যাই!

সেই ভাল। সপ্রতিভ গলায় উত্তর দিল মেয়েটি।

বারান্দার প্রান্তে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে নিতান্ত পরিষ্কার গলায় মেয়েটি বলল, আপনার ছেলে হেমন্ত কাল রাত্রে আমার দু'হাজার টাকার গয়না চুরি করে নিয়ে গেছে, আমার গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল সে ; আমার গয়না ফেরৎ চাই, না হয় টাকা।

গন্ধটা কিসের বুঝতে পারলেন না তারিণী বাবু, বাগান থেকে ফুলের না মেয়েটি কোনো এসেন্স ছড়িয়েছে তার জামায়। বললেন, টাকা পেলেই তোমার সুবিধে হয়, না ? আবার নতুন ডিজাইনের গয়না গড়াতে পার। তোমার নাম কি ?

সুভদ্রা।

ঠিকানা ?

সতেরো নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র রোড, চীৎপুর থেকে বেরিয়েছে, খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে ডানহাতি রাস্তা।

কাল সন্ধ্যেবেলা ব্যবস্থা করব।

ঠিক ত' ?

তারিণী বাবু তার কাঁধে হাত রাখতে যাচ্ছিলেন, মেয়েটি সরে দাঁড়াল।

ট্রাম থেকে নেমে প্রথম রাস্তাটা রাধিকা বাবু নির্বিবাদে পার হয়ে এলেন, দ্বিতীয় রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, গ্যাসের অনুজ্জ্বল আলোয় রাস্তার অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। পকেট থেকে ছোট শিশি বার করলেন তিনি, মোদকের একটা গুলি, হাতের তালুতে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন, তারপর বলে উঠলেন, কালী, কালী! মনটা তাঁর খুবই ভাল আজ, বরানগর কালী-মন্দির তৈরী করছেন তিনি, সুরবালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা দান করবে ; আজই টাকাটা পাওয়া যাবে, মাটিতে পা পড়ছে না তাঁর, তিনি যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছেন ; মন্দির প্রতিষ্ঠা হলেই তিনি ধুতি ত্যাগ করবেন, গেরুয়া পরবেন, আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, নাম হবে রাধিকানন্দ গিরি-মহারাজ, কিছু মড়ার খুলি জোগাড় করতে হবে, টুনকী মেয়েটা দেরী করছে বড় হতে, আর দুটো বছর ; তিনি আর একটা গুলি মুখে পুরলেন, কালী, কালী, তোমার ইচ্ছে মা !

দেখুন ত! এই ঠিকানাটা চেনেন না কি ?

প্রায় ছ'ফুট লম্বা একটি জোয়ান ছেলে রাধিকারমণের সামনে এক টুকরো কাগজ মেলে ধরল।

কাগজটা হাতে নিলেন তিনি, কালী, কা—

পিছনে ঘাড় আর গলার মাঝখানে প্রচণ্ড আঘাতে শব্দটা তাঁর গলায় আটকে রইল ; সামনের ছেলেটি দু'পা সরে এসে চিবুকে ঘুষি মারল, তিনটি দাঁতের বাঁধানো পাটি মুখ থেকে ছিটকে পড়ল রাস্তায়, মাটিতে ঢলে পড়ছিলেন তিনি, কোমরে শক্ত লাথি খেয়ে আবার সোজা হলেন, চিবুকে আর একটা ঘুষি ; মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল ; চীৎকার করে উঠতে গেলেন তিনি, এবারের ঘুষিটা পড়ল নাকের উপর, বড় নাকটা দুমড়ানো টোমাটোর মত থেঁতলে গেল, মুখ দিয়ে একটি শব্দ বার করতে পারলেন না তিনি। চোখের দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হয়ে গেল, খানিকটা নোণা রক্ত গিলে ফেললেন, চোয়ালটা বাঁকা হয়ে রইল ; মাথায় আবার আঘাত লাগল, কাপড়-জড়ানো লাঠির আঘাত, খুলি ফাটলো না, সমস্ত ঘিলু ওলট-পালট হয়ে গেল ; হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন রাধিকা বাবু, পড়বার আগে কেউ জুতোপায়ে লাথি মারল মুখে, চোয়ালটা সোজা হল বটে, কিন্তু গাল কেটে মাড়ি বেরিয়ে গেল।

সব চুপচাপ ; চারটি ছেলে ঝুঁকে পড়ে রাধিকা বাবুকে পরীক্ষা করল।

একটা কান কেটে নেব না কি ?

ডান হাতটা ভেঙ্গে দে।

হেমন্ত হাত লাগায়নি, কেমন যেন মেরুদণ্ডের মধ্যে তার শিরশির করছিল, সে বলল, এবার ছেড়ে দে কানু, ছেড়ে দে !

রাধিকা বাবু তেমনি নিঃশব্দে পড়ে রইলেন রাস্তায়, তাঁর সোনার আংটি আর মণিব্যাগ তাঁর কাছে রইল না।

চার বছর এমন কিছু একটা সময় নয়। হেমন্ত মা'র কিছু গয়না আর বাবার নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, তারিণী বাবু খোঁজ করেননি ; তবে সুরবালার শোকে হেমন্তর বন্ধু কানু তাকে অনেক সান্ত্বনা আর সাহায্য করেছে ; পরিবারের সংগে অনেক অন্তরংগ হয়ে উঠেছে সে, সুরবালাকে মা বলে, আর পঞ্চদশী টুনকী কানুদা' বলতে অজ্ঞান ! তারিণী বাবুকে শ্রদ্ধাভরে কাকাবাবু বলে, কিন্তু তারিণী বাবু কানুকে সযত্নে পরিহার করেন। কানুই একদিন হেমন্তর খোঁজ নিয়ে এল, সে বোম্বাইতে আছে, ব্যবসা করছে। তারিণী বাবুর অনেক পসার বেড়েছে, গাড়ির আকারটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে টাকার সংগে ; চার বছরে মাথার চুল আরও পাতলা আরও সাদা হয়ে এসেছে। সুভদ্রা বালীগঞ্জে ছোট একটা বাড়ি কিনেছে, সামনের বছর একটা ছোট গাড়ি

আপনি ঘৃণ্য কি প্রশংসার যোগ্য—সেটা বিচার করবার আমার কোন দিন প্রয়োজন হয়নি......।

ফিরবারও প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সে। রাধিকা বাবু তাঁর বরানগরের বাড়িতে আছেন, কালীর মন্দির তাঁর হয়ে ওঠেনি, সামান্য একটু মাথার দোষ দেখা দিয়েছে, সেটা আর সারবার নয়।

রাধিকারমণ গেছে, সুরবালার তাতে ক্ষতি নেই, কানু মল্লিককে পাওয়া গেছে; কিন্তু সেদিন হেমন্ত ছিল, আজ আর হেমন্ত নেই। আর সুরবালাও কোনো দিন প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে না।

সেদিন সুরবালা বলল, কানু, হাওড়া যাচ্ছি, যাবে আমার সংগে?

হাওড়ায় কেন মা?

টুনকীর একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, ছেলেটি বড় ভাল শুনেছি, বড় বংশ, তিন পুরুষ জমিদার, কথাবার্তা পাকা করে আসি। যাবে?

আমি আর যেতে পারলাম না তোমার সংগে, বলল কানু, বিকেলে বর্ধমান যেতে হবে, মামার বাড়ি; কালই ফিরব।

কৈ আমায় ত একবারও বলনি?

হঠাৎ আজকে ঠিক হল।

বেশ!

তারিণী বাবু আদালত থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, কানু মল্লিককে নিয়ে সুরবালা হাওড়া গেল এগারোটার সময়, ওকে নামিয়ে দিল ষ্টেশনে, ষ্টেশন থেকে আরও এক ঘণ্টার পথ যেতে হবে সুরবালাকে।

জমিদার-বাড়ির কাছাকাছি এসে সুরবালা ড্রাইভারকে বলল, গাড়ি থামাও।

বিরাট, ঝকঝকে মোটর গাছের ছায়ায় থামল, হাওড়া থেকে বাইশ মাইল দূরে, গাড়ির আশে-পাশে লোক জমতে লাগল; এমন বড় একটা হয় না, যদি বা এমন গাড়ি দৈবাৎ চোখে পড়ে, ঘরের দরজায় থাকে কৈ? কে জানে হয়ত গাড়ির মধ্যে মধুবালা কিংবা দিলীপকুমার।

সুরবালা চোখ বন্ধ করে বলল, আমার মাথা ঘুরছে, আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাব।

ড্রাইভার ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, একটা ঠাণ্ডা কোকো-কোলা দেখব?

দেখ।

গাড়ি থেকে প্যাণ্ট-পরা ড্রাইভার নেমে পড়ল; কিন্তু ওরা শুনে বলল, এখানে কোকোকোলা কি মহায়? কলসীর ঠাণ্ডা জল হতে পারে, বড় জোর নেয়াপাতী ডাব।

না, ডাবের দরকার নেই, ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।

ঘটির জল মাথায় ঢালল সুরবালা, গলায় ঢালল; হাত-পাখায় হাওয়া করল ড্রাইভার।

একটু সুস্থ হয়ে সুরবালা বলল, বাড়ি ফিরে চল।

ধুলো উড়িয়ে, হর্ণ বাজিয়ে গাড়ি দৌড় দিল। একটা হাড়-জিরজিরে কুকুর চীৎকার করে গাড়িটাকে তাড়া করল কয়েক কদম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার রাস্তা ফাঁকা।

এমন গাড়ি যে দরজা বন্ধ করবার শব্দ পর্যন্ত হল না। গাড়ির মধ্যে তন্দ্রা এসেছিল সুরবালার, অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করছে সে; একবার মনে হল কাজটা চুকিয়ে এলেই হত।

গাড়ি চলে গেল আদালতে; ছোট বাগানটা পার হয়ে সুরবালা দোতলায় উঠে এল। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাইরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, টুনকীর ঘরের দরজাটা বন্ধ কেন? দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ঠেলে দেখল, ভিতর থেকে বন্ধ। বুকের মধ্যে ধক্‌ করে উঠল তার, দরজায় ধাক্কা মারল কয়েক বার, সাড়া নেই। জোরে লাথি মারল কয়েকটা, বলল, শীগ্‌গির দরজা খোল্‌, টুন্‌কী।

ভিতর থেকে টুনকী বলল, খুলছি, দাঁড়াও।

কিন্তু একটা মুহূর্ত্তও দাঁড়াবার ধৈর্য নেই সুরবালার, ছুরির ঘায়ে হৃৎপিণ্ড যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দরজা খুলে দিল টুনকী; ঘরে ঢুকে সুরবালা একবার তাকাল টুনকীর দিকে, আর একবার কানু মল্লিকের দিকে। কানু মল্লিক দাঁড়িয়েছিল চেয়ারের পিঠ ধরে, সার্টটা মাটি থেকে তুলে কাঁধের উপর ফেলল সে। হিংস্র বাঘিনীর মত সুরবালা ঝাঁপিয়ে পড়ল টুনকীর গায়ের উপর।

টুনকী এটা আন্দাজ করেছিল, খপ করে মা-র হাত দুটো ধরে ফেলল সে, হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল সুরবালা, পারলো না। টুনকী তার মা-র চাইতে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা, আর তেমনি নিখুঁত স্বাস্থ্য। টুনকীর হাত কামড়াবার চেষ্টা করল সুরবালা, টুনকী কনুই দিয়ে জোরে আঘাত করল সুরবালার মুখে, সুরবালা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

হাত ছাড় বলছি।

না ছাড়ব না, আগে তুমি শান্ত হও।

সুরবালা তার পেটে লাথি মারল, টুনকী তার মা-র একটা হাত জোরে মুচড়ে দিল; চীৎকার করে কেঁদে উঠল সুরবালা, বসে পড়ল মাটিতে, আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল, পিঠটা তার বার বার কেঁপে উঠছিল।

কানু মল্লিক প্যাণ্টের বোতাম ক'টা এঁটে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেটটা শেষ করে যাবার সময় সে দেখল দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সুরবালা তখনও পড়ে আছে মাটিতে, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, টুনকী বসেছে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে, দৃষ্টি তার জানালার বাইরে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে জানালার নিচেই চিঠিটা পেল সুরবালা।

"এ-বাড়ির সমস্ত দেওয়াল, জানালা দরজা, সমস্ত জিনিষ, আসবাবপত্র—বিষে জর্জরিত, তার ওপর আর এক কৌটায় কি এমন এসে-যাবে? আমার খোঁজ কোরো না। টুন্‌কী।"

এই তো জীবন, মানব-জীবন, ফুল ফোটা, ফুল ঝরা
সমুখে হাস্ত, পিছনে অশ্রু, শয্যাশায়িনী জরা।

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহত্তম ও উৎকৃষ্টতম উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অভূতপূর্ব সর্বভারতীয় মহোৎসব

—শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী সঙ্গীত সম্মেলন—

নবজীবন আন্দোলনের (শৃঙ্খলা) সাহায্যকল্পে

—স্থান—
মনোরম পরিবেশ
পার্ক সার্কাস ময়দান,
কলিকাতা
—তারিখ—
১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ও ১৮ই
আগষ্ট—১৯৫৯

সিজন টিকিটের হার:
৩৲, ২৫৲, ৩৫৲, ৫০৲, ৭৫৲,
১০০৲, ২০০৲ ও
১০০০৲ টাকা

—যোগদান করছেন—

—কণ্ঠ সঙ্গীতে—

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ (বম্বে); ওস্তাদ আমীর খাঁ (বম্বে); ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় (দিল্লী); শ্রীভীমসেন যোশী (পুণা); শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর (পুণা); শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক (উড়িষ্যা); শ্রীমতী লক্ষ্মী শঙ্কর (বম্বে); শ্রীমতী গিরিজা দেবী (বেনারস); শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী (কলিকাতা) ও আরও অনেকে।

—যন্ত্র সঙ্গীতে—

সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (পদ্মভূষণ); ওস্তাদ আলি আকবর খান; পণ্ডিত রবিশঙ্কর; ওস্তাদ বিলায়েৎ খান ও ইমরাৎ খান; আশীষ কুমার; পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বেনারস); শ্রীনিখিল ব্যানার্জী; শ্রীপান্নালাল ঘোষ (দিল্লী); ওস্তাদ শুকুর খাঁ (দিল্লী); ওস্তাদ মুনীর খাঁ (দিল্লী); পণ্ডিত শামতা প্রসাদ (বেনারস); পণ্ডিত কিষণ মহারাজ (বেনারস); কেরামতুল্লা খাঁ ও আরও অনেকে।

—নৃত্যে—

শ্রীমতী রোশন কুমারী (বম্বে)
শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী (বম্বে)
শ্রীমতী নয়না জাভেরী ও সম্প্রদায় (বম্বে)।
শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি (কলিকাতা)

এ ভিন্ন বাংলার প্রসিদ্ধ শিল্পীবৃন্দ —আরও অনেকে—

টিকিট প্রাপ্তিস্থান: **শৃঙ্খলা কার্য্যালয়,** ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন:—৩৪-১৩৫১
নবজীবন আন্দোলন (শৃঙ্খলা) **কার্য্যালয়**—৫২বি, ইণ্ডিয়ান মীরর ষ্ট্রীট (ফোন:—২৪-৩৩১৫)
নবজীবন আন্দোলন কার্য্যালয়—৪-এ, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা—২৯।
বসুশ্রী সিনেমা ফোন:—৪৬-৪৮০৮
বীণা সিনেমা ফোন:—৩৪-১৫২২
মডার্ণ ডেকরেটারস্ ৬৫এ, ডব্লু, সি ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, ফোন:—৫৫-২৫৪৯
ভীমচন্দ্র নাগ ৬—৮, নির্ম্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট, ফোন:—৩৪-১৪৬৫

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

মেয়েটির নাম গোলাপ। তাকে দেখতেও ঠিক গোলাপের মতন। সবাই শুধু ভাবে ঐ বস্তীর ভিতর অমন রূপ এলো কোথেকে? চোখ যেন ফেরানো যায় না। তবুও তো একদিনও বেচারা একখানা ভালো শাড়ী পেলো না ভালোভাবে সাজবার। ছেঁড়া টুকরো টুকরো শাড়ীর ফাঁক দিয়ে উচ্ছল যৌবন যেন ঠিকরে পড়ছিল।

রুক্ষকেশে শুকনো মুখে ও আজকাল সারাটা দিন বসে থাকে। মুহূর্ত মাত্র যার কোনোদিন অবসর জোটেনি আজ কর্মমুখর সেই মেয়ে এত শান্ত কেন? লক্ষ লক্ষ নর নারীর কলরব মুখরিত এ বিরাট শহরে এ ঘটনা কারুর মনে কি বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করেছে? সবই ঠিক চলছে। অদূরের ঐ বাসগুলো। কারখানার এক ঘেয়ে ঠকাঠক আওয়াজ। টাঙ্গাওয়ালাদের যাত্রী সংগ্রহের শ্লোগান। ফেরিওয়ালাদের মিষ্টি ও কর্কশ কণ্ঠ। পথচারীর আনাগোনা। সামনের বেকারীর টুকটাক আওয়াজ। হারমোনিয়ম মেরামতের দোকানের টুং-টাং শব্দ। এ বিরাট শহরের দৈনন্দিন প্রোগ্রামের কোনো জায়গায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। তবুও কেন ঐ রুক্ষকেশা আলুলায়িত বসনা গোলাপের সব কাজ কর্ম হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে? গোলাপের দিবা যামিনী কাজের মাঝে যে দরিদ্র জীবন প্রতিক্ষণ সংগ্রাম করে চলেছে তার হঠাৎ কি অপমৃত্যু ঘটলো?

—এই ত সেদিনের কথা। সকাল নেই সন্ধ্যে নেই মেয়েটি বসে বসে মাটির পুতুল তৈরী করে যায়। ছোট শিশুটি তাকে পাশে বসে সাহায্য করে। নাম তার ঝুলন। ওরই ছেলে।

সকালে উঠে গোলাপ মাটির পুতুল বানায়। তারপর পাহাড় থেকে সংগৃহীত কাঠের আগুনে পুতুলগুলোকে ফেলে মাথায় সাজি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুতুল বিক্রীর আশায়। ছোট ছেলেটিকে দরজায় বন্ধ করে যায়। দরজা ঠিক নয় বাঁশ, লতাপাতা দিয়ে ঘেরা একটা বেড়া মাত্র। তাই যথেষ্ট।

বিকেল বেলায় শ্রান্ত গোলাপ মাথার ঝুড়ি ফিরিয়ে এনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তার ঐ পোড়ামাটির সস্তা পুতুল কেউ কেনে না। শহরের লোকের রুচি বদলেছে। ওর আদ্ধেক দামে তারা বিলিতি পুতুল পায়। তার পুতুলের চোখ কান নাক নাকি বোঝাই যায় না। গোলাপের কি দোষ? পুতুল বানানো কি চারটি কথা? না আছে ভালো মাটি। না আছে তুলি, রঙ। না আছে সাজাবার সুন্দর সুন্দর কাগজের বাক্স। তার বাপ—নকুল কুমোর কেমন সুন্দর প্রতিমা গড়ত! ঠিক যেন জীবন্ত মানুষ। নকুল আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে কি তার গোলাপকে অমন অসহায় দিন যাপন করতে হত শহরের ঐ ছোট বস্তীতে। নকুলই গোলাপকে পুতুল তৈরী শিখিয়েছে। সে শেখা সেদিন ছিল কেবল সখের পুতুল খেলা। এতদিন সেই পুতুল তৈরী করেই গোলাপ তার ছোট সংসারটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ সেই ছোট সংসারেই যেন একটা কিসের ঝড় উঠেছে। যেন কোন মহাকালের প্রলয় নৃত্যে বেচারার বস্তীর কুটীরখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু কেন? বস্তীর প্রায় সব মেয়ে পুরুষই সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়ে। সকালের দিকে কলতলায় ভারি ভীড়। সকালে উঠলেও গোলাপ কলতলায় একটু দেরীতেই যায়। অন্য মেয়েদের মতন ঝগড়াটা সে পছন্দ করে না। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। সেটা খুব কম লোকই জানে। লোকজন একটু হাল্কা হলে পরিধানের শাড়ীটুকু রোজ সে পরিষ্কার করে। ভীড়ের ভিতর সেটুকু করায় অসুবিধে আছে। তার দ্বিতীয় শাড়ী নেই।

গোলাপ টুকটুক করে অষ্টপ্রহর কাজ করে। ঝুলন সারাদিন বস্তীটা চরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে গোলাপ উচ্চকণ্ঠে তাকে ডাকে, ঝুলন, লক্ষ্মী বাবা ঝুলন। ছুটে আয় রোদে ঘোরে না। লক্ষ্মী সোনার ছেলে ঝুলন।

ঝুলন বলে, খেতে দিবি? বল আজ ভাত খেতে দিবি? তিন দিন শুধু মুড়ি খেয়ে আছি। বল ভাত দিবি?

দু'গ্রাস ভাতের আশায় ঝুলন বস্তীর এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে। যদি কেউ ডেকে হঠাৎ কিছু দেয় খেতে।

এই হ্যাংলামিটুকু ঝুলনের ছিল না। মা ছাড়া অন্য কেউ যে খেতে দিতে পারে এ ধারণাটুকুও তার ছিল না। সেদিন বোধ হয় নবান্নই হবে। শুকনো মুখে ভাঙা লাটিম হাতে সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটিকে ঘুরতে দেখে বস্তীর বাতাসীর মা তাকে ডেকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছে। গোলাপ শুনে খুশীই হয়েছিল। নবান্নর দিন। সবাই সোনালী ধান ঘরে তুলছে গ্রামে। শহরের জীবনে তার ছোঁয়া লেগেছে দেখে খুশীই হল। তবুও মনটাকে প্রবোধ দিতে পারে না। ঝুলন ভিক্ষে চাইতে যায় না তো আজকাল? শহরের লোক এত দয়ালু ত নয় যে ডেকে খেতে দেবে! শিশুমন। ও সব বোঝে না। এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারে। যদি কেউ ডেকে কিছু খেতে দেয়। মনের আশা মনেই থাকে। শিশুকে কেউ ডাকেও না। কেউ খেতেও দেয় না।

ঝুলন আবার বলে, বল, খেতে দিবি? মা সত্যি বলছি ভারী খিদে পেয়েছে।

গোলাপ মাটির হাঁড়ি থেকে দু মুঠো মুড়ি এনে ঝুলনকে খাওয়াতে বসে। ছেলে কিছুতেই খাবে না। গোলাপ বলে, লক্ষ্মী সোনা আজ শুধু খাও। সামনের মেলাতে কত পুতুল বেচবো। কত দীপ গড়ব। কত টাকা পাব। সকাল বিকেল তুমি আর আমি পেট ভরে ভাত খাব। শুধু ভাত নয়। কত মিষ্টি। কত মোয়া। কত কি—

চোখ দুটো আশায় ভরে যায়। শিশু ঝুলন আবদার করে নতুন জামা দিবি? লাল—নীল পুলিশ দিবি? বাঁশি—বেলুন দিবি—

গোলাপ বলে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমার ঝুলনকে দোবো না? ঝুলনের পুলিশ নতুন পাগড়ী পরবে। নীল জামা পরবে। আসুক না মেলাটা একবার।

ঝুলন সত্যি কথাটি বলেছে। ঐ গেরুয়া রঙের পুলিশ কারুর ভালো লাগে? গোলাপ কি করবে? দু' পয়সার গেরুয়া রঙ কিনলে জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে মৃৎপাত্রগুলি যেমন রঙ করা চলে, তেমনই পুতুলও গেরুয়া-রঞ্জিত করা যায়। শুধু পোড়া মাটি কেউ কখনো কেনে? সত্যি বলেছে ঝুলন—মেলার পরে কিছু রঙ কিনতে হবে। পুলিশগুলো শুধু গেরুয়া রঙেই নয় এবার তাদের রঙীন পাগড়ী দিয়ে সুন্দর সাজিয়ে বাজারে ছাড়তে হবে।

দু মুঠো মুড়ি খেয়ে ঝুলন পাড়া বেড়াতে চায়। গোলাপ কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। বুড়ো মিস্ত্রীটা আজকাল আবার কাজে যায় না। কে জানে ওর কি হয়েছে? সেদিন ঝুলনকে ডেকে সে তার বাপ হবার ইঙ্গিত দিয়েছে। ছি ছি, লজ্জায় মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। ঝুলন বলল, বল না মা কেন তুই রাগ করলি? বুড়োটা তো বেশ ভালো লোক। বল মা—

এমনি ভাবেই দিন কাটে।

গোলাপ অধীর আগ্রহে প্রতিদিন প্রহর গোণে—কবে আসবে মেলা। কবে তার পুতুলগুলো বিক্রী হবে। মাটির প্রদীপ আজকাল কেউ বড় একটা জ্বালায় না। মোমবাতি চলে বেশী কেউ কেউ আবার ছোট ছোট রঙীন ইলেকট্রিক বালব দিয়ে ঘর সাজায়। শত আধুনিকতার মাঝেও মেলার উৎসবটুকুই আজ শুধু পুরোনোর ছোঁয়া নিয়ে দেখা দেয়। গোলাপ সমস্ত বছর ধরে মেলার দিন ক'টির স্বপন দেখে। মেলায় সবাই তার জিনিষ কেনে, পুতুল, প্রদীপ, কাপড়ের খেলনা কিছুই ফিরিয়ে আনতে হয় না গোলাপকে।

কবে আসবে সেই মেলা?

গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লাল হলদে ঘাগরা পরা মেয়ের দল গরুর গাড়ী চেপে গান গাইতে গাইতে আসবে। সাথে তাদের স্বামী, দেবর অথবা শ্বশুর। গড়গড়া হাতে মাথায় পাগড়ী লোকটা গ্রামের মোড়লও হতে পারে। গোলাপ তাদের ভাষা ঠিক বুঝতে পারে না। তাদের পোষাক পরিচ্ছদে, মুখের ভাব ভঙ্গীতে মনে হয় তারা নিশ্চয়ই সুখী। না হলে কখনো অমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে। মনে হয় যেন জলের ঘড়া থেকে কল কল শব্দে জল গড়িয়ে পড়ছে। গাঁয়ের মেয়েগুলিই গোলাপের পুতুল কেনে বেশী।

কত লোক আসে দূর দেশ থেকে তার পুতুল কিনতে। তারা গোলাপের পুতুল কেনে। কেউ কেউ আবার ঘাড় হেলানো বুড়োটা দেখিয়ে বলে, আরে বহিনি এই পুতলিটাও তুই নিজের হাতে গড়েছিস?

বহিনি—আহা কি মিষ্টি লোকগুলো! গোলাপ বলে, হাঁ।

কত দাম বললি?

দু' আনা?

দে দে চারটে বেঁধে দে।

শহরে দু' পয়সা দামেও কেউ একটা পুতুল কেনে না। তারা কেনে সস্তা বিদেশী প্লাষ্টিকের খেলনা।

পুতুলগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রী করে গোলাপ এদিক ওদিক হরিণীর মতন ছুটে বেড়ায়। ঝুলনকে মেলায় নিয়ে আসতে সাহস হয় না।

এদিক ওদিক ছোটে।

বাঃ! কি সুন্দর চর্কিবাজীর মতন ঘুরছে ছেলেমেয়েগুলো। ওগুলোকে নাগরদোলা বলে। মাত্র দু'টো পয়সা দিলেই দু মিনিট ঘোরাবে তোমাকে। ঝুলনকে নিয়ে এলে মন্দ হত না। ওকে কোলে নিয়ে বসলে বেশ হত। একবার ঐ উপরে ওঠো। আবার নীচেতে নামো। সে কিন্তু তিনি পয়সাতেই রোজ বেশ চর্কীবাজীর মতন ঘুরছে। কিছুই চায় না সে। ঐ কোণের দোকানীর চা। বনমালী মিশ্রের পাঁপর। মাংসের ঘুগনি। ওসব সে চায় না। তার দরিদ্র জীবনে সে চায় দু' মুঠো অন্ন। ছেলেটার দু' বেলা দুটি ভাত। তার জন্য এক বেলা হলেই যথেষ্ট। এই বিরাট শহরের কেউ কি জানে অমন সুন্দরী মেয়ে গোলাপের জীবনে এক দিনে দু' বেলা আহার একটা কত বড় বিলাস? সমস্ত বছরে মাত্র মেলার দিনকটি গোলাপ দু বেলা পেট ভরে খায়।

মেলায় সার্কাস পার্টি আসে। বাঘ আসে, হাতী থাকে, ভালুক নাচে, সিংহ গান গায়। লোকগুলোর কথাও শোনো একবার। বলে কিনা, বাঘ হাতীর পিঠে চড়ে নাচবে। এক আনার পয়সা দাও। তারপর ঐ ত্রিপলের ভিতরে ঢুকে দেখো সত্যি সত্যি বাঘ হাতীর পিঠে চড়ে নাচছে। এও কখনও হয়?

নাচের দলও একটা আসে প্রতি বার। ঠিক সন্ধ্যায় তাদের প্রোগ্রাম সুরু হয়। সারাটি দিন সুন্দর গোঁফওয়ালা একটি লোক

মেয়ের পোষাক পরে ছুটো আঙুল দিয়ে গোঁপটাকে চেপে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে হেলে ছুলে নাচে। গান গেয়ে গেয়ে লোকটা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গোঁফ থেকে আঙুল সরিয়ে তখন সে একটা বিড়ি ধরায়। ছ পাশের লোকগুলো তখন হি হি করে হাসতে থাকে। গোলাপও হাসে। ঝুলনটা বড় হোক। সে চাকরী করে টাকা আমুক। তখন গোলাপ একদিন ঐ নাগর-দোলাতেও চাপবে। কিন্তু তখন কি তার বয়স থাকবে?

কত রকমের বেলুন দেখো। একটা বেলুনে আবার বাঁশি লাগানো। ফুঁ দিয়ে বড় করে ছেড়ে দাও। আপনা থেকেই বাজতে থাকবে। আবার ঐ দেখো গ্যাস বেলুন। নিজে থেকে উপরে উঠবে। সুতো নিয়ে তুমি ঘুঁড়ির মতন দাঁড়িয়ে থাকো। ভারী দাম। ছ আনা দিয়ে কেনা যায়? ছ' পয়সার একটা লাল বেলুন কিনে গোলাপ ঘরে ফেরে। ঘুমন্ত ঝুলনকে তুলে গোলাপ তার হাতে বেলুনটি দিল।

সে আজ তিন বছরের কথা।

ঝুলনের জন্তই বোধ হয় মেলাটা একটু তাড়াতাড়ি বসছে এবার। এগারো দিনের মেলা। গোলাপের মরবার ফুরসুতটুকু নেই এবার আর প্রদীপ বানাবে না। শহরে মাটিটুকু পর্য্যন্ত পয়সা খরচা করে কিনতে হয়। পুতুলগুলো সাজিতে সাজিয়ে ঝুলনের হাত ধরে গোলাপ বেরুলো। শাড়ীখানা সুন্দর মানিয়েছে। সস্তা নকল সিল্কই হয়ত হবে। বাতাসীর মার কাছ থেকে ঘণ্টা তিনেকের জন্ত শাড়ীখানা সে ধার নিয়েছে। শত ছিন্ন মলিন শাড়ী পরে কি মেলায় যাওয়া যায়?

ঝুলনের ভারী আনন্দ। আজ নিশ্চয়ই সে পেট ভরে খেতে পাবে। গোলাপ তাকে একটা বাঁশীও কিনে দিয়েছে। আজকাল সে ভারী আব্দার করতে শিখেছে।

কিন্তু কোথ্‌থেকে কি যেন হয়ে গেল। অন্ত বছরের চেয়ে মেলায় এবার ভীড়টা একটু বেশী হয়েছে। নিমেষের ভিতর গোলাপের পুতুলগুলো বিক্রী হয়ে গেছে। এদিক ওদিক হাঁ করে করে চলতে চলতে ঝুলন কখন হাত ছাড়া হয়ে গেল। এদিক ওদিক খুঁজেও গোলাপ তার কোনো সন্ধান পেলো না।

সন্ধ্যা সমাগমে রাস্তার মোড়ে ভীড় দেখে গোলাপ একটু দূ দিয়েই চলছিল। বস্তীর হরলাল হঠাৎ তাকে দেখে হিড় হিড় করে টানতে টানতে টানতে নিয়ে বলল, দেখ দেখ, শহরের লোকগুলোর কাণ্ড দেখ। ছ বেলা পেট ভরে খেতে দেবে না রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলব তাও দেবে না। দেখ এসে কাণ্ড দেখ। লোকটাকে কেউ ধরতে পারল না। হুস করে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।

গোলাপ গিয়ে দেখলো একটি মৃত শিশুকে কেন্দ্র করে রাস্তা জনতা ভীড় করে দাঁড়িয়ে। ছেলেটির হাতে একটি বেলুন-বাঁশি গোলাপের এক বিন্দু চোখের জল পড়ল না।

গোলাপের স্তব্ধতায় কেউ তাকে বলল, ডাইনি, কেউ বলল মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ রূপোপজীবিনী।

সে শুধু রুক্ষ কেশে শুকনো মুখে দিবা যামিনী বসে থাকে।

বস্তীর বুড়ো মিস্ত্রীটা ছ' একবার এদিক ওদিক ঘুরে ফি গেছে।

দিন এলো। দিন গেল। বছর ঘুরে আবার মেলা এলো গাঁয়ের বধূরা গরুর গাড়ীতে চেপে গান গেয়ে গেয়ে মেলা এলো। সার্কাসপার্টি এলো। নাচের দল এলো। বেলুনওয়া এলো। নাগরদোলা এলো। কোণের দোকানের চা-ওয়া এলো। বনমালী মিশ্র পাঁপর নিয়ে এলো। মেলায় এবা কেউ শুধু দেখতে পেলো না কোনো অপটু হাতের পোড়া মাটি গেরুয়া রঙের পুতুল।

দামোদর

অধীর সরকার

লজ্জায় ঢেকেছে বুক; কখনো বা আলোকের থেকে
নিজেকে আড়াল করে সঙ্গোপনে রেখেছে লুকিয়ে,
কুণ্ঠিত সলজ্জ পায়ে কখনো বা ভীরু চিহ্ন রেখে
এঁকে-বেঁকে গেছে চলে কে জানে সে কোন্ পথ দিয়ে।

কখনো যুবতী সে যে যৌবনের রুদ্ধ বেদনায়
আপনাকে দীর্ণ করে, মুক্ত করে, ব্যাপ্ত করে দিক;
কী কঠিন যন্ত্রণায় অবশেষে দিগ্বিদিক যায়—
কী যে ব্যথা যুবতীর!—অসহায় আমরা প্রেমিক।

অবশেষে বধূ হল, অন্তরের দুর্মদ প্রকাশ
যেন কোন নীড়ে-বাঁধা আনন্দিত আসঙ্গের মাঝে
প্রসন্ন কোমল হাতে ভরে দিল বুঝি বারো মাস
সুন্দর সুশ্যাম স্বপ্নে সংসারের নানাবিধ কাজে।

কোলাহল ছিল যাহা, এতদিনে আজ হল বাণী
যুবতী সে বধূ হল নবনীতা সুন্দরী কল্যাণী।
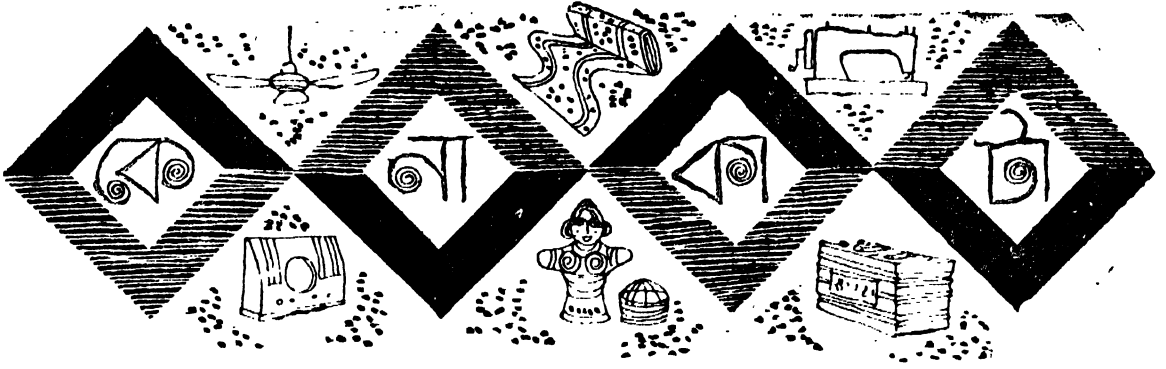
সিমেণ্টশিল্প ও ভারত

আধুনিক যুগে সিমেণ্টশিল্পের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইস্পাতের ন্যায় এরও রয়েছে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। বলতে গেলে, যে কোন নির্ম্মাণ কার্য্যেই (পূর্ত্তকার্য্য ও গৃহ নির্ম্মাণাদি) আজিকার দিনে সিমেণ্ট না হলে নয়, দীর্ঘস্থায়ী মজবুত গাঁথুনির জন্যই এইটি অত্যাবশ্যক।

ভারতে পরিকল্পিত ভাবে সিমেণ্ট উৎপাদন সুরু হয়েছে, খুব বেশী দিন নয়। এখানকার সর্ব্বপ্রথম সিমেণ্ট তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয় মাদ্রাজে আর সেটি মাত্র চলিত শতাব্দীর প্রথম পাদে। উৎপাদন-ব্যয় বেশি পড়তে থাকায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায় অল্পকালের ভেতরেই। তারপর আবার এক একটি করে কারখানা (সিমেণ্ট) গড়ে উঠতে থাকে দেশের এখানে সেখানে। ১৯২৫ সালের মধ্যেই ভারতে সিমেণ্ট উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়ে যায় ১২টি এবং উহাদের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা হয় ছয় লক্ষ টনের মতো।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সিমেণ্টের চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে দেখতে দেখতে। চাহিদা মেটাবার জন্য কারখানার সংখ্যাও কিছু বাড়তে থাকল ক্রমেই। ১৯৪০ সালের ভেতর দেশে প্রায় ২০টি সিমেণ্ট উৎপাদন কারখানা ভাল রকম দাঁড়িয়ে যায়। বিদেশী শাসনমুক্ত হবার (১৯৪৭) পর ভারতে কয়েকটি নতুন সিমেণ্ট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে ১৯৫৭-৫৮ সাল মধ্যে সমগ্র দেশে প্রায় ৩০টির অধিক কারখানায় পুরাদমে কাজ চলে। উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে দাঁড়ায় ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার টন।

এখন অবধি যতগুলো সিমেণ্ট কারখানা এদেশে স্থাপিত হয়েছে, তাদের প্রায় সব ক'টিই বে-সরকারী শিল্পসংস্থা। সরকারী উদ্যোগেও দুইটি বৃহৎ কারখানা চালু হয়েছে এর ভেতর—একটি উত্তর প্রদেশ সরকারের পরিচালনাধীন ও অপরটি মহীশূর রাজ্য সরকারের। বহির্ভারত থেকে সিমেণ্ট আমদানীর যাতে প্রয়োজন না হয়, সেদিকে জাতীয় সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। তাঁরা তাই প্রতিটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সিমেণ্ট কারখানার সংখ্যা বাড়ানো ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনা কালে দেশে অন্ততঃ ৪৪টি সিমেণ্ট কারখানার ব্যবস্থা ও এক কোটি ৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদনের সঙ্কল্প তাঁদের রয়েছে।

সিমেণ্টশিল্পে ভারত স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পেরেছে সকল দিক থেকে—এমনটি জোর করে বলা যায় না। বৃটেন, আমেরিকা, জার্মাণী, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে এখনও সিমেণ্ট কারখানার উপযোগী বহু যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয়। অবশ্য দেশের অভ্যন্তরেও এই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি ও কল-কব্জা তৈরী আরম্ভ হয়েছে আর সেটি জাতীয় সরকারের ব্যবস্থাধীনেই। এইরূপ আশা করা হচ্ছে, ১৯৬২ সালের ভেতর দেশের সিমেণ্ট কারখানাগুলোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বেশীর ভাগই নির্ম্মিত হবে দেশের ভেতরেই।

সিমেণ্ট উৎপাদনে কয়লা ও কর্দম ছাড়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয় চূণাপাথর ও জিপসাম্। এখন অবধি ভারতে যতগুলো সিমেণ্ট কারখানা চালু রয়েছে, সেগুলোর জিপসাম্ ও চূণাপাথরের চাহিদা দেশের অভ্যন্তর থেকেই মেটানো চলছে। কিন্তু এই শিল্প আরও সম্প্রসারিত হলে, সিমেণ্ট উৎপাদন অধিকতর বর্দ্ধিত করতে চাইলে, উক্ত দুটি উপাদান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। সেজন্য আগে থেকেই এ অপরিহার্য্য প্রয়োজন কিভাবে মেটানো যায়, ভেবে রাখা দরকার। দেশের ভেতর অনুসন্ধান চালিয়ে জিপসাম্ ও চূণাপাথরের সরবরাহ যদি বাড়ানো না গেল, সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে, আগে থেকেই ঠিক রাখা চাই।

কিছুকাল থেকে দেশে সিমেণ্টের চাহিদা অতিমাত্র বেড়ে চলেছে দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির এক অভিনব পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন নতুন কারখানা গড়ে তোলা অপেক্ষা এক্ষণে সরকার যে কারখানাগুলো চালু রয়েছে, সেগুলোর কাজ সম্প্রসারিত করতে চাইছেন। নির্দ্ধারিত ব্যবস্থামতো উৎপাদন সত্যি যদি সম্ভবপর হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে সিমেণ্ট উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টন। এই পরিমিত সিমেণ্ট সরবরাহ মারফৎ দেশের দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালীন চাহিদা মেটানো যাবে—অন্ততঃ কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ্, দাবী রেখেছেন এমনটি।

ইস্পাত সরবরাহ প্রয়োজন মত না হওয়ায় সিমেণ্ট উদ্বৃত্ত হয়েছে ভারতেই, সম্প্রতি এরূপ একটি অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য এই ধরণের পরিস্থিতি সাময়িক মাত্র, ইস্পাত সরবরাহের মাত্রা বেড়ে গেলেই এদেশে এখন সে অবস্থা থাকতে পারে না। আর একান্ত যদি উদ্বৃত্ত হয়, সেক্ষেত্রে বিদেশী বাজার খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না ভারতীয় সিমেণ্টের, এ ঠিক। এর ভিতর ভারতে উৎপাদিত সিমেণ্টের একটি অংশ (প্রায় ১০ লক্ষ টন) অবশ্য রপ্তানীর ব্যবস্থাও

হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি সিমেণ্ট রপ্তানী বৃদ্ধির ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অত্যাবশ্যক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য, সহজেই অনুমান করা চলে। সিমেণ্ট উৎপাদকগণ রপ্তানী ব্যাপারে যাতে অসুবিধায় না পড়েন এবং দেশে যাতে সিমেণ্ট উৎপাদন অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলতে পারে, সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের সেদিকে দৃষ্টি ও মনোযোগ না থাকলে নয়।

চাকরি প্রসঙ্গ—কয়েকটি কথা

বসে খাওয়া কিছুতেই চলবে না, কাজ করে খেতে হবে—এই নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সাধারণ অবস্থায় চাকরি বা উপজীবিকা চাই-ই একটা না একটা। কিন্তু প্রশ্ন থাকছে এর পরও—কে কি ধরণের কাজ করবে, কোন্ কাজ বা চাকরিটি সত্যি কার উপযোগী হবে? এর সদুত্তর ও মীমাংসা আগে ভাগে মিলে গেলে কোন কথা নেই। যেখানে সে-টি না হ'ল, কাজ সেখানে সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদিত হবার আশা কম। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—এরূপ ক্ষেত্রে অসন্তোষের আবহাওয়া একটা থেকে গেছে কোথাও।

সোজা কথা যেটি দাঁড়াচ্ছে এই থেকে—মনঃপূত কাজ বা চাকরিটি খুঁজে পাওয়া চাই গোড়াতেই। এমন কার্য্যক্রম যেন না গ্রহণ করা হয়, যাতে করে পরে আফশোষের কারণ হবে। উপযুক্ত লোকের জন্য উপযুক্ত কাজের যদি ব্যবস্থা হল অর্থাৎ যিনি যে কাজের যোগ্য, বাস্তবক্ষেত্রে তিনি যদি পেয়ে গেলেন সেই কাজটি, সব দিক থেকে শুভ। সেক্ষেত্রে সহসা চাকরি রদবদলের প্রশ্ন ওঠে না, কর্তৃপক্ষ-কর্মচারী তথা মালিক-শ্রমিক অসন্তোষের অবকাশও খুব কম থাকে।

অনেক স্থলেই দেখা যায়, অন্ততঃ এই দেশে, কর্মজীবনে ঠিক লোকটি এসে ঠিক যায়গায় পড়লো না। যার যেখানে থেকে কাজ করবার কথা নয়, কার্য্য-কারণে তাই হয়ত করতে হচ্ছে বহু চাকরি-জীবীকে। যিনি শিক্ষকতা করলে সত্যি ভাল হয়, তাঁর চললো বরাবর কেরাণীর জীবন, এমন অনেক দেখা যায়। আবার, এমনও পরিদৃষ্ট হয়—ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোকের ব্যবসায়ের সুযোগ হয়তো মিললোই না, তাকে গ্রহণ করতে হলো জীবিকার সূত্রহিসাবে শিক্ষকতা কিংবা অপর কোন বেমানান (তার পক্ষে) বৃত্তি।

সাধারণতঃ চাকরি রদবদলের প্রশ্ন ওঠে, কোথায় এবং কেন? যেখানে থেকে থেকে দেখা যায় যে, পদোন্নতি বা আর্থিক অগ্রগতির কোন সম্ভাবনাই নেই, সেক্ষেত্রে চাকরির ওপর বিতৃষ্ণা আসতে পারে। অপর পক্ষে, কাজের ধারা ও মাসমাহিনার দিক থেকে পছন্দসই চাকরি যেখানে হল না, সেখানেও চাকরি রদ-বদলের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আরও একটি কথা—মনোমত চাকরি পেলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতিলাভ ও দক্ষতা প্রমাণের জন্য চাকরিজীবী অবশ্য সচেষ্ট হবেন। অপরদিকে এ ও ঠিক যে, অসন্তুষ্ট বা অনিচ্ছুক মন নিয়ে কারোর পক্ষেই কর্ম-জীবনে খুব বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চাকরি রদবদল করেও যদি নিশ্চিন্ত অবস্থান্তর ঘটানো যায়, অন্ততঃ যাবে বলে বিশ্বাস থাকে, তবে সেদিকে পা বাড়ানো সমীচীন বলতে হবে। কিন্তু এইখানে স্মরণ রাখবার—যা কিছু করতে হবে, বয়স থাকতে থাকতেই, যৌবন ও উদ্যম বিনষ্ট হবার আগেই। বয়স যদি পেরিয়ে গেলো, উৎসাহ-উদ্যমে যদি পড়লো ভাঁটা, তবে নতুন জীবন গড়া তথা প্রতিষ্ঠা অর্জনের স্বপ্ন বৃথা।

সেই সঙ্গে এ-ও অবশ্য বলতে হবে—বেকারী যেখানে ব্যাপক, কর্ম-সংস্থান যেখানে কর্মপ্রার্থীর তুলনায় স্বল্প বা সীমিত, সে ক্ষেত্রে চট্ করে চাকরি পেয়ে চাকরি ছাড়তে যাওয়া কঠিন। বিপদ বা অনিশ্চয়তার ঝুঁকি সেখানে অনেকটা থেকে যায়, এ অতি সহজেই অনুমেয়। সে জন্যই একটা কোন কাজ বা চাকরিতে ঢুকবার মুহূর্ত্তেই যেমন ভাবতে হবে ভালরকম, তেমনি সেই কাজটি (যতই অপছন্দ বা বেমানান হোক) ছাড়বার প্রশ্নেও পূর্বাহ্নে বেশ নিবিড় ভাবে না ভাবলে নয়।

চাকরিজীবীদের মানসিক গঠন সম্পর্কে বিলেতের পেশা বিশেষজ্ঞরা গবেষণা ও আলোচনা চালিয়ে এসেছেন প্রচুর। তাঁরা দেখেছেন যে, মাঝামাঝি বয়সে পা দেওয়ার সময়ই চাকরি রদবদলের প্রশ্নটি সাধারণক্ষেত্রে মনকে আলোড়িত করে বেশি। চল্লিশের কোঠায় যাঁরা পৌঁছলেন, একটি জিনিস লক্ষ্য পড়ে তাদের অনেকেরই বেলায়—যে পেশা বা উপজীবিকায় তাঁরা নিয়ে আছেন, তার জন্য তাঁদের যতটা অসন্তুষ্টি নয়, তার চেয়ে ঐ পেশা থেকে সারা মাস খাটার পর যা তাঁরা পাচ্ছেন, তাই নিয়ে। এর কতকগুলো সঙ্গত কারণ যে না আছে, তা নয়। কেন না, সেই সময় মধ্যে পরিবার সম্প্রসারিত হয়, সংসারের আর্থিক দায়ও আগের চেয়ে স্বভাবতঃই বেড়ে যায়।

কর্মজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার জন্য যা কিছু করতে হবে, প্রথম ভাগেই হওয়া চাই—এইটি একটি মূল সূত্র ধরে নেওয়া চলে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রথম বয়সে যতটা উদ্যম থাকবে, দম থাকবে এগিয়ে যাবার, বয়স বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে তা হ্রাস পাবে, এ খুব স্বাভাবিক। সর্বোপরি, জীবনারম্ভে যতটা ঝুঁকি লওয়া যায়, পারিবারিক দায়িত্ব বর্দ্ধিত হলে পর সাধারণ অবস্থায় ততখানি ঝুঁকি লওয়া সম্ভব নয়। চাকরির ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এ কথাগুলো স্মরণ রেখে কাজ করা যেতে পারে, এবং এতে অনেক ক্ষেত্রেই সুফলও যে না মিলবে, এমন নিশ্চয়ই নয়।
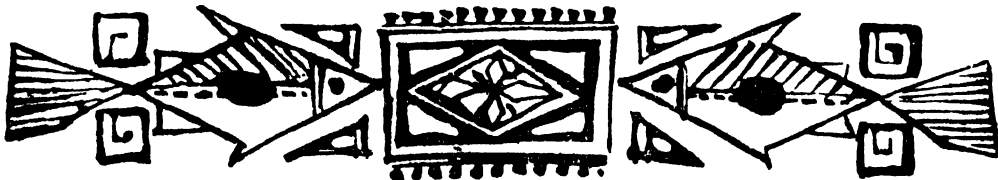
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ব্যবসায় দৌড় দেখে এতক্ষণ আপনারা মুখ টিপে হেসেছেন, কিন্তু এইবার আপনারা গম্ভীর না হয়ে পারবেন না। ডেকরেশনের ব্যবসাটা একটা পূর্ণাবয়ব বৃহৎ ব্যবসাই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে বিবরণের আগে স্বদেশী হাঙ্গামার বিকাশের বিভিন্ন দিকের বিবরণ কিছু দেওয়া দরকার।

বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রাণপাত করলে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হবে, এবং সে দাবীর সম্মান রেখে বৃটিশ সরকার যে ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই স্বায়ত্তশাসন পুরস্কার দেবে, একথা প্রচার করে যে নিষ্ঠাবান রিক্রুটিং এজেন্ট গান্ধী, তিলক, অ্যানী বেসান্ট প্রভৃতি কংগ্রেসী গরম দলের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন, রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় সেই গান্ধী বিগড়ে গিয়ে বললেন, এই সরকার আমার সকল বিশ্বাসের গোড়া কেটে দিয়েছে। কিন্তু বৃটেন বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওপর বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়নি। তাই সশস্ত্র বিপ্লবের আশঙ্কাকে তিনি অহিংস অসহযোগের পথে পরিচালিত করলেন।

মডারেট কংগ্রেস নেতা প্রভাস মিত্র ছিলেন রৌলট কমিটির অন্যতম সদস্য। ১৮ সালের শেষেই কংগ্রেসের এই মডারেট নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে পৃথক নতুন লিবারাল ফেডারেশন গঠন করেছিলেন।

২০ সালের আগষ্ট মাসে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়, এবং সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয়। সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দামান থেকে মাণিকতলা বোমার আসামীরা—বারীন ঘোষ প্রভৃতি মুক্ত হন। ২১ সালে বারীন ঘোষ "বিজলী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হলে প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস অবতীর্ণ হবে বলে নেতারা স্থির করেছিলেন, এবং বাংলা দেশে নির্বাচন-প্রার্থীদের নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল,—কিন্তু অসহযোগ প্রস্তাব অনুসারে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত করা হয়, এবং লিবারাল ফেডারেশন প্রভৃতি অন্যান্য দলের নির্বাচনের পথ নিষ্কণ্টক হয়।

শাসন সংস্কার পরীক্ষা করে দেখা গেল,—কয়েকজন মিনিষ্টার করার ব্যবস্থা ...

জন্যে—যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি শিল্প প্রভৃতি। রাজস্ব, অর্থ, পুলিশ, প্রভৃতি প্রধান বিভাগগুলো সরকার নিজের হাতেই রেখেছে,—আগেকার মত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের শ্বেতাঙ্গদের সদস্যদের হাতে।

প্রথম বিভাগগুলোর নাম ট্রান্সফার্ড সাবজেক্ট, আর দ্বিতীয় বিভাগগুলোর রিজার্ভড্ সাবজেক্ট—তাই এই শাসন ব্যবস্থাকে দ্বৈতশাসন বা ডায়ার্কি বলা হত। নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য কিছু বাড়ানো হয়েছিল।

ব্যবস্থা হয়েছিল, জাতি গঠনের বিভাগগুলোর ব্যয় বরাদ্দ করার দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর থাকবে না,—তাঁদের সংরক্ষিত বিভাগগুলোর ব্যয় নির্বাহ করে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে হস্তান্তরিত বিভাগগুলোকে কিছু কিছু বেঁটে দেওয়া হবে,—অন্যথা হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রীদের নিজ নিজ বিভাগের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে—দরকার হলে তাঁরা সেজন্যে নতুন ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন।

প্রথম মন্ত্রী হয়েছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যে, প্রভাস মিত্র এবং নবাব আলি চৌধুরী (বগুড়ার নবাব)। সুরেন বাঁড়ুজ্যের হাতে ছিল স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ। অর্থাভাবে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়গুলো থেকে কিছু টাকা তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন—প্রথম দিন নাম লেখানোর সময় রোগীদের কাছ থেকে চারটে করে পয়সা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল—ফলে "দিশী" মন্ত্রীদের ওপর সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা হয়েছিল।

কিন্তু সেই প্রথম চান্স পেয়েই সুরেন বাঁড়ুজ্যে কলকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন বিধিবদ্ধ করেন—কলকাতা কর্পোরেশনের উপর মেয়রের শাসনের ব্যবস্থা করেন, যে ব্যাপারটাকে কংগ্রেস সমেত সারা দেশ তাঁর জীবনের একটা বিরাট সাফল্য বলে অভিনন্দিত করে।

যাই হোক, ডায়ার্কির সঙ্গে ভারতবাসীদের আর কয়েকটা বড় চাকরী-ঘুস দেওয়ারও ব্যবস্থা বৃটিশ সরকার করেছিল। কেন্দ্রে আর একজন ভারতীয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার—বিলাতে ভারতসভায় একজন ভারতীয় সভ্য,—বিলাতে একজন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রভৃতি। ফলত শাসন সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা প্রচারে কংগ্রেসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

(গোয়ায় নিহত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বাদে) তাঁরা ফিরে না এলে সরকারও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না,—আর বিপ্লবীদেরও বর্ত্তমান অঙ্কের পরিসমাপ্তি হয় না। সুতরাং বারীনদা' প্রভৃতি সরকারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন। একদিকে বিজলীতে বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগলো,—"ভাই অমর, বা ভাই অতুল, তোমরা যেখানেই থাক, আমাদের সঙ্গে পত্রালাপ কর"—আর একদিকে চন্দননগরের মতি রায়ের সঙ্গে অতুলদা'র গোপনে কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হল, চন্দননগরে ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার হবে, এবং কথাবার্ত্তার পর বিপ্লবী নেতাদের নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে দেওয়া হবে।

তদনুসারে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এবং গোয়েন্দাচীফের সঙ্গে অতুলদা'র সাক্ষাৎকার ও কথাবার্ত্তা হয়ে স্থির হল, ফেরারীদের বিরুদ্ধে সকল চার্জ তুলে নেওয়া হবে,—অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের কথা তোলা চলবে না,—এবং আবার কখনো তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হলে, আগে তাঁদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য বলার সুযোগ দিতে হবে।

এই বন্দোবস্তের পর ফিরে এলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্ত্তী (খুলনা) পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নলিনী কর। যাদুদা মেডিক্যাল পড়তে পড়তে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, ফেরারী অবস্থায় প্রয়োজন হলে ডাক্তারীও কিছু কিছু করতেন,—এখন হঠাৎ ডাক্তারী (এম, বি) পরীক্ষা দিয়ে ফার্ষ্ট হয়ে স্বর্ণপদক পেলেন!

জীবনের সঙ্গে উত্তরপাড়ায় গিয়ে অমরদা'কে প্রথম দেখলুম। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘাবয়ব, অপূর্ব স্বাস্থ্যবান এক বিরাট পুরুষ, দেখলে মনে হয়—জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন—এমন মানুষ যাদের সহায়, তাদের জয় অনিবার্য।

দাদারা কোন্ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন, তার আলোচনা হল। দেশজোড়া প্রকাণ্ড গণ-আন্দোলন সুরু হয়েছে,—সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলন বা কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই,—অহিংসার আদর্শ সামনে না রেখে "এই শয়তানী শাসন ব্যবস্থাকে হয় সংশোধন, না হয় ধ্বংস" করার প্রকাণ্ড আন্দোলন চলতেও পারেনা,—এবং এতবড় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকাও ভবিষ্যৎ বিপ্লব আন্দোলনের পক্ষে সমীচীন হবে না!—সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন,—কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। কিন্তু গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের এক বছরে স্বরাজের আইডিয়াটা সম্বন্ধে আর একটু ভাল করে জানা দরকার।

সুতরাং যাদুদা' অমর বসুকে গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করলেন,—এবং সাক্ষাৎ করে আলোচনা করে এলেন। গান্ধী বললেন, একটা বছর তোমরা আমার কর্মপদ্ধতি নিয়ে আমাকে একটা চান্স দাও। সুতরাং দাদারা কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

আমি তার আগে থেকেই, ১৩২১ সালের গোড়া থেকেই, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলুম। হিংসা-অহিংসার কথা একটা বছর পরে ভেবে দেখা যাবে। সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা বুকে পুষে রেখেও তো হয়ত এখনো বহু বৎসর অহিংসই থাকতে হবে। ইতিমধ্যে একটা বছর সারাদেশে প্রকাণ্ডভাবে সরকার-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলে কি ভবিষ্যতের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতির ক্ষেত্রই প্রশস্ত হবে না?

যুদ্ধের ক'টা বছর বিলাতী কাপড় আমদানীর অসুবিধা হওয়ায় দেশে বস্ত্রাভাব হয়েছিল, দর চার গুণ বেড়েছিল। কিছু জাপানী কাপড় এবং কিছু দেশী মিলের কাপড়ের ব্যবসায় সুযোগ এসেছিল, কিন্তু দর বৃদ্ধির জন্য গরীব লোক কাপড় কিনতে পারতো না—বস্ত্রাভাবে গরীব ঘরের মেয়েরা ঘরের বার হতে পারতো না—বস্ত্রাভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মরার খবরও কাগজে প্রকাশ হচ্ছিল। একটা অর্থনৈতিক জাতীয়তার ভাবও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। বিলিতী কাপড় আবার আমদানী সুরু হয়েছিল।

এই সময়ে বিলিতী কাপড় বয়কট করা, এবং খদ্দর উৎপাদন করে বস্ত্রসমস্যার আংশিক সমাধানের পরিকল্পনা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছিল। যারা নতুন উৎপন্ন মোটা খদ্দর পরতে পারবে না,—তারা যাতে অন্ততঃ মিলের মোটা কাপড়ই পরে, তার জন্যে একদল লোকের খদ্দর পরা প্রয়োজন। সেটা হবে দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য। এই একটা কাজের খাতিরেই তো আন্দোলনে সামিল হওয়া চলে। চিন্তা এই লাইনে চললো।

এদিকে ডেকরেশনের ব্যবসার জন্যে নিলাম থেকে বড় বড় সতরঞ্চি, কার্পেট বড় বড় কয়েক জোড়া করে ফুলদান শামাদান, পরদা প্রভৃতি কেনা হল,—কয়েকটা হাঁড়িবাতি (Punch light) এবং কিছু অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো কেনা হল। বিয়ের প্রসেশনের আলো তৈরীর জন্যে একজন মিস্ত্রীও রাখা হল এবং মোটা দামে একগাড়ী পাইপ কেনা হল। দোকানে থাকে ভাগনী-জামাই এবং একজন ছোকরা। আমি out door কাজ করার অজুহাতে বাইরে বাইরেই থাকি এবং নানা আড্ডায় ঘুরে সমস্ত কাগজ ও ম্যাগাজিনগুলো পড়ি এবং বিকালে কলেজ স্কোয়ারে মিটিং দেখি। সেখানে পদমরাজ জৈন, জে, এল, ব্যানার্জি, হরিদাস হালদার, ললিত ঘোষাল, মৌলবী আহমদ আলী প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন। আহমদ আলী তার মধ্যে "নব্য ইটালী"র ম্যাটসিনীর বক্তৃতা মুখস্থ করে অসহযোগ ব্যাখ্যার নামে চালাতে সুরু করেছিলেন—পরে সেটা কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়েছিল।

হরিদাস হালদার বলতেন, যে সরকারী যন্ত্রটা আমাদের হাতের জোরে চলে, হাত সরিয়ে নিয়ে সেটাকে অচল করে দিতে হবে। কাজটা অতি সহজ,—একটা negetion, inaction মাত্র!

যন্ত্রটা চালাবার লোকের অভাব যে এদেশে হবে না—৩২ কোটি লোকই যে অসহযোগ করবে না,—অচল হওয়াটাই যে শেষ নয়, সেটাকে দখল ও সচল করাই শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত,—এ সব কথা মনে হত না কারো,—মনে হওয়াটা যেন তখন দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। বক্তৃতা শুনতে সকলেরই ভালো লাগতো।

সভার শেষে স্বতঃ-সংগঠিত এক প্রসেশন যেত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বদিকে Forbes mansionএ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিসে—নতুন অফিস। জালালউদ্দীন হাসেমী থাকতো প্রসেশনের সামনে। এক পা কাটা—crutchএ ভর দিয়ে চলা—বেশ একটা show হত। স্লোগান ছিল,—বন্দে মাতরম্, ভারতমাতা কি জয়, হিন্দু মুসলমান কি জয়।

টালা-বরানগর ছিল ২৪ পরগণার অন্তর্গত। ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন ইংরাজী সাপ্তাহিক মুসলমান পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মৌলবী মজিবর রহমান। কড়েয়াতে তাঁর বাড়ীতে ছিল অফিস।

আমরা কংগ্রেস অফিস থেকে নতুন-ছাপানো রসিদ বই এনে মেম্বার করতে সুরু করলুম। টালায় কংগ্রেস কমিটি সংগঠন করলেন পাটু বাবু, তাঁদের বাড়ীতেই অফিস (পরাণ মুখুজ্যের বাড়ী)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দাদা সুশীল বাবু (ভানুদা)—হাটবেড়ের (নড়াল) জমিদার জিতেন রায়ের ছোট ছেলে, পাটু বাবুর বন্ধু ফটু,—আর ছিলেন জাপান প্রত্যাগত "জাপান" লেখক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেশদা)—তাঁর মামার বাড়ী ছিল টালায়। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কিছু মেম্বার করলুম টালাতে।

কিন্তু বরানগরেও তো একটা কংগ্রেস কমিটি করা দরকার। আমি প্রথমে গেলুম বিপিনদা'র চেলা, ভূতপূর্ব আটকবন্দী বিশু সেনের বাড়ীতে। তিনি বয়সে আমাদের চেয়ে বড়,—তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে পড়লুম। তাঁরা বিশেষ আমল দিলেন না। কিন্তু সেখানকার আড্ডা থেকে একটা হদিস সংগ্রহ করলুম। বড়বাজারের লৌহব্যবসায়ী প্রৌঢ়-ভদ্রলোক হরিশঙ্কর দে, এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণধন দেকে গাঁথতে পারলে অনেক লোক আসবে,—কংগ্রেস কমিটী করা যাবে।

কৃষ্ণধনের সঙ্গে দেখা করে অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাঁকে বোঝালুম, রাজী করালুম,—এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হরিশঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেখা করে বললুম, আপনি সভাপতি না হলে তো এখানে কংগ্রেস কমিটাই হয় না,—বরানগরের বদনাম হয়ে যায়।

ভদ্রলোক, যাকে বলে hard not to crack, কিন্তু কয়েকদিন ধস্তাধস্তির পর রাজী হলেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট এবং কৃষ্ণধন বাবু সেক্রেটারী—হল বরানগর কংগ্রেস কমিটী।

আলমবাজারে বিপিনদা'র আর এক চেলা, ভূতপূর্ব আটকবন্দী ছিলেন তুলসী ঘোষ—তাঁর কাছে গেলুম আলমবাজারে কংগ্রেস কমিটী করার জন্যে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর দোসর (জুনিয়ার) লেফ্‌টেন্যাণ্ট ছিলেন ধীরেন চাটুজ্যে (যিনি এযুগে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন)—তিনিও থাকলেন। শরৎ বাবু (বোধ হয় চাটুজ্যে) নামক একজন সন্ত এম-এ পাশ ভদ্রলোককে সেক্রেটারী করে আলমবাজারেও এক কংগ্রেস কমিটী হল।

বরানগরের বিশু সেনের বাড়ীতে শুনলুম, তুলসী ঘোষের বদনাম। বললুম, কংগ্রেস বা অসহযোগ আন্দোলন ও-সব কথার ধার ধারে না,—কংগ্রেসের কাজ ভালই চলবে এবং সেই যথেষ্ট।

বরানগরের খগেন চাটুজ্যেরও (খগেন বাঁড়ুজ্যে বা বাঁটুল বাবু নয়) বদনাম শুনেছিলুম—তিনি ছিলেন গরীব গৃহস্থ, অথচ অন্তরীণ থেকে ফিরে আসার পরে নতুন বাড়ী তৈরী করেছিলেন। Theoryটা হচ্ছে, ওঁর কাছে নাকি কোনো ডাকাতির টাকা ছিল, ধরা পড়ায় সে টাকা আর পাওয়া যায়নি।

এ ধরণের কথা প্রভাস দে সম্বন্ধেও কিছু দিন বাজারে চলেছিল তারপর আপনিই থেমে গেছে।

কিন্তু জার্মাণ ষড়যন্ত্রে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী,—যাঁর কথা আগে লিখেছি,—তিনি যুদ্ধের পর আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বিবেকানন্দ রোডে গিরীশ পার্কের কাছে এক বিরাট পাঁচতলা বাড়ী তৈরী করেছিলেন এবং এতদিন সেখানেই আছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোন মেলামেশা নেই।

যাই হোক, Forbes mansion থেকে একটা চরকা কিনে এনে দিদিকে দিয়েছিলুম,—তিনি বাড়ীতে চরকা কাটতেন। আমি সকালে একটু চরকা কেটে পাড়ায় বেরিয়ে একবার সেক্রেটারী কৃষ্ণধন বাবুর বাড়ীতে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে তাঁকে একটু তাতিয়ে এসে খেয়ে দেয়ে কলকাতায় চলে আসতুম। একবার দোকানে পদধূলি দিয়ে সরে পড়তুম। খদ্দর প্রচারের জন্যে টালা-বরানগরে খদ্দরের ধুতি ও শাড়ী ঘাড়ে করে লোকের বাড়ী পৌঁছে দিতুম। পাটু বাবু তো খদ্দর প্রচারের জন্যে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে এক খদ্দরের দোকানই করে বসলেন।

দোকানে তিনি বসিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলীকে (যিনি এযুগে নারী আশ্রমের সেক্রেটারীরূপে rape case-এ জেল খেটেছেন)—এবং সেই সিদ্ধেশ্বরই শেষপর্যন্ত পাটু বাবুর খদ্দরের দোকান অল্পদিনেই ফাঁক করে দিয়েছিলেন। কিছু অর্থনষ্ট এবং কিছু মনঃকষ্ট হয়েছিল তাঁর নীট লাভ।

বরানগর ও আলমবাজার কংগ্রেসে উৎসাহ সঞ্চারের জন্যে কলকাতা থেকে বক্তা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলুম। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীতে বক্তা খুঁজে কোন বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতাকে পাওয়া গেল না—শেষে নিয়ে গেলুম ভগবতী সোমকে। আমার বয়সী বক্তা দেখে কৃষ্ণধনবাবু হতাশ হলেন—তবু একটা বৈঠক হল। আলমবাজারে ফুটবল গ্রাউণ্ডে বড় মিটিংএর বন্দোবস্ত হল। প্রাদেশিক ভাইস-প্রেসিডেণ্ট আক্রাম খাঁকে সকলের পছন্দ, কারণ Jute mill এর অনেক মুসলমানকে আকৃষ্ট করা যাবে। গেলুম আক্রাম খাঁর কাছে; তিনি ঠেকিয়ে দিলেন এক রোগা লম্বা ছোকরা নেতাকে—বোধ হয় তাঁর জামাই আবদুর রেজাক খাঁ—বর্তমান কমিউনিষ্ট নেতা। বড় নেতা না পেয়ে উৎসাহ জমলো না।

এই রকম চলতে চলতে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে ভারতে এনে সরকার জনগণের রাজভক্তির উদ্রেকের ব্যবস্থা করলেন। বোধ হয় ২০ সালের শেষে এই উদ্দেশ্যে ডিউক অফ কনটকে (রাজার ভাই) আনা হয়েছিল এবং কলকাতায় আগমন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আনুষঙ্গিক কিছু মারামারি, পুলিশের লাঠিবাজী ও ধরপাকড় হয়েছিল। সুতরাং প্রিন্স অফ ওয়েলস যেদিন কলকাতায় আসেন, সেদিন লোক যাতে দেখতেই না যায়, হাওড়া থেকে গভর্ণমেণ্ট হাউস পর্যন্ত রাস্তা যাতে ফাঁকা থাকে, তার জন্যে কলকাতার সমস্ত পার্কে আটটা সভার বন্দোবস্ত হয়েছে, এবং নিখিলভারত নেতারা এসেছেন। ঐ আটটা সভাতেই তাঁরা বক্তৃতা করবেন—মতিলাল নেহেরু, গান্ধী, মহম্মদ আলী, সৌকত আলী, ডাঃ সত্য পাল, কিচলু, সেরওয়ানী প্রভৃতি। পার্কে পার্কে বিরাট জনসমাগম দুপুর থেকেই সুরু হয়েছে—ষ্ট্রাণ্ড রোড ফাঁকা, বয়কট সম্পূর্ণ সফল, বিনা গণ্ডগোলেই।

নেতারা এক এক সভায় বক্তৃতা করেই অন্য সভায় রওনা হচ্ছেন, দেখা, সাতো ব্যালেকাটা পার্কে সভা চলছে। আফিস এবং পার্বা কোলেন

অন্ত পার্কে চলেছি মিটিং দেখতে। রাত আটটা পর্যন্ত এমনি চলে' সব মিটিং শেষ হ'লে আমি ইডেন হসপিট্যাল রোডে এক মেসে মুন্সীগঞ্জের যতীন দত্তের ঘরে গিয়ে আড্ডা মেরে সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছি। তার আগের দিনও বাড়ী যাওয়া ঘটেনি।

সকালে উঠে টালা হয়ে কাশীপুর দিয়ে ষ্টিমারে বাড়ী যাবো,—টালার পোল পার হয়েই দেখা একদল মহিলা গঙ্গাস্নানার্থীর সঙ্গে—টালার গিন্নীবান্নীর দল। আমাকে দেখে এক দিদি জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁয়্যা, তোর দিদির কি হয়েছিল?" বললুম, কিছু হয়নি তো! তিনি বুঝলেন, আমি বাড়ীর খবর রাখি না,—চেপে গেলেন। আমি মনে করলুম, কথার ছিরি দেখ,—যেন দিদি মারা গেছে।

কাশীপুরে র‍্যালী ব্রাদার্সের গুমটিতে গোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—তিনি তখনও সে চাকরী ছেড়ে বেরোতে পারেননি। তিনি বললেন, বাড়ী যান শীগ্‌গির। বুকটার মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। বাড়ী চলে গেলুম। উঠোনে পৌঁছতেই ভাগ্‌নী এসে হাঁউমাউ করে চীৎকার করে পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো—পাশের বাড়ীর গিন্নী "লক্ষ্মীর মা" তাকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। আফ্‌শোষ করে বলতে লাগলেন,—"আহা, মেয়ে-জামাইয়ের কথা কিছু না বলে' শুধু কেঁদেছে,—খোকার সঙ্গে দেখা হল না।" দিদি আমাকে খোকা বলে ডাকতেন।

ছুটলুম রতন বাবুর ঘাটে—শ্মশানঘাটে—এবং দেখলুম দাহ হয়ে গেছে—চিতায় জল দিলুম, এবং বাড়ী ফিরে বেকুবের মতন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লুম।

ঘটনাটা হয়েছে,—আমি যখন যতীন দত্তের মেসে হৈ হৈ করে—সভার বিবরণ দিয়ে মাতব্বরী করছি,—ঠিক সেই সময়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে দিদি আমার জন্যে ধড়ফড় করছেন, আর ভাগ্নীজামাই সারা কলকাতার সব জানা ঠিকানায় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—যতীন দত্তের মেসটা তার জানা ছিল না। ভোরে দিদির মৃত্যু হয়েছে,—স্যালাইন ইন্‌জেকশন দেওয়ার ব্যবস্থার আগেই। অপূর্ব ঘটনাচক্র!

দুদিন বিছানায় পড়ে নিঃশব্দে কাঁদলুম, আর ভাবলুম, কি হবে! চারদিকে যেন একটা শূন্যতা,রিক্ততা, সহায়হীনতার অন্ধকার নেমে এসে সবকিছু ঝাপসা করে দিয়েছে। দিদি যে কি ছিল, কেমন ছিল, সে কথা এখানে বলার অবকাশ নেই—সে একটা বৃহৎ উপন্যাসের কাহিনী হতে পারে। অতি সংক্ষেপে মাত্র দু'একটা কথা এখানে বলবো।

আমি জন্মাবার বছর খানেক আগে দিদির একটা ছেলে হয়ে অল্পদিন বাদেই মারা গিয়েছিল। সুতরাং আমি জন্মের পর সমানে মা ও দিদির মাই খেয়েছি, এবং শেষ পর্যন্ত দিদিই আমাকে ছেলের মতন করে মানুষ করেছিলেন। মার কাছে তাড়া খেলে দিদির কাছে পালাতুম, কিন্তু দিদির কাছে তাড়া, এমন কি মার খেলেও মা'র কাছে কখনো পালাইনি। তারপর মা মারা গেছেন, আমার বয়স যখন আট বছর। তার পর থেকে মানুষ হয়েছি দিদির হাতেই। ভগিনীপতি নেশাখোর হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

আমার বারো বছর বয়সে বাবা মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাড়ীর অর্ধাংশ দিদির নামে লেখাপড়া করে দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিই তাঁকে নিবৃত্ত করেন এই বলে যে, আপনি যদি এই ভাবে খোকার সঙ্গে আমার একটা "দেইজি" সম্পর্ক করে দিয়ে যান, তাহলে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধবেই, আজ সে-বিরোধের কোন সম্ভাবনাই নেই। এই ছিলেন আমার দিদি!

যাই হোক, দুদিন পড়ে থেকে উঠলুম, চাঙ্গা হলুম, এবং সংসার ও ব্যবসার দিকে একটু মনোযোগ দিতে মনস্থ করলুম। ব্যবসার একটা সুযোগও এসে গেল।

টালার খালধারে কাঁড়ির পাশে গুড়ের আড়তে একটা বড় বারোয়ারী হত, সেখানে অনেকদিন ধরে যাত্রা পুতুলনাচ প্রভৃতি হত। সেই বারোয়ারীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ম্যারাপ প্রভৃতির কনট্রাক্ট নিয়ে ফেললুম। একটা রীতিমত খাটুনীর প্রয়োজন এবং কেরামতি দেখাবার scope সামনে পেয়ে মেতে উঠলুম। ১০ গাড়ী বাঁশ, ১৬০০ হোগলা, ৩ গাড়ী শালের খুঁটি, তিনটে বড় খুঁটি ৪০ ফুট করে, এইসব কিনে ফেললুম ম্যারাপের জন্যে। সরু খেলো থান একগাদা কিনে লাল, নীল, হলদে রঙে ছুপিয়ে ফেসটুন হল, বড় চওড়া থান একগাদা কিনে তৈরী হল বড় বড় চাদর এবং ফুলকাটা রঙীন Ceilingএর কাপড়! যাত্রার আসরের খুঁটিতে খুঁটিতে পরদার ওপর জোড়া জোড়া ন্যাশান্যাল ফ্ল্যাগ এবং জাতীয় নেতাদের ত্রিবর্ণ ছবি—গ্রীন বোর্ড Oval করে কেটে আমেরিকান সাদা নক্সাদার ফ্রেমে বাঁধানো। সকলে দেখে খুসী হল, আমার স্বদেশিতার সখও একটু মিটলো। সব মিলে কাজটা প্রকাণ্ড, এবং বেশ সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্নও হল। টাকা পেতেও বেগ পেতে হল না!

এই কাজের মারফৎ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল, তাও সামান্য নয়। চারটে বিদঘুটে শ্রেণীর লোক নিয়ে কাজ—মুটে, গাড়োয়ান, ঘরামী আর মিস্ত্রী—প্রায় একটা যুদ্ধ ম্যানেজ করা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলুম।

ঝকমারির একটা উদাহরণ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ধরুণ আমার মিস্ত্রীর কথা। সে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে টাকা নেয়, এবং মদ খেয়ে এক খোলার বস্তীতে পড়ে থাকে, তাকে খুঁজে ধরে আনতে হয়। একদিন টাকা পেয়ে মদ খেয়ে ফুটপাথের ওপর আড়াআড়ি রাস্তা বন্ধ করে শুলো,—কিছুতেই উঠবে না। চ্যাংদোলা করে তুলে তাকে দোকানের ভেতরে এক তক্তপোষের ওপরে বড় একখানা সতরঞ্চি ভাঁজ করে শুইয়ে দেওয়া হল। সকালে দেখা গেল, প্রস্রাব করে সতরঞ্চি ভাসিয়ে রেখে দিয়েছে।

ভয়ে কিছু বললুম না। অনেক বেলায় উঠে ছোকরাটাকে সঙ্গে নিয়ে কলতলায় সতরঞ্চিখানাকে কাচার নামে ভিজিয়ে নিয়ে ছাতের ওপর ফেললে। সন্ধ্যার পর তাকে মিষ্টি কথায় কিছু সদুপদেশ দিলুম। চুপ করে খানিক শুনে, তারপর চটে গেল—বললে, কি আপনি উপদেশ দিচ্ছেন মশাই? এই করে আমার এতকাল কাটলো, বুড়ো হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে কাঠহাসি হেসে রণে ভঙ্গ দিলুম। ভাল মিস্ত্রী, চটালে চলবে না। বিয়ের প্রসেশানের আলো তৈরী হতে লাগলো।

এদিকে এসে গেল বরিশাল কন্‌ফারেন্স। চললুম বরিশালে, বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে পাটুবাবু এবং ফটুবাবুর সঙ্গে দেখা হল। বন্ধুর ভারি ফূর্তি—এত বাঙ্গাল একসঙ্গে কখনো দেখেনি।

গান্ধীজি তখন মহাত্মা হয়েছেন, এবং আমার মুখে গজিয়েছে এক প্রকাণ্ড চাপ দাড়ি, plain living এর রূপায়ণ। high thinking এরও বটে।

কন্‌ফারেন্সের নির্বাচিত সভাপতি বিপিন পাল। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন এবং আন্দোলন থেকে স্বভাবতই দূরে সরে যাচ্ছিলেন। প্রতিনিধি ও দর্শকে বিরাট প্যাণ্ডাল পরিপূর্ণ,—বাইরেও বিশাল জনতা। সি আর দাশ, অখিল দত্ত প্রভৃতি নেতারাও উপস্থিত। সভাপতির ভাষণ সুরু হল। যেমন দরাজ কণ্ঠস্বর, তেমনি অকুণ্ঠ ওজস্বিনী ভাষা। বক্তৃতার মধ্যে তিনি যেই বলেছেন মিষ্টার গান্ধী, অমনি চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠলো মহাত্মা বলুন।

গোলমাল থামলে তিনি আবার সুরু করলেন, আরো দৃঢ়কণ্ঠে বললেন মিঃ গান্ধী। আবার আওয়াজ উঠলো মহাত্মা বলতে হবে। গোলমাল বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটু থামলে বিপিন বাবু বজ্র নির্ঘোষে বললেন, বলবো না—বলে তিনি সভাপতির আসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। প্যাণ্ডালের মধ্যে এবং বাইরে উদ্দাম ধ্বনি চলতে লাগলো মহাত্মা গান্ধী কি জয়। কন্‌ফারেন্স প্রায় ভেঙ্গে যায়।

তখন বরিশালের জনপ্রিয় জুনিয়ার নেতা শ্রীশরৎ ঘোষ (যিনি পরবর্তীকালে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ হয়েছিলেন) উঠে মহাত্মার স্তুতি করে বক্তৃতা সুরু করলেন, এবং দু ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করলেন, থিওজফি ও নন কো-অপারেশনের অপূর্ব মিশ্রণ। স্বরাজ পাওয়ার অর্থ, তাঁর মতে, নিজেকে মায়াময় বহির্বিষয় থেকে সরিয়ে এনে সংহত করে আত্মস্থ হওয়া, স্বরাট হওয়া। মহাত্মা গান্ধীকি জয় রবে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সভা ভঙ্গ হল। আবার যখন সভা বসলো তখন সভাপতিত্ব করলেন শ্রীঅখিল দত্ত। তিন মাসের জন্যে আদালত বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রমে যোগ দিতে উকীলদের আহ্বান করে প্রধান প্রস্তাব পাশ হ'ল।

সাবজেক্টস কমিটীর সভার পর সি আর দাশ ও অখিল দত্ত কথা কইছেন, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শুনলুম। অখিল দত্ত বলছেন, তিন মাস আদালত ছাড়লে কীই বা হবে। দাশ মহাশয় বললেন,—একবার সবাই আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, তারপর তিন মাসে আমরা এমন অবস্থা করে তুলবো যে, কেউ আর ফিরে যেতেই পারবে না।

কার্যতও হয়েছিল কতকটা ঐ রকমই—অনেকে আদালত ছেড়েছিলেন, এবং তিন মাস পরে অনেকেই আর ফিরে যাননি। অবশ্য একথাটা মনে রাখা দরকার,—উকীল ননকোঅপারেটরদের অধিকাংশই ছিলেন উপার্জনহীন বুভুক্ষু শ্রেণীর,—এবং তাঁদের অধিকাংশকেই মাসিক ১০০ টাকা পর্যন্ত অ্যালাউয়েন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন দাশ মহাশয়।

তিনি যখন প্রথমে ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করায় ঘোষণা করলেন, এবং ডুমরাঁও রাজার মামলা ত্যাগ করে তাদের অগ্রিম দেওয়া ৪০,০০০ টাকা ফেরৎ দিলেন, তখন [illegible]

বিস্ময়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। এমন একটা ভাবাবেগের সৃষ্টি হল যে, অসংখ্য লোক আদালত ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো—কলেজ বয়কট মোটামুটি সফল হল, অসহযোগ আন্দোলনের কাজ হু হু করে সাফল্যের পথে এগিয়ে চললো। অনেকের বিশ্বাস, সি আর দাশ ব্যারিষ্টারী না ছাড়লে বাংলা দেশে গান্ধীর আন্দোলন সফল হত না। বস্তুত আমরাও আরো আকৃষ্ট হলুম সত্যিকারের দেশপ্রেম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার বাস্তব উদাহরণ দেখে।

বরিশাল থেকে ফেরার পরই এলো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বেজোয়াদা প্রোগ্রাম—মে এবং জুন এই দু' মাসের মধ্যে সারা দেশে এক কোটি কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করতে হবে, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা তুলতে হবে, এবং ২০ লাখ চরকা চালু করতে হবে। এই প্রোগ্রাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে এক স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট কর্মোন্মাদনার বন্যা বয়ে গেল। সব কাজ ছেড়ে দিনরাত ভূতের মত খাটতে লাগলুম—প্রোগ্রাম সফল হল।

বুঝলুম ব্যবসা এবং সংসারের মায়া কাটাতে হবে। ব্যবসাটা ঠিক যখন দাঁড়িয়ে গেছে,—তখনই আবার সেটা তুলে দিলুম মালপত্র বাড়ীতে নিয়ে গেলুম। বাড়ী থেকে ভাগনীজামাই যেটুকু পারে তাই চলতে লাগলো। ভাবতে লাগলুম,—যদি বাড়ী ছেড়ে বেরোতে হয়, তাহলে অপোগণ্ডগুলোকে দেখবে কে?

গোপাল বাবু তখন বোস ইনষ্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন, এবং ফ্যামিলি আনার জন্যে ঘর খুঁজছেন। আমি বললুম, আমাদের বাড়ীতে একটা ঘরে থাকতে পারেন তো ভাড়াটা লাগবে না। তিনি বললেন বরানগর থেকে অফিসে যাতায়াত বড় অসুবিধা, একখানা সাইকেল থাকলে চলতে পারে। তদনুসারে ১১০ টাকা দিয়ে একখানা সাইকেল কেনা হল, আমি টাকা দিলুম, পরে গোপাল বাবু সেটা শোধ করলেন। মোটের উপর গোপাল বাবুকে বাড়ীতে বসিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হলুম, অন্তত একটা আক্কেলওয়ালা লোকতো বাড়ীতে থাকলো।

একটা কথা এখানে বলে রাখতে চাই। খবরের কাগজে নেতাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ হওয়া মাত্র দেশসুদ্ধ লোক যে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সে সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, এমন কর্মোন্মাদনা আমরা যারা ২১ সালে দেখেছি, আজকের চীনের কর্মোন্মাদনা তাদের কাছে একটুও অসম্ভব বা দুর্বোধ্য নয়। যারা ২১ সাল দেখেনি, তারা হয়ত আজকের চীনের কর্মোন্মাদনা বুঝতে পারে না। তারাই চীনের শত্রুদের এই অপপ্রচার বিভ্রান্ত হয় যে, লোকগুলোকে জোর করে খাটানো হচ্ছে।

জুনের পরেই এল বি পি সি সির ইলেকশন। সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট প্রথম প্রবর্তিত হল। অন্যান্য প্রধান কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে আমিও নির্বাচিত হলুম।

প্রথম বি, পি, সি সি-র মিটিং হল Forbes mansionএ। সেখানে দাশ মহাশয় ঘোষণা করলেন সুভাষ বসু আই-সি-এস পাশ করে সরকারী চাকরী না নিয়ে দেশে ফিরছেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে। তাঁকে বি, পি, সি, সিতে নেওয়া দরকার,—সুতরাং একটা সীট খালি করার জন্যে একজন সভ্যের পদত্যাগ প্রয়োজন। শোনামাত্র কয়েকজন উঠে দাঁড়ালো,—আমিও—কিন্তু [illegible]

২৪ পরগণা কংগ্রেস কমিটিতে কয়েকজন মাতব্বর ছিলেন,—প্রফুল্ল ব্যানার্জি (পরবর্তীকালে জেলাবোর্ডের ভাইস), ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত (বেঙ্গল কেমিক্যাল-খাদি প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি, যাঁদের কাজ ছিল জেলা কমিটির সভার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, বক্তৃতাবর্ষণ, সংশোধনী প্রস্তাব প্রভৃতি। জেলা কংগ্রেস কমিটি বলা হবে, না জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি বলা হবে, তাই নিয়েই তিন ঘণ্টা লড়াই।

কাজে কোন সুখ পেতুম না। বেজওয়াদা প্রোগ্রামে কংগ্রেসের আসল কাজ হয়ে গেছে। তার জের চলছিল সভা-সমিতিতে অসহযোগের ব্যাখ্যা প্রভৃতি। কলেজ স্কোয়ার ছিল ৩০ দিনই সরগরম। অনেক নতুন বক্তা গজিয়েছিল। বক্তৃতার পর কয়েকটা ছোট ছোট গ্রুপ তর্কবিতর্ক করতো এবং একখানা বেঞ্চিতে কয়েকজন বারোমেসে সিনিয়র বসে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতো। ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীর অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট লাইব্রেরীয়ান, নাম উপেন বাবু,—চন্দননগরে বাড়ী, হৃষ্টপুষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, ছোট করে চুল ছাঁটা,—তিনি নরম ভাবে প্রতিবাদ করে আন্দোলন সমর্থন করতেন।

আমি থাকতুম বিতর্কের একটা গ্রুপের মধ্যে। বন্ধুও ড্যালহাউসী থেকে এসে জুটতো মাঝে মাঝে। একদিন এক ভদ্রলোক খুব ইংরিজী ঝেড়ে তর্ক করছেন। বন্ধু ইংরিজী জানে না মনে মনে চটে গেছে। এমন সময় তাকে লক্ষ্য করেই সাক্ষী মানার ঢংএ ভদ্রলোক কিছু ইংরেজী বলেছেন। বন্ধু কটমট করে তাকিয়ে বললে,—তা অত ইংরিজী বলছেন কেন? আগে বাংলায় বলুন,—না বুঝতে পারি, তখন ইংরিজীতে বলবেন। বিরুদ্ধপক্ষ হো-হো করে হেসে উঠে ভদ্রলোককে তর্কে হারিয়ে দিলে।

স্বরাজের ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচনা চলতো সর্বত্রই। শ্রীনগেন গুহ রায় (নোয়াখালী) এক বই লিখেছিলেন "স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী"—তাতে কতকগুলো প্রশ্ন ও নেতাদের জবাব ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয়শ্রেণীর নেতাদের জবাব। একটা প্রশ্ন ছিল "আপনি কি বিশ্বাস করেন, আন্দোলনের সাফল্য হিসেবে এক বছরে স্বরাজ হবে?"—জবাবে প্রায় সকলেই বলেছিলেন "হ্যাঁ"। বোধ হয় কিরণশঙ্কর রায় এবং আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন "না"।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রচারের সহায় ছিল প্রধান শ্লোগান "হিন্দু-মুসলমান কি জয়"। মাঝে মাঝে কোন হিন্দু নেতার সঙ্গে মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিতেন, বেদ আর কোরাণ একই কথা বলেছে। হিন্দু আর মুসলমান ভারতমাতার দুটি চক্ষুর মত। ইত্যাদি—

আন্দোলনের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা শুনে জ্ঞানার্জন করি, সুখ পাই না। ঠেসে পড়াশুনা করি। বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-খণ্ডগুলো ভালো করে পড়লুম, এবং আনন্দ পেলুম। সবচেয়ে আনন্দ পেলুম ধর্মতত্ত্ব পড়ে। ছোটবেলায় পড়েছিলুম এগুলো বাদ দিয়ে শুধু উপন্যাসগুলো।

একখানা বই পেলুম "যোগসাধন"। বড় ভাল লাগলো। রহস্যময় মিষ্টিক-ভাববাদী কথা একেবারে নেই,—যোগ কর্মের কৌশল, এটাই প্রতিপাদ্য। যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রথম অঙ্গ যম হচ্ছে—অহিংসা সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য) ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (বিলাস বর্জন)। ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'শ্রবণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং, সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেবচ—এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ, বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।' হিংসা তিন প্রকার—কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত। দোষ তিনটাতেই সমান।

একখানা এক্সারসাইজ বুকে এক রুটিন লিখলুম,—যম সাধনের প্রাত্যহিক রেকর্ড—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, এই পাঁচ খাতের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাণ রোজ লিখে রাখতুম।

দাদারা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, অস্ত্র-শস্ত্র শিকেয় তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। জীবন কিছু মাল রেখেছিল এক স্কুলে, হেডমাষ্টার সুধী বাবু আমাদের লোক। শ্যামবাজারে দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের মোড় যেখানে, ঐখানে তখন ছিল "গাঁজার গলি।" তার মধ্যে একটা হাফবস্তিতে ছিল ঐ স্কুল। মালের মধ্যে একটা রাইফেলও ছিল—বাঁট আর ব্যারেল খুলে পৃথক ক'রে খাটো করা ছিল। সেগুলো চন্দননগরে সরাতে হবে। জীবনের ব্যবস্থায় রোহিণী মুখুজ্যে আর আমি সেগুলো নিয়ে গেলুম চন্দননগরে খোড়াপুকুরের পাশে কুণ্ডু বাবুদের বাড়ীর পিছনে বলাই কর্মকারের বাড়ী। তিনি ছিলেন টাঙ্গার পঞ্চাননের মাতুল, আর পঞ্চাননই রাইফেলটাকে খুলে দু টুকরো ক'রে দিয়েছিল।

রোহিণী মুখুজ্যের বাড়ী জীবনদের গ্রামে, বিক্রমপুরে পঞ্চসার গ্রামে। সেও আমাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হয়েছিল। ফিরে এসে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাবিত্রী এজেন্সী নামে এক ষ্টেশনারী দোকান করেছিল, যে দোকান ২৪ সালের কাণপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের তরফের এক পোষ্ট-অফিস বলে' বর্ণিত হয়েছিল। আসামীদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে জীবনের নামও ছিল। ২৪ সালে জীবন ছিল দ্বিতীয়বার জেলে, ষ্টেট প্রিজনার।

যাই হোক, ২১ সালের মাঝামাঝি জীবন দৌলতপুরে (খুলনা) কিরণদা' (কিরণ মুখার্জি) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যাশ্রমে যাতায়াত করতো। তার সঙ্গে আমিও একবার সত্যাশ্রমে ঘুরে এলুম। তখন শচীন ঘোষ (পরে অমৃতবাজার পত্রিকার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এডিটর) সবেমাত্র ম্যাট্রিক পাশ করেছে—সত্যাশ্রমে যাতায়াত সুরু করেছে—দৌলতপুর কলেজের ছাত্র।

ইতিমধ্যে বরিশাল শঙ্করমঠের বন্দোবস্তে বরিশাল থেকে কলকাতায় প্রেস আনা হয়েছে জাতীয় সাহিত্য প্রচারের জন্য এবং সরস্বতী লাইব্রেরীও স্থাপিত হয়েছে মনোরঞ্জনদা-অরুণ গুহের পরিচালনায়। শঙ্করমঠ ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (ভূতপূর্ব স্কুলমাষ্টার সতীশ মুখুজ্যে) ছিলেন নেতা। নিশি গাঙ্গুলী সেখানেই থাকতেন (এখন কলকাতায় হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস করেন) আর মনোরঞ্জন-দা (গুপ্ত বর্তমান এম এল সি) এবং অরুণ গুহ যাতায়াত করতেন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের কি একটা বই পড়েছিলুম, মনে নেই, শুধু একটা কথার একটা টুকরো মনে আছে—"ধর্মপুরঃসর হত্যা করিবে"—একটা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা। আমরা যে "অভিশাপ"

নাটক অভিনয় করেছিলুম, তার শেষ দৃশ্যে ব্যাসদেব (সত্যবাবু) কৃষ্ণ (করাসী) এবং অর্জুনের (পুলিন) সম্বন্ধে শিষ্যের কাছে ধর্মযুদ্ধের ব্যাখ্যা করেছিলেন—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বইটাও সেই ধর্মযুদ্ধের ব্যাখ্যা। আমাদের চোখে অহিংসার বিপ্লববিরোধী ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট।

বরিশাল থেকে প্রেসটা এসেছিল ষ্টীমারে আর্মানীঘাটে এবং সেখান থেকে এক গরুর গাড়ীতে এল বেনেটোলা লেনের বাড়ীতে। বাড়ীর উঠোনে প্রেসটা নামাবার জন্যে মুটে ডাকা হল, তারা হাঁকলে ৬ টাকার কমে হবে না। তখন ছ'টাকা একটা বৃহৎ ব্যাপার। আমি উপস্থিত ছিলুম—মনোরঞ্জনদা'কে বললুম, আমরা মুটেদের চেয়ে গায়ের জোরে খাটো, কিন্তু বুদ্ধিতে বড়,—আমরাই নামাতে পারবো,—যদি আপনিও হাত লাগান। তিনি বললেন, রাজী। আমি বললুম দুটো টাকা খরচ করতে হবে, রসগোল্লার। তিনি বললেন, রাজী। আর কে কে ছিল মনে নেই—প্রেসের সঙ্গে এসেছিল রোগা লিকলিকে মহেন্দ্র দত্ত—তিনিও হাত লাগালেন। একটা বড় পিসই বেশী ভারী—প্রেস নামিয়ে ফেললুম উঠোনে। তারপর হল দু' টাকার রসগোল্লা খাওয়া।

হ্যারিসন রোডের কাছে রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটের মোড়ে সরস্বতী লাইব্রেরী হল। কিরণদাকে এনে চার্জে বসানো হল। দু'জন তরুণকে সর্বক্ষণের জন্যে রাখা হল, লাইব্রেরীতে বই বিক্রীর জন্যে। তারই মধ্যে একজন ছিল গোপী শা—ডে সাহেবকে টেগার্ট ভ্রমে হত্যা করে যার ফাঁসী হয়েছিল।

এই সময়ে মুন্সীগঞ্জ (বিক্রমপুর) থেকে জীবন প্রভৃতির ডাক এল, ন্যাশান্যাল স্কুলের ভার নেওয়ার জন্যে। প্রাথমিক সংগঠন করেছিলেন বৃদ্ধ "মাষ্টার মহাশয়" শ্রীশচীন ঘোষ, বাহেরকের জিতেন কুশারী প্রভৃতি। প্রথমে হাই স্কুল খালি হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার হাইস্কুলও চালু হল। ন্যাশান্যাল স্কুলে আড়াইশো ছাত্র, আর হাইস্কুলে ২০০র মতন। কালীবাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড টিনের চালাঘরে ঝাঁপ বেঁধে বেঁধে ক্লাশের ঘর প্রভৃতি ভাগ করা হয়েছিল।

যতীন দত্ত হ্যারিসন রোডে graduates' union নামক sporting goods-এর দোকান করেছিলেন, পাটনার ছিলেন রোহিণী নন্দী—উভয়েই পঞ্চসারের লোক। রোহিণী বাবুর হাতে দোকান ছেড়ে যতীন দত্ত মুন্সীগঞ্জে গিয়ে ন্যাশান্যাল স্কুলের হেডমাষ্টার হলেন। জীবনও টিচার হয়ে গেল। কামারখাড়ার পরেশ সেন মুন্সীগঞ্জের সরকারী উকীল উমাচরণ সেনের জামাতা—তিনি চট্টগ্রাম কালেকটরেটে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন—এখন চাকরী ছেড়ে ন্যাশান্যাল স্কুলে যোগ দিলেন। এমনি আরো অনেকে এসেছিলেন,—সে কথা পরে বলা যাবে।

জীবনকে এখানকার কাজের অবস্থার কথা বলেছিলুম। মুন্সীগঞ্জে যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল, আমাদের ওখানে কর্মীর প্রয়োজন হলে তোমায় লিখবো,—লিখলেই তুমি চলে এসো। তাই স্থির হলো।

গোপাল বাবু আমাদের বরানগরের বাড়ীতে বৌমাকে এনেছেন,—বড় ছেলে পটলও (সুধীর ?) এসেছে। তার তখন এতটা বয়স হয়েছে যে, সে ছড়া বলতে শিখেছে—"শীত কললে দাদাবাই কাথা কিন্না দে,—কাথাল মইদ্দে বউ হইব, বউ কিন্না দে।"

[ক্রমশঃ।

বৃন্দাবন

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বৃন্দাবনের শূন্য দেউলে মিলিল না তব দেখা,
ব্রজের ধূলায় আছে বটে সখা, তব পদরেণু মাখা ;
শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন,
বেদনা মূর্চ্ছিত আজ নাহি তার প্রাণের স্পন্দন।
গোধনশূন্য গোচারণভূমি বিরহ বেদনে কাঁদে,
ব্রজবালা আর ছোটে না সেথায় সাজিয়া বিবিধ ছাঁদে,
রাখালরাজারে নাহি দেখা যায়, ময়ূরপুচ্ছ মাথে,
হাস্য লাস্য লয়েছে বিদায় ব্রজের কানুর সাথে,
যমুনা-পুলিনে বাঁশরী বাজায়ে কেহ ডাকে না ক' অভিসারে,
নীপতরুতলে মিলনের মেলা ফুরায়েছে, চিরতরে ;
কোথায় গোপিকা কোথায় রাধিকা তোমার পরাণ প্রিয়া ?
কত মধুমাস আসে আর যায় আকুল করিয়া হিয়া,
নাই শ্যামচাঁদ, নাই সে রাধিকা, নাহিক যশোদা মাতা,
শূন্য দেউলে বিরহবেদনে পথিক লুটায় মাথা,
কোথায় কৃষ্ণ কোথা রাধানাথ কোথায় লুকালে তুমি ?

লীগ আসরে ছন্দপতন

কলকাতা ময়দানে সিনিয়র ডিভিসন ফুটবল লীগের পালা প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর কয়েকটি মাত্র খেলা সাঙ্গ হলেই লীগ মরশুমের ওপর যবনিকাপাত ঘটবে আর সেই সঙ্গে বহুজনের জল্পনা-কল্পনা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বেরও অবসান হবে। এবার কিন্তু লীগ খেলার আসর কোন সময়েই জমে উঠলো না। নিতান্ত উদ্দীপনাহীন অবস্থার মধ্যেই এবারের লীগ মরশুম শেষ হলো। বিভিন্ন দলের উত্থান-পতনকে কেন্দ্র করে অনুরাগী ও সমর্থকদের মধ্যে যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের বন্যা বয়ে থাকে, এবার তার কতকটা ব্যতিক্রম হয়েছে বলা যায়। অবিশ্যি এ ব্যতিক্রমের কারণও আছে। এবারের লীগ খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলই লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকর্ষণ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছে।

অনিশ্চয়তা ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য বলে জানা ছিল। এ উক্তিটি যে ফুটবল খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা চলতি মরশুমের কয়েকটি খেলা দেখে এ প্রতীতি জন্মেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা খেলোয়াড় নিয়ে কলকাতার কয়েকটি প্রখ্যাতনামা দল তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। মুখ্যতঃ এই সব খেলোয়াড়দের কৃতিত্বে ও নৈপুণ্যে সংশ্লিষ্ট দলগুলি গৌরব অর্জ্জন করে থাকে। কিন্তু এহেন শক্তিশালী ও খ্যাতনামা দল যদি স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত অল্পখ্যাত অথবা অখ্যাত দলের বিরুদ্ধে পয়েন্ট বিসর্জ্জন করে অথবা পরাজিত হয়, তাহলে সমর্থক ও দরদীরা যে উষ্মা প্রকাশ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এবার সত্যিই তাই হয়েছে।

লীগ তালিকার ওপর তলায় যে কয়টি খ্যাতনামা দল আছে তাদের কথা বলতে হয়। এর মধ্যে একটা দলকেও জয়লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নিশ্চিত আস্থা ও জয়লাভে অটুট মনোবল নিয়ে খেলতে দেখা যায় নি। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দলের বিরুদ্ধে যে ভাবে কষ্ট করে এরা পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তাতে অতি বড় গোঁড়া সমর্থক নিরাশ হয়েছেন। আবার যখন এই সব খ্যাতনামা দল দুর্ব্বল দলের বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করেছে অথবা পরাজয় স্বীকার করেছে তখনই সমর্থক ও দরদীদের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ ঘটিয়েছে। মনখারাপ খেলোয়াড়দের উত্তেজিত (সময় সময় মারমুখী) দর্শকদের সামনে পড়তে হয়েছে। ক্লাবের কর্ম্মকর্তাদের জবাবদিহি হতে হয়েছে! কোন কোন ক্ষেত্রে নিগৃহীত করার ছোটখাটো ঘটনাও হয়েছে।

অবিশ্যি কলকাতা ময়দানের এ হোল-নিয়মিত ঘটনা। এধরণের ঘটনা-দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কলকাতা ময়দানে ফুটবল মরশুম মেতে ওঠে। এ সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে একটি প্রশ্ন নিরপেক্ষ এবং সত্যিকারের ক্রীড়ামোদীকে ভাবিয়ে তুলেছে। ফুটবলের মান কোথায়?

ক্রীড়ামহল ও সংশ্লিষ্ট অনুরাগীমহলে সর্ব্বত্রই একই প্রশ্ন। ফুটবল খেলায় বাংলা দেশের ক্রীড়ামান উন্নত না হয়ে ক্রমশঃ নিম্নগামী হচ্ছে এটা সর্ব্বজনস্বীকৃত। এ নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু উপায় নির্দ্ধারণ করা হয় নি। বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ভাগ্যনিয়ন্তা হোল ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন বা আই, এফ, এ। ফুটবলের মান উন্নত করার এবং খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের জন্ত উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব মুখ্যতঃ এই সংস্থার ওপর। কিন্তু ফুটবল খেলা পরিচালনায় প্রশাসনিক কাজটুকু করেই এরা ক্ষান্ত। এর বাইরে এদের সুষ্ঠু পরিকল্পনার কোন পরিচয় আজ অবধি পাওয়া যায়নি। হয়ত এরা একাজে সরকারী উদ্যমের অপেক্ষায় বসে আছে। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে মস্ত ভুল করা হবে।

লীগবিজয়ের পথে মোহনবাগান

এ বৎসরের লীগ খেলার সুরু থেকেই জনপ্রিয় দল মোহনবাগান জয়লাভের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে লীগ অভিযানে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। সমর্থককুল দৃঢ় আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যে মোহনবাগান অপরাজিত আখ্যা নিয়েই লীগবিজয় করবে। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দল সে আশায় বাদ সাধলো। লীগের ফিরতি খেলায় তারা মোহনবাগানকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে অপরাজিতের গৌরব ম্লান করে দেয়। কারণ তখন পর্য্যন্ত মোহনবাগানই ছিল লীগ তালিকায় একমাত্র অপরাজিত দল। লীগের পালা শেষ করতে মোহনবাগানের যখন আর ছটা খেলা বাকী তখন এই বিপর্য্যয় তাদের সামনে এসে হাজির হয়। এই বিপর্য্যয় মোহনবাগানের গতির পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও তাদের লীগ জয়যাত্রায় যতির চিহ্ন টানতে পারবে না বলেই মনে হয়। কেননা বর্ত্তমান পর্য্যায়ে মোহনবাগান তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে লীগ তালিকায় যে অবস্থানে রয়েছে তাতে নিতান্ত অস্বাভাবিক ধরণের কোন অঘটন না ঘটলে তারা যে শেষ পর্য্যন্ত লীগবিজয়ী হবে, তা একরকম নিশ্চয় করেই বলা যায়। লীগ পাল্লার দৌড়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দল, খ্যাতনামা মহমেডান স্পোর্টিং এবং গতবারের লীগবিজয়ী ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সুতরাং বাকী পথটুকু বিপর্য্যয় এড়িয়ে পার হলেই মোহনবাগানের লীগ জয়যাত্রা সফল হবে, সার্থক হবে। দরদী ও অনুরাগী দলও তাই গভীর আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে অপেক্ষা করছে সেই চরম ক্ষণটির জন্ত, এদের আশা নিশ্চয়ই নিরর্থক হবে না।

ইংলণ্ড দলের "রাবার" লাভ

বর্ত্তমানে ইংলণ্ড সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দল উপর্য্যুপরি তিনটি টেষ্ট খেলাতেই পরাজিত হওয়ায় ইংলণ্ড দল রাবার

লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। এখনও দুটো টেষ্ট খেলা বাকী রয়েছে। "রাবার" প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ায় অবশিষ্ট দুটো টেষ্ট খেলারও আকর্ষণ অনেকটা কমে গিয়েছে। অধিকাংশ তরুণ এবং উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ভারতীয় দল অল্পক্ষেত্রেই নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে। শক্তিশালী ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল মোটেই সুবিধা করতে পারেনি এবং শোচনীয় ভাবেই তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতীয় দলের অসাফল্য উপলক্ষ্য করে ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অতি রূঢ় এবং নির্ম্মমভাবে সমালোচনা করেছে।

কোন কোন সংবাদপত্র আবার বেশ চড়া সুরেই সমালোচনা করেছে যে ভারতের সঙ্গে টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের সময়ের অপচয় হয়েছে। শুধু ভারতই না, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের টেষ্ট খেলার যোগ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ড এখনও টেষ্ট খেলায় যোগ্যতার অধিকারী হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এদের সংগে খেলায় ইংলণ্ড নিজেই জয়লাভ করে বলে এদের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলার সময় পাঁচদিনের বদলে তিনদিন স্থির করার জন্য আবদার জানানো হয়েছে। মনে হয় ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকাগুলো অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভুলে গেছে। গত বৎসরের শীতকালে পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড দল চারটিতেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে আসে।

সেদিন অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলার মেয়াদ কমিয়ে আনার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমান ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দল ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কয়েকজন খেলোয়াড় আহত ও অসুস্থ থাকায় তাদের বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ভারতীয় দলের তরুণ খেলোয়াড়গণ মনোবল হারাননি।

আজকের এই পরাজয়ের মাঝ থেকেই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরবেন তা যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগালে আগামী দিনের খেলোয়াড়রা তৈরী হবার প্রয়াস পাবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পদ ভারতীয় ক্রিকেটের কল্যাণে নিয়োজিত হোক এই কামনা করি।

ভারত-ইংলণ্ড টেষ্ট খেলার ফলাফল

প্রথম টেষ্ট—নটিংহাম

ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫১ রাণে জয়লাভ করে। পাঁচদিনের খেলা চতুর্থ দিনেই মীমাংসা হয়। ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে এই খেলায় ১০৬ রাণ করেন। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৪২২ রাণ করে। প্রত্যুত্তরে ভারত প্রথম ইনিংসে ২০৬ রাণ এবং ফলো অনে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৭ রাণ করে।

দ্বিতীয় টেষ্ট—লর্ডস

ভারতের অধিনায়ক দাত্তাজীরাও গায়কোয়াড় অসুস্থতার জন্য দ্বিতীয় টেষ্টে খেলেননি। তাঁর পরিবর্ত্তে সহ-অধিনায়ক পঙ্কজ রায় দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতের নেতৃত্ব করেন। চাঁদু বোড়ে ও নাদকার্নি করে ১৬৮ রাণে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ২২৬ রাণ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৬৫ রাণে সকলে আউট হয়। ইংলণ্ড জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রাণ করলে তৃতীয় দিনে খেলার মীমাংসা হয়। বিপর্য্যয় রোধে মঞ্জরেকার (৬১ রাণ) ও কৃপাল সিং (৪১ রাণ) প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড'৮ উইকেটে জয়ী হয়।

তৃতীয় টেষ্ট—লীডস

তৃতীয় টেষ্টে ভারত এক ইনিংস ও ১৭৩ রাণে পরাজিত হয়। এই খেলাটিও তৃতীয় দিনে শেষ হয়। ভারত প্রথম ইনিংসে ১৬১ রাণ করে। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৪৮৩ রাণ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে, কলিন কাউড্রে ১৬০। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৪৯ রাণে খেলা শেষ করে।

রামনাথন কৃষ্ণাণের অপূর্ব্ব সাফল্যে টেনিস-জগতে বিস্ময়

দক্ষিণ আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড় অ্যালেক্স অলমেডো এ বৎসর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে বিজয়ীর কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। তিনি পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে কুইন্সল্যাণ্ডের (অষ্ট্রেলিয়ার) লেভারকে ৬-৪, ৬-৩, ৬-৪ সেটে পরাজিত করে এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

মহিলা বিভাগেও দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিযোগিনী মারিয়া এস্থার বুনো চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জ্জন করেন। দুটো বিভাগেই দক্ষিণ আমেরিকার সাফল্য এবারের উইম্বলডনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অলমেডোর পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকার কোন খেলোয়াড় উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেননি।

ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণাণ তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় অলমেডোর কাছে পরাজিত হয়ে উইম্বলডন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তরুণ খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণাণ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই পরাভব স্বীকার করেন।

উইম্বলডনে পরাজিত হলেও কৃষ্ণাণ এই বছরই অলমেডোকে দু'দুবার পরাজিত করে ক্রীড়াজগতে বিস্ময়ের সঞ্চার করেন। লণ্ডন গ্রাসকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে কৃষ্ণাণ ৮-৬, ৬-১ সেটে অলমেডোকে পরাজিত করেন। এই প্রতিযোগিতারই ফাইন্যালে তিনি বিশ্বের আর একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নীল ফ্রেজারকে ৬-৩, ৬-০ সেটে পরাজিত করে লণ্ডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের কৃতিত্বপূর্ণ সম্মানলাভ করেন। উইম্বলডনের বাছাই তালিকায় অলমেডো পয়লা নম্বরের এবং অষ্ট্রেলিয়া নীল ফ্রেজার (ইনি গতবারের উইম্বলডন রাণার-আপ) দুই নম্বরের খেলোয়াড়। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়ের এই সাফল্য ভারতকে নতুন আশার সন্ধান দিয়েছে। পুনরায় সুইডেনে সুইডিশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস সেমি-ফাইন্যালে কৃষ্ণাণ আর একবার উইম্বলডন বিজয়ীকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণাণের এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্য বিশ্বের ক্রীড়ামণ্ডলে বর্ত্তমান বৎসরে এখনকার মত সবচেয়ে বড় সংবাদ। কৃষ্ণাণ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বিদেশী পত্র-পত্রিকাও তাঁর নৈপুণ্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় পুরাতন নয়। ভারতীয় সঙ্গীতে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্রের প্রচুর আলোচনা ও বিষয়বস্তুর নির্দেশ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা, শারীরিক সম্বন্ধ বজায় রেখে এবং পারিবেশিক অবস্থার দিকে নজর রেখে কোন শাস্ত্রকার কোন শাস্ত্র রচনা করেছেন কিনা তার নজির নাই। তবে সঙ্গীতজ্ঞের বা গায়কের কণ্ঠের বিশেষত্ব গুণ প্রভৃতির আলোচনা কখন কখন হয়েছে।

পরবর্তী যুগে ওস্তাদ ও পণ্ডিত মহলে স্বর-সাধনার কিছু পদ্ধতির কথা শুনা যায়। তাঁদের মতানুসারে কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনার প্রথম এবং প্রধান পদ্ধতি হ'লো 'মরজ-সাধনা'। অর্থাৎ উদারা বা মন্দ্র-সপ্তকে গলার অভ্যাসই কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনা। ঠিক এই প্রকার গলার অভ্যাস দ্বারা গলার কিছু উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়তো হ'তো কিন্তু এই প্রকার ক্রমাগত অত্যধিক অভ্যাস গলার স্বর সুমধুর ও লালিত্যপূর্ণ হওয়ার বদলে ধরা, ভারী ও কর্কশ আওয়াজেরই উৎপত্তি হ'তো। এই সব কারণে, অবশ্য সমস্ত গায়ক মাত্রেই নয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীর জনপ্রিয়তা লাভে বঞ্চিত হওয়ার নানা কারণের মধ্যে ইহা একটি প্রধান কারণ বলা যেতে পারে।

যান্ত্রিক যুগে যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে রেডিও মাইক্রোফোন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় গায়ক মহলেও তার প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। যন্ত্রের প্রচলনের উদ্দেশ্য হয়তো সঙ্গীতকে অনায়াসে বেশী সংখ্যক শ্রোতার নিকট পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু গায়ক মহলে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে "মাইক-টেকনিক" নামক ভয়েসের উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতি হ'লো প্রধানতঃ গলাকে দাবিয়ে ও তার স্বরকে যথাসম্ভব সংযত করে গান গাওয়া। আর যন্ত্রের সাহায্যে তা পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে সবার নিকট উচ্চ আওয়াজে পরিণত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রের গুণাগুণ হিসেবে আওয়াজও সে রূপ ধারণ করে। আর শিল্পীর আসল পরিচয় চাপা পড়ে যায়। এরূপ ক্রমাগত অভ্যাসে কণ্ঠ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকে। কণ্ঠস্বরের আয়ুও এতে কমে যায়। চলচ্চিত্রশিল্পী ও কিছু সংখ্যক বেতার শিল্পীর মধ্যে ইহা বিশেষভাবে পরিদৃষ্টমান। তাদের ধারণা, এই প্রথা গানে ভাব সংযোজনা করতে বেশী সহায়ক ও অল্প পরিশ্রম হয়। কিন্তু আসল দিকটার কথা তাঁরা ভুলে যান। ফলস্বরূপ আসল স্বরসাধনার পথ হ'তে বিপথগামী হয়। প্রকৃত স্বরকণ্ঠ হ'তে নির্গত না হ'লে সঙ্গীতের ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না।

ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরোয়ানার চলন বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। ঘরোয়ানার উদ্দেশ্য কি এবং তার কি কি বিশেষত্ব থাকলে একটি ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়, তার দিকে দৃষ্টি না রেখেই ভিন্ন ভিন্ন ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। বনেদী পরিবারে ঘর বা বাড়ী ভাগাভাগী হ'লেই পরিবারের বংশজাত পরিচয় যেমন আলাদা হয় তেমনি গায়কের সামান্য মতভেদে ভিন্ন ঘরোয়ানার সৃষ্টি অমূলক। আর নিছক গায়কের মত ভেবে ভিন্ন ঘরোয়ানার নিদর্শন হওয়া উচিত নয়।

সঙ্গীত সমাজে প্রকৃত কণ্ঠের বিনাশ সাধন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়ানার গায়কের বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে। গুরুজী হয়তো যে কোন কারণে হোক তাঁর গলার স্বর মিষ্ট বা স্বরলালিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন বা পারেননি, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিল্পকুশলতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু শিষ্য তার ঘরোয়ানার বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁর নিজের সুকণ্ঠের অপব্যবহার করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু দৃষ্ট হয়। যে কোন বিষয়েই হোক গুণ অর্থাৎ ভাল জিনিষ নকল করা বড়ই শক্ত; কিন্তু খারাপটা নকল করতে বেশী সময় লাগে না। তাই গুরুজীর শিল্পকুশলতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করার চেয়ে তাঁর দোষ-ত্রুটিগুলি বেশী বিদ্যমান দেখা যায় পুরুষানুক্রমে।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দিনের দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণের দৃষ্টি শিল্পীর কণ্ঠের স্বরলালিত্য ও স্বরসাধনার দিকে সচেতন হ'চ্ছে। এই স্বরসাধনার বিষয়বস্তু নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং আজও হ'চ্ছে। এ সম্বন্ধে তাঁরা বহু নির্দেশ পুস্তিকাকারে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিনা দ্বিধায় শিক্ষা দিচ্ছে পরবর্তী যুগের কর্মীদের প্রতি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ও তাঁদের চিকিৎসার পেশা এই বিষয়বস্তুর উপর নিবদ্ধ রেখে তাঁরা গায়কদের কণ্ঠসাধনার কাজে সহায়তা করেন। এই ভাবে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষাবিদ্গণ বিশিষ্ট শিল্পিগণ ও কণ্ঠসাধনার শিক্ষকগণ, যাঁরা নিজে গলার শারীরিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা পূর্ণভাবে নেননি, তাঁরা চিকিৎসকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনার পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান ক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। ফলতঃ কণ্ঠসাধনার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এই স্বরসাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ গলার স্বর ত্রুটিশূন্য হয়েছে শিক্ষা-গুরুর উন্নত ধরণের শিক্ষকতায়। তাঁরা বলেন, কোন এক বিশেষ

ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি আছে যার দ্বারা এই দোষত্রুটিযুক্ত গলার স্বর শুদ্ধ স্বরে পরিণত হয়। কিন্তু সে সব শিক্ষাগুরুর নিকট গিয়ে অনুসন্ধান করলে তাঁদের নিকট হ'তে গলার স্বরজ সাধনার পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন, বিশেষ ধরণের পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আরো বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, সুকণ্ঠ ভগবানের দান। যে সব স্বর ত্রুটিযুক্ত তা সুরু হ'তেই এবং তা ভবিষ্যতে ঠিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন শিল্পীর গলার শিল্পকুশলতা সাধনার দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কি পদ্ধতিতে তা সমৃদ্ধ হয়েছে সে বিষয়ে সেই শিল্পী নিজেই জানেন না। অনেক সময় আমরা শুনি যে ওস্তাদরা তাঁদের বিশেষত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁরা তাঁদের পদ্ধতি কা'কেও জানতে দেন না। কেবলমাত্র তাঁদের নিজের পুত্র বা পুত্রবৎ শিষ্য ছাড়া। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে পিতার কণ্ঠে যে শিল্পকুশলতা স্বরচাতুর্য্যতা তাঁর পুত্র কিংবা পুত্রবৎ শিষ্যের কণ্ঠেও নাই। অবশেষে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন তাঁদের স্বরসাধনার দূরদৃষ্টির অভাব এবং মনে করেন সুকণ্ঠ ভগবানেরই দান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ সম্বন্ধেও তাঁরা একই মত পোষণ করেন।

পাশ্চাত্য দেশে একটি গবেষণাকারীর দল যাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, কণ্ঠধ্বনি শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, শ্রবণশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিদ শারীরিক বিদ্যাবিদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের সাহায্যে গবেষণার দ্বারা কণ্ঠসাধনার ও স্বরসাধনার যে সব তথ্য আবিষ্কার করেন, তার দ্বারা ভগবান প্রদত্ত কণ্ঠস্বরের যুক্তি ছিন্ন হয়ে যায়। তবে কণ্ঠস্বরের যে গুণাগুণ থাকে তা ভগবান প্রদত্ত বলা যেতে পারে। তাকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও কণ্ঠের ধ্বনিশাস্ত্রের দিকে নজর রেখে শিক্ষিত করতে পারলেই সুন্দররূপে ও সুষ্ঠুভাবে সুকণ্ঠ অর্জন করা যায়; বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্তই আজ প্রতিষ্ঠিত।

এখন প্রশ্ন উঠে, ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার পাশ্চাত্য—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কিনা। কারণ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই সেই পদ্ধতি ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার গ্রহণ করলে ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে পাশ্চাত্য কণ্ঠসঙ্গীতের প্রভাব এসে যাবে এবং ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের আসল রূপ বিনষ্ট হ'বে, এরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন মনের মধ্যে। আর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঠিক ঐরূপ কোন গবেষণা হয়নি পূর্ব্বে। তবে আজ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-দপ্তর ভারতের বিশিষ্ট মেধাবীযুক্ত যুবক শিল্পীদের ছাত্রবৃত্তি দানের দ্বারা এই গবেষণায় সাহায্য করছেন অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংস্পর্শে রেখে এবং তবেই আজ ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কণ্ঠসঙ্গীতেরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা উন্নতি সাধন করা হয়েছে। তাই ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে স্বরসাধনার ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হওয়া দরকার।

এ বিষয়ে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, আমাদের ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব আমরা নিজে প্রবেশ না করালে আসার কোন সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি ছাড়াও সাধারণ বুদ্ধি দিয়া আমরা দেখতে পাই যে কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় তার শরীরের রূপ বদল হয় কিনা। আর যে বিষয়ে যে দেশে গবেষণা বেশী হ'য়ে তার উন্নতি সাধিত হয়েছে ঠিক সেই বিষয়ে সেই দেশের নির্দেশ বা পরামর্শ পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বলোকই গ্রহণ করে থাকে। তবে এই কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার ক্ষেত্রেও তাঁদের নির্দেশ কোন ক্ষতির কারণ হওয়া উচিত নয়। মানুষের দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভেদে ভিন্ন নয়। যে প্রথায় পাশ্চাত্য শিল্পীর কণ্ঠস্বর সমৃদ্ধ হয় ঠিক সেই প্রথায় প্রাচ্যের শিল্পীর কণ্ঠস্বর সমৃদ্ধ না হবার কোন কারণ নাই। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে অভিজ্ঞ স্বরসাধনার ও ধ্বনি শ্রবণশাস্ত্রের শিক্ষকের নিকটেই শিক্ষা গ্রহণ সহায়ক, অন্যথায় বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়। —নিমাইচাঁদ বড়াল।

রেকর্ড-পরিচয়

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া"র প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের পরিচয়:—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82831—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া নতুন ধরণের আধুনিক গান—"তুমি মেঘলা দিনের" ও "দু'টি ঐ কাঁকনের ছন্দ।"

N 82832—সুমধুর দু'খানি আধুনিক গান "জনপদের ছাড়িয়ে সীমা" ও "স্বপ্ন রাঙাতে কেন এলে"—গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82833—৺সুকুমার রায়ের জনপ্রিয় দু'টি কবিতা "বাবুরাম সাপুড়ে" ও "এই দুনিয়ার সকল ভালো।"—সুরের মায়াজালে পরিবেশন করেছেন সনৎ সিংহ।

N 82834—শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে ছন্দময় দু'টি আধুনিক গান—"হয়তো সেদিন আগের মত" এবং "ভালোবাস তুমি শুনেছি অনেক বার।"

N 82835—চণ্ডীদাস ও জগদানন্দ দাস রচিত দু'খানি মধুর কীর্তনগান "সখি, কহিও নিঠুর আগে" ও "কেন গেলাম যমুনায়"—গেয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ।

N 76086 এবং N 76087 রেকর্ড দু'খানিতে "শশীবাবুর সংসার" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলম্বিয়া

GE 24957—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"সাগরের দু'টি ঢেউ" ও "ওগো লজ্জাবতী।"

GE 24958—"এই রাত এই গান এই সন্ধ্যা" ও "নীল প্রজাপতি"—আধুনিক গান দু'খানিকে পরিবেশন করেছেন কুমারী গায়ত্রী বসু।

GE 24959—শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠের আধুনিক গান—"কেন চলে যাবে" ও "ফুলের কানে কানে।"

GE 30422—"ঠাকুর হরিদাস" বাণীচিত্রের দু'খানি গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য শিল্পীরা।

GE 30425—মান্না দে ও লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে "দীপ জেলে যাই" বাণীচিত্রের দু'খানি জনপ্রিয় গান।

আমার কথা (৫৪)

কুসুম গোস্বামী

গানের কুসুমকলি জীবনশৈশবের সহজ হাসির দিনগুলিতে ফুটে উঠেছিল পরিবারের একটি রসমধুর পরিবেশের প্রভাবে। জন্ম হয় বাংলা ১৩৩১ সালের ২৮শে ফাল্গুন ঢাকায়। পিতামহ শরৎচন্দ্র গোস্বামী ছিলেন ঢাকার সুপরিচিত সেতারী। তাঁর কাছেই প্রথম সংগীত শিক্ষার গোড়াপত্তন। পিতা হরিপ্রসন্ন গোস্বামী ভাল কীর্তন গাইতেন, তাই সংগীত চর্চার আদিপর্বেই কীর্তন নামগান দিয়েই আরম্ভ। এদিকে আবার মাতা লাবণ্যপ্রভা গোস্বামীও খুব ভাল গাইতে পারতেন কীর্তন ভজন। কিন্তু তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবারের পরিবেশে থেকে আসরে গান করার রেওয়াজ ছিল না, তাই কন্যাকে শিক্ষার মধ্যে দিয়েই মাতার সংগীতচর্চা সীমিত হয়েছিল। আশৈশব বৈষ্ণব সাহিত্য ও কীর্তন সংগীত পারিবারিক প্রাচীন ঐতিহ্য-সূত্রে স্বভাবতই মানস গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। আজও মাঝে মাঝে স্মৃতি-রোমন্থনে মনে পড়ে পিতামহ ধরেছেন সেতারে তান আর পিতা মন্দিরা হাতে গাইছেন কীর্তন গান।

কুসুম গোস্বামী

বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হলো ঢাকার রাধাসুন্দরী গার্লস হাইস্কুলে। এখানে পরিচয় হয় বিজনবালা ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে। ঢাকায় বছর চারেক লেখাপড়া করার পরে পরিজনদের সঙ্গে চলে যেতে হলো তখন নারায়ণগঞ্জে। এখানে মরগ্যান গার্লস হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়। ইংরাজী ১৯৩৭ সালে পরিবারবর্গের সঙ্গে চলে আসতে হলো কলকাতায় বাগবাজারে মাতুলালয়ে। দু' বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও লেখাপড়ার মধ্যে সংগীতচর্চাও বাদ যায়নি, তবুও এর পর থেকে বাসন্তী বিদ্যাবীথি সংগীত বিদ্যালয়ে ঠিক ধারাবাহিক শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সংগীত শিক্ষার সুযোগ হয়েছে। বাসন্তী বিদ্যাবীথিতে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা সংগীতবিদ রামকৃষ্ণ মিশ্র গ্রহণ কালে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির অনুমতি দান করেছিলেন। এ সময়ে অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্স, বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি বহু সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীর সম্মান ও পুরস্কার লাভ করার সুযোগ ঘটে।

ব্যক্তিগত ভাবে গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, উমাপদ ভট্টাচার্য, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তানসেন পাণ্ডে প্রমুখ

বহু সংগীত-শিক্ষকের কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ আসে, কিন্তু সুগীতিকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল যে দিন নিজে গান লিখে, সুর দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বরচিত গান, সে কথা ভোলার নয়। হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতেই নজরুলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। ১১৩৮ সালে প্রথম হিন্দুস্থানে 'সই লো আমি করি কী উপায়' এবং 'তোমায় যে বঁধু আমি বাসিয়াছি ভাল' গান দু'খানি রেকর্ড হয়েছিল। প্রথম বছরে আটখানার মত রেকর্ডে প্রায় পাঁচ শত টাকা পারিশ্রমিক লাভ হয়। এই সময় শচীন দেববর্মণের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হওয়ায় পল্লীগীতির প্রতি পূর্বের দরদ আরো প্রসারলাভ করে। নজরুলের চেষ্টায় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীতেও যোগাযোগ হয়। 'মোর দুঃখনিশি কবে হবে ভোর' ও 'সন্ধ্যা ঘনালো আমার বিজন ঘরে'—সে সময়ের দু'টি জনপ্রিয় কাব্যসংগীত রেকর্ডিং হয়েছিল। এই সময়ে ভবানী দাসের সঙ্গে নীলিমা দাস ছদ্মনামেও কয়েকটি রেকর্ডিং হয়। দিলীপকুমার রায়ের সুর সংযোজনায়ও অনেক রেকর্ড হয়। হিন্দুস্থান, মেগাফোন, হিজ মাষ্টার্স ভয়েস প্রমুখ রেকর্ড কোম্পানীর শিল্পিস্বরূপ কীর্তন, পল্লীগীতি, নজরুলগীতি, আধুনিক, ঝুমুর, রাগপ্রধান, ভক্তিপ্রধান, ধর্মসংগীত, ভাটিয়ালী, বাউল, শ্যামাসংগীত, ভজন, গজল, গীত, সারি ও অনেক ধারার বাংলা হিন্দী গানের রেকর্ড হয়েছে।

সর্বপ্রথম বেতারে গান প্রচারিত হয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত গল্পদাদুর আসরে; তখন বিদ্যাবীথির ছাত্রী। এর পর গীতচ্ছবি প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছাড়া নিয়মিত বেতারে সংগীত পরিবেশন চলেছে।

বর্তমান সংগীতশিল্পি-জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে চলচ্চিত্রে নেপথ্যে (প্লে ব্যাক) সংগীতশিল্পিরূপে সুনাম অর্জন। সে সময় 'বন্দী' কথাচিত্রের 'চোখে চোখে রাখি হায় রে, তবু তারে ভুলে থাকা যায় রে'—গানটি এতই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে যে পথে ঘাটে তরুণদের মুখে বিশেষ ক'রে বা অলস বিছানায় শুয়ে তরুণীদের গাইতে শোনা যেতো। এটি গিরীন্দ্র চক্রবর্তীর সুরে জগন্ময় মিত্রের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গীত। চলচ্চিত্রে প্রথম অবশ্য 'শকুন্তলা' চিত্রে মীরা দেবীর হয়ে নেপথ্যে গান করার সুযোগ হয়। এর পর থেকে রাইচাঁদ বড়াল, অনিল বাগচী, দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক তত্ত্বাবধানে এপার ওপার, বন্দী, আহুতি, কবি, রামের সুমতি, বিরাজ বৌ প্রভৃতি অসংখ্য ছায়াচিত্রে নেপথ্য সংগীতে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছে।

সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একবার সাক্ষাতে তিনি তাঁর প্রার্থনা-সভায় ভজন গানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেতে পারা যায়নি। পণ্ডিচেরীর "মা" একবার গান শুনে তন্ময় হয়ে পড়েন। ১১৪৭ সালে মহারাজা কুচবিহারের জন্মোৎসব-সভায় আমন্ত্রিত হয়ে যে সম্মান ও সমাদর লাভ ঘটেছে তা একজন বাঙালী মহিলা শিল্পী হিসেবে অভাবনীয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথা বিলাসপুর, নাগপুর, পণ্ডিচেরী, দ্বারকা, বোম্বাই, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, দিল্লী ও কলকাতার বিচিত্রানুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের প্রভূত প্রশংসা ও অভিনন্দন আজও প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পথে সংগীত সাধনায় ও ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পর্যালোচনায় সদা ব্যাপৃত রেখেছে। সংগীতের সুরলোক জীবনকে আলোক-উদ্ভাসিত ক'রে অজানা একটি সুবর্ণ-সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে।

সেই প্রাগৈতিহাসিক মেয়ে

বিমলচন্দ্র সরকার

অন্ধকার গলিটায় রয়েছো দাঁড়িয়ে
জানি তুমি প্রাগৈতিহাসিক সেই মেয়ে
কামনার বহ্নিশিখা নয়নের ছায়ে
প্রতীক্ষিতা আজ রূপের বেসাতী নিয়ে
আহা! ক্ষমায় ত্যাগে মূর্তিমতী প্রতিমা
নিজেরে বিলিয়েও ঘৃণাই করো জমা!
তুমি ঢাকার সেই ছাত্রী মালতী সেন
বিগত দাঙ্গায় কি হ'ল কি করে যেন!

ছন্নছাড়া ভেসে এসে এই ক'লকাতা
হলে বাস্তুহারা মানুষেরই আশ্রিতা
বেঁচেও মরলে তুমি ওদের চক্রান্তে
পসারিণী গো দাঁড়ালে আসি পথপ্রান্তে!
নিজেরে আহুতি দিয়ে পাশব কামনায়
সেবিছো সমাজ তুমি আজ মমতায়
তবুও তোমায় ওরা করে শুধু ঘৃণা
জানি মূল্যে শোধ হবে না তোমার দেনা।

অমৃত ছড়িয়ে পাও শুধু অত্যাচার
হে ক্ষমার প্রতীক! তোমার নমস্কার।
তোমার ধমনী শিরা ও উপশিরায়
জানি সীতা-সাবিত্রীর রক্ত আজো বয়
শক্তির অংশ তুমি দেবী মধুস্মিতা
সমাজকল্যাণী ওগো ত্যাগের সবিতা!
দীপান্বিতা তুমি গো মহিমায় ভাস্বতী
জানাই তোমারে শত সহস্র প্রণতি।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

ঢাকাই গল্প

ঢাকাই গল্প চলতি গল্প নয়—খোশ গল্প। অপবাদ আছে, বাঙালী শুধু কাঁদতেই জানে, হাসতে জানে না। কিন্তু ঢাকাই গল্প প্রমাণ করবে বাঙালী শুধু কাঁদতেই জানে না, হাসতেও জানে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসাতেও জানে। ঢাকাই অমৃতি, ঢাকাই গহনা, ঢাকাই শাড়ী, এর সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে বৈশিষ্ট্যের ছাপ। ঢাকাই গল্প—এর মধ্যেও ফুটে উঠেছে সেই বৈশিষ্ট্য। পাঠক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়তে পারবেন। লেখক শ্রীঅবিনাশ সাহাও বাঙলা সাহিত্যে অপরিচিত নন এমন কি নবাগতও নন। তাঁর রচনার সঙ্গে বাঙলাদেশের পাঠক-পাঠিকার পরিচয় নেই! লেখার মধ্যে লেখকের বর্ণনাভঙ্গী, রসসৃষ্টি ও বিন্যাসচাতুর্য প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকাশক ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। দাম দুই টাকা মাত্র।

রোদ-জল-ঝড়

মানবজীবনে ক্ষয়রোগকে একমাত্র তুলনা করা চলে শনির দৃষ্টির সঙ্গে। এই রোগের আক্রমণ মানুষের জীবনকে কতখানি যে বিষিয়ে দিতে পারে সে বিষয়ে কেউই অবিদিত নন। এর স্পর্শে মানুষের জীবনীশক্তি তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারে এই রোগের আবির্ভাব বিধাতার চরম অভিশাপেরই নামান্তর। আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমোন্নতির ফলে এই রোগ দূরীকরণের নানা পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এর ফলে মধ্যবিত্তদের যে খুব বড় রকমের কোন উপকার হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেন না, এর ব্যয়ভার বহন করা সাধারণ মধ্যবিত্তদের পক্ষে প্রাণান্তক ব্যাপার। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারে এর আবির্ভাব এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত, এই রোগ আসে অপ্রতিরোধ্য, এক চরম সর্বনাশের বার্তাবহ রূপে, এই রোগ বিদায় নেয় অশেষ বিপর্যয়কে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে—উপরোক্ত পটভূমিকা অবলম্বনে রোদ-জল-ঝড় উপন্যাসটির সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু এর স্রষ্টা। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই অনন্ত প্রশ্নটি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন দক্ষিণারঞ্জন শান্তনু ও মঞ্জুশ্রীকে কেন্দ্র করে। পঞ্চানন ও ফুল্লরার চরিত্র দুটি সৃষ্টি করে যথোচিত দৃঢ় বলিষ্ঠ ও অভিনন্দনযোগ্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন। চিকিৎসালয়ের পারিপার্শ্বিক পরিবেশটিও লেখনীর মাধ্যমে সুচিত্রিত হয়েছে। গ্রন্থটির পাতায় পাতায় লেখকের মানব-দরদী মনের আভাস পাওয়া যায়, মানুষের অসহায় করুণ অবস্থা লেখকের মনে ব্যথার সৃষ্টি করে। দুঃখের ত্রিযাম রাত্রি অতিক্রম করে আনন্দের প্রভাত-সূর্যের আলোকরশ্মি মানব সমাজ প্রাণ ভরে উপভোগ করুক—লেখকের এই মনোবাসনাই গ্রন্থটির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী ১৯৫। ১-বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম সাড়ে চার টাকা মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধ্যাপনার ক্ষেত্রে শ্রীভূদেব চৌধুরী একজন যশস্বী পুরুষ। সাহিত্যের দরবারেও তিনি আগন্তুক নন। সাহিত্য বিষয়ক তাঁর বহু রচনা বাঙলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর সাম্প্রতিক নিদর্শন। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য যোগ। সাহিত্যের ইতিহাস মানুষেরই ইতিহাস। মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ব্যাপক জয়যাত্রার ও ক্রমাগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে। এক-একজন সাহিত্যকার আপন আপন যুগকে—যুগ সভ্যতাকে ফুটিয়ে তোলেন আপন আপন সাহিত্যে, বিভিন্ন কালে সাহিত্যিকদের লেখনীর কল্যাণে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সভ্যতার ছবি ধরা পড়ল সাহিত্যে, এমনি করেই বহু শতাব্দীব্যাপী জয়যাত্রা এবং নব নব সৃষ্টির ফলে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে—সেই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল সভ্যতার সর্বকালের এক সার্থক আলেখ্য মানুষের ভাব-ভাষা, আনন্দ-বেদনা, চিন্তা-কল্পনা প্রকাশ করতে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থে অধ্যাপক চৌধুরী বাঙলা দেশ বাঙলা ভাষা, চর্যাপদ বাঙলা সাহিত্যের আদিম যুগ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের এক আলোকোজ্জ্বল যুগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেলেন। গ্রন্থটি যুগপৎ পাঠক সমাজ ও ছাত্র সমাজের উপকার সাধন করবে। সাধারণ সাহিত্য পাঠকের দরবারে আমাদের সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের আলোচনা যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। সমগ্র গ্রন্থটি গ্রন্থকারের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে। গ্রন্থটি অসংখ্য তথ্যের আকর, বাঙলা সাহিত্যের বিরাট ইতিহাস অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সারগর্ভ ও মনোরম এই গ্রন্থের বহুল প্রসার ও প্রচার আমরা কামনা করি। প্রকাশক

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬। দাম সাত টাকা মাত্র।

প্রেমতারা এবং এতটুকু আশা

হাজার হাজার মানুষকে অফুরন্ত আনন্দ দিয়ে চলেছে একদল শিল্পী বিপদের সম্ভাবনাকে চোখের সামনে রেখে। সার্কাসের শিল্পী। প্রতি মুহূর্তে এরা জীবন-দুর্যোগের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কিন্তু সেই অবস্থায় দর্শক দরবারে এদের আনন্দরস পরিবেশনে এতটুকু ছেদ পড়ে না। শিল্পী হিসেবে এদের কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয় এবং অনেকের থেকেই বেশী। কেন না চরম বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষের মনে যারা নিয়ত আনন্দ জুগিয়ে চলছে তারা যে কতখানি শক্তিমান, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু তার বিনিময়ে এরা কি পায়? এতখানি দুর্জয় সাহস কঠোর পরিশ্রম পরিপূর্ণ নিষ্ঠা দিয়ে এরা যে কাজ করে থাকে তার জন্যে এদের জীবনে কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিটুকু পর্যন্ত নেই, যে মুহূর্তে এরা ক্রীড়াংক থেকে বিদায় নেয় সেই মুহূর্তেই তো এরা মুছে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে, এদের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য মানুষের স্মৃতির ইতিহাসে পায় না এতটুকু স্থান। এই পটভূমির ভিত্তিতে প্রথমোক্ত উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বাঙলার প্রতিভাময়ী সাহিত্যশিল্পী শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের লেখনী থেকে। দ্বিতীয়োক্ত উপন্যাসটিও তাঁর লেখনীজাত। প্রথম উপন্যাসটিতে লেখিকা সার্কাসশিল্পীদের জীবনের উত্থান-পতন চাওয়া-পাওয়া লাভ-লোকসান এবং সর্বোপরি তাদের জীবনবৈশিষ্ট্যকে লেখনীর মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। সার্কাস-জগতের পূর্ণাঙ্গ এক আভ্যন্তরীণ চিত্রও গ্রন্থটিতে যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে দেখা যাচ্ছে যে এই ঘাত-প্রতিঘাতময় জগতের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে মানুষ হাসিমুখে এগিয়ে চলেছে আশার একটুখানি আলো অনুসরণ করে। মানুষের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি প্রাপ্তিতে এই একটুখানি আশারই প্রভাব অবর্ণনীয়। কিসের আশা? বাঁচবার আশা। জগতের বিরাটত্ব আজ আর মানুষের কাছে অনুপলব্ধ নয়। জগতের মানুষ জগতের সঙ্গে তালে তাল রেখে চলতে চায়, গড়ে তুলতে চায় তারও একটি নিজস্ব জগৎ। ছোট হোক ক্ষতি নেই, কোণে হয় তো হোক না, তবু তো তার নিজস্ব, যেখানে তার সঙ্গে একত্রে বাসা বাঁধার আনন্দ, প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা এই সৃষ্টির স্বপ্ন অধিকার করে আছে মানুষের মন, মানবচিত্ত গঠনব্যাকুল। ঐ একটুখানি আশাকে অবলম্বন করেই মানুষ গড়ে তুলতে চায় তার আপন জগৎ। দেখা যাচ্ছে যে জীবনের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ঐ একটু আশার আনন্দ অসামান্য। জীবনযাত্রার এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র উপন্যাসটির পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে।

উভয় উপন্যাসই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টিতে, বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় লেখিকা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বঞ্চিত শিল্পিকুলকে সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের যথাপ্রাপ্য সম্মান দিয়ে লেখিকা বহুজনের ধন্যবাদ লাভ করবেন। লেখিকার বিন্যাসভঙ্গী অপূর্ব, প্রকাশ-দক্ষতা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আন্তরিকতা সাধুবাদার্হ। গ্রন্থ দুটি যুগোপযোগী যথেষ্ট আবেদন বহন করে। প্রচ্ছদশিল্পিদ্বয় দক্ষতার কম পরিচয় দেন নি। প্রেমতারার প্রচ্ছদশিল্পীর নাম জানা গেল না। এতটুকু আশার প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীগণেশ বসু। প্রেমতারার প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, দাম—চার টাকা মাত্র। এতটুকু আশার প্রকাশক—করুণা প্রকাশনী, ১১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

ক'টি কবিতা ও একলব্য

বর্তমান বাঙলায় কবিদের মধ্যে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এক বিশেষ আসনের অধিকারী। বাঙলা দেশের শক্তিমান কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বাঙলা কবিতার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও তিনি করেছেন যথেষ্ট সহায়তা ক'টি কবিতা ও একলব্য তাঁর বর্তমান কাব্যগ্রন্থে। ক'টি কবিতা এবং "একলব্য" চরিত্রকে কেন্দ্র করা একটি কাব্যনাট্য এই গ্রন্থের অঙ্গ। কবিতাগুলি তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করছে, স্বকীয়তার আলোয় উজ্জ্বল, ভাব-প্রাচুর্যের দিক দিয়েও অসাধারণ। কবিতাগুলি যেন কবির অন্তরের কোমলতা। পৃথিবীর প্রতি বিপুল ভালোবাসার বৈচিত্র্যের প্রতি অসীম আকর্ষণের এক-একটি অনন্ত দৃষ্টান্ত, একলব্যের জীবন প্রশ্নের সম্যক প্রস্ফুটন ঘটেছে একলব্যের মধ্যে। ভাবের দিক থেকে ব্যঞ্জনার দিক থেকে প্রকাশের দিক থেকে গ্রন্থখানি সর্বতোভাবে এক অভিনবত্বের স্পর্শ বহন করছে। প্রচ্ছদপটটি সুঅঙ্কিত, প্রচ্ছদশিল্পী স্বনামধন্য শ্রীখালেদ চৌধুরী। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—দু'টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা

সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতির জন্যে অনন্ত ঐশ্বর্য রেখে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্য সারা জগতের সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। রবীন্দ্রনাথের অনুপম সাহিত্যকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে যে সমালোচনার বিরাট ধারা বয়ে গেছে তার দ্বারাও সাহিত্য বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে, তার ফলে সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের হয়েছে দ্বারোদ্‌ঘাটন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা করে বহু জন লেখনী ধারণ করে পরবর্তীকালে অভিজ্ঞ সমালোচক হিসেবে সাহিত্যের দরবারে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছেন। বিদেশে এই জাতীয় গ্রন্থের নমুনা আমরা পেয়েছি (Shakespeare Criticism ও Chanecr Criticism) কিন্তু বাঙলা দেশে ঠিক এই ধরণের গ্রন্থ এই প্রথম জন্মাল। এ জন্যে গ্রন্থকার প্রাবন্ধিক ডঃ আদিত্য ওহদেদার নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিভিন্ন যুগে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্য কোন রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে বিভিন্ন সমালোচকের সামনে, ঐ সাহিত্য সমূহ কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করল সমালোচকদের মনে, সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচকদের কি মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া গেল, তদুপরি রবীন্দ্রসাহিত্য মূলরস, ভাব, কল্পনা, স্বরূপ, সারবত্তা, চিন্তাধারা কোন কোন সমালোচকের দ্বারা কি ভাবে বিশ্লেষিত হ'ল, ব্যাখ্যাত হল, আলোচিত হ'ল, এই সকল বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করলে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত হওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রণয়নে গ্রন্থকার

যথেষ্ট আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, গ্রন্থকারের প্রভূত শ্রম স্বীকার গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে। ১২৮০ থেকে শুরু ১৩৬০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ আশী বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে যে বিরাট সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠল তার ইতিবৃত্ত এই একটি গ্রন্থের মাধ্যমে যথেষ্ট সুষ্ঠু ভাবে পরিবেশন করে গ্রন্থকার শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেলেন। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। প্রকাশক—এভারেষ্ট বুক হাউস, ১৪ সাউথ সিঁথি রোড। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য সংস্কৃতির যে বিভাগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী হাতের ছোঁয়া লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভাগ সমর্থ হয়েছে পূর্ণতার রসাস্বাদনে, সংস্কৃতির সকল দুয়ারই সর্বদা সসম্মানে উন্মুক্ত ছিল কবিগুরুর জন্যে, দেশীয় নাট্যকলার ইতিহাস সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। সৌখীন নাট্যকলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী যোগাযোগের এক অনবদ্য আলেখ্য লেখনীর মাধ্যমে এই গ্রন্থে অঙ্কিত করেছেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর আলোচনা এই গ্রন্থটির আকারে রূপ নিয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যের যাদুকরই নন, রবীন্দ্রবোদ্ধাদের মধ্যেও তাঁর আসন প্রথম সারিতে; এ ক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় কথা যে আমাদের নাট্যশালার এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ অথচিটি তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং কাহিনীর সঙ্গে তিনি সুপরিচিত, নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিবৃন্দের বিবরণীও তাঁর অজানা নয়—সেইজন্যই আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্বন্ধে হেমেন্দ্রকুমারের আলোচনা যেমনই মূল্যবান তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে হেমেন্দ্রকুমারের অবর্ণনীয় শ্রদ্ধা ও অসংখ্য তথ্যের মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ছাড়াও এ দেশে নাট্যকলার ও নাট্যশালার উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত তার ক্রমবর্ধন, প্রভূত প্রসার ও ব্যাপক জয়যাত্রার এক প্রামাণ্য ইতিহাস পরিবেশনের ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রকুমার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। "নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব" অধ্যায়টি মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের শুভ আবির্ভাব বাঙলাদেশের নাট্যলোককে সমৃদ্ধির সিংহদ্বার অভিমুখে আগুয়ান হ'তে যে কতখানি সহায়তা করেছে, সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই গ্রন্থটি পাঠ করলে। রসিক মহলে এই গ্রন্থ তাঁর যথাপ্রাপ্য সমাদর লাভ করবে বলে আমরা অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

ভেলকি থেকে ভেষজ

ভেলকিতে যার সূচনা ভেষজে তারই গৌরবময় পরিণতি—আজ বিংশ শতাব্দীর আলোয় ভেষজশাস্ত্রের যে রূপটি আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে, সুপ্রাচীন কালে এতখানি আলোকোজ্জ্বল রূপ নিয়ে তখনকার মানুষের সামনে এই শাস্ত্র ধরা দেয় নি। কালের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সঙ্গে তালে তাল রেখে মানুষ যেমন ধীরে ধীরে তার আদিম বন্য, অসভ্য, পশুভাব কাটিয়ে ক্রমে রূপান্তরিত হল সুসভ্য, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত মানবে, তেমনই তাকে কেন্দ্র করে যে সব শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তাদের ইতিহাসও অনুরূপ। আজকে ভেষজশাস্ত্রের যে মহিমান্বিত রূপটি আমাদের সামনে প্রতীয়মান তার ইতিহাসের প্রস্তরযুগের বর্বরতার অধ্যায় থেকে শুরু করে তার বর্তমানকালের ব্যাপক জয়যাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়ক সারবান আলোচনা গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য। মানুষের চেতনা কেমন করে সজীব হয়ে উঠল, কবে, কোথায়, কি পরিবেশে মানুষ প্রথম অনুভব করল যে ভেলকিবাজীর কাজ শেষ হয়েছে, জীবনটা পুতুলখেলা নয়, তারপর বহুকালের সেই বন্ধ দুয়ার কেমন করে খুলে গেল, তার ফলে মানুষের মনোমন্দিরে প্রবেশ করল মুঠো মুঠো স্বপ্ন-সম্ভাবনা, প্রাণজয়ী প্রত্যাশা, অগ্রগমনের অপ্রতিরোধ্য অভিলাষ তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা গ্রন্থের অঙ্গপুষ্টি করেছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রোগের অভিনব আবিষ্কার, ভেষজশাস্ত্রের ইতিহাসে দিকপাল আবিষ্কারকদের আবির্ভাব তাঁদের সাধনার অনন্যসাধারণ কাহিনী, ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক কাহিনীর উল্লেখ, অসংখ্য চিত্রের সংযোজন সর্বতোভাবে গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধি করে। লেখক আনন্দকিশোর মুন্সীর অনবদ্য বর্ণনা যেমনই রসসমৃদ্ধ, যেমনই তথ্যপূর্ণ, তেমনই হৃদয়গ্রাহী। চিকিৎসাশাস্ত্রের অতুলনীয় আবিষ্কারগুলির সরস, মধুর ও প্রাঞ্জল বর্ণনায় তিনি আশাতীত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরম সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর পাঠকদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পাঠকসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠে শুধু পড়ার আনন্দই পাবেন না, প্রভূত জ্ঞানলাভেও সমর্থ হবেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—ছ' টাকা মাত্র।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছেন বাঙলার বর্ষীয়ান সাহিত্যিক শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদেরই একজন। খুব কাছের একটি কোণ থেকে শরৎচন্দ্রকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটে যাওয়া বহু কাহিনীর সাক্ষিস্বরূপ আজও যাঁরা আমাদের মধ্যে আছেন, এমন ঘটনা আছে যার ধারা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের উপর দিয়েও যুগপৎ ভাবে বয়ে গেছে, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে বছর তিনেক আগে শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত অসমঞ্জ বাবুর স্মৃতিকথা ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তারই গ্রন্থরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থটিতে লেখক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণী যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ্যে অজানা বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। অসমঞ্জ বাবুর আন্তরিকতাপূর্ণ, দরদভরা বর্ণনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ও

দরদভরা বর্ণনায় এবং সর্বোপরি তাঁর রচনানৈপুণ্যে অতীতের অজস্র ঘটনা নতুন করে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মানুষ শরৎচন্দ্রের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা যেমনই অনবদ্য, তেমনই মনোজ্ঞ এবং তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। বলা বাহুল্য, তাঁর স্মৃতিকথা রচনায় তাঁর লেখনী যথোচিত শক্তির পরিচয়ই প্রদান করেছে। যে শরৎচন্দ্রের নিবিড় সান্নিধ্যে আপন জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে তাঁর বিয়োগব্যথা যে লেখকের মনকে কতখানি বিষন্ন করে তুলেছে তার সম্যক প্রতিচ্ছবিও গ্রন্থটি থেকে অনুপস্থিত নয়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ গান্ধী রোড। দাম-দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

ভূস্বর্গের অভ্যন্তরে

আচার্য শ্যামাপ্রসাদের অকাল প্রয়াণ বাঙালীকে কতখানি শূন্য করে দিয়েছে তার তুলনা মেলে না। মৃত্যু মানুষের জীবনের সার্থক পরিণতি, মৃত্যু আছে বলেই জীবন পূর্ণ, সুতরাং ক্ষোভ সেজন্যে নয়, ক্ষোভ এই জন্যে যে, শ্যামাপ্রসাদের জীবনে মৃত্যু যেভাবে এল তা যেমনই করুণ, তেমনই মর্মান্তিক। বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই আশা করি এ বিষয়ে একমত হবেন যে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু এক কুৎসিত ষড়যন্ত্রের মর্মঘাতী পরিণতি। বিভ্রান্ত, বিবেচনাহীন অদূরদর্শী ভারত সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ভ্রমাত্মক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করার ফলেই শ্যামাপ্রসাদকে সুদূর কাশ্মীরে স্বজনহীন অবস্থায় অচেনা পরিবেশে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হল। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই শ্রদ্ধেয় জননেতার যুক্তিধর্মী সমালোচনায় প্রমাদ গণলেন ভারত সরকার—তার পরবর্তী কালের ইতিহাস কারো অজানা নয়। পদত্যাগী মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদের জীবনের শেষ অধ্যায় এবং প্রধানতঃ তাঁর কাশ্মীরে থাকাকালীন ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ যাঁরা খুঁটিয়ে জানতে চান এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা উপকৃত হবেন। সংসদে শ্যামাপ্রসাদের বিতর্ক, তারপর তাঁর কাশ্মীর যাত্রার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে কলকাতায় তাঁর মৃতদেহ আনয়ন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ পর্যন্ত গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেলেন লেখক শ্রীজ্যোৎস্নাময় চৌধুরী। গ্রন্থটিকে শ্যামাপ্রসাদের জীবনের শেষাংশের একটি প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জী অনায়াসে বলা চলে। তাঁর শেষ জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি বলে গ্রন্থটিকে অভিহিত করলেও ভুল হয় না। কাশ্মীররাজ্যের সকল বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আবদুল্লার জীবনের পরিচয় এবং আরও বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লেখকের বলবার ভঙ্গী অপূর্ব, আগাগোড়া ইতিহাসকে তিনি গল্পের রূপ দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। আয়তনের দিক দিয়েও গ্রন্থটি নাতিদীর্ঘ। অল্প পরিসরে এত বড় একটি বিরাট বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় লেখক অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করছেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়। এই যুগোপযোগী গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার আমাদের কাম্য। প্রকাশক—শ্রীকালীপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ২-এ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম—তিন টাকা মাত্র।

অভিষেক

বিদ্রোহের ইতিহাস সৃষ্টিতে থারাওয়াডী বিদ্রোহের অবদান কম নয়। এর জন্ম ছিল ব্রহ্মদেশ। এতে ইন্ধন জোগাল সাইমন কমিশনের সুপারিশ ক্ষুব্ধ জনগণ আর সুশোষিত কৃষকসম্প্রদায়। এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন শেয়া শান। সাধারণ মানুষের মনোরাজ্যে এই বিদ্রোহ কম প্রভাব বিস্তার করে নি। বর্তমানে ঐ বিদ্রোহের পটভূমিকা অবলম্বন করে পূর্বোক্ত উপন্যাসটি রচনা করেছেন শক্তিমান সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে হরিনারায়ণ বাবুর প্রত্যক্ষপরিচয়ও অগভীর নয়। ব্রহ্মপ্রবাসে হরিনারায়ণ বাবুর জীবনেও ঘটেছে। বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাসটি সৃষ্ট—স্বভাবতঃই রাজনীতিও উপন্যাসের মধ্যে এসে গেছে অবশ্য, তাই বলে সমগ্র উপন্যাসটি কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ মানুষ তার জীবন, তার স্বপ্ন-কল্পনা, তার আশা, আকাঙ্খা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনাও উপন্যাসের পাতায় তাদের যথাপ্রাপ্য স্থান পেয়েছে। ঐ সমাজের ওখানকার মানুষের মনের এক অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে হরিনারায়ণ বাবুর লেখনীর বলিষ্ঠতায়। উপন্যাসের নামকরণও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের মধ্যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত করে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসটি বহুপ্রতিষ্ঠ স্রষ্টার সুনাম বর্দ্ধনে প্রভূত সহায়তা করবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম

প্রেম রবীন্দ্র-রচনার এক প্রধান অঙ্গ। প্রেমকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, ভাবধারা, কল্পনা রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরদত্ত লেখনীর কল্যাণে তাঁর সৃষ্ট অনবদ্য চরিত্রগুলির মাধ্যমে সাহিত্যের মধ্যে প্রেম এক মহিমময় দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে। প্রেমবাদ রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছে এক অভিনব মূর্তিতে, তার ফলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোষাগারে প্রেম এক মহার্ঘ রত্ন হিসেবে পরিগণিত। শ্রীমতী মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছে অপরিচিতা নন। ইতিপূর্বে মাসিক বসুমতীতে তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম সম্পর্কে আলোচনায় তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেমের বিশিষ্টতা, বিপুলতা ও বিচিত্রতা সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা যেমনই সারগর্ভ, তেমনই মনোরম। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মনোজ্ঞ আলোচনা ধন্যবাদের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমবাদের নিখুঁত বিশ্লেষণকর্মে লেখিকা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রপূর্ব বাঙলা-সাহিত্যে প্রেমের রূপ ও রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রেম সাহিত্যের সূচনা সম্বন্ধে লেখিকার আলোচনার ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের যে প্রতিচ্ছবি আমরা পাই, সেই সম্পর্কে লেখিকার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যান ও ভাষ্যকরণ আরও স্পষ্ট জোরালো ও বিশেষত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাঙলার অন্যতম প্রথম শ্রেণী মুদ্রণশিল্পী নাভানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস মুদ্রণকর্মে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র এভিনিউ। দাম—তিন টাকা মাত্র।

◎ দেশে-বিদেশে ◎

আষাঢ়—১৩৬৬ (জুন-জুলাই, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৬ই জুন): ছয় দিবস ব্যাপী সিংহল সফর উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সদলবলে কলম্বো উপস্থিতি।

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন): কলিকাতা পৌরসভার বিশেষ অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

৩রা আষাঢ় (১৮ই জুন): প্রবল বর্ষণে আসাম ও ইম্ফলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত—বহু নদীতে জলোচ্ছ্বাস।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন): করিমগঞ্জ সীমান্তে পুনরায় সশস্ত্র পাক্ সৈন্যের হানা—পাথারিয়া অঞ্চলে গুলীবর্ষণ অব্যাহত।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন): মুসৌরিতে সাংবাদিক বৈঠকে দালাই লামা কর্ত্তৃক তিব্বত প্রশ্নের সমাধানকল্পে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্-লাই-এর বৈঠকে আগ্রহ প্রকাশ।

৬ই আষাঢ় (২১শে জুন): জব্বলপুরে শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক সামরিক যান নির্ম্মাণ কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

৭ই আষাঢ় (২২শে জুন): পশ্চিমবঙ্গে লেভী প্রথা ও খাদ্যশস্যে মূল্যনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রত্যাহার—সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

৮ই আষাঢ় (২৩শে জুন): ন্যূনতম বেতন আদায়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে পৌর কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চলিত ১৯৫৯ সালের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্রদের শতকরা ৪৪·৬৭ জন এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ২৬·৬৬ জন উত্তীর্ণ।

৯ই আষাঢ় (২৪শে জুন): দিল্লী পৌরসভার মেয়র পদে কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত করিয়া প্রোগ্রেসিভ দলের নেতা শ্রীত্রিলোকচাঁদ নির্ব্বাচিত।

১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন): মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে কলিকাতা ও মফঃস্বল অঞ্চলে সর্ব্বাত্মক হরতাল।

১১ই আষাঢ় (২৬শে জুন): নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠকে কেরল পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক অবস্থা বিশ্লেষণ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফরাক্কা বাঁধ অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় পরিবহন ও যোগাযোগ সচিব শ্রী এস কে পাতিলের সুস্পষ্ট আশ্বাস দান।

১২ই আষাঢ় (২৭শে জুন): ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক কেরলে নূতন নির্ব্বাচন (মধ্যবর্ত্তী) অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের আশ্বাসে পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা কর্ম্মচারীদের ৮ দিন ব্যাপী ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার।

দিল্লীতে কেরল পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সহিত কেরল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জরুরী বৈঠক।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন): নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির (৭০) হৃদরোগে বরাহনগরে জীবন-দীপ নির্ব্বাণ।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বৈঠকে প্রস্তাব—সাধারণ নির্ব্বাচনই কেরল সমস্যা সমাধানের একমাত্র গণতান্ত্রিক উপায়।

১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন): কাশ্মীর-সীমান্তে দুই জন ভারতীয় পাকিস্তানীদের দ্বারা অপহৃত।

পাঞ্জাব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ কর্ত্তৃক মহাশূন্যে ৪টি রকেট উৎক্ষেপণ।

১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই): জুন মাসে (১২ই জুন হইতে ৩০শে জুন) কেরলে সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে ২৪,১৬১ জন গ্রেপ্তার—কেরল সরকারের ইস্তাহার।

১৭ই আষাঢ় (২রা জুলাই): দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য গঠন আন্দোলন কালে আমেদাবাদে বিগত বর্ষে পুলিশ যে গুলীচালনা করে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া সরকারী তদন্ত কমিশনের (বিচারপতি শ্রী এস টি কোটওয়াল কমিশন) রিপোর্টে মন্তব্য।

১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই): নিকৃষ্ট ধরণের চাউল সরবরাহের অভিযোগে দমদম সেন্ট্রাল জেলে কয়েদীদের অনশন ধর্ম্মঘট।

১৯শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই): দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ আর জি মেঞ্জিসের পর পর বৈঠক।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই): অবিরাম বর্ষণের ফলে অবশিষ্ট ভারত হইতে কাশ্মীর উপত্যকা একরূপ বিচ্ছিন্ন।

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ফিলিপাইন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্ম্মাণী সফরে যাত্রা।

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের সভাপতিত্বে দিল্লীতে সর্ব্বদলীয় বৈঠক।

২২শে আষাঢ় (৭ই জুলাই): সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—ভারতে কোন তিব্বতী সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলিতে পারে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের (অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল-কুমার সিদ্ধান্ত) হস্তক্ষেপের পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের (কলিকাতা) ছাত্র ও অধ্যাপকদের অনশন ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই): আসাম সীমান্তের নূতন নূতন অঞ্চলে পাকসৈন্যের গুলীবর্ষণের সংবাদ।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত সমাজকল্যাণ ও অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টে সমাজকল্যাণ-কর্ম্মী সংস্থা গঠনের সুপারিশ।

২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): রাষ্ট্রপতির নিকট কেরল প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেরল সরকারের (কম্যুনিষ্ট) বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জ্জসীট) পেশ।

কেরল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীই. এম, এস, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের বৈঠক।

২৬শে আষাঢ় (১১ই জুলাই) : মণিপুরের তামেঙলঙ-এ নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মণিপুর চীফ কমিশনার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকা 'উপদ্রুত অঞ্চল' বলিয়া ঘোষিত।

সিমলায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের (কম্যুনিষ্ট) সাক্ষাৎকার।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) : কেরলে সরকার-বিরোধী আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে নির্বাচন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে কেরল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের ঘোষণা।

২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই) : কেরলে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে ১২ই জুন হইতে এক মাস মধ্যে ১৮০৪ জন দণ্ডিত।

জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহে (বিশেষতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল) ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিল প্রণয়ন।

২৯শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই) : প্রবল বর্ষণ ও ধ্বস নামার ফলে কালিম্পং মহকুমায় ৯ জন ফুটবল খেলোয়াড় সমেত মোট ৩২ জন নিহত হওয়ার সংবাদ।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : কেরল মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে কেরল রাজ্যপালের নিকট বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিমোচন সমর-সমিতির নেতা শ্রীমান্নাথ পদ্মনাভনের স্মারকলিপি পেশ।

প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতে কচ্ছের সদর ভুজ বহির্বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : ২৪-পরগণা জেলার বাগদা থানার একটি স্থলে পাকিস্তানী হানা—২জন ভারতীয়কে বলপূর্ব্বক অপহরণ ও তিনজন জখম।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : কেরল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কেরলের রাজ্যপাল শ্রীরামকৃষ্ণ রাওকে দিল্লীতে আহ্বান।

বহির্দেশীয়—

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন) : বার্লিন সম্পর্কে ৩৮ দিনব্যাপী জেনেভা সম্মেলনের অচলাবস্থা দূরীকরণে বৃহৎ চতুঃশক্তি (রুশিয়া, মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স) পররাষ্ট্র সচিবদের জরুরী গোপন বৈঠক।

৩রা আষাঢ় (১৮ই জুন) : ডারবানে একদল আফ্রিকান নারী বিক্ষোভকারীর উপর পুলিশের রাইফেল ও ষ্টেনগানের গুলী চালনা।

আইরিশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে মিঃ ইমন ডি ভ্যালেরা (ফিয়েন ফেল দলের নেতা) ভোটাধিক্যে নির্বাচিত।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন) : জার্ম্মাণী প্রসঙ্গে পশ্চিমী ত্রিশক্তির প্রস্তাব রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন) : বার্লিন ও জার্ম্মাণ প্রশ্নে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের জেনেভা বৈঠক ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত মুলতুবী।

৯ই আষাঢ় (২৪শে জুন) : মার্কিণ সামরিক ও পররাষ্ট্র নীতি না মানিলে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে না—আমেরিকান কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের রিপোর্ট।

১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন) : শ্রমিক ধর্ম্মঘটজনিত অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলম্বো বন্দরের কাজ চালু রাখার সৈন্যবাহিনী আহ্বান।

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন) : দুর্নীতি; অসদাচরণ ও অযোগ্যতার দায়ে পাকিস্তানে এ যাবত ২৭০ জন সরকারী কর্ম্মচারী (অধিকাংশই অফিসার) দণ্ডিত হওয়ার সংবাদ।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন) : ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ক্রিশ্চিয়ান হার্টারের সহিত সোভিয়েট প্রথম সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভের বৈঠক।

১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন) : দীর্ঘকালব্যাপী রাণা শাসনের পর নেপালে নূতন সংবিধান প্রবর্ত্তন—গণতন্ত্রের পথে নেপালবাসীদের জয়যাত্রার সূচনা।

প্রতিরক্ষাখাতে ১৯৫৯—৬০ সালের জন্য পাকিস্তানের ৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ।

১৭ই আষাঢ় (২রা জুলাই) : ফিনল্যাণ্ডের কারাগারে রুদ্ধ কক্ষে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৬ জন কয়েদী জীবন্ত দগ্ধ।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই) : গণপরিষদ বাতিল করিয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্ণো কর্তৃক ডিক্টেটরী ক্ষমতা গ্রহণ।

ফরাসী-পশ্চিম জার্ম্মাণ চুক্তি অনুসারে সার অঞ্চল পশ্চিম জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত।

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) : দুইটি কুকুর ও একটি খরগোস লইয়া মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত সোভিয়েট রকেটের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন।

করাচীর আন্তর্জ্জাতিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণকল্পে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮ লক্ষ ডলার ঋণদানের সিদ্ধান্ত।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই) : আমেরিকা ও রুশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ করিবে—মস্কো-এ সফররত মার্কিণ গভর্ণরদের নিকট সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের উক্তি।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই) : প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্ণো কর্তৃক নিজেকে ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষণা ও নূতন ইন্দোনেশীয় মন্ত্রিসভা গঠন।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) : বাগদাদে অনুষ্ঠিতব্য ইরাকী বিপ্লবের প্রথম বার্ষিক উৎসবে যোগদানে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক ইরাকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত কারখানাসমূহে ধর্ম্মঘট—পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের যোগদান।

বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতকে দুই দফায় ছয় কোটি ডলার ঋণদানের ব্যবস্থা।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : জেনেভা পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকে সারা জার্ম্মাণ কমিটি গঠনের সোভিয়েট প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তিত্রয় (বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) কর্তৃক অগ্রাহ্য।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : কিউবার বিপ্লবী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ফাইডেল কাষ্ট্রো ও কিউবার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ উরুটিয়ার পদত্যাগ।

নটগুরুর দেহরক্ষা

নটগুরু শিশিরকুমারের আকস্মিক দেহান্তর সমগ্র জাতির পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। শিশিরকুমারের মহাপ্রয়াণে কেবলমাত্র অভিনয় জগতই নয় বাঙলার সংস্কৃতির জগতও হারাল একজন দিকপাল মহারথীকে। শিশিরকুমারের মৃত্যু জাতীয় জীবনে যে কতখানি শূন্যতা এনে দিল তা ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। বাঙলার যে সকল কালজয়ী সন্তানদের কল্যাণে সংস্কৃতির ইতিহাসে এক-একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাসের হয়েছে সূচনা, সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালী পেয়েছে নতুন পথের সন্ধান সেই পথস্রষ্টা, ইতিহাসস্রষ্টা, যুগস্রষ্টাদের শেষ পুরুষ শিশিরকুমার। নব নব চেতনায়, চিন্তাধারায়, স্বপ্নে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে জাতীয় জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণে প্রতিভা-মনীষা-মেধার রাজ্য থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধিদের হয়েছে আবির্ভাব সেই প্রণম্য প্রতিনিধিকুলের শেষ প্রতিনিধি শিশিরকুমার। অসংখ্য মনীষীর সুমহান অবদানে যে বিরাট ঐতিহ্যের সৃষ্টি হ'ল শিশিরকুমার সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের শেষ দীপশিখা।

শিশিরকুমারের সৃজনীপ্রতিভা কেবলমাত্র অভিনয়কলার উন্নতি সাধনে বা নাট্যজগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তনেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র অভিনয় জগতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন শিশিরকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, জাতীয় দরবারে তাঁর অনবদ্য অবদান।

গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন লোকান্তরিত। অমরেন্দ্রনাথ দত্তও তখন জীবিত নেই, অমৃতলাল বসুও তখন বিদায় নিয়েছেন সাধারণ রঙ্গালয় থেকে। বলতে গেলে তখন একমাত্র দানীবাবু। অভিনেতা হিসেবে তিনি অসাধারণ ছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য কিন্তু নতুন সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর একেবারেই ছিল না। সাঙ্ঘাতিক অবস্থা তখন বাঙলাদেশের রঙ্গালয়ের। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নবীনচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষণায় ও মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, প্রভৃতির স্পর্শ প্রভাবে বাঙলার নাট্যজগতের যে বিরাট ধারার সৃষ্টি হয়েছিল সেই ধারা তখন নিরতিশয় ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এ হেন সময়ে অসাধারণ প্রতিভার আধার অধ্যাপক শিশিরকুমার এই অজন্মা রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করলেন। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয় নিজেই শুধু এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন অসংখ্য প্রতিভাধর শিল্পীকে, যাঁরা তাঁরই পদপ্রান্তে বসে অভিনয়ের অ-আ-ক-খ সম্বন্ধে পাঠ নিয়েছেন, নিয়ে এলেন অনেকানেক গুণী যাঁদের স্ব স্ব অবদানে রঙ্গমঞ্চের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল বহু গুণ রঙ্গমঞ্চ সাদর আহ্বান জানাল বহু সুধীজনকেও নাটক সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামতের জন্যে, শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে রঙ্গ জগতে গড়ে উঠল জ্ঞানী গুণীর এক বিরাট সমাবেশ। হাওয়া গেল বদলে, নটগুরু এনে দিলেন নতুন সম্ভাবনা, নতুন স্বপ্ন, নতুন উপহার। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনতা জয়মাল্য পরিয়ে দিল নাট্যাচার্যকে। শিশিরকুমারের জীবনেও ঘটল VINI—VIDI—VICI। বাঙলার রঙ্গালয়ের হ'ল এক স্বর্ণ যুগের শুভ উদ্বোধন।

শিশিরকুমার অভিনয়কলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করলেন, নাট্যজগতের আবহাওয়া দিলেন একেবারে বদলে, গতানুগতিকতার মূলে করলেন কুঠারাঘাত, নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী

সৃষ্টি করলেন নাটক রচনা করালেন, নতুন নতুন নাট্যকার সৃষ্টি করলেন। সুর যোজনায়, শিল্পসজ্জায়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সব দিক দিয়ে তাঁর নাট্যোপহার যুগান্তর সৃষ্টি করল। তাঁর কল্যাণে বাঙলাদেশ পেল বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, অমিতাভ বসু, শীতল পাল, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু লাহিড়ী, কঙ্কা, প্রভা, মালিনী শেফালিকা প্রমুখ দিকপাল শিল্পীদের, শিশিরকুমারের কল্যাণে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ পেল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরকার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শিল্প নির্দেশক চারু রায় ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম, ডহুর প্রমুখাৎ গুণীজনের সেবা।

অটল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, প্রখর পাণ্ডিত্যের আধার, সারস্বত সমাজের গর্ব ও গৌরব এই বিরাট পুরুষের মৃত্যুতে ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের যবনিকা পতন ঘটল। শিশিরকুমারের মৃত্যুতে বাঙালী যে সম্পদ হারাল বহু বছরের মধ্যে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। দেশ হারাল তার বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে, মাসিক বসুমতী হারাল তার একজন অশেষ শুভাকাঙ্ক্ষীকে, তার একজন অকৃত্রিম কল্যাণকামীকে, তার মতবাদের একজন বিশেষ সমর্থককে।

বর্তমানে, সারা জাতির কর্তব্য নাট্যাচার্যের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ভার গ্রহণ করা। অন্য দেশ হ'লে এ বিষয়ে আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করতুম, কিন্তু এ দেশে সরকার কই? এখানে সরকার বলতে যা বিদ্যমান, তা প্রকৃতপক্ষে সরকার শব্দটির ব্যঙ্গ। তাই এদেশের সরকারের কাছে কি আবেদন করব? যে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, চক্ষুলজ্জাহীন সরকার অতবড় বিরাট পুরুষের জীবদ্দশায় তাঁকে কোন সম্মানই দিল না, অত বড় প্রতিভাকে যথাযথ সমাদর করতে পারল না—যে ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শসেবী, তেজস্বীপুরুষের মৃত্যুতে সরকারপক্ষ থেকে কোনরকম শোক পালন করা হ'ল না, তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্যে সেই সরকারের কাছে আর্জি জানিয়ে মাসিক বসুমতী তাঁর বিরাট আত্মার অসম্মান কোনও দিনই করবে না। আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জনসাধারণের কাছে, যাদের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গিত, যাঁদের শ্রদ্ধার উত্তুঙ্গ আসনে

তিনি সমাসীন। অন্য দেশ হ'লে শিশিরকুমারের মত অসামান্য শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকেই অবলম্বন করা হোত। এ সম্বন্ধে আমাদের ভাববার কিছু থাকত না, কিন্তু এই স্বাধীন দেশে তা তো হবার নয়, সেইখানেই তো আমাদের সব চেয়ে বড় ব্যথা, সব চেয়ে বড় বেদনা, সব চেয়ে বড় হতাশা। তাই জনসাধারণ ছাড়া এ দুঃখ কার কাছে জানাব, জনগণ ছাড়া এ ব্যথা উপলব্ধি করবে কে—কারণ তারা প্রত্যেকেই সমান অংশে এই ব্যথার ভাগীদার। শিশিরকুমারের জন্মস্থান ও মৃত্যুস্থান জাতীয় সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইনষ্টিটিউটে, বিদ্যাসাগর কলেজে তাঁর যথাযথ স্মৃতিরক্ষা হওয়া উচিত, মহানগরীর প্রেক্ষাগৃহগুলির অর্থলোভী পরিচালকবর্গের কাছ থেকে প্রকাশ্যে কৈফিয়ৎ দাবী করা উচিত যে কোন সাহসে সেদিন তাঁদের প্রেক্ষাগৃহগুলি চালু রেখে এতখানি অকৃতজ্ঞতার ততোধিক অমানুষিকতার পরিচয় তাঁরা দিতে পারলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের শুনছি নটগুরুর নামানুসারে নতুন নামকরণ হবে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের নাম বদলে ঐ রাস্তার নামকরণ শিশিরকুমারের নামানুসারে হবে অনেকে বলবেন—ও রাস্তা রবীন্দ্রনাথের নামে হচ্ছে যে, আমরা বলব হোক না, শ্যামবাজারের মোড় থেকে বিবেকানন্দর মোড় পর্যন্ত শিশিরকুমারের নামে হোক, সেখান থেকে কলেজ ষ্ট্রীট সহ বউবাজারের মোড় পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙলার সাহিত্যপল্লী হোক রবীন্দ্রনাথের নামে, আর একটি রেখার উপর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্যতম প্রধান ভাবশিষ্য শিশিরকুমারের নামাঙ্কিত রাস্তা দুটির পাশাপাশি অবস্থান হবে সকল দিক দিয়েই শোভন। শিশিরকুমারের নামানুসারে শ্রীরঙ্গমের অদূরে নির্মীয়মান একটি পার্কের নামকরণের ও সেখানে তাঁর একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠেছে। জনসাধারণের দরবারে এই আমাদের বিশেষ অনুরোধ যেন তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রতিটি প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করে তুলুন বা নটগুরুর স্মৃতিরক্ষার জন্যে আরও যা যা ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সব বিষয়ও তাঁরা যত্নবান হয়ে এই উপেক্ষিত, অনাদৃত, অভিমানী অথচ বাঙলার রঙ্গালয়ের নতুন প্রাণের অমর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করুন।

মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পীর অমর আত্মার উদ্দেশে আমাদের প্রাণের প্রণাম নিবেদন করে কবিগুরুর ভাষায় বলি—

মরণ-সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি—

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী যে বিরাট ভারতবর্ষ—আমার জন্মভূমি, আবার মাতৃভূমি, আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যপবিত্র ভূমি—তার বিশিষ্টতার যেন শেষ নেই, সীমা নেই, ইতি নেই। ভারতবর্ষের মাটিতে মাটিতে বৈশিষ্ট্যের বীজ। ভারতবর্ষ শিল্প-সৌন্দর্যের 'দেশ এক কথায় (বিদেশীর কাছে বিশেষ করে) সব পেয়েছির দেশ। ভারতের প্রতিটি নগর-জনপদ-গ্রাম শিল্পসম্ভারে ভরপুর। ভারতের শিল্পপ্রাচুর্য বিদেশীর মনে জুগিয়েছে ঈর্ষা অন্যদিকে বিস্ময় ও সম্ভ্রম। ভারতের এই শিল্পরূপী মণিমাণিক্য বিদেশের দরবারে ভারতকে এক প্রধান আসনে অধিষ্ঠিত করেছে (অবশ্য এক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গগুলির অবদানও কম নয়)। অজন্তা ও ইলোরার নাম এই প্রসঙ্গে দাবী রাখে বিশেষ উল্লেখের। অজন্তা ও ইলোরা, যেখানে সৌন্দর্য শব্দটি অভিধানের বদ্ধ আবহাওয়া কাটিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভারতের ঐতিহ্যের এক মহিমান্বিত রূপ যেখানে পরিদৃশ্যমান, ভগবৎদত্ত শক্তির অধিকারী শিল্পী ও ভাস্করদের কর্মকুশলতার যেন অমলিন স্বাক্ষর। এই শিল্পীরা কালজয়ী ভাস্করগণও নমস্য।

সুদূর বাঙলা দেশের মেয়ে আমি। মাইলগত দূরত্বের বিরাট ব্যবধান, কিন্তু যেখানে হৃদয়ের যোগ সেখানে সে একান্ত নিকটে। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি অজন্তার গল্প, ইলোরার কথা। কত গল্পে দেখতুম অজন্তা-ইলোরার উল্লেখ, কত জনের মুখে শুনতুম অজন্তা-ইলোরার মাধুর্যের বর্ণনা, কত গ্রন্থে, কত পত্রিকায় দেখতুম অজন্তা-ইলোরার অনবদ্য শিল্পসম্ভারের নিদর্শনবিশেষ। এইভাবে হঠাৎ একদিন অনুভব করলুম যে অজন্তা-ইলোরা দেখার প্রবল এক ইচ্ছা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে আমার মনে। বছরের পর বছর কেটে যায়, নিজের জীবনের ইতিহাসও কত বিভিন্ন পরিবেশে কত বিভিন্ন রূপ নেয়, কত কিছু ওলটপালট হয়ে যায় চোখের সামনে দিয়ে কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় ভরে উঠতে থাকে এ জীবন, কত ঘটনা-কাহিনী অধিকার করে নেয় স্মৃতির মঞ্জুষা। তবু সেই ছেলেবেলা থেকে মনে যে দুর্বার বাসনা জেগেছে অজন্তা, ইলোরা নিজের চোখে দেখার, সেই বাসনায় এতটুকু ভাঁটা পড়ে না বরং যত দিন যায় অজন্তা ইলোরা দেখার অভিপ্রায় যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তীব্র ভাবে যেন আমায় আকর্ষণ করতে থাকে দূর থেকে অজন্তা আর ইলোরা, মানসচক্ষে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই অজন্তা আর ইলোরার হাতছানি।

ছায়াছবির জগতে নিজেকে যুক্ত করেছি, সেই ছায়াছবিকেই উপলক্ষ্য করে আমাদের যেতে হয়েছে বোম্বাই। সেখানে কাজ করতে হয়েছে, সেখানে বাসা বাঁধতে হয়েছে। চিরকালের জন্যে না হলেও কিছুকালের জন্যে বোম্বাইয়ের বাসিন্দা হতে হয়েছে।

অজন্তা ইলোরা দেখার বাসনা এই সময় আরও তীব্র হয়ে উঠল, মনে পড়ে, ঐ সময় কাজে অকাজে প্রায় সকল সময়ই কথায় ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ করে থাকতুম আমার বাল্যকাল থেকে অন্তরে লালিত এই ইচ্ছাটি।

কুমকুম শেষ হল। কাজের পর কিছুটাতো বিরতি, সাময়িক অবকাশ শুধু বিশ্রামই আনে না সঙ্গে সঙ্গে আনে এক অদ্ভুত আনন্দও। এই আনন্দকে উপভোগ করা চলেও নানা রকমে। বন্ধুবর বুলবুল (সুরেন্দ্র দেশাই) তখন জানালেন অজন্তা ইলোরা দেখার ব্যবস্থাদি তিনি করতে পারেন। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীসতীশ হোসালি তখন জলগাঁওয়ের (আরঙ্গবাদের কাছে) ডি, এস, পি অর্থাৎ Deputy Superintendent of Police. তাঁর কাছ থেকে অজন্তা-ইলোরা দেখার আমন্ত্রণ এল। বাবা, মনু

সতীশ এবং আমি তলগাঁওয়ে সতীশের বাঙলোতে কিছুদিন ছিলুম। ঐ সময় সতীশ আমাদের প্রতি যে কি যত্ন নিয়েছেন এবং আমাদের সুখ সুবিধের দিকে যে কতখানি লক্ষ্য রেখেছেন তার তুলনাই হয় না।

সতীশের বাঙলো থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলুম অজন্তা-ইলোরা অভিমুখে অর্থাৎ প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে, কবিগুরুর ভাষার পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়—আমাদের যাত্রা হল শুরু। আমাদের সকলের দৃষ্টি যা প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিল—বিস্ময়ে যা হতবাক করে দিয়েছিল আমাদের—যা আমাদের একেবারে আশ্চর্য করে দিয়েছিল, তা হচ্ছে এই অভিযানে বাবার অসাধারণ আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, বাবার সে কি স্ফূর্তি। প্রাণপ্রাচুর্যে, স্পন্দনে, উল্লাসে বাবা যেন ভরে আছেন, অনেক বছর পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোকে যেন আবার হাতের মুঠোয় তিনি পেয়ে গেছেন, অতীতের তারুণ্য যেন আবার নতুন করে বাসা বেঁধেছে তাঁর মধ্যে। বাবার সে যৌবনোচিত চাঞ্চল্য আমি কোনও দিন ভুলতে পারব না। এক অবর্ণনীয় গতিবেগে আমাদের অনেক পিছনে পিছনে ফেলে রেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন, বাস্তবিক—আমরা উঠতে উঠতেই দেখি, সে জায়গা পেরিয়ে আরও অনেকখানি তিনি এগিয়ে গেছেন। সেদিন আনন্দের এক অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যের অভিনব প্রকাশ দেখলুম বাবার মধ্যে।

অজন্তা-ইলোরা দেখলুম। দেখলুম চর্মচক্ষে, এতদিন যাকে মনশ্চক্ষে দেখেছি, আজ তাকে প্রত্যক্ষ করলুম চর্মচক্ষে, আবার প্রথম মুহূর্তে যাকে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করলুম, তার পরমুহূর্তেই তাকে দেখতে পেলুম মর্মচক্ষে। এতদিনের স্বপ্ন আজ দেখা দিল সার্থকতার রূপ নিয়ে। আশা পূর্ণ হল, চোখ ধন্য হল, মন মুগ্ধ হল। দেখলুম ভারতের অসামান্য শিল্পসম্পদ, শিল্পের মায়াপুরী, শিল্পের নন্দনকানন, শিল্পের মহাতীর্থ। আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেওয়াল চিত্রগুলি, ঐ দেওয়াল চিত্রগুলি আমার মন এতখানি অধিকার করেছিল তা বলে বোঝাতে পারব না ঐ দেওয়াল চিত্রগুলির প্রভাব আমার নতুন নতুন নৃত্যনাট্য রচনা করার সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করে, আমার চোখে আবার নতুন স্বপ্নের জন্ম দেয়, আমার জোগাতে থাকে অফুরন্ত অনুপ্রেরণা আর আমি তা করেও ছিলুম পরবর্তী বছরগুলিতে।

১৯৪০ সালটি আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় বছর। আমাদের জীবনে এর প্রভাব অমলিন, আমাদের জীবনের বহমান ধারা এক ভিন্নতর স্রোতে বইতে থাকল এই ১৯৪০ থেকেই, আমাদের জীবনের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি হলো এই ১৯৪০ এর কল্যাণে। ভাগ্যদেবতার মুঠো মুঠো আশীর্বাদে আমরা ভরে উঠলুম, পরম কারুণিকের অপার করুণায় আমরা ধন্য হলুম, জীবনের চলার পথের নির্ধারিত সীমানা পেরিয়ে এসে আরও বৃহত্তর পথে পদার্পণ করে আমরা পূর্ণ হলুম। শ্রীচিমনলাল দেশাই প্রস্তাব আনলেন যে এমন একটা ছবি করা যাক যার পরিধি, যার ব্যাপকতা, যার প্রসার হবে জগৎজোড়া। এবার শুধু ভারত নয়—সারা জগৎ, এতদিন শুধু ভারতের দরবারে চিত্রাঞ্জলি দিয়ে আসা হয়েছে। এইবার সেই অঞ্জলি পাঠাতে হবে জগতের দরবারে—এক কথায় যার পরিধি হবে আন্তর্জাতিক। ঠিক এই জাতীয় ছবি করার বাসনা মধুর মনে দীর্ঘকাল ধরেই বাসা বেঁধেছিল। বাঙালীর ছেলে মধু, অন্নপূর্ণা বাঙলা মায়ের সন্তান সে, স্বভাবতঃই দেশীয় সত্তার সে সর্বদেশের দরবারে উজাড় করে দিতে উৎসুক, ব্যাগ্র, উন্মুখ। আর বুলবুলের সঙ্গে তো আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাই ছিল সেই জন্যেই এই প্রস্তাবে সেও সম্পূর্ণরূপে সায় দিল। ছবির প্রযোজনার ভার গ্রহণ করলেন বোম্বাইয়ের ওয়াদিয়া মুভিটোনের মিঃ জে, বি, এইচ, ওয়াদিয়া। ছবির নির্মাণ কর্মে অনেক কীর্তিমান কুশলীদের নিপুণ হাতের স্পর্শ পড়ল। আলোকচিত্রের ভার গ্রহণ করে ছবির গল্পাংশকে রূপালী পর্দায় জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুললেন বাংলা দেশের দুই বিখ্যাত ও প্রবীণ চিত্রকর—একজন শ্রীযতীন দাস অন্যজন শ্রীপ্রবোধ দাস, সুরের মায়াজাল বুনে ছবির সারাটি অঙ্গে এক অনবদ্য রসসঞ্চার করলেন প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ, সম্পাদনার দুরূহ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন শ্যাম দাস, ছবির শিল্পের অলঙ্করণ ও শিল্পসজ্জার ভার নিলেন সুধাংশু চৌধুরী। ওয়াদিয়া মুভিটোনের মিঃ টাটাকে পাওয়া গেল রেকর্ডিংএর কাজে। প্রযোজক মিঃ ওয়াদিয়া এবং মিসেস ওয়াদিয়াও এগিয়ে এলেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের প্রগতিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, গোষ্ঠীর প্রতিটি কর্মীর জন্যে প্রাণভরা সহযোগিতা নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে, অনুপ্রেরণা নিয়ে। এই বিরাট পরিকল্পনার বাস্তব রূপদানরত প্রতিটি কর্মীর মনকে ওয়াদিয়া দম্পতির এই সহানুভূতিশীল মনোভাব যে কত গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল—তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশিরকুমার

করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূর সেই অতীতের রঙ্গের মাঝারে
গিরিশ অর্ধেন্দু আদি জ্যোতির্ময় আলো
প্রাকৃতিক নিয়মেতে গেলে পরপারে
অমানিশা দেখা দিল রঙ্গমঞ্চে কালো।
সেদিন ভাবেনি কেহ দীপ্তরবি নব নব
দেখা দিবে আর যার প্রদীপ্ত প্রভায়
রঙ্গভূমি মুগ্ধ যার দানে অভিনব
বিভায় কিরণে যার আলোক-সম্পাতে
প্রতীচী বন্দনা করে প্রাচীর গরিমা
কৃতী শিল্পী অসংখ্য যে নবধারাপাতে
জাগায় কল্পনালোকে গুরুর মহিমা।
বাচনে, প্রকাশে যার অপূর্ব সাধনা
দিকে দিকে শুনি যার জয়ধ্বনি বাজে
শিশিরকুমার সে যে মূর্ত আরাধনা

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ইতালি

এক

কুপেতে উঠেই পল্লব দেখে যুসুফ। যুসুফ বলে জর্মনে: Gott sei dank, mein Freund![১] ভাবছিলাম কত কী?

মানে? আমি আসব না?

কে জানে ভাই? সাক্ষাৎ শেক্সপীয়র যখন বলেছেন: সাবধান, প্রেমিক, পাগল ও কবি এদের মধ্যে চেনা যায় না কোনটা কে।

পল্লব হাসে: বলে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি আসব বলে যখন কথা দিয়েছি, তোমাকে দিয়ে টিকিট কিনিয়েছি।

যুসুফ এবার ধরে ইতালিয়ান বুকনি: L'amore é divina, ma terribile[২] কথা দিয়ে কথা ভাঙা কোন কথা যে হৃদয় দিয়ে হৃদয় ভাঙে দাদা! কিন্তু ঠাট্টা থাক। তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে।

ট্রেন ছাড়ল···

মিনতি?

হ্যাঁ। তুমি তোমার তাঁকে লিখে দাও যে আমি জানতাম না।

কী?

যে এরি মধ্যে তোমার হৃদয় তাঁর হয়েছে—তাঁর হৃদয় তোমার।

পল্লব ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বলে: খবরটা দিলেন কিনি, শুনি?

যুসুফ এবার ফরাসি বুকনি ঝাড়ে: Que vous ètes indiscvet, moncher![৩]

নাস্তানা নিশ্চয়ই?

তবু জেরা? শোনো, আমি সত্যিই দুঃখিত, বিশ্বাস করো।

দুঃখিত কেন?

তোমাকে তাঁর কাছছাড়া করলাম বলে।

তাতে কী? দুদিন বাদেই তো ফের দেখা হবে।

কে বলতে পারে ভাই? ঐ দুরন্ত কবিটিই কি ফের কুডাক ডাকেন নি—there is a tide in the affairs of men...?

পল্লবের বুকের মধ্যে কের ধ্বক করে ওঠে। মনে পড়ে বিকেল বেলা আইরিনের একটা কথা: যদি আর দেখা না হয়?

যুসুফ ঝটিতি হেসে বলে: ও কী? আমি স্বভাবে প্রগলভ জানোই তো—দুমদাম করে কখন কী বলি! না না, বিরহিণীর সঙ্গে বিরহীর দেখা হবে বৈ কি যখন ভরসা দিয়েছেন অকুতোভয়ে যে সে কবি নয়, কবিদের রাজরাজ দান্তে আলগিয়েরি:

L'amor che move il sole e I'altre stelle'[৪]

কেবল তবু তুমি তাঁকে লিখে দিও যে প্রেমময় এ ক্ষমতা জানা সত্ত্বেও আমি তাঁর পথের কাঁটা হয়েছি শুধু না জানার দরুণ।

পল্লব হাসে: ভয় নেই—সে নিজেই বলেছে আমাকে ইতালি ঘুরে আসতে।

খাঁচায় ঢুকতে না ঢুকতে দোর খুলে দেওয়া?

খাঁচাতত্ত্বের সে কী জানে শুনি যে চিরদিন গাছে গাছে কু কু করেই বেড়ালো?

যুসুফ ওর দিকে একটু চেয়ে বলে: একটু কোণঠেসা করেছ মানছি। বলেই হাই তুলে: একটু কফি আনানো যাক, কী বলো? সারাদিন যে ছুটোছুটি করিয়েছ! বলেই বোতাম টিপল।

উল্টো চাপ? রুষ কায়দা বুঝি?

অথ পরিচারকের অভ্যুদয়।

যুসুফ জর্মনে বলে: Bitte eine kaffekanne und Zwai tasse![৫]

Sofort, mein Herr![৬] বলেই অভিবাদন করে প্রস্থান।

যুসুফ অভিজ্ঞ হাসি হেসে বলে: একটি কফিপট তিন পেয়ালা ভরিয়ে দেয়, বন্ধু! অথচ দাম দিতে হয় দু পেয়ালার মাত্র! বলেই থেমে: কিন্তু জর্মন ট্রেনের এই দাক্ষিণ্যের কথা জানে কেবল—নিজের বুকে হাত রেখে—The duffer that has been taught to roam but not—পল্লবের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে—The duffer who sighs for home, sweet home!

পল্লব হেসে বলে: But who still entrains for Rome.

যুসুফও হাসে।

দুই

ওরা যখন রোমে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা আকাশে মেলে ধরেছে তার ঝিকমিকে পাখা। ট্রেন রোমের ষ্টেশনে থামতেই একটি সুরূপা সুবেশিনী মধ্যবয়স্কা ছুটে এসে যুসুফের দুই গালে চুম্বন করলেন। যুসুফ পল্লবকে তাঁর সামনে পেশ করে যথাবিধি হাঁকল: সিঞোর পল্লব বাকচি—সিঞোরীনা এলিওনোরা জেনোনি—আমার বহুদিনের বান্ধবী তথা দুর্দিনে আশ্রয়দাত্রী—l' attrice famosa e graziosa[৭]।

পল্লব যথাবিধি অভিবাদন করে ট্যাক্সি নিল।

Albergo Luna, per favore![৮]।

পথে মন ওর একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল ভাবতে যে মোহনলাল ও রিতা হয়ত ইতিমধ্যে এসে পড়েছে।

* * * *

হোটেলটি বড় নয় কিন্তু ছবির মতন সুন্দর। শহর থেকে একটু দূরে। সামনে একটি ছোট্ট বাগান লতায়-পাতায় ফুলে ভরা। জর্মনির কোলাহল ও শীতের পরে এ মনোরম উদ্যানবাটিকায় এসে পল্লবের কী যে ভালো লাগল—বিশেষ করে ইতালির নির্মেঘ আকাশ আর স্নিগ্ধ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে।

১। ভগবানকে ধন্যবাদ, বন্ধুবর!
২। প্রেম স্বর্গীয় বটে, কিন্তু ভয়ানক।
৩। এমন প্রশ্ন করে, বন্ধু?
৪। যে প্রেমের চির নির্দেশে ধায় তপন ও তারাদল।
৫। একটি কফিপট ও দুটি পেয়ালা, দয়া করে।
৬। এক্ষুণি, মহাশয়!
৭। প্রখ্যাতা ও কমনীয়া অভিনেত্রী।
৮। লুনা হোটেল, দয়া করে!

কেবল কোথায় মোহনলাল? লুনা হোটেলের অধ্যক্ষ কোনো খবরই দিতে পারল না। একলা পড়ে ফের ওর মন কেমন করে ওঠে আইরিণের জন্যে।

* * * *

ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুতে না শুতে ঘুম। স্বপ্ন দেখল: আইরিণ নাতাশার ওখানে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে, মাশা ও কাতিয়া সামোভার থেকে চা ঢালছে, আর নাতাশা এক কোণে দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে।

ঘুম ভেঙে গেল। আইরিণের কথা ভেবে ওর বুকের মধ্যে টন টন করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে নাতাশার কথা: আইরিণের ঘরে দুহাতে মুখ ঢেকে তার সেই কান্না, আর আইরিণের উক্তি: পারো তো ওকে ক্ষমা কোরো, ও বড় দুঃখ পেয়েছে। পল্লবের মনে বিষাদ ছেয়ে আসে···বেচারি নাতাশা!

তিন

পল্লব কুঙ্কুমকে রোমের ঠিকানা দিয়ে তার করল: মোহনলাল রওনা হয়েছে কি না জানিও, আমি তার জন্যে রোমে অপেক্ষা করছি। দু-দিন বাদে তার এল মোহনলালের কাছ থেকে: ইতালী যাওয়া পেছিয়ে গেল। চিঠিতে সব লিখছি।

কিন্তু চিঠি আসতে তো অন্তত এক সপ্তাহ। কী করা যায়? ভেবে-চিন্তে স্থির করল: অপেক্ষা করাই পন্থা যখন এসেই পড়া গেছে। রোজই ইচ্ছা হয় বার্লিনে ফিরতে, কিন্তু আইরিণকে ব'লে এসেছে যে নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে হবে একেবারে একলা! এখন সাত তাড়াতাড়ি ফিরলে মুখ থাকবে না। মনে মনে আওড়ায় বিষণ্ণ হ'য়ে: নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

* * * *

কিন্তু মানুষের মন তার উপর যৌবনের আরোগ্য শক্তি: পল্লব দু-তিন দিনের মধ্যেই খানিকটা ফিরে পেল ওর সহজ প্রফুল্লতা। কেবল একটি চিন্তা ওকে বেঁধে ক্রমাগতই: কুঙ্কুমের চিঠির উত্তর দিতে এত দেরি ও কখনো করে নি—চার পাঁচ দিন হ'য়ে গেল। একবার ভাবল আইরিণের কথা সব লেখে—কিন্তু তার পরেই আসে কুণ্ঠা: থাক্ এত তাড়া কী? মনটা আগে একটু স্থিরই হোক! তাছাড়া কুঙ্কুম সবে জেল থেকে বেরিয়েছে, তার উপর অসুস্থ—এ সময়ে কাজ কি ওকে 'শক্' ক'রে?

* * *

একলা একলা মন্দ লাগে না। দু-চার দিনের মধ্যে ওর মন আরো একটু সহজ হ'য়ে আসতে জনারণ্যের মধ্যে নিঃসঙ্গতার রস যেন আরো বেশি ক'রে পায়। তবে একেবারে নিঃসঙ্গ বলা যায় না—যেহেতু প্রত্যহ ঘণ্টা তিন-চার ক'রে কাটে যুসুফের সাহচর্যে। এলিওনোরার ভিলা রোম থেকে মাইল পনের দূরে, কিন্তু সে ভয়ে কম্পিত হয় যুসুফ হৃদয় বলত যুসুফ ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রগলভ ঢঙে। ব'লেই মুখে মুখে ছড়া কাটত গৈরিশী ছন্দে (বহু ভাষাবিৎ হ'লে হবে কী—ওর মাতৃভাষা তো বাংলাই বটে):

এলিওনোরার ঘরে আছে বন্ধু, দুইটি মোটর,
ভয় কারে আর?
সিনেমায় প্রাতঃকালে যায় সে দিনের পরে দিন
একটি মোটরে যায় বান্ধবী যখন—
বান্ধবেরে দেয় ধার দ্বিতীয় স্যন্দন খুশি মনে,
ধায় যে পেট্রোল বেগে সাড়ে সাত ক্রোশ
অবলীলাক্রমে সখা, অবলীলাক্রমে।
সব চেয়ে ভালো গণি এই ব্যবস্থারে
পরের মোটর যানে হওয়া ভ্রাম্যমান:
মোটরের ঝক্কি নাই, আছে শুধু ভ্রমণ বিহার!
চলো ভাই চলো
ইতিউতি—যথা প্রাণ চায়।
ঘণ্টা দুই প্রতিদিন করা যাক রোম-পরিক্রমা,
দেখি' রাশি রাশি ধ্বংসস্তূপ, কাটাকোম্,
জাঁকালো ঐতিহাসিক চিত্রশালা, গির্জা, ভ্যাটিকান
গথিক চ্যাপেল-আদি—যাহা পেশাদার টুরিষ্টের
স্বপ্ন লক্ষ্য ভবে—
যা দেখি' সে হয় কাল্চার্ড, লভে জ্ঞান,
যদিও কী মূল্য সেই কাল্চারের অথবা জ্ঞানের
জানে না কেহই আজো হায়!
তথাপি হবেই হবে দেখিতে সে-সবই,
যেহেতু এ সব দেখি' তবেই না যাযাবর উৎকৃষ্ট ভাকায়
মহাগর্বে ওঠে ফুলি,' ভাবিয়া—'দেখেনি
এ সব তো গৃহাসীন নিকৃষ্ট ভাকায়।'

পল্লব যতই যুসুফের সঙ্গে মেশে ততই যেন বোঝে বেশি ক'রে একটি কথা: হাসতে ও হাসাতে পারা জীবনে প্রায় একটি প্রতিভার সামিল। অথচ কেন যেন ওর মনে হয় যুসুফের হাসি একটা মুখোষ—Laughter veiled in tears—আর তাই জন্যেই ওর হাসি, রসিকতা হ'য়ে উঠেছে এমন সমৃদ্ধ!···

চার

যুসুফের সঙ্গে মোটরে ঘুরে ঘুরে পল্লবের ঝটিতি উৎকৃষ্ট ভাকায়ের পদবী লাভ হোক বা না হোক এই একটা লাভ হ'ল যে রোমের পথঘাট অনেকটা জানা হ'য়ে গেল। এছাড়া প্রত্যহ দু' তিন ঘণ্টা ক'রে ইতালিয়ান পড়তে পড়তে ইতালিয়ানে ফরাসি ভাষার মতন স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা চালাতে না পারলেও এ শ্রুতিমধুর সাঙ্গীতিক ভাষাটির মাধুর্যরসে ওর মন রসিয়ে উঠল। এখানে ওখানে ইতালিয়ানদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ওর কানও ক্রমশই খুশি হ'য়ে উঠতে থাকে—আর সঙ্গে সঙ্গে এ সুখপ্রিয় গান পাগল জাতটির গুণাগুণ সম্বন্ধেও ওর অনেক কিছু জ্ঞান লাভ হ'তে থাকে যার মধ্যে শুধু তথ্যই নেই, রসও আছে। যুসুফ মিথ্যে বলেনি: এক একটা ভাষা শেখা মানে মনবিহঙ্গের একটি ক'রে নতুন আকাশের খবর পাওয়া। তাছাড়া শহর হিসেবে রোমের সৌন্দর্যেও সত্যিই মুগ্ধ হ'ল। এখানে নেই বটে লণ্ডনের বা বার্লিনের পরিচ্ছন্নতা, পকেট কাটার উপদ্রব এখান দারুণ, রাস্তাঘাট পার হ'তে বেগ পেতে হয়, ট্রাফিক পুলিশের চিহ্নও কোথাও নেই, রেস্তর'াতে পরিচারকদের তৎপরতার একান্ত অভাব, যেখানে সেখানে পথিকদের ঝগড়া—এক কথায়, গোলমাল, বিশৃঙ্খলা, অসুবিধা

যেমনি সদানন্দ তেমনি সৌন্দর্যবিলাসী; যেমন মঞ্জুবাক্ তেমনি সহজিয়া। আইরিণের তাড়না না থাকলে এখানে ও সহজেই দুতিন বৎসর পরম সুখে কাটাতে পারত—নিশ্চয়ই পারত।

* * * *

কিন্তু তবু আট দশ দিন যেতে না যেতে ওর কেমন যেন মনে হ'তে থাকে—কী করছি এখানে? ছুটি? কিন্তু ছুটি যখন দীর্ঘায়িত হ'তে হ'তে লক্ষ্যহীন আলসেমিতে পরিণত হয় তখন বিবেক ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। ও স্থির করল—যদি এখানে মোহনলালের আসা পর্যন্ত থাকতেই হয় তাব অন্তত একটু ইতালিয়ান গান শিখলে মন্দ কি? কয়েকটা ইতালিয়ান গান ও বার্লিনেই শিখেছিল ওর শিক্ষক ও আইরিণের কাছে কিন্তু সে তো উপর উপর শেখা। এখানে একটু রীতিমত শিখলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়—ছুটির রসও সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে, বিবেকেরও মুখ চাপা দেওয়া হয়। সকালটা ইতালিয়ান পড়ে, দুপুরটা য়ুসুফের সঙ্গে ভ্রমণে কাটে, কিন্তু বিকেল আর সন্ধ্যায় করে কি? এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

* * * *

রোজ সন্ধ্যাবেলা পল্লব লুনা হোটেলে একাই খেতে বসত ডাইনিং রুমের এক কোণে। সেখানে পাশের টেবিলে দেখত একটি দীর্ঘাকৃতি, শ্মশ্রুবান, গৌরবর্ণ যুবককে। ওর মুখে কমনীয়তার সঙ্গে ছিল তেজস্বিতার আভা। পল্লবের ওর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ও পল্লবের সঙ্গে চোখোচোখি হলেই এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয় যে পল্লব ভরসা পায় না এগোতে। একদিন হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল: সিন্‌ভোরে-র নাম পাপিরো, এর বেশি কেউ কিছু জানে না—E molto researvato ১

দিনকয়েক বাদে য়ুসুফকে নিয়ে ভোজনকক্ষে ঢুকতেই চোখে পড়ে—'সিন্‌ভোর পাপিরো' দুপুর বেলায়ও হোটেলেই খাওয়া শুরু করেছে। য়ুসুফ ওকে দেখেই চাপা সুরে পল্লবকে বলে: রুষ।

যুবকটি নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিল, কারণ তৎক্ষণাৎ ওদের দিকে একবার তাকালো, তারপরে তাড়াতাড়ি আহার সমাধা করে উঠে চলে গেল। য়ুসুফ ওর পাইপ ধরিয়ে হেসে বলে: বেশ চেহারা না?

বেশ? Damning with taint praise? আমার তো মনে হয় ওর মুখ হ'ল তাই যাকে ফরাসীরা বলে distingue, নয়?

য়ুসুফ ভেবে বলে: তা বলা যায়। কিন্তু—

তুমি যে কী! সব তাতেই কিন্তু!

য়ুসুফ হাসে: বলে না—ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ডরায়?

আমার ঘর পোড়েনি। সুতরাং আমি চাই ওর সঙ্গে ভাব করতে!

উঁহঃ, ও ধরা-ছোঁওয়া দেবে বলে মনে হয় না। বলেই একটু থেমে: জোর করে বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয়—ও হয় কোনো দারুণ কাজ নিয়ে আছে, নয় তোমার মতন কোনো সমস্যায় পড়েছে।

আমি সমস্যায় পড়েছি—কে বলেছে? নাতাশা?

কেন?

না বলতেই হবে, আমি ছাড়ব না আজ।

য়ুসুফ একটু চুপ করে থেকে বলে: তুমি যখন ধরেই ফেলেছ—আর লুকিয়ে কী হবে? হ্যাঁ—বলেছে সেই যে সইতে পারে নি—তোমারই গান ভাই—'আপন বঁধুয়া আন ঘরে যায় আমারি আঙিনা দিয়া।'—না?

কী যে বলো যা তা। বলো—নাতাশা কী বলেছে?

অকথ্য কথা কিছু নয়। যা ঘটেছে তাই, আর কী?

বলল কবে? কখন?

আইরিণের শয়ন কক্ষে যে সীনটি হয়ে যায়—তার পরেই। বিকেল চারটেয় ও আমাকে টেলিফোন করে দেখা করতে বলে আসতেই হবে—অত্যন্ত জরুরি ইত্যাদি। কী করি? যেতে হল।

কী বলল?

এ ঠিক তোমারি মতন কথা হল। আমাকে যা বলেছে তোমাকে বলতে পই পই করে মানা করে দেয়নি নাকি? বলেই হেসে:

এই আর এক রীতি মেয়েদের সার্বজনীন। তোমাকে যা বলবে যেন ঘুণাক্ষরেও আমি না জানতে পারি, আমাকে যা বলবে তোমার কাণে উঠলেই সর্বনাশ! জানো না কি এখনো, হে ভুক্তভোগী?

জানি হে সবজান্তা! কেবল এইটুকু জানতেই বাকি তুমি এইমাত্র আমার সমস্যার কথাটা তুললে কেন? নাতাশার কাছে শুনে, নিজেরি আন্দাজ?

য়ুসুফ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলে: কী নাছোড়বান্দা! কী হবে বলো তো এসব কালতো কথায়? কল একটু হেসে: তুমি নিজেই বুঝবে একদিন।

কী? না, ছাড়ব না। অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।

আরে ভাই, আড়াল আছে বলেই তিন ভুবন চলছে।

যাও। তোমার সঙ্গে আড়ি। এরই নাম বন্ধু বটে!

য়ুসুফ পল্লবের হাতের উপর হাত রেখে বলে: আমি অনেক কিছু শিখেছি যে ঠেকে ভাই! আর একবার নয় বারবার। অনেক পোড় খেয়ে তবে বুঝেছি যে, গায়ে প'ড়ে বন্ধু তো বন্ধু প্রিয়তমা বান্ধবীকেও কিছু বলতে যাওয়া ভুল: তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি—শুধু যে বলে তার নয় যাকে বলবে তারও।

না। বলতেই হবে আজ। আমার লোকসান হয় হোক

য়ুসুফ একটু চুপ করে থেকে নিচু সুরে বলে: আমার মনে হয় তুমি ভুল করেছ আইরিণকে ছেড়ে এসে। তাই তো সেদিন ট্রেণে তোমাকে বলছিলাম আমার খেদের কথা—মানে তোমাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে।

কিন্তু ছিনিয়ে আনলে বলছ কেন? আমি তো এসেছি দুদিনের জন্যে বেড়াতে। নাতাশা বলে নি?

বলেছে, কিন্তু ভাই···বলব?

না বললে—

আচ্ছা আচ্ছা বলছি। বলে ফের পাইপে টান দিয়ে: আমার মনে হয় মানুষের জীবনে এক একটা লগ্ন একবারই আসে—দু'বার না জানি বলেই তাকেই যে সে-লগ্ন দেখলেই চিনতে পারে! এ সময়ে দুদিনের জন্যেও তোমার ওকে ছেড়ে এত দূরে আসা উচিত হয়নি।

১। উনি বড়ই চাপা প্রকৃতির মানুষ।

পল্লবের মনে ফের সেই অনামা শঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—আজ সাত আট দিনের মধ্যে আইরিণের একটি চিঠিও পায়নি, অথচ ও তাকে লিখেছে প্রায় প্রত্যহ ! ও য়ুসুফকে বলে একথা।

য়ুসুফ শুনে : হুঁ বলেই ফের পাইপ টানা শুরু করে।

হুঁ—মানে কী বলি তাই ভাবছি। তবে একটা কথা বলতে পারি যদি কথা দাও—কিছু মনে করবে না।

দিচ্ছি।

আমার মনে হয়, বলে য়ুসুফ থেমে থেমে, যে, তোমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যে-স্তরে পৌঁছেছে সে স্তরে হৃদয়ের পরামর্শ চাওয়াই ভালো—বিজ্ঞ বুদ্ধির নির্দেশে চলতে যাওয়া বোকামি।

বোকামি !

Folie, folie mon ami ! ফরাসী ভাষায় folie pure et simple. জর্মণরা যাকে বলে—Narrheit, Dummheit, ক্যাপিটাল হরফে, এদেশের ভাষায়—follia—আরো ভাষ্য করব কি ?

পল্লব গুম্। য়ুসুফ ওর পিঠে হাত রেখে কোমলকণ্ঠে বলে :—তাই তো বলছিলাম ভাই—জীবন এমন সময় আসে যখন প্রিয়তম বন্ধুর কথায়ও উল্টো উৎপত্তি হয়। আমি তো বলতে চাইনি।

না না। তোমার তিরস্কার আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। কেবল আমি কী করতে পারতাম বলো তো যখন—যখন আইরিণ নিজে জোর করল তার আদর্শের কথা ব'লে।

য়ুসুফ আরো নরম সুরে হেসে বলল ; ভাই, তোমাকে দেখে সময়ে সময়ে আমার বড় মায়া হয়। আর কেন জানো ? কারণ···বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, তবু এ সত্যি যে আমি এক সময়ে ছিলাম প্রায় তোমারই যমজ—মানে হিরো, আইডিয়াল, আর্ট এই সব বুলিকেই মনে করতাম পথের পাথেয়, তুফানে দিশারি।

পল্লব আহত সুরে বলে : বুলি ? তুমি কী বলছ য়ুসুফ ?

য়ুসুফের মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে ; বলছি ভাই, অনেক ঘা খেয়েই। কিন্তু এ ঘা খাওয়ারই আমার দরকার ছিল, নৈলে আমার হয়ত কোনো দিনই চোখ খুলত না—মানে, আমি এই পরম সত্যকে সত্য বলে চিনতে পারতাম না যে, ধোঁয়ার চেয়ে বাস্তব বড়—নীতিবাদের চেয়ে মানুষ। শোনো বলি আজ যা এতদিন বলি বলি করেও তোমাকে বলতে পারিনি—এই দ্বিধায় যে তুমি বুঝবে না বা ভুল বুঝবে। আজ হয়ত বুঝলেও বুঝতে পারো—আমি কী বলতে চাইছি।

ব'লে নিবন্ত পাইপ ফের ধরিয়ে ব'লে চলে :—বছর দশেক আগে যখন আমি তোমারই মতন 'সবুজ' ছিলাম এই ইতালিতেই ভালোবাসি একটি অষ্টাদশী সরলাকে। সে ধর্মে ছিল ক্যাথলিক—দেখতে সুন্দরী, নামটিও তেমনি মিষ্টি—মারিয়া।

তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ—ঠিক তোমার বয়স। তাই ভাবতাম—'সবুজ'দেরই মতন—যে জরাজীর্ণরা পুরোনো পুঁথির পাতায় যা যা লিখে গেছেন তারই নাম জ্ঞান দূরদর্শিতা—জীবনের অন্ধকারে আলোর এজাহার, আর এ সবের মধ্যে সেরা এজাহার—কোরাণের বাণী। ফলে আমি মারিয়াকে বলি ও মুসলমান না হলে আমাদের বিবাহ অসম্ভব। [illegible]

সবুজ। কাজেই মনে করত বাইবেলই একমাত্র সত্য। পরিণাম যা হবার আমাদের প্রেমের নর্মে ধর্ম এসে হানা দিল, আমি মারিয়াকে ছেড়ে চলে গেলাম অক্সফোর্ডে দর্শন প'ড়ে অশান্ত মনকে শান্ত করতে।

দর্শন পড়তে পড়তে মন আমার উঠল জেগে, কিন্তু দর্শনের কোনো বাণীর দরুণ নয়, তার মধ্যে কোনো বাণী খুঁজে না পাওয়ার দরুণ। হ'ল কি, দর্শন পড়তে গিয়ে দেখলাম দর্শন তা নয় তাকে যা ভেবেছিলাম—অর্থাৎ তার মধ্যে সত্য নেই আছে শুধু সত্য নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি।

এ মুনি বলছেন জগত বিকাশ পেয়েছে একটা আইডিয়া থেকে, ও-মুনি বলছেন জগত একটা নাম-না-জানা আলোর ছায়া, সে মুনি বলছেন এর সংগে ওর সংঘাতে থেকে জীবনের বিকাশ···ইত্যাদি। এক কথায় শুধু কথা—কথা—কথা ! ফলে আমার মন ক্লান্ত হ'য়ে হাল ছেড়ে দিল যখন দেখলাম এ-কথার ফুলঝুরির ঠাণ্ডা ফিনকিতে না আছে জীবনের তাপ, না পথ দেখাবার আলো। তখন বুঝলাম—হৃদয়কে ধর্মের বুলির চাপে পিষে মেরে কী দারুণ ভুল করেছি। মারিয়াকে অনুতপ্ত হয়ে লিখলাম যে আমি অন্যায় ভ্রান্তি বশে, যদি সে আমাকে ক্ষমা করে তবে তার কাছে ফিরে যাব। কিন্তু তখন ঐ যে বললাম, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে লিখল—সেও ভুল করেছে বাইবেলকে গুরু মনে করে, কিন্তু আর হয় না, তার শরীর মন ভেঙে গেছে—এক লম্পটকে বিয়ে ক'রে। শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখল : তোমাকে যদি বিবাহ করতাম তাহ'লে মুসলমান হয়েও সুখী হ'তাম, কারণ তাহ'লে ধর্ম থাকত বুলি হয়ে মনের নেপথ্যে—অন্ধকারে, সামনের জ্বলন্ত প্রেমের মিলনের পাদপ্রদীপ। আমি তৎক্ষণাৎ রোম রওনা হলাম, গিয়ে শুনলাম এলিওনোরার মুখে—যে মারিয়া টাইবারের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

এলিওনোরা !

হাঁ—এলিওনোরা মারিয়ার দিদি। তাই আরো ওর কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসি। এ লক্ষ্যহীন খুঁটিহীন জীবনে কেবল ওর দরদে ও স্নেহে যা একটু সাময়িক শান্তি না হোক—সান্ত্বনা পাই।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে কিন্তু বলেই থেমে যায়। য়ুসুফ বলে : তুমি কী বলতে যাচ্ছিলে আমি জানি। না, আমি বলি না দেশও ধর্মের মতনই ছায়াবাজি। কারণ ধর্মের পনের আনা কবিকল্পনা হ'লেও দেশ ঠিক তা নয়, তার অন্তত কায়া আছে—যাকে চোখে দেখা যায় দিনে দিনে, পলে পলে। কিন্তু তবু বলব জগৎজোড়া মানুষের প্রাণস্পন্দিত সত্যের তুলনায় দেশাত্মবোধের সত্য একেবারে ছায়া না হ'লেও সে-ধরণের প্রত্যক্ষ-গোচর সত্য নয়—যাকে বলা যেতে পারে 'কংক্রীট'—অপ্রতিবাক্য। অন্তত: মারিয়ার অকাল মরণের পর থেকে আমার কেবলই মনে হয়েছে, উঠতে বসতে, যে মাত্র একটি মানুষকে সুখী করার জন্যে যদি দেশকেও ছাড়তে হয়, তবে দেশের চেয়েও যে বড়, সবার বড়—মানে আমাদের অন্তরাত্মা, যে আছে বলেই জগৎ আছে—সে প্রসন্ন হ'য়ে আমাদের আশীর্বাদ করবেই করবে। আমি তার

কিছুই আসে যায়, থাকে কেবল একটি জিনিষ—হৃদয়। ব্যক্তিগত প্রেমের কেন্দ্র হ'ল এই হৃদয়, তাই ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে বড় এ-সংসারে কিছুই নেই। অন্ততঃ এই হ'ল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি—এখন পর্যন্ত। পরে এর চেয়ে বড় উপলব্ধিকে আয়ত্ত করব কিনা বলতে পারি না। তবে যেটুকু জানি বললাম—মানে আমার আজকের credo:

শুনতে শুনতে পল্লবের মনে বিষাদ ছেয়ে আসে। সে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে··বৃষ্টি নেমেছে···পাতায় পাতায় জেগে উঠেছে ঝর-ঝর শব্দ···যেন ওর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি। য়ুসুফও খানিক বাইরের আকাশে ঘনঘটার দিকে চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে। তার পর পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলে: ও কী? কী হয়েছে?

পল্লব হাসতে চেষ্টা করে: হবে আবার কী?

য়ুসুফ কোমল কণ্ঠে বলে: এই জন্যেই বলতে চাইনি ভাই। কী হবে দুঃখের কথা ব'লে? আঁধার দিয়ে আঁধার কাটে না। তাছাড়া—ব'লে একটু থেমে—

পরের অভিজ্ঞতা ধার ক'রে এমন মূলধন জোগাড় করা যায় না ভাই, যাকে জীবনের বাজারে খাটিয়ে মুনাফা মিলতে পারে।

কিন্তু কাজে আসে—অন্ততঃ কোনো কোনো সময়ে।

য়ুসুফ চিন্তিত সুরে বলে: আসে কি? জানি না। হয়ত কিছু কাজে আসতে পারে দৈনন্দিন লেনদেনের বেলায়—কিন্তু যখন আমাদের মূল শিকড়ে টান ধরে ভাই, তখন সে বেদনায় সত্যিকার আলো দিতে পারে এক আমাদের অন্তরাত্মা—অন্ততঃ আমি শুধু তাকেই মানি দিশারি ব'লে—বাইরের কাউকে নয়। ব'লে একটু থেমে:

বৃষ্টি থামল—আজ উঠি। হ্যাঁ, আমি এলিওনোরাকে বলব তোমার গান শেখার কথা। ওহো, দেখ দেখি—ভুলেই ব'সে আছি: কাল বিকেলে সে তোমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছে। চারটের তার মোটর আসবে তোমাকে নিতে। মনে রেখো, কেমন? কারণ কাল রবিবার, ওর ছুটি—আমি লাঞ্চে আসতে পারব না।

[ক্রমশঃ।

উন্মনা মেয়ে

শেফালি সেনগুপ্তা

উন্মনা মেয়ে নীল ঝিলমিল আকাশের দিকে চেয়ে
ভাবে দিনগুলো কিশোর বেলার অবসর কিছু পেয়ে।
এ সংসারের রুটিনে অবশ্য অবসর মেলা ভার
মিলেছে আজকে কি জানি কেন যে অনেক ভাগ্য তার।
ছন্দবিহীন নীরস কাজেতে বাঁধা সে যে দিনে রাতে
কাজের পরিধি যার শুধু ঘর কলতলা উঠোনেতে।
কাজ করছে তো জগতে সকলে কাজের অন্ত নাই
শুধু দেখা চাই সে কাজ কেমন স্বাদ কতটুকু পাই।
শত ব্যস্ততা তার মাঝেও তো অবাক পৃথিবী জাগে,
রূপ-রস-আশা-রং বাসনার ঢেউ অন্তরে লাগে।
একদা অতীতে জেগেছিল ঢেউ বধূর হৃদয়তটে—
পূর্ণ সে হিয়া শূন্য আজকে জোয়ার আসে না মোটে।
ঘর ঝাড়ামোছা, রান্না বাটনা, এঁটো বাসনের তলে
হৃদয়ের নদী হারিয়েছে গতি পাঁক ঘোলা কাদা জলে।
এই সংসার একখানি দাওয়া ঘর-স্বামী-ছেলেপুলে
অনেক অভাব ব্যাধি-লোভ-ক্ষোভ সব কিছু অবহেলে।
অলস ভাবনা ভাববে আরামে সে সময় কি সে পায়?
ভোর রাতে উঠে কয়লা ভাঙার কাজ কে বা বলো নেয়।
আরো আছে তার নিত্য ভাবনা অন্ন পাবো কোথায়?
জোড়াতালি মারা এত দারিদ্র্য। তবুও বাঁচতে হয়।
সে আছে বলেই এখনো এ ঘরে সৃষ্টির খেলা চলে
বিকৃত কামনা: তার স্বাক্ষর গুটি ছয় সাত ছেলে।
মনে করতে সে চায়নাকো তবু ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
মনে পড়ে তার শত স্মৃতিভরা মধুর অতীতটাকে।
দমকা হাওয়ায় উড়ে আসে যেন স্মৃতির ছিন্নপাতা
সেই রূপাদীঘি ছায়াঘন গ্রাম কিশোর কালের কথা।

উপকারী ইংরাজ

"সম্প্রতি কলিকাতা গড়ের মাঠ হইতে লর্ড রিপণের যে মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে কোন পত্রলেখক কোন সহযোগীকে লিখিয়াছেন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড রিপণের জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—তিনি যে ভারতীয়দিগের জন্ত বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু—The purity of his intentions, the loftiness of his ideals, the righteousness of his policy and his hatred of racial discriminations were an open book to the people of India. এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। লর্ড রিপণের মূর্ত্তিটি য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ভারতবাসীর অর্থে ভারতীয়দিগের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লর্ড রিপণ এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার কয় বৎসর পরে 'সঞ্জীবনী', পত্রে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়—ভারতবাসীরা লর্ড রিপণের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোন নিদর্শন দেন নাই। সেই পত্র উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি দেখেন তাঁহার স্বামীর হিসাবে রহিয়াছে—লর্ড রিপণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত সংগৃহীত কয় হাজার টাকা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ছিল। তিনি ঐ টাকা—চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের সহিত তাঁহার এটর্ণীর নিকট যথাস্থানে প্রেরণ জন্ত পাঠাইয়া দেন। এটর্ণী তাহা জানাইলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা উদ্যোগী হইয়া ঐ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া আনেন। কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঐ মূর্ত্তির বেদীটি উপহার দিলে—সরকারের অনুমতি লইয়া মূর্ত্তিটি কলিকাতায় গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু লর্ড রিপণ ইংরেজ বড়লাট ছিলেন আজ যখন ইংরেজদিগের মূর্ত্তি অপসারিত হইতেছে তখন—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।"

—দৈনিক বসুমতী।

বিশ্বভারতী

"রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আজ অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বভারতী পরিচালনার যে মূল পদ্ধতি ছিল, তাহারও যদি ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে তাহা কবিগুরুর দেশবাসীর পক্ষে সত্যই খুব বেদনার কারণ হইয়া উঠে। কবিগুরু নিয়মকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিতেন না, নিয়মানুগত্যের গুরুত্ববোধও তাঁহার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু নিয়ম অপেক্ষা হৃদয়বত্তাকে আরও ব্যাপক অর্থে বলা চলে মানবত্তাকে তিনি উপরে স্থান দিতেন। তাহার ফলে নিয়মতান্ত্রিক কাঠিন্যমুক্ত হইয়া আবহাওয়ার মধ্যেও একটা মুক্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। বিশ্বভারতীর পরিচালনে সেই বিশেষত্বটুকু বর্জিত হইবে না ইহা স্বভাবতই দেশবাসীর কাম্য। কিন্তু বিশ্বভারতীর যে সব সংবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তাহাতে সে বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সে কথা অকুণ্ঠভাবে বলিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। বিশ্বভারতীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে রীডার নিয়োগের ব্যাপারেও অদরদী মনের রূপ প্রকট হইতে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। অস্থায়ী তাঁহার উল্লেখ না করার মধ্যেই প্রার্থীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি অমনোযোগের ভাব রহিয়া গিয়াছে। তদুপরি নির্বাচিত প্রার্থীর সঙ্গত অসুবিধার কথাও সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচিত হইবে না, কবিগুরুর পুণ্য স্মৃতি জড়িত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একথা ভাবিয়া শুধু দুঃখিত নহে বিস্মিতও হইতে হয়। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহা কি আশা করা চলে না?"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

জুয়াচুরি

"ভুয়া লাইসেন্স বা পারমিট লইয়া লোক অসাধু ব্যবসা করে, মিথ্যা বিবরণ দিয়া কেহ কেহ নানা ব্যাপারে সরকারী ঋণ গ্রহণ করে, ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্ত টাকা আদায় করে, কিন্তু পরে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, এরূপ ব্যাপার ইতিপূর্বে অনেক ঘটিয়াছে, এখনও ঘটিতেছে। যাহাদের খোঁজ পাওয়া যায়, তাহাদের কেহ কেহ হয়তো ধরা পড়ে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়। কিন্তু এই সকল প্রতারণা বা ষড়যন্ত্র নিবারণের দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে কমই দেখা যায়। বিদ্যালয়ে উদ্বাস্তু ছাত্রদের নামে যত সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে তদন্তে ধরা পড়িয়াছে যে, তত প্রকৃত উদ্বাস্তু সে বিদ্যালয়ে নাই। ভুয়া লাইসেন্স পারমিটই হউক বা ঋণ অথবা সাহায্যের টাকাই হউক, সহজেই বুঝা যায় যায় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারিগণ যথেষ্ট তদন্ত না করিয়াই উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি এই সব ব্যাপারে কিছু সতর্কতা অবলম্বিত হইতেছে, তথাপি দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী বা লোকের অভাব নাই। এজন্ত যাহাদের মারফতে অন্যায়ভাবে অর্থ, লাইসেন্স বা পারমিট বাহির হয়, তাঁহাদেরও উপযুক্ত তদন্তের পরে কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।" —যুগান্তর।

আবার শিক্ষা-কমিশন

"পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনে আবার একটি শিক্ষা-কমিশন গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব শুধু নিরর্থক নয়, প্রকৃত শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া আমরা মনে করি। রাধাকৃষ্ণ কমিশনের মত আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ লইয়া গঠিত কমিশন আধুনিক কালে খুব কম হইয়াছে। এই কমিশনের রিপোর্ট ভারত সরকারের রাজনৈতিক নেতারা হুমায়ুন কবীরকে দিয়া পদদলিত করাইয়া ছাড়িয়াছেন। যে শিক্ষানীতি সারা ভারতে আজ প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে তাহা উচ্চশিক্ষা-সংহারের নীতি এবং রাধাকৃষ্ণ কমিশনের সুপারিশের

সিণ্ডিকেট অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে সরকারী নীতি মানিয়া নিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টের মর্য্যাদা তাঁহারাও দেন নাই। কোন প্রতিবাদও শোনেন নাই। এ বিষয়ে অধ্যাপক সমাজের যে দায়িত্ব ছিল তাহা পালনে ঐ সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তারাই বাধা দিয়াছেন। সিনেট কমিটিতে সরকারী শিক্ষা স্কীমের প্রতিবাদে যে আপত্তিপত্র (note of dissent) দিয়াছিলাম সেইটুকুও বাতিল করিবার জন্ত এই সম্মেলনের বর্ত্তমান সভাপতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এঁদের উপর অধ্যাপকদের কিরূপ আস্থা আছে তাহাও ঐ সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে সাদা ব্যালট পেপার পড়ায় বুঝা গিয়াছে। অধ্যাপক সমাজের একাংশ সক্রিয় ভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থার নীতিতে সাহায্য করিয়াছেন আর এক অংশ নিষ্ক্রিয় রহিয়া উহাদেরই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন—ইহাই আমাদের অভিযোগ। নূতন কমিশন গঠন ইহার সমাধান নহে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্যাটেলের কলঙ্কক্ষালনে যিনি ঢেঁড়া সই দিয়াছেন তাঁহাকে ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে আনা উহার কর্ম্মকর্ত্তাদের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

কেরালায় বিরোধী পক্ষের রূপ

"কেরালার কংগ্রেস, ক্যাথলিক গীর্জা, নায়ার সেবাসমিতি, পি-এস-পি, আর-এস-পি ও মুসলিম লীগ সংগ্রামীচক্র তড়িৎগতিতে কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার অবসান ঘটাইবার প্রাথমিক লক্ষ্যলাভে ব্যর্থতার আক্রোশে নিজেদের বর্ব্বরতার ভদ্রবেশ খুলিয়া ফেলিয়া আজ নির্লজ্জ হিংসাত্মক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিমোচন সমিতির নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে তদ্বির-তদারকের পর কেরালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্পর্দ্ধিতক্রুরতায় বীভৎস চিৎকার ছাড়িয়াছেন—অহিংসা, শান্তি প্রভৃতির কোনও আব্রু রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই; যে কোন প্রকারে সরকার দখলে অগ্রসর হও! এই নূতন নির্দ্দেশ অনুসারে কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই গত কয়দিন সংগ্রামীদের কার্যকলাপে তাহাদের এতদিন গোপন করিয়া রাখা বিষদন্তের বিকট রূপটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা মূঢ় উন্মত্তায় যে সমস্ত কাজকর্ম্ম, করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদিরিপাদ কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যদি অন্য কোনও রাজ্যের বিরোধী দলগুলি এই ধরণের হিংসা ও হিংসাত্মক কার্য করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কী করিতেন? সকলেরই জানা আছে যে, ভারতের অন্ত যে কোন রাজ্যসরকার যদি কেরালা সরকারের ন্যায় আইন-শৃঙ্খলায় গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইতেন। সংবিধানের নির্দ্দেশও ইহাই। কিন্তু কেরালায় সম্পর্কে তাঁহাদের আচরণে আগাগোড়া এমন কিছু দেখা যায় নাই যাহাতে মনে এই নিশ্চিন্ততা আসিতে পারে যে, দেশের সংবিধানের অথবা গণতন্ত্রের ও পার্লামেন্টারী প্রথার মর্যাদা রক্ষার জন্ত তাঁহাদের মনে এতটুকু উদ্বেগ রহিয়াছে।" —স্বাধীনতা।

বর্দ্ধমান পৌরসভার নানা কীর্তি

"বর্দ্ধমান পৌরসভার অবহেলিত অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত পানীয় সরবরাহ, রাস্তা নির্মাণ ও ড্রেণ ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা পৌরসভা করিতেছেন না। এই অঞ্চলগুলি পৌর এলাকাভুক্ত হইয়া কেবল মাত্র ট্যাক্সের বোঝাই বহিয়া আসিতেছে। এতদঞ্চল হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণেরও কোনরূপ হাঁ চা নাই। দলীয় রাজনীতির পোষণ ও দল রাখিতেই পৌরসভার অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। পৌরসভার এই অঞ্চলগুলির করদাতাগণের পক্ষ হইতে পৌরসভার এই নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা এই এলাকাগুলির করদাতাগণকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্ত আবেদন জানাইতেছি।" —বর্দ্ধমান।

রাতারাতি বাড়ী উধাও!

"সিউড়ী সহরের উপকণ্ঠে সিউড়ী-দুবরাজপুর পাকা রাস্তার পাশে একটি পাকা বাড়ী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট কর্ত্তৃক (P. W. D.) নির্ম্মিত হয়। বাড়ীটি রাস্তার পাশে, সুতরাং এই পথে যাহারা সদা-সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, এই নবনির্ম্মিত সুদৃশ্য সরকারী ভবনটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল, এই বাড়ীটি রাতারাতি উধাও হইয়াছে। যে ঠিকাদার ইহা নির্ম্মাণ করেন—তিনিই রাতারাতি স্থানীয় বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের যোগসাজসে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু এই বাড়ী সংলগ্ন কুয়াটি এখনও রহিয়াছে দেখা গেল! তাহা কেন উধাও হইল না বুঝা গেল না! জানা গেল, পূর্ব্বাহ্নে স্থান নির্ব্বাচনের অনুমতি ঊর্দ্ধতন মহল হইতে না লইয়া স্থানীয় বিভাগীয় কর্ত্তারা ইহা নির্ম্মাণের আদেশ দেন। ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন ও চাপিয়া ধরেন। ফলে ঠিকাদার বিভাগীয় কর্ত্তাদের সহিত যোগসাজসে রাতারাতি ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই দৃশ্য দেখিয়া সাধারণ মানুষ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছে—ইহা কি হইল? সরকারী বাড়ী যখন রাতারাতি উধাও হইতে পারে, তখন এই রাজ্যে সবই সম্ভব! এই বাড়ী তৈরী ও ভাঙ্গার খেসারত কাহার পকেট হইতে যাইবে তাহা জানা না গেলেও গাই-বাছুরে মিল থাকিলে নাকি মাঠে গিয়াও গরুতে দুধ দেয়! এইরূপ প্রবাদ আছে। এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে বলিয়া গুজব শুনা যাইতেছে! জেলা-শাসক মহাশয় এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইতে পারে!"

—বীরভূম বার্ত্তা।

অসহায়তার সুযোগ

"আসানসোলের নিকটস্থ বগুড়া উদ্বাস্তু শিবিরের চতুর্দ্দিকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকায় সম্প্রতি একদল গুণ্ডা প্রকৃতির লোক নিয়মিত রাত্রিতে ক্যাম্পে হানা দিয়া অসহায় মহিলাদের ভয় দেখাইয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। কয়েকটি পরিবার এইভাবে সর্ব্বস্ব নিঃস্ব হইয়াছে বলিয়া সংবাদে জানা গেল। প্রকাশ, ক্যাম্পের প্রহরারত দারোয়ান মহিলাদের আবেদন সত্বেও গুণ্ডাদলের আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যোগী হয় না। ক্যাম্পের মহিলারা অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে। অপর এক সংবাদে প্রকাশ, সরকারী নিয়ম উপেক্ষা করিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় ৩০টি পরিবারের ডোল বন্ধ এবং কয়েকজনকে ট্রানসিট ক্যাম্পে প্রেরণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কয়েকজন মহিলা জানান যে, স্থানীয় রিলিফ

অফিসার মহিলাদের প্রতি সর্ব্বসময় অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্যাম্পের মহিলারা অসহায় অবস্থায় আপন ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।”

—আসানসোল হিতৈষী।

গণতন্ত্র না পাপতন্ত্র?

“বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধুচক্রে বড় বড় রাজকর্ম্মচারী জড়াইয়া পড়িবার পর নানাস্থানে অধস্তন কর্ম্মচারীদেরও তুল্য ব্যভিচার কাহিনী শুনিতে হইতেছে। কামিনী ও কাঞ্চন লইয়া সর্ব্বত্র যে পাপচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, অসহায় দেশবাসী শুধু তাহা জুল জুল করিয়া চাহিয়াই দেখিতেছে। প্রতিকার করিতে সাহস নাই, হয়ত সদিচ্ছাও নাই, আছে শুধু আন্দোলন ও শ্লোগান—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। বিদ্রোহ করিবে? কর, সে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু কিসের বিদ্রোহ? কাহার বিরুদ্ধে? বলিতে পার? পাপের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিতে হয়। সমাজ হইতে দুর্নীতি স্বজনপোষণ চুরি জুয়াচুরি মুনাফাখোরী কালোবাজারী—এই সব পাপ নির্ম্মূল করিতে হইলে ধর্ম্মবিশ্বাসী হইতে হইবে—পার্টিপলিটিক্স এ পাপ দূর করিতে পারিবে না। কেরলে আজ যে ষড়যন্ত্র এক হইয়া কম্যুনিষ্টদের ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ানো হইতেছে, উহারও মূলে তো ঐ রাজনীতির খেলা! আজ যদি পাপের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম প্রমাণিত হয়, তবে ধার্ম্মিক জনতা পাপশাসনের অবসান নিশ্চয়ই চাহিবে। কিন্তু তৎপূর্বে যে সব দল সংগ্রামে ঝাঁপাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই বলিতে হইবে—আমরা সারা দেশ হইতে পাপের রাজত্ব দূর করিতে বদ্ধপরিকর। সর্ব্বত্র পাপ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত পাপের প্রবল প্রতাপ। আন্দোলন করিতে তো হইবেই—সারা দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন কর। ঘুষ, চোরাকারবার, ব্যভিচার—নির্ম্মমহস্তে বন্ধ কর।”

—পল্লীবাসী (কালনা)।

টেষ্ট রিলিফ, মন্ত্রী, এম-পি, জেলাশাসক

“প্রচার দপ্তর, সরকারী দপ্তর থেকে আরম্ভ করে স্বয়ং জেলা শাসকমশায় পর্য্যন্ত সকলে প্রায় এক সুরে এ সম্পর্কে একটা অদ্ভূত রহস্যজনক মনোভাব দেখিয়েছেন। টেষ্ট রিলিফ সম্পর্কিত কোন খবর জেলাশাসক সরাসরি আমাদের দিতে চাননি। সারা জেলা ঘুরে এসম্পর্কে খবর নেবার জন্যে তিনি আমাদের সদুপদেশ দিয়েছেন। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকার জেলা পরিক্রমারত ষ্টাফ রিপোর্টার সরকারী দপ্তর থেকে অনুরূপ ব্যবহার পেয়েছিলেন বলে আমরা জানি। জেলাশাসকের মতে এসব খবর নাকি কাগজে সরকারী ভাবে দেওয়া যায় না। অথচ অন্যান্য বছর টেষ্ট রিলিফের কাজের খতিয়ান দিয়ে এত ইস্তাহার আমাদের কাছে এসেছে যে তা আমরা ছাপিয়ে শেষ কোরতে পারিনি। আমরা জানি না এবছর রহস্যময় টেষ্ট রিলিফ কোন সুড়ঙ্গপথে অথবা শূন্যমার্গে হচ্ছে কি না—প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত প্রান্তরে সে কাজ হবার খবর আমরা এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। টেষ্ট রিলিফের কাজ আজকাল মিলিটারী সিক্রেসীর মধ্যে গণ্য হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হবার কারণ যথেষ্ট হয়েছে, তা না হলে সে খবরটিক [illegible]

লুকোচুরি মনোভাব কেন? এই অবস্থায় আমরা কার কথায় বিশ্বাস করবো? মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা ভাষণ বলে অভিহিত না করলে জেলাশাসকের ওপর ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ প্রতিপালনে গড়িমসি মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করতে হয়। কিন্তু নির্দ্দেশ যাকে দেওয়া হয়েছে তিনি নির্দ্দেশ পেয়েছেন কি না কিংবা পেলে প্রতিপালনে বাধা কোথায় অথবা ওপরতলা থেকে নির্দ্দেশ না পৌছানোর কারণ কি, যতক্ষণ না জানতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। প্রতিশ্রুতি এবং কাজের সামঞ্জস্য রেখে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করা হোক, এটাই আমাদের মূল বক্তব্য।”

—জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

ক্যানাল ট্যাক্স

“সরকারের ক্যানেলের জলের ট্যাক্স ধার্য্য করিবার একটি বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে। ক্যানেলের জল পাইবার পূর্ব্বে চাষী বিঘা-প্রতি যে হারে ফসল পাইতেন তাহার উপরে ক্যানেলের জল পাইয়া যে উদ্বৃত্ত ফসল পাইতেছেন সে উদ্বৃত্ত ফসলের বাজার-দর হিসাব করিয়া যত টাকা হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত সরকার ট্যাক্স ধার্য্য করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ফসলের দর এত বেশী হইয়াছে যে ঐ রূপ বাঁধা-ধরা হিসাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিলে চাষীকে আরও বেশী টাকা ট্যাক্স দিতে হয়—সেই জন্য সরকার হইতে প্রতি বৎসর এক একটি এলাকার জন্যে বিভিন্ন ভাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হয়। কোথাও একর-প্রতি ৫৷৷০ টাকা কোথাও ৭ টাকা আবার কোথাও ৭৷০ টাকা পর্য্যন্ত ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে। অবশ্য এই ট্যাক্স প্রতি একর বা ৩/০ বিঘা ভূমির জন্য ধার্য্য হইয়াছে। যে সমস্ত চাষী মৌয়াক্ষী নদীর জল-ধারার সুযোগ পান এবং যাঁহারা এই জলের সুযোগে ঠিক সময় মত চাষের জল পাইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে চাষ-আবাদ করে যাহাদিগকে কেত্তেরার জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না—যাহারা খাদ্য উৎপাদন জন্য যত বার ইচ্ছা ততবার জল পাইয়া থাকেন, তাহারা এই ট্যাক্স দিতে কাতর নহে। সময় মত সরকারের এই ট্যাক্স আদায়ে অব্যবস্থার জন্যই বরং এই সমস্ত চাষীরা বিশেষ ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং এককালীন আদায় দিতে কষ্টকর হইবে মনে করে।”

—সেবা (সিউড়ী)।

ধর্ম্মাদায় বা বৃত্তির টাকা অনাদায়?

“বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ যে, এখানকার ব্যবসায়ী মহল নাকি বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ধর্ম্মাদায় বৃত্তির টাকা দেন নাই। উক্ত টাকাটা তাঁহারা নাকি নিজ নিজ মূলধনে নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অন্যায় এবং ক্ষোভের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, বৃত্তির টাকা কাহারো ব্যক্তিগত ধন নয়, উহা সম্পূর্ণ জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থ। অতএব উক্ত অর্থ জনকল্যাণমূলক কার্য্যে ব্যয়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখানকার ব্যবসায়ী মহলে দৈনিক প্রায় লক্ষ টাকার লেন-দেন চলে বলিয়া প্রকাশ, সুতরাং বিগত কয়েক বছরের হিসাব ধরিলে একটা মোটা রকম অর্থ অন্যায় ভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে। ব্যবসায়ী মহলে

কাশে জমা দিয়া মানবত্তাবোধের পরিচয় দেন। এবিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্ষিপ্রদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—মালঞ্চ (আসানসোল)।

শিক্ষা ও শিক্ষকত্ব

"একদালে খৃষ্টান মিশনারী শিক্ষকদের আন্তরিক চেষ্টায় ভারতবাসী সুশিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বেলুড়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের আন্তরিক চেষ্টায় ফলেই বেলুড় দেশবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। উন্নত ধরণের শিক্ষার জন্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের এতদিন যে সুনাম ছিল সামান্ত কয় বছরের মধ্যে বেলুড়ের নিকট প্রেসিডেন্সি কলেজের সে গৌরব ম্লান হইতেছে। সমাজের দুর্নীতি অথবা রাষ্ট্রের অব্যবস্থা বেলুড়ের শিক্ষকশ্রেণীর আন্তরিকতায় নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। পশ্চিমবাংলার শিক্ষক সমাজ বেলুড়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় কর্তব্য যথাযথ পালন করিলে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ শিক্ষকের যোগ্য মর্য্যাদা দান করিতে এবং তাঁহাদের দাবী মানিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। মাদ্রাজের শিক্ষকশ্রেণী বা অন্তান্ত রাজ্যের শিক্ষকদের বেতনের হার কত তাহাও বিবেচনা করা দরকার। আশা করি, সব দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষক সমিতি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।"

—বীরভূমবাণী।

শোক-সংবাদ

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

বর্তমান বাঙলার তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, বাঙলার নাট্যজগতের নবযুগের স্রষ্টা, প্রতিভা-মনীষা-মেধার দিকপাল বরপুত্র পরম শ্রদ্ধেয় নটগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ী গত ১৪ই আষাঢ় সোমবার রাত ১-২০ মিনিটে ৭০ বছর বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। ১২৯৬ সালের ১৬ই আশ্বিন মাতুলালয়ে সাঁতরাগাছির স্বর্গীয় হরিদাস খাঁ ভাদুড়ীর ছয় পুত্র ও এক কন্তার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ শিশিরকুমারের জন্ম। ১১১৩ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। অল্পকালের মধ্যেই ঐ বিভাগের সিনিয়ার অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন। ১১২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গালয়ে পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাঁর প্রথম অভিনয়যুক্ত নাটক আলমগীর (তখন নাম ছিল ভীমসিংহ)। ১১৩০ সালে সসম্প্রদায়ে শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেন, সেখানে "সীতা" নাটকটি তিনি মঞ্চস্থ করেন। শিশিরকুমারের প্রতিভার স্পর্শসংযুক্ত যে অসংখ্য নাটক নাট্যজগতে যুগান্তর এনেছে, তাদের মধ্যে সীতা, আলমগীর, দিগ্বিজয়ী, নরনারায়ণ, মাইকেল মধুসূদন, রীতিমত নাটক, প্রফুল্ল, ষোড়শী, সাজাহান, চিরকুমার সভা, বিরাজ বৌ, রঘুবীর, জীবনরঙ্গ, শেষরক্ষা, পরিচয়, বিজয়া, সিরাজদ্দৌলা, সধবার একাদশী, চন্দ্রগুপ্ত, দুঃখীর ইমান, মিশরকুমারী, রমা, তখ্‌ত-এ-তাউস প্রমুখ নাটকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের আদিযুগ থেকেই ঐ জগতের সঙ্গে শিশিরকুমারের যোগাযোগ, নির্বাক যুগে মোহিনী, কমলে-কামিনী, আঁধারে আলো, বিচারক এবং সবাক যুগে পল্লীসমাজ, সীতা, দস্তরমত টকী, চাণক্য, পোষ্যপুত্র প্রভৃতি ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয় দেশবাসী দেখতে পেয়েছেন—এদের মধ্যে আঁধারে আলো, পল্লীসমাজ, সীতা, দস্তরমত টকী, চাণক্য ছবিগুলির পরিচালকও তিনিই ছিলেন। ১৯৫৬ সালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং গত ১০ই মে মহাজাতি সদনে নাট্যাচার্যের জীবনের শেষ অভিনয়। বর্তমান বছরে নটগুরুকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। বলা বাহুল্য, চিরউন্নতশির নাট্যাচার্য "খেতাব" এই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে সারা বাঙলার মুখ উজ্জল করেন। শিশিরকুমারের লোকান্তরে দেশ শুধু যে একজন বিরাট অভিনেতাকে হারাল, তাই নয়—তাঁর দেহত্যাগে বাঙলা দেশ এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে, প্রখর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক পূজনীয় পুরুষকে, বাঙলার রঙ্গমঞ্চের এক অনন্যসাধারণ যুগপ্রবর্তককে হারাল। এই জাতীয় ক্ষতি পূর্ণ হবার নয়। (নটগুরু সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা রঙ্গপট বিভাগে দ্রষ্টব্য)।

তুলসী লাহিড়ী

বাঙলার বিখ্যাত নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী গত ৭ই আষাঢ় ৬৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বাঙলার নাট্য ও চিত্রজগত সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁর সেবা পেয়ে এসেছে ও তাঁর অবদানে রঙ্গজগতের নানাদিক ভরে উঠেছে। নলডাঙার বিখ্যাত জমিদার-বংশে এঁর জন্ম। তুলসীবাবুর কর্মজীবন শুরু হয় রংপুর কাছারির আইন ব্যবসায়ী হিসেবে, আলীপুর আদালতে কিছুকাল তিনি ওকালতী করেন। ১১৩০ সালে শিল্পজগতে প্রবেশ করেন সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে (এইচ, এম, ভি) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ আর্ট থিয়েটারের "পোষ্যপুত্র" নাটকের সুরকাররূপে। অভিনেতারূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের ভূমিকায়। তারপর তাঁর প্রতিভা নানাভাবে বিকশিত হতে থাকে, চিত্র-কাহিনীকার, নাট্যকার, অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রপরিচালক ও নাট্যপরিচালকরূপে। বাঙলাদেশের অসংখ্য নাটক ও ছায়াছবি এঁর প্রতিভার স্পর্শ বহন করছে।

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

তুলসী লাহিড়ীকে বাঙলা দেশ যেদিন হারাল সেই দিনই আরও একজন শক্তিমান অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর নাম প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। ইনি তুলসী লাহিড়ীর মতই প্রথমে সুরকাররূপে চলচ্চিত্র জগতে যোগ দেন ও পরে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বোম্বাই চিত্রজগতেও সুরকাররূপে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ছবির কাহিনীকাররূপেও বাঙলার চিত্রলোক তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি জীবনের অর্ধশতাব্দী পূর্ণ করেছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীমতী আশা রায়ের 'বৌদ্ধ পঞ্চশীল' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীহেম সমাজদার মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করলাম। তাঁর সমালোচনা ঐতিহাসিক সত্যকে বর্জন করে ধর্মান্ধতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে পুনরালোচনা কতদূর সমীচীন হবে জানি না। তবুও কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। সমাজদার মহাশয়ের দৃষ্টিতে যাই প্রতিভাত হোক না কেন, বিশাল হিন্দুশাস্ত্র এক দিনে গড়ে ওঠেনি। বিশ্ববিধানের নিয়মানুবর্তনে তার রচনায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। 'বুদ্ধ-জন্মের হাজার হাজার বছর আগে হিন্দুধর্মের শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছে' সমালোচকের এ উক্তি পাঠ করে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ হাস্য সংবরণ করতে পারবেন না। ভারতে আর্য অভিযানের আরম্ভ খৃঃ-পূঃ বিংশ শতকের আগে নয় এবং বুদ্ধের আবির্ভাব খৃঃ-পূঃ পঞ্চ ষষ্ঠ শতকে! আর্য ঋষিরা ভারতের মাটিতে বেদ রচনা করেন। ঐতিহাসিকগণ বৈদিক যুগের বয়ঃক্রম নির্ণয় করেছেন খৃঃ-পূঃ ১৫০০ হতে খৃঃ-পূঃ ৫০০ শতক। বেদে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মিত্র বা সূর্যের উদ্দেশে স্তব-স্তুতি, পূজা-যজ্ঞ ও বলিদানের নির্দেশ। শীলাচারের উল্লেখ তাতে নেই। উপনিষদই সর্বপ্রথম বৈদিক স্তুতি ও প্রার্থনার সীমা অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় সত্তার কথা বলে এবং উপলব্ধির জন্য শম দম তিতিক্ষার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে নির্দেশ সীমিত হয় বিজ্ঞ আত্মসন্ধানীদের মধ্যে, গণমানসে তার রেখাপাতের কোন প্রমাণ নেই। সুদূর অতীতে কালের বিবর্তনে যখন ভারতের ধর্মজীবনে ও সমাজ-জীবনে গ্লানি নেমে আসে, ধর্মের নামে অধর্মের এক বীভৎস রূপ আত্মপ্রকাশ করে, অবাধ পশুহত্যায় এবং শিথিল হয়ে আসে নীতির বাঁধন। অনাচারের আঘাতে, তখন ভারতের নিপীড়িত আত্মা তৃষিত চাতকের মত সে দুর্দশার অবসান প্রার্থনা করে। সে-ই যুগসন্ধিক্ষণে বুদ্ধ প্রবর্তন করেন পঞ্চশীল মন্ত্র। বলা বাহুল্য, এ মন্ত্র ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সামাজিক ও ব্যৈক্তিক জীবনে কল্যাণের উৎসরূপে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীমতী রায়ের উক্তি একটুকুও অসংগত নয়। প্রাক-বুদ্ধযুগের শীল-তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে শ্রী সমাজদার মহাশয় পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলির জন্ম হয় খৃঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতকে। তাঁর তিন শ' বছর আগে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধ কি ভাবে পঞ্চশীলের জন্য তাঁর কাছে ঋণী হলেন সমালোচক বলতে পারেন কি? প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ও পুরাণ শিরোমণিরূপে সম্মানিত শ্রীমদ্ভাগবতে ঐতিহাসিক বুদ্ধ প্রসঙ্গে উক্তি রয়েছে। এ সব উক্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এদের রচনাকাল বুদ্ধজন্মের হাজার হাজার বছর আগে কি ভাবে নির্ণয় করলেন তা সমালোচক বলবেন কি?

কেবলমাত্র শীলসাধনায় অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আয়ত্ত হয় এবং সত্যের উপলব্ধি হয়—এ কথা বৌদ্ধধর্মের কোথাও বলা হয় নি। শীল চারিত্রিক শুদ্ধির জন্য। শীলের সাধনায় চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ হলে চিত্ত সমাধিভাবনায় অনুকূল হয়। সমাধিভাবনায় অগ্রসর হলে লোভ দ্বেষ মদ মাৎসর্যাদি রিপু মনে স্থান পায় না এবং মন কলঙ্কমুক্ত হয়ে সৌন্দর্যে সুষমায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এতাদৃশ মনে প্রজ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, তার শুভ্র আলোয় জাগে স্তরে স্তরে নির্বাণের উপলব্ধি। এর বিশদ আলোচনা অঙ্গুত্তর নিকায়ের রোহিতস্স বগ্‌গে না, রয়েছে বিশেষভাবে নিকায় গ্রন্থসমূহের মধ্যে। সমালোচকের উক্ত বিশুদ্ধিমার্গ পরবর্তী যুগের রচনা, পিটকের অন্তর্ভুক্ত নয়। বৌদ্ধধর্মে গুরুবাদের স্থান নেই। ভগবান বুদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—তথাগত নিজেকে সঙ্ঘের পরিচালক ভাবেন না এবং তাঁর কাছে সঙ্ঘের আত্মনিবেদনও কামনা করেন না। তিনি আরও বলেছেন—অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞ সরণা। বৌদ্ধশাস্ত্রে নিবৃত্তির পরে আর কোন উল্লেখ নেই, সমালোচকের এ উক্তি নিতান্ত অবান্তর। 'নিব্বাণং পরমং সুখং অজাতং অজরং অমতং যোগকখেমং নিব্বাণং' ইত্যাদি উক্তিসমূহ সমালোচককে অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। মহামানব বিবেকানন্দ যে তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—Buddhism is the fulfilment of Hinduism, সে বাণীকে সমালোচক ব্যঙ্গভাষায় ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাস বা কৈতববাদ বলে অভিহিত করেছেন। এ উক্তি স্বামীজীর উদার বাণীর উদ্দেশে ধর্মান্ধ মনের বিষোদ্গার ছাড়া কিছুই নয়। স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন উপনিষদের সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের চিন্তা বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে বুদ্ধের মৈত্রী করুণার উদার আদর্শে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতের বুকে সংস্কৃতির যে বিরাট আণবিক বিস্ফোরণ হয়েছিল, তা শূন্যে মিলিয়ে যায়নি। ভারতে তথাকথিত বৌদ্ধধর্মের সমাধি হয়েছে বটে, কিন্তু সেই বিরাট সংস্কৃতি অন্তর্হিত হয়নি, তার ভাবধারা ভারতবাসীর অবলম্বিত ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। সমালোচকের কাছে তা দুর্বোধ্য হলেও সত্যসন্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছে দিনের মত উজ্জ্বল। আর অধিক আলোচনায় পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। সমালোচককে উদার দৃষ্টি নিয়ে অনাচ্ছন্ন মনে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করি।—শীলানন্দ ব্রহ্মচারী বমুনগর, মধ্যমগ্রাম।

পত্রিকা সমালোচনা

১৩৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বসুমতী পাইলাম। অশেষ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আমরা দীর্ঘদিন হইতে বসুমতীর ভক্ত পাঠিকা। বসুমতী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে মায় আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সহিত এবাড়ীর যোগাযোগ চলিতেছে। আমরা বোধ হয় বর্ণপরিচয়-এর সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক বসুমতীর সহিত পরিচিত। প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে মা-সি-ক-ব-সু-ম-তী, বানান করিয়া পড়িয়াছি এবং প্রতি মাসেই মা-কাকিমার বসুমতীর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠা দেখিয়া ভিতরে ভিতরে নিজেরাও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছি। পিওনের কাছ হইতে এই বই কে মা-কাকিমার দরবারে পৌঁছাইয়া দিবে এই লইয়া ভাইবোনেদের মধ্যে রীতিমত দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া যাইত। মাসিক বসুমতী তাহার জন্মকাল হইতে এ তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের গৃহে শুধুমাত্র আমাদের গৃহেই বা কেন সমস্ত ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকার কাছে এইরূপ সমাদরের পাত্রী। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছেন, সেই বই-এর আগমন যখন অকারণেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল তখন মনের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া উঠিল। বিশেষ আপনার পরিচালনায় ইহা আরও মনোজ্ঞ আর চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। এবছরের 'বর্ণালী' প্রতি মাসেই মনের পরতে পরতে নানা বর্ণের ছটায় আলোকিত করিয়া তোলে। এক এক সময় মনে হয় মেয়ের কলমে এত জোর এত রস? কি অপূর্ব্ব ভাষা। স্বচ্ছ নয় কিন্তু সুন্দর সুলেখা দেবীকে আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তাঁহার "জিজ্ঞাসা" খুব ভালো লাগিয়াছিল, তাহার পর 'মিত্রাও' মনের কোণায় চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া গিয়াছে, আর বর্ণালী? বর্ণালীর ত কথাই নাই সুলেখা দেবীর সোনার দোয়াত-কলম হোক, আমরা যেন তার আরও লেখা পাই এই কামনা। এমাসে বর্ণালী নাই দেখিয়া আমাদের মনের আকাশেও বর্ণাভাব ঘটিয়া কিঞ্চিৎ মেঘ দেখা দিয়াছে। আগামী মাসের অপেক্ষায় উদগ্রীব হইয়া আছি। এছাড়াও আছে "ইন্দ্রাণীর প্রেম" অপরূপ ইনা মীনা যেন চোখের সামনে তাহাদের নব প্রেমের আনন্দ-বেদনা লইয়া চোখের সামনে নাচিয়া বেড়ায় আরও আছে 'বন কেটে বসত' 'চম্পা তার নাম' কোনটা বাদ দিয়া কোনটা লিখিব? শুধু কি আমাদের? বাড়ীর কর্ত্তা ব্যক্তিরাও উদগ্রীব কম নয় 'আনন্দ বৃন্দাবন' 'অখণ্ড নিমাই' এবং চারজন মানে প্রথম হইতে শেষ পাতার বেঙ্গল কেমিক্যাল পর্য্যন্ত সবটা পড়িয়া তবে ক্ষান্ত হই। কাহার ঘর হইতে কে বইখানি চুরি করিয়া আগে পড়িবে তাহার প্রতিযোগিতা চলে। মায় এ বসুমতীর দৌলতে পাড়ায় বিস্তর বান্ধবীও যোগাড় করিয়াছি বসুমতী পড়িতে দিবার লোভ দেখাইয়া। কি অনুরাগ সকলেরই এই বইখানির প্রতি! প্রথমে B. K. Banerjeeর নামে এবং পরে P. K. Banerjee মানে আমার স্বামীর নামে এই বই আমার শ্বশুরবাড়ীতে বোধ হয় বসুমতীর প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা হইতে এবাড়ীতে আসিতেছে। তাই গত মাসে না পাইয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়ি, আবার তেমনি এমাসের পুনরায় যখন পাঠাইলেন তখন যেন আনন্দের অবধি রহিল না। সেই আনন্দরই কিছু অংশ কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে জানাইলাম। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। বিনীতা, মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়। C/o. P. K. Banerjee. M- 46192. Hakim para, Jalpaiguri.

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ছয় মাসের জন্য চাঁদা পাঠাইলাম।—S. S. Basu, Bombay.

বৈশাখ—আশ্বিন এই ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৭.৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম।—Tripti Basu, Aminabad, Lucknow.

গত বৈশাখ ১৩৬৬ সাল হইতে মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—সুজাতা রায়, মালদহ।

১৫৲ টাকা পাঠাইলাম, এই বছরের গ্রাহক করিয়া লইবেন।—Mira Choudhury, Calcutta.

বৈশাখ হইতে আগামী চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম।—বকুলরাণী দেবী, Bombay.

Please accept subscription for Monthly Basumati for 6 months from Jaistha 1366 B. S. —Manjusree Ghose, Bombay.

মাসিক বসুমতীর আরও ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম।—বাসন্তী ভট্টাচার্য্য, United Mikir & N. C. Hills.

বৈশাখ – আশ্বিন ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। পত্রিকা অবশ্যই পাঠাইবেন।—A. C. Chakravorty, Mongher.

ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ৭.৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। আশা করি সত্বর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের তিন সংখ্যা পাইব।—শ্রীপ্রভাবতী দেবী, দিনাজপুর।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত চাঁদা পাঠাইলাম।—Mrs. Purnima Chakravorty, New Delhi.

Herewith Rs. 15/- being the subscription for Basumati for the current year. Please send the Baisakh, Jaistha and Ashar issue of Basumati. Mrs. Anjali Ghose, Patna.

I am sending Rupees fifteen only as the annual subscription for Masik Basumati.—Mrs. Bani Guha, Nagpur.

Subscription for Monthly Basumati from Baisakh to Aswin. Please send the magazine regularly.—Mohammad Hydar Ali, Murshidabad.

১৩৬৬ সন বাংলা মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Hiranmoyee Kundu, Cacher.

Subscription for 1366 B. S. amounting Rs. 15/- is sent herewith.—Rekha Banerjee, Calcutta.

বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। পূর্ণ সেট মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sudharani Choudhury, Cacher.

জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক সংখ্যার সডাক মূল্য বাবদ ৭.৫০ টাকা পাঠাইতেছি। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Anima Banerjee, Calcutta.

ভক্তি-পরীক্ষা

—স্বর্গত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত

(একটি দুষ্প্রাপ্য পেন্সিল স্কেচ)

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী
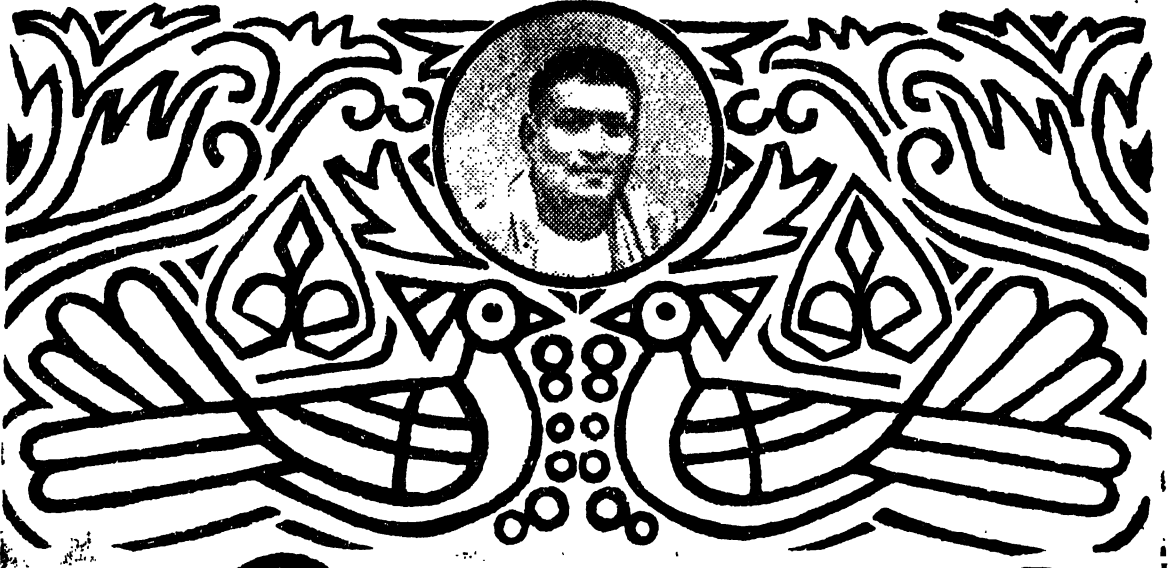
৩৮শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৬ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

১৯১৬ খৃঃ, মঠে দুর্গাপূজা। শ্রীশ্রীমা সপ্তমী পূজার দিন দুপুরে মঠে আসিয়া উত্তর পাশের বাগানবাড়ীতে আছেন। অষ্টমীর দিন সকাল বেলা আটটা-নটার সময় মঠ ও প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রান্নাঘরের পাশের 'হলে' ভক্তেরা ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণ অনেকে কুটনো কুটিতেছিলেন। মা দেখিয়া বলিতেছেন, "ছেলেরা ত বেশ 'কুটনো কুটে'!" জগদানন্দজী বলিলেন, "ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই হল উদ্দেশ্য, তা সাধন-ভজন করেই হোক্, আর কুটনো কুটেই হোক।"

এই দিনে বহু লোকে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে বার বার গঙ্গাজলে পা ধুইতে দেখিয়া যোগীনমা বলিয়াছিলেন, "মা, ওকি হচ্ছে? সর্দ্দি করে বসবে যে।"

মা বলিলেন, "যোগেন, কি বলবো, এক একজন প্রণাম করে যেন গা ঠাণ্ডা হয়, আবার এক একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিনে।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, এক একজন প্রণাম করলে তোমার খুব কষ্ট হয়, একবার পূজার সময় তোমার এই কথা শুনেছিলুম।"

মা বললেন, "হাঁ, বাবা, এক একজন প্রণাম করলে যেন বোলতায় হুল ফুটিয়ে দেয়। কাউকে কিছু বলিনে।" এই কথা বলিয়াই সস্নেহ দৃষ্টিতে বলিলেন, "তা বাবা, তোমাদের বল্ছি না।"

আমি বললাম, "মা, ভয় হয়, তোমার মত মা পেয়েও কিছু যেন হল না মনে হয়।"

মা—"ভয় কি বাবা, সর্ব্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন—'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষ কালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।'"

"যে যা খুসী কর না কেন, যে যে ভাবে খুসী চল না কেন, ঠাকুরকে শেষ কালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত-পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা ত ছুড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।"

একবার ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে দেখি—ছবি হইতে একটা আলোর স্রোত নৈবেদ্যের উপর পড়িয়াছে। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যা দেখি সে কি মাথার ভুল, না সত্যি? যদি ভুল হয় তবে যাতে মাথা ঠাণ্ডা হয় তাই করে দাও।"

মা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না বাবা, ও সব ঠিক।"

আমি—"তুমি কি জান, কি দেখি?"

মা—"হাঁ।"

আমি—"ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই তা কি ঠাকুর পান? তুমি কি তা পাও?"

মা—"হাঁ।"

আমি—"বুঝবো কি করে?"

মা—"কেন গীতায় পড় নাই—ফল, পুষ্প, জল ভগবানকে ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।"

এ উত্তরে বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি তুমি ভগবান?" এই কথায় মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও হাসিতে লাগিলাম।

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা হইতে।

বৌদ্ধ দেবী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলা দেশের দেবী-পূজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা আমরা নানা ভাবে বলিয়া থাকি। হিন্দু তন্ত্র-পুরাণাদিতে গৃহীত বহু দেবীকে আমরা বৌদ্ধ দেবী বলিয়া সন্দেহ করিতেছি। হিন্দু দেবী তারাকে আমরা বহুরূপে হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে পাই; এই তারা দেবী যে বৌদ্ধ তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী, সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত। হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রে এবং বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে এই দেবীর বর্ণনায় সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পূজিতা প্রসিদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম—পর্ণ (হলুদ পাতা) পরিহিতা পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ 'সাধন-মালায়'ও দেখিতে পাই। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় আমরা বেতাল-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ তন্ত্রেও বজ্র-বেতালীর সন্ধান পাই। মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে শক্তির মায়ূরী, অপরাজিতা, বারাহী, ভীমা, কপালিনী, কৌবেরী প্রভৃতি নাম পাই, বৌদ্ধ 'সাধন-মালা'র মধ্যেও মহামায়ূরী, অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভীমা কপালিনী, কৌবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। চণ্ডীতে শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী 'শিবদূতী' নামে খ্যাতা, বৌদ্ধতন্ত্রে মহাকালের সহিত যুক্তা দেবীকে 'কালদূতী' নামে দেখিতে পাইতেছি।১ প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধতন্ত্রের 'যমদূতী'র কথাও স্মর্তব্য। ছিন্নমস্তা হিন্দু দশমহাবিদ্যার এক বিখ্যাত মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধতন্ত্রে কালিকা দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহাকালের সহিত সংশ্লিষ্টা; ইঁহার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, দ্বিভুজা, অগ্নিকোণস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অন্যহাতে অস্ত্র। আলীঢ় ভঙ্গিতে ইনি শবের উপর দণ্ডায়মানা।২

এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্রাদিতে যে-সকল দেবীর নাম পাইতেছি, হিন্দু ধর্মে তাহাদিগকে গৃহীত হইতে দেখিলেই আমরা সাধারণভাবে একটা কথা বলিয়া থাকি—এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ দেবী—বৌদ্ধধর্ম হইতেই হিন্দুধর্মে তাঁহারা গৃহীত হইয়াছেন।

কিন্তু এই বৌদ্ধদেবী শব্দের অর্থ কি? বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লেখ পাইলেই কি সে দেবী বৌদ্ধ দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধতন্ত্রগুলিকে বৌদ্ধ বলিবারই বা তাৎপর্য কি? দেবদেবী সাদৃশ্য, বর্ণিত সাধনার সাদৃশ্য এবং গুহ্য যোগবিধির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দুতন্ত্রগুলি হইতেই নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধতন্ত্রগুলির রচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই হিন্দুতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে৩ আমরা এ জিনিসটি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে মূলে হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া কোনও জিনিস নাই, মূল দর্শনে এবং সাধনায় এই উভয়বিধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধন-ধারার সহিত বিভিন্ন কালে হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব যুক্ত হইয়া ইহাকে হিন্দুতন্ত্রের রূপ দান করিয়াছে, আবার পরবর্তী কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবদেবী ও পূজা-অর্চনাবিধির কথা যদি ধরা যায় তবে দেখিব—উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবী, উপদেবী, ডাকিনী-যোগিনী, যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পূজা-বিধি বা ধ্যান-অর্চাবিধি স্থান পাইয়াছে। এই সব দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর হিন্দু-দার্শনিক তত্ত্ব বা বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার জন্যই আস্তে আস্তে বিশদবর্ণনায় বিগ্রহবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সে-কথা আমরা স্বীকার করি না, এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজস্তরের মানসিক প্রবণতায় বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত স্থানীয় দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রসিদ্ধি হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতেছি। বৌদ্ধ সাধন-মালায়৪ যে সকল দেবীগণের উল্লেখ পাইয়াছি দেবী হিসাবে বজ্র, শূন্যতা, করুণা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞা প্রভৃতি কতকগুলি চিহ্নাঙ্কন ব্যতীত প্রচলিত হিন্দুদেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পরিকল্পনা দেখিতে পাই তাহার সহিত পরোক্ষ ভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের 'ধ্যান'-পরিকল্পনা এবং যোগাশ্রিত মহাযানের ধ্যান-পরিকল্পনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু আসলে হিন্দু দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাস যেরূপ, বৌদ্ধ দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অনুরূপ।

অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে হইবে। এই বৌদ্ধতন্ত্রের প্রচুর প্রসার ঘটিয়াছিল মহাচীনে—অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের কিছু অঞ্চল এবং নেপাল-তিব্বত-ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে; ফলে এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধা কিছু কিছু দেবীগণ বৌদ্ধতন্ত্রে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ বৌদ্ধতন্ত্রের মারফত হিন্দু তন্ত্রাদিতেও দেবী বলিয়া গৃহীতা এবং স্বীকৃতা হইয়াছেন। তারা বা উগ্রতারা বা একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবী বলিয়া ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বিশ্বাস।৫ পর্ণশবরী দেবীও এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই গৃহীত বলিয়া কাহারও কাহারও মত।৬ হিন্দুতন্ত্রে বর্ণিত ষটচক্রের অধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকিনী, শাকিনী দেবীগণের সকলে না হইলেও কেহ কেহ মহাচীনাঞ্চল হইতে গৃহীতা বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমানে আমরা বহু সংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্রের সন্ধান পাইতেছি;

১। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-লিখিত **Buddhist Iconography** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

২। ঐ, ১২২ পৃষ্ঠা।

৩। এই লেখকের **An Introduction To Tantric Buddhism** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

৪। গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, দুই খণ্ড।

৫। **Cultural Heritage of India**, চতুর্থ খণ্ডে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত **Evolution of the Tantras** প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ৬। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখিত 'সাধন-মালার' ভূমিকা এবং **Buddhist Iconography** বইখানি দ্রষ্টব্য।

তিব্বতী অনুবাদ হইতে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা। মূলতন্ত্রাদির উপরে টীকা-টিপ্পনীর সংখ্যাও কম নয়। বাঙলা দেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল, এ সত্য আজ ঐতিহাসিক তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই তন্ত্রসমূহ এবং তাঁহাদের উপরে রচিত অনেক টীকা-টিপ্পনীর বাঙলা দেশে এবং তৎসংলগ্ন দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার তথ্য আমাদের যথেষ্ট নাই। কিন্তু পরবর্তী কালের যে বৌদ্ধসাহিত্য বাঙলা দেশেই লিখিত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি তাহা হইল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত দোহা ও চর্যাগীতিগুলি। এই দোহা ও চর্যাগীতিগুলি যদিও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ মতবাদ ও সাধন পন্থা অবলম্বনেই লিখিত তথাপি পরোক্ষ ভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগুলি মোটামুটি ভাবে খৃষ্টীয় দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বলিয়া গৃহীত; সুতরাং এইগুলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন প্রচলিত দেবীবাদ বা শক্তিবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপক ভাবে বুঝিতে সমর্থ হই।

বৌদ্ধ দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে আমরা এক 'দেবী'র উল্লেখ দেখিতে পাই; এই দেবী বহু স্থানে নৈরাত্মা, নৈরামণি, ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী নানারূপে অভিহিত। সাধনতত্ত্বের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যা দ্বারা সিদ্ধাচার্যগণের মনোসংগঠনের সবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্বের সহিত এই বৌদ্ধদেবীর নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি। সহজিয়া বৌদ্ধগণের এই দেবীতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে এই দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়োজন মনে করি।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখিতে পাই, উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে—অর্থাৎ নেপাল-ভুটান-তিব্বত এবং কতক ভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা এক আদিবুদ্ধ এবং তাঁহার নিত্যাশক্তি আদিদেবী বা আদিশক্তির কথা জানিতে পারি। এই আদিবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবর্তী মহাযানের ধর্মকায়-বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। যে রূপে বুদ্ধ সমস্ত প্রপঞ্চাত্মক বস্তুর পরমাধিষ্ঠান কারণাত্মক এককপে বিরাজিত, সেই কারণাত্মক অদ্বয়তত্ত্বই পরিকল্পিত হইয়াছে আদিবুদ্ধরূপে। তিনি নিজে নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার—কিন্তু সকল বিশেষ, গুণ ও আকারের তিনিই পরমাধিষ্ঠান—অতএব তাঁহা হইতেই নিখিল বিশ্ব প্রসূত। কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তিনি নিজে নিত্য অবিকারী। কোনও কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকায়-বুদ্ধই আদিবুদ্ধ নহেন; মহাযানের ত্রিকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বলিয়া স্বীকার করে নাই—ধর্মকায়-বুদ্ধও যেন খানিকটা অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব; তাঁহারও ঊর্দ্ধে হইল বুদ্ধের চরম স্থিতি—তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় বুদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল অবিকারী শূন্যকায়—ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধই আদিবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তন্ত্রের পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের শক্তি যেমন পরমেশ্বরী—তেমনই আদিবুদ্ধের নিত্যা শক্তি হইলেন আদিদেবী। এক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্রগুলি তাঁহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে আদিবুদ্ধ বা আদিদেবী বা আদিপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছে না বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হিন্দুতন্ত্রের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে সিদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বলিয়া মনে করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিমান ও শক্তির অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদ-কল্পনা করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব দেখিতে পাই, হিন্দুতান্ত্রিক পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ-আদিপ্রজ্ঞা বা আদিদেবীর পরিকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শক্তিতত্ত্বের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাই।

প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈবশাস্ত্রে যে শক্তিতত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি প্রপঞ্চাত্মক যে বহিঃসৃষ্টি তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপের সহিত অভিন্না সমবায়িনী শক্তি হইতে হয় না; সৃষ্টি হয় বিক্ষেপ-শক্তি বা পরিগ্রহা শক্তি হইতে। এই তত্ত্বটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অন্যরূপে। আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হইতে সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশক্তিক ধ্যানিবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত হইতে। আদিবুদ্ধের সৃষ্ট্যাত্মক পঞ্চ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেকটি ধ্যান হইতে প্রসূত হন এক এক জন ধ্যানিবুদ্ধ, ইঁহারা হইলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের দেবতা; সৃষ্টি এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের পঞ্চশক্তি; তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা বা বজ্রধাত্বীশ্বরী, মামকী, পাণ্ডরা, আর্যতারা এবং লোচনা। সশক্তিক পঞ্চতথাগত মনুষ্যদেহের মস্তক, মুখ, হৃদয়, নাভী ও পাদদেশ এই পঞ্চস্থানে অধিষ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার প্রারম্ভে দেহশুদ্ধির দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশক্তিক পঞ্চতথাগতকে দেহের বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়—তাহা দ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়—তথাগত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না।

বৌদ্ধতন্ত্রে আদিবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সর্বেশ্বরী মহাদেবী আদিদেবীকে পাই। অন্যভাবেও আমরা এই সর্বেশ্বর ভগবান এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীকে পাই—তাহারও একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

বৌদ্ধতন্ত্র মহাযান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পরিণতি। মহাযানী বৌদ্ধেরা যাঁহাদিগকে হীনযানী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যান বা মত এবং পথকে হীন বলিবার কারণ এই, তাঁহারা শূন্যতার উপরেই একমাত্র জোর দিয়াছেন এবং শূন্যতা-জ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মুক্তি—অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাযানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্বমুক্তির প্রশ্ন—সুতরাং মুক্তিদাত্রী শূন্যতার সহিত তাঁহারা যুক্ত করিলেন কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শূন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর করুণা হইল ইতি-বাচক উপায় অর্থাৎ কুশল-কর্মপ্রেরণা। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ মহাযানের এই শূন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিত্ত-লাভের সাধনা, আর বোধিচিত্তের

তাঁহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, 'শূন্যতা-করুণাভিন্নং বোধিচিত্তং তদুচ্যতে'—শূন্যতা এবং করুণার অভিন্নত্বই হইল বোধিচিত্ত। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে নানাভাবে বহুদূরে টানিয়া লইতে লাগিলেন। বোধিচিত্ত-তত্ত্বই হইল তন্ত্রের যুগল বা যামল-তত্ত্ব; ইহাই মূল সামরস্য, ইহাই মিথুন-তত্ত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞারূপিণী ভগবতী—উপায় নিখিল ক্রিয়াত্মক ভগবান—এই ভগবান ভগবতী সামরস্য-রূপ মিথুনতত্ত্বই হইল অদ্বয় বোধিচিত্ত-তত্ত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃত্তি-লক্ষণা, শূন্যতাই পরম-সংহৃতি, শূন্যতাই বিন্দু; কর্মচোদনারূপে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ—উপায় পরম-প্রকাশ—উপায়ই নাদতত্ত্ব। শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞাই নৈরাত্মারূপিণী নির্বাণ—উপায়ই সর্ববুদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরস্যই হইল যুগনদ্ধ তত্ত্ব—সেই অদ্বয় যুগনদ্ধই হইল পরম কাম্য।

তন্ত্রশাস্ত্রের (তাহা হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক—অথবা হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম সত্য অদ্বয়-স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু দ্বয়ের অভাব নয়—তাহা দ্বয়ের মিথুনতত্ত্ব—দ্বয়ের নিঃশেষ সমরসতা। যে দ্বয়ের সমরসতায় অদ্বয়সিদ্ধি হিন্দুতন্ত্র মতে সে দ্বয়তত্ত্বই হইল শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব—একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; একটি জ্ঞানমাত্র তনু নিবৃত্তিমূলক—অপরটি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকাশাত্মিকা প্রবৃত্তিমূলা। দার্শনিক ভাষায় শিবতত্ত্বই জ্ঞাতৃত্ব—শক্তিতত্ত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম সঙ্কুচিত বিন্দু—শক্তিই পরম প্রসারিতা নাদরূপিণী।

তন্ত্রের এই যে অদ্বয়তত্ত্ব এবং অদ্বয়ের মধ্যে অবিনাভাবে মিথুনীকৃত দ্বয়তত্ত্বের দ্বি-ধারা এই মৌলিক তত্ত্বটি বৌদ্ধতন্ত্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বোধিচিত্ত এবং শূন্যতা-করুণাকে লইয়া। শুধু তফাৎ এই—বৌদ্ধতন্ত্রে ভগবতী-ই হইলেন নির্বাণরূপিণী বা বিন্দুরূপিণী প্রজ্ঞা আর সর্ববুদ্ধাত্মক ভগবানই হইলেন ক্রিয়াত্মক এবং প্রকাশাত্মক। প্রজ্ঞাই গ্রাহক-তত্ত্ব, আর উপায়াত্মক করুণাই হইল গ্রাহ্যতত্ত্ব। এই ভাবে দেখিতে পাই, হিন্দু তন্ত্রেও যেমন শিব-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মিথুন সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধতন্ত্রেও করুণারূপী ভগবান ও প্রজ্ঞারূপিণী দেবী ভগবতীকে লইয়া তান্ত্রিক মিথুন-সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগ-সাধনায় এই ভগবতী এবং ভগবান ইড়া-পিঙ্গলা গঙ্গা-যমুনা, বাম-দক্ষিণের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বয়তত্ত্বই ত অর্ধনারীশ্বর-তত্ত্ব—বামে দেবী ভগবতী, দক্ষিণে ভগবান—দুই মিলিয়া এক। একে দুই—দুইয়ে এক; হিন্দুতন্ত্রেও এই কথা—বৌদ্ধতন্ত্রেও সেই একই কথা। ৭

তন্ত্রসাধনার এই ভগবান এবং ভগবতী পূর্বালোচিত আদিবুদ্ধ ও আদিদেবীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গেলেন; ফলে বৌদ্ধতন্ত্রেও আমরা এক সর্বেশ্বর ভগবান এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীর কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। এই সর্বেশ্বর দেবতা সাধারণতঃ শ্রীহেবজ্র শ্রীহেরুক শ্রীবজ্রধর, শ্রীবজ্রেশ্বর, শ্রীবজ্রসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব শ্রীমন্মহাসুখ, শ্রীচণ্ডরোষণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সর্বেশ্বরী দেবী দেখা দিয়াছেন তাঁহারই অঙ্কবিহারিণীরূপে—অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্তরূপে তিনি কোথাও বজ্রধাত্বীশ্বরী, বজ্র-বারাহী, কোথাও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞা-পারমিতা, অথবা দেবী নৈরাত্মা। স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু মহেশ্বর—মহেশ্বরী এবং বৌদ্ধ। সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী বহু স্থানে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন।

মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহেশ্বর সংবাদের কথা দেখিতে পাই। সেখানে দেখিয়াছি, জগজ্জীবের প্রতি করুণায় বিগলিতা জগজ্জননী পার্বতী সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর মহাদেবের নিকটে একটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জীবের হিতকর সমস্ত তত্ত্ব জানিয়া লইয়াছেন। সমগ্র হিন্দু আগম-শাস্ত্র এই ভাবেই রচিত হইয়াছে; এখানে জগন্মাতা মহাদেবী স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্রী এবং শ্রোতা এবং জ্ঞানগুরু স্বয়ং মহাদেবই হইলেন এখানে বক্তা। তাবৎ হিন্দু তন্ত্রগুলির মধ্যে আমরা এই রীতিই লক্ষ্য করিতে পারি। প্রত্যেক তন্ত্রেই দেখি, দেবী জীবের দুঃখে বিগলিতা হইয়া তাহাদের আর্তিনাশ, মঙ্গল ও মুক্তিবিধানের জন্য মহাদেবকে অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার স্বমুখ হইতে সকল তত্ত্ব জানিয়া লইতেছেন। প্রসিদ্ধ অনেকগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেও আমরা এই রীতি অনুসৃত হইতে দেখি। বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেবজ্র-তন্ত্রে দেখিতে পাই,—

কপাল-মালিনং বীরং নৈরাত্মাশ্লিষ্টকন্ধরম্।
পঞ্চমুদ্রাধরং দেবং নৈরাত্মা পৃচ্ছতি স্বয়ম্॥

এখানে 'দেবের' বিশেষণ 'কপাল-মালিনং বীরং' কথাটিও বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়। উত্তরে দেখিতে পাই,—

চুম্বয়িত্বা তু নৈরাত্মাং———
———দেবো মণ্ডলং সম্প্রকাশতে॥৮

বজ্রবারাহী-কল্প-মহাতন্ত্র, একল্লবীর-চণ্ডমহারোষণ-তন্ত্র, ডাকার্ণব তন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্রগুলি এই ভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবীর প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুতন্ত্রে পরম-সামরস্য জনিত কৈবল্যানন্দ লাভের জন্য নর-নারীর মিলিত সাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঠিক এই একই সাধনা বৌদ্ধতন্ত্র-গুলিতেও দেখিতে পাই। হিন্দুতন্ত্রগুলিতে এই-জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহার শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, সাধিকাকে বিশুদ্ধ শক্তিস্বরূপা হইতে হইবে। বিশুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও যামল-সাধনা সম্ভব নহে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধনাই হইল প্রচলিত ভৈরব-ভৈরবী সাধনার গূঢ়ার্থ। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও আমরা বহু ভাবে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই। নারী মাত্রই প্রজ্ঞারূপিণী—পুরুষ বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্ব; এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধনাই হইল প্রজ্ঞোপায় সাধনার তাৎপর্য। কোনও কোনও বৌদ্ধতন্ত্রে এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। ৯ একল্লবীর-চণ্ডমহারোষণতন্ত্রে স্পষ্ট দেখিতে পাই—

'নরাঃ বজ্রধরাকারাঃ যোষিতঃ বজ্রযোষিতঃ॥'

নাগার্জুনপাদের 'পঞ্চক্রম' গ্রন্থে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'স্ত্রী-সংজ্ঞা চ তথা প্রোক্তা।' একল্লবীরচণ্ডমহারোষণ তন্ত্রে এক স্থলে স্বয়ং বজ্রধর চণ্ডরোষণ দেবীকে বলিতেছেন—

৭। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা লেখকের **An Introduction to Tantric Buddhism** দ্রষ্টব্য।

৮। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথি।

৯। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পুথি।

ভাবাভাববিনির্মুক্তশ্চতুরানন্দ-তৎপরঃ।
নিষ্প্রপঞ্চ-স্বরূপোঽহং সর্বসঙ্কল্পবর্জিতঃ ॥
মাং ন জানন্তি যে মূঢ়াঃ সর্বপুংবপুষি স্থিতম্।
তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সংস্থিতঃ ॥

আবার দেবীর দিক হইতে দেখিতে পাই—

অথ ভগবতী বজ্রবজ্রী-সমাধিমাপদ্যেদম্ উদাজহার—
শূন্যতা-করুণাভিন্না দিবা-কাম-সুখ-স্থিতা।
সর্ব-কল্প-বিহীনাহং নিষ্প্রপঞ্চা নিরাকুলা ॥
মাং ন জানন্তি যে নার্যঃ সর্বস্ত্রীদেহ-সংস্থিতাম্।
তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সংস্থিতা ॥

এই তন্ত্রের এক স্থলে এমন কথাও দেখিতে পাই যে, মায়াদেবী-সুত বুদ্ধদেবই চণ্ডরোষণতা রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আর প্রজ্ঞা-পারমিতাত্মিকা দেবীই হইলেন বুদ্ধপত্নী গোপা। বিশ্বের সকল স্ত্রী হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমাত্মিকা দেবীস্বরূপা এবং দেব চণ্ডরোষণ স্বরূপই হইলেন বিশ্বের সকল পুরুষ।

মায়াদেবীসুতশ্চাহং চণ্ডরোষণতাং গতঃ।
ত্বমেব ভগবতী গোপা প্রজ্ঞাপারমিতাত্মিকা ॥
যাবন্তস্তু স্ত্রিয়ঃ সর্বা ত্বদ্‌রূপেণৈব তা মতাঃ।
মদ্‌রূপেণ পুমাংসস্তু সর্ব এব প্রকীর্তিতা ॥

এই সকল ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্র হইতে এই এই ধারণা বৌদ্ধতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে বা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে এই এই ধারণা হিন্দুতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ কতকগুলি কাটাছাঁটা কথা বলিয়া দিলেই সবখানি কথা বলা হইল না। আসলে তন্ত্রসাধনাকে অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কতকগুলি ধারণা সমাজ-মানসে অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের তান্ত্রিক-সাধনায় আবার দেখিতে পাই, এই ভগবান ও ভগবতী বাহিরের কিছু নহেন—সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান। সাধক-চিত্তই স্বয়ং ভগবান—নৈরাত্মাই গৃহিণী। ১০ সেই নৈরাত্মার সঙ্গে সাধক-চিত্ত নিঃশেষে মিলিয়া যায়—যেমন মিলিয়া যায় লবণ জলের সঙ্গে।

জিম লোণ বিলিজ্জই পাণিয়েহি
তিম ঘরিণী লেই চিত্ত।
সমরস জাই তক্‌খণে
জই পুণু তে সম নিত্ত ॥

অদ্বয়-সিদ্ধি নামক বৌদ্ধ-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

ভগবানিতি নির্দিষ্টঃ চিত্তস্যাধিপতিঃ প্রভুঃ।

তিল্লোপাদ তাঁহার দোহায় বলিয়াছেন—

চিত্ত খসম জহি সমসুহ পলট্‌ঠই।
ইন্দিঅ-বিসঅ তহি মত্ত ণ দীসই ॥

চিত্ত এবং আকাশ স্বরূপা (শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞা) যখন সমসুখে প্রবিষ্ট হয় তখন ইন্দ্রিয়-বিষয় তাহাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আবার— মণহ ভঅবা খসম ভঅবঈ।
দিবারাত্তি সহজে রহিঅই ॥

১০। কাহ্নপাদের দোহা।

মন ভগবান—শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞা ভগবতী; ইহারা দিবারাত্রি সহজে (মিলিত) থাকে।

চর্যাগীতিকার কুক্কুরীপাদ একটি গীতিতে বলিয়াছেন—

হাঁউ নিরাসী খমণভতারী
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।

এখানে দেবী নিজে বলিতেছেন, আমি হইলাম, আশারহিতা বা আসঙ্গরহিতা, খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী; আমাদের মিলনানন্দের কথা কহা যায় না। খ-মন শব্দের অর্থ শূন্য মন—অর্থাৎ তান্ত্রিকগণের চতুর্থ শূন্য বা সর্বশূন্য স্তরের প্রকৃতি-প্রভাস্বর মন।

চর্যাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানা ভাবে পাইতেছি; কোথাও তিনি দেবী বলিয়া আখ্যাতা—কোথাও যোগিনী বলিয়া, কোথাও 'ঘরিণী' (গৃহিণী) বলিয়া, কোথাও আবার ডোম্বী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি বলিয়া। বজ্রধরস্বরূপ সাধকের ইহার সহিত নাচ-গানের কথা দেখি, ১১ কোথাও জাঁকজমক করিয়া ডোম্বীকে বিবাহ করিতে যাইবার দৃশ্য দেখিতে পাই এবং সেখানে দিন-রাত্রি তাঁহার সহিত সুরত-প্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা পাই। ১২ কোথাও আবার বজ্রধর সাধক বলিতেছেন—

জোইণি তঁই বিণু খণহিঁ ণ জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥

'যোগিনি, তোমাকে বিনা ক্ষণমাত্রও বাঁচিব না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া কমল-রস পান করিব।'

কোথাও আবার ডোম্বীর 'ভাভরিআলী' অর্থাৎ চতুরালী দেখিয়া বজ্রধর সাধক তাঁহাকে কামচণ্ডালী বলিয়াছেন, তাঁহাকে 'ছিনালী'র অগ্রগণ্য বলিয়া গাল দিয়াছেন।

'অদঅ বঙ্গালে' গিয়া এই চণ্ডালীকে 'নিজ ঘরণী' করিয়া বজ্রধর সাধক একদম 'বঙ্গালী' ('বাঙাল'?) হইয়া গিয়াছেন।১৩ কোথাও এই দেবীকে মাতঙ্গীরূপে পাটনীর বেশে গঙ্গা-যমুনার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগীকে লীলায় পার করিয়া দিতে দেখি।১৪ কোথাও দেবীকে নৃত্যকুশলা নৌকাবিহারিণী বেদেনীরূপে বাঁশ-বেতের চুপড়ি-চাঙারি বিক্রী করিতে দেখি। ১৫ কোথাও তাহাকে দেখি উঁচু পর্বতের শিখরে ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হইয়া গুঞ্জার মালা গলায় শবরীরূপে—উন্মত্ত শবরকে লইয়া তাঁহার ঘর-সংসার। ১৬

চর্যাপদে নানা রূপকে এবং কবিকল্পনা যোগে বিচিত্র রূপে বর্ণিত এই দেবী কে?

১১। নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ (১৭ সং)

১২। ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥
অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ
জোইণিজালে রঅণি পোহাঅ ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥

১৩। ১৮ সংখ্যক পদ।

১৪। ৪১ সংখ্যক পদ। ১৫। ১৪ সংখ্যক পদ।

১৬। ১০ সংখ্যক পদ।

সাধকগণ বর্ণিত এই দেবীকে বুঝিতে হইলে হিন্দুতান্ত্রিক সাধকগণ কর্তৃক বর্ণিত দেবী বা শক্তিকেও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে এবং বিবিধ যোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা জানিতে পারি; এই শক্তি সর্বনিম্ন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিত হইয়া নিদ্রিতা আছেন; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সুপ্তা শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা। দেবী মূলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত সাধনায় সাধকের কোনও অনুভূতির স্পন্দনই নাই—দেবীর বা শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন। শক্তির জাগরণের পরেই আরম্ভ হয় তাঁহার উর্ধ্বগতি—একটি একটি করিয়া চক্রকে ভেদ করিয়া শক্তি উর্ধ্বে উত্থিত হন—সর্বোচ্চধামে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমাস্থিতি। শক্তির একটি একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নূতন নূতন আনন্দানুভূতির স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দানুভূতির স্পন্দন চরমবিশুদ্ধি এবং পরমপূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শক্তির স্থিতির সহিত। এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তির অধ্যাত্ম-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে দেখিতে পাই যোগ-তন্ত্রাদিতে এই শক্তির উত্থান ও গতি একটি বিচিত্র-স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রতিক্ষণে সাধকের বিচিত্র দিব্যানন্দের অনুভূতি। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনায়ও এই জাতীয় একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্মিকা শক্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। এই শক্তির ব্যুত্থানের সঙ্গে যে আনন্দানুভূতির আরম্ভ, মস্তকস্থিত উষ্ণীষকমলে পৌঁছিয়া তাহারই পরিণতি বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের পরমকাম্য মহাসুখে। এই মহাসুখই সহজানন্দ। 'সহজ'ই হইল প্রত্যেক প্রাণীর—শুধু প্রাণীর নয়—সকল ধর্মের স্বরূপ; আর এই স্বরূপ হইল বিশুদ্ধ আনন্দ—তাহাই মহাসুখ; সুতরাং আনন্দই হইল সহজের নিত্য স্বভাব। বৌদ্ধতন্ত্রমতে দেহমধ্যে চারিটি চক্র বা পদ্ম অবস্থিত, নিম্নতম হইল নির্মাণচক্র, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত; তদূর্ধ্বে হৃদয়ে হইল ধর্মচক্র, কণ্ঠে হইল সম্ভোগচক্র—আর মস্তকে উষ্ণীষকমলে হইল মহাসুখ-চক্র।১৭ নির্মাণচক্র শুধু নিম্নতম চক্র নয়—ইহাই স্থূলতম তত্ত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু শক্তির জাগরণ প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্মে; এইখানে এই শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধ। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ বিশুদ্ধ নহে—বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জড়িত; উর্ধ্বগতিতে এই আনন্দ পরমানন্দে, পরমানন্দ বিরমানন্দে, বিরমানন্দ সহজানন্দে পরিণতি লাভ করে; সহজানন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতি উষ্ণীষ-কমলে। এই সহজানন্দদায়িনী শক্তিই হইলেন বৌদ্ধসহজিয়া—তথা বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের দেবী; এই জন্য তিনি সর্বদাই সহজ-স্বরূপা বা সহজানন্দরূপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাত্ম্যরূপিণী বা আদরিণী 'নৈরামণি'। এই আনন্দরূপিণীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে হৃদয়ে (ধর্মচক্রে) ধারণ—সেখান হইতে তাহাকে কণ্ঠে ধারণ (সম্ভোগচক্রে)—এই সমস্তের ভিতর দিয়াই দেবী বা যোগিনীর সহিত বজ্রধর সাধকচিত্তের সুরতযোগ; এই সুরতযোগের পরিণতি দেহ-পর্বতের উচ্চশিখর উষ্ণীষকমলে অচ্যুত সহজানন্দের পূর্ণানুভূতিতে—সে অনুভূতিতে সাধকচিত্তের সহজ-স্বরূপিণীর ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্যের উদ্ভব—তখনই দেবীসঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত বজ্রধরের যুগনদ্ধস্থিতি।

এই আনন্দসন্দোহরূপিণী শক্তির যখন প্রথম নির্মাণচক্রে জাগরণ তখন সহসা জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার প্রচণ্ড দাহন; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই বলা হইয়াছে 'চণ্ডালী'। ১৮ আবার এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরূপা দেবী ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা—এইজন্যই দেবী 'ডোম্বী'। ১৯ দেহরূপ নগরের বাহিরে অবস্থিত হইল এই ডোম্বীর কুঁড়েঘর—'ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া'র দল তাহাদের সকল আচার-বিচার ও পাণ্ডিত্যাভিমান লইয়া ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়—ঠিক সঙ্গলাভ করিতে পারে না; সঙ্গলাভ করিতে পারে নির্ঘৃণ 'নাঙ্গ' (অর্থাৎ সর্ববিধ আবরণ বর্জিত) কাপালিক যোগী। একটি হইল পদ্ম, চৌষট্টিটি তাহাতে পাপড়ি (নির্মাণচক্রস্থিত চৌষট্টিদলযুক্ত পদ্ম), তাহাতে চড়িয়া নাচে এই 'ডোম্বী বাপুড়ি'। ২০ যে পর্যন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই 'ডোম্বী'র আনন্দ-স্পন্দনের নৃত্য সে পর্যন্ত 'ডোম্বী' খুব ভাল নহে—কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে বজ্রধর সাধকচিত্তের যোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন উর্ধ্বায়ন আরম্ভ হইল ততই ডোম্বী আদরিণী হইয়া হৃদয়ে—পরে কণ্ঠে স্থান পাইল; উষ্ণীষ-কমলে গিয়া—

> ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো
> খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো॥

চর্যাপদাদিতে বর্ণিত এই সহজানন্দরূপিণী শক্তিরূপিণী দেবীর প্রসঙ্গে আরও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও কিছু কিছু তথ্য লক্ষ্য করিতে পারি। দেবী এখানে 'মাতঙ্গী', 'চণ্ডালী', 'শবরী'। দেবীর 'মাতঙ্গী' নামটি দশমহাবিদ্যার মধ্যে গৃহীত দেখিতে পাই। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে দেবী-ধ্যানের মধ্যেও দেবী 'মাতঙ্গী'। পুরাণাদিতে দেবীকে 'কিরাতী', ২১ 'শবরী' প্রভৃতি রূপে বর্ণিত দেখি। চর্যাগীতিতে বর্ণিত শবরী দেবীও কিন্তু উচ্চপর্বতবাসিনী, অতএব এই শবরী দেবীও পর্বতস্থা পার্বতী। এই 'শবরী'র বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

> উঁচা উঁচা পাবত তঁহি সিই সবরী বালী
> মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

শবরী দেবী শুধু পর্বতের উচ্চশিখরবাসিনী নন, ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা। সম-বিধান-ব্রাহ্মণে কুমারী রাত্রিদেবীকে আমরা 'কন্যাং শিখণ্ডিনীং' রূপেই দেখিতে পাই। এই শবরীর বর্ণনায় আরও দেখিতে পাই—

> নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
> একেলী শবরী এবণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥

'নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল; একেলা শবরী এ বনে খুঁজিয়া বেড়ায়—সে কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।' পার্বত্যবনে একাকিনী ঘুরিয়া বেড়ায় এই শবরী বালিকা—কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী

১৭। এ-বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ও আলোচনা লেখকের **An Introduction to Tantric Buddhism** গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১৮। 'চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ'—হেবজ্রতন্ত্র। ১৯। অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্তিতা—ঐ। ২০। ১০ম সংখ্যক চর্যা। ২১। খিল হরিবংশ।

এই শবরী। কর্ণকুলবজ্রধারী দেবীর বর্ণনা তন্ত্রপুরাণে দুর্লভ নহে।

শুধু তাহাই নয়, এই শবরীর স্বামী যে শবর সে নেশায় উন্মত্ত পাগল, বাড়িতে বাধায় হৈ-চৈ, নিজের ঘরের সুন্দরী স্ত্রীকেই সে নেশার ঘোরে চেনে না; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম দায়! তাই অনুনয়-বিনয় করিতে হয়—

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহেরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী॥

শবরী খাট পাড়ে—মহাসুখে শয্যা বিছায়—তাহার পরে সেই শবর-ভুজঙ্গের সহিতই এই নৈরামণি শবরী স্ত্রী ভাবে প্রেমের রাত্রি পোহায়। শবরকে আদর করিয়া খাইতে দেয় তাম্বুল—আর কর্পূর; ক্ষণিকের জন্য পোষ মানে মাতাল স্বামী—শবরীকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়।

তিঅ ধাউ খাট পড়িলা মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই॥

কিন্তু খেয়ালী মাতাল স্বামীর কি আর কিছু ঠিক আছে, এই শান্তখুশি দিব্য মানুষ, আবার কখন গুরুরোষে উন্মত্ত; গুরুরোষে ঘর ছাড়িয়া সে প্রবেশ করে গিয়া পর্বতের শিখরসন্ধিতে—কি করিয়া আবার তাহাকে খুঁজিয়া ফিরাইয়া আনা যায়!

উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

সমস্ত ছবিটি তুলিয়া ধরিলাম। ইহার মধ্যে পরবর্তী কালের লৌকিক ভাবে বর্ণিত হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের আভাস মিলিতেছে কি? পার্বতীর স্বামীকে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাইতেছি নেশাখোর পাগলা ভোলা—বাড়িতে বাধান কোন্দল—নেশার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ান কুচনী পাড়া, চেনেন না নিজের ঘরের সুন্দরীকে। কত কষ্টে কত অনুনয়ে-বিনয়ে এই ভোলাকে খুশি রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম রক্ষা করিতে হয় পার্বতীকে। তাহাতেও কি মানেন, কখন আবার গুরু রোষে চলিয়া যান পর্বতের কোনো শিখর-সন্ধিতে—কে করে আবার তাঁহার সন্ধান। চর্যাপদটির বর্ণনায় কি ভাষা-সাহিত্যে বর্ণিত লৌকিক শিব-পার্বতীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে?

চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় হর-গৌরী বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন; লোকমুখ হইতে এই জাতীয় কিছু কিছু পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি পদ এখানে উল্লেখ করিতেছি—চর্যার আলোচিত পদটির সহিত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। মহাদেব গৌরীর প্রতি রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; গৌরী বলিতেছেন—

হমসোঁ রুসল মহেসে।
গৌরী বিকল মন করথি উদেসে॥
পুছিঅ পথুক জন তোহী।
এ পথ দেখল কহুঁ বুঢ় বটোহী॥
অঙ্গমে বিভূতি অনূপে।
কতেক কহব হুনি জোগিক সরূপে॥
বিদ্যাপতি ভন তাহী।
গৌরী হর লএ ভেলী বতাহী॥ ২২

'আমার উপরে রোষ করিয়াছেন মহেশ। গৌরী বিকল মন, উদ্দেশ করিতেছেন। হে পথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ পথে দেখিলে কোনও বৃদ্ধ পথিককে? অঙ্গে তাঁহার অনুপম বিভূতি, কত আর বলিব, সেই সেই যোগীর স্বরূপ? বিদ্যাপতি বলে তাহাতে—হর লইয়া গৌরী হইলেন পাগলিনী।'

অপর একটি পদে দেখি—

উগনা হে মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা সি কি দহু ভেলা॥
ভাঙ নহি বটুয়া রুসি বৈসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ॥
জে মোর কহতা উগনা উদেস।
তাহি দেবঁও কর কঙ্গনা বেস॥
নন্দন বনমে ভেটল মহেস।
গৌরি মন হরসিত মেটল কলেস॥

'আমার উগনা (উলঙ্গ) কোথায় গেল? কোথায় গেল, তাহার কি হইল? বটুয়াতে ভাঙ নাই, রুষিয়া বসিল; যেমনই খুঁজিয়া আনিয়া দিলাম—হাসিয়া উঠিল। যে মোরে বলিবে আমার উগনার উদ্দেশ তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ। নন্দনবনে দেখা হইল মহেশের সঙ্গে; গৌরীর মন হরষিত—মিটিল ক্লেশ।'

আর একটি পদে দেখি—

পীসল ভাঁগ রহল এহি গতী।
কথি লঁই মনাইব উমতা জতী॥
আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতী।
আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতী॥
আনক নীক আপন হো ছতী।
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী॥
ভণহি বিদ্যাপতি সুন হে সতী।
ঈ থিক বাউর ত্রিভুবন পতী॥ ২৩

'পেষা ভাঙ এমন ভাবে রহিল; কি করিয়া মানাইব এই উন্মত্ত যতিকে? অন্যদিন ভাল ছিল মোর পতি, আজ কে বাড়াইয়া দিল তাহার উন্মত্ততা? অপরের ভাল, নিজের হয় ক্ষতি; কোথায় এক ঠোকর লাগিবে—পড়িবে বিপত্তি। বিদ্যাপতি বলে, শুন হে সতি,—এ নহে পাগল—এ যে ত্রিভুবনের পতি।'

২২। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতি।

২৩। ইহার সহিত পরবর্তী কালের কবি ঈশনাথের এই পদটির তুলনা করিতে পারি।

বসহা-চঢ়ি রুসিকত ভাগি পড়এলা, ত্রিভুবনপতি শিবদানী॥ ধ্রুব॥
ভাঙ ধথুর পীসি জাবে হম, আনক ঘরসঁ আনী।
তাবে অনট-বিনট বজইত রুসি, কতএ গেলা নহি জানী॥
কতবও কুবচন কহথি তদপি হম, কনিও খেদ ন মানী।
তেহন বতাহ স্বামি মোর ভেলা, হোইছ মন জে কানী॥ ইত্যাদি।
গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত।

শুধু বিদ্যাপতির পদে নয়, মৈথিলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের এই দৃশ্য দেখিতে পাই। নিম্নে এই জাতীয় একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

সবকে দৌরি দৌরি পুছকিন ব্যাকুল গৌরী
এহি পংথ দেখল দিগম্বর বে কী।
তোহর দিগম্বর কে কৈসন রূপ
হমরো দিগম্বর কে সন সন কেস ছৈক্হি।
জীর সন দাঁত ছৈক্হি
অংগ মে ভসম রমাবথি রে কী।
সবকে দৌরি দৌরি ... ...
হাথ মে ডমরু বগল মে ত্রিশূল ছৈক্হি
জটা মে গঙ্গা বিরাজথি রে কী—
অহো রামা এহি পংথ দেখল দিগম্বর রে কী॥ ২৪

"সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী—'এই পথে দেখিলে কি দিগম্বরকে?' (লোকে জিজ্ঞাসা করিল)—'তোমার দিগম্বরের কি রকম রূপ?' 'আমার দিগম্বরের শণের মত কেশ। দাঁত আছে—আর অঙ্গে আছে ভস্ম মাখা।' সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গৌরী, 'এই পথে দেখিলে কি দিগম্বরকে? হাতে তাহার ডমরু, বগলে ত্রিশূল; জটায় বিরাজ করে গঙ্গা।' 'ওহে মেয়ে—এই পথে দেখিয়াছি দিগম্বরকে।'

সভকেঁ দৌড়ি দৌড়ি পুছথি বিকল গৌরী,
আহে এহি পথ দেখল দিগম্বর রে কী।
দেখইত বুঢ় সন বসথি সভক মন,
আহে লখইত পুরুষ পুরন্দর বে কী।
অপনে নে অএলা শিব ঘর নহি কৌড়ী থিক,
আহে গণপতি অউরি পসারল কে কী।
বসহা চড়ল শিব ফিরথি আনন্দবন,
আহে ঘুমি ঘুমি ডমরু বজাবথি রে কী।
ভনই বিদ্যাপতি সুনু গৌরা পারবতি,
আহে ইহো থিকা ত্রিভুবন নাথ রে কী।
গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত।

আমরা আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি যে আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞা এবং হিন্দু পুরাণ-তন্ত্রের হর-পার্বতী বা শিব-শক্তি লোকায়ত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালের বৌদ্ধতন্ত্রে স্থানে স্থানে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা শিবশক্তিরূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। কোনও কোনও বৌদ্ধতন্ত্রে আদিপ্রজ্ঞার ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্রেরও উল্লেখ পাই। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে এই আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার প্রভাব সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙলা বিবিধ প্রকারের সাহিত্যে বর্ণিত আদিদেব এবং আদিদেবীর কল্পনায়।

এই আদিদেব আদিদেবীর সাক্ষাৎলাভ করি বাঙলা-সাহিত্যের সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যের মধ্যে আমরা এই সৃষ্টির বর্ণনা পাই। শূন্যপুরাণ, ধর্মপূজা-বিধান এবং ধর্ম-মঙ্গলগুলিতে এই সৃষ্টি-প্রকরণের বিশদ বর্ণনা পাই। নাথ-সাহিত্যের 'গোরক্ষ-বিজয়ে' সৃষ্টি-আরম্ভের বর্ণনা আছে। মাণিক দত্তের ও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' এবং দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' সৃষ্টি-কাহিনী বর্ণিত আছে। কিছু কিছু মনসা-মঙ্গলেও এই কাহিনীর ছায়া দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে'ও এই সৃষ্টি-কাহিনী বাদ পড়ে নাই। মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে এবং ওড়িয়া-সাহিত্যেও নানা ভাবে অনুরূপ সৃষ্টি বর্ণনা দেখিতে পাই। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের বর্ণনা এবং সেখানে বর্ণিত তত্ত্ব ও কাহিনী সমূহের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে অন্য গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।২৫

বাঙলায় বর্ণিত এই সৃষ্টি-কাহিনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছু কিছু তফাৎ সত্ত্বেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বত্রই দেখি, সৃষ্টির পূর্বে নিখিল নাস্তিত্বের অন্ধকার (ধুন্ধুকার); শূন্যতার মধ্যে ছিলেন শুধু এক দেবতা—তিনি সর্বত্রই 'নৈরাকার নিরঞ্জন'—তিনিই আদিদেব। সিসৃক্ষু এই আদিদেব শূন্য-মূর্তি নিরঞ্জন হইতেই এক আদিদেবীর সৃষ্টি হইল। 'শূন্য-পুরাণে' দেখি, শূন্য নিরঞ্জন ধর্মের ঘর্ম হইতে এই 'আদ্যাশক্তি'র জন্ম; বর্ণনায় তিনি 'আদ্যা' নামেই খ্যাত। সহদেব চক্রবর্তীর 'ধর্ম-মঙ্গলে'ও এই কথাই দেখি। সীতারাম দাসের 'ধর্ম-মঙ্গলে' দেখি, নিরঞ্জন নিজেই এক সুন্দরী কন্যার রূপ ধারণ করিয়া নিজেই আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অন্যান্য 'ধর্ম-মঙ্গলে' দেখি, সৃষ্টিকাম নিরঞ্জন আদি-দেবের বামপার্শ্বে 'আচম্বিতে' দেবীর আবির্ভাব ঘটিল। রামদাস আদকের 'অনাদি-মঙ্গল' অনুসারে মহামায়া ধর্ম-নিরঞ্জনের বামপার্শ্ব হইতে উৎপন্না হইলেন। নরসিংহ বসুর 'ধর্মায়ণ' মতে নিরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই প্রকৃতিরূপা আদ্যার উৎপত্তি। নাথ-সাহিত্যের গোরক্ষ-বিজয়ে দেখি, সৃষ্টির পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্বে এক ছায়া-মূর্তিকে দেখিতে পাইলেন, এই ছায়ামূর্তিই দেবী আদ্যা। নাথ-সাহিত্যের কোথাও কোথাও দেখি, অলেকনাথ নিজদেহের শক্তি হইতেই কাকেতুকা দেবীকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন; এই কাকেতুকা দেবী হইলেন আদিদেবী।

চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' দেখি, 'সৃষ্টি সৃজিতে হাসে, দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে'। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মতে—

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ॥
তখন— চিন্তিলে এমত কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।

২৪। শ্রীমতী অণিমা সিংহের সংগ্রহ। বিদ্যাপতির নামেও এইরূপ একটি পদ প্রচলিত আছে।

২৫। এই লেখকের Obscure Religious Cults গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

এই আদিদেব নিরঞ্জনের তনু হইতে উৎপন্না প্রকৃতিই হইলেন আদিদেবী।

আদি দেবরাজ-শক্তি ভুবন-মোহন-মূর্ত্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
রচিয়া সম্পুট পাণি মৃদু মন্দ সুভাষিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী॥

একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে এবং কিছু কিছু ধর্ম-মঙ্গলেও শিব এবং চণ্ডীর পৃথক বর্ণনা দেখিতে পাই—সে সব বর্ণনার পরে সৃষ্টি-প্রকরণকে অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাই আদিদেব আদিদেবীর বর্ণনা। তাহা হইতে বেশ বোঝা যায়, এই সব ভাষা-সাহিত্যের কবিগণ২৬ শিব-পার্বতীর পাশাপাশি আর একটি যুগলের পৃথক ধারা একটি সামাজিক ঐতিহ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ধারা বৌদ্ধতন্ত্র অবলম্বনে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলিয়া মনে করি।

আদিদেবীর উৎপত্তির পরে সর্বত্রই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আদিদেবী আদিপ্রকৃতি রূপ গ্রহণ করিলেন। আদি-প্রকৃতিরূপে তিনি প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তিকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) প্রসব করিলেন; এই ত্রিমূর্তি হইলেন আদিপ্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণেরই ত্রি-বিগ্রহ।

২৬। সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ।

একটি কবিতা

অবন্তী সান্যাল

আমি বলেছিলাম আসব।
আমি আসব, যখন খাঁ-খাঁ রোদ্দুরে
পিচ গলবে, পাতা উড়বে
ঘূর্ণী হাওয়ায়, কৃষ্ণচূড়ার ডাল
সে কি দাউ-দাউ জ্বলবে, যখন
ঘাম ঝরবে, বুক ফাটবে
তেষ্টায়।
আমি আসব।

আমি আসব, যখন আকাশের অ্যাসফল্ট
সূচের মতন বিঁধবে। পথের কুকুর
লক্‌লকে জিভে ক্লান্তি ঝরাবে।
তির্যক ছায়া
গাছে গাছে মুখ গুঁজবে।
আমি আসব।

আহা, এই রোদ্দুর, আগুন দুপুর, পাখির গান
বন্ধ।
এখন মধ্যদিন।
ঘাম-দরদর মুখ,
গুঁড়ো-গুঁড়ো রুখু চুল
হাওয়ায় উড়ছে।
তপ্ত আঁচলে একটু বাঁচানো ছায়া
রেখে দিলে বুঝি, আসব যখন
আড়ালে আমাকে ঢাকবে।
আমি আসব।

কত দূর, বলো, কত দূর! এই পথ
বাঁকে বাঁকে জট খুলছে।
অফুরান পথ,
পথ হেঁটে হেঁটে কাটছে। কখন
মোড়ে পৌঁছুব। শ্রান্ত ললাট
ঘাম মুছে নেওয়া মিঠে নিঃশ্বাসে
ছায়ার স্পর্শ মাখবে।
আমি আসব।

আহা, এই রোদ্দুর, হু-হু করা মন
তুমি দাঁড়িয়ে।
গণগণে নীল আকাশ পুড়ছে, পাতারা
উড়ছে।
মধ্যদিন।
তেষ্টায় বুক ফাটছে
তুমি দাঁড়িয়ে।

আমি বলেছিলাম, আসব,
তুমি দাঁড়িয়ে।

জননী জগদ্ধাত্রী ও জননী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী

অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

"জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥"
জগদ্ধাত্রীকল্পে জগদ্ধাত্রীস্তবঃ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্মা জননীকে স্তুতিমুখে বলেছেন—
"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥"

অর্থাৎ হে বিশ্বাত্মিকে, যা কিছু বস্তু, সৎ হোক বা অসৎ হোক, আছে, সেই সমস্ত বস্তুর তুমিই শক্তি; সেই তোমাকে কি করে স্তুতি করা যায়?

একই ভাবে জগদ্ধাত্রীকল্পে ঋষিস্তবে জননী জগদ্ধাত্রীকে সংবোধন করে বলেছেন—
"দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥"

অর্থাৎ ১৪ কোটি মন্ত্রের শক্তিরূপা সনাতনী তুমি সর্বশক্তির স্বরূপভূতা; হে জগদ্ধাত্রি! তোমায় নমস্কার। উভয় মন্ত্রেই জগজ্জননীকে সর্বশক্তিস্বরূপা বলা হয়েছে। যিনিই শ্রীশ্রীচণ্ডী—দুর্গা, তিনিই শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী—মন্ত্র বলে তাই প্রমাণিত হলো। ফলতঃ স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প প্রভৃতি সর্বত্র "জগদ্ধাত্র্যাঃ দুর্গায়াঃ" বলতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেছেন, "বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী বিশালাক্ষী বিরাগিণী।" দেবীপুরাণ স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন—যেহেতু জননী লোক সকল ধারণ করেন—এবং তাদের পরিপালনোদ্দেশ্যে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দেন, সেজন্যই দ্বিবিধাত্মক 'ধা' ধাতুনিষ্পান্ন পত্র জগদ্ধাত্রী জননীর নাম। "যস্মাদ্ধারয়তে লোকান্ বৃত্তিমেষাং দদাতি চ।
ডু ধাঞ্ ধারণে ধাতুর্জগদ্ধাত্রী মতা বুধৈঃ ॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণও বিশ্বমাতাকে জগদ্ধাত্রী বলেছেন—"বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।"

দশপ্রহরণধারিণী দুর্গতিনাশিনী জননী দুর্গাকে দেবীপক্ষে আরাধনা করে আবার তৎপরবর্তী শ্বেতপক্ষে কার্তিকী নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীরূপে আরাধনা করার বিধি-বিধানে কি হেতু থাকতে পারে, তা স্বভাবতই মনে জাগে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত পরম্পরায় সনাতন ক্রমে আশ্বিনী শুক্লপ্রতিপদি বা সপ্তম্যাদিকল্পে জননীর পূজার বিধান, রাত্রি-সূক্তের ক্রমানুসারে মহানিশায় বা কার্তিকী কৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যাদিকল্পে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া পর্যন্ত মা কালীর পূজা, তন্মধ্যবর্তী কোজাগরী পূর্ণিমা তিথি জননী লক্ষ্মীপূজার কারণ সব শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে তার আলোচনা করেছি। কিন্তু জগদ্ধাত্রীপূজা কে, কবে, কি কারণে কোথায় আরম্ভ করলেন, তার প্রমাণ পাইনে। কাত্যায়নীতন্ত্রে যে উপাখ্যান আছে, তা একান্তভাবে কেন উপাখ্যানের "উমা হৈমবতী" উপাখ্যানের নামান্তরপূর্বক পুনরুক্তি মাত্র। তাতে চিত্তের ক্ষুধা মিটে না। তবে একটি কথা নিরন্তর মনে হয় এ বিষয়ে—সেটি হচ্ছে, মহালয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ কোনও কারণে প্রদত্ত না হলে দীপান্বিতা অমাবস্যাতে সে শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদনের বিধান আছে শাস্ত্রে। যদিও জগদ্ধাত্রীপূজার বিষয়ে সে রকম কোনও শাস্ত্রীয় বিধানের উল্লেখ দেখতে পাই না, তথাপি যেন বারংবার না হয়—যে সাধক ভক্ত কোনও কারণে দেবীপক্ষে জননী দুর্গার বা কৃষ্ণপক্ষে জননী কালী বা লক্ষ্মী দেবীর চরণ বন্দনা করতে পারেননি, তাঁদেরই জন্য এ জগদ্ধাত্রী পূজার বিধান। অবশ্য এটি একটি বিশেষ বিধানরূপে বিবেচনা করার কথা উত্থাপন করছি। যাঁরা উক্ত তিন ভাবে মাতৃদেবীর উপাসনা করেছেন, সামর্থ্য ও সুযোগ অনুসারে তাঁরা এই পূজাও সম্পাদনা করবেন, সে বিষয়ে অন্যথা করবার কি আছে?

আমার এই বিশেষ বিবেচনার মূলে দুইটি কারণ উল্লেখ করছি। প্রথমটি হলো এই যে, জগদ্ধাত্রীপূজার ক্রম একেবারে ত্রিদিবসনিষ্পাদ্য জননী দুর্গার পূজার একদিবসসাধ্য অনুক্রম, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিথির পূজা এখানে দিনোদয়—মধ্যাহ্ন—সায়ংসন্ধ্যায় সমাপন করে একই শ্রীগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, হোমপ্রয়োগ প্রভৃতি করতে হয়। মন্ত্রেও সর্বত্র "জগদ্ধাত্রী দুর্গা" বলতে হয়—স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, প্রভৃতি সর্বত্রই এই নিয়ম। বর্তমান যুগে প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে অকাট্য একটি প্রমাণ আমি উপস্থাপিত করছি। সেটি হচ্ছে বর্তমান যুগের অবতীর্ণ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী নিজে স্বয়ং অবতীর্ণা জগদ্ধাত্রী হয়েও প্রতি বৎসর জননী জগদ্ধাত্রীর ত্রিদিবসব্যাপী অর্চনা করতেন। জননীর জননী শ্রীশ্রীশ্যামাসুন্দরী দেবী জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা যথাসাধ্য উপচারে সম্পাদন করতেন। কোনও বছর বাদ দেননি। পরবর্তী যুগে জননী সারদামণি নশ্বর দেহ পরিত্যাগের সময় পর্যন্ত কেবল এক বৎসর বিশেষ কারণে জগদ্ধাত্রীপূজা সম্পাদন করতে পারেননি। তজ্জন্য পরের বৎসর বহু কাল আগে থেকে জয়রামবাটীতে উপস্থিত ষোড়শোপচারে জননী জগদ্ধাত্রীর অর্চনা করিয়েছিলেন। জননী পূজার সময়ে তাঁর মাতৃদেবীর দেহাবসানের পরে সর্বদাই আমার মা এই সময়ে এই করতেন, এই উপায়ে জননীর পূজার সামগ্রী মজুত রাখতেন—কালীপূজার তারিখ থেকে সলতে পাকাতেন, পৃথিবী কত শত জগদ্ধাত্রীপূজার গল্প পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), যোগীনমা প্রভৃতিদের কাছে করতেন। সে সময়ে জননীর ভক্ত সন্তানেরা অনেকেই পূজামণ্ডপে উপস্থিত থেকে জননীর কর্মে সহায়তা করতেন। জননীর মাতৃপূজায় এত ছিল আনন্দ ও উৎসাহ। কিছুতেই তিনি ঐ সময়ে কলিকাতায় বা অন্য স্থানে থাকতেন না; জয়রামবাটীতে পিতৃগৃহে গিয়ে যে কোনও রকমে উপস্থিত হতেন, এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে জননী জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পাদন করেন।

যা হোক—আমরা আমাদের বিশেষ বিবেচনার কথা এখন বলি, যে কারণে মায়ের মাতৃ-পরিবারে সর্বপ্রথম জননী জগদম্বা জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম অবতারণা হলো, সে কারণটিই বলা প্রয়োজন। একবার জয়রামবাটীর নব মুখুজ্যে গ্রাম্যসঙ্কীর্ণতা বশতঃ মায়ের মা অর্থাৎ শ্যামাসুন্দরীর চাল কালীপূজার জন্য নিলো না। শ্যামাসুন্দরীর পরম ভক্তি ও অপরিসীম যত্নে সংরক্ষিত চাউল মায়ের পূজায় লাগলো না।

এই দুঃখে জননী-জননী শ্যামাসুন্দরী নিরন্তর অশ্রুবিসর্জনে ধরণী সিক্ত করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, রক্তবর্ণা এক দেবী পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন এবং মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—"তুমি কাঁদছ কেন? কালার চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?" শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুমি?" দেবী উত্তর দিলেন—"আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।" পরের দেবীর বর্ণনা করতেই মা সারদামণি জননীকে বলতেন—"ঐ তো, উনিই তো জগদ্ধাত্রী।" সেই পূজার সুরু হলো মা সারদামণির পিতৃ-পরিবারে। পূজার সময় সে সংবাদ জননী জগদম্বা কয়েকটি বিভূতিও প্রদর্শন করালেন। অল্প চাউলে চতুষ্পার্শ্ব সমস্ত গ্রামের লোকেরা প্রসাদ পেল। জননী শ্যামাসুন্দরী মা জগাই-য়ের কানে কানে যাওয়ার সময় বলে দিলেন—

"মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি তোমার জন্য সমস্ত বছর ধরে সব জোগাড় করে রাখবো"। শাস্ত্রের মত—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। কাজেই বর্তমান যুগের স্বয়ং অবতীর্ণা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীরূপা শ্রীশ্রীসারদামণির জননী যে শিষ্টাচার পালন পূর্বক লোকশিক্ষার পথ অবারিত করে গেছেন, সে মত যে ধর্মানুশাসিত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তাঁর আচরিত পথ বলেই তো এটি শাস্ত্রসিদ্ধ পথ।

জননীর পিতৃপরিবার এত দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে অতি অল্প ব্যয়েও জননী জগদ্ধাত্রীপূজা প্রতি বৎসর চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই জননী পরের বছর "জগাই-"য়ের পূজায় আপত্তি করেন। স্বপ্নে জগাই সখী জয়া বিজয়াকে নিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, সত্যি ওঁরা তা হ'লে যাবেন কি না। জননী অমনি বল্লেন—"না, না, তোমরা যাবে কেন?"

প্রথম বছর বিসর্জনের দিন বৃহস্পতিবার ছিল। শ্রীমা আপত্তি করলেন যে লক্ষ্মীবারে মাকে বিদায় দেওয়া যায় না। পরের দিন সংক্রান্তি, তার পরের দিন শনিবার থাকায় মায়ের বিসর্জন হয়েছিল রবিবারে—চতুর্থ দিনে।

বার বৎসর পর পর জগদম্বা জননীর পূজা করে জননী ভেবেছিলেন আর জগদ্ধাত্রী পূজা করবেন না। প্রথম চার বৎসর জননী-জননী শ্যামাসুন্দরী, পরের চার বৎসর মা সারদামণি নিজে এবং তার পরের চার বৎসর খুল্লতাত নীলমাধবের নামে পূজা হয়ে গেছে। কাজেই তিনি দরিদ্র পরিবারে আর পূজা চালাতে চাইছিলেন না। জননী সারদামণি যেদিন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন, সেদিন রাত্রেই জননী জগদ্ধাত্রী স্বপ্নে মা সারদামণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি তিনি তা হ'লে মধু মুখুজ্জের পিসীমাদের ওখানে চলে যাবেন কি না। জননী সারদামণি জননী জগদ্ধাত্রীর শ্রীচরণকমল জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"আমি আর ছাড়ব না তোমাকে, আমি বছর বছর তোমাকে আনব"। এই সঙ্কল্পানুসারে পূজা চালাবার জন্য জননী সাড়ে দশ বিঘার কিছু বেশী জমি দেবোত্তর করে গেছেন। এ জমির আয় ও সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে আজও জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দিরে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা সম্পাদিত। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, বিগত কয়েক বছর ধরে পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীযুক্ত বিমুক্তানন্দজীও বেলুড় মঠে সারদাতত্ত্ব মন্দিরে জগদ্ধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান করছেন।

প্রথম বারের মত প্রতি বৎসর জননীর পিতৃবাটীতে তিন দিনে জগদ্ধাত্রী পূজা করা হয়—প্রথম দিন ষোড়শোপচারে এবং পরের দুই দিন সাধারণ ভাবে। দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া বিজয়ার মূর্তি স্থাপিত ও পূজিত হয়।

জননী দেখতে জগদ্ধাত্রীর মত ছিলেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হলদে পুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল উপস্থিত হলেন। উভয় জননীকে বারংবার নিরীক্ষণ করেও কোনও পার্থক্য বুঝতে না পেরে পালিয়ে গেলেন।

শেষের দিকে জননী যখন জয়রামবাটীতে যেতেন ও ভক্ত সন্তানগণ জননীকে জগদ্ধাত্রীর মত পূজা করতেন, জননী শ্যামাসুন্দরী আর অশ্রুসংবরণ করতে পারতেন না। একবার তিনি বলেছিলেন—"হাঁ গো! তখন সকলেই জামাই ক্ষেপা বলতো, সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, আমায় কত কথা শুনাত, মনের দুঃখে মরে যেতুম। আর আজ দেখ, কত বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা-পূজা করছে!"

জননী জগদ্ধাত্রীর পূজার সময় জননী সারদামণি ঠাকুরকে সকাল সকাল ভোগ দিতেন এবং বলতেন যে, এখন পূজার জায়গায় যেতে হ'বে। সন্ধ্যারতির কয় দিন এবং মহাষ্টমীর সন্ধ্যাপূজাক্ষণে জননী জগদম্বাকে দর্শনপূর্বক চামরব্যজন করতেন, ভক্ত সন্তানগণ উভয় জননীর মধ্যে কোনও প্রভেদই খুঁজে পেত না।

ফলতঃ—এ রকম বহু প্রমাণ আছে—যাতে প্রমাণিত হয়, জননী সারদামণি জননী জগদ্ধাত্রীরই বর্তমান যুগের অবতীর্ণ আত্মরূপ। উভয় জননীকেই আজ এই পুণ্য জগদ্ধাত্রীপূজারূপে যুগপদ্ ভাবে প্রণাম নিবেদন করি।

প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি,
আমরা মানি না শিখা ত্রিপুণ্ড্র উপবীত তরবারি,
জাব্দা খাতার ধারি না কো ধার মোরা শুধু মমতারি।
মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন ভারতে গণিকা

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

বিশেষ একটি সামাজিক শ্রেণী হিসাবে বারবনিতার উল্লেখ না করলে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় নারীজাতির স্থান নির্ধারণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। কেলিকলা-নিপুণা সুচারু-দেহিনী সুধাকণ্ঠী নৃত্যপরা যৌবনবতী গণিকাকুল প্রাচীন ভারতের নাগরিক সভ্যতায় যেরূপ উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার তুলনা একমাত্র প্রাচীন গ্রীসদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। চরম বৈসাদৃশ্যের দেশ এই ভারতবর্ষ! এর একদিকে পবিত্র শান্ত আরণ্য পরিবেশে সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করে জিতেন্দ্রিয় তপস্বীরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ-সম্মত গভীর তপশ্চর্যায় অকলঙ্ক পরমার্থের সন্ধানে নিমগ্ন হতেন। অন্যদিকে নগরীর পথে পথে বিভ্রমনিপুণা, লুব্ধা, লুণ্ঠকী, মদালসমন্থরা, সুতনুকা নগরমোহিনীরা পুরুষ-হৃদয় সংহারের নিষ্ঠুর ছলপ্রণয়-বিলাসে মত্ত হত। দণ্ডীর দশকুমারচরিত, ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকা, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমতম্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের বহু স্থানে নিখুঁত নারীত্বের প্রতীকরূপে এই প্রমদা পণ্যাংগনাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ভারতীয় প্রেম-জীবন ও লাম্পট্য-লীলার প্রাণময়ী প্রতিমারূপে গণিকাকে চিত্রিত করা হয়েছে। বহুবল্লভা ও কামদা হয়েও তারা ঘৃণ্যারূপে পরিত্যক্তা হয়নি, বরং অপার কলা-কুশলতার জন্য বিশেষ ভাবে আদৃতা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের নগরজীবনে গণিকাদের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হত। সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না বরারোহা গণিকারা সাধারণ্যে সমাদর লাভ করলেও, প্রত্যেকটি বারবনিতাই এই সামাজিক, সম্মানের অধিকারিণী ছিল না। 'কামসূত্র' ও 'উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথায়' সাধারণ ও অসাধারণ দু' শ্রেণীর গণিকার উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমার-চরিতে বর্ণিত রাগমঞ্জরীর অগ্রজা কনকমঞ্জরীর চরিত্র থেকে আমরা সাধারণ গণিকা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। প্রভূত লোভ আর পুরুষ-মৃগয়ার ছলাকলার জন্য সাধারণ গণিকাদের যথেষ্ট দুর্নাম ভোগ করতে হত। শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের শিক্ষিতা করে তোলা হত। সেটি হচ্ছে, প্রণয়াসক্ত পুরুষের কাছ থেকে মিথ্যা প্রণয়ে অর্থ নিষ্পেষণ।

তন্ত্রসাহিত্যে, বিশেষ ভাবে মহানির্বাণতন্ত্রে বারবনিতাদের পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(১) রাজবেশ্যা (নৃপতির উপভোগ্যা)। নৃপতির আমোদ-প্রমোদের জন্য তারা নিযুক্ত হত এবং রাজ-অন্তঃপুরের একাংশেই অবস্থান করত। জাতক থেকে জানা যায় যে, কোন কোন নৃপতির ষোল সহস্র নর্তকী ছিল। কৌটিল্যও রাজবেশ্যার উল্লেখ করেছেন। রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থান করলেও রাজা এদের মোটেই বিশ্বাস করতেন না। এদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য নারী-গুপ্তচর ও নর্তকী নিযুক্ত করা হত। এদের আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত এদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেওয়া হত না। এদের সম্পদের অভাব না থাকলেও ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব ছিল।

(২) নাগরী বা নগরবেশ্যা। এরা সাধারণতঃ নগরের একাংশে বাস করত এবং নাগরিকেরা এদের গৃহে গমন করত। বিশেষ বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে বা প্রমোদ-বিহারে এদের আমন্ত্রণ জানান হত। রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় ও 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক থেকে জানা যায় যে, উৎসব উপলক্ষে নগরীর পথে বারাংগনা সমাবেশ ঘটতো। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' ও 'রতিরহস্যে' বিভিন্ন প্রমোদভ্রমণে বারনারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রভূত সাক্ষ্য মেলে। সাধারণ নগরবেশ্যার আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব না হলেও 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বর্ণিত বসন্তসেনার প্রাসাদের সমুজ্জ্বল সমৃদ্ধি থেকে রূপসী কলাবতী নগরবেশ্যার বিলাস-উচ্ছল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা চলে। বসন্তসেনার আবাসগৃহের গজদন্তশোভিত সু-উচ্চ তোরণদ্বার, মণিখচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, মুক্তাশোভিত কক্ষাবলী, সুবর্ণলিপ্ত সোপানশ্রেণী, স্ফটিক-নির্মিত বাতায়নরাজি, মণিময় অক্ষ-সমন্বিত ক্রীড়া-পীঠিকা—সর্বত্রই চরম ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) গুপ্তবেশ্যা। ভদ্রপরিবারভুক্ত নারীরাও সময়-বিশেষে গোপনে দেহবিক্রয় ব্যবসায়ে লিপ্ত হত। এই প্রসঙ্গে আমরা 'কাদম্বরীতে' রেশমী ওড়না-আবৃত মুখে তরুণীকুলের পূর্ণিমা রাত্রে প্রণয়ি-সন্নিধানে গমনের উল্লেখ দেখতে পাই। বাৎস্যায়নও উদ্যানযাত্রা পানযাত্রা প্রভৃতি প্রমোদ বিহারে ব্যভিচারিণী পুরনারীদের পরপুরুষ-মত্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। 'রতিরহস্যেও' ভ্রষ্টা পুরস্ত্রীর নৈশাভিসারের কথা বলা হয়েছে। 'অভিধানরত্নমালায়' একশ্রেণীর জায়াজীব নটের উল্লেখ আছে। স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করে তার উপার্জনের উপর এই শ্রেণীর নটেরা অন্নসংস্থান করত। 'রতিরহস্যেও' এই অদ্ভুত পাপাচরণের অস্তিত্ব সমর্থিত হয়েছে। মেধাতিথি বলেন, বহু গায়কের পত্নী পরিপূর্ণ বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ না করলেও স্বামীদের জ্ঞাতসারে ও পরিপূর্ণ সমর্থনে নিজেদের গৃহেই উপপতিদের আমন্ত্রণ জানাতে কুণ্ঠাবোধ করত না।

(৪) দেববেশ্যা (দেবদাসী বা দেবমন্দিরের নর্তকী)। গণিকা বৃত্তির সঙ্গে সমভাবে যুক্ত দেবমন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের প্রথা প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিল। বাহ্যদৃষ্টিতে দেবনর্তকীরা দেবভোগ্যারূপে পরিগণিত হলেও, কার্যক্ষেত্রে এদের বিগ্রহ-পূজারীদের আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য অপ্সরী-বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হত। কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল-মন্দিরে দেবদাসী নিযুক্ত ছিল। হিউয়েন-সাঙয়ের সময়েও পূর্ব-সিন্ধুর এক নগরের সূর্য-মন্দিরে দেবদাসীর অস্তিত্ব দেখা যায়। গুপ্তোত্তর যুগেও দেবদাসী প্রথার বিলোপ ঘটেনি। মেধাতিথি ও তৎকালীন শিলালেখন থেকে এর যথেষ্ট সমর্থন মেলে। আবু জয়িদও ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে গণিকাকে যুক্ত থাকতে দেখেছেন। রাণী চিত্রলেখার বায়ানা স্তম্ভলিপি, পশ্চিম চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয়ের তুম্বগি শিলালিপি ও দাক্ষিণাত্যের চোলনৃপতি প্রথম পরান্তক এবং প্রথম রাজরাজের শিলালেখন প্রাচীন ভারতে দেবদাসী-প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

(৫) ব্রহ্মবেশ্যা বা তীর্থগা। এরা প্রধানতঃ তীর্থক্ষেত্রের গণিকা। নারী ও ধর্মানুরাগ পরস্পর সংযুক্ত থাকায় ভারতে তীর্থস্থানগুলি সাধারণতঃ প্রেমের লীলাক্ষেত্ররূপে পরিচিত হত এবং তীর্থক্ষেত্রে প্রভূত জনসমাগম হেতু গণিকাকুলও তাদের দেহ বিক্রয় বৃত্তি অবাধে অনুসরণ করবার সুযোগ পেত। এই প্রসঙ্গে ব্যাস তাঁর 'কাশীখণ্ড' গ্রন্থে রত্নেশ্বর লিঙ্গ মাহাত্ম্য বর্ণনায় কলাবতী নামে

এক সুপণ্ডিতা, নৃত্যগীত-বাদননিপুণা নর্তকীর উল্লেখ করেছেন। জাতকেও বারাণসী-তীর্থে শামা, সুলসা অর্ধকাশী প্রভৃতি গণিকার অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রব্রজিতা বা ভিক্ষুকী নামে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসিনীর উল্লেখ দেখা যায়। কামসূত্রে এদের নৈতিক চরিত্রে উচ্চসম্মানের অধিকারিণীরূপে চিত্রিত করা হয়নি। বিবাহিতা নারীদের এদের সংস্রব বিষবৎ পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সন্ন্যাসিনী কলাবিদ্যায় যথেষ্ট পারঙ্গমা ছিল এবং প্রেমঘটিত ব্যাপারে কামোপহত নাগরিকেরা এদের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হ'ত না। বহু ক্ষেত্রে এরা কুট্টনীবৃত্তি অবলম্বন করত এবং এদের কুটীর প্রেমিকদের অভিসার ক্ষেত্র ও সুরতস্থলীরূপে পরিগণিত হত। অবশ্য সমস্ত প্রব্রজিতাই এই দুর্নামের অধিকারিণী ছিল না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে জনসাধারণের কাছ থেকে এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করতে দেখা গেছে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও কাত্যায়নের ভ্রাতৃকসূত্রে গণিকা-সংঘের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিতে গণিকাদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। একটি গণিকাকন্যাকে জন্ম থেকেই নৃত্য, গীত, বাদন, অভিনয় ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সুকুমার কলা, মাল্য ও সুগন্ধী পুষ্পসার প্রস্তুত প্রণালী, পঠন, লিখন ও কথনবিদ্যা, ব্যাকরণ, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদিতে সুশিক্ষিতা করে তোলা হত। সঙ্গে সঙ্গে গণিকাসুলভ ছল প্রণয়কলায় তাকে লাভ করতে হত প্রত্যক্ষ শিক্ষা, গণ-উৎসবে তাকে যোগদান করতে হত, মুগ্ধ নাগরিকদের মধ্যে তার উদ্ধত দেহশ্রী ও গুণাবলী বিজ্ঞাপিত করতে হত এবং তার প্রণয়-লাভের উপর উচ্চ দর্শনী নির্ধারিত করতে হত। কৌটিল্যও এই শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করেছেন এবং রাষ্ট্রকে শিক্ষিকাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুট্টনীমতমের একটি কাহিনী থেকে আমরা গণিকাদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। মালতী তার প্রেমিকের কাছে যে দূতী পাঠিয়েছিল, সে শুধুমাত্র তার বিকশিত যৌবনশ্রীর বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মালতীর আরও অনেক গুণের উল্লেখ করেছিল। গণিকা হিসাবে মালতীর বাৎস্যায়ন ও দত্তক বিরচিত কামশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল, প্রণয়-অভিনয়ের ছলাকলায় ছিল তার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য, ভেষজবিজ্ঞান, সূচীকর্ম, দেহ-বন্ধন, মূর্তি রচনা, নৃত্য, গীত ও যন্ত্র বাদনে তার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

কুট্টনীমতমের অপর এক স্থানে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনক্ষণে গণিকার সাজসজ্জা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে। গণিকার পরিধানে থাকবে ধৌত, সুরভিত, কোমল ও সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ, দেহে থাকবে সুদৃশ্য অলংকার, চোখে থাকবে কজ্জল, অধর হবে রঞ্জিত, মুখ-গহ্বর সুগন্ধিত হবে সুসিদ্ধ মুখশুদ্ধিতে। কামসূত্র থেকে জানা যায় যে, একজন গণিকা হবে চৌষট্টি কলায় সুশিক্ষিতা, তার ব্যবহার হবে বিনয়নম্র, দেহশ্রী হবে মনোলোভা ও পুরুষ-চিত্ত বিজয়ের অনুকূল। তার প্রসন্নতা, তার সংগ সকলের কাম্য হবে, আর সে হবে সকলের দর্শনীয়া। ললিতবিস্তার গ্রন্থে মহারাজ শুদ্ধোধন কর্তৃক যুবরাজ সিদ্ধার্থের জন্য সর্বশাস্ত্রজ্ঞা ও গণিকাসুলভ কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী বধূ কামনার কথা লিখিত আছে। গণিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন, গণিকা হবে সম্ভ্রময়ী, শক্তিরূপা, বিনয়নম্র ও সুচতুরা। সে হবে সুন্দরেক্ষণা, সুতনুকা, কলাবতী, অপার রংগপারংগমা নারীরত্ন। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হবে একটি রভস-ব্যাকুল উৎসব, উচ্ছলিত হবে কামাতুর মত্ত-মধুপের গুঞ্জরণ।

মহাকাব্যের যুগ থেকেই গণিকারা নগরজীবনে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে আছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির নগরীর যৌবনরুচিরা রূপাতিশালিনা গণিকাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও গণিকারা উপস্থিত থাকত। দুর্যোধনের সৈন্যদলে শিল্পী, গায়ক, গুপ্তচর ও বারনারীরা অংশ গ্রহণ করেছিল। রামায়ণে নৃপতি দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের সৈন্যগঠনে গণিকাদের সৈন্যদলের শোভাবর্ধনের জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। কেবলমাত্র যুদ্ধাভিযানেই বারাংগনারা স্থান পেত না, তারা ছিল নগরের প্রত্যেকটি উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেককালে মহর্ষি বশিষ্ঠ বারনারীদের উৎসব-আনন্দে যোগ দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের বনবাসের পর সমগ্র অযোধ্যা নগরীতে উৎসব নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে ভ্রাতা ভরতও গণিকাকুল সহ সমস্ত নগরবাসীকে রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রিমা দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাজা বিরাটের পাণ্ডব-সহায়তার ফলে যুদ্ধজয়ের শেষে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কালে নগরের সমস্ত যুবতীবৃন্দ বারবনিতা সহ বিজয়ীদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শান্তিস্থাপনার্থে কৌরবশিবিরে যাত্রা করেছিলেন, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে নগর-মোহিনীরাও নগ্নপদে, মনোহরবেশে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

উদ্যানযাত্রা বা মৃগয়াকালেও বারবনিতারা নৃপতির অনুসরণ করত। দুর্যোধনের মৃগয়াকালে স্ত্রীকুল, নর্তক, গায়ক এবং আনন্দদায়িনী নারীরাও অংশ নিয়েছিল। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্য নৃপতির স্ত্রী-দেহরক্ষী হিসাবে গণিকাদের নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। বারহুত ভাস্কর্যে এইরকম একজন অশ্বারূঢ়া পতাকাধারিণী দেহরক্ষিণীর মূর্তি চিত্রিত হয়েছে। মৌর্যযুগে একজন কলাবতী সুযৌবনা গণিকাকে উচ্চ পারিশ্রমিকে গণিকা সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধায়িকারূপে নিযুক্ত করা হত। আবার তার ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য অর্ধ পারিশ্রমিকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী গণিকার নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক সুবিধার্থে গণিকাদের স্ত্রী-গুপ্তচর হিসাবেও নিযুক্ত করা হত। রাজ-অন্তঃপুরেও উচ্চ পারিশ্রমিকে তারা কর্ম গ্রহণ করতে পারত। তারা রাজ-ছত্র, স্বর্ণময় জল-পাত্র ও ব্যজনী ধারণ করত, ভাণ্ডারকক্ষ, রন্ধনশালা ও স্নানাগারের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হত। 'উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথা' থেকে জানা যায়, রাজকুমার নন্দীবর্ধনের সঙ্গে রাজকুমারী কনকমঞ্জরীর শুভ-পরিণয়ে গণিকারা নন্দীবর্ধনকে স্নান করিয়েছিল। আবু জয়িদ ও ইবন অল ফাকী বিশ্রামাগারে পথিকদের আনন্দদানের জন্য গণিকা নিয়োগের কথা বলেছেন।

সম্মানিত অতিথিদের সেবার জন্য গণিকাদের নিযুক্ত করার

প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। ব্যাসপুত্র জিতেন্দ্রিয় শুকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বিদেহ-রাজ জনকের উদ্যান-কুঞ্জে প্রবেশকালে পঞ্চাশটি সুদর্শনা, খরযৌবনা, রম্ভোরু ও গুরুনিতম্বিনী গণিকা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সুরত-লিপ্সা জাগিয়ে তোলবার জন্য তারা ঋষিকুমারকে নিবেদন করেছিল সুস্বাদু খাদ্য, বিলাস শয়নের জন্য প্রস্তুত করেছিল কোমল শয্যাসন। রামায়ণে উল্লিখিত লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থে বিভাণ্ডকমুনির পুত্র ঋষ্যশৃংগকে আনয়নের জন্যও কৌতুকময়ী যুবতী বারবনিতাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও রাজন্য-বর্গের চিত্তবিনোদন ও সাময়িক উপভোগের জন্য সহস্রাধিক নবযৌবনা গণিকাকে নিযুক্ত করেছিলেন। দ্বারকায় অর্জুনের মনোরঞ্জনার্থে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বারবনিতা নিয়োগও দৃষ্ট হয়। জনৈক রাজকুমারের ঔদাসীন্য দূর করবার জন্য নর্তকী নিয়োগের কথা 'কুল্লপলোভন' জাতকে লিখিত রয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভে গৌতমকেও এই ভাবে নর্তকীর ছলাকলার সাহায্যে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

'কামসূত্রে' বর্ণিত 'নাগরকের' জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে জানা যায় যে, গৃহে অনুগত প্রেমময়ী পত্নী থাকা সত্ত্বেও নাগরিকেরা বিহারযাত্রায়, উদ্যানভ্রমণে, পানযাত্রায় ও গণিকালয়ে বারনারীদের সঙ্গে মিলিত হত।

'রতিরহস্য' থেকে জানা যায় যে, নিশাকালে প্রমোদবিলাসী যুবকেরা আলোকোজ্জ্বল পুষ্পসার-সুরভিত কক্ষে নর্তকীদের সঙ্গে নির্লজ্জ নর্মলীলায় মত্ত হত। 'উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথায়' দেখা যায় যে, বসন্ত সমাগমে পানোন্মত্ত নাগরিকেরা গণিকাদের সঙ্গে নগরের বহির্ভাগে উদ্যানসমূহে যাত্রা করত। সেখানে তারা বকুল অশোক প্রভৃতি বৃক্ষতলে কামোদ্দীপক ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হত, রত্নখচিত আধার থেকে সুগন্ধী সুরা পানপাত্রে ঢেলে নিয়ে তারা ভ্রষ্টা পণ্যাংগনাদের রক্তিম অধরে তুলে ধরত। 'মেঘদূতে' বিদিশা নগরীর যুবকবৃন্দকে নিকটবর্তী শৈলদেশের শিলাগৃহে গণিকাদের সঙ্গে কাম-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হতে দেখা গেছে। কবি রাজশেখর বিরচিত 'কাব্যমীমাংসা' ও 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' গ্রন্থদ্বয়েও কেলিশয়ন-সুশোভিত লীলাগৃহ সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, নৃত্যস্থলীতে নর্তকীর লাস্যময় নৃত্যানুষ্ঠান ক্ষণে ক্ষণে যুবকবৃন্দের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়েছে। মুদ্রারাক্ষস, কুমারসম্ভব ও কাদম্বরী গ্রন্থ থেকেও গণিকাসক্ত যুবকদের ক্রীড়ামত্ততার পরিচয় মেলে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন সমাজ ছিল সুরুচির সমাজ। এক শ্রেণীর গণিকার অপরূপ দেহলাবণ্য, বিনয়-নম্র আচরণ ও বিভিন্ন কলাশাস্ত্রে অসাধারণ প্রজ্ঞার জন্য সমস্ত কলারসিকেরাই তাদের সংগ কামনা করত। বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে গণিকারা চৌষট্টি কলায় যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করত, অন্তঃপুরচারিণী বিবাহিতা নারীদের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না। কারণ, তাদের উপরে ছিল সংসার প্রতিপালন ও গৃহস্থালী সংরক্ষণের গুরু দায়িত্ব। তাছাড়া যে সমস্ত কলাগৃহ বা গন্ধর্বশালায় গণিকাকন্যারা বিবিধ কলায় শিক্ষালাভ করে ধনী সন্তানদের মাঝে মক্ষিরাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হত, সে সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণ করাকে বিবাহিতা নারীরা সুরুচিসম্মত ও ভদ্রজনোচিত বলে মনে করত না। সে যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পবিত্রতা সংরক্ষণকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হত এবং তার স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বহুবিধ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা ছিল। যার ফলে এক স্বামী ছাড়া সে আর কারও কাছ থেকে কলাবিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত না। আর নাগরিক স্বামীও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এত ব্যস্ত থাকত যে তার পক্ষে স্ত্রীকে কলারসিকা করে তোলবার অল্পই সুযোগ মিলত। সেই কারণে বিবাহিতা স্ত্রীদের চেয়ে গণিকারাই ছিল অধিকতর শিক্ষিতা, মার্জিতা ও কলাবতী। নগরবাসী পুরুষেরাও সেজন্য গৃহে পতিপ্রাণা ঘরণী থাকলেও শিক্ষিতা বারবনিতার সংগ অধিক কামনা করত। উদাহরণস্বরূপ চারুদত্ত বসন্তসেনার উপাখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। নগরবাসী পুরুষদের গৃহে অশান্তি ছিল না, অসহনীয় ছিল না গৃহ-পরিবেশ। তবু তারা গণিকার সংস্পর্শে আসত তাদের রুচিসম্মত গুণাবলীর জন্য। সাধারণ মানুষে গণিকা-জীবনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখলেও, তার উচ্চ কলাজ্ঞানের জন্য তারা তাকে সহ্য করত ও সময় বিশেষে সমাদর করতেও কুণ্ঠিত হত না। গণিকাদের অপার কলারসের পরিচয় পাওয়া যেত বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জনসাধারণও আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পেত। দশকুমারচরিতে বর্ণিত রাগমঞ্জরী নাগরিকদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য প্রকাশ্যে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। মহাভারত ও ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'কলাবিলাসের' একটি কাহিনী থেকে জানা যায় যে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারীরা পর্য্যন্ত বিকচযৌবনা আসঙ্গপ্রিয়া, সুবেশা রূপাজীবাদের সমাদরকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন।

পুরুষের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যই গণিকার সৃষ্টি। মনোহারী দেহসুষমা, কপট প্রেমের ছলাকলা ও চটুলতার সাহায্যে তারা দুর্বলচিত্ত পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। সাধারণভাবে তারা লুব্ধা, লুণ্ঠকী ও স্বার্থপর। পুরুষ-মৃগয়ায় তারা পায় অপার আনন্দ, কামুক সম্পদশালীকে নিগৃহীত করাই তাদের স্বভাব-বিলাসিতা। অবশ্য সমস্ত গণিকাই কপটিনী অসৎ ও অর্থলোলুপা ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও জাতক কাহিনীগুলিতে বহু গণিকাই তাদের দেহশ্রী, বুদ্ধিমত্তা ও ত্যাগব্রতের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা ও উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বহু বারবনিতাই বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসে প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে আদর্শ জীবন যাপন করেছে এবং অবশেষে অর্হত্ত্ব লাভ করেছে। জনসাধারণও তাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদনে দ্বিধাবোধ করেনি। ভগবান বুদ্ধ তাঁর সংঘ থেকে ছিন্নমুষ্ক ও নপুংসকদের বর্জন করলেও গণিকাদের বর্জন করেননি। এই প্রসঙ্গে 'মহাভগ্‌গ' জাতকে বর্ণিত অম্বপালী বা আম্রপালীর জীবনকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈশালী নগরীর এক বিত্তবান নাগরিকের কন্যা এই আম্রপালী। সে ছিল রূপসী, কলাবতী, সুকণ্ঠী ও নৃত্যপটীয়সী। বহু যুবক আম্রপালীকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে উদ্‌গ্রীব হওয়ায় তার পিতা তাকে লিচ্ছবী-সংঘের সামনে উপস্থিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর আম্রপালী স্ত্রীরত্নরূপে অভিহিতা হয় এবং প্রচলিত প্রথানুসারে তাকে সমগ্র সংঘের উপভোগ্যা সভা-নর্তকীরূপে গ্রহণ করা হয়। আম্রপালীও এই বারাংগনা-জীবন গ্রহণে স্বীকৃতা হয়। তার অবস্থান বৈশালী নগরীকে সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রমে উজ্জ্বল করে তোলে। এরূপ একটি সুযৌবনা কলাশীলা গণিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে রাজধানী রাজগৃহের গৌরববর্ধনের জন্য জনৈক বণিক নৃপতি বিম্বিসারকে

অনুরোধ জানিয়েছিল। মগধাধিপ বিম্বিসারও বৈশালী গিয়ে আম্রপালীর প্রণয়াসক্ত হন। 'অবদানকল্পলতায়' 'আম্রপাল্যাবদান' কাহিনী অনুসারে বিম্বিসারের ঔরসে আম্রপালীর গর্ভজাত পুত্র অভয় সামাজিক ঘৃণা লাভ না করে রাজসভায় সম্মানিত আসন লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'ছান্দোগ্যোপনিষদের' সত্যকাম ও জবালার উপাখ্যানও উল্লেখযোগ্য। বহুভোগ্যা ভর্তৃহীনা জবালার পুত্র সত্যকামকেও ঋষি গৌতম সত্যকুল-জাত দ্বিজোত্তমরূপে স্বীকার করে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষালাভে অধিকার প্রদান করেছিলেন।

যখন ভগবান বুদ্ধ বৈশালী নগরীর উপকণ্ঠে উপনীত হন, তখন নর্তকী আম্রপালী তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে সশিষ্য তাঁকে তার গৃহে অন্নগ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। ভগবান বুদ্ধও তার অনুরোধ রক্ষা করেন। 'বিনয়পিটক' থেকে জানা যায় যে, আম্রপালী স্বীয় নামের একটি প্রমোদকানন বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘকে উৎসর্গ করে। এই আম্রপালীই পরে দিব্যজ্ঞান অর্জনের দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করে ধন্যা হয়।

থেরী গাথায় উল্লিখিত অনেক থেরী গণিকার জীবনও বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে পরিশোধিত হয় এবং তারা অর্হত্ত্ব লাভ করে। 'মহাবংশ,' 'ধম্মপদভাষ্য,' 'সুত্ত-নিপাত,' 'বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা,' 'মহাবস্ত্ববদান' প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বহু নর্তকীর উল্লেখ রয়েছে। উজ্জয়িনীর সভা-নর্তকী পদ্মবতী ধার্মিক সন্ন্যাসী-পুত্রের মুখে ধর্মবাণী শুনে গণিকার ঘৃণ্য জীবন পরিত্যাগ করে ও পরিশেষে অর্হত্ত্ব অর্জন করে। রাজগৃহের অপরূপ লাবণ্যময়ী নর্তকী সিরিমাও ভগবান বুদ্ধের শুভ সংস্পর্শে এসে পবিত্রতার প্রথম স্তরে উপনীত হয়। বারাণসীর গণিকা শামা দস্যু বজ্রসেনের প্রণয়াসক্তা হয়ে গণিকা-বৃত্তি পরিত্যাগ করে। পরে দস্যুর পাশব প্রবৃত্তি ও অর্থলোলুপতা দেখে তার মোহভঙ্গ হয় এবং সে তার পূর্বের জীবনে ফিরে যায়। বারবনিতা সুলসার জীবনও শামার মত। একটিমাত্র পুরুষকে আশ্রয় করে সাধুজীবন কাটাতে চাইলেও সুলসাকে আবার তার ঘৃণ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। যৌবনমদে মত্তা নটী বাসবদত্তার লাস্য আহ্বান সন্ন্যাসী উপগুপ্ত প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরে বসন্তরোগাক্রমণে বাসবদত্তা যখন নগর-পরিখায় পরিত্যক্তা হয়েছিল, তখন একমাত্র উপগুপ্তই তাকে সেবা দ্বারা ব্যাধিমুক্ত করেছিলেন। কাশীর বারবধূ অর্ধকাশীও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ধর্মপথ গ্রহণ করেছিল এবং অর্হত্ত্ব লাভে ধন্যা হয়েছিল।

'মৃচ্ছকটিকের' বসন্তসেনা, দশকুমারচরিতের রাগমঞ্জরী, চন্দ্রসেনা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর গণিকা স্বেচ্ছায় তাদের দেহ-বিক্রয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে অজস্র নিগ্রহ স্বীকারের পর নিজেদের পছন্দমত প্রেমিকদের সহিত মিলিত হয়েছে। 'মাধবানল-কামকন্দলা-কথা' থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণকুমার মাধবানল নর্তকী কামকন্দলার প্রণয়াসক্ত হয়ে সুদীর্ঘ যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদের পর রাজা বিক্রমাদিত্যের আনুকূল্যে কামকন্দলাকে বিবাহ করেন। 'দশকুমারচরিতে' চম্পা নগরীর এক গণিকা-কন্যার সংগে রাজপুত্রের বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। বিজাপুর জেলার মহাকূট মন্দিরের একটি শিলালেখনে বাদামীর চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের 'হৃদয়েশ্বরী' গণিকা বিনাপটির দান-কর্মের কথা লিখিত আছে।

উপরোক্ত কাহিনীগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে গণিকারা মোটেই ঘৃণার পাত্রী ছিল না বরং শৌর্যবান নৃপতিকুল ও সুবিখ্যাত ধর্মগুরুগণ তাদের যথেষ্ট সমাদর করতেন এবং বহু ক্ষেত্রে তাদের অনুগ্রহ করতে দ্বিধা করতেন না বা তাদের উপহার গ্রহণে লজ্জিত হতেন না।

দেবায়তন নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, উদ্যান রচনা, সেতু নির্মাণ, উৎসর্গ ও উৎসব মণ্ডপ নির্মাণ প্রভৃতি সৎকর্মে অর্থ নিয়োগকে গণিকারা জীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করত। ব্রাহ্মণকে গোদান পরম পুণ্যকার্য বলে স্বীকৃত হত এবং পতিতারা এই দান-কর্ম তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে সমাধা করত, কারণ শাস্ত্রীয় মতে কোন ব্রাহ্মণই গণিকার দান গ্রহণ করতেন না। 'বিষ্ণুস্মৃতি' অনুসারে বিদেশ যাত্রার সময় গণিকার মুখদর্শন শুভ বলে গণ্য হত।

প্রাচীন ভারতে গণিকাদের কর্তব্য ও অধিকার (বেশ্যাধর্ম) সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত বিবরণ 'মৎস্যপুরাণে' লিখিত আছে। তৎকালে গণিকা-বৃত্তিকে একটি আইন-সম্মত বৃত্তি বলে গণ্য করা হত এবং বিশেষ সর্ত-যুক্ত কতকগুলি বিধি-নিষেধ গণিকাদের প্রতি প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যও গণিকাবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক গণিকাকে তার দু' দিনের উপার্জন মাসিক কর হিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হবে। উপপতিদের সঙ্গে তাদের মতানৈক্য ঘটলে প্রধানা গণিকা তার সহজ নিষ্পত্তি করে দেবে। গণিকাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন, তাদের অভাব অভিযোগ ও শ্রেণীগত দর্শনীর হার গণিকাধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মীমাংসিত ও নির্ধারিত হবে। নর্তকীর বিনা সম্মতিতে তার উপর বলাৎকার করলে বা গণিকাকন্যার সংগে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে অপরাধীকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে হবে। নারদ বলেছেন, গণিকার অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চললেও তার ব্যবসায়ের সহায়ক অলংকারাদি কখনও রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগত করা চলবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, কোন গণিকা যদি কোন ব্যক্তির শয্যাসংগিনী হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অগ্রিম অর্থ নেয় এবং পরে তাতে অসম্মতা হয়, তবে সে অগ্রিমদাতাকে দ্বিগুণ অর্থ প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে। অগ্নিপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দেশ সমর্থিত হয়েছে। কৌটিল্যের মতানুসারে বেশ্যালয়গুলিকে তালিকাভুক্ত করা হত। বিগতযৌবনা গণিকাদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও ছিল।

শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না বারনারীদের সাধারণ ভাবে যথেষ্ট সমাদর করা হলেও মহাভারতের উপদেশাত্মক অংশ, বিভিন্ন পুরাণ ও সংহিতায় জনসাধারণকে এদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে, দশটি হত্যাগৃহ থেকে একটি তৈল-নিষ্পেষক চক্র অধিক মন্দ ; একটি অতিথিশালা দশটি তৈল-নিষ্পেষক চক্র থেকে নিকৃষ্ট ; একজন বেশ্যা দশটি অতিথিশালা থেকে মন্দ, আবার একজন নৃপতি দশ জন গণিকা থেকে নিকৃষ্ট। প্রত্যেক প্রজানুরঞ্জক নৃপতিকে পানশালা, বারাংগনা, জুয়াড়ি, ব্যবসায়ী ও বিদূষকদের অন্যায় প্রভাব থেকে নিজরাজ্যকে মুক্ত রাখবার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নইলে রাজ্যের ও প্রজাপুঞ্জের ধ্বংস অনিবার্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বহু স্থানে অক্ষক্রীড়া ও বারাংগনাকে পরস্পর সংযুক্ত দেখান হয়েছে। দশকুমারচরিত থেকে জানা যায় যে, তস্কর ও অপরাধীদের সংগে গণিকাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, তস্করের চৌর্যাপরাধের চারটি প্রমাণের মধ্যে একটি হচ্ছে বেশ্যাগৃহে বাস। জৈনকাহিনী 'অগলদত্তে' তস্করের উদ্দেশে বেশ্যাগৃহেই প্রথম অনুসন্ধান করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহাভারত থেকে জানা যায় যে মদ্যশালা ও গণিকালয় পরস্পর সংযুক্ত। নারদ, মনু, বৃহস্পতি প্রভৃতি শাস্ত্রকার 'প্রকাশবঞ্চকদে'র মধ্যে জুয়াড়ি, অসাধু ব্যবসায়ী ও উৎকোচগ্রহীতার সংগে গণিকারও উল্লেখ করেছেন। বাৎস্যায়ন, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু প্রভৃতি শাস্ত্ররচয়িতা একবাক্যে ব্রাহ্মণকে গণিকার দান ও গণিকাগৃহে অন্নগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। পরাশরসংহিতা ও মহানির্বাণতন্ত্রে গণিকার সহিত ব্রাহ্মণের সুরতক্রিয়াকে জঘন্যতম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। অগ্নিপুরাণেও এর সমর্থন রয়েছে। গৌতমের অভিমতানুসারে গণিকা-হত্যা অপরাধ বলে গণ্য হত না।

জাতককাহিনীগুলির উপদেশাত্মক অংশগুলিতেও গণিকাদের সংস্পর্শ বিষবৎ পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কেন না, মায়াবিনী প্রবৃত্তি ও অপ্সরা বৃত্তিই বারাংগনার উপজীবিকা। পুরুষ-চিত্ত বিজয়ের অভিযানে আয়ুধ তাদের মনোহরা মদালসমন্থর যৌবনশ্রী, সুধাকণ্ঠ, স্পর্শন, পরিরম্ভণ প্রভৃতি ছল-প্রণয়ের লীলাকলা। তাদের প্রকৃতি বেণীবদ্ধ তস্করের মত, গরলমিশ্রিত পানীয়ের মত, আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ পণ্যজীবীর মত, সর্বভুক হুতাশনের মত, সর্বগ্রাসী স্রোতস্বিনীর মত, কুরঙ্গের বংকিম শৃংগের মত, চির-বুভুক্ষিত কৃতান্তের মত, অনবরুদ্ধ-গতি স্বেচ্ছাসঞ্চরমান ঝটিকার মত, দুস্তর কলুষ-তমিস্র নরকের মত এবং চির-অতৃপ্তা নিশাচরীর মত। এদের নির্লজ্জ কেলিকপটতায় পতংগবৃত্ত ধনীসন্তান সম্পদহীন ভিক্ষুকে, দুশ্চরিত্র মণ্ডপে পরিণত হয়। অর্থলোলুপা কামুকী এই নারীদের চরিত্রে শুধুমাত্র ছলনা আছে, অসন্তোষ আছে, কৃতজ্ঞতা নেই, মমত্ববোধ নেই, নেই প্রকৃত প্রণয়ের মধুরতা।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে গণিকাদের সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী অভিমত ব্যক্ত হলেও, এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া সাধারণ গণিকা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকলেও, আম্রপালী, বসন্তসেনা, রাগমঞ্জরী, চন্দ্রসেনা, কামকন্দলা প্রভৃতি নর্তকীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্নতশ্রেণীর রূপাতিরম্যা, বিদুষী, ঐশ্বর্যশালিনী গণিকাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও জন-সমাদর সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এদের সংখ্যা অল্প হলেও অনুল্লেখ্য নয়। এদের কেউ বা স্বেচ্ছায় দেহ-বিক্রয়বৃত্তি পরিত্যাগ করে মনোমত প্রণয়ীর সংগে মিলিত হয়েছে, আবার কেউ বা প্রচণ্ড ভোগের পর সাধুসংসর্গে পরম-মুক্তির সন্ধান পেয়েছে।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় নীচের পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে: 1. History & Culture of the Indian people Volumes II, III & IV—Majumdar & Pusalkar. 2. Position of Women in Ancient India-Altekar. 3. Sexual Life in Ancient India—J. J. Meyer. 4. Kautilya's Arthasastra—Meyer. 5. Social Life in Ancient India—Chakladar.

প্রভু-শিষ্য-সমাচার

বিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রভু যখন হাই তোলেন
শিষ্যেরা দেয় তুড়ি,
এমনি ক'রেই বছর বছর
প্রভুর বাড়ে ভুঁড়ি।

প্রভুর হাতে লাটাই যখন
শিষ্যেরা হয় ঘুড়ি,
শূন্যে উড়ে দুই পায়ে দেয়
নাক ঘষে' শুড়শুড়ি।

চালের কাঁকর যক্ষুণি হয়
বিষ-পাথরের নুড়ি,
শিষ্যেরা দেয় সোনায় মুড়ে
প্রভুকে গুড়গুড়ি।

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অভিধান তৈরী করার মত সহিষ্ণুতার কাজ আর নেই।
পৃথিবীর মধ্যে নানা লোক নানা বিষয়কে পরম সুখ বলে
বর্ণনা করেছেন। কেউ বা অর্থসঞ্চয় করাকে পরম সুখ, কেউ বা বৃক্ষমূলে বসে নতুন কাব্য পড়াকে পরম সুখ, কেউ বা প্রথম ছেলের মুখের আধ-আধ বুলি শোনাকে পরম সুখ—আবার কেউ বা সমুদ্র-তটে বসে তরঙ্গরাশি দেখাকে পরম সুখ বলেছেন—কিন্তু অভিধান তৈরী করার যে কত সুখ তা যাঁরা না করেছেন—তাঁরা তা অনুভব করতে পারেন না।

অভিধান তৈরী করার মত পরিশ্রমও বুঝি আর কোন কাজে দেখা যায় না—কেউ বলেন, যাঁরা অভিধান তৈরী করেন তাঁরা যেন বিল্ডার মজুর—তাঁরা মাল-মসলা তৈরী করে দেন—অন্যেরা সেই মসলা দিয়ে ঘর গাঁথেন। আবার কেউ বলেন—একটা সুবিশাল সৌধ। প্রবেশদ্বার তার তালাবন্ধ। সেই সৌধের প্রতিটি ঘর অগণিত শব্দ আর ভাষার ভাণ্ডার। কিন্তু প্রবেশদ্বার উন্মোচন করা চাই তো—তা করতে হলে চাই চাবি। এই শব্দ ও ভাষাভাণ্ডারের চাবিই হচ্ছে অভিধান।

এক শব্দের অনেক মানে, এক মানের অনেক শব্দ। সেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে মুখস্থ করা দরকার। বেদের যুগে এ রকম শব্দ মুখস্থ করার প্রথা ছিল। এই শব্দগুলিকে সন্নিবেশিত করা হয় যে বই-এ, তাকে কোষগ্রন্থ বলা হয়।

ভাষাকে সুষ্ঠুভাবে আয়ত্তে আনতে গেলে বিদ্যার্থীদের বহু বছর ধরে মুখস্থ করতে হত এই সব কোষগ্রন্থ, সে কোষগ্রন্থ আজকের কালের বর্ণানুক্রমে লেখা নয়। সুললিত ছন্দে শব্দ, শব্দার্থ ও লিঙ্গ প্রকরণে সজ্জিত। ভেবে দেখুন ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্রানুশীলনের মাঝে মাঝে আহরণ করতে থাকে শব্দার্থ-সম্ভার। এমনি করে তার মোটামুটি শব্দ প্রভৃতি সঞ্চয় করতে লেগে যেত প্রায় সাতটি বছর।

কালে সেই সব কোষগ্রন্থ রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রাচীন কালের কোষগ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক কালের অভিধান। অভিধানগুলিকে মুখস্থ করার আর প্রয়োজন হয় না, সম্ভবও নয়। যত দিন যায় শব্দসম্ভারও বাড়ে, অভিধানের কলেবরও দীর্ঘ হয়। ধীরে ধীরে প্রাচীনকালের কোষগ্রন্থগুলির প্রচলন রহিত হতে থাকে। অনেকগুলি কোষগ্রন্থের নামও আজ শোনা যায় না অথবা সম্পূর্ণরূপে দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় আছে। তাদের কোন প্রাচীন মঠে বা মন্দিরে, টোলে বা যাদুঘরে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তা সাধারণের নাগালের বাইরে। আধুনিক ভাবে সজ্জিত অভিধানের কথা বলার আগে আগেকার কালের অভিধান কি রকম ছিল দেখা যাক। এতে দেখা যাবে বাঙলাদেশই আধুনিককালের অভিধান সঙ্কলনের এক কেন্দ্র। এই কেন্দ্রভূমিতে ছোট, বড় অনেকগুলি অভিধান তৈরী হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে বলার আগে প্রাচীনকালের কতকগুলিকে অভিধানের কথা বলা দরকার।

অভিধান কথাটির সাধারণ অর্থ নাম। সুতরাং নামের সংগ্রহ আর তার পরিচয়ই হচ্ছে অভিধান। একই জিনিষের অনেকগুলি নাম আছে আর একই শব্দের অনেকগুলি মানে আছে। ভাষার মধ্যে শব্দের ব্যবহারকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হলে এ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। বৈদিক যুগ এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল দেখা যায়। শুধু অর্থ নয়, লিঙ্গ সম্বন্ধেও প্রাচীন যুগের ভাষ্যানিয়ন্ত্রগণ সচেতন ছিলেন। সংস্কৃতে প্রত্যেক শব্দেরই কোন না কোন লিঙ্গ হয়—বেদাঙ্গে এটা সুপরিপুষ্ট হয়। তাই পাণিনির আগে থেকে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়। ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ব্যাকরণের কাজ আর অভিধানের কাজ এক নয়। সংস্কৃত অভিধানে তিনটি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্যায় মানে এক জিনিসের অনেক নাম; নানার্থ একই শব্দের নানা মানে আর লিঙ্গ অর্থে কোন কোন শব্দের কোন কোন লিঙ্গ বুঝায়। প্রাচীন কালে এই তিনটি বিষয়ের পরিচয় এক সঙ্গে একই গ্রন্থে পাওয়া যেত না। এক একজন এক একটা বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন পর্যায়ের (বিভিন্ন নামের) সুপ্রাচীন পুথির নাম নিঘণ্ট। নিঘণ্ট বেদেরই অঙ্গ। বেদেরই মত মুখস্থ রাখতে হয় বলে এর নাম আম্নায় বা সমাম্নায় (বেদাঙ্গের অভ্যাস)। নানার্থের প্রাচীন পুথিগুলির মধ্যে কালিদাসের নানার্থ-শব্দরত্ন, লিঙ্গের পুথিগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ বররুচিই সুপ্রাচীন বলে মনে হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে যেমন পাণিনি, তেমনি অভিধানে অমরসিংহের নাম সংস্কৃত ভাষায় সুবিদিত। অমর সিংহই সম্ভবতঃ অভিধানের তিনটি বিষয় বা কাণ্ড একত্রে সঙ্কলন ও ও গ্রথিত করেন। আর এই জন্যই তাঁর অভিধান 'ত্রিকাণ্ড' নামে খ্যাত। সাধারণতঃ অমরসিংহের অভিধান অমরকোষ নামে সুবিদিত।

অমরসিংহকে ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলা হয়। প্রবাদ আছে—ইনি মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন। সম্ভবতঃ "ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু" এই শ্লোক হতে অনুমান করা হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে, ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এবং গয়ার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির, যা উরুবিল্ব গ্রামে (বোধগয়া) আছে, তা ইঁহার দ্বারা নির্মিত বলে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেবের মতে এই বৌদ্ধ-মন্দির খৃঃ ৪র্থ হতে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। উক্ত মন্দিরে ক্ষোদিত আছে, ইনি ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

আরও প্রবাদ আছে, ইনি হেম সিংহের শিষ্য। এঁর রচিত অমরমালা ও অমরকোষ ব্যতীত বৌদ্ধবিদ্বেষী শঙ্করাচার্য এঁর সমস্ত বই পুড়িয়ে দেন।

অমরসিংহ তিনটি অংশ নিয়ে নামলিঙ্গানুশাসন এবং ত্রিকাণ্ড নামে যে কোষগ্রন্থ লেখেন তাহাই অমরকোষ নামে খ্যাত। বইখানি ছন্দে গ্রথিত ও মুখস্থ করা সহজ।

বিভিন্ন কোষকার বিভিন্ন প্রাচীন কোষকাব্যের নামোল্লেখ করেছেন। ঐ সকল কোষকারগণের মধ্যে কাত্যায়ন, বাচস্পতি, বিশ্বরূপ, মঙ্গল ভোগীন্দ্র, সাহসাঙ্ক, শুভাঙ্ক, বররুচি, রন্তিদেব, বিক্রমাদিত্য, রুদ্র, মাধব, গোবর্ধন, ব্যাড়ি, ভাগুরি, গঙ্গাধর, তারপাল, রভস পাল, বাভট, ধর্ম, বামন প্রভৃতির নামই বেশী পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অমরকোষই অধিক প্রচলিত ও লোকপ্রিয় হওয়ায় ভারতের সর্বত্রই এর আদর দেখতে পাওয়া যায়।

অমরকোষ তিন কাণ্ডে ও আঠার বর্গে বিভক্ত। কেহ কেহ এই কোষকে ত্রিকাণ্ড বা নামলিঙ্গানুশান বলে। অমরকোষের বর্গগুলি এই—

১। স্বর্গবর্গ, ২। পাতালবর্গ, ৩। ভূমিবর্গ, ৪। পুরবর্গ, ৫। শৈলবর্গ, ৬। বনৌষধিবর্গ। ৭। সিংহাদিবর্গ, ৮। মনুষ্যবর্গ, ৯। ব্রাহ্মণবর্গ, ১০। ক্ষত্রিয়বর্গ, ১১। বৈশ্যবর্গ, ১২। শূদ্রবর্গ, ১৩। প্রাণিবর্গ, ১৪। বিশেষ্যবর্গ বা নিম্নবর্গ, ১৫। সংকীর্ণবর্গ, ১৬। নানার্থবর্গ, ১৭। অব্যয়বর্গ, ১৮। লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গ।

কেউ কেউ বলেন, অভিধানের আদি অগ্নিপুরাণ 'সর্বেষাং কোষানামাদি অগ্নিপুরাণোক্তাভিধানং.' কিন্তু এটি ঠিক নহে। কারণ অগ্নিপুরাণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হতে ৯ম শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলাদেশ অথবা বিহারের কোন স্থানে এই পুরাণ লিখিত হয়। অভিধান সংকলনে অমরকোষ থেকে বহু বিষয় অগ্নিপুরাণ গ্রহণ করেছেন। এটাকে অমরকোষের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে। বিশেষতঃ উভয়ের মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের সমতা দেখা যায় আর অধ্যায় বিন্যাস-রীতিও একরূপ। অমরকোষের বর্গগুলির সঙ্গে মেলালে দেখা যায়, অগ্নিপুরাণে অনেকগুলি বর্গ এক। যথা—
১। স্বর্গবর্গ। ২। পাতালবর্গ। ৩। অব্যয়বর্গ। ৪। ভূমিবর্গ। ৫। বনৌষধিবর্গ। ৬। মনুষ্যবর্গ। ৭। ব্রহ্মবর্গ। ৮। ক্ষত্রবর্গ ৯। বৈশ্যবর্গ। ১০। শূদ্রবর্গ। ১১। সামান্যনামলিঙ্গাদিবর্গ। ইত্যাদি—

অমরকোষের প্রায় ৪০খানি টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায়। ক্ষীরস্বামীর (৮ম শতাব্দী) টীকা, ভানুদীক্ষিত কৃত ব্যাখ্যাসুধা, অচ্যুত উপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদীপ, ভরতমল্লের মুগ্ধবোধিনী প্রভৃতি।

এই টীকাকারদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী টীকাকার আছেন। তাঁর নাম সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১২ শতাব্দীর লোক। তাঁর পিতার নাম—আর্তিহর। গ্রন্থের নাম টীকাসর্বস্ব। ১১৫৯ খৃঃ রচিত হয়। তিনি অন্য দশখানি টীকা আলোচনা করে এই টীকা রচনা করেন। তাঁর টীকায় ৩০০ সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আদেশে এই টীকাখানি মুদ্রিত হয়। এই বইখানি বাঙলাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে মালাবারের কোন অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। বইখানি সম্বন্ধে রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যায় যথাক্রমে 'সাড়ে সাত শত বছর পূর্বের বাংলা শব্দ' ও 'দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১৪৩১ খৃষ্টাব্দে বৃহস্পতি মাথিস্তা (মতিলাল) 'পদার্থচন্দ্রিকা' নামে অমরকোষের একখানি টীকা লেখেন, এই টীকায় তিনি মেদিনীকোষ থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন—তিনি প্রাচীন ১৬টি কোষগ্রন্থ যেমন, ক্ষীরস্বামী, সুভূতি, কলিঙ্গ, কক্কট, সর্বধর, ব্যাখ্যামৃত টীকাসর্বস্ব থেকে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ইনি রাজা গণেশ (১৪০৫) ও তাঁর মুসলমান পুত্রগণের সভাসদ ছিলেন। এই টীকা লিখে গৌড়ের মুসলমান সুলতানের কাছ থেকে তিনি 'রায়মুকুট' উপাধি পান। সেই হতে তিনি রায়মুকুটমণি নামেও পরিচিত 'পদার্থচন্দ্রিকা' বা 'অমরচন্দ্রিকায়' তাঁর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ, মাতা নীলমুখায়ী দেবী এবং স্ত্রী রমা দেবী। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। মহাত্মা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সা-প পত্রিকায় (১৩৩৮) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

অমরকোষের পরিশিষ্টকারদের মধ্যে পুরুষোত্তমদেবের (১২-১৩শ খৃঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুষোত্তম একজন বড় শাব্দিক ছিলেন। তিনি অমরকোষের পরিশিষ্ট 'ত্রিকাণ্ডশেষ' প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি একাক্ষরকোষ, দ্বিরূপকোষ, হারাবলী নামে তিনখানা অভিধান সঙ্কলন করেন। 'হারাবলী' একখানি ছোট অভিধান। আমাদের পকেট অভিধানের মত। এখানি লেখবার জন্যে তিনি প্রায় ২ বছর খাটেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের বাড়ীতে যাতায়াত করেন নতুন নতুন শব্দ সংগ্রহের জন্য। যে শব্দ চলিত ছিল অথচ উঠে যাচ্ছে, সেই শব্দের অর্থ দেওয়া এই অভিধানের উদ্দেশ্য। ত্রিকাণ্ডশেষে কোন কোন স্থানে যেখানে অমরকোষ এক পর্যায়ে ১৭টি শব্দ আছে, পুরুষোত্তম সেখানে ৩৭টি শব্দ দিয়েছেন। এ রকম ভাবে তিনি অমরসিংহের পরবর্তী অনেক চলতি শব্দ তাতে সংযোগ করেছিলেন।

নানা কারণে পুরুষোত্তমের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পাণিনির বৈদিকসূত্র ছেড়ে দিয়ে ভাষাসূত্রগুলির বৌদ্ধমতে এক বৃত্তি লিখে যান। তার নাম 'ভাষাবৃত্তি'। বানান সম্বন্ধেও সেই প্রাচীন যুগেও তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। সাধারণতঃ ব-কার (অন্তঃস্থ ও বর্গীয়), য-কার (অন্তঃস্থ ও বর্গীয়), স-কার (শ, ষ, স), ন-কার (ন, ণ) প্রভৃতি ভেদ করা শব্দশাস্ত্রে এক দুরূহ ব্যাপার। ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ ভেদে এইরূপ বানান বিভ্রাট সে যুগেও আরম্ভ হয়েছিল। অনেকে উচ্চারণ ধরে বানান করত আবার অনেকে বেদ-পুরাণাদির বানান ধরে চলত। আবার লিখন পদ্ধতির দোষেও র ও ক, থ, ক্ষ ও য প্রভৃতি অক্ষরকে একরূপ দেখাত। পুরুষোত্তম এর সমাধান করেন 'বর্ণযোজনা' নামে এক বই লিখে। পরবর্তীকালে অমরকোষের টীকা আরও অনেকে লেখেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালীদের নাম পরে উল্লিখিত হবে।

অমরকোষের পরে বহু উল্লেখযোগ্য অভিধান রচিত হয়—তার মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা হল—শব্দচন্দ্রিকা (১০-১১শ খৃষ্টাব্দ; এই গ্রন্থ চক্রপাণি দত্ত রচনা করেন। ইঁহার পিতা নারায়ণ কবিরাজ পালবংশীয় রাজা নরপাল দেবের পাকশালার মন্ত্রী ছিলেন); নানার্থসংগ্রহ (অজয় পাল কৃত—১১৪০ খৃঃ ইঁহার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে); বিশ্বপ্রকাশ (মহেশ্বর বৈদ্য, বঙ্গদেশ, ১১১১ খৃঃ); অভিধানচিন্তামণি (হেমচন্দ্র সূরি। ইনি ১১-১২শ খৃষ্টাব্দের লোক। অর্ধাষ্টম (আমেদাবাদ) প্রদেশের ধন্দুক গ্রামে চাচিঙ্গের ঔরসে ও পাহিনীর গর্ভে ১০৮৮ খৃঃ জন্ম। শৈশবে হেমচন্দ্র 'চংদেব' নামে অভিহিত হতেন। ইনি জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। জৈনাচার্য দেবচন্দ্র সূরি ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে চংদেবকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। ২১ বছর বয়সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর জৈনাচার্য তাঁকে "হেমচন্দ্র" অর্থাৎ সোনার চাঁদ বলে সূরি উপাধি দেন। সেই সময় হতে চংদেব হেমচন্দ্র সূরি নামে প্রসিদ্ধ। জৈনধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা ছিল। তিনি সিদ্ধরাজ ও পরে কুমারপাল রাজার সভাপণ্ডিত হন। ১১৭৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়; কবিকল্পদ্রুম (বোপদেব মিশ্র

১৩শ শতাব্দীতে দৌলতাবাদে আবির্ভূত হন। পিতা—কেশব। ইনি ধনেশ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন। যাদবরাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত। ইঁহার 'মুগ্ধবোধ' ও 'কবিকল্পদ্রুম' বাঙলাদেশে বিশেষ আদৃত); অভিধানরত্নমালা (হলায়ুধ ভট্ট। ১০-১১শ খৃঃ। ইনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ হলায়ুধ হতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি); ভূরিপ্রয়োগ (পদ্মনাভ দত্ত দ্বিজ। হলায়ুধ বংশধর শ্রীদত্তের প্রপৌত্র, দামোদর দত্তের পুত্র। মিথিলায় ইনি ১৩-১৪শ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন); ধরণী (সারসংগ্রহনামাকানেকার্থসমুচ্চয়, ধরণীদাস ব্রাহ্মণ কৃত); শব্দমালা (রামেশ্বর শর্মা); বর্ণাভিধান (নন্দ ভট্টাচার্য); ভাবপ্রকাশ (ভাবমিশ্র); শব্দরত্নাবলী (মথুরেশ পণ্ডিত); রাজবল্লভ (নারায়ণ দাস কবিরাজ); নামমালা (ধনঞ্জয় কবি), নানার্থরত্নমালা (দণ্ডাধিনাথ); পর্যায়নানার্থকোষ (জটাধরাচার্য)। নানার্থধ্বনিমঞ্জরী (গদসিংহ), নিঘণ্টু অর্থাৎ রাজনিঘণ্টু (নরসিংহ কাশ্মীর পণ্ডিত); উণাদিকোষ (রাম শর্মা); আয়ুর্বেদার্ণবোপ্দিত পর্যায় রত্নমালা (রত্নমালাকর বৈদ্য) ইত্যাদি। উপরি-উক্ত কোষগ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই প্রচলন নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙালী কোষকারের মধ্যে সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আগে উল্লেখ করেছি। বাঙালী কোষকার মহেশ্বর বৈদ্য ১১১১ খৃঃ বিশ্বপ্রকাশ রচনা করেন। এর পর মেদিনীকোষ। এই কোষটি রচিত হয় ১২০০-১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থের রচয়িতা মেদিনীকর। ইনি দ্বাদশ শতকের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। মহামঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিখরভূমির রাজা রামচন্দ্রকৃত পুঁথিখানি হতে আবিষ্কার করেন যে প্রাণকর নামক জনৈক রাজা কর্ণগড় প্রদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র মেদিনীকর কর্তৃক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মেদিনীকরই মেদিনীকোষের রচয়িতা। মেদিনীকোষেই ইনি নিজ পিতার নাম উল্লেখ করেন। (১৮৬৯ খৃঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মেদিনীকোষ সম্পাদনা করেন। মেদিনীকোষ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে)। পুরুষোত্তমদেব, যার সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বঙ্গদেশীয় কোন রাজা বা মহারাজা ছিলেন—সম্ভবতঃ ১২শ-১৩শ খৃষ্টাব্দে। ইনিও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। বাঙালী এর পরে আরও অনেক অমরকোষের টীকা রচনা করেন। যেমন অমরকোষ টীকা—নয়নানন্দ শর্মা ও তৎছাত্র রামচন্দ্র শর্মা। পদার্থকৌমুদী—নারায়ণ চক্রবর্তী, ত্রিকাণ্ডবিবেক—রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, অমরকোষ টীকা—রমানাথ চক্রবর্তী, ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি—রঘুনাথ চক্রবর্তী, রামলিঙ্গ কৌমুদী—রামকৃষ্ণ, মালাখ্যা—পরমানন্দ শর্মা ইত্যাদি। এগুলি সবই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

পুরুষোত্তমদেবের অভিধান প্রায় ৮০০ বছর আগেকার লেখা। এর পর এদেশের ইতিহাসে অনেক ওলোট-পালোট হয়েছে। এখন আর কেউ-ই অভিধান মুখস্থ করে না; অকারাদি বর্ণক্রমে শব্দমালা সাজিয়ে অভিধান সঙ্কলন করা হয়। কিন্তু উনবিংশ শতকের আগে শব্দগুলিকে বর্ণমালা অনুসারে সাজাবার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। ইংরেজরাই এই প্রথার প্রবর্তক বলে আমাদের মনে হয়। কারণ ১৮০৭ খৃঃ কোলব্রুক সাহেব (H. T. Colebrooke, ১৭৬৫-১৮৩৭) 'অমরকোষ'কে সুসজ্জিত করে সম্পাদন করেন। তাতে তিনি পরিশিষ্টে বর্ণমালা অনুসারে অমরকোষের শব্দগুলি সাজিয়ে দেন। ইংরেজ যুগের আদিপর্বে কোলব্রুক সাহেবের অভিধান সম্পাদনের প্রীতি জন্মাল কেন? তিনি ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ত্রিহুত পুর্ণিয়ায় এসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর হয়ে আসেন। তরুণ বালক বললেই হয়, ১৭ বছর বয়স তখনও হয়নি—তিনি আকৃষ্ট হলেন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি।

সংস্কৃত শাস্ত্র ভালভালেই শিখলেন, হিন্দুর আইন সম্বন্ধে, হিন্দু বিধবাদের কর্তব্য সম্বন্ধে, জাতি, শ্রেণী সম্বন্ধে বই লিখলেন। এর পর তিনি সদর আদালতের জজ হন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আইন ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গলের সভাপতি হন (১৮০৭—১৮১৪)। এই সময় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন—তার সঙ্গে সম্পাদনা করেন অমরকোষ। তার (৩য় সং নামপত্রে এইরূপ লেখা আছে—Kosha। or। Dictionary। of the। Sanskrit Language। by। Umura Singha। with an English Interpretation and Annotations.। by। H. T. Colebrooke, Esq.। Calcutta। Dec. 1883 কোলব্রুক একাধারে হলে দাঁড়ালেন—গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি গ্রন্থ আর প্রবন্ধ রচনা করলেন—বেদ সম্বন্ধে, সংস্কৃত অভিধান, ব্যাকরণ, জৈন ধর্ম, আইন, হিন্দুদর্শন, ভারতীয় বীজগণিত, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি। তাই অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর এঁকে Prince of Orientalists (প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ) বলেছেন।

অমরকোষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা আভিধানিকদের কাছে তিনি হয়ে রইলেন অমর।

প্রায় এই সময় থেকেই বাংলা ভাষায় অভিধানের আবির্ভাব হয়। ইংরেজদের অনুকরণে বাংলা অভিধানের অ-কারাদিক্রমে সাজানর রীতি এই সময় থেকেই দেখা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে কয়েকটি বাংলা ইংরেজি অভিধান তৈরী হয়। সেগুলি বেশীর ভাগ ইংরেজদের লেখা। পর্তুগীজেরাও তাদের সুবিধার জন্য অভিধান তৈরী করেছিলেন। তখনকার বাংলা অভিধান মানেই মূলগত সংস্কৃত অভিধান—কারণ শব্দগুলির মধ্যে ১০ ভাগ সংস্কৃত শব্দ ও ৬ ভাগ বাংলা অথবা অন্য শব্দ থাকত। [ক্রমশঃ।

আসিছে সেদিন, আসিছে সেদিন,
চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহামানব ধর্ম
মানুষ ধর্মে বিলীন হবে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা নিষ্ফল করার আলোচনা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সেই ইউরোপের কথা বলছি না, নেপোলিয়ন বিসমার্ক, মেটার্নিক বা হিটলার 'ইউরোপ' শব্দটি বলতে যা বুঝতেন। বিসমার্কের মতে যাদের নিজেদের নামে যে জিনিসের দাবি করা সম্ভব নয় তাদেরই সব সময় ইউরোপের দোহাই দিয়ে সেই জিনিষ দাবি করতে দেখা গিয়েছে। জার্মাণ ভূমি দখল করে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, তিনি শুধু ইউরোপের সীমান্ত সম্প্রসারিত করছেন মাত্র। রুশিয়া আক্রমণ করার সময়ও তিনি ইউরোপ রক্ষা করার দায়িত্বের কথা বলে রুশিয়ার গ্রামকে গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। ইউরোপের নামেই তিনি ইউরোপের অন্যান্য দেশ আক্রমণ করেন। নেপোলিয়নের কাছে ফ্রান্সই ছিল ইউরোপ। মেটার্নিকের ইউরোপও ছিল জার, কাইজার ও হাপসবুর্গ বংশের ইউরোপীয় রাজত্ব। নেপোলিয়নের অক্ষম উত্তরসাধক হিটলার-হিমলার-গোয়েবেলস-রোজেনবের্গ কোম্পানীও ইউরোপের দেশের পর দেশ দখল করে লক্ষ লক্ষ লোককে বন্দিশালায় জীবন্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলেন সেই ইউরোপেরই দোহাই দিয়ে। তাঁদের চেলারা আজ সেই ইউরোপীয় ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্যে ইউরোপের স্বার্থের নামে ইউরোপের অংশ-বিশেষের দেশগুলিকে একজোট করে, "ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ" মার্কা মেরে সেই ইউরোপেরই অন্য অংশটির বিরুদ্ধে 'যুদ্ধং দেহি' বলে হুংকার ছাড়ছেন। সেই ইউরোপের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যেই ঠাণ্ডা লড়াই এবং সেই ঠাণ্ডা লড়াইয়েরই সন্তান পশ্চিম-জার্মাণীর আদেনাউয়ের সরকার। ঠাণ্ডা লড়াইয়েরই উত্তপ্ত জমি যদি সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাহলে আদেনাউয়ের সরকারের দেহে জমি থেকে রস পৌঁছানো থেমে যাবে। ঠাণ্ডা লড়াইকে গরম লড়াই-এ নিয়ে যাবার অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হিসেবে পশ্চিম-জার্মাণীতে এবং অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটির সবচেয়ে সামনের ডগা পশ্চিম-বার্লিনে জঙ্গীবাদের গায়ে যাতে আঁচড় না লাগে এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ যাতে নির্ব্বিবাদে চলতে পারে তার জন্যেই না হচ্ছে অস্ত্রহ্রাস বা পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তি, না হচ্ছে যুদ্ধ শেষ হবার ১৪ বছর পরে জার্মাণীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি। পশ্চিমী গোষ্ঠী পশ্চিম-জার্মাণীর সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারে একেবারে পেয়ারের বন্ধুর মত মেলামেশা করছেন কিন্তু এত গলায় গলায় ভাব হলেও তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে তাঁরা রাজী নন। বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু শত্রুতা শেষ হয়নি।

দশ বছরের ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে দাঁড়িয়েছে কী ?

প্রথমতঃ, ইউরোপের দেশে দেশে মারণাস্ত্রের গাদা হয়েছে পর্বত প্রমাণ এবং সেগুলোর মারণশক্তি প্রচণ্ড ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। কথায় বলে আজ হোক আর কাল হোক, কামানেরা নিজেরাই গোলা উগরোতে আরম্ভ করে। এমন কি, কোথাও কোন যান্ত্রিক গলদ বা ভুল কিম্বা কোন উন্মাদ বৈমানিকের খেয়াল বশে যদি একটা অ্যাটম বোমা বা রকেট গিয়ে পড়ে তাই থেকেই পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কিণ অ্যাটম বোমা ও রকেট অস্ত্রের ঘাঁটি বানানোর ফলে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন মীমাংসা করার দায়িত্ব সেই দেশগুলির হাত থেকে আজ আমেরিকার হাতে চলে গিয়েছে। সুতরাং যে কোন সময়ে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তারা যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়তে পারে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম-জার্মাণীতে রাখা হয়েছে বলে পূর্ব-জার্মাণীতে সোভিয়েত দেশ তার সৈন্য রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই ভাবে জার্মাণ ভূমিতে বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি জার্মাণী ও ইউরোপে উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছে

চতুর্থতঃ পশ্চিম-জার্মাণীর সেই সব জঙ্গীবাদী ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে যারা বর্তমান শতকের মধ্যে দু'টি মহাযুদ্ধ বাধিয়েছে। সেই সঙ্গে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে এই বলে ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে যে, এসব ব্যবস্থা শুধু কমিউনিষ্ট দেশগুলির দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে তাদের "সীমাবদ্ধ" যুদ্ধের বিরুদ্ধে। প্রথম কথা, প্রথম লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি হলেও সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধের রূপ নিতে বাধ্য। আজকের দিনে সীমাবদ্ধ যুদ্ধ বলে কিছু নেই। ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইউরোপের দুটি মহাযুদ্ধই বেধেছিল দুটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ করে (সার্বিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রোহাঙ্গারীর সংঘর্ষ এবং জার্মাণীর পোলাণ্ড আক্রমণ)। তবে হাঁ, যে আমেরিকান কূটনৈতিক পাণ্ডারা তাঁদের রণ পরিকল্পনার প্রথম ব্যূহের তরোয়াল হিসাবে মার্কিণ সশস্ত্র বাহিনীকে এবং ঢাল হিসাবে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে দেখেন তাঁদের কাছে ইউরোপের যুদ্ধ 'স্থানীয়' বা 'সীমাবদ্ধ' মনে হতে পারে। কিন্তু সে যুদ্ধের আগুন যে ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র নির্বিশেষে ইউরোপের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং মার্কিণ আক্রমণের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হিসেবে আক্রান্ত পক্ষের অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং রকেট যে সেই দেশগুলির মাথায় আগে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

এই বিপদ আজ এমন কি জর্জ কেনানের মত ঝুনো সোভিয়েত-বিরোধী মার্কিণ কূটনৈতিকও উপলব্ধি করতে পারছেন। তিনি শান্তিরক্ষার যে পরিকল্পনা দেন, তাতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র আস্ফালনের ভিত্তিতে কূটনীতি পরিচালনা বন্ধ করা দরকার; কারণ আজকের যুগের অস্ত্রশস্ত্রের মারণশক্তি এত প্রচণ্ড যে সশস্ত্র শাসানিকে রঙের টেক্কা হিসাবে ব্যবহার করতে যাওয়া বাতুলতা। মিঃ কেনান (যিনি মস্কোয় মার্কিণ রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করার সময় গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সোভিয়েত সরকার তাঁকে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' ঘোষণা করেন) বলছেন যে, বৃহৎ শক্তিরা পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপ থেকে তাঁদের সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুই রকম সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলবে এবং তাতে শান্তির কোন বিঘ্ন হবে না এবং জাতিগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিপদ থেকে রেহাই পাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ বহু দিন যাবৎ ঠিক এই প্রস্তাবই করে আসছে, অস্ত্রহ্রাসের বৈঠকে এবং জেনেভার পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনেও এই প্রস্তাবই করেছে। কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।

বৃটিশ লেবার পার্টির নেতা হিউ গেইট্‌স্কেলের প্রস্তাবও গঠনমূলক। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মাণী, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া

ও হাঙ্গারী থেকে চুক্তি করে ক্রমে ক্রমে বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নিতে এবং ঐ সব দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করতে বলেছেন এবং পশ্চিম ও পূর্ব-জার্মাণীর নাটো ও ওয়ার্স চুক্তি থেকে বার হয়ে এসে একতাবদ্ধ হবার প্রস্তাব করেছেন।

পশ্চিম-জার্মাণ পার্লামেণ্টের সদস্য হের ফ্রেইডার (শান্তি পরিকল্পনা দেবার অপরাধে যাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়) যে পরিকল্পনা দেন তাতেও জার্মাণী থেকে বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, কতকগুলি সর্ত্তে পশ্চিম-জার্মাণীর নাটো চুক্তি ত্যাগ এবং পশ্চিম-জার্মাণ বাহিনীকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত না করা ও বিদেশী সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব ছিল।

ভারতে নিযুক্ত ভূতপূর্ব মার্কিণ দূত মিঃ চেষ্টার বোল্‌সও এই ধরণের পরিকল্পনা দিয়েছেন।

পশ্চিম-জার্মাণীর সুপরিচিত ভাষ্যকার পল সেথে, কেনান, বোলস, গেইট স্কেল ও ফ্রেইডারের যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনার প্রশংসা করে দেখিয়েছেন যে কূটনীতির ইতিহাসে বরাবরই দেখা গিয়েছে কোন জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যারই মীমাংসা একসঙ্গে বা রাতারাতি হয় না। শান্তিপূর্ণ আপোষ আলোচনার দ্বারা ধাপে ধাপে আংশিক ভাবে মীমাংসা হতে হতে শেষ পর্যন্ত চরম মীমাংসায় পৌছানো যায়।

আস্তে আস্তে সৈন্য সরানো, আংশিক ভাবে অস্ত্র হ্রাস করা, প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করা, নাটো ও ওয়ার্স চুক্তিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি করা, সর্বপ্রথমে পশ্চিম-জার্মাণীতে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা এবং নির্দিষ্ট এলাকাকে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া, এই সব সোভিয়েত প্রস্তাব সারা দুনিয়ার শান্তিরক্ষার কর্ত্তব্যের প্রথম ধাপ মাত্র। কিন্তু পশ্চিমীরা সেই প্রথম ধাপটুকু কিছুতেই এগোতে রাজী নয়, কারণ প্রথম পা বাড়ালেই দ্বিতীয় পা-ও বাড়াতে হবে। জার্মাণ জঙ্গীবাদ এবং পারমাণবিক অস্ত্র এই দুটিই আজ মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ! জার্মাণ জঙ্গীবাদের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি বা ব্রেন্তানো-ষ্ট্রস-ব্রাণ্ডের ভাষায় Front Line City পশ্চিম-বার্লিনের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার (নিরস্ত্রীকৃত মুক্ত নগরী ঘোষণা করা) কর্ত্তব্যটি তাই আজ প্রথম পালনীয়। পারমাণবিক অস্ত্রের সমস্যা মীমাংসা করার প্রথম ধাপ হচ্ছে ঐ সব অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করা এবং অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করা, এই দুটি ব্যাপার নিয়েই জেনেভায় দুটি আলাদা সম্মেলন বসে।

প্রথমে ধরা যাক পারমাণবিক অস্ত্রের প্রশ্ন। সমস্যাটির মীমাংসা যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যিই চায়, তার প্রমাণ দেবার জন্যে সে একাই পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করে সারা দুনিয়ার সামনে এক দৃষ্টান্ত রাখে। কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা দূরে থাক, আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে তার পরে আরো বেশী করে পরীক্ষা চালাতে আরম্ভ করে এবং বৃটেনও বাদ যায়নি। সেই সঙ্গে চলতে থাকে সোভিয়েত সীমান্তের চার দিকে আমেরিকার যে সব বিদেশী ঘাঁটি আছে সেগুলিতে অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমাবাহী বিমানের মহড়া এবং পশ্চিম জার্মাণীর পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা। এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে একা অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ রাখা আর সম্ভব ছিল না; কারণ তা রাখলে পশ্চিমীরা ঐ সব অস্ত্রপরীক্ষায় সোভিয়েতের চেয়ে এগিয়ে যাবে এবং এগিয়ে গেলেই সোভিয়েতকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে। যার ফলে বেধে যাবে মহাযুদ্ধ।' সুতরাং সোভিয়েতের একা পরীক্ষা বন্ধ রাখা শুধু যে তার পক্ষে বিপজ্জনক তা নয়, সারা দুনিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক। বিশ্বশান্তি একপক্ষীয় চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না। কারণ 'শান্তি অবিভাজ্য।' রাজাজী যখন মিঃ ক্রুশ্চফকে একাই অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার উপদেশ দেন তখন মিঃ ক্রুশ্চফ ঠিক এই কথাটাই তাঁকে জানিয়েছিলেন।

পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার অজুহাত পশ্চিমীরা দেবার চেষ্টা করেন নানা ছলে। প্রথমে তাঁরা বলেন, সোভিয়েতের একা বন্ধ করাটা প্রচারের খেলার একটা চাল মাত্র। জবাবে বলা যায়, বেশ তো তাই যদি হয় তো সেই প্রচারের ব্যাপারে সোভিয়েতের সঙ্গে তাঁদের পাল্লা দিতে আপত্তি কেন? তাঁরা নিজেদের "মুক্ত গণতন্ত্রের" কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন, সোভিয়েতের "অমানুষিক" শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত প্রচার করেন কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করে নিজেদের মানব হিতৈষণা প্রচার করতে তাঁদের বাধলো কেন? এই প্রচারকার্য করলে পৃথিবীর মানুষ তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে অন্তত কিছুদিনের মত রেহাই পেতে পারত। তাতে যখন তাঁরা রাজী নন, তখন মনে হয় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারই তাঁদের সামরিক পরিকল্পনার মেরুদণ্ড।

আর একটি অজুহাত দেওয়া হোল যে, একপক্ষীয় কাজের কোন অর্থ হয় না। কারণ সেটা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা করা হয়নি। তাছাড়া সত্যিই পরীক্ষা বন্ধ হোল কি না তা যাচাই করবার কোন উপায় নেই। এই অছিলা ধোপে টেঁকে না, কারণ আমেরিকা ও বৃটেন যদি নিজেরা একপক্ষীয় ভাবে পরীক্ষা বন্ধ করত, তাহলে তিন পক্ষ মিলে চুক্তি করার পথে কোন বাধাই হোত না। আর পরীক্ষা ধরা পড়ার প্রশ্নে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, যে কোন পরীক্ষা আজকাল যন্ত্রে ধরা পড়ে। পরীক্ষা বন্ধ আছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যে ১৯৫৭ সালের জুন মাসেই তো কনট্রোল কমিশন গঠন এবং সোভিয়েতে, আমেরিকায়, বৃটেনে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে কতকগুলি চৌকিদার-ফাঁড়ি তৈরী করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব সেদিন যাঁরা গ্রাহ্য করেন নি আজ ঠিক তাঁরাই বলছেন যে একা পরীক্ষা বন্ধ করা কনট্রোল এড়িয়ে যাবার একটা কৌশল মাত্র।

এই মিথ্যেও জাহির করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত আমেরিকার চেয়ে বেশি বার পরীক্ষা চালিয়েছে বলে সামরিক ভাবে পরীক্ষা বন্ধ রাখলে তার কোন অসুবিধা নেই। পরে জানা গেল যে, আমেরিকা ও বৃটেনের পরীক্ষাগুলি এক সঙ্গে যোগ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় সোভিয়েতের পরীক্ষার সংখ্যা ছিল তার চেয়ে বেশ কিছু কম। অর্থাৎ পরীক্ষার সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমের চেয়ে পেছিয়ে থেকেও সে নিজের সদিচ্ছার পরিচয় দেখার জন্যে একাই পরীক্ষা বন্ধ করেছিল।

শেষ পর্যন্ত জেনেভায় পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার বৈঠক আরম্ভ হবার পর প্রায় ৬ মাস কেটে গেল। ৬০।৭০ বার প্রতিনিধিরা এক টেবিলে বসে আলোচনা করলেন। কিন্তু কোন চুক্তিই আজ পর্যন্ত হোল না। সোভিয়েত পক্ষ প্রথমেই যে খসড়া চুক্তি দাখিল করে, তাতে পরীক্ষা বন্ধ করা এবং সর্ববাদিসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক চৌকিদার-ফাঁড়ির সাহায্যে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলিতে কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিন সপ্তাহ ধরে পশ্চিমীরা এই বলে টালবাহানা করতে লাগলেন যে, অস্ত্রপরীক্ষা

বন্ধ করা বৈঠকের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে কণ্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা ব্যাপারটা ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুতে দেওয়ার মত। কারণ, পরীক্ষাই যদি বন্ধ করা না হয় তো কণ্টোল করা হবে কী? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যখন তাঁদের বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হোল যে বৈঠক বসেছে আসলে অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার জন্যে, তখন তাঁরা অজুহাত দিলেন যে সোভিয়েত প্রস্তাবে কার্যকরী কণ্ট্রোল ব্যবস্থার ভাল গ্যারাণ্টি নেই। সুতরাং কণ্ট্রোল ব্যবস্থার সর্ত্তগুলি ঠিক করে সেগুলি অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধের চুক্তির মধ্যেই লিখতে হবে, না হয় আলাদা একটা ক্রোড়পত্র হিসাবে জুড়ে দিতে হবে। সোভিয়েত যখন ক্রোড়পত্রের প্রস্তাব মেনে নিল তখন পশ্চিমীরা নিজেদের কথা উড়িয়ে দিয়ে জিদ ধরলেন যে ক্রোড়পত্র নয়, চুক্তির মধ্যেই কণ্টোল ব্যবস্থাকে স্থান দিতে হবে। সোভিয়েত যখন তা-ও মেনে নিল তখন মার্কিণ সরকার আতংকিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত নতুন এক যুক্তি বার হোল। তাঁরা বললেন, মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সহজে ধরার উপায় নেই, বিশেষ করে সেগুলি যদি ছোট ধরণের হয়। সুতরাং মাটির নিচে ২০ কিলোটন পর্যন্ত ক্ষমতার বিস্ফোরণ চুক্তির আওতায় পড়া উচিত নয় অর্থাৎ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে মাপের বোমা পড়েছিল সেই মাপ পর্যন্ত পরীক্ষা করা চলবে নির্বিবাদে।

এই সঙ্গে মিঃ আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন যে, অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার আগে বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে বসে ঠিক করুন কণ্ট্রোল ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত। অর্থাৎ অস্ত্রপরীক্ষা চলতে থাকুক, সেই সঙ্গে চলতে থাকুক কণ্ট্রোল ব্যবস্থার কচকচানি। কণ্ট্রোল নিয়ে মাতামাতির আসল উদ্দেশ্য বুঝেও সোভিয়েত মার্কিণ রাষ্ট্রপতির বিশেষজ্ঞ বৈঠকের প্রস্তাব মেনে নিল। সোভিয়েতের এই মনোভাবের প্রশংসা করে নিউইয়র্ক টাইমস-এর ওয়াশিংটন সংবাদদাতা কেনওয়ার্দি লিখলেন যে, এবার আমেরিকা ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলির ন্যায্যতই অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ করার আলোচনায় বসা উচিত।

সোভিয়েত যখন বিশেষজ্ঞ বৈঠকের প্রস্তাব মেনে নিল তখন পশ্চিমীরা আর একটি সর্ত্ত অর্থাৎ বাধা খাড়া করলেন। তাঁরা বললেন যে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য কোন পারমাণবিক খনিজ পদার্থ উৎপাদন না করার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার কথা উঠতে পারে।

সোজা কথায় পশ্চিমীরা প্রশ্নটি এমন আর একটি সমস্যার সঙ্গে গেয়ে বেঁধে দিলেন, যেটি সহজে মেটবার নয়। কায়দা কিছু নতুন নয়। জেনেভার পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনেও একগাদা সমস্যার বাণ্ডিল তাঁরা হাজির করেছিলেন, যাতে কোনটিরই মীমাংসা করা না যায়। সেই সঙ্গে কণ্ট্রোলের প্রশ্ন নিয়ে হৈ-চৈ চলতে লাগল। মাটির নিচে ছোট ধরণের বিস্ফোরণ ধরা না পড়ার অজুহাত নিয়ে মার্কিণ খবরের কাগজগুলো বলতে লাগলো, ঐ-সব বিস্ফোরণ ধরা না গেলে পরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তির কোন পথ হয় না। প্রথম কথা, মার্কিণ পরমাণু-বৈজ্ঞানিক ডাঃ হান্স বেথে বলছেন যে, ১৮০টি কণ্টোল-ফাঁড়ি নিয়ে যে কণ্ট্রোল ব্যবস্থা খাড়া করবার কথা বলা হয়েছে, তাতে ভূগর্ভের অস্ত্র-পরীক্ষাও ধরা পড়বে। দ্বিতীয়ত, ধরা যদি না-ও পড়ে তাহলে মাটির নিচে পরীক্ষা চালাবার সুযোগ তো আমেরিকাও পাবে। তবে চুক্তি না করার কারণ কী? কারণটা মার্কিণ পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের মুখেই শুনুন। তিনি গত ২১শে জানুয়ারী বলেন:—"জেনেভায় চুক্তি হোক বা না হোক, আমেরিকা তার 'শান্তিপূর্ণ' পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা চালিয়ে যাবে।"

সেনেটার গোর বলেন যে, "প্রস্তাব মত এশিয়ায় ৩৭টি কনট্রোল-ফাঁড়ি হবার কথা। প্রত্যেক ফাঁড়িতে যদি ১০০ জন করে কর্মচারী থাকে, তাহলে সেই ৩৭০০ লোকের সেই বিরাট অঞ্চলের যে কোন জায়গায় যাবার ও তদন্ত করবার অধিকার থাকা চাই। সেই অঞ্চলের মধ্যে চীনও থাকবে। আমেরিকা চীনকে স্বীকার করে না বলে অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ করা সম্পর্কে সে চীনের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি করতে রাজী নয়, একথা বললেই ত সে অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তি এড়িয়ে যেতে পারে।"

এই চুক্তি এড়িয়ে যাবার জন্যেই মিঃ হ্যারল্ড ষ্টাসেনকে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাঁর আলোচনায় যোগ দেবার ফলে উভয় পক্ষের মত অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল।

আলোচনা যাতে নিষ্ফল হয়, সেজন্য পশ্চিমীরা অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার প্রশ্নটি ধামা চাপা দিয়ে কণ্ট্রোলের প্রশ্নটি সামনে তুলে ধরে যখন দেখলেন যে তাতেও বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না, তখন কনট্রোলের ব্যাপারটা এমন ভাবে দাঁড় করালেন, যাতে নিজের সার্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে কোন দেশ সেই ধরণের কণ্ট্রোল মেনে নিতে পারে না। পশ্চিমীরা প্রস্তাব করলেন যে, কণ্টোল কমিশনে সাত জন সদস্য থাকবে। তাদের তিন জন স্থায়ী সদস্য হবে মার্কিণ, বৃটিশ ও রুশ। বাকি চার জন অস্থায়ী সদস্য চুক্তিকারীরা নির্বাচন করে নেবে। সেই সাত জন সদস্যের সাধারণ ভোটাভুটির দ্বারা প্রত্যেকটি কাজের ব্যবস্থা হবে। এই চতুর প্রস্তাবের আসল মানে হচ্ছে, চুক্তিকারী তিনটি প্রধান রাষ্ট্রের মতৈক্যের অর্থাৎ সমতার ভিত্তিতে কাজ হবে না এবং সোভিয়েতের একটি ভোটের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণদের দু'টি ভোট সব ব্যাপারেই জিতবে এমন কি অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করার বেলাতেও। এই মতলব বুঝেও সোভিয়েত চুক্তির চেষ্টা যাতে সফল হয় সেজন্য বললেন যে, কণ্ট্রোলের সবচেয়ে প্রধান বিষয়গুলিতে ত্রি-শক্তির মতৈক্যের ভিত্তিতে কাজ করার প্রস্তাব যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে অন্য ব্যাপারে পশ্চিমীদের প্রস্তাব মানতে সে রাজী আছে। পশ্চিমীরা তাতে রাজী না হয়ে বুঝিয়ে দিলেন কণ্ট্রোল কমিশনে সোভিয়েতকে কোণঠাসা করার সুযোগ পেলে তবেই তাঁরা চুক্তি করবেন, নাহলে নয়।

কণ্ট্রোল-ফাঁড়িতে কারা কাজ করবে? এই প্রশ্ন সম্পর্কে সোভিয়েত প্রস্তাব করলে যে, প্রত্যেকটি ফাঁড়ির রূপ হবে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ যে দেশে ফাঁড়ি থাকবে সেই দেশের এবং চুক্তিকারী অন্য দেশ দুটির থেকে কয়েকজন করে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে প্রত্যেকটি ফাঁড়ির কর্মিদল গঠিত হবে। আমেরিকার দাবি হোল যে তা হবে না। কারণ, সোভিয়েত দেশের ফাঁড়িতে যদি সোভিয়েত কর্মী থাকে তারা ঠিক মত তদন্ত না-ও করতে পারে। সেই জন্যে সোভিয়েত দেশের ফাঁড়িগুলিতে যে সব কর্মী থাকবে তারা হবে অন্য দেশের লোক এবং তাদের যেখানে খুসি যাবার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। সোজা কথায় সেই ফাঁড়িগুলিতে নাটোগোষ্ঠীর কিছু দালাল ভর্ত্তি করে সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে সমস্ত রকমের গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ

করা। এই হচ্ছে আমেরিকার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই রকম প্রস্তাব সোভিয়েতের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। এইখানেই শেষ নয়। সোভিয়েতের মতে কণ্ট্রোল কমিশনের অধীনে যে তদন্তকারী দলগুলি থাকবে, সেগুলির মধ্যেও তিনটি দেশেরই লোক থাকা চাই এবং কমিশনের স্থায়ী সদস্য তিন জন একমত হলে তবে সেই দলগুলিকে কোন কিছু তদন্ত করতে পাঠান চলবে অর্থাৎ তদন্তকারী দলগুলিকে কণ্ট্রোল কমিশনের অধীনে কাজ করতে হবে এবং কণ্ট্রোল কমিশন ত্রিশক্তির ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে। তা ছাড়া তদন্তকারী দলগুলিকে পাকাপাকি ভাবে মোতায়েন রাখার দরকার নেই। দরকার পড়লে সেগুলি গঠন করা হবে। আমেরিকা তাতে রাজী নয়। তার মতে প্রথমত তদন্তকারী দলগুলি বরাবরের মত জেঁকে বসবে এবং কণ্ট্রোল কমিশনের হুকুম মত তারা চলবে না। যে দেশে যে দল থাকবে, সেই দেশের কোন লোক সেই দলে থাকতে পারবে না। একজন পরিচালক নিযুক্ত করা হবে, যাঁর হুকুম মত দলগুলি যে কোন জায়গায় তদন্ত করতে যাবে। এমন কি, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটছে এমন সন্দেহ না হলেও। অর্থাৎ কমিশনের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিণরা দলে ভারী থাকবে এবং তার দরুণ তারা যে সব লোককে পরিচালক নিযুক্ত করবে সাধারণ ভোটের দ্বারা তারা তাদেরই তাঁবেদার। সেই তাঁবেদারের দল সোভিয়েত দেশের কণ্ট্রোল-ফাঁড়িতে বসে রুশবিবর্জিত তদন্তকারী দলকে দিয়ে যেখানে খুসি এবং যা খুসি পরীক্ষা করাবে এবং সত্যি মিথ্যে যা খুসি বিবৃতি দেবে। কিন্তু আমেরিকা বা বৃটেনের বেলায় তারা মুখ খুলবে না। এই হচ্ছে পশ্চিমীদের কনট্রোল প্রস্তাবের স্বরূপ। এই প্রস্তাব সোভিয়েত মেনে নেবে না, নিতে পারে না। সুতরাং পশ্চিমীরা আওয়াজ তুলবে আমরা তো চুক্তি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সোভিয়েত তার বেয়াড়া গোঁ কিছুতেই ছাড়তে রাজী নয়। আলোচনা সফল না হওয়ার জন্যে সোভিয়েতই দায়ী।

নিরস্ত্রীকরণের অন্যান্য বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস ইত্যাদির ব্যাপারেও পশ্চিমীরা একই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছে আজ ১৩ বছর ধরে। সম্মিলিত জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন এবং কমিশনের অধীন সাব কমিটিগুলি যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৩ বছরে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার মীমাংসার দিকে এক পা এগোন তো দূরের কথা বরং পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের ভাঁওতাবাজী করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই, এটা বুঝতে পেরে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন সেই কমিশন থেকে বার হয়ে আসে তখন পশ্চিমী মহলে সোরগোল ওঠে যে সোভিয়েত আসলে নিরস্ত্রীকরণ চায় না, তাই সে সম্পর্কে যাতে কোন চুক্তি হতে না পারে সেজন্যে সে কমিশন থেকে বার হয়ে গেল। যারা অস্ত্র ত্যাগের চেয়ে অস্ত্র গ্রহণ বেশি পছন্দ করে, যারা মানুষ মারার অস্ত্র উৎপাদন করে ও বিক্রী করে কোটি কোটি টাকা কামায়, তারা সেই সোভিয়েতের ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপালে যে সোভিয়েত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েও একাই পরীক্ষা বন্ধ করেছিল যে তার সশস্ত্র বাহিনী থেকে কয়েক লক্ষ সৈন্য কমিয়ে দিয়ে নিজেই হাঙ্গারী, রুমানিয়া, পূর্ব-জার্মাণী ইত্যাদি দেশ থেকে ক্রমশই কিছু কিছু করে সৈন্য দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে নাটো এবং অন্যান্য সামরিক জোটের দেশগুলিরই প্রাধান্য। শতকরা ৫০ জন সদস্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে নেওয়া হোক, এ্যালবেনিয়ার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। সোভিয়েত কমিশন থেকে বার হয়ে গেল বলে যাঁরা হা-হুতাশ করছেন তাঁদের জিগ্যেস করা যায়:—

প্রথমত তাঁরা যদি সত্যিই অস্ত্রহ্রাস কামনা করেন তাহলে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার প্রস্তাব কেন তাঁরা মানলেন না? তবে কি কমিশনের বাইরে তাঁরা চুক্তি করতে নারাজ এবং সোভিয়েত কমিশনের ভিতরে থাকলে তাঁরা চুক্তি করতেন? হয়ত বা তাঁরা 'অবজার্ভার' পত্রিকার মতই ভেবেছেন যে "দুনিয়া এখনই তো বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পড়েছে। কিন্তু বৃটেন ফ্রান্স এবং আরো গোটা পাঁচ-ছয় দেশের হাতে যখন অ্যাটম বোমা আসবে তখনকার বিপদের তুলনায় এখনকার বিপদ সামান্য?" মিঃ ডালেসের ঘোষণা থেকেই আসল কথা জানা যাবে। তিনি কিছু দিন আগে বলেন যে বিশেষজ্ঞদের বৈঠকের ফলে সারা পৃথিবীর সব জায়গায় অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ হবে এমন কোন কথা নেই এবং বৈঠকের সাফল্য পশ্চিমী শক্তিদের পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারে না। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা মন্তব্য করে: "আইসেনহাওয়ার ও ডালেস মস্কোকে মুখে এবং লিখে জানিয়েছেন যে জেনেভার বিশেষজ্ঞ বৈঠকে (যে বৈঠক তাঁরাই ডেকেছেন) পশ্চিমী শক্তিরা যোগ দিচ্ছেন বলেই যে আমেরিকা অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা নিষিদ্ধ করায় চুক্তি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা নয়।"

দ্বিতীয়ত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার উদ্দেশ্য যাঁদের নেই তাঁরা নিশ্চয়ই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে চুক্তি করতে নারাজ হবেন না। সেই রকম একটা চুক্তি করার জন্যে জেনেভা সহরেই নভেম্বর ও ডিসেম্বরে দেড় মাস ধরে নাটো ও ওয়ার্স চুক্তির দেশগুলির আলোচনা চলে। তারপর পশ্চিমীরা বৈঠক ভেঙ্গে দেন। অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার প্রস্তাব সোভিয়েতের দিক থেকেই আসে। কারণ সে দেখলে যে পশ্চিমীরা অস্ত্র হ্রাস বা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে রাজী নয়। উল্টে অ্যাটম-বোমা-বোঝাই মার্কিণ বিমান বিভিন্ন দেশের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। সোভিয়েত পক্ষ থেকে বলা হোল যে, এই ধরণের ওড়া সবচেয়ে আগে বন্ধ করা দরকার। পশ্চিমীরা তা মানতে রাজী হলেন না। সোভিয়েত প্রস্তাব করলে যে নাটো ও ওয়ার্স চুক্তির সৈন্যবাহিনী যেখানে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সেখানে পূর্ব ও পশ্চিমে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গা হাওয়াই-ফটোগ্রাফি করে বড় বড় রেলকেন্দ্র, বন্দর ও সড়কে কনট্রোল-ফাঁড়ি বসিয়ে, কোথাও যাতে আক্রমণের তোড়জোড় হতে না পারে সেদিকে সজাগ থেকে সেই সঙ্গে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে বেশি অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত জমা হতে না দিলে, সেই জায়গাগুলিকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে মেনে নিলে এবং ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে বিদেশী সৈন্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সরিয়ে নিলে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু পশ্চিমীরা এর একটাতেও রাজী হননি। তাঁরা এই সব বাস্তব কর্তব্য এড়িয়ে কনট্রোলের পদ্ধতি নিয়ে কথার তুবড়ী ফোটাতে লাগলেন। কনট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের আসল মতলবটা যে সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা, সে কথা আগেই বলেছি। সোভিয়েত আন্তর্মহাদেশীয় রকেট নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই তাঁদের ঝোঁক দেখা গেল সবচেয়ে বেশি। যদিও যে পারমাণবিক

অস্ত্রটির (war-head) দৌলতে রকেটের মারণশক্তি সেই অস্ত্রটি সম্পর্কে বিহিত করতে তাঁরা রাজী হলেন না।

কনট্রোল বলতে মার্কিণ নেতারা কী বোঝেন, সে সম্পর্কে মার্কিণ প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ফষ্টার বেশ খোলসা করেই বলেছেন ; কন্ট্রোল ও তদন্তের মধ্যে দিয়ে প্রতিপক্ষের সামরিক ক্ষমতার খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করতে পারলে সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে প্রচণ্ড পাল্টা আঘাত হানার জন্যে আমরা তৈরি হতে পারব। সেই আঘাতের ভয়ে কেউ আর যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না বলে শান্তি বজায় থাকবে।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ! মিঃ ফষ্টার 'ডেট্রয়েট এডিসন' পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। মার্কিণ পত্রিকা 'টাইমস' এর মতে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা ও ব্যবহার বন্ধ হলে যে সব কোম্পানী ঐ সব অস্ত্র তৈরি করার বায়না পেয়েছে তারা মার খাবে বলে 'পেন্টাগণ' বা মার্কিণ সমর দপ্তর পরীক্ষা বন্ধের বিরুদ্ধে। বৃটিশ পত্রিকা 'ইকনমিষ্ট' বলছেন যে পেন্টাগণের হর্তাকর্তাদের পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রমাণ হিসাবে ফষ্টার এবং মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান জন ম্যাকোনের নাম করা যেতে পারে। শুধু এঁরাই নন। 'ষ্টেজ উইকলি' পত্রিকায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওরিয়ার লিখছেন যে বহু মার্কিণ সেনাপতিরও পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে মধ্যে ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে ; যেমন সহকারী দেশরক্ষা সচিব জেনারেল লোপার এবং পরমাণু কমিশনের সামরিক প্রয়োগ বিভাগে অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ষ্টার্বার্ড। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলার, অ্যাডমিরাল বার্ক ইত্যাদি।

এই সব দেখে-শুনে আজ আবার 'লীগ অফ নেশন্সের' কথাই মনে পড়ে। চোখের সামনে আমরা ইতিহাসের এক মারাত্মক পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। 'লীগ অফ নেশন্স'-এ সোভিয়েতের নিরস্ত্রীকরণের সমস্ত রকমের প্রস্তাব নিরর্থক বাক্‌বিতণ্ডার সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আসল সমস্যা এড়িয়ে সমস্ত আলোচনাকে আজেবাজে ছোটখাটো দিকে, পদ্ধতিমূলক প্রশ্নের দিকে পরিচালিত করা হয়েছিল। আজ যেমন অস্ত্রহ্রাস, পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করা ইত্যাদি জরুরী প্রশ্ন নানা ছল ও অছিলায় এড়িয়ে গিয়ে কনট্রোল ও চৌকিদারীর চরিত্র ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কের ঝুড়ি পরিবেশন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি লীগ অফ নেশন্স-এও অস্ত্রত্যাগের প্রশ্ন এড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা ও যুদ্ধের হাতিয়ারগুলি লেবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখার হাজারো রকমের প্রস্তাবের আড়ালে যে অস্ত্রসজ্জার হিড়িক লাগানো হয়, তারই পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি বাধে, তার সর্বনাশা রূপের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে ছেলেখেলা মাত্র সে কথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে—যদি অবশ্য ঠাণ্ডা লড়াই-এর ঝাঁপসা চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে না যায়।

একথা কেউ স্বীকার না করে পারবেন না যে কোন অস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন অর্থাৎ তার সংহারশক্তি বাড়াবার জন্যেই সেটি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। অস্ত্রের মারণ শক্তি আরো শাণিত করার শেষ লক্ষ্য যে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা সে সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই অস্ত্র ব্যবহার হলে ফল কী হবে সে সম্পর্কে ৭ জন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক বলছেন যে, একটিমাত্র তাপ-পারমাণবিক বোমা রটারডাম থেকে দি হাগ সহর পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা এক মহাশ্মশানে পরিণত করবে এবং সেখানে একটি ঘাসও বেঁচে থাকবে না। এখানেই শেষ নয়। সেই একটি বোমা থেকে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০ রণ্টজেন। ১৯৫৬ সালে আইনষ্টাইন পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলিত হবার জন্যে যে আহ্বান জানান, তারই ফলে কানাডার পুগওয়াশে এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক-সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে জানা যায় হিরোশিমায় ৫০ হাজার লোক তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে তিলে তিলে মারা যায়। পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা সারা দুনিয়ার মানুষকে শান্তিকালেই ক্যান্সার ও লিউকিমিয়ার কবলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সারা দুনিয়ার আবহাওয়া দূষিত হওয়া যদি এই মুহূর্তে বন্ধ করা না যায় তাহলে আমাদের যুগের কথা বাদ দিলেও উত্তরকালে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক পুরুষে গড়ে ৭০ লক্ষ লোক তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে অকালে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবে।

সঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

তখনো ছিল আরক্তিম আকাশ গোধূলিতে
ভ্রূ-ধনু আঁকা কাজল-কালো সে তার দুই চোখে
দেখল চেয়ে, সে-চাওয়া যেন ছড়িয়ে দিতে দিতে
মনে, মনের গভীরে আরো ! আবার ধীরে ধীরে
দৃষ্টি তার চাঁপার কলি আঙুলে সাদা নখে
আনত হল। দোললো হাওয়া কয়টি যেন শাখা
ওড়ালো তার চূর্ণ-চুল, আর সে ঝির-ঝিরে
স্বপ্ন-ভরা মুহূর্তটি রইল মনে আঁকা !

তেমনি ক'রে গোধূলি আসে তেমনি ক'রে যায়
হাওয়ার হাতে হয়ত আজও স্বপ্ন বুঝি ঝরে
সেখানে সেই নিরালা নীল হ্রদের কিনারায় ;
সে নেই তবু, নীলাভ জলে যে ছায়া চেষ্টনাটে
ছড়িয়ে রাখে সেখানে আজও—তাকে যে মনে পড়ে—
মনে যে পড়ে সে ছায়া শুধু ছিল যে তার-ই চোখে,
স্মৃতির প্রেমে যে আজ ছবি : লাজুক পায়ে হাঁটে
——দৃষ্টিনত চাঁপার কলি আঙুলে সাদা নখে !!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৯ সালের শেষ ও ২০ সালের প্রথমে যখন আটকবন্দীরা এবং ক্রমশ রাজবন্দীরা অন্তরীণ ও জেল থেকে ফিরে আসতে লাগলো, তখন অনেকেরই অবস্থা হয়েছিল যেন জলে-পড়া। জেলে বা অন্তরীণে তবু একটা "হিল্লে"ছিল, কিন্তু মুক্ত হয়ে আসার পর দেখা গেল, অনেকেরই আশ্রয় বা জীবিকার কোন সংস্থান নেই—বাড়ী গিয়ে বসে খাবার অবস্থাও অনেকের নেই, আর নানাকারণে তার অসুবিধাও প্রচুর। সরকার থেকে অনেকের ফ্যামিলি অ্যালাউয়েন্স দেওয়া হত,—একজন উপার্জনশীল ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক রাখলে ফ্যামিলি অ্যালাউয়েন্স দিতেই হয়,—সে অ্যালাউয়েন্সও বন্ধ হল। ফলে এই সব মুক্ত দেশকর্মীদের নিয়ে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। ২০ সালের শেষ দিকে বহু মুক্ত কর্মীর এমনি অবস্থা।

এরকম আসন্ন অবস্থা বুঝে দেশের নেতারাও উদ্বিগ্ন, কেউ কেউ কারো কারো জন্যে কিছু চেষ্টাও করছেন। সরকারও দেখছেন, এদের জন্যে কিছু না করলে এরা আবার কোন পথ ধরে, কে জানে—তাই তাঁদেরও মাথায় কিছু মতলব ঘুরছে। তার ওপর অসহযোগ আন্দোলন একটা আসন্ন ঝড়ের মতন এগিয়ে আসছে—"ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে, করতিছে গোঁ গোঁ—ওরে, ডিঙ্গা বেঁধে থো।"

এই অবস্থায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং Y. M. C. Aর নেতা O. R. Raha এবং বি সি চ্যাটার্জি, এস আর দাশ প্রভৃতি মডারেট নেতাদের নেতৃত্বে মুক্ত বন্দীদের জন্যে ইটালী-বেনেপুকুরের একটা বড় বাড়ী নিয়ে একটা ফ্রি মেসের মতন ব্যবস্থা হল। ঢাকা অনুশীলন পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সদ্যমুক্ত রাজবন্দী নলিনীকিশোর গুহকে সেখানে বসানো হল পরিচালক হিসাবে।

জীবন জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর, কার যেন খোঁজ করতে ঐ মেসে নলিনী বাবুর কাছে গিয়েছিল,—আমিও সঙ্গে গিয়েছিলুম—সেই প্রথম আমি নলিনী বাবুকে চিনলুম,—হয়ত তাঁর মনে নেই।

সেখানে গিয়ে জমতে লাগলো অনুশীলন পার্টির লোকেরাই। যুগান্তর পার্টির ছুটকো ২।১ জনও জুটেছিল, কিন্তু ওটা হয়ে উঠেছিল, অনুশীলন পার্টিরই আড্ডা। অবশ্য অনুশীলন পার্টিরও ২।১ জন লোক ওদিকে যাওয়াটা পছন্দ করেননি।

ওই আড্ডা থেকেই নলিনী বাবু 'শঙ্খ' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তারপর পুলিন দাসের নেতৃত্বে ওখানেই ভারত-সেবক-সংঘ সংগঠিত হয়, এবং তার মুখপত্র "হক কথা" প্রকাশিত হয়। হক কথারও সম্পাদক হয়েছিলেন নলিনী বাবুই। অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারই ছিল এই সংঘ ও পত্রিকার কাজ। এ বিষয়ে পরে অনেক ভিতরকার কথা আসবে।

এখানে আর কয়েকটা ভিতরকার কথা বলা দরকার বোধ করছি, যা আগে দরকার বোধ করিনি। যাদুদা' তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "বাংলার মসনদে তিনজন মন্ত্রী জাতিগঠনের বিভাগ নিয়ে দিল্লীকা লাড্ডু চুষতে লাগলেন।" এই অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বলা হয়েছে,—অথচ এই শাসন সংস্কার মেনে নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা কংগ্রেস থেকেও হয়েছিল, অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হওয়ায় যে নির্বাচন পরিত্যক্ত হয়।

তা ছাড়া আগে গান্ধীজি নিজে তিলক, অ্যানি বেশান্ত প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও শাসন সংস্কার মেনে নিয়ে তার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করার পক্ষপাতী ছিলেন।

আবার, তাঁর অসহযোগের প্রস্তাবের মূলও হচ্ছে খিলাফৎ কমিটির অসহযোগ প্রস্তাব। মৌলানা মহম্মদ আলী খিলাফৎ সম্বন্ধে সুবিচারের দরবার করতে বিলেতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর সেই অসহযোগ প্রস্তাব খিলাফৎ কমিটির সভায় গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী আগে থেকেই হাওয়া বুঝে খিলাফৎ কমিটির বন্ধু ও পরামর্শদাতার ভূমিকা নিয়ে বিক্ষুব্ধ মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের সহযোগিতা দিয়ে বাগ মানাবার মতলব করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১৯শে মার্চ খিলাফৎ কমিটির এক সভায় তাঁদের অসহযোগ-প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতায় গান্ধিজী বলেন,—"প্রস্তাবটাতে অতি সম্মানজনক ভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আন্দোলনের কয়েকটা স্তর নির্দেশ করা হয়েছে,—যার শেষ পর্যায়ে হবে সশস্ত্র বিপ্লব। ভগবান করুন, এদেশকে যেন এমন সশস্ত্র বিপ্লব ও তার আনুষঙ্গিক বিভীষিকার মুখ দেখতে না হয়। কিন্তু খিলাফৎ প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষের মনোভাব এত তীব্র যে, এ সমস্যার যথোচিত সমাধান না হলে, বা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হলে এমন এক সশস্ত্র বিপ্লব আসবে, যা এদেশ কখনো দেখেনি। আমি আশা করি, ক্রোধোন্মত্ত নির্যাতন দ্বারা সরকার সে অবস্থা টেনে আনবেন না।"

এই বক্তৃতা থেকে বোঝা যায়, কেন মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অহিংসাকে মূলনীতিরূপে জুড়ে দিয়েছিলেন,—এবং

কেনই বা বেপরোয়া ভাবে ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হবে।"

তাঁর অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল খিলাফৎ কমিটীরই কাজের দ্বারা। ১৯২০ সালের ২২শে জুন খিলাফৎ কমিটী বড়লাটকে লেখেন,—১লা আগষ্টের মধ্যে তুরস্কের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা না হলে তাঁরা অসহযোগের কার্যক্রম সুরু করবেন। গান্ধিজীও বড়লাটকে চিঠি লিখে ব্যাখ্যা করেন,—কেন তিনি খিলাফৎ কমিটিকে সমর্থন করছেন। ১লা জুলাই আবার গান্ধিজী হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের তরফ থেকে বড়লাটকে ঐ কথা জানিয়ে দেন।

তারপর ১লা আগষ্ট পার হলে হাকিম আজমল খাঁ তাঁর সরকারী সম্মান উপাধি বর্জন করেন। ৩১শে আগষ্ট খিলাফৎ কমিটীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়, এবং গান্ধিজী তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ পদক বর্জন করেন। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে "অহিংস" অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে খিলাফৎ কমিটীর কার্যক্রমের সঙ্গে থাকলো অহিংসা, আর সেটাকে মানানো হল "এক বছরে স্বরাজ"-এর "প্রতিশ্রুতি" দিয়ে। যাদুদা'র বইয়ে "মহাত্মাজী"র প্রতি ভক্তির অপ্রতুল নেই।

যাদুদা' প্রভৃতি ফেরারী বিপ্লবী নেতাদের মুক্তি সম্পর্কেও সুরেন্দ্রনাথ এবং গান্ধিজীর তুলনার অবকাশ আছে।

কলিকাতা কংগ্রেসের সময়েই সদ্যমুক্ত রাজবন্দী অমরকৃষ্ণ ঘোষ (অতুলদার ভাই) এবং অরুণ গুহ প্রথমে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে ঐ সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁর সাহায্য চান। তিনি প্রথমে যথেষ্ট আপ্যায়ন করে পরে যখন শুনলেন, ফেরারী নেতাদের নামে সরকারের ঘোষণা আছে, ধরে দিতে পারলে ১০।২০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে, তখন তিনি পাশ কাটালেন।

তার পর তাঁরা গেলেন গান্ধিজীর পরামর্শ নিতে। তিনি পরামর্শ দিলেন, ফেরারীরা যদি তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে সবরমতীতে থাকতে চান, তিনি তাঁদের গ্রহণ করবেন।

শেষে অমর বাবু এবং অরুণ বাবু গেলেন সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে, ব্যারাকপুরে। তিনি ওঁদের বুকে করে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দিলেন, এবং সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই চন্দননগরে সেক্রেটারী নেলসন ও ডি আই জি আই বি গোল্ডির সঙ্গে অতুলদা'র সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল।

ইতিমধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং কুন্তল চক্রবর্তী গান্ধিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তিনি তাঁদের বলেন অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে।

যাই হোক,—আমরা তখন এ সব কথা জানতুমও না, আর আন্দোলনে যখন যোগ দিয়েছি এবং এক বছর পরে পুনর্বিবেচনারও কথা আছে, তখন বিশ্বস্তভাবে প্রাণপণে আন্দোলনের কার্যক্রম নিয়ে খেটে চলেছি।

জীবন ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধিজীর কাছে এক দীর্ঘ পত্র লিখে নিজের সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস প্রকাশ করে পরামর্শ চেয়েছিল, কি করবে। তিনি স্বহস্তে জবাব লিখে দিয়েছিলেন,—অসহযোগ আন্দোলনের কার্য্যক্রমের একটা কিছু বেছে নিয়ে একটা বছর কাজ করে যাও। সে চিঠিটা জীবন রেখে দিয়েছিল এবং পরে একদিন সেটা বিশেষ ভাবে কাজেও লেগেছিল। সে কথা যথাসময়ে আসবে।

১৯২১ সালের শেষার্ধে সারা দেশে চরকা চলতে সুরু করেছে—মোটা খদ্দরের নানা রকমের কাপড় তৈরি চলছে—কলিকাতা সহরেরও পাড়ায় পাড়ায়,—২১০ খানা তাঁতও বসে গেছে। টালার ব্যায়ামবীর প্রোফেসর কে, ডি শীল বাইরের ঘরে দু'খানা তাঁত বসিয়েছিলেন। কবি সত্যেন দত্তের বিখ্যাত কবিতা 'চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর' টালায় পাটুবাবুদের বাড়ীতে বসে তিনি লিখেছিলেন। "জাপান" লেখক সুরেশদা'র সঙ্গে তিনি টালায় যেতেন। একদিন পাটুবাবু ও তাঁর দাদা ভানুদা' একসঙ্গে চরকা কাটতে বসলেন, আর কবি সত্যেন দত্ত কবিতা লিখলেন।

অনেক ছেলে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছে,—তাদের জন্যে ন্যাশানাল কলেজ হল, গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন (ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি)—সেখানে অধ্যক্ষ করে বসানো হল সুভাষচন্দ্রকে। কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কয়েকজন হলেন প্রোফেসর।

মাখন সেন এবং এক শৈলেন ঘোষ বোধ হয় ছিলেন ম্যানেজমেন্টে। সুভাষ বাবু জেলে যাওয়ার পর (২১ সালেই) সেখানে কিছু টাকার গোলমাল ধরা পড়ে এবং শৈলেন ঘোষ উধাও হয়। পরে তিনি ভোটরঙ্গ নামে কাগজ বার করেছিলেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সম্পাদনায় সার্ভেন্ট নামে ইংরাজী দৈনিক কাগজ বেরোয়। সুরেশ মজুমদারের গৌরাঙ্গ প্রেস প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ছাপার কাজ করে কিছু পয়সা পেতো। সেখান থেকে মাখন সেন ও সত্যেন মজুমদারের সহযোগিতায় বেরুলো আনন্দবাজার পত্রিকা।

সার্ভেন্ট ও আনন্দবাজার হল পুরোপুরি কংগ্রেসী কাগজ। মহাত্মাজী এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার এবং প্রাসঙ্গিক সংবাদই ছিল কাগজের প্রধান উপজীব্য! মহাত্মাজীর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজও বেরিয়েছিল—সে ছিল আন্দোলন পরিচালনের গাইড। পড়ে তারিফ করতে হত—চমৎকার! কিন্তু মহাত্মাজীর রাজনীতির অভিনব, অবিশ্বাস্য প্রকৃতিও তাতে প্রকট হত।

সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও মডারেট দল তাদের কাগজগুলোতে অ্যাণ্টি ননকোপারেশন প্রোপাগ্যাণ্ডা করে চলেছিল। কিন্তু জনগণের মধ্যে তাদের প্রচারের উপযোগী কাগজ, সংস্থা বা কর্মীদল ছিল না। ফলে আন্দোলন বেড়েই চলেছিল, এবং সরকারও ক্রমশ নির্যাতন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছিল। ফলে আন্দোলন দমার পরিবর্তে আরো জোরালো হয়ে চলেছিল।

২১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে গভর্ণমেণ্ট সভা বন্ধ করার জন্যে ১৪৪ ধারা জারি করতে সুরু করলে। সে বাধা গ্রাহ্য না করে সভা করে লোকে গ্রেপ্তার বরণও সুরু করলে। কলেজ স্কোয়ারে এই রকম নিষিদ্ধ সভা ও গ্রেপ্তারের একটা চিত্র আমি আগে লিখেছি, গত পৌষ মাসের বসুমতীতে।

খদ্দর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী বস্ত্র বয়কটের জন্যে পিকেটিং এবং ধরপাকড়ও সুরু হয়েছিল। দেশী মিলওয়ালারা চাঁদাও দিচ্ছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেশী মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা মিলনও লোকচক্ষুর অগোচরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল

পরবর্তী যুগে যেটার পরিণতি হয়েছিল দেশী ধনিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের স্বার্থের পরিপূর্ণ মিলনে।

পুলিশ পিকেটারদের মারতে সুরু করলে সি, আর, দাশ নিজের একমাত্র পুত্র চিত্তরঞ্জন, স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী ঊর্মিলা দেবীকে পিকেটিংএ পাঠালেন—পরের ছেলেদের বিপদের মুখে পাঠাবার আগে আপনার প্রিয়জনদের পাঠালেন। তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। আন্দোলন আরো জোর হল।

তখন সরকার ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করার জবাব দিতে সুরু করলে লাঠি চার্জ করে সভা ভেঙ্গে দিয়ে। ফল হল না, মেয়েরাও সে সব সভায় বক্তৃতা সুরু করলেন। তখন হেমপ্রভা মজুমদার সভায় বক্তৃতা দিতে সুরু করেছেন। একদিন এমনি এক সভায় লাঠি চার্জ হল, হেমপ্রভার একটা হাত লাঠির ঘায়ে জখম হল। তিনি ব্যাণ্ডেজ করা ভাঙ্গা হাত নিয়েই সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়ালেন।

প্রথমে মেয়ে বক্তা বেশী ছিল না। বৃদ্ধা মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মোহিনী দেবী গোড়া থেকেই ছিলেন (ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল ওয়ার্কসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খগেন দাশগুপ্তের জননী—আমরণ একনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত) আর ছিলেন বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি। ক্রমশ: নতুন নতুন মেয়ে-বক্তা তৈরী হচ্ছিল।

ভেজাও ছিল, যেমন সর্বত্র থাকে। একটি যোয়ান মেয়ে দিনকতকের জন্যে ধূমকেতুর মতন উদয় হয়েছিল—চমৎকার ওজস্বিনী ভাষায় উপযুক্ত অঙ্গসঞ্চালন সহযোগে লম্বা বক্তৃতা গড়গড় করে আউড়ে যেতেন। এক লীডারের কন্যা। তাঁর সভায় তিনিই সাধারণত একমাত্র মহিলা বক্তা থাকতেন। তার পিতাও বক্তৃতা করতেন। সভার শেষে চাদর পেতে কংগ্রেস ফাণ্ডের জন্যে অর্থ সংগ্রহও চলতো। একটা কথা বাজারে ক্রমশ চালু হয়েছিল, মেয়েটি বাপের লেখা বক্তৃতা মুখস্থ করে ঘরে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রিহার্স্যাল দিয়ে তৈরী হয়ে আসে। নামে বোধ হয় স্বর্ণলতা। যাক—

শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় '২১ সালের নভেম্বরে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার দলকে বে আইনী ঘোষণা করলে, এবং ভলাণ্টিয়ারদের লীডাররূপে কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার সুরু করলে। সি আর দাশ গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর স্থলে একে একে অনেক নেতা বসেন আর গ্রেপ্তার হন, শেষ পর্যন্ত সুভাষ বাবুও গ্রেপ্তার হলেন।

এদিকে '২১ সালের ডিসেম্বর এবং আহমদাবাদ কংগ্রেস এসে গেল। গেলুম আহমদাবাদে। বাংলার ডেলিগেট ক্যাম্পে বেদের পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যায়ী প্রমুখ কয়েকজন স্বরাজ ঘোষণার প্রস্তাব চাই বলে হৈ-চৈ সুরু করেছিলেন। কোথায় স্বরাজ?

নির্বাচিত সভাপতি সি আর দাশের অনুপস্থিতিতে হাকিম আজমল খাঁ হলেন প্রেসিডেণ্ট। মূল প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মূল প্রস্তাব। জেল ভর্তি করে দিতে হবে, এমন কি' যাঁরা গঠন মূলক কাজ নিয়ে আছেন, দরকার হলে তাঁরাও কাজ ছেড়ে জেলে যাবেন। The battle may be prolonged—এই হল মহাত্মাজীর বক্তব্য।

হজরৎ মোহানী চরমপন্থী, তিনি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করার, সে প্রস্তাব ভোটে টিকলো না। কংগ্রেসের পাশেই চলছিল মোসলেম লীগের অধিবেশন। হজরৎ মোহানীই ছিলেন সে অধিবেশনের সভাপতি। তিনি সেখানেও ইণ্ডিপেণ্ডেন্স রেজলিউশন এনে পরাজিত হলেন। কংগ্রেসের মধ্যেকার খিলাফৎ ওয়ালারাই সেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই তারা কংগ্রেসের লাইনেই চললো। তখন মুসলমানেরা কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ, উভয় সংস্থারই সভ্য হতে পারতো।

এই উপলক্ষে মহাত্মাজী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে যা লিখেছিলেন, সেটা আজও কংগ্রেসের ইতিহাসের পাতা কালো করে অক্ষয় হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন,—"Moulana Hasrat Mohani put up a plucky fight for independence on the Congress Platform and then as president of the Muslim League, and was happily each time defeated. He wants to sever all connections with British People even as partners and equals, and even though the Khilafat question is satisfactorily solved.....It is Common cause that if the Khilafat question cannot be solved without complete independence......there is nothing left for us to do but insist on independence......But assuming that Great Britain alter her attitude, as I know she will when India is strong, it will be religiously unlawful for us to insist on independence."

অর্থাৎ মৌলানা হজরৎ মোহানী কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগের সভাপতিরূপে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলে রীতিমত লড়াই করেছিলেন, কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি দু'জায়গাতেই পরাজিত হয়েছেন। তিনি বৃটিশের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান, এমন কি সমান অংশীদার হিসাবেও, এবং খিলাফৎ সমস্যার ন্যায্য সমাধান হলেও। অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন যদি খিলাফৎ সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে স্বাধীনতার দাবী করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। কিন্তু বৃটেন যদি তার বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন করে, আমি জানি, ভারত শক্তিশালী হলে তারা তা' করবেই, তাহলেও স্বাধীনতার জন্য পীড়াপীড়ি করাটা আমাদের পক্ষে একটা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ হবে।

স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, অসহযোগ আন্দোলন যে স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, তার আরো অনেক প্রমাণ ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। নাগপুরের কংগ্রেসের পর থেকেই লোকে জিজ্ঞাসা করতে সুরু করেছিল, স্বরাজ কথাটার সঠিক অর্থ কি? মহাত্মা জবাব দিয়েছিলেন, যখন স্বরাজ পাওয়ার সময় আসবে, তখন ভারতবাসীই সেটা স্থির করবে, আমি নয়। কিন্তু স্বরাজের ব্যাখ্যার দাবী নিস্তব্ধ হচ্ছিল না। বোম্বাইয়ে পার্শী এসোসিয়েশনে বক্তৃতা কালে মহাত্মাজী বললেন,—তিনি নিজে সন্তুষ্ট হবেন ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস পেলেই। অসহযোগের বিরোধীরা প্রচার চালাচ্ছিল, আন্দোলনটা অবৈধ। তার জবাবে মাদ্রাজ মেলের প্রতিনিধির কাছে তিনি বললেন,—"I do not consider non-cooperation to be unconstitutional, but I do

believe that of all the constitutional remedies now left open to us, non-cooperation is the only one left for us." অর্থাৎ আমি অসহযোগ আন্দোলনকে অবৈধ মনে করি না। আমি মনে করি,—অন্যায়ের প্রতিকার আদায় করার সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ের মধ্যে এই একটা মাত্র উপায়ই আমাদের হাতে অবশিষ্ট আছে।

গভর্ণমেণ্ট কেন কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করছে না,—এ কথার উত্তরে পার্লামেণ্টে কর্ণেল ওয়েজউড বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের স্বরাজের অর্থ স্বায়ত্তশাসন, সুতরাং কংগ্রেস বে-আইনী করার কোন কারণ নেই।

অনেক জমিদার-শিল্পপতিও যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তার কারণও এই। তারকের তুলার ব্যবসায়ের রাজা যমুনালাল বাজাজ ছিলেন কংগ্রেসের তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ, মহাত্মাজীর পরম ভক্ত। তিনি ওয়ার্ধা কটনের একচেটিয়া কারবারী হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেস-চরকা-খদ্দরের দৌলতে। কংগ্রেস ওয়ার্ধা তুলা সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিল, সারা ভারতে গ্রামাঞ্চলের কোণায় কোণায় পর্যান্ত খদ্দর উৎপাদন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ওয়ার্ধা তুলা বিক্রি হত,—দর দু' টাকা সের পর্যন্ত উঠেছিল। বাজাজ কোটির অঙ্কে টাকা রোজগার করে লাখের অঙ্কে কংগ্রেসকে চাদা দিয়েছিলেন। ন্যাশান্যাল এডুকেশনের পাশ কাটিয়ে তিনি নিজের ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে।

আমরা এসব লক্ষ্য করেও একটা লড়াই চলছে এবং এগোচ্ছে দেখে প্রাণপণে খেটে চলেছিলুম। অন্ন বস্ত্র, শিক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী সাহায্য বর্জন করে, নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সরকারকে খাজনা-টেক্স দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা বা দায়িত্ব থাকবে না,—এবং তখন খাজনা বন্ধ করা হবে, এই ভাবে একটা **State within State** গড়ে তোলা হবে, এ ধরণের প্রচারও চলছিল, কাজেই খেটে যাওয়ার একটা প্রেরণাও বর্তমান ছিল।

ইতিমধ্যে আর একটা বৃহৎ ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল, বলা হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম জোয়ারের মুখে আসামের চা-বাগানের চির-নির্যাতিত কুলীরা ধর্মঘট করে একযোগে,—এবং মালিকেরা তাদের ঘরছাড়া করে তাড়িয়ে দেয়। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হিসাবে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মীরাও ধর্মঘট করে,—শেষ পর্যন্ত সে ধর্মঘট বিস্তৃত হয় গোয়ালন্দ, চাঁদপুর প্রভৃতি ষ্টীমার কর্মীদের মধ্যেও। ফলে রেল ও ষ্টীমার চলাচল বন্ধ হয়, এবং চা-কুলীর দল পদব্রজে বাড়ীমুখো যাত্রা সুরু করে। পথে তাদের বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনসাধারণ স্থানে স্থানে লঙ্গরখানা স্থাপন করে। এক এক স্থানে হাজার হাজার কুলী জমে যায়, একটা প্রকাণ্ড সমস্যা দেখা দেয়। স্বভাবতই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে টেলিগ্রাম আসতে থাকে।

সি আর দাশ স্বচক্ষে অবস্থা পরিদর্শনের জন্যে রওনা হন, এবং গোয়ালন্দে পৌছে দেখেন ষ্টীমার বন্ধ। বর্ষার পদ্মা-মেঘনা সমুদ্রের আকার ধারণ করেছে। সেই অবস্থায় তিনি নৌকায় পাড়ি দিলেন গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরে—কারো নিষেধ মানলেন না। ধর্মঘটী ও সাধারণ জনগণের সাহস ও উৎসাহ কতখানি বেড়ে গেল, তা সহজেই অনুমেয়।

ওদিকে চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যারিষ্টারী ছেড়ে কংগ্রেসের হাল ধরেছেন। তাঁর স্ত্রী বিলাতের মেয়ে নেলী সেনগুপ্তা বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেলে গেছেন। ধর্মঘটের জন্যেও সেনগুপ্তের প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। পরে সেনগুপ্ত ও নেলী কলকাতায় চলে আসেন, এবং তাঁদের কলকাতার লোক এক বিরাট প্রোসেশন করে অভ্যর্থনা করে। এই সব ঘটনার ফলে আন্দোলনের জোর বেড়েই চলেছিল।

কংগ্রেসের ভাববন্যার মধ্যে বিপ্লবী বিবেককে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিপ্লবীরা নানা স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল,—মাঝে মাঝে উৎসব উপলক্ষে সেখানে বিপ্লবীদের জমায়েত হত,—স্থানীয়ভাবে রিক্রুটিংও চলতো। আহমদাবাদ কংগ্রেসের পর '২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে কি মার্চে দোলের দিনে বোধ হয়, ডায়মণ্ড হারবারের কাছে আবদালপুরে গঙ্গার কাছেই এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সেখানে বসানো হয় রসিক দাসকে, যিনি ৩০ সালে ড্যালহাউসী স্কোয়ার বোমার মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডলাভ করেন এবং আন্দামানে নির্বাসিত হন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন নেতৃত্ব করেন মনোরঞ্জন দা' (মনোরঞ্জন গুপ্ত—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এম-এল-সি)—এবং আমার রচিত একখানা গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। গানটী এই :

আজ হোলীর রাঙা উৎসবে
উঠলো মেতে রক্ত-পাগল প্রাণ
তোরা আয় সবে
ফাগুনের এই রঙীন গানে
জাগলো সাড়া বনে, মনে
শুকনো ডালে ফুটলো রে ফুল
নবীন শোভা সৌরভে।
আনন্দের এই পাগলা ঝোরা
ভাসিয়ে দিল সকল ধরা
বাঁধন ছিঁড়ে কাঁদন ছেড়ে
উল্লাসে আয়, আয় সবে
খুনখারাপীর রক্ত স্রোতে
বিশ্বটারে রাঙিয়ে দে রে
ঘর ছেড়ে আজ আয় বাহিরে
অবাধ পানে চলবি কে।

আবদালপুরে নানা দিক দিয়ে অবস্থা এমন প্রতিকূল ছিল যে, আর কেউ গিয়ে সেখানে থাকতে পারতো না। অর্থাৎ আন্দামানে নির্বাসিত হওয়ার আগে রসিক দাসের প্রকৃতপক্ষে বছর সাত-আট আবদালপুরে নির্বাসিতের জীবনই যাপন করা হয়ে গিয়েছিল।

আহমদাবাদ কংগ্রেসের পর "জেলে ভর্তি করে দাও" হল প্রধান কর্মসূচী। সর্বত্র সভা এবং ধরপাকড়, পিকেটিং এবং ধরপাকড় অনেক বেড়ে গেল এবং জেলে ভর্তি হতে দেরী লাগলো না। জেলের কর্মচারীরা সত্যাগ্রহীদের ভিড়ে এবং হুল্লোড়ে উদ্বাস্ত হওয়ার জোগাড়। সরকার বাহাদুর খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজে বড় বড় গুদামে নিয়ে সত্যাগ্রহীদের পুরতে লাগলো। সভায় লাঠি চার্জ করে কতক

লোককে তাড়িয়ে ভূড়িয়ে বাকি লোকদের ধরে নিয়ে যায়, এবং অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। রক্তবীজের ঝাড় নির্মূল হয় না, আবার দেখা দেয়।

এক দিকে এই অবস্থা, আর দিকে খাজনা বন্ধের মৎলব পেকে উঠছে। ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন এ্যান্টি-ননকোঅপারেশন প্রোপোগ্যাণ্ডার জন্যে টাকা ঢেলেও কূল পাচ্ছে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সময় সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা আপোষ ঘটাবার চেষ্টায় মহাত্মাজীর কাছে এক রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। কংগ্রেস নেতাদের বিভিন্ন জেল থেকে এক সৌকত আলী জেলে জড়ো করার সরকার রাজী হল। মহম্মদ আলী, তখন করাচীতে এক খিলাফৎ সভায় রাজদ্রোহকর বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ করে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। মহাত্মাজী বললেন, তাঁদের সভায় আনতে হবে। সরকার রাজী হল না। আপোষ প্রস্তাব ফেঁসে গেল। সি আর দাশ চটলেন।

কংগ্রেসের থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সারা দেশে সর্বত্র সভা করে ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করতে হবে। মাদারীপুরের বিপ্লবীনেতা পূর্ণ দাশ ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করিয়ে তিন বছর কারদণ্ড পেয়েছিলেন। অনেক দাদা কাজটা সমর্থন করেননি। কিন্তু পূর্ণ দাশ বলেন, জেলে অসংখ্য নতুন নতুন জোয়ান ছেলের ভিড়,—রিক্রুটিংয়ের বিরাট ফিল্ড। বাইরে থাকার চেয়ে কাজ বেশীই হবে। তখন দাদারা পূর্ণ দাশের "ঘুঘুত্ব" আর একবার নতুন করে অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন। ইতি পূর্বেই পূর্ণ দাশ এক "শান্তি সেনাদল" গঠন করে' কংগ্রেসের নামের আড়ালে নিজস্ব এক সংগঠন খাড়া করে ফেলেছিলেন—তারা স্বদেশী গান গেয়ে সারা জেলার গ্রামে গ্রামে রুট-মার্চ করে ফিরতো।

ঢাকার অনুশীলন পার্টি প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করেছিলেন প্রধানত অহিংসার বিপ্লববিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্যে—তাঁদের কথা ছিল, বৈপ্লবিক প্রগতির মুখে এই গান্ধীবাদ দেশটাকে ক্লীবে পরিণত করবে নতুন করে। কিন্তু শুধু এই নেতিবাচক প্রচারের জোরেই বৈপ্লবিক সংগঠনের বাস্তব কাজ চলে না। সপত্নী-প্রতিম যুগান্তর দল গান্ধী এবং কংগ্রেসের নামের জোরে সারা দেশে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, টাকারও অভাব নেই, কংগ্রেসের স্থানীয় ফাণ্ডও তাদের হাতেই সর্বত্র কংগ্রেস কমিটী করে নিজেদের লোক বসাচ্ছে, ধীরে অথচ নিরবচ্ছিন্নভাবে দলের রিক্রুটিং-এর কাজও চলেছে। এ অবস্থার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। মন তাদের আরো বিষিয়ে উঠতে লাগলো যুগান্তর পার্টির ওপর।

এই অবস্থায় পুলিন দাসের সঙ্গে এস আর দাশের বন্দোবস্ত হল, তাঁর সঙ্গে (তিনি তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল) ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বন্দোবস্ত হল, তারা প্রচুর টাকা ছাড়তে লাগলো, সে টাকা এস আর দাশের মারফৎ পুলিন দাসের হাতে আসতে লাগলো, ভারত-সেবক-সংঘ গঠিত হল, মুখপত্র 'হক কথা' সারা দেশে ছড়াবার ব্যবস্থা হল, সর্বত্র ভারত-সেবক-সংঘের প্রচারকেন্দ্র গড়া হতে লাগলো সর্বত্র স্থানীয় কংগ্রেসের এবং যুগান্তরদলের কর্মীদের সঙ্গেও তাদের চাপা ঠোকাঠুকিও চলতে লাগলো। কিন্তু গান্ধী, কংগ্রেস, যুগান্তর দল এবং আন্দোলনের ভাবাবেগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বভাবতই তারা হ'টে যেতে লাগলো। যুগান্তর দলের বিশেষ বিশেষ কর্মী হল তাদের চক্ষুশূল।

যাই হোক, '২২ সালের গোড়ার দিকেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা করে গ্রেপ্তার হওয়া মুন্সীগঞ্জেও (বিক্রমপুর) চলছিল। একদিন এমনি এক সভায় মুন্সীগঞ্জ ন্যাশান্যাল স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীর ২৭ জন ছাত্র, ৪জন শিক্ষক, এবং শেষ পর্যন্ত "বড়দি" (মুন্সীগঞ্জের সরকারী উকীল উমাচরণ সেনের বড় মেয়ে, রেণু সেনের মা) একে একে নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা করে গ্রেপ্তার হলে জীবন আমাকে টেলিগ্রাম করলে—অবিলম্বে চলে এসো। আমিও অবিলম্বেই মুন্সীগঞ্জে চলে গেলুম, সংসারধর্ম শিকেয় উঠলো। একটু হাল্কা শোধ করলুম।

মুন্সীগঞ্জের অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে এক মহামূল্যবান এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বস্তুত, সেখানকার প্রায় সকল কর্মীরই জীবন সে সময় ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক জীবন। ২।৪ জন বিবাহিত, এবং যে ২।৪ জনের পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কটা যেন নিতান্তই গৌণ—একবার দয়া করে ভাত খেয়ে আসা মাত্র। অধিকাংশেরই অবস্থা ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। দিনরাত ভূতের মত খাটুনী।

এক মাইলটাক লম্বা এবং আধমাইলটাক চওড়া মুন্সীগঞ্জ সহর, তার মধ্যে আছে সাব-ডিভিসন্যাল হেড কোয়াটার, আদালত, থানা জেলখানা, পোষ্ট অফিস, উকীল মোক্তার সরকারী কর্মচারীদের বাসা, একটা বাজার, কালীবাড়ী, মসজিদ,—আর দুটো হাই স্কুল, মেয়েদের স্কুল প্রভৃতি।

আন্দোলনের প্রথমে একটা মাত্র হাই স্কুল ছিল, এবং সেটাই ভেঙ্গে হয়েছিল ন্যাশন্যাল স্কুল,—পরে আবার হাই স্কুলটাও পুনর্গঠিত হয়—হাই স্কুলে ২০০ ছাত্র, ন্যাশন্যাল স্কুলে ২৫০। এই রকম ন্যাশন্যাল স্কুল—হাই স্কুল ষ্ট্যাণ্ডার্ডের—ঐ এক সাব-ডিভিশনে ১৭টা!

কালীবাড়ীর সামনের প্রকাণ্ড টিনের চালাঘরে হয়েছে ন্যাশন্যাল স্কুল, বাজারের পিছনে আর একটা প্রকাণ্ড টিনের ঘরে কয়েকটা তাঁত বসেছে, সেখানে ছেলেরা তাঁত বোনা শেখে,—রাস্তার ধারে আর একটা ঘরে কংগ্রেস অফিস। কংগ্রেসের ফাণ্ড প্রধানত মুষ্টিভিক্ষা—সকল বাড়ী থেকে নিয়মিতভাবে আদায় হয়। স্কুলের ছাত্রবেতনও নিয়মিত ভাবে আদায় হয়—ফ্রি-হাফফ্রি ছাত্রও অনেক আছে। স্কুলের আয় যথেষ্ট নয়।

যতীন দত্ত হেড মাষ্টার বোধ হয় ৪০টি টাকা পেতেন সর্বোচ্চ বেতন। পরেশ সেন শ্বশুরবাড়ীতেই (উমাচরণ সেনের বাড়ী) থাকতেন এবং স্কুল থেকে পেতেন ৩০টি টাকা। জীবনও টিচার—তাঁর বাড়ীর জন্যে দেওয়া হত ২৫টি টাকা। হারাণ ব্যানার্জি আগে এক জেলাবোর্ডের সেনিটারী ইন্সপেক্টর ছিলেন,—তিনি তাঁর কাকা গিরীন্দ্র ব্যানার্জির বাড়ী থাকতেন, স্কুল থেকে নিতেন মাত্র ৮টি টাকা। অন্যান্য টিচার এবং এক পণ্ডিত ও এক মৌলবী ২০, ১৫, ১২, ১০—এমনি পেতেন। উমাচরণ বাবুর এক ছেলে সুরবিন্দু ল পাশ করে বসেছিলেন—তিনি ছিলেন এক অনারারী রিলিভিং টিচার—মাসের মধ্যে ১৫।২০ দিন তাঁকে টিচারী করতে হত।

পরেশ সেন ছিলেন কাংগ্রেসের থানা অফিসার—অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জ থানা এলাকায় যতগুলো লোক্যাল কংগ্রেস কমিটী ছিল, তিনি সেগুলোর তদ্বির করতেন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। প্রথমে আমাকে সেই পদ দেওয়া হল। জীবনদের গ্রাম পঞ্চসারে যতীন দত্তের বাড়ীতে বাইরের ঘরে ছিল গ্রামের কংগ্রেস

অফিস। আমি প্রথম দিনকতক সেইখানে থাকতুম, যতীন দত্তের বাড়ীতেই খেতুম। সভা হত শিওচতলার মাঠে।

জীবন মুন্সীগঞ্জেই যত্র তত্র থাকতো,—এক একদিন গ্রামে এসে শুতো আমার কাছেই—যতীন দত্তের বাইরের ঘরে। সারারাত চলতো জল্পনা-কল্পনা ও তর্ক-বিতর্ক। সেইখানেই সে গান্ধীকে সত্যিকারের খাটমল খিলানেওয়ালা, অহিংসাপন্থী, বিপ্লব-বিরোধী বলে আমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছিল। আমি তখনও খাজনাবন্ধ ও স্বরাজের বৈপ্লবিক পরিণতি কল্পনা করে সুখ পেতুম। বস্তুত "এক বছরে স্বরাজ" ব্যর্থ হল দেখে দাদারা কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান নিয়েই কাজ করছিলেন।

যাই হোক, কিছুদিন পরেই বজ্রযোগিনী থেকে ন্যাশান্যাল স্কুলের সেক্রেটারী পূর্ণ গুহ, হেডমাষ্টার রমানাথ মিত্র এবং টিচার ও কংগ্রেসের সেক্রেটারী ফণী বাবু গ্রেপ্তার হয়ে মুন্সীগঞ্জে এসে খবর দিলেন,—সেখানে সেক্রেটারী হবার মতন লোক পাওয়া যাচ্ছে না, মুন্সীগঞ্জ থেকে একজন লোক অবিলম্বে পাঠানো দরকার।

মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত প্রাচীন ইতিহাসে বিখ্যাত এক গণ্ডগ্রাম এই বজ্রযোগিনী। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্যে যে বাঙ্গালী পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ইতিহাসে বিখ্যাত, তিনি জন্মেছিলেন এই বজ্রযোগিনী গ্রামেই। মুন্সীগঞ্জ থেকে মাইল পাঁচেক দূর—ইতিহাস-বিখ্যাত রামপাল গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—রামপাল দীঘির পাশ ঘুরে। দীঘি এখন মজে জঙ্গল হয়ে গেছে।

সেখানে কংগ্রেস সেক্রেটারী করে পাঠানো হল আমাকে। যাবার সময় স্থানীয় রাজনীতি একটু বুঝিয়ে দেওয়া হল। পর পর কয়েকজন সেক্রেটারী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছে। ময়মনসিং-এর কংগ্রেস নেতা ও উকীল সূর্য সোমের বাড়ী এই বজ্রযোগিনী গ্রামে, তিনি গ্রামের কংগ্রেসেরও একটু খবরাখবর করে থাকেন। তাঁর ছেলে শিশির সোমও সেক্রেটারী হয়ে জেলে গেছেন। তাঁর পর আর একজন কংগ্রেস কর্মী কালীজীবন ঘোষ সেক্রেটারী হয়ে জেলে গেছেন। তাঁর পরে ন্যাশন্যাল স্কুলের টিচার ফণী বাবু সেক্রেটারী হয়েছিলেন। ন্যাশন্যাল স্কুলই এখন কংগ্রেসের প্রধান ঘাঁটা।

ছিল হাই স্কুল, সেটাই হল ন্যাশন্যাল স্কুল, ছাত্রসংখ্যা ২০০র মতন। জমিদার রায়বাহাদুর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশ গুহ ছিলেন সেক্রেটারী—তিনি বাধা দেন নি। কিন্তু তাঁর জ্ঞাতি পূর্ণ গুহের সঙ্গে ছিল তাঁর বহুকালের মামলা মোকদ্দমা। সেই পূর্ণ গুহ ন্যাশন্যাল স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে কংগ্রেস কমিটীর সাহায্যে রমেশ গুহকে নানা ভাবে জব্দ করার চেষ্টা করেন। রমেশ বাবুর মুন্সীগঞ্জে আসা বন্ধ হয়েছে ডুলির অভাবে, পূর্ণ বাবুর ব্যবস্থায়। রমেশ বাবুর একটা পা একটু ছোট, খুঁড়িয়ে হাঁটেন, হেঁটে মুন্সীগঞ্জে আসতে পারেন না। পূর্ণ বাবু তাঁকে বেশ জব্দই করেছেন।

হাটে একটা ঘরে কংগ্রেস অফিস, অফিসের বাইরে একটা বড় বোর্ডে রোজকার সংবাদপত্রের খবর, কংগ্রেস সংক্রান্ত খবর সংক্ষেপে হাতে লিখে সেঁটে দেওয়া হয়—সাধারণ লোক ভিড় করে পড়ে যায়।

আমি গিয়ে কংগ্রেস অফিসে উঠলুম, খাওয়ার ব্যবস্থা হল ন্যাশান্যাল স্কুলের পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে। তিনি রেঁধে খেতেন। সর্বক্ষণের ভলান্টিয়ার কর্মী চন্দ্রভূষণ, ডাকনাম গৌরা, অমাবস্যার নিশির চেয়ে কালো, সত্যিকারের কর্মী। ভোরে দৌড়তে দৌড়তে পাঁচ মাইল দূরে মিরকাদিম ষ্টীমার ঘাট থেকে খবরের কাগজ এনে বাড়ী বাড়ী বিলি করে, রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গেই খায়, এবং সারাদিন কংগ্রেসের তরফ থেকে সর্বপ্রকার লোককে ধমকধামক দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করে।

আমি গিয়েই চন্দ্রভূষণের সাহায্যে একখানা প্রকাণ্ড নোটিশ লিখে বোর্ডে সেঁটে দিলুম—আমি অমুক, মুন্সীগঞ্জ থেকে বজ্রযোগিনীর কংগ্রেসের ভার নিয়ে এসেছি—আমি শুনলুম, কোন কোন কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস সংগঠনকে তাঁর ব্যক্তিগত বিবাদে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের উপর অত্যাচার করেছেন। এ রকম কাজ কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। অতঃপর এ রকম কোন ঘটনা ঘটলে কংগ্রেস অফিসে জানালে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে।

"লোকটা কোলকাতা থেকে এসেছে" এটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা ভাবলে "লোকটা জবরদস্ত"—কাজেই সবাই হয়ে গেল সাধু। রমেশ গুহের বাড়ী নিকটেই—তিনি বিকেলে হাটে এসে নোটিশ দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। গেলুম এবং অনেক কথা শুনলুম ও জানলুম।

কলকাতায় ও সারা দেশে সভা-সমাবেশে স্বদেশী গান গেয়ে বিখ্যাত হরেন ঘোষের বাড়ী বজ্রযোগিনী গ্রামে। তিনি এলেন, আলাপ হল—তাঁর বাড়ী একদিন নিমন্ত্রণ খেলুম।

কংগ্রেসের সব কাগজপত্র পুলিশ নিয়ে গেছে। কাজেই আমি নতুন খাতাপত্র তৈরী করলুম দু সেট—এক সেট থাকবে কংগ্রেস অফিসে, আর সেট থাকবে গোপন। বিধুবাবু (বোধ হয় মুখার্জি) হলেন গোপন দপ্তর রক্ষক। তাঁর ছেলেরা এখন কলেজ স্কোয়ারে বই-এর কারবার করছেন।

অল্পদিন পরেই জীবন গ্রেপ্তার হল—ভলান্টিয়ার আইনে। তখন পেডির স্থলে সাব ডিভিশন্যাল অফিসার এসেছেন ফণী মুখার্জি—উত্তরপাড়ার অমরদা'র পিসতুতো ভাই—আগে আমাদের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মুন্সীগঞ্জেও তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধুই।

জীবন গ্রেপ্তার হতেই আমাকে বজ্রযোগিনী থেকে সরিয়ে এনে জুড়ে দেওয়া হল স্কুলে, জীবনের জায়গায়। আমি পড়াতুম ১ম, ২য় ৩য় শ্রেণীতে বাঙলা, এবং ৪র্থ, ৫ম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভূগোল। তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা "সাধারণ" ক্লাশ—সব ছেলেই এসে বসতে পারতো এবং যার যা খুসী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো—সে প্রশ্নের জবাব তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হত।

জীবনের মামলা উঠলো কোর্টে—জীবন বললে, **I take no part in the proceedings**—কোন কথার জবাব দেবো না। প্রধান সাক্ষী গ্রামের দফাদার বললে, আমি জানি, জীবন বাবু কংগ্রেসের বলন্টিয়ার। কোর্ট প্রশ্ন করলে, কেমন করে জানলে? দফাদার বললে,—উনি লোকের বাড়ী বাড়ী বিনা পয়সায় চরকা দেন, কলেরা হলে লোকের সেবা করেন। জীবনকে খালাস দেওয়া হল। কিন্তু জীবন আর স্কুলে যোগ দিলে না,—উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে চলে এল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে। বিপ্লবীদের আড্ডা-আশ্রমের অন্যতম ছিল উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ। খরচ যোগাতেন অমরদা'।

মুন্সীগঞ্জেও একটা ছোট পৃথক আড্ডা করা হয়েছিল আমাদের

দলের মিজস্ব—মুন্সীগঞ্জ ষ্টোর নামে একটা ছোট ষ্টেশনারী দোকান ছিল সামনের ক্যামোফ্লেজ—সেখানে বসতেন জীবনের ভগিনীপতি হীরালাল বাবু,—আর পিছনে চলতো আমাদের আড্ডা। দলের ছেলেরা স্থানীয় এবং বাইরেকার, ওখানে আসতো।

আমি কাজ করতুম আপ খোরাকী। দরকার মত কিছু পয়সা-কড়ি খরচও করতুম। স্কুলে প্রাইজ দেওয়া হবে, কিছু ভাল চাঁদা দিলুম। স্কুলের ছেলেদের তৈরী খদ্দরের গামছা চাদর—সরু মোটা ডায়মণ্ড কাটা, পিঁপড়ী-পড়া সুতোর প্রথম ব্যবহার রিজেক্ট মাল—একগাদা জমে গেছে কংগ্রেস অফিসে—কেউ কেনে না—আমি কিছু টাকা দিয়ে সেগুলো নিয়ে বাড়ীতে দিলুম—"যা খুসী কর" বলে। একটা মেস করা হল, ডাল আর ভাত—সস্তার মাছও বাদ। আমি মাঝে মাঝে মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে ভজকট করতুম। রসগোল্লা আট আনা সের,—মাঝে মাঝে কিছু খেতুম ও খাওয়াতুম।

মাইল দু-আড়াই দূরে রেকাবীবাজার, বেশ বড় বাজার,—কয়েক শত মুসলমান কলুর বাস,—তাদের ডাকাত বলে ডাকনাম ছিল,—নদীতে কিস্তী মারা যেত আগে—এখন সেখানে হয়েছে কংগ্রেস ও খিলাফৎ কমিটি—একসঙ্গে একঘরে—সেক্রেটারী একজন মুসলমান—সংগঠক ও নেতা আমাদের দলের স্বরেন মজুমদার—২৫০ জন কলু ভলাণ্টিয়ার এক কথায় ওঠে বসে,—সব অহিংস। কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা সব জায়গার চেয়ে বেশী। বরাবরই সমানে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, বিবাদ বিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমার সালিশী বিচার প্রভৃতি সব জায়গার চেয়ে সফল। দোকানের সামনে খদ্দরের হাফ প্যাণ্ট কুর্তা-টুপী পরিহিত কলু ভলাণ্টিয়ার বসলেই হল, দোকানে কেউ যাবে না। পিকেটিং তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা হল, বিলাতী কাপড়ের গাঁট বেঁধে কংগ্রেসের ছাপ মেরে দেওয়া হবে, সে গাঁট আর খোলা চলবে না, কংগ্রেস অফিসে কিছু জরিমানা দিতে হবে, আর, যে কদিন পিকেটিং করতে হয়েছে, ভলাণ্টিয়ারদের মাথা-পিছু আট আনা হিসাবে রোজ দিতে হবে। স্বরেন মজুমদারের প্ল্যান।

সালিশী বিচারেও দু পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেস অফিসে কিছু কিছু সেলামী দিয়ে যেত। সব চেয়ে স্বচ্ছল কংগ্রেস খিলাফৎ কমিটী।

আমার হাতের টাকা-কড়ি ফুরিয়ে এল; একবার বাড়ী গিয়ে দেখে শুনে আসারও দরকার। ওদিকে জীবনেরও একবার মুন্সীগঞ্জে আসা দরকার। বন্দোবস্ত হল, আমি উত্তরপাড়ায় বিদ্যাপীঠে গিয়ে জীবনের জায়গায় দিন পনেরো বসবো, জীবন মুন্সীগঞ্জ ঘুরে যাবে।

গেলুম উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে। সেখানে কিছু ছেলে লেখাপড়াও শেখে, অমরদা'র ছেলেরাও সেখানেই পড়তো, আর নানা জায়গার বিপ্লবী রিক্রুট কতকগুলি ছেলে সেখানেই থাকতো। সকালে খবরের কাগজ পড়ার মধ্য দিয়ে তাদের বৈপ্লবিক শিক্ষার কাজ চলতো। তখন সেখানে বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের রাখাল দে প্রভৃতি ছিল, যারা পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত হয়েছিল।

একবার বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করে এলুম, এবং গোপনে ব্যবস্থা করে বাড়ী ও জমি বন্ধক দিয়ে ৮০০০ টাকা সংগ্রহ করে ফেললুম। সর্তাদি মহাজন যা খুসী লিখে নিলে, আমি নির্বিবাদে সই করে দিলুম। খুব গোপনে ভাগ্নীর কাছে টাকাগুলো রেখে, কিছু বাণী-টানী দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে মুন্সীগঞ্জে ফিরে এলুম। ভাগ্নের পড়াশুনো বন্ধ হয়েছিল, তাকেও নিয়ে এলুম মুন্সীগঞ্জে। জীবনদের বাড়ীতে থেকে সে ন্যাশান্যাল স্কুলে পড়তে লাগলো।

দুদিন বাদে শেষ সংগ্রাম আসবেই, কে কোথায় থাকবে বা মরবে কিছুই ঠিক নেই, কিসের বাড়ী? কিসের সংসার? মনটা চাঙ্গাই হল।

[ক্রমশঃ।

প্রতীক্ষা

সুধীন চট্টোপাধ্যায়

বিমর্ব বসন্ত কত বিপ্রলব্ধা-ময়ূরী-ডানায়
আমার আকাশে বসে উৎকর্ণ হতাশ্বাস ভিড়
জমিয়ে তুলেছে ম্লান অবসন্ন সন্ধ্যার কিনারে
কত মরা কোকিলের শবে ভরে আছে মহুয়ার নীড়।

কত নীড় হারিয়েছে, কত গান হয়েছে ক্রন্দন
অনাঘ্রাত ফুল ঝরে শুকতারা কত হলো ম্লান
দ্রাবিড় আকাশে কত দগ্ধকাম অতনু কেঁদে ফেরে
কত দিন নীরব সেতারে ওঠেনি কো ভৈরবীর তান।

সেদিন দেখেছি কত বালসূর্য্য নব আশা-বাসনা রক্তিম
কত ফুল, আহা, কত সুর—জানি, তুমি এনেছিলে মুঠোভরা প্রাণ।

এ শ্রাবণের মরা সাঁঝে অতীতের শ্মশান জাগিয়ে
শবরী-প্রতীক্ষা যদি ঝরা শিউলির পথে আসে কোন বসন্তের গান।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৩

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব হল।

কে ঈশ্বরপুরী ?

পূর্বাশ্রম কামারহাটি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আর কিছু পরিচয় নেই ? আছে। মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

কে মাধবেন্দ্র ?

চেননা তাকে ? মাধবেন্দ্রই তো লৌকিক লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু।

থাকবার স্থায়ী কোনো স্থান নেই, তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ায় মাধবেন্দ্র। অযাচক। অযাচিত ভাবে ফল-দুধ পেলে তবে খায়, নচেৎ নিরম্বু উপবাস।

ব্রজমণ্ডলে এসেছে মাধবেন্দ্র। গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যেয় বসেছে গোবিন্দকুণ্ডের ধারে। আপনা-আপনি কিছু জোটেনি, তাই রয়েছে অনাহারে। না জুটুক, বসে বসে নামকীর্তন করি।

কোথা থেকে এক গোপবালক এসে হাজির। বললে, 'আমি এই গ্রামেই থাকি, আমি অযাচকদের খাবার জোটাই। এই নাও, একভাঁড় দুধ এনেছি তোমার জন্যে। নাও, খেয়ে ফেল। ভাঁড় আমি পরে এসে নিয়ে যাব।'

কি মিষ্টি দুধ! মাধবেন্দ্র খেয়ে নিল এক চুমুকে। ফিরে এসে ভাঁড় নিয়ে যাবে বালক, তারই প্রতীক্ষায় বসে রইল। কীর্তন করতে লাগল।

কিন্তু, কই, বালকের আর দেখা নেই।

শেষরাতে স্বপ্ন দেখল মাধবেন্দ্র। এসেছে সেই বালক, মাধবেন্দ্রের হাত ধরে—তাকে নিয়ে এসেছে এক কুঞ্জে, বলছে, আমি কে জানো ? কে ?

মধুর হেসে বালক বললে, আমি গোবর্ধনের অধিপতি। আমি গোপাল।

তুমি ? তন্মন হয়ে তাকিয়ে রইল মাধবেন্দ্র।

জানো, আমার সেবক ম্লেচ্ছের ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে চলে গিয়েছে। আর ফিরে আসেনি। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে এখানে।

কষ্ট ? কিসের কষ্ট ?

একা থাকার কষ্ট। রোদ বৃষ্টি শীত দাবানলের কষ্ট।

আমি—আমি কী করতে পারি ?

তুমিই তো পারো, তোমার জন্যেই তো আমি বসে আছি। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ থেকে মুক্ত করো, সেবা-প্রতিষ্ঠা করো আমার।

ঘুম ভাঙল। ব্রজবাসীদের ডাকল মাধবেন্দ্র। তাদের নিয়ে আঁতি-পাঁতি খুঁজতে বেরুল। অনেক সন্ধানের পর দেখা পেল গোপালের।

আর কথা নেই, গোবর্ধনের উপর বসিয়ে তার সেবা-প্রতিষ্ঠা করল।

কিছু দিন পরে স্বপ্নে আবার দেখা দিল গোপাল। মাধবেন্দ্রকে বললে, তুমি আমার অঙ্গের তাপ দূর করার জন্যে অনেক সেবা করেছ, কিন্তু জানো, এখনো আমি শীতল হইনি।

কিসে শীতল হবে বলো ?

মলয়জ চন্দন লেপন করলে বুঝি শীতল হই। আনবে সে চন্দন ?

সে চন্দন কোথায় ?

নীলাচলে।

তখুনি যাত্রা করল মাধবেন্দ্র। প্রথমে এল শান্তিপুরে, অদ্বৈতের ঘরে। পুরীগোস্বামীর প্রেমাবেশ দেখে অদ্বৈতের আনন্দ আর ধরে না। বলে, আমাকে দীক্ষা দিয়ে যাও।

অদ্বৈতকে দীক্ষা দিয়ে মাধবেন্দ্র যাত্রা করল দক্ষিণে। এল রেমুণায়, বালেশ্বরের এক গ্রামে। রেমুণায় গোপীনাথকে দর্শন করল, কি কি তার ভোগ লাগে জানতে চাইল সবিস্তার। তেমনি ভোগ লাগাব গোপালের। জানতে পেল সন্ধ্যায় যে ভোগ দেওয়া হয় গোপীনাথকে, তার নাম অমৃতকেলি। সে আবার কী জিনিস ? সে এক অপূর্ব ক্ষীর, গোপীনাথের ক্ষীর বলেই সবাই জানে। দ্বাদশ পাত্রে তা নিবেদন করা হয়। আহা, তেমন একটু ক্ষীর যদি পেতাম

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না।]

প্রতীক্ষা

-বহু বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

'বিদ্যুৎ-সহর'

—দেবাশীষ গুহ
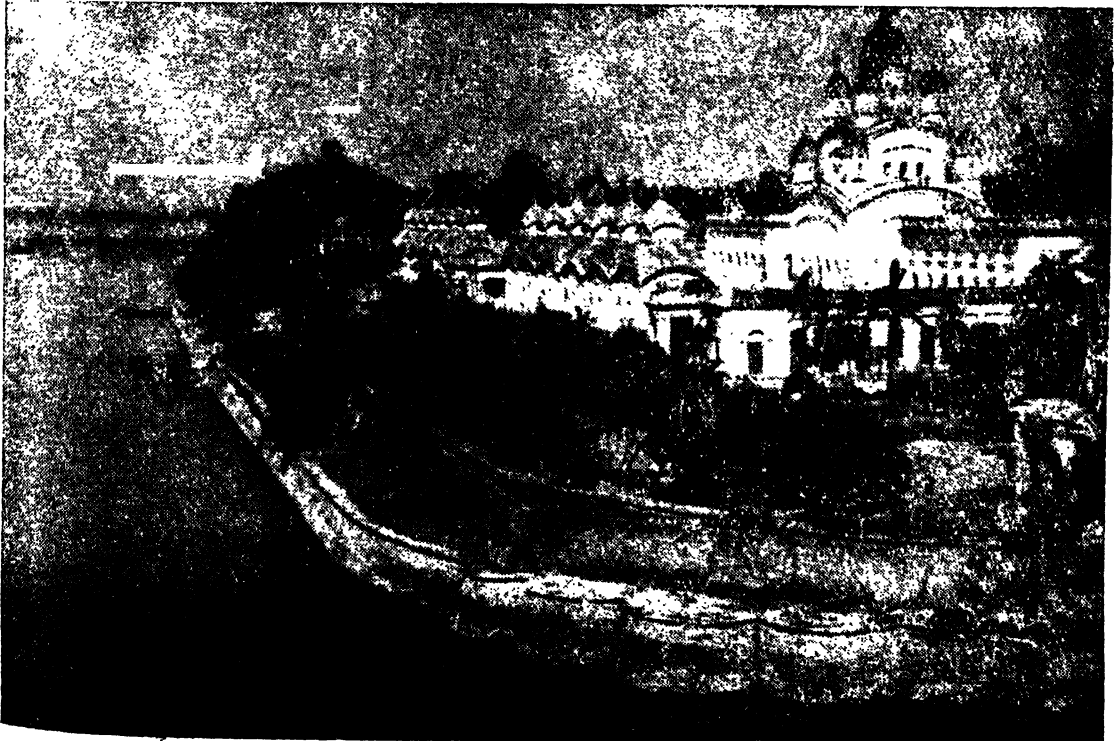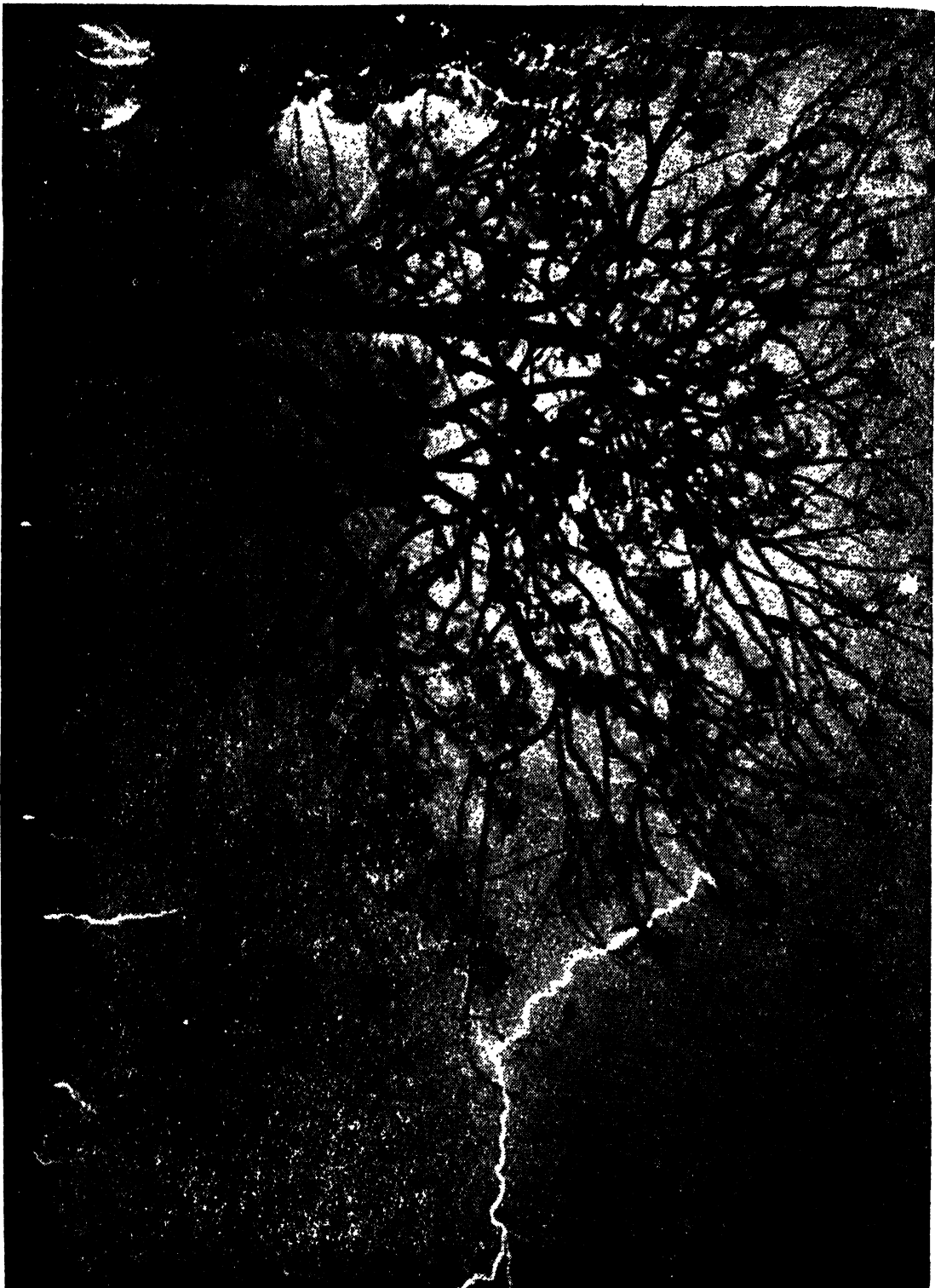
বেয়াই-বেয়ান —আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ব্যাগ-পাইপ (নেপাল) —রঞ্জিৎ মিত্র

অযাচিত, দেখতাম খেয়ে কেমন তার স্বাদ-গন্ধ। যদি ভালো হত অমনি করে রেঁধে খাওয়াতাম আমার গোপালকে।

ছি, ছি, আমি না অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করেছি? তবে আমার মনে ক্ষীর পাওয়ার, ক্ষীর খাওয়ার বাসনা কেন? নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল, কাউকে কিছু না বলে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেল অন্যমনে। গ্রামের শূন্যহাটে বসে কীর্তন করতে লাগল।

এদিকে পূজারী গোপীনাথের শয়ন দিয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছে, স্বপ্ন দেখল। গোপীনাথ বলছে, ওঠ, দরজা খোল। আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্যে একভাঁড় ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছি। যাও তাকে দিয়ে এস। সে শূন্য হাটে বসে আছে একা-একা। কোথায় ক্ষীর, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? পূজারী অবাক মানল। আমার মায়ায় তোমার তা চোখে পড়েনি, সেই ক্ষীর আমার ধড়ার আঁচলে লুকানো আছে।

পূজারী ছুটে গিয়ে মন্দিরের দ্বার খুলল। কি আশ্চর্য, গোপীনাথের বস্ত্রাঞ্চলের নিচে ক্ষীরভাণ্ড।

ক্ষীরের ভাঁড় নিয়ে ছুটল পূজারী। কিন্তু কে মাধবেন্দ্র, এত রাতে কোথায় কোন তল্লাটে লুকিয়ে আছে? হাটে ঢুকে ডাকতে লাগল চেঁচিয়ে, কে মাধবপুরী, কোথায় আছ, বেরিয়ে এস শিগগির। তোমার জন্যে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। চুরি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে।

সাড়াও নেই শব্দও নেই, কোথায় মাধবেন্দ্র? গোপীনাথের স্বপন কি তবে মিথ্যে?

বিহ্বলের মত বেরিয়ে এল মাধব। এই যে আমি, কোথায় আমার গোপালভোগ?

প্রেমাশ্রুবিগলিতনেত্র মাধবকে দেখে পূজারী বিমুগ্ধ হয়ে গেল। প্রণাম করল দণ্ডবৎ। এমনটি না হলে কি গোপীনাথ নিজে চোর সাজেন! চুরি করেন ভক্তের জন্যে, ভক্তপরবশ হন।

মাধবের হাতে ক্ষীরভাণ্ড তুলে দিয়ে চলে গেল পূজারী। মাধব সেই ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করল। সর্বাঙ্গে অমৃতান্বিত হয়ে উঠল।

ভাণ্ডটা ভাঙল টুকরো-টুকরো করে, টুকরোগুলো বেঁধে নিল বহির্বাসে, ইচ্ছে একেক টুকরো খাবে প্রত্যহ। কিন্তু ভয় হল, রাত ভোর হলেই ভিড় জমবে হাটে, দিকে-দিকে সুখ্যাতি কীর্তন শুরু হবে। পূজারী কি ঢ্যাটরা পিটোতে বাকি রাখবে? সবচেয়ে ভয়, আর কিছু নয়, প্রতিষ্ঠার। ভক্তির শত্রুই হল খ্যাতি। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করো, কেউ যেন তোমার না যন্ত্রণা বাড়ায়।

রাত্রি প্রভাত হবার আগেই মাধবেন্দ্র রেমুণা ত্যাগ করল। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠা চায় না, প্রতিষ্ঠা যে তারই অনুগামিনী।

অন্তত গোপীনাথের তো প্রতিষ্ঠা হল। তার নাম হল "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।"

মাধবেন্দ্র নীলাচলে এল, প্রেমবিহ্বল হয়ে দর্শন করল জগন্নাথ।

পালাবে কোথায়? গোপালের জন্যে চন্দন নিয়ে যাবে না? চন্দনই তো এখন তোমার বন্ধন হয়ে দাঁড়াল। উপায় কি, নিজে ঠাণ্ডা না হই, গোপাল তো ঠাণ্ডা হোক। জগন্নাথের সেবকাদের বললে স্বপ্নবৃত্তান্ত। তারা রাজার লোকদের গিয়ে ধরলে। রাজপুরুষদের আনুকূল্যে জোগাড় হল এক মণ চন্দন আর বিশ তোলা কর্পূর। বহন করে নিয়ে যাবে কে? রাজপুরুষরাই দু'জন বাহক দিয়ে দিল। চন্দন আর কর্পূর নিয়ে মাধবেন্দ্র ফিরে এল রেমুণায়। যাবার আগে আরেক বার দেখে যাই গোপীনাথকে।

রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখল মাধব। দেখল গোপাল এসেছে। মুখে মদিরমধুর হাসি। বলছে, মাধব, তোমার প্রেমচন্দন কত গাঢ় তা পরীক্ষা করবার জন্যে তোমাকে বৃক্ষচন্দন আনতে বলেছিলাম। এ বৃক্ষচন্দন আর তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি এ চন্দন গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন কর। তাতেই আমার তাপক্ষয় হবে।

গোপীনাথকে মাখালেই তুমি শীতল হবে?

হব। গোপীনাথের আর আমার একই অঙ্গ।

পূজারীকে ডাকল মাধবেন্দ্র। শোনাল গোপালের প্রত্যাদেশ। দুজনে চন্দন ঘষতে বসে গেল আর দুজন লাগল গায়ে মাখাতে। প্রত্যহ চলল এমন ঘর্ষণ-ম্রক্ষণ। যত দিনে না চন্দন শেষ হল মাধবেন্দ্র থেকে গেল রেমুণায়।

যখন দেহ রাখছে মাধবেন্দ্র, এই বলে কাঁদছে, পেলাম না, পেলাম না, কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না, কিছুই পেলাম না। হে দীনদয়ার্দ্র, হে করুণাকেতন, তোমার অলোককাতর হয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছি পথে-পথে, কবে তোমার দর্শন পাব? আর যত দিন তুমি থাকবে অদর্শনে, কি করব আমি, কোথায় যাব, কেমন করে আমার দিন কাটবে?

সেই মাধবেন্দ্রের আশীর্বাদধন্য ঈশ্বর। সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। একখানা আবার কাব্যগ্রন্থ লিখেছে, নাম শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত। চাদরের নিচে সবসময়ে রয়েছে সে পুঁথি। অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র অক্ষরকৃষ্ণস্পর্শ।

অলক্ষিতে আছে নবদ্বীপে। আর কেউ না পারুক চিনতে পেরেছে গৌরহরি। অন্তত ভক্ত বলে চিনতে পেরেছে।

কৃপাসুধাসরিৎ শ্রীগৌরাঙ্গ। নদীর জল যখন কূল ছাপিয়ে মাঠে এসে পড়ে তখন কী হয়? সমস্ত মাঠ জলে ভেসে যায়, ডুবে যায়। কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়ায় জল, কোথায় দাঁড়ায়? যে সব জায়গা উচু বা সমতল সেখানে দাঁড়ায় না, সেখান থেকে সরে পড়ে আস্তে-আস্তে। কিন্তু যে জায়গা নিচু, যে জায়গায় গর্ত বা খোদল সেখানেই জল দাঁড়ায়, সেখানেই জল জমে।

গৌরকৃপা সর্বত্র সমান ভাবে বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু অভিমানের স্ফীতি, বা অহমিকার ঔদ্ধত্য তাকে ধরে রাখতে পারছে না। ধরে রাখতে পারছে কে? ধরে রাখতে পারছে শূন্যতা, দীনতা, নিরভিমানতা। এ নয় যে ভগবান শুধু ভক্তকেই কৃপা করেন। ভগবানের কৃপা অচ্ছিন্নপ্রবাহা, নিরন্তর তার বর্ষণ হচ্ছে সর্বত্র। ভক্তই একমাত্র পাত্র যার মধ্যে কৃপা থাকতে পারে, জমতে পারে। যেমন গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল তেমনি ভক্তির মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, অহঙ্কারশূন্যতার মধ্যে ভগবানের কৃপা।

পড়িয়ে ফিরছে একদিন নিমাই, পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা। দ্বিধা-কুণ্ঠা নেই, ঈশ্বরকে প্রণাম করল নিমাই।

'তুমি কে?' জিগগেস করল ঈশ্বর।

'আমি নিমাই।'

'কোন নিমাই?'

'পড়ুয়াদের পুঁথি পড়াই, আমি নিমাই পণ্ডিত।'

'তুমি?' কত নাম-ডাক শুনেছে, সেই লোক চোখের সামনে, ঈশ্বর নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। তাই সিদ্ধপুরুষের মত তোমার এমন পরম গম্ভীর শরীর, এমন প্রেমপরিপূর্ণ চোখ—'

'আপনি?'

'আমি এক কৃষ্ণকথক। কৃষ্ণপ্রস্তাবই আমার একমাত্র প্রসঙ্গ।'

'তবে আর কথা নেই। চলুন আমাদের ঘরে। সেখানেই আজ ভিক্ষা করবেন প্রসাদ।' সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ করল নিমাই।

'তাই চলো। তোমাদের ঘরে গেলে সর্বক্ষণ, বহুক্ষণ তোমাকে দেখতে পারব চোখ ভরে। তোমার চোখের দৃষ্টিই তো আমার পরম প্রসাদ।'

প্রহ্লাদকে তার বন্ধুরা জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ, সুখ কিসে? প্রহ্লাদ বললে, স্বার্থপর হয়ে যদি শুধু নিজের সুখ খুঁজে বেড়াও, সুখ নেই, পাবে না সুখ। কিসে পাব তবে? প্রহ্লাদ বললে, আমাদের একজন প্রিয়জন আছে তার নাম আত্মা। সে পূর্ণতৃপ্ত, নিত্যসুখী, তার কোনো অভাব নেই আকাঙ্ক্ষা নেই। আমাদের কী এমন সেবা আছে না প্রীতি আছে যে তাকে আমরা সুখী করব। কিন্তু মজা কী জানো, যদি আমরা তাকে সুখী করবার জন্যে চেষ্টা করি তা হলেই আমাদের সুখ হয়। আমাদের সুখ শুধু সেই আত্মাকে সুখী করবার উদ্যমে। আর কোনো উপায়েই, কোনো রহস্যেই, আমাদের সুখ নেই।

দর্পণ দেখ, দর্পণে দেখ তোমার মুখচ্ছায়া। তোমার ইচ্ছে হল তিলকচন্দনের ফোঁটা কেটে ঐ প্রতিবিম্বকে সুখী করি। দর্পণের পিছনে হাত বাড়িয়ে প্রতিবিম্বকে ধরতে গেলে, নিষ্ফল সেই দুশ্চেষ্টা। তখন কী কর! বিম্বে অর্থাৎ নিজমুখে তিলক চন্দন রচনা করো, তাই তখন ফুটে উঠবে প্রতিবিম্বে। তুমি হাসলেই প্রতিবিম্ব হাসে, তুমি সুখী হলেই প্রতিবিম্ব সুখী। তোমার মাধ্যম ছাড়া প্রতিবিম্বকে ধরাছোঁয়া যাবে না, তোমার মাধ্যম ছাড়া পৌঁছুনো যাবে না প্রতিবিম্বে। তাই আত্মার সুখেই আত্মসুখ। তাই কৃষ্ণসুখে সুখী—এ ছাড়া আর পথ নেই, কৌশল নেই।

সুতরাং বিচিত্র বাসনা স্বীকার করে কৃষ্ণসুখসাধনে তৎপর হও। যারা গোবিন্দকে ভালোবাসে তারা বাসনাকে হেয় করে না, নষ্ট-দগ্ধ করে না, পূর্ণমাত্রায় বাঁচিয়ে রাখে। তারা কৃষ্ণের জন্যে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, চন্দন ঘষে, সে মালাচন্দন কৃষ্ণের গলায় দুলিয়ে দেয়। কৃষ্ণের জন্যে তারা গরু দুইয়ে দুধ জাল দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে। কৃষ্ণ দেখে খুশি হবে বলে নয়নে কাজল দেয়, অধরে তাম্বূল লেপে। কটা

আর হাসিকে যুগপৎ উজ্জ্বল করে। লাবণ্যের স্ফূর্তির জন্যে গাত্রমার্জনায় তৎপর হয়। অশ্রাসনের ঢেউ আনে বসনে। সকল বাসনা কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্যে উৎসর্গ করে। কা'কে তুমি শারীরিক ক্লেশ বলছ, এ কৃষ্ণভোগ, এ কৃষ্ণস্বাদ, এ কৃষ্ণস্পর্শ। এই আমার আনন্দসন্দোহ। শীতে কি করল গোপী? গায়ের উত্তরীয় কৃষ্ণকে দিয়ে নিজে রইল রিক্তগাত্রে—কৃষ্ণ যদি উত্তাপে থাকে তাহলে আর আমার শীত কোথায়? কৃষ্ণ যদি আরামে থাকে তাহলে আমার আর ব্যাধি কি!

শান্তি শান্তি—শান্তি তো সুখ নয়। আমি স্বস্তি চাই না, আমি সুখ চাই। শান্তি মানে কি? শান্তি মানে দুঃখনিবৃত্তি, দুঃখ পরিহার। দুঃখ যাতে না ছুঁতে পারে তেমনি একটা সুরক্ষিত অবস্থায় আসা শান্তি। কিন্তু আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য তো নঙর্থক নয়, সদর্থক। আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য সুখ। ঘুমিয়ে পড়া নয়, জেগে থাকা।

আর এ সুখ আমার নিত্যসুখ। এ সুখে বয়স নেই জরা নেই মৃত্যু নেই, নেই দুর্ধর্ষ কালপ্রতাপ। আমার পাঁচ বছরের গোপাল পাঁচ বছরেরই থাকে। আমার কিশোরকৃষ্ণ নওলকিশোরই থাকে, নিত্য-কিশোর, কোনোদিন সে বুড়ো হয় না। আর তুমি যদি তার ষোড়শী সখী হও তুমিও থাকবে তেমনি চিরন্তনী স্থিরদেহী। জাগতিক সুখ গোয়ালার দুধের মত, জল-মেশানো। স্বার্থদোষ কামদোষের ছোঁয়াচ লাগা। আর ব্রজের সুখ? ব্রজের সুখ খাঁটি দুধ, শুদ্ধ-শুভ্র-মধু স্বাদু, নেই একবিন্দু কামস্বার্থের গন্ধ। নিজসুখে তাৎপর্য নেই, রাধাকৃষ্ণ সুখী হলেই আমার অনিবার্য সুখ। আমার অনিবার্য জাগৃতি।

নিমাইয়ের ঘরে আতিথ্য নিল ঈশ্বর।

তারপর কিছুদিন বাসা নিল গোপীনাথ আচার্যের ঘরে। রোজ সেখানে তার কৃষ্ণলীলামৃত পুঁথি পড়িয়ে শোনায় গদাধরকে। একদিন নিমাই এসে হাজির। নিমাইকে দেখে ঈশ্বরের যেমন কুণ্ঠা তেমনি উৎসাহ। তুমি জগৎখ্যাত পণ্ডিত, তুমি শুনবে আমার পুঁথি? কেন শুনব না? কৃষ্ণকথার কি তৃষ্ণা মেটে?

'তাহলে শোনো। কিন্তু এক কথা।'

'কি কথা?'

'কোথায় কি দোষ-ত্রুটি হয়েছে বলবে সব সরল ভাবে।'

'দোষত্রুটি?' নিমাই উত্তেজিত হয়ে বললে, 'ভক্ত কৃষ্ণের কথা লিখছে তাতে আবার দোষত্রুটি কি! কার সাধ্য কৃষ্ণকথায় দোষ ধরে! ভক্তবাক্যে যে দোষ দেখে সেই পাপী, সেই দোষী। ভক্তের যেরকমই ছন্দ-কবিত্ব হোক, কৃষ্ণের অখণ্ড বিনোদ।'

ঈশ্বরপুরী চুপ করে রইল।

'যে মূর্খ সে 'বিষ্ণায়' বলছে আর যে পণ্ডিত সে ঠিক-ঠিক বলছে 'বিষ্ণবে'।' নিমাই বলছে হাসিমুখে, 'কিন্তু বিষ্ণু কি তারতম্য করছেন? দুই-ই তিনি সমান ভাবে গ্রহণ করছেন। কেন করবেন না? তিনি যে ভাবগ্রাহী জনার্দন।'

> মূর্খে বোলে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বোলে ধীর।
> দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥
> ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
> ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥

আরেক দিন ব্যাকরণের কথা উঠল, আত্মনেপদী না পরস্মৈপদী। নিমাই বললে, 'যে ধাতুর কথা বলছেন সে পরস্মৈপদী।'

বিদ্যারস-বিচারে ঈশ্বরও পশ্চাৎপদ নয়। সে দেখিয়ে দিল ভুল হয়েছে নিমাইয়ের। ধাতু পরস্মৈপদী নয়, আত্মনেপদী।

হার মানল নিমাই। ভক্তের কাছে ভৃত্যের কাছে হার মানতে তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। কিন্তু, যাই বলো, আত্মপদ, অহঙ্কারের পদ নয়; পরপদ, পরমপদই নির্ভুল। পরমপদই স্থিরতম আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণ আবার অবতীর্ণ হলেন কেন? তার মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ কি? শুধু প্রেমরসনির্যাসের আস্বাদন আর রাগমার্গ ভক্তিপ্রচার।

ভূভারহরণের জন্যে নয়, ভক্তিযোগবিধানের জন্যে তাঁর আসা।

কি রকম ভক্তি? রাগমার্গের ভক্তি। আত্মসুখ চাই না পরসুখেই পরমসুখ—এই হল প্রেমসার।

[ক্রমশঃ।

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

২

শিশিরকুমারের কথা বলতে গেলেই দু'টি জায়গার কথা আমাদের মনে পড়ে—৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে গ্রন্থজগতের ঘর আর ২৭৮নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়ীতে তাঁর নিজস্ব ঘর। এ ছাড়া শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চের বা ওখানে যে ঘরে তিনি থাকতেন, তার কথাও হয়ত বলা চলত, কিন্তু অকারণ কথার জাল বুনে সময় কাটানোর প্রয়োজন কি? তবে প্রথম দুটি ঘরের পরিবেশেই তাঁর কথা আমরা শুনেছি বলে, পরিবেশ বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করছি।

গোলদীঘির আশে-পাশে নানা আকর্ষণ পথচারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কাজেই তাদের মধ্যে ৬নং বাড়িটির নজরে পড়বার মত কোন গুণই নেই। একেবারে সেকেলে প্যাটার্ণের দোতলা বাড়ি, বাইরের দিকে কাঠের বারান্দা, তার কাঠগুলোও নড়বড়ে হয়ে গেছে, নীচের ঘরগুলোয় সারি সারি বই-এর দোকান—অবশ্য নামকরা কোন কোম্পানী নয়, তাই সাধারণের সঙ্গে পরিচয় এদের অল্প। উপযুক্ত সঙ্গ না পাওয়ার দরুণই বোধ হয় বাড়িটা সাধারণের চোখে অপরিচিতই রয়ে গেছে। অথচ বাঙলার চিন্তাক্ষেত্রে যে সব মনীষীর দান আমরা সগর্বে স্বীকার করি তাঁদের অনেকেই এ বাড়িতে বহু বার এসেছেন।

বাড়ির প্রথম মালিক ডেভিড হেয়ারের নাম আজকের দিনে কোন বাঙালীকেই বোধ হয় বলতে হবে না। এ বাড়ির প্রতিটি কামরায় সেদিন উনবিংশ শতকের নব জাগরণের অগ্রদূতরা এসে যে রীতিমত সোরগোল তুলতেন তা এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও আমরা কল্পনা করতে পারি। হিন্দু কলেজের মাতব্বররা ছাত্রদের সঙ্গে এসে ড্যাম-নেটিভ দশা থেকে কি করে মুক্তিলাভ করা যায়, তার উপায় নির্ধারণ করুন আর নাই করুন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙলা দেশবাসীদের আলোকের রাজ্যে আনার পন্থা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক যে করতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশের সম্ভাবনার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম কা'র কা'র এ বাড়ীতেই হয়েছিল তার খবর আমাদের জানা নেই; জানলে সে যুগের বহু বিখ্যাত মনীষীর নামই যে নজরে পড়ত তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমাদের।

ডেভিড হেয়ারের যুগ কাটিয়ে বিংশ শতকের প্রথম দিকে এ বাড়িতে দেখতে পাই আমরা আর একজন বিখ্যাত বাঙালী মনীষীকে। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' সে সময়ে বাঙলা দেশে রীতিমত আলোড়ন তুলত। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার বহু বিখ্যাত রচনাই হয়ত তৎকালীন বিদগ্ধ জনসমাজের সামনে পড়া হয়েছিল এবং ফরাসের ওপর বসে পান-তামাক খেতে খেতে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তিরা সুচিন্তিত মতামতও হয়ত দিয়েছিলেন।

মেসোমশায়ের কাছে শ্রীঅরবিন্দ বা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এসে অনেক দিন কাটিয়ে গেছেন, আর সেই সময় তাঁদের বন্ধু ও পরিচিত লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করে বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদের জন্মও বোধ হয় এই বাড়িরই কোন ঘরে বসে দিয়েছিলেন তাঁরা।

এমনি বহু মনীষীর আনাগোনায় একশ' বছরের ওপর মুখর থেকেছে ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িটি। অথচ সেখানকার বোবা মাটিতে কারো পদচিহ্নই আজ দেখা যায় না। আজ ব্যস্ত-সমস্ত খরিদ্দারের দল লিষ্টি মাফিক বই কিনতে দোকানে দোকানে হানা দিচ্ছে। তাদের প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে নজর দেবার মত অবকাশ তাদের কোথায়? অবশ্য সে অবকাশ থাকলে এই বাড়ির একটি ঘরের বৈশিষ্ট্য তাদের নজরে পড়ত।

দরজা দিয়ে ঢুকে দু'পাশের কাঠ দিয়ে ঘেরা দোকানঘরগুলো পেরিয়ে, ওপরে ওঠার সিঁড়ি বাঁয়ে রেখে, ডাইনের কাদা-প্যাচপেচে উঠানটা পেরিয়ে যে ঘরের সামনে দাঁড়াতে হয় তার সাজসজ্জা সাধারণ দোকান-ঘরের মত নয় ঠিক। সামনের দরজার প্যাডেলগুলোতে সুন্দর মাদুরের টুকরো বেত দিয়ে আটকানো। দরজার ঠিক ওপরে চৌকো ভেণ্টিলেটারের গায়ে শোলার চাঁদমালা, তার নীচেই সুদৃশ্য কাপড়ের ঝালর।

ঘরের ভেতরে ঢুকে একটু এগিয়ে এলেই, কাঠের ওপর বেত দিয়ে আটকানো মাদুর মোড়া কাউণ্টার। কাউণ্টারের পেছনে গোটা দুই তিন বই ঠাসা আলমারী—এইটুকুতেই দোকানের লক্ষণ। ঘরের বাকী অংশের বেশীর ভাগ জুড়ে একজোড়া তক্তাপোষের ওপর ফরাস পাতা আর তার চার পাশে কতকগুলো মোড়া পাতা। পশ্চিম দিক ছাড়া বাকী তিন দিকে বুকসমান উঁচুতে কাঠের র‍্যাক-প্রদর্শনীর কাজে লাগানো হয়। ঘরের এখানে ওখানে শোলার ময়ূর ও অন্যান্য শোলার কাজ। সবটা মিলিয়ে বৈঠকখানার চেহারাই ফুটে ওঠে। এখানে প্রায়ই আসতেন শিশিরকুমার। আসতেন রিহার্স্যাল দিতে, আসতেন নাটক পড়তে, আসতেন আসর জমাতে।

এখানেই হ'ত নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন, সেখানে আসতেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায়—যাঁর আঁকা 'নিউ জেনারেশন' পশ্চিমের দেওয়ালের মাঝখানটা জুড়ে ঝুলছে, তার ডাইনে রয়েছে শিশিরকুমারের বসা একটা ছবি আর বাঁয়ে ফরাসী শিল্পী তুলু লোত্রেকের 'নিজের চেহারা' আর তাঁর জীবনীকার পেয়ের লা মুরের ছবি—রসজ্ঞ পণ্ডিত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী লেখক ও শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চিত্র ও নাট্য-সমালোচক পঙ্কজকুমার দত্ত, জ্যোতির্ময় বসু-রায়, মন্মথেন্দ্র ভঞ্জ, সাহিত্যিক শিবনারায়ণ রায়, কুমারেশ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, অধ্যাপক তারক গঙ্গোপাধ্যায়, হারাণ চক্রবর্তী, কাউন্সিলার তারাপ্রসন্ন মিত্র, কবিরাম বসু, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে রত্নমালার মধ্যমণির মত উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে বিরাজ করতেন শিশিরকুমার।

---

২৭৮ নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়িটার সর্বাঙ্গে যেন মাখানো আছে একটা শান্ত বিষাদ। সামনের অশ্বত্থগাছটার ভেতর খোলা হাওয়া যেন সেই বিষাদের সুরটাই বয়ে নিয়ে যায়।

বাড়িটার অবস্থা খুব ভাল নয়, দেখলে মনে হ'ত এই বুঝি ধ্বসে পড়ে। খোলা নর্দমার ওপর বাঁধানো সাঁকোজাতের জিনিষটার এক পাশে ছড়ানো এক রাশ পাথরের খোয়া। কোন দিন হয়ত রাস্তাটা সারানো হবে তারই প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে ঢালা হয়েছে তাদের। কিন্তু প্রস্তুতিব চাপে হতভাগ্য পথের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে বাড়ির সদরে এসে দাঁড়ালে প্রথমেই নজরে পড়ে দু' পাশের দুটো দোকান।

কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক গোষ্ঠী দুই তিন চেয়ার আর রঙচটা একটা চৌকো টেবিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের বসার ঘর। এখানে শিশিরকুমারের কোন স্পর্শ আমাদের নজরে পড়েনি।

বাইরের ঘর পেরিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি—সরু সরু উঁচু উঁচু ধাপগুলো গোটা দুই বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ছোট্ট একটা ছাদে। ছাদের ওপাশেই শিশিরকুমারের ঘর। সে ঘর থেকে বাইরের বড় রাস্তার জীবনের প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। ঘরের মধ্যেও তাই অতীতের স্তব্ধ প্রতীক্ষা, ভবিষ্যতের পথনির্দেশের অপেক্ষায়।

ঘরের একটা দিক জুড়ে একটা জোড়া খাট, মাঝখানে একটা সোফা, তার পাশে উপরে খানকতক বই আর অ্যাশট্রে। অন্য দিকে ছোট একটা খাট—উনি ঐ খাটেই শোন। ঘরে একখানি মাত্র চেয়ার—কেউ এলে বসতে দেওয়া হয়, লোক বেশী এলে জোড়া খাটে বসে। ঘরের বাকী অংশে শুধু বই—অধিকাংশই নাটক, মঞ্চ সম্বন্ধীয় বা সমালোচনা, তার মধ্যে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী আছে, আছে অন্য বিদেশী নাট্যকারদের নাটক, নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন যুগের লেখা বই, বহু বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচকের রচনা সংগ্রহ, বাংলা নাটকের প্রায় সব ক'টি বই আর কিছু সংস্কৃত কাব্য ও নাটক।

ঘরের তিন দিকের দেওয়ালে তিনটি ছবি—নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পরেই তোলা শিশিরকুমারের ছবি। মাইকেলের রূপসজ্জায় শিশিরকুমার—ছবির পাশে বোধ হয় 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি হাতে লেখা আর সমরনায়কের সাজে সুভাষচন্দ্র।

ঘরটির সর্বাঙ্গে শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের ছাপ। কিন্তু এ শিশিরকুমার গ্রন্থজগতের আসরের মধ্যমণি শিশিরকুমার নন ইনি, এ অনাদৃত কমল হীরা যার দ্যুতি একদিন দিগন্ত উদ্ভাসি ছিল কিন্তু যা ইতিমধ্যেই স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে।

৩

প্রথম যেদিনের কথা আমাদের খাতায় লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে সেটা ১৯৫৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, কয়েক দিন পরেই এণ্টালী কালচারাল কনফারেন্সে (এর আর এক নাম কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলন, প্রধান শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। দ্বিতীয় নামটিতেও বিশেষভাবে পরিচিত উল্লিখিত সাংস্কৃতিক সংস্থাটি) নাট্যাচার্যের অভিনয় করার কথা মাইকেলের ভূমিকায়, তাই রিহার্স্যাল দিচ্ছেন আর অন্যান্য সমস্ত চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে শেখাচ্ছেন। কে একজন তাঁর নিজের ভূমিকা বলতে গিয়ে কথাগুলো অহেতুক একটু টেনে বলায় নাট্যাচার্য সেটি সংশোধন করে দিয়ে বললেন—প্রত্যেক লোকেরই একটি না একটি মুদ্রাদোষ থাকে। আকাঙ্ক্ষার 'আ'টির এই টান আমার মুখে মানায়, অন্য লোকে কপি করতে গেলে মানাবে কেন? সে যে চৌর্যবৃত্তি।

অন্য একজন অভিনেতার কথা উঠলো, মাইকেলে কোনো একটি চরিত্রের জন্য তাঁর নাম করা হ'লো। একটু ভেবে নাট্যাচার্য বললেন—অনেক দিন করেনি, সেই ১৯৪৩এ আর এটি ১৯৫৭ হ'লো বলে।

মাইকেলের মদ খাওয়ার কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় বললেন—**Rosy wine** কেন বলে? **Rosy condition** হয় বলে? লাল রঙের এক মদ আছে বটে, কিন্তু সে তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের মদ ধরতে শেখানোর জন্যে ব্যবহার হয়।

এই সময় চা এসে পড়লো, ওঁকে দেওয়া হ'লো এক কাপ, একটা চুমুক দিয়েই বললে কী দিলে হে, গরম চিনির সরবৎ?

ব্যস্ত হলাম—সে কি! খুব চিনি দিয়েছে বুঝি?

চিনি তো বেশি দিয়েছেই, তার উপর চা একদম দেয়নি।

ইতিমধ্যে মাইকেলের সম্বন্ধে কে প্রশ্ন করেছেন, তাকে উত্তর দিলেন—মিশ্র ছন্দে প্রথম এলো ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। তার আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতায় ছিল আইনমাফিক ছন্দ। এই লোকটাই প্রথম নিগড় ভেঙে ফেললো। বাংলা দেশে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে রেঁনাসাসের ফাদার বলতেই হবে।

চায়ে চিনি বেশি হয়েছে বলে আমরা ওঁকে চা-টি খেতে বারণ করলাম, তাতে বললেন—খাওয়ার দিকে মন দিলে রিহার্স্যাল দেওয়া হবে না। তবু কিছুটা চা দিতে যাওয়ায় বললেন—আচ্ছা, দাও আধ কাপ, এখন আমার স্বাস্থ্যের দিকে তোমাদেরই নজর রাখতে হবে, আমার এখন কেউ নেই **I am all alone** একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন—আমার যে কর্মকর্তা ছিল, সে এখন **mentally as well as physically paralysed** যা করতে হবে তোমরা নিজেরাই **plan** করে ঠিক করে নাও।

এই সময় টাকা-পয়সার কথা উঠল, তাতে বললেন—টাকা-পয়সা হলে মানুষ মস্ত বড় একটা ভুল করে। ভাবে, তারা একটা মস্ত বড় কিছু হলো। কিন্তু বোঝে না মরলে কেউ তাকে মনেও রাখবে না, সংসারকে কিছু দান করলে তবেই তাকে মানুষ মনে রাখে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠল এবার, বললেন—কোনো বিশ্বাস সত্য নয়। সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক, সত্য **grow** করছে। কেউ কেউ বলে ভগবানও **grow** করছে। সবাই মনে মনে একটি ঔরঙ্গজেব। যে যার বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর যা হওয়া উচিত নয় তাই হচ্ছে—গোঁড়া হচ্ছে।

তারপর অভিনয়ের প্রসঙ্গে গেলেন, বললেন—আমার সত্তর বছর বয়স হতে চললো। এ তো আর মিথ্যে কথা নয়! সত্তর বছর সত্য হতে চললো। আমি চাই **Play**টি ভালো করতে। তোমরা সবাই ঠিক সময়ে ঢুকলে আর বেরোলেই হবে। আমি আর গৌরদাস তো ভালোই করেছিলাম, লোকেও মন্দ বলেনি।

চা আর দেবো কি না প্রশ্ন করায় বললেন—না, আর চা দিয়ো না। আমি অসুস্থ, মনেও সুস্থ নই। তবে লোককে বলতে ভালোবাসি না যে অসুস্থ আমি।

কথা বলতে বলতে হাত থেকে চা-টা চলকে গায়ে পড়লো, হাসলেন—দেখেছ, অসভ্যের মতো কেমন গায়ে এসে পড়লো চা-টা।

'মাইকেল' বইটা পাওয়া যায় না এই অনুযোগের উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, বইটি ছাপাতে হবে। তারপর জানতে চাইলেন ক'টা বেজেছে, আটটা ?

বললাম—সাড়ে ন'টা।

চমকে উঠলেন সময় শুনে, বললেন—এতো সময় কেটে গেল, অথচ কই, রিহার্স্যাল তো তেমন হলো না! উঠে পড়লেন।

যাবার সময় বললেন—আর কিছু গোলমাল না হয় তো আগামী এপ্রিল মাসে **we shall meet under** এ ছাউনী। তবে সবই ভাগ্য।

গাড়ীতে যেতে যেতে কলকাতার থিয়েটারের রি-মডেলিং-এর কথা হচ্ছিল, তাতে উনি বললেন—আজ তো দেখলাম; কোন একটা থিয়েটারের বাড়ি তো খুব ভালো করেনি, ঐ রকম হলদে রঙ হবে? ও যে পায়খানার রং। ষ্টেজের কি কিছু **Improvement** করেছে? তা যদি না করে থাকে, এতো হৈ-চৈ কেন? স্রেফ হুজুগ?

পরের দিন আবার এলেন রিহার্স্যালে। কে একজন হঠাৎ হেসে উঠেছিল, শুনে বললেন—১৮৯১ সালে আমি তখন আট ন'বছরের ছেলে। একদিন এক খৃষ্টীয় সভায় গেছি, সেখানকার এক পাদ্রীর প্রার্থনার সময় তাঁর অদ্ভুত সুর শুনে খুক্ করে হেসে উঠেছিলাম। তোমরা সে রকম অদ্ভুত শব্দ কেউ করো না।

মাইকেলের জীবন প্রসঙ্গে এক সময় বললেন—দেবকী বলে কেউ নেই। ও যে কি করে মাইকেলের জীবনে এলো তা-ও জানি না। আবার এক সময় একজনের কথা সংশোধন করে বললেন—মেসো অর্থাৎ মাসির বর। আমি সেকেলে লোক, সেকেলে কথাই বলি। তারপর ছ'নম্বর বাড়ির কথায় বললেন—বাড়িটি তো ঐতিহাসিক বাড়ি।

শ্রীঅরবিন্দ আসতেন শুনে বললেন—আসবেনই তো। না এসে উপায় আছে? কেষ্ট বাবু তো ওঁর মেসো ছিলেন।

আবার একজন রাজনারায়ণের পার্ট বলতে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করেছেন, তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—বক্তৃকতা নয়—বক্তৃতা। তুমি মধুর বাবা, হিব্রু-লাতিন জানো, পণ্ডিত লোক। অথচ বক্তৃতা উচ্চারণ করতে পারো না। নীচেকার দাঁতের পাটাতে আঙুল দিয়ে চেপে ধরো।

ইতিমধ্যে একজন একটু সুর করে কথা বলেছে, তাকে বললেন সুর টেনে বলছো কেন?

সুর টেনে বলে যাত্রায়, কারণ, সেখানে দৃশ্যপট নেই। কাজেই সুর করে না বললে আসত না। ষ্টেজে স্বাভাবিক সুরে বলা দরকার।

এবার বললেন—দেখার চোখ সকলের থাকে না। শার্লক হোমসের ছিল। আর কিছু কিছু লোকের ছিল। আর থাকে সাহিত্যিকদের।

নিজের পার্ট বলতে গিয়ে গৌরের জায়গায় গোকুল বললেন। ভুলটি ধরিয়ে দিতে বললেন—কথাটি ষ্টেজে বললেও ক্ষতি হয় না। মধু মাতাল অবস্থায় বলছে। তারপর স্বীকার করলেন—বয়েস হয়েছে সব কিছু ভুলে যাচ্ছি। স্মৃতিশক্তিও কমে গেছে।

এর পর মধুর সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তির প্রসঙ্গে বললেন—সংস্কৃতে মজা হচ্ছে যে, কোথায় গিয়ে ক্রিয়াপদ পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই।

কথা প্রসঙ্গে অতীতের অভিনেতৃবৃন্দের কথা ওঠায় উনি বললেন—১৮৮৯ সালে তারাসুন্দরীর বয়স সাত বছর। তারা প্রথম 'চৈতন্যলীলা'য় ফ্ল্যাগ ওড়ায়। এগারো বছর বয়সে প্রফুল্ল নাটকে প্রথম যাদব করে।

দানী বাবুর সম্বন্ধে বললেন—দানী বাবুর—গলা! **Wonderful** গলা, ও রকম গলা যদি আমায় দিতেন! কিন্তু দিলেন না।

এর পর এলো ২রা জানুয়ারী। প্রথমে সব লোকজন আসেনি, কাজেই রিহার্স্যাল না দিয়ে নানা রকম কথা হতে লাগল। কি খেতে ভালো লাগে না লাগে সেই প্রসঙ্গে বললেন—বাঁধাকপি-ভাতে খেতে বেশ ভালো লাগে। তবে ঈষৎ কাঁচা থাকা চাই। ফুলকপি নেহাৎই অসভ্য। দাঁতে আর জোর নেই। চারটে দাঁত বাঁধানো, তাতে নাকি বেশ শোভা হয়।

অন্য একটি কথা প্রসঙ্গে বললেন—চোদ্দো রথীর কথায় আর একটি কথা মনে পড়লো। তখনও মনোমোহন থিয়েটারের **Possession** ছাড়িনি, হঠাৎ বাগিজ্জ দামী লুঙ্গিপরা এক ভদ্রলোক হাজির। বললেন থিয়েটারের পোষাক করাচ্ছেন, আমাকে দেখে দিতে হবে। তাতে কোনো কাজ ছিল না, রাজী হয়ে গেলুম, ভদ্রলোক বিপণ ষ্ট্রীটের একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তেতলার ঘর, তখনও সাজানো হয়নি, শলমা চুমকির কাজ করবার লোকেরা বসে। চারদিকে অনেক ভেলভেট পড়ে রয়েছে। তখন সবচেয়ে ভালো ভেলভেটের দাম গজ-প্রতি এক টাকা চোদ্দো আনার বেশি নয়। সব জিগ্যেস করতে একশ, একশ একুশ এইরকম যা খুশি বলে গেল। আমাকে অবাক হতে দেখে তিনি বললেন—হ্যাঁ, এগুলো সবচেয়ে ভালো পোষাক, পাবলিক থিয়েটারের পক্ষে অত দাম দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। বললুম—সম্ভব তো নয়ই। কারণ সবচেয়ে ভালো ভেলভেট এক টাকা চোদ্দ আনা গজ অত দাম হবে কেন? দর আপনি জানেন না, তা টাকা আপনার যতই থাক। কথাটা তাঁর ভালো লাগল না।

এর পর কথায় কথায় স্বদেশীযুগের কথা উঠল। বললেন—রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন **a Prince among men**, ১৯০৫ সালের কথা **National University** হবে, পাঁচ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। গোলদীঘিতে সতীশ মুখুজ্যে মশায় সুবোধ মল্লিকের টেলিগ্রাম পড়লেন—**Another five is to follow.**

গান শেখার কথায় বললেন—সন্ধ্যের মুখেই গান গেয়ে নেওয়া ভালো। যার লজ্জা নেই তার যদি শেখবার ইচ্ছে থাকে তো তারা ভালো শিখতে পারে।

সংস্কৃতি সম্মেলনের কথা উঠলে বললেন—সংস্কৃতি সম্মেলন এখন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মত পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে। ও সব না করে একটা সংস্কৃতির পত্রিকা বের করো, কাজ হবে। এর পর পত্রিকা প্রসঙ্গে বললেন—বাংলা দেশের এক শ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদকের নাম করে বললেন, ওকে বলেছিলুম বাঁধা মাইনে দিয়ে একজন ভালো ক্রিটিক রাখো।

মদ খাওয়ার কথায় বললেন—রাম মদ খেতেন, সীতা মদ খেতেন, কেষ্ঠাকুরও মদ খেতেন; আর 'রামরাজ্যে' এঁরা মদ খাওয়া বন্ধ করতে চাইছেন। গান্ধীজির **Sense of humour** ছিল না।

এবার রিহার্স্যাল শুরু হলো। উনি বললেন—লোকের কথা শুনে

কথার ওপর কথা বলবে Promptingএর দিকে কান দেবার ততো দরকার নেই।"

আবার ওঁর সঙ্গে দেখা হলো ওঁর বাসায়—৩১শে জানুয়ারী। একজন কবি নাট্যকারের নাটক পড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কথায়ক থায় শিশিরকুমার বললেন—একটা জিনিষ হয়ত তুমি লক্ষ্য করেছ, আমি কখনো মেক-আপ করে আয়নায় মুখ দেখি না। ইছু-মিয়াকে জিজ্ঞাসা করি—দেখ, সব ঠিক আছে কি না। ব্যস! নিজের যা চেহারা আছে তার থেকে মেক-আপ করে কি রঙ মেখে কী সুন্দর লাগবে! আমার তো মনে হয় তা লাগবে না। অবশ্য অন্য সবাই থেকে থেকে মেক-আপ করা অবস্থায় আয়নার সামনে মুখটা একবার দেখে নেয়—কেমন হয়েছে নিজেকে দেখতে।

৮ই ফেব্রুয়ারী শিশিরকুমার এলেন গ্রন্থজগতে। তার ক'দিন আগে থেকে তিনি গিরিশ বাবু না অর্ধেন্দু বাবুর শিষ্য, এই নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছে। তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বললেন—আমি গিরিশ বাবুকে জীবনে তিন-চার বার মাত্র দেখেছি সামনাসামনি। কথাবার্তাও বলেছি। অর্ধেন্দু বাবুর সঙ্গে কোন দিন দেখাই করিনি।

অভিনেতা হিসেবে অর্ধেন্দু বাবু গিরিশ বাবুর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু গিরিশ বাবুর ছিল realism, ছিল দর্শক-বিচারের ক্ষমতা আরও একটি কথা, গিরিশ বাবুই বাংলা মঞ্চকে লাইফ দিয়েছেন, মঞ্চকে বাঁচাবার জন্যে সবরকম compromise করেছেন।

প্রত্যেক বড় অভিনেতাই অভিনয় কালে gag ব্যবহার করেন অবশ্য playকে disturb না করে। অর্ধেন্দু বাবু কিন্তু playকে disturb করতেন।

দক্ষযজ্ঞতে গিরিশ বাবুকে প্রথম দেখি, কিন্তু তখন নাটক দেখার চোখ আমার কোথায়? তবে তাঁর সেই অদ্ভুত চোখ দুটির কথা আজও মনে আছে।

অর্ধেন্দু বাবু কিন্তু ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত।

[এর পর এক বছরের ওপর কোনো কিছু লেখা আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না।]

১৯৫৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আবার এলেন গ্রন্থজগতে। সেই সময় পিয়ার্সনের লাইফ অফ ডিকেন্স পড়ছেন। এসেই বললেন—ওহে ডিকেন্স তো লোক সুবিধের ছিলেন না। তারপর নিজেই হেসে বললেন—স্ক্যাণ্ডাল পড়তে ভালই লাগে।

নাটক পড়ার কথা ওঠায় বললেন—এলিজাবেথীয় যুগের নাটকগুলো পেলে ভাল হয়। গ্রীক নাটকও পড়া দরকার। তারপর ইবসেন, ইভাসেন ঐ সব সেনফেনের বই পড়বো।

এই সময় রিহার্স্যালের জন্য লোক জন এসে পড়লো। ক'দিন পরেই বেলেঘাটায় সংস্কৃতি সম্মেলনে আলমগীর হবে। রিহার্স্যাল শুরু হবার আগে বললেন যে, নিকোলাই মানুচির story of Mughal থেকে আলমগীরের অনেক কিছু নেওয়া। তারপর শুরু হলো রিহার্স্যাল।

একজনকে পার্ট বলতে গিয়ে বললেন—থাম না কেন? Life of acting হচ্ছে pause। জীবনে যতটা থামো, ষ্টেজে থামবে তার চেয়ে বেশি। নইলে লোকে বুঝবে না। লোককে বোঝাবার জন্যে revive pause,

আবার পুরোনো যুগের কথা উঠলো। বললেন—দক্ষযজ্ঞ দেখেছি, ভ্রান্তি দেখেছি। আরো বললেন—কথা বলতে বলতে আমার মাথায় ছবিগুলো ভেসে ওঠে। শব্দে চিত্র হয়। অবশ্য সে চিত্র definite হয় না। এক এক রকম চীৎকারে এক এক রকম রঙও ফুটে ওঠে। খুব চীৎকার করলে লাল রঙের effect আসে।

তখনি গিরিশ বাবুর কথায় বললেন—উনি তো রামায়ণ মহাভারত উগরে দিয়েছেন।

আবার আগের কথায় ফিরলেন—কথা দিয়েও ছবি ফোটানো যায়। যাত্রাও তাই ওয়ার্ড পেইন্টিং।

নিজেদের কথায় বললেন—আমরা যা কিছু করেছি, মনে মনে অর্থাৎ কল্পনায় যা ভেসে এসেছে তাই করেছি। প্রথম open sky ব্যবহার করি সীতাতে। আলোতে shadow পড়াও বন্ধ করি। কেবল নাচের সময় shadow পড়ে।

ইংলণ্ডের অভিনেতাদের সম্বন্ধে বললেন—অলিভিয়ার ছাড়া সত্যি সত্যি নামকরা ভালো অভিনেতা কেউ নেই। ১৯২২ সালের পর ভালো অভিনেতা আর কেউ হয়নি।

দেশী অভিনেতাদের সম্বন্ধে—গিরিশ বাবু, অমৃত বাবু আর দানী বাবুর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কত বড় অভিনেতা ছিলেন তাঁরা। অমৃত বাবুর বই সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একজনের বিরূপ মন্তব্যের উত্তরে বললেন—রঙ্গমঞ্চকে ঘৃণার চোখে দেখলে রঙ্গমঞ্চ আপনাকে দেবে কি?

তারপর বললেন—অমর দত্তের জীবনী তাঁর ভাইপো লিখেছেন, তার মূল্য আছে। যুগটাকে ভালো করে চেনা যায়, অমৃত বাবু খুব খারাপ নাট্যকার ছিলেন না। গিরিশ বাবুকে তাঁর যুগ দিয়ে বুঝতে হবে। ওঁরা যদি যাত্রাকে উন্নত করবার চেষ্টা করতেন, ইংরেজী নাটকের মোহে চোখ ঝলসে না যেত তাহলে বাংলা নাটকের চেহারা অন্য রকম হতো।

সিরাজদ্দৌলা প্রসঙ্গে বললেন—গিরিশ বাবুর সিরাজ হিরো নয়। রাণী নিতান্ত ছেলেমানুষ।

পরের দিন আবার রিহার্স্যাল। বইটা তখনও শেষ হয়নি। এসেই বললেন—ডিকেন্স মানুষটা ভালো ছিলেন না। স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তবু এদিক-ওদিক ছিল। ঐ যে কে একটি অভিনেত্রী, তার সঙ্গে খুব গভীর প্রণয় ছিল।

তারপরেই বললেন—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় অধুনা প্রকাশিত বই সম্বন্ধে—আসল কথা কিছু নেই তবে কন্টিনেণ্টাল নাট্যকার, ইবসেন থেকে শুরু করে আজকালকার আমেরিকান নাট্যকার, আমার আবার নাম মনে থাকে না, পর্যন্ত সবায়ের কোটেশন-কণ্টকিত, অনুবাদ অংশটাই ভালো হয়েছে। তবে ছোকরার ক্ষমতা আছে, অতগুলো বই তো পড়েছে।

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের কথা উঠল, বললেন—আমাদের সময় ইনষ্টিটিউটের কি দিনই ছিল। আমি আর নরেশই ছিলাম best actor আর আমরাই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলুম।

আমাদের মধ্যে আর একজন ছিল, তার নাম ছিল জ্ঞানপ্রিয়। আমরা বলতাম গুরু। বড় মিষ্টি ব্যবহার ছিল। কখনও দলাদলি

হতে দিতো না। তাঁর অপূর্ব কণ্ঠ ছিল। খুব যে একটা সাধা-গলা ছিল এমন নয়, তবে শুনতে ভালো লাগতো। একবার সেক্সপীয়রের নাটকের আগে মঙ্গলাচরণ গেয়েছিল, তাই শুনে ও দেশের এক ভদ্রলোক বললেন—ও ছেলেটি কে? এখানে পড়ে আছে কেন? ও-দেশে গেলে হপ্তায় একশ' কুড়ি ডলার পাবেই।

রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'র কথা উঠতে বললেন—তপতী করে আমার কোনো দুঃখ নেই। কবি অভিনয় দেখেন নি তবে নাটক পাঠ শুনেছেন। সাজ-পোষাক কেমন হবে তা নিয়ে খুড়ো-ভাইপোয় ঝগড়া; কবি বললেন—এই তো ওঁদের জন্যে ঐ রকম পোষাক পরতে হলো। তাতে অবনী বাবু বললেন—তুমি যা দেখো তাই পরবে বল তো, কি করবো বলো?

দৃশ্যপটের কথা জিজ্ঞেস করতে কবি অবনী বাবুকে দেখিয়ে বললেন—এঁদের অক্ষমতার জন্যেই দৃশ্যপট বাদ দিয়েছি। এঁদের তো ধারণা অজন্তার পর পৃথিবী আর এগোয়নি, তোমরা নিশ্চয়ই দৃশ্যপট করবে, আমি এসে দেখবো।

তা ওদের এমনই দৃশ্যপট করেছিল যে, কি বলবো। শেষ দৃশ্যের দৃশ্যপট এমনি এঁকেছিল যে শীত করতো। আমায় এসে বললে—বড়বাবু আখরোট গাছ তো দেখিনি, তাই আপেলগাছ এঁকেছি। অথচ দেখো, তাঁর আঁকার দাম কেউ দেয়নি এদেশে! তবে 'সীতা'র ভাভাচোরা দৃশ্যপট দেখেই আমেরিকানরা অবাক হয়েছিল, বিশ্বাসই করতে চায়নি যে কোনো হিন্দুর আঁকা। বলেছিল—এ নিশ্চয় কোনো পশ্চিমী শিল্পীর আঁকা। কিন্তু তারা অত্যন্ত সহজ কথাটি ভুলে গিয়েছিল যে, তাদের দেশে তখন শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর জঙ্গল, আমাদের দেশে তখনও ছবি আঁকা হচ্ছে।

তবে একটা কথা বলবো, ওদের উৎসাহ আছে। সীতার নাচ নাচতে চল্লিশ ডলার নিয়ে অনেকগুলো মেয়ে নাচতে এসেছিল। রাধাচরণ আর—(নামটা বুঝতে পারা যায়নি) শেখাতো। ন'টার সময় আসার কথা, ন'টা বাজতে পাঁচ পর্যন্ত কারো দেখা নেই, আর ন'টা বাজতে না বাজতে ঝপাঝপ বাথরুমে পোষাক খুলে ছোটো পোষাক পরে নাচার জন্যে তৈরী। আবার বলতো—নাচ শিখবো কখন। এঁদের এক একজনের সিগারেট খেতে বিশ মিনিট, বাকি সময় দু'জনে ঝগড়া করবেন তো শেখাবেন কখন আর আমরা শিখবোই বা কী?

ধনগোপাল ভারতীয় অথচ মেলাটে দেখা হতে বললে—আপনার খোঁজ পাইনি বলে দেখা করতে পারিনি। দেশে ফেরার পর অমৃতবাজারে লিখেছে দেখলুম—শিশির বাবু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বা পরিচালক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিল বলেই তাঁর নাটক সার্থক হয়নি।

ভারতীয়দের কাছে বিশেষ কোনো সাহায্যই পাইনি আমরা। Crowd sceneএ যারা অভিনয় করেছিল, তাদেরও দু' ডলার করে দিতে হয়েছিল, অথচ চীনা অভিনেতা—(নামটা বুঝতে পারিনি) যখন এসেছিল, তখন ওখানকার চীনারা কী সাহায্যই না করেছিল!

ওদের দেশে জাপানীদের তাড়ালেও চীনাদের অবস্থা ভাল্লাই। যে জিনিষ কোথাও মেলে না, তাও China townএ পাওয়া যায়।

কলকাতার China townএরও সেই একই অবস্থা। Canton Hotel ১৯০৮ সালে প্রথম আবিষ্কার করে আমাদের শিবু বড়াল।

এবার আলমগীরের রিহার্স্যাল সুরু হ'ল। ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্বন্ধে বললেন—ক্ষীরোদ বাবুর লেখার balance বড় ভাল, একটু ছোট হলেই কানে লাগে। তিনি লিখতে শিখেছিলেন

তবে ওঁর একটু অসুবিধে হয়েছিল, শরীরে কিছু ক্ষীণ ছিলেন ও তাই বীরত্বের কল্পনা কিছু প্রখর ছিল। একজন লোকের ক্ষমতা পাঁচ লক্ষগুণ না বাড়ালে তাঁর আনন্দ হয় না। রত্নেশ্বরের মন্দিরে রত্নেশ্বর এক দলকে ঠ্যাঙালো, তার পর দুজনকে দু' বগলে দু' জনকে দুহাতে, আর আর একটাকে দাঁতে করে ধরে চললো।

তার পর রূপনগরের রাজসভায় শ্যামসিংহ যেখানে রামসিংহকে 'কছোয়া' বলে টিটকারী দিচ্ছে সেখানটা বোঝাতে বললেন—কছোয়ারা আসলে কচ্ছ থেকে এসেছিল, হয়ত রাজপুতই নয়। তবে রাজপুতরাও mixed জাতি; কালোও আছে, ফরসাও আছে। ওরা বোধ হয় শকদের (Seythian) বংশধর।

২৩ তারিখেও রিহার্স্যাল দিতে এলেন। প্রথমেই কে একজন বুঝি বলেছে আমাদের গভর্ণমেণ্টকে দেশের কেউ দেখতে পারেন না।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলেন—কেউই যদি দেখতে পারে না ত গভর্ণমেণ্ট জেতে কি করে?

আর একজন বললে—বোধ হয় রাস্তা করেছে বলে গ্রামাঞ্চলের লোকেদের সুবিধে হয়েছে, তাই তারা সরকারকে জিতিয়েছে।

সায় দিলেন—তাই হবে, স্রেফ রাস্তা করেই জিতছে ওরা। তার পরেই প্রসঙ্গান্তরে গেলেন Picture-goer বড় ভাল কাগজ ছিল, তবে আজকাল সে ফর্মাও নেই, সে জিনিষও নেই। আবার দুঃখ করে বললেন—আজকাল নিউ মার্কেটে সেক্সপীয়রের বড় বড় প্রডিউসারদের ২১।২২টা দৃশ্যের ছবিওয়ালা বই পাওয়াই যায় না।

বাংলায় কোনো ভালো থিয়েটার সম্বন্ধীয় পত্রিকা ছিল কি না প্রশ্ন করাতে বললেন—একটি পত্রিকা কিছুদিন বড় ভালো চলেছিল—নাট্যভারতী, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চালিয়েছিলেন। ওতে (হরপ্রসাদ) শাস্ত্রী মশায়ের লেখা ছিল, গিরিশ বাবুর লেখার reprint ছিল।

দুঃখ করে বললেন—আমরা বেশি ইংরেজী শিখে বিপদে পড়েছি! গিরিশ বাবুদের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল; সমালোচনা টমালোচনা পড়েন নি; সেকেলে এডিশনে সেক্সপীয়র পড়েছিলেন, কাজেই বুঝে পড়েছিলেন। ম্যাকবেথের অপূর্ব অনুবাদ করেছিলেন। তবে শিক্ষিতরা তাঁকে চেপে দিয়েছে। প্রমথ চৌধুরী মশায় প্রফুল্ল দেখে বললেন—এই সব 15th class বই নিয়ে শিশির কেন যে মাতামাতি করছে। রবিবাবুই তাঁকে চেপে দিলেন।

পুরোনো কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দেখেছেন প্রশ্ন করায় বললেন—পুরোনো দিনের মধ্যে তিনকড়ির অভিনয় দেখেছি জনায় প্রবীর আর সুভদ্রার ভূমিকায়। আর ক্ষেত্রমণি—ইতিহাসে তার নাম নেই, কিন্তু অমন গয়লা বৌ—অমন করে 'বুক জ্বলে যায়' বলা এমনটি আর দেখিনি। বিনোদিনীর অভিনয় দেখিনি।

অপরেশ বাবুর গলা বড় মিষ্টি ছিল—সুরও ছিল।

আমাদের দেশে convention বড্ড বেশি চলে। তারাসুন্দরীর গলায়ও সুর ছিল, তবে বয়স হতেই মিষ্টত্ব গেল। হাড় বেরিয়ে লাবণ্যও চলে গেল। আমি বলতুম—তারা মা, ও-সব ছাড়ো।

তা বলতো—বাবা, আমি সেকেলেই থাকবো, (মুস্তাফি) সাহেব যা শিখিয়েছেন তাই বলবো।

আমি বলতুম—সাহেব তো শেখায়নি, শিখিয়েছেন গিরিশ বাবু। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি। থিয়েটারের বাইরে তাঁকেই সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছি, মরবার সময়ও টাকা দিয়েছি। তবে মেয়েরা বলবে কিনা জানি না। তারা খুব বুদ্ধিমতী ছিল, বাংলা বই সব পড়েছিল, আর Problem তুললে এমন সব কথা বলতো যে অবাক করে দিতো।

ইনষ্টিটিউট প্রসঙ্গে বললেন—ইনষ্টিটিউটের ব্যাপারে আগে গোলমাল করলেই কলেজে রিপোর্ট পাঠানো হ'তো, নাম কাটানোর জন্যে। আশু বাবুকে বললুম,—থিয়েটার, খেলাধূলো করতে আসে এখানে, তার জন্যে যদি কলেজ থেকে নাম কাটা যায়, ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় ত আর কি মেম্বার পাওয়া যাবে?

উনি বললেন—তবে যে ওরা বললে এতে ভালো হবে?

যাদের বাঁচালুম তারা কিন্তু কোমর বেঁধে আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে লেগে গেল।

শেখানোর কথায় বললেন—এখন আর আমার মনের জোর নেই, অথচ একদিন অনেককেই ত তৈরী করেছিলাম।

সীতা কত দিন রিহার্স্যাল দিয়েছেন? প্রশ্ন করায় বললেন—মাসের পর মাস। মাঠে রিহার্স্যাল দিতে গিয়ে বই চুরি গেল। লোকে যোগেশ বাবুকে দোষ দেয়, জানে না তো কত অসুবিধের মধ্যে বই লিখেছেন। পুরোনো কাঠামোর মধ্যে বাঁধা হয়েছিল, তবু যা লিখেছিলেন অপূর্ব! শাস্ত্রীমশায় বলেছিলেন—লবকে আনা খুবই সুন্দর হয়েছে।

হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে পড়লেন, বললেন—একটি জায়গা দাও, আর বছর তিনেক বোধ হয় বাঁচবো, পুরোনো সত্তর বছরের কথা ভুলে নতুন উদ্যমে কাজ করি।

আবার প্রসঙ্গান্তরে গেলেন—আমি, আজাদ আর জহরলাল একবয়সী। জহর আমার চেয়ে এক মাস কুড়ি দিনের ছোটো আর আজাদ ক'মাসের বড়। কাশ্মীরীরা হলো কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতকের জাত। হরিশঙ্কর কাউল আর তার ভাই- দেওয়ান হয়ে নানা রাজ্যের খবর দিয়েছে। আর হরি সিংকে মেয়ে কলেজে কেউ দেখতে পারতো না। সে ছাত্রদের কথা মাষ্টারদের বলতো, পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদ দেখ, বুঝবে আমার কথা ঠিক কি না।

[ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

ডালে-লট্‌কানো লাল ঘুড়ি

উদার আকাশের অনন্ত নীলিমায় নয়,
ঘনবিন্যস্ত পত্রপুঞ্জের গাঢ় শ্যামলিমায় নয়,
দৃষ্টি ওদের আসক্ত দেওদারের ডালে-লটকানো এক লাল ঘুড়িতে।
কোনো দর্শন গড়েনি ওদের ঐকান্তিক আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে,
কোনো কাব্য ঘনিয়ে তোলেনি ওদের চোখের ঐ বিভোর দৃষ্টিকে,
কোনো বিজ্ঞান আনেনি ওদের আকাশের কোনো অনুসন্ধিৎসা।
ওদের হৃদয় চঞ্চল—ওদের দৃষ্টি বিহ্বল
ঐ দেওদারের ডালে-লটকানো একটা লাল ঘুড়িতে।

পিতার ক্রোধে আরক্ত নয়নের কোনো ইঙ্গিত নেই ঐ লালের মধ্যে—
মায়ের শাসনের ভঙ্গিতে উদ্যত হাতের লাল শাঁখার কোনো আভাস
নেই ঐ লালের মধ্যে—
সঙ্গিনীর লাল চুড়ি আর লাল ফিতের কোনো স্মৃতিও নেই
ঐ লালের মধ্যে,—
ও শুধুই লাল ঘুড়ি—দেওদারের উঁচু ডালে আটকে-যাওয়া
চির-অপ্রাপ্য তবু চির-আকাঙ্ক্ষার দুর্লভতায় সুন্দর,
ঐ শিশুচিত্তের মনোহারিণী ভঙ্গিমায় সংলগ্ন—
ঘনবিন্যস্ত দেওদারপত্রের ঘন-আন্দোলনে বিভগ্ন,
একটি উখড়ে-আসা কিংবা কেটে-যাওয়া লাল ঘুড়ি
এক হাত লম্বা আর চওড়া শিশুমনের একটি ক্ষুদ্র স্বর্গ—
যার মাঞ্জা-দেওয়া সুতোয় ঝিকঝিক করছে কাচের গুঁড়ো
সন্ধ্যাকালীন বঙ্কিম আলোকের স্পর্শে।

স্তবপাঠে নয়—কলকোলাহলে ব্যস্ত ঐ বালখিল্য সন্ন্যাসীর দল
অর্দ্ধনগ্ন—ছিন্ন দেহাবরণ—
ওদের কারুর পায়ে নেই জুতো, মাথার রুক্ষ চুলে নেই সিঁথির
পারিপাট্য,
গায়ে নেই বোতাম-পরা জামা—
ওরা কেউ বা ব্যস্ত ঘুড়ির রঙের গুণপণায়, কেউ বা মাঞ্জার—
সেই অর্দ্ধভুক্ত অর্দ্ধনগ্ন কৃষ্ণকায় বালখিল্য সন্ন্যাসীর দল—
পথই যাদের তপোবন আর দুনিয়ার সমস্ত নর-নারীই পয়সা চাওয়ার
মা আর বাপ।

হঠাৎ উঠল হাওয়া—মেঘ এল ঘোরালো হয়ে
বিকেলের সূর্যকে ডুবিয়ে দিল সন্ধ্যার অন্ধকারের সমুদ্রে—
শনশনে তীর-বেঁধা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে চিড় খেয়ে গেল ঘুড়ির
লাল কাগজ,
হঠাৎ আঘাতে চিড় ধরে যাওয়া বক্তিম হৃদয়ের মতন।

ওরা পালাল উর্দ্ধশ্বাসে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় নাচতে নাচতে,
ঐ অর্দ্ধভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন মানব-শিশুর কয়েকটি করুণ আকৃতির উপহাস,
যাদের সব আশাই ঐ লাল ঘুড়ির মতন থাকবে অপ্রাপ্যের উঁচু
শাখায় আটকানো,
যাদের সমস্ত উদ্যমই নষ্ট হবে দুর্লভকে পাবার পঙ্গু বাসনায়,
যাদের জীবন হঠাৎ একদিন এক ঝড়ের রাত্রে
সব চেয়ে আগে ছিঁড়ে যাবে ঐ ঘুড়ির কাগজের মতন,
ক্ষয়ার্ত সমাজবক্ষের ছিন্ন ফুসফুসের রক্তিম টুকরোর মতন—
উড়ে যাবে অনির্দিষ্ট পথে—কেউ জানতেও চাইবে না কোথায়।
ঐ তারাই নিবে যাবে সব চেয়ে আগে
যাদের মন প্রাণশক্তিতে তরঙ্গিত হত—
ঐ দেওদারের ঘনবিন্যস্ত পত্র আন্দোলিত শাখার মতন,
আর আকাশ ও পৃথিবীর যোগসূত্র যারা রচনা করতে পারত
ঐ ঝিকঝিকে রঙিন মাঞ্জা সুতোর মতন—
ঐ অর্দ্ধনগ্ন, অর্দ্ধভুক্ত পথে ঘুরে-বেড়ানো বালখিল্যের দল।

(সিন্ধুপারের উত্তর পর্ব)

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

[সুশান্ত-সার পৌত্র বিকাশ এদেশে ডাক্তারী পাশ করে, স্ত্রী সুধা ও শিশুপুত্রকে রেখে অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্য বিলেত চলে গেল, আর ফিরল না—এসব খবর 'নীল শাড়ি' উপন্যাসে লেখা হয়েছে। বিলেতে বিকাশের ছাত্র-জীবনের কাহিনী নিয়েই "সিন্ধুপারে" লেখা। তার পরবর্তী জীবনের ঘটনা এই উপন্যাসখানির বিষয়বস্তু। কোনও বিশেষ কারণে বিকাশ তার বিলেতের জীবনের কাহিনী তার ছোট বোন বুলাকে চিঠি লিখে বিস্তারিত অকপটে দিচ্ছে জানিয়ে।—লেখক]

এক

সেন্ট জন হোস্টেল
সলিহল।
ওয়ারউইক সায়ার

কল্যাণীয়াসু

স্নেহের বোন বুলা !

এদেশে আমার ছাত্রজীবনের কাহিনী লিখে তোমাকে পাঠিয়েছি। এত দিনে নিশ্চয়ই পেয়েছ। এইবার পরিণত বয়সের কাহিনী আরম্ভ করি। ছাত্রজীবনের কাহিনীটি যতটা সম্ভব বিস্তারিত করেই লিখেছি। পড়ে জেনেছ—সে জীবনে এ দেশের কাজ শেষ হলে দেশে ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই হয়েছিল, কিন্তু সহসা কি রকম পড়ল বাধা। তার পরেও দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি—কেন, সবই ত জান।

আজ জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে সমস্ত জীবনটার দিকে চেয়ে একটা জিনিষ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের কোনও কর্ম্মই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। আগেই এক জায়গায় তোমাকে লিখেছিলাম—জীবনস্রোতের কোন সে অতল গভীরে কী যে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত চলে উপরে ভেসে ভেসে আমরা কিছুই জানি না। কোনও প্রতিরোধ করার শক্তিও নাই আমাদের, অথচ উপরের ভাঙ্গা-গড়া সবই হয় তারই ফলে, আমরা শুধু হাবুডুবু খেয়েই মরি। এ কোন শক্তির মহালীলা ! আজও সেই কথাই বলি। আমার সে যুগের জীবনটার দিকে চেয়ে ভেবে দেখ—যেদিন দেশের জন্য রওয়ানা হতে গিয়েও যে আমার যাওয়া হল না, সে কী আমার ইচ্ছায়ই হয়েছিল ? আমি ত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পড়ল বাধা। আমি ত স্বপ্নেও ভাবিনি—ও ভাবে বাধা আসবে। মার্লিনও যে তখন আমার দেশে ফিরে যাওয়াটাই চেয়েছিল সেটা সে যুগের কাহিনী পড়ে মার্লিনের চরিত্রের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই সহজে বুঝতে পারবে। মনে আছে ত—শেষ পর্য্যন্ত আমি যখন মার্লিনকে ছেড়ে দেশে যেতে একান্ত কাতর হয়ে পড়েছিলাম, মার্লিনই আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিল, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তবে ?

হয়ত তুমি বলবে—তুমি মার্লিনের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলে কেন ? তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, দেশে তোমার সাধ্বী গুণবতী স্ত্রী বর্ত্তমান, তা সত্ত্বেও বিলেত গিয়ে মার্লিনের সঙ্গে প্রেম করার ফল ত তোমাকে পেতেই হবে। কিন্তু বুলা ! আমি তোমাকে কথাটা আরও একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে বলি।

আমার ছাত্রজীবনের সমস্ত ব্যাপারটাই ভেবে দেখ। ডডিংটনে, মার্লিনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল। আমি যে ডডিংটনে গিয়েছিলাম সে ত মার্লিনের সঙ্গে দেখা করতে নয় ? মার্লিনের অস্তিত্বই আমি তখন জানতাম না। এবং লণ্ডন ছেড়ে ডডিংটনে আমি যে খুব খুসী মনে গিয়েছিলাম—তাও ত নয়। লণ্ডনে কাজ শেষ হলে, আমি প্রায় এক মাস বসে ইংল্যাণ্ডের নানা হাসপাতালে চাকুরীর দরখাস্ত করেছি—ডাক্তারী পরীক্ষা দেওয়ার আগে ছয় মাস হাসপাতালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য। কেন না, ডাক্তারী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সেটা প্রয়োজন ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল লণ্ডনে কিংবা তার কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে চাকুরী করি। কিন্তু কই—কোথাও ত কিছু জুটল না ! শেষ পর্য্যন্ত সুদূর কেম্ব্রিজসায়ারের গ্রাম ডডিংটন, সেইখানে হাসপাতালে একটা চাকুরী পেলাম। কাজেই চাকুরীটি আমাকে নিতেই হল।

বুলা ! এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হাসপাতাল থাকতে, কোন শক্তির লীলায় আমাকে ডডিংটনেই যেতে হল—যেখানে ছিল মার্লিন ? অন্য কোথাও গেলে ত মার্লিনের সঙ্গে আমার জীবনে দেখাই হত না।

তার পর ডব্লিংটনে থাকাকালীন মার্লিনের সঙ্গে আমার দেখা এবং তার সঙ্গে আমার প্রেমের কাহিনী—সবই জান। কিন্তু আবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মার্লিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এমি জনসনের সঙ্গে আমার লণ্ডনে দেখা হয়েছিল। এমি জনসনও সুন্দরী ছিল। মিশেছিলামও তার সঙ্গে খুব। কিন্তু কই, তার সঙ্গে ত প্রেম হয়নি? মার্লিনের সঙ্গেই বা প্রেম হল কেন? কোথায় কোন সে গভীরে কি যোগাযোগ ছিল আমার সঙ্গে মার্লিনের? আমি না হয় দুর্ব্বল চরিত্রের লোক—সহজে অভিভূত হই। কিন্তু মার্লিন? সে ত খুব দুর্ব্বল চরিত্রের মানুষ ছিল না? তার সেই কথাটা মনে আছে ত? আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই সে তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ডরোথীর কাছে একদিন চুপি চুপি বলেছিল—আমি জগতে এমন একটি মানুষ খুঁজে নিতে চাই যে, বিশেষ করে তৈরী হয়েছে আমারই জন্য। আমিই বা সেই বিশেষ মানুষটি হলাম কেন? যখন মনে মনে সে আমাকে সেই মানুষটি বলে বরণ করে নিয়েছিল তার ত কোনও অপরাধ ছিল না? সে ত জানত না আমি বিবাহিত?

আরও ভেবে দেখ—মার্লিন যেদিন শুনল আমি বিবাহিত, তারপর থেকে সে আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল—মনে আছে ত? যতদূর মনে পড়ে, তারপর দু'মাসের উপর তার সঙ্গে দেখা হয়নি—সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়ওনি। সে সময়ের আমার মনের অবস্থার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আবার যে আমার সঙ্গে মার্লিনের দেখা হল—সেটা কি আমার ইচ্ছায় না মার্লিনের ইচ্ছায়? যে ভাবে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সবই জান—এ কোন শক্তির লীলা? যদি ওভাবে দেখা না হত সবই যেত চুকে। আমিও এগিয়ে গিয়ে মার্লিনের সঙ্গে দেখা করতাম না, মার্লিন ত নয়ই।

হয়ত বলবে—মানি, ভগবান কখন কা'কে কি অবস্থায় ফেলেন সেটা তিনিই জানেন, তার উপর আমাদের কোনও হাত নেই। কিন্তু যখন যে অবস্থায়ই আমরা পড়ি না কেন, নিজেদের অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে চলা আমাদেরই কর্ত্তব্য। নইলে তার ফল ভোগ করতে হবেই। কিন্তু বুলা! কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায় এর কি একটা সঠিক মাপকাঠি আছে? অবস্থা-বিশেষে ন্যায়-অন্যায়ের রূপ পরিবর্ত্তন হয় না কি?

নরহত্যা ঘোরতর অন্যায়, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে সেই হত্যাই হয়ে দাঁড়ায় শুধু ন্যায়ই নয়—পুণ্য। এর দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই? আরও ভেবে দেখ—মানুষের ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি যুগে যুগে বদলে যায়। স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র যে ভাবে শূদ্রককে হত্যা করেছিলেন, আজকের দিনে কি তুমি প্রাণ-মন দিয়ে সেটাকে সমর্থন করতে পার? অথচ সে যুগে সে কাজের গুণকীর্ত্তনই করা হয়েছে।

যাক। ও-সব যুগের বড় বড় মহাসমস্যার কথা যদি ছেড়েও দিই অবস্থা-বিশেষে ন্যায়-অন্যায়ের রূপ বদলে যায় না কি?

মার্লিনের জীবনের দিক দিয়েই প্রশ্নটা করি। জমিদারের ছেলে, সুবেশ, সুদর্শন, সুশিক্ষিত রোলাণ্ড মার্লিনকে বিবাহ করতে চেয়েছিল—মনে আছে ত? মার্লিন তখন আমার প্রেমে ভরপুর মার্লিন তখন জানে—আমি বিবাহিত, আমার সঙ্গে বিবাহের কথা তখন সে কল্পনাও করে না। তবুও রোলাণ্ডকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। মার্লিন ন্যায় করেছিল না অন্যায়? তার মা—সংসারে তখন তার একমাত্র সম্বল—বর্ষীয়সী, বাতে পঙ্গু তার মা—তিনি প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিলেন, এই বিবাহটি হোক, তাহলে তিনি শান্তিতে মরতে পারেন। তবুও মার্লিন বিবাহ করতে রাজী হয়নি। রোলাণ্ডকে বলেছিল—অন্য কোনও পুরুষের বুকে আশ্রয় নেওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন। নিজের কাছে সে খাঁটী থাকতে চেয়েছিল. তাই মায়ের মনে শান্তি দিতে পারেনি সে—অন্যায় করেছিল?

আমার দিক দিয়েও কথাটা ভেবে দেখ। মার্লিনকে ছেড়ে আমি দেশে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিলাম, তখন তার প্রধান কারণ বাবা দেশে অসুস্থ, তিনি বেশী দিন না-ও বাঁচতে পারেন, তিনি আমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন—এই রকম চিঠি দাদার কাছ থেকে প্রায়ই পাচ্ছিলাম। দেশে যাওয়াতে কি ভাবে বাধা পড়ল জানই ত? দেশে যাওয়া বন্ধ করে আমি কি অন্যায় করেছিলাম? রিউম্যাটিক ফিবারের দরুণ মার্লিনের হার্টটা বিশেষ সবল ছিল না; সবই ত জান। তবে, উত্তর দাও। আমি অনেক ভেবেছি—এ সব প্রশ্নের কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

আরও ভেবে দেখ—উইসবীচের কাজ শেষ হলে আবার ত দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, কেন বন্ধ হল জানই ত। এখন শুধাই—মার্লিনকে ইংলণ্ডের জীবনস্রোতে ও অবস্থায় একলা ভাসিয়ে দিয়ে আমার দেশে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হত? আমি কালো, আমি বিবাহিত—আমারই জন্য সবাই মার্লিনকে ছেড়েছিল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব, সমাজ। কেউ ছিল না আর তার। তখন আমার কি করা উচিত ছিল—তুমিই বল।

বুলা! আজ জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে এইটেই বুঝেছি—জগতে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, এমন কি আমাদের তথাকথিত কর্ম্ম কিছুই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। সবই নির্ভর করে অবস্থাবিশেষের উপরে, আমাদের মনের গঠনের উপরে, যার কোনটার জন্যই আমরা দায়ী নই। আমি অবশ্য সাধারণ মানুষের কথাই বলছি—তপস্যাসিদ্ধ মহামানবদের কথা বলছি না। কেন? আমাদেরই দেশের মহাশাস্ত্র কেনোপনিষৎ-এর গল্পটি জান ত? অগ্নি-বরুণের মত দেবতাদের পর্য্যন্ত একটি তৃণখণ্ড নড়াবার শক্তি নাই—তাঁর ইচ্ছা ছাড়া। আমি materealist নই। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, মানুষের মনকে অবিশ্বাস করি না। কিন্তু 'মনসো মনো যদ্'—মনের মন যিনি, কর্ম্মের কর্ম্ম যিনি, সেইখানেই লীলা। আমরা নিমিত্ত মাত্র! অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়; আমি অবশ্য এ সব মহাসমস্যার কতটুকুই বা বুঝি? আমার নিজের জীবনের কর্ম্মের সমর্থনে আমি এ সব কথা বলছি না বুলা! তা যদি মনে কর আমাকে ভুল বুঝবে। আমার ছাত্র-জীবনের কাহিনীর গোড়াতেই আমি তোমাকে লিখেছিলাম, আমি তোমার কাছে বিচারপ্রার্থী নই। লিখেছিলাম পূজনীয় সুশান্ত দা মানুষের আদালতে সুবিচার না পেয়ে তাঁরই বড় আদরের গঙ্গুর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাই লিখেছিলেন এত বড় দীর্ঘ আত্মজীবনী।

কিন্তু আমি তোমাকে লিখেছিলাম, আমার বিচারের ভার রইল ভবিষ্যতের গর্ভে তোলা। আজও সেই কথাই বলি।

দুই

আমার এ দেশে ছাত্র-জীবন শেষ হয়েছে—প্রায় বারো বৎসরেরও বেশী। আমি এখন ম্যানচেষ্টারের সন্নিহিত সহর সেল-এ ডাক্তারী করি। সেলের ওল্ড হল লেনে আমার নিজেরই বাড়ী এবং সেল রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছাকাছি আমার বাড়ী থেকে মাইলখানেক দূরে মরদেনডেন রোডে আমার সার্জ্জারী।

আমার এখানকার দৈনন্দিন জীবনের মোটামুটি একটা বিবরণ দিই। সকালবেলা নিজের বাড়ীতে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে এই বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ আমি সার্জ্জারীতে যাই। সেখানে আমারই তালিকাভুক্ত রোগীর দলের মধ্যে অনেকে এসে অপেক্ষা করে আমাকে দেখাবার জন্য। একে একে তাদের দেখে ফিরে আসতে আমার রোজই প্রায় একটা বাজে। বাড়ীতে ফিরে এসে লঞ্চে (মধ্যাহ্ন ভোজন) খাই। তারপর দু তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করি। বিকালে সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ 'চা' খেয়ে আবার যাই সার্জ্জারীতে। সাতটা দুই সার্জ্জারীতে থেকে বাড়ীতে আসি ফিরে। বিকালের দিকে সাধারণত রোগীর ভীড় কম হয়। সার্জ্জারীতে আমার একজন সেক্রেটারী থাকেন—মিস হলওয়েল। বর্ষীয়সী মহিলা কিন্তু বিশেষ কর্ম্মনিপুণা। সার্জ্জারীতে একজন লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে—তিনি সেইখানেই থাকেন। মিস হলওয়েলের বাড়ী ম্যানচেষ্টারে। প্রত্যেক শনিবার কাজের পরে তিনি বাসে ম্যানচেষ্টার চলে যান এবং সোমবার প্রত্যুষে এসে কাজে যোগ দেন। তাঁর প্রধান কাজ রোগীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলে আমার সঙ্গে দেখা করাবার ব্যবস্থা করা এবং তার হিসাব রাখা। প্রয়োজন মত তিনি সার্জ্জারী থেকে বাড়ীতে আমাকে টেলিফোন করে আমার পরামর্শ নেন।

রবিবার দিনটা আমার ছুটী—অর্থাৎ সার্জ্জারী বন্ধ থাকে। বিশেষ কোনও জরুরী রোগীর একান্ত প্রয়োজনে হয়ত তাকে বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসি। এছাড়া সপ্তাহে আর এক দিন—বুধবার—বিকেলের দিকেও সার্জ্জারী থাকে বন্ধ—মিস হলওয়েলের ছুটী। তিনি মাঝে মাঝে বুধবার দুপুরেও ম্যানচেষ্টার চলে যান। সেল্ থেকে বাসে ম্যানচেষ্টার যেতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগে।

* * * *

সেলের ওল্ড হল লেনে আমার বাড়ীখানির একটু পরিচয় দিই। লাল রংয়ের ছোট একটি দ্বিতল বাড়ী—ছবির মত দেখতে। বাড়ীর সামনে রাস্তার দিকে একটি বাগান এবং তার পাশ দিয়ে বাড়ীর গা-ঘেঁষে একটি লাল ঘোরান রাস্তা শেষ হয়েছে রাস্তার দিকে দুটি ফটকে—গাড়ী ভিতরে এসে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। এই দুটি ফটকের মধ্যে রাস্তার রেলিংয়ের ধারে তিনটি নাতিদীর্ঘ লার্ক গাছ—কতকটা আমাদের দেশের ঝাউ গাছের মত দেখতে। বাড়ীর দু'পাশে সারি সারি কয়েকটি স্প্রুস (Spruce) গাছে বাড়ীটির শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাগানে সবুজ ঘাসের উপর ছড়ান নানা ফুলের বিছানা। একটা মালী আছে—সপ্তাহে তিন দিন বাগানের কাজ করে দিয়ে যায়।

বাড়ীটির মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি—এক তলায় এক পাশে একটি বড় ঘর, আর এক পাশে দুটি। বড় ঘরটি লাউঞ্জ অর্থাৎ বসবার ঘর—পুরু কার্পেট পাতা এবং খানকয়েক গদিআঁটা কৌচ দিয়ে সাজান। ওপাশের দুটি ঘরের মধ্যে একটি খাবার, এবং অপরটি ভাঁড়ার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ঘরটির সংলগ্ন রান্নাঘর। দোতলায়, একতলারই অনুরূপ—এক পাশে একটি বড় ঘর এবং অন্য দিকে দুটি। তিনটিই শোবার ঘর বড় ঘরটা আমাদের, এবং ওপাশের দুটি সাধারণতঃ পড়েই থাকে, কখনও কোনও অতিথি এলে থাকতে দেওয়া হয়।

আমাদের! হ্যাঁ, মার্লিন এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আজ প্রায় বারো বৎসর হল আমাদের বিবাহ হয়েছে।

এই বারো বৎসরের কথা মোটামুটি বলি। মার্লিনকে যখন বিবাহ করি তখন আমার উইসবীচ হাসপাতালের কাজটি শেষ হয়েছে। মনে আছে ত কেম্ব্রিজসায়ারের ছোট্ট সহর উইসবীচের নর্থ কেমব্রিজসায়ার হাসপাতাল? মার্লিনকে বিবাহ করে চলে গেলাম, গ্লাষ্টারসায়ারের একটি সহর লিডনী—সেখানকার হাসপাতালে একটা চাকুরী নিয়ে। একে ভারতবর্ষের **M. B.** তার উপর এখানে এসে **L. R. C. P. M. R. C. S.** পাশ করেছি, হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে হয়েছে অনেক। তাই হাসপাতালে চাকুরী পাওয়া আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। লিডনীর চাকুরীটি পাকা ছিল, তাই মার্লিনকে নিয়ে সেখানে প্রায় তিন বৎসর ছিলাম।

সেখান থেকে চলে যাই ম্যানচেষ্টারের একটি বড় হাসপাতালে আরও বেশী মাইনের একটি ভাল চাকুরী নিয়ে। সেখানে বছর তিনেক কাজ করার পরে সেল-এর ডাঃ ম্যাকডোনাণ্ডের কাছ থেকে তার ডাক্তারী ব্যবসাটি কিনে নিয়ে স্বাধীন ভাবে সেল-এ ডাক্তারী করতে সুরু করি।

সেল-এ ব্যবসায় আমার উন্নতিই হতে লাগলো—ডাঃ ম্যাকডোনাণ্ডের রোগী ছাড়া অনেক রোগী ক্রমে এসে যোগ দিল আমারই তালিকায় এবং সেল-এ যাওয়ার বছর তিনেকের মধ্যে ওল্ড হল লেনের বাড়ীখানি কিনে ফেললাম—মার্লিন তাকে সাজাল মনের মতন করে। সামনের বাগানটি মার্লিনেরই পরিকল্পনায় ক্রমে সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ীটি কেনার পর বাড়ীর কি নাম দেওয়া হবে, এই নিয়ে মার্লিনের সঙ্গে প্রায় মাসখানেক আমার আলোচনা চলেছিল কিন্তু কিছুতেই যেন একমত হতে পারিনি। মার্লিন যেটা বলে আমার সেটা ঠিক মনে লাগে না এবং আমার দেওয়া নামও মার্লিন যেন তেমন উৎসাহের সঙ্গে নিতে পারে না। আমি অবশ্য ভারতীয় নাম দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম। ভারতীয় নাম দিতে মার্লিনের যে কোনও আপত্তি ছিল তা নয়, কিন্তু কোনটাই যেন তেমন তার মনে লাগেনি। শেষ পর্য্যন্ত মার্লিন এক দিন শুধাল তোমার নামটা ঠিক যেন কি বিকো?

বললাম, বিকাশ।

শুধাল—বিকাশ কথাটার মানে কি?

একটু ভেবে বললাম, যা আপনা থেকেই নিজেকে প্রকাশ করে।

বলল তা বেশ। বাড়ীর নাম দেওয়া যাক—বিকাশ, সে বেশ হবে।

হেসে বললাম, না—না। নামটার মধ্যে না আছে ছন্দ, না

আছে সুর। তার চেয়ে নাম রাখ লীনা। ভারি মিষ্টি শোনাবে।

মনে আছে ত মার্লিনকে আদর করে আমি লীনা বলে ডাকতাম।

তাড়াতাড়ি বলল না—না। ছিঃ! লোকে বলবে কি!

সেদিন কথাবার্তা এই পর্য্যন্তই হয়ে রইল। পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাষ্ট খেতে-খেতে মার্লিন বলল, বাড়ীর নাম আমি ঠিক করে ফেলেছি—আর কোনও কথা চলবে না।

শুধালাম, কি?

বলল, বিকোলীনা।

হেসে বললাম, লোকে বলবে কি?

বলল, বলুকগে।

সেই নামই রাখা হল।

* * * *

এই বছর বারোর কথা আমার মনের দিক দিয়েও একটু বলি। মার্লিনকে বিবাহ করবার পর থেকে মার্লিন যেন সুধা ঢেলে দিল আমার জীবনে। মোটের উপর কি আনন্দ কি শান্তিতে এই ক'টা বছর কাটিয়েছি, বুলা! আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না এবং এতটুকুও অতিরঞ্জিত করে বলছি না। ঘর-সংসারের কাজে মার্লিন যে এত সুনিপুণ—বিবাহের আগে মার্লিনের এ দিকটা আমার একেবারেই জানা ছিল না। সংসারের প্রত্যেক কাজটি মার্লিনের দৃষ্টির সামনে যেন আপনা থেকে নিখুঁত ভাবে নিঃশব্দে হয়ে যেত—কোনও দিকে কোনও ত্রুটী ধরার উপায় ছিল না। মার্লিন নিজের হাতেই রান্না করত, কখনও রান্নার জন্য লোক রাখেনি, যদিও আমি অনেকবার তাকে সে কথা বলেছি। আজও এ কথা জোর করে বলতে পারি—সে যুগে তার হাতের রান্না খেয়ে বিশেষ তৃপ্তি পেতাম—কোনও দিন এতটুকুও অরুচি বোধ করিনি। এটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি— যে আমার পছন্দসই খাবারগুলি সে যেন সবই জানত এবং পর পর দু'দিন কখনও সে একই খাবার আমাকে দিত না, কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন আনতই।

বসবাসের বাড়ীখানিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার দিকে তার দৃষ্টি সব সময়ই ছিল প্রখর এবং সে দিক দিয়ে তার রুচিকে আমি সহজেই মেনে নিতাম। কখন এ-দিক দিয়ে কিছু বলার কোনও কারণ ঘটেনি। শুধু তাই নয়, এক একদিন সাজঘরী থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে অবাক হয়ে দেখতাম—হয় শোবার ঘরের কিংবা বসবার ঘরের সাজাবার ধরণটিতে সে কিছু পরিবর্ত্তন এনে ফেলেছে; হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনটুকু করার কারণ যে কি তা আমি কোনও দিনই বুঝিনি।

ওল্ড হল লেনের বাড়ীতে একদিন এই রকম পরিবর্ত্তন দেখে হেসে বললাম লীনা! তোমার মাথায় কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে।

মৃদু হেসে শুধাল কেন?

বসবার ঘরে বসেই আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। বললাম, বড় কৌচটাকে আবার এদিকে এনে কোণাকুণি ভাবে রেখেছ কেন? আগে মন্দ ছিল কি?

বলল, তুমি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ত এই ঘরেই বিশ্রাম কর। আমি দেখেছি—আগুনের ধারে ত ছোট কৌচটা ছিল—তুমি ঐটেতে বসে পা দুটিকে লম্বা টেনে দাও আগুনের দিকে। কখনও কখনও ঐ ভাবে একটু ঘুমিয়েও পড়। তাই বড় কৌচটাকে আগুনের কাছে দিলাম—দরকার হয় পা তুলে দিয়ে ওটার উপর একটু শুয়েও পড়তে পারবে।

শুধালাম আচ্ছা, তা যেন হল, কিন্তু বড় ফুলদানীটাকে আবার ওদিক থেকে এ কোণে এনেছ কেন?

বলল, নইলে কৌচের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানায় না যে।

শুধালাম, ফুলদানীর ফুলের রং বদলে গেল কেন? ওটাতে ত বরাবর লাল ফুল রাখ তুমি।

বলল, লাল ফুলটি এ ঘরে অনেক দিন থেকে ছিল ত—বড্ড একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দেওয়ালের রংয়ের সঙ্গে মানাত বলেই এতদিন রেখেছিলাম। আজ বদলে নীল ফুল দিয়ে দেখলাম—কি রকম হয়। কি সুন্দর মানিয়েছে বলত—নীচের কার্পেটের সঙ্গে। তার উপর বড় কৌচটাতে যদি তুমি শুয়ে পড়—সামনেই দেখতে পাবে থোকা-থোকা নীল রংয়ের ফুল। তোমার চোখ দুটি সহজেই বিশ্রাম পাবে।

হেসে বললাম, লীনা! আমি চলে গেলে তুমি কি খালি এই সবই ভাব?

আমার কৌচের হাতটির উপর বসে এক হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, বুঝলে না—বাড়ী-ঘর-দোর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলে মনটাও সুন্দর থাকে।

হেসে বললাম—কিন্তু মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন কর কেন?

মুখখানা আমার মাথার উপর রেখে একটু চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল। বলল, তোমার মনটাকে তাজা রাখবার জন্য—একঘেয়ে না হয়ে যায়।

বললাম, ওঃ! তাই বুঝি তুমি প্রায়ই বেশভূষার পরিবর্ত্তন কর—রোজই সকালে দেখি, পরিধানে কিছু না কিছু নতুনত্ব আছেই।

এইবার পরিষ্কার খিল-খিল করে হেসে উঠল—মুখখানি যেন লজ্জায় লুকিয়ে ফেলতে চায় আমার মাথার উপরে। [ক্রমশঃ।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

মণিবাবুর নিকট হতে এই তদন্ত সম্পর্কে নাকি-বীণার নামটা আমাদের শুনা ছিল। এই মেয়েটি তার টিকলা নাকের জন্য এ'পাড়ায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। নাকি-বীণা ২নং নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের একতলার দুইখানি ঘরে বাস করে। আমরা দুই জন জালবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে ঐ বাটীতে প্রবেশ করি। প্রথমে নাকি-বীণার বাড়ীর দুইজন ভৃত্যের সহিত সংলাপ সুরু করে দিলাম। ভৃত্যদ্বয় 'আমরা ইতিপূর্ব্বে তাদের মনিবনী নাকি-বীণার নাম শুনিনি' শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদের হাতে একটি করে টাকা গুঁজে দিলে তারা খাতির করে আমাদের ঐখানকার একটি ঘরে বসিয়ে জানালো যে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তাদের গৃহকর্ত্রীর কক্ষে একজন ধনী জমিদার তখনও পর্য্যন্ত আলাপরত আছেন। আমরা এইবার আশ্বস্ত হয়ে ভৃত্য কয়জনের সহিত আলাপ পরিচয়ে জেনে নিলাম যে সত্যই ঐরূপ একটি ঘটনা ঐদিন ঐ বাটীতে ঘটেছিল। তাদের বিবৃতির সংক্ষিপ্ত সারবার্ত্তা নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

: ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ৮-৩০ সময় তারা দিদিমণির নির্দ্দেশমত ছাদের উপর রসুইকার্য্য করছিল, এমন সময় একটা বিরাট হাল্লা শুনে তারা নীচে নেমে এসেছিল। প্রথমে তারা মনে করেছিল উহা পুলিশের হাল্লা, কিন্তু নীচে এসে তারা দেখল তা নয়। প্রায় নয়জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দিদিমণির ঘরে ঢুকে পড়েছে। এদের মধ্যে একজন লোককে তারা ভালো করেই চিনতো। সেই লোকটি হচ্ছে এ পাড়ার নাম করা 'তবলচীবাবু, পাগলাদা'। তাদের মনিবনীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলছিল, নাকি! 'যদি পারিস তো বাঁচা আমাকে।' পাগলাবাবুর কথায় দিদিমণি নিশ্চল মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি মাত্র কথাও তাঁর মুখ হতে বার হলো না। পাগলা কতো কান্নাকাটি এবং কতো আছড়া-আছড়ি করলো, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো না। পাগলা নাচার হয়ে ঘরের জানালার একটা রেলিঙ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঐ লোকগুলো জোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চেঙদোলা করে তুলে বাইরে এনে একটা ট্যাক্সির ভিতর বসিয়ে দিলে। আমরা মনে করছিলাম এদের ঐ অপকার্য্যে প্রাণপণে আমরা বাধা দেবো। এইজন্য মনিবনীর মুখের দিকে আমরা তাকিয়েও ছিলাম। কিন্তু উনি ইসারায় এইরূপ কার্য্য হতে আমাদের বিরত থাকতে বললেন। এর পর ট্যাক্সিখানা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে আমাদের গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি সদর দরজাটা বন্ধ করতে বলে জানালেন যে ওদের সঙ্গে খোকা গুণ্ডা নিজে ছিল। এইজন্য আমরা তাদের বাধা না দিয়ে ভালো কাজই করেছি।

রূপোপজীবিনী নাকি-বীণা তখনও পর্য্যন্ত আপনার অর্গলবদ্ধ কক্ষে পেশারতা ছিল। এই অসময় তাকে আমরা বিরক্ত করবো কিনা ভাবছি, এমন সময় নাকি-বীণা নিজেই তার কক্ষ হতে বার হয়ে এলেন। বলা বাহুল্য যে, পরিশেষে তাঁর উন্নত নাসিকা আরও উন্নত করে তাকে তাঁর ভৃত্যদেরই অনুরূপ একটি বিবৃতি দিতে হয়েছিল। এ ছাড়াও নাকি-বীণার উপদেশানুযায়ী—আমরা ঐ অঞ্চলে দিদিভাই নামে পরিচিতা অপর আর এক জনৈকা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ঐ বাটীর দ্বিতলের একটি কক্ষেও গমন করি। ঐ কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দেওয়ালে ঝুলায়মান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সুবৃহৎ আলোকচিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এ-ছাড়া ঐ ঘরটি সুদৃশ্য কৌচ এবং অন্যান্য আসবাবপত্রে সজ্জিতও ছিল। তথাকথিত দিদিভাই নাম্নী মহিলাটি একজন শিক্ষিতা নারী। ইনি গ্রে ষ্ট্রীটের একটি বাটীতে পুত্র-কন্যাসহ বসবাস করলেও প্রতিদিন এই কক্ষে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কালাপহরণ করে থাকেন। বহু কৃষ্টিমন্য যুবক ঐ সময় এখানে এসে এঁর সঙ্গে সদালাপ করেন। এই জন্য এ-পাড়ায় তাঁর এই কক্ষটি এ-পাড়ার 'ওয়েসিস' নামে পরিচিত।

দিদিভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি-বীণা এবং তাঁর ভৃত্যদের বিবৃতির সমর্থনসূচক একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিই। উপরন্তু তাঁর নিকট হতে ঐ সময়ে ঐখানে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন কৃষ্টিমন্য আভিজাত্য সম্পন্ন ভদ্রসন্তানেরও নামধাম সংগ্রহ করে নিই। দিদিভাই-এর মতে ভদ্রসন্তান বিধায় লজ্জাবশতঃ তাঁদের পক্ষে এ-পাড়ার কোনও ঘটনা বাহিরের কাউকে জানানো সম্ভব ছিল না। এর পর এইখানে অযথা আর কালহরণ করা আমাদের পক্ষে উচিত মনে হয়নি। কারণ এখানকার অন্যান্য সাক্ষীদের বিবৃতি পরবর্ত্তীকালে কোনও এক সময় লিপিবদ্ধ করলে কোনপ্রকার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এইজন্য ঐ স্থানে আর একটুমাত্রও অপেক্ষা না করে আমরা মলিনা নাম্নী অপর এক নারীর বাসস্থান অভিমুখে রওনা হলাম। সাক্ষী মণীন্দ্রবাবু তাঁর বিবৃতিতে এই মলিনার নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করেছিল।

আমরা এর পর দ্রুতগতিতে ৩২ নং ইমামবক্স খানাদার লেনে শ্রীমতী মলিনাসুন্দরী দেবীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা দেখলাম যে, ঐ বাড়ীর'বাসিন্দা প্রত্যেকটি নারী তখনও পর্য্যন্ত ভীতা ও সন্ত্রস্তা হয়ে রয়েছে। এমন কি, খোকাবাবু নামটা পর্য্যন্ত তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে থাকে। দেখা গেল যে এরা মলিনা দেবীর কক্ষটি পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিতেও ভয় পায়। বেশ বুঝা গেল যে খোকাবাবু এ পাড়ায় সাক্ষাৎ যমরাজ অপেক্ষাও ভয়াবহ। আমাদের অবশ্য মলিনা দেবীর কক্ষটি খুঁজে বার করতে একটুমাত্রও দেরী হয় নি। কারণ আমাদের নিযুক্ত এ-পাড়ারই কয়েকজন ছদ্মবেশী প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রয়োজন মত আমাদের গোপন সংবাদ

সরবরাহের জন্য আমাদের আশে-পাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। তাদের ইসারা পাওয়া মাত্র আমরা সদলে মলিনা দেবীর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সেখানে মলিনা দেবীকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। তবে মলিনা দেবীকে না পাওয়া গেলেও সেই কক্ষে তাঁর মাতা সরোজিনী দেবীকে পাওয়া গেল। ঐ ঘরে তখন মলিনার মাতা সরোজিনী দেবী ট্রাঙ্ক বাক্স গুছিয়ে পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে ঐ সকল দ্রব্যসহ অন্য কোনও এক স্থানে সরে পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে আমরা ঠিক সময়েই ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম, তা না হ'লে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ মহিলাটি কোনও এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন আর কি! এইজন্য দুরূহ মামলা সমূহের তদন্তকার্য্যে সফলতা লাভ করতে হলে সর্ব্বাগ্রে স্পিড্ বা গতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর পর আমরা মলিনাসুন্দরীর মাতা সরোজিনী দেবীকে একটু পীড়াপীড়ি করে নিম্নলিখিতরূপ জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিই।

প্র:—তুমি তা'হলে মলিনার গর্ভধারিণী মা নও? তা' তাড়াতাড়ি এখন চলেছ কোথায়? এই সব পুঁটলি-পোঁটলা মেয়ের ঘর হতে তুমি চুরি করে পালাচ্ছ? সত্যি সত্যি সব কথার জবাব দাও, তা না হলে তোমাকে আমরা গেপ্তার করব। তোমার উপর আমাদের ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে। এই সব দ্রব্য সরিয়ে নিয়ে যাবার অধিকার কে তোমাকে দিলে? তুমি তো দেখছি একজন মহা চোর। মেয়েটা কোথায় বেড়াতে গেছে আর এই সুযোগে তুমি তার জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলছো, এঁ্যা?

উ:—এঁ্যা! কি বলছেন আপনারা? আমি গর্ভধারিণী না হ'লেও আমি তারই মা, বাবা! এই এতটুকু বেলা থেকে তাকে আমি মানুষ করেছি। মা কি মেয়ের জিনিস কখনো চুরি করে, বাবা! আমি মেয়ের কাছেই এই সব নিয়ে চলেছি। সে এখন আমার উত্তরপাড়ার বাড়ীতে কিছুদিন থাকবে কি না। ধকলে ধকলে বাছার শরীরটা বড্ড কাহিল হয়ে গেছে। তাই গাঁয়ে-ঘরে গিয়ে বাছা একটু বিশ্রাম করবে।

প্র:—কি করে বুঝবো যে তুমি সত্যি কথা বলছো? মেয়ের জিনিস তো মেয়েই যাবার সময় নিয়ে যেতে পারত। এ নির্ঘাৎ কোনও প্রকারে চাবি সংগ্রহ করে বা ঝুটা চাবি তৈরী করিয়ে ওর নকল মা সেজে তুমি এখানে জিনিসপত্র চুরি করতে এসেছ। তোমাকে এই সব জিনিসপত্র সুদ্ধ আমরা এক্ষুণি থানায় নিয়ে যাব। তবে তোমার মেয়ে যদি বলে এ সব জিনিস তোমাকে সে নিয়ে যেতে বলেছে, তাহলে অবশ্য তোমাকে আমাদের ছেড়েই দিতে হবে।

উ:—তা বাবা, এতোই যখন তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে তখন তোমাদের একজন না হয় আমার সঙ্গে চলো। আমি তো এখান থেকে সোজা উত্তরপাড়ায় আমাদের বাড়ীতেই যাবো। ওখানে গিয়ে আমার মেয়েকে না হয় কেউ জিজ্ঞেস করেই আসুন না—এ সব যা আমি বলছি তা সত্যি কথা, কি না।

উপরের প্রশ্নোত্তর হতে বুঝা যাবে, এই জিজ্ঞাসাবাদ ভারতীয় রক্ষীদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছে। এই বিশেষ পদ্ধতিতে সরাসরি মূল ঘটনা সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করা হয় না। বরং মানুষের মনকে বাক্চাতুর্য্য সহযোগে কৃত্রিম উপায়ে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে, পরে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করে তাদের মনের কথা টেনে বার করে আনা হয়ে থাকে। এইরূপ বাক্যজাল সাক্ষীদের স্ব-স্ব কৃষ্টি অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কারণ যে বাক্-প্রয়োগ স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য, তাহা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। এই ক্ষেত্রে মলিনার মাতা চুরির অভিযোগের কথাই ভাবছিল। ঐ সময় খুনের কাহিনী তার মনের মধ্যে স্থান পায়নি। তা না হলে এতো সহজে মলিনার মা আমাদিগকে মলিনারঠিকানা না দিতেও পারত।

উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে মলিনার মা সরোজিনীর মনের প্রতিরোধশক্তির হানি ঘটিয়ে তার স্বাভাবিক মনোবল ভেঙে দিয়ে তার নিকট হতে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতিও আমরা আদায় করে নিই।

: আমি মলিনা দেবীর পালিকা মাতা। কিছুকাল যাবৎ আমি উত্তরপাড়ায় ঘর বেঁধে বাস করছি। আমার এই মেয়ের রূপের খ্যাতি আছে। সে নাচ-গান ভালো জানে। ছিনেমাতেও সে নাম করেছে। আজকাল আমায় সে ভাল মাসহারা দেয়। তাই এখন উত্তরপাড়ার গাঁয়ে-ঘরে বসে আমি শুধু ভগবানেরই নাম করি। তবে সে ব্যবসার জন্যে কোলকাতাতেই থাকে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকাল সাতটায় সে তার মানুষকে নিয়ে হঠাৎ উত্তরপাড়ায় আসে এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সেখানে সে কিছু দিন থাকতে চায়। কিন্তু সে তার জিনিসপত্র উত্তরপাড়ায় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। তাই আমাকে তার জিনিসপত্র আনবার জন্যে সে আমাকে তার চাবি দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। না, না বাবা! মনের মানুষ কে কার কখন কি করে হয়, তা মা হয়ে আমি জানতে চাইব কেন? আজ্ঞে না, খোকাবাবু নামে কাউকে আমি চিনি না। তবে যে ভদ্রলোক মলিনাকে আমার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গিয়েছে তাকে আমি নিশ্চয়ই চিনিয়ে দিতে পারবো। আজ্ঞে হাঁ, সে কথা ঠিকই বলেছেন আপনারা। মলিনা মাস ছয় হ'লো আমার মাসহারা আশাতীতরূপে বাড়িয়ে দিয়েছে। 'এছাড়া পত্র দ্বারা সে এ-ও জানিয়েছিল যে ঐ সময় হতে তার আয় ঈশ্বরের কৃপায় তিন চার গুণ বেড়ে গিয়েছে।

এর পর আর কালক্ষেপ না করে আমি উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। ইন্সপেক্টার সুনীলচন্দ্র রায়কে অকুস্থলে আরও তদন্ত করার জন্য রেখে আমি একাকী মলিনার মা সরোজিনী সমভিব্যাহারে একখানি ট্যাক্সিযোগে উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হলাম। উত্তরপাড়ার বাড়ীর দালানে বসে মলিনা বিষণ্ণ মনে কি চিন্তা করছিল। এমন সময় তার মাকে নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রথমে মলিনা খুন সম্পর্কে কোনও কথা বলতে চায় নি। কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি করার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি প্রদান করে। তবে তার কথন-ভঙ্গি এবং মুখাকৃতি হতে বুঝা যায় যে, সে সত্য কথাই বলেছে।

: আজ্ঞে হাঁ! আমি একজন রূপোপজীবিনী নারী। আমার বর্ত্তমান মাসিক আয় এগার বা বার শত টাকা। বর্ত্তমানে এই টাকাটা আমার বর্ত্তমান দয়িত খোকাবাবু একাই দিয়ে থাকেন। এছাড়া সিনেমা করে যা আমি পাই তা আমার ফালতু লাভ। খোকাবাবু আসলে কে এবং তিনি থাকেন কোথায় কিংবা বর্ত্তমানে ওঁর পেশা কি, তা আমি জানি না এবং কোনও দিন আমি তা জানবার চেষ্টাও করি না। আমার সঙ্গে তার টাকা নিয়ে সম্পর্ক।

দেয় টাকা বন্ধ না করলে এসব প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে না। কে ভালো আর কে মন্দ আমদের মনে এসব প্রশ্নের ঠাই নেই। তবে এ'কথাও ঠিক যে, ভাল লোক আমাদেব নিকট কমই আসেন। ও-রকম মানুষ দু'-একজন এলেও তাঁরা বেশীদিন ভাল থাকতে পারেন না। আজ্ঞে হাঁ, মাত্র ছয় মাস হলো খোকাবাবু কেবল আমার ঘরেই আসছে। তাঁর সঙ্গে আমার সর্ত্ত আছে এই যে আর কেউ আমার কাছে আসতে পাববে না। ওঁর সঙ্গে যারা আমার ঘরে গান শুনতে আসেন, তাঁরাই ওঁকে 'খোকাবাবু খোকাবাবু' বলে ডাকেন। এইজন্য আমার কাছেও উনি ঐ নামে পরিচিত। আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে আমার ঘরে গানের মহড়া হলে পাগলাবাবু বলে একজন তবলচী সেখানে তবলা বাজিয়ে যায়। হাঁ, খোকাবাবুর জামানতেও কয়েক বার তিনি আমার ঘরে তবলা বাজিয়ে গেছেন। হাঁ, এ কথা সত্য যে, খোকাবাবু মধ্যে মধ্যে কয়েক দিন পর্য্যন্ত উধাও হয়ে থাকতেন। ঐ সময় চেষ্টা করলেও তাঁর কোন খোঁজ বা খবর পাওয়া যেত না। জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানাতেন কাজকর্ম্মে তাঁকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। আজ্ঞে হাঁ, চার দিন উধাও হয়ে থাকার পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভোর ছয়টার সময় তিনি হঠাৎ আমার নিকট এসে বললেন যে সেই দিনই তাঁকে বিদেশে যেতে হবে। ফিরতে তাঁর প্রায় দুই মাস সময় লাগবে। এই জন্য তিনি আমায় আমার মার কাছে রেখে যেতে চাইলেন। বিশেষ পীড়াপীড়ি কবায় আমি তখুনি তাঁর সঙ্গে মার কাছে চলে আসি। পরে খোকাবাবুর উপদেশ মত মাকে আমার ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র আনতে কোলকাতায় পাঠাই। পাছে খোকাবাবুর অবর্ত্তমানে আমি আর কাউকে কামনা করি, এইজন্যই বোধ হয় তিনি আমাকে আর একটুখনও ওখানে থাকতে দিলেন না। আমি খোকাকে ভালবাসি কি না তা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে খোকা আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে বলে মনে হয়। আজ্ঞে হাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমরা ভালবাসা বিক্রিই করে থাকি। তবে কখনও কখনও ওটা দান যে একেবারেই করি না, তা'ও নয়। না না না, আমাকে আপনারা মাপ করবেন। এ'ছাড়া আর আমি কিছু আপনাদের বলতে পারব না।

বেশ বুঝা গেল যে মলিনাসুন্দরী প্রকৃত তথ্য গোপন করছে এবং সে ইচ্ছা করেই সত্য কথা বলতে চায় না। এ অবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা প্রকৃত সত্য তার কাছ হতে বার করা ভিন্ন উপায়ও ছিল না। পরিশেষে আমরা তাকে নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিই। একটা কিছু অঘটন ঘটার জন্যই যে খোকাবাবু মলিনাকে সহর হতে সরিয়ে দিয়েছে, এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি মলিনাসুন্দরীর নিশ্চয়ই আছে। এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে পুলিশের উপস্থিতি তাকে যে ভীতা ও সন্ত্রস্তা করে তুলবে তাতে আর বিচিত্র কি? এইজন্য পরামর্শদাতার অভাবে তার মত একটি নারীর মনোবল যে সহজেই ভেঙ্গে পড়বে তাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিম্নে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর হতে আমার আশা যে অমূলক ছিল না তা নিশ্চিতরূপে বুঝা যাবে।

প্রঃ—খোকাবাবুর দোস্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তবে আমি তোমার কাছে এসেছি। কোলকাতায় খোকাবাবু কি করেছেন বা না করেছেন তা তুমি যে একটুও জানো না, তা নয়। তবে খুনের সঙ্গে তুমি যে সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত নও, তা আমি বিশ্বাস করি।

উঃ—এ্যাঁ খুন? কি বলছেন আপনি। কে কা'কে খুন করলো? বলুন না বলুন না, কে খুন হয়েছে। আমি খুনের কথা কিছু জানি না।

প্রঃ—জানো না মানে? খোকাই তো পাগলাকে খুন করেছে। খোকাকে তুমি কতটুকু ভালবাস তা জানি না। কিন্তু তুমি যে পাগলাবাবুকে সত্যসত্যই ভালবাসো তা আমরা ভালরূপেই জানি। জানো, আজ তোমার জন্যই পাগলাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। তার একমাত্র অপরাধ ছিল, সে তোমাকে ভালবাসতো। এখনও যদি তুমি মিথ্যা কথা বলো কিংবা সত্য গোপন করো, তা'হলে পাগলার অমর-আত্মা তোমাকে ক্ষমা করবে না।

আমরা খুনের কারণ সম্পর্কে কেবলমাত্র যা অনুমান করেছিলাম, তাই কেবল আমি মলিনাকে বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের এই ব্যাখ্যা বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিসংযোগ করে দিলে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, মলিনা অঝোরে কাঁদতে সুরু করে দিয়েছে। লৌহ তপ্ত থাকতে থাকতেই তাতে ঘা দেওয়ার রীতি আছে। তাই আর দেরী না করে আমি মলিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

: আজ্ঞে, আজ আমি কোনও কথাই আর গোপন করবো না। এ কয় দিন আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, প্রকৃতপক্ষে কা'কে আমি ভালবাসি, নির্ধনী সহায়-সম্বলহীন পাগলাবাবুকে, না ধনী-সুপুরুষ খোকাবাবুকে? আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমি পাগলাকেই বেশী ভালবাসতাম। আমি যদি জানতাম যে খোকা এই ভাবে তাকে খুন করবে, তা'হলে কি খোকাকে আমি আমার ঘরে স্থান দিই? তবে এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। খোকাকে আমি স্থান না দিলে পাগলাকে সে এর আরও আগে খুন করে আসতো। তার পথের কোনও বাধা বা কাঁটাকে সে কোনও দিনই ক্ষমা করেনি। এইবার হয়তো সে আমাকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। খোকাবাবু যে কী ভীষণ দুর্দ্দান্ত লোক, তা আমার চেয়ে বেশী আর কেউই জানে না।

আজ্ঞে হাঁ, আমি যা জানি নিশ্চয় বলবো। মাঝে মাঝে খোকার ভয়ে পাগলা যে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতো এ কথা সত্য। প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টায় আমি গান-বাজনা শিখতে পেরেছি। মাত্র কয়েক দিন আগে খোকা আমার ঘরে পাগলাকে দেখে তাকে ঘাড় ধরে বার করে দেয়; আর তামায় সাবধান করে দিয়ে বলে যে আমি যেন আর একটি দিনও তাকে আমার ঘরে আসতে না দিই। পাগলা এই দিন একটু মদ খেয়েই এসেছিল। অপমানিত হয়ে চলে যেতে যেতে সে-ও খোকাকে শাসিয়ে যায় এই বলে—'তুমি যে একজন জেলাখারিজ গুণ্ডা তা আমি জানি। দেখো, কালই আমি তোমাকে গোয়েন্দা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো।' এর কয় দিন পর একদিন রাত্রে খোকা আমার ঘরে বসেছিল। এমন সময় সাদা পোষাকে দুইজন পুলিশ আমার দরজায় এসে খোকার খোঁজ করতে থাকে। আমি দরজার ফুটো দিয়ে সিপাই দু'জনকে দেখে খোকাকে তাদের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে দিই। খোকাবাবুও তৎক্ষণাৎ দ্বিতলের জানলার গরাদ সরিয়ে একলাফে নীচের রাস্তার উপর নেমে চক্ষের পলকের মধ্যে উধাও

হয়ে যায়। পরে আমি শুনেছি পাগলা পুলিশে খবর দেয় নি। সিপাই দু'জন অন্য সূত্র হতে সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে গিয়েছিল। কিন্তু খোকাবাবু এজন্য একমাত্র পাগলাবাবুকেই পুলিশের সংবাদদাতারূপে সন্দেহ করেছিল।

এর পর তেসরা সেপ্টেম্বর রাত্রি নয়টার সময় আমার ঘরে বসে আছি, এমন সময় খোকাবাবুর বন্ধু কালী এসে বললো, 'বৌদি! খোকা এখুনি তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বললো।' এই বলে কালী বাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে সোনাগাছির উষা নামে একটি মেয়ের বাড়ীতে তুললো। এর পর রাত প্রায় দশটার সময় খোকাবাবু তার বন্ধু কেষ্ট বাবুকে সঙ্গে করে উষার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। এই সময় আমি খোকার নীল রঙের সার্টের উপরে দু'-এক জায়গা লাল রঙে রঞ্জিত দেখি। আমি ঐ লাল রঙের দাগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে খোকা বললো, 'ও, না না, ও কিছু না রে। ও পানের পিচ লেগেছে।' এই কথা বলে খোকাবাবু তার বন্ধু কেষ্টবাবু এবং কালীবাবুকে নিয়ে পুনরায় কোথায় চলে গেল। তার পর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় খোকাবাবু পুনরায় আমাদের নিকট ফিরে আসে। এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে খোকাবাবু চান করে মাথায় গন্ধ তেল দিয়েছে। এ'ছাড়া সে তার নীল সার্টটা বদলে একটা ছাই রঙের পাটভাঙা নূতন সার্ট পরে নিয়েছে। এর একটু পরে খোকার অপর এক বন্ধু ভূপেনবাবুও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ উষা নামের মেয়েটি ছিল ভূপেনেরই রক্ষিতা। এর পর সারা রাত ধরে বসে বসে আমরা সেখানে বিয়ার খাই। এবং সেই সঙ্গে বহু গল্প-গুজবও করি। পরদিন প্রত্যূষে ছয়টায় খোকাবাবু আমাকে জানালো যে তার নামে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। এইজন্য কিছুদিনের মত সে কলকাতার বাইরে গিয়ে গা-ঢাকা দেবে। এই বলে সে আমাকে সোজা উত্তরপাড়ায় এনে আমার মা'র কাছে রেখে দিয়ে যায়। আমি সময়ের অভাবে আমার বাড়ী হয়ে আসতে পারিনি। এইজন্য আসবাবপত্র আনার জন্য মাকে কোলকাতায় পাঠাতে হয়েছিল। খোকাবাবু এখন কোথায় আছেন তা আমি জানি না। তবে আমি আপনাদের সোনাগাছিতে উষার বাড়ীটা দেখিয়ে দিতে পারবো।

এর পর আমি যে ট্যাক্সিতে উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম সেই ট্যাক্সিতেই মলিনাকে নিয়ে কলিকাতায় উষার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হই। এই সময় উষার দয়িত ভূপেনবাবুকেও উষার ঘরে আমি দেখতে পাই। আমাদের দেখামাত্র ভূপেন সরে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পালাবার পূর্ব্বেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলি। তাকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হয় নি। এইজন্য তাকে একজন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি বলে আমাদের মনে হলো না। ভূপেনের রক্ষিতা উষাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে মলিনা দেবীর অনুরূপই এক বিবৃতি দিয়েছিল। এর অধিক তার পক্ষে এই হত্যা সম্পর্কে অবগত থাকাও সম্ভব ছিল না। তবে তার দয়িত ভূপেনের নিকট হতে খুন সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া গেলেও যেতে পারে ব'লে আমাদের মনে হয়েছিল। এইজন্য বিশেষ করে ভূপেনকেই এই হত্যা সম্পর্কীয় একটি বিবৃতি দিবার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি। এই সম্পর্কে ভূপেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবৃতিটি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো:

আমি আমার রক্ষিতা উষার সহিত তার ঘরেতেই বাস করি এবং বাজারে পাটের দালালী দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। খোকাবাবু এবং তার বন্ধু কেষ্ট, গোপী, কালী এবং সুবলবাবুর সঙ্গে আমার এই পাড়াতেই আলাপ হয়। আমরা কয়জন প্রায়ই সন্ধ্যাকালে নিকটস্থ স্কোয়ারে ব'সে আলাপ আলোচনা করতাম। কিন্তু এই কয় ব্যক্তি'যে কোথায় থাকে এবং তারা যে কি করে তা তারা কোনও দিনই আমায় বলে নি। তবে মধ্যে মধ্যে তারা আমার রক্ষিতা উষার ঘরে এসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। আজ্ঞা হাঁ, তেসরা সেপ্টেম্বরও রাত আন্দাজ নয়টার সময় এদের কয়েকজন উষার ঘরে বসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ সময় তারা খোকার রক্ষিতা মলিনাকে কেন উষার ঘরে এনেছিল তা আমার জানা নেই। ঐদিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে দেখি খোকা, কালী এবং কেষ্ট আমার ঘরে বসে জটলা করছে। ঐ রাত্রে একটু বেশী মদ খাওয়ায় আমি আক্রান্ত হয়ে স্কোয়ার মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ি। এই জন্যই বাড়ী ফিরতে আমার অতো বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল।

মলিনা দেবীর বিবৃতি অনুযায়ী আমরা তদন্ত করে জানতে পারি যে, কলিকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের গুণ্ডা শাখার দুইজন সিপাই কোনও এক সংবাদ অনুযায়ী খাঁদা নামে একজন জেলা-খারিজ (Externed গুণ্ডার খোঁজে সত্য সত্যই মলিনার ঘরে ঐ দিন হানা দিয়েছিল। তবে ঐখানে খাঁদার অবস্থান সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাগলাবাবু তাদের দেয়নি। এ'ছাড়া এ'ও জানা যায় যে, ঐ সময় বরাবর খোকাবাবুর বন্ধু কেষ্টকেও মাতাল অবস্থায় রাস্তা হতে বটতলা থানার জনৈক কনেষ্টবল পাকড়াও করে নিয়ে যায়। কেষ্টকে একটি পেটিকেসে আদালতে সোপার্দ্দ করাও হয়েছিল। আদালতের বিচারে কেষ্টর দশ টাকা জরিমানা হয়। এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাগলা-বাবুর সহিত সম্পর্ক রহিত হইলেও খোকাকে যেদিন সে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছিল তার একদিন পরেই সংঘটিত হয়। এইজন্যই বোধ হয় খোকাবাবু এবং তার বন্ধু কেষ্টবাবুর ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের সম্বন্ধে বারে বারে পুলিশে সংবাদ দিচ্ছে।

কোনও একটি হত্যার মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমেই প্রমাণ করতে হয় যে, ঐ হত্যাকাণ্ডটি কি উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে। ইংরাজীতে একে বলা হয় মোটিভ। এই মোটিভ বা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে না পারলে মূল হত্যাকাণ্ডটিও প্রমাণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষণে উপরোক্ত দুইটি বিভিন্ন ঘটনা হ'তে আমরা বুঝতে পারি যে পাগলা খোকাবাবুকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে আসার একদিন পরে খোকার ঘরে গোয়েন্দা পুলিশ হানা দেওয়ায় খোকাবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাহলে পাগলাবাবুই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য খোকাবাবুর আস্তানা সম্বন্ধে পুলিশকে খবর দিয়েছে। এ'ছাড়া প্রথম ঘটনার দুই একদিন পরে খোকার অকৃত্রিম বন্ধু কেষ্টবাবুকে বটতলার পুলিশ অন্য এক কারণে রাস্তা হতে ধরে নিয়ে গেলেও খোকাবাবু ও কেষ্টবাবুর ধারণা হয়েছিল যে কেষ্টবাবুর এই গ্রেপ্তারের পিছনেও পাগলাবাবুরই কারসাজী ছিল।

এর পর আমরা সন্দেহক্রমে উষার দয়িত ভূপেনকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও অন্য কোনও আসামীকে আমরা ঐ রাত্রে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। এই সময় আমরা

বুঝতে পারি এই কালী ও ভূপেনও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। তবে এদের চাইতেও অধিকতর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির আরো কয়েকজন ব্যক্তি যে এই হত্যাকাণ্ডে খোকাবাবুর সহকারী ছিল, তাও আমরা সহজে বুঝে নিতে পেরেছিলাম।

এই দিন অধিক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় আমরা মলিনাকে তার কলিকাতার নিজ বাড়ীতে রেখে আমরা আমাদের থানায় ফিরে আসি। কিন্তু পাছে মলিনাকে খাঁদা পুনরায় সেখান থেকে সরিয়ে নেয়, এইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ মলিনাসুন্দরীর গৃহে আমরা সাদা পোষাকে দুইজন পুলিশ মোতায়েন করতেও ভুলিনি। কারণ যে নারীটিকে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে তাকে খোকাবাবু সত্য সত্যই অন্তরের সহিত ভালবাসতো। এই অবস্থায় খোকাবাবুর পক্ষে পুলিশের অবর্ত্তমানে তাহার সহিত মিলিত হবার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

এর পরদিন ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, তারিখে প্রত্যূষে আমরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কোয়ার্টারস থেকে নেমে থানার অফিসঘরে এসে সমবেত হলাম। বস্তুতপক্ষে ভোর রাত্রে বাড়ী ফিরলেও আমরা কেহই ঘুমাতে পারিনি। বরং ঘুমের আমেজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা এই হত্যাকাণ্ডটি সম্বন্ধেই চিন্তা করেছি। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সুনীলবাবু প্রস্তাব করলেন যে আমাদের এখন উচিত হবে পুনরায় সোনাগাছির বেশ্যাপল্লীতে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়ীতে বাড়ীতে আরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। এইরূপ তদন্ত দ্বারা যে কয়টি বেশ্যানারী কোনও দিন না কোনও দিন পাগলাবাবুর সংস্পর্শে এসেছে তাদের খুঁজে বার করার আশু প্রয়োজনও আমাদের ছিল। সুনীলবাবুর উপদেশ মত আমরা পুনরায় সোনাগাছি অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়ী বাড়ী তদন্ত করে প্রায় বাইশজন কুলটা নারীকে সংগ্রহ করলাম। তদন্ত দ্বারা জানা গেল যে, ওরা সকলেই ভালরূপে পাগলাবাবুকে বহু বার দেখেছে। এদের সহিত আমরা ঊষা, মলিনা এবং মৃতের অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিদেরও সঙ্গে নিলাম। এদের সকলকে সঙ্গে করে কলিকাতার পুলিশ-মর্গের বরফ ঘরে এনে তাদের একে একে পাগলার মৃতদেহটি দেখাতে সুরু করলাম। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ঐ মুণ্ডবিহীন দেহটি পাগলার বলে এরা সকলেই সনাক্ত করেছিল। মুণ্ডবিহীন দেহ সনাক্ত করা যে খুবই কঠিন তা সর্ব্বদাই স্বীকার্য্য। কিন্তু নিম্নোক্ত কয়টি বিশেষ চিহ্ন হতে তাদের পক্ষে ঐ মৃতদেহটি বিশ্বাসযোগ্যরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

(১) মৃতদেহটির বুকে ও পিঠে প্রচুর চুল ছিল। দারুণ মাতাল অবস্থায় তাকে তারা প্রায়ই নগ্ন অবস্থায় পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখতো। এইজন্য এই সব বৈশিষ্ট্য দেখার সুবিধা তাদের হয়েছিল।

(২) মৃতদেহটির বাম হাতে একটি ফুলের কুঁড়ি উল্কি সহযোগে অঙ্কিত ছিল। এ'ছাড়া তার বাম কাঁধে একটা গভীর ক্ষতও দেখা যেতো। পাগলাবাবুর দেহের এই সব চিহ্নগুলি এরা প্রায়ই দেখেছে।

(৩) মৃতদেহের বাম পা'টি কুশ-পা ছিল এবং উহার ডান পায়ে ত্রিশূলের মত একটি দাগ ছিল। এই রকম পা সাধারণত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

(৪) মৃতদেহের মাপ, আকৃতি এবং গাত্রবর্ণ হতেও উহা পাগলাবাবুর মৃতদেহ বলে তারা সনাক্ত করতে পেরেছিল। এই পাগলাবাবুকে বারে বারে তারা দেখেছে। এইজন্য এই সম্বন্ধে তারা কোনওরূপ ভুল বা ভ্রান্তি করতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত আমরা পাগলার মৃতদেহের ওজন ও মাপও নিয়েছিলাম। কারণ কোনও দর্জ্জির কাছে জামার মাপ দেওয়া কিংবা কোনও স্থানে তার দেহ ওজন করানোও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। উপরন্তু তার পদ-চিহ্ন এবং হস্তাঙ্গুলীর চিহ্নও আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কারণ কোনও থানায় ধরা পড়ার পর জামীনের কাগজে তার পক্ষে টীপ দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই কয়েকটি সূত্র অনুযায়ী তদন্ত করে আমরা কোনও সুফল পাইনি।

ইতিমধ্যে আমাদের একজন অফিসার পাগলাবাবুর এক ভাইকেও খুঁজে বার করতে পেরেছিল। এই ভদ্রলোক বনগাঁয়ে ডাক্তারী করতেন। এই দিন ইনিও এসে মৃতদেহটি তাঁর বিগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বলে সনাক্ত করে গেলেন। ভদ্রলোকটির নিকট হতে আমরা জানতে পারি যে, পাগলাবাবুর প্রকৃত নাম প্রতুলবাবু এবং সে সত্যই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু কুলটা নারীদের গানবাজনা শেখাতে এসে সঙ্গ দোষে ধীরে ধীরে সে অধঃপাতের শেষ সীমায় নেমে এসেছে।

এক্ষণে আমাদের বিবেচনার বিষয় হলো যে, উপরোক্ত কয়টি মাত্র চিহ্ন হতে ঐ মৃতদেহ পাগলা ওরফে প্রতুলবাবু নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে কি না। এই বিষয়ে শেষ বিচারের ভার জজ ও জুরীদের ধ্যান-ধারণার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে। এইজন্য এই বিষয়টি নিয়ে আর অধিক মাথা ঘামানোর আমরা প্রয়োজন মনে করিনি।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা পুলিশ সার্জ্জেনের নিকট লাস চেরাই-এর বা পোষ্টমোর্টম পরীক্ষার রিপোর্ট পেয়েছিলাম। রিপোর্টটিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নোক্তরূপ তথ্যটিও লিপিবদ্ধ ছিল। এই বিশেষ তথ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্ত্তীকালীন তদন্ত করবার জন্য ঐ রিপোর্টের এই অংশটি আমরা মনযোগ সহকারে আর একবার পাঠ করে নিলাম।

আমি পরীক্ষা দ্বারা আরও জেনেছি যে, রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে প্রথমে এই ব্যক্তিকে ছুরিকা দ্বারা বার বার আঘাত করে মৃতপ্রায় করে ফেলা হয়। কিন্তু তখনও এই ব্যক্তির প্রাণ দেহ হতে বিচ্যুত হয়নি। এর কিছু পরে তার জীবিত অবস্থায় তার দেহ হতে মুণ্ডটি ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত করা হয়েছিল।

সব দিক বিবেচনা করে আমরা প্রায় সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করতে সমর্থ হই যে—কোন ব্যক্তি কোন সময় কার দ্বারা কি কারণে এবং কবে ও কি কি উপায়ে কোথায় নিহত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এই ভাবে আমরা এই হত্যা-রহস্যের উপর প্রচুর আলোকপাত করতে পারায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম। এই অবস্থায় আমাদের দলের কোনও কোনও অফিসার মতপ্রকাশ করলেন যে আজকের মত তদন্ত এইখানেই সমাপ্ত করা যাক। কারণ আমরা সকলে এই দুই দিন যাবৎ ঘোরাঘুরি করে সত্যসত্যই ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহ যতটা সইতে পারে তাকে তার বেশী সওয়াতে গেলে তা সহজেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, নিজেদের দেহ ও মনকে সুস্থ না রাখলে কোনও দুরূহ কার্য্যে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু তা সত্বেও আমি আমার সহকারী তদন্তকারীদের সহিত একমত হতে পারিনি। আমার মতে তদন্তের সাফল্য একান্তরূপে নির্ভর করে স্পিড বা গতির উপর। অন্যথায় বহু সাক্ষ্য প্রমাণ ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া বিলম্বের কারণে মূল হত্যাকারী পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গেলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তার পক্ষে ফেরার জীবন অতিবাহিত করা সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে বহু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকেও নানা কারণে আর খুঁজে পাওয়া না-ও যেতে পারে। এইজন্য আসামী বহু বৎসর পরে ধরা পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত আর মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয় কয়টি ছাড়া আমার সহকারী অফিসারদের সহিত দ্বিমত হওয়ার অপর আর একটি কারণও ছিল। এই কারণটি হচ্ছে এই যে, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল খোকাবাবু এইদিন গভীর রাত্রে তার রক্ষিতা মলিনাসুন্দরীর কক্ষে নিশ্চয়ই একবার হানা দেবে। এইজন্য আমার সহকারীদের বিশ্রাম করবার সুযোগ দিয়ে আমি একাই কয়েকজন সিপাহীসহ মলিনাসুন্দরীর বাটীর নিকট গোপনে অবস্থান করতে মনস্থ করলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাদের অভিজ্ঞ পুরাতন ইনস্পেক্টার সুনীলবাবু আমার মতেই মত দিয়েছিলেন। অগত্যা এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করার ভার স্বেচ্ছাকৃতভাবে আমি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এতে যে নিজের জীবন কতদূর বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে, তা তখনও আমি অনুমান পর্য্যন্ত করতে পারিনি।

আমি কয়েকজন মাত্র সিপাহী সমভিব্যাহারে সাদা পোষাকে মলিনাসুন্দরীর বাটীর নিকট যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজতে চলেছে। হঠাৎ আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করলাম, দিকে দিকে ঐ অঞ্চলের নিশাচর লোকেরা এবং স্থানীয় দোকানদাররা ভীত-ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। সকলের মুখে সেই একই কথা "খোকা খোকা খোকা!" এই সময় তাদের সমবেত কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে মলিনাসুন্দরীর ঘর থেকে করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল, "ওরে বাবা রে মেরে ফেললে রে। ওগো তোমরা কে কোথায় আছো-ও। শীঘ্র এসে আমায় রক্ষা করো গো"—মলিনাসুন্দরীর বাটীর নীচের ঘরে দুই জন পাহারাদার পাহারার জন্য পূর্ব্ব হতেই মোতায়েন ছিল। ইতিমধ্যে কে বা কাহারা বাহির হতে তাদের দরজা শিকলের সাহায্যে বন্ধ করে দিয়েছিল। ঐ ঘরের ভিতর হতে তারাও প্রাণপণে চীৎকার করে সাহায্য-ভিক্ষা করছিল। এই সময় বটতলা থানার সেকেণ্ড অফিসার আসিরুল হক সাহেব এলাকায় রোঁদ দিতে দিতে ওইখানে এসে পড়েছিলেন। তিনি অকুস্থলে জমায়েৎ ভীড়ের ওপার থেকে প্রাণপণে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত লোকের চাপে কিছুতেই তিনি এগিয়ে আসতে পারছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, মলিনা দেবীর বাড়ীর দোতলার কার্ণিশ থেকে এক ব্যক্তি পিস্তল হাতে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে চতুর্দ্দিকের জনতাকে লক্ষ্য করে উপর্য্যুপরি গুলীবর্ষণ সুরু করে দিলে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমারও জামার নীচেকার পেটিকায় গুলীভরা একটি পিস্তল ছিল। আমিও তৎক্ষণাৎ উহা বার করে ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করে উপর্য্যুপরি কয়েক বার গুলী ছুঁড়লাম। কিন্তু সম্মুখের জনতার জীবন পাছে অকারণে বিপন্ন হয়, সেই জন্য আমাকে শীঘ্রই সংযত হয়ে গুলীবর্ষণে বিরত হতে হলো। এই সুযোগে লোকটি পাশের অপরিসর গলি দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তা জনতার আর সকলের মত আমিও বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বটতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার যতীন্দ্র মুখার্জ্জী বহু সিপাহী-শান্ত্রীসহ সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। এই খবর শ্যামপুকুর থানাতেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেইখান হতে ইনস্পেক্টার সুনীল বাবুও তাঁর অন্যান্য সহকারীদের সহিত ত্বরিত গতিতে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সকলে মিলে দ্রুতগতিতে সারা সোনাগাছি অঞ্চলটিই ঘেরাও করে ফেলে সেখানকার প্রতিটি বাটীর প্রতিটি কক্ষ এবং তৎসহ চতুর্দ্দিককার মেথরগলি ও রাজপথ সমূহে তন্ন তন্ন করে ঐ আততায়ীর জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া তো গেলই না ; এমন কি কোন্ পথ দিয়ে যে ঐ ব্যক্তি অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল, তার সামান্য হদিস পর্য্যন্ত কেউই আমাদের জানাতে পারলো না। [ক্রমশঃ

সকলই কবিতা

শ্রীনন্দলাল বেরা

এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটিছে সবই কবিতার ছন্দ,
ছোট-বড় আর মান-অপমান ভালো হোক্ কিবা মন্দ।
কবির মানসে জাগে তারি ছবি ভুলিয়া বিভেদ দ্বন্দ্ব।

ক্ষুদ্র তুচ্ছ, কিবা ছোট-বড়ো,
গাঁথিতে তাহায় করি সব জড়ো,
একই সূত্রে গাঁথা সে মাল্য—কেবল নানান ছন্দ।

বিক্ষোভ-রোষ, প্রেম-ভালোবাসা,
তারো মাঝে — ছ কবিতার ভাষা,
কবির বীণায় বাজে তারি সুর হয়নি তা কভু বন্ধ।
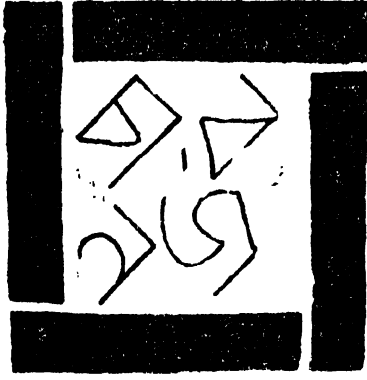
শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন স্মৃতিতীর্থ

[জ্যোতির্বিদ ও শাস্ত্রবেত্তা সুপণ্ডিত]

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মা যুগে যুগে চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে স্মৃতাঃ॥"

বেদের চক্ষুস্বরূপ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের (Astronomy) অনুশীলন আত্মতৃপ্তিকর—ইহাতেই ব্রহ্মদর্শন লাভ সম্ভব। কারণ গণিত জ্যোতিষশাস্ত্র পূর্ণ বিজ্ঞান সত্যে প্রতিষ্ঠিত আর ফলিত জ্যোতিষ-বিজ্ঞান কল্পনার উপর নির্ভরশীল। সৎপথযাত্রী ও নির্লোভী শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্বিদ শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি মনে হয়েছিল।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রধান পরিচালক পণ্ডিত ৺রামেশ্বর বিদ্যারত্ন ও পরলোকগতা ৺শাকম্ভরী দেবীর পুত্র হরিচরণ ভট্টপল্লীর স্বগৃহে ১৮৮১ সালের ২৫শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ ছিলেন বিগত শতাব্দীর অন্যতম পণ্ডিত ৺রামদয়াল তর্করত্ন। ভাটপাড়া মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠকালে তিনি একবার বসন্তরোগে মৃতপ্রায় হন, কিন্তু চন্দননগরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ৺অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত 'পঞ্চানন্দ রস' সেবনে নিরাময় হন। চৌদ্দ বৎসরে হুগলী সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। সেই সময় পিতার নিকট কুলবিদ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির সাধনা করিয়া তিনি 'ধ্যান-ধারণা' স্তরে উপনীত হন। তিন বৎসর পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট গণিত ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন ও ৺সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট পাশ্চাত্য জ্যোতিষবিদ্যা আয়ত্ত করেন। ১৩২১ সালে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণনা, ৺বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের টোলে নব্যস্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ১৩৩৫ সালে নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে স্মৃতির উপাধি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন।

শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য

১৩২৫ সালে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি পঞ্জিকার গণনা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং ১৩৫৩ সালে চক্ষুঃপীড়ার দরুণ উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ের মধ্যে 'পুরাতন পঞ্জিকা সংগ্রহ' নামে গ্রন্থ সঙ্কলন এবং 'পঞ্জিকা সংস্কার প্রদীপ' 'পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরের প্রভাহরণ' নামক ৭ খণ্ড পুস্তিকা তৎকর্ত্তৃক প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর স্বত্বাধিকারী ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তথা হইতে প্রকাশিত "স্তবকবচমালা" আংশিক সম্পাদনা করেন। সতীশ বাবু তাঁহাকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ এক খণ্ড মনুসংহিতা, প্রাণতোষিণীতন্ত্র ও স্তবকবচমালা প্রদান করেন। পরে স্বর্গীয় ভবতোষ ঘটক মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের সুগভীর জ্ঞানের জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ সাল হইতে হরিচরণ বাবুর উপর **Indian National Almanac** প্রণয়নের ভারার্পণ করেন। ইহা ছাড়া ১৮৮০।৮১ শক হইতে রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ-এর সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের তদারক করিতেছেন। ১৩৫৭ সালে কলিকাতায় পঞ্জিকা সংস্কার সভার যে অধিবেশন হয়, বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি ভট্টপল্লীতে "ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞান পরিষদ" নামে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনা করেন। বিভিন্ন প্রান্তের বহু ছাত্র উহাতে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

১৩৩০ সালে ভট্টপল্লীতে উক্ত বৎসরের রাজনৈতিক সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে পণ্ডিত সমাজ এক অভিনন্দন দেন। তন্মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৩৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত মহাসম্মেলনে জ্যোতিষ শাখার সভাপতি, ১৯৫৭ সালে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও ভগবতী শ্রীশ্রীমার জীবন-দর্শন আলোচনা সভার সভাপতি, ভবতারিণী পীঠ প্রতিষ্ঠা, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষক, স্থানীয় সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের অন্যতম পরিচালক, ১৩৬০ সালে "সুখের সন্ধান" নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রকাশ, ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত নারদ-স্মৃতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্তি, ভট্টপল্লী পরীক্ষা সমাজের সহঃ সম্পাদক "জ্যোতিষচতুষ্পাঠী"র অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কার্য্য-সম্পাদন প্রভৃতি শ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজে এক স্থায়ী উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

১৩১৭ সালে ভট্টপল্লীর শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীকে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বিবাহ করেন।

দ্বাদশ বৎসরে উপনয়নের পর হইতে তিনি ধর্ম্ম সাধনায় মগ্ন হন। এই পর্য্যন্ত তিনি উত্তর-ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। নবগ্রহ সাধনায় তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

পরিণত বয়সেও তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া সুগভীর আলোচনা ও গবেষণায় নিজেকে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন দেখিয়া কর্ম্মক্ষম বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লই।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুলেখক]

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াও মাতৃভাষা বাঙ্গালার মাধ্যমে লেখায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন কেন ? এই প্রশ্নের জবাবে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইংরাজীতে লিখে কোন স্থায়ী ছাপ রাখা যায় না বলে আমার ধারণা।" এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের পরবর্ত্তী জীবনধারা লক্ষ্য করিলে উঁহার যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৯৯ সালের আশ্বিন মাসে বীরভূম জেলার হাতিয়া গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ৺মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত শতাব্দীর অন্যতম ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আইনজীবী না হইয়াও আইন শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেন। মাতা ৺রাজবালা দেবীকে পুত্র শ্রীকুমার মাত্র চারি বৎসর বয়সে হারান। স্বগ্রাম বীরভূম জেলার কুশমোর গ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষা বাবার নিকট গ্রহণ করিয়া ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার সি, এম, তায়িব বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। মামা আশুতোষ রায়চৌধুরী তখন উঁহার প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৬ সালে তথা হইতে মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেলা স্কলারসিপ পান। দুই বৎসর পরে হেতমপুর কলেজ হইতে ত্রয়োদশ স্থানাধিকারী হিসাবে এফ, এ, পাশ করিয়া কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গ্রাজুয়েট হন। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে "ঈশান স্কলার" হয়েছেন একমাত্র ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যাচার্য্য সদ্য-লোকান্তরিত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় তাঁহার অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি শিশিরকুমার সম্বন্ধে একটি রচনায় ব্যাপৃত আছেন। ১৯১২ সালে তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম, এ পাশ করেন। উঁহার ফলাফল বাহির হওয়ার পূর্ব্বে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ও অধ্যক্ষ জানকী শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে তিনি তিন মাস রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করেন। উক্ত বৎসরের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ এচ, আর, জেমস-এর আহ্বানে তিনি উক্ত কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করিয়া ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ১৯৩৫-৪০ সাল পর্য্যন্ত রাজশাহী কলেজে সহাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ হিসাবে কার্য্য করিয়া পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৪৬ সালে তথা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৬-৫৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে কার্য্য করেন। "Critical Theories & Poetic Practice in Lyrical Ballads" এর উপর তিনি ১৯২৯ সালে "ডক্টরেট" উপাধি পান।

প্রথম জীবনে শ্রীকুমার বাবু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যদু রায়ের (ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের সভাগায়ক) ভ্রাতুষ্পুত্র ৺আশুতোষ রায়ের নিকট নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদ গানে আশুতোষ বাবু অদ্বিতীয় ছিলেন।

১৯১১ সালে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৩২৯ সালে হাতিয়া গ্রামে এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ৺জলধর সেন, ৺অপরেশ মুখার্জ্জি প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ উঁহাতে যোগদান করেন। সেই সভায় শ্রীকুমার বাবু "রূপকথা" নামে একটি স্ব-লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উঁহা উচ্চপ্রশংসিত হওয়ায় "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বর্ত্তমানে আই-এর বাঙ্গালা পুস্তকে উঁহা সন্নিবেশিত আছে। ইহার পর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশঃ বাঙ্গালা রচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে আদৃত। তাঁহার লেখা "উনবিংশ শতকের গীতি-কবিতা সঙ্কলন"-এ আমরা পাই ১৮৫০ সালের পর হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বাংলার বহু জানা-অজানা কবির কবিতা সংগ্রহ। তিনি বহু পুরাতন ও অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা হইতে কবিতাগুলি সংগ্রহ করেন। এছাড়া তাঁহার 'সমালোচনা-সংগ্রহ' ও 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' পূর্ব্বোক্ত দুইটি পুস্তকের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পাঠ্য হিসাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতে শ্রীকুমার বাবু খেলাধূলায় অনুরক্ত ছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস কনট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে কার্য্য করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কলিকাতার
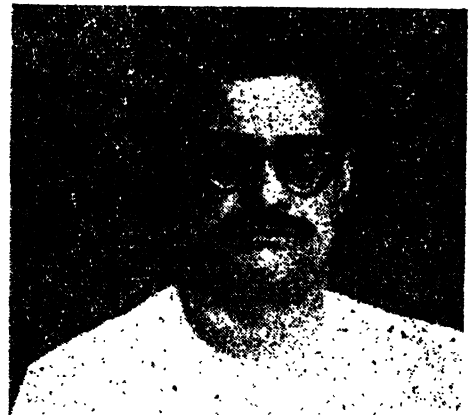
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ ময়দানে নিজস্ব খেলার মাঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। রাজ্য সরকারের খেলাধূলা সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে রচিত বিলের উপর তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৫২ সালে তিনি রামপুরহাট কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই সময় তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলসমূহের একীকরণ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। 'রবিবাসর,' 'নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন,' 'বোর্ড অব ষ্টাডিজ ইন মিউজিক'এর চেয়ারম্যান, আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি এখনও সক্রিয় ভাবে জড়িত আছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী সাহিত্যিক অনেকেই আছেন কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শক্তিশালীই নন নিঃসন্দেহে নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

উত্তর প্রদেশের জোনপুরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৺তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন সহর মুঙ্গেরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁদের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার বরানগরে। তারপর সেখান থেকে পূর্ণিয়া এবং পূর্ণিয়া থেকে নিজের কর্মকেন্দ্র মুঙ্গেরে চলে আসেন সপরিবারে শরদিন্দুর পিতা। তিনি বিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব ছিল না। তাই সমৃদ্ধ পারিবারিক পরিবেশে শরদিন্দুর বাল্যকাল কেটেছে। লেখার আগ্রহ তাঁর ছোটবেলা থেকেই। মা বিজলীপ্রভা দেবীর ভসম্ভব বই পড়ার ঝোঁক। বালক শরদিন্দু মায়ের সংগ্রহ করা বইগুলি পড়তেন। একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পড়ে তাঁর মনে অদ্ভুত প্রেরণা এল। তিনি গল্প লিখবেন ঠিক করলেন। এই ভাবে ভাবী সাহিত্যিকের হাতেখড়ি হল। স্থানীয় জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় পড়তে এলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলার অনেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তিনি। বিশেষ ফুটবল ও টেনিসে। কলকাতায় কেশব সেন ষ্ট্রীটের ওয়াই, এম, সি-এতে তিনি থাকতেন। এবং সেখানেই বাস্কেট বলের একটি দল গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে এই দলটি একাধিকবার ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্মান অর্জন করে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু এই সবের ফাঁকেও সাহিত্যচর্চা তাঁর সমানে চলছিল। এই সময়েই তিনি নিজের উদ্যোগে 'যৌবনস্মৃতি' নামে একটি ছোট্ট কবিতার বই প্রকাশ করেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় পত্রিকা প্রবাসীতে এর দীর্ঘ সমালোচনাও বেরিয়েছিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মুঙ্গেরের অন্যতম উকিল শ্যামলদাস চক্রবর্তীর নাতনী পারুলবালা দেবী শরদিন্দুর সহধর্ম্মিণী হয়ে আসেন।

কলকাতা থেকে বি-এ পাশ করার পর তিনি পাটনা থেকে ল' পাশ করেন। পিতা বিখ্যাত উকিল, সমস্ত রকম সুবিধা থাকা সত্বেও তিনি ওকালতি করেননি। কিছুদিন বার লাইব্রেরীতে ঘোরা-ফেরা করে পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করলেন এসে। কয়েকটি পত্রিকায় তখন তিনি লিখছেন। একদিন বসুমতীতে গল্প (উড়োমেঘ) পাঠালেন তিনি। প্রকাশও পেল কিন্তু গল্পের শেষের দিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে। তিনি কিছুটা রাগত ভাবেই সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্র দিলেন। উত্তর এল যথাসময়ে। সুন্দর প্রেরণাময় চিঠি। সম্পাদক জানিয়েছেন, লেখার অদলবদল করা হয়েছে লেখককে ছোট করার জন্যে নয়—রচনাটিকে আরো গতিশীল করার জন্যেই। এর পর বসুমতীতে তিনি প্রচুর লিখেছেন। এমন কি তাঁর বিখ্যাত ব্যোমকেশের প্রথম আত্মপ্রকাশ এখানেই।

১৯৩৮ সালে তাঁর বম্বে যাওয়ার আহ্বান আসে। বম্বে টকিজের হিমাংশু রায়ের একজন বাঙ্গালী কাহিনীকারের প্রয়োজন ছিল। ওই সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কেও আহ্বান জানান হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে শরদিন্দুই নির্ব্বাচিত হন। সেই থেকে তিনি পশ্চিম-ভারতেই আছেন। উপস্থিত তিনি আর কনট্রাক্টের বাঁধাবাঁধির মধ্যে নেই। স্বাধীন ভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁর বহু কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। তার মধ্যে ভাবী, নবজীবন, দুর্গা, পুনর্মিলন, আজাদ, মুকাদ্দার ইত্যাদি ছবি দর্শকদের চিত্তজয় করেছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরদিন্দুর স্থান একক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সাহিত্যের দরবারে যুগান্তর এনেছে। জাতিস্মর, বিষকন্যা, কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, তুমি সন্ধ্যার মেঘ ইত্যাদি যে শুধু রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট উদাহারণ তাই নয় বরং ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ডিটেক্টিভ কাহিনী রচনায় তিনি ভারতের কোনেন ডায়েল। তাঁর অমর সৃষ্টি ব্যোমকেশের কীর্ত্তিকলাপে পাঠক-সমাজ চমৎকৃত! ব্যক্তিগত জীবনে শরদিন্দু অত্যন্ত

সদালাপী ও রসিক। উপস্থিত তিনি পুণায় বাড়ী করে বসবাস করছেন। তাঁর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগিনী মানুরাণী মুখোপাধ্যায় স্ব স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর তিন পুত্র—সকলেই কৃতিমান। তাঁর মধ্যম পুত্র শান্থু বন্দ্যোপাধ্যায় বম্বের একজন উদীয়মান চিত্রপরিচালক।

প্রকৃতপক্ষে শরদিন্দু সারা জীবন সাহিত্যই করে- চলেছেন। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসেন। গত বছর আনন্দবাজার তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে সম্বর্দ্ধিত করেছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

[পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল]

অপূর্ব্ব কর্ম্মতৎপর, সাহসী ও কর্ম্মদক্ষ এ পুরুষটি। মুখে সর্ব্বদাই হাসি। এঁকে ঠিক পুলিশ অফিসার হিসেবে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন দেখেন না। সাংবাদিক হিসেবে এই পদস্থ পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি দীর্ঘকাল। কিন্তু একটি দিনও তাঁকে গম্ভীর হতে কিম্বা মেজাজ খারাপ করতে দেখিনি। কঠোর দায়িত্ব সম্পাদনের কার্য্যে লিপ্ত থাকা কালে দেখেছি তাঁর সদাহাস্যময় মুখখানি। কিন্তু এঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যখনই যে কাজের আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে, যত কঠিনই হোক না কেন, সুষ্ঠুভাবে ও অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তিনি তা সম্পন্ন করে আসছেন অক্লান্ত ভাবে কোন নিন্দা বা স্তুতির অপেক্ষা না করে। যখনই প্রয়োজন হয়েছে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তিনি এগিয়ে গেছেন কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে। অসাধারণ সংগঠনী শক্তি নিহিত আছে এঁর কর্ম্মধারায় আর তার সাথে রয়েছে বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই মূলধন নিয়েই শ্রী বসু এগিয়ে চলেছেন তাঁর কর্ম্মজীবনে এবং এ কয়টি মূলধনের সহায়তায় আজ তিনি পুলিশ বিভাগে এতখানি উচ্চ আসন ও মর্য্যাদা লাভ করেছেন। আর একটি মহান্ আদর্শ রয়েছে শ্রী বসুর জীবনে। তিনি নিজেকে সর্ব্বদাই জনগণের সেবক বলে মনে করেন। শুধু পুলিশ অফিসার হিসেবেই নয়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে। নিজের কর্ম্মময় জীবনধারায় তিনি এই আদর্শেরই একনিষ্ঠ পূজারী।

'পুলিশ বিভাগে চাকরি করতে হবে এ কখনই ভাবিনি। শুধু আমিই নয় আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব কিম্বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন কোন দিন মনে করেন নি। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে আমি শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাব্রতী হয়ে কাজ করি। আমার পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল অক্সফোর্ড-এর ডিগ্রি নিয়ে এসে শিক্ষা বিভাগে আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু লোকে ভাবে এক, আর হয় এক। ঠিক এমনই দিনেই আমার পিতৃদেবের টাকা যে ব্যাঙ্কে ছিল, সেই ব্যাঙ্ক ফেল্ হলো। এদিকে আমার পিতৃদেবও তখন বৃদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে আমার কর্ম্মগ্রহণ। নতুবা আজ আমি পুলিশ অফিসার না হয়ে শিক্ষাব্রতী হিসেবেই পরিচিত হতুম।'—এ কয়েকটি কথা শ্রীবসু আমাকে বললেন আলোচনা প্রসঙ্গে।

শ্রীবসুর পৈত্রিক বাসভূমি পূর্ব্ববঙ্গের (বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তান) যশোর জেলার ঝিনাইদাতে হলেও তিনি কখনও নিজের পৈত্রিক বাসভূমিতে যাননি। ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতার বাগবাজারে তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় সনৎকুমার ঘোষের বাড়ীতে শ্রীবসুর জন্ম। পিতা ছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ দুর্গাপদ বসু। দুই বৎসর বয়সে শ্রীবসু তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে হারান। সেই থেকে তিনি মামার বাড়ীতে লালিত-পালিত। তার পর তাঁর বাল্য, শৈশব ও ছাত্রজীবন কাটে এ ক'লকাতা মহানগরীতেই। ১৯২৯ সালে সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল (মেন) থেকে তিনি চারটি 'লেটার'সহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সালে ক'লকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই, এ, পরীক্ষায় পঞ্চদশ স্থান অধিকার করে উক্ত কলেজেই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি, এ, পড়তে থাকেন এবং ১৯৩৪ সালে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে ১ম হয়ে সসম্মানে বি, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তার পর শ্রীবসু এম, এ, কোর্স ও দুই বৎসর আইনও পড়েন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এবং ইণ্ডিয়ান অডিট ও একাউন্টস সার্ভিসে পরীক্ষা প্রদানের জন্য তাঁর এম, এ, ও আইন পরীক্ষা দেওয়া হলো না। হাতের লেখা খারাপের অজুহাতে ৫ নম্বর কাটা যাওয়ার জন্যে শ্রীবসুর শেষ পর্য্যন্ত অডিট ও একাউন্টস সার্ভিসে যোগ দেওয়া হলো না।

বি, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি ডেপুটি সুপার হিসেবে সরকারী কাজে যোগদান করলেন ১৯৩৮ সালে। ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা গ্রহণান্তে প্রথমে নদীয়ায় তার পর সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার হিসেবে ২৪ পরগণা জিলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় যোগদান করেন। এর পর শ্রী বসু রাজসাহী, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে কাজ করেন। তিনি মেদিনীপুরে পুলিশ সুপার থাকাকালীন ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন

শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ১৫ই আগষ্ট ভারতের শ্রেষ্ঠ মহানগরী কলিকাতায় পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কার্য্যে যোগদান করেন। এই কাজে তিনি প্রশংসার সঙ্গে ১৯৫২ সাল অবধি কাজ করেন। তারপর অল্প কিছুদিনের জন্যে ২৪ পরগণা জিলার আলিপুরে পুলিশ সুপার হন। ১৯৫৪ সালে শ্রী বসু পুনরায় কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার হ'য়ে আসেন। ১৯৫৫ সালে কলকাতা পুলিশের সদর কার্য্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার হন। ১৯৫৬ সালে পুলিশের নর্দার্ণ রেঞ্জের (জলপাইগুড়ি সদর কার্য্যালয়) ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল হিসেবে কলকাতায় বদলী হন এবং তখন হ'তে অদ্যাবধি ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেলের দায়িত্বভার বহন করে চলেছেন নিরলস ভাবে।

পুলিশ বিভাগে কাজ করবার সময় শ্রী বসু কয়েকটি দুঃসাহসিক কাজ করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্থানাভাবে এখানে মাত্র দু'টি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রথমটি হচ্ছে ১৯৪৭ সালে। শ্রী বসু তখন মেদিনীপুরে। সেই সময় খড়গপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। পরে ঐ দাঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করে। দাঙ্গাকারীরা উভয় পক্ষেই বন্দুক, ছোরা, তরবারি, বোমা ও গোলাগুলী ব্যবহার করে।

এই বিধ্বংসী দাঙ্গার মাঝে সহসা কোন লোক যেতে চায় না। শ্রীবসু নিজের জীবন বিপন্ন করে স্বেচ্ছায় দাঙ্গা দমনে এগিয়ে গেলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ না করেই দাঙ্গা প্রশমিত করেন। শ্রীবসুর উপস্থিতিতেই দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে। তারপর ১৯৪৮ সালে ক'লকাতার আপার সারকুলার রোডে শ্রীবসুর জীবন বিপন্ন হয়। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত তাহার অসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাঁহার জীবন রক্ষা পায় ও তিনি বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন এবং দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে। ঘটনাটি ঘটে মহরমের শোভাযাত্রার সময়। শোভাযাত্রাটি যখন আপার সারকুলার রোডস্থ বিজ্ঞান-কলেজের সম্মুখে উপনীত হয় তখনই ঘটনাটি ঘটে। জনৈক ভদ্রলোক সারকুলার রোডে ফুটপাত ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ইতোমধ্যে শোভাযাত্রাকারীরা ভদ্রলোককে আক্রমণ করে এবং ভদ্রলোকের মস্তকে আঘাত করে। ভদ্রলোক রক্তাক্ত অবস্থায় ফুটপাতে পড়িয়া যায়। শ্রীবসু ঘটনাস্থলের অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সাদা পোষাক পরিহিত কয়েকজন মাত্র কনষ্টেবল ছিল। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি একাকী ক্রুদ্ধ ও নৃশংস জনতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ভদ্রলোকটিকে রক্ষার জন্য। সেদিন শ্রীবসু ঐ ভাবে অকুস্থলে না গেলে ভদ্রলোকের জীবন রক্ষার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীবসু ভদ্রলোকটিকে ধরে তোলবার সঙ্গেই ক্রোধান্ধ জনতা তাঁকে আক্রমণ করলো। তিনি গত্যন্তর না দেখে জীবন রক্ষার জন্যে তাঁর রিভলভার থেকে ১ রাউণ্ড গুলী করেন জনতার পা লক্ষ্য করে। ফলে ১ জন পায়ে আঘাত লেগে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মুসলমান পলায়ন করে। ক্রমে শ্রীবসু ভীষণ দাঙ্গা প্রশমিত করেন সেদিন। সবাই মনে করেছিলেন, শ্রীবসু বেঁচে আসতে পারবেন না। কিন্তু নিজের কর্ত্তব্যের কাছে কোন শক্তিই সেদিন তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

খুব সম্ভবতঃ একথা অনেকেই জানেন না যে, বাল্যকাল থেকেই শ্রীবসু সাহিত্যচর্চ্চা করে আসছেন। "বঙ্গশ্রী" "বিচিত্রা" ও "শ্রীহর্ষ" মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁহার বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অদ্যাবধি তিনি সাহিত্যচর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। একদিন স্বর্গত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশাই শ্রী বসুর গল্পের প্রশংসা করেছেন।

শ্রী বসু ১৯৪১ সালে গৌরী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী একজন বিদুষী মহিলা ও প্রখ্যাত শিল্পী। তিনটি সন্তানের জননী হয়েও ১৯৫৩ সালে শ্রীমতী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গীতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। শ্রী বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অশোককুমার ১৯৫৮ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে। তার সাফল্যের মূলে রয়েছেন শ্রীমানের মাতা গৌরী দেবী ও শ্রীবসু। তাঁরা উভয়েই ছেলের লেখাপড়ায় সাহায্য করেছেন সক্রিয় ভাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রী বসু অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করেন। ক্লাব, খেলাধুলো হৈ-হুল্লোড় তাঁর ভাল লাগে না। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চ্চা, পড়া ও গানবাজনা নিয়েই সময় অতিবাহিত করতে ভালবাসেন। নিরহঙ্কার, সদালাপী, বন্ধুবৎসল প্রভৃতি বহুগুণে তিনি বিভূষিত। জনগণের সেবাই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। আমরা এই গুণী, বিদ্বান ও সৎ অফিসারটির দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি বহুদিন জীবিত থেকে দেশের ও জনগণের কল্যাণ-সাধন করুন।

রমণী

শ্রীমতী তৃপ্তি সোম

তুমি যে রমণী
তোমার পূর্ণতা নহে রজত-কাঞ্চনে
রূপের গরবে তুমি নহ বিজয়িনী।

নারীত্বের মাতৃত্বের অনন্ত গৌরব
তোমাতে নিহিত ; তব অন্তর সৌরভ।

সে সুরভি জয় করে সবাকার মন—
মমতা ও সেবা-হস্ত, মিষ্ট আলাপন।

শ্রান্ত-ক্লান্ত-রিক্ত-চিত্তে স্নেহ-সঞ্চারিণী
তুমি পূর্ণ তুমি ধন্য তুমি বিজয়িনী।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েও গোবিন্দজী দর্শন করেনি তপন। অথচ তাকেই গিয়ে ধরলেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী: আমাকে হরিদ্বারে নিয়ে যাবি বাবা?

আমি?

তুই না নিয়ে গেলে আমার আর যাওয়াই হয় না।

কিন্তু আরও গুরুতর কারণ আছে তপনের বিস্মিত হবার। এবার তাই প্রকাশ হয়ে পড়ল তার প্রশ্নে।

এতদিন যাওয়া হয়নি কেন, মাসীমা? তীর্থ তো কম করনি তুমি?

আসল কারণটা জানা গেল মোক্ষদার ষাট বছর বয়সের জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের কাছ থেকে। কেবল হরিদ্বার কেন, মাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে কেদারবদরী পর্যন্ত যাবার একটা ইচ্ছা অনেক দিন যাবৎ তিনি মনে মনে পোষণ করে আসছেন বলে দু'-একবার সুযোগ থাকলেও জননীকে তিনি হরিদ্বার যেতে দেননি। কিন্তু বিধি তার উপর বাম বলেই বুঝি চাকরি ছেড়ে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজে বাতে একেবারে অচল হয়ে পড়েছেন। এরকম অবস্থায় আর একজনের সঙ্গে এই সময় মোক্ষদাকে পাঠাতে না পারলে এ জীবনে বৃদ্ধার আর হরিদ্বার দর্শন হয় না।

আশীর কোঠায় পড়েছেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী। তাঁর জরাজীর্ণ দেহখানির দিকে চেয়ে তপন মৃদু হেসে বললে, তুমি সচল আছ নাকি মাসীমা? হরিদ্বার পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে উপরে উঠে ঠাকুর দেখতে পারবে তুমি?

খুব পারব বাবা!

বেশ দৃঢ় কণ্ঠস্বর বৃদ্ধার। কাতরতা যেটুকু তা কেবল তার চোখের দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টি অনুনয়ের।

তবু সংশয় দূর হয় না তপনের মন থেকে। কিছুক্ষণ পর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, অত দূরে তুমি কেন যেতে চাও মাসীমা? কি দেখবে তুমি হরিদ্বারে গিয়ে?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন মোক্ষদা, হরগৌরী দর্শন করব বাবা!

সে তো কাশীতেও দেখেছ তুমি। দেখ নি?

সে তো বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা।

হরগৌরী আলাদা নাকি?

তা কেন? তবু—

বলতে বলতে থেমে গেলেন মোক্ষদা; কিন্তু একটু পরেই তিনি গাঢ়স্বরে আবার বললেন, ছেলেবেলা থেকেই আমার গৌরী দর্শন করবার সাধ। পূজা হত তো আমাদের বাড়ীতে। তখন আগমনীর গান শুনতাম আর মনে হত যে হিমালয়ে গৌরীর বাপের বাড়ীতে গিয়ে সেই কুমারীরূপে মাকে দর্শন করব।

ত্রৈলোক্যনাথ খপ করে তপনের ডান হাতখানা চেপে ধরে বললেন, তুমি তপন, কথা রাখ আমাদের, মাকে নিয়ে যাও হরিদ্বারে। ঘুরে ঘুরে বেড়ানোই তো তোমার স্বভাব। আর হরিদ্বার তো তোমার বেশ চেনা জায়গা।

সেই জন্যই তো আপত্তিও আমার বেশী, উত্তর দিল তপন: হরিদ্বার তো বাংলাদেশ নয়, দাদা! মাসীমার এ সাধ মিটবে না সেখানে গিয়ে। মাঝে থেকে আমারই বদনাম বাড়বে। মাসীমা হয়তো শেষে বলবেন যে আমার মত পাষণ্ডের সঙ্গে গিয়েছেন বলেই গৌরী দর্শন দিলেন না তাকে।

কিন্তু কোন ওজর, কোন আপত্তিই খাটল না তপনের। শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল তাকে। তারপর পাজি দেখে এক শুভ দিনে দেরাদুন এক্সপ্রেস যোগে হরিদ্বার যাত্রা।

ভোর হল লাকসার ষ্টেশনে। তপনের চেনা পথ, পরিচিত দৃশ্য। তবু যেন মায়াকাজল লেগেছে তার চোখে!

বাঁ দিকে বিচিত্র দৃশ্য সব। দিগন্ত অদৃশ্য হয়েছে। যতদূর চোখ যায় দেখা যায় শুধু পর্বতশ্রেণী। অতুলনীয় তার রূপ! নাই বা ঝলকে উঠল তুষারের মুকুট, নাই বা মেঘ মেঘলোক ছাড়িয়ে উঠল তার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। তথাপি সে হিমালয়। বিরাট তার গঠন, বিপুল সমৃদ্ধি। অরণ্য-সম্পদের আংশিক প্রকাশেও অপরিমেয়তার ইঙ্গিত। শেষ বর্ষার প্রকৃতি। বিজয়ী প্রাণের ধ্বজা উঠেছে যেন নিষ্প্রাণ পাষাণের কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ করে। ঢাকা পড়ে গিয়েছে পাহাড়ের শিলাময় রূপ। গাছে গাছে পাতার ঠাস বুননি। শ্যাম আর সবুজের নিবিড় কোলাকুলি। স্তরের পর স্তর ঐ ঘন সবুজের সমারোহ। উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সবুজের সমুদ্র যেন অকস্মাৎ কোন দেবাদিদেবের দর্শন লাভ করে সসম্ভ্রম বিস্ময়ে নির্বাক ও নিশ্চল হয়ে গিয়েছে।

ভোর থেকেই মালা জপছিলেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী। তথাপি তাকেই সম্বোধন করে তপন বললে, দেখ মাসীমা, কি সুন্দর!

জপ বন্ধ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন মোক্ষদা ; তারপর বললেন, কি দেখতে বলছিস ? এ তো ঝোপ।

ক্ষুণ্ণ হল তপন ; কিন্তু হেসেই সে বললে, রাজার বাড়ীকে বলছ ঝোপ ? কোন সেপাই কোটালের কানে গিয়ে থাকলে হাতে মাথা কেটে নেবে তোমার। এই তো হিমালয় তোমাদের গৌরীর বাপের বাড়ী।

অ্যাঁ !—চমকে উঠলেন মোক্ষদা।

তপন বললে, হ্যাঁ মাসীমা, হরিদ্বার এসে গেল আর কি।

শুনে দুই হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করলেন মোক্ষদা, তথাপি বিহ্বল তাঁর ভাব।

গাড়ী তখন গজেন্দ্র গমনে একটি পুলের উপর উঠছে। নীচে খালের মত একটি নদী। তবু তাই দেখেই বুঝি সহযাত্রী একদল রাজপুতানী সমস্বরে সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলে জয়ধ্বনি দিল : জয় জয় গঙ্গা মাঈকী জয়।

মোক্ষদা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এই গঙ্গা নাকি রে তপু!

তপন উত্তরে বললে, স্বয়ং গঙ্গা না হলেও তাঁরই কোন বোন হবেন।

কি বলছিস তুই ?

তাই বই কি মাসীমা! ইনিও তো শিবের জটা থেকেই নেমে আসছেন।

উত্তর মনঃপুত হল না মোক্ষদার, হবার কথাও নয়। কিন্তু আবার তিনি তাকালেন নীচের সেই নদীর দিকে। গাড়ী পুল পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর তা যখন আর দেখা গেল না, তখন ফিরে তপনের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তেরাতাতার কথা আগে নয় রে তপু! গাড়ী থেকে নেমেই আমায় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাবি। কলুষনাশিনী গঙ্গা। সত্যিই তো, শিবের জটা থেকে নেমে এই হরিদ্বারেই তিনি প্রথম মর্তের মাটি ছুঁয়েছেন আমার মত পাপী-তাপীর কল্যাণ ও মুক্তির জন্য। আগে গঙ্গায় ডুব না দিয়ে আর কোন কাজ নয়।

রিক্সা গিয়ে থামল ভোলাগিরির আশ্রমের কাছে। রিক্সাওয়ালা ভাঙা বাংলায় মোক্ষদাকে বুঝাতে চেষ্টা করল যে নিকটেই যে ধর্মশালা আছে সেখান থেকে তিনি রাত-দিন গঙ্গা দর্শন করতে পারবেন বলেই বিশেষ করে ঐ জায়গাতেই মাঈজীকে নিয়ে এসেছে সে।

ততক্ষণে দর্শন পেয়ে গিয়েছেন মোক্ষদা। একেবারে কূলে কূলে পরিপূর্ণ বাঁধা ঘাটের প্রায় সব ক'টি সিঁড়ি অতিক্রম করেছে জল—পথে দাঁড়িয়েই নীচু দেয়ালের উপর দিয়ে বেশ দেখা যায়। প্রস্থে তেমন বিশালতা না থাকুক, পরিপূর্ণতায় ফাঁক বা ফাঁকি একেবারেই নেই। ওপারে কনখলের দিকে সযত্ন-রোপিত তরুশ্রেণীর নিবিড় শ্যামলতার অন্তরালে সিমেণ্ট-কংক্রীটের পাকা গাঁথুনি চোখেই পড়ে না। মাঝে শুধু জল আর জল। তরঙ্গ নেই, কুটিল আবর্ত নেই। আছে শুধু গতি—বিপুল, বিশাল জলধারার অবিরাম ক্ষুরধার গতি। আর আছে যেন নিখুঁত, তানলয়সমন্বিত অসংখ্য জলতরঙ্গের সমাপ্তিহীন সুললিত ঐকতান সঙ্গীত।

একরকম ছুটেই ঘাটে গেলেন মোক্ষদা। অঞ্জলি ভরে জল তুলে তুলে মাথায়, মুখে সিঞ্চন করতে করতে তপনকে ডেকে বললেন, তোর মন না চায় তো ওখানেই দাঁড়া তুই। আমি দুটি ডুব দিয়ে সকল জ্বালা জুড়াই।

শুনে কিন্তু রীতিমত ভয় পেয়ে গেল তপন। ওটি স্নানের ঘাট হলে কি হবে, স্রোত এত প্রখর যে তার নিজেরই সাহস হয় না ঐ ঘাটে জলে নেমে স্নান করতে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, সে কি মাসীমা, এই গঙ্গায় নেমে ডুব দেবে তুমি ? মনে নেই ঐরাবতের কি দশা হয়েছিল ?

হেসে উত্তর দিলেন মোক্ষদা, ঐরাবতের মনে পাপ ছিল বলেই অমন দুর্দশা হয়েছিল তার। আমি হলেম গিয়ে মায়ের বেটা। আমি তো গঙ্গার কোলে গিয়ে বসব। আমার ভয় কিসের ?

হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল তপনের মাথায়। সে বললে, তাই বলে তীর্থ করতে এসে এই অস্থানে ডুব দেবে তুমি ? এ তো গঙ্গা নয়, নহর—মানে খাল। মানুষে কেটেছে গঙ্গার জলকে তাদের চাষের কাজে লাগাবার জন্য।

অ্যাঁ !—চমকে উঠলেন মোক্ষদা।

হাসি চেপে আরও গম্ভীর স্বরে তপন বললে, হ্যাঁ মাসীমা, এটি খাল। আসল তীর্থ হল গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ড। সেখানে গঙ্গা আছেন স্বয়ং ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে। সেখানেই যদি ডুব না দেবে তবে ঘরে কাছের কলকাতার গঙ্গা ছেড়ে এত দূরে এলে কেন তুমি ?

যুক্তি খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেন না মোক্ষদা। কিন্তু জেদ করে বললেন, তাহলে সেখানেই চল। মোট কথা, গঙ্গায় ডুব না দিয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।

অগত্যা আবার চলতে হল তপনকে ; জিনিসপত্র থাকলো ধর্মশালায়।

সঙ্গ. নয়, কিন্তু বিভক্ত হবার পূর্বের অবস্থা ওখানে গঙ্গার। সুতরাং আরও বিপুল তার আয়তন, প্রবল তার উচ্ছ্বাস, খরতর তার গতি। কিন্তু সে তো অনেক দূর—হরকি পৌড়ীর প্রশস্ত ও সুদৃঢ় বলয়বেষ্টনী অতিক্রম করে অত দূরে দৃষ্টি চলে না মোক্ষদার। সঙ্কীর্ণায়তন ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে এসে তিনি যেন থ হয়ে গেলেন—এই গঙ্গা নাকি!

ততক্ষণে পাণ্ডা জুটে গিয়েছে। সে-ই হাত-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে বললে, সমুদ্র-মন্থনের অমৃত দেবতাদের ভাণ্ড থেকে ঠিক এই জায়গাতেই উপচে পড়েছিল। এখানে ডুব দিয়ে স্নান করতে পারলে মোক্ষদার স্বর্গলাভ ঠেকায় কে।

কিন্তু ডুব দেওয়া কি অত সহজ! সেটি যোগস্নানের দিন না হলেও স্নানের সময় তো বটেই। স্নানার্থীর ভিড় মন্দ জমেনি। তাদের সঙ্গে আছে আবার পাণ্ডা, দোকানদার, ফেরিওয়ালা ও ভিখারীর ভিড়। ঠেলে এগুনো যায় না জলের দিকে।

অনেক চেষ্টার পর জলে যখন পা ফেলা গেল, তখনই আর এক ফ্যাসাদ। হুস করে মোক্ষদার প্রায় পায়ের কাছেই ভেসে উঠল গোটা দুই মাছ। অস্ফুট আর্তনাদ করে হাত তুলে, পা টেনে নিয়ে দূরে সরে গেলেন তিনি।

হৈ হৈ করে উঠল একটি বাঙালী যুবকের দল। অনেক চার নষ্ট করেও শেষ বর্ষার ঘোলা জলে এতক্ষণ একটি মাছও দেখতে পায়নি তারা। এখন দেখে তাদের আনন্দের আর সীমা নেই।

কিন্তু নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণের বিধবা মোক্ষদা। বাড়ীতে মাছ তিনি স্পর্শও করেন না, দেখলেও বোধ করি নিজেকে অশুচি মনে করেন। আর এই মহাতীর্থ হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটেই কিনা—

বুঝতে পেরে হেসে ফেলল তপন। সে বললে, এ মাছ অশুচি নয় মাসীমা! কেউ তো খায় না এ মাছ—দেখছ না, বরং খাওয়ায় মাছেদের।

তাই বলে ছুঁয়ে দেবে আমায়? আর এই জলে আমি ডুব দেব?

বুঝতে পেরে পাণ্ডাও অভয় দিল মোক্ষদাকে; আরও একটু বাড়িয়ে সে বললে, ওরা তো গঙ্গাজীর সন্তান—পরম পবিত্র জীব। এ তীর্থে গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মছলিরও পুজা করতে হয়। তুমিও ভোগ লাগাও মাঈজী, গুলি কিনে জলে ছিটিয়ে দাও।

আটার সঙ্গে হয়তো আরও কি কি মিশিয়ে ছোট ছোট নাড়ুর আকারে তৈরি হয়েছে মাছেদের মিষ্টান্ন। ও-জিনিস যারা বেচছিল তাদেরও কয়েকজন ততক্ষণে মোক্ষদার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে তপন যেন মজা পেয়ে গেল। সে বললে, তাই তো মাসীমা, হরিদ্বার-হৃষীকেশে এসে মাছের পুজা না করলে কি চলে? এস, আমরা দুজনেই ভোগ লাগাই।

আট আনার নাড়ু কিনে নিয়ে এল সে; অনেকগুলি গুঁজে দিল মোক্ষদার হাতে; তার হাত দিয়ে নিজেই সে অনেকগুলি নাড়ু জলে ছড়িয়ে দিল।

এত বড় ভোজের নিমন্ত্রণ বৃথা যাবার নয়। ভেসে উঠল মাছ। দুটি-একটি নয়, এক ঝাঁক। সিঁড়ি পর্যন্ত ছুটে এল কয়েকটি মাছ—মোক্ষদার পায়ের ঠিক নীচেই।

বড় বড় মহাশোল সব। গায়ের রং কালচে—শেওলাই জমেছে বোধ করি। কিন্তু লেজের দিকটা হলুদবর্ণ। সবটা মিলে ঘোলা জলেও চিক-চিক করছে। পাখনা মেলে, গা ভাসিয়ে, নির্ভয়ে সাঁতার কাটছে ওরা। মাঝে মাঝে হাঁ করছে। যেন একদল অবোধ শিশু হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছুড়ে আঁকু-পাঁকু করছে।

আবার হৈ-হৈ করে উঠল সেই বাঙালী যুবকের দল; তপনও উৎফুল্ল হয়ে পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললে, তোমার পুজা ওরা গ্রহণ করেছে মাসীমা; দেখছ না, আরও ভোগ চাচ্ছে তোমার কাছে।

ততক্ষণে অনেক বদলে গিয়েছিলেন মোক্ষদা। তাকিয়ে দেখছিলেন মাছেদের খেলা। কিন্তু তপনের কথা শুনে একটু যেন লজ্জা পেলেন তিনি। বললেন, নে বাপু, এখন ওদের সরিয়ে দে ঘাট থেকে। একটা ডুব দিয়ে শুদ্ধ হই আমি।

কিন্তু স্নান শেষ হতেই আর এক গোঁ তার—তখনই হরগৌরী দর্শন করবেন তিনি।

অগ্নিতে ইন্ধন দিল পাণ্ডা। সে বললে, চল বুড়ী মায়ী, বিল্বকেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে যাই তোমাকে; কাছেই সতীকুণ্ড। স্বয়ম্ভু শিব আর জাগ্রত গৌরী। দর্শন করলে জনম সার্থক হোবে।

দ্বিতীয় গোঁ মোক্ষদার—তিনি পদব্রজে মন্দিরে যাবেন।

শুনে অমন যাদু পাণ্ডাও শঙ্কিত হয়ে বললে, অত দূরের পথ কি হেঁটে যাওয়া যায়? আতুরে নিয়মো নাস্তি। রেলগাড়ীতে এলে যেমন দোষ হয় না, টাঙ্গায় চাপলেও তেমনি।

তবে পদব্রজে যাবার সাধও মিটল মোক্ষদার। মন্দিরের কাছাকাছি এসে টাঙ্গা থেমে গেল। সামনে চড়াই, গাড়ী আর যাবে না।

একটি টিলার উপর বিল্বকেশ্বরের মন্দির। তেমন খাড়া বা খুব দীর্ঘ পথ না হলেও উপরে উঠা বেশ কষ্টকর। দম নেবার জন্ত দু'বার থামতে হল মোক্ষদাকে। তাঁর ক্লান্তির চেয়ে প্রত্যাশাই তার বেশী—স্বভাবনিষ্প্রভ চোখ দুটিও তার জ্বল-জ্বল করছে যেন।

কিন্তু দেখলেন কি! উঁচু পাহাড় ও সবুজের সমারোহ যা তা ঐ টিলার পিছনে। ততদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না বৃদ্ধার। যে শিখরে বিল্বকেশ্বরের মন্দির সেটি নেড়া পাহাড়। দু'-তিনটি মোটে গাছ, তা-ও শাখাসর্বস্ব। ওদের মুখে ও মাথায় বিগত বসন্তে মলয়ানিলের সপ্রেম চুম্বন কোন শিহরণই যেন জাগাতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে ওদের মূলে গতবর্ষার অবিরাম বারিসিঞ্চন। ঠিক যে গাছটির নীচে মন্দির তার পাতা দেখে বোঝবার জো নেই যে তা বেলগাছ না নিমগাছ।

নেড়া-নেড়া দেখায় মন্দিরটিও। পাথরের দেয়াল, পাথরের চূড়া, শিলাস্তম্ভের উপরেই নাটমন্দির বা বারান্দার ছাদ। সব নিয়েও মনে হয় যেন ছোট একখানি কুটির। পারিপাট্যহীন গঠন, বিবর্ণ। প্রাঙ্গণ মসৃণ মোটেই নয়। পাথরের কোণগুলি মাঝে মাঝে বর্শাফলকের মত উঁচু হয়ে রয়েছে।

বিহ্বলের মত চারিদিকে তাকাতে তাকাতে মোক্ষদা বললেন, এই মন্দির নাকি?

হ্যাঁ, বুড়ী মায়ী, পাণ্ডা উত্তরে বললে, মন্দিরে আছেন বিল্বকেশ্বর, আর এই হল গিয়ে কালভৈরব। একে আগে পুজা করে খুশী করতে পারলে তবে মহাদেবের দর্শন মিলবে।

বাড়ীতে কুলুঙ্গিতে যেমন বসানো থাকে সাধারণ গৃহস্থের গৃহ-দেবতা তেমনই ভৈরবের বিগ্রহ। ফুল-পাতার ছড়াছড়ি ওর চারিদিকেই, চাপ চাপ সিঁদুরের ফোঁটা ওর সারা গায়ে। পাথরের মূর্তি ভাল করে চোখেই পড়ে না! মোক্ষদা অসহায়ের মত বললেন, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি নে বাবা!

বিগ্রহের পায়ের কাছের ফুলপাতা কিছু কিছু সরিয়ে দিয়ে পূজারী বললে, ভৈরব বড় ভয়ঙ্কর আছে। তুমি এই তার চরণ দর্শন কর, গড় কর, দক্ষিণা দাও। তাহলেই ভৈরবজীর হুকুম পেয়ে যাবে তুমি।

নির্দেশ পালন করলেন মোক্ষদা। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ হবার পর একটি সিকি রাখলেন বিগ্রহের পায়ের কাছে; পূজারী ও পাণ্ডাকে দিলেন এক একটি দু'আনি।

তাতেই খুশী ওরা। পূজারী বললে, যো আপকী ইচ্ছা। যেমন প্রভু তেমনি তার ভৈরব। অল্পেই তুষ্ট। লেকিন হ্যাঁ, ভক্তি চাহিয়ে। ফিন গড় করো।

মূল মন্দিরের কাছে গিয়ে আবার মুখর হয়ে উঠল পাণ্ডা: এই বিল্বকেশ্বর স্বয়ম্ভু শিব। এইখানে সতীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন তিনি। তুমিও ভক্তি করে পুজা চড়াও মায়ী, তোমারও পরমগতি হোবে। বলতে বলতে ঝুলন্ত ঘণ্টার শিকল টেনে দিল সে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। প্রতিধ্বনি বললে—ওম ওম ওম—

গায়ে কাঁটা দিল মোক্ষদার। কিন্তু শিব কোথায়?

কালো পাথরের বাতায়নহীন মন্দিরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। তাকেই যেন গাঢ়তর করেছে তেমনি কালো পাথরের এক যন্ত্রবেষ্টনী। তার মধ্যে শিবলিঙ্গ। ক্ষীণদৃষ্টি মোক্ষদার চোখে পড়বার কথা নয় তা।

তাই অনুমান করে পাণ্ডা মোক্ষদার ডানহাতখানি নিজেই টেনে নিয়ে শিবলিঙ্গের উপর স্থাপন করে বললে, বাবার খুব কৃপা হয়েছে তোমার উপর বুড়ী মায়ী—আপন ছোঁয়া তোমাকে আগে দিতে চাইছেন। এই তো শিব,—দেবাদিদেব মহাদেব। এখন শ্রীমুখের দিকে চাও, দর্শন কর।

স্পর্শলাভ অপ্রত্যাশিত; কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসলেন মোক্ষদা, তারপর একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। কপালটা ঠক করে পড়ল বুঝি গৌরী-পট্টের উপর। কিন্তু উঠে স্থির হয়ে বসবার পর আবারও তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন, কিন্তু মহাদেব কোথায়, বাবা? আমি যে হরগৌরী দর্শন করব বলে এতদূরে এসেছি।

আশাভঙ্গের বেদনায় ঝঙ্কার মোক্ষদার কণ্ঠস্বরে। তাঁর মনের অবস্থা কিছু কিছু অনুমান করে তপন এগিয়ে এসে তাঁকে বললে এই তো মহাদেব, মাসীমা,—এই তো তাঁর নির্বাণ রূপ। কাশীতেও তো তাই।

পাণ্ডাও বললে, হ্যাঁ মায়ী, হর হর মহাদেব এই তোমার সামনে। আর গৌরী আছেন নীচে সতীকুণ্ডে। নাও, এখন পূজা শেষ কর।

পূজার অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত। ঘটভরা জল শিবলিঙ্গের উপর ঢাললেই হল। ফুল-বেলপাতা ইচ্ছা হয় দাও, না দিলেও পূজার অঙ্গহানি হবে না। ভোগ বা ভোগমূল্যও যাত্রীর সাধ্য বা ইচ্ছানুরূপ। কোন দিকেই তেমন দাবী-দাওয়া নেই।

কিন্তু মোক্ষদা পূজা করলেন যন্ত্রচালিতার মত। মন্দির-পরিক্রমা শেষ করবার পরেও তৃপ্তির প্রসন্নতা ফুটে উঠল না তাঁর মুখে। দুটি চোখ তাঁর চঞ্চল হয়ে যেন তখনও তাঁর বাঞ্ছিত দেবতাকে খুঁজছে।

গৌরী কোথায় বাবা? আবার পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাণ্ডা বললে, ঐ সতীকুণ্ড।

বেশ খানিকটা উতরাই ভাঙবার পর ছোট-খাটো একটি উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে দ্বিতীয় তীর্থ। তেমন নেড়া আর নয়। চারিদিকেই সবুজ পাহাড়, নীচেও বড় বড় গাছ। ওদের ফাঁকে ফাঁকে চোখ পড়ে ভাঙা-চোরা কুটিরের মত একটি মন্দির আর সেই মন্দিরেরই প্রাঙ্গণে ছোট একটি পাতকুয়োর মত সতীকুণ্ড। পাহাড় আর গাছের ছায়ায় মধ্যাহ্নও কেমন যেন অন্ধকার মনে হয়। পাখীর ডাক নেই, ধূপধূনার গন্ধ নেই। মন্দিরে পূজারী ও পথে একটি ফুলের দোকান থাকলেও কেমন যেন থমথম করছে জায়গাটি।

থমথম করছে মোক্ষদার মুখখানিও। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ পড়োবাড়ীর মত মন্দিরের গায়েই। সেই দিকেই এগিয়ে চললেন তিনি।

ফুলের দোকান থেকে একটি মেয়ে ডেকে বললে, ফুল দিয়া নেহি, ফুল?

মোক্ষদার হয়ে তার পাণ্ডাই নিজের গামছাখানা প্রসারিত করে মেয়েটির কাছ থেকে কিছু ফুল কিনে নিল। প্রায় এক সাজি ফুল যায় পাতার দাম সে নিল দু'পয়সা। তাতেই যেন খুশীতে ডগোমগো মেয়েটি। এবার সে তপনের দিকে চেয়ে বললে, তুম ভি লেও।

মাথা নেড়ে অস্বীকার করল তপন, কিন্তু পকেট থেকে একটি ঝকঝকে নয়া নয়া পয়সা বের করে সেটি সে ছুঁড়ে দিল মেয়েটির সামনে পাথরের উপর।

মুহূর্তের জন্য যেন বিহ্বল হল মেয়েটির দৃষ্টি; কিন্তু পরক্ষণেই আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল তা। সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে মুদ্রাটি তুলে নিল সে—মুঠিতে চেপে ধরে একেবারে বুকের কাছে।

হাসল তপন, তারপর সে-ও তরতর করে উপরে উঠে গেল।

কুণ্ড থেকে জল তুলতে হবে—পাণ্ডা যথারীতি নির্দেশ দিয়েছিল মোক্ষদাকে। কিন্তু তিনি ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছেন মন্দিরের দোরের কাছে। শুধু এগিয়ে যাওয়া নয়, হাঁটু গেড়ে বসেছেন চৌকাঠের এধারে। কিন্তু সমস্ত মন দুই চোখের দৃষ্টিতে একাগ্র করেও কিছুক্ষণ পর নিরাশ স্বরে তিনি বললেন, কৈ বাবা, গৌরী তো দেখতে পাচ্ছি নে?

ঐ তো সামনেই, উত্তর দিল পাণ্ডা, কেবল গৌরী কেন, মহাদেবজীও আছেন।

হয়তো আছেন। কিন্তু ফুলপাতার স্তূপ আর চাপ চাপ চন্দন-সিন্দূরের আবরণের মধ্যে তপনের সুস্থ চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও পরিচিত হরগৌরীর মূর্তি একত্র বা স্বতন্ত্রভাবে ধরা পড়ল না। মোক্ষদা অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর আবার বললেন, এই গৌরী নাকি?

সতীজী, পাণ্ডা নির্বিকার স্বরে উত্তর দিল, যিনি সতী তিনিই গৌরী। তাঁরই এই কুণ্ড—এও স্বয়ম্ভু। উঠ, জল তোল, পূজা কর।

সেই একই অনুষ্ঠান, তেমনই সংক্ষিপ্ত। অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন মোক্ষদা, মন্দির পরিক্রমাও বাদ গেল না। কিন্তু সবই যেন কলের পুতুলের মত। বেশ বুঝতে পারল তপন যে বাংলা দেশের দেবদেবীর নয়নাভিরাম মূর্তি দর্শনে অভ্যস্ত চোখ দুটি মোক্ষদার মোটেই তৃপ্ত হয়নি। হাসি পেল তপনের; বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে বললে, দর্শন পেলে মাসীমা,—তোমার হরগৌরীর?

মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ করে মোক্ষদা তখন ফিরতি পথে। পূজা শেষ করেছেন তিনি, ঐ সঙ্গে খোঁজাও শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তেজনার অবসানে এখন বুঝি অবসাদ। তারই প্রতিফলন মোক্ষদার মুখে, চোখে, গতিতে। মন্দিরের পূব দিকে উঁচু পাহাড়টির গা ঘেঁষে যে সরু পায়ে-চলা পথটি এঁকে-বেঁকে নীচে নেমে গিয়েছে সেই পথে পাণ্ডার পিছনে পিছনে পা টিপে টিপে চলেছেন তিনি। থমথমে গম্ভীর মুখ তাঁর, চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে—আর তো কিছুই দেখবার নেই।

তপনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না তিনি। দেখে খোঁচা দেবার প্রবৃত্তি আরও যেন বেড়ে গেল তপনের মনে। আরও খানিকটা শ্লেষ ওর মধ্যে ঢেলে দিয়ে প্রশ্নটি মোক্ষদার ঠিক কানের কাছে পুনরাবৃত্তি করবার উদ্দেশ্যে উপর থেকে বেশ জোর পা চালিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু তখনই ঐ ঘটনাটা ঘটে গেল।

হঠাৎ যেন বিদ্যুতের ঝিলিক—আলোময়, ধ্বনিময় বিদ্যুৎ।

পরসাদী লেও—

বাঁশীর মত মিষ্টি মিহি সুরের সাদর আমন্ত্রণ শুনে চমকে উঠল তপন। চমকে উঠলেন মোক্ষদাও। এদিক-ওদিক তাকাতেই প্রায় একই সঙ্গে দু'জনেরই চোখে পড়ল সেই দৃশ্যটি।

গাছপালায় মোড়া বামদিকের পাহাড়ের গায়ে। অনেক উপরে কেবল পাতা আর পাতা—যেন ঘন সবুজ রংএর একখানি ঠাসবুননের চন্দ্রাতপ। নীচে ঝোপঝাড়—ছোট ছোট গাছ আর বড় বড় লতার জড়াজড়ি। কিন্তু একেবারে সবুজ আর নয়। থাঁটে থাঁটে ফুল। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে লাল, নীল আর হলুদের বিচিত্র সমৃদ্ধি। দশ-বারো ধাপ উপরে ছোট্ট একখানা কুটীর। তার নীচে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে এই উপবন বা উদ্যান। দূর থেকে অনেক পাথর আর অনেক গাছপালার আড়ালে এতক্ষণ যা চোখে পড়েনি, তাই এখন দেখা গেল। পাতা আর লতার সঙ্গে ফুলই কেবল নয়, যেন পুষ্পিতা-লতার ঝালর-আঁটা একখানি ছবিও। ফুলের মতই কোমল, সুন্দর একখানি মুখও তার, যার কণ্ঠের সাদর আমন্ত্রণ কানের ভিতর দিয়ে বোধ করি বা মোক্ষদার মর্মেই প্রবেশ করেছে।

পরসাদী লেও—

একটি মেয়ে। বেঁটে গড়নের কিশোরী। কম্বলের মত কালো, মোটা একখানি শাড়িই তার কোমর থেকে জানু পর্যন্ত ঘাগরা ও উপরে বুক, পিঠ, ঘাড় ও গলা জড়িয়ে জড়িয়ে চোলিই হয়েছে যেন। নিটোল সুগোল বাহু দুটি ঢাকা পড়েনি তাতে। মাথায়ও কোন আবরণ নেই। একমাথা চুল। বেণী নয়। অযত্নবর্ধিত, অসংস্কৃত কেশরাশি জটার মত ঝুলছে তার পিঠে, কাঁধের উপর দিয়ে বুকের কাছে; সাপের মত ফণা তুলে আছে তার ললাটের উপর। অমার্জিত মুখে বেশ দেখা যায়, চাপ চাপ ময়লা। তবু, বোধ করি সেইজন্যই আরও বেশী চোখে পড়ে তার কাঁচা সোনার মত রং, আপেলের মত গাল, কাকাতুয়ার ঠোঁটের মত টুকটুকে লাল দুটি ওষ্ঠ, মুক্তার মত ঝকঝকে ক'টি দাঁত আর নৃত্যচটুলা পার্বত্য নির্ঝরিণীর মতই তার হাসি-ঝলমল চকচকে চোখ দু'টির চঞ্চল দৃষ্টি।

শুধু মুখের আমন্ত্রণই নয়, হাতও বাড়িয়েছে মেয়েটি প্রসাদ দেবার জন্য। বাম হাতে পিছনের গাছটির একটি ঝুলে-পড়া ডাল শক্ত মুঠায় চেপে ধরে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, চুলশুদ্ধ মাথাটিকে দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে, পরসাদী লেও।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটি কেটে যেতেই তপন মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডান দিকে তাকাল যেখানে সতীকুণ্ডে যাবার পথে মোক্ষদার হয়ে পাণ্ডা পূজার ফুল কিনে নিয়েছিল। দেখলে তপন—প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডখানি এখন শূন্য, ফুলওয়ালী সেখানে নেই। দেখে সহজ ভাবে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

কিন্তু মোক্ষদার চোখে বিহ্বল দৃষ্টি! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

মেয়েটি তখন গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে ক্ষিপ্রপদে আরও দু'ধাপ নীচে নেমে এল। প্রায় মোক্ষদার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আবার বললে সে, পরসাদী লেও।

একটু থেমে আবার: পূজা কিয়া, পরসাদি নেহি লেওগী? লেও—

ততক্ষণে পাণ্ডাও তার যজমানের দেরী দেখে ফিরে এসেছে। এখানে মেয়েটিকে দেখেই মোক্ষদার মুখের দিকে চেয়ে হেসে সে বললে, লেও বুড়ী মায়ী। কোই হরজা নেহি। ওই হৈ মালীকী লড়কী—পারবতিয়া।

মোক্ষদা অস্ফুটস্বরে বললেন, অ্যাঁ!

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাকালেন তিনি মেয়েটির মুখের দিকে। তার পর পথের মাঝখানেই ঐ পারবতিয়ার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে যুক্ত করতল প্রসারিত করে গদগদকণ্ঠে তিনি বললেন, দাও মা, দাও।

এক রকমের ডালই হয়তো হবে—শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে কিছু ফুলের পাপড়ি ও কয়েকটি পাতা। অঞ্জলিপুটে গ্রহণ করে ভক্তিভরে সে প্রসাদ মাথায় ঠেকালেন মোক্ষদা। তারপর কিছু মুখে দিলেন, অবশিষ্ট বাঁধলেন আঁচলের খুঁটে।

মেয়েটি ততক্ষণে তপনের কাছে এসেছে। তার মুখের দিকেও তেমনি হাসিমুখে চেয়ে সে বললে, তুম ভি লেও।

ঠোঁটে হাসিই কেবল নয়, মেয়েটির চোখে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। কয়েকটি টোল পড়েছে গালে। কণ্ঠস্বরে কেবল অনুনয় নয়, একটু যেন বিদ্রূপেরও আভাস পাওয়া যায়।

চকিতে মনে পড়ে গেল তপনের যে কিছুক্ষণ পূর্বে পূজার ফুল হাতে নিয়ে মেয়েটি ঠিক ঐ ভাবাতেই সেধেছিল তাকে, কিন্তু তখন ফুল সে নেয় নি। সেই কথা মনে করে রেখেছে বলেই ঐ অতিরিক্ত অভিব্যক্তি নাকি মেয়েটির মুখের ভাবে!

এবার আর অস্বীকার করতে পারল না তপন; হাত পেতে সে-ও গ্রহণ করল ঐ প্রসাদ। তার পরেই পার্বত্য হরিণীর মত ছুটে ধাপে ধাপে উপরে উঠে গাছপালার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারও মুখেই কোন কথা নেই। কিন্তু নীচে নেমে আসবার পর তপনের কৌতুক প্রবৃত্তি আবার যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। দুষ্টামির হাসি সযত্নে ঠোঁটের কোণে চেপে রেখে আবার সে মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করল, হরগৌরী কেমন দর্শন করলে মাসীমা? বলছ না যে!

উত্তর দিলেন মোক্ষদা এবং তাও তপনের মুখের দিকে চেয়েই। বললেন, ছিঃ তপু, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে কি ফাজলামি করতে আছে?

ভর্ৎসনার ভাষা। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তপন যে কিছুক্ষণ পূর্বেই নৈরাশ্যের যে ম্লান ছায়াখানি মোক্ষদার শীর্ণ কিন্তু গৌরবর্ণ মুখের উপর ভেসে বেড়াতে দেখেছিল তার চিহ্নমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। বরং এখন যেন তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ সে মুখখানি।

তথাপি আরও একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা ছিল তপনের। কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না সে।

রিক্সাতে উঠে বসবার পর তপনের মুখের দিকে চেয়ে মোক্ষদা আবার বললেন, তাছাড়া মন্দিরে কার কি দর্শন হল তা কি বলতে আছে রে! পাপ মুখে বলতে নেই।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর, কিন্তু শান্ত। তপনের মনে হল যেন ওষ্ঠপ্রান্তে সলজ্জ হাসির ক'টি রেখা গোপন করবার চেষ্টা করছেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী।
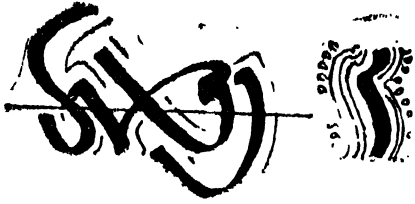
অরুণ সেনগুপ্ত

এর নাম 'মেরিণ ড্রাইভ'। বিলাস আর প্রাচুর্য্যের স্রোতের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে যাবার বঞ্চনার কাছে ঘা খাওয়া কোন জীবনের স্বপ্ন, নিতান্ত কাগজের রংয়ের অভাবেই শিল্পীর আত্মনিগ্রহ।

বুধবার প্রাতরাশ সেরে রোজকার নিয়মমত একবার ও বেরিয়েছিল বাইরে। সংক্ষিপ্ত কাজের পরে তরতর করে উঠে গেছে চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ীটার মিসেস উপাধ্যায়ের কাছে। তার ছোট ছেলে বাবলুর ষ্ট্যাম্পখাতা দেখেছে, আর পিকাসোর অ্যালবাম। তারপর কাল ট্রেণে চড়েছে। এখন এই কলকাতায় আবার।

হাঁটছিল অঞ্জনা, ট্রামবাসগুলোকে বেপরোয়া মনে হয়। হাওয়ার দেয়াল কেটে ছুটে চলেছে। কোন এক যাত্রীর নির্লজ্জ অভদ্রতাকে অগ্রাহ্য করেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। চোখে পড়ল খানিক ওদিকে কারা যেন ব্যায়াম করছে।

ফুটপাথের ওপর উঠে হাঁটতে লাগল অঞ্জনা। এই ন' মাসের মধ্যে চাকরীর খাতিরে দু' জায়গায় ঘুরেছে—বোম্বাই, মাদ্রাজ। দানাপুরে ব্রাঞ্চে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়নি, সম্মান আর সম্মানী বেশী পাওয়া গেলেও। কলকাতাতেই স্থায়িভাবে থাকার জন্ত দরখাস্ত দিয়েছে। বিধবা মা ও ছোট ভাইবোন দুটো রয়েছে শ্যামবাজারে। এখানে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।

বেশ গুছিয়ে বসেছে ছোট ছোট ষ্টেশনারী দোকানগুলো।

মানুষের ভীড় এখানে কম নয়। সকাল পাঁচটায় যে প্রাণ জেগে ওঠে, রাত বারোটায় তার সমাপ্তি। সকালে আবার হবে সুরু।

পরশু সারাটা দিন ও কাটিয়ে এসেছে অনীতার বাড়ীতে। কবে ভুলে পড়েছে, এখনও সে ভোলেনি। জানতে পেরে জন্মতিথিতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। অনীতার মামাত ভাই বিকাশ লিফট দিতে চেয়েছিল। ও রাজী হয়নি।

কর্ম্মজীবনের তাগাদায় মাঝখানে ওর জীবনের ছবি এখন অচল। বি, এ পাশের পর গল্প, কবিতা পড়বার সময় খুব কম পেয়েছে অঞ্জনা। জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ সেই গানই বন্ধ। তবু দুঃখিত নয় সে। সংসারের বন্ধনকে জিইয়ে রাখাটাই আজ ওর প্রধান কর্ত্তব্য। তাই গানের জন্ত অবসর না পেলেও আজ ও কাতর নয়।

আরও একটু হেঁটে দাঁড়াল সে। এক গাদা মাসিক সাহিত্য আর সিনেমার পত্রিকা নিয়ে বসেছে একজন। অঞ্জনা হাতে তুলে নিল মোটা একটা পত্রিকা। জলতরঙ্গ। অনামী। কে চেনে এর সম্পাদক অখিলেশকে? তবু এক টাকা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে বার করে কিনল। রবিবারে অনেক দিন পরে পড়া যাবে। আর কিনল কিছু লজেন্স ভাইবোনের জন্ত।

অনেক দিন বাদে নিজের জগতে ফিরে এল অঞ্জনা। ভাইকে রাগানোর শেষ ডিগ্রীতে ওঠায় মায়ের কৃত্রিম ভর্ৎসনা পেল—এতদিন পরে এলি, কোথায় একটু বসবি না—

দুপুরে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল বার বার। কিন্তু সকালের কেনা পত্রিকাটা পড়তে হবে আজকেই।

বিদ্যুৎ!

খানিক পরে আশ্বস্ত হল অঞ্জনা কারোর কোন সাড়া না পেয়ে। ওর চেঁচিয়ে ওঠাটা নীচু পর্দ্দায়ই ছিল।

পাঁচ বছরের স্মৃতিটা আর্ত্তনাদ করে উঠল। অখ্যাত পত্রিকা জলতরঙ্গ গল্প বেরিয়েছে বিদ্যুৎ সোমের। কোন এক সময়—এক সময় গল্পের মাঝখানে খুঁজে পেল অঞ্জনা হারিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎকে।

গানের আসরে আলাপ। পাটনায় তখন অঞ্জনাদের বাসা ছিল। চমৎকার গাইত অঞ্জনা। ওর সুরমূর্চ্ছনায় চমৎকৃত হয়েছিল সবাই। আবেগ-বিহ্বল সবাই। আবেগ-বিহ্বল করে তুলেছিল ওর কারুকার্য্য-করা গলার উপস্থিত সকলকে।

—মেঘ-মেদুর বরষায়...

সেই আলাপ অঞ্জনার বাবা প্রবোধবা বুর কাছে শুধু সামান্ত পরিচয় হয়েই থামেনি। আন্তরিক ভালবাসায় তার পরিবর্ত্তন ঘটেছিল ধীরে ধীরে।

কার্ণেশনের পরিচ্ছন্ন মায়াবী ছায়ায় বিদ্যুতের কয়েকটা কথা বড় মধুর মনে হয়েছিল অঞ্জনার।

—সত্যি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই মানুষের প্রকৃতি দেখে। কি করে তারা নকল আভিজাত্যের বেড়ায় নিজেদের নিয়ে চলে স্বতন্ত্র ভাবে। কি ভাবে তাদের চোখের মাঝখানে ঢুকতে পার না মানুষ!

খানিকটা নীরবতা। বাতাসে বয়ে চলেছিল গভীর প্রশান্তি।

—তোমার গলায় যেন জন্ম-জন্মান্তরের তপস্তার আশীর্ব্বাদ। একটা স্বপ্নময় পুরীতে যেন থাকে তোমার গানের সময়।

লাজুক চোখে হেসে তাকিয়েছিল অঞ্জনা।

—আত্মপ্রকাশের সানাই কবে থেকে বাজাতে শুরু করছ ?

—আত্মার থেকে আত্মপ্রকাশ বড় নয় নিশ্চয়ই।

—খুব দার্শনিকের মত কথা বটে। শিশুর মত হেসে উঠল বিদ্যুৎ।

—আমাদের কলেজে একটা ফাংশন আছে। যাবে ?

—আমি কেমন করে—

—সেটুকু ক্ষমতা আমার আছে কলেজে।

—বেশ ত।

সেও আর একটা দিন। বহু শ্রোতার মাঝখানে হয়ত প্রকৃত গুণীও কত আছেন। কিন্তু নিজের নৈপুণ্যের প্রতি সন্দেহ রইল না। প্রথমে একটা মীরার ভজন। বহুজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভরে গেল ওর সাধনা-বহুল সঙ্গীত-জীবন। তারপর অধ্যক্ষের কথায় অঞ্জনা গেয়েছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ গান।

চলো সখী, কুঞ্জধামে খেলত···

গান শেষে একটু আড়াসে নিয়ে গিয়েছিল বিদ্যুৎ। হাতে একটা রাখী।

—এই রাখীর মত চির-পবিত্র আর অমর হয়ে থাকুক তোমার আমার ভালবাসা।

এর চেয়ে আর আনন্দ কি আছে ? এ প্রেম শীতের কুয়াশা নয়। রাত্রিশেষেই শুক্‌ হেসে বিদায় নেয় না। গভীর ভক্তিভরে প্রণাম করেছিল অঞ্জনা বিদ্যুৎকে।

কিন্তু বসন্ত আসেনি। দিগন্ত-কপোলে পূর্ণ হেসে আবির্ভূত হয়নি লাজরক্তিম আলোরেখা। কমনীয় সানাইয়ের সুরে আনন্দ-চন্দনে মুখর হয়নি প্রবোধ বাবুর নির্জ্জন নিকেতন 'পথের শেষে।'

অঞ্জনার জন্মতিথিতে বিদ্যুতের কাছে পাকা কথাটা বললেন অঞ্জনার বাবা। এই যেন ঠিক ছিল আগে হতে। বাবার গলা শুনে মনে হল অঞ্জনার, এ যেন হবেই, কোন বাধা নেই।

সকালে খাওয়া হল। দুপুরে ওপরে নিয়ে গেছলেন অঞ্জনার মা মাত্র বিদ্যুৎকে।

—তোমার হাতে অঞ্জনাকে দেওয়া সৌভাগ্যেরই বিষয়। কথা সবই ঠিক, সন্দেহ নেই। তোমার ইচ্ছাও আমি জানি। কিন্তু আমি মা। তোমাকে পেটে না ধরলেও মায়েরই সমান। তাই সন্তানের ত্রুটী জেনে রাখা আর দরকারে অন্তকে জানান ধর্ম মনে করি। তারই কল্যাণের জন্য। ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়বার সময় অঞ্জনার একবার ক্ষয়রোগের সূত্রপাত হয়। ডাক্তারের পরামর্শে গান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ও আবার আরম্ভ করেছে। এখন অবশ্য ভালই আছে। যদি তাকে সত্যিই জীবনের সাথী হিসেবে চাও, তবে এখন থাক, আর ক'টা বছর যাক।

বোধ হয় আশাভঙ্গের ঝাপ্‌টা সেদিন সইতে পারেনি কলার বিদ্যুৎ সোম। খুব সকালেই এসেছিল ওদের বাড়ীতে। একটা নমস্কার করে কোন কথা বলার অবসর না দিয়েই সে অ্যাটাচি হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রবোধ বাবুর কাছ থেকে।

—দূরে ইউনিভার্সিটিতে একটা চান্স পেয়েছি। আজই রওনা হচ্ছি।

দুপুরবেলা সকল কথা বললেন মা নিজে থেকেই। অঞ্জনা জানলার ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছিল দূরে। অস্পষ্টভাবে কানে আসছিল ঝাউবনের দীর্ঘশ্বাস। অঞ্জনার মনে হল, মাতৃত্বের চরম পরীক্ষা দিয়েছে মা। তার রোগ হওয়াটা ত মিথ্যা নয় !

মাস ছয়েকের মধ্যেই থ্রম্বসিসে মারা গেলেন স্নেহময় বাবা। তারপর সংসারের চাকায় চলে গেল পাঁচটি ফাল্গুন। জীর্ণতা ওর দেহবল্লরীকে অবশ্য গ্রাস করতে পারেনি। বিদ্যুৎ আর কোন খবর দেয়নি। তার ঠিকানা অবশ্য ওদের জানা আছে।

এক্ষেত্রে চিত্রিতা আর অমিত। ঠিক সেই পাটনায় স্বল্পকালের ইতিহাস। গল্পটার শেষের দিকে একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস করেছে বিদ্যুৎ, নিপুণ তুলির সংযত টানে।

ওই সুর, যে সুর নিবিড়ভাবে বেজেছিল একদিন মনে-প্রাণে, তা বেঁচে থাকবে চিরদিন। তার ভালবাসা সাগরের ঢেউয়ের মতই ঝঙ্কার তুলবে অমিতের বুকে। ভাল থাক চিত্রিতা। তার কালো চোখের প্রতীক্ষা করবে সে, যত দিন হোক।

অঞ্জনা চাপ দিলে বিদ্যুৎ ছুটে আসত তাকে গ্রহণ করতে। কিন্তু না—বিদ্যুতের জীবনকে পঙ্গু করে দেবার সম্ভাবনা ঘটাতে রাজী নয় অঞ্জনা।

চিত্রিতা ! দীর্ঘকাল পরে একটা ভাল গল্প পড়ল বলে মনে হল অঞ্জনার।

তুমি আছ

প্রীতিযূষা বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার ঠিকানা পেলাম আজকে হঠাৎ
প্রভাতের রোদ-ঝরা আরাম সকালে,
পড়ে দেখি প্রতি ছত্রে অনেক তফাৎ
আমার নিকট হতে বহু দূরে তুমি তো জন্মালে।

গোলাপের বুকে দেখি আর ঐ যুঁই-মল্লিকায়
উড়ে এসে বসে কত মধুলোভী মৌ,
তাই দেখে কত লোক নিরাশ তাকায়
ওষ্ঠে নিয়ে মধুহাসি হাসে কত বৌ !

তোমার ঠিকানা পেয়ে যাত্রার উদ্দেশে
গৃহ ছাড়ি ধূলি-পথে বাহির হলেম,
চলিলাম বহুদূর তবু অবশেষে
আমারই আবাস-মাঝে ফিরিয়া এলেম।

এসে দেখি তুমি আছ ঠিক যথাস্থানে
দূরে যদি থেকে থাক বহুদূরে আর
তবু তুমি জেগে আছ আমারই তো প্রাণে
তুমি আছ যথাস্থানে হৃদয়ে আমার।

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পাঁচ

যুসুফ বিদায় নেওয়ার পর পল্লবের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। ফিরে ফিরে মনে হ'তে লাগল ওর একটা কথাই—ধুঁয়োর মতন: লগ্ন যখন বাজে তখন তাকে ফিরিয়ে দিলে সে আর ফিরে আসে না। ভাবতে ভাবতে ওর মনে হ'ল—আর দেরি করা নয়—কী হবে এখানে বাজে গান শিখে? নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে তো লাভ হ'ল সমূহ—এবার বার্লিনে ফেরাই পন্থা। আর শুভস্য শীঘ্রম্—কিন্তু কাল এলিওনোরার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে ফেলেছে, কাজেই ওখানে চায়ের পরেই বার্লিন রওনা হবে। মোহনলালের জন্যে আর অপেক্ষা করা নয়। ওর নামে একটা চিঠি লিখে লুনা হোটেলের ম্যানেজারের কাছে রেখে যাবে—ও যেন মিতাকে নিয়ে সোজা বার্লিনেই আসে—সেখানেই দেখা হবে। সেই ভালো। ভাবতেই ওর মন অনেকখানি হালকা হ'য়ে যায়। আইরিণকে কাল সকালেই তার ক'রে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা ফের দেখা সেই রুগ্ন যুবকের সঙ্গে। ওর সঙ্গে আলাপ করা হ'ল না। না হোক। ওর মন আইরিণের জন্যে উঠেছে উন্মুখ হ'য়ে—খাওয়া শেষ ক'রেই নিজের ঘরে গিয়ে বসল মোহনলালকে চিঠি লিখতে:

ভাই মোহনলাল,

আমি তোমার জন্যে এখানে দিন দশেক অপেক্ষা ক'রে ফিরে যাচ্ছি বার্লিনে কাল রাতের ট্রেনে—

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

Avanti? ১

পরিচারিকা দুটি চিঠি দিয়ে গেল।

ওর বুকের রক্ত দ্রুত বয়—আইরিণের চিঠি—কিন্তু এ কী! এতদিন পরে চিঠি লিখল তাও ছবি পোষ্টকার্ডে!

ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে—চিঠি জেনেভা থেকে লেখা:

প্রিয় পল,

কাল কাতিয়া মাশা ও আমি এখানে এসেছি। আমার শরীর ভালো যাচ্ছিল না বলে হাওয়া বদলাতে এসেছি। সুইজর্লণ্ডে মাসখানেক এখানে ওখানে একটু ঘুরব, তাই তোমাকে ঠিকানা দিতে পারলাম না। তুমি ফ্রাউ ক্রামারের ঠিকানায় আমাকে লিখলে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন—যখন যেখানে থাকি। এখুনি যাব লসানে। তাই ইতি করি। আশা করি ইতালিতে যুসুফের সঙ্গে আনন্দেই আছ।

তোমার আইরিণ।

এ কী! দশ দিনের পরে প্রথম চিঠি তাও শুধু পোষ্টকার্ড, তার উপর এমন শুষ্ক চিঠি! আইরিণ নিশ্চয় রাগ করেছে। কিন্তু কেন? ও আবার পড়ে: আশা করি ইতালিতে যুসুফের সঙ্গে আনন্দেই আছ। এ-সুর চিনতে কি ভুল হয়? অভিমান-দুর্জয় অভিমান! তা ছাড়া আর কী?

কিন্তু তা হ'লে কী করবে এখন বার্লিনে ফিরে গিয়ে আইরিণই যখন সেখানে নেই? ও অত চিঠিটা পড়া স্থগিত রেখে লিখল:

প্রিয় আইরিণ,

তোমার জেনেভা থেকে লেখা চিঠি প্রথম চিঠি এইমাত্র পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। পত্র পাঠ জানাবে কি কবে বার্লিনে ফিরবে?

লিখতে লিখতে ওর মনও দুর্জয় অভিমানে ছেয়ে যায়, লিখল: আশা করি তিন বোনে মিলে সুন্দর সুইজর্লণ্ডে আনন্দেই আছ। ইতি।

তোমার পল।

লিখেই মনে হল—ছি ছি! ওর শরীর খারাপ, এমন শুষ্ক চিঠি পেলে হয়ত—ভেবেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল, স্থির করল আইরিণ ভ্রমণ শেষ করে বার্লিন ফিরে ওকে যখন জানাবে তখন ওকে লিখবে, তার আগে না। কেন লিখবে? এই কয় দিনে ওকে পাঁচ-ছয়খানা চিঠি লেখেনি কি? অভিমান শুধু ওই করতে পারে না কি?

অন্য চিঠিটা মোহনলালের বার্লিন ঘুরে এসেছে। কিন্তু ওর মনে কই আজ আর কোনো আনন্দ জাগে না তো? সে আসে আসবে, না এলেই বা কী? বিমনা হ'য়ে খুলল চিঠি, কিন্তু এ কী!

ভাই পল্লব,

আমাদের আপাতত ইতালি যাওয়া স্থগিত রাখতে হ'ল। কারণ, কুঙ্কুমকে তরশু দিন ফের পুলিশে ধরেছে। ওর বিরুদ্ধে এবার কী অভিযোগ তা ওরা প্রকাশ করেনি, তবে গুজবও না কি বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছে। এবার শুনছি ওর কোনো প্রকাশ্য বিচারই হবে না, কেন না ও আজ দেশের হিরো, কোনো কোর্টে ওর প্রকাশ্য বিচার হ'লে আন্দোলন আরো কেঁপে উঠবে। দেশবন্ধু বললেন: তিনি খবর পেয়েছেন ওকে না কি এবার বিদেশে পুলিপোলাও চালান দেওয়া হবে—হয় আন্দামানে, নয় মান্দালয়ে। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন কুঙ্কুমের কারামুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদেশে না যেতে কয়েকটি কাজের ভারও নিতে হ'ল কুঙ্কুমের অবর্তমানে। কাজেই ঠিক এ সময়ে কোন মুখে স্ত্রীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে বিদেশে পাড়ি দিই বলো? একেই আমাদের সম্বন্ধে নানা লোকে যে সব মন্তব্য করছে সে যাক। কী আর হবে কাঁদুনি গেয়ে?

শুধু একটা কথা: যদি মাস খানেকের মধ্যেও কুঙ্কুমকে না ছাড়ে তবে ভাবছি মিতাকে একাই পাঠাব, তবে সুইজর্লণ্ডে নয়—সোজা বার্লিনে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে সে তবু একটু ভরসা পাবে। তারপর যাবে সুইজর্লণ্ড। কিন্তু সে পরের কথা—এখন শুধু ব'লে রাখলাম জানতে চেয়ে তুমি আর কত দিন বার্লিনে থাকবে, আর ওর একটু দেখাশুনো করতে পারবে কি না?

মিতার জন্যে আমার সময়ে সময়ে সত্যিই দুঃখ হয় আজকাল। আমি বড় গলা করেই বলতাম একদিন যে আজকের মানুষের গৃহ স্বদেশ নয়—সর্বদেশ। কিন্তু এখন দেখছি এ-জাতীয় বুলিতে মন মানলেও প্রাণ মানে না, ঠেকে শিখছি উঠতে বসতে যে, যে-বিশ্বমানব সর্বান্তঃকরণে বলতে পারেন যে, তাঁর কাছে স্বদেশের চেয়ে বিশ্ব বড়: আমাদের মনে দাগ কাটতে পারেন হয়ত, কিন্তু প্রাণে ঠাঁই পাবেন না—অন্তত এযুগে। হয়ত দুশো পাঁচ শো বৎসর পরে বিশ্বমানবতা: বাণী সর্বমানবের স্বধর্ম হ'য়ে উঠতেও পারে—বলতে পারি না, কি একথা বলতে পারি খুব জোর ক'রেই যে, এ-যুগের মানুষে কাছে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বাণী হ'ল জাতীয়তা—সবদেশেই আমি দেশবন্ধু বা কুঙ্কুমের মতন দু-একজন অসামান্য মানুষের ক

১। এসো।

বলছি না, যাদের দেশভক্তি বিশ্বপ্রেমের অন্তরায় না হ'য়ে সহায় হয় : কিন্তু অসাধারণ ব্যতিক্রমের কাছে যা স্বধর্ম সাধারণের কাছে সে পরধর্ম হ'য়েই থাকবে ; যতদিন না তারা সাধারণ চেতনায় চলাফেরা করা ছেড়ে অসাধারণদের চেতনায় উঠতে শিখবে। না, শিখবে বলি কেন, এ তো বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করার ব্যাপার নয় ভাই। বিকাশ লাভ করে হয়ে ওঠার ব্যাপার আর যে কোন বড় বিকাশ সাধারণের নাগালের বাইরে। যেহেতু সাধারণ মানেই হ'ল অসাধারণের উল্টো অর্থাৎ অসাধারণের কাছে যা প্রত্যক্ষ, অপ্রতিবাদ্য সাধারণের কাছে তা অদৃশ্য, না-মঞ্জুর। বিশ্ব-মানবতার বাণী হ'ল এই অসাধারণদের উপলব্ধ চেতনার আলো। সুতরাং এ আলোকে সাধারণ চেতনার আলো-আঁধারী মন বুঝবে কেমন করে ? তাই রিতাকে খুব অপরাধিনী মনে করতেও বাধে। বিশ্বমানবতার বাণী ওর বুদ্ধি গ্রহণ করলেও ওর হৃদয় আজো বরণ করতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতে পারবে কি না বলা কঠিন। কেন না কোনো মানুষের বিকাশ কখন কোন্ খাতে পথ কেটে চলবে কেউই জোর করে বলতে পারে না। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে আজকের রিতা ফ্রান্স ছাড়া আর কোন দেশকে স্বদেশ মনে করতে পারেনি বলে ভাবে যে, ভারতবর্ষকে ফ্রান্সের মতন ভালোবাসলে সে হবেই হবে দ্বিচারিণী।

তাছাড়া আজকের ভারতবর্ষের—মানে ভারতবাসীর যা অবস্থা তাতে ও যদি আমাদের মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতে না-ই পারে, তবে তার জন্যে ওকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি ? কিছুদিন আগে মহাপ্রাণ দেশবন্ধু করুণ হেসে কুঙ্কুমকে বলেছিলেন (তাঁর এ বক্তব্যটি এখন সারা বাংলায় চালু হয়ে গেছে) ; মাত্র এক বৎসর দেশধ্বজ অসহযোগীদের সঙ্গে মিশে থ' হ'য়ে গেছি বাবা, থ হ'য়ে গেছি যে-কদর্যতা তাদের মধ্যে দেখলাম পঁচিশ বৎসরের ক্রিমিনাল প্রাকটিসে দুবাত্মাদের মধ্যেও দেখিনি। নির্লজ্জ মানুষ দেশভক্তির নাম নিয়ে কী যে করে বেড়াচ্ছে দেখে শুনে সত্যিই হকচকিয়ে যেতে হয়। ভাবতে পারো কি কুঙ্কুমের এক বিশ্বস্ত (?) বন্ধুই পুলিশের গুপ্তচর হ'য়ে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে ? নিলে হয়ত সি-আই-ডি ওকে ফের ধরত না এত তাড়াতাড়ি।

রিতা এই সব কারণে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া নিত্য চোখে দেখছে আমাদের 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী', দেখছে আমাদের নোংরামি, তামসিকতা, কাপুরুষতা আরো কত কী। এক আধটা তিলক, গান্ধী, দেশবন্ধু, কুঙ্কুমে কী হবে ? এ যেন দু' চার ঘটি জলে মরুভূমিকে উর্বর করার প্রয়াস।

আমি ভারতের আত্মার মহিমা অস্বীকার করি না। কুঙ্কুমের মতন আমিও বিশ্বাস করি যে ঋষিদের তপঃশক্তি এখনো এ-দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু থাকলে হবে কি ?—ভারতের সে গহন আত্মশক্তিকে তো চর্মচক্ষে দেখা যায় না ভাই—দেখা যায় কেবল প্রেমের শিবনেত্রে। এইখানেই হয়েছে রিতার মুশকিল—ও আমাদের দেশের বাইরের অবস্থা দেখে এত ঘা খেয়েছে যে ভারতের অন্তলীন সনাতন মহিমায় জয়ধ্বনিতে সাড়া দিতে পারছে না। এ রকম মনের অবস্থায় ও কেমন করে ভারতকে ভালোবাসবে বলো তো ? আর যদি ভালো না বাসে তবে কেমন করে টিকবে এ দেশে ? ওর শরীর খারাপ হওয়ার মূলে রয়েছে এই মনঃকষ্ট, স্বপ্নভঙ্গ। ও বড় আশা করে এসেছিল যে আমাদের দেশে ও এমন আত্মিক শক্তির দেখা পাবে যার দেখা য়ুরোপে পায় নি ? সে আশা ওর প্রায় নির্মূল হল বুঝি। তাই ও দিন গুণছে—কবে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও ওর স্বদেশে ফিরে গিয়ে একটু জুড়োবে।

এছাড়া আর একটা কারণও রয়েছে যেটা সাময়িক হলেও এত দুরন্ত ও জাজ্বল্যমান যে মনে হয় বুঝি চিরন্তন। সেটা হল আমাদের বিজাতি-বিদ্বেষ। এর জন্যে আমি আমাদের দেশবাসীকে খুব বেশি দোষ দিতে পারি না। ইংরাজের অত্যাচারে আমরা আজ অস্থিচর্মসার, এ অবস্থায় বিশ্বমানবতার দোহাই দিয়ে উৎপীড়িতকে বলা বৃথা যে তোমরা উৎপীড়কদের বুকে তুলে নাও। তাছাড়া এ অসহযোগ আন্দোলন আমাদের রুদ্ধ আক্রোশকে মুক্ত করে দিয়েছে যার ফলে আমরা সাহেব বা মেমসাহেব নাম শুনতে না শুনতে আগুন হয়ে উঠি। এ আক্রোশের আঁচ রিতাকে রেহাই দেয় নি একথা বলাই বাহুল্য। তাই ও আরো মুষড়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে ওকে কী করে সুখী করব ভেবে পাই নে। আজকাল আমার মনে সময়ে সময়ে সত্যিই গভীর সংশয় জাগে কেউ কাউকে সুখী করতে পারে কি না ?

ওর আর এক কষ্ট—কষ্ট কি ওর একটা ? এখানে ইউরোপীয় অপেরা, সিমফনি, চেম্বারম্যুসিক প্রভৃতি শুনতে পায় না। য়ুরোপীয় সঙ্গীত ও কি রকম ভালোবাসে জানোই তো। ওর কাছে সঙ্গীত বিলাস নয়—তৃষ্ণার জল, চোখের আলো, বুকের নিশ্বাস। তাই কালই বলছিল তোমাকে লিখে দিতে—তুমি শীগগির ফিরে এসো তোমার মুখে শুনবে শুবার্ট, শুমান, শোপ্যাঁ, দ্যবুসি, ব্রাহ্মস, রাখমানিনফ, পুচিনি, ভের্দি প্রভৃতির গান। তুমি এ সব স্বরকারের গান নিশ্চয়ই শিখেছ ? ও জিজ্ঞাসা করছে। হয়ত দু-চারদিনের মধ্যে ও নিজেই তোমাকে লিখবে ওর শরীর একটু সুস্থ হলে।

আর কী ? চিঠি মস্ত হয়ে গেল—হাতে অনেক কাজ পড়েছে কুঙ্কুমের জেলে যাওয়ার দরুণ। তাই এবার আসি।

এ চিঠির উত্তর পারো তো একটু তাড়াতাড়ি দিও, আর আমাকে না লিখে রিতাকেই লিখো, ও খুব খুশি হবে। কারণ তোমাকে ও আগের মতনই স্নেহ করে। ইতি স্নেহার্থী

মোহনলাল।

ছয়

পল্লবের বুকের রক্ত যেন জল হ'য়ে গেল। ঠিক এ সময়ে এ কী চিঠি ? চিঠিটা ও দু'বার পড়ল। যতই পড়ে ততই যেন ও চোখে অন্ধকার দেখে। এ অবস্থায় আইরিণকে নিয়ে দেশে ফিরতে চাচ্ছে কোন ভরসায়—বিশেষ যখন কুঙ্কুম জেলে ? নাঃ কুঙ্কুম বাইরে থাকলেই বা এমন কী মস্ত সুবিধা হ'ত ? হয়ত সে মুখ ফেরাত—কে বলতে পারে ? কে না জানে—যেখানে মানুষের প্রত্যাশা বেশি সেখানে আঘাতও বাজে বেশি ? মোহনলালকে ক্ষমা করতেই যখন কুঙ্কুমকে এত বেগ পেতে হয়েছিল তখন পল্লবকে ক্ষমা করতে—এ চিন্তাকে ও ঠেলে দেয়। না, না, এখানে ক্ষমার প্রশ্ন আসে কোথেকে ? কুঙ্কুম কি নিজেই লেখেনি সহদেশিনীকে বিবাহ করার কথা ?

কিন্তু সেখানেই বা ভরসা কোথায়? আইরিণ তো অকুণ্ঠেই কবুল করেছে—দেশ বলতে ওর বুকের তার বেজে ওঠে না, ও চায় শিল্পীর জীবন—দেশসেবিকার জীবন নয়। তবে? কী করবে ও? আইরিণকে সব খোলাখুলি জানিয়ে বিদায় নেবে? ক্রমাগতই মনে হয়—এই-ই তো সুযুক্তি।

কিন্তু হায় রে যুক্তির জাঁক। যুক্তি তো হ'ল মনের দিশারি—প্রাণ তাকে কবে মেনে নিয়েছে গুরু বলে? আর প্রাণকে উপবাসী রেখে যুক্তির আগাজল খেয়ে কে কবে অসাধ্য সাধন করেছে? ওর মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঘনিয়ে ওঠে, মোহনলালের খেদ ওর হৃদয়ের তারে তারে অনুরণন তোলে: মানুষ কি মানুষকে সুখী করতে পারে? অথচ তবু এই সুখের জন্যেই আবহমান কাল মানুষ হাত পেতে এসেছে তো মানুষেরই কাছে। শূন্য হৃদয় আর কার কাছেই বা হাত পাতবে পূর্ণতার বর পেতে? ভগবান? তাঁর কাছে দরবার করতে পারে তারাই যারা শুনেছে তাঁর ডাক। পল্লবের মনে পড়ে ওর কৈশোরের কথা—যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় ওর হৃদয় সাড়া দিত। কিন্তু সে-ডাক আজ ওর অন্তরের কানে কই আর তো বেজে ওঠে না তেমন ক'রে? আজ ওর মন-প্রাণ সাড়া দেয় শুধু আইরিণের ডাকে। তাকেই ও আজ চায় সর্বান্তঃকরণে—চায় তাকে ভালোবেসে সুখী করতে, নিজেও কৃতার্থ হ'তে। কিন্তু দেশের যে অবস্থা—তাতে ও কেমন ক'রে আশা করতে পারে যে আইরিণ ভারতবর্ষে গিয়ে সুখী হবে?

ঝোঁকের মাথায় ও যুযুফকে টেলিফোন করে।

* * * *

কে?

আমি—পল্লব।

পল? কী ব্যাপার?

ঘুমুতে পারছি না ভাই! তাই তোমাকে বিরক্ত না ক'রে পারলাম না।

না না, বিরক্ত কেন? এলিওনোরা শুতে গেছে। আমি আমার ঘরে একটা বই পড়ছিলাম। অখণ্ড অবসর এখন। কিন্তু কী ব্যাপার?

মোহনলালের এক চিঠি পেয়েছি। আইরিণেরও। মন বড় অশান্ত হ'য়ে উঠেছে।

অশান্ত?

শোনো মন দিয়ে—বিরক্ত হবে না তো?

টেলিফোনে যুযুফের হাসি বেজে ওঠে। কী পাগল? তোমার যদি কোনো কাজে আসতে পারি, অন্তত নিজেকে বলার একটু ফুর্সৎ তো পাবো—বা রে আমি!

পল্লবও হাসে: ধন্যবাদ প্রিয়ম্বদ। তবে শোনো। ব'লে প্রথমে আইরিণের চিঠি প'ড়ে শোনালো, তারপরে মোহনলালের পড়া শেষ হ'লে একটু চুপ ক'রে থেকে পল্লব বলে: কী? কথা কচ্ছ না যে?

ভাবছি।

শুধু ভাবলে চলবে না। বলতে হবে—কী করব? এক দিকে আইরিণ রাগ করেছে—

না, আমার মনে হয় এ রাগ নয়।

তবে?

ভেবে কাল বলব।

না। কাল অনেক দূরে। তা ছাড়া আমি ভাবছিলাম কাল রাতের ট্রেনেই বার্লিনে ফিরে যাই।

কিন্তু বার্লিনে ফিরে গিয়ে কী করবে তুমি যখন আইরিণ সুইজর্লণ্ডে।

তবু—

তবু না। শোনো। কষ্ট বাড়ানো কেন? মানুষ কত কষ্ট পায় কারুর আসার আশায় থাকলে আমি জানি। এখানে অন্তত এক বাঁচোয়া, আইরিণের অভ্যুদয়ের আশা নেই। অপেক্ষা যদি করতেই হয় এখানেই করা ভালো। আইরিণ বার্লিনে ফিরলে তখন ফিরে যেও সেখানে। এইই হ'ল সুবুদ্ধির কাজ।

একটু ভেবে পল্লব বলে হয় তো ঠিক বলেছ। কিন্তু ও কবে বার্লিনে ফিরবে জানাব কী ক'রে? ধরো যদি ও না জানায়?

কী পাগলের মতন কথা বলছ?

পাগল কেন? ধরো যদি ও ইতিমধ্যে আর কাউকে ভালোবেসে থাকে?

দূর পাগল!

তবে চিঠি না-লেখার কারণ কী?

আমি কি অন্তর্যামী?

তবু—

না, তবু-টবু নয়। শোনো ভাই! এ ক্ষেত্রে ব্যস্ত হ'লে সুফলের চেয়ে কুফল ফলবারই সম্ভাবনা বেশি। একটু থিতিয়ে যেতে দাও—তুমি নিজেই তো সময় চেয়েছিলে।

চেয়ে তো ভুল করেছিলাম—তোমার মতে।

কিন্তু আমার মত তো আর অভ্রান্ত নয়। তাছাড়া আমি একথাও বলি নি কি যে থতিয়ে প্রত্যেককে পথ খুঁজতে হয় নিজেরি অন্তরের কাছে?

আমার অন্তর যে একবার বলে এ-পথে চলো, একবার বলে ও-পথে।

তাই তো বলছি—থিতিয়ে যেতে দাও। তখন পাবে ঠিক পথের নির্দেশ। ব'লে একটু থেমে: আমিও ইতিমধ্যে একটু ভেবে দেখি কিছু করা যায় কি না।

পল্লব খুশি হ'য়ে হেসে বলে: যার যুযুফ আছে তার সবই আছে।

যুযুফের হাসির সাড়া বেজে ওঠে: এই-ই তো চাই, সাবাস জোয়ান! কিন্তু শোনো এবার একটা কাজের কথা বলি। এলিওনোরা বলছিল তোমার এখানে গান শেখার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। যিনি তোমাকে শেখাবেন তিনি কাল চা-য়ে আসছেন। তুমি বিরহের দাহনে ভুলে যেও না কাল আসতে।

ভুলব না। কিন্তু তুমিও ভুলো না তোমার আশ্বাস।

না ভুলব না। কেবল একটু ধৈর্য ধরে চুপ করে বসে থাকো এখানে। তুমিই তো একটি কীর্তন গাও মনে নেই: 'রাই ধৈর্যং, রহু ধৈর্যম্?' রাই এ উপদেশে কান দিয়েছিলেন বলেই না তাঁর কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছিল।

পল্লব হেসে বলে: আমারও হ'ল ব'লে। মা ভৈঃ। Grazie, amicono mio ! ২

সাত

পল্লবের মন খানিকটা শান্ত হ'য়ে এল। মনে মনে যুসুফের সাধুবাদ ক'রে ও ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে দেখল: আইরিণ গাইছে ওরই শেখানো গান: "প্রিয়, তোমার কাছে যে-হার মানি···" আনন্দের শিহরণ ব'য়ে যায় ওর দেহে—এত আনন্দ যে ওর ঘুম ভেঙে গেল। এর পরে সারা রাত আর ঘুম হ'ল না—কেবলই বাজে আইরিণের কণ্ঠে বাংলা গানের মীড়···চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার জলভরা কালো চোখ দুটি।···

* * * *

যুসুফ টেলিফোন করল দুপুরবেলা: "এলিওনোরা তোমাকে টেলিফোন করতে বলল যে ওর মোটর তোমার হোটেলে পৌঁছবে ঠিক বেলা সাড়ে তিনটের।"

না না, মোটরে কী হবে?

খুব ভালোই হবে, amico sciocco ! ৩ ওর দু'-দুখানা মোটর পাঠাতে চায়—পাঠাক না! বলে না—জো আপসে আয়া, উস্কো আনে দো ? ৪

পল্লব হেসে বলে: জানি সবই—তবে—

জানো না কিছুই, অন্তত জানো না সিনেমা তারকাদের মতিগতি। ওরা চায় ওদের ঐশ্বর্য একটু জাহির করতে। করতে দাও না! You must humour the charming, amico intelligente ! ৫

পল্লব হেসে বলে: Concesso, amico insistente !

* * * *

যথাকালে তারকার রথ এসে হাজির। উর্দিপরা সারথি পল্লবের হাতে দেয় একটি চমৎকার সুগন্ধি লেফাপা। পল্লব খুলে দেখে একটি ফুল-আঁকা কার্ড, উপরে লাল হরফে ছাপা: এলিওনোরা জে নোনি। নীচে লেখা নীল লোহিত কালিতে: Wel Come E leonora.

* * * *

এলিওনোরার ভিলাটি, রোম থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত একটি মনোরম হ্রদের উপরে পোপের বসন্ত নিলয় Castel gondolfaর কাছেই। কী সুন্দর ভিলা! মোটর থামতেই চতুষ্টয় জাপানি পুড্‌ল্ এল ছুটে। ও নামতেই তাদের সে কী পুলক! পল্লব একটি কোলে তুলে নিতে না নিতে এলিওনোরার আবির্ভাব।

পল্লব কুকুরটিকে মাটিতে রেখে দিতেই এলিওনোরা পরিষ্কার ইংরাজীতে বলল: আসুন। আপনি কুকুর ভালোবাসেন দেখে কী যে ভালো লাগলো!

২। ধন্যবাদ, পরমবন্ধু!

৩। অবোধ বন্ধু!

৪। বুদ্ধিমন্ত বন্ধু।

৫। মেনে নিলাম, নাছোড়বান্দা বন্ধু!

সঙ্গে সঙ্গে যুসুফের অভ্যুদয়, বলে ইতালিয়ানে: বন্ধু আমার বিশ্বপ্রেমিক—কুকুর বেড়াল কাকাতুয়া—ভালো না বাসে কী?

এলিওনোরা সুমিষ্ট হেসে ইংরাজিতেই বলে: তাহ'লে আমাদের বনবে ভালো।

যুসুফ বলে: ও কি? ও ইতালিয়ান জানে।

পল্লব তাড়াতাড়ি বলে: না, ইতালিয়ানে এখনো বাক্‌সিদ্ধি হয়নি কাজ চালাতে পারি মাত্র। ইংরাজিতেই কথা চলুক। ব'লে হেসে: বন্ধু আমার একজন বিখ্যাত লিঙ্গুইষ্ট—কাজেই বোঝেন না আমাদের মতন নিরীহ মানুষের অবস্থা।

এলিওনোরা হেসে বলে: হ্যাঁ, ও ভাবে—ওর কাছে যা সহজ তা বুঝি সবার কাছেই সহজ! কিন্তু চলুন—ভিতরে।

সিনেমার পূর্বোদিতা তারকার যোগ্য সাজ বটে। এর কাছে কোথায় লাগে ফ্রাউ ক্রামারের সেকেলে সাজ। সোফা, ডিভান, পারস্য-কার্পেট, রঙিন মাছ, বিচিত্র দীপমালা—কিসের অভাব? ওরা তিনজনে আরাম ক'রে বসল। এলিওনোরা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে: গিদো এত দেরি করছে! ব'লেই হেসে: আমরা জর্মণ কি মার্কিণ নই—সময় আমাদের কাছে টাকা নয়—বরং বিহারের অন্তরীক্ষ। তাই কিছু মনে করবেন না মিষ্টার বাক্‌চি!

যুসুফ বলল: ওকে পলই বোলো। ও তোমার আমার চেয়ে অনেক ছোট।

এলিওনোরা কৃত্রিম কোপে বলল: কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি! পাঁচ বৎসর অক্সফোর্ডে থেকে তবু শিখলে না—a woman is as old as she looks ?

যুসুফ হেসে বলে: And a philosopher is as old as he feels ! তাহ'লে পল, তুমি মারা পড়লে, কারণ প্রাচীন দর্শনে তুমি সিদ্ধ। কাজেই You are as old as the hills.

এলিওনোরা বলল: সে কি? মিষ্টা—পল তো গায়ক।

যুসুফ হাসে: ও বহুরূপী। যখন যে-বন্ধুরই কাছে থাকে, তারই ছোপ গায়ে লাগে।

এলিওনোরা বলে: এটা কি হিরো-ওয়র্শিপেরই ধর্ম নয়?

যুসুফ হেসে গড়িয়ে পড়ে: ওকে এক আঁচড়ে চিনেছ এলিওনোরা!

এলিওনোরা কৃত্রিম কোপে বলে: বন্ধুকে নিয়ে হাসাহাসি? Zola-র তিরস্কার মনে পড়ে: J'accuse ! (ধিক্, ধিক্!)

পল্লব প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করতে বলে: আপনি ক'টা ভাষা জানেন সিন্যোরিনা—

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলে: আমাকে এলিওনোরাই বলবেন। আপনি যুসুফের বন্ধু, কাজেই আপনার অধিকার আছে। কি জিজ্ঞাসা করছিলেন? আমি ক'টা ভাষা জানি? বেশি না—ব'লে যুসুফের দিকে চেয়ে: তবে ওর চোখে ছোট হই কি করে? তাই চার-চারটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়েছে—ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরাজি আর জর্মণ। কিন্তু ও এর উপরেও শিখে নিল আরো দু' দুটো ভাষা। ও সোজা লোক নয়। জানেন তো ওকে?

পল্লব উত্তর দিতে যাবে, এমন সময়ে এক সুদর্শন প্রফুল্ল প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছুটে এসেই এলিওনোরার দুই গালে চুম্বন।

এলিওনোরা ওর চুম্বনের প্রতিদান দিয়ে পল্লবকে বলে: ইনি হলেন আমার মামা—গিদো বিয়াংকি। রোমের একজন মস্ত গায়ক

—আমাদের সিনেমার গানের ডিরেক্টর। ব'লেই তাকে : তোমাকে তো বলেছি মিষ্টার বাকচির কথা ?

হ্যাঁ। উনি হিন্দু গান করেন, না ?

যুসুফ হেসে বলে : ঠিক নয়। ও মুসলমানি গানও করে— হিন্দু মুসলমান দুজাতের ওস্তাদের কাছেই শিখেছে কিনা।

সিঞোর বিয়াংকি বললেন : Scusi, Signori ? ৬

পল্লব ইংরাজিতে বলে : আমাদের দেশে রাগ সঙ্গীতের জন্মদাতা হিন্দু হলেও, তার পালনকর্তা এ-যুগে মুসলমান গায়কেরাও বটেন। তাই আমাদের দেশের উচ্চসঙ্গীত শিখতে হলে মুসলমান ওস্তাদের কাছেও তালিম নিতে হয়।

মামা ভাগনীর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বললেন : উচ্চসঙ্গীত ? আপনাদের সঙ্গীত তো লোকসঙ্গীত, Primitive—নয় কি ?

পল্লব বিরক্ত হয়ে বলল : সেটা নির্ভর করে যে বিচার করছে তার উপরে। খৃষ্ট যে খৃষ্ট, একদল ফারিসী তাঁকেও বলেছিল— তিনি শয়তানের সাহায্যেই শয়তানকে তাড়ান।

এলিওনোরা ব্যস্ত হয়ে বলে : গিদো কিছু মনে করে বলে নি। অমনি দুমদাম ক'রে কথা বলা ওর স্বভাব। তবে কি জানেন ? আমরা তো শুনি নি কখনো হিন্দু কি মুসলমানি গান ? এখনো মানুষ মানুষের খবর সত্যি কত কম রাখে জানেন তো ?

সিঞোর বিয়াংকি বললেন : আমার কথাটা একটু— malaccorto ৭ হয়ে গেছি—কিছু মনে করবেন না। বলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : ইংরাজিতে বলে জানেন তো—dont take offence when no offence is meant.

পল্লব হাসিমুখে করপীড়ন করে বলে : ধন্যবাদ।

এই সময়ে তিনটি পরিচারিকার চা কেক প্রভৃতি নিয়ে প্রবেশ।

এলিওনোরা চা ঢেলে পল্লবকে বললেন : চিনি ?

দু' চামচ।

চাপর্ব সুরু হল—একথা সেকথা···অকারণ হাসি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা—কখনো ইংরাজিতে কখনো বা ইতালিয়ানে।

* * * *

সন্ধ্যা হয়ে এল। এলিওনোরা আলোর সুইচ টিপতেই ঘর আলোয় আলো, অথচ স্নিগ্ধ আলো, চোখে লাগে না।

পল্লব বলল : চমৎকার সাজ আপনার সিঞোরিনা—

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলে : ফের ? বলিনি যুসুফের বন্ধুর অধিকার আছে আমার নাম ধ'রে ডাকবার।

পল্লব খুশি হয়ে বলে : গ্রাৎসিয়ে, এলিওনোরা। তবে আমি বিদেশী তো—তাই একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় বৈ কি।

যুসুফ বলল : তোমার মুখে এ কী কথা বন্ধু ? তোমার হিরো না নির্ভীকতার অবতার—বাংলার গ্যারিবলডি ?

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলল : বাজে কথা অনেক হ'ল, এবার একটু কাজের কথা হোক। ব'লেই সিঞোর বিয়াংকিকে : গিদো। উনি বার্লিনে বছর খানেক জর্মণ গান শিখেছেন, এখন ভালো ইতালিয়ান গানও কিছু শিখতে চান।

সিঞোর বিয়াংকির মুখ গম্ভীর ক'রে মুরুব্বিয়ানা সুরে বললেন : জর্মণরা রটিয়েছে—ইতালিয়ান গান শেখা খুব সোজা কিন্তু আসলে, জগতের সব গানের মধ্যে ইতালিয়ান গানই সব চেয়ে কঠিন। ইণ্ডিয়ান গানের মতন সাদামাটা নয়।

পল্লবের রক্ত গরম হ'য়ে উঠল : আপনি কি জানেন আমাদের গান—যে এ কথা বলছেন ?

সিঞোর বিয়াংকির ঠোঁটে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল : না, তবে নিছক মেলডি তো—তাছাড়া, কিছু মনে করবেন না মিষ্টার বাকচি, আমাদের কণ্ঠসাধনার রীতি এত কঠিন যে বিদেশীর পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন।

পল্লবের মেজাজ আরো খারাপ হ'য়ে গেল এ-ইঙ্গিতে, বলল : কণ্ঠসাধনার কথা যদি বললেন তবে আমাকেও বলতে হচ্ছে—কিছু মনে করবেন না সিঞোরে—যে আমাদের কণ্ঠসাধনার পদ্ধতি থেকে আপনাদেরও হয়ত কিছু শেখার থাকতে পারে।

সিঞোর বিয়াংকি দুই ভুরু তুলে একটু বাঁকা হেসে বললেন : Patrottismo è ammirabile—ma—Signore, ৮ আমাদের স্বরসাধনা এত জটিল যে বিদেশীর পক্ষে—বিশেষ ক'রে ওরিয়েণ্টাল গায়কের পক্ষে—স্বরসিদ্ধি—তবে আপনি যদি বছর দশেক আপ্রাণ সাধনা করেন তবে হয়ত একটু গাইতে পারলেও পারেন। কারণ আমাদের গানে যে-সব ইণ্টারভাল নিতে হয় সে অত্যন্ত কঠিন।

পল্লবের মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠল, বলল, : ইণ্টারভালের বিভীষিকায় আমরা ভয় পাই না সিঞোরে ! কারণ, কিছু মনে করবেন না—আমাদের গানের নানা তানালাপে যে-ধরণের ইণ্টারভাল আমাদের সাধতে হয়, সে-ধরণের ইণ্টারভাল আপনার হাজার চেষ্টা করলেও নিতে পারবেন না।

সিঞোর বিয়াংকির মুখ লাল হয়ে উঠল, ব্যঙ্গভরে বললেন কিছু মনে করবেন না। সিঞোরে, আপনাদের গান তো নিছক লোকসঙ্গীত—সহজ মেলোডি—আমাদের গান উঠেছে বিকাশে এমন একটা শিখরে—

যুসুফ বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বলল : আমাদের গানের বিকাশ কোথায় উঠেছে, তা তো জানেন না আপনি—বলেই পল্লবকে তুমি একটা জাঁকালো রাগ শুনিয়ে দাও না সিঞোর বিয়াংকিকে।

পল্লব তৎক্ষণাৎ উঠে পিয়ানোর কাছে গিয়ে টুলে বসে বলল সিঞোরে, শুনুন তবে আমাদের একটি—যাকে আপনি বলছেন সহজ মেলডি : এ রাগটির নাম মালকোষ—যদি এর একটিমাত্র তান গমক গলায় তুলতে পারেন, তাহ'লেই আমি হার মানব। তবে প্রথমেই বলে রাখি—মেলডি বলতে আপনারা যা বোঝেন, আমাদের রাগ তা নয়। রাগ বলতে কি বোঝায় দু'কথায় বোঝানো অসম্ভব—তবে একটু শুনলে হয়ত টের পাবেন মেলডির বিকাশ কোথায় পৌঁছেছে আমাদের রাগ। ব'লেই পিয়ানোয় পাঁচটা পর্দা পর পর বাজিয়ে : শুনুন মন দিয়ে—মাত্র এই পাঁচটি পর্দায় এ রাগটি গাইছি—সি, ই ফ্ল্যাট, এফ, এ-ফ্ল্যাট আর বি-ফ্ল্যাট। এ

৬। কী বললেন, মহাশয় ?

৭। বেফাঁস।

৮। দেশভক্তি চমৎকার—কিন্তু মহাশয়,

আপনাদের কল্পনারও অতীত, কিন্তু আমাদের শিখতে হয় প্রথমেই। ব'লে ঠাটটি গলায় গেয়ে: এবার এ-ঠাটে নানা রকম তান শুনুন —মাত্র এই পাঁচটি পর্দা, মনে রাখবেন। কোথাও যদি এর বাইরে একটি পর্দাও লাগাই ধমকে দেবেন, আমি হার মানব। ব'লে 'উমড ঘুমড ঘন গরজে' ব'লে একটি মালকোষের অস্থায়ীটুকু গেয়েই রকমারি তান ও গমক দেওয়া সুরু করল। কসরৎ-এর শেষে বলল: এটি গাইলাম আপনাদের চতুর্মাত্রিক ছন্দে। কিন্তু এবার এই রাগেই আর একটি গান গাই শুনুন এমন একটি তালে যা আপনি ধরতে পারবেন না—মানে হাতে তাল দিতে পারবেন না পারেন তো করজোড়ে ক্ষমা চাইব বলেই উত্তেজিত সুরে ঝাঁপতাল ধরে দিল পঞ্চমাত্রিক ছন্দে:

শঙ্কা তরে বন্ধু নহে—প্রেমের ডাকে চাই শরণ,
সিন্ধু তরি' অকূলে কূল লভিব বরি রাঙা চরণ।

ঝাঁপতাল শেষ করেই তাল ফের ধরল সপ্তমাত্রিক ধামারে:

'বেসেছি যদি ভালো, যায় না এ তনুর প্রতিটি অণু কেন তোমার পানে—তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, একথা অন্তর যখন জানে?'

গেয়েই থেমে বলে: এ তাল হল বিষমপদী, দেখুন আগের তাল ছিল দুই তিনের ছন্দ, এ হল তিন দুই দুই কিনা সাতের ছন্দ—এ তাল আয়ত্ত করতে আপনাদের অন্তত দশটি বৎসর সাধনা করতে হবে যদি সুরের সঙ্গে সুরবিহার করতে চান। বলেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে গেয়ে চলে:

'তোমার শ্রীচরণে আমার আমি যদি অর্ঘ সম হয় আপনি নত,
জানি এখনি তব পরশে পঙ্কজ ফুটিবে কঙ্করে আমার যত।
ডুবি না তবু কেন সাগরে তব? চলি আজিও ভেসে ভেসে
কিসের টানে?

তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, এ কথা অন্তর যখন জানে?'

গান শেষ করে বলে: আমি এই যে সব তান বাঁট দেখালাম, আমাদের দেশের ওস্তাদের কাছে তা ছেলেখেলা। সুরকে নিয়ে তাঁরা যে কাণ্ড করেন শুনলে আপনারা স্তম্ভিত হবেন। শুনুন সিঞোরে। আপনারা য়ুরোপে কথায় কথায় আমাদের ওরিয়েন্টাল বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। আমরা যদি পেট্রিয়ট হই, তবে আপনারা অন্ধ তথা আত্মম্ভরী। কিন্তু দাম্ভিক মানুষ পায় না সত্যের দেখা, বিনয়ী না হলে চোখের ঠুলি খসে না। আমি এত কথা বলতাম না—কিন্তু আমি এসেছিলাম শিখতে। আপনাদের কাছে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক কিছু শিখবার আছে। কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গীতকে প্রিমিটিভ বলে ডিসমিস করে দিলেন তার কিছুই না জেনে।

য়ুসুফ উঠে ওর কাঁধে হাত রেখে বলে: হয়েছে, হয়েছে—আর থাক।

এলিওনোরা বলে ওঠে: না না বলুন আপনি। গিদোর একটু শিক্ষা হবে—ভালোই হবে।

পল্লব ঈষৎ লজ্জিত হয়ে সুর নামিয়ে নিয়ে বলল: মাফ করবেন সিঞোর বিয়াংকি। আমি তর্কাতর্কি কি জাঁক করতে সাত সাগর পেরিয়ে আসি নি। এসেছি সত্যি শিখতে। কিন্তু আমাদের দেশের বহু বিকশিত ঐতিহ্যের কিছুই না জেনে যখন তাকে আপনারা দুকথায় নস্যাৎ করে দিতে এগিয়ে আসেন, তখন একটু বিরক্ত হতে হয় বৈ কি। আর একটা কথা: আমাদের দেশের সঙ্গীতের আমি বেশি জানি না, সামান্যই শিখেছি। ইচ্ছা আছে: দেশে ফিরে রীতিমত শিখব। আপনাদের গানে কিছু তালিম নিতে এসেছি আপনাদের সঙ্গীত মুখস্থ করে এদেশে নাম কিনতে নয়—আপনাদের সঙ্গীতের বিশেষ করে নানা বিন্যাস ও উদ্ভাবন থেকে যতটা পারি গ্রহণ করে আমাদের সঙ্গীতকে আরো সমৃদ্ধ করতে। কারণ আপনাদের যন্ত্রসঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হলেও আপনাদের কণ্ঠসঙ্গীত আমার তেমন ভালো লাগে না। কণ্ঠসঙ্গীতে আপনারা আমাদের কাছেও আসতে পারেন না জানবেন, যেমন অভাবনীয় সুরসম্পাতে আমাদের যন্ত্রসঙ্গীত, অর্কেষ্ট্রা, আপনাদের সঙ্গীতের কাছে আসতে পারে না। তাই দেখছেন পেট্রিয়ট আমার উপাধি নয়, আমার সত্য উপাধি—সত্যান্বেষু, জিজ্ঞাসু। সত্যকে জানতে হলে চাই বিনয়—তাই আমি নম্র ভাবেই আপনাদের সঙ্গীতকারদের কাছে শিখতে এসেছি। কিন্তু আপনাদেরও ঠিক এমনি নম্র হ'য়ে আমাদের সঙ্গীতকারদের কাছে শিখতে যাওয়া দরকার। আর যদি যান, দেখবেন—আমাদের ভজন, কীর্তন, নাট্যসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, তাল ও তানের বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য এসব থেকে আপনাদের অনেক কিছুই শিখবার আছে। বলে একটু থেমে: যদি অন্যায় কিছু ব'লে থাকি ক্ষমা করবেন এই ভেবে যে গায়ে-পড়ে আঘাত দিতে চেয়ে আমি আজ এসব কথা বলি নি।

সিঞোর বিয়াংকি মাথা নিচু করে বললেন: না সিঞোরে, আপনি অন্যায় কিছুই বলেন নি, তাই ক্ষমা করবার প্রশ্নই ওঠে না। বরং আপনাকে আমার ধন্যবাদই দেওয়ার কথা যে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা অনেক বিষয়ে আজো কী রকম অজ্ঞ আছি। আপনিই আমাকে ক্ষমা করবেন যে আপনাদের এ আশ্চর্য সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু না জেনে চলতি মতামতকেই প্রামাণ্য ক'রে যা তা বলেছি।

পল্লব মুহূর্তে প্রসন্ন হ'য়ে ঈষৎ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল: সে কি কথা? আমিও কি কম যা তা বলেছি না কি? তাই আপনিও কিছু মনে করবেন না, সিঞোরে।

সিঞোর বিয়াংকি বললেন: No, niente signore।[১] কেবল একটা কথা বলব কি? যদি বিশ্বাস করেন অবশ্য—

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলে: না করবেন না বিশ্বাস। তুমি থামো। বার বার বলি যেখানে সেখানে দুমদাম ক'রে কথা বোলো না—

পল্লব বলে: না না, সে কি কথা? আপনি বলুন—ব'লে য়ুসুফকে দেখিয়ে: আমার এই অতি বিজ্ঞ বন্ধুটিকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হলে খবর পাবেন যে বিশ্বাস না করা আমার স্বভাব নয়—বরং উল্টো। অন্তত ও ত আমাকে উঠতে বসতে ধমকায় যে, আমি এখনো সাবালকই হইনি—তাই এক কথায় সবাইকেই বিশ্বাস করে যা খাই—taking them at their face-value.

এলিওনোরা বলে: আপনি ওর কথা শোনেন কেন? নিজের

১। না না কখনই নয় মহাশয়।

স্বভাবেই চলবেন। যা খান তাতে কী? তাছাড়া—বলে একটু থেমে: বিশ্বাস না করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা ঢের বেশি ভালো।

য়ুসুফ আভূমি প্রণত অভিবাদন করে বলে: একজন জ্ঞানী বলেছিলেন, হায়রে হায়: Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pluerer ১০ মরুকগে আমি কাঁদি কাঁদব, আপনি বলুন সিক্তোরে, আপনার অবিশ্বাস্য কথা আজ আমিও বিশ্বাস করব, কথা দিচ্ছি।

সিক্তোর বিয়াংকি হাসলেন না, পল্লবকে বললেন: কথাটা এই যে, আপনাকে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ইতালিয়ান আমি শেখাতে চাই নিজেরি গরজে—আর কেন গরজ শুনবেন? কারণ এ রকম আশ্চর্য কণ্ঠ আমি ইতালিতেও বেশি শুনিনি। তাই শুনতে চাই ভালো ইতালিয়ান গান আপনার কণ্ঠে কী রকম শোনায়।

য়ুসুফ এলিওনোরাকে টেনে ধরে দাঁড় করিয়ে বলে: বলো হিপ হিপ,—

এলিওনোরা ভর্ৎসনার সুরে বলে: শ—শ। How vulgar এ সময়ে শুধু চাই শান্তি পাঠ—মহাকবি দান্তের 'E la sua volontale è nostra pace. ১১

আট

গিদো প্রস্থান করতেই এলিওনোরা পল্লবকে বলে: শুনুন, আপনার কণ্ঠ শুনে কী যে বলব ভেবে পাচ্ছি না।

য়ুসুফ হেসে বলে: ওকে কেন এসব বলছ? ও হয়ত ফের বিশ্বাস ক'রে বসবে।

এলিওনোরা বলল: তুমি থামো: ব'লেই পল্লবকে: আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল বলবো?

কী?

সালভিনির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেওয়া। এরকম কণ্ঠ তাঁকে না শোনালেই নয়।

পল্লব সভয়ে বলে: না না, তিনি ইতালির শ্রেষ্ঠ গায়ক—তাঁর সামনে আমি গাইব কি? পাগল!

এলিওনোরা ফরাসি কেতায় কম্প্লিমেন্ট দেয়: পাগল করবার মতনই কণ্ঠ আপনার—ব'লে হেসে—কিন্তু ভয় নেই—সালভিনি কুমারী নন—পুরুষ, তায় উপরে বৃদ্ধ—তিনি টাল সামলাতে পারবেন।

পল্লব সকুণ্ঠে বলে: কী যে বলেন—

এলিওনোরা হেসে বলল: আমার বলা সহজ—কারণ য়ুসুফ তো ফাঁসই ক'রে দিয়েছে যে আমার বয়স বিপদের কোঠা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ঠাট্টা না। আপনাকে বলছি আমি—তিনি অন্তত: খুশি হবেন এমন অপরূপ কণ্ঠ শুনে। তাঁর গানও আপনাকে শোনাতে চাই।

পল্লব বলল: আমি শুনেছি তাঁর গান।

কোথায়?

বার্লিনে।

এলিওনোরার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে: বটে! কেমন লাগল তাঁর কণ্ঠ?

পল্লব বলল: অপূর্ব! যেমন উদাত্ত তেমনি মধুর। য়ুরোপে এ পর্যন্ত অমন কণ্ঠ আমি শুনিনি।

এলিওনোরা সগর্বে বলল: গলায় ইতালিয়ানদের কাছে কে? আর ভাবুন—এখনো ওই গলা—ষাট বৎসর বয়সে। দু-হাজার লোক শুনতে পায়!

পল্লব বলল: তা সত্যি। আর কণ্ঠস্বরের এই বোলন্দ্ আওয়াজ বার করবার কৌশলটাই আমি ভালো ক'রে শিখতে চাই এদেশে।

তাই তো আরো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াই চাই।

কিন্তু সালভিনি তখন য়ুরোপে কন্সার্ট-টুরে ভ্রাম্যমাণ। তাই অনেক আলোচনার পরে স্থির হ'ল যে তিনি তাঁর ভ্রমণান্তে রোমে ফিরলেই পল্লব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে এলিওনোরার সঙ্গে।

* * * *

পল্লবের বিদায় নেবার সময় হ'ল। এলিওনোরা ওকে মোটরে তুলে দেবার সময়ে হাসিমুখে বলল: এখন থেকে কিন্তু এখানে মাঝে মাঝে আসতেই হবে। একদিন গান শুনিয়েই পালালে চলবে না।

পল্লব খুশি হ'য়ে বলে: এ তো আমার সৌভাগ্য, সিন্তো—

ফের? তোমাকে পল ব'লে ডাকব আর তুমি আমাকে ডাকবে এলিওনোরা, আর ভুল হবে না তো?

না, প্রাৎসিয়ে—এলিওনোরা!

এলিওনোরা হাততালি দিয়ে বলে: পাশ।

য়ুসুফ বলে: এলিওনোরা! তোমার তো আজ সারারাত শুটিং—আমি এই সুযোগে পলের সঙ্গে একটা থিয়েটার দেখে আসি?

কী?

পিরান্দেল্লোর Sei Personaggi in Cerca d' Autore. ১২

এলিওনোরা পল্লবকে হেসে বলে: হাসতে যদি ভালোবাসো তবে এ-নাটিকাটি দেখলে খুশি হবেই হবে—আমার আজ শুটিং না থাকলে আমিও যেতাম।

য়ুসুফ বলল হেসে: এখন তো পল তোমার মুঠোর মধ্যে—ওকে নিয়ে যেও কাপ্রিতে—ওর মন খারাপ—ঐ যাঃ ভুলে, ব'লেই এলিওনোরার দিকে চেয়ে চোখ মিট-মিট ক'রে: মন খারাপ হলেও দান্তের মতন অবস্থা ওর এখনো হয় নি, তাই বলো না ওকে, লক্ষ্মীটি: 'Tu mi Segui ed io Saro tua guida.' ১৩

[ক্রমশঃ।

১০। আমি সব তাতেই হাসি এই ভয়ে—নৈলে পাছে সব তাতেই কাঁদতে হবে।

১১। তাঁর (ভগবানের) ইচ্ছাই আমাদের শান্তির একমাত্র আশ্রয়।

১২। ছটি মানুষ গ্রন্থকারের খোঁজে।

১৩। এসো আমার সঙ্গে, আমি হব তোমার দিশারিণী।

স্পেনসার সুব্রত দত্ত

তাই স্থির হল অবশেষে। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে, বর্তমান জীবনকে ইতিহাসের একটা অধ্যায় করে, নতুন অধ্যায়ের গোড়াপত্তন। একশ' সাতষট্টি টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা। সওদাগরী অফিস পুরো একশ' আটষট্টি দেবে না। কি দরকার অমন কাজে ?

ভাগ্য মেরেছে অশান্তকে। চোখের পাওয়ার—মাইনাস আট। কমপিটিটিভ পরীক্ষায়ও সুবিধে হবে না। বেণীনন্দন ষ্ট্রীটে বীরেশ বাবুর মেসের বোর্ডার হয়ে সে সারাজীবন কাটাতে পারবে না। না হয় ভগবানে মেরেছে—তবু এই তিনশ' কুড়ির বেড়াজালে ও নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবে না। এ জীবন ওর নয়—ওর নয়। তিনতলার ঘরের দু' নম্বর ঘর। তার দক্ষিণ দিকের বেডটা ওর। ঘরের আর দুজন বোর্ডার কেন জানি না ওকে 'খাতির করে দক্ষিণ দিকের বেডটা ছেড়ে দিয়েছে। তবু সন্ধ্যার সময় অশান্ত পশ্চিম দিকের জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে। নীল আকাশ, ধূসর পৃথিবী। কোলকাতার আকাশে পানকৌড়িরা সার দিয়ে উড়ে চলে যায় অনেক দূরে। কোথায় যায় ওরা পশ্চিম-আকাশে ? অনেক দূরে ? অনেক দূরে।

পশ্চিম দিকের বেডটা অসিত রায়ের। সে কি করে কোথায় থাকে অশান্ত খোঁজ নেয় না, তবে জানা আছে যে সে দশটা-পাঁচটার কেরাণী নয়। অন্য বেডে থাকে অতুল নিয়োগী, সে ভেবেছিল অশান্ত বুঝি মেয়ে দেখে, পশ্চিমের জানলায় একদিন মুখ বাড়িয়ে দেখে সারি সারি বস্তীর চালা আর গ্যারাজ। কি দেখে অশান্ত ?

এই পশ্চিম দিকের অনেক দূরে এক দ্বীপ আছে, সে দ্বীপ লবংগ-দারুচিনির বাতাসে মন্থর নয়, সন্ধ্যা সেখানে অসংখ্য তারার আলোয় উদ্ভাসিত নয়। সেই দ্বীপের বন্দরে জাহাজ আসে পণ্য নিয়ে, আর আশা নিয়ে সেই বন্দরের স্বপ্ন দেখে অশান্ত, কোন বন্দর ? টিলবারী না সাদাম্পটন ? ও ঠিক জানে না। ওর পরিচিত কয়েকজন এসেছে নীল রংএর air letter এসেছে ওর নামে একাধিক বার। তবে তাদের কেউ নেমেছে টিলবারীতে, কেউ সাদাম্পটনে। মেসের ঠাকুর তখন ওকে প্রশ্ন করেছে বাবু বুঝি বিলেত যাবেন ? আপনার দেখি রাণীর ছাপমারা নীল কাগজে চিঠি আসে। অশান্ত জবাব দেয় না, অতুল নিয়োগী একদিন কলতলায় দাঁতন করতে করতে আলোচনা করছিল ওর বিলিতী চিঠির কথা। অশান্ত কিছুই বলে না এদের। ওর আয়োজন যদি মিথ্যে হয় ? তবু আয়োজন সে এগিয়ে এনেছে অনেকখানিই।

তোমাকে তাহলে একটা কাজ যোগাড় করতে হবে—সন্ধ্যা বলে, নয়তো চলবে কি করে ? তোমার বাবা যদি হঠাৎ সরকারী কাজটা না ছেড়ে দিতেন তাহলে হয়তো কিছু টাকার আশা থাকতো।

না, বাবার কাছে কিছু আশা নেই। বাবার নিজের সঞ্চয় আছে কি না তা-ও জানি না। বাবার মনে বৈরেগীর রং লেগেছে, আর তা অনেক দিন। মা বাবার পরেই, আমার নিজের সঞ্চয়ের ওপর ভরসা করতে পারি না। যদি যাই তো কাজ যোগাড় করতেই হবে।

না গেলে কি হবে অশান্ত ? বিদেশ-বিভুঁয়ে ? সেখানে তো কেউ চেনা নেই ?

জানি না সন্ধ্যা—তবু আমাকে যেতেই হবে। কাজ কি যোগাড় হবে না ? কত ছাত্র তো সেখানে কাজ করে পড়াশুনো করছে। আমার যোগ্যতা বেশী না হলেও কেমিষ্ট্রীতে অনার্স ডিগ্রী তো আছে ? আমারও কি কাজ হবে না ?

আচ্ছা অশান্ত, তুমি যদি যাও তবে কবে ফিরবে ? ক'-বছরের জন্য যাচ্ছ ?

জানি না তো। তিন বছর চার বছর—হয়তো অনেক বছর।

অনেক বছর না ? তারপর এই অনেক বছর পরে ঘরে—তোমার আমার আবার দেখা হবে তখন ?

তখন কি ? অশান্ত বলে। তখন সেই তুমি আর এই তুমি কি এক থাকবে ? যে পথে পথ চলা হয় না—ঘাসের অংকুর জন্মায় সেখানে, পথের রেখা মুছে যায়, একদিন সূর্যও নিবে যাবে।

যাবে বোধ হয় সন্ধ্যা, তবুও। আচ্ছা অশান্ত, তোমার চোখের পাওয়ার কত ? মাইনাস আট, তাই না ?

হাঁ মাইনাস আট। জান অশান্ত, তোমার চোখের চশমা খুলে নিলে তোমাকে আমার কেমন লাগে ?

কেমন লাগে কি করে বলব, আমি তো কিছুই দেখি না।

আমি দেখি তুমি বড় অসহায়, তোমাকে কেউ দেখার নেই। আমারও সাহস নেই তবু যদি পারতাম।

অশান্ত চুপ করে থাকে, সন্ধ্যা ওর দয়িতা নয় বান্ধবী। সন্ধ্যাকে তার ভালো লাগে, সন্ধ্যার সংগ সে চায় হয়তো কিছুক্ষণ বা কিছুদিন, কিন্তু সারাজীবনের কথা ও আজও ভেবে দেখেনি। অশান্তর নীরবতা অনেক কথাই বলে। তাই সন্ধ্যা খুব সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অশান্তকে সে ভালবাসে, অশান্ত তাকে ভালবাসে কি না সে জানে না। বোধ হয় না। তবু সে আশা রাখে, আর অশান্ত যদি চলে যায়—তাহ'লে ওর কোন আশাই থাকে না, সাতাশ বছর বয়স ওর, হৃদয়ের আবেগ শুকিয়ে এসেছে বকুলতলা স্কুলে এগারটা-পাঁচটা চাকরী করে, ভালবাসা তার প্রয়োজন—তার জীবনে অপূর্ণতার সমাপ্তি আনবে অশান্তর ভালবাসা—এ তার স্বপ্ন, চুপচাপ স্বল্পভাষী অশান্ত ওর কাছে এসে বত কথা বলে। একদিন হয়তো ও সেই কথাই বলবে যার জন্য সন্ধ্যা বসে আছে, কবে তুমি বলবে সে কথা অশান্ত?

অশান্তও বোঝে। সাতাশ বছর বয়স তার। ওর মাকে বলে সে ভুলে গেছে অনেক দিন, মা গেছে অনেক দিন—তখন ওর পনের বছর বয়স। মার অনেক ইচ্ছা ছিল—অনেক সাধ ছিল অপূর্ণ—তাই অশান্তর পৃথিবীও অপূর্ণ রইলো। কলেজে পড়তে আসার সংগে মেসজীবন সুরু—মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে। তাতে সুর নেই, আছে দোয়ারকির ফিরে আসা লাইনে বারে বারে আবৃত্তি, গতি আছে—ছন্দ নেই। এ জীবনে অভ্যস্ত হতে দেরী হোল না। আবার বৈচিত্র্য আনলো সন্ধ্যার সংগ। আজ সে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিজেকে দোষী মনে করতে লাগলো। এই যে অতি-সাধারণ শ্যামলা রং-এর মেয়ে এর সংগে ওর প্রতিটি শনিবার নিয়ম করে দেখা করার নিশ্চয় কোনও মানে আছে—অন্ততঃ সন্ধ্যার মা-বাবার কাছে। আইবুড়ো ছেলেটি প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে তাঁদের বাড়ীতে চায়ের আসরে হাজিরা দেয়—ছেলেটি পাত্র হিসাবে সুপাত্রই, তার ওপর স্বজাতি, মেয়ের বয়স বাঙালী ঘরের হিসাবে কম নয়—আর মেয়ে সুরূপাও নয়, অতএব বোস-দম্পতির অনুমোদন অতি স্বাভাবিক, অশান্ত এ সুযোগ নিয়েছে—কিন্তু তার অপব্যবহার করেনি। সন্ধ্যাকে ও আজ আবার বুঝতে চায়। কিন্তু এতে বোঝার আর কি আছে? সন্ধ্যার সে অবলম্বন ছিল—সন্ধ্যার সে ভবিষ্যৎ ছিল—সন্ধ্যার সে স্বপ্ন।

অনেকক্ষণ ওরা বসে থাকে—অশান্ত ভরসা পায় না কিছু বলার। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজে আশে-পাশের বাড়ীতে। শনিবারের বিকেল ফুরিয়ে যায়, একটু পরে অশান্ত বলে—আজকে আসি।

ধীরে ধীরে অশান্ত এগোয়, রাইটার্স বিলডিং-এর হাংগামা,—বিরাট হাংগামা। প্রথম যেদিন ও পাসপোর্টের ফর্ম নিয়ে আসে তা ওর মনে আছে। কি এক বিরাট উত্তেজনা, বিলাত-যাত্রার প্রথম আয়োজন। ওর মাথা থেকে পা অবধি বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে, না ওর ঘুম ভেঙেছে। আয়োজন সুরু হয়েছে। যতদিন না পাসপোর্টের ঝামেলা শেষ হয়েছে ততদিন ওর বড় অস্বস্তি গেছে, ইনকোয়ারী হবে পুলিশ থেকে, লোক আসবে ওর খোঁজখবর নিতে। তখন তো মেসে জানাজানিই হবে, উপায় কি? জানাতেই হবে।

আপনার খোঁজে পুলিশ-অফিস থেকে একজন এসেছিল। অতুল নিয়োগী ওকে বলে, কি ব্যাপার—স্বদেশী করছেন নাকি? তারপর হেসে বলে, না তাও বা কি করে হয়, দেশ তো এখন স্বাধীন। তাহলে কি নোট-জাল-টাল করছেন?

আপনাদের মত রুমমেট যার, তার কি তাই করা উচিত নয়? অশান্ত আহত-স্বরে বলে।

চটেন কেন মশাই? রসিকতাও বোঝেন না? আপনাকে বোঝা সত্যি কঠিন, মাপ চাইছি। বলুন—কবে বিলেত যাচ্ছেন?

একটা কথায় যেন ভেলকি খেলে। মুহূর্তে অশান্ত সম্পূর্ণ বদলে যায়। ওর মায়ের কথা মনে পড়ে—রাগ মনে রাখিস নে ছোটখোকা, কেউ যদি মাপ চায় তো সব ভুলে যাস। অশান্ত নিজেকে সামলে নেয়। সহজ হয়ে আসে ওর ব্যবহার।

চেষ্টা করছি অতুল বাবু, তবে জানেন তো—যাওয়া বড় কঠিন, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে, তবে যদি সম্ভব হয়, ভাল কথা, আমার সন্ধানে কখন লোক এসেছিল পুলিশ-অফিস থেকে? আবার কবে আসবে—কিছু বলে গেছে?

হ্যাঁ, লোক এসেছিল কাল সকালে। আবার আসবে আজ রাত্রে, আপনাকে জানাতে বলেছে।

শেষ হোল একের পর এক জট খোলা, সবচেয়ে বড় হাংগামা পাসপোর্ট পাওয়া, তা যেদিন চুকলো সেদিন অশান্তর যেন রাহু-মুক্তি হোল।

কবে বিলেত যাচ্ছেন? গলির মোড়ের ষ্টেশনারী দোকানের জগদীশ বাবু জিগ্যেস করে, ছাপোষা জগদীশ সরকার—বাড়ীর সামনের ঘরে ষ্টেশনারী দোকান, অশান্ত ওর কাছে দাড়ি কামাবার ব্লেড, সাবান-টাবান কেনে, একবার সে সন্ধ্যার প্রসাধনের কি যেন সুগন্ধি এসেন্সও কিনেছিল, কেন জানে না, তবে তা আর সন্ধ্যাকে দেওয়া হয়নি, ওর হাতবাক্সেই আছে, বিলেত যাবার আগে সন্ধ্যাকে তা দিয়ে যাবে—মনে মনে ঠিক করে রেখেছে অশান্ত।

এখনি তারিখ ঠিক হয়নি জগদীশ বাবু! এই পাসপোর্টের হাংগামা সবে চুকেছে—এখন প্যাসেজের ব্যবস্থা করতে হবে।

যান মশাই চলে, এদেশে থাকলে কিসসু হবে না, আপনাদের মত ইয়ং-ম্যানরা যদি ঘুরে এসে কিছু করে।

অশান্ত বিশেষ কিছু বলে না, শুধু একটু হাসে। কি-ই বা বলার আছে।

কদ্দিন থাকবেন বিলেতে? আবার প্রশ্ন হয়।

বছর তিনেক—অশান্ত বলে।

তা একা ফিরবেন তো, না হেঁ হেঁ—জগদীশ সরকার দন্তপাটি বিকশিত করে তারপর আবার বলে না না, তাই বা কেমন করে হয়? আপনার তো ঐ বকুলতলা স্কুলের দিদিমণিটি যার জন্য আপনি আমার দোকান থেকে সুরভি পুষ্পসার এসেন্স কিনলেন। তা বে-থা করেই যাবেন তো?

কে বলেছে আপনাকে এসব কথা?—অশান্তর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

হেঁ হেঁ হেঁ—জগদীশ সরকার আবার কান-সকড়ি হাসি হাসে আমাদেরও তো বয়সকাল ছিল অশান্ত বাবু! মেসবাড়ীতে আপনার অসুখের সময় ওনার যাতায়াতের কথা কে জানে না। আর আমার ছোট মেয়ে টিয়া তো ঐ স্কুলেরই, সেই তো বলে বাবা সন্ধ্যাদিদিকে দেখলুম বীরেশ বাবুর মেসবাড়ীতে। এবারে বুঝি

মেসে মেয়েছেলেরা থাকবে? তা এ আর এমন কি ব্যাপার যে এই নিয়ে আপনি রাগারাগি করছেন?

না গুরুতর আর কি? তবে আপনারা বোধ হয় গুরুতর হলে খুসী হতেন—অশান্ত দোকানে আর দাঁড়ায় না। ছ' মাস আগে ও নৈহাটিতে গিয়েছিল এক বন্ধুর বিয়েতে। সেখান থেকে ফেরার পরে ওর সেপটিক ফিভার হয়, আর তখন সন্ধ্যা আসে ওকে দেখতে। সন্ধ্যার সেদিন আসাটা ও খুব অনুমোদন করেনি। মেস-বাড়ীতে অনাত্মীয় পুরুষ বন্ধুকে কোনও তরুণীর দেখতে আসার একাধিক মানে নেই। সেই শনিবারের বৈঠকে অশান্ত হাজির হয়নি বলে সন্ধ্যা তার পরের দিনই এসেছিল ওর খোঁজে।

রবিবারের বিকেল সেদিন, সদর দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যা কড়া নাড়ে, মেসের ঠাকুর রান্নাঘরে আর চাকর শ্রীহরি ঝিমোচ্ছিল। একটু অবাক হয়ে শ্রীহরি এগোয়, বেণীনন্দন ষ্ট্রীটের বীরেশ বাবুর মেসে সুবেশা তরুণী? নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে অন্য বাড়ীর।

কা'কে চাই আপনার? শ্রীহরি প্রশ্ন করে।

এটা কি বীরেশ বাবুর মেস? এখানে অশান্ত মিত্র থাকেন?

হ্যাঁ এখানে অশান্ত বাবু থাকেন তিনতলায় ছ' নম্বর ঘরে। কিন্তু বাবু তো জ্বরে বেহুঁশ, অতুল বাবু গেছেন ডাক্তার ডাকতে, আপনি?

কোন রকম উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা ওপরে আসে। ছেলেটার জ্বর তাই সে হাজির হয়নি!

এই অশান্তর ঘর! তিন দিকে তিন চৌকী পাতা, দড়ির আলনায় ধুতি পাঞ্জাবী এলোমেলো, কয়েকটা বাক্স-তোরংগ ইতস্তত: ছড়ান এক কোণে স্তূপাকার বই আর খবরের কাগজ। ভিজে গামছা পড়ে আছে আর এক কোণে, চৌকীতে অশান্ত শুয়ে, বোধ হয় বেহুঁস।

হাত দিয়ে সন্ধ্যা ওর কপালের তাপ দেখে, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কোনদিন অশান্তর ও কপাল ছোঁয়নি। এই প্রথম ছোঁওয়া তার কপাল, আলগোছে সন্ধ্যা ওর মুখে গালে হাত দেয়, মুখের একপাশ একটু ফোলা কেন ও বোঝে না। দু চোখ ভরে সন্ধ্যা অশান্তকে দেখে, এমন করে ও কখনও অশান্তকে দেখেনি। একবার ইচ্ছে হয়েছিল অশান্তর ফটো চাইতে, কিন্তু কাঙালপণারও সীমা আছে, তাই আর চাওয়া হয়নি, দু চোখ সন্ধ্যার জলে ঝাপসা হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় অশান্তর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকে। উপায় নেই তার, হায় অদৃষ্ট! যাকে সে ভালবাসে তাকে সেবা করবারও ওর অধিকার নেই? চোখ মুছে সন্ধ্যা আবার দেখে। বকুলতলা স্কুলের অংকের টীচার সন্ধ্যা বোস, যে হোম-টাসক না আনলে কোন ছাত্রীকে ক্ষমা করে না, আজ তার দু চোখ ভরে জগতের কাছে মার্জনা-ভিক্ষা। যদি সে দু'দণ্ড অশান্তর মাথা ওর কোলে রাখে—ওকে কি পৃথিবী ক্ষমা করবে না?

একটু পরে অতুল নিয়োগীর সংগে ডাক্তার আসে। সেপটিক ফিভার। গলার গ্ল্যাণ্ডে আর দাঁতে সংক্রামিত রোগ, সন্ধ্যাকে নীরব-বিস্ময়ে দেখে! মেসবাড়ীতে অবিবাহিতা তরুণী! মরুভূমিতে মেঘের ছায়া! সেই দিন অশান্ত হাসপাতালে যাবার পরে জলসা বসে হুজুগের। কে এই মেয়েটি? যার সমাধান করেছিল জগদীশ সরকারের অকালপক্ক মেয়ে টিয়া। দুই আর দুইএ চার হোল। এই সব ছেলে মশায়, বিশ্বাস হয় না এমন ভালমানুষের মত দেখতে, বিশ বাঁও জল। অশান্তকে অবশ্য এ নিয়ে অসিত রায় প্রশ্ন করেনি, সে সাতে পাঁচে থাকে না। অন্যের জন্য তার মাথা ব্যথা নেই। অতুল নিয়োগী একদিন টিল ফেলেছিলেন, আপনারা ভাগ্যবান অশান্ত বাবু, সেপটিক ফিভারেই বান্ধবী ছুটে আসে, আর আমাদের ঘরে নোটিশ দিলেও কেউ আসবে না। নিজের স্বভাব অনুযায়ী অশান্ত চুপ করে থাকে।

আজ জগদীশ সরকারের কথা শুনে অশান্ত সন্ধ্যার কথা আবার ভাবে। কবে কথায় কথায় ও বলেছিল বেণীনন্দন ষ্ট্রীটে বীরেশ বাবুর মেস বিখ্যাত। এর নম্বরের দরকার করে না। একটা শনিবার ওর সন্ধ্যাদের বাড়ীর অনুপস্থিতিকে তাকে এত উতলা করেছে যে সে তার পরের দিনই হাজির হয়েছে বীরেশ বাবুর মেসে! সন্ধ্যা কি ওকে ভালবাসে? কিন্তু ওর তো কিছু করার নেই? ভালবাসার জন্য সময় দরকার, অবসর দরকার, অশান্তর অবসর নেই অনেক তাড়া, তাছাড়া অনিশ্চিতের পথে ওর যাত্রা। এ বিলাস ওর সাজে না। হয়তো একদিন ওর অবসর আসবে, এ বিলাস সেদিনের জন্য থাক।

সেজমাসীর বাড়ী যেতে হবে। ছোট বোন লীলা ওকে বড় ভালবাসে। অশান্তর নিজের বোন নেই। লীলা সহোদরার মত। আর ক'দিন পরে তো ও চলে যাবে। 'কারগো' জাহাজের ব্যবস্থা হয়ে গেছে ভিজগাপট্টম থেকে ছাড়বে জুলাই মাসের শেষে। এখন মে মাসের শেষ। বোনটার জন্য একটা কিছু কিনতে হবে যাবার আগে। কবে ফিরবে তার স্থির নেই, হয়তো ততদিনে ও শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে, কি কিনবে অশান্ত? সন্ধ্যার জন্য আবার কিছু কিনতে হয়, ওকেও দেবে একটা অভিজ্ঞান—স্যুভেনীয়র, কিছু টাকা খরচ হবে, তা হোক।

আপার সার্কুলার রোডে যাবার বাসে অশান্ত চেপে বসে, সেজ মাসীর বাড়ী যাবার পথে নেমে লীলার জন্য এক ভাঁড় দই আর রাবড়ী নিয়ে যাবে, বেচারা মিষ্টি খেতে বড় ভালবাসে, গত বছরের কথা অশান্তর মনে আছে—পূজোর বোনাস পেয়ে সেজমাসীর বাড়ীতে গিয়েছিল লীলার জন্য একবাক্স কড়াপাক সন্দেশ নিয়ে, রবিবারের দুপুর—লীলা তখন ঘুমিয়ে ছিল মেঝেতে মাদুর পেতে। অশান্ত চুপি চুপি ওর এক পাশে বাক্সটা বসিয়ে লিখে রেখেছিল—রাক্ষুসীর জন্যে, ঘুম ভেঙে উঠে ওর আনন্দ ভোলার নয়;

বাসে লোকে ওঠা-নামা ক'রতে বড় সময় নিচ্ছে, অশান্ত বারে বারে ঘড়ি দেখে। পৌনে তিনটে, গেরুয়া-দুপুর।

দেখাশোনার পালা পড়েছে। আর নেমন্তন্ন খাবার পালা। মে মাস শেষ, জুনও শেষ হ'তে চললো, ওর 'কারগো' ছাড়বে জুলাই-এর মাঝামাঝি, সন্ধ্যাদের বাড়ীতে প্রতি শনিবার হাজিরা দেওয়া বন্ধ হয়েছে অনেকদিন, সময় কখন, অফিস করার পর কত কাজ। কেনা-কাটা আছে—দর্জীর বাড়ী যাওয়া আছে, তারপর কত টুকিটাকী হাংগামা।

আর আছে কোটালপুকুরে যাওয়া যেখানে ওর বড় মামীমা আছেন। বড় মামীমা আঠার বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন নিঃসন্তান, এখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। একরাশ মল্লিকার মত সাদা

ধবধবে রঙ, তাই তাঁর নাম সাদা-মামীমা, কোটালপুকুরের ষ্টেশন কি এখন তেমনি আছে? সেড পেরিয়ে একটু দূরে টিনের চালায় এনে গাদা করে খড় জমান। অশান্ত প্রথম যে বার মামার বাড়ী যায় এই খড়ের গাদার সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিয়েছিল—নতুন খড়ের গন্ধ। কেমন কেমন যেন? ওর বেশ লাগছিল। মা ওর এগিয়ে গেছে বড়দার সংগে, বাবা আসছেন না কখনও কোটালপুকুরে, অশান্ত পেছিয়ে পড়েছে, ষ্টেশনের পানি-পাঁড় অবাক হয়ে দেখছিল একটা ছেলে খড়ের গাদার সামনে দাঁড়িয়ে যেন কি ক'রছে, একটু পরে মা আবিষ্কার করলেন ছোট খোকা আসেনি। মার ডাকে অশান্ত এলে নতুন ধানের গন্ধ গায়ে মেখে, সাদা-মামীমা যেন দ্বিতীয় মা। এতো স্নেহ ও কোন দিন ভুলবে না। তার সংগে দেখা করতে হবে বিলেত যাবার আগে, আর একবার ওরা সাহেবগঞ্জ যাচ্ছিল লুপ-লাইনে। ভোর রাত্তিরে ষ্টেশনে কে যেন নীল আলো উঁচিয়ে বলছিল কো-টা-ল-পু-কু-র। সেই ডাকে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এখানে নামবে না মা সাদা-মামীমার বাড়ীতে? ও মাকে বলেছিল, না ছোট খোকা তোমার বাবা যাচ্ছেন সাহেবগঞ্জে, এবারে নামা হবে না, জানলায় মুখ বাড়িয়ে অশান্ত দেখে ভোরের আলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে শালগাছের মাথার ওপরে। সেই টিনের সেড খালি পড়ে আছে—খড় নেই। সাদা-মামীমার জন্ম ওর মনটা হু-হু করে উঠেছিল, সে তো অনেক দিন হোল? এবারে দেখা না করলে নয়।

সন্ধ্যারা নেমন্তন্ন ক'রেছে—এবারে সন্ধ্যার মা নিজে বলছেন অনেক দিন তো দিশী খাওয়া খাবে না বিলেত গেলে, সামনের শনিবার মাসীমার হাতে দুটি ঝোল-ভাত খেয়ে যেও। সামনের শনিবার মানে জুন মাসের উনত্রিশ তারিখ, আজ বাইশে, ওরা সকাল সকালই বলেছে, জাহাজ তো জুলাই-এ।

বোস-গিন্নী ঠিক জানেন না কতদূর কি ব্যাপার, মেয়েকে জিগ্যেস করতেও বাধ-বাধ ঠেকে, একবার ঠারে-ঠোরে মেয়েকে বলেছিলেন যে কর্তাকে দিয়ে কথা তুলবেন কি না। কিন্তু মেয়ে তাতে এত রাগ করে যে তিনি আর কিছু বলার সাহস পান নি, কে জানে! আজকালকার ছেলে-মেয়ে। কি যে ভাল কি যে মন্দ কিছুই বোঝা যায় না, তার ওপর মেয়ে স্বাধীনা—নিজের ভাতে আছে। মাস গেলে সংসারে পঁয়ত্রিশটি টাকা ধরে দেয়, কর্তা প্রথমে ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন, পরে তা টেকেনি, তাঁরই বা এমন কি আয়? সওদাগর অফিসের কেরাণী, প্রথম দুই মেয়ের বিয়ের দেনা এখনো শোধ হয়নি। জামাই দুটিই রেলের চাকুরে, কোলকাতার বাইরে থাকে, সে মেয়ে দুটির রং আর একটু ফর্সা ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার রং প্রায় বাপেরই মত! যদি মেয়েটার একটা হিল্লে হয়—কর্তা-গিন্নী ভাবেন, অশান্ত তো পাত্র হিসাবে সুপাত্রই!

সারা দিন ধ'রে রান্নার আয়োজন চলে বোসবাড়ীতে, বোস-গিন্নী অবশ্য বলেছিলেন—ঝোল-ভাত, কিন্তু আয়োজন হোল মোগলাই খানদানী ব্যাপার। অশান্ত খেতে ব'সে অবাক হয়েছিল। এত কেন মাসীমা?

এ তো সামান্য বাছা—বোস-গিন্নী বলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে অশান্ত তিনতলায় ছোট ঘরটায় ব'সে থাকে। সন্ধ্যার ঘর, এই ঘরেই চায়ের আসর বসে, আজই হয়তো শেষ দেখা তোমাদের সংগে সন্ধ্যা—বিলেত যাবার আগে অশান্ত বলে। ধূপছায়া রং-এর শাড়ী পরে সন্ধ্যা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের কোণে রজনীগন্ধার গুচ্ছ—তার সৌরভে বাতাস মন্থর, সন্ধ্যার কপালে কুমকুমের টিপ, চুল আলগা করে বাঁধা, অশান্ত কথাটুকু বলার পর সন্ধ্যাকে দেখে, এই কি সেই সন্ধ্যা—যাকে সে প্রতি শনিবারে দেখে?

আজ কেন অশান্ত, তোমার তো জাহাজ ছাড়বে জুলাই-এর শেষে, এখনো তো তিন সপ্তাহ হাতে, তোমার কি অনেক কাজ?

তারিখ বদলে গেছে সন্ধ্যা, ২১ তারিখের 'কারগো' ছাড়বে আরো দেরীতে, ৮ তারিখে একটা 'কারগো' আছে—সেটায় যেতে পারি। ইণ্ডিয়া ষ্টীম সীপকে লিখে দিলাম আট তারিখেই যাব। ওরা তাতে রাজি আছে। এতে প্যাসেঞ্জার ছিল না।

সন্ধ্যার দু' চোখ জলে ভরে আসে। এ তো তার জানাই ছিল যে অশান্ত চলে যাবে—আজ না হয় কাল, তবু কিসের প্রত্যাশা তার? অশান্তকে কি সে যথেষ্ট জানে না? যে কথা শোনবার জন্য সে আকুল আগ্রহে প্রতিটি শনিবার বসে থাকে অশান্ত তা কোন দিনও বলবে না, অথচ আজ তার শেষ সুযোগ। আজকে স্বীকৃতি না পেলে ও কোন দিনই পাবে না। শাড়ীর আঁচল দিয়ে সে চোখের জল মোছে।

তোমার চোখে জল কেন সন্ধ্যা?—অশান্ত প্রশ্ন করে।

তুমি কি বোঝ না অশান্ত!—অশান্তর হাত দুটো সন্ধ্যা দু' হাত দিয়ে ধরে, তারপর টেবিলে মাথা রাখে। ওর সারাটা দেহ ফুলে ওঠে বারে বারে, যেন বুঝি সেও খান-খান হয়ে গেছে।

দু' হাত ভরে অশান্ত ওর মুখটা তোলে, চোখের জলে কুমকুমের রেখা মুছে গেছে, বুকের আঁচল পড়েছে খসে। অশান্ত হঠাৎ সন্ধ্যার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে।

এ তুমি কি করলে অশান্ত?—সন্ধ্যা অস্ফুট স্বরে বলে। অশান্ত জবাব দেয় না—মনে হয় সে বুঝি ভুলই করেছে, কিন্তু ভুল কি? কি এমন দোষ! সন্ধ্যার দিকে সে তাকায় আবার। সে চাহনি কিসের, সন্ধ্যা বোঝে না। সদর দরজার দিকে অশান্ত অগ্রসর হয়।

আর একটু বসো অশান্ত, এখনো বেশী রাত হয়নি, আর একটু বসো।

না সন্ধ্যা, আজ যাই। আবার আসবো যাবার আগে। সেদিন না হয় বসবো।

সাদামামীমার সংগে আর দেখা করার সময় নেই, জাহাজের তারিখ এগিয়ে আসায় কোটালপুকুর যাওয়া হোল না। গেলে দু'দিন থাকতেই হবে, অন্ততঃ একদিন। তার আর সময় নেই।

আজ দেখা করতে হবে মায়ের সংগে। মাকে অশান্ত বারো বছর আগে রেখে এসেছে কেওড়াতলার শ্মশানে। দক্ষিণ দিকের চিতায়, যার সংগে দেখা করতে হবে অশান্তর। শ্মশান ওর ভাল লাগে না—মনে হয় কেমন যেন নোংরা। লোকে বলে শ্মশান পবিত্র, হয়তো হবে।

তবু মায়ের কথা মনে হোলেই মনে হয়, মা আছে সেখানে। যেখানে ও একদিন অনেক জনের সংগে মাকে নিয়ে গিয়েছিল হরিধ্বনি দিয়ে। একটু আস্তে আস্তে তোমরা হরিধ্বনি দাও ন

কেন মেজদা'—ওর পাশে ওর মেজদা' যাচ্ছিলো, ও তাকে বল্লো। এঁদের একটু আস্তে চলতে বলো মেজদা'।

বাড়ী থেকে শ্মশান-ঘাট খুব দূরে নয়, অশান্ত একটুও কাঁদেনি। কেন কাঁদবে সে? তার মামার বাড়ীর অনেক পয়সা, মা মানুষ হয়েছিলেন যত্নে, বিলাসিতার মধ্যে। বাবা বাউণ্ডুলে বৈরাগীর মত, তাই মা'র কোন'আশাই পূর্ণ হয়নি। মামাতো ভাইয়েরা সাহেবী স্কুলে গেছে, মা'র ইচ্ছে ছিল ওরা যায়। কিন্তু পয়সা কোথায়? এ্যানিমিয়ায় মা মারা গেলেন—অশান্তর মনে হয়, বোধ হয় তাঁর ভাল চিকিৎসা হয়নি। তাই অশান্ত সেদিন একটুও কাঁদেনি, বুক-ফাটা কাঁদলো ওর বড়দা, ওর চেয়ে বারো বছরের বড় সে।

চিতা সাজাচ্ছিল কারা, ওর মনে পড়ে না। মা'র পায়ে মাথা রেখে ও বসেছিল, আলতা-রাঙা পা, এ্যানিমিয়ার সাদা পা। চিতায় তোলার আগে সেই পায়ে চুমু খেয়েছিল ও। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও বাছা—মড়ার অত বাঁধুনী ভাল নয়। কে যেন বলেছিল, অশান্ত মুখ তুলে দেখে, গেরুয়া-পরা এক শ্মশানচারিণী। মেজদা' ওকে সরিয়ে নিল মার কাছ থেকে। ওঠ ছোট খোকা, মা তো বাড়ী গেছে।—ঠোঁটটা মেজদার ভেঙে গেল, মুখটা অন্যদিকে নিয়ে বিকৃতস্বরে মেজদা' বলেছিল, তুই কি একটুও কাঁদবিনে ছোট খোকা?

কেন কাঁদবে অশান্ত? মা যে তাকে কত সাধ-আহ্লাদের কথা বলেছে তা ওই জানে। মার কোন আশাই পূর্ণ হয় নি। তুই বড় হয়ে বিলেত যাবি ছোটখোকা—দাদার ছেলেরা সাহেব-ইস্কুলে যায়, আমার ছোটখোকা বিলেত যাবে, তারপর সে যখন ফিরে আসবে মস্ত বড় লোক হয়ে তার মার কাছে তখন? তুই কি হবি রে ছোট খোকা?

দক্ষিণ দিকের চিতার সামনে অশান্ত দাঁড়িয়ে। বারো বছর পর চিতা জ্বলছে না নেবা। আকাশ ঘনঘটা করে এসেছে, দূরের দুটো চিতা জ্বলছে, ধু ধু করে। তোমার কাছে ছুটি নিতে এলুম মা, অশান্ত অস্ফুটস্বরে বলে, কাল তোমার ছোট খোকা বিলেত যাবে। তুমি বলেছিলে ছোট খোকা তুই বিলেত যাবি, দাদার ছেলেরা সাহেব ইস্কুলে যায়, আমার ছোট খোকা বিলেত যাবে একদিন। যেদিন তোমায় এখানে রেখে গেছি সেদিন আমি কাঁদিনি, কিন্তু আজ যে মা পারছি না! দু চোখ বেয়ে দর-দর ধারে জল নেমে এলো, মুখ বুক ভেসে গেল। তোমার ছোট খোকা আবার যখন ফিরে আসবে তখন কার কাছে আসবে মা?

শ্মশানঘাটে এমন করে একলা দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিস বাছা! অকল্যেণ হবে। অশান্ত ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো সেই শ্মশানচারিণী যাকে ও বারো বছর আগে দেখেছিল। গেরুয়াপরা গলায় রুদ্রাক্ষ। আশ্চর্য! তার চেহারার একটু পরিবর্তন হয়নি। চোখের জল মোছে অশান্ত। বাইরে বেরোয়, নতুন যাত্রী আসছে, শববাহীর সঙ্গে। এও-এক যাত্রা।

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ছেড়ে দেবার পরেও অশান্তর উত্তেজনা যায় না বিলাত যাত্রার, খুব বেশী লোক আসেনি ওকে তুলে দিতে। বড়দা আর বড় বৌদি এসেছিলেন কোন্নগর থেকে, বড়দা সেখানেই থাকেন। মা বাবার পরে কোলকাতার সংসার খান খান হয়ে যায়। মেজদা' জলপাইগুড়ি, সে চা বাগানের চাকুরে, তার আসা হয়নি। সেজমাসীর সংগে লীলা এসেছিল, এক বাক্স গিরীশের কড়াপাক সন্দেশ নিয়ে। সন্ধ্যা আসেনি। তার আসার কথাও ছিলো না, অশান্ত অবশ্য তার কথামত আর একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু সে যাওয়ার বিশেষ কোনও মানে ছিল না। সন্ধ্যার সঙ্গে একান্তে ও দেখা করেনি। সন্ধ্যার মা, মেয়ের সংগে একা থাকার সুযোগ ওকে দিয়েছিলেন কিন্তু অশান্ত তা গ্রহণ করেনি। ও জানে সন্ধ্যাকে ও কোন কথাই দিতে পারবে না, ওর নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, কেন মিথ্যে আর একটা মেয়েকে এই অনিশ্চয়তার সংগে জড়ান? শেষ দিনের ঘটনা যে কেন হ'য়ে গেল ও ঠিক জানে না, অশান্ত যে তার সংগে একা দেখা করতে চায় না সন্ধ্যা তা বোঝে, তাই প্রথমে ও ম্লান চোখে তাকিয়ে রইলো অশান্তর দিকে, এই তার অশান্ত! যাকে সে চিরদিন ভালবেসেছে এই তার হৃদয়? তারপর হেসেছে মর্ম-বেঁধা বিদ্রূপের হাসি।

রুমমেট অসিত রায় অবাক করেছিল। এ মেস ছেড়ে দিচ্ছি অশান্ত বাবু!

সে কী মশায়, মেস তো আমাদের ভালই। ছাড়বেন কেন?

যার-তার সংগে তো থাকা চলে না অশান্ত বাবু! কে আসবে এ ঘরে কে জানে! তার চেয়ে কোন জায়গায় সীংগল বেডে চলে যাব—

আর অবাক করেছে ঠোঁটকাটা অতুল নিয়োগী, এ ক'দিন চুপচাপই ছিল, হঠাৎ হাওড়া ষ্টেশনে হাজির, হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। বেশ কয়েক ডজন হবে। আপনি মশায় ভাবুক লোক, সায়েন্স ভুল করে পড়েছেন। এই আপনার উপযোগী। অশান্ত অভিভূত হ'য়েছিল।

ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী, জীবনে এই প্রথম ফার্ষ্ট ক্লাস-এ যাচ্ছে ও। সেকেণ্ড ক্লাসের বার্থ রিজার্ভ করার সময় ছিলো না, সব রিজার্ভ হয়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে আসা, চিরকাল একশ' এগারোয় চড়েছে অশান্ত—কদাচ দেড়া ক্লাশ মানে ইনটারে। সে তো ছেলেবেলার কথা। এতগুলো পয়সা খরচ করতে হাত করকর করছিল, কী আর করে? বিলেত যাচ্ছে। লীলা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো। আবার কবে আসবে নতুনদা'? কতদিন পরে—

আসব রে তাড়াতাড়িই, ভাবিসনে।

গাড়ী ছাড়ার কিছু পরেও সহযাত্রী-যাত্রিণীদের ভাল করে দেখে। আপার বার্থে এক ভদ্রলোক—বাঙালীই হবে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। চুলের রং তামাটে, গোঁফের রংও তাই, সামনের বার্থে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান-দম্পতি,

'কতদূর যাওয়া হবে আপনার'—আপার বার্থের ভদ্রলোকটি আপ্যায়িত করার চেষ্টা করেন।

ওয়ালটেয়ার—অশান্ত বলে।

ওয়ালটেয়ারে তো আমিও যাচ্ছি। তা চেঞ্জে বুঝি? বেশ তো মাল নিয়েছেন ভারি ভারি। অথচ বেডিং নেই!

অশান্তর রাগ হোল। গায়ে পড়ে ভাব করা, আবার অযাচিত মতামত দেওয়া। ও স্বভাব অনুযায়ী জবাব দিলো না। স্যুটকেশের গায়ে তখনও জাহাজ কোম্পানীর লেবেল মারেনি ও, তাই উপরতলার বাবুটি বুঝলো না ও বিলাতযাত্রী। একটু রাত হলে বাবুটি বোধ হয় জলযোগ করলেন কিছু তার পর

নীচে নেমে এসে ওর সীটের একপ্রান্তে বসে বোতল খুলে কী যেন খোলেন, বোধ হয় মদ বেশ কয়েক পাত্র খেয়ে একটা মোটা বর্মা চুরুট ধরালেন। তার পর অশান্তকে বললেন, বসতে পারি একটু? অশান্ত তো অবাক! ভদ্রলোক তো ওর সীটে বসেই আছেন। আবার জিজ্ঞেস করা কেন এত পরে?

ও বললে, হাঁ নিশ্চয়ই, তা ওয়ালটেয়রে কোথায় উঠবেন, ঠিক করেছেন কিছু? ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করে,

হোটেল যোগাড় করে নেব'খন—অশান্ত বলে।

ও বললে, হোটেল মেলে না মশাই এখন ওয়ালটেয়রে। আমি অনেক বার যাতায়াত করছি—ওয়ালটেয়র আমার নখদর্পণে। আপনি জিমি সাহেবের হোটেলে চেষ্টা করতে পারেন। আমার ব্যবস্থা করা আছে। হোটেল ভালই, চার্জ একটু বেশী হবে। ভদ্রলোকের নেশা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে একটু বেচাল হয়তো হবেন। তা মশাই তখন তো বললেন না কি কাজে যাচ্ছেন? আমি? আমি রবার্ট কোম্পানীর সেলস-এর লোক। হরিনারায়ণ মিত্তির। আমাকে তো হরদম তেলেগুদের দেশে যেতে হয়, একলা পথ—কথা না বলে সুখ নেই। কই আপনার নাম তো বললেন না?

আমার নাম অশান্ত মিত্র। অশান্ত বলে।

আরে ভায়া, আপনি মিত্তির? কোথাকার বলুন তো? বি, এন, আর-এ কত বার ওয়ালটেয়র গেছি। তা এই প্রথম মিত্তিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তা ওয়ালটেয়রে?

আমি ভিজগাপট্টম থেকে বিলেত যাচ্ছি আট তারিখে, তাই ওয়ালটেয়রে যাচ্ছি—

আ—চ্ছা? তাই এত ফুলের ঘটা। আমি ভাবি বরযাত্রী ছাড়া একা বর—না কবি সম্বর্দ্ধনা? বড় খুশী হলাম। তা যদি একটু আগে জানতাম একা ড্রিঙ্ক করতাম না। একে ডবল টি মার্কা কায়েত—আর এক ডবল টি মার্কা কায়েতের সংগে দেখা, তার ওপর বিলেত যাত্রী, আপনাকে না হয় এক চুমুক।

আজ্ঞে আমার ওসব চলে না—অশান্ত বলে।

বড় ভাল ভায়া এ জিনিষ, না খেলে বোঝা যায় না, তবে আমার বড় দোষ, কয়েক ঢোঁক বেশী পেটে পড়লে বাজে বকি। আমি কি এখন বাজে বকছি? মোটেই না! বুঝলেন ভায়া—আমাদের মনের মধ্যে একটা দরজা আছে, যেটা আমরা বন্ধ করে রাখি—এই কয়েক পাত্তর পেটে পড়লে সে দরজা খুলে যায়—তখন রেলগাড়ী মোটর ইষ্টিমার—হেলিকপটার অবধি চলে যায় সে দরজা দিয়ে, এই দরজা পেরিয়ে আর একটা দরজা আছে, সে দরজা—থাক ভায়া।

রবার্ট কোম্পানী কি কোম্পানী অশান্তর জানা নেই, তবে নাম শুনে মনে হয় বিলিতী কোম্পানী। ভদ্রলোক নিশ্চয় মোটা মাইনে পান—নয়তো ফার্ষ্ট ক্লাশে যাচ্ছেন, আবার পানদোষও আছে। ওর মনের ভেতরের দরজার খবর অশান্ত জানে না, তবে ওর পরিচয়ের জগৎ বড় হয়েছে ও জানে, কোথা থেকে কত কি আসছে, কত আসবে ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতা, কোনটা হয়তো বাদামী হয়ে গেছে বেদনায়, কেউ বা কুঁকড়ে গেছে অকালে। আবার কোন কিশলয় প্রাণোন্মাদনায় উদ্বেল।

শুয়ে পড়ুন ভায়া, ওপর থেকে মিত্তির মশাই বলেন, অনেক দূরে যেতে হবে। আমিও যাব একদিন—অনেক দূরে। বিলেত নয়—বিলেত পেরিয়ে—জল-জংগল মাটী পেরিয়ে অনেক দূরে, অ-নে-ক-দূরে। হরিনারায়ণ মিত্তিরের বোধ হয় নেশা জমে আসছে, অশান্ত একটু ভয় পায়, তার পর শুয়ে পড়ে।

ওয়ালটেয়রে হোটেল খোঁজা সত্যি ঝামেলা, এক রাত্তের তো মামলা—তাও মিললো না, জিমি সাহেবের হোটেল বিশেষ বড় নয়, সেখানে মিত্তির মশাইএর ব্যবস্থা ছিল—অশান্তর জায়গা হোল না। জিমি সাহেব কালো কুচকুচে—হাবসীও হার মানে রং-এর জেল্লায়, মিত্তির মশাই কিন্তু হাল ছাড়লেন না। চলুন মশাই নব্য-বংগে আপনাকে নিয়ে যাই, বাঙালী মেস, দু'জনেই ওঠা যাবে সেখানে, সাইকেল-রিক্সা করে দুজনে রওনা হয় নব্য-বংগ মেসে, অশান্তর মাল অনেক, মিত্তির মশাই-এর মাল নেই বললে চলে, সদর রাস্তা পেরিয়ে ঘিঞ্জি বাজার তার পরে সরু গলি, সাইকেল-রিক্সা চলে না সেখানে। মিত্তির মশাই তেলেগু ভাষায় কি যেন বললেন—সাইকেল-রিক্সার চালক গাড়ী থেকে নেমে হাতে ঠেলে চললো। একটু এগিয়েই নব্য-বংগ-মেস।

কেরোসিন কাঠের ওপরে সাদা রং দিয়ে লেখা, 'নব্য-বংগ-মেস'। বাঙালীদের জন্ম, প্রোঃ শ্রীগোপালকৃষ্ণ সাহা, দোতলার জানলা থেকে একটি মুখ দেখা গেল, তার পর সাদর আপ্যায়ন, আসুন আসুন মিত্তির মশাই, অনেক দিন পরে এঁ্যা!

তোমার সৈরিন্ধ্রীকে পাঠিয়ে দাও হে সাহা, দুটো বেড চাই আজকের মত—আছে তো?

আপনার জন্ম সদা-সর্বদা অধীনের ব্যবস্থা। দিচ্ছি আমি সৈরিন্ধ্রীকে পাঠিয়ে, সৈরিন্ধ্রী এলো তেলেগু ঝি, কুচকুচে কালো রঙ জিমি সাহেবেরই মতন, আঁট-সাট চেহারা—অক্লেশে মাল তুলে নিয়ে এল।

ঘুপসী বাড়ী, অশান্ত তো অনেক দিনই মেসে কাটিয়েছে, কোলকাতায়, ধীরেশ বাবুর মেস—মামুলীই। নব্য-বংগের তুলনায় তাকে রাজকীয় মনে হোল, অশান্তর বেড ছিল তিনতলায় দক্ষিণ খোলা জানলার সামনে, আলো-হাওয়া ছিল, এখানে যেন রাজ্যের অন্ধকার বাসা বেঁধেছে—তার ওপরে জুলাই-এর অসহ্য গরম। মিত্তির মশাই-এর দাক্ষিণ্যে অশান্ত মুগ্ধ হয়েছিল, জিমি সাহেবের হোটেলএর চেয়ে শতাংশে ভাল। ওর জন্ম ভদ্রলোক কষ্ট নিলেন, মিত্তির মশাই একটু পরে এসে বললেন—যান নীচে ইঁদারার জলে চান করে আসুন, একটু আরাম পাবেন।

বাড়ীর পেছনে রান্নাঘর—তার লাগাও ইঁদারা। সাবান-তোয়ালে হাতে অশান্ত স্নানের জন্ম আসে, কুয়োতলায় আবার সৈরিন্ধ্রীর সংগে দেখা। একজন বাবুর সংগে মসকরা হ'চ্ছে তেলেগু ভাষায়, বাবুটিও স্নানে এসেছেন।

আজ এলেন বুঝি? তার পর—ভকেই তো। কবে থেকে লাগবেন? বাবুটি বললেন।

আজ্ঞে আজই সন্ধ্যের ট্রেনে এসেছি, তবে ভকে তো কিছু হয়নি। অশান্ত বলে।

ও হয়নি, তা ভাববেন না। সুরেশ সরকারের রেকমেণ্ডসনে

ওঁকে কতো লোক কাজ পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আপনারও হ'য়ে যাবে, তেলেঙ্গু-পটীতে দু'শো বাঙালী আছি মশাই, বিদেশে বাঙালীকে যদি বাঙালী না করে ?

আজ্ঞে আমি কালই চলে যাব—অশান্ত ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই বলে।

সে কী মশাই, এই তো সবে এলেন এখন দু'দিন গোপাল বাবুর মেসের ভাত খান, ওয়ালটেয়রের শোভা দেখুন তার পর তেলেঙ্গু মেয়ে—মাইরী ফার্ষ্ট ক্লাশ, আপনার ইদিক-সিদিক হয়তো ?

আজ্ঞে আমার এসব miss করবার একটু ইচ্ছে নেই, কালকের জাহাজেই আমি বিলেত যাচ্ছি। 'sorry'

বিলেত ? আরে মশায় তাহলে তো ফিষ্টি দিতে হবে। থাক চান করা। দেখি মোচলমান পাড়ায় মুর্গী আছে কিনা ?

সুরেশ বাবু তড়িৎ বেগে উধাও হলেন, রাত্রে ফিষ্টি হোল—নৈবিদ্যির রান্না মুর্গীর ঝোল তিলতেল দিয়ে রান্না। অশান্তর মনে হোল—করোসিন তেলের গন্ধ। মিত্তির মশাই বেরিয়েছেন কোথায়, তবে আর দু'-চার জনের সংগে আলাপ হোল—তার মধ্যে হিতেন ভাদুড়ীকে ওর মনে থাকবে, অল্প-বয়সী ছেলে, ভাসা-ভাসা চোখ, তাতে অনেক স্বপ্ন, অশান্তর সংগে কিছু রজনীগন্ধা ছিল অতুল নিয়োগীর দেওয়া, তাই দেখে ও খুব খুসী।

কতো দিন রজনীগন্ধা দেখেনি অশান্ত বাবু, আহা—বড় ভাল এ ফুল !

এটা আমি যাবার আগে আপনাকে দিয়ে যাব—আর আপনাদের পাঁচজনের জন্যে এক বাক্স কড়াপাক সন্দেশ। আমি মিষ্টির খুব ভক্ত নই, আর এখানে তো ওটা পাওয়া যায় না—আপনারা বোধ হয়—

না না না—তা কি করে হয়, আপনার মিষ্টি—কেউ কেউ প্রতিবাদ করলেন।

দাদাকে দেশ ছাড়ার আগে আর দুঃখ দিও না, উনি ভালবেসে দিচ্ছেন। নিয়েই নাও হে—কেউ কেউ বললেন।

পরদিন দুপুরের দিকে হিতেন হঠাৎ ওর ঘরে এলো। অশান্ত সকালবেলায় ওকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ দিয়ে এসেছিল। দুপুরে তার ডকের চাকরীতে যাবার কথা, কিন্তু আজ আর সে কাজে যায় নি।

আপনার কাছে কি শুধু শুধুই রজনীগন্ধা নেব, তার বদলে আপনি এই ক্যালেণ্ডারটা রাখুন, এতে আমাদের দেশের ছটা ঋতুর ছবি আছে—দু' মাস করে এক এক পাতায়—ও বলে।

থাক আপনার ক্যালেণ্ডার হিতেন বাবু, আমি আপনাকে রজনীগন্ধা দিলাম বলেই যে কিছু নিতে হবে তার কোনও মানে নেই, আর তা ছাড়া ফুল তো আমার শুকিয়ে এসেছে।

এটা আপনাকে নিতেই হবে, এই দেখুন, এতে আমার নাম লিখে দিয়েছি, হয়তো তাহ'লে আমাকে মনে থাকবে, ক্যালেণ্ডারের একটা ঋতু চলে গেছে—গ্রীষ্ম, বাকি আছে আরো পাঁচ, বসন্ত সব শেষে, বসন্তে অনেক আশা মুকুলিত হয়, অনেক ঝরে যাওয়া গাছে পাতা গজায়—আবার বসন্ত একদিন আসবেই, সেদিন আমিও যাব আপনার মত।

নিশ্চয় আপনার যাওয়া হবে, আমার যাওয়া খুব সোজা পথে হয়নি হিতেন বাবু! আপনি বিশ্বাস রাখুন আর চেষ্টা করুন।

'কারগো' জাহাজ। মাল বোঝাই হবে এ বন্দরে। খালাস হবে অন্য বন্দরে, যে ঘাটে থামবে সে ঘাটে সওদা হবে, পণ্যের অন্নের—অন্তের : কতো রকম সওদা হয় খুচরো পাইকারী কত রকম দেওয়া-নেওয়ার খেলা খেলে বন্দর, জাহাজ এসে থামলে নাবিকরা মাটি চায়, মাটির বাসা চায়, মাটির বাসার স্বাদ চায়, মানুষীর দেহে, মনে, রক্তে, রক্তের স্বাক্ষর সে রেখে যায়—রক্তের স্বাক্ষর সে নিয়েও যায়, সওদাগর নাবিক তার কত রকম সওদা !

সব ঝামেলা শেষ হয়েছে অশান্তর, কাষ্টমস-এর বেড়াজাল হেলথ পারমিটের হাংগামা। মাল একে একে উঠেছে জাহাজে। এবারে তাহ'লে সে যাচ্ছে। নোঙর তোলা হ'য়ে গেছে, জাহাজের একমাত্র প্যাসেঞ্জার বলে ওর নাম মিঃ প্যাসেঞ্জার।

অনেক অনেক দিন আগে একজন স্বপ্ন দেখতো এক দ্বীপের, ছায়াঘন পল্লব দেবদারু পাইন নারিকেলের হিন্দোল নেই সেখানে—তারার আবছা আলোর ইসারা নেই সেখানে, তবু সে স্বপ্ন, হিতেন ভাদুড়ী বোধ হয় আজ তার স্বপ্ন দেখে, সেই দ্বীপ তো আর বেশী দূরে নয় ? তবে কেন ভীড় করে আসছে এরা চোখের সামনে ? সন্ধ্যা বোসের ম্লান-মুখ আর বিদ্রূপ-মাখান হাসি, তাতে অপমান মাখান, লীলার জল-ভরা চোখ, অতুল নিয়োগীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ, মিত্তির মশাই-এর নেশায় ছড়ান চাহনি—আর এ্যানিমিয়ায় সাদা মার মরা মুখ।

দমকা বাতাস আসছে বঙ্গোপসাগর থেকে, হিতেন ভাদুড়ীর ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ে যাচ্ছে—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ; শীত দুর্জয় শীত যেখানে—যেখানে অশান্ত যাচ্ছে, ওর পাথেয় একটা অনার্স ডিগ্রী আর কিছু পাউণ্ড, এই নিয়ে ওকে লড়াই করতে হবে—শীতের সংগে, যে শীত থাকবে, যত দিন না ওর সুরাহা হয়—একটা কাজ যোগাড় হয়।

আসবে বসন্ত, শীতের পরেই তো তার পালা, এবারও বসন্ত আনবে—স্কাই-লাভ আর ড্যাফোডীল, এবারও ওর সন্ধ্যা রঙীন হবে লাভ-ইন-দি-মিষ্টর স্নিগ্ধতাতে কর্ণফ্লাওয়ারের পাপড়ীতে, প্রিয় রোমের দাক্ষিণ্য আর হায়ামীনথের বিলাসে।

নতুন ডায়েরীর পাতা আরম্ভ করে অশান্ত, প্রথম লাইন লেখে, আজ সোমবার ৮ই জুলাই, যাত্রা সুরু হয়েছে।

[*Osamu Dazai's* "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

চতুর্থ অধ্যায়

পত্রাবলী

চিঠি লেখা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। শেষ অবধি আজ সকালে সর্পের ন্যায় বিচক্ষণ ও কপোতের ন্যায় নিরীহ যীশুর এই বাণী পড়ে বুকে জোর পেলাম, চিঠি লেখাই শেষ করলাম।

নাওজির বোন আমি। আমার কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে মনে করবার চেষ্টা করবেন।

নাওজি আবার বেয়াড়াপনা আরম্ভ করেছে এবং আপনাকে উত্যক্ত করছে এজন্য দুঃখিত। (বাস্তবিক তার ব্যাপার সেই বুঝুক, আমার পক্ষে আগু বেড়ে তার হয়ে মাপ চাইতে যাওয়া অর্থহীন)।

আজ নাওজির জন্য নয়, নিজের জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু ভিক্ষা করব। তার মুখে শুনেছি আপনার পুরনো বাড়ী যুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে গেছে বলে আপনারা নতুন ঠিকানায় উঠে গেছেন। ভেবেছিলাম সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। বাড়ীটা বোধ হয় টোকিওর আশে-পাশে কোন সহরতলীতে; কিন্তু সম্প্রতি মায়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না, তাঁকে একা ফেলে অত দূর যাওয়া চলে না, সেইজন্যই চিঠি লেখা।

আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই। আমার আলোচ্য বিষয়টি যুবতী নারীর সাধারণ শালীনতার পর্য্যায়ে তো পড়েই না, বরং উল্টে গুরুতর অপরাধ বলা যেতে পারে কিন্তু আমি, না, আমরা আর এ অবস্থায় থাকতে পারি না। সুতরাং যিনি আমার ভাই নাওজির চোখে এ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁর কাছে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে তিনি যেন আমার অত্যন্ত সহজ অনাড়ম্বর অনুভূতির কথা অনুধাবন পূর্ব্বক সুপরামর্শ দিয়ে বাধিত করেন।

আমার বর্ত্তমান জীবন অসহ্য। পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নয়, আমাদের (মা, নাওজি ও আমি) এই ভাবে আর বেঁচে থাকা অসম্ভব।

গত কাল শরীরে অসহ্য এক যাতনা অনুভব করলাম। তার সঙ্গে জ্বরও ছিল; নিঃশ্বাসের কষ্টে কি করি ভেবে পেলাম না, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর চাষী-মেয়ে ভিজতে ভিজতে এক বোঝা চাল পিঠে নিয়ে এল। যে কাপড়গুলো তাকে দেব বলেছিলাম, দিয়ে দিলাম। খাবার ঘরে আমার সামনে বসে চা খেতে খেতে সোজাসুজি সে আমায় প্রশ্ন করল—এ-ভাবে নিজেদের জিনিষ বেচে আর কদ্দিন চলবে?

আমি তার জবাবে বললাম—ছ'-মাস, বড় জোর বছরখানেক। তার পর ডানহাতে মুখখানা আড়াল করে বললাম—ঘুম! ঘুমে আমার দু'চোখ ভেঙ্গে আসছে।

তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এ তোমার মনের অবসাদ।

হয়ত তোমার কথাই ঠিক। চোখে জল আসে-আসে, এই অবস্থায় উঠে দাঁড়াতে, দুটো কথা মনের মধ্যে গুমরে উঠল—'বাস্তব' এবং 'কল্পনা'। বাস্তব সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার নেই। সম্ভবতঃ এই কারণেই বেঁচে থাকার আশঙ্কায় আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। মা প্রায় অথর্ব্ব—বিছানাতে কাটে তার বেশীর ভাগ সময়।

নাওজির মানসিক অসুখের কথা আমাদের অজানা নেই। এখানে যতক্ষণ থাকে, স্থানীয় এক তাড়িখানায় কাটায়—আর দু'দিন অন্তর আমাদের কাপড়বেচা টাকায় ফূর্ত্তি করতে যায়। কিন্তু দুঃখ আমার সেজন্য নয়। আমার ভয় হয়, পচা পাতা যেমন ঝরে না পড়ে, অনেক সময়ে গাছেই ঝুলে থাকে—তেমনি আমিও দৈনন্দিন জীবনের এই ক্লান্তির বোঝা টেনে টেনে অনন্তকাল বেঁচে থাকব। এ চিন্তা অসহ্য এবং এর হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়, আমি আজ যুবতী ভদ্রকন্যার যাবতীয় শালীনতা লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হয়েছি। এখন আপনার উপদেশের অপেক্ষা।

এবার আমি, আমার মা এবং নাওজির কাছে সব কথা খুলেই বলতে চাই। কিছুকাল যাবৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এখন থেকে আমি তাঁকেই অবলম্বন করে বাঁচতে চাই। তাঁর নামের আগক্ষর দু'টি এম, সি। দুঃখ পেলেই তার কাছে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছা করে এবং তার প্রেমে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে বাসনা জাগে।

আপনার মতই এম, সি'র স্ত্রী ও একটি কন্যা আছে। তাঁকে দেখে মনে হয় আমার চেয়ে সুন্দরী, বহু রমণীর সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। তবু মনে হয়, তাঁকে না পেলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা শক্ত। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে আমি দেখিনি, তবে শুনেছি তিনি

চমৎকার মহিলা। তাঁর কথা চিন্তা করলেই তাঁর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়। আমার বর্ত্তমান জীবন আরও ভয়াবহ। এম, সি'র কাছে আবেদন আমি করবই। কোন বিবেচনা আমার এ সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারবে না। সর্পের ন্যায় বিচক্ষণ ও কপোতের ন্যায় নিরীহ আমার এ প্রেম চরিতার্থ হবেই হবে। কিন্তু একটি কথা আমি স্থির জানি যে মা বা নাওজি কেউই আমায় সমর্থন করবে না। আপনার মতামত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমার নেই। মোট কথা, নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে সেই ভাবে চলা ভিন্ন গত্যন্তর আমার নেই।

একথা ভেবে নিজের মনে কেঁদে মরি। জীবনে এই প্রথম নিজের বলতে কিছু হবে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক সকলের সমর্থনের অপেক্ষা রেখে এ কাজ করা অসম্ভব। আলজেবরার কঠিনতম সমস্যার সমাধান করতে যে পরিমাণ মানসিক একাগ্রতার প্রয়োজন, আমি আমার মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে, সেই রকম একাগ্রচিত্তে আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। শেষ অবধি বুঝেছি একটি মাত্র জায়গায় সমস্ত ব্যাপারটার জট খুলে যায় এবং ভেবে শান্তি পেয়েছি।

আমার পরমাস্পদ এম, সি কি বলেন? এই একমাত্র হৃদয়বিদারক প্রশ্ন। আমাকে আপনি 'স্বয়ংবরা পত্নী' অথবা 'স্বয়ংবরা প্রণয়িনী' নাম দিতে পারেন। এর পর এম, সি' যদি বলেন তাঁর পক্ষে আমায় বরদাস্ত করা অসম্ভব তাহ'লে আমার বলার কিছু নেই। আপনার কাছে একটি অনুরোধ আছে। আপনি কি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন? ছয় বৎসর আগে আমার মনে রামধনুর হাল্কা রং লেগেছিল। তার মধ্যে না ছিল প্রেম, না ছিল কাম। কিন্তু দিনে দিনে তার রং গভীরে মিশেছে, গাঢ় হয়েছে। আমার মন থেকে একবারও সে রং মুছে যায়নি। বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশে যে রামধনু, সে স্বল্পায়ু কিন্তু মানুষের অন্তরের রং এত সহজে ধুয়ে যায় না। অনুগ্রহ করে তাকে জিজ্ঞেস করবেন আমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা? হয়ত তিনি আমায় বৃষ্টিঝরা আকাশের রামধনু ভেবেছেন, এবং তা'কি এরই মধ্যে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে?

উত্তর প্রার্থনা করি।

উয়েহারা জিরোর উদ্দেশে (আমার শেখব—এস, সি) লিখিত।

সম্প্রতি আমার ওজন বেড়েছে। নেহাৎ জংলীভাব কেটে গিয়ে নিজেকে মানুষের মত লাগে। এই গ্রীষ্মে আমি ডি, এইচ লরেন্স-এর একখানা মাত্র উপন্যাস পড়েছি।

আপনার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে, আবার আমি চিঠি লিখতে বসেছি। আমার আগের দিনের চিঠিখানা অত্যন্ত অন্যায় চক্রান্তে পরিপূর্ণ ছিল। বোধ হয় আপনি সমস্তই ধরে ফেলেছেন। হাঁ—সে কথা সত্যি। চিঠির ছত্রে ছত্রে আমি ধূর্ত্তামি নিহিত করেছিলাম। বোধ হয় ভেবেছিলাম, আমার জীবন ধারণের জন্য আপনার কাছ থেকে অর্থ সংস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য। যাই হোক, মাপ করবেন, আপনাকে জানাতে চাই যে কেবল মুরুব্বির সন্ধানই যদি আমার লক্ষ্য হ'ত, তবে বিশেষ করে আপনার কথা মনে আসত না। এটুকু বিশ্বাস আছে যে, টাকাওয়ালা বহু বৃদ্ধ আমার ভার নিতে আপত্তি করবেন না। সত্যি বলতে, অল্প কিছুদিন হ'ল আমার কাছে এ ধরণের এক প্রস্তাব আসে। আপনি ভদ্রলোককে চিনলেও চিনতে পারেন। বয়স ষাটের ওপর। সম্ভবতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সভ্য এই মহাপুরুষ (!) আমাদের পাহাড় বেয়ে এসে আমার পাণিপ্রার্থনা করেন। আমরা নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতে—ইনি ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। পাড়ার উৎসবাদিতে মাঝে মাঝে দেখা হত। মনে পড়ে এক শরৎসন্ধ্যায় গাড়ী করে এঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে মা আর আমি আসছিলাম, ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হ'য়ে ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। মা গাড়ীর ভেতর থেকে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে নমস্কার করতেই হঠাৎ ভদ্রলোকের ফ্যাকাশে মুখের ওপর কে যেন আবীর ছড়িয়ে ছিল!

আমি ঠাট্টা করে বললাম,—মা, বোধ হয় একেই বলে প্রেম। ভদ্রলোক তোমার প্রেমে পড়েছেন।

শান্তস্বরে মা নিজের মনেই উত্তর দিলেন—না, উনি মস্ত লোক।

আমার বোধ হয় শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা বস্তুটা আমাদের অস্থিমজ্জাগত।

ওয়াদামামার পরিচিত রাজকুমার, এই চিত্রকর মায়ের কাছে আমার বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তিনি বেশ কিছুকাল বিপত্নীক রয়েছেন—এ তথ্যও জানাতে ভোলেন নি। মা বললেন—যা ভাল বোঝ, সেই মত সোজা ভদ্রলোককে জানিয়ে দাও। বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই আমি লিখে দিলাম—বর্ত্তমানে আমার আদৌ বিবাহে রুচি নেই।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম—আমি আপত্তি করলে তোমার খারাপ লাগবে না তো?

এ রকম যোগাযোগ সম্ভব বলে আমার মনেই হয়নি। জাপানী আল্‌পস এ শিল্পীর কাছে এই মর্মে চিঠি গেল। আমার চিঠি পাবার আগে—দিনকয়েকের মধ্যে হঠাৎ ভদ্রলোক স্বয়ং এসে উপস্থিত।

তিনি খবর দিলেন 'ইজু' (Izu)তে গরম জলের ঝরণায় যাবার পথে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান। শিল্পীদের যত বয়সই হোক না কেন, এধরণের ছেলেমানুষীতে কখনও ক্লান্তি আসে না।

মা'র শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, আমি নিজেই চীনাঘরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। চা ঢালতে ঢালতে বললাম,—এতক্ষণে প্রত্যাখ্যান বহন করে আমার চিঠি আপনার বাসায় পৌঁছে গেছে। আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করে দেখলাম, এ অসম্ভব!

তাই নাকি? ভদ্রলোকের স্বরে অধৈর্য্য। ঘাম মুছে বললেন—আশা করি, আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখবেন। হয়ত আমি—কেমন করে বলব জানি না—আপনাকে মানসিক আনন্দ দিতে পারব না। কিন্তু অন্য ভাবে বাস্তব জীবনে আপনাকে যথেষ্ট সুখী করার ক্ষমতা আমার আছে। এ বিষয়ে আমি আপনাকে নিঃসন্দেহ করতে পারি। আশা করি, আমার ভাষা অমার্জ্জিত হয়নি।

আপনি যে সুখের কথা বলছেন তার স্বরূপ আমার জানা নেই। ধৃষ্টতা মাপ করবেন, এক্ষেত্রে আমার একটিমাত্র উত্তরই জানা আছে—না ধন্যবাদ! নীৎসের (Nietzche) ভাষায় বলতে গেলে আমায় সেই জাতীয়া রমণীর পর্য্যায়ে ফেলা উচিত, সন্তানের জননী হওয়াই যাদের একমাত্র কাম্য। আমি সন্তান চাই, সুখে আমার অরুচি। অর্থে আমার আসক্তি নেই, শুধু সন্তানকে মানুষ করার জন্য

যেটুকু প্রয়োজন। হাসিতে বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগে। শিল্পী বলেন—আপনি আমায় অবাক করলেন দেখছি! প্রত্যেকে মনে মনে যা চিন্তা করে, তা আপনি কেমন প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন। আপনার সঙ্গে জীবনটাকে বাঁধতে পারলে নতুন করে কাজে উদ্দীপনা পাওয়া যেতো।

সাজান কথাগুলি আদৌ বুড়োমানুষের উক্তি বলে মনে হ'ল না। হঠাৎ এই ধারণাই হ'ল যে, এত বড় শিল্পীর মনে নতুন অনুপ্রেরণা জাগাবার মত আমার মধ্যে কিছু পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে বেঁচে থাকা সার্থক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে বৃদ্ধের বাহুপাশে আবদ্ধ অবস্থায় কল্পনা করতে পারলাম না। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম—আমার দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রেমের অভাব কি আপনার সহ্য হবে?

গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক—তাতে বিশেষ কিছু এসে যাবে না। নারীর অন্তরের কথা দেবতারও অজানা।

কিন্তু আমার মত নারী প্রেমহীন বিবাহের কল্পনাও করতে পারে না। পূর্ণ বয়স আমার, আগামী বৎসর ত্রিশ-এ পা দেব।

নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলাম। ত্রিশ! উনত্রিশ বৎসর বয়স অবধি নারীদেহে কুমারীসুলভ কোমলতার কিছু অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু ত্রিশোর্দ্ধ নারীদেহ নিঃস্ব, রিক্ত। ফরাসী উপন্যাসে পড়া এই কথাগুলি স্মরণ করে আমার মন অবসাদে এমন ভারাক্রান্ত হ'ল যে কোন মতেই তাকে মন থেকে দূর করতে পারলাম না। বাইরে চোখ ফেরালাম। রৌদ্রস্নাত সমুদ্রের প্রখর ঔজ্জ্বল্য ভাঙ্গা কাচের টুকরোর মত ঝিকমিক করছিল। মনে পড়ে গেল উপন্যাসে এই দু' লাইন পড়তে গিয়ে; সত্যি ভেবে মনে মনে সায় দিয়েছিলাম। যে সময়ে ত্রিশের কোটায় মেয়েদের যৌবনের সীমা টানতে পারতাম, সেই দিনগুলির জন্য বুকের ভেতর হু হু করে উঠল। অবাক হয়ে ভাবলাম এই যে আমার নেকলেস, ব্রেসলেট, দামী দামী পোষাকগুলো বেচে দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার যৌবনের মাধুরী নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে না তো? হায় রে ভগ্ন হৃদয় মধ্যবয়সী রমণী! কিন্তু তবু মধ্যবয়সেও নারীজীবনে একমাত্র তারই অধিকার নয় কি? সম্প্রতি এই ধারণাই আমার হয়েছে। উনিশ বছর বয়সে আমার এক ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী দেশে ফেরার মুখে আমায় সাবধান করে দিয়েছিলেন, কখনও প্রেমের বাঁধনে নিজেকে জড়িও না। প্রেম তোমার সর্বনাশের মূল হবে। বাঁধা যদি পড়তেই হয়, অনেক বয়সে, ত্রিশ পেরিয়ে প্রেম করো।

তাঁর কথা নিঃশব্দে হজম করেছিলাম, মন তা গ্রহণ করেনি। সে সময়ে আমার পক্ষে ত্রিশোর্দ্ধ জীবনের কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

তিক্ত স্বরে শিল্পী হঠাৎ বলে উঠলেন শুনলাম আপনারা বাড়ীটা বেচে দেবেন? কথাটা সত্যি?

আমি হেসে উঠলাম, মাপ করবেন, আমাদের চেরী বাগানটার কথা এইমাত্র মনে হল। আপনি ওটা কিনবেন?

ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হ'ল, উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক। শিল্পী মানুষ, আমার কথার ইঙ্গিত ধরতে কষ্ট হয়নি।

বাড়ীখানা এক রাজকুমারকে বেচে দেবার কথা চলছিল—একথা সত্যি কিন্তু শেষ অবধি কিছুই করা হয়নি। এরই মধ্যে শিল্পীর কানে পৌঁছে গেছে খবরটা জেনে অবাক হলাম।

কিন্তু যেই বুঝলেন তাঁকে চেরী বাগানের ঠিকেদার লোপোখিন এর সমগোত্রীয় মনে করি, অমনি ভদ্রলোকের মেজাজ বিগড়ে গেল। এর পর কয়েক মিনিট এটা, ওটা বলে উঠে পড়লেন।

এই লোপোখিন পর্ব্বের পুনরাবৃত্তি হোক, এ অনুরোধ আপনাকে আমি করব না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। কিন্তু দয়া করে মধ্যবয়সী রমণীর অন্তরের ব্যাকুলতার কথা ক্ষণেক অবধান করুন।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে সময়ে আপনি আমার ভাই-এর গুরু, শুধু তাই নয়—অসামান্য এক গুরু, এইমাত্র আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল। একত্রে আমরা গেলাস গেলাস মদ খেয়েছিলাম, এবং আপনার দিক থেকে দুঃসাহসের পরিচয় পেয়েছিলাম। উচ্ছ্বাসের এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা ভিন্ন আমার বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। আপনাকে আমার ভালও লাগেনি, মন্দও লাগেনি—আসলে আমার তখন আবেগের বালাই মোটে ছিল না। পরে ভাইকে খুশি করতে আপনার কয়েকটি উপন্যাস চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম, তার মধ্যে কয়েকটি ভালই লেগেছিল, কয়েকটি লাগেনি। সত্যি বলতে আমি তেমন পড়ুয়া নই। কিন্তু গত ছয় বৎসরের মধ্যে, ঠিক কোন সময় থেকে বলতে পারব না, আপনার স্মৃতি আমার সমস্ত অন্তর কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং সেরাত্রে একতলা থেকে উঠে আসার সময়ে সিঁড়িতে যে ঘটনা ঘটেছিল, পরিষ্কার সব আমার মানসচক্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে। কেমন যেন মনে ভয় হয়, আমার ভাগ্যপটে ঐ ব্রাহ্মমুহূর্তের দাম অতুলনীয়। অন্তরের অন্তঃপুরে আপনার অভাব ফিরে ফিরে বাজে। জানি না একে প্রেম বলে কিনা এবং তারই সম্ভাবনায় নিজেকে এত নিঃসঙ্গ বোধ হয় যে আপন মনে কেঁদে আকুল হই। দুনিয়ার আর সব পুরুষের চেয়ে আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন। "সাগর-বিহঙ্গ" (The sea gull) উপন্যাসের নায়িকা নীনার মত উপন্যাসিকের মোহ আমায় অভিভূত করতে পারেনা। লেখকের প্রতি আমার আকর্ষণ কম। আমাকে বিদুষী মহিলা বা ঐ ধরণের কিছু মনে করলে ভুল হবে। আপনার কাছে আমার একটি মাত্র ভিক্ষা আছে, আমি সন্তান চাই।

হয়ত বহুকাল আগে, যখন আমরা দুজনেই অবিবাহিত ছিলাম, তখন সাক্ষাৎ হ'লে আমাদের বিয়ে হ'তে পারত। হয়ত আমার আজকের এই আন্তরিক যাতনার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারতাম, কিন্তু এ-ও জানি যে আপনার সঙ্গে আমার কোন দিনই বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। আপনার স্ত্রীর স্থান দখল করার চিন্তা মাত্র বর্ব্বরতা। আমি আপনার রক্ষিতা হ'তে প্রস্তুত আছি। (শব্দটি নিজের কাছেই অসহ্য। প্রেমিকা লিখতে গিয়ে মনে হ'ল রক্ষিতা লিখলেই আমার মনের ভাব স্পষ্টই হয়; এসব ব্যাপার পরিষ্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়) শুনেছি রক্ষিতার বরাত মন্দ। লোকে বলে কাজ ফুরোলেই ছিন্ন কন্থার মত তাকে দূর করে দেওয়া হয়। পুরুষ মানুষ সে যেমনই হোক ষাটের কাছাকাছি এলেই ঘরমুখী হয়। আমাদের নিশিকান্তা ষ্ট্রীটের বুড়ো মালীর সঙ্গে আমার নার্সের আলোচনা শুনেছিলাম একদিন। তাদের শেষ কথা হ'ল এই যে, মেয়েদের কোনমতেই 'রক্ষিতা' হওয়া উচিত নয়। তারা অবশ্য বারবনিতার কথা বলছিল, আমাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে আপনার কাজই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিষ এবং আমায় যদি আপনার পছন্দ হয়, ঘনিষ্ঠতা হ'লে সেদিক দিয়ে সুবিধা বই অসুবিধা হবে না। আপনার স্ত্রীর পক্ষেও আমাদের সম্পর্ক মেনে নিতে কষ্ট হবে না। অদ্ভুত শোনালেও আমাদের যুক্তিতে কোন ভুল নেই।

সমস্যা আপনার জবাব নিয়ে। আমাকে আপনার পছন্দ হয়, কি হয় না? এ বিষয়ে আপনার মনের ভাব কি? না জানি কি উত্তর দেবেন, কিন্তু একটা উত্তর যে চাই-ই। আগের চিঠিতে লিখেছিলাম স্বয়ংবরা প্রণয়িনী, এবার লিখলাম মধ্যবয়সী রমণীর অন্তরের ব্যাকুলতার কথা। এখন মনে হচ্ছে আপনার জবাব না পেলে এই ব্যাকুলতাও কারণ অভাবে বাষ্পীভূত হ'য়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে এবং আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল অভিশপ্ত হয়েই কাটবে। আপনার কাছ থেকে জবাব না পেলে আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত হবে।

আপনার উপন্যাসে প্রেমের অভিযানের বর্ণনা করেন, লোকে আপনাকে হৃদয়হীন আখ্যা দেয়, কিন্তু সম্ভবতঃ সাধারণ বুদ্ধির উপর আপনার আস্থা বেশী। ব্যক্তিগত ভাবে সাধারণ বুদ্ধি আমার কাছে অর্থহীন। আমার মতে আত্মার ইচ্ছা পুরণের দ্বারাই জীবনকে সৎপথে চালনা করা যায়। আপনার সন্তানের জননী হওয়াই আমার একমাত্র কামনা। কোন কারণেই অন্য কোন ব্যক্তির সন্তান আমার কাম্য নয়। এক্ষণে আপনার উপদেশের অপেক্ষা এর উত্তর জানা থাকলে আমায় জানিয়ে বাধিত করবেন। অনুগ্রহ করে সেই সঙ্গে আপনার মনের ঠিকানা দেবেন।

বৃষ্টি থেমে হাওয়া উঠেছে। এখন বেলা তিনটে। আমি আমাদের বরাদ্দ সবচেয়ে ভাল মদের সন্ধানে বেরুবো। দুখানি শূন্যগর্ভ 'রাম'-এর বোতল এবং এই চিঠিখানা পকেটে ভরে দশ মিনিটের মধ্যে গ্রামের পথে পাড়ি দেব। এই মদ আমার ভাই-এর নাগালের বাইরে নিজের জন্য সরিয়ে রাখব। প্রতি রাতে গেলাসে ঢেলে একটু করে মদ আমি খাই। জানেন বোধ হয় 'সাকে' গেলাসে খাওয়াই রেওয়াজ।

একবার এখানে আসুন না?

মিষ্টার এম, সিকে লিখিত।

আজ আবার বৃষ্টি হয়ে গেল। কুয়াশা এবং বৃষ্টির এক বিশ্রী সংমিশ্রণ দেখা দিয়েছে। প্রত্যহ আমি আপনার উত্তরের প্রত্যাশায় থাকি, বাড়ীর বাইরে পা দিতে ভরসা হয়না। কিন্তু এপর্য্যন্ত একটারও জবাব এলনা। কি মনে হয় আপনার? জানিনা এর আগের চিঠিতে শিল্পীর বিষয় লিখে ভুল করলাম কি না! বোধ হয় ভাবছেন আপনার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্রেক করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবের কথা লিখেছি। কিন্তু তারপর থেকে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেছে। এই তো খানিক আগে মা আর আমি এই কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম। কিছুদিন হল মা জিভের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন কিন্তু নাওজির সৌখিন চিকিৎসার কল্যাণে ব্যথাটা কমেছে এবং সম্প্রতি শরীর একরকম ভালই আছে।

কয়েক মিনিট আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কেমন করে হাওয়ার ঝাপটায় বৃষ্টিধারা উড়ে ঘুরে মরছে আর সেই সঙ্গে আপনার মনের হদিশ পাবার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময়ে খাবার ঘর থেকে মায়ের ডাক কানে এল,—দুধ জ্বাল দিয়েছি, এদিকে এস।

দিনটা এমন দারুণ ঠাণ্ডা দেখে দুধ একটু বেশীই গরম করলাম। ধোঁয়ালো দুধে চুমুক দিতে দিতে শিল্পীর প্রসঙ্গ উঠল; আমি বললাম —তার সঙ্গে আমার মিলতেই পারেনা, কি বল মা?

মায়ের শান্ত স্বর—সে কথা সত্যি।

একে তো আমি বেয়াড়া মেয়ে! তাছাড়া শিল্পীদের ওপর আমার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে, এদিকে ভদ্রলোকের রোজগারও ভাল, সব দিক দিয়ে বিচার করলে এ যোগাযোগ নেহাৎ নিন্দের নয়। কিন্তু তবু অসম্ভব।

মা হেসে ফেললেন—কাজুকো, তুমি ভারী দুষ্টু মেয়ে। যদি অসম্ভবই জানতে তবে কেন সেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে অত খোসগল্প জুড়ে দিলে? তোমার মতিগতি বোঝা দায়!

বাঃ কথা বলতে মজা লাগছিল যে। আরও অনেক কথাই বলা যেত। তুমি তো জান—কথা কওয়ার লোক পেলে আমার জ্ঞান থাকে না।

না কাউকে ছেড়ে কথা বলা তোমার স্বভাব নয়। কাজুকো, তুমি বড় জেদী মেয়ে।

আজ মায়ের মেজাজখানা খুব ভাল আছে। গত কাল আমি মাথার ওপর চুড়ো করে চুল বেঁধেছিলাম, সেদিকে চোখ পড়তে বললেন—যাদের চুল কম, তাদের জন্য এইরকম চুল বাঁধার কায়দা। তোমার মাথায় এই চুড়ো অসম্ভব জমকালো দেখাচ্ছে। একখানা ছোট্ট সোনার টায়রা হলেই খুলত ভাল। এমন করে না বাঁধলেই পারতে।

মা, তুমি আমায় নিরাশ করলে। একবার তুমিই তো বলেছিলে যে, আমার এত সুন্দর ঘাড় ঢেকে রাখার কোন মানে হয় না। বলনি?

হ্যাঁ, সেই রকমই যেন মনে পড়ছে। আমায় কেউ প্রশংসা করলে তার একটা কথাও আমি ভুলি না। তোমারও মনে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

সেদিন সেই ভদ্রলোক নিশ্চয় তোমার প্রশংসা করেছিলেন। হ্যাঁ তা করেছিলেন। সেইজন্যেই তো অত সহজে তাঁকে হাতছাড়া করতে চাইনি। তিনি বলেছিলেন যে, আমি তাঁর পাশে থাকলে তিনি আবার নতুন কাজে উৎসাহ পাবেন। না আর বেশী বলব না। শিল্পী যে পছন্দ করি না তা নয়। তবে হামবড়া ভাব আমার অসহ্য লাগে।

নাওজির মাষ্টার কেমন লোক?

আমার শরীরের ভেতর দিয়ে হিমেল স্রোত নেমে গেল—ঠিক জানি না, তবে নাওজির মাষ্টারের আর দৌড় কত হবে! শুনেছি ভদ্রলোকের গায়ে 'অনাচারী' লেখা তকমা ঝুলছে।

তকমা? মায়ের চোখে কৌতুকের ছায়া খেলে গেল—ভারী মজার কথা তো! তকমাই যদি রইল তবে আর কিসের? এ যেন বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতই মিষ্টি। তকমাহীন অনাচারীকেই ভয় বেশী।

কি জানি।

আমার সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে আনন্দের জোয়ার নামল। মনে হল

দেহটা ধোঁয়ার মত হাল্কা হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে বুঝছেন ব্যাপারটা? কিসে আমার আনন্দ—এ যদি আপনি না বোঝেন তবে আমি আপনাকে আঘাত দিয়ে বোঝাব!

আপনি কি কখনও এখানে আসবেন না? আমি নাওজিকে বলব আপনাকে ধরে আনতে। অবশ্য তাকে বলা আমার পক্ষে অশোভন হবে ঠিকই। সবচেয়ে ভাল হত হঠাৎ যদি আপনি এখানে উপস্থিত হতেন, যেন আপনার একটা খেয়ালের ব্যাপার। নাওজির সঙ্গে এলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু তবু নাওজি টোকিওতে থাকতে থাকতে আপনি একা চলে এলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এখানে থাকলে নাওজি আপনাকে দখল করে বসবে, আপনাকে ওসাক্কির ওখানে মদ খাওয়াতে নিয়ে যাবে ব্যস, তাহ'লেই সব মাটি।

বংশানুক্রমে আমাদের পরিবারে শিল্পিপ্রীতি বর্ত্তমান। কিওটোতে আমাদের আদি বাসায় কোরিন (Korin) বহু বৎসর কাটিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন। সুতরাং আপনি এলে মা খুব খুশি হবেন, আমি জানি। ওপর তলায় বিদেশী প্যাটার্ণের ঘরটিতে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। দয়া করে আলো নেবাতে ভুলবেন না। মোমবাতি হাতে আমি অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠব। পছন্দ হল না? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

অনাচারী মানুষ আমি ভালবাসি, বিশেষতঃ যাদের নামের সঙ্গে কলঙ্ক জড়ানো আছে। আমি নিজেও অনাচারী হ'তে চাই। আমার বিশ্বাস, এ ছাড়া বাঁচবার আর কোনও রাস্তা আমার নেই। সারা জাপানের মধ্যে আপনি যথেচ্ছাচারিতার উদাহরণস্বরূপ। নাওজির মুখে শুনেছি, লোকের ধারণা আপনি অত্যন্ত নোংরা, কদাকার, সবাই আপনাকে ঘৃণা করে এবং মাঝে মাঝে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। এই সব শুনে আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আপনার মত ব্যক্তির গুণগ্রাহিবৃন্দ পরিবেষ্টিত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এখন থেকে আপনি শুধু আমারই। এ না ভেবে আমার উপায় নেই। আমার সঙ্গে থাকলে কাজে আপনি নতুন স্বাদ পাবেন। ছেলেবেলা থেকে অনেকের মুখে শুনেছি, আমার সঙ্গ মানুষকে তার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। জীবনে কারুর অনাদর পাইনি। প্রত্যেকে একমুখে বলেছে ভাল মেয়ে। এই কারণেই মনে হয় আমায় অপছন্দ করার সাধ্য আপনারও নেই।

একবার আপনার দেখা পেলে কি ভালই হত। আর আমার উত্তর বা কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি দেখা করতে চাই। সবচেয়ে ভাল হ'ত যদি টোকিওর বাসায় গিয়ে দেখা করতে পারতাম; কিন্তু মায়ের আমি একমাত্র নার্স পরিচারিকা—কাজেই তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। পায়ে পড়ি একবার এখানে আসুন। শুধু একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। তখনই আপনি আমার সব কথা বুঝতে পারবেন। অধর প্রান্তে অস্পষ্ট রেখাগুলি নজর করে দেখবেন। শতাব্দীর অভিশাপবাহী বলিরেখাগুলি দেখে যান, ভাষার চেয়ে মুখের ভাবে আমার মানসিক অবস্থা অনেক বেশী বুঝতে পারবেন।

প্রথম চিঠিতে আমার অন্তরে চিত্রিত এক রামধনুর আভাস
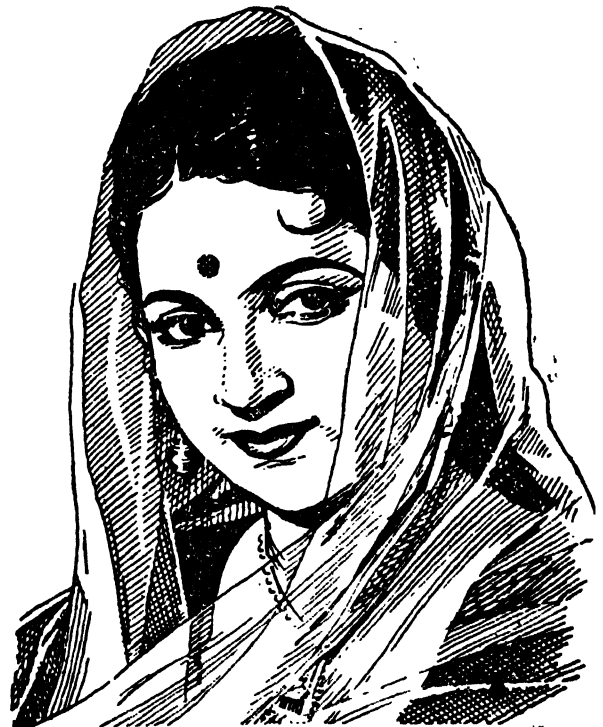
দিয়েছিলাম। জোনাকীর ক্ষীণ আলো অথবা সুদূর দিগন্তের মন্দগামিনী আলোকসম্পাতে সেই রামধনু গঠিত হয়নি। তেমন অস্পষ্ট অথবা ব্যবধানসাপেক্ষ হ'লে আমায় এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত না এবং হয়ত কালে আপনাকে ভুলেও যেতাম। আমার অন্তরে নিহিত এই রামধনু অগ্নিশিখায় রচিত। অনুভূতির তীব্রতা আমার হৃদয় দগ্ধ করে। আফিং ফুরিয়ে গেলে আফিংখোর যে যাতনায় ছটফটিয়ে মরে, তাও বোধ হয় এত অসহ্য নয়। আমি নিশ্চিত জানি, এ আমার ভুল নয়, আমি কোন অন্যায় করছি না কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মনের তাড়নায় নিজেই চমকে উঠি, এ আমি কি অসম্ভব গতিতে নির্ঘোষের মত এগিয়ে চলেছি। প্রায় অবাক হয়ে ভাবি, হয়ত আমি পাগল হয়ে গেছি। যাই হোক, এখনও মাঝে মাঝে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজের কথা ভাবতে পারি। দয়া করে একবার শুধু এখানে আসুন, যে কোনও সময়ে এলেই হবে। এখানে আপনার প্রতীক্ষা করে বসে থাকব, কোথাও যাব না। দয়া করে আমায় বিশ্বাস করুন।

আর একবার শুধু দেখুন এবং তারপরেও যদি আমায় অপছন্দ হয় তবে অসঙ্কোচে বলুন। আপন হাতে জ্বালা আমার হৃদয়ের এই বহ্নিশিখা আপনি স্বেচ্ছায় নিবিয়ে দিতে পারেন। নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টায় এ শিখা নির্বাপিত করা অসম্ভব। আমি জানি আমাদের সাক্ষাৎ হলে, শুধুমাত্র সাক্ষাৎ হলেই আমি বেঁচে যাব। হায়! দি টেল অফ গেঞ্জি (The tale of Genji)নামক উপন্যাসের দিনগুলি যদি ফিরে পাওয়া যেত! এর পর আমি যে কথা বলতে চাই, তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু আজ, উঃ! আপনার পাশে ঠাঁই পাবার, আপনার সন্তানের জননী হবার বাসনা কি দুর্দান্তই না হয়ে উঠেছে! আমার এ চিঠিগুলি পড়ে যদি কেউ হাসে, তবে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি নারীর বেঁচে থাকবার প্রচণ্ড প্রয়াসকে, নারীর জীবনকে ব্যঙ্গ করছে। জাহাজঘাটের চাপা হাওয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার মন চায় উন্মুক্ত সাগরবক্ষে পাল তুলে ভেসে যেতে—ঝড় আসে আসুক, তাতে ক্ষতি নেই কিছু। গুটিয়ে-তোলা পাল অপরিষ্কার হ'তে বাধ্য। যারা আমায় উপহাস করে তাদের মন অপরিচ্ছন্ন। তাদের সাধ্য কি ভাল কিছু করার?

নারীজীবনের কলঙ্ক। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী শুধু আমি। 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' আলস্য ভরে, অপরিষ্কার পাল নামানোর মত বাইরে থেকে আমার কাজের সমালোচনা করার অপচেষ্টা অর্থহীন। আমার চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব, অপরের ঘাড়ে তুলে দেবার আদৌ স্পৃহা আমার নেই। চিন্তার আমি ধার ধারি না। জীবনে শাস্ত্রবাক্য বা দর্শনের ভিত্তিতে কাজ আমি করিনি।

আমার বিশ্বাস, দুনিয়া যাদের ভাল বলে শ্রদ্ধা করে, তারা সবাই মিথ্যাবাদী, ভণ্ড! এ দুনিয়ার ওপর আমার আদৌ আস্থা নেই। আমার একমাত্র সুহৃদ সুপরিচিত এক ব্যভিচারী পুরুষ। তকমাধারী ব্যভিচারী। একমাত্র এই ক্রুশের উপর আমি আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত। দশ হাজার মানুষ আমায় সমালোচনা করলেও আমি তাদের মুখের ওপর এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারি—প্রাণের স্বরূপ গোপন রাখা আরও অনেক বেশী মারাত্মক নয় কি?

বুঝলেন কিছু?

প্রেম অর্থহীন। আপনাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে গিয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে আমার ভাই-এর বুলি পাখীপড়া আওড়ে যাচ্ছি এতক্ষণ আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, আমি আপনার পথ চেয়ে রইলাম। আপনাকে আর একবার দেখতে চাই। ব্যস ঐ পর্য্যন্ত।

শুধু অপেক্ষা করে থাকা। আমাদের জীবন সুখ দুঃখ, ক্রোধ আদি বহু আবেগে পরিপূর্ণ কিন্তু জীবনের শতকরা এক ভাগ সময় যদি এদের নিয়ে কাটে, বাকী নিরানব্বুই ভাগ আশায় আশায় কেটে যায়। সেই পরম ক্ষণটির অপেক্ষা করে আছি। মনে হয় বাঞ্ছিতের পদধ্বনিতে বুকের ভেতরটা দলিত, নিষ্পেষিত হচ্ছে। সব শূন্য! হায়, জীবন কি বিস্ময়! বৃথা জন্ম—এই চিরন্তন সত্য বাস্তবের ভেতর দিয়ে বার বার প্রমাণিত হয়ে আসছে।

এই ভাবে প্রত্যহ সকাল থেকে রাত অবধি পথ চেয়ে চেয়ে নিরাশ হই। মনে মনে ভাবি এই যে আমি জন্মেছি, বেঁচে আছি, মানব-জীবন আছে, দুনিয়া আজও টিকে আছে—এ নিয়ে যদি সুখী হ'তে পারতাম।

যে নৈতিক দায়িত্ববোধ আপনার পথে অন্তরায়, তাকে কি ঝেড়ে ফেলতে পারেন না?

এম, সি। (মাই শেখভ-এর আত্মক্ষর নয়। সাহিত্যিকের প্রেমে আমি পড়িনি। মাই চাইল্ড)। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ ঃ কল্পনা রায়।

পরাজিত

শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

বাস্তব দুনিয়ার
হায়—
এই শুধু জানলেম:
হৃদয় বিলিয়ে দিয়ে ব্যথা শুধু আনলেম।

ভালোবাসা দিয়ে কত
আপন মনের মত
প্রাণের বীণার তারে আহা সুর বাঁধলেম!
সে তার তো ছিঁড়ে গেলো, তাই শুধু কাঁদলেম।

প্রেমের প্রদীপখানি
সযতনে আমি আনি
ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাতে যে চাইলেম,
নিবে গেলো তবু শিখা আমি হারলেম।
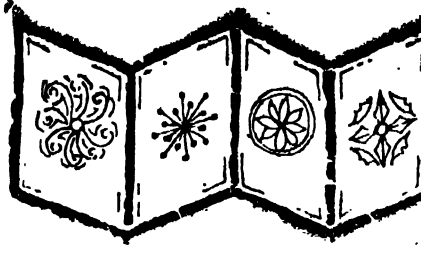
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৭

জিয়ালগোড়া পোঃ
জেলা মানভূম, বিহার
১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৯।

প্রিয় মহাত্মাজী,

ভাবিয়াছিলাম ১০ই এপ্রিলের পত্রই আমার শেষ পত্র হইবে কিন্তু তাহা হইবার নয়। আমি খুব সকালে উঠিয়াছি। নিদ্রাদেবী আমাকে ত্যাগ করায়, নিস্তব্ধ উষার আলো-আঁধারির মধ্যে আমাদের উভয়ের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তারপর উভয়ের পত্রগুলি পুনরায় আদ্যন্ত পড়িয়া দেখিলাম যে, কয়েকটি বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা আবশ্যক।

৩০শে মার্চের পত্রে আপনি বলিয়াছিলেন যে, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সেবাগ্রামে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, মূল বিষয়গুলিতে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। আলাপ-আলোচনার সময় আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ আছে কিন্তু এ-বিষয়ে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, সেই মতভেদগুলিকে মূলবিষয়ে মতভেদ বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না। আপনার পত্রগুলিতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই সে-সময় আপনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ দুর্নীতি, হিংসাত্মক মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন; স্বরাজলাভের জন্য চরমপত্র দান এবং জাতীয় সংগ্রাম সুরু সম্পর্কে আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন। আপনার মতে, তখন অহিংস গণ-সংগ্রামের উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদগুলি কি মূলবিষয়ে এবং সেজন্য কি একযোগে কাজ করার সকল আশাই ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত? কর্মসূচী সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, উহা স্থির করার ভার কংগ্রেসের। ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের অভিমত এবং পরিকল্পনা প্রকাশ করিতে পারি কিন্তু তাহা গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা কংগ্রেসেরই। স্বরাজলাভের জন্য চরমপত্র দানের এবং জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে আমার মূল প্রস্তাবটি ত্রিপুরী কংগ্রেস অগ্রাহ্য করিয়াছিল কিন্তু এজন্য আমার কোনও অভিযোগ নাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এধরণের বিলম্ব স্বাভাবিক। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, আমি ঠিক কথাই বলিয়াছিলাম এবং কংগ্রেসও একদিন তাহা বুঝিতে পারিবে। আশা করি, তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যাইবে না। এখন যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, উপরিউক্ত বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহা হইলেও একযোগে কাজ করার অক্ষমতার কারণ কি? এই মতভেদগুলি সহসা আজিকেই গজাইয়া উঠে নাই। উহারা কিছুকাল যাবত আছে এবং তাহা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়াছি! ঐ মতভেদগুলি বা অনুরূপ মতভেদ ভবিষ্যতেও থাকিবে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের ঐরূপই তখন করিতে হইবে (সম-উদ্দেশ্যের জন্য সহযোগিতা করিতে হইবে)।

অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করুন যে, সেবাগ্রামে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম একটি মাত্র বিষয় লইয়া—সর্বদলীয় বনাম একদলীয় কার্যানির্বাহক সমিতি গঠন। কিন্তু তখন আমরা ঐ বিষয়ে আমাদের মতভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার শেষের দিকে আমি বলিয়াছিলাম যে, সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যের সংগে যখন আমি সাক্ষাৎ করিব তখন তাঁহাদের সহযোগিতা আদায়ের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। সম্ভবতঃ আমি যদি অসুস্থ না হইতাম এবং গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যদি আমাদের সাক্ষাৎকার হইত, তাহা হইলে একযোগে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিত।

আপনার ৩০শে মার্চের পত্রে আর একটি মন্তব্য আছে যাহার সহিত আমি একমত নই। উহা ভাল করিয়া চোখে পড়ে নাই বলিয়া ইতিমধ্যে সে সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি নাই। আপনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্য যদি আমার নীতি সমর্থন করে তাহা হইলে, যাঁহারা আমার নীতিতে বিশ্বাসী, একমাত্র তাঁহাদের লইয়াই আমার পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা কর্তব্য। আমাদের পক্ষের পরিষ্কার অভিমত এই যে, এ, আই, সি, সিতে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন আমরা পাইলেও সর্বদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি বা কর্মপরিষদের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কারণ, উক্ত পরিষদের গঠন যথাসম্ভব কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রতিধ্বনি হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন উহার পশ্চাতে থাকা চাই। ভারতের মধ্যে এবং বিদেশে আজ আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি তাহাতে আমাদের মতে, একদলীয় কর্মপরিষদ গঠন নিতান্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্র-প্রসারের সময় আসিয়াছে। জাতীয় কর্মপরিষদকে—ওয়ার্কিং কমিটিকে সঙ্কীর্ণ, দলীয় ভিত্তিতে গঠন করিয়া আমরা কি সে কার্য্য সুরু করিতে পারি?

দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আমরা আপনার সহিত একমত যদিও আমি মনে করি যে, ঐ বিষয়ে আপনার আশঙ্কা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমি জানি না, সমগ্র ভাবে ভারতের কথা বিচার করিলে কেহ বলিতে পারেন কি না যে, দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে যাহা হউক, আমি মনে করি যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইলেও, আমরা এমন অক্ষম

হইয়া পড়ি নাই যে, জাতীয় সংগ্রাম সুরু করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে না। দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, জাতীয় সংগ্রাম মুলতুবী রাখা এবং সরকারী পদাধিকারের দ্বারা বিলাস-জীবনের আস্বাদন এই দুর্নীতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী কি না। আমার পূর্ব্ববর্তী পত্রে যেমন বলিয়াছিলাম এখনও তেমনই বলিতেছি যে, আরও আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের আহ্বান প্রতিষেধকরূপে কাজ করিবে এবং সমগ্র জাতিকে উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত করিবে।

৬ই এপ্রিল রাজেন বাবু অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে শ্রমিক-সমস্যা লইয়া আমরা আলোচনা করিবার পর কংগ্রেসের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। যখন আমি আপনার সহিত পত্রালাপ সুরু করি তখন আশা করিয়াছিলাম যে, এই ভাবেই (পত্রালাপের মাধ্যমে) ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যার সমাধান হইবে এবং বড় বড় সমস্যাগুলি আমাদের উভয়ের পরবর্ত্তী সাক্ষাৎকারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পত্রালাপ চলিতে থাকাকালে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, উহা কোনওরূপ সমাধানের দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে না। যখন রাজেন বাবু দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তখন, ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবার কথা ভাবিতেছিলাম। কারণ, আশা ছিল যে, উহার ফলে আমাদের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার অনুরোধে সাক্ষাৎকারের জন্য, রাজেন বাবু আপনাকে বিড়লা হাউসে টেলিফোন করিয়াছিলেন। রাজেন বাবু আমাকে উৎসাহব্যঞ্জক কোনও সংবাদ না দেওয়ায় আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আর একবার আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব। সুতরাং বিকালের দিকে আমার ডাক্তার আবার বিড়লা হাউসে টেলিফোন করেন এবং আমিও একটি এক্সপ্রেস টেলিগাম পাঠাই। উভয়ের উত্তরে আপনি জানান যে, রাজকোটের ব্যাপারে আপনাকে তৎক্ষণাৎ দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তখন আমার মনে হইয়াছিল এবং এখনও মনে হইতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে জলাঞ্জলি দিয়া সম্ভবতঃ উহার চরম ক্ষতিসাধন করিয়া, রাজকোট সমস্যা লইয়া আপনি মাতিয়া উঠিয়াছেন। আমার ন্যায় লোকের নিকট কংগ্রেসে বিষয়সমূহ—বিশেষ করিয়া এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে—রাজকোটের আহ্বান অপেক্ষা সহস্রগুণ মূল্যবান। ইহা আপনার ভাবা উচিত ছিল যে, স্যার মরিস গায়ারের রোয়েদাদের পর, একা সর্দার প্যাটেলই রাজকোট পরিস্থিতিকে সামলাইতে পারিতেন, দীর্ঘদিন সেখানে আপনার উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক এখন আর উহা লইয়া খেদ করিয়া লাভ নাই; কারণ, ঐ বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়াছেন।

৭ই এপ্রিলের এক তারবার্ত্তায় আপনি শরৎকে বা অন্য কোনও প্রতিনিধিকে দ্রুত রাজকোটে ধাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, উহা কার্য্যকরী প্রস্তাব নহে। আপনার সহিত সরাসরি পত্রালাপে যদি সন্তোষজনক ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রতিনিধির মাধ্যমে কথাবার্ত্তায় কি ফল হইবে—বিশেষ করিয়া সমস্যা যেখানে কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ। না, আমার মনে হয়, রাজকোটে প্রতিনিধি পাঠাইলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। আমাদের উভয়ের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হইলে তাহা সম্ভব হইত।

আপনার দশ তারিখের পত্র এইমাত্র হস্তগত হইয়াছে এবং উহার উপর আমাকে কয়েকটি মন্তব্য করিতে হইবে। দুঃখের সহিত বলিতেছি, অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কে আপনার উত্তর আমার নিকট নৈরাশ্যকর মনে হইতেছে। আপনার সমগ্র পত্রখানি নিরাশার ভাবে ভরপুর। আমার পক্ষে ঐরূপ মনোভাব সমর্থন করা সম্ভব নয়। সঙ্কোচের সহিত বলিতেছি, আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। আমাদের দেশপ্রেমে আপনার এই বিশ্বাস যথেষ্ট থাকা উচিত যে, জাতীয় সঙ্কট যখন দেখা দিয়াছে তখন এই সকল বিষয় অতিক্রম করিতে আমরা সমর্থ হইবই। যদি আমরা কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করিতে না পারি, তাহা হইলে সারা দেশের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য কি করিয়া সম্পাদন করিব?

পন্থ-প্রস্তাব সম্পর্কে আপনি প্রকৃতপক্ষে আমাকে কোনও উপদেশই দেন নাই।

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কেও যদি আপনি নৈরাশ্যের মনোভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে ঐ রাজ্যগুলির জনগণের জন্য দায়িত্বশীল সরকার এবং পৌরস্বাধীনতা কি করিয়া আদায় করিবেন? মোটের উপর আমাদের একমাত্র অস্ত্র হইতেছে অহিংস গণ-সংগ্রাম আর তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমাদিগকে কেবলমাত্র মধ্যপন্থী নীতি গ্রহণ করিতে হইবে অথবা আপনার খাপছাড়া আত্মনিপীড়নের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আপনি লিখিয়াছেন যে, যেখানে সেখানে আপনার প্রভাব আছে, সেখানেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি রাজকোটে আপনি উহা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর নিজের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছিলেন। আপনার জীবনও উহার জন্য বিপন্ন করিয়াছিলেন। কি আপনার দেশবাসীর পক্ষে, কি রাজকোট রাজ্যের অধিবাসীর পক্ষে ঐ কাজ কি কল্যাণকর হইয়াছে? আপনার জীবন আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে যে যখন ইচ্ছা আপনি তাহা বিপন্ন করিয়া তুলিবেন। রাজকোট অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের জন্য দেশবাসী ন্যায়তঃ দাবী জানাইতে পারে। রাজকোটবাসিগণ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তাহারা যদি নিজেদের আত্মত্যাগ ও চেষ্টা ব্যতিরেকে একমাত্র আপনার আত্মনিগ্রহের ফলে স্বরাজ লাভ করে, তাহা হইলে রাজনৈতিক দিক হইতে তাহারা অনুন্নতই থাকিয়া যাইবে এবং আপনার দ্বারা লব্ধ স্বরাজ রক্ষা করিতে পারিবে না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন আমাদিগকে বহু সংগ্রামক্ষেত্রে অসংখ্য সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তখন কত বার আপনি আপনার মূল্যবান জীবন এই ভাবে বিপন্ন করিবেন?

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের সহযোগিতা সম্পর্কে আপনি নিরাশা পোষণ করিতেছেন। আপনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ আপনি ভারতের জন্য আমাদের শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা সমর্থন করেন না, যদিও আমরা শিল্পপ্রসারের সহিত উপযুক্ত কুটিরশিল্পের উন্নয়নের কথা বলিয়া আসিতেছি। রাজনৈতিক মতভেদ সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কো

মতভেদগুলিকে আপনি মৌলিক এবং ঐক্যের ও সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যের পক্ষে দুরতিক্রমণীয় বাধা বলিয়া মনে করিতেছেন! আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, এইরূপ কার্য্য (একযোগে কার্য্য) অসম্ভব, তাহা হইলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ—অন্ততঃপক্ষে অদূর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতদিন আমি এই আশা পোষণ করিতেছিলাম যে, আপনার মাধ্যমে বিভেদ জোড়া লাগিবে এবং একটা ভীষণ জাতীয় দুর্দৈব এড়ান সম্ভব হইবে।

আপনি যে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা ভাল, মন্দ বা উদাসীন যাহাই হউক না কেন, উহাদের অস্তিত্ব পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন যদি একযোগে কাজ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোনও কালেই তাহা সম্ভব হইবে না। উহার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জন্য নিদারুণ নৈরাশ্য ব্যতীত আর কিছুই নাই। যৌবনোচিত বলিষ্ঠ আশাবাদ এবং ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনির্ব্বাণ বিশ্বাস লইয়া আমরা কি করিয়া এই পরিস্থিতি স্বীকার করিয়া লইতে পারি?

কয়েকটি পত্রে আপনি আমাকে সত্বর নীতি নির্দ্ধারণ এবং কর্ম্মসূচী স্থির করিয়া তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস আমাকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাই আমার বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আমি আমার কর্ম্মসূচী পেশ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত থাকায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট আমার কর্ম্মসূচী পেশ করার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না।

প্রথম পত্রে আপনি লিখিয়াছিলেন যে, আমারই হাতে উদ্যোগপর্ব্ব। তদনুসারে, যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন আমরা হইয়াছি, তৎ-সম্পর্কে আমার মতামত এবং আমার সমাধানগুলিও আপনার নিকট পেশ করিয়া আসিতেছি। দেখিতেছি যে, হয় সকল অথবা অধিকাংশ প্রস্তাবই আপনি সমর্থন করেন নাই। অতএব এখন আপনারই উদ্যোগী হইবার এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। পন্থ প্রস্তাবানুসারে ওয়ার্কিং কমিটিকে কেবল যে আপনার ইচ্ছানুসারেই গঠিত হইত তাহা নহে, উহাকে আপনার পুরা বিশ্বাসভাজনও হইতে হইবে।

কতকগুলি বিকল্প প্রস্তাব আপনার বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমি সত্বর জাতীয় সংগ্রাম সুরু করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। উহা করিলে আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটগুলির মোচন স্বভাবতঃই হইত। এই প্রস্তাবটি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, আমি যদি একদলীয় কর্ম্মপরিষদ গঠন করি তাহা হইলে আপনি যেন সমর্থন-জ্ঞাপক ভোট দেন। আপনি লিখিয়াছেন যে, তাহাও সম্ভব নহে। আমার তৃতীয় প্রস্তাবে জানাইয়াছিলাম, আপনার উচিত আগাইয়া আসিয়া ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বহু বাধা দূর হইত এবং বহু বিপত্তির নিরসন হইত। আমার এই প্রস্তাবের কোনও উত্তর আপনি দেন নাই। আপনি যদি ইহাও প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে কার্য্যারম্ভের দায়িত্ব আমার হাত হইতে আপনার হাতে চলিয়া যাওয়া উচিত। আপনাকে তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, একমাত্র আমাদের দলের সদস্যদের লইয়া আপনার পরামর্শ মত একটি একদলীয় কর্ম্মপরিষদ, (ওয়ার্কিং কমিটি) আমি গঠন করিতে পারি না। এই পরামর্শ কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধী, কারণ ঐ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি আপনার পুরা বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই। অধিকন্তু আমার ক্ষুদ্রমতে, বর্ত্তমান অবস্থায় একদলীয় কর্ম্মপরিষদ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। উহা কংগ্রেসের গণ-প্রকৃতির সত্যকার প্রতিনিধিস্থানীয় হইবে না এবং বলিতে কি, উহা গঠন করা হইলে রীতিমত মতবিরোধের সৃষ্টি হইবে এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঘটাইবে।

আশা করি, ত্রিপুরী কংগ্রেস আপনার উপর যে দায়িত্ব চাপাইয়াছে তাহা আপনি যথাযথভাবে পালন করিবেন। আপনি যদি তাহাও করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি কি করিব? আমি কি এ, আই, সি-সিকে সমগ্র বিষয়টি জানাইয়া তাঁহাদিগকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে বলিব? অথবা অন্য কোনও পরামর্শ আমাকে দিবেন?

আশা করি বা (কস্তুরবা) পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন এবং শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন। আপনার স্বাস্থ্য কেমন—বিশেষ করিয়া রক্তের চাপ? আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছি। সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুনশ্চ—

আপনার নিকট আস্থাজ্ঞাপক ভোটের অনুরোধের উত্তরে গত ১০ই এপ্রিলের পত্রে আপনি লিখিয়াছিলেন যে, আমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলে, এ, আই, সি, সি সে সম্পর্কে নিজ বিচারবুদ্ধিমত কাজ করিতে পারেন, আপনার অভিমত বা আপনার আদেশ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আরও ভাল কাজ হইবে যদি তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে নিজ বিচার-বিবেচনাশক্তির প্রয়োগ করেন। পন্থপ্রস্তাবের বিরোধী আপনার পরামর্শ অনুসারে যদি কাজ করিতে আমি না পারি এবং আপনি যদি নিজে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব এ, আই, সি, সির অতি অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। আপনি কি অন্য কোনও সমাধান দিতে পারেন?

রাখিও বল জীবনে
রাখিও মনে আশা
নিখিল এই ভুবনে
রাখিও ভালোবাসা। —রবীন্দ্রনাথ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

দক্ষিণ-আফ্রিকা

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবাসীদের অন্যতম পরম আস্থাভাজন নেতা ছিলেন গোখেল। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর কাছ থেকে তারযোগে আমি এক জরুরি নির্দেশ পেলাম। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমদাসত্ব প্রথার কবলে অসহনীয় অত্যাচারে নিপীড়িত হচ্ছে। এই প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন মহাত্মা গান্ধী। এঁদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে অবিলম্বে দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রা করতে হবে,—এই হোলো গোখেলের নির্দেশ।

নাটালের বিভিন্ন বাগিচায় কাজ করবার জন্যে ১৮৬১ সাল থেকে ভারতীয় শ্রমিক চালান করা হোতো চুক্তি প্রথার মাধ্যমে। দিনে দিনে এই প্রথা অতি বীভৎস রূপ ধারণ করেছিল,—জমে উঠেছিল নানা অন্যায়ের দুরপনেয় কলংক। ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্যে পেশাদার আড়কাটি নিযুক্ত করা হোতো,—এরা মালিকের কাছ থেকে শ্রমিকের মাথা-পিছু দাম পেত। পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোক চালানের পারিশ্রমিক ছিল বেশি। আড়কাটিরা নির্বিচারে ছলবলের আশ্রয় নিত। হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিককে তারা চুক্তিপ্রথায় সংগ্রহ করে নাটালে চালান দিয়েছিল। ফলে নাটালে ইউরোপীয়ের চেয়ে ভারতীয় সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ভারত গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যে প্রাথমিক চুক্তি হয়েছিল তাতে সর্ত ছিল এই যে, ভারতীয় শ্রমিকরা নাটালে পাঁচ বছরের জন্য কাজ করবে। পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার পর ভারতীয় শ্রমিক স্বাধীন ভাবে নাটালে বসবাস করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু এই চুক্তিকে বানচাল করবার উপায় উদ্ভাবনে দেরি হয়নি। নাটাল গভর্ণমেণ্ট আইন করল যে পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিককে হয় তিন পাউণ্ড কর দিতে হবে না হয় আবার আর এক পাঁচ বছরের শ্রমচুক্তি করতে হবে। যে করও দেবে না বা নূতন করে শ্রমদাসত্ব মেনেও নেবে না তাকে নাটাল থেকে বিতাড়িত করা হবে।

নাটাল সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অতি সরল। ভারতীয়রা হয় চিরকাল বাগিচার শ্রমদাস হয়ে থাকবে না হয় তাদের রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হবে। মাথা-পিছু মুক্তিকর স্ত্রী-পুরুষ ও এমন কি পনেরো বছরের উপরের বালকবালিকাকেও দিতে হবে। এমনি মহার্ঘ মাশুল দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করতে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমিকের ক'জনই বা পারবে?

এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-প্রথা দাসত্বের নামান্তর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সার ডবলু ডবলু হাণ্টার বলেছিলেন যে এই প্রথা ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে সীমারেখা টানা দুষ্কর। বাস্তবিক অবস্থা তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করার পর আমিও দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলাম যে হাণ্টারের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। ভারতীয় শ্রমিকরা নিজের পছন্দমত মালিক নির্বাচন করতে তো পারতই না,—যদি বা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাগিচা পরিত্যাগ করত, তাহলে ফৌজদারী অপরাধে শাস্তি পেত।

সরকারী পর্য্যবেক্ষণের একটা তথাকথিত ব্যবস্থা যে অবশ্য ছিল না তা নয়। কিন্তু তাতে মালিকের নিষ্ঠুরতা বিন্দুমাত্রও লাঘব হোতো না। প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস দাসের মনে যোগাত ছিল না। এই প্রথার সব চাইতে বীভৎস রূপ ছিল এই যে, প্রতি একশো জন পুরুষ-শ্রমিকের অনুপাতে চল্লিশ জন করে নারী-শ্রমিক সংগ্রহ করা হোতো। বিবাহিত দম্পতি অতি অল্পই ভারতবর্ষ থেকে আসত। অতএব পুরুষ ও নারী-শ্রমিকের সংখ্যার এই বিপজ্জনক তারতম্যের ফলে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায় দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল।

১৮৩৪ সালে দাসত্বপ্রথা রদ হয়। দাসত্বপ্রথার পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার উদ্ভব হয় এবং এই প্রথা অনুসারে মরিশাস ট্রিনিডাড, জামাইকা, গ্রেনাডা, বৃটিশ গায়না প্রভৃতি উপনিবেশের ইক্ষুবাগিচায় দলে দলে ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হয়। প্রাক্তন দাসত্বপ্রথার অধিকাংশ অনাচার এই নূতন প্রথাতেও ফুটে উঠতে থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন প্রথার কলংক পূর্বতন প্রথার কলংককে ছাড়িয়ে যায়। মালিক যেখানে ভালো হোতো সেখানে ভারতীয় শ্রমিকরাও ভালো ব্যবহার পেত। কিন্তু মালিক যেখানে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী, সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা লাগাম-বাঁধা জন্তুর মতো। এমনি অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে কতো হতভাগ্য শ্রমিক যে আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভ করত তার ইয়ত্তা নেই। বাগিচা-জীবনের দুর্নীতি দুর্ভাগ্যকে আরো গভীরতর করে তুলত।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সরের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে···রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL

কখনো বা পৌঁছতো নারীহত্যা ও পুরুষের আত্মহত্যার ভয়ংকর পরিণতিতে। এই সমস্ত হত্যালীলায় আখ-কাটা ধারালো ছুরি সাধারণত ব্যবহৃত হোতো। সরকারী তথ্য থেকেই জানা যায় যে বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ও আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় শ্রমিককে বাগিচার দাসত্বে শৃংখলিত রাখার জন্যে নাটাল সরকার যে তিন পাউণ্ড মুক্তিকর প্রবর্তন করেছিল এই কর অন্যায় ও মানবতাবিরোধী বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই করের প্রধান সমর্থক ছিল ইউরোপীয়ানরা। জেনারাল বোথা বা জেনারাল স্মাটস, ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও উভয়ের কেউই ইউরোপীয়ানদের চটিয়ে এই কর রদ করবার নির্দেশ দিতে পারেননি। মনে মনে তাঁদের অবশ্য ইচ্ছা ছিল, গোখেল যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান তখন তাঁরা গোখেলকে মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা রাখতে পারেননি।

এই অন্যায় করকে রদ করবার জন্যে সমস্ত প্রকার আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হোলো তখন মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীরা অহিংস অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। উত্তর নাটালের কয়লা খনি অঞ্চল থেকে একদিন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে গান্ধিজী তাঁর সত্যাগ্রহের বাহিনী গঠন করলেন। ভারতীয়দের দুঃখ দুর্দশার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই বাহিনী নিয়ে তিনি ট্রান্সভাল যাত্রা করলেন। দু'হাজারের অধিক ভারতীয় পুরুষ নারী ও শিশু গান্ধিজীর নেতৃত্ব বরণ করে নিল, তাঁর পিছু পিছু ড্রাকেন্স্‌বার্গ পর্বতমালা পার হয়ে ট্রান্সভাল অভিমুখে যাত্রা করল। আরো হাজার হাজার ভারতীয় নেতারা পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। কয়লা খনি পরিত্যাগ করা এবং ট্রান্সভালে প্রবেশ করা দুই কাজই বে-আইনি, উভয় কারণেই সশ্রম কারাদণ্ডের কঠোর শাস্তি। প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও তাদের অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুগণ এই শাস্তির কথা জানত কিন্তু তারা ভয় পেল না। দুর্গম পথযাত্রায় কষ্টের সীমা নেই, কিন্তু গান্ধিজীর অনুবর্তিগণের একজনও পিছন ফিরল না।

শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সঙ্গিসহ মহাত্মা গান্ধী কারাবরণ করলেন। আন্দোলনের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেউ বা জেলে কেউ বা হাজতে আবদ্ধ হোলো। নাটাল থেকে আরো ভারতীয় শ্রমিক বাগিচা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিতে অগ্রসর হলে তাদের উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু হোলো, গুলী চলল নিরস্ত্র অভিযাত্রীদের উপর। ভারতবর্ষে যখন এই সব সংবাদ পৌঁছলো, তখন উত্তেজনা চরমে উঠল। প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী সমর্থন করে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যখন এই সংকটজনক পরিস্থিতি, গান্ধিজী ও অন্যান্য নেতারা যখন প্রত্যেকে কারারুদ্ধ, তখন গোখেল আমাকে তারযোগে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাবার জন্যে। স্বদেশে আমার মা তখন অন্তিম রোগশয্যায়, আমি ইতিমধ্যে তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দেশে রওনা হচ্ছি। আমার মা'র জীবনে স্বার্থপরতার লেশ ছিল না। এবার তিনি তাঁর শেষ স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দিলেন—আমাকে বললেন, তাঁর কাছে না গিয়ে নাটালেই যেন আমি যাই, সেখানে তাঁর ভাগ্যহত ভারতীয় ভগিনীদের পরম প্রয়োজনের ক্ষণে তাদের যেন আমি সেবা করি। মা'র সঙ্গে আর আমার দেখা হোলো না, আমি দক্ষিণ-আফ্রিকায় পৌঁছবার কিছুদিন পরেই তিনি চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ডাক্তার স্যামুয়েল পিয়ার্সনের পুত্র উইলি পিয়ার্সন নাটাল যাত্রায় আমার সাথী হোলো। উইলির মা কোয়েকার ছিলেন। দিল্লীতে উইলি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার আশ্চর্য ব্যবহারে সে আমাকে এবার চমৎকৃত করে দিল। তাড়াহুড়ো করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি,—কেন না দেরি করবার সময় নেই, সেদিন মধ্যরাত্রেই দিল্লী থেকে যাত্রা করতে হবে, নইলে জাহাজ পাব না। উইলি আমার কাছে এসে বললে,—তোমার যাওয়ার আগে একটি উপহার তোমাকে দিতে চাই। আমি প্রশ্ন করলাম,—উপহার?

উইলি বললে,—এই যে, উপহার তোমার সামনেই উপস্থিত—আমি।

তারপর তার সে কী উল্লাসভরা হাসি!

তার এই কৌতুকভরা আত্ম-উপহার তার উচ্ছল চরিত্র-মাধুর্যেরই প্রতীক। তার মতো অকপট বন্ধু ও বিশ্বস্ত অনুচর আমি ইতিপূর্বে পাইনি। নাটালে পৌঁছনো মাত্র সে মুহূর্তে সেখানকার ভারতীয়দের অন্তর জয় করে নিয়েছিল। তীরের আশ্রয় পরিত্যাগ করে বিভিন্ন সমুদ্রযাত্রা আমার আরম্ভ হোলো,—এই সব যাত্রায় উইলি ছিল আমার প্রধান সহায়। আমার জীবনের গভীরতম আঘাত আমি পাই যখন ১৯২৪ সালে ইটালিতে এক চলন্ত ট্রেণ থেকে পড়ে উইলি মারা যায়। তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্যেই এই শোক অসহনীয় হয়েছিল।

কলম্বো থেকে ডারবান যাত্রার পথে অধিকাংশ দিন আমাদের জাহাজ প্রবল ঝটিকার পিছনে পিছনে চলল। ফলে ডারবান পৌঁছতে আমাদের পাঁচ দিন দেরি হয়ে গেল। তীরে পৌঁছতে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, জাহাজঘাটে মহাত্মা গান্ধী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জেনারেল স্মাটস মীমাংসা চান, তাই তিনি বিনা সর্তে গান্ধিজীকে মুক্তি দিয়েছেন। বুঝলাম, অসমর্থনীয় পোল-ট্যাক্সের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর আপত্তিকে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় নিগ্রহের মূল রহস্য কী, তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র দেরি হোলো না। মূল কারণ জাতিভেদ আর বর্ণবিদ্বেষ। ভারতীয়রা কৃষ্ণকায় জাতি;—একমাত্র বাগিচার মালিকরা ছাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্য সমস্ত ইউরোপীয়ানরা চাইত ভারতীয়দের দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে দূর করে দিতে। ভারতীয় শ্রমিকদের কেন যে আমদানী করা হয়েছিল, এই ছিল তাদের মহা দুঃখ। আফ্রিকার অন্যান্য কৃষ্ণকায় জাতিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক হীনতার মধ্যে জীবন কাটাতে হোতো,—ইউরোপীয়ানদের উদ্দেশ্য হোলো ভারতীয়রাও যতোদিন দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকবে, ততোদিন তাদেরও বর্ণমালিন্যের হীনতা মেনে নিয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকতে হবে।

দিল্লীতে অথবা টোকসের সঙ্গে শিমলা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম

তখন খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত্যভিমান ও বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্রয় আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিল। জাতির বাধা আর বর্ণের বাধা মানুষ আর মানুষের মধ্যে প্রাচীর তুলবে,—আমি ভাবতাম প্রকৃত খৃষ্টান হয়ে এই বাধাকে আমি মেনে নেব কেমন করে? এই বাধার ফলে পৃথিবীতে এমনি এক জাতিভেদ প্রথাও সৃষ্টি হবে যা আমার প্রভু যীশুখৃষ্ট চাননি। তিনি বলেছিলেন, মানুষে মানুষে ভাই ভাই আর সর্বমানবের পরমপিতা ঈশ্বর। এই জাতিভেদের ফলে খৃষ্টীয় বিশ্বসমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ধর্মের ঐক্যকে খান খান করে দেবে জাত্যভিমানের অস্ত্র। সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের মৌলিক দাবীর জন্য ক্রুসে আত্মবিসর্জন করেছিলেন খৃষ্ট। কিন্তু খৃষ্টান হয়েও দুই জাতি পাশাপাশি বসে উপাসনা করতে পারে না। আমি ভাবতাম এ কী আমরা করছি, কোন সর্বনাশা পথে আমরা চলেছি। খৃষ্টান হয়ে খৃষ্টের মুখে কলংকলেপন করে নূতন করে কি আবার তাঁকে ক্রুস-বিদ্ধ করব?

ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেও আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম যে ইহুদীদের জাতীয় কূপমণ্ডুকতা যখন প্রাথমিক খৃষ্টীয় সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন এই বিপদকে প্রতিহত করবার জন্যে খৃষ্টশিষ্য পল এমন কি সাধু পিটারেরও মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধ সাবধানবাণী পলের পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে।

নিউ টেষ্টামেন্টের অন্যতম প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা জাতিভেদকে পরিহার করার শিক্ষা। জাতি মিলনের বাণী খৃষ্টের দ্ব্যর্থবিহীন সুস্পষ্ট বাণী। সাধু পল লিখেছেন,—"যীশুর দৃষ্টিতে ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই, আর্য নেই, অনার্য নেই,—প্রভু নেই, দাস নেই, খৃষ্টই সর্বস্ব এবং সকলের মধ্যেই তিনি বর্তমান।"

কিন্তু যখন আমি নাটালে পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে মানুষে মানুষে যে বৈষম্যকে আপ্রাণ প্রতিহত করতে সাধু পল চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক সেই বৈষম্য নাটালের খৃষ্টীয় সমাজকে কলংকিত করে রেখেছে। খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে জাতিভেদ যে কেবলমাত্র সরকারী কাজে কর্মে প্রশ্রয় পাচ্ছে তাই নয়, এই অন্যায়কে আইনের সাহায্যে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক গির্জা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জাতিতে জাতিতে সামাজিক গণ্ডীবদ্ধতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, জনমতও এই ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে।

এই ভেদবুদ্ধির বীজ উপ্ত হয়েছিল অতীতে, যখন বুয়র শাসনের যুগে আইন ছিল যে রাষ্ট্রে বা ধর্মে শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়দের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই, উভয়কে কিছুতেই সমদৃষ্টিতে দেখা হবে না। সেই অতীত কলংকের দায়ভার গ্রহণ করে সেই একই নীতিহীন পন্থা নাটালের বৃটিশ অধিবাসীরাও বহন করেছে এবং একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

প্রথম যেদিন আমরা ডারবানে পৌঁছলাম সেই দিনই এই জাতিভেদের কুসংস্কার আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ল। তারপর অবিলম্বে দিনে দিনে এই সংস্কারের নানা কুৎসিত অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হতে লাগল। এই পাপ বিষাক্ত সংক্রমণের মতো সুস্থ সমাজদেহের অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংক্রমণ দক্ষিণ-আফ্রিকায় অনেক দিন থেকে শুরু হয়েছিল এবং এই ব্যাধিকে রোধ করবার চেষ্টাও বলতে গেলে কিছুই হয়নি। খৃষ্টান সমাজের বিভিন্ন শাখায় গভীরে এই বিষ বাসা বেঁধেছিল।

এ ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অতি স্পষ্ট,—ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। আমাদের পক্ষে অতি লজ্জার কথা যে খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ এ পর্যন্ত এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিতান্ত ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মৌখিক ধর্মকথার সঙ্গে ব্যবহারিক আচরণের কোনো সম্বন্ধ না থাকায় জন্যে এই দুর্বল আত্ম-অবিশ্বাসী প্রতিবাদ কার্যকরী হয়নি।

এক খৃষ্টান গির্জায় যাজনা করার নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছিলাম। মহাত্মা গান্ধী আমার যাজনা শুনতে চেয়েছিলেন বলে উইলি পিয়ার্সন তাঁকে গির্জায় নিয়ে এসেছিল। পরে আমি জানলাম যে গান্ধিজী কৃষ্ণকায় এসিয়াবাসী বলে তাঁকে গির্জার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় আমার লজ্জার পরিসীমা ছিল না। আমার মনে হয়েছিল স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে যেন তাঁর আপন মন্দিরদ্বার থেকে ওরা দূর করে দিয়েছে। কিন্তু এমনি ঘটনাই দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় খৃষ্টানদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

কিছুদিন পরের আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি কেপ টাউনে গিয়েছি। শুনেছিলাম, নাটাল অপেক্ষা কেপ টাউনে বর্ণবিদ্বেষের উষ্মা অনেক কম। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে

আমাকে দেখাশুনা করবার জন্যে গান্ধিজী তাঁর পুত্র মণিলালকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন।

মণিলাল যে কী ভাবে আমার সেবা-যত্ন করেছিল তা বলবার নয়। আমিও তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতাম। এক দিন মণিলাল অতি উদগ্রীবভাবে আমাকে বলল, এক দিন কোনো গির্জায় বসে আমার উপদেশ সে শুনবে এই তার বড়ো সাধ। সহরের উপকণ্ঠে একটি গির্জা ছিল, সেখানকার ধর্মযাজক ছিলেন ভারতীয়দের সুহৃদ। সেই গির্জায় আমি মণিলালকে নিয়ে গেলাম।

এই গির্জার যাজক আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। প্রার্থনা-সভা আরম্ভ হবার আগে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে ও মণিলালকে চা খাওয়ালেন। এ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় কাটল দেখে আমি প্রস্তাব করলাম প্রার্থনাসভায় মণিলালকে নিয়ে যাব। ধর্মযাজকের মুখ ভার হোলো এ কথা শুনে। তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তি করলে উপাসকমণ্ডলী। শ্বেতকায় উপাসকদের পাশাপাশি গির্জার মধ্যে বসে কোনো ভারতীয় বালক যীশুর বাণী শ্রবণ করবে,—অসম্ভব এ প্রস্তাব! কিন্তু বেচারা মণিলালের আকাঙ্ক্ষা আমি মিটাই কী করে? শেষ পর্যন্ত একটা আপোস মীমাংসা হোলো। মণিলাল গির্জায় ঢুকবে না, গির্জার দোরগোড়ায় বসে কান পেতে ধর্মোপদেশ শুনবে।

একের পর এক এমনিধারা নানা ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হতে লাগল। একটি ঘটনার কথা বলব, কারণ ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

কেপ টাউনের সেন্ট জন গির্জায় কোনো বর্ণবিভেদ ছিল না। এক রবিবার প্রত্যূষে আমি সেই গির্জায় হোলি কমিউনিয়নে যোগ দিলাম। খৃষ্টের পূতাবশেষ সমস্ত উপাসক গ্রহণ করেছেন, এবার আমার ধর্মোপদেশ দানের পালা। হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিশীর্ণা বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা প্রার্থনাসভার শেষ প্রান্ত থেকে শ্লথ চরণে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। সমস্ত ইউরোপীয়ান উপাসকরা যতোক্ষণ না নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসেন ততোক্ষণ ঐ কৃষ্ণকায়া বৃদ্ধা সকলের পিছনে অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে পূতাবশেষ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। গভীরতম ভক্তিতে মাথা নিচু করে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসলেন। সহসা আমার মনে হোলো এই নতজানু নিগ্রো বৃদ্ধার মূর্তি যে সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশের আত্মার প্রতীক,—যে আত্মা ইউরোপের অগণিত অন্যায়ের বেদনায় মুহ্যমান নতশির। বিনম্র সহিষ্ণুতার অনন্ত শক্তি দিয়ে শ্বেত জাতির এই অশেষ অন্যায়কে আফ্রিকা আপন শিরে গ্রহণ করেছে, এই নির্বাক নিরুদ্ধ শক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আফ্রিকার আসন্ন মুক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।

এই গির্জায় ধর্মোপদেশ দানের জন্যে এখানকার ডীন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু চারিদিকে দিনে দিনে যে সব নিষ্ঠুর দৃশ্য আমি দেখেছি তাতে আমার সমস্ত অন্তর তখন জ্বলছে। আমি বললাম, এই আফ্রিকা পরমপিতা একেশ্বরকে ভুলেছে, তার বদলে এখানে দুই দেবতার পুজা। এক দেবতার নাম স্বর্ণতৃষা, আর এক দেবতার নাম বর্ণবিদ্বেষ। বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই উপাসনা-সভায় আমার মনের সমস্ত পুঞ্জীভূত অনুভূতি সেদিন আমি প্রকাশ করে ফেললাম।

পরে আমার সমস্ত মন এক গভীর হতাশায় ভরে গেল। মনে হোলো, এই উপাসনাসভা, এ যেন এক শ্বেতপাথরের কঠিন দেয়াল, এই দেয়ালে একটি মাত্র রেখাপাতও আমি করতে পারিনি। তবে একটি লাভ হোলো আমার। বিধান-সভায় সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত সদস্য জে, এক্স, মেরিম্যান আমাকে একটি সহৃদয় পত্র লিখে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি লিখলেন,—আপনি জেনে রাখুন যে, এই আফ্রিকাতে এখনো দু-একজন আছেন যাঁরা ঈশ্বরের নামে শয়তানের কাছে মাথা পাতেননি। এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন সাধু আছেন, যাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলে আমি খুসী হব। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম।

এই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মাশোনাল্যাণ্ডের আর্থার শার্লি ক্রিপস। অক্সফোর্ডে তাঁর শিক্ষা, তরুণ বয়স, অপূর্ব কাব্য-প্রতিভার অধিকারী। আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে সরল অনাড়ম্বর খৃষ্টীয় জীবন তিনি যাপন করেন। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ও ক্রমে এই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

আফ্রিকার বান্টু অধিবাসীদের আমি এই সময় সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে শিখি। তাদের শীর্ণশ্রান্ত মুখে তাদের শতাব্দীপারের বেদনা আমি অনুভব করি। আফ্রিকার মর্মরহস্যের প্রথম পরিচয় আমি লাভ করি অলিভ শ্রাইনারের কাছ থেকে। তারপর দক্ষিণ-আফ্রিকার আর এক মহিলার কাছে আমার এই শিক্ষা পূর্ণতর হয়। এই মহিলা মিস মল্টেনো। অলিভ শ্রাইনারের মতো এই মহিলাও শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি কোনো দিন। দুর্গত ও উৎপীড়িতের হয়ে সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামের চিহ্ন তাঁর শ্বেত-শুভ্র চুলে, তাঁর মুখের অসংখ্য বলিরেখায়।

ভারতীয়দের এক সভায় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি "দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমরা থাকতে চাও আমি জানি। কিন্তু এ জন্যে যদি নির্যাতন বরণে প্রস্তুত না হও তাহলে জননী আফ্রিকার উপযুক্ত সন্তান বলে দাবী করতে তোমরা পারবে না। নির্যাতন বরণ আমাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার—সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ। আফ্রিকাতে যদি থাকতে চাও, তাহলে এই আফ্রিকাকে মাতৃভূমি বলে মানতে হবে, নির্যাতিতা জননীর সমস্ত বেদনাকে বহন করতে হবে।

ভারতীয়দের কাছে মিস মল্টেনো তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। বুয়র মেয়ে তিনি, বাস করতেন এক নির্জন গোলা-বাড়িতে। চারিদিকে নিশ্চুপ পর্বতমালা, মাঝে মাঝে বেগবতী ঝরণা, রাত্রির নিঃসীম অন্ধকারে আকাশভরা অসংখ্য নক্ষত্রের আলোক-ইঙ্গিত। মুষ্টিমেয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিল তাঁর যাওয়া-আসা। সেই বৈচিত্র্যহীন দীন পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটাতে কাটাতে এই ছায়াভূমি আফ্রিকার আত্মশক্তির ত্রিধারাকে তিনি উপলব্ধি করলেন।

একটি শক্তিধারা সঙ্গীত। এই মেদুর আকাশ ও শান্ত পর্বত-ছায়ার মহাদেশে বৃটিশ ও ওলন্দাজের কর্কশ কণ্ঠও কোমল হয়ে যায়। মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত প্রেমসঙ্গীত কেমন ভাবে আফ্রিকার

মানবাত্মাকে নাড়া দিতে পারে, এমন আর কিছুই পারে না। অন্তরের সমস্ত তিক্ততাকে সঙ্গীতের প্লাবন হরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় শক্তি বেদনাধারা। আফ্রিকা যতো নির্যাতন সহ্য করেছে পৃথিবীর কোনো দেশ কোনো মহাদেশ তা করেনি। কিন্তু এতো নির্যাতনেও আফ্রিকার হৃদয় কঠিন হয়নি, কোমলই হয়েছে। বহু যুগের সহিষ্ণুতার দ্বারা নিষিক্ত তাদের বেদনা-করুণ ভাষা এক দিন বিশ্বমানবের মর্মে গিয়ে পৌঁছবেই।

তৃতীয় শক্তি আফ্রিকার নারীজাতির নৈতিক শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তিরও পূর্ণ প্রকাশ হবে। সারা পৃথিবীতে সর্বত্র নারীজাতিই সৃষ্টির বোঝা বহন করে। আফ্রিকার নারীর মতো এতো গুরুভার বোঝাও কোনো নারী বহন করে নি। দুর্বহ ভার ও দুর্বিসহ বেদনার অগ্নিপরীক্ষায় আফ্রিকার নারী-চরিত্র নিকষিত স্বর্ণের পবিত্রতা লাভ করেছে।

মিস মল্টেনো যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন তাঁর বেদনা-বিধুর মুখের দিকে একদৃষ্টে আমি তাকিয়ে ছিলাম। আফ্রিকার ভূমিতলে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমি আবার নূতন করে উপলব্ধি করেছিলাম যে খৃষ্টের বাণী সর্বযুগে প্রসারিত, খৃষ্টের আশীর্বাদ সর্বজাতির অধিকার। আরো উপলব্ধি করেছিলাম যে প্রেমই সর্বশক্তিমান, সমুচিত বিক্ষোভের শক্তিও এই শক্তির কাছে ম্লান। এই প্রেমের শক্তি বলেই আফ্রিকার যুগসঞ্চিত বঞ্চনার অবসান সম্ভব।

মিস মল্টেনো বলেছিলেন, আফ্রিকাবাসীর নির্যাতন বরণ ঈশ্বরদত্ত অধিকার। কয়েক দিন পরে নাটালে একটি অন্তরস্পর্শী ঘটনায় মিস মল্টেনোর এই কথার তাৎপর্য আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

ডারবানের ভারতীয় সমাজ আমার জন্য একটি বিদায়-সভার আয়োজন করেছিলেন। লক্ষ্য করলাম, এই সভায় কয়েক জন জুলু উপস্থিত। এর পূর্বেও অন্যান্য সভায় কিছু কিছু জুলুকে আমি দেখেছি। আমি যখন বক্তৃতা দিতাম তখন তারা স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের হাবভাবের গম্ভীর মর্য্যাদার প্রকাশ ও মুখমণ্ডলে গভীর বেদনার ছায়া আমাকে আকৃষ্ট করত।

এই বিদায়সভার অবসানে আমি মিঞা খান নামক এক বৃদ্ধ মুসলমানের দোকানে ফিরে গেলাম। এইখানেই আমি থাকতাম। মিঞা খানের সঙ্গে চা পান করতে বসেছি এমন সময় দুজন জুলুনেতা সেখানে এসে উপস্থিত হোলো। আমরা তাদের আমাদের সঙ্গে চা পান করতে নিমন্ত্রণ করলাম। তখন একজন জুলু আমার দিকে নির্দেশ করে মিঞা খানকে স্থানীয় ভাষায় বললে, আমরা এঁকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

মিঞা খান আমাকে বুঝিয়ে বলতে আমি বললাম, নিশ্চয়ই, আপনি অকপটে বলুন কী আপনার প্রশ্ন?

আমার দিকে ফিরে সেই জুলুনেতা তখন বললে, ভারতীয়দের সঙ্গে আপনি যখন কথা বলেন তখন আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে তাদের জন্যে প্রাণ দিতে আপনি প্রস্তুত। আমাদের জন্যেও প্রাণ দিতে কি আপনি পারেন?

আশ্চর্য এই প্রশ্ন! এই প্রশ্ন এতো বেদনা-উদ্‌গ্রীব যে সোজা বুকের মধ্যে গিয়ে বেঁধে। এই প্রশ্ন এতো সহজ যে সহজ উত্তর ছাড়া এর কোনো উত্তর নেই। হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর কেমন ভাষায় দেব, তাই ভাবতে আমার এক মুহূর্ত দেরি হোলো। তারপর দ্বিরুক্তি না করে সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দিলাম। বললাম, হ্যাঁ পারি। সময় যেদিন আসবে সেদিন আপনাদের জন্যও প্রাণ দেবার জন্যে আমি প্রস্তুত।

উত্তর দিতে মুহূর্তমাত্র দেরি হয়েছিল আমার। সেই মুহূর্তে চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো এই সত্য আমার অন্তরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল যে, যীশুর সেবায় জাতিভেদের স্থান নেই, তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান। তাঁর অনন্ত প্রেমসমুদ্রে সর্বজাতির সর্বধারা এসে মিশেছে!

আর একজন মহাপ্রাণবতী মহিলার সঙ্গে আমার এখানে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ডবলু ই গ্ল্যাডষ্টোনের কন্যা মিসেস ড্রু। তাঁর ভ্রাতা লর্ড গ্ল্যাডষ্টোন ছিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল। ভারতীয় সমাজের এই সংগ্রামে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল এবং তিনি নীরবে তার ভ্রাতাকে সাহায্য করতেন। দুর্গত মানবাত্মার গভীর বঞ্চনাকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন,—তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে করুণাধারা ঝরে পড়ত। মহাত্মা গান্ধী ও গান্ধী-পত্নীর প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তায় আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতাম।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এই দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সেই প্রথম দর্শনেই আমাদের উভয় হৃদয় এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়,—সে বন্ধন এ জীবনে কখনো শিথিল হবে না। আমাদের দুজনের হৃদয়ের মাঝখানে যে প্রেম-মন্দাকিনী প্রবাহিত,—সে স্রোতে কোনো ভাঁটা নেই।

মহাত্মা গান্ধীর বেদনাক্লিষ্ট কঠোর জীবনের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করেছি নির্যাতন-সহিষ্ণুতার সর্বজয়ী পরমশক্তি। গান্ধিজীর সংস্পর্শে এসে আমি ভয়কে জয় করতে শিখেছি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে প্রদীপ যেমন জ্বলে, আমার চরিত্রের যা কিছু নিষুপ্ত শুভবোধ তাঁর চরিত্রস্পর্শে তেমনি জাগ্রত হয়েছে, উজ্জীবিত হয়েছে আমার প্রেরণা। সামান্যতম প্রাণ যেখানে নির্যাতিত,—সেখানেই তাঁর অনন্ত মমত্বভরা প্রাণ ছুটে গেছে। এমনি ভাবে অবিশ্রাম ছুটে ছুটে তাঁর দুঃখ-সন্ধানী আত্মা বিরামহীন আবেগে সেই অনির্বচনীয়েরই সন্ধান করেছে,—যাঁর নাম সত্য, যাঁর অপর নাম ঈশ্বর।

একটি উষ্ণ দিনের কথা মনে পড়ে। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়া শহরের কাছে একটি নদীতীরে মহাত্মার সঙ্গে আমি বসে আছি। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করছিলাম এই বলে, সৃষ্টির উন্নততর প্রাণী নিম্নতর প্রাণীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, এটা প্রকৃতির নিয়ম,—অতএব মানুষ যে পশুপক্ষী খায়, সেটা নীতিবিরুদ্ধ নয়।

গান্ধিজী আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন,—কিন্তু খৃষ্টান হয়ে তুমি এই যুক্তি কী করে দাও? তুমি তো বিশ্বাস করো যে পরমপ্রভু মানব-জন্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন জীবনকে রক্ষা করবার জন্যে, ধ্বংস করবার জন্যে নয়। তোমাকে আমাকে সকলকে রক্ষা করবার জন্যেই যীশুখৃষ্ট আত্মবলিদানকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তবে? জীবন নেওয়া নয়, জীবন দেওয়া,—এই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য নয়?

তাঁর এই কয়েকটি কথার মধ্যেই গান্ধিজীর জীবনসত্যকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। গান্ধিজীর জীবনের ব্রত শুধু দেওয়া,—কিছু নেওয়া নয়—চরম আত্মদানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম অবিশ্রাম শুধু দেওয়া,—এই দেওয়ার মধ্যেই অনির্বাণ আনন্দ। প্রথম থেকেই অন্তরের সূক্ষ্মানুভূতি দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে গান্ধিজী একজন অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্মনেতা তো নিশ্চয়ই, যাঁর আহ্বানে অসংখ্য নরনারী বিগলিত চিত্তে অসহনীয় দুঃখ-বিপদকে বরণ করে নেয়,—কিন্তু এইটুকুই গান্ধিজীর পরিচয় নয়। ঐ আকাশের তারাকুল যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্থায়ী পর্বতমালা যেমন সত্য, ঐ অবিনশ্বর চিরন্তন চিরনূতন সত্যের মূর্ত প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী। সমস্ত বাধা-বেদনাকে অতিক্রম করে কে? সমস্ত অন্যায়কে হরণ করে কে? সমস্ত শক্তির অধিরাজ পরম শক্তি কে? অনন্ত সহিষ্ণু প্রেম। গান্ধিজীর এই একমাত্র বাণী। এই বাণী পরম সত্যের বাঙ্ময় রূপ। মিস মল্টেনোও গভীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে এই একই সত্যের প্রতিধ্বনি করতেন যখন তিনি বলতেন, সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ।

এই সত্যের ব্যবহারিক পরীক্ষা আমি দক্ষিণ-আফ্রিকার সংগ্রামের মধ্যে নিত্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেখানকার নিত্য-নির্যাতিত ক্ষুদ্রকায় ভারতীয় সমাজের অবস্থা দেখে প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টভক্ত-সম্প্রদায়ের কথা আমার মনে পড়ত। সহজ সরল অন্তর মাধুর্য ভরা সামান্য একটি গোষ্ঠী, তাদের ঘিরে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের বিক্ষুব্ধ হলাহলবন্যা।

মহাত্মা গান্ধীর ফিনিক্স আশ্রমে গিয়ে প্রথম দিনই এই চিত্র স্পষ্ট প্রতিভাত হোলো। গান্ধী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুবর্তীরা এই আশ্রমে তাঁদের ধর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন। শিশুদের মহাত্মা বড়ো স্নেহ করতেন। শ্রীযুক্তা গান্ধী ও তাঁর পুত্ররা তখনো কারারুদ্ধ। আমি গিয়ে দেখলাম, এই নিরাত্মীয় মানুষটিকে প্রিয় শিশুর দল ঘিরে রয়েছে। ভারতের অচ্ছুৎ সমাজের একটি শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে তিনি বসে আছেন; আর একটি রুগ্ন পঙ্গু মুসলমান বালক তাঁর কোলের একটি কোণ দখল করবার চেষ্টা করছে। আমাদের সঙ্গে আহার করবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে একটি জুলু খৃষ্টান রমণী।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেক আলোচনা হোলো। বৃটিশ ও বুয়রদের সম্বন্ধেও অনেক কথা হোলো, কিন্তু কোনো কথায় হিংসা নেই উষ্মা নেই, জ্বালা নেই। দিনান্তের সেই অবসন্ন অন্ধকারে ধর্মগ্রন্থের কয়েকটি কথা কেবলই আমার মনে পড়তে লাগল,—

"যারা বিশ্বাস করে, তাদের এক প্রাণ এক আত্মা; তারা একসঙ্গে আহার করে; প্রভুর নামে দুঃখবরণের জন্যে তারা নির্বাচিত হয়েছে সেই একই আনন্দে তারা বিভোর হয়।" সরকারি পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও চুক্তিদাস-প্রথার বীভৎস রূপের সঙ্গে পরদিন সকালেই আমার পরিচয় হোলো। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি বেড়াতে বা'র হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা ইক্ষু-বাগিচার ধারে একটি মূর্তি আমাদের চোখে পড়ল। পথের পাশে গুঁড়ি মেরে রয়েছে একটা লোক। মহাত্মা গান্ধীর কাছে এসে সে তাঁর পদধূলি নিল ও নিজের নগ্ন পিঠটা খুলে তাঁকে দেখাল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে সমস্ত পিঠটা ক্ষতবিক্ষত। বুঝলাম, অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে লোকটা বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছে ও মহাত্মা গান্ধীর আশ্রয় চাইছে। আমি কিছুটা পিছনে ছিলাম, এখন লোকটির পিঠের ক্ষতগুলি পরীক্ষা করবার জন্যে সামনে এগিয়ে এলাম। লোকটি যখনই দেখল আমি ইউরোপীয়ান, তখনি সে আতংকে কুঁকড়ে গেল, এই বুঝি আবার তাকে আমি মারব। আমি শ্বেতকায় হলেও তার শত্রু নই, বন্ধু, এ কথা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ হোলো না। আমি যখন প্রথম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তার চোখের সেই ভয়ার্ত বিহ্বল দৃষ্টি বহু দিন আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

চারিদিকের এই সব ঘটনা ও দৃশ্যের মাঝখানে দেশ থেকে সেই তারবার্তাটি এসে পৌছলো, যেটি আসবে বলে সমানে আমি ভয় করছিলাম। আমার মা আর ইহজগতে নেই। নিরাত্মীয় বিদেশে বসে এই সংবাদ আমি পেলাম। তখন শ্রীযুক্তা গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় জননী আমাকে মাতৃবিয়োগ-শোকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। ভারতীয় জননীবৃন্দ, প্রেমময়ী সান্ত্বনাদাত্রী তোমরা, বিদেশী সন্তানকে কী পবিত্র স্নেহসুধাদানে তোমরা তৃপ্ত করেছ! শোকের মর্মান্তিক আঘাতে যে করুণ সান্ত্বনাস্পর্শে যে অকপট ভালোবাসায় তোমরা আমাকে অভিষিক্ত করেছ, সে অপরিশোধ্য ঋণ সারাজীবনে আমি ভুলব না। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল

বকুল বসু

ফুলের কুঁড়ি যেমন থাকে নিলীন হোয়ে মত্ত আপন গাছে,
তেমনি তুমি নীরব হোয়ে গুঞ্জরিত তোমার হৃদয়-মাঝে।
ভুলের 'পরে ভুল জমেছে তাই তো তোমায় গভীর কোরে চাই,
আমায় তুমি ক্ষমা কোরো—ভুল কোরেছি বুঝতে পারি নাই।

আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকে শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।
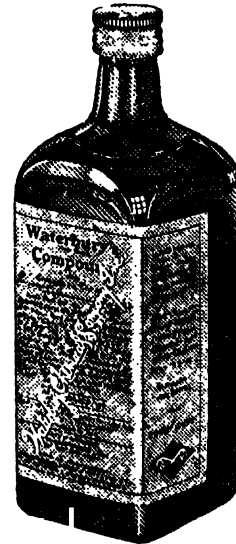
এখন চুরি-নিরোধক ক্যাপ এবং নূতন লাল লেবেলযুক্ত বোতলে পাওয়া যায়।

এক্ষণে লাল মোড়ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

১

যক্ষপুরী

যদিও বিকেল থেকেই আকাশের চেহারা ভাল ছিল না, কেমন যেন মুখ ভার করে গম্ভীর হয়ে বসেছিল, তবু সন্ধ্যে না হতেই যে এরকম হুড়মুড় করে বৃষ্টি এসে পড়বে তা কমলেশ মোটেই ভাবেনি। ভাবলে অন্তত এই দুর্যোগের মধ্যে একলা হোষ্টেলে ফেরবার চেষ্টা করত না। বিশেষ করে এ অঞ্চলেও যখন নতুন লোক, পথঘাটও ভাল করে চেনা নেই।

সহর থেকে চার মাইল দূরে নতুন গড়ে উঠেছে এক কলোনী। অনেকগুলি পরিবার যারা গ্রামের সহজ সুন্দর জীবন ভালবাসে, সহরের মধ্যে বাস করতে যাদের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, তারাই শুধু এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জমি অনেকখানি, তারই মধ্যে ছোট ছোট সব বাড়ী, কম করে পঞ্চাশটি সংসার এখানে থাকে। এখানকার ছেলে বুড়ো সবাই কাজ করে কলোনীর জন্যে, যার যেরকম ক্ষমতা। গাঁয়ের ছেলেদের পড়বার সুবিধের জন্যে এই কলোনী থেকেই করা হয়েছে স্কুল, আর তার সঙ্গে লাগোয়া হোষ্টেল। কমলেশ এই হোষ্টেলেই থাকে।

কমলেশের বয়েস বছর চোদ্দ। মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করছিল কলকাতায়। বাবা কাজ করেন মফঃস্বলে, তার উপর বদলির চাকরি, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। কমলেশেরই মুস্কিল হত সবচেয়ে বেশী কতবার সে স্কুল পালটাবে? কলকাতায় থেকে তার সেই সুবিধা হয়েছে বেশ কয়েক বছর একই স্কুলে পড়তে পারছে। কিন্তু তা হলে হবে কি, কলকাতার স্কুলে আর যা কিছুই হোক না কেন পড়াশুনাটা হয় না। ছেলেরা সব তৈরী হয়ে থাকে কোনরকম ছুতো পেলে হয়, তাহলেই ওরা ষ্ট্রাইক করে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবে। বেচারী মাষ্টার মশাইরা আর কি করবেন, ইচ্ছে থাকলেও পড়াবেন কা'কে? প্রথম প্রথম কমলেশও অন্যদের সঙ্গে ষ্ট্রাইক করেছে, হৈ হৈ করে আনন্দ পেয়েছে, ষ্ট্রাইক করে বাড়ী এসে গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছে। কিন্তু তার মতামত ক্রমশ বদলে গিয়েছিল সদাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে। সদাশঙ্কর বুঝি কোন কলেজে পড়তো কিন্তু তার বুদ্ধি কলেজের সীমা ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো বহু দূরে। তখন থেকেই নিজের মতামত লিখতো, বিভিন্ন কাগজে প্রকাশ করতো। কমলেশের সদাশঙ্করকে খুব বেশী ভাল লাগত। সব জিনিষকে এত সহজ করে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা সে আর অন্য লোকের মধ্যে দেখেনি।

সদাশঙ্করের অনেকগুলো কথা সে আজও ভুলতে পারে না, কত সময় মিষ্টি হেসে বলতেন, স্কুল ষ্ট্রাইক করে কি লাভ? তোমরা এখন ছাত্র, যদি পড়াশুনো না কর, দেশের কি কাজে লাগবে বলতে পারো?

কমলেশ হয়ত কখনও তর্কের খাতিরে বলেছে, তা বলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব না?

—তা করবে না কেন? কিন্তু ইস্কুল কি দোষ করল, ষ্ট্রাইক করে ছেলেরা তো সিনেমায় গিয়ে ভীড় করে। তাতে কি লাভ? চল তুমি আমার সঙ্গে একদিন, আমরা যে কলোনীতে থাকি, সেখানে একটা স্কুল খুলেছি, ছেলেরা কি রকম পড়াশুনো করে দেখলে তুমি খুসী হবে। এর নাম দিয়েছি বিদ্যাপীঠ।

কমলেশ সেই প্রথম শুনেছিল বিদ্যাপীঠের কথা। একদিন শঙ্করদা'র সঙ্গে গিয়ে দেখেও এসেছিল। ভাল লেগেছিল। তার কিন্তু এখানে এসে যে পড়াশুনো করবে তা সে মোটেই ভাবেনি। বাবা মাকে অবশ্য সে উচ্ছ্বাসভরে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, শঙ্করদা'র এই আদর্শ স্কুলের কথা, কিন্তু কোন জায়গায় লেখেনি সেখানে গিয়ে একলা হোষ্টেলে থেকে তার পড়বার ইচ্ছে আছে। বরং তার বাবাই লিখেছিলেন, তোমার শঙ্করদা' বড় ভাল ছেলে, যদি চাও, তুমি এদের বিদ্যাপীঠে পড়তে পার, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বিদ্যাপীঠে যাবার কথা তখন না উঠলেও কয়েক মাসের মধ্যেই কমলেশ স্থির করল সে ওখানেই চলে যাবে। তার প্রধান কারণ অবশ্য প্রশান্ত আর তার দিদি রেণুকা। কলকাতায় এসে স্কুলে ঢোকার পর থেকে যার সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্ব হয়েছে, সে প্রশান্ত। ওরই বয়সী ছেলে, ফর্সা রঙ, টানা-টানা চোখ, কেমন যেন নরম চেহারা। পড়াশুনোয় খুব ভাল না হলেও স্বভাব বড় চমৎকার! কমলেশ কত দিন ওদের বাড়ীতে গেছে। ছোট্ট দুখানা ঘরের বাসা-বাড়ী, অভাবের চিহ্ন চারিদিকে সুস্পষ্ট। প্রথম যেদিন কমলেশ ওদের বাড়ী যায় প্রশান্তর মুখে সে কি হাসি, বলেছিল, আমি জানতাম তুই ঠিক আসবি। ক্লাশের সকলকেই তুই ভালবাসিস—

নিজের প্রশংসায় লজ্জা পেয়েছিল কমলেশ, দেয়ালে আঁকা একটা ছবির দিকে চেয়ে থাকে, বাঃ বড় সুন্দর তো, কেনা বুঝি?

—কেনা নয়, দিদির আঁকা।

—তোর দিদি আছে?

—হ্যাঁ, আমার চেয়ে দু'-তিন বছরের বড়, ওর এবার ফার্ষ্ট ক্লাশ।

হাতে খাবারের থালা নিয়ে তাদেরই বয়সী একটি মেয়ে ঘরে ঢোকে।

প্রশান্ত আলাপ করিয়ে দেয়, এই আমার দিদি।

রেণুকা হেসে জিজ্ঞেস করে কেন, আমার কথা হচ্ছিল বুঝি?

—কি সুন্দর আপনি ছবি আঁকেন?

—আমাকে আর আপনি কেন ভাই, তুমি বল।

সেই ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর কত দিন কমলেশ ওদের বাড়ী গেছে, প্রশান্তর দিদি সত্যিই ভাল ছবি আঁকে। শ্যামল বাংলার কত অপূর্ব্ব ছবি, জীবনের কত দৃশ্য। রেখায় কত অমর মুহূর্ত্তকে ধরে রেখেছে। এত ছবি, এত সুন্দর, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কমলেশ। জিজ্ঞেস করে, এগুলো প্রকাশ করা হয় না কেন?

দিদি উত্তর দেয়, কি করে করব, আমাদের জানা-শুনো তো কেউ নেই? কমলেশ ভাবে সত্যিই তো, জানা-শোনা না থাকলে এদেশে কিছুই করা যায় না। প্রশান্তদের বাড়ীতে এসেই কমলেশ সত্যিকারের জীবন দেখতে পেয়েছিল, প্রশান্তরা বই পড়তে চায়, কিন্তু বই পায় না। রেণুকাদি'র ছবি আঁকার সুন্দর হাত, কিন্তু তার সুযোগ কই? অভাব এদের সব নষ্ট করে দিচ্ছে। এদের বাড়ী বার বার এসে কমলেশের শুধু মনে হয়েছে, এখানে যেন 'নেই'-এর একটা মিছিল চলেছে। কাগজ নেই, বই নেই, সুযোগ নেই। কমলেশের কত সময় মনে হয়েছে এদের যদি সে সাহায্য করতে পারত কিন্তু তার শক্তি কতটুকু, কি করতে পারে সে?

আরও ব্যথা পেত যখন সে দেখত, তারই ক্লাশের ছেলে সুধাংশুদের বাড়ী। কি বিশাল ইমারৎ, আসবাবের বাহুল্য, অযথা বিলাসের স্পষ্ট আভাস। সবচেয়ে মজার কথা, সুধাংশুও ছবি আঁকে, কিন্তু ছবির তলায় লিখে না দিলে বোঝা যায় না, কি সে আঁকতে চেয়েছিল। অথচ এরই জন্তে তার আঁকবার আলাদা ঘর আছে, শেখাবার মাষ্টার মশাই আছে, কত রং, কত তুলি। সুধাংশুদের লাইব্রেরীতে প্রচুর বই, সব বই-এর দোকানে বলা আছে, নতুন ভাল বই বেরুলে পাঠিয়ে দিতে। কাচগুলোর ওপর ধুলো পড়েছে, কেউ এসব নাড়াচাড়া করে বললেও বিশ্বাস হয় না। কমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, তোরা খুব পড়াশুনো করিস?

সুধাংশু হেসে উত্তর দেয়, আমাদের সময় কোথায়? মাষ্টার মশাইরা মাঝে মাঝে এসে বই নিয়ে যান।

প্রচুর বই, অথচ পাঠক নেই। আর ওদিকে প্রশান্তরা চায় পড়তে অথচ বই নেই, কি সুন্দর বিচার!

সদাশঙ্করের সঙ্গে আলোচনা হয় কমলেশের, সে প্রাণ খুলে বলে তার কিশোর মনের কথা, সে ভেবে পায় না কেন টাকার অভাবে রেণুকাদের প্রতিভার অপমান হয়, আর প্রতিভার অভাবে সুধাংশুদের টাকার অপমান হয়। কেন দু' দিকেই অভাব? কেন কেউ সম্পূর্ণ নয়?

সদাশঙ্কর তাকে বুঝিয়ে বলত, এই যে সমাজের নিয়ম! তুমি আমি কি করতে পারি বল? তবে চেষ্টা আমাদের করতে হবে, যাতে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে পারি।

প্রায় মাসখানেক বাদের কথা, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ পাঁচ দিনের অসুখে ভুগে মারা গেলেন প্রশান্তর বাবা। ভাল করে চিকিৎসাও করান গেল না। এই দু'টি ছোট্ট কিশোর-কিশোরীর আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল এই বিপদের সময় সবাই দূরে সরে গেল, পাছে এদের ভার নিতে হয়। সেই সময় কমলেশ দিন-রাত এসেছে এদের বাড়ী, যতরকম ভাবে সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করছে। রেণুকা ওর হাত ধরে বলত, তুই না থাকলে আমাদের কি হ'ত বলত কমল, বাবা যে এভাবে হঠাৎ চলে যাবেন, বেচারী প্রশান্ত, ওকে এই বয়েস থেকেই কাজ করতে হবে। তা না হলে আমাদের চলবে কি করে।

কমলেশ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তা হবে না, তোমাদের পড়াশুনো করতে হবে।

কি করে করবো? এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে তো? তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়ছে। আমিও চেষ্টা করছি, যদি মেয়ে ছবি আঁকা শিখতে চায়—

কমলেশ আর কোন কথা না বলে সোজা গিয়েছিল সদাশঙ্করের বাড়ী। প্রশান্তদের সব কথা খুলে বলে সজল চোখে জিজ্ঞেস করেছিল, কি হবে শঙ্করদা'? এদের জন্তে কি কিছুই করতে পারব না?

শঙ্করদা' সস্নেহে বলেন, বোকা ছেলে, ওদের এ বিপদের কথা আমাকে এত দিন বলনি কেন?

—কি যে করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

—প্রশান্ত আর রেণুকাকে বলো এখানকার ওদের যা দেনাপত্তর আছে, হিসেব করে রাখতে, আমি কাল গিয়ে সব মিটিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে যাব আমাদের বিদ্যাপীঠে, সেখানেই লেখাপড়া করবে।

শঙ্করদা' যে এত সহজে এত বড় সমস্যার সমাধান করে দেবেন, তা কমলেশ ভাবতেই পারেনি। ধরাগলায় বলে, ওরা বড় ভালো শঙ্করদা', আপনি দেখলে খুব খুশী হবেন।

সদাশঙ্কর কোন উত্তর দেয়নি, নীরবে কমলেশের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখেছিল, সেই গাঢ় স্পর্শ থেকে কমলেশ বুঝতে পারে তার ওপর শঙ্করদা'র ভালবাসা আর বিশ্বাস কতখানি।

কমলেশ নিজে থেকেই বলে, প্রশান্তরা চলে গেলে, আমিও আর একলা ক'লকাতায় পড়ে থাকব না। বিদ্যাপীঠেই পড়াশুনো করব।

—সে তো খুব ভালো কথা, তোমার বাবাকে চিঠি লিখ, উনি যদি মত দেন.—

বাবার মত আছে, সে আমি জানি।

এর পরের ইতিহাস ছোট্ট। ক'দিন বাদেই সদাশঙ্করের বিদ্যাপীঠে এসে হাজির হয় কমলেশ, প্রশান্ত আর রেণুকা। কলকাতা থেকে জায়গাটা প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে, ট্রেণ লাইনের উপর। বিশাল ধানক্ষেত, চার দিকে শুধু সবুজের ইসারা। সহরের দমবন্ধ-করা সভ্যতা এখানে নেই। এখানে প্রকৃতির খেলা, স্বাভাবিক জীবন।

কমলেশ আর প্রশান্ত উঠেছে হোষ্টেলে। সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা, চল্লিশটি ছেলে থাকে। কিন্তু মেয়েদের হোষ্টেল এখনও তৈরী হয়নি। তাই রেণুকা উঠল মণিকাদি'র বাড়ী। মণিকাদি' ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখান আবার অবসর সময় গানও। বড় মিষ্টি স্বভাব মণিকাদি'র, কত সহজে এদের আপনার করে নিয়েছেন। এতটুকু দূরত্ব যেন নেই।

এই ক'দিনের মধ্যেই বিদ্যাপীঠের নানা কাজের ভার নিয়েছে এরা। রেণুকা মণিকাদি'র সঙ্গে সারাদিনই কাটায় শিল্পভবনে। এখানকার সবকিছু গুই গুছিয়ে রাখে। মণিকাদি' খুশী হয়ে বলেন, ভাগ্যিস রেণুকা এসে পড়েছিলো, আমি তো একলা সামলে উঠতে পারছিলাম না।

প্রশান্তর খেলোয়াড় হিসেবে নাম ছিল কলকাতায়। স্কুলের টিমে ফুটবল খেলত। এখানে এসে ও খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। সারাদিন স্কুলের পর সোজা চলে যায় খেলার মাঠে, হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে কোথা দিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে তা সে বুঝতেই পারে না।

কমলেশ ভার নিয়েছে লাইব্রেরীর। দোতলার কোণের ঘরে বেশ কিছু বই থাকলেও তা যত্ন করে এতদিন সাজান হয়নি। সদাশঙ্কর সেই ভারটাই দিয়েছে কমলেশের ওপর। একদিন কমলেশ বইগুলো আলমারীতে বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে রেখেছে, নতুন লিষ্ট তৈরী করেছে. এবার তার বই কেনার পালা। বিদ্যাপীঠ থেকে চার মাইল দূরে সহর। সেখানেই দোকানপত্র। কমলেশ আজ গিয়েছিল সাতখানা নতুন বই-এর অর্ডার দিয়ে আসতে। মনে করেছিল কাজ সেরে বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে। ফিরেও আসত ঠিক যদি না হঠাৎ এত জোরে বৃষ্টি নামত। সহর থেকে বিদ্যাপীঠে যাবার অনেকখানি পথই বাস-এ যাওয়া যায়। ইচ্ছে করেই কমলেশ বাসে চাপেনি। হেঁটে আসবে বলে। কিন্তু অর্দ্ধেক পথ না আসতেই, কালবৈশাখীর ঝড়ে চারদিক অন্ধকার করে ধূলো উড়িয়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি সুরু হল। কিছুক্ষণের জন্যে কমলেশ ভেবে পেল না কোন দিকে যাবে! একটা বড় গাছের তলায় গুটিসুটি মেরে বসেছিল কিন্তু বৃষ্টির প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়ছে দেখে তার ভয় হল, এ রাস্তা দিয়ে সে খুব বেশী হেঁটে যাতায়াত করেনি। তবু মনে পড়ল এরই কাছ বরাবর কোথায় যেন নদীর ধারে একটা বিশাল বাড়ী আছে, যা সে বাসে যেতে যেতে দেখেছে। অন্ধকারের মধ্যেও চারদিকে তাকাতে লাগল কমলেশ, মনে হল কিছু দূরে যেন একটা আলো দেখা যাচ্ছে। এই দুর্যোগের রাতে অন্ততঃ একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে, এই আশায় বুক বেঁধে কমলেশ প্রাণপণ শক্তিতে ছুটল সেই আলো লক্ষ্য করে। দূর থেকে দেখে যতটা কাছে মনে হয়েছিল, তত কাছে নয়। যখন কমলেশ সে বাড়ীর সামনে এসে পৌছল, তখন তার জামা-কাপড় সবই ভিজে ছপ-ছপ করছে। কমলেশ জোরে-জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন, কে আছেন?

অনেকক্ষণ ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কমলেশ তখনও ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল।

কমলেশ একটু রেগেই বলে, কি মশাই, এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আছি শুনতে পাচ্ছেন না? কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলে আর কথা শেষ করতে পারে না। দেখে সামনে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ফর্সা রঙ, সাদা চুল, একমুখ সাদা দাড়ী। সারা মুখে বয়সের গভীর রেখা পড়েছে। ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, বেশ কুঁজো। পরনে সাদা ধুতির ওপর একটা সাদা ফতুয়া। কমলেশের আপাদ-মস্তক একবার ভাল করে দেখে ঘরের কোণে রাখা একটা ভাঙ্গা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসেন।

কমলেশ ভাল করে ঘরটা চারদিকে তাকিয়ে দেখে। পুরোন ঘর, চারদিকে বালি খসে পড়ছে। ঘরের এক কোণে যে লণ্ঠন জ্বলছে তাতে আলো খুব কম। চিমনির কাচটা কালো হয়ে গেছে। যে তক্তপোষটা বুড়োর সামনে রয়েছে তার একটা পায়া নেই। খান কয়েক ইটের ঠেকনোর ওপর দাঁড় করানো।

বুড়ো জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, এখানে কোথায় থাকো?

গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক! কমলেশ মৃদুস্বরে বলে, বিদ্যাপীঠে থাকি।

—ওখানে কি হয়?

—লেখাপড়া, খেলাধূলো, আর কি।

—তোমার নাম?

—কমলেশ বসু।

—বুড়ো চুপ করে যায়, আর কোন কথা বলে না। কমলেশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাছাড়া শীত করছিলও বেশ, সহজ গলায় জিগ্যেস করে, একটা গামছা দেবেন? গা-হাতটা মুছে ফেলতাম।

বুড়ো কিন্তু শুনেও শুনলো না। ইচ্ছে করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কমলেশ আবার বলে, বড় শীত করছে, একটা শুকনো কাপড় যদি দেন, কালই আমি ফেরৎ দিয়ে যাবো।

ভদ্রলোক এইবার ফিরে তাকান। চোখ দুটো যেন জ্বল-জ্বল করছে। সোজা উঠে গেলেন দরজার কাছে, খুলে দিয়ে বললেন এবার বাড়ী যাও, বৃষ্টি কমে গেছে।

কমলেশ আর কথা বলার সুযোগ পায় না। অন্ধকারের মধ্যে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বাকি রাস্তাটুকু জোরে জোরে হেঁটে কমলেশ যখন হোষ্টেলে এসে পৌছল তখন সাতটা বেজে গেছে। সকলেই তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বসে ছিল মণিকাদি' সব কথা শুনে বললেন, খুব সাবধান কমল, খবরদার আর ও-বাড়ীতে যেও না।

—কেন মণিকাদি' ''

—জান না বুঝি ? ও-বাড়ীর আমরা নাম দিয়েছি যক্ষপুরী। ঐ যে বুড়োকে দেখেছো, ঐ তো যকবুড়ো।

কমলেশ অবিশ্বাসের হাসি হাসে, আপনি ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে, তাই কখনও সত্যি হয় ?

মণিকাদি' হেসে বলেন, বেশ তো, যাকে খুশী জিগ্যেস করো। ও-বাড়ীতে যে কারা থাকে, আমরা কেউ দেখিনি। মাঝে মাঝে ওখান থেকে একটা গাড়ী বার হয়, তার চারদিকে পর্দা, পাছে কেউ দেখে ফেলে। একমাত্র ঐ বুড়োকে দেখা যায়, সে যে কে, কত তার বয়স, কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা ধরে নিয়েছি ঐ নিশ্চয় যকবুড়ো। তোমার সঙ্গে তো তবু দু'-চারটে কথা বলেছে, অন্য কারুর সঙ্গে কোন কথাই বলে না। চুপ করে বসে থাকে।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সারাক্ষণই ওই যক্ষপুরীর কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা হল। কমলেশ কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না মণিকাদি'রা কি বলতে চাইছে। ঘুমোবার সময় প্রশান্তকে ডেকে নিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলতো ? ওরা সবাই ওই বড় বাড়ীটার নাম যক্ষপুরী দিয়েছে কেন ? কেনই বা যেতে আমাদের বারণ করছে ?

প্রশান্তর ঘুম পেয়েছিল, হাই তুলে বলে, অত ভাবনা-চিন্তার দরকার কি ? বারণ করছে যখন, না গেলেই তো হয়।

—আমি কিন্তু আবার যাব।

—কেন ? ওখানে কি আছে ?

—ওই বুড়োর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। লোকটা অদ্ভুত ! কেমন যেন কথাবার্তা।

প্রশান্ত ভুরু কুঁচকে বলে, তবে আর ওখানে গিয়ে কি লাভ হবে ?

কমলেশ দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, ওই বুড়োর চোখ দুটো আমার বড় ভাল লেগেছে, যখন চুপচাপ বসে থাকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ একলা চাহনি। নিশ্চয় ও কিছু বলতে চায়।

প্রশান্ত থামিয়ে দিয়ে বলে, কি সব আবোল-তাবোল বকছিস ? কিন্তু একলা আর যাস না, আমাকে বলিস।

দিন কয়েক পরের কথা। কমলেশ গিয়েছিল সহরে অর্ডার দেওয়া বইগুলো নিয়ে আসার জন্যে। বইগুলো হাতে করে ফেরবার সময় একবার যদিও ভেবেছিল বাসে করেই আসবে, কিন্তু কে যেন তার মন পাল্টে দিলে। কমলেশ হেঁটেই চলল হোষ্টেলের দিকে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ, নিস্তেজ হয়ে এসেছে। হাওয়া আছে, তাই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। গুমোট ভাবটা নেই। কমলেশ অনেক কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিল। তার হাতে গড়া লাইব্রেরীর কথা, বিদ্যাপীঠের অন্যান্য কার্য্যক্রমের কথা, আবার কলকাতার দু'-চারটে টুকরো কথাও যে মনে আসছিল না তা নয়। আজ সকালের ডাকেই বাবার একটা চিঠি এসেছে। উৎসাহ দিয়ে লিখেছেন, যদি তোমার শঙ্করদা'র আদর্শের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে কাজ করতে পার তবে সবচেয়ে খুসী হব আমি।

ভাবতে ভাবতে কখন যে কমলেশ সেই যক্ষপুরীর সামনে এসে পড়েছে তা তার নিজেরই খেয়াল হয় নি। এ পর্য্যন্ত এসে তার পা দুটো আপনা হ'তেই থেমে গেল। দেখল, সেদিন দুর্য্যোগের রাত্তে বুড়োর সঙ্গে যে ঘরে বসে গল্প করেছিল, সেটা একটা দরোয়ানের ঘর। গেটের সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট ঘর। গেট পেরুলেই বিশাল মাঠ, তার ওপর কি বিরাট প্রাসাদ ! সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ, লোক বাস করে বলে তো মনে হয় না। তখনও সন্ধ্যা নামেনি। তাই বুকে ভরসা করে কমলেশ গেট পেরিয়ে সেই প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। মণিকাদি'র কথাগুলো তার কানে ভাসছে, সেই সঙ্গে প্রশান্তর সতর্কবাণী। একবার মনে করল এখান থেকে ফিরে গেলেই হয়, কিন্তু পারলো না। কে যেন তাকে সামনের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সেই প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কমলেশ চারদিকটা ভাল করে দেখল। কি ভারী দরজা ! তার ওপর বড় বড় তালা লাগান। মরচে পড়েছে। বোঝা যায় অনেক দিন ব্যবহার হয় নি ! বাড়ীটা পুরোন, দেখলে মনে হয় মস্ত বড় জমিদারের, এখন তার আগের বোলবোলা নেই। অনেক জায়গায় বালি খসে পড়েছে, দরজা-জানালাতেও রঙ পড়েনি বহু দিন। কমলেশের নজরে পড়ল নদীর দিকে একটা ছোট দরজা খোলা রয়েছে, খিড়কীর দরজা। কোন রকম দ্বিধা না করে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। কি আশ্চর্য্য, অবাক হয়ে দেখল কমলেশ বাড়ীর বাইরে ভাঙ্গা-চোরা হলেও ভেতরটা ঝকঝক তকতক করছে। আয়নার মত পরিষ্কার মার্ব্বেলের মেঝে, বড় বড় থামের ওপর কি নিখুঁত কারুকার্য্য ! বারান্দা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায় কমলেশ। চোখে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। তার মনে হয় মণিকাদি'র কথাই যেন সত্যি, গল্পের বই-এ যক্ষপুরীর যে বর্ণনা পড়েছে তারই সত্যিকারের চেহারা দেখছে এই বাড়ীর মধ্যে। পাশের একটা হলঘর থেকে অনেকের গলার স্বর ভেসে আসছিল। কমলেশের ইচ্ছে হ'ল তাদের সঙ্গে আলাপ করার। কিন্তু যেই দরজায় হাত দিতে যাবে, পেছন থেকে হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে উঠল।

—কে তোমাকে এ বাড়ীতে আসতে বলেছে ?

কমলেশ ফিরে দেখে সেদিনকার সেই বুড়ো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কমলেশ ভয় পেয়ে বলে, দরজা খোলা ছিল, ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করে যাই।

—খবদ্দার আর এ বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা করবে না। আজ আমি তোমাকে কিছু বলব না। কিন্তু এর পর এসে আর ফিরে যেতে পারবে না।

কমলেশ ভয়ে শিউরে ওঠে। না, না, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। কমলেশ আর কথা না বাড়িয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে মাঠে বেরিয়ে আসে। পেছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বুড়ো তার পেছন পেছন আসছে। অন্ধকার নেমে এসেছে, কমলেশের গা ছমছম করে। বুড়ো হঠাৎ জিগ্যেস করে, হাতে তোমার ওগুলো কি ?

—গল্পের বই। লাইব্রেরীর জন্যে কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

—কিসের গল্প ?

কমলেশ সাহস করে ফিরে তাকিয়ে বলে, ছোট ছোট ছেলেরা কি রকম করে একটা সুন্দর সহর গড়ে তুলেছে তারই কাহিনী।

—সে তো আজগুবী গল্প !

কমলেশ জোর দিয়ে বলে, আজগুবী নয় সত্যি, বইটা পড়ে দেখবেন ?

—ওসব বাজে জিনিষ আমি পড়ি না।

কমলেশ আর কথা বাড়ায় না, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে চলে। ঠিক গেটের মুখে যেই এসে পৌঁছেছে বুড়ো আবার কথা বল্লে, তোমার একলা এ বাড়ীতে আসতে ভয় করে না ?

—একটু একটু ভয় করে।

—তবে এসেছিলে কেন ?

কমলেশ মৃদুস্বরে বল্লে, আমার মনে হয়েছিল আপনি বোধ হয় আমায় কিছু বলতে চান।

বুড়ো এবার হাসে, আচ্ছা পাগল তো তুমি, আর লোক পেলাম না, তোমার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করব। খবদ্দার আর গেট পেরুবে না। তাহলেই ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।

কমলেশ আর কোন কথা না বলে চুপ করে বেরিয়ে আসে। সারা রাস্তায় মনে হয় ওই বাড়ীতে না ঢুকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। মণিকাদি'রা ঠিকই বলেছে এ হোল যক্ষপুরী। আর ঐ বুড়ো নিশ্চয়ই যকবুড়ো। [ক্রমশঃ।

বোতামের যাদু ফুল

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

প্রদর্শনীয় প্রারম্ভিক খেলা হিসাবে আলোচ্য 'বোতামের যাদু ফুল' অতুলনীয়। আমি বহু বার এই খেলাটি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে দেখিয়ে খুব ভাল ফল পেয়েছি। বিশেষ করে পশ্চিমের দেশগুলোতে এ খেলাটি দর্শকদের যে আনন্দ দেয় তার তুলনা মেলা ভার।

ফিটফাট 'সান্ধ্য-পোষাক' পরিহিত অবস্থায় যাদুকর প্রবেশ করেন রঙ্গমঞ্চে। সকলকে অভিবাদন জানাবার পরে হঠাৎ তার নজর পড়ে তার কোটের 'বটন হোল'বা বোতামের গর্ত্তের দিকে। তাই তো সেখানে কোনও ফুল নেই এবং তার ফলে তার পোষাক অসম্পূর্ণ। এজন্যে দুঃখ প্রকাশ করে যাদুকর তার যাদুকৌশল প্রয়োগ করলেন। খালি ডান হাতখানা একবার বোতামের গর্ত্তের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিতেই দেখা গেল, সেখানে রয়েছে এক শ্বেত-গোলাপ। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে দর্শকেরা যে কত খুশী হলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্বতঃস্ফূর্ত্ত হর্ষধ্বনির মধ্যে। কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখানো যায় তাই এবার শোন।

এই খেলা দেখানোর জন্যে চাই কাপড়ের তৈরী একটি সাদা গোলাপ আর এক খণ্ড সরু কালো 'ইলাষ্টিক'। এই ইলাষ্টিকের এক প্রান্তে লাগানো থাকবে নকল গোলাপ আর অন্য প্রান্তটি ফুল রাখার জন্য নির্দ্দিষ্ট বোতামের গর্ত্তের ভেতর দিয়ে যুক্ত হবে কোটের 'ল্যাপেলের' ধারের বোতামে। ইলাষ্টিকের দৈর্ঘ্য এমন হবে যেন স্বাভাবিক অবস্থাতেই এ ফুলটিকে বোতামের ঘরে ধরে রাখতে পারে। এর পরে ফুলটিকে টেনে নিয়ে যদি বাঁ বগলে চেপে ধরে রাখ তবে ইলাষ্টিক আপন ধর্ম্মে লম্বা হবে। বগলের চাপ কম হলে আপনা থেকেই ইলাষ্টিক ফুলটিকে টেনে এনে বোতামের ঘরে বসাবে। এই খেলা দেখানোর সময়ে গায়ে থাকবে কালো কোট, কাজেই কালো ইলাষ্টিক এই কালো কোটের রঙের সঙ্গে সহজেই মিশে থাকবে। বেশ অভ্যাস করে তবেই কিন্তু দেখাবে এ খেলা। ম্যাজিকে উৎসাহী যারা তারা আমার সঙ্গে জবাবী কার্ডে পত্রালাপ করতে পার। **A. C. Sorcer. Magician. Post Box 16214, Calcutta 29** ঠিকানায়।

যাদুকর সরকার

বীণাদেবী সেন

আমার ছোটো বন্ধুরা,

আজ তোমাদের আমি একজনের বিষয় গল্প বলবো যা কাহিনী হলেও সত্য। আমি গত বিশ বৎসর ধরে শিক্ষকতা কার্য্যের মাধ্যমে আমার ছাত্রীদের গল্প শুনিয়েছি, রেডিওতে শিয়াল-বাঁদরের গল্প বলেছি, গল্প লিখেছি মহাপুরুষদের বিষয়ে যাঁরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আজ কিন্তু এমন একজনের বিষয় বলবো যিনি বাল্যে এবং কৈশোরে নানারূপ অচল অবস্থা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর শক্তিসাধনা এবং প্রতিভাবলে স্বীকৃত হয়েছেন, ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। তোমরাই বলতো এ কথা শুনে তোমাদের বুক ফুলে দশ হাত হচ্ছে কি না ? তোমরা কবি সত্যেন দত্তের 'আমরা' কবিতা পড়েছো ? সে কবিতাতে লেখা আছে বাঙ্গালীর যশ এবং প্রতিষ্ঠার বিষয়। আজকে যার বিষয় বলতে সুরু করেছি তিনি সম্প্রতি আমেরিকাতে সদলবলে রওনা হবেন। তিনি হচ্ছেন যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার ওরফে প্রতুল চন্দ্র সরকার। এই অসামান্য খ্যাতিসম্পন্ন বাঙ্গালী তাঁর প্রতিভা দেখিয়ে জগতের নিকট হতে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, বারংবার বিজয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছেন, তামাম দুনিয়ার জনগণমনকে যাদুবিদ্যার ভেল্কি দেখিয়ে চমৎকৃত করেছেন। তিনি শুধু যে যাদুবিদ্যায় সুনিয়ন্ত্রিত তা নয়, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মধারা তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, তাঁর সুজনতা, অমায়িক আচরণ যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে অনুপ্রেরণা পেতে পারো। অনুপ্রেরণা লাভ করবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজ যাদুসম্রাট পি, সি, সরকারের বিষয় লিখছি। তাঁর আদিনিবাস ময়মনসিংহ জিলাতে, টাঙ্গাইল মহকুমায়। তিনি বছরের মধ্যে প্রায় দশ মাস ভারতবর্ষের বাইরে থাকেন, নানারূপ আদব-কায়দা-দুরস্ত দেশ বিদেশ ঘুরে, তাঁর যাদুবিদ্যার ভেল্কী বাজী দেখিয়ে যখন বাংলা দেশে ফিরে আসেন তখন কিন্তু পি, সি, সরকার পুরোদমে বাঙ্গালী আচরণে, কথাবার্ত্তায় ইত্যাদিতে। ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং গর্ব্ববোধ করেন তার জন্য। সব চেয়ে তাঁর বেশী গর্ব্ব তিনি বাঙাল দেশের ছেলে।

পি, সি, সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এ পড়তে পড়তে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যাদুকর হয়ে চলে আসেন কলিকাতায়। ভারতে প্রথম প্রদর্শনীর পর তিনি প্রথমে যান শ্যাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ। তারপর থেকে আজ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে চলেছে তাঁর সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত কোটি কোটি নরনারীর চিত্ত জয়, শ্রদ্ধা আকর্ষণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথায় তিনি যাননি ? সর্ব্বত্র, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, জাভা, মালয়, জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী তদ্ব্যতীত অন্য বহু স্থানে। তিনি বহুবার গিয়েছেন ইংলণ্ডে, আমেরিকাতে। তিনি স্বীকৃত হলেন বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে। বিদেশের পত্রিকাতে প্রথম পাতায় যাদুকর হিসেবে তাঁর ছবি মুদ্রিত হলো, তিনি আমাদের জাতীয় পতাকা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বারংবার ভারতের জন্য বিজয়মাল্য নিয়ে এলেন। সর্ব্বদেশের পত্রিকাতে তাঁর প্রচুর প্রশংসা, বিদেশে পি, সি, সরকারকে ভারতের হুডনি আখ্যা দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর কোটি, কোটি অনুরাগীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র একজন। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকেন নু তাঁকে এশিয়ার গৌরব এই আখ্যা দিয়েছেন। কেনই বা দেবেন না ?

১৯৩৬ সালে কলিকাতায়, ১৯৫০ সালে প্যারীতে তারপর ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর 'সব চাইতে জনবহুল রাস্তা নিউইয়র্ক টাইমস স্কোয়ারে চোখ বেঁধে সাইকেল চালিয়ে ইনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লণ্ডন নিউইয়র্ক শিকাগোতে এর প্রদর্শনী টেলিভেশন যোগে দেখানো হয়েছে। শ্রীযুক্ত সরকার ইলেকট্রিক করাতে একটি মেয়েকে দুই টুকরো করে যে যাদু ক্রীড়া দেখিয়েছিলেন তা অতি আশ্চর্য্যজনক ! এই খেলা দেখতে গিয়ে কয়েকজন সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন, এমন কি টেলিভেশনের ছবি দেখেও অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। অতএব যাদুর রাজত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট পি, সি, সরকারের ভোজবাজী অদ্ভুত ! পরলোকগত নেপালাধীশের মতে তাঁর যাদুপ্রদর্শনী সম্ভারে পূর্ণ। জার্ম্মেণী তাঁদের সোনার লরেল দিয়ে তাঁকে স্বীকার করেন—বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকররূপে নিউইয়র্ক পি, সি, সরকারকে দুইবার ফিনিক্স পুরস্কার দিয়েছেন, ম্যাজিকে নোবেল প্রাইজরূপে বরণীয় এই ফিনিক্স পুরস্কার এবং পৃথিবীর মধ্যে শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকারই একমাত্র যাদুকর যিনি দুইবার এই পুরস্কার পেয়েছেন। হল্যাণ্ড এঁকে দিলে ট্রিক্স পদক (১৯৪৮ এবং ১৯৫৪), টোকিও ম্যাজিসিয়ান ক্লাবের ইনি সম্মানিত সভ্য, তাঁরা এঁকে উপহার দিলেন একটি পদক। একজন অজাপানীদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী (১৯৩৭)। আমেরিকা আন্তর্জ্জাতিক যাদুকর ভ্রাতৃত্ব সংস্থার কলিকাতা শাখার নাম—এরই নামানুসারে পি, সি, সরকার চক্র রাখা হয়েছে। এ ছাড়া, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, প্যারিস, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলির বড় বড় যাদু-সংস্থার দ্বারাও ইনি সম্মানিত। আমেরিকা জাতীয় টেলিভিশনে **National Broadcasting Company** গত বৎসর মে মাসে শ্রীযুক্ত সরকারের বিশ্ববিখ্যাত বৈদ্যুতিক ঘূর্ণায়মান করাত দ্বারা জীবন্ত তরুণীকে দ্বিখণ্ডিত খেলাটি টেলিভিশনে দেখাবার জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করে শ্রীযুক্ত সরকারকে দলবল সহ নিয়ে যান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের সম্মান মিষ্টক ক্রেগের স্বর্বণ ম্যাজিক ও ধণ্ড যাদুসম্রাটের হাতে পৌছাবার জন্য আমেরিকা থেকে বিমানযোগে অষ্ট্রেলিয়াতে আনা হয়। আমেরিকাতে যখন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকরের আখ্যায় দ্বিতীয় বার ভূষিত হলেন তখন অন্যান্য দেশের মত বৃটিশ প্রতিনিধিরা কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। বিদেশে গেলে পি, সি, সরকার সেই মহামূল্যবান একটি পোষাক পরেন—পোষাকটি ভারতের বিভিন্ন দেশের উপকরণ দিয়ে তৈরী। তখনকার দিনে রাজপুত্রের মত দামী পোষাকে, দামী জুতো জোড়া পরে তিনি যখন ষ্টেজে দাঁড়িয়ে যাদুক্রীড়া দেখান সে সব ছবিগুলো দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সুপুরুষ পি, সি সরকারকে সুন্দর মহামূল্যবান পোষাকে আরও সুন্দর দেখায়। বৃটিশ প্রতিনিধি সেই পোষাক লক্ষ্য করে তাঁকে জব্দ করার জন্য বলেছিলেন, **You have no Royal blood. Then why do you dress like a prince ?**

যাদুসম্রাট সহাস্যে উত্তর দিলেন, **No I am the prince of Magic.**

অপর পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন উঠল না।

যাদু-বিদ্যার ইতিহাস প্রসঙ্গে পি, সি, সরকার বলেন, অথর্ব্ববেদের মতে ভারতেই এই মহাবিদ্যার উদ্ভব। তবে আমাদের ছিলো গুরুমুখী বিদ্যা, কাজে কাজেই পূর্ব্বাচার্য্যদের মহাপ্রস্থানের পর এ বিদ্যা প্রায় লুপ্ত হতে থাকে। তবে এখনও বেদে-বেদেনীদের খেলা, ভানুমতী খেলা, ভোজবাজী প্রভৃতির খেলাগুলি সেই আদিম ঐতিহ্যের অপস্রয়মান চিহ্ন। হিপনোটিজিম এবং মেসমেরিজিম সম্বন্ধে তিনি বলেন, গ্রীসের ঘুমের দেবতা হিপনাসের নামানুসারেই এই বিদ্যার পরিচিতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই বিদ্যার উদ্ভব। বিদেশ তাহাকে সম্মান দিয়েছে, যথাযোগ্য সমাদর জানিয়েছে এবং আমাদের দেশ থেকে তাঁকে যে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়নি তা নয়, কিন্তু বিদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। কলিকাতা নাগরিকগণের এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনপত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি অক্ষরের ঔজ্জ্বল্য পি, সি, সরকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে তা থেকে সামান্য কিছু উল্লেখ করছি : 'কিম্বদন্তাখ্যাত ভোজরাজের সুযোগ্য উত্তরসাধক তুমি, অথর্ব্ববেদ ও তন্ত্রসার বর্ণিত ইন্দ্রজালকে অলৌকিক অবিশ্বাসী আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মধ্যেও জয়যুক্ত করিয়াছ, তোমার মন্ত্রপূত ইন্দ্রজাল নিখিল জগৎকে স্তম্ভিত ও বিমূঢ় করিয়া জয়পত্র ললাটে লইয়া স্বদেশের যজ্ঞভূমে ফিরিয়া আসিয়াছ—তোমার ভারতের তীর্থসলিল (ওয়াটার অফ ইণ্ডিয়া) পাশ্চাত্য পৃথিবীর গতানুগতিক মুমূর্ষু ম্যাজিককে সঞ্চারিত করিয়া ভারতীয় ভোজবাজীর মহিমা অভ্রচুম্বী করিয়াছ, প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তুমি স্বাধীন নব ভারতের নবীন যাদু-সৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, অবজ্ঞেয় ভেল্কি ভোজরাজীকে ইন্দ্রজালের ইন্দ্রধনু বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছ।' কলিকাতা মহানগরীর পৌর সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দনপত্রে শ্রীযুক্ত সরকারের অমর অবদানের কথা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে।

তাহলে বুঝতে পারছো, আজ আমি কেন পি, সি, সরকারের বিষয় এসব কথা লিখছি। তোমরা সুখী হবে শুনে, গর্ব্বিত বোধ করবে। আমি এ কথা বলছি না যে, তোমরা সবাই একযোগে যাদুকর হও, তা নয়—তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মান অর্জ্জন করে

বিদেশে গিয়ে তোমাদের কৃতিত্ব বিভিন্ন ধারায় দেখিয়ে ফিরে এসো মাতৃভূমিতে, আমাদের ভারতবর্ষকে চিনুক সমস্ত দুনিয়া। আমাদের বাংলা দেশের বিষয় মহামান্য গোখলে বলেছিলেন **What Bengal thinks to-day India will think to-morrow** আবার যেন বিদেশীরা বলতে পারে। **What India thinks to-day The World will think to-morrow,** একদিন পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ জ্ঞানগরিমাতে সভ্য তার আলোকে দীপ্ত ছিল—যখন পাশ্চাত্য দেশকে কেউ চিনত না— আবার কি আমাদের অতীত ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না? নিশ্চয়ই পারবো।

যাদুকর পি, সি সরকারের প্রতিভার বিষয় তোমাদের বলেছি; এখন বলবো তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে তিনি তাঁর কর্ম্ম পদ্ধতিকে কি ভাবে পরিচালনা করেন। আমরা একবার তাঁর 'ইন্দ্রজাল' তাঁর গৃহের নাম সেইখানে গিয়ে পরিচালনা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তিনি সহকারীদের সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন সর্ব্ববিষয়ে যেমন আদবকায়দা শৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য করা ইত্যাদি। তিন তলার ঘরটি যাদুসম্রাটের অফিসঘর। ঘরে যথারীতি চেয়ার, টেবিল, আলমারী —তার থেকে এ-হেন জিনিস নেই যেমন ক্রাঙ্কিং মেশিন পর্য্যন্ত, তিনি খ্যাতনামা যাদুকরদের, বিশ্ববিখ্যাত লোকদের বিষয়ে সংবাদ রেখেছেন। তাঁর বাটীতে ফটো বিভাগ আছে—ডার্করুম তাঁর প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। এমন ভাবে সজ্জিত করেছেন যে প্রয়োজনানুরূপ পাওয়া যায় হাতের কাছে। তিনি নানা জনের সহায়তায় নানারূপ পোষাক সংগ্রহ করেছেন—পোষাক, রৌপ্য তরবারি সবই উপহার। এমন যে ব্যস্ত মানুষ অবসর মত তিনি সংগ্রহ করেন বিভিন্ন দেশের ডাক টিকিট, পোষ্ট অফিসের খাম টেলিগ্রাম ফর্ম, ট্রামবাসের টিকিট, দেশলাইএর ছবি, মুদিদোকানের মেমো, চাল ডালের প্যাকেট সব জোগাড় করে এক যেন মিউজিয়ম তৈরী করেছেন। কার্টুনের ছবি, ভিজিটিং **Card**। ম্যাজিকের বই, সিন সিনারী বিষয় কত যে বই। তাঁর যাদুবিদ্যা নয়নে ধাঁধা সৃষ্টি করে। তাঁর সংগ্রহ বিস্মিত করেছে যাঁরা দর্শক তাঁদের কিন্তু সর্ব্বোপরি সব চেয়ে মূল্যবান পি, সি, সরকারের সর্ব্বজনবিদিত, বিনয়পূর্ণ আচরণ। আধুনিক জগতে, উন্নাসিক আচরণে ইহা দুর্লভ। তাঁর সংগ্রহ-নেশা ছাড়া অন্য নেশা নাই, ধুমপান নয়, চা পান নয়। তাঁর ম্যাজিক দেখানো এবং সুজনতা উভয়ই পরচিত্তহারিণী। যাদুকর পি, সি, সরকারের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য এই যে, এঁর জীবনদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তোমাদের মধ্য থেকে কয়েকজনও যদি মাতৃভূমির গৌরব হয়ে দাঁড়াও তবেই আমার এ লেখা সার্থক হবে। যাঁরা প্রকৃত গুণী, তাঁরাই মহত্ত্বের অধিকারী এবং শ্রীমান প্রতুলচন্দ্র সরকার ওরফে পি, সি, সরকার আমাদের ভারতবর্ষকে যে দশের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করে আমাদের সবার মুখ উজ্জ্বল করেছেন সে ঋণবোধ তোমাদের অন্তরে জাগরুক থাকুক, তিনি যে বহু গুণের অধিকারী সে অনুপ্রেরণা তোমাদিগকে জীবনপথে পরিচালিত করুক—আমি সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে তোমাদের সেই আশীর্ব্বাদই করছি।

দুই বোন

(রূপকথা)

পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

অনেক দিন আগে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল না। কিন্তু দুটি ফুলের মত ফুটফুটে মেয়ে ছিল। রাজকুমারী চন্দ্রা আর পদ্মার মা মারা গিয়েছিলেন। তাই রাজামশায় তাঁর ছোটরাণীকে ডেকে বললেন, তুমি আজ থেকে পদ্মা আর চন্দ্রাকে মানুষ কর।

ছোটরাণীর নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণ আলস্যপরায়ণা। তার উপর চন্দ্রা আর পদ্মা তাঁর চেয়েও বেশী সুন্দর দেখতে ছিল বলে তিনি তাদের হিংসাও করতেন। তাই রাজামশায় বাড়ী না থাকলেই তিনি রাজকুমারীদের দিয়ে রাজবাড়ীর বাসন মাজান থেকে নিজের গা-হাত-পা টেপান পর্য্যন্ত সব কাজই করিয়ে নিতেন।

রাজামশায় যখন জিজ্ঞাসা করতেন, চন্দ্রা আর পদ্মা অত রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন?

ছোটরাণী তখন কৃত্রিম স্নেহে বলতেন, যা দুষ্টু, মেয়েরা আমার, সারাদিন সখীদের সঙ্গে বাগানে বাগানে প্রজাপতিদের পেছনে ছুটে বেড়ায়। সময়ে নাওয়া খাওয়া করে না। তাই তো রোগা হয়ে যাচ্ছে।

রাজামশায় এজন্য মেয়েদের কিছু বলতে গেলেই ছোটরাণী গলায় মধু ঢেলে বলতেন, তাই বলে আপনি যেন ওদের বকবেন না। ছেলেমানুষই তো? একটু বড় হলে আপনিই শান্ত হবে।

ছোটরাণীর কথায় রাজা যেমন নিশ্চিন্ত তেমনি খুসী হতেন। যাক, মেয়েরা তাহলে তাদের ছোট মায়ের স্নেহে সুখেই আছে।

একবার রাজামশায় দূর দেশে যুদ্ধে গেলেন। সেই সুযোগে ছোটরাণী মেয়েদের উপর এমনই অত্যাচার আরম্ভ করলেন যে তারা আর সহ্য করতে পারল না।

বড় বোন চন্দ্রা বলল, এ ভাবে না খেয়ে পরিশ্রম করে আর ছোটমার হাতে রোজ রোজ প্রহার সহ্য করে আমরা বেশী দিন বাঁচব না। তার চেয়ে চল বনে চলে যাই, সেখানে বাঘ-ভালুক আমাদের খেয়ে ফেলবে সেই ভাল হবে। সে পদ্মার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বনে পালিয়ে এল।

সেদিন জ্যোৎস্না রাত। বনের মধ্যে চারদিকে বাঘ-ভালুক হালুম হুলুম করে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্য। তারা যেন চন্দ্রা আর পদ্মাকে দেখেও দেখছে না। চন্দ্রার মনে পড়ল তার ধাইমার কথা—"রাখে কেষ্ট মারে কে? যারা সৎ হয় স্বয়ং ভগবান তাদের রক্ষা করেন।"

একথা মনে পড়তেই চন্দ্রার মনে সাহস এল। সে এবার চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে চলল। কিছু দূর গিয়ে সে দেখে বনের মধ্যে একটা বড় রাজপ্রাসাদ রয়েছে। দেখে দুই বোনে সেই প্রাসাদে গেল। কিন্তু সারাটা প্রাসাদ ঘুরেও তারা জনপ্রাণীরও দেখা পেল না। অথচ ঘরে ঘরে আসবাব পত্র, বিছানা সব কিছুই রয়েছে। কেবল ভঁড়ার ঘরই একেবারে খালি, এক দানা চালও সেখানে পড়ে নেই।

দুই বোনে রাজপ্রাসাদের এই অবস্থা দেখে খুব অবাক হলেও সেইখানেই থাকবে বলে স্থির করল। কিন্তু খাওয়ার কি করা যায়? চন্দ্রা ব্যবস্থা করল সকালে পদ্মা আর সন্ধ্যায় সে নিজে বনে গিয়ে গাছতলা থেকে বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনবে আর ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসবে।

দিন কতক দুই বোনে সেই রাজপ্রাসাদে বেশ আনন্দেই কাটাল। তারপর একদিন বিকালে চন্দ্রা বন থেকে ফল আর জল আনতে গিয়ে আর ফিরল না।

বিকাল গিয়ে সন্ধ্যা হল, তারপর অন্ধকার হয়ে এল। তখনও চন্দ্রা ফিরল না দেখে পদ্মা বেরুল তার খোঁজে। সে দিদি, দিদি, চন্দ্রা, চন্দ্রা ডেকে ডেকে সমস্ত বন তোলপাড় করে বেড়াল সারা রাত ধরে কিন্তু কোথাও চন্দ্রার সাড়া পেল না।

সকাল বেলা সূর্য্য উঠলে হঠাৎ পদ্মা তার দিদির গলার মুক্তোমালার একটা মুক্তো দেখতে পেল। খানিক গিয়ে দেখল আর একটা মুক্তো পড়ে রয়েছে। এই ভাবে পর পর তিন-চারটে মুক্তো পেয়ে পদ্মা বুঝল তার দিদি এই পথেই কোথাও গিয়েছে।

আর খুব সম্ভব কেউ তাকে জোর করে নিয়ে নিয়েছে। কারণ পদ্মাকে না জানিয়ে তার দিদি কখনই কোথাও যাবে না। তাছাড়া ঝরণার ধারে দিদির হাতের জলভরা ঘড়া আর ফলের ঝুলিটাও ফলভরা পড়ে ছিল।

পদ্মা তখন সেই মুক্তো কুড়োতে কুড়োতে বনের শেষে এক নগরের রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারের সামনে এসে পৌঁছল। তোরণের সামনে ঢাল তলোয়ার হাতে সেপাই-শান্ত্রী দেখে তার প্রাসাদের ভেতর যেতে সাহস হল না। সে আবার বনের পথে ফিরে চলল।

খানিক দূর গিয়ে সে দেখল প্রাসাদের কাছাকাছি একটা বাগানে একটা কুঁড়ে-ঘর রয়েছে। সে ঘরে লোকজন কেউ নেই দেখে পদ্মা সেই ঘরেই রয়ে গেল। এখানে থাকলে তবু দিদির কাছাকাছি থাকা হবে। সেই বাগানে একটা বড় পদ্মপুকুরও ছিল। পদ্মা পদ্মফুল বড় ভালবাসত। কিন্তু দিনের বেলায় পদ্ম তুললে যদি কেউ বকে, এই ভয়ে সে রোজ ভোর রাত্রে গিয়ে পুকুরে স্নান করে জলের মধ্যেকার সব চেয়ে বড় পদ্মগুলি তুলে আনত।

এই বাগানের মালিক ছিল ঐ রাজ্যের ছোটরাজপুত্র কমলকুমার। সেও পদ্মফুল খুব ভালবাসত। রোজ পদ্মপুকুরে স্নান করে জলের সেরা পদ্মগুলি তুলে এনে সে নিজের ঘর সাজাত। কিন্তু কয়েক দিন ধরে সে দেখছিল জলের বেশীর ভাগ টাটকা ফোটা বড় পদ্ম কেউ রাত্রে তুলে নিয়ে যায়।

পর পর কয়েক দিন এই ভাবে তার প্রিয় ফুল চুরি যাওয়ায় কমলকুমারের খুব রাগ হল। একদিন রাত্রে সে বাগান পাহারা দেবার জন্য পুকুরের কাছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

পদ্মা তো আর রাজকুমারের পাহারার কথা জানে না। তাই সে যখন অন্যদিনের মতন স্নান করে জলের সেরা পদ্মগুলি তুলে পুকুরপাড়ে উঠেছে ঠিক তখনই কমলকুমার এসে তার হাত চেপে ধরল। বলল কে তুমি? রোজ রোজ আমার পুকুরের পদ্ম কেন চুরি করে নিয়ে যাও?

পদ্মা মনে মনে ভয় পেলেও মুখে সাহস করে বলল, তুমিই বা কে? এ পুকুর যে তোমার, তার প্রমাণ কি?

কমলকুমার বলল, আমি এ রাজ্যের ছোট রাজপুত্র কমলকুমার। চল তোমাকে ধরে রাজসভায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গেলেই বুঝবে এ পুকুর আমার কি না।

পদ্মা বলল, তাই চল। আমিও রাজামশাইকে বলবো, আমি তো কেবল ফুল চুরি করেছি। আর আপনারা আমার দিদি চন্দ্রাকে চুরি করেছেন। আমাকে যদি শাস্তি দেন তো আমার দিদিকে যে চুরি করেছে তাকেও শাস্তি দিতে হবে।

কমলকুমার অবাক হয়ে বলল, তুমিই তাহলে আমার বউদি চন্দ্রার ছোট বোন পদ্মা? বউদি রাজবাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত রোজ তোমার নাম করছেন। রাজ্যের সেপাই-শান্ত্রীরা বনে বনে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পদ্মা রাগ করে বলল, সেপাই-শান্ত্রী আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন? দিদির মতন আমাকেও জোর করে ধরে আনবে বলে?

কমলকুমার উত্তর দিলেন তোমার দিদিকে আমরা জোর করে আনিনি। ঐ বনে একটা রাক্ষস থাকতো। তোমরা যে বাড়ীতে ছিলে তার মালিক ঐ রাজ্যের রাজা, রাণী, রাজপুত্রদের আর সব লোকজন খেয়ে শেষ করে সে এসেছিল আমাদের রাজ্যে উপদ্রব করতে। তারপর আমার দাদার হাতে তীর খেয়ে সে আবার বনে পালিয়ে গিয়ে ঝরণার ধারে তোমার দিদিকে দেখে তাকে খাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার দাদা সে সময় রাক্ষসটাকে তাড়া করে বনে গিয়ে তাকে মেরে তোমার দিদিকে অজ্ঞান অবস্থায় রাজবাড়ীতে নিয়ে আসেন।

সকাল বেলায় তোমার দিদির জ্ঞান হলে তার কাছ থেকে তোমার কথা শুনে বাবা তখনই তোমাকে আনবার জন্যে বনে লোক পাঠান। কিন্তু সারা বন খুঁজেও লোকেরা তোমাকে পায়নি। তোমরা রাজকুমারী জেনে বাবা তোমার দিদির সঙ্গে আমার দাদা অমলকুমারের বিয়ে দিয়েছেন। এখন চল তোমাকে তোমার দিদির কাছে নিয়ে যাই।

তারপর? তারপর তো বুঝতেই পারছ দুই বোনে এক হয়ে কত সুখী হল। তাদের সেই আনন্দ আরও বেড়ে গেল যখন কমলকুমারের সঙ্গে পদ্মরাণীর বিয়ে হল টাক ডুমাডুম ডুম বাজনা বাজিয়ে আর সারা রাজ্যের প্রজাদের ভোজ খাইয়ে।

কিশোর-সাহিত্যে রোমাঞ্চ

শ্রীমতী ছায়া দেবী

সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি প্রধানত দুরকম উপন্যাস, নাটক, কবিতা এবং রম্য রচনা প্রভৃতি। তেমন ভাবে লিখতে পারলে রসোত্তীর্ণ ভ্রমণ কাহিনীও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু রোমাঞ্চকর গল্প বলতে আমরা যা বুঝি তাকে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলতে বোধ করি সব সমালোচকদেরই আপত্তি আছে। উচ্চশ্রেণীর গল্প ও উপন্যাসের তালিকা তৈরী করার সময় সযত্নে রোমাঞ্চকর গল্পগুলিকে বাদ দেওয়া আমাদের

এক বিশেষ অভ্যাসের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। এর উদাহরণও আমাদের চোখে প্রতি পদেই পড়ে।

রোমাঞ্চকর সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা শুধু ডিটেকটিভ গল্প কিন্তু ভালো ভাবে বিচার করলে বৈজ্ঞানিক রহস্যের গল্প এবং এ্যাডভেঞ্চারের গল্পকেও স্থান দিতে কারোর দ্বিমত হবে না। এ হিসাবে আমরা ওয়েলসের 'দি ফাষ্ট মেন ইন দি মুন,' 'দি ডোর ইন দি ওয়াল,' এম, আর জেমসের 'কাষ্টিং দি রুলস', আর এল ষ্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', উইলকি কলিনসের, 'উওম্যান ইন হোয়াইট' এসবকেই রোমাঞ্চকর সাহিত্যের শ্রেণীতে ফেলতে পারি! শেষোক্ত উপন্যাসটি একটি সফল সামাজিক উপন্যাসও বটে। কারণ যাতে মানবিকতা পূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করেছে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলতে দ্বিধা হয় না।

এবার রোমাঞ্চকর সাহিত্য সম্পর্কে জনমত কি রকম দেখা যাক। পাশ্চাত্য দেশে রহস্য-উপন্যাসের কাটতি দারুণ। কোনান ডয়েলের চেয়ে শার্লক হোমস অনেক বেশি বিখ্যাত। শার্লক হোমসের নামেও দেশের লোক পাগল। কেবল লেখা পড়েই ওদেশের জনসাধারণ এত উন্মাদ হয়ে পড়েছিল যে তারা শার্লক হোমসকে জীবিত দেখতে চেয়েছিল। এ সম্বন্ধে এত কৌতুককর গল্প আছে যে, তা রহস্য-উপন্যাসের আদর এবং লেখকের কৃতিত্ব সমভাবে এ দুইয়েরই প্রমাণ করে। অজানা রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল মানুষের চিরদিনের চিরকালের এবং এরই উপর ভিত্তি করে মানুষের এত কল্পনা-জল্পনা। তা ছাড়া ভৌতিক কাহিনীর একটা ছায়াময় অস্তিত্ব আছে, মানুষের জীবনে অন্ততঃ এক বারো একটা অদৃশ্য অশরীরী অনুভূতির অদ্ভুত সাড়া এসেছে এডোগার এ্যালেন পো এবং জেরোম কে জেরোমের কোন কোন রচনা এই কথারই স্বীকৃতি দেয়।

দূর দিগন্তে অসীম আকাশে, পর্ব্বতের পরপারে, মহা সমুদ্রের অতল গভীরে, তুহিন হিমমেরু-শিখার রৌদ্রদগ্ধ অগ্নিতপ্ত মরু-সাহারায় বালুঝড়ের আর্ত্তনাদে মানুষের মনে শুধু কাব্যের ঝঙ্কারই জাগায় নি জাগিয়েছে আরো কিছু। মানুষের একটা মন নিরন্তর কর্মকোলাহলে ব্যস্ত থাকতে পারেন তাই একটু ফাঁক পেলেই রহস্যের সন্ধান-পিয়াসী মন জাগ্রত হয়ে ওঠে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষের আর একটা ইন্দ্রিয় আছে, যেমন সুদূর লোক থেকে অজানা অলৌকিক রহস্য রোমাঞ্চকর সন্ধান এনে দেয়, ঐ ইন্দ্রিয় তারই পথপ্রদর্শক। শিশু ও কিশোরদের কল্পনাপিপাসু মন, অজানাকে একান্ত করে জানার আগ্রহ এ্যাডভেঞ্চারের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সর্ব দেশের সর্ব কালের শিশু কিশোরদের এ্যাডভেঞ্চার-পিপাসু মনকে তাদের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছেন (বহু ক্ষেত্রে বড়দের সাহিত্যেও) বহু খ্যাত অখ্যাত লেখকবৃন্দ। যাঁদের লেখা নিয়ে বলবার দিন আজ এসেছে। অহমিকার বশে পরিত্যাগ না করে সযত্নে সে সব রচনার আলোচনা হওয়া উচিত। রচনার নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, শব্দচয়নে শিশু কিশোরদের মনপ্রাণকে আকর্ষণ করবার জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও কম প্রচেষ্টা করেননি। কাজেই তাকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করবার অবজ্ঞা করবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ঘটেনি। কেউ কেউ বলতে পারেন এদেশ আর ওদেশ— অনেক তফাৎ। হতে পারে—কিন্তু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব পরিবেশ আছে, সে কথা ভুললে চলবে কেন? বাংলা দেশের শিশু সাহিত্যিকদের একটা বিশেষত্ব আছে যা অন্য দেশের রোমাঞ্চ সাহিত্যে কমই চোখে পড়ে, তা হল এই—আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ তুচ্ছ পরিবেশ থেকে ক্রমশ রহস্য-ঘন আবহাওয়া জাগিয়ে তোলা।

রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি আগ্রহ অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের কথা ছেড়ে দিলেও অসাধারণদের আগ্রহও এর প্রতি কম নয়। এ বিষয়ে আমরা বার্ট্রাণ্ড রাসেল, স্যার অলিভার লজ এবং চার্লস ডিকেন্সের উদাহরণ দিতে পারি। রাসেল বৃদ্ধ বয়সে নূতন করে ভৌতিক কাহিনী লিখতে সুরু করেছেন। চার্লস ডিকেন্স মৃত্যুর জন্য এমন একটি রহস্য-উপন্যাস অসম্পূর্ণ রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন যা নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃতি পেতে পারতো। এ ছাড়া আমাদের দেশের সম্বন্ধে অনুরূপা দেবীর হেমলক, শ্রীঅরবিন্দের অ্যাবলার্ডের দরজার কথাও বলতে পারি। আমাদের দেশেও রসসাহিত্যের চেয়ে রহস্যগল্পই বেশি কাটে, এ কথা সন্দেহ করলে ভুল হবে না হয়ত।

অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকাদের হাতে ঘোরে মোহন সিরিজ, যাকে মরিস লেবলাকের ব্যর্থ অনুকরণ বললেও দোষ নেই। খুবই বিমর্ষ হই একথা ভেবে যে আজকাল রহস্য সাহিত্য বলে আমাদের দেশে যা চলছে তার অধিকাংশই রাস্তায় ফেলে দেবার মত। কোথায় ওয়েলস আর জুলভার্ণ আর কোথায় শশধর দত্ত আর স্বপনকুমার! এ পর্য্যন্ত আমরা শিশু ও কিশোরদের জন্য রহস্য ও রোমাঞ্চ সাহিত্য বলতে যা পেয়েছি তার মূল্য বড় কম নয় কিন্তু এর মান দিনে দিনে আরও উন্নত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে এখনও আমাদের সুসাহিত্যিকের প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় রহস্যঘন মৌলিক গল্পেরও আজ খুব প্রয়োজন আছে। কারণ তা না হলে আজকের দিনে কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করবে না এবং সে গল্প হবে অচল।

অবশ্য আমাদের দেশে কোনান ডয়েল বা এইচ জি, ওয়েলস না থাকলেও একেবারে কিছুই নেই বলা চলে না। বৈদেশিক সাহিত্যে আমরা যেমন প্রতিভাধর লেখকের সমারোহ দেখতে পাই, এদেশেও তার কিছুটা একেবারে বিরল নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা এইচ জি ওয়েলস এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের তুলনা করতে পারি। অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ওয়েলস হতে পারেননি কিন্তু তিনি যে বাংলা কিশোর-সাহিত্যকে নূতন কিছু দিয়ে গিয়েছেন একথা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রকে উপজীব্য করে সব দেশের পাঠকদের যে কৌতূহল তা যথাসাধ্য নিবারণ করবার চেষ্টা করেছেন ও দেশের ওয়েলস এবং জুলভার্ণ। তাঁদের মত উন্নত সৃষ্টি করা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব না হলেও 'পাতালে পাঁচ বছর' 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' এবং 'ময়দানবের দ্বীপ' পড়লে মনে হয় তার পিছনে দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস দি আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরোর পরিকল্পনা দেখতে পাই। অনেকটা এই রকম ধরণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির পটভূমিকায় অভিনব ধরণের নূতন উপন্যাস 'ধূমকেতু'। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের এই উপন্যাসটির নূতন ধরণের উন্নত মানুষের এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভবিষ্যতে হয়ত অনুসরণ অসম্ভব হবে না। এইচ, জি ওয়েলসের 'দি আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো'তে যে নরপশুদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সৃষ্টি করা হয়েছে, অনেকটা তারই আভাস দেখতে পাই শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'রঙ্গিলা পাহাড়ের নীল কুঠি' নামে ছোটগল্পে। তবে ডক্টর মোরোতে যে নরপশুদের

নিয়ে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সৃষ্টি করা হয়েছে অনেকটা তারই আভাস দেখতে পাই শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের "রঙ্গিলা পাহাড়ের নীল কুঠি" নামে ছোটগল্পে। তবে ডক্টর মোরোর যে যুগান্তব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল পশুদের মানুষ করবার, তার সঙ্গে ডক্টর চিরঞ্জীবের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নামে মানুষদের নরপশু করে তোলার নৃশংসতাকে মিশিয়ে ফেললে ভুল হবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের যুগ্ম প্রচেষ্টা ওয়েলসের প্রতিভা খানিকটা বহন করে এসেছে। ফরাসী সাহিত্যিক জুলভার্ণ যে আদর্শ স্থাপনা করেছেন, বাংলা ভাষাতে তার স্থানে আমরা দু'জন মাত্র লেখকের নাম করতে পারি, একজন ৺কুলদারঞ্জন রায় এবং অপরজন ৺রমেশচন্দ্র দাস। এঁদের মধ্যে ৺কুলদারঞ্জন মৌলিক কাহিনী বিশেষ কিছু লেখেন নি অবশ্য। কিন্তু এঁর অপূর্ব অনুবাদ পড়তে পড়তে মনে হয় এ রকম সাবলীল সুন্দর অনুবাদ এবং নানা বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অনুসন্ধানী মনের সামনে নূতন জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

সাগরিকা, অজ্ঞাতদেশ এবং আশ্চর্য্য দ্বীপ পড়লে মনে হয় অনুবাদকদের প্রাণের সৃষ্টি ও মৌলিক প্রতিভা অনুবাদ রচনার সাথে মিশে রয়েছে। ঠিক এই রকম ধরণের প্রাণবন্ত লেখা পাই হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যের রচনায়, যদিও তা অনুবাদ নয়, তথাপি ওয়েলসের ক্ষীণ প্রভাব আছে মনে হয়, যাকে অনুসরণ বলা যেতে পারে। "মঙ্গল গ্রহে কারা থাকে" এই রচনাটির বিষয়বস্তুর চমকপ্রদ অভিনবতায় তিনি যে ভয়াবহ বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই আশ্চর্য্য! হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যের লেখা "কটা পৃথিবী," রীতিমত বিস্ময়ের এবং কৌতূহলের কারণ ঘটেছে। বাস্তবিক মহাশূন্যে, আমাদের সৌরজগতের বাইরে কত অজানা বিস্ময় লুকিয়ে আছে, তা জানার ইচ্ছে মানুষের চিরন্তন; এই রকম উপাদানে আরো লেখার দরকার। ওদেশে নূতন ধরণের বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখে এইচ, জি, ওয়েলস যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন এদেশে ঠিক তেমনি ভাবে সাড়া জাগিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যের কোন কোন রচনা। মহাসমুদ্রের অতল গভীরে, ভূগহ্বরের অপর পিঠে, গগনচুম্বী পর্ব্বত-শিখরে এমন কি পৃথিবী ছাড়িয়ে মানুষের মতই কোন বুদ্ধিমান জীব আছে কি না তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার শেষ নেই। বাস্তবধর্মী অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে কুলদারঞ্জন রায় এবং রমেশচন্দ্র দাসের তুলনা নেই। একদা 'রবিনসন ক্রুশো' ও 'সুইট ফ্যামিলী রবিনসন' পাঠক মহলে যে ঝড় তুলেছিল, সমাদৃত হয়েছিল বোধ হয় তার চাইতেও অদ্ভুত সুন্দর এদের রচনায় প্রাণসঞ্চার করবার ক্ষমতা। রমেশচন্দ্র দাসের নিজস্ব মৌলিক রচনাগুলিও তাঁর সুনাম বজায় রেখেছে। তাঁর লেখা 'পাতালনগরী', 'লাইট হাউস রহস্য' এবং 'আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে'। 'লাইট হাউস রহস্যে' বোর্ণিও দ্বীপের যে অপূর্ব বিবরণ পাওয়া যায়, তা সত্যই চোখের সামনে ওখানকার দৃশ্যপট উন্মুক্ত হয়ে যায়, তবে শেষ দিকের ঘটনাটি সন্নিবেশিত না হলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতো।

বিচিত্র ধরণের বৈজ্ঞানিক রহস্য এবং অভিযানের কথা বাদ দিলে বাকি থাকে ডিটেকটিভ ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। সাধারণ লোকদের এই ধরণের বই যত প্রিয় ক্ল্যাসিক্যাল নভেল ঠিক ততটা নয়। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এই ধরণের বই অনেক বেরিয়েছে, কিন্তু উন্নত ধরণের বই বেরিয়েছে খুব কম। যাঁরা এই ধরণের বই লিখেছেন, তাঁদের শীর্ষস্থানীয় হচ্ছেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

ও-দেশে রহস্য-সাহিত্যে অদ্বিতীয় হচ্ছেন ষ্টিভেনসন। 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'কিডন্যাপড' প্রভৃতি অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী লিখে এবং নিউ 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' প্রভৃতি রহস্য-কাহিনী লিখে তিনি তুলনাহীন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রহস্য-কাহিনীর লেখক বলা চলে। এ বিষয়ে দ্বিধার কোনও কারণ নেই, আমাদের দেশের সাহিত্যের মান বিচার করলে সহজেই হেমেন্দ্রকুমার রায়কে ষ্টিভেনসনের আসন দেওয়া যায়।

অবশ্য এর কারণ এই নয় যে, হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে ষ্টিভেনসনের লেখনভঙ্গীর কোন সাদৃশ্য আছে। তা নয়—এ তুলনার অর্থ পাশ্চাত্যে যেমন ষ্টিভেনসন অদ্বিতীয়, ঠিক তেমনি এ-দেশেও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সমতুল্য কেউ নেই। ১৩২৯ সালের মৌচাকে যখন হেমেন্দ্রকুমার 'যকের ধন' লিখেছিলেন, তখন সমস্ত বাংলা দেশে রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল, কারণ, এমন রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল উপন্যাস আর ছিল না। অবশ্য ওর অনেক আগে দীনেন্দ্রকুমার রায় 'লোহার বাক্স' লিখেছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা এমন ভাবে সমাদর পায়নি। যকের ধন এবং তার নায়ক বিমল ও কুমার সম্পূর্ণ ভাবে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়ালো। তাদের আগ্রহ চরমে উঠলো যখন 'মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন' এবং 'ময়নামতী'র মায়াকানন' লিখে তিনি আরো উন্নত ধরণের প্রতিভার পরিচয় দিলেন। যদি বুদ্ধদেব বসু বলেন যে এ-সব লেখার পেছনে বিদেশী হস্তক্ষেপ রয়েছে,—তবে সবিনয়ে বলা চলে যে—অনুবাদ-সাহিত্য কি প্রতি দেশের সব সাহিত্যেরই একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে নেই? আমরা কি তবে বার্ণার্ড শ'য়ের লেখা ছেড়ে আমাদের দেশের হিরণ বসুর লেখা পড়বো?

তাছাড়া হেমেন বাবুর লেখাকে শুধু মাত্র অনুবাদ বললে সত্যের অপলাপ হবে সুনিশ্চিত। হেমেন্দ্রকুমার প্রথম তিনখানা উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করলেও এর মধ্যে কাঁচা হাতের ছাপ অস্পষ্ট নয়। কিন্তু আবার 'যখের ধন' থেকে তাঁর হাতের রচনা একেবারে পাকা। আবার যখের ধন পড়তে পড়তে আমরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের পরিচয় পাই। তাঁর লেখা সূর্য্যনগরীর গুপ্তধন, যক্ষপতির রত্নপুরী, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর এই নৈপুণ্যকে ব্যাপক ক্ষমা ছাড়া কমাতে পারে নি।

তাঁর রচিত ডিটেকটিভ কাহিনীও অনবদ্য। "জেরিনার কণ্ঠহার" ও "জয়ন্তের কীর্ত্তি।" পড়তে পড়তে মনে হয় এ যেন ডিনা-মাইটাস্রের আরেক অংশ। "ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন" বইটিতে তিনি আমাদের মনকে রহস্যে ঘেরা পরিবেশের ভেতর দিয়ে চীনা, তাও ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রাণবন্ত-ভাব—নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের সমারোহ আছে। তাঁর রচনা পাঠকদের মনকে আত্মনির্ভরশীল ও সবল করে তোলে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ডিটেকটিভদ্বয় জয়ন্ত ও মাণিক নিঃসন্দেহে পাঠকদের হৃদয় জয় করেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশু-উপন্যাস মান্ধাতার

মুল্লুকে। এমন সফল রোমাঞ্চকর ট্র্যাজিডি বাংলা দেশে খুব বেশি নেই।

রোমাঞ্চকর সাহিত্যে ট্র্যাজিডি আরো অনেকেই সৃষ্টি করেছেন। শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের 'অভিশপ্ত' একটি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর করুণ উপন্যাস। কেবল এই একটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রলাল রায়কে কিশোর-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। উপন্যাসটির প্রথম দিক—ভাইবোনের যে উৎসাহদৃপ্ত অভিযান শূন্য পথে এরোপ্লেন নিয়ে,—তা বিশেষ করে পাঠিকাদের মনে সাড়া জাগিয়ে তোলে। ইরার সাহস, ধৈর্য্য এবং অদম্য উৎসাহ এবং রণজিতের ভগিনীস্নেহ, এবং অজয়ের আন্তরিক বন্ধুপ্রীতি মনকে আকর্ষণ করে। প্রথম দিকের একটা দিক এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, শোকার্ত্ত পিতামাতা যখন সন্তানদের সংবাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন সে সময়ও তাঁরা যে অদ্ভুত সংযম ও ভদ্রতা ও সুবিবেচনা দেখিয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে বাস্তব ক্ষেত্রে তা অনুকরণযোগ্য। উপন্যাসটির শেষ দুই পরিচ্ছেদে কল্পনাতীত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়,—অদ্ভুত একটা ভীতি-বিহ্বলতা মনকে আশ্রয় করে। এই রকম বিষয়বস্তু নিয়ে বোধ হয় আর কোন উপন্যাস বার হয়নি। মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর এই নামে ধারাবাহিক ভাবে উপন্যাসটি 'রামধনু'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের আবিসিনিয়া ফ্রন্টে, প্রলয়ের পথিক, আঁধার রাতে আর্ত্তনাদ, কামানের মুখে নানকিঙ প্রভৃতি অপূর্ব্ব ট্র্যাজিডি। রোমাঞ্চকর বীরত্বব্যঞ্জক বিয়োগান্ত উপন্যাস লেখাই শ্রীযুক্ত ধরের বৈশিষ্ট্য। বাঙালী যে কোথাও পিছিয়ে নেই জলে, স্থলে, রণক্ষেত্রে সে যে অসীম বাবণে এগিয়ে যেতে পারে বিশ্বমৈত্রীই তার মূল মন্ত্র। আমরা প্রেরণা পাই তাঁর লেখা থেকে। তবে ভারতবর্ষ, চীন দেশ এবং বৃটেনকেই মিত্রভাব পুরোভাগে দাঁড় করিয়েছেন এবং অনেকক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি ভেদে কালো তুলিকার ছাপ না দিয়ে কেবল দেশভেদেই দিয়েছেন। ঈষৎ প্রচারধর্মীর গন্ধ না থাকলে তাঁর উপন্যাসগুলির কয়েকটি তুলনাবিহীন বলা যেতো।

যাঁরা অভিযোগ করেন এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লিখতে গেলেই নায়কদের আফ্রিকাতে নিয়ে যাওয়া লেখকদের প্রধান দোষ। তাহলে তাঁদের বলবো, এর দুটো কারণ প্রথমতঃ বই পড়ার বিষয়ে তাঁদের অনুসন্ধানী মনের একান্ত অভাব, ভালো বই খুঁজে দেখবার অবসর তাঁদের নেই, দৈবাৎ হাতের কাছে পেলেন তো পড়লেন এবং তার থেকেই উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতার বিচার হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভুলে যান সমগ্র ভারতবর্ষে উপযুক্ত পটভূমিকার অভাব নেই, যার জন্য সব সময় অন্য দেশের পটভূমিকাকে ধার করতে হবে। বাংলা দেশের সুন্দর বন, আসামের জঙ্গল পাহাড়, পর্ব্বত, নাগপুর ও ছোট নাগপুরের জঙ্গল, হিমালয়ের পাদভূমি উপত্যকা ও অধিত্যকাগুলি, সমগ্র ভারতবর্ষে ছোট বড় অসংখ্য স্থান ছড়িয়ে আছে পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী, জলাভূমি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শুষ্ক মরুভূমি কোন কিছুরই অভাব নেই।

তাই এই ধরণের সমালোচকদের উচিত দেশীয় পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস ও গল্পগুলি পড়া, হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত অমাবস্যার রাত। 'কে' নামে ছোট গল্পটি, প্রশান্তের অগ্নিলীলা, ধীরেন্দ্রলাল ধরের যকের জঙ্গলে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের লাল কুঠি, ছিন্নমস্তার মন্দির, যতীন সাহার সোনার ঘড়া, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ডাকাতের হাতে ইত্যাদি। দেশী পটভূমিকায় লিখিত বই যে কত সুন্দর হতে পারে এই সব বইগুলিই তার প্রমাণ, অনুসন্ধান করলে এই রকম রচনা আরও পাওয়া যাবে। তাছাড়া ভালো রচনার জন্য পাঠকদের দাবী জানানো উচিত। তাঁদের আগ্রহ উৎসাহ পেলে সার্থক রচনা সৃষ্টিতে মনোযোগী হওয়া উচিত।

অত্যন্ত নীচুদরের সস্তার মারপ্যাচে পাঠকদের ভোলাবার চেষ্টা করেন এক শ্রেণীর লেখক, কিশোর-পাঠ্যের নামে কত যে অপাঠ্য চলে যায়। এবার ডিটেকটিভ প্রসঙ্গে আসা যাক ; এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের প্রশংসনীয় হুকা-কাশি সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় এখনও সত্যিকার ডিটেকটিভ গল্প হতে পারলো না। শুধু তার বিকৃতি চরমে উঠলো শিশু-সাহিত্যের কুপথ্যশালায়। দুঃখের বিষয় এ বিকৃতি আমরা দেখতে পাই বুদ্ধদেব বসুর নিজের রচনাতেই, কিশোর-সাহিত্যে রোমাঞ্চ আনার ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেননি। রহস্য ও রোমাঞ্চের নামে অসার বস্তুতে পাতা ভরেছেন, একঘেয়েমীর চূড়ান্ত। এ ছাড়া আর যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে স্বপনকুমার, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং রাধারমণ দাস ইত্যাদির রচনা নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। আগাছার মত বহু রচনার অভাব বাংলা দেশে নেই, কিন্তু তার কোন সার্থকতা আমরা খুঁজে পাই না। ভারতীয় মেয়েদের রহস্য-রোমাঞ্চ বা গোয়েন্দা কাহিনীর মাঝে অসার্থক ভাবে আনার কোন মানে হয় না। কেন না আজকালকার দিনের মেয়েরা এ্যাডভেঞ্চার বা গোয়েন্দাগিরিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অসমর্থ একথা বলতে চাইনা কিন্তু তাদের নিয়ে লিখতে গেলে যে কলাকৌশল সহজ সুন্দর রসসৃষ্টি করা দরকার, সে ক্ষমতা এদের লেখনীতে নেই। কিশোর সাহিত্যে রহস্য ও রোমাঞ্চকর পরিবেশে মেয়েদের এগিয়ে আনা বড় সহজসাধ্য নয়। এ বিষয়ে প্রকৃতই আগ্রহ, ও কৌতূহল জাগিয়ে রাখার মত শ্রেষ্ঠ রচনা প্রবোধচন্দ্র ঘোষের 'আজও তারা ডাকে', পড়ার পড়েও সহজে ভুলতে না পারার মতো রচনা সার্থক সৃষ্টি। সুমিতা ও চন্দ্রার চরিত্র যেভাবে রহস্যঘন পরিবেশের মধ্যে আনা হয়েছে তাতে লেখকের যে রকম নিপুণতা প্রকাশ পায় তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর একটি নারী-চরিত্র মিসেস ডিক্রুজ, অদ্ভুত রহস্যময়ী মহিলা মিসেস ডিক্রুজ পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ থাকবে, "বাইরের ঝড়-জলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে উঠলেন মিসেস ডিক্রুজ" পড়লে মনে থাকবে। যদিও এটা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি "রংমশালে" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আশা করা যায় রচনাটি বই হিসাবে বার হ'লে জনপ্রিয়ও সমাদৃত হবে।

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, রহস্য-ঔপন্যাসিক। কিন্তু সত্য বলতে কি, একমাত্র কালো ভ্রমরই তাঁর সার্থক সৃষ্টি। এই রকম কিশোরপাঠ্য উপন্যাস আর তাঁর খুব কমই আছে। "নাগপাশ" অপর একটি ভালো রচনা, সম্ভবতঃ অনুবাদ, তবুও রসোত্তীর্ণ। এই রকম আর দু-একটা ছাড়া আর সবই কিশোরদের অপাঠ্য। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কিশোরপাঠ্য (কোন কোন ক্ষেত্রে বড়দেরও) রহস্য-ঔপন্যাসিক বলে মানতে দ্বিধা হয়।

তাঁর লেখার কিরীটি গোয়েন্দাকে নাইট ক্লাবের গোয়েন্দার বাসিন্দা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে প্রকৃত ভালো উপন্যাস তুলে দিয়েছেন স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিদীপ্ত রচনা একমাত্র তাঁরই হাত দিয়ে বার হয়েছে। ৺মনোরঞ্জন যে কি রকম রসিক ছিলেন তা তাঁর অবিস্মরণীয় গোয়েন্দা হুক-কাশির নাম শুনলেই বোঝা যায়। কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস ও মনোরঞ্জনের মূলগত সুরটুকু এক। সেইজন্য কোন কোন পাঠক তাঁর "ঘোষ চৌধুরীর ছবি" উপন্যাসটির সঙ্গে কোনান ডয়েলের "সিক্স নেপোলিয়নের" টেকনিক সাদৃশ্য আছে মনে করেছিলেন। কিন্তু এ রচনা দুটি পাঠক মাত্রই জানেন, এ সন্দেহ আসলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অতি সুন্দর মাধুর্য্যপূর্ণ সহজ ভাষায় লেখা তাঁর প্রত্যেকটি রচনা। আজগুবি, গাঁজাখুরী খুন-জখম, গোয়েন্দার অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অবিশ্বাস্য ঘটনা অথবা গভীর সমুদ্রের মাঝে পড়ে গিয়েও নায়ক বেঁচে যায়, উড়ন্ত প্লেন থেকেও নায়ক অক্ষত দেহেই নেমে আসে, গায়ে পর পর সাতটা গুলী লাগলেও নায়ক গোয়েন্দার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, এ রকম লোমহর্ষক ঘটনা—অর্থাৎ সস্তার মারপ্যাচ নেই কোথাও, কিন্তু তবুও কি রকম পরিচ্ছন্ন কৌতূহলোদ্দীপক তাঁর প্রত্যেকটি রচনা!

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অদ্ভুত বুদ্ধি-চাতুর্য্য এবং কথন-কৌশল। তাঁর প্রথম উপন্যাস "পদ্মরাগ" এই উপন্যাসটিতে কে যে প্রকৃত অপরাধী তা কল্পনা করা প্রায় দুঃসাধ্য! অথচ শেষ পর্য্যন্ত পাঠকমনকে সমান আগ্রহে এগিয়ে নিয়ে চলেন। তাঁর রচনার নূতনত্ব জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে—এটা যে কত বড় সফলতা তা এক কথায় বলা যায় না। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "সোনার হরিণে"র অপরাধী যে মিঃ বাসু তা বলে না দিলে ধরা প্রায় অসাধ্য। পাঠকমনকে যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে মস্তিষ্ক চালনার সুযোগ দিয়েছেন লেখক। কিন্তু মনোরঞ্জন যে ততটা জনপ্রিয় হতে পারেননি তার কারণ তাঁর লেখা নিয়ে আন্দোলন করার মত প্রকৃত সমালোচকের অভাব। অতি অল্পবয়সে তিনি যা দিয়ে গেছেন তাঁর স্থান পূরণ করবার মত খুব কম শিশুসাহিত্যিক আজ আছেন। যাঁরা তাঁর রচনা পড়েছেন তাঁরাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত।

এর পরে আরো কয়েকজন কুশলী লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার নাম উল্লেখ করতে চাই, সেগুলি উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা কাহিনী, কিশোরদের হাতে তুলে দেবার মতই। বিশেষ করে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের জয়-পরাজয়, বিজয় অভিযান, রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার; হেমেন্দ্রকুমারের বিভীষণের জাগরণ, রাত্রির যাত্রী, অন্ধকারের বন্ধু, সুকুমার দে-সরকারের হানাবাড়ী এবং মনটা হু হু করে। প্রকৃত পক্ষে সুকুমার দে-সরকারের লেখা মনটা হু হু করে, একটা প্রশংসার যোগ্য আকর্ষণীয় লেখা, তাঁর রচনা পড়লে অণুমাত্র সন্দেহ থাকেনা কিশোর-সাহিত্যে লেখক একজন শক্তিমান রহস্যোপন্যাস লেখক। এখানে বলতে ভুলে গিয়েছি, ছোটদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, জগকনন্দা সিরিজ এবং প্রহেলিকা সিরিজে অনেক নূতন ধরণের গোয়েন্দা কাহিনী এবং রোমাঞ্চ কাহিনী বেরিয়েছিল; বলা বাহুল্য এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কারণ প্রথমোক্ত সিরিজ দুটি থেকে অনেকগুলি এবং শেষোক্ত সিরিজ থেকে দু'-তিনটে ভাল বই পাওয়া যায় যা প্রশংসার যোগ্য।

অতি উত্তম না হলেও কিশোরপাঠ্য রহস্য ও রোমাঞ্চকর যে কয়েকখানি ভালো বই আমরা পাই এই সিরিজে তিনটির থেকে তার মধ্যে কয়েকখানি হয়ত অনুবাদ, কিন্তু তবুও তা প্রশংসার যোগ্য। এর মধ্যে আমরা হেমেন্দ্রকুমারের সুন্দরবনের রক্তপাগল, কুমারের বাঘা গোয়েন্দা, রক্তপুরের যাত্রী, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের সকলের হিমালয়, সুবোধকুমার দাশগুপ্ত জীবনের মেয়াদ, শেষ নিঃশ্বাস ইত্যাদি। এই সিরিজ ছাড়াও আরো কয়েকখানি সুখপাঠ্য বই-এর নাম করা যেতে পারে। সুকুমার দে-সরকারের হলুদকুঠি, নিশাচর, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের আফ্রিকার জঙ্গল, হেমেন্দ্রলাল রায়ের দুর্গম পথের যাত্রী, সুবোধচন্দ্র মজুমদারের পাতালপুরী ইত্যাদি। ছোটদের মনকে আকর্ষণ করবার মতই লেখা এগুলি। ছোটদের জন্য লিখতে গেলে কল্পনার মাত্রা সহজ সুন্দর স্বাভাবিক হওয়া চাই।

আমরা ছোটদের রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি যথা—বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় কোন বৈচিত্র্যময় অভিযান বা রহস্যজনক আবিষ্কার। নানারকমের অভিনব পদ্ধতির গোয়েন্দা কাহিনী, তৃতীয়তঃ প্রেততত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নানা রকম ভৌতিক কাহিনী। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে যাই লেখা হোক, আন্তরিকতার স্পর্শ না থাকলে সবই অচল। উপযুক্ত ছোটদের কাহিনী বড়দের মনকেও আকর্ষণ করে। যথার্থ রসোত্তীর্ণ ভৌতিক কাহিনীগুলির আদর বড়দের কাছেও কম নয়। নানা রকম বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় লেখা গল্প এবং গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়াও কিশোর-সাহিত্যে আর একটা বিশেষ স্থান অধিকার আছে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর ভৌতিক কাহিনী। অন্যান্য ভৌতিক কাহিনী লিখে ওদেশে ব্রায়াম ষ্টোকার যদিও ততটা খ্যাতি পাননি তবুও তাঁর ড্রাকুলা যে সারা বিশ্বে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসটির চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়েছে, নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন লন চ্যানী। অবশ্য ড্রাকুলা উপন্যাস ও তার চিত্ররূপের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বসাহিত্যে যতগুলি ভৌতিক কাহিনী রচিত হয়েছে, তার মধ্যে ভীষণতম উপন্যাস এই ড্রাকুলা। একে শ্রেষ্ঠতম বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

বাংলা ভাষার মূল ভৌতিক কাহিনী বলতে আমরা ভূত, পেত্নী, শাঁকচুন্নী দেড় মামদো এবং ব্রহ্মদৈত্য বা ব্রেহ্মদত্যির কথাই, এছাড়া আর কিছুই পাই না। বিশুদ্ধ ভৌতিক কাহিনী অতি চমকপ্রদ ভাষায় বর্ণিত হলে মনকে তা কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখবেই। বাংলা দেশের শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই ভৌতিক রসের নামে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। ভৌতিক কাহিনীর মধ্যেও এমন একটা বাস্তব অথচ ভয়ানক আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার যাতে পরিবেশটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রেততত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এদেশে ও ওদেশে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে, যেগুলি রহস্যময় পটভূমিকায় বাস্তব অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, সেইগুলি যথার্থ সার্থক হয়েছে, সত্য হোক মিথ্যা হোক ভৌতিক কাহিনীর যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মৃত্যুর পরেও যে কিছু আছে এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই, এক দিকে

যেমন পুনর্জন্মবাদ—আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে, অপর দিকে ঠিক তেমনি প্রেততত্ত্ববাদ—অশরীরী প্রেতাত্মা এমন কি শরীরী প্রেতেরও সৃষ্টি হয়েছে।

যে দিব্য অনুভূতি মানুষকে ভগবানের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়, সেই অনুভূতিই মানুষকে জাগিয়ে দেয় আমাদের চার পাশে অদৃশ্য অলৌকিক রহস্যময় কিছু আছে। মানুষ মরে গেলেও তার ইচ্ছাশক্তির কাজ করে, কোন কোন মানুষের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে, দূরাগত বিপদের আভাস তারা বুঝতে পারে, মানুষ না থাকলেও তার ছায়াময় অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, অতৃপ্ত বাসনা কামনা হয়ত তা অতি ভয়ানক, কেউ কেউ তা চরিতার্থ করতে চায় অপরের ওপর নিজেকে আরোপ করে। নানা রকম বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে যে সমস্ত ভৌতিক কাহিনী রচিত হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত লেখাগুলিই শ্রেষ্ঠতম। যদিও তাঁর কয়েকটি বই ড্রাকুলার খণ্ডাংশের অনুবাদ তবুও তার মধ্যে মৌলিকতার অভাব নেই, নিতান্তই প্রাণহীন আড়ষ্ট অনুবাদ নয়। তাঁর কিশোরপাঠ্য রচনাগুলির মধ্যে যে লিপি-কুশলতা আছে তা অতি অদ্ভুত! তাঁর লেখা বিশালগড়ের দুঃশাসন, মোহনপুরের শ্মশান, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ এবং ঐন্দ্রজালিক পড়লে চমৎকৃত হই। অনুবাদ হলেও ড্রাকুলার সঙ্গে বিশালগড়ের দুঃশাসনের পার্থক্য আছে যথেষ্ট, মিলিয়ে পড়লেই সে কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

'বিশালগড়ের দুঃশাসনে'র ভাষা এবং ঘটনা-বিন্যাস পাঠককে বিস্মিত করবার মত। বিনয় যখন বিশালগড় অভিমুখে রওনা হচ্ছিল, সেইখানটা অথবা রাজা প্রতাপচন্দ্রের ঘরে গিয়ে বিনয় যা দেখলো অথবা অবিনাশ বাবু যখন বিনয়কে প্রায় মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় গণ্ডির ভেতরে টেনে আনলেন তখন, তখন পাঠককেও ভীত, বিস্মিত এবং চমকিত করে। হেমেন্দ্রকুমার রায় কৃত শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস বলা চলে 'মানুষ-পিশাচ'কে। কারণ 'মানুষ-পিশাচে'র কাহিনীর বিন্যাস, অত্যাশ্চর্য্য ভাষার খেলা এবং ভৌতিক অংশ সমস্তই অতুলনীয়। এরকম অদ্ভুত লিপিচাতুর্য্য সাধারণতঃ কোন ভৌতিক কাহিনী রচনায় দেখা যায় না। ভয়াবহ অপরাধী নবাব ও তার ছয়জন প্রেত অনুচরের কথা যে একবার পড়েছে, সে কখনোই ভুলে যাবে না। 'মানুষ-পিশাচে'র কাহিনীর মধ্যে 'ড্রাকুলা'র একটা অস্পষ্ট আভাস আমরা অনুভব করি। যদিও কাহিনীর জোর 'বিশালগড়ের দুঃশাসনের'ই বেশি। তবুও রচনা-দক্ষতার জন্য প্রথম স্থান 'মানুষ-পিশাচে'র।

এ ছাড়া হেমেন বাবুর আরও তিনখানি বই 'সন্ধ্যার পরে সাবধান', 'রাত্রে যারা ভয় দেখায়' ও 'যাদের নামে সবাই ভয় পায়' ছোট ছোট ভৌতিক কাহিনীতে পূর্ণ। এগুলির মধ্যে 'বাজলে বাঁশী কাছে আসি' ও 'মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে শেষোক্তটি 'ড্রাকুলা'র খণ্ডাংশের অনুবাদ। হেমেন বাবুর ভৌতিক কাহিনীর প্রত্যেকটাই উল্লেখযোগ্য। 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ' অদ্ভুত রচনা! এরকম ভৌতিক করুণ রচনা প্রায় দুর্লভ! যে কোন কারণেই হোক মানুষ খুন করে যারা প্রেত-পাহাড়ের উপত্যকায় বাস করে তার এবং বংশধরদের আর কোন কারণেই রেহাই নেই। পড়ার পরেও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে এই রচনাটি। আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, দৃশ্যতঃ অথবা অদৃশ্যতঃ 'ড্রাকুলার' প্রভাব নিয়ে যত বেশি ভয়াবহ রসোত্তীর্ণ গল্প লেখা সম্ভব হয়েছে আর কোনটিই তত নয়। এই জন্যই আমরা ব্রাম্‌ষ্টোকারকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।

ড্রাকুলার প্রায় হুবহু অনুবাদ শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিদেহী আত্মা'। 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' এবং 'বিদেহী আত্মা' মিলিয়ে পড়লেই 'বিদেহী আত্মা'কে অনেক উঁচুতে স্থান দিতে হয়। অনেক বেশি ভয়াবহ চিত্তাকর্ষক ঘটনা 'বিদেহী আত্মা'তে পাই। 'বিদেহী আত্মা'র মৃত্যু-তুহিনতা, রাজা কৃতান্ত বর্মার অদ্ভুত ভৌতিক-বিজ্ঞান প্রায় স্তম্ভিত করে দেয়। এই লেখকের লিপিচাতুর্য্য তত টা প্রখর না হলেও নিঃসন্দেহে তাঁর 'বিদেহী আত্মা' যে কোন ভৌতিক উপন্যাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা চলে কাহিনীর দিক থেকে। 'বিদেহী আত্মা' পড়লে মনে হয়, কাহিনীর জোর অত্যন্ত বেশি বলেই বইটি যথার্থ প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই অদ্ভুত লোমহর্ষক উপন্যাসটি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি 'রামধনু'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই লেখাই প্রমাণ করে দেয়, লেখক ইচ্ছা করলে বিদেশী সাহিত্য থেকে অতি উৎকৃষ্ট ভৌতিক কাহিনী কিশোরদের জন্য উপহার দিতে পারেন এবং এতেই কৃতকার্য্য হবেন।

এ ছাড়া ছোটদের জন্য আরো কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বই-এর নাম করা চলে, যথা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অসম্ভব', এই বইয়ের গল্পগুলিতে যথার্থ ই লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় আছে। ছোটদের জন্যে ইনি যা লিখেছেন, তা প্রকৃতই সুন্দর রচনা। কিন্তু ষ্টোকারের প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে উন্নত ধরণের অতি সুন্দর সাবলীল ভাষায় রচিত শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক কাহিনীগুলি। তাঁর রচিত কাশী কবিরাজের বিপদ, "দুটি মস্তর" প্রভৃতি গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই ক্ল্যাসিক। বিভূতিভূষণের প্রত্যেকটি পাতায় যে অশরীরী পরশ রয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। "আরক" গল্পের বাস্তবিক তুলনা নেই। গভীর রাতে চাঁদের আলোয় আকাশপরীরা যখন জল খেতে নেমে আসে, তখন সে দৃশ্য যে দেখে সে আর আপনাকে ধরে রাখতে পারে না! এমন উন্নত ধরণের ছোট গল্প খুব বেশি পড়া যায় না। বিভূতিভূষণের ভৌতিক গল্পে কেমন একটা সকরুণ ভাব দেখা যায়, মৃত আত্মা সে-ও গিয়েও এপারকে ভুলতে পারে না তাই সে নিয়ত মানুষকে ওপারের ডাক দেয়। শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "মর্ম্মর" এমনই একটি 'সকরুণ রহস্যময় গল্প, "আরক" ও মর্ম্মরের পেছনে "ক্ষুধিত পাষাণের" প্রভাব আছে মনে হয়।

বড়দের সাহিত্যে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর রচনা লিখে যারা বাংলা সাহিত্যকে প্রকৃতই উন্নত করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কিশোর-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে বসে বড়দের সাহিত্যে রোমাঞ্চ ও রহস্য নিয়ে আলোচনা ভালো দেখায় না। পরে স্বতন্ত্র ভাবে করবার ইচ্ছা রইল। যদিও দীনেন্দ্রকুমারের অনেক রচনা এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন রচনা কিশোরপাঠ্য হিসাবেও অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এরা কেবল মাত্র বড়দের জন্য লিখেছেন বলেই সে সব রচনার নাম এখানে উল্লেখ করলাম না।

পিয়ার্স
...সুন্দরী
নারীদের
ঐতিহ্য
PEARS
TALCUM
PEARS
TRANSPARENT
SOAP
"পিয়ার্স" নামটী সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়ার্সে
তাদের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়ার্স সাবানের সাহায্যে
তাঁদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়ার্স আসল
গ্লিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিশুদ্ধ এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম পিয়ার্স ট্যালকম
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিশুদ্ধতা।
আপনার সৌন্দর্য্য
চর্চায় নিয়মিত
পিয়ার্স ব্যবহার করুন

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১

তিপ্পান্ন নং রেজিমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার ইভান্স। দীর্ঘ দেহ। একহারা গড়ন। পঁচিশ বছর বয়সের তুলনায় যেন একটু বালক ভাব আছে চেহারায়। বিশেষতঃ দুই চোখের দৃষ্টিতে আছে একটা বিস্ময়ের ভাব। যেন বুঝতে চেয়েও বুঝতে পারছে না কিছু মানুষটি। ঈষৎ বিব্রত ভাব, কুণ্ঠিত একটা মিনতির ব্যঞ্জনা এখনও ইভান্সের মধ্যে দেখা যায়, যা দেখে অন্যান্য সাহেবরা বিদ্রূপ করেন। তাঁদের মনে হয় মানুষটা দুর্বল চরিত্রের। দুর্বল হোক না হোক, সে যে কিছুটা স্বল্পভাষী ও স্বপ্নদর্শী তাতে সন্দেহ নেই। আর এখনও তার এ দেশ সম্পর্কে অনেক কৌতূহল অনেক জিজ্ঞাসা আছে মনে। সেটাও তাঁদের কাছে কম আশ্চর্য বোধ হয় না। আফগান ও পাঞ্জাব ফেরৎ পাকা জঙ্গী বুড়োরা ইভান্সকে বোঝাতে ছাড়েন না—ওহে স্বপ্নদর্শী, এ দেশটার মাটিতে সোনা-রূপো ছড়িয়ে নেই, আর কলকাতার পথে ঘাটে বাঘ সাপ যোগী সাধু কিলবিল করছে না। এ নেহাৎই একটা জায়গা। বুদ্ধি থাকলে পেট আর ট্যাঁক দুই-ই তোমার ভরবে। আর নেটিভগুলোকে দুইশো হাত তফাৎ রেখে চলবে। ওদের অসভ্য পোষাক, বাঁদুরে ভাষা আর আমাদের সম্পর্কে উদ্ভট আজগুবী সব ধারণা—সবগুলোই দূরে রেখে চলা উচিত। কি ছিলো এ দেশে বল ? সবই তো আমরা এসে শেখালাম। ভিখারী, নেহাৎ ভিখারী এরা। এদের সঙ্গে মিশেছ কি মরেছ।

কিন্তু বুঝেও বোঝে না ইভান্স। হাজারটা শেখানো কথাও তার মনে থাকে না। আর একটা কথা সে কারুকে বোঝাতে পারে না। নিজের সম্পর্কে তার নিজেরই খানিকটা বিভ্রান্তি রয়েছে। জ্ঞান থেকে তার যতটুকু মনে পড়ে, সে যেন সর্বত্রই বেখাপ্পা। নিজে যেন সেই প্রবাদবাক্যের চৌকো পেরেক, যে কোনও গোল গর্ত্তেই খাপ খায় না। আরো কি, সমস্ত দোষগুণ আর অসঙ্গতি ক্ষমা করে তাকে গ্রহণ করবে এ রকম কোনও মনের মানুষ দূরে থাক, কোন বন্ধুও সে পায়নি। ঐ রকমই দাঁড়িয়ে গিয়েছে তার চরিত্রের আদল।

তবে বিঠুরের প্রাসাদে এক পৌষালী সন্ধ্যায় চম্পাকে দেখে ভালো লেগেছিল তার। শুনলো সে মেয়ে কানপুরে থাকে। মেয়েটিকে দেখে ভাল লাগলো তার। আর মনটা যেন ঈষৎ উত্তপ্ত হলো। টমশন ও ফ্রেডরিক প্রমুখ বন্ধুরা অবশ্য উপদেশ যা দিলো তা বন্ধুজনেরই মতো। বললো—এ সব কাজ করে এমন বুড়ো মেয়েছেলে পাবে অনেক। পাঠিয়ে দাও একটাকে ক'টা টাকা বা গয়না দিয়ে। ভজে যেতেও পারে। তবে আমি বলি বন্ধু, ঐ আলগা আলগা করে যাওয়া-আসাই ভালো। বেশী জড়াতে গেলে ব্রাইটের মতো ফেঁসে যেতে হবে।

আর একজন বললো—ব্রাইট হলো হাফনেটিভ। আর যা-ই বলো ব্রাইট পুরুষ বাচ্চা। মেয়েটাকে শায়েস্তা করে রেখেছে। ফৈজাবাদের কালেক্টর কি ক্যাপ্টেন নক্সের মতো একেবারে সবটুকু বিকিয়ে দেয়নি।

মাতৃভূমি আর এই দেশের মধ্যে যেমন সাত সাগরের তফাৎ, নোণাজলের ঢেউ খেয়ে খেয়ে আইন-কানুনও পালটে গিয়েছে এদের কাছে। স্বদেশে এবং এখানে শ্বেতাঙ্গিনীদের সম্মান রাখবার জন্য আজও জানকবুল আর মানকবুল রাখতে প্রস্তুত আছে টমসন ফ্রেডরিক, ইভান্সরা। কিন্তু এ দেশের মেয়েদের দরকার হলে দোর বন্ধ করে বাংলো ঘরে চাবুক দুই-এক ঘা মারতে দোষ নেই। প্রশ্রয় দিলেই এরা মাথায় চড়ে বসবে।

সে বিষয়ে মতবিরোধ হয় না। তবু টাটকা আমদানী ইভান্স চট করে অতখানি অধিকার জাহির করবার কথা ভাবতে পারে না। এই দুনিয়াতে তার অবাধ অধিকার থাকতে পারে কোন বিষয়ে এ কথা ইভান্স ভাবতে পারে না।

থিওডোর এফ ইভান্স পঁচিশ বছর আগে কোথায়, কোন পরিবারে কোন মায়ের কোলে জন্মেছিলো, তার মনে নেই। তার চেতনা যতদূর যায়, মনে পড়ে একটা উঁচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলটা যে তার শিশুমনকে শৈশবে কয়েদ করে রেখেছিলো। আর আজ সে কথা মনে করতে গেলেই মনটা গুটিয়ে যায়। থেমে যায়। না হয় থাক। ঐ পাঁচিলটার ওপারে স্যাঁৎসেঁতে একতলা ঘরে লোহার খাটে বসা একটা রোগা ছোট্ট ছেলের কথা মনে করে কাজ নেই তবু মনে হয়। মনে হয় সে ছোট্ট ছেলেটার বয়স হবে নয় কি দশ সুপারের চড়ের দাগ গালে লাল হয়ে ফুটে রয়েছে। আর চোখে জল চিকচিক করছে। মনে পড়ে ছেলেটাকে শাস্তি দিয়ে অনাথাশ্রমের সুপার সে দিনকার মতো উপোসী রেখেছেন। আর ওপারে দাঁড়িয়ে সুপারের প্রিয়পাত্র একটা নিষ্ঠুর ছেলে, বয়স হয়তো তের কি চোদ্দ, চেহারা বেশ বলিষ্ঠ—পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে একটা আপেল কামড়াচ্ছে। রোগা শাস্তি পাওয়া ছেলে মুখ তুলেও দেখছে না। দুনিয়ার অবিচার আর অত্যাচারে মন তার ভোঁতা হয়ে গেছে। মনটা দিয়ে সহস্র সূচীমুখে র পড়ছে।

শৈশবে যার বাপ মা মরে গিয়েছে, আর জন্ম থেকেই যে অনাথাশ্রমে মানুষ, সেই বাচ্চা থিওডোর তখন শুধু একটা কথাই ভাবতো। ভাবতো, যে এমন কি কেউ নেই যে তাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে? এই পাঁচিলঘেরা বাড়ী, সুপারের থেকে সুরু করে প্রত্যেকের হাতে মার খাওয়া, জলের মতো সুপ আর শক্ত কালো রুটি খেয়েই কি তার দিন কেটে যাবে? মনে হতো কিছু ছেলেকে তার আত্মীয় স্বজন এসে নিয়ে গিয়েছেন। কেউ বাইরে পালিয়ে গিয়ে রুজি-রোজগার করছে। মনে হতো এর চেয়ে কয়লার খনিতে কাজ করা বা চিমনী সাফ করাও ঢের ভাল।

এই ছিলো জীবন। আর প্রত্যেক দিন ঘুমোবার আগে এই জীবনের জন্যেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হতো। বলতে হতো Hallowed be thy name.

হে ঈশ্বর, তোমার নাম জয়দীপ্ত হোক। জয়দীপ্ত হোক হে করুণাময় ঈশ্বর এই স্যাঁৎসেঁতে ঘরে শীতে ঠাণ্ডা বিছানা আর পাতলা সস্তা গরম শার্টের জন্য, জ্বর ও কাশিতে মরে যাওয়া ছোট ছোট কফিনে শায়িত বালকদের জন্য, কদর্য চরিত্রের বর্ব্বর চাকরদের হাতে বিবিধ নিত্য-নূতন অত্যাচারের জন্য। জয়দীপ্ত হও তুমি।

হঠাৎ সম্ভব হলো স্বপ্ন। মুক্তি এলো থিওডোরের জীবনে। থিওডোরের মা সঙ্গতিপন্ন এক কাপড়ের ব্যবসায়ীর মেয়ে হয়েও পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিলেন তার বাবাকে। বাবা নেহাৎই সঙ্গতিহীন। এক জমি কেনাবেচা দালালের সহকারী ছিলেন তিনি। তার মায়ের পিসীমার ছিলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কিছু শেয়ার। থিওডোরের এগারো বছর বয়সে একদিন সেই মহিলার তরফ থেকে খোঁজ এলো। তাঁর নোটারী পাবলিকের তরফ থেকে। ভায়োলেটের ছেলের জন্য কিছু করতে চান তিনি। শিক্ষাদীক্ষার খরচ বহন করতে চান।

অনাথাশ্রম থেকে লণ্ডনের উপকণ্ঠে এক স্কুল। ভদ্রমহিলার ধারণা ছিলো ইঞ্জিনীয়ার করবেন থিওডোরকে। তাঁর আশানুরূপ হয়ে উঠতে থিওডোর ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তিনি ছিলেন বাতিকগ্রস্ত এবং খুঁৎখুঁতে। আহার পরিচ্ছদ বা শিক্ষাদীক্ষায় তিনি কার্পণ্য করতেন না। যদিচ বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। তবে অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ে তাঁর জেদ দেখা যেতো। চেয়ারের সোফায় তিনি শাদা ঢাকনী দিয়ে রাখতেন। হেলান দিয়ে বসলে তিনি চটে যেতেন। পিঠসোজা করে বসে থাকতে পারেননি, বা হেলান দিয়ে বসেছেন, এই সব কারণে ঝি ও রাঁধুনীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হতো। তা ছাড়া অনাথাশ্রমের জন্যে উলের মোজা বোনা তাঁর অন্যতম বাতিক ছিল। বছরে দুবার করে তিনি একশো জোড়া মোজা দান করতেন অনাথাশ্রমে। আর সেই উলের কাঁটায় মরচে পড়লে বা হারিয়ে গেলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। তিনি কুকুর পুষতেন না। বেড়ালের ওপর ছিল তাঁর টান। এবং বেড়ালকে তিনি কুকুরের মতো চেনে বেঁধে বেড়াতে বেরুতেন। তাঁর বিবিধ বাতিক সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করলে তিনি রেগে যেতেন।

পুরুষজাতি সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস এত প্রবল ছিল, যে বাড়ীতে বেড়াল বা পাখীও পুষবার সময়ে তিনি সময় দেখে কিনতেন।
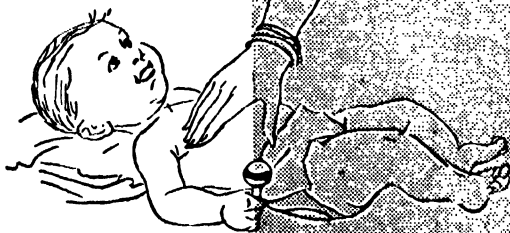
থিওডোরকে কেমন করে যেন একটু স্নেহ করে ফেলেছিলেন। লীডস-এ পাঠাবেন ইঞ্জিনীয়ারদের স্কুলে পড়তে সব ঠিক করেছেন। সহসা আবিষ্কার করলেন থিওডোর কবিতা পড়ে ও লেখে।

সঙ্গে সঙ্গে থিওডোরের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। তাড়াতাড়ি পাঠালেন তাকে লীডস-এ।

দুই বছর বাদে যখন ফিরলো সে, তখন সে লম্বা হয়েছে অনেক। বেশ ঝাড়াঝাপটা চেহারা।

মহিলার মনে হলো, বাড়ীতে এই একজন পুরুষের নিরন্তর উপস্থিতি তাঁর পক্ষে নেহাৎ অসহ্য। খোঁজ করে তাকে পাঠালেন কয়লাখনিতে চাকরী দিয়ে।

কিন্তু নিজেকে মানাতে পারল না ইভান্স। ইঞ্জিনীয়ার সে নামে-ই। আসলে মালিক চায় যে সে জবরদস্ত লোক। কাজ আদায় করুক। যে অবস্থায়, যে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করে শ্রমিকরা, দেখে তার মন প্রথমে ক্ষুব্ধ হলো, তারপর ভেঙে গেল। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য কিছু করতে-ই নারাজ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই খনিতে দুর্ঘটনা হলো। ইভান্সকে দোষী খাড়া করলেন কর্তৃপক্ষ। মিটিংয়ে ইভান্স বার বার বললো, যে সে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য যা-ই বলেছে, সেটাই উপেক্ষা করা হয়েছে। এমন কি জল সেচে ফেলবার ব্যবস্থাও করেন নি তাঁরা সময় মতো। এমন পরিস্থিতিতে কাজ করেছে শ্রমিকরা, যে মৃত্যু অনিবার্য, ঠেকানো সম্ভব নয়।

ইভান্সের ধৃষ্টতায় চটে গেলেন কর্তৃপক্ষ। সেখান থেকে চলে এলো ইভান্স। বললো—সম্ভব হলো না।

সম্ভব হলো না কি? চটলেন সে মহিলাও। বললেন—অনির্দিষ্টকাল ধরে আমি তোমায় পুষতে পারব না।

সে কাজ থেকে তাকে সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন এক কাচের কারখানায়। সেখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না ইভান্স। তার অসাবধানতায় ক্ষতি হয়ে গেল মালিকের। আবার হাতফিরতি হয়ে ফিরে এল সে।

সম্পর্কিতা ঠাকুমা আর কি করতে পারেন? অগত্যা লেখালেখি করে ইভান্সকে ভারতবর্ষে পাঠানোই স্থির হলো। বিদায় যাত্রার দিনে ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বললেন—আমি তো তোমাকে সেই বর্বর অনুন্নত দেশটায় পাঠাতে চাইনি! কে না জানে যত রাজ্যের নোংরামি কুসংস্কার আর অসুখবিসুখ সেখানে? হয়তো সাপ-ই কামড়াবে তোমাকে, বা অন্য কিছু বিপদে পড়বে, যা আমার ধারণার অতীত।

তার পর নস্যি টেনে স্মেলিংসল্ট শুঁকে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। সোনার চেনে গাঁথা একখানি মুক্তাখচিত ছোট ক্রশ তিনি দিলেন ইভান্সকে। বললেন—আর কিছু দিতে পারলাম না। সর্বদা সঙ্গে রেখো। এটা তোমার মাকে দেবো বলে মনে ইচ্ছে ছিলো। তা তো আর হলো না।

তা ছাড়াও দিলেন বিশ পাউণ্ড। পরম কুণ্ঠিত ও বিব্রত হয়ে ইভান্স বার বার বলতে লাগলো—না, না! কি দরকার! কি দরকার!

ভারতবর্ষে আসবার পরে অবশ্য ইভান্স তাঁর চিঠি পেয়েছিলো। সে-ও লিখেছিলো। ব্যস, তার পরে আর চিঠিপত্র নেই।

এখানে ইভান্স এলো হুইলারের রেজিমেন্টে ইঞ্জিনীয়র হয়ে। আর এই সুবৃহৎ উপনিবেশে শ্বেতাঙ্গদের সমাজজীবন দেখে দিশাহারা হয়ে গেল। এত অবসর, এত স্বচ্ছলতা, এত সুপ্রচুর খাদ্য-পানীয় দাস-দাসী!

এই জীবনের নেশা সবে আমেজ ধরাচ্ছে তার চোখে, তারই মুখে চম্পার সঙ্গে দেখা। আর তারপর রেজিমেন্ট-এর এক সুবৃহৎ জলসার তাড়াহুড়ো লাগলো।

চামড়ার জিনপোষ ও জুতোর কারবারী, ধনী ব্যবসায়ী পুরণমল-এর বাগানবাড়ীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলো ক'জন। ভোর রাত থেকে বেলা অবধি বসে চাকরদের কাঁধে মাছের বেতের ঝোলা আর হুইল ইত্যাদি দিয়ে ফিরতে ফিরতে ব্রাইট ইভান্সকে চোখ টিপে বললো—কালো আগুন দেখেছ? আসবে এই জলসায়!

—কে?

—চম্পা। চম্পা তার নাম।

শুনে ইভান্সের মেজাজ খুসী হয়ে গেল। ব্রাইটও কেন জানি খুসী-খুসী ভাব। চারি পাশে তাকিয়ে ওঁকে বললো,—মনে হচ্ছে এবার জবরদস্ত গরম পড়বে। শুকিয়ে যাবে খালবিল। আর জলের জন্যে হন্যে হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে পড়বে। আঃ, কি মজাই না হবে! গরমকালে বসে শীতকালের মতো পাখী শিকার করতে পারবে।

—ব্রাইট, তুমি নাকি শিকার বিষয়ে অনেক জান?

স্মরণ করতে আত্মপ্রসাদে ব্রাইটের মুখ হাসিতে ভরে গেল। বললো।—শিখিয়েছিল একটা বদমাইস। জব্দও করেছিলাম তাকে। তবে বুড়ো ম্যাকমোহনের জন্যে লোকটা বেঁচে গেল। বেরিলী আর নৈনীর পথে ট্রানজিট একটা সাফাখানার কীপার আছে লোকটা। পাক্কা শিকারী। বলতেই হবে! দেখলে মনে করবে বুড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাড়ে হাড়ে শক্তি। আর নজর কি! বাঘের মতো তীক্ষ্ণ।

রেজিমেন্টের জলসা। সিভিলিয়ান যতো সাহেব, ব্যবসার খাতিরে যারা আছে সে সব সাহেব, তা ছাড়া রেজিমেন্টের যত অফিসাররা সমবেত হয়েছেন। মার্চ মাস শেষ হয়েছে। এখনো লেগে আছে শীতের আমেজ। আর এমন এক জলসার আয়োজন হয়েছে, যা নাকি কানপুরের মানুষ অনেক দিন মনে রাখবে। গালিচা নাকি এমন সুকোমল এমন সুন্দর যে হাঁটতে গেলে পায়ে এক অপূর্ব সুখানুভূতি হবে। খাস পারস্য থেকে আমদানী কারিগররা যারা দিল্লীতে বসত করেছে দুইশো বছর ধরে তাদের কোমল ও পাতলা আঙুল এই গালিচা বুনেছে কত দিন ধরে। এর রেশম ও পশম রং করেছে লক্ষ্ণৌ ও ফৈজাবাদের সুবিখ্যাত রংরেজীরা। তাদেরও আঙুলের স্পর্শ মিলবে এতে।

এই গালিচায় কত ময়ূর, কত বাগিচা কত নক্সা ফুটে উঠেছে। এর বুকে হাঁটতে গেলে এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, যে অনেক ভারতীয় কারিগরদের অনেক পুঞ্জীভূত স্বপ্ন ও শ্রমই পায়ের তলে এমন কোমল হয়ে বুক পেতে দিয়েছে।

মাথার ওপরে জ্বলছে সুবৃহৎ ঝাড়। অপরূপ তার কারুকাজ, অদ্ভুত এক স্বপ্নলোকের আলোকিত সমারোহ যেন দীপ্যমান।

দেয়ালে আঁটা পিতলের ও রূপার ফুলদানীতে জয়পুরের কারিগরদের হাতের কাজ। বুকে তার গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ্মীরী ও শাহারাণপুরের গোলাপ।

পাতলা কাচের গেলাসে টলমল টলমল সোনালী শ্বেতাভ ও স্বচ্ছ পানীয়। দুর্মূল্য সেই ফরাসী ও বিলেতী পানীয়। অনেক মূল্য তার। উর্দি পরে ঘুরছে যে সব বেয়ারা তারা সন্তর্পণে বয়ে আনছে ট্রেগুলি।

মেমসাহেবরা বসেছেন স্বামীদের পাশে। তাঁদের বেশভূষায়ও আজ জাঁকজমক। এদেশে এসে কোন শ্বেতাঙ্গ ললনার সাধ যায়নি হীরা, সোনা, মুক্তা পরতে? তাঁরাও কিছু কিছু গহনা পরেছেন। ফরাসী সিল্কের পোষাকে আলো ঝলমল করছে।

অপর দিকে বসেছেন কতিপয় ভারতীয় রিসালা ও ইনফ্যাণ্ট্রির অফিসাররা। আর সাহেবদের সঙ্গে সহজে কথাবার্তা চালাতে অভ্যস্ত বাঙালী বাবুদেরও দেখা যাচ্ছে।

ক্লাবঘরে সাহেবদের নাচ ও ব্যাণ্ডের আয়োজন আলাদা। এখানে তাঁরা বসে কিছুক্ষণের জন্য এই 'নেটিভ নাচগার্ল'দের নাচ দেখছেন। তারপরে তাঁরা উঠে যাবেন, আর এই রঙ্গভূমি ছেড়ে যাবেন ভারতীয়দের হাতে।

লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে এক নর্তকী। আজমীরে দরগা শরীফ দর্শন করতে গিয়েছিল সেই পুণ্যার্থিনী। প্রত্যাবর্তনের পথে বিশ্রাম করতে করতে এবং আনন্দ বিতরণ করতে করতে চলেছে সে। আসরের একপ্রান্তে বসে সেই বিগতযৌবনা ঠুংরীওয়ালী বিতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে এদিকে ওদিকে। এই সব আসরে বসে কি গাইবে সে! কে গান বুঝবে এখানে? কদর করবে কে? পিছনে বসে বাঙালীবাবুরা কথাবার্তা কইছেন তার কানে আসে। একজন আর একজনকে বলছেন।

—এসে পড়েছিলে ভাই, তাই কান আর চোখ সার্থক করে যাবে। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ঘরের সব তওয়ায়েফ! পড়ে থাকতে সেই বাঁশবেড়ে আর ভদ্রেশ্বরে, জন্মে সুযোগ হতো না!

জর্দা ও তামাকে কালো ঠোঁট কুঁচকে গায়িকা পিক্ ফেলে রূপার পিকদানীতে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে আঙুলের সাত আটটা আংটির দিকে চেয়ে থাকে। তারপর সারেঙ্গীওয়ালাকে বলে।

—লক্ষ্ণৌ-এর তওয়ায়েফ! অমনি সস্তা তারা! এই পয়সাতে আর এমনি আসরে তারা আসবে কি না! এদের কপালে আমাদের মতো দো-মেশাল, ভাঙাঘরাণার মানুষই জুটবে।

সারেঙ্গীওয়ালা খিসখিসে গলায় বলে—রেসমবাঈ! যে মূর্খ চন্দনগাছ দেখেনি সে পিপ্পল গাছের ছায়াতে বসেই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবে।

ঈষৎ নিমীলিত চোখে মনোদুঃখে রেশমবাঈ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মনে হয় লক্ষ্ণৌ-এর মানুষের গানের ঘরাণা চিরকালের মতো ভেঙে গেল, আর সে সুবৃহৎ দুঃখের কথা রসিকহৃদয় ছাড়া কে আর বুঝবে? নির্বাসনে গিয়েছেন সঙ্গীতরসিক সুরের দরদী নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্, আর গানও গিয়েছে বেইজ্জত হয়ে। কে বুঝবে এই দুঃখ? সনিশ্বাসে ঘন ঘন আন্দোলিত হয় এক মামুলী ঠুংরীওয়ালীর বুক সাঁচ্চা শিল্পানুভূতিতে। মনে হয় ঐ যে আর একজন এসেছে, ঐ রমজামী চম্পা—যার যৌবন ছাড়া অন্য কোনও পুঁজি নেই—ঐ রকম মানুষই ভালো এই সব আসরে।

তারপর বড় সাহেব আসেন। পাকা সাহেব। শিকারী বেড়ালের মতো ঝোলা পাকা গোঁফ। তাঁর অনুমতিতে সুরু হয় আসর। নানাভাবে আঙুলের মুদ্রায় ভঙ্গিমা জাহির করে রেশমবাঈ এক মামুলী গজল গায়। শুনতে শুনতে মেমসাহেবরা গহনার ঝিলিক দেখেন ও তার দাম সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করেন। সাহেবরা একটু শুনেই নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করেন। যে হিন্দুস্থানী মুন্সী একে এনেছিলেন তিনি নিচু গলায় সঙ্গীকে জানান পাকা বদমায়েস মেয়েটা। মোটেই দিল লাগিয়ে গাইছে না আজ। আমার মুখটাই হাসলো সাহেবদের কাছে।

দর্শকজন একেবারে খুসী হয় না। সে বিরক্তি যে স্পর্শ করে না রেশমকে তা নয়! তবে শ্রোতারা বুঝতে পারে না, যে নানাকথা মনে হয়ে ঐ গায়িকার মনটি আজ ভেঙে গিয়েছে। তারা বোঝেনা, ঐ যৌবনের ফুলকির মতো চম্পাকে দেখে রেশম অনুভব করেছে যে সে চিরতরে যৌবন হারিয়েছে। সেই দুঃখেও যে আজ রেশম বার বার সুরের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে, সে কথা কেউ বোঝে না।

দরদী মনপ্রাণ সব কোথায় গেল? বোঝে শুধু চম্পা। বোঝে আজ ঐ রেশমের মনে কোন দুঃখ আছে। বুঝে সে সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

তারপর সে যখন দাঁড়ায় আসরে, তখন মাপ চেয়ে বেরিয়ে যায় রেশম। চম্পাকে দেখেই খুশী হয়ে উঠে ভারতবাসীরা। এদিকে ওদিকে চেয়ে কা'কে যেন খোঁজে চম্পা। নজরটা তবুও তার আটকে যায় সামনে।

সেই সাহেব! যে তাকে বিঠুর-প্রাসাদে তারিফ করেছিলো,

আর এই কানপুর, ফতেগড় ও ভগবানপুরে বার বার যার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সেই সাহেব চেয়ে আছে। ত্রিজহুলারী তবে এরই হয়ে দৌত্য করতে এসেছিলো? হাসি পায় চম্পার। দেখে সাহেবের চোখে অকুণ্ঠ অনুরাগ।

দেখে যে গুটিয়ে যাবে, সে মেয়ে-ই নয় চম্পা। ইচ্ছা করে ওড়না আঙ্গিয়া থেকে আর একটু নামিয়ে নিলাজ হয় সে। ঈষৎ ভাঙা মিষ্টি গলায় সে তীক্ষ্ণ পর্দায় ধরে, 'না মারো না মারো সৈঁয়া'—

প্রথম লাইনটি বেশ খেলিয়ে গেয়ে নেয়। তারপর ঠমক দিয়ে নেচে উঠে বলে—'প্রীত কে পিচকারী'

চম্পার গান যেন গান নয়, কোলাহল। তার দেহ, চরণ, সুর, চোখ, চুল ও ওড়নী—সব মিলে যেন কোলাহল সুরু হয় একটা।

এই হৈ-চৈ করে আসর মাতাতে পারে বলে-ই চম্পা সকলের প্রিয়। এরা আসর মেতে উঠে। চম্পা বে-পরোয়া হয়েই মুঠো মুঠো নক্তরের পিচকারী ছুড়ে মারে আসরের সর্বত্র।

রাত বারোটায় আসর শেষ করে ঘরফিরতি চম্পার আগে-পেছনে চার জন সিপাহী চলে। তাদের কারুর হাতে ঘুঙুর-জোড়া দিয়ে, আর কারুর হাতে নাচের পোষাক দিয়ে তাদের ধন্য করেছে চম্পা! গল্প করছে চম্পা, যেন একটা ঝর্ণা-ই চলেছে কলকল করে। তারা বলছে:—চম্পা বাঈ, তুমি পালকী ফিরিয়ে দিলে কেন?

—আমার ইচ্ছে।

বলে হাসছে চম্পা। আসলে তাকে কানে কানে একটা খবর দিয়ে গিয়েছে ত্রিজহুলারী। খুব কৌতুক বোধ হচ্ছে চম্পার।

চম্পার কুঠি কিছু কম রাস্তা নয়। পথে জৈৎরাম চৈৎরাম দুইভায়ের কুঠিবাড়ী। কুঠিবাড়ী ঘিরে বাগান। তার পিছন দিয়ে সহজে যাওয়া চলে। যেতে যেতে একজন সিপাহী বলে—

—তাহলে চম্পা বাঈ, কারুকে দিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসব আর্জি। তুমি ব্রাইটের বিবিকে দিয়ে আর্জি পাশ করিয়ে দিও। তিন সাল ঘরে যাইনি। ভুলেই গিয়েছি দেশঘরের চেহারা।

—এ বার এত তাড়া কেন?

সিপাহীটি বলে—বলেছি তো? বড় মামলা লাগিয়েছে আমার চাচেরা ভাই। একটা লেবুগাছের মালিকানা নিয়ে। আমি না গেলে আমার বুড়ো বাপ কিছু করতে পারবে না। তার কোন জ্ঞানই নেই!

—একটা লেবুগাছ?

অজানতি সিপাহীটির গলায় উন্মনা সুর লাগে। সে বলে—হাঁ। তুমি বুঝবে না। সে গাছের লেবু কি বড়, আর তেমনি মিষ্টি। বাবা চারা এনেছিল চৌধুরীদের বাগান থেকে। গরমকালে লেবুর সরবৎ খেয়ে শরীর জুড়িয়ে যায়—আর যখন ফুল ফোটে, তখন তার কি গন্ধ! চাই কি সময়কালে ক'টা লেবু বিক্রীও করাতে পারে আমার মা, শেঠদের বাড়ীতে দিয়ে কয় সের ছাতুও আনতে পারে। তুমি বলছ কি চম্পা বাঈ? একটা লেবুগাছ অমনি ছেড়ে দেওয়া যায়?

এবার চোখে পড়ে চম্পার। জ্যোৎস্নাতে চিনতে ভুল হয় না। নিচু গলায় সিপাহীদের বলে—তোমরা চলে যাও। আমার সঙ্গে কথা আছে ঐ সাহেবের। বুঢ়াকে বলো যে আমি আসছি। যেন চিন্তা না করে।

এগিয়ে যায় চম্পা। আশ্চর্য হয়ে ইভান্স ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বলে—তোমার সঙ্গীরা?

—এগিয়ে গেছে।

—তুমি?

—একা যাব।

—ভয় করবে না?

চম্পা জ্যোৎস্নায় ঝিলিক দিয়ে হাসে। বলে—সাহেব, তুমি ত' রয়েছ।

ইভান্স এই দুঃসাহসী কথা শুনে অধর দংশন করে। তারপর বলে—আমাকে ভয় কর না তুমি?

—না সাহেব! তুমি ভাল।

—কে বললো?

—আমি শুনেছি।

হিন্দুস্থানী শিক্ষার কথা ইভান্সের ততখানিই, যাতে 'ফৌজী অখবর' পড়া চলে। আর যে হিন্দুস্তানী তাকে পড়ে পাশ করতে হয়। তাতে আর যাই হোক, এই সব কথা ঠিক ঠিক জোগায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইভান্স বলে পুঁথির ভাষায়, থেমে থেমে—

—তুমি কি বিশ্রাম করবে। তুমি কি ক্লান্ত হয়েছে? তুমি কি ঐ কুঠির প্রাচীরে সামান্য বসতি চাও?

চম্পা আবার হাসে। বলে সাহেব, আমার সঙ্গে অমন করে বসে গল্প করলে তোমার অপমান হবে।

—কেন?

—কে-ও করে না।

—কে-ও করুক বা না-ই করুক। চম্পা, তুমি সে কথা আমাকে বলো না।

—যা হুকুম।

দাঁড়িয়ে থাকে ইভান্স। আর চম্পাও দাঁড়িয়ে থাকে। এবার ঈষৎ নিচু হয়ে ইভান্স আঙুলের আগা দিয়ে চম্পার কপাল ও চুল আলতো করে ছোঁয়। অস্ফুটে বলে, সুন্দর! সুন্দর তুমি চম্পা।

কৌতুকের স্পৃহা চলে গিয়ে চম্পা এবার শঙ্কিত হয়। মনে হয় ভুল করেছে সে। সেধে ডেকে এনেছে বিপদ।

ইভান্স তার চোখে, চুলে, কপালে আঙুল বুলিয়ে এবার আরো সহজ ও অকৃত্রিম আন্তরিকতায় যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুগ্ধ বালকের মতো পুনর্বার বলে—বড় সুন্দর তুমি। আমার বড় সুন্দর লেগেছে তোমাকে।

চম্পা বলে—সাহেব! আমি যাই।

—নিশ্চয় যাবে। আমি তোমাকে এগিয়ে দেব।

—তুমি? না সাহেব, তা হয় না।

—কেন চম্পা?

চম্পা এবার আত্মনির্ভর খুঁজে পায়। সে অসঙ্কোচে ইভান্সের দিকে চায়, বলে—সাহেব, এখানে আমাকে সবাই জানে। কেউ আমার অনিষ্ট করবে না। তুমি ফিরে যাও।

তবু ইভান্স শোনে না। বলে—অন্তত তোমার বাড়ী দেখা যায় তত দূর চল।

—না। শোন, আমি ছুটে চলে যাব।

—কিন্তু চম্পা, আমি যে বলতে চাই।

চম্পা কাছে আসে। বলে—তুমি দুলারীবিবিকে খবর দিও। সে আমাকে জানাবে।

এবার আলো-আঁধারির পথ ধরে ছুটে চলে যায় চম্পা।

ঘরে আসতে সম্পূরণ প্রশ্ন করবার আগেই চম্পা জিজ্ঞাসা করে—বুঢ়া, কেও আমার খোঁজ করে নি?

—কে, চম্পা?

—কোনো চন্দন?

—না। কোন চন্দন, চম্পা?

—তুমি তাকে চেন? সে ঐ ডাক্তার বাবুর সহকারী।

—না চম্পা!

—ও!

ঘর থেকে পোষাক বদলে ফিরে আসে চম্পা। সম্পূরণকে বলে—বুঢ়া, কথা আছে।

—কি কথা?

—নতুন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ভাব করতে চায় আমার সঙ্গে। অনেক দিন ধরে আমার পিছু নিয়েছে বুঢ়া!

—সত্যি?

—সত্যি।

—তুমি কি করবে?

—বল, কি করব।

—বলব চম্পা?

—বল।

সম্পূরণ বলে—তবে শোন চম্পা! বলি তোকে।

—বল, বুঢ়া।

সম্পূরণ বলে চলে। বলে—তুই যখন ওখানে ছিলি, আজ এখানে এসেছিল রিসালার শোভালাল, পতেলা রিসালদার কুন্দন সাহেব, আরো অনেককে তুই চিনবি, চিনবি না। এ কথা নিশ্চয় জানবি চম্পা, যেখানে সাহেব আছে, তারা বসে আছে বারুদের গোলার ওপর। একটু এদিক-ওদিক হবে, কি ফাটবে গোলা। ধর্ম নেই, জাত নেই, ইজ্জত নেই, রুটি নেই—আর মানবে না সিপাহীরা। লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, দিল্লী, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ সব জায়গায় এক কথা চলেছে। তোকে নিশ্চয় বলি চম্পা, তুই এই কানপুর সহরের আশে-পাশে সব জায়গায় একেবারে একা চলতে ফিরতে পারিস। তোকে সম্পূরণের লোক জানে সবাই। জানে, তোকে কেউ কিছু বলবে না।

—সবাই কি তোদের লোক বুঢ়া?

—না বেটি! তবে সহরের হিন্দু মুসলমান সবাই তো ক্ষেপে আছে কি না! কম লোক না।

—এ কথা তো আগেও বলেছিস বুঢ়া!

—তো আবার বলছি। কথা যদি কথার মতো হয়, তাহ'লে দশ বার বলতেই বা কি! আর দশ বার শুনতেই বা কি, বেটি! বলে, আর অল্প অল্প হাসে সম্পূরণ। বলে—আমি অযোধ্যার কিষাণ চম্পা! তুই জানিস না—তোর বুঢ়া অনেক দেখেছে এই তিন কুড়ি বছর ধরে। দেখেছে তার দেশঘরের জোয়ান ছেলে রংরুট হয়ে চলে যায়।

আর তার পর কি জীবন হয় তাদের। আমি অনেক দেখেছি চম্পা! আমার বাপ মরেছিল সেই পানজ্যাবের লড়াইয়ে। দাদাকে আমার গুলী করে মেরেছিল সেই সময়। সেই যাটজনের একজন আমার দাদা, যারা সিন্ধু পেরুবে না বলে বলওয়া লাগিয়ে ছিলো। তুই জানিস না, আমার মা আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। বলেছিলো—ভিখ মেঙ্গে খাবি, ডাকাতি করে খাবি—তবু টাকার লোভে ফৌজে নাম লেখাবি না।

সম্পূরণকে মনে হয় অন্য মানুষ। সিংহের মতো মস্তমাথাটা সে অল্প-অল্প নাড়ে। বলে—চম্পা, বেইমানী করবি তো মাথাটা কেটে রেখে যাব তোর। খুন করতে ভয় পায় না সম্পূরণ।

—বুঢ়া, মৌতির ভয় দেখাস না।

—তো, শোন চম্পা। সাহেবের সঙ্গে ভাব কর। ওদের খবরাখবর জান। তুই পারবি। পারবি না চম্পা?

এ যেন চম্পার গলা নয়। অন্য কারু গলা। চম্পা না চন্দনের সঙ্গে কত প্রেম, কত যুগল জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। সে কথা ভুলে বিপদের কথাতেই কেন সাড়া দেয় তার মন। চম্পা বলে—পারব।

—আমি জানতাম।

—কি?

—যে তুই পারবি।

—বুঢ়া, চুপ কর। কেন আমি বললাম, তা তুই বুঝবি না।

—বুঝব না?

—না বুঢ়া, তোর জওয়ানী নেই।

—জরুর।

এবার আর অস্বীকার করে না সম্পূরণ। তার পর কি কথা মনে করে সে বলে—চম্পা, চন্দন কে তোর?

—চন্দন আমার গ্রামের মানুষ। আমার শৈশবের সহেল।

—বুঝলাম।

—কিছু বুঝলি না বুঢ়া! আমি তার থেকে দূরে যাব বলে এখানে এসেছি। তবু সে তো বোঝে না। চন্দন বড় নির্বোধ, বুঢ়া!

—তো সে নির্বোধের জন্য তুই কেন দুঃখ পাস চম্পা?

—বুঢ়া, তুই বুঝবি না। আর চন্দনের মা—

—কি?

—চন্দনের মা বড় পুণ্যবতী। সে বলেছিল চম্পা, তুই রমজানী হবি। দেখ, আমি কোন গাঁয়ের মেয়ে—চলে এলাম শহরে। হলাম রমজানী।

—বুঝলাম।

—চন্দনের মা-ও বড় নির্বোধ, বুঢ়া! দেখে এসেছি সে দুখিয়ারী, দুঃখে মরে যাচ্ছে।

—চম্পা, এসব কথা তুই বলিস না কেন?

যৌবনমুকুলিত দেহ ঈষৎ ঝুঁকিয়ে কাছে আসে চম্পা। হেসে বলে—বুঢ়া, তুমি এত জান, আর একথা জান না, যে দুঃখের ভাগ কারুকে দেওয়া যায় না? সুখের ভাগ আছে, দুঃখের ভাগ নেই। বুঢ়া, তুমি সে কথা জান না?

—না। সে কথা জানে না সম্পূরণ। যৌবনের কাছে বার্ধক্য এমনি করেই পরাজিত হয়—কি সুখ, কি দুঃখ। একটা বাজিও জিততে পারে না সম্পূরণ। [ক্রমশঃ।

বোটানিকাল গার্ডেন-এ

অশোক ভট্টাচার্য

উর্দ্ধে আলোর বন্যায় ভেসে যায়
মেঘে-মেঘে ঐ পুষ্পিত নভঃলোক,
নিম্নে কোমল সবুজ ঘাসের 'পরে
বসেছি আমরা দোঁহার নিকটে দোঁহা।

পাশে বয়ে চলে বৈরাগী নদী তার
ধূসর অঙ্গে কত মানুষের আশা,
নিঃশেষে লীন,—শ্মশান-কুড়ানো ছাই
কত না চলেছে সাগরের সন্ধানে।

অদূরে হঠাৎ শাগরেদ্বৈখিকায় শুনি
যুবক-যুবতী কলকোলাহলে মাতে,
তবু হায় কই, তোমার আমার প্রাণে
জাগে না তো সেই দুর্লভ ভালোবাসা!

আমরা দু'জনে যেন এ কালের দুই
নট আর নটী ব'সে আছি পাশাপাশি,
মঞ্চের 'পরে নেমে পাঠ ভুল ক'রে
সাথ মেনেছি এ গালে-চোখে রঙ মাখা।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

মাহ চুচাক বেগম

শিবানী ঘোষ

অন্ধকার কারাগারে বন্দিনী অবস্থায় ফুঁপিয়ে চলেছে একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া কিশোরী। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। এভাবে আর ক'দিন তাকে রাখা হবে! তার মনে পড়ছে দিন কয়েক আগেও সে চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে কান্দাহারের পাহাড়ে পর্বতে। এই ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারে তার মায়ের কিছুটা আপত্তি থাকলেও তার পিতার দেওয়া ছিল অবাধ স্বাধীনতা; ঐ রকম পিতা খুব কম জনের ভাগ্যেই জোটে। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর রাজনীতির দাবাখেলায় তাঁকে চিরকালের মত বিদায় নিতে হল এই পৃথিবী থেকে।

ওড়নাঞ্চলে চোখ মোছে মাহ চুচাক। তার মনে পড়ছে সেই দিনটা। যেদিন বাবর বাদশাহ কান্দাহার আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন দেশটা। প্রতি ঘরে ঘরে সেদিন উঠল করুণ আর্তনাদ। মাহ চুচাক তখনও বুঝতে পারেনি কি বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তাদের ওপর। সেদিনও সে স্থির করেছিল ছুটোছুটি করে বেড়াবে কান্দাহারের পাহাড়ে পর্বতে। কিন্তু হঠাৎ কতকগুলো লোক বেগে প্রাসাদে প্রবেশ করে বেঁধে ফেলল তাদের সকলকে। তারপর তাদের উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে চলে এল কাবুলের এই কারাগারে। তখনই মাহ চুচাক প্রথম জানলো আরঘান জাতি পরাজিত হয়েছে মোগলের হাতে। শুধু পরাজিতই নয়, তার পিতা মির্জা মোহম্মদ মোকিম নিহত হয়েছেন আততায়ীর হস্তে।

এই কথাটা শেলের মত এসে বিঁধেছিল মাহ চুচাকের হৃদয়ে। যে পিতার প্রশস্ত বক্ষে মুখ লুকিয়ে সে কত হেসেছে কেঁদেছে, সেই পিতা আর নেই! এখনও সে বিশ্বাস করতে পারে না তিনি নেই। মনে হয় কান্দাহারে ফিরে গেলেই সে তাঁকে দেখতে পাবে। কিন্তু এখান থেকে সে যাবে কেমন করে? তার মা এবং অন্যান্য আত্মীয়ারা নাকি সব মুক্তি পেয়ে গেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই এত দিনে দেশে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু একমাত্র তাকে এখনও এভাবে আটক রাখা হল কেন?

—এই পোষাকগুলো পরে নিন কুমারী!

মাহ চুচাক চেয়ে দেখে তার সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে মোগল রাজপ্রাসাদের এক দাসী। তার হাতে কতকগুলি বিবাহের বস্ত্র। বিস্মিতা হয়ে সে প্রশ্ন করে, এ পোষাক কি হবে?

দাসীটি মৃদু হেসে বলে—আজ যে আপনার বিয়ে।

—বিয়ে! এ কি আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে?

—না কুমারী, ঠাট্টা আপনাকে কেউ করেনি। স্বয়ং মোগল সম্রাট বাবর আপনার বিবাহ স্থির করেছেন কাসিম গোকুলতাস নামক তাঁর এক প্রতিভাসম্পন্ন কর্মচারীর সাথে। কাজেই এগুলো পরে নিয়ে উপস্থিত আপনি কারাগারের বাইরে চলুন।

দাসীটির কথা শুনে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে মাহ চচাক বলে, কি! কি বললে? কাসিম গোকুলতাসের সাথে হবে আমার বিয়ে? এতে আমাদের বংশের মর্যাদাহানি হবে না?

দাসীটি পুনরায় মৃদু হেসে বলে, মিথ্যে বংশাভিমান আঁকড়ে ধরে থেকে আর লাভ নেই কুমারী! হরিণী যখন বাঘের কবলে পড়ে তখন তার সব দৌরাত্ম্য তাকে মেনে নিতে হয়। এখন যদি আপনি আমার কথা অবহেলা করেন তবে সম্রাটের কোন পুরুষ কর্মচারী এসে আপনাকে বলপূর্বক এই পোষাক পরিধান করিয়ে নিয়ে যাবে বাইরে। নারীর পক্ষে সেটা কি চরম অপমান হবে না কুমারী?

মাহ চুচাক ফুঁপিয়ে উঠে বলে—ওগো তোমরা কি নিষ্ঠুর!

দাসীটি বলে—আমাকে ঐ দলের মধ্যে টানবেন না কুমারী। আমি যথার্থই আপনার মঙ্গল চাই।

ক্রন্দিতকণ্ঠে মাহ চুচাক বলে—ওগো, তাই যদি চাও তবে তুমি আমাকে উদ্ধার করে দাও এই পাষাণপুরী থেকে।

দাসীটি বলে—সে ক্ষমতা আমার নেই কুমারী, থাকলে নিশ্চয়ই করতাম। উপস্থিত আমি যা পারি তা নারীর মর্যাদা রক্ষা করা। এর বিনিময়ে উপস্থিত আপনাকে ছাড়তে হবে জাত্যভিমান। আর বাস্তবিকই কাসিম গোকুলতাসের বংশমর্যাদা খুব বেশী না থাকতে পারে কিন্তু তাঁর মত নির্ভীক বিচক্ষণ এবং উদার পুরুষ এই পৃথিবীতে কমই আছেন। তাঁকে স্বামিরূপে পাওয়া যে কোন নারীর পক্ষেই ভাগ্যের কথা।

মাহ চুচাক সজোরে ফুঁপিয়ে উঠে বলে—ওগো শুনিও না, আর শুনিও না ও-সব কথা। আমাকে নিয়ে তুমি যা করতে এসেছো করো। আমি আর একটা কথাও সহ্য করতে পারছি না।

দাসীটি আর কোন কথা না বলে এগিয়ে আসে কুমারীর কাছে। তারপর তাকে একটি একটি করে পরিয়ে দিতে থাকে বিবাহের বস্ত্র এবং অলঙ্কার।

মাহ চুচাকের বিধবা মাতা বিবি জারিফা খাতুন প্রাসাদে আপন নিভৃত কক্ষে বসে শুধু চিন্তা করেন মেয়ের কথা। তাঁরা মুক্তি পেলেন সকলেই। কিন্তু বাবর বাদশাহ ঐ কচি মেয়েটাকে কেন যে ধরে রাখলেন তা বুঝতে পারা যায় না! এক এক সময় ভয়

হয় ওর পবিত্র দেহটাকে নিয়ে তিনি আপন বিলাস চরিতার্থ করবেন না তো? কথাটা মনে উদয় হতেই শিউরে ওঠে বিবি জারিফার সর্বাঙ্গ। তিনি নানা উপায়ে জানবার চেষ্টা করেন মেয়ের কথা। কিন্তু কার্যকরী হয় না কোনটাই। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে যখন তিনি মেয়ের সংবাদ পেলেন তখন জানলেন, তার বিবাহ হয়ে গেছে এক বংশমর্যাদাহীন পুরুষের সাথে। শুধু তাই নয়, তার ঔরসে মাহ চুচাকের কোলে এসেছে একটি কন্যাসন্তান।

শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় জারিফা খাতুনের। তাঁর এক মাত্র কন্যার এমন দুর্দশা হয়েছে? দেশে কি এমন লোক নেই যে এর প্রতিকার করে? তাকে কি করে কান্দাহারে ফিরিয়ে আনা যায় তাই তিনি ভাবেন সারাদিন। তাঁর স্নেহের দুলালী কি কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে! একে শত্রুপুরী, তার ওপর এক বংশমর্যাদাহীন পুরুষ তার স্বামী! এ তো সমগ্র আরঘান জাতির পক্ষেই অপমানজনক। জারিফা বিবি সময়ে অসময়ে কাঁদেন আর ভাবেন, কবে শিউস্থি থেকে ফিরে আসবেন তাঁর ভাসুর শাহ বেগ। আজ আর জীবিত নেই তাঁর স্বামী। কাজেই ভাসুরের সহায়তায় উদ্ধার করতে হবে মেয়েটিকে।

শিউস্থি রাজ্যের বিভিন্ন গোলযোগ মিটিয়ে কান্দাহারে ফিরতে বেশ কিছু বিলম্ব হয়ে গেল শাহ বেগের। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর দেশে ফেরায় তখন চতুর্দিকে চলল আমোদ-প্রমোদ। কিন্তু সেই আনন্দ তখন বিষ ঢেলে দেয় জারিফা বিবির অন্তরে। এই কি প্রমোদ করবার সময়? তাঁর কন্যার উদ্ধারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি দেশবাসীকে এই স্ফূর্তি করতে কিছুতেই দেবেন না। তিনি এই কথা ভাসুরকে জানাবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন নিশ্চল হয়ে। সেই পথ দিয়ে শাহ বেগ অন্দর মহলে যাবার সময়ই জারিফা খাতুন ফুঁপিয়ে উঠে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদতলে। প্রথমটা হতচকিত হয়ে পড়েন শাহ বেগ। তখন তাঁকে মেয়ের সব কথা জানালেন জারিফা বিবি। তাঁর কথা শুনে অন্তরে আঘাত পেলেন শাহ বেগ। বিশেষ করে কোন মোগলের সাথে আরঘান জাতির মেয়ের বিবাহ হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক। কিন্তু কি ভাবে মাহ চুচাককে বাবরের নাগপাশ ছিন্ন করে কাবুল থেকে কান্দাহারে নিয়ে আনা যায় তা তাঁর মাথায় আসে না। যা হোক, এর ব্যবস্থা শীঘ্রই করবেন, বেগমকে এই আশ্বাস দিয়ে আপন কক্ষে চলে গেলেন শাহ বেগ।

অবশেষে স্থির হল একটা মতলব। বিভিন্ন বেগমরা এই মত পোষণ করলেন যে তাঁদের এক দাসী ছদ্মবেশে কাবুলে গিয়ে সাক্ষাৎ করুক মাহ চুচাকের সাথে। তারপর তাকে সংগে নিয়ে সে চলে আসবে হাজারা দেশে। সেখান থেকে উটের পিঠে চড়ে কান্দাহারে ফিরে আসতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। কিন্তু কথা হল, সেখানে যাবে কে? তখন দৌলত কিতা নাম্নী মির্জা মোকিমের এক দাসী রাজী হল তাঁর প্রভুকন্যাকে উদ্ধার করতে। সে সেই দিন ছদ্মবেশে রওনা হয়ে গেল কাবুলের পথে।

কাবুল রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে মাহ চুচাক বেগম মুখ ভার করে বসে রয়েছে এক পাশে। অদূরে বিছানায় শুয়ে কেঁদে চলেছে তার শিশু-কন্যা নাহিদা, কাঁদুক যত পারে কাঁদুক। ঐ মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তার আদর করতে এতটুকু ইচ্ছে হয় না। তার মনে পড়েছে গত দু বছরের কথা। সেই যে বাবরের সেনানীর হাতে বন্দিনী হয়ে এল এই কাবুলে তারপর আর একটি বারের জন্যেও সে যেতে পারেনি কান্দাহারে। একবারও তার সাক্ষাৎ হয়নি মা কিংবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে। উঃ, এরা কি নিষ্ঠুর শয়তান! তাকে জোর করে বিয়ে দিল এক হীনবংশীয়ের সাথে। তারপর তার ঔরসে এল ঐ মেয়েটা।

—এ কি নাহিদ কাঁদছে যে? ঘরে এসে খুকীকে কাঁদতে দেখে বললেন কাসিম গোকুলতাস।

—কাঁদছে তা আমি কি করতে পারি? ধিক্কার দিয়ে কথাটা বলে মাহ চুচাক।

তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে কাসিম দাসীকে ডাক দেন, খাদিজা!

দুধের বাটি হাতে ছুটে আসে খাদিজা। সে তাড়াতাড়ি তাঁর কোল থেকে নাহিদকে নিয়ে আদর করে বলে—দুষ্টু, শোনা, এরই মধ্যে ঘুম হয়ে গেল? চল দুধ খাবে চল। বলেই খাদিজা তাকে নিয়ে চলে যায় পাশের ঘরে।

কাসিম তখন এসে বসেন তাঁর সহধর্মিণীর সামনে। মাহ চুচাক বিরক্তির সাথে মুখটা ফিরিয়ে রাখে অন্য দিকে। তিনি তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেন—চুচাক, মেয়েকে কোন দিনই কি আপন বলে গ্রহণ করবে না?

এর কোন জবাব দেয় না মাহ চুচাক। কাসিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আজ তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আজ আমাকে সম্রাটের সাথে যেতে হচ্ছে উজবেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এই যুদ্ধে আজ কি হবে কিছুই বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে এই আমাদের শেষ দেখা। এতে অবশ্য তুমি খুসীই হবে। কারণ আমি তোমার জীবনে খানিকটা দুঃখ এবং বোঝা ছাড়া আর কিছুই নই। কাজেই এ থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু চুচাক, আমার একটা অনুরোধ—ঐ নাবালিকা শিশুটিকে অন্ততঃ তুমি একটু দেখো।

তবু নিরুত্তর হয়ে বসে থাকে মাহ চুচাক। কাসিম বলেন—বলো প্রিয়া, এর পরও কি তুমি নাহিদকে টেনে নেবে না বুকের কাছে?

—না। গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় বেগমসাহেবা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন কাসিম গোকুলতাস। তারপর যুদ্ধের সাজপোষাকে সজ্জিত হয়ে তখুনি তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে।

স্বামী চলে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তি পায় মাহ চুচাক। আজ তাকে বেশ খানিকটা আঘাত দেওয়া গেছে। যুদ্ধে যাবে, মরবে, তাতে তার কি? সে তো তাই চায়। আর তার সাথে ঐ মেয়েটাও যদি শেষ হয়ে যায় তবেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

—শাহজাদী?

—কে? কে তুমি? চমকে ওঠে মাহ চুচাক। এ কে এসে দাঁড়াল তার সামনে?

আগন্তুক মুখে আঙুল দিয়ে ইসারা করে—চুপ! তারপর চারদিক দেখে সে সরিয়ে দিল মুখের আবরণটা। মাহ চুচাক তখন বিস্মিতা হয়ে বলে—এ কি দৌলত কিতা, তুই কেমন করে এখানে এলি?

দৌলত কিতা চাপাগলায় জানিয়ে দিল যে কেমন করে প্রবেশ করেছে এই রাজপ্রাসাদে এবং তার আসার উদ্দেশ্যটাই বা কি।

তার কথা শুনে আনন্দে নেচে ওঠে মাহ্ চুচাকের অন্তর। এইবার সে নিষ্কৃতি পাবে এই নাগপাশ থেকে। এইবার সে আবার দেখতে পাবে কান্দাহারের পাহাড়-পর্বত। এইবার সে চরম প্রতিশোধ নিতে পারবে তার স্বামী কাসিম গোকুলতাসের ওপর। কিন্তু এই জনপূর্ণ রাজপুরী হতে সে বাইরে যাবে কেমন করে?

সে-মতলবও দিল দৌলত কিতা। বললে—বিকেলে প্রার্থনার পূর্বে পথে-ঘাটে যখন জমে উঠবে স্নানার্থীদের ভিড় তখন আপনিও আপনার জাফরাণী রঙের বোরখাটা পরে বেরিয়ে পড়বেন স্নানের উদ্দেশ্যে। সে-সময়টা আর কেউই লক্ষ্য রাখবে না আপনাকে। তখন আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে নিয়ে যাব নিরাপদ জায়গায়।

মাহ্ চুচাক বলে—তা না হয় হল, কিন্তু এখন তুই থাকবি কোথায়?

দৌলত কিতা বলে—আমার জন্যে ভাববেন না শাহজাদী! এখন আমি চলি। সময় হলে দেখা করবো। বলে মুখের আবরণটা টেনে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বিকেলের দিকে মাহ্ চুচাক একাকিনী পায়চারী করছে আপন কক্ষে। খাদিজা মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে বিছানায়। অকাতরে সে ঘুমোচ্ছে কচি হাত দুটো মুঠো করে। এইবারেই বেরিয়ে পড়তে হবে স্নান করতে যাওয়ার ছলনা করে। মাহ্ চুচাক জাফরাণী রঙের বোরখাটা চড়িয়ে দিল দেহে। এইবার আর তাকে রাখে কে! কিন্তু এ কি! যাবার সময় ঘুমন্ত মেয়েটা তাকে এমন আকর্ষণ করছে কেন? সে একবার চেয়ে দেখল নাহিদের মুখের পানে। কি চমৎকার মুখ! এত ভাল করে মাহ্ চুচাক কোনদিন দেখেনি মেয়েকে। মুখের আদল কতকটা তার পিতারই মত। কিন্তু না না, আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। নচেৎ ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ঘুমন্ত মেয়েটিকে ফেলে রেখে মাহ্ চুচাক একাকিনী দ্রুত বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে।

পথে বেরিয়ে সহজেই দেখা হল দৌলত কিতার সাথে এবং তার সহায়তায় হাজারা দেশে আসতে তাদের অসুবিধে হল না কিছুমাত্র। তারপর সেখান থেকে উটের পিঠে চড়ে কান্দাহারে ফিরে আসে মাহ্ চুচাক। মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে বিবি জারিফা খাতুন ছুটে আসেন তার কাছে। চতুর্দিকে তখন বেজে ওঠে আনন্দসূচক বাজনা।

কিন্তু এ কি! এখন ঐ বাজনা শুনতে মাহ্ চুচাকের তো আর ভাল লাগছে না! কাবুল থেকে কান্দাহারে এসে সে যা আনন্দ পাবে মনে করেছিল তা তো পাচ্ছে না! বরং মনে হচ্ছে কে যেন তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছে কাবুলের দিকেই।

মেয়ের বিষণ্ণ মুখের পানে তাকিয়ে জারিফা খাতুন বলেন—আহা, মেয়ে আমার দুশ্চিন্তায় কত রোগা হয়ে গেছে। তুই কিচ্ছু ভাবিস না চুচাক, তোকে ওরা জোর করে যে বিয়ে দিয়েছে সে আমি কিছুতেই মানবো না। আমি আবার নতুন করে তোর বিয়ে দিয়ে ঘরসংসার পেতে দেবো। আর সেই সংগে অভিশাপ দিই যেন ঐ কাসিম আর তার মেয়েটার মৃত্যু হয়।

—মা। হঠাৎ শিউরে ওঠে মাহ্ চুচাক।

—কি? কি হল চুচাক?

—না মা কিছু নয়। এতক্ষণে মাহ্ চুচাক বুঝতে পারে কাবুল থেকে কে তাকে হাতছানি দিচ্ছে। সেই যে ছোট্ট মেয়েটিকে একলা ঘরে ফেলে রেখে সে চলে এল এ তারই আকর্ষণ! তার রেশমের মত কোঁকড়া চুল, কচি হাত দুখানি, কোঁপানি কান্না এগুলি যেন অত্যন্ত বেশী করে মনে পড়ে মাহ্ চুচাকের। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে ওঠে প্রাণ। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে—মা!

জারিফা খাতুন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—কি হল মা? চল ঘরে যাই। আমি বুঝতে পারছি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তোর শরীর।

মেয়েকে নিয়ে ঘরে গেলেন জারিফা বিবি। মাহ্ চুচাক কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় না মনে। এইবার তার মনে পড়ছে স্বামীকে। তাঁর শেষের কথাগুলো বড্ড বেশী করে বাজছে বুকের মধ্যে। উজবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উনি চলে গেলেন। সত্যি যদি সেখানে তার মৃত্যু হয়? উঃ, না না না, এ যেন আর সে ভাবতে পারছে না। অন্য সময় সে কত বার তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু এখন সে-কথা ভাবলেই চোখে জল এসে পড়ছে।

ক্রমশঃ নেমে আসে রাত্রি। সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায়। শুধু ঘুম আসে না মাহ্ চুচাকের চোখে। কান্দাহারের এই প্রাসাদ যেন আজ হুল ফোটাচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। কাবুলে ফিরে যেতে আনচান করছে প্রাণ। মনে হচ্ছে নাহিদ যেন আচমকা ঘুম থেকে উঠে কাঁদছে। তাকে দেখবার জন্যে খাদিজা পর্যন্ত সেখানে নেই। তার ওপর তার স্বামী যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন কি না কে জানে। এখুনি যে তাঁর খবর নেওয়া দরকার। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে মাহ্ চুচাক। আর একবার সে চেয়ে দেখে কক্ষের সকলেই নিদ্রাভিভূত। তখন সে ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে বেরিয়ে যায় বাইরে।

নাহিদকে কোলে নিয়ে একাকিনী পদচারণা করছে খাদিজা। মনে মনে সে বলছে হায়, কি কুমাতার গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলি খুকী! বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করা তো দূরের কথা, আপন মেয়ে বলে কোনদিন কোলে পর্যন্ত নিল না। তারপর তোকে একলা ফেলে রেখে সে চলে গেল আপন আস্তানায়। শুধু তাই নয়, পিতার যেটুকু বা স্নেহ ছিল তাও আজ শেষ হয়ে গেল জন্মের মত। হায় পোড়া কপালী, পিতৃমাতৃহীন হয়ে এবার মানুষ হবি কার কাছে? বাঁদী খাদিজার কাছে? হায় রে রাজনন্দিনী!

—খাদিজা!

—কে? বেগমসাহেবা?

—হ্যাঁ খাদিজা, আমার নাহিদ কই?

—নাহিদ তো এই আমার কোলে।

—কই দে দে আমার কোলে দে। মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোলে নিয়ে চোখে-মুখে চুম্বন করে মাহ্ চুচাক। এই মেয়ের আকর্ষণে সে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ছুটে এসেছে এখানে। এর কাছে সে যে বহুদিনের ঋণী। শুধু এর কাছেই নয় আর একজনের ঋণও আজ

তাকে শোধ করতে হবে। মাহ চুচাক খাদিজার পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—উনি কোথায় ?

বিস্মিতা হয়ে খাদিজা বলে—কার কথা জিজ্ঞেস করছেন বেগমসাহেবা ?

—তোর প্রভু, মানে আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাদিজা বলে—তাঁর কথা আর না-ই বা শুনতে চাইলেন বেগমসাহেবা!

ব্যস্ত হয়ে মাহ চুচাক বলে—ওরে না না, আমাকে শীগগির বল তিনি কোথায় ?

খাদিজা বলে—তিনি উজবেগদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আর ফেরেন নি। সেখানে সম্রাট বাবরকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

—এ্যাঁ! সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে মাহ চুচাকের। মৃত্যু ঘটেছে তার স্বামীর! উঃ, জেনে শুনেও কেন সে তাঁকে মানা করেনি যুদ্ধে যেতে! কেন সে তাঁকে জোর করে ঠেলে দিল মৃত্যুর পথে? যাবার সময় উনি যে অনুরোধ করেছিলেন তা সে অবজ্ঞা করে কেন কষ্ট দিল! হায় নাহিদ, কেন আমি তোদের আগে বুঝতে পারিনি! বসে অঝোরে কাঁদতে থাকে মাহ চুচাক।

দেখে অবাক হয়ে যায় খাদিজা। মনিব-ঠাকরুণের এই পরিবর্তন দেখে তার চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সে তাঁর পাশটাতে এসে বলে—আপনি শান্ত হোন বেগমসাহেবা!

শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা ও নারীত্বের মূল্যায়ন

অরুণিমা মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় লেখক তাঁর সমসাময়িক কালে তো নয়ই, তাঁর পরেও বোধ হয় জন্মাননি। তাঁর এ বিপুল জনপ্রিয়তা কালের বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে অটুট থাকতে পারবে কি না, সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলা শক্ত। তবে একথা অনস্বীকার্য্য, শরৎ-সাহিত্যের ভক্ত পাঠকের সংখ্যা-বৈপুল্য বোধ হয় আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই মনোহারিতা গুণের পিছনে যে যুক্তিটি প্রধান বলে মনে হয় সেটি হচ্ছে সময়োপযোগিতা। শরৎচন্দ্র আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-জীবনের নির্লজ্জ অবিচার ভণ্ডামির দৌরাত্ম্যে দুঃসহ মানুষের মননশীলতার কাছে প্রকট করে তুলে ধরেছেন সে সমাজের সাহিত্য-রস-মণ্ডিত স্বরূপটি। করেছেন সমাজের তথাকথিত অসার নীতি-আদর্শের উপর স-বিদ্রূপ
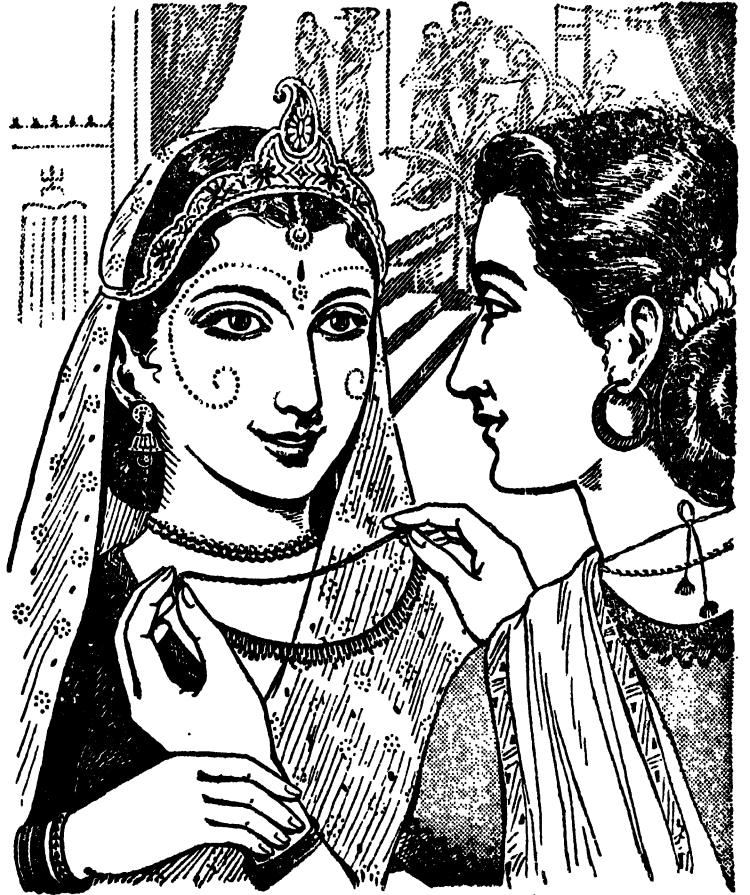
কটাক্ষপাত। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যথার্থ নীতি-আদর্শ শেখাবার পরিকল্পিত স্বতন্ত্র প্রয়াস নেই সেখানে আর তার সংগে পাঠকমনের রুচির বিরোধ ছিল না,—ছিল আনুকূল্য। জন-মানস ঝোঁক ছিল বিপ্লবধর্মিতার দিকে। শরৎচন্দ্র হাওয়া বুঝে পাল খাটালেন। যুগের দৃষ্টিভংগীর বিবর্তনকে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর সাহিত্যে।

এই অর্থে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে 'রিভলিউশনার আর্টিষ্ট'—বিপ্লবী সাহিত্যকার। সাহিত্যে প্রধানত নীতি-আদর্শের নাম-সংকীর্তনের মধ্যে তিনি আনলেন নতুন সুর, নতুন বাণী। অভিনব দৃষ্টির আলোকে তিনি রাঙিয়ে তুললেন অন্তরপ্রকৃতিকে। মানবতা পেলো তাঁর হাতে নতুন মান। হৃদয়হীন সমাজের অন্ধ-কারায় নিপীড়িত মানব-সত্তাকে তিনি দেখালেন তাঁর অন্তরতম হৃদয়ের সহানুভূতির শান্ত-স্নিগ্ধ প্রদীপ-শিখা। এবং এ অভিনবত্বটুকু প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন নারীসত্তাকে তাঁর নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে। অবশ্য রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের অনেকেই এ অভিনবত্ব সম্বন্ধে নীতি ও শ্লীলতার প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তেমন রক্ষণশীল বিচার-বুদ্ধির উর্দ্ধে।

প্রাক-শরৎ-সাহিত্যের বঙ্কিমী নীতি-আদর্শের প্রাধান্যের যুগে শরৎ-সাহিত্য এক প্রশংসার্হ দুঃসাহসিক প্রয়াস সন্দেহ নেই এবং শরৎচন্দ্র বাংলার যে সমাজ-জীবন থেকে তাঁর সাহিত্যের উপাদান নিয়েছেন তাঁর সাহিত্য সেই আচার-সর্বস্ব নির্মম সামাজিকতার এক অনিবার্য্য, বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া। প্রধানতঃ শরৎচন্দ্র এ 'রিভল্ট' আনলেন তাঁর সাহিত্যে নারীত্বের বিশ্লেষণে। অবশ্য প্রথম রিভল্ট হলেও তথাকথিত সমাজের অন্ধ কুসংস্কার, কু-প্রথা অন্যায় অবিচার সম্পর্কে একটা বিরোধমূলক ভাব-বন্যা বয়ে চলেছিল বাংলার বুকে, বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে অস্পষ্টতার চোরাবালি সরিয়ে কূলগ্রাসী, বিরোধী বিপ্লবী এই ফল্গু ধারাটিকে আবিষ্কার করেছেন। প্রকাশ করেছেন মানবতার কাছে মানুষেরই অবমাননা—ঘৃণা তাচ্ছিল্য অ-সহানুভূতি। রসাত্মক ভাবে। শরৎচন্দ্রের নিজের কথাতেই বলি:—'রিভল্ট আমি আনিনি, তবে যা এসেছে যুগের প্রবাহে এবং আমি শুধু তা প্রকাশ করেছি। আর এ-প্রকাশ সামাজিক কুসংস্কার, অনাচারের নিশ্চল শিলাস্তূপের ওপর আঘাত হেনেছে। সমাজের গণ-মানসে আলোড়ন তুলেছে।'

কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজ চিরকাল নারীত্বকে নৈতিকতা দিয়ে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে শুধু নীতি-স্বীকৃত ছিল না, তা সমগ্র নারীত্বের নৈতিকতা। সেখানে সতীত্ব ও নারীত্বে কোন প্রভেদ নেই। সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীত্বের বিকাশ অসম্ভব। শরৎচন্দ্র এই প্রচলিত সামাজিক ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন। নারীত্বে এমন একচোখো বিশ্লেষণের অযৌক্তিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, অনেকদিন ধরে কোন ধারণা বা বস্তু চলে আসছে বলেই যে তা ঠিক তা নয়। কোন কিছুই চিরকালের জন্য সমান ভাবে ঠিক নয়। শরৎচন্দ্রের অভিনবত্ব হল: তিনি নারীত্ব থেকে সতীত্বকে পৃথক করে দেখেছেন। সতীত্ব ও নারীত্ব নারীচরিত্রের দুইটি সত্তা—এক বৃহতের দু'টি অংগ—তাহল পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্ব এ দুয়ের প্রত্যেকটি থেকে বড়। তাই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সতীত্ব একটা অংগ বই তো নয়। কাজেই মনুষ্যত্বকে সে ছাপিয়ে উঠতে যাবে তা তো হতে পারে না! শরৎচন্দ্রের মতে নারীচরিত্রের বিকাশ শুধু মাত্র সতীত্বে নয়, বা একমাত্র সতীত্বই সমগ্র নারীসত্তা বিচারের মানদণ্ড নয়।

সতীত্ব বাদ দিয়েও নারীত্বের মহিমা গ্রাহ্য হতে পারে। যে নারীর জীবনে তথাকথিত সতীত্ব নেই, বা তেমন সতীত্ব বিকাশের সুযোগ নেই,সে কি নারীচরিত্রের অন্য গুণে মহিমময়ী হয়ে উঠতে পারে না? তাই বলে সংসারে সতীত্বের প্রয়োজন নেই একথা ঠিক নয়। আবার একমাত্র সতীত্বের গুণ নিয়েও নারীত্ব পূর্ণতা পেতে পারে না। এমন কি, সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীত্বের বিকাশ (যদিও পরিপূর্ণ নয়) সম্ভব, কিন্তু আমাদের বিচারের নারীত্ব—স্নেহ-মমতা সেবা ধর্ম-দরদ-আত্মত্যাগ প্রভৃতি নারীর কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলোকে বাদ দিয়ে, শুধু সতীত্ব নিয়ে নারীসত্তার বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ—নারীত্ব সে মনুষ্যত্বের সংগে অচ্ছেদ্য ভাবে, প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, আর সতীত্ব নিহিত থাকে জীবনের একটা বিশেষ পর্য্যায়ে গড়ে ওঠা আনুগত্য ও পরিতৃপ্ত মনোধর্মিতার মধ্যে। মনুষ্যত্বের সাথে তার যোগসূত্র কিছু দূরের—পরোক্ষ। অবশ্য সংস্কারান্ধ হিন্দু নারীর লোকদেখানো পোষাকী সতীত্বের মধ্যে মনুষ্যত্বের কোন মহৎ বৃত্তি নেই। সে এক ধরণের অন্ধতা, আত্ম-প্রতারণা—যাকে তথাকথিত হিন্দু সমাজ দিয়েছে প্রচুর মূল্য।

জীবনে চলার পিচ্ছিল পথে কোন নারীর দৈবাৎ পদস্খলন হল—ভুল করে ফেললো—সতীত্ব হারালো, কিন্তু তাই বলে কি সে সমগ্র নারীত্বকে হারিয়ে ফেললো? হয়তো তার মধ্যে এক মহাপ্রাণ লুকিয়ে আছে—যে পরের ব্যথায় কাঁদে, পরের এতটুকু ভাল করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরের জন্য এই যে কাঁদা, এই যে ব্যাকুলতা তাই তো নারীমনের কোমল বৃত্তি, নারীত্ব, যা ছাড়া নারীচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব!

সতীত্ব নারীর গুণ সন্দেহ নেই, তাই বলে ক্ষণিকের ভুলের জন্যে সে যদি সতীত্ব না রাখতে পারলো তার জন্যে কি সে সমাজ থেকে চিরতরে বহিষ্কৃত হবে? নারীত্বে ঐশ্বর্য্যবতী হওয়া সত্ত্বেও? শরৎচন্দ্র কত দুঃখ করে বলেছেন: 'একটি যুবতী মেয়ে যদি যৌবনে একবার একটা ভুল করে ফেলে তাহলে তার আর রেহাই নেই। তার চরম দুর্গতি করিয়ে তবে লোকে ছাড়বে। কেন? তার ভাল হবার পথ, সমাজের একজন হয়ে ফিরে আসবার পথ কেন খোলা থাকবে না? তার কি প্রাণ নেই? আমি তো জানি তাদের মধ্যে এত বড় প্রাণ আছে যা অনেক গৃহস্থঘরের সতী মেয়ের মধ্যে নেই। সতীত্ব না রাখতে পারাটা অপরাধ ঠিকই, তাই বলে পতিতের উপরে উঠবার সুযোগ করে দেওয়াটা অন্যায়ের প্রশ্রয় নয়।' শরৎচন্দ্র মানুষের এই দৈহিক পতনের দুর্ভাগ্যে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছেন। স্বভাবদুর্বল নীতিচ্যুত মানুষকেই তিনি কোনদিনই পাপী বলে হীন চক্ষে ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ-জাতিভ্রংশকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি সতীত্ব ও নারীত্বকে এক করে দেখেছেন সতীত্বহীনার নারীত্ব নেই। সে পাপীয়সীর সামাজিক কর্তব্য। তাই কুন্দনন্দিনী রোহিণীর শাস্তি হল ঐ একই কারণে। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা তাচ্ছিল্য শরৎচন্দ্র ভাবতেও পারেন নি।

তাঁর চন্দ্রমুখী পতিতা অসতী পাপীয়সী হয়েও পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করলো কোন্ গুণে? তার সতীত্ববোধ জাগবার জন্যে? না তার নারীত্বের মনোরম বিকাশের জন্যে? শুধু মাত্র সতীত্ব হলে তা সম্ভব হত না। কেননা নারীত্বকে বাদ দিয়ে সতীত্ব কি করে সুন্দর হবে? সতীত্ব একক ভাবে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। নারীর কোমল চিত্তবৃত্তি সতীত্বকে মহিমা দিয়ে সুন্দর করে তোলে। তা না হলে অমন সতীত্বের অর্থ কি? তাই শরৎচন্দ্রের দরদী মনের প্রশ্ন: 'দৈহিক শুচিতাই কি এতবড় গুণ, যে মেয়েমানুষ স্বামী জেলে যায় দেখেও তাকে বাঁচাবার জন্যে গহনা টাকা বের করে দেয় না—সেও সতী! সেরূপ সতীত্বের যে কি মূল্য জানিনে।'

হিন্দুসমাজ তবুও হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ নারীত্বকে বাদ দিয়ে পোষাকী ফরমাসী সতীত্বকে সমগ্র নারীসত্তা বিচারের মাপ-কাঠি করেছে। কোন নারী চিরাচরিত সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হয়ে শরৎচন্দ্রের মতো মানবদরদীর সমর্থন পেতে পারে যদি সে সমাজ ভৈরব ভটচায্যি বেণী ঘোষালের সমাজ হয়—যে সমাজ প্রকৃত তথ্যকে উপেক্ষা করে কেবল এক নিরর্থক কংকালকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। মানবতাকে অবমাননা করেছে। রমা-রমেশের মত সমাজের প্রকৃত মংগলাকাঙ্খীর সমস্ত সদিচ্ছাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। তাই শরৎচন্দ্রের কত সহানুভূতি মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্যে: 'আমার কথা হচ্ছে, আমি যেন কোন দিন মানুষের আত্মাকে আমার লেখার মধ্যে অপমান না করি। মেয়ে মানুষই হোক আর পুরুষ মানুষই হোক তার ওঠার জন্য পথ যেন একটা খোলা থাকে। হিন্দু সমাজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তার তুলনায় মুসলমান সমাজ অনেক ভাল। বাইরের জিনিষ দেখে আমরা অনেক ভুল করছি। কিন্তু বাহিরটাই তো সব নয়। অন্তরই যে বড়। তাকে তো সত্যি অস্বীকার করা যায় না।' কোমল-শুভ্র নারী-হৃদয়ের ভালবাসা কোমল বৃত্তির পরম উৎস—পরম ধন। সে পাঁপড়িটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দলিত করে দিতে চায় নিষ্ঠুর সমাজ-শাসন। সমাজ-নিয়ম তার মূল্যায়ন কোন দিন করতে শেখেনি। তার মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে শেখেনি। বোঝেনি—ভালবাসা কত বড় শক্তির উৎস—নারীকে কত বড় ত্যাগের কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিত করে। শরৎচন্দ্র বলেছেন আরও বড় কথা: 'ভালবাসা যে কত বড় জিনিষ তা বলে বোঝান যায় না। সব দোষ-ত্রুটি এতে ঢেকে যায়। ভালবাসার মত আত্মত্যাগের শিক্ষা দিতে আর তো কিছু পারেনা। প্রণয়-পাত্রীকে জয় করবার জন্যে যুবকের যে বিপুল চেষ্টা, যে আন্তরিক সাধনা, এত মাধুর্য্য তা আমি অন্যত্র দেখে দেখে ভুলতে পারিনি। এই যে পাবার মধ্যে কত সেকরিফাইস, কত চেষ্টা, কত সাধনা, এতে মানুষকে অনেকখানি নোবল, অনেকখানি গ্রেট করে দেয়।'

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা অন্য রকম। রকমটা অবশ্য একান্তভাবে অসমর্থনীয়—অন্ধতায় পটু। অপব্যবস্থায় কণ্টকময়। এ সমাজে যুবক-যুবতীর বিয়ে ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে বাবা-মায়ের ইচ্ছাধীন ছিল। কয় যুগ আগেও হিন্দু ঘরের কোন মেয়ে ভাবতেও ভয় পেত—সে কখনো কোন যুবককে ভালবেসে বিয়ে করবে। এমন কি ভাবী স্বামীর কল্পনাও বুঝি তার কাছে ভয়ের। এই ভয় করতে শিখিয়েছে তার পরিবেশ—বাবা-মায়ের শাসন ও সমাজের দৃঢ় অনুশাসন। সে জানে বাবা-মা তাকে যার হাতে তুলে দিয়েছে, সেখানে তাকে বাঁধা পড়ে থাকতে। দাম্পত্য-জীবনে অতৃপ্তি থাকলেও সামাজিক মন্ত্রোচ্চারণ আর যজ্ঞের ধোঁয়ায় যে জীবন একবার বাঁধা পড়েছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে কি করে? সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হবে কি করে? বিদ্রোহের ধাতটি তার রক্তে নেই—সে সংস্কারান্ধ। সমাজ-শাসনের দাস। শৃংখলিত। শরৎচন্দ্রের অভিযোগ এ ধরণের অন্ধতার বিরুদ্ধে। সমাজের কু-শাসনের বিরুদ্ধে। যে সমাজ নারীর কোমল হৃদয়ের কোন গোপন কোণ ঘেঁষে ফুটতে যাওয়া একটি মৃদু-সুন্দর প্রণয়-ফুলকে কঠোর শাসনের রুদ্রতেজে অকালে ঝলসে দেয়, শরৎচন্দ্রের মতদ্বৈধ সে হৃদয়হীন সমাজের সংগে। যে সমাজ অন্তরের চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করে চরম অন্ধতায় একান্ত অসত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে, মানবতায় দৃঢ়বিশ্বাসী মানুষ সে সমাজের নিয়ম-শাসনকে কোন দিনই সমর্থনের দৃষ্টি ফেলে দেখবে না। নারী-হৃদয়ের সেই সত্যানুভূতির প্রতি তথাকথিত সমাজের মনোভাব সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন: আমাদের এখানে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। জয়ের যে একটা আনন্দ, জীবনের ওপর তার যে একটা মহৎ প্রভাব, তা থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত থাকে। জয়ের জন্য কত ব্যগ্রতা, কত ব্যাকুলতাই না দেখেছি। তারা শক্তি সঞ্চয় করে, নিজেকে তারা যোগ্য করে তোলে, দরকার হলে 'ডুয়েল' লড়ে। তারা ভালবাসার মর্য্যাদা বোঝে, ভালবাসার সম্মান তারা রাখতে জানে। এখানকার সমাজ ধরে-বেঁধে কতকগুলো মন্ত্র পড়ে দু'জনকে এক করে দিল, কিন্তু তারা ভালবাসার একটা জীবন্ত আনন্দ কখনো পায় না।'

শরৎচন্দ্রের এই মতবাদ রক্ষণশীল সমাজের চোখে বিপ্লবাত্মক সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের সমর্থিত সে 'ভালবাসা' সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধ মতবাদ হচ্ছে: "প্রণয় পাত্র-পাত্রীকে জয়ের জন্যে যে ব্যাকুলতা তা ক্ষণিকের—তার স্থায়িত্ব চিরদিনের নয়।" শরৎচন্দ্রের উত্তর হল: 'যে আনন্দ তাতে আছে, তা দুর্লভ। হতে পারে ক্ষণিকের, কিন্তু দু'-দশ দিনের যে আনন্দ, তার তুলনা নেই। সে আনন্দ জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্টকে ছাপিয়ে বড় হয়ে থাকে। তার ইনফ্লুয়েন্স খুবই কার্য্যকরী। কঙ্কোয়েষ্টের আনন্দ—সে কি কম? 'সেলফ-মেড' মানুষ যেমন বড়, যারা হৃদয় কঙ্কার করে তারাও তেমন বড়।'

নারীত্বে মূল্যায়ন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এ ধরণের সম্বন্ধ-চেতনা তথাকথিত সামাজিক রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক করবে। তারা তুলবে শরৎ-সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন। কিন্তু সে অন্ধরা ভুল বুঝেছে। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র দুর্নীতি প্রচার করেননি। নীতি-বর্জ্জিত তিনি মোটেই ছিলেন না, ছিলেন উদারনীতিবাদী। মানবদরদী। তিনিই স্বীকার করেছেন: 'নীতি আমি মানিনে, এমন কথা আমি বলিনে। শুধু সৌন্দর্য্যচর্চা করব, কোনও নীতি-রুচি মানবো না—এতো আর সত্যি সত্যি চলতে পারে না। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, সাহিত্যের ভেতর নীতি-টিতি নেই, রুচি আছে। আমি কিন্তু তা বলিনি, আমি বলি, নীতিও আছে।'

শরৎ-সাহিত্যে নীতিকথা যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু সেখানে কাউকে পরিকল্পিত ভাবে নীতি শিক্ষাদানের প্রয়াস নেই—যে প্রয়াসটুকু খুঁজে পাওয়া যায় বংকিম-সাহিত্যের অনেক জায়গায়। সেখানে নায়ক-নায়িকায় কথাবার্তায় যে নীতিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে তা

সামাজিক মানুষের সংস্কারের সাথে মিশে যাওয়া স্বভাবসিদ্ধ নীতিবোধের প্রকাশ। একান্ত সাহিত্যোচিত রসাশ্রয়ী পন্থায়।

নারীত্বের মূল্যায়ন পর্য্যায়ে শরৎচন্দ্রের অভিনব সমাজ-দর্শনের ছায়া পরবর্ত্তী বাংলা-সাহিত্যে প্রচুর রয়েছে। তা শুধু অনুকরণ নয়। 'রিভল্টে'র উত্তরাধিকার। বৈধ বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। আরও এগিয়ে তৃতীয় ধাপে—অর্থাৎ সর্বাধুনিক যুগে সেই অভিনব সমাজ-দর্শনের দৃষ্টি সাহিত্যে আরও উদার হয়েছে। তাই শরৎচন্দ্র বাংলায় যে বিপ্লবাত্মক নূতন পথের পথিকৃৎ শরতোত্তর বাংলা-সাহিত্যে প্রধানতই সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে পথেই এগিয়ে চলেছে, আরও বুঝি চলবে বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে পা ফেলে।

রক্তগোলাপ

গীতা চক্রবর্ত্তী

মিতা,

লক্ষ্ণৌ থেকে তোমায় যে চিঠি দিয়েছি আশা করি তা পেয়েছ। এখন যে চিঠি তুমি পাবে তা যাচ্ছে আগ্রা থেকে। মিতা, ৪ঠা তারিখে আমরা এসে আগ্রায় পৌছেছি। সেদিন বিকেলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রেমিক সাজাহানের 'মর্ম্মর স্বপ্ন' তাজমহল দেখতে। আমরা যখন মতি মসজিদের সামনে দাঁড়ালাম, তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা এসে পড়েছে মসজিদের উপর। দেখলাম ঘুরে ঘুরে সব। দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো, মনে হোলো এই মহাকাল, যে কালের কবলিত হয় সব প্রতিপত্তি, মান, সম্মান। আস্তে আস্তে সূর্য্য মতি মসজিদের পিছনে বিলীন হয়ে গেলো। আমার মনে হোলো ঠিক এমনি করেই অস্ত গেছে মোঘল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য্য। সাইপ্রাস বনভূমির মধ্যে দিয়ে বৈকালিন বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পাতার মধ্যে আসতে আসতে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তা যেন বনভূমির দীর্ঘশ্বাস। আমরা সেইখানে ঘাসের উপর বসে আমাদের জলযোগ সারলাম। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, ভাগ্যক্রমে সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। একটু একটু করে জ্যোৎস্না তার রূপালী ফাগ ছড়াচ্ছে তাজমহলের উপর। চমৎকৃত হলাম। যে বেদনার গুরুভার এতক্ষণ বুকটা চেপে ছিল এতক্ষণ তা যেন নেমে গেল। অবাক হয়ে গেলাম যে তাজমহল এতদিন শুধু গল্পে পড়া রূপকথার রাজত্ব ছিল, আজ তা প্রত্যক্ষ করছি। তা এত সুন্দর!

অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব সাজাহানের শিল্পদৃষ্টি! তাঁর প্রেম! তাজমহলের প্রতিটি পাথর যেন মমতাজ আর সাজাহানের প্রেমসুধা-সিঞ্চিত। আর সেই পাথর দিয়েই তৈরী তাদের প্রণয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি। আমার মনে হোলো মনের গহনে কোন কবি বলে উঠলেন—

তাজমহলের পাথর দেখেছ দেখেছ কি তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরে সাজাহান।

মিতা। আজ বড়ো তোমার কথা মনে হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে যেমন দুজনে সিরাজদৌল্লার কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলাম, তেমনি এই দুই প্রণয়ী যারা আজও দুটি কবরে পাশাপাশি শুয়ে করছে তাদের প্রেমালাপন যুগ যুগ ধরে, তাদের করতাম আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন।

মিতা, অনেকে বলে এই তাজমহল নাকি মমতাজের মৃত্যুর পর হয়নি। হয়েছিলো তাঁর জীবিতাবস্থায়। তবে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ হয়নি। সাজাহানের ছিল 'রঙমহল' মমতাজের 'তাজমহল'। কোন একটি বিশেষ দিনে যখন বিশেষ বাতি জ্বলবে রঙমহলে তখন মমতাজ আসবে নৌকা করে যমুনা অতিক্রম করে রঙমহলে। আর যখন বিশেষ বাতি জ্বলবে তাজমহলে তখন সাজাহান আসবে যমুনা বেয়ে তাজমহলে। কিন্তু বিধাতার অভিশাপ, কল্পনা তাঁদের কল্পনাই রইলো। নিষ্ঠুর নিয়তি ছিনিয়ে নিলো মমতাজকে। তাই প্রেমিকার অভিসার রজনী শেষ হলো। রচিত হলো বাসরশয্যা কবরের কঠিন মাটিতে তাজমহলের বুকে। মিতা! তবু তারা সুখী—

একজন আগে গিয়ে অপেক্ষা করছে আর একজনের জন্যে তারপর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পেয়েছে তার দয়িতকে।

দীর্ঘদিন অদেখায় যে বিরহ-যমুনার সৃষ্টি হয়েছে কবে তা পার হোয়ে তোমার দেখা পাব? মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে, আর বেশি দেরী করব না। এবার কিছু গ্রাম ঘুরে মাসখানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরব। এর মধ্যে চিঠি না-ও পেতে পার, লক্ষ্মীটি রাগ করো না। আমার যাওয়ার দিন আমাদের বাড়ী তোমার থাকা চাই। ইতি

তোমারই অসীম।

চিঠিটা পেয়ে খুশিতে ভরে যায় সুমিতার মন। অসীম আগ্রা গেছে, দেখেছে তাজমহল। তারও বড় তাজমহল দেখার সখ। ঠিক আছে বিয়ের পর তারা যাবে। সে শুনেছে তাজমহল দেখতে যায় 'ক্রৌঞ্চ-মিথুন।' ভাবতেই লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে যায়। চিঠিটাকে বার বার পড়ে। হঠাৎ অসীমের বোন সুনন্দার গলা পাওয়া যায়—

বৌদি ভাই! ও বৌদি ভাই—

ছুটে যায় সুমিতা—এই নন্দা কি করছিস?

—কেন কি করেছি?

—তুই বৌদি ভাই বৌদি ভাই বলে চেঁচামিচি করছিস কেন? মা শুনলে কি ভাববেন বল তো?

—ও মা, এতে আবার ভাববার কি আছে! কাল যা হবে আজ তা বলছি, আর তা ছাড়া ত মাসিমা জানেনই।

—জানলেই বা।

আচ্ছা বাবা, অন্যায় হয়েছে। এবার থেকে মিতাদি' বলবো। যাক দাদার চিঠি পেয়েছো? অবশ্য এ' জিজ্ঞাসা করা অন্যায়, তবু করছি। মিতা চিঠিটা দেখায়।

—ও বাবা! তোমার চিঠিটা কত বড় আমারটা মাত্র এক পৃষ্ঠা, দাঁড়াও না কেমন ঝগড়া করি ওর সঙ্গে।

সুমিতা বলে থাক, আসলে ত ঝগড়া করবি আপাততঃ একটু চুপ কর। আয় চা খাবি আয়।

কানপুর এসেছে অসীম আর তার বন্ধুরা। আশ্রয় নিয়েছে এক বাঙ্গালী পরিবারে। অত্যন্ত যত্নে তারা এদেরকে আপন করে নিয়েছে। অসীমের অপর দুই বন্ধু কয়েক দিন পর তাদের আত্মীয়ের বাড়ী চলে গেছে। অসীমকে বাধ্য হয়ে এখানেই থাকতে হলো।

প্রতিদিন অসীম ভোরে উঠে ক্যামেরা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, দুপুর রোদে পুড়ে তবে ফিরে আসে। কানপুরে বড় বড় ধান-ক্ষেতের

মধ্য দিয়ে যখন সে আসে মনে ভাবে, বিয়ের পর 'সে' আর 'মিতা' আসবে। খেলবে লুকোচুরি ধানক্ষেতের মধ্যে।

অসীম অবাক হয়ে যায়, প্রতিদিন তার ঘর কে যেন গুছিয়ে রেখে যায়। ময়লা জামা-কাপড় পরদিন ধোয়া অবস্থায় ভাঁজকরা থাকে টেবিলে। যাক, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব বেশী অবসর থাকে না অসীমের। বাড়ীর কর্ত্তা, গিন্নী, অত্যন্ত ভাল। আপন লোকের মতো যত্ন করে তাকে।

অসীমের কানপুর দেখা হয়ে গেছে, এবার বাড়ী যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আয়োজন করে যাত্রার। বাড়ীর কর্ত্তা বলেন—বাবা, আমার একটি মেয়ে আছে বোধ হয় জান। সামনের ৫ই তারিখে তার বিয়ে। এই দিনটি তোমায় থেকে যেতে হবে। ওকে বোধ হয় তুমি দেখনি বড় লাজুক, তবে ও তোমায় বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে।

অসীম বলে, তাই বুঝি ? আমি ত আপনার মেয়ে আছে জানতাম না!

জানবেই বা কি করে, বাইরে বাইরেই ত থাক চব্বিশ ঘণ্টা—যাক লীলা এদিকে আয় তো মা!

অসীম ভাবে এই তবে তার ঘর গুছায়, পরে বলে—আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ না খেয়ে কিন্তু যাচ্ছি না, লজ্জায় লীলা পালিয়ে যায় বাবার সামনে থেকে।

বিয়ের দিন, রাত্রিবেলা বর বিয়ে করতে বসেছে, হঠাৎ একটা গণ্ডগোল শোনা গেলো। বরপক্ষ বর তুলে নিয়ে যাবে, এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। কারণ অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই বর পক্ষ বর নিয়ে চলে গেলো। শোনা গেল ছেলে পক্ষ মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান আর তার জন্য অসীমই দায়ী। অবাক হয়ে যান মেয়ের বাবা ভূপেন বাবু। ছিঃ ছিঃ অমন দেবতুল্য চরিত্রের ছেলের নামে এ অপবাদ! কি বলবেন তিনি অসীমকে, অসীম তো চলেই যেত শুধু তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে এই কলঙ্কের সম্মুখীন হতে হলো। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ভূপেন বাবু। স্ত্রী এসে মিনতি করে বলেন. ওগো তুমি একবার অসীমের হাতে-পায়ে ধরে মিনতি করো ও ছাড়া কে রক্ষা করবে আমাদের। মান-সম্মান সবই যায়, ওগো কুলধর্ম সবই যায়। যাও তুমি একবার।

এরই মধ্যে সব ঘটনা গিয়ে পৌঁছেচে অসীমের কানে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে। ছিঃ ছিঃ একি কথা, এমন এদের অবস্থা! আর এ কথা মনে করতেই যার কথা মনে হয় সে একটি শান্ত সুন্দর লাজুক মেয়ে। হায় রে! এই মেয়েরও ভাগ্যবিড়ম্বনা। ভাবতে থাকে অসীম, ঘরময় ঘুরে আর অস্থির ভাবে পায়চারি করে।

হঠাৎ ভূপেন বাবু হন্তদন্ত হয়ে অসীমের ঘরে ঢুকে কেঁদে ফেলে। বাবা অসীম, তুমি বাঁচাও আমায়, নইলে আমার মান সম্মান সব যায়। শত্রু হাসছে, তুমি আমাদের স্বজাতি আর লীলা আমার দেখতে খারাপ নয় বাবা, ধর্ম রাখো। আমি এখুনি তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। আমারই সব অপরাধ আমি স্বীকার করব।

—না না, একি কি বলছেন আপনি, এ কি করে সম্ভব হবে?

বাবা তোমার পায়ে ধরছি, তোমরা যুবক ছেলে, তোমরা না বাঁচালে আমাদের উপায় কি বাবা? তুমি যদি রাজী না হও আমি এক্ষুণি মেয়েকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হবো। তবুও আমি শত্রুর মুখ হাসাব না, কুল রাখব।

নিরুপায় অসীম, সবার উপরে একখানি মুখ বার বার মনে হয়, যে এখনও তার অপেক্ষায় দিন গুণছে, সে হোলো সুমিতা। তাই হঠাৎ নিরুপায়ের মতো বলে উঠে, না না, ব্যাপার হয়েছে কি আমি বিবাহিত।

বিবাহিত! মুহূর্ত্তের জন্য থমকে যান ভূপেন বাবু। পরে অসহায়ের মতো বলে ওঠে বাবা, তাতে কি হয়েছে তোমার স্ত্রীর ত দাসীর প্রয়োজন—লীলাকে তার দাসী করে নাও বাবা! তুমি যদি না নিতে চাও তবে শুধু একটু শাস্ত্রমতে সিঁদুর দিয়ে দাও। তারপর আমরাই রাখবো। এটুকু দয়া আমায় করো বাবা, ১১টাই শেষ লগ্ন, এর পর আর ওর বিয়ে হবে না। আর বেশী সময় নেই।

অসীম ভাবে—মিতা, আমায় তুমি ক্ষমা করো, আমি নিরুপায়। তার পরে বলে, ঠিক আছে, আপনারা বিয়ের আয়োজন করুন।

বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু হলো না কোনো আনন্দোৎসব। যেন বিরাট একটা অমঙ্গল কোন রকমে নির্বিঘ্নে কাটান হোলো।

খবর পৌঁছাল বাড়ীতে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলো সবাই, এ কি! মা বড় আশা করেছিলেন যে সুমিতা হবে এ-বাড়ীর বধূমাতা। সব আয়োজনই সম্পূর্ণ, শুধু মাত্র অসীমের কথার অপেক্ষা, কি বলবেন তিনি সুমিতার মাকে?

খবর পেয়ে অসীমের বাবা চলে যান কানপুর, বউ দেখে তার বেশ পছন্দই হয়। তাছাড়া ভূপেন বাবু দিয়েছেন অনেক। তাতেই তাঁর তৃপ্তি। ছেলেমেয়ের মনের খবর তিনি রাখেন না বা তার মূল্যও তিনি দিতে চান না। তাই বাড়ীতে খবর দেন বৌভাতের সব বন্দোবস্ত করতে। তিনি দু'এক দিনের মধ্যেই ছেলে-বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরছেন। সুনন্দা সুমিতাদের বাড়ী যায় অপরাধীর মতো, কি বলবে সে মিতাদি'কে। দেখে খাটের বাজু ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মিতা। সুনন্দাকে দেখে মিতা বিছানার উপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। কি দেবে সান্ত্বনা তাকে, সুনন্দা নিজেই কাঁদতে থাকে। আসেন সুমিতার মা, শান্ত সৌম্য একটি দেবী-মূর্ত্তি। যেন আরো বেশী মাত্রায় শান্ত হয়েছেন। সুনন্দা কিছু বলতে পারে না। তিনিও কিছু বলেন না, এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নীরবে আবার চলে যান।

এসে গেছে অসীম আর লীলা। বাড়ীতে ফুলসজ্জার আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। অসীম বার বার বারণ করেছে এসব আয়োজন করতে কিন্তু তার বাবা ললিত বাবু তার কথা রাখেন নি। স্ত্রী যখন বলতে এসেছে তিনি বলেছেন, কেন? এটা কি আমার শ্রাদ্ধ না কি যে চুপ করে কাজ সারতে হবে? আমার একটি ছেলের বৌভাত, আর তাছাড়া আমার মান জাত কুল সবই বজায় আছে। প্রকাশ করার মতো সম্বন্ধ হয়েছে আনন্দ করব না কেন? দু'দিন আগে থেকে সানাই আসবে। তোমার অসুবিধা হলে অন্য বাড়ী গিয়ে বসে থেকো।

কি বলবেন অসীমের মা, চুপ করেই থাকেন। যথানিয়মে ফুলসজ্জার দিন এসে পড়ে। সকাল থেকে লোকজনের আসার বিরাম নেই। কিন্তু সুনন্দার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। মাকে গিয়ে বলে—মা মিতাদি' আসবে না মা? মা বলেন কি করে আসবে মা সে? আর আমিই বা কোন মুখে তাকে আসতে বলবো?

হঠাৎ কার গলার স্বর শুনে চমকে যায় মা, মেয়ে—নন্দা এই নন্দা কোথায় গেলি বলতো, তোর কি কাজের দিনেও ঘুম কমালে চলে না—আর এই ত আমি ভাবছি কোথায় বসে বসে ঘুমাচ্ছিস—

আয় আয়, এখনও বৌদিকে সাজাস নি, সন্ধ্যে হয়ে গেলো, লোকজন আসতে সুরু হয়েছে। তোর বুদ্ধি কোন জন্মে হবে না। আর মাসিমাও বেশ ওর সঙ্গে এখনও দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কি বলবেন মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। কি অপূর্ব্বই না লাগছে আজ মিতাকে। বড় সুন্দর লাগছে মিতাকে—যেন শ্বেতবসনা সরস্বতী পরেছে একখানা শাদা বেনারসী। গায়ে শাদা ব্লাউজ, গলায় সাদা মুক্তোর মালা হাতে সাদা রজনীগন্ধার চুড়ি, খোঁপায় রজনীগন্ধার মালা, কপালে শ্বেত চন্দনের টিপ। শুধু মাত্র একটি রক্তগোলাপ বুকে। সুনন্দা বুঝতে পারে না তার সাজের অর্থ। সুনন্দা জানে মিতাদি'র কোন কাজই অর্থহীন নয়। অবাক হয়ে বলে মিতাদি' এর অর্থ ?

—কিসের ?

—তোমার সাজের ?

কিছু না, শোন, বাইরে আমাদের চাকরের হাতে যা আছে নিয়ে আয় বৌদিকে সাজাব। সাজায় মিতা বৌদিকে লাল বেনারসী লাল ব্লাউজ, খোঁপায় রক্তগোলাপের মালা, কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা। পরায় চন্দন অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে। যেন আপন মনের সমস্তটুকু রস নিংড়ে রঞ্জিত করেছে সে লীলাকে।

নন্দা যা না ভাই, অসীমকে সাজিয়ে দে। বাড়ীতে লোকজন আসবে, বর সে, তাকেও একটু সাজাতে হবে। যদি না সাজতে চায় বলিস মিতা বলেছে। আমি যাই ওদের খাটটা সাজিয়ে দিয়ে আসি। তুই বৌদিকে একটু পরে নিয়ে আসিস।

মিতা বর-কনের খাট ফুলে ফুলে সুন্দর করে সাজিয়েছে। খাটের দু' পাশে শিয়রের দু' পাশে দিয়েছে তার নিজের হাতে গড়া দু'টি মাটির প্রদীপ, নিজের হাতে আঁকা একখানা হর-পার্ব্বতীর মিলন মূর্ত্তি তার তলায় লেখা রয়েছে তোমাদের শুভমিলনের দিনে মহামিলনের প্রতীক। আর বড় একটা ফুলদানিতে এক ঝাড় রক্তগোলাপ। যে এসেছে বৌ এবং ফুল-সজ্জার ঘর দেখে সকলেই প্রশংসা করে গেছে। সত্যি যে সাজিয়েছে সাজাবার ক্ষমতা আছে। শিল্পিজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

রাত্রে একে একে সব অতিথি চলে গেছে, আত্মীয়-স্বজন যারা আছে তারা বৌকে নিয়ে খেতে গেছে—কেউ নেই ঘরে। আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে মিতা। দেখে অসীম চোখ বুজে শুয়ে আছে, মুখে একটা ক্লান্ত অবসাদের ভাব। সুমিতা ভাবে ঘুমিয়েছে অসীম। তাই শেষবারের মতো চুপি চুপি তাকিয়ে থাকে ঐ ঘুমন্ত মুখের দিকে, তারপর ? তারপর আস্তে আস্তে চোরের মত বেরিয়ে আসার সময় জেগে যায় অসীম, ডাকে—মিতা—! দাঁড়িয়ে পড়ে সুমিতা, এই ডাককে উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই সুমিতার।

এগিয়ে আসে অসীম, মিতা তুমি তো জানো যে আমি নিরুপায়। আমার পার তো ক্ষমা করো কিন্তু মিতা, সবইতো তুমি একজনকে দিয়ে গেলে, আমায়—আমায় কি দিলে মিতা! আমি কি নিয়ে থাকবো ? সুমিতা কিছু না বলে আস্তে আস্তে বুক থেকে রক্তগোলাপটা খুলে দেয় অসীমকে।

—আমার যেটুকু ছিল সবটুকু দিয়ে যাকে রাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলাম দেখো তার যেন কোন অনাদর না হয়। বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। না খেয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে যায় বাড়ী।

পরের বছর। আজ-কাল কেমন যেন হয়ে গেছে সুমিতা, সব সময় একটা অন্যমনস্ক ভাব। দশ বার ডাকলে একবার উত্তর দেয়। একটুতে রেগে যায়। আজ কাল তারা মামার বাড়ীর কাছে এসে বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকে। নিজেদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কারণ তাদের নিজেদের বাড়ী অসীমদের বাড়ীর পাশে। সেদিনটা ছিল অসীমের ফুলসজ্জার দিন। গত বছর এমন দিনে অসীমের ফুলসজ্জা হয়েছে। সুমিতা মাকে বলে অজস্র ফুল আনিয়েছে। আনিয়েছে রক্তগোলাপ, আনিয়েছে দুটো বড়ো বড় যুঁইয়ের মালা। সুন্দর করে সাজিয়েছে তার শোবার খাট। যেমন করে সাজিয়েছিল অসীমের ফুলসজ্জার দিন, তারপর সেজেছে নিজে তেমনি করে। আজ কিন্তু সাদা নয় আজ সব লাল। যেমন সাজিয়েছিল সেদিন লীলাকে।

রেখেছে অসীমের দেওয়া অসীমের ফটোটা বিছানার উপর, পরিয়েছে তাকে মালা। সাজিয়েছে তাকে চন্দন দিয়ে। মা ঘরে ঢুকে এই ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে যায়। দেখেন সুমিতা অসীমের ফটোটাকে মালা পরিয়েছে, পরেছে নিজে মালা। তারপর বুকের অত্যন্ত কাছে নিয়ে বলছে—

তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার বৌকে হিংসে করবো। দেখলে ত এতটুকুও হিংসে করিনি। নিজেকে রিক্ত করে সমস্তটুকু রক্ত নিংড়ে রাঙ্গিয়েছি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না ? কিন্তু আজ আমি রিক্ত নয় আজ আমি পূর্ণ। দেখছো তাই আজ আমি লাল। আমি যাচ্ছি আমার মহলে মমতাজের মতো। আমিও অপেক্ষা করবো। তোমার কাজ সেরে যেদিন আসবে সেদিনের জন্য। তখন আর কেউ থাকবে না থাকবে না কোন প্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু তুমি আর আমি। বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। তার ফটোটাকে বুকের অত্যন্ত কাছে নিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মা এই অবস্থা দেখে চোখে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর মিতার কোন সাড়া না পেয়ে মা মেয়ে ঘরে এসে দেখেন খাটের উপর ফুলের উপর ঢলে পড়েছে যেন কুসুম-কন্যা আর বিড় বিড় করে বলছে—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙ্গীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

কিন্তু মুখের অবস্থাটা যেন কেমন! পায়ের কাছে খাটের উপর নিজে পড়ে আছে অসীমের ফটোটা টুকরো টুকরো অবস্থায়। এগিয়ে আসেন মা—হঠাৎ দেখেন মিতার হাতে তার আফিমের কৌটো। তিনি তাঁর বাতের জন্য প্রতি সন্ধ্যায় একটু একটু আফিম খান, সেই আফিমের কৌটো খালি।

চীৎকার করে উঠেন মিতার মা—মিতু—মা, আমার কি সর্ব্বনাশ করলি তুই, ওরে, এই জন্য তোর এত সাজ! আমি একটু বুঝিনি। কি করলি মা—

মহলে যাত্রী অভিসারিণী মিতা জড়িত ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, আঃ—মা অ-ত চেঁচামেচি করছ কেন, কাল সারা রাত বাসর জেগেছি, আজ একটু ঘুমুতে দাও।

ছুটি

রীনা মিত্র

এখন সময় আর আমার মাঝখান
দুস্তর মরুর ব্যবধান।
ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে,
ঘণ্টার সরব ঝঙ্কারে,
হরিণ-পায়ে ছোটাবে না আমায়।

মিলের আকাশ-ছোঁয়া নলের পাশে,
রক্তরাঙা সূর্য্যের প্রকাশে,
সময় বললে—'পাঁচটা দশ'।
তাকে জগতের সবার দ্বারে
পাঠিয়ে দিয়ে,
পরম নিশ্চিন্ততার কুহেলী-ঘেরা স্বপ্নটাকে
আবার জড়িয়ে ধরলুম।

এখন আকাশ-জোড়া ছুটির রবে
নীল রঙে ভরা দিনগুলি।
বাতাসও বেশ মন্থর,
মা'র কোলের কাছে ঘন হয়ে বসা
নিশ্চিন্ততার মতো।

এখন সময় নেই, 'গ্রামার' নেই,
স্কুলের টেবিলের সবুজ খাতাটা নেই,
এখন সময় আর আমার মাঝখানে
দুস্তর মরুর ব্যবধান।
ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে,
ঘণ্টার সরব ঝঙ্কারে,
হরিণ-পায়ে ছোটাবে না আমায়।

মৃত্যুর পরে

বিশাখা ঘোষ-রায়

আমাকে ক'র না দাহ, বন্ধ রেখো না কফিনের আধারে।
উদার আকাশ-ছায়ায়, মৃত্তিকার কণার কণায়,
আমার দেহের প্রতি অণুতে অণুতে—মিশিয়ে দাও।
সেনোটাফের প্রয়োজন মিটে গেছে;
(কারণ ওটা লোকদেখানো আর জমির অপচয় মাত্র)।
শুধু একটি ফুলের গাছ, পুরোনো বিশ্বাসী ভৃত্যের মত,
উষার সাথে সাথে অজস্র ফুল ঝরিয়ে দেবে
আমার সমাধির ওপর।
আর কবরের মাটিতে, চির-নিদ্রায় শায়িত থেকেও
আমি দেখব, ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রণয়লীলা।
এবং শতবর্ষ পরে
তখনকার সেই কৃষকের মুখে কলহাস্য ফুটে উঠবে।
জমিতে প্রচুর শস্য;
মৃতদেহের সার।

একফালি রোদ্দুর

স্বপ্না গুপ্তা

একফালি কাঁচা রোদ্দুর
আবির মাখিয়ে দিলে কত শুল মনে।
ছোট্ট একফালি রোদ্দুর,
ও-বাড়ীর কার্ণিশ ঘেঁসে যে এসেছিল
এ-বাড়ীর ছোট্ট উঠানে।
সে এনেছিল দিনের খবর, আর—
জীবনের একটুকু হাসি।
সে এনেছিল এ-বাড়ীর ধোঁয়া অন্ধকারের রাজ্যে
আনন্দ-ভরা ফুল এক রাশি।
তাই—এ-বাড়ীর ছেলেদের মাঝে,
কাড়াকাড়ি পড়ে গেল মহা ধুমধামে।
তার পর ছোট্ট রোদ্দুর চলে গেল হঠাৎই,
বেঁকে গেল ও-বাড়ীর থামে।

অব্যক্ত

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

এ মনের প্রান্তদেশ জুড়ে
শুধু এক নিঃসীম রিক্ততা জাগে।
আকাশ উজাড় করে যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরে,
হৃদয়ের শব্দহীন কান্নার মতো।
অন্তরের পুঞ্জীভূত ব্যথার সকরুণ রাগিণী বাজে,
যখন প্রভাতের আবছা কুয়াশা-ঘেরা মাঠে
ঘাসে ঘাসে বিন্দু বিন্দু শিশিরের 'পরে;
ভোরের প্রথম আলো চিক্-চিক্ করে
গোপন অশ্রুর বেদনাবিষন্ন প্রকাশের মতো।
হৃদয়ের অতলান্ত দেশে সব
খেলা শেষের চির-বিদায়ের ধ্বনি ওঠে,
যখন ছায়াম্লান গোধূলি নামে পৃথিবীর 'পরে,
অন্ধকার রাত্রি আসে আকাশের পটে দ্রুত পদসঞ্চারে;
বর্ণহীন, রন্ধ্রহীন, হিমনীল মৃত্যুর মতো।

দিন-রাত্রির কাব্য

সঙ্ঘমিত্রা রায়

কবির কথা আর বেদনায়, ওমরে মরে দুঃখের কাব্যখানি
হাসি-কান্নার মাঝে বিদ্রূপের কুটিল ভ্রূকুটি।
জীবনের বাকী ক'টা দিন বিদায়ের শেষও জানায়,
এ জীবন সুরুতেই জানি।
তবু হাসি ম্লান হয়ে অম্লান কিছু কাটি ছাঁটি সান্ত্বনা লেখায়
আমায় মানুষের যত কথা জান, সুখ ও শান্তির যত বাণী
এ সবের অচেনা রাগিণী অজানার বেড়াজালে দুঃখের সেই কাব্যখানি,
বাস্তবতা রূঢ় অতি যন্ত্রণাদায়ক।
জীবন-সংগ্রাম কবি পেটে ক্ষিদে কঠোর যন্ত্রণা
লজ্জা পেয়ে কাব্য মানি আরক্তিম মুখটি লুকায়,
কবি লিখেছে শুধু সে কাব্যের সেই কি নায়ক?

বাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দশ লক্ষ টাকা আর এই লালকুঠি ছাড়া কলকাতায় আরো দুখানি বাড়ী এই হোল তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি। শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলছিলেন সোমনাথ সুমিতাকে—আজ তার একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য আমি এসেছি। হলে অপেক্ষা করছেন কয়েকজন সাক্ষী এ্যাটর্নি আর রেজিষ্ট্রার—একটু হেসে আবার বললেন তিনি—তুমিই এ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এর জন্য কোনো উইল বা দানপত্রের প্রয়োজন নেই। তবে আমি বেঁচে থাকাকালীন সেটার পূর্ণ অধিকার তোমরা পেতে পারো না, সে জন্য আমাকে আইনতঃ তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তবে—নীরব হলেন তিনি।

—তবে কি বাবা? মৃদুকণ্ঠে শুধোলো সুমিতা।

কম্বলের ওপর পদ্মাসনে বসে চোখ বুঁজে কি যেন চিন্তা করছিলেন সোমনাথ। কপালে ফুটেছে কয়েকটি রেখা, চাপা বেদনার ম্লান ছায়া যেন আজ উঁকি মারছে তাঁর প্রশান্ত সৌম্য বদনে। কন্যার প্রশ্নের জবাব দিলেন না তিনি, কোন্ গভীর সমস্যার নিবিড় অরণ্যে যেন পথ অন্বেষণ করছেন!

লাইব্রেরীকক্ষে তখন আর কারুর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো।

কয়েক মিনিট পরে চোখ খুললেন সোমনাথ। চাইলেন কন্যার দিকে। কোন অলৌকিক দিব্য বিভা ঝলমল করছে ওঁর দুটি চোখে, তার তীব্রদ্যুতি সইতে পারা যায় না।

—মিতু!

চমকে উঠলো সুমিতা পিতার ডাক শুনে!

ও কণ্ঠস্বর যেন এ পৃথিবীর নয়, কোন্ দূর-দূরান্তরের দিব্যলোক থেকে ভেসে আসছে ও ডাক।

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো সে আমায়,—আমায় কিছু বলবেন বাবা?

না। পূর্ব্বের মত সুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন সোমনাথ। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো। কথার শেষে কন্যার মাথায় হাত রেখে নীরবে আশীর্ব্বাদ করলেন যেন।

—বাবা! কেঁপে উঠছে সুমিতার গলার স্বর।

—বলো মা! সঙ্কোচ কোরো না!

বাবা! এ সম্পত্তির দুর্ব্বহ বোঝাটা আমার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। আমি এ বোঝা বইতে পারবো না বাবা! আপনি কোনো সৎকাজে এ-সব দান করে দিয়ে এর সদ্ব্যয় করুন বাবা! আর—কথা থামিয়ে মাটির দিকে চোখ নামালো সুমিতা।

বলে যাও, থেমো না!

দামীদা'কে সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়েছেন ওঁর কাকা। ব্যবসা, বাড়ী কিছু নাকি তার নেই বাবা! কান্নার ভারে কেঁপে উঠলো সুমিতার কণ্ঠস্বর। দু'চোখে আঁচল চেপে ধরে বাঁধভাঙা অশ্রুবন্যাকে রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো সুমিতা।

সব জানি মিতু! পরম স্নেহভরে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন সোমনাথ। আমার মা-ঠাকুমার পবিত্র রক্তধারার সম্মান তুমি আজ রক্ষা করেছো। মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলে আজ তুমি। সামনের অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ো না মা! এর পরে আছে অনন্ত জীবন, অনির্ব্বাণ আলো। সে আলোর পথে চলবার অধিকার লাভ আজ করেছো তুমি।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁর দুটি পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলো সুমিতা।

ওকে দু'হাতে তুলে ধরে প্রগাঢ় স্নেহে নিজের বুকে টেনে নিয়ে ওর মাথার ওপর হাত রেখে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে অস্ফুটস্বরে কি আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারণ করলেন সোমনাথ। কোন এক ঐশ্বরিক মনঃশক্তি দিব্যচৈতন্য যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে সুমিতার সঙ্কুচিত অন্তরে। জাগতিক সত্তা ডুবে যাচ্ছে মহাভাবসাগরের অতল গভীরে।

সুমিতার সর্ব্বাঙ্গে জেগেছে এক পুলক-কম্পন, সে কম্পনে আছে কি এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ! দুনয়নে ঝরছে দর-দর ধারায় আনন্দাশ্রু।

কেটে গেলো কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত্ত।

কন্যাকে সঙ্গে করে হলঘরে এলেন সোমনাথ। একটু পৃথকভাবে বসলেন কম্বলাসনে!

আর সকাল বসেছিলেন সোফায়, চেয়ারে!

—সোমনাথকে নীচে বসতে দেখে সকলে উঠে দাঁড়ালেন সসম্ভ্রমে।

আপনারা এখানেই বসুন,—এবং কাজের সুরু করুন, বললেন সোমনাথ।

অসীমও উপস্থিত ছিলো সেখানে, তির্ষক দৃষ্টিতে চাইলো সুমিতার দিকে। ক্রোধ আর বিরক্তিতে থমথম করছে ওর মুখখানা।

অপমানের জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে ওর। ওকে বাদ দিয়ে মেয়েকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করার মানে হচ্ছে সকলকার সামনে ওকে অপদস্থ করা। আচ্ছা, এর প্রতিশোধ কি ভাবে দিতে হয়, সেটাও দেখবে আজকের দর্শকরা। আগে সম্পত্তিটা হাতে আসুক।

করবী আর অনিলও বসেছিলো সেখানে সোমনাথের আদেশে। মায়া দেবী আনাগোণা করছিলেন, আগন্তুকদের চা-জলখাবার ঠিকমত দেওয়া হল কি না তার তদারকে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন।

—এবার লিখুন আপনারা—বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন সোমনাথ!

—আমি প্রস্তুত! জবাব দিলন অ্যাটর্নি।

—আমার এত নম্বরের ওল্ড বালিগঞ্জের পৈত্রিক বসতবাড়ী লালকুঠি ও এক লক্ষ নগদ টাকা আমি দান করলাম আমার কন্যা সুমিতা হালদারকে।

অ্যাটর্নি বিব্রতভাবে একবার চাইলেন সোমনাথের দিকে আর আড়চোখে দেখলেন অসীমের মুখখানা, তারপর লিখতে সুরু করলেন।

—হয়েছে? এবারে লিখুন—আমার অমুক নম্বর এলগিন রোডের বাড়ী ও নগদ এক লক্ষ টাকা আমি দান করলাম—আমার স্বর্গীয় বন্ধু মহিম হালদারের একমাত্র পুত্র শ্রীমান সুদাম হালদারকে।

গুরু-গুরু মেঘ গর্জ্জনের সাথে সাথে, রাশি রাশি আগুনের সাপ ঝিলমিলিয়ে উঠলো আকাশে, ঘরশুদ্ধ সকলে একবার নড়ে চড়ে বসলো। পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলো। অসীমের দৃষ্টি তখন ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিবদ্ধ। হু হু করে বইছে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া, অঘ্রাণ মাস। শীতের সুরুতেই হঠাৎ এমন ঝড়-বৃষ্টি জ্বালিয়ে মারলে, তাই বোধ হয় তেতো খাওয়ার বিকৃতি ওর চোখে-মুখে সুস্পষ্ট।

—হাঁ লিখুন, বললেন সোমনাথ—আমার এত নম্বরের থিয়েটার রোডের বাড়ী আর সাত লক্ষ টাকা আমি দান করলাম একটি হাসপাতালের জন্য। এই হাসপাতালে আমার দেশের দুঃস্থ জনগণের চিকিৎসা ও সেবা হবে বিনা পয়সায়। আর এই হাসপাতাল গঠন ও তত্ত্বাবধানের ভার দিলাম শ্রীমান সুশান্ত হালদারের ওপর। বাকি এক লক্ষ টাকার ভেতর থেকে আমি কুড়ি হাজার টাকা দান করলাম আমার কনিষ্ঠা শ্যালিকা শ্রীমতী করবী চ্যাটার্জ্জিকে। দশ হাজার টাকা দিলাম আমাদের বৃদ্ধ মালী রামভজন সিংকে, আর কুড়ি হাজার টাকা দিলাম বৃন্দাবনে শ্রীগুরু গোপী মহারাজের যোগাশ্রমে।

বাকী পঞ্চাশ হাজার ব্যাঙ্কে থাকবে আমার নামে, আমার মৃত্যুর পর ঐ টাকা যোগাশ্রমকে দেওয়া হবে।

নীরব হলেন সোমনাথ। বাইরে তখন প্রবল বেগে বর্ষণ সুরু হয়েছে। দুরন্ত বাতাসের ঝাপটা লেগে দুলে উঠছে দেওয়ালে বিলম্বিত দীর্ঘাকার অয়েল পেণ্টিং ছবিগুলো। মনে হচ্ছে যেন পূর্ব্ব-পুরুষদের ছবিগুলোর মাঝে অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা দল বেঁধে দেখতে এসেছেন সুযোগ্য বংশধরের কীর্ত্তিকলাপ। অভিশপ্ত সম্পত্তির সার্থকতায় বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস ভারে দুলে উঠছেন ওঁরা। ওঁদের প্রতিভাদীপ্ত নয়ন থেকে ঝরে পড়ছে নীরব আশীর্ব্বাদ। শান্ত দৃষ্টি মেলে, ছবিগুলোর দিকে চেয়েছিলো সুমিতা। দিব্য প্রশান্তির শান্ত আলোয় ঝলমল করছিলো ওর করুণ মুখখানি!

অনতিদূরে কোথায় কড়কড় শব্দে বাজ পড়লো, থর-থর করে কেঁপে উঠলো লালকুঠি! চারিদিক থেকে শাঁখ বাজতে লাগলো, সত্যর লালা সংবরণ করার মিনতি জানিয়ে।

—আমার কিছু বলবার আছে!

চমকে উঠলো সুমিতা। অসীমের কণ্ঠস্বরে যেন বজ্রপতনের আওয়াজ!

—ওর দিকে চোখ ফেরালেন সোমনাথ, ধীর কণ্ঠে বললেন, বলো!

—আপনার কন্যা মানে আমার স্ত্রী সুমিতাকে যেটুকু দান করতে চাইছেন, সেটা ওর প্রয়োজন হবে না, বরং ওটা আপনি আশ্রম-টাশ্রমে দান করলে বাইরে আপনার সুনাম হবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে একটু হাসলেন সোমনাথ, তারপর প্রশান্ত বদনে জবাব দিলেন—আমার যা করবার তা আমি শেষ করেছি। ভবিষ্যতে সুমিতা যদি ইচ্ছা করে, তবে সে-ই ওটা জনকল্যাণে উৎসর্গ করতে পারবে।

—ঠিক আছে, অধৈর্য্য ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললো অসীম—এসো মিতা, আমার আর বসবার সময় নেই, কাজ আছে।

—সে কি? এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে যাবে কোথায়? বোসো, বোসো, একটু পরেই বৃষ্টি থেমে যাবে মনে হয়, বললো অনিল।

—ধন্যবাদ! তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো অসীম। কুলি-মজুর খাটিয়ে খাই আমরা, ঝড়-বৃষ্টি থেকে গা বাঁচানোর ক্যাসান করা শোভা পায় না আমাদের মত ইতর জনের!

—মিতাকে কাল আমি যাবার পথে পৌঁছে দিয়ে যাবো, সুগম্ভীর স্বরে বললেন সোমনাথ।

—চাপা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো অসীমের মুখখানা। দুচোখে চক-চক করে উঠলো যেন দুই বিদ্যুৎশিখা আর তার তীব্র জ্বালাভরা উত্তাপ ছিটকে গিয়ে লাগলো সুমিতার সর্ব্বাঙ্গে।

কি, তোমারও তাই ইচ্ছে নাকি? যাবে? না থাকবে? দাঁতে দাঁত ঘসে বললো অসীম।

কালই যাবো, ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলো সুমিতা। পিতার আরেকটু কাছে সরে বসে।

ঠিক আছে। মস-মস করে জুতোর শব্দ তুলে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো অসীম।

অখণ্ড নীরবতার মাঝে কেটে গেলো কয়েক মিনিট। কোন্ দুষ্টু যাদুকর হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে সকলকে বোবা করে দিয়ে গেছে! শুধু টেবিলের ওপর বসে সোনার খাপের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে 'ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক' বলে যাচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়িটা।

সামনের বারান্দার এক কোণে রূপোর দাঁড়ে বসেছিলো এ বাড়ীর বুড়ো কাকাতুয়াটা। সুমিতার আবাল্য সাথী সে। অনেকদিন পরে মিতাকে দেখে ঝিমুনি ছেড়ে আজ হঠাৎ খুসিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জানলায় উড়ে বসে বার বার মুখ বাড়িয়ে দেখছে মিতাকে। আপন মনে বক বক করে বলে যাচ্ছিলো এতদিনের না বলা কথাগুলো।

সকলকে অমন চুপচাপ দেখে সে-ও হঠাৎ থেমে গেলো। লাল লাল ক্ষুদে চোখগুলো পিট-পিট করে গলা ফুলিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করলো—তারপর আচমকা হো-হো করে হেসে উঠলো।

সারাদিন ধরে চললো একটানা ঝড়-বৃষ্টি। সন্ধ্যার পর মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়লো। প্রশস্ত সাদা মার্ব্বেল পাথরের বারান্দায় বসেছিলেন সোমনাথ, নিকটে তাঁর উপবিষ্ট সুমিতা আর করবী।

—আচ্ছা আমাকে অতগুলো টাকা শুধু শুধু দিলেন কেন জামাইবাবু? আর দিলেন যদি, কি ভাবে তার সদ্ব্যয় করবো সে উপদেশ আপনার কাছেই চাইছি—বিনীতভাবে বললো করবী।

—ওর দিকে চেয়ে একটু হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন সোমনাথ—বিবাহ যদি না করো তবে নিজের জীবন নির্ব্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে কখনও যদি অর্থের প্রয়োজন নেই বোধ করো, তাহলে চিন্তা করে নিজেই এর সদগতি কোরো।

তেরচা ভাবে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে লালকুঠির মোটা মোটা থামগুলোর গায়ে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে আলোর বন্যা নেমে এসেছে শুভ্র মর্ম্মর-চত্বরের ওপর। কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে আসছে স্বর্ণচাপা, শিউলি, বকুলের গন্ধ। আলো-আঁধারে মেশামিশি স্তব্ধ নিঝুম সাঁঝের মায়া বড় আনমনা করে তুলেছে সুমিতাকে। অকারণে কেন দুচোখ ভরে আসে জল!

ঠিক দু বছর আগে এমনি দিনে চলে গেছে সুদাম কোন সুদূর সাগরপারে। এমনি চাঁপা বকুলের গন্ধ তখনও ছড়ানো ছিলো বাতাসে। তখন মনটা ছিলো ওর মধুর বিরহ বেদনায় ভরপুর, কিন্তু হতাশার অন্ধকার ছিলো না তো? অনাগত দিনের কত রঙিন স্বপ্নে ভরা ছিলো সে দিনগুলো।

তারপর? কি যে হল! সব মিলিয়ে গেলো ছায়াছবির মতো, উঃ!

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট সজোরে চেপে ধরে, উঠে গিয়ে বাগানের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো সুমিতা। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে ফেললো জলে ভরা চোখ দুটো। ঝটপট আওয়াজে মুখ তুলে চাইলো সে—মহাশূন্যে আলোর সায়রে সাঁতার দিয়ে ভেসে চলেছে একজোড়া দুধ-শাদা বলাকা।

বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ওর কেঁপে কেঁপে মিশে গেলো পুষ্পগন্ধী বাতাসের সাথে। চমক ভাঙলো ওর দিদিমার ডাকে।

—দুধটা খেয়ে নাও তো মিতু! ছ'-সাত মাস শ্বশুরবাড়ীর ভাত খেয়ে কি ছিরি হয়েছে গো! মরে যাই। গলার স্বর কেঁপে উঠলো ওর।

সুমিতা দিদিমার আদেশ পালন করলো। এঁটো গ্লাশটি ওর হাত থেকে জোর করে দিদিমা কেড়ে নিয়ে বললেন, এত সঙ্কোচ কিসের দিদি? সেই একরত্তি থেকে তো এই দিদিমারই বুকে ছিলে, পরের ঘরে পাঠিয়ে কেমন করে যে বেঁচে আছি—বাকিটা আর বলতে পারলেন না, কান্নার ভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো তাঁর।

রুমালে চোখ মুছতে মুছতে সোমনাথের কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।—বাবা সোমনাথ! কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন মায়া দেবী—তুমি যে এত মহৎ একথা আগে বুঝিনি বাবা! আমার কপার অদৃষ্টে এত সুখ সইলো না—এমন রামচন্দ্র স্বামী এমন রামরাজত্বি ফেলে তাকে চলে যেতে হল বড় অসময়ে। রুমালে চোক-নাক মুছে, আবার বলতে লাগলেন তিনি, সবই আমার এই পোড়া অদৃষ্টের ফল বাবা, তা না হলে কি এত বড় মেয়ে আইবুড়ো থুবড়ি হয়ে চোখের ওপর ঘুরে বেড়ায়? না অমন বিদ্বান ছেলে বিয়ে করে একটা সিনেমার নটীকে?

কত আশা ছিলো বাবা, এই দুটো ছেলে-মেয়ের ওপর কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেলো।

করবী একটু হাসলো সোমনাথের মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে।

—অত শত আর নাই বা ভাবলেন, বললেন সোমনাথ, ওরা বড় হয়েছে, যে যার পথে চলুক, যার যা করণীয় কাজ তারা নিজেরাই সম্পাদন করুক, এখন, ওদের দিকে নজর না দিয়ে আপনার নিজের চিন্তা করুন, বোধ হয় এতেই শান্তি পাবেন। ফুলকে উৎপাদন করুন

ক তৈরী করে দেওয়াই গাছের কাজ, কিন্তু সে ফল গাছ কোনোদিন াগ করে না, সময় হলেই ফল ফুল চলে যায় যেমন তার জননীর কাছ কে, মানুষের জীবনের তাই হয়, সৃষ্টির রহস্যই এই। মাতা, পিতা, , পুত্র, কন্যা, সবারই প্রয়োজন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, তারপর লের স্রোতে কে কোথায় হারিয়ে যায়, তার জন্য শোক করা বৃথা। নন্ত মহাকালের মহাসমুদ্রে প্রতি মুহূর্ত্তে ভেসে উঠছে অনন্ত জীব-বুদ, দু-চার দণ্ড লীলাখেলার তরঙ্গে ভেসে আবার মিশে যাচ্ছে াসাগরের বুকে। কিন্তু কেন এই আসা-যাওয়া? এই মহা জ্ঞাসার জন্যই যোগী-ঋষিরা কঠোর তপস্যা করেছেন। তারপর সব নেছেন, পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন পথভ্রান্ত মানুষকে। একটু থেমে াবার বললেন সোমনাথ—শোক, দুঃখ, হতাশায় জর্জরিত মানব-ন্তানদের এঁরাই শুনিয়েছেন আশার বাণী, অভয় বাণী অমৃতের ন্তান তুমি, মৃত্যু তোমার নেই। ধনী, দরিদ্র, সুরূপ, কুরূপ, পণ্ডিত, র্খ, সুখী, দুঃখী, এসব তোমার ক্ষণভঙ্গুর খোলস মাত্র। এক মুঠো লা এর স্বরূপ। আসল তুমি কি? আর কে? তারই অনুসন্ধান রো, নিজেকে জানো, সব জানার শেষ হবে। অনন্ত কামনার যে ন্ত শিখা নিত্য দহন করছে তোমাকে, সাধনার অমৃতধারায় ঘটবে ার চিরনির্ব্বাণ।

নীরব হলেন সোমনাথ। অলৌকিক জ্যোতিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি তাঁর শূন্যে নিবদ্ধ। নিবিষ্ট চিত্তে মায়া দেবী শুনছিলেন সোমনাথের থাগুলো। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—

—আহা, তোমার কথা শুনে বুকটা যেন জুড়িয়ে গেলো বাবা! মন জ্ঞানের কথা আর কেউ শোনায়নি কখনও। এখন মনে হচ্ছে বনটাকে বাজে খরচ করেছি বাবা! তুমি ঠিকই বলেছো, সব খাঁটি থা, কেউ কারুর নয়। তাই এখন ইচ্ছে করে এসব ছাই-ভস্ম ফেলে ন কতক তীর্থবাস করি ধম্ম-কম্মো করি; জানি না বাবা, কপালে ওসব হবে কি না। সখেদে কপালে হাত দিলেন তিনি।

—প্রবল ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই হবে। ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন সোমনাথ।

সব কিছু যেন আজ নতুন ঠেকছে সুমিতার কাছে। রেলিংএ লান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনছিলো ওদের থাগুলো। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দেখছিলো, ক্ষ পাষাণ গিরিকন্দর থেকে কেমন করে ঠাৎ শত ধারে ঝরে পড়ছে মন্দাকিনীর ইমধারা! মিতভাষী, উদাসীন, অটল াম্ভীর্য্যের বর্ম্মে ঢাকা পিতার যে কঠোর প্রতি এতদিন সকলকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো, আজ সে রূপের এ কি শ্চর্য্য বিবর্ত্তন! কোথায় লুকিয়েছিলো ই স্নেহপ্রস্রবণ! আর সেই রূঢ়ভাষিণী, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না অভিভাবিকা দিদিমা! আজ যেন স্নেহকরুণাময়ী মৃদুভাষিণী মমতায় বিগলিতা!

হায়! আগে কোথায় ছিলো এ দুর্লভ বস্তু? যার অভাবে ওর হৃদয়-শতদলটি পরিপূর্ণ আনন্দের আলোয় দল মেলে ফুটে উঠতে পারেনি? সঙ্কোচ-কুহেলিকায় সে গেলো বিশীর্ণ হয়ে।

না, না, বাবার কথাই ঠিক। যখন যা হবার, তখনই তাই হয়, আগেও নয়, পরেও নয়। যা তার পাওনা ছিলো তাই পেয়েছে সে।

থপ থপ করে চেককাটা কালো কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো রামভজন সিং। চাঁদের আলোয় মিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ বিষম চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর হাতজোড় করে বললো, উধারে কেন মায়ী? রাজলছমী। এ বুঢ়ার শিরমে দাঁড়াও মা! হা-হা করে কেঁদে, উপুড় হয়ে দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো রামভজন সিং।

—অবাক সুমিতা—ছুটে এসে দু-হাতে বুড়োকে তুলে ধরে বললো—একি একি! ভজনদা', কি হল তোমার?

সোমনাথও বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

দু-হাতে চোখ মুছে কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললো বুড়ো,—ভীমরথী ধরেছে দিদি ও কিছু না।

জরাভারে নুয়েপড়া দেহটাকে টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে সোমনাথের কাছে গিয়ে বসে, হাঁপাতে লাগলো রামভজন। সুমিতাও বসলো ওর পাশে, ওর পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন সোমনাথ—এতটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে কেন ভজন সিং? মিতুকে দেখে হঠাৎ অমন চমকেই বা উঠলে কেন, বলে ফেলোতো ব্যাপারটা কি?

—বলবো? আচ্ছা বলছি বাবা! ফুটফুটে আলোয় মনে হল, না, না মনে হল না, একেবারে পষ্টই যেন দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন বহুরাণী কমলা দেবী।

সেই কত কাল আগে—বাবা তুমি যখন এতটুকু এই বছর খানেকের ছিলে, তখন পেরায় রাত ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি বহুরাণীকে। একদিন হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকলেন আমায়, আমি এমনি করে এসেছিলাম এইখানে। দেখি ফুটফুটে চাঁদের আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আহা

রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রক্‌টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রক্‌টাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রক্‌টা দেখলো তার-পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রক্‌টা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবিনা?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্‌টা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার সামনে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রক্‌টা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি? "ফ্রক্‌টার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এমন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধম্‌কালো—" তোর মাথা খারাপ

হল নাকি' এতটুকু বাচ্চাকে মারছিস। "মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রকটা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।"

ফ্রকটা নিয়ে আমি কলতলায় পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রকটাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো" মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি!"

"এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অন্য ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো, "কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"

আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে?"

"আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামা-কাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিশুদ্ধ যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয় না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—" সে কিরে, ভেবে দেখ্, একটু ঘষলেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে এক গাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই সাদা ধব্‌ধবে করে। এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্বনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।"

তক্ষুনি আমি একটা সানলাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনার স্তূপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধব্‌ধবে হলো। সন্ধ্যেবেলা নতুন কাচা ফ্রকটা পরে মুন্নিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগছিলো। আমি মুন্নিকে কপালে কাজলের টীপ্ পরিয়ে দিলাম।

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই
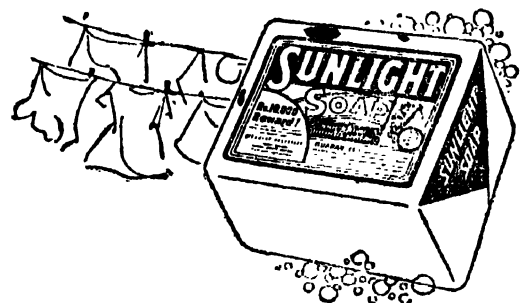
মুখখানা কি দুখভরা, আমি শুধোলাম, আমায় কেন ডাকলেন বহুরাণী!

—একবার নাচ-ঘরে গিয়ে খবর নাও না ভজন সিং, কুমার সায়েব কেমন আছেন? কাল থেকে জ্বর হয়েছে, কত বারণ করলুম শুনলেন না, নিচে চলে গেলেন, আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন বহুরাণী। তারপরে বললেন, অত হৈ-চৈ করছে বন্ধুবান্ধবরা করুক, একটু আড়ালে ডেকে ওদের আমার নাম করে বোলো, কুমার সায়েবের বেমার আছে, মদ যেন ওঁকে কেউ না খাওয়ায় ডাগদারের নিষেধ আছে।

মা লক্ষ্মীকে প্রায়ই দেখতাম ঐখানে ভর দিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে, ঐ কোণ থেকে নিচের হল কামরাটা নজরে পড়ে কি না তাই। একটু থেমে, দম নিয়ে আবার বললো রামভজন।

—আজ হঠাৎ মিতা দিদিকে মনে হয়েছিলো একেবারে অবিকল বহুরাণী! আহা যেন আমার জনম-দুখিনী সীতামাঈ।

ময়লা কাপড়ের খুঁট দু-হাতে তুলে চোখ মুছলো রামভজন সিং।

—ভুল দেখোনি ভজন সিং, ধরাগলায় বললেন সোমনাথ, আমার মা-ই দেহ পাল্টে এসেছেন মেয়ে হয়ে। তাঁর স্বামীর পাপ, এ বংশের পাপের কালি ধুয়ে মুছে এ বংশকে শাপমুক্ত করবার জন্যে যে আসতেই হবে তাঁকে! বার বার জীবনদান করে সমস্ত অপরাধের ঋণ শোধ না করা পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি যে তাঁর নেই ভজনসিং! তাঁর সন্তানেরও নেই!

মহাশূন্যের দিকে উদাস আঁখি মেলে নীরব হলেন সোমনাথ।

পরম বিস্ময়ে দেখলো সুমিতা, চাঁদের আলোয় তাঁর জলেভরা চোখ দুটো যেন চক-চক করছে!

—অমন অলুক্ষুণে কথা বোলো না বাবা! কবে কি হয়ে গেছে, সে সব কথা যাক, এখন আশীর্ব্বাদ করো মেয়েটা তোমার যেন সুখী হয়! বললেন মায়া দেবী।

জবাব দিলেন না সোমনাথ, কি এক গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন রইলেন।

—একটা কথা শুধাতে যে এসেছিলাম বাবা! বললো রামভজন দুহাত কচলে!

—বলো! যেন সুদূর থেকে ভেসে আসা সোমনাথের কণ্ঠস্বর!

—এই এতগুলো টাকা দিলে কেন বাবা ঘাটের মড়াটাকে?

—কতদিন বাঁচবে বলা তো যায় না রামভজন! না হয় দেশে ফিরে যাও, আরাম করে দু'-চারদিন থাকো গে, তারপর ভালো কাজে টাকাটা দান করে দিও!

—অনেক, অনেক আরাম করেছি বাবা, অনেক ভালো-মন্দ খেয়েছি তোমাদের কাছে! তেমন আরাম আজকালকার হাল ফ্যাসনের বড় লোকেরা কেউ কখনো চোখেও দেখেনি!

—দিদিমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে—আবার বললো বুড়ো—এই আজকালই না হয় বুড়ো মালী হয়েছি বাবা—কিন্তু তোমার বাবার আমলে তাঁর ইয়ারবক্সিদের সঙ্গে একসঙ্গে খানাপিনা করিয়েছেন আমাকে তোমার বাবা! আর যাই হোক অমন দরাজ দিল কোথাও কেউ খুঁজে পাবে না বাবা, এ আমি বলে দিলাম! আর দেশ মুলুক সবই আমার এই লালকুঠি। সেই কতটুকুন এসেছি এখানে, সারা জীবনটা তো কাটালুম, আর ক'টা দিন। মিতু দিদিকে ছেড়কে যে আমার বেহাস্তেও যেতে দিল চায় না বাবা!

—তাই নাকি? হেসে বললো করবী, আমাদের তাহলে তুমি একটুও ভালোবাসো না?

—আরে না, না রুবি দিদি! তা নয়, তা নয়, এই যক্ষিপুরীর ঐ একটা মাণিক কি না তাই বলছিলুম ঐ কথা, ভালো আমি সবাইকেই বাসি।

রাগে মুখ হাঁড়ি করে বসেছিলেন দিদিমা। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—যাই বাবা, নটী-বৌ হয়তো বেড়িয়ে ফিরবেন এখুনি, রান্নাবান্নার কি করছে বামুনটা দেখে আসি। একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি রামভজনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বিড়-বিড় করে বললেন, বুড়ো ভাল্লুকটা আবার এখানেও জ্বালাতে এসেছে, আ-মোলো যা। ঘাটের মড়া। দুম দুম করে পা ফেলে চলে গেলেন তিনি।

করবী মায়ের দিকে চেয়ে ভ্রূ কোঁচকালো। মৃদু হেসে বললেন সোমনাথ।—যা ভালো বোঝো কোরো ভজনসিং। আমি তো কালই রওনা হবো। বৃন্দাবনে থাকবো মাস দুয়েক, তারপর মানস সরোবর যাত্রা করবো।

—কতদিন পরে আপনি আবার ফিরবেন বাবা? কাতরস্বরে শুধোলো সুমিতা।

—এখানে তো আর ফিরবো না মা! এ বাড়ীতো এখন আর আমার নয়। গাঢ় স্বরে বললেন সোমনাথ, তবে সময় হলেই আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

নির্মেঘ আকাশের গায়ে ভেসে এলো একখানি ঘন কালো চলন্ত মেঘ, ঢেকে দিলো আলোঝরা চাঁদকে। চাঁপা, বকুলের গন্ধে মাতাল দুরন্ত উত্তুরে বাতাস সকলকার অঙ্গে দিয়ে গেলো হিমশীতল পরশ। টিঁ টিঁ শব্দে করুণ আর্ত্তনাদ করে গাছের ভেতর থেকে উড়ে গেলো একটা রাতজাগা পাখী।

—বাবা! কান্নার ভারে কেঁপে উঠলো সুমিতার কণ্ঠস্বর।

—বলো, মা! ওর পিঠে হাত রাখলেন সোমনাথ।

—আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে তো?

—কিছু বিলম্বে হবে মা! একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি।

—কি যেন একটা ভয় আমার মনটাকে পেয়ে বসেছে বাবা! কিছুই বুঝতে পারি না। দামীদা' চলে গেলো, আপনি চলে গেলেন, ঠিক তারপর থেকে কেমন ভয়ের ছায়া যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর রাত হলে আমি ঘুমের ঘোরে প্রায়ই দেখি কি ভয়ানক কালো সমুদ্দুর, শোঁ-শোঁ করে গর্জন করছে আর আমি ডুবে যাচ্ছি তার ভেতর! ঠিক ঐ বাতিঘর ছবিটার মতই একটা আলো জ্বলছে দূরে, আমি প্রাণপণ চেষ্টায় এগিয়ে যেতে চাই তার কাছে, কিন্তু বাবা, সে সরে যায়। উঃ, তখন কি যে কষ্টের ভেতর ঘুমটা ভেঙে যায় আর শরীর মন সব কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। তাই মনে হয় বাবা, আপনি কাছে থাকলে বোধ হয় ঐ ভয়ানক স্বপ্নটা আর দেখতে হবে না, সব ভয়ের ছায়াগুলো আর আমার সঙ্গে ঘুরবে না, তখন আবার আমি সুস্থ হয়ে উঠবো বোধ হয়।

কয়েক মিনিট চোখ বুজে নীরব রইলেন সোমনাথ। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে বার বার চোখ মুছছিলো বুড়ো ভজন সিং। করবীও

মুখ ফিরিয়েছে অন্য দিকে, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার গাল দুটো। চোখ চাইলেন সোমনাথ। সুমিতার মাথায় হাত বুলিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন—আমি লৌকিক পিতা মাত্র। তোমাকে ঐ কর্মফল মহাসাগরের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে সকল শঙ্কামুক্ত করতে পারেন একমাত্র জগৎপিতা। তুমি মনে-প্রাণে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করো মা! এই মহা অন্ধকার দুস্তর সাগর পেরিয়ে সেই অনির্বাণ জ্যোতিকে অবশ্যই লাভ করবে। অনন্তকালের মহাসাগরে জন্ম-জন্মান্তররূপ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলেছি আমরা তাঁরই দিকে। বাসনা কামনার ঝড়-ঝঞ্ঝা, সদসৎ কর্মের বিভীষিকা চারিদিকে। ভয় পেয়ো না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ো না, আলোর সন্ধানে এগিয়ে যাও তাঁকে স্মরণ করে। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই তোমার, আলোর তীর্থে যাবার শক্তি আর অধিকার লাভ করেছো তুমি। নীরব হলেন সোমনাথ। শুধু তাঁর হাতখানি ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে লাগলো কন্যার মাথায়, পিঠের ওপর। অলৌকিক শক্তি যেন সঞ্চারিত করছেন কন্যার দেহে-মনে।

আবার সেই অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ জাগলো সুমিতার সর্বাঙ্গে। কোন দিব্যভাবের মৃদু কম্পনে কেঁপে উঠলো দেহ-মন। দর-দর করে দু' চোখে নেমেছে পুলক-বেদনার অশ্রুধারা। অবনত হয়ে পিতার চরণে মাথা রাখলো সুমিতা। উষ্ণধারায় সিক্ত হতে লাগলো তাঁর চরণ-যুগল। [ক্রমশঃ

শ্রেষ্ঠ উপদেশ

শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধেয়া বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নাম আজ দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। স্বর্গত মতিলাল নেহেরুর কন্যা অথবা শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীর ভগিনী হিসাবেই তিনি খ্যাতি লাভ করেননি, নিজের কীর্তিতেও তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তিনি একাধিক বার কারাবরণ করেছেন ও স্বাধীনতার পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ যোগ্যতার সঙ্গে পূর্ণ করে মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি ইউনাইটেড নেশনস-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, তার পর যথাক্রমে আমেরিকা ও রাশিয়াতে চারি বৎসর ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিলাতে ভারতের হাই-কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

কয়েক বৎসর আগে তিনি একটা বিলাতী পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন "আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ।" সে প্রবন্ধটার কিয়দংশের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হোল।

"দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। সে সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু কারাগারে ও তাঁর কন্যারা আমেরিকায় শিক্ষারত। শোকে মুহ্যমানা হয়ে তিনি শান্তির অন্বেষণে স্থির করলেন দেশের বাইরে চলে যেতে। যাত্রার দিন-ক্ষণ ঠিক করে তিনি এলেন গান্ধীজির কাছে বিদায় নিতে। কথান্তরে গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করেছ ত?"

বৈধব্য-শোক ছাড়াও নানান পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর মন তখন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বৈষয়িক কারণে স্বামীর আত্মীয়দের উপর তিনি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তখনও দেখা করেন নি ও আদৌ দেখা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বেশ রূঢ় ভাবে গান্ধীজিকে জবাব দিলেন, "যারা আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গে আমি কিছুতেই দেখা করব না। বাপু, তুমি বললেও না।"

গান্ধীজি বোধ হয় এত রূঢ় উত্তর আশা করেন নি। খানিকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার বোঝাতে সুরু করলেন "তোমার উচিত যাবার আগে তাদের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া। এদেশে আমরা এখনও এ সব সৌজন্যে বিশ্বাস করি। তুমি অসুখী, তাই তুমি দেশের বাইরে যাচ্ছ শান্তির অন্বেষণে। কিন্তু অন্তর যদি তোমার স্বচ্ছ না থাকে তবে তুমি কি দেশের বাইরে গিয়ে শান্তি পাবে? তুমি অতি প্রিয়জনকে হারিয়েছ। এ গভীর ক্ষত ভুলতে হলে নিজেকে ক্ষুদ্র কর। সব অভিমান বিসর্জ্জন দাও। নিজের অন্তর পরিষ্কার কর। তা না হলে তোমার আহত মন শুধু আরও আঘাত পাবে। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারে না, যদি না তুমি নিজে তোমার ক্ষতি কর। (**Nobody can harm you except yourself**)."

তাঁর মন যতই বিদ্রোহ করুক না কেন, গান্ধীজির কথাগুলি তিনি কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। মনের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করে শেষে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হোল। সব অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে তিনি গেলেন তাঁর পরলোকগত স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা বলেই বুঝতে পারলেন যে তিনি তাঁদের ভুল বুঝেছিলেন। তিনি উপযাচক হয়ে দেখা করতে যাওয়ায় সমস্ত আবহাওয়াটাই বদলে গেল। সকলেরই মন হালকা হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন গান্ধীজির উপদেশটা কত মূল্যবান! মস্ত একটা বোঝা মন থেকে দূর করে তিনি রওয়ানা হলেন গন্তব্য স্থান আমেরিকায়।

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বা অবস্থা বিপর্য্যয়ে জীবনে এক-একটা সময় আসে যখন আমরা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি ও শতধা জর্জ্জরিত অন্তরে মনে করি সকলেই আমাদের শত্রু, আমাদের অনিষ্ট করতে চেষ্টা করছে। বিদ্বেষপূর্ণ অন্তরে আমরা মনে করি বুঝি বিদ্বেষ দিয়ে বিদ্বেষকে জয় করা যায়—ফলে বিদ্বেষের বহ্নি বেড়েই চলে আর সে বহ্নিতে নিজেরাই সব চেয়ে বেশী মরি জ্বলে-পুড়ে। আমরা ভুলে যাই 'অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর না করতে পারলে শান্তি মিলে না।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে দেওয়া গান্ধিজীর উপদেশ—"**Nobody can harm you except yourself**" সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব লোকের জন্যেই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। আকাশের ধ্রুবতারার মতন সকলের অন্তরে সর্ব্ব সময়ে জাজ্বল্যমান রাখা উচিত।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২১। সুখ ও দুঃখের সমতা উপলব্ধি করতে করতে ব্রজবাসীরা যতক্ষণে এই আকস্মিক ঘটনার মীমাংসায় ব্যাপৃত, ততক্ষণে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেছেন ব্রজরাজ শ্রীনন্দ। তিনিও দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁরও মুখে বিন্দু বিন্দু ফুটে উঠল উদার হাসির অমৃত। পিতৃমুখের সেই উল্লসিত সৌন্দর্য্য দেখে, আহ্লাদে নেচে উঠল বালকৃষ্ণেরও মন।

এগিয়ে এলেন ব্রজরাজ, নিজের হাতে বাঁধন খুলে দিলেন লীলাশিশুর। কোলে তুলে নিলেন। তারপর ফিরে চাইলেন ব্রজরাণীর দিকে, ঐ যিনি তাঁর সভা উজ্জ্বল করে থাকেন, এবং ঐ যিনি তাঁর অতিকর্মকুশলা, তাঁর দিকে। নিন্দাচ্ছলে বললেন, বড় অনার্য্য কার্য্য করেছেন আপনি। বলেই ব্রজরাজের অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল মহর্ষি গর্গের বাণী "নারায়ণসমো গুণৈঃ" ; বুঝতে পারলেন, এ তাঁর মহিমা জানা ছেলেটিরই কীর্ত্তি।

২২। সহচর বালকেরা বলে উঠলেন—আমাদের কৃষ্ণের কোনো দোষ নেই। কোনো পাপ করেনি ও। ও কেবল বাঁধন-শুদ্ধ উদূখলটাকে একটু বাঁকিয়েছিল। তারপর যেই একটু চাপ দিয়ে না টেনেছে, অমনি মড়মড়িয়ে উপড়ে এল গাছ দুটো। উপস্থিত একজনও কিন্তু বিশ্বাস করলেন না তাঁদের কথা।

যিনি বিশ্ব-স্বস্তির বৃহস্পতি, তাঁরি কল্যাণার্থ তখন স্বস্ত্যয়ন করালেন ব্রজরাজ। আদি ও অক্ষত শ্রীনারায়ণের অপেক্ষাও যিনি গুণাধিক গুণসম্পন্ন সেই শ্রীকৃষ্ণের আরতি করলেন ব্রজরাজ দধি দূর্বা ও অক্ষত দিয়ে। গম্ভীর নির্ঘোষে বেজে উঠল মঙ্গলতূর্য। তারপরে লীলাবালককে কোলে নিয়ে স্বভবনে প্রবেশ করলেন ঘোষাধীশ।

২৩। আর একদিনের কথা। বয়স্যবালকদের সঙ্গে নিয়ে ধুলোখেলায় মেতে উঠেছেন বালকৃষ্ণ। এ খেলায় যেন এক নতুন রসের আস্বাদ। নিজের রেণুতে যেমন ধূসর হয় নীল পদ্ম, ধুলোট লীলাতেও তেমনি দুর্দ্দশা ঘটে বালকৃষ্ণের অমল তনুর। তবু কত সে কৌতুক এ খেলায়!

টাকাটা দান করে দিও ; ধলোটখেলা। যেন কত আবেশের খেলা।

—অনেক, অনেক আরাম" ঘুরে খেলা। একরত্তি মেঘের মত

খেয়েছি তোমাদের কাছে! তেম খেলা। সময়ের জ্ঞান থাকে না

ফ্যাসনের বড় লোকেরা কেউ কখনো চোখে

—দিদিমার দিকে একবার আড়চোক সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ এখনও

বুড়ো—এই আজকালই না হয় বুড়ো মালী য়ের প্রাণ।

বাবার আমলে তাঁর ইয়ারবক্সিদের সকেই হবারই কথা, তুষ্ট হবার

করিয়েছেন আমাকে তোমার বাবা! আর খানি দয়ার যেহেতু পূর্ণ,

দিল কোথাও কেউ খুঁজে পাবে না বাবা, পাঠিয়ে দিলেন কি হয়েছে,

আর দেশ মুলুক সবই আমার এই লালকুঠি। কাজ হয় না যে যশোমতীর।

রোহিণী দেবী তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে চললেন। অবসন্ন হয়ে পড়ল অনভ্যস্ত চরণ, পা যেন আর গায়ে নেই। তাই দূর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন—

বলি ও দুলাল, সকাল থেকে এ সব কি আরম্ভ করেছিস বলতো? তোর খেলার বিস্তি যে দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঘরে ফেরার নামটি নেই। এ কি ঘরভোলা ছেলে যে বাবা! আকাশের ঠিক মধ্যিখানে সূর্য্যিদেব, কপাল থেকে টসটস করে ঘাম ঝরছে, আর তুই মোদের ননীর ছেলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠায় রোদ্দুরে মার খাচ্ছিস! খেলা থামা। খেলাটি রেখে এবার দুলাল ঘরেতে এস। দাদা বলরামের সঙ্গে একসঙ্গে নেয়ে খেয়ে মায়ের মন জুড়োবে এস।

২৪। শ্রীরোহিণীর এত বলাও বিফলে গেল। কে কার কথা শোনে! খেলেই চলেছেন কৃষ্ণ ছেলে। বলরামের মা তখন হনহনিয়ে ঘরের পানে ফিরে চললেন। তাই না দেখে কেমন যেন দমে গেলেন ব্রজেশ্বরী।

কী যন্ত্রণা—একবার বল তো! তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন ব্রজেশ্বরী। বলরামকে ডাক দিয়ে বললেন—বাছা রাম, শীগগির দৌড়ে এস। হিতকথা কানে নাও। তোমার মুখ চেয়ে ব্রজরাজও না খেয়ে বসে আছেন।

তারপরে বিশেষ করে বললেন—বাছা কৃষ্ণ, আজ তোমার জন্ম-নক্ষত্র যোগ। তোমায় এখন মঙ্গলস্নান করতে হবে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ নিতে হবে, পিতার হাত থেকে সোনা কাপড় কত কি নিয়ে যথারীতি তাঁদের দিতে হবে, বাবার সাথে বসে খেতে হবে—

২৫। বলতে বলতে গজেন্দ্রগমনে নিকটে এসেই আয় রে দুলাল—বলে যশোমতী ধরে ফেললেন কৃষ্ণের পদ্মের মত দুখানি হাত।

বলরামকে সামনে নিয়ে কৃষ্ণকে টানতে টানতে, সাথীরা চলেছেন পিছনে, মা যশোদা তখন চললেন ঘরের দিকে। মায়ের বিধান বড় কড়া।

ব্রজরাণীর আদেশে দাসীরা হন্তদন্ত হয়ে দু'ভাইয়ের জন্য নিয়ে এল তেল মাখার, গা-মাজার, গা-ঘষার, স্নানের সমস্ত উপকরণ; নিয়ে এল, পরনের কাপড়, চন্দন, ভূষণ, মাল্য। ফুটন্ত নীলপদ্মের মত কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে তখন ব্রজরাণী নিজের আঁচল দিয়ে ঝেড়ে দিলেন ধুলো। তিমতিমে ভিজে কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিলেন গা। শেষে মাল্য-চন্দন পরিয়ে রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ব্রজরাজের সমীপে। পুত্রদ্বয়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন ব্রজরাজ।

২৬। দুটিতে ব্রজরাজের কাছে এসে দাঁড়ালেন। খুশীতে মন ভরে গেল ব্রজরাজের। ফিক করে একটু হাসলেন। দুটির মুখ দেখলেন। তারপরে দুটিকেই তুলে নিলেন নিজের কোলে।

২৭। তনয় দুটিকে নিয়ে আরম্ভ করে দিলেন ভোজন। ভগবজ্জননীও তখন বলরাম ও কৃষ্ণের সখাদের ডেকে পাঠিয়ে গায়ে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন। তাঁরা সবাই যেন তাঁর নিজের পেটের ছেলে। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদেরও খেতে বসিয়ে দিলেন। ভোজন-পর্ব শেষ হলে তাঁদের বাড়ী ফেরার সময় ব্রজরাণী বললেন—দেখ, অতক্ষণ ধরে অত খেলাটা ভাল নয়। আমার ছেলেটি অত্যন্ত চঞ্চল, খেলা পেলে সব ভুলে যায়, কিন্তু তোমরা

জেনারেল পোষ্টাফিস

—আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব-প্রয়াগ

—শ্রীপথিক মুখোপাধ্যায়

গেছোমেয়ে —সত্য পাল

দুষ্টু ছেলে

—সাধন রায়

প্রতিচ্ছবি

যাত্রা হ'ল শুরু —রামকৃষ্ণ (খড়্গপুর)
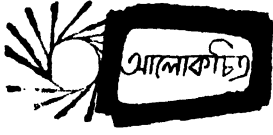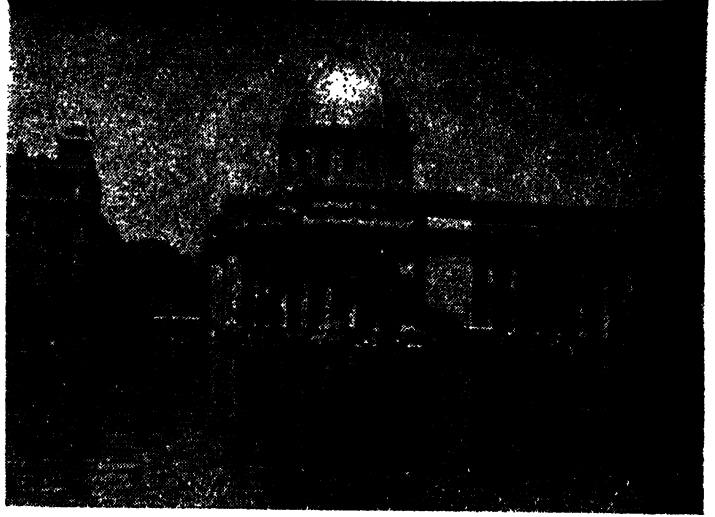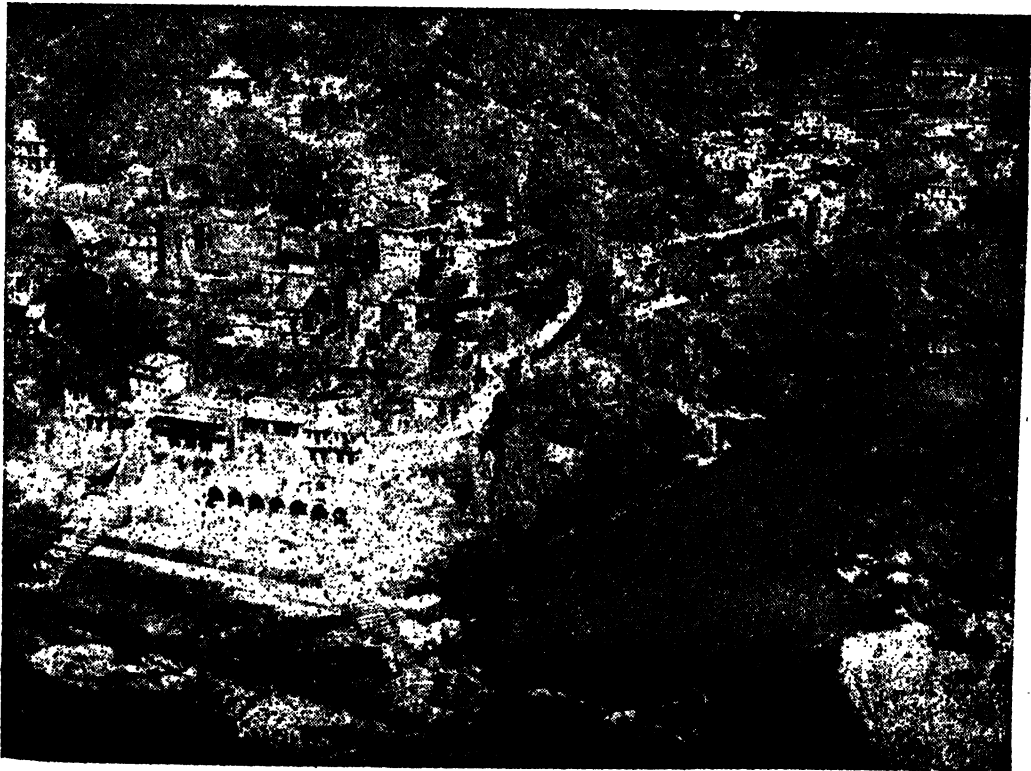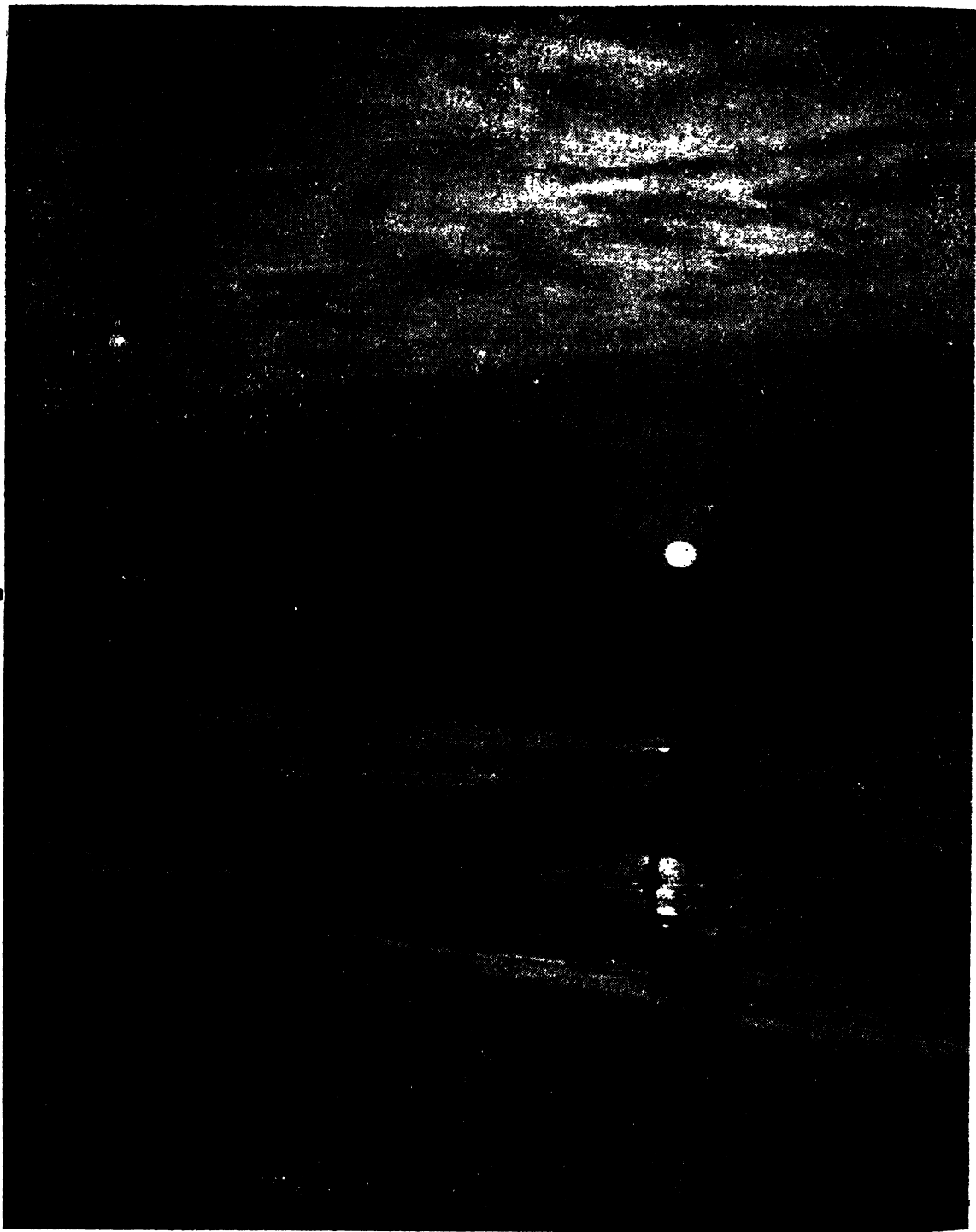
অমনটি হোয়ো না। খানিকক্ষণ খেলবে, তারপরে হয় আমাদের বাড়ী নয় নিজেদের বাড়ী চলে যাবে। দেখি তখন ও ছেলে কেমন করে একলা খেলে। এই বলে ব্রজরাণী যে যার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন ছেলেদের।

২৮। এর পর আর একদিনের কথা।

মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ফল বিক্রী করতে বেরিয়েছে এক চৌখস ফলওয়ালী। 'কে কিনবে গো ফল, কে কিনবে'—হাঁকতে হাঁকতে হনহনিয়ে হাজির হয়ে গেল ব্রজরাজের প্রাসাদ-দ্বারে।

আওয়াজটি কানে পৌছল নন্দদুলালের।

বুকে দুলছে মোতির মালা, থল-কমলের মত পা দু'খানি থুপথুপ করে ফেলতে ফেলতে, মৃণাল-ফলের মত দু'-হাতের আঁজলায় এক মুঠো ধান ভরে নিয়ে, বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন নন্দদুলাল! সোনার কাঞ্চী ঝুমুর-ঝুমুর নাচাতে নাচাতে যতক্ষণে তিনি ফলবিক্রয়িণীর কাছে এসে পৌছলেন ততক্ষণে তাঁর হাতের ধান সব ঝরে পড়ে গেছে মাটিতে, দু'-তিনটি দানা মাত্র বাকি।

নন্দদুলালকে দেখে, একরত্তি নীল মেঘের মত সেই মূর্ত্তানন্দকন্দকে দেখে, কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল ফলওয়ালী, ঘোর লাগল তার হৃদয়ে। যা ছিল মনের মধ্যে, মনে তা আর রইল না। কী করি কী করি, ভাবতে ভাবতে নন্দদুলালের অঞ্জলি ভরে সে বিলিয়ে দিল তার সব ফল। তারপরে ঝুড়ি উঠিয়ে যখন ফলওয়ালী চলে গেল তখন পথের লোকেরা দেখতে পেল, ঝুড়িতে ফল নেই, রয়েছে রত্ন।

২৯। তারপরে একদিন অন্তঃকরণের মধ্যে যেন সেই অন্তর্যামীটিরই প্রেরণা অনুভব করেই, দ্রুতচরণে ব্রজরাজসমীপে উপস্থিত হয়ে গেলেন উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি প্রবীণ আভীরমুখ্যেরা। ব্রজরাজ তখন সমাসীন ছিলেন আস্থান-মণ্ডপে। দৃপ্ত-বিশ্বাসে সম্ভ্রমনত হয়ে তাঁরা তাঁকে বললেন,—

ব্রজেশ্বর, আপনার সম্পদেই আমাদের সম্পদ। আপনার সমতুল বিপুলতম সৌভাগ্যশালী মানব অদৃষ্টপূর্ব্ব। আপনিই সত্যই মহাশয় ব্যক্তি। কেন না, আপনার পুত্রটি নিতান্তই বিশ্ববাসীর দুঃখহন্তা। সূতিকাগৃহ হতে আরম্ভ করে এত প্রকারের শুভাশুভ ঘটনা ঘটতে সংসারে আজ পর্য্যন্ত কোথাও আমরা দেখিনি।

৩০। প্রথমে এক নিশাচরী নিয়ে এল…ঘনঘোর প্রলয়ের মত অবস্থা। তারপরে ঘটল এক দৈত্য নিপাত—সর্ব্বজনের যেন মনোনিপাত। তারপরে উঠল তৃণাবর্ত্তের ঝড়। কী অনিষ্টই না ঘটাল সেই দানব ঝড়ের ঘূর্ণী! সম্প্রতি ঘটেছে ঐ দুটি অর্জ্জুন গাছের ভীমপতন। মহান অন্যায় সব ঘটেছে।

৩১। এ ক্ষেত্রে নিদান কি? কুমারের জন্মলগ্নে ততটুকুও তো কোথাও দোষ নেই? সব গ্রহগুলিই তাঁর শুভগ্রহ। আপনার অদৃষ্ট যে লোকোত্তর তা প্রত্যক্ষ। তা না হলে কেমন করেই বা আপনি অকস্মাৎ লাভ করবেন এ-হেন দেবদুর্লভ অপত্যরত্ন, যিনি জগৎপতি নারায়ণের অংশকলিত এবং যাঁর অসীম কৃপায় অকস্মাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে-যায় ভীষণ সব অনর্থ?

৩২। অতএব আমরা অনুমান করছি, এই স্থলটিতেই কিছু দোষ লেগেছে, এবং সেইহেতু মহারাজ, এই স্থলটি পরিত্যাগ করে বৎসরকালের মধ্যেই আমরা বৃন্দাবনে যেতে চাই। সে বন সর্ব্বদাই সুখদ, ষড়ঋতুর সমস্ত সদগুণই সেখানে বর্ত্তমান, শ্যামল তৃণের অ[ভাব] নেই সেখানে। বৃন্দাবনে যাঁরা বাস করেন তাঁরাও বলেন, বৃন্দাব[নের] তুলনায় ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য তৃণবৎ। সেথায় চির-নিবাস লক্ষ্মীদে[র] সকলেই সেবা করেন তাঁর; এবং সেখানে রয়েছেন গিরি গোবর্দ্ধ[ন] আমাদের গোধনের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সে স্থল অনুকূল; জানি[না] মহারাজের যদি অভিমত হয়, তাহলে বৃন্দাবন-যাত্রা আমাদের সন্তো[ষের] কারণ হয়ে উঠবে।

৩৩। আভীরমুখ্যদের ভাষণ শ্রবণ করে সর্ব্বদিক বিবেচনা ক[রে] দেখলেন গোপাধীশ। বিচারগম্ভীর প্রজ্ঞার আনুকূল্যে নিজের চি[ত্ত]ধারাকে শোধিত করে নিয়ে শেষে বললেন—

এই বৃহদ্বনের উপর আমার যে মমত্ব-বোধ রয়েছে, আপনা[রাই] তার নিমিত্ত। এখন আপনারাই যদি এই স্থলটিকে দোষসঙ্কুল ম[নে] করেন তাহ'লে মানুষে কেমন করেই বা এখানে থাক[বে]? অতএব, আমার মনে হয়, সুষ্ঠুতা ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে বৃন্দাব[নের] পথেই যাত্রা করা অধুনা বিধেয়।

ব্রজেশ্বরের অনুমতি লাভ করে উপনন্দাদি আভীরমুখ্যেরা সপরি[বারে] হৃষ্ট হয়ে উঠলেন।

প্রথমেই তাঁদের আশঙ্কা হল, শকটগুলি সুদৃঢ় রয়েছে কি ন[া]। কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন শকটগুলি নির্ভরযোগ্য তখন দৃঢ় হয়ে উ[ঠল] তাঁদের চিত্তবল।

৩৪। অনন্তর যা ঘটল সে এক বৃহৎ ব্যাপার! শকটে বলী[বর্দ্দ] সংযোজিত হয়েছে সকলেই দেখে থাকবেন, কিন্তু কেউ কি কখ[নো] দেখেছেন শুভ্রবর্ণ নব লক্ষ বলীবর্দ্দের সংযোজন? চার-দাঁতি বলীব[র্দ্দের] প্রত্যেকটিই কি ইন্দ্রদেবের শাদা হাতীর উপমাস্থল? মৌনব্র[ত] যোগীদের মত স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে সহস্র সহস্র নবদন্তী বলীবর্দ্দের দ[ল]। লক্ষ লক্ষ সোনাবাঁধানো শিঙ্। যেন সুমেরুর শিখরগুলো চমকাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ খুরের সে কী প্রখর লীলা! যেন থরথরে নৃত্য শেখাচ্ছে সংগীতাচার্য্যেরা। চার পায়ে বলীবর্দ্দেরা নাচছে বটে কিন্তু আশ্চ[র্য্য] সেই চারিটি পায়েই কি নেচে উঠছেন চতুষ্পদী আদিচ্ছন্দ!

যথা, শ্রীনারী মৃগী সমালিকা ইন্দ্রবজ্রা? লক্ষ লক্ষ লতার ম[ত] দুলে উঠছে চামরপুচ্ছ। লক্ষ লক্ষ গলায় বাজছে অযুত-নিযু[ত] কিঙ্কিণী। কিন্তু শকটে সকলকেই যখন জোতা হল, তখন নাকে মস্ত মস্ত ফুটোয় সকলেরই কি দড়ি!

শকটগুলিও দ্রষ্টব্য। প্রতি শকটের মাথায় সটান চীরমণ্ডপ ঘেরা টোপের কাপড়ের রঙ শাদা, সবুজ, লাল, হলদে, কমলা, ধূসর চারদিকে বহু মূল্য পটবস্ত্রের বৃতি। চীরমণ্ডপের চূড়ায় চূড়ায় কন[ক] কলসের শোভা। পত-পত করে বাতাসে কাঁপছে অজস্র পতাকা যেন তারা কলা-পাণ্ডিত্য দেখিয়ে রসনা বিস্তার করে, অমর-বিমানে[র] পরিহাস করে, বারংবার লেহন করে নিতে চাইছে দিনকরের কিরণজাল এদের প্রসঙ্গগুলি নির্দ্দোষ, সাধুদের প্রতি আসক্তির মত; এদে[র] অক্ষগুলি সুন্দর, হরিভক্তদের ইন্দ্রিয়ের মত; এদের চক্রগুলি শোভ[ন] চক্রবাক-লাঞ্ছিত তড়াগের মত; এবং এদের উজ্জ্বল যুগন্ধরগুলি স্মরণে আনে অলকাপুরীর নলকুবরের সান্নিধ্য।

এই মনোহর শকটগুলিতে ব্রজবাসীরা প্রথমে ধীরে ধীরে আরোহ[ণ] করিয়ে দিলেন আপন আপন পরিবারবর্গকে। তারপরে তাঁরা যখন অন্যান্য শকটগুলিতে বোঝাই করতে লাগলেন স্বর্ণ-রৌপ্য-পিত্তল-তাম্র

ও কাংস্যনির্মিত তৈজসপত্র, তখন বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র হয়ে গেলেন সভা-জন।

তারপরে উঠল চলার প্রশ্ন। গাভীসঙ্ঘকে পুরোবর্ত্তী করে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব হবে? স্থির হল ধেনুরাই আগে যাবে, তারপরে যাত্রা করবে শকট-শোভা। কিন্তু গাভীসঙ্ঘের প্রাচুর্য্য বিধায় ক্রম রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শেষে পংক্তিদ্বয়ের বিন্যাস দিয়ে যুগপৎ যাত্রা করল ধেনু ও শকটের সমারোহ। কী বিপুল সেই শোভাযাত্রা, গম্যস্থানে পৌঁছলেও তার পা পড়ে রইল ত্যজনীয় স্থানে।

৩৫। বৃহদ্বনের মধ্যস্থল থেকে আরম্ভ করে বৃন্দাবনের সীমা পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে ধেনু-পংক্তি। যমুনার তীর ধরে যখন চলেছে তখন জনতার মনে হল, না, এরা বুঝি চলছে না। বিতর্কান্তরের আস্পদ হয়ে দাঁড়াল ধেনুপংক্তি।

৩৬। যমুনার সঙ্গে রহস্যালাপের অভিপ্রায়ে তবে কি এখানে এসে মিলিতা হয়েছেন সুরধুনীর ধারা?

বৃন্দাবনের রেণু সংগ্রহের লোভে তবে কি একের পর এক ধেয়ে আসছে ক্ষীরসাগরের অক্ষয় ঢেউ?

ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের শয়নভার পরিত্যাগ করে তবে কি লোভে পড়েই বৃন্দাবন দেখতে বেরিয়ে পড়েছে অনন্তনাগের দ্রাঘীয়সী ফণা?

না, না, এটি ধরিত্রীর মুক্তাবলী মালা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই ধেনুপংক্তির মত ঐ শকট-পংক্তিটিও সাধারণ মানুষের চোখে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সকলেরই ধারণা হল, নিশ্চয় তাদের চোখ বিরাট একটা কিছু ভুল দেখছে। সত্যিই এটি কি একটি শকটপংক্তি, না, কনককলস-বিলসিত পতাকা-নিকর করম্বিত ললিতাট্ট-গোপুর-ঘটাঘটিত একটি অপূর্ব সুন্দর দুর্গপ্রাচীরের কল্পনা?

এ-ও তো হতে পারে…এটি পর্ব্বতরাজ সুমেরু হিমালয় বা কৈলাস প্রভৃতির শিশু কুমারদের পংক্তি, যমুনার তীরে খেলতে নেমেছেন, করুণা করে ইন্দ্র তাঁদের ডানাগুলিকে আর কাটেন নি?

ধীরে ধীরে চলছে শকটের সমারোহ ও ধেনুর সমারোহ, আর শ্রেণীর পর শ্রেণী রচনা করে আকাশে উঠছে ব্রজধূলির সমারোহ। শূন্যে যেন ফলিত হয়ে যাচ্ছে নিরালম্ব এক মায়িক দুর্গের কল্পচিত্র।

এ-ও তো হতে পারে এই ধূলির সমারোহই ধরিত্রীদেবীর নব-প্রতিমা? পুরাকালে একদিন দৈত্য-কদন নিবেদন-ব্যপদেশে ধরণীদেবীকে ব্রহ্মলোকে যেতে হয়েছিল দীনহীন গো-রূপ ধারণ করে। তিনিই কি আজ তবে কৃষ্ণপাদপঙ্কজ-সঙ্গমসুখ নিবেদনের অধীর লালসায় ঊর্দ্ধপবনবিকম্পিত ধূলিশ্রেণী পরম্পরায় ব্রহ্মলোকে পুনর্বার ছুটেছেন স্বরূপে?

৩৭। ক্রমে যাত্রাপথে মাংসল হয়ে উঠল কোলাহল। সহস্র মুখে সহস্র কথা। এস এস, যাও যাও,আনো, নাও চলো, রোখো চালাও। একীভবনত্ব থাকা সত্ত্বেও ক্রমশঃ বহুকণ্ঠের মিলিত ব্যাহৃতিতে সর্ব্বাগ্রে বহুতরত্ব ঘটল প্রত্যেকটি শব্দের। তারপরে অকস্মাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্বিভাব্য হয়ে উঠল কে বক্তা, কি বক্তব্য। বাক্যের সমস্ত ব্যবহার কেবল সম্পন্ন হতে লাগল হস্ত-সংজ্ঞায়।
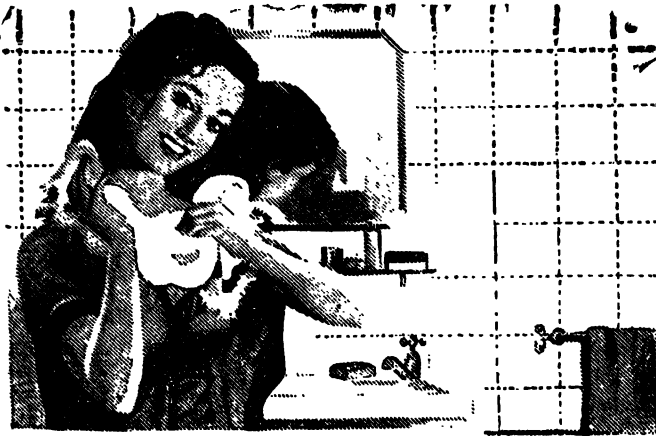
একদিন যা ঘটেছিল······ওদের মায়ে ছেলের ছোট্ট সংসার। মাধুরী এসেছে নতুন বৌ হয়ে। খাস্ কোলকাতার মেয়ে মাধুরী। মাধবপুরের মতো গ্রামে ঠিক সে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। রাত্রি হলে এখনও তার ভূতের ভয় করে। শেয়ালের ডাকে ঘরে দোর দেয়। হুতুম প্যাঁচার ডাকে তার নিশিথ রাতেও ঘুম ভাঙে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দেও নাকি মাধুরীর ভীষন ভয়। গাঁয়ের

তারাপদ মাষ্টার

বৌ-রা সহুরে মাধুরীকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মাধবপুরের মতো অ-জ গ্রামদেশে এসে কোলকাতার লোকও সত্যিই তবে বোকা বনে যায়!······তবু মাধুরীর গ্রামকে কিন্তু ভাললাগে। ভালবেসে ফেলে মাধুরী ও গাঁয়ের মাটি আর মানুষগুলোকে—আপ্রান চেষ্টা করে ওদের আপন করে নিতে।······

বৃদ্ধা শাশুড়ী সরলাবালার যত্ন নিতে মাধুরী কখনও ভুল করে না। তাইতো তিনি মাধুরীকে এত ভালবাসেন। ফায়ফরমাস মতো তাঁকে মাধুরী ভালটা মন্দটা রেঁধে খাওয়ায়। আর কত দিনইবা বাঁচবেন—এই ভেবে মাধুরী বৃদ্ধার সব অনুরোধই মেনে চলতে চেষ্টা করে। ওদের ছোট্ট সংসারে মাধুরীকে পেয়ে বোধহয় সব চাইতে বেশী খুশী হয়েছেন তার শাশুড়ী।······কত অনুনয়ের পর তারাপদ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বেচারী তারাপদ এই বিয়ের কথা নিয়ে মা'র কাছে কতই না কথা শুনেছে। মাধুরী এসে অবধি তাকে আর সকাল সাঝে মা'র মোকাবেলায় যেতে হয়না।

এম. এ. পাশ করে গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারীর কাজ নিয়েছে তারাপদ। ভাল চাকুরীর আশায় সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে যায় নি। গ্রামকে সে ভালবাসে। এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার সে আপনারজন—তারাপদ মাষ্টার। এদের নিয়েই তারাপদর দিন কেটেছে।······মাধুরী আজ তার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে—মাধবপুরকে আদর্শ গ্রাম করে গড়ে তুলতে।······

ইতিমধ্যে মাধুরী সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলাইয়ে রান্নায় মাধুরী পাড়া জোড়া নাম। আনাড়ী ভাবলেও আজকাল কাজের ফাঁকে গাঁয়ের বৌ-রাই এসে মাধুরীর কাছে ভীড় জমায়। বুড়ীদের আসরে সরলাদেবী বৌ-মার যা প্রশংসা করে বেড়ান, তাতে সব শাশুড়ীই চায় বৌ-রা তাদের মাধুরী-বৌ-র মতো কাজকর্ম শিখুক।······

গাঁয়ের বৌ-দের যত্ন নিয়ে রান্না শেখায়—মাধুরী। অবাক হয়ে তারা দেখে মাধুরীর রান্নার নতুন ঢং। মাধুরী তার সব রান্নাতেই 'ডাল্ডা' ব্যবহার করে। ওদের কাছে, আজব লাগে। কালু মুদীর দোকান সাজানো খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিন তারা অনেকেই দেখেছে। বৌ-রা জানে 'ডাল্ডা' দিয়ে মেঠাই-মণ্ডা ভাজাভুজি হয়—সব রকম রান্নার কাজও যে 'ডালডা'য় হয় এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। তাই মাধুরীকে 'ডাল্ডা' দিয়ে সব রান্না রাঁধতে দেখে ওদের অত আশ্চর্য্য লাগে। কৌতূহল বাড়ে—তবু মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জা পায় লজ্জার মাথা খেয়ে 'বেনু-বৌ' জিজ্ঞেস করে বসে। মাধুরী কিন্তু ওর কথায় হাসে না, বুঝিয়ে বলে ওকে 'ডালডার' কাহিনী। 'বেনু-বৌ, পায় তার প্রশ্নের জবাব, কেন মাধুরী সব রান্নাতেই 'ডাল্ডা' ব্যবহার করে।······

"খাঁটি ভেষজ তেল থেকে 'ডাল্ডা' তৈরী। আর প্রতি "আউন্স" 'ডাল্ডা'তেই আছে ভিটামিন 'এ'র ৭০০ 'ইণ্টার ন্যাশানালইউনিট' এবং 'ডি'র ৫৬ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ইউ-নিট'—আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ রান্নার কাজেই 'ডাল্ডা' ব্যবহার হয় না, 'ডাল্ডা' দিয়ে আমরা সব রকম রান্নাই রাঁধতে পারি। আর 'ডাল্ডা' সবসময় সীল করা টিনে পাওয়া যায় বলে ধুলোময়লা পড়বার বা ভেজালের কোন ভয় থাকে না। 'ডাল্ডা' চেনবার সহজ উপায় হোল—সীল করা টিনের গায়ের 'খেজুরগাছ' মার্কা ছাপ"—মাধুরী তার 'ডাল্ডা'র বিশ্লেষন পর্ব শেষ করে। গাঁয়ের বৌ-রা ঘরে ফেরে।······

দিন কতক পরের কথা। বাইরে গনেশ ব্যাপারীর গলা শুনে মাধুরী দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে গনেশ ব্যাপারীর হাতে 'ডাল্ডা'র একটা ছোট্ট টিন। আজই হয়ত গনেশ কিনেছে। সত্যতা জেনে নিতে মাষ্টারের কাছে ছুটে আসা। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এ সব বেনু-বৌ-র পরামর্শে। নইলে গনেশ আবার 'ডাল্ডা' কিনতে যাবে কেন!······ স্বামীর চোখে চোখ পড়ায় মাধুরী ভেতরে চলে আসে। ভেতর থেকে কান পেতে শোনে স্বামীর কথা "হ্যাঁ গনেশ, একেবারে খাঁটি জিনিষ 'ডাল্ডা' ওতে আর বলার কি আছে। ব্যবহার করলেই বুঝতে পরবে······হেসে মাধুরী কাজে চলে যায়।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই।

তূর্যোর আরাবে, আভীরদের প্রণাদে, শকটের নির্ঘোষে, বেণুদের উন্নাদে যদিও নষ্ট হয়ে গেল অন্য সমস্ত শব্দ, তবুও কিমাশ্চর্যামতঃপরং সেই শব্দভৈরবকেই যেন আলিঙ্গন করে রইল মহাব্যোমের সমস্ত গুণ।

৩৮। এদিকে শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী একত্রে আরোহণ করলেন শকট-রত্নে। শকট তো নয়, সেটি যেন একটি ক্রীড়াশৈলের মণিকুট্টর। নিজের নিজের কুমারটিকে কোলে নিয়ে তাঁরা বসলেন। এঁর আলো পড়ল গিয়ে ওঁর গায়ে। তাঁরা দুটিতে যেন একজোড়া স্ফুক্তিস্বরূপা সিদ্ধৌষধি লতিকার ছবি, আর তাঁদের উৎসঙ্গ দুটিকে যেন সফল করে রেখেছে জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গল ফল। কৃষ্ণগুণগীতির কলস্বরে ভাস্বর হয়ে উঠল শকটবর্গ।

৩৯। শোভাযাত্রার সম্মুখে পার্শ্বে পশ্চাতে ইতস্ততঃ চলতে লাগলেন শত শত শস্ত্রধারী শকটে আরোহণ করে, চললেন অনেকে, পদব্রজে চললেন অনেকে। বিপুল পদক্ষেপে যখন অগ্রসর হল ব্রজবাহিনী তখন মনে হল মহাবন—রাজধানীর লক্ষ্মীদেবীই যেন মূর্তিমতী হয়ে গতিবেগে যেন গগন লেহন করতে করতেই, নিজেই প্রথমে ছুটে চলেছেন গন্তব্যস্থলটিকে অলঙ্কৃত করতে; সেখানে কেবল ফেলে রেখে যাচ্ছেন জমি।

৪০। সর্বাগ্রে যাঁরা যাত্রা করেছিলেন গন্তব্যস্থলের সীমানায় পৌঁছে তাঁরা ফিরে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন অনুযাত্রীদলের গতিবিধি। আসছেই তো তারা আসছে, বাড়ছেই তো তারা বাড়ছে। মূলের কেমন যেন সন্ধান রাখা হল দায়! অতএব তাঁরা স্থির করলেন, যমুনা পার হওয়া অসম্ভব, এ পারেই নিশিবাস বিধেয়।

সকলেই দেশকালজ্ঞ। ব্রজরাজের আজ্ঞার অপেক্ষা না করেই তাঁরা বিন্যস্ত করলেন পটমণ্ডপ। ব্যবস্থার সে কী পারিপাট্য! দেখে মনে হল পুরঃপ্রস্থিতা রাজধানী লক্ষ্মীদেবীই যেন স্বয়ং রচনা করে ফেলেছেন স্বসন্নিবেশ।

সন্নিবেশের মধ্যস্থলে গড়ে উঠল হাজার হাজার দীর্ঘপ্রসার পট-গৃহ। চতুর্দিকে বিতানের পর বিতানের শ্রেণী। আকাশ অদৃশ্য করে চৌদিকে উঠল বিরাট বিরাট পট-প্রাচীর। চতুষ্পথের মোহানায় মোহানায় ক্রমানুসারে সৃষ্টি হয়ে গেল বণিকমণ্ডলীর সমসূত্র ও সুশ্রেণী বিপণি।

প্রথমেই সে স্থানটিতে সমবেত হয়েছিল কয়েকটি দল, দেখতে দেখতে সেই স্থানটিতেই ভিড় জমে উঠল বহু গো-সংহতির। যে স্থলটিকে প্রথম দেখতে হয়েছিল এক টুকরো জ্যোৎস্নার মত একটু পরেই সেটি হয়ে দাঁড়াল দুধসায়ের, তারপরেই একেবারে ক্ষীর-সমুদ্দুর!

৪১। দেখতে দেখতে পটগৃহগুলি বাসোপযোগী হয়ে উঠল। প্রথমাগত পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীনন্দ, সনন্দ ও উপনন্দপ্রমুখ ধুরন্ধরেরা সুখপ্রবেশ করলেন তাঁদের যথানির্দিষ্ট পটগৃহে। বিশ্রাম করলেন। তারপরে এলেন অন্যান্য আভীরমুখ্যগণ। তাঁদের শ্রমাপনোদনেরও বহু পরে মূল-বিচ্ছিন্ন হয়ে এল ধেনুপংক্তি ও শকট-পংক্তি।

৪২। দেখতে দেখতে সহস্র সহস্র শকট থেকে নেমে পড়লেন গোপ এবং গোপীরা। শকট থেকে তাঁরা শনৈঃ শনৈঃ নামিয়ে ফেললেন তৎকাল-ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী। বলীবর্দ্দগুলিকে শকটমুক্ত করিয়ে অধিকারীরা তৎপর হয়ে উঠলেন আহার-দানের ব্যবস্থায়। ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল পরিচারকবর্গ। তারপরে এলেন স্থল-পরিষ্কারকেরা, দাঁড়িয়ে থেকে তাঁরা সুব্যবস্থা করে দিলেন রন্ধনাদির। ভগবান ময়ূখমালীকেও দেখা গেল, যাম-চতুষ্টয়-গম্য গমনপথ অতিক্রম করে যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, এবং অধুনা অভিলাষী হয়ে উঠেছেন পশ্চিম-দিঙ্‌নাগরীর আতিথ্যের।

৪৩। দেখতে দেখতে কলধ্বনি তুলে আকাশ ছেয়ে উড়ে চলে গেল কুলায়মুখী পাখীর দল। উঁচু-উঁচু ডাল দেখে গাছে চড়ে বসল ময়ূর-ময়ূরী, সর্বদিকে মুখ রেখে মণ্ডলরচনা করে শুয়ে পড়ে রোমন্থ-মন্থর মৃগকদম্ব। পদ্মের ঘরে ঘরে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, হঠাৎ বন্দী হয়ে গেলেন সেই সব মধুকরের দল। আর ঐ দিশ্বধূরা তিমিরনীল অবগুণ্ঠনের মহিমায় তাঁরা ধারণ করলেন অভিসারিকাদের ভাবালুতা। একদিকে যেমন হাস্যমুখী হয়ে উঠল কুমুদিনীর দল, ওরে এসেছে, এবার যেন ওদের মনের মত সুখের সময়টুকু এসেছে। অন্যদিকে তেমনি এপার থেকে ওপারে ডাকাডাকি করতে লাগল বিরহ-বিধুর চক্রবাক-মিথুন। হায় রে ওদের বুঝি এবারে দুঃখের বাতাসখানি বয়েছে! আহা! কী করুণ ওদের আহ্বান, চোখে দেখা যায় না! ঐ দেখ চক্রবাক-মিথুনের কাণ্ড! মৃণালের টুকরো দিয়ে এখনও দুটিতে বাঁধছে এ ওর ঠোঁট! রৌদ্রাবসানের মালিন্যে আকাশে অস্পষ্ট ফুটে উঠল দু-চারটি নক্ষত্র। বিজাতীয় হলেও অতি প্রকট হয়ে মিশে যেতে লাগল মানুষ ও পশুর দীর্ঘ দীর্ঘতর ছায়া। তারপরে যখন প্রত্যেক পটগৃহের অভ্যন্তরে একটি একটি করে জ্বালিয়ে দেওয়া হল দীপ, এবং বাইরের দীপগুলিকেও দেখতে হল সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় প্রকাশের মত; এবং প্রত্যেক সরণিতে সরণিতে পাহারায় বসে গেল প্রহরিয়ার দল, তখন মনে হল, শ্রীভগবানকে তাঁর উপাসিত-সেবা নিবেদন করবার অভিপ্রায়ে প্রদোষলক্ষ্মীর বুঝি শুভাগমন হল!

৪৪। দেখতে দেখতে জমজমাট হল স-বৎসা ধেনুসংহতি। তাদের আহার তৈরী, কোনো আকুলতা নেই, তৃপ্ত হয়ে তারা বিশ্রাম করতে লাগল আনন্দে। ক্রমে ধেনুমণ্ডলীর মাঝখান থেকে ভেসে উঠতে লাগল সমুদ্রমন্থনধ্বনির মত বিপুল দুগ্ধদোহন রব, এবং দোহনপাত্রের গর্ভ থেকে উদ্‌ভ্রান্ত হতে লাগল মুগ্ধ-মধুর আরও একটি গম্ভীর ধ্বনি। সে ধ্বনি অতি ভালো লাগল শ্রীকৃষ্ণের। শব্দরস রস্য হল তাঁর। রসপ্রিয়তা আরো বেড়ে উঠল যখন তিনি দেখলেন ও শুনলেন, নাম ধরে ধরে গাভীদের ডাক দিয়েছে ব্রজের গোয়ালারা। মুখ থেকে টুপ টুপ করে টপকিয়ে বেরোচ্ছে নাম, আর মণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাম্বাধ্বনি তুলে, ফেরা-জবাব দিয়ে ছুটে আসছে গাই। উত্তমা গাভীটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গোয়ালার সে কী আদর করার ঘটা! কী নধরকান্তি সব গাই!

দেখতে দেখতে ব্রজনগরের নরনারীদের সুখসম্পন্ন হয়ে গেল পানাহার-বিহার। নিজেদের জাগরণ কৌশল প্রকাশ করে প্রহরে প্রহরে প্রহরিয়ারা চীৎকার করতে লাগল 'জাগতে রহো', নিশঙ্কায় নিদ্রামগ্ন হয়ে গেল বিপুল ঠাট।

রাত্রিশেষের আর যখন এক প্রহর বাকি, তখন শয়ন ছেড়ে গাত্রোত্থান করলেন গোপললনারা। সুপবিত্র বেশভূষায় অলঙ্কৃতা হয়ে পটগৃহের দীপিত দীপ প্রতি-অলিন্দে সমাধা করলেন বাস্তুপূজা

তারপরে মন্থন করলেন দধি। দধিমন্থনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল ভগবান বালকৃষ্ণের কর্ণরম্য গুণগান। কীর্তনের সহচর হল মণিময় কঙ্কণ বলয়ের ও মঞ্জুমঞ্জীরের শিঞ্জা। গর্গরীকুহরে সঞ্চরমান সেই মসৃণ ধ্বনির গভীরতা, সরসমধুর গীতধ্বনির সেই অনাবিল সুরলালিত্য, দিগঙ্গনাদের দশমুখে সেই স্বরলালিত্যের পেশল অনুরণন, যেন সমূলে নির্মূল করে দিল জাগতিক সমস্ত অমঙ্গল। আর সেইক্ষণে অমর-পতিদের পালঙ্কে সত্বর জেগে উঠে বসলেন অমরসীমন্তিনীরা। সত্যিই তো, আর কি এখন ঘুমিয়ে থাকা চলে! একান্ত ভাবে তাঁরা সানন্দে কান পেতে শুনতে লাগলেন ঘোষ-রমণীদের সেই দধিমন্থন-নির্ঘোষ।

৭৬। দেখতে দেখতে যখন উদয়াচলের শিখরে সমুত্থিত হলেন ভগবান শ্রীকিরণমালী, তখন কিরণমালি-দুহিতা শ্রীমতী যমুনাদেবীর অপর পারে অধুনা কেমন করে পৌছনো যাবে তারই বিপুল সমুদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে উঠল ব্রজবাসীদের বিশাল ঠাট। ব্রজরাজ প্রথমেই আদেশ দিলেন—

"অধিকারীরা এবার যে যাঁর ধেনুবৃন্দ পারে নিন।" আরম্ভ হয়ে গেল ধেনুবৃন্দের পারাপার। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য!

লক্ষ লক্ষ ধেনু সাঁতরে পার হয়ে যাচ্ছে যমুনা। দু'-পাশ দিয়ে তাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে স্রোত। নিঃশ্বাসের বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে তাদের নাসা; দেহের পুরোভাগ ভেসে চলেছে জলের উপরে। তাদের চালাচ্ছে ভীমের মত বলিষ্ঠবপু গোপ, ঘন ঘন রব তুলছে…হৈ: হৈ:; আর হাম্বাধ্বনি তুলছে লক্ষ লক্ষ ধেনু… যেন প্রত্যুত্তরে জানাচ্ছে "আমরাও যাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ।"

লক্ষ লক্ষ বাছুর তারাও সাঁতরে পার হচ্ছে যমুনা। শিঙ গজায়নি, তাই বোধ হয় জলের উপরে আনন্দে নাচিয়ে চলেছে হাল্কা-হাল্কা মুণ্ডু। ছোট্ট ছোট্ট দেহ হলে হবে কি, বেগে তারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে চলেছে। জলে ভিজে ভারী হয়ে গেছে ল্যাজ, উঁচিয়ে আর কেমন করে দোলায়? নিজের নিজের মায়ের সামনে গা ভাসিয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে তারা চলে গেল ওপারে—কুশলে।

চোখের সামনে দিয়ে ছবির মত সাঁতরে চলে গেল হাজার হাজার দক্ষ সাঁতারু। এক হাত খেলিয়ে তারা সাঁতরাল। অন্য হাতে তারা বুকের কাছে চেপে ধরে রইল কচি কচি চারটে ঠ্যাঙ। ঘাড়ের উপর লতিয়ে রয়েছে সদ্যপ্রসূত বাছুর। আর তাদের পিছনে সঘনে হাম্বা দিয়ে সাঁতরে আসছে মায়ের দল। সেই বাছুর নিয়ে যমুনা পার হয়ে গেল তারা।

তারপরে সাঁতরে চললেন বৃষপর্বতরা। তাঁদের পরিপুষ্ট বিরাট ককুদের আঘাতে জর্জরিত হতে লাগল যমুনার জলতল। মনের ভিতর কী তাঁদের উষ্মা! ঘাড় বাঁকিয়ে তাঁরা শৃঙ্গাঘাত করতে লাগলেন তরঙ্গের দেহে, আর আশ্চর্য্য, স্রোতের বেগ অতো তুঙ্গ হলেই বা হবে কি, নিঃশ্বাসের রুদ্রবেগে তাঁরা জল কাঁপাতে কাঁপাতে, মাথা উঁচু করে একটানা সোজা পার হয়ে গেলেন যমুনা।

৪৭। নদী পার হয়ে ওপারের কর্পূর-ধূলিস্বচ্ছ বালুবেলায় যখন নৈচিকী গাভীদেব বিরাট শ্রান্ত সংহতি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল তখন মনে হল বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে একত্রস্থিতির বাসনায় জাহ্নবী বুঝি মিলিতা হয়েছেন কালিন্দীর সঙ্গে।

৪৮। চঞ্চল সন্তরণে এই ভাবে যমুনা পার হয়ে গেল গোধন। তারপরে নদীতে হঠাৎ আবির্ভাব হল বহুবচিত্র অসংখ্য তরণি। এত আকস্মিক তাদের আবির্ভাব যে মনে হল, নাগনাগরীদের মণিশৈলের লীলাদ্রোণিগুলি হঠাৎ বুঝি পাতাল ভেদ করে উপরে উঠে এল; বুঝি বা ব্রজরাজ সমাজের আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে সুবশিল্পী বিশ্বকর্মা নিজেই গগন-গঙ্গার প্রবাহ থেকে তুলে নিয়ে নাতঙ্গনী যমুনার কাছে হঠাৎ পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এই বিজ্ঞান মূর্ত্তিগুলিকে। বুঝিবা এই তরণিগুলিই কোনো বহুপদাঙ্কিত বিচিত্র জলজন্তুবিশেষের কুলবধূর দল।

৪৯। এই তরণিগুলির মধ্যস্থলে ছিল একখানি অতিসমীচীন তরণি। এবং তারও ঠিক মধ্যস্থলটিতে ছিল একটি চিত্র-ভবনের পরিকল্পনা। তরণির ললিত পতাকায় মৃদু পবনের কম্পন। নিজের নিজের তনয়টিকে কোলে নিয়ে সেই ভবনে একত্রে প্রবেশ করলেন স-পরিচারিকা শ্রীব্রজরাজ-রাজমহিষী ও শ্রীবসুদেব-রমণী! যমুনার মাঝখান দিয়ে যখন তরণিখানি চলেছে তখন বালকৃষ্ণ ঈষৎ কাঁধ ঝুঁকিয়ে দেখতে পেলেন, আহা কী সুন্দর জল, ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ দিয়েছে জলে, আর জলের রঙও কি ঠিক নিজের পায়ের রঙেরই মত! আর যায় কোথা? মায়ের আঁচল ছেড়ে বালকৃষ্ণ তখনি গুটি-গুটি দৌড়লেন তরণির প্রান্তে। কী যেন এক নিধি দেখেছেন তিনি। তরণি তখন দুলছে। কৃষ্ণেরও টলটল করছে পা। কিন্তু ডান হাতখানি প্রসারিত করে যেই শ্রীকৃষ্ণ নিজের করকমল দিয়ে আলোড়ন করতে যাবেন জল, অমনি তাঁকে ধরে ফেললেন তাঁর মা যশোদা; মা রোহিণীও তাঁকে ধরে ফেললেন। অসংবৃত আতঙ্কে তাঁরা যেন অস্থির! কিন্তু রুখলে কি হবে বারণ মানে কি ছেলে? অনিষ্টের আশঙ্কায় ব্রজরাজও তখন দ্রুত উঠলেন সেই তরণিতে। হাসতে হাসতে এক ঝটকায় কৃষ্ণকে উঠিয়ে নিলেন কোলে। তার পর সাবধান হয়ে বসে রইলেন তরণিতে। তরণি-বাহীরা বেয়ে চলল তরণি।

অন্যান্য ব্রজবাসীরা সপরিজন নিজেদের সুখসুবিধামত আরোহণ করলেন অতি সুলভ অথচ সমান দ্রঢ়িমাগুণবিশিষ্ট অন্যান্য তরণিতে। আরামে তাঁরা সমকালেই পার হয়ে গেলেন যমুনা।

৫০। তাঁদের পারে পৌছিয়ে দিয়ে সেই তরণিগুলি নিয়েই আবার ফিরে এলেন নাবিকেরা। নিটোল কাঠের সিঁড়ি তাঁরা পাতলেন। তার উপর দিয়ে তাঁরা তরণিগুলিতে তুলে নিলেন ব্রজশকটের সেই বিরাট ঠাট। পার করে দিলেন যমুনা। ব্রজরাজ পারিতোষিক দিলেন নাবিকদের। সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন সকলে।

ইতি যমলার্জ্জুনভঙ্গো নাম ষষ্ঠস্তবকঃ। [ক্রমশঃ।

এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি উৎসাহ শিখায়
ঘুচিয়েছিল নিবিড় তমঃ নিজের প্রতিভায়—
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

দিন দশেক পরের কথা :

অফ পিরিয়ডে কফি-হাউসে কাপ কাপ কফি সামনে করে বসে মঞ্জুরা সব বর্তমান বছরের নোবেল পুরস্কার পাওয়া বইখানা নিয়ে তর্কের তুফান বইয়ে দিচ্ছিল। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। নিছক সাহিত্য আলোচনায় সাধারণত হাওয়াটা এতোটা উত্তপ্ত হয়ে হয়তো ওঠে না, কিন্তু বর্তমানে সাহিত্য পুরস্কারের পেছনে সাহিত্যের মান বিচারের চাইতেও বেশী থাকে রাজনীতি। আর যেখানে রাজনীতি সেখানেই আর না রইল বাকি, না রইল ব্যক্তির বিদগ্ধ মনের নিজস্ব মত। রইল কেবল দল আর দলীয় মত। হোক সাহিত্য হোক শিল্প, যে কোন আলোচনার চেহারাটাই গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার দলীয় লড়াই-এর মতো। কফি হাউসের টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে মঞ্জুদের মধ্যেও যা চলছিল তাকে সাহিত্য আলোচনা বলে না—বড়দের এই গোষ্ঠীমতের লড়াইএরই একটা ছোট সংস্করণের জোর মহলা চালাচ্ছিল ওরা। এমনি সময় হঠাৎ একটা নিতান্ত অপরিচিত ছেলেকে হন্তদন্ত ভাবে উপস্থিত হয়ে এসে একেবারে ওদের টেবিলের পাশে দাঁড়াতে দেখে তর্কের তোড় বন্ধ হয়ে গেল ওদের। একসঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ছেলেটির ব্যস্ত-সমস্ত মুখের উপর।

—মঞ্জুদি'—

অপরিচিতকে ওর দিকে তাকিয়ে ওকেই সম্বোধন করে মঞ্জুদি' বলে উঠতে শুনে বিস্মিত ভাবে বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখালো মঞ্জু—আমাকে বলছেন?

মাথা নাড়লো সে—হাঁ আপনাকে বলছি। শীগ্‌গির উঠে আসুন। ভীষণ জরুরি খবর আছে।

—ভীষণ জরুরি খবর আছে আমার কাছে? বলতে বলতে ছেলেটির মুখের উপর ফেলে-রাখা ওর না-চেনা না-বোঝা দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে ত্বরিংহাতে বই খাতা ব্যাগ গুছিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবতে লাগল, কে ছেলেটি? কে পাঠিয়েছে তাকে ওর কাছে? প্রথমে মুখটা যতটা অদেখা মনে হয়েছিল, এখন যেন ততটা অদেখা মনে হচ্ছে না। ওদের পাড়ার ছেলে? আসতে-যেতে দেখে কিন্তু চেনে না? কথাটা মনে হতেই হাত-পায়ের জোড়াগুলো যেন সব আল্‌গা হয়ে আসতে চাইল মঞ্জুর—কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বাড়ীতে। বাবা-দাদা বাড়ী নেই। আকস্মিক দুঃসংবাদের খবর নিয়ে পাড়ার ছেলে ছুটে এসেছে ওকে নিয়ে যেতে? কি হয়েছে না শুনে আর চলতে পারছে না মঞ্জু। কফি-হাউসের দরজা আর সিঁড়ির স্বল্পপরিসর জায়গাটায় পা দিয়ে থেমে পড়লো সে। ভেতর থেকে গলার স্বরটা টেনে বের করে এনে জিজ্ঞাসা করলো—কি জরুরি খবর? কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমার কাছে?

সিঁড়ির দিকেই মোড় ঘুরতে যাচ্ছিল ছেলেটি। মঞ্জু দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলে দাঁড়িয়ে পড়লো সে-ও। মঞ্জুর দিকে ফিরে বললো—জয়াদি'র মা পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার কাছে। আর পাঠানোর কারণটা বলতে গিয়ে ছেলেটি থেমে পড়ে যে মুহূর্ত সময়টুকু নিল, তারই মধ্যে মঞ্জুর মনের ভেতর খেলে গেল—হাঁ, ঠিক। জয়াদের বাড়ীর উল্টোদিকের পানের দোকানটায় যে ছেলেগুলো সকাল সন্ধ্যা দুপুর কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে, পান খায়। যাদের এতো বাজে লাগে ওর যে পাছে ওদের উপর দিয়ে চোখ পড়ে এই জন্য পানের দোকানটা পার হয় মঞ্জু ঘাড়টা একেবারে উল্টো দিকে ফিরিয়ে, তাদেরই ভেতর একে ও দেখেছে—না তাকানোর ভেতরও যে তাকানোটুক্ হয়ে যায় তারই মধ্যে দেখেছে।

সম্ভবত এই থমকানো মুহূর্তটা নিল ছেলেটি কথাটা এখানে দাঁড়িয়েই মঞ্জুকে বলবে না গাড়ীতে গিয়ে বলবে, এটাই ঠিক করে নিতে, তারপর বললো, জয়াদি' আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। সিরিয়াস অবস্থা—

আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল জয়া! সিরিয়াস অবস্থা তার! বিমূঢ়তার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল মঞ্জু—শীগগির, শীগগির গিয়ে আগে একটা ট্যাক্সি ধরুন আপনি। ও, সঙ্গে আছে ট্যাক্সি। এবার একেবারে ছেলেটিকে পেছনে ফেলে দৌড়ে নেমে চললো সে। এই গাড়ীটা তো। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—জেনে নিয়েই উঠে বসল গাড়ীতে। না, না ওখানে নয় আপনি ভেতরে আসুন। ছেলেটি সামনের আসনে বসতে গেলে ডেকে এনে তাকে বসালো পেছনের আসনে। গাড়ী ছুটে চললে অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—

—এঁ্যা, কি ভাবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল জয়া? বিষ খেয়ে? কোথায় পেলো সে বিষ? কে দিলে তাকে বিষ যোগাড় করে এনে? কখন করলে সে এ কাণ্ড? এঁ্যা, বিষ খায়নি? তবে? হাতের কব্জির শিরা সাংঘাতিক ভাবে কেটে দিয়েছে ব্লেড দিয়ে? ছেলেটি তার হাতের কব্জির উপর আঙুল টেনে জয়াকে কি গভীর ভাবে হাতের শিরা উপশিরা ব্লেডে টেনে কেটে দিয়েছে দেখালে, 'মা গো' বলে দু' হাতে চোখ ঢাকল মঞ্জু যেন হোস পাইপের জলের তোড়ের মতো জয়ার ছিন্ন শিরার মুখ দিয়ে রক্তের তোড় ছুটে এসে ছিটকে পড়েছে ওর গায়ের উপর। খানিক বাদে ঘামে ভেজা হাত দুটো নয়তো যেন রক্তভেজা হাত দুটো নামলো মঞ্জুর মুখ থেকে—কখন একাণ্ড করলে জয়া?

তারপর ছেলেটির মুখ থেকে মঞ্জু যে বিবরণ শুনে চললো তা হলো এই, দুপুরের নির্জন অবসরে কখন যে জয়া এ কাণ্ড করেছে টের পাননি জয়ার মা। ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। ছেলের ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠের ডাকে জেগে উঠে দেখেন অজ্ঞান জয়া পড়ে আছে বিছানার উপর। তার কাটা হাতটা যেখানটায় পড়ে আছে সেখানকার চাদর ভিজে উঠে রক্তের ফোঁটা নীচে গড়িয়ে পড়ে পড়ে একটা রক্তের ধারা সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে ঘর থেকে বাইরের

দিকে। দেখে তিনি আর্তকান্নায় যে চিৎকার করে ওঠেন সে কান্না সর্বপ্রথম শুনতে পায় সে। সে-ই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে। তারপর জয়ার মা'র দেওয়া ঠিকানা মেয় মঞ্জুর খোঁজে। প্রথমে যায় বাড়ীতে। সেখানে শোনে সে কলেজে। আসে কলেজে। কিন্তু কলেজেও না পেয়ে কি যে সে করবে এই ভেবে না পাওয়া মুহূর্তে একটি ছেলে হদিস দেয় তাকে এই কফি-হাউসের। বলে, একবার খুঁজে দেখুন। অফ-পিরিয়ড চলছে, হয়তো সেখানেই পাবেন। তারপর আসে সে এখানে।

—ডাক্তারকে কি বলতে শুনে এসেছে সে?

সে শুনে এসেছে ডাক্তার বলছেন, একটুও সময় নষ্ট না করে—এক্ষুণি হাসপাতালে রিমুভ করে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। নইলে বাঁচানো দুষ্কর হবে। ক্রমেই সব রক্ত নিঃশেষে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে জয়াদি'র।

—ড্রাইভায় জলদি—খুব জলদি—মঞ্জু ড্রাইভারের আসনের ওপর দুই হাত রেখে সামনে এগিয়ে এসে রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার অপূর্ব হিন্দীতে বোঝাতে চাইলে; তার এই তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ওপর যে একটা জীবনের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে সেই কথা।

কিছুই দরকার ছিল না। ড্রাইভার বাংলা যথেষ্ট বোঝে। সে সব শুনেছে এবং বুঝেছে। হর্ণের উপর হর্ণ বাজিয়ে যেন নিজের গুরুতর ত্বরার কথা সঙ্কেতে বলতে বলতে এবং একটু পথ ছেড়ে দেবার অনুরোধ করতে করতে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চললো সে।

কিন্তু মানুষের ভেতরটা যখন ত্বরা করার উদ্বেগে ছুটতে থাকে, তখন তার সেই মনের ছোটার সঙ্গে যন্ত্রের ছোটা তাল রেখে চলতে পারে না। তখন মনে হতে থাকে, রাস্তায় নেমে পড়ে নিজে ছুটে চলতে পারলেই বুঝি বেশী তাড়াতাড়ি হয়। মোড়ের মাথার লাল বাতি, চৌমাথার ট্রেফিক পুলিশের হাত, মোটরের ভিড় যখন তাবও উপর কেবলই সে চলাকেও বার বার দিতে থাকে থামিয়ে, তখন যে মানুষ গাড়ী থেকে নেমে পড়ে সত্যি নিজে ছোটে না, সেটুকুই বুঝি পাগলের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির তফাৎ। আর শুধু এই বিশেষ অবস্থার বিশেষ ক্ষেত্রেই নয়—ইচ্ছে করলেই সব করা যায় না, ইচ্ছে করছে বলেই করতে গেলে যে পাগলামী হয়, এই বোঝার সম্বলটুকু নিয়েই তো সর্বক্ষেত্রে মানুষ পাগলের সঙ্গে নিজের তফাৎটুকু বাঁচিয়ে চলে।

বসে থাকতেই হলো মঞ্জুকে, স্থির হয়েই বসে থাকতে হলো তাকে। শরীরটা গদির উপর নামমাত্র রেখে সমুখের আসনের পিঠটা ধরে স্তব্ধ হয়েই বসে রইলো মঞ্জু, যতক্ষণ না গাড়ী জয়াদের বাড়ীর গলিতে প্রবেশ করলে। আশেপাশের কোন বাড়ীতে যে দুরন্ত রকমের কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার পরিচয় গাড়ীটা গলিতে ঢোকার পর থেকেই মিলতে লাগলো তার মোড়ের মাথার গভীর জটলায়, জয়াদের বাড়ীর সমুখের রাস্তার এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ভিড়ে, মানুষগুলো দাঁড়ানোর শ্লথ ভঙ্গিতে আর মুখের কারুণ্যে। মুহূর্তপূর্বের নির্মম-উদাসীন প্রতিবেশী মুখগুলো যেন মুহূর্তের মধ্যে মায়ায়-মমতায় উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় পর্য্যবসিত হয়ে উঠেছে পরমাত্মীয়ের মুখে।

না থাক চেনা, না থাক জানা, না থাক পরিচয়, তবু তারা তো কেউ কারু অপরিচিত নয়। সব কথা না জানুক অনেক কথাই তারা জানে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে। পানের দোকানের সামনে বাড়ীর মেয়েটিকে পৌঁছে যে ছেলেটি নিত্যদিন বিদায় নিয়ে যায়, তার খবর বাড়ীর লোক না জানুক, জানে প্রতিবেশী। দোকান ধার, বাড়ী ভাড়া বাকী, পত্রিকার বিল, গোয়ালার ঋণের খবর না জানতে পারে আত্মীয়গোষ্ঠী, কিন্তু জানে প্রতিবেশী। পর পর দুদিন কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া এসে দম বন্ধ করে না তুললে প্রতিবেশী দৃষ্টি তাদের নিজেদের অজ্ঞাতেই গিয়ে ধাক্কা দেয় উপবাসী জানালার উপর। তারা কেউ কাউকে চেনে না কিন্তু জানে সবাইর কথা সবাই। জানে জয়ার সম্বন্ধেও। তারা দেখেছে, এক দিন এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় এক বিষণ্ণমুখী মেয়েকে এসে এই বিশ টাকা ভাড়ার ঘরের দরজায় রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়াতে, মা-ভাই-এর হাত ধরে সযত্নে নামাতে, ঠেলাওলার মজুরি মিটিয়ে দিয়ে মলিন ভাঙ্গাচোরা মালপত্রগুলোকে মা আর ছোট্ট ভাইটির সাহায্যে টেনে টেনে ঘরে তুলতে। তারপর দেখেছে মোটা ছিট কাপড়ের ভরা থলিতে কি সব নিয়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে, তার চোখের তলার কালীকে গড়িয়ে গড়িয়ে গালের উঁচু হাড় বেয়ে নেমে আসতে, তার ফর্সা রংকে দিনে দিনে রোদে পুড়ে কালো হয়ে চোখের তলার কালীর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে। তারা দেখেছে দু'পা ভেতরে ঢুকলে যেখানে আর কিছু না হোক অন্ততঃ ঘরের আড়ালের বিশ্রামটুকু মেলে, সেখানে নিজের বাড়ীর খোলা রাস্তারই রকের চিলতেটুকুর উপরই বসে পড়ে তাকে বিশ্রাম করতে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে। তারপরের দ্রুত পটপরিবর্তনও অদেখা নেই কারু। হঠাৎ হঠাৎ করে দেখতে দেখতে প্রায় সবারই দেখা হয়ে গেছে তার রাতের বেরুনো আর প্রাতের ফেরা। আর ইদানীং রাস্তার উপর সে যে কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করতো, তাকে নিয়ে যে টানা-হেঁচড়া রাস্তার উপরই চলতো তা আর দেখতে বাকি ছিল কার? কুৎসা চলেছে ওকে নিয়ে। শিস্ দিয়েছে পানের দোকানের বিড়িটানা ছেলেগুলো। কিন্তু সেই সব নিষ্ঠুর নিষ্করুণ মুখগুলোই আজ মমতায় কি আশ্চর্য্য নরম—কি আশ্চর্য্য করুণ!

হায়! মানুষের বুকে এই মমত্ববোধটুকু জাগতে যদি এতো কিছুর দরকার না হতো। যদি 'আহা' শব্দটা যতটুকু হাওয়া নিয়ে তাদের বুক থেকে বেরিয়ে আসে তাতেই ফুরিয়ে না যেতো!

এতোদিন জয়াকে তারা বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখেছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করেছে। রায় দিয়েছে। দাওয়ায় বসে পড়তে দেখে সহানুভূতির সঙ্গে বলেছে, বেচারা মেয়েটা! এই দুর্দিনের সংসার কি এভাবে টেনে চালাতে পারবে? মরবে। আবার গাল দিয়েছে, উঠেছে রাত বিচরণ করা জয়াকে নির্দয় ভাবে। গেছে একেবারেই জাহান্নমে গেছে মেয়েটা! যেমন প্রবৃত্তি তেমনি পথ বেছে নিয়েছে। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ করবার সময় কোথায় তাদের। কিন্তু আজ প্রথম তারা প্রথম দিনের সেই বিষণ্ণমুখী মেয়েটির মা-ভাইএর হাত ধরে এসে দরজায় দাঁড়ানোর দিনটি থেকে আরম্ভ করে তার থলি কাঁধে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়, এর দরজায় তার দরজায় ঘোরা থেকে, তার প্রতিদিনে এক গ্রাস অন্নের জন্য সংগ্রাম তার পাগলামো, তার উচ্ছৃঙ্খল হাসি, তার আজকের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে শয্যায় শোয়া পর্য্যন্ত প্রতিটি ছিন্ন ঘটনাকে এক সঙ্গে গাঁথলো। প্রবৃত্তির পথে চলে নয় চরম

অপ্রবৃত্তির চলা চলতে গিয়ে আজ সে সেই চলা থামিয়ে দেবার জন্য স্নায়ুতন্ত্রী কেটে ফেলেছে আপন হাতে। কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করেছিল মরে নাই। এ মরে প্রমাণ করতে চাইছে সে মরেছিল। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ করে আজ তাদের বুক থেকে যে দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলো বের হয়ে আসতে লাগল তা কি শুধুই জয়ার জন্য? না। তাদেরই বা কি এমন রমণীয় সমৃদ্ধ জীবন! সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের ক্ষুধিত বঞ্চিত জীবনগুলোও এসে মিশে গিয়ে নিঃশ্বাসকে টেনে দীর্ঘ করলো।

চোখের কোণে কোণে তাদের যে আলোর কণিকা জ্বলে উঠতে লাগল যদিও তা জোনাকির আলো ব্যতীত কিছুই নয়। তাপ নেই, বিদ্যুৎ নেই, আগুন নেই। জ্বলে উঠতে পারে না জ্বালিয়ে দিতে পারে না—মৃত। তবু সেই মৃত আলোগুলো যখন মোড়ের মাথায় জটলায় রাস্তার সমুখের ছোট ছোট ভিড়ে, একতলা দোতলার বারান্দায় দরজায় জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা চোখে চোখে জ্বলে উঠতে লাগল তখন সেই বিন্দু বিন্দু মৃত আলোর কণাগুলোর ভেতর এক বিন্দু করে প্রাণ ভরে দেওয়ার জন্য ভগবানের দরজায় মাথা কুটতে ইচ্ছে করতে লাগলো মঞ্জুর।

এতক্ষণ মঞ্জু গাড়ীতে বসে বসে কেবল এখানে এসে পৌছোনোর তাগিদে ছটফট করেছে। এখন এসে গিয়ে নিজেকে ভারি নিরবলম্ব মনে হতে লাগলো ওর। কি করে কি করতে হবে, কি করে হাসপাতালে যেতে হবে—কোন হাসপাতালেই বা নিয়ে যাবে। যে অনবধানতার কথা কাগজে পড়ে, তাদের গাফলতি আর উদাসীনতার দরুণ প্রাণহানির যে কলঙ্কজনক সব ঘটনার কথা শুনতে পায়—যদি সেখানে গিয়েও সঙ্কটকালের ত্বরিৎ ব্যবস্থা না মেলে। তবু চোখে অন্ধকার যে মঞ্জু দেখছিল না তা সে কোন ব্যাপারেই চোখে অন্ধকার দেখে না বলেই। কিন্তু ছেলেটিকে সঙ্গে রাখতে হবে। তার নাম জানতে চাইলো মন—আচ্ছা, আপনার নামটা কি?

—অমল।

—আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। আমি যে কি ভাবে কি করবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে। আপনি থাকলে তবু আমি জোর পাবো।

যেন কৃতার্থ করল মঞ্জু তাকে, এমনি ভাবে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো ছেলেটি।

কিন্তু এখানে নামা হলো না ওদের। গাড়ী থেকে নামবার মুখেই একটি ছেলে ছুটে এসে বাধা দিলো। বললো, একেবারে এঁকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে চলে যা অমল। মিঃ চৌধুরী—মাথা চুলকে বোধ হয় জয়ার নামটা মনে করে নিল সে—জয়াদি'কে নিয়ে সেখানে রওনা হয়ে গেছেন। তোদের আসামাত্র সেখানে চলে যেতে বলে গেছেন ওঁরা।

ফের বন্ধ গলি থেকে গাড়ী পেছু চলতে লাগল। মঞ্জু দেখল, যদিও মস্ত একটা তালা ঝুলছে জয়াদি'র দরজায় কিন্তু খোলা। হয় দিশেহারা জয়ার মা তালার মুখটা টিপতে ভুলে গেছেন নয়তো হাতে তার এমন জোর এখন নেই যে তার হাতের টিপে তালার মুখ বন্ধ হয়। নেমে বন্ধ করে আসবে? না। মূল্যবান জিনিষ খোয়া গেলেও এখন সময় দেওয়া যায় না—আর এতো নেই-ই কিছু। যায় যাবে। রজতের দেওয়া টাকার যা হাতে আছে জয়ার মা'র এবং যে টাকা ক'টা এখন বর্তমান মুহূর্তে ওর একমাত্র ভরসা সে টাকা তো জয়ার মা সঙ্গেই নিয়ে গেছেন।

কতই বা দূর, গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে সারপেণ্টাইন লেন থেকে মেডিকেল কলেজ। দু' মিনিটে পৌছে দিলো ওদের ড্রাইভার মেডিকেল কলেজের প্রশস্ত সিঁড়ির চত্বরে। মঞ্জু ট্যাক্সি-মিটারটার দিকে একবার তাকালোও না। সে বিলক্ষণ জানে, যে অঙ্কই মিটারে উঠে থাক ওর ব্যাগের সাধ্য নেই তা মিটিয়ে দেবার। এ ছাড়াও দরকারও হতে পারে ট্যাক্সির। এমন অবস্থায় একটা ট্যাক্সি হাতের কাছে থাকা ভালো। ড্রাইভারকে ওয়েটিং চার্জের সঙ্গে বকশিস কবুল করে নেমে পড়ল মঞ্জু। কিন্তু তার পর? কোথায় এখন ওরা খুঁজবে ওদের, কা'কে জিজ্ঞাসা করবে জয়াদের কথা?

কি করা যায় জিজ্ঞাসা নিয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকালো।

—চলুন ইমারজেন্সি কেস কোথায় নিয়ে যায় খোঁজ করি। অমল বলতেই মঞ্জু 'চলুন' বলে হাঁটা দিল তার সঙ্গে। কিন্তু খোঁজ করার জন্যও কোন দিকে যেতে হবে সেটা জেনে নেওয়া দরকার। ও মশাই শুনুন, বলেই অমল চেঁচিয়ে উঠল ঐ তো ওরা মিঃ চৌধুরীরা দাঁড়িয়ে। মিঃ চৌধুরীদেরও অমলের দিকে চোখ পড়ে গেল। ডেকে উঠলেন তাঁরা। একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে দুজনে উঠে এলো চত্বরের সিঁড়ি পার হয়ে উপরে।

না, কিছুই করে উঠতে পারছে না তারা। শুধু দুটো কুলী এসে জয়াকে ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে ইমারজেন্সি রুমের টেবিলে শুইয়ে রেখে গেছে। ব্যস! কোথায় ডাক্তার! কোথায় নার্স! ডাক্তার নাকি আর একটি ইমারজেন্সি রোগীকে অপারেশন করছেন।

—চলুন।

মঞ্জুকে নিয়ে এলো তারা ইমারজেন্সি রুমে। জয়ার মা কখনো কাঁদছিলেন, কখনো ঘর-বার করছিলেন। কখনো মেয়ের কাছে গিয়ে তার হিমশীতল হাত-পা হাতে নিয়ে ঘষছিলেন গরম করে তুলবার জন্য। কখনো নাকের কাছে হাত ধরে দেখছিলেন শ্বাস বইছে কি না। মঞ্জুকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মুখে আঙুল চেপে থামতে ইসারা করে মঞ্জু এক মুহূর্তের জন্য জয়ার রক্তশূন্য সাদা কাগজের মতো মুখটার দিকে তাকালো। তাকালো জয়ার ব্যাণ্ডেজবাঁধা রক্তভেজা হাতটার দিকে। রক্ত যে কেবল বেরিয়েই গেছে সব তাই নয়। যেটুকু অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ যে রক্ত ক'বিন্দুর জন্য এখনও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে জয়ার, তাও নিঃশেষে বেরিয়ে চলেছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কোমরে আঁচল গুঁজল মঞ্জু।

বারান্দায় বেরিয়েই যে অফিস-পিয়নটার সঙ্গে দেখা হলো তার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লো মঞ্জু। তোমাদের ডাক্তার বাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?

—কোন ডাক্তার বাবুর কথা বলছে সে? ডাক্তার বাবু তো একজন নয়?

এক-বোঝা ওষুধ ব্যাণ্ডেজ হাতে হনহন করে ছুটে চলে গেল একজন নার্স তাদের পাশ দিয়ে। আর ছুটে চলা নার্সের

পেছনের বাতাসটা যেন মঞ্জুর কানে কানে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল তুমি মমতার খোঁজ করছ না কেন? সে যে মেডিকেল কলেজের চীফ নার্স একজন—মনে নেই তোমার? মিস সেন, মিস সেনকে চেন তুমি? নার্স মিস সেন—মমতা সেন? যেন লোকটা মিস মমতা সেনকে চেনে বলে তবেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে তার।

চেনো? আমাকে তবে তার কাছে একটু নিয়ে চলো না। করুণ মিনতি করল মঞ্জু।

আর্ত আবেদন শোককাতরতা কোন অনুকম্পাই আর এদের মনে সাড়া জাগায় না। চলতে চলতে জবাব দিল সে—সে অনেক জায়গা দিয়ে চলেছে। তার পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ নার্স-কোয়াটার এখান থেকে দশ পনেরো মিনিটের পথ। ঘণ্টা খানেক হবে ডিউটি শেষ করে সে দিদিমণি তার কোয়ার্টারে চলে গেছেন।

—দশ-পনেরো মিনিটের পথ। আসতে যেতে আধ ঘণ্টা। ফোন—ফোন করা যায় না একটা? সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু।

—যায় কিন্তু সেখানে ফোন করতে হলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়ে আগে অনুমতি নিতে হবে।

—কোথায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘর?

আঙুল দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। মিনতি করলো মঞ্জু—তুমি আমাকে দয়া করে অন্ততঃ অফিসঘরটায় পৌঁছে দেও। আমি তোমাকে বখশিশ দেবো।

এবার কাজ হলো।

অতি বিনয়ের সহিত, সঙ্গে করে নিয়ে এসে সে পৌঁছে দিল মঞ্জুকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরের দরজায়। মঞ্জু ব্যাগ থেকে ওর কলেজের যাতায়াত খরচার টাকাটা বের করে পিয়নের হাতে তুলে দিয়ে গিয়ে অফিসরুমে ঢুকল। সামনের চেয়ারটায় যিনি বসেছিলেন মঞ্জু জানে না তিনিই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিনা, তবু সে তাঁরই কাছে আবেদন জানালো—তাকে নার্স-কোয়াটারে একটা ফোন করবার অনুমতি দেবার জন্য। মঞ্জু জানে না নার্সদের ফোন করার এই অনুমতির নিয়মের কতটা কড়াকড়ি তার মুখের অস্থিরতায়, তার গলার স্বরের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেই এতো অনায়াসে অনুমতি মিলে গেল কি না। ভদ্রলোকটি নিজে উঠে ডায়েল ঘুরাতে ঘুরাতে জিজ্ঞাসা করলেন, কা'কে চান আপনি?

—মমতা সেনকে।

একেবারে মমতা সেনকে ডেকে ওর হাতে ফোন তুলে দিয়ে ভদ্রলোক গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

—হ্যালো কে? কে আপনি? একটা মিষ্ট গলা ভেসে এলো মঞ্জুর কানে।

—আপনি—আপনি কি মমতা সেন?

—হাঁ। বলুন।

—আমাকে আপনি চিনতে পারবেন কি না বুঝে উঠতে পারছিনে। আমার নাম মঞ্জু। আপনাদের বাড়ীতে আমি গিয়েছি। একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছিল কিন্তু পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।

এক ঝলক নিচু মিষ্টি হাসির সঙ্গে জবাব এলো—আমি খুব চিনতে পারছি আপনাকে। আপনার কথা আমি দাদার মুখে শুনেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

—আমার এক বন্ধুকে অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় আপনাদের মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তার হাত কেটে গিয়ে অতিরিক্ত রক্ত পড়ে গেছে। কিন্তু এক ঘণ্টার উপর হয়ে চলল আপনাদের ইমারজেন্সি রুমের টেবিলের উপর সে পড়ে আছে অজ্ঞান অবস্থায়—কি যে করবো—

—তাই! আমি এক্ষুণি আসছি। আপনি ইমারজেন্সি রুমে চলে যান। ফোন রাখার শব্দ হলো ঠক করে।

ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা মঞ্জুর প্রতীক্ষমান চোখের উপর দিয়ে বার পাঁচ সাতের বেশী ঘুরে আসতে পেলো না। পোনেরো মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে চলে এসে ঘরে ঢুকল মমতা। ভোর ছ'টা থেকে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত একটানা ডিউটি দিয়ে—কোয়াটারে ফিরে গিয়ে সে সবে স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিছানায় শরীর এলিয়েছিল। মঞ্জুর ফোন পেয়ে যেভাবে ছিল সে ভাবেই চলে এসেছে, শুধু ভিজে চুলের রাশি হাতে জড়িয়ে কয়েকটা কাঁটা গুঁজে। এক ঘণ্টা পরে না দিয়ে আগেই কেন খবরটা মঞ্জু ওকে দিল না—মঞ্জুকে এ কথাটাই বলতে বলতে চলে গেল সে একেবারে জয়ার টেবিলের কাছে। প্রথমেই সে জয়ার ডান হাতটা হাতে নিয়ে নাড়ী দেখলো। তারপর দেখলো কালো হয়ে আসা তার আঙুলের ডগাগুলো। এক নজর তাকালো তার নীল হয়ে আসা ঠোঁট দুটোর দিকে। তারপর এমন অবস্থায় করণীয়টা আগে করে নিলো সে; জয়ার হাতের রক্তভেজা ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে আটারি ফরসেপ নিয়ে এসে মুখটা আটকে দিয়ে দিল রক্ত পড়ার পথ বন্ধ করে। নিতান্তই হাতের সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা। কিছুক্ষণ রক্ত বেরুনোর পর রক্ত জমে গিয়ে নিজ থেকেই থামে, কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে ফের রক্ত জমে জমে চাপ সৃষ্টি হয়ে রক্ত ক্ষরণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। আর এই ভাবে কিছুক্ষণ পড়া আর কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার ভেতর চলছিল বলেই জয়ার এই নিঃশ্বাসটুকু এখনও বইছিল। নইলে কখন সব চলা থেমে যেত তার। কিন্তু আর সময় নেই। একটা গ্লুকোজ সেলাইন এখন—এই মুহূর্তে দেওয়া দরকার—যদি মেয়েটিকে বাঁচাতে হয়। কিন্তু গ্লুকোজ সেলাইন দেওয়া নার্সদের—বিশেষ জুনিয়ার ট্রেইণ্ড নার্সদের পক্ষে একেবারেই আইন-বিরুদ্ধ! তবে তারা যে এ কাজ না করে বা কোন রকম আইনবিরুদ্ধ কাজ না করে তা মাত্রও নয়। নিজের হাতেও গ্লুকোজ সেলাইনও সে দিয়েছে। ডাক্তার উপস্থিত থাকতেন এই মাত্র। কিন্তু এখন লোকচক্ষুর উপর সে কিছুতেই একাজ করতে পারে না। কিন্তু যার অবসর আছে, যে সময় দিতে পারে নিজের কাজ ছেড়ে আসবার এমন একজন ডাক্তার খুঁজে পেতে আনতে আধ ঘণ্টা সময় পার হয়ে যাবেই—যে আধ ঘণ্টা সময় রোগীর বিপদের কথা ভাবলে কিছুতেই দেওয়া যায় না। ফের জয়ার নাড়ী দেখল মমতা তার ডান হাতটা তুলে নিয়ে। তার পর দাঁত দিয়ে পাতলা ঠোঁটটা কামড়ে ধরে দ্রুত হাতে তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করে চলল রোগীকে গ্লুকোজ সেলাইন দেওয়ার। হাঁ সে-ই জয়াকে সেলাইন দেবে। তারপর যখন এই আইনবিরুদ্ধ কাজের জবাব তার কাছে চাওয়া হবে, তখন তার জবাবের কথা ভাবা যাবে।

[ক্রমশঃ।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

ঊনত্রিশ

বার্ণার্ড শ'কে প্রশ্ন করা হল, Saint Joan নাটক লেখার পরিকল্পনা কি ভাবে আপনার মনে এল ?

বার্ণার্ড শ' উত্তরে বললেন—আমি অবস্থার দাস, যদি আমাকে নাটক লিখতে বলা হয় আর মাথায় যদি আইডিয়া থাকে, তাহলে সেই অনুরোধ আমি রাখবো কিন্তু দেখা যায় ঠিক সেই জাতীয় নাটক কেউ চায়নি। Saint Joan সুরু করার আগেও এই অবস্থা, যাহা কিছু লিখতে চাই কিন্তু মাথায় কোনো আইডিয়া নেই। আমার স্ত্রী বললেন—Joan of Arc চরিত্র নিয়ে একটা নাটক লেখ না কেন ? আমি তাঁর কথা রেখেছি। আমি জোনের বিচার এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিবরণ পড়েছিলাম, তখনই মনে হয়েছিল এর মধ্যে নাটক আছে, শুধু বিন্যাসের প্রয়োজন ষ্টেজের উপযুক্ত করে। আমার কাছে এ ছেলেখেলা। প্রাচীন জোন সম্পর্কিত নাটক এবং ইতিহাস রোমান্সের ফানুস আমি সমসাময়িক বিবরণ পড়েছিলাম, কিন্তু সমালোচনা বা জীবনী পড়েছি নাটক রচনা শেষ করে। প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট হিসাবে জোনের ভূমিকা আমাকে আকর্ষণ করেছে, পথিকৃতের লাঞ্ছনা আমি বুঝি। আমি পরিশেষে জোনের মৃত্যুর পর কি হল তা বলার চেষ্টা করেছি, বাকী অংশ সমগ্র ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণী। প্রথমে নাটকটা অনেক দীর্ঘ হয়েছিল, পরে কেটেকুটে কঙ্কালটুকু রেখেছি মাত্র। তবু অনেকে মনে করেন সাড়ে তিন ঘণ্টার অর্থ—কঙ্কালের অনেকটা অংশ।

বার্ণার্ড শ'র Back to Methusclah নাটকের পর সকলে মনে করেছিল তিনি নিঃশেষিত, বিশেষ কিছুই আর দেওয়ার নেই। তাঁর নিজেরও ধারণা এই তাঁর সর্বোত্তম রচনা। তাঁর অনুরাগী পাঠকের অনেকেই বলেন, না Man and Supermanই শ্রেষ্ঠ, এবং Saint Joan যে শ্রেষ্ঠ নাটক এই অভিমত পোষণ করেন যাঁরা তাঁরা সংখ্যায় কম নন। এই নাটক অতি জনপ্রিয়। বার্ণার্ড শ' এই নাটক রচনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তাই যেখানে ঘাতক ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে বলেন—You have heard last of her তখন ওয়ারউইক সহাস্যে বললেন—The last of her ? Hm ! I wonder

এইখানেই নাটকের শেষ হলে তা সঙ্গত হত। সমালোচকদের এই মত, কিন্তু লেখকের মত বিভিন্ন, তাই তিনি Epilogue বা পরিশিষ্ট জুড়ে দিয়েছেন, তার কারণও বললেন।

পুরোহিত আর রাজনৈতিকদের কাছে যদি জোন নতি স্বীকার করে, তাহলে তার প্রাণ বাঁচে, কিন্তু জোন আপোষ-বিরোধী। যা অন্যায় মনে করে তার কাছে নতি স্বীকার তার চরিত্র-বিরুদ্ধ। সে তার বিশ্বাসে অচঞ্চল। সে বলে—কোথায় থাকতে আজ তোমরা, যদি আমি তোমাদের কথাই মেনে নিতাম ? তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য, কোনো উপদেশ আমি পাইনি। হ্যাঁ, আমি এই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ। চিরদিনই এমন একা। আমার বাবা আমার ভায়েদের হুকুম দিয়েছিলেন আমাকে জলে ডুবিয়ে দিতে, যদি আমি তাঁর ভেড়াগুলো না দেখি, ওদিকে তখন ফ্রান্সে মৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে। আমাদের ভেড়াগুলো হয়ত নিরাপদ হত, কিন্তু ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে যেত। আমি ভেবেছিলাম ফরাসী সম্রাটের রাজসভায় ফ্রান্সের মিত্র আছে, কিন্তু দেখলাম, ফ্রান্সের ছিন্ন মৃতদেহটা নিয়ে নেকড়ের লুব্ধ হানাহানি। ভেবেছিলাম ঈশ্বরের সর্বত্রই মিত্র আছে, কারণ তিনি সকলের বন্ধু, আর সরল মনে ভেবেছিলাম আজ আপনারা যাঁরা আমাকে এখন এই ভাবে অপসারণ করছেন, তাঁরা আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, আপনারাই আমার শক্তিমান দুর্গতোরণ। কিন্তু এখন আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত।

বার্ণার্ড শ' এই নাটকে সুদীর্ঘ উক্তি দিয়েছেন, ছাপার অক্ষরে তা অনেকাংশে আড়াই পাতার বেশী এবং উচ্চারণ করতে সাত-আট মিনিট লাগে, তবু এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রোতারা মন দিয়ে শুনেছে। বিশেষতঃ জোনের উক্তিগুলি এত সুন্দর কাব্যাত্মক ভঙ্গীতে রচিত যে, অভিনয় না দেখে এই নাটক পাঠ করলেও আনন্দ পাওয়া যায়।

জোন যেখানে বলে—You promised me my life ; but you lied. You think that life is nothing but not being stone dead. It is not the bread and water I fear—I can live on bread : when have I asked for more ?...Bread has no sorrow for me and water affliction......

তার পর উত্তেজিত পুরোহিতগোষ্ঠী ঈর্ষা ও ক্রোধে জোনকে ডাইনী ঘোষণা ক'রে প্রকাশ্য বাজারে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারে। এমন নাটকীয় বিষয়বস্তু আর বার্ণার্ড শ'র বিচিত্র রচনা-কৌশল দর্শককে আকুল করে তোলে।

কঠিন-হৃদয় সমালোচকও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন Saint Joan বার্ণার্ড শ'র শ্রেষ্ঠতম রচনা।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই নাটক রচনাকালে বার বার নানা ছোটোখাটো অনুরোধ বার্ণার্ড শ'কে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, এখন আর কোনো কিছু নয় I must get my Joan of Arc play through the press and on to the stage—for the moment, spare me. I will make good later.

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব, তিনি বার্ণার্ড শ'র একটি জীবনী লিখেছেন। নিছক ভালোবাসার খাতিরে নয়, অর্থের প্রয়োজনে। এই জীবনীর পরিশেষে The Saint Joan Row

নামে একটি পরিচ্ছেদে, **Saint Joan** নাটক সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে তাঁর কি পত্রালাপ হয়েছে এবং কোথায় বিরোধ তা বর্ণিত হয়েছে। বার্ণার্ড শ'র অপর একজন জীবনীকার আর্কিবালড হেনডারসন বলেছেন—**Saint Joan is the greatest play in english since Shakespeare**—ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন, এই কথাতেই বার্ণার্ড শ'র মাথা ঘুরে গেছে। এই নাটক ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের মতে ঐতিহাসিক ত্রুটী, সাধারণ ভুল ভ্রান্তি এবং নাটকীয় দুর্বলতায় পরিপূর্ণ। বার্ণার্ড শ' বলেছেন, **most other writers made Joan an operatice heroine—a grand opera stunt. What she really was did not interest them—**

এর পটভূমিকায় আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিসও জোনের জীবন নিয়ে লিখেছিলেন **Joan La Romee**—বার্ণার্ড শ' এই গ্রন্থ নির্বোধের রচনা বলেছিলেন। পশ্চিমের মানুষরা কিঞ্চিৎ স্পষ্টবাদী, তাই ফ্রাঙ্ক এ কথাও স্বীকার করেছেন—**Shaw did not like my play and that, you may be sure, quite obviously infiuences my judgment of his Saint Joan.**

বার্ণার্ড শ' তাঁর **Man and Superman** নাটক তাঁর বন্ধু এ, বি, ওয়াকলির নামে উৎসর্গ করেছেন। **Saint Joan** প্রকাশিত হওয়ার পর **Times** পত্রিকায় ওয়াকলি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন, তিনি এই প্রবন্ধে স্বীকার করলেন, তিনি নাটকটি পাঠ করেননি এবং চোখেও দেখেননি, তবু তাঁর মতে বার্ণার্ড শ'র মত মানুষের এমন একটি গভীর এবং মহৎ বিষয়বস্তুকে রূপদানের চেষ্টা হাস্যকর। সমালোচনা-সাহিত্যে এমন অভূতপূর্ব উক্তির আর নজীর নেই। যাই হোক, পরে কিন্তু ওয়াকলি নিজের ত্রুটী বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছিলেন।

পৃথিবীর সব দেশেই বন্ধুরাই বন্ধুকে আক্রমণ করে অশোভন ভঙ্গীতে।

ঐতিহাসিকরাও বার্ণার্ড শ'র রচনার তথ্যগত ত্রুটী সম্পর্কে বলেছেন। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অগ্রণী পণ্ডিত ডাঃ জি, জি, কুলটন নাটকটিকে উচ্চ প্রশংসা করেছেন কিন্তু ভূমিকাটির তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—

মিঃ শ'র **Saint Joan** নাটক হিসাবে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে, তাঁর পরিকল্পিত জোন চরিত্র ইতিহাসের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণভাবে গঠিত ; তবে তাঁর সুদীর্ঘ ভূমিকাটুকু বালকোচিত বিবেচনা করা যেতে পারে। তবু স্বীকার করতে হবে এই নাটক বার্ণার্ড শ'র সার্থক রচনা।

নিউইয়র্কের গ্যারিক থিয়েটারে ১৯২৩-এর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে **Saint Joan** প্রথম অভিনীত হয়। অভিনেত্রী উইনিফ্রেড লেনিহান জোন চরিত্রটিতে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। এই নাটকটি অতি দ্রুত মার্কিণ দর্শকদের মনে লাগল, তাঁরা বুঝলেন যে একটি মহৎ নাটকের প্রথম প্রদর্শন দেখার সুযোগ তাঁদের মিলেছে। কিন্তু সংবাদপত্র ও সমালোচকরা বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করলেন না, বরং কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মনোভাবই প্রদর্শন করলেন। প্রথম রজনীতে এমন দর্শকের ভীড় হল যে পরদিন অন্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। **The Shaw Bulletin** নামক শ' সোসাইটীর মুখপাত্র ডাঃ এলিস গ্রিফিন এই প্রথম রজনীর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিউইয়র্কের নাট্য-সমালোচকরা যদি এযুগের মতো শক্তিমান হতেন তাহলে হয়ত নিউইয়র্কে **Saint Joan** এর এত সাফল্য সম্ভব হত না। আলেকজাণ্ডার উলকট অবশ্য বলেছিলেন—**beautiful, engrossing and at times, exalting.** আর নিউইয়র্কের তদানীন্তন বিখ্যাত সমালোচক মিঃ ওয়াল্টার প্রিচার্ড ইটন কিন্তু অপূর্ব উক্তি করেছিলেন—**Shaw is not only one of the keenest minds in the world to-day, he is one of the most religious men—Saint Joan is the work of a religious soul !**

সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতালীয়ান লেখক ও নাট্যকার লুইজী পিরান্দেলো এই সময় নিউইয়র্কে ছিলেন। তিনিও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

নাটক লেখার অনেক আগেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী ঠিক করে রেখেছিলেন বার্ণার্ড শ'। অনেক আগেই সিবিল থর্নডাইক ক্যানডিডা ভূমিকা চেয়েছিলেন, শ' তখন বলেছিলেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে ঘরকন্নার কাজ করো, চারটে ছটা ছেলে হোক, তারপর এসে ক্যানডিডায় অভিনয় করো। এই উপদেশ পালন

করে ফিরে এসে ক্যানডিডা অভিনয় করেন। যুদ্ধের পর তাঁর স্বামী লুইস কাসন ও তিনি কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক মঞ্চস্থ করেন।

সেই নাটকগুলি কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে তেমন সাফল্য লাভ করেনি। থর্ণডাইক দম্পতি স্থির করলেন The Cenci নাটকের ম্যাটিনী প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করবেন। সবাই বলেছিল এই নাটক খোলো না, একেবারে জমবে না, বন্ধুরা বললেন তোমরা সর্বনাশ ডেকে আনছো। কিন্তু ওঁদের তখন অবস্থা মরি আর বাঁচি এই নাটকই ধরা যাক। The Cenci-র জন্যে গেল, এমন কি আগেকার জনপ্রিয় নাটকগুলির ক্ষতিপূরণ হল এই নাটকের সাফল্যে। আর এই নাটকের জন্যই থর্ণডাইক পেলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা, বিচারদৃশ্যে সিবিল থর্ণডাইকের অভিনয় দেখে শ' মুগ্ধ হলেন। তাকেই 'জোনে'র ভূমিকা দেবেন স্থির করলেন।

সিবিল থর্ণডাইক এবং তাঁর স্বামী লুইস ক্যাসনকে বার্ণার্ড শ' আহ্বান করলেন আয়ট সেণ্ট লরেন্সের বাসভবনে। সেদিন বার্ণার্ড শ' তাঁদের কাছে Saint Joan পাঠ করে শোনালেন। এই দিনটি সিবিলের জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল।

সিবিল বলেছেন—কি অপূর্ব তাঁর আবৃত্তি, যেন এক আশ্চর্য সুরকারের কণ্ঠে এক মধুর সঙ্গীত শুনছি, তিনি জানেন কোথায় কি সুর, প্রতিটি লাইন যেন এক অপূর্ব সঙ্গীত। প্রতিটি চরিত্র অর্কেষ্ট্রায় বিভিন্ন যন্ত্রের মত সুর সৃষ্টি করছে। আর যাদুকর বার্ণার্ড শ' জানেন কখন কি সুর বাজাতে হবে। সেই সুরতরঙ্গ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

এই নাটক বার্ণার্ড শ'র কণ্ঠে বার বার তিন বার শুনেছেন সিবিল থর্ণডাইক, আর নাট্যকারের কাছ থেকে নিজস্ব ভূমিকাটি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। আর কোনও অভিনেত্রীর জীবনে এই সুযোগ আসেনি এবং বার্ণার্ড শ'র মতে এমন সার্থকভাবে কোনো চরিত্র কেউ এযাবৎ অভিনয় করে নি।

লণ্ডনের নিউ থিয়েটারে ২৬শে মার্চ ১৯২৪ এই নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট উভয় দলই এই নাটককে সমান মর্যাদা দান করেছেন, নাটকাভিনয় দেখে খুসী হয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, আপনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন নাকি? জবাবে বার্ণার্ড শ' বলেছেন—"রোমান ক্যাথলিক চার্চে ত 'আর দুজন পোপের স্থান হবে না, তাহলে হয়ত তাই হতাম।" ন্যুইয়র্কে উইনিফ্রেড লেনিহান আর লণ্ডনে সিবিল থর্ণডাইক (পরে ডেম সিবিল থর্ণডাইক), দুজনেই সমান খ্যাতি অর্জন করেছেন জোনের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই অভিনয়ের ফলে পুরুষের পক্ষে যেমন 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেটের ভূমিকা তেমনই মেয়েদের পক্ষে Saint Joan নাটকের জোন চরিত্র। ১৯৩১-এ লণ্ডনে এই নাটক যখন নতুন করে মঞ্চস্থ হল তখন আবার অনেক সপ্তাহ চলেছিল।

রিহার্সেলের সময় বার্ণার্ড শ' সিবিল থর্ণডাইককে প্রশ্ন করলেন—জোন সম্পর্কে কোনো বই পড়েছ নাকি?

সিবিল বললেন—হ্যাঁ, যা সংগ্রহ করতে পেরেছি সবই পড়ে ফেলেছি।

উত্তরে শ' বললেন—তাহলে, সব ভুলে যাও, আমি মূল দলিলকে নাটকায়িত করেছি।

সবাই জোনকে নিয়ে এতদিন রোমান্স সৃষ্টি করেছে, আমি ঠিক যেমনটি ঘটেছে তাই বলেছি। আমার মনে হয় যা নাটক এতাবৎ লিখেছি এই নাটক সবচেয়ে সহজ। আমি তথ্য সমাবেশ করেছি, জোনকে ষ্টেজের উপযুক্ত করে পরিবেশন করেছি। বিচার দৃশ্য আসল বিচার দৃশ্যেরই রিপোর্ট। আমি জোনের প্রতিটি কথাই ব্যবহার করেছি, যেমনটি বলেছে, যেমন করেছে।

বার্ণার্ড শ'কে আমেরিকার থিয়েটার গিল্ড অনুরোধ করেছিলেন Saint Joan-কে কিঞ্চিৎ কাটছাঁট করে ছোটো করতে, কারণ অভিনয় শেষ হতে মধ্যরাত্রি হয়ে যায়। বার্ণার্ড শ' জবাবে বলেছিলেন, হয় একটু আগে অভিনয় সুরু করো, নয় রাতের শেষ ট্রেণের সময় কিঞ্চিৎ পিছিয়ে দাও।

বলা বাহুল্য, দর্শকের অভাব ঘটেনি। কি ন্যুইয়র্কে কি লণ্ডনে সাধারণ দর্শক Saint Joan অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছে। লুইজী পিরান্দেলো এই নাটকের অভিনয় দেখে তাই বলেছিলেন—ইতালীয় রঙ্গমঞ্চে যদি Saint Joan এর চতুর্থ অঙ্কের মতো বলিষ্ঠ অংশ অভিনীত হত তাহলে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী উঠে দাঁড়াত এবং যবনিকা পতনের পূর্বেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উন্মত্তের মতো করতালি দিয়ে উঠত।

তিন বার এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, তিন বারই তার সাফল্য ঘটেছে অসামান্য। Pygmallion নাটকের সাফল্য এই নাটকের কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

এখন থেকে বার্ণার্ড শ' Saint Joan নাটকের নাট্যকার হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হলেন। যখন কেউ প্রশ্ন করতো আপনি জোনের জন্য এত দূর গেলেন কেন? শ' জবাবে বলেছেন—কারো জন্যে বা কোনো কারণে আমি কখনো কিছু করিনি। আমি কবি, চূণকামের বেপারি নই (I am a poet and not a soot and white wash merchant), যা জোনের প্রাপ্য তাকে দিয়েছি আর যা অপরের তা দিয়েছি তাদের। নাট্যমঞ্চকে এতদিনে তাঁর আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এইবার সুপ্রতিষ্ঠ হল। জর্জ বার্ণার্ড শ' এখন মনীষী, মহাপুরুষ, মহাজন। তাঁর পাকাদাড়ি, জ্বলন্ত উজ্জ্বল-নীল চোখ এবং ঋজু সুদীর্ঘদেহ যেন বৃদ্ধের আকৃতি চিরযৌবনের প্রতিমূর্তি। ভলতেয়ার বলেছেন—'Sages, once acclaimed, retired into solitude to become sapless with ennui—' বার্ণার্ড শ' এই উক্তির ব্যতিক্রম। তাঁর সমগ্র কর্মও সাহিত্য-জীবনের চরম পরিণতির কাল ১৯২৪। তাঁর মর্যাদার সীমা নেই। যা তিনি বলেন তা লোকে সশ্রদ্ধ চিত্তে শোনে, সম্ভ্রমভরে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে। যা কিছু তাঁর উক্তি সবই সারা পৃথিবীতে তারযোগে প্রচারিত হয়, বিশ্ববাসী তা উপভোগ করে, গ্রহণ করে। তাঁর রসিকতা, তাঁর অদ্ভুত বক্রোক্তি, বিশ্বমানবের মনে জ্ঞানসাধকের বহু চিন্তা ও সাধনা লব্ধ বাণী হিসাবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সমর-দপ্তর (ওয়ার অফিস) তাঁকে অনুরোধ জানায় আপনার তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচন করে দিন,

সমাজের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বার্ণার্ড শ' সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর নাটকাবলীর বিচার সুরু করলেন। কিন্তু মন স্থির করা কঠিন। তিনি বললেন, এর কারণ, আমি ত' আর স্কুলমাষ্টার নই যে পরীক্ষার খাতার নম্বর দেব। বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন অংশ ভালো লাগে। তাদের পিছনে আছে ভাবাবেগমিশ্রিত স্মৃতি। Mrs. Warren's profession ও The snewing up of Blanco posnet—নাটক দুটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। Candida এবং Man and Superman নাটকে গ্রানভিল বার্কারের অভিনয়ের স্মৃতি বিজড়িত। Arms and the Man নাটকে প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে রসিকতা করেছেন, আর Back to Methuselah নাটকে বার্ণার্ড শ' তাঁর সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' 'কারে রাখি, কারে দেখি কে বেশী সুন্দর?' বার্ণার্ড শ'র মনে হল এর চেয়ে সংকলকগণ যদি অনুরোধ করতো নতুন নাটক লেখার, কাজটা অনেক সহজ হ'ত। তাঁর মতো সুযোগ্য ভাবে কে আর সে কাজ পারে!

অবশেষে নির্বাচিত হল, Androcles and the Lion। Pygmallion আর Saint Joan। এর কারণ এই তিনটি নাটকেই আছে করুণ আবেদন। এই নিদারুণ দুঃসময়ে এই নাটকের আবেদনই সর্বাধিক। তিনি শুধু একটি মাত্র অনুরোধ জানালেন এই সব নাটকের 'ভূমিকার' অংশটুকুই বাদ দেওয়া চলবে না। ভূমিকাগুলিই বিচিত্র। Androcles and the Lion নাটকের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে—

I am ready to admit that after contemplating the world and human nature for nearly sixty years, I see no way out of the world's misery but the way which would have been found by Christ's will if he had undertaken the work of a modern practical s'atesman.

আর শেষ প্রশ্ন Saint Joan নাটকের শেষ কথা সেন্ট জোনের কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা না আর্তনাদ—?

O god that madest this beautiful earth, when it will be ready to receive thy Saints? How long O Lord, how long?

সেই চিরন্তন প্রশ্ন হে ঈশ্বর! কত দিন? আর কত কাল?

Saint Joan এর ফলে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠলেন জর্জ বার্ণার্ড শ'। এই ১৯২৪-এ তিনি বন্ধুবিয়োগ জনিত নিদারুণ আঘাত পেলেন। আজীবন সহযোগী বন্ধু উইলিয়াম আর্চার, বিপদে, সম্পদে যিনি বার্ণার্ড শ'কে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি ইং ১৯২৪-এর ১৭ই ডিসেম্বর নার্সিং হোম যাত্রার প্রাক্কালে বার্ণার্ড শ'কে লিখলেন—

—তোমাকে চিঠি লেখার পর জানা গেল, ক'দিনের ভেতর একটা অপারেশন করানো প্রয়োজন। কাল নার্সিং-হোমে যাচ্ছি। অপারেশন তেমন গুরুতর নয়, আমার শরীরও বেশ ভালো। সুতরাং সেরে উঠবো আশা রাখি। তবু বিপদের কথা বলা যায় না, তাই এই সূত্রে দু-একটা কথা বলার সুযোগ নিচ্ছি, তুমি ত জানো যে মাঝে মাঝে তোমার হিতৈষী সংশোধক হিসাবে কিছু বললেও তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কখনো এ কথা ছাড়া আর কিছু ভাবিনি যে অদৃষ্টক্রমে তোমার মত একজন সমসাময়িক বন্ধু লাভ করেছি। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুত্বের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি তোমার

ডব্লু. এ—

কিন্তু আর্চার যাই ভাবুন, সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন না, ২৭শে ডিসেম্বর নার্সিং-হোমেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বার্ণার্ড শ' সে সময় বিদেশে বেড়াতে গেছেন। এমন এক বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে ক্ষিপ্ত হলেন বার্ণার্ড শ', তিনি বললেন, আর্চারকে হত্যা করা হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অনেক, মতের অমিল অনেকখানি, তবু উভয়ে বন্ধু। গভীর ভালোবাসায় দুজনের জীবনসূত্র বাঁধা, তাই লণ্ডনে ফিরে এসে বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন—আর্চারহীন লণ্ডনে ফিরে এসে মনে হচ্ছে এ যেন এক নতুন যুগে এসেছি, এই পরিবেশে আমি প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মাত্র। এখনও মনে হয়, আর্চার আমার জীবনের একটা বড় অংশ সঙ্গে নিয়ে গেছে।

উইলিয়াম আর্চারের বিয়োগবেদনা বার্ণার্ড শ'র মনে যে আঘাত করেছিল, ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বিয়োগেও তিনি তেমন বিচলিত হননি। চল্লিশ বছরের বন্ধুত্বের মধ্যে কত মান-অভিমান, কত

ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ, কত ঘনিষ্ঠ ইতিহাস বিজড়িত তা বার্ণার্ড শ' বুঝেছিলেন বলেই এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

উইলিয়াম মরিসের মৃত্যুর পর শ' লিখেছিলেন—You can loose a man like that by your own death, but not by his উইলিয়াম আর্চারের মৃত্যুতে এই শোক আরো গভীরভাবে বেজেছে, তার আর একটি কারণ তত দিনে বার্ণার্ড শ'র বয়স অনেক বেড়ে গেছে, অনেক আত্মীয় ও বন্ধুজনের বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁকে বার বার আঘাত করেছে, আর সব চেয়ে বেশী কারণ হয়ত আর্চারের সর্বশেষ চিঠিখানি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হয়ত মানুষ তাঁর অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন বুঝতে পারে।

ত্রিশ

সুইডিস আকাদেমির নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ পার হলষ্ট্রোম্ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্য বার্ণার্ড শ'কে নোবেল পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করে লিখলেন—

জর্জ বার্ণার্ড শ' তাঁর তরুণ বয়সে লিখিত উপন্যাসে পৃথিবী ও তার সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সেই ধারণায় তিনি আজও অব্যাহত আছেন। তিনি গণতন্ত্রের রাজদরবারে পেশাদারী দরবার, এই স্থায়ী অভিযোগের বিরুদ্ধে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাঁর উজ্জ্বল শাণিত সরসতা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তিনি যা বলেন তা সবই রসিকতা মনে করে সবাই হেসে উড়িয়ে দেয়। বার্ণার্ড শ'র এই নিস্পৃহ ভঙ্গীই তাঁর বিচিত্র রণকৌশল, মানুষকে হাসিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করেন যা তাঁর আসল বক্তব্য তা সহজে ধরতে দেন না।

এই সত্তর পূর্তির কালে বার্ণার্ড শ'র জীবনে অনেক সম্মান একসঙ্গেই প্রায় বর্ষিত হওয়ার উপক্রম হল। সরকারী জগতের কাছে সত্তর বছরই বোধকরি বিচারের পক্ষে যথাযোগ্য। সাহিত্যের স্বীকৃতিতে প্রদত্ত নোবেল প্রাইজ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। যে লেবর পার্টি গঠনে একদা তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেই লেবর পার্টি ক্ষমতার আসীন হয়ে তাঁকে পীয়রত্ব দান করতে চাইলেন, লর্ড বার্ণার্ড শ' তাঁর পছন্দ নয়, তিনি জবাবে বললেন তোমরা আমাকে ন্যূনপক্ষে হয়ত ডিউকত্ব দিতে পারো, কিন্তু আমার পোষাবে না, সইবে না। তখন তাঁরা বললেন, তাহলে Order of merit নাও। বার্ণার্ড শ' উত্তরে জানালেন, I have already conferred it on myself। তাঁর বন্ধুরা কিন্তু ভীষণ আহত হলেন এই উক্তিতে।

য়ুনিভারসিটির অনারারি ডিগ্রীও বার্ণার্ড শ' নিতে চাইলেন না, বললেন যে সব মানুষ উপাধি ও ডিগ্রীর জন্য আপ্রাণ খেটেছেন তাঁদের অপমান করা হবে, কারণ বিনা পরিশ্রমেই নিছক সম্মানের খাতিরে অপরে বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে উপাধি পাবে, এ কেমন কথা।

বার্ণার্ড শ' অনেক বয়সে, নব্বই বছরের প্রান্তে এসে গ্রহণ করলেন Freedom of Dublin, এই তাঁর জন্মস্থানের সম্মান। অথচ আশ্চর্য তিনি এই জায়গাটা অপছন্দ করতেন। যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই বরো সেণ্ট প্যানক্রাস তাঁকে সম্মানিত করল Freedom of the borough of St. Pancras উপাধিতে, এই বরোতেই তিনি একবার কাউনসিলর হয়েছিলেন। আরো ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন গ্রহণ করলেন Freeman of the city of London। লক্ষ্য করার বিষয় এর সবগুলিই নাগরিক সম্মান, তার জন্মভূমি, বাসস্থান এবং বিচরণ ক্ষেত্রের প্রদত্ত সম্মান।

নোবেল প্রাইজ গ্রহণে আপত্তির কারণ যে কোনো উপাধি বা পুরস্কার নিতেই বিতৃষ্ণা। এখন তাঁর যথেষ্ট সম্পত্তি, লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। ৬,৫০০ পাউণ্ডের চেক ফেরৎ দেওয়ার সময় বললেন, আমার পাঠক এবং নাটকের সমর্থকরাই আমার ভরণ পোষণের ভার নিয়েছে, এই চেক যেন তীরে উত্তীর্ণ সাঁতারুকে লাইফবেল্ট ছুঁড়ে দেওয়া (a life-belt thrown to a swimmer who has already reached the shore in safety.)

৬,৫০০ পাউণ্ড, সুইডিস ক্রোনাবে ১১৮,১৬৫। বার্ণার্ড শ'কে বহু প্রার্থী এই টাকার জন্য পত্র লিখতে লাগল, সবাই বলে, তুমি না নাও, নিয়ে আমাদের দাও, আমাদের এত অভাব, এত সংকর্ম করার আছে ইত্যাদি। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে ঘর বোঝাই হয়ে গেল। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—ডিনামাইট আবিষ্কারকের অছিরা আমাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পর প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আমাকে চিঠি লিখে বলেছে—টাকাটা নিয়ে আমি যেন তাদের দিয়ে দিই। অথচ আমি দাতাদের টাকাটা ফেরৎ দিলাম। তখন সবাই লিখল ফেরৎই যদি দিলাম, ওদের ১৫০০ পাউণ্ড হিসাবে তিন বছর ধরে কর্জ দিলাম না কেন?

যাই হোক বার্ণার্ড শ সুইডিস-সাহিত্যের প্রচারের জন্য Anglo-Swedish Literary Foundation স্থাপন করলেন, সুইডিস ক্রাউন প্রিন্স তার পৃষ্ঠপোষক। ১৯২৯ এ আগষ্ট ষ্ট্রিণ্ডবার্গের চারখানি নাটকের তর্জমা প্রকাশ করলেন এই ফাউনডেশন, ১৯৩৯-এ আরো সাতখানি গ্রন্থ অনূদিত হল, তার মধ্যে তিনটি ষ্ট্রিণ্ডবার্গের নাটক। যুদ্ধান্তে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আরো কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—I can forgive Alfred Nobel for having invented dynamite. But only friend in human form could have invented the Nobel prize!

[ক্রমশঃ।

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পাঠরতা পাঠিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।
আলোকচিত্রশিল্পী বিত্ত চক্রবর্তী।

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

প্রতিভা বসু বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন। কোনো গুরুভার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়, নরনারীর চিরন্তন প্রেমসত্তাই তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু; জীবনের উজ্জ্বল শুভক্ষণের আনন্দকণিকা আহরণেই তাঁর অফুরন্ত আগ্রহ। আধুনিক প্রেমের পরিভাষায় প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর' 'মাধবীর জন্য' 'বিবাহিতা স্ত্রী' 'তিন তরঙ্গ' 'মেঘের পরে মেঘ' ইত্যাদি গ্রন্থের সরস ও স্বচ্ছন্দ কাহিনীগুলিতে নারী-হৃদয়ের, বিশেষ ক'রে বাঙালী নারী-হৃদয়ের যে কোমল নির্ঝর রূপায়িত হয়েছে সমকালীন সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।
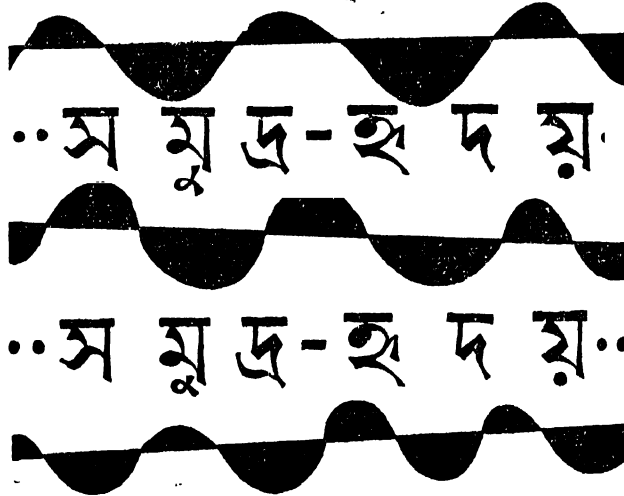
'সমুদ্র-হৃদয়' প্রতিভা বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমেদের ভালো লাগার আলো কি ক'রে ভালোবাসার আগুনে আহুতি হ'লো আর নবাবের সবুজমহলে বন্দিনী তেজস্বিনী সুলেখা তালুকদারের চিরসঞ্চিত অন্ধ আক্রোশ অবশেষে কোন অতলান্ত মমতায় আকুল উদ্বেল, 'সমুদ্র-হৃদয়'-এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিধুর রেখায় আঁকা পড়েছে॥ দাম: চার টাকা॥
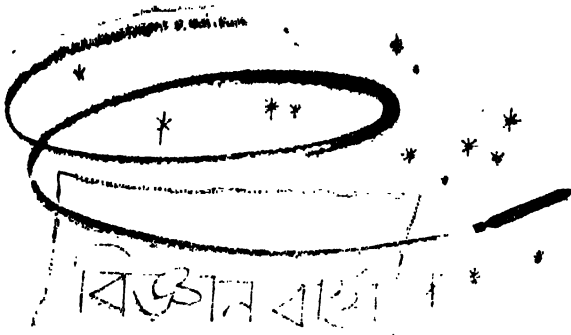
বৈজ্ঞানিক পাস্তুর

আজ তোমাদের কাছে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলছি। পাস্তুরের নাম তোমরা অনেকেই জানো। বড় হ'য়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে। বিজ্ঞানের পৃষ্ঠায় পাস্তুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

পাস্তুরের পুরো নাম হলো লুই পাস্তুর। ফ্রান্সের ডোলে নামক স্থানে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। তখন কে জানতো এই ক্ষুদ্র শিশুটিই একদিন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিগণিত হবেন? লুই পাস্তুরের বাবা ছিলেন একজন সামান্য লোক। তিনি ছিলেন চর্ম-ব্যবসায়ী। এই ব্যবসা করে তিনি সংসার নির্বাহ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই লুই পাস্তুরের লেখাপড়ার দিকে ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর পিতা দেখলেন ছেলের তো পড়াশুনায় ভারী মন! তিনি মনে মনে উপলব্ধি করলেন যে, ছেলে নিশ্চয়ই একদিন বড় হ'য়ে উঠবে—তাঁর মুখ উজ্জ্বল করবে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—"Childhood shows the man." কথাটির আসল অর্থ হচ্ছে যে, কোন্ লোক ভবিষ্যতে কি ধরণের হবে, এটা তার বাল্যকালের স্বরূপ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। উপরের কথাটি লুই পাস্তুরের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শৈশবেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় সকলেই পেয়েছিল। লুই পাস্তুর যে একদিন বিখ্যাত লোক হবেন, এটা তাঁর বাবার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। তিনি লুই পাস্তুরকে ফ্রান্সের সবচেয়ে ভাল বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। বিদ্যালয়টির নাম হচ্ছে—"ইকোলে নর্মাল"। লুই পাস্তুর এখানে খুব ভালভাবে পড়াশুনা শেষ করে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাস্‌বার্গে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকেই। পরে তিনি রসায়নবিদ্যার গবেষণা করে "ডক্টরেট" উপাধি পেলেন। পিতার আশা পূর্ণ হ'লো। বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের নাম ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সের অন্যতম বৈজ্ঞানিক হিসাবে গণ্য হলেন তিনি। পিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। হবারই তো কথা! পুত্রের এ-হেন উন্নতিতে কোন্ পিতা আনন্দিত না হয়ে থাকতে পারেন?

লুই পাস্তুর তাঁর জীবনে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। যে আবিষ্কারের জন্য লুই পাস্তুর সারা পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করেছেন, সেই আবিষ্কারের কথা এখানে বলছি। লুই পাস্তুর জলাতংক রোগনিবারক সিরাম আবিষ্কার করেছিলেন। তোমরা অনেকেই জলাতংক রোগের নাম শুনে থাকবে। ইংরাজিতে এই রোগটিকে বলা হয়—"Hydrophobia".

পাগলা কুকুরের বা শিয়ালের বিষে জলাতংক রোগ হয়। শুধু কি তাই? এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য্য। ভাখো, কী ভীষণ এই রোগ! লুই পাস্তুরের আগে এই রোগের কোন ঔষধ বের হয়নি। কাজেই তখন বহু লোক এই রোগে মারা গেছে। লুই পাস্তুর এ-হেন রোগের প্রতিষেধক ইন্‌জেকশন বের করলেন। পাগলা কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত একটি ছেলের উপর তিনি এই ইন্‌জেকশন প্রয়োগ করলেন। খুব ভাল ফল পেলেন তিনি। ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠলো, ছেলেটির জলাতংক রোগ হ'লো না। ছেলেটি বাঁচল, লুই পাস্তুরের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক আসতে লাগল তাঁর কাছে। সারা পৃথিবীতে লুই পাস্তুর এক যুগান্তরের সৃষ্টি করলেন। লুই পাস্তুর সারা পৃথিবীর লোকদের বাঁচালেন এক ভীষণ রোগের গ্রাস থেকে, সত্যই তিনি মহৎ!

আজ লুই পাস্তুর নেই। তাঁর দেহ পৃথিবীতে নেই সত্যি, কিন্তু তিনি অমর হোয়ে আছেন বিজ্ঞানের পৃষ্ঠায়। তাই তাঁর মৃত্যু নেই।

—শ্রীনরেশনাথ মৈত্র।

কৃত্রিম উপগ্রহ

গত ৬ই অক্টোবর তারিখে পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রের শিরোনামায় বোধ করি একই সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছিল, আর সে সংবাদটি হইতেছে—সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি। রাশিয়ার এই সাফল্যে বিশ্বের কোন সংবাদপত্র মন্তব্য করিল—"Russia wins space race." কেহ বা লিখিল—"East has beaten West in putting first m n made moon." আমেরিকার New York Herald Tribune সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিল—"A grave defeat for America... The Soviet satillite meant that the U. S. had lost its supremacy in scientific research and development."

মস্কো বেতার থেকে সর্ব্বপ্রথম এই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়। সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান Tass-এর এক খবরে বলা হয় যে, গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজনে সাফল্যলাভ করিয়াছে। উপগ্রহটি এখন পৃথিবীর ৫৬০ মাইল উপর দিয়া ঘণ্টায় ১৭০০০ মাইল বেগে মাত্র ৯৫ মিনিটে পৃথিবীকে 'ডিম্বাকার কক্ষপথ' (Elliptical orbit) একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। সংবাদে আরও প্রকাশিত হয় যে, কৃত্রিম উপগ্রহটি গোলাকার, ব্যাস ২৩" ইঞ্চি, ওজন ১৮৩ পাউণ্ড এবং উহা বিষুবরেখার সহিত ৬৫° কোণ করিয়া ঘুরিতেছে। Tass-এর এই সংবাদ যে সত্য তাহা অচিরেই প্রমাণিত হইয়াছে, কেন না, কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে প্রেরিত বেতার সংকেত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমেত বহু রাজ্যই পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা মহাশূন্য পরিক্রমা (Space Travel) বিষয়ে পিছাইয়া আছে, এ কথা তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সাফল্যে সমগ্র বিশ্ব আজ স্তম্ভিত! মানুষের প্রচেষ্টা, সাধনা ও তিতিক্ষা কতদূর ফলপ্রসূ হইতে পারে, বোধ করি ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব ক্ষুদ্র মানুষ তাহার বৃহৎ বুদ্ধির ফলে দিনের পর দিন যে অপ্রতিহত

গতিতে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে, অবাস্তবকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিতেছে—তাহাতে সত্যই বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়। ক্ষুদ্র মানুষই সেদিন লঙ্ঘন করিয়াছে দুর্লঙ্ঘ্য গিরিরাজ হিমালয়কে। মানুষের হাতেরই তৈয়ারী Radio, Television, Aeroplane আর প্রচণ্ড শক্তিশালী Hydrogen তথা পরমাণু বোমা। আজকে আবার সেই মানুষই সৃষ্টি করিল দ্রুত চলমান এই ছোট্ট চাঁদটিকে, যাহাকে দিগন্তের গায়ে অতি সাধারণ কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই উষা অথবা সন্ধ্যাকালে (অর্থাৎ যখন আমরা পৃথিবীর ছায়ায় থাকিতেছি, অথচ উপগ্রহটি তখনও সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত থাকিতেছে) উজ্জ্বল একটি বিন্দুর মতন দেখা যাইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বৎসরের (International Geographical year from 1st. July '57 to 31st. Dec. '58) কর্মসূচীর অন্তর্গত। এই সময়ে পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশের বৈজ্ঞানিকেরা সমবেত প্রচেষ্টায় পৃথিবী সম্বন্ধে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ ও মহাশূন্যে পরিক্রমা প্রভৃতির বিষয়ে গবেষণা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আনুমানিক এক কোটি ডলার ব্যয়ে ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন অপরপক্ষে Artic (Franz Joseph Land) হইতে ২৫টি দেশের মধ্যভাগ হইতে ৭০টি এবং Antartic (Miruyর নিকটে) হইতে ৩০টি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ফ্রান্স আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বৎসরে ১৫০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি টাকা) খরচ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি কিন্তু একদিনেই সম্ভবপর হয় নাই। বস্তুতঃ ইহার পিছনে রহিয়াছে দীর্ঘকালের নিরলস প্রচেষ্টা। বহুদিনের গবেষণা ও অনুশীলন আজ মানুষকে সাফল্যদান করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন অনেক দিন হইতেই রকেট পরিচালনা দ্বারা শূন্যপথে গমনাগমনের বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইতেছিল। অতি আধুনিক কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন এক বিশেষ ধরণের রকেটকে কাজে লাগাইয়াছে। এই সকল রকেটগুলিতে বিশেষ এক ব্যবস্থায় দুটি ধাতুপাত্রকে (Metallic cylinder,—দৈর্ঘ্য ১ মিঃ এবং ব্যাস ৪০ সেঃ) উর্দ্ধে নিক্ষেপ করে। Cylinderগুলির মধ্যে নানা যন্ত্রপাতি থাকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আর থাকে কাচের পাত্র, যাহা উর্দ্ধে অবস্থানকালে তত্রত্য বায়ু সংগ্রহ করিয়া আনে। রকেটটি ১০—১২ কিলোমিটার উপরে উঠিলেই Cylinder সংলগ্ন প্যারাস্যুট আপনা আপনি খুলিয়া গিয়া রকেটের মধ্যস্থিত সাজসরঞ্জামগুলিকে ধীরে ধীরে মাটিতে নামাইয়া আনে। মাটিতে নামিবার সময়ে ধাক্কা লাগিয়া যন্ত্রপাতি যাহাতে নষ্ট না হয় তাহারও বন্দোবস্ত থাকে। কাচপাত্রে সংগৃহীত বায়ু হইতে তত্রত্য ঘনত্ব (Density) এবং উপাদান সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। রকেটের মাথায় আবার কতকগুলি যন্ত্রপাতি থাকে যেগুলি প্যারাস্যুটে করিয়া নীচে নামে না, সেগুলি বেতার মারফৎ পৃথিবীতে সংবাদ সরবরাহ করে, এই সকল রকেট তৈয়ারী যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এই পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে। ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার উর্দ্ধে তাপমাত্রা কমিতে থাকে, পরিমাণ হয় সাধারণতঃ—৫০ থেকে—৬০ সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আরও অধিক উচ্চতায় তাপমাত্রা না কমিয়া বরং বাড়িতে আরম্ভ করে। ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পারদসীমা ০° সে অতিক্রম করে। কখন কখন তাপমাত্রা বাড়িয়ে ৩০°—৩৫° সে পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু ৭৫—৮০ কিলোমিটার উর্দ্ধে তাপমাত্রা আবার কমিয়া গিয়া দাঁড়ায়—১০° সে।

গত ডিসেম্বর মাসে Parisএ অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে, তাহাতে সোভিয়েট প্রতিনিধি Mr. A. Pokrovsky এক চমকপ্রদ পরীক্ষাকার্য্যের কথা বিবৃত করেন। বিভিন্ন উচ্চতায় দ্রুত চলমান যানের মধ্যস্থিত জীবের দেহের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব লক্ষ্য করিবার জন্য কয়েকটি কুকুরকে রকেটের মাথায় রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় তাপ ও চাপের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলির শারীরিক উত্তাপ, শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া ও নাড়ীর গতি নির্দ্ধারণ করিবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হয়। একটি চলচ্চিত্রের 'ক্যামেরাকে' রকেটের মধ্যে এমন ভাবে সংস্থাপিত করা হয় যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও উচ্চতায় কুকুরগুলির আচরণ ফটোর সাহায্যে পরে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ১১০০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত রকেটটি উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। গতিবেগ হইয়াছিল ঘণ্টায় ৪৩০০ কিলোমিটার। এর পর কুকুরগুলি যে কক্ষে ছিল, সেটিকে রকেট হইতে উৎক্ষিপ্ত করা হয়, যাহা পরে প্যারাস্যুটের সাহায্যে মাটিতে নামিয়া আসে।

এই ভাবে মানুষ দিনের পর দিন মহাশূন্যে পরিক্রমা বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কাজেই আজকের সোভিয়েট রাশিয়ার এই কৃতিত্বের পিছনে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের সাধনা আর প্রচেষ্টা।

এইবার উপগ্রহের বিষয় আলোচনা করিব। উপগ্রহ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সৌরজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। সূর্য্য ও তাহার নয়টি গ্রহকে লইয়া আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। এই গ্রহগুলি সূর্য্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে থাকিয়া বিভিন্ন সময় ধরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের পরিক্রমণকাল বিভিন্ন (different) হইলেও কিন্তু নির্দ্দিষ্ট (fixed)। পরিক্রমণকালে সূর্য্যের সহিত এই নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানকে লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা গ্রহগুলির নাই। ইহার কারণ, সূর্য্য বিপুল আকর্ষণবলে গ্রহগুলিকে নিজের দিকে টানিতেছে। ফলে গ্রহগুলি কক্ষচ্যুত হইতে পারিতেছে না। সৌরজগতের গ্রহগুলির অধিকাংশেরই আবার এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। উপগ্রহগুলি আবার গ্রহের আকর্ষণে গ্রহেরই চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর উপগ্রহ একটি চন্দ্র। মঙ্গলের কিন্তু উপগ্রহের সংখ্যা দুইটি—ডিমস ও ফোবস। বস্তুতপক্ষে সূর্য্যের সহিত গ্রহের যে সম্বন্ধ, গ্রহের সহিত উপগ্রহের সম্পর্কে অনেকটা অনুরূপ। তবে সূর্য্যেরই একমাত্র আলোকদানের ক্ষমতা আছে, অপরপক্ষে গ্রহগুলি সূর্য্যালোকেই আলোকিত, ইহাদের নিজস্ব কোন আলোক নাই। মানুষের তৈয়ারী কৃত্রিম উপগ্রহের সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ও আয়তন

সাধারণতঃ ইহার ব্যাস হইতে ১৮″ ২০″ ইঞ্চির মধ্যে (সোভিয়েট নির্ম্মিত উপগ্রহটির ব্যাস ২৩″ ইঞ্চি) ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। অধিকন্তু ক্ষুদ্রতর আয়তনের জন্য ইহাকে দেখিতে পাওয়াও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। আবার ইহার আয়তন খুব বড় হইলেও চলিবে না, কেন না, সেক্ষেত্রে রকেট বহন কষ্টকর হইবে এবং জ্বালানীর খরচ খুব বেশী হইবে। এক্ষেত্রে জানিয়া রাখা দরকার যে, প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য আবশ্যক হয় ১০০ কিলোগ্রাম জ্বালানীর। নির্দ্দিষ্ট উচ্চতায় নির্দ্দিষ্ট গতিবেগে ঘূর্ণায়মান রকেটের একটি ঊর্দ্ধতন ভারবহন ক্ষমতা আছে। এই ভারবহন ক্ষমতা হইতে জ্বালানীসমেত রকেটটির ওজন বাদ দিলেই সর্ব্বোচ্চ ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহের পরিমাণ পাওয়া যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২১½ পাউণ্ড ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবার মনস্থ করিয়াছেন, অপর পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে উপগ্রহটি সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ওজন ১৮৩ পাউণ্ড।

কৃত্রিম উপগ্রহের আকার গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন না, তাহা হইলে ইহা গমনকালে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ইহার আকারের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।—সর্ব্বাবস্থায়ই একাকার থাকিবে। অন্য যে কোন আকারের হইলে কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইত না। বস্তুতঃ কৃত্রিম উপগ্রহের আকারের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নিকট কম দরকারী নয়। কেন না, কৃত্রিম উপগ্রহের উপর বায়ুর আকর্ষণের পরিমাণ অনুসারে তাঁহারা অতি উর্দ্ধদেশে বায়ুর ঘনত্ব Density সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাইবেন। উপগ্রহের আকার সকল অবস্থায় সমান না হইলে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা আছে। কৃত্রিম উপগ্রহের আকার আবার "মস্তক রকেটে" প্রাপ্তিযোগ্য স্থানের উপরও নির্ভর করে।

বহিরাবরণের উপাদান

বহিরাবরণ পাতলা অথচ দৃঢ় হইবে। এ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার এ বিষয়ে প্রশস্ত। তবে ম্যাগনেশিয়ামের উপর ক্রমান্বয়ে তামা, দস্তা, নিকেল, রূপা ও পরিশেষে সোনার পাতলা আবরণ দিয়া বহিরাবরণ নির্ম্মাণ করিলে, ইহা একদিকে সূর্য্যের উত্তাপ ও অপরদিকে অত্যধিক শৈত্যের প্রভাব হইতে (যখন উপগ্রহটি ও সূর্য্যের মধ্যে পৃথিবী থাকিবে) রক্ষা করিবে। তবে এ্যালুমিনিয়ম অথবা কোন ধাতু বহিরাবরণ হিসাবে ব্যবহার করিলে একটি অসুবিধা হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হইতেছে পৃথিবীর বায়ুস্তরের উপরিভাগে Ionosphere-এর মধ্যে এবং উহার উর্দ্ধে প্রবহমান তড়িৎপ্রবাহের অনুসন্ধান করা (ইহার সম্বন্ধে পরে বলা হইয়াছে)। ইহা সাধারণতঃ Magnetometer দ্বারা নির্দ্ধারণ করা হইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উপগ্রহের বহিরাবরণ হইতে হইবে চুম্বকশক্তিবিহীন এবং তড়িৎপ্রবাহে অক্ষম। এইজন্য স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রেও প্লাষ্টিকের বহিরাবরণ ব্যবহৃত হইবে।

বহিরাবরণের রং হইবে দুধের মতন সাদা, কারণ তাহা হইলে ইহা সূর্য্যালোককে প্রতিফলিত করিয়া এবং ছড়াইয়া দিয়া (scattering) অধিকতর সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? ইহা কি মানুষের নিছক খেয়াল আর প্রকৃতির উপর নিজের আধিপত্য দেখান না অন্য কিছু? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পৃথিবীর বহু রহস্যের কার্য্যকারণ আজও আমরা জানি না। শুনিতে হয়ত আশ্চর্য্য লাগিবে যে আমরা ২লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত চন্দ্র সম্বন্ধে যত খবরাখবর জানি, পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিন্তু তাহাপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ কি ভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে? আয়তনে ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ইহার মধ্যে মানুষ যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে কি ইহারা বহির্বিশ্বে কিছুদিন ঘুরিয়া সংগৃহীত তথ্য সরবরাহ করিতে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে? না তাহাও নয়। কেন না ইহার গতিবেগ যখন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া পুনরায় মাধ্যাকর্ষণের জন্য মর্ত্তের মাটিতে নামিতে থাকিবে তখন চারিদিকের ঘন বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষ লাগিয়া উল্কাপিণ্ডের মতন জ্বলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তবে উর্দ্ধলোকের সংবাদ সংগ্রহ কি ভাবে সম্ভবপর? সম্ভবপর হইবে বেতার-তরঙ্গের সহায়তায়। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংকেত-সংস্থা (signal corps) সর্ব্বপ্রথম চন্দ্র হইতে বেতার প্রতিধ্বনির সন্ধান পান (Radio echo) তাঁহারা আবিষ্কার করেন যে বেতার-তরঙ্গ মহাশূন্যেও যথারীতি স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করিতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম থাকিবে তাহাদিগকে একটি স্বয়ংক্রিয় বেতার-প্রেরক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
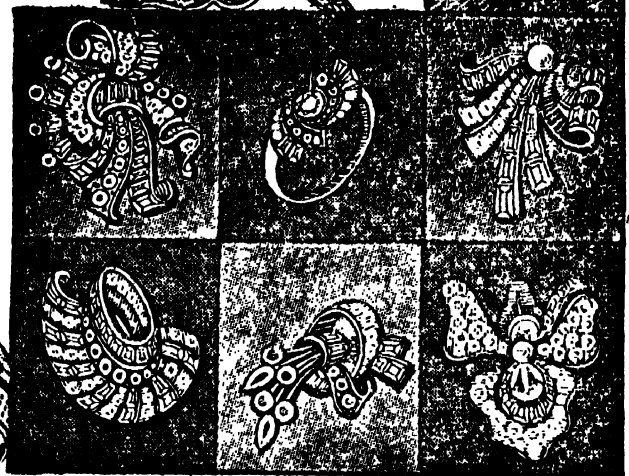
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস্
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ

এই বেতার প্রেরক যন্ত্র হইতে প্রেরিত শব্দ অথবা অন্য কোন সাংকেতিক ক্রিয়ার যথাযোগ্য অর্থ পৃথিবীতে বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে (যাহারা পূর্ব্বোক্ত সাংকেতিক প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম অর্থ করিতে অক্ষম), আমরা বহির্বিশ্বের খবরাখবর পাইতে পারিব। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বৎসরে (I. G. Y.) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ২৫টি বেতার-গ্রাহক কেন্দ্র স্থাপন করিবার সংকল্প করা হইয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষে নৈনিতালে মার্কিণ সহায়তায় অনুরূপ একটি গ্রাহক-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে, সংগৃহীত তথ্য সমূহ পৃথিবীর সকল জাতিই জানিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেতারে এইরূপ ভাবে সংবাদ প্রেরণের নাম **Telemetering.** এখন কথা হইতেছে যে, স্বয়ংক্রিয় বেতার-প্রেরক যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালনের জন্য প্রয়োজন শক্তিসংগ্রহ-পারদের (Hg) ব্যাটারীর ব্যবহার এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য, কেননা, তাহারা ওজনের তুলনায় সর্ব্বাধিক শক্তি (energy) সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু উপগ্রহের মধ্যে খুব বড় ব্যাটারী লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তনের যে ব্যাটারী লইয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাতে একদিন সর্ব্বক্ষণ ধরিয়া বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে চালু রাখিবার মতন শক্তি সরবরাহ সম্ভব। কিন্তু এক দিনেই সকল তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই জন্য স্থির করা হইয়াছে, যখন উপগ্রহটি ইহার কক্ষপথে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থানে থাকিয়া তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সক্ষম থাকিবে, কেবল তখনই ইহার যন্ত্রপাতিগুলিকে পৃথিবী হইতে বেতার সংকেত মারফৎ কিছুক্ষণের জন্য চালু রাখা হইবে। উপগ্রহটির মধ্যে তাই বেতার পরিচালিত সংগ্রাহকের (**Radio command Receiver**) সংস্থাপন করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাত্র ১ ওয়াট শক্তি ব্যয়ে ইহারা মর্ত্তভূমি হইতে প্রেরিত সংকেত অনুসারে যন্ত্রপাতিগুলিকে চালু অথবা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে। হিসাব করিয়া *দেখা গিয়াছে, ৯০ মিনিটের কক্ষপথে দিনে ১৬ বার ঘূর্ণায়মান ৩০ পাউণ্ড ওজনের উপগ্রহটির যন্ত্রপাতিকে যদি ১৬ বারের প্রতিবার* সুবিধানুযায়ী মাত্র ৫ মিনিট করিয়া চালু রাখা যায়, তাহা হইলে তড়িৎকোষাবলীর (**Battery**) শক্তি সরবরাহ ক্ষমতা ১৫ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। ৩০০ মাইল ঊর্দ্ধে অবস্থিত সেকেণ্ডে ৪½ মাইল গতিতে চলমান কৃত্রিম উপগ্রহের সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার ইহাই ঊর্দ্ধতম সময়। তবে একথা ঠিক যে, ইহার পর যদিও উপগ্রহটি তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেতার মারফৎ তাহা সরবরাহ করিতে অক্ষম থাকিবে, তথাপি ইহারা নিজ কক্ষপথে এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়ে থাকিতে পারে।

বর্ত্তমানে সূর্য্য হইতে শক্তি সংগ্রহের কথা চিন্তা করা হইতেছে। নিউইয়র্কের 'বেল টেলিফোনে ল্যাবরেটরী' সৌর তড়িৎ-কোষাবলীর (**Solar Battery**) আবিষ্কার করিয়া শূন্যে গমন গবেষণা বিষয়ে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছে। **Solar Battery**র গঠন প্রণালী হইতেছে কতকগুলি পাতলা অগ্নিপ্রস্তরের (**Silicon**) ডিসকে স্বল্প পরিমাণ **Boron** এর আবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। যখন ঐ ডিসগুলির উপর সূর্য্যালোক পড়ে, তখনই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয়। যেহেতু সূর্য্যালোক চারিদিকেই বর্ত্তমান, সেই জন্য তড়িৎ-কোষাবলীর জীবনীশক্তিও অবিনশ্বর। এই ব্যবস্থা চালু হইলে কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে প্রেরিত তথ্য বহুদিন যাবৎ পাওয়া যাইবে। তবে এ ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহটির এক অংশকে বরাবরই সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকিতে হইবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

—শ্রীশ্যামলকুমার রায়

অথচ

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভেঙেছিলো ঘুম সকালের মেঘ-ছড়ানো আবীরে,
প্রত্যুষ চোখে দেখেছি আকাশ পাখীদের ভীড়ে,
দিগন্তনীল শূন্য হৃদয় উধাও কখন।
অথচ জীবন কাঠ-কেরোসিনে প্রাত্যহিকের
চিন্তার জালে দুর্নিরীক্ষ্য ; চতুর্দিকের
রজ্জুপীড়নে ফাঁক নেই, বাঁধা অশান্ত মন
মাথা ঠোকে শুধু টেবিলে ; ঘণ্টা টেলিফোন কানে
মানুষ মানুষ—সামনে-পেছনে মাথা ধ'রে টানে।

কি যন্ত্রণা যে কাঁপে হৃদয়ের রক্তে রক্তে !
দিগন্ত কবে হারালো শূন্যে ; মাটির শিবিরে
জেনেছি জীবন যোগানের জোরে নতুন তক্তে।
শৈশব নেই—হাত-পা ছুঁড়ছি জনতার ভীড়ে
ছায়ার স্বপ্ন নাচে জানলায় শার্শীকে ঘিরে
আমায় বেঁধেছে যন্ত্র-বেতাল ক্রীতদাসত্বে।

কাশির মূলকারণ দূর করুন
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract
সিরোলিন খান
নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ
সিরোলিন কেবল যে কাশি 'থামিয়ে দেয়' তা নয়— কাশির মূলকারণ দুষ্ট-জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।
একমাত্র পরিবেশক: ভলটাস লিমিটেড

মোহনবাগানের লীগবিজয়

বহু ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় দল মোহনবাগান নিতান্ত প্রত্যাশিত ভাবেই এ বৎসরের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগবিজয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে তারা মোট আটবার লীগ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ এই কয়বারের জয়ের ইতিহাসে তারা কোনবারই অপরাজিত আখ্যা নিয়ে এই সম্মান লাভ করতে পারেনি। বহু-আকাঙ্খিত এই আখ্যালাভের সুযোগ মোহনবাগানের প্রায় সামনে এসেও হাজির হয়েছিল। কিন্তু 'বিধি বাম'। লীগ খেলার প্রায় সমাপ্তি পর্য্যায়ে তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গলের কাছে হেরে গিয়ে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবারের লীগ মরশুমে মোহনবাগানের এইটি হোল একমাত্র পরাজয়ের 'ছাপ'। অবিশ্যি ৬টি অমীমাংসিত খেলায় তারা ৬ পয়েন্ট হারিয়েছে। এতে পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে কিন্তু সম্মান নষ্ট হয়নি। প্রথম পরাজয়ের আঘাত তীব্র না হলেও সামলে উঠতে মোহনবাগানের বেশ সময় লাগলো। চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা হতোদ্যম হয়নি সত্য কিন্তু লীগের সূচনায় তারা যে বিক্রমে যাত্রা সুরু করেছিল শেষ পর্য্যায়ে তাদের পদক্ষেপ সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এতে দরদীকুলের কোন মহলে হয়ত কিছুটা সংশয়েরও সঞ্চার করেছিল। কিন্তু মোহনবাগানের লীগজয়ের পথ অবরুদ্ধ ছিল না। বাকী পথটুকু পাড়ি দিয়ে তারা লীগ পরিক্রমা সার্থক করলো ও সফল করলো। অগণিত দর্শক ও সমর্থককুল জনপ্রিয় মোহনবাগনের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠলো। মোহনবাগান যে জনচিত্তে কতখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে তার জাজ্বল্য প্রমাণ পাওয়া গেল খিদিরপুর দলের সঙ্গে তাদের লীগের শেষ খেলায়। খেলা হিসেবে এ খেলাটি নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় ছিল না। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এ আশাও করা যায়নি। তবে খেলাটার ফলাফলের উপর কিছুটা গুরুত্ব ছিল। এ খেলায় মোহনবাগান এক পয়েন্ট পেলেও লীগবিজয়ী হতো। কিন্তু লীগবিজয়ের চরম ক্ষণটি চাক্ষুষ করে নিজেদের মন ভরাতে বিপুল দর্শকশ্রেণী এই দিন মাঠে উপস্থিত থাকে। খিদিরপুরের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয়লাভের ফলে লীগ-বিজয়ের মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় এই জনসমষ্টি বাঁধভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত আনন্দে ও উল্লাসে মেতে ওঠে। প্রাণচাঞ্চল্যের যে নজীর সেদিন পাওয়া গেছে, তা সাম্প্রতিককালের খেলাধূলোর ইতিহাসে বিরল। এই সঙ্গেই কলকাতা ময়দানে লীগ মরশুম সাঙ্গ হলো। সামনে পাতা হয়েছে আই, এফ, এ, শীল্ডের আসর। নতুন উৎসাহে, নতুন উদ্দীপনায় খেলবার আগ্রহে দিকে দিকে সাজ সাজ রব।

আই, এফ, এ, শীল্ডে ৪৩টি দল

এবারে আই, এফ, এ, শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ৪৩টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে ১৫টি দল হোল বাংলাদেশের বাইরের। বাইরের খ্যাতনামা দলগুলোর মধ্যে হায়দারাবাদ স্পোর্টিং, ই, এম, ই, (সেকেন্দ্রাবাদ), বিজয় ক্যান্টনমেন্ট (দেরাদুন), ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে (বোম্বাই), হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফট (বাঙ্গালোর) দলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের বিরুদ্ধে কলকাতার প্রখ্যাতনামা দলের খেলা নিশ্চয়ই আকর্ষণ ও উৎসাহের কারণ। লীগ ও শীল্ড প্রতিযোগিতার চেহারা দুটো আলাদা ধরণের। লীগ যেন লম্বা সড়ক বেয়ে দূর লক্ষ্যস্থলে পৌছবার একটা প্রয়াসমাত্র। এ পথে চলতে গিয়ে সাময়িক ভাবে পিছিয়ে পড়লেও একেবারে মিলিয়ে যাবার বা নিশ্চিহ্ন হবার ভয় নেই। বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে যে আগে গিয়ে চরম লক্ষ্যে পৌছবে, জয়ের মালা তারই গলে দুলবে। কোন উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ করাই যেন শীল্ডে সাফল্যলাভের সামিল। চড়াই-উৎরাই বেয়ে উঁচুতে চলতেই হবে—পেছনে ফেরবার অবকাশ নেই। পেছনে ফিরলেই বিপদ। এমনতর দুর্জ্জয় মনোভাব নিয়ে যোগদানকারী দলগুলো এবারের শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং তার নমুনা দেখিয়ে দর্শকমনে দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণা জোগালে তাতে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না, আশা করা যায়।

[ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে]

রোমে আগামী বিশ্ব অলিম্পিকে ভারত হকি প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিজয়ী আখ্যা অক্ষুন্ন রাখতে পারবে বলেই মনে হয়। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের গর্ব্ব করার একটি জিনিষই আছে, সেটা হোল হকি।

১৯২৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিক থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত ভারত হকি প্রতিযোগিতায় তাদের বিশ্ব-জয়ের পতাকা উঁচুতে ধরে রেখেছে। বিজয়-বৈজয়ন্তী অক্ষুন্ন থাক—এটা ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য।

টোকিওতে অনুষ্ঠিত গত এশীয় ক্রীড়ায় ভারত হকিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করায় অনেকেই আগামী বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের সাফল্য সম্বন্ধে কিছুটা নিজেদের ভাব হয়ত বা পোষণ করে থাকবেন। এশীয় ক্রীড়ায় ভারত পরাজিত হয়নি। গোলসংখ্যার হিসেবে তালিকার ক্রমিক অবস্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল। সেই হিসেবেই পাকিস্তান তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এর ফলে ভারতের হকি খেলার মান নিম্নগামী হয়েছে বা ভারতীয় দলের শক্তি আগের থেকে ক্ষুন্ন হয়েছে, একথা মনে করলে চরম ভুল করা হবে।

খুবই আশার কথা যে, আসন্ন অলিম্পিকের জন্য ভারতীয় দলকে

বিশেষ শক্তিশালী করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি সুরু হয়ে গিয়েছে।

ভারতে হকি খেলার নিয়ামক-সংস্থা নিখিল ভারত হকি ফেডারেশন এ বিষয়ে যোগ্য দৃষ্টি দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় হকি দল পূর্ব্ব-আফ্রিকা সফর করে গত মাসে দেশে ফিরেছে। বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক 'বাবু' (কে, ডি, সিং) ছিলেন পূর্ব্ব-আফ্রিকা সফরে ভারতীয় দলের 'কোচ' এবং ম্যানেজার। তিনি বিশেষ করে ৬ জন খেলোয়াড় সম্বন্ধে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেছেন এবং ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য এই ছয় জনের নাম সুপারিশ করেছেন। "বাবু" নির্ব্বাচনী কমিটিরও অন্যতম সদস্য। সুতরাং তাঁর সুপারিশ যৌক্তিকতা এবং যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহ্য হবে বলেই মনে হয়। অবিশ্যি ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠনে এখনও দেরী আছে। জার্ম্মানীর মিউনিকে হকি প্রতিযোগিতায় এবং বিদেশের আরও কয়েকটি জায়গায় খেলার পর দল গঠন করা হবে। এ সমস্ত খেলাগুলো হবে বিশ্ব অলিম্পিকের জন্য ভারতের প্রস্তুতি-পর্ব্ব।

এ ছাড়াও খেলোয়াড়দের বিশেষ শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ, বাবু এবং হাবুল মুখার্জ্জী শিক্ষাদান করবেন।

এবারের অলিম্পিকে ভারতীয় দলকে আগের তুলনায় অনেকখানি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে হয়। কেন না, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণী ইতিমধ্যেই হকি খেলায় যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করেছে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের অনমনীয় দৃঢ়তা, প্রশংসনীয় ক্রীড়াধারা এবং সর্ব্বোপরি জাতীয়তা ভাব প্রকাশ ভারতের জাতীয় সুনাম এবং ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকবে এবং সারা বিশ্বে তাঁদের বিজয় পতাকা চির-উড্ডীন থাকবে। জগৎসভায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ আসন নেবেন।

কলকাতায় ষ্টেডিয়াম

আবার কলকাতায় "ফুলবল ষ্টেডিয়াম" প্রসঙ্গ। ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে কোন মুখরোচক খবর হলেই কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের কৌতূহলের শেষ থাকে না। ষ্টেডিয়াম নিয়ে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনের শেষ নেই! কিন্তু সেই একই প্রশ্ন—কবে ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ আরম্ভ হবে? সম্প্রতি সরকারী দপ্তর থেকে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে কিছুটা আশার আলো নিক্ষেপ করা হয়েছে। এখন নাকি "এলেনবরা কোর্সে" (কেল্লা সংলগ্ন প্রান্তরে) ষ্টেডিয়াম গঠনের জন্য জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

"এলেনবরা কোর্সে" ভারত সরকার তেরো একর জমি ষ্টেডিয়ামের জন্য দেবে বলে ঠিক করেছে। একে নাকি দু'ভাগে বিভক্ত করা হবে। সাড়ে ছয় একর অর্থাৎ কুড়ি বিঘা জমির ওপর ষ্টেডিয়াম নির্ম্মিত হবে এবং বাকি সাড়ে ছয় একর জমির ওপর সুইমিং পুল, ভলিবল, কবাডি, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি খেলাধূলার মাঠ প্রস্তুত হবে বলে ঠিক হচ্ছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা, স্যার বি, এন, মুখার্জ্জী ও শ্রীশিবচন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে নিয়ে ষ্টেডিয়াম গঠনের জন্য একটা "অছিমণ্ডলী"ও গঠন করা হয়েছে। শ্রীশিবচন্দ্র ব্যানার্জ্জী হিন্দুস্থান কন্সট্রাকসন কোম্পানীর কর্ণধার। তাঁরই ওপর ষ্টেডিয়াম গঠনের ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি রোমে গেছেন। রোমে এবং লণ্ডনের নানাস্থানে ষ্টেডিয়াম গঠনের তথ্য সংগ্রহ করে তিনি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরবেন। "কলকাতার ষ্টেডিয়াম" এবারকার প্রসঙ্গ যে বেশ কিছুটা মুখরোচক, তা বলাই বাহুল্য। দেখা যাক ষ্টেডিয়াম নিয়ে আর কতকাল টালবাহনা চলে।

কলকাতায় আমেরিকান সন্তরণ-শিক্ষক

আমেরিকার খ্যাতনামা সাঁতার-শিক্ষক মন মিলারের শিক্ষাধীনে কলকাতার তরুণ ও উদীয়মান সাঁতারুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। মিলার একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক। ১৯৫৬ সালে বোম্বাই রাজ্য সুইমিং এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে তিনি ভারতে এসেছিলেন। এবার তাঁর আসার ব্যবস্থা করেছেন ইউনাইটেড ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট। তবে এখানকার শিক্ষাদানের সকল উদ্যোগ আয়োজন করবে বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন। মিলার কলকাতায় অবস্থান কালে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের "রজত-জয়ন্তী" উৎসবে যোগদান করবেন। কলকাতার লেক ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুলে তিনি শিক্ষাদান করবেন। কলকাতার পর তিনি দিল্লী ও বোম্বাই যাবেন। সেখানেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ফাষ্ট বোলিং ভীতিরোধের চেষ্টা

ভারতের ক্রিকেট-অনুরাগী মাত্রেই জেনে খুসী হয়েছেন যে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খ্যাতনামা "ফাষ্ট বোলার" রয় গিলক্রিষ্টকে ভারতে এই বৎসরের শেষাশেষি "কোচ" হিসাবে আনার প্রচেষ্টা চলছে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের "ফাষ্ট বোলিং" ভীতির কথা সুবিদিত। ভারতীয় খেলোয়াড়দের গিলক্রিষ্ট কিছুটা সহায়ক হোন, এটাই সকলে কামনা করেন।
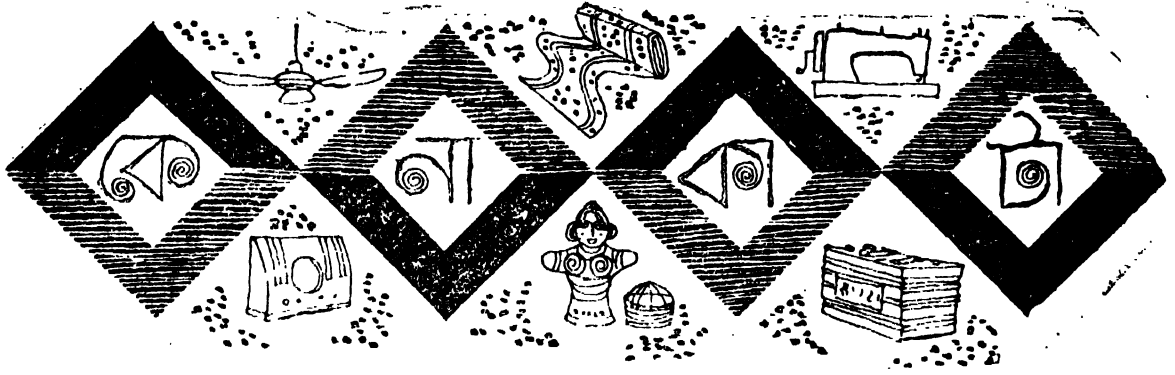
গবেষণা ও শিল্প-সমৃদ্ধি

মানুষ সে-দিন থেকে এসেছে এই মাটির পৃথিবীতে, সাথে সাথে হাজির হয়েছে তার কল্পনাও। প্রথমটায় কল্পনার পরিধি ছিল নিতান্ত সীমিত, কিন্তু যুগে যুগে তা বিস্তার লাভ করে চলে। এই দুরন্ত কল্পনা ও স্বপ্নকে আশ্রয় করেই একদিন বিজ্ঞানী মানুষের হয় জন্ম—সেই থেকে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবধি নেই।

একথা আজ আর বলবার অপেক্ষা রাখে না, সভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অপরিমেয়। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্বাদেই মানুষ পেয়েছে বিচিত্র ধরণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—ব্যবহার উপযোগী রকমারী শিল্প-সম্ভার বা শিল্প-ঐশ্বর্য্য। এমনি দাঁড়িয়েছে—আজকের দিনে কোন লোকের পক্ষেই বিজ্ঞানকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুফল কিছু না কিছু ভোগ করছে প্রত্যেকেই।

যেখানকার অধিবাসী এই মানুষ, সেই পৃথিবী সম্পর্কেও জল্পনা-কল্পনা ও গবেষণার অন্ত ছিল কি? কত রকম বিচিত্র ধারণাই না করা হয়েছে পৃথিবীর আকার ও অবস্থান সম্বন্ধে। প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক থেলসের বিশ্বাস ছিল—পৃথিবীটা দেখতে রেকাবীর মতো—আর সমুদ্রের জলে এটি স্থির ভাসমান। দুই হাজার বছরেরও ওপর এই নিয়ে চিন্তা-আলোচনা করলেন ভাবুক-মহল। গবেষণা শেষে আজকের মানুষ পৃথিবীর আকার ও রহস্য সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণায় আসতে পেরেছে—বুঝে নিয়েছে সত্যি কতো সব মৌলিক উপাদান ও রাসায়নিক পদার্থ মিলেমিশে এইটি গড়া।

পর পর আবিষ্কৃত এই বহুমূল্য পদার্থগুলো নিয়ে গবেষকরা শিল্প-গবেষণাগারসমূহে গবেষণা চালিয়েছেন, সে-ও বহুদিন। এর ভেতর হাজার হাজার নতুন জিনিস তৈরী হয়েছে—দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো অনেক প্রয়োজনে আসছে আমাদের। একদিকে গবেষণা, অপর দিকে শিল্প-সমৃদ্ধি—এই নিয়ম এক্ষণে প্রায় বাঁধাধরা, নিয়মানুযায়ী কাজেরও বিরতি নেই বলা যায়।

শিল্পোন্নত হবার জন্যে আজ ছোট-বড় সকল দেশেই উদ্যম চলেছে নানাভাবে। অগ্রসর রাষ্ট্রগুলিও চায় আরও শিল্প-সমৃদ্ধি, আরও শিল্প-সম্প্রসারণ। তাই দেখা যায়—বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অবিরাম গতিতে চলেছে সেই সঙ্গে সর্বত্র। বলতে কি, ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগেও শিল্প-গবেষণার গতিবেগ এতখানি তীব্র ছিল না। রাসায়নিক ও পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞানের অগ্রগতি সে পরিমাণে হয় নি তখন অবধি। আজকের মানুষ সেই তুলনায় এগিয়ে গেছে বহু যোজন পথ—শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহায়তায় চমক সৃষ্টি করছে প্রতি মুহূর্তে।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলতে হয়—বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শিল্পের যেমন প্রসার হচ্ছে অবিরাম, শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে প্রায় তেমনি। প্রধানতঃ দুইটি দিকে নজর রেখে শিল্প-গবেষক বা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে থাকেন। এক—যে অভিনব পণ্য বা শিল্প-সামগ্রী সৃষ্টি হলো, কি ভাবে তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে; দুই—গবেষণা করে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের আর কি জিনিস বের করা যায়। কয়েকটি শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানী প্রথমটির ওপর জোর দিয়ে থাকেন, আবার অপর কতকগুলোর বেলায় জোর থাকে দ্বিতীয় দফা ব্যবস্থার ওপর।

আরও একটি কথা বলতে হবে—শিল্প-সমৃদ্ধি ও শিল্প-গবেষণার জন্য সর্বোপরি থাকা চাই সরকারী তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা। বেসরকারী উদ্যমের সাথে সরকারী উদ্যমের ঐক্য ঘটলে খুব তাড়াতাড়ি সুফল পাবার স্বতঃই সম্ভাবনা থাকে। অপর দিকে শিল্প-সমৃদ্ধি চাইলে শিল্প-গবেষণা চালাতেই হবে, আর যথারীতি গবেষণা চালালে নতুন শিল্পও আবিষ্কৃত না হয়ে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় কিংবা হওয়া বিচিত্র নয় যে, একটি বিশেষ শিল্প-সৃষ্টি করতে গিয়ে, অপর কোন শিল্প (উপজাত) সৃষ্টি হয়ে গেলো, আর সেটিও মূল্যবান। পরমাণু বা আণবিক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ায় গবেষণা মারফত শিল্প-সমৃদ্ধি ও শিল্প-সম্প্রসারণের পথ আজ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়েছে। শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের নিরলস সাধনা ও দুর্জয় অভিযান আরও কতো অভাবনীয় সাফল্য বহন করে আনবে, সে প্রতীক্ষা আদৌ অবান্তর বা বাড়াবাড়ি নয়।

শ্রম-জীবন—কয়েকটি কথা

বাঁচবার জন্য নিয়মিত শ্রম করতে হবে, খেয়ে-পরে দিন কাটাতে কাজ করতেই হবে কোন না কোন—সাধারণ লোকের কাছে এ নতুন কিছু নয়। শুধু প্রশ্ন কে কি ধরণের শ্রম করবে, কার পক্ষে কতক্ষণ সুস্থ ভাবে খেটে যাওয়া সম্ভবপর। শ্রম-জীবন যদি সবদিক থেকে বিরক্তিকর হলো, কাজ করে সামান্য আরাম বা আনন্দের খোরাকও যদি না পাওয়া গেলো, তা হলেই গোলমাল।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি দেশে কর্ম-সংস্থান বেড়ে যায়। আর কর্ম-সংস্থান বাড়তি হওয়ায় অর্থ শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি। শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা-ব্যবস্থা স্বভাবতঃই তখন আলোচনা-গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে। এই থেকেই ক্রমে অবশ্য নানা শিল্প-আইন বা শ্রমিক কানুন তৈরী হয়।
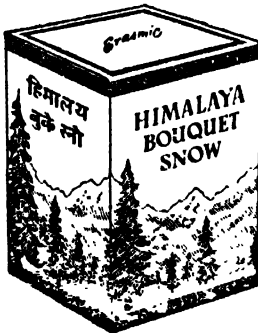
একটু পেছনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে—শিল্পগত মনস্তত্ত্ব বলতে যা বুঝায়, তার সূচনা হয় চলিত শতকের গোড়ার দিকে। সূচনায় দুইটি ভ্রান্ত ধারণা মূল বিষয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, প্রথম ধারণাটি ছিল—মানুষের দেহ হচ্ছে নিছক একটি যন্ত্র, একে খুশিমতো কাজে লাগালেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ধারণা—শ্রমিককে যেখানে কাজ করতে হবে, সেই যায়গাটি যদি উপযুক্ত আলো ও তাপ সমন্বিত হয় এবং কাছাকাছি কোন হৈ-চৈ না থাকে, তা হলেই সব ঠিক-ঠাক।

শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে যেটি বড় কথা, পর্য্যালোচকদের কাছে সেইটি ধরা পড়ে নি প্রথমটায়। কাজ করে শ্রমিক আসলে কি চায় অর্থাৎ তার মনের মূল চাহিদাটি কি, এই দিকে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি পড়ে বহুদিন বাদে। শ্রমিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য চায়, বাঁচবার অধিকার চায় সে-ও মানুষের মতো, এটি সর্বোপরি সত্য। এ সত্য আজও যেখানে স্বীকৃতি পায় নি, শ্রমিককে যেখানে মাত্র যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাওয়া হচ্ছে, সেখানেই দেখা যাবে অসন্তোষ ও অশান্তি।

শিল্প-শ্রমিক সম্পর্কে গোড়াকার দিনগুলোতে যে যে ধারণা পোষণ করা হতো, সে যে ভুল, তা প্রমাণিত হয়েছে বাস্তব পরীক্ষাতেই। একটি দৃষ্টান্ত—বছর ত্রিশেক আগে চিকাগোর একটি বিদ্যুৎ কারখানায় কতকগুলো সমস্যার উদ্ভব হয়। সেখানে শ্রমিকদের ভেতর অসন্তোষ বেড়ে চলে এবং কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। অথচ কারখানায় আলো-বাতাসের অভাব ছিল না, বাইরে থেকে দেখতে কাজের উপযোগী পরিবেশ সেখানে ছিল।

গলদ কোথায় বোঝবার জন্যে ডেকে আনা হলো অষ্ট্রেলীয় অধ্যাপক এল্টন মেয়োকে। তিনি সে সময় অন্যত্র শিল্প-গবেষণার কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। চিকাগোর কারখানাটিতে এসে পরীক্ষা চালালেন তিনি নানা ভাবে। প্রথমেই চিরাচরিত ব্যবস্থা মতে আলোর বহর বাড়িয়ে দেওয়া হলো, যে কোন কারণেই হোক—উৎপাদনও বাড়লো তখন কিছুটা। স্বতঃই ধরে নেওয়া হলো এর পর আলোকসজ্জাই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। অধ্যাপক মেয়ো আবার উল্টো দিক থেকে অবস্থাটি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এবারে কমিয়ে দেওয়া হলো কারখানার সব কয়টি আলো। চাঁদের আলোর পরিমিত আলোতে এসে যখন দাঁড়ালো, বিস্ময় যে, তখনও বজায় থাকলো উৎপাদনের। ঊর্দ্ধগতি। বরং উৎপাদনের মাত্রা এমনটি কখনও সে কারখানায় দেখাই যায়নি।

তা হলে ব্যাপারটি আসলে কি ? অধ্যাপক এল্টন যখন পরীক্ষাটি চালাতে থাকেন, তখন কিন্তু শ্রমজীবীদের কাজের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের কিছুটা চেষ্টা চলে। শ্রমিকরা এইটি বুঝতে পারা মাত্র সোৎসাহে কাজে যোগ দেয় এবং এরই পরিণতিতে উৎপাদন ক্ষমতা এগিয়ে যায় অনেক দূর। গবেষণা করে অগ্রগতির এই মূল সূত্রটি ধরতে পারেন অধ্যাপক এল্টনও। তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়লো—কাজ করতে যেয়ে কর্ম্মীর মনে কিসে স্ফূর্তি আসে, সেইটি বড় কথা।

শ্রমজীবী ও শ্রম-জীবন সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করতে যেয়ে আরও একটি কথা বলা চলে—সাধারণ মানুষ মোটেই শ্রমকাতর নয়। কাজে ফাঁকি দিয়ে পয়সা লুঠবার মৎলব গড়পড়তা শ্রমিকদের মাঝে নেই। পরন্তু বলা চলে শ্রমজীবী মাত্রই সাধারণতঃ সন্তোষজনক অবস্থায় থেকে কাজ করতে চায়। বস্তুতঃ যে-কাজটি যে করছে, ষোল আনা মন ও তৃপ্তি নিয়ে সেটি করার ব্যবস্থা যদি থাকে, সব দিক থেকে মঙ্গল।

আয়—ব্যয়—সঞ্চয়

দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলবার প্রয়োজন রয়েছে। আয় বুঝে ব্যয় করা আর তারই ফাঁকে কিছু কিছু সঞ্চয়—এই বিধিটি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—সীমাবদ্ধ আয়বিশিষ্ট সংসারী লোকের বেলায় তো বটেই।

বুঝে-শুনে ব্যয় করার বিধি ব্যবস্থার কথা উঠলেই একটি উপবিধি দাঁড়ায়—খরচের বাজেট ঠিক রাখতে হবে আগে থেকেই। সরকারী ক্ষেত্রে যেমন বাজেট করবার রীতি আছে সর্ব্বত্র, তেমনি কোন না কোন ধরণের বাজেট (যতই ক্ষুদ্র হোক) চাই পারিবারিক ক্ষেত্রেও। খরচের একটা মোটামুটি ধারণা চোখের সামনে না থাকলে অনেক সময়ই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হবার আশঙ্কা থাকে। আর সে অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের সুযোগটি সহসা মিলতে পারে না।

এমন অনেক দেখা যায়—যাঁরা আয়ের দিকে না তাকিয়ে বেপরোয়া খরচ করে চলেন, ভবিষ্যতে যা-ই ঘটুক না কেন, তার জন্যে এতটুকু তোয়াক্কা রাখেন না। 'ঋণ করেও ঘি খাওয়ার কথা' এই শ্রেণীর লোকরাই ভাবতে পারেন। নিম্ন আয় বিশিষ্ট সংসারী মানুষের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করতে যাওয়া বিপজ্জনক। বলতে কি, বাস্তব দুনিয়ায় এই ধরণের পদক্ষেপ অত্যন্ত জটিল পদক্ষেপ—এ গার্হস্থ্য অর্থনীতির বিরোধী।

আয়ের অনুপাতে ব্যয় করার যে বিধান, সেইটি অর্থাৎ মিতব্যয়ী হওয়া সকল অবস্থাতেই শ্রেয়ঃ। বিলাস-ব্যসনে অযথা অর্থব্যয় করে পথে দাঁড়ানো কিংবা খেয়ে-পরেই সব টাকা পয়সা অসঙ্কোচে উড়িয়ে দেওয়া—এই যদি হলো, বুঝতে হবে পদে পদে বিপত্তি। আয়ের সীমারেখা ছাড়িয়ে অপরিহার্য্য কারণ ভিন্ন ব্যয় কোন মতেই চলতে পারে না। বর্ত্তমান সমাজ কাঠামোতে প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের সামনে অনিশ্চয়তা রয়েছে বলেই সঞ্চয়ের কথা বড় হয়ে দেখা দেয়।

খরচের মাত্রা যতদূর সম্ভব কমাতে হবে আর সব খরচই হওয়া চাই আয়ের ভেতর, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কিন্তু তাই বলে পর্য্যাপ্ত টাকা-পয়সা থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্য দেখানো কিংবা খাওয়া-পরার অহেতুক কষ্টভোগ সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সোজাসুজি বলতে গেলে—অমিতব্যয়ী হওয়া যেমন ভালো নয় কিছুতেই, অতিসঞ্চয়ী হবার নীতিটিও তেমনি ত্রুটিপূর্ণ ও অযৌক্তিক।

প্রসঙ্গত, আর একটি কথা বলতে হয়—একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় যেখানে আয়ের সীমা নিয়মিতভাবে ছেড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আয় বাড়ানোর সক্রিয় চেষ্টা ছাড়া উপায় নেই। মোটের উপর, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের প্রশ্নটি খুব যত্ন সহকারে ভাবতে হবে সাধারণ বৈষয়িক মানুষকে—তারপর মাঝামাঝি একটা সূত্র স্থির করে তবেই কার্য্যক্ষেত্রে পা বাড়াতে হবে। আয়ের সীমাবদ্ধতা অথচ খরচের নিতান্ত মাত্রাধিক্য, এমনটি যাতে না হয়ে পড়ে, তার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্ক না থাকলেই নয়। সঞ্চয়ের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও (কারণ, গড়পড়তা পরিবারে সেটি হওয়া স্বতঃই কঠিন), আয় ও ব্যয়—এ দু'-এর ভেতর একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই একান্ত সমীচীন, নিশ্চয়ই বলতে পারা যায়।
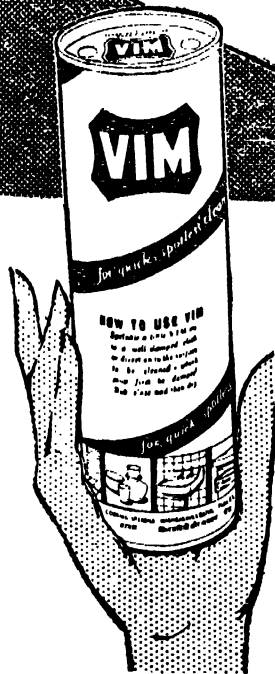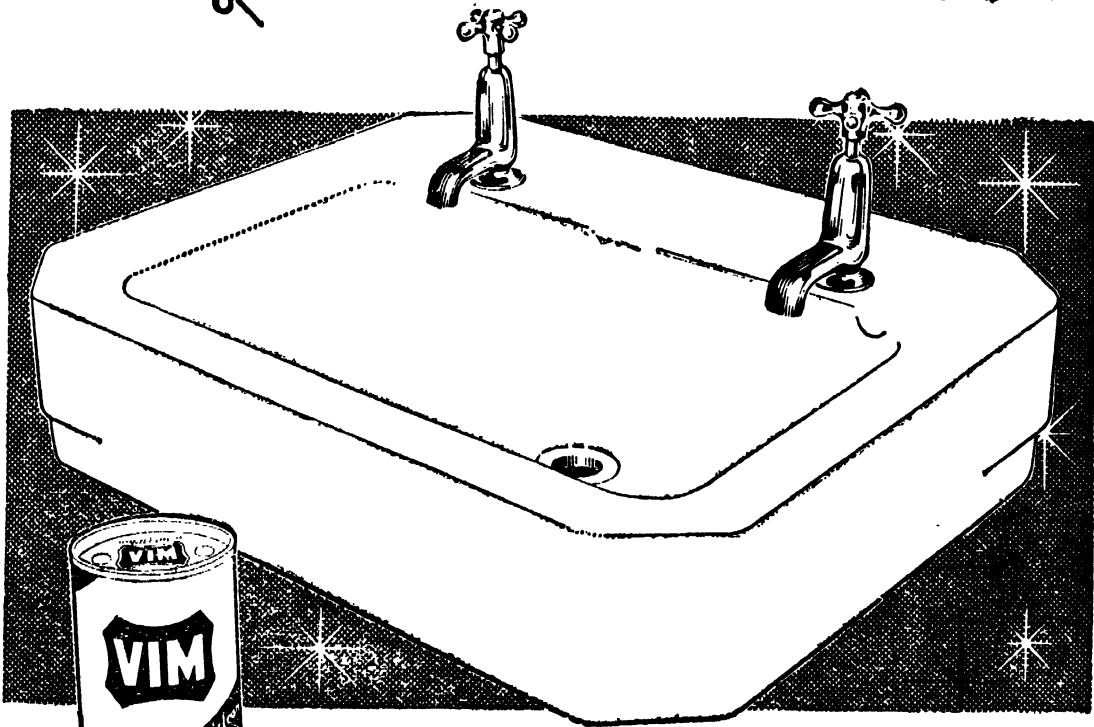
যাত্রাগানের ইতিকথা

"গান শুনতে যাব"—গাঁয়ের লোকে বলে, যাত্রা দেখতে যাবার ইচ্ছা অন্যের কাছে প্রকাশ করে। যাত্রাপালা, যাত্রা-গান বা শুধু যাত্রা—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যাত্রা যে নাটকের দেশীয় লৌকিক রূপ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই যাত্রার উদ্ভব কি ভাবে হোল, বিকাশ কি ভাবে হোল, এর যথার্থ ইতিকথা কী—বিভিন্ন আলোচকের বিভিন্ন মন্তব্যে এক দুর্ভেদ্য বাতাবরণের মাঝে এসব প্রশ্ন আত্মগোপন করেছে। এসব প্রশ্নের একটা সুস্পষ্ট সমাধান লাভের আশায় এই আলোচনার অবতারণা করছি।

অনেকে বলেন, নৃৎ ধাতু হতে নাটক কথাটির উৎপত্তি। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, নৃৎ ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে নৃত্ত ও নৃত্য কথা দু'টি। নৃত্ত শব্দটির অর্থ তাললয়াদি সহযোগে অঙ্গবিক্ষেপ আর নৃত্য শব্দের অর্থ হাবভাবযুক্ত বিবিধ অঙ্গবিন্যাসের সাহায্যে মূক অভিনয়।(১) নৃত্য হতে ভারতীয় নাটকের জন্ম। কীথ বলেছেন—"the origin of the drama in the sacred dance, of course, accompanied by gesture of pantomime character, combined with song and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama."(Sanskrit Drama)। এ মত স্বীকার করলেও, সংস্কৃত নাটক কালক্রমে সুপরিণত রূপ লাভ করেছিল মৃচ্ছকটিক বা মুদ্রারাক্ষস ইত্যাদির মত নাটকে। সংস্কৃত নাটকের বিকাশ ও আবেদন অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দেশের ও দশের হৃদয়ের সঙ্গে এর কোনো সচল যোগাযোগ ছিল না। ম্যাকডোনেল বা মণ্টজিয়াস প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ঐ বৈদিক আদিম গীতিনাট্যের অঙ্কুরিত রূপ জনসমাজে ধারাবাহিক ভাবে এসে যাত্রায় পরিণতি লাভ করেছে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে তারই প্রকাশ। কিন্তু ডাঃ সুশীল দে বা কীথ জয়দেবের নাট্যরূপের মাঝে বৈদিক ঐতিহ্যের কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, ওরাওঁদের 'জেঠযাত্রা' বা দাক্ষিণাত্যের 'মারীযাত্রা' বা সাঁওতাল-ভুইঞাদের 'যাত্রাপরব' প্রভৃতির মাঝে যাত্রা কথাটি একটি উৎসবানুষ্ঠানরূপে প্রচলিত দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া, যাত্রার মূলে আদিম সমাজে গ্রহ-নক্ষত্রাদির কক্ষান্তর গমনোপলক্ষে যে sympathetic magic জাতীয় অনুষ্ঠান হোত তার অনুমানও করেছেন।(২) যে নদী তার দীর্ঘ গতিপথ অতিক্রম করে সমুদ্রে মিশে, তার উৎপত্তি বিশেষ একটি ধারা থেকে নয়, ছোট ছোট বিভিন্ন ধারা মিলে মিশে একটি নদীকে গড়ে তুলে; তেমনি যাত্রার উদ্ভবমূলে একটি বিশেষ ধারাই ক্রিয়াশীল, বিভিন্ন ধারা মিলে-মিশে তাকে সম্ভব করে তুলেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথিত ধারাটি তাই যাত্রার উদ্ভবমূলে ক্রিয়াশীল হতে পারে, কিন্তু এই ধারাটিই যাত্রার একান্ত উদ্ভব-মূল নয়।

অতীতে কোন দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করে নাচ-গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করত। একে যাত্রা বলত। কেউ কেউ বলেন, সৌরোৎসব সবচেয়ে আদি-উৎসব। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যও এ কথা বলেছেন। মন্মথমোহন বসু বলেছেন, 'সূর্য্যের যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে।' (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ) সূর্য্যদেবতা পরে শিবঠাকুরের সঙ্গে মিলে যান। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা প্রভৃতি নানা পুরাণে নৃত্য-গীতাদিসহ শিবশক্তির উৎসবের কথা বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক অমিতকুমার ঘোষ গ্রীক-দেবতা ডায়োনিসাসের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, যে ডায়োনিসাসের উৎসব থেকে গ্রীক ট্র্যাজেডি ও কমেডির উৎপত্তি। এবং অনেকের সঙ্গে তিনিও দেখিয়েছেন, শিবোৎসবমূলক নৃত্য-গীত ও হাস্যকৌতুকপূর্ণ বর্তমান গম্ভীরা বা গাজন উৎসবের মধ্যে যাত্রার আদি উপাদান দেখা যায়। কিন্তু তিনি পরিশেষে বলেছেন, পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব। তিনি বলছেন, প্রথমে পাঁচালীর একজন মাত্র মূল গায়ক গান করত। কালক্রমে পাঁচালীর পয়ার ও পালাগানের দীর্ঘতার ফলে একজনের স্থলে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আমদানী হতে লাগল। এই ভাবে পাঁচালীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং কালক্রমে পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল। এই মতটি মনোহারী, কিন্তু সত্যধারী নয়। সচল শিবোৎসবের নাচগান আমোদ কৌতুকের ধারা আর একটি আসরে স্থির পাঁচালী গানের ধারাকে তিনি মিলাতে পারেন নি।(৩)

ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন,(৪) যাত্রা কথাটি চলে এসেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে, এর অর্থ ছিল—'পিছন পিছন যাওয়া, দল বেঁধে বা মিছিল করে যাওয়া।' যাত্রা ছিল দু'রকম—আমোদ-প্রমোদের জন্য 'বিহার যাত্রা' যার থেকে বর্তমান জেলা অর্থে 'জাত' কথাটি এসেছে; আর ধর্মকর্মের জন্য ধর্মযাত্রা, নাটগীতবোধক তৎসম শব্দটিতে এই ধর্মযাত্রার ইঙ্গিত। নাচগান করে ধর্মযাত্রা বা বিহারযাত্রার উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। হরিবংশে

১। বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ।

২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৪। বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড।

এমনি এক উল্লেখ পাই। সেখানে সমুদ্রযাত্রা করে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মঙ্গলগানের উল্লেখ আছে, তাতে নাট্যগীতের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। তাই তিনি মনে করেন, একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে মঙ্গলগান বা পাঁচালীর ধারাও নাটগীতের ধারা চলে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন, নেপালের কোন কোন ভাষা নাটকে নাটপালা পাঁচালীর যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর এইমাত্র পার্থক্য ছিল যে, পাঁচালীতে মূল গায়ন বা পাত্র একটি মাত্র, যাত্রায় একাধিক—সাধারণত তিনটি। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড—২য় সং; ৫৫৭ পৃ:) ডা: সেনের মতটি নিশ্ছিদ্র বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মতের প্রমাণ হিসেবে (শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত) নেপালে ভাষানাটকগুলি অবলম্বিত হয়েছে। মনে প্রশ্ন না জেগে পারে না, কেন ঐ ভাষা-নাটকগুলি বাংলার ভূমিতে স্থান পেল না নেপালে গিয়ে আশ্রয় নিল? নাটক এমন একটা সাহিত্যিক রূপ যেখানে সমগ্র জাতিহৃদয় মথিত ভাব আন্দোলন রূপ পায়, তা জাতির হৃদয়ের সামগ্রী, জাতির প্রাণের কাছেই তার ঠাঁই। তাহলে ওগুলি জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত নয় কি? মনে হয় ওগুলি নিতান্ত শৈল্পিক প্রচেষ্টা। আর আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে লোকসমাজে যাত্রার যে ধারা পাচ্ছি তার পূর্বসূত্র হিসেবে এই জনান্তিকে থাকা নাটগীতগুলি ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারায় আলোকপাত করতে ততটা পারছে কই?

যাত্রার পূর্বেতিহাস অনুসরণে এত গোলযোগ দেখে ডা: সুশীল দে বলেছেন, **the old yatra seem to be of indigenous growth, peculiar to itself.** তাই বাংলাদেশে যাত্রা বা যাত্রার অনুরূপ কি কি প্রকরণ পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাক।

চর্য্যাপদেই বাংলার নাট্যরচনার রূপ ও স্বরূপের আভাস পাচ্ছি—

নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেঈ।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥

বুদ্ধনাটক অভিনীত হচ্ছে। কেমন ভাবে? বজ্রগুরু নাচছেন ও দেবী গাইছেন—এর উল্টোভাবে, অর্থাৎ বজ্রগুরু গা'ন ও দেবী নাচেন—এভাবে সেই প্রাচীন নাটকের অভিনয় চলে। এর পর গীতগোবিন্দ পাচ্ছি। জয়দেব গাইতেন, পদ্মাবতী নাচতেন, পরাশরাদি প্রিয় বন্ধু দোহারের মত তাঁকে সাহায্য করতেন। গীতগোবিন্দে নাটের চেয়ে গীতের প্রাধান্য। এর পর পাওয়া যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যাত্রাপালার রূপটি যেন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে দেখা দিয়েছে।

চৈতন্য আমলে নাট গীতাভিনয়ের উল্লেখ পাচ্ছি—স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও তাঁর পরিষদবর্গ কর্তৃক। চৈতন্য বলেছেন, "আজি নৃত্য করিবাঙ্ অঙ্কের বন্ধানে।" তিনি অভিনয়ের যে চূড়ান্ত সার্থকতা—অভিনয়ের বিষয়ীভূত পাত্রপাত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ—তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। (৫) এমন কি তাঁর অভিনয়ে সাজপোষাকের উল্লেখও আছে। "চৈতন্যভাগবতে" "কৃষ্ণযাত্রা" কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬)

৫। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, ভূমিকা—শ্রীকুমার বন্দ্যো:।
৬। "কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোন জন॥"

কিন্তু বাংলার অভিনয় গ্রন্থের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না একালে। কেবল কয়েকটি সংস্কৃত অভিনয় গ্রন্থ পাচ্ছি—শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব', রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ', কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ইত্যাদি। চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালী জাতির মধ্যে যে একটা ভাব-আলোড়ন জেগেছিল তারই ফল এগুলি। এর পর প্রায় দু'শ বছর বাংলা সাহিত্যে যাত্রার কোন নিদর্শন পাচ্ছি না। এই মধ্যবর্ত্তীকালের গুপ্ত ও সুপ্ত প্রচেষ্টা হিসেবে ভাষা-নাটকগুলিকে ধরা যেতে পারে।

এর পর আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে যাত্রাগানের উল্লেখ পাচ্ছি। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'কালীয়দমন' পালার তখন বিশেষ প্রচলন। তার সবচেয়ে পুরনো কবির নাম শিশুরাম অধিকারী। শিশুরামের নিবাস ছিল কেঁদুলিগ্রামে। তাঁর শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীও নাম করেছিলেন। পরমানন্দের পর শ্রীদাম-সুদামের যাত্রা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। লোচন অধিকারীর 'অক্রুর-সংবাদ' ও 'নিমাইসন্ন্যাস'ও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এরপর কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোবিন্দ অধিকারী ও তাঁর শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়; তারপর ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় ইত্যাদি যাত্রাওয়ালার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের যাত্রাগুলি বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম স্তরে পড়ে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রাপালাগুলি। এর ভিতর গদ্য আছে কয়েক ছত্র মাত্র, এটি মুখ্যত কীর্তন পালারই নাট্যরূপ। দ্বিতীয় স্তরে পড়ে গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পালাগুলি; এদের মধ্যে গান ও কথা প্রায় সমান সমান

অংশ গ্রহণ করেছে। তৃতীয় স্তরে ব্রজমোহন, মতিলাল রায় হতে আরম্ভ করে আধুনিক সখের যাত্রাওয়ালাদের রচনায় (প্রায় ষাট বৎসর হইতে চলিল, এই সখের যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয়। বঙ্গদর্শন ফাল্গুন, ১২৮১) উচ্ছাসপূর্ণ দীর্ঘ গদ্য সংলাপের প্রাধান্য আর প্রত্যেক সংলাপের সঙ্গে একটি করে গান আছে। আবার এই স্তরের রচনায় অহেতুক ভাঁড়ামি বা তরল হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। কৃষ্ণকমল বা গোবিন্দ অধিকারীর ভক্তিরসও নেই এখানে। এর থেকে বৈদ্যনাথ শীল মনে করেন, (৭) গীতগোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধারায় সঙ্গীতাত্মক নাটগীতের এক ধারা এসে আঠার শতকের শেষ থেকে পরিণতিলাভ করেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যও বলেছেন, "বাংলার লোকনাট্যের এই দুই প্রান্তবর্তী দুইটি নিদর্শনের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।" আর সেসব নাটপালার বিষয়বস্তু ছিল 'বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কিত এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক'। বৈদ্যনাথ শীল দেখিয়েছেন, কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও ভাবের পারম্পর্য্য রক্ষা করে পদের পর পদ সাজিয়ে নিবদ্ধ কীর্তনের যে সব পালা ষোল শতকের শেষ দিকে রচিত হতে লাগল, পরে কবিগণ এই সংগ্রহগ্রন্থের আদর্শে নিজেরা স্বতন্ত্র পালা রচনা করতে লাগলেন। দীন চণ্ডীদাসের যে পালাগ্রন্থ মণীন্দ্রমোহন বসু আবিষ্কার করেছিলেন, তা তোল এই ধরণের নিদর্শন। পরে পালাকীর্তনে নানা দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কথকতা অনুপ্রবেশ করতে লাগল। কীর্তন ও যাত্রার মধ্যবর্তী স্তরে ঢপকীর্তন। ঢপের মধ্যে যাত্রার প্রায় সমস্ত লক্ষণই দেখা যায়। একক অভিনয় না রেখে তাকে ভেঙে বহু পাত্রপাত্রীর দ্বারা অভিনয় করালেই যাত্রা হয়। ঢপে সংলাপের আধিক্য দেখা যায়। মোট কথা, সংলাপ ও সঙ্গীতের সমবায়ে যে যাত্রার উৎপত্তি, ঢপকীর্তন তারই অন্যতম রূপ (পূর্ববর্তী রূপ)। আর এই ঢপকীর্তন যে নতুন পাঁচালীর উদ্ভব, সে কথা ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন। (৮) তাই পাঁচালীর সঙ্গে যাত্রার সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। আমার মনে হয়, সতের শতকে রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড পালা রচনার আধিক্য বা রায়বার পালা রচনা যে মনোভঙ্গীপ্রসূত সেই একই মনোভঙ্গী থেকে যাত্রাপালা রচনার সূত্রপাত। কীর্তনগানকে নতুন ভোলে উপভোগ করবার প্রয়াস থেকেই যাত্রাপালার প্রবর্তন। আঠার শতকের শেষদিক থেকেই বিদ্যাসুন্দর পালা রচনার উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে বরাহনগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বেলতলার প্যারীমোহন, শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু, গোপাল উড়ে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙালী সংস্কৃতিতে ও বাংলাসাহিত্যে যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করা গেল। এবং তাতে দেখা গেল, নাটগীতের এক বিশেষ ধারা গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাঝ দিয়ে বৈষ্ণব আবেগাত্মক ভাবাকুলতা ও সঙ্গীতকে পালাসংকীর্তনের রূপে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বাংলা যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল। তার মূলে বৈদিক নাটগীতের ধারা প্রবাহিত হয়নি। আর ডাঃ সেন কথিত প্রাচীন নাটগীতের ধারা থাকতে পারে। কিন্তু তা-ই যাত্রাপালার সরল প্রবাহকে প্রবর্তিত করে নি। প্রাচীন সৌরযাত্রার উত্তরসূরী শিবোৎসবের সঙসাজা ও নাচগানের ধারাও কিছু পরিমাণে থাকতে পারে, এসব প্রাক্তন সংস্কাররূপে মিলেমিশে যাত্রারূপকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে ; কিন্তু যাত্রা বাংলাসাহিত্যে **indigenous growth, peculiar to itself**—এর মূলে মানুষের আদিম নাট্যাকৃতি সক্রিয়, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রাক্ আর্য্যযুগের লক্ষণ-সমন্বিত ব্রতকথার মাঝে তার স্ফুরণ দেখিয়েছেন। অনেকে মঙ্গলকাব্যের মাঝে বা অন্য কোথাও নাট্যরসের ক্ষণিক স্ফুরণ দেখিয়ে বলেন, যাত্রার ধারা এদের মাঝ দিয়েও এসেছে। আসলে কিন্তু তা' এই নাট্যাকৃতির স্বাভাবিক স্ফুরণ। এদের মাঝ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, যাত্রার পূর্বসূরী বা পটভূমি হিসেবে তা বিবেচ্য নয়, কেননা **dramatic element** কেবল **play-drama-opera**রই একান্ত উপকরণ নয়। বাংলার অধিবাসীরা ছিল রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা থেকে দূরীভূত, তাই মৃত্তিকাচারী স্বল্প সরঞ্জামে সংগঠিত, বাহুল্য ব্যতীত, নৃত্যের দ্রুততাব, সঙ্গীতের বারবীয় ধর্মে তার গ্রাম্য নাট্যপ্রয়াস বিলসিত হয়েছে, আর ধর্মমোহে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকায় বাস্তব সংঘাতে দ্বন্দ্বমুখর হয়ে উঠেনি। এজন্যেই যাত্রার আড়ষ্ট ও বিলম্বিত বিকাশ ও প্রকাশ। —দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

৭। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা।

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—২য় সং—৯৫৮ পাতা]।

আমার কথা (৫৫)

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

শিল্পিজীবনের চরম উৎকর্ষতায় উঠিয়া আজও যিনি নিজেকে শিক্ষার্থীনা মনে করেন—অন্যতমা শ্রেষ্ঠ-গায়িকা হওয়া সত্ত্বেও অহংকারকে যিনি দূরে রাখেন—বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন গানকে নিজ অস্থিমজ্জার সাথে যিনি মিশাইয়াছেন—সেই শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ব্যক্ত করলেন :

আমি যখন পাঁচ বৎসরের শিশু, তখন থেকে পাড়ার যাত্রা ও কীর্তনের আসরে বসে যে গানগুলি শুনতাম—তা যতটুকু মনে পড়ত ততটুকু বাড়ীতে গাইতাম। আমাদের জিয়াগঞ্জের লোক ছিলেন জেলা-খ্যাত কীর্তনীয়া হরিমাখন দাস। তাঁর গান প্রায়ই শুনতাম চুপটি করে বসে। তাঁরই জিজ্ঞাসায় একদিন তাঁরই গাওয়া দু'-চার লাইন কীর্তন গাই। তারপরে তিনিই হলেন আমার প্রথম সঙ্গীতগুরু। সাত বৎসর বয়স থেকেই তিনি আমায় নানা আসরে নিয়ে যেতেন এবং তাঁরই কোলে বসে গান গাইতাম। এই রকম এক আসরে ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক বাঙ্গালাভাষী ও প্রা[illegible] বৈষ্ণব ইংরাজ এডি (Eddie) সাহেব। তিনিও হরিনাম কীর্তনে যোগ দিতেন। আমার গান শুনে নিজে থেকে একটা প্রশংসাপত্র দিলেন—আজও তা রেখেছি যত্ন করে। পল্লী অঞ্চলে অনেক বৈষ্ণব কীর্তনীয়া, অনেক সত্যকারের বাউল আসতেন। গৃহস্থ হতেন তৃপ্ত তাঁদের গান শুনে—আর তাঁরাও মন-প্রাণ উজাড় করে কীর্তন গাইতেন। সামান্য 'সিদে' নিয়ে অনেক জিনিষ শিখেছি এই স[illegible] নামহীন ভ্রাম্যমান কীর্তনীয়া আর বাউলদের কাছ থেকে। তাঁরা আমার গুরু—আমার প্রণম্য। তাঁদের গাওয়া দেহতত্ত্বের গান কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার মনে, হয় গান শেখার স[illegible]

কান তৈয়ারী করতে হবে। অর্থাৎ কানের ভিতর যে কান আছে তাকে সজাগ রাখতে হবে। নচেৎ জীবনে সুর আসে না—গলায় সুর আসে না—গলায় সুর ঠিক বাজে না। সাধারণ লেখাপড়ার গর্ব্ব করতে পারি না—ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মনঃসংযোগ বার বার ভেঙ্গে চলছে—কিন্তু যেটুকু শিখেছি তার অনেকখানি আছে এই কান পেতে রাখার অভ্যাস।

কলিকাতায় এসে পেশাদারী কীর্ত্তন গায়কদের সঙ্গে পরিচয় হয়। জাত-বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের গান গাওয়ায় ভুল থাকত। তজ্জন্য উহা রসিকমহল থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে শ্রাদ্ধবাড়ীতে "পেলা" খুঁজে বেড়াত। তবুও তাঁরা দুঃখের দিনে, অনাদরের দিনে কীর্ত্তনগানের ধারাকে শুকিয়ে যেতে দেন নি। তাঁদের অনেকের প্রীতি পেয়ে ধন্য হয়েছি। বড় হয়ে বুঝলাম যে কীর্ত্তন গানের অনেক কিছুই শেখা হয়নি। তাই আকুল আগ্রহে খুঁজেছি সেই শিক্ষককে—যিনি নতুন করে আমায় পাঠ পড়াবেন। সৌভাগ্যবশতঃ কীর্ত্তনশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীহরিদাস করের সঙ্গে পরিচয় হল—কিন্তু শারীরিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটে। তার পর শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্যা হই।

কলিকাতায় জীবিকার্জ্জনের জন্য আসবার আগে মঞ্জু সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। এত বড় সঙ্গীতশিল্পীর মধুর কণ্ঠে ঠুংরীর সূক্ষ্ম কাজ ও স্বাচ্ছন্দ্য আলংকারিতা প্রতিটি শ্রোতাকে সম্মোহিত করত। কাজী নজরুল ইসলাম ও আরও অনেকে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। এত বড় সঙ্গীতশিল্পীর শেষ পরিণতি হয়েছিল—দু মুঠো অন্নের অভাবে কণ্ঠ হয়ে যায় ক্ষীণ আর মাণিকতলার এক জঘন্য বস্তীর এক ভাঙ্গা ঘরে পথ্যহীন, ঔষধহীন সম্বলহীন হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রচণ্ড জ্বর গায়ে এক রিক্সায় চেপে আমার বাড়ী এলেন। সর্ব্বাঙ্গ তাঁর কাঁপছে—চোখ দিয়ে জল ঝরছে—জড়ানো গলায় আমায় তানপুরা নিতে বললেন। এই অবস্থায় ওস্তাদজী গান ধরলেন। মুগ্ধ হলুম অপূর্ব্ব প্রতিভায়। তাঁর ধারণা হয়েছিল তিনি ঠিকমত শেখাতে পারেন না। তাই লোকে তাঁকে ত্যাগ করেছে। হিন্দী ও উর্দ্দু গান শেখাবার আগে আমায় তিনি প্রথম শেখান ঠিকমত উচ্চারণভঙ্গী ও ভাষা। অনেক বাঙ্গালী শিল্পী ভুল উচ্চারণের জন্য অনেক আসরে হাস্যাস্পদ হন। মঞ্জু সাহেবের শিক্ষার গুণে আমি দিল্লী, লখনৌ, নাগপুর, পাটনা প্রভৃতি বেতার কেন্দ্র থেকে বাৎসরিক আমন্ত্রণ পেয়েছি। শ্রীসুরেশ চৌধুরীও আমাকে হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারে বহু সাহায্য করেন। এই ভাষা দুটি ঠিকমত আয়ত্ত না করলে, নতুন আন্তঃপ্রাদেশিক সংস্কৃতি-গোষ্ঠীতে বাঙ্গালী শিল্পী অনাদৃত হতে পারে।

কলিকাতায় এসে তদানীন্তন বেতার কেন্দ্রে শিল্পী হিসাবে যোগ দিই এবং আজও আমি উহার শিল্পী। এখনকার প্রধান প্রোগ্রাম পরিচালক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের অপূর্ব্ব স্নেহময় ব্যক্তিত্ব আমার শিল্পিজীবনকে গড়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করেছিল। রাইচাঁদ বড়াল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক, ৺রাজেন্দ্র সেনের সহিত শিল্প সহযোগিতার কথা বার বার মনে পড়ে। এই সময় বেতারের সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক ছিলেন শ্রীসুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি আমায় উচ্চ সঙ্গীতের তালিম দেন। এছাড়া বাণীকুমারের বেতার বিচিত্রায় আমার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবর্ত্তিত মহালয়ার উষা অনুষ্ঠানে আমি প্রায় বারো বৎসর যোগদান করি। আদর্শ ব্রাহ্মণের মতন তাঁহার শুচিতা আমাদের উদ্দীপিত করত। ইহাকে সার্থক করে তুলেছিলেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।

সেই সময় কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদান করিয়া প্রথম গান করি উর্দ্দু গজল 'না কিসিকি আঁখ কা নূর হুঁ'। এর পর বহুরকম গানের রেকর্ড করিয়েছি সেখান থেকে। গৃহ প্রবেশের বিখ্যাত গান দুটি 'অগ্নিশিখা এসো এসো', ও 'ঐ মরণের সাগর পারে' শ্রীঅনাদি দস্তিদারের সুরে আমি গাই। তাছাড়া, নেপালী মাড়োয়ারী ও নাগপুরী ভাষায় রেকর্ড করাই এখান থেকে। মধু বোসের হিন্দী আলিবাবার রেকর্ডাভিনয়ে আমি 'মর্জিনার' ও বড়ুয়া সাহেবের 'জবাব' (হিন্দী) রেকর্ডাভিনয়ে নায়িকার অংশে অভিনয় করি। দুঃখের বিষয়, গত কয়েক বৎসর আমার কোন রেকর্ড সেখান থেকে হয়নি।

সিনেমায় যোগদানের পর কৃষ্ণ-সুদামা, কণ্ঠহার, মানময়ী গার্লস স্কুল, রাঙাবৌ, রামানুজ ও চাণক্যতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছি। চাণক্যর প্রয়োগকর্ত্তা ছিলেন নাট্যাচার্য্য সদ্য-লোকান্তরিত শিশিরকুমার। ইহার আউটডোর স্যুটিং-এর সময় শ্রীমতী কঙ্কাবতী প্রচণ্ড জ্বরে সংজ্ঞাহীনা হয়ে পড়েন। সে সময় একমাত্র আমিই তাঁর কাছে ছিলাম। শত চেষ্টাতেও তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে নাই। প্রযোজক হিসাবে বড়ুয়া সাহেব, নীতিন বসু, দেবকী বসু ও মধু বসুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। এন, টির ছবির কিছু কিছু গান আমি রেকর্ড করি। পঙ্কজকুমার ও আমার দ্বৈত-সঙ্গীত 'কোন লগনে জনম আমার' খুবই জনপ্রিয় হয়। এখনকার মতন সেদিনের

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

নেপথ্য-গায়কদের টাইটেলে নাম থাকত না বা এত সম্মান ছিল না। সিনেমায় নাম করতে হলে প্রযোজকের শুভদৃষ্টি পাওয়া চাই শিল্পীর—ইহাই আমার ধারণা।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যখন যোগ দিই, তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভগ্নপ্রায় অবস্থা। অভিনয় শেখার জন্য স্বর্গত শিশিরকুমারের মতন আচার্য্য পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। দু'-একদিন মহলা দিয়ে তাঁর সঙ্গে পিয়ারা, ছায়া, সিতারা, দেবকী প্রভৃতি ভূমিকায় আমায় অবতরণ করতে হয়েছে। কালিকায় মীরাবাঈ নাটকে নামভূমিকায় ও নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে সাবিত্র ভূমিকায় আমি তৃপ্ত হয়েছি। শেষোক্ত স্থানে শ্রীপ্রবোধ গুহ ও শ্রীমতী নীহারবালার সঙ্গে আমার খুব পরিচয় হয়। নীহারবালা ফিলম্ থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিচারীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে স্থান পান ও সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে ছিল একটি শিল্পিপ্রাণ। সারা বার্ণার্ডের বা ইসাডোরা ডানকানের জীবনী হয় কিন্তু খ্যাতনামা লেখক ও সাংবাদিকদের সহিত শ্রীমতী নীহারবালার এত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাঁহার শিল্পিজীবনী কেহই এ পর্য্যন্ত লেখেন নি!

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল আমার—কিন্তু শেখার সুযোগ পাই নি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৈতালিক' দলে আমায় নেন ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুশীলন আরম্ভ করান। ভয় ভেঙ্গে গেলে মহানন্দে অন্তরে অনুভব করতে লাগলাম শিল্পিজীবনের চরম সার্থকতা—রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে। এর জন্যে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আমি বিশেষ ঋণী।

কিছুকাল আগে কীর্ত্তন গানের একটি ছোট বিদ্যালয় খুলি—আর তার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন সত্যিকারের সঙ্গীতরসিক ভূপতিদা' অর্থাৎ রাজ্য সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার। আমার পরিচালনা শক্তির অভাবে সে বিদ্যালয় চলেনি—কিন্তু ভূপতিদা'র সঙ্গীতপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়েছি।

অজয় নদীর চর

শ্রীআইভি রাহা

ছোট একটি গ্রাম ঐ দেখা যায়
অজয় নদীর চর,
যেথায় মোরা বেঁধেছিনু মোদের
সাধের কুঁড়েঘর।
নদীর বুকেতে বয়ে যেত তরী
উড়ায়ে তাদের পাল,
কালের হাওয়ায় হায় সেথায়
নেমে এল মহাকাল।
কত কুঁড়েঘর সমাধি হয়েছে
চাল উড়ে গেছে ঝড়ে,
তাদের দেখিয়া নয়নের জলে
কত কথা মনে পড়ে।
কিছু দূর গেলে চোখে এসে পড়ে
রায়েদের ভাঙ্গা বাড়ী,
যেতে হয় সেথা মোদের বাড়ীও
বট গাছ পথে ছাড়ি।
পুকুরের পাড়ে চোখে পড়ে কত
অতীতের ভাঙ্গা ঘাট,
সকালে বিকালে বসে যেত যেথা
"বউঠাকুরাণীর হাট"।
হোসেনেরে যেথা সমাধি দিয়েছে
অজয় বাঁকের তীরে,
আজিও সেথায় পথিক চলিতে
চেয়ে দেখে ফিরে ফিরে।
শরতের দিনে আগমনী গানে
উঠিত গো আবাহন,
সজীব সবুজ হাসিতে ভরিত
পথ-প্রান্তর-বন।
সোনার বরণ ধানের ক্ষেতেতে
যাইত মলয় বহিয়া,
শীষগুলি সব ঢলিয়া পড়িত
কতই না কথা কহিয়া।
গ্রামবাসী মোরা সরল প্রকৃতি
মুখেতে মধুর হাসি,
সুখে দুখে মোরা দাঁড়াতাম সদা
সবার পাশেতে আসি।
ভেদাভেদ নাহি জানিতাম মোরা
হিন্দু-মুসলমান,
আকাশে বাতাসে ভরিয়া উঠিত
রাম-রহিমের গান।
অভাব কাহারো ছিল নাক' হেথা
কেহ পাতেনিক' কর;
নদীর মাঝেতে জেগে আছে আজো
অজয় নদীর চর।

বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

বাঙলা সাহিত্যের দীর্ঘকালব্যাপী গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আলোচনা এ পর্যন্ত বহু সুধীই করেছেন, ঐ আলোচনা-গ্রন্থগুলি বলা বাহুল্য, দেশের ও দশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন—তবে এক ভিন্নতর আঙ্গিক অবলম্বন করে, সাহিত্যের ইতিহাসই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য ; তবে আলোচনার ভঙ্গী একটু পৃথক ধরণের। আর এর ফলে গ্রন্থটি যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত হয়েছে। ঠিক কতকগুলি তথ্যপঞ্জীর সংকলন বা সাহিত্যবিশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর পর্যায়ে এই গ্রন্থটিকে ফেলা যায় না, এর আলোচনার ভিত্তি আরও গভীর। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পরিবেশে সাহিত্যের যে নিত্য নবরূপায়ণ ঘটেছে তার মূল পটভূমিকার প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন, যে মূল ধারাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শতাব্দী যাবৎ বাঙলা সাহিত্যের উপর দিয়ে যে বৈচিত্র্যের বন্যাধারা বয়ে চলেছে তার উৎস-সন্ধানে লেখক ব্যাপৃত। নব নব চেতনা ও নব নব চিন্তাধারার সংমিশ্রণে সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে তালে তাল রেখে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে যে সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, পুষ্টি হয়েছে, বিকাশ ঘটেছে, সে সম্বন্ধে লেখকের মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থটিকে যথোচিত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবান ও অভিনব করে তুলেছে। গ্রন্থটির গঠনকার্যে লেখকের প্রচুর পরিশ্রম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হয়েছে। আমরা আশা রাখি যে দেশবাসী এর যথাযথ মূল্যদানে কার্পণ্য প্রকাশ করবেন না। এই গ্রন্থ পাঠক-সমাজে ও ছাত্রসমাজে সমান সম্মানলাভ করবে বলে আশা করা যেতে পারে, এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থের শেষাংশে বাঙলা সাহিত্যের একটি কালানুক্রমিক এবং সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি স্মরণীয় তারিখের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা যুক্ত করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কন অপূর্ব হয়েছে, শিল্পীকে অভিনন্দন জানাই। (যদিও সম্মুখ প্রচ্ছদে গ্রন্থের লেখকের নাম লিখিত নেই এবং প্রচ্ছদশিল্পীর নামও গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না) প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ

আজকের দিনে ধ্বংসের অভিমুখে সারা জগতের ক্রমাগ্রসরণ শান্তিকামী মানুষকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলছে। ধরণীর দিগ্বিদিকে আজ যে ব্যাপক ভাবে বিনষ্টির মহোৎসব চলছে তার মধ্যে সৃষ্টির পূজারী মানুষদের পক্ষে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা এক বিরাট প্রশ্নের তথা সমস্যার রূপ নিয়েছে। বর্তমান কালে আন্তর্জাতিক সুধী সমাজে বার্ট্রাণ্ড রাসেল একটি বিরাট শ্রদ্ধার আসনের অধিকারী, মনীষার দরবারে এঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান অনন্যসাধারণ বিশ্ববন্দিত। এই বর্ষীয়ান চিন্তানায়ক ও দার্শনিকের অভিমতের মূল্যও অপরিসীম। জগতের এই ধ্বংসমুখীনতা সুধীবরের মানবপ্রেমিক মনকে ব্যথিত করে তুলেছে, ব্যাকুল করে তুলেছে, বিহ্বল করে তুলেছে। চতুর্দিকে হিংসা হানাহানির ষড়যন্ত্র, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা ও ক্ষমতা-লোলুপতার ভয়াবহ মিছিল তাঁর মনকে পীড়িত করে, তাঁর মতে এ পথ বাঁচার পথ নয়, প্রকৃত পথ নয়, কল্যাণের পথ নয়, এ পথ পরিহার করে শান্তির, মৈত্রীর, প্রীতির পথে পদার্পণ করলে কল্যাণের স্নিগ্ধ আলোয় সারা জগত ভরে উঠবে, নিদারুণ বিপর্যয় থেকে পাওয়া যাবে রক্ষা—মিলবে জীবনদেবতার মুঠো মুঠো আশীর্ব্বাদ। উপরোক্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত এবং সুধীসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত। আণবিক যুদ্ধের মারাত্মক পরিণতির দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই রাসেল ক্ষান্ত হন নি, শান্তির পথে পদক্ষেপণের এক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীও সেই সঙ্গে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবনসাধকের এই সুমহান প্রচেষ্টা সফল হোক, এই কামনাই করি। পথভ্রান্ত মানুষকে পথ খুঁজে নিতে আর্ল রাসেলের সুচিন্তিত নির্দেশ প্রভূত সহায়তা করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীমতী কল্পনা রায়। ইতিপূর্বে একাধিক বিদেশী সাহিত্য বাঙলায় অনুবাদ করে প্রভূত যশ ও খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছেন শ্রীমতী রায়, মাসিক বসুমতীতে বর্তমানে তাঁর অনুবাদ-উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। রাসেলের গ্রন্থানুবাদেও অনুবাদিকা যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং আপন সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাঁর অনুবাদকর্ম নিঃসন্দেহে আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। প্রকাশক—আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। জবাকুসুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মধুমালা

বাঙলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভারতীর প্রধানতম সেবকদের মধ্যে এই সৈনিকটির আসনও পুরোভাগে। বাঙলা কবিতার ইতিহাসে নজরুলের নাম চিরকালের মত লেখা থাকবে অমলিন স্বর্ণাক্ষরে। অনেকেই জানেন যে, সুরলক্ষ্মীর কৃপাও নজরুলের উপর কম পরিমাণে বর্ষিত হয় না। সুরকার ও গীতিকার হিসেবেও নজরুল জনপ্রিয়তার

অটল আসনে সমাসীন, সুরকার ও গীতিকার হিসেবে তাঁর অবদান যেমনই ব্যাপক তেমনই বিরাট। গীতিনাট্য রচনাতেও তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়, সম্প্রতি উপরোক্ত শিরোনামায় তাঁর একটি গীতিনাট্য দীর্ঘকাল পরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই গীতিনাট্যটি এককালে সগৌরবে নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়েছে এবং এই নাটকটির দ্বারাই নাট্যভারতীর যাত্রা শুরু। গীতিনাট্য রচনায় নজরুলের কুশলতার ছাপ পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে, গানগুলি অত্যন্ত সুকল্পিত এবং রূপকধর্মী। এই নাটকের কাহিনীর মূল বক্তব্যটিও যথেষ্ট হৃদয়স্পর্শী। প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন শ্রীগণেশ বসু। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা মাত্র।

রক্তের বদলে রক্ত—ও মানুষ নামক জন্তু

রূপ-রস-বর্ণ-বৈচিত্র্য সমন্বিত জীবনের মহিমামণ্ডিত রূপ ধরা পড়ে যাঁদের চোখে, জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করতে পারেন, জীবন-রহস্যের উৎস-সন্ধানে তৎপর যে সব সন্ধানীর দল, সেই সার্থকনামা জীবনশিল্পীদের মধ্যে মনোজ বসুও একজন। উপরোক্ত উপন্যাস দু'টিকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। উপন্যাস দু'টির নামকরণের মধ্যে এদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক মতান্তর থেকে জাত দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুনের লেলিহান শিখা মানব-জীবনে যে কতখানি বিপর্যয় আহ্বান করে আনল, হিংসা-হানাহানির মারপ্যাঁচ কত শান্তির নীড়কে ধূলিসাৎ করে দিল, জগতের মানুষের মিছিল থেকে কতজন যে কোথায় ছিটকে পড়ে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল, মানুষের জীবন যে কতখানি ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, মানুষের হাসি-আনন্দ-গান কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল। প্রাণ নিয়ে কি ভীষণ ছিনিমিনি খেলা চলতে পারে, প্রথম উপন্যাসটিতে সেই বীভৎস নৃশংসতার করুণ প্রতিচ্ছবিই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের মুখোসের অভ্যন্তরে জন্তুও লুকিয়ে থাকতে পারে, যথাসময়ে তার পাশব প্রবৃত্তির বিকাশের ফলে কয়েকটি নিষ্পাপ সরল জীবনের উপর দিয়ে সর্বনাশের বিধ্বংসী বন্যাধারা বয়ে যায়। পাশব প্রবৃত্তির বিকাশে সুস্থ সমাজ কেমন করে বিষিয়ে ওঠে দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে মানব-জীবনের ব্যথার, বেদনার, বঞ্চনার দিকটির এক সম্যক চিত্র লেখকের লেখনীর কল্যাণে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আজকের দুনিয়া যে কতখানি মেকিতে ছেয়ে গেছে লেখক সেদিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। জীবনের শূন্যতার বেদনাবিধুর ছবিই কেবল তাঁর লেখনী আঁকেনি, আশার মা ভৈঃ বাণীও তাঁর লেখনী শুনিয়েছে। অন্ধকার রাত্রির ভীষণ ভয়াল রূপের প্রতিচ্ছবিটি তুলে ধরেই লেখক ক্ষান্ত হন নি, উজ্জ্বল প্রভাতের জ্যোতির্ময় আলোকের কল্পনাও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। পাঠক-পাঠিকা তথা মানুষের দরবারে লেখক কেবলমাত্র দুঃখবাদের প্রচার করেই থেমে যান নি—শেষে আনন্দলোকের সিংহদ্বারের দিক নির্দেশও তিনি দিয়েছেন, ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্রচিত্রণে, সংলাপ সৃষ্টিতে অনন্যসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করেছেন শক্তিমান কথাশিল্পী শ্রীমনোজ বসু। ব্যঞ্জনায়, বর্ণনায়, বিন্যাসে অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিয়েছে লেখকের লেখনী। মনোজ বসুর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি গভীর উপলব্ধি ও তীব্র অনুভূতির স্পর্শপ্রভাবে গ্রন্থ দু'টি সার্থক হয়ে উঠেছে। উভয় গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনে আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—প্রথমটির দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র এবং দ্বিতীয়টির তিন টাকা মাত্র।

নতুন বাঁকে

বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্প ও উপন্যাসের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় নামগুলির মধ্যে 'বনফুল' নামটি অন্যতম। বহু সার্থকনামা ছোট গল্প ও উপন্যাসের তিনি স্রষ্টা, আশা করি, এ কথাও কারো অজানা নয় যে, কবি হিসাবে বনফুল কম যশস্বী নন, বাঙলা কবিতার পুষ্টি সাধনে বনফুলের অবদানও অল্প নয়, বাঙলা কাব্য দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দ্বারা সেবিত হয়ে আসছে। বর্তমানে তাঁর কতকগুলি কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থে তিরিশটি কবিতা স্থানলাভ করেছে। কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ, হৃদয়স্পর্শী ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতাগুলির ভাব অপূর্ব, ছন্দ মনোরম, ভাষা সাবলীল। কবিতাগুলির আবেদন পাঠকচিত্তে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র কবিতাগুলির মধ্যে প্রশস্তিবাচক কবিতাগুলি যথা শাক্যসিংহ, পঁচিশে বৈশাখ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, দাদামশাই, (রসসম্রাট কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), রবীন্দ্রনাথ (মৃত্যুদিবসে), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিতাগুলি এক অনবদ্য আন্তরিকতার স্পর্শে ভরপুর। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনের প্রশংসা দেখিয়েছেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অশেষ গল্প

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের কবিখ্যাতি সুবিদিত, যশস্বী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রচারক হিসেবেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু ছোট গল্প রচনাতেও তাঁর লেখনী যে সমান পটু, এই বিষয়টি অনেকের কাছেই এখনও অজানা রয়ে গেছে। তাঁর কয়েকটি ছোট-গল্পের সংকলন এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমরা এটুকু ধারণা অনায়াসে করতে পারি যে ছোট গল্পলেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদের আসনও নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে। গ্রন্থে সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। হরপ্রসাদের গল্পরচনাকেও তাঁর কবিমন যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। গল্পগুলির সৌন্দর্যের প্রতি অসীম অনুরাগের ও এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে লেখকের এক প্রখর হৃদয়ানুভূতির পরিচয় মেলে। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই এক বিশেষ আবেদন বহন করে। ঘটনার সংস্থাপনে, চরিত্রসৃজনে, বর্ণনাভঙ্গীতে লেখক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের এক উদার দরদী ও স্নিগ্ধ মনের আলেখ্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৩১ নেতাজী সুভাষ য্যাভিনিউ শ্রীরামপুর, প্রাপ্তিস্থান—ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা মাত্র।

অপাঠ্য

পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ যে, উপরের শিরোনামাটি যেন তাঁরা আমাদের মন্তব্য বলে মনে না করেন—আমাদের মন্তব্য বরং এর বিপরীতই। রম্যরচনার মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি যাঁদের দ্বারা হয়ে চলেছে, নীলকণ্ঠ তাঁদেরই একজন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির তুলনায় রম্যরচনার লেখকসংখ্যাও নগণ্য, সেই বিরল সংখ্যকদের মধ্যে নীলকণ্ঠ নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। স্পষ্ট উক্তি, তীক্ষ্ণ মন্তব্য এবং সত্যভাষণ এই ত্রিধারা মিলিত হয়েছে নীলকণ্ঠের সাহিত্যে এবং তার ফলে তাঁর রচনা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, এই গুণগুলির যথাযথ প্রকাশ আলোচ্য গ্রন্থটি থেকেও অনুপস্থিত নয়। যে দুর্নীতির বিষবাষ্প আজকের সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছে তার বিরুদ্ধে লেখক এক 'সন্দেশের চাবুক' ব্যবহার করে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রচনাগুলির মধ্যে লেখকের জীবন, মানব ও সমাজ-সচেতন মনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা পাঠক সাধারণের অন্তর স্পর্শ করবে বলে আশা করা যায়। দু'টি খোলা চিঠি (একটি সিদ্ধার্থ রায়কে অপরটি বাটা প্রতিষ্ঠানকে) এবং দু'টি ছবির (পথের পাঁচালী ও কাবুলিওয়ালা) সময়োপযোগী বলিষ্ঠ ও ততোধিক নির্ভীক সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পার্শ্বপ্রচ্ছদ এবং পশ্চাৎপ্রচ্ছদে লেখা গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রচনা-কৌশলে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

নাট্যগুচ্ছ

সাম্প্রতিক কালে বাঙলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সেবা করে যে তরুণ বাণী-উপাসকের দল সুনাম অর্জন করেছেন শ্রীতরুণ রায় ওরফে ধনঞ্জয় বৈরাগীর স্থান তাঁদেরই মধ্যে। সার্থক নাটকের সৃষ্টিকর্মে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করেছে, এ কথা বললে ভুল হয় না। নাট্যশাস্ত্রের কল্যাণকর্মে তাঁর আত্মনিয়োগের বিষয়ও সুবিদিত। বাঙলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসও অসামান্য গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল, তার অভিযান যেদিন থেকে শুরু হয়েছে তার পর আজ একটি শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। এই কিঞ্চিদধিক একটি শতাব্দীর সাধনায় বাঙলার নাট্যসম্ভার যথেষ্ট পরিমাণেই সমৃদ্ধ হয়েছে। সাধারণতঃ নাটকের মাধ্যমে যুগের সমকালীন ছবি, তার প্রশ্ন, তার সমস্যার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা নাট্যকারের প্রধান দায়িত্ব। নাটকের প্রধান ধর্ম বলতে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলা। এই প্রধান দিকগুলিকে কেন্দ্র করে বিচার করলে দেখা যায় যে, তরুণ রায়ের নাটকগুলি আশানুরূপ রসোত্তীর্ণ। পাঠক বা দর্শকের দাবী মেটাতে সক্ষম, আজকের সমাজের বিভিন্ন রূপের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি যথোচিত নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছে পাঠক তথা দর্শক-সাধারণের সামনে। লেখকের সন্ধানী মনের পরিচয়ও গ্রন্থের নানাস্থানে পাওয়া যায়। নাটকগুলি বাস্তবধর্মী হলেও তাদের মধ্যে রূপ-রস-বর্ণময় বিচিত্র কল্পনার এক আশ্চর্য অনুভূতি অদৃশ্য নয়। গ্রন্থে সবসমেত ন'টি নাটিকা স্থানলাভ করেছে, এদের মধ্যে অধিকাংশই আকাশবাণী এবং অন্যান্য স্থানে সমারোহে অভিনীত। নাট্যামোদীদের দরবারে এই নাটিকা সংকলনটি যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে বলে আশা রাখি। শ্রীভাস্করানন্দ রায়ের প্রচ্ছদ অঙ্কন প্রশংসার্হ। প্রকাশক—আর্ট য্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস

আজকের দিনে বিশ্বপ্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনীয় যে ক'টি দেশের নাম উল্লেখ করা চলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে অন্যতম। জগতের মহাদেশগুলির মধ্যে অ্যামেরিকাই বয়সে সবচেয়ে তরুণ। পৌনে পাঁচ শ' বছর আগেও সারা পৃথিবীতে এই মহাদেশের অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না। আর একটি কারণে বাঙালীর কাছে মার্কিণ মুলুকের গুরুত্ব যথেষ্ট, বহির্ভারতে যুগাবতার রামকৃষ্ণের প্রচারের পুণ্যফল লাভ করে সর্বপ্রথম ধন্য হয়েছে এই য়্যামেরিকা। আজকের এই মানবসভ্যতার ব্যাপক জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই মানুষের মনের গতিবেগও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তার মন ক্রমশঃই স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে চলেছে। মানবমনের প্রশ্নও আজ হতে চলেছে অনন্ত থেকে অনন্ততর। সঙ্কীর্ণতার সীমারেখা অতিক্রম করে প্রসারতার আহ্বান মানুষকে আকর্ষণ করছে। ক্ষুদ্রতার প্রাচীর ভেদ করে বিশালতার প্রাঙ্গণে পা ফেলতে মানবচিত্ত উন্মুখ। জানার ইচ্ছা নয় আজ জানার ক্ষুধা মানুষের মন অধিকার করে আছে। আজ মানুষ পরিণত হতে চলেছে এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীতে, মানুষ অপরের সম্বন্ধে আজ বিশদভাবে জানতে চায়, পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই এই জানা সম্ভবপর হবে, দেশের ইতিহাসই নিরসন করবে এই জানার কৌতূহল।—শ্রী আর, বি, নাই ও শ্রী জে, ই, মোরপারগার লেখা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্যে ভরপুর এবং ঐ দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা বিবরণ-সমৃদ্ধ। য়্যামেরিকার বিশদ ইতিহাস যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখকদ্বয়। বাঙলায় গ্রন্থটির প্রশংসনীয় অনুবাদ করেছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনীলরতন দেব ও শ্রীমতী দীপালি মুখোপাধ্যায়। অনুবাদ-কর্ম যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের হয়েছে এবং নিপুণতার স্বাক্ষর বহন করেছে। শেষোক্তদের শ্রম সফল হয়েছে এ কথা অনায়াসে বলা যায়। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এঃ ১৩২-১৩৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। দাম—দশ টাকা মাত্র।

আবিষ্কারের গল্প

আজকের দিনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে পরিচালিত করা হচ্ছে ধ্বংস কর্মে, বৈজ্ঞানিক শক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বিনষ্টি প্রচেষ্টায়, বিজ্ঞানের ধ্বংস করার শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে পূর্ণমাত্রায়, কতকগুলি আত্মসর্বস্ব, ক্ষমতালোভী, নরদানবের হাতে পড়ে বিজ্ঞান আজ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে বিধাতার অভিশাপরূপে অথচ এ কথাও কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না যে, বিজ্ঞান বিধাতার আশীর্বাদের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর। সাহিত্যের মত বিজ্ঞানও সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। বিজ্ঞান ব্যতিরেকে সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণ। সভ্যতার উৎকর্ষহীন বিজ্ঞানের অবদান যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সীমাহীন। সেই অসভ্য, বন্য, বর্বর জীবন যাপন করেছে যে মানুষ—তার পর বহু শতাব্দী ধরে যে অনলস সাধনার সে আজ পরিণত হয়েছে আলোকপ্রাপ্ত সুসভ্য নাগরিকে, তার মূলে

বিজ্ঞানের অবদানও কিছু কম নয়। মানুষের ক্রমজাগরণের ইতিহাসে সাহিত্যের মতই বিজ্ঞানের অবদানও সমান মূল্য বহন করে। বিজ্ঞানী ছদ্মনামের অন্তরালে লেখক বৈজ্ঞানিক অসামান্য আবিষ্কারগুলি আলোকোজ্জ্বল কাহিনীর ইতিবৃত্ত ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশন করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞানের এক-একটি আবিষ্কারের কাহিনী যেমনই আশ্চর্য, তেমনই চমকপ্রদ, যে সকল আবিষ্কারের সফল আজ আমরা প্রত্যেকে ভোগ করছি তাদের জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে সরস, সুন্দর ও সাবলীল আলোচনা নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দেবে বলে আশা করা যায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির কাহিনী ও ইতিহাসগুলি এই গ্রন্থের উপজীব্য। কালানুক্রমিক আলোচনার ফলে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কাহিনীর প্রতি আলোকপাত করার ফলে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টিতেও লেখকের লেখনী অপটু নয়, লেখকের বর্ণনভঙ্গী, রচনাকৌশল লিপিচাতুর্য প্রশংসার দাবী রাখে। এই গ্রন্থ ছোট বড় উভয় সম্প্রদায়কেই যুগপৎভাবে আনন্দ দান করবে। বিজ্ঞানানুরক্তের দল এই গ্রন্থ পাঠে বহুলাংশে উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থের যথাপ্রাপ্য সমাদর আমরা কামনা করি। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের নব অবদান

পৃথিবীতে মানুষের বোধ হয় সব চেয়ে বড় শত্রু রোগ, ব্যাধি, জরা। এরা শুধু দেহের দিক দিয়েই নয়, মনের দিক দিয়েও মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে মৃত্যুর চেয়েও মনের মৃত্যু সকল দিক দিয়েই ভয়ানক সাংঘাতিক, দুর্বিষহ! প্রাচীনকালে ঋষিদের সাধনার প্রভাবে রোগ দূর হোত। আজ সে পুণ্যকল্প ঋষিরা কোথায়? আধুনিককালে রোগের অবসানকল্পে বৈজ্ঞানিকদের অবদান অপরিসীম, তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত হল অসংখ্য ঔষধ, রোগের নাশকারী। আজকের দিনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বেগবান অগ্রগতি লক্ষ্য করবার মত। লক্ষ্যই হচ্ছে, কত জটিল রোগকে কত সহজে মানুষের দেহ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, আশার কথা, বিজ্ঞানসাধকের দল এই সাধনায় ক্রমেই সিদ্ধিলাভ করছেন। এই নব নব ঔষধাবলীর ইতিহাস তাদের আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে বহু তথ্য, তাদের উদ্ভব প্রসার ও জয়যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উপরোক্ত গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটি 'আর্মেনগার্ড ইবার্গের মডার্ণ মেডিক্যাল ডিসকভারিস' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদকর্মে অনুবাদকও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অনুবাদ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সাবলীল ও মনোরম হয়েছে। প্রাঞ্জল বর্ণনভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক। প্রচ্ছদচিত্রটিও বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটিতে অনুবাদকের বা অনুবাদকদের এবং প্রচ্ছদচিত্রীর নাম অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। ভিটামিন, পেনিসিলিন, ডি, ডি, টি, প্লাজমা, সালফা ড্রাগস, ষ্ট্রেপটোমাইসিন, গামাগ্লোবুলিন, গ্রামিসিডিন, ভেকসিন প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহল পোষণ করেন এই গ্রন্থটিতে তাঁদের কৌতূহল নিরসন করবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনার অংশগুলি যাতে সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে, সেদিকেও যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে, এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯ গান্ধী রোড। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের উপস্থিতি বলতে গেলে যৎসামান্য, খুব অল্প অংশ জুড়ে থাকলেও রামায়ণের মধ্যে কুম্ভকর্ণ যে একটি বিশেষ অর্থাৎ টাইপ চরিত্র, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের অংশটুকু অবলম্বন করে ছোটদের উপযোগী একটি তিনটি দৃশ্য-সমন্বিত নাটক রচনা করেছেন খ্যাতিমান লেখক প্রশান্ত চৌধুরী। সারা নাটকের মধ্যে কৌতুকরস যুক্ত করায় নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নাটকটি অভিনীতও হয়েছে সগৌরবে। নাটকটির মধ্যে কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র যুক্ত করে নাটকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। নাটকটি ছোটদের দরবারে সাদরে গৃহীত হবে বলে আমরা আশা রাখি। নাটকটি সুকল্পিত ও সুলিখিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সংলাপাংশ যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী, চরিত্রগুলিও অস্বাভাবিক নয়। প্রচ্ছদ এবং গ্রন্থের অন্যান্য চিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন লেখক স্বয়ং। প্রকাশক—বলাকা প্রকাশনী ২৭, সি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

ভালোবাসা

অঞ্জলি দাশগুপ্তা

আমার চিতা তোমার বুকে জ্বলুক জ্বলুক,
আমার স্মৃতি তোমার চোখে ঝলুক ঝলুক,
রাত্রিশেষের নিবিড় ক্ষণে
পরলোকের হাওয়ার সনে
আমার সুখে ব্যথার বীণা
বাজুক মনে বাজুক মনে!

◎ দেশে-বিদেশে ◎

শ্রাবণ, ১৩৬৬ (জুলাই-আগষ্ট '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই) : কেরলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভার উচ্ছেদের দাবীতে রাষ্ট্রপতির (ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ) নিকট কেরল বিমোচন সমর সমিতির নেতা শ্রীপদ্মনাভন ও কেরল প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীথানু পিল্লাই-এর দরবার।

২রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই) : শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি জনকল্যাণ সংস্থায় ধর্মঘট বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তাবিত আইন-ব্যবস্থার প্রতিরোধকল্পে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্ত্তৃক পাঁচ দফা আন্দোলনসূচী গ্রহণ।

৩রা শ্রাবণ (২০শে জুলাই) : দার্জ্জিলিং-এর সরকারী গুদাম হইতে দশ হাজার টাকার চাউল পাচারের সংবাদ।

কেরলে অবিলম্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাকল্পে রাষ্ট্রপতির নিকট কেরল কংগ্রেস কমিটির স্মারকলিপি পেশ।

৪ঠা শ্রাবণ (২১শে জুলাই) : জম্মু ও কাশ্মীরের ভয়াবহ বন্যায় ১৩১ জনের প্রাণহানি—১০ কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট।

কেরলের সর্ব্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ত্রিবান্দ্রামে রাজ্যপাল ডাঃ বি. রামকৃষ্ণ রাও-এর সহিত কেরল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

৫ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই) : ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি প্রসঙ্গে নয়াদিল্লীতে সেক্রেটারী পর্য্যায়ে উভয় রাষ্ট্রের সম্মেলন।

৬ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই) : পাক সৈন্যদল কর্ত্তৃক আসামের জয়ন্তিয়া পাহাড়-সীমান্তে আরও দুইটি ভারতীয় গ্রাম (বাকুরটিলা ও বাশা) অধিকার।

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে পূর্ব্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ-রাণাঘাট এবং দমদম-বনগাঁ সেকশন দুইটির বৈদ্যুতিককরণ—সংশ্লিষ্ট রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকৃপাল সিং-এর ঘোষণা।

৭ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই) : কলিকাতা পৌরসভার অধিবেশনে পৌরকর্ম্মীদের বেতনের হার পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন আলোচনাকালে সভাকক্ষের ভিতরে ও বাহিরে তুমুল হট্টগোল।

৮ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই) : কেরল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির সহিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কংগ্রেস-সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

৯ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) : নয়াদিল্লীতে কেরলের প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের জরুরী আলোচনা।

১০ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) : পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহিত বিরোধী দলভুক্ত সদস্যদের তীব্র বাদানুবাদ এবং সরকারী কার্য্য-ব্যবস্থার প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যদের সভা-কক্ষ ত্যাগ।

১১ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই) : কেরল সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—দিল্লী ও ত্রিবান্দ্রামে প্রকাশিত কেরল সরকারের (কম্যুনিষ্ট) জবাবে স্পষ্ট ঘোষণা।

১২ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই) : কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষ হইতে কলিকাতায় রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নিকট এবং দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগ সম্বলিত স্মারক-লিপি পেশ।

১৩ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে তিন সহস্রাধিক নর-নারীর বিক্ষোভ।

১৪ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) : কেরলে ২৮ মাসব্যাপী কম্যুনিষ্ট শাসনের অবসান—ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক শাসনভার গ্রহণ।

প্রথম ডিভিশান ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দলের (কলিকাতা) চ্যাম্পিয়ান শিপ (এ যাবৎ ৮ বার) লাভ।

১৫ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট) : অস্ত্রসম্বরণ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ডাওকি অঞ্চলে পাক-সৈন্যদের পুনরায় গুলীবর্ষণ।

১৬ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট) : কেরলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে গত্যন্তর ছিল না—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

১৭ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট) : লোকসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ কর্ত্তৃক কেরলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে একযোগে সভাকক্ষ ত্যাগ।

১৮ই শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট) : বিনিয়ন্ত্রণের পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—লোকসভায় প্রশ্নবাণে জর্জরিত কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের স্বীকৃতি।

১৯শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট) : লোকসভায় স্পীকার শ্রীঅনন্ত-শয়নম্ আয়েঙ্গার কর্ত্তৃক কেরল (কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ) সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য—পরিণতিতে লোকসভায় তুমুল হট্টগোল।

২০শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট) : লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি—তিব্বতস্থ চীনা কর্ত্তৃপক্ষের এক আদেশবলে তিব্বতে ভারতীয় ও তিব্বতী মুদ্রা বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে।

২১শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট) : ভারতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইংরেজী ভাষা চালু থাকিবে—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২২শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে ২০শে আগষ্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন—মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত।

২৩শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট) : নয়াদিল্লীতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত—১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

২৪শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট) : রাজ্যসভায় কেরলের রাজ্যপালের কেরল সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিলের দাবী প্রত্যাখ্যান হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ কম্যুনিষ্ট সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ।

২৫শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট) : তিব্বতস্থ ভারতীয়দের স্বদেশে আনয়ন ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুরোধ গণচীন কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য—লোকসভায় শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের (কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী) উক্তি।

নয়াদিল্লীতে দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে নূতন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত।

২৬শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট) : সীমানা (পাক্-ভারত) নির্দ্ধারণ ব্যাপারে খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় (আসাম) ও শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনারদের বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

২৭শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট) : চীনের সরকারী পত্রিকায় ভারত ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর ঘোষণা।

২৮শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান সমস্যাসঙ্কুল খাদ্যপরিস্থিতির সঙ্কট নিরসনের নূতন প্রচেষ্টায় অপ্রত্যাশিতভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রাজ্য প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের যৌথ বিবৃতি প্রচার।

২৯শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) : দেশের সর্বত্র মামুলি পদ্ধতিতে স্বাধীনতার দ্বাদশ বার্ষিকী উদ্‌যাপন। বহু স্থানে সভা-সমিতিতে অগণতান্ত্রিক কংগ্রেসী সরকারের তীব্র সমালোচনা।

মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ২০শে আগষ্ট হইতে রাজ্যব্যাপী (পশ্চিমবঙ্গ) আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বিবৃতি মারফত আলোচ্য কমিটিকে সতর্কীকরণ।

৩০শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট) : সুপ্রীম কোর্ট ও ভারতীয় কমিশনের এক্তিয়ার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে—কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের ঘোষণা।

৩১শে শ্রাবণ (১৭ আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন (রাজ্যব্যাপী) দমনে ১৬ জন এম, এল, এ সহ প্রায় দুই শত বামপন্থী নেতা ও কর্মী গেপ্তার।

বহির্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই) : পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ৭ই মে তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত।

পেশোয়ারে মার্কিণ ঘাঁটি স্থাপনে পাক্-মার্কিণ সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ।

৩রা শ্রাবণ (২০শে জুলাই) : সমগ্র জার্ম্মাণ সমস্যার মীমাংসা-কল্পে বৃহৎ চতুঃশক্তি (রুশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স) পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনকে আধা স্থায়ী সংস্থায় পরিণত করার পশ্চিমী প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

৪ঠা শ্রাবণ (২১শে জুলাই) : ইরাকের তৈল সহরে কিরকু-এ বিদ্রোহীদের সহিত ইরাকী বাহিনীর সংগ্রাম অব্যাহত।

৫ শ্রাবণ (২২শে জুলাই) : জার্ম্মাণী প্রসঙ্গে জেনেভায় চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচনায় অচলাবস্থা দূরীকরণের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

৭ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই) : আলজিরিয়ায় বিদ্রোহ দমনে ফরাসী সরকারের বৃহত্তম সামরিক অভিযান আরম্ভ।

মস্কোয় ক্রেমলিনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের সহিত মার্কিণ ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ রিচার্ড নিকসনের সাক্ষাৎকার।

৯ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) : আন্তর্জাতিক আইন-বিশেষজ্ঞ কমিশন কর্ত্তৃক তিব্বতের ঘটনাবলী তদন্তের জন্য কমিটি গঠন—চেয়ারম্যান : শ্রীপুরুষোত্তম ত্রিকমদাস (ভারত)।

১১ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই) : রুশ কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ পরিকল্পনার প্রধান অধ্যাপক এণ্টোনি ব্লাগনরাভভের ঘোষণা—রুশিয়া শীঘ্রই সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে গবেষণার যন্ত্রপাতি সজ্জিত রকেট প্রেরণ করিবে।

১২ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই) : দুর্নীতির দায়ে পূর্ব-পাকিস্তানের তিন জন প্রাক্তন মন্ত্রী (আওয়ামী লীগ—কংগ্রেস কোয়ালিশান সরকারভুক্ত) গ্রেপ্তার।

১৩ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই) : বিশ্ব সমস্যাবলী সমাধানের উপায় বিবেচনার্থ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব।

১৪ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) : লাওস-এ সরকারী বাহিনী ও প্যাথেট-লাও বাহিনীর (বিদ্রোহী) মধ্যে পুনরায় লড়াই হওয়ার সংবাদ।

১৭ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট) : পারস্পরিক আমন্ত্রণ অনুযায়ী রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক সেপ্টেম্বরের (১৯৫৯) মাঝামাঝি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার (মার্কিণ) কর্ত্তৃক শরৎকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৮ই শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট) : বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর সহিত রাজকীয় লাও বাহিনীর সংঘর্ষের পর লাওসের পাঁচটি প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

১৯শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট) : প্রায় আড়াই মাস অধিবেশন চলার পর বিনা সিদ্ধান্তে জেনেভায় জার্ম্মাণী সম্পর্কে বৃহৎ চতুঃশক্তি পররাষ্ট্রসচিবগণের সম্মেলনের পরিসমাপ্তি।

২২শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট) : কাশ্মীরের পাক্-অধিকৃত এলাকায় মঙ্গলাবাঁধ নির্মাণ ব্যাপারে ভারত কর্ত্তৃক রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তৃতীয় দফা প্রতিবাদ পেশ।

২৪শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট) : সিন্ধুনদের জল বিভাগ সম্পর্কে ১৯৬০ সালের প্রথমার্দ্ধে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি সম্পাদিত হইবে—লণ্ডনে সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের সহ-সভাপতি মিঃ উইলিয়ম ইলিফের ঘোষণা।

২৬শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট) : চীন কর্ত্তৃক লাওস হইতে মার্কিণ সামরিক কর্ম্মচারীদের প্রত্যাহার দাবী। লাওসে ফ্রান্স ও আমেরিকার জেনেভা চুক্তি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের অভিযোগ।

ঊর্দ্ধতন চীনা কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের পিকিং-এর বাহিরে কোন স্থানে এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার সংবাদ।

২৮শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট) : জাপানে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যায় প্রায় ৫ শত লোক হতাহত—১ লক্ষাধিক গৃহ বিধ্বস্ত ও ৪২ খানি মাছধরা জাহাজ জলে নিমজ্জিত।

৩০শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট) : সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র ও জর্ডনের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং জর্ডন-সিরিয়া সীমান্ত উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা।

৩১শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট) : তিব্বতে নূতন বিদ্রোহের সম্ভাবনা—পাঞ্চেন লামার উপর চীন সরকারের আস্থা লোপ পাওয়ার সংবাদ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

উনিশ

চৌধুরির ঘেরি ঠিক করালীর উপরে নয়। করালী থেকে খাল বেরিয়েছে, ঘেরির বাঁধ প্রায় তার সমসূত্রে চলেছে। একটা জায়গায় এসে খাল থেকে এক ডাল বেরিয়ে সেই ডাল সোজা ঢুকে পড়েছে ঘেরির ভিতর। বাঁধ দিয়ে মুখ আটকানো। বাইন গেঁয়ো ও বনঝাউয়ে আচ্ছন্ন ঐ দিকটা। চোত-বোশেখে নদীতে বান কখনো বাঁধের ওখানটা কেটে দেয়। বাঁধ কেটে ইচ্ছা মতো ঘেরির খোলে নোনা জল তোলে। জলের সঙ্গে মাছের ডিম ও গুঁড়ো-মাছ উঠে আসে। তারাই বড় হয় ঘেরির ভিতর। মাছের পোনা কেনার জন্য এক আধেলা খরচা নেই এ তল্লাটে। বর্ষাকালে ভেড়ি জলে ভরভরতি হয়ে যায়। জল ছাপিয়ে উঠে বাইরের সঙ্গে একাকার হওয়ার উপক্রম, মাছ ঠেকানো দায়। তখন আবার মরা-কোটালে বাঁধ কেটে দিয়ে খালের পথে জল বের করে দেয়। খুব সতর্ক হয়ে এই কাজ করতে হয়, জলের সঙ্গে মাছ বেরিয়ে না যেতে পারে। বাঁশের শলার পাটা বোনা থাকে, বাঁধের কাটা জায়গায় সেইগুলো শক্ত করে বসিয়ে দেয়। জোয়ার আসবার আগেই তাড়াতাড়ি মাটি ফেলে বাঁধ মেরামত করে যেতে হবে। নয়তো খালের জল ভিতরে ঢুকে জল কেঁপে যাবে আবার। অনেক হাঙ্গামা। এবং একদিন একবার করেই হল না। সারা বর্ষাকাল ধরে নজর রাখতে হয়, অনেক বার এমনি কাটাকাটির প্রয়োজন পড়ে।

বাঁধের ঠিক নিচে সেই জন্য একটা চালা বানিয়ে রেখেছে। বাঁধ-কাটা লোকেরা বৃষ্টিবাদলার মধ্যে সেখানে আশ্রয় নেয়, কোদাল রেখে তামাক-টামাক খায়। রাত্রিবেলা পড়েও থাকল বা এক একদিন। বর্ষার সময়টা ভিড় খুব, মানুষের গতায়াতে সর্বদা সরগরম, পায়ে পায়ে জঙ্গলের ভিতর পথ পড়ে যায়। অন্য সময় উঁকি মেরেও তাকায় না কেউ ওদিকে। জঙ্গল এঁটে গিয়ে পাতালতায় মধ্যে চালাঘর একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গগন দাসের আলায় ভরদ্বাজকে সেদিন বড় খাতির করল। পুজো-আচ্চা মিটে গেছে, ভরপেট প্রসাদ পেয়েছেন, তবু ছেড়ে দেয় না। নাছোড়বান্দা চারু বলছে, সে হবে না ঠাকুর মশায়! বউদি বলছে, দুটো চাল ফুটিয়ে সেবা করে যেতে হবে এখান থেকে। ভিটেবাড়ি পবিত্র হবে, দোষদিষ্টি কেটে যাবে। বউদি ছাড়বে না, আমি কি করব? ঐ দেখেন, উনুন ধরাতে লেগে গেছে এর মধ্যে।

চারুবালা মেয়েটা হাসে বড় খাসা, আর আব্দার করে। আবাদের পেত্নিগুলোর মতন নয়। ছাড়বে না যখন, কী উপায়? আসবার সময় অন্নদাসীকে বিদায় দিয়ে এসেছেন। রাত্রে আজ ভাতের গরজ নেই, ওদের ওখানে জলটল খাওয়াবে, তাতেই ঢের হয়ে যাবে। কিন্তু গুরুতর রকমের জলযোগের উপরে আবার এই ভাত জুটে যাচ্ছে। হোক তবে তাই, মা-লক্ষ্মীকে না বলতে নেই।

ভরপেট খাওয়াদাওয়ার পর গড়াতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু না, অনেক রাত হয়েছে, দেরি করা চলবে না আর একটুও। গোপাল ভরদ্বাজ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে লোক দিতে চাচ্ছে গগন। ভরদ্বাজ ঘাড় নাড়েন: নাঃ, কী দরকার! এই তো, পৌঁছে গেলাম বলে।

চারুবালা বলে, শালতিও নিয়ে এলেন না। পায়ে হেঁটে একলা যাবেন এদ্দূর?

ভরদ্বাজ বলেন, শালতি আর চাপিনে এখন। কতটুকু বা রাস্তা! ফুলতলা থেকে নতুন এসেছি তখন, জুতো পরে পরে তুলতুলে পা মাটির উপর বড্ড লাগত। এখন কড়া পড়ে গেছে। মুগুর মারলেও পায়ে সাড় হবে না। আরও ঐ অন্নদাসীকে দেখেই হয়েছে। দেখ না, সাঁইতলা থেকে সে কেমন রোজ দু-বেলা ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে যাওয়া-আসা করে। সে আমায় লজ্জা দিয়েছে। মেয়েমানুষে পারে তো আমি দশাশই মরদ পারব না কি জন্যে?

গদগদ হয়ে বলেন, খুব খেয়েদেয়ে গেলাম। পুজোআচ্চার ব্যাপারে কি অন্য রকম দায়ে-বেদায়ে যখনই দরকার হবে, আমায় ডেকো। আসব। সত্যিই তো, ব্রাহ্মণ বলতে একলা আমি তল্লাটের মধ্যে—মান টানিয়ে বসে থাকলে হবে কেন, আমারও একটা কর্তব্য আছে বইকি! ডেকো তোমরা, কোন রকম সঙ্কোচ কোরো না।

হনহন করে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ভয়-ভয় করছে! একেবারে নিশুতি হয়ে গেছে যে! বাদাবনের দিক থেকে ভয়ানক একটা আর্তনাদ উঠল, এক রকম রাত্রিচর পাখীর ডাক ঐ রকম,

সর্বদেহ কেঁপে ওঠে। ফিরে এসে ভরদ্বাজ বললেন, খাতির করতে চাচ্ছ। তা বেশ, আলো ধরে একজন কেউ চৌধুরিগঞ্জের বাঁধে তুলে দিয়ে আসুক। এলাকার বাঁধে উঠলেই হল, আমাদের আলা অবধি যেতে হবে না। কে যাচ্ছ, চলে এসো। বড্ড রাত হয়ে গেছে।

পচা থাকতে অন্য কে যাবে? পচা যেন কেনা-গোলাম। তাই বা কেন, কাজের নামে গা ঝাড়া দিয়ে আপনি উঠে পড়ে, কিছু বলতে হয় না—কেনা-গোলামে এত দূর করে না। ভরদ্বাজের আগে আগে আলো ধরে পচা চলল। চৌধুরিগঞ্জের বাঁধের উপর উঠে গেছে, অদূরে আলা। ভরদ্বাজ বললেন, চলে যা এবারে তুই। আর কষ্ট করতে হবে না। সোজা পথ—জলকাদা নেই, দিব্যি চলে যাব এইটুকু পথ।

তবু পচা খাতির করে বলে, কী দরকার! আমারই কোন পথটুকু এগিয়ে দিলে পায়ে ব্যথা ধরবে!

ভরদ্বাজ চটে উঠলেন: আচ্ছা নেই-চুড়ে তুই তো বেটা! বলছি যেতে হবে না, জোর করে যাবি নাকি? চৌধুরি-আলায় গিয়ে ঘাঁতঘোঁৎ বুঝে আসবার মতলব? চরবৃত্তি করবার?

এত বড় অভিযোগের পর পচা আর এগোয় না। রাগে গজগজ করতে করতে ফিরে চলল।

ভরদ্বাজও এগুলেন না আর আলার দিকে। চুপচাপ দাঁড়ালেন। পচা নজরের বাইরে যেতে ফিরে চললেন আবার! ডাইনে ঘুরে বাঁধ ধরে হনহন করে চালছেন। বাঙ্কের মুখে, জঙ্গলের দিকে।

কাছাকাছি এসে বাঁধ থেকে নেমে পড়লেন। রাত অন্ধকার, ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালা। বাঁধের উঁচু সোজা সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথে যেতে গা-ছমছম করে। উঃ, সাহস বলিহারি অন্নদাসীর! অনেক দিন টালবাহানার পর শেষটা এই জায়গার কথা বলে দিয়েছে। পরিত্যক্ত ঐ চালাঘরে। ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছে সে। জায়গাটা বেছেছে অবশ্য ভালই—স্বয়ং যমরাজেরও খুঁজে পাবার কথা নয়।

ভরদ্বাজকে দেখতে পেয়ে চালাঘরের ভিতরে নয়—বাইরে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে অন্নদাসী। হাঁ, অন্নদাসী বই কি—মানুষ ঠিক চেনা যায় না, কাপড়-চোপড় জড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। নিঃসংশয় হবার জন্য ভরদ্বাজ ডাক দিলেন, কে?

অন্নদাসী হেসে গলে গলে পড়ছে: আমি গো—আমি এক পেত্নী। এত কথাবার্তা—মনের মানুষ পোড়ারমুখো সমস্ত বিস্মরণ হয়ে গেলি?

মাণিকপীরের গান হয়ে গেছে সম্প্রতি গাঙপারে বরাপোতায়। গরুর বড় রকমের রোগপীড়া হলে কিম্বা গরু নিখোঁজ হলে মাণিক-পীরের নামে সিন্নি মানে, পীরের মহিমা প্রচারে গানও দেয় সুবিধা হলে। এর ফলে গরু নিয়ে আর কোন ঝামেলা হয় না, মাণিক-পীরের সতর্ক দৃষ্টি থাকে গরুর উপর। পীরের থান থেকে বাদশা নামদারের প্রতি প্রেয়সী উক্তি অনেকগুলো অন্নদাসী মনে গেঁথে রেখে দিয়েছে। বলে, পীরিতের মানুষ একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেছে গো। ভাবছে পেত্নী আছে দাঁড়িয়ে।

বলেন, পেত্নী ছাড়া কী আর তুই। মানুষ হলে এখানে আসতে ডর লাগত। কান পেতে দেখ রে—পুরুষমানুষ হয়ে বুকের মধ্যে আমার ধড়াস-ধড়াস করছে। একলা মেয়েমানুষ এলি তুই কেমন করে বল দিকিনি।

একা কেনে আসব—

ভরদ্বাজ বলেন, কাকে নিয়ে আবার দল জোটাতে গেলি? এত রঙ্গ জানিস, এমন ঘাবড়ে দিস সময় সময়—

অন্নদাসী বলছে, আসছিলাম একা একা তো—তা মরদ কেমনে টের পেয়েছে। সন্দ-বাতিক কি না—পিছু নিয়েছে কখন থেকে। খোঁড়া হয়ে তো ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে কোঁকায়, চৌধুরিগঞ্জ থেকে আপনার হাঁড়ির ভাত এনে খাওয়াতে হয়। হঠাৎ একবার পিছন ফিরে দেখি, খোঁড়া পা দিব্যি ভাল হয়ে গেছে; বাতাসের আগে ছুটছে। বলি, অত হিংসে কিসের শুনি? আপনার দয়ায় ধরুন গুষ্ঠিসুদ্ধ পেটে খেয়ে বাঁচছি—কোন দরকারে একটু জঙ্গলে ডেকেছেন, তা নিয়ে ছুটোছুটি অত কিসের শুনি?

রাধেশ্যাম হঠাৎ কথা বলে ওঠে। ঝোপের আড়ালে ছিল, উদয় হল যেন মায়া বলে। বলে, এসেছি তাতে কি দোষ হল? দায়ে পড়ে আসতে হয়। একা তুই আসিস কি করে? জঙ্গলের মধ্যে ধর কোন জন্তু জানোয়ার বেরিয়ে পড়ল।

রাধেশ্যামের পাশে আবার জগা। ফিকফিক করে হাসছে। জগা বলে, আমি মানা করেছিলাম: দল বেঁধে গিয়ে কাজ নেই তুইুর মা। মেয়েমানুষ তুমিই বা কি জন্য যাবে—আমরা কেউ গিয়ে দরকারটা শুনে আসিগে। তা নায়েব মশায়, আপনার উপর দেখলাম টান খুব। ছেলে অন্য বাড়ি রেখে রাত্তিরবেলা হোঁচট খেতে খেতে চলে এসেছে।

রাধেশ্যাম বলে, টান বলে টান! চৌধুরি-আলা থেকে ফিরতে এদিকে বিকেল, ওদিকে রাত দুপুর।

অন্নদাসী কিন্তু হাসে। রাধেশ্যামের মুখের নিন্দেমন্দ গায়ে মাখে না। হাসতে হাসতে বলে, তা কথাবার্তা কি আছে, বলে দেন নায়েব মশায়। এতখানি পথ আবার তো ফিরে যেতে হবে।

জগা হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল: এই রাধে, মারধোর দিবি নে—খবরদার! মানী লোক—ফুলতলা সদরের নায়েব মশায়। গায়ে হাত না পড়ে। সঙ্গে চাকু এনেছি—জাপটে ধর, ক্যাচ-ক্যাচ করে কান দুটো কেটে নিয়ে ছেড়ে দিই।

ভরদ্বাজ আকুল হয়ে কেঁদে বলেন, ওরে বাবা! ধর্মবাপ তোরা আমার। অন্ন আমার মা। নাক মলছি, কান মলছি—বারদিগর আর এমন কাজ হবে না।

জগা নরম হয়ে বলে, আচ্ছা, ব্রাহ্মণ মানুষ এমন করে বলছেন—মাঝামাঝি একটা রফা করে নেওয়া যাক। দুটো কানের দরকার নেই। একটা কেটে নিয়ে যাই, একটা ঠাকুর মশায়ের থাকুকগে।

কান কাটা শেষ অবধি রদ হয়ে গেল অবশ্য। চ্যাংদোলা করে ভরদ্বাজকে আলার সামনে পুকুর ধারে দড়াম করে এনে ফেলল। ফেলে দিয়ে জগা আর রাধেশ্যাম সরে পড়ল। ভরদ্বাজ সেখানে থেকে কাতরাচ্ছেন: ওরে, কারা আছিস—তুলে নিয়ে যা আমায় এখান থেকে। হাঁটবার জো নেই।

লোকজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

হয়েছে কি নায়েব মশায়?

বলো কেন। পুজো করতে গিয়ে এই দশা। ঠাহর করতে পারিনি, বাঁধ থেকে গড়িয়ে একেবারে পগারের মধ্যে। গা-গতর আর আস্ত নেই।

দুই জোয়ান মরদ বগলের নিচে হাত দিয়ে একরকম ঝুলিয়ে ভরদ্বাজকে আলায় নিয়ে চলল। আলায় গিয়ে একটা চৌপায়ায় গড়িয়ে পড়লেন। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের ঝোড়া সব উঠে গেছে? নৌকো ছাড়বার দেরি কত রে?

এই তো, ভাঁটা ধরে গিয়ে জল থমথমা খেয়ে গেছে। উল্টো টান ধরলেই ছেড়ে দেবে।

ধরে নিয়ে আমায় নৌকোর চালির উপর তুলে দে বাপসকল। ফুলতলায় গিয়ে চিকিচ্ছেপত্তোর হইগে।

নৌকোয় তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো নিয়ে কালোসোনা জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে আসা হবে ঠাকুর মশায়?

আমি আসি কিম্বা অন্য যে-কেউ আসুক। পাশের ওই ছুঁচোর পত্তন নিকেশ না করে কাজ নেই। পৈতে ছুঁয়ে এই দিব্যি করে যাচ্ছি।

কুড়ি

কুমিরমারি থেকে সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে। কিন্তু তা বলে মুনাফা কিছু নেই—বলাইকে পাওয়া যাবে না। সকাল হোক আর দেরি হোক, ডিঙি থেকে মাটিতে পা দিয়েই চলে যাবে সে গগন দাসের আলায়। আলা আর কি জন্যে বলা, আলয় এখন পুরোপুরি। আলার কাজকর্ম গিয়ে আড্ডামচ্ছব সেখানে। ওদের আমোদফূর্তি হৈ-হল্লা—আর জগা দেখ কথার দোসর পায় না একলা ঘরের মধ্যে। পায়ে পায়ে সে রাধেশ্যামের বাড়ি গেল।

আছ কেমন রাধে?

আলার দিক থেকে একটু বুঝি খোলের আওয়াজ আসছিল, রাধেশ্যাম উৎকর্ণ হয়ে ছিল সেদিকে। জগন্নাথের গলা শুনে চকিতে ফিরে তাকিয়ে আঃ-ওঃ করতে লাগল। তারই মধ্যে টেনে টেনে বলে, ভাল নয় গো বিশ্বাস ভাই। সেই একদিন ছুটোছুটি করে রাগের বশে ব্রাহ্মণ নির্যাতন করে পায়ের দরদ বড্ড বেড়ে গেল। তার উপরে বউ জবরদস্তি করে দুটো দিন আবার জাল ঘাড়ে দিয়ে পাঠাল।

ব্রাহ্মণ না কাঁচকলা! পৈতেয় বামুন হয় না। একটা শত্রু নিপাত হল, আর একটা ঘাড়ের উপর চেপে রয়েছে। এরা কবে বিদায় হবে, কালীতলায় ঢাক-ঢোলে পুজো দিয়ে মানত শোধ করে আসব।

রাধেশ্যাম ঘাড় নাড়ে: না বিশ্বাস ভাই, মিছামিছি রাগ তোমার চারুবালার উপর। সকলে যায়, তুমি তো একদিন গেলে না। গিয়ে আগে নিজের চোখে দেখ—

জগা বলে, যা শুনছি তাতেই আক্কেল-গুড়ুম হয়ে যায়। দেখবার আর সাধ থাকে না। থুতু ফেলবার উপায় নেই, থুতু নাকি গিলে ফেলতে হবে। বিড়ি খেয়ে গোড়াটুকু হাতের মুঠোয় ধরে বসে থাক, নয় তো উঠে ফেলে দিয়ে এস সেই বাঁধের ধারে। জোরে হাসবে না, কথাবার্তা হিসেব করে বলতে হবে। পাড়ার যত মরদ সব ভেড়া হয়ে গেছে। ছুঁড়ি কামরায় বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাসন করে যেমনটা বলবে ঠিক তেমনি করতে হবে।

রাধেশ্যাম হেসে উঠে বলে, পরের মুখে ঝাল খেয়েছ তুমি! চোখে দেখে তারপরে যা বলবার বোলো। পচা-মাছের গন্ধে ভরা সে পুরানো জায়গা আর নেই, একবারে ভোল পালটেছে। শুধু জায়গা কেন, মানুষগুলোও। বড়দা অবধি যেন আলাদা এক মানুষ। ধবধবে গেঞ্জি গায়ে, পান খেয়ে মুখ রাঙা, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বড়দা। অভ্যেস সকলের ভাল হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, গিয়ে দেখ একদিন। হাতে ধরে বলছি বিশ্বাস ভাই।

জগা বলে, যাব বই কি! গিয়ে পড়ে বাবুইয়ের বাসা ভেঙে দিয়ে আসব।

বলতে বলতে বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে: আমার ডান-হাত বাঁ-হাত হল বলাই আর পচা—হাত দুখানা মুচড়ে ভেঙে ষোলআনা নিজের করে নিয়েছে। ঘরের মধ্যে একটা কথা বলার দোসর পাইনে। ও ছুঁড়িকে সহজে ছাড়ব? কুলো বাজিয়ে বিদেয় করে দেব আমাদের বাদা অঞ্চল থেকে।

গজরাচ্ছে কেউটেসাপের মতো। রাগের ক্ষান্তি হয় না। বলে, তুমি এক দৈত্য মানুষ—নিজের বউ পিটিয়ে তুলো-ধোনা কর—ও মেয়ের কাছে গিয়ে কেঁচো। হাত ধরে তুমি ওর ওকালতি করছ। খবর কোনটা রাখিনে? পা ভেঙে পড়েছিলে সেই খোঁড়া পায়ে গড়াতে গড়াতে ওদের ওখানে গিয়ে উঠতে। তোমার বউ তাই নিয়ে ক্যারক্যার করে, খেউড় গায়—ঘরের চালে কাক বসতে দেয় না।

রাধেশ্যামও চটেছে: ক্যারক্যার করে বুঝি সেইজন্যে? না জেনেশুনে তুমি এক একখানা বচন ঝেড়ে বোসো। দুই দিন জালে

গিয়ে দু'গণ্ডা কুচো-চিংড়িও আনতে পারিনি, সেইজন্যে চেঁচায়। লোভী মেয়েমানুষ। কুকুরের মুখে মাংস ছুঁড়ে দিলে ঘেউ-ঘেউ বন্ধ, ওদের সামনেও তেমনি পয়সা ছুঁড়ে দিলে চেঁচানি থামে। সেটা পেরে উঠিনে—অনেকদিন শুয়ে বসে থেকে অভ্যাস ছেড়ে গেছে। গতরও নেই। চৌরস বাঁধের উপরেই এক পা হাঁটতে চিড়িক মেরে ওঠে, ঘাঁতঘোঁত বুঝে ভেড়ীতে জুত করে জাল ফেলি কেমন করে? মাগি তা বুঝবে না, আজে বাজে নানান কথা তুলে ঝগড়া করে মরে।

জগা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, বাড়ি যে একেবারে চুপচাপ! বউ কোথায় গেল তোমার?

গেছে ঐ নতুন আলায়। ছেলে ঘুম পাড়িয়ে আমায় পাহারায় রেখে সে গিয়ে মচ্ছবে বসেছে।

কী সর্বনাশ! অ্যাঁ, অন্নদাসী অবধি ভক্ত হয়ে গেল?

রাধেশ্যাম বেজার মুখে বলে, ভক্ত না আরো-কিছু! হিংসে—বুঝতে পারলে না? আমি কখনো কখনো গিয়ে বসতাম, সেইটে আর হতে দেবে না। আগে থেকে ঘাঁটি করে বসে আছে। কেষ্টকথায় মন বসাবে হাড়বজ্জাত ঐ মেয়েমানুষ? তবে একটা ভাল—সমস্তটা দিনের পর বাড়ি এইবারে ঠাণ্ডা। দিব্যি শান্তিতে আছি একলা মানুষ।

জগা বলে, তুমি তো জালে বাচ্ছ না রাধে। জালগাছটা দাও দিকি।

রাধেশ্যাম অবাক হয়ে বলে, জালে তোমার গরজ কি জগা?

বাইব, কী আবার! পারিনে ভাবছ? দুনিয়ায় হেন কর্ম নেই, তোমাদের জগা বিশ্বাস যা পারে না। মাছ-মারার কাজ কত করেছি! যতই হোক, কাজটা চুরি-ছ্যাঁচড়ামি তো! এখন তাই আর ইচ্ছে করে না।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে রাধেশ্যাম বলে, জগা তুমি ভটচাজ্জি হয়েছ। পেটে জুত থাকলে সবাই হয়'ওরকম। মাগি এদ্দিন চাট্টি চাট্টি ভাত এনে দিত আলা থেকে—আমিও খুব সাচ্চা হয়ে ছিলাম। এখন ভাত নেই—সেই জন্যে ভোল পালটাবার দরকার। কিন্তু পেরে উঠছি নে। পা-খানা খারাপ। পা যদিই বা ভাল হয়ে যায়, অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। জাল ফেলতে গা ছমছম করে। সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

জগা দেমাক করে বলে, আমার তো অভ্যাসই মোটে নেই। তবু কিছু না কিছু হবে। জাল তো নিয়ে যাচ্ছি, দেখো।

যারা তুমি যেখানে সেখানে জাল ফেললেই হল না। সমস্ত পরের জায়গা—এ-লোকের ভেড়ি নয় তো ও-লোকের ভেড়ি। কোথায় ফেলবে, পাহারা কোন দিকে কমজোরি—আগের থাকতে সমস্ত জেনে বুঝে নিতে হবে। দিনমানে ভালমানুষ হয়ে ঘোরাঘুরি করতে হয়। গতিক বুঝে নিতে দুটো-তিনটে দিন লেগে যায় অন্তত। আর তুমি তো কোন দিন ওমুখো হও নি, পয়লা দিনেই জালগাছটা আক্কেলসেলামি দিয়ে শুধু-হাতে আসবে।

জগা রাগ করে বলে, জাল কেড়ে নেয় তো জরিমানার পয়সা দিয়ে খালাস করে এনে দেব। ছিঁড়ে যায় তো নিজ খরচায় মেরামত করে দেব। মাছ সমস্ত বড়দার খাতায় উঠবে, তার অর্ধেক বখরা হিসেব করে পয়সাকড়ি নিজের হাতে গণে গেঁথে নিয়ে আসবে। এই চুক্তি। এর উপরেও মনে সন্দ থাকলে কাজ নেই। ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি বল। অন্য কোথাও চেষ্টা দেখি গে।

এত সুবিধা আর কোথায়? রাধেশ্যাম জাল দিয়ে দিল। অন্নদাসীর গতর যতদিন আছে, দুবেলা দু-পাথর যেমন করে হোক জোটাবেই। তার উপরে হাতে-গাঁটে কিছু যদি নগদ মেলে, সেটা রাধেশ্যাম অন্যভাবে খরচ করবে।

বলে, জাল নিয়ে যাও জগা। একটা কথা, বখরা আমি নিজে আনতে যাব না। তোমার উপর ধর্মভার, চোরাগোপ্তা তুমি এসে দিয়ে যাবে। মাগি হল চিলের বেহদ্দ। টের পায় তো ছোঁ মেরে সমস্ত নিয়ে নেবে। আমার ভোগে হবে না।

জাল নিয়ে বেরিয়ে এসে তখন খুব বড় ভাবনা ঐ যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে রাধেশ্যাম—বেকুব হবার ভয়, ধরা পড়ে আহাম্মক বনে যাওয়ার ভয়। জাল ফেলতে জানে সে ঠিকই। অনেক বছর জাল ফেলে নি, তা হলেও ভরসা আছে, সুতোয় আর কাঠিতে জড়িয়ে গিয়ে আনাড়ির হাতে যেমন লাঠির মতন সোজা হয়ে জাল পড়ে সে অবস্থা হবে না। জায়গা ঘিরে গোল হয়েই পড়বে। কিন্তু ফেলে কোন জায়গায়? যেখানে সেখানে ফেললেই মাছ পড়ে না। কোন ঘেরিতে কি রকম পাহারা, তারও কিছু আন্দাজ নেই। রাধেশ্যাম যে ভয় করেছে—হয়তো বা ধরাই পড়ে গেল। জগন্নাথ বিশ্বাসকে ধরে ফেলেছে, বাদা অঞ্চলে এর চেয়ে বড় খবর কি? জঙ্গলের মধ্যে এত কাল চরে বেড়াচ্ছে—সরকার বাহাদুর এত নৌকো মোটরলঞ্চ মানুষজন পিটেল-পুলিশ নিয়েও তার গায়ে হাত ঠেকাতে পারে নি। আর এখানে কাঁকা ঘেরির এলাকায় পাঁচ-দশটা মানুষ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে—তারা ধরলে তো মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

জাল কাঁধে নিয়ে জগা হন হন করে চলেছে রাস্তা ধরে। কুমিরমারি থেকে নতুন যে রাস্তা আসছে। নতুন মাটি ফেলেছে—আর ঐ চারু মেয়েটার অত্যাচারে কিছু অন্যমনস্কও বটে জগা—হোঁচট লাগে বারম্বার।

তা হোক, রাস্তা তবু সরকারি জায়গা। হাতে তুলে জাল নাচিয়ে শব্দসাড়া করে রাস্তা ধরে যতদূর খুশি যাও, কারও কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই। বড় বড় মেছোঘেরি ডাইনে বাঁয়ে, রাত্রে আজ জোর হাওয়া দিয়েছে, ছলছল করে জল এসে লাগে রাস্তার নতুন মাটির গায়ে। আঘাতে আঘাতে ফেনা উঠছে জলে। জলের উপর ঢেউ-লাগা সাদা ফেনা আবছা আঁধারে বেশ নজরে আসে। জল অগভীর—জলের মধ্যে মাছ। অনেকবার ঝোঁক হয়েছে, কোন এক দিকে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দেয় এক খেওন। কিন্তু খেওনের জাল জল থেকে টেনে টেনে তুলছে—যদি সেই সময় পাহারার মানুষ গেঁয়োবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে খপ করে জালের মুঠো চেপে ধরে! বড্ড অপমান।

এগিয়েই যাচ্ছে। যতদূর সম্ভব চেনা-জানার চৌহদ্দি যাবে ছাড়িয়ে। মাঝে মাঝে জঙ্গল—হাসিল হয় নি এখনো। হয়তো করবেই না হাসিল, ইচ্ছে করে রেখে দিয়েছে। ধানকরের চেয়ে জলকরে রোজগার বেশি—যদি অবশ্য ঠিক মতো মাছ চালানের ব্যবস্থা করা যায়। বনকর আরও ভাল। রোজগারে জলকরের মতন না হোক—একটা সুবিধা, পয়সা খরচ করে বাঁধ বাঁধতে হয় না। বাঁধ বেঁধে 'কখন ভাঙে' 'কখন ভাঙে' করে শঙ্কিত থাকতে হয় না অহরহ। ক্ষেতে ধানের চারা লাগানো কিম্বা ঘেরিতে চারা-মাছ তোলার বাবদে পয়সা খরচ করতে হয় না। কখনো জলকর কখনো বা বনকর দু'-পাশে ফেলে জগা নিশিরাত্রে নতুন রাস্তা ধরে চলেছে।

ধবধবির খাল—পুল এখনো বানানো হয় নি। ইঁট এনে ফেলেছে, পুল গাঁথা শুরু হয়ে যাবে খুব শিগগির। এমনি আরও তিন-চারটে পুল বাকি, বাঁশের সাঁকো বানিয়ে পারাপারের কাজ চলছে। ধবধবিতে এসে জগার খেয়াল হল অনেকটা দূর এসে পড়েছে। খাল পার হয়ে গিয়েই, মনে পড়ছে, মেছোঘেরি একটা। যা হবার হোক, ঐ ঘেরিতে কপাল ঠুকে দেখা যাবে। সত্যিই তো, সারা রাত্তির ধরে হাঁটবে নাকি? হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে সেই কুমিরমারি অবধি?

সাঁকোয় উঠবে, খালের পাড়ে গোলবনের ভিতর কি নড়ে উঠল। কুমির—কুমির নাকি? বাঁশের উপর মাঝামাঝি জায়গায় দ্রুত চলে এসেছে। দাঁড়িয়ে পড়ল চুপচাপ সেখানে। বাঁশ মচমচ না করে। অপেক্ষা করছে কোন জন্তু বেরিয়ে আসে ফাঁকায়। তারপরে সাঁকো পার হয়ে ছুটে পালাবে, অথবা এপারে ফিরে মাটির ঢিল ও বন-কাটা গরানের ছিটে নিয়ে রণে প্রবৃত্ত হবে—সে বিবেচনা তখনকার।

বেরুল জন্তুটা গোলবনের ভিতর থেকে। কুমির নয়, বাঘ নয়, শুয়োর নয়, এমন কি মেছো-ঘড়েল নয়—মানুষ একজন। সঙ্গে তার বেশ বড় সাইজের মাছের খালুই। খালুই হাতে করে নেয় নি। কাঁধের উপর লাঠি দিয়ে তারই ওদিকে পিঠের গায়ে ঝোলানো। বোঝা যাচ্ছে তবে তো চাঁদ, মাছে ভরতি তোমার খালুই। ভরতি এতদূর যে হাতে ঝুলিয়ে নিতে পার নি, কাঁধের উপরে ঠেকনো দিয়ে নিতে হচ্ছে।

রাস্তায় উঠবে মানুষটা, জলজঙ্গল ভেঙে সোজা আসছে। জগারও অতএব খাল পার হওয়া ঘটল না, ফিরে এসে আড়ালে-আবডালে টিপি টিপি এগোচ্ছে মানুষটার দিকে। একটা ঝোপও পাওয়া গেল, ঘাপটি মেরে আছে সেখানে। যেই মাত্র মানুষটা রাস্তায় পা দিয়েছে, জগা নাকি সুরে বলে, চাঁটি মাঁছ দেঁ—

মাছের উপর সকলের লোভ। বনকরের বাবু, ঘেরিওয়ালা, নৌকোর মাঝি, ডাকপিওন, ডাক্তারবাবু, গুরুমশায়—মাছের নামে সবাই হাত পাতে। মানুষ ছাড়া এমন কি বাদাবনের ভূত-দানো ওঁরাও। সেইজন্য রাত্রিবেলা মাছ হাতে নিয়ে মানুষ পারত পক্ষে একলা যাতায়াত করে না।

মাঁছ দেঁ আঁমায়—খাঁব।

চমক খেয়ে মানুষটা ঝোপের দিকে তাকায়। হো-হো করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে জগন্নাথ তার হাত চেপে ধরে।

আমরা মাছ-মারারা সেই কোন সন্ধ্যে থেকে জাল নিয়ে চক্কোর দিচ্ছি—কোন ঘেরিতে কখন খেওন দেওয়া যায়। তুমি বাবা ওস্তাদ সিঁদেল—টুক করে কার তৈরি রুটি ফয়তা দিয়ে এলে বল তো?

মানুষটা চটে ওঠে: ওসব বল কেন? তোমরাই বা কোন সাধুমোহান্ত শুনি? তুমি যা, আমিও সেই। দু-জনেই মাছের ধান্দায় ঘুরছি।

জগা বলে, না সাঙাত, বিনয় কোরো না। এক খেওন জাল ফেলনি, জালই নেই তোমার হাতে, গায়ে ফুঁ-দেওয়া কাজকর্ম। মাছের ভারে পিঠ কুঁজো হয়ে চলেছ। আর আমাদের দেখ, কালঘাম ছুটিয়ে জাল ফেলে ফেলে মুনাফার বেলা অষ্টরম্ভা। বলছ কিনা, তুমি যা আমরাও তাই। অনেক উপর দিয়ে যাও তুমি আমাদের।

মানুষটা দেমাক করে: গায়ে ফুঁ-দেওয়া কাজ হলে সবাই ঝুঁকত এই দিকে। কষ্ট করে জাল ফেলতে যেত না কেউ। বুকের বল চাই রে দাদা, যেমন তেমন লোকের কর্ম নয়। টের পেলে গাঙের মধ্যে ধরে চুবানি দেবে। গলা টিপে মেরে ফেলে ভাসিয়েও দিতে পারে জোয়ারের জলে; টানের সঙ্গে ভেসে ভেসে লাস চলে যাবে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক। তক্কে তক্কে থাকতে হয় সেই জন্যে। পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বসে মশার কামড় খাও, আর নজর পেতে রাখ। নৌকো কাছি করল এইবারে। বেউটি-জাল নামাল জলে। গাঁজা খাচ্ছে হাত-ফিরতি করে—এ-হাত থেকে ও-হাত, ও-হাত থেকে সে-হাত। পাঁচবার সাতবার চলল এইরকম। তারপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে গল্প চলল, শেষটা ঝিম হয়ে আসে। তৈরি হও এবারে,—জলে নেমে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে এগোও। জলে এতটুকু তোলপাড় নেই—ভাঁটার টানে যেমন একটানা নেমে যাচ্ছে তেমনি। জালের মাথা উঁচু করে সাবধানে তুলে ধর, খালুই পাতো ঠিক তার নিচে, ধারাল ছুরি দিয়ে পোঁচ লাগাও জালে এইবার। খলবল করে মাছ এসে পড়বে খালুইতে, কপালে থাকে তো ভরে গিয়ে ছাপিয়ে পড়বে। তিলেক আর দেরি নয়—ফেরো, ঠিক যেমন কায়দায় এসেছিলে। ফাঁকায় যাবে না, জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে এগুবে। হাতের নাগালে পেলে বন-কাটা হেঁসো-দা দিয়ে কাঁধের উপরের মুণ্ডখানা নামিয়ে নেবে। সড়কির নাগালে পেলে এ-ফোড় ও-ফোড় করবে। এত কষ্টের কাজ—আর তুমি বল গায়ে-ফুঁ দিয়ে বেড়ানো!

জগা বলে, মাছ কি করবে—বেচবে তো নিশ্চয় এত মাছ? মহাজন কে তোমার, কোন খাতায় নিয়ে তোল? [ক্রমশঃ।

স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে সুন্দর জিনিস

কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় ব'লে ন্যাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লীয়ারটোন সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক রকমের পাওয়া যায় যে আপনি মনের মতো জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন!
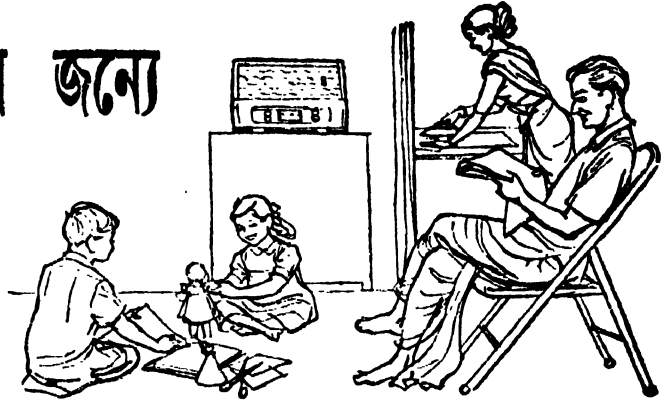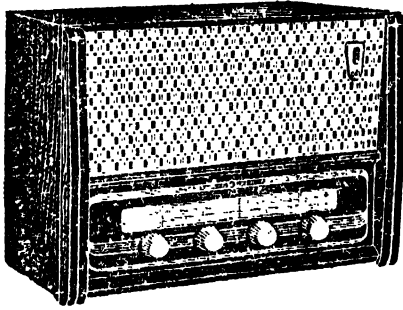
ন্যাশনাল-একো রেডিও

ন্যাশনাল-একো-মডেল এ-৭২২ : এসি।
৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড; কাজে চমৎকার; এই শ্রেনীর রেডিওর মধ্যে সেরা; 'মনসুনাইজড্'। দাম ৩৩৫৲ নীট
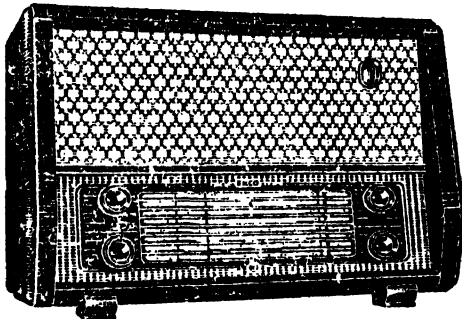
ন্যাশনাল-একো মডেল এ-৭৩১ : এসি।
'নিউ প্রমুখ' ৭ ভালভ; ৮ ব্যাণ্ড। এর শব্দগ্রহণশক্তি অসামান্য। স্বরনিয়ন্ত্রিত আর এফ- স্টেজ সংযুক্ত, এছাড়া এক্সটেনশন স্পীকার ও গ্রামোফোন পিক্-আপের বন্দোবস্ত আছে। 'মনসুনাইজড্'
দাম ৬২৫৲ নীট

Kleertone ক্লীয়ারটোন বাতি ও সরঞ্জাম

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সঙ্গে সঙ্গে গরম বা ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। সাইজ : ৩.৫ ও ৮ গ্যালন। এসিতে চলে।
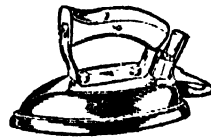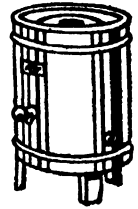
ক্লীয়ারটোন ঘরোয়া ইস্ত্রি
ওজন ৭ পাউণ্ড; ২৩০ ভোল্ট, ৪৫০ ওয়াট; এসি/ডিসি। ব্যাকালাইটের হাতল।

ক্লীয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ
দুটো হট্‌প্লেট ও উনুন আছে—প্রত্যেকের আলাদা কন্ট্রোল। সর্বোচ্চ লোড ৫,৫০০ ওয়াট।
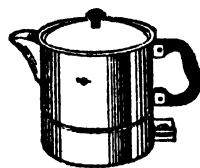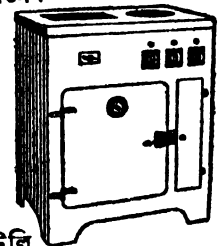
ক্লীয়ারটোন বৈদ্যুতিক কেট্‌লি
৩ পাইট জল ধরে; ক্রোমিয়ম কলাই করা। ২৩০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এসি/ডিসি।

ক্লীয়ারটোন টুইন্ হট্ প্লেট
রান্নার জন্যে। প্রতি প্লেটের আলাদা কন্ট্রোল। ২৩০ ভোল্ট—এসি/ডিসি। সর্বোচ্চ লোড ৩.৫০০ ওয়াট।
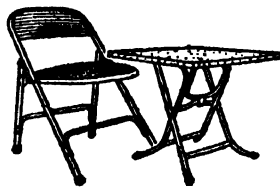
ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং স্টীল চেয়ার ও টেবিল
নানা রঙের পাওয়া যায়। আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী। গদি মোড়া কিংবা গদি ছাড়া পাওয়া যায়।

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড
৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১।১৮, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২ • ফ্রেজার রোড. পাটনা • ৩৬।৭৯, সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর • যোগধিয়ান কলোনি, চাঁদনি চক. দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দ্রাবাদ

GRA 9022/II

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কুড়িটি বছরের সীমানা পেরিয়ে আসার পরে আজও, রাজনর্তকীর কথা মনে পড়লে মনের মধ্যে জেগে ওঠে বিরাট বিস্ময়। পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি রাজনর্তকী। তিনটি ভাষায় তোলা হয়েছিল, বাঙলায়, হিন্দীতে ও ইংরিজীতে, ইংরিজী ভাষায় তোলা ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল The Court Dancer. হিন্দীতে তোলা ছবিটির অবশ্য নতুন কোন নাম দেওয়া হয় নি, অবাক হওয়ার কারণ—এই

সাধনা বসু

পূর্ণ দৈর্ঘ্য ত্রিভাষী ছবিটির নির্মাণকার্য শেষ হতে এত অল্প সময় লেগেছিল যা কল্পনা করা যায় না। যথেষ্ট নিশ্চয়তার সঙ্গে এ কথা আমি বলতে পারি যে আপনারাও সময়ের পরিমাণ শুনলে তার আশাতীত অল্পতা সম্বন্ধে কম বিস্মিত হবেন না। বিশ্বাস করুন—মাত্র ছ'টি মাস লেগেছিল এই পূর্ণ দৈর্ঘ্য ত্রিভাষী ছবিটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হতে। এক বছর নয়, দশ মাস নয়, আট মাস নয় মাত্র ছ'মাস, একটি পুরো বছরের অর্ধাংশ। বলুন, ভাবা যায় কি কিন্তু তবু এই অসম্ভবও সম্ভবপর হয়েছে। অবশ্য আরও গভীরভাবে চিন্তার সমুদ্রে অবগাহন করলে দেখা যায় যে হবে নাই বা কেন, প্রতিটি কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম, অকৃত্রিম সহানুভূতি, আন্তরিক সহযোগিতা কি কোন মূল্যই বহন করে না? নিশ্চয়ই করে—তা যে মূল্যহীন নয় তার জাজ্বল্য প্রমাণ রাজনর্তকী। এ বিষয় নিয়ে আমরা এখনো যথেষ্ট গর্ব করতে পারি যে যাদের সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিচালনার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল, ছবির নির্মাণ-কার্যে যাদের পরিশ্রমের চিহ্ন জড়িয়ে আছে তাঁদের কাছ থেকে আমরা সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছবির নির্মাণকার্য সমাপনের এই-ই হচ্ছে মুখ্য কারণ, প্রকৃত রহস্য আসল চাবিকাঠি।

ছবির নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এটি এক নৃত্যপ্রধান চিত্র, স্বভাবতঃই আমার করণীয় অংশ ছিল অনেক বেশী এবং ছবিতে সর্বাঙ্গে আমার করণীয় কর্মের পরিমাণও যথেষ্ট। কেরল কলামণ্ডলম (Poet Vallathole's School of Dancing in South India) থেকে জয়শঙ্করকে এ জন্যে গুরুরূপে আহ্বান জানানো হল, সেনারিক রাজকুমারও গুরুরূপেই এলেন মণিপুর থেকে। মণিপুরেরই এক রাজনর্তকীকে কেন্দ্র করে গল্পাংশ রচিত অর্থাৎ কাহিনীর পটভূমিকা মণিপুর, সেই কারণেই সাজসজ্জা সমস্তই সরাসরি মণিপুর (ইম্ফল) থেকে আনানো হ'ল। রাজনর্তকী যখন নির্মীয়মান, সে সময় আমার নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না। সাজসজ্জার পরিকল্পনায়, ব্যালের শিক্ষাদানে, নিজের অভিনীতব্য ভূমিকায় মহড়া দেওয়ার মধ্যে দিয়েই সময় এগিয়ে যেত জলস্রোতের মত, কোথা দিয়ে কখন যে একটি একটি করে দিন এগিয়ে যেত তা ভাবতে পারা তো দূরের কথা, সে কথা চিন্তা করার মতও সময় মিলত না। তবে এ কথা সত্য যে, এই ব্যস্ততার মধ্যে ছিল এক বিরাট আনন্দ। এই পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দের অংশও তো কম ছিল না, প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছি ঠিকই, নাওয়া-খাওয়ারও সময় পাইনি, নিয়মের জীবন তো প্রায় অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, "অবসর" বা "বিরতি"—এই জাতীয় শব্দগুলি বলতে গেলে আমাদের মন থেকে তখন একেবারে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু তবু সেই সময়ে সব কিছু ভুলে আমাদের দিন, আমাদের রাত, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, উদ্যম, শক্তি আমরা পুরোপুরি মিশিয়ে দিয়েছি ছবির কাজে—তার প্রধান কারণ তখন আমাদের চোখের সামনে ছিল বুকভরা আশা, অনন্ত স্বপ্ন অপরিমিত কল্পনা—এই আশার, এই স্বপ্নের, এই কল্পনার প্রাচুর্য আমাদের জুগিয়েছে মুঠো মুঠো প্রেরণা, অদম্য কর্মশক্তি, এগিয়ে যাওয়ার মা ভৈঃ বাণী।

আমার অভিনয়ের দিকেও কম দৃষ্টি ছিল না, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং পৃথ্বীরাজ কাপুরের মত সুদক্ষ অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে আমা

অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তাঁদের সম্মান, তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের প্রতিভার গগনস্পর্শী। অভিনয়কালে এ বিষয়ে আমার নিজেকে সম্পূর্ণ সচেতন রাখতে হয়েছিল। বাংলা এবং হিন্দী রাজনর্তকীতে অহীন্দ্র চৌধুরী প্রধান পুরোহিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দি কোর্ট ডান্সারে ঐ ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল মিঃ জাল খাম্বাটাকে। হিন্দী রাজনর্তকী এবং কোর্ট ডান্সারের নায়কের চরিত্রে দেখা দিয়েছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, বাংলা রাজনর্তকীতে ঐ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রকাশ, সেনাপতির ভূমিকায় নবাগত ক্যাপ্টেন কে, এল, থাপানও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। থাপান ছ' ফুটেরও বেশী লম্বা ছিলেন, হিন্দী ছবিতে সেই তাঁর প্রথম অবতরণ। থাপানের দৈহিক আকৃতির এই অসাধারণ উচ্চতায় আমাকে কি রকম মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল সে সম্বন্ধে বেশ একটি মজার গল্প মনে পড়ছে। হাস্যরসের দিক দিয়ে এই গল্পের আবেদন অল্প বলে মনে হয় না। ছবিতে আমি থাপানকে চড় মারছি এই রকম একটি দৃশ্য আছে, কিন্তু মুস্কিল হল অত উঁচুতে আমার হাত পৌঁছোয় না। শেষে আমাকে একটি টুলের উপর দাঁড় করিয়ে ঐ দৃশ্যটা গ্রহণ করা হল। ছবির মধ্যে সেই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল—কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ও রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের চিত্রায়ণ ষ্টুডিওর মধ্যে রীতিমত এক হাস্যকৌতুকময় পরিবেশ গড়ে তুলল। থাপানের দৈহিক উচ্চতার মাত্রাতিরিক্ততাই এর জন্যে দায়ী নয় কি ?

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যেও কয়েকজনের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী নিশ্চয়ই রাখে। হিন্দী রাজনর্ত্তকী এবং কোর্ট ডান্সারে রাজার চরিত্র রূপায়ণের ভার গ্রহণ করেছিলেন মিঃ নিয়ামপালী (Nyampally), লেখক শ্রীমন্মথ রায় স্বয়ং রাজার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাংলা রাজনর্ত্তকীতে। শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তও উচ্চাঙ্গের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। কোর্ট ডান্সারের এবং হিন্দী রাজনর্তকীর সংলাপ রচনার ভার গ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে বিখ্যাত লেখক শ্রীডি, এফ, কারাকা এবং বর্তমানকালের বিশিষ্ট প্রযোজক মিঃ ডব্লিউ, জেড, আমেদ কোর্ট ডান্সারের আন্তর্জাতিক পরিবেশন স্বত্ব নিয়েছিলেন কোলাম্বিয়া পিকচার্স, এবং রাজনর্ত্তকী (বাংলা ও হিন্দীর) পরিবেশন স্বত্ব নিয়েছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত এম, বি, বিলিমোরিয়া।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন আঙ্গিকে মিনার্ভার পুনরুদ্বোধন

মিনার্ভা থিয়েটারের পুনরুত্থানের বারতায় নাট্যামোদীদের সঙ্গে আমরাও যথেষ্ট আনন্দবোধ করছি। দীর্ঘকাল পরে লিটল্ থিয়েটার দলের সুপরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটার দর্শক-সাধারণকে অভিবাদন জানালেন ওথেলো ও ছায়ানটকে কেন্দ্র করে। অভিনয়-নিপুণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পিগণের পুরোভাগে আছেন উৎপল দত্ত এবং শ্রীমতী শোভা সেন। মিনার্ভা থিয়েটার বাঙলার গৌরব! গত শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অসংখ্য নাটক উপহার দিয়ে এসেছে এই রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন বহু দিকপাল শিল্পী, যাঁদের কল্যাণে বাঙলার অভিনয়-জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বহু গুণ। বাঙলাদেশের নাট্যাভিনয়ের উন্নতিকল্পে সাংবাদিক ও

শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের পূর্বসূরী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অবদান এবং নাটকাভিনয়ের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষণার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। মাতামহের নাট্যানুরাগ দৌহিত্রের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। প্রসন্নকুমারের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকলার প্রতি অনুরক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন মিনার্ভা থিয়েটার। তার পর বহু জনের অধিকারে এসেছে মিনার্ভার মালিকানা। কিন্তু মিনার্ভার সৃষ্টির এই হ'ল আদি ইতিহাস। বর্তমান পরিচালকগোষ্ঠীর এই নতুন প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই কামনাই আমরা সর্বতোভাবে করি। নাটকের প্রতি এঁদের অনুরাগের কথাও অবিদিত নয়, আজকের দিনে যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে তালে তাল রেখে মিনার্ভাও এগিয়ে যেতে থাকুক, তার জয়যাত্রা হোক অপ্রতিহত, তার নাট্যসম্ভারের আবেদন মানুষের মনে রেখাপাত করুক, তার অতীতের গরিমাকে চোখের সামনে আদর্শস্বরূপ রেখে ভবিষ্যতের জন্যে নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে উঠুক। আজকের জাতীয় জীবনে নাটকের আবেদন অপরিসীম, নাটক সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ, জাতীয় চরিত্র গঠনে নাটকের সহায়তাও অপরিহার্য। বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে, যুগোপযোগী নাট্যোপহার জাতি নিশ্চয়ই সাদরে গ্রহণ করবে—এ বিশ্বাস রাখি।

বর্তমান পরিচালকবর্গ মিনার্ভার নব নামকরণ করতে চেয়েছেন, নটগুরু শিশিরকুমারের নামানুসারে। তাঁদের এই মহৎ সঙ্কল্পের জন্যে আমরা অভিনন্দন জানাই। পরিশেষে উৎপল দত্ত এবং লিটল থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের—তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের জন্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, আমরা সর্বতোভাবে কামনা করি তাঁদের প্রচেষ্টায় সর্বাঙ্গীন সাফল্য।

চলতি ছবির বিবরণী

কলকাতার প্রধান প্রধান চিত্রগৃহগুলিতে যে ছবিগুলি সমারোহে প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে ছবি, কিছুক্ষণ, আম্রপালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছবির কাহিনী সম্বন্ধে পাঠকসমাজকে নতুন করে বলার কিছু নেই। এর কাহিনীর স্রষ্টা বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। ছবির গল্পাংশ মানবীয়তার আবেদনে ভরপুর, এর পটভূমি বর্মা, বর্মার মানুষ, বর্মার সমাজ, বর্মার জীবনযাত্রার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই মর্মস্পর্শী গল্পটি ছায়াচিত্রায়িত হল নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায়। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন আশীষকুমার ও মালা সিনহা, অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায় এবং অন্যান্য খ্যাতিমান শিল্পিবৃন্দ।

কিছুক্ষণেরও গল্পাংশও জন্ম নিয়েছে বাঙলার একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিকের লেখনী থেকে, ছোটগল্প হিসেবে বনফুলের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। কিছুক্ষণ ছোট গল্পটি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। জীবনের হাসি-কান্না, গান, আনন্দ, বেদনভরা বিচিত্রময় রূপ বনফুলের দক্ষ লেখনীর মাধ্যমে সুনিপুণতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। পরিচালনা করেছেন লেখকের অনুজ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। পরিচালক তাঁর পরিচালন-প্রতিভার যথাযথ পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালক ছবিটিকে সব দিক দিয়েই পরিচ্ছন্ন, শোভন ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। বলিষ্ঠ আবেদন সমৃদ্ধ এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন অসীমকুমার ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, গঙ্গাপদ বসু, শিশির বটব্যাল, শোভা প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রে রূপ দিয়েছেন।

বৌদ্ধযুগের এক নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আম্রপালীর কাহিনী। আম্রপালী তৎকালীন সমাজের বিস্ময়, এই সুন্দরী নারী রূপেও যেমন অসামান্যা, নৃত্য প্রভৃতি গুণেও তার যথেষ্ট অধিকার। তাকে পাওয়ার জন্যে বৈশালীর ধনী শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিশেষে তথাগত বুদ্ধের করুণাধারার মধ্যে জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির চাবিকাঠি খুঁজে পায় আম্রপালী। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীতারাশঙ্কর। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রিয়া চৌধুরী, অন্যান্য ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি। অনিল বাগচীর সঙ্গীত পরিচালনা দর্শকচিত্তে যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দ দেয়, গানগুলি উপভোগ্য এবং সুগীত।

নকল 'আকাশ পাতাল', জাল 'খেলাঘর'

বাঙলা সাহিত্যের মহামূল্য কোষাগারে আকাশ-পাতাল একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আকাশ-পাতাল বাঙলাদেশে অতি প্রিয় বহু পঠিত এবং স্বনামধন্য একখানি অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি। প্রভাত মুখোপাধ্যায় নামধারী চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি বর্তমানে একটি ছবি পরিচালনা করছেন, যার নাম দিয়েছে আকাশ পাতাল, এ কথা বলাই বাহুল্য যে আকাশ পাতাল উপন্যাস খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা এত বিরাট যে ঐ নাম শুনলে যে কো ব্যক্তিই প্রাণতোষ ঘটকের আকাশ পাতাল বলেই মনে করবেন এই ধারণা যে আমাদের মিথ্যা নয় তার প্রমাণ বহু ব্যক্তি মহিলা পত্রে বা বচনে লেখককে আকাশ পাতাল চিত্রায়িত হ জেনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এ ধারণাও আমরা করতে পারি ঐ ছবি মুক্তিলাভ করলে বহু জনে তা দেখতে যাবেন পূর্বোক্ত ধারণ বশীভূত হয়েই। বলতে গেলে, প্রাণতোষ বাবুর বিখ্যাত উপন্যা নাম ভাঙ্গিয়ে তার আকাশচুম্বী খ্যাতির সুযোগ সম্পূর্ণরূ গ্রহণ করতে চেয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বইয়ের নাম প্রাণতোষ ঘটককে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, কিন্তু মুক্তিলাভের পর দর্শক জানবেন যে ছবির আকাশ পাতা সঙ্গে এক নামটুকু ছাড়া মূল আকাশ পাতালের কোন নেই অর্থাৎ ব্যবধানটাও আকাশ পাতাল। এই লেখকের একটি উপন্যাস "খেলাঘর" ও অন্যতম। প্রযোজক সরোজ সেন পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের। এমন প্র সত্যিই নিন্দনীয়।

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই এক বিরাট হাসি। শুধু একরাশ হাসি। জীবনের যত ব্যথা ও বেদনা, হাহাকার ও হতাশাকে হাসির তুফানে উড়িয়ে দিতে পারাটাই আজকের দিনে চরম বাহাদুরি!
শ্রেষ্ঠাংশে
ছবি বিশ্বাস • ভানু বন্দ্যোঃ
বাসবী বন্দ্যোঃ (ভানু বন্দ্যোর কন্যা)
প্রেমাংশু • তুলসী চক্রঃ
তপতী • কেতকী
কাহিনী • অবধূত
পরিচালনা • নির্মল দে
সঙ্গীত • নচিকেতা ঘোষ
মেট্রোপলিটন পিকচার্সের
নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে
প্রযোজনা • বি. এল. খেমখা
শ্রী বিষ্ণু পিকচার্স রিলিজ

ভাকরার ভবিষ্যৎ

"বৎসর না ফিরিতেই ভাকরা বাঁধে ফাট ধরিয়াছে। আপাততঃ (অবশ্য সরকারী হিসাবে) প্রাণহানি দশ জনের (কেহই মন্ত্রী নহেন) আর আর্থিক ক্ষতি ৫০ লক্ষ টাকার (এক কোটিও নহে)। এখন তদন্তের পালা। সেচ-মন্ত্রী মিষ্টার হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম তদন্ত কমিটির জন্য—Bade his messengers ride forth, East west and south and north, To summon his array. নল, নীল, গয়, গবাক্ষ সকলেরই তলব হইয়াছে। এই ১৭০ কোটি টাকার পরিকল্পনার কর্তা আমেরিকান। তিনি এখন আমেরিকায় তাঁহাকে আসিতে তার করা হইয়াছে। আর আসিবেন কয়জন কালা বিশেষজ্ঞ। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন বাঙ্গালীও আছেন—মিষ্টার এ, সি, মিত্র। এই অনুসন্ধান কার্য্যে কয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহার রিপোর্টে কি বলা হইবে—সিমেন্টের পরিবর্তে গঙ্গামৃত্তিকা (অবশ্য নেপালচন্দ্র রায়ের নহে) ব্যবহার করিলে এমন হইয়াই থাকে ?" —দৈনিক বসুমতী।

সখের বিচার

"সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতি দমনে কেন্দ্রীয় সরকার যে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নহেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝেই দুর্নীতি দমন চেষ্টার বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক খবরে জানা গিয়াছে যে, দিল্লী প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে গত মাসে ১৩ জন সরকারী কর্মচারী দণ্ডিত হইয়াছে। একজন আদালতের বিচারে শাস্তি পাইয়াছে, বারো জনকে বিভাগীয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। উচ্চ-নিম্ন সরকারী প্রায় সকল মহলেই যে দুর্নীতির প্রভাব পরিব্যাপ্ত, তাহা দূর করা খুচরা চেষ্টার কর্ম নহে। এখানেও অসতর্ক ব্যক্তিরাই বেশী ধরা পড়ে, কৌশলীদের বহু কৌশল করায়ত্ত। তাহাদের ধরাও যেমন কঠিন, শাস্তি দেওয়া আরও শক্ত। তবু এইটুকুই সান্ত্বনা যে, কেন্দ্রীয় কর্তারা এই ব্যাপারে 'তেজস্ক্রিয়' না হইলেও একেবারে উদাসীন নহেন।" —যুগান্তর।

খাদ্য ও সরকার

"কথা হইল যে, শ্রীজৈন কেবল খাদ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন নাই, তিনি প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার-অনুসৃত খাদ্যনীতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নব-নিযুক্ত খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যনীতির পুনর্বিচার করিতে উদ্যোগী হইবেন কিনা, তাহাই জানিবার বিষয়। খাদ্যশস্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের সর্বস্তরে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় অগ্রসর হইলে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবেন, বর্তমান সঙ্কট তাহার সুনিশ্চিত আভাস দিয়াছে। শ্রীজৈনও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের সর্বস্তরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করিবার সরকারী নীতি অবাস্তব এবং অদূরদর্শী প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব কেন্দ্রীয় খাদ্য-দপ্তরের ভার নূতন মন্ত্রীর উপরে অর্পিত হইলেই মুশকিল আসান হইতে পারে না। নীতিগত ব্যর্থতার ফলে যে ভুলের ফসল পর্বতপ্রমাণ হইয়া খাদ্য-পরিস্থিতিতে স্থায়ী সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে না পারিলে নেহরু সরকার জনসাধারণকে শঙ্কামুক্ত করিতে পারিবেন না। দেশজোড়া দুর্গতির প্রতিকারের উপায় কেবল মন্ত্রী-বদল নয়, বাস্তবনিষ্ঠ নীতি নির্ণয়।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভারত-চীন সম্পর্ক

"আমাদের দেশে এই চীনাবিরোধী কুৎসা যে-পরিমাণে রটিতে পাইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে মার্কিণ-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পুষ্টি লাভ করিতেছে। চীনকে ভারতের শত্রু প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুদ্ধ-জোটটিকে এবং উহাতে সমবেত সরকারগুলিকে ভারতের মিত্ররূপে জাহির করিবার কাজ বেশ সহজ হইয়া আসে। চীনকে ভীষণরূপে চিত্রিত করা গেলে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বার বার যে মার্কিণ-বৃটিশ যুদ্ধ জোট দুইটিকে ভারতের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে উদ্যত বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন সেই জোটকে এবং উহার সরকারগুলিকে পরম সুন্দররূপে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা একটু সহজ হয়। চীনকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, সমাজতন্ত্রের প্রতি, চীনের বিপুল সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলির প্রতি ভারতের মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং সেই পথে চলিবার দুর্বার অনুপ্রেরণা অন্ততঃ ক্ষুণ্ণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাহাদের ক্রীড়নকেরা সেই উদ্দেশ্যেই চীনাবিরোধী কুৎসা ও প্ররোচনার জাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। জানিয়া হউক, অগোচরে হউক ঐ ফাঁদে যিনিই পা দিবেন তিনিই ভারত-চীন মৈত্রী ক্ষুণ্ণ করিয়া যেমন এশিয়ার এবং সারা-পৃথিবীর শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারী হইয়া পড়িবেন, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তেরও হাতিয়ার হইবেন।" —স্বাধীনতা।

ভাকরা বাঁধ

"ভাকরা বাঁধে বিপর্যয় ঘটিয়াছে। উহার জন্য তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই বাঁধটি যাহাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত হইয়াছিল, তাহাদেরই দুই কর্তাকে তদন্ত কমিটির প্রধান পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শুধু ভাকরা বাঁধ নয়, দুর্গাপুরেও সেদিন ভিত্তিতে ফাটল ধরা পড়িয়াছে। উহার জেনারেল ম্যানেজারকে ইহার পর যথারীতি খাতির দেখানো হইয়াছে। এই যে দেশে নিয়ম, যে সব অপদার্থের দোষে কোটি কোটি টাকার প্রজেক্টে ফাটল বাহির হইলেও তাদের যেখানে শাস্তির বদলে পুরস্কার হয়, সে দেশে সব কয়টা প্রজেক্ট সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ গভীরতর হইতে বাধ্য। ভিলাই প্রজেক্টের ভার নিয়াছে রাশিয়ান দল। তাহারা প্রতিটি ছটাক সিমেন্ট, বালি প্রভৃতি নিজেদের ল্যাবরেটরীতে নিজেরা পরীক্ষা না করিয়া কাজে লাগাইতে দেয় না। ডাঃ মেঘনাদ সাহা একবার ঐ রাশিয়ান দলের নেতাকে এত সতর্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক জবাব দিয়াছেন—আমাদের কাজে গলদ বাহির হইলে আমাদের গবর্ণমেন্ট কি করিবে জানেন? দেয়ালের

অত্যাশ্চর্য্য
কাপড় কাচার
পাউডার
Surf
নীল
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!

সামনে দাঁড় করাইয়া সোজা গুলী করিবে। খোসলা, কুনওয়ার সাঁই, করুণাকেতন সেন প্রভৃতির কাজের উপযুক্ত তদন্ত এবং প্রমাণিত অপরাধের কঠোর শাস্তি হইলে অন্ততঃ ভবিষ্যতের প্রজেক্টগুলা রক্ষা পাইত।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রসঙ্গ

"ভারত সরকার পুনর্ব্বাসনের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেছেন ইহা সত্য ; কিন্তু ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে উদ্বাস্তুদের যে দুরবস্থা ছিল, আজও তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা শোচনীয়তর হইয়াছে। এদিকে সরকার চাহিতেছেন যে, ১৯৬১ সালের মধ্যে পুনর্ব্বাসন দপ্তর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, কারণ সরকারের মতে পুনর্ব্বাসনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পুনর্ব্বাসন অফিসগুলির কাজ বিগত এক বৎসর যাবৎ প্রায় বন্ধ আছে বলা চলে, কারণ মাঝে মাঝে যে ঋণ দেওয়া হইত, তাহাও এখন আর তেমন দেওয়া হইতেছে না। শুনা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে সামান্য টাকা ঋণ হিসাবে দিবার জন্য এতদঞ্চলের পুনর্ব্বাসন অফিসগুলিতে দিয়াছিলেন তাহাও সব বণ্টন না করিয়া ৩১শে মার্চ্চে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। অথচ শত শত উদ্বাস্তু দিনের পর দিন ঋণের জন্য ধন্না দিয়াছেন ও দিতেছেন। এই কাছাড় জেলাতেই সরকার অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক স্কীম করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করিয়াছেন। আই-টি-এ স্কীম এবং সি, টি, ও ইত্যাদির কেলেঙ্কারী সকলেরই জানা আছে। জনসাধারণের অর্থ যাহারা এই ভাবে নষ্ট করিয়াছে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইবে কি ? দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ রাখিয়া লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নর-নারীর সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা সরকার অবিলম্বে করুন—ইহাই আজ ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

ঝাড়গ্রামের জনস্বাস্থ্য

"চিকিৎসার জন্য সরকারী ব্যবস্থা রহিয়াছে ২০টি বেডসমন্বিত একটি সদর হাসপাতাল ও একটি ডাক্তার। আউটডোরের রোগী ও হাসপাতালের রোগী দেখা ছাড়া তাঁহার উপর রহিয়াছে জেলখানার ভার ও পোষ্টমর্টমের দায়িত্ব। তাহা ছাড়া পুলিশের সাক্ষীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম। স্বাস্থ্যকেন্দ্র রহিয়াছে ১৩টি, মোবাইল ইউনিট রহিয়াছে ৬টি, কুষ্ঠ ক্লিনিক রহিয়াছে ২টি, মহকুমায় এক্সরের ব্যবস্থা নাই, অক্সিজেনের ব্যবস্থা প্রায় থাকে না, রক্ত, মল, থুতু পরীক্ষার সরকারী কোন ব্যবস্থা নাই। কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া আমরা সংক্ষেপে কেবল তথ্যগুলি প্রকাশ করিলাম। খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের শেষ হইতেছে। সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রসারণ ইত্যাদি উন্নয়ন চলিতেছে। কাজেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে আমাদের বলিবার আর কিছু নাই, কেবল এই কথাই বলা চলে, 'মন্বন্তরে মরি নাকো মোরা মারী নিয়ে ঘর করি।' কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য লইয়া সরকারের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তবু অন্ধ জনগণ নাচার। তাই কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

বখাটে ছেলের উৎপাত

"সম্প্রতি বার্ণপুরে এক শ্রেণীর বখাটে ছেলের উৎপাতে স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিগণ উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকাশ যে কতিপয় যুবক, অধিকাংশই অবাঙ্গালী, স্কুল-কলেজগামী মেয়েদের যাতায়াতের পথে, গাছের উপর ইত্যাদি স্থানে ওৎ পাতিয়া থাকে এবং মেয়েরা রাস্তা পার হইবার সময় ছোট ছোট ঢিল, কাগজের টুকরো ছুঁড়িয়া, শিস দিয়া অশ্লীল মন্তব্য নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিব্রত করিয়া তুলে। ইহাঁরা স্বচ্ছল গৃহস্থের সন্তান, বাপের হোটেলে অন্ন ধ্বংস করিয়া বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা করিয়া বেড়ায়। যুবকদের চরিত্র-ভ্রংশতার যে কুৎসিত চিত্র ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। এখনি ইহার প্রতিবিধান না করিলে সমাজজীবনকে ইহা কলুষিত করিয়া তুলিবে। কলিকাতায় ব্যাড কণ্ডাক্টের জন্য যে শাস্তিমূলক আইন প্রচলিত আছে তাহা এখানেও অবিলম্বে প্রযুক্ত হওয়া দরকার। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হইবেন।"

—মালঞ্চ (আসানসোল)।

চালের চাপ

"সদর মহকুমার আংশিক বরাদ্দ ব্যবস্থায় যে চাউল বরাদ্দ আছে তাহার দশ আনা অংশ সহরের এক লক্ষ লোকের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাকী ছয় আনা অংশ পল্লী অঞ্চলের অর্থাৎ ছয় লক্ষ লোকের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, সহরের লোকের ক্রয়ক্ষমতা অধিক। তদুপরি বহুলোক আছেন যাঁহারা খোলাবাজার হইতে অধিক মূল্য দিয়া চাল খরিদ করিলে কোন অসুবিধা ভোগ করিবেন না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের কথা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। তাহাদের পক্ষে খোলাবাজার হইতে চাউল সংগ্রহ করা একান্ত কষ্টকর। এই অসম ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মহকুমা শাসক এদিকে দৃষ্টি দিলে এবং পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিলে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। ইহার উপর আর একটি কথা বলিবার আছে। পল্লী-অঞ্চলে কেবলমাত্র 'ক' শ্রেণীর লোকেরা এই বরাদ্দ ব্যবস্থার সুযোগ পাইতেছে অথচ সহরাঞ্চলে কোন ব্যতিক্রম নাই। পল্লী-অঞ্চলের সকলেই যাহাতে চাল পায় তাহার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।"

—বর্দ্ধমানবাণী।

খাদ্যকথা অমৃত সমান

"ভবিষ্যৎ বংশধর যখন ইতিহাসের পাতায় দেখিবে যে সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীদের হাতে সরকারী অর্ডিনান্সের চরম পতন হইয়াছে—এই সরকার সমাজের নাম কি ভাষায় উল্লেখ করিবে তাহা কে বুঝিতেছেন ? গত সপ্তাহ হইতে ৩৫৲ মণ দরের চাউল কয়েক টাকা হ্রাস পাইতেছে। সরকারী মহলের ধারণা, আউস ধান্যের আমদানীর ফলে চাউলের দাম হ্রাস পাইয়াছে। এই ধারণার সবটুকু সত্য নহে। চলতি মরশুমে বৃষ্টিপাত ও আমন ধান্যের চাষ আবাদ পূর্ব্বাপর বৎসর হইতে ভাল হইয়াছে এবং প্রকৃতির অস্বাভাবিক বিপর্য্যয় না ঘটিলে আগামী অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধানে দেশ ভরিয়া যাইবে। নতুন ধান উঠিলে বাজারের দাম হ্রাস পাইবে। মহাজন ব্যবসায়ীদের গুপ্ত ভাণ্ডারে যে চাউল সঞ্চিত আছে যদি ইত্যবসরে

সম্পূর্ণ বিক্রয় করিতে পারে তবে তাহাদের বড় বিপদ ঘটিবে। এই বিপদের আশঙ্কায় ধান্য চাউলের ব্যবসায়ীরা এখন বাধ্য হইয়া বাজারের দাম কমাইয়া গুপ্ত সঞ্চিত চাউল খালাস করিতেছে। কিন্তু যদি এই ধান্য চাউলের হাঙর মহাজন ব্যবসায়ীদের ছোবল থাবলা হইতে আগামী মরশুমের ধান্য চাউল রক্ষা করা না যায় তবে প্রকৃতির অশেষ করুণা নিশ্চয়ই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমবঙ্গের ধান্য চাউল ব্যবসায় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা বলিয়া আসিতেছি এবং জাতির স্বার্থে নিরুপায় অসহায় দুঃখী দেশবাসীর দুই বেলার দুই মুষ্টি অন্নের স্বার্থে ধান্য ও চাউল ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফার চক্রান্ত দমন করিতে সরকারকে আবেদন জানাইতেছি।"

—বারাসত বার্তা।

নেহরু অবতার

"কর্ত্তাভজার দেশে সবই সম্ভব। বোম্বাই বিধান সভার মুখ্যমন্ত্রী কে প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ করিয়াছেন, গুজরাটের দাধোদা নাম গামে কেতল লোক "শ্রীজওহর শক্তি মণ্ডল" নামক এক সংস্থা গঠন করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে দশম অবতার বলিয়া ঘোষণা ও জওহরলালের পূজা সুরু করিয়া দিয়াছে। এক দিন এই গুজরাটেই গান্ধী-পূজা সুরু হইয়াছিল, তখন শাসন-ক্ষমতা হাতে আসে নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন ব্যক্তিকে দশম অবতার বানাইবার প্রচেষ্টা গুজরাটের মাটিতে গজাইয়াছে। কর্ত্তাভজা দেশের পুরাতন শ্লোগান ছিল দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। এই স্তুতি-গানে বাদশার দিলখোস হইত। শাসিত বিভ্রান্ত হইত। কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস এখনও এদেশের মজ্জাগত, তাই ব্যক্তি পূজার সাড়ম্বর মহড়া প্রতিনিয়ত চলিতেছে। শ্রীজওহর শক্তিমণ্ডল সাধনা ও প্রচারণা যেন একটু বেশী আগে সুরু করিয়া বসিয়াছেন। আগামী নির্ব্বাচনের অল্প দিন পূর্ব্বে এটা সুরু হইলে বেশী কাজে লাগিত। সাধু সমাজ গঠন করিয়া রাষ্ট্র-নেতাদের স্তবস্তুতি করার জন্য জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর অভাব সে-দেশে হয় না, সে-দেশে শ্রীজওহর শক্তি মণ্ডলের ন্যায় সংঘ গঠনের লোকের অভাব হইবে কেন? কোথাও মা মনসার দেওয়াশীর "ভর" কাহারো বা স্বপ্নাদেশ, এমনি করিয়া গাজন জমিয়া উঠে।"

—বীরভূমবাণী।

বাংলার হাসপাতালের অস্বাস্থ্য পরিবেশ

"ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের বাংলা শাখার উদ্যোগে ৬ জন বিশিষ্ট প্রবীণ চিকিৎসক লইয়া স্পেশাল কমিটি কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের প্রশাসনিক নানা গলদ ও শৃঙ্খলাহীনতার বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপক তদন্ত করিয়া এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কর্য্যকলাপের অব্যবস্থাই সকল অভিযোগের জন্য মুখ্যত দায়ী—এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। হাসপাতালগুলির উন্নয়নকল্পে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং একটি কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়াছিলেন। সরকার সকল সুপারিশ ও দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সরকারের এইরূপ প্রত্যাখ্যান গণতন্ত্র-বিরোধী কি না দেশবাসী ইহার উত্তর দিবেন।"

—বাঙালীসঙ্ঘ (কলিকাতা)।

সাব্রুম পর্য্যন্ত

"লজ্জার কথা রাজ্যের মহকুমাগুলির সহিত সংযোগকারী বার মাস চলাচলোপযোগী সড়ক আজ বার বৎসরেও নির্ম্মাণ করা যায় নাই। আরও লজ্জার কথা, যে আসাম-আগরতলা সড়ক নির্ম্মাণে সরকার অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্ব্ব সম্পন্ন করিয়াছেন; সেই সড়কটি দিয়াও রীতিমত মোটর যানবাহন চলিতে পারে না। ছয় দিবসে সাত ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে ইহাই ত্রিপুরার পক্ষে যথেষ্ট, ধর্ম্মনগর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত যানবাহন চলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দশটি মহকুমার মধ্যে সাতটি মহকুমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যানবাহনের অভাবে শত শত যাত্রী আটক পড়িয়াই থাকে নাই, ঐ সমস্ত সাতটি মহকুমার জনসাধারণ ডাকের চিঠি, সংবাদপত্র পাইতেছে না, দুনিয়ায় কি ঘটিয়াছে, কি ঘটিবে তাহার কিছুই জানিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। আগরতলা-আসাম সড়ক যাহাকে ত্রিপুরার লাইফ লাইন বলা হয় তাহা ইতিমধ্যেই যানবাহন চলার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সড়কের অনেক স্থানেই পিচ উঠিয়া গভীর গর্ত্তের আবির্ভাব হইয়াছে। কালভার্ট নির্ম্মাণে বিলম্বের ফলে ডাইভার্শন রোডগুলি বিপজ্জনক হইয়াছে। তিন টনের বেশী মাল নিয়া ঐ সড়কে ট্রাক চলিতে দেওয়া হয় না। মোটের উপর সড়কটির অবস্থা এক সঙ্কট জনক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। সড়কটি নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এর মধ্যেই ইহার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ আমরা পাইতেছি তাহা উদ্বেগজনক ত বটেই, নানা প্রকার সন্দেহেরও উদ্রেক করিতেছে।"

—সেবক (আগরতলা)।

ভয়াবহ

"পশ্চিম বাংলায় বেকারের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর হইতে বাংলা দেশের জীবনে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত! দিনের পর দিন এই অর্থনৈতিক সংকট জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। বাংলা দেশের এই সমস্যা সহৃদয়তার সহিত কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন কিনা তাহা আমরা জানি না। দেশে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা আসিতেছে এবং তাহার ফলে দেশের কিছু সংখ্যক যুবকগণ যে চাকুরী পাইতেছে না তাহা নহে কিন্তু তাহাতে সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হইতেছে না। পশ্চিম বাংলার অবস্থা ও সমস্যা বিচিত্র!

আমরা বহুবার বহুভাবে তাহা আলোচনা করিয়াছি। স্বাধীন দেশে কর্মক্ষম প্রতিটি ব্যক্তি দেশ গঠনের জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছেন এই স্বপ্ন যাহারা একদিন দেখিয়াছিলেন তাহারা আজ রূঢ় বাস্তবের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারেন না। সমবেদনা ও সহানুভূতি লইয়া সমগ্র সমস্যাটি দেখিলে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও দুর্গতি লাঘব করা সম্ভব হইত বলিয়া আমরা মনে করি। আজ সমবেদনা ও সহানুভূতির অভাব সর্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ মানুষ যে আয় করে তাহার দ্বারা কোন মতেই ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছে না। ইহারই ফলে সামাজিক নানা পাপ মানুষের সমাজ-জীবনে দেখা দিয়াছে। দেশের যুবকগণই স্বাধীন দেশের একমাত্র আশা-ভরসাস্থল। আর্থিক অনটন ও বেকার অবস্থার ফলে দেশের যুবকগণ কোন পথে চালিত হইতেছে, তাহা বর্তমান অবস্থা দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শোক-সংবাদ

বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৬) ইং-১৪।৬।৫৯ তারিখে বুধবার ইঁহার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার আমতলা গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে ১০ই আশ্বিন বুধবার উক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের জন্ম হয়। পিতা প্রবীণ স্মার্ত ৺শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ ও মাতা ৺বামাসুন্দরী দেবীর ইনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। দেশেই তিনি ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া ইদিলপুরের মূলগ্রামবাসী পণ্ডিত ৺নবীনচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের কতক অংশ অধ্যয়ন করেন, পরে ২১ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে যাইয়া সেখানকার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ভারত-বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা দেশের "তর্কতীর্থ" এবং কাশীধামের "ন্যায়াচার্য্য" পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী হইয়া উত্তীর্ণ হন। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচারদক্ষতা গুণে কাশীস্থ পণ্ডিতসমাজে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তারপর ক্রমে কাশীস্থ বিশুদ্ধানন্দ মহাবিদ্যালয়ে টিকমানি সংস্কৃত কলেজে, রাজস্থান সংস্কৃত কলেজে ও গোয়েঙ্কা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনার দ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি এমন বিস্তৃতিলাভ করে—যাহার ফলে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কর্ম্মদক্ষতায় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে সেখানে তিনি "রীডার" পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও অধ্যাপনা-খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের নানাদেশীয় বহু ছাত্র তাঁহার নিকট আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উত্তম অধ্যাপক হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কাশী বিদ্বৎ পরিষদের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "ন্যায়ারণ্যকেশরী" উপাধি দিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া বিদ্যার্থীদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইঁহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল এবং শেষ পর্য্যন্তও যুবকের ন্যায় কর্ম্মশক্তি বর্তমান ছিল। সুদীর্ঘকাল যাবৎ কাশীধামে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের যে প্রশস্ত গৌরবধারা প্রবাহিত ছিল, সম্প্রতি এই বামাচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের তিরোধানে সেই ধারা লুপ্ত হইল। ইহা পণ্ডিত-সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি। হাঁর ভাগ্যবতী পত্নী মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার পাঁচ পুত্র, চার কন্যা ও কতিপয় পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী বিদ্যমান। করুণাময় বিশ্বনাথ এই শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গের শান্তিবিধান করুন।

উপেন্দ্রনাথ সাঙ্খ্যভূষণ

বাঙলাদেশের সুপ্রব শিক্ষাব্রতী সিটি কলেজের ভূতপূর্ব সহাধ্যক্ষ বিশিষ্ট সুধী উপেন্দ্রনাথ সাঙ্খ্যভূষণ গত ৪ঠা শ্রাবণ ৯২ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ ইনি সিটি কলেজের সহাধ্যক্ষরূপে অতিবাহিত করেছেন। একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের ইনি প্রণেতা। বাঙলাদেশের শিক্ষাজগতে ইনি এক বিশেষ আসনের অধিকারী। শিক্ষাজগতে এঁর অক্লান্ত সেবা এঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। ইনি রাজা শশিভূষণ রায়ের পুত্র।

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সার্থকনামা বঙ্গজননীর আরও একজন সুপ্রবীণ সন্তানের জীবনাবসান ঘটল। চন্দননগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯০ বছর বয়সে গত ২রা শ্রাবণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এঁর সুনাম সর্বজনবিদিত। সুলেখক এবং সুপণ্ডিত হিসেবেও ইনি প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

"বৌদ্ধ পঞ্চশীল"

বিগত সংখ্যার পত্রদাতা ও লেখকের মতে, 'ঐতিহাসিকগণ বৈদিক যুগের বয়ঃক্রম নির্ণয় করেছেন খৃঃ পূঃ ১৫০০ হ'তে খৃঃ পূঃ ৫০০ শতক।' এটি হ' পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়দের স্কুলপাঠ্য কোন কোন পুস্তকের উচ্ছিষ্ট। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডাঃ সুনীতিকুমা চট্টোপাধ্যায়ের মতে বৈদিক যুগ খৃঃ পূঃ ২১০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১২০০ বৎসর। ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের মতে ঋগ্বেদ-সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর এবং অন্যান্য সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসর ধরা হ'য়েছে। প্রখ্যাত মনীষী স্বর্গত রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, খৃঃ পূঃ ৮০০০ (আট) হাজার অব্দে বৈদিক ঋষিদের অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়! শ্রীশীলানন্দের বর্ণিত শতকে বৈদিক কাল ও আর্যগণের ভারত আগমন স্কুলপাঠ্য পুস্তকের অসার উপকথা মাত্র। তা পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বহু মূল্যবান পুস্তক 'ভারতীয় সংস্কৃতি'তে প্রমাণ করেছেন। তথাকথিত 'Aryans' এবং বৈদিক আর্য এক নয়। Aryans-রা 'মত্ত অসভ্য ও বর্বর অবস্থায়' ভারতে প্রবেশ করে। এদের দ্বারা বেদও রচিত হয়নি। পরে এই Aryans-রাই ভারতীয় আর্য জাতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যেমন Sir John Marshalও অনুরূপ মত অনুমোদন করেছেন। বৈদিক কাল গণনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বর্গত রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন, মহেঞ্জোদড়ো 'পণি'দের নগরী। Rev. Father Heras বলেন, এই নগরী দ্রাবিড়দের। অবশ্য তিনি সুমেরিয়ানদের নগরী বলেও অনুমান করেছেন। 'পণি' ও 'দ্রাবিড়' যাই হোক 'পণিরা' বৈদিক বৈশ্য সমাজের লোক। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' দ্রাবিড়দের পরিচয় পাওয়া যায়। 'দ্রব দিড়ম্-সাম' যাঁরা গান করতেন তাঁরাই কালক্রমে 'দ্রাবিড়' হয়েছেন। এ ছাড়া যে সকল গৌরীপট্ট সংযুক্ত শিবলিঙ্গ, স্তূপ, শবসমাধির বিবরণ উদ্ধার করা হয়েছে ঐগুলি যে বৈদিক আর্যদের অনুকৃতি এবং দ্রাবিড়ের বৈদিক আর্যাদেরই যে একটি শাখা তা স্বামিজী 'ভারতীয় সংস্কৃতি'তে বিশদ আলোচনা করেছেন। অতএব সিন্ধু সভ্যতার বয়ঃক্রম কাল যদি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০০ হতে ৮০০০ বৎসরও ধরা যায়, তা হলে বৈদিক আর্যদের প্রাচীনত্বের পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ ক'রল।

লেখকের মতে—'বেদে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মিত্র বা সূর্যের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি, পূজা-যজ্ঞ ও বলিদানের নির্দেশ।' বেদের দৌড় বোধ হয় লেখকের এই পর্যন্ত। কিন্তু এ যে কত বড় অজ্ঞতা-প্রসূত উক্তি তা সমালোচনা করতে যাওয়া দুর্ভাগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। লেখক অনুগ্রহ ক'রে আর্য-সমাজের পূজ্যপাদ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিরচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ ও ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা' নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করুন, তা' হ'লে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বেদের কবল থেকে মুক্তি লাভ ক'রতে পারবেন। ব্রহ্মসূত্র আলোচনা ক'রলে দেখা যায়, লেখক যে সকল দেবতার নাম ক'রেছেন ওগুলি ব্রহ্মপদবাচক বা ব্রহ্মের উপাধিবাচক শব্দ যা জড়বাদীদের প্রজ্ঞানশূন্য মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ ক'রতে পারেনি। ধরা যাক ইন্দ্র শব্দের দৃষ্টান্তটি। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥" ১।১।৩০ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ এই শ্লোকের তাৎপর্য—ইন্দ্র ব'লছেন—'আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকেই জান।' একথা তিনি বামদেব ঋষির ন্যায় 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ' অনুসারে ব'লেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর 'ইন্দ্র' ব'লতে স্বতন্ত্র পদার্থ আর থাকে না। ইন্দ্র তখন 'প্রজ্ঞাত্মা'। লেখক আরও জেনে রাখুন—বেদের ভাষ্যই বেদান্ত ও উপনিষদ। আবার বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের ভাষ্য বলা যেতে পারে শ্রীমদ্ভাগবতকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাচ্ছন্ন মনে বেদার্থের সত্য-জ্ঞান বা উপলব্ধির স্থান নেই। প্রজ্ঞানের আলো ব্যতিরেকে এ সকল শ্রুতি-স্মৃতি গ্রন্থের অর্থ অনুধাবন ক'রতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

'সুদূর অতীতে কালের...পঞ্চশীল মন্ত্র।" (বসুমতী, আষাঢ়, পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য।) লেখকের এই নাটকোচিত বাচনভঙ্গী বেশ বর্ণাঢ্য এবং প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। লেখক ইতিহাসানুগ ব্যক্তি। অতি বুদ্ধিমান লেখকের হাতে এ বিষয়ে তথাকথিত ইতিহাসের নজির আছে। তবে দুঃখের বিষয়, তথাকথিত ইতিহাস যে নিরপেক্ষ অভ্রান্ত সত্যদ্রষ্টা ঋষি এই অপবাদ ইতিহাসের কোন ছাত্রই তাকে দিতে পারবে না। নির্ভেজাল চিত্তে লেখক একটি কথা জেনে রাখুন—তদানীন্তন কালে উত্তর-ভারতের স্থানে স্থানে যদি হিন্দুধর্মের কিছুটা বিকৃতি সাধন ঘটে থাকে তদ্দ্বারা ব্রহ্মবাদী সমগ্র ভারতের অবলুপ্তি ঘটান যে বিশেষ অভিসন্ধিমূলক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতএব ভারত যে তখন কতটা 'তৃষিত' চাতক হ'য়ে উঠেছিল একথা বলা সুকঠিন।

এখন দেখা যাক 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধ প্রসঙ্গ।' অমরকোষে 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ 'বুদ্ধঃ—সর্বজ্ঞঃ। অদ্বয়বাদী।' কিন্তু ঐতিহাসিক বুদ্ধ অদ্বয়বাদী নন শূন্যবাদী। যোগবাশিষ্ঠের ও শ্রীমদ্ভাগবতের বুদ্ধ হ'লেন সুরাচার্য বৃহস্পতি। তিনি 'একদা শ্রুতি-বহির্ভূত হেতুবাদ-সমন্বিত শাস্ত্র রচনা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র নামে তখন তা' খ্যাত হয়। "জিন ধর্ম্ম সমাস্থায়...বেদবাহ্যান পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্ ॥"—মাৎস্যে, ২৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যোগবাশিষ্ঠে—বৈরাগ্য প্রকরণে, ১৫।৬—১০ শ্লোকের তাৎপর্য—'আমি বুদ্ধদেবের ন্যায় শান্তভাবে সর্বভূতেই আত্মবৎ ব্যবহার (বা সর্বভূতে আত্মজ্ঞানের সাধনা) করিতে ইচ্ছা করি। ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্মে 'আত্মজ্ঞানের' সাধনা নেই। আছে নির্বাণমুক্তির সাধনা। —"We have seen that Buddha said that there was no atman (soul)"—A History of Indian Philosophy—Dr. S. N. Dasgupta.—দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'বুদ্ধকৃত নিরীশ্বরশাস্ত্রম্। তৎ সর্বৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ খণ্ডিতং অগ্রাহ্যম্।' ফলতঃ বৃহস্পতি নামধেয়, বুদ্ধের শাস্ত্র ছাড়া ঐতিহাসিক বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ 'সর্বৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ খণ্ডিতম্' হ'তে পারেনি। যদিও ভারতভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদের জন্য প্রধানতঃ শঙ্করাচার্যকেই

দাবী করা হয়—ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়।...It will be wrong to say that he (Sankara) routed the Buddhists by his philosophical arguments.—The cultural heritage of India.—Prof. H. Bhattacharjee, M. A. B. L. বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদের জন্য আর আছে কুমারিল ভট্টের উল্লেখ। অতএব এর দ্বারা 'সর্বৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ' 'ঐতিহাসিক' মত হ'তে পারে না।

আমাদের প্রাচীন মহর্ষিদের 'জন্মকাল' সম্বন্ধে শ্রীশীলানন্দের কাছে পাঠ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মনে করি না। তবে 'বৃদ্ধ মহর্ষি পতঞ্জলির কাছে সে ঋণী' একথার উল্লেখ আমার প্রবন্ধে নেই। উহা লেখকের স্বকপোলকল্পিত দিবাস্বপ্ন। 'বৌদ্ধ' ও বিরাটসংস্কৃতি বলতে লেখক কি বুঝেন? শুধু নাটকোচিত আবেগ সৃষ্টির লেখকের 'বিস্ফোরণ' বাস্তব ইতিহাস নয়। বাস্তব ইতিহাসের চশমা এঁটে লেখক এবার দৃষ্টিপাত করুন—সব 'Ism' তা ধর্মীয় আর political হোক মতপার্থক্য থাকলেও তার ভিতরের সত্যের ঐ সব Ism এর follower দের হাতে প'ড়ে পরবর্তী কালে অপমৃত্যু ঘটে। শঙ্করাচার্য বা কুমারিল ভট্ট নয়। নির্বাণমুক্তির নামে পরবর্তী কালের যখন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল এবং সম্রাট অশোক ও হর্ষবর্ধনের পরে ভারতের জাগ্রত ক্ষাত্রশক্তি (গুপ্ত বংশ প্রভৃতি) নির্বাণমুক্তি জাতীয় জীবনের অনুপযুক্ত বলে গ্রহণ ক'রল ও বাস্তববাদী মুসলমানদের যখন ভারতে আগমন ঘটল, তখন ভারত থেকে অবলুপ্তি ঘটল বৌদ্ধধর্মের। বড়ই দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমান জগতের মানচিত্র থেকেও বৌদ্ধজগত নবজাগ্রত কাল-ধর্মের হাতে অবলুপ্ত হ'তে চলেছে। চীন ও তিব্বত তার দৃষ্টান্তস্থল। বৌদ্ধ বার্মা, সিংহল, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম), কাম্বোডিয়া ইত্যাদি রাজ্যে অহিংস পঞ্চশীল সহিংস হ'য়ে উঠেছে। শীলানন্দের সংস্কৃতির বিরাট আণবিক বিস্ফোরণ এখন শূন্যে বিলীন হ'তে চ'লেছে। এই হিংসাই আজ জগতকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। আজ জগত চায় না ধর্ম। চায় মহাবুভুক্ষার খাদ্যপানীয়। এই দুর্দিনে অতীতের বস্ত্র নিয়ে শীলানন্দ বা ব্রজানন্দের মধ্য-যুগ-সুলভ বাক-যুদ্ধে কোন সত্য নির্ণীত হবে না। অতএব আমাদের 'পঞ্চশীল' সাধনার এখানেই সমাপ্তি ঘটুক।—হেম সমাজদার।

আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ

"মাসিক বসুমতীতে" মাসে মাসে প্রকাশিত কবিকর্ণপূরের "আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ" গ্রন্থের সুললিত অনুবাদ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি। আপনার বঙ্গানুবাদ ত আদৌ অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। নূতন মৌলিক কাব্য বলিয়াই মনে হয়। যেমন মধুর কৃষ্ণলীলা কাহিনী চিরকালই সুমধুর, তেমনি আপনার অনুবাদের ভাষা মধুর হইতেও মধুর; এ ভাষার মন্দাকিনী-ধারা তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া পাঠককে অমৃতরসে অভিসিঞ্চিত করে। কবি কর্ণপূরের নাতিপ্রাঞ্জল সংস্কৃতের প্রতিটি ভাব ও ব্যঞ্জনা আপনার অনুবাদ-ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনুবাদের এই ভাষা ঠাকুরবাড়ীর বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখিয়াছে।

কিন্তু এই সম্পর্কে আমার একটি নিবেদন আছে। কবি কর্ণপুর গোস্বামী প্রণীত "আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ" মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বাজারে আর পাওয়া যায় না। আপনি এই গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় যদি এই অনুবাদের সঙ্গে মূল সংস্কৃত চম্পূকাব্যটি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়, কবির কাব্যরস আস্বাদনের তথা আপনার কৃত অনুবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবগ্রন্থকে বৈষ্ণব-সমাজে পুনরায় উপস্থাপিত করা হয়। আমার এই নিবেদন, আপনার প্রণীত সকল অনুবাদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য জানিবেন। আশা করি আমার নিবেদন কার্য্যকরী করিবেন। শ্রীবিপিনবিহারী দাস, গড়বেতা, মেদিনীপুর।

পত্রিকা সমালোচনা

আমি মাসিক বসুমতীর এক জন নিয়মিত পাঠিকা, এই মাসিক বসুমতী গ্রন্থটি আমার খুবই ভাল লাগে, অতীতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখক-লেখিকাদের উপন্যাস পড়ে খুব খুসী হয়েছি। বিশেষ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চতপার কথা উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস আবার মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখতে চাই। সম্প্রতি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত সুলেখা দাশগুপ্তার 'বর্ণালী' ও সাত্যকির 'অনিকেত' খুবই ভাল লাগছে। হিমানীশ গোস্বামীর ভ্রমণ কাহিনীটি পড়েও দেশ সম্বন্ধে নোতুন করে অনেক কিছু জানতে পারলাম। বার্ণার্ড শ'র জীবনী পড়ে খুবই খুসী হচ্ছি। ভবিষ্যতে এই রকম পৃথিবী-বিখ্যাত লেখকদের জীবনী মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখতে পেলে আনন্দিত হবো। বাতিঘরের চতুর্থ পর্ব আবার কবে বের হবে? তবে একটি বিষয়ে আমার অভিযোগ আছে। সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিষয়ে। এই বিভাগটি উঠিয়ে দিলেন কেন? এর পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করুন।—অঞ্জলি সেনগুপ্ত, ১৪৫, [illegible] রোড; কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please receive the annual subscription for another year. Kindly send the magazine regularly.—Head Master, Govt. High School, Haflong.

Herewith Rs 15/- being the subscription for Masik Basumati for one year. Please send it from the Jaistha number.—Manager, New Chunta T. Estate, Darjeeling.

আগামী ৬ মাসের জন্য চাঁদা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Mrs. Bani Chakravorty, Ahmedabad.

Remitting herewith Rs. 15/- as my annual subscription for the ensuing season,—Ambujaksha Mahanty, Purulia.

মাসিক বসুমতীর আষাঢ় '৬৬ সংখ্যা থেকে মাঘ '৬৬ পর্য্যন্ত চাঁদা বাবদ ১০৲ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।—শ্রীমতী চাঁপারাণী মণ্ডল—মেদিনীপুর।

Payment of annual subscription for Masik Basumati—Vani Sen Gupta.—Bombay.

রঙ-বাহার

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৩৮শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে যত প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্ত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা —ধর্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে ধর্ম নিতান্ত অপরিণত ও সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্ত্য বহির্মুখী। পাশ্চাত্ত্য দেশ ধর্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিলাভ করিতে হইলে তাহা ধর্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই কারণে আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথও হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন— আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, কিন্তু ধর্মকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেভাবে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।

একটি কাষ্ঠখণ্ডকে উহার আঁশের অনুকূলে যেমন সহজে চিরিয়া ফেলা যায়, হিন্দুধর্মকেও তেমনি হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়াই সংস্কার করিতে হইবে; নব্যতান্ত্রিক মতবাদের মধ্য দিয়া নহে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারগণকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশের সংস্কৃতিধারাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে।

খাঁটি চরিত্র, সত্যকার জীবন, যাহা শক্তির কেন্দ্র এবং দেব-মানবত্বের মিলনভূমি—তাহাই পথ দেখাইবে। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদানসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইবে এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সমস্ত অপবিত্রতা ধুইয়া দিবে।

এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

বাঙ্গালী কেরাণীর যুদ্ধ পরিচালনা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বাঙালী ভীরু, যুদ্ধবিমুখ, ভেতো বাঙালী, বাঙ্গালী শুধু কাঁদতেই জানে, বাঙ্গালী সামরিক জাতি নয় ইত্যাদি অজস্র মিথ্যে অপবাদ এই বাঙলা দেশের অধিবাসীদের নামে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কিন্তু বাঙ্গালী যে ভীরু নয়, সমরবিমুখ নয়, সুদূর অতীতের মহাভারতের যুগ থেকে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। বাঙ্গলার মৃত্যুভয়-লেশহীন বিপ্লবী যুবকদলই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বৃটিশ আমলের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বাঙ্গালীর এই মিথ্যে অপবাদের মূলে রয়েছে ইংরেজ। ইতিহাসে যাঁদের কিছুমাত্র দখল আছে তাঁরাই জানেন একদা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রসারের প্রধান সহায়ক হয়েছিল এই অসামরিক বলে উপেক্ষিত বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী সিপাহীরাই। বৃটিশ আমলের গোড়ার দিকে একদিন এই ইংরেজরাই বাঙালীর সমরকুশলতার প্রশংসা করেছেন। কে এবং ম্যালিসন প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিক তৎকালীন অনেক যুদ্ধে ইংরেজগণ যে শুধু বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী সিপাহীর বীরত্বেই জয়লাভ করেছেন একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। সে যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক অনেক বাঙ্গালী যোদ্ধাকে বীরত্বের জন্য যে 'ইংলিশ' নামক জায়গীর প্রদত্ত হয়েছে তারও ঐতিহাসিক নজির আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই ইংরেজই আবার বাঙ্গালীকে সমর বিভাগ থেকে সরিয়ে একেবারে কেরাণীতে পরিণত করেছে।

বৃটিশ আমলে অন্য সব প্রদেশ থেকে শিক্ষাদীক্ষা এবং শিল্প-কুশলতায় বাঙ্গালীই ছিল অগ্রণী। বাঙ্গালীর দেশপ্রেম, স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা এবং বিপ্লবী মনোভাবই হল ইংরেজের ভয় ও আশঙ্কার কারণ। নিরক্ষর, ও অনগ্রসর রাজনৈতিক চেতনাহীন ভিন্ন প্রদেশবাসীকে বাঙ্গালী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার জন্যই ইংরেজ তাই সুকৌশলে তাদের সরিয়ে দিলে সমর বিভাগ থেকে। শুধু সরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, বাঙ্গালী প্রভাব খর্ব্ব করবার সর্ব্বপ্রকার কূট কৌশলও অবলম্বিত হল। কার্জ্জন করলেন বাংলার অঙ্গচ্ছেদ, হার্ডিঞ্জ বাংলা থেকে সরিয়ে নিলেন রাজধানী, সর্বশেষে ম্যাকডোনাল্ড কায়েম করলেন কম্যিউন্যাল এওয়ার্ড। সিপাহী বিদ্রোহের পর সৈন্যদলে লোক নির্ব্বাচনের কড়াকড়িটা আরো বেড়ে গেল। ফলে সিপাহী যুদ্ধে যারা যোগ দেয়নি এমন অঞ্চলের লোক ছাড়া সমর বিভাগে অন্য সকলেই হয়ে পড়ল অবাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ কেবল মাত্র সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, নেপাল প্রভৃতি রাজনৈতিক চেতনাশূন্য কয়েকটি প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া অন্য সব প্রদেশবাসীকেই বাঙ্গালীর মত সরিয়ে দেওয়া হল অসামরিক পর্য্যায়ে। সুতরাং সেনা বিভাগে সামরিক বা অসামরিক জাতি এই কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টির উদ্ভাবক যে ইংরেজ এবং তার রাজনৈতিক মস্তিষ্ক একথা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাঙ্গালী যে অসামরিক জাতি নয় এবং কোন কালেই সমরবিমুখ ছিল না, হিন্দু যুগের অতীত ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে শুধু নবাবী আমলের শেষ ও বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করলেও তার যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়। তখনো বাংলার ঘরে ঘরে ছিল শক্তিচর্চ্চা বাংলার লাঠিয়ালের প্রতাপ সে যুগে লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি, বাংলার কোন ইতিহাস নেই। তাই আজ নিছক আত্মশ্লাঘা ও আত্মবিবরণ-সর্ব্বস্ব মুসলমান বা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনাই বাঙ্গালার ইতিহাস সংকলনের একমাত্র অবলম্বন। এ সব বর্ণনার মধ্যে কদাচ কখনো প্রসঙ্গ ক্রমে বাঙ্গালী হিন্দুর যে ছিটে-ফোঁটা আলোচনাটুকু পাওয়া যায় তাই হয়েছে এখন আমাদের ইতিহাস রচনার অকিঞ্চিৎকর পাথেয়।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পলাশীর যুদ্ধের সময়ে সিরাজ-সেনাপতি মোহনলালের ন্যায় আরো তিন জন বাঙ্গালী যোদ্ধার নাম পাওয়া যায় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁদের বংশপরিচয় বা কীর্ত্তিকলাপের বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানা যায় না। এ তিন জনই ছিলেন আলীবর্দ্দির জামাতা পূর্ণিয়ার নবাব সইদ আহম্মদের সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। গোলন্দাজ বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন লালু হাজারী এবং বেতন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্যামসুন্দর নামে জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ। এ ছাড়া নবাবের দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন একজন বাঙ্গালী যোদ্ধা, তাঁর নাম মিতনলাল। সইদ আহম্মদের অপদার্থ ও আহম্মক পুত্র সওকৎ জঙ্গ অতি তুচ্ছ কারণে প্রবীণ সেনাধ্যক্ষ লালু হাজারীকে বরখাস্ত করলে লালু হাজারী মুর্শিদাবাদ দরবারে গিয়ে নবাব সওকৎ জঙ্গের দুর্নীতি ও খামখেয়ালীর কথা জ্ঞাপন করেন। মুর্শিদাবাদ ও পূর্ণিয়া দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রবীণ তোপাধ্যক্ষের পদচ্যুতিতে মর্ম্মাহত হন এবং সওকতের আহম্মকী এবং অদূরদর্শিতার নিন্দা করেন। লালু হাজারী বা মিতনলাল সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসে এর বেশি আর কিছুই জানা যায় না। তবে কতখানি বিশ্বস্ততা ও সামরিক যোগ্যতা থাকলে সেই মুসলীম প্রভুত্বের যুগে কোন বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে নবাবের দেহরক্ষী বাহিনী বা গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কত্বের মত সামরিক উচ্চপদ লাভ সম্ভব ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

সে যুগে দেশবাসীর মধ্যে শরীরচর্চ্চা, অশ্বচালনা বা বাহিনী পরিচালনা শিক্ষার একটা স্বাভাবিক রেওয়াজ ছিল। কেন না, মোটামুটি এসব গুণ আয়ত্ত না থাকলে নবাব সরকারের অসামরিক বিভাগেও রাতারাতি উন্নতি লাভের সুযোগ ঘটত না। এ জন্য নবাবী আমলে দেওয়ান তহশীলদার প্রভৃতি অসামরিক সরকারী কর্ম্মচারীদিগকেও সময় সময় দক্ষ সেনাপতির মত বাহিনী পরিচালনা করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেওয়ান দয়ারাম, জানকীরাম, রাজা রাজবল্লভ, রাজা দুর্ল্লভরাম, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁরা সব অসামরিক কর্ম্মচারী হয়েও অনেক সময় দক্ষ সেনাপতির মত সৈন্য পরিচালনাও করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ণিয়া সরকারের গোলন্দাজ বিভাগের কেরাণী শ্যামসুন্দরের যুদ্ধ পরিচালনার কাহিনী উল্লেখ করব।

নবাব আলিবর্দ্দীর তিন কন্যার মধ্যে বড় ঘসেটি বেগম ছিলেন নিঃসন্তান। মেজ আমিনার দুই পুত্র সিরাজ ও এক্রামদ্দৌলা এবং ছোট মেয়ের পুত্র হলেন সওকৎ জঙ্গ। পিতা সইদ আহাম্মদের মৃত্যুর পর সওকৎ পূর্ণিয়ার নবাবী তক্তে বসলেন। সওকৎ-এর মত ভীরু,

আহাম্মক, আকাট মূর্খ আর নেশাখোর নবাব মুসলমান ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। সওকৎ নিজের নাম স্বাক্ষর করতে গলদঘর্ম হয়ে পড়তেন। এক এক সময় দলীল দস্তাবেজ বা ফারমানে স্বাক্ষর করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে কলম ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসন থেকে সরে বসতেন। সকল রকম কুক্রিয়া আর পাপাচারে সিরাজের সমগোত্রীয় হলেও সিরাজের যে বুদ্ধি বা বিবেচনাশক্তি ছিল, সওকতের মধ্যে তার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর মীরজাফর, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি বিরোধীদল সিরাজকে সরিয়ে এই সওকতকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললেন এবং এই মর্ম্মে সওকতের নিকট একটা গোপন পত্রও প্রেরিত হল। মনে হয়, সিরাজের বিরোধীদল তখনো সওকতের স্বরূপটা ঠিক জানতেন না, জানলে তাঁরা এমন নির্ব্বুদ্ধিতা করতেন বলে মনে হয় না।

এদিকে মুর্শিদাবাদের আমীর ওমরাহগণ তাঁকে বাংলার মসনদে বসাতে চায়, একথা জেনে সওকতের মাথা ঘুরে গেল। চারদিক থেকে ইয়ার চাটুকারের দল উস্কানি দিয়ে আহাম্মক নবাবকে আরো ক্ষাপিয়ে তুললে। সওকৎ গোঁফে চাড়া দিয়ে ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে তাঁর খোয়াবী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করতে লাগলেন—বাংলা জয় করেই তিনি অযোধ্যার নবাব ও বাদশাহের উজীর গাজীউদ্দিনকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করবেন। তারপর দিল্লীর তক্তে একজন পছন্দসই লোককে বসিয়ে লাহোর এবং কাবুল পার হয়ে একেবারে সুদূর খোরাসানে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করে বসবাস করতে লাগলেন। কেননা, বাংলার জলবায়ু নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর। এরকম অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাঁর মত উচ্চমর্য্যাদাসম্পন্ন লোকের বসবাস অসম্ভব! দেশশুদ্ধ লোক আহম্মক নবাবের এসব প্রলাপোক্তি শুনে হেসে অস্থির হল।

সহজে বাংলার নবাবী তক্ত লাভের জন্য সওকৎ ইতিমধ্যে বহু লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়ে দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী পদের একটা ফারমান জোগাড়ও করেছিলেন, যদিও এ ফারমানের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না, কেন না ফারমানের নিচে স্বাক্ষর ছিল উজীরের। বাদশাহের কোন স্বাক্ষর ছিল না। ফারমানে সিরাজদ্দৌলার সমস্ত সম্পত্তি এবং বার্ষিক এক কোটি টাকা রাজস্ব দিবার সর্ত্তে সওকৎ সমগ্র বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা দখল করে নিবেন এরূপ আদেশ ছিল।

একদিকে মুর্শিদাবাদ দরবারের ষড়যন্ত্রকারী আমীর ওমরাহদলের গোপনপত্র আর একদিকে বাদশাহী ফারমান, এর ওপর আবার চাটুকার ইয়ার বন্ধুদলের উস্কানি। মূর্খ সওকৎ একেবারে আহ্লাদে আটখানা। পূর্ণিয়ার দরবারে বসেই তিনি নিজেকে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করলেন। তারপর মুর্শিদাবাদে সিরাজকে লিখে পাঠালেন—বাদশাহী ফারমান বলে এখন আমিই বাংলার আসল নবাব। তুমি ভাল চাও তো সিংহাসন ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এখনি চলে যাও। কিন্তু হুঁসিয়ার, যাওয়ার পূর্ব্বে আমার কর্ম্মচারীদের রাজকোষের অর্থ ও মূল্যবান হীরা জহরৎ বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। আমি ইচ্ছে করলে তোমার মাথাটা এখনি ক্যাচাৎ করে কেটে ফেলতে পারি কিন্তু তুমি আমার মাসতুতো ভাই, নেহাৎ আত্মীয়; তাই ঐ নৃশংস কাজটা আর করলুম না। ভাল মানুষের মত মসনদ ছেড়ে যদি ঢাকা চলে যাও, তোমার জন্য ভাল মাসোয়ারা মঞ্জুর করব। অবিলম্বে এ পত্রের জবান চাই, আমি ঘোড়ার রেকাবে পা তুলেই আছি, জবানে বিলম্ব হলেই মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করব।

মুর্শিদাবাদ দরবারে এ পত্র পৌঁছলে সেখানে প্রথমে একটা হাসির ধুম পড়ে গেল। দরবারের প্রধানগণ ইতিপূর্ব্বেই পদচ্যুত প্রবীণ গোলন্দাজ সেনানায়ক লালু হাজারী মারফৎ সওকৎ জঙ্গের আসল পরিচয় পেয়েছিলেন, এক্ষণে সিরাজের কাছে লিখিত পত্রের বয়ান দেখে সওকতের চরিত্র ও আহাম্মকী সম্বন্ধে তাঁদের আর কোন সন্দেহ রইল না। সকলেই সওকতের ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প জানালেন। বিরাট দুই দল ফৌজ মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্ণিয়ার পথে রওনা হল। একদলের পরিচালক স্বয়ং নবাব, মীরজাফর খাঁ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীরকাজেম খাঁ, দিলীর খাঁ, আসালৎ খাঁ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ অপর দল পরিচালনা করলেন রাজা মোহনলাল এবং তার বীর অনুগামিগণ। নবাবের আদেশে পাটনা থেকে সদলবলে অগ্রসর হলেন। পাটনার নায়েব নাজিম রাজা রামনারায়ণ। পূর্ণিয়ার প্রবীণ সেনানায়কগণের পরামর্শানুসারে সওকৎ জঙ্গও নবাবগঞ্জ ও মণিহারীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিখার ন্যায় চারদিক কর্দ্দমাক্ত বিলে পরিবেষ্টিত একটি উঁচু জায়গায় সেনাসন্নিবেশ করেছিলেন। এই সেনাব্যূহের মাঝখানে স্থাপিত হল সওকৎ জঙ্গের শিবির। একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া এই সুরক্ষিত স্থানে গমনাগমনের জন্য কোন উপায় ছিল না। এই সঙ্কীর্ণ পথমুখে মুষ্টিমেয় সৈন্যসমাবেশ দ্বারাই অনায়াসে সিরাজের বিপুল বাহিনীর গতিরোধ করা যাবে ভেবে পূর্ণিয়ার প্রবীণ সেনানায়কগণ স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু এমন অনুকূল পরিবেশে ব্যূহ রচিত হওয়া সত্ত্বেও মূর্খ নবাবের ভীরুতা ও বুদ্ধির দোষে সমস্তই বানচাল হয়ে গেল।

রাজা মোহনলাল ভাগীরথী পার হয়ে পূর্ণিয়ার পথে সিরাজের অগ্রগামী বাহিনীসহ আবরি ও মণিহারী মধ্যস্থ হলদিবাড়ী নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সেটা ১৭৫৬ সালের নভেম্বর মাস। গঙ্গার পাহাড়ের ওপর সেনা-সন্নিবেশ করে মোহনলাল দেখলেন, সেখান থেকে সওকতের শিবিরের ব্যবধান মাত্র দুই ক্রোশ। সওকতের শিবিরের সুরক্ষিত অবস্থান এবং পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টির মুখে জলাভূমি মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী চালনা বিপজ্জনক বুঝে মোহনলাল শত্রুবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করার জন্য সেখান থেকেই শত্রুব্যূহের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের আদেশ দিলেন।

সওকৎ জঙ্গের শিবিরে তখন নাচ-গানের মহড়া চলছিল। অকস্মাৎ গোলাবর্ষণের ফলে সেখানে হুলুস্থুল পড়ে গেল। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাবার উদ্যোগ করল। শত্রুকে বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে যে যার মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত। একটি গোলা এসে একেবারে সওকতের শিবির-প্রান্তে পড়ল। আর যায় কোথায়? ভয়ে বিহ্বল সওকৎ তাঁর মাহী পতাকা নামিয়ে ফেলবার আদেশ দিলেন, অনুচরদের তাঁর শিবিরের আশে-পাশে ভিড় না করে দূরে সরে যাওয়ার জন্য বার বার ধমক দিতে লাগলেন। কারণ তাঁর ধারণা হল যে মাহী পতাকা এবং লোকজনের ভিড়ের জন্যই শত্রুপক্ষের

বৃষ্টি তাঁর শিবিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সওকতের সেনানায়করাও দূরে দূরে সব নিশ্চেষ্ট, কেউ কোন হুকুম দিচ্ছে না। কোন আদেশ না পেয়ে পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীও স্থাণুর মত নিশ্চল। সওকৎ শিবিরের বিশৃঙ্খলা ও ভীতিবিহ্বলতার সুযোগ বুঝে বিচক্ষণ মোহনলাল এই সময়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে সেই জলাপথ মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে পরিচালিত করলেন। মোহনলালের অশ্বারোহী বাহিনী জলাপথ পার হয়ে একবার এ পারে এসে পড়লে যে সওকতের সমগ্র বাহিনী বিপন্ন হয়ে পড়বে, কারো পালাবারও উপায় থাকবে না, একথা তখন কেউ ভাবছে না, শত্রুকে বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে সবাই তখন শত্রুগোলার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্তই ব্যস্ত। রণক্ষেত্রের এই ঘোরালো ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীর বেতনাধ্যক্ষ বাঙ্গালী শ্যামসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না। অবিলম্বে মোহনলালের অগ্রগামী অশ্বারোহী বাহিনীর গতিরোধ না করলে সমূহ বিপদ বুঝে তিনি কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করেই কয়েকটি কামান ও গোলন্দাজ সৈন্ত সহ ঘাঁটি ছেড়ে এক মাইল এগিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলেন। এই আক্রমণের ফলে মোহনলালের অশ্বারোহী বাহিনার অগ্রগতি রুদ্ধ হল এবং সন্ত্রস্ত পূর্ণিয়া বাহিনীর মধ্যেও কিছুটা মনোবল ফিরে এল। এর পর উভয়পক্ষের মধ্যেই কিছুক্ষণ চললো প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ, উভয়পক্ষেই বহু লোক হতাহত হতে লাগল। ভীরু আহাম্মক এবং যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ সওকৎ এ সময়ে আর এক দারুণ ভুল করে বসলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি কারগুজার খাঁকে এ সময়ে সেই সঙ্কীর্ণ পথে অশ্বারোহী বাহিনী সহ শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাবার আদেশ পাঠালেন। কারগুজার এবং অভিজ্ঞ সেনানায়কগণ বলে পাঠালেন যে, উভয় পক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে ঐ সঙ্কীর্ণ পথে অশ্বারোহী বাহিনী চালনা করলে সমগ্র বাহিনীই ধ্বংস হবে, পূর্ণিয়ার শ্রেষ্ঠ সৈনিকগণ বেঘোরে প্রাণ হারাবে। কিন্তু মূর্খ সওকৎ সেনাপতি এবং সেনানায়কগণের সতর্কবাণীতে ভ্রূক্ষেপ না করে রেগে আগুন হয়ে বলে পাঠালেন—সামান্ত একজন হিন্দু কেরাণী শ্যামসুন্দর অসম সাহসে কামান চালিয়ে আমার ইজ্জৎ রক্ষা করছে আর তোমরা রণদক্ষ মুসলমান বীর হয়ে এ সময়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রয়েছে? ধিক তোমাদের বীরত্বে! কারগুজার খাঁ এবং তাঁর সহকারী সেনানায়কগণের কাছে নবাবের এ রকম অপমান-সূচক বাক্য অসহ্য বোধ হল, তাঁরা আর দ্বিরুক্তি না করে নিশ্চিত ধ্বংস জেনেও সেই সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনা করলেন। মূর্খ সওকৎ তাঁর আদেশ পালিত হয়েছে দেখে মনের আনন্দে নিজের শিবিরে এসে নাচ-গানে মসগুল হলেন এবং উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করবার জন্ত প্রচুর মাদক ও ভাঙ্গ সেবন করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেহুঁস হয়ে পড়লেন।

এদিকে জলাভূমি-মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথে ধাবমান কারগুজারের অশ্বারোহী বাহিনী বিপক্ষের গোলার আঘাতে কাতারে কাতারে ধরাশায়ী হতে লাগল। অনেক সৈনিক অশ্বসহ দু'দিকের বিলের মহাপঙ্কে পড়ে প্রাণ হারালো। হতাবশিষ্ট সেনাদল মীরজাফর ও মীরকাজেমের প্রচণ্ড আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সইদ আহাম্মদের বন্ধু মুতক্ষরীণ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন স্বয়ং এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং অপর কয়েকজন সেনানায়ক ইতস্ততঃ পলায়মান ছত্রভঙ্গ পূর্ণিয়া বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনবার শেষ চেষ্টা হিসেবে সওকৎ জঙ্গের সংজ্ঞাশূন্য দেহটাকে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়ে এ সময়ে রণক্ষেত্রে নিয়ে এলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সহসা শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গোলার আঘাতে সওকতের প্রাণহীন দেহ হস্তিপৃষ্ঠের হাওদার মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে অসীম বীরত্বের সঙ্গে কামান চালাতে চালাতে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত গোলাঘাতে শ্যামসুন্দরও এ সময়ে প্রাণ হারালেন। সিরাজ ও সওকতের এই সংগ্রাম ইতিহাসে মণিহারীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। নিজের বুদ্ধির দোষে আহাম্মক এবং অদূরদর্শী সওকৎ এই যুদ্ধে কারগুজার ও শ্যামসুন্দরের ন্যায় বিশ্বস্ত সেনানায়ক সহ পূর্ণিয়ার বীর-বাহিনীর ধ্বংস সাধন তো করলেনই, নিজের রাজ্য ও প্রাণও হারালেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সুরক্ষিত গোলন্দাজ ঘাঁটি ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে শ্যামসুন্দরের এই কামান চালনাকে হঠকারিতা বলে কটাক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু নবাব সওকতের মুখের প্রশংসা-বাক্য থেকেই বুঝা যায় যে, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কায়স্থ শ্যামসুন্দর যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার দ্বারা শুধু শত্রুর অগ্রগতিই প্রতিরুদ্ধ হয়নি, নবাব এবং তাঁর শিবিরপার্শ্বস্থ বিশৃঙ্খল সেনাদলের মনোবল ফিরিয়ে আনাও সম্ভবপর হয়েছিল। রণক্ষেত্রের সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ বিচার করে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার পরিণাম শুভ কি অশুভ হত, তা নির্ণয় করা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তা ছাড়া শ্যামসুন্দরের মত একজন নগণ্য গোলন্দাজ বিভাগীয় কেরাণীর কাছ থেকে একজন সমরদক্ষ সেনানায়কের স্থৈর্য্য, প্রতিভা বা রণনৈতিক দূরদর্শিতা আশা করা সমীচীনও নয়। বিপক্ষদলের ভয়াবহ গোলাবর্ষণের মধ্যেও বিশ্বস্ত ও নির্ভীক সৈনিকের ন্যায় আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে শ্যামসুন্দর যে শত্রুবাহিনীর গতিরোধ করেছিলেন, শুধু তারই জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।

বাঙ্গালী হিন্দুর ইতিহাস নেই, তাই বাঙ্গালী কেরাণী শ্যামসুন্দরের এই অপূর্ব্ব বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের কথা আজ কেউ জানে না! কেউ রাখে না তাঁর বংশপরিচয় বা জীবনেতিহাসের সন্ধান! আত্মবিস্মৃত বাংলা এবং বাঙ্গালী জাতির এই হল পরম দুর্ভাগ্য আর চরম অভিশাপ!

"খৃষ্টধর্ম খৃষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত তিষ্টিতে পারে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বঙ্গরমণীর মৌন বিক্রম

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংলগ্ন উদ্যান হইতে ভারতের প্রথম বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল (১৮৩৩-৩৫) লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিশ বেণ্টিঙ্কের প্রতিমূর্তি অপসারিত হইয়াছে। ইহা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ কিছু আলোড়নও হইয়া গিয়াছে এবং বেণ্টিঙ্কের মূর্তি অপসারণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ, বেণ্টিঙ্ক ছিলেন উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সংস্কারকামী, জনদরদী শাসক। ভারতীয়দিগের সহিত তাঁহার সখ্যতামূলক মনোভাবের জন্য তিনি তৎকালীন ইংরেজদের কাছে "ক্লিপিং ডাচম্যান" (তিনি ছিলেন ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সংস্কারমূলক বহু জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে সতীদাহ নিবারণ-মূলক আইন তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। নবভারতের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির আবেদন ও আন্দোলনের ফলেই যে এই সংস্কারমূলক আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত এবং যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এরূপ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য্য। তবুও সহমরণের মাধুর্য্যটুকুও এই সঙ্গে স্মরণীয়। একথা সত্য যে, হিন্দুরমণীগণ সকল সময়ে স্বেচ্ছায় অগ্নিপ্রবেশ করিতেন না; কারণ জীবনের প্রতি মমতা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একথাও সত্য যে, কালক্রমে সহমরণ প্রথার ভিতর স্বার্থ, দ্বেষ, অনাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া প্রথাটিকে কুৎসিত এবং বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বঙ্গনারীগণ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক য়ুরোপীয় মহিলা লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এমন অনেক নারী আছেন, যাঁহারা মৃত স্বামীর শবের সহিত সহমৃতা হইয়া অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দেন। সেই সাহস অন্যভাবে পরিচালিত হইলে নারীজাতিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিতেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, তাঁহাদের (সহমৃতা হইতে) কুণ্ঠিতা হওয়ার কথা শুনা যায়। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল" (১)। বঙ্গরমণীর সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেমের কথা লিখিতে যাইয়া শত বৎসর পূর্ব্বে হটন সাহেব লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও প্রাণ সমর্পণ জ্বলন্ত চিতার শিখাকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছে" (২)।

সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথা কোন বিস্মৃত অতীত হইতে বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা আর এখন সঠিক জানা যায় না। তবে, অনেকের মতে সতীদাহ প্রথা পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে (২।৮।৩-১০) মৃত স্বামীর সহিত পুড়িয়া মরিবার জন্য সমাজনায়কেরা দ্বিজনারীদের পুণ্যলোভে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। ইহার চেয়ে বীরত্ব নাকি তাঁহাদের আর কিছু নাই (৩)। পাটনা মিউজিয়ামে রক্ষিত মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত 'সতীস্মারক' স্তম্ভগুলি এই প্রাচীন অনুষ্ঠানের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে।

ইতিহাসে জানা যায়, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে ৪০৩টি সহমরণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮১৫ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বার বৎসরে ৭১৫টি রমণীর সহমৃতা হইবার সংবাদ ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট পৌঁছে। ১৮১৮ সালের সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল, এই তিন বৎসরে ২,৩৬৫ জন বিধবা সহমরণে যায়। এর মধ্যে ১,৫২৮ জন কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলের। ১৮১৯ সালের কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠের সতীদাহের একটা ফর্দ্দ পাওয়া গিয়াছে। এক বৎসরে ৪টি থানায় ৫২টি সহমরণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক সতীর নাম, জাতি, স্বামীর নাম, সৎকারের তারিখ, থানার নাম ও কয়টি ছেলেমেয়ে ছিল তার একটা দীর্ঘ ফর্দ্দ আছে। এই ৫২টি সতীর মধ্যে ২০ জন ব্রাহ্মণ, ১০ জন কায়স্থ, ২ জন বৈদ্য, ২ জন সদ্গোপ, ৫ জন কৈবর্ত, ৩ জন যুগী, ২ জন শুঁড়ী, ২ জন ময়রা, ১ জন কাঁসারী, ১ জন ছুতোর, ১ জন গোয়ালা, ১ জন তেওয়ার, ২ জন অন্য জাত। বয়সের গড় ৫২ বৎসর ১০ মাস, ৭০ বা তার চেয়ে বেশী ১৩ জনের বয়স ছিল। ২০ বৎসর বা তার চেয়ে কম বয়সের চারটি নাম পাওয়া যায়। এর সঙ্গে দুই স্ত্রী সতী হওয়ার একটিমাত্র উদাহরণ আছে। দেখা যায়, উচ্চ-নীচ ভেদে সব জাতির মধ্যেই সতীদাহ প্রচলিত ছিল; হয়তো উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলন কিছু বেশী ছিল। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ৫২টি সতীর মধ্যে ৪০ বৎসরের কম মাত্র দশটি নাম পাওয়া যায়। ১৮১৮ সালে বাংলা দেশে ৮০০টি সতীদাহ হইয়াছিল (৪)। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা এলাকায় ৩০৯ জন বিধবা সহমরণে যায় (৫)। সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে বাঙ্গালাদেশে যত অধিক সহমরণ হয়, পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না, এবং বাঙ্গালার মধ্যেও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয়। আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল হুগলী জেলাতে হয় (৬)। এবিষয়ে বিলাতের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট (১৮৯০-৯৫) লিখিয়াছিলেন—সম্প্রতি যে সকল ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার সকলগুলিতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, আইনের নিষেধ ও সতীদাহের স্বপক্ষে জনমতের পরিপোষকতার অভাব সত্ত্বেও নারীগণ প্রত্যেকেই এই ভাবে আত্মবলিদানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

১। Hartley House—Miss Sophia Goldbourne 1789.

২। বৃহৎবঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন ১ম খণ্ড, ভূমিকা—১৷৷/০

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়, আদিপর্ব্ব—৪১১পৃঃ

৪। ইতিহাস—১৩৫৭—ভাদ্র, ১১ পৃঃ

৫। বাঙলার নারী আন্দোলন—ছবি রায়—১২ পৃঃ

৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড—২৮১ পৃঃ

পুরুষগণ সকল ক্ষেত্রেই ইহা অনুমোদন করিয়াছেন—বাধ্য করেন নাই" (৭)।

কলিকাতায় বঙ্গীয় বিধান সভার উত্তরে টাউনহলের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রতিমূর্ত্তিটি অপসারণের যে কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, উহার পাদপীঠে সতীদাহের বিষয় অবলম্বন করিয়া ব্রোঞ্জে ঢালা চমৎকার একটি চিত্র আছে। এই চিত্রটি বাস্তবিকই অতি সুন্দর। পাদপীঠের আকার অনুসারে গোলাকারে গঠিত তিন দিক হইতে তিনখানি ছবি লইয়া উহা প্রদর্শিত হইল। মধ্যচিত্রটির প্রধান পাত্রী—সহগমনের জন্য প্রস্তুত জনৈক তরুণী বিধবা দণ্ডায়মানা; বিধবার মস্তকের উর্দ্ধে সু-উচ্চ চিতার উপরে শায়িত তাহার মৃতপতির বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ দেখা যাইতেছে। বিধবার সমস্ত ভঙ্গীতে একটা অপার্থিব আত্মভোলা ভাব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিধবার বামপার্শ্বে গভীর বিষাদ ও সহানুভূতির ভাবে রাজপুতের বেশে একজন বর্ষীয়ান অস্ত্রধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া—সম্ভবতঃ বিধবার পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি যেন মেয়েটিকে সহগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মৃদুভাষায় অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন। সম্মুখে একজন আত্মীয়া বিধবার দুইটি পুত্রকে লইয়া—কোলের শিশুটি মায়ের কাছে ঝাঁপাইয়া যাইতে যায়, কিন্তু মাতার সেদিকে লক্ষ্যই নাই। আর একটি শিশু সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ও মায়ের স্তব্ধ উন্মাদিনীবৎ ভাব দেখিয়া সভয়ে পিসী বা মাসীর কাছে আশ্রয় লইতেছে—সন্তানের প্রতি মায়ের আর স্নেহ মমতা বা কোনও আকর্ষণ নাই। চিত্রটির দক্ষিণ ভাগে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ। পুঁথি হাতে ব্রাহ্মণের কাঁধে হাত রাখিয়া তাহাকে যেন উৎকণ্ঠিত ও কাতর ভাবে কি প্রার্থনা জানাইতেছেন।—শিল্পী ওয়েষ্টমেটক বিশেষ দরদ দিয়া, এমন কি যে জাতির মধ্যে বিদ্যমান এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটির চিত্র তিনি আঁকিতেছেন তাহার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাভাবও লইয়া এবং পুরা গ্রীক ও রোমান দৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভাস্কর্যটি গঠিত করিয়াছেন (৮)।

বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামে অদ্যাপি সহমরণের স্মৃতিজ্ঞাপক মঠ ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যে বেজগাঁ গ্রামের "সতীঠাকুরাণীর মঠটি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং বিখ্যাত। সে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ গ্রামে এই সতীদাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যে পরিবারের পুত্রবধূ তাঁহার মৃতপতির সহগামিনী হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ বংশ, মুন্সী-পরিবার বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর, ভরদ্বাজগোত্র, ফুলিয়া মেল। এই বংশের কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় রুগ্নাবস্থায় বিদেশ হইতে বাড়ি আসিলে সকলে রুগ্ন কাশীনাথকে ধরাধরি করিয়া তদীয় পত্নীর শয়নগৃহে লইয়া গেলেন।

পত্নী মহামায়া প্রাণপণে পতির সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। রুগ্ন পতির শারীরিক ও মানসিক শান্তি ও সুখের জন্য দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার-নিদ্রার প্রতি তেমন লক্ষ্য নাই। সর্ব্বদা স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শিশুপুত্র ও কন্যার প্রতিও কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু এত সেবা শুশ্রূষা সত্ত্বেও কাশীনাথের জীবন রক্ষা হইল না, কাশীনাথের মৃত্যু হইল। সকলে শোকমগ্ন, কিন্তু কাশীনাথ পত্নী মহামায়া দেবী হাস্যময়ী। নয়নে অশ্রু নাই, বদনমণ্ডলে বিষাদের কোন চিহ্নও দেখা যায় না। অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া সেই বিবাহের লোহিত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, ওষ্ঠ দুইখানি রক্তকমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, অনবগুণ্ঠিতা সাধ্বী আজ মৃত স্বামীর পার্শ্বদেশে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে শ্বশুর, ভাসুর সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। শব শ্মশানে নীত হইল। সাধ্বী মহামায়া দেবীও চিতারোহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সকলে নিষেধ করিলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুপুত্র ও কন্যা দুটিকে দেখাইয়া কত প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মতেই মহামায়া দেবী তদীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুতা হইলেন না। আত্মীয়-স্বজনেরা বিফল-মনোরথ হইয়া থানায় সংবাদ দিলেন। দারোগা আসিলেন এবং মহামায়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি স্বেচ্ছায় মৃত স্বামীর সহগামিনী হইতেছেন কি না?' মহামায়া দেবী বলিলেন—'হাঁ! তবে পরীক্ষা হউক!' মহামায়া দেবী তৎক্ষণাৎ অগ্নিমধ্যে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক হাসিমুখে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, দারোগা বিস্মিতচিত্তে চিতারোহণের অনুমতি দিলেন। চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ ঝড়ের মত ছড়াইয়া পড়িল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে শত শত নরনারী সহমরণের দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। হাস্যমুখী মহামায়া ধীর মন্থর গতিতে উপস্থিত জনসাধারণকে আশীর্বাদ করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সধবা মহিলারা তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিল। তৎপরে মহামায়া দেবী চিতারোহণ করিয়া মৃতপতির শবদেহের বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিতা জ্বলিল। সমবেত জনমণ্ডলী চারিদিকে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আর্ত্তনাদ করা দূরে থাকুক। বিন্দুমাত্রও তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে কেহ দেখিল না। দেখিতে দেখিতে দম্পতির পঞ্চভৌতিক দেহচিতা ভস্মে পরিণত হইল (৯)।

গয়াধামে জনৈক বাঙ্গালীর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পত্নী সহমরণে উদ্যতা হইলে গয়ার জজ মিঃ ক্রষ্টোফার স্মিথ্ গিয়া তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন। তাহাতে সে ব্রাহ্মণী আপন অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেখাইলে জজ সাহেব আজ্ঞা দিলেন। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল (১০)। আর একস্থানে সহমরণের বিষয় তৎকালীন সংবাদপত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে:—

সাহেবরা আসিয়া দেখিলেন যে, ঐ স্ত্রী হরিদ্রা মাখিয়া আম্রশাখা হস্তে করিয়া ঘরের পিড়ায় বসিয়া আছে। সাহেব গিয়া বিনয়পূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন যে, তুমি দগ্ধা হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইবা। অতএব দগ্ধা হইয়া মরণে ক্ষান্ত হও। তোমার বাপেরা তোমাকে অনাদর করিবে ইহা চিন্তা করিও না। আমি তোমার স্বতন্ত্র ঘর করিয়া দিব ও যাবজ্জীবন তোমার ভক্ষ্য পরিচ্ছদ দিব। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী স্থিররূপে সবিনয়ে কহিল যে, হে কোম্পানী, আমি যাহাতে

৭। বিশ্ববাণী—১৩৩৭—৪৭২ পৃঃ

৮। প্রদর্শনী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গশ্রী—১৩৪০, ভাদ্র—১৩৯ পৃঃ

৯। প্রবাসী—১৩৪৭, ভাদ্র—৩২০-২২ পৃঃ

১০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড—২৮৫ পৃঃ

অন্তে সুখ পাই সেরূপ অনুমতি কর। আমি তিন জন্ম এই স্বামীর সহিত সহগমন করিয়াছি। এরূপ কথোপকথন হইতে সূর্য্যাস্ত হইলে তখন জজ সাহেব কহিলেন—এখন কি করিবা। তাহাতে সে স্ত্রী কহিলেন যে, অদ্য রাত্রি হইল অদ্য হইবে না, কল্য সূর্য্যোদয় হইলে সহগমন করিব। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তাহার বন্ধুলোকেরা সহমরণোদ্যোগ করিতে লাগিল ও এক খট্টা আনিয়া তাহাতে ঐ শব রাখিল এবং ঐ স্ত্রী সে খাটে শব সন্নিকটে বসিল। পরে আত্মীয়-স্বজনেরা ঐ খট্টা স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া গেল। সেখানে আর কোন ব্রাহ্মণ ছিল না। কেবল চতুর্দ্দশ বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ বালক ছিল, সেই মন্ত্রাদি পাঠ করাইল। পরে ঐ স্ত্রী হরিধ্বনি করিয়া স্থির ভাবে চিতারোহণ করিল। তখনও দ্বিতীয় সাহেব তাহাকে টাকা, ঘর ও পাল্কী দিতে চাহিলেন। তাহাতে সে স্ত্রী উত্তর করিল, এই আমি পাল্কীতে আরোহণ করিলাম। ইহা কহিয়া ঐ মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া চিতাতে শয়ন করিল। কেহ ধরিল না, বান্ধিল না। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে তাহার অঙ্গ স্পন্দন হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল (১১)।"

রংপুর জেলার তুষভাণ্ডারের জমিদার-বংশের কয়েকজন কুলবধূ সহমরণে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐ বংশের জয়দুর্গা দেবীও যথারীতি সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া স্বীয় স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। তৎকালে তুষভাণ্ডার নিবাসী হিসারিয়ারা তুষভাণ্ডারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা জয়দুর্গা দেবীকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। তাঁহারা গোপনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তুষভাণ্ডারে আসিয়া জয়দুর্গা দেবীকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। জয়দুর্গা দেবী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, 'আমি সতী, স্বামীর পদপূজাই আমার জীবনের 'ব্রত, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমি স্বামীর সহিত নিশ্চয়ই সহমৃতা হইয়া তাহাতে আমার একটুও কষ্ট হইবে না।' তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি প্রজ্বলিত অনলে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। হস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কষ্টানুভব করিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সহমৃতা হইতে আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। জয়দুর্গা দেবী হাসিতে হাসিতে চিতায় আরোহণ করিলেন (১২)।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গার রাজা রামশঙ্কর দেব-রায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার সাধ্বী পত্নী রাধামণি দেবী পতির অনুগামিনী হইয়া 'সতী' হইয়াছিলেন। যে সময়ে রাজা রামশঙ্করের প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময় রাণী রাধামণি শোকসূচক কোনপ্রকার ধ্বনি করেন নাই। তিনি চিত্রার্পিতমূর্তির স্তায় নিস্পন্দ ভাবে বসিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন আমার স্বামী ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন,—আমি তাঁহারই সঙ্গে পরলোক যাইব।—অনেকে রাণীকে বুঝাইলেন। 'সতী' হইয়া পতির চিতায় দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেকে রাণীকে কত কথাই কহিলেন কিন্তু রাণীর সঙ্কল্প অটল। অনেকে রাণীকে অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া মরিবার বিভীষিকাও দেখাইলেন, তখন রাণী একটি প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার শিখায় তাঁহার তর্জ্জনী ধরিলেন। অগ্নিশিখায় অঙ্গুলি চট-পট শব্দে পুড়িতে লাগিল। কিন্তু রাণীর মুখে কোন প্রকার বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বরং আনন্দের চিহ্নই প্রকটিত হইতে লাগিল। অঙ্গুলিটি ভস্মীভূত হইয়া গেল; তথাপি সতীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলে রাণীকে লইয়া কালিকাতলার দহের নিকটবর্ত্তী শ্মশানে গেলেন, রাণী রাধামণি তাঁহার যাবতীয় সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিলেন, মস্তকে সিন্দূর লেপন করিলেন, তথায় সমস্ত লোকদিগকে টাকা, পয়সা, ও চাউল মুক্ত হস্তে বিতরণ করিলেন এবং শেষে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল বদনে সাত বার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন।—রাণী একবার রাজার মুখের দিকে চাহিলেন, আর হাস্য মুখে রাজার পার্শ্বেই সেই চিতাশয্যায় শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্রই তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। সকলে আসিয়া দেখিল, দেহে প্রাণ নাই; রাজার প্রাণের সহিত রাণীর মহাপ্রাণ অনন্তে উড়িয়া গিয়াছেন (১৩)।

বিস্তৃত বঙ্গের নানা স্থানে এইরূপ সহমরণের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; অতি আধুনিক কালেও সংবাদপত্রে আকস্মিক ভাবে সহমরণের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায় (১৪)। এইরূপে স্বেচ্ছায় আত্মদান করিবার মধ্যে যে শক্তি, দৃঢ়তা ও শঙ্কাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মাধুর্য্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন পুত্র কন্যা ভ্রাতা সকলেই চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যখন সংসারে গৃহিণীর যাহা কাম্য সে সকলই রহিয়াছে, নাই কেবল তাঁহার পরম প্রিয়তম স্বামী; তখন তাহারই সস্নেহ প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহারই চরণ ধ্যান করিতে আনন্দে অগ্নি প্রবেশ করিতে যে বিক্রম প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন দেশেই দেখা যায় না। বঙ্গনারী সেই অনুপম মৌন বিক্রমে গর্ব্বিতা বাঙ্গালী মাত্রই তাঁহার স্তন্যে লালিত, তাঁহারই স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত, তাঁহারই আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত—তাঁহারই পদরেণু স্পর্শে বলদর্পিত। নোয়াখালীর বীভৎস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের সময় বঙ্গরমণীর অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক সতীত্ব রক্ষার কাহিনী তদানীন্তন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৫)। রাজপুত মহিলার "জহর ব্রত" সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ; কিন্তু নোয়াখালীর বীর বঙ্গবালার আত্মত্যাগ সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

বাঙ্গালার প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে একদিন স্বচক্ষে বঙ্গরমণীর এই মৌন বিক্রম দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজবিধি সতীদাহ বন্ধ করিয়াছে। সেই সময় আমি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম আমার কুঠি হইতে কয়েক মাইল দূরেই সতীদাহ হইবে। গঙ্গাতীরে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটনা ঘটিত। —আমার সহচরদ্বয় রমণীকে নানারূপ বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা জানিতেন না বলিয়া আমি

১১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড—২৮৩ পৃ:

১২। বংশপরিচয়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—২য়খণ্ড—৩৫১-৫২পৃ:

১৩। বংশপরিচয়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—১ম খণ্ড—২২৯-৩০পৃ:

১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯।

১৫। "women jump into fire! Take poison and hang to save honour"—Hindusthan Standard—23rd october, 1946.

তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি গম্ভীরভাবে একমনে সমস্ত কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আমি যখন দেখিলাম কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যায় না, তখন তাঁহাকে চিতার পার্শ্বে যাইতে অনুমতি দিলাম।

পুরোহিত আমাকে বলিলেন—একবার জিজ্ঞাসা করুন অগ্নিতে তাঁহার যে যন্ত্রণা হইবে তাহা কি তিনি ভাবিতেছেন?

রমণী আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহার তীক্ষ্মবুদ্ধিব্যঞ্জক মুখখানি তুলিয়া ঘৃণাভরে কহিলেন—একটা প্রদীপ আনুন। প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখা হইল। তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্ত ভূমিতে সংস্থাপনপূর্বক অগ্নিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেন। অঙ্গুলিটি ঝলসাইয়া গেল—উহাতে ফোসকা উঠিল, উহা শেষে কালো হইয়া গেল। একটি হংসপক্ষে আগুন ধরিলে উহা যেরূপ বক্র হইয়া যায়, অঙ্গুলিটিও সেইরূপ বক্র হইয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। রমণী একটি বারও হাত সরাইলেন না—একটুও কাতর শব্দ করিলেন না, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। তিনি কহিলেন, এখন আপনার সন্দেহ দূর হইয়াছে কি? আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম হাঁ, হইয়াছে। তখন ধীরে ধীরে অগ্নি হইতে অঙ্গুলি অপসৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি আমি যাইতে পারি? আমি অনুমতি দিলাম। তিনি অবসর্পিত নদীতীর বাহিয়া ধীরে ধীরে চিতার নিকটে গিয়া চিতায় আরোহণ করিলেন।

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই চিতার নিকটেই ছিলাম, শেষে অগ্নির উত্তাপে সরিয়া আসিলাম—তখনো তাঁহার কণ্ঠ হইতে শব্দমাত্র শুনিতে পাই নাই, চিতার মধ্যে কিছু যে নড়িতেছে এমন পর্য্যন্ত দেখি নাই! কেবল দেখিলাম তাঁহার দেহের উপরিস্থিত কাষ্ঠগুলি একবার অতি ধীরে একটু নড়িয়া উঠিল তার পর সব স্থির। (১৬)

ইহাই বঙ্গরমণীর অসাধারণ মৌন-বিক্রমের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ইতিহাস। ইহারই কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"বাংলার সেই প্রাণ-বিসর্জ্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আমরা আজ প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীর পুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের সকল কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যজীবনের অবসান দিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি শয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই জীবনাহুতির দ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব; কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয় অমর স্মরণ নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে তোমার সেই অন্তিম বিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্ট-বসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চির নীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক!"

১৬। "I stood near enough to touch the pile, but I heard no sound and saw no motion, except one gentle upheaving of the brushwood over the body, afterwhich all was still;—Bengal under the Hr. Governors—Buckland—vol—1—p 160—62.

কোন একজনকে

শ্রীজগৎকুমার বিশ্বাস

তুমি বলো—কি সুন্দর সেজেছে আকাশ
একবার চেয়ে দেখ ভাই!
আবো বলো কি যে গন্ধ মেখেছে বাতাস!
আমি শুনে চোখ দুটো বেদনার আগুনে জ্বালাই।
তেতলার ছাদে শুয়ে অলস সন্ধ্যায়
উজ্জ্বল আকাশে তুমি মেলে দাও মনের ঠিকানা।
কত সাদা মেঘ উড়ে যায়,
তারি সাথে মেঘ হয়ে পাড়ি দাও কত পথ বন্ধুর অজানা।

আমি শুধু চেয়ে দেখি, ভাবি
বহুদূর চলে গিয়ে আবার কেমন করে ফিরে আসো
পৃথিবীর এই বুকে।—তুমি সিন্ধু নও বিশ্বপ্লাবী,
তবুও ঢেউ-এর তারে সেতার বাজিয়ে তুমি হাসো;

কত দূরে চলে যাও—আমি শুধু এ কূলে দাঁড়িয়ে
পাই কিছু অনুভব, কল্পনায় ভরে নিই তারে।
তোমারি বুকের নীল, আমি যাতে বহুবার গিয়েছি হারিয়ে,
রূপকথা লেখে কত আকাশের আলোর সম্ভারে।

আমিও অবাক হই নদনদী নগরীর রূপে,
তোমার মনের মাঝে তারা তোলে ঢেউ;
আমার মনের মাঝে সাড়া তার জাগে চুপে চুপে,
তোমার তরঙ্গে স্থির থাকে নাক' কেউ।
তাদের আনন্দ কি তোমার মনের মাঝে জন্ম নিয়েছিল
যেমন নদীর জন্ম নির্ঝরের অশান্ত নর্ত্তনে?
শিল্প আর জীবনেরা তোমার মনের মাঝে বাসা বেঁধেছিল
প্রেরণার অমৃত যা—একটি তীব্র সুরের স্পন্দনে?

কী হয়েছে নিমাইয়ের ?

কী জানি কী হল ?

কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে কখনো ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কখনো মালসাট মেরে হুঙ্কার-গর্জন করছে। কখনো বা সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকার হয়ে যাচ্ছে। শচী ভয় পেয়ে লোক ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন। ওগো দেখে যাও, আমার নিমাইয়ের এ কী হল ? এই দেখ, যাকে কাছে পাচ্ছে মারছে, নিজের ঘরদোর তছনছ করছে। এ কী, মাটিতে যে পড়ল মূর্ছিত হয়ে। শিগগির যাও, বদ্যি ডাকো।

ছুটে এল লোকজন। সবাই বললে, বায়ুরোগ হয়েছে। মাথায় বিষ্ণুতেল দাও।

আমি সব ব্যবস্থা করছি। বললে বুদ্ধিমন্ত খান। নবদ্বীপের টাকাওয়ালা লোক, নিমাইয়ের প্রতি পক্ষপাতী। ধরে আনল কবরেজ। কবরেজ তেল চাপাল।

তেলে ঠাণ্ডা হলনা নিমাই। আচম্বিতে অলৌকিক শব্দ করে উঠছে: 'আমিই সেই, আমাকে কেউ চিনতে পারলনা।' বলে ছুটল রাস্তা দিয়ে। 'বিশ্ব ধরে আছি বলেই তো আমি বিশ্বম্ভর।'

ধরো, ধরো, নিশ্চয়ই ওর ওপরে দানবের অধিষ্ঠান হয়েছে। কেউ বা বললে, ভর করেছে ডাকিনী। নারায়ণতৈল লাগবে। আর এ তেল শুধু মাথায় নয়, মাখাতে হবে সর্ব্বাঙ্গে।

তৈলাক্ত কলেবরে খলখল করে হাসছে নিমাই।

হাহাকার করছেন শচী, আর সকলেও ম্রিয়মাণ, মহাবল বায়ু কী ভীষণ কাণ্ড করে ফেলল, আমাদের সে সোনার নিমাই আর নেই—চারদিকে এমনি যখন বিষাদ আর নৈরাশ্য—হঠাৎ স্বভাবের আলো ঝলমল করে উঠল। এ কী, কই সেই মেঘবিকার, এ যে দেখি নীলের নির্মল থালায় রুপালি রোদের ক্ষীর। নিমাই আবার আগের মতন হয়েছে। বায়ু নেই, আগুন নেই, নেই আর আস্ফালন। ফিরে এসেছে স্বরূপানন্দে। হাসছে মৃদু-মৃদু।

সবাই হরিধ্বনি করে উঠল।

কেউ এল উপদেশ দিতে। বললে, 'তুমি এত বুদ্ধি ধরো, তবু তুমি কৃষ্ণভজন করো না কেন ?'

'যার কৃষ্ণকথারুচি সেই ভাগ্যবান।' প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বললেন মহাপ্রভু।

নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ, প্রদ্যুম্ন প্রভুর কাছে এসে

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বললে, 'প্রভু, আমি দীনাধম গৃহস্থ। আমার কৃষ্ণকথা শোনবার খুব ইচ্ছে। তুমি দয়া করে শোনাবে আমাকে কৃষ্ণকথা ?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'আমি কৃষ্ণকথার কী জানি ? জানে শুধু রামানন্দ। তার কাছ থেকেই শুনি আমি কৃষ্ণকথা। তুমিও তার কাছেই যাও। সেই তোমাকে শোনাবে।'

প্রদ্যুম্ন মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে। কী অনবদ্য দৈন্য, পাণ্ডিত্যের এক তন্তু অভিমান নেই, না বা কৌলীন্যের। আর ভক্তের গুণগরিমা প্রকাশ করতে কী উচ্ছ্বসিত আগ্রহ !

'মিশ্র, তোমার যে কৃষ্ণকথা শুনতে মন হয়েছে, তোমার এ মহাভাগ্য।' বললেন আবার মহাপ্রভু।

যদি হরিকথাতে রতি না হয় তা হলে ধর্মকর্ম পরিশ্রমের সামিল। যার ভগবানের প্রতি টান আছে তার আর টানাপোড়েন নেই, নেই কোনো টানাটানি। তোমার যখন কৃষ্ণকথায় লালসা তখন তোমার ধর্মানুষ্ঠানও অর্থান্বিত।

প্রদ্যুম্ন গেল রামানন্দের বাড়ি। রামানন্দ বাড়ি নেই। চাকর বললে, আপনি বসুন। শিগগিরই ফিরবেন।

'কোথায় তিনি ?'

'তাঁর বাগানে আছেন।'

'বাগানে ? সেখানে কী ?'

'অভিনয় শেখাচ্ছেন।'

'কাকে ?'

'দুটি পরমাসুন্দরী কিশোরী দেবদাসীকে।'

'আর কেউ আছে সেখানে উপস্থিত ?'

'না, আর কেউ নেই।'

ভৃত্য আরো বিশদ হল। রামানন্দ রায় নাটক লিখেছেন, নাম শ্রীজগন্নাথবল্লভ। আকাঙ্ক্ষা, স্বয়ং জগন্নাথের সামনে সেই নাটকের অভিনয় হবে। তারই জন্যে এত চেষ্টা-যত্ন-আয়াস-ক্লেশ চলেছে।

জগন্নাথবল্লভ নাটকে পাত্র-পাত্রী তো অনেক। নায়ক কৃষ্ণ ও তার সখা মধুমঙ্গল এই দুই পাত্র আর পাত্রী সাত জন। নায়িকা রাধিকা, তার সখী মাধবিকা, মদনিকা, শশীমুখী, অশোকমঞ্জরী আর মদনমঞ্জরী আর বনদেবী বৃন্দা। এত জনের মধ্যে শুধু দুটিকে বেছে অভিনয় শেখাচ্ছেন কেন? তাও নির্জন বাগানে?

শুধু অভিনয় শেখাচ্ছেন? নিজের হাতে তাদের গায়ে তেল-হলুদ মাখাচ্ছেন, তারপর স্নান করিয়ে গা মেজে দিচ্ছেন। স্নানান্তে সর্বাঙ্গ মণ্ডন বসন পরাচ্ছেন। কোন্ অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার শোভা পাবে তাই দিয়ে সাজাচ্ছেন বেছে-বেছে। সাজাচ্ছেন মাল্যানুলেপনে।

বলো কি?

উপায় কী তাছাড়া। অভিনয় নিখুঁত করা চাই। যে দুজনকে শেখাচ্ছেন তাদের একজন হয়তো কৃষ্ণ আরেকজন রাধিকা। কৃষ্ণ-রাধিকার নিগূঢ়-দুর্গম ভাব রামানন্দ ছাড়া আর কে শেখাবে? অভিনেত্রীদের অঙ্গসৌষ্ঠব কমনীয় না হলে অভিনয় মধুর হবে কি করে? আর এই মাধুর্য সম্পাদনের জন্যে যত লৌকিক উপায় ও উপাদান আছে সব কিছুই সম্বল করেছে রামানন্দ। ব্রজলীলায় যারা অভিনয় করবে তাদের দেহ স্নিগ্ধলাবণ্যে কান্তোজ্জ্বল হতে হবে তাই রামানন্দের নিজ হাতে ক্ষালন-মার্জন, নিজ হাতে মর্দন-মণ্ডন। আমি নিজ হাতে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে-গুছিয়ে না দিলে আমার তৃপ্তি নেই। আমার পূজা রাগানুগা। আমি রাধারাণীর দাসী। দেবদাসীদ্বয়ের সেবার সময়েও আমার সেই আরোপ, সেই ভাব।

অত কথা কে বোঝে! গুম হয়ে বসে রইল প্রদ্যুম্ন।

মহড়া শেষ হবার পর দেবদাসীদের প্রসাদ খাইয়ে তাদের নিজ-নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে রামানন্দ ঘরে ফিরল।

ভৃত্য খবর দিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র বসে আছে।

সনমস্কার রামানন্দ মিশ্রের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, ক্ষমা করবেন। আপনার পায়ের ধুলোয় আমার ঘর পবিত্র হল। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে।'

বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, মিশ্র উঠে পড়ল। বললে, 'আমার অন্য কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছিলাম। দর্শন পেলাম, তাতেই আমি কৃতকৃতার্থ।'

ফিরে গেল প্রদ্যুম্ন।

পরদিন সকালে মহাপ্রভুর কাছে যেতেই মহাপ্রভু জিগগেস করলেন, 'কি, রামানন্দের কাছে শুনলে কৃষ্ণকথা?'

প্রদ্যুম্ন রামানন্দের কীর্তিকথা ব্যক্ত করল বিরক্ত হয়ে।

এ দুর্গম মহিমা। উদ্যানের বিরলে বসে পূর্ণ-যৌবনা দেবদাসীদের অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। ভাব-বিভ্রমের আধার নৃত্যগীতের উচ্ছ্বাস যে সব রমণী, তাদের। শুধু দেখছেনা, স্পর্শ করছে। অঙ্গভঙ্গি শেখাতে যেটুকু দরকার শুধু ততটুকু নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। নিজহাতে তেল মাখাচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, গাত্রমার্জনা করে দিচ্ছে, রচনা করছে বেশভূষা। কী পরিমাণ চিত্তচাঞ্চল্য হবার কথা সহজেই অনুমেয়। তার কাছে কৃষ্ণকথা শুনব কি। বরং কলঙ্ককথা শুনি?

মহাপ্রভু বললেন, 'তুমি রামানন্দের কাছেই যাও। সেই সত্যিকার কৃষ্ণকথার অধিকারী'

এ যে আশ্চর্য কথা, প্রদ্যুম্ন বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, রামানন্দের কথা আশ্চর্য কথা।' বললেন মহাপ্রভু, 'সুন্দরী যুবতী মেয়ে যদি একটুকরো কাঠ বা পাথরকে স্পর্শ করে তা হলে কাঠ বা পাথরের কী হয়? কিছু হয়না। কোনো বিকারই তাতে হয়না। রামানন্দও তেমনি কাষ্ঠ-প্রস্তরের মতই নির্বিকার।'

'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমিই বলছি। গুহ্য অঙ্গের দর্শনে স্পর্শনেও তার ভাবান্তর নেই। তার যে দাসীভাবে আরাধনা। তার ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব নেই। তুমি ফিরে যাও তার কাছে। বোলো আমি পাঠিয়েছি। প্রাণ ভরে কৃষ্ণকথা শুনে এস।'

প্রদ্যুম্ন ছুটতে ছুটতে চলে এল রামানন্দের কাছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললে, 'প্রভু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে।'

'কেন বলুন তো?' প্রভুর নাম শুনে প্রেমাবিষ্ট হল রামানন্দ।

'কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে।'

প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণকথা অন্তরে স্ফুরিত হোক। প্রাণের উল্লাসে রামানন্দ বলতে লাগল। আর প্রদ্যুম্ন? প্রদ্যুম্ন নাচতে লাগল কৃষ্ণপ্রেমে।

দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে তবে না বক্তা, না শ্রোতা কারুই আত্মস্মৃতি নেই।

নিমাই চলল তার শিষ্যদের সঙ্গে লীলা করতে।

বললে, 'চলো বাজারে যাই। কত দিন কিছু আসেনি সংসারে।'

'চলুন।' বললে পড়ুয়ারা। 'কিন্তু কেনবার কড়ি কোথায়? নিয়েছেন সঙ্গে করে?'

'কোথায় পাব? দেখি মিষ্টি কথায় পাই কিনা।' নিমাই হাসল: 'দেখি মধুরের বাজারদর কত?'

বাজারে ঢুকতেই প্রথমে ডাকল তন্তুবায়।

'ও ঠাকুর, আমার দোকানে আসুন, দেখুন না কেমন সুন্দর আর মজবুত ধুতি—'

'কই দেখি।'

একখানা ধুতি বাছল নিমাই।

'খুব ভালো, কেমন মিহি অথচ টেঁকসই।' ক্রেতার পছন্দকে তারিফ করল দোকানি।

'দাম কত? আর দাম জিগগেস করেই বা লাভ কী। দেব কোত্থেকে? একটা কাণাকড়িও হাতে নেই।'

দোকানি ফাঁপরে পড়ল। বললে, 'তা দামের জন্যে ভাবনা কি। দাম না হয় কদিন পরে দেবেন।'

'না বাবা, ঋণ করতে পারব না।' নিমাই ফিরে চলল। 'কোনোদিন ঋণ করিনি। যদি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে শোধ করতে না পারি।'

'না পারেন তো মেয়াদ বাড়িয়ে নেবেন।' দোকানি দোনামনা করতে লাগল।

'না বাবা, সেই মেয়াদও বজায় থাকে কিনা তার ঠিক কি।' নিমাই পা বাড়াল রাস্তায়। 'একে ঋণ তায় আবার কথার খেলাপ—অত পোষাবেনা। অদৃষ্টে যখন নেই তখন আর কী করব!'

রাস্তায় নেমে পড়েছে নিমাই, পিছন থেকে ডাকল দোকানি। 'ও ঠাকুর, ধুতিখানা তুমি অমনি নিয়ে যাও। তোমার ইচ্ছে হয়েছে তাই আমি কৃপা হয়েছে বলে মনে করছি। তুমি যদি নাও মনে হচ্ছে তাইতেই আমার মঙ্গল।'

নিমাই নিল হাত বাড়িয়ে।

'ও ঠাকুর, পান খেয়ে যাও।' তাম্বুলি ডাকল।

হনহন করে চলে যাচ্ছে নিমাই, বললে, 'পান খাবার কড়ি নেই।'

'আহাহা, নাই বা থাকল, এক খিলি পান তোমাকে খাওয়াতে পারি না?' পানওয়ালা বললে ব্যগ্র হয়ে।

নিমাই থামল। বললে, 'তুমি খাওয়াতে চাইলে আমিই বা বিনা কড়িতে খাব কেন?'

'না খাও তো, তুমি হাতে নিয়ে ফেলে দাও রাস্তায়—'

'তা তোমার জিনিস আমি অমনি-অমনি নেবই বা কেন, ফেলবই বা কেন?' নিমাই মুখ ফেরাল; 'যখন স্বচ্ছল হব তখন কিনে খাব।'

'না, তুমি যদি আমার হাতের পান না খাও আমি প্রাণ দেব। তোমাকে বিনা দামে পান খাওয়াব এই আমার প্রাণের অভিলাষ।' পানওয়ালা নিমাইয়ের হাত ধরল।

নিমাই হাসতে হাসতে বললে, 'তোমার প্রাণ যাওয়ার চাইতে আমার পান খাওয়ায় ঝঞ্ঝাট কম। দাও তাহলে এক খিলি।'

পর্ণে-চূর্ণে-খদিরে-কর্পূরে পান সাজতে লাগল তাম্বুলি।

বাজার থেকে নিমাই চলল এবার গোয়ালার ঘরে। বললে, 'দই-ক্ষীর কী আছে আনো দেখি।'

গোয়ালারা আনতে লাগল ভাঁড়ে ভাঁড়ে। যা পারো খাও নয়তো পাঠিয়ে দিই বাড়িতে। দাম? দাম কিসের? তুমি খাবে এই তার দাম।

'ভালো দেখে গন্ধ আনো।' গন্ধবণিকের ঘরে গিয়ে হাঁক দিল।

নিয়ে এল দিব্য গন্ধ। দাম কত নেবে? আমার গন্ধ যদি তোমার গায়ে লাগে, তোমার গায়ে থাকে তাই আমার দাম।

মালাকরের ঘরে গিয়ে নিমাই বললে, 'মালা দাও। দাম দিতে পারব না কিন্তু।'

তোমার গলায় যদি আমার মালা দোলে, সেই আমার দাম।

তারপর শঙ্খবণিকের ঘরে গিয়ে শঙ্খ চাইল নিমাই। শঙ্খবণিক নিমাইয়ের দক্ষিণ হাতে তুলে দিল শঙ্খ। দাম?

তুমি যদি এই শঙ্খে একটি ধ্বনি তোলো, বললে শাঁখারি, তবে সেই আমার জয়ধ্বনি। [ক্রমশঃ।
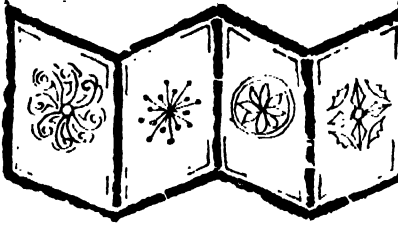
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৮

জিয়ালগোড়া পোঃ
জেলা মানভূম, বিহার,
১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৯

প্রিয় মহাত্মাজী,

এক তারবার্ত্তায় আজ আমি আপনাকে জানাইয়াছি যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের সময়ে কলিকাতায় আপনার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। ইহা এতই আবশ্যক যে, আপনার সুবিধার জন্য, প্রয়োজন হইলে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত। অনুগ্রহ করিয়া জানান কোন্ তারিখে আপনার পক্ষে কলিকাতায় আসা সম্ভব হইবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী কয়েকজন বন্ধু আমাকে জানাইয়াছেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্ব্বেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। এ-বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত এতই দৃঢ় যে, তাঁহারা মনে করেন যে ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব্বাহ্নে গঠিত না হইলে, এ, আই, সি, সির অধিবেশন ডাকিয়া কোনও লাভ হইবে না। তাঁহারা আরও মনে করেন, আমাদের উভয়ের পত্রালাপের মাধ্যমে কোনও মীমাংসা না হইলে, ব্যক্তিগত (উভয়ের) আলোচনার মাধ্যমে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদের মতে, আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হইলে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি অধিবেশন স্থগিত রাখিতে সাহস করি না, (কারণ আমার বিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ আসিতে পারে), যদি না আপনি পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু আমারও দৃঢ় অভিমত এই যে, পত্রবিনিময়ে যদি সুফল না ফলে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন এবং তাহা এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্ব্বেই হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাতেও যদি কোনও মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে এইটুকু অন্ততঃ আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে বলিতেছি। একদলীয় কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনার উপদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না; সেজন্য আমি দুঃখিত। (কি জন্য তাহা পারিলাম না তাহা পূর্ব্ববর্তী পত্রগুলিতে জানাইয়াছি। এখানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না।) অতএব, পন্থ-প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে আপনার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সোজা কথায়, ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের নামের তালিকা আপনাকে ঘোষণা করিতে হইবে। আপনি যদি তাহা করেন, তাহা হইলে অচলাবস্থার অবসান হইবে, ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিবে এবং তাহার পর বসিবে এ, আই, সি, সির অধিবেশন। এই আশা করা যাইতে পারে যে, তাহার পর সব ঠিক হইয়া যাইবে, আর কোনওরূপ সঙ্কট দেখা দিবে না।

যদি কোনও কারণে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে আপনি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে গোলকধাঁধায় ঘুরিতে হইবে। তখন বিষয়টি (ওয়ার্কিং কমিটি গঠন) এ, আই, সি, সির সম্মুখে অনিশ্চিত অবস্থায় উপস্থাপিত হইবে। আমার মনে হয়, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্ব্বেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। কারণ, তাহা হইলে ত্রিপুরীর ন্যায় এ, আই, সি, সির অধিবেশন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবে না।

জানি না, এখন আপনি কিরূপ চিন্তা করিতেছেন কিন্তু আমি এই আশা করি যে, আপনি ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের নাম ঘোষণা করিবেন এবং অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবেন। আপনার অভিমত যদি অন্যরূপে হয় তাহা হইলে আমার অনুরোধ এই যে, আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন, ওয়ার্কিং কমিটি গঠন পূর্ব্বাহ্নে না করিয়া কলিকাতায় এ, আই, সি, সির অধিবেশন বসিলে কি দুর্বিপাকে তাহা পর্য্যবসিত হইবে। যদি ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় (আপনি অন্যরূপ অভিমত পোষণ করেন) তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন এবং তাহার জন্য প্রয়োজনবোধে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখাও উচিত।

একটি বিষয়ে সম্প্রতি আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি। একদলীয় ক্যাবিনেট সম্পর্কে আমরা বহু আলোচনা করিতেছি—কিন্তু একদলীয় ক্যাবিনেট বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি কি? উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর, হরিপুরা কংগ্রেসের পর যে সকল ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপনি একদলীয় ক্যাবিনেট বলিবেন না অন্য নামে অভিহিত করিবেন? যদি ঐগুলিকে আপনি একদলীয় বলেন তাহা হইলে একদলীয় বনাম সর্ব্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠন লইয়া বিবাদ-বিসংবাদের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি ঐগুলিকে সর্ব্বদলীয় বলেন, তাহা হইলে, তিন বৎসর সাফল্যের সহিত কাজ চালাইবার পর, এই বৎসরই বা সর্ব্বদলীয় ক্যাবিনেট কার্য্যকরী হইবে না কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদলীয় বনাম সর্ব্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠন সম্পর্কে পুঁথিগত আলোচনা যদি আমরা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের মোট নামের একটা তালিকা খাড়া করিতে পারিব যাহা, সামগ্রিক ভাবে এ, আই

সি, সির এবং কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যগণের আস্থাভাজন হইবে। সমস্যার এই দিকটি দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।

দুর্নীতি, হিংসা ইত্যাদি সমস্যা লইয়াও আপনি বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত। সম্ভবতঃ এই প্রশ্নগুলিকে আপনি মূলগত বলিয়া মনে করেন। বর্ত্তমানে কতখানি দুর্নীতি আছে, কতখানি হিংসার ভাব বিদ্যমান—এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে কি আমরা একমত নই যে দুর্নীতির এবং হিংসার অবসান হওয়া উচিত এবং সেজন্য যথাযোগ্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আপনি কেন আশঙ্কা করিতেছেন যে, কাজের সময় আমরা একযোগে কাজ করিব না বা জরুরী বিষয়ে আমরা একমত হইব না?

পত্রটিকে আর দীর্ঘ করিব না। মনের কথা খুলিয়া আপনাকে জানাইয়াছি। আমি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, ক্যাবিনেটের রূপ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ থাকিলেও, ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার পর আমরা দেখিতে পাইব যে, আসল নামগুলি সম্পর্কে আমরা একমত হইতে পারিয়াছি এবং জরুরী বিষয় সম্পর্কে আদর্শগত যতই বিরোধ থাকুক না কেন, কাজের সময় উপস্থিত হইলে, একযোগে কাজ করিতে আমরা পারিবই।

আশা করি, কস্তুরবা দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছেন এবং অত্যধিক কাজের চাপ সত্ত্বেও আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক। আমি ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছি।

সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

[ইহার পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সহিত নেতাজীর তারবার্ত্তা-বিনিময় হয়। নেতাজী তিনটি এবং গান্ধীজি তিনটি তার-বিনিময় করেন। গান্ধীজি নেতাজীর সাত নম্বর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র দেন নাই। গান্ধীজির ১১।৪।৩৯ তারিখের তারবার্ত্তার পর নেতাজী দুইটি তার পাঠান এবং তাঁহার ৮নং পত্র লেখেন। উহাই তাঁহার শেষ পত্র। পত্রালাপ-পর্ব্বের এইখানেই শেষ। এই শেষ পত্রের পর নেতাজী ২খানি তার পাঠান এবং শেষ তারে গান্ধীজি জানান যে, পত্রগুলি প্রকাশ করা যাইতে পারে।]

নেতাজীর পত্র—৮নং

জিয়ালগোড়া পোঃ,

জেঃ মানভূম, বিহার,

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৯।

প্রিয় মহাত্মাজী,

অদ্য আপনাকে নিম্নোক্ত তারবার্ত্তাটি পাঠাইয়াছি:—"মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট। আপনার জ্বরের জন্য চিন্তিত। সত্বর আরোগ্য কামনা করি। জওহরলালজীর এবং আমার আন্তরিক আশা এই যে, আমাদের উভয়ের (আপনার এবং আমার) সাক্ষাৎকারের ফলে সুফল ফলিবে এবং একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল কংগ্রেসসেবীর মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব করিবে। কলিকাতায় আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনায়, ঐ সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে, পত্রগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক। প্রণাম। সুভাষ।"

গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ পত্রালাপ হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে এই পত্রালাপ কোনও সুফল প্রসব করে নাই। যাহা হউক উহা একবিষয়ে সহায়ক হইয়াছে—আমাদের পারস্পরিক বুঝাপড়ায় মনের ভাব পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়া উহা সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু জরুরী সমস্যার সমাধান এখনই করিতে হইবে, কারণ, আমরা আর অধিক দিন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কাজটি ফেলিয়া রাখিতে পারি না। দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ এমনই যে, এখনই কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান প্রয়োজন। আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রতিদিন অবনতির দিকে যাইতেছে। বৃটিশ লোকসভায় যে সংশোধনী বিল পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে বৃটিশ সরকার, ভারতীয় প্রদেশগুলিতে যেটুকু স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা আছে, তাহাও কাড়িয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সকল দিক বিচার করিয়া উহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধ হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা একটা দারুণ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছি যদি এখনই আমরা বিভেদ দূর করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমরা সেই বিপর্য্যয়ের সহিত যুঝিতে পারিব।

আপনি যদি আগাইয়া আসিয়া নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন, তবেই এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমরা সবাই আপনার অনুগমন করিতে এবং আপনার সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আপনি আরও দেখিতে পাইবেন যে, দুর্নীতি দূরীকরণ এবং হিংসাত্মক প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আমাদের দুই দলের মধ্যে একটা ঐক্যমত আছে, যদিও দুর্নীতির পরিমাণ এবং বর্ত্তমানে দেশে হিংসাত্মক মনোভাব ঠিক কতখানি আছে সে সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কার্য্যক্রম সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, কংগ্রেস অথবা এ, আই, সি, সিকেই উহা স্থির করিতে হইবে যদিও প্রত্যেক সভ্যই ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ অভিমত উক্ত সংস্থাগুলির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারে। কার্য্যক্রম সম্পর্কে আমার এই কথা মনে হইতেছে যে, যে সঙ্কট আমাদের সম্মুখে আসিতেছে তাহাই উহা স্থির করিতে সাহায্য করিবে এবং তখন ঐ বিষয়ে আর মতভেদের অবকাশ থাকিবে না।

এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্ব্বে কলিকাতায় অথবা কলিকাতার নিকটে আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য প্রদেশে এই মতই ক্রমশ দৃঢ় হইতেছে যে, আদর্শগত বিরোধ এবং অতীত মতভেদ বা মনকষাকষি সত্ত্বেও পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যার সমাধান করা উচিত। পন্থ প্রস্তাব অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব আপনার। ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমরা আপনার সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছি।

ভোরাই

শ্রীসজনীকান্ত দাস

আমি কি তোমার গান গা'ই ?
তুমি আজ কোথা আছ, মরেছ অথবা বাঁচো
আমার তো কিছু জানা নাই।
ভুলে গেছি যেন কবে প্রত্যূষের সে উৎসবে
তুমি দিয়েছিলে আল্‌পনা ;
ধুয়ে মুছে গেছে সব, আছে কি না অনুভব
নাই—কিছু করি না কল্পনা।
আমি কি তোমার গান গা'ই ?
জীবনের দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড সে সূর্য্যকরে
পুড়ে গেছে ভোরের সানাই।

সুনীল আকাশে চেয়ে চেয়ে
কত রং কত ছবি দেখে যে সন্ধ্যাব করি ;
তোমার সে কচি মুখ, মেয়ে,
তার মাঝে পায় ঠাঁই ? আমার তো মনে নাই,
জীবনের প্রথম রাগিণী
কবে কোথা কে বাজাল, আঁধারে অরুণ আলো
কে বুলাল—রাখিনি তো চিনি।
সুনীল আকাশে চেয়ে চেয়ে,
হাজারো সুরের ভিড়ে ভোরের সে সুরটিরে
ভুলে গেছি, আন্‌ গান গেয়ে।

নিয়ো না, নিয়ো না অপরাধ।
অনেক ঝড়ের ঘায়, মধুপের পায়-পায়
মুছে যায় মুকুলের সাধ।
চলার নেশায় যদি পার হয়ে গিরিনদী
ভুলে যাই প্রিয় গ্রামখানি,
বার বার আঁখি এসে পথিকে ভুলায় শেষে
তারে কি দুষিবে, দোষী মানি ?
নিয়ো না, নিয়ো না অপরাধ—
আমি খাঁটি সোনা নই তব সোহাগায় কই
কাটে না তো জীবনের খাদ ?

পাখী তো নিজের গান গায়।
নিশান্তে তরুণ আলো চোখে তার লাগে ভালো
সে তো দূরে উড়ে যেতে চায়।
প্রহরে প্রহরে তার গান ওঠে অনিবার—
কভু রোদ, কভু সমীরণ,
কভু ফুল কভু ফল, কভু আকাশের জল,
গান তার কিসের কারণ ?
পাখী তো নিজের গান গা'য়—
সে গান তাহারি বুকে ঘুমাইয়া থাকে সুখে
আপনা আপনি উছলায়।।

ভেবে থাকো যদি, আনমনে
গেয়েছি তোমার গান— তটিনীর কলতান
নয় সে তো উৎসের স্মরণে !
যে তট নিকটে তাকে ভালবাসে, ঘিরে থাকে,
তাহারি আঘাতে ওঠে সুর ;
তারে ভাঙে তারে গড়ে তবেই না গান ঝরে—
গিরি-পথ সে তো বহু দূর।
ভেবে থাকো যদি, আনমনে
গেয়েছি তোমারে স্ম'রে, ক্ষমা তুমি কর়ো মোরে,
ভুলে যেয়ো ভোরাই স্বপনে।

জওহর এখানে গতকাল আসিয়াছিল। বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাহার সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। আমাদের উভয়ের একমত দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।

আমাদের মনে হয়, আপনার আসিবার সময় কলিকাতার নিকটে কোনও ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলে ভাল হয়, তাহা হইলে শান্তপরিবেশে আলোচনা হইতে পারিবে। আপনি যদি নাগপুর হইয়া আসেন তাহা হইলে মেদিনীপুরই (খড়্গপুরের নিকট) সর্ব্বোত্তম স্থান হইবে। আপনি যদি চুকি হইয়া আসেন, তাহা হইলে, বর্দ্ধমানের নিকট কোনও এক স্থানের কথা ভাবিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনাকে একটি তার পাঠাইয়া উত্তরের অপেক্ষায় আছি। তাহা সম্ভব না হইলে, কলিকাতাতেই আমাদের সাক্ষাৎকার হইবে। আমি জওহরকে আলোচনায় যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছি এবং সে সানন্দে সম্মতি দিয়াছে।

আপনার জ্বরের জন্য চিন্তান্বিত আছি। প্রার্থনা করিতেছি, উহা যেন শীঘ্র দূর হয়।

সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

[ইহার পর নেতাজী দুইটি এবং গান্ধীজি একটি তারবার্ত্তা বিনিময় করেন এবং পত্রালাপ-পর্ব্বের অবসান হয়।]

শি শি র-সা ন্নি ধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

Prompting সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, বললেন—মণিমোহন বড় ভালো prompter ছিলো, অভিনেতা তৈরী করতে পারতো। অথচ কি পেলো? কী কষ্টে মরলো, কি রকম বাড়ির কী রকম ঘরে! তার আত্মীয় তাকে দেখলে না, অথচ থিয়েটারে প্রথম নাববার সময় মণিমোহনের পেছনে পেছনে ঘুরেছে। কথাগুলো বলেই কি রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

উনি যখন চুপ করে বসে আছেন আমরা ক'জন একপ্রান্তে বসে তখন ফিসফাস করে কথা কইছিলাম, তারই একটি কথা কানে যেতে চমক ভাঙলো ও'র, প্রশ্ন করলেন—মিতা শ্রীকান্তে কমল করছে? তারপর নিজেই বলে চললেন—মেয়েটা অভিনয় তো ভালোই করে, তবে বাপ স্বীকার করবে কি না জানিনে। ওর একটি মাত্র দোষ, অভিনয় হৃদয় থেকে করে না, মুখস্থ বলে। approachটা বড় মেকানিক্যাল, দেখো, জীবন রঙ্গে নিভার ভূমিকা করেছিলো বন্দনা, বড় ভালো করেছিলো। জীবন সম্বন্ধে বিশেষ করে হৃদয় সম্বন্ধে জ্ঞান যে খুব বেশি। বাইরের মেয়েরা জীবন সম্বন্ধে জানে ভালো। কর্ণেল ক্রফোর্ড বলতেন, লেখাপড়া না জেনে অভিনয় করে কি করে। তাতে বলেছিলুম, They have drank from the fountain of life and not through conduit pipe.

ও'র পুরোনো দলের কথায় বলেছিলেন—আমাদের টুর বড় ভালো হতো। দলটা ভালোই গড়ে উঠেছিলো, মৃত্যু আর অন্যান্য কারণে ভেঙে গেলো।

এর পর হলো বিদেশী নাট্যকারদের সম্বন্ধে আলোচনা। উনি বললেন—বার্থল্ড ব্রেক্ট অনেক কিছু করেছেন, মায় বিনা ষ্টেজে অভিনয় করানো পর্যন্ত। আমাদের কিন্তু ওটা ট্রাডিশন—বিনা ষ্টেজে, বিনা সিনে অভিনয় আমরা চিরকালই করেছি। তারপরই দুঃখ করে বললেন—বাড়ি পেলুম না, experimentation করতে পেলুম কই। যাত্রাকে জাতে তুলে থিয়েটারকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু exit-entrance হবে কি করে? যাত্রায় আসরে বসে পড়তো, কিন্তু সকলের মাঝখানে বসে রাধা হুঁকো খাচ্ছে চোখে লাগতো।

হঠাৎ বিনয়দাকেই জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গিতে বললেন—গ্রীক নাটকের রূপ কেমন ছিলো? কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বলে চললেন—যাত্রার স্পীচগুলো এক ধরণের আর লম্বা লম্বা হতো। এই দুর্বলতার জন্যই অ্যাপিল করলো না। সীতাতে গিরিশবাবু তো সীতা বিসর্জনের পর গান ধরলেন। যাত্রা ধরণের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বই হলো পাণ্ডবগৌরব harmonius বই।

গিরিশ প্রসঙ্গেই বলে চললেন—গিরিশবাবু নাটক লিখবেন কখনো ভাবেননি, কিন্তু বঙ্কিম আর দীনবন্ধু দিয়ে চললো না, তাই লিখলেন। তবে গান ভালোই বাঁধতেন।

আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরলেন—চারদিক খোলা হয়তো চলবে না। তবে তিন দিক খোলা রেখে কেমন হয় পরীক্ষা ক'রে দেখতে দোষ কী। উঁচুটাকে নিশ্চয়ই নাবানো যায়, অতো উঁচু রাখার দরকার কি?

ষ্টেজের কথায় বললেন—একটি নতুন বই হ'চ্ছে না। যা' ষ্টেজ আছে তারও তো উন্নতি করা যায়। এই তো অডিটোরিয়ামকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করলো, অথচ ভেতরে আর্চ দিয়ে ষ্টেজকে ছোটো ক'রে দিলে।

আমি যা কিছু innovation করেছি লোকে নিল না, আর অন্যদের চেঞ্জ সবাই নেয়। একবার রেল লাইনের ধারে একজনকে মুড়ি সাজাতে দেখেছিলুম, বলেছিলো, শোভা ক'রছি। এরাও শোভা করছে।

শ্রীর ওপেনিং আর ডেপথ সবচেয়ে বেশি। দিগ্বিজয়ীর মতো বই কী আর হবে?

কোনো বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকের কথা উঠতে বললাম—They are hardly educated.

তার পর নির্মলচন্দ্রের কথা বললেন—নির্মলের frustration যাদের জন্যে এতো ক'রলো, কংগ্রেসের জন্যে এতো করলো অথচ তারা সবাই তাকে ঝেড়ে ফেলতো। দেনার দায়ে মাথাপাগল। যাদের মানুষ করলে তারা ডাকলে আসবে কি না এ সন্দেহ ছিলো তার। ওর মতো অমন হৃদয়ের বিস্তার অল্পই দেখেছি। আগে খুব স্মার্ট ছিলো, কিন্তু বড় ছেলে মারা যেতেই গোঁতোমি আর আলবোলা নিয়ে প'ড়লো। অতো দিন কাউন্সিলে ছিলো, ইকনমিক্স আর পলিটিক্যাল ইকনমিতে অতো বড় পণ্ডিত কিন্তু কখনো বক্তৃতা দেয়নি। বিজয় ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো, এসে আবার থিয়েটার দেখতে পারতো না, ভাবতো আমিই নির্মলকে ডুবিয়েছি।

আমাদের দেশে কেনো কিছু মন-প্রাণ দিয়ে করতে গেলে পেছনে লোক পাওয়া যায় না। গিরিশবাবু তাই ছেলেকে বলেছিলেন—প্রোপ্রাইটর হ'সনে। ছেলের কথা ভেবে সিরাজে বড় বড় বক্তৃতা ঢোকালেন। দানীবাবুর অনেক দোষ ছিলো, কিন্তু কমেডি ভালো ক'রতেন, বোধগম্য হ'লেই ভালো ক'রতেন, তবে ভক্তদের তোষামোদে ডুবলেন।

—রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করেছিলুম—বাংলা দেশের নাটক বাঙালীর মতো ক'রতে গেলে কেমন কর্ম হবে? তাতে বলেছিলেন, তোমরা দেবে, নয়তো এসেছো কেনো? নিজে কিন্তু এলিজাবেথান ষ্টেজকে ফলো করলেন, তাঁর সাংকেতিক নাটক মেতারলিংক প্রভৃতির অনুসরণ করে।

—বার্থল্ড ব্রেক্টের নাটক অপূর্ব—Exception and the rule কি সুন্দর! আজকাল তো আর মেয়েছেলে নিয়ে আড্ডা নেই, তাই এখন একটা বাড়ি আর কিছু এনডাওমেন্টস—যাতে সবাই কিছু পায়।

সিনেমা ভালো কি থিয়েটার ভালো, জানতে চাওয়ায় বললেন—গত পঞ্চাশ বছরে সিনেমায় ক'টা ভালো বই হয়েছে। বছরে লাখ-লাখ নায়ক-নায়িকা হচ্ছে অথচ তিনকড়ি আর তারাকে সকলে মনে রাখবে। প্রভার মতো অভিনেত্রী আর হয়নি।

—দানীবাবুর সঙ্গে প্রফুল্ল যত বার করেছি Understanding ছিলো যে উনি যখন অভিনয় করবেন আমি কিছু করবো না, কারণ নরেশ একবার ভুঁড়িতে হাত বুলিয়েছিলো। (নরেশ কাত্যায়ন হলেই চাণক্যকে মারবার তাল করে।) দানীবাবুর গলা ছিলো অপূর্ব। উদারা-মুদারা-তারা—তিন গ্রামেই গলা চলতো: তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিলো প্রখর আর তার জোরেই চ'লতো। বিলেতে হ'লে বিপদে পড়তেন, তবে গলার জন্যে হয়তো ও-দেশেও দাম পেতেন।

কথার জের টেনে চললেন—গিরিশবাবু আর অমৃত বোসের দু' দল না হ'লে হয়তো ভালো হতো। ভুবন নিয়োগী, অর্ধেন্দু বাবু, অমৃতলাল তো ছিলেনই, কিন্তু সবার ওপরে ছিলেন গিরিশবাবু। গিরিশবাবু ছাড়া থিয়েটার তো কেউ রাখতে পারেন না। ষোল হাজার টাকা দিলেন (আজকালকার এক লাখ ষাট হাজার টাকার মতো) অথচ পার্টনার না করে তাড়িয়ে দিলে। থিয়েটার থেকে পেতেন কি? মাসে একশ' টাকা মাইনে আর দৈনিক চার পয়সার তামাক—ছিলেন Dramatic director। রোজ রোজ সেই ষোল হাজার টাকা দেবার কথা বলতেন, তাই তাড়িয়ে দিলে।

—থিয়েটারে দলাদলি চিরকাল। ক্ষেত্রমণিকে ভালো পার্ট না দিয়ে Starve করিয়ে করিয়ে নষ্ট করে দিলে। দলাদলিতে থাকতেন না অর্ধেন্দুবাবু। খুব ভালো লোক ছিলেন তিনি। সব দলেই মিশতেন। খুব দরাজ দিলও ছিলো ওঁর। অমন লোক আর হবে না।

তাঁর থিয়েটারের পুরোনো খাতাপত্র কিছু আছে কিনা জানতে চাওয়ায় একটু যেন বিরক্ত হলেন, বললেন—খাতাও কী আমি রাখবো? বিশ্বেশ্বর যতদিন ছিলো ততোদিন করেছে। অশিক্ষিত লোক, যতটুকু পেরেছে ততোটুকু করেছে। সে মারা যেতে হীরালালবাবুকে বললুম, আপনি খাতা রাখুন। তা'তে বললেন—ওই নিয়ে অমর দত্তর সঙ্গে ঘুষাঘুষি হয়েছিলো। বললুম, আমার সঙ্গে হবে না। তবু বললেন—ও ভার আর আমার ওপর চাপাবেন না।

পরের দিন চব্বিশে ফেব্রুয়ারী আবার এলেন। তখনও ডিকেন্সের কথাই ঘুরছে মাথায়। ঢুকতে ঢুকতে বললেন—ডিকেন্স বড় ভালো লোক ছিলেন হে! তবে পরিচিত আত্মীয়দের সবাইকেই লেখায় ঢুকিয়েছেন। আর কি অপূর্ব গলা! খুব ভালো অভিনয় করতে পারতেন, নিজের লেখা পড়ে প্রচুর পয়সা পেয়েছেন, বিশেষ ক'রে আমেরিকায়। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের গলাও ওই রকম ছিলো, উনিও ইচ্ছে করলে ওই ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

—ডিকেন্সের স্বভাবচরিত্র খুব ভালো ছিলো না। লিটল অ্যানের সঙ্গে খুব ভাব ছিলো, বইও পড়তেন খুব। লিটল অ্যানের মৃত্যুর পর বই-ই হয়েছিলো একমাত্র সঙ্গী, পড়তে পড়তেই চোখ গেলো।

—হেস্কেথ পিয়ার্সনের লেখা জীবনীটা বেশ ভালোই লাগছে। ওতে বহু literary allusion আছে। ফিসারের ইতিহাসেও আছে। আর-কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে সেক্সপীয়ার কোট ক'রে বেকুব বনে গেলুম। হ্যামলেট পড়েনি তা স্বীকার করতে রাজী নয় অথচ যা বোঝালুম তা কিছু বুঝলো ব'লে তো মনে হয় না।

কোনো এক অভিনেতা সম্বন্ধে বললেন—ওর যা দাম তা কী পেলো? বড্ড লাফায় যে! শৈলেনেরও ওই দোষ ছিলো, দু'পয়সা পেলেই ছুটতো। অথচ একটু ভেবেচিন্তে অভিনয় করলে ওই তোমাদের কি কুমার—তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারতো। অথচ মরবার সময় কী আর রেখে যেতে পেরেছে? ওর একটা কিন্তু মস্ত বড় ক্ষমতা ছিলো—সমস্ত চরিত্রের সংলাপ মুখস্থ থাকতো! ও ক্ষমতা রবিরও ছিলো, আর একটা মজার ব্যাপার ছিল, সকলের আগে এসে মেক-আপ নিতে ব'সতো অথচ কখনো মেক-আপ নিয়ে খুশি হ'তো না।

এর পর রিহার্স্যাল সুরু হ'লো। বললেন—আগের দিন মোটেই রিহার্স্যাল হয়নি, আজ আর কোনো কথা বলবো না।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারী বোধ হয় রবিবার ছিলো, সেদিনটা বাদ দিয়ে ছাব্বিশে এলেন। ডিকেন্সের জীবনী পড়ার রেশ তখনও কাটেনি, তাই সেদিনও ঢুকেই প্রথম বললেন—ডিকেন্স মস্ত বড় অভিনেতা ছিলেন, ছিয়াত্তর রাত্রিতে বিশ হাজার টাকা রোজগার করেছেন।

এই সময় সম্ভবতঃ বিনয়দার সঙ্গেই কথা উঠলো, নাটকে কথার দাম কি? উনি বললেন—নাটকে কথা দরকার বই কি। আলো নিবে পর্দা উঠলো, সবাইয়ের মনেই যখন ঔৎসুক্য তখন প্রথম কথাটার দাম কতখানি বলোতো? প্রথমে ঢুকে বাজে কথা বললে কী ভালো হ'তো? তবে আমাদের দেশে নাটকে কথা একটু বেশি। বার্ণার্ড শ'র লেখাতেও এই দোষ আছে। আসলে তিনি ভালো নাট্যকার নন, his characters are so many pegs to hang his ideas on! তবে গল্পটা সব সময়ই বলেছেন। যে যে বইতে গল্প সব চেয়ে ভালোভাবে বলেছেন সেই সেই বই মানুষ ভালোভাবে নিয়েছে।

নির্বাক ছবিতে কথা না বললেও তো গল্প বলতে পারা যায়। যেখানে সেইভাবে বলেছে সেখানে sub title ছাড়াও বুঝতে অসুবিধে হয় না।

এই সময় পার্সিভাল সায়েবের কথা উঠলো, বয়স্কদের মধ্যে কারা তাঁর কাছে পড়েছেন, তিনি কেমন পড়াতেন ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে বললেন—পার্সিভাল সায়েবের কাছে তো আমরা পড়েছি, তাঁর কাছে পড়েছে এমন বহু লোক আজও আছে তাঁর লেখা বইপত্তর সমস্ত প্রফুল্লবাবু নিয়েছিলেন, ওঁর জ্বালা পার্সিভাল সায়েবের ওপর রাগ ধ'রে যেতো আমাদের।

—প্রফুল্লবাবু খেটেখুটে পড়া তৈরী ক'রে নিয়ে আসতেন, তবু প্রথম দিকে খুব ভালো রিসেপসন পাননি ব'লে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে পার্সিভাল সায়েব আবার ওঁকে ধ'রে নিয়ে এসেছিলেন, যে পড়াতেন তিনি, কিন্তু তা' তো আর ভালো পড়ানো নয়। পড়াতেন ভালো এম, ঘোষ। তাঁর পড়ানো শুনলে জ্ঞানরাজ্যের দ্বার খুলে যেতো, পড়াশোনা যে ভালো জিনিষ তা' বোঝা যেতো।

এবার রিহার্স্যাল সুরু করলেন। উদিপুরীর তাঁবু থেকে রূপকুমারীকে যেবার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্যে কামবক্স যখন রাজ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলছে তখন রাম সিংয়ের যে কথা আছে

মেবারীর অস্ত্রে নয়, ভয় দৃষ্টিতে,' আগের দিন সেটা রাম সিংয়ের ভূমিকাভিনেতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে বুঝতে পারেনি। প্রথমেই সেই কথা বললেন—কথাটা ও না বুঝেই ব'লছে। কথাটার ভেতরের অর্থ হ'লো Traitor has now turned upon himself, একটা মেয়ের জন্যে সমস্ত দেশ আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত, অথচ এত বড় গৌরবের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার কোনো অধিকারই নেই তার। সেই দুঃখের আভাসই তো ফুটবে কথায়। লোকটার মাথায় কিন্তু তা ঢোকে না।

গান নাটকে থাকা ঠিক কিনা জানতে চাওয়ায় বললেন—বাংলা নাটকে গান থাকা দরকার, এ বিষয়ে আমি রবিবাবুর সঙ্গে একমত। গান যদি নাটকের moodকে অনুসরণ করে, তবে আপত্তি কিসের? তা ছাড়া আলমগীরে বাণীবাবু অপূর্ব সুর দিয়েছেন। 'অতিথি এসেছে দ্বারে'তে প্রথমে দরবারী কানাড়া লাগিয়েছিলেন, বললুম, ভালো লাগলো না। শুনে তো চটেই আগুন! শেষ পর্যন্ত বোঝাতে বললেন—কি রস? বললুম, বি-রস!

আবার রিহার্স্যাল সুরু করলেন, তবে হঠাৎই থেমে গিয়ে বললেন—একটা নতুন বই করো। এই বই রিহার্স্যাল দিতে কুইনাইন গেলার মতো লাগছে।

রিহার্স্যাল বন্ধ করে ডিকেন্সের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন আবার, বললেন—হেস্কেথ পিয়ার্সন ডিকেন্সের জীবনের আওতাল বাদ দিয়ে indomitable spiritটাই দেখিয়েছেন। ডিকেন্স কাগজ চালিয়েছেন, সিরিয়াল লিখছেন, আবার নাটকও প্রোডিউস করেছেন। ম্যাকারডি খুব বন্ধু ছিলেন, ডিকেন্সের গলা শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল তাঁর, বলেছিলেন—আমার কাজ যাবে।

কাব্যনাট্য সম্বন্ধে কথা হ'লো, বললেন—নাটক কবিতায় না নিয়ে গেলে কিছু হবে না অথচ মজা দেখো, কবিতা কেউ পড়তেই পারে না। স্কুলে যারা পড়ে, তারা মাইনে বেশি দেয় অথচ নোট ছাড়া চলে না। বাড়িতে অভিধান কিনিয়ে বিপদে পড়েছি। ছেলেরা দেখে না, আমার কাছেই পড়ে থাকে।

—নোট আমিও লিখেছি ফোর্থ ইয়ারে পড়তে পড়তে। জিতেনের দোকানের ধার শোধ দিতে চার-পাঁচজন মিলে ফর্মা-পেছু দশ-পনেরো টাকা নিয়ে লিখে দিয়েছি।

—আমাদের দেশে পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটের ওপর ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

—আগেকার দিনে মাষ্টার মশায়রা ভালো ছেলেদেরকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়াতেন। আজকাল তাঁদের প্রাইভেট টিউটরি করেই দিন কাটছে; ভালো ছেলেদের পড়াবেন কখন?

২১ তারিখেও এলেন। সেদিন গোড়াতেই রিহার্স্যাল সুরু হ'লো। দয়াল শা'র সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলবে, বোঝাতে গিয়ে বললেন—দয়াল শা'কে একটু খাতির দেখানো দরকার। আজকালকার মন্ত্রীদের যেমন খাতির করা হয়, পাতিয়ালা ইত্যাদি রাজাদের কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি মন্ত্রীদের খাতির করতে হতো। রাজদরবারের অবস্থা মুঘল দরবারের মতোই ছিলো, সবাই খুব মাথা নোয়াতো। দেওয়ানের ক্ষমতা কতো ছিলো, ইচ্ছে করলেই রাজাকে রাজ্যচ্যুত করতে পারতো। অথচ সামনে কি বিনত, কথায় কথায় গরীব পরোয়ার, অন্নদাতা বলেই চলেছে।

দোল এসে পড়েছে, সেদিন আবার দুপুর পর্যন্ত ট্রাম-বাস বন্ধ। তাই নিয়ে কথা ওঠায় বললেন—দোলের একটি barbarous ভাব আছে, বড়বাজারে দোল খেলা বন্ধ করা উচিত। গান যা গায়, সে ছোটদের শোনবার অযোগ্য; মনে একটা খারাপ ইম্প্রেশন হয়। কনষ্টেবলরা কিন্তু খুব ভদ্রভাবে দোল পালন করে। দোলে আবীর আর লাল রঙ দেওয়াতেও খারাপ কিছু নেই। তবে আলকাতরা, বাঁদুরে রঙ, ছাপ এগুলো বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

থিয়েটারের সাজ-পোশাক প্রসঙ্গে বললেন—পোষাক ঠিক রুচি মাফিক হয় না! লোকে পোষাকের দোকান করে না কেন? তাতে তো লাভ হয়। থিয়েটারে এমনিতে সবাইকেই এক রকম সাজিয়ে দেয়। আমরা ষ্টারে খুব চেষ্টা করে উন্নতি করেছিলুম, রাখাল বাবু (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) নিজে এসে সবাইকার আলাদা আলাদা রকম পাগড়ী বেঁধে দিতেন, অবন বাবুও হরদম আসতেন। তখনকার দিনে পণ্ডিতরা সংস্কৃতিবানরা প্রায়ই থিয়েটারে আসতেন।

ইংরেজের সার্টিফিকেট ছাড়া আমাদের এখনও চলে না, আমি দর্শন টর্শন বুঝি না, থিয়েটার বুঝি। আমাদের দেশে যাত্রা ছিলো এখনও আছে। আর আমাদের ভরত মুনির সময়কার নাটক আর ইংরেজদের নাটকে অনেক মিল ছিলো।

—নাটককে যাত্রাইজড্ করতে হবে, তার জন্যে দরকার লেখক। যোগেশ বাবু থাকলে পাবা যেতো। তবে এখনও লেখক পাওয়া যেতে পারে। আসলে চাই কিছু আগ্রহশীল যুবক-যুবতী, বসবার জায়গা, সতরঞ্চি, তামাক খাবার জায়গা আর কিছু অর্থ। বাজে কথা বলতে বলতেও নই রিহার্স্যাল হয়।

আমেরিকান ভাইস দেশে খুবই আসছে, আমেরিকান ছবি বোধ হয় আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আসে।

Sacrilege করতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের দেশে যাত্রার দর্শন, Aesthetics ইত্যাদি সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করা হতো যে সাধারণ লোকে বুঝতে পারতো এবং কিছু খারাপ convention ছাড়া এর ফল ভালোই হয়েছিলো।

আমার মনে হয়, একজন মহাপুরুষ আসা দরকার, যিনি আমাদের মনের অন্ধকার তাড়িয়ে দিতে পারবেন।

এর আগে নাটক নিয়ে experimentation করেননি কেন জানতে চাওয়ায় বললেন—experimentation করার জন্যে martyr to the cause হবার রাস্তা পেলুম কোথায়, বাপের অর্থ না থাকলে কিছু করার উপায় নেই। I am not man enough to do it (i. e. to change the trend), তবে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

নাটক আজকাল প্রগতিশীল হচ্ছে মন্তব্য করায় বললেন—আজকালকার দিনের নাটকে পথ দেখাবার মতো কিছু আছে কি? প্রগতিশীল তো বলছো, কিন্তু কোন্ দিকে প্রগতিশীল? অর্থ না বুঝেই কথা বলো কেনো? রেডিও অভিনয়ধারা এমন কি পাঠ করা পর্যন্ত খুব ক্ষতি করছে, পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, তাই গড়গড় করে বলাটা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

গান বুঝতে হলে সুরজ্ঞান থাকার কি দরকার জানতে চাওয়ায় বললেন—আমার নিজের মনে হয় সুরজ্ঞান না থাকলেও বেসুরো গান

শুনতে কানে লাগে। আমারও ঐ জ্ঞান নেই, অথচ বেসুরো গান শুনে চঞ্চল হই একথা অন্য লোকে বলেছে।

ছবি কে কেমন আঁকে কার ছবি ভালো দেখায়, কেন এই নিয়ে কথা সুরু হলো, তখন বললেন—ছবি সম্বন্ধে কেউ কোনো উৎসাহ দেয়নি আমাদের। অথচ ইউরোপে বা আমেরিকায় ছোটো ছোটো সহরেও আর্ট গ্যালারী থাকে। ছোটোরা তা দেখতে যায়, ছবি আঁকতে শেখে, পারিপার্শ্বিকের গুণে ছবি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়। আর আমরা এসব বিষয়ে বিশেষরূপে অজ্ঞ।

আমার মনে হয়, জাত হিসেবে আমরা ছোটো, তবে আশা করি ভগবান আমাদের দুরবস্থা ঘোচাবেন।

আঠাশে ফেব্রুয়ারী আর পয়লা মার্চ; দু'দিনই এলেন। প্রথম দিন ষ্টেজে কী পরিবর্ত্তন করা দরকার এই নিয়ে কথা উঠলো, বললেন—আমার মনে হয় বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রোসেনিয়াম পাল্টানো উচিত। এসব কথা তোমাদেরই তো ভেবে দেখা দরকার, তবে আর কিছু করার আগে কাজ সুরু করা দরকার। তিন-চার হাজার টাকা হ'লেই তো সুরু করা যায়। তারপর বললেন—দেশের লোকের রুচি কি রকম খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে তা' বলবার নয়। আর্টের অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় না আজকাল, হয় ফ্যাশন, পনেরো নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটে দল বেঁধে সবাই ভিড় করে যাচ্ছে কিন্তু বোঝে ক'জন? তাছাড়া বোঝাবার লোকও তো নেই, লোকে বুঝবে কী ক'রে?

—আমার দুঃখ হয় বেঁচে আছি অথচ শক্তি নেই, গ্রুপফিলিং অর্থাৎ সবাই মিলে গড়ে তুলবো, এই ইচ্ছেটা তো দরকার! দেশে কোন্ Organisation-টা কাজের? কাজের Organisation অত্যন্ত rare। আসলে willing young man দরকার।

একজন প্রশ্ন করলো গান শেখেননি কেন উনি, উত্তরে বললেন—গান শিখলে বোধ হয় ভালোই হ'তো। সুখের হতো ভবিষ্যৎটা। তবে গাইয়েদের জীবনও খুব একটা সুখের কিছু নয়। অনেক বড় গাইয়ের কথা জানি যাদের জীবন বড় দুঃখের। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম দু'-চারজন বাঈজী। তাদের ভাবটা don't care, লোকের সঙ্গে যা'তা ব্যবহার করে অথচ সবাই হাত জোড় করে ব'সে থাকে।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল কোলকাতায় সংস্কৃতি-সম্মেলনের বিষয়ে, একজন বললো যে হারে কোলকাতায় বেড়ে চলেছে সম্মেলন, একমাত্র শুধু বেলেঘাটাতেই দেখুন না, কতগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে! এতে যে সংস্কৃতি যাবে! শুনে হাসলেন, বললেন—সংস্কৃতি যাবে! যাবে কেনো? বেলেঘাটা তো ভালো জায়গা, আমি প্রথম ওদিকে যাই উনিশ' তেতাল্লিশ সালে। সেই সময়েই নস্করবাবুদের সঙ্গে পরিচয় হয়। হেম বাবু মানুষ বেশ ভালো neutral লোক। ওঁকে পলিটিক্সে আনেন দাশ মশায়, তিনি যে সি, আর, দাশ আর অন্য পক্ষ যা তা একথা কখনও ভাবেননি। তাঁর বুকটা যেমন দরাজ ছিলো, মনটাও ছিলো তেমনি, তবে মানুষটানুষ বিশেষ চিনতেন না। সুভাষ বাবু কিন্তু মানুষ চিনতেন ভালো, যার যা দাম তাকে তাই দিতেন। তবে একটা ভুল উনি করেছিলেন, (অবশ্য বিপ্লবীদের কেউ কেউ বলতে পারেন, তুমি শিশির ভাদুড়ি দেশের জন্যে কি করেছো যে, স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা জীবন-পণ করেছেন তাঁদের কাজের ভুল ধরো।) কর্পোরেশনে ঢুকে তাঁরা যেভাবে কনট্রাক্টরদের কাছ থেকে চাঁদা তুলেছেন তা'তে ভবিষ্যতে তাঁদের শিষ্যরা যে অপব্যবহার করবে এই কথাটাই ভেবে দেখেননি।

—বিপ্লবীদের টাকা উঠেছিলো ডাকাতি ক'রে। ঢাকার লোক খুলনায়, খুলনার লোক ঢাকায় ডাকাতি ক'রতো। তার পর সেই টাকা দিয়ে দল ক'রতো; তার ফলে কতো নিরীহ লোক যে কষ্ট পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিপ্লবীদের মত ছিলো endjustifies means, সেই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে কতো ভালো ছেলেও immoral কাজ করেছে।

একাদমী প্রসঙ্গে বললেন—সরকার একটি স্কুল খুললেন, কিন্তু কী হয় সেখানে? বিলেতে একাডেমি আছে, বার্ণার্ড শ'র সব টাকা পাচ্ছে। খুব কাজ ক'রছে। একজন ডিরেক্টর আছে বছরে আড়াই হাজার পাউণ্ড মাইনে পায়। কেনেথ ক্লার্ক বুড়ো হয়েছেন বলে রিটায়ার করেছেন। অন্য একজন আছেন, লিভারপুল ম্যাকেষ্টারে অনেক কাল অভিনয় করিয়েছেন।

—আমাদের দেশে নাটক পড়তেই বা পারে কে? গিরিশবাবুর শতবার্ষিকী হ'লো অথচ ক'জন তাঁর ক'টা বই পড়েছে আর প'ড়ে মানে বুঝেছে। তাঁর নাটক তো খুব খারাপ কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের মোটে দু'খানি সফল নাটক আছে। তপতী আমাদের আগে কেউ বোঝবারই চেষ্টা করেনি, কারণ রবীন্দ্রনাথ বইটা পড়তেও পারেননি। রাজা-রাণীতে যে সংঘাতের ইংগিত ছিলো তপতীতে তাই পূর্ণতা পেয়েছে।

—স্কুলে দু' বছরে ষোল লক্ষ টাকা খরচ হলো অথচ হ'লো না কিছু। জনসংযোগ বিভাগেও তো কতো খরচ হচ্ছে, সবায়েরই কিছু না কিছু হচ্ছে আর আমি মোটে দু'লাখ টাকা পেলে একটা কিছু করতে পারতুম।

পরের দিন যখন এলেন দেখলাম বেশ ক্ষুব্ধ, কিছুদিন আগে কোথায় পুরোনো কি একটা বই অভিনয় করেছিলেন, লোকে তার দুর্নাম করেছে। তক্তপোষে বসে বললেন—বুড়ো বয়েসে জাত খোয়ালুম। ও সব পুরোনো বই কোনো মতেই করা উচিত হয়নি। পরিচিত একজন তো বললে, 'ও সমস্ত পুরোনো বই ছাড়ুন, দেখছেন তো পুতুলখেলা করে বহুরূপী কতো নাম করেছে। আপনি তো আবার কাগজ দেখেন না', তা' দেখো, নাম তো কতলোকেই ক'রলে আবার কতো লোকই গেলো, ছত্রিশ বছরে অনেক তো দেখলুম! পাথর ওপরে উঠলেও শেষ পর্যন্ত মাটিতে নেবে আসে।

অভিনেতাদের মধ্যে কার গলা ভালো, এই প্রসঙ্গে বললেন—গলা আমার খুব খারাপ নয়; আজকালকার দিনে আমার মতো গলাও তো দেখি না কারোরই। কিন্তু দানীবাবু, অমৃত মিত্র কি গিরিশচন্দ্রের মতো গলা আমারও নয়।

আবার বললেন—অনেকে বলে চিরকুমার সভা একটি ভয়ানক নাটক, কেন যে অভিনয় হচ্ছে না! চিরকুমার সভা যদি নাটক হয়, তবে আমরা এতদিন বৃথাই নাটক করেছি।

Prostitution প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের দেশে prostitution আছে ব'লে আমরা ছোটো জাত। লণ্ডনে দেখিনি, তবে শুনেছি, সন্ধ্যের পর Picadillyতে বাপ-ছেলে একসঙ্গে পথ চলতে পারে না। নিউইয়র্কে মেয়েরা কেমন ক'রে পুরুষদের pester

করতে পারে তার প্রমাণ পেয়েছি। ওদের দেশের মেয়েরা কিছু নির্লজ্জ। দু'-চার হপ্তায় পোষ্ট আপিসে কাজ ক'রে, কি নতুন রুমানিয়ান যা ঐ ধরণের মেয়ের সঙ্গে খাইয়ে দাইয়ে ভাব করা যায়।

—আমাদের দেশের বেশ্যাদের মধ্যেও একটি শ্রী আছে। সারা রাত হুল্লোড় ক'রে সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে ঠাকুরপ্রণাম করবার সময় চোখ দিয়ে জল প'ড়ছে দেখা যায়। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও ঠিক ওই ভাবটি দেখা যায়।

—আমাদের দেশে moral যে ভাঙছে তার poverty is the cause কিন্তু only cause নয়, মেয়েরা যদি নিজেরা রোজগার করে তো এ অবস্থার বদল হয়।

বিদেশী নাট্যকার ও নাটুকে দলের প্রসঙ্গ বললেন—ব্রিয়েঁ। লেগে ভালো, কিন্তু বড় বস্তুতান্ত্রিক। বিদেশী দলেদের ভালো লেগেছে drilling। নিউইয়র্কে ভালো লেগেছে নিগ্রো বই Green Pastures। নাটক দাঁড় করাতে হ'লে দরকার প্রাণ। নিগ্রোদেরই প্রাণ আছে। আর কি গান! অমন গানের গলা এদেশে নেই।

—ও'নীলের Desire under the Elms-এ আছে—বীজ এসো, নয়তো দেশটা গেল। ওদের মেয়েদের আঠারো বছর বয়স পার হ'লেই কাউকে যদি খুব ভালোবাসে তো বলে, come on, my honey, I will manage.

—বিয়ে আর সার্বজনীন উৎসবে আমাদের যে রকম waste হয়, তা দেখে মনে হয় এ জাতের কিছু হবে না।

আবার (পুতুল খেলার কথায়) বললেন—নোরা আমাকেও করতে বলেছিলো, তার উত্তরে আমি বলি, ইবসেন আঠারো শ' আটষট্টি সালের, এখন নোরা পুরোনো হয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক শক্তিমতী নারী এখন রণক্ষেত্রে এসেছে।

—ইবসেনের নাটক Dated হ'য়ে গেছে। সেক্সপীয়রের সঙ্গে তার তফাৎও সেইখানেই। সমাজ একটু বদলালেই problemও বদলে যায়।

[ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

রেড রোডের শুকনো পাতা

উড়তে লাগল কয়েকটি শুকনো ঝরা পাতা
ছুটে-চলা মোটরের সামনে হাওয়ায় হাওয়ায়—
বাদামি, হলদে, লালচে আর না-রঙ শুকনো পাতা
নানা আকারের—হয়তো বা নানান বয়সের।
ওরা যেন কয়েকটি ক্ষণ—ছিল সুপ্ত হ'য়ে
বিস্মৃতির মোলায়েম পুরু ধূলোর শয্যায়—
আর এই মুহূর্তে জেগে উঠল তড়িৎ-তাড়িত হ'য়ে
ছুটন্ত গাড়ীর উন্মত্ত আবেগের অগ্নি-গর্ভ স্পর্শে।
ওরা যেন কয়েকটি প্রজাপতি—
ঘুমিয়েছিল ফুটে-ওঠা নানা রঙের মুহূর্তের
ফুলমধু পান ক'রে
সন্ধ্যার রাঙা রোদের ছায়া ছায়া আসরে,
রেড রোডের দু'ধারের গাছের আড়াল-দেওয়া বাসরে।

কত উন্মথিত হৃদয়ের মধু ঝরে-যাওয়া মুহূর্তের দল
কত অশ্রু ঝরে-যাওয়া ক্ষেপামির উনপঞ্চাশে হাওয়া
কত স্বপ্নের দিশাহারা চপলতা
ওই মুহূর্তগুলি—ওই পাতাগুলি—
ওই প্রজাপতিদের শুকনো ম'রে-যাওয়া
রঙিন ডানাগুলি,
পাতা হ'য়ে যারা আবার উড়তে লাগল
ছুটন্ত গাড়ীর প্রমত্ত আবেগের সম্মুখে
অগাধে ডুবে যাওয়ার সুখে—
ঘুম ভেঙে যাওয়া স্মৃতি-সচকিত পরীদের মত
কাঁপতে কাঁপতে
রক্তিম আলোয় বিহ্বল বাতাসে আসন্ন
অন্ধকারের রহস্যে।

জানলাম—
একদিন এই মুহূর্তও মিশবে ঐ পাতার দলে
ঘুমিয়ে পড়বে হাজার হাজার মুহূর্ত চিরন্তন স্বপ্নে
বিভোর হ'য়ে
শুধু আবার জেগে উঠতে—কেঁপে উঠতে
কোনো এক ছুটন্ত গাড়ীর প্রমত্ত হাওয়ার সম্মুখে
অবাধে উড়ে যাবার সুখে।

কালীদেবী ও কালীপূজার ইতিহাস

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকার ধারা মিলিয়া পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে এক মহাদেবীর বিবর্তন দেখিতে পাই, তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে আর একটি ধারা, তাহা হইল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বা কালিকাই বাঙলা দেশের শক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়া দেবীর অন্যসব রূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন। বাঙলা দেশের শক্তিসাধনা এবং শাক্ত সাহিত্যকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে সেই জন্য এই কালী বা কালিকার ধারাটির প্রাচীন ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কি করিয়া এই দেবী মহাদেবীর সঙ্গে মিলিয়া গেলেন তাহার ইতিহাস বহু পুরাণের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সব দেবীর ইতিহাসই বেদের মধ্যে আবিষ্কার করিবার আমাদের প্রবণতা। বেদের রাত্রিসূক্তকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে যে এক রাত্রিদেবীর ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে কাহারও কাহারও বিশ্বাস সেই রাত্রিদেবীই পরবর্তী কালে কালিকা রূপ ধারণ করিয়াছেন। আমাদের এই কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী দেবীর প্রসঙ্গে বৈদিক কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী নির্ঋতি দেবীর কথাও কেহ কেহ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। (১) 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' নির্ঋতি দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' দেবীকে কৃষ্ণা (কৃষ্ণং হি তত্তম আসাদথ কৃষ্ণা বৈ নির্ঋতিঃ ৭।২।৭) এবং ঘোরা (ঘোরা বৈ নির্ঋতিঃ ৭।২।১১) বলা হইয়াছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৪।১৭) নির্ঋতি দেবীকে পাশহস্তা বলা হইয়াছে এবং নির্ঋতি দেবীর হস্তস্থিত এই পাশ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এই নির্ঋতি দেবীর পরবর্তী কালে আর কোনও ইতিহাস দেখি না। সুতরাং বর্ণনার সামান্য একটু কোথাও মিল দেখিয়াই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত মনে হয় না। পূর্বে বলিয়াছি, অন্ধকাররূপিণী রাত্রিদেবীকেও কালীর সহিত যুক্ত করা হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থে কবি ভাসোকের নামে ধৃত একটি শ্লোকে দেখি কালীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে, 'ক্ষুৎক্ষাম' ২কাণ্ডচণ্ডী চিরমবতুতরাং ভৈরবী কালরাত্রিঃ।'

বৈদিক সাহিত্যে কালী এই নামটি আমরা প্রথম দেখিতে পাই 'মুণ্ডক উপনিষদে'; সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা।

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥

এখানে 'কালী' আহুতি-গ্রহণকারিণী অগ্নিজিহ্বা মাত্রই; মাতৃ-দেবীত্বের এখানে কোনও আভাসই নাই। শুধু বিশ্বরুচীর ক্ষেত্রে দীপ্যমানা অর্থে দেবী কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাই। 'মহাভারতে'ও যজ্ঞাগ্নির এই সপ্তজিহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাই (আদি, ২৩২।৭)। দার্শনিক মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিকে অগ্নির সপ্তজিহ্বা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রচলিত মহাভারতে একাধিক স্থলে 'কালী'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পৌরাণিক কালীদেবীর সহিত মহাভারতের এই সকল স্থলে বর্ণিত কালীদেবীর বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। সৌপ্তিক পর্বে দেখিতে পাই, দ্রোণের মৃত্যুর পরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করিতেছিলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ঙ্করী কালীদেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কালীদেবী রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা এবং ভয়ঙ্করী। কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক; কালরাত্রিরূপিণী এই দেবী বিগ্রহবতী সংহার।

মহাভারতে কালীদেবীর এই উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজনা হইতে পারে। পরবর্তী কালের যোজনা না হইলেও এই সব বর্ণনায় কালীর কোনও দেবীত্বের আভাস নাই; কালী এখানে অত্যন্ত ভীত মনের একটা ভয়ঙ্করী ছায়ামূর্তি দর্শনের ন্যায়। কবি কালিদাসের সময়েও কালী কোনও প্রধানা দেবী বলিয়া গৃহীতা হন নাই। 'কুমারসম্ভবে' উমার সহিত মহাদেবের বিবাহ-প্রসঙ্গে বর-যাত্রার বর্ণনায় দেখিতে পাই, কৈলাস পর্বতের মাতৃকাগণ বিবাহযাত্রায় মহাদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন; আর—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী
দূরং পুরঃক্ষিপ্তশতহ্রদেব ॥ (৭।৩৯)

কনকপ্রভা তাঁহাদের (সেই মাতৃকাগণের) পশ্চাতে কপালাভরণা কালী অগ্রে বিদ্যুৎপ্রসারকারিণী বলাকা সমন্বিতা নীলমেঘরাজির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। মাতৃকাগণের পশ্চাদ্গামিনী এই কালীদেবী কালিদাসের যুগেও একজন অপ্রধানা দেবী বলিয়া মনে হয়। 'রঘুবংশের' মধ্যে একটি উপমাতেও এই কালী বা কালিকা দেবীর উল্লেখ দেখিতে পাই। রাম-লক্ষ্মণের জ্যানিঃস্বন শুনিয়া

১। স্যার জন উড্রফ-কৃত Shakti And Shakta গ্রন্থের। মুখোপাধ্যায় লিখিত দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ভয়ঙ্করী তাড়কা রাক্ষসী যখন আত্মপ্রকাশ করিল তখন সেই ঘনকৃষ্ণ রাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা তাড়কাকে মনে হইতেছিল চঞ্চলকপালকুণ্ডলা বলাকাযুক্তা কালিকার মত।

জ্যানিনাদমথ গৃহ্ণতী তয়োঃ
প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা
কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥ (১১।১৫)

মল্লিনাথ 'কালিকা' শব্দের অর্থ কালিকাদেবী করেন নাই, 'কালিকা' শব্দের এক অর্থ 'ঘনাবলী', সেই অর্থ ধরিয়া এবং 'বলাকিনী' কথার সহিত যুক্ত করিয়া 'ঘনাবলী' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু 'চলকপালকুণ্ডলা' কথাটি তাড়কা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও ইহা কালিকা দেবীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। কবি কালিদাসের 'কালিদাস' নামটির ব্যুৎপত্তি কি? 'কালীর দাস' এই অর্থে কি কালিদাস? 'ঈ' এখানে বিকল্পে হ্রস্ব হইয়াছে, 'কালীদাস' পদও বিকল্পে সিদ্ধ। কালিদাসের লেখার মধ্যে কালী তেমন কোনও প্রসিদ্ধ দেবীত্ব লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু কালিদাস নামের ব্যুৎপত্তিতে মনে হয়, কালীর দেবীত্ব তখন যত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে এক রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাই। যে নামেই দেবীকে পাই না কেন, মনে হয় এই সকল দেবী তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্থান করিয়া লইতে পারেন নাই। আমরা 'খিল হরিবংশে' মদ্যমাংসপ্রিয়া দেবীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দগণ কর্তৃক পূজিত হইবার কথা পাইয়াছি। সুবন্ধুর (ষষ্ঠ শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) 'বাসবদত্তা'য় আমরা কুসুমপুরের গঙ্গাতীরে ভগবতী বা কাত্যায়নীর বাসের কথা জানিতে পারি। এই দেবী 'শুম্ভ-নিশুম্ভ-মহাবন-দাবজ্বালা', 'মহিষমহাসুর-গিরিবজ্রসারধারা' এবং 'প্রণয়প্রণতগঙ্গাধরজটাজুট-স্খলিত-জাহ্নবী-জলধারাশ্বেতপাদপদ্মা' বটেন, কিন্তু 'বেতালাভিধানা'। এই 'বেতালা' অভিধানটিই এখানে তালভঙ্গ করে। বাণভট্ট রচিত (সপ্তম শতক?) 'কাদম্বরী'তে আমরা শবরগণ কর্তৃক বনমধ্যে যে ভাবে রুধিরের প্লাবন দিয়া 'চণ্ডীর' পূজার বর্ণনা পাই, বিশেষতঃ চণ্ডী-পূজক বৃদ্ধ শবরের যে জুগুপ্সিত বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা কবির শবরপূজিতা রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী চণ্ডীদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধারই দ্যোতনা করে। বাক্‌পতিরাজ (অষ্টম শতক) তাঁহার 'গউড়বহো' প্রাকৃত কাব্যে শবরপূজিতা 'পর্ণ' বা পত্রপরিহিতা 'পর্ণশবরী'র উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির রচিত (সম্ভবতঃ সপ্তম শতক) 'মালতীমাধব' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে আমরা নরমাংস-বলিদানে পূজিতা ভয়ঙ্করী 'করালা' দেবীর বর্ণনা পাই। এই দেবীই ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা; বনপ্রদেশ সন্নিহিত শ্মশানঘাটের নিকটে ইহার মন্দির। ইনি কৃষ্ণবর্ণা উগ্রা দেবী।

কৃষ্ণবর্ণা শোণিতলোলুপা ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা দেবীকে আমরা কালী বা কালিকাদেবীর সহিত পরবর্তী কালে অভিন্না দেখিতে পাই। কিন্তু মনে হয়, ইহার মূলে দুই দেবী ছিলেন; আকার সাদৃশ্যে এবং সাধর্ম্যে ইহারা পরবর্তী কালে এক হইয়া গিয়াছেন।

এই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী কালিকা ও চামুণ্ডা দেবী এক পরমেশ্বরী মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে এই মিলনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। উপাখ্যানাদির সাহায্যেই পুরাণকারেরা এই-জাতীয় মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভনিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে আর এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন, এবং এই দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীরকোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন সেই জন্য সেই দেবী 'কৌশিকী' নামে লোকে পরিগীতা হইলেন। (২) কৌশিকী দেবী এইরূপে দেহ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন, এই জন্য তিনি হিমাচলবাসিনী 'কালিকা' নামে সমাখ্যাতা হইলেন। (৩) মনে হয় এই যুগে কালিকা দেবী কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মেও খানিকটা গৃহীতা হইয়াছিলেন, সেই জন্য হিমাচলবাসিনী দেবীর সহিত এইভাবে তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে 'কালিকা'র আবির্ভাব-রহস্য এইরূপ দেখিলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই গিয়া আবার অন্যরূপ দেখিতে পাই। শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণ দেবীর নিকটবর্তী হইলে—

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥
ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥ (৭।৫-৬)

'তখন অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত কোপ করিলেন; তখন কোপের দ্বারা তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রুকুটীকুটিল ললাটফলক হইতে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন।' এই কালী দেবী—

২। এই কৌশিকী দেবী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন; তাঁহার রূপেই শুম্ভ-নিশুম্ভ মুগ্ধ হইয়াছিল। এই 'কৌশিকী' দেবী মূলে (ডক্টর ভাণ্ডারকরের মতে) কুশিক জাতির (tribe) দেবী ছিলেন। দেখিতেছি, এই কৌশিকীরূপেই দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করিয়াছিলেন। কুশিক-জাতির এই কৌশিকী দেবীই কি শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর নিধনের উপাখ্যানাদি লইয়া হিমালয়-বাসিনী পার্বতীর মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া হিমালয়-বাসিনী দেবীকেই শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন? শিব-পুরাণ-সংহিতায় কৌশিকীর শুম্ভ-নিশুম্ভ হননের বিশেষ কারণ দেওয়া হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাইতেছি, দেবীর দেহ হইতে গৌরবর্ণা অনিন্দ্যসুন্দরী যে দেবী বাহির হইলেন তিনিই কৌশিকী; কিন্তু পদ্মপুরাণে অন্যকথা দেখিতে পাই, দেবীর দেহ হইতে কৃষ্ণবর্ণা যে রাত্রি দেবী বাহির হইয়া আসিলেন তিনিই কৌশিকী—এই কৌশিকী দেবীকে ব্রহ্মা বিন্ধ্যাচলে প্রতিষ্ঠিতা হইতে বলিলেন। কালিকা-পুরাণেও দেখি, কৌশিকী রূপে পার্বতীর দেহ হইতে নিঃসৃতা দেবীই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া বালিকা রূপ গ্রহণ করিলেন। সেই দেবীই কালরাত্রি (৫।২৩।২-৩)। পরস্পর বিরোধী উপাখ্যানগুলি দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, কৌশিকী নামে যে পৃথক্ দেবী ছিলেন তাঁহাকে মহাদেবীর সহিত মিশাইয়া লইবার এই সব পৌরাণিক চেষ্টা।

৩। তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥ (৫।৮৮)

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥ (৭।৭-৮)

'বিচিত্রনরকঙ্কাল-ধারিণী, নরমালা-বিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, শুষ্কমাংসা (মাংসহীন অস্থিচর্মময় দেহ), অতিভৈরবা, অতিবিস্তার-বদনা, লোলজিহ্বা হেতু ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা,—তাঁহার নাদে দিঙ্‌মুখ আপূরিত।'

দেবী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াই সেই কালীদেবী বেগে দেবশত্রু অসুরগণের সৈন্যমধ্যে অভিপতিতা হইয়া সেখানে মহা-অসুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের সৈন্যবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দেবী পৃষ্ঠ-রক্ষক, অঙ্কুশগ্রাহক, যোদ্ধা ও গলঘণ্টাদিসহ হস্তীগুলিকে হস্তে লইয়া মুখে গ্রাস করিতে লাগিলেন। শুধু হস্তীগুলিকে নয়, ঘোড়ার সহিত যোদ্ধাকে, সারথির সহিত রথকে মুখে ফেলিয়া দিয়া দন্তদ্বারা অতিভীষণ ভাবে চর্বণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও চুলে ধরিলেন, আবার কাহাকেও গ্রীবায় ধরিলেন; কাহাকেও পায়ের দ্বারা আক্রমণ করিয়া অন্যকে বক্ষের দ্বারা মর্দিত করিলেন। সেই অসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রগুলিকে এবং মহাস্ত্রগুলিকে তিনি মুখে গ্রহণ করিলেন এবং রোষে দন্তদ্বারাই মথিত (চূর্ণ) করিলেন। অসুর দলের কতগুলিকে তিনি মর্দন করিলেন, কতগুলিকে ভক্ষণ করিলেন, কতগুলিকে বিতাড়িত করিলেন। অসুরগণ কেহ কেহ অসিদ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাড়িত হইল, কেহ কেহ দন্তাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত অসুরসৈন্য নিপতিত দেখিয়া চণ্ড সেই অতিভীষণা কালীর দিকে ধাবিত হইল। সেই মহাসুর চণ্ড মহাভীম শরবর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা সেই ভীষণনয়নাকে ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু কালমেঘের উদরে যেমন অসংখ্য সূর্যবিম্ব শোভা পায় সেইরূপ চক্রসমূহ তাঁহার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইল। অতঃপর ভৈরবনাদিনী কালী অতিরোষে ভীষণ ভাবে অট্টহাস করিলেন—তাঁহার করাল বক্ত্রের অন্তঃপাতী ভীষণদর্শন দশনগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পরে মহাখড়্গ উত্তোলন পূর্বক দেবী হুঙ্কারনাদে (হং শব্দে) চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং তাহার চুলে ধরিয়া সেই খড়্গের দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। চণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া মুণ্ড দেবীর প্রতি ধাবিত হইল; দেবী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গের দ্বারা আহত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। হতশেষ অসুরসৈন্যগণ চণ্ডমুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। চণ্ডমুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে গ্রহণ করিয়া কালী চণ্ডিকার নিকটে গিয়া প্রচণ্ড অট্টহাসের সঙ্গে বলিলেন,—'এই যুদ্ধযজ্ঞে আমি এই চণ্ড-মুণ্ড দুই মহাপশু তোমাকে উপহার দিলাম, তুমি স্বয়ং শুম্ভ-নিশুম্ভকে হনন করিবে। দেবী চণ্ডিকা যখন কালীকে বলিলেন,—

যস্মাৎ চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি॥ (৭।২৭)

'যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে (তাহাদের ছিন্ন শির) লইয়া আসিয়াছ, সেই কারণে তুমি লোকে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে।'

চণ্ড শব্দ হইতে বা মুণ্ড শব্দ হইতে চামুণ্ডা শব্দ হয় না; চণ্ডের ও মুণ্ডের মুণ্ড লইয়া তাহার পরে অকারণে 'চ'তে দীর্ঘ করিয়া এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'-প্রত্যয় করিয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে হয়। এ-জাতীয় ব্যুৎপত্তিগুলি প্রায়ই গোঁজামিলের জন্য পুরাণকারগণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার তৎকালের প্রচলিত কালীদেবীকে এবং তৎসদৃশা চামুণ্ডা দেবীকে মহাদেবীর সহিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রয়োজনবোধ করিয়াছিলেন; সুতরাং দেবীকে 'কালী' করিয়া এবং চণ্ড-মুণ্ড-হন্ত্রী চামুণ্ডা করিয়া সেই কার্য সাধন করিলেন।

রক্তবীজ-বধের সময়ও কালীদেবী চণ্ডিকাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রাহত রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তধারা ভূমিতে পড়িবামাত্রই সেই রক্ত হইতে রক্তবীজের ন্যায় অসংখ্য অসুর যোদ্ধা উত্থিত হইতেছিল; তখন দেবী চণ্ডিকা—

উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু॥

দেবী কালীকে বদন বিস্তার করিয়া রক্তবীজের দেহ হইতে নির্গত রক্তবিন্দু সকল মুখব্যাদনের দ্বারা গ্রহণ করিতে বলিলেন—এবং সেই রক্তনির্গত অসুরগণকেও ভক্ষণ করিতে বলিলেন। দেবী এই বলিয়া শূলের দ্বারা রক্তবীজকে আহত করিলেন, কালীও মুখের দ্বারা তাহার রক্ত লেহন করিলেন। সেই কালী-চামুণ্ডার মুখে পতিত শোণিত হইতে যত সকল অসুর সমুদ্‌গত হইয়াছিল তাহাদিগকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ করিলেন। চামুণ্ডার এইরূপ শোণিত পানের ফলে রক্তবীজ নিরক্ত হইয়া গেল এবং দেবী তখন অতি সহজেই তাহাকে হনন করিলেন। কালী-চামুণ্ডার রক্তলোলুপত্ব এই ভাবে 'চণ্ডী'তে নূতন রূপে প্রকাশ পাইল।

রক্তলোলুপা কালীর এখানে যে ভয়ঙ্করী রণোন্মাদিনী রূপ দেখিতে পাইলাম অন্যান্য পুরাণে এই জাতীয় বহু বর্ণনা দেখিতে পাই। উপপুরাণগুলিতে ইহার আর কিছু কিছু বিস্তারও দেখিতে পাই। পরবর্তী কালের পুরাণতন্ত্রাদিতে আমরা কালী ও চামুণ্ডাকে এক করিয়াও পাই, পৃথক্ করিয়াও পাই। উভয় দেবীর ধ্যানেও পার্থক্য আছে। চামুণ্ডা চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা; আলুলিত-কুন্তলা নন, 'পিঙ্গলমূর্ধজা' (জটাধারিণী?); উলঙ্গিনী নন, শার্দুলচর্মাবৃতা (কোন কোন পুরাণে গজচর্মাম্বরা) সর্বস্থলের বর্ণনাতেই দেখি, চামুণ্ডাদেবী নির্মাংসা এবং কৃশোদরী, তাঁহার চক্ষু কোটরাগত। কোন স্থলেই কালিকার এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই না। সংস্কৃত-সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে কালিকার বর্ণনায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই যে কালিকা অজিনাবৃতা। ৪ 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত উমাপতি ধরের একটি শ্লোকেও কালীকে অজিনাবৃতাই দেখিতে পাই। ইহা পরবর্তী কালের মিশ্রণের ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি। চামুণ্ডার বর্ণনায় একটা জিনিস প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করি, চামুণ্ডা অতি ক্ষুধায় কৃশোদরী। কবিগণ কর্তৃক কালীর বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে কালীকে ক্ষুধার্তারূপে দেখি। ভাসোক কবি কালীকে 'ক্ষুৎক্ষামা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারে কালীর বর্ণনায় দেখি—

দীপ্তক্ষুদ্বেগযোগাদ্বদনহলহলল্লম্বজিহ্বাগ্রলীঢ়-
ব্রহ্মাণ্ডক্ষৌদ্রবিন্দুপ্রবলতরভবজ্জাঠরাগ্নিস্ফুলিঙ্গাম্।

৪। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত।

কালীং কঙ্কালশেষামতুলগলচলন্মুণ্ডমালাকরালী-
শুষ্কাসংবাদিনেত্রামজিননিবসনাং নৌমি পাশাহিহস্তাম্ ॥ ৫

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে বিস্তার ও বিবর্তন দেখিতে পাই, সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করিতে চাহি না। এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য বস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। শিব কালীর পদে স্থিতা, কালীর এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত। সাধকের দিক হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।৬ কিন্তু কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবারূঢ়া দেবীর বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রের 'বিপরীতরতাতুরা' তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ—যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা। দক্ষিণাকালীর প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও দেখিতে পাই—

শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্।
... ...
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্ ॥

পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তায় শক্তি বিহনে শিবেরই শবতা-প্রাপ্তির তত্ত্ব খুব প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববর্তী কালে বর্ণিত শবের স্থান গ্রহণ করেন—শবারূঢ়া দেবীও তাই শিবারূঢ়া হইয়া ওঠেন। অসুরের শবারূঢ়া বলিয়াই যে দেবী শিবারূঢ়া বলিয়া কীর্তিতা বাঙলা দেশের শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে এই সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই। সাধক রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত একটি গানে দেখিতে পাই—

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে ॥
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে। ৭

মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা প্রাপ্তির আসল অর্থ হইল, শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্ত্ব-দৃষ্টিতে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক কালে রচিত মৈথিল কৃষ্ণসিংহ ঠাকুরের দেবী-বর্ণনাতেও দেখি—'শিবশবরূপ-উরসি তুঅ পদযুগ, সদা বাস সমসানে।'৮ তন্ত্রাদিতে শিবের বুকে কালীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। যেমন মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন ব'লয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা, এই নিমিত্তই লোকে দেবীকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে।—

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥
কালসংগ্রহণাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে ॥

বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্রাদির ভিতরে 'কালীতন্ত্র'ধৃত কালীর বর্ণনাই কালীর ধ্যানরূপে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে গৃহীত হইয়াছে এবং কালীর এইরূপই এখন সাধারণ ভাবে বাঙলা দেশের মাতৃপূজায় গৃহীত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বামহস্ত যুগলের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন শির, আর ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, ঊর্ধ্বহস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যাম বর্ণা (এই জন্যই কালী দেবী শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং দিগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রুধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত; আর দুইটি শবশিশু তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদংষ্ট্রা, করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরা; শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিতা হইয়া দেবী হসন্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিস্ফুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদিনী, মহারৌদ্রী—শ্মশানগৃহবাসিনী। বালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র; তিনি উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা; তিনি চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা। তিনি মহাকালের সহিত 'বিপরীতরতাতুরা'-সুখপ্রসন্নবদনা এবং 'স্মেরাননসরোরুহা'। (৯)

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালীর বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' অজ্ঞাতনামা কবির একটি চমৎকার কালীবর্ণনা পাওয়া যায়।—

শিখণ্ডে খণ্ডেন্দুঃ শশিদিনকরৌ কর্ণযুগলে
গলে তারাহারস্তরলমুডুচক্রং চ কুচয়োঃ।
তড়িৎকাঞ্চী সন্ধ্যাসিচয়রচিতা কালি তদয়ং
তবাকল্পঃ কল্পব্যপরমধেয়ো বিজয়তে ॥

শিখণ্ডিনী দেবীর ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াতেই খণ্ড-ইন্দু; কর্ণযুগলে দুই কুণ্ডল হইল চন্দ্র সূর্য; গলায় তারার হার, কুচযুগলে উডুচক্র (চন্দ্রপথচক্র); তড়িৎই কাঞ্চী; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন।

'মহানির্বাণ-তন্ত্রে'র মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সেখানে দেখি পার্বতী দেবী মহেশ্বরকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, মহদ্‌যোনি-স্বরূপা আদিশক্তিস্বরূপিণী মহাদ্যুতি-সম্পন্না সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতা যিনি মহাকালী তাঁহার আবার

৫। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই ক্ষুধার্তা কালীমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া একটি অপূর্ব আধুনিক কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহার 'ত্রিযামা' কাব্যগ্রন্থের 'পশারিণী' কবিতায়।

৬। দ্রষ্টব্য—'শিবের বুকে শ্যামা কেন?'—বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা।

৭। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ৩১৮ পৃঃ।

৮। গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সঙ্কলিত। ১৪।৩১-৩২।

৯। করালবদনা' ঘোরা' মুক্তকেশীং চতুভু'জাম্—ইত্যাদি।

শক্তিনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সদাশিব বলিতেছেন—'হে প্রিয়ে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্যের নিমিত্ত গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ প্রকল্পিত হইয়া থাকে। শ্বেতপীতাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণে বিলীন হয়, হে শৈলজে, সর্বভূতসমূহ তেমনই কালীতে প্রবেশ করে। এইজন্যই যোগিগণের হিতের জন্য সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অমৃতত্বের হেতুই এই নিত্যা কালরূপা অব্যয়া কল্যাণরূপিণীর ললাটে চন্দ্রচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শশি সূর্য অগ্নি দ্বারা তিনি এই কালকৃত জগৎ সম্যক দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার তিনটি নয়ন কল্পিত হইয়াছে। সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদণ্ডের দ্বারা চর্বণ করেন বলিয়া তাহাদের রক্তসমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর বর ও অভয় বলিয়া ভাবিত। রজোগুণজনিত বিশ্বসমূহকে তিনি ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন এই জন্যই, হে ভদ্রে, তিনি রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কথিত হন। মোহময়ী সুরা পান করিয়া সেই সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী দেবী কালসম্ভূত ক্রীড়ামগ্ন সৃষ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের হিতের জন্য গুণানুসারে দেবীর বিবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। (১০)

'ব্রহ্মযামলে' আদ্যাস্তোত্রে যেখানে আদ্যা দেবী কোন্ দেশে কি মূর্তিতে পূজিতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে সেখানে দেখিতে পাই, 'কালিকা বঙ্গদেশে চ', বঙ্গদেশে দেবী কালিকারূপে পূজিত। উক্তিটিকে আমি ইতিহাসের দিক হইতে গভীরার্থব্যঞ্জক বলিয়া মনে করি। দেশ হিসাবে বাঙলাদেশই শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার দিক হইতে বিচার করিলে বাঙলাদেশে কালীপূজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসবের রূপে এখন পর্যন্তও দুর্গাপূজারই অধিক ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা এবং জাঁক-জমক। কিন্তু বাঙ্গালী যে বিশেষ করিয়া শাক্ত তাহাত শুধু তাহার ধর্মোৎসব রূপে শক্তি-পূজার জন্য নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্য; সেই সাধনার দিক হইতে বিচার করিলে দেখিব, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত শক্তি-সাধনার কেন্দ্রে কালী; তারাকেও আমরা কালীস্থানীয়া করিয়াই লইয়াছি; দশমহাবিদ্যার ভিতরকার অন্যান্য মহাবিদ্যাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গা-পূজা ঠিক কখন হইতে বাঙলাদেশে প্রচলিত সে-কথা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রচিত কতগুলি দুর্গা-পূজাবিধান পাইতেছি। এই বিধানগুলি মুখ্যত: দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকা-পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণ জাতীয় কয়েকখানি উপপুরাণ হইতে সঙ্কলিত।

বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে দেখিতে পাই, 'কালী-বিলাস তন্ত্রে' কার্তিকগণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমার শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুরাণ আদির মধ্যে অগ্নিপুরাণের ১৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গৌরীপ্রতিষ্ঠা ও গৌরীপূজার বিধান আছে। ঐ পুরাণের ৩২৬ অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত উমা-পূজার বিধিও দৃষ্ট হয়। গরুড়-পুরাণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবমী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

১০। বঙ্গবাসী সং, ১৩১২-১৩

এই দেবীপূজা-বিধানকারগণের পরিচয় অনেকেই দিয়াছেন, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র ভূমিকায় ইঁহাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ (ষোড়শ?") শতকে আবির্ভূত হন। রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' নামক একটি প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও ভবিষ্য-পুরাণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তৎপরবর্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণের-রচিত নিবন্ধের নাম 'দুর্গার্চনকৌমুদী'। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫—১৪৮০) তাঁহার 'ক্রিয়াচিন্তামণি' এবং বাসন্তীপূজাপ্রকরণ গ্রন্থদ্বয়ে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি (১৩৭৫— ১৪৫০) তাঁহার 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে ১৪৭১ খ্রীঃ মৃন্ময়ী দেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসববিবেক' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণিও (১৩৭৫-১৪৬০) 'দুর্গোৎসববিবেক' ও 'বাসন্তী-বিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব-প্রয়োগ' নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমূতবাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসব নির্ণয়' গ্রন্থে মৃন্ময়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী স্মৃতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন বালক ও শ্রীকরের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী।"

উপরিউক্ত তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সম্ভবত: দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক হইতে দুর্গাপূজা বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। পূজাবিধি রচিত হইবার পূর্ব হইতেই পূজা প্রচলিত থাকে। কিছুদিন পূজা প্রচলিত থাকিলেই পরে বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়—ধর্মের ইতিহাসে এইরূপই সাধারণত: দেখিতে পাই। বিদ্যাপতি যে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবত: মিথিলায় সিংহরাজাগণের মধ্যে সমরবিজয়ী ধীরসিংহের আদেশে (মতান্তরে ধীরসিংহের পিতা নরসিংহদেবের আদেশে)১১; আদেশ পাইয়াই বিদ্যাপতি পূজাবিধি লিখিতে আরম্ভ করিলেন কিরূপে? 'দৃষ্ট্বা নিবন্ধস্থিতি'—এ বিষয়ে পূর্ববর্তী যে নিবন্ধ সকল ছিল তাহা দেখিয়া। প্রথমে হয়ত পূজাবিধি সংক্ষিপ্ত ছিল; রাজা ও তৎস্থানীয় ব্যক্তিগণের পূজায় উৎসব-অনুষ্ঠান জাঁক-জমকও যত বাড়িয়া যাইতে লাগিল, পূজাবিধানও সম্ভবত: ততই বর্ধিত-কলেবর হইতে লাগিল।

১১। ঈশানচন্দ্র শর্মা কর্তৃক অনূদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থের সমাপ্তিতে আছে,—ধীরসিংহদেবপাদানাং সমরবিজয়িনাং কৃতৌ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী পরিপূর্ণা।

বর্তমানে আমরা বাঙলা দেশে যেভাবে দুর্গাপূজা করি, তাহা সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকে প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই, আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহিতার বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। কথিত হয়, কুল্লুক ভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ শাস্ত্রী তাঁহাকে দুর্গাপূজা করিবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখানি দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন। অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পৌত্র রাজা কংসনারায়ণ।

বাঙলা দেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা দেশে 'কালী' নানা প্রকারের আছেন; 'তন্ত্রসারে' আমরা বিবিধ প্রকারের কালীর সাধনার পদ্ধতি দেখিতে পাই। প্রচলিত মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করিয়া ষোড়শ শতকের লোক বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' নামক তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলন গ্রন্থকে পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'তন্ত্রসারে'র মধ্যে কালী বা শ্যামাপূজার বিধি ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধন-বিধিও সঙ্কলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা ক্রিয়াকলাপবিধি সম্বন্ধে গ্রন্থরচয়িতারূপে ব্রহ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রসিদ্ধি সমধিক।(১২) ব্রহ্মানন্দ পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন এবং আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী'তে শাক্তদিগের আচার অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তারারহস্যে' তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ পরমহংস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত 'শ্যামারহস্যে' কালীর উপাসকের আচার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। অপর একজন গ্রন্থকার (সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমাচার্য) 'গৌড়ীয় শঙ্কর' নামে অভিহিত হন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার 'তারারহস্যবৃত্তিকা' গ্রন্থে তারার উপাসকের আচারাদি বিবৃত হইয়াছে।

বর্তমানকালে যেসব স্থানে নিত্য কালী পূজার প্রথা রহিয়াছে বা বিশেষ কোনও উপলক্ষে 'মানসিক'-করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়, ইহা ব্যতীত সাংবৎসরিক কালীপূজার বিধি হইল দীপালি-উৎসবের দিনে। দীপালি-উৎসবের দিনে এই কালীপূজা বা শ্যামাপূজার বিধি সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবিধি' গ্রন্থে। (১৩) কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে যে-ভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে সুগৃহীত ছিল না। কালীপূজা বিষয়ে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই এই পূজার প্রবর্তন করেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালীপূজা করিতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রতি বৎসর দশ সহস্র করিয়া কালীমূর্তি পূজিত হইতে লাগিল। কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র সহস্র সহস্র মণ নৈবেদ্য এবং সহস্র সহস্র খণ্ড বস্ত্র এবং সমপরিমাণ অন্যান্য উপচারে কালীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। রটন্তী চতুর্দশীর রাত্রিতে (মাঘের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে) কালীপূজার কথা 'স্মৃতিসমুচ্চয়' গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, বৃহস্পতি রায়মুকুট এবং কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।১৪

এই দেবী-পূজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা নহে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার তন্ত্র-সাধনা, এই তন্ত্র-সাধনা মুখ্যভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল কালী-সাধনা এবং দশ-মহাবিদ্যার সাধনার সঙ্গে, এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্যান্য দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি-সাধকগণের কথা জানিতে পারি। আমরা পূর্বে কালীপূজার বিধান রচয়িতৃরূপে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি; ইঁহারা সাধকও ছিলেন। অন্যান্য সাধকগণের মধ্যে ষোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি শবরূপী ভৃত্য পূর্ণানন্দের দেহের উপরে বসিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার বংশধর তান্ত্রিক সাধকগণ 'সর্ববিদ্যা'র বংশ বলিয়া খ্যাত। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে 'অর্ধকালী'রও প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার সমীপবর্তী পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে দ্বিজদেব নামক সাধকের গৃহে ইনি কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। তাঁহার নাম ছিল জয়দুর্গা, তিনি স্বয়ং মহেশ্বরী বলিয়া প্রবাদ। তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধেক গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার অর্ধকালী নাম হইয়াছিল। (১৫) গোসাঁই ভট্টাচার্য নামে খ্যাত রত্নগর্ভ নামক সাধক ঢাকা জেলার মাইসারের দিগম্বরীতলায় বীরাচারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত হয়, ইনি প্রসিদ্ধ 'বার ভূঞা'র মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠের নিকট আটলাগ্রামে সাধক বামাক্ষেপার জন্ম হয়; তারাপীঠ তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির স্থান।

১২। এ-বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখিত The Cultural Heritage of India, চতুর্থ খণ্ডে Sakta Worship and The Sakta Saints প্রবন্ধ ও তদ্রচিত 'তন্ত্রকথা' (বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর Sakta Festivals of Bengal and their Antiquity (Indian Historical Quarterly, September, 1915) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

১৪। ঐ।

১৫। তন্ত্রকথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া শক্তিসাধকরূপে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাঙলা শাক্ত-পদাবলীর তিনিই প্রবর্তক। তাঁহার পরে সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাধক শাক্ত গান রচনা করিয়াছেন।১৬ দক্ষিণেশ্বরের মা 'ভবতারিণী'র মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঙলার এই শক্তি-সাধনাকে বিশ্ব-বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। যোগিপ্রবর শ্রীঅরবিন্দ বাঙলার শক্তি-সাধনার অন্তর্গূঢ় রহস্যকে তাঁহার অখণ্ড মহাযোগের সহিত যুক্ত করিয়া সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক দার্শনিক রূপ দান করিয়াছেন।

আমরা উপরে অতি সংক্ষেপে বাঙলা দেশে মাতৃপূজার যে ইতিহাস আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম যে, স্বাভাবিক ভাবেই দুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালে এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আমরা এ-কথা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূজাকে অবলম্বন করিয়া ধর্মোৎসবের ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অদ্যাবধি বাঙালীর সর্বপ্রধান পূজা। এখনও আমরা সাধারণ ভাবে 'পূজা' বলিতে শারদীয়া দুর্গাপূজাকেই মনে করি; 'পূজা আসিতেছে, এবারে পূজা কোন্ মাসে' প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'পূজা' কথার লক্ষ্য কি, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু 'দুর্গাপূজা' আমাদের সাংবৎসরিক উৎসব-বিশেষ মাত্র। সাংবৎসরিক পূজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নিত্যপূজার প্রচলন তেমন কোনও অঞ্চলে দেখিতে পাই না।১৭ রোগে, শোকে, দৈব-দুর্বিপাকে সঙ্কল্পপূর্বক 'চণ্ডীপাঠ' বা দুর্গানাম জপের ব্যবস্থা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের অঙ্গরূপে দেখা যায়। কিন্তু এই সব ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন কোনও প্রাধান্য দেখিতে পাই না। শারদীয়া দুর্গাপূজার পর হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকাল পর্যন্ত দেবীকে আমরা নানারূপে পূজা করিয়া থাকি। লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা—সর্বশেষে বসন্তকালে দেবীর বাসন্তী মূর্তির পূজা—ইহার মধ্যে এক কালীপূজা ব্যতীত আর সবই সাংবৎসরিক পূজা। শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন সাধারণভাবে কালী—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশমহাবিদ্যার অন্য কোনও রূপ।

১৬। অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, এম, এ রচিত 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা' গ্রন্থখানির কবি-প্রসঙ্গ শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৭। কোনও কোনও মন্দিরে অবশ্য হর-গৌরী বা হর-পার্বতীর নিত্যপূজা প্রচলিত আছে।

রঙহরিণ

জয়ন্তী সেন

আমি জানি সেই রঙের ঝলক—রঙহরিণ,
ছুটেছে আকাশে লুটেছে বাতাসে ফুলের গন্ধ
চলার ছন্দে টুটেছে বন্ধ রাত্রি-দিন।
উদ্ধত তার দুরন্ত বেগে
উড়ন্ত ধুলো ঝড়ের আবেগে
ঝরালো স্বপ্ন জাগরি জীবনে ক্লান্তিহীন
সোনালী-স্বপ্ন-সুধা-নির্ঝর রঙহরিণ।
দিগন্ত পথ চোখের পলকে হয়েছে পার,
নদী নির্জন তটবালিরেখা ঘন কিনার
চলেছে—চলেছে কাছের দূরের;
সীমানার তীরে অন্য পারের
ইসারায় টানে দুর্গম পানে লুপ্ত তাহার আভাস ক্ষীণ;
নিশীথ গহনে আশ্বাস-মানা রঙহরিণ।
আমি জানি সেই রঙিন স্বপ্ন—রঙহরিণ
উধাও বন্যা জীবন-নদীতে—নীলিমা লীন।
আশার পিপাসা আকণ্ঠে নিয়ে পিছনে ধাই
শুধু পলকের অসহ পুলক—ক্ষণিকে নাই;
সে যে কল্পনা-মনে আল্পনা মগ্ন-দিন—
হারানো রঙের নির্ঝরধারা রঙহরিণ।

তৃতীয় নয়ন

দেবব্রত চক্রবর্তী

তারপর উঠে এলো নারী।

ফাঁকা ঘর:
সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে ঘেরা ছোটো কোণে
একটি মাটির প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে
লক্ষ্মীর পটের কাছে মাথা রেখে
কী যেন বলেছে
অনেকক্ষণ।
তারপর কান্না যেমন উঠে আসে মনের গভীর থেকে
তেমনি সে উঠে এলো।

হে নারী,
তোমার হৃদয়কে প্রদীপের মতো তুলে ধ'রে
কোন্ স্বপ্ন দেখো?
একলা ঘরের আলো-আঁধারিতে
কার কাছে বলো তুমি মনের সব কথা?
জানি, আর একটু পরেই হয়তো নিবে যাবে
এই ক্ষীণ শিখাটুকু,
মুছে যাবে পাঁচালীর সুরে ভরা এই ঘর,
আর তুমিও যাবে হারিয়ে।

তবু জেগে থাকবে একটি সিঁদুর-টিপ
ভোরের সূর্য হবার অপেক্ষায়।

সরোজ আচার্য

সাংবাদিক ও সাহিত্য-সমালোচক]

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক এবং সাহিত্য-সমালোচক শ্রীসরোজ আচার্য জীবন সুরু করেছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হিসাবে, কিন্তু জীবনের স্রোত আজ তাঁকে রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নদীয়ার এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-পরিবারের সন্তান শ্রী আচার্য্যের জন্ম কুষ্টিয়া সহরে (বর্ত্তমানে পাকিস্তান) ১৯০৬ সালে। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কলকাতায় আসেন আই-এ পড়তে। পাশ করে আবার ফিরে যান নদীয়ায় এবং ১৯২৭ সালে ইংরাজি অনার্স নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে পান 'মোহিনীমোহন রায়-পুরস্কার'। ছাত্র-জীবনে অধ্যয়নের চেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল বেশী। ১৯২১ সালে স্কুলে পড়বার সময় অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি এক বছরের জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি কুষ্টিয়া মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং নদীয়া জেলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন, কিন্তু কয়েক দিন বাদে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় সরোজ বাবুদের পরিবার অত্যন্ত অর্থ-সঙ্কটে পড়েন এবং তিনি তখন মালদায় গিয়ে স্কুল-মাষ্টারের চাকরী নেন। সেখানে বে-আইনী লবণ বিক্রয় এবং বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবে নেতৃত্ব করায় তাঁর উপর পুলিশের নজর পড়ে এবং ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েক দিন বাদে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তাঁকে ডেটিন্যু করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন বন্দী-শিবিরেই কেটেছে তাঁর জীবন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন (প্রথম স্থান পেয়েছিলেন শ্রীমতী সুজাতা রায়) এবং প্রবন্ধের পেপারে সব চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে রেজিনা গুহ স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। মুক্তি লাভের পর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কেরাণীর পদ লাভ করেন। চার বছর সেই চাকরী করবার পর উইমেন্স কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পান। ঐ সময় মার্ক্সবাদী দর্শন নিয়ে বিখ্যাত দার্শনিক স্বর্গীয় ডাঃ সুরেন দাসগুপ্ত এবং ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে শ্রী আচার্য সুধী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৪৪ সালে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ আসে। এ যাবৎ সেই পদেই বহাল ছিলেন। সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সিনিয়র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। ইংরাজি এবং বাঙলা—দুই ভাষাতেই তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে কলম
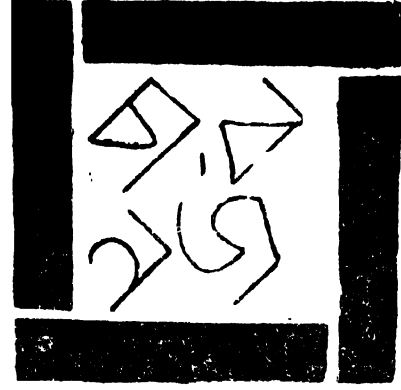
চালাতে পারেন। বর্ত্তমানে ডোভার লেনের বাসিন্দা, শ্রী আচার্য লিখতে সুরু করেন চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। 'জাগরণ' নামে বাবার একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। তাতে তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। কৃষ্ণনগর কলেজে পড়বার সময় সহপাঠী ডাঃ প্রমোদ ঘোষাল তাঁকে মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেন। বন্দী অবস্থায় ব্যাপক ভাবে তিনি মার্ক্সবাদ চর্চার সুযোগ পান এবং মার্ক্সবাদকেই আত্মদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। সাহিত্যের ছাত্র হলেও, দর্শনই তাঁর প্রিয় বিষয় এবং প্রকৃত পক্ষে 'মার্ক্সীয় দর্শন' লিখেই তিনি সর্বপ্রথম সুধী সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পড়াশোনায় শ্রী আচার্য্যের কোন বাদবিচার নেই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ডাক্তারী, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, চিত্রকলা, শিকার, খেলাধূলো—সব বিষয়ই তিনি অধ্যয়ন করে থাকেন। ১৯২৭ সালে তিনি "রুশিয়ার রক্ত-বিপ্লব" এবং "বিপ্লবী অনন্তহরি" নামে দুখানা বই লেখেন। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে "মার্ক্সীয় যুক্তি বিজ্ঞান", 'বই পড়া' এবং "সাহিত্য রুচি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুই পুত্রের জনক, শ্রী আচার্যের স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সাহিত্যিক শ্রীপরিমল গোস্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী। বিয়ের ব্যাপার একটা মজার গল্প। পরিমল বাবুর সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনি জানতেন যে পরিমল বাবুর বিবাহ-যোগ্যা একটি বোন আছেন কিন্তু ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ১৯৩৯ সালে যখন বাড়ী থেকে বিয়ের চাপ আসতে লাগল, তখন তিনি একদিন পরিমল বাবুর বাসায় গিয়ে বললেন, "আমি আপনার বোনকে বিয়ে করতে চাই।" শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী তখন কলেজের ছাত্রী। পরিমল

সরোজ আচার্য্য

বাবু তৎক্ষণাৎ বোনকে সেখানে ডেকে বললেন, "ওহে —এই ভদ্রলোক তোমায় বিয়ে করতে চান। এক্ষুনি বসে যা হয় ঠিক করে ফেল।" পরিমল বাবুর সামনে টেবিলে মুখোমুখি বসে দশ মিনিটের মধ্যে তাঁরা নিজেদের বিয়ে স্থির করে ফেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-টি শ্রীমতী আচার্য সদাহাস্যময়ী হুল্লোড়প্রিয় মহিলা। আট বছরের ছেলে জয়ন্তকে নিয়ে তিনি একা একা বিলেত গিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট-অফ-এডুকেশান নিয়ে এসেছেন। আগে রাজ্য সরকারের শিক্ষণে শিক্ষা-বিভাগে চাকরী করতেন। এখন চাকরী ছেড়ে গৃহস্থালী নিয়ে আছেন। চেইন স্মোকার সরোজ বাবু এখনও ধুমপানের ব্যাপারে গৃহিনীর রক্ত চক্ষুকে নরম করতে পারেন নি। সরোজ বাবুরা তিন ভাই, এক বোন। মা এখনও জীবিত।

ডাক্তার শ্রীঅরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট দন্ত-চিকিৎসক

"দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না—"—একটি চলতি কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু রোগী নিজে মর্য্যাদা না দিলেও, দন্ত-চিকিৎসক উহার পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করে থাকেন। বিশিষ্ট দন্ত-চিকিৎসক ও আর-জি কর, মেডিক্যাল কলেজের ডেন্টাল-সার্জ্জারীর ডিরেক্টর প্রফেসার ডাঃ অরুণ গাঙ্গুলী তন্মধ্যে অন্যতম।

বিক্রমপুর (ঢাকা) বেগের সুপরিচিত ব্রাহ্মণ বংশের অন্তর্ভুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের বিশিষ্ট সন্তান বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের শ্রীশীতলা কান্ত গাঙ্গুলীর ও শ্রীমতী প্রফুল্ল দেবীর পুত্র অরুণ ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরিয়া হওয়ায় পিতার সঙ্গে পুত্রকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে লেখা পড়া করিতে হয় এবং ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা ও ১৯৩০ সালে রাজসাহী শিক্ষায়তন হইতে আই, এস, সি পাশ করেন। দাঁত সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে আগ্রহ থাকায় উক্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি ১৯৩২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন—যদিও সেই সময় ভাল চাকুরী পাওয়া ও পৃষ্ঠ-পোষকতার জন্য ভারতীয় ছাত্ররা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ভর্ত্তি হইতেন। ১৯৩৬ সালে তথা হইতে Z.D.S., D.S. ডিগ্রী লইয়া স্থানীয় জেনারেল হাঁসপাতালে oral-surgeon নিযুক্ত হন। পরে প্রেলে কিছুদিন থাকিয়া বার্লিন মিউনিসিপ্যাল ও বিশ্ব-বিদ্যালয় হাঁসপাতালদ্বয়ে একই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই সময় তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দন্ত-চিকিৎসালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া প্রভূত জ্ঞানলাভ করেন এবং দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ব্বে ভারতে ফিরিয়া আর, জি, কর হাঁসপাতালে ভিজিটিং সার্জ্জেন হিসাবে যোগদান করেন ও ব্যক্তিগত চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

ডাঃ শ্রীঅরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৪৫ সালে গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়ার আমন্ত্রণে এক বৎসরের মধ্যে রাজ্যের দন্ত-চিকিৎসা বিভাগকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (চিকিৎসা বিজ্ঞান) সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লেখা "An aspect of Industrial Absenteeism and its method of control" সরকারী ও বেসরকারী মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্প-মন্ত্রী সি, এইচ, ভাবা ও বঙ্গের অর্থমন্ত্রী ৺নলিনীরঞ্জন সরকার ইহার ভূমিকা লেখেন ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া মন্তব্য করেন "Dr. Arun Ganguli has done his part in producing such a book-let and it will be for the trade-unionists to carry its contents to the workers on a mass scale."

ডাঃ গাঙ্গুলী জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি হিসাবে বস্তী-উন্নয়ন আর্ত্ত-আতুরদের ত্রাণকার্য্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি রাজনৈতিক আবর্ত্ত হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতা অন্ধ স্কুলের গভর্ণর হিসাবে তিনি যুক্ত আছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্রথম ভারতীয় দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় ডাঃ গাঙ্গুলীকে আমন্ত্রণ করা হয়। তথাকার চারিশত বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে তিনি বিখ্যাত মস্কো Stomatological Instituteএ তাঁহার সর্ব্ব-শেষ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মানলাভ করেন। ফেরার পথে য়ুরোপের প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া দন্ত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্প্রতিকার উন্নতিমূলক কার্য্যধারা অনুধাবন করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ডাঃ গাঙ্গুলীর বেশ কিছু অবদান আছে। সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তিনি যুক্ত আছেন। চারি বৎসর যাবৎ তিনি "নিরীক্ষা" নামে একটি পাক্ষিক পত্র সম্পাদনা করিতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে উহার মতাদর্শ কিছুটা ছাপ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্বমৈত্রীর পথে মানব-সংস্কৃতিকে সার্থক করে তুলবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

বই পড়া তাঁহার অবসর বিনোদনের উপায় এবং কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। নদী সমস্যার অন্যতম বিশেষজ্ঞ ও ই, বি, রেলওয়ের ডেপুটী চীফ ইঞ্জিনীয়ার ৺কুমুদভূষণ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা অণিমা দেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন।

শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়

[আজীবন রাজনৈতিক কর্ম্মী ও বিহার আইন-সভার সদস্য]

অর্থ ও আত্মসুখের দিকে না তাকিয়ে আজীবন দেশের নিরলস ভাবে সেবা করার মহান্ ব্রত পালন করে আসছেন, এমন অল্প সংখ্যকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিহার আইন-সভার সদস্য শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়।

১২৯১ সালের (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) ২৯শে আশ্বিন বর্দ্ধমান জেলার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দীননাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতার ব্যবসায়ী ছিলেন। পুত্রের পড়াশুনার সুবিধার্থে তিনি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং বঙ্গবাসী-স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। লেখাপড়ায় খুবই মেধাবী ছিলেন শ্রী মুখোপাধ্যায়, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্কুলের সেরা ছাত্র বলে পরিগণিত হন। এই সময়েই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত পর পর তাঁর মাতা ও পিতার মৃত্যু হইল। চারিধারে অন্ধকার দেখলেও অকুলে ভাসলেন না তিনি, তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় দৃঢ় হস্তে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনিও কৃতি-পুরুষ ছিলেন। ভারত ও বর্ম্মার পোষ্টাল ইউনিয়নের স্থাপনা করেছিলেন তিনিই।

বাংলায় তখন বৈপ্লবিক যুগ। তরুণ শ্রী মুখোপাধ্যায়ও দেশের ডাকে সাড়া দিলেন। সুবিখ্যাত অনুশীলন-সমিতিতে যোগ দিলেন তিনি। বৈপ্লবিক কার্য্য-কলাপের এটি ছিল একটি মূল কেন্দ্র। অবশ্য ভবানীপুরের সমাজবাদী দলেই তাঁর রাজনৈতিক হাতে-খড়ি হয়। পরে তিনি ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ান নামে একটি দল গঠন করেন। বাঘা যতীন এই দলের সদস্য ছিলেন। তিনি তখন সরকারী, অফিসের ষ্টেনো। গোয়েন্দা-বিভাগের ইন্সপেক্টার শশধর গোস্বামী এই সময়ে পরিচয় গোপন করে তাঁদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বাঘা যতীনের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রেখে ছিলেন। কিন্তু দৈবাৎ একদিন সব জানাজানি হয়ে গেল।

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘোর ঘনঘটা। এল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। শ্রী মুখোপাধ্যায় এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর পড়াশুনার বিরাম ছিল না। তিনি বঙ্গবাসী-কলেজ থেকে ল' পাশ করেন (তখন বঙ্গবাসী-কলেজে ল' পড়ান হত) এবং ১৯১০ সালে ভাগলপুর বারে যোগ দেন। এর বছর পাঁচেক আগেই তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কিত ভ্রাতা রায় বাহাদুর সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী রাণী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ভাগলপুর থেকে অল্পদিনের মধ্যেই মুঙ্গের কোর্টে চলে আসেন এবং অচিরেই সেখানে শ্রেষ্ঠ উকিল হিসেবে পরিচিত হন। পরে তাঁকে পাব্লিক-প্রসিকিউটারের পদ গ্রহণ করতে হয়। এই সময়েই তিনি এখানে নানা রাজনৈতিক কর্মে রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন।

এক বর্ষা-শ্রান্ত সকালে শ্রী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বয়স ৭৫ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও চেহারায় কত দৃপ্ত ভাব!

দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছিল। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। আইন-অমান্যের দরুণ ধৃত হলেন এবং হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেলে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হল। এর কিছুদিন পরে তিনি গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট অনুসারে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ১৯৩১ সালে ডিষ্ট্রীক্ট লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন। ১৯৩২ সালে আবার জেলে যেতে হল তাঁকে। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে ছাড়া পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বিহারের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প হল (১৯৩৪ জানুয়ারী)। বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকম্প-বিধ্বস্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে এই কাজে আর কজন বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি হলেন বিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ ৺শ্রীতারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯৩৬ সালে বিহার আইন-সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯৪১ সালে বিহার কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্যে তাঁহাকে আবার জেলে যেতে হয়। ১৯৪৬ সালে আবার আইন-সভার সদস্য হন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালে তিনি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মনোনীত হন। তাঁর অধীনে আইন, ন্যায়, কারা ও ত্রাণ দপ্তরগুলি ছিল। ১৯৫২ সালে স্বায়ত্ত শাসন ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের উপ-মন্ত্রীর পদ তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে আবার তিনি আইন-সভায় আসেন। উপস্থিত বিহার পুলিশ-কমিশনের তিনি সদস্য।

আমাদের দুজনের প্রশ্ন ও উত্তরের বিনিময়ের মাঝে তিনি জানান, ছাত্র-জীবনে বহু কীর্তিমান্ অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সাহচার্য্যে তিনি এসেছেন। যেমন, রেভারেণ্ড ডি-এন হুইলার, ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জি-সি বসু ইত্যাদি। তিনি কলকাতার সুবিখ্যাত ওল্ড ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন সুবক্তা। কলকাতার দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোডটি তাঁরই জ্যেঠামশাই-এর নামাঙ্কিত।

শ্রীমতী কল্পনা যোশী

[বিপ্লবী বাঙ্গালী মহিলা]

বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা। বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন। পন্থাবলম্বনে মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল অহিংসার পথে চলেছেন—আর অন্যদল সশস্ত্র বিপ্লবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। শেষেরটির প্রাণকেন্দ্র ছিল অবিভক্ত বাঙ্গালা। ক্ষীণদেহ বাঙ্গালী সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে প্রবল নাড়া দিয়াছে—সংগ্রামী মনোভাবে ও রণমূর্ত্তিতে। আবিষ্কৃত হল যে শুধু তরুণ ও যুবক বিপ্লবীরা নহে—বাঙ্গালী কিশোরী এবং যুবতীও সশস্ত্র সংগ্রামে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে চট্টল-কন্যা শ্রীমতী কল্পনা যোশী (দত্ত) অন্যতমা।

১৯১৩ সালের ২৭শে জুলাই চট্টগ্রাম জিলার শ্রীপুর গ্রামে ৺বিনোদবিহারী দত্ত ও বর্ত্তমানে পাকিস্থান-নিবাসিনী শ্রীমতী শোভনাবালা দেবীর কন্যা শ্রীমতী কল্পনা দত্ত জন্ম-গ্রহণ করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ছিলেন মামা। স্থানীয় ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় হইতে ১৯২৯ সালে তিনি ভালভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর পরে কলিকাতা বেথুন কলেজ হইতে নন্-কলিজিয়েট ছাত্রী হিসাবে আই, এস, সি পাশ করেন। পরে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে বি, এস, সি পড়েন কিন্তু রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে জড়িত হওয়ায় পড়াশুনা বন্ধ থাকে।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজি চট্টগ্রামে আসিলে সাত বৎসরের কল্পনা তাঁহার বক্তৃতা শোনার পর হাতের সোনার চুড়া গান্ধীজিকে দিলে তিনি উহা ফেরৎ দেন। তখন থেকে দেশের স্বাধীনতা, ধর্ম্ম ও অনাথ-আতুরদের দুঃখকষ্ট দূর করার চিন্তা এলোমেলো-ভাবে বালিকার মনে উঠত। কিন্তু দিশাহারা হয়ে পড়ত ক্ষুদ্র হৃদয়। বাড়ীতে দুই কাকা চুপি চুপি "দেশের কাজ" করতেন আর ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁদের আহৃত 'দেশের ডাক' 'পথের দাবী' প্রভৃতি পুস্তকগুলি পড়ত। সেই সময় মেজ কাকা ৺কুমুদবন্ধু দত্ত সরকারী চাকুরী ত্যাগ করায় বাড়ীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঠাকুরদাদা ক্ষুব্ধ হলেন, কারণ সরকারী মহলে তাঁহার সম্মান ছিল যথেষ্ট। বালিকা যেন ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ল স্বদেশীয়ানার দিকে, খদ্দর পরা আরম্ভ হল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা কিশোরীকে আকৃষ্ট করল—বিজ্ঞান চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ হল মন। ১৯২৮ সালের কলিকাতায় নিখিলভারত কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করা সম্ভব হল না। কিন্তু পরের বৎসর বিপ্লবী নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদারের উৎসাহে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন কল্পনা দত্ত। এই সম্মেলন ছিল সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের। 'রাউলাট এ্যাক্ট' পড়ে তাঁর মন বিষময় হল। কলিকাতায় পড়ার সময় সিমলা ব্যায়াম সমিতির 'পদাইদার' কাছে ছোরা, লাঠিখেলা, আর নৌকাচালনা শিখলেন। কলিকাতায় দুই কাকার মাধ্যমে তিনি কয়েকজন বিপ্লব পন্থীর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু তাঁদের কর্ম্মধারা প্রথমে ঠিক অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। সহসা ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল বৈকালে তিনি সংবাদপত্রে পড়লেন সূর্য্যসেন (মাষ্টারদা) ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের আক্রমণে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বীরকাহিনী। ব্রিটিশ সিংহকে অপমান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের চেষ্টায় গ্রামের বালকদের দুঃসাহসিকতা চট্টলকুমারীর মনে এনে দিল এক গভীর প্রেরণা—যদিও তিনি তখনও বিপ্লবীদলভুক্তা ছিলেন না। কলেজের গ্রীষ্মাবকাশে তিনি নিজ জেলায় ফিরলেন। মাষ্টারদা ও অন্যদের সহিত সাক্ষাত পরিচয় হল। ফরমুলা দিয়ে কল্পনা দত্তকে explosives তৈয়ারী ও সংগৃহীত আগ্নেয়াস্ত্র তাঁরই বাড়ীতে রাখার ভার দেওয়া হল। চট্টগ্রাম কলেজে বদলীর চেষ্টা চলল। সুবিধা না হওয়ায় সেখানে থেকে দলের কাজ করিতে লাগিলেন। নভেম্বরে কলিকাতায় টেষ্ট পরীক্ষা দিয়ে ফিরলেন স্বস্থানে। সেই সময় বন্দুক ও রাইফেল চালনায় মনোনিবেশ করেন। মাষ্টারদার সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ হত আর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীদের সহিত লুকিয়ে জেলে প্রত্যহ দেখা করতেন। কলিকাতা হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর কেনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হল। ইহার পর চট্টগ্রাম সহরে ডিনামাইট পুঁতিয়া সমস্ত সরকারী ভবন উড়াইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা শ্রীমতী যোশীর দক্ষতায় চালিত হয়—কিন্তু দলের একটি ছেলে ধরা পড়ায় কল্পনা দেবীর কথা পুলিশ জানিতে পারে। তাঁহার পরিবারের ও গৃহের উপর পুলিশী হামলা আরম্ভ হল—আর তাঁহাকে পক্ষকাল অন্তর থানায় হাজিরা দিতে হত। সতর্ক পুলিশ পাহারা ভেদ করে তিনি বিপ্লবী কার্য্যধারা চালিয়ে যান। ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা প্রমাণাভাবে বন্ধ হয়ে গেল। পূর্ব্বপরিচিতা প্রীতি ওয়াদ্দেদারকে তিনি মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাৎ করান। দুইজনে পুলিশের সাজে বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পুলিশ কল্পনা দেবীর উপর খুব লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করল। ১৭ই সেপ্টেম্বর '৩২ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় আর ২৪শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে চলে শাসক বনাম তরুণ বিপ্লবীদের এক অভূতপূর্ব্ব সংগ্রাম। যদিও তিনি এখন কারান্তরালে, তবুও তিনি যে ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন—তাহা বলার প্রয়োজন নাই। ইহার পর ব্যাপক পুলিশী অত্যাচার চলে। সর্ব্বসমেত ১০৮ জনকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়। ২৩শে নভেম্বর তাঁহাকে জামিনে খালাস করা হল। দলের নির্দ্দেশে ২৬শে ডিসেম্বর তিনি গৃহত্যাগ করেন। ফলে বাবার সরকারী চাকুরী গেল—বাড়ীর জিনিষ নীলাম হল—তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হল। সেই সময় তিনি ও মাষ্টারদা গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করেন। ধানের গোলায় লুকিয়ে থাকতেন

কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তা একদিন তাঁদের বার করে দিলেন। পুলিশ পিছুতাড়া করল—মাষ্টারদা ধরা পড়েন কিন্তু কল্পনাদেবী আশ্রয় পেলেন গৈছিয়া গ্রামে পূর্ণ তালুকদারের বাড়ীতে। পুলিশ সন্ধান পেল—সমস্ত বাড়ী ঘিরে গুলী চালাতে লাগল, পূর্ণ তালুকদার গুলীতে মারা গেলেন—আর ১৯৩৩এর ১৯শে মে শ্রীমতী যোশী ধৃত হলেন। পঁচিশ মাইল পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল পুলিশ তাঁকে চট্টগ্রাম সহরে। আত্মগোপনের সময় মাষ্টারদাকে জেল থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা চলেছিল আর স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দারা বিপ্লবীদের সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করতেন—সে কথার উল্লেখ করেন কল্পনাদেবী। কিন্তু নেত্র সেন ধরিয়ে দিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধেয় মাষ্টারদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-মামলা চলল—বিচারে মাষ্টারদার ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের ফাঁসীর ও শ্রীমতী যোশীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে মেয়ে রাজনৈতিক বন্দিনীদের (শান্তি, সুনীতি, উজ্জ্বলা, পারুল, বীণা দাস ও কল্পনা দত্ত) আন্দামানে প্রেরণ করা হয় নাই—তবে বিভিন্ন জেলে থাকিতে হয়। দুঃখের সঙ্গে জানালেন শ্রীমতী যোশী যে—'Terrorist History' ও 'Details of explosives manufacture' নামে তথ্যবহুল হস্তলিখিত পুস্তক দুটি পুলিশ নষ্ট করিয়া দেয়।

১৯৩৯ সালের মে মাসে মুক্তি পাওয়ার পর কল্পনা দেবী চট্টগ্রামে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়া কালিদাস বিজ্ঞান কলেজে এম, এস, সি পড়িতে থাকেন। সেই সময় কিষাণ সভা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিতে জড়িত থাকায় পুনরায় তাঁহাকে গৃহে অন্তরীণ করা হয়। ফলে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। ১৯৪২ সালে মুক্ত হওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষ ও বোমাবিধ্বস্ত এলাকায় সমাজসেবার কাজ করেন। উক্ত বৎসর তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যা হন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্টপার্টির ভূতপূর্ব্ব সাধারণ সম্পাদক শ্রীপূরণচাঁদ যোশীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। বর্ত্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্টাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে চাকুরীসূত্রে যুক্ত রহিয়াছেন।

পুরীর ঝাউবনে

অমলেন্দু দত্ত

এই ঝাউবন
এসেছি এখানে এসেছি কখন
এখানের এই আদরে গলানো
সোহাগে জড়ানো শীতল ছায়ায়,
বাদামি বালুর সোনালি রোদের
মোহিনী মায়ায়···

এসেছি এখানে এসেছি কখন
এখানে আসতে চেয়েছে কি মন ?
দিক-জ্ঞানহীন অবোধ সাগর
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাঙে মনের আগড়,
কভু ঘন নীল কভু ফিকে যেন
একটু সবুজ মেশানো—এ কেন ?

সারাদিন কাল কত রঙ ফেরা
দেখেছি, দেখেছি অবোধ ঢেউয়েরা
সারারাত আর সারাদিন ধরে'
ভেঙে লুটে পড়ে, লুটে ভেঙে পড়ে
আমার পায়ের কাছে কী যে খোঁজে
বুঝি ছোঁয়-ছোঁয়···এই যাঃ ছুঁলো যে
ভিজে বালু পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে
ঝিনুক কুড়িয়ে ঝিনুক হারিয়ে
এসে গেছি যেন এখানে কখন
এখানে আরেক নীলের সাগরে
নীল চুঁয়ে পড়ে পাতার ঝালরে
শীতের রাতের শিশিরের মত
কিংবা ভোরের কুয়াশা যেমন ॥
কোন্ গুণী যেন হাওয়ার আঙুলে
ঝাউয়ের সেতারে সুর তুলে তুলে
দিগন্তলীন বধির সাগরে
শোনাবেই সে যে শোনাবেই অকারণ !
এসেছি কে জানে কখন খেয়ালে
বালিয়াড়ি ভেঙে, সকাল বেলার
সোনালি রোদের ডাকে সাড়া দিয়ে
সাগরের নীল ইসারা ডিঙিয়ে।
এখানে এসেই বুঝেছি : এ-মন
এখানে আসার জন্তে উতল
হয়েছিল বুঝি কতকাল যেন
কত যুগ ধরে···
আশা আর সাধে বাঞ্ছিত সেই
চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া নীলের পেয়ালা
ধরে দেবে বলে' ;
আমি শুধু বসে
থাকবো এখানে—এখানে তোমার
ঝাউবন বীথি ছায়ায় ছায়ায়
বসবো আঁচলে, বসবো তোমায়
সুনীল আঁচলে···।

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

(২)

যতদূর সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে জানতে পারা যায় মুদ্রিত বাঙলা শব্দের অভিধানের গোড়াপত্তন করে যান এক পর্তুগীজ মিশনারী।

১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী আভিধানিকদের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে কিন্তু তারপর থেকে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তকে অভিধান-ক্ষেত্রের অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় পাদে পাদ্রে ফ্রে মানোএল দা আসুম্পসাঁও (Padre Frey Manoel da Assumpco) নামে এক পর্তুগীজ আভিধানিকের আবির্ভাব।

পর্তুগীজদের বাঙলা দেশে আসার একটা ইতিহাস আছে।

১৪৯৮ খৃঃ ২০এ মে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা মলবরের রাজধানী কালিকটে পদার্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে আসেন পেড্রো দে কোভিলহাম (Pedro de Covilham)। ১৫০০ সালে এই ভদ্রলোক ভারতে খৃষ্টান মিশনের সূত্রপাত করেন। এই বছরেই পেড্রো আলভারেজ কাব্রালের সঙ্গে আট জন যাজক আর আট জন ফ্রানসিসকান আসেন। মুসলমানেরা কিন্তু এদের তিনজনকে হত্যা করে। তাতে দমে না গিয়ে তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনের কাজে হাত দেন। ১৫০৩ সালে ডমিনিক্যানরা ভারতে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। ফলে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আর গোয়ায় ১৫১০ খৃঃ মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। পর্তুগীজরা ১৫১০ সালেই গোয়া নগরী অধিকার করে। তারপর সেখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের জন্য তারা চেষ্টা করে। ধর্মপ্রচারের জন্য তারা কতকগুলি বই ছেপেছিল, ছাপাখানারও ব্যবস্থা করেছিল আর সেই সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যও চালাত। যখন পর্তুগীজদের বাণিজ্য বেশ চলছে তখন নুনো দা কুনহা (Nuno da Cunha, ১৫২৯—৩৮) তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাঙলা দেশের সঙ্গে ব্যবসায় চালাতে সুরু করেন। তারই চেষ্টার ফলে পর্তুগীজরা বাঙলায় এসে বালেশ্বর থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আর হুগলী থেকে ঢাকা পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার জন্যে বাস করতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তাদের আর একটা কাজ ছিল জলদস্যুতা আর লুঠতরাজ। এতে তারা খুব নৃশংসতার পরিচয় দিত। বেশ কিছুদিন কাটবার পর পর্তুগীজ মিশনারীরা লিসবন হয়ে গোয়ার পথে বাঙলায় আসে। ধর্মপ্রচার আর ব্যবসার জন্যে তাদের বাঙলা ভাষা শিখতে হয়। তারা যেখানে থাকত সেখানকার কথ্য ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করত। বাঙলা ভাষা শেখবার উপযোগী তারা এক বাঙলা ব্যাকরণ আর প্রচলিত শব্দ নিয়ে অভিধান তৈরী করার, আর সেই সঙ্গে খৃষ্টধর্মের প্রার্থনা-বই বাংলা ভাষায় ছাপানোর প্রয়োজন মনে করে।

পাদ্রে ফ্রে মানোএল দা আসুম্পসাঁও (Padre Frey Manoel da Assumpcao) একজন পর্তুগীজ অগষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনারী। তিনি পর্তুগালের এভোরা-নিবাসী ছিলেন। তিনি ১৭৩৪ সাল থেকে ১৭৫৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনো মিশনের (Missio dos Nicholas Tolentino) অধ্যক্ষ (rector) ছিলেন। তিনিই একাজের ভার নিলেন। কঠোর পরিশ্রমে বাঙলা ভাষা শিখলেন—তাতে দেখলেন অপরকে শেখাতে গেলে বাংলা শব্দের প্রতিশব্দ পর্তুগীজ আর পর্তুগীজ শব্দের প্রতিশব্দ বাঙলার অভিধান থাকা প্রয়োজন।—তাই সহকর্মীদের কাজের সুবিধার জন্য তিনি একটা ব্যাকরণ ও একটা শব্দকোষ তৈরী করেন। শব্দকোষটির নাম—"Vocabulario em idioma Bengalla Portuguesa"। বইখানি ১৭৪৩ খৃঃ পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ছাপা হয়। বইখানির আখ্যাপত্র এইরূপ—"Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duos Partes dedicado as Excellent e Rever. Senhor. D. F. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. Lisboa 1743. তখন বাংলা অক্ষরের হরফ ছিলনা। বইখানি সমস্তটা রোমান অক্ষরে ছাপা। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে এভোরার আর্চবিশপ Senhor D. F. Miguel de Tavora-কে। ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের কোথাও বইখানির সন্ধান করে পাননি। গ্রীয়ারসন সাহেব তাঁর Linguistic Survey-তে ১ম খ· ১ম ভা· ১৩ পৃঃ) এই বইখানির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বইখানির তিনটি ভাগ আছে—১ম ভাগে ১ থেকে ৪০ পাতা পর্যন্ত ব্যাকরণ। ২য় ভাগে ৪১ থেকে ৩০৬ পাতা পর্যন্ত বাংলা-পর্তুগীজ অভিধান, আর ৩য় ভাগে ৩০৭—৫৭৭ পাতা পর্যন্ত পর্তুগীজ-বাঙলা অভিধান। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে ব্রিটিস মিউজিয়াম থেকে বাঙলা হরফে ১টি শব্দকোষ পেয়েছেন। এই বই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে—Hist. of the Beng. Language and Litt., (১৯১১), Bengal Past and Present, ১৯১৪; J. A. S. B. (১৯১৩); কেদারনাথ মজুমদারের বাঙলা সাময়িক সাহিত্য, ১৯১৭, ডক্টর সুশীলকুমার দের Bengali Litt. in the 19th Century, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২৩; অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (ভারতী, ১৩২৯; প্রবাসী, ১৩৩৭), ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাদ্রি মানোএল দা-আসুম্পসাওরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলি· বিশ্ববিদ্যালয়), ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ', প্রস্তাবনা (কলি· বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭), শ্রীসজনীকান্ত দাস (সা-প-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪র্থ সং প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

এর পর অগষ্টিন আসাঁ (Augustin Aussant) প্রণীত 'ফরাসী-বাঙলা' অভিধানখানির (১৭৮১-৮৩) উল্লেখ করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of Bengali Literature, ১ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়। এটি মুদ্রিত হয়নি, পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে, ইহা তিনি উল্লেখ করেছেন।

কলিকাতা গেজেটের (১৭৮৯ খৃঃ ২৩এ এপ্রিল) এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায় বাঙালী পণ্ডিতমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হচ্ছে একখানি ভাল বাঙলা ব্যাকরণ এবং অভিধান রচনা করার জন্যে। (সা-প-পত্রিকা, ৪৩ খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ)।

তারপরে পাওয়া গেল একখানি ডিক্সনারী 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' নামে। এর প্রকাশকাল ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় এই বইখানির আবিষ্কর্তা (সা-প-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪র্থ সংখ্যা)। এই বই-এর লেখকের নাম জানা যায়নি। মুদ্রাকরেরও নাম নেই—কেবল আছে 'ক্রনিক্যাল প্রেস' থেকে ছাপা। সজনীবাবুর মতে আপজন (A. Apjohn) সাহেব ক্রনিক্যাল প্রেসের আংশিক মালিক। গ্রন্থকারের নাম না থাকায় তিনি অভিধানখানিকে আপজন সাহেবের অভিধান বলে অভিহিত করেছেন। বইখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ—(সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় সজনীবাবুর প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)—"ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি"

An Extensive | Vocabulary, | Bengalee and English, | very useful | To Teach the Natives English, | and | To Assist Beginners in Learning | The Bengali Language | Calcutta, | Printed at the Chronicle Press | MDCCXCIII |

'ক্যালকাটা ক্রনিকল' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (মঙ্গলবার, মার্চ ২০, ১৭৯২) A. Upjohn সাহেব এক বিজ্ঞাপন দেন ইংরেজি ও বাঙলাতে। বাঙলা বিজ্ঞাপন এরূপ—

"ইংরাজি ও বাঙ্গালি লোকের। সিখিবার কারন এক বহি অস্তি। সিত্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে। ক সাহেব লোকে বাংলা কথা। সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে। ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএ। ব সকল লোকের কেফাএত। কারণ এই বহি তৈয়ার করা জা। ইতেছে জে ২ লোকে চাহে তা। হারা মেং আবজান সাহেবের। ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক। ইতি সং ১৭৯২ ইংরাজী। তারিখ ১৯ মার্চ সন ১১৯৮। বাঙ্গালা তারিখ ৯ চৈত্র।"

সজনীবাবু আপজনের অভিধানের একটা পাতারও প্রতিলিপি উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তার শব্দ-বিন্যাস কিরূপ ছিল—তার কয়েকটা কথা এখানে উল্লিখিত হল—

কাঁটালিকলা	a plantain of an angular kind
কাটাইতে	to cause to cut
কাটার	a poignard, dagger
কাটারি	a crooked broad knife
কাটিতে	to cut, to hew
কাটিতে আঁখর	to blot a letter
কাটরা	a fence of boards
কাটুরা	a wood-cleaver

ইত্যাদি।

তারপর যে অভিধানখানির কথা উল্লেখ করছি—সেখানিই আপজনের অভিধান আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত আদি অভিধান বলেই কীর্তিত ছিল। এই অভিধানখানির রচয়িতা হেনরি পিটস ফরষ্টার (Henry Pitts Forster)। ফরষ্টারের জন্ম ১৭৬৬ খৃ আর মৃত্যু হয় ১৮১৫ খৃঃ। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফে চিহ্নিত কর্মচারী হয়ে ভারতে আসেন। ১৭৯৩ সালে কালেক্টারের পদে আর ১৭৯৪ সালে ২৪-পরগনার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন। আদালতে বাঙলা ভাষা প্রচারের জন্য তিনি বাঙলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। অভিধানখানির নাম—"A Vocabulary, in two parts, English and Bengalee and Vice Versa", Calcutta 1799. কলকাতা ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে পি· ফেরিস কর্তৃক প্রকাশিত। বইখানির ১ম খণ্ড প্রকাশ হয় ১৭৯৯ সালে (মূল পৃষ্ঠা ৪২১), ২য় খণ্ড ১৮০২ সাল (মূল পৃষ্ঠা ৪৪৩)। ইহাতে প্রায় ১৮০০০ বাঙলা শব্দ আছে। সে সময় যে সব ইংরেজ বাঙলায় আসতো—তারা বাঙলা বুঝত না—কাজের অসুবিধা হত। এবং আদালতের কাজেও বাঙলা না জানার অসুবিধা ফরষ্টার সাহেব অনুভব করতেন। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি কঠোরভাবে বাঙলা ভাষা শেখেন এবং অভিধান সঙ্কলনে হাত দেন। আরও একটা কারণ জানা যায় তাঁর বাঙলা ভাষার প্রতি প্রীতির। এই দেশে অবস্থান কালে তিনি এক জাঠ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই জাঠ রমণী বাঙলা ভাষা জানতেন, আর ঐ ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেই কারণেও ফরষ্টার সাহেবেরও বাঙলা ভাষার প্রতি এত সমাদর সম্ভব হয়।

অভিধানের শব্দ সঙ্কলনের সময় তিনি সাধু ও প্রচলিত উভয় শব্দই যথা সম্ভব উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিধানখানির শব্দবিন্যাস এইরূপ—

অগ্রে Ogre—above all, before, already ইত্যাদি।
আগে Age—above all, before, already "
প্রথমতঃ Prothomotho—above all, before "
আচমকা } Sudden
আচম্বিতে } Suddenly
হঠাৎ Sudden, perchance
পতিত—Waste

"ই" তালিকায়—		ইতস্ততঃ পতিত	Scattered	(সাধু)
"উ"	"	উলচুল	Hurly burly	(গ্রাম্য)
"স"	"	সায়ং	Evening, twilight	(সাধু)
		সাঁজবেলা	" "	(গ্রাম্য)
"আ"	"	আকর্ষণ	To drag	(সাধু)
"হ"	"	হেঁচকান	" "	(গ্রাম্য)
"প"	"	পরিশ্রম	Labour	(সাধু)
"খ"	"	খাটনী	"	(গ্রাম্য)
"ম"	"	মজুরী	"	(গ্রাম্য)
"চ"	"	চন্দ্রাতপ	Tent	(সাধু)
		চাঁদোয়া	"	(গ্রাম্য) ইত্যাদি···

(বঙ্গভাষার আদি অভিধান ও ফরষ্টার সাহেব—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বঙ্গভাষা, ১৩১৪, ১৫ পৃষ্ঠা)।

১৮০৭ সালে কোলব্রুক সাহেব অমরকোষের সম্পাদন করে এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। কোলব্রুক সাহেবের কথা

গত বারেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি অমরকোষকে এক নতুন ধারায় ইংরেজি অর্থ সমেত সম্পাদন করেন। বইখানির মুখবন্ধে তিনি বলেছেন যে, তিনি অমরকোষের মূল গ্রন্থের সঙ্গে বহু প্রাচীন-কালের বিভিন্ন দেশের পুথিগুলি পরীক্ষা করেন। ত্রিহুতীয় অক্ষরে এক প্রাচীন পুথির নকল করান। দেবনাগরী অক্ষরেও নকল করান। সেগুলি স্যর উইলিয়ম জোনস বেশ ভাল করে পরীক্ষা করেন—জোনস সাহেব শব্দগুলির বহুলাংশে ইংরেজি প্রতিশব্দ লিখে দেন, তাতে তাঁর কাজের খুব সুবিধা হয়। কর্ণাটীয় অক্ষরের পুথির নকল. টীকা ও ব্যাখ্যা সমেত দেবনাগরী ভাষায় রূপান্তরিত করান—সেগুলির মধ্যে অনেকাংশ অপর প্রচলিত গ্রন্থে না থাকায় সেগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। বাঙলা ভাষায়ও টীকা সমেত একখানি গ্রন্থ পান, তার অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করেন। এই সব গ্রন্থ তিনি এবং অপর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা বিচক্ষণতার সহিত বিচার করে তবে তিনি অমরকোষ সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করতে তাঁর পাঁচ বছরেরও অধিক সময় লাগে। এই বইখানি শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। গ্রন্থখানিতে তিনি সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ইংরেজিতে দিয়েছেন—তারপর ধারাস্থিত মন্তব্য, শ্লোকের সারাংশ এবং পাদটীকায় শব্দগুলির ইংরেজি অর্থ এবং পরিশিষ্টে অকারাদিক্রমে শব্দসূচী দেন। পরিশিষ্টে বর্ণানুক্রম-পদ্ধতি পরবর্তী কালের আভিধানিকগণ গ্রহণ করেন। কোলব্রুক সাহেব যে কত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—তা তাঁর (১৮১৪ খৃঃ) ভারত ত্যাগের পর ২৩ বছর পরে যখন তাঁর মৃত্যু হয় (১৮৩৭ খৃঃ ১০ই মার্চ), তখন সেই মৃত্যু সংবাদ ভারতে এসে পৌঁছুলে তদানীন্তন সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণে' নিম্নোক্ত সংবাদটী প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানতে পারা যায়—

"আমরা অতি খেদ পূর্ব্বক জ্ঞাপণ করিতেছি যে ইংলণ্ড হইতে যে শেষ সম্বাদ পঁহুছিয়াছে তদ্দ্বারা অবগম হইল যে কোলব্রুক সাহেব লোকান্তর গত হইয়াছেন।.....ঐ সাহেব কতক বৎসরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতে প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌন্সেল ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত লোকদের প্রতিপোষকতা করণের উপরই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য সংস্কৃত বিদ্বান কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না জোন্স সাহেবও নহেন এবং সর্ব্বসাধারণ লোকই স্বীকার করেন যে তিনি সর্ব্ব বিষয়েই স্বদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাতে বিরত হন নাই।....." (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮০)

কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষের ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খৃঃ শ্রীরামপুরের ছাপাখানায়। দাম ১২৲ টাকা।

১৮০১ সালে জন লীডন (John Leydon) সাহেব বাংলায় এক অভিধান রচনা করেন। লীডন সাহেব (১৭৭৫-১৮১১). চিকিৎসক হিসাবে ভারতে এসে মাদ্রাজ, মহীশূর, পেনাঙ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। তারপর কলকাতায় আসেন ১৮০৬ সালে। তিনি কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক হন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকাকালীন পণ্ডিতদের কাছে বাঙলা শেখেন। সে বাঙলা কিন্তু পুরো পণ্ডিতী বাঙলা অর্থাৎ পণ্ডিতদের কাছে শেখার দরুণ সংস্কৃত-বহুল বাঙলা। তাই তাঁর অভিধানটাও সংস্কৃত শব্দের অভিধান হয়ে দাঁড়ায়।

পাদরী উইলিয়ম কেরী সাহেবের (১৭৭২-১৮৩৪) নাম বাঙলা দেশে শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তাঁর জীবনের ইতিহাস তাঁদের কাছে অজানাও নয়। তিনি ১৫ বছর পরিশ্রম করে এক বাঙলা-ইংরেজি অভিধান সঙ্কলন করেন। আর ৫ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থটীর মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করেন ১৮১৫ সালে। ১ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ মুদ্রণের পর দেখা গেল বড় অক্ষরে ছেপে বইখানির আকৃতি অত্যন্ত বৃহৎ হয়েছে এবং সম্পূর্ণ হতে যে আকার ধারণ করবে তা সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী হবে না। তাই তিনি বইখানি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে ছোট অক্ষর তৈরী করিয়ে সুন্দর ভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপেন। এই ভাবে ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ বের হয় ১৮১৮ সালের ১৭ই এপ্রিল। তার আখ্যাপত্র এইরূপ—

A । Dictionary । Of the । Bengali Language । in Which । The Words । Are Traced to their Origin । And । *Their Various Meanings Given.* । Vol. I । By W. Carey, D. D. । Professor of the Sanskrita, And Bengalee Languages, In the । College of Fort Wlliam । Second Edition, with corrections and Additions, । Serampore, । Printed at the Mission Press, । 1818. ।

২য় খণ্ডের ২য় ভাগ প্রকাশ হয় ১৮২৫ খৃঃ ৭ই জুন।

১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৬ আর ২য় খণ্ডের দু'ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৪৪। এই অভিধানটীতে ৮০,০০০ শব্দ আছে (জি, স্মিথের কেরীর জীবনী, ১৮৮৭ ; বিস্তৃত বিবরণ, গদ্যসাহিত্যের ভূমিকা, সা-প-পত্রিকা, ৪৬শ, ৩য় খণ্ড, দ্রষ্টব্য)

বইখানি ১৮২৫ সালে প্রকাশিত হবার পর সমাচার দর্পণে (১১ জুন ১৮২৫) নিম্নোক্ত সংবাদটী প্রকাশিত হয়েছিল—

"বাঙ্গালা ডেক্সিয়ানরি।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত ডাক্তার কেরি সাহেব পোনর বৎসর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ডেক্‌সিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সম্পূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্র সংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি-পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড সমেত ১১০ একশত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত যোগজবক্রত গণ আছে তৎপরে অকারাদি ক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।....(সংবাদপত্রে সেকালে কথা, ১ম খণ্ড, ৭৭পৃঃ)।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

লোকটা হেসে বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা—মহাজন লাগে না আমার। জাল কাটার জন্যে বারো আনার এক ছুরি মাত্তোর মূলধন। যেখানে খুশি মাল ছাড়তে পারি। কুমিরমারি চলে যাওয়াই ভাল। দেড় পহরের ভিতর পৌঁছে যাব। বাজার পুরোপুরি ধরা যাবে।

কেন ভাই, কাছেপিঠে গগন দাসের খাতা—তোমাদের জন্যই খাতা বসানো। কুমিরমারি অবধি কেন কষ্ট করবে?

খাতায় কি আর কুমিরমারির দর দেবে। খাতার ব্যাপারিরা কুমিরমারি নিয়ে বেচবে—মাঝখানে লাভ চাই তো খানিকটা! আর তোমাদের খাতা বসবে সেই ভোর-রাত্রে। হাত-পা কোলে করে অতক্ষণ বসে না থেকে কত দূর চলে যাব পায়ে পায়ে!

জগা বলে, মাল নামাও, কোনখানে যেতে হবে না। নইলে তো অত্তিস্ব বন কেটে এত কাণ্ড করেছি কেন? কি মাছ এগুলো—পারসে? আচ্ছা রাক্ষুসে পারসে জুটিয়েছ ভাই।

মাছের আয়তন দেখে উল্লাসের অবধি নেই। এক একটা বের করে জগা, পরম আদরে হাত বুলায়, আর বাৎসল্যের চোখে চেয়ে থাকে: আহা-হা, রাজপুত্তুর! পাঁচটা ছ'টায় সেরের ধাক্কা। এ জিনিষ পেটে খাবার নয়—সদরে নিয়ে দেখালে সরকারি পুরস্কার দেবে। আমি ছাড়ছি না, কুমিরমারির দর দিয়েই কিনে নেব। আরও বেশি চাও, তা-ই দেব। কষ্ট করে তোমায় একবার সাঁইতলা অবধি যেতে হবে। পয়সাকড়ি সদাসর্বদা লোকে গাঁটে করে ঘোরে না!

কুমিরমারি চলে যাচ্ছিল, সেই লোক সাঁইতলার এইটুকু পথ যাবে, এ আর কত বড় কথা! কালীতলার গেঁয়ো-বনে ভাণ্ডার আছে। ভাণ্ডার খুঁড়ে টাকা বের করে দাম দিতে হবে লোকটাকে।

সাঁইতলায় নিয়ে গিয়ে তাকে চালাঘরের ভিতর বসাল। প্রসন্ন মুখে জগা বলে, ঢেলে ফেল সমস্ত মাছ এইবারে। নেড়েচেড়ে দেখে আন্দাজ করে দাম বল।

লোকটা দাম বলে, পাঁচসিকে।

উঁহু, দেড় টাকা। দেড় টাকায় খুশি হলে কিনা বল। কুমিরমারিতেও তুমি এই দর পেতে না ভাই। বসে বসে তামাক খেতে লাগ, টাকা নিয়ে আসি।

তামাক সাজছে জগা। লোকটা প্রশ্ন করে, তুমিই বা এত দর দিচ্ছ কেন? পোষাতে পারবে?

তাই বোঝ। না পোষালে দিচ্ছি কেমন করে?

লোকটা হি-হি করে হাসে: বুঝতে পেরেছি।

কি বুঝলে?

মানুষের মনে কত কি মতলব থাকে। কত রকম ভেবে কাজ করতে হয়। খাতা জমাচ্ছ বুঝি এই কায়দায়? বাবুরা যেমন করে হাট জমায়। হাটে যে মাল অবিক্রি থাকে, বাবুদের তরফ থেকে সমস্ত কিনে নেবে। এমনি করে করে ব্যাপারি জমে। ব্যাপারির মাল আমদানি হতে লাগলে খদ্দেরও এসে জুটবে। হাট জমে গেল। তারপরে কষে তোলা আদায় করে যাও। ভাল দর দিয়ে তোমরাও তেমনি খাতা জমাচ্ছ—যত মাছ-মারা তোমাদের ওখানে যাতে জোটে। কেউ কুমিরমারি যাবে না, এদিক-ওদিকে হাতে কেটে বেচতে যাবে না। খাতায় এসে নির্ঝঞ্ঝাটে পাইকারি ছেড়ে দিয়ে যাবে।

জগা বিষণ্ণমুখে বলে, বন কেটে ঘেরি বানালাম ভাই, খাতার বুদ্ধিটাও আমার। কিন্তু আমি আর কেউ নই এখন। আমি তো আমি—খোদ মালিক গগন দাসের দশা গিয়ে দেখ একবার। আমি যাইনে—কিন্তু যা শুনতে পাই পাষাণ ফেটে জল বেরিয়ে যায়। ডাঙা অঞ্চলের ভদ্দোররা এসে চেপে পড়েছে। সে আছে জেলখানার কয়েদির মতো হয়ে।

লোকটা ছিলিমে গোটা দুই টান দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল: মতলব এবারে ধরতে পেরেছি। বলব? জাল নিয়ে বেরিয়েছ—জালে তো একেবারে ফক্কা। আমার মাছ দেখিয়ে বউয়ের কাছে পশার বাঁচাবে তুমি।

জগাও হাসে: বউই নেই। এই হল বসত-ঘর। বউ থাকলে মজা করে এমনি হাত-পা মেলে থাকতে দিত? ঘরের চেহারা দেখে বল তুমি।

একুশ

ভোররাত্রে আর দশটা মাছ-মারার সঙ্গে জগা গিয়ে নতুন আলায় উঠল। বসেছে মাছ-মারাদের মধ্যে। জালে জড়িয়ে মাছ এনেছে, জাল খুলে মাছ পাতিয়ে দিল। জগার এই নবমূর্তিতে অবাক

হয়েছে সকলে। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলে না। কাজের ভিতর গোঁয়ার মানুষকে ঘাঁটাতে গিয়ে কোন বিপত্তি ঘটে না জানি!

আলায় এসেছে জগা অনেকদিন পরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চতুর্দিক। হায় হায়, কী চেহারা করে ফেলেছে তাদের সাধের আলায়! রাখেশ্যাম বাড়িয়ে বলেনি। আলা কে বলবে, ষোলআনা গৃহস্থবাড়ি। দরাজ উঠান পড়ে ছিল—আগাছার জঙ্গল, আর নুন ফুটে-ওঠা সাদামাটি জায়গায় জায়গায়। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সারা উঠান ভরে লাউ-কুমড়ার চারা পুঁতেছে, নটে-পালংশাক-মূলোর বীজ ছড়িয়েছে। নধর লকলকে শাকে মাটি দেখা যায় না। সামনের দিকে গোয়ালঘর বাঁধা হচ্ছে। উদ্যোগী মরদ মানুষের তো অভাব নেই। খুঁটি পোঁতা হয়ে চাল উঠে গেছে এর মধ্যে। গোয়ালঘর শেষ হতে মাস দুয়েকের বেশি দেরি হবে না। শেষ হয়ে গেলে গরু আসবে, ছাগল আসবে। আর এখনই এই ভোর হবার মুখে হাঁস ঝটপট করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় একটুকু খোপের ভিতরে। হাঁস তবে তো এসেই গেছে এর ভিতরে। মাস দুই পরে যে কী কাণ্ড হবে, ভাবতে শিহরণ লাগছে। গোয়াল, তরিতরকারির ক্ষেত, উঠান জুড়ে লাউ-মাচা। মাচার তল দিয়ে মাথা নিচু করে দাওয়ায় এসে উঠতে হবে। সাগরের কূলে চর পড়ে ডাঙা বেরুল, ডাঙায় জঙ্গল জমল আপনা আপনি। জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার চরে বেড়ায়। সকলের শেষে এলো মানুষ। শুধু মাত্র চরে খেয়ে ও-জীবের সুখ হয় না। জমিজিরেত নিজস্ব করে ঘিরে নেবে, চিরস্থায়ী ঘরবাড়ি বানাবে—সকল জীবের মধ্যে এই মানুষই কেবল যেন অনড় হয়ে এসেছে দুনিয়ার উপর।

সব চেয়ে কষ্ট হয় বড়দার জন্যে। কথা বলা চুলোয় থাক, নিদারুণ লজ্জায় মুখ তুলে সে জগার দিকে চাইল না এতক্ষণের মধ্যে। যেন কে না কে এসেছে। পুরো-তাতা কাচিক এবং পুরো দশহাতি কাপড় পরিয়ে খাতা-কলম আর হাতবাক্স সামনে দিয়ে মাচার উপর এগনকে ভদ্রলোক করে বসিয়ে দিয়েছে। বসে বসে হিসাব কর, আর লিখে যাও। লেখাপড়া শেখার এই বড় জ্বালা। ফষ্টিনষ্টি ঠাট্টা-তামাসা হাসিগল্লা করবে—তা দেখ, শ্যালক নগেনশশী ঘোড়াতে ঘোড়াতে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে সামনের উপর। এবং কামরার দরজার আড়াল থেকেও দোর্দণ্ডপ্রতাপ বোন আর বউ নিশ্চয় একগণ্ডা চোখ তাকিয়ে পাহারায় রয়েছে। মানুষটাকে নড়ে বসতে দেবে না। তোমার এই কেনাবেচার সময়, কাজের সময় বলেই নয়—দিনরাত অষ্টপ্রহর নজর রয়েছে। তার উপর সন্ধ্যার পর গান-বাজনা আর ফষ্টের আড্ডা ছিল, আড্ডা এখনো আছে। কিন্তু রসের গান গাও দিকি একখানা—'গয়লা দিদি লো, বড় ময়লা তোর প্রাণ'—গাও দিকি কত বড় সাহস! শ্রীখোলের সঙ্গে নামগান করে এখন বড়দা বোন-বউ-শ্যালকের সামনে বাবাজি হয়ে বসে। হরিধ্বনি করে হরির লুঠ ছড়ায়, শাঁখ-শঙ্খ বাজায় হয়তো বা লক্ষ্মীপূজোর সময়। জেলের কয়েদি হয়ে আছে, সেটা কিছু মিথ্যে বলেনি জগা।

গগন গম্ভীর হয়ে বসে। আর নগেনশশী মাতব্বরির চালে চরকির মতো ঘুরছে। অকাজের ঘোরাফেরা নয়—খাবার মাছ বলে এক এক আঁজলা মাছ তুলে নিচ্ছে মাছমারাদের ঝুড়ি খালুই ও জাল থেকে। জগা বলেও বাদ দিল না, নিয়ে নিল তার কাছ থেকে গোটাকতক। জগা কিছু বলবে না, সে তো পুরোপুরি মাছ-মারা হয়েই এসেছে। এমনি ভাবে খাতার নিজস্ব ঝুড়িও প্রায় ভরতি। তার অল্প-কিছু খাবার জন্য রান্নাঘরে পাঠিয়ে বাকিটা বিক্রি করে দেবে। সেটা সকলের শেষে। নগেনশশী এসে এই একখানা বুদ্ধি বের করেছে—রোজগারের নতুন পন্থা। ফন্দিফিকিরের অন্ত নেই লোকটার মাথায়। মাছ-মারারা মাছ নিয়ে বসে আছে—নগেনশশী ঘুরে ঘুরে এক এক জনের কাছে যায়, হাত দিয়ে মাছ উল্টেপাল্টে ব্যাপারিদের দেখায়, দু-হাতে তুলে ধরল বা একটু উঁচুতে। বলে, উঃ, পাহাড়ের সমান ওজন! একটা জালে ভেড়ির যাবতীয় মাছ তুলে এনেছ গো! কত দেবে ঘড়ুই মশায়? হর ঘড়ুই কিছু বলবার আগে নিজেই মন-গড়া দর বলে, বার আনা? ঝড়ু ব্যাপারি ঐ দেখ এক আঙুল দেখিয়ে পুরোপুরি টাকা বলে বসে আছে। এর উপরে কে কত উঠতে পার? এক-দুই—উঁহু আটার আনা নয়, পাঁচ সিকে—তিন। পাঁচ সিকেয় গেল, মাছ ঢেলে নাও ব্যাপারি।

এমনি কায়দায় মাছের দর তোলে নগেনশশী। দর উঠলে বৃত্তি বেশি আদায় হয়, খাতার মুনাফা বেশি। যা গতিক, খাতা তো ধাঁ-ধাঁ করে এবারে জমে উঠবে নগেনশশীর ব্যবস্থা ক্রমে।

সকাল হয়েছে! কিন্তু আজ বড় কুয়াশা—মনে হচ্ছে, রাত্রি আছে এখনো। বেচাকেনা শেষ। মাছের ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ, পচা আর বলাই বেয়ে নিয়ে চলে গেল। জগা ভাবছে, দু-জনেই ওরা সমান ওস্তাদ—এই কুয়াশায় পথ ভুল করে কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। আবার ভাবছে, তাই কর মা-কালী, জগা কী দরের নেয়ে না হাড়ে-হাড়ে বুঝবে তবে সকলে। মাছ-মারাদের হিসাব খাতায় উঠে গেছে, এইবার পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পয়সা গণেগেঁথে নিয়ে চলে যাচ্ছে একে একে।

বিনোদিনী গিয়ে হাঁসের খোপের ঝাঁপ সরিয়ে দিল। প্যাক-প্যাক আওয়াজ তুলে ছুটোছুটি করে হাঁসের পাল বাঁধের ধারে ডোবায় গিয়ে পড়ে। বাদাবনে শিয়াল নেই, এই বড় সুবিধা। কোমরে আঁচল জড়িয়ে দিয়ে নিয়ে চারুবালা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। বলে, বেটেলা পড়ছে। সরে যাও গো ব্যাপারি মশায়েরা। সরো ও মাছ-মারা মশায়—

সব মাছ-মারার হয়ে গেছে, সর্বশেষ জগার পয়সা গণা হচ্ছে। সেই বাকি আছে শুধুমাত্র। ইচ্ছে করেই যেন চারুবালা তার দিকে চেয়ে মাছ-মারা বলে ডেকে মুখের সুখ করে নিল। হর ঘড়ুই আর জগার কথাবার্তা চলছে তখন। ঘড়ুই তারিফ করে: ওস্তাদ বটে তুমি জগা! সর্বকালে দড়। একদিন জাল নিয়ে পড়লে, তাতে একেবারে সকলের সেরা মাছ তুলে নিয়ে এসেছ।

ঝাঁট দিতে দিতে চারুবালা স্বগতোক্তির মতো বলে, ওস্তাদ বলে ওস্তাদ! মাছ মেরে আনা হয়, তা জালে জলের ছিটে লাগে না। একেবারে শুকনো জাল।

হর ঘড়ুই তাকিয়ে দেখে, ব্যাপার তাই বটে! আচ্ছা কাজের মেয়ে তো, অতদূর থেকে ঠিক নজর করে দেখেছ।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, বড়দা বারণ কর। মরদ মনিবের কথায় মেয়েলোকে কেন ফোড়ন কাটবে?

জগা যত রাগে ততই চারুবালা খিল-খিল করে হাসে: কাণ্ডখানা বুঝেছ ঘড়ুই মশায়? এর-তার কাছ থেকে মাছ জোগাড় করে নিয়ে মানুষটা আলায় এসেছে।

ঘড়ুই বলে, তার গরজটা কি ছিল? যার যখন ইচ্ছে, চলে আসে চলে যায়। বাধা কিছু নেই।

চারু বলে, মনে পাপ থাকলে ছুতো খুঁজতে হয়। সকলকে মানা করে, আলায় যাতে না আসে। মাছ-মারা সেজে নিজে তারপর চরবৃত্তি আসে।

হাঁটার তলে হঠাৎ পোকামাকড় পড়েছে বুঝি! মরীয়া হয়ে মেঝের উপর বাড়ির পর বাড়ি দিচ্ছে। জগা কোন দিকে না তাকিয়ে পয়সা গাঁটে নিয়ে দুমদুম করে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল।

চালাঘরে জগা একা। সোয়াস্তি নেই। সাপের মতন ফোঁস-ফোঁস করছে। ঘরে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ, বেরিয়ে পড়ে। লোকের সামনে এমন হেনস্থা আজ অবধি কেউ করেনি তাকে। চারুবালা থাকতে ভুলেও কোনদিন আর নতুন আলায় যাবে না। বাদাবন থেকে তাকে তাড়িয়ে অপমানের ষোল আনা শোধ নিয়ে তবে যাবে। ভরদ্বাজকে তাড়িয়েছে—তারও চেয়ে বড় শত্রু মেয়েটা। ভরদ্বাজ ছিল ভিন্ন এলাকায় চৌধুরিদের মাইনে-খাওয়া গোলাম—নিজের ইচ্ছেয় কিছু করত না। চারুবালা বুকের উপর পড়ে থেকে শত্রুতা সাধবে। বলাই আর পচা, তার ডান-হাত বাঁ-হাত কেটে নিয়েছে সকলের আগে।

আপাতত একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। চৌধুরি-আলায় চলে যাবে। সেখানে পুরানো সাঙাৎরা আছে—অনিরুদ্ধ, কালোসোনা এবং আরও সব। গগন দাসকে নিয়ে প্রথম যেখানে এসে উঠল, বাদাবনের স্বাদ পাইয়ে দিল গগনকে। অতিথ এসে সেই গৃহস্থ তাড়ানোর ফিকির। গোপাল ভরদ্বাজ বিদায় হয়েছে, এখন আবার সেখানে ভাব জমিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না। চৌধুরিগঞ্জের মানুষ আমদানি করে চালাঘরের ভিতরেই আড্ডা জমাবে। নতুন আলার পাশাপাশি ওদের চেয়ে ঢের ঢের জবর আড্ডা।

এমনি সব আনাগোনা করতে করতে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশা—সৃষ্টিসংসার মুছে গিয়েছে যেন একেবারে। দু-হাত দূরের গাছটাও নজরে আসে না। সূর্যিঠাকুর বনের এই নতুন বসতির পথ ভুলে গেছেন বুঝি আজ।

থমকে দাঁড়াল। শিস দিচ্ছে কে কোথায়। শিস দিয়ে ডাকছে যেন কাকে। মন্দ মানুষের কাণ্ডবাণ্ড নাকি? ঐ ভরদ্বাজের যে ব্যাপার—ব্রাহ্মণ-সন্তান পিটুনি খেয়ে গেল অসৎকর্মে গিয়ে। আর মজা এমনি, কাউকে কিছুই বলবার জো নেই—কিল খেয়ে কিল চুরি করা। কান কেটে নেওয়ার কথা হয়েছিল সেদিন—সেটা হলে কি করত? খোঁড়া পায়ের অজুহাত আছে—পগারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। ফোলা মুখের কৈফিয়ৎ—মৌমাছি কামড়ে দিয়েছে। পিঠে লাঠির বাড়ির দাগ—তা হয়তো গায়ের ফতুয়াই খুলল না দাগ বসে না যাওয়া অবধি, তেল মাখবার সময়েও না। কিন্তু কাটা কানের কি কৈফিয়ৎ? হেন ক্ষেত্রে কান ঢেকে পাগড়ি পরে থাকত হয়তো বার মাস তিরিশ দিন। রাত্রিবেলা মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে পাগড়ি খুলত। শয়তান মানুষ বাগে পেলে এবারে আর ছেড়ে কথা কইবে না—কানই নেবে কেটে।

শিসটা বড় ঘন ঘন আসছে গো! জোর-জোর এখন। মানুষটা বে-পরোয়া—পিরীতের মানুষ সাড়া দিচ্ছে না, বেশি রকম উতলা হয়েছে তাই। নদী-খাল বনজঙ্গল কুয়াশায় অন্ধকার। রাত্রি-জাগরণ ক্লান্ত মাছমারারা বেহুঁশ হয়ে ঘুমচ্ছে; বউরা পয়সা নিয়ে কেনাকাটায় বেরিয়ে গেছে। দিন-রাত্রির মধ্যে সব চেয়ে নিরালা এই সকালবেলাটা। সময় বুঝে রাসলীলার জোগাড়ে বেরিয়ে পড়েছে কেউ।

জগন্নাথ বাঁধ থেকে নেমে পড়ল। আওয়াজের আন্দাজ করে যাচ্ছে। কোনখানে কার কাছে গিয়ে পড়বে, কিছুই জানে না। মানুষটা যে-ই হোক—সেই একদিন গোপাল ভরদ্বাজকে নিয়ে যেমন হয়েছিল,—আজকেও হাতের সুখ হবে তেমনি ধারা। যেতে যেতে অকে নাবালে একেবারে খালের উপর এসে পড়ল সে! ঠিক ওপারে বাদাবন। আওয়াজের অনেক কাছে এসেছে। অত্যন্ত টিপিটিপি এগুতে হচ্ছে—কাদার মধ্যে পায়ের ওঠানামায় শব্দ না হয়। সতর্ক হয়ে যাবে তা হলে মানুষটা।

একেবারে পিছনটিতে এসেছে, তখন চিনল। চারুবালা। চারু, তোমার এরই কাণ্ড? দিগন্তজোড়া কুয়াশা পেয়ে আলা থেকে এত দূর এসে প্রেমিকপুরুষ ডাকাডাকি করছ? জগা হাতের মুঠি পাকাল। উঁহু, এখন কিছু নয়—এসে পড়ুক সেই রসিক নাগর, দৌড় কত দূর দেখা যাক। কাদার মধ্যে একেবারে জলের কিনারে হেঁতালের ডাল ধরে আছে চারু। শিস দিচ্ছে, প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে তাই ফিরে। আবার করছে অমনি। হাত কয়েক পিছনে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জগা। এসে পড়লে যে হয়! বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘের গায়ে জোর কতটুকু—তার দুনো জোর তখন জগার হাতে মুষ্টিতে।

শিস দেওয়া ছেড়ে এবারে আর এক রকম—কু দিচ্ছে চারুবালা। কু-কু-কু-উ-উ-উ—কোকিলের রবের মতো কণ্ঠ ঢেউ খেলে যায়। নোনাজল-ওঠা কুয়াশামগ্ন বাদাবনের ভিতর থেকেও পাল্টা দেখি কোকিল ডেকে উঠল। ভারি মজা চলেছে নির্জন খালের এপারে আর ওপারে। মেয়ে এবার স্পষ্টাস্পষ্টি কথাবার্তা শুরু করল বনের সঙ্গে: ও বন, শোন—আমার কথা শোন। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি আসছে: শোন—। অতি স্পষ্ট—চারুবালার চেয়েও স্পষ্টতর গলা। ঘাড় তুলিয়ে চারুবালা আরও চেঁচিয়ে বলে, না, শুনব না। তুমি আমার কথা শোন আগে, যা বলি শোন। শোন, শোন—দূর-দূরান্তরে ধ্বনিত হয়। চারু বলে, শোন; বনও বলে, শোন। দু-জনে পাল্লাপাল্লি। মাঝখানে খাল না থাকলে বোধকরি চুলোচুলি বেধে যেত দুই পক্ষে।

এতক্ষণে জগা বুঝতে পেরেছে। মাথা খারাপ মেয়েটার। রকমসকম দেখে অনেক আগেই সেটা বোঝা উচিত ছিল। হৃৎকম্প হচ্ছে জগন্নাথের। বনরাজ্যে একটা খাল এমন-কিছু দুস্তর বাধা নয়—ভাঁটা সরে গিয়ে সেই খাল এখন আরও সরু হয়ে গেছে। চুলোচুলির ভাবনা ভাবছে না, বাঘ আসতে পারে খাল পার হয়ে। মানুষের গলা পেয়ে দূরের কোন-ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে হয়তো পার হয়ে এসে উঠেছে—সেখান থেকে টিপিটিপি পা ফেলে ঘাড়ের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কত হয়ে থাকে! পাগলের জায়গা মানবেলায়। বাদাবনে যারা আসবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচার-বিবেচনা করে প্রতি পায়ে সতর্ক হয়ে চলতে হবে তাদের। মানবেলার মেয়ে বাদায় এসে সঙ্গিনী পাচ্ছে না, বনের সঙ্গে তাই ডেকে ডেকে কথা বলতে এসেছে।

গালিগালাজ করা উচিত। কিন্তু খানিক আগে যা কথার খোঁচা খেয়ে এসেছে, চারুকে নাড়তে জগন্নাথের আর সাহসে কুলায় না। শুধু কথাই বা কেন, মাটিতে ঐ যে অতবড় ঝাঁটা ঠুকল তাই বা তাকে উদ্দেশ করে কি না কে বলবে? বাঘে যদি মুখে করে নিয়ে যায়, ভালই তো—ভরদ্বাজ গেছে, শেষ শত্রু আপোসে খতম হয়ে যাক তাদের সাঁইতলা থেকে।

কুয়াসা কেটে হঠাৎ আলো ফুটে উঠল। সূর্য দেখা দিয়েছে। বনের মাথায় রোদের ঝিলিমিলি, কী সর্বনাশ, চারুবালার একেবারে পিছনটিতে জগা—দেখলে যে ক্ষেপে উঠবে দজ্জাল মেয়ে! পা টিপে টিপে পিছিয়ে সে বাঁধে গিয়ে উঠল। খানিকটা বাচোয়া এবার। বাঁধের উপর দিয়ে হন হন করে চলেছে কবালীর দিকে। চারুবালার দৃষ্টিতে না পড়ে যায়। কিন্তু হয়ে গেল তাই। তাড়াতাড়ি করতে পা পিছলাল। পড়ে যাচ্ছিল, একটা ডাল ধরে সামলে নিল। মুখ ঘোরাল চারুবালা। এক পলক। ঘুরিয়ে নিল মুখ সঙ্গে সঙ্গে। চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থ যেন দেখে ফেলেছে—এমনি অবস্থা এখন জগার। সন্ন্যাসী চোর নয়, সৌচকার্য ঘাটায়। কিন্তু কে বুঝবে, যাবেই বা কে বোঝাতে? বলি, বাঁধের পথ তো কারো কেনা জায়গা নয়—দরকার পড়েছে, তাই এসেছি এখানে। যা ইচ্ছে ভাব গে, বয়ে গেল।

নতুন আলার একেবারে গা ঘেঁসে বাঁধ চলে গেছে, সেইখানটা এসে পড়েছে। বাঁধের মাটি তুলে ভিতর দিকে ডোবা মতন হয়েছে। মতলব করে একটা জায়গা থেকেই মাটি তোলে। ক'বছর পরে এই ডোবা পুকুর হয়ে দাঁড়াবে। কলমির দামে এরই মধ্যে জলের আধাআধি ঢেকে গেছে, কলমিফুল ফুটে আছে। হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে তার ভিতরে। কতগুলো হাঁস রে বাবা! ডোবাটা আলার এলাকার ভিতরেই, কিনারা দিয়ে পথ। পিটুলি-গোলায়—লক্ষ্মীর পা এঁকেছিল, খানিকটা তার চিহ্ন রয়েছে। সাদা পায়ের দাগ ফেলে ঐ পথ ধরে লক্ষ্মীঠাকরুন আলাঘরে উঠে বসেছেন—আপদবালাই তাদের দূর করে দিয়ে লক্ষ্মীর বসত। এবং সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীমন্তদের আনাগোনা সেই জায়গায়।

খান দুই-তিন গুঁড়ি ফেলে ডোবার একদিকে ঘাট বানিয়েছে! বনি-বউ ধুচনি করে চাল ধুতে এল। বেড়ে আছে বড়দা, রাঁধা ভাত খাচ্ছে। রকমারি খাবার মাছ রেখে দেয় রোজ, এসে ভিম পাড়ে, তার উপরে এটা-ওটা ফাইফরমাস করে পচা-বলাইকে—কুমিরমারি থেকে তারা কেনাকাটা করে আনে। ভাত বেড়ে অষ্টব্যঞ্জন চতুর্দিকে সাজিয়ে পিঁড়ি পেতে গগনকে ডাক দেয়, ভাত খেতে এস গো। সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও—বলে, দাঁত খোঁচাবার জন্য খড়কে-কাঠি এনে দেয় আঁচাবার সময়। বউ-বোন-শালার সংসার পাতিয়ে দিব্যি মজায় আছ নতুন ঘেরি ও খাতার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র দাস। [ক্রমশঃ।

মন

বীরেশ্বর বসু

"How fleet is the glance of the mind
Compared with that of wind."

বাসে যেতে যেতে মনে হয়—
আমি যদি পাখি হোতাম,
উড়ে যেতাম বহুদূরে বিদিশার দেশে
অথবা নীল শান্ত কোনো সমুদ্রের পারে
কিম্বা ঊর্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে মহাশূন্য 'পরে
যেখানে পাখিরা ওড়ে,
মহানন্দে গায়, মেঘে মেঘে বাতাসে হারায়!

এর মাঝে কখন যে বাস—
এসে গেছে বহুদূর,
পেরিয়ে গড়ের মাঠ, আলিপুর, ঘাস, মাটি, চুপ-
পাখিরা পিছনে সব :
আমি গেছি আরো দূরে অনন্ত নিখিলে
সেখানের খোঁজ কিন্তু পাখিরা জানে না,
জানি আমি, অর্থাৎ এ-মন!

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এর পর আমরা সকলে মিলে খোকাবাবুর রক্ষিতা মলিনাসুন্দরীর কক্ষে এসে দেখলাম, মলিনাসুন্দরী আপন কক্ষে বসে ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। তার পাশে পড়ে রয়েছে একটা শক্ত মোটা দড়ী ও একটি ক্লোরোফর্ম-ভর্তি শিশি। এই ঘটনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়েছিল। তার সেই বিবৃতির একটি সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"এই রাত্রে আমি নিশ্চিন্ত হয়েই আপন কক্ষে নিদ্রিত ছিলাম। কারণ, আমি জানতাম যে নীচের ঘরে দুইজন সিপাই আমাকে রক্ষার জন্য উপস্থিত আছে। সহসা জানালা ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে একটা ঝুপ করে আওয়াজ হলো। এইরূপ একটা আওয়াজ শুনা মাত্র আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আমি উঠে বসবার পূর্ব্বেই দেখি, আমার ঘরের বিজলী বাতিটি জ্বেলে দিয়ে খোকাবাবু আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠা মাত্র খোকাবাবু আমাকে চুপ করে থাকবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ভিন্ন আমার উপায়ও ছিল না। খোকাবাবু এর উপর প্রস্তাব করলেন যে তিনি আজই আমাকে বাঙলাদেশের বাইরে এক স্থানে নিয়ে যাবেন। আমি সভয়ে তাঁকে জানালাম যে এতে তাঁর বিশেষ বিপদ ঘটতে পারে। কারণ নীচে দুয়ারের কাছে দুই জন পুলিশের লোক আমাকে রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করা আছে। ইতিমধ্যে খোকার বন্ধু কেষ্টবাবুও ঐ একই পথে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন যে, ঐ সিপাহিদ্বয়ের ঘর বাহির হতে অতর্কিতে তিনি শিকল তুলে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঠিক এই সময় নীচেকার সিপাহিদ্বয়ও বাহিরের ব্যাপার উপলব্ধি করে চীৎকার সুরু করে দিলে। তাদের চেঁচানিতে বিরক্ত হয়ে খোকাবাবু তার সাকরেদ কেষ্টবাবুকে জানান, 'এই তুই শীগ্রি নেমে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া। মলিনা সহজে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি একে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করে ওর দেহটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নীচে গলিটায় নামিয়ে দেবে, আর নীচে থেকে তুই ওকে ধরে ফেলে বাঁধনটা তাড়াতাড়ি খুলে দিয়ে ওকে কাঁধে করে নিয়ে চলে যাবি। ঐ গলির অপর মুখে এতক্ষণে সুবল নিশ্চয়ই মণ্টুদের ট্যাক্সিখানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।' খোকার আদেশ পাওয়া মাত্র কেষ্টবাবু জানালা গ'লে দেওয়ালের খ'ড়া ব'য়ে নীচে নেমে গেলো। কিন্তু আমি এই সব ডাকাতদের কথামত কাজ করতে আদপেই ভরসা পেলাম না। আমি খোকাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে তাদের সঙ্গে আমি কোথায়ও যাব না এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের লোকের সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে সুরু করে দিলাম—'ওগো কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা করো। খোকাবাবু এসে আমাকে খুন করে ফেললো গো। শীঘ্র তোমরা থানায় খবর দাও গো, ইত্যাদি' কথা বলে। আমাকে এই ভাবে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে খোকাবাবুও 'ধোং' ব'লে কেষ্টর মত খ'ড়া ব'য়ে নীচে নেমে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনতে পেলাম, বাইরে বন্দুক ছোঁড়ার দমাদম্ আওয়াজ হচ্ছে। এই জন্য তখন থেকে ভয়ে ঘরের মধ্যেই আমি বসেছিলাম।"

আমরা অকুস্থল হতে দড়ী, কাপড়, ক্লোরোফর্মের শিশি প্রভৃতি প্রদর্শনী দ্রব্য কয়টি সাবধানে সংগ্রহ করে নিজেদের হেপাজতীতে গ্রহণ করলাম। ঐ ঔষধের শিশিটা গ্রহণের সময় আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। কারণ তাতে খোকাবাবুর অঙ্গুলির টিপ-চিহ্ন সন্নিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ'ছাড়া নেমে এসে আমরা পাশের গলিতে এবং বাটীর দেওয়ালের গাত্রে অপরাধীদের পদচিহ্নের সন্ধানও করেছিলাম। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারিনি।

সাক্ষিনী মলিনাসুন্দরীর উপরোক্ত বিবৃতিতে আমরা কেষ্ট এবং সুবল নামে আরও দুই ব্যক্তির নাম জানতে পারি। খোকাবাবুর দলে যে বহু ব্যক্তি সংযুক্ত আছে তা ইতিপূর্ব্বেই আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম। এই জন্য মলিনাসুন্দরীকে এই সম্পর্কে জেরা করে এদের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এ'ছাড়া আরও একটি বিশেষ তথ্য তার কাছ হতে অবগত হওয়া আমাদের দরকার হয়েছিল। এই তথ্যটি হচ্ছে এই যে, মলিনাসুন্দরী খোকার সহিত বহুদিন রক্ষিতারূপে বাস করা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে অন্যত্র যেতে চাইছিল না কেন? এই সকল দুরূহ মামলার তদন্তে পুলিশের কর্ত্তব্য শুধু সাক্ষ্য সংগ্রহ করা নয়। মামলার শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত এই সাক্ষীকে নিজেদের তাঁবে রাখাও তাদের অপর আর এক বিশেষ কর্ত্তব্যরূপে বর্ত্তিয়ে থাকে। এই জন্য সাক্ষীদের মধ্যে কোনও বিসদৃশ ব্যবহার পরিলক্ষ্য করা মাত্র আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে উহাদের এইরূপ ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই জন্য এই সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা মলিনাসুন্দরীর নিকট হতে আমরা অবগত হতে থাকি। নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নোত্তর হতে বক্তব্য বিষয়টি বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

প্রঃ—আচ্ছা! তুমি তো কিছুকাল খোকাবাবুর রক্ষিতারূপে বাস করেছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি খোকার সঙ্গে অন্যত্র যেতে রাজী হলে না কেন? খুব বেঁচে গেছ কিন্তু তুমি। হয়তো তোমাকেই এইদিন সে খুন করে বসতো।

উঃ—আজ্ঞে, যেভাবে আমরা জীবনযাপন করি তাতে যে কোনও দিন আমরা খুন হয়ে যেতে পারি। বাড়ীতে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে অনেক কম। এইজন্য সাধারণতঃ এমনি চেনা লোকের সঙ্গেও তাদের কথামত অন্যত্র কোথাও আমরা যাই না। এক্ষণে এই হত্যা-কাণ্ডের পর ঐ ভয়ঙ্কর লোকটার সঙ্গে অন্যত্র কোথাও যাওয়া আমি নিরাপদ মনে করিনি। এ'ছাড়া নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে

অন্য একজনের তেপাজতে আমি যাবোই বা কেন? আমাদের এই জঘন্য জীবনের একমাত্র সুবিধা হচ্ছে এই স্বাধীনতা। স্বেচ্ছায় এই স্বাধীনতা হারাতে আমরা সাধারণতঃ রাজী হইনা। অন্যান্য কারণের মধ্যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার এইটিই ছিল অন্যতম কারণ। খোকাবাবু এই বিশেষ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে আমাকে জোর করে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রঃ—হাঁ। আমরাও এই বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু একটি কথা আজ আমাদের কাছে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। আপনি উপরোক্ত কারণ ছাড়া খোকাবাবুকে প্রত্যাখ্যানের অন্যান্য কারণের কথাও বলেছেন। আমরা কি ধরে নিতে পারি যে এই অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল খোকাবাবুর প্রতি আপনার সাম্প্রতিক ক্রোধ? খোকাবাবু পাগলাকে অকারণে হত্যা করার জন্য তার উপর আপনার এক দারুণ বিতৃষ্ণা এসেছিল। আসলে আপনি পাগলাবাবুকেও খোকাবাবুর মতই প্রীতির চক্ষে দেখতেন।

উঃ—কেন আপনারা এই সব অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে মিছামিছি কষ্ট দিচ্ছেন। খোকাবাবু আমাকে প্রচুর অর্থ প্রতি মাসে দিয়ে এসেছেন। তাঁর মত দুর্দান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অন্যত্র গেলে আমাকে তাঁর একান্তরূপে তাঁবে থাকতে হতো। আমার প্রাপ্য অর্থের কথা তুললে হয়তো তিনি আমাকে একাকী পেয়ে অকথ্য নির্যাতন করতেন। খুনে ডাকাত প্রভৃতিদের ভালবাসার কোন স্থিরতা আছে ব'লে আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। কিন্তু পাগলাবাবুর কাছে আমি কোনও দিনই একটি কপর্দকও নিই নি। বরং সে আমাকে গানবাজনা শেখাতো ব'লে প্রথম প্রথম আমিই তাকে বহু অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দিয়ে এসেছি। তবে ইদানীং রাত্রে সে অতিরিক্ত মদ্যপান সুরু করেছিল। এই দুর্বিপাক হতে তাকে রক্ষা করার জন্যই আমি কিছুদিন তাকে অধিক অর্থপ্রদানে বিরত ছিলাম। তবে ভালবাসা শব্দটি আমাদের কাছে আপনারা আর দয়া করে তুলবেন না। আমরা মানুষকে খুশি করতে শিখেছি, কিন্তু তাদের আমরা ভালবাসতে শিখিনি। তবে—থাক সে সব কথা।—আজ্ঞে হাঁ। একথা সত্য পাগলাবাবু নিহত হওয়ায় আমরা সকলেই খুব ব্যথা পেয়েছি, বাবু। প্রকৃতপক্ষে এখনও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে তার মত নিরীহ মানুষকে নিহত করতে পারে এমন নিষ্ঠুর মানুষও পৃথিবীতে বিচরণ করছিল।

প্রঃ—আচ্ছা, এইবার বলো এই কেষ্টবাবু এবং সুবলবাবু লোক দুইটি কারা? খোকাবাবু যে একটা খুনের দলের সর্দার এখন তুমি তা তো ভাল করেই বুঝেছ। এইবার তা'হলে তুমি মনে করে করে বল, তার দলে আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি তোমার ধারণা মত সংযুক্ত ছিল?

উঃ—আজ্ঞে, আমি এই কেষ্টবাবু, সুবলবাবু, কালীবাবু এবং গোপীবাবু নামে কয়টি লোককে খোকাবাবুর বন্ধুরূপে চিনি। এরা সকলে মধ্যে মধ্যে খোকাবাবুর সঙ্গে আমার ঘরে এসে আমার গান শুনে গিয়েছে। কিন্তু এরা আমার সঙ্গে কোনও প্রকার বেল্লিকী ব্যবহার করতে কোনও দিনই সাহসী হয় নি। তবে আমি এ-ও লক্ষ্য করেছি যে, এরা খোকাবাবুকে সব সময়েই ভয় ও সেই সঙ্গে ভক্তি করে চলত এবং এদের উপর খোকাবাবুর প্রতাপ ও সেই সঙ্গে বিশ্বাসও ছিল অসীম।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তর হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই প্রধান সাক্ষিনী মলিনাসুন্দরীর সহিত খোকাবাবুর আর সাক্ষাৎকার না ঘটলে তাকে বিচারের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের তাঁবে রাখা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। তবে মলিনাসুন্দরীর হাবভাব হতে আমরা এ'কথাও বুঝেছিলাম যে তাকে রক্ষা করার অজুহাতে তাকে নজরবন্দিনী করে রাখারও প্রয়োজন আছে। মধ্যে মধ্যে তাকে পাগলাবাবুর নিহত হওয়ার করুণ কাহিনী শুনিয়ে তাকে খোকাবাবুর প্রতি বিরূপ করে রাখা আমাদের উচিত হবে।

পরের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ প্রত্যূষে ছয়টার সময় আমরা সকলেই যথারীতি অফিসঘরে নেমে এলাম। গত দিবস অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্যে রত থাকায় আমাদের কাহারও ভালো করে ঘুম হয় নি। এতদিনে আমরা ভালরূপেই বুঝতে পেরেছি যে এই খুনের কিনারা করতে হলে আমাদের মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যেতে হবে। এমন কি, আমাদের মধ্যে যে কেহ যে কোনও মুহূর্ত্তে নিহতও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জার্ম্মাণ আর্ম্মি এবং বৃটিশ নেভীর ন্যায় কলিকাতা পুলিশেরও একটা ঐতিহ্য ছিল। এই বিশেষ ঐতিহ্য গুরুপরম্পরায় আমরা অর্জ্জন করেছিলাম। এতদিনের এত বড় ঐতিহ্য আমাদের পক্ষে হেলায় হারিয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। আমরা যে কোনও দুর্বিপাক মাথা পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এখন আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো পরবর্ত্তী তদন্ত এখন কোন দিকে পরিচালিত করা উচিত হবে, তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি যে, এই হত্যাকাণ্ডটি খোকাবাবু এবং তার দলের লোকদের দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই খোকা-বাবুটির প্রকৃত পরিচয় কি? তিনি কে এবং থাকেনই বা তিনি কোথায়? অভিজ্ঞ ইনস্পেক্টার সুনীলবাবু মত প্রকাশ করলেন যে এখনো পর্য্যন্ত এইরূপ এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি কোনও না কোনও সূত্রে কলিকাতা পুলিশের নজরে আসেনি তা কখনও হতে পারে না। আমাদের পরামর্শসভায় তিনি দৃঢ় চিত্তে ঘোষণা করলেন যে নিশ্চয় লোকটা কলিকাতা পুলিশের নিকট অন্য কোনও নামে পরিচিত আছে।

এই সময় সহসা আমার স্মৃতিপথে উদয় হলো প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বেকার একটি ঘটনা। এই ঘটনাটি "শিউচরণ হত্যাকাণ্ড" নামে ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এই শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়া ছিল একজন পুরাতন পাপী। তবে শেষের দিকে আর চৌর্য্যবৃত্তিতে লিপ্ত না থেকে সে চোরদের ধরাতে এবং চোরাই মাল উদ্ধার করতে আমাকে প্রায়ই সাহায্য করত। এজন্য আমি তাকে প্রতিটি মামলা বাবদ প্রচুর অর্থও প্রদান করেছি। একদিন সে আমাকে জানাল যে, খাঁদা নামক একজন জিলাখারিজ গুণ্ডা গুণ্ডা-আইন অমান্য করে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। এই খাঁদাগুণ্ডার নাম পূর্ব্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে দেওয়াদত তেয়ারী নামক জনৈক জমাদার তাকে ধরতে গেলে সে তাকে ছুরী মেরে পলাবার চেষ্টা করে। এই মামলাটি আমিই তদন্ত করেছিলাম। আমার রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশের ঐ জমাদারটি বীরত্বের জন্য ভারতীয় পুলিশ পদকও প্রাপ্ত হয়েছিল। আমার অনুরোধে আমার ঐ ইনফরমার শিউচরণ কৃপানাথ লেনের একটি বাড়ী দূর হতে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় খাঁদাগুণ্ডা তার বাড়ী থেকে বার হয়ে আমাদের উভয়কে সেখানে একত্রে দেখে ফেললে। আমি তৎক্ষণাৎ পথের উপর দিয়ে দৌড়ে তাকে ধরতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু খাঁদাগুণ্ডার সঙ্গে একটি সাইকেল থাকায় সে তাতে চড়ে সহজেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পেরেছিল। [ক্রমশঃ।

সাঁঝের বেলা —কমল

॥ আলোকচিত্র ॥

জুবিলি পার্ক (টাটা) —অসিতরঞ্জন ঘোষ-দস্তিদার
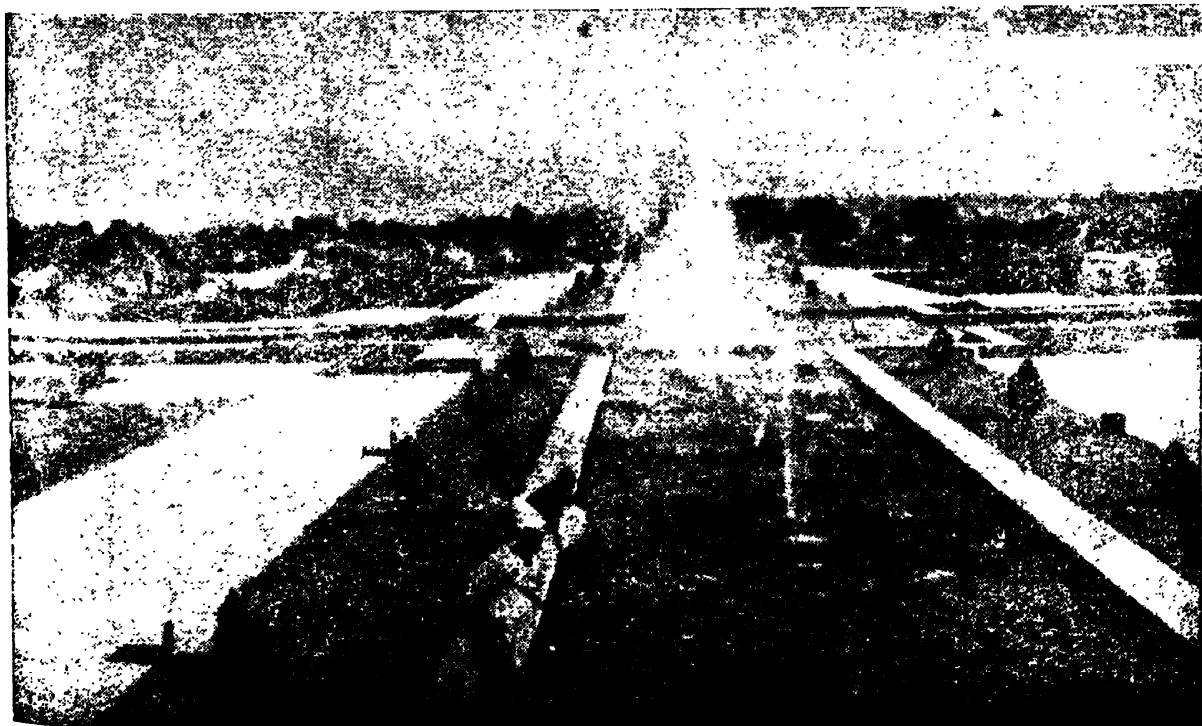
কালীমন্দির (দক্ষিণেশ্বর)
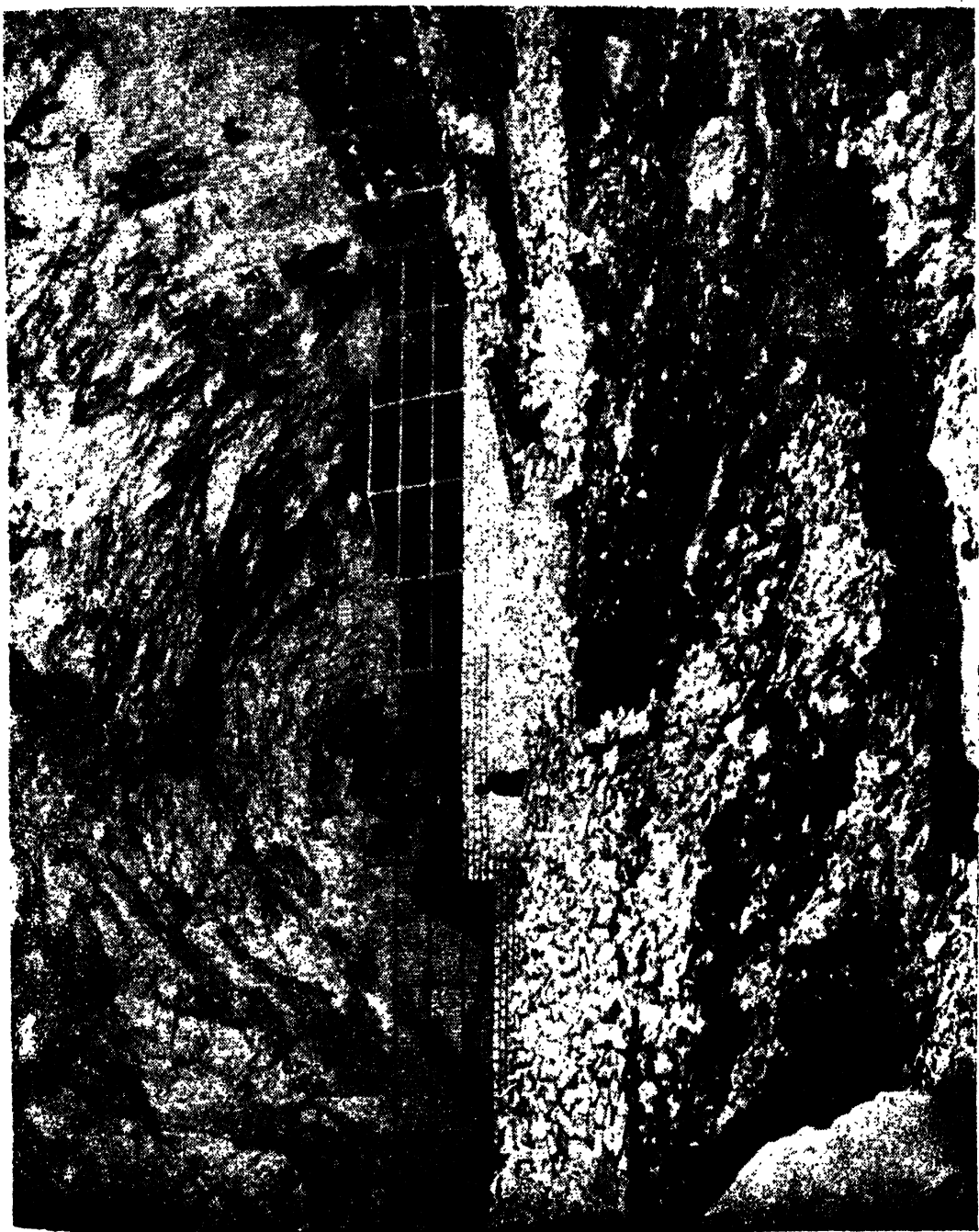
—কেশবরঞ্জন পাল

অমরনাথের গুহা —রবীন্দ্রনাথ দে

মেষপালক

—চিত্তরঞ্জন মণ্ডল
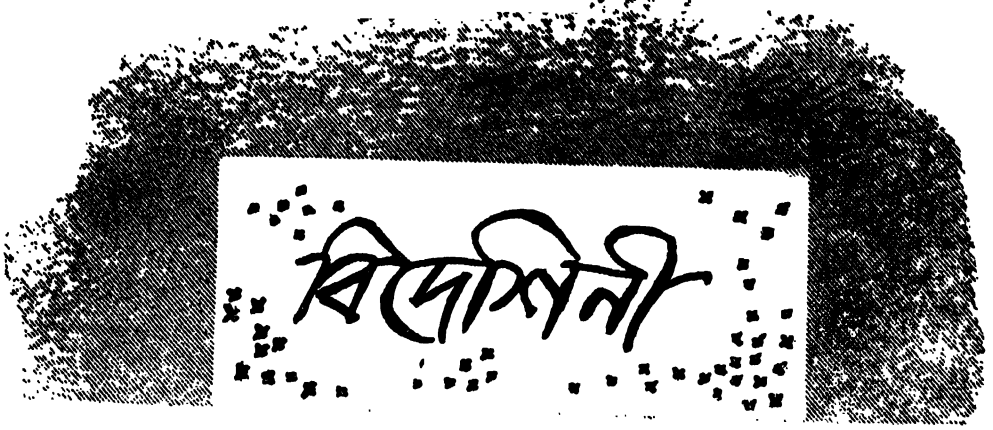
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

তবে এই বারো বছরের মধ্যেই একটা আঘাত পেয়েছিলাম, মনে আছে—এবং সে কথাটাও তোমাকে এইখানেই বলে রাখি। আঘাতটা এল—সুধার মৃত্যু-খবরে।

বাবার মৃত্যু-খবরে মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা ত জানই। তার মধ্যে বেদনা ছিল ঘনীভূত—সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিলাম মনে আছে ত? কিন্তু এবার সুধার মৃত্যু-খবর বেদনাঘন হয়ে আমাকে ঠিক অভিভূত করেনি। সুধাকে হারালাম, আর তাকে কোনও দিনই দেখতে পাব না—এদিক দিয়ে মনটা আমার মোটেই কাতর হয়নি। কিন্তু সুধার মুখখানা মনে করে মনের গহন তল থেকে একটা যেন জ্বালা থেকে থেকে সমস্ত মনটাকে বিঁধিয়ে দিচ্ছিল—বেচারী! বিনা অপরাধে, আমারই জন্য প্রাণটা দিল। অনুশোচনা? কি জানি, জোর করে ঠিক তাও বলতে পারি না, নিজের কাছে ত নিজেকে কোনও দিনই অপরাধী মনে করিনি।

কিন্তু ক্রমে দেখলাম—ঘনীভূত বেদনা চোখের জলে মেঘের মতন সময়ে নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু এই জ্বালাটা ঠিক একেবারে মুছে যায় না। তীব্রতা অবশ্য কমে গিয়েছিল—সময়ে কমে যায়। কিন্তু তবুও অকারণে হঠাৎ কখনও সমস্ত মনটা টনটন করে উঠত। বুঝিয়ে দিত—অন্তরতম অন্তরে বিষের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হয়নি, কোনও দিনই বোধ হয় হবে না।

মার্লিনকে যখন খবরটি দিলাম—তখন আমরা ম্যানচেষ্টারে। মার্লিন কথাটা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেল—এদিক দিয়ে তার মনের কথা আমি আজও জানি না। ফলে, শুধু এইটুকু বলে রাখি, প্রায় ১৫।২০ দিন আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যেন খুব কমে গেল, প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া দু-জনে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাবার্তা বলিনি। বুলা! ভুল বুঝো না, এ সময় কোনও বিরোধের সৃষ্টি হয়নি আমাদের মধ্যে।

আমি বোধ হয় সে সময়টা চুপচাপ থাকতেই চেয়েছিলাম এবং মার্লিনও যেন তা সহজেই মেনে নিয়েছিল। এগিয়ে এসে কথায় বার্তায় বা ব্যবহারে কোনও সহানুভূতিও আমাকে দেখায়নি কিংবা কোনও দিক দিয়ে কোনও বিক্ষোভেরও সৃষ্টি করেনি কোনও দিন।

ফলে, ক্রমে যখন সময়ের সঙ্গে মার্লিন এবং আমার পরস্পরের প্রতি ব্যবহার আবার সহজ হয়ে গেল, সুধার বিষয় কিন্তু কোনও কথা আভাসে-ইঙ্গিতে পর্য্যন্ত কোনও দিন হয়নি আমাদের মধ্যে—দু-জনেই যেন এড়িয়ে চলেছি।

তবে, এই সময় প্রায় বছর খানেকের জন্য আমার মনে ক্রমে একটা প্রবৃত্তি জেগে উঠল—সেটা একান্ত আমারই মনের নিভৃত গোপন কথা আর কেউ জানে না। মাঝে মাঝে মনে মনে আমি সুধার সঙ্গে মার্লিনের তুলনা করতাম। মার্লিনের সংসারকর্ম্মের সুনিপুণতার দিক দিয়ে সুধাকে যাচাই করে দেখতাম—সুধার কি এতটা দক্ষতা ছিল? বলতে লজ্জা করব না—মার্লিনের প্রেম নিবেদনের নব নব রূপের মধ্যে মাঝে মাঝে সুধাকে যাচাই করে দেখেছি, এত মধু কি ছিল তার প্রাণে? আমার সেবাযত্নের দিক দিয়েও সুধার কথা ভেবে দেখেছি—মার্লিনের মতন এমন করে কি সে প্রাণখানা বিছিয়ে দিতে পেরেছিল আমার চলার পথে? বুলা! ভয় পেও না। এই তুলনায় সুধাকে আমি কখনও পরাজিত হতে দিই নাই আমার মনে—নানা যুক্তি দিয়ে তার গৌরব মনে মনে বজায় রেখেই চলেছি। রূপের দিক দিয়ে অবশ্য কোনও দিনই মার্লিনের সঙ্গে সুধার তুলনা করিনি, কেননা সেদিক দিয়ে সুধার নিশ্চিত পরাজয়ের কথা ত আমার অজানা ছিল না এবং সেদিক দিয়ে সুধাকে অপমান করতে আমার মন একেবারেই চায়নি।

* * * *

আমার মনের আর একটা দিকের কথাও তোমাকে এইখানেই বলে রাখি মনে রেখ। দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশের সঙ্গে প্রায় সমস্ত সম্পর্কই ক্রমে দিয়েছি চুকিয়ে, তবুও সেই দেশের দিক দিয়ে মাঝে মাঝে এক একটা প্রবৃত্তি কেন যে আমার মনে কিছুদিনের জন্য প্রবল হয়ে উঠত—আমি জানি না। ইরাজীতে যাকে বলে Complex, সেই রকম এক একটা Complex যেন আমাকে পেয়ে বসত কিছুদিন।

বুলা! মনে আছে ত, বাবার মৃত্যুর পরে, দেশে আমাদের ক[illegible] বড় বংশগৌরব, আমাদের বংশগৌরব এ দেশের লর্ডবংশে[illegible]

সমতুল—এ ধরণের কথা প্রায়ই কিছুদিন জাহির করেছি মার্লিনদের কাছে, এতটুকুও দ্বিধা করিনি। শুধু তাই নয়,—পিতামহ সুশান্ত সা'র, ভাইকে খুন করার অপরাধে জেল হয়েছিল, একথা ত তখন আমার অজানা ছিল না। সে কথাটি সকলের কাছ থেকে চেপে রেখে, আমাদের বংশগৌরবে কোনও দিন কোনও কলঙ্ক পর্য্যন্ত স্পর্শ করেনি—মার্লিনদের কাছে একথা জাহির করতেও এতটুকু লজ্জা বোধ করিনি। এ সব খবর আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতে কতক কতক তোমাকে জানিয়েছি। এ প্রবৃত্তি অবশ্য ক্রমে গেল কেটে, তবে সুশান্ত সা'র জেল হওয়ার খবরটি গোপনই রেখেছি—মার্লিনকেও কিছু বলিনি।

আজ ভাবি—কেন বলিনি? মার্লিন ত এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তার সঙ্গে মনের সমস্ত অনুভূতির নিবিড় আদান-প্রদানে এই বারোটা বছরের মধ্যে কোনও দিন কোন বিরোধের ত সৃষ্টি হয়ইনি বরং একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি পেয়েছি। নিজের সমস্ত প্রাণখানা বিছিয়ে আমার প্রাণ-মন তার উপর তুলে নিয়ে তাকে লালন করার একটা অদ্ভূত যাদু যেন সে জানত—সহজেই আমার মন একটা নিশ্চিন্ত বিশ্রামে ঘুমিয়ে পড়ত সেখানে, অনায়াসেই কেটে যেত বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্লান্তি। তবুও বলিনি। কেন? লজ্জা পেতাম কি? অত বড় বংশের ছেলে রোলাণ্ডকে আমারই জন্য বিবাহ না করে সে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বিবাহ করেছিল—তাই কি আমার বংশের কলঙ্কের কথাটা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম? জানি না। হায় রে! তখনও আমি মার্লিনকে কি ঠিক চিনিনি? বোধ হয় তাই। আজ এই কথাটা নিয়ে প্রায়ই ভাবি, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পাই না। বহু পূর্ব্বে ছাত্রজীবনে চন্দ্রনাথের কথাটা মনে পড়ে। সত্যিই কি তেলে-জলে মিশ খায় না?

অনেক পরে তোমার পাঠান পূজনীয় সুশান্ত সা'র আত্মজীবনী হাতে এল। কিন্তু তখন—

* * * *

যাই হোক, দেখতে দেখতে বারোটা বছর জীবনের কেটে গেল। এইবার আমি যেন একটু ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম—মনের দিক দিয়ে একেবারেই নয়, শরীরের দিক দিয়ে। সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে যেন আর ইচ্ছে করে না, বিকালে সান্ধ্যারীতে যেতে যেন আর ভাল লাগে না, আগুনের কাছে কৌচে শুয়ে পড়েই সময়টা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে—এই ধরণের একটা ভাব। এই যে আমি গলফ খেলতে ভালবাসি, প্রত্যেক রবিবার দিনটা একটু পরিষ্কার থাকলেই সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে মার্লিনকে নিয়ে চলে যাই ক্লাবে এবং সমস্ত দিন সেইখানেই কাটিয়ে, সেইখানেই লাঞ্চ খেয়ে, খেলে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে আসি, এবং শুধু তাই নয়, শীতকাল কেটে গেলে বুধবারেও বিকালের দিকে মাঝে মাঝে যাই সেখানে, ক্লাবে যাওয়ার এত ঝোঁক আমার—ইদানীং তাও যেন আর ইচ্ছে করে না। গলফে পুরো আঠারো হোল্ অনায়াসে খেলি আমি কিন্তু ইদানীং নয় হোল খেলতে না খেলতেই একটু যেন ক্লান্ত বোধ করি। ডাক্তারীর দিক দিয়ে শরীরটাকে আমি পরীক্ষা করেও দেখেছি—কিন্তু কোনও দোষ কোথাও পাইনি।

আমার শরীরের এই দিকটা মার্লিনকে অবশ্য কিছুই জানাইনি। কেননা—ভেবেছিলাম—যদি বলি মার্লিন অযথা ভেবে মরবে। যখন এই রকমটা হল তখন শীতকাল। এদেশের শীতকাল যে কি তাও তুমি জান—আগেই বলেছি। গাছে গাছে পাতা থাকে না, সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, একটা শন্‌শনে হাওয়া ও প্রায়ই ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে সমস্ত দেশটা যেন খালি শিউরে শিউরে উঠছে। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া লোকজন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেই না—কোনওরকমে ছুটে পালিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে সার্সি এঁটে বাইরেটাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আগুনের কাছে এগিয়ে গিয়ে যেন বাঁচে। তাই ভেবেছিলাম—শীতকালটা কেটে গেলে, আমার এ ভাবটাও যাবে কেটে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, মার্লিনের চোখ এড়ায়নি। তখন ফেব্রুয়ারী মাস—বাইরের বরফ পড়াটা কিছুদিন বন্ধ হয়েছে কিন্তু শীতের প্রকোপটা চলেছে খুব। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব্ব শেষ করে বসবার ঘরে আগুনের কাছে বসেছি—আমি বসেছি কৌচে এবং মার্লিন মেঝের কার্পেটের উপর পা ছড়িয়ে বসেছে, আমারই পাশ ঘেঁষে, আমারই কৌচে হেলান দিয়ে, মাঝে মাঝে একটা লোহা দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটাকে দিচ্ছে একটু জোর করে।

সহসা মার্লিন বলল, বিকো, অনেক দিন ত ছুটি নাওনি—কাজই করছ। এইবার কিছুদিনের ছুটি নাও না। চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

বললাম, সে ত এখন সুবিধা হবেনা—শীতকালে আর কোথায় যাব?

বলল, শীতকালটা ত আর মাস দুই পরেই কেটে যাবে—তারপরে। তখন ছুটি নিতে হলে ত তোমাকে এখন থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কথাটা মনে লাগল। সত্যি—শীতকালটা কেটে গেলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে হয়। কিছু টাকার লোকসান হবে—তা হলই বা, যথেষ্ট ত রোজগার করছি।

বললাম, তা মন্দ বলনি।

বলল, হ্যাঁ তাই কর, এখন থেকেই সব ব্যবস্থা কর—এপ্রিলের শেষাশেষিই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

শুধালাম, কোথায় যেতে চাও?

বলল, কোনও একটা ভাল জায়গায় গিয়ে চুপচাপ নিরিবিলি থাকব দুজনে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, চল, না হয় ইংল্যাণ্ড ছেড়ে, দক্ষিণ ফ্রান্সে রিভিয়ারায় কোথাও থেকে আসি—নীস কি মন্টিকার্লো। শুনেছি খুব স্বাস্থ্যকর সে সব জায়গা।

বললাম, ও বাবা! সে ত অনেক টাকার ব্যাপার।

বলল, তা হলই বা। টাকা ত অনেক রোজগার করছ—আমাদের কি দরকার এত টাকার। শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবেত।

একটা হাই তুলে বললাম, তা যা বলেছ—শরীরটা ইদানীং একটু ক্লান্ত বোধ করি।

বলল, তা আমি জানি বিকো!

শুধালাম, কি জান?

বলল, তোমার ক্লান্তির খবর।

শুধালাম, কি করে জানলে? আমি ত তোমাকে কিছু বলিনি।

মৃদু হেসে বলল, আমার কি চোখ নেই—তোমার মুখে যে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে।

* * * *

শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া ঠিক হল—দক্ষিণ ফ্রান্সে নয়, ইংল্যাণ্ডেরই কর্ণওয়ালে সমুদ্রতীরে—'লু'তে। বুলা! 'লু'র কথা আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতে বিস্তারিত করে লিখেছিলাম, মনে আছে ত? অসুখের পরে মার্লিন সুস্থ হলে হাওয়া বদলাতে 'লু'তে গিয়েছিল—ছিল তার মাসীর হোটেলে, রোজ এণ্ড ক্রাউনে। আমিও গিয়েছিলাম, তবে ছিলাম ভিন্ন হোটেলে—তখন ত আমাদের বিবাহ হয়নি। এবার ঠিক হল—আমারই মোটর গাড়ীতে দুজনে বেরিয়ে পড়ব এবং ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি গ্লষ্টার, ডেভন্ কর্ণওয়ালের মধ্য দিয়ে ঘুরে লু'তে গিয়ে বিশ্রাম করব দুজনে। সেই হেডল্যাণ্ড হোটেল, যেখানে সেবার আমি ছিলাম—সেখানে চিঠিও লিখে দিলাম—দোতলায় সমুদ্রের দিকে আমাদের জন্য একটি ঘর রাখতে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মার্লিন বলেছিল সে বেশ হবে—যে ঘরটায় তুমি ছিলে, সেই ঘরটা যদি পাওয়া যায়। ঘরে বসেই দিনরাত সমুদ্র দেখতে পাব জানালা দিয়ে।

বললাম, সে ঘরটা হয়ত ঠিক পাওয়া যাবে না। তবে সেইরকম ঘরই পাশাপাশি আরও আছে।

একটু আবদারের সুরে বলল না—সেই ঘরটা।

হেসে শুধালাম, বিশেষ করে সেই ঘরটা কেন বলত?

মৃদু হেসে বলল, সেবার ত সে ঘরে তুমি আমাকে ঠাঁই দাওনি—

বললাম বা রে—সে বুঝি আমার অপরাধ? আমি ত প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিলাম—

আমার গলা জড়িয়ে দুটি আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট দুটি চেপে বলল, চুপ! চুপ! ওকথা বলে না।

তিন

এপ্রিল মাস শেষ হয়ে গেছে—মে মাসের সুরু। সেল ছেড়ে আমাদের বেরিয়ে পড়বার সবই ঠিকঠাক—আর মাত্র সাত-আট দিন বাকী। মার্লিন ক'দিন ধরে খুব গুছিয়েছে—তার গোছান যেন শেষ হয় না, রোজই কিছু না কিছু করে। আমার গাড়ীখানি ভালই—ডজ্ হল—বছরখানেক আগেই কেনা, আমি নিজেই চালাই। এদেশে গাড়ীর ড্রাইভার খুব কম লোকেই রাখতে পারে—অসম্ভব খরচের ব্যাপার—আমাদের মতন ভাল প্র্যাকটিসওয়ালা ডাক্তারদেরও সাধ্যের বাইরে। তাই আমিই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাব—এই রকমই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এদিক দিয়ে মার্লিনের মনে একটু দ্বিধা ছিল।

একদিন বলল, দেখ তুমি গাড়ী চালিয়ে এতটা ঘুরবে—আমার মন এতে ঠিক সায় দিচ্ছে না।

শুধালাম, কেন?

তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে—তোমার শরীরের দিক দিয়ে সেটা ঠিক ভাল হবে না।

বললাম, গাড়ী চালাতে আমার কোনও ক্লান্তি হয় না—জানই ত। আর তাছাড়া, বেশীদূর এক সঙ্গে চালাতেও ত হবে না। মাঝে মাঝে প্রায়ই ত নানা হোটেলে বিশ্রাম করব—এদেশের ম্যাপ দেখে সেই ভাবেই ত সব ঠিক করা হয়েছে।

মার্লিন বলল, তা ত জানি—কিন্তু তবুও—

বললাম, আর তাছাড়া শেষ পর্য্যন্ত 'লু'তে গিয়ে লম্বা বিশ্রাম ত নেবই—এক মাস চুপচাপ থাকব সেই হোটেলে।

মার্লিন শুধাল, ট্রেণে 'লু'তে যাওয়া যায় না?

বললাম, তাহলে ত ডেভন কর্ণওয়ালের কিছুই দেখা হবে না। আর ট্রেণে এতদূর যাওয়াও ত কম ক্লান্তিকর ব্যাপার নয়! বোধ হয় অনেক অদল-বদল আছে।

মার্লিন চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, বেরুবার আগে গাড়ীটা কিন্তু ভাল করে দেখিয়ে ঠিকঠাক করে নিও।"

বললাম—তা ত বটেই। সে সব ব্যবস্থা আমি করেছি।

* * * *

যাই হোক, সামনের শনিবার লাঞ্চ খেয়ে রওয়ানা হব—আজ রবিবার। সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমি আমার বসবার ঘরে আগুনের ধারে কৌচটির উপর পা ছড়িয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। মার্লিন একবার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আগুন জ্বালিয়ে দেবে কি না। বলেছিলাম—আপাততঃ দরকার হচ্ছে না।

নিজের মনে খবরের কাগজ পড়ছি—মার্লিন ঘরে ছিল না, বোধ হয় রান্না-ভাঁড়ার নিয়ে ছিল ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে মার্লিন হঠাৎ ঘরে ঢুকল—কোলে তার বছর তিনেকের একটি পুতুলের মতন মেয়ে—নাম পিপা। মার্লিনের কোলে পিপাকে দেখে একটু অবাক হলাম—কারণটুকু বলি। পিপাটি আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে। আমাদের বাড়ীর পূবের দিকে আমাদের সীমানা সংলগ্ন বাগানওয়ালা আর একটি বাড়ীতে পিপা থাকে, তার বাপ-মার সঙ্গে। পিপার বাপ মিঃ হোমস্ কি করেন আমি জানি না এবং আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে টুপী তোলা ব্যতীত আর কোনও পরিচয় নাই। তবে শুনেছি, পিপার মা'র সঙ্গে মার্লিনের পরিচয় হয় পরস্পরের বাগানে বেড়ার দুপাশে দাঁড়িয়ে এবং এই ভাবে মাঝে মাঝে আলাপ হত দুজনার। ক্রমে মার্লিন পিপার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মিসেস হোমসের আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে যেতে সুরু করল পিপাদের বাড়ীতে। মিসেস হোমসও মাঝে মাঝে পিপাকে নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়ীতে কিন্তু আমার সঙ্গে কখনও তাঁর দেখা হয়নি। তবে মার্লিনের কাছে শুনেছি, মহিলাটি নাকি খুব ভাল। পিপাকে আমি অবশ্য এর আগে দু-চার বার দেখেছি—মার্লিনই কোলে করে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। পিপাকে আদর করে চুমো খেয়ে বলছে এক টুকরো মিষ্টি—না বিকো?

প্রায় বারো বছর হল আমাদের বিবাহ হয়েছে—কিন্তু আমাদের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। সেদিক দিয়ে আমার মনে যে কোনও দুঃখ ছিল এমন কথা বলতে পারি না। কেন না, সেদিক দিয়ে কোনও অভাব বোধ আমি কোনও দিনই করিনি এবং সেদিক দিয়ে মার্লিনের মনে যে কোনও দুঃখ থাকতে পারে—তাও কখনও ভেবে দেখিনি বা খেয়ালও হয়নি। দুজনে যেন দুজনকে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছিলাম।

কিন্তু ক্রমে মার্লিনের পিপার প্রতি এই আকর্ষণে হঠাৎ একদিন কথাটায় খেয়াল হল—আমার মনের অবস্থা যাই হোক, মার্লিনের মন

নিশ্চয়ই ঐদিক দিয়ে একটা দুঃখ আছে। কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন ভাবলাম—দুঃখ ত হওয়ারই কথা, সব মেয়েই ত 'মা' হতে চায়, এ যে তাদের অন্তরতম অন্তরের একান্ত নিভৃত কামনা। অনেকদিন ত হয়ে গেল—হলই বা না কেন ?

সেই দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে মার্লিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—লীনা! পিপার মতন তোমার একটি মেয়ে হলে কি সুন্দর হত বলত ?

মার্লিন যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিল সেটুকু বুঝতে আমার দেরী হয়নি। একটু চাপা হাসি হেসে বলল, নাই বা হল। আমাদের কিসের অভাব।

কিন্তু ফলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম ; যেদিন রাত্রে মার্লিনের সঙ্গে এই কথা হল, তারপর থেকে মার্লিন আর পিপাকে কোলে করে আমার সামনে আসত না। আড়ালে পিপাকে আদর করে, আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার সামনে—সেদিন রাত্রের কথার পরে একটা লজ্জা এসেছিল কি তার মনে ? হয়ত তাই।

তাই বোধ হয় আজ অনেক দিন পরে হঠাৎ পিপাকে কোলে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে একটু অবাক হয়েছিলাম।

মার্লিন হেসে বলল, দুষ্ট টা কি বলে জান ?

শুধালাম, কি ?

বলল, বলে—uncle যাবে যাক কিন্তু তুমি যেও না।

হেসে পিপার দিকে চেয়ে বললাম, হ্যাঁ পিপা—তুমি আমাকে ভালবাস না ?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মার্লিনের গলা জড়িয়ে আদরমাখান সুরে বলল, না আন্টি যাবে না।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটি ছিল ঘরের বাইরে সিঁড়ির পাশে। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম, শুধালাম কে ?

উত্তর এল, আমি লালকাকা।

বললাম, আরে, মিঃ লালকাকা! কি খবর আপনার ? অনেক দিন দেখা হয় নি—ক্লাবে আর আসেন না কেন ?

'সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, শুনলাম আপনারা ডেভন, কর্ণওয়াল বেড়াতে যাচ্ছেন শীগ্‌গিরই। তার পূর্ব্বে আপনাদের সঙ্গে একটু কথা ছিল। কখন গেলে আপনার সুবিধা হয় ?

বললাম, আজই আসুন না। আজ সকালটা ত বাড়ীতেই আছি।

একটু ইতস্তত করে বলল, আজ—আজ একটু অসুবিধা হচ্ছে। কাল ডিনারের পরে রাত্রে যদি যাই ?

একটু ভেবে নিলাম। কাল ডিনারের পরেও কোথাও যাওয়ার কথা নাই।

বললাম, বেশ তাই আসবেন—আমি বাড়ীতেই থাকব আপনার জন্য।

'অনেক ধন্যবাদ' বলে টেলিফোন কেটে দিল। [ক্রমশঃ।

জলছবি

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

হাওয়ার হরিণ ঘুরছে ফিরছে ঘুরছে,
জ্যোৎস্নার জরি নক্সা আঁকছে আকাশে
সময়ের সুর থেকে থেকে পাতা মুড়ছে!

খুশির হাওয়ারা কী কথা বলছে কানে
মনের ময়ূর বল না কী জানে কী জানে—
আয়নার মতো সাগরের মনে মনে
স্রোতের সোহাগে কি পারদ এনে পুরছে!

(প্রেমিক হৃদয় তার, মৌমাছি উড়ছে ও উড়ছে ;
দু'চোখে নীরব ভাষা, কালো চুলে হাওয়ার চিরুণী
ধ্যানব্রত ভবিষ্যৎ মৌননীল বার্তা সঙ্গোপনে—
অরণ্যে রেখেছে ঢেকে, সবুজের মন্ত্রে পদধ্বনি !)

তবুও হাওয়ার হরিণ ঘুরছে ফিরছে ;
নীলমাতানো সুরে আমাকেই ফিরছে,
কথার পাপড়ি জলতরঙ্গ ছিঁড়ছে !
জ্যোৎস্নার জরি নক্সা গাঁথছে আকাশে,
হৃদয়ে জোনাকি যুঁই হয়ে ফোটে—
ঝি বা সেবু আসে, সে আসে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১০

ব্রাইটকে যারা চেনে তারা তার মুখে হাসি দেখলে শঙ্কিত হয়। জলসার রাতে ব্রাইটের মেজাজ বড় শরীফ বোধ হয়েছিলো। দেখে গ্যেটস্কেল ও টড বলাবলি করেছিলো—নিশ্চয় কোন মৎলব এঁটেছে। কি ব্রাইট, হাসছ কেন ?

—আবার কি ভাবছ ?

সব সময় রাগে না ব্রাইট। সে তার অধিকারের পাল্লা জানে। তার বিবিধ কীর্তির কথা কানপুরে সবাই জানে। সবাই জানে টাকাপয়সার ব্যাপারে ব্রাইট একেবারে উদার। আড়ালে সাহেবরা বলে—ভাগ্যে মরে গিয়েছে ম্যাকমোহনের বোন। বেঁচে থাকলে দরকার পড়লে ব্রাইট-ই তাকে খুন করতো।

আর খুন ব্রাইট অনেক করেছে। যেখানে যেখানেই সে ঘুরেছে, সেখানে অদ্ভুত সব দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে বোকা নয় সে। ভুলেও কখনো শ্বেতাঙ্গ মারেনি। নেটিভ! এ দেশে এত কালোকালো মানুষ কিলবিল করে, আর আইনের নামে তাদের গায়ে এমন জ্বর আসে, যে দুটো-একটা কমে যাওয়াতে কেউ অভিযোগ করেনি। কেউ নালিশও করেনি সাহেবের নামে।

সাহেবরা ব্রাইটের বাপের দিক থেকে ভেজাল রক্তের ব্যাপারটা জানেন। তাঁরা ব্রাইটের আচার-ব্যবহার দেখে তাকে পরিহার করে চলেন। রক্তের যে কৌলীন্য দাবী করে ব্রাইট ভারতীয়দের উপর চাবুক চালায়, সেই কৌলীন্যের দাবীতেই সাহেবরা ব্রাইটকে পরিহার করে চলেন।

ব্রাইট এখন হাসলো। নিমীলিত চোখে বললো—কাল জবরদস্ত মজা হবে। দেখতে এসো। মজা পাবে।

সে রাতে ব্রাইটের স্বভাব-বহির্ভূত হাসিমুখ দেখে ব্রিজদুলারীর চোখ থেকে ঘুম চলে গেল চট করে। উঠে বসল সে। ব্রাইট ছোটবেলা থেকে স্বভাব অনুযায়ী লাইনছুরি-গার্ড আর সহিসদের সঙ্গে মিশেছে বেশী। তাদের পিঠে ছপটি চালিয়ে মজা দেখেছে কাজের সময়। অবশ্যই সে সব ক্রীড়াকৌতুক ম্যাকমোহনের চোখের আড়ালে হতো। তবে ব্রাইট হিন্দী বলতে শিখেছে মাতৃভাষার মতোই। সহিসের বাচ্চার হাত মুচড়ে দিয়ে বলেছে—যাও আপনা পাপাকো পাশ যাও!

রেজিমেন্ট সাহেবদের হিন্দী পরীক্ষা দিতে হয়। ব্রাইটও বাইরে বলে সে পরীক্ষা দিয়েই শিখেছে হিন্দী। বলে, আর অন্যরা চোখ টিপে বলে—ব্রাইট, হিন্দী সবাই শেখে কিন্তু এমন চমৎকার কেউ বলে না।

ব্রাইট সে কথা শুনে মনে বোঝে, এটা হলো তার বাপের প্রতি কটাক্ষপাত। কে না জানে যে, বুড়া ম্যাকমোহনের বোন বিয়ে করেছিলো একটা ফিরিঙ্গীকে ?

বুঝে ব্রাইট সমঝে গিয়েছে। পারতপক্ষে অন্য সাহেবদের সামনে প্রয়োজনেও হিন্দী বলতে চায় না।

ব্রিজদুলারীর কাছে এসে তার মুখ খোলে। ব্রিজদুলারীর সঙ্গে সে কথা বলে সেই হিন্দীতে, যা সহর বা গ্রামের মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। যা শুনে পণ্ডিত ও মুন্সীরা দুঃখ করে বলেন—ভাষাতে জারজ দোষ ঢুকলো। কলঙ্কিত হলো ভাষা।

অর্থাৎ নিরন্তর রেজিমেন্টের সঙ্গে ঘোরে যারা, সামান্য দেড় টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা যাদের মাসিক রোজগার, রুক্ষ ও সুকঠোর যাদের জীবন, সেই সব সহিস, লাইনগার্ড, ভিস্তি, মেথর—তাদের ভাষা থেকে গ্রামের মানুষের সুমিষ্ট সরলতা ঝরে পড়ে সহজেই। গালাগালি ও রুক্ষ হুকুম শোনে তারা, আর ভাষাও হয়ে ওঠে অশালীন, রুক্ষ।

এমনি করেই ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

ব্রাইট তাকে সেই ইতর ভাষাতেই কথা বলে। ব্রিজদুলারীকে রাতে গালাগালি করে বলে—এক একটা দেশী মেয়ে যেন আগুন! তোমার মতো নিরুত্তাপ, ঠাণ্ডা কেউ নয়। যেন মরামানুষ।

এরকম প্রত্যেকটা নিশীথে অবমানিত হয় তার নারীত্ব। মৃত্যু-কামনা করে ব্রিজদুলারী। এই বর্বর মানুষটা কেন যে তাকে ছাড়ে না, তাড়িয়ে দেয় না, তাতেও সে বিস্মিত।

আজ রাতে, এই জলসার রাতে কিন্তু ব্রিজদুলারীকে সে রকম কোন অভিযোগ করলো না ব্রাইট। বরঞ্চ বললো—খুব ভারী একটা সোনার গহনা দেব তোমার কোমরে। খবর দেব লক্ষ্মীচান্দকে।

—কি দরকার ?

—কেন, তুমি পরবে ?

—আমি আর গহনা চাই না।

—সেটা তুমি পরবে।

—কেন, দেখিয়ে দিতে চাই আমি সবাইকে। এত গহনা কার ঘরে আছে ?

ব্রাইট শুয়ে শীষ দেয়, ভাবে, এ ছাড়া তিনশো টাকা আটকে ফেলবার কোন রাস্তা নেই। আর তিনশো টাকা মনে করতেই তার মনে হয় একটা পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের আহেরিয়া ছেলের ভীত মুখ। পিট্-পিট্ করে পড়ছে চোখের পাতা ভয়ে। মনে করতেই এমন

আনন্দ হয় তার, যে দুনিয়াটা ভাল হয়ে যায় তার কাছে। ব্রিজদুলারী বলে—কি হয়েছে? তুমি শীষ দিচ্ছ কেন?

—মন ভাল আছে।

—কেন?

পাশ ফিরে গড়িয়ে ব্রিজদুলারীর নরম শরীরটা একটা শক্ত হাতে চটকে ধ'রে ব্রাইট বলে—এমনি।

অন্ধকার। আর এ-ই হলো ব্রাইটের মজা। যতক্ষণ না যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মুক্তি চাইবে ব্রিজদুলারী, ততক্ষণ সে ছাড়বে না।

ব্রিজদুলারীর নিষ্পেষিত, নিঃশেষ নারীসত্তা দাঁতে ঠোঁট চেপে থাকে। চোখ দিয়ে জল পড়ে। তবু মুখে যন্ত্রণার শব্দ করে সে ব্রাইটকে বিজেতার আনন্দ উপভোগ করতে দেয় না।

সে রাতে গারদে জেগে থাকে একটা পঁচিশ বছরের তরুণ সিপাহী। আর গারদের বাইরে দাঁড়িয়ে যে পাহারা দেয়, সেই সিপাহী-ও জেগে থাকে। গারদের ভেতরে বসে সিপাহীটা থেকে থেকে শুধু জিজ্ঞাসা করে—সকাল হলো?

—নান্নু, ভাই—যা হবে, তা হবে—তুমি ভেব না।

—না, ভাবছি না আমি।

আকাশে আঁধার যেন পাতলা হয়ে আসে। পাহারাদার সিপাহী বলে—একটু চুণ, পাত্তি ডলে দেব? খাবে?

—না

তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে—হাঁ ভাই, এ্যাড্‌জুটান্ট সাহেব এখানে নেই?

না। নান্নু, তুমি ভেব না ভাই!

—না, আমি ভাবছি না।

এই কয়েদী সিপাহীর মাথায় কোন দিন-ও চট করে ঢোকেনা কথা। সহজে বুঝতে পারেনা সে। বড় জটিল তার কাছে প্রক্রিয়াটা। বুঝতে বড় সময় নেয় সে। যখন আকাশ দেখে সে বোঝে যে সকাল হতে আর খুব দেরী নেই, তখন সে উবু হয়ে বসে মাথার দু'দিকে হাত রেখে বুঝতে চেষ্টা করে কি করে কি হলো।

হ্যাঁ। সে নান্নু মুখিয়া, 53rd-এ যে একজন সিপাহী। যাকে কি গ্রামে কি শ্বশুরবাড়ীতে, কি এখানে সকলে জানে মূর্খ বলে, সে দোষ করেছে। সে চুরি করেছে।

তার কারণ হলো সকলে তাকে চিরদিন বলেছে বোকা। অন্য ছেলেদের সঙ্গে সে লালার গরু-ছাগল চরাতে গিয়েছে। অন্য ছেলেরা লালার বাগান ভেঙে আম পেয়ারা নিয়ে বেচে এসেছে জরীপ সাহেবের তাঁবুতে। নিয়ে এসেছে ঢেবুয়া পয়সা। সে ভয় পেয়েছে। মা বোন বলেছে—মূর্খ তুই নান্নু। তুই বোকা।

শ্বশুর এক বিঘে জমি দিয়েছে, আর বৌ বলেছে—বোকা তুমি। তোমাকে পাথুরে জমি দিয়ে ঠকালো আমার বাপ। আরে, নালার ধারে যে জমি, সেটা দেখে বেছে নিলো আমার বোনের বর। সে জমি থেকে সে তিন বার ফসল তুলবে। তোমার এ জমি থেকে কি পাবে? বড় বোকা তুমি। বড় মূর্খ।

হঠাৎ কেন সাহেবদের মনে হলো যে নতুন নতুন সিপাহী সওয়ার দরকার হবে রেজিমেন্টে! কথাবার্তা চলছিলো। আর ঘোড়াও কিনছিলো রেজিমেন্ট। সে ব্রাইটের কুঠি পাহারা দিচ্ছিল, তাতেই না জানতে পারলো? জানতে পারলো, যে বরাবর রেজিমেন্টে ঘোড়া সরবরাহ নিয়ে রেষারেষি ছিলো তোলারাম আর শিরাজি বাইজু-র মধ্যে। তোলারামরা চার পুরুষ ধরে দিল্লী আগ্রায়, এখন কানপুর লক্ষ্নৌ-এ ঘোড়া সরবরাহ করছে। তার মস্ত ব্যবসা। শিরাজি বাইজু কোনদিন সুযোগই পায়নি। জানলো যে এবার কোন অজ্ঞাত কারণে সাহেবদের ঘোড়া দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তোলারাম। আর শিরাজি বাইজু দর দিয়ে পাঠালো।

ব্রাইট আর যা-ই হোক ঘোড়া চেনে। তাই এসব লেনদেনের সময়ে কেমন করে যে সে জড়িয়ে পড়ে কেউ বুঝতেও পারে না। তিনশো টাকায় এক একটা ঘোড়া, এই হিসেবে ত্রিশটা ঘোড়া কেনা হলো। নয় হাজার টাকা পেলো শিরাজির ছেলে। কোম্পানীতে কাঁচা কাজ হয় না—সব হাতে-কলমে।

কিন্তু সেখানেই ব্রাইট টেক্কা দেয় অপরকে, আর সেখানেই তার কৃতিত্ব।

শুধু মুখের কথায় এক একটা ঘোড়া-পিছু বিশ টাকা করে কমিশন চাইলো ব্রাইট। সব কথা ঠিকঠাক। টাকা আনবে নান্নু। তার মতো মূর্খ কে আছে? শিরাজির ছেলে সামাদ নান্নুকে বললো, এই ঘোড়া পৌঁছিয়ে দিবি সাহেবকে।

ব্রাইটের হিন্দুস্থানী বিবি আছে। অনেক দেশীলোক সদাসর্বদা যাওয়া-আসা করে সেখানে। সুরজের হাত দিয়ে একটা ছোট তেজারতি কারবারও খুলে দিয়েছিলো ব্রাইট। সেজন্যেও আসে কেউ-কেউ। টাকা-পয়সার দরকারে।

তেমনি করেই এল নান্নু। আর তোড়া নিয়ে গুণতি তিনশো টাকা দেখে চটে গেল ব্রাইট।

আসলে সামাদ তাকে টেক্কা দিয়েছে। নান্নুকে দিয়েছে পাঁচটা টাকা। আর ব্রাইটকে ডাহা ঠকিয়েছে। সামাদ শিরাজি নয়। শিরাজি পুরনো বিশ্বাসের লোক। সে কথা দিয়ে কথা রাখে। মুখের কথায় আর বিশ্বাসেই টাকাকড়ির লেনদেন চলে। খুব একটা প্রবঞ্চনা হয় না।

কি বুঝলো ব্রাইট কি জানে! নান্নুর ডিউটি বদল হয়েছিলো। নান্নুর মনে হয়েছিলো সে হাতে স্বর্গ পেয়েছে। বুক ফুলিয়ে সে একে-তাকে বলেছিলো—আমি যদি ডাহা মূর্খই হবো, তবে পাঁচটা টাকা কেমন করে কামালাম?

আবার দিব্যি দিয়ে বলেছিলো—কারুকে বলো না এ কথা।

আসলে খুব ফুর্তি হয়েছিলো তার। আর এখন ভারতীয় অফিসাররাও গরম হয়ে আছেন। এমনিতেই জাঁকজমকে সাহেবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলেন তাঁরা। এখন যেন বেশ বেপরোয়া। নান্নুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন—তুই কি মিথ্যে কথা বলছিস? তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারি, তা জানিস? এ রকম আলগা কথা বলিস কেন? আবার শুনছি তুইও পেয়েছিস পঁচিশ টাকা?

হাবিলদার সাহেবের কথা শুনে ভয়ে নান্নু কুঁকড়ে গিয়েছিলো। পুরনো ভয়টা পেয়ে বসেছিলো তাকে। বলেছিল—হুজুর পাঁচ টাকা। পঁচিশ নয়।

তখন সুবেদার চোখে চোখে হেসেছিলেন হাবিলদারের সঙ্গে। গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন—সিপাহী, তুই সত্যি কথা বল।

সব বলেছিলো নান্নু। বলেছিলো—রাইজু সাহেব আমাকে টাকা দেন। আমি সাহেবকে দিই। আমি কিছু জানি না।

তারপর এ নিয়ে আরো কথা হয়েছিলো। ভারতীয় অফিসার থেকে সিপাহী পর্য্যন্ত ইনফ্যাণ্ট্রি ও রিসালার লোকেরা সকলে একটি কথাই ভেবেছিলো, কত দিন, আর কত দিন সহ্য করতে হবে এই অত্যাচার? আর যেন পারা যায় না। মুখ বন্ধ করে কিল খেয়ে কিল চুরি করে আর কত দিন চলবে? এর কি শেষ নেই?

তারপর স্বতঃই এ-কথা ছড়িয়েছিলো। ও-দিকে সামাদ শহরে বসে চৈৎরাম জৈৎরাম ব্যাঙ্কারদের মুন্সীকে শুনিয়ে বলেছিলো—মনিবদের বল ব্যবসা গোটাতে। হিন্দুস্থান ছেড়ে যাচ্ছে সাহেবরা আর সোনা-রুপো সব নিয়ে ফাঁক করে দিয়েছে রিয়াসত। আর বেচারীদের হাল কি! দশ-বিশ টাকা মেঙ্গে নিচ্ছে? আহা হা!

সম্ভবতঃ প্রশ্রয় ছিলো আকাশে-বাতাসে বাজার গরম গুজবে। তাই রেখে-ঢেকে বলেনি সামাদ। বলেছিলো বাজারে আগুন লেগেছে দেখছ না?

সত্যি কথা। রেজিমেণ্টের চাহিদা মেটাতে মেটাতে বাজার ফতুর। ঘি টাকায় আড়াই সের আর আটার দাম টাকায় ত্রিশ সের। বেঁচে কোন্ সুখটা রইলো। এর চেয়ে কাঁচাপয়সা খেলেই তো হয়।

তারপর কথাটা মুখেমুখে ডালপালা মেলে ছড়ালো। ব্রাইটকে খোলাখুলি তলব করে কিছু বললেন না সাহেব। কিন্তু কথাচ্ছলে পরোক্ষে বললেন। বললেন—সময় ভাল নয়। এমন কোন আচরণ করো না, যাতে নেটিভরা দশটা কথা বলবার সুযোগ পায়। কি টাকা-পয়সা, এটাসেটা!

বুঝলো ব্রাইট। বুঝে হাতের মধ্যে যাকে পেলো সেই বোকাসিপাহী নান্নুকে জব্দ করবার মতলব করলো।

হঠাৎ মাঝডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে জুয়া খেলতে গিয়েছিল নান্নু, এই অপরাধে সে অপরাধী হলো।

গারদে বসে ভাবে নান্নু। ভাবে হঠাৎ সাহেবের মুখোমুখী হয়ে ভয়ে তার পা কেমন কেঁপে গিয়েছিল। আবার এ কথার মাঝখানে সেই পাঁচটা টাকার কথাও উঠেছিল। সে কেমন ভয়ে ভয়ে কবুল গিয়েছিল। আগেই তাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন হাবিলদার। পারেননি। সুযোগ মেলেনি। তবে এটুকু বলেছিলেন—সিপাহী তোকে জেরা করলে তুই যা সত্য, সবই বলিস।

কি বলবে স? জেরা তো সেদিক দিয়ে গেল না। জেরাটা গেল শুধু তাকে আর তার পাঁচটা টাকার কাছ ঘেঁষে। সেই বিষয়েই কবুল গেল সে। কবুল না খেয়ে নিস্তার কি? ততক্ষণে আট টাকা মাইনের সিপাহী নান্নুর সেই পাঁচটা রুপোর টাকার ওপর ঘেন্না এসেছে। কে জানতো এত ঝামেলা হবে?

তারপর বিচার। তারপর বিশ ঘা বেত। এক মাসের মাইনে জরিমানা।

রাত পোহালে বিশ ঘা বেত খাবে সে। সেই ভাবনায়ই মরে রয়েছে নান্নু। দেখেছে যে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত পড়ে। দেখেছে যে একজোড়া বেত থাকে চামড়ায় মোড়ানো। শুনেছে তার রেজিমেণ্টে কেউ কবুল যাচ্ছে না বেত মারতে। শুনেছে মারবে হয়তো কোন গোরা, চাই কি অন্য কেউ। শুনেছে এ্যাডজুটেণ্ট সাহেব আপত্তি করেননি। দিনকাল খারাপ। বেশ কড়া হাতে এই সব ছোট ছোট ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তাহ'লে এই নেটিভ সিপাহীগুলো শিক্ষা পাবে।

অবশ্য এমন কথাও বলা হয়েছে যে, এই বেত্রাঘাত দেখলে অসন্তুষ্ট হতে পারে সিপাহীরা।

—তা কখনো হয়? আর কে কবে শুনেছে যে এরা সন্তুষ্ট রইলো?

—তাদের মনে পরোক্ষে বিক্ষোভের ভাব জাগতে পারে।

—এই একটা সামান্য সিপাহীর ব্যাপারে? এ সিপাহী মাত্র। এখনি একটার জায়গায় দশটা রংরুট মিলবে। এ সিপাহী মাত্র। এত নগণ্য এই মানুষ, যে এ সব ঘটনা কোন দিনও খাতার পাতায় উঠবে না।

কয়েদী সিপাহী নান্নুকে পাহারা আর বদল পাহারার সিপাহীরা বলে গিয়েছে—নান্নু! তুই ভাবিস না, সুবেদার সাহেব বন্দোবস্ত করেছেন কি বেত মারবে তোকে শোভারাম।

—শোভারাম?

—হাঁ। আর নরম নরম মারবে।

—তবু তো লাগবে।

—লাগবে। তবে কম। ঐ কোন ফিরিঙ্গী বা অন্য রেজিমেণ্টের মানুষ তো দয়া মায়া করে মারবে না।

—আমি ভয় পাই।

ব্রাইট এই কয়েদী সিপাহীর কথা ভেবেই উৎফুল্ল। সকাল হয়। লাফিয়ে ওঠে সে।

কয়েদে যা'ও বা মনে হচ্ছিল, বাইরে আনতে দেখা যায় নান্নুর চেহারা খুবই ছেলেমানুষের মতো। নির্বোধ মানুষের যেমন চেহারায় বয়সের ছাপ সহজে পড়ে না, এর চেহারাতেও তেমনই নির্বোধ সরলতা। বর্ত্তমানে ভীরু ভাবটা প্রবল। দুর্বল চিবুকটা থরথর করে কাঁপে তার। ছোট জাঙ্গিয়া পরে আরো অসহায় দেখায়। দুঃখ ও ক্রোধে অন্যান্য সিপাহী জমাদাররা থুথু ফেলে মাটিতে।

ব্রাইটকে খুব উৎফুল্ল দেখায়। যে সিপাহী অন্য সময় কুস্তি করে, মাটি মেখে কুস্তি দেখায়, সে-ই নিয়েছে চাবুক। সে নান্নুকে যতই ইসারা করে চোখে চোখে চেয়ে—নান্নু দেখে না। সে শুধু বলে—হা রাম! জো রাম! হা রাম!

ভবানীশঙ্কর ও চন্দনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ভবানীশঙ্কর রয়েছেন ডাক্তার হিসেবে। আর চন্দন তাঁরই সহকারী। ভবানীশঙ্করের মুখ যেন একটু শাদা। চোখ ছোট। যে সব মানুষ নরম স্বভাবের, আর নিষ্ঠুরতা যারা দেখতে পারে না, ভবানী তাদেরই একজন। উত্তেজনা ও বিতৃষ্ণায় দুর্বল বোধ হয় তাঁর।

চন্দনের হাত দুইখানা ঘামতে থাকে। আজব ফৌজী-জীবন, আর আজব তার আইন-কানুন! এই জীবনের জয়গানেই মুখর তার দাদা চন্দন! এ কোন বিবেচনার কথা! যে একটা মানুষকে এমন করে বেঁধে মারবে? বেঁধে রাখেনি লোকটাকে, তবু ঘিরে রেখেছে তো? সেটাই বা কম কি? আর কি, চন্দন ভাল করেই

বোঝে, বাতাসটা ইতিমধ্যেই গরম আর ভারী হয়ে উঠেছে। ভারী হয়েছে সমবেত ভারতীয়দের মানসিক বিক্ষোভের চাপে।

এত ক্ষোভ কেন ? চন্দন ভাল করে মনে জানে। যে অন্যায় করে বা বিনা অপরাধে একজন সিপাহী বেত খাবে কয়েক ঘা, তা নিয়ে সিপাহীরা মোটেই মাথা ঘামাতো না ক-মাস আগেও। কিন্তু এখন তারা বড় বেশী সচেতন হয়েছে। বড় বেশী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, কোথায় কোথায় তাদের অধিকার খর্ব হলো। কোথায় কোথায় তাদের ছোট করা হলো। দেখছে আর মনে মনে জমা করে রাখছে সেই সব অভিযোগ। ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রাইট দূরে। দুই পা ফাঁক করে। দুই-পা মাটিতে পুঁতে রয়েছে। পা নয়, যেন শক্ত দুই খুঁটি। ঐ খুঁটি যেন অনড়, অচল। চন্দন আশ্চর্য্য হয়, ঐ সাহেব টের পাচ্ছে না, চারিপাশের বাতাসে পুঞ্জ পুঞ্জ বিক্ষোভ আর প্রতিবাদ ?

এখানে ওখানে কতরকম গুঞ্জনের ফুলকি। জমায়েতে জমায়েতে হাটে বাজারে শোনা কতরকম কথা। সাহেবদের কত অত্যাচারের কথা। কতদিন ধরে কত অত্যাচারের কথা ! এখন চন্দন বুঝতে পারে যেন কিছু কিছু। বুঝতে পারে সাহেবমেমদের দেখলে তার গ্রামের মানুষ ভাবতো। তার দাদা-পরদাদা ভাবতো সাহেবরা-ই এই পৃথিবীর রাজা। তাদের উপরে আর কেউ নেই। সাহেবরা যা বলতো তা-ই করতো তারা। করতো কি ? এখনো করে। এই নিয়ে গেল বাংলামুলুকে। রাজমহলে গুলী চালিয়ে খুন করে এল কালোকালো সাঁওতালদের। আবার যারা বর্মায়, আফঘানিস্তানে নেপালে গিয়েছিল, তারাও তো কতজন সে সব দেশেই মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। এখন চন্দন বুঝতে পারে, যে তখনো অনেক অত্যাচার অবিচার ছিল, যা তারা স্বাভাবিক মনে করতো। বুঝতে পারে। যে সে সব আচরণের মধ্যে তাদের উপর একটা ঘৃণার ভাব চিরদিন-ই ছিল।

এবার চারি দিক স্তব্ধ। বাতাসে সাপের মতো শীষ দিয়ে লকলকিয়ে ওঠে কালো চাবুক। পাকা বেতের সঙ্গে চামড়ার দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে এখন তাকে এক নাগিনীর মতোই দেখাচ্ছে।

আন্দোলিত সেই চাবুক শীষ দিয়ে নেমে আসে নান্নু সিপাহীর নগ্ন পিঠে। খুব হিসাব করেই মেরেছে সিপাহী, তবু নান্নুর গলা চিরে যায় আর্তনাদে।

এক-দুই-তিন-চার—মানুষ কেমন জন্তু হয়ে যেতে পারে তাই দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্দন। তার জোয়ান শরীরে পেশী ফুলে উঠছে। তার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে আর তার মতো অন্যান্য সকলে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে তারা। তারাও জানোয়ার। জানোয়ারের মতোই ভয়ে চুপ করে রয়েছে।

যে মার খাচ্ছে সেও জন্তু। গলাফাটা ঐ আর্তনাদ কি মানুষ করতে পারে ! আর ঐ যে সাহেব দাঁড়িয়ে রয়েছে ? সে-ও এক জন্তু। জানোয়ার নইলে এমন উল্লাসে কে অপরের যন্ত্রণা দেখে !

চন্দনের হাত দু'খানা ভবানীর চেয়ারের পিঠটা মোচড়ায়। মনে পড়ে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মতো ছবির পর ছবি। মনে পড়ে
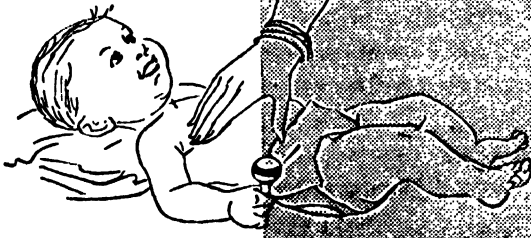
এলাহাবাদের উপকণ্ঠে পালামৌ-এ এক শিকারের দৃশ্য। সাহেব মেমকে নিশানা শেখাচ্ছে। তারপর সাহেবের গুলীতে ঐ দূরে অনেক দূরে পড়লো পাখী ঘুরতে ঘুরতে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সাহেব এক পুরস্কারলোভী বালককে বলে—যা! এনে দে ঐ হাঁস! নগদ এক আনা পাবি।

ছুটতে ছুটতে যায় সেই রাখাল বালক। সেই আঁধারে, ঘাস, জঙ্গল ভেঙে নিয়ে আসে হাঁস। এসে দাঁড়ায় যখন, কচি বুকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে। পড়ন্ত আলোয় মুখটা জ্বল-জ্বল করছে।

মেমসাহেব হাতে নেয় একটা আনি। সমস্ত দিনের শিকার এবং মদমত্ততা তার মাথায় নেশার মতো ঢুকেছে। মুখ লাল। বেশী হাসি। বেশী কথা। মেমসাহেব হঠাৎ সেই আনিটা দূরে ছুঁড়ে দেয়। বলে—খুঁজে নিতে বলো।

ছেলেটা তখনও চেয়ে থাকে। তারপর চলে যায়। চন্দনের মনে পড়ে তারা চলে আসছে। আর আঁধারিতে ঝোপঝাড় দিয়ে একটা গরীব আধা-নেংটা ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা আনি।

মনে পড়ে তার দাদার কথা। মনে পড়ে এই ব্রাইট-ই তার দাদার জীবনটা পঙ্গু করে দিয়েছে। আবার মনে পড়ে সেই সাকাখানার বাংলোতে এসেছে দুই সাহেব। সে আর তার দাদা চলেছে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে। সাহেবদের পৌঁছে দিতে হবে রামপুরের রাজাসাহেবের শিকার পার্টিতে। মনে পড়ে সাহেবরা তার দাদাকে উদ্দেশ্য করে বলছে—শুয়োরটা শিকারের মাংস খেয়ে খেয়ে চেহারা বাগিয়েছে বেশ।

—দেখছ না পেছন দিকটা? টিপ করে ছররা মেরে দেখলে হয়।

—লাফিয়ে উঠবে।

—আর ছোকরাটা যেন জোয়ান গাধা একটা।

শুনছে আর চন্দনের ঘাড়টা লাল হয়ে যাচ্ছে। অপমান ও বিভ্রান্তিতে তার দাদার মুখটা থর-থর করে কাঁপছে। দুজনে দুজনের দিকে চাইছে না।

মনে পড়ে গোরা কন্ট্রাক্টরকে দেখে এসেছে এলাহাবাদ আর কাশীর মাঝে রেলপথ মেরামতের সময়ে চাবুক নিয়ে মেয়ে পুরুষ কুলীকে একই সঙ্গে তাড়না করতে। মনে পড়ে বাচ্চা পিঠে বেঁধে মা-ও ভয়ে ত্রস্ত হয়ে চমকে চমকে কাজ করছে। দু'হাতে চটপট তুলছে পাথর। ভরছে ঝুড়ি।

শুধু কি তার? সমবেত সকলেরই বুঝি মনের নজরে এমনি সব ছবি খেলে যায়। মনে পড়ে। তবু মুখের ভাবে কিছু বোঝা যায় না। তারা প্রতিশ্রুত এক সত্যরক্ষার জন্য। অন্ততঃ মনোভাব গেল

বিষয়েই কবুল খেল না কোন নির্বোধ।

আট টাকা মাইনের সিপাহী ঘা পড়তে না পড়তে অজ্ঞান হয়ে ওপর থেমা এসেছে। কে জানে তাই সিপাহী নামিয়ে নিয়েছে।

তারপর বিচার। তারপর কি!

জরিমানা। হাঁশ হো গিয়া—মুখে মুখে গুঞ্জন

রাত পোহালে বিশ ঘা বেত কেন, থেমে গেল কেন? বলে—

রয়েছে নান্নু। দেখেছে যে চাম

যে একজোড়া বেত থাকে

—কি বললে?

বিস্মিত ব্রাইট ঘুরে দাঁড়ায় ভবানীর দিকে। ভবানীর চোখ-মুখও লাল। তিনি বলেন, আমি উপস্থিত থাকতে অজ্ঞান এই মানুষটার ওপর বেত চলতে পারে না।

—তুমি কাজে বাধা দিচ্ছ?

—বেহুঁশ কয়েদীর উপর বেত তুমি চালাতে পারো না সাহেব!

ভবানীর দিকে চেয়ে আর নান্নুর দিকে চেয়ে সম্ভবতঃ বুঝতে পারে ব্রাইট। বলে, বহুৎ আচ্ছা। তোমাকে আমি দেখব।

দুজন সিপাহী নিয়ে যায় নান্নুকে। উপুড় করে শোয়ায় তাকে খাটিয়ায়। উষ্ণ জলে আয়োডিন দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলতে ফেলতে ভবানী বুঝতে পারেন জ্ঞান ফিরে আসছে নান্নুর। তার উরু আর দুই হাত খাটিয়ার সঙ্গে ধরে ছ'জন সিপাহী।

সে বেত্রাঘাত সামান্য। কিন্তু এ অবস্থায় সামান্য নয়। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে যখন শুকিয়ে ইন্ধন হয়ে গিয়েছে অরণ্য, তখন একটা চকমকি কি সামান্য? তাতেই কি আগুন জ্বলতে পারে না?

কথা হয় সে দ্বিপ্রহরে ব্যারাকে। কথা হয় সাহেবদের আড়ালে, কান বাঁচিয়ে। প্যারেড বা ডিউটি যাদের নেই, সেই সব সিপাহীরা আজ আর রামায়ণ পাঠ করে না বা কুস্তি খেলে না। এমন কি লুকিয়ে জুয়া খেলাতেও আগ্রহ দেখা যায় না আজ। কথা হয় যেখানে তিনজন চারজন একত্র। 2nd Cavalry বা 53rd Infantry-র বিশ্বস্ত সিপাহী সওয়াররা কথা কয়। তাদের হৃদয় বিভ্রান্ত। তারা কিছু বুঝতে পারছে না। চাপাটি ও পথের নিশানা দেখিয়ে যে সব ফকির সন্ন্যাসী কথা কয়ে গেছে জমায়েতে তারা কি মিথ্যা বললো? কোথায়? কোথা থেকে আসবে লড়াইয়ের নিশানা? দিল্লী? লক্ষ্ণৌ? মীরাট?

তারা কথা কয়। কথাগুলি যন্ত্রণার আগুনে ফুলকির মতো ওড়ে।

—বিনা অপরাধে এই অত্যাচার আর কত দিন? কত দিন চলবে?

—আজ নান্নু? কাল কার সময় আসবে?

—আমাদের বেলা বিচার নেই, আর ওদের বেলা সাতখুন মাপ!

—কে বলেছে ওরা নির্দোষ? আর যত দোষ আমাদের? কথা হয় হাটে বাজারে দোকানে।

—এই পচা আটা, দুর্গন্ধ গম! এতে কিসের ভেজাল আছে?

—কেমন করে জানব জাত মারছে না ইংরেজ?

—মিশনারী সায়েবরা বলছে বিধবাদের বিয়ে দোব, ঠাকুর দেবতা ফেলে দোব। সাহারাণপুরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মেথর দিয়ে জল খাওয়াচ্ছে ওরা!

—কত দিন সহ্য করব? রেললাইন কেন আনছে? কেন এমন করে জিনিষের দাম চড়িয়ে দিল? কেন এমন করে সব জায়গায় আমাদের পায়ের তলা থেকে জমি সরে সরে যাচ্ছে?

কথা হয় রেজিমেণ্টের বিশ্বাসী ব্যাঙ্কার জৈৎরাম চৈৎরামের কুঠিতে। সেখানে সমবেত হয় শহরের নামীলোকদের মাথা। কথা হয়।

—কে বলেছে ওরা সর্বশক্তিমান? তবে সিবাস্তোপোলে হারছে কেন?

—বিঠুর, অযোধ্যা, সাতারা, নাগপুর একটার পর একটা রাজ্য এমন করে নিচ্ছে কেন ওরা ?

—আগেকার বুড়ো সাহেবদের তাড়িয়ে ছোকরা ছোকরা সাহেবদের এনে বসাচ্ছে কেন ? তারা সম্মান করে চলতে পারে না ?

—ওরা এক মুঠো মানুষ। নিজেদের সাদা চামড়া নিয়ে চলে যাক না কেন ? আমরা ওদের চাই না।

—ওরা চলে যাক ! হিন্দুস্থান যে কলঙ্কে ভরে গেল ! আমাদের ছায়াটুকু পর্যন্ত ওরা এড়িয়ে চলে। এমন করলে এক জমিতে এক আকাশের নিচে বাস করবে কি করে ?

সকলেই এক কথা বলে। আর সহ্য হয় না। আর কত দিন ? আর কত দিন এ কলঙ্ক ? এ অপমান ?

আসন্ন এক ছোট সফরের প্রাক্কালে এক আশ্চর্য পরিবেশে কথা বলেন ভবানী। বলেন ব্রিজদুলারীর সঙ্গে। ব্রাইটের আচরণে মনে মনে জ্বলে ব্রিজদুলারীর ওপরে বিষ ঢেলে দিয়েছে চম্পা। আর চম্পাকে বিস্মিত করে ব্রিজদুলারী ভবানীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ভিক্ষা চেয়েছে।

চম্পার কুঠিতে নিচের ঘরে এক প্রদীপ জ্বলছে। দাঁড়িয়ে আছেন ব্রিজদুলারী আর ভবানী। প্রদীপের রাঙা আলো দু-জনের পায়ের কাছটুকু শুধু আলো করেছে। মুখ আলোর আভায় যেটুকু দেখা যায়, তাতে ব্রিজদুলারীর মুখে অনেক রঙ দেখা যায়। গালে জলের আভাস দেখা যায়। মাথার কাপড় খসে পড়ে গিয়েছে। গহনার সে গুরুভার দেখা যায় না। বুক ঘন ঘন দুলছে। নিশ্বাস এখনো সহজ হয়নি। সে বলে, জানি, তোমাকে আর দেখব না, তুমি বলে যাও আমি কি করব ?

—আমি কি বলব ব্রিজদুলারী ?

—বল। একবার ডেকেছিলে, আমি ভীরু আমি পারিনি। তুমি বোঝ না, যে আমি মনে মনে মরে গিয়েছি ?

—এখন আর হয় না।

—জানি। এ কথা ভুলি না যে তোমার কত দয়া। ভুলি না যে সেই রেস্তরাঁয় মৈনপুরীতে, বান্দায় তুমি না থাকলে আমি মরে যেতাম। তুমি বাঁচিয়েছিলে, বলেছিলে আত্মহত্যা পাপ। বলেছিলে নিজেকে যত ছোট ভাবছ ততই দুঃখ পাব। বলেছিলে তুমি আমার কলঙ্ক দেখ না।

—সে কথা আজ কেন ?

তিরস্কার করেন না ভবানী। দুঃখ করেন না। শান্ত এক বিষণ্ণতা শুধু ফোটে তার গলায়। তিনি বলেন—তুমি জান ব্রিজদুলারী, সেদিন যদি তুমি একবার রাজী হতে তবে আজ তুমি কোথায় আমি কোথায় থাকতাম। বলিনি যে আমার সাহস আছে ? কই তুমি ত পারোনি !

—বলেছিলে ! আমি ত বলেছি সে কথা ! আজ আর সে কথা বলে কষ্ট দাও কেন ডাক্তার সাহেব !

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। একদা এই দুটি নরনারী পরস্পরকে জানতো। ভাগ্য প্রতিকূল না হলে তাদের সে পরিচয় অন্তরঙ্গতা হয়ে উঠতো এতদিনে। কিন্তু দুজনের ভাগ্য দুজনকে দুদিকে নিয়ে গিয়েছিলো তিন বছর আগেই। আজ তাই সামনাসামনি এত কাছে দাঁড়িয়েও মাঝখানের সে বিচ্ছেদের সমুদ্র তারা পেরিয়ে আসতে পারে না। সকরুণ চোখে চেয়ে থাকে ব্রিজদুলারী। যে পরিচয় কোন পরিণতি পায়নি, যে প্রেম অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল, তারই দুঃখস্মৃতি যেন কুয়াশার ওপারে গ্রামের বাতিগুলির মতোই সুদূর হয়ে মনকে আকর্ষণ করে।

সে ছিলো একদিন, যেদিন পিতৃহীন, বিমাতা-পরিত্যক্ত ভবানীশঙ্কর জেস্যুইট ফাদারদের সঙ্গে নিয়ে ক্রীশ্চান হতে উৎসাহী হয়েছিলেন। মনে হয়েছিলো বুঝি বা তাতে মুক্তির আস্বাদ পাবেন। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হবার পরামর্শ দিলেন তাঁকে ব্যারাকপুর চার্চের ফাদার। আর ডাক্তারী তিন বছর পড়ে পাশ না করেই চলে এলেন ভবানী চাকরী নিয়ে।

১৮৫৪-৫৫ সালে মিলিটারী জীবনে তাঁর স্বদেশ ও সমাজের বাঙালীর অভাব ছিল না। কিন্তু ভবানী কেমন যেন তাঁদের সঙ্গেও মিলতে পারলেন না। রুচি এবং মানসিক সংগঠনে বাধলো। একদিনের Humanity আর Ethics-এর ছাত্র ভবানীশঙ্কর ঠিক এ জীবনেও মিশে গেলেন না। আর যা যা ভেবেছিলেন—মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, অন্য দেশের মানুষকে জানা, আহত ও আর্তের সেবাব্রত—এর কোনটাই পেলেন না। এক আশ্চর্য জীবন, মানুষের সমাজ ও সংস্পর্শ থেকে বিচ্যুত, মিলিটারীর জীবনে—ফৌজী ডাক্তার হয়ে তিনি মনুষ্যত্বকে অবমানিতই হতে দেখলেন। তিনি নেটিভ ডাক্তার। নেটিভ সিপাহী সহরারদের। তাঁর জন্য অপরিসর তাঁবু, অপ্রচুর ঔষধ এবং কর্তৃপক্ষের অপরিসীম অবহেলা।

তাঁর দোসর প্রাণ আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সঙ্গ ও সমাজবিমুখ মন তাঁর। ফৌজীজীবনে এই সুবিপুল বর্ণবৈষম্য এবং মানুষের অবমাননা দেখে তিনি দুঃখিত হলেন, যেমন সাধুসন্ন্যাসী দুঃখিত হয়। এই অভিশাপের কারণ খুঁজে তলিয়ে দেখে বা বিচার না করেই তিনি অন্যদিকে মানসিক ভারসাম্য খুঁজতে গেলেন। প্রকৃতি-প্রেমিক হলেন ভবানী। মানুষের চেয়ে প্রকৃতির রাজ্যকে অনেক শান্ত, উদার ও ক্ষমাময় বোধ হলো। গাছ, নদী, আকাশ, পাহাড়, ফুল ও জীবরাজ্যে তিনি ঈশ্বরের অপার করুণা অনুভব করলেন।

কিন্তু মানুষের দিকেই কি বিমুখ হতে পারলেন ? তখন তিনি রেওয়াতে। ব্রাইটের ইন্‌ফ্যান্ট্রির wing-এর ডাক্তার ঘুরছেন সফরে ; ব্রাইট সেই সময়ই সংগ্রহ করেছেন ব্রিজদুলারীকে। ভবানী শুনেছিলেন সে মেয়ের অপূর্ব রূপের কথা।

ব্রাইটও ভেবেছিলো ব্রিজদুলারীকে তার উপযুক্ত করে নেবে। অন্ততঃ সামান্য উর্দু ফার্সী জানা দরকার তার। সেই প্রসঙ্গেই সে ভবানীকে ডাকে। বলেছিলো—সামান্য শিখিয়ে দাও। টাকা দেব আমি।

সেই হলো আলাপ। বিস্মিত ভবানীশঙ্কর দেখলেন, যে মেয়েটি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিলো না তাঁর সম্পর্কেই তাঁর মনে জেগেছে করুণা।

ব্রাইটের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা প্রচলিত ছিল মুখে মুখে। তার অনেক আচরণ সম্পর্কে সাহেবরাই লজ্জা পেতো। ভবানী মেয়েটিকে করুণা করলেন। তাঁর মনে আত্মবিশ্বাসে জাগাতে চাইলেন এবং সহসা একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর অনেকখানি মনই একখানি সুন্দর, বিষণ্ণ মুখের পাণ্ডুর ছবিতে ভরে উঠেছে।

ব্রিজদুলারীর অবহেলিত জীবনে ভবানী হলেন প্রথম পুরুষ, যিনি তাকে শ্রদ্ধা করেছিলেন। তার আশ্চর্য জীবন তাকে তার দেশসমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছিঁড়ে বাইরে এনেছিলো, আর কোন পথের দিশা না দিয়ে অন্ধকারে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলো। ভবানী তাকে শেখালেন—ভয় পেয়ো না। ভয়-ই তোমাকে দুর্বল করেছে। তুমি সাহসী হও।

কোন দিন বললেন—নিজেকে মূল্যহীন মনে ক'রো না। নিজেকে বিশ্বাস করো।

সেই সময়-ই ব্রিজদুলারীর জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। সে যেন প্রথম এক আলোর নিশানা দেখতে পেয়েছিলো, আর মনে ভেবেছিলো যদি ভবানীশঙ্কর তার হাতখানা ধরে রাখেন, তবে হয়তো বা সে এই জীবনের নিগড় বন্ধন ভেঙে চলে যেতে সাহস পাবে।

সেদিন ভবানী সাহস হারাননি। তিনি রাজী হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নিয়ে চলে যেতে পারবেন তাকে। কাজের অভাব কি? কাজ পাবেন কোথাও না কোথাও। বিয়ে করবেন ব্রিজদুলারীকে। তাকে মানুষ করবেন। উন্নত করবেন।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্রিজদুলারী-ই সাহস হারালো। মেয়েদের বুঝি বা এমনি হয়।

সে কথা বাইরে কেউ জানলো কি না বড় কথা নয়। ভবানী মনে বড় ঘা খেলেন। আর এমনই পরিস্থিতি, যে মুখ বুঁজে সইতে হলো আঘাত। এ-ও তিনি বুঝলেন, যে এর পরে আর ব্রিজদুলারীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। সে মন তাঁর নেই। মন ভেঙেচুরে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। অসুস্থতার ছুটি নিয়ে বদলী হলেন ভবানী। কিছুদিন রইলেন কুমায়ুন প্রদেশে এক সাফাখানায়। অপরূপ আরণ্য পরিবেশ। অপরিসীম সারল্য সেখানকার মানুষদের মধ্যে। সেখানে গিয়ে যেন আবার উপলব্ধি করলেন ভবানী, ঈশ্বর, বা আশীর্বাদ, বা সৌভাগ্য, সে যা-ই হোক —ব্রিজদুলারী-ই সব কিছু বয়ে নিয়ে এসেছিলো। তাঁর জীবন সেই একজনকে ধরেই মধুময় হতে পারতো। আর সে বিহনে সত্যিই তাঁর জীবনটা শূন্য হয়ে গেল। মানে হারিয়ে গেল। জীবনটা অনেক বেশী অর্থপূর্ণ হতে পারতো। করুণা ও স্নেহের পথ ধরে প্রেম আসতো। একটা মানুষকে নিজের মধ্যে পুনর্বাসিত করবার সার্থক কাজ নিয়ে তিনিও সার্থক হয়ে উঠতে পারতেন।

ভবানীশঙ্কর বুঝতে পারলেন চলতে চলতে একটা জায়গায় হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছে, আর সে হিসেব কোনদিনও মিলবে না। যত দিন যাবে তাঁর জমার ঘরে শুধু লালকালিতে ঢ্যারাই পড়বে। কিছুই পাবেন না তিনি।

আজ সেই সব বিফলতা আর নিরাশার কথা মনে পড়ে দুজনেই দুঃখ পান।

ব্রিজদুলারী আবার বলে, ফিস-ফিস করে—বল, আমি কি করি —এরকম ক'রে আর কতদিন বাঁচব? সবাই আমাকে ঘেন্না করে। আমার সঙ্গে কেউ মেশে না। ঈশ্বর জানেন আমার কি দুঃখ।

সে নিচুগলা আরো নামিয়ে বলে—মনে হয় মরে যাই, কিন্তু সে সাহস-ও হয় না। আমি একেবারে হেরে গেলাম।

ভবানীর চোখে ভর্ৎসনা নেই। ধিক্কার নেই। সে দিকে চেয়ে ব্রিজদুলারী কোনো অসম্ভব দুরাশায় বলে।

—আর একবার নিয়ে যেতে পার না?

ফর্সা গলার নীলশিরাটা দপদপ করে তার। ভবানী মাথা নাড়েন।

তারপর আর কোন কথার প্রয়োজন থাকে না। নিরর্থক এই সময়টায় ভার যেন অসহ হয়ে ওঠে। ব্রিজদুলারী বলে,—আমি যাই।

আর যাবার কালে ভবানীর চোখে পড়ে অপসৃয়মান এক নীল শাড়ীর আঁচল। যেন চেনা মনে হয়। তারপর মনে পড়ে একদিন যেন তিনি বলেছিলেন,—সুন্দর এই নীল রং। বড় স্নিগ্ধ। আমার দেশে এই রঙের আকাশ দেখা যায়।

তারপর-ই প্রস্ফুট তারার মতো ছোট ছোট শাদা লাল রেশমের বুটি তোলা এই নীল শাড়ীখানি বার বার পরতো ব্রিজদুলারী।

তিনি বলেছিলেন,—এই অলংকার, এ যেন বোঝা! কেন পরো তুমি?

আজ সেই পরিচিত নীল সাড়ী পরে নিরাভরণে, যে এসেছিলো ব্রিজদুলারী, সে তাঁরই রুচিকে সম্মান করে। মনে হলো শুনেছেন রেজিমেণ্টের বাঙালীদের কাছে, আর অন্যত্র-ও।

—ব্রাইট কম চালাক নয়। কাঁচা টাকা হাতে রাখেনা সে। সবই ঐ মেয়েটাকে গহনা গড়িয়ে দেয়। ওর অনেক টাকার গহনা আছে।

পোষ্টঅফিসের বাবু তাঁর কাকা চন্দ্রমোহন বসু লিখেছিলেন— বড়সাহেবের বিবিকে ফার্সী ও ইংরাজী সামান্য শিখাইয়া আমি সোনার ঘড়ি জেবচেন ও উত্তম চাঁদির ডিবা পারিতোষিক লইয়াছিলাম। তুমি জান, তোমার খুড়ীমাতা কিরূপ অলঙ্কারপ্রিয়। তোমার জন্য না হৌক, তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া একজোড়া উত্তম বালা, বা সোনার নাসদান, অবশ্য লইও। তোমার সৌভাগ্য যে—

দেশীয় অফিসাররা বলেছেন—ডাক্তার সায়েব, ওই মেয়েটা আমাদের কলঙ্ক। তাতে ও যেরকম গহনার বাহার দিয়ে বেড়ায়। এইজন্য টাকার এত দরকার হয় ব্রাইটের, জানলেন; আর এতরকম গোলমাল হয়।

ভবানীর মনে হলো সত্যিই ব্রিজদুলারী দুর্ভাগিনী। আর এখন চম্পার ঘর থেকে বিদায় নিয়ে চন্দনের সঙ্গে চলতে চলতে মনে হলো, যে রকম শোনা যাচ্ছে, যদি কোন বিপদ হয়, তবে রেজিমেণ্টের লোক ব্রাইটকে তো নয়ই, ব্রিজদুলারীকেও ছেড়ে দেবে না। সহসা চন্দন প্রশ্ন করলো।

—ডাক্তার সাহেব, আপনি ব্রাইটের বিবিকে জানলেন কি করে? কি দরকার ছিলো তার? এমন করে কথা বলবার মতো?

—আমি তাকে অনেক দিন জানি চন্দন!

—ও।

এবার ভবানী কৌতুহল ও ঈষৎ কৌতুকে প্রশ্ন করেন।

—চন্দন চম্পাকে তুমি কত দিন জান?

—কেন?

চন্দন যে হাসছে তা যেন ভবানী বুঝতে পারেন। ভবানী সরলভাবেই বলেন।

—চম্পাকে সকলেই চেনে। তার সঙ্গে সকলেই মিশতে চায়

দিনের পর দিন প্রতিদিন...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে
যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সরের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে···রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা প্রো, লিঃ, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

সকলেরই তার সম্পর্কে কৌতূহল। তবে চম্পা তো কারুকে আমল দেয় না। দূরে রেখে চলে। তবে ?

—তবে কি ডাক্তার সাহেব ?

—শুনছি ইঞ্জিনীয়ার ইভান্স সাহেবের সঙ্গে বড় ভাব হয়েছে তার।

চন্দন বলে—ও কথা বলোনা ডাক্তার সাহেব !

—কেন, চন্দন ?

—চম্পা কোন বে-আদব করবে না।

কৌতুক ছাড়া চন্দন কথা কয় না। সব কথাতেই সে হাসে। চন্দনের গলায় এখন কোন পরিহাস নেই। ভবানী বলেন।

—আমি কিছু জানিনা চন্দন, এমনই বলেছি।

—এমনই চম্পার সম্পর্কে কোন কথা বলো না ডাক্তার সাহেব। জবান বড় খারাপ জিনিস। একটা ছুট কথা বে-আন্দাজ তীরের মতো ছুটে গেলে আর ফিরিয়ে আনতে পারো না আর কে না জানে একটা কথা থেকে লড়াইও লেগে যায় ? এমন কথা বলো না, যাতে আফশোষ জাগে মনে।

তারপর আবার হাসতে থাকে। লঘু হয় কণ্ঠ। বলে—ডাক্তার সাহেব, আজ কি বলছিলেন তোমাকে ঐ সাহেব ডাক্তার ? ক্লাবে যেতে যেতে ?

—বলছিলেন কি, যে পাগলা কোন ফকির না কি ভগবানপুর, উনাও আর ফতেগড়ে দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে চাপাটি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর কি বলছে।

—চাপাটি ?

—মামুলী জোয়ার বাজারা-র ছাতুর চাপাটি। সেই তো হাসির কথা।

—হাসির কথা তো ভাবছে কেন সাহেবরা ?

—কোথায় ভাবছে। পাগলা সেই ফকিরকে তো জেরা করে ছেড়ে দিয়েছে।

আর কোন কথা হয় না। চুপচাপ চলেন দু'জনে পাশাপাশি। সহসা চন্দন গান গাইতে সুরু করে। বলে—কিছু গুনাব নিও না, বড় ফুর্তি হচ্ছে।

সে রাতে চৈৎরাম জৈংবামদের পরিত্যক্ত সে বাগান বাড়ীর চত্বরে বসে কথা কয় ইভান্স ও চম্পা। এ নির্জন জায়গায় নির্বাচনে শুধু চম্পার জেদে। প্রেমের প্রাথমিক পর্ব শেষ। অতৃপ্ত ইভান্স। বলে আমার ভাললাগে না।

ছোট একটা ফুল গাছের নিচু ডাল ধরে দাঁড়িয়ে চম্পা সব কথাই বলে কৌতুকের সুরে। বলে—সাহেব, তুমি ব্যারাক ছেড়ে নিজে কুঠি নাও, নয় তো আমার ইজ্জত থাকবে না যেখানে সেখানে আমি যেতে পারব না। আচ্ছা, তুমি না কি চলে যাবে ?

—No, my princess. No, my pretty.

—সাহেব, ইংরাজী বলো না।

—তোমার কিচির-মিচির ভাষা আমি বেশী বলতে পারি না।

—তবে, তুমি যাবে না ?

—না। বড় সাহেব নিষেধ করেছে।

—কেন ?

এবার চম্পা ঘুরে এসে তার সামনে বসে। ইভান্সের মনে হয় এই সুন্দর গেজেল হরিণের মতো গতি ভঙ্গী, এ বুঝি প্রাচ্যের মেয়েরই নিজস্ব। বলে—চম্পা, বড় সুন্দর তুমি। তুমি মনোহর !

—বল, কেন মানা করেছে সাহেব ?

—কি চিন্তা ঢুকেছে মাথায়, হঠাৎ না কি সকল সাহেব মেমদের নিরাপদে থাকবার দরকার হবে। আমার উপর হুকুম এসেছে, স্বল্প সময়ে নিরাপদে থাকবার বন্দোবস্ত কি ভাবে করবো আমি যেন ভাবি।

—কি করবে তুমি, কেল্লা বানাবে ?

চম্পা হেসে গড়িয়ে যায়। ইভান্স বলে—না। আমি এক টাওয়ার বানাব, তার উপরে তোমাকে কয়েদ করে রাখব। শুধু আমি ছাড়া কেউ তোমার কাছে আসবে না।

—তুমি আসবে কি করে ?

—চম্পা, তুমি রূপকথা জান না। তুমি চুল নামিয়ে দেবে, আমি উঠে আসবো সেই টাওয়ারে।

—সাহেব, তুমি বড় ভাল। এ দেশে নতুন এসেছ কি না !

—কেন, চম্পা ? আমি শীঘ্রই সুন্দর কুঠি নেব। সেখানে তোমাকে কালো কালো দাস দাসী, তামাক আর পানের সরঞ্জাম যা যা তোমরা ভালবাস, সব তোমাকে দেব।

—সব ?

—সব।

—এখানেই থাকবে তুমি ? আর দেশে যাবে না ?

—না। এ দেশও তো আমাদের-ই।

—নিশ্চয়। তোমার ভাষা আমাকে শেখাবে না ?

—না চম্পা। তুমি চিরদিন এ রকম অদ্ভুত পাখীর মতো কল কল কথা বলো। আমার শুনতে ভালো লাগবে। তুমি এই বাগানের বুলবুল। কেন তোমাকে বিলাতের পাখীর গান শিখাব ?

—সাহেব, তবে তুমি যাবে না ?

—না চম্পা, আমি এখানেই থাকব। খুশী হলে ?

—খুশী হলাম।

ঘরে ফিরে সম্পূরণকে চম্পা বলে—বুঢ়া, তোমরা ভাব সাহেবরা খবর রাখে না ? বুঢ়া, তুমি জেনো, যে সাহেবরা বিপদ আশঙ্কা করে। তারা দিল্লীর ইস্তাহার, কি মীরাটের বাজারের হল্লার খবর রাখে কি না, জানি না। তবে তারা সাবধান হবার কথা ভাবছে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তাই বললো। বড় সাহেব বলেছে তাকে গড় বাঁধতে ! কি অন্য কোন কিছু বানাতে !

—চম্পা, একথা আমরাও জানি। তবে তোর মুখে যাচাই হয়ে গেল সত্যি মিথ্যা।

—তারপর ?

—আর দেরী বোধ হয় নেই চম্পা। মনে হয় তাই। বুঝি না।

চন্দনের আসন্ন সফরের প্রাক্কালে বিদায় জানাতে আসে চম্পা। পরিত্যক্ত মন্দির পিছনে ফকিরদরগার বাগানে দাঁড়িয়ে কথা হয়। চন্দন বার বার বলে—চম্পা, তুই সাবধানে থাকবি। তোর জন্য বড় চিন্তা নিয়ে গেলাম।

—চন্দন, তুমি ভেব না। আমি একা নই।

—চম্পা, বিপদের সময় আমি সকলের কথা ভাবতে পারি না। মনে জানি এ আমার একার দায়িত্ব।

—ভয় করো কেন?

—ভয় করি কেন?

চম্পার ঘাড় ধরে রেগেই ঝাঁকি দেয় চন্দন। বলে—ক্ষতি হলে কার হবে? আমার? না সকলের?

চম্পা হাসতে চায়। তারপর হাসি থেমে যায়। বলে—আমি ভাল থাকব। কিন্তু তুমি? তুমি কবে আসবে চন্দন?

—দেরী করবো না।

চন্দন হেঁট হয়ে চামড়ার দড়ি বিনিয়ে বিনিয়ে বাঁধা ভারী চপ্পলটা বেঁধে নিতে চায়। চম্পা নিচু হয়ে বেঁধে দেয়। তারপর বলে—কি রকম সময়ে যাচ্ছ। মনটা আমার ব্যস্ত হয়ে রইলো।

চন্দন ঈষৎ ভুরু কুঁচকে চম্পার মুখ দেখে। বলে—বড় তোমার সুনাম চম্পা, বড় ভাল বলে তোমাকে সবাই। কিন্তু তাতে আমার গর্ব নেই।

—কেন?

—মনে হয় তোমার নিষেধ শুনে ভুল করলাম। কিছু কথা না মেনে যদি ধরে নিয়ে যেতাম ঐ খোঁড়া পণ্ডিতজীর কাছে, আর তাকে পুরুত রেখে বিয়ে করে নিতাম, সব হাঙ্গামা মিটে যেতো। তোমার জন্য হলো না!

—আবার সেই কথা?

—একশোবার। আর কোন্ কথা থাকে? শোনো চম্পা, আমার ডাকগাড়ী ছেড়ে যাবে, চলে যাব এখনি। বলে যাই—তুমি হুঁশিয়ারে থেকো। সাহেবকে বেশী খেলিও না। ওরা ম নয়। ধরে ফেলতে পারে? আর,—

—আর কি চন্দন?

—তোমার মালিক তুমি নয় চম্পা, তোমার মালিক আমি? এই খেয়াল রেখে খুব ভাল থাকবে? যখন ফিরে আসব, যেন না দেখি আমার চম্পা রোদে জলে গিয়েছে কি মলিন হয়ে গিয়েছে? জানলে?

—জানলাম।

—আচ্ছা। তবে চলি।

—এসো চন্দন। মঙ্গলময়ের কৃপায় ভাল করে ঘুরে এসো। আমি কিন্তু পথ চেয়ে থাকব।

—এ কি ডেরাপুরের পথ, পাগলী।

—হাঁ চন্দন, আমার কাছে সেই একই পথ। ঐ পথটা তোমাকে বার বার নিয়ে যায়।

—আবার ফিরিয়েও দেয়।

—তা দেয়।

কিছুক্ষণ কাটে এমনই। এ ওর দিকে চায়। চম্পা যেন এখন আত্মবিশ্বাস স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নারী। আর সে অপরিণত তরুণী নয়। আর চন্দন তেমনই বেপরোয়া এক নির্ভীক যুবক। আত্মবিশ্বাসে সে-ও প্রোজ্জ্বল।

পেছনে সান্ধ্যরাগে রাঙা আকাশ। হৃদয়ে প্রেম। তবু যেন প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা।

জোর করেই চম্পার মুখ থেকে চোখ ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে চন্দন।

চন্দনের হাতে হাত রেখে চলে চম্পা। হৃদয়ে অনেক কথা। তাই মুখে কোন কথা হয় না। [ক্রমশঃ।

স্বাধীনতা

(পি, বি, শেলী)

বহ্নিমান পর্বতেরা দেয় একে অন্যের উত্তর;
বজ্রনাদে তাহাদের প্রতিধ্বনি জাগে দিকে দিকে;
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সিন্ধুদল জাগাইয়া রাখে পরস্পর,
এবং হিমশৈলচয় চূর্ণ হয় শীতেরই সম্মুখে,
ঝড়ের বিষাণ যবে বাজিয়া ওঠে এ বিশ্বলোকে।

এক খণ্ড মেঘ হ'তে খ'সে যাওয়া বিদ্যুৎ-ঝলক
ব্যাপ্ত হ'য়ে চারিভিতে সহস্র দ্বীপের আলো হয়,
ভূমিকম্প করে যায় লীলা তার অতি-ধ্বংসাত্মক—
নগরী পোড়ায়, শত লক্ষ দ্বীপে ত্রাস সঞ্চরয়;
ভূমির গর্ভেও তার বাঁতার ঘর্ঘর শ্রুত হয়।

তথাপি তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর বিদ্যুৎ হ'তেও,
ভূ-কম্প থেকেও দ্রুত পদক্ষেপ কর স্বাধীনতা;
ডুবাইয়া দাও তুমি বারিধির ভীমগর্জনেও;
আনে তব দৃষ্টিপাত অগ্নি-বর্ষী পর্বতে ম্লানতা;
আলেয়ার আলো নহ, তুম এক সৌর ভাস্বরতা!

ঊর্মি হ'তে, গিরি হ'তে, বাষ্প-আবরণ হ'তে আর
রবি-রশ্মি ছুটে যায় কুজ্ঝটি ও পবন ভেদিয়া;
আত্মা হ'তে আত্মান্তরে, জাতি হ'তে অপর জাতিতে,
সর্বগ্রাম জনপদে যায় তব আলো বিস্তারিয়া—
ভূ-স্বামী ও ভূমিদাস ত্রিযামার তিমির সমান
প্রভাত আলোকে তব কেঁপে কেঁপে যায় মিলাইয়া।

অনুবাদ: জীবনকৃষ্ণ দাশ।

[*Osamu Dazai's* "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

পঞ্চম অধ্যায়

ভদ্রমহিলা

এই গ্রীষ্মে আমি তাঁকে তিনখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। সে সময়ে মনে হয়েছিল, এছাড়া আমার আর উপায় নেই এবং আমার হৃদয় উজাড় করে চিঠিগুলিতে ঢেলে দিয়েছিলাম। নিস্তরঙ্গ অন্তরীপ ছেড়ে উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত দোদুল্যমান অবস্থায় চিঠিগুলি ডাকে দিই, কিন্তু বহুকাল অপেক্ষা করেও কোন জবাব পেলাম না।

একবার এমনি নাওজিকে জিজ্ঞেস করলাম—ভদ্রলোক কেমন আছেন। নাওজী জবাব দিল যেমন থাকেন তেমনি আছেন। প্রতি রাত্রে মদ ও আনুষঙ্গিক হৈ-হল্লার মধ্যে কাটে; তাঁর সাহিত্য দ্রুতগতিতে নীতি-বিগর্হিত খাতে বয়ে চলেছে। সভ্য সমাজ তাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে। উপরন্তু তিনি নাওজিকে এক পুস্তক প্রকাশনী স্থাপন করতে বলেছেন এবং সে-ও সেই প্রস্তাব যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করেছে। গোড়াপত্তন হিসাবে নাওজি, এই ভদ্রলোক ছাড়া আরও দু'জন ঔপন্যাসিককে ব'লে কয়ে তাদের কর্ম্মচারীর কাজ যোগাড় করেছে। এখন মূলধন জোগাবার মত কাউকে ধরা যায় কিনা, এই হ'ল সমস্যা। নাওজির কথা শুনতে শুনতে পরিষ্কার বুঝলাম যে আমার মনের এক কণা সুরভিও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভেদ করে আমার প্রেমাস্পদের কাছে পৌছয়নি। এর জন্য যত না লজ্জা পেলাম, তার চেয়েও বেশী করে বুঝলাম যে, বাস্তব জগৎ আমার কল্পনার দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থে গঠিত। আমার সব অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে ভয়াবহ এক নিঃসঙ্গ বোধ আমায় ঘিরে ফেলল, মনে হ'ল সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিজন এক শারদীয় প্রান্তরে আমি নির্ব্বাসিতা। এখান থেকে আমার ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দেবে না কেউ। অবাক হয়ে ভাবি, একেই চলতি ভাষায় হতাশ-প্রেমিক বলে? সূর্য্যদেব সম্পূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে সরে যাবার পর, একাকী বিজন প্রান্তরে নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে মৃত্যুই কি আমার কপালের লিখন? রুদ্ধকান্নার আবেগে আমার স্কন্ধদেশ, বক্ষস্থল আলোড়িত হল।

অতঃপর টোকিওতে গিয়ে মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে দেখা করা ভিন্ন গত্যন্তর রইল না—খরচ যা হয় হবে। পাল উড়িয়ে জাহাজ ঘাট ছেড়ে আমার তরী অকূল সাগরে ভাসল। আর অপেক্ষা করা যায় না। যেখানে যাবার সেখানে আমায় যেতেই হবে। টোকিও যাত্রার গোপন আয়োজন করার সময়ে এই কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। ইতিমধ্যে হঠাৎ-ই মায়ের অবস্থা মোড় নিল।

এক রাতে মা দারুণ কাশতে সুরু করলেন। শরীরের তাপ নিয়ে দেখলাম ১০২° ডিগ্রি জ্বর। কাশির ধমকের ফাঁকে মা বললেন—খুব সম্ভব আজকের এই প্রচণ্ড শীতটা সহ্য হ'ল না। কাল আমি ঝেড়ে উঠব। যাই হোক, শুধু কাশি বলে আমার মনে হল না এবং নিশ্চিন্ত হবার জন্য পরদিন সকালে ডাক্তার ডাকব স্থির করলাম।

পরদিন শরীরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে কাশিও কমল। যাই হোক, আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে মা'কে একবার দেখে যেতে অনুরোধ করলাম এবং সেই সঙ্গে সম্প্রতি মায়ের দুর্বলতার কথা, গত রাতের জ্বরের কথা এবং কাশির পেছনে ঠাণ্ডা ছাড়াও আরও কোন কারণ আছে, আমার এই অনুমানের কথা সব তাঁকে জানালাম।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছব,—বলে ডাক্তার আমায় ভরসা দিলেন, তারপর বললেন, তোমার জন্যে একটা জিনিষ আছে। বাইরের ঘরের তাকের ওপর থেকে তিনখানা ন্যাসপাতি এনে আমায় দিলেন। পরিপাটী পোষাক পরে বেলা তিনটের খানিক পরে তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন। প্রতিবারের মত এবারেও দীর্ঘ সময় নিয়ে মা'কে পরীক্ষা করলেন। বুক, পিঠ ঠুকে ঠুকে কান পেতে শব্দ শুনে শেষে আমার দিকে ফিরে বললেন—ভয় পাবার কিছু নেই। আমার ওষুধ খেলে ভাল হয়ে উঠবেন বলেই মনে হয়।

ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী দেখে হাসি চেপে রাখা দায়। কোন মতে জিজ্ঞেস করলাম—ইন্‌জেকশন্ দেবেন না? ডাক্তার বাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—তার কোন দরকার নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে, তোমার মা যদি চুপচাপ শুয়ে থাকেন তবে শীগ্‌গির সেরে উঠবেন।

কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেল, মায়ের জ্বর গেল না। কাশি কমল বটে, কিন্তু জ্বর সকালে ৯৯° এবং রাত্রে ১০২° ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করে। ঠিক এই সময়ে পেটের গোলমাল হয়ে ডাক্তার শয্যা নিলেন। আমি তাঁর বাড়ীতে ওষুধ আনতে গিয়ে নার্সের কাছে মায়ের অবস্থার কথা বললাম, সে গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিল। তাঁর

কাছ থেকে জবাব এল—সামান্য সর্দ্দি কাশির' ব্যাপারে ঘাবড়াবার কি আছে? এক শিশি মিক্সচার আর একটা পাউডার নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

নাওজি টৌকিওতেই আছে। প্রায় দশ দিন হ'ল সে গেছে। একাকী ভগ্নহৃদয়ে আমি ওয়াদা মামাকে মায়ের কথা জানিয়ে চিঠি লিখলাম।

দিন কয়েক পরে আমাদের গ্রামের ডাক্তার এসে জানালেন, শেষ অবধি তাঁর পেট সেরে গেছে।

খুব মন দিয়ে মায়ের বুক পরীক্ষা করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—আঃ, এতক্ষণে বোঝা গেল। এইবার ধরেছি। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—জ্বরের কারণ ধরা পড়ে গেছে। বাঁ দিকের ফুসফুসটা জখম হয়েছে। যাই হোক, উদ্বেগের কোন কারণ নেই। জ্বর এখন কিছুকাল চলবে, কিন্তু তোমার মা যদি চুপ করে পড়ে থাকেন, তবে ভয়ের সত্যি কোন কারণ নেই।

কে জানে—মনে মনে ভাবলাম, কিন্তু তবু ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়-কুটো নিয়ে ভাসতে চায়, তেমনি ডাক্তারের পরীক্ষার ফল থেকে যেটুকু আশ্বাস পাওয়া যায়—এই আর কি!

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে এসে খুশির ভাণ করলাম—মা, এতদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কি বল? কেবল ছোট্ট একটা ছ্যাঁদা, এ তো বেশীর ভাগ লোকেরই থাকে। মনটাকে যদি তুমি শক্ত করতে পার মা, তবে ভাগ ভাগ করে সেরে উঠবে। গ্রীষ্মকালটা আমার দু'চোখের বিষ, গরমের ফুলগুলোও তাই।

চোখ বন্ধ করেই মা হাসলেন—লোকে বলে যারা গ্রীষ্মের ফুল ভালবাসে, তারা গরমেই মারা যায়। আমি এই গ্রীষ্মেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলব আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন নাওজি ফিরে এসেছে বলে শরৎকাল পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারব।

নাওজির মত এমন অপদার্থই আজ মায়ের চোখ বড় হয়ে দাঁড়াল ভেবে মনে ব্যথা পেলাম।

বেশ, সেই গ্রীষ্মই যখন পেরিয়ে এলে, তবে তোমার ফাঁড়াও বোধ হয় কেটে গেল—না মা! বাগানে লবঙ্গ ফুল ফুটেছে মা! তাছাড়া ভ্যালেরিয়ান, বার্নেট, বেল ফ্লাওয়ার টিমোথি সবাই মিলে বাগানে শরতের আহ্বান ডেকে এনেছে। আমার মন বলছে অক্টোবর পড়তেই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।

প্রাণপণে ভগবানকে ডাকি, হে ভগবান! তাই যেন হয়। সেপ্টেম্বরের চটচটে একঘেয়ে দিনগুলো গেলে বাঁচি। তার পর যখন ক্রিসান্থিমাম্ ফুটবে, ভারতীয় গ্রীষ্মের মত একটার পর একটা ঝলমলে দিন আসবে তখন মা ভাল হয়ে উঠবেন। একটু জোর পেলেই আমি যাব অভিসারে। হয়ত মস্ত এক ক্রিসান্থিমামের মত আমার আশা পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। হায়! অক্টোবর মাসটা যদি এগিয়ে আসত আর সেই সঙ্গে মা'ও সেরে উঠতেন।

এক সপ্তাহ পরে আমি মামাকে চিঠি লিখতে এককালীন রাজবৈদ্য প্রবীণ ডাক্তার মিয়াকে (Miyake)কে টৌকিও থেকে এনে মাকে দেখবার ব্যবস্থা করলেন।

ডাক্তার মিয়াকে বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁকে দেখে মা খুশি হ'লেন

বোঝা গেল। তাঁর অমার্জিত ভাষা আর রুক্ষ ভাষা মায়ের মন গলিয়ে দিল। পোষাকী পরীক্ষার আয়োজন না করে ভদ্রলোক মায়ের সঙ্গে অবাধ পরচর্চ্চায় মেতে গেলেন। পুডিং রান্না শেষ করে এসে দেখি মাকে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বেতের চেয়ারে বসে আছেন, তার কণ্ঠ থেকে কণ্ঠহারের মত ষ্টেথিসকোপটা ঝুলছে।

আমার মত লোক রাস্তার ধারে এঁদো হোটেলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মুড্‌ল্ খেয়ে লাঞ্চ-পর্ব্ব সারে। তোমরা কখনও সে রকম অপূর্ব্ব সব খাদ্য, অর্থাৎ বাজে জিনিষ একেবারে খাও না।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে এই কথা কানে এল। আর এই ছিল তাঁদের আলোচনার ধরণ, মা একমনে তাঁর কথা শুনছিলেন।

মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, তাহ'লে মায়ের অসুখটা বোধ হয় বিশেষ কিছু নয়। হঠাৎ মনের মধ্যে জোর পেয়ে প্রশ্ন করলাম—মা কেমন আছেন—গ্রামের ডাক্তার ব'লে গেল বাঁ দিকের ফুসফুসে ছ্যাঁদা হয়েছে। আপনি কি বলেন?

নির্ব্বিকার মুখে ডাক্তার বাবু জবাব দিলেন—সে আবার কি? তোমার মা'র কিছু হয়নি।

আঃ! বাঁচা গেল বুকের ওপর থেকে পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা নেমে গেল। আমি খুশি হয়ে বলে উঠলাম—শুনেছ মা, উনি বললেন—তোমার কিছু হয়নি।

এর পর ডাক্তার মিয়াকে চেয়ার ছেড়ে চীনাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিশ্চয় আমায় কিছু বলতে চান। তাঁর পেছন পেছন পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলাম।

দেয়াল-ঢাকা পর্দ্দা অবধি গিয়ে উনি থামলেন—অদ্ভুত শব্দ পাচ্ছি বুকে।

ফুসফুসের ছ্যাঁদা নয়?

না।

ব্রঙ্কাইটিস? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চোখে জল এল।

না।

টি, বি'র কথা আমি জোর করে মন থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস বা ঐ জাতীয় রোগ হ'লে মা'কে আমি এ যাত্রা টেনে তুলতে পারব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এ যে রাজরোগ, তাছাড়া হয়ত অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। মনে হ'ল পা'দুটোয় দাঁড়াবার মত জোর নেই—

আপনি যে আওয়াজের কথা বললেন, সেটা কি খুব খারাপ? তখন আমি অসহায় ভাবে কাঁদছি।

ডান, বাঁ দু-দিকের সবটুকু ছেয়ে গেছে।

কিন্তু মাকে তো এখনও দিব্যি সুস্থ দেখায়? কেমন তৃপ্তি করে খান?

কোন উপায় নেই মা!

এ সত্যি নয়, এ হতেই পারে না। মা'কে যদি প্রচুর পরিমাণে মাখন, ডিম, দুধ খাওয়াই তবে নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন—তাই না? যে পর্য্যন্ত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আছে, তত দিনে তাঁর জ্বর ছেড়ে যেতে বাধ্য;—কি বলেন?

তাঁর যা প্রাণ চায় তাই প্রচুর পরিমাণে খেতে দেবে।

আমি তো তাই বলছি এতক্ষণ। দিনে মা পাঁচখানা করে টমাটো খান।

টমাটো ভাল জিনিষ।

তবে ভাবনার কি আছে? মা তো সেরেই উঠবেন!

এ রোগ মারাত্মক দাঁড়াতে পারে। তোমার আগে থেকে জানাই ভাল।

জীবনে আজ প্রথম জানলাম যে, দুনিয়াতে কতগুলি জিনিষ আছে। যাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার এমন এক দুর্লঙ্ঘ্য নিরাশার প্রাচীর তৈরী হয়, যার সামনে মানুষের সকল শক্তি ব্যর্থ।

দু'বছর? তিন বছর? কাঁপাগলায় ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলাম।

বলা যায় না। মোট কথা এর কোন রাস্তা নেই।

নাগাওকা গরম জলের ঝরণার জায়গায় সেদিন কি যেন কাজের কথা আছে, সেই সব বিড়বিড় করতে করতে ডাক্তার মিয়াকে চলে গেলেন। আমি ফটক অবধি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর আচ্ছন্নের মত মায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালাম। যেন কিছুই হয়নি, মুখে এমনি এক হাসি টেনে আনলাম, কিন্তু মা জিজ্ঞেস করলেন—ডাক্তার কি বলে গেলেন?

তাঁর মত তোমার জ্বরটা ছেড়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বুকের কথা কি বললেন?

বোধ হয় বিশেষ কিছু নয়। তুমি এর আগে একবার যেমন ভুগেছিলে, তেমনি কিছু একটা হবে। আমি জানি ঠাণ্ডাটা একবার পড়ে গেলে তুমি ঝেড়ে উঠবে।

নিজের মিথ্যা কথাগুলি যেন নিজের কাছে সত্যি হয়ে দাঁড়াল। ঐ ভয়ানক মারাত্মক শব্দটা ভুলে থাকতে চাইলাম। মনে হ'ল মা মারা গেলে আমার শরীর থেকে সব মাংস গলে পচে বেরিয়ে যাবে। দৃঢ় সঙ্কল্প করলাম, এখন থেকে মায়ের জন্য সব রকম সুস্বাদু খাবার তৈরী করাই হবে আমার সাধনা।

চীনাঘর থেকে আরামচেয়ার বারান্দায় টেনে এমন জায়গায় পাতলাম, যেখান থেকে মাকে স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁর মুখে চোখে অসুস্থতার লেশমাত্র নেই। চোখ দুটি উজ্জ্বল, গায়ের ত্বক সতেজ মসৃণ। জ্বরটা আসে ঠিক বিকেলের মুখে।

মনে মনে ভাবলাম, মাকে কি সুন্দর দেখায়! আমি ঠিক জানি মা আবার ভাল হ'য়ে উঠবেন। মন থেকে ডাক্তার মিয়াকে'র রোগ বিশ্লেষণের কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেললাম।

কল্পলোকে অক্টোবরের ছবি, পূর্ণ প্রস্ফুটিত ক্রিসান্থিমামের ছবি এঁকে গেলাম। অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমের ঘোরে কখন যে এক পটভূমিতে নেমে এসেছি—টের পাইনি। স্বপ্নে আমার এ জায়গার সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু বাস্তবিক কখনও এমন জায়গায় যাইনি। যেন আমি বনের মধ্যে এক হ্রদের ধারে পৌছে পরিচিত স্থান দেখে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এক জাপানী ছেলের পাশে পাশে নিঃশব্দে চলেছি। সারা দৃশ্যপট সবুজ কুয়াশায় ঢাকা, পলকা এক সাদা পুল জলের তলায় ডুবে আছে।

ছেলেটি বলছে—পুলটা ডুবে গেছে। আজ আর আমাদের কোথাও যাওয়া চলে না। এস এখানে হোটেলে গিয়ে উঠি। নিশ্চয়ই একখানা খালিঘর পাওয়া যাবে।

হ্রদের প্রান্তে এক হোটেল। তার পাথরের দেওয়ালগুলো সবুজ কুয়াশাচ্ছন্ন। পাথরের ফটকের গায়ে সোনার জল দিয়ে লেখা

রয়েছে—হোটেল সুইজারল্যাণ্ড। এস, ডব্লিউ, আই অবধি পড়ে হঠাৎ মায়ের কথা মনে হল। না জানি কেমন আছেন এখন, মনের মধ্যে অস্বস্তি, এই হোটেলেই আছেন কি না কে জানে! সেই যুবকের সঙ্গে ফটক পেরিয়ে সামনের বাগানে ঢুকে পড়লাম। হাইড্রেনজিয়ার মত মস্ত মস্ত লাল ফুল থোঁয়াটে বাগান আলো করে আছে।

ছেলেবেলার আমার বিছানায় চাদরের ওপর টুকটুকে লাল রং-এর সুতো দিয়ে হাইড্রেনেজিয়ার প্যাটার্ণ তোলা ছিল। সেগুলো দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু এখন মনে হল বোধ হয় হাইড্রেনজিয়া ফুল লালও হয়।

তোমার শীত করছে না তো?

সামান্য, আমার কান দুটো কুয়াশায় ভিজে উঠেছে আর শরীরের ভেতরটা জমে যাচ্ছে।

হেসে উঠে ওকে প্রশ্ন করলাম, মা কেমন আছেন কে জানে!

ছেলেটির ম্লান হাসির মধ্যে বিষাদ ও সহানুভূতির ছায়া। তিনি তাঁর কবরে স্থান লাভ করেছেন।

আমি আর্ত্তনাদ করে উঠলাম। তবে ঠিকই হয়েছে। মা আর আমাদের মধ্যে নেই। শ্রান্তি-শান্তি চুকে গেছে। মায়ের মৃত্যুর এই দুঃস্বপ্নে অবর্ণনীয় নিঃসঙ্গতায়, আমার সারা দেহে ঝাঁকুনি লেগে চোখ খুলে গেল।

এতক্ষণে গোধূলির আলো বারান্দায় নেমে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে। প্রতিটি জিনিষে স্বপ্নে দেখা সবজের ছোঁয়া।

মা—ডাক দিলাম আমি।

স্বভাব-শান্ত কণ্ঠে মা জবাব দিলেন—কি করছ ওখানে?

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে মা'র পাশে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মা!

আমি এতক্ষণ ভেবে মরছি না জানি তুমি কি কাজে ব্যস্ত। টানা ঘুম দিয়ে নিলে—কি বল? আমার অবস্থা দেখে মা কৌতুক বোধ করলেন।

মায়ের রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম তিনি যে বেঁচে আছেন আজও, এর জন্য কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এল।

দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করলাম সান্ধ্যভোজের জন্য কি আদেশ রাণীমা?

কিছু দরকার নেই। আজ আর কিছু খাব না, জ্বর ১০৩° ডিগ্রি উঠেছিল।

আনন্দের ভেতর থেকে কে যেন আমায় অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কি করব কোন দিশা না পেয়ে ঘরের আধো অন্ধকারে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। আর আমি বাঁচতে চাই না।

তা কেন হবে? ১০৩' ডিগ্রি?

ও কিছু নয়। জ্বর আসার মুখে একটা কষ্ট হয়। মাথা ব্যথা করে, শীত-শীত ভাব হয়—তার পরেই জ্বরটা নামে।

বাইরে এতক্ষণে আঁধার নেমেছে। বৃষ্টি ধরে গেছে, কিন্তু হাওয়া রয়েছে।

আলো জ্বেলে খাবার ঘরে যাবার মুখে মায়ের ডাক কানে এল—আলোটা বড্ড চোখে লাগছে। নিবিয়ে দাও তো মা!

কিন্তু এই অন্ধকারে কি করে শুয়ে থাকবে? সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম।

তাতে কিছু এসে-যায় না। ঘুমোলে চোখ তো বন্ধই থাকে, অন্ধকারে একটুও খারাপ লাগে না। এর পর থেকে এঘরে আর আলো জ্বেলোনা—কেমন?

মায়ের কথায় মনের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। দ্বিতীয় কথা না বলে বাতি নিবিয়ে দিলাম। পাশের ঘরে একটা বাতি জ্বেলে। নিঃসঙ্গতার অসহ্য ভারে জর্জরিত হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলাম। সেখানে ঠাণ্ডা ভাতের সঙ্গে টিনের সামন মাছ খেতে বসে চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল।

রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে বাতাসের জোর বেড়ে গেল এবং রাত নয়টা আন্দাজ প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে আঝোরে বৃষ্টি নামল। বারান্দার জানালার পাখিগুলো দিন দুই আগে আমি গুটিয়ে তুলেছিলাম, এখন সেগুলো বাতাসে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। মায়ের পাশের ঘরের অদ্ভুত এক উত্তেজনা নিয়ে রোজা লাক্সেমবার্গের অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা Introduction to Economics পড়তে বসলাম। নাওজির ঘর থেকে এ বইখানা ধার করে এনেছি। (সে অবশ্য একথা জানে না।) তাছাড়া লেনিনের শ্রেষ্ঠ রচনা (Selected works of Lenin) এবং কাটুস্কীর সামাজিক বিপ্লবও (Social Revolution) সঙ্গে ছিল। আমার ডেস্কের ওপর সব জড়ো করা ছিল। একদিন সকালে এই ডেস্কের পাশ দিয়ে কলঘরে যাবার সময়ে মা একখানা বই তুলে নিয়ে ভেতরে চোখ বুলিয়ে বিষয়টা দেখে নিলেন। তারপর করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে ছোট করে নিশ্বাস ফেলে বইটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। তাঁর চোখে বিষাদের ছায়া টলমল করছে। কিন্তু সে দৃষ্টির ভেতর নিষেধ ছিল না বা দরদের লেশমাত্র অভাব ছিল না। মায়ের প্রিয় বইগুলি ছিল হিউগোর রচনা, 'ডুমার' 'পেয়ের এল ফিল' (Pe're el fils) মুসেং এবং দোদে, কিন্তু আমি জানতাম এই সব মধুর প্রেমের উপন্যাসগুলিতেও বিদ্রোহের গন্ধ ছিল।

মায়ের মত যাঁরা 'ভগবান দত্ত শিক্ষা' নিয়ে জন্মেছেন জানি আমার কথা তাঁদের কাছে অদ্ভুত ঠেকবে। তাঁরা বিপ্লবকে অত্যন্ত সহজ মনে, সাধারণ ব্যাপার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এমন কি রোজা লাক্সেমবার্গ-এর বই এর মধ্যেও আমি আপত্তিকর উক্তি পেয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মত লোকের মনে বইখানি যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেক করেছে। তাঁর বই-এর বিষয়বস্তু অর্থনীতি এবং সেই দিক থেকে বইখানি বাস্তবিক নীরস। এর ভেতর লেখক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। হতে পারে অর্থনীতি আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমার আগ্রহও কিছু নেই। 'মানব মাত্রেই লোভী এবং কোন দিনই লোভমুক্ত হ'তে পারে না'—এই অনুমানের উপর যে বিজ্ঞান ভর করে আছে, নির্লোভ মানুষের কাছে সে বিজ্ঞান অর্থহীন। কিন্তু তবু এ বই পড়তে পড়তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আমার উত্তেজনার সীমা থাকে না। কারণটা হ'ল এই—যে, চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে বিনা দ্বিধায় কুঠারাঘাত করার মত সৎসাহস লেখিকার আছে। নীতির বিরুদ্ধে মনে যতই বিদ্রোহ থাক না কেন, নিশ্চিন্ত নীড়ে ফেরা পাখীর মত আমার প্রেমাস্পদের সেই মমতাময়ী জীবনসঙ্গিনীর ছবিও তো চোখের ওপর থেকে মুছে ফেলতে পারি না। অতঃপর আমার মনে ধ্বংসের নেশা লাগে। ধ্বংসলীলা যেমন করুণ, বিষাদময়, তেমনি উপভোগ্য। ধ্বংস, নূতনের সৃষ্টি পরিপূর্ণতার স্বপ্ন! হয়ত বিনাশের পর নতুন

রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রকটা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রকটাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধবধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রকটা দেখলো তার-পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রকটা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমতন্নে যাবিনা ?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রকটা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রকটা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার সামনে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রকটা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি ? "ফ্রকটার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এমন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধমকালো—" তোর মাথা খারাপ

হল নাকি' এতটুকু বাচ্চাকে মারছিস। "মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রকটা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।"

ফ্রকটা নিয়ে আমি কলতলায় পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রকটাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো" মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি!"

"এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অন্য ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো, "কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"

আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে?"

"আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামা-কাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিশুদ্ধ যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয় না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—" সে কিরে, ভেবে দেখ, একটু ঘষলেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে এক গাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই সাদা ধব্‌ধবে করে। এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্ব্বনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।" তক্ষুনি আমি একটা সানলাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনায় ঢুপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধব্‌ধবে হলো। সন্ধ্যেবেলা নতুন কাচা ফ্রকটা পরে মুন্নিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগছিলো। আমি মুন্নিকে কপালে কাজলের টীপ, পরিয়ে দিলাম।

করে সৃষ্টি করার দিন না-ও ফিরে আসতে পারে। তবু প্রেমের উন্মাদনায় ধ্বংস আমায় করতেই হবে। বিদ্রোহের সূচনা করতে হবে। দুঃখের বিষয় রোজা (Rosa) তার অভিন্ন হৃদয়ের প্রেম মার্ক্সবাদে সমর্পণ করে বসে আছে।

বারো বৎসর আগের এক শীতকাল। সারাশিনা ডায়রীর (Sarashian Diary) মেরুদণ্ডহীন মেয়েটির মত তুমি কখনও মুখ খোল না। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ভার।

এই বলে আমার বন্ধুটি এগিয়ে গেল। এইমাত্র আমি তাকে লেনিনের একখানা বই না পড়েই ফেরৎ দিলাম।

বইটা পড়লে?

অত্যন্ত দুঃখিত, পড়িনি।

একটা পুলের কাছ থেকে টোকিও রাশিয়ান অর্থোডক্স কেথিড্রাল (Tokyo Russian Orthodox Cathedral) দেখা যায়, তারই ধারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কেন কি হল?

বন্ধুটি আমার মাথার ওপর এক ইঞ্চি লম্বা ছিল আর অনেক দেশের ভাষা জানত। লাল টুপীটা তাকে চমৎকার মানিয়েছিল। মেয়েটি ছিল অপূর্ব্ব সুন্দরী! মোনালিসার মত অপূর্ব্ব চেহারা বলে তার নাম-ডাক ছিল।

মলাটের রংটা আমার বিশ্রী লাগল।

অবাক করলে যে! আসলে ওটা কোন কারণ নয়। তুমি আমায় সন্দেহ করতে শুরু করেছ, তাই না?

না সন্দেহ আমার নেই, মলাটের রংটা আমার সহ্য হল না তাই।

তাই নাকি? সখেদে বলে উঠল মেয়েটি এবং এর পরই আমায় সারাশিনা ডায়রীর মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে। আমার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। দুজনে খানিক চুপ করে শীতের নদীর দিকে চেয়ে রইলাম।

বিদায়, যদি এই হয় আমাদের শেষ দেখা! বিদায়, বন্ধু বিদায়। বায়রণ; নিজের মনে গুনগুনিয়ে বায়রণের কবিতার পদগুলি আবৃত্তি করে গেল। তারপর আমায় আলগোছে আলিঙ্গন করল।

নিজের প্রতি ধিক্কারে মন ভরে গেল: ফিসফিস করে একটা কি অজুহাত দিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হলাম। একবার পেছন ফিরে দেখি বন্ধুটি তখনও সেখানে সেই ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমরা দু'জনে দুই স্কুলে পড়লেও একই বিদেশী টিচারের কাছে ভাষা শিখতে যেতাম।

তারপর বারো বছর কেটে গেছে। সারাশিনা ডায়রীর অবস্থা পেরিয়ে আমায় আরও এক পা অগ্রসর হতে হয়েছে। এতকাল ধরে আমি কি করলাম তবে? বিদ্রোহের প্রতি আমার আসক্তি নেই, নেই ভালবাসার দিকে ঝোঁক। দুনিয়ার বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা চিরদিন বিদ্রোহ ও প্রেমই এই দুটি অনুভূতিকে মানব-মনের হীনতম প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের আগে, এমন কি যুদ্ধের সময়ই আমরা সেকথা বুঝেছি।

পরাজয়ের পর থেকে প্রবীণ বিজ্ঞদের ওপর আস্থা আমরা হারিয়েছি। এবং তাঁরা যা বলেন তার বিপরীতটাকেই মূল্য দিতে শিখেছি। বাস্তবিক বিদ্রোহ ও প্রেমের মধ্যেই দুনিয়ার সেরা আনন্দের বাসা। সেই সঙ্গে একথাও বুঝেছি যে ঠিক এই কারণেই জ্ঞানী বৃদ্ধেরা হিংসা-পরবশ হয়ে তিক্ত দ্রাক্ষাফলের মত মিথ্যা দিয়ে আমাদের প্রতারণা করতে চেয়েছেন। আমি চোখ বুঁজে এই কথাই বিশ্বাস করতে চাই যে, প্রেম ও বিদ্রোহের জন্যই মানুষের জন্ম।

হঠাৎ দরজার ফাঁকে মায়ের হাসিমুখ দেখা গেল। ঘুমওনি এখনও? ঘুম আসছে না—না? ডেস্কের ওপর ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি বারোটা বেজে গেছে। না আমার একটুও ঘুম আসছে না; সমাজতন্ত্রের ওপর একখানা বই পড়ে মাথা গরম হয়ে আছে।

ও! আচ্ছা বাড়ীতে কোনরকম ড্রিংক নেই—না? এরকম অবস্থায় শোবার আগে এক গেলাস কিছু খেয়ে নিলে ভাল হয়।

সুন্দর ঘুম আসে। মায়ের গলার স্বরে, কথার ঢং-এ কেমন যেন মন-গলানো ভাব।

শেষ পর্য্যন্ত অক্টোবর এল কিন্তু আকাশে-বাতাসে তেমন করে হঠাৎ সোনার রং লাগলো না। বরং বর্ষাকালের মত এক এক করে অনেকগুলি স্যাঁৎস্যাঁতে দিন পেরিয়ে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় মায়ের জ্বর একশ'র কিছু ওপরে লেগে রইল।

এক সকালে হঠাৎ একটা জিনিষ লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেলাম। মায়ের হাতখানা ফুলে উঠেছে। তাছাড়া সকালের খাবারটুকু মা চিরদিনই যত্ন করে খান, কিন্তু ইদানীং সকালের দিকে নামে মাত্র ভাতের কাথ মুখে দেন। কড়া গন্ধযুক্ত কোন খাবার খেতে পারেন না। সেদিন সুপের ভেতর ব্যাঙের ছাতার গন্ধ পর্য্যন্ত সইতে পারলেন না।

সুপটা মুখে তুলে, না চেখেই ট্রের ওপর নাবিয়ে রাখলেন। সেই সময়ে আমার নজর পড়ল মার ডান হাতখানা ফোলা।

মা, তোমার হাতে কি হল?

মুখখানাও কেমন যেন সাদাটে ফোলা-ফোলা লাগল—ও কিছু নয়, এটুকু ফোলায় কিছু এসে যাবে না।

ক'দিন হল এমন হয়েছে?

মা কোন উত্তর দিলেন না, মুখে চোখে কেমন আচ্ছন্ন ভাব। আমার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল—ও হাতখানা কিছুতেই আমার মায়ের নয়। মার হাতটি কত সুন্দর, ছোট্ট। চিরপরিচিত, সুকোমল সে হাত যে আমার পরম আদরের ধন। আমি অবাক হয়ে ভাবি মায়ের সে হাতখানা কি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হল? বাঁ হাতখানা এখনও অবিকৃতই আছে। কিন্তু আর যে আমি মায়ের দিকে চেয়ে থাকতে পারি না! চোখ ফিরিয়ে ঘরের কোণে রাখা ফুলের ঝুড়িটার দিকে তাকাই।

টের পাচ্ছি চোখের জল রুখতে পারব না। অসহ্য হওয়ায় হঠাৎ-ই রান্নাঘরের দিকে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, নাওজি একখানা নরম সেদ্ধ ডিম খাচ্ছে। কচিৎ কখনও বাড়ীতে এলে, রাতটা ও মাসীর ওখানে মদ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। সকালে বাড়ী এসে রান্নাঘরে ঢুকে গোমড়া মুখ করে বসে নরম সেদ্ধ ডিম খায়। এই একমাত্র খাবার যা সে খুশিমনে খায়। তারপর দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে সারাটা দিন বিছানায় শুয়ে, বসে কাটিয়ে দেয়।

মাটির দিকে চোখ নাবিয়ে বললাম,—মায়ের হাতখানা ফুলে

উঠেছে। আর বলতে পারলাম না, কান্নায় সারাদেহ কেঁপে উঠছে, নাওজ্জি কোন উত্তর দিল না।

এবার আমি মুখ তুলে চাইলাম,—সব শেষ হয়ে এল। তুমি লক্ষ্য করনি? ওরকম ফুলতে সুরু হলে, আর কোন আশা থাকে না। টেবিলের প্রান্ত শক্ত মুঠোর ধরে দাঁড়িয়েছিলাম কোন মতে। নাওজ্জির মুখে মেঘ ঢেকে এল—আর দেরী নেই। এ কি হ'ল! কি মুস্কিল!

মাকে আমি বাঁচাতে চাই। যেমন করে হোক মা'কে ফিরে পেতেই হবে। নিজেই নিজের হাত দুটি নিষ্পেষিত করে বললাম। হঠাৎ নাওজ্জি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—দেখছ না মা, এখন আমাদের হাতের বাইরে। কিছু করার সাধ্য কি? জোরে জোরে হাতের মুঠি দিয়ে চোখ কচলাতে লাগল। সেদিন নাওজ্জি টোকিওতে ওয়াদা মামাকে খবর দিতে এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থার নির্দ্দেশ নিতে চলে গেল। মায়ের পাশে থেকে যে সময়টুকু উঠে আসতে হ'চ্ছিল, তার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কেঁদে কেটেছে। সকালের কুয়াশা ভেদ করে দুধ আনতে যাবার সময়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধার সময়ে, প্রসাধন করার সময়ে সারাক্ষণ শুধুই কেঁদেছি। মায়ের সঙ্গে আমার আনন্দের দিনগুলি, বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনা চোখের ওপর দিয়ে ছবির মত ভেসে গেল। কান্নার কোন সীমা, কোন সার্থকতা ছিল না তখন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় চীনাঘরের সামনে বসে সমানে কেঁদেছি। শরৎ-আকাশে তারার শোভা, পায়ের কাছে না জানি কার এক বেড়াল চুপ করে গুটিয়ে পড়ে আছে।

পরদিন মায়ের হাতের ফোলা আরও বেড়ে গেল। খাবার সময়ে মোটে কিছুই খেলেন না। কমলার রস পর্য্যন্ত গলার ব্যথায় গিলতে পারলেন না।

মা, নাওজ্জির ব্যবস্থা মত সেই মুখ ঢাকা আবার কিছুদিন পরে দেখবে? হাসি দিয়ে কথাগুলো ভেজাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনের উদ্বেগ চাপা রইল না।

শান্তস্বরে মা বললেন—দৈনিক কাজের ভারে তোমার শরীরপাত হচ্ছে। আমার জন্যে নার্সের ব্যবস্থা কর। বুঝলাম তাঁর নিজের চেয়েও আমার চিন্তা বেশী এবং এতে আরও বেশী করে মন খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরের খানিক পরে নাওজ্জি ডাক্তার মিয়াকে এবং এক নার্স সঙ্গে নিয়ে এল। বৃদ্ধ ডাক্তার সাধারণতঃ হাসিঠাট্টা করতে ভালবাসেন, কিন্তু এখন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সোজা রোগীর ঘরে ঢুকে পরীক্ষা সুরু করলেন। কাজ শেষ করে নিজের মনেই বললেন, বেশ কাহিল হয়েছেন। বলে একটা কর্পূরের ইন্‌জেকশন দিলেন।

প্রলাপের ঘোরে মা প্রশ্ন করলেন—ডাক্তারবাবু আপনার থাকবার জায়গা আছে?

নাগাওকাতে যেতে হবে আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আপাততঃ পরের কথা ছেড়ে নিজের বিষয় একটু ভাবুন, যা ভাল লাগে বেশী বেশী করে খান। পুষ্টিকর খাবার খেলে সেরে ওঠা শক্ত হবে না। আমার নার্স রেখে গেলাম, প্রয়োজন মত এর সেবা নিতে দ্বিধা করবেন না।

মায়ের বিছানার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে কথাগুলি বলে ইশারায় নাওজ্জিকে কাছে ডাকলেন। নাওজ্জি নিজেই ফটক পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেল। যখন সে ফিরে এল, তার মুখ দেখে বুঝলাম, সে কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা নিঃশব্দে খাবার ঘর ছেড়ে রোগীর ঘরে এলাম।

আর কি কোন আশাই নেই, উনি কি বললেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে বিকৃত হাসিতে নাওজ্জির ঠোঁট কেঁপে উঠল—এ আর সহ্য হয় না; আগের চেয়ে অনেক বেশী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবুর মত আর দু-একদিনের বেশী নয়। বলতে বলতে ওর চোখ দু'টি জলে ভরে এল।

আমি বললাম,—সবাইকে টেলিগ্রাম করা দরকার বোধ হয়। আশ্চর্য্য। কেমন করে যেন নিজের ওপর দখল ফিরে এসেছে।

ওয়াদামামার সঙ্গে কথা হল, উনি বললেন—আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এতবড় আয়োজন করা সম্ভব নয়। ধর যদি মানুষজন এসে উপস্থিত হয়—আমাদের এটুকু বাড়ীতে তাঁদের ঠাঁই দেবে কোথায়? এছাড়া ভাল হোটেলপত্তর কিছুই নেই এখানে। তাঁর কথার ভাবে বুঝলাম আমাদের পরিবারের মহামহারথীদের নিমন্ত্রণ করার কথা আমাদের ভাবা উচিত নয়। ওয়াদামামা শীগ্‌গিরই আসছেন। কিন্তু উনি চিরকালই এত কৃপণ যে ওঁর কাছে কোন সাহায্য আশা করা যায় না। গত রাতের মত অমন দুঃসময়েও উনি মায়ের অসুখের কথা ভুলে গিয়ে আমায় মর্মান্তিক এক বক্তৃতা শোনালেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই, যেখানে কৃপণের বক্তৃতায় অজ্ঞান আলোর সন্ধান পেয়েছে। এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ, মার কথা তো ছেড়েই দিলাম। ওঁকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন থেকে আমার যদি না-ও হয়, তোমায় তো তাঁর ওপরই ভরসা করতে হবে।

কক্ষণো না, বরং ভিক্ষে করে খাব। বোনটি আমার, তোমাকেই ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে।

আমি—চোখে জল ভরে এল—আমার যাবার জায়গা আছে।

বিয়ে করবে? ঠিক হয়ে গেছে?

না।

স্বাধীন জেনানা? চাকরী করবে? হাসিও না বাপু!

না, চাকরী নয়, বিদ্রোহ করব।

কী? অদ্ভুত চোখে নাওজি আমার দিকে তাকাল। ঠিক এই সময়ে নার্সের গলা পেলাম—আপনাকে মা ডাকছেন।

ছুটে গিয়ে মায়ের পাশে বসলাম। মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে মা? মা চুপ করেই রইলেন—কিন্তু আমি বুঝলাম কি যেন বলার চেষ্টা করছেন।

জল?

ঈষৎ মাথা নেড়ে মা বললেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেই খুব আস্তে বললেন—স্বপ্ন দেখছিলাম।

কেমন স্বপ্ন?

সাপের বিষয়।

শিউরে উঠলাম আমি।

আমার বিশ্বাস, সামনে গাড়ীবারান্দার সিঁড়িতে লাল ডোরাকাটা সাপিনী এসেছে। দেখতো গিয়ে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেলাম আমার সারা দেহ হিম হয়ে গেছে। বারান্দা অবধি গিয়ে কাচের দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকালাম। সিঁড়ির ওপর নিশ্চিন্ত দেহ এলিয়ে শরতের সূর্য্যকে উপভোগ করছে এক সাপিনী। আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

তোমায় আমি চিনি। শেষ তোমায় যা দেখেছি, তার চেয়ে তুমি বড় হয়েছ, বুড়ো হয়েছ, কিন্তু তুমি সেই ডিমেদের মা, যাদের আমি একদিন পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিলাম। তোমার প্রতিশোধ তো আমার উপর দিয়ে নিলে, এবার তুমি দূর হও।

সাপিনীর ওপর দৃষ্টিবদ্ধ করে আমি মনে মনে এই প্রার্থনা করলাম, কিন্তু তার এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। কেন জানি না, নার্সের চোখে পড়ে এটা আমার ইচ্ছে ছিল না। সেইজন্য অনাবশ্যক জোরে মাটিতে পা ঠুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেঁচিয়ে বললাম—না, মা এখানে তো কোন সাপ দেখছি না। ও তোমার ভুল স্বপ্ন। আবার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণে নড়েচড়ে সাপটা চলে যাচ্ছে।

আর কোন আশা নেই, কোন আশাই না। সাপটা নজরে পড়ার পর থেকে আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। আমি জানতাম বাবার মৃত্যুর সময় একটা কালসাপ বিছানার পাশে দেখা গিয়েছিল, আমি নিজেই বাগানের সমস্ত গাছে সাপ জড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

মনে হল মা বিছানায় উঠে বসার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন এবং সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন। আমি নার্সকে মায়ের সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছি। খাবার তাঁর গলা দিয়ে প্রায় নাবে না। সাপটা চোখে দেখার পর সমস্ত উদ্বেগ কেমন যেন গলে গিয়ে স্বস্তি বোধ হ'ল। দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গিয়ে শান্তি পেলাম। আমার একমাত্র কাজ, এখন মায়ের পাশে যতটা সম্ভব সময় কাটানো।

পরদিন সারাক্ষণ মায়ের পাশে বোনা নিয়ে ব'সে রইলাম। সেলাই বা বোনায় আমার বেশীর ভাগ লোকের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত চলে, কিন্তু খুব ভাল কিছু একটা করতে পারি না। মা আমায় সর্ব্বদাই বোনার মধ্যে কাঁচা-কাজের জায়গাগুলি দেখিয়ে দিতেন। সেদিন বোনাটা আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু সারাদিন ঐভাবে মায়ের পাশে বসে কাটানোয় তাঁর মনে কোন সন্দেহ না হয়; সেই জন্য উলের বাক্স নিয়ে আড় হয়ে বসে বুনতে লাগলাম। যেন দুনিয়ায় এ ছাড়া আমার কোন চিন্তাই নেই।

মা আমার হাতের দিকে চেয়ে রইলেন—তোমার নিজের মোজা—না? মনে রেখো লম্বার দিকে আটটা করে না বাড়ালে পরার সময়ে আঁট লাগবে।

ছেলেবেলায় মা হাজার সাহায্য করলেও কিছুতেই আমি ঠিক বুনতে পারতাম না। আজও সেই রকম বোনা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, কিন্তু এর পর আর কোন দিনও মা আমার ভুল ধরিয়ে দেবেন না মনে হ'তেই বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। চোখের জলে বোনা দায় হ'ল। মা'কে ঐভাবে শুয়ে থাকতে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে, তাঁর শরীরে কোন কষ্ট আছে। সকাল থেকে কিছুই খাননি আজ, সারা দিন থেকে থেকে শুধু গজ (Gauze) কাপড় চায়ে ডুবিয়ে তাঁর ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে দিচ্ছিলাম। যাই হোক, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিল এবং মাঝে মাঝে শান্ত গলায় কথা বলছিলেন, খবর কাগজে সম্রাটের একটা ছবি দেখেছিলাম, আর একবার দেখি ছবিখানা।

কাগজের ঐ অংশটা মায়ের মুখের ওপর তুলে ধরলাম।

বুড়ো হয়ে গেছেন।

না, ছবিটা ভাল ওঠেনি। সেদিন অন্য একখানা ছবিতে দেখলাম, দিব্যি হাসিখুশি তরুণ চেহারা। বোধ হয় আজকাল আগের তুলনায় ভালই আছেন।

কেন?

তিনি তো এখন মুক্ত, স্বাধীন।

করুণ হেসে মা বললেন—কাঁদতে চাইলেও আজকাল আমার কান্না আসে না।

হঠাৎ মনে হ'ল এখন মায়ের খুশি হবার পালা এসেছে। শোকের প্রবাহে নিমজ্জিত সুখের অস্পষ্ট সোনালী ঝিলমিলির মত এই সুখের অনুভূতি। সকল দুখের বন্ধন অতিক্রম করে এই যে ক্ষীণ আলোর আভাস, এই তো সুখ! আমাদের সম্রাট, আমাদের মা জননী, এমন কি আমি নিজে পর্য্যন্ত এই সুখের পরশ পেয়ে ধন্য।

শরতের প্রভাত শান্ত, স্থির। সূর্য্যালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শে মনোরম উদ্যান শোভা! বোনা নাবিয়ে রেখে দূরে উজ্জ্বল সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে বললাম—মা, এতদিন আমি সংসারের বিষয় কিছুই জানতাম না। আরও অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঘরের কোণে নার্স একটা 'ভেন ইনজেকশন' তৈরী করছিল, পাছে তার কানে যায় এই ভেবে লজ্জায় কথার মাঝে চুপ করে গেলাম। আমার কথার খেই ধরে স্মিতহাস্যে মা বললেন—তুমি যে বললে 'এতদিন', তার মানে এখন তুমি সংসারকে চিনেছ?

আমার মুখখানা অসম্ভব লাল হয়ে উঠল। আমি কিন্তু আজও চিনি না—বলে মা অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

আমিও বুঝি না, জানি না কে বোঝে? সময়ের মনে সময় বয়ে যায়, আমরা ছেলেমানুষ থেকে যাই। কিছুই বুঝি না আমরা।

বাঁচতে আমায় হবেই, বলতে পারেন ছেলেমানুষী, তবু সহজ প্রাণে একে মেনে নেওয়াও শক্ত। এখন থেকে দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হবে। মনে হ'ল যাঁরা সৌন্দর্য্যের ভেতর দিয়ে, শোকের ভিতর দিয়ে কারুর সঙ্গে বিবাদ না করে, কাউকে ঘৃণা না করে, প্রতারণা না করে জীবন যাপন করে গেছেন—মা তাদেরই শেষ নিদর্শন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এমন লোকের ঠাঁই হবে না। মৃত্যুপথযাত্রীরা সুন্দরের প্রতীক, কিন্তু বেঁচে থাকা, টিঁকে থাকা এ ব্যাপারগুলো ক্রমশঃ দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়ে গেল গর্ভবতী সর্পিণীকে একবার মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়তে দেখেছিলাম। আমি মাটিতে শুয়ে সেইভাবে শরীরটাকে গুটিয়ে নিলাম। কিন্তু এমন কিছু আছে যার কাছে আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব। বলতে পার আমি নীচাশয় তবুও আমায় বাঁচতেই হবে, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য দুনিয়াতে টিকে থাকতেই হবে। এখন যখন স্পষ্ট বুঝলাম, মায়ের আয়ু ফুরিয়েছে, আমার মন থেকে প্রেম, ভাবপ্রবণতা বাষ্পের মত উবে গেল, মনে হল দিন দিন আমি স্বার্থপর, অনাচারী হয়ে উঠছি।

দুপুরের পরে আমি মায়ের ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছি, এমন সময় ফটকের কাছে একটা গাড়ীর শব্দ পেলাম। ওয়াদামামা ও মামীমা এসেছেন টোকিও থেকে। মামা সোজা রোগীর ঘরে ঢুকে রোগীর পাশে বসলেন। মা রুমাল দিয়ে মুখের নীচের দিকটা ঢেকে মামার মুখের ওপর চোখ রেখে কাঁদতে লাগলেন কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জলও এল না। মাকে দেখে আমার পুতুল বলে মনে হল।

নাওজি কোথায়? কিছুক্ষণ পরে আমায় জিজ্ঞেস করলেন। আমি দোতলায় গিয়ে দেখি নাওজি সোফায় শুয়ে বই পড়ছে।

মা তোমায় ডাকছেন.—বললাম আমি।

কিন্তু? আবার সেই ভয়াবহ শোকের দৃশ্য! হে বীরহৃদয়া, ক্ষীণ অনুভূতিসম্পন্না নারী, ধৈর্য্য ধরে তোমার কর্ত্তব্য পালন করো, আমাদের মত তাপিত ব্যক্তি যাদের প্রাণ চায়, চক্ষু না চায় তাদের পক্ষে মায়ের পাশে বসে থাকা অসম্ভব। জামা গায়ে দিয়ে আমার সঙ্গে নীচে নেমে এল।

দুই ভাই বোনে গিয়ে মায়ের দুপাশে বসলাম। হঠাৎ চাদরের নীচ থেকে হাত বের করে প্রথমে নাওজি, পরে আমার দিকে নির্দ্দেশ করে অনুরোধের ভঙ্গীতে জোড়হাতে মামার দিকে তাকালেন।

উদার ভাবে ঘাড় নেড়ে মামা সান্ত্বনা দিলেন—হ্যাঁ, বুঝেছি, আমি বুঝেছি।

এই শেষ কথাটি বলে পরম নিশ্চিন্তভাবে হাত দুটি চাদরের ভেতর টেনে নিয়ে চোখ বুঁজলেন। আমি কাঁদছিলাম, নাওজিও চোখ নিচু করে ফোঁপাচ্ছিল। ডাক্তার মিয়াকে এসেই একটা ইনজেকশন দিলেন। মামাকে দেখে মা ধরেই নিলেন, তাঁর আর দেরী করে লাভ নেই। মুখে বললেন ডাক্তার বাবু, দয়া করে আমার ভবযন্ত্রণা শীগ্‌গির শেষ করুন। ডাক্তারের সঙ্গে মামার একবার চোখাচোখি হ'ল—দু'জনের মধ্যে কারুর চোখই শুকনো ছিল না।

খাবার ঘরে গিয়ে যা হোক একটু খাবার ব্যবস্থা করলাম। টোকিও থেকে মামা কিছু স্যাণ্ডউইচ এনেছিলেন—মা'কে দেখিয়ে বালিশের পাশে রেখে দিলাম—বিড়বিড় করে মা বললেন—তোমার ওপর দিয়ে যা ঝক্কি চলেছে।

চীনাঘরে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। মামা-মামীর টোকিওতে কি যেন কাজ ছিল, তাঁদের ফিরে যেতেই হল। মামা আমার হাতে খামে করে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। স্থির হ'ল তাঁরা ডাক্তারের সঙ্গেই ফিরবেন। ডাক্তার মিয়াকে ইতিমধ্যে নার্সকে পরবর্ত্তী চিকিৎসার কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ধরে নেওয়া গেল ইনজেকশনের গুণে মা আরও চার পাঁচদিন বেঁচে থাকবেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁর পুরো জ্ঞান ছিল, হার্টটাও বিশেষ জখম হয়নি।

সবাইকে ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মায়ের পাশে ফিরে এলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে মায়ের মুখে সর্ব্বদাই কেমন যেন দরদ ফুটে উঠত—তোমার ওপর দিয়ে খুব ঝড় ঝাপটা চলেছে। ফিসফিস করে আমায় বললেন। মুখখানা উত্তেজনায় ঝলমল করছে। মনে করলাম মামাকে দেখে খুশি হয়েছেন বুঝি!

এর পর মা আর কথা কননি। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শান্ত শরতের গোধূলি লগ্নে নার্স তাঁর নাড়ী দেখল; নাওজি, আমি, মায়ের দুই সন্তান আমরাও দেখলাম। জাপানের শেষ সম্ভ্রান্ত মহিলা আমাদের সুন্দরী মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাঁর অপরূপ মুখখানা মৃত্যুর করাল স্পর্শ বিকৃত করতে সাহস করেনি। বাবার মৃত্যুর পর দেখেছিলাম মৃত্যুর পর হঠাৎই তাঁর মুখখানা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মায়ের মুখখানা জীবিত কালের মতই সুন্দর রয়ে গেল। কেবল তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হ'ল, কিন্তু তাও এত শান্ত ভাবে গেল যে, আমরা টেরই পেলাম না। আগের দিনই মুখের ফোলাটা নেমে গিয়েছিল, এখন তাঁর গাল দুটি মোমের মত মসৃণ দেখাচ্ছে।

ঠোঁট দুটি যেন ঈষৎ হাসিতে স্ফুরিত হয়ে আছে। জীবিত কালের চেয়েও এখন অনেক বেশী লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল জননী মেরীর সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

শাস্ত্রশাসন রইল মাথায় তর্কে মিছে নাইকো ফল
বন্দরে ঐ দাঁড়িয়ে জাহাজ বেরিয়ে পড় বন্ধুদল।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

যীশুখৃষ্ট ও জাতিভেদ

মাতৃবিয়োগের ব্যক্তিগত বেদনা যখন আমি পেলাম, তখন আমার চারিদিক ঘিরে দুঃখ বেদনার অন্ত নেই। সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে নিগৃহীত ভারতীয়ের বেদনা। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আবার আরম্ভ হবে বলে মনে হচ্ছে। সেই শোক দুঃখ ক্ষণে খৃষ্টরাজ্য সম্বন্ধে এক নূতন ভাবনায় আমার চিত্ত আচ্ছন্ন হোলো. মনে হোলো খৃষ্টের মূর্তি স্পষ্টতর ভাবে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠেছে। আমি পিতৃদেবকে লিখলাম যে এখানকার সংগ্রাম শেষ হলেই আমি ইংলণ্ড হয়ে ফিরব। আমার এই কাজকে তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে সমর্থন করেছিলেন, তাঁর ও আমার মধ্যে মনের এমন নিবিড় সংযোগ বহু বৎসরের মধ্যে হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি জিনিষ আমার কাছে স্পষ্ট হোলো। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুচরবৃন্দের প্রচেষ্টার মধ্যে আমি খৃষ্টের আদর্শকে প্রত্যক্ষ করলাম, অন্যায়কে তাঁরা পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে বরণ করছেন, অশুভকে তাঁরা জয় করছেন শুভ দিয়ে। যীশুখৃষ্ট প্রচার করেছিলেন বিশ্বপ্রেম আর প্রাচীন ভারতে বুদ্ধ শুনিয়েছিলেন অনন্ত করুণার বাণী। আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে এই দুই মহামানবের শিক্ষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই চেতনায় একই আদর্শে একই ধারায় এই দুই শিক্ষা মানবসাধনা ও মানবভাগ্যের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সাধু জেমসের পত্রের সেই মহান বাক্যটি বারে বারে আমার মনে বাজতে লাগল,—

প্রতিটি শুভপ্রসাদ প্রতিটি মঙ্গলদান তাঁর কাছ থেকে প্রেরিত যিনি আলোকের পিতা। সকলকে যিনি সমভাবে আলো দেন, কোথাও আলো আর কোথাও ছায়া,—এ নয়।

দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুচরদের এই খৃষ্টাদর্শ প্রণোদিত আত্মদানের পাশাপাশি খৃষ্টীয় সমাজের এ কি আদর্শবিরোধী অন্যায় কার্য্যাবলী আমি প্রত্যক্ষ করলাম! প্রভু খৃষ্ট বলেছেন সুনীতির পরিচয় কথায় নয়, কাজে। বৃথা বাক্যে নয়, প্রকৃত কর্মের মধ্য দিয়েই চরিত্রের প্রকাশ। আমি ভাবলাম,—এই যারা অত্যাচারিত অখৃষ্টান আর যারা অত্যাচারী খৃষ্টান,—আমার প্রভু খৃষ্ট কোন্ দলে? ধর্মের পরীক্ষা কর্মের মধ্যে। যে ধর্ম শুধু বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বাক্য যতো প্রাচীনই হোক,—সেই ধর্ম বৃথা,—সেই বৃথা ধর্মকে খৃষ্ট রূঢ়ভাষায় অবজ্ঞা করে গেছেন। এই অন্তঃসারশূন্য ধর্মকথা-সর্বস্ব ধর্ম ছলচাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়,—এই খৃষ্টের বিচার!

জেনারাল স্মাটসের সঙ্গে আলোচনার জন্যে মহাত্মা গান্ধী যখন প্রিটোরিয়াতে অবস্থান করছিলেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল,—উন্মুক্ত আকাশের নিচে আমরা রাত্রে বিশ্রাম করতাম। অনেক রাত্রে আমার প্রথম দিকে ঘুম আসত না,—অসংখ্য তারকাখচিত বিপুল রহস্যমণ্ডিত সীমাহীন কৃষ্ণ আকাশের দিকে স্তব্ধ-বিস্ময়ে আমি তাকিয়ে থাকতাম। অনেক দিন আবার সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে ঘুম ভেঙে যেত। সমস্ত জগৎ তখন নিদ্রামগ্ন। প্রত্যূষ-পূর্বের সেই অচঞ্চল অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি একলা চুপ করে বসে থাকতাম। মনে মনে ভাবতাম,কি বিরাট এই সৌরজগৎ, তার অন্যতম গ্রহ এই পৃথিবীও কতো বিরাট! এই বিরাট বিশ্ব-মাঝে এই অনন্ত কালসমুদ্রে মানুষের জীবন কতো সামান্য, কতো ক্ষণিক। যেন অন্তহীন অন্ধকারে মুহূর্তস্থায়ী একটি শিখা। নিঃসীম জড়সমুদ্রে চৈতন্য-তরঙ্গের পলকস্থায়ী স্পন্দন! মানুষের জীবন সামান্য বলেই এতো মহার্ঘ, হ্রস্ব বলেই এতো মূল্যবান! সেই জন্যেই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে ঈশ্বরের কাজে ব্যয়িত করতে হবে এবং সেই কাজের নির্দেশ ও প্রেরণা দেবেন পরমপ্রভু খৃষ্ট।

চুক্তিদাসের মুক্তি আন্দোলনের উত্তেজনা চরম থেকে চরমতর হয়ে উঠছে। মহাত্মা গান্ধীর সহায়তায় আমি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছি! কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের নিভৃততর স্তর থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীর অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিত্বের রহস্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি। গান্ধীজি সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু অথচ তিনি পরম খৃষ্টান। খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী তাঁর চরিত্রে প্রকট, খৃষ্টের আদর্শে সমর্পিত তাঁর জীবন। এই বিষয়ে আমি অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলাম। আমার বন্ধু শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই পত্রাবলী মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মানুষ বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু মানবাত্মা এক। বিভিন্ন ধর্মমতে বাহ্যিক পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত আপাত পার্থক্যের প্রান্তে এক গূঢ় গভীর ঐক্য। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ইতিহাসের আদিম ঐক্য শুধু এ নয়, এই ঐক্যবোধ অন্তর্মুখী উপলব্ধির। সকল মানুষেরই এক পরম পিতা, তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানকেই সমানভাবে স্নেহ করেন, প্রতি সন্তানকে প্রেমের আকর্ষণে পরস্পরের

প্রতি ও তাঁর নিজের প্রতি টানেন। এই উপলব্ধি যদি সত্য হয়, মানুষে মানুষে ভাইএ ভাইএ ভেদাভেদের স্থান কোথায়?

ঈশ্বরের ও ঈশ্বর-প্রতিভূ যীশুর এই সর্বপ্লাবী করুণার সঙ্গে আমি কোনো প্রকারের সংকীর্ণ ধর্মোন্মাদনাকে একসূত্রে গাঁথতে পারিনি। আথানাসিয়াসের ঘোষণা সর্বদা আমার মুখে এসে বেধে গেছে। যারা খৃষ্টান নয়, তাদের মুক্তি নেই, অনন্ত নরকে তাদের স্থান, এই ঘোষণাকে আমি কখনো মেনে নিতে পারিনি, মেনে নিতে পারিনি যে ভারত ও চীনের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বিধর্মী বলে বর্বর, বিধর্মী বলে অন্ধকার তাদের জীবন, জীবনের অবসানে অন্ধ নরকে তাদের গতি।

খৃষ্টানদের এই ধরণের সংকীর্ণ বিশ্বাসকে খৃষ্টনামের অনুপযুক্ত বলে বহুদিন আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। এখন গান্ধীজিকে আমার আত্মার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে গ্রহণ করলাম, তাঁকে অকপটে খুলে বললাম আমার সমস্যার কথা। যে ঘোষণা অখৃষ্টানকে নরকযাত্রী করে, সেই ঘোষণা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিনে, অথচ খৃষ্টানযাজক হিসেবে উপাসনাক্ষেত্রে সেই ঘোষণাকে আমাকে উচ্চারণ করতে হয়, এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাব কেমন করে? মহাত্মা গান্ধী আমার এই সমস্যার কথা অতি নিবিষ্টভাবে শুনলেন, আমার দুর্বল অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, বরং তিনি ধৈর্য ধরবার উপদেশই দিলেন। বললেন,—এমন দিন আসবে যেদিন খৃষ্টসেবার উদারতর ক্ষেত্রে আপনিই আমার আহ্বান আসবে, সেদিন ধর্মীয় অনুশাসনের শীর্ণ গণ্ডী আপনিই আমি অতিক্রম করতে পারব। লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে শ্রীযুক্ত গোখেলের সঙ্গে এই একই বিষয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম, তিনিও আমাকে ঐ একই উপদেশ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগ্রহে আমি মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলাম। সে কাহিনী আমি পরে বিবৃত করব।

বাহিরে ঘটনার আবর্ত,—সেই সঙ্গে মনের মধ্যেও চিন্তার আবর্ত। গভীরতর অভিনিবেশের সঙ্গে আমি আমার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলাম,—ধীরে ধীরে পরিচ্ছন্ন হতে লাগল আমার অন্তর্দৃষ্টি, যীশুখৃষ্টের স্বচ্ছ সরল স্পষ্ট বাণী আমার প্রাণে এসে বাজতে লাগল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়ে আমার আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে আমি যেন নূতন আলোক দেখতে পেলাম। সে জাতিভেদ সংকীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বয়ং যীশু তাঁর ক্লিষ্ট অন্তরের কঠিন ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন, সেই জাতিভেদ ও সেই কুসংস্কার তাদের কুৎসিত কুটিল প্রশ্ন নিয়ে পদে পদে আমার সমুখবর্তী হতে লাগল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ধর্মভীরু ফরীশীর উদাহরণস্বরূপ ঘৃণ্য সামারিটানকে কেন যীশু গ্রহণ করেছিলেন, কেন তিনি ফরীশীদের মনে প্রবলতর আঘাত দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে মদ্যব্যবসায়ী ও পাপীরাও তাদের পূর্বে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে।

এই সমস্ত চিন্তা জাত্যভিমান ও জাতিবৈরিতার বিরুদ্ধে আমার মনকে দৃঢ়তর করে তুলল। আমি বুঝলাম, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। এ জন্যে হয়তো আমাকে

আমার স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে, খৃষ্টানদের বিপক্ষে যেতে হবে, তবু পিছপাও হলে চলবে না। খৃষ্টের নামে বিশ্বের দরবারে আমি সত্য সাক্ষ্য দেব, আপন জনের বিমুখতায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসার আমার উপায় নেই। খৃষ্টান কা'কে বলে? আমি খৃষ্টান-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, খৃষ্টান-সমাজের সুযোগ সুবিধা লাভ করে বড়ো হয়েছি, খৃষ্টান-গির্জায় প্রবেশের অধিকার পেয়েছি, অতএব আমি খৃষ্টান? খৃষ্টপ্রেমের একটি মাত্র পরীক্ষা। সমাজ সংসারের সমস্ত স্বার্থ নির্দেশ নির্বিশেষে অকুতোভয়ে বিবেকের নির্দেশকে যে অনুসরণ করে সেই খৃষ্টান। মানুষের নির্দেশকে অতিক্রম করে ঈশ্বর নির্দেশকে মান্য করাই খৃষ্টানের এক মাত্র পরীক্ষা। এই নির্দিষ্ট পথে যে যাত্রা করে সে সমাজ বন্ধন মানে না, সে জাতিস্বার্থ মানে না। আত্মীয়ের আহ্বানেও সে কান পাতে না। সে চলে পরম পিতার নির্দেশে, সে শুধু তার পরমাত্মীয় পরম পিতাকেই জানে। খৃষ্টের আপন জননী ও ভ্রাতারা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন,—

'কে আমার মাতা? কেই বা আমার ভ্রাতা? ঈশ্বরের আজ্ঞা যে পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, সেই আমার ভগিনী, সেই আমার জননী।'

আজ আমার চারি দিকে যেমন জাতিগত কুসংস্কার সেই কুসংস্কার যীশুর প্রথম শিষ্যদের মনেও ছিল। তাঁরা তাঁদের সুক্ষ্মানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, যীশুর ঐশী প্রেরণা একের পর একে এই সমস্ত কুসংস্কারের বাধাকে বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলেছে। তাঁরাও তাঁদের মন থেকে এই সমস্ত কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে খৃষ্টের অনুবর্তী হয়েছিলেন। খৃষ্টই তাঁদের দেখিয়েছিলেন ভেদ-বাধাবিহীন ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথ। যারা সমাজচ্যুত, যারা অবজ্ঞাত, মন্দিরে যাদের স্থান নেই, যীশু তাদের কাছে ডেকেছিলেন, কোলে স্থান দিয়েছিলেন। এই মহান্ দৃশ্য চর্মচক্ষু মেলে দেখেছিলেন প্রভুর প্রথম অনুগামীর দল। সর্ব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সমাজ যাদের দূরে পরিহার করেছে প্রভু তাদেরই ভালোবাসতেন অধিক,—এই দৃশ্য তাঁর শিষ্যরা খৃষ্টের প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মূঢ় জাত্যভিমানকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিহার করার শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন, সমাজ যাদের ঘৃণা করেন, খৃষ্ট তাদেরই প্রেম করেন, সমাজ যাদের পরিত্যাগ করে, খৃষ্ট দেন তাদেরই আশ্রয়।

খৃষ্টের জীবনের মধ্য থেকে ভক্তগণ ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দেশ প্রত্যক্ষ করেন। দূরকে করো আপন, পরকে করো ভাই,—ঈশ্বরের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হলেন শিষ্যগণ। এই শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা গৃহবন্ধন পরিহার করলেন, সুরু করলেন ঈশ্বর-প্রেরিতের অভিযান। সমাজ তাঁদের পরিত্যাগ করল, সমাজের গণ্ডী তাঁরা অতিক্রম করলেন নির্ভয় আনন্দে।

পদে পদে তাঁদের কতো আতংক, কতো বিপত্তি! প্রাচীন ইহুদী গির্জা মনুষ্য সমাজকে ইহুদী ও যে ইহুদী নয়, অর্থাৎ 'জেণ্টিল' এই দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। সেই গণ্ডী পার হয়ে দূর দূরান্তরে তাঁরা এগিয়ে চললেন। প্রাচীন জাতিগত ও ধর্মগত কুসংস্কারকে পদে পদে তাঁরা ভাঙতে ভাঙতে চললেন। যতো তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন ততো তাঁদের আচ্ছন্ন দৃষ্টি সমুজ্জল হতে লাগল, ঈশ্বরকে যে রূপে পূর্বে কখনো কল্পনা করেন নি, সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল,—খৃষ্টবাণীর যে উদার মহৎ অর্থ পূর্বে তাঁরা বুঝতে পারেনি, সেই অর্থ প্রতিভাত হোলো তাঁদের মনে। খৃষ্ট বলেছিলেন, "ঈশ্বরই করুণা"। এই বাক্য শুধু আমার নিরুদ্ধ উপাসনাগৃহের কঠিন দেয়ালে লিখে রাখার নয়—এই বাক্যের অমোঘ মন্ত্রে বিশ্বচরাচর মন্ত্রিত হচ্ছে, সেই মহাধ্বনির প্রতিধ্বনি তাঁদের হৃদয়ে এসে বাজতে লাগল। এই মন্ত্র প্রাক্তন বিশ্বাসের বদ্ধ দ্বার উন্মোচন করে দেয়, অভূতপূর্ব অকল্পনীয় সাধনার পথে মানবমনকে আহ্বান করে নিয়ে যায়।

প্রেমসাধনার এই যাত্রাপথে দু-একবার থমকে দাঁড়ালেন শিষ্যগণ, প্রতিনিবৃত্ত হলেন দু-একবার। উত্তেজনা ও চিত্ত-দৌর্বল্যের বশে পিটার একবার খৃষ্টভক্ত 'জেণ্টিল'দের সঙ্গে আহার করতে আপত্তি করলেন। সেই পরাজয়ের পঙ্ক থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন পল। কিন্তু পিছু তাঁরা শেষ পর্যন্ত হটলেন না, আশ্চর্য তাঁদের সাহস, আশ্চর্য তাঁদের নিষ্ঠা। তাঁদের সামনে নিত্য-সমুজ্জ্বল খৃষ্টমূর্তি,—নিত্য-নূতন দ্বার খুলে নিত্য-নূতন পথ সন্ধান দিচ্ছেন প্রভু, বলিষ্ঠ হাতে ভেঙে দিচ্ছেন যুগসৃষ্ট কঠিন শৃংখল, মোচন করছেন যুগ-সঞ্চিত আবর্জনা। খৃষ্টের প্রেম পরমপিতার আশীর্বাদ, গোষ্ঠীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানবসমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

খৃষ্ট সভ্যতার প্রাথমিক অভিযানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হোলো এই। এই অভিযান মানব-ইতিহাসের এক মহৎ প্রগতি। এই অভিযান ও সংস্কারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম মানবাত্মাকে এক উদার মুক্তির ঐশ্বর্য দান করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে দেখলাম, উদার সর্বমানবিক খৃষ্টীয় সভ্যতা জাতিভেদের আঘাতে খান্ খান্ হতে চলেছে। খৃষ্টের আদি শিষ্যদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি যেন উপলব্ধি করলাম। আমি বুঝলাম, আমাকেও পিছিয়ে পড়লে চলবে না, শংকা নিয়ে কুণ্ঠা নিয়ে দূরে সরে থাকলে চলবে না। খৃষ্টের সেই আদি শিষ্যদের মতো নির্ভয় বলিষ্ঠ হতে হবে আমাকে। যুদ্ধ করতে হবে আমাকে। খৃষ্টের উদার আহ্বানকে যারা জাতিভেদের সংকীর্ণ কোলাহলে লুপ্ত করতে চায়, সাধু পলের মতো তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আমাকে।

এও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, যারা নিজেদের খৃষ্টান বলে না, তাদেরও অন্তরে খৃষ্ট আছেন। তাদেরই দলে আমাকে যোগ দিতে হবে,—জাতির নামে ধর্মের নামে যারা মানুষকে মানুষের কাছ থেকে পৃথক করে রাখে তাদের দলে আমার থাকলে চলবে না। আমি জানি আমার পক্ষেই ঈশ্বর আছেন,—যে ঈশ্বর ব্যক্তির গর্বকে প্রশ্রয় দেননা, যে ঈশ্বর সমভাবে করুণা করেন সর্বমানবকে।

এমনি পণ যে কেবল আমি একাই করেছিলাম তা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আরো অনেক সহৃদয় ও ধর্মপ্রাণ শ্বেতকায় খৃষ্টান আমার মতে একমত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর পত্নীর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগব্রত লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছিলেন,—'এই সাধুদম্পতি প্রকৃত খৃষ্টান, আমাদের চেয়ে অনেক মহৎ খৃষ্টান এঁরা।' একথা শুধু কথার কথা নয়, এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যকে তাঁরা

স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গান্ধীর অনুগামী ভারতীয় অহিংস সত্যাগ্রহীদের হিন্দু বা মুসলমান ঘরে জন্ম হলেও তাঁদের খৃষ্টীয় জীবনাদর্শ যে কোনো খৃষ্টানের চেয়ে অনেক বড়ো। নূতন করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে করতে ও খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে এই কথা কেবলই আমার মনে বাজতে লাগল।

আমার মনের মধ্যে এক বিপ্লব আবর্তিত হতে লাগল অবিরাম। স্বদেশে 'রবিন হুড বে'-র কাছে একদিন বিশপ ওয়েষ্টকটের সঙ্গে ভ্রমণকালীন তাঁর কয়েকটি কথা বারে বারে আমার মনে পড়তে লাগল। দুজনে পাশাপাশি আমরা বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন লাঠির মাথায় দু-হাতের ভর দিয়ে। তারপর বলে উঠলেন, মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যদি খৃষ্টকে অবলোকন করতে পারো, তবেই প্রকৃত তাঁকে অন্তরের মধ্যে দেখতে পাবে। তা যদি না পারো তাহলে তাঁর সর্ব-অস্তিত্বব্যাপী অখণ্ড অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারলে না, বুঝতে পারলে না মানবপুত্র কেন তাঁর নাম।

এই কথা ক'টি বলার পর বিশপ ওয়েষ্টকট কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, অনুভূতির উদ্বেলনে তাঁর সুন্দর দুটি চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ তাঁর পক্ষে বিরল ছিল। তাঁর সেদিনকার অশ্রু তাঁর গভীর অন্তরের অমৃতধারা।

সমস্ত ধর্মমত ও সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের উর্ধ্বে সত্যের স্থান। অভিজ্ঞতার অসংখ্য উন্মুক্ত দ্বারপথে সত্যের আলো এসে আমার দৃষ্টিকে অভিষিক্ত করতে লাগল। আমার হাইচার্চ ধ্যানধারণায় যেটুকু পরিবর্তন এ পর্যন্ত হয়েছিল, তা এই সত্যদৃষ্টির কাছে নিতান্ত সামান্যমাত্র। কিন্তু এখন থেকে সত্যের আলোকে আমার যাত্রা। এই যাত্রাপথে কুসংস্কারের অন্ধকারের কোনো স্থান নেই। প্রত্যক্ষ বাস্তবের আঘাতে যে বিশ্বাস অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে আঁকড়ে রাখা সম্ভব নয়, সেই বিশ্বাস বহু-অভ্যস্ত ধর্মবিশ্বাস হলেও।

ধর্মসংস্কারের নিগড়ে যারা আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়, তাদের মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। সংস্কারের একটা নির্দিষ্ট ও নিরাপদ গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীর মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখায় কোনো ঝঞ্ঝাট নেই,—নিতান্ত নিরুপদ্রব এই ব্যবস্থা। আমারও মন সহজে এই গণ্ডী পার হতে পারেনি,—এই গণ্ডীর আকর্ষণই আমাকে হাই চার্চের অবলম্বন থেকে যুক্ত হতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু যে মন মুক্তি চায়, কোন্ অনুশাসন তাকে বাধা দেবে? সমাজচ্যুতির কোন্ ধমক তাকে ডরাবে?

বাইবেলে এক রুগ্না রমণীর কাহিনী আছে, সে বিশ্বাস করেছিল যে যীশুর বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করলেই রোগমুক্ত হবে। যীশু তাকে ভর্ৎসনা করেননি, করুণা করেছিলেন। যীশুর বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ সে করেছিল, আপন বিশ্বাসে রোগমুক্ত হয়েছিল। তার এই দৃঢ়বিশ্বাসের মধ্যেও ভিক্ষার দীনতা ছিল। এই দীনতা তার বিশ্বাসকে পার্থিব সংসারের সঙ্গে আবদ্ধ রেখেছিল। রোমক সেণ্ট রিয়নের অন্তরে যে বিশ্বাস ছিল তার সমকক্ষ হতে পারেনি। সে বলেছিল,—"প্রভু, তুমি শুধু বলো, তোমার বাণীতেই আমার ভৃত্য সুস্থ হবে।" যীশুর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এই মহাবিশ্বাসী ভক্ত লাভ করেছিল। তিনি বলেছিলেন,—"সত্যই, এমন বিশ্বাস আমি ইস্রাইলে কোথাও দেখিনি।"

উন্নত করো তোমার হৃদয়—এই মহাবাণীর অর্থ কী? আমার আত্মিক দৃষ্টিকে শুধু যে স্বর্গরাজ্যের দিকে তুলতে হবে তাই নয়,—পরমাত্মার প্রসাদ নীরবে কেমন করে সর্বমানবের অন্তরকে নিষিক্ত করে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতি মানবাত্মাকে কল্যাণ ও শুভকর্মের পথে পরিচালিত করে, তা লক্ষ্য করতে হবে, তবে হবে অন্তরের উন্মীলন।

মহাত্মা গান্ধী ও জেনারাল স্মাটস সংক্রান্ত এই সমাচার একটি কাহিনী অতি অপূর্ব! অন্য বিষয় অবতারণা করার পূর্বে সেই কাহিনীটি এখন বলতে চাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কারাবাসে ভারতীয় নারীদের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন শ্রীযুক্তা গান্ধী। নাটালে পৌঁছানো মাত্র আমি জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি তখন এত অসুস্থ যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় না। যতোদিন আমরা প্রিটোরিয়ায় ছিলাম, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁর অসুস্থতার দুশ্চিন্তা সর্বক্ষণ আমাদের মনে লেগেছিল। সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা যখন শুভপথে এগিয়ে চলল, তখন অন্য বন্দীদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা গান্ধীও মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দিনে দিনে তাঁর দেহ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল।

এদিকে অবিলম্বে প্রিটোরিয়া পরিত্যাগ করা তখন আমাদের

পক্ষে সম্ভব নয়। বিরোধের সম্পূর্ণ মীমাংসা তখনো হয়নি,—কয়েকটি প্রশ্ন তখনো রয়ে গেছে,—যে কোনো মুহূর্তের সংকটে সব ব্যবস্থা ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। ধীরে ধীরে সব প্রশ্নের মীমাংসা হোলো, বাকি রইল শুধু চুক্তিপত্রে জেনারাল স্মাটসের একটি স্বাক্ষর। এদিকে জেনারেল স্মাটস তখন দেশের এক আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। তাঁর এই স্বাক্ষরটি আদায় করতে কতোদিন দেরি হবে তার ঠিক নেই। ঠিক সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর কাছে তারবার্তা এল,—তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়! আমি গান্ধীজিকে অনুরোধ করলাম,—কালবিলম্ব না করে তিনি স্ত্রীর কাছে চলে যান, চুক্তিপত্রে সই আমি যথাসময়ে করিয়ে নেব। কিন্তু আমার কথায় তিনি কর্ণপাত করলেন না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জাতীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবার মানুষ তিনি নন। কর্তব্যনিষ্ঠায় তিনি প্রস্তরের মতো অটল, তাঁকে টলানো অসাধ্য আমার পক্ষে, তাঁর তখনকার বিপুল মর্মযন্ত্রণা আমি আমার নিজের মনে অনুভব করতে পেরেছিলাম, এইটুকু মাত্র।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই আমার চোখে ঘুম আসছিল না। মধ্যরাত্র যখন পার হয়ে গেল তখন হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এল। আগামী কাল প্রত্যুষে উঠেই জেনারাল স্মাটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সইটা আদায় করার চেষ্টা করি না কেন? আগামী দিনের প্রথম কর্তব্য মনে মনে স্থির করে নিয়ে আমি শান্তিতে চোখ বুজলাম।

পরদিন প্রভাতে ঠিক ছ'টা নাগাদ আমি ইউনিয়ন বিল্ডিংসে পৌঁছলাম। আমি জানতাম যে এই ধর্মঘট আন্দোলন দমনের জন্য জেনারাল স্মাটস প্রতিদিন অতি ভোরে পরিভ্রমণে বার হয়ে যান। ঠিক সাতটার সময় তিনি উপস্থিত হলেন এবং আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে মর্মাহত হলেন। মুহূর্তে তাঁর গভীর মানবতাবোধ জাগ্রত হোলো। আমার কাছ থেকে চুক্তিপত্রটা তিনি দেখতে চাইলেন। চুক্তিপত্রের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্ত পয়েণ্টগুলো ঠিক ঠিক আছে তো এর মধ্যে?

আমি বললাম—হ্যাঁ, আছে।

তৎক্ষণাৎ চুক্তিপত্রটি তিনি সই করে দিলেন। পরম আনন্দিত মনে আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে ফিরে চললাম। সেই দিনই আমরা ডারবান যাত্রা করলাম। ট্রেনে যেতে যেতে পথিমধ্যেই সুসংবাদ পেলাম যে শ্রীযুক্তা গান্ধীর অবস্থা একটু ভালোর দিকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার এই রচনার পাঠকগণ মনে রাখবেন যে, এসব ঘটনা প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বেকার কথা। তার পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার খৃষ্টীয় সমাজের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য নব জাগরণ ঘটেছে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ, উভয় জাতির উৎসাহী নরনারীর দল ঘনিষ্ঠতর ভাবে খৃষ্টানুসরণে ব্রতী হয়েছেন। খৃষ্টশিষ্যত্বের প্রকৃত কর্তব্যবোধের আনন্দে বিভিন্ন খৃষ্টানগোষ্ঠী উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলন তরুণ হৃদয়ে নব উন্মাদনার সঞ্চার করছে। এই সমস্ত দেখে মনে হয় যে, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের পাপগণ্ডী বোধ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ধীরে ধীরে বিদূরিত হবে। খৃষ্টজীবনের আনন্দিত আলোকে আবার ধর্মবিশ্বাসীর মনের কালো অপসৃত হবে, সেখানে বিরাজ করবে খৃষ্ট-হৃদয়ের প্রেম-প্রভা।

ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার পর আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করলাম। গোখেল তখন রুগ্ন অবস্থায় লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন,—তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল আমার। তাছাড়া উদ্দেশ্য ছিল পিতৃদর্শন। আমার মাতৃবিয়োগের পর আমার বাবা অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছিলেন,—এই শেষ বয়সে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন গুণছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে, আমার মা-ও তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কার্যকলাপের খবর রেখেছেন ও আমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। আমাদের মধ্যে স্নেহময়ী জননী আর নেই,—এতো দিন পরে বাড়ি ফিরে এই শোকের মধ্যেও আত্মীয়-মিলনের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এর পর আমি ভারতবর্ষে ফিরে এলাম,—মনে মনে এই স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে কেম্ব্রিজ মিশনের স্থানীয় গণ্ডী আমাকে অতিক্রম করতেই হবে এবার,—নইলে উদারতর পৃথিবীর পথে কেমন করে পা বাড়াব?

বহু বৎসর ধরে আমি এই পদক্ষেপের বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করছিলাম এবং ঈশ্বরের পথ-নির্দেশের প্রতীক্ষা করছিলাম। এই সঙ্গে এই কথা সর্বদা আমার মনে জাগত যে, ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে সংযুক্ত করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে বিদেশী সংস্থাপনের উপর নির্ভরশীলতা। জনগণের প্রয়োজনে নবতর কর্তব্যের আহ্বানের জন্যে নিজেকে স্বাধীন করতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেখানে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা রয়েছে, সে সমস্ত স্থানে আমাকে যেতে হবে ও ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে,—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম। অতএব মিশনের বন্ধন আর আমার ভবিষ্যৎকে বেঁধে রাখতে পারবে না। যদি যীশুর পথে একান্ত ভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারি তাহলে নোঙরের বন্ধন ত্যাগ করে দুস্তর সমুদ্রে ভাষাতে হবে জীবনতরী।

কেম্ব্রিজ ভ্রাতৃসংঘ ও তাঁদের পরিচালক অ্যালনাট স্পষ্টই বুঝছিলেন যে ঈশ্বর নবকর্মপথে আমাকে আহ্বান করেছেন। অতএব এই ভ্রাতৃসংঘ থেকে আমি যখন বার হয়ে এলাম তখন তাঁদের সঙ্গে সম্প্রীতিচ্যুতির কোনো কারণ ঘটল না। এর পূর্বে আমি অধৈর্য উৎসাহের সঙ্গে এমন অনেক কাজ করেছি যাতে বিশপ ও অ্যালনাট নিতান্ত বিব্রত হয়েছেন। আমার অনেক ব্যবহার তাঁদের পক্ষে সহ্য করা শক্ত হয়েছে, তবু আমার প্রতি অন্তরের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের কখনো হ্রাস হয়নি, গভীর প্রেমানুভূতি দিয়ে তাঁরা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষের নাড়ীতে তখন নবীন জীবন-স্পন্দন, প্রাচীন সমাজে জেগেছে বন্ধন-মোচনের সাড়া। খৃষ্টীয় বিশ্বাসেরও নূতন পরীক্ষার প্রয়োজন তখন সমাগত, খৃষ্টীয় সমাজের নূতন পথে যাত্রা করার দিন। আমার পক্ষে আর বিলম্ব করার উপায় ছিল না, বিলম্বের ফল মর্মান্তিক হোতো আমার পক্ষে।

সুশীল রুদ্রের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াই হোলো আমার পক্ষে সব চেয়ে শক্ত। তিনি ছিলেন আমার সহোদর ভ্রাতার অধিক। তাঁর দেহে তখন এক মর্মান্তিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, যে ব্যাধি দিনে দিনে তাঁর জীবনীশক্তিকে গ্রাস করছে। তাঁর এই ব্যাধির কথা

আবার আশ্চর্য্যজনক সুস্থবোধ করুন!

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্য বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বুকে শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হৃতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।
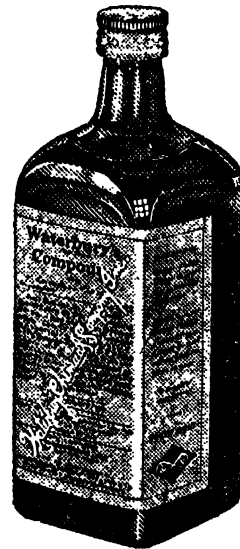
এখন চুরি-নিরোধক ক্যাপ এবং নূতন লাল লেবেলযুক্ত বোতলে পাওয়া যায়।

এক্ষণে লাল মোড়ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

অবশ্য তখন আমি জানতাম না। তিনি নিজে জানতেন এই কালরোগের কথা, কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অপরিসীম ছিল তাঁর নিঃস্বার্থতা। তাঁর নিজের প্রয়োজনে একদিনের জন্যেও তাঁর কাছে আমাকে ধরে রাখতে তিনি চাননি।

আমার জীবনের এই পরম পরিবর্তন কী ভাবে এল তা বোঝাতে গেলে পিছনের একটি ঘটনা বিবৃত করা দরকার।

ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে আমার দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্ত শিখার মতো নিত্য-উজ্জ্বল হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ভারতীয় সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। মহৎ তাঁর রচনাবলী তেমনি মহান তাঁর জীবন। দিল্লীতে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ আমি পাইনি, কেন না, দিল্লী থেকে কলিকাতা অনেক দূর। দূর থেকে তাঁর কথা আমি উইলি পিয়ার্সনের মুখে অনেক শুনেছিলাম। উইলি আগে বঙ্গ প্রদেশে ছিল ও রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিল। গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে উইলি আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা বলত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার উদগ্রীব বাসনা আমার ছিল। সেই বাসনা চরিতার্থ হোলো ভারতবর্ষে নয়,—লণ্ডনে।

১৯১২ সালের একটি চমৎকার গ্রীষ্মসন্ধ্যা। হ্যাম্‌ষ্টেড হীথের কাছে তাঁর গৃহে রদেনষ্টাইন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন লণ্ডনে। তিনি রদেনষ্টাইনের গৃহে আসছেন। ডবলু বি য়েটস্‌ও আসবেন। 'গীতাঞ্জলি' নামক রবীন্দ্রনাথের এক নূতন পাণ্ডুলিপির কবিতাবলী পাঠ করা হবে।

সেদিন কবিকে আমি প্রথম দেখলাম, তাঁর কাব্যসুধা পান করলাম ভারতের অন্তর-গভীরে যে মহান্ বিশ্বসংস্কৃতি নিহিত, সেই সংস্কৃতির সূক্ষ্ম নিবিড় মাধুর্যের পরিচয় আমি আমার স্তব্ধ অন্তরের মধ্যে অনুভব করলাম। কবি তখনো লণ্ডনে অপরিচিত, তাছাড়া তিনি তখন অসুস্থ। য়েটস যখন গীতাঞ্জলি আবৃত্তি করছিলেন কবি তখন তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় ও অপরিচিতের ব্রীড়া নিয়ে প্রায় সকলের দৃষ্টির অন্তরালে এক কোণে সরে বসেছিলেন। আমি যখন শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম, তখন আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আমার সে মনোভাব কথা দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যের জন্য মৌখিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমার পক্ষে সম্ভব হোলো না। কবিও বুঝি আপন অনুভূতি দিয়ে আমার অন্তরের অনুভূতি উপলব্ধি করলেন।

সেদিন রাত্রে হ্যামষ্টেড হীথে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালাম, শুধু ভাবতে লাগলাম, আজ সন্ধ্যায় একা আমি দেখলাম, একা এ কী আমি শুনলাম,—এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক কী? বাহিরে রাত্রির অন্ধকার,—কিন্তু আমার অন্তর আকাশ যেন এক আশ্চর্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

সেই দিনই রাত্রে শয্যা গ্রহণের আগে একটি বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হলাম। কবি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে স্থান নেব। দিল্লীর বিদেশী মিশনে বসে এই ভারতবর্ষকে কিছুতেই আমি চিনতে পারব না। শান্তিনিকেতনের পটভূমিকায় এই বিচিত্র মহাদেশ নিবিড় ভাবে আমার কাছে ধরা দেবে, একটা কথা শুনে আমার আনন্দের শেষ রইল না যে উইলি পিয়ার্সনও এই একই বাসনা কবির কাছে নিবেদন করেছেন এবং কবি তাতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু আমার পক্ষে অবিলম্বে এমনি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না; কেন না তখনো আমি মিশনের কর্তব্য থেকে মুক্ত হইনি। কিন্তু মনে আশা রইল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্কটময় দিনগুলির বেদনা এই আশার আনন্দে লাঘব হোলো।

ভারত-আত্মার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যরূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে কেবলই আমি চাইছিলাম। এই অধরা রূপকে কখনো বা বুঝি দৃষ্টির বন্ধনে আমি বেঁধেছি, আবার চকিতে তা আমাকে এড়িয়ে গেছে। কখনো বা আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছি পথের মানুষের মুখে,—সেই মুখ আবার হারিয়েছি মুহূর্ত পরে। দিল্লীতে বসে ভারতবর্ষকে পুরোপুরি চিনতে আমি পারিনি। এখানে থাকতে শুধু বিদ্রোহ করে করেই আমার দিন কেটেছে,—সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিদেশী মিশনারীর কর্মধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদেশী মিশনারী আমি হতে চাইনি, আমি চেয়েছি ভারতের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে আমার জীবনকে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলতে। এই ভারতভূমিতে বসে যদি আমার পরমপ্রভু যীশুকে প্রকৃত মানবপুত্র রূপে অন্তরে পেতে চাই, তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গে এক প্রাণ এক আত্মা আমাকে হতে হবে,—বিদেশী বলে দূরে থাকলে চলবে না।

দিন যতোই যেতে লাগল ততোই পুরাতন ধারার প্রতি বিদ্রোহভাব আমার মনে গভীর হতে লাগল। কেন না, আমি দিনে দিনে লক্ষ্য করতে লাগলাম যে পুরাতন ধারার দিন ফুরিয়ে আসছে। অহংকার আর আভিজাত্যের প্রাচীরে আষ্টেপৃষ্ঠে ফাটল ধরেছে, রুদ্ধ দ্বারে বাজছে নবযুগের বলিষ্ঠ আঘাত। বাতাসে নব-জীবনের সাড়া। বন্দী বিহঙ্গ মাটিতে ডানা ঝাপটাতে আর চায় না,—উন্মুক্ত উদার নীলাকাশে সে মুক্তপক্ষ বিস্তার করতে চায়। ভারতের নবযুগের এই আন্দোলনে আমারও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে, আমারও দেহমন ছুটে বার হতে চাইছে। দিল্লীতে বসে বসে অনেক শিক্ষানবিশী করেছি,—এবার আমি মুক্তি চাই। আর কোনো বন্ধনে আমি বাঁধা পড়ব না।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্য গোখেলের সহসা অপ্রত্যাশিত নির্দেশ যদি না আসত তাহলে আমি আরো আগেই শান্তিনিকেতনে যোগ দিতাম। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বিনা আয়াসে কেম্‌ব্রিজ মিশন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হোলো। ১৯১৪ সালে ঈষ্টারের সময় আমি দিল্লী পরিত্যাগ করলাম।

কবি তাঁর উদার হৃদয়ের মহত্ব দিয়ে আমাকে তাঁর আশ্রমে গ্রহণ করলেন। আমার খৃষ্টান ধর্মযাজকবৃত্তির কোনো প্রতিবন্ধক আশ্রম থেকে আমি পেলাম না। আমি আমার বিশপকে জানালাম যে, শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে আমি প্রতি রবিবার বর্দ্ধমানের এক গির্জায় গিয়ে যাজনা করব। সুশীল যখন বালক ছিলেন, তখন সুশীলের পিতা পিয়ারীমোহন রুদ্র বর্দ্ধমানের এই গির্জার ধর্মযাজক ছিলেন।

ট্রিনিটির রবিবার এল। প্রভাতী প্রার্থনা সভায় অ্যাথানেসিয়ান

ক্রীড আমাকেই পড়তে হবে। কেন না, এ গির্জার আমিই একমাত্র ধর্মযাজক। যারা খৃষ্টান নয়, তাদের অনন্ত নরকের অভিসম্পাত বাণী নিজমুখে উচ্চারণ করতে হবে আমাকে। আমি তখন সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে এসেছি, এখানকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ও অখৃষ্টান বন্ধুজনের অকৃপণ প্রেমে আমার মন বিভোর হয়ে রয়েছে। আজকের আনুষ্ঠানিক ধর্মযাজনার পরীক্ষায় কেমন করে উত্তীর্ণ হব? কোন্ মুখে অভিসম্পাত দেব অখৃষ্টান মানবপুত্রদের? আমি শেষ পর্যন্ত যাজনার ঐ অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দিলাম। কিন্তু এতেও আমার বিবেক প্রবোধ মানল না। মনে হোলো, আমি চুরি করেছি, নিতান্ত কাপুরুষের মতো সুলভ আত্ম-ছলনা করেছি মাত্র।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে যখনই কবির নিষ্পাপ মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, তখনই উপলব্ধি করলাম যে আমার জীবন অসত্যের বন্ধনে জড়িত হয়ে রয়েছে, এ বন্ধন থেকে আশু মুক্তি চাই, কবি আমার চোখের দিকে উজ্জ্বল স্বচ্ছদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি যেন মহাবিচারের দিনে যীশুখৃষ্টের দৃষ্টি। তাঁর সেই পবিত্র দৃষ্টির প্রতি আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারলাম না, চোখ নিচু করে অকপটে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বললাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, সত্যের সঙ্গে আর প্রবঞ্চনা করব না, এই মুহূর্ত থেকে সত্যের পথ থেকে মুহূর্তের জন্যেও ভ্রষ্ট হব না।

কবি প্রথমটা খুবই চিন্তিত হলেন। হঠাৎ উত্তেজনার কোনো কিছু যেন না করে বসি, সেই উপদেশই তিনি আমাকে দিলেন। কিন্তু মিথ্যার শেষ সীমান্তে এসে আমি পৌঁছেছি। এই সীমান্ত রেখার উপর দাঁড়িয়ে বহু বৎসর আমি যুদ্ধ করেছি, যুদ্ধ করেছি নিজের সঙ্গে, আপন মনের দ্বিধা-সংশয়ের সঙ্গে। এইবার আর যুদ্ধ নয়। শুধু শেষ পদক্ষেপটি ফেলতে হবে, পার হতে হবে গণ্ডী। আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি এইবার।

দু'খানি চিঠি লেখা দরকার, সেদিনই লিখে পাঠিয়ে দিলাম। একটি চিঠি লিখলাম বিশপকে, তাঁকে জানালাম কেন আমার পক্ষে আর বর্তমান গির্জার ধর্মযাজকবৃত্তি করা সম্ভব নয়। অপর চিঠিটি আমার পিতাকে।

ভয় ছিল, আমার চিঠি পড়ে পিতৃদেব যে আঘাত পাবেন তা তাঁর দুর্বল হৃদয় সহ্য করতে পারবে কি না। চিন্তিত মনে তাঁর উত্তরের প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু সুখের বিষয়, আমার সম্বন্ধে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা তিনি প্রকাশ করলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে যা কিছু আমি করি, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।

এঁর পর থেকে কোনো বিশপের অধীনে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মযাজক-বৃত্তি আর আমি কখনো গ্রহণ করিনি। তবে দেশে বিদেশে যেখানেই আমি গিয়েছি, সর্বদা অ্যাংলিক্যান খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমি সংযোগ রেখেছি। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে আমি কোনো কোনো গির্জায় ধর্মালোচনা করেছি ও ধর্ম-আচরণে যোগ দিয়েছি। এই কাজে আমি খৃষ্টীয় সমাজের কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর গণ্ডীকে স্বীকার করিনি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাস আমার মনে আছে যে ঈশ্বর যে কাজের জন্য আমাকে প্রস্তুত করেছেন ও যে কাজ আমার প্রতি নির্দিষ্ট করেছেন, সে কাজ পুরোহিতের নয়, পরিব্রাজক ও প্রচারকের। অনেক বৃথা ভ্রমণের পর তিনি আমাকে সত্য পথে টেনে এনেছেন, এই শেষহীন পথের নিরুদ্দেশ যাত্রায় আমার পথিক আত্মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

প্রচলিত ধর্মের অন্যান্য নিয়মকানুন সম্বন্ধেও আমার সংশয় ছিল, সে সব আলোচনা বন্ধন-মোচনের পর অবান্তর। এর পর যতো দিন কেটেছে, আমার স্বস্তিবোধও ততো বেড়েছে। মুহূর্তের জন্যেও পুরানো অবস্থা ও গণ্ডির মধ্যে ফিরে যাবার বাসনা আমার মনে জাগেনি। যে জীবন আমি যাপন করেছি তা অসম্ভব হোতো, যে কর্তব্যপথে আমি চলেছি সেই পথ কখনো আমি খুঁজে পেতাম না, যদি না গোষ্ঠীর গণ্ডী থেকে আমি মুক্তি পেতাম। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ছলনা

(চীনাকবি Ho Chi Fang এর কবিতার অনুবাদ)

ছলনা!
বলনা, "আবার আসিবে তো?
সোনালি রং-এর আবছায়া কুয়াশার জাল ছিঁড়ে?"
সেই তো বিকেল বেলায়
যখন মুখোমুখি বসেছিলাম
আমার চোখে ছিল নীল মত্ততা
আর ওর চোখে ছিল বনবিড়ালের মায়াভরা জিজ্ঞাসা;
আন্দামানের ধূসর জগতে
আমরা পাখা মেলে ভাসছিলাম
তখনই ত তুমি প্রেতিনী মায়াবিনীর মত
খলখলিয়ে হেসে উঠেছিলে।
বলনা ছলনা!
"আবার আসিবে তো?"

অনুবাদক: শ্রীঅজয় বসু।
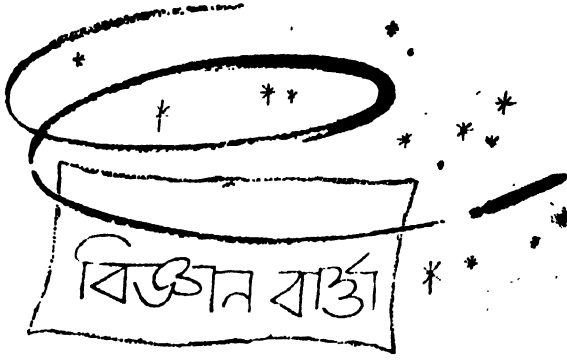
কৃত্রিম উপগ্রহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে সংগৃহীত তথ্য কি ভাবে পৃথিবীতে সরবরাহ করা হইবে তাহার আলোচনা করিলাম। এখন সাধারণ ভাবে কি কি তথ্য কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ সংগ্রহ করা হইবে তাহা দেখিতে হইবে।

(১) Cosmic Rays (মহাজাগতিক রশ্মি)—পৃথিবীর চারিদিকে রহিয়াছে বায়ুসমুদ্র। মাধ্যাকর্ষণ বলে পৃথিবী এই বায়ুসমুদ্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে এবং ঐ অবস্থাতেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্য আর বায়ুবেষ্টিত পৃথিবীর মধ্যে বস্তুতপক্ষে বিরাজ করিতেছে এক মহাশূন্য। কিন্তু 'শূন্য' কথাটি ব্যবহার করা বোধ করি ঠিক হইল না। কারণ সূর্য্য স্থিতিশীল বস্তুর ন্যায় কেবল আলো আর উত্তাপ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যের মধ্যে ঘটিতেছে নানা অদ্ভুত ঘটনা। একটি পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া আর একটি পরমাণুতে রূপান্তরিত হইতেছে, আর সেই রূপান্তরের সময় যে বিপুল শক্তি উৎসারিত হইতেছে, তাহাই সূর্য্যকে তাহার সৌরজগতের অধিবাসীদের তাপ ও আলোক দিবার ক্ষমতা যোগাইতেছে। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরমাণুর রূপান্তরকালীন যে বিপুল শক্তি উৎসারিত হয়, তাহাকে কাজে লাগাইয়াই বর্ত্তমানকালে নির্ম্মিত হইয়াছে, পরমাণু তথা হাইড্রোজেন বোমা) পরমাণু রূপান্তরের সময়ে নানা রশ্মিকণা সূর্য্য হইতে নির্গত হয়। এই সকল রশ্মির কোন কোনটি পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে সূর্য্য ও সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহগুলির মধ্য দিয়া অতি দ্রুত গতিবেগ-সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রশ্মিকণা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি আবার পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর বুকে আসিয়া পৌঁছিতেছে। ইহাদেরই নাম 'মহাজাগতিক রশ্মি' বা Cosmic Rays. মহাজাগতিক রশ্মি হইতেছে বস্তুতপক্ষে 'প্রোটন' Proton (পরমাণু-কেন্দ্রকের Nucleus, প্রধানতম অংশ। ইহারা +(ve) শক্তি-বিশিষ্ট) হইতে নিঃসৃত অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রশ্মিকণা। কণাগুলির মধ্যে যেগুলি অধিকতর শক্তিশালী, কেবল তাহারাই পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিতে সক্ষম হয়। এই রশ্মিকণাগুলির গুণাগুণ এবং শক্তির পরিমাণ সঠিক নির্দ্ধারণ করা পৃথিবীর বক্ষ অপেক্ষা ভূপৃষ্ঠের ঊর্দ্ধদেশেই অধিকতর সহজ ও সম্ভবপর। কাজেই কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি দ্বারা মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে অধিকতর তথ্যানুসন্ধান, ইহাদের সৃষ্টির আদিকথা এবং মানবদেহের উপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইবে।

(২) Ultraviolet Rays ও Ionosphere—সূর্য্য যে কেবল আলো আর উত্তাপ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সূর্য্য হইতে কম্পনবিশিষ্ট (High frequency) অদৃশ্য x-ray এবং Ultraviolet rays প্রভৃতি বিকিরিত হয়। এই সকল High frequency waveগুলি পৃথিবীতে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কর্ত্তৃক শোষিত (absorbed) হয়। Ultraviolet Rays এর বায়ুমণ্ডলে এই শোষণ নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটায়, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Ultraviolet রশ্মি বায়ুকণাগুলিকে ইলেকট্রন ও আয়নে বিভক্ত করে। ভূপৃষ্ঠের ৩০ মাইল ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ হয় বায়ুমণ্ডলের এই Ionosphere যেখানে থাকে কেবল ইলেকট্রন (Electron) আর আয়ন (Ion), বায়ুমণ্ডলের এই Ionosphere পৃথিবীর উপর দিয়া বেতার-তরঙ্গ চলাচলের বিশেষ সহায়তা করে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কাজ হইবে সূর্য্যালোকের মধ্যস্থ Ultraviolet বা অতিবেগুনী রশ্মি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করা—ইহাদের আক্রমণ হইতে কি ভাবে নিজেদেরকে বাঁচান যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। U. V. রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার সম্বন্ধেও অধিক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হইবে। Ultraviolet রশ্মির গবেষণা জন্য যে যন্ত্রটি কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহার করা হইবে, তাহার নাম photon counters, Ionosphere এ তড়িৎ-প্রবাহের অনুসন্ধান করাও কৃত্রিম উপগ্রহের অন্যতম একটি কাজ। ইহার জন্য Proton precession Magnetometer অথবা Nuclear Resonance Magnetometer এর ব্যবহার করা হইবে।

Proton precession Magnetometer এর গঠন প্রণালী সংক্ষেপে এইরূপ—"একটি জলপূর্ণ ছোট প্লাষ্টিকের পাত্রের মধ্যে তামার তার ডুবান থাকে। ইহার সহিত সংযুক্ত থাকে একটি programmer যাহাকে পৃথিবী হইতে প্রেরিত সংকেত অনুসারে পরিচালিত করিলে তামার তারটিকে প্রতি সেকেণ্ডে পর্য্যায়ক্রমে একবার শক্তিসম্পন্ন ও পর মুহূর্ত্তে শক্তিবিহীন করিয়া দেয়। যখন তারটি শক্তিসম্পন্ন অবস্থায় থাকে, তখন জল মধ্যস্থ হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকগুলি (Hydrozen nucleus অর্থাৎ Protons) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের মতন সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায়। শক্তিবিহীন হইলে সারিবদ্ধ কেন্দ্রকগুলি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পৃথিবী চুম্বকক্ষেত্রের দিকে (Earth's magnetic field) দুলিতে থাকে। কেন্দ্রকের এই দোলন তামার তারের মধ্যে স্বল্পপরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহকে আরও বৃহৎ আকারে দেখাইয়া (Amplify) সাংকেতিক পরিভাষায় পৃথিবীতে বেতার যোগে প্রেরণ করা সম্ভবপর। এই সকল সংকেতবলীর দ্বারা সূচিত তথ্যরাজির সহিত ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে Magnetometer দ্বারা সংগৃহীত খবরাখবরের তুলনা করিয়া বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর চুম্বকশক্তির মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতেও সক্ষম হইবেন।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি হইলে এই ভাবে পৃথিবী হইতে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুর উপর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি মাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যাইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সঠিক তথ্য সংগ্রহ। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা আমরা সাধারণভাবে জানিলেও সঙ্গতভাবে জানি না। যেমন আমরা Magnetic Poles, North Pole ও South Pole-এর সঠিক অবস্থান জানি না। বিভিন্ন দেশের দূরত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকিলেও উহাদের সঠিক দূরত্ব (exact distance) আমরা জানি না। কারণ পৃথিবীর বক্র উপরিভাগের Curveol Surface উপর দিয়া সঠিকভাবে দূরত্ব নির্ণয় সম্ভবপর নয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে নির্দ্দিষ্ট গতিতে ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিবিধি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দেখিয়া ঐ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দূরত্ব জ্যামিতির সাহায্যে (Triangular measure) সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি হইলে আরও বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে। যেমন পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত হইব। পৃথিবী ও গ্রহ ও উপগ্রহের 'ফটো' বেতার মারফৎ (Radio Photo) আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব। শুনা যাইতেছে যে, সোভিয়েট নির্ম্মিত উপগ্রহটি নাকি Radio Photo সম্প্রতি ঊর্দ্ধদেশ হইতে পৃথিবীতে পাঠাইতেছে। মেরুজ্যোতি বা Aurora Borcalins কার্য্যকারণ আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আশা করা যায় যে, কৃত্রিম উপগ্রহ এই বিষয়ে আলাকপাত করিয়া রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবে। সূর্য্যালোক সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য ও মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যের কারণ জানা হইবে। বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া না আসিলেও সূর্য্যালোক মানবদেহের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিত তাহাও জানা যাইবে।

রাসায়নিকেরা কাচের গবেষণা করিতে গিয়া পাইয়াছিলেন Pyrex এর সন্ধান, প্লাষ্টিকের গঠন প্রণালীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আবিষ্কার করিলেন Nylonকে, সেই রকম হয়ত বা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করতে গিয়া আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করিয়া বসিব যাহা আশাতীত ভাবে সৌভাগ্যদায়ী হইবে। আর সব চাইতে বড় কথা যে কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টির দ্বারা মহাশূন্যের পথ আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি ভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি সম্ভব? পৃথিবী হইতে বাহিরে যাইবার প্রধান বাধা হইল মাধ্যাকর্ষণ। আমরা জানি, পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে ভূপৃষ্ঠের উপরের এবং নিকটের যাবতীয় বস্তুকে বিপুলবেগে আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর এই মহাকর্ষণের নামই মাধ্যাকর্ষণ। এইজন্যই কোন বস্তুকে উপরে ছুঁড়িয়া দিলেও মাধ্যাকর্ষণের জন্য পুনরায় উহা মাটির বুকে নামিয়া আসে। দেখা গিয়াছে, কোন বস্তু যদি ১০০ মাইল উপর থেকে মাটিতে পড়ে, তবে উহার পতনকালীন গতিবেগ হয় সেকেণ্ডে এক মাইল (বায়ুর প্রতিবন্ধকতার দরুণ অবশ্য কিছু পরিমাণ গতি হ্রাস হইতে পারে)। বিপরীতক্রমে যদি কোন বস্তুকে সেকেণ্ডে এক মাইল প্রাথমিক গতিতে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করা যায়, তবে উহা ঠিক ১০০ মাইলই উপরে উঠিতে সক্ষম হইবে। V-2 রকেট দিয়া এ ব্যাপারটা পরীক্ষা করা গিয়াছে। এই হিসাবে কোন রকেট যদি সেকেণ্ডে ৫ মাইল প্রাথমিক গতিতে উপরে উঠে তবে উহা ৪০০০ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে পারিবে। কিন্তু প্রাথমিক গতির পরিমাণ যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইল করা যায়, তবে উহা মাধ্যাকর্ষণের জন্য আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না। কেন না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কোন অবস্থাতেই সেকেণ্ডে ৭ মাইল অথবা তাহার অধিক কোন গতি উৎপাদনে অক্ষম। অর্থাৎ লক্ষ মাইল অথবা তদধিক উচ্চতর কোন স্থান হইতে কোন বস্তুকে পৃথিবীর উপর ফেলিলেও উক্ত বস্তুর পতনকালীন গতিবেগ কোন অবস্থাতেই সেকেণ্ডে ৭ মাইলের অধিক হয় না।

এতক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, প্রাথমিক গতি যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইল (অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬০ × ৬০ × ৭ = ২৫২০০ মাইল) হয়, তবে উহা মাধ্যাকর্ষণের জন্য আর ফিরিয়া আসিবে না, পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া চিরকালের জন্য মহাশূন্যে চলিয়া যাইবে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবার সময়ে রকেটের গতিবেগ (প্রাথমিক) সেকেণ্ডে ৭ মাইল হওয়ার প্রয়োজন নাই, কেননা, ঐরূপ গতিবেগ সাতায় হইলে উহা আর পৃথিবীর চারিদিকে না ঘুরিয়া বহির্বিশ্বে চলিয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ প্রচণ্ড প্রাথমিক গতি উৎপাদনও একপ্রকার অসম্ভব। কেননা, প্রাথমিক গতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে, সমস্ত জ্বালানীকে মুহূর্ত্তমধ্যে পুড়াইয়া এক প্রচণ্ড ধাক্কা সৃষ্টির প্রয়োজন, যাহা রকেটকে একেবারে নির্দ্দিষ্ট উচ্চতায় লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ বিস্ফোরণ তথা ধাক্কা ঘটানো এক কথায় অসম্ভব এবং সম্ভবপর হইলেও রকেটের পক্ষে তাহা সহ্য করা সাধ্যাতীত। এরই জন্য বৈজ্ঞানিকেরা সৃষ্টি করিলেন Three stage Rocket, যাহাতে ধাক্কাটা একেবারে না দিয়া বারে বারে, পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

মাধ্যাকর্ষণ ও কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন সম্বন্ধে সাধারণ একটি উদাহরণ দিতেছি। আশা করি, বিষয়টা এবার বোধগম্য হইবে। একটি ঢিলকে সূতা বাঁধিয়া উপরে ছুঁড়িয়া দিলে মাধ্যাকর্ষণ হেতু উহা পুনরায় মাটিতে পড়ে,—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু ঐ ঢিলটিকেই যখন সূতায় এক প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইয়া থাকি, তখন উহা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, নীচে আর পড়ে না। কারণ জানিতে গেলে উভয়ের অবস্থার তারতম্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বের সহিত পরের অবস্থার প্রধান পার্থক্য হইল যে, দ্বিতীয়াবস্থায় ঢিলটি গতিবেগ সম্পন্ন হইয়াছে এবং উক্ত গতিই ঢিলটিকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছে। সূতা ঘুরাইবার সময় দুইটি শক্তি কার্য্যকরী হইতেছে—একটি কেন্দ্রাভিমুখী Centripetal অপরটি কেন্দ্রবিমুখী Centrifugal। প্রথমটির কাজ হইতেছে ঢিলটিকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখা, দ্বিতীয়টি বস্তুটিকে কেন্দ্র হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এখন এই শক্তি দুইটি উভয়ে যদি পরস্পর সমান হয়, তবে বস্তুটি কেন্দ্রের দিকে অথবা কেন্দ্রের বিপরীত কোন দিকেই না গিয়া, কেন্দ্র হইতে নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করিয়া কেন্দ্রেরই চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।

বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মানুসারেই সূর্য্য পৃথিবীকে ও পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছে (All bodies attract cach other) আর এই আকর্ষণকেই বলা যাইতে পারে Centripetal Force. প্রকৃতপক্ষে সূতাবাঁধা ঢিল যে কারণে কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরে ঠিক সেই কারণেই পৃথিবীও ও চন্দ্র যথাক্রমে সূর্য্য এবং পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। তবে একটা কথা, গতিবেগ ও আকর্ষণের মধ্যে থাকা চাই সামঞ্জস্য। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরে, কেননা সূর্য্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর গতিবেগের মধ্যে

সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলেও চাই মাধ্যাকর্ষণ ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া!

কৃত্রিম উপগ্রহ তৈয়ারী করিবার সময় সাধারণতঃ তিনটি নিয়ম পালন করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইহার গতিবেগ হওয়া চাই সেকেণ্ডে ৪½ মাইল (সোভিয়েট উপগ্রহের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৬ মাইল।) দ্বিতীয়তঃ ইহাকে পৃথিবীর ঘন বায়ুস্তরের উপরে থাকিতে হইবে। কারণ গতিবেগ বায়ুস্তর দ্বারা ব্যাহত হইলে ইহা ক্রমশঃ গতিহীন হইয়া নীচে পৃথিবীর দিকে পড়িবে এবং পতনকালে পৃথিবীর ঘন বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষে উল্কাপিণ্ডের মতন জ্বলিয়া উঠিবে। তৃতীয় এবং শেষ সর্ত্ত হইতেছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহটিকে তথাকথিত যে কোন একটি Great Circle বা 'বৃহৎ বৃত্তে' ঘুরিতে হইবে। Great Circle কথাটির অর্থ হয়ত অনেকের কাছে বোধগম্য না হইতেও পারে। মনে করা যাক, একটি ময়দার গোলাকার বল। এখন যদি ইহাকে ছুরি দিয়া লম্বা অথবা আড়াআড়ি, যেভাবেই হউক না কেন খণ্ড খণ্ড করা যায়, তবে ঐ খণ্ডগুলির প্রত্যেকটির আকারই বৃত্তাকার হইবে। এখন ঐ বৃত্তাকার খণ্ডগুলির মধ্যে যে খণ্ডটি পূর্ব্বোক্ত বলের মধ্য অর্থাৎ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কাটা হইবে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার হইবে। এই বৃহত্তর খণ্ডটির যে কোন অংশকেই Great Circle বলা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন করিবার সময়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহা যেন Great Circle অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের উপর দিয়া পরিকল্পিত বৃহৎ বৃত্তে ঘুরে। এই ঘূর্ণন পূর্ব্ব-পশ্চিম অথবা উত্তর-দক্ষিণ যে কোন দিকেই সম্ভব। তবে পূর্ব্ব-পশ্চিমেই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন অধিকতর সুবিধাজনক, কেননা পৃথিবীর আহ্নিকগতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। কাজেই পৃথিবীর গতির তালে তাল রাখিয়া ঘুরিলে জ্বালানী খরচের পরিমাণটা কিছু কম হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজনের সর্ত্ত অর্থাৎ Conditionsগুলির কথা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। এখন দেখিতে হইবে, কি ভাবে উপরোক্ত সর্ত্তগুলি পালন করা সম্ভব। সাধারণতঃ এ ব্যাপারটি সম্ভবপর হয় রকেটের সহায়তায়। রকেটের মূল কথা বুঝিতে হইলে হাউই বাজীর দৃষ্টান্ত দিতে হয়। হাউই বাজীতে যখন আগুন দেওয়া হয়, তখন উহার নিম্নদিক হইতে নির্গত গ্যাস যে বিপুল ঊর্দ্ধচাপের সৃষ্টি করে তাহাই হাউই বাজীকে ঊর্দ্ধে উঠিতে সহায়তা করে। রকেটের গঠনপ্রণালী মূলগতভাবে অনুরূপ। তবে পার্থক্য এই যে, রকেট বড় আর হাউই বাজী ছোট। সাধারণ রকেটের সঙ্গে, কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন করিবার জন্য যে রকেট ব্যবহার করা হয় তাহার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তুত, ইহাকে একটি রকেট না বলিয়া "রকেট সমষ্টি" বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজীতে ইহাদের নাম Three Stage Rocket.

এই বিশেষ ধরণের রকেটের মধ্যে থাকিবে তিনটি স্বতন্ত্র অংশ, মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ। যাহারা প্রত্যেকটিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রকেট। কৃত্রিম উপগ্রহটি থাকিবে মস্তক-রকেটে। সমুদ্রতীর হইতে যাত্রা করাই সুবিধাজনক, কেন না পরে যখন রকেটের লেজ ও দেহকাণ্ড একে একে খসিয়া পড়িবে, তখন জলের উপর পড়িলেই ভাল হয়। রকেট যখন ছাড়া হয়, তখন দর্শকেরা বিদ্যুৎ চমকের মতন আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না। কারণ কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই সেকেণ্ডে ৭০০০ ফুট গতিতে উহা ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহাদের গতিবেগ খুব একটা বেশী না হইলেও গতিবেগ ক্রমশঃ সেকেণ্ডে ৫০ ফুট করিয়া বাড়িতে থাকে। ২০ সেকেণ্ড পরে রকেটকে দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতন। এক মিনিট পরে ইহা ১২০০০০ফুট উঠিতে সক্ষম হয়। এই সময় কিন্তু রকেট আর খাড়াভাবে (straight) উঠিতে সক্ষম হইবে না, একটু আড়ভাবে উঠিবে। ১মিঃ ১৫ সেঃ পরে রকেটের লেজের অংশ খসিয়া পড়িবে। খসিয়া পড়া অংশ ইহার সহিত পূর্ব্ব হইতে সংলগ্ন লোহার প্যারাস্যুটে করিয়া রকেট ছুঁড়িবার স্থান হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবে। তবে 'বেগবল' বা Momentum এর জন্য খসিয়া পড়া অংশ প্রথম প্রথম কিছুটা উপরে উঠিবে (চলন্ত বাস হইতে নামিবার সময় আমরা যেমন বাসের গতিবেগের সঙ্গে সমতা রাখবার জন্য খানিকটা এগিয়ে যাই) লেজ খসিয়া পড়িবার পর রকেটের দেহভার শতকরা ৭৫ভাগ কমিয়া যায়। দ্বিতীয় রকেটের কাজ সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়। গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়া হয় সেকেণ্ডে ৩ মাইল। আরও এক মিনিট পনেরো সেকেণ্ড পরে প্রায় ৪৫ মাইল ঊর্দ্ধে থাকাকালীন দেহকাণ্ডও খুলিয়া পড়িয়া যায় এবং রকেট ছুঁড়িবার স্থান হইতে আনুমানিক ১০০ মাইল দূরে আসিয়া পড়ে। লেজ ও দেহকাণ্ডের গুরুভার হইতে মুক্ত হইয়া মস্তক-রকেট, যাহার জ্বালানী তখনও পর্য্যন্ত একবিন্দুও খরচ হয় নাই, অসম্ভব দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতে থাকে, মাটি হইতে যাত্রা করিবার প্রায় ৪ মিনিট পরে তৃতীয় রকেটের জ্বালানীর দহনক্রিয়া (Fuel consumption) বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় উহা প্রক্ষেপকের (Projectile) মতন ছুটিয়া যাইবে। গতিবেগ ইতিমধ্যেই সেকেণ্ডে ৪½ মাইল হইয়াছে. এইবার কৃত্রিম উপগ্রহ সমেত মস্তক-রকেটটি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমকেন্দ্রিক কক্ষপথে অর্থাৎ Great circle এ আসিয়া পৌছায়। আনুমানিক ৪৫ মিনিট পরে যখন উহা পৃথিবীকে প্রায় অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিয়াছে তখন উহার গতিপথ পুরাপুরি 'বৃহৎ বৃত্তের' বা Great circle অন্তর্গত হয়। এর পর থেকেই ইহা ঘুরিতে থাকে পৃথিবীর চারিদিকে ঠিক একটি ছোট্ট চাঁদের মতন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। কৃত্রিম উপগ্রহটি যে বৃত্তাকার কক্ষপথেই ঘুরিবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতপক্ষে ইহার ডিম্বাকার কক্ষপথে (Elliptical Orbit) গমন করাই অধিকতর স্বাভাবিক। তবে এক্ষেত্রেও কক্ষপথটি পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়া পরিকল্পিত সমতলের (Plane passing through the centre) উপর দিয়া যাইবে। কক্ষপথের আকার মুখ্যতঃ নির্ভর করে মস্তকের রকেট কর্ত্তৃক উপগ্রহটিকে নিক্ষেপণের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর।

রাশিয়া যে উপগ্রহটিকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ডিম্বাকার কক্ষপথে বিষুবরেখার সহিত ৬৬° কোণ করিয়া ঘুরিতেছে। ৬৬° কোণ করার সুবিধা হইতেছে যে একমাত্র মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সকল অংশ হইতেই কোন না কোন সময়ে উপগ্রহটিকে দেখা সম্ভবপর হইবে। কারণ কক্ষপথটি বরাবর একই সমতলে থাকিবে (in the same plane), না। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সহিত বিষুবরৈখিক

অঞ্চলের মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যের জন্য কক্ষপথটি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে সরিয়া আসিতেছে (Precessional Motion)। কক্ষপথটির এই ভাবে সরিয়া আসার দরুণই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে উপগ্রহটিকে দেখা সম্ভবপর হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষপথ ডিম্বাকৃতি হইলেও ক্রমে ক্রমে ইহা বৃত্তাকারে রূপান্তরিত হইতেছে। ইহার কারণ এই—কৃত্রিম উপগ্রহটি ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘুরিবার সময়ে একবার পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে (Perigee) ও একবার সর্ব্বাপেক্ষা দূরে (Apogee) চলিয়া যাইতেছে। যখন সবচেয়ে কাছে থাকে তখন পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ সর্ব্বাধিক এবং দূরে চলিয়া গেলে আকর্ষণের মাত্রা হ্রাস পায়। অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের Uniformity বা সমতা থাকে না। পৃথিবীর নিকটে থাকিবার সময়ে উপগ্রহটির শক্তি কিছু পরিমাণ ক্ষয় হইতেছে। এই ভাবে কক্ষপথটি ক্রমে বৃত্তাকার হইয়া ছোট হইয়া (shrink) যাইবে।

একটা মজার কথা এই যে, একটি উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে গিয়া আমরা দুইটি সৃষ্টি করিয়া বসিব। বস্তুতপক্ষে রাশিয়া যে কৃত্রিম উপগ্রহটি ছাড়িয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারটাই ঘটিয়াছে। কেন?

আগেই বলিয়াছি যে, কেবল মস্তক-রকেটের মধ্যেই থাকিবে কৃত্রিম উপগ্রহটি। মস্তক-রকেটটি যখন যথানির্দ্দিষ্ট গতিবেগ ও গতিপথে আসিয়া পড়িবে, তখন যান্ত্রিক কর্ম্মকুশলতায় কৃত্রিম উপগ্রহটি মস্তক-রকেট হইতে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু মস্তক-রকেটটির অবস্থা কি হইবে? উহা নিশ্চয়ই আর নীচে পড়িবে না। কেননা কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মস্তক-রকেটের অবস্থাগত কোন পার্থক্য নাই। কাজেই দুইটিই অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহটি একটু আগে ও মস্তক-রকেটটি তাহার পিছু পিছু পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।

রাশিয়া যে কৃত্রিম উপগ্রহটি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সাধারণের কৌতুহল হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, ইহা কি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে, না অনন্তকাল ধরিয়া চাঁদের মতন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে? কৃত্রিম উপগ্রহটির যে পৃথিবীতে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে যে, উপগ্রহটির দূরত্ব পৃথিবী হইতে সব সময়ে সমান নয়। যখন পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে থাকিতেছে, তখনকার দূরত্ব ৫৬০ মাইল, আর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকাকালীন দূরত্বের পরিমাণ মাত্র ১৫০ মাইল। দূরে থাকিবার সময়ে পৃথিবীর ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুস্তর তথা মাধ্যাকর্ষণ, কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিবেগ ও গতিপথের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে নিকটে থাকিবার সময়ে উহাদের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। বায়ুস্তরের সহিত অল্পবিস্তর সংঘর্ষ friction এবং মাধ্যাকর্ষণের অসম আচরণ কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিবেগ ধীরে ধীরে হ্রাস করিতে থাকিবে। উহা ডিম্বাকার কক্ষপথটি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইয়া বৃত্তাকারে পরিবর্ত্তিত হইবে কক্ষপথটি ক্ষুদ্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহটিকে অধিকতর ঘন বায়ুস্তরের সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে। আর সেই সংঘর্ষের দ্বারা সৃষ্ট হইবে উত্তাপের, যে উত্তাপ কৃত্রিম উপগ্রহটি উল্কাপিণ্ডের মতন ধ্বংস নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

'এ ব্যাপারটা কবে ঘটিবে, তাহা সঠিকভাবে বর্ত্তমানে বলা সম্ভব নয়। কেহ বলিতেছেন, ইহার আয়ুষ্কাল এক মাস, আবা কাহারও মতে ইহা ২০ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে বস্তুতপক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহটির আয়ুষ্কাল নির্ভর করিতেছে অন্তত বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এবং কৃত্রিম উপগ্রহটির উপর মাধ্যাকর্ষণে পরিমাণের উপর। কাজেই উহা কত দিন যাবৎ ঘুরিতে থাকিবে— তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। আর একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহটির বেতার-সংকেত-প্রেরণ-ক্ষমতা কতকাল থাকিবে এ বিষয়েও আগে কিছু বলিয়াছি। যদি কৃত্রিম উপগ্রহের বেতার চালনের শক্তি ব্যাটারী হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তবে ইহা ১ দিন, কি খুব বেশী এক মাস অবধি বেতার সংকেত পাঠাইতে সক্ষম হইবে, আর যদি সূর্য্য হইতে শক্তি আহরণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তবে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে উহার বেতার-সংকেত-প্রেরণ-ক্ষমতা বহুকাল বর্ত্তমান থাকিবে। তবে একথাও ঠিক যে, সংকেত প্রেরণ ক্ষমতা না থাকিলেও, কৃত্রিম উপগ্রহটি অনেক দিন ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকিতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি বিজ্ঞান জগতে এক আলোড়ন আনিয়াছে। মানুষ এখন দেখিতেছে, গত দিনেও যাহা ছিল স্বপ্ন, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। যাহা ছিল অবাস্তব, তাহা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকের মানুষ তাই চন্দ্রলোকে তথা মঙ্গলগ্রহে যাইবার কথা ভাবিতেছে। যাওয়াকে আজ আর অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছে না। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক M. Khlebtzevitch এর মতে মানুষ আগামী ৫ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যেই চাঁদে পৌঁছাইতে পারিবে। তখনকার দিনে মাইকেল অসম্ভব বস্তুলাভের Simile খুঁজিতে নিশ্চয়ই "বামন হইয়া কে চাহে ধরিতে চাঁদে?"—এই দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইবেন না।

—শ্রীশ্যামলকুমার রায়

তুমি এসো

কুমারী সুস্মিতা মিত্র

আমার মনের নিভৃতে তোমার, হে পান্থ,
বাজে রিনি-ঝিনি চরণ-নূপুর শুনি কানে—
জীবন আমার হল যে মুখর, অশান্ত
চাওয়া-পাওয়া নিয়ে চলেছে দ্বন্দ্ব মোর প্রাণে।

জীবনে আমার তুমি এসে হেসে যাও চলে,
আমি কাঁদি আর ঝরা-ফুল ল'য়ে মালা গাঁথি
ওগো প্রিয়, এসো, অমৃতের বাণী যাও বলে,
সার্থক হোক না-ফোটা রজনী-গন্ধাটি।

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নয়

য়ুসুফ মোটরে চড়েই পল্লবকে জড়িয়ে ধরল। বলল: না পল্ল! আজ কী খুশি যে হয়েছি—জানো না।

কেন?

আর কেন। ঐ গিদো—গায় ভালো—কিন্তু কী যে দাম্ভিক। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ওকে যে থ করে দিয়েছ—সাবাস! ব্রাভো! Ausgezeichet! Vive le grand chanteur! Grazie a Dio!

পল্লব হেসে বলে: বাকি চারটে ভাষার জয়ধ্বনিগুলি আর বাকি থাকে কেন?

য়ুসুফ হেসে বলল: সত্যি এত আনন্দ আমি অনেক দিন পাইনি। আর কী গানই গাইলে দাদা! ফাটিয়ে দিলে তানে গমকে গর্জনে হুঙ্কারে! ধন্য হে চারণ-আম্বাসাডর! আমাদের দেশ যদি দৈবাৎ স্বাধীন হয়—মানে আমাদের জীবদ্দশায়, তবে তোমাকে পাঠাতেই হবে আম্বাসাডর করে দেশের পর দেশে।

পল্লব প্রসঙ্গান্তর আনতে বলে: কিন্তু সালভিনির কাছে এলিওনোরা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এখন উঠে পড়ে লেগেছে কেন বলতে পারো?

পারি না? আমি কী না পারি শুনি? সালভিনি এলিওনোরার প্রেমে অথৈ জলে।

পল্লব চমকে ওঠে: বলো কি হে? ষাট বছরের বুড়ো!

য়ুসুফ বলল: এলিওনোরাও এমন কিছু কচি খুকি নয়। চল্লিশের কিনারায়।

তবু—

তবুর কী আছে এতে? রোমান্সের আয়ু এদেশে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি। পঁচাত্তর বৎসরের পিতা এদেশে এখনো পঁচিশ বৎসরের নববধূর পাণিগ্রহণ করতে উঠে পড়ে লেগে থাকেন এবং প্রায়ই করে থাকেন।

পল্লব লজ্জিত হয়ে ধমকায়: কী যে কথার ছাঁদ!

য়ুসুফ বলল; কিন্তু—থাক এ সব অশ্লীল মধুবাক্য। তোমাকে আমার একটা অনুরোধ আছে ভাই! তুমি সালভিনির সঙ্গে দেখা না করে বার্লিনে ফিরো না।

বার্লিনে ফিরব আমি—কে বললে?

মানে—যদি ফেরো।

পল্লবের মনে বিষাদ ছেয়ে আসে। একটু উল্লাসের বিদ্যুতের পরেই ছেয়ে আসে বেদনার অন্ধকার।

দশ

গিদোর কাছে পল্লব ইতালিয়ান গান শেখা সুরু ক'রে দিল। শেখাতে শেখাতে উল্লাস বেড়েই চলল। শেষে একদিন বলল: এলিওনোরার কথা তুমি ঠেলো না। সালভিনি মাসখানেকের মধ্যে রোমে ফিরবেন—তাঁকে এ গানগুলি তোমাকে শোনাতেই হবে।

পল্লব সাক্ষাৎ গিদোর কাছে উৎসাহ পেয়ে ভেবেচিন্তে স্থির করল—যাবে সালভিনির কাছে। এর পরে মাঝে মাঝেই এলিওনোরা ওকে নিমন্ত্রণ করত। পল্লবের সত্যিই ভালো লেগে গেল এলিওনোরার ব্যবহার। শেষে একদিন ঝোঁকের মাথায় আইরিনকে লিখবে না লিখবে না করেও লিখে দিল সব কথা: কী ভাবে ওর জীবন কাটছে রোমের আবহাওয়ায়। কোনো উত্তর এল না। ওর 'সদাটলমান' মন আবার খারাপ হয়ে যায়—ফের ইচ্ছা হয় দেশে ফিরতে। কী হবে মিথ্যে ইতালিয়ান গান শিখে? কী হবে সালভিনির সঙ্গে দেখা করে? ওর মনের মধ্যে কেবলই খচখচ করতে থাকে: কুসুম জেলে আর সে কি না এখন অবান্তর বিয়াংকি সালভিনি এলিওনোরার কথা ভাবছে? গান তো ইন্দ্রিয়-বিলাস সূক্ষ্ম বিলাস হ'তে পারে, কিন্তু বিলাস ছাড়া আর কী? অথচ মজা এই যে, এ-বিলাসে এখন কই আর উল্লাসের ছিটে-ফোঁটাও তো নেই! একদিকে আইরিনের কোনো খবরই নেই, অন্যদিকে কুসুম ওকে ডাকছে দেশে ফিরতে, অথচ ঠিক এই সময়েই কি না ও আটক পড়ল কোথাকার-কে সালভিনির জন্যে? বিড়ম্বনা বলে আর কা'কে?

এমন সময়ে লসান থেকে এল আইরিনের আর এক ছবিকার্ড। শুধু লেখা: আমরা খুব ঘুরে বেড়াচ্ছি—কবে যে কোথায় থাকি নিজেরাই জানি না। পরে লিখব। আইরিন।

কিন্তু আইরিনের দু'-দু'টি কার্ডেই এই একই আশ্বাস—পরে লিখবে। এর মানে কী? আইরিন কি ওকে দূরে রাখতেই চেষ্টা করছে? কিম্বা ভুলে যেতে? কে জানে? স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—আওড়ায় মনঃক্ষোভে। তারপরেই আসে অনুশোচনা। ছি ছি? আইরিন তো যেমন তেমন মেয়ে নয়!

একদিন আর থাকতে না পেরে য়ুসুফকে বলল। য়ুসুফ শুনে ভাবিত হ'য়ে তাই তো ব'লেই চুপ।

এর সাত আট দিন বাদে আইরিনের আর এক ছবিকার্ড এল জারমাট থেকে। এখানে চমৎকার তুষারের দৃশ্য—ব্যস্।

পল্লবের মন দুঃখে অভিমানে কালো হ'য়ে আসে। রুখে উঠে ও আরো মন দিল ইতালিয়ান গান শিখতে—যাকে বলে প্রতিহিংসার সহিত।

এমন সময়ে একদিন বিকেলে হঠাৎ য়ুসুফ মুখ অন্ধকার ক'রে বলল: ভাই, মেয়াদ ফুরুল, আজই বার্লিন ফিরতে হবে।

পল্লব ওর মুখ দেখেই চমকে গেল: কী হয়েছে?

য়ুসুফ ম্লান হেসে বলল: সে আমি বলতে পারব না। চললাম—ঘণ্টাখানেক বাদেই ট্রেন।

সে কি? এত তাড়া কিসে?

য়ুসুফ হেসে বলে: আর কিসের? আকাশের তারারা জোট পাকিয়ে তাড়ালো। আমি জ্যোতির্ময় পুরুষকে না মেনেও মাঝে মাঝে জ্যোতিষ না মেনে পারি না।

পল্লব হঠাৎ বলল: চলো, আমিও যাই। আমার এখানে একটুও ভালো লাগবে না তুমি চ'লে গেলে।

য়ুসুফ বলল: না, সেটা ভালো হবে না। এলিওনোরা তোমাকে সত্যিই নিজের ছোটভাইয়ের মতন মনে করে। তোমার সম্বন্ধে ও যে-ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শুনলে তোমার গৌর কর্ণমূল লোহিত—কিন্তু সে থাক্। ও তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই সালভিনিকে লিখেছে, তিনি আর দিন-পনেরর মধ্যেই আসবেন—

তোমার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যও প্রকাশ করেছেন। এ-সময়ে you must not let her down বলেই একটু থেমে: তাছাড়া শ্রীমতীই যখন অন্তর্হিতা তখন বার্লিনে ফিরে শ্রীমান্ কী করবেন শুনি? তৃণ-কর্তন?

ফিরতেও তো পারে।

উঁ হুঃ। ও যদি সত্যিই তোমাকে এড়িয়ে চলতে চেয়ে থাকে তবে এ সময়ে কিছুতেই বার্লিন ফিরবে না। বলেই হেসে: ভাই, ওঁরা যখন ধরা দেন তখন কাছে আসেন যেন পোষা পায়রা। কিন্তু পরে আবার যখন উধাও হন তখন ঈগল পাখীর মতন কোন ছায়াপথে যে বিচরণ করেন—দূরবীণ দিয়েও পাত্তা পাওয়া যায় না। বলে ওর পিঠে হাত রেখে: কিন্তু তুমি ভেবো না—আমি ইতিমধ্যে ফ্রাউ ক্রামারকে লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে ধরা-ছোঁয়া দেন নি! সে যাই হোক, বার্লিনে ফিরে যে করেই হোক এ-রহস্য ভেদ করব।

আর তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে—কথা দাও?

য়ুসুফ হেসে বলল: জানাব বৈ কি। কেবল তার করলেই তুমি উড়ে এসো—কেমন? মানে, যদি শ্রীমতীকে গ্রেপ্তার করতে চাও।

ব'লে ওর স্বভাবসিদ্ধ মধুর হেসে বিদায় নিল। কেবল আজ সে হাসির উপরে একটা বিষাদের ছায়া মতন!

পল্লব ভাবে আর ভাবে: কী হ'ল ওর হঠাৎ!

এমনি সময়ে এলিওনোরার মোটর এসে হাজির। সেই উর্দিপরা সারথি ওর হাতে দিল কার্ড: পল! একবার এক্ষণি আসতে পারো কি? এখানেই ডিনার খেও ও খাওয়ার পর রাত্রে থেকে যেও। লক্ষ্মীটি!

এগারো

এলিওনোরার মোটরে হু-হু ক'রে চলতে চলতে পল্লবের মনে রাজ্যের দুর্ভাবনা ভিড় ক'রে আসে। এলিওনোরার সঙ্গে সম্প্রতি গানের সূত্রে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেও এ-ভাবে সে ওকে ডেকে পাঠাবে এ ও ভাবতেই পারে নি। য়ুসুফ ওকে ভরসা দিয়েছে বটে যে পল্লবকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন ভালোবাসে—তবু—মনে হয় ফের কুসুমের কথা। কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর মনে পড়ে য়ুসুফের ম্লান হাসি ও পল্লবের প্রশ্নের উত্তরে মাথা-নাড়া: সে আমি বলতে পারব না।

এলিওনোরা ওকে সত্যি আপন মনে করে বলেই ডেকেছে ভাবতে ভালোও লাগে···অথচ একটা কেমন যেন সঙ্কোচও আসে। কুসুমের একটি প্রায়োক্তি ওর ফিরে ফিরে মনে হয়: আমাদের এখানে আসা মেয়েদের মনস্তত্ত্ব জানবার জন্যে নয়—নিজেদের তৈরি করতে—মানুষ হ'তে। বিধান অপ্রতিবাদ্য—অথচ—তবু এলিওনোরার মত মনোরমার স্নেহ এত সহজে পেয়ে ওর মন খুশি হ'য়ে ওঠে—কুসুম এদের জীবনের কতটুকুই বা জানল? অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে: কিন্তু জানার এমনই বা কী দরকার?

উত্তর খুঁজে পায় না। হয়ত পেত—যদি মনের মধ্যে ওর বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে না আসত।

* * * *

এলিওনোরার সুন্দর ভিলায় মোটর এসে দাঁড়াতেই ওর কামেরিয়েরা ১ অভিবাদন ক'রে ওকে নিয়ে গেল সোজা এলিওনোরার শয়নকক্ষে।

পল্লব মেডকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে: কী ব্যাপার?

মেড ফিস্-ফিস্ ক'রে বলে: Signora e' ammalata. ২

* * * *

পল্লব এলিওনোরার ঘরে ঢুকেই চমকে গেল। কমনীয় মুখের উপর কালো ছায়া, চোখের কোলে কালি—তাছাড়া প্রসাধন নেই ব'লে আরো যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে। শয়ন অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে পল্লবের হাত চেপে ধ'রে বলে: বোসো ভাই!

বিছানার পাশেই একটি কুশনওয়ালা চেয়ার ছিল, পল্লব বসল। এলিওনোরা এবার ওর দু'টি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখে চোখ বোজে।

* * *

মিনিট দুই পরে এলিওনোরা চোখ খুলে পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাসে—নামমাত্র হাসি—

ব্যাপার কি এলিওনোরা? তোমার কামেরিয়েরা বলল—অসুখ।

হ্যাঁ, এ আমার কালব্যাধি—মাথা-ঘোরা। একটু বোসো ভাই! বলছি। বলতেই ডেকেছি। উঃ! ব'লে ফের চোখ বোজে।

এলিওনোরা ঘুমিয়ে পড়েছে। পল্লব পা টিপে টিপে বাইরে যায়—বাগানে। আকাশ মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর দেহ জুড়িয়ে যায়। কেবল চিন্তার তাপ বেড়েই চলে: কী ব্যাপার?

কামেরিয়ারার পুনরাবির্ভাব: Favorisca Signora.... ৩

বারো

এলিওনোরা বিছানায় অর্ধশায়িতা অবস্থায় ওর হাত ধ'রে টেনে জোর ক'রে ওকে বিছানার উপরেই বসিয়ে বলে: তুমি কত কী ভাবছ হয়ত—কিন্তু আমি তোমাকে না ডেকে পারলাম না। মনের ভার একলা বইতে পারি না আর। হয়ত অন্যায় করলাম—য়ুসুফ কি সাধে আমাদের অবজ্ঞা করে—

না না, সে কি কথা? আমি—

এলিওনোরা ম্লান হেসে ওকে থামিয়ে বলে: শোনো পল! আমি তোমাকে যা বলতে ডেকেছি শুনলে তুমি এতই অবাক হবে, যে হয়ত ভাববে আমি বাড়িয়ে বলছি।

না না—

শোনো আগে, তবে 'না না' কোরো। আমি আজ এত দুর্বল বোধ করছি—যে কথা বলতেও কষ্ট—

তবে এখন থাক না—আমার কোনো কাজই তো নেই, একটু পরে হবে।

না পল! না ব'লে আমি আর থাকতে পারছি না—নৈলে ভাবো কি তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে জোর ক'রে বলাত চাইতাম যা—যা—এক য়ুসুফ ছাড়া আর কেউ জানে না? ব'লেই ফের চোখ বোজে।

পল্লব চুপ ক'রে ওর দিকে দিকে চেয়ে ওর একটা হাতে হাত বুলোয়।

এলিওনোরা একটু পরে চোখ চেয়ে বলে: য়ুসুফ তোমাকে মারিয়ার সম্বন্ধে বলেছে নিশ্চয়ই?

১। পরিচারিকা।

২। কর্ত্রী অসুস্থা। ৩। দয়া ক'রে—কর্ত্রী—

কিছু বলেছে—তবে আমাকে ও মনে করে—নাবালক, তাই বেশি বলেনি।

এলিওনোরা ম্লান হাসে: না, তোমাকে ও মুখে যা বলে মনে মনে তা ভাবে না। ও তোমাকে বেশি বলেনি কেন শুনবে?

পল্লব ওর দিকে প্রশ্নোৎসুক নেত্রে তাকায়।

এলিওনোরার হাসি আরো ম্লান হ'য়ে আসে, বলে: ও তোমাকে খুব সাবধান হ'য়েই বলেছে এই জন্যে যে, বেশি বললে আমার কথাও বলতে হয়—আর সেটা ও পারে না আমার অনুমতি বিনা। কিন্তু শোনো—সব কথা শুনলে বুঝতে পারবে—কিম্বা—কে জানে—হয়ত ভুল বুঝবে? হয়ত এখনই ভাবছ অবাক হ'য়ে—সিনেমা-তারকাও কি না এমন সেণ্টিমেণ্টাল!

পল্লব ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে: না এলিওনোরা, মানুষের পেশা যে তার স্বভাবকে বদলে দিতে পাবে না এটুকু বুঝবার মতন সাবালক আমি হয়েছি বিশ্বাস কোরো। কারণ—কারণ ঘা আমিও খেয়েছি হয়ত য়ুসুফ তোমাকে কিছু ব'লে থাকবে?

আভাসে কিছু বলেছে। তবে ও ভারি চাপা মানুষ—কাউকেই কিছু বলে না, যা ভাবে তা গোপন ক'রে এমন ভাব দেখায় যাতে লোকে ওকে তা-ই ভাবে যা ও নয়। তবে আমাকে ও আইরিনের কথা বেশি না বললেও রিতার কথা বলেছে বেশ ঘটা ক'রেই যার—ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—যে এক কথায় সব ছেড়ে চ'লে যেতে পারল সত্যি, রিতাকে আমি হিংসে করি।

হিংসে?

হ্যাঁ, কারণ সে পেরেছিল যা আমি পারিনি—পারিনি—কারণ—কিন্তু না, বলি আগে—ভূমিকা রেখে। কেবল একটি ভরসা চাই—তুমি শুনতে রাজি আছ তো?

সে কি কথা এলিওনোরা? আমার একটি দিদির সাধ ছিল অনেক দিন থেকে। য়ুসুফ আমাকে ব'লে গেছে যে তুমি আমাকে ছোট ভাই ব'লেই বরণ ক'রে নিয়েছ—আমি না চাইতেই—

এলিওনোরা মৃদু হাসে: যিশুর একটি কথায় আমার আপত্তি আছে। তিনি বলেছিলেন—যে চায় সে পায়ই। আমি বলি—যে প্রেমের ক্ষেত্রে সেই পায় না যে চায়—পায় সেই যে পেতে না চেয়ে দিতেই ছোটে। তুমি এত লোকের স্নেহ পাও এই জন্যেই—তোমার ভাষায়—তুমি দেবার সময়ে প্রতিদানের কথা ভাবো না ব'লে। আর তাই হয়ত দিতে পারো এত সহজে। কিন্তু শোনো—কথায় কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে। গিদো ফোন করেছে, সে ডিনারে আসবে। তার আসার আগেই যা বলার ব'লে শেষ করতে হবে।—তোমার হাত দাও, যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে—

পল্লব আর্দ্র হ'য়ে ওর দুটো হাতই নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে: ভাই-বোন পাতিয়েও এমন কথা বলে?

এলিওনোরার মুখে ফের সেই করুণ হাসি ফুটে ওঠে: এত মিষ্টি কথা কত দিন শুনিনি—মারিয়া যাবার পর। ব'লে হাত ছাড়িয়ে চোখের জল মুছে সুরু করে: শোনো তবে। মারিয়ার সম্বন্ধে য়ুসুফ তোমাকে হয়ত বলেছে—সে সম্পর্কে আমার বোন হ'য়েও স্বভাবে ছিল ঠিক আমার উল্টো। তার সত্যি বিশ্বাস ছিল বাইবেলে। আমি

ক্যাথলিক মাত্র নামে, সে ছিল মনে-প্রাণে। ভার্জিন মেরীর মূর্তি, ঐ যে দেখছ—ব'সে ঘরের কোনো কাচের ঘেরাটোপ-পরা একটি সুন্দর মেরী-মূর্তি দেখিয়ে—ঐ বিগ্রহটির সামনে সে রোজ ধূপ-দীপ জ্বালাত, স্তব করত নতজানু হ'য়ে সাঁঝ-সকালে।

তাই য়ুসুফ যখন তাকে বলল যে, সে কোরাণ মেনে মুসলমান না হ'লে ওদের বিবাহ হ'তেই পারে না, তখন সে ভেঙে পড়ল। আমি য়ুসুফকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু সে-সময়ে য়ুসুফ ছিল দারুণ—যাকে বলে গোঁড়া—'যা নেই কোরাণে, তা নেই ভুবনে' গোছের মনোভাব জানোই তো। ওদিকে মারিয়াও ঠিক তেমনি গোঁড়া ক্যাথলিক, রফা হবে কোত্থেকে? অথচ দেখ বিধাতার দুর্বোধ্য লীলা: এই দুটি মানুষ ধর্মের পায়ে মনকে বলি দিলেও প্রাণকে বাগ মানাতে পারল না। কবি বলেছেন না—প্রেমের পথ মসৃণ নয়? কিন্তু যাক, কথায় কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে।

য়ুসুফ চ'লে গেল অক্সফোর্ডে দর্শন পড়তে। মারিয়া কেঁদে বলল—যাবে কনভেন্টে। আমি ওকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর মন ভালো করতে ভ্রমণে বেরুলাম। আমরা যখন প্যালেস্টাইনে, তখন একটি ধনী ইহুদি ওর প্রেমে প'ড়ে পাগলের মতন হ'য়ে যায়। মারিয়া তাকে ভাগিয়ে দিল, বলল সে ক্যাথলিক। গাব্রিয়েল বলল সে খৃষ্টান হবে। মারিয়া তখন তাকে বলতে বাধ্য হ'ল, সে আর একজনকে ভালোবাসে। গাব্রিয়েল বলল: সে অপেক্ষা করবে—

তার পর সে অনেক ওঠা-পড়া, আগু-পিছু—শেষটা মারিয়ার মন ভিজল—ওকে বিয়ে করল।

কিন্তু বিয়ে করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর ভুল ভাঙল। কেমন ক'রে—সে-সব বলার আজ সময় নেই, সে অনেক কাণ্ড—তা নিয়ে একটা রীতিমত নাটক লেখা যায়। শেষে মারিয়া মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করল। সে মনঃকষ্টের প্রধান কারণ এ নয় যে, গাব্রিয়েল লম্পট—প্রধান কারণ—ওর হ'ল আত্মগ্লানি যে ও দ্বিচারিণী হয়েছে।

চোখের জল ফের মুছে এলিওনোরা ব'লে চলল: য়ুসুফ এ খবর পেয়েই ছুটে এল রোমে। ওকে সেই একবারই কাঁদতে দেখেছি। যাক্।

তারপর ও উদাস হ'য়ে শান্তির আশায় সারা য়ুরোপ ঘুরে বেড়ালো ছ'-সাত বৎসর ধ'রে। শেষে গেল রুষ দেশে। সেখানে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের সময়ে ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি—কারণ ও কোথায় ব'লে ফেলেছিল যে বলশেভিকরা মানুষ নয়—দানব। লেনিনকে টিপ ক'রে যে-মহিলাটি গুলী ছুড়েছিল সে য়ুসুফকে চিনত। কাজেই চেক পুলিশ ওর পিছু নেয়। ও অতিকষ্টে ছদ্মবেশে কোনো মতে পালিয়ে আসে—একেবারে অসহায় ও নিঃস্ব। আমি ওকে আশ্রয় দিই এই ভিলাতেই। বলতে ভুলেছি—আমি ইতিমধ্যে সিনেমায় ঢুকে নাম করি। য়ুসুফ আমার এখানে এসে শক্ত অসুখে পড়ে—নিউমোনিয়া। বহু শুশ্রূষায় ওকে আমি সারিয়ে তুলি।

ওর মনে কৃতজ্ঞতা জেগে ওঠে আশ্রয়দাত্রীর প্রতি। তাছাড়া মারিয়ার দিদি আমি। ও আমাকে Sorella [৪] ব'লেই ডাকত।

কিন্তু হৃদয় চলে তার নিজের খেয়ালে—ভালো-মন্দকে পিষে একাকার করে। ফলে বছর খানেকের মধ্যে—বুঝতেই পারছ—আমরা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলাম। তারপর আবার সে কত কাণ্ড—কত ওঠাপড়া!...সব বলার দরকার নেই—কেবল পরিণামটুকু বলি: আর মারিয়ার জন্যেই পরস্পরের কাছে এসে পড়া সত্ত্বেও মারিয়াকেই ভুলে গেলাম ওর প্রতি দুর্নিবার টানে।

কিন্তু ও ভুলেও ভুলতে পারেনি। ফলে ওর এল চিত্তগ্লানি—সে আর এক নাটকীয় কাণ্ড—যাক্। ও বলল: না এ হতেই পারে না—এরি নাম পাপ—মরিয়ার দিদিকে আমি কিছুতেই সে-চোখে দেখতে পারি না যে-চোখে মারিয়াকে দেখেছিলাম। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তখন য়ুসুফ আমাকে বোঝানো সুরু করল। আমার প্রাণ সায় না দিলেও শেষে মন সায় দিল—পাপের ভয়েই বলব। ক্যাথলিক সংস্কার তো! আমরা ঠিক করলাম—পরস্পরের সঙ্গে আর দেখা করব না, মারিয়ার মান রাখতে অন্ততঃ আরো কিছুদিন অপেক্ষা করব।

এই সময়ে সাল্‌ভিনি দান্নুনৎসিয়োর এক মেলো ড্রামায় আমার অভিনয় দেখে আমার জন্যে পাগল হয়ে উঠলেন। দিনের পর দিন আমাকে ফুল পাঠানো, গান শোনানো—আরো কত কী। আমি তাঁকে বললাম যে আমি আর একজনকে ভালোবাসি। তিনি জানতেন—কা'কে। সিনেমা-তারকাদের তো ঘরোয়া ব'লে কিছু থাকে না—যাই করি আমরা, রটে যায় হাজার লোকের মুখে। সাল্‌ভিনি বললেন: আমি একজন ভারতীয়কে বিবাহ করব এ হ'তেই পারে না। তাছাড়া ভয় দেখালেন—য়ুসুফকে বিবাহ করলে সে আমাকে আর সিনেমায় অভিনয় করতে দেবে না। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল, কারণ য়ুসুফ থিয়েটারের উপরে না হলেও—টকির উপরে ছিল হাড়ে চটা। বার্লিনে এক টকিতে কাজ ক'রে ওর বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়।

এদিকে আমাদের সিনেমার ডিরেক্টর ছিলেন সালভিনির বন্ধু। তিনিও আমাকে ধরলেন এসে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মামা গিদোও একদিন আমাকে খুব ধমকালো: সাল্‌ভিনি শুধু ধনী নন—ইতালির শ্রেষ্ঠ গায়ক—বিশ্ববিখ্যাত—তা ছাড়া য়ুসুফ যখন আমার মারিয়ার ওজর তুলে সময় চেয়েছে, তখন তার মুখ চেয়ে ব'সে থাকা আমার সাজে না—আমার কি আত্মসম্মান জ্ঞান নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি—বলতে বলতে ক্ষেপে উঠে আমাকে মূর্খ পাগল কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন—আরো কত কী উপাধিই যে দিল—যাক্।

আমার প্রথমে খুবই রাগ হয়েছিল বৈ কি—কিন্তু রাগ পড়ে যেতে মনে হল—সত্যিই তো! তা ছাড়া য়ুসুফের সময়-চাওয়ার জন্যে আমি নিজেও খুবই ঘা খেয়েছিলাম—গিদো আমার সেই কাটা ঘায়ে দিল নুনের ছিটে। আমি রোখের মাথায় সাল্‌ভিনির প্রস্তাবে রাজি হয়ে য়ুসুফকে তার ক'রে দিলাম যে সামনের মাসে আমাদের বিয়ে।

তার পেয়েই য়ুসুফ ছুটে এল—তোমাকে সঙ্গে ক'রে। বলল: করছ কী? যাকে ভালোবাসো না তাকে—আমার দারুণ রাগ হ'ল, বললাম: আমি কা'কে ভালোবাসি না বাসি তাতে যে আমাকে ভালোবাসেনি তার কী? য়ুসুফ ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলল: আমি তোমাকে ভালোবাসি—কিন্তু আমার দ্বিধার কারণ কি তুমি জানো না? আমি রুষ্টকণ্ঠে বললাম: সে তো আর ফিরবে না? তুমি কথায় কথায় সবাইকে সেন্টিমেন্টাল বলে বিদ্রূপ করো—কিন্তু এ তোমায় কী সুবুদ্ধি বলো তো? ও তখন স্বীকার করল যে আমাকে

৪। বোন।

যে ও কতখানি ভালোবেসেছে নিজেই ভালো ক'রে বুঝতে পারেনি, সে অনেক কথা।—শেষে বলল: বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতামত তুমি জানো। আমি বিশ্বাস করি বিবাহে—যদি তার প্রতিষ্ঠা হয় প্রেমের ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। তোমাকে আমি শুধু ভালোবাসিনি,—শ্রদ্ধা করতে পেরেছি। তাই আমার মন ব্যথিয়ে উঠেছে ভাবতে যে, তুমি বিবাহ করবে কারুর নামের জন্যে বা নিজের সুবিধের জন্যে। না, যার কাছে আমি এত ঋণী, যাকে শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভালো না বেসে পারি নি—সে হীন হ'য়ে যাবে আর আমি বসে দেখব? আমি ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললাম, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল: এলিওনোরা, মনগড়া নীতির আইন-কানুন মেনে ভুল করেছি বার বার, কিন্তু এখন থেকে মানব না আর মনের মানা, চলব হৃদয়ের নির্দেশেই। তোমাকে আমি বিবাহ করব—হাতের লক্ষ্মী আর পায়ে ঠেলব না বুদ্ধির বিধিবিধান মেনে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—যা গেছে, আর ফিরতে পারে না তাকে জপ ক'রে তাপই বাড়ে, আলো মেলে না—অতীত চারণ নিয়ে যে বেঁচে থাকে তার উপাধি জীবন্মৃতই বটে।

আমি আনন্দে অধীর হ'য়ে সালভিনিকে একটা চিঠিতে সব কথা জানিয়ে শেষে লিখলাম: তোমার সঙ্গে আমি আর দেখা পর্যন্ত করব না—দয়া ক'রে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না।

ঘা খেয়ে সালভিনি বেরুলেন ভ্রমণে—বিশেষ ক'রে আমাকে ভুলতে। একটি চিঠিতে আমাকে শুধু লিখে পাঠালেন: তুমি রোমে আর একজনকে বিবাহ করবে এ আমি রোমে ব'সে দেখতে পারব না।

মনে আমার দুঃখ হ'ল বৈ কি। কিন্তু উপায় কী? য়ুসুফ ফিরে এসেছে—য়ুসুফ আমার হবে—আমি তার—এই আনন্দে আমি উজিয়ে উঠলাম, সালভিনির জন্যে দুঃখ এ-উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ধুয়ে মুছে ভেসে গেল।

কিন্তু বাধা এল এবার এক অচিন পথে। য়ুসুফ ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে বদলে গিয়েছিল। আর কেমন ক'রে শুনবে? তোমার সংস্পর্শে।

পল্লব চমকে উঠল: আমার?

হ্যাঁ তোমার। তোমার কাছে বার্লিনে ও দিনের পর দিন শুনত কুকুমের কথা। মুখেও তাকে হেসে উড়িয়ে দিত—দেশধ্বজ, সবুজ এই সব ব'লে। কিন্তু—এ বিধাতার আর এক বিচিত্রলীলা—মুখে ও দেশভক্তির আদর্শকে যতই বিদ্রূপ করে ওর মনে ততই ঘনিয়ে ওঠে আত্মগ্লানি—দেখতে দেখতে ও জেগে উঠল যেন এক নতুন চেতনায়—নতুন বিবেকে—হয়ে উঠল অশান্ত। ওর মনে হ'ল—যে কথা পরে বলেছিল আমাকে—যে, পুরুষমাত্র প্রেমকে বরণ ক'রে সার্থক হ'তে পারে না, তার চাই একটা কর্মের ক্ষেত্র, কিছু গ'ড়ে তোলার সুযোগ।—মজা দেখ: যে-আদর্শকে ও সবুজমনের সেন্টিমেন্টালিটি ব'লে বরাবর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে এসেছে হঠাৎ সে-ই যেন ফিরে এসে শোধ তুলল ওর ঘাড়ে চেপে—ওর মনে হ'ল, নিছক ব্যক্তিগত আনন্দ সার্থকতার পথ দেখাতে পারে না—আমি-র গণ্ডি কাটাতে না পারলে আমি-র ভারে মানুষ নুয়ে পড়েই পড়ে—এক পরম ব্যর্থতায়।

বলেছি—এসব কথা ও আমাকে বলে পরে। কাজেই তখন প্রায়ই অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। হাসে বটে সমানেই, কিন্তু সে হাসিতে আর বেজে ওঠে না ওর স্বভাবসিদ্ধ রিক্ততার সুর, শেষে আমি একদিন ওকে ধ'রে পড়লাম। ও তখন বলল যে, ওর মন একটু থিতিয়ে না গেলে কিছু বলবে না।—একদিন হঠাৎ কথায় কথায় বলল কুকুমের বার বার জেলে যাওয়ার কথা। পরে একদিন বলল—সে অসুস্থ হ'য়ে জেল থেকে বেরুতে না বেরুতে ফের জেলে গেছে। আমি ভয় পেলাম—কিন্তু সে-ভয়ের নাম দেওয়া ভার। ভাবলাম—যাক, কাজ কি পীড়াপীড়ি ক'রে—ও বলবে পরে কী ভাবছে—বলবেই—যখন কথা দিয়েছে—কারণ স্বভাবে ও সত্যবাদী।

হঠাৎ পরশু রাতে ও আমাকে বলল: এলিওনোরা! জানি—তুমি কত কী ভেবে দুঃখ পাচ্ছ—কিন্তু—আর একটু ধৈর্য ধরো—আমার মানে—যতক্ষণ আমার মন না স্থির হচ্ছে ততক্ষণ কী ক'রে বলি যা তোমাকে বলতে চাই?

আমার মন ফের সেই নাম-না-জানা ভয়ে ছেয়ে গেল, কিন্তু বললাম শান্ত সুরেই: আমি জানি—তোমার মন ভালো নেই। কিন্তু কী হয়েছে একটু অন্তত আভাস দাও? কোনো খারাপ খবর?

ও এড়িয়ে গেল, বলল: এখনো আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি কাল সকালে তোমাকে বলব। আজ রাতে আমি আমার মনের সঙ্গে একেবারে একলা মুখোমুখি হ'তে চাই। ব'লেই বেরিয়ে গেল।

এ রকম ও কখনো করে নি এর আগে। সারা রাত ফিরল না। আমার ঘুম হল না। কী হল আবার? আমাদের বিবাহ হবে মাস দুই পরে সব ঠিক—এ সময়ে আমার মাথা ঘুরে উঠল।

পরদিন সকালে ও ফিরেই বলল: আমার মন স্থির হয়েছে—আমি এদেশে আর টিকতে পারছি না—এবার দেশে ফিরতেই হবে। সময় এসেছে।

আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, বললাম: সে কি? কথা ছিল—তুমি এদেশেই থাকবে—আমাদের বিবাহ সামনে—

ও ম্লান হেসে বলল: মানুষ যা ভাবে তাই কি পারে? আমি ভেবেছিলাম প্রেমের জন্যে সব পারা যায়। কিন্তু আমার চোখ খুলে গেছে। আমি দেখতে পেয়েছি যে য়ুরোপের সভ্যতার আছে শুধু বাইরের চেকনাই, সে যতই আদর্শ আদর্শ করুক, সত্যি বিশ্বাস করে শুধু ভোগকে। বিজ্ঞান তাকে এনে দিয়েছে এই ভোগের উপকরণ—শান্তিহীন অন্তহীন ভোগ, ভোগ, ভোগ। তাই আজ সে বিজ্ঞানের উপাসক। কিন্তু ভারতবর্ষের বাণী এ নয়, কারণ তার বাইরের চটক না থাকলেও অন্তরে আছে এমন এক সম্পদ যা য়ুরোপের চোখধাঁধানো ধুমধামে নেই। তাই আমাদের দেশে এ যুগেও জন্মায় গান্ধী, দেশবন্ধু, তিলক, অরবিন্দ, কুকুমের মতন মানুষ। এরা ভোগের মোহ জয় করেছে এমন কোনো সত্যের যোগে যার দেখা পেতে য়ুরোপের এখন অনেক দেরি। বলতে বলতে এলিওনোরার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল ও বলল: তাই তো কুকুম অর্থ, দেহসুখ, বিলাস, সাংসারিক প্রতিপত্তি, বড় চাকরির মোহ সব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এত সহজে। সে ফের জেলে গেছে হয়ত তার দ্বীপান্তর হবে। এ-হেন যুবকদের সঙ্গে যখন আমি নিজে তুলনা করি তখন আমার আত্মকেন্দ্র মন ধিক্কারে ভরে ওঠে। তা

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, বললাম : আর আমি ? ও বলল : তুমি যাবে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে। আর কি ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম : তোমার সঙ্গে যাব ভারতবর্ষে বরাবরের জন্যে ? ও বলল : নয় কেন ? আমাকেও কি তুমি এ দেশে বরাবরের জন্যেই ধরে রাখতে চাও নি ? আমার কাছে যে দাবি করতে তোমার বাধেনি তোমার কাছে সে দাবি করতে আমার বাধবে কেন ? ব'লেই হেসে : ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে—What is sauce for the gander should be sauce for the goose.

আমার মাথায় কে যেন হাতুড়ি মারল। আমি বললাম : আমাকে একটু সময় দাও ভাবতে।

এলিওনোরার চোখে জল ভ'রে এল, নিজেকে সামলে ব'লে চলল : সেদিন—মানে কাল সারারাত ঘুমতে পারলাম না, সব ছেড়ে যেতে হবে অচিন দেশে ! মন আমার উঠল রুখে। ওদিকে য়ুসুফকে হারাবার কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে ওঠে টন টন ক'রে। যাক। পরদিন মানে আজ সকালে উঠে য়ুসুফকে বললাম : তুমি দেশে ফিরে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবে বলছ, কিন্তু আমার সেখানে ঠাঁই কোথায় ? ও অম্লান বদনে বলল : আমার পাশে আর কোথায় ? আমি বললাম কিন্তু তোমার দেশবাসী ? তারা কি আমাকে সাদরে বরণ ক'রে নেবে ? ও বলল ব্যঙ্গ হেসে : আদরের স্বাদ তো পেয়েছে অঢেল, এবার না হয় একটু মুখই বদলালে আমোরে আমারে ৫ ব'লে দান্তের কাব্য পড়তে পড়তে এত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠো, না হয় তার জন্যে একটু অনাদরই সইলে। আমি বললাম : শুধু অনাদরই তো নয় তোমারি মুখে তো শুনেছি সেদিন রিতার অবস্থা। ও বলল : তার কী অবস্থা এত দূর থেকে কী ক'রে জানব ? কিন্তু সে ওদেশে গিয়ে অসুখী হ'য়েছে যদি ধ'রেই নিই তা হ'লেও তুমিও যে অসুখী হবে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে কি ? তা ছাড়া আমি যোগ দেব মহাত্মাজীর গ্রাম-সংগঠনের কাজে, শহরে থাকব না। তুমি হবে আমার প্রধান সহায়। আমি শিউরে উঠে বললাম : গ্রামে গ্রামে ঘুরব আমি ? ও বলল মন্দ কি ? ছবির জন্যে কি এমন অনেক গ্রামে যাওনি যেখানে ছবির জন্যে না হ'লে যাবার কথা ভাবতেও পারতে না ? এবার না হয় প্রেমের জন্যেই কিছুদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরবে, তা ছাড়া এত আগু পিছু ভাবলে কি কেউ ঝাঁপ দিতে পারে ?

আমার মন বিষাদে কালো হ'য়ে গেল, বললাম : য়ুসুফ, তুমি জানো না তুমি কী বলছ ! ভাবছ শুধু তোমারি কথা। কিন্তু আমার দিকের কথাটা কি এতই তুচ্ছ যে এক কথায় সব ডিসমিশ ক'রে দিতে চাও ঝাঁপ দেবার কথা ব'লে ? আমার একটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে এদেশে। আমি ভালোবেসেছি আমার প্রতিপত্তিকে, সাফল্যকে, শিল্পে সৃষ্টি করবার আনন্দকে। তুমি প্রেমের জন্যে আমাকে বলছ এ সবই ছাড়তে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তা হ'লে তুমিই বা কেন প্রেমের খাতিরে আমার কাছে থাকতে পারবে না ? ও বলল : থাকতে পারতাম যদি এখানে কোনো কাজের মতন কাজ থাকত কিন্তু এখানে আমি কী করব বলো ? আমি বললাম : কেন ? আমাদের সহযোগী হবে। আমরা শীগগিরই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা ছবি করব। ও ব্যঙ্গ হেসে বলল : জানি। এরকম ছবি এদে[শে] কয়েকটি বেরিয়েছে। ভারতীয় রাজা, সাপুড়ে, রোপ-ট্রিক এবা[র] মহাত্মা গান্ধীকেও হয়ত নামতে হবে কৌপীন পরে আর সবাই শিউরে উঠবে ভেবে—এই অর্ধনগ্ন ফকির যে দেশের নেতা সে দেশের ন[া] জানি কী অবস্থা ? আমি যদি থাকি এদেশে, তবে তোমাদেরি হবে মুস্কিল ; কেন না আমি কিছুতেই এই মানুষের মতন মানুষটিকে তোমাদের ছবিতে অবতীর্ণ হ'তে দেব না। আমার রাগ চ'ড়ে গেল, বললাম : কেন ? তোমাদের দেশে নানা ছবিতে কি তিনি আসেননি এরি মধ্যে ? ভবিষ্যতে আরো আসবেন দেখে নিও। ও বলল : আসতে পারেন যদি তোমাদের ক্যাপিটালিষ্টরা জাল ফেলেন। কাউকে তাঁরা সাজাবেন সরোজিনী নাইডু, কাউকে মহাত্মা গান্ধী, দেখাবেন দু জনে চরকা কাটছেন তাজমহলের সামনে, টাকার জন্যে ছবিধ্বজরা কী না করতে পারেন ? আমি রেগে বললাম : শুধুই টাকার জন্যে ? শিল্পের আদর্শ ব'লে কি কিছুই নেই ? রূপ সৃষ্টি—ও বাধা দিয়ে বলল রাখো রাখো। আমি আজ তিন বৎসর বার্লিনে একটি সিনেমাতেই কাজ করছি। আদর্শ ? সিনেমার আদর্শকে যদি আদর্শ নাম দিতে হয় তবে তেলাপোকারো নাম দিতে হয় পাখি। ছবিধ্বজদের একমাত্র লক্ষ্য টাকা, আর তার উপায় হ'ল সুন্দরীদের নগ্ন মূর্তি হাব ভাব, ছলাকলা। এ দিয়ে যা সৃষ্টি করা হয় তার নাম রূপ সৃষ্টি নয়, তার নাম কী, নাম তুমি খুব ভালো ক'রেই জানো। আমি চেঁচিয়ে বললাম : এই-ই যদি তোমার ধারণা তবে আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিলে কেন ? ও বলল : শোনো এলিওনোরা, রাগ করো না আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই বলিনি, কিন্তু সিনেমার আদর্শ আছে ব'লে যখন এই মাত্র তুমি জাঁক করলে তখন তা[র] নিজমূর্তির সম্বন্ধে কিছু না বলে কী ক'রে চুপ করে থাকি বলো— যখন জানি যে খুব সস্তা যৌন উত্তেজনাই তার উপজীব্য—যা[কে] বাদ দিয়ে তোমাদের দক্ষ সিনেমার লক্ষ রংমহল ধ্ব'সে পড়বে পড়বে ?

রাগে ক্ষোভে আমি কেঁদে ফেললাম। ও আমার কাছে এ[সে] অনুতপ্ত হয়ে আমার হাত ধরতেই আমি ওর হাত ঠেলে দিয়ে বললাম আর তোমাদের রাজনীতির আদর্শ—যাতে তুমি যোগ দিতে যাচ্ছ তার নিজমূর্তিটি কী আমরা কি কেউ জানিনা না কি ? য়ুরোপে কি তাকে আমরা চাক্ষুষ করিনি বার বার ? জাহিরিপনা, মিথ্যাচার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ঘুষ, গুপ্তচরবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, খুনখারাপি— কোনটাতে বাধে আজকের সেরা রাজনীতিকদেরও ? তুমি কি নিজে বলশেভিকদের দানব উপাধি দাও নি ? দেখনি কি বিপ্লবী রাজনীতি[র] স্বর্গীয় পাল তুলে রুষ শক্তিমন্তরা চলেছেন কোন্ নরকের বন্দরে এক আধটা মহাপ্রাণ দেশভক্তের মহত্ত্ব দেশজোড়া মিথ্যাচার ও ঘাতকবৃত্তির গ্লানিকে মুছে দিতে পারে না। না য়ুসুফ, হবার ন[য়] —আমার পথ আলাদা, তোমার পথ আলাদা।

এলিওনোরা থেমে গাঢ় কণ্ঠে বলে চলে : একথা শুনে ও চমকে উঠল। মুখ ঢেকে খানিক চুপ করে রইল। তারপরে মুখ তুলে শান্তকণ্ঠে বলল : তুমি ঠিকই বলেছ এলিওনোরা ! আর এখ[ন] তোমাকে বলি—তোমাকে ভালোবেসেও যে তোমাকে কাছে টানতে চাইনি তার প্রধান কারণ—এই-ই, মানে তোমাদের কাজে আমার অন্তরের সায় নেই। তোমার খাতিরে আ[মি]

৫। Amore =প্রেম।

নিজেকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে হয়ত সিনেমার মতিগতি বদলানো যেতেও পারে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমি তো অন্ধ নই, তাই কেমন ক'রে অস্বীকার করব যে সিনেমার প্রধান পাণ্ডা যে-প্রবৃত্তি—যাকে খোরাক দিয়ে তোমরা আজ টাকার গদিতে গদিয়ান—সে-প্রবৃত্তিকে বাদ দিলে সিনেমার অতিকায় মূর্তি দুদিনে অনাহারে শুকিয়ে হবেই হবে অস্থিচর্মসার। লক্ষ লক্ষ লোকের সাড়াতেই তোমরা ক্রোড়পতি—আর তারা সাড়া দেয় কিসে ও কেন—বলেছি। এ অবস্থায় সিনেমার সংস্কার অসম্ভব—কেন না অশ্লীল যৌন উত্তেজনা বাদ দিয়ে এযুগে সিনেমার রূপসৃষ্টি হয় না, হ'তে পারে না। তাই তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম! কেবল একটি কথা বলব। তুমি যে বলেছ যে আজকের জগতে রাজনীতির অবস্থা শোচনীয়, একথা কে না স্বীকার করবে? কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে: সেটা এই যে, ভারতবর্ষে আজ সর্বপ্রথম নেমেছেন কয়েক জন সত্যিকারের মহাত্মা যাঁরা রাজনীতিকে ঢেলে সাজতে চাইছেন। এঁরা সফল হবেন কি না জানি না। তবে একথা তুমিও নিশ্চয় মানবে যে তিলক ও মহাত্মাজী রাজনীতির অনাচারের মূলেই আঘাত করেছেন—সত্যকে পুরোপুরি না হ'লেও অনেকখানি মেনে। এ রকম ত্যাগী ও মহৎ আরো কয়েকজন এ-কাজে যোগ দিয়েছেন, যেমন দেশবন্ধু কুমুম ও আরো অনেক অখ্যাতনামা তরুণ মহাপ্রাণ যুবক। এদের আদর্শেই আমার মন সাড়া দিয়েছে আজ—বিশেষ ক'রে পল্লবের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে তার মাধ্যমে আমাদের দেশের এযুগের আদর্শবাদীদের মতিগতি আশা স্বপ্নের সম্বন্ধে একটু ভিতরকার খবর পেয়ে। ফলে আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছে এই যে, আমার চোখের ঠুলি খ'সে গেছে—আমি আমি দেখতে পেয়েছি দেশের কাজ একটা সত্যিকার আদর্শ, যেখানে সিনেমা হ'ল শুধু ইন্দ্রিয়বিলাস নয়, অতি নিকৃষ্ট স্তরের ইন্দ্রিয়বিলাস—অসার আমোদ-প্রমোদের লোভে পথের পাথেয় খোয়ানো। ভালোই হ'ল—এ সূত্রে তোমার সঙ্গে এবিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হ'য়ে। শেষে আর একটি কথা বলব: তোমার ভালোবাসাকে ভালোবাসা নাম দেওয়া চলে না! এ হ'ল একটা সুবিধার ভোগের ব্যবস্থা: তুমি চাও একটি পুরুষ যে তোমার মন টানে অথচ তোমার তাঁবে থাকতে নারাজ নয়। তাকে তুমি সুখের বিলাসের খুব প্রচুর দেবে বৈ কি, নৈলে সে থাকবে কিসের লোভে? কিন্তু এ-ধরণের সুখ সুবিধা যে চায় তার নাম না-মরদ, ভেড়ুয়া। আমি আর যাই হই না কেন—স্বধর্মে ভেড়ুয়া নই—পুরুষ। তাই এবার বিদায় দাও আমাকে—কেবল ক্ষোভ না রেখে, আর যদি পারো তো আমাকে ক্ষমা কোরো এই ভেবে যে, আমি তোমার মনে দুঃখ দিতে চেয়ে বলি নি যে সব কথা আজ বললাম: বলেছি—না ব'লে উপায় ছিল না ব'লেই—তেলে জলে যে মিশ খায় না সে-দোষ তেলেরো নয়, জলেরো নয়—সে দোষ—

এলিওনোরা কথাটা শেষ করবার আগেই ভেঙে পড়ল: বালিশে মুখ গুঁজে সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না!

পল্লবের হৃদয় অনুকম্পায় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে—ও পিঠে হাত রেখে বলে: এলিওনোরা—শোনো—আমি—য়ুসুফকে—

কিন্তু এর পরে য়ুসুফকে কী-ই বা বলবে?

* * *

খানিক বাদে মুখ তুলে এলিওনোরা বলে: আমার সবচেয়ে দুঃখ কী জানো পল? বিচ্ছেদ নয়। বিচ্ছেদ দুঃখের জানি—কিন্তু প্রেম যেখানে সত্য সেখানে গভীর বিচ্ছেদেরও ক্ষতিপূরণ মেলে অন্তরের এক অচিন উৎস থেকে। কিন্তু দুঃখ বাজে সবচেয়ে—যখন দেখি যে সত্যি তেমন ভালোবাসতে পারিনি, যদিও মনকে বুঝিয়েছি উল্টো কথা।

য়ুসুফকে সত্যি ভালোবাসোনি?

এলিওনোরা করুণ ভাবে মাথা নাড়ে: এর পরেও কেমন ক'রে তার নাম দেব—সত্যি ভালোবাসা? যদি সত্যি ভালোবাসতাম তবে কি এত আগুপিছু ভাবনা এসে আমার পথ আগলে দাঁড়াতে পারত—না, পরে কী হবে ভাবতে চোখে অন্ধকার দেখতাম? সত্যি যে ভালোবাসে সে সব আগে ছাড়ে পরিণাম চিন্তা—এমন কি নিজের সার্থকতার চিন্তাও বিসর্জন দেয়। তার শুধু এক চিন্তা, এক সাধনা—কিসে তাকে সুখী করবে যার কাছে নিজের যা কিছু সব দিকেই আনন্দ। কিছু রাখতে গেলেই চিত্তগ্লানি। বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: য়ুসুফ আমাকে চোখে আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমার ভালোবাসায় কোথায় খাদ। নিলে কি আমি ছাই সিনেমার কথা ভাবি—প্রশ্ন তুলি ভারতবর্ষে গিয়ে যদি অসুখী হই?

পল্লব ওর হাতে হাত বুলোতে বলল: এ আত্মধিক্কার কেন এলিওনোরা? য়ুসুফই কি পারল তোমার জন্যে দেশছাড়া হতে?

এলিওনোরা ম্লান হেসে বলল: ও বৃথা সান্ত্বনা পল! য়ুসুফ পুরুষ মানুষ। ওরা প্রেমে দেয় নিজের সবটা নয়—চার আনা মাত্র। আমরা, মেয়েরা, দিই বারো আনা—কর্তব্য ভেবে নয়, না দিয়ে পারি না বলে, এইই আমাদের প্রকৃতি ব'লে। তাই হার মানতে হয়েছে এখানে আমাকেই। বলতে বলতে ওর চোখ ফের জলে ভরে ওঠে: না ভাই না। আমার কোনো সাফাইই নেই। বলে না: Many are called but few are chosen? প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। আমি ডাক শুনেছিলাম সব ছাড়বার, কিন্তু পারলাম না সব ছাড়তে। কারণ আমি আহূত হ'য়েও বাহাল হ'তে চাইলাম না। তাই নিয়তি হেসে আমাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন দুয়ো দিয়ে: 'পেয়েছিলি তুই মস্ত সুযোগ কিন্তু পারলি না ঝাঁপ দিতে।' ব'লে একটু থেমে: অথচ দুদিন আগেও আমার প্রেম নিয়ে কত গৌরবই না করেছি মনে মনে—যখন বিখ্যাত সালভিনিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে ডাক দিলাম এক অজ্ঞাতকুলশীলকে। কিন্তু ফাঁকি দিয়ে ফাঁক ভরে না ভাই। তাই না মাণিক কুড়িয়ে পেয়েও কাজে এল না—পারলাম না রাখতে। অথচ উপায় কী বলো? যে-নদী সাগরের ডাক শুনেছে শুধু সেই চলতে পারে শুধু মোহানাকে জপ ক'রে। খাল বিল হ্রদ হাজার বড় হোক না কেন আপনাকে নিয়েই থাকে, তাই যা ছিল তাই থাকে—আরো বড় হ'তে পারে না কোনো দিনও।

কামেরিয়ারা এসে বলল: "সিঞোর বিয়াংকি।"

[:

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১। একদিকে গিরি গোবর্দ্ধন, অন্যদিকে শ্রীনন্দীশ্বর যমুনার তীর ধরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, তাৎকালিক নিবাস হল শকটকুণ্ডলীর।

পূর্ব-ভণিত যে (নন্দীশ্বর-বর্ত্তিনী) রাজধানীটি এতকাল অপ্রকট ছিল সেই রাজধানীটিই যেন নিজগুণমাগস্থোর অন্যূনতায় অধুনা প্রাকট্যলাভ করে বসল।

শ্রীহরির লীলাধামের সব কটিরই নিত্যত্ব যদিও খ্যাতি বা প্রমাণের কোনো অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ সু-সিদ্ধ, তবুও একটির মধ্যে অপরটির এই মিলনবদ্ধ সংঘটিত হওয়াতে এই ধামটির কোথাও দৃশ্যমান হল না অনিত্যতা। তেজ যেমন তেজের মধ্যে, জল যেমন জলের মধ্যে লীন হয়ে যায়, পরিত্যক্তনীরতা তার আর থাকে না, তেমনি হল বৃহদ্বনাশ্রিতা পুরলক্ষ্মীর দশা; তিনি আবিষ্টা হয়ে গেলেন শ্রীগোবর্দ্ধন ও কালিয় হ্রদের অন্তর্বর্ত্তিনী এই শকটাবর্ত্ত নামক রাজধানীটির পুরশ্রীতে।

২। এক হয়ে গেলেন উভয় পুরশ্রী। এবং শ্রীবৃন্দাবন তখন সর্বতোভাবে উপভোগ করতে লাগলেন তাঁদের উভয়েরি আন্তরশ্রী। বর্ণনার অতীত হয়ে দাঁড়াল তাঁর রামণীয়ক-সম্পত্তি।

গোপেরা এমন কি গোপীরাও আনন্দে উল্লাসিত হয়ে বাক্যহারা হয়ে গেলেন শ্রীবৃন্দাবনকে দর্শন করে।

এই কি সেই বৃন্দারণ্য! নানাচিত্র-পতত্রিহারি বৃন্দারণ্য! কত হরিণ, রুরু-মৃগের কত সমাবেশ! কত গাছ, কত নিকুঞ্জ, গুল্ম-লতা, দীঘি, সায়র, পুষ্করিণী! ঝকঝক করছে কালিন্দীর কত পুলিন! আর তার মধ্যে গিরি গোবর্দ্ধনের ঐ অদ্ভুত প্রসন্নতা!

শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজরাজপুরীতে প্রবেশ করলেন ব্রজরাজ। সন্নন্দ-আদি মুখ্য ঘোষেরা প্রবেশ করলেন স্ব স্ব প্রাসাদে। কারও স্থানাভাব হল না একটুকুও। গোশালায় গোশালায় গাভী; বিপণির বীথিতে বীথিতে বণিক; চতুর্দ্দিকে দোকান খুলে বসল মালাকর, তাম্বুলিক।

৩। তবু সমস্তই কেমন যেন প্রকট হয়েও অপ্রকটের মত লাগছে···এই ভাবনাটি ঘুরঘুর করতে লাগল সামাজিক মনে। কেউ ভুলতে পারলেন না এই ভাবটি। এই ভাবেই ভাবিত হয়ে নগরবাসীরা নিবিষ্ট হয়ে গেলেন আপন আপন গৃহসুখে। পুলিন্দরাও বাদ পড়লো না। অভিনব তৃণাস্বাদনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল গোধনের প্রমোদ। এই বৃন্দাবনেই না জানি কতকাল যেন তারা রয়েছে; তারা যেন বিস্মৃত হয়ে গেল তাদের পূর্বাবাস। সেবাধন বিতরণ করতে লাগলেন শঙ্খপদ্মাদি নব নিধি। দাসীবৎ পরিচরণশীলা হয়ে উঠলেন অণিমা লঘিমা প্রাকাম্যাদি অষ্টসিদ্ধি। আর যিনি শ্রীভগবান তিনি নিজের মহৈশ্বর্য্য গোপন করে রাখলেও মাঝে মাঝে প্রকাশ করে ফেলতে লাগলেন নিজৈশ্বর্য্য; হয়ে উঠলেন লীলাবালক, প্রকাশনের দায়ক হল···তাঁর নিরর্গল দুর্নিবারতা।

৪। বৃন্দাবনে এসেই কিছু দিনের মধ্যে বালকৃষ্ণের মধ্যে আবির্ভূত হল বৎস-পালন-ক্ষমতা। এই কাজের জন্য যদিও অভাব ছিল না উপযুক্ত দাস-কুমারের, তবুও বোধ হয় শ্রীভগবান তাঁর তথাবিধ লীলাকৌতুক প্রকটনের উদ্দেশ্যেই ব্রজরাজের অন্তঃকরণে প্রেরণ করেছিলেন একটি অভিসন্ধি। হঠাৎ ব্রজরাজের বিচারবুদ্ধি তটস্থ হয়ে বলে উঠল—অত্যন্ত সুকুমার হলেও পরম দুরন্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণ, ওকে এখন বৎসপালন কর্মে নিযুক্ত রাখাই কর্ত্তব্য।

ব্যবস্থা শুনে মা যশোদা, যিনি বাৎসল্যরসের শেষ সীমানা,—তিনি শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটি বড় উপভোগ্য হবে না বুঝতে পেরে, তিনি বাধা দিলেন, ব্রজরাজকে বললেন, দুধের ছেলেকে নিয়ে হঠাৎ এ কী তোমার কাণ্ড! এখন থেকেই কষ্ট দিতে চাও? কিন্তু লীলাবালক অবাক করে দিলেন সকলকে। অম্লান সুন্দরের মোহন ভালে লীলা ভরে দুলে উঠল ভাঙা-ভাঙা চুলগুলি, বললেন—মা, মা, অমন কথা মুখে আনিস নি মা! সত্যি মা, বাছুরগুলোকে আমি বড্ড ভালবাসি। ওদের আমি পুষব, চোখে চোখে রাখব। যদি মা তুই না করিস, আমার দরকার নেই তোর ভালবাসায়। ও মা, তুই বল, খেলার সাথীদের নিয়ে এবার থেকে বাছুর চরাব। আমি বাছুর চরাচ্ছি দেখলে পৃথিবীর সব্বাই কী খুশীটাই না হবে!

ছোট্ট ছেলের মুখের বুলি···এতও মিষ্টি হয়! তার মিষ্টি আঘাতে শিথিল হয়ে যায় সমস্ত সংকল্প, সমস্ত অভিমান। মা যশোদারও বন্ধ হয়ে গেল মুখ। অনন্ত কৌতুক বোধ করলেন ব্রজরাজ, আহ্লাদে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তারপরে একটি শুভদিন দেখে ব্রজরাজ স্বয়ং উপস্থিত হলেন আঙিনায়। কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে এলেন বলভদ্র ও বাল্যসহচরেরা। কয়েকটি বাছুরকে নিয়ে আসা হল তাঁর সম্মুখে। ব্রজরাজ পুত্রের হাতে স্বয়ং ধরিয়ে দিলেন লালরঙের পাঁচনবাড়ি। ছড়ি হাতে লীলাবালক চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন বৎসদের, আর ব্রজরাজ পাছু পাছু চললেন লীলাবালকের।

৫। বাছুর হাঁকাতে হাঁকাতে ঘাড় ফিরিয়ে কৃষ্ণ দেখলেন—পাছু পাছু পিতাও আসছেন, মাতাও আসছেন।

চীৎকার দিয়ে উঠলেন—

বাড়ী ফিরে যাও তোমরা। আমরা যে এখন কাজ করছি। অত ভয় করিস নি মা!

ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী বলে উঠলেন—বেশ বেশ, কিন্তু দূরে যাসনি যেন। এইখানেই আজ চরা। আর দেরী করিসনি যেন। শীগ্‌গির করে ঘরে ফিরে আসিস কিন্তু।

পিতামাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সাথীদের সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে স-বলরাম নন্দদুলালের সে কী বাছুর-চরানো কর্মকাণ্ড! যেন কতদিনকার এই সদভ্যাস।

প্রথম দিন কেটে যায় বৎস-পালনের।

৬। তারপর প্রতিদিন বাছুর চরান শ্রীকৃষ্ণ। একটি একটি করে দিন যায় আর একটু একটু করে বেড়ে ওঠে তাঁর বিক্রম; মেধার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে থাকে মানসিক উল্লাস। আর ঐ উল্লাস-ভরা বৎসচারণ-লীলার প্রকাশ দেখতে দেখতে আনন্দে মূর্চ্ছা যেতে থাকেন আকাশ-পথের অমর পথিকেরা। তাঁরা অনুভব করেন এক অদ্ভুত আমোদের প্রখরতা। ব্রজবাসীরা, সহচরেরা এমন কি বলভদ্রও অনুভব করেন সেই হর্ষ-প্রাচুর্যের বৈচিত্র্য। স্ফীত

হয়ে ওঠে জনক-জননীর আনন্দ। আর আমাদের ঐ নন্দদুলাল, যিনি নবীন ঘনঘটার মত তাঁর শ্রীঅঙ্গের অমলশ্যামলিমায় ব্রজভূমিকে শ্যামল করে দিয়ে খেলতে থাকেন বাছুর-চরানো খেলা, তিনি এমন লীলাকুশলী হয়ে ওঠেন যে, গোঠের সমস্ত বাছুরই পর্যুৎসুক হয়ে ওঠে, তারা সবাই চায় তিনিই তাদের চরান। সানন্দে তারা চরতে থাকে লাল টুকটুকে একটি পাঁচনবাড়ির শাসনে।

৭। এমনি করে দিন যায়। আর প্রতিদিন সূর্য্য ওঠবার আগেই শয়ন ছেড়ে উঠে পড়েন মা যশোদা। ত্রিভুবনের যিনি জন-পাবন-জননী সেই কৃষ্ণজননী, দয়ার শরীর তাঁর, উত্থান দেন দুলালকে। নিজের হাতে সব কিছুই যে তাঁর করা চাই। মুখ ধোয়ানো, তেল মাখানো, স্নান করানো, চন্দন মাখানো, গয়না পরানো সবই করেন নিজের হাতে। তিনি ছাড়া আর কে-ই বা পারবে বল? অমন দামাল ছেলেকে সামলানো কি যার-তার কাজ? কত যে কৌশল করতে হয় মা'কে!

তারপরে খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নন্দদুলাল গোঠে যান। মা তাঁর সঙ্গে চলেন অর্দ্ধেক পথ। আর ছেলের মুখ থেকে মুহুর্মুহুঃ বেরুতে থাকে নিবেদন—ফিরে যা মা, ও মা তুই ফিরে যা।

সেই মধুর মধুর অতিমধুর বুলি শুনে শেষে ভারামনে ঘরে ফিরে আসেন মা। আর দাদা বলরামের সঙ্গে নাচতে নাচতে চলতে থাকেন নন্দদুলাল, ললিত বুকে নাচতে থাকে বিনোদ ফুলের মালা। সুবল সুদাম চলেন তাঁদের সঙ্গে। পৌঁছে যান গোঠে। গোঠে গিয়ে বাছুরেরা কচি কচি শষ্পাঙ্কুর ছিঁড়ে আস্বাদ পায় নতুন রসের, চরতে থাকে আনন্দে। আর মজার মজার খেলায় মেতে ওঠেন বালগোপালের দল। কাটতে থাকে সুসময়।

তারপরে ঠিক সময় বুঝে ব্রজপুরপরমেশ্বরীর কাছ থেকে আপ্ত-পরিজনের হাতে গোঠে এসে পৌঁছয় মাধ্যন্দিন ভোগ।

সে ভোগ—সুকবির কাব্যের মত সরস, পুরুষার্থসার্থের মত সর্বদা চতুর্বিধ, পুরুষার্থ সাধনের মত অমীতল-প্রায়, এবং বিশ্বের মত প্রভূত অন্নময়। নন্দদুলাল সহচরদের নিয়ে মিলে-মিশে গোল হয়ে খেতে বসেন সেই ভোগ। হাসি-পরিহাসের হুল্লোড় বয়ে যায় ভোজনকালে। ভোজনশেষে দীনোদ্ধারণ শ্রীকৃষ্ণ আবার চরাতে থাকেন বাছুর, কাননে কাননে উঠতে থাকে কিঙ্কিণীর রণৎকার, কোমল চরণতলের কমল-স্পর্শ পেয়ে জুড়িয়ে যায় ধরণীদেবীর হৃদয়ের জ্বালা।

৮। তারপরে ফুরিয়ে যায় বেলা। বাছুরদের গুণে-গেঁথে ঘরের পানে ফিরতে থাকেন নন্দদুলাল। ব্রজতিলক-বল্লভা শ্রীযশোদা পথের পানে নয়ন মেলে বসে থাকেন, কান পেতে শোনেন ফেরা-গোঠের আনন্দগান। যেন বৎসদের ঘরে তুলতে আগে বাড়িয়ে ছুটে চলে যায় বাৎসল্যরসের একখানি উৎকণ্ঠা।

৯। দুলাল যখন ফিরে আসেন ঘরে, তখন অতো দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও নিজের হাতেই মা যশোদা আগের মতই তাঁর হাত-পা ধুইয়ে দেন, পরিপাটি করে তাঁকে খাইয়ে দেন সায়ংভোগ; তারপরে, সন্ধ্যা পার করে দিয়ে তাঁকে শয়নে দেন পরার্দ্ধ মূল্যের পালঙ্কে।

১০। বৎসপালনলীলায় মাত্র কয়েকটি দিন কেটেছে, এমন সময় একদা, বাছুর চরাতে চরাতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ দেখতে পেলেন, ঠ্যা একটিবার মাত্র দেখেই বুঝতে পারলেন, জনৈক কংসানুচর বাছুরের আকৃতি ধরে ব্রজের বাছুরদের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি যেন একটি বৈষ্ণববেশধারী মহাশক্তির ছবি; যেন পরমত-লিপ্সায় আস্তিকতার চিহ্ন উঁচিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বৌদ্ধ চার্বাক; যেন সর্ব্বস্ব হরণের লোভে মিত্র সেজে দুয়ারে এসেছেন চোর।

সর্বজ্ঞ চক্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিপক্ষকে চিনতে পেরেই অগ্রজ বলরামকে বললেন—

দাদা, ওটি কি আমাদের ব্রজের বাছুর না বাছুরের নকল?

সচকিত নয়নে যতক্ষণে শ্রীবলরাম সদলবলে সেটিকে দেখছেন, ততক্ষণে তাঁদের স্বরূপ নির্ণয়ের পূর্বেই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পদ্মের পাপড়ির মত বামকরতল দিয়ে ধরে ফেলেছেন বাছুরটার পিছনের জোড়া ঠ্যাং, আর মাথার উপরে অলাতচক্রের মত ঘোরাতে ঘোরাতে তাকে আছড়ে মেরেছেন কপিত্থগাছের কাণ্ডে। যখন প্রাণ বেরুচ্ছে, তখন সে ধারণ করল তার নিজের বিকৃত আকার। যম-সদনে পাঠিয়ে দিলেন তাকে শ্রীকৃষ্ণ।

১১। শ্রীকৃষ্ণের এই শত্রুবধ প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠল সুরসভার। প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন শিব-ব্রহ্মা, যদিও যিনি দুর্ঘট-ঘটনপটীয়ান, যিনি দুষ্কর-কর্মকর্তা তাঁর পক্ষে এমন কিছুই অদ্ভুত নয় এই শত্রুবধের নগণ্যতা।

১২। কিন্তু সেই সময়ে অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি। সাথীদের মধ্যে যিনি লীলারসের মনোরম আলস্যে ছিলেন মগ্ন, তিনি হয়ে উঠেছিলেন দনুজদমন, এবং তাঁকে উদ্ভাসিত করেছিল মহাপিচ্ছিল একটি জ্যোতির্ময়তা (হালস)।

তারপরে গগনাঙ্গনের শেষসীমায় যখন উপনীত হলেন অস্তরবি, এবং রশ্মিমালিজের অনুশোচনায় যখন ম্লান হয়ে এল তামরস, তখন ব্রজ-চর বাছুরদের অনুসরণ করে সখাদের সঙ্গে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলেন শ্রীকৃষ্ণ।

১৩। বাড়ী ঢুকেই ছেলেদের কী কলরব! মায়েরা এসেছেন, যে যাঁর ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরবেন, কিন্তু কে শোনে তাঁদের কথা? তাঁরা প্রথমেই একদৌড়ে পৌঁছে গেলেন ব্রজপুরপরমেশ্বরীর কাছে এবং তারপরেই চীৎকার করে বলতে লাগলেন—

উঃ, কী অগম্যচরিত আপনার ছেলে! আর দানবটারই বা কী অদ্ভুত শরীর! ঠিক কি একেবারে একটি নধর চোখজুড়োনো বাছুর! বিনাযুদ্ধে তাকে তুলে আছড়ে মারলেন আমাদের কৃষ্ণ।

১৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তখন জনকজননী পরিবৃত হয়ে ঘর আলো করে বসে পড়লেন। তাঁকে যেন আরতি করতে লাগল পৌরজনের আনন্দ। তারপর অন্যদিনের মতই সায়ন্তন স্নানানুলেপন সাঙ্গ করে ব্রজরাজের সঙ্গে একত্রে সান্ধ্য-ভোজন করলেন সমাপ্ত। সুখসুপ্তির মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলেন রজনী।

১৫। তার পরের দিন, আকাশে তখনও দেখা দেননি সূর্যদেব, শ্রীকৃষ্ণ আহারশেষে বুকের উপর হার নাচাতে নাচাতে সহচরদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। শ্রীবলরামও এলেন। বাছুরগুলিকে যথারীতি সংগ্রহ করে চলে গেলেন বনান্তরে। সেখানে গিয়ে দেখেন নতুন ঘাস গজিয়েছে, বনতল ছেয়ে আছে, জলাশয়ের ধারে ধারে নবাঙ্কুরিত দূর্বার মেদুর সমারোহ। বাছুরগুলিকে চরতে দিলেন সেখানে।

১৬। অনন্তরসিক নবীন বংসপাল যখন সেখানে রাজার রাজা হয়ে বিরাজমান, তখন তিনি অনতিদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হলেন এক দানবের। দানবটি আর কেউ নন, তিনি পূতনার সহোদর, কংস-সম্মত মহাবীর। অভ্রভেদী বক পক্ষীর মত তাঁর শরীর। দানব-সংহতি বন্দনা করতেন তাঁর নীতি। তিনিও ভগবানের অনুসন্ধানে ছিলেন—দৈবজ্ঞশ্রেষ্ঠের মত। দৈবগতিকে আজ তিনি বুঝতে পারলেন, 'ইনিই তিনি।' বোঝাও যেই অমনি সেই বকদানব, —যেন পৃথিবীটাকে উগ নিয়ে উর্দ্ধে তুলতে তুলতে নীচের চঞ্চুটিকে ধরণীপৃষ্ঠে এবং স্বর্গটাকে নীচের দিকে টেনে নামাতে নামাতে উপরের চঞ্চুটিকে আকাশপৃষ্ঠে সংলগ্ন করে দিলেন যুগপৎ। প্রচণ্ড ভয়ে ভাণ্ডব-ভাণ্ডব হল কৃষ্ণ-সহচরদের হৃদয়। আতঙ্ক-পঙ্কিল নয়নে তাঁরা দেখতে লাগলেন দানবপক্ষীকে; যেন তাঁদের সামনে বিরাট কালপুরুষ, দেব-দনুজ-মনুজাদি সর্বজীবের জীবনাকর্ষণের বাসনায় বিশাল তাঁর সাঁড়াশীটিকে বিস্ফারিত করে রয়েছেন দাঁড়িয়ে।

১৭। তাঁরা সভয়ে বলে উঠলেন—

সখা, এটি পক্ষী নয়। এ দানব। আমাদের সকলকে গিলে খাবার চেষ্টায় রয়েছে। বিপুল দম্ভে রূপ ধারণ করেছে বক-পক্ষীর। এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে পলায়নই পথ্য। কিন্তু পালাব কোথায়? কৈলাস পাহাড়ের চূড়োর চেয়েও যে প্রকাণ্ড ওর দেহ, তার চেয়েও যে দীর্ঘ দীর্ঘতর ওর চঞ্চুপুট।

সমস্যা ও মীমাংসার মধ্যপথেই মৃদু-মন্দ হাস্য করলেন লীলাবালক। বাণীতে সুধা ঝরিয়ে বললেন—

তোমরা আমার প্রাণের সমান। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অতো ভয়টা কিসের? মা ভৈঃ।

বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ—যিনি অব্যয় অকুতোভয়, যিনি অখিল লোকের অভয়দাতা, যিনি ভুবনৈকবন্ধু, যিনি অনুপধি-নিরবধি-করুণৈকসিন্ধু, তিনি হেলাভরে ধাবিত হলেন পক্ষীদানবের অভিমুখে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অব্যাহত মহাপ্রভাব থাকিলেও তবে কি, দেবদ্রোহী সেই অসমসাহসিক পামর তৎক্ষণাৎ তার অতি করাল তুণ্ড বিস্তার করে লাফিয়ে গিলে ফেলল শ্রীকৃষ্ণকে। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন দ্যুলোকের দেবতারা।

১৮। কী ঘোর সঙ্কট! নিরুপায় হয়ে হায় হায় ধ্বনি তুলে চীৎকার দিয়ে উঠলেন বলরাম। 'অহো কষ্টম্, অহো কষ্টম্' বলতে বলতে লজ্জায় মান খুইয়ে, নত-বদনায় চেতনা হারিয়ে, মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হল স্বর্গের দেবতাদের। কিন্তু ইত্যবকাশে ঘটে গেল এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

শোকপ্রদ ভীতিপ্রদ জ্বলন্ত এক খণ্ড অনলের মত শ্রীকৃষ্ণকে মুখের মধ্যে গ্রহণ করতেই যেন দাউ দাউ করে জ্বলে গেল বকাসুরের তালু। নতুন আমের পল্লব গিললে যে দশা হয় উটের, সেই দশা হল দানবের। গলার নলীটিকে একবার কোঁচকায় তো একবার ফোলায়। কী কাতর সঙ্কোচন, কী ব্যাকুল বিস্ফার। আর তার সঙ্গে দুটো প্রচণ্ড ডানার সে কী অসম্ভব প্রকম্পন! শেষে গলা আর ঠোঁট ফাঁক করে বকাসুর এক দমকে উদ্গার করে বিপুলবেগে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল কৃষ্ণকে,—যেন তার নিজেরই বেরিয়ে-যাওয়া প্রাণ।

১৯। রাহুর গ্রাস থেকে চন্দ্রের মত নিষ্ক্রান্ত হলেন লীলা-বালক। ঘনতর ঘনঘটার কোটর থেকে বেরিয়ে এলেন যেন কিরণমালী। হিমালয়ের গুহাকুহর থেকে বিনিষ্ক্রান্ত হল যেন সিংহশাবক। নিবিড় তমসাচ্ছন্ন সংসার-কূপ থেকে যেন মুক্ত হলেন ভক্তজন।

বকাসুরের কণ্ঠক্লেদে বসন-ভূষণ সিক্ত হয়ে গেলেও সে কী অপূর্ব্ব শোভা তখন শ্রীকৃষ্ণের! বেরিয়ে এসেই তিনি বললেন—ভয় কোরো না।

সপ্রণয় মধুরতর সেই কলস্বর সখাদের দেহে নিয়ে এল মূর্চ্ছার বিরতি। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত। তারপরেই সেই দানবপক্ষী পুনর্ব্বার চঞ্চুপুট বিঘটন করতে করতে ঠুকরে খেতে এল শ্রীকৃষ্ণকে এগিয়ে। আসাও যেই অমনি শ্রীকৃষ্ণ··তাঁর বাম করকমল-কুট্মল দিয়ে তার উর্দ্ধ চঞ্চু এবং দক্ষিণ করকমলকোশ দিয়ে তার অধরচঞ্চুটিকে ধারণ করে,—সহচর বালকদের দুঃখশোকানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, সন্তাপভারনত অমরদের আন্তরিক ত্রাস-জননের সঙ্গে সঙ্গে, দুর্দান্ত দনুজদৈতেয়-পরিষদের হর্ষোৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গে,—নিজের মুখকমলটিকে সহসা হাসিতে ফুটিয়ে দিয়ে, বীরণ-তৃণের মত হেলাভরে বিদীর্ণ করে ফেললেন বকাসুরকে। গলগল করে অনর্গল ঝরে পড়তে লাগল অসুরের রক্তধারা, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল নাড়ীনাল, খসে পড়তে লাগল থোলো থোলো চর্ব্বি। দ্বিখণ্ডিত হয়ে পতন হল বকাসুরের, যেন ধ্বসে পড়ে গেল দু'-দুটো শৈলশিখর।

২০। বকাসুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে আনন্দমদে প্রমুদিত হয়ে উঠলেন দেবতারা। সঘনে বর্ষণ করতে লাগলেন নন্দনকাননের গন্ধফুল। দেবদ্রুম ঘিরে গুঞ্জনে মেতে উঠল দিব্য ভ্রমরেরা; যেন তারা সুর-নায়িকাদের পুলকিত নয়নের সকজ্জল জলবিন্দু। আনন্দিত বিস্ময়ে দলে দলে নৃত্য করে উঠল গন্ধর্ব-কিন্নর-যুবতীর দল। দিকে দিকে বেজে উঠল অভয় দুন্দুভি। এবং মুনিগণ, যাঁদের আহ্বান করেছিলেন বৈবস্বত মনু তাঁরাও উপলব্ধি করলেন পরমাশ্চর্য্য লীলার বিলাস, স্তবগান গেয়ে উঠল তাঁদের হৃদয়।

২১। আর এখানে কৃষ্ণসহচরেরা? প্রমোদের চাপে বুঝি ভাঙে-ভাঙে তাঁদের হৃদয়। জনায় জনায় তাঁরা বুকে জড়াতে লাগলেন তাঁদের কৃষ্ণপ্রাণকে, তাঁদের হৃদয়াধিনাথকে, ঐ বকারিকে। আর তাঁদের মধ্যে হেলে-দুলে শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করতে লাগলেন, যেন জনৈক করিপুঙ্গব।

তারপরে যখন বেলা পড়ে এল, তখন আর আর দিনের মতই সকলে সংগ্রহ করলেন বাছুরদের। তারপর তাঁদের লীলাময়টিকে মধ্যিখানে নিয়ে,—তাঁর করকমলে তখন ললিত-লতিত কদম্বফুলের নাচছে গেরুয়া,—সেই তাঁদের সেই সকল সৌভাগ্যবান ভগবানটিকে নিয়ে, তাঁরা পৌঁছে গেলেন যশোদা-ভবনে। পৌঁছেই আর তর সয় না। দৌড়ে গেলেন ব্রজপুর-পরমেশ্বরীর কাছে। উৎকণ্ঠা সারথ্য করছে তাঁদের কণ্ঠে, অথচ পথশ্রমে ভেরে আসছে তাঁদের ভাষা। উচ্চারণে তাই মাধুর্য্যের ভঙ্গি জুড়ে দিয়ে তাঁরা আদ্যোপান্ত বলে গেলেন বকহনন-কথা। সব শেষে বললেন—

২২। মা জননি, এর পরে—এর চেয়ে আর অসম্ভব কিছু হয় না। এমন কাণ্ড কার না চোখ কপালে তোলে। মালসাট মেরে আজ যা সখা দেখিয়েছেন, হ্যাঁ, তাকেই বলে পরাক্রম।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
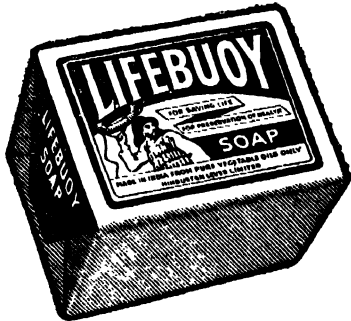
পর্বতের মত পাখী মা, পর্বতের মত পাখী। অহঙ্কারের পাল-পার্বণ। সকলকে গিলতে এল। কিন্তু চোখের পলক পড়তে না পড়তেই আনন্দলোপ। তোমার ঐ ফুলের মত ছেলে দু হাতের পদ্ম নাচিয়ে—কি বলব মা—হেলাভরে অনন্ত পাবকের মত বকটাকে উঃ, কী তার ধারালো ঠোঁট, কী জোরালো তার বেঁকে বেঁকে চলা—পুণ্যের জোর তোমার মা জননি—এক নিমিষে ফেঁড়ে ফেললেন অসুরটাকে—যেন সে বেটা একগাছি বেণা-ঘাস।

২৩। বাছুর চরাতে যায় যে সব বালকেরা তাদের মুখের বাণীতে কর্ণকৌতুক তৃপ্ত হল বটে ব্রজরাণীর কিন্তু সাথে সঙ্গে শঙ্কায় ভঙ্কা বাজল তাঁর হৃদয়ে। একদিকে কৌতুক অন্যদিকে শঙ্কা এ এক বিস্ময়কর হাস্যোদ্দীপক পরিবেশ হয়ে দাঁড়াল! তাই ব্রজেশ্বরী পুরন্ধ্রীদের দিকে চেয়ে সহসা বলে উঠলেন—

কী কপাল আমার! যে ভয়ে আমি ত্যাগ করলুম 'মহাবনে'র অবস্থান, হায়, এখানেও কি সেই দুখ! সমস্ত কিছুই যেন উপড়ে ফেলছে চায় দৈত্যদের ভয়ঙ্কর উপদ্রব। ভাগ্যিস আমার পরমচঞ্চল ছেলেটির অসীম সাহস, তাই রক্ষে। এখন কোথায় যাই, কী করি! পোড়া বিধাতার যে কী ইচ্ছে তা কেমন করে জানি?

২৪। ক্ষণকাল চিন্তা করলেন ব্রজেশ্বরী। তারপর অন্যদিনের মতই যে যার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণসহচরদের। সময়োচিত অভ্যঙ্গন উদ্বর্তনাদি সমাপন করালেন তনয়ের। ভালবাসাই মায়ের ব্যবসা। সন্ধ্যায় ছেলেকে খাইয়ে ধীরে ধীরে বললেন—

এবার থেকে তোকে ঘরেই থাকতে হবে, বনে-বনান্তরে বাছুর চরিয়ে ঘুরে বেড়ানো আর চলবে না। এ উৎসবে ক্ষেমা দে বাবা। বাছুর পাহারা দেবার অনেক লোক রয়েছে। আর তোকে অতো কষ্ট করতে হবে না।

জননীর মুখে এই জননীত্তিকর বচন শুনে, 'ও মা, তোমার এতটুকুও ভয়ের কিছু নেই মা, এরা সবাই মিছে কথা বলেছে মা। কেন মিছে ভাবিস মা—'

বলতে বলতে লীলাবালক অভিনয় করতে লেগে গেলেন নিদ্রার। ভগবতী জননী তখন আর কী করেন! অগ্নিপর্যাঙ্ক শয়নতলে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে তাকে আদর করতে করতে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

[ক্রমশঃ।

অপারগ

মায়া মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব-জুড়ে শ্রেণীযুদ্ধ, আত্মম্ভরী মানুষের মন
দানবের বাসভূমি। এক দল বিক্ষত প্রাণের
অশরীরী আর্তনাদে কেঁপে ওঠে কোমল শিশুরা,
যন্ত্রজয়ী যুগের নিশানা
উড়ছে বিরাট শূন্যে—
[তৃতীয় (বিশ্ব) যুদ্ধের এরা কি সূচনা ?]
অসংলগ্ন ভাবনার মেঘ
উড়ে উড়ে চলছেই।
উপগত সমস্যার ভীড়ে
হারিয়েছি সেদিনের নীলাভ আকাশ।
শূন্য চায়ের কাপে নিষ্ফল চুমুক

গলা ভেজাবার এক অদম্য চেষ্টায়,
শেষ নেই এর শুধু ক্লান্তির ঝাপটে
নড়ে-চড়ে উঠে বসি।
অপারগ আমি, নয়াযুগ বিকল বধির
গহায়ু মাংসল দেহে আজ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি।
স্মৃতির দূরবীণ দিয়ে।
বাঁচবার তাগিদেই যেন
বেঁচে আছি ঈপ্সিত সত্যকে ছেড়ে।

বেশ লাগে

বকুল বসু

বেশ লাগে
নীরব দুপুরে দুজনে
পাতা-ঝরা বাগানে
হৃদয়ের অনুভবে
বোসে বোসে ভাবতে।

বেশ লাগে
সোনা-ঝরা সন্ধ্যায়
চাঁদোয়া আলোয়
ঘাসভরা পার্কেতে
হাতে হাত দিয়ে বোসতে।

বেশ লাগে
চুপি চুপি নিরালায়
হাত দু'টি ধোরে এসে
তোমার হাসি-ভরা মুখটি
মুখ দিয়ে ঢোবতে।

বেশ লাগে
নিরিবিলি জগতে
তুমি সাথে থাকবে
আর নিশি-দিন জাগবে
শুধু আমার ভালবাসতে।

ভূস্বর্গ পরিক্রমা

শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ

কনফুসিয়াস বলেছিলেন—'পৃথিবীর সর্বত্রই সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু তা দেখবার মত চোখ কই ?' জাতিগত ভাবে দরিদ্র হলেও বাঙ্গালীর কিছুটা চোখ আছে। যুগে যুগে এ-জাতির জীবন বহুবার বিড়ম্বিত হয়েছে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহে, বৈদেশিক আক্রমণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তার ওপরে যে-অভিশাপ নেমে এসেছে, তেমনটি বোধ হয় আর কখনও হয়নি। তবু এ-জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে ভাটা পড়েনি। হয়ত এই প্রাণশক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে তার রসবোধে, তার সৌন্দর্য-পূজায়। তাই সুন্দরের আকর্ষণে সে ছুটে যায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সামান্য অবসর পেলেই। আর কাশ্মীর? বাঙ্গালীর নাড়ীর সঙ্গে তার যেন একটা অচ্ছেদ্য যোগ আছে। বাংলার সমতল থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে পর্বতবেষ্টিত ভূস্বর্গ কাশ্মীর তাই বাঙ্গালীর কাছে দূর নয়—'যো যস্য হৃদ্যং ন হি তস্য দূরম্।' সত্যিই তো, হৃদয়ের যোগ থাকলে আবার দূর কি ?

আগেকার দিনে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়াটা কতকটা স্বপ্নের সামিল ছিল। এখন পথ ঘাট ভাল হয়েছে, ট্রেণে কন্‌সেসান্ পাওয়া যায়, চোর-ডাকাতের ভয় নেই আর দল জুটিয়ে যাওয়াও সহজ। সুতরাং গত পুজোর ছুটিতে বহু বাঙ্গালী কাশ্মীর গিয়েছিলেন—কেউ বিমানে, কেউ মোটরে, বেশীর ভাগই ট্রেণে বাসে। সেপ্টেম্বরে অক্টোবরে সেবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রী গিয়েছিলেন—তার মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশী বাঙ্গালী। আমরাও অবশ্য এই অভিযাত্রীদের অন্যতম ছিলাম।

দলে আমাদের এগারো জন—মহিলাই মেজরিটি। লেডিস ফার্ষ্ট নীতি অনুসারে নয়, নিছক দক্ষতার জন্যেই দলের নেত্রীর স্থান অধিকার করেছিলেন চন্দননগরের শেফালী নন্দী—আমাদের শেফালী দি'। ব্যবস্থাপনার ভার এঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা পুরুষরা রীতিমত নিশ্চিন্তই ছিলাম। খরচ বাঁচিয়ে ডান হাতের ভালো ব্যবস্থা করা, নানা খুঁটিনাটি হিসেব রাখা আবার দরকার মত রূপসায়রে ডুব দেওয়া, একি আর আমাদের মত সাধারণ পুরুষের কাজ? সিকিউরিটি কন্‌ট্রোল থেকে পাশপোর্ট যোগাড় করা, রেলের কন্‌সেসানের জন্য ধন্না দেওয়া, কামরা রিজার্ভ করা এ সবই করেছিলেন সঙ্গিনীরা।

তুষারপাত দেখবার ইচ্ছে ছিল বলে আমরা অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে, বেশ একটু বিলম্বেই, কাশ্মীর রওনা হই। রেলপথে কাশ্মীর দুটো পথে যাওয়া যায়; একটা হচ্ছে দিল্লী হয়ে আর একটি অমৃতসর দিয়ে। আমরা স্থির করি, দিল্লী হয়েই যাত্রা করব। কামরা রিজার্ভ করাই ছিল, সুতরাং বেশ শান্তিতেই যাত্রারম্ভ হোল। পরদিন দুপুরে আমরা আগ্রা ফোর্টে নেমে যাই। অবশ্য এর জন্যে খেসারত দিতে হয়েছিল। রিজার্ভ কামরা আর মেলেনি। তৃতীয় দিন দুপুরে তুফান মেল ধরে কষ্টেসৃষ্টে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ পুরাতন দিল্লীতে পৌছলাম। যাত্রাপথে রাজধানী দেখলাম দূর থেকে, আলোয় আলোকিত। সাড়ে এগারো বর্গ-মাইল জুড়ে ২৫ কোটি টাকার 'ভারত ১৯৫৮' প্রদর্শনী চলছিল। রাজধানীর চেয়ে কাশ্মীরের আকর্ষণই ছিল বেশী। তাই রাত্রি ৯টার কাশ্মীর মেল ধরলাম। তাজের মোহে একদিন আগ্রায় কাটানোয় রিজার্ভেসান ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ট্রেণটিতে পাঠান আর পাঞ্জাবীর ভিড়—গরু ছাগলের মতই গাদাগাদি। মহাসমস্যায় পড়লাম আমরা পর্বতপ্রমাণ লটবহর নিয়ে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। মেয়েরা ক্ষেপে ষ্টেশান-মাষ্টারকে পাকড়াও ক'রে একটি রিজার্ভ মেয়েদের কামরা নিজেদের জন্যে গুছিয়ে নিলেন। আমরা কয়েকজন আউট্ অফ বাউণ্ড্স্। কোন রকমে তেমাথা অবস্থায় রাতটা অন্যান্য কামরায় কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকাল আটটায় মেল পৌছল পাঠানকোটে। রেল-লাইনের এইখানেই শেষ। এদিকে পাঠানকোটই পূর্ব-পাঞ্জাবের শেষ সীমা। হাওড়া থেকে টিকিট করার সময় বাসের ব্যবস্থাও করতে হয়। আমাদের বাসের নম্বর আগে থেকেই জানান ছিল। নেমে দেখলাম বাস অপেক্ষা করছে। হিল্-সেক্‌সানে চলবার উপযোগী মজবুত, আরামী বাস। সিট-নম্বর অনুসারে বসতে হয়। ২২/২৪টির বেশী আসন থাকে না। ঝুলে যাওয়া বে-আইনী। ৯টায় বাস ছাড়ল।

পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর ২৬৭ মাইল, বিমান-পথে মাত্র ৪৫ মাইল। বাস-ভাড়া রিটার্ণ ২৭ টাকা। দু'দিনের সফর। দুটো দিনের জেলখানা ভোগ করতে হবে ভেবে আমরা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই আমাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম, তার তুলনা মেলে না। হাওয়াই জাহাজে উড়ে গেলে পথের কষ্ট কম হয় সত্যি কিন্তু সে 'অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে' মন দীপ্ত হয়ে ওঠে না। পথে মাঝে মাঝে ১০/১৫ মিনিটের জন্যে বাস থামে, যাত্রীরা প্রয়োজনমত চা পান করেন, গা এলিয়ে ঘুরে বেড়ান।

রাভী নদী পেরিয়ে তিন মাইল আসবার পর আমরা জম্মু রাজ্যের প্রথম সহর লক্ষ্মণপুরে পৌছলাম। এখানে এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। ভারতীয় সামরিক অফিসারেরা আমাদের পাশপোর্ট একে একে পরীক্ষা করলেন, কারুর মালপত্র টিপেটাপে দেখলেন। তারপর অল্ ক্লিয়ার। গাড়ী আবার চলল। ৬৭ মাইল সমতলভূমির

ওপর দিয়ে চল্‌বার পর আমরা এসে পৌছলাম জম্মু নগরীতে। তখন দুপুর। এখানে এক ঘণ্টা বিশ্রাম। এরই মধ্যে স্নান-ভোজন সেরে নিতে হল। জম্মুতে যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে কিছু নেই। দোকানপাট প্রচুর। কিন্তু জলের অভাব। বিখ্যাত রঘুনাথ জীউর মন্দির বাস-ষ্ট্যাণ্ডের সামনেই। বিরাট চত্বরের মধ্যে ঢুকেই বাঁ দিকে প্রথমে নজরে পড়ে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান ভক্তবীর হনুমানজীর মূর্ত্তির উপর। বিরাট মূর্ত্তিটি পাথরে খোদাই। মন্দিরের মধ্যে রামচন্দ্র, সীতাদেবী আর লক্ষ্মণ অধিষ্ঠান করছেন। রামচন্দ্রের বর্ণ 'নবদূর্বাদলশ্যাম' নয়, কালো। সম্ভবতঃ কালের খোপে রাম আর কৃষ্ণ এক হয়ে গেছেন। এখানের চারপাশের ছোটখাট মন্দিরগুলিতে এক লক্ষ শালগ্রামশিলা আছে। সে এক অভিনব ব্যাপার! সংগ্রাহকদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করতে হয়।

জম্মু সহরটি মোটের ওপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাজ্যটি কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্তভাবে শাসিত হয়। কাশ্মীরের ডগ্‌রা রাজাদের জম্মু হচ্ছে শীতের রাজধানী। এ-রাজ্যের শতকরা ৯০-এর বেশী হিন্দু। মাড়োয়ারী আর পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী সর্ব্বত্রই চোখে পড়ে। শীতকালে জম্মু সহরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়লেও তুষারপাত হয় না, তবে সহর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে পাহাড়ে তুষারপাত হয়। ঐ পাহাড়ে বিখ্যাত এক বিষ্ণুমন্দির আছে।

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় আমাদের বাস সচল হোল। মাইল খানেক যেতে না যেতেই চোখে পড়ল পর্ব্বত-বিস্তার। একটার পর একটা পাহাড় ঢেউ খেলে চলে গেছে। এই পাহাড় কেটে কেটেই সুন্দর পিচের রাস্তা করা হয়েছে। রাস্তাগুলি বিসর্পিলগতিতে এঁকে-বেঁকে পাহাড় কেটে ঘুরে ঘুরে উঠেছে আর নেমেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর নাম পীরপঞ্জাল। ভারত বা জম্মু থেকে এই পাহাড়গুলিই কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বিস্তার বড় কম নয়—প্রায় দু'শো মাইল। কাশ্মীর সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যদি ভাবা যায় যে, উত্তরদিকে তিনটে সমান্তরাল রেখা পর পর পড়ে আছে। এর প্রথমটি হচ্ছে পীরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, তার পরেরটি কাশ্মীর উপত্যকা আর শেষেরটি হচ্ছে কাশ্মীরের উত্তরে থাকে থাকে সাজান পাহাড়ের সারি, যারা পরম স্নেহে সমগ্র উপত্যকাটিকে ঘিরে রক্ষা করছে।

মোটর বাস পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠে আবার ঘুরে ঘুরে নেমে এগিয়ে চলল। কোনও কোনও পাহাড়ের উচ্চতা ন' হাজার ফিট। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে জিনেল তাওয়া পর্য্যন্ত শৈত্যের কয়েক ডিগ্রী অনুভব করলাম চড়াই আর উৎরাইয়ের সময়। এই পার্ব্বত্যপথ অধিকাংশ স্থানেই সঙ্কীর্ণ, একটিমাত্র বাস চলবার মত; তবে প্রতি মোড়ের মাথায় দুটি বাসের পথ করে নেওয়ার মত যায়গা আছে। দু তিন মিনিট পর পর এক একটা মোড় আসে আর হর্ণ বাজিয়ে বাস মোড় ঘোরে। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে মোড় ঘুরতে হয় কারণ বিপরীত দিকের গাড়ীর সঙ্গে সামান্য ধাক্কা লাগলেই কয়েক হাজার ফিট নীচে পড়ে কঙ্কাল দিয়ে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে! তবে চালকেরা অত্যন্ত দক্ষ, দুর্ঘটনার সংবাদ এ অঞ্চলে প্রায় শোনাই যায় না। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কল্যাণে পথগুলি দিনরাত তদারক করা হচ্ছে। সুতরাং বিপদ থাকলেও শঙ্কা নেই। বদরীনাথের পথে যেতে বাসযাত্রীরা আর ড্রাইভারেরা ভগবানের নাম স্মরণ করেন। বাসের পেছনে লেখা থাকে—'ভগবান, তুমিই একমাত্র সহায়।' নেপালের ভিমপেদি থেকে কাঠমণ্ডু পর্য্যন্ত রাস্তাটাও ঐরকমই বিপদসঙ্কুল। কিন্তু ততটা বিপদের ভয় এখানের পার্ব্বত্য-পথে নেই। সামরিক গাড়ী আর মাল-বোঝাই ট্রাক সারাদিন ছুটে চলেছে। তবুও ড্রাইভারদের রীতিমত বাজিয়ে নেওয়া হয়। ঝানু চালক ছাড়া এপথে মোটর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ঘন ঘন মোড় ঘোরা, ন' হাজার ফিট উঁচু দিয়ে যাওয়া—ব্যাপারটা আটপৌরে আদৌ নয়। কেউ কেউ ভয়ে কাতর হয়েও পড়েন। শুনলাম পাঞ্জাবী বীরপুঙ্গবদের মধ্যে একজন এমনই ভয় পেয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি মূর্চ্ছা যান, তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়েও শ্রীনগর পর্য্যন্ত আর চোখ খোলেন নি। বিমানে ফিরে গিয়েছিলেন। অবশ্য ভেতো বাঙ্গালী হলেও আমাদের দলের কারুর স্নায়ু তত দুর্বল ছিল না। তবে ঘন ঘন মোড় ঘোরার জন্যে মাথা ধরেছিল অনেকেরই, আর কেউ কেউ মুখ দিয়ে ঢেলেও ফেলেছিলেন। ফেরবার সময় একজন মধ্যবয়সী পাঞ্জাবী সৈনিককেও ঐ কর্ম্ম করতে দেখেছি।

ভয় যে সকলেই কিছুটা পেয়ে থাকেন, তার পরিচয় মিলল বাসের ভেতর থেকেই। কেউ কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে আছেন, পাছে মোটর-চালকের মনের ওপর রেখাপাত হয়, তার হাত নড়ে চড়ে যায়। আমরা কয়েকজন বেপরোয়া। মরলে অন্ততঃ খাটিয়ায় চেপে মামুলি নিমতলায় যেতে হবে না ত! রীতিমত রজোগুণের খেলা দেখিয়ে পীরপঞ্জালে দেহ-পঞ্জরকে রাখতে পারব! চাই কি, পীরের দয়ায় বেহেস্ত-বাসেরও ব্যবস্থা হতে পারে!

অবাক-বিস্ময়ে দেখছিলাম পাহাড়-কাটা আঁকাবাঁকা বিচিত্র পথগুলো; মানুষের পায়ে-চলা পুরাতন, পরিত্যক্ত পথগুলোও নজরে এল। হয়ত এই পথ ধরেই ললিতাদিত্যের সৈন্য বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল, আবার হয়ত ঐ পথ ধরেই রাজপুত্র গুণবর্ম্মণ দক্ষিণ ভারতে এসে জাহাজে চড়ে যবদ্বীপ আর চীনে গিয়ে তথাগতের বাণী ছড়িয়েছিলেন।

দেখলাম দেশলাইয়ের বাক্স চলেছে নীচের পথগুলো ধরে। মিলিটারি ট্রাক আর যাত্রিবাহী বাসকে তাই মনে হচ্ছিল। দূরে অগণ্য তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের চূড়া, সূর্য্যের সোনালী আলো পড়ার কি তাদের শ্রী! যাত্রাপথে পার্ব্বত্য ঝর্ণাও চোখে পড়ল, পাশ কাটিয়ে কয়েকটার চলেও গেলাম। নিস্তব্ধ, শ্যামল পর্ব্বতগুলির এক একটা ভেদ ক'রে সাদা সাদা প্রাণময় স্রোত নীচে ঝরে পড়ছে। বন-ঝাউ, দেবদারু আর পাইনের শ্যামলিমার মধ্যে এই শ্বেতাঙ্গিনীদের আবির্ভাব মনের গহনে গভীর সংবেদন জাগিয়ে তোলে। ভূস্বর্গের উপযুক্ত পরিবেশই বটে!

বিকেল নাগাদ আমরা এসে পৌছলাম কুদ্‌-এ। অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যে স্থানটির প্রসিদ্ধি আছে। এখানে বন্দী আছেন কাশ্মীরের 'শের' শেখ আবদুল্লা। দোকানপাট এখানে ভালই। পনের মিনিট বিশ্রামের মধ্যে সবাই চা পান করলেন। চা-ওয়ালা আমার সঙ্গিনীদের এক গুচ্ছ ফুল এনে দিলেন। নামটা নাকি নার্গিস। আসল নামই ঐ, না এখানেও চিত্র-তারকারা আসর জাঁকিয়ে বসেছেন কে জানে! কি দুর্নিবার আকর্ষণ তারকাদের! এ-যুগে জন্মালে

নিউটন হয়ত ওদের নিয়েই প্রিন্সিপিয়া লিখতেন। ফুলটি কিন্তু ভারী ভালো লাগল। প্রতিটি ফুল নব্বই ডিগ্রি কোণ করে আছে। সাদা তার রং, মুখের কাছটা ঈষৎ হলদে। মৃদু-মধুর গন্ধ। অন্য কোথাও এ-ফুল আমাদের নজরে পড়েনি, এমন কি শ্রীনগরের মোগল উদ্যানগুলিতেও নয়।

সন্ধ্যার আগে বানিহালে পৌঁছান সম্ভব হ'ল না—বাটোটে পৌঁছলাম। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গাড়ী যাবে না; রাত্রির বিপদের ঝুঁকি নেবে কে?

পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথে মধ্যে মধ্যে সরকারী ডাকবাংলো আছে জম্মু, উধামপুর, কুদ, বাটোট, রামবাণ, বানিহাল, কাজিগুন্দ-এ। বাটোটের ডাকবাংলোটি বেশ বড়। রাস্তা থেকে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে হয়। তাড়াতাড়ি যেয়ে একটা বড় ঘর আমরা ভাড়া নিলাম। ভাড়া মাথা-পিছু আট আনা আর খাটিয়া-পিছু এক টাকা। মালপত্র বাস থেকে নামিয়ে বাংলোয় এনে বহাল-তবিয়ত হওয়া গেল। চাঁদনি রাত। ডাকবাংলোর চার পাশে মরশুমী ফুলের সমারোহ। সামনের পাহাড়গুলোতে দীর্ঘদেহ দেবদারু আর পাইনের সারি আর তার ওপর একটা হাল্কা কুয়াশা। রীতিমত ইডিলিক, একটা জীবন্ত কাব্য। স্কটের 'মর্দ্দারতুর'-এর দৈবী তলোয়ার এক্সক্যালিবার জলে ফেলার দিন এমন রূপময় চাঁদনি রাত ছিল কিনা জানি না। জুলিয়েটকে প্রেম নিবেদনের সময় রোমিও বলেছিলেন, 'এ হেন রাতে।' কিন্তু সে-রাত কি এমনি ছিল?

বাটোটে কয়েকটি হোটেল আছে, নিতান্ত মামুলি হোটেল। মালিকদের অধিকাংশই শিখ। আগ্রা থেকে দেখে আসছি মোটর গাড়ীর আর হোটেল-রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ে এরা কেমন একচেটিয়া করে ফেলছে। দেশ-ভাগের ফলে ওরাও আমাদের মতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পথের ভিখিরি হয়েছিল, কিন্তু সাহস, উদ্যম, ঐক্যবোধ ওদের আজ আবার মানুষ করে তুলেছে। একটা শিখকে ভিক্ষা করতে কোথাও দেখলাম না। আর আমরা? এত গুণ থাকা সত্ত্বেও এমন লক্ষ্মীছাড়া জাত আর আছে কোথায়? আত্মসম্মানবোধটা বোধ হয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

বাটোটের হোটেলে রুটি, ভাত, মাংস পাওয়া যায়; ভাতের স্বাদ আর ঘ্রাণ চমৎকার! জম্মুর বাসমতী চালের মতই সুগন্ধ। বাংলা দেশেও এ-চাল উৎপন্ন হয়, তবে কাশ্মীর ও জম্মুর মত এতো নয়। মাংসে রুচি এল না—বোটকা গন্ধে ভরা। প্রথমে রান্নার দোষ বলে মনে হয়েছিল, পরে জানতে পেরেছিলাম সারা কাশ্মীরে পাঠা আর দুম্বার মাংসের গন্ধ ঐ রকমই। একপ্রকার ঘাসই নাকি ঐ গন্ধের জন্যে দায়ী। মুরগীর মাংস খুবই সুস্বাদু। বানিহাল থেকে আরম্ভ করে শ্রীনগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আমরা এই 'নিষিদ্ধ মাংসে' তৃপ্তি পেয়েছি।

রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। সকাল সাতটায় বাস ছাড়বার কথা। এজন্যে পাঁচটায় উঠতে হোল। মেয়েরা ষ্টোভ জেলে চা করে ফেললেন, টোষ্টও তৈরী হল। এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-দম্পতি এখানে আমাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিলেন। তাঁরা কিছুই খেলেন না। পথে ফল ছাড়া আর সব তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য।

সকাল সাতটায় বাস ছাড়লো। শীতে আমরা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। ভারী কোটের ভিতরেও হাত পা কন্‌কনিয়ে উঠছে। একটা হাল্কা কুয়াশা তখনও চারদিক ছেয়ে আছে। দূর পাহাড়ের উচ্চতম চূড়ায় সোনালি আভা দেখে বুঝলাম—তিমিরবিদারের অভ্যুদয় হয়েছে।

বন্ধুবর মনোজ মুখার্জ্জি চন্দননগরের পৌর-পিতাদের অন্যতম। অকৃতদার, বামপন্থী, আধা-দার্শনিক। হঠাৎ হুকুম করলেন—গান লাগাও 'আমাদের যাত্রা হল সুরু।' হেমপ্রভা, পুষ্প আর শুভাদি'র গলা খাসা। তাঁরাই সুরু করলেন। সেই কুয়াশাভরা হিম-স্নিগ্ধ প্রভাতে কাশ্মীরের পথে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সঙ্গীত-সুরভি। কবিগুরুর সাধনা যে বিশ্বজনীন তা সেদিন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলাম। বাসের মধ্যে যে ৫।৬ জন অবাঙ্গালী ছিলেন তাঁরাও নিঃশব্দে সে-সুধা পান করছিলেন। বাংলা দেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে আছি, একথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। দূরের পর্ব্বতরাজির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম—যাত্রা ত সুরু হোল, কিন্তু চলেছি কোথায়? আত্মবিস্মৃত হয়ে ভাবছিলাম—এই ত সেই কাশ্মীর! কথাসরিৎসাগর রচয়িতা কবি সোমদেব, দ্বিতীয় চালুক্য বংশের রাজা বিক্রমাঙ্কের সভাকবি বিহ্লন, যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক রাজপুত্র গুণবর্ম্মণের দেশের মাটির উপর দিয়ে চলেছি। মনে পড়ল 'শ্রীকাশ্মীরিক মহামাত্য চম্পক প্রভুপুত্র কহ্লনকৃত' রাজতরঙ্গিনীর কথা—ভূস্বর্গের জন্মকথা থেকে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত হিন্দুরাজাদের কাহিনী। প্রথম কল্পারম্ভ থেকে ছটি মনুর কাল পর্য্যন্ত হিমালয়ের কুক্ষিদেশের নিকটবর্ত্তী ভূভাগ জলপূর্ণ ছিল। নাম ছিল তার সতীসর। তারপর বৈবস্বত মন্বন্তরের সময়ে প্রজাপতি কাশ্যপ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে সেখানে এনে প্রস্রবণগুলির নিরোধ করলেন। ভূমিতে পরিণত হোল সরোবর। জন্ম হোল 'কশ্মীর' প্রদেশের। তারপর কত অমিতবিক্রম রাজা রাজত্ব করলেন, গড়লেন কত পাথরের প্রাসাদ, কত মন্দির। মহাভারতের যুগের কথা। জরাসন্ধের বন্ধু কাশ্মীররাজ গোনন্দ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী অবরোধ করলেন। বহুকাল পরে শ্বেতহূনপতি, 'দুর্ম্মতি' মিহিরকুল কাশ্মীররাজের অনুগ্রহে ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হলেন। তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করে করলেন কাশ্মীর আক্রমণ ও জয়। দুর্ম্মতি হলেও তিনি শ্রীনগরীতে প্রতিষ্ঠা করলেন মিহিরেশ্বর শিবের। তারপর রাজা সন্ধিমতি, মহাধার্ম্মিক চন্দ্রাপীড়, ভ্রাতৃনিধনকারী তারাপীড়, ললিতাদিত্য, জয়াপীড় অবন্তীবর্ম্মা, মেঘবাহনদেব, তুঙ্গ আরো কত রাজা রাজত্ব করলেন। ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ থেকে পূবে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বঙ্গদেশ জয় করলেন। স্ত্রীরাজ্য বা মণিপুর জয় করতে যেয়ে স্ত্রী-সেনাদের নগ্ন বক্ষোদেশ দেখে তাঁর সেনারা প্রায় ঘায়েল হয়েছিল। এই ললিতাদিত্যই চুরাশী হাজার তোলা সোনা দিয়ে নির্ম্মাণ করেছিলেন মুক্তাকেশব বিগ্রহ। তারপর নেপালরাজ অরমুড়ির সঙ্গে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের যুদ্ধ ও পরাজয়। বিধবা রাণী দিদ্দার কাশ্মীর শাসন—রাজা তুঙ্গের সময়ে 'তুরস্কগণের' প্রথম আক্রমণ। মনে পড়ল প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত্র গুণবর্ম্মণের কথা। সিংহাসনের প্রলোভন ত্যাগ করে মহাভাবের আকর্ষণে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমুদ্রপথে তিনি চীনেও গিয়েছিলেন। কে জানে কোথা থেকে তিনি চেপেছিলেন সেদিনের অর্ণবপোতে—হয়ত বাংলার তাম্রলিপ্ত থেকে, হয়ত দক্ষিণ ভারতের কোনও বন্দর থেকে। এই কাশ্মীরী রাজপুত্রই চীনে এক নূতন শিল্পরীতির

প্রবর্তন করেছিলেন। এই সেই প্রাচীন কাশ্মীর যার রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন সপ্তম শতকের প্রথম পাদে তিব্বতের রাজা স্রারিবট্ সন্ গাম্পো। ইনিই ত কাশ্মীরের এক পণ্ডিতকে পাঠিয়ে কাশ্মীরী লিপি তিব্বতে নিয়ে এসে সামান্য অদলবদল করে, তিব্বতের জন্যে তা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর পদ্মসম্ভব? চিত্রলের বিখ্যাত সন্ন্যাসী তিনি। অষ্টম শতকে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন আর সেখানে তেরো বছর কাটিয়ে লামা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। তারপর ১০০০ খৃষ্টাব্দের কথা। তিব্বতী সুপণ্ডিত, সংস্কারক, সন্ন্যাসী রিন্ সেন্ বজান্-পো দেশে মন্দির নির্ম্মাণ, ভাস্কর্য্য আর চিত্র তৈরীর জন্যে কাশ্মীর, নেপাল আর বাংলা থেকে শিল্পীদের আমন্ত্রণ ক'রে তিব্বতে নিয়ে আসেন।

মনের রূপালি পর্দায় একটার পর একটা ছবি ভেসে আসছিল। একটা মৃদু ধাক্কায় আত্মস্থ হলাম। হাজার বছরের যবনিকা আবার নেমে এল। গান কখন থেমে গিয়েছে। সঙ্গিনী পুষ্প বললে—কি ভাবছিলেন তন্ময় হ'য়ে?

বললাম—না, কিছু না। দূরের পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।

পথের ছোট্ট একটা ঘটনা। বাসের দোলায় আমাদের জলের কুঁজোর মুখটা ভেঙ্গে গেল। সঙ্গী অন্যান্য বাঙ্গালী যাত্রীরা বললেন—ফেলে দিন মশাই, কুঁজোটা। ভাঙ্গা কুঁজো অপয়া।

দলের অণিমা রুখে উঠল—না, আমরা ভাঙ্গাই নিয়ে যাব। যত সব কুসংস্কার!

অপর পক্ষ বললেন—বাসটায় শুধু আপনারাই যাচ্ছেন না, আমরাও যাচ্ছি। পথে বিপদ হ'লে কে তার জন্যে দায়ী হবে? ফেলে দিন।

যাঁরা বললেন তাঁরা সবাই পুরুষ, রীতিমত ভদ্র-দুরস্ত, বাঙ্গালী। অবাঙ্গালীরা মাইনরিটি। তাঁরা চুপ করেই ছিলেন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যে কুঁজোটা ফেলেই দিলাম। ভদ্রলোকদের দোষ দিই না। এসব পার্ব্বত্যপথে মানুষের সংস্কার আপনিই সজাগ হয়ে ওঠে। যে ভগবান আর ভূত আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকের কাছে আউট অফ বাউণ্ডস্, তাঁরাও ন' হাজার ফিট উপরে পার্ব্বত্যপথে বেশ কল্কে পান।

বেলা ন'টা নাগাদ আমরা বানিহালে পৌঁছলাম। স্থানটা নানা কারণে প্রসিদ্ধ। সামরিক গুরুত্বও আছে। এখানে চার মাইল সুড়ঙ্গপথ জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে তৈরী চলছে। এই চার মাইলের জন্যে দু'শো মাইল পার্ব্বত্যপথের ৪০ মাইল কমে যাবে। সুড়ঙ্গপথ আসলে দুটি—একটি পুবে আর একটি পশ্চিমে। পশ্চিমেরটি প্রথম তৈরী হয় হাল্কা ধরণের মোটরের জন্যে ১৯৫৬ সালে। সেটি মাঝে বন্ধ করে দিয়ে নতুন করে তৈরী হয়। সম্প্রতি এটি গত ২১শে ডিসেম্বর খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন সব রকমের গাড়ী আর মানুষ এই টানেল দিয়ে যেতে পারবে। ১৮ মাইল পথ কমে গেল এই সুড়ঙ্গটির জন্যে। এর নাম দেওয়া হয়েছে "জহর টানেল"। প্রধান মন্ত্রী নেহরু কয়েক মাস আগে এর উদ্বোধন করেছেন। পুবের টানেলটি খোলা হবে ১৯৬০ সালে। কাজ এখনও চলছে। সুড়ঙ্গগুলির জন্যে মোট ব্যয়-বরাদ্দ চার কোটি টাকা।

বানিহালের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। পার্ব্বত্যনদী নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—চারিদিকে শ্যামশোভা, বিচিত্র রং-বাহার। এখানকার অধিবাসীদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই ফুলের বাগান। প্রকৃতির যে কতখানি ক্ষমতা মানুষের মনে রং ধরাবার তা এখানে এলে বেশ বোঝা যায়। বানিহালে বাস থামে যাবার সময় আধ ঘণ্টা, আসবার সময় এক ঘণ্টা। বিশ্রামান্তে আবার চলা সুরু হোল। গত দিনের অবসাদ, মাথাধরা ইত্যাদি দলের কারুর আর ছিল না। চড়াই আর উৎরাই-এর জন্যে ভাবনাও মিলিয়ে গিয়েছিল। "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।"

পথে পড়ে ভেরীনাগ, শ্রীনগর থেকে ৬০ মাইল দূরে। শ্রীনগর যাবার পথে একটা মোড় ঘুরে ভিন্ন একটা পথ চলে গিয়েছে ভেরীনাগের দিকে। চার মাইল এই পথে যাঁরা যেতে চান, তাঁদের মাথা-পিছু কিছু দক্ষিণা বাসওয়ালাকে দিতে হয়। ভেরীনাগে যেয়ে যে-দৃশ্য আমরা দেখলাম, তার তুলনা সারা কাশ্মীরে নেই বলেই শুনলাম, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়েনি। সবচেয়ে বিচিত্র আকর্ষণ হচ্ছে গভীর লাল রং-এর চীনার গাছগুলির। সারা কাশ্মীর উপত্যকায় চীনারের প্রাচুর্য্য কিন্তু এমন মনমাতানো লাল রং আর কোথাও দেখিনি। চারিদিকের সবুজের মধ্যে প্রকৃতির এই ফাগুয়া, সুন্দর কেয়ারী-করা রং-বেরংয়ের ফুলের বাগান, প্রবহমান ঝিলামের ধারা, অদূরে দৃশ্যমান্ তুষারকিরীট পীরপঞ্জালের স্বর্ণকান্তি—সে দৃশ্য ভোলা যায় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তা দেখলে পাগল হয়ে যেতেন! চীনার গাছ জম্মুতে দু'-চারটে দেখেছি—খর্ব্বাকৃতি, বিবর্ণ। একমাত্র কাশ্মীর উপত্যকাতেই এদের লালিমার বিকাশ। ষোড়শ শতকে সম্রাট আকবর পারস্য দেশ থেকে কয়েকটি চীনার গাছ এনে কাশ্মীরের মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারাই বংশবৃদ্ধি করে সারা কাশ্মীরকে আরও সৌন্দর্য্যময় করে তুলেছে। শ্রীনগরের এস, পি কলেজের অধ্যক্ষ জিলানী সাহেব আমাকে বলেছিলেন যে, পারস্যেও চীনার গাছ এত বড়, এত সুন্দর হয় না। কাশ্মীরীদের কাছে চীনার হচ্ছে জাতীয় বৃক্ষ। শালের ওপর চীনার পাতার ডিজাইন, আখরোট কাঠের চীনার পাতা, চীনার পাতা-ট্রে, পেপার-মাসির উপর চীনারের চিত্র—চীনার-প্রীতিরই বাহ্যপ্রকাশ। শীতের দিনে চীনারের পাতা দরিদ্রের কুটিরকে গরম করে রাখে। অন্যান্য পাতার চেয়ে এর অগ্নিদেবকে সহ্য করবার ক্ষমতা বেশী। চীনার

পাতার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে কাশ্মীরীরা যে ঘুঁটে তৈরী করে, তার তাপ-বিকিরণের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী আমাদের দেশের ঘুঁটের চেয়ে।

ভেরীনাগ হচ্ছে ঝিলাম নদীর উৎস। মুঙ্গেরে যেমন সীতাকুণ্ড আছে, এই উৎসটিও তেমনি একটি কুণ্ড। ঠাণ্ডা, নীল তার জল। গভীরতা ৫৪ ফিট। উৎস বলে মনেই হয় না—এত স্তব্ধ, নিথর এর জল। ট্রাউট মাছেরা শতে শতে খেলা করে বেড়াচ্ছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৩৫ কুসেক পরিমিত জল নীচে থেকে ওপরে উঠছে! এটা বোঝা যায় কুণ্ডের বাইরে যেয়ে, যেখান দিয়ে পাথরে বাঁধান অগভীর খাদ বেয়ে জলস্রোত ভীষণ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডের চারপাশে পাথরের তৈরী ঘর আছে। পাথর দিয়ে বাঁধানোর কাজ জাহাঙ্গীর ১৬২০ খৃষ্টাব্দে সুরু করেন আর শাজাহান ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তা' শেষ করেন। হিন্দু-আমলে ভেরীনাগের নাম ছিল নীলনাগ। নীলনাগ হচ্ছেন সর্পদেবতা। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে আছে—নাগগণের আদেশে নীল নামক নাগ বিতস্তা নদীর প্রস্রবণকে আতপত্রস্থানীয় করে সর্বদা কাশ্মীরকে রক্ষা করেছেন। ভেরীনাগ, কোকরনাগ, অনন্তনাগ, শেষনাগ ইত্যাদিতে নাগের ছড়াছড়ি দেখে মনে হয়, এককালে অন্-আর্য্য নাগপূজা এখানে বেশ চলত। অবশ্য সেই নাগ এখন রূপান্তরিত হয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেবে। ভেরীনাগে দেবপূজা এখন আর হয় না।

ভেরীনাগ দেখে আবার চার মাইল পিছু হটে শ্রীনগরগামী পথে এসে পৌঁছলাম। ক্রমশঃ সমতল ভূমিতে এসে পড়লাম—পার্ব্বত্য-পথের শেষ হোল। বেলা তখন একটা—শ্রীনগরে পৌঁছলাম। বাস এসে সহরের মাঝখানে ট্যুরিষ্ট রিসেপসান সেণ্টারের বিস্তৃত চত্বরের মধ্যে প্রবেশ করল। এই কেন্দ্রটি একটি এল্-আকৃতির বড় দোতলা বাড়ীতে স্থাপন করা হয়েছে সম্প্রতি। নূতন বাড়ী—ঝকমকে তকতকে; সামনে, আশে-পাশে ফুলগাছের সারি। কয়েক শ' গজ দূরেই পর্ব্বতমালার উন্নত বিস্তার। সারা জম্মু আর কাশ্মীরের ভ্রমণ সংক্রান্ত অধিকর্ত্তার অফিস এখানে। যাত্রীদের সুখসুবিধার দিকে তাঁর কড়া নজর। কাশ্মীরের শতকরা ২০ জন অধিবাসী ভ্রমণকারীদের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করে, সরকারেরও প্রচুর আয় হয়। সুতরাং খাতকদের সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর রাখতেই হয়। এই কেন্দ্রে বহিরাগতদের থাকবার জন্যে অনেকগুলি কামরা আছে। আকার হিসেবে তাদের ভাড়া। সাধারণতঃ একদিন মাত্র এখানে থাকতে দেওয়া হয়; তা'পর যার যেখানে খুসী—হোটেলে বা হাউসবোটে চলে যান। অধিকর্ত্তার নিজের অফিস দোতলায়। একতলার বড় হলঘরটায় নানা বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার আর বিভিন্ন স্থানে যাবার জন্য বাসের টিকিটের কাউণ্টার আছে। অফিসাররা সবাই ভদ্র আর সাহায্য করবার জন্যে সদাই উন্মুখ। একতলার আর দোতলার সিলিং কাঠের তৈরী—কাশ্মীরী নক্সা করা। এখানে একটি ডাকঘরও আছে।

দৈনিক পনের টাকা ভাড়া কবুল করে একটা বড় ঘরে আমরা উঠলাম। কামরাটি অবশ্য তিন জনের থাকবার মত অর্থাৎ তিনটি মাত্র খাট আছে। কিন্তু ঢালাও গালিচার উপর প্রচুর যায়গা—সহজেই সকলের শোবার ব্যবস্থা করা যায়। রাজা-মহারাজা-জমিদার নই, নিতান্তই মধ্যবিত্ত আমরা। তিনজনের কামরাতেই এগারো জনের ব্যবস্থা করা হোল। এখানের পরিবেশটা এতই মনোরম যে, সহজে ছেড়ে যাবার ইচ্ছে কারুর দিল না।

টুরিষ্ট রিসেপসান্ সেণ্টারে চায়ের জন্য একটি ভালো রেস্তোরাঁ আছে। ভাত রুটি বাইরে খেয়ে আসতে হয়। রাজসিক পরিবেশে সে রাত্রিটায় আমাদের ভালই নিদ্রা হোল। পরদিন গুলমার্গ আর খেলনমার্গ যাওয়া স্থির হয়েছিল; টিকিট কাটা ছিল। সকাল সাড়ে ন'টায় বাস ছেড়ে যায়। ভাড়া টন্মার্গ পর্য্যন্ত যাতায়াত ২'২৫ টাকা। শ্রীনগর থেকে টন্মার্গের দূরত্ব ৩৪ মাইল। ওখান থেকে ঘোড়ায় চেপে চার মাইল গেলে গুলমার্গ আর সেখান থেকে তিন মাইল দূরে খেলনমার্গ। টন্মার্গ থেকে ক্রমশঃ পাহাড়ের উপরে উঠতে হয় তার উপর ঘোড়ায় চড়া। ঘোড়া মানে ওয়েলার নয়, পাহাড়ী টাট্টু।

ধুতি আর শাড়ী পরে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হলেও উচিত নয়—বিপদের ঝুঁকি আছে। তাই আমরা ইউরোপীয় পোসাকে সজ্জিত হয়েই গিয়েছিলাম। মেয়েরাও চোস্ত্ বা পাৎলুন পরে, কেউ বা মারাঠি কায়দায় শাড়ী পেঁচিয়ে নিলেন। পাহাড়ের উপরে কন্কনে ঠাণ্ডা বলে আঙ্গুল ঢাকবার জন্যে গ্লাভ্স্, গলার জন্যে পশমের মাফলার, পুরুষদের টুপী আর মেয়েদের হেড-স্কার্ফ নিয়ে যাওয়া দরকার। ওভারকোট অত্যাবশ্যক। গ্রীষ্মকালে অবশ্য এ-সবের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীনগর সমুদ্রের লেভেল্ থেকে ৫২০০ ফিট উঁচু, গুলমার্গ ৯৫০০ ফিট আর খেলনমার্গ ১১৫০০ ফিট। সুতরাং পুজোর ছুটিতে গেলে কনকনে ঠাণ্ডার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। টন্মার্গে পৌঁছতেই ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া নিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়। দু'জাতের ঘোড়া আছে। একটু মোটাসোটা, চিকণ-চাকণের নাম ফার্ষ্ট ক্লাস। রেট টন্মার্গ থেকে গুলমার্গ হ'য়ে খেলনমার্গ পর্য্যন্ত ১৪ মাইল যাতায়াত বাবদ সাড়ে ছ' টাকা। একটু পংখীরাজ গোছের ঘোড়ার রেট সাড়ে পাঁচ টাকা। এর নাম সেকেণ্ড ক্লাস। কলকাতায় গুলমার্গ-ফেরত বন্ধুরা সাবধান করে দিয়েছিলেন—ঘোড়াগুলোর স্বভাবই নাকি খাদের ধার ঘেঁষে যাওয়া, হাজার লাগাম ধ'রে টান মারলেও খাদ ঘেঁষে যাবেই। সুতরাং পৈতৃক প্রাণটা রাখবার ইচ্ছায় আমরা পংখীরাজেই চড়া স্থির করলাম। অন্ততঃ ধীরে ধীরে ত যাবে।

প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে সহিস থাকে। সওয়ারের সুখ-সুবিধের দিকে তার কড়া নজর। কারণ টাকাটা সিকেটা বকশিসের সে প্রত্যাশা করে। তাকে হেঁটে হেঁটেই চড়াইয়ে উঠতে হয়। মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের বন্ধুবর ভবানী আঢ্য সস্ত্রীক গিয়েছিলেন; তাঁর গৃহিণী একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে সবার আগে আগে চললেন—সহিসের সাহায্যও নিলেন না। মহিলাদের বীরবেশ দেখে মনে হোল—এঁরা বাঙ্গলার ঘরকুনো মেয়ে, না প্রমীলার দল? অবস্থা-বিশেষে মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বাঁশী বাজানে-ওয়ালা বাঙ্গালীরও অসি ধরতে বেগ পেতে হয় না। সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্যপথে, দেবদারু আর পাইন-অরণ্যের মধ্যে সঙ্কীর্ণ চড়াইয়ে আমরা ছিলাম সেদিন সবাই বঙ্গবাসী। যাঁরা আগে গিয়ে ফিরছিলেন তাঁরাও। মনে হ'চ্ছিল আমরা যেন বাঙ্গলার দার্জ্জিলিং-এই আছি।

পিয়ার্স
সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!
PEARS
TALCUM
PEARS
TRANSPARENT
SOAP
পিয়ার্স সাবান—বিশুদ্ধ গ্লিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্য্যের পক্ষে এত নিরাপদ।
সুগন্ধ পিয়ার্স সাবান আপনার সৌন্দর্য্যচর্চ্চার নিত্য সঙ্গী হোক।
শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়ার্স আদর্শ।
পিয়ার্স ট্যালকাম, এত মখমলের মত মোলায়েম, এত অপূর্ব সুগন্ধ—আপনাকে সারাদিন সতেজ, সুন্দর রাখে। সুদৃশ্য হাল্কা হলুদ-সবুজ-সোনালী টিনে পিয়ার্স ট্যালকাম কিনুন।

ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগলাম। বুঝলাম, বন্ধুরা খাদ সম্বন্ধে নিতান্তই গুলমার্গের গুল মেরেছিলেন। ঠিকভাবে বসতে পারলে ঘোড়া নিয়মমতই যায় আর খাদও তেমন গভীর নয়। গভীরতা কোথাও এক-কোমর, কোথায় এক-গলা। পড়ে গেলেও মরবার ভয় নেই, হাড়গোড় একটু-আধটু ভাঙ্গতে পারে মাত্র। তবে ঘোড়ারা সবাই ওস্তাদ। এ-পথ তারা ভালভাবেই চেনে। জল দেখলে, পথে কাদা দেখলে পথ শুঁকে শুঁকে আস্তে আস্তে চলে। তার পর সহিস তো আছেই। ভয় হচ্ছে উৎরাই-এর সময়। তখন যদি তাড়াতাড়ি নামবার লোভ সংবরণ করতে পারা যায়—ভয় কিছুই নেই। পায়ে হেঁটে ওপরে ওঠা যে কষ্টকর তা মালুম হোল সহিসদের দেখে। ওরা এ-পথের ঘুণ হ'লেও রীতিমত হাঁপাচ্ছিল।

কথা হচ্ছিল আমার সহিসের সঙ্গে—তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে। মাইনে পায় ওরা মাসিক ১৫৲ থেকে ২৫৲ টাকা। এই সামান্য আয়ে চলে না—জমিজমাও কারুর নেই। যাত্রীরা দয়া করে য' বকশিস দেয়, তাতে কিছুটা সুরাহা হয়, তবে দুঃখ ঘোচে না। প্রতিদিনের আয় ঘোড়ার মালিকের। অবশ্য আয় অনুসারে তাঁকেও সরকারকে কর দিতে হয়। কিন্তু তিনি মাত্র ঘোড়ার মালিক হয়ে, না খেটে জুন থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্য্যন্ত ভালো আয়ই করেন। আর বেচারা সহিস? এদের কথা কেউ ভাবে না। সহিস বললে—ভারত স্বাধীন হবার আগে গুলমার্গ ছিল শ্বেতকায়দের একটা বড় আস্তানা। হাজারে হাজারে তারা আসত, উৎসবও হোত। সহিসদের মুখে তখন হাসি লেগে থাকত। আজও অনেক সাহেবের কাঠের বাড়ী অযত্নে পড়ে আছে। গুলমার্গে দেখলাম, কাঠের বাড়ীর ঢালু ছাদের ওপর শিশির জমে আছে। রোদে ক্রমশঃ গলে টুপটুপ করে পড়ছে। সহিস বললে—আপনাদের ভাগ্যি ভালো, আকাশ এখন পরিষ্কার। এখানে ২১৪ দিন ছাড়া জল হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে, নভেম্বরে কখনও কখনও তুষারপাতও হয়। অন্ততপক্ষে ঠাণ্ডাটা তখন অসহ্য হয়ে পড়ে।

অবশেষে সাড়ে ন'হাজার ফিট উঁচুতে গুলমার্গে পৌছলাম। ওপরটায় বেশ খানিকটা সমতলভূমি আছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম আর দুপুরের আহার সেরে চড়াই অভিযান। ছোট-বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ এখানে অনেক। বোর্ডিং-এরও অভাব নেই। বারটি বড় বড় বোর্ডিং-হাউস আছে। এদের মধ্যে বাদশাহী মেজাজের হোটেল হচ্ছে 'নেদুর হোটেল।' দৈনিক খরচ ১৮৲ টাকা থেকে ৪০৲ টাকা। দৈনিক ৫৲ টাকার নীচে কোনও হোটেল এখানে নেই। কাশ্মীরের মহারাজার একটি প্রাসাদ আর ভারত সরকারের প্রতিনিধির থাকবার জন্যে রেসিডেন্সীও আছে। এক সময়ে গুলমার্গের সমতলভূমিতে ইউরোপীয়রা গলফ্ খেলতেন। এখনও শ্রীনগরে আর গুলমার্গে সরকারী গলফ্ ক্লাব আছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলা সুরু হোল। খেলনমার্গে ওঠবার তিন মাইল পথ এক এক যায়গায় বেশ সঙ্কীর্ণ। সরুপথের দু'পাশে বিশাল, উন্নত দেবদারু আর পাইনেরা যেন সব সতর্ক প্রহরী। মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দীর মত মুখে তর্জ্জনী রেখে যেন বলছে—চুপ! ভাঙিসনে এই স্তব্ধতা! সত্যিই হিমালয়ের এই সব অঞ্চল মানুষের মনে একটা বিরাট অনুভূতি জাগায়, ভাবা তখন স্তব্ধ হয়ে আসে। যতই উপরে উঠছিলাম, ততই নিঃশ্বাস নেওয়ায় একটু যেন কষ্টবোধ হচ্ছিল। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে যেয়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র নন্দাদেবীর পদতলে কেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল ওপরে উঠতে। ওপরে অপূর্ব্ব দৃশ্য! সত্যিকার তুষারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হোল। গাছের নীচে, ফাঁকা যায়গায়, পাথরের ওপরে পেঁজা-পেঁজা তুলোর মত পড়ে আছে। আমরা শিশুর মত হয়ে গেলাম। সমতলভূমিবাসী বাঙ্গালীর তা' না হ'য়ে উপায় নেই। সেই পেঁজা তুলো হাতে নিয়ে এ ওর গায়ে একটু ছড়িয়ে দেওয়া গেল। ওপর থেকে চারিদিকের পাহাড়ের আর সমতলভূমির বিচিত্র দর্শন মেলে। আমাদের গাইড্ বললে—ঐ দূরে দেখুন, নাঙ্গা পর্ব্বত—২৬,৬২০ ফিট। শুনলাম কাশ্মীরের অন্য এক স্থান থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব্বত কে—২ বা গডউইন অষ্টেনও (২৮,২৭৮ ফিট) দেখা যায়।

খেলনমার্গের ওপরে একটি চায়ের দোকান আছে। মালিক একজন শিখ। যাত্রীদের বসবার জন্যে কয়েকখানি চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থাও ইনি করে রেখেছিলেন সমতলভূমিটুকুতে। ১৫ই নভেম্বরের পর আর থাকা চলে না, তাঁকে নেমে যেতে হয়। তখন তুষারপাত সুরু হবার সময়।

গুলমার্গ, খেলনমার্গ আর সোনামার্গে ঘোড়াই সবচেয়ে ভাল বাহন। পায়ে হেঁটেও কেউ কেউ ওঠেন। তবে পাইনের ঝরা-পাতায় পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। ঘোড়াই এ-পথে নিশ্চিন্ত বাহন। যাঁরা বিশেষ স্থূলাকৃতি, তাঁদের পক্ষে ডাণ্ডী ছাড়া গতি নেই। খরচ কিছু বেশী পড়ে অবশ্য।

খেলনমার্গ থেকে নামবার সময় দেখা হোল একদল ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে। টহলদারী দল। ব্রেণগান, মেসিনগান, রাইফেল, তাঁবু ইত্যাদি নিয়ে এঁরা উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, তাঁরা ৫ মাইল দূরে পাক-ভারত-সীমান্ত থেকে টহল দিয়ে ফিরছেন।

বললাম—এতটা পথ এই ভাবে ভারী বোঝা নিয়ে হেঁটে হেঁটেই এলেন?

উত্তর দিলেন একজন—এ আর কি! দেশরক্ষার জন্য এটুকু কষ্ট করতে হবে বৈ কি!

ভারী ভালো লাগলো যুবকের দৃপ্ত ভঙ্গীটি। ভাবলাম, সব ঠিক আছে। দেশরক্ষার জন্যে জোয়ানদের উৎসাহের, আত্মত্যাগের অভাব নেই। শুধু কর্ণধারদের হেড-এ কিছু গোলমাল, এই যা।

নামবার সময় ঠিক হোল, গুলমার্গ থেকে বাকী চার মাইল হেঁটে নামা হবে, ঘোড়াওয়ালাকে পুরো ভাড়া কবুল করেও। চোখ খুলে দৃশ্য দেখা ত বটেই, উৎরাই-এর কঠোর অভিজ্ঞতাও হবে। মুস্কিল হল শুধু একজনকে নিয়ে—শুভাদি'কে। প্রস্থে তিনি আমাদের চেয়ে বেশী। অণিমা ঠাট্টা করে বললে, শুভাদি', সাবধান কিন্তু। মাস্ ইনটু ভেলসিটির ব্যাপার। দেখে-শুনে পা ফেলবেন। না হলে একেবারে বুলডার হয়ে গড়াবেন।

শুভাদি' রসিকতায় চটেন না। মুচকি হেসে সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন।

বহু ইউরোপীয় পর্য্যটক কাশ্মীরকে 'প্রকৃতির কার্পেট' বলেছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। সর্ব্বত্রই আমরা প্রাকৃতিক রং-বাহার লক্ষ্য করেছি। কিন্তু গুলমার্গ থেকে টনমার্গ পর্য্যন্ত হেঁটে নামবার সময় আমরা যা দেখলাম, বাস থেকে বা ঘোড়ায় চড়ে, তা দেখা সম্ভব নয়।

লাল, সবুজ আর হলদে রঙের খেলা। সবুজের সঙ্গে মিশেছে উপত্যকার লাল চীনারের রং আর মাঝে মাঝে প্যাটার্ণ বুনেছে পাহাড়ের ওপরে হলদে পাতাওয়ালা গাছ। থাকে থাকে যেন এক একটি কার্পেট রচনা করেছে! পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে প্রবহমান পার্ব্বত্য-নদীর রূপও অপূর্ব্ব দেখায়!

শ্রীনগরে ফেরবার পর ঘোড়ায় চড়ার প্রতিক্রিয়া সুরু হোল। শরীরের সর্ব্বত্র ব্যথা, পা যেন আর চলে না। দিন দুয়েক এই টনটনানি থাকে। ব্যথার চোটে মেয়েরা বললেন—সোনামার্গে আর নয়। অবশ্য পরে এই সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছিল।

পাততাড়ি গুটিয়ে পরদিন যাত্রা করলাম পহলগাঁও। দেশী নাম পহলগাম। শ্রীনগর থেকে সোজা-পথে ৭২ মাইল। কোকরনাগ, অছাবল হয়ে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখে গেলে ১৫৫ মাইল। টুরিষ্টরা এই দ্বিতীয় পথটি বেছে নেন, কারণ, কোকরনাগ, অছাবল দেখবার মত। প্রথম পথের ভাড়া রিটার্ণ ৫।৷০ টাকা আর দ্বিতীয়টির ৬।৷০ টাকা। সরকারী টুরিষ্ট বাসে ২২।২৪টি আসন থাকে, মোটঘাট যায় মাথার উপরে। একদিন আগে থেকে টুরিষ্ট রিসেপশান সেণ্টারে টিকিট করে রাখলে আসন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

পহলগামের পথে সবচেয়ে যা চমক লাগায় তা হচ্ছে পপলার-এভেন্যু। সোজা, খাড়াই গাছগুলি। অনেকটা বৈদ্যুতিক খুঁটির মত। ওপরের দিকে ছোট ছোট কয়েকটা ডাল-পালা। বড় হ'লে গুঁড়ির রং হয়ে যায় সাদা। কাশ্মীরের অন্যত্রও এই রকম পপলার এভেন্যু করবার চেষ্টা করা হচ্ছে—চারা গাছ লাগান হয়েছে'।

কোকরনাগে এসে বাস প্রথম থামল। এখানে তিনটি উৎস আছে। পাথর ভেদ করে বেরিয়েছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ চারদিক বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। চারদিকে পাথরের দেওয়াল আর তার মধ্যে বাগান। সর্ব্বত্রই চীনারের দর্শন মেলে। অছাবলে উৎস ছাড়া সুন্দর বাগান আর ট্রাউট মাছের সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

দুপুরে পহলগাম পৌঁছলাম। পাহাড়ের মাঝখানে সুন্দর, ছোট্ট এই পল্লী। পথগুলি পিচ্ দিয়ে বাঁধান। কয়েকটি ভুষিমালের, মণিহারির আর সব্জির দোকান আছে। শাল-কার্পেটের দোকানগুলিরই এখানে আভিজাত্য। কার্পেট, গাব্বা আর শাল এখানেও তৈরী হয়। কম-দামী কার্পেট আর গাব্বা কিনতে হলে শ্রীনগরের চেয়ে এ যায়গাই ভালো। একটি ডাকঘর আছে—মরশুমে চালু থাকে। ১৫ই নভেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। টুরিষ্টদের আহার ও বাসস্থানের জন্যে কয়েকটি ভালো হোটেল এখানে আছে। বাড়ীগুলি মূলতঃ কাঠের, কারণ, এ অরণ্য-সম্পদ এখানে প্রচুর। মালিকদের অধিকাংশই শিখ। পাঁচটি ভাল হোটেলের মধ্যে আমরা এসে উঠলাম পহলগাম হোটেলে। এ-হোটেলগুলির থাকা-খাওয়ার ব্যয় জন-প্রতি দৈনিক ৯—১২।৷০ টাকা আর শুধু থাকার ব্যয় জন-প্রতি ৫—১০৲ টাকা। অবশ্য এ হিসেব মরশুমের। বে-মরশুমে অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গেলে অপেক্ষাকৃত কম। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেই যাত্রীরা হোটেল ছেড়ে চলে যান, দোকানগুলিও বন্ধ হতে সুরু করে। তুষারপাত সাধারণতঃ ১৫ই নভেম্বর থেকে সুরু হয় কিন্তু তার আগে থেকেই আবহাওয়া কন্‌কনে হয়ে ওঠে।

আমরা যখন পহলগামে এসে পৌঁছুলাম, তখন চাঁদের হাট ভেঙ্গে গিয়েছিল। অর্দ্ধেক দোকান বন্ধ। পাঁচ মাসের জন্যে পাকাপাকি ভাবে দরজার উপর কাঠের প্যানেল দিয়ে পেরেক ঠুকে বন্ধ। হোটেলেও যাত্রী নেই। আমরা আর এক পাঞ্জাবী পরিবার। মাসখানেক আগে এই আধা—নির্জ্জনপুরী ছিল গুলজার। হোটেলে ত তিলধারণের স্থান ছিল না, মাঠের মাঝখানে তাঁবুতে বাস করতে হয়েছিল। হোটেলের দুখানা কামরা জুটেছিল সস্তাতেই। সঙ্গিনীদের কল্যাণে স্বপাক ভোজনও চলেছিল। তিন আনা সের আলু আর সওয়া পাঁচ টাকা সের খাঁটি ঘি। সুতরাং একটু খাটাখাটনি করলে এখানে খাওয়া ভালই জোটে।

শ্রীনগরের অনেকেই বারণ করেছিলেন ও সময়ে পহলগামে থাকতে। জমে যাবার নাকি সম্ভাবনা। দেখলাম কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঠিকই, তবে জমে যাবার মত নয়। ওখানের সকল লোককেই দেখেছি লম্বা পা-পর্য্যন্ত ঢিলে আলখাল্লা চাপিয়েছে জামার ওপর। প্রত্যেকের কাছে এক একটা আঙ্গোটি। বেত দিয়ে একটা ভাঁড়ের মত তৈরী করা হয়, ভেতরে থাকে একটা পোড়া মাটির পাত্র আর তাতে জ্বলন্ত অঙ্গার। একটা হাতল আছে। তাই ধরে আলখাল্লার ভেতরে বুকের কাছে আগুনটা রাখে। শ্রীনগরেও এই রীতি। তবে ডিসেম্বর থেকে এটা সার্ব্বজনীন। সন্ধ্যার আগেই হোটেলে ফিরতে হত। তার পরে আর বাইরের ঠাণ্ডা সহ্য করা যায় না। দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে তোফা রাত কেটে গেছে। নভেম্বরেও যাত্রীরা

এসেছেন শ্রীনগর থেকে। দিনের বেলা এসে দেখে-শুনে সন্ধ্যের আগে ফিরে গেছেন। আমরা কিন্তু পহলগামের শীতকে স্বাগত জানিয়েছিলাম।

এখানে তুষারপাত হয় আগেই। সাধারণতঃ ১৫ই নভেম্বরের পর থেকে আরম্ভ হয়। শ্রীনগরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। কিন্তু আজকাল নাকি ইতরবিশেষ হচ্ছে। একজন কাশ্মীরী অধ্যাপক রহস্য করে বলেছিলেন, বোধ হয় রাশিয়ার আণবিক বিস্ফোরণের জন্যেই ঋতু-পর্য্যায়ে এই ব্যতিক্রম। পহলগামে তুষারপাত আট ফিট পর্য্যন্ত হয় আর শ্রীনগরে দু'ফিট। পাহাড়ের ওপর নাকি পঁচিশ ফিট তুষার জমে। এবার তুষার পড়েছে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা একটানা বৃষ্টিপাতের পর। তুষারপাত নাকি এবার এতই বেশী যে, ভারের চোটে বড় বড় গাছ পড়ে গেছে। মার্চ্চের প্রথম দিকে এই তুষার কাশ্মীরের সর্ব্বত্র গলতে থাকে, সারা মাস ধরে চলে এই গলানির কাজ। তখন পার্ব্বত্য নদী আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বর্ষায় আর একবার উচ্ছ্বাস। মে-জুন মাস থেকে ভূস্বর্গ আবার শ্যামলিমায় ঢাকা হতে সুরু করে, ফুলের বাগানগুলি আবার জেগে ওঠে, ডাল হ্রদে পদ্মের অরণ্যে আসে প্রাণ-তরঙ্গ।

পহলগামই আখরোট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। বারো আনা থেকে এক টাকা পর্য্যন্ত শ'। একশো প্রায় সওয়া সের। কলকাতায় তার দাম প্রায় পাঁচ গুণ। আপেলও দশ-বারো আনা সের। শ্রীনগরেও তাই। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত নাকি আপেল চার আনা সের ছিল। আখরোট গাছ এখানে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর। বড় বড় গাছ—আমাদের আম-জামগাছের মত। এর কাঠ থেকেই নানা কাঠের খেলনা তৈরী হয়। বাদামও প্রচুর পাওয়া যায়। ছাড়ানো বাদামের দাম সাড়ে তিন টাকা সের, কলকাতায় আট টাকা।

আমাদের হোটেলের সামনে দিয়েই প্রবাহিত শেষনাগ নদী বা নীলগঙ্গা। জলস্রোত প্রখর কিন্তু হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া যায় যদি সাহস থাকে। রাত্রিতে চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে নীলগঙ্গার গুরুগম্ভীর ধ্বনি দূরাগত সমুদ্রের গর্জনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অমরনাথের পথে কিছুটা এগিয়ে গেলে পহলগামের স্তব্ধ সৌন্দর্য্য অভিভূত করে ফেলে। এখানকার জলহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর,

পহলগাম্ : অমরনাথের পথে।

শ্রীনগরের চেয়ে ভালো। যাঁরা নাগরিক জীবনের জঞ্জাল থেকে ক্ষণিক মুক্তির জন্যে কাশ্মীরে আসেন, তাঁদের এখানে কয়েক দিন কাটিয়ে যাওয়া দরকার। এমন নার্ভটনিক খুব কমই আছে।

আশে-পাশের গ্রামে আমরা গিয়েছি, কৃষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। আমাদের দেশের চাষীদের তুলনায় এরা আরও দরিদ্র। এদের ছেলেমেয়েরা যাত্রী দেখলেই হাত পাতে। সুন্দর কচি-কচি মুখগুলিকে হাত পাততে দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়। বাংলায় দারিদ্র্যের চির-অধিষ্ঠান। মানুষকে ডাষ্টবিন থেকে কুকুরের সঙ্গে আহার খুঁজতে আমরা দেখেছি। আমাদেরই দেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে। তবু এদের দারিদ্র্য প্রাণে আঘাত দেয়। প্রকৃতি যেখানে ভূস্বর্গ রচনা করেছেন অকৃপণ হাতে, যে-দেশের মানুষকে এত রূপও তিনি দিয়েছেন, সে-দেশে অলক্ষ্মীর আবাস মনকে ভারাক্রান্ত না করে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলাম এক কৃষককে—এত লোক তুষারপাতের ভয়ে চলে যাচ্ছে, তোমরা যাবে না?

উত্তর এলো—কোথায় যাব বাবু? যাদের পয়সা আছে, যাবার জায়গা আছে, তারাই এখান থেকে অনন্তনাগ বা শ্রীনগরের দিকে চলে যায়। আমাদের নড়বার উপায় নেই।

বললাম—শুনেছি এখানে নাকি আট ফিট বরফ জমে যায়? তা'লে তোমরা টিকে থাকো কি ক'রে? খাও কি?

উত্তর দেয়—প্রতিদিন দরকারমতো তুষার কেটে সরিয়ে দিই। দিন-রাত আগুন জেলে রাখতে হয় ঘরের ভেতর। তার জন্যে আগে-ভাগেই কাঠ জোগাড় করে রাখি, জঙ্গল থেকে কেটে এনে। ৪।৫ মাসের জন্যে চাল আর ভুট্টাও জোগাড় করি। তাই বসে বসে খাই। কোনো রকমে বেঁচে থাকি। সয়ে গেছে।

এদের ঘরগুলি শ্রীহীন, বেশীর ভাগই আধ-ভাঙা। পল্লীর পথগুলিও পরিচ্ছন্ন নয়। বিনা পয়সায় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, সে-সুযোগ নিতে পারে না। ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে করবে কি? মাঠের কাজে সাহায্য করবে কে? শের-ই-কাশ্মীর এদের জন্যে কিছুই করেননি। গোলাম মহম্মদ এখনও কিছু ক'রে উঠতে পারেননি। তবে চার আনা সের দরে কন্ট্রোলে চালের ব্যবস্থা করে কিছুটা সুরাহা করা হয়েছে। শ্রীনগরে দেখেছি এক ছটাক চাল যাতে চোরাকারবারীর খপ্পরে না পড়ে তার জন্যে প্রতি বাসে জোর খোঁজাই হয়। কাশ্মীরী পুলিশ আর ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে দিয়েই এই কাজ করানো হয়। আর পশ্চিম বাংলায়? জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটরা হতাশার সুরে বলেন, এমনই আইনের ফাঁক যে, চোরাদের চালানী কারবার চোখের সামনে চলতে দেখেও ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে তাঁদের বসে থাকতে হয়। সুতরাং চালের দাম বাংলায় ত তিরিশ টাকা মণ হবেই!

পহলগাম হয়ে দুদিকে দুটো বড় রাস্তা চলে গেছে—একটা গেছে আরু-লিদ্দেরওয়াত হয়ে কোলাহয় গ্লেসিয়ারের দিকে কুড়ি মাইল দূরে। আর একটা গিয়েছে চন্দনওয়ারী-শেষনাগ-ওয়াবজান-পঞ্চতর্নী হয়ে অমরনাথের গুহায় ২৮ মাইল দূরে। ঘোড়ায় চড়ে চন্দনওয়ারী পর্য্যন্ত যাওয়া চলে, তারপর পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। কোলাহয় গ্লেসিয়ারও হাঁটা-পথের শেষে। সেপ্টেম্বরের পরে আর ঐ দুটো যায়গায় যাওয়া অসম্ভব না হলেও নিরাপদ নয়। সুতরাং আমাদের ভাগ্যে দুটোর কোনটাই হয়নি। [ক্রমশঃ।

বোকা চাকর—বুদ্ধিমতী গিন্নী
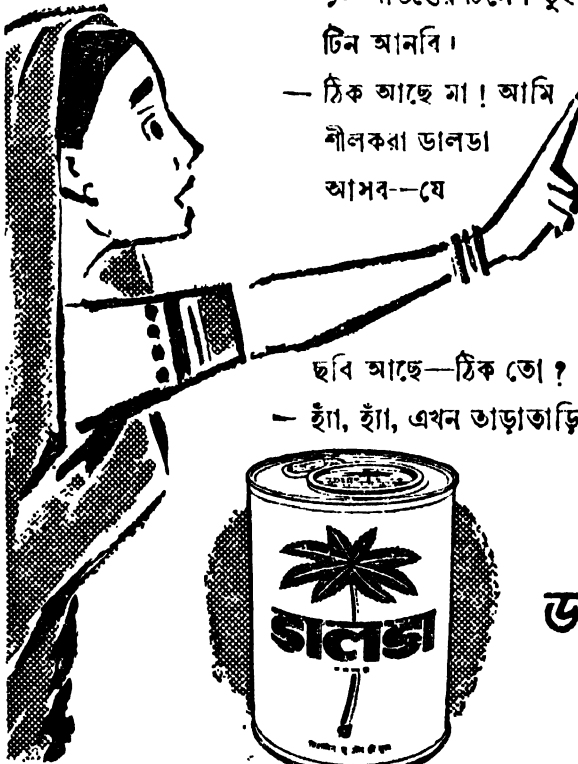
— মা আপনি যে 'ডালডা' চাইছেন তা আমি কেমন করে খুঁজে পাব ?

— ঠিক। নাম তো তুই পড়তে পারবিনা কিন্তু—'ডালডাব' টিনের ওপর থাকে খেজুর গাছের ছবি।

— ও এখন মনে পড়েছে ! আচ্ছা মা, বাটি করে আনব না বড় কিছু একটা নিয়ে যাব ?

— দুর সবজান্তা ! 'ডালডা' কখনও খোলা বিক্রী হয় না। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা টিনে।

— যাতে কেউ চুরী না করতে পারে ?

— হ্যাঁ, তাছাড়া শীলকরা টিনে মাছি ময়লা বসতে পারেনা, ভেজালের ভয় থাকে না। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ারও ভয় নেই।

— ও সেই জন্যেই সব বাড়ীতে 'ডালডা' দেখা যায় !

— হ্যাঁ, কিন্তু কত ওজনের টিন আনবি বল তো ?

— যেটা পাওয়া যায়।

— 'ডালডা' পাওয়া যায় ½, ১, ২, ৫ আর ১০ পাউণ্ডের টিনে। তুই একটা ৫ পাউণ্ডের টিন আনবি।

— ঠিক আছে মা ! আমি একটা ৫ পাউণ্ডের শীলকরা ডালডা মার্কা বনস্পতির টিন নিয়ে আসব—যে টিনের ওপর খেজুর গাছের

ছবি আছে—ঠিক তো ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন তাড়াতাড়ি কর।

ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন

স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন

DL. 468-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

২

আবার সেই বুড়ো

কমলেশ যে আবার সেই বুড়োর কাছেই গিয়েছিল একথা কাউকে জানায়নি, পাছে এই নিয়ে সবাই হাসি ঠাট্টা করে। বিদ্যাপীঠের নানা কাজের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ভুলতে চেয়েছে সেই যক্ষপুরীর কথা, সেই বুড়োর কথা।

সারাদিনে তাদের কত রকম কাজ। সকালবেলা উঠে প্রভাত-ফেরিতে যোগ দিতে হয়। এই নতুন গড়ে-উঠা কলোনীর সব ছেলে মেয়েরাই ভোরবেলা গান করতে করতে চারদিকটা ঘুরে আসে।

প্রথম দিন অবশ্য কমলেশ আর প্রশান্ত অবাক হয়েছিল খুব। প্রভাতফেরির কথা তারা জানতো না। ভোরবেলা ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনো চারদিকে অন্ধকার, কাকেরা সবে ডাকতে সুরু করেছে। গম্ভীর আওয়াজে তাদের মন নেচে উঠে। কিসের ধ্বনি!

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে গান করতে করতে ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে আসছে। শঙ্করদা তাদের মধ্যে রয়েছে, সামনের দিকে। কমলেশদের দেখে হাত নেড়ে ডাকে, আরে তোরা আমাদের সঙ্গে যোগ দে।

—এ কি শঙ্করদা?

—প্রভাতফেরি।

—কিন্তু আমি তো গান করতে পারি না?

—তাতে কি হয়েছে গেয়ে দেখ ঠিক পারবি।

কমলেশ আর প্রশান্ত ওদের দলের সঙ্গে মিশে যায়। সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠে—

বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

ভোরের আলো ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে। চারদিক ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠে—চারপাশে একটা ঠাণ্ডা আমেজ। অদ্ভুত অনুভূতি ফুলের গন্ধে বাতাস যেন মাতাল। গাছের পাখীরা কত রকম শব্দ করে উড়ে চলে যায়। বড় বড় ফুলগুলো তাদের অভ্যর্থনা করে।

প্রত্যেকটা বাংলোর সামনে দিয়ে তারা এগিয়ে চলে। কত ছেলে মেয়ে সব বেরিয়ে আসে। হাত জোড় করে গান করতে করতে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

সমস্ত কলোনীটা কমলেশরা দেখতে পায়। একদিকে গরুর গোয়াল, অনেকগুলি গরু, নধর দেহ, চকচকে রং, বিশাল চোখে তাদের দিকে চেয়ে আছে। খানিকদূরে হাঁস-মুরগীর আস্তানা, পালে পালে ঘর থেকে বেরিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। কত ধানের গোলা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটা মাঝারি পুকুর—সেখানে ছাড়া আছে মাছ। কত ছোট বড় বাড়ী—স্কুল, ডাক্তারখানা, থিয়েটারের মঞ্চ, সব তাদের চোখে পড়ে। কী সুন্দর সারবন্দি।

পাক দিয়ে গানের দল ফিরতে সুরু করে। দূরে সূর্য্য ওঠে। টকটকে লাল বিশাল—চারদিকে তার কোমল প্রভা। সহরের ছেলে, যারা এ দৃশ্য কখনো দেখেনি, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দল ভাঙতে থাকে। যে যার বাড়ীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। এখুনি তারা তৈরী হয়ে কাজে যাবে। সূর্য্যের তেজ বাড়তে থাকে, চারদিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভোরের মাধুর্য্য কেটে যায়।

প্রথমদিন প্রভাত ফেরির পর বেণুদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কমলেশের একটা বাগানের মধ্যে। কমলেশ উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করে—জায়গাটা কী সুন্দর, না দিদি?

—সত্যিই বড় ভালো, এই রকম একটা জায়গাই আমি খুঁজছিলাম। আজ কি ইচ্ছে করছে জানিস? ইচ্ছে করছে সারাদিন বসে ছবি আঁকি এই রূপকথার রাজ্যের। আমি এখনও ভাবতে পারছি না, একি সত্যি না স্বপ্ন?

—না দিদি, এইতো সত্যি, এইতো সত্যিকারের মানুষের রাজ্য।

সেদিন চুপ করে দুই ভাইবোনে তাকিয়ে ছিল অসীম ফাঁকার দিকে। বাধাহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

ধনঞ্জয় বৈরাগী

রেণুকা যা বলেছিল তা সত্যি কথা—এ যেন রূপকথারই রাজত্ব। ক'দিন এখানে থেকে, এখানকার নিয়ম কানুন দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছে। এ কলোনীর সকলেই যেন একটা বিরাট যৌথ পরিবারের বাসিন্দা। নিজেদের পৃথক সত্তাকে তারা বিসর্জন দিয়েছে। সকলেই ওরা কাজ করে, যার যে রকম ক্ষমতা। অনেকখানি জমি নিয়ে চাষ হয়। সেই ফসল থেকেই এতগুলি পরিবারের খাওয়া চলে। উদ্‌বৃত্ত হলে বাজারে বিক্রী করা হয়।

বড়রা এখানে চাসের কাজ করে। অনেকে মাছের তদারক করে। সেও তো আরেক রকম চাষ। আবার যারা পশুপাখী ভালবাসে, তারা দেখে গরুগুলোকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ সহরে যায় বিক্রী হতে, এখানকার খাঁটি দুধের চাহিদা ওখানে খুব। খাঁটি দুধের মতোই, সযত্নে পোষা মুরগীর ডিমও বাজারে পড়তে পায় না। অনেকে তো না জানলে সন্দেহ প্রকাশ করে হাঁসের ডিম ভেবে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যান্ত এ কলোনীর বুড়ো জোয়ান কতজনই এই চাষ আবাদে ব্যস্ত থাকে, কী ভাবে আরও তারা উন্নতি করবে সেই চিন্তাতেই বিভোর।

এখানকার নিয়ম-কানুনের কথা জানতে নতুন ছেলেদের বেশ ক'দিন সময় লেগে যায়। প্রথম প্রথম কমলেশ আর প্রশান্ত নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা বলত। চুপচাপ থাকত, কিন্তু খুব শিগ্‌গিরি আলাপ হয়ে গেল, ওদেরই বয়েসী একটি ছেলের সঙ্গে, নাম তার অমিতাভ। এখানে দু'বছর আছে। পড়ে সেকেণ্ড ক্লাশে।

ওর সঙ্গে আলাপ হ'ল খাবারঘরে। সব ছেলেদের একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থা। কাঠের পিঁড়ি, সামনের কলাপাতায় অন্ন-ব্যঞ্জন।

দুধের গেলাসটা দেখিয়ে কমলেশ প্রশান্তকে বলে, দেখছিস্ এখানকার গরুর দুধ, কি রকম গাঢ় ?

প্রশান্ত হেসে বলে, হজম হলে হয়, আমাদের তো আর খাঁটি দুধ খাওয়া অভ্যেস নেই। এখানকার গয়লাগুলো একেবারে কাঁচা, দুধে জল মেশাতে জানে না !

ওদের কথা শুনে পাশ থেকে একটি ছেলে হেসে ওঠে, সেই অমিতাভ—গয়লা কোথায় ? আমরাই তো গয়লা।

—তার মানে ?

—প্রভাতফেরীর পর আমরাই দুধ দুয়ে নিয়ে আসি। তবে প্রত্যেকদিন সকলকে যেতে হয় না। ভাগ করা আছে, সপ্তাহে একদিন। আমার পালা সোমবার।

—বাঃ বেশ সুন্দর ব্যবস্থা।

অমিতাভ নিজের থেকেই বলে, তোমরা নতুন ছেলেতো চল, এই জায়গাগুলো দেখিয়ে দি।

খাওয়া দাওয়ার পর অমিতাভ তাদের নিয়ে এল একটা বাড়ীর সামনে, এই হচ্ছে মায়েদের কার্য্যালয়।

ভেতরে ঢুকে যায় তারা। সত্যিই তাই। কমলেশ দেখে তারই মার মত মায়ের দল। কয়েকজন চরকায় সুতো কাটছেন, কয়েকজন সেই সুতো দিয়ে কাপড়ের জমি তৈরী করছেন। আবার অনেকে কলে সেলাই করে জামা-কাপড় তৈরী করছেন।

অমিতাভ বুঝিয়ে দেয়, এইখানেই সব জামা-কাপড় তৈরী হয়, এ কলোনীর সকলেই প্রায় একই রকম জিনিষ পরে।

একটা বারান্দা পেরিয়ে দুটো বড় ঘর। প্রথমটায় কোটা হয় তরকারি, অনেকে বসে তৈরী করে রান্নার সরঞ্জাম। আর তার পাশের ঘরে হয় রান্না। সেখানেও মায়ের দল কাজে ব্যস্ত। এতগুলো ছেলেমেয়ের দায়িত্ব তাদের ওপর।

অমিতাভ বলে, সকালে এঁরা এই সব কাজ করেন। দুপুরে কয়েকজন স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ান। কয়েকজন রান্না সেলাই, গৃহস্থালীর কাজ শেখান। যেসব মেয়েরা এই স্কুলে পড়ে, তাদের এ সব কাজ শিখতেই হয়।

কমলেশ আর প্রশান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। অমিতাভ ওদের নিয়ে যায় আর একটি বাড়ীতে। বলে, এখানে গান শেখানো হয়।

কমলেশরা দেখে, কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে আছে। আর এক ভদ্রলোক তাদের গান শেখাচ্ছেন। অমিতাভ আলাপ করিয়ে দেয়, এই আমাদের শশাঙ্কদা', এর কাছে আমরা সকলে গান শিখি।

প্রশান্তরা ওঁকে আগেই দেখেছে। প্রভাতফেরীর সময় উনিই তো সকলের আগে গান করছিলেন।

সুন্দর চেহারা শশাঙ্কদা'র। ফরসা রং, চোখে-মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বলেন তোমরা বুঝি নতুন ছেলে ?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের কথা শঙ্কর বলছিল বটে, সময় করে এস আমার কাছে। প্রভাতফেরীর সুরগুলো সব তুলিয়ে দেব। তাহলে গাইবার সুবিধে হবে।

—বেশ আমরা বিকেলের দিকে আসব।

অমিতাভ তাড়াতাড়ি বলে, বিকেলে তো আমাদের ড্রিল হয়। বরং স্কুলের টিফিনের সময় এস। আমাদের আধ ঘণ্টাখানেক ছুটী থাকে।

শশাঙ্কদা' আবার ছেলেদের গান শেখাতে থাকেন। অমিতাভ ওদের পাশের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে কমলেশরা দেখে চারদিকে কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে, চমৎকার সাজান ঘর ! মাঝখানে একটি ভদ্রমহিলা বসে একটি মেয়েকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছে। অমিতাভ আলাপ করিয়ে দেয়, ইনি মণিকাদি', আমাদের ছবি আঁকা শেখান।

মণিকাদি' হেসে ওদের অভ্যর্থনা করেন। রোজ এস ভাই, এখানে ছবি আঁকা শিখবে।

প্রশান্ত উত্তর দেয়। আমরা তো ছবি আঁকতে জানি না ?

—তাতে কি হয়েছে, শিখতে দোষ কি ?

—কি মিষ্টি কথা, ভারী নরম স্বভাব, মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। বলেন, এই দেখ না আমার একটি নতুন ছাত্রী কি সুন্দর ছবি আঁকছে !

প্রশান্তরা নতুন ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে দেখে, সে আর কেউ নয়, রেণুকা। এত মন দিয়ে সে ছবি আঁকছে যে একটা কথাও তার কানে যায়নি।

কমলেশ ডাকে, দিদি !

রেণুকা এবার মুখ তুলে তাকায়, হেসে জিজ্ঞেস করে, কি রে তোরা এখানে ?

মণিকাদি' বলেন, কি তোমরা বুঝি ভাই-বোন ? দিদি যখন এত ভালো ছবি আঁকে, ভাইরাও নিশ্চয়,—

কমলেশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, না মণিকাদি"। দিদি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো—

রেণুকা জলভরা চোখে তাকায়, ওদের কথা শুনবেন না মণিকাদি', ওরা আমার পাগল ভাই।

কলাভবন থেকে বেরিয়ে ওরা এগিয়ে চলে ডাক্তারখানার দিকে। সোনালী রোদে সবুজ ক্ষেত ঝলমল করছে। কমলেশ প্রশ্ন করে, এই যে ফসল, এ-ও কি সব তোমাদের চেষ্টায় ?

—হ্যাঁ ভাই! জমি ঠিক করা, লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল কাটা সবই আমাদের করতে হয়।

—তোমরা শিখলে কি করে ?

—লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজও যে আমাদের শেখানো হয়।

তাদের কথা শেষ হয় না, সদাশঙ্কর এসে পড়ে।

—কি কমল, কি রকম লাগছে তোমাদের এখানে ?

—খুব ভাল শঙ্করদা', এ যেন স্বপ্নরাজ্য।

—অমিতাভ বুঝি তোমাদের গাইড হয়েছে। এখন কোন দিকে যাচ্ছ ?

—ডাক্তারখানায়।

—চল। আমি ওদিকেই যাচ্ছি।

ওরা এগিয়ে চলে। সামনে পুকুর পেরিয়ে আরও খানিকটা গেলে তবে ডাক্তারখানা। কমলেশ নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করে, এধারে রোগের দৌরাত্ম্য কি রকম শঙ্করদা' ?

—হ্যাঁ, তা একটু আছে। তবে অন্য গাঁয়ের চেয়ে অনেক কম। এই কলোনীর ডাক্তার আমার বন্ধু মিহির। খুব যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করে।

অমিতাভ বলে, সত্যি মিহিরদা' যেন চিকিৎসার যাদু জানে! এত সহজে শক্ত রোগ সারায় যে দেখলে অবাক হতে হয়। আচ্ছা মিহিরদা' বুঝি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন ?

সদাশঙ্কর হেসে ফেললেন, সে কথা আর বোল না। ওর মত দুষ্টু ছেলে আর দুটি মেলে না, বাপ্‌রে বাপ্, মাষ্টারদের চিরকাল পাগল করে মেরেছে। ক্লাশের ফ্যান, জানালার সার্শী ভাঙ্গা ওর ছিল রুটীনবাঁধা কাজ। স্কুলের বোর্ডে সরষের তেল মাখিয়ে ও রাখবেই। অথচ ফাইন দেবার নামও করত না। হেড্-মাষ্টার ভয় দেখালে একেবারে পায়ে গিয়ে পড়ত।

কমলেশ অমিতাভ আর প্রশান্ত হো-হো করে হেসে উঠে। সদাশঙ্কর দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, ফেলে-আসা দিনের কথা ভাবতে ভাবতে বলে, সেই মিহির যখন ডাক্তার হয়ে বেরুল আমি তো অবাক! সবে তখন এই কলোনী গড়ে উঠছে। একদিন ওর কাছে গিয়ে হাজির; যদি কিছু সাহায্য করে, দেখলাম সেই একই রকম ফাজিল, হেসে বললে, কি রে তুই নাকি আশ্রম খুলে সাধু-টাধু হয়ে বসেছিস্, তা চল্‌ছে কি রকম ?

—বললাম তোর কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে

—কিসের সাহায্য ?

—নতুন ভাবে ইস্কুল গড়ছি, সত্যিকারের মানুষ তৈরী করার ইস্কুল। শুনলাম তোর প্র্যাকটিস্ বেশ জমে উঠছে।

মিহির কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেয়, দূর দূর একেবারে ভুল শুনেছিস্, টাকা কোথায় আমার, টাকা দিয়ে সাহায্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

রেগে বললাম, টাকাই যদি না দিবি, তাহলে আর কি করে সাহায্য করবি ?

মিহির ঠিক আগের মত হেসে বললে, আমাকে যদি কোন কাজে লাগাতে পারিস্ তাহলে যেতে রাজী আছি।

—তার মানে ?

—মানে তুই চাইলি টাকা, দিতে পারলাম না—তাই নিজেকেই না হয় দিলাম।

আমার চোখে জল ভরে এল। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যি যাবি মিহির, এখানকার পশার টাকাকড়ি নাম-ধাম ছেড়ে সেই পাড়াগাঁয়ে পাঁচ জনের সেবা করে একেবারে সাধারণ জীবন যাপন করতে ?

ঠিক আগের মত হেসে ও বললে, আমাকে বিশ্বাস করা একটু শক্ত বই কি, সহজে কেউ করতে চায় না। তবে ভয় নেই, জীবনের সব কথাই আমার ফাজলামী নয়, অন্ততঃ এটা নয়। যাব যখন বলেছি, আজই যাব।

কথাগুলো বলতে বলতে সদাশঙ্কর-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেদিনের কথা ভাবলেও আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। সেই দুষ্টু মিহির, যার কাছে একটা কানাকড়ি সাহায্য পাব বলে আশা করিনি, সে কোথায় নিজেকে বিলিয়ে দিলে দেশ আর দশের মাঝে! আর যারা তখন দেশ দেশ বলে চীৎকার করে বেড়াত তাদের মধ্যে কতজনই আজ কালো-বাজারী ব্যবসাদার, কি বিচিত্র সংসার!

আবার একটু থেমে সদাশঙ্কর বলে, মনে পড়ে স্কুলে বাংলার মাষ্টার মশাই বিরক্ত হয়ে মিহিরকে বলতেন, তুমি লেখাপড়া ছেড়ে গোচারণে যাও। তাঁর কথাই আজ ফলেছে, ও গোচারণেই এসেছে। কিন্তু সেদিনকার সেই সেরা ছেলের চাইতে ও অনেক ভাল কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তারখানায় এসে পড়ায় সদাশঙ্কর সামনের দিকে এগিয়ে যায়, কমলেশেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। রুগীর সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার এক একজনকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে, লম্বা, শ্যামল চেহারা। চোখে চশমা। সারা মুখে সেয়ানা হাসির ঝিলিক।

একটি ছেলেকে পরীক্ষা করে বলেন, কি রে পণ্টু, পেট কামড়াচ্ছে ?

—হ্যাঁ মিহিরদা'। কাল বিকেল থেকে—

—কামড়বে না! কাল যা আলুর দম খাচ্ছিলি, যত সব টিপিন খাওয়া ছেলে।

ডাক্তার টিপিন কথার ওপর এমন একটা জোর দেয় যে সকলে হেসে ওঠে। কমলেশদের ওপর চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করেন, এরা যেন ভিন্ গাঁয়ের লোক মনে হচ্ছে। কি রে অজিত, তোর আমদানী না কি ?

অমিতাভর কথা বলার আগেই মিহির কমলেশের কাছে এগিয়ে

যায়। তা বাপু তোমার বেদনাটা কোথায়? পিঠে না পেটে, না ভূ'জায়গায়ই।

কমলেশ হেসে ফেলে। মিহির তড়বড় করে বলে, ছেলে আবার হাসে দেখ, এ যে দেখনহাসি। বলি কিছু কামড়াচ্ছে না কি, পেট কি পা?

অমিতাভ উত্তর দেয়। এদের কোন অসুখ করেনি, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

—সে কথা আগে বলতে হয়? আমি তো এখুনি এক শিশি ক্যাষ্টর ওয়েল খাইয়ে দিচ্ছিলাম আর কি। মিহির নিজের মনেই হেসে বলে, এখন তো ভাই ব্যস্ত আছি। পরে সময় মত বুঝে সুঝে আলাপটা সেরে নেওয়া যাবে।

মিহির ডাক্তারের সঙ্গে প্রথম আলাপেই ওরা খুসী হয়।

বিকেলে ছুটীর পর ড্রিলের আয়োজন। সবাই এসে জড় হয় স্কুলের সামনের ফাঁকা মাঠে। ফ্ল্যাগ-পোষ্টের ওপর উড়ে দেয় তিনরঙা পতাকা, তারই নীচে দাঁড়িয়ে সকলে এক সাথে গান করে।

তারপর হয় খেলা সুরু। একদল বল নিয়ে চলে যায় ফুটবল খেলতে। একদল খেলে ভলী। আবার অনেকে করে কুচ্‌কাওয়াজ। সমান তালে পা ফেলে হাত নেড়ে এগিয়ে চলে। বীরের মত বুক ফুলিয়ে বলে,

> আমরা নবীন তেজপ্রদীপ্ত বীর তরুণ
> বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন।
> আমরা ফলাব ফুল ফসল,
> অগ্র পথিক রে যুবাদল।
> জোর কদম চল রে চল।

কথায় ছন্দে পা ফেলে তারা এগিয়ে যায়। মেয়েরা আর একদিকে খেলা করে। এক দল খেলে ব্যাড্‌মিণ্টন। এক দল কপাটি। আবার হয়ত একদল একসঙ্গে হাত তোলে, নামায়। ওঠে, বসে। সুন্দর সারবন্দী ভাবে ড্রিল করে।

এদের মধ্যে কমলেশ রেণুকাকে দেখতে পায়, একসঙ্গে হাত তুলে, মাথা নেড়ে দলের সমতা রাখার চেষ্টা করছে। প্রশান্ত চলে গেছে ফুটবল খেলতে। কমলেশ একলা দাঁড়িয়ে ছিল।

—কি হে, তুমি কিছু করছ না?

কমলেশ পেছু ফিরে তাকায়, দেখে, মিহিরদা' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—মিহিরদা', আপনি?

—আলাপ করবে বলেছিলে, তাই দুপুরে হাজির দিলাম। কিন্তু তুমি ড্রিল করছ না কেন? খুব পালোয়ান বুঝি? কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। দেহের স্বাস্থ্যের চেয়ে তোমার চুলের স্বাস্থ্য বেশ পরিপাটি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

কমলেশ লজ্জিত স্বরে বলে, না তা নয়, আজ নতুন কি না তাই কিছু করছি না। কাল থেকে—

মিহির কথা থামিয়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ক'দিন জিরিয়ে নাও। এই তো জিরোবার বয়েস, শেষ কালে বুড়ো হলে তো আর জিরোবার সময়ই পাবে না, তখন কাজ আর কাজ। কি বল?

মিহিরদা'র কথার ধরণই ঐ রকম, সারাক্ষণ সবাইকে হাসিয়ে মারে।

এ সবই কিন্তু কমলেশদের প্রথম দিকের কথা। এ কলোনীর সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতেও তো সময় লাগে। ক্রমে এরা এখন সকলের মাঝে মিলে গেছে। হৈ হৈ আনন্দে ভরা দিন কেটে যায়। লেখাপড়া কাজকর্ম, খেলাধূলোর স্রোতে ওরাও অন্যদের মত গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

এ জায়গা যে কমলেশের কতখানি ভালো লেগেছে, তা ওর চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। বাবাকে মাকে সে বার বার করে লেখে, "তোমরা একবারটি এখানটা ঘুরে যাও। দেখবে আমরা কি আনন্দে আছি। কলকাতায় দেখতাম, ছাত্ররা শুধু ভাঙতে চায়, দেখে দেখে বড় দমে যেতাম। নিরুপায়ে মন ভরে যেত। এখানে এসে মনে আশা জাগছে। আমরা শুধু লেখাপড়া করছি না, কাজ করছি, কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। গড়ার যে কি আনন্দ তা এতদিন আমরা বুঝতে পারিনি। এই বিদ্যাপীঠ আমাদের তাই বুঝিয়েছে।"

সেদিন শনিবার। কমলেশ গিয়েছিল ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে। খুব জব্বর খেলা হল। শহর থেকে একদল ছেলে এসেছিল খেলতে বিদ্যাপীঠের সঙ্গে। কোন পক্ষই জিততে পারেনি। ড্র হয়ে গেল। প্রশান্ত সত্যিই ভাল খেলেছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেছে গোল দিতে, তবে সফল হয়নি।

খেলা শেষ হয়ে গেলে শহরের দল ফিরে গেল শহরে, কমলেশরাও ক্লান্ত শরীরে ফিরছিল হোষ্টেলের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পাখীরা ফিরছে বাসায়, ফুরফুরে বাতাস-এর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়লো দূরে গাছতলায় কি যেন একটা জিনিষ পড়ে রয়েছে।

কমলেশ জিজ্ঞেস করে, ওখানে কি ওটা সাদা মত মনে হচ্ছে? প্রশান্ত এড়িয়ে যায়, কাপড়চোপড় কিছু হবে।

—একবার দেখে গেলে হয় না?

—না না চল, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, হোষ্টেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

তবু কমলেশ কথা শোনে না, কি রকম যেন তার সন্দেহ হয়—তোরা দাঁড়া, আমি আসছি, বলে কমলেশ ছুটতে ছুটতে গাছের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যেতে হয় না, খানিকটা গিয়েই বুঝতে পারে ওটা শুধু কাপড় নয়, কোন লোক উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ঐখান থেকেই চেঁচিয়ে ওঠে, তোরা শীগ্‌গির এদিকে আয়, কেউ বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ছেলেরা ব্যস্ত ভাবে ছুটে আসে, সবাই মিলে আস্তে আস্তে সেই গাছের দিকে এগিয়ে যায়। দেখে, কমলেশ যা বলেছিল তাই সত্যি, জলকাদার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে এক ভদ্রলোক পড়ে রয়েছে। প্রথমটা ভয় পেলেও ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে তারা কাছে গিয়ে বসে, লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবু বয়েস বেশ বেশী হয়েছে বলেই মনে হয়। তিন-চার জনে ধরে আস্তে আস্তে ভদ্রলোককে তুলে ধরে, এতক্ষণে তার মুখটা দেখা যায়, কমলেশ চমকে ওঠে, এ সেই বুড়ো।

সকলে জিজ্ঞেস করে, তুই ওকে চিনিস্ না কি?

—হ্যাঁ, এ সেই বুড়ো যক্ষপুরীতে থাকে।

সবাই চিন্তিত হয়, তাহলে এখন কি করা যাবে?

কমলেশ ভেবে নিয়ে বলে, চল্, সবাই মিলে ওকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসি।

—ঐ যক্ষপুরীতে ?

—ভয়ের কি আছে ? বুড়ো বিপদে পড়েছে, ওকে সাহায্য করা আমাদের উচিত।

মনে মনে খুসী না হলেও মুখে কেউ আপত্তি করল না। বলল, চল, তবে ভেতরে আমরা ঢুকব না। দোরগোড়ায় নামিয়ে রেখেই চলে আসব।

কমলেশ কোন কথার উত্তর দেয় না। একদৃষ্টে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে হাঁটতে থাকে, কিছুতেই সে ভেবে পায় না এখানে এসে বুড়ো অজ্ঞান হয়ে পড়ল কেন ? আবার যদি জ্ঞান ফিরে উঠলে এদেরই বকাঝকা করে। যক্ষপুরীতেই বা ওই বুড়োকে দেখাশোনার লোকজন কে আছে ?

কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর সে নিজের মনে খুঁজে পায় না। আর সকলের সঙ্গে থমথমে অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞান বুড়োকে নিয়ে এগিয়ে যায় সেই ভয়াবহ যক্ষপুরীর দিকে।

[ক্রমশঃ।

রুমাল আর পেন্সিলের ভেল্কী

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

কাফে এতোয়ালের ক্যাশিয়ার মাঁদমসেল জিলে ছিলেন আমার ম্যাজিকের বিশেষ ভক্ত। প্যারিসে থাকা কালে মাঝে মাঝেই যেতাম 'কাফে এতোয়াল'এ কফি খেতে। সর্বপ্রথম সেদিন ওখানে যাই সেদিন ঘটেছিল এক মজার ব্যাপার! বাইরে পড়ছিল ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি। গা থেকে রেনকোটটা খুলে দোরের পাশে ঝুলিয়ে দিয়ে কাফের এক কোণে একটি খালি চেয়ারে বসলাম গিয়ে। আগের দিন ফরাসী টেলিভিসন 'টেলিভিসিও ফ্রঁসে'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে আমার যাদুর খেলা। কাজেই হোটেলে অপেক্ষমান খদ্দের থেকে শুরু করে পরিচারক পরিচারিকারা পর্যন্ত প্রথম দর্শনেই চিনে ফেললেন আমাকে। টেবিলে টেবিলে উঠল মৃদুগুঞ্জন। একটু বিব্রত বোধ করলাম। এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করে যিনি কাফের ভেতর দিককার এক কেবিনে নিয়ে আমাকে বসিয়ে সেখানেই আমাকে খাবার ও কফি সরবরাহ করলেন, তিনিই মাঁদমসেল জিলে। তাঁর অনুরোধে সেদিন একটি ম্যাজিক দেখাতে হয়েছিল সবার সামনে: যা নাকি খুব সমাদর লাভ করেছিল সবার কাছে। টেবিলের উপরে পড়েছিল একটা লেড পেন্সিল। ডান হাতে ঐ পেন্সিলটাকে উঁচু করে ধরে জনৈক খদ্দেরের এক রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলাম ঐ পেন্সিল শুদ্ধ হাত। রুমালচাপা অবস্থাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ঐ উদ্ধত পেন্সিলটি। এর পরে ওয়ান—টু—থ্রি—বলে রুমালটা তুলে নিতে দেখা গেল পেন্সিল অদৃশ্য! রুমালের মালিক রুমাল পকেটস্থ করলেন আর আমি ফিরে গেলাম কেবিনে।
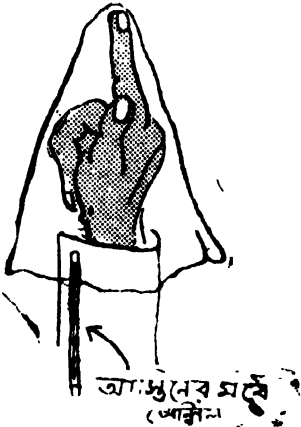
কেমন ক'রে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা করেছিলাম তাই শোন। পেন্সিল-শুদ্ধ হাতটাকে রুমালচাপা দিয়ে যখন রুমালের ধার টেনে টেনে রুমালটাকে ঠিক ভাবে হাতের উপরে রাখছিলাম, সেই সময়ে এক ফাঁকে পেন্সিলটাকে দিয়েছিলাম ছেড়ে আর তা আপনা থেকেই ঢুকেছিল আস্তিনের ভেতরে। উদ্ধত তর্জনী নিয়েছিল পেন্সিলের স্থান। রুমালে ঢাকা অবস্থায় তর্জনী আর পেন্সিলের পার্থক্য বোঝা যায় নি কোন মতে। বাকী অংশ খুবই সহজ—রুমাল টেনে নেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে তর্জনী গুটিয়ে নেওয়া। ভাল ভাবে অভ্যাস করে দেখাতে পারলে এ দিয়ে সহজেই দর্শকদের অবাক করতে পারবে। যারা যাদুবিদ্যায় উৎসাহী তারা আমার সঙ্গে A. C. SORCER, Magician, Post Box 16214, Calcutta—29 এই ঠিকানায় জবাবী পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখতে পার।

ছোট গিন্নী

বুদ্ধদেব বাগচী

ছোট্ট খুকি বেড়ায় দুলে বোঝে না কিছুই,
ছোট্ট একটা দিদির দেওয়া কাপড় প'রে।
মাথার উপর ঘোমটাটা তার দেয় তুলে দেয়,
মায়ের মতই আলতো করে চরণ ফেলে।
কোলের উপর ছোট্ট পুতুল মেয়ে নাকি ওর?
দুধ খাওয়াতে বারে বারেই হয় নাকো ভুল,
শান্ত ছেলে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে,
মায়ের মতই দুধের হিসাব দেয় বুঝিয়ে।
গোয়ালা তার পুঁটলি বাঁধা ছেঁড়া কাপড়,
বালতিটাই বড় হ'য়ে বাধায় ঝাঁপড়।
যা হোক ওসব মেয়ের বিয়ে আসছে মাসে,
টুকটুকে বর বেনারসী পাচ্ছে না যে।
দিদি বলেছে বিয়ের আগে দেবেই দেবে,
ওরও যে বিয়ে হয়েছে এই সেদিনই।
জামাই নাকি বিলেত ফেরৎ টাকা অনেক,
কলকাতাতে দু'খান বাড়ী ওর নিজেরই।
হঠাৎ গিন্নী পড়ে গেলেন কাপড় বেধে,
হাতের চুড়ি ভেঙে যাওয়ায় উঠল কেঁদে।
আওয়াজটি তার ছড়িয়ে পরে আশে-পাশে,
ভুলে গেল মেয়ের বিয়ে আসছে মাসে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রূপকথা

শ্রীসুলতা কর

[ভূমিকা—দেশ-বিদেশের কত সুন্দর রূপকথা আছে। এই সব দেশ-বিদেশের রূপকথার সঙ্গে পরিচয় হলে ছোটদের মন খুশীতে ভরে ওঠে, তাদের জ্ঞানের সীমা বেড়ে যায়। এখানে একটি চেকোশ্লোভাকিয়া দেশের রূপকথা লিখলাম।—লেখিকা]

মেঘে-ঢাকা সূর্য্য। বর্ষাকাল। আকাশ ঘোর কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে আর দিনরাত বৃষ্টি পড়ছে। তিন দিন ধরে পৃথিবীতে এক ঝলক্ রোদের দেখা পাওয়া যায় না, একটু কড়া আলো দেখা যায় না।

ছোট ছোট মুরগীছানারা গজ্‌গজ্ করে মাকে বলতে লাগল —হ্যাঁ মা, সূয্যিমামা আকাশ ছেড়ে কোথায় পালাল? তাকে টেনে আকাশে নিয়ে আসতে হবে। এক ফোঁটা রোদ নেই। শীতে আমরা কাঁপছি, এ কি অন্যায় বলত?

মোটাসোটা শরীরটা দোলাতে দোলাতে মুরগী-মা বলল—সে ত বুঝেছি বাছারা! কিন্তু সূয্যিমামার বাড়ীটা যে কোথায় তা ত জানি না, সেইখানেই হয়েছে মুস্কিল।

মুরগীর ছানারা বলল—ওসব তোমায় ভাবতে হবে না মা! সূয্যিমামার বাড়ীর ঠিকানা আমরা ঠিক খুঁজে বার করব। এত আমাদের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তারা কেউ না কেউ নিশ্চয় ঠিকানা জানে। চল্ রে ভাই-বোনেরা, সবাই মিলে একটু খুঁজে দেখি। এই বলে কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ, করে ডাকতে ডাকতে মুরগীছানারা মাকে ফেলে রেখে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

মুরগীছানারা একটু এগিয়ে একটা ছোট বাগানে ঢুকল। বাগানের সামনে একটা কপিক্ষেত। সেখানে মস্ত বড় একটা কপির তলায় এক শামুক বসে বসে হাই তুলছে। মুরগীছানারা শামুককে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল—শামুক দাদা, সূয্যি ঠাকুরের বাড়ীর ঠিকানাটা বলতে পার? বিষ্টিতে ভিজে মরে গেলাম। সূয্যি ঠাকুরকে ঘর থেকে টেনে বার করতে হবে। তাই আমরা তার বাড়ী যাচ্ছি।

শামুক হাই তুলতে তুলতে বলল—ঠিকানা ত আমি জানি না। তবে একটু দূরে গিয়েই ওই ঝোপের ভিতর মস্ত বড় এক পায়রা দেখবে। সে হয়ত ঠিকানা তোমাদের বলতে পারবে। এই কথা বলেই শামুক খোলের ভিতর ঢুকে ঘুমাতে আরম্ভ করল।

মুরগীছানারা ঝোপের দিকে এগোতে লাগল। দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে পায়রা তাড়াতাড়ি ঝোপ থেকে উড়ে বেরিয়ে এল। মনের আনন্দে ভাবতে লাগল—বাঁচলাম বাবা, মুরগীর ছানাদের সঙ্গে খানিকটা বক্ বক্ করতে পারব।

মুরগীছানারা কাছে এসে নমস্কার করল। পায়রা বলল—কি খবর? কি খবর ভাই? দু'চারটে খবর বল। প্রাণটা জুড়োক। বর্ষার দিনে কারো মুখ দেখবার উপায় নেই, দুটো কথা বলতে পাই না, হাঁপিয়ে উঠলাম।

মুরগীছানারা বলল—পায়রামাসী? সে জন্যই ত তোমার কাছে এসেছি। এমন বর্ষায় কি কারো প্রাণ বাঁচে? সূয্যিমামাকে ঘর থেকে টেনে বার করব বলে আমরা তার বাড়ী যাচ্ছি। এখন সূয্যিমামার বাড়ীর ঠিকানাটা তুমি আমাদের বলে দাও।

পায়রা বক্ বক্ করে অনেক কথা বলে গেল। তারপর বলল—আমি ত ভাই ঠিকানা জানি না? তবে আমার বন্ধু খরগোস নিশ্চয় জানে।

চল তবে খরগোসের কাছে যাই। বলে মুরগীছানারা চলতে আরম্ভ করল। পায়রাও তাদের সঙ্গে উড়ে চলল।

খরগোস দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি গায়ের লোম ঝেড়ে ফিটফাট হয়ে নিল। তারপর তার বাড়ীর দরজা খুলে বলতে লাগল—এস এস। আমার ঘরে এসে বস। এই বর্ষার দিনে একটু চা খাও।

কিন্তু মুরগীছানারা তার ঘরে ঢুকল না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—নমস্কার, খরগোস মামা! বড্ড ব্যস্ত আমরা, এখন বসতে পারব না। সূয্যিমামাকে ঘর থেকে টেনে বার করতে যাচ্ছি তুমি শুধু সূয্যিমামার বাড়ীর ঠিকানাটা বল।

খরগোস থতমত খেয়ে বলল—সূয্যিমামার ঠিকানা ত বলতে পারব না! তা আমি না পারলেও আমার বন্ধু পাতিহাঁস ঠিক জানে। চল তার কাছে তোমাদের নিয়ে যাই। ওই যে সামনে নদী রয়েছে, ওর পাড়ে যে নলখাগড়ার বন, সেইখানেই পাতিহাঁসের বাড়ী। নদীতে ওই যে একটা নৌকা রয়েছে, চল ওইতে চড়েই যাওয়া যাক।

খরগোসের কথামত সবাই সেই নৌকায় চেপে বসল। দুলে দুলে নৌকা চলতে লাগল। একটু পরেই নলখাগড়ার বনে এসে আটকাল। সবাই মিলে নেমে পাতিহাঁসের বাড়ীর দরজায় এল। খরগোস দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল—ও ভাই পাতিহাঁস, আমি তোমার বন্ধু খরগোস। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দরজাটা একটু খোল। আমার সঙ্গে অনেক সব অতিথিরাও এসেছেন।

ভিজে ডানা ঝটপট করে নাড়তে নাড়তে পাতিহাঁস দরজা খুলে বলল—ওঃ বিষ্টির জ্বালায় মরে গেলাম। তিন দিন ধরে ডানা শুকোতে পাইনি। কি কষ্টই না হচ্ছে!

পাতিহাঁসের কথা শুনে মুরগীছানারা বলল—ঠিক বলেছ হাঁসমাসী! দুষ্টু সূয্যিমামা, নিজের ঘরে শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশে ওঠবার নাম নেই, তাই আমাদের এত কষ্ট। এখন আমরা সবাই সূর্য্যের বাড়ী চলেছি। তাকে টেনে ঘর থেকে বের করে আকাশে নিয়ে আসব। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে সূর্য্যের বাড়ীর ঠিকানা আমরা কেউ জানি না। তুমি মাসী, ঠিকানাটা বলে দাও।

পাতিহাঁস বলল—আমি ত বাপু, সূর্য্যের বাড়ীর ঠিকানা জানি না। তবে আমার বন্ধু সজারু খুব পণ্ডিত লোক। সে জানে না এমন জিনিষই নেই। নদীর অন্য পাড়ে ওই যে প্রকাণ্ড গাছ দেখা যাচ্ছে ওরই একটা কোটরে সে থাকে। চল সবাই মিলে নৌকায় চেপে সজারু-বন্ধুর বাড়ী যাই।

তাই চল—বলে সেই প্রকাণ্ড দল নৌকায় চড়ে সজারুর বাড়ী গেল। গাছের কোটরের গরম বাতাসে শুয়ে বাদলার দিনে সজারু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। সবায়ের ডাকাডাকিতে সজারুর ঘুম ভাঙ্গল।

বাসা থেকে বেরিয়ে এসে অতিথিদের নমস্কার করে বলল—আসুন আসুন। আমার গরম ঘরে বসে বিশ্রাম করুন।

পাতিহাঁস বলল—না বন্ধু সজারু, আমরা আর বসব না। একটা শক্ত কাজ করতে হবে, সেজন্য এই ঝড়-বাদল মাথায় নিয়ে সবাই মিলে ছুটে চলেছি। তুমি হলে আমাদের সবায়ের চেয়ে পণ্ডিত। তুমি না সাহায্য করলে আমাদের কাজ সফল হবে না। কষ্ট করেও কোন ফল হবে না।

সজারু নিজের প্রশংসা শুনে খুশী হয়ে বলল—তা যা বলেছ ভাই পাতিহাঁস। সব জীব-জন্তুরাই বলে বটে আমি পণ্ডিত লোক। কোন কাজে তোমরা যাচ্ছ বল? নিশ্চয়ই যা পারি সাহায্য করব। তোমরা সবাই আমার বন্ধু।

সজারুর কথা শুনে মুরগীর ছানারা বলল—সজারু দাদা, তিন দিন ধরে সুয্যিমামা নিজের ঘরে শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশেও ওঠে না, রোদও ছড়ায় না। আমরা সবাই বিষ্টি-বাদলে ভিজে মরে গেলাম! সেজন্য আমরা সুয্যিমামার বাড়ী চলেছি। তাকে টেনে ঘর থেকে বার করে আকাশে বসিয়ে দেব। তবেই আমাদের প্রাণগুলো বাঁচবে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে। কেউ আমরা সুয্যিমামার বাড়ীর ঠিকানা জানি না। তুমি সজারু দাদা, ঠিকানা বলে দাও।

সজারু গম্ভীর ভাবে বলল—যে কথা কেউ জানে না সে কথা বলতে কেবল আমিই পারি। পণ্ডিত বলে একটা সুনাম আছে, সেটা ত আর মিথ্যে নয়। সূর্য্যের বাড়ীর ঠিকানা আমি জানি। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে সজারু বলতে লাগল—সূর্য্যের বাড়ী এমন কিছু দূর নয়। এই আমার বাড়ী থেকে কতটুকুই বা রাস্তা। ওই যে সামনে প্রকাণ্ড পাহাড় দেখছ, তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড কালো কুচকুচে মেঘ ঝুলছে। সেই কালো মেঘের চূড়ার ওপর রূপালী চাঁদ আটকান আছে। তোমাদের প্রথমে সেই চাঁদের দেশে যেতে হবে। তারপর চাঁদের দেশ পার হয়ে নেই এক পা এগোবে অমনি সুয্যিমামার বাড়ী পেয়ে যাবে। চল আমি সঙ্গে গিয়ে পথ দেখিয়ে দি। এই বলে মাথায় একটা নতুন টুপী পরে হাতে একটা লাঠি নিয়ে সজারু পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল। তার পিছনে পিছনে মুরগীর ছানারা, পায়রা, খরগোস, পাতিহাঁস চলল।

সজারু যেমন রাস্তা চলেছিল ঠিক তেমন রাস্তা ধরে চলে তারা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মাথায় উঠল, কুচকুচে কালো মেঘের ভিতর দিয়ে চলে গেল। তারপর চাঁদের দেশে পৌছল। তাদের দেখে চাঁদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খাতির করে সবাইকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সূর্য্যের বাড়ী পৌছে দিয়ে এল।

সূর্য্যের বাড়ীর ধারে এসে তারা সবাই দেখে চারদিকে কি ঘোর অন্ধকার, কিছুই চোখে দেখা যায় না। তবু তারা মনে সাহস এনে সুয্যিমামার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখে, ঘোর অন্ধকার ঘরে প্রকাণ্ড এক কালো মেঘের কম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে সুয্যিমামা নাক ডাকিয়ে অগাধে ঘুমাচ্ছেন।

তাদের পায়ের কত শব্দ হল কিন্তু সুয্যিমামার ঘুম ভাঙ্গল না। তখন সবাই মিলে সুয্যিমামার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে বিকট চীৎকার করতে আরম্ভ করল।

মুরগীছানারা কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ করে ডাকতে লাগল, পায়রা 'বক্ বকম্' 'বক্ বকম' করে ডাকতে লাগল, পাতিহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকতে লাগল, খরগোস ঝপ ঝপ করে কানঝাপ্টা দিতে লাগল, সজারু তার লাঠিটা নিয়ে দুম দুম করে ঠুকতে লাগল। একসঙ্গে সবাই চীৎকার করতে লাগল—সুয্যিমামা ঘুম ভেঙ্গে ওঠ, সুয্যিমামা ঘুম ভেঙ্গে ওঠ। আকাশে চল, রোদ্দুর দাও।

সবায়ের এত চীৎকারে সূর্য্যের ঘুম ভাঙ্গল। খুব রেগে উঠে মেঘের কম্বলটা একটুখানি মুখের কাছ থেকে সরিয়ে, বিছানায় শুয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কে রে, চেঁচামেচি করে অসময়ে আমার ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস?

সূর্য্যের রাগ দেখে তারা কেউ ভয় পেল না, উল্টে আরও চীৎকার করতে লাগল। বলতে লাগল—দেখ সুয্যিমামা, অনেক বেলা হয়েছে। ভাল চাও ত আকাশে উঠে পড়, আর নয়ত তোমাকে টেনে তুলব।

সূর্য্য দেখল, এদের হাত থেকে কিছুতেই ছাড়া পাবে না। তখন সে বলল—কেমন করে উঠি বল? তিন দিন ধরে ভারী ভারী কালো মেঘ আমার সারা শরীর আর মুখ চেপে ধরেছে, তাদের ঠেলে সরাতে পারছি না। দেখ না কালো মেঘেরা আমার মুখটা কি রকম কালো করে দিয়েছে। সূর্য্যের কথা শুনে খরগোস ছুটে বাইরে গিয়ে একটা বড় কলসী-ভরা ঠাণ্ডা জল টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এল। পাতিহাঁস সেই কলসীশুদ্ধ জল ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে সূর্য্যের মুখের উপর উপুড় করে ঢেলে দিল। পায়রা একখানা প্রকাণ্ড সাদা তোয়ালে নিয়ে সেই জল দিয়ে সূর্য্যের মুখ ঘসে দিতে আরম্ভ করল, আর সজারু কাঁটা দিয়ে খড় খড় করে টেনে সূর্য্যের মুখের ওপরের কালো মেঘগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে লাগল। মুরগীর ছানারা সেই সব মেঘের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে ফেলতে লাগল।

দেখতে দেখতে সূর্য্যের মুখের ওপর থেকে সব কালো মেঘ মোছা হয়ে গেল। সুয্যিমামা এদের হাতে পড়ে ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল। তখন আর কি করে, অগত্যা ঘর ছেড়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে আকাশে উঠল। তখন সূর্য্যের এমন তেজ হল, তা দেখে সবায়ের চোখ ঝলসে গেল।

সমস্ত পৃথিবী প্রচণ্ড রোদে ভরে গেল। ঝড়, বিষ্টি, মেঘ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোথায় যে ছুটে পালাল তার ঠিক নেই!

তখন মুরগীছানারা, পায়রা, পাতিহাঁস, খরগোস, সজারু মনের আনন্দে রোদ পোহাতে পোহাতে আর গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে চলল।

পশু ও পাখী

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

সবুজ পাখী টিয়ে, ডাকে না শিষ দিয়ে
সাদা পাখী বক, নয়কো জেনো ঠগ
কালো পাখী কাক, কর্কশ তার ডাক
এবং লাল পাখী কি, মুরগী ও মুরগী।

ডাকে ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, তারাই কোলাব্যাঙ
দেখতে নয় খারাপ, জিরাফ তারা জিরাফ
পথে যায় না ঝুট, মরুর রাজা উট
লম্বা ডোরা দাগ,—হিংস্র পশু বাঘ।

জলেতে যার বাস, সে হিপোপটেমাস
চামড়া মোটা যার, গণ্ডার নাম তার—
কেশর কার চিহ্ন, পশুরাজ সিংহ
সব দিকে কার হুঁশ,—মানুষ, সে মানুষ।

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ সালেই ভারতের নানা স্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষ নানা ভাবে প্রকাশ হচ্ছিল—সরকারী হিসাব অনুসারে '২১ সালে ৪০০ ধর্মঘট হয়েছিল, এবং ৫ লক্ষ শ্রমিক তাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। দেশের মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিকরা সামিল হতে চাচ্ছিল নিজেদের বিশিষ্ট সংগ্রাম পদ্ধতির মারফৎ—কিন্তু মহাত্মাজী সেটা পছন্দ করছিলেন না, এবং শ্রমিকনেতাদের তদনুসারে নিরুৎসাহিত করছিলেন। কৃষকরাও নানা স্থানে তাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্যে বিপুলভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল, এবং স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহের দিকে ঝুঁকছিল। এপ্রিল মাসে মুলসীতে কৃষকরা সত্যাগ্রহ সুরু করতে যাচ্ছিল,—জমির মালিক টাটাগোষ্ঠী—মহাত্মাজী তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন 'উপযুক্ত' ব্যবস্থা করতে। রায়বেরিলীতে বিরাট কৃষক বিক্ষোভের পর কৃষকনেতাদের গ্রেপ্তার করা হলে কৃষকরা বিদ্রোহমুখী হয়ে ওঠে এবং সরকার গুলী চালিয়ে ৭ জন কৃষককে হত্যা, এবং বহুসংখ্যককে আহত করে। ফলে সেখানকার ৭০ হাজার কৃষক কংগ্রেসে যোগ দেয়। শিখদের তীর্থস্থান ও মন্দিরাদিতে ছিল দুশ্চরিত্র মোহান্তদের রাজত্ব—সরকার ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক—তাদের হাত থেকে পাবলিক কমিটীর হাতে কর্তৃত্ব আনবার জন্যে শিখেরা চেষ্টা করছিল। এই অবস্থায় নানকানা-সাহেব-এর মোহান্ত ১০০ শিখ তীর্থযাত্রীকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করে, এবং পেট্রোল দিয়ে মৃতদেহগুলো জ্বালিয়ে দেয়। ফলে শিখকৃষকরাও দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দেয়। মহাত্মাজীর এক বছরে স্বরাজের ভরসায় নির্ভর করে এইভাবে কৃষকেরাও তাদের দুর্দশার অবসানের আশা নিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করছিল। মহাত্মাজীও প্রাণপণে তাদের অসন্তোষকে অহিংসার পথে টেনে রাখার চেষ্টা করছিলেন।

মালাবারের সমুদ্রোপকূলের চিরনির্য্যাতিত দরিদ্র মোপলা কৃষকরা কিন্তু এক রীতিমত সশস্ত্র বিদ্রোহ করে এক খিলাফৎরাজ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল।

এর আগে তারা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল, এবং সরকার রক্তের বন্যায় সে সব বিদ্রোহ ডুবিয়ে দিয়েছিল—একদল বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ এবং একদল সৈন্য সেখানে স্থায়িভাবে মোতায়েন করেছিল। '২১ সালের কংগ্রেস-খিলাফৎ আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে তারা এবার পুলিশ, সৈন্য, জমিদার, মহাজন, সবাইকে আক্রমণ করেছিল, এবং অবশ্য হিন্দুদেরও,—যাদের তারা বরাবরই শত্রুশিবিরের সামিলই দেখে এসেছে। তাছাড়া তারা ইউরোপীয়দের হত্যা করেছে সরকারী-ভবন লুঠ করেছে, রেল, টেলিগ্রাফ বিধ্বস্ত করেছে।

তাওয়া বুঝে মহাত্মাজী মোপলা বিদ্রোহকে ধিক্কার না দিয়ে বললেন, তারা সাহসী ও ঈশ্বরভক্ত,—এবং বললেন সরকার তাদের অসহ্য উৎপীড়ন করেছে, এবং তাদের অপকর্মের সরকারী ফিরিস্তি অতিরঞ্জিত। তিনি এবং মৌলানা মহম্মদ আলী মালাবারে যাওয়ার পথে ওয়ালটেয়ারে গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পরেই করাচীতে রাজদ্রোহকর বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ করে মৌলানা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের জেল হয়।

মোট কথা '২১ সালের শেষেই আইন অমান্য ও শেষ পর্যন্ত খাজনা বন্ধ আন্দোলনের কথায় লোকে সর্বত্র উৎসাহ-উত্তেজনায় সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অনেকে আশা করেছিল, আহমদাবাদ কংগ্রেসেই খাজনা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু তা হল না। জেল ভর্তি করার নির্দেশে বে-আইনী-ভলান্টিয়ার দলে নাম লিখিয়ে, বে-আইনী সভা করে দলে দলে লোক জেলে যেতে লাগলো। '২২ সালের গোড়াতেই জেলে ৩০,০০০ লোক জমে গেছে। মহাত্মাজী ছাড়া বড় বড় নেতারাও জেলে গেছেন।

দেশের লোক কিন্তু খাজনা বন্ধের জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। অনেক স্থান থেকে মহাত্মার কাছে আবেদন আসছে, খাজনাবন্ধ সুরু করার অনুমতির জন্যে—মহাত্মা অনুমতি দিচ্ছেন না। অন্ধের গুণ্টুর জেলা খাজনাবন্ধ সুরু করে দিয়েছিল,—১৫ লাখের মধ্যে মাত্র ৪ লাখ টাকার বেশী সরকার আদায় করতে পারেনি,—এই অবস্থায় মহাত্মাজী তাদের নিন্দা করে সব খাজনা চুকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। লোকে হতভম্ব হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বড়লাটকে নোটিশ দিলেন, সরকার যদি নির্য্যাতন বন্ধ করে বন্দীদের মুক্তি না দেয়, তিনি খাজনা বন্ধ আন্দোলন সুরু করবেন। তিনি সকলকে বলে দিয়েছিলেন, সরকারী নির্য্যাতন ও প্ররোচনার মুখে কেমনভাবে সম্পূর্ণ অহিংস থাকতে হয়, তা তিনি নিজে আগে দেখিয়ে দেবেন, তার পরে অন্যত্র খাজনা বন্ধ সুরু করা যাবে। তিনি এজন্যে বারদোলী তালুকে খাজনা বন্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন! ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে নতুন শাসন সংস্কার অনুযায়ী ইউনিয়নবোর্ড সংগঠনে বাধা দিয়ে একটা নতুন
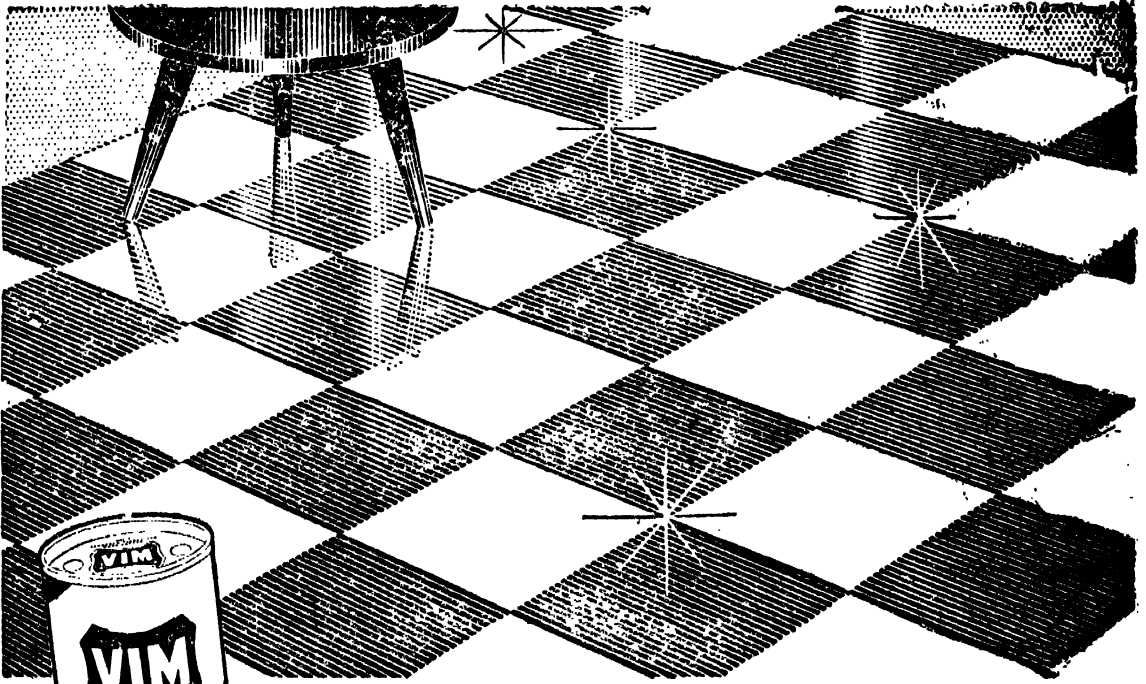
রকমের আইন অমান্য সুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিল, সরকার ইউনিয়ন বোর্ড সংগঠন করতে পারেনি।

যাই হোক, বারদোলীতে খাজনা বন্ধ সুরু হওয়ার আগেই চৌরীচৌরার বিখ্যাত ঘটনা ঘটে গেল। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের ওপর পুলিশ গুলী চালিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা থানা আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং ২২ জন পুলিশকে হত্যা করেছিল। ঘটনা শ্রবণমাত্র মহাত্মা গান্ধী তীব্র অপমান বোধে জর্জরিত হয়ে আন্দোলন বাতিল করে দিলেন এবং বললেন, তিনি তাঁর হিমালয় প্রমাণ ভ্রান্ত বিচারের জন্যে ঈশ্বর ও মানুষের চোখে বেইজ্জৎ হয়েছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী সভা করে নির্দেশ দিলে, অতঃপর আইন অমান্য স্থগিত থাকবে, এবং কংগ্রেসকর্মীদের সর্বত্র চরকা অস্পৃশ্যতা নিবারণ, মাদকবর্জন ও শিক্ষাকার্য নিয়ে থাকতে হবে।

সংগ্রামী উৎসাহ-উত্তেজনার উত্তুঙ্গ তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেল,—কর্মীরা ক্ষুণ্ণ হয়েও নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে তথাকথিত গঠনমূলক কাজেই মনঃসংযোগ করলে। আমরা চরকা-খদ্দর এবং ন্যাশান্যাল স্কুল নিয়েই খাটতুম—সবটুকু সময় ও শক্তি তাতেই নিয়োজিত ছিল—আমরা তাই নিয়েই থাকলুম। কংগ্রেসের স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, এবং তাও এখন গিয়ে পড়লো "বিশ বাঁও জলে"—সুতরাং আমাদের নিজেদের আদর্শ কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই এখন আমাদের করতে হবে,—এটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এদিকে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক কনফারেন্স এসে পড়লো—গেলুম সেখানে। সভানেত্রী বাসন্তী দেবীর বক্তৃতায় আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র কাউন্সিলের ভিতর পর্যন্ত প্রসারিত করার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আমরা উৎসাহিত হলুম, কিন্তু গোঁড়া গান্ধীবাদীরা তার মধ্যে সি আর দাশের ব্যারিষ্টোক্রেসীর দুর্নীতির গন্ধ পেলো।

মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশন, এবং ঢাকা সহরের অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানা নিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুর (সাবডিভিশন্যাল) কংগ্রেস কমিটি ৬টা থানা—তার মধ্যে দোহার এবং নবাবগঞ্জ ছিল প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ গোঁড়া গান্ধীবাদীদের আড্ডা—বাকি ৪টে থানা—মুন্সীগঞ্জ, রাজাবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী এবং শ্রীনগর আমাদের আড্ডা। এর মধ্যে বানরী বিদ্যাশ্রমের ধীরেন দাশগুপ্ত এবং পূর্ণানন্দ সেন, এবং লৌহজঙ্গে জিতেন কুশারী গোঁড়া গান্ধীবাদী। খদ্দরই ছিল এদের প্রধান অবলম্বন,—কিন্তু আমরাও তাতে নেহাৎ পিছিয়ে ছিলুম না—'২২সালে শুধু পঞ্চসার কেন্দ্রেই পৌণে দুশো চরকা চলেছিল। সকল বাড়ীতে তুলোর বীজ বিতরণ করে আমরা তুলোর গাছও করেছিলুম অনেক। ন্যাশান্যাল স্কুলের তাঁতে ভাল খদ্দরের ধুতিশাড়ীও তৈরী হচ্ছিল। আমার প্ল্যান অনুসারে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কিছু কাঠ সংগ্রহ করা হত, এবং কারো বা একটা বড় আমগাছের মোটা সোজা একটা ডাল চাঁদা আদায় করা হত। ডালের টুকরো দিয়ে চরকার কুঁদো বা "ডিম" তৈরী হত, এবং অন্যান্য কাঠ দিয়ে অন্যান্য অংশ তৈরী হত। যাদের বাড়ী থেকে কাঠ আনা হত,—তাদের একটা চরকা বিনামূল্যে দেওয়া হত,—বাড়তি চরকা অন্যান্যকেন্দ্রে দু টাকা দামে বিক্রী করা হত, তাতে টাকু ও ছুতারের মজুরীর খরচ চলতো।

দাশ মহাশয় জেল থেকে বেরিয়ে স্বরাজপার্টি গঠনের পরিকল্পনা প্রচার করলেন। সার্ভেন্ট ও আনন্দবাজার গোঁড়া গান্ধীবাদীদের কাগজ দাশ মহাশয়কে প্রত্যহ গালি দিয়ে ভূত ভাগাতে লাগলো। দাদাদের সঙ্গে দাশ মহাশয়ের বন্দোবস্ত হল, যুগান্তরপার্টি স্বরাজপার্টিকে সমর্থন করবে, এবং কাজ করবে। স্বভাবতই কংগ্রেসের কেন্দ্রগুলো দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল Nochanger গান্ধীবাদীদের কেন্দ্র, এবং Prochanger স্বরাজপার্টির সমর্থকদের কেন্দ্র। বিক্রমপুরে প্রফুল্ল ঘোষেদের সঙ্গে লাগলো আমাদের ঠোকাঠুকি।

কলকাতায় দাদারাই প্রথমে আত্মশক্তি কাগজখানা বার করেছিলেন এবং উপেনদা'কে সম্পাদক করেছিলেন। বৌবাজারের চেরী প্রেস এসেছিল অমরদা'র হাতে। শেষ পর্যন্ত চেরী প্রেসে আত্মশক্তি উঠে গেল,—কাগজটা চালাতে লাগলেন উপেনদা' এবং অমরদা'ই, এবং এই একখানি ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকাই হল দাশ মহাশয়ের সমর্থক, স্বরাজপার্টির কর্মপন্থার প্রচারক। সুতরাং সেখানে এসে জমলেন ভূপতি মজুমদার, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি স্বরাজপার্টির প্রাথমিক সর্বক্ষণের কর্মীরা। চেরীপ্রেস হল স্বরাজপার্টির প্রধান কর্মকেন্দ্র।

মুন্সীগঞ্জ ন্যাশানাল স্কুল থেকে আমরাও একটা হাতে লেখা মাসিক পত্র বার করেছিলুম,—প্রথমে জীবনের নাম ছিল সম্পাদক—কিন্তু জীবন কলকাতায় পার্টির কাজ এবং স্বরাজ পার্টির কাজেও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং পরে সম্পাদক হলুম আমি। সেই কাগজেই আমি আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের মুখবন্ধরূপে "নন-কোঅপারেশন ও স্বরাজ" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলুম, যার মধ্যে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো—গান্ধী, হজরৎ মোহানী প্রভৃতির কথাগুলো লিখেছিলুম। কাগজটার প্রকৃতি বোঝা যাবে একটা সংবাদ উদ্ধৃত করলে—"আনন্দ রাজারের দেশসেবা—(এটা গয়া কংগ্রেসের পরের কথা)—"গত ২২শে বৈশাখ আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে :

যখন দেশের সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের একযোগে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া কার্য করিবার প্রয়োজন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে,—সেই মুহূর্তে বৃহৎ নেতৃত্ব পরিচালিত স্বরাজ্য দল প্রতিকূল সমালোচনায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লাঘব এবং কাউন্সিলের মহিমা কীর্তন করিবার জন্য দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ঐ কাগজেই দেশবন্ধুর মির্জাপুর পার্কের বক্তৃতা বেরিয়েছে—তাতে কাউন্সিল সম্বন্ধে দেশবন্ধু বলেছেন :

"কাউন্সিল যে অসার তা তিনি বিশ্বাস করেন এবং অসহযোগ নীতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে তিনি অমৃতসর কংগ্রেসেও একথা বলিয়াছিলেন। কাউন্সিল দ্বারা আমাদের কোন উপকার হইবে না সত্য, কিন্তু দেশদ্রোহীদিগের সাহায্যে কাউন্সিল দেশের অনেক ক্ষতি করিতে পারে।"

আমাদের কাগজে আমরা এইরকম ভাবে প্রচার করতুম। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু বললেন,—কাউন্সিল বয়কট করার ফলে আমরা গভর্ণমেণ্টের একটা মস্ত সুবিধে করে দিয়েছি,—কতকগুলো যো-হুকুমের দল দেশের লোকের প্রতিনিধি সেজে সেখানে বসে গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করছে—আইনতঃ গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর সমর্থনেই নির্যাতন চালাচ্ছে। আমরা কাউন্সিলের ঐ আসনগুলো দখল করে সরকারের দুষ্টনীতিকে পদে পদে বাধা দোব, যাতে তারা

দেশবাসীর নামেই দেশের সর্বনাশ না করতে পারে। কংগ্রেসের তাতে জোরই বাড়বে,—বাইরের আন্দোলন কাউন্সিলের জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত হবে, জোরদার হবে।

গয়া কংগ্রেসের পর এই কাউন্সিল-প্রবেশের প্রচার নিয়ে নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ দুই দলের গুঁতোগুঁতি বেড়ে চললো। ইতিমধ্যে অ্যাডভোকেট-জেনারেল এস, আর, দাশ এক দিন কাউন্সিলে বক্তৃতার মধ্যে একটি কথা বলে সকলের তাক্ লাগিয়ে দিলেন—"বিপ্লবীরা কংগ্রেসে ঢুকে সারা দেশে কংগ্রেসের আড়ালে নিজেদের দল গড়ছে, এবং তাদের নামের লিষ্ট আমার পকেটেই আছে!"

জীবন ও আমি গয়া কংগ্রেসে গিয়েছিলুম। এম, এন, রায়ের একখানা ম্যানিফেষ্টো সেখানে বিলি হয়েছিল,—যাতে বলা হয়েছিল চাষী-মজুরদের ব্যক্তিগত ভাবে কংগ্রেস-সদস্য না ক'রে, তাদের সংগঠনগুলোকে কংগ্রেসের affiliation দেওয়া হোক। সেটা অবশ্য গ্রাহ্য হয়নি। এম, এন, রায় তখন কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশান্যালে ভারতের প্রতিনিধি এবং রুশিয়া থেকে কমিউনিষ্ট সাহিত্য এবং প্রচারপত্র ভ্যানগার্ড পাঠাতেন, জীবন কলকাতায় সেগুলো পেতো এবং মাঝে মাঝে মুন্সীগঞ্জেও পাঠাতো। ড্যাঙ্গে তখন তরুণ এবং প্রথম বই লিখেছেন "Gandhi Vs Lenin"—জীবন তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলো, আমিও সঙ্গে ছিলুম।

এই গয়া কংগ্রেসে অনুশীলনের চারজন নেতার নামে এক ম্যানিফেষ্টো বিলি হয়—

ভারত-সেবক-সংঘ

সাধারণের অবগতির জন্য আমরা জানাইতেছি যে, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের বর্তমান কার্যকলাপের সহিত আমাদের কোন প্রকার সংশ্রব নাই এবং ভারত-সেবক-সংঘ নামক যে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন সেন
" প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
" রমেশচন্দ্র আচার্য্য
" রমেশচন্দ্র চৌধুরী

এই ম্যানিফেষ্টোটা কলিকাতার আত্মশক্তি কাগজেও ছাপা হয়েছিল, এবং আমরা আমাদের কাগজে (উন্মত্ত) তা থেকে উদ্ধৃত করেছিলুম।

রহস্যটা পরে শুনলুম। এস আর দাশের পকেটে বিপ্লবীদের নামের তালিকা গেল কেমন করে? অনুশীলনপার্টির কর্মীরা বিভিন্ন কংগ্রেস কেন্দ্রে ভারত-সেবক-সংঘের নামে "হক কথা" প্রচার করতো, কিন্তু যুগান্তর পার্টির কর্ম্মীদের দ্বারা তাদের প্রচার বানচাল হত। তাদের ব্যর্থতার কৈফিয়তে তারা এস, আর, দাশের কাছে (পুলিন দাসের মারফৎ) লিখতো, যুগান্তর দলের অমুক কর্ম্মীর জন্যে আমাদের প্রচার ব্যাহত হচ্ছে, সে এখানে কংগ্রেস কমিটি দখল করে বসে ছেলেদের বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে দল গড়ছে। এমনি করে নানা জায়গা থেকে যুগান্তর দলের দাদাদের নাম এস, আর, দাশের

পকেটে জমা হয়েছে। তিনি নির্বোধের মতন সেটা নিয়ে বড়াই করার যুগান্তরের দাদাদের আর বুঝতে কিছু বাকি নেই। তাই এই কেলেঙ্কারী থেকে অনুশীলন পার্টিকে বার করে আনার জন্যে ঐ ম্যানিফেষ্টো প্রচার করা হয়েছে। দোষটা সবই পুলিন দাসের ঘাড়ে চাপিয়ে অনুশীলনের নেতারা সরে এসেছেন। পরবর্তীকালে পুলিন দাস ব্যাপারটার উল্লেখ করে বলতেন,—"বেইমানের দল, আরে অরাই তো সব খাইচস—আমি একটা পয়সা খাইচি?"

এর পরই অনুশীলন দল যুগান্তরের সঙ্গে মিতালী করে কংগ্রেসে যোগ দেয়। এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বই (বিপ্লবের পদচিহ্ন) থেকে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন:

ধরা পড়ার কিছুদিন আগে থেকে ('২৩ সাল) প্রতুল বাবু ও রমেশ বাবু আমার কাছে যাওয়া-আসা করছিলেন। তখন এঁরা ভারত-সেবক-সংঘ করার দরুণ বাংলা রাজনীতিক্ষেত্রে অপাংক্তেয়। প্রতুল বাবু একদিন আমায় বলেন, "ও যা করতে গিয়েছিলাম, দেশের ভাল হবে বলেই তো করতে গিয়েছিলাম।"

কিন্তু দেশের ভাল হবে বলে ওঁরা এই সময়ে মিলতে এসেছিলেন, এ কথাটা যে কত অসার, সেটা বুঝি ১৯২৮ সালে খালাসের পর। এসেছিলেন তখন স্বরাজপার্টি গঠিত হচ্ছে বলে।...(১২৪ পৃষ্ঠা)

"...যাই হোক, স্বরাজ্যদল গঠনের ভার কিন্তু প্রায় সবটাই পড়লো আমাদেরই উপর। এবং তাই স্বাভাবিক। প্রতুল বাবুদের এই সময় আমাদের সঙ্গে মিলন কামনাও তেমনি স্বাভাবিক।"

—(২০৭ পৃষ্ঠা)

ফলত, এস, আর, দাশের পকেটের তালিকায় স্বভাবতই অনুশীলনের নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীদের নামও উঠলো। কিন্তু I B তো সেই তালিকার উপরই নির্ভর করে না—তাদের খাতায় আরো বড় তালিকা গড়ে তোলার ব্যবস্থা তারা আগে থেকেই করেছিল। দাদারা এক বছরের জন্যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে একনিষ্ঠ ভাবে চান্স দিয়ে, তারপর নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ঐ কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনার দুশ্চেষ্টা মাত্র, এবং তার জন্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিয়ে চলার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন, যাতে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে তাঁদের দল গড়ার কাজ I B বানচাল করে দিতে না পারে, ঝাঁকশুদ্ধ গ্রেপ্তার করার কোন সুযোগ না পায়।

তার পর যখন কাউন্সিল-প্রবেশের প্রশ্নে নো-চেঞ্জ প্রোচেঞ্জ দু'দল ভাগ হয়ে গেল, তখন প্রকৃত পক্ষে গান্ধীবাদী, বিপ্লব-বিরোধী, অহিংসাপন্থীরাই হল নো-চেঞ্জার, আর বিপ্লবীরাই হল প্রো-চেঞ্জার I Bর টার্গেট আরো পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দেশে চালু করার ব্যবস্থা তারা আগে থেকেই সুরু করেছিল এজেন্ট প্রোভোকেটর লাগিয়ে ছুটকো-ছাটকা বিপ্লবী রোমাঞ্চ প্রবণ তরুণদের দিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই রকম একজন এজেন্ট ছিল শিশির ঘোষ। সে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে এক খদ্দরের দোকান করে বসে কাজ চালাতো। আর একজন ছিল, ভুপেন বাবু। তাঁর বইয়ে তার ছদ্মনাম দিয়েছেন ছিল হাওড়ার ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেঁকির পিছনে। শিশির এবং টুনুর মধ্যে আবার পাল্লা এবং রেষারেষিও চলতো।

বিপিনদা'র চেলা হিসাবে সন্তোষ মিত্র তাঁর কাছ থেকে (বা শিশিরের কাছ থেকে?) রিভলভার যোগাড় করে ভাই দেখিয়ে ছেলে রিক্রুট করতো, এবং নেতা বলে বিপিনদা'রই নাম করতো। বিপিনদা' কংগ্রেসে দাদাদের সঙ্গে যোগ দিয়েও এ ব্যাপার বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। শিশিরের বন্দোবস্তেই সন্তোষ মিত্রের দল শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে ডাকাতি করতে গিয়ে পোষ্ট মাষ্টারকে হত্যা করে। বরেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে এবং পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে। মামলায় তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় যারা, তার মধ্যেও শিশিরের লোক ছিল। বরেনের প্রথমে প্রাণদণ্ড, ও পরে Mercy petition করায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারপর সন্তোষ মিত্রের দল কোণা (হাওড়া) ডাকাতি করে, ডাকাতি ব্যর্থ হয়। তারপর সন্তোষ মিত্র, ধীরেন বাগচি এবং সুবোধ লাহিড়ীকে রেগুলেশন থ্রিতে রাজবন্দী করা হয়, এবং দেবেন দে (খোকা) গা ঢাকা দেয়।

পরে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে শিশির ঘোষের খদ্দরের দোকানে বোমা পড়ে, শিশির পালিয়ে বেঁচে যায় এবং তার কর্মচারী প্রকাশ বণিক্য বোমার আঘাতে মারা পড়ে। এই সম্পর্কে ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেঁকি পরে ধরা পড়ে, এবং মামলায় তার ফাঁসি হয়। শিশিরের দোকানে বোমা মারা কাজটা নাকি টুনু সেনের আকচা-আকচির ফল। শিশির তার পর I Bর চাকরী নিয়ে ইউ পিতে চলে যায়। পরবর্তী কালে গোপী শার পিছনে থেকে টুনু সেনই নাকি তাকে দিয়ে ডে সাহেবকে খুন করিয়ে টেগার্টকে বাঁচিয়েছিল। গোপী টেগার্টকে মারার জন্যে ঘুরছিল।

এই সব সন্ত্রাসবাদী কাণ্ড সুরু হওয়ার সময় থেকেই দাদারা মনে মনে বিপদ গণছিলেন, দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। ওদিকে আর এক রকমের কাণ্ডও চলছিল। দাদারা মোজাফফর আহমদের মারফৎ এম এন রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতীয় বিপ্লবে রুশ সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা সুরু করেছিলেন, কিন্তু এম এন রায়ের চাষা-মজুরের বিপ্লবের প্ল্যান গ্রহণ করতে সম্মত হননি। ২১ জন দাদা, যেমন ভূপতি মজুমদার, কিন্তু প্রায় কট্টর কমিউনিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ২১ সাল থেকেই কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে মেতেছিলেন এবং মোজাফফরের আড্ডায় (ধূমকেতু অফিস) আস্তানা গেড়েছিলেন। উপেনদা'ও আত্মশক্তি কাগজে এম এন রায়ের ভ্যানগার্ড প্রভৃতি থেকে চাষা-মজুরের বিপ্লবের আদর্শ সন্তর্পণে প্রচার করতেন। দাদাদের মধ্যে মনোরঞ্জনদা' ছিলেন এসব কাণ্ডের সব চেয়ে উগ্র বিরোধী।

বস্তুতঃ একদিকে গান্ধী, আর এক দিকে বলশেভিজম দাদাদের মধ্যে রীতিমত ভাব-বিরোধের সৃষ্টি করছিল। বিপ্লবী দলের জিতেন কুশারী হ'য়েছিলেন পরিপূর্ণ গান্ধীবাদী এবং নো-চেঞ্জার দলভুক্ত—তিনি দাদাদের কাছে গোপন রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, জীবন ছেলেদের ভ্যানগার্ড পড়তে দিচ্ছে। মনোরঞ্জনদা' হয়েছিলেন বারো আনা গান্ধীবাদী এবং নো-চেঞ্জার—তিনি জীবন এবং ভূপতিদা'কে ভাল চোখে দেখতেন না—কারণ এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রো-চেঞ্জার দাদাদের সামিল,

খেয়াল বর্জন করেছিলেন এবং '২৩ সালে তাঁকে বি-পি-সি-সির সেক্রেটারী করে দিয়ে দাদারা তাঁর কমিউনিজমপ্রেম সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিলেন। জীবন কিন্তু দাদাদের সঙ্গে স্বরাজ্যপার্টিও করে এবং ভ্যানগার্ডও প্রচার করে। দাদাদের সঙ্গে মোজাফ্ফর আহমদের যোগাযোগ রক্ষার জন্যে দাদারা জীবনকেই নিযুক্ত করেছিলেন।

অতুলদা' পলাতক জীবন শেষ করে বেরিয়ে আসার পর ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন,—দাদাদের সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেননি—বলেছিলেন অহিংসাপন্থা আমার হজম হবে না। অনেকে তখন তাঁর ওপর চটেছিলেন, কিন্তু তাঁরাই বছরের পর বছর তাঁর কাছ থেকে নানা প্রকারে সবচেয়ে বেশী অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতেন।

সতীশদা' বেরিয়েছিলেন সকলে বেরোবার প্রায় এক বছর পরে। তিনি ও পাঁচুদা' সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে পৃথক হয়ে পড়েছিলেন,—জানতেই পারেন নি যে সরকারের সঙ্গে আপোষ হয়েছে,—সকলেই ফিরে এসেছেন। তাই তাঁর নামে বিজলীতে দাদাদের বিজ্ঞাপন অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। তার ফলে তাঁরা চন্দননগরে মতিলাল রায়ের কাছে এসে ওঠেন, এবং সতীশদা' তাঁর নামে মোটা টাকার সরকারী ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাতিল হওয়ার পর আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২১ সালের শেষে। তিনি তার পরেও গাঢাকা দিয়ে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন, ভবিষ্যতের কাজের সুবিধার জন্যে,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদাদের সঙ্গে কংগ্রেসে ভিড়ে গিয়ে খুলনায় গিয়ে বসেন, যেমন প্রায় সব দাদাই নিজ নিজ জেলায় বসে'ছিলেন।

যাই হোক, গয়া কংগ্রেসের পর আমি ও জীবন কয়েক দিন একটু মধুপুর, দেওঘর, জামসেদপুর ঘুরে গেলুম লক্ষ্মীসরাইয়ে। সেখানে জীবনের একটু ছোট্ট জমিদারী ছিল। বৎসরান্তে কিছু খাজনা আদায় হত—জীবন সেটুকু বিক্রী করার বন্দোবস্ত করে এল। এদিকে মুন্সীগঞ্জে রটে গেল জীবনবাবু মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে চলে গেছেন, এবং তার ফল হল, ন্যাশান্যাল স্কুল প্রায় উঠে যাওয়ার যোগাড়—ছেলেরা স্কুলে আসা বন্ধ করতে সুরু করলো। ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে জীবনের প্রভাব, তার প্রতি বিশ্বাস কতখানি, তা দেখা গেল। আমরা মুন্সীগঞ্জে এসে যখন এই অবস্থা দেখলুম,—তখন জীবন উন্মাদের মতন বাড়ী বাড়ী ছুটোছুটি করতে লাগলো। তখন চৌরীচৌরার মামলায় ১৭২ জনের ফাঁসীর হুকুম হয়েছে—মহাত্মা গান্ধীকেও সরকার গ্রেপ্তার করেছে এবং ৬ বছর জেল দিয়েছে—আন্দোলনের ভাঁটার মুখে সরকার নির্ভয়ে তাঁর উপর চরম আঘাত হানার বন্দোবস্ত করেছিল।

জীবন চৌরীচৌরার আসামী ১৭২ জন কৃষকের ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করলে। প্রকাণ্ড সভা হল, আমি উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলুম "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী—আসিল যত বীরবৃন্দ" ইত্যাদি। সভাপতি বোধ হয় শৈলেশ মিত্রের বাবা সিনিয়র উকীল জ্ঞান মিত্র। জীবনের বক্তৃতায় এমন এক নতুন উৎসাহ উত্তেজনা সৃষ্টি হল যে আবার ন্যাশান্যাল স্কুল জমজমাট হয়ে উঠলো।

খরচ সঙ্কুলানের অসুবিধা বরাবরই ছিল। যতীন দত্ত, পরেশ সেন প্রভৃতি মাষ্টার মশায়রা জেলে গিয়ে জাঁতায় গম পেষা শিখে এসেছিলেন—২খানা জাঁতা কেনা হল, এবং টিচারদের ডিউটি হল এক ঘণ্টা করে গম পেষা। অনেকের বাড়ী থেকেই গম আসতো, এবং আমরা চার পয়সা সের হারে গম পিষে দিতুম।

প্রাইজ দেওয়ার সময় আসছে টাকার দরকার—জগদ্ধাত্রী খোলায় মেবারপতন অভিনয় হল, কিছু টাকা উঠলো। আমি গানের সুর গঠিয়ে দিলুম। আমাদের পাড়ায়, টালায়, একবার মেবারপতন প্লে করেছিল পাড়ার দল। বিখ্যাত নাট্যশিল্পী ও সুরশিল্পী রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য—করালীর পিসতুতো ভাই, টালার লোক! তিনি নৃত্যশিল্প এবং সর্বপ্রকারের যন্ত্রসঙ্গীতেও ছিলেন ওস্তাদ। তিনি গানের সুর রপ্ত করে দিয়েছিলেন,—এবং আমি শুনে শুনে মেরে দিয়েছিলুম। জগদ্ধাত্রী নাট্য সমাজের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সাবডিভিসন্যাল অফিসার পূর্বোল্লিখিত ফণী মুখার্জি। ঢাকায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কেউ আবেদন করেছিল প্লে বন্ধ করার জন্যে—সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনার অজুহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধ করার আদেশও জারি করেছিলেন,—কিন্তু ফণী বাবু নিজে লিখে সে আদেশ বাতিল করিয়ে নিজে সারাক্ষণ বসে থেকে প্লে করিয়েছিলেন।

এইখানে একটা মনোবিজ্ঞানের প্যাঁচের কথা বলে নিই। যারা কোন আদর্শ নিয়ে খাটে, কর্মপন্থা সঠিক হোক বা না হোক, তারা নিজেরা কষে খাটে বলেই মনে করে, কাজের কাজ অবশ্যই কিছু হচ্ছে। আমাদের অবস্থাও ছিল কতকটা ঐ রকমের। সারাদিন ভূতের মতন খেটে বার লাইব্রেরীর গরাদেবিহীন জানালা টপকে ঢুকে লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেওয়া, এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। পঞ্চসারের এক কায়স্থ
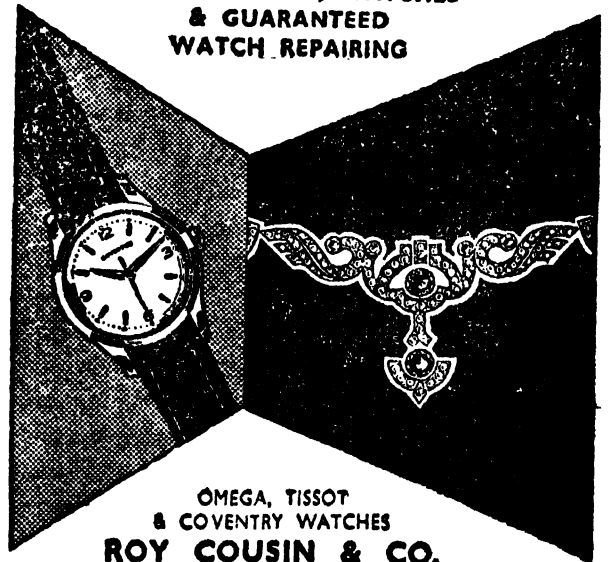
ব্যস্ত থাকতেন বার লাইব্রেরীর রাত্রের পাহারা, তাতেই আমাদের এই সুযোগ হয়েছিল।

থিয়েটার শেষ করে বেরোতে রাত তিনটে বাজলো—পরদিন পাইকপাড়া (আবদুল্লাপুর) যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে, মিটিং করতে হবে—শেষ রাতটুকু না ঘুমিয়ে কয়েকজনে হাঁটা দিলুম—মাইল পাঁচেক হেঁটে সকালেই সেখানে পৌঁছে গেলুম। '২২ সালেও কংগ্রেসের মেম্বার করা কঠিন হয়নি, কিন্তু '২৩ সালে সেটা কঠিনই হয়ে উঠেছিল, বিশেষত ঐ কেন্দ্রে প্রধানত চাষীদের বাস, তারা স্রেফ কংগ্রেসে আসতে চায় না। স্থানীয় কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

বিকালে আবদুল্লাপুরের মাঠে সভা হল, আমি প্রধান বক্তা—"কলকাতার বক্তা"! এক মৌলবী সাহেবকে করা হল সভাপতি আর পাইকপাড়ার (পার্শ্ববর্তী গ্রাম) ন্যাশন্যাল স্কুলের কর্মীরা কংগ্রেসের রসিদ বই নিয়ে সভার মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেন। আমি বক্তৃতা দিলুম, প্রায় কমিউনিজম—"কংগ্রেসে শুধু বাবুদের ভিড়, তারাই কর্তা, সুতরাং কংগ্রেস শুধু তাদের স্বার্থ সাধনের কল হয়ে উঠছে, আর যদি স্বরাজ হয়ই, তাহলে সেটা হবে বাবুদের স্বরাজ—তাতে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হবে না, কারণ কৃষকদের স্বার্থ আর বাবুদের স্বার্থ এক নয়। সুতরাং কৃষকদের দলে দলে কংগ্রেসে প্রবেশ করা দরকার,—তারাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী, তারা যদি কংগ্রেসের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়, তাহলে তাদের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না।"

মৌলবী সাহেব যখন আমাকে সাধুবাদ দিয়ে বক্তৃতা করছেন, তখন ওদিকে ১০ জায়গায় কংগ্রেসের সদস্য করে রসিদ কাটা চলছে। সভাতেই বেশ কিছু সদস্য সংগৃহীত হল, এবং তার পর সেখানে কংগ্রেস কমিটীও হয়ে গেল।

এ দিকে কংগ্রেসের এডুকেশন বোর্ডের যে রকম ভগ্নদশা,—তাতে ন্যাশানাল স্কুলে ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তিত হলুম।

Education may wait, but Swaraj cannot—এ স্লোগান স্বরাজের সম্ভাবনা দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা মনস্থির করে লেখালেখি করে স্বদেশী যুগের National Council of Education-এর অন্তর্ভুক্ত হলুম, যাতে আগু পরীক্ষার পর ছেলেরা Bengal Technical Institute-এ সহজে ভর্তি হতে পারে। সেটা হয়েছিলও—আমাদের কয়েকজন ছাত্র বেঙ্গল টেকনিক্যালে ভর্তি হয়ে পাশ করে চাকরী বাকরী পেয়েছিল।

ঢাকায় সরস্বতী লাইব্রেরীর এক ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছিল, আমাদের দলের লোক তরুণ ব্রহ্মচারী কালা মহারাজ বোধ হয় চার্জে ছিলেন। একজন ভাল কর্মীর প্রয়োজন হল গ্রামে গ্রামে ঘুরে সরস্বতী লাইব্রেরীর প্রকাশিত জাতীয় সাহিত্য প্রচারের জন্যে—আমি কলকাতা থেকে সারদা ব্যানার্জিকে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিলুম। প্রভাস মল্লিককেও মুন্সীগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিলুম, সে ছিল সকল কাজেই General assistant—এবং সর্বজনপ্রিয় করিতকর্মা ছেলে। সেই সময়ে সরস্বতী লাইব্রেরী নরেশদা'র (চৌধুরী) একখানা ছোট বই প্রকাশ করেছিল—কোরিয়ার বিপ্লব আন্দোলন ও জাপানী বর্বরতার বিবরণ—কোরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা সীংম্যান রী চীন থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন। নরেশ চৌধুরী যুগান্তর দলের লোক, আর তাঁর দাদা রমেশ চৌধুরী ছিলেন অনুশীলন দলের। '১৭।'১৮ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে ৪৪ ডিগ্রীতে বহুকাল নির্জন কারাবাসে থেকে জোয়ান বয়সেই নরেশদা'র চেহারা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা হয়েছিল বৃদ্ধদের মতন। '২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে তাঁর সঙ্গে ছিলুম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। '২৮ সালে জেল থেকে বেরোবার পর কিছুদিন রোগভোগ করে তিনি মারা গেছেন।

যাই হোক,—২৩ সালের মাঝামাঝি স্বরাজ্যদলের ঘাঁটি চেরী প্রেসে যখন সুভাস বাবু আড্ডা গাড়েন, তখন উপেনদা' তাঁর ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেন, এবং দাদাদের গতিগতি দেখে সুভাষবাবুকে করায়ত্ত করে গোপনে অনুশীলন পার্টিকে নিয়ে কাজ করার প্ল্যান করেন। অনুশীলন পার্টি চাইছিলো জনপ্রিয় সুভাষচন্দ্রকে যুগান্তর দলের প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নিতে এবং তার জন্যে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্ব মেনে নিতে,—যাতে কংগ্রেস এবং পাবলিক ফিল্ডে তাদের কাজের সুবিধা হয়। সুভাষবাবুর মনেও একটা রোমাঞ্চকর মোহ দেখা দিয়েছিল, উপেনদা'র মতন মন্ত্রী এবং একদল অভিজ্ঞ বিপ্লবী কর্মীর আনুগত্য পেলে তিনি হতে পারেন স্বরাজ সংগ্রামের একটা deciding factor.

এই সময়ে দেশবন্ধু বেরুলেন পূর্ব্ববঙ্গ সফরে—সঙ্গে নিলেন সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর এবং উপেনদা'কে। জীবনও সুযোগ বুঝে রেকাবীবাজারে (সুরেন মজুমদারের সাহায্যে) বিক্রমপুর রাজনৈতিক সম্মেলনের বন্দোবস্ত করে তাঁদের নিমন্ত্রণ করলে। তাঁরা মুন্সীগঞ্জে এলেন। কমলা ঘাট থেকে মুন্সীগঞ্জ সহরের মাঝখানের খাল থেকে নৌকায় সহরে আসাই সুবিধা। দেশবন্ধু আসছেন বলে লোকের যে উৎসাহ, ততোধিক উৎসাহ সুভাষবাবু আসছেন বলে। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ মতি সিং-এর। বজ্রযোগিনীর চন্দ্রভূষণ ওরফে গৌরার মতন সে হচ্ছে মুন্সীগঞ্জ কংগ্রেসের পাঁজরার হাড়—সনাতন ভলান্টিয়ার। তফাৎ এই যে, মতি তার চেয়ে কালো—তার হাতের তেলোটাও কালো। কিন্তু ওপরটা যত কালো, ভেতরটা তত সাদা—আর সাদা তার সুন্দর দাঁতের পাটি, যাকে বলে milk white, সাদা মনের পরিচয় তার নির্মল হাসিতে, আর সে হাসির অন্তও নেই বিরামও নেই—তাকে ধরে মারলেও সে হাসে। বোধ হয় তার পেট কামড়ালেও সে হাসে, আর সে হাসিতে যেন মুক্তা ঝরে।

নেতাদের নৌকা ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুভাষচন্দ্রকে দেখে তার আনন্দ আর উৎসাহ যেন লাফিয়ে উঠলো—সে এক লাফে নৌকোয় উঠে পড়ে সুভাষবাবুর একখানা হাত ধরে টেনে তার পাশে নিজের কুচকুচে কালো হাতখানা রেখে দেখে হেসে একেবারে লুটোপুটি। সদাগম্ভীর সুভাষবাবুর মুখেও হাসি ফুটে উঠলো, সুভাষবাবু তাকে বুকে টেনে নিলেন—এক মুহূর্তে সে সুভাষবাবুকে আপনার করে নিলে।

মতি Matriculation Examination এর আগেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, পরে আগু পাশ করে, এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে কর্পোরেশনের স্কুলের টিচার হয়েছিল।

যাই হোক, কনফারেন্সের অধিবেশন চলার মধ্যেই রাত্রে উপেনদা' প্রতুল বাবুকে খবর দিয়ে আনিয়ে সুভাষবাবুকে নিয়ে এক পুকুরের 'ঘাটলার' সাঁকোয় বসে কিছু গোপন পরামর্শ করলেন। ওদিকে কনফারেন্সে কাউন্সিল প্রবেশ নিয়ে নো-চেঞ্জার প্রোচেঞ্জার গুঁতোগুতি চললো। নো-চেঞ্জার নেতা ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ দলবল নিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি জীবনকে লক্ষ্য করে সভায় বললেন,—যারা অহিংসায় বিশ্বাস করে না, তাদের কংগ্রেসে থাকার কোন অধিকার নেই। তার জবাবে জীবন মহাত্মা গান্ধীর স্বহস্তলিখিত পত্র বার করে পড়ে শুনিয়ে প্রফুল্ল বাবুদের আহ্বান করলে স্বচক্ষে পত্রখানি দেখে যাওয়ার জন্যে। ওঁরা চুপ করে থাকলেন,—থোঁতামুখ ভোঁতা হয়ে গেল। স্বরাজপার্টির সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

ন্যাশান্যাল স্কুলে বাংলা পাঠ্যপুস্তক ১ম শ্রেণীর জন্যে নির্বাচিত হয়েছিল,—সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন,—কাব্য—নবীন সেনের রৈবতক, এবং প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলন। দেশপ্রেম, বীরত্ব, সশস্ত্র সংগ্রাম, রাজনীতি, বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই সব নিয়েই তত্ত্ব আলোচনা। ফার্ষ্ট ক্লাশের ফার্ষ্ট বয় ছিল একটি মুসলমান ছেলে, নীরব ও নিরীহ প্রকৃতির। সে হঠাৎ একদিন আমাকে গোপনে তার লেখা এক প্রবন্ধ দেখালে—তার প্রতিপাদ্য, ধর্মানুষ্ঠান এবং ধর্মের প্রচলিত বচনগুলো, ঈশ্বর-আল্লার কুদ্‌রৎ—এসবই বুজরুকী,—সাধারণ সরল লোকদের ধোঁকা দিয়ে ঠকিয়ে খাওয়ার জন্যে মোল্লা পুরুতদের কৌশলমাত্র। প্রকাণ্ড প্রবন্ধ, প্রত্যেকটি কথার সমর্থনে প্রচুর উদাহরণ ও যুক্তি—দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ—আমার মাষ্টারীর সন্দেহাতীত সাফল্য, আশাতীত ফল! এখন সে কোথায় আছে, কি করে জানিনা,—মনে পড়লে জানতে ইচ্ছে করে,—মনে মনে বুঝি, যেখানেই থাক,—সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ভেবে আনন্দ পাই।

বিক্রমপুরের মতন মাণিকগঞ্জেও সাবডিভিসন্যাল কনফারেন্স হল—সেখানকার নেতা ছিলেন নরেন বোস। বিক্রমপুর সাব-ডিভিসন্যাল কংগ্রেস ছিল আমাদের হাতে। নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা কয়েকজনে গেলুম। সকলে ষ্টিমার থেকে মাণিকগঞ্জে নেমে একজন ভলাণ্টিয়ার গাইডের সঙ্গে ১২ মাইল হণ্টন দিয়ে গেলুম তেওতা গ্রামে—কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ী। ঐ ১২ মাইল পথের মধ্যে একটা জিরোবার জায়গা নেই, খাবার জলের পর্যন্ত বন্দোবস্ত নেই। কিরণবাবু কিছু চাঁদা নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু তা ছাড়া তাঁর সংস্পর্শের কোন পরিচয়ই ছিলনা।

'২৩ সালের শেষে ইলেকশন এল,—ঢাকায় স্বরাজ্যদলের প্রার্থী হলেন কিরণশঙ্কর। ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি তখন অনুশীলন পার্টির হাতে। প্রতুলবাবুর ভগিনীপতি উকীল মনোরঞ্জন ব্যানার্জির সঙ্গে কিরণশঙ্কর ব্যবস্থা করলেন, তাঁরাই নির্ব্বাচনী প্রচার করবেন, এবং সারা জেলার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এজেণ্ট পাঠাবেন,—তাঁদের কর্মী আছে সর্বত্র। বলা বাহুল্য,—নির্বাচনের ব্যয়ের একটা মোটা অংশ এই প্রচার-এজেন্সীর নামে তাঁরা পেলেন। জীবন কলকাতায় তাঁকে আগেই নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিল, আমাদের কেন্দ্রগুলো সম্বন্ধে। মনোরঞ্জন বাবুর কোন লোকই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করায় আমরা একটু চিন্তিত হয়েছিলাম। শেষে ইলেকশনের আগের দিন আমরা চারিদিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়লুম,—কারণ স্বরাজ্যদলের সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের, অনাচারীদের, সবচেয়ে বেশী গরজ—কারণ যুগান্তর দলের হাতেই স্বরাজ্যপার্টির সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব ছিল।

আমি গিয়েছিলুম ঘোলঘরে। হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন
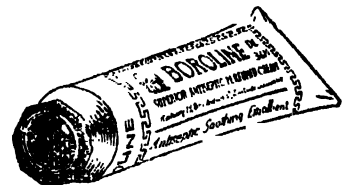
একজন দরদী, তাঁর বাড়ীতে রাত্রে থাকলুম incoguito, সকালে পোলিং বুথে গিয়ে বসলুম, লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। বেলা হওয়ার সঙ্গে ২।১ জন করে লোক আসতে সুরু করলো, দেখলুম একটু কথা কয়ে, সকলেই স্বরাজ্যদলের ভক্ত। দুপুর বেলা মনোরঞ্জন বাবু একজন ছোকরা নিয়ে এলেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে বললেন, এই যে, এ-ই থাকবে এখানে।

ইলেকশন হয়ে গেল, কিরণশঙ্করই নির্বাচিত হলেন। বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছিল, মনে নেই, বোধ হয় ভাগ্যকুলের জমিদারদের কেউ। বিক্রমপুর থেকে বি-পি-সি-সির ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আমিও তখন বি-পি-সি-সির মেম্বার হয়েছি।

ইতিমধ্যে '২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়ে গেছে। নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ নিয়ে কংগ্রেস প্রায় দ্বিখণ্ডিত হওয়ার যোগাড় হয়েছিল বলে' একদল সেণ্টার গ্রুপ রূপেও গজিয়ে উঠেছিল, বাংলায় তার একজন পাণ্ডা ছিলেন বাঁকুড়ার অসহযোগী প্রোফেসর অনিলবরণ রায়। একদিকে গান্ধীভক্তি, আর একদিকে যুগান্তর দলের দাদাদের প্রো-চেঞ্জ কর্মকাণ্ড, এই দোটানায় পড়ে মনোরঞ্জন 'দা'র (গুপ্ত) অবস্থাও হয়েছিল কতকটা মধ্যপন্থী। অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে তাঁর খাতির এবং ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। সরস্বতী প্রেস থেকে মনোরঞ্জনদা' এক সাপ্তাহিক কাগজ বার করেছিলেন "সারথি" এবং অনিলবরণকে সম্পাদক করে আরো নিকট বন্ধু করে' নিয়েছিলেন।

যাই হোক, এই সেণ্টার গ্রুপের চেষ্টায় দিল্লীতে আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়—মৌলানা মহম্মদ আলী হয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট। বাংলা থেকে দেশবন্ধু তাঁর ডেলিগেটের দলবল নিয়ে দিল্লী চললেন, মুন্সীগঞ্জ থেকে আমরাও কয়েকজন দিল্লী গেলুম—যতীন দত্ত, পরেশ সেন প্রভৃতি—জীবন কলকাতা থেকেই গিয়েছিল।

বৈধ গণতান্ত্রিক রাজনীতির রাজা ছিলেন দেশবন্ধু—বেপরোয়া জাঁদরেল। তখন ডেলিগেটের নির্বাচনও হত না, প্রাদেশিক সম্পাদক ডেলিগেটের চাঁদা নিয়ে certificate ও card issue করলেই যত খুসী ডেলিগেট হতে পারতো, সংখ্যা বাঁধা ছিল না।

দেশবন্ধুর একটা বৈধ গণতান্ত্রিক কায়দা দেখা গেল অপূর্ব! সারা ভারতের নো-চেঞ্জার ডেলিগেটদের চেয়ে বেশী সংখ্যক প্রো-চেঞ্জার ডেলিগেট জমা করে নো-চেঞ্জারদের out vote করে দেওয়ার অবস্থা করতে না পারলে তারা আপোষ মীমাংসায় বাগ মানবে না, সুতরাং অগুন্তি ডেলিগেট নিয়ে যেতে হবে। বাংলায় লোকের অভাব নেই, কিন্তু দিল্লী যাওয়া-আসার খরচ জোগাতে জিভ বেরিয়ে যাবে।

সুতরাং কয়েকজন লোক পাঠানো হল কাশীতে, এবং প্রায় সমগ্র বাঙ্গালীটোলাটাকেই খদ্দরে সাজিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লীতে, বেঙ্গল ডেলিগেট! কংগ্রেসে দেশবন্ধু বললেন, যদি আপনারা চান, আমি ভোটাভুটিতে রাজি আছি, কিন্তু আমি চাই না, কংগ্রেস ভেঙ্গে দুখানা হয়ে যাক। আমি মিলিত, সংহতি কংগ্রেসই চাই। ইত্যাদি—

ডেলিগেটের বহর দেখে out vote হওয়ার ভয়েই নো-চেঞ্জাররা বাগ মানলেন। ঠিক হল, দুদলই কংগ্রেসের ভিতরে থেকে দুটো বিভাগের মতন কাজ করবে, একদল প্রধানত কাউন্সিলের কাজ নিয়ে থাকবে, আর একদল গঠনমূলক কাজ নিয়েই থাকবে।

জীবন দিল্লী থেকে বম্বে যাওয়া স্থির করে রওনা হয়েছিল। আমরা ফিরে এলুম। কিন্তু ইতিমধ্যেই ১৭ জন নেতার নামে রেগুলেশন থ্রির ওয়ারেণ্ট বেরুলো, আর অনেকেই ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁরা হচ্ছেন—অমরদা' (চ্যাটার্জি), উপেনদা', যাদুদা', মনোরঞ্জনদা' (গুপ্ত), ভূপতিদা', ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রো: জ্যোতিষ ঘোষ (মাষ্টার মশায়), মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ চৌধুরী, অমৃত সরকার, সতীশ পাকড়াশী এবং বোধ হয় প্রভাস দে। জীবন পথে খবর পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়ার পর গ্রেপ্তার হল, হঠাৎ একদিন রাস্তার মধ্যে। পূর্ণ দাশ এবং প্রতুল গাঙ্গুলীও গা ঢাকা দিয়েছিলেন, এবং পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

কাণ্ড দেখে আমি স্কুলে নোটিশ দিলুম,—ডিসেম্বরের পর আমি আর থাকবো না, কলকাতায় ফিরে যাবো। ডিসেম্বরে হল কোকনদ কংগ্রেস সাধারণ অধিবেশন। আমি কোকনদ কংগ্রেস থেকে ফিরে কলকাতায় চলে এলুম। সারদাও পরে চলে এল,—প্রভাস মুন্সীগঞ্জেই থেকে গেল, আমার ভাগ্নেও।

২৪ সালের জানুয়ারীতে হঠাৎ একদিন গোপী শা টেগার্ট ভ্রমে আর্নেষ্ট ডে নামক এক সাহেবকে গুলী করে হত্যা করে পালাবার পথে ধরা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আর পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করল রেগুলেশন থ্রিতে। তাঁরা হলেন, অতুলদা' (ঘোষ), সতীশদা' (চক্রবর্তী খুলনা), কিরণদা' (মুখার্জি), গোপেনদা' (পাবনা) এবং অরুণ গুহ। সরস্বতী প্রেস ও লাইব্রেরী একটা বিরাট ধাক্কা খেলো।

কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনার প্ল্যান স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনে আপাততঃ পর্যবসিত হয়েছিল,—সেই স্বরাজ্য পার্টিও একটা ধাক্কা খেলো। স্বরাজ্য পার্টির ইংরাজী দৈনিক ফরোয়ার্ড প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছিল ২৩ সালের সেপ্টেম্বরের আগে। উপেনদা' থাকবেন সম্পাদকীয় বোর্ডে,—মনোমোহন ভট্টাচার্যের ম্যানেজারির আশা ছিল, তিনি খুব খাটছিলেন। যখন প্রথম দাদারা ধরা পড়লেন, তখন লালবাজারে (বা ইলিসিয়মরোই) মনোমোহন বাবুকে দেখে রবি সেন তাঁর কাছে চুপি চুপি খবর বলছিলেন, যাতে ফরোয়ার্ডের প্রথম সংখ্যায় খবরগুলো বেরোয়। মনোমোহন বাবু চুপ করে শুনছিলেন। এমন সময়, হরি, হরি! রবিবাবুর সঙ্গে মনোমোহন বাবুকেও কালো গাড়ীতে বোঝাই করলো। তখন এক চোট হাসাহাসি লেগে গেল,—যেন মরণোল্লাস।

যেন বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্ব শেষ হল। হরিদা (চক্রবর্তী), সুরেনদা (ঘোষ), নরেশদা' প্রভৃতি যারা থাকলেন, তাঁরা আবার ভাঙ্গাঘর গোছাতে সুরু করলেন। আমরাও থাকলুম পিছনে।

[ক্রমশঃ

"হিন্দুধর্ম বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে এবং সমুদয় ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মাচার্য এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলী

—স্বামী বিবেকানন্দ

অত্যাশ্চর্য্য কাপড় কাচার পাউডার
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)
নীল সার্ফ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

কল্যাণী

অপরাজিতা ঘোষ

বছর খানেক ধরে মানসকন্যা কল্যাণীতে আসবার আমন্ত্রণ আসছিল। সময় আর হয়ে উঠছিল না, তাই এই যাব শিগ্‌গির, এই সামনের ছুটিতে যাব বলে ওকে কিছুটা শান্ত করছিলাম আমার দিক থেকে। প্রত্যেক চিঠিতেই 'কবে আসছ?' এই কথাটুকু বিশেষ করে লেখা থাকত।

এবার বেলাদির একখানা খুব কড়া চিঠি এল। খুব অভিমান করে লিখেছে। বেশ বুঝতে পারলাম, বেলাদিকে চিঠি দিয়ে আর শান্ত করা যাবে না। যেতেই হবে কল্যাণীতে। মাস খানেকের ছুটি নিয়ে দুর্গা নাম জপতে জপতে ট্রেনে চেপে বসলাম।

ট্রেন একটার পর একটা ষ্টেশন পেরিয়ে যেতে লাগল—কোনটায় থামে, কোনটায় থামে না। বেশীরভাগই থামে না। এসব দিকে বিশেষ খেয়ালও ছিল না' কেবল মনের মধ্যে কয়েকটা আত্মজিজ্ঞাসা ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করছিল। কেমন জায়গা কল্যাণী, শুনেছি ত খুব ভালো জায়গা, ঘিঞ্জি সহরের নোংরামি এখানে নেই, পথ চলতে গেলে ট্রাফিক পুলিশের দরকার হয় না, ডাষ্টবিনের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে না।

হ্যাঁ, রাস্তাটা ত বেলাদি চিঠিতে ভালোকরে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তবুও চিঠিটা এনেছি সঙ্গে করে, কি জানি আবার যদি বাড়ী চিনতে না পেরে ফিরে যেতে হয়! বেলাদির চেহারাটা ভাসা ভাসা মনে আসছিল, কিজানি এখন কেমন দেখতে হয়েছে। দশ বছরের পুরোণো চেহারার সঙ্গে মিল আছে কি না। আমাকে চিনতে পারবে ত বেলাদি? দীর্ঘ দশ বছর পরে দেখা হবে—সোজা কথা? এইসব এলোমেলো কথা মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছিল।

হঠাৎ মনে হ'ল কতদূর চলে এসেছি। পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এই সামনের ষ্টেশনটা কাঁচড়াপাড়া। ওঃ তাইতো, ভাগ্যিস মনে হল, নইলে কোথায় চলে যেতাম! ক্লান্ত গাড়ীখানা একবার দম নেবার জন্য থামল। নেমে পড়লাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ বড় ষ্টেশন, লোক গিস্‌গিস্ করছে। বেলাদি লিখেছিল কল্যাণী ষ্টেশনে না নেমে কাঁচড়াপাড়া হয়ে এলে নাকি অনেক সুবিধে হয়। কি জানি, হয় বোধ হয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, বেলাদির সেই ডিরেকসন দেওয়া চিঠিখানা আছে, কি না। ষ্টেশনের বাইরে এসে খানিকটা হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দুপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মনটা বিষিয়ে উঠল। নোংরা-বস্তী বললেও অত্যুক্তি হয় না। নোংরা রাস্তা আর দুপাশে সারি সারি দোকান—মুদির দোকান থেকে বইএর দোকান পর্য্যন্ত। পাশে একটা বাজার।

কণ্ডাক্টার 'বাগমোড়' বলে একটা জায়গায় নামিয়ে দিল। চৌরাস্তার মোড়। সোজা দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, ওটা নাকি কলকাতা'র পথ। মোড়ের পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, উত্তর দিকে যেতে হবে। আরো জানলাম, কল্যাণীর বাস নাকি এখুনি আসবে। প্রায় আধঘণ্টা বৈশাখ মাসের দুপুর দু'টোর সময়ে ছাতিফাটা রোদে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাসের জন্য। বাস আর এল না। সামনে একটা রিক্সা পেয়ে উঠে বসলাম। রিক্সা চলতে লাগল বেলাদির বাড়ীর দিকে।

—কতদূর, জিজ্ঞেস করলাম।

—এই মাইলখানেক বাবু, পশ্চিমা রিক্সাওয়ালা জবাব দিল।

দুপাশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা পিচঢালা পথ সোজা চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটা বাড়ীও চোখে পড়ল। ওকে ঠিক বাড়ী বলা যায় না; জীর্ণ লোনা লাগা, ইট খসে যাওয়া দেওয়াল সব! খাপছাড়া ভাবে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এগুলো এককালে সব বড় বড় বাড়ী ছিল। আজ সে সব কিছুই নেই। বাড়ীর লোকগুলোও সব কোথায় চলে গিয়েছে জানি না, বংশে কেউ আছে কিনা তাও বলতে পারব না। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দেওয়ালগুলোকে জিজ্ঞেস করে আসি,—বলতে পার এরা সব কোথায়? যাদের দেখেছো তোমাদেরই পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে, হয়ত তোমাদেরই গায়ে ঠেস্ দিয়ে তারা কত গল্প গুজব করেছে প্রিয়জনদের সঙ্গে। তোমরা ত সবই জান, বলতে পার এরা সব এখন কোথায়? হায়রে, ওরা যে কথা বলতে পারে না, নির্ব্বাক। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে এই আশ্চর্য জগৎটাকে।

চোখে পড়ল কবি ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাগার। শুনলাম ওর পাশেই নাকি ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ী ছিল। আজও সে মিলিয়ে যায় নি কালের কপোলতলে, ভগ্নপ্রায় অবস্থায় তার অস্তিত্বকে স্বীকার করবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—আর কতদূর, জিজ্ঞেস করলাম।

—এই যে এসে গেছি বাবু।

সত্যি এখন মনে হচ্ছে যেন এসে গেছি। রিক্সাটা একটা গোল হ'ত পার্ককে ডাইনে রেখে এগোচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, পার্কটা বেশ বড় এবং সুন্দরও। দেখলাম পার্কের এক কোণে পাঁচটা বটগাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চবটীর খানিকটা ভাব এনে দিচ্ছিল। তাদের তলায় আধো আলোয় আধো আঁধারে একটি পাথরের ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি দেখলাম—বেশ বড়। মনে হ'ল বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। বাস্তবিকই মূর্ত্তিটি ভারি সুন্দর। আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে মূর্ত্তিটি যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি।

রিক্সা চলেছে বেশ মন্থর গতিতে। দূরে দেখা যাচ্ছে হলদে রং-এর ছোট ছোট বাড়ী সার সার ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ যে বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলো কিগো ?

বলল, ঐ ত বাবু কল্যাণী। আমরা এসে গেছি।

দুপুরের সমস্ত ক্লান্তি যেন কোন যাদুস্পর্শে মুছে গেল। আনন্দে ভ'রে উঠল মনটা। যাক্, তাহলে বেলাদির অভিমান ভাঙ্গাতে পারলাম।

রিক্সা হঠাৎ থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলাম ওকে, থামলে কেন ?

গলায় জড়ানো গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল রিক্সাওয়ালা, নামুন, এসে গেছি কল্যাণী।

হ্যাঁ তাইত। বাড়ী ঘর সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওকে বললাম, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। কিছু চিনি না, জানি না, কোথায় যাব ?

—বাবু, আর যাবে না রিক্সা। এই পর্য্যন্তই আপনার সঙ্গে ভাড়া ঠিক হয়েছে।

—আচ্ছা বেশ ত, আমি না হয় তোমাকে বেশী ভাড়া দিচ্ছি। নিয়ে চল।

—না বাবু আর যেতে পারবো না।

—কেন ?

কিছুতেই বলল না ও, কেন আর নিয়ে যেতে পারবে না আমাকে। কতবার জিজ্ঞেস করলাম। ঘাড়টা নেড়ে একটু হাসল শুধু।

ওর মনের কথা ওর কাছেই থাক্। আর ঘাঁটালাম না। যখন কল্যাণীতে আসতে পেরেছি তখন নিশ্চয়ই বাড়ী চিনে নিতে পারব। কষ্ট একটু হবে এই আর কি।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বাঁদিকে চোখে পড়ল আধুনিক ষ্টাইলের বিরাট গোলাপী রং-এর দোতালা বাড়ী। পরে শুনেছিলাম, ঐ বাড়ীটাই নাকি কল্যাণীর এডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং। আর ডান দিকে যতদূর চোখ যায় কেবল বাড়ী আর বাড়ী—একই রকমের দেখতে, একই রংএর। দু একটা বড় দোতালা বাড়ীও চোখে পড়ল। চোখে পড়ল কাছেই একটা বড় পার্ক। চারিপাশের রাস্তাগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। পার্কটার ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা বিরাট ট্যাঙ্ক। আর তার চারপাশ দিয়ে গজিয়ে উঠেছে সুন্দর বাগান—ফুলে গাছ ভর্ত্তি। এত সুন্দর পার্ক খুব কমই দেখেছি। এখানে ফুল ফোটে, আবার আপনিই শুকিয়ে যায়, কেউ ওদের স্পর্শ করে না। প্রকৃতি-দুহিতাই বটে ওরা। ওখানে থাকতে প্রায়ই বেড়াতে আসতাম এই পার্কে বিকেলের দিকে। বসতাম, গল্প করতাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রকৃতির কারুকার্য্য দেখতাম। এই পার্কের নাম সেন্ট্রাল পার্ক। এখানকার মধ্যে সব থেকে বড়, সব থেকে ভালো পার্ক। ঐ যে পার্কের মাঝখানে ট্যাঙ্কটা দেখা যাচ্ছে, শুনেছিলাম ওর মধ্যে জল সঞ্চিত থাকে, পরে ছড়িয়ে দেয় কল্যাণী উপনগরীতে। শুধু ঐ একটাই ট্যাঙ্ক গোটা কল্যাণীকে জল যোগাচ্ছে না, এইরকম আরও ট্যাঙ্ক আছে।

হাঁ, রিক্সাওয়ালা আমাকে হদিস দিয়েছিল নেহেরু-পার্ক যাবার। ঐ সেণ্টাল পার্কের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, ঐ রাস্তা ধরে বরাবর গেলেই নাকি নেহেরু-পার্ক চোখে পড়বে।

কিন্তু রাস্তা ত আর একটা নয়, গোটা ছয়েক হবে। সব রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখি সবই ত সেণ্ট্রাল পার্কের সামনে। তাহলে ? চুপচাপ দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কানে এল দূর থেকে কে যেন বলছে—বাবু, ওধার না। ঐ রাস্তা দিয়ে যান। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, সেই রিক্সাওয়ালা। এডমিনিসট্রেটিভ বিল্ডিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আসল রাস্তাটা। অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না, আবার ঐ চড়া রোদে হেঁটে ওর কাছে গেলাম।

এবার বুঝতে পারলাম। আবার ওকে অনুরোধ করলাম, বেশী পয়সা দেব, বাড়ী পৌঁছে দাও। এবারও ও একটু হাসল। ওর হাসি দেখেই বুঝতে পারলাম, ও যেতে চাইছে না। আজও বুঝতে পারি না, কেন ও গেল না ঐ সীমানাটুকুর বাইরে। কি জন্য ?

হাঁটতে লাগলাম ওর নির্দ্দেশ দেওয়া রাস্তা দিয়ে। ভারি সুন্দর রাস্তাটা। ঐ জ্বলন্ত রোদের মধ্যেও যেন কত সুন্দর লাগছিল। দু'পাশ দিয়ে সার সার বাড়ী চলে গেছে একরকমের, এক রংএর। আবার রাস্তার দুপাশে লাইন করে গাছ লাগানো হয়েছে। মাঝারি গোছের গাছগুলো প্রত্যেকটা ইট দিয়ে ঘেরা গোল জায়গার মধ্যে। এটাও যেন কত সুন্দর।

চলেছি ত চলেছিই, কোথায় নেহেরু পার্ক। জানতাম না যে, ঐ রাস্তা ধরে সোজা গেলে কোনদিনও নেহেরু পার্কের দর্শন লাভ হবে না। ঐ রাস্তার ডান দিক দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে গেলে দুটো বড় বড় বাড়ী চোখে পড়বে। তার সামনে দেখা যাবে একটা ছিম ছাম মাঝারি গোছের পার্ক। ওরই নাম নেহেরু পার্ক। আর বাড়ী দুটো নেহেরু বিল্ডিং। কংগ্রেস উৎসবে নাকি ঐ বাড়ী দুটোর একটাতে নেহেরু আর একটাতে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন।

কোন্দিকে গেলে নেহেরু পার্ক পাওয়া যাবে আমি ত তা জানতাম না, তাই সোজা চলে গিয়েছিলাম। একটা মোড় পেলাম, চারটে রাস্তা এসে মিশেছে চারদিক থেকে। মোড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট কমপাউণ্ডে ঘেরা কল্যাণীর হাই ইস্কুল। বেলাদির কাছে পরে শুনেছিলাম, ওখানে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। বেলাদি ঐ ইস্কুলেরই টিচার। কোন হৈ চৈ নেই, শান্ত। আর একটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণীর ডাকঘর। একটা বাড়ীকে সরকার ডাকঘর বানিয়েছেন। মাঝে মাঝে আসতাম খাম-পোষ্টকার্ড কিনতে,

চিঠি ডাকে দিতে। দেখতাম পোষ্টমাষ্টার আর একটি পিয়ন নিয়ে এখানকার কারবার। পোষ্টমাষ্টারই সব, তিনিই সব কাজ করেন। খাম-পোষ্টকার্ড, ডাকটিকিট বিক্রী করেন, আবার মনিঅর্ডারের কাজও করেন। ভদ্রলোককে দেখে রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটা মনে পড়ে যেত। সেই গল্পের পোষ্টমাষ্টারই যেন ফিরে এসেছেন এখানে।

ইস্কুল আর ডাকঘরের পাশ দিয়ে উত্তর মুখো যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে দেখা যাবে একটা বেশ বড় বাড়ী। ঐ বাড়ীটা কল্যাণীর বাজার। এখন অল্প বিস্তর সব জিনিসই পাওয়া যায় বাজারে। বছরখানেক আগেও নাকি পাওয়া যেত না তরি-তরকারি মাছ-মাংস। সরকার আধুনিক রুচিসম্মত ভাবেই বাজারটা তৈরী করেছেন।

বাঁদিকে না ঘুরে ঐ কৃষ্ণচূড়া, আমগাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর সোজা গেলে দেখা যাবে একটা বড় বিল। ঐ বিলটাই নাকি এককালে হ্রদ বা লেক হবে। সেইজন্যই বোধহয় ঐ বিলটার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, ওর নাম—লেক রোড। কয়েকদিন গিয়েছিলাম বেলাদির সঙ্গে আগামী লেকের ধারে বেড়াতে। বেড়াবার জায়গা অবশ্য এখনও হয় নি, দেখে এসেছিলাম শুধু।

যাক্, কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেললাম। ইস্কুলের মোড়ে এসে একটু সন্দেহ হ'ল মনে। অনেকদূর ত চলে এলাম সেন্ট্রাল পার্ক থেকে। রিক্সাওয়ালা ত অতদূর আসতে বলে নি। কাকেই বা জিজ্ঞেস করব এখন? একটি লোকও ত দেখছি না। ডাকঘরে ঢুকলাম, যদি কিছু উপায় হয় ভেবে। ভাবাই সার হ'ল। ডাকঘর বন্ধ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, কাউকেই ত দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ দেখি, ডাকঘরের পাশের খালি বাড়ীটা থেকে সদ্য ঘুম ভাঙা একটা লোক আমার কাছে এগিয়ে এল জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে। দেখে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, আমি একজন নবাগত।

তাকে বাড়ীর নম্বরটা বললাম, ঠিক বুঝতে পারল না। নেহেরু পার্কের কথা বলতে অবশ্য দেখিয়ে দিল। কাছেই।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, কি লোকের বাড়ী।

বললাম, তা ত জানি না। চিঠিতে নম্বরটা লেখা রয়েছে, এর বেশী আর একটুও জানি না। ষ্টেশন থেকে কল্যাণী আসবার ডিরেকসান দেওয়া আছে। লিখেছে নেহেরু-পার্কের পাশেই ওদের বাড়ী। আর ত কিছু লেখেনি।

লোকটি নিজে থেকেই ওর পরিচয় দিল। এখানকার দ্বারওয়ান সে। ওকে বেলাদির বাবা অবনীবাবুর নামটা বললাম। তাঁর চেহারার বর্ণনা দিলাম।

এবার ও ঠিক চিনতে পারল। বাস্তবিকই ভদ্রলোকের একটা বিশেষত্ব আছে। চেহারায়, গুণে, সব কিছুতেই। চেনে না এখানে তাঁকে এমন একজনও নেই। শুধু এখানে কেন কলকাতায় যখন ছিলেন, তখনও না চিনত এমন কেউ পাড়াতে ছিল না। অমায়িক ব্যবহার আর অত্যন্ত রসিক। পরকে আপন করতে তাঁর এক মিনিটও লাগে না। তাঁকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে, চার আলাপ নেই তাই ভাবি। এখানকার চীফ ইঞ্জিনিয়ারও তাঁর বন্ধু আবার এই অখ্যাত দ্বারওয়ানটাও তাঁর অত্যন্ত পরিচিত।

দ্বারওয়ান আমাকে অবনীবাবুর বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। বেলাদির সেই মলিন হয়ে যাওয়া চিঠিখানা খুলে মিলিয়ে নিলাম ঠিকানাটা। হ্যাঁ, নম্বরটা ত একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে, সামনেইত নেহেরু-পার্ক।

এক নজরে দেখে নিলাম সার সার ভাবে দাঁড়ানো বাড়ীগুলোকে। প্রত্যেকটা বাড়ীর চারিপাশে খোলা খানিকটা করে জায়গা, সামনে পাঁচিল দিয়ে, পাশে তারের বেড়া দিয়ে সীমানা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সামনেই লোহার গেট, তারপর গেটটা পেরিয়ে পাঁচ কদম হেঁটেই সিঁড়ি, ঘরে উঠবার। আর দু'পাশে খোলা জায়গায় নানা রকমের ফুলের গাছ; অজস্র ফুলে ছেয়ে আছে। দুপুরে সব ক্লান্ত, ঝিমিয়ে পড়েছে। শুধু ঐ ফুলগুলো নয়, গোটা সহরটাও ঝিমুচ্ছে। একটু শব্দ নেই কোথাও, শুধু সামনের নেহেরু পার্কের হাওয়া লাগা ঝাউ গাছের শন্ শন্ শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, বেলাদি—বেলাদি।

খুট্ করে দরজা খোলার একটা শব্দ হ'ল। একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে বছর কুড়ি বয়স হবে। জিজ্ঞেস করল আমাকে,—কাকে চাই।

বললাম, বেলাদি আছে, বেলাদি—

ভেতরে চলে গেল মেয়েটি। একটু পরে সেই মেয়েটি আর একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। এই মেয়েটিকে একটু বয়স্কা বলে মনে হ'ল। চোখে চশমা, মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ।

ওদেরকে আবার বললাম, বেলাদি আছে? একটু ডেকে দিন ত? বয়স্কা মেয়েটি উত্তর দিল,—আমার নামই বেলা ব্যানার্জ্জি। আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারলাম না। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

আমার চিনতে একটুও দেরী হ'ল না বেলাদিকে। কত বদলিয়ে গিয়েছে সেই দশ বছর আগের পরিচিতা মেয়েটি!

বেলাদি কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু হেসে বললাম—কি, চিনতে পারছ না?

মুখের কোন ভাবান্তর হ'ল না বেলাদির।

এবার সেই চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললাম,—দেখত?

চিঠিখানার দিকে একটুখানি তাকিয়ে একগাল হেসে বলে উঠল,—আরে তুমি স্বদেশ! এইরকম দেখতে হয়ে গেছ তা চিনতে পারি কি করে বল? রোদে দাঁড়িয়ে কেন? এস এস, বলে গেটটা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

বেলাদির মাকে প্রণাম করলাম। একগাল হেসে নানা কথার ভীড় জমালেন। বললেন একটু অভিমানের সুরে, সেই দশ বছর আগে যে দেখা করে গেলে তারপর আর এলেও না, একটা খবরও নিলে না। আরো কত প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোনটার জবাব দিলাম, কোনটার দিলাম না। অবনীবাবু ছিলেন না তখন, সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

বেলাদির মারও শরীরে এবং মনে বার্দ্ধক্যের ছাপ এসে গিয়েছে। তবে সেই হাসিটুকু আজও লেগে আছে মুখে। বেলাদিকে ত আর চিনতেই পারা যায় না, একেবারে অন্য রকমের হয়ে গিয়েছে। কথায়, চেহারায়, সব কিছুতেই। অবনীবাবুও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু মনটি এখনও তাঁর সেইরকমই সতেজ আছে। সেইরকম স্বভাব, সেইরকম রসিকতা করে কথা বলা, সব একই রকমের আছে। আশ্চর্য্য, একটুও পরিবর্ত্তন হয় নি একমাত্র চেহারাটা ছাড়া।

বেলাদির মা পরিচয় করিয়ে দিলেন পাশে বসে থাকা মেয়েটির সঙ্গে, এই বাড়ীতে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এর নাম নমিতা, এবার আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে এসেছে এখানে। নমিতা আমার ভাইএর মেয়ে। আলাপ হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে, বেশ মেয়েটি।

* * *

আবার যেন ফিরে পেলাম সেই দশ বছর পিছিয়ে যাওয়া জীবন। বেলাদিকে আবার যেন ফিরে পেলাম সেই অনার্স ক্লাসের মেয়ে। এই সুন্দর পরিবেশে হাসি গল্পে কেটে যেতে লাগল দিনগুলো। কোন আপনজনের সঙ্গে বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হ'লে তাকে যেমন করে আপ্যায়ন করে লোকে, আমার বেলাতেও ঠিক সেইরকমই হয়েছিল বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়।

কল্যাণীর দৈনন্দিন জীবনটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

খুব সকালে সাইকেলে করে দুধ দিয়ে যেত গোয়ালা। একটু পরেই আসত খবরের কাগজ। ঐ কাগজটা নিয়ে সকালটা কেটে যেত। চাকরটার সঙ্গে দু'একদিন বাজারেও গিয়েছিলাম। মনে হ'ল অন্যজায়গার থেকে সব জিনিসের দাম একটু বেশী।

যা গরম, সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে দিতাম একটু বেলা হলেই। দুপুরগুলো ঘুম আর গল্পে কেটে যেত।

দুপুরটা শান্ত, স্তব্ধ। পথে একটিও জনপ্রাণী নেই। পিচের রাস্তাগুলো রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে ধারে এসে জমা হচ্ছে। বাইরে বেরোলে শুধু শোনা যাবে, সামনে নেহরু পার্কের ঝাউগাছগুলোর হাওয়া-লাগা শন্ শন্ শব্দ আর থেকে থেকে ডেকে ওঠা দু একটা কাকের কা কা রব. সে রবও যেন কত ক্লান্ত।

ঘরের ভেতরেরও সেই অবস্থা। শুধু জেগে আছে একটা জিনিষ। ঐ টেবিলের ওপর রাখা সুদৃশ্য বাক্সটা। রেডিওটা গান দিয়ে, কথা দিয়ে, আমাদের ঝিমিয়ে পড়া ভাবটাকে কাটিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বিকেলে রোদ পড়লে আমাকে নিয়ে বেলাদি বেড়াতে বার হ'ত। সঙ্গে যেত নমিতা। কোনদিন শুধু রাস্তা দিয়ে হেঁটেই কতদূর চলে যেতাম, ইস্কুল পেরিয়ে, বাজার পেরিয়ে কতদূর। কোন কোন দিন ভবিষ্যতের লেকের ধারে বেড়াতে যেতাম। বেশীর ভাগ দিন সেণ্ট্রাল পার্কে গিয়ে বসতাম। ঐ পার্কে আরো অনেক ছেলে মেয়ে বেড়াতে আসত।

একদিন বেলাদিকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বেলাদি, এখানে গরীবের স্থান নেই, না ?

একটু হেসে বেলাদি বলেছিল, তোমার বুদ্ধিটা দেখছি এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখত, গরীব বলে কাউকে মনে হয় ? এখানে যাঁরা থাকেন সব মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স হোল্ডার। বেশীর ভাগই ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, প্রফেসর বা কোন অফিসের বড়বাবু রিটায়ার করেছেন প্রায় তিরিশ হাজার ক্যাস নিয়ে। জানো, এখানকার বাড়ীগুলোর কত দাম ? এই দামে অন্য জায়গায় পছন্দমত ভালো বাড়ী তৈরী করা যায়। আমার একদম ভালো লাগে না এখানে, বাবা যে কেন ঝোঁকের মাথায় এখানে বাড়ী কিনলেন, বুঝতে পারি না। এখানকার সবাই নিজেদের চাল নিয়ে ব্যস্ত, হাবভাবে বুঝিয়ে দেন আমাদের এত টাকা আছে, এত ফার্ণিচার আছে। এঁদের মধ্যে আন্তরিকতা নেই, আছে বাহ্যিক আবরণ। জান না বোধ হয়, এখানকার ইস্কুল-মাষ্টারদের সঙ্গে কেউ বড় একটা মেশেন না, তাঁদের ত আর এঁদের মত এত টাকা নেই, তাঁরা যে গরীব। একদম ভালো লাগে না আমার এখানে, অন্য কোন জায়গায় চাকরী পেলে চলে যাব।

বললাম, কেন, কাগজে দেখি, লোকের মুখে শুনি, কত সুন্দর জায়গা কল্যাণী। নগরের কোন কোলাহল এখানে ঢুকতে পারে না। ফাঁকা ফাঁকা সব বাড়ী। বাড়ী করতে হলে একমাত্র কল্যাণীতেই বাড়ী করতে হয়। আলো বাতাস প্রচুর। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর পার্ক, কলের জল, আলো পাখা, বাজার বিদ্যালয় সবই এখানে আছে। সব কিছু মিলে নগর-জীবনযাত্রার নতুন রূপ কল্যাণীতে যেন ফুটে উঠেছে। তার ওপর সরকারের বড় বড় প্ল্যানও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে, বড় বড় অফিসগুলো এখানে উঠে আসবে, আরো কত কি।

আমার কথা বলার ধরণ শুনে বেলাদি, নমিতা, দুজনেই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল বেলাদি, এতক্ষণ ধরে যা রসিয়ে রসিয়ে বললে তা সবই আছে এখানে। আমি ত তা অস্বীকার করছি না। আমি যা বলতে চাইছিলাম, তুমি সেটা ঠিক ধরতে পারলে না। আমি বলছিলাম, এখানে মানুষের মনের নাগাল মেলা ভার। এদের সমাজের সঙ্গে একটু মেশ, দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল, নিজেই সব বুঝতে পারবে। তোমার হয়ত খুব ভালোও লাগতে পারে। মানুষের মন ত একরকম না।

একটু থেমে আবার বলল, শুধু এখানে কেন, আজ সব জায়গাতেই তাই। সবাই আজ নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।

বললাম, এখানকার মানুষের মনের খবর আমার থেকে তুমি বেশী জান, কারণ, তুমি এখানে বাস করছো। তবে এই ক'দিনে আমার এইটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে কল্যাণী সম্বন্ধে যে, এত সুন্দর নগর খুব কমই দেখা যায়। কল্যাণীর প্ল্যান বিপুল, এককালে নিশ্চয়ই এ একটি সার্থক নগরী হয়ে উঠবে। এখন ত সে একটা ছোট মেয়ে। এই ছোট মেয়েটি একদিন পূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠবে, জোয়ার আসবে তার দেহে, আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে সে সকলের কাছে।

নিশ্বাস ফেলতে হলে সোজা চলে আসতে হয় কল্যাণীতে। প্রকৃতিকে যাঁরা উপভোগ করতে পারে না, শহরের আবর্জ্জনায় যারা হাঁপিয়ে উঠেছে, এখানে তারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে পারবে অন্ততঃ দিন কয়েকের জন্য।

হয়ত এখানে ট্রাম বাস মটরের কনসার্ট নেই, সিনেমা নেই, আকাশ ছোঁয়া বাড়ী নেই, চোখ ধাঁধানো চৌরঙ্গীর মোড় নেই, তবুও এখানে আছে শান্তি। হ্যাঁ, শান্তি। যার জন্য আজ সবাই পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম

শ্রীমতী শান্তি ভট্টাচার্য্য

সাম্প্রতিক কালে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম লইয়া বিভিন্ন মহলে বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করিতে মত প্রকাশ করেন, আবার কেহ বা ইংরেজীকেই উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রাখার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান আজ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিতেছে না।

স্বাধীন ভারতে সমস্যার অন্ত নাই। খাদ্য ও শিক্ষা সমস্যাই বেশী প্রকট। শিক্ষা সমস্যার মধ্যে ভাষা সমস্যা অন্যতম। দীর্ঘদিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতবাসী উপকৃত কি অপকৃত হইয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে।

যুগের প্রয়োজনে, বিদেশী শাসকবর্গের শাসন-পরিচালনার সুবিধার্থে, রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, বুদ্ধি ও নীতির দিক দিয়া ইংরেজ, এমন এক দল লোকের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই ১৮৩৫ খৃঃ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মেকলের প্রস্তাব বা "মিনিট" অনুমোদন করিয়াছিলেন। এ যাবৎকাল ধরিয়া সেই প্রস্তাবই সরকারী নীতি রূপে চলিয়া আসিতেছে।

যুগের প্রয়োজন বলার তাৎপর্য্য এই যে, তখন কোন একটি ভারতীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য ভাবে সমৃদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করার মত শব্দ-ভাণ্ডার ছিল না এবং যাহা ছিল তাহাও আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য ছিল। এই কারণেই এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব চর্চ্চার দ্বারা জাতির লুপ্ত চেতনা পুনরুদ্ধারের আশায়ই রাম মোহন রায় প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক ব্যক্তিগণ এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু কাল-প্রবাহে আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন যদিও আজও রহিয়াছে, কিন্তু ইহাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রাখিয়া দেশের অন্যান্য ভাষার উন্নতিকে বাধা দেওয়া গণতন্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা নয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সব ক্ষেত্রেই সৃজনী মনোবৃত্তি লইয়া আগাইয়া আসিতেছে। কাজেই আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সাধন করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করাও আজ সরকারের একান্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত।

কোন জাতিকে শিক্ষিত করিয়া গড়িতে হইলে উচ্চ শিক্ষার

ইমারত যেমন শক্তিশালী হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে শিক্ষার স্থায়িত্ব দৃঢ় হয়—অকালে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ভয় থাকে না। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনে তৎপর হয় সেই কারণে।

বিরুদ্ধবাদিগণ একটি প্রশ্ন করিবেন—আঞ্চলিক ভাষায় পরিভাষা কোথায়? অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমগ্র আঞ্চলিক ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নত হয় নাই। যেমন তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি। কিন্তু উত্তর হইবে এই যে, সহানুভূতি ও উদগ্র আকাঙ্খা লইয়া সরকার যদি পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে অত্যল্প-কালের মধ্যে তাহা নিশ্চয়ই উন্নতি করিতে পারিবে।

বাংলা ভাষার আসন সমগ্র বিশ্বে আজ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকের প্রতিভার স্পর্শে তাহা সঞ্জীবিত হইয়াছে। ইংরেজীর সংস্পর্শে আসিতে পারিয়া বাংলা ভাষা জীবন্ত হইয়াছে। যে কোন প্রকার ভাব প্রকাশের পক্ষে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইংরেজী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য যদি উপযুক্ত শব্দ না পাওয়া যায়, ইংরেজী হিসাবেই তাকে ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি? যেমন ব্যবহার আছে ট্রেণ, প্লাটফর্ম, চেকার, টিকেট ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য এই যে, উন্নত সাহিত্য হইয়াও রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা সে পাইল না—তার কারণ হিন্দীভাষীর সংখ্যা এবং আয়তন বেশী। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছে হিন্দীভাষা। যদিও ভাষা হিসাবে সমৃদ্ধ নয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সরকার যদি শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা লইয়া অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দান করা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।

খোলা মন লইয়া, জাতির অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য জাতীয় সরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করার কারণও এই বিদেশী ভাষা। বিদেশী ভাষা জোর করিয়া চাপানর ফল যে কিরূপ সময়, শক্তি এবং অর্থের অপচয়, তাহা পরীক্ষায় ফেল করার সংখ্যা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে এইরূপ অপচয় রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

অতি উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইংরেজীতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর উপর হইতে বাধ্য-বাধকতা প্রত্যাহার করিতে হইবে। ভাষা হিসাবে ইংরেজী সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পথে তাহা বাধা স্বরূপ হইবে কেন? আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা যে কোন মহৎ এবং বৃহৎ কাজ করা সম্ভব। নদী যখন প্রবল বেগে ধাবিত হয়, কোন বাধাই তার গতি রোধ করিতে পারে না। জাতির প্রয়োজনে জাতীয় সরকার যদি আন্তরিক সহানুভূতির সহিত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার জন্য অগ্রণী হন, তাহা হইলে শিক্ষার প্রসার অতি দ্রুত হইবে, জাতির অন্তরে শিক্ষার আগ্রহ বাড়িয়া যাইবে ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে নব যুগের প্রবর্তন হইবে। গণতান্ত্রিক সমাজে চুঁইয়ে পড়ার নীতি কখনই ফলপ্রসূ হইবে না। তাই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির মুরুব্বিয়ানার হাত হইতে জনগণকে মুক্তি দিতে সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

কবিতা ও তার জনপ্রীতি

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

আমি কবি নই; কোন্ কবিতা ভাল, কোন কবিতা মন্দ অথবা কেন ভাল, কেন মন্দ, এ বিচার করার মত পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি কিম্বা ধৃষ্টতা আমার নেই।

আমি কবিতা ভালবাসি—আর কবিতার জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, এ সত্যও উপলব্ধি করি, কেন কমছে সে সম্বন্ধেও ভেবে থাকি।

কবিতা-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলে কবিতার জনপ্রীতি বাড়বে অনেকে বলেন। নানা মনীষী আরও নানা কথাই বলেছেন।

কবিতার ছন্দ, পদলালিত্য, ভাববস্তু, রসাত্মক সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হ'য়েছে। পাণ্ডিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে আমার মত একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার স্পর্দ্ধাই প্রকাশ পাবে। আমি শুধু সাধারণবুদ্ধিতে কবিতা ভাল লাগার বস্তু অথচ তার জনপ্রিয়তা কেন কমে যাচ্ছে, সেকথা বলবারই চেষ্টা করব।

আমার যুক্তি সাধারণ পাঠক-পাঠিকারই যুক্তি ব'লে বুঝে বিদগ্ধসমাজ হাস্যসংবরণ করবেন, এই প্রার্থনা করি।

আমরা কবিতা ভাল না বেসে পারি না। কবিতা আমাদের সত্তা বললেও চলে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ছন্দ আছে, স্বতঃস্ফূর্ত হিল্লোল আছে, সেই ছন্দের, সেই হিল্লোলের, নৃত্যপর ভাষার ললিতঝংকারে সুসংবদ্ধ বহিঃপ্রকাশই কবিতা। ছন্দ হিল্লোল আমাদের তনুতে তনুতে, মনের পরতে পরতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যেতে হয় সেই জীবের প্রথম উৎপত্তির যুগে, অর্থাৎ সেই আদিম Palaeozoic যুগে, কোন অজ্ঞাত কারণে, কোন শুভমুহূর্ত্তে যখন পৃথিবীতে প্রাণ সম্ভব হয়েছিল।

অগভীর সমুদ্রের উপকূলসমীপে জলজ উদ্ভিদের ওপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভরশীল প্রাণীরাই জীবের আদি জনক-জননী। অগভীর জলে গা ভাসিয়ে থাকতো তারা আর পরম আরামে নিশ্চয়, ঢেউএর দোলায় বিভোর হ'ত—অগভীর জলের ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি কখনও কখনও বায়ু-হিল্লোলে অথবা জোয়ারের আবেগে সৈকতে এসে মৃদু মৃদু আঘাত করত—মা যেমন শিশুকে চাপড়াতে থাকেন আদরে সোহাগে। অবস্থিত প্রাণীগুলিও সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গের দোলনায় দুলতো।

জল ছেড়ে স্থলে যখন প্রাণ সম্ভব হ'ল, সেই বহুযুগের আনন্দের স্মৃতি প্রাণী বহন ক'রে নিয়ে এল তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। জলের পারিপার্শ্বিকের ছন্দ, হিল্লোল এখন ধ্বনিত হ'তে থাকল কর্ণপটহে, শব্দবাহী স্নায়ুতন্ত্রী নিয়ে যেতে থাকল হেড অফিস মস্তিষ্কে।

ছন্দহিল্লোলে গা ভাসিয়ে পরমানন্দ আস্বাদনের অনুভূতি তাই আদিম, শাশ্বত। আমাদের মন, আমাদের [illegible]

তাই নাচ গান কবিতা কার্য্যকলাপ, সকলের মধ্যেই ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াসী আমরা, ছন্দের পূজারী, ছন্দের অনুশীলন-প্রবণ।

মানব ইতিহাসের প্রথম দিকে এই ছন্দপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাণের আবেগে নৃত্য, করতালি, পদতাড়না প্রভৃতির উদ্দাম অভিব্যক্তিতে।

পরে ভাষার উদ্ভব হওয়ার পর থেকে তীব্র অনুভূতিকে প্রকাশ করা হ'তে থাকল ভাষার মাধ্যমে—যে ভাষায় ছিল হিল্লোল ওঠা-নামার নূপুর-নিক্কণ।

ভাষার ছন্দোহিল্লোল অথবা প্রাণের লীলায়িত আবেগ যখন স্বয়ং সম্পূর্ণ না হ'ত তখন ব্যবহার করা হ'ত নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের, বহু প্রাচীন যুগের যে সমস্ত অবশেষ পাওয়া যায়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিওলিথিক যুগের ধনু ক্রমবিবর্ত্তনে নানারূপ তারযন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়—এছাড়া ঢাক, ঢোল, তম্বুরা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রেরও অভাব ছিল না।

আমরা যতই সভ্য হই, যতই আধুনিক হই, যত মার্জ্জিত, সংস্কৃত, সংযত হই—চড়ক পূজার ঢাকে কাঠি পড়লে অথবা কীর্ত্তনের মৃদঙ্গে বোল্ উঠলে আজ-ও কি আমরা সেই কোন্ কোটি কল্প যুগের পূর্ব্বপুরুষদের হৃদয়ের স্পন্দন আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আধুনিকতা-অধ্যুষিত হৃদয়ে অনুভব ক'রে তালে তালে নেচে উঠিনা?

প্রত্যেকের মনে আছে লুকিয়ে একটি ছন্দপাগল বাউল, আনন্দলহরী খানি হাতে নিয়ে যে রসসাগরের অনস্বীকার্য্য দোল্‌নায় দুলছেই, দুলছেই, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

কিন্তু স্বানুভূত রস প্রকাশ ক'রে অন্য পাঁচজনের মনকে ভাসিয়ে দিতে পারে খুব কম লোকেই—আর সহজাত ছন্দোহিন্দোল ওতঃপ্রোতভাবে দেহমনে জড়িয়ে থাকলেও তা অনুভব ক'রে রসাস্বাদন করতে পারেও কম লোকে। তাই প্রয়োজন কবির—যিনি নিজের উপলব্ধ রসে তার বেঁধে পরিবেশন করতে পারবেন অন্যকে—আর রসচেতনা সম্বন্ধে সুপ্ত মনের তারগুলিতে ঝংকার তুলতে পারবেন অনাস্বাদিতের আস্বাদনোন্মুখ ক'রে।

উপমার ঔৎকর্ষ, অর্থগৌরবের বৈশিষ্ট্য ও পদলালিত্যের স্বপ্নময় দ্যোতনা কবিতার প্রাণ। অর্থাৎ কালিদাস, ভারবি ও নৈষধের রস একত্রে জাল দেওয়া মাঘের রসকদম্ব।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন যতদিন না হ'য়েছে, ততদিন মানুষের রসতৃষ্ণা তৃপ্ত করেছেন চারণ ও কথক কবিরা সুরের মাধ্যমে তাঁদের উপলব্ধ অনুভূতির প্রচার ক'রে; উদ্ঘাটিত করে—মানুষের মনের বদ্ধ দুয়ারের কপাট খুলেছেন, অনুভূত রসের আবদ্ধস্রোতে জোয়ার এনেছেন। মনোরোচক, শ্রুতিরোচক, প্রাণের স্পন্দন ও একান্ত চাওয়াকে সুরে ছন্দে যে দোলায়িত করতে পেরেছে, সেই হ'য়েছে চিরন্তন, সেই হয়েছে চিরকাম্য, চির আদৃত।

সেই রামায়ণ কত যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে—সেই আগমনী 'এলি যদি ঘরে ফিরে আয় মা উমা কোলে আয়।' চিরন্তন জননীর অন্তরের কথা। সেই বাউল-ভাটিয়ালী—'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে।' সেই 'নিতাই এনেছে নাম হরিবোল, হরিবোল।" পাগল ক'রে রেখেছে আজও বাঙালীকে চির অমৃতের উৎস হ'য়ে।

সেই মনসা-মঙ্গলের লখাইএর করুণ ছলছল কাহিনী—"শোনরে বেউলে, যায় বেণের ঝি। তোরে পাইল কালনিদ্রে, মোরে খাইল কি।" তারপর রামপ্রসাদ, "মনরে কৃষি কাজ জাননা", মত্ত প্রমত্ত উন্মত্ত ক'রে দেয় নাকি মনকে আজও? পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ চন্দ্রাবতী প্রভৃতির কবিতা নাকি এখনও প্রচলিত আছে। তাছাড়া মুখে মুখে রচিত ছড়াগান, পালা গান আজও বাঙালীর প্রাণের জিনিষ হ'য়ে আছে। দ্বিজবংশী কেনারামের মত পাষাণেও অমৃত-প্রস্রবণ ছুটিয়ে ছিলেন। রসিক বাঙালী জাতি ধান কাট্‌তে, নৌকা বাইতে সুরের হিল্লোল তোলে। বিয়ে, পৈতে, পালা পার্ব্বণে, ব্রত অনুষ্ঠানে ছড়া কাটে। ঘুম-পাড়ানি ছড়া কেটে খোকার চোখে আনে ঘুম, ভোলায় অবুঝ খোকাকে। এসব ছড়ার সঙ্গে কেই বা নয় পরিচিত তাই বাহুল্য বোধে আর উল্লেখ করলাম না সেগুলি।

যে চিত্র এতক্ষণ তুলে ধরা হোল তা সবই প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের। এর পরেই মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব মানুষের আনন্দ উপভোগ করবার ধারা ও রীতির মধ্যে আনল এক বিরাট পরিবর্ত্তন। একখানি বই কিনে ধীরে সুস্থে প'ড়ে মানুষ তার মনের তৃষ্ণা মিটাতে আরম্ভ করল এবং গানের মাধ্যমে যাঁরা রসসৃষ্টি করতেন, তাঁরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের বৃত্তির জনপ্রিয়তা হ্রাস হ'তে দেখলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মন শুধু কর্ণ ও হৃদয়কে পরিতৃপ্ত ক'রে শান্ত থাকতে পারল না—বুদ্ধির খোরাক চাইল। তখন যুক্তিবহুল, বুদ্ধিগ্রাহ্য, বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার মালমশলাযুক্ত কাব্য রচিত হ'তে লাগল। এমন ক'রে মূল শিকড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে গেল কবিতা—টবের ফুলের মত হ'ল তার অবস্থা—মাটির অতলান্তে পারল না শিকড় চালাতে।

সাধারণস্তরের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'লেন কাব্যলক্ষ্মী;—শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা কত? কবিতার জনপ্রীতি তাই কমে যেতে বাধ্য হ'ল।

একমাত্র শিক্ষিত অন্তঃকরণ ছাড়া অন্যকারও হৃদয়ে স্পন্দন জাগাতে পারে, এমন কবিতা আর রচিত হ'লনা। রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ—তাঁর কবিতাই বা সাধারণ কটা লোকে পড়েছে? তাঁর গভীর ভাবের কবিতাগুলি কজন বোঝেন বা বোঝবার যোগ্যতা রাখেন? ঐ ভাসা ভাসা পড়া, ভাসা ভাসা জ্ঞান। অন্য কবিদের কথা ছেড়েই দিলাম। সিনেমার দৌলতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান লোকের মুখে মুখে ফেরে—তবে হিন্দীগান, অথবা তাঁকে ভাঙিয়ে রচিত চটুল, হাল্কা গানেরইতো রাজত্ব।

Glamour আর অনবসরের যুগ এসেছে। বাঁচবার কঠোর সংগ্রাম নিয়ে এসেছে অর্থচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, এমনি আরও কত চিন্তায় পাহাড়। আনন্দ উপভোগের সময় কোথায়? সময় নেই, সময় নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সেই চণ্ডীর গান, কথকতা শোনবার নিশ্চিন্ত জীবন কোথায়? ইউরোপে তাই one act drama হ'য়েছে—সংক্ষিপ্তকরণ—সবেতে—এলাম, দেখলাম, চলে গেলাম—অভিনিবেশ দেবার, মনঃসংযোগ করবার সময় কোথায়? মাথায় ঘুরছে রাজ্যের চিন্তা। বিক্ষিপ্ত মন, কিছুই যখন মন দিয়ে করতে পারা যাচ্ছেনা তখন সবখানি মন দিয়ে কবিতা পড়বারই বা সময় বা মন কোথায়?

ঘোড়দৌড় ক'রে সিনেমার তারকাখচিত বইএর পাতা গেলাম উলটিয়ে। বড়জোর একখানা ডিটেক্‌টিভ গল্প অথবা হাল্কা ধরণের

…ম পাতার উপন্যাস হু হু শব্দে পড়লাম—আর কবিতার বই ?

হাতে কি বই রে ? ওঃ বাবা ঃ ক্যোবিত্যা ! এই হ'ল বেশীর ভাগ লোকের অভিব্যক্তি ।

Ready made সৌন্দর্য্য সাজানো থাকবে আমার বিনা আয়াসে একটুও মন খরচ না ক'রে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চানাচুরের মত মচ্‌মচিয়ে খেয়ে বলব, বাঃ ! তবেই না !

মেকলে অবশ্য বলেছিলেন—As civilisation advances, poetry declines, তা বোধ হয় সত্যি হ'তে চলেছে—আমরা হয়েছি না ?

এমন সব কবিতা লেখা হয় আজকাল যার অনেকগুলি পড়ে …তৃপ্তি ও হৃদয়তৃপ্তি হওয়াতো দূরের কথা, দন্তস্ফুট করবার উপায় …—এপর্য্যন্ত একজনকেও এ সকল কবিতার …নিহিত অর্থ বোধগম্য করাতে সক্ষম …াম না। আমরা সাধারণ পাঠক, …দেরই সংখ্যাধিক্য—তাই মনে হয় …া পড়বার সময় কবি এসে যদি …ক'রে অর্থটি বুঝিয়ে দেন তবেই …স্বাদন করতে সক্ষম হওয়া যেতে পারে, …আর কোনই উপায় নেই । মিল্টনের …মহাকাব্য Paradise Lost পড়াবার …অধ্যাপক আনন্দে গদগদ হন, কিন্তু জনসাধারণের কাছে তা অবহেলিত ।

তাই মনে হয়, পাঠাগার স্থাপনাই করা …ক কবিতা পড়ো, কবিতা পড়ো ব'লে …ন বিদীর্ণ ক'রে দেওয়াই হোক্‌ ; কোন …হবেনা—যতদিন না কবিরা নিজেদের …খেয়াল-খুশী মাফিক কবিতা সৃষ্টি করা বন্ধ …বেন, জনসাধারণের হৃদয়ে স্পন্দন জাগাবার মূলমন্ত্রটি ধরবেন, ততদিন কবিতার …প্রিয়তা আসতে পারবে না ।

শুনতে পাই কবিতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই মশগুল আধুনিক কবিরা—সে …দের ব্যাপার, অথবা মুষ্টিমেয় কাব্যজ্ঞান-…দের—কিন্তু সাধারণ কাব্যপিপাসু জন আকুশির পর আকুশি লাগিয়ে তাঁদের নাগাল …চ্ছেনা ।

আমাদের তৃষ্ণা আকণ্ঠ—কিন্তু সে তৃষ্ণা মিটাবে কে ?

আধুনিক কবিতার দুর্ব্বোধ্যতার সুযোগ নিয়ে, শব্দের চটকে, ভাষার কারুকার্য্যে, …র অস্বাভাবিকত্বে ও অভিনবত্বে বিভ্রান্ত ক'রে অনেক অনধিকার-প্রবেশও ঘটেছে কবিতা-ক্ষেত্রে, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই ।

অনেক আধুনিক কবিতা বোধগম্য করাও যেমন, মনে রাখাও তেমনি কষ্টকর, উদ্ধৃত করাও—ফলে ব্যবহৃত, কথিত বা লিখিত ভাষায় তা নিজস্ব সম্পদ হ'য়ে যেতে পারে না ।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, কাব্যবিচার করা বা নমস্ত কবিদের বিস্ময়কর সৃষ্টির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেননা তার যোগ্যতাও আমার নেই । আমার প্রিয় কাব্যলক্ষ্মী যাতে সকলের হৃদয়ের বেদীতে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে শ্রান্ত, তাপিত, ক্লিষ্ট, পীড়িত মনকে আনন্দের অমিয়-নির্ঝরে সিঞ্চিত, তৃপ্ত করতে পারেন, তাই তাঁর প্রসাদ প্রাপ্ত গুণী জনকে আমার ভাবনা, আমার আকুলতা জানালাম ।

তাঁরা এমন সৃষ্টি করুন যাতে আমাদের ভগ্নবুকে আশার হিল্লোল জাগবে, কাব্যবিমুখতা বিপরীত খাতে প্রবাহিত হয়ে, রসসঞ্চারে শুষ্ক জীবন ডুবু ডুবু হয়ে ভেসেই যাবে আর—

'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

তারপর কেটে গেছে আরো সুদীর্ঘ তিনটি বছর! জগৎ জুড়ে চলেছে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা।

মানব জীবনের উত্থান, পতন, সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নায় নিত্য রচিত হচ্ছে পৃথিবীর অলিখিত ইতিহাস।

দীর্ঘ পাঁচবছর পরে স্বদেশের মাটিতে পা দিয়েছে সুদাম, M. R. C. P,—F. R. C. S.—M. R. C. O. G. ডিগ্রির মালা গলায় পরে। প্রথমে কাকার নির্দেশ মতই সোজা চলে এসেছিলো সে তার মামার বাড়ীতে। ফেরা হয়নি আর সেখানে, যেখান থেকে জনক-জননীর পদধূলি মাথায় নিয়ে, মঙ্গলঘটকে প্রণাম করে যাত্রা সুরু করেছিলো! সে বাড়ী এখন কাকার সম্পত্তি, সেটি তিনি ভাড়া দিয়ে, নিজে বাস করছেন লালকুঠিতে, সুদামের মা গেছেন তাঁর পিত্রালয়ে। মামার বাড়ীতে অবশ্য বেশীদিন আর থাকতে হয়নি ওকে, সোমনাথের দানপত্র আর এ্যাটর্ণি মারফৎ একখানি শিলমোহর-করা তাঁর লেখা চিঠি পাবার পর প্রথমে বিহ্বল ভাবে এসে মাকে বলেছিলো সুদাম—

—কি করবো মা?··কাকাবাবুর দেওয়া এ বাড়ী আর টাকা, কোন্ অধিকারে গ্রহণ করবো আমি!

—তাঁকে ভুল বুঝোনা দামী! মৃদুস্বরে বলেছিলেন যমুনা দেবী!—তাঁর স্নেহের দানকে উপেক্ষা করে তাঁকে কঠোর আঘাত করতেই কি পারবে তুমি?

—মুখ নিচু করেছিলো সুদাম মায়ের জবাব শুনে! দুচোখের কূল ছাপিয়ে দর দর করে নেমে এসেছিলো জলের ধারা।

অনেক দিনের সঞ্চিত বেদনার জমাট তুষার আজ অকস্মাৎ গলতে সুরু করেছে।

মায়ের গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধে মাথা রেখে, ফুলে ফুলে কেঁদেছিলো সুদাম, সেই ছোটবেলার মতো!

তারপর মাকে নিয়ে চলে এসেছিলো এল্‌গিন্ রোডের বাড়ীতে!

থিয়েটার রোডের বাড়ী হবে কমল-সেবাসদন! কাকাবাবুর দেওয়া এ মহান্ কার্য্যভার সশ্রদ্ধচিত্তে মাথায় তুলে নিয়েছে সুদাম! আরো কয়েকজন নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্মী ডাক্তার আর কয়েকজন ধনী বাঙালী, অবাঙালীর সহায়তা লাভ করেছে সে! সেবা-ভবনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে! নাওয়া-খাওয়ার সময় মেলেনা তার। ক্লান্তিহীন এই কর্ম্মযোগের মাঝে আত্মনিমগ্ন রূপটি তার বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছে তার সহকর্ম্মীদের মনে! সেদিন ওর মুখের চোখের ভাব দেখে বিখ্যাত হৃদ্‌তত্ত্ববিদ্ প্রবীণ ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন—

—শরীর অসুস্থ নাকি হালদার? দেখি, দেখি! ওর হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী টিপে ক্লোভের সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ! বেশ জ্বরতো দেখছি! যাও, যাও, শিগ্‌গির বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম নাওগে! শরীরটা গাড়ীর চাকা নয় হে, যে তাকে বেপরোয়া ভাবে চালাবে;—যে রকম অনিয়ম, অত্যাচার দেখছি তোমার, মিষ্টার ত্রিবেদীর সেবাশ্রমে প্রথমেই তোমাকেই না ভর্ত্তি করতে হয়!

—লজ্জিতভাবে হাসলো সুদাম—মুখ নিচু করে বললো,—তেমন কিছু নয়। যতটা পরিশ্রম করা উচিৎ—ততটা আর পারি কৈ? হস্‌পিটালের ডিউটি সেরে, বাকি সময়টা এ কাজের জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও আপনাদের যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছি, তাই তাঁর পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলা সম্ভব হচ্ছে!

—কি আর করতে পারছি হে! পাঁচজনের উপকার হলে, আমাদের কিছু পুণ্যি সঞ্চয় হবে,—এই আর কি! হা, হা, করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, আমার গাড়ী তোমায় পৌছে দিয়ে আসুক হালদার, বড্ড চড়া রোদ্!

—না, না, আমি ট্রামেই যেতে পারবো, তেমন কিছু হয়নি আমার! বিনীত নমস্কার জানিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলো সুদাম!

—ওর গমনপথের দিকে চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বললেন ডাক্তার—Poor Soul.

সোমনাথের বাল্যবন্ধু, গৃহচিকিৎসক তিনি! দানপত্রের প্রধান সাক্ষী! লালকুঠির ইতিহাস তাঁর অজানা নয়!

ট্রামে উঠবার পর মাথাটা কেমন টলো, টলো মনে হতে লাগলো সুদামের। চোখ দুটো যেন বড্ড জ্বালা করছে। অতিকষ্টে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লো সিটে, মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো সে!

পাশের সিটেই বসেছিলো করবী!—সুদামের দিকে নজর ফেরালো কিছু পরে!

যেন ভারি চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না?

বার বার দেখলো করবী ওর মুখখানা!

মনের গহন বনে চললো ব্যাকুল অনুসন্ধান—কে? কে?

চমকে উঠল স্মরণ বিদ্যুৎ!—তার আলোতে চিনলো করবী ওকে—পরম বিস্ময় ভরে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো—সু—দাম!!!

—কে? চমকে উঠে চোখ মেলে চাইলো সুদাম।

—চিনতে পারছো না সুদাম? আমি করবী!

ফিরলে কবে?

—ছোটমাসী? ওর দিকে চেয়ে হাসলো সুদাম!

—তা প্রায় বছরখানেক হয়ে গেলো ফিরেছি!

কথা বলতে বলতে কেমন হাঁফাতে লাগলো সে। চোখ দুটো লাল, লাল!

তোমার কি শরীর অসুস্থ সুদাম? ব্যস্তভাবে শুধোয় করবী!

—হ্যাঁ ছোটমাসী। বাড়ীতে বোধ হয় হেঁটে যেতে পারবো না।

—কোথায় নামবে?

—এলগিন রোডের মোড়ে—

—ঠিক আছে! আমি যাবো তোমার সঙ্গে সুদাম? বাড়ীটা চিনে আসবো!—এখন আর কথা নয় পরে বলবো, আর শুনবো সব!

ট্রাম থামলো! সুদামের হাতটা চেপে ধরে ওকে সাবধানে নামালো করবী!—উঃ, কি ভীষণ গরম তোমার গা!—বাপরে! এযে বড্ড জ্বর দেখছি! এই নিয়ে বেরিয়েছো? মিতা শুনলে—!

নিজের জিব দাঁত দিয়ে চেপে ধরল করবী! মহা অপ্রস্তুত ভাবে

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলো সুদামের মুখপানে !..বুকটা যেন কেটে গেলো ওর সুদামের ঠোঁটের কোণে করুণ ম্লান হাসি দেখে ! একটা চলন্ত ট্যাক্সি যাচ্ছিলো,—তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো করবী !

দিন সাতেক বাদে জ্বরটা ছাড়লেও, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর কড়াশাসনে সুদামকে আরো একসপ্তাহ শান্তছেলের মত বাড়ীতে থাকতেই হলো।

করবী রোজ এসেছে, যমুনাদেবীর সঙ্গে সুদামের শুশ্রূষায় যোগ দিয়েছে !

—জ্বরের মাঝেই একদিন সুদাম বলেছিলো, ছোটমাসী ! তুমি এত সেবা করতে পারো, তা'তো জানতাম না আগে !

—সেই আগেকার ছোটমাসী আমি আর নেই গো !

নার্সিং শিখ্‌ছি যে ! মানে খোলস পাল্‌টেছি ! কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে উঠতো যমুনাদেবীর চোখ দুটো ! বলতেন—

—এমন বিপদের দিনে ভগবানই তোমাকে এনে দিয়েছেন বোন্‌টি—তা, না হলে একা যে কি করতুম !

সুমিতার কথা ওঠে না ! ওরা সকলেই যেন—পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে মিতার তথ্যটি বেদনার আড়াল দিয়ে গোপন রাখতে চায় !

পথ্য পাবার দিন দুয়েক পরের সন্ধ্যায় খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে একটা বই নাড়া চাড়া করছিলো সুদাম ! ঘরে এলো করবী, সঙ্গে তার অনিরুদ্ধ !

—কাকে এনেছি দেখতো সুদাম, চিনতে পারো কি—না ! সকৌতুকে বললো করবী !

একটু বিস্মিত ভাবে চাইলো সুদাম অনিরুদ্ধর দিকে !

—অনিরুদ্ধ এগিয়ে এসে খাটের পাশের চেয়ারটি দখল করে বললো—দুর্ব্বল মস্তিষ্কটাকে অনর্থক খাটিয়ে আর কাজ কি ?—আমার নাম অনিরুদ্ধ বসু, বিলেতে থাকতে কয়েকদিনের পরিচয় আপনার সঙ্গে !

—ও হো, তো ! মনে পড়েছে ! যুক্তকরে ওকে প্রণাম জানিয়ে হেসে বললো সুদাম—অপরাধ নেবেন না, স্মৃতিশক্তির ধারটা আমার দিন দিন কেমন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে ! অনেকদিন বাদে আপনাকে দেখে ভারি ভালো লাগছে আমার !

—হ্যাঁ ! আমারও ! বললো অনিরুদ্ধ ! করবী দেবীর কাছে আপনার খবর পেয়ে নিজেই এলাম, অবশ্য পূর্ব্ব পরিচয়ের দাবী নিয়ে এবারের আসা নয় ; আমার এবারের পরিচয় মিতার দাদা আমি ! মানে একমাত্র দাদা !

—তাই নাকি ? হাসলো সুদাম ! তা আপনার ভগ্নির খবর

—খবর? মাথা চুলকালো অনিরুদ্ধ!

বিব্রত দৃষ্টিতে চাইলো করবীর মুখের দিকে!

—ওর অপ্রস্তুত ভাবখানা দেখে হাসলো করবী—তারপর বললো—কি আশা করো তার সম্বন্ধে সুদাম?

তোমার কাকাকে চিনতে পেরেছো বোধ হয়; তার সঙ্গিনী হয়ে মিতার অবস্থাটা কি হতে পারে কল্পনা করে নাও।—বেচারী অত বড় বাড়ী খানায় একেবারে একলা থাকে! কোথাও বেরোয় না; যাকে বলে নির্ব্বাসন দণ্ড; তাই ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তার কথা—কি আর বলবো বলো! গলার স্বর কেঁপে উঠলো করবীর—চোখ দুটি ভরে এলো জলে!

—সোজা হয়ে উঠে বসলো সুদাম! বেদনা-ছলো-ছলো, চোখ দুটি তুলে চাইলো করবীর দিকে—

—একলা? একলা থাকে কেনো মিতা?

তুমি, দিদিমা, ছোট মামা! সকলেই তো আছো।

—না সুদাম, আমরা প্রায় বছর চারেক অন্যত্র আছি!

—সে কি? জানতাম না তো?

—জানাবার আর সময় পেলাম কই? স্বর নিয়ে তো প্রথম দেখা। এবারে সবই বলছি শোনো! কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো করবী!

—আপনার হাতে কি বই ওখানি? শুধোলো অনিরুদ্ধ!

—বালুচর! বললো সুদাম! একখানি কবিতার বই!

—বালুচর? ইছামতীর লেখা? —কেমন লাগছে?

—অপূর্ব্ব! প্রত্যেক কবিতাটি রসোত্তীর্ণ! তবে রসটি, বেদনার রস আর কি! সেই জন্যেই বোধ হয় এত মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে! একটা ছোট্ট নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললো সুদাম!

—ঠিক বলেছেন! শুনেছি, লেখিকার প্রথম রচনা এই বইখানি। আশ্চর্য্য হলাম বইখানি পোড়ে—প্রথম রচনা যে এত মনোরম হতে পারে।

—আরো আশ্চর্য্য হবেন শুনে যে, বইখানি ডাকে কে-যে আমাকে পাঠিয়েছেন জানি না। এমন একজন অখ্যাত দীন হীনকে এমন কাব্যগ্রন্থের উপযুক্ত সমঝদার কে যে ঠাওরালেন, বুঝলাম্ না। বোধ হয় পরিহাস করেছেন কেউ, সেই কথামালার শেয়াল আর বকের গল্পের মত।

—না, না, তাইবা ভাবছেন কেন? হয়তো আপনার পরিচিত বা অতি প্রিয়জন, আপনার জন, কেউ পাঠিয়েছেন—পাঠিয়ে হয়তো তিনি নিজেই তৃপ্তি পেয়েছেন,—আর এমনো তো, হতে পারে, ছদ্মনামের অবগুণ্ঠন সরিয়ে একদিন তিনি উদয় হতে পারেন আপনার সামনে! অসম্ভব নয় কিছু!—সেদিন এ অভাজনকে স্মরণ করবেন কিন্তু! কারণ এই ইছামতীটি যে কে, বাস্তবে কি তার পরিচয় জানবার যথেষ্ট কৌতূহল আছে আমার, প্রকাশকের দোরে ধর্ণা দিয়েও এ রহস্যের সূত্র কিছু মেলেনি!—এই বাজারে বইখানার চড়্ চড়্ করে তিন্‌টে সংস্করণ কেটে গেলো, একবছরের মধ্যেই?

—তিনটে কেন, ছ'টা সংস্করণ কেটেছে শুনলেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; কারণ যথার্থ ভালো জিনিষ সমাদর পাবেই!—হাঁ! ছোটমাসী কি যেন বলবে বলছিলে না? করবীর দিকে চাইলো সুদাম।

—তাইতো ভাবছি, বলবো করবী—অপ্রিয় ঘটনাগুলো তোমাকে জানিয়ে······

—জানলে মনে আঘাত পাবো এইতো? ম্লান হেসে বললো সুদাম, সব কিছুকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার শিক্ষা করছি ছোটমাসী! জানি, যা ঘটবার—তা অবশ্যই ঘটবে, এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের চলতে হবে। শত চেষ্টাতেও ঘটনাস্রোতকে যখন ফেরাবার আমাদের ক্ষমতা নেই, তখন শান্তচিত্তে তাকে যাতে মেনে নিতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাদের করা উচিৎ—এই আমার মনে হয়।

—আপনার মূল্যবান অভিমতটিকে জীবনে কার্য্যকরী করতে পারলে মনে হয় জীবনের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানের সূত্র কিছু মিলতে পারে! বললো অনিরুদ্ধ।

—আপনি নয়—তুমি! হেসে বললো সুদাম, মিতার দাদার ওপর আমিও ভাগ বসালাম, আমারও যে দাদা-দিদির একান্তই অভাব!

—অবশ্যই! আজ থেকে দাদার কড়া শাসনটিকেও কিন্তু মেনে চলতে হবে—হা, হা শব্দে উচ্চরোলে হেসে জবাব দিল অনিরুদ্ধ!

—ভরসা পেলাম এতক্ষণে!—মৃদুহেসে বললো করবী;—বছর চারেক আগে জামাইবাবুর দানপত্রে, তাঁর সম্পত্তির যা ব্যবস্থা হয়েছে, তা'তো তুমি জানোই! এর কয়েকদিন পরেই অসীম এসে মাকে সোজাসুজিই বললো,—

—এত বড় বাড়ীটা আমি অম্‌নি ফেলে রাখতে চাইনা, অন্যের ব্যবস্থা করবো,—মানে আপনারা যদি চান্ তো একতলায় থাকবেন ভাড়া দিয়ে! দোতালায় আমি নিজে থেকে আমার বাড়ী ভাড়া দেব।

একটু থেমে,—আবার আরম্ভ করলো করবী—

—মাকে তো জানোই সুদাম,—তিনি সেইদিনই আমার হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। ছোড়দা আর আমি কত বোঝালাম, যে, একটা ফ্ল্যাট খুঁজে নিয়ে তবে যাবো,—কিন্তু মা কোনো কথাতেই কান দিলেন না!

মা ছোড়দাকেও বললেন সঙ্গে আসতে,—তারও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার নতুন বিয়ে করা বৌ একেবারে চোখ কপালে তুলে বললো:—

—ফ্ল্যাটতো আর বিনাভাড়ায় জুটবেনা;—তার চেয়ে ভাড়া দিয়ে এখানেই থাকবো! এমন চমৎকার মার্ব্বেলের ঘর, এমন লন, ফুল ছেড়ে আমি একপাও নড়চিনে,—যেতে হয় তুমি যাও মায়ের আঁচল ধরে।

আহা কত আরাধনা করে পাওয়া বৌ!

ছোড়দা মায়ের আঁচলের বদলে বৌএর আঁচলই ধরলো!

—ছোটমামা বিয়ে করেছেন নাকি? শুধোলো সুদাম কৌতূহলী হয়ে।

—হাঁ,—সে তো অনেকদিন! মিতার বিয়ের মাস ছয় পরেই! বৌ তোমার অচেনা নয়,—তোমার কাকার বান্ধবী··· শুকতারা সেন!

—কোন্ শুকতারা? সেই অভিনেত্রী শুকতারা? কাকার সঙ্গে একবার গিয়েছিলেম কোন একটা নাচ গানের ক্লাব না ক্লাব

জানি না, সেখানে দেখেছিলাম ওঁর নাচ। সেখানকার—পরিচালিকা যিনি। মাসীমা বলতেন তাঁকে কাকা—ভদ্রমহিলা, কি রকম যেন, আমি তখন বেশ বড় হয়েছি,—আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এমন ছেলেমানুষের মত আদর করতে লাগলেন, ভীষণ লজ্জা করছিলো আমার! যাকুগে ওকথা—তারপর রাস্তায় নেমে—

—ও! অলকাপুরীর মাসীমাকেও তুমি চেনো দেখছি! চোখ বড় করে চেয়ে বললো করবী—ছেলে, মেয়ে ধরার জেলেনি তিনি। ঐ অলকাপুরীটি তাঁর একখানি মোক্ষম জাল। আর ঐ জালে ধরেই মিতার গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন তিনি। জানতাম না,—সুদাম, আগে এসব জানতে পারিনি,—যখন জানলাম, তখন করবার আর কিছু নেই!

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলো করবী!

—জানবার কোনো উপায়ই ছিলো না,—যদি না পুলিশের হাঙ্গামা হতো। বললো অনিরুদ্ধ।

—পুলিশের হাঙ্গামা? সে কি? চমকে উঠলো সুদাম।

—মানে, টাকা রোজগারের নানারকম কৌশল বিস্তার করছিলেন ভদ্রমহিলা! নাচ গানটা বাইরের শো মাত্র! ধনী সন্তানদের নিয়ে জুয়োখেলা, ছেলে মেয়েদের অবৈধ ব্যাপার,—ইত্যাদিতে প্রচুর টাকা লাভ করতেন! ওঁর দলে অবশ্য ছিলেন কলকাতার আরো সম্ভ্রান্ত নামকরা লোকেরা!—বাঙালী অবাঙালী সব রকমই নিয়ে তৈরী করেছিলেন তিনি ঐ অবৈধ ব্যবসায়ের ঘাঁটিটি!

আমিও দিনকতক ওখানকার মেম্বার হয়েছিলাম কি—না, তাই জেনেছিলাম ব্যাপারগুলো। প্রথম প্রথম বেশ মজাই লাগতো,—তারপর আস্তে আস্তে—এলো সন্দেহ, বিতৃষ্ণা! ছেড়ে দিলাম অলকাপুরী।

এর পরেই কাগজে দেখলাম ভয়ানক খবর!

দল বল সহ গেপ্তার হয়েছেন মাসীমা! ঐ ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক কয়েকজন সব জানতে পেরে পুলিশের কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছিলেন আর কি!

মামলা অবশ্য চললো না। টাকা ঢাললো রতনলাল ক্ষেত্রি! মাসীমা খালাশ পেলেন বটে, তবে বিষ-দাঁতটি খোয়া গেলো। অলকাপুরীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেলো!

রতনলাল ক্ষেত্রির উপকারের প্রতিদান দিতে কিন্তু তিনি ভোলেননি;—পাপিয়া রাওকে নিয়ে বোম্বাই পালানোর মূলে তাঁর মূল্যবান কৌশল দানের কথা রতনলাল কোনো দিন ভুলবে না আশাকরি! খালি দুঃখ হয় বেচারি বুড়ো, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে দেখে—মা-মরা নাতনীটিকে—হারিয়ে কেমন যেন হয়ে গেছেন। রতনলালের কাছে—বিস্তর দেনাও ছিলো তাঁর,—আর অর্থবল, দেহের বল কিছুই আর এখন নেই.. তাই..'দ'রে পড়া হাতীর মতই চাম'চেকের লাথীকে শিরোধার্য্য করলেন তিনি!..

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলো অনিরুদ্ধ!

করবী একবার চোখ তুলে চাইলো ওর মুখের দিকে—চাপা বেদনার ম্লান ছায়া ভাসছে যেন ওর চোখ দুটিতে!

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সুদামের কপালে, বিস্ময় ফুটেছে.. চোখের দুটি তারায়!

উঃ কি ভয়ানক!!!..এই ভয়াবহ অলকাপুরীতে নাচ গান শিখতো মিতা? কে নিয়ে গেলো সেখানে তাকে ছোটমাসী? সে তো....ওসব চিনতো না,..তার প্রকৃতি যে ছিলো বড় কোমল, ভারি ভীতু!—উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠে—বললো সুদাম!

কে নিয়ে গিয়েছিলো? এর জবাব তো তোমার অজানা নয় সুদাম! তোমার কাকা,—অসীম হালদারের কীর্ত্তি এটা! অলকাপুরীর নামকরা পাণ্ডা ছিলেন তিনি, তা তো জানতেই! প্রথম প্রথম আমরা কেউ কিছু সন্দেহই করিনি—কিন্তু তারপর..

ও প্রসঙ্গ—আজ থাক্ ছোটমাসী! আর্ত্তকণ্ঠে বললো সুদাম!

ওহো! এ আমি..কি করছি! ওর দুর্ব্বল মাথায় দুঃসহ বোঝাটা চাপাতে চাইছি? মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো করবী!

সকল লজ্জার হাত থেকে ওকে বাঁচালেন যমুনা দেবী! দুটি খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন,—পেছনে দুকাপ চা নিয়ে এলো বাচ্ছা চাকর—মঙ্গল।

—একি? রুগীর ঘরে এসব কেন দিদি? দাঁড়িয়ে উঠে শশব্যস্তে যমুনা দেবীর হাত থেকে প্লেট দুটো নিয়ে টেবিলে রাখতে, রাখতে, বললো করবী—আমায় ডাকেননি কেন? আমিও যোগাড় দিতাম আপনার সঙ্গে,—তাতে আমার শেখাও হতো!

—কি-ই বা করেছি? মাছ মাংস'র পাট তো বাড়ীতে নেই, শুধু চা ধরে দিতে মনটা যে কেমন করে ভাই, তাই সামান্য দুখানা নিমকি ভেজে নিয়ে এলাম! ক্ষীরের পুলি আগেই করা ছিলো!...

—বেশ করেছেন মাসীমা—খাবারের ডিস্ টেনে নিয়ে বললো অনিরুদ্ধ! মা মাসীরা খাওয়াবেন না তো খাওয়াবে কে? ওসব অকেজো ভদ্রতা আমার নেই!

বাড়ীতে ঢুকে প্রথমেই যমুনাদেবীর সঙ্গে করবী অনিরুদ্ধ'র পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। ভারী ভালো লেগেছিলো ওকে

—মুখের ভাব যেন অনেকটা সুদামের মত! যমজ ভাই যেন ওর!

—একি আর খাওয়া বাবা? ভালো করে দামী'র সঙ্গে বসে পরে খেও। বললেন তিনি!

—সে কথা আর আপনাকে বোলতে হবে না মাসীমা, ক্ষীরের পুলি খেতে খেতে বললো অনিরুদ্ধ—এখন আর আপনার একটি ছেলে নয়, এ ছেলেটাও এসে দৌরাত্ম্য করবে মাঝে মাঝে! আর যে রকম লোভনীয় খাবার দেখছি আপনার হাতের, এর কাছে কোথায় লাগে বিলিতি হোটেলের মোগ্‌লাই রান্না!

—খাবার তৈরী করতে তো প্রায় ভুলেই গেছি বাবা, ক্ষুব্ধ ম্লান মুখে বললেন যমুনাদেবী—খাবার লোক কোথায়? আগেকার দিনে,—নিত্যি নতুন ধরণের খাবার তৈরী করে সকলকে খাইয়ে কত আনন্দ তৃপ্তি পেতাম, তখন ঠাকুরপো কত ভালো বাসতো আমার হাতের রান্না খেতে, আর এখন···

অবরুদ্ধ বেদনার চাপে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল ওঁর! নিজেকে সংযত করে নিয়ে আবার বললেন তিনি—

—হ্যাঁ রে দামী! সেই তো এসে একবার গিয়েছিলি! ঠাকুরপোর সঙ্গে তো দেখা হয়নি বললি, আর যাসনি সেখানে? মিতুর সঙ্গেও দেখা করলি না একবার?—আহা, মেয়েটার জন্যে বড্ড প্রাণটা কেমন করে রে!

—হ্যাঁ মা গিয়েছিলাম আরেকদিন; তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি! হেসে জবাব দিলো সুদাম। কাকা নীচেই ছিলেন, সেখানেই বসে দুচারটে কথা বললেন আমার সঙ্গে;—আরো বললেন মিতার শরীরটা ভালো নেই; অন্যদিন দেখা কোরো।

—ও, তাই বুঝি! নিঃশ্বাস চাপলেন যমুনা দেবী। অনেকক্ষণ কিছু খাসনি দামু! দুধটা আনি। ক্লান্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

—তারপর ছোটমাসী! এখন নিবাস কোথায় তোমাদের? ছোট মামাতো লালকুঠিতে আছেন জানলাম, অবশ্য আমার সঙ্গে দুদিনই দেখা হয়নি। নীচের ঐ কোণের দিকের যে ঘরটা সর্ব্বদা বন্ধ থাকতো—মানে মিতার দাদু খুন হয়েছিলেন শুনেছি যে ঘরটায়, সেই ঘরটা এখন খোলা, আর পর্দ্দা সবানো ছিলো, বেশ সুসজ্জিত মনে হলো। একজন মহিলা বার দুয়েক এসে কাকাকে ডেকে নিয়ে গেলেন, তখন চিনতে পারিনি, এখন মনে হচ্ছে তিনিই ছোটমামার স্ত্রী বোধ হয়।

—বুঝেছো ঠিকই; অল্প হেসে বললো করবী। লালকুঠি থেকে চলে আসবার পর আমি মাকে লুকিয়ে দু'তিন দিন মিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম ঐটি ওদের শোবার ঘর হয়েছে।

নিবাস?—প্রথমে পথে নেমেই মা'র মনে হল কোথায় যাওয়া যায়! নিজের বাড়ীতো ভাড়া দেওয়া। অলকাপুরীতে যাবেন স্থির করলেন দেশপ্রিয় পার্কে বসে। কিন্তু আমার মন চাইলো না সেখানে যেতে—গোড়া থেকেই কেমন আমার ভালো লাগেনি ও জায়গাটা। আমি বললাম চলো যাই আলিপুরে অনিরুদ্ধ বাবুর বাড়ী। তাঁর মায়ের সঙ্গে তো তোমার বেশ আলাপ আছে, আর তিনি বড় ভালো। রাজী হলেন মা। সেখানে গিয়ে একেবারে ঠাকুর-আদরে কাটলো কয়েকদিন, তারপর ওঁদের চেষ্টাতেই বাড়ী একটা মিললো চেৎলায়। টিউসানী করি, চলে যায় কোনরকমে দুজনের। জামাইবাবু প্রচুর টাকাও দিয়ে গেছেন। আর কোনো কষ্ট নেই, খালি মিতুর জন্যে মাঝে মাঝে বড্ড মনটা কাঁদে।

বিমর্ষ দৃষ্টি মেলে, চুপ করলো করবী।

—এত সব ব্যাপার ঘটে গেছে? আমি এর কিছুই জানি না! রুক্ষ চুলগুলো, হাতের মুঠোয় চেপে ধরে টানতে টানতে বিষণ্ণকণ্ঠে বললো সুদাম; তা মাঝে মাঝে ওখানে গেলেই তো পারো ছোটমাসী! মিতা আসে না তোমাদের কাছে?

—না। সে আজ চার বছর নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছে নিজেকে! কোথাও যায় না! কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। আমি প্রথম প্রথম যেতাম ওর কাছে,—কিন্তু যাওয়া বন্ধ করতে হলো!

—কেন? কেন ছোটমাসী?—ব্যাকুল কণ্ঠস্বর সুদামের!

—ওর দিকে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে চাইলো করবী, তারপর উঠে গিয়ে সুদামের একখানি হাত চেপে ধরে আর্ত্তকণ্ঠে বললো সে—

—জানো সুদাম! আমাকে জড়িয়ে ধরে মিতুর সেদিন কি কান্না!··তুমি এখানে আর এসোনা! এলে হয়তো তোমার সম্মান আর থাকবে না!—

আর কিছু বলতে পারেনি সে সুদাম! তবুও আমি বুঝতে পেরেছিলাম সব! ওর ক্ষত বিক্ষত··মনটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। আঁচলে চোখ মুছলো করবী!

'বালুচর' বইখানিকে অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুলে নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলো সুদাম!

বাগানে সদ্যফোটা ল্যাভেণ্ডার চাপার গন্ধ মুঠো মুঠো চুরি করে, ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে, শন্ শন্ করে, খোলা জানলা-পথে বেরিয়ে গেলো আশ্বিনের উদাসী বাতাস!

বড় চেনা, বড় ভালোলাগা গন্ধটি যেন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলো সুদামকে! কোন্ এক হারিয়ে-যাওয়া মধুর রাগিণীর বিষাদ-ভরা সুর কেঁদে ফিরতে লাগল ওর অন্তরের গভীর অতলে!

লালকুঠির ··নীচের তলায় বারান্দায় অস্থির ভাবে পাইচারী করছিলো অনিল!

জ্বালা, বুকভরা শুধুই জ্বালা! এজ্বালা আর সহ্য হয়না! বিক্ষিপ্ত মনটা তার বার বার প্রশ্ন জানাচ্ছে ওর কাছে—

কি পেয়েছো? কি পেয়েছো তুমি? কি রকম? কিসের—লোভে··মা বোনকে ত্যাগ করেছিলে?

মিতুর সর্ব্বনাশের বিনিময়ে কি লাভ করলে তুমি? এতদিনের দিবা রাত্রির পরিশ্রমের অর্থে কার ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ জুগিয়েছো? নিজের মনুষ্যত্বকে বলি দিয়েছো কার পায়ে? কে? সে? সে আলেয়া! ওর সবটাই মিথ্যা ছলনা মাত্র!

পেয়েছে বৈকি কিছু তার কাছে! পেয়েছে বঞ্চনা, অবহেলা, চাতুরী, আর নিদারুণ হতাশা!

ঢং ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা বেজে গেলো, এখনও বাড়ী ফেরেনি শুকতারা!
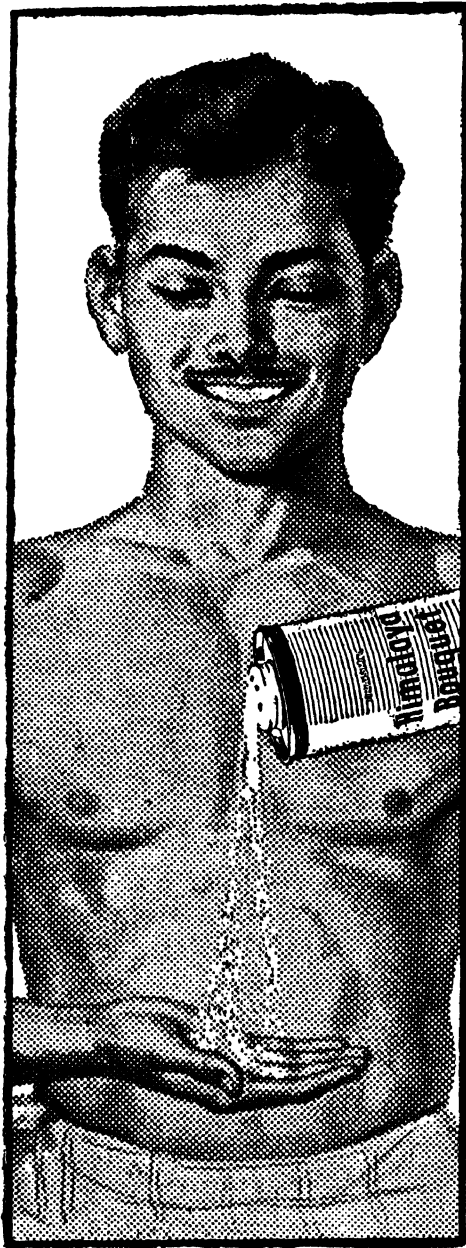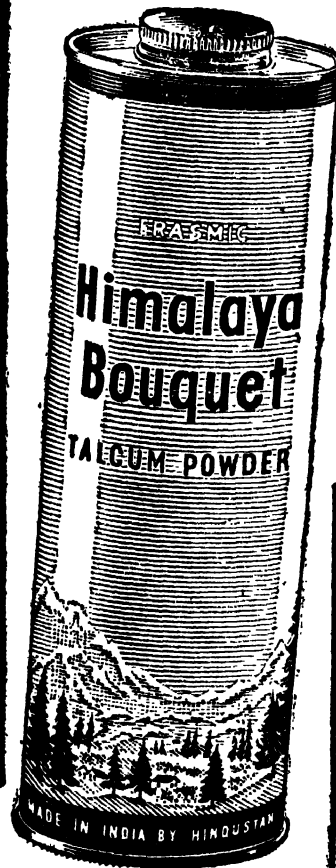
কোথায় গেছে?··

[ক্রমশঃ

বাউল পদ্মলোচন

বাউল-কবিদের মধ্যে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন লালন ফকির। লালন ফকিরের মতো অতটা প্রসিদ্ধ না হইলেও, পদ্মলোচন বা 'পোদো' একজন সুকবি বাউল ছিলেন।

অধিকাংশ বাউলাঙ্গের গানের মধ্যে তত্ত্বকথা, স্বর-সৌন্দর্য, গীতি-সঙ্গতি প্রভৃতি অতুলনীয় হইলেও, অশিক্ষিত বাউল-কবিদের বহু গানই কাব্যাংশে নিকৃষ্ট। ইহার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমতঃ, বাউল সাধকরা জনসমাজ হইতে আত্মগোপন করিয়া দূরে থাকিত, তাহার ফলে তাহাদের গানগুলি রসিক সমাজে সুপ্রচারিত হয় নাই। ফলে, তাহাদের বহু গানেরই ভাষাভঙ্গী প্রাচীন ধারায় পরিচ্ছিন্ন, সমঝদারদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিবার অবসর পায় নাই।

ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন,—"বাউল গান আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা হইতে ভাষা সম্বন্ধে কোন প্রাচীনত্বের অনুমান করা যায় না। খুব বেশি হইলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহাদের রচনাকাল। লালনের গানের রচনা যদি যৌবনকাল হইতে আরম্ভ হয়, তবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে তাঁহার রচনা আরম্ভ হইয়াছে—এইরূপ সঙ্গত অনুমান করিতে পারি। বড় জোর, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান গানগুলির রচনাকালের শেষ সীমা ধরা যাইতে পারে।"

দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত অশিক্ষিত বাউল কবিদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী গানগুলি রচিত। তাহারা প্রচলিত ভাষায় কোন প্রকারে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছে। উচ্চতর রচনাভঙ্গীর সঙ্গে তাহাদের পরিচয়ই ঘটে নাই।

তৃতীয়তঃ, লোক-মুখে-মুখে এসকল গানের নানাভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গায়করা নিজেদের মনোমত শব্দের যোজনা করিয়াছে, অর্থ-সঙ্গতির রূপান্তর করিয়াছে। তাহার ফলেও গানগুলির বিকৃতি ঘটিয়াছে।

তবে, রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়ে' যে সকল বাউল-গান আছে, সেগুলি কবিত্ব-রসে সমৃদ্ধ। কিন্তু ঐ শ্রেণীর বাউল গান ঐ কয়টি ছাড়া আর সংগৃহীত হয় নাই বলিলেই চলে।

পদ্মলোচনের যে বাউল গানটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহে আছে, সেটির কাব্যসৌন্দর্য ও সুরমাধুর্য দুই-ই অতুলনীয়—

'আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে,
কমল যে তার গুটাল দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে রসের লহরী,
(কালোয় ঢালা যমুনাতে রসের লহরী)
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাশরি,
শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে।'

কীর্তনের ন্যায় বাউলেও আঁখরের ব্যবহার হইত। এই সকল আঁখর গায়করা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত না। গাহিবার সময়েই তাহাদের কণ্ঠ হইতে আবেগভরে উচ্চারিত হইত। পদ্মলোচনের গানে এইরূপ আঁখর থাকিত।

পদ্মলোচন রাঢ় অঞ্চলের বাউল, তাঁহার অনেক গান বর্দ্ধমান অঞ্চলেই গীত হয়। গোসাঁই হরি ছিলেন তাঁহার গুরু, প্রায় সকল গানেই তিনি গুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতাগুলিতে তিনি নানাভাবে আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়া নিজের অকিঞ্চনতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

'গোসাঁই হরি বলে, ও পোদো নচ্ছার,
মলে চুরি করলি রে গোঁয়ার,
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণী
আমার তাগা বাঁধা হ'ল সার।'

এই ধরণের উক্তি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রাচীন। চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঠিক এই শ্রেণীর সুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। চর্যায় এই সকল উক্তি সে আমলে জনপ্রবাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর হইতে ঐগুলি, সমানে চলিয়া আসিতেছে।

বাংলা গানে অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমকের সাহায্যে পদবিন্যাসের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা সুপ্রাচীন প্রথা। এই শ্রেণীর বাক্‌চাতুর্য কবির-গানের আসরে খবই প্রাবল্য লাভ করে। গানের মধ্যে এইরূপ বাক্‌চাতুর্য ও কথায় কথায় উপমাদি ব্যবহার করা পদ্মলোচনের রচনারও বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর বাউলগান বেশ অভিনয় সহকারে রসাইয়া রসাইয়া গাওয়া হইত:—

গোল ছেড়ে মাল লও বেছে।
গোলমালে মাল মিশান আছে।
গোলমাল বলতে পারে যে,
গোলের ভিতর মাল থাকলেও চিনতে পারে সে।
ওদে পোদো হ'ল কাণা বেড়াল, দই ব'লে কাপাস খাচ্ছে।

'পোদো' কবির আসরী নাম; এই শ্রেণীর খাস্তা-করা নামের মাধ্যমে বাউল-কবিরা জনসমাজের অন্তরঙ্গ হইতে চাহিতেন।

বাউলদের আদর্শ হইলেন রূপ-সনাতন। পরম প্রেমের আহ্বান শ্রবণ করা মাত্র তাঁহারা খ্যাতি-প্রতিপত্তি, পদমর্যদা, ধন-মান সবই ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া চলিয়া যান। পদ্মলোচনের নিম্নলিখিত বাউল গানটিতে তাঁহাদের আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে।

॥ আলোকচিত্র ॥

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একজন বাঙালী মেয়ের আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রটি শ্রীসত্য পাল গৃহীত।

পাহাড়িয়া —মণ্ট মল্লিক

জয়পুররাজ সমাধি —তরুণ চট্টোপাধ্যায়

চাষীভাই —সুব্রত বাগচী

উদয়গিরি (ভুবনেশ্বর)

—সুব্রত মুখোপাধ্যায়

বিশ্রাম
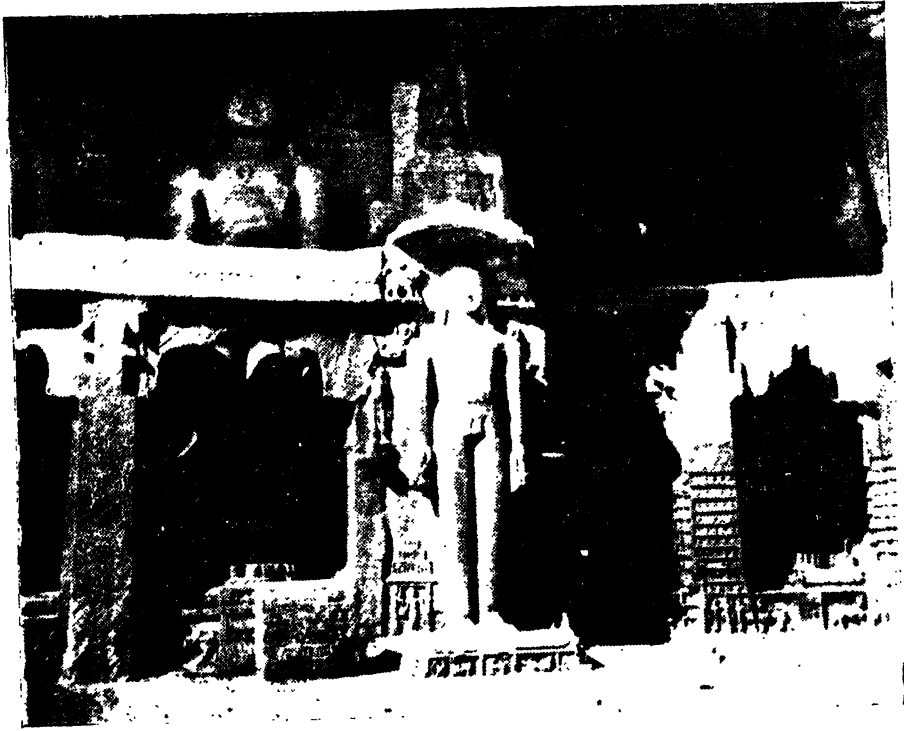
—নিমাইরতন গুপ্ত

অজন্তা —তরুণ চট্টোপাধ্যায়

খেলা —অনিলকুমার ঘোষ

গাগরী ভরণে —সন্তোষ ভট্টাচার্য্য

গানটিতে সুভাষিত প্রবচনগুলি লক্ষণীয়—

'রাগের করণ যজে গেছে গোসাঁই শ্রীরূপ-সনাতন
প্রেমপিরিত করবি যদি ধর গে সাধুর শ্রীচরণ।
কথায় কথা সবাই তো কয়, বোবা নয় তো জগৎ জন,
ছেঁড়া চ্যাটায় শুয়ে থাকে, দেখে লাখ টাকার স্বপন।
গাভীতে হয় গোরোচনা, সে জানে না তার মরম,
দেখ, সাপের মাথায় মাণিক থাকে, তবু করে
ভেক ভোজন।'

গুপ্তকবির নামে প্রচলিত "দিনদুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহানো ভার" নামক বিখ্যাত গানটি পদ্মলোচনের রচিত বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন। তাহা হয়ত সত্যও হইতে পারে, গুপ্তকবি দেশের প্রাচীন কবিদের রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই বাউল কবির রচিত সুন্দর গানটি তাঁহার নামেই চলিয়া গিয়াছে। গানটি বেশ উচ্চাঙ্গের সুরে-তালে রচিত; হাস্যরসের গান বলিয়া যাহাতে সহজে মনে না হয় তাহার জন্য গাহিবার সময়ে সাধ্যমত গাম্ভীর্যমণ্ডিত রাগিণী অবলম্বন করা হইত। গানের শেষে পদ্মলোচন বলিতেছেন—

'গোসাঁই পোদোয় কয় ভেবে এবার, কথা শুনতে চমৎকার,
সাধক বিনে বুঝতে পারে এমন সাধ্য কার?
কথা যে বুঝেছে, সেই মজেছে, গিয়েছে সে বেদের পার।'

রঙ্গরসের গানে তবে এই শ্রেণীর ভণিতা উপযুক্ত হয় নাই। ইহাতে অতীন্দ্রিয়তা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস হইয়াছে মাত্র!

বাউল গানের মধ্যে ঠারেঠোরে আকার ইঙ্গিতে গূঢ় গভীর ব্যঞ্জনা থাকিত, বাউল গানের 'মনের মানুষ—রসের মানুষ' পরমপুরুষের রূপভেদ—

রসের মানুষ খেলা করে বিরজাপারে।
তার করণ উল্টা, স্বরূপ রূপের ছটা,
আছে করণ আঁটা, অতি নির্বিকারে।
আটে আটে চৌষট্টি কুঠুরি ভিতরে,
রসের মানুষ সেথা নিত্য লীলা করে,
তিন দ্বারে কবাট মেরে প্রভু যান তো বাহিরে,
কভু সিংহদ্বারে, কভু সিন্ধু নীরে।

পল্লী-গৃহস্থদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন, বাগ্‌ধারা, টুকরো টুকরো রসের কথা পদ্মলোচনের গানগুলিকে বন্য ফুলের মত সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে—

(ওরে তুই) রইলি বেলা গাছে ব'সে
ডুমুর গিলবি কোন সাহসে?
ও তোর মরবার এই কি করণ, শোনরে পদ্মলোচন,
পিপীলিকার পাখা ওঠে কেবল মরিবার তরে।

শ্রীজয়দেব রায়

নতুন রেকর্ড গীতি

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82834—শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান "হয়তো সেদিন" ও "ভালবাসো তুমি শুনেছি অনেক বার।"

N 82835—দু'খানি কীর্তন গান "সখি, কহিও নিঠুর আগে" ও "কেন গেলাম যমুনার জলে" গেয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ।

N 82836—"ঐ দূর নীলাকাশ" ও "চম্পক বনে" মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অনবদ্য দু'টি আধুনিক গান।

N 82837—নবাগতা শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "রিক্ত আঁখির" ও "একটি গানের একটি কলি" সবাইকে মুগ্ধ করবে।

N 76088, N 76089, 76090 এবং 76091—রেকর্ডগুলিতে "মাহুত বন্ধুরে" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলম্বিয়া

GE 24960—পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের ভাব মধুর কণ্ঠের শ্যামা সঙ্গীত "কালো বলে হয়নি বলো" ও "মা বলে মা ডাকতে তোরে।"

GE 24961—কুমারী বনানী ঘোষের অভিনব আধুনিক গান—"আম আঁটির ভেঁপু" ও "না জানি ঐ কাজল কালো"।

GE 24962—"মেঘ রাঙানো অস্ত আকাশ" ও "ছলকে পড়ে" বৈশিষ্ট্যময় আধুনিক গান—গেয়েছেন শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 24963—অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা কণ্ঠের সুন্দর গান "দেখ শুকতারা" ও "চাঁদের থেকে অনেক দূরে।"

GE 30427—শ্রীমতী আশা ভোঁসলে ও মান্না দে'র কণ্ঠে "গলি থেকে রাজপথ" বাণীচিত্রের গান।

GE 30428, GE 30429 এবং GE 30430 রেকর্ডগুলিতে "রাতের অন্ধকারে" বাণীচিত্রের গানগুলি গেয়েছেন—শ্রীমতী আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ইলা বসু।

আমার কথা (৫৬)

সঙ্গীত-শিল্পী পরেশ দেব

বাংলার পল্লীগীতি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এই পল্লীগীতির মধ্যেই বাংলার গ্রামীন সমাজের সাহিত্য ও সঙ্গীত সহজ ভাবে বিকাশ লাভ করেছে। তাই, এ বাংলার তথা বাঙালী সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান।

সরল পল্লীজীবনের আশা-নিরাশা, প্রেম-বিরহ, সাধন-ভজন, দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক ভাবাবেগের অতি সহজ অভিব্যক্তি দেখি পল্লীগীতির ছন্দে ছন্দে। নিত্য-ব্যবহার্য্য কথায় সাধারণ অলঙ্কার-উপমায় এ-এক অনায়াস অনাড়ম্বর সুধুর সাহিত্য-সৃষ্টি ; পল্লী-কাননে প্রকৃতির আপন খেয়ালে প্রস্ফুটিত বিচিত্র ফুলের সম্ভার, বিচিত্র মাধুর্য্য-ভরা। কবে অজানা কোন্ গ্রাম্য কবি আপন খেয়ালে রচনা ক'রছেন এই সুললিত পদরাজি, হৃদয়ের গভীর আবেগ ও দরদ-ভরা সুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন পল্লীবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে। বৈরাগী-বাউলের ভজন, নদীতে নৌকা-চালনারত মাঝি, খেত-খামারে কর্মরত কিষাণের গানে পল্লী পরিবেশ কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মণ্ডিত হয়ে উঠে। আধুনিক যুগে নাগরিক সভ্যতার এই জয়যাত্রার মাঝে শহরে উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক সঙ্গীতের পাশে পল্লী-সঙ্গীত তার যথাযোগ্য আসন করে নিয়েছে।

ঐ প্রসঙ্গে গীতিকার ও সুরকার শ্রীপরেশ দেবের নাম উল্লেখ-যোগ্য। পল্লীর গায়কদের নিজস্বভঙ্গি আশ্চর্য্যভাবে রূপ পেয়েছে পরেশ বাবুর কণ্ঠে। এ ক্ষেত্রে ইনি শ্রীশচীন দেব বর্ম্মণের উত্তর-সাধক। সে আজ অনেক দিনের কথা। তরুণ শিল্পী পরেশ দেবের কণ্ঠে 'আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো', 'তুমি কি আমার বন্ধুরে, আমি কি তোমার বন্ধু' ইত্যাদি গানগুলি কোন এক সরলা পল্লীবালার প্রেম ও বিরহে আমাদের মন ব্যাকুল করে তুলেছিল। পরেশবাবু একান্তই পল্লীবাংলার মানুষ, তাঁর কণ্ঠে গ্রাম্য গীতিকারের মনের সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবটি অনায়াস-দক্ষতায় ধরা দিয়েছে।

ত্রিপুরা জেলার "ব্রাহ্মণবাড়িয়া" শহরে ১৯১১ সালে পরেশ দেবের জন্ম। সঙ্গীতের ঐতিহ্য তাঁহার পরিবারে ছিল না। তাই তাঁর আবাল্য সঙ্গীতানুরাগ কোন অনুকূল পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারেনি। তবে মাতামহ অনন্ত কুমার দেব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের শিক্ষক হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁর সাফল্যের সহায়ক হয়। হরেনবাবু নিজে সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, এবং ছাত্রের সঙ্গীত-চর্চ্চায় তিনি ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। তাঁর সস্নেহ সাহচর্য্যে সাধনার পথে পরেশবাবুর যাত্রা শুরু হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সারা ত্রিপুরা জেলায় সুকণ্ঠ বলে পরিচিতি লাভ করেন। এই সময়ে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে আসামের এক চা-বাগানের সাহেবকে গান শুনিয়ে তিনি চাকুরী লাভ করেন। কিন্তু এই চাকুরী-জীবন বেশি দিন তাঁর ভাল লাগেনি। সঙ্গীত-সাধনার উগ্র বাসনায় আবার তিনি ফিরে এলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেই জানেন, তখনকার পুর্ববাংলার এই ক্ষুদ্র শহরটি সঙ্গীত চর্চ্চায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন ওস্তাদ্ আলাউদ্দীন খাঁ-সাহেব, স্বর্গতঃ কামিনী কুমার ভট্টাচার্য, স্বর্গতঃ অজয় ভট্টাচার্য্য, স্বর্গতঃ সুরসাগর হিমাংশু দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পী ও গীতিকার। বাংলা সঙ্গীতে সমগ্র ত্রিপুরা জেলার অবদানও কম নহে।

কামিনীবাবু ও ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ-র নিকট পরেশ দেব দুই বৎসরকাল সঙ্গীত-সাধনার সুযোগ পান। পরে ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় এসে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী জ্ঞান দত্ত, বাণীকণ্ঠ ও অজয় ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সুরশিল্পী শৈলেন দত্তগুপ্তের কাছে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই সময় মেগাফোন কোম্পানী তাঁর "ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো" গানখানি রেকর্ড করে এবং কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রেও তিনি গান গাইবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত পরেশবাবু মেগাফোনে সঙ্গীত-শিক্ষকের কাজ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৫ সালে কালী ফিল্মের একখানি ছবিতে তিনি 'প্লেব্যাক' গান করেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় উক্ত ছবিখানির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন।

১৯৪০ সালের পর তিনি ঢাকা বেতারে যোগদান ক'রে নিয়মিত পল্লীগীতি, ভজন ও ঝুমুর গানের প্রচার করেন। সঙ্গীতের সুর ঢং ও পল্লীগীতিতে রাগ-প্রধানের সমন্বয়ে পরেশ দেব শচীন দেব বর্ম্মণেরই অনুবর্ত্তী। তাঁহার 'ভ্রমরা যাওরে মধুবনে মধু নাই', 'ওরে শ্যামের বিহনে মধু-বৃন্দাবনে গোঠের ধেনু নাহি তৃণ খায়,' 'কোন্ রঙ্গীলা নাইয়া ডিঙ্গা বাইয়া যাওরে' প্রভৃতি গানগুলি শুনলে শচীনদেবের বিখ্যাত গানগুলিই মনে পড়ে। ১৯৪০ সালে 'রাজকুমারের নির্ব্বাসন' ছবির প্লেব্যাক গাইবার জন্যে সঙ্গীত-পরিচালক শচীনদেব বর্ম্মণ পরেশ বাবুকে মনোনীত করেন।

মেগাফোনে কাজ করার সময় নজরুল ইসলাম পরেশবাবুর পল্লীগীতির প্রতি অনুরাগে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে গাহিবার জন্যে গানও লিখে দেন। ১৯৩৯ সালে স্বর্গত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে তাঁর ইউরোপ যাত্রার কথা হয়। কিন্তু যুদ্ধারম্ভে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪৭ সাল হ'তে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলম্বিয়া কোম্পানীর সঙ্গীত-শিক্ষক (ট্রেণার) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে কয়েক বৎসর মেদিনীপুরের বাসন্তীপুর ষ্টেটের ষ্টেট-মিউজিশিয়ান ছিলেন।

পরেশ দেব বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনে যোগদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর অভিনন্দন লাভ করেছেন। ১৯৪৭ সালে তিনি তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলনের বিভাগীয় বিচারক পদে নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। 'এণ্টালি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' সঙ্গীতের একটি বিভাগের পরিচালনা-ভারও পড়ে পরেশ বাবুর উপর। রাজভবনে সোভিয়েট অতিথিবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে তিনিও আমন্ত্রণ লাভ করেন। পরেশবাবু কয়েকখানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সঙ্গীত-সাধনায় পরেশবাবু জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং যতদিন বেঁচে থাকবেন, সঙ্গীতের সাধনাই করে যাবেন।

**I do not consider myself a good painter at all.
I am a genius.** ***—Salvador Dali***
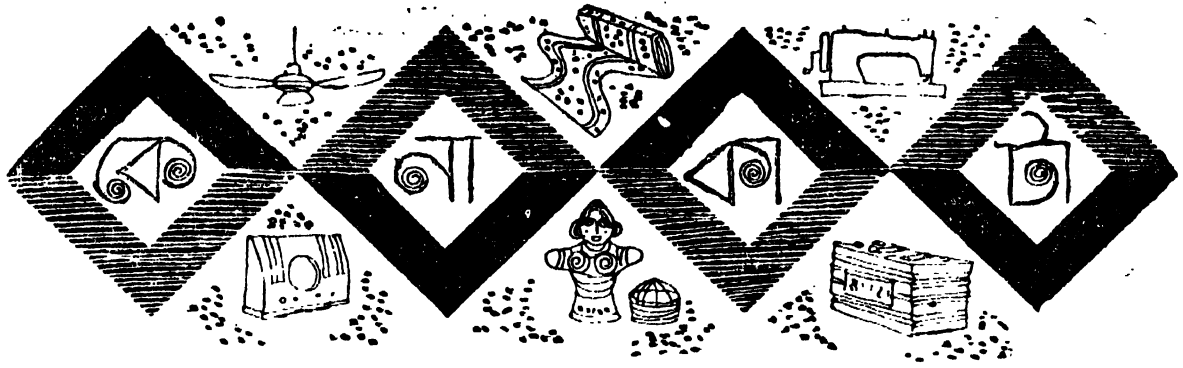
এ দেশের অলঙ্কার-শিল্প

বাংলা তথা ভারতে গহনা বা অলঙ্কারের প্রচলন চলে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। আজকের দিনে সেটা অবশ্য সহস্র গুণে বেড়েছে, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য্য। বাঙালী সাধারণভাবে রূপ ও সৌন্দর্য্যের পূজারী—তাই নারীদেহে যে-ধরণেরই হোক, অল্প-বিস্তর অলঙ্কার তার চাই।

এ কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নয়—বাংলার অলঙ্কার-শিল্প বাংলার একটি পরম ঐতিহ্য। সমগ্র ভারতে তো বটেই, বহির্ভারতেও এর সুনাম ও খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। বাঙালী স্বর্ণশিল্পী ও মণিকারগণ যেমন সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাজ করতে সক্ষম, অন্যত্র তেমনটি আজও বিরল।

গহনাশিল্পে বাংলা যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা একদিনে হয় নি, সহজেই অনুমান করা চলে। এর পিছনে এদেশের সুবর্ণ-বণিক সমাজের অবদান রয়েছে অপরিসীম। গোড়া থেকেই এ তাঁদের জাতীয় ব্যবসা ছিল—এখনও এই উন্নত শ্রেণীর ব্যবসা বা শিল্পে তাঁরাই রয়েছেন অধিক সংখ্যায়। আজকাল অন্য সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোকও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং শিল্পের মান ও ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে এটি লক্ষ্য করবার।

প্রথমাবস্থায় গ্রামে-ঘরে সাধারণ বণিক বা স্যাকরার হাতে ছিল এই শিল্পের মানদণ্ড। সামান্য মূলধনের উপর নির্ভর করে সেদিন তাদের কাজ-কারবার চলতো। যারা গহনা তৈরী করতেন, প্রয়োজনীয় সোনা বা রূপো সরবরাহ করতেন তাঁরাই। শিল্পী মনোমত গহনা তৈরী করে দিয়ে হাতে তুলে নিতেন শুধু তাঁর প্রাপ্য সামান্য মজুরী বা বাণী।

সহরগুলো গড়ে উঠতে থাকলে সেখানেও এই ব্যবসা চালু হয়ে চলে ক্রমিক ধারায়। রকমারী অলঙ্কারের চাহিদা যুগে যুগে বর্দ্ধিত হয়ে চলে দেশের সর্বত্র। শুভ বিবাহ কিংবা অপর কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যৌতুক দানের প্রশ্ন উঠলেই গহনার কথা বড় হয়ে দেখা দিতে থাকে। বিগত শতাব্দীতেও দেখা গেছে—রূপোর গহনা বা অলঙ্কারের সমাদরই বেশি—এমন কি, ধনিক ও সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহেও ছিল এরই সমধিক প্রচলন। ক্রমে সেই রুচির রূপান্তর ঘটতে দেখা গেলো—তখন থেকেই রূপোর চেয়ে সোনার গহনার চাহিদা বেড়ে যায়।

গ্রামের পরিবেশে যে শিল্প এক কালে আবদ্ধ ছিল, সহরের বৃহত্তর আওতায় এসে উহা উন্নতির প্রচুর সুযোগ পায়। অলঙ্কারের চাহিদা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, দেখা যায় যে সাবেকি ধরণের ব্যবসা-কাঠামোতে এ আর চলে না। মাল মজুত করে রাখবার প্রয়োজন দেখা দেয় এইভাবে আর সেটি সম্ভবপর করে তোলবার জন্য মূলধন বিনিয়োগ অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। বিত্তশালী পোদ্দারগণ প্রচুর অর্থ নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। তাঁদের নিরলস উদ্যম ও ব্যবসা-প্রীতি—শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের ফলেই আজ এটি এক বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে।

অলঙ্কার-শিল্পে বাংলার ভেতর রাজধানী কলকাতার স্থান সকলের শীর্ষে, এ কারও অজানা নয়। গ্রামে ও ছোট সহরে এখনও কুশলী শিল্পী বা পেশাদার স্যাকরাগণ সোনা-রূপোর কাজ-কারবার করছেন বটে, কিন্তু নতুন নতুন নক্সা বা ডিজাইনের জন্য কলকাতার দিকে তাঁদের দৃষ্টি না রাখলে চলে না। দেশ-বিভাগের আগে ঢাকাতেও (বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তানের রাজধানী) এই শিল্পের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। সে অঞ্চলের অলঙ্কার-শিল্পী ও স্বর্ণকারগণ একটা বৈশিষ্ট্যের দাবী রেখে এসেছেন বরাবর।

কলকাতার বাজারে আজ স্বর্ণালঙ্কারের দোকান বা ব্যবসা-কেন্দ্রের অভাব নেই। নগরীর সর্বত্র—এমনকি, অলিতে গলিতে—এই শিল্পসংস্থা ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় অবশ্য বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট বা পূর্বতন বহুবাজার ষ্ট্রীটে। তারপরই বোধ হয় রাসবিহারী এভিনিউ—গড়িয়াহাটা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভবানীপুর-কালীঘাট প্রভৃতি এলাকার নাম করা যায়। যতদূর খবর নেওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, কলকাতা ও হাওড়াতেই বড় রাস্তায় শো-কেস সাজিয়ে কাজ-কারবার চলছে, এমন দোকানের সংখ্যা দুই হাজারের কম হবে না। অপর দিকে হাজার হাজার লোক এই সকল দোকানে কর্ম্ম-নিযুক্ত রয়েছেন, এ সহজেই অনুমেয়।

পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও কিন্তু এত অধিক সংখ্যক গহনার দোকান মহানগরী ও সহরতলী অঞ্চলে ছিল না। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা এলাকায় অত্যধিক লোকবৃদ্ধি হয় আর জুয়েলারী ফার্ম্মের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়ে চলে ধাপে ধাপে। বহু স্বর্ণকার তথা সুদক্ষ শিল্পী ও কারিগর পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এদিকে চলে এসেছেন এবং ছোট বড় দোকান খুলে তাঁরা বসেছেন নানা যায়গায়। আধুনিক গহনাপত্রে বহু ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর চোখে পড়ে।

আর একটি জিনিস এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার যে, পূর্বে এই মহানগরীতে এই শিল্প বা ব্যবসাটির রূপ এখনকার চেয়ে পৃথক ধরণের ছিল। একটু আগেই বলা হলো—তখন দোকানের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। আজকের দিনে কলকাতার এমন কোন রাজপথ প্রায় পাওয়া যাবে না, যেখানে দুই চারটি জুয়েলারী শপ

নেই। কত সহস্র স্যাকরা ও স্বর্ণকারের দোকান (শো-কেস বিহীন) রয়েছে নগরীর অলিতে গলিতে—মহল্লায় মহল্লায়। বিগত দিনগুলোতে স্বর্ণশিল্পের বাজারে তেজারতী বা বন্ধকী কাজ-কারবারই ছিল বেশি। আর সেই সঙ্গে অবশ্য নিয়মিত ব্যবস্থায় চলতো সোনা-রূপোর বেচা-কেনার কাজ। গহনাপত্র অর্ডার পেয়ে তবেই সরবরাহ করার রীতি ছিল সেদিনে অনেকটা চলতি। তখনকার দিনে আজকার মতো দোকান-পাট এমন সজ্জিত ছিল না—জুয়েলারী ফার্ম সমূহে শো-কেশের প্রচলন অল্পদিনেরই বলা যায়। এখন বেশিরভাগ দোকানেই তৈরী (রেডি-মেড) জিনিষ বিক্রি হয়—গহনার অসংখ্য নমুনা শো-কেসে সব সময় মজুত থাকে। ক্রেতাদের পক্ষে অর্ডার দিয়ে পছন্দসই জিনিষ পেতে আগের চেয়ে সুবিধা এখন বেড়েছে বই কমেনি।

এ দেশের গহনা ও গহনা-শিল্প আজ সত্যি বিশেষ গর্বের ব্যাপার। অতীত দিনের তুলনায় এ এগিয়ে গেছে সকল দিক থেকেই, বলতে দ্বিধা নেই। শিল্প-কাজ এখন অনেক সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধতায় পরিণত হয়েছে—নিত্য নতুন নক্সা ও ডিজাইনের সর্বত্র ছড়াছড়ি।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গহনা যারা পরবে, সেই নারী সমাজের রুচিও যে না পালটিয়েছে, তা নয়। আগেকার দিনের মেয়েদের পছন্দ ছিল ভারী অলঙ্কারের ওপর; নক্সা বা ডিজাইন নিয়ে এতটা মারামারি ছিল না এখনকার মতো। এ যুগে মেয়েরা গহনা কিনতে এসে সাধারণতঃ হালকা জিনিষেই সন্তুষ্ট হন, শুধু, তাঁরা দেখেন কাজটি সূক্ষ্ম কি না। এখনও সাবেকি ধরণের ঝুমকো পাশা, চিক, তাগা (অনন্ত), বালা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় বটে, তবে পূর্বেকার তুলনায় নিশ্চয়ই হাল্কা ওজনের। অর্থনৈতিক কারণ এর পিছনে বিশেষভাবে রয়েছে, সে-ও অবশ্য অস্বীকার করা যায় না।

সৃজনকুশলী মণিকার ও স্বর্ণশিল্পীদের প্রযত্নে ও উদ্যমে অলঙ্কার-শিল্প ক্রমেই উন্নতির দিকে যাবে। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতা যতই বাড়বে, এ শিল্পের অগ্রগতির পথও হবে তত প্রশস্ত। যৌতুকের প্রশ্ন বাদ দিলে, বিপদের দিনের সম্বল হিসাবেই বহুক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে সোনার গহনা কেনা হয়। কিছুদিন হয় সরকার এই শিল্পের ওপর বিক্রয় কর ধার্য্য করেছেন। এই কর ব্যবস্থা এমনি করা হয়েছে যে, গ্রাহক বা খরিদ্দারের নিজের সোনার গহনা তৈরীর বেলাতেও উহা প্রযুক্ত হয়। বিক্রয় করের প্রশ্নটি নিয়ে তাই একটা অসন্তোষ রয়েছে, সেই থেকেই। যা হোক, বাংলার অলঙ্কার-শিল্প নিজের সুনাম ও ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে চলুক, সকলেই এই দাবী রাখতে পারে।

মধুর ব্যবসা ও পশ্চিম-বঙ্গ

কি নামে, কি কাজে, সকল দিক থেকেই মধু সত্যি মধুর। এর স্বাদ ও মিষ্টত্বের যেমন তুলনা হয় না, তেমনি এর উপকারিতাও অপরিসীম। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, শিশুর মুখে মধু দেওয়ার রীতি বহুদিনকার। বার্দ্ধক্যের দিনগুলোতেও মানুষকে কম শক্তি যোগায় না এই মধু। পূজা-পার্বণে বা উৎসব-অনুষ্ঠানে যখন প্রয়োজন হয়, এ-ও একটি চিরাচরিত রীতি। অনেক রোগের ক্ষেত্রেই এইটি মূল্যবান্ ঔষধের কাজ করে থাকে। সর্বোপরি এ যতই সহজপাচ্য, ততই বুঝি পুষ্টিকর।

বর্ত্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ একটি ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। এখানকার বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর মধুর চাহিদা নিতান্ত কম হবার কথা নয়। সে দিক থেকে মধুকে কেন্দ্র করে আধুনিক ধারায় সুন্দর ব্যবসা বা শিল্প গড়ে উঠতে পারে এই দেশে। এর জন্যে একদিকে চাই কতকগুলি উদ্যমশীল ও ব্যবসা-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ, অপর দিকে যথাসম্ভব সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা।

ব্যবসার কথা উঠলেই, মধুর উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সেইটির উপর লক্ষ্য রাখা দরকার আগেভাগে। ভেজালহীন ভালো জিনিষ বাজারে সরবরাহ করতে পারলে, কাটতি সম্পর্কে ভাবতে যাওয়া (অন্ততঃ মধুর বিষয়ে) নিষ্প্রয়োজন। রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) সরকারের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে মধু সংগৃহীত হয়, তার একটা স্থায়ী বাজার নিশ্চয়ই রয়েছে।

মধুর উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞান-সম্মত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা সব সময়েই সমীচীন হবে। মধু আহরণের পুরানো রীতি প্রয়োজন হলে পরিহার করা ছাড়া উপায় নেই। অনেক সময় পরীক্ষায় দেখা যায়, মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হলেও, সে মধু নির্ভরযোগ্য হয় না। এর কারণ, অবৈজ্ঞানিক সংগ্রহ-পদ্ধতি—যাতে করে মৌচাকের কত লো দূষিত পদার্থ হয়তো মধুতে মিশে যায়। সুতরাং মৌমাছি পালন থেকে মৌ বা মধু আহরণ অবধি সবটা কাজই হওয়া দরকার বিশুদ্ধভাবে আর নিতান্ত যত্ন সহকারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগের নির্দ্ধারিত পারমিট নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে মধু সংগৃহীত হচ্ছে, প্রসঙ্গতঃ তার একটি হিসাব পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক। ১৯৫৭-৫৮ সালে যে মধু সংগৃহীত হয়, উহার পরিমাণ ছিল ৩,৬০১ মণ। ১৯৫৮-৫৯ সালে অর্থাৎ বিগত বর্ষে ২,৬৮১ মণ মধু সংগৃহীত হয়েছিল এবং আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হয়েছে ৩,৬০০ মণ। সরকার এই (মধু) খাতে বেশ কিছু টাকা রাজস্ব স্বরূপ পেয়ে থাকেন, আর সেটি প্রতি বছরই।

অনুসন্ধানে জানা গেছে—পশ্চিমবঙ্গের বিপুল চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে এখনও মধু আমদানীর প্রয়োজন হয়। আমদানীকৃত মধুর বেশিটাই হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার ও সিংহলদেশের। যেখানে একটু চেষ্টা থাকলেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া যায়, সেখানে বাইরে থেকে আমদানী করতে যাওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবসাটি সম্প্রসারণের এখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়, এ 'সমস্যা-সঙ্কুল' রাজ্যের বহু পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হতে পারে এই থেকেই।

মধুর ব্যবসার কথা বলতে গেলে উহার সঙ্গে জড়িত আর একটি জিনিষের কথাও বলার প্রয়োজন হয়। মৌচাকে যে মোম পাওয়া যায়, সেইটি কেন্দ্র করেও ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য হতে পারে। মোম থেকে বহু রকমারী প্রসাধন সামগ্রী তৈরী হয়—বাজারে যার বেশ চাহিদা ও দাম রয়েছে। যদি দেখা গেলো মোম তৈরী অপেক্ষা মোমজাত পণ্য উৎপাদন লাভজনক হবে তা হলে সেদিকেই ঝোঁক থাকা উচিত। মোটের উপর, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাইরে শুধু মধুই নয়, মধুর সংশ্লিষ্ট মোমজাত দ্রব্যের রপ্তানীও কি উপায়ে বাড়ানো যায়, সেদিকে লক্ষ্য না রাখলে নয়।
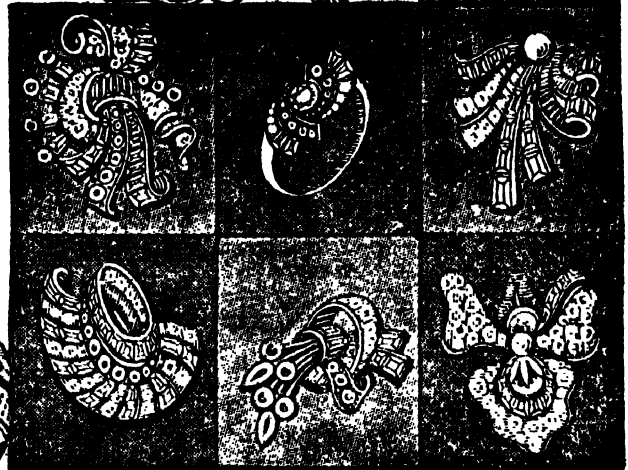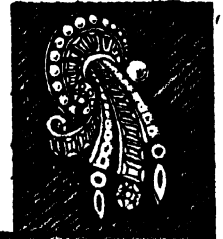
একটি আদিম কান্নার ইতিকথা

আবদুল আজীজ আল-আমান

সোলেমানপুর বালিকা-বিদ্যাপীঠে ছুটির ঘণ্টা পড়লো। চারটের ঘণ্টা। বাঁধভাঙ' বন্যার জলের মত খিলখিল হাসিতে মুখর হ'য়ে সুরকী-বাঁধানো লাল সড়কে নামলো ছাত্রীর দল। নীল আকাশে ডানা মেলে হাওয়ায় উড়ে চলেছে। ফ্রকের গোল বেড় ঘুরিয়ে, রঙিন ফিতেয় বাঁধা ঘাড় ছোঁয়া কেশ দুলিয়ে, রাস্তায় যেন মাতামাতি শুরু করেছে ছোট মেয়ের দল। তরুণীরা চলেছে বেণী দুলিয়ে বুকে বই চেপে মন্থর পদক্ষেপে। কিছুক্ষণের মধ্যে কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। সহরতলীর জনবিরল সড়কে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

বিদ্যাপীঠের গেট পেরিয়ে এবার পথে নামল দিদিমণিরা। হাতে বেঁটে ছাতা। কাঁধে ঝোলান রঙিন ব্যাগ। অনসূয়া, গৌরী, রাবেয়া—।

খানিকটা পথ এগিয়ে এসে অনুসূয়া—গৌরী বাঁক ঘুরে বাড়ীর পথে মিলিয়ে গেল। নিকটেই বাসা। রাবেয়াকে আরো খানিকটা পথ যেতে হবে। লাল সড়ক বেয়ে বকুলতলা হয়ে জনপ্রিয় লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে খানিকটা এগুতে হবে। তারপর শেখ পাড়া। প্রায় মিনিট দশেকের পথ।

মাথা থেকে ছাতাটা সরিয়ে একবার সূর্য্যটার দিকে তাকাল রাবেয়া। ক্লান্ত সূর্য্য বটগাছটার আড়ালে নুয়ে পড়েছে। তারপর আবার ছাতায় মাথা ঢেকে মৃদু তালে পা চালিয়ে দিল। শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সারা দিনটা একটানা বক্তে হয়েছে ক্লাসে ক্লাসে। ফাঁকি সে দেয় না। দিতে পারে না। অঙ্কের ঘণ্টায় অঙ্ক করতে বলে দিয়ে দিব্যি বসে থাকা যায়, কিন্তু না, ফাঁকি দেয় না রাবেয়া। ছাত্রী মহলে তাই তো তার এত নাম। ঘণ্টার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এতটুকু বিশ্রাম করে না সে। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সমগ্র প্রাণ-মন যেন ঢেলে দেয় রাবেয়া। অবাক হয়ে শোনে মেয়েরা। পড়া শুনতে শুনতে তারাও ভাবে মনে মনে—তারাও যদি অমন করে পড়াতে পারত।

বকুল তলায় এসে যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলে রাবেয়া। ছাতাটা বন্ধ করে দাঁড়ায়। রোজ-ই দাঁড়ায় এখানে। কোন কোন দিন অনেকক্ষণ বসে থাকে সবুজ ঘাসের উপর। আজও বসল। মৃদুল হাওয়ায় বকুলের মিষ্টি গন্ধ। ভরাট এক-বুক নিশ্বাস টেনে নিল রাবেয়া। ক্লান্ত দেহটা যেন পরম শান্তিতে ডুবে গেল। সামনে সবুজ ঘাসের উপর একটা চড়ুই বসে লাফালাফি শুরু করেছে আপন মনে। একটা কাঠবিড়ালী লেজ ফুলিয়ে অবা'ক চোখে তাকিয়ে আছে সে দিকে। বড় ভাল লাগে রাবেয়ার। একটা ঢিল নিয়ে ফোলা লেজে মারতে গিয়ে থেমে গেল। কি ফল হবে এই রোমান্টিক দৃশ্যটা নষ্ট করে? সেও মুগ্ধ বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। অনেক্ষণ।

হঠাৎ মনে হলো এক সাইকেল-আরোহী ব্রেক কসে নেমে পড়েছে রাস্তায়। মাঝে মাঝে এমন উপদ্রব শুরু হয়। রংমহল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বড় ছেলে মুসা এমন আকস্মিক ভাবে এসে মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ হতে চায়! সতর্ক হয়ে তাকায় রাবেয়া! না, মুসা নয়—আহসান। রবিউদ্দিন চাচার ছোট ছেলে। রাবেয়া শুধায় কোথায় যাচ্ছিসরে আহসান?

সাইকেলটা একহাতে ধরে আহসান জবাব দেয়, কুমুদমিষ্টান্ন-ভাণ্ডারে—কিছু মিষ্টি আনতে। একটু থেমে বলে, জান আপা—আজ আড়াইটার মেলে আবিদ ভাই বাড়ী এসেছে।

আবেগে উচ্ছ্বাসে হঠাৎ যেন ফুলে ওঠে রাবেয়া। এঁ্যা—আবিদ বাড়ী এসেছে, আবিদ! পাল্টা শুধায়, সত্যি?

মিষ্টি আনতে তো যাচ্ছি সে জন্যে। সাইকেল চড়ে সড়ক বেয়ে দূর পথে মিলিয়ে যায় আহসান।

রাবেয়ার সারা দেহটা যেন কেঁপে ওঠে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত খুশির আমেজে ক্লান্তি জড়িমা যেন ছিটকে পালিয়ে গেছে দেহ থেকে। হঠাৎ—হ্যাঁ একান্ত হঠাৎ-ই এক গুচ্ছ শুভ্র কেতকীর মত হালকা হয়ে গেছে দেহটা। বহু বছর পর কুমারী-জীবনের সেই প্রথম প্রেম-জাগা প্রভাতের দুর্নিবার শিহরণের মত অভিনব আবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে সারাটি দেহের অণুপরমাণু! একি—এমন করে কাঁপছে কেন রাবেয়া? সুদীর্ঘ তিন বছর পর গ্রামের শান্ত পরিবেশে ফিরেছে আবিদ। বলিষ্ঠ সুঠাম যুবক। কর্মঠ, সুদৃঢ় অভিমতে অচঞ্চল। কিন্তু তার জন্যে রাবেয়া কাঁপছে কেন এমন করে?

বকুলতলার সেই শান্তশীতল নির্জন ছায়াতলে সবুজ ঘাসের ওপর বসে চারিদিক সন্তর্পণে একবার দেখে নিল রাবেয়া; না—কেউ নেই কোথাও। তারপর দুর্নিবার আবেগে লুটিয়ে পড়ল কোমল ঘাসের বুকে। চোখ বন্ধ করে স্বপ্নের ঘোরে যেন বলে ফেললো,—তুমি—তুমিই এসেছ আবিদ!

উঃ সেই ছোট বেলা থেকে আর এই সেদিন পর্য্যন্ত কত হাসি, কত গল্প আর কত গান। একই পাড়ায় ঘর। একই সাথে স্কুলে যাওয়া। একই সাথে খেলা, আর একই সাথে খাওয়া।

বিকেলের অলস বেলায় মা কাঁথা সেলাই করতে বসেছে রোয়াকে। ছুটিতে কোথায় ছিল—হঠাৎ এসে হাজির। তারপর আর কি। দুজনেই লুটিয়ে পড়লো কাঁথার ওপর, তারপর গড়াগড়ি। কাঁথা সেলাই করে আর সাধ্য কার? মা যদি কখনো বলতো—ওরে সুঁই ফুটে যাবে—ওঠ, তাহলে গড়াগড়ির আরো জো'র লাগতো দুজনার। শেষে সুঁই ছেড়ে দিয়ে মা বলে উঠতো—মর তোরা ওখানে।

খানিক চুপচাপ শুয়ে থেকে দুজনার কি ইশারা হয়ে যেত।

তারপর কাঁথা ছেড়ে ছুটে চলে যেত দুজনাই। নতুন পরিকল্পনায় তখন তারা উন্মাদ। ধীর পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে দু'জনে এসে হাজির গাদার ধারে। দুজনার হাতেই ইট। আবিদ আগে। পিছনে রাবেয়া। একটা কুকুর শুয়ে আছে গোলার তলায়। খুব কাছে এসে খান ইট তুলে সজোরে নিক্ষেপ ক'রে একই সাথে চেঁচিয়ে ওঠে দুজন,—মুরগীর পিলে খাবে আর ?

কুকুরটা তখন লম্বা আর্তনাদ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে ছুটে পালাচ্ছে।

পুকুরে মাতামাতির কথাগুলো আজো স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু থাক সে সব কথা। কলেজ-জীবনের কথা যে আরো স্পষ্ট। একই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বারাসাত কলেজে ভর্তি হলো দুজন। সোলেমানপুর থেকে মাত্র দুটি ষ্টেশন দূরে বারাসাত। কতদিন কলেজ ফাঁকি দিয়ে ছুটিতে চলে এসে বাইরে বেড়িয়েছে এখানে ওখানে। গল্প করেছে কবির মত। নীল আকাশে ডানা মেলে কপোত-কপোতীর মত হাওয়ায় ভর করে ছুটিতে উড়ে গিয়েছে সুদূর দিগন্তের কোলে—যেখানে মিলেছে অসীম আকাশ আর সবুজ পৃথিবী, অসীম-সসীম যেখানে চুমোচুমি করেছে ব্যগ্র হয়ে, নুয়ে পড়ে। ও, সে কত স্বপ্ন, কত সাধ !

বারাসাত কলেজ থেকেই এক সাথে বি, এ পাশ করলো দুজনে। তারপর আবিদ চলে গেল কলকাতায়—এম-এ পড়তে, আর সোলেমানপুর বিদ্যাপীঠে শিক্ষয়িত্রীর পদ নিল রাবেয়া। তারপর থেকে এই তিন বছর; আবিদ এম-এ পাশ করেছে সসম্মানে। তারপর একটা ভাল চাকরীও পেয়েছে আজকাল।

ছায়া ঢাকা বকুলতলার নির্জন প্রান্তে পলকে সকল কথা মনে পড়ে রাবেয়ার। কিন্তু এভাবে আর বসে থাকা যায় কতক্ষণ। হাঁা, বাড়ী যাওয়া প্রয়োজন। বৃদ্ধ আব্বা হয়তো চায়ের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এতক্ষণ। তা ছাড়া—এক্ষুনি গিয়ে একবার দেখা করে আসতে হবে। মনের উপল খণ্ড যেন আনন্দ-বন্যার প্রবল জলকল্লোলে ডুবে গেছে। নতুন রং লেগেছে দেহে-মনে-প্রাণে। হাঁা এখুনি গিয়ে একবার দেখা করে আসতে হবে বৈকি ! আবিদ, আহা ! স্বপ্নের আবিদ !

রাবেয়া যখন বাসায় ফিরল তখন কমলা রংএর নরম রোদ বিকেলের শান্ত আকাশ ঘিরে বিছিয়ে পড়েছে। মাথার ওপর পাখী পাখালীদের ডানার ঝাপটা শোনা যায়। কনে দেখা আলোর মনোরম পরিবেশে সকল কিছুই মনোরম হয়ে উঠেছে। রাবেয়ার চোখে আজ সব কিছুই সুন্দর। অপূর্ব মনে হয় পশুপাখীকে। কি হয়েছে আজ রাবেয়ার ?

হাত মুখ ধুয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাবেয়া। পরণের শাড়ীটা পাল্টে নিল। ইস্ত্রিরী করা ঝকঝকে আকাশ-নীল শাড়ীটা সে পরে নিয়েছে। কোন বিশেষ উপলক্ষ না হলে সে পরে না এ শাড়ীটা। কিন্তু আজ হঠাৎ ট্রাঙ্ক থেকে শাড়ীটা বের করে নিয়েছে। ভাল ব্লাউজটাও। শাড়ীর সাথে শোভন করে নিটোল লাবণ্য-দীপ্ত কান্তিতে জড়িয়ে নিয়েছে ওটা। অপূর্ব লাগছে নিজেকে। আয়নার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল আপন মনে। ইচ্ছে করেই। হাঁা, গালে টোল পড়েছে। ঝিকমিক করে উঠছে দাঁতগুলো। হাঁা, এমন মিষ্টি করেই হাসতে হবে আজ। হাঁা, ঠিক এমনি করেই।

কি করছে আবিদ ! হয়তো চা খেতে বসেছে—হয়তো গল্প জুড়েছে সকলের সাথে। স্নো-মাখা কোমল গণ্ডে পাউডারের গন্ধটা একবার বুলিয়ে নিল। হাঁা ঠিক হয়েছে। রঙিন ব্যাগটাও নিল কাঁধে ঝুলিয়ে। তারপর খানিক ভেবে নিল আপন মনে। আবোল তাবোল। তাইতো কি বলা যাবে গিয়ে ? হাঁা হয়েছে—বলবে, বেশ মিষ্টি হেসেই বলবে—স্কুল থেকে ফেরবার পথেই তোমার আসার সংবাদ পেলুম আহসানের মুখে ; বাড়ী না গিয়ে একেবারে সোজা চলে আসছি। তারপর মিষ্টি টোল-খাওয়া হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে, কেমন আছ আবিদ ভাই ?

শেষবারের মত আয়নায় মুখটা দেখে পা তোলে রাবেয়া। ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে রিটায়ার্ড বৃদ্ধ আব্বার গলা ভেসে আসে, একটু চা তৈরি করে দেমা রাবু।

দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় রাবেয়া। সব আশা সব আনন্দ যেন অকস্মাৎ ডুবে গেছে। তাইতো এই ভাবে সেজেগুজে যাওয়াটা কি তার শোভন হবে ? কি হবে গিয়ে ! কত কাজ বাকী পড়ে রয়েছে সংসারে। সন্ধ্যা হয়ে এল বলে। পাখীপাখালীরা বাসায় ফেরা শুরু করেছে। ডানার ঝাপটা শোনা যাচ্ছে। পাশের বাঁকা বনটা নীড়ফেরা পাখীদের কাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে। আব্বাই বা কি বলবেন দেখে ?

অভিসারের নিখুঁত বেশে দরজার কাছে তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রাবেয়া। নির্বাক, নিস্তব্ধ।

অকস্মাৎ ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে বেডের উপর। শাড়ীটা
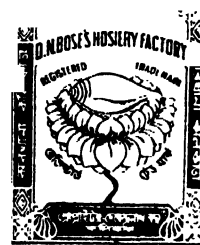
পাল্টে নিল। ব্লাউজটাও ভাঁজ ভাঙা শাড়ী ব্লাউজ পড়ে রইলো অবিন্যস্ত হয়ে। কি হবে গিয়ে? একটু দেখা—না, দরকার নেই। ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইছে। নির্জন, নিস্তব্ধ গৃহ কোণে দাঁড়িয়ে আজ স্পষ্ট অনুভব করে রাবেয়া, মনের উপলে শুষ্ক বালুস্তর ভেদ করে দুরন্তবেগে লবণাক্ত জলোচ্ছাস বার হয়ে আসতে চাইছে। অবশ ক্লান্ত দেহে অবিন্যস্ত শাড়ীর ওপর লুটিয়ে পড়লো রাবেয়া।

পাশের ঘর থেকে বৃদ্ধ আব্বা আবার বলে উঠেন,—রাবু, একটু চা তৈরি কর মা।

ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লো রাবেয়া। বললে, হ্যা যাই। কথাটা কেমন যেন ভাঙা ভাঙা শোনাল!

পাশের বাড়ীর ছাত্রীটিকে পড়িয়ে যখন বাসায় ফিরলো রাবেয়া, তখন রাত নটা। ফিরতেই আব্বা বললেন, আবিদ এসেছিলো রাবু—এই মাত্র চলে গেলো বেশ ছেলেটা—অনেকক্ষণ ধরে কত গল্পই করলো। কাল একবার দেখা করে আসিস মা। একটা সমিতি নাকি গঠন করতে চায়—তোর সাথে অনেক কথা আছে।

অবাক চোখমেলে কথাগুলো শুনলো রাবেয়া। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। খুশীতে ডগমগ। আবিদ এসেছিলো তা'হলে? এ্যা আবিদ!

দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই যেন চমকে ওঠে রাবেয়া। আয়নায় বাঁধানো তার ফটোটা টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। ইস—ফটোটা যদি আজ আব্বার ঘরে থাকতো! এক অস্ফুট কাতর ধ্বনি বের ওঠে। রাবেয়া। যেন অপূর্ব সোনালী স্বপ্ন অকস্মাৎ ঘা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

হ্যা, কাল সকালেই ফটোটা আব্বার ঘরে টাঙিয়ে দিতে হবে। আবিদ এসে যে ওঘরেই বসে।

সোলেমানপুর বালিকা বিদ্যাপীঠ থেকে ফেরার পথে সেদিনও আহসানের সাথে যে দেখা হল রাবেয়ার। ঠিক বকুল তলাতেই। আহসানের মুখে শুনলো আবিদের ফিরে যাওয়ার সংবাদ। অফিসের বড় সাহেব নাকি একটা জরুরী কাজের জন্য টেলিগ্রাফ করেছে। আজ দুপুরেই এসেছে টেলিগ্রামটা। ভোর পাঁচটার মেলে চলে যাবে কলকাতায়।

বকুলের ডালপালা দুলিয়ে মিষ্টি হাওয়া বইছে। ঝিরঝিরে পাতাগুলো মাতালের মত দুলছে। একটা হলুদ রঙের পাখী মাথার উপর ডালটায় বসে গান ধরেছে আপন মনে। রাবেয়া একটু তাকালো ওদিকে—তারপর বসে রইল নিস্তব্ধ হয়ে।

ক্লান্ত বিকালের আকাশ ঘিরে পেঁজা তুলোর মত রাশ রাশ মেঘ জমে উঠেছে। চোখের ভ্রূর মত দীঘল ডানা মেলে নাম না-জানা কয়েকটা পাখী উড়ে চলেছে মেঘের দেশে। বকুলের ঘন-সন্নিবিষ্ট পত্রপল্লব ভেদ করে একগুচ্ছ ফলকের মত ঠিক সামনের সবুজ ঘাসের বুকে লুটিয়ে পড়েছে অবসন্ন সূর্য্যের আলতা-মাখা রোদ। না, এসব কিছুই ভাল লাগে না রাবেয়ার। সকল নীরবতার মাঝে সকল চিন্তার মাঝে সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ে, আজ ভোরে চলে যাবে আবিদ? দেখা হবেনা শেষবারের মত? মাত্র একটিবার? একটি পলক?

বাড়ী যখন ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আব্বাকে চা দিয়ে একফালি বারান্দায় ইজিচেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিল রাবেয়া। তখনও ঠিক ঐ চিন্তাই তার মনের অলিতে গলিতে ফিরছে। রূপ সুন্দর এই পৃথিবীর সকল কিছুই যেন একান্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণের হিমেল বাতাসটা রাবেয়ার ঘুম-ভেজা দেহটাকে শীতল করে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলো রাবেয়া। না—যাওয়ার আগে একবার আসবে বৈকি আবিদ। সেতো জানে মেয়েদের অনেক বাধা আছে। যাওয়া হয়ে ওঠে না ইচ্ছেমত। তা ছাড়া সে যে আজ ভোরেই চলে যাবে, এ সংবাদটুকু রাবেয়া নাও জানতে পারে। অন্ততঃ এটা খেয়াল করে আবিদের একবার আসা উচিত। হ্যা—আজ রাত্রেই আসবে আবিদ, নিশ্চয় আসবে।

ঘরের ভিতরটা বেশ আঁধার আঁধার মনে হচ্ছে। আলোটা জ্বালিয়ে নিল রাবেয়া। আব্বার ঘরের আলোটাও জ্বালিয়ে দিল। ছড়িটা নিয়ে আব্বা বেড়াতে গেছেন—এখনই ফিরবেন। তারপর টুকিটাকি সাংসারিক দু'একটা কাজ সেরে নিয়ে কাপড়-চোপড় পাল্টে নতুন সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত হয়ে উঠল রাবেয়া। হঠাৎ কখন এসে পড়বে আবিদ কে জানে। আকাশী-নীল রংএর সেই কাপড়, সেই ব্লাউজটাই পরে নিল। তারপর অন্যমনস্কতার ভাণ করে বারান্দায় সেই ইজি চেয়ারটায় বসে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সময় গড়িয়ে চলে। ঘড়ির কাঁটাও। রাত গভীর হয়।

ঘরের আশপাশ হতে রাতজাগা পোকামাকড়ের গীতালীর ধ্বনি ভেসে আসে। পত্র-পল্লবে আছাড় খেয়ে মর্মরিত হয়ে ওঠে উদাসী সমীর। চাঁদের আলোয় চিকচিক করে ওঠে কলাগাছের মাজপাতা। ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে ছায়া-ঢাকা পল্লীর কলমুখর গৃহ-প্রাঙ্গণ। এই একান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে মাঝেমাঝে সচকিত হয়ে ওঠে রাবেয়া, আবিদ—আবিদ কই? এখনো কি আসবার সময় হলো না? সেই আগের মত চুপিসাড়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এসে পিছন হতে চোখ ধরবে নাকি আজ! সামান্য শব্দেই বাঞ্ছিতের আগমন সংকেতে গহন বনান্তরালগামী হঠাৎ-থামা হরিণীর মত উৎকর্ণ হয়ে ওঠে রাবেয়া। না—আবিদ নয়, বাতাস।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ও বারান্দায় অপেক্ষা করে। আব্বা ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত কত? আলোটা জোর করে সুগোল হাতটা তুলে সময় দেখে নিল রাবেয়া। একটু চমকে উঠেই টেনে টেনে উচ্চারণ করলো, বারো—ও টা। এত রাত হয়ে গেছে।

দুরন্ত অভিমানে বুকটা ফুলে ওঠে রাবেয়ার। অভিমান-বিস্ফারিত কণ্ঠে বলে, নিষ্ঠুর—একবার এলে না। একটিবার আসার সময় হলো না তোমার!

যেন পাগল হয়ে ওঠে রাবেয়া। সমগ্র দেহমন দুরন্ত অভিমানে দোল খায়। বাইশটা বসন্ত অতিক্রান্তা রাবেয়ার জীবনে এমন দেহমন মাতান পাগল করা আবেগ-ব্যাকুল মুহূর্ত খুব কমই এসেছে। না—দেখা একবার করতেই হবে। যুগ-যুগান্তরের বন্দীশালা হতে আদিম নারীত্ব যেন দুর্নিবার ব্যাকুলতায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

রাতের ঘন কালো আবরণ ভেদ করে সন্তর্পণে পথে নামল রাবেয়া। মাথার উপর এক আকাশ তারা। মিট মিট করে জ্বলছে। একাদশীর চাঁদ তখন নিম গাছটার ওপাশে নুয়ে পড়েছে। সোলেমানপুরের অলিগলি সব রাবেয়ার নখ-দর্পণে। একান্ত

জানা-চেনা পথেই সে আজ দুরন্ত অভিমান-ক্ষুব্ধ অভিসারিকা। ওমরেজ শেখের কলমবাগানের ধারে এসে একটু থমকে দাঁড়ায় রাবেয়া। চারদিকটা দেখে নিল ভাল করে। না—কেউ নেই কোথাও। জনবিরল পল্লীপথ গভীর নিশীথে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। রাতজাগা পাখী-পাখালীর ডানার ঝাপ্‌টায় মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে ওঠে নির্জন পথ-ঘাট। দূর গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসে দীর্ঘ লয়ে।

আবিদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে বুকভরা অভিমান যেন ঝরে গেল রাবেয়ার দেহ থেকে। নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার নীচের শুভ্র কেতকী ফুলের মত নব বধূর অপরিসীম লজ্জায় কেঁপে কেঁপে ওঠে দেহটা। বিরাট বাড়ীটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকাল একবার। হ্যা—ঐতো আলো জ্বলছে। আবিদের ঘরেই। কি করছে এত রাত জেগে? হয়তো ঘুমিয়ে গেছে ক্লান্ত দেহে, ভুলে গেছে আলো নেভাতে।

জানালার রড ধরে শংকিত বুকে সন্তর্পণে একবার উঁকি দিল রাবেয়া। একি, এখনো লিখছে আবিদ! টেবিলে হারিকেন জ্বলছে। নত হয়ে একমনে লিখে চলেছে লাবণ্যদীপ্ত বলিষ্ঠ যুবক। কি লিখছে এত? গল্প? উপন্যাস? চিঠি?

রাবেয়ার বলতে ইচ্ছা করে,—ওগো পাষাণ-হৃদয়—আমি এসেছি। যুগযুগান্তর ধরে আমি যে তোমার প্রতীক্ষা করছি।

আষাঢ়ের সজল মেঘমালায় আমি তোমারই ছায়া দেখেছি। শরতের সোনাগলা বিকেলে আমি তোমারই ধ্যান করেছি। বসন্তের ভোরে সুরভী সমীরণে কোকিলের কণ্ঠে আমি যে তোমারই কণ্ঠ শুনেছি। ওগো পাষাণ, ওগো দেবতা—।

অকস্মাৎ পিঠে যেন চাবুক পড়ে রাবেয়ার। একি করেছে সে! একি পাগলামি তার? কেউ যদি দেখে ফেলে। অপরের কথা দূরে থাক, আবিদ-ই বা কি মনে করবে তাকে দেখে? এই নির্জন গভীর রাতে? এই অবস্থায়?

জানালার ধার থেকে সরে এসে পথে নামল রাবেয়া। ধ্যান যার ভাঙলো না—কি হবে তার ধ্যান ভাঙিয়ে? দুরন্ত অভিমানে আবার বিস্ফারিত হয়ে ওঠে রাবেয়ার বুক। কান্নায় কণ্ঠ যেন অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। দ্রুতবেগে সড়ক বেয়ে, আমবাগান পেরিয়ে ঘরে এসে পৌছাল রাবেয়া। দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় লুটিয়ে দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়লো। ওগো পাষাণ তুমি সুখে থাক। কি হবে তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে? বিশাল বুকের নিরাপদ আলয়ে একটু স্থান চেয়ে কি হবে? হয়তো দেবে না। হয়তো প্রত্যাখ্যান করবে। তার থেকে আমার এই ভালো। কেঁদে কেঁদে কাটুক সারাটা জীবন। মর্মভেদী চোখের জল সান্ত্বনার উৎস হয়ে থাক। বসন্তের গভীর নিশীথে হঠাৎ জেগে আমি চোখের জলেই সান্ত্বনা পাব। ওগো আমার সেই ভাল—ওগো পাষাণ, ওগো—।

দুর্নিবার অভিমানে এবার অস্ফুট কণ্ঠে ডুকরে কেঁদে উঠলো রাবেয়া। এ কান্নার শেষ নাই।

একাদশীর চাঁদ তখন ডুবে গিয়েছে।

বহুরূপী

তরুলতা ঘোষ

মহাকাল-জলধির একটি বুদ্বুদ যেন চেতনার চকিত ঝলক—
মৃত্তিকার রঙ্গমঞ্চে ওরই মাঝে কত অভিনয়। একটি পলক
মাত্র বুঝি আয়ু তার অনন্তের কালের বিচারে।
তারই মাঝে দেখে যেতে হবে ঘটনার পারম্পর্যে, সত্যেরে মিছারে।
অক্ষমের, অজ্ঞানের, অর্থহীন ক্রন্দনের আর্ত আবেদনে
যতটুকু দাবী ছিল, বিস্মৃতি কুহেলি ঘেরা কামনায় প্রথম বোধনে,
বহুগুণে-বহুরূপে মূল্য তার হোয়ে গেছে পাওয়া,
এখন জীবন স্বপ্নে তারই রোমন্থন, তারই গান গাওয়া,
সেই শুধু একবার ধরণীর ধূলি চুমি স্বর্গ নেমেছিল,
কুটীরের দ্বারপ্রান্তে অনাহূত দেবতার সমুদ্ধত রথ থেমেছিল।
অবরুদ্ধ গন্ধ সম তখনও তো চেতনার সুষুপ্ত বিকাশ,
তারপর ঘটনার গতিপথে কতই রং-এর খেলা, কত বেশবাস।
নূতন ছন্দের তালে আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু, সমতল ভূমি,
বাত্যারে কঠোর করে, মসৃণ-পিচ্ছিল কভু পদতল চুমি।
শূন্যগর্ভ বুদ্বুদের ক্ষণিক জীবনে যত অনিশ্চিত রং-এর বাহার,
অহংকারে কাঁপে তত। আমিত্বের বোঝাটুকু অবশেষ সম্বল তাহার।
তবে একি অর্থহীন, জীবনের ঘটনায় বিচিত্র রং-এর ফুলে মালা গেঁথে যাওয়া,
রঙ্গমঞ্চে নাটকের এত অভিনয়, এত হাসি, এত অশ্রু, এত গান গাওয়া?
সে বিচারে কিবা কাজ? বহুরূপী চেতনায় যত পার রং কর লুঠ,
যেদিন হবার হবে সকলি ফ্যাকাশে, ফেটে যাওয়া বুদ্বুদের সব রং ছুট।

Zola র The Fairy amoereuse গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ

শ্রীমতী তুষার সান্যাল।

এমন বাদল-ঝরু-ঝরু সন্ধ্যা আগে কখনও দেখেছ তুলা? বাইরে জানালার শার্সিতে আছড়ে পড়া বৃষ্টিবিন্দুর একঘেয়ে আর্ত্তনাদ আর বাঁধন-ছেঁড়া বাতাসের দুরন্ত দাপাদাপি; এমনি দুর্যোগের সন্ধ্যায়ই দিগ-বধূদের অন্তরে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অশ্রুধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে ধরিত্রীর বুক ভাসিয়ে দেয়, আর মানুষকে প্রিয়সঙ্গ-কামনায় আকুল ক'রে তোলে।

আজকের এ সন্ধ্যার রূপ কি, তা জানো? জানো না, তোমার জানার কথাও নয়, তোমার মাথার উপরে একটা আচ্ছাদন আছে কিনা? খোলা জানালা দিয়ে একবার তাকাও ঐ অদূরের বড় বাড়ীটির পানে; চেয়ে দেখো ঐ তোরণ-দুয়ার! কন্‌কনে ঠাণ্ডায় যাদের হাতে-পায় খিল ধরে, তারা মিনতিভরা চোখে ঐ রুদ্ধ দুয়ারটির উপর মাথা খুঁড়ছে একটু আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু দুয়ারের আগল তো মুক্ত হবার নয়; ভিতরের উষ্ণ পরিবেশে যারা হাসি-গান-গল্পের বান ডাকিয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসে প্রবৃত্ত, ওদের ভিতরে আশ্রয় দিলে সে চেষ্টায় ছন্দ পতন ঘটবে যে!

কাজ নেই, তুলা ওদিকে তাকিয়ে—তুমি ব্যথা পাবে। তার চেয়ে এস, এখানটিতে আমার পাশে এসে বস—খুলে ফেল তোমার জবকালো বেশভূষা, পর তোমার সেই নীলাম্বরী—যার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে উঠবে তোমার নিরাভরণ দেহের অরূপ শ্রী, অসীমের ছোঁয়া লাগুক তোমার তনুলতায়, আর তারই এককণা ঠিকরে পড়ে রাঙিয়ে দিক আমার অন্তরলোক।

ওকি, তবুও মুখ নীচু কেন তুলা? বাদল-ঝরা এ সন্ধ্যায় তোমার মুখ ভার সইতে পারিনে। তোল মুখ লক্ষ্মীটি, আর এস এখানে জলন্ত শিখার পাশে আমার কাছ ঘেঁষে বসবে এসো। অগ্নিশিখার রক্তিম আভায় তোমার গালে দুটি কৃষ্ণচূড়া ফুটে উঠুক। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর তোমায় একটি রূপকথা বলে শোনাই।

দূরে—বহু দূরে—বনের কিনারায় পাহাড়ের উপর কালো কালো পাথর দিয়ে গড়া এক দুর্গ-প্রাসাদে বাস করতেন এক বিশাল-বপু দৈত্য। প্রাসাদের রুক্ষ ভয়ানক রূপটি যেন প্রাসাদ-অধিকারীর নির্মম কঠোর মনেরই একটা প্রতিচ্ছবি!

এই প্রাসাদের এক কক্ষে বাস করতো বন্দিনী নন্দিনী! বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মনে কোথাও বুঝি বা এই নন্দিনীর জন্য এক কণা স্নেহ সঙ্গোপনে সঞ্চিত ছিল। নন্দিনীর পিতাকে যুদ্ধে হত্যা করে তাকে ধরে এনে এই প্রাসাদে বন্দিনী করে রেখেছেন। সে তখন ছোট এক ফোঁটা মেয়ে ছিল। আজ সে প্রথম যৌবনের সিংহদ্বারে উপনীতা! বসন্ত-প্রভাতের নূতন অরুণের রাগে চোখ মেলে চাওয়া পদ্মের সঙ্গেই শুধু নন্দিনীর রূপের তুলনা করা চলে!

নন্দিনীর মনে সুখ ছিল না, অজানা ব্যথায় তার মন সারাক্ষণ টন্‌টন্ করতো; অশ্রু যেন তার বাধা মানতো না, ঝরে ঝরে তার বুক ভাসিয়ে দিত। বৃদ্ধের পানে সে চাইতে পারতো না; কেমন যেন একটা উৎকট ভয়ে সারা দেহ ঝড়ে নড়া পাতার মতই কেঁপে কেঁপে উঠতো!

খোলা জানালার ধারে সে শ্বেত-পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত বসে থাকতো। আকাশের স্বচ্ছ নীলিমা আর শ্যাম বনানীর বিপুল সম্পদের পানে উদাস দৃষ্টি মেলে অজ্ঞাতে হয়তো বা উৎসারিত হতো এক ব্যাকুল প্রার্থনা। কত রাতে নিদ্রাহীন আঁখি মেলে সে চেয়ে থাকত আকাশের ঐ তারকাপুঞ্জের পানে—চোখে তার অব্যক্ত মৌন জিজ্ঞাসা, কিসের এই ব্যথা, কি তার অন্তরের কামনা? তার অবচেতন মনে বুঝি লেগেছে প্রেমের ছোঁয়াচ, অতন্দ্র চোখে তার বুঝি নূতন জাগা প্রেমের দৃষ্টি। কে তার মনের এই ক্ষুধা মেটাবে, কে তাকে দেবে এককণা প্রীতি, যার জন্যে সারা দেহ উন্মুখ প্রতীক্ষায় নিশিদিন দুলে দুলে উঠছে। প্রেম আর সৌন্দর্য্য মিলিয়ে যে তৃপ্তি, সে তৃপ্তি সে পাবে কোথায়? শুষ্ক কাঠের মত নীরস ঐ বৃদ্ধ তার ব্যথা বুঝবে কেন?

একদিন বাতায়নে তার নির্দ্দিষ্ট কোণটিতে বসে নন্দিনী বাইরের পানে তাকিয়ে একজোড়া ক্রৌঞ্চ-মিথুনের প্রেমালাপ দেখছিল, এমন সময় তার কানে ভেসে এলো দূরাগত বাঁশীর সুরের মত মিষ্টি একটি কোমল স্বর। নীচে তাকিয়ে নন্দিনী দেখলো কণ্ঠে অপূর্ব্ব সুরের ঝঙ্কার তুলে এক সুদর্শন তরুণ যুবা প্রাসাদের তোরণের দিকে এগিয়ে আসছে। যুবকের কণ্ঠ-নিঃসৃত সে অপূর্ব্ব সুরে নীরস পাষাণের বুক চিরে আনন্দের ধারা যেন উথলে পড়ছে। যুবকের কথা শুনবার জন্য নন্দিনী যেন উন্মুখ হয়ে উঠলো। এমন মধুক্ষরা দরদী কণ্ঠস্বর সে আগে কখনও শোনেনি। নন্দিনীর দু'চোখ ছাপিয়ে নেবে এলো অশ্রুর বন্যা, তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—সে অশ্রুতে সিক্ত হল তার হস্তধৃত নীল-পদ্মটি।

প্রাসাদের রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত হলো না, দ্বারীর রুক্ষকণ্ঠ গর্জ্জে উঠলো—"দূরে রহ—তুমি সৈনিক নও, সৈনিক ভিন্ন অপর কারুর এ প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ।"

নন্দিনী যেমন তাকিয়ে ছিল তেমনি রইলো। অশ্রুসিক্ত নীল কমলটি সে নীচে ফেলে দিল! পদ্মটি পড়ল তরুণের পায়ের কাছটিতে। তরুণ চোখ তুলে চাইল, ফুলটি তুলে নিয়ে তার নরম পাপড়িতে এঁকে দিল ছোট একটি চুমো, তারপর এক-পা এক-পা করে বনের দিকে চলে গেল।

অনাস্বাদিতপূর্ব এই সুখের আবেশে নন্দিনীর চোখ দু'টি বুঁজে এলো, অজানা যাদু-দণ্ডের পরশে তার মনের রুদ্ধ কপাট খুলে গেল বুঝি।

সে রাতে নন্দিনী স্বপ্ন দেখলো, তরুণের পায়ের কাছে ফেলে দেওয়া তার সেই নীল-পদ্মটিকে। আর দেখলো—কি দেখলো জান তুলা? দেখলো সেই ঈষৎ কম্পমান পাপড়িগুলির মধ্যে থেকে

আবির্ভূতা হলো এক নারীমূর্ত্তি, তিলোত্তমার মত যার রূপ, গৌরী তনুলতা আগুন-রাঙা চেলি দিয়ে ঢাকা। মাথায় ফুলের মুকুট, দেহে স্বচ্ছ সবুজ আস্তরণ আর কটিতটে স্বর্ণ মেখলা!

নারীমূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো; নন্দিনীর ললাটে একখানি হাত রেখে বললো—নন্দিনী চেয়ে দেখ, আমি এসেছি। আমিই আজ ভোরে পাঠিয়েছিলাম তরুণকে—কণ্ঠে যার সুধা-ঝরা সুর। তোমার অশ্রু আমি মুছিয়ে দেব নন্দিনী।

স্নেহহীন জীবনের ভার বয়ে বয়ে যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তাদের সন্ধানে আমি বিশ্বময় ঘুরে বেড়াই। তাদের ভাঙা বুক জোড়া লাগাই। রাজার প্রাসাদ, দীনের পর্ণকুটীর—বিশ্বের সর্ব্বত্র আমার গতি অবারিত। প্রয়োজন মত রাজা-প্রজার ব্যবধান ঘুচিয়ে আমি তাদের মধ্যে মিলন ঘটাই। আমার পক্ষপুট-ছায়ায় যারা একবার আশ্রয় পায়, কেউ তাদের অকল্যাণ করতে পারে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, দেহের সঙ্গে দেহ বেঁধে দিই আমি প্রেমের অন্তরতম বন্ধনে! হিয়ায় হিয়ায় আমি জাগাই পুলকের উচ্ছাস। বসন্ত-প্রভাতে বনানীর শ্যাম-ছায়ে আর শীতের হিমেল রাতে প্রিয়তম-প্রিয়তমার নিবিড় মিলনেই আমার আনন্দ। প্রেমের নিভৃত কুঞ্জরচনাই আমার নিত্যকার কাজ। তোমার ব্যথা দূর করবো বলেই আমি তোমার কাছে এসেছি।

এই না বলে নারীমূর্ত্তিটি অন্তর্ধান করলো, পদ্মের দলগুলি বুঁজে গিয়ে আবার কুঁড়িতে পরিণত হল!

তুমি জান তুলা, স্বপ্নে নন্দিনী যে নারীমূর্ত্তি দেখেছিলো, তিনি ছায়াময়ী নন। এই গৃহকোণে চেয়ে দেখ, আজকের এই সন্ধ্যায় তাঁর নৃত্যপরা রূপ তুমিও দেখতে পাবে।

পর দিন ঘুম ভেঙে নন্দিনী দেখলো নূতন রবির সোনালী হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার ঘরে, পাখীর কাকলিতে বনাঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে আর ঘুম ভাঙা ফুলের চুম্বন-সুরভিত ভোরের বাতাস তার কালো চুলের রাশির সাথে যেন লুকোচুরি খেলছে। নন্দিনীর মনে আজ দুঃখের লেশমাত্র নেই; সারা দিনমান তার শরতের মেঘের মত হাল্কা হাল্কা মনে হল। পাহাড়ের রুক্ষ সৌন্দর্য্যও আজ যেন আর ততটা রুক্ষ নয়। মাঝে মাঝে ছোট্ট শিশুর মতই হাততালি দিয়ে সে অকারণে হেসে উঠছিল!

সেদিন সন্ধ্যায় রোজকার মত নন্দিনীর ডাক পড়লো দৈত্যের কাছে, তার বিগত যৌবনের দুঃসাহসিক কথা ও কাহিনী শোনবার জন্য। নন্দিনী এসে তার নির্দ্দিষ্ট আসনটিতে বসলো! বাইরে ঝিল্লীর অশ্রান্ত একঘেয়ে আওয়াজ। খোলা বাতায়নের পথে বাইরের পানে দৃষ্টি মেলে নন্দিনী বুঝি সেই আওয়াজই শুনছিল।

একটু বাদে দৈত্যের পানে চাইতেই সে কি দেখলো, দৈত্যের পাশে বসে আছে এক তরুণ, হাতে তার নন্দিনীর ফেলে দেওয়া সকাল বেলাকার সেই পদ্ম।

তার লাজরাঙা মুখখানি দৈত্যের দৃষ্টি হতে লুকোবার উদ্দেশ্যে সে আবার বাইরের পানে তাকালো।

তরুণ মৃদু মৃদু হাসছিলো, আর মধ্যে মধ্যে মাথা নেড়ে দৈত্যের কাহিনীর তারিফ করছিল।

বাতায়নের নীচে পদ্ম-দীঘির জল একটু নড়ে উঠল না? দেখতে না দেখতেই আবির্ভূতা হলেন স্বপ্নে দেখা সেই নারীমূর্ত্তি আর ধীর পাদক্ষেপে বিদেহিনী ঘরে প্রবেশ করলেন দৈত্যের নিকট অদৃশ্য হয়ে। দৈত্য তার কাহিনীতে বিভোর। চাপা সুরে বিদেহিনী নন্দিনী আর তরুণকে বললেন—"বুড়ো তার অতীত জীবনের কাহিনী বলুক। তোমাদের তো বুড়োর গল্প শোনবার সময় নয়, ভাল-বাসবার সময়, ভালবাসা ছাড়া তরুণ-তরুণীর আর কোন কাজ নেই। তোমাদের প্রেম গভীর হোক; এত গভীর যে ভাষা-হারা। ইঙ্গিতে, চাহনিতে, চুম্বনে ব্যক্ত হোক তোমাদের প্রেম।"

পুলকের প্লাবন সে ভীরু হিয়া বইতে পারবে কেন? কম্পবক্ষ নন্দিনী অসহ্য আবেশে যেন মুয়ে পড়ল!

এর পর কি হল জান তুলা? বিদেহিনী তার শ্যাম অঞ্চল দিয়ে একটি ঘর—নন্দিনী আর তরুণের মিলন-বাসর—রচনা করলো। এই বাসরে দৈত্যের অলক্ষ্যে তরুণ নন্দিনীর গণ্ডে এঁকে দিল প্রেমের পরিচয়ের লেখা। দৈত্যের কাহিনী শেষ হল। তরুণ নন্দিনীর উদ্দেশ্যে একটি বিদায়-চুম্বন জানিয়ে দৈত্যের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল। নন্দিনীর সুখের আর অবধি নেই।

পরদিন ভোরে নন্দিনী ফুল-বাগিচায় রঙীন পাখনা মেলে প্রজাপতি যেমন উড়ে উড়ে ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায় তেমনি করে বেড়াচ্ছিল কুঞ্জ হতে কুঞ্জে। তেমনি একটি কুঞ্জের পাশে শাস্ত্রীর ছদ্মবেশে তরুণ তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল—হাতে তার রক্ত-পদ্ম।

তারা দুজনে হাত ধরাধরি করে পাহাড়ের কোলে যেখানটি ঝরণার বুকের মধু ঝরে পড়ে সেখানে গিয়ে বসল। দিনের আলোয় দুজনে দুজনকে দেখে কি খুসিই হলো। সে দিন বনানীর পাখীরা কত কথাই না শুনেছিল!

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সন্ধ্যার আবছায়ায় দৈত্যের বিশাল বপু উঁকি দিচ্ছে কি? তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভয়-চকিতা হরিণীর মত নন্দিনীর সারা দেহ যেন থেকে থেকে থর থর করে কাঁপতে লাগল। দৈত্য দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই।

ঝরণার শীকরকণা হঠাৎ ইন্দ্রধনু রঙে রঙিন করে বিদেহিনীর আবির্ভাব হলো, রঙীন আলোচ্ছায়ে সে নন্দিনী আর তরুণকে অন্তরাল করে রাখলো। বুড়ো দৈত্যের কানে দূরাগত বাঁশীর সুরের একটা মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এলো, কিন্তু দৃষ্টিহারা তার চোখে কোন মনমূর্তি ধরা পড়লো না।

তরুণ আর নন্দিনীর গালে দুটি স্নেহ-চিহ্ন এঁকে দিয়ে বিদেহিনী বললো—"প্রেমের দেউলের দোরের অতন্দ্র প্রহরী আমি।

"যারা ভালবাসে না, তাদের চোখের দৃষ্টি আমি হরণ করে নিই; দেউলে তাদের প্রবেশ নিষেধ। অস্ত রবির এই মায়া-আলোয়, তোমরা দুজনে দুজনার বুকে রহস্যময় আবেশ রচনা করো নির্ভয়ে। কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না; আমার পক্ষপুট ছায়ে তোমরা যতক্ষণ আছ। প্রেমের ছোঁয়া লাগিয়ে তরুণ-তরুণীর রুদ্ধ হিয়ার কপাট খুলে দেওয়াই আমার কাজ। প্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় যারা অবগাহনে অক্ষম, তাদের কলুষ দৃষ্টিতে তোমাদের সুখে ছেদ পড়বে না।"

এই না বলে নন্দিনী আর তরুণকে নিয়ে বিদেহিনী অন্তর্হিত হলো।

তারপর তরুণ আর নন্দিনীর কি হলো জানতে তোমার খুব সাধ হচ্ছে, না তুলা?

ওকি! ঠোঁট তোমার ফুলে ফুলে উঠছে কেন? দুষ্টু মেয়ে! আর মুখ ভার করো না। বলছি বলছি—তরুণ ও নন্দিনীকে বুকে করে বিদেহিনী কত পাহাড়, কত প্রান্তর, কত নদ, কত নদী পেরিয়ে গেল তার ঠিক ঠিকানা নেই। অবশেষে বিদায়ের ক্ষণ এলো, কিন্তু তরুণ নন্দিনী কেউ কাউকে ছাড়তে রাজী নয়। বিদেহিনী তখন কি করলো জান তুলা? তার হাতের যাদুদণ্ডটি ওদের কপালে একটু বুলিয়ে দিল—অমনি—ওকি তুলা—তোমার চোখ দুটি অত বড় হয়ে উঠল কেন?

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তরুণ আর নন্দিনী, নন্দিনী আর তরুণ—দুটি আশ্চর্য্য সুন্দর রক্তকমলের মৃণালে পরিণত হলো। এত কাছাকাছি যে, তাদের পাতাগুলি যেন পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছে। সেই মৃণাল দুটিতে ফুটলো দুটি রক্তকমল।

এবার যখন আমরা—তুমি আর আমি—বেড়াতে বেরুবো, তখন এই রক্ত-কমল দুটি আর তাদের অধিশ্বরীর খোঁজ করবো, কি বল

মৃত্যুর অখণ্ড প্রেম

জয়ন্তী রায় (লাহিড়ী)

মৃত্যুর অখণ্ড প্রেম নেয় যদি মোরে কাছে টেনে,
অমৃতের পাত্রখানি দেয় মোরে এনে,
হয়তো বা তবে এই আঁধারের রাত্রি হবে শেষ,
আলোকের জয়রথে দেখা দেবে সুন্দর নিমেষ।
এ জীবনে যেন মোর বেদনার নাই অবসান,
বৃথা মোর সুখ খোঁজা বৃথা তারে আকুল আহ্বান।
দুঃখ মোরে ভালবাসে,
তাই সে জড়াতে আসে তার বাহুপাশে,
গভীর বিষের রঙে রাঙাতে এ প্রাণ,
এ জীবনে বেদনার নাই অবসান।
আঁধারের ফুল যে গো, ফুটেছে যে চির অন্ধকারে,
কে দেখাবে আলো তারে,
কবেকার কোন্ সূর্য্য তার লাগি হ'য়েছে আকুল,
সে যে চির আঁধারের ফুল।
সমস্ত প্রহর ধরে যত তার আলোর সাধনা,
রক্তের চন্দনে মাখা যত আরাধনা,
মিথ্যে সে কুসুমে বাঁধা মালার প্রয়াস,
এ জীবনে সুখ পরিহাস।
তাইতো আঁধার পথে চলেছিনু আমি একা একা,
বসন্তের কুহু নয়—শ্রাবণের কেকা,
আকণ্ঠ বেদনা ভরি ছিল মোর সাথী।
আমার আকাশ ছিল মেঘ-ছায়া পাতি,
উত্তপ্ত জ্বালার মাঝে বৃষ্টির সান্ত্বনা
আমার জীবনে ব্যর্থ আলোর সাধনা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মন স্থির করতে যেমন সময় নিলে না মমতা, তেমনি স্থির হয়েও সময় নষ্ট করলে না। প্রাথমিক পরীক্ষার পর রোগীকে তেতলায় তুলে নিয়ে যাওয়াটা পর্যন্ত বাদ দিলে। এখানেই সেলাইন স্টার্ট করবে সে। এ্যানিমিকের রোগী, তাতে রক্ত চলে গেছে প্রচুর—আর দেরী করা নয়। হাঁটা দিলো সে ডক্টরস্ রুমের দিকে—অষুধপত্র যন্ত্রপাতির ঘরের দিকে।

তেমন প্রয়োজনে এই টেবিলে সেলাইন দেওয়াটা আইনবিরুদ্ধ কাজ নয়। কিন্তু কোন ডাক্তারের উপস্থিতি ছাড়া নার্সের পক্ষে—বিশেষ করে জুনীয়ার গ্রেড নার্সের পক্ষে রোগীকে সেলাইন দেওয়াটা যে হাসপাতাল-আইন-বিরুদ্ধ কাজ, এটা মঞ্জুর জানার কথা নয়, জানেও না। ঝুঁকি এবং মনের জোর নিয়েই যে মমতা একাজে প্রবৃত্ত হলো সেটাও সে বুঝল না। সে শুধু দেখল, এই যে এঘর থেকে ও ঘরের দিকে হাঁটা দিল মমতা সে হাঁটার সঙ্গে তার কিছুক্ষণ পূর্বের হাঁটার কণামাত্র মিল নেই। নার্সদের চলার যে বিশেষ ধরণের একটা শরীর টান করা আর টান-চলায় তড়িৎ ভঙ্গির গতি আছে, এবারের চলায় মমতার শরীরে সেই টান ভাব, পায়ে সেই তড়িৎ গতি এসে গেছে।

'এখন যা করবার মমতা করবে।' নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভেতরও এ নিশ্চয়তা কম নয়। মা একটু শান্ত হয়ে মেয়ের পায় হাত বুলোতে লাগলেন। প্রতিবেশী কাঞ্চন আর অমল তিন-তিনটে রক্তমাখা দেহ এনে কুলীরা যেখানে নামালো দু' পা এগুলো সেদিকে। মঞ্জু জয়ার বরফের মতো ঠাণ্ডা কপালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। আহত দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলে, এই লোকগুলোও আবার কতক্ষণ এ ভাবে পড়ে থাকবে কে জানে!

মমতা যেমন গেল প্রায় তেমনি ফিরে এসে হাতের ট্রে শিশি-বোতল নামিয়ে রাখল একটা টেবিলে। একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক জয়ার টেবিলের পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল একটা লম্বা ষ্ট্যাণ্ড।

মমতা ট্রে থেকে টলটলে জল ভরা একটা বোতল তুলে নিয়ে ঝুলিয়ে দিলে সেই ষ্ট্যাণ্ডের হুকে। তারপর দক্ষ পরিচ্ছন্ন হাতে মিনিট পোনেরোর ভেতর জয়ার শরীরে সেলাইন সঞ্চরণ করে চটপট হাতে এক টুকরো কার্ডবোর্ডের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল জয়ার হাতটা। ফোঁটায় ফোঁটায় টলটলে লবণ জল রবারের নল বেয়ে নেমে এসে সূচের মুখ দিয়ে বেয়ে চলল জয়ার ধমনীর ভেতর।

এ হাতে সেলাই, ও হাতের কব্জিতে আর্টেরি ফরশেপ—হাতের মাঝখানের নাড়ীতে তিনটি আঙুল রেখে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নাড়ীর স্পন্দন গুনলো মমতা অনেকটা সময়। তারপর মঞ্জুকে বললো—এবার আমি একটু একজন ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছি—

—হাতটা ধরে রাখবো আমি, যাতে নাড়াচাড়া করতে না পারে? জানতে চাইলে মঞ্জু।

—দরকার নেই। ব্যাণ্ডেজ এমন ভাবে বাঁধা আছে ও নাড়াতে পারবে না। আচ্ছা, আমি আসছি।

মমতার ডিউটির সময় ছিল না এটা। ঢিলেঢালা পোষাকটা বোধ হয় সে অষুধপত্র আনবার আগেই আঁচলে জড়িয়ে প্রায় কোমর-বন্ধনীর মতোই শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছিল। আর মাথার উড়ন্ত চুল গুলোকে বেঁধে নিয়েছিল একটা রুমাল দিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে মঞ্জুর মনে হলো, মমতা সুন্দর স্নিগ্ধ সেটাই

কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে আছে—আর মমতার সব রূপ যেন সেইখানে।

হ্যালো, ব্যাপার কি? পরিচিত কেস নাকি? ডক্টরস্ রুমের দিকে এগুতে গিয়ে একেবারে মমতার মুখোমুখী পড়ে গিয়ে থেমে পড়লেন এক ডাক্তার।

ডাক্তারকে দেখে যেন বর্তে গেল মমতা। সাগ্রহে বলে উঠল—বাঃ এই তো কেমন আপনাকে পেয়ে গেলাম। মিঃ সেন একটু এদিকে আসুন।

চিনল মঞ্জুও। একেই সে সেদিন মমতাদের বাড়ীতে দেখেছিল।

মমতার মুখ থেকে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত এই আগ্রহান্বিত আহ্বান ডাঃ সেন কিন্তু এর পূর্বে আর কোন দিনও শোনেননি। মমতার দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে শায়িত জয়ার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। —কি হয়েছে?

জয়ার কাটা হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরল মমতা নীরবে।

মঞ্জু তাকে জয়ার আত্মহত্যা করতে যাওয়ার কথা বলেনি বা বলবার সময় পায়নি। কিন্তু মমতা ব্লেডে কাটার চেহারাটা দেখেই যেমন বুঝে নিয়েছিল এটা সুইসাইড্ কেস, ডাঃ সেনও তেমনি কাটা দেখেই সেটা বুঝে নিলেন। জয়ার হাতের মাঝখানের শিরার ওপর ঠিক মমতারই মতো করে তিনটি আঙুল ছুঁইয়ে তারই মতো ঘড়ির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাক্তার অনেকটা সময়। কালো হয়ে আসা আঙুলের ডগা নখ গোটা দুই তিন তুলে তুলে দেখলেন টিপেটিপে; তারপর টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন,—ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করে ফেল। ডাঃ সিনহা কোথায়?

—ডাঃ সিনহা হেড ইনজুরী কেস নিয়ে চলে গেছেন ওটিতে। তাইতো—

—একে সেলাইন দিলে কে? ডাঃ দাস?

আমি। বিনীত কণ্ঠে বলল মমতা।

—তুমি? ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ডাক্তার জয়ার দিকে।

—উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হয়েছে। সবিনয় কণ্ঠে বললো সে।

সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে মমতা—এমনিভাবে প্রশংসার দৃষ্টি

সবাই-ই বুঝল আইন-বিরুদ্ধ ভাবে মমতা নিজ দায়িত্বে সব করেছে। মঞ্জুদের সবার দৃষ্টিতেই কৃতজ্ঞতা প্রশংসা ফুটে উঠল।

—এ কেসটা আপনি একটু দেখুন ডাঃ সেন। এখন কাউকে পাওয়া যাবে না—এই মেয়েটি আমার বিশেষ বন্ধু। কিছুটা মধুস্বর দাবী, কিছুটা প্রীতির সুর—যেন মিশিয়ে দিল মমতা তার আবেদনের সুরে।

অত্যন্ত দুরূহ একটা ডেলিভারি-কেস নিয়ে ডাক্তার সেনকে আজ গলদ ঘর্ম হতে হয়েছে সমস্ত দিন। তারপরও স্বাভাবিক ডেলিভারি সম্ভব হয়নি। মেয়েটির স্বাস্থ্যের অবস্থা, হার্টের কনডিশন দেখে অপারেশনটা এড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সার্জিক্যাল অপারেশন থিয়েটারে-নিয়ে মৃত শিশু বের করতে হয়েছে ডাক্তারকে সিজারিয়ান করে। এই মাত্র রোগীকে বেডে পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ব্লাড সেলাইন সার্ট করে বাড়ী ফেরবার মুখে একটু দরকারে এখানে এসেছিলেন ডাক্তার। একে সমস্ত শ্রম ব্যর্থ করে শিশু হয়েছে মৃত, তাতে মার অবস্থা আশঙ্কা-জনক—দিনটাই ব্যর্থ মনে হচ্ছিল ডাক্তারের। পরিশ্রান্ত পিঠটা হাত পা মেলে শুয়ে পড়তে চাইছিল কোথাও। কিন্তু মমতার মনস্তত্ত্ব বোধটা বৃথা গেল না। তার গলার সেই প্রীতির সুর—আবার এক নজর তার দিকে তাকাতে বাধ্য করলো ডাক্তারকে। সার্টের গুটোনো হাতা অভ্যাস বশেই ঠেলে তুলে দিতে দিতে জয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ডাক্তার। ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে আসা নাড়ীর গতিটা দেখল আবার। দেখল বুকের স্পন্দন। তারপর বললো—কোরামিন।

মমতা ছুটলো কোরামিন আনতে।

—হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার। বাইরে যাওয়া-আসা কথাবার্ত্তায় সরগরম। এ্যাম্বুলেন্স থামার শব্দ হয়। দুপ, দাপ, শব্দ তুলে কতকগুলো পা ছুটে আসতে থাকে এদিকে। ষ্ট্রেচার এনে নামায় কুলীরা। টেবিল গুলো ভর্ত্তি হয়ে হয়ে শেষে শুধু সিমেন্টের ওপর শরীরগুলো নামিয়ে রেখে খালি ষ্ট্রেচার নিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে কুলীরা।

কি হয়েছে?

আহা, বিষ খেয়েছে।

ইস্, রাজমিস্ত্রী, কাজ করতে করতে আচমকা তিনতলার ছাদ থেকে ছিটকে পড়ে গেছে!

মাগো, গাছ চড়ে খেলা দেখতে গিয়ে গাছ উপড়ে পড়ে চাপা পড়েছে ওপরের লোক নীচের লোক!

এ্যা, গাড়ীর তলায় চাপা পড়েছে?

মদ খেয়ে মারামারি করে মাথা ফাটিয়েছে!

কেউ কাতরাচ্ছে। কেউ গোঙাচ্ছে। কেউ পড়ে আছে নিথর হয়ে। জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না। যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে করে ঘটনা জানতে আর নোট নিতে চেষ্টা করছে। যারা অজ্ঞান, তাদের আর এই জিজ্ঞাসাবাদটুকুও সম্ভব হচ্ছে না। নেড়ে চেড়ে নার্সরা একটু প্রাথমিক এটা ওটা দেখে তুলে দিচ্ছে ষ্ট্রেচারে। ডেটল, লাইজল, ইথার, ক্লোরোফরমের-মিশ্রিত যে হাল্কা গন্ধটা হাসপাতালের গেটে ঢোকার পরই নাকে আসে, তারই উগ্র গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে চারিদিকে—

জয়াকে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্ম যখন ষ্ট্রেচার আনা হলো—তখন যেন এখান থেকে বেরুতে পেরে বাঁচল মঞ্জু।

সরু ছোট্ট প্যাসেজটা গিজগিজ করছে লোকে। শেষ হয়ে গেছে ভিজিটিং আওয়ার। রোগীদের আত্মীয় বন্ধু সব বেরিয়ে যাচ্ছে। কারু হাতে খালি টিফিন-কেরিয়ার। কারু হাতে খালি কৌটো। আর এখন হাসপাতালের ভেতর থাকা চলবে না বাইরের লোকের। জয়ার মাকে নিয়ে ওদেরও বাইরে চলে আসতে হলো। এক মঞ্জুকে নিয়ে নিল মমতা সঙ্গে করে। জয়াকে নিয়ে লিফটে তোলা হলো। ওরা চলল সিঁড়ি ভেঙ্গে। এতক্ষণে বুঝলো মঞ্জু ইমারজেন্সী রুমটা কিছুটা কাজ করে যেন একটানা তেতলায় তুলে নেবার আগের নিরীক্ষণ-কেন্দ্র হিসাবে। তেমন গুরুতর ক্ষেত্রে সেখানে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে, যেমন মমতাকে জয়ার সেলাই সার্ট করে দিয়েছিল—নইলে তেতলায় ব্লকেই নিয়ে আসতে হয় সবাইকে।

কিন্তু মঞ্জু যে ভেবেছিল ঐ ঘরটা ছেড়ে সে বাঁচলো—তা একেবারেই মিথ্যে। উপরে উঠে দেখল এটা—আরো ভীষণ। কারু হাত কেটে ফেলা হয়েছে। কারু পা। কারু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখ একেবারে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা। কারু পা উপর দিকে টানা। কারু হাত। কারু নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢোকানো। কারুর কাছে অক্সিজেন সিলেণ্ডার। সারি সারি ষ্ট্যাণ্ডে ঝুলছে রক্ত, লবণ-জল। প্যাসেজ থেকে শুরু হয়েছে রোগীদের খাটিয়া পাতা। তাতেও কুলোচ্ছে না। মাটিতে মেঝেতে এখানে ওখানে পড়ে আছে সব। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন বেশবাস পরিবেশ বিছানা-পত্র আবহাওয়া। এই হাসপাতাল? মানুষের আরোগ্যনিকেতন?

করিডোরের বেডগুলোর পাশ দিয়ে কুলীরা ষ্ট্রেচার ডান দিকে ঘুরালো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো মঞ্জুও। এখানেই মেয়েদের ওয়ার্ড। সেই এক অবস্থা—এক চেহারা। জয়ারও খাটিয়া মিলল না। নামিয়ে রাখা হলো তাকে নীচের একটা গুটোনো নোংরা তোষক টান করে।

কোন উপায় নেই।

পেইং ওয়ার্ডের কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল মমতা। নেমে গেলেন ডাক্তার। অবস্থা বুঝতে কতক্ষণ লাগে?

সেই মেঝের বিছানায়ই ব্লাড, ট্রান্সফিউশন দিলেন ডাক্তার। দিলেন মরফিয়া। করলেন কাটা হাত সেলাই। তারপর বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন করিডোরে।—তুমি থাকবে এখন এই মেয়েটির কাছে?

—থাকা দরকার হলে থাকবো।

—দরকার মানে, ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার সেন—এখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নটা নাগাদ আমার চেম্বারে একটা রিং করে তুমি এর অবস্থাটা জানাবে আমাকে। তখন আমি বলে দেবো, আজই আর একবার ব্লাড দেওয়া দরকার, না কাল সকালে দিলেই চলবে। আর তুমি যদি না থাকো তবে ওয়ার্ডনার্সকে বুঝিয়ে বলে যাবে—থামলেন ডাক্তার। আচ্ছা, আমিই বলে যাচ্ছি। তোমার কথায় তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারে।

—আমিই থাকবো। ন'টার পর আপনাকে অবস্থা জানাবো

একটু চিন্তা করলেন ডাক্তার—আজ সমস্ত দিন ডিউটি দিয়েছেন, কাল সকালে আবার তোমার ডিউটি রয়েছে—

একটু হাসল মমতা—এটাও ডিউটিই। ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত থাকতে আমার কিছু কষ্ট হবে না। আমি আপনাকে ঠিক ন'টায় ফোন করবো।

ডাক্তার বুঝলেন,—তিনি যে আরো কিছু সময় রোগীর কাছে এ্যাটেনডেন্স দরকার মনে করছেন, মমতা তার কথায় সেটা বুঝেছে।

—আই উইস্ ইওর সাকসেস্। বলে জুতোর শব্দ তুলে করিডোর পার হয়ে গেলেন ডাক্তার।

সে দিনের জয়াদের বাড়ীতে দেখা ডাক্তার আর এই ব্যক্তি কি একই লোক? মঞ্জুর মনে হতে লাগল যেন এক নয়। তা ভিন্ন লোক বৈ-কী। এখানে সে ডাক্তার।

মমতার সঙ্গে থেকে যেতে চাইলো মঞ্জুও। কিন্তু মমতা দিলে না। তুমি, তা তোমাকে এতক্ষণ আপনি বলছিলাম কিন্তু বলতে একটুও ভালো লাগছিল না। ছোট তো। তুমিই বলি, কি বলো? তোমার থাকার কোন দরকার নেই। দরকার থাকলে কি আমি কখনোই যেতে দিতাম তোমাকে? ভয়ের কারণ কেটে গেছে। আমার থাকার প্রয়োজন হলো,—অবস্থা দেখছ তো হাসপাতালে। কি করবে ডাক্তার, কি-ই বা করবে বেচারা নার্স অর্থাৎ আমরা। হাসল মমতা। একেবারে হিমশিম খাই আমরা। সামনের গুরুতর কেস পেছনের গুরুতর রোগীর কথা ভুলিয়ে দেয় জানি তো। তাই রয়ে গেলাম। ফের ব্লাড দিতে হয় তো, দেওয়া হয়ে গেলেই চলে যাবো আর না দিতে হলে তো কথাই নেই। তুমি শুধু শুধু কেন রাত করবে? তারপর তোমাকে রাখাটাও একেবারে নিয়ম-বিরুদ্ধ যে—

—কাল সকালে ক'টায় সময় আসবো।

সেটাও যেন নাই করতে যাচ্ছিল মমতা। বলতে যাচ্ছিল একেবারে হাসপাতালের ভিজিটিং সময়ে এলেই চলবে। কিন্তু থেমে গেল। রক্ত আনতে হয়েছে ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে, আবারও হয়তো আনতে হবে। অষুধ এসেছে। ইনজেকসান এসেছে। জয়ার মার আঁচলের টাকায় তার অনেক কিছুর মূল্য দেওয়াই বাকী থেকে গেছে। নিজ দায়িত্বে আনিয়েছে মমতা। কাল টাকা দিতে হবে। বললো—তা তোমার সময় মতো এসো। কাল আমার ডিউটি সকালে। লেবার-রুমে থাকবো। খোঁজ করলেই ডেকে দেবে।

মঞ্জু যখন হাসপাতালের দালান থেকে বাইরে এলো তখন ওর মুখের রংও ঐ ইমারজেন্সী-ওয়ার্ডের ঘরে, বাইরে, প্যাসেজে, টেবিলে, মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলোর মুখের মতোই কালো চটচটে ঘামে ভেজা। শরীরের অবস্থা ঐ লোকগুলোর মতোই বুঝি অর্ধমৃত। ইমারজেন্সী ওয়ার্ড নয় তো যেন যমের কড়াই থেকে হাত পা গুলো সুস্থ ছিল বলে ও ছিটকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

জয়ার মা সমস্ত পথ গুণগুণ করে যত কথা বলে গেলেন, তা সবই মমতার প্রশংসা। এমন রূপ, এমন গুণ, একত্র হয় না কখনো, যদি না দেবী হয়। মমতা নিশ্চয়ই শাপ-ভ্রষ্টা দেবী। আহা, কি ভালো মেয়ে।

—হাঁ, নিঃসন্দেহে ভালো মেয়ে। আর এই শুধু জানো বলার যেন কিছুই বলা হয় না মমতার সম্বন্ধে। ওর আর জানতে ইচ্ছে করে—কেনই বা মমতা রত্নার কাকাকে বিয়ে করতে বলায় একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কেনই বা সে আর একদিন ওর ছোড়দাকে বিয়ে করতে মত দিয়েছিল। গালে একটু হাসির টোলই যেন খেলে গেল—মঞ্জুর। এবার ছোড়দা এলে সে তাকে বলবে—ছোড়দা, তুমি কি হারাইয়াছ তাহা তুমি জানো না।

পাশের বাড়ীর মিঃ চৌধুরী—যিনি উদযোগী হয়ে জয়াকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন এবং যার বাড়ীর মেয়েরা জয়াকে নিয়ে তাদের কাছে রেখেছিলেন। এখন জয়ার মাকেও চৌধুরী তার বাড়ীতেই নামিয়ে দিয়ে যেতে চাইলে নিশ্চিন্তবোধ করলো মঞ্জু। এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? ওরা নেবে গেলে এবার রূঢ় গলায় ড্রাইভার জানতে চাইলো—সে কোথায় যাবে।

সেই বেলা তিনটে থেকে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এই থামা ওয়েটিং চার্জের চাইতে চলায় তাদের দ্বিগুণ লাভ। কিন্তু মঞ্জুকে সে খুঁজে বের করতে পারে নি। আর খুঁজবেই বা কোথায়—এদিক ওদিক তাকানো ছাড়া। অমলরা বেরিয়ে এলে তাদের ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু ওরা দেবে কোথা থেকে? বাধ্য হয়ে গজগজ করতে করতে থেকে যেতে হয়েছিল তাকে।

বুঝল মঞ্জু সবই। না ভেবে-চিন্তেই সে বলে ফেলল—গ্র্যাণ্ডে চলো।

—গ্র্যাণ্ড হোটেলে? মঞ্জুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানতে চাইলো সে। একটু অবাক হওয়া ভাব তার জিজ্ঞাসায়। যেন—বেশবাস আদব-কায়দা কিছুই তো মঞ্জুর গ্র্যাণ্ডে যাওয়ার সাক্ষ্য দেয় না; ওকে ঐ সমাজের কেউ বলে বলে না।

জবাব দিল মঞ্জু—হঁ, গ্র্যাণ্ডে।

বহুৎ আচ্ছা।

গাড়ী ছুটে চলল।

যদিও মঞ্জু ভাবলো সে না ভেবে-চিন্তেই গ্র্যাণ্ডের কথা বলেছে, কিন্তু—তা কি কখনো হয়? মন প্রস্তুত না হয়ে কোথাও এক পা বাড়াতে চায় না, বাড়ায় না! জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া অবশ্য যায় কিন্তু তার পেছনে জোর থাকে, বল প্রয়োগ থাকে, জুলুম থাকে। হঠাৎ করে কিছু করে বসলেই যে আমরা ভাবি, না ভেবে-চিন্তে করেছি—এটা ভুল। হঠাৎ করা কাজের পেছনে মনের প্রস্তুতি থাকে সব চাইতে বেশী।

ওর এখন এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে সাত রকম প্রশ্ন করে ওকে কেউ বিরক্ত করবে না, কোন সন্দিগ্ধচিত্ততা নিয়ে ওর দিকে কেউ তাকাবে না।

যদি সে কথা বলতে না চায়, একটা কথাও না বলে, বসে বসে নীরবে সিগারেট টেনে চলবে।

মুখ দেখে ওর দুরন্ত ক্ষিধের কথা বুঝতে পেরে খাবার এনে কাঁটায় গেঁথে হাতে তুলে দেবে।

ড্রাইভারের কবুল করা বকশিস্, ট্যাক্সি মিটারের অঙ্ক, কালকের বেশীটার প্রয়োজন, কোন কিছুর জন্যই ওকে আর ভাবতে হবে না—

এর কোন্ কথাটা মনের অজানা?

তবে কোথায় যেতে হবে সে জানবে না কেন ?

প্রস্তুত হয়েই বা তবে থাকবে না কেন ?

গ্র্যাণ্ড ছাড়া যে মঞ্জুর আর কোথায় এখন যাওয়া হতে পারে না, এটা মন জানতো। প্রস্তুত হয়েও ছিল সে। আর কোথাও নিতে হলেই তাকে—জোর ক'রে নিয়ে যেতে হতো।

হোটেলের দরজায় গাড়ী এসে থামলে মঞ্জু নেমে পড়লো।

নেমে পড়লো ড্রাইভারও। জানালো আর সে এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবে না। তার টাকা মিটিয়ে দিক মঞ্জু।

ড্রাইভারের বলার ভঙ্গিতে, মুখের চেহারায় কোন সম্মান ছিল না। শঙ্কিত হলো মঞ্জু।

এমনি সময় রজতের গাড়ী এসে থামল মঞ্জুর ট্যাক্সির পেছনে। মঞ্জুকে দেখে নেমে এসে সসম্ভ্রমে সেলাম জানালো, রজতের ড্রাইভার।

এতো বড় গাড়ী থেকে অমন ফ্রাসো ধসা ঝকঝকে বোতাম আঁটা, সাদাপোষাক পরা ড্রাইভারকে নেমে এসে মঞ্জুকে সেলাম জানাতে দেখে যেন গুটিয়ে গেল ট্যাক্সি-চালক। হাত কচলে জানালো, মঞ্জু যেন মেহেরবাণী করে টাকাটা এক্ষুনি তার পাঠিয়ে দেয়।

হাঁফ ছেড়ে গ্র্যাণ্ডের পরিচিত পথে হাঁটা দিলে মঞ্জু।

তেমনি জোড়ায় জোড়ায় দেশী-বিদেশী নারী-পুরুষ চলেছে করিডোর দিয়ে। খোলা হাওয়ার রেষ্ট্রেন্টে তেমনি বাজছে অরকেষ্ট্রা। তেমনি একটি মেয়ে মাইকের মুখ কিউটেক্স রঞ্জিত আঙুলে আলতো হাতে ধরে গান গাইছে। তার মুক্তোর মতো দাঁত রাঙ্গা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। বয় ঘুরছে ট্রে হাতে। সব কিছু পাশ কেটে সোজা চলে গিয়ে লিফ্‌টে উঠল মঞ্জু। কিন্তু রজতের ঘরের দরজার বাইরে সঙ্কীর্ণ করিডোর ঘেঁসা টেবিলটা পেরিয়ে যাবার জন্ত পা বাড়িয়েও থেমে পড়ে সরে দাঁড়াতে হলো তাকে। জন তিন চার নারী পুরুষের একটা ছোট দল হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো রজতের ঘর থেকে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রজতের ঘরের উদ্দেশে বলল—নাইট ইজ ষ্টিল ইয়ং—ওগো, রজত নিষেধ জারি করেছে তো নিজেদের ভেতর ইংরেজী বলায়। বুঝলে রজত, রাত্রি এখনও নবীন—আবার আসছি আমরা।

জবাব এলো ভেতর থেকে—ও, সিওর।

—সিওর নয়, বলো নিশ্চয়। সকৌতুকে পাল্লাটা ঠেলে ঘরের ভেতর ডাক দিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে, 'সরি' বলে মাথা টেনে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হাসির রোল তুলে চলে গেল সবাই লিফ্‌টের দিকে।

ওরা লিফ্‌টে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু অপেক্ষা করে। এখানে ওরই বিশ্রামের জন্ত ওরা ঘরটা কিছুক্ষণের জন্ত খালি করে দিয়ে গেল। ভাগ্যটাকে একটা ধন্তবাদই দিয়ে ফেলল মঞ্জু।

কিন্তু কোথায় যে সত্যিকারের ভাগ্য, তা যদি মানুষ বুঝতে পারতো তবে তো, কথাই ছিল না। মঞ্জু লোকটির রজতের ঘরের ভেতর মাথা ঢুকিয়েই 'সরি' বলে মাথা বের করে এনে হো হো করে হেসে ওঠার কারণটা ধরে উঠতে পারেনি। নিষ্প্রয়োজন বোধে তাই টোকাঠোকা না দিয়েই দরজার ভারী নিঃশব্দ পাল্লাটা ঠেলে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়লো ও। কিন্তু ঢুকেই হকচকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো মঞ্জুকে।

রজতের ডবল স্প্রীংএর খাটের ডানলোপী গদীর ভেতর শরীর তলিয়ে দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে বসে আছে একটি মেয়ে। তার সিগারেট ধরা অলস হাতটা শিথিল ভাবে পড়ে আছে খাটের বাইরে। বোধ হয় রজতের শরীরে যাতে না লেগে যায় সে জন্তই হাতটা দূরে রেখেছে মেয়েটি। রজতের দুহাত বেষ্টন করে আছে মেয়েটির খালি কোমর। মুখটা মেয়েটির মুখের উপর।

কি করে বেরিয়ে যাবে ঠিক করে উঠবার আগেই মেয়েটির চোখ পড়ে গেল মঞ্জুর দিকে। রজতের মুখটা হাত দিয়ে সামান্ত ঠেলে দিয়ে, নেশাগ্রস্ত শরীর এগিয়ে দিল সে—বিছানায়।

বললো,—রজত, সাম ওয়ান হ্যাজ কাম। কাম আপাটা মেয়েটির মতোই গ্রাহ্য করলে না রজত। যেমন ছিল প্রায় তেমনি ভাবে বসে থেকে—শুধু মাথাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে স্ফূর্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো সে—হ্যালো, কে ?

বেরিয়ে যাওয়া হলো না মঞ্জুর। থাকতে হলো দাঁড়িয়েই।

—মঞ্জু! মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো—রজত বিছানা ছেড়ে। বিমূঢ় মঞ্জুর দিকে তার মাতাল চোখ দুটোও কিছু সময় তাকিয়ে রইল বিমূঢ় হয়ে। তারপর পা টলা পায় এগিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল মঞ্জুর দিকে—আঃ মঞ্জু, তুমি—তুমি এখন এখানে এসেছ কেন? এখন—এখন তোমাকে আমি কোথায় বসাবো, কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলবো? না—না। তুমি এখন চলে যাবে মঞ্জু। কথাগুলোর—আদ্দেক বোঝা গেল। আদ্দেক চাপা পড়ল তার ভারী জিবের তলায়।

চলো, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি। চলতে গিয়ে কৌচের পিঠ ধরে টাল সামলালো। তারপর বললো—চলো।

হঠাৎ সোজা হলো মঞ্জু।

—চলো।

—না।

লাল চোখ দুটো তুলে বিস্মিত ভাবে মঞ্জুর দিকে তাকালো রজত—যাবে না! বলছ ?

মঞ্জু মাথা নেড়ে জানালো। হ্যাঁ সে তাই বলছে।

বিহ্বল কণ্ঠে রজত বললো—কি করবে ?

মঞ্জুর মুখের বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে এখন যেন সেখানে বিদ্যুৎ খেলছে। বললো—বসবো।

[ক্রমশঃ]

A bad book is as much of a labour to write as a good one—it comes as sincerely from the author's soul.

—*Aldous Huxley*

ভবানী মুখোপাধ্যায়

একত্রিশ

বার্ণার্ড শ' দারুণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হলেন। কেউ বললেন—আকাশে উড়ে বেড়িয়ে আমি আনন্দে আছি, তুমিও তাই করো। আকাশে ওড়া তখন নতুন চালু হয়েছে। আরো অনেক প্রস্তাব এল। টি, ই লরেন্স (লরেন্স অব এ্যারাবিয়া) বার্ণার্ড শ'র স্ত্রীকে বললেন, যে আরব দেশে আকৃতি পরিচয় বদলাতে হয়েছিল গোলমালের সুত্রপাতে, তার ফলে অনিদ্রা সেরে গেছে।

বার্ণার্ড শ' একথা শুনে বললেন—তাহলে তোমাদের কি ইচ্ছা যে আমি দাড়ি কামিয়ে রাস্তার ঝাড়ুদারের কর্মটা গ্রহণ করি? সে কাজে আমার তেমন যোগ্যতাও নেই।

প্রোফেসার আলবার্ট আইনষ্টাইন একটা নতুন প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন—চিন্তা করা এবং না করার মধ্যে দীর্ঘ বিরতি থাকা প্রয়োজন। সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ানোটা যেমন অস্বাভাবিক চিন্তাও তাই। তাইত মানুষ চিন্তা করতে চায় না। আইনষ্টাইন বললেন—প্রচুর পরিশ্রম করুন। শরীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন। কাঠ চেলা করুন করাত দিয়ে, মেঝে পরিষ্কার করুন, কিংবা বাগানের মালীর কাজ সুরু করুন।

বার্ণার্ড শ' প্রস্তাবটি ভেবে দেখলেন। তাঁর মনে হল আইনষ্টাইনের কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। তবে আইনষ্টাইন এ কথা হয়ত ভেবে দেখেন নি দাসী-চাকর বা মালী হয়ত কর্ম পরিবর্তনে রাজী হবেনা। এই কারণেই ধনীদের জন্য নানাবিধ খেলাধুলা ব্যবস্থা।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে স্যাভয় হোটেলের সম্বর্ধনা ভোজে বার্ণার্ড শ'কে আইনষ্টাইনের স্বাস্থ্য প্রস্তাব করার অনুরোধ জানানো হল। বার্ণার্ড শ' সানন্দে এই কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। দার্শনিক শিল্পী (Artist Philosopher) গাণিতিক শিল্পীকে (Artist Mathematician) সম্মান প্রদর্শন করবেন। বার্ণার্ড শ'র ধারণা ছিল নীলনাগারে যে সব বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন, কবি ও কলাবিদরা তাদের চেয়েও অগ্রগামী। ধর্ম নিয়তই অভ্রান্ত আর বিজ্ঞানকে সব সময়েই ভুল প্রমাণ করা যায়।

বার্ণার্ড শ' ভাবলেন, Back to Methuselah নাটকে যেখানে তিনি বলেছেন—When a man is mentally incapable of abstract thought he takes to metaphysics; and they make him a professor. when he is incapable of conceiving quantity in the abstract he takes to mathematics; and they make him a professor.

এই সম্বর্ধনাসভার সভাপতি ছিলেন লর্ড রথসচাইল্ড, তিনি বললেন—আচ্ছা মিঃ শ', আপনি আর আমি আমাদের যথাসর্বস্ব যদি দরিদ্রদের দিয়ে দিই তাহলে সকলের জীবনযাত্রা সহনীয় হয়ে উঠবে?

বার্ণার্ড শ' বললেন—জানেন, আমার কোথায় আপত্তি! আমার আপত্তি দরিদ্র তার যথাসর্বস্ব ধনীর হাতে তুলে দেওয়ায়। যা অর্থনীতি হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ, ধর্ম হিসাবেও তার ত্রুটি থাকবে।

—মিঃ শ', আপনার ধর্ম কি? ঠিক যা বলুন?

—আপনারও যা আমারও তাই। আমিও বাইবেল পড়ে মহামানবের আবির্ভাবের আশায় বসে আছি।

লর্ড রথসচাইল্ড চোখ ছোট করে বললেন—আপনার হিসাবে তিনি ত' এসেই গেছেন।

শ' সেদিনকার সম্মানিত অতিথির দিকে ফিরে বললেন—দেখুন প্রোফেসার আইনষ্টাইন, আমার এই প্রশ্নটা আমি বহু বৈজ্ঞানিককেই করেছি, যদি দেখেন আপনাদের থিয়োরীর সঙ্গে আসল ঘটনার পার্থক্য অনেক তাহলে কি করেন? প্রশ্ন করার সঙ্গে নিজেই উত্তর দেন—আসল ঘটনা যদি খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তাকে বাদ দেওয়াই ভালো।

আইনষ্টাইন হেসে বললেন—বন্ধু! দুঃখের বিষয় আপনার ধর্মবক্তা ব্যক্তিটি বা বিজ্ঞানী বা কলাবিদ্ কেউই তর্ক করার অবসর পাবে না। তাছাড়া তারা সবাই হয়ত একই ব্যক্তি।

—তাহলে তাদের জন্য অপেক্ষা করবো, শুধু সেই কারণেই নয়, উপযুক্ত কথার জন্যও বসে থাকবো। মানুষকে তাদের চিন্তা সম্পর্কে সচেতন করার ধন্যবাদহীন দায়িত্বটুকুও আমি নিজের ঘাড়েই নিয়েছি!

আইনষ্টাইন আবার হাসলেন, বললেন—সে কর্ম আপনি ভালোভাবেই করেছেন—তাতে তারা এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় তার পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।

সকলে অট্টহাস্য করে উঠলেন। বার্ণার্ড শ' এই সময় যে নাটকটি লিখছিলেন টি, ই, লরেন্সের চরিত্র সেই নাটকে রূপায়িত করেছিলেন, বার্ণার্ড শ' তাঁর সব পরিচিত চরিত্রকেই এই ভাবে অমর করেছেন, তবে রঙ চড়িয়েছেন অনেক বেশী। এই নাটক কিন্তু সম্পূর্ণ হল না, তার আগেই রাশিয়া যাওয়ার একটা সুযোগ ঘটল।

লর্ড লোথিয়ান ও লেডী এ্যাষ্টর প্রভৃতি রাশিয়া যাচ্ছিলেন, তাঁরা বার্ণার্ড শ'কে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা জানতেন, শ' রাশিয়া দেখে খুশী হবেন। তেমনই রাশিয়াও খুশী হবে বার্ণার্ড শ'কে চাক্ষুষ দেখে। বার্ণার্ড শ' যেন কার্ল মার্কস ও সেক্সপীয়রের সংযুক্ত সংস্করণ। এর ফলে বার্ণার্ড শ'র সঙ্গীতও কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত মর্যাদা লাভ করবেন। হয়ত ষ্ট্যালিনের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

সার্লোট এলেন না এই তীর্থযাত্রায় তবে বার্ণার্ড শ'কে বার বার বললেন—লেনিনের বিধবা স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে যেন দেখা করা হয়।

এ্যাষ্টররা সঙ্গে প্রচুর টিনের খাবারের রসদ সংগ্রহ করলেন, যেন দুর্ভিক্ষের দেশে চলেছেন। বার্ণার্ড শ' কিন্তু নিজের পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিলেন না, তিনি ইংলণ্ডে অনেক রাশিয়ান দেখেছেন, তাদের খানা খেয়েছেন, আর কালো রুটিও তিনি পছন্দ করতেন, ছোটবেলায় আইরিশ বাদামী রুটিও তাঁর অপছন্দ ছিল না।

আশ্চর্য কাণ্ড, বার্ণার্ড শ'র সহচরবৃন্দ মস্কো শহরের হোটেল দেখে তাজ্জব! তাদের য়ুরোপীয় খানা আরো তাজ্জব! মস্কো শহরের সেই সেই হোটেল তখন মার্কিণ ভ্রমণকারীতে বোঝাই।

আগমনের পূর্বে শুধু বার্ণার্ড শ'র কথাটাই রাশিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বার্ণার্ড শ' যেন 'মানবীয় বিদ্যুৎযন্ত্র' তাঁকে বলা হল, Human Dynamo। রুশ দেশের মাপকাঠিতে এই সর্বোচ্চ সম্মান। যে শ্রেষ্ঠ উৎপাদক এবং আরো উৎপাদনে সক্ষম তাকেই আদর করে এই কথা বলা হয়। বার্ণার্ড শ' এই সব লক্ষ্য করে থাকবেন।

বার্ণার্ড শ'কে প্রকাণ্ড 'হল অব নোবেলস'এ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। তাঁকে ওপেরা, ব্যালে, বক্তৃতা ও ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হল।

বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে মঃ লিটভিনফের দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনিই সর্বত্র দোভাষীর কাজ করলেন।

বার্ণার্ড শ' বলতেন—সারভাইভাল অব দি ফিটেষ্ট বা যোগ্যতমের জয় হিসাবেই ষ্ট্যালিন তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতালাভ করেছেন, অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত ও সংকটময় কালের মধ্যে তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, নবীন সভ্যতার প্রসব বেদনার সমস্ত অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাই ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত বলে স্বীকার করেছেন।

বার্ণার্ড শ'র স্তুতিবাদ অত্যন্ত সমঝদার শ্রোতার মত হাস্যমুখে শুনলেন জোসেফ ষ্ট্যালিন।

বার্ণার্ড শ' অতি ভীরুগলায় বললেন—যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই, আমি বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় আপনার রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন সমর্থন করি। এই সব ঘটনা এখনই ছেড়ে দেওয়া চলে না।

ষ্ট্যালিন অট্টহাস্য করে বললেন—এটা কি শুধু আমারই নীতি? আপনার নয়?

শ' বললেন—আমার কি ক্রীড বা নীতি তাতে কি এসে যায়? আমি একজন লেখক মাত্র, নব্য সভ্যতার জনক নই। আমি এক ক্ষীণচরিত্র,—জীর্ণ মোমের পুতুল মাত্র।

এর জবাবে ষ্ট্যালিন বললেন—কার্ল মার্কসও এমনই একজন সামান্য লেখক মাত্র। অথচ কার্ল মার্কস না থাকলে আমরা প্রতিপদেই হয় ত ভুল করতাম। আমরা লেখক চাই, আমাদের মতবাদ প্রচারের সহায়তায় প্রয়োজন লেখকদের। ঠিক এই মুহূর্তে আপনার হাস্যরসের জন্য হয় ত আমরা প্রস্তুত নই, তবে আবার একদিন হয় ত হাসতে শিখব।

শ' বললেন—আমাদের দেশে যখন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে ভয় পাই তখন আমরা তা হেসেই কাটিয়ে দিই। এখানের মানুষ জীবনের সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তাই তাদের জীবনে এখন হাসির অবসর নেই। আমার কবি-বন্ধু টমাস হার্ডি একটি চমৎকার পেনটিং নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তাতে তাঁর হাস্যময় অবস্থা রূপায়িত করা হয়েছিল।

ষ্ট্যালিন বললেন—আমাদের জীবনে তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক আমরা পেয়েছি—লিও টলষ্টয়, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ বার্ণার্ড শ'। টলষ্টয় ধর্মের চাপে পড়েছিলেন এবং পরাভূত হয়েছিলেন, ডিকেন্সের ত্রুটি তাঁর সেনটিমেনটালিজম আর আপনি—এখনও আপনি যথেষ্ট নবীন, কিসের চাপে পড়ে যে আপনি স্বধর্মচ্যুত হবেন তা আমার এখন বলা সাজে না।

ছোট ছেলে যেমন পুরাতন হেডমাষ্টারকে দেখে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে পড়ে, যাকে সে এতদিন মনে মনে ঈশ্বর জ্ঞান করেছে তার মানবিক রূপ দেখে বিস্মিত হয়, ষ্ট্যালিনেরও সেই অবস্থা। যে বার্ণার্ড শ'কে মনে মনে এতদিন পূজা করেছেন, তার গড়গড়ানো মূর্তি দেখে একটু যেন আনমনা হলেন।

রাশিয়া সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র মনোভংগী কিন্তু অতিশয় সংবেদনশীল, তিনি যা কিছু দেখেন তাই তাঁর কাছে বিস্ময় ও চমৎকার! ভালো ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখেন নি। কারখানা দোকান প্রভৃতি সর্বত্রই তিনি সম্মানিত হয়েছেন। সর্বত্র রাশিয়ার মানুষ তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে বরণ করেছে, অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করেছে। তার মধ্যে ছিল যথেষ্ট অনাড়ম্বর আন্তরিকতা।

যে সমালোচক এতদিন সব কিছুই উপহাস করে কাটিয়েছেন তাঁকে এখন নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়, যে শব্দ প্রশংসা ও প্রশস্তির।

অসুবিধা হল লেনিনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সময়। বার্ণার্ড শ' অসুবিধাটা বেশী করে অনুভব করলেন। ক্রুপস্কায়া শুনেছিলেন যে বার্ণার্ড শ' অতি দুর্বিনীত প্রতিক্রিয়াশীল (illmannered reactionary) মানুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। একদা লেনিন যাঁকে বলেছিলেন—A good man fallen among Fabious

সেই ব্যক্তি সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে সেই ব্যক্তি A bad man fallen among Tories হয়ে গেছেন।

লেলিনের স্ত্রীর এই ধারণা আরও দৃঢ় হবার কারণ বার্ণার্ড শ'র এই নতুন রাশিয়ার তীর্থযাত্রার সঙ্গীরা সবাই সোস্যালিজমের বিরোধী, এক হিসাবে শত্রু বলা চলে।

অবশেষে ক্রুপসকায়া তাঁর কুটীরে বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে চা পানে রাজী হলেন। এই দিন বার্ণার্ড শ' অতিশয় বিস্মিত হলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এক কুদর্শনা স্ত্রীলোককে তিনি দেখবেন এবং তাঁর সঙ্গে অবান্তর তর্ক করতে হবে। যথাস্থানে পৌঁছে দেখলেন, ক্রুপসকায়া অতি মধুর চরিত্রের মমতাময়ী মানুষ! ক্রুপসকায়া' এক সময় বার্ণার্ড শ'কে বললেন—এই পরিহাস-সরসতা-বর্জ্জিত দেশে এই দীর্ঘ নির্বাসনে আপনি কি করে এমন হাসিখুসী বজায় রেখেছেন?

বার্ণার্ড শ' বললেন—এখানে আনন্দের খোরাক প্রচুর।

মার্লোট রাশিয়া যাত্রার সময় বার বার বলেছিলেন, যেন লেলিনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা হয়। সামাজিক রীতি অনুসারেই বার্ণার্ড শ' তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। সহযাত্রীরা অবশ্য ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যই উদ্‌গ্রীব।

ক্রুপসকায়ার দিক থেকে কোন আপত্তি না হলেও, একটা না একটা ছল-ছুতায় এই সাক্ষাৎকার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বার্ণার্ড শ' অবশেষে বুঝলেন না দেখা করারই চেষ্টায় এই সব আয়োজন।

কখনো বলা হল ক্রুপসকায়া অতিশয় অসুস্থ, কঠিন সর্দিতে ভুগছেন। তাঁর বয়স হয়েছে, নির্জনবাস পছন্দ করেন। এই সময় বিরক্ত করা উচিত হবে না। তা ছাড়া তিনি মস্কো শহরে বাস করেন না। গ্রামে অরণ্য অঞ্চলে আছেন। মোটরে সেইখানেই যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন শ', আজ শোনা গেল তিনি মস্কোতে আছেন।

অবশেষে বার্ণার্ড শ' গোঁ ধরে বসলেন আমি যাবই। দেখা না হয় না হবে, একখানি বই তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার কথা, বইটি আর আমার নামের কার্ড দরজায় রেখে চলে আসুক। সেই দরজা যেখানেই হোক।

লেডী এষ্টর শুনলেন, ষ্ট্যালিনের সঙ্গে ক্রুপসকায়ার দারুণ মতবিরোধ, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। সেই বিরোধ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ষ্ট্যালিন নাকি বলেছেন—অন্য কাউকে লেলিনের স্ত্রী সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেই হবে লেলিনের সরকারী স্ত্রী। এমন মুখরোচক সংবাদ পেয়ে লেডী এষ্টর বললেন—লেলিনের বিধবা ক্রুপসকায়াকে না দেখে আমি মস্কো থেকে এক পা নড়ছি না।

সহসা সব কিছু ওজর-আপত্তি কোথায় অদৃশ্য হল! দিন স্থির হল এবং লেলিনের স্ত্রীর কুটীরে একদিন সদলবলে যাত্রা করলেন।

কুটীর নয় একেবারে প্রাসাদ। ক্রুপসকায়া তাঁদের এমন অভ্যর্থনা জানালেন যে একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হল যে তিনি নির্জনতা পছন্দ করেন, নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী। ক্রুপসকায়ার প্রাসাদের সহচর সহচরীর সংখ্যা অনেক। দুর্দমনীয় বার্ণার্ড শ'কে স্বচক্ষে দেখে তিনি অতিশয় প্রীত হলেন বোঝা গেল। ষ্ট্যালিন সম্পর্কে একটিও কথা হলনা।

আসল কথা, ক্রুপসকায়াই এতদিন আপত্তি করছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছিল বার্ণার্ড শ' একজন দুর্দান্ত, অভব্য, অসামাজিক মানুষ। বার্ণার্ড শ' ক্রুপসকায়ার অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—একঘর ছেলেমেয়ের মধ্যে যদি ক্রুপসকায়াকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তারা সবাই এই গণেশজননীকে ঘিরে ধরবে। এমনই জননীসুলভ মনোরম আকৃতি ক্রুপসকায়ার।

বার্ণার্ড শ' রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সবাইকে বললেন—রাশিয়ার মানুষ অতিশয় সচেতন এবং সজীব। নতুন আদর্শ গ্রহণ করতে তাঁরা মন উন্মুক্ত রেখেছেন—ফেবিয়ান আইডিয়া তাঁরা পছন্দ করেন।

বার্ণার্ড শ'র কথা শুনে ওয়েবদম্পতি উৎসাহিত হয়ে রাশিয়ায় ছুটলেন স্বচক্ষে সব দেখার জন্য। তাঁরা ফিরে এসে লিখলেন Soviet Communism, A New Civilization.

বার্ণার্ড শ' বলেছেন—রাশিয়ান বিপ্লবের জনক এক হিসাবে আমি। সর্বদাই আমি তাই মনে করি। আমি ১৯১৪—১৮ র যুদ্ধের সময় বলেছিলাম—সৈন্যদের পক্ষে সবচেয়ে সৎকর্ম হবে তাদের অফিসারদের গুলী করে মেরে বাড়ি ফিরে যাওয়া। রাশিয়ানরাই একমাত্র সৈনিক যাঁরা আমার সেই সদুপদেশ শুনেছিলেন।

বার্ণার্ড শ' তাই রাশিয়া, এযুগের সব পেয়েছির দেশ দেখে আনন্দে, আবেগে, উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই কালেই বলেছেন—"রাশিয়ায় না এলে আমার এ জীবনের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।"

[ক্রমশঃ।

আশ্বিনের ভোর

পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

এখন এখানে শুধু কাঁচা রোদ করিতেছে ভিড়
অনেক বর্ষণ-শেষে উঁকি দে'ছে সোনাগলা দিন।
প্রভাতের একতারা বাজাতেছে ভৈরবীর মীড়
এ ক্লান্ত প্রাণের তীরে তরী নিয়ে এসেছে আশ্বিন।

আমার ঘুমন্ত চুলে কাশফুল বুলাতেছে পাখা
সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ প্রাণভরে নেয় রাজহাঁস।
শিশিরের জমা অশ্রু মুছে ফেলে জিয়লের শাখা
এ আশ্বিন নিয়ে আসে জীবনের গভীর আশ্বাস।

শিউলিফুলেরা আজ পথিকেরে জানায় স্বাগত
কুমারী সীঁথির মত ধূলোভরা পথের দু'ধারে।
কচি কচি ধানচারা হাওয়া লেগে হয় অবনত
সবুজের ছোঁয়া লাগে আকাশের বুকে বারে বারে।

এখন নদীর তীরে শামুকেরা করিতেছে খেলা
ফড়িঙেরা খুশীমনে হেথা-হোথা ইতি-উতি ঘোরে।
প্রথম রোদের 'পরে শালিকেরা জমায়েছে মেলা
পৃথিবীর যত ক্লেদ মুছে গেল আশ্বিনের ভোরে।

শীল্ড ফাইন্যাল অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ, শীল্ডের ফাইন্যালে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলা নিয়ে এবারও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বর্তমানে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা স্থগিত রাখা হয়েছে। আই এফ এ বাঙ্গালা তথা ভারতের প্রাচীন ক্রীড়া-সংস্থা। কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থা তাদের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। এর সত্তাও বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে। এখন তাদের বড় বড় ক্লাবদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে চলতে হয়। আই, এফ, এ'র পরিচালনা পদ্ধতিতে ঘুন ধরতে আরম্ভ করায় শীল্ডের আকর্ষণ বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। একদিন শীল্ডে যোগদান বাইরের নামকরা দলের কাছে একটা বড় আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এখন দাঁড়িয়েছে ঠিক অন্যরূপ। এখন বাইরের কোন নামকরা দল যোগদান করতে রাজি হয় না। কেন দিন দিন শীল্ডের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে? এ নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে—পরিচালক-সংস্থা আই, এফ, এ'র পরিচালক-মণ্ডলীর ত্রুটি-বিচ্যুতি। ক্রীড়া-সূচী তৈরী করার সময় তাঁদের কারসাজি কারও অজানা নয়। কোন কোন বিশেষ দলকে সুবিধে দেওয়াটা তাদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কেবল কোন রকমে কয়েকটা চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা করার দিকে লোলুপ দৃষ্টি। সব সময়ই কোন রকমে দুটো জনপ্রিয় দলকে ফাইন্যালে তুলে দু'পয়সা রোজগার করার ফন্দি। এদিকে রেফারীর কারসাজি তো আছেই। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গালা দেশের ফুটবল খেলাটা ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠছে।

শীল্ডের খেলা এত বেশী পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে বাইরের নামকরা দলের পক্ষে যোগদান করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। যারা যোগদান করলো তাদের অবস্থা তো একেবারে সঙ্গীন। পচা বর্ষার জন্য এখানকার মাঠের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় তাতে করে প্রথম শ্রেণীর খেলা মোটেই চলে না। তাই বাইরের নামকরা দলেরও স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয় না। তাদের অভিযোগ যে শীল্ডের খেলার সময় পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার।

এবারকার যোগদানকারী বাইরের দলের মধ্যে গুর্খা ব্রিগেডের খেলা সকলের বেশী আনন্দ দিয়েছে। এই দলের সব খেলোয়াড়ই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কঠিন পরিশ্রম করবার মতন এদের মজবুত গড়ন। খেলা দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে এদের খেলার পেছনে শিক্ষা আছে, কঠিন অনুশীলনও আছে। গুর্খা দল তিন ব্যাক প্রথায় খেলতে অভ্যস্ত। এই দলের সকলের খেলাতেই কিছু না কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অলিম্পিক দলে নির্ব্বাচিত মলয় লাহিড়ীর খেলা দর্শকদের বেশী বেশী আনন্দ দিয়েছে। বাইরের অন্যান্য দলের মধ্যে মীরাট থেকে আগত এ, এস, সি, সেণ্টার, পাটনা এথেলেটিক এসোসিয়েশন, কটক সাম্মলিত দলের খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার দলের মধ্যে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত এরিয়ান্স ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফের খেলা প্রশংসার দাবী রাখে। খ্যাতনামা দলের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং সেমি-ফাইন্যালের খেলায় সকলকে নিরাশ করেছে। বিশেষ করে তারা ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তবে এই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে। মোহনবাগান সেমি-ফাইন্যালে এরিয়ান্সের বিপক্ষে মোটেই তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। তাদের এই খেলা দেখে সকলেই হতাশ হয়েছেন।

এশীয় দলে ভারতের নয়জনের স্থানলাভ

আগামী জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে এশীয় ফুটবল কনফেডারেশনের আমন্ত্রণে পেরু দল ভারত সমেত প্রাচ্যের নানান অঞ্চলে মোট আঠারোটা ম্যাচ খেলবে। এই দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য এশীয় দল গঠনে জোর তোড়জোড় হচ্ছে। নভেম্বর মাসে কেরালায় এশীয় কাপের পশ্চিমাঞ্চলের খেলার শেষে এশীয় দল চূড়ান্তভাবে গঠন করা হবে। সাময়িকভাবে যে তেত্রিশজন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভারতের নয়জন খেলোয়াড়—থঙ্গরাজ, লতিফ, কে, প্পয়া, রামবাহাদুর, প্রদীপ ব্যানার্জ্জী, চুনী গোস্বামী, দামোদরণ, নেভিল ডি' সুজা ও বলরাম আছেন। অন্যান্য বাছাই খেলোয়াড়দের দলে হংকং জাপান, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ও মালয়ের প্রতিনিধি আছেন। তবে ইস্রাইল, পাকিস্তান ও ইরানের তরফ থেকে এ পর্য্যন্ত কোন খেলোয়াড়ের নাম পাঠান হয় নি।

একুশজন খেলোয়াড়কে প্রাথমিক ভাবে মনোনীত করে কুয়ালালামপুর অথবা ম্যানিলায় ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ডাঃ বিমল চন্দ্রের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

সাবাস ডাঃ বিমল চন্দ্র! তোমার সাফল্যে বাঙ্গালা তথা ভারতের সকলেই গৌরব অনুভব করছে। কলকাতার নামকরা সাঁতারু ডাঃ বিমল চন্দ্র ফ্রান্সের উপকূলবর্ত্তী কেপ গ্রিজ নেজ থেকে ডোভার পর্য্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। ডাঃ বিমল চন্দ্রকে নিয়ে আজ পর্য্যন্ত দু'জন ভারতীয় এবং তিনজন বাঙ্গালী চ্যানেল অতিক্রমে সমর্থ হয়েছেন। সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ও বাঙ্গালী সাঁতারু মিহির সেন চ্যানেল অতিক্রম করেন। ডাঃ চন্দ্রের সাফল্যে ভারতের অন্যান্য সাঁতারুরা চ্যানেল অতিক্রমে উৎসাহিত হোক এটাই সকলে কামনা করে।

ব্রজেন দাসের পুনরায় চ্যানেল অতিক্রম

পাকিস্তানের খ্যাতনামা সাঁতারু ব্রজেন দাস পুনরায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে সন্তরণে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি একই মাসের মধ্যে উভয় দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ইহার পূর্ব্বে ১৯৫১ সালে স্কটল্যাণ্ডের উইলিয়াম ডালি অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ব্রজেন দাস ডোভার থেকে সন্তরণ আরম্ভ করে ১৪ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে কেপ গ্রিজনেজে উপনীত হন। এবার নিয়ে ব্রজেন দাস তিনবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন এবং এশিয়ার মধ্যে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল উভয় দিক থেকে অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেনের এডওয়ার্ড টমি, গ্রেট ব্রিটেনের ফিলিপ মিকম্যান, আমেরিকান মহিলা সাঁতারু মিস ফ্লোরেন্স চ্যাডউইক, মিশরের হাসান আব্দেল রহিম, ব্রিটেনের টমাস ব্লোয়ার, ইটালীর গিয়ামী গাম্বি, স্কটল্যাণ্ডের উইলিয়াম বার্নি, আমেরিকার বার্ট টমাস প্রভৃতি উভয় দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুবই দুর্ব্বল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি ভারতীয় দল সম্পর্কে বলেন—ফিল্ডিং খুবই দুর্ব্বল হয়েছে। কিন্তু খেলোয়াড়রা ফিল্ডিংয়ে অনুশীলনে গাফিলতি করেছেন বলে যে অভিযোগ হয়েছে তা সমীচীন নয়। ইংলণ্ড সফরে সরকারী দলকে সপ্তাহে ছয় দিন খেলতে হয়। এটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর। বিশেষ করে ভারতীয় খেলোয়াড়রা সাধারণত সপ্তাহে দুই দিনের বেশী খেলতে অনভ্যস্ত নন বলে সপ্তাহে ছয় দিন খেলায় তাঁদের অনেক বেশী ধকল ভোগ করতে হয়েছে এবং ইহা ছাড়া ভারতীয় দলের একাধিক খেলোয়াড় আহত হয়ে পড়ায় তাদের অসুবিধা হয়। কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে যে এই সব অসুবিধা বুঝেই তো ভারতীয় দলের ক্রীড়া-সূচী তৈরী হয়েছিলো। ভারতে বা কেন বেশী দিন খেলার ব্যবস্থা হয় না? ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং-এর উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না; এটাই সকলের প্রশ্ন।

অষ্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফর

অষ্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে আসছে। তারা ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে দিল্লীতে পৌছাবে। পাঁচটা টেষ্ট ম্যাচ ও দুটি প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করে ২৯শে জানুয়ারী স্বদেশ যাত্রা করবে। তারা দিল্লীতে (প্রথম), কানপুরে (দ্বিতীয়), বোম্বাইতে (তৃতীয়), মাদ্রাজে (চতুর্থ) ও কলকাতায় (পঞ্চম) টেষ্ট ম্যাচ খেলবে।

১৯৬০-৬১ সালের শীতের মরশুমে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে।

খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় স্মিথের মৃত্যু

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ও'নীল গর্ডন স্মিথ বা কোলি স্মিথ হাসপাতালে মারা যান। সম্প্রতি তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে গারফিল্ড সোবার্স, টম ডিউডগেও আহত হন। ষ্ট্যাফোর্ডশায়ারের কাছে রাস্তার তাঁদের মোটরের সঙ্গে ১০ টনের এক মালগাড়ীর সংঘর্ষ হয়। তিনজনে চ্যারিটী খেলার জন্য এক মোটরে যাচ্ছিলেন। কোলি স্মিথ একজন উদীয়মান চৌখস ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁর অভাব ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে বিশেষভাবে অনুভব করতে হবে।

স্মিথ মোট ২৬টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। তাতে মোট রাণ-সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৩১ রাণ ও গড়পড়তা দাঁড়ায় ৩১.৬৯ রাণ। এ ছাড়া বোলিং করেও ৪৮টি উইকেট পান।

ভয়

(জার্মান কবি Peter Baum-এর কবিতা Horror অবলম্বনে)

মাঝে মাঝে এই কথাটাই হয় মনে,
তোমার আঁখি, তোমার যেন কেশ
আনছে দ্রুত ক্ষয় মনে।
শঙ্কিত হই, কম্পিত হয় হাত!
যেন আসে রাত,
ওষ্ঠে ফোটে তিক্ত গ্লানি
চূর্ণ ভাবাবেশ!
সাঁঝের পাখি—যমজ পাখি
পালিয়ে গেল রে,
গলিত কি পলিত পাখা
জ্বালিয়ে গেল রে!
কান্না আসে চক্ষু ছেয়ে
মিলায় রাঙা রেশ!

অনুবাদ: মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

নীল আকাশ

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অবদান বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রেও সামান্য নয়। তাঁর নীল আকাশ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর বিপুল সমাদরে বিভূষিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর বর্তমানে ঐ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। এই গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমারের বত্রিশটি কবিতার রস আস্বাদনে পাঠক সাধারণ সমর্থ হবেন। অচিন্ত্যকুমারের কবিতাগুলি যেমনই বৈশিষ্ট্যবান, তেমনই বৈচিত্র্যধর্মী। কবিতাগুলির মধ্যে কবির বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, তীব্র অনুভূতি ও অপূর্ব প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় মেলে। কবিতাগুলির আবেদন অন্তরকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। সত্য-শিব-সুন্দরের বর্ণনায় কবির মন-প্রাণ নিয়োজিত, কপটতা, জড়তা ও যান্ত্রিকতা তাঁর অসহ্য, কবিতাগুলি যেমনই জোরালো, তেমনই স্পষ্ট, যেমনই বেগবান, তেমনই আবেগমণ্ডিত, যেমনই হৃদয়স্পর্শী, তেমনই প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথের এবং শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে লেখা যথাক্রমে তিনটি ও দু'টি মোট পাঁচটি কবিতা এই গ্রন্থের মধ্যে যুক্ত হয়ে সমগ্র গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—দু' টাকা মাত্র।

ধীরপ্রবাহিনী ডন

জগতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থগুলির মধ্যে "কোয়াএট ফ্লোস দি ডন" অন্যতম। এর স্রষ্টা মিখাইল শলোখফ-এর সৃজনী প্রতিভার ছাপ এর পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাদের দরবারে শলোখফ-এর জন্যেও যে একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। উপন্যাসখানি চার খণ্ডে সমাপ্ত। লেখকের চোদ্দ বছরের সাধনার ফল। ডন নদের তীরে তীরে দুর্ধর্ষ কশাকদের কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। তাদের বিচিত্র প্রাণ-চাঞ্চল্য, দুর্দাম জীবনাবেগ এবং বিপ্লবের পর সর্বনাশা গৃহযুদ্ধের পর সেই জীবনের এক বিরাট রূপান্তরই উপন্যাসটির মুখ্য উপজীব্য। বাঙলায় এই গ্রন্থটির অনুবাদ করেন যশস্বী সাহিত্যশিল্পী অবন্তী সান্যাল। কবি অবন্তী সান্যাল আজকের লেখক নন। বাঙলা সাহিত্যের সেবা ইনি করে চলেছেন যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতার সঙ্গেই। দীর্ঘকাল সাহিত্যসেবার ফলে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই অনুবাদকর্মেও ইনি প্রভূত সাফল্যলাভ করেছেন—এ কথা ভুল নয় যে, বিদেশী সাহিত্যের যে পরিমাণ অনুবাদ বাঙলা ভাষায় হয়ে থাকে ভারতবর্ষের অন্য কোন ভাষায় তা হয় না। তবে বাঙলা ভাষায় এখন অনুবাদ-সাহিত্যের আখ্যা নিয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তাদের অধিকাংশকেই অনুবাদ তো দূরের কথা, গ্রন্থও বলা চলে কি না সন্দেহ। এমন কি, গ্রন্থটি শেষ করারও ধৈর্য পাঠকের থাকে না। এর কারণ অনুবাদকদের ব্যর্থতা। বাঙলাদেশে সত্যিকারের অনুবাদকের সংখ্যা তো বিরল বললেই চলে। তবে আশার কথা, অবন্তী সান্যালের অনুবাদ যথেষ্ট বলিষ্ঠ, সার্থক ও উন্নত। বহুকাল পরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদগ্রন্থ চোখে পড়ল। দীর্ঘায়তন উপন্যাসটির প্রতিটি পৃষ্ঠা শ্রীসান্যালের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকেছেন শ্রীখালেদ চৌধুরী। প্রকাশক—ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট, লিমিটেড ১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—ন' টাকা মাত্র।

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্বনির্বাচিত গল্প

বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বর্গগত সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের নাম। আজ প্রায় আড়াই বছর আগে তাঁর দেহান্তর ঘটেছে, তার অল্পকাল পূর্বেও তাঁর লেখনী সচল ছিল। বর্তমানে তাঁর ছোট গল্পের একটি স্বনির্বাচিত সংকলন আত্মপ্রকাশ করেছে। জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বহন করে। সার্থকনামা লেখক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। চরিত্রসৃষ্টিতে, সংলাপ যোজনায় ঘটনাবিন্যাসে অভূতপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করে গেছেন স্বর্গত লেখক। মনকে আকৃষ্ট করার যথেষ্ট ক্ষমতা গল্পগুলি রাখে। জীবনকে, সমাজকে এবং জগতকেও নানাদিক দিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখেছেন—এই উক্তির সত্যতা তাঁর গল্পগুলি প্রমাণিত করে। মানুষের মনের অব্যক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্যক প্রকাশ ঘটেছে গল্পগুলির মধ্যে। কৃত্রিমতাহীন, সহজ সরল জীবনকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম চার টাকা মাত্র।

গ্রন্থাগার প্রচার

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির মর্যাদা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম তো নয়ই বরং বেশী। এ দেশের গ্রন্থাগারে এমন বহু দুর্লভ রত্ন সযত্নে রক্ষিত যা সারা জগতের বহুল উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে। সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে তথা মানসিক চেতনার ক্রম জাগরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান অসামান্য। বর্তমান যুগের বিধান অনুযায়ী কোন কিছুর গুরুত্ব সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ

কথার ক্ষেত্রে প্রচারের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বভাবতঃই গ্রন্থাগারেরও প্রচারের প্রয়োজন। এই বক্তব্যকেই যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং নানাবিধ আলোচনার সাহায্যে উপরোক্ত গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বিষয়ক প্রভূত জ্ঞানের তিনি অধিকারী। গ্রন্থাগারের প্রচারের সম্পর্কে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মূল্যবান। প্রাচীরপত্র, পত্রিকা, সিনেমা, বেতার, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রচার কেমন ধরণে করা যায়, কি ধরণের হওয়া উচিত, প্রচারকর্ম কি ভাবে সম্পাদন করা যায়, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের চিন্তাশীল মনের পরিচয় গ্রন্থে প্রস্ফুটিত, তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট সারবান। প্রচার সম্বন্ধেও তাঁর দক্ষতা বা জ্ঞান অসীম, গ্রন্থটিই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করে। প্রকাশক—গ্রন্থভবন, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—দুই টাকা মাত্র।

প্রণয়ী পঞ্চক।

কাহিনী-কাব্য কাব্য-সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এতাবৎকাল অসংখ্য কবি এই কাহিনী-কাব্যের মাধ্যমে আপন আপন সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সাহিত্য সেবা করেছেন। তবুও এ দেশে বর্তমানকালে কাহিনী-কাব্য রচয়িতার সংখ্যা যে অনুপাতে হওয়া উচিত ছিল সে অনুপাতে যে হয়নি—আশা করি এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অথচ সে যুগে মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় কবিগণ এই কাহিনীকাব্যের মাধ্যমে দেশীয় কাব্যকে সমৃদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি সুখ্যাত কবি ও সাহিত্যশিল্পী সুশীল রায়ের কাহিনী-কাব্যের একটি সংকলন-গ্রন্থ। তাঁর পাঁচটি কাহিনী-কাব্য এর মধ্যে স্থান পেয়েছে—মহাভারত থেকে স্বল্পোল্লেখিতা পাঁচটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে পাঁচটি কাহিনী তিনি কবিতায় রচনা করেছেন। এই পাঁচটি নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনা হতাশা-যাতনা তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে, পাঁচটির মধ্যে চারটির মূল সুর এক, কেবল তৃতীয়টি ভিন্নধর্মী। অন্যগুলিতে নারীর দয়িতা রূপকেই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু তৃতীয়টিতে নারীর দয়িতারূপের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহৃদয়ের বুভুক্ষাকেও কবি অসামান্য দক্ষতা সহকারে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। কাহিনী-কাব্যগুলি সাবলীল, মনোরম এবং লালিত্যপূর্ণ, বর্ণনভঙ্গী, ঘটনা বিশ্লেষণ এবং বিন্যাস-কুশলতা মনকে আকৃষ্ট করে। নারীচিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, নারীর জীবন-জিজ্ঞাসা নারী জীবনের চাওয়া-পাওয়ার প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কে কবি পূর্ণসচেতন, তাঁর বিশ্লেষণী, শক্তিই তার পরিচায়ক। ব্যঞ্জনায়, শিল্পকর্মে অভিনবত্বে সকল দিক দিয়েই গ্রন্থটি শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—নতুন প্রকাশক, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

এক মুঠো আকাশ (নাটক)

মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিখ্যাত উপন্যাস এক মুঠো আকাশ সম্বন্ধে আজ নতুন করে আর বলার কিছু নেই। বাঙলার নাট্যজগতও এই সার্থক উপন্যাসটিকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। লেখক কর্তৃক উপন্যাসটি নাটকে সম্প্রতি এই নাট্যরূপ গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। নাট্য-রূপদানে ধনঞ্জয় বৈরাগী যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ কথা কারোর অজানা নয় যে, সাহিত্য সৃষ্টির তুলনায় নাট্য সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা বিন্দুমাত্র কম নয়। নাটকের ধর্ম অনুযায়ী মূল উপন্যাস থেকে অনেক রকম অদলবদল করা হয়েছে এবং কাহিনীর মূলরস তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। আয়তনের দিক থেকে স্বভাবতঃই উপন্যাসটির তুলনায় নাটকটি অনেক ক্ষুদ্র। যে সকল গুণাবলীর জন্যে উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—সেই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নাটকটিও সমান জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। উপন্যাসটির সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। নাটকটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে, নাট্যজগতে এক বহু-আকাঙ্ক্ষিত নতুনত্বের সন্ধান দেবে এবং বাঙলার নাট্যসাহিত্যের এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২।১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম—দু'টাকা মাত্র।

স্বগতোক্তি

সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায় অধিকার করে আছে নাটক। জাতীয় চরিত্রের বিকাশে নাট্যজগতে সহায়তা করে যথেষ্ট। এই নাট্যজগতের ইতিহাসও যেমনই গৌরবময়, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলার সাধারণ নাট্যজগতের বিশদ ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কিছুকাল আগেও ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত উপন্যাসটি রচনা করে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন শক্তিমান সাহিত্যিক প্রশান্ত চৌধুরী। উপন্যাস হলেও এই গ্রন্থটিকে বাঙলা দেশের রঙ্গজগতের প্রামাণ্য ইতিহাস বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু ইতিহাসও নয়, সাহিত্যও তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, লেখনীর নিপুণতায়, গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। শুধু বাঙলার রঙ্গালয়কে তুলে ধরেই লেখক থেমে যাননি ভারতের প্রথম নাটক, কি পরিবেশে, কেমন করে জন্মাল সে সম্বন্ধেই যথেষ্ট চিত্তহারী একটি ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য নাটক, অসংখ্য শিল্পীর সমন্বয়ে যে বিরাট নাট্যজগত গড়ে উঠেছে সেই জগতের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা-রহস্য-বৈচিত্র অপরিসীম নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা বা প্রধান শিল্পী যাঁরা লেখকের আলোচনা কেবল তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই জগতের সঙ্গে অভিজ্ঞ প্রবীণ দর্শক হিসেবে, শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এবং অন্তরালের নেপথ্যকর্মী হিসেবে যাঁরা যুক্ত এ গ্রন্থে তাঁরা কেউই অবহেলিত নন, বরং লেখক তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করেছেন। সামান্য কর্মী যাঁরা—রূপসজ্জাকর, ভাণ্ডারী, বাদক, দ্বাররক্ষী এমন কি ড্রপের দড়ি টানে যারা তারা প্রত্যেকেই লেখকের কাছে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পাত্র। উপন্যাসটিতে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য জগতে দৈনন্দিন বিচিত্র ঘটনা কাহিনী, পরিবেশ লেখনীর কল্যাণে সার্থক ভাবে চিত্রিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় বহু তথ্যের আকর এই উপন্যাসটি তার প্রাপ্য সমাদর লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

মায়াপুরী

বাঙলা দেশের খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীঅখিল

শিশু-সাহিত্যকে সেবা করে এসে শিশুমহলে নিজের আসন ইনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানকালে শিশুদের উপযোগী নৃত্যনাট্যের অভাব কম নয় যা আছে তা-ও স্বল্পসংখ্যক। শ্রীনিয়োগীর উপরোক্ত গ্রন্থটি সেই অভাব অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থটি সর্বাঙ্গে গ্রন্থকারের দক্ষতার পরিচয় বহন করে, এর কাহিনীর অভিনবত্ব শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে, বর্ণনভঙ্গী, সংলাপ কবিতার গতি সকল দিকেই সার্থকতার স্পর্শে ভরপূর হয়ে উঠেছে। শিশুমহলে গ্রন্থটি যথাযথ সমাদরে বিভূষিত হোক—এই কামনাই আমরা করি। প্রকাশক—সাহিত্যচয়নিকা ৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শেষনাগ

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে শক্তিপদ রাজগুরু নবাগত নন, একাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। দিন এগিয়ে চলেছে যথানিয়মে, জগতের গায়ে প্রতিমুহূর্তেই লাগছে পরিবর্তনের ছোঁয়াচ, জীবনের ধারা কত বদলে চলেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একটি অঞ্চলের কথাই ধরা যাক, আগে যে অঞ্চল ছিল রীতিমত অনুন্নত, ঝোপ-ঝাড়-পরিপূর্ণ, দস্যু-ঠ্যাঙ্গাড়েদের রাজত্ব, যে অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের ছিল বিরাট প্রভাব, আবার যে অঞ্চলে প্রকৃতি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল তার যা কিছু সম্বল, সেই অঞ্চল কেমন করে ধীরে ধীরে তিলে তিলে পরিণত হ'ল রীতিমত উন্নত, আলোকপ্রাপ্ত এক শিল্পপুরী—তারই বর্ণোজ্জ্বল বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে। কন্দর্প ও মানব পিতাপুত্রের চরিত্র দুটির মাধ্যমে নীতি ও আদর্শগত সংঘাতের একটি নিখুঁৎ ছবি ফুটে ওঠে। লেখকের রচনা রসোত্তীর্ণ, চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসনীয়, রচনার বলিষ্ঠতা মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থের নামকরণটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—ন্যাশানাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

দুই পকেট হাসি

বর্তমান যুগে রসসাহিত্যিকরূপে সাহিত্যের দরবারে যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে প্রবুদ্ধের নাম বিশেষ উল্লেখনীয়। শিরোনামা দেখেই আশা করি পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারছেন যে আলোচ্য গ্রন্থটিও হাস্যরসসমৃদ্ধ। টুকরো টুকরো অসংখ্য হাসির চুটকি গল্পে দুই শতাধিক পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি পূর্ণ। কার্টুনও যুক্ত করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। চুটকি গল্পগুলির বিষয়বস্তুও একের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বহুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। গ্রন্থকারের মন বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে অতীব সচেতন। লেখকের চিন্তাধারা, কল্পনাশক্তি ও প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রসসৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে লেখক স্বীয় দরদী, সহানুভূতিশীল ও রসঘন মনের পরিচয়ও দিয়ে গেছেন। চুটকি গল্পগুলি সবিশেষ উপভোগ্য, এবং লেখকের রসরচনা পাঠকচিত্তে প্রভূত পরিমাণে আনন্দরস সৃষ্টি করে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন শ্রীসন্তোষ গুপ্ত। কার্টুনগুলিও বাঙলার বিখ্যাত কার্টুনিষ্টদের তুলিকাজাত। প্রকাশক—বলাকা প্রকাশনী, ২৭-সি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

কয়েকটি সাম্প্রতিক কালীন কাব্যগ্রন্থ

সাম্প্রতিক কালে যে ক'টি আধুনিক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মানোন্নয়নে সহায়তা করেছে, তাদের মধ্যে আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের মধুর দিনের গল্প, দেবতোষ ঘটকের রাজপুরী, কুশল মিত্রের চৈত্রের পলাশ ও মায়াবতী মেঘ এবং বিনয় মজুমদারের নক্ষত্রের আলোয়—এই চারখানি বইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কবিতাগুলি উচ্চাঙ্গের, হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করে এবং নতুনত্বের সন্ধান দেয়। কবিতাগুলির মধ্যে কবিদের রসঘন অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পিমনের একটি সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। কবিদের প্রত্যেকের কতকগুলি কবিতা এক কথায় অনবদ্য। ভাবের দিক দিয়ে ছন্দের দিক দিয়ে ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থগুলি সর্বতোভাবে কবিদের প্রতিভার স্পর্শ বহন করছে। গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়। কেবল দেবতোষ ঘটকের গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন কবি স্বয়ং। গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রকাশক গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। মূল্য—এক টাকা মাত্র (কেবল কুশল মিত্রের গ্রন্থের মূল্য—দুই টাকা মাত্র)।

নিঃসঙ্গ

উপরোক্ত গ্রন্থটি এক বিপ্লবীর আত্মকাহিনী। লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র দে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে একদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও যথেষ্ট নির্যাতনও ভোগ করতে বাধ্য হন। অতীতের সেই স্মৃতি, দেশের স্বাধীনতার মহান তপস্যার গৌরবোজ্জ্বল বিবরণী, শোষকের বিরুদ্ধে মুক্তিকামীদের মুক্তি অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সকল সময়েই সমান মর্যাদাই পেয়ে আসে। কালের ব্যবধানে তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। কারাকাহিনী বর্ণনায় লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসগন্ধী এই গ্রন্থে লেখকের সাহিত্যিক দক্ষতারও পরিচয় মেলে, তখনকার দিনের তরুণ সম্প্রদায়ের দেশের জন্যে সকল প্রকার স্বার্থত্যাগের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। লেখকের শ্রম সফল হোক। শ্রীবরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনও প্রশংসনীয়। প্রকাশক—চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়্যার। দাম, তিন টাকা মাত্র।

Happiness is like coke—something you get as a by-product in the process of making something else.

—*Aldous Huxley*

জেনিফার জোন্স

খুব বেশী দিনের কথা নয়, হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিস জেনিফার জোন্স রোম-এ বিশ্ববিখ্যাত মার্কিণ ঔপন্যাসিক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে রচিত 'এ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস' এর স্যুটিং সেরে তাঁর স্বামী প্রযোজক পরিচালক মিঃ ডেভিড ও. সেলজ্‌নিক সহ ভারতবর্ষে পাঁচ সপ্তাহের জন্য অবকাশ যাপন করতে এসেছিলেন। এ খবর বোধ করি আমাদের দেশের চিত্রামোদীদের কাছে অজানা নেই। বর্তমানে হলিউডে যে কয় জন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী আছেন মিস জোন্স তাঁদের মধ্যে অন্যতমা ও অনন্যা। অবশ্য এই প্রথম শ্রেণীতে মিস মেরিলিন মনরো, জেন মেন্সফিল্ড ও অনিতা এক্‌বার্গের কোন স্থান নেই। কারণ তাঁরা ভিন্ন স্তরের ও ভিন্ন রুচির অভিনেত্রী।

মিস জোন্স মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ওক্‌লাহোমা ষ্টেটের টুলসা-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইসলে ষ্টক কোম্পানী নামে এক ভ্রাম্যমান থিয়েটার পার্টির মালিক, পরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন। এই থিয়েটার পার্টি আমেরিকার বিভিন্ন সহরে তাঁবু খাটিয়ে অভিনয় করে বেড়াতেন। এঁদের অভিনীত "দি ওল্ড হোমষ্টেড", "ইষ্ট লীন" প্রভৃতি নাটকগুলি তখনকার দিনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে বিজ্ঞানের মহিমায় নির্ব্বাক ছবি সবাক ছবিতে রূপান্তরিত হওয়ায় ইসলে ষ্টক কোম্পানী উঠে যায় এবং জেনিফার-এর বাবা কয়েকটি সিনেমা-গৃহ তৈরী করে সেখানে সবাক ছায়াছবি দেখাতে শুরু করেন।

ছোটবেলা থেকেই নাট্য পরিবেশের মাঝে মানুষ হয়েছেন মিস জোন্স। প্রতিদিন গভীর আগ্রহে তিনি থিয়েটার দেখতেন। রঙ্গমঞ্চের বুকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সুখ দুঃখ, আশা হতাশাকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। মাত্র চার বৎসর বয়সে জেনিফার ডাল্লাস-এর উরসুলাইন একাডেমীতে ভর্ত্তি হন। এই স্কুলের ছাত্রী থাকা কালে তিনি আবৃত্তি ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এখানকার শিক্ষাগ্রহণ শেষ হলে তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভের আশায় ওকলাহোমা সিটিতে চলে আসেন এবং নর্থওয়েষ্টার্ন (?) ক্যাসিনোয় পড়াশুনা শেষ করে আমেরিকার মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের একটি বিখ্যাত থিয়েটার কোম্পানীতে যোগদান করেন। প্রায় দু' বৎসর তিনি এই থিয়েটার কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বাবা, থিয়েটারের প্রতি জেনিফারের গভীর আগ্রহ দেখে তাঁকে নিউইয়র্কের 'আমেরিকান একাডেমী অফ ড্রামাটিক আর্টস'-এ ভর্ত্তি করে দেন। কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। এ সম্বন্ধে মিস জোন্স নিজেই বলেছেন—বাবা চেয়েছিলেন আমি আইন পড়ি। কিন্তু আমার ঝোঁক ছিল নাটকের প্রতি। তাই শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমার মতেই মত দিলেন।

কিছুদিন পরে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সহপাঠী মিঃ রবার্ট ওয়াকার-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল জেনিফারের প্রথম পুত্র রবার্ট ওয়াকার জুনিয়ার ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ দ্বিতীয় পুত্র মাইকেল-এর জন্ম হয়। চার বৎসর পরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এই সময়ে তাঁর মনে হলিউডের চিত্রাকাশে 'তারকা' রূপে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বিশেষ ভাবে বলবতী হয়ে ওঠে। কিন্তু চিত্রজগতের কারো সাথে তাঁর পরিচয় না থাকায় তিনি প্রত্যাখ্যাত হন ও আবার রঙ্গমঞ্চেই অভিনয় শুরু করেন।

দু'বৎসর পরের কথা। একদিন তিনি অভিনয়ের শেষে গ্রীণরুমে বসে মেকআপ তুলছেন। এমন সময় জনৈকা সুবেশা তরুণী সেখানে এসে বিনীত ভাবে তাঁর সাথে আলাপের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একটু বিরক্ত হয়েই জেনিফার তাঁকে বসতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে তরুণীটি তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন—আমি হলিউডের প্রযোজক পরিচালক ডেভিড ও. সেলজনিকের নিউইয়র্কস্থিত প্রতিনিধি মিস ক্যাথরিণ ব্রাউন।

তাই নাকি?—খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল জেনিফারের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অমার্জ্জিত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মিস ব্রাউন জেনিফারকে চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করলেন এবং প্রযোজক-পরিচালক মিঃ সেলজনিকের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ সেলজনিক্ জেনিফারের অভিনয় প্রতিভায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্মীয়মান ছবি 'সঙ্গ অব বার্ণাদেৎ'-এর নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্য মনোনীত করলেন। অবশ্য এই মনোনয়নের পূর্ব্বে জেনিফারকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল।

নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্য ছয় জন অভিনেত্রীর নাম ঘোষণা করা হলেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় মিস জোন্স-ই সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল দৈবলীলা (Vision) দর্শনের পর বার্ণাদেৎ-এর মানসিক পরিবর্ত্তন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিস জোনসের অভিব্যক্তি এত সুন্দর ও নিখুঁত হয়েছিল যে পরিচালক মশায় নিজে পর্য্যন্ত এতটা আশা করেন নি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মিস জোনস বার্ণাদেৎ-এর ভূমিকায় অভিনয় করে অস্কার পুরস্কার লাভ করেন।

বর্ত্তমানে মিস জোনস পারিবারিক জীবনে প্রযোজক পরিচালক ডেভিড ও সেলজনিক-এর পত্নী। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তাঁদের একমাত্র কন্যা মেরি জেনিফারের জন্ম হয়। মিস জোনস মধুরভাষিণী ও সদালাপী। খ্যাতির হিমালয়-শীর্ষে আরোহণ করেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। হলিউডের তথাকথিত চিত্রাভিনেত্রীদের মত পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তিনি নেগলিগী ও বিকিনি-মার্কা হ্রস্বতা-স্বচ্ছতা পছন্দ করেন না। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে সর্ব্বদাই রুচি ও সংযমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মিস জোনসের হৃদয় অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ। তাই ভাবাবেগপূর্ণ নাটকীয় দৃশ্যগুলি রূপায়ণে তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি "সঙ্গ অব বার্ণাদেৎ", "দি ব্যারেটস্ অব উইম্‌পোল ষ্ট্রীট", "উই ওয়্যার ষ্ট্রেন্‌জার্স," "ডুয়েল ইন দি সান," "ম্যাদাম বোভারি"

"লাও ইজ এ মেনিস্প্লেনডার্ড থিং," "বীট দি ডেভিল," "ইনডিস্ক্রিশন অব অ্যান আমেরিকান ওয়াইফ," "গুড মরণিং," "মিস ডাভ" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। এ যাবৎ আঠারোখানি চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন।

প্রতিদিন দেশ-বিদেশের অনুরাগী ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে তিনি হাজার হাজার চিঠি পান। নানা আব্দারে ভরা সে সব চিঠি। যতদূর সাধ্য মিস্ জোনস্ তাঁর ভক্তবৃন্দের আব্দার পূরণের চেষ্টা করে থাকেন। সেক্রেটারী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে হাতে লিখে (টাইপ করে নয়) ফ্যান্ মেলের উত্তর দিতে ভালোবাসেন। কারণটি সহজেই অনুমেয়। প্রচুর খ্যাতি ও অর্থের মোহে আজো তিনি বিভ্রান্ত হননি। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হল—আমার অভিনয় যদি কারো জীবনের ক্ষণিক অবসর মুহূর্তটুকু আনন্দে ভরে দিয়ে থাকে অথবা কোন সন্ধ্যায় তাঁর দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথা—বেদনাকে লাঘব করতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে থাকে তবে অভিনেত্রী হিসাবে সেইটাই হল আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা শিল্পী মাত্রেরই কাম্য। কারণ শিল্পীর মূল্যায়ন তাঁরাই করে থাকেন।

সম্প্রতি বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্-এ অনুষ্ঠিত চিত্রমেলায় মিস্ জোনস বছরের সেরা (১৯৫৮) অভিনেত্রীরূপে সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন। আশা করি, জেনিফার অনুরাগীরা এ সংবাদে আনন্দিত হবেন।

—শ্রীদেবব্রত ঘোষ

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কলকাতার এবং বোম্বাইয়ের মেট্রো সিনেমায় একযোগে কোর্ট ডান্সার মুক্তিলাভ করল ১৯৪১ সালে। এর পূর্বে মেট্রো সিনেমায় কোন ভারতীয় ছবি মুক্তিলাভ করে নি। অর্থাৎ ভারতীয় ছবিদের মধ্যে কোর্ট ডান্সারই প্রথম ছবি, যে মেট্রো সিনেমার মাধ্যমে সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করল। এবং বলা বাহুল্য, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রসজ্ঞ দর্শকসাধারণ এবং অভিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দের আনুকূল্যে, প্রশংসায় এবং সমর্থনে ছবিটি সর্বতোভাবে পূর্ণতা পেল। বোম্বাইতে তখন আমরা উপস্থিত থাকতে পারি নি, কারণ ঠিক সেই সময় নিউ থিয়েটার্সের জন্য দ্বিভাষী "মীনাক্ষী" ছবিটির গঠনকর্মে আমরা ভীষণ ব্যস্ত, সেইজন্যেই দুর্ভাগ্যক্রমে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বোম্বাইতে কোর্ট ডান্সারের মুক্তিকালে উপস্থিত থাকা কিছুতেই আর আমাদের পক্ষে শেষ অবধি সম্ভবপর হয়ে উঠল না। যাই হোক, বোম্বাইতে যেতে পারি নি, তবে কলকাতায় কোর্ট ডান্সারের মুক্তি তো প্রত্যক্ষ করেছি আর তার আলোকোজ্জ্বল স্মৃতিও তো মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়।

এই ছবির কাছে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে স্বীকার করছি, আমার ব্যক্তিগত ঋণেরও সীমা-পরিসীমা নেই। কারণ সম্পূর্ণরূপে ভারতে নির্মিত প্রথম আন্তর্জাতিক ছায়াছবির তারকারূপে অভিহিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনে আমি সমর্থ হতে পেরেছি—এই ছবিরই কল্যাণে।

১৯৪১ সালের কথা মনে পড়লেই বিশেষভাবে মনে পড়ে যার কথা বাঙলার অদ্বিতীয় প্রযোজক স্বর্গীয় হরেন ঘোষের কথা। "এক এবং একমাত্র" (one and only) আখ্যাটি যার প্রসঙ্গে ব্যবহার করলে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। দেশীয় নৃত্যশিল্পের ইতিহাসের একটি অধ্যায় গড়ে উঠেছে হরেনদা'র অবিস্মরণীয় অবদানে। মাদাম মেনকা, উদয়শঙ্কর প্রমুখ বহু দিগ্বিজয়ী নৃত্যশিল্পীদের ভারতীয় দর্শকের সামনে প্রথম উপস্থিত করার গৌরব হরেনদা'রই। ঐ বছর (১৯৪১) দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের একটি আয়োজন করছিলেন হরেনদা'। তাঁদের সঙ্গে আমিও যেন যাই, এই ইচ্ছা হরেনদা' প্রকাশ করলেন—এ সম্পর্কে অনুরোধও তিনি জানালেন মধুর কাছে। অসম্মতি আসেনি মধুর পক্ষ থেকে—ঠিক সেই সময় বাঙলার চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরব ও ইতিহাসস্রষ্টা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে মীনাক্ষী ছবির নির্মাণকার্যে যথেষ্ট ব্যস্ত ছিল মধু। তাই তার নিজের পক্ষে আমাদের সঙ্গে যাওয়া শেষ অবধি সম্ভবপর হয়ে উঠল না।

আমরা, তারপর কোন একটি দিনে অফুরন্ত আনন্দ সঙ্গে নিয়ে প্রচুর কৌতূহল মনের মধ্যে জমিয়ে রেখে যাত্রা শুরু করলুম দক্ষিণ-ভারত অভিমুখে। বিরাট একটি দল হল পুরো শিল্পিসম্প্রদায়, হরেনদা', সঙ্গীত পরিচালক তিমিরবরণ, মাধব মেনন প্রভৃতি শেষোক্ত জন কোচিনে নৃত্যশিল্পী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। আমার নৃত্যসঙ্গী হিসেবে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটি ভ্রমণে ইনিও যোগ দিয়েছিলেন। রাজনর্তকী ছবিতেও আমার নৃত্যসঙ্গীর ভূমিকায় আপনারা (যাঁরা রাজনর্তকী দেখেছেন) এঁকেই দেখতে পেয়েছেন।

দক্ষিণ-ভারত আমরা মহা আনন্দে বেড়ালুম, যেখানে গিয়েছি সেইখানেই পেয়েছি আশার অতীত সমাদর, আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা, পেয়েছি আন্তরিকতাপূর্ণ দরদী ব্যবহার, পেয়েছি সহৃদয়তার মধুর পরশ।

আমাদের শিল্পাপতার সেখানকার দর্শকদের মধ্যে যে কতখানি সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল তার একটি প্রমাণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। একটি হলেও এই প্রমাণ অনেকের তুলনায় কম নয়। যেখানে যেখানে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে, দর্শকদের অসীম আগ্রহে নির্ধারিত দিনেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমাদের পরিকল্পিত শেষ অনুষ্ঠানটিতেও দেখা গেছে দর্শক সমাগমে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি—আমাদের দিন বাড়াতে হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করেও দর্শকদের ইচ্ছায় আরও ক'টা দিন যুক্ত করতে তার সঙ্গে, অনুষ্ঠান-রজনীর সংখ্যা করতে হয়েছে বৃদ্ধি।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছি সাংবাদিকদের কাছ থেকে। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে আমাদের ভরিয়ে তুলেছেন জনতার প্রতিনিধি সাংবাদিকদের দল। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে জনতার অনুকূল মতামত রূপ পেল তাঁদের বলিষ্ঠ ও দরদী লেখনীর মাধ্যমে। সেদিনকার দক্ষিণ-ভারতীয় সাংবাদিকদের কয়েকটি অভিমতের অংশবিশেষ আজকের বঙ্গদেশীয় পাঠক-সাধারণের সামনে তুলে ধরছি—একটা কথা তার আগে বলে নিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে নেওয়াই ভালো। আত্মপ্রশংসার সুবিস্তৃত প্রচারের স্বপক্ষে আমার

আমি এখানে উদ্ধৃত করছি না। আমার প্রধান পরিচয় আমি বাঙালী, আমি বাঙলাদেশের মেয়ে—জগতের দরবারে সেইটেই আমার বিশেষ চিহ্ন বা পরিচিতি। দক্ষিণ-ভারতে, শুধু দক্ষিণ-ভারতই বা কেন দেশের বাইরে যেখানেই গেছি বাঙালী-পরিচিতিতেই বাঙলা দেশের শিল্পী হিসেবেই, সুতরাং বাইরে যে সম্মান আমি পেয়েছি সে সম্মান তো আমার ব্যক্তিগত সম্মান নয়, সে তো আমার জন্মভূমির সম্মান; এ দেশের প্রত্যেকটি নরনারীর তাতে সমান অধিকার, আমার ব্যক্তি-সত্তার পরিবর্তে সেক্ষেত্রে এক জাতিগত প্রশ্ন আসন পায়। নৃত্যশিল্পের সেবিকা হিসেবে দক্ষিণ-ভারতীয়েরা যে অভূতপূর্ব সম্মান আমাকে দেখিয়েছেন তা শুধু আমাকে নয়, আমাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাঙলা-দেশকে শ্রদ্ধা জানাল দক্ষিণ ভারত—দেশের প্রত্যেকটি নরনারীর মত সেই সম্মানের আমিও একটি অংশীদার মাত্র। অতএব এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে অভিমত উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকতে পারে না। অন্ততঃ আত্মপ্রশংসার সুবিস্তৃত প্রচারের দোষে দুষ্ট হতে হয় না।—

"THE SPLENDER THAT IS SADHONA BOSE, BEAUTY THY NAME IS SADHONA BOSE."

"The ballet show which opened before a full house and distinguished gathering at Sun Theatre was indeed a feast for the eye and ear. Sixteen varied items were put across in the ballet and among these the great Sadhona herself—for she is truly great—figured in five. While not one of the items were bad, some were just superb, drawing rousing applause from the enthusiastic audience..After Ranga Puja by the supporting ladies came Sadhona Bose herself to render "DRAUPADI." The composition shows Draupadi at Shiva's temple praying for the boon of a husband..Sadhona portrays each of these qualities with exquisite clarity without loss to the subtlety so essential in art. The "Mudras" through which she interprets these qualities became sheer poetry as she renders them..the audience insisted on enchore."..Sunday Times, Madras—April 1941.

"LIKE A POEM OF GRACE."

"The opening performance proved such a tremendous success that the conductors have announced extension of the shows"..Free India, Madras, April 1941.

"Grand-daughter of late Mr. Keshub Chunder Sadhona Bose has made a rich contribution to the reneissance of Indian Dancing and her performance was of a high order..she was particularly brilliant in "Meghduta" adapted from Kalidasa's epic,"..The Mail, Madras, April 1941.

"Sadhona's dancing is a lyric poem of grace, rhythm, pose, abhinaya, Mudras and dexterous foot work. Her movements are lithe and graceful and her mastery of the art superb. She is irresistable in every way."..The Echo, Madras, April 1941.

"INDIAN MONA LISA IN BANGALORE."

"Slim, lovely looking Sadhona Bose dressed in typical Hindu fashion with a dot of Kumkum ..Poise and grace being her character, she is a fit vessel for the spirit of our classical dancing which is often defined as the poetry of poise and grace, emphasizing, as it does, "Mudras" and "Bhavas". In her style she is quite electic.—She takes the best wherever she finds, and concerns herself with creating a thing of beauty, out of that. She blends the four schools—Manipuri, Kathakali, Bharata Natyam and Kathak, forming a new harmonious whole and to that she adds the electric current of her personality. The result is a work of art that which has its own laws and its own features."..Daily News, Bangalore, 1941. [ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

হেড মাষ্টার, নৃত্যেরই তালে তালে এবং অগ্নিসম্ভবা

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অসংখ্য ছোট গল্পের মধ্যে "হেড মাষ্টার" অন্যতম। সেই ছোট গল্পই বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিটির বক্তব্য দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে। এই হৃদয়ধর্মী ছবিটির কাহিনী এক শিক্ষাব্রতী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সহস্র বাধা দুর্যোগকে উপেক্ষা করে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়েও নিজের সারা জীবনের আদর্শকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে সে বিষয়ে এক স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এর কাহিনীর মাধ্যমে হেড মাষ্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন চরিত্রটি লেখকের এক অপূর্ব সৃষ্টি—আর এই সার্থক সৃষ্টি চলচ্চিত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয়ে। ছবি বিশ্বাস অভিনীত সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণপ্রসন্ন চরিত্রটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে অনায়াসে অভিহিত করা যায়। মানবিক আবেদনে ছবিটি ভরপুর। হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই এর আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারবেন না। ছবিতে যুক্ত গানটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনীজাত। সুরারোপ করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। অগ্রগামী পরিচালিত ছবিটিতে ছবি বিশ্বাস ছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন নবাগত শ্যামল ঘোষাল, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ বসু, মণি শ্রীমানী, শোভা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগত

[illegible])

'নৃত্যেরই তালে তালে' ছবিটি কাহিনীকার পরিচালক সুধীরবন্ধুর ব্যর্থতার স্বাক্ষর বহন করছে। সর্বতোভাবে ছবিটি অসাফল্য বরণ করে নিয়েছে। দুর্বল কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপায়ণের মধ্যেও আশা বা সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করে না। এক সর্বভারতীয়তার আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে বাঙলার বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। ছবির মন্থর গতি দর্শককে বিশেষভাবে পীড়া দেয়। চিত্রনাট্যও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। ছবিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির গানগুলি যুক্ত করে ছবির অনেক দোষ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। গানগুলি এবং নৃত্যাংশ ছবিটির একমাত্র আকর্ষণ বললেই হয়, তার ফলেই ছবিটির অসংখ্য ত্রুটির অনেকাংশ চাপা পড়ে গেছে। ছবির তিনটি প্রধান ভূমিকায়ও তিনজন অবাঙালী—গোপীকৃষ্ণ, রাগিণীও সুকুমারী। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, ইন্দ্রনাথ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, পদ্মা দেবী, সন্ধ্যা রায়, ভারতী রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতির কণ্ঠসঙ্গীত ছবিটির এক বিশেষ আকর্ষণ।

আজকের দিনের বহুধাবিভক্ত সমাজের প্রধানতঃ দুটো স্তরই চোখে পড়ে। "HAVE"দের স্তর আর "HAVE NOT"দের স্তর, একদল উপরের মহলে বাস করে, হাওয়ায় ওড়ে, নীচের মহলের বাসিন্দাদের মানুষ বলে গণ্যই করে না। সুখের পায়রার দল এরা, আর একদল নীচের মহলে বাস করে, উপরের মহলের উপেক্ষাই যেন এর প্রাপ্য। বাস্তব জগৎ এদের সামনে দেখা দেয় কঠিন মূর্তিতে, এদের বাঁচতে হয় যুদ্ধ করে, জীবনযুদ্ধ। এই যে দুটো স্তর এদের পরস্পরকে বিভক্ত করেছে কাঞ্চনকৌলীন্য। তবে স্তরগত প্রশ্নের বহু ঊর্ধ্বে প্রতিভার অবস্থিতি, পরিবেশ যত প্রতিকূলই হোক না প্রতিভার যথাযথ বিকাশ একদিন না একদিন ঘটবেই। তার প্রাপ্য সমাদর মিলবেই, এই পটভূমিকা অবলম্বন করে "অগ্নিসম্ভবা"র গল্পাংশের সৃষ্টি। লেখিকা শান্তি দাশগুপ্তের লেখনীর সৃজনীশক্তির প্রকৃত পরিচায়ক বলে গল্পটিকে অভিহিত করা যায়। এর চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। এই রজতচক্রের দ্বারা আজকের সমাজে যে অসাম্য দেখা দিয়েছে তার ফল সমাজের পক্ষেই যে কতখানি ভয়াবহ, সেদিকেও ছবিটির মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী বলিষ্ঠ ও সারবান কাহিনী পরিবেশিত করলেন পরিচালক সুশীল মজুমদার। ছবিটির জোরালো বক্তব্য দর্শকমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন কালোবরণ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অমর মল্লিক, ভুবন চৌধুরী, তরুণকুমার, প্রেমাংশু বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান তিলক, শ্রীমান দেবাশীষ, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, কুমারী শিবানী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

ইন্দ্রজাল

জগতের দরবারে বাঙলার গৌরব বর্ধনে যাঁরা সহায়তা করেছেন, বিখ্যাত যাদুশিল্পী প্রতুলচন্দ্র সরকার বা পি, সি. সরকার তাঁদের অন্যতম। যাদুকর হিসেবে তাঁর প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ যাদুশিল্পীদের দরবারে একটি বিশিষ্ট আসন তাঁর জন্য সংরক্ষিত। কলকাতায় তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনীও জনগণের প্রচুর সমাদরে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর বর্তমান প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে, এ বছর নতুন ধরণের কয়েকটি যাদুক্রীড়া তাঁর অনুষ্ঠানসূচীর তালিকা বৃদ্ধি করেছে। তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রদর্শনীটি সর্বতোভাবে নৈপুণ্য, কুশলতা ও চমৎকারিত্বের স্বাক্ষর বহন করে—কয়েকটি ক্ষেত্রে যাদুসম্রাট অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ক্রীড়াগুলির প্রত্যেকটি অভিনব এবং অতুলনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আবালবৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন। প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই যাদুপ্রদর্শনীটি কেবলমাত্র কয়েকটি কৌশলপ্রধান ক্রীড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে সিনেমা, থিয়েটার, হাস্যরস অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন যাদুসম্রাট শ্রী সরকার। মঞ্চসজ্জা আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি তাঁর অভিজ্ঞ সহকারীদের কর্মনৈপুণ্যে "ইন্দ্রজাল" পরম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, ইন্দ্রজাল দর্শকের মনে যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করতে সমর্থ হয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে একাধিক ভাষায়, গণিতে ও চিত্রশিল্পে শ্রী সরকারের ব্যুৎপত্তির প্রমাণ মেলে। মনোমুগ্ধকর বহু যাদুকৌশল প্রদর্শন করে সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে তিনি যে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

তরুণ পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুবীর হাজরার "কোন এক দিন" কাহিনীটির চিত্ররূপ গড়ে উঠছে। রূপায়ণে দেখা যাবে কমল মিত্র, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, শোভা সেন, তপতী ঘোষ, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গকে।···প্রখ্যাত চিত্রকর বিশু চক্রবর্তীর পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী "অবাক পৃথিবীর" চিত্ররূপ গৃহীত হচ্ছে। রূপালী পর্দায় দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, সবিতা গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পিগণকে। হেমন্তানুজ শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে দেখা যাবে।···প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনায় "সখের চোর" ছবিটিতে অভিনয়াংশে অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বাসবী নন্দী প্রভৃতি শিল্পিগণ। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়।···রাসবিহারী লালের লেখা "সোনার হরিণ"-এর চিত্ররূপ গড়ে উঠছে মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায়। অভিনয়াংশে দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, বিপিন গুপ্ত, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নমিতা সিংহ, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের। সুর-যোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।···নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় নির্মীয়মান ছবি "চলতি পথের গ্রন্থি" ছবিতে অভিনয় করছেন বলে যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবীন রায়

দেশে-বিদেশে

ভাদ্র, ১৩৬৬ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট) : পণ্ডিচেরী বিধান সভার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস দলের জয়লাভ—মোট ৩১টি আসনের মধ্যে ২১টি আসন অধিকার।

২রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট) : কলিকাতায় দুই দিবসব্যাপী পাক্-ভারত বৈঠক সম্পন্ন—টুকেরগ্রাম ও পাথারিয়া বনাঞ্চলের (আসাম) সীমারেখা সংক্রান্ত রিপোর্টের অমীমাংসিত আলোচনা ;

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট) : সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে ও সস্তা দরে খাদ্যোপযোগী চাউলের দাবীতে মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ও সারা পশ্চিমবঙ্গে গণ-সংগ্রাম ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ।

কেরল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা (কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ) লোকসভায় ২৭০-৩৮ ভোটে অনুমোদিত—প্রতিবাদে কম্যুনিষ্ট সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ।

৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের পদত্যাগপত্র পেশ।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) : শিলং-এ আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলির (৭৩) পরলোকগমন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলিকাতা ও সহরতলীর প্রায় ৩০ হাজার কর্মচারীর বিভিন্ন দাবী দাওয়া পূরণের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাস ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) : মুসৌরীতে দালাই লামার বিবৃতি—তিব্বতের সংগ্রামে এ যাবৎ ৮০ হাজার লোক নিহত।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) : পে-কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ—অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ বৎসরের স্থলে ৫৮ বৎসর ধার্য্যের সুপারিশ।

দক্ষিণ আফ্রিকা বসবাসকারী ভারতীয়দের দায়িত্ব দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) : খাদ্য-আন্দোলনের ৬ষ্ঠ দিবসে হাওড়া, আমতা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খাদ্য-আন্দোলনকারীদের উপর পুলিসের লাঠি চালনা।

৯ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট) : চীনা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন ও নেফায় (উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী) খাম্পাদের সহিত তুমুল সংঘর্ষের সংবাদ।

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য ১২ জন কংগ্রেসী পার্লামেন্টারী সদস্যের কলিকাতা উপস্থিতি এবং রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহিত আলোচনা।

১১ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) : লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—ভারতের নেফা অঞ্চলে রক্ষী ঘাঁটিতে চীনা ফৌজের হামলা ও প্রবল গুলীবর্ষণ—লাডাকে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া চীনাদের ঘাঁটি স্থাপন।

নিবর্তনমূলক আটক আইনে কাউন্সিলার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ইউ, সি, সি, কাউন্সিলারদের একযোগে কর্পোরেশন সভা ত্যাগ।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট) : ভারতসভা (কলিকাতা) হলে অনুষ্ঠিত আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ্‌দের সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমননীতি ও জনস্বার্থ-বিরোধী খাদ্যনীতির প্রতিবাদ—সভার সুস্পষ্ট অভিমত যে, ন্যায্য দাবীর জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার আইনসঙ্গত ও সংবিধানসম্মত।

১৩ই ভাদ্র (৩০শে আগষ্ট) : তিব্বতের প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দিল্লীতে দালাই লামার ঘোষণা।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট) : খাদ্যের দাবীতে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানকারী গণ-মিছিলের উপর পুলিসের বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ—পাঁচ শতাধিক লোক আহত ও ৭০ জন গ্রেপ্তার।

১৫ই ভাদ্র (১লা সেপ্টেম্বর) : খাদ্য আন্দোলন প্রসঙ্গে কলিকাতায় পুলিসের গুলীবর্ষণে ৭ জন নিহত ও ৬৫ জন আহত।

পারস্পরিক আলোচনা মারফত পাক্-ভারত অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহের মীমাংসা প্রস্তাবে মতৈক্য—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) ও জেনারেল আয়ুব খানের (পাকিস্তান) বৈঠকান্তে যুক্ত ইস্তাহার।

১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর) : খাদ্য আন্দোলনের জের—পুলিসের গুলীবর্ষণে কলিকাতায় পুনরায় ৪০ জন আহত—কয়েকটি থানা আক্রান্ত।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর অনুরোধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল থিমায়ার উপস্থাপিত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার।

১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) : পুলিসের সহিত বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষে কলিকাতা ও হাওড়ায় ১৫ ব্যক্তি নিহত—হাওড়ায় হাঙ্গামা (খাদ্য আন্দোলন সংক্রান্ত) দমনে মিলিটারী তলব।

মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অগণতান্ত্রিক খাদ্যনীতি ও পুলিসের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ-স্বরূপ কলিকাতা-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণ হরতাল পালিত।

দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও দেশরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণ মেননের সহিত দালাইলামার (তিব্বত) দীর্ঘ বৈঠক।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর) : ৪ দিন হাঙ্গামা ও বিপর্য্যস্ত অবস্থা চলার পর কলিকাতা মহানগরীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু।

১৯শে ভাদ্র (৫ই সেপ্টেম্বর) : ভারত-চীন সীমান্তে পুনরায় সংঘর্ষ—৭জন চীনা ও একজন ভারতীয় নিহত হওয়ার সংবাদ।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন—কংগ্রেস পরিকল্পনা সাব-কমিটির চারদফা সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ।

২১শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে ১২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী শ্বেতপত্র পেশ।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর) : নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত লাওসের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ খামদাল মন্ত্রের সাক্ষাৎকার ও লাওস পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

খাদ্য আন্দোলন ব্যাপারে আপোষের চেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র [illegible]

ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল—এই তিনজন বামপন্থী পার্লামেণ্ট সদস্যের বৈঠক।

২৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): জাতীয় আয়বৃদ্ধির দিক হইতে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে তথ্য প্রকাশ।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): ম্যাকমোহন লাইনই চীন-ভারত সীমারেখা—এই দাবীর ভিত্তিতে চীনের নিকট ভারতের আর এক দফা কড়া নোট প্রেরণ।

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হইতে খাদ্য আন্দোলন প্রসঙ্গে বলবৎ ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান বর্ষের অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের চাহিদা কেন্দ্র পূরণ করিবে—নব নিযুক্ত কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব শ্রী এস কে পাতিলের ঘোষণা।

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): খাদ্য আন্দোলন প্রসঙ্গে কলিকাতা ও হাওড়ায় ধৃত বন্দীদের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার বসু প্রমুখ ৫৭ জনের (১৬ জন বিধান সভা সদস্য) মুক্তিলাভ।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): খাদ্য আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কলিকাতায় বিরাট মৌন শোক-মিছিল।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): ক্রমাগত সপ্তাহকাল প্রবল বর্ষণের ফলে বৃহত্তর কলিকাতার ২৫ বর্গমাইল অঞ্চল (বহু উদ্বাস্তু কলোনী) জলমগ্ন ও জনগণের অপরিসীম দুঃখ দুর্দ্দশা।

৩০শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির খাদ্য আন্দোলনের সময় হাওড়ায় পুলিসের সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণ সম্পর্কে শাসন বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা রাষ্ট্রপতির নিকট যে অভিযোগ পেশ করে, রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক উহার জবাব দান। জবাবে কম্যুনিষ্টদের সকল অভিযোগ অস্বীকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ।

বহির্দেশীয়:—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট): আণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রশ্নটি রাষ্ট্রসংঘে আলোচনার্থ রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল দাগ হামারস্কজোল্ডের নিকট ভারতের প্রস্তাব।

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): জেনেভা ত্রিশক্তি আণবিক সম্মেলনে রুশিয়ার ঘোষণা—গোপন অস্ত্র পরীক্ষা সম্পর্কে সন্দেহজনক স্থান পর্য্যবেক্ষণ চালনার পশ্চিমী প্রস্তাব নীতিগতভাবে মানিয়া লইতে সে প্রস্তুত।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের স্বাক্ষর ক্রমে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট): লাওসের রাজধানী লুয়াংপ্রবাং-এর ৫০ মাইল মধ্যে বিদ্রোহীদের সশস্ত্র অভিযান।

৯ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট): ইউরোপীয় রাজধানীগুলি সফরের প্রথম পর্য্যায়ে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বন (পশ্চিম জার্ম্মানী) উপস্থিতি।

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট): দুই জার্ম্মানীর মধ্যে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠানের ব্যাকুলতায় পশ্চিম জার্ম্মাণ চান্সেলার ডাঃ কোনারাড আদেনুয়েরের নিকট রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের পত্র।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়া—বাকিংহামসায়ারে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলন ও পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সেলুইন লয়েডের মধ্যে জরুরী আলোচনা।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট): লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের (বৃটেন) সহিত সফরকারী মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার।

১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর): চীনভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘন করে নাই—চীনা পররাষ্ট্র সচিব মার্শাল চেন ইয়াই'র ঘোষণা।

ঢাকা হইতে পাক্ প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খানের ঘোষণা—পাকিস্থানে নূতন ধাঁচের গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনের আয়োজন করা হইয়াছে।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): চীন কর্ত্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার—পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

অবিলম্বে লাওসে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী প্রেরণের জন্য লাও সরকারের অনুরোধ—উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): লাওস পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন সুরু।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): লাওসের পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্তের জন্য রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক জাপান, ইতালী, তিউনিসিয়া ও আর্জেণ্টিনা—এই চার সদস্য লইয়া কমিটি গঠন।

২৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): শ্রীনেহরুর নিকট চৌ এন্ লাই এর (চীন প্রধানমন্ত্রী) পত্র—বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করা হউক।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): তিব্বত প্রশ্নে আশু হস্তক্ষেপের জন্য দালাইলামা কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন পেশ।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): চীনা পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্-লাই-এর ঘোষণা—পঞ্চশীলের (সহ-অবস্থানমূলক) ভিত্তিতে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হইবে।

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক সাফল্যের সহিত চন্দ্রাভিমুখে মহাজাগতিক রকেট (লুনিক-২) উৎক্ষেপণ।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): রুশ রকেট লুনিক-২ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ৩৪ ঘণ্টা পরই চন্দ্রলোকে উপনীত—সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ঘোষণা।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) চারদিবসব্যাপী আফগানিস্থান সফর সুরু।

২৯শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): আমেরিকায় ১৩দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক সফরে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ওয়াশিংটন উপস্থিতি।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত প্রাথমিক বৈঠকান্তে এক সরকারী ভোজসভায় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—'ঠাণ্ডা লড়াই-এর ব্যবস্থাপ' ভাঙ্গিতে সক্ষ করিয়াছে।

দেশপ্রেম

"কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস আদর্শের মূল ভিত্তি বরাবরই জাতীয়তাবাদ এবং এই লক্ষ্য হইতে কোনদিনই কংগ্রেস বিচ্যুত হইতে পারে না। শ্রীমতী ইন্দিরার এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া আর কিছু না হউক তাঁহার দুঃসাহসের প্রশংসা করিতেই হয়। ইতিহাস বিকৃত করিতে হইলে সাহসের চেয়ে দুঃসাহসের প্রয়োজন বেশি। কংগ্রেস সভানেত্রীর সেই দুঃসাহস ইদানীং খুবই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অখণ্ড ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুই টুকরা করিবার পরও নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে যে কংগ্রেস সভানেত্রী সাহস করিয়াছেন—ইহাও কম কথা নয়। কিন্তু দুঃসাহস দেখাইয়াও কি দেশের লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে আর যাহাই থাক, জাতীয়তাবাদ কোনদিন ছিল না—ছিল মুসলিম লীগের ন্যায় চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে তোষণ করার আদি এবং অকৃত্রিম চেষ্টা। সেই প্রচেষ্টার ফলেই যে শেষ অবধি ভারত বিভক্ত হইয়াছে, একথা স্বয়ং মৌলানা আজাদও 'আত্মজীবনী'তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইদানীং কংগ্রেস নেতারা অন্যান্য বিরোধী দলদের দেশপ্রেমের প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য দাবী জানাইয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু যাঁহারা প্রায় অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ ক্ষমতার লোভে বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, সেই কংগ্রেস নায়কদের দেশপ্রেমিকতার প্রমাণ কি সর্ব্বপ্রথম পাওয়া দরকার নয়?" —দৈনিক বসুমতী।

ভারত-চীন

"ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ লইয়া আলাপ-আলোচনার যে প্রস্তাব উঠিয়াছে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকিবার প্রয়োজন আছে। আপাতত চীন সরকার ভারতভূমিতে সামরিক অভিযান চালানো হইতে বিরত থাকিতে পারেন। পিকিং হইতে লাসা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে এবং লাসা হইতে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত সৈন্যচলাচলের উপযুক্ত সড়ক তৈয়ারী করিতে চীন সরকারের আরও দুই-এক বৎসর সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের উত্তর সীমান্ত অঞ্চল সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া চীনা সৈন্যবাহিনী ভারতভূমির যে সমস্ত জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করিয়াছে সেগুলি পুনরুদ্ধার করা না গেলে পিকিং সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা নিরর্থক প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লিখিত পত্রে শ্রীচৌ এন লাই জানাইয়াছিলেন, আলাপ-আলোচনার সময় "স্থিতাবস্থা" বজায় রাখা সঙ্গত। ইহার অর্থ মোটেই সুস্পষ্ট নয়। ভারতভূমির যে সকল জায়গা বলপূর্বক দখল করা হইয়াছে সেগুলি হইতে চীনা সৈন্যগণ বিদায় না লইলে "স্থিতাবস্থা"র নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি-গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় এলাকায় চীনের অনধিকার প্রবেশ অবশ্য প্রতিরোধ করিতে হইবে (must be resisted) ইহা ভাল কথা। কিন্তু যে জায়গাগুলি চীন সরকার দখল করিয়াছেন সেগুলি উদ্ধারের জন্য কী ব্যবস্থা হইতেছে? নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীনেহরু কিছুটা সুর চড়াইয়া বলিয়াছেন, "দরকার হইলে, সংগ্রাম করিতেই হইবে।" অতঃপর প্রধানমন্ত্রী নেহরু কবে কখন এবং কী অবস্থায় দরকারটা যথোচিত দৃঢ়তার সহিত উপলব্ধি করিবেন তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী উৎসুক রহিল।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা

"দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২০টির বেশী ক্ষুদ্রশিল্প সমিতির প্রতিনিধিগণ দিল্লীতে সমবেত হইয়া সর্ব ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। ইহার ফলে ছোট ছোট শিল্পের সাংগঠনিক দুর্বলতাজনিত জটিল উপসর্গের প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে। এখন সংগঠনের যুগ, কথায় বলে দশের লাঠি একের বোঝা। ছোট ছোট শিল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত; যন্ত্রসজ্জায় ও অর্থসঙ্গতিতে নিতান্ত দুর্বল, যথাসম্ভব সস্তা দরে কাঁচামাল ক্রয়ের, তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিয়া ন্যায্যদর পাওয়ার এবং প্রয়োজন অনুসারে দাদন বা ঋণ জোগাড় করার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আকারে এবং ঐশ্বর্যে নগণ্য বলিয়া সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়া ন্যায্য ব্যবহারও ইহারা অনেক সময় পায় না। সরকারের পক্ষেও অবশ্য হাজার হাজার ছোট ছোট শিল্পকারবারের বক্তব্য আলাদাভাবে বিবেচনা করা অসুবিধাজনক। এই কারণেই সমস্বার্থবান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ, শ্রেণীস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ প্রসারের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকে। আলোচ্য ক্ষুদ্র শিল্পসঙ্ঘের সভ্যগণ মধ্যবিত্ত পর্যায়ভুক্ত। তাঁহাদের নিকট দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতিক্রম আশা করিতেছি। জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্যপদ্ধতি ও দাবী-দাওয়া স্থির করিলে তাঁহারা সব মহলেরই সহানুভূতি ও সমর্থনলাভ করিতে পারিবেন।" —যুগান্তর।

বিধানসভায় জুতা

"পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কালীপদ মুখার্জ্জির প্রতি জুতা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনিও সেই জুতা ছুঁড়িয়া ফেরৎ দিয়াছেন। ইহার পর আরও কিছু জুতা উভয় পক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ডাঃ রায় বীরের ন্যায় আগেই পলায়ন করিয়াছিলেন। এই জুতা ছোঁড়ার ব্যাপারে

আমরা আবারও বলিব—এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে কেন এবং তার জন্য দায়ী কে? আজ জুতা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কাল বোমা নিক্ষেপ হইবে না ইহার গ্যারাণ্টি কোথায়? আমরা দিবা চক্ষে দেখিতেছি বিধান সরকার বাঙ্গলাদেশকে সেই পথেই ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছেন। খাদ্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অভিযোগ অত্যন্ত সঙ্গত এবং অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। শান্ত এবং ভদ্র উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতেছে না, প্রতিকারের সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। লোকে যখন খাওয়ার কষ্ট পায় এবং অপমানিত হয় তখন তাহারা মরিয়া হইয়া ওঠে। খাদ্যের দাবী উপেক্ষিত হইয়া যখন তার উপর অপমান ও লাঞ্ছনা আসে তখন এই অবস্থা ঘটিতে বাধ্য। ফরাসী এবং জাপানী পার্লামেণ্টে এর চেয়ে বেশী খারাপ অবস্থা হইয়াছে। ডাঃ রায় তাঁর ঘরে বসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিতেছিলেন। তিনি যদি তখনই সভাকক্ষে আসিতেন এবং বলিতেন —'আমি এর জন্য দায়ী এস, জুতা মারিতে হয় আমাকে মারো, তাহা হইলেও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইত। সমস্ত দুষ্কার্য্যের প্রকৃত নায়ক তিনি, তাঁর উপযুক্ত সাকরেদ জুটিয়াছে দুইটি—প্রফুল্ল সেন আর কালীপদ মুখার্জ্জি। দুষ্কার্য্যের সখ আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার সাহস নাই—ইহা দেখাইয়া বিধান রায় সেদিন প্রমাণ করিয়াছেন তিনি চূড়ান্ত কাপুরুষ।" —যুগবাণী।

ভারত-চীন মৈত্রী

"মহাচীন স্বাধীন ভারতকে আক্রমণ করিতে পারে না—এই দৃঢ়বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি মানুষের থাকা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের বৈদেশিক নীতির চিরশত্রুগণই ভারত-চীন মৈত্রীর বিরুদ্ধে সর্ব্বাধিক উগ্র প্রচারক। সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার প্রশ্ন হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি সরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিই সুপরিকল্পিত ভাবে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। এই যুদ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টির বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরুকেও সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। চীনের জাতীয় দিবসে আমাদের শপথ হইবে—সীমান্ত বিরোধের সমস্যা শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুমীমাংসিত হওয়া চাই। ভারত-চীন মৈত্রী আমরা দুর্ব্বল করিতে দিব না। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চূর্ণ করিয়া ভারত চীন মৈত্রী সম্পর্ককে সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইবে। ভারত ও চীন উভয় দেশের স্বার্থেই ইহা প্রয়োজন। ভারতের শান্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও গণতন্ত্রের জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা। ভারত ও চীনের অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ্য দীর্ঘজীবী হোক।" —স্বাধীনতা।

নূতন ট্যাক্স ও পঞ্চায়েত কর্ম্মকর্ত্তা

"বিনপুর থানায় পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের মাদকতা ও তাণ্ডবতা থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসী এবং নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তারা অন্ধকার দেখিতেছেন। পঞ্চায়েৎ আইনে যেভাবে ট্যাক্সের চাপ আসিতেছে, তাহাতে সকলে আতঙ্কিত। জমির ফসলের উপর কিভাবে আয় ধার্য্য হইবে—জমির হিসাব, এবং জমির আয়ের হিসাব কে করিবে? গ্রাম্য দলাদলির প্রকোপে নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘাড়ে যে অন্যায় ট্যাক্স

ধার্য্য হইবে তাহার প্রতিকার কে করিবে? গরুর গাড়ীর উপরেই বা কত ট্যাক্স বসিবে? ইহা হইল গ্রামবাসীদের আতঙ্ক। কর্ম্মকর্ত্তারা ভাবিতেছেন আইন মানিয়া এই সমস্ত ট্যাক্স ন্যায্যভাবে ধার্য্য করিলেও অঞ্চলের প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের পর্য্যন্ত গ্রামে বাস করা কষ্টকর। যাহাই হউক নূতন পঞ্চায়েতের ট্যাক্সের হারও কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে, সেই সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর প্রচারের প্রয়োজন। আমাদের মহকুমায় সাধারণ গ্রামবাসীদের যা অবস্থা তাতে যে কোন উন্নয়নের জন্যই হউক নূতন ট্যাক্সের বেশী বোঝা তাহারা বহিতে পারিবে না। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের কর্ম্মকর্ত্তারা সজ্ঞান থাকিলে ভাল হয়।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

বিনা মূল্যে চিকিৎসা-প্রহসন।

"বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার নামে ভারতে যে প্রহসন চলিয়াছে তাহা কোন স্বাধীন দেশের জনসাধারণই সমর্থন করিতে পারে না। সরকারী কর্ম্মচারী ও জনসাধারণ দুইটি শ্রেণী হইলেও জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কার্য্যে সরকারী দ্বিমুখী নীতি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সরকারী কর্ম্মচারীর বেলায় দামী ও ভাল ঔষধ পত্রের (যাহা হাসপাতাল হইতে সরবরাহ করা হয় না) ব্যয় সরকার বহন করিবেন আর জনসাধারণের বেলায় এই সুযোগ থাকিবে না ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সরকার যখন এক শ্রেণীর রোগীর ঔষধপত্রের মূল্য বহন করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রোগ নিরাময়ের তাগিদে সরকারী অর্থ ব্যয়ে ঔষধ-পত্র খরিদ করা সরকারের নীতি বহির্ভূত নয়। তবে কেন জনসাধারণ এই সুযোগ পায় না? 'বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ' এই নীতিটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ না করা জনকল্যাণ বিরোধী বলিয়া আমরা মনে করি। পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি হাসপাতালের আউটডোর ও ডিস্পেন্সারীতে সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হইলেই 'বিনা মূল্যে চিকিৎসার' নীতিটি যথাযথরূপে পালন করা হইবে। আমরা ত্রিপুরা প্রশাসনকে এই ব্যাপারটি নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আলোচনা করিতে পরামর্শ দিতেছি।"

—সেবক (আগরতলা)

'দর বাঁধা' না পরিহাস!!

"বীরভূমে তথা দেশে চিনি 'কনট্রোল' হইয়াছে অর্থাৎ ঠিক কনট্রোল নয় তবে দর বাঁধা হইয়াছে। সব দোকানেই দোকানদারের মুখের ভাবে ইহা গোপন থাকিতেছে না যে চিনি নাই কথাটি ভাঁওতা কারণ সব দোকানেই চিনি আছে, তাহারা সরকারী দর বাঁধাকে অপমান করিবার বা তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার জন্যই ইহা করিতেছেন। এদিকে অনেকে আবার খরিদ্দারকে রাত্রে আসিতে বলিতেছেন। ইহা শুধু বিস্ময়দীপক নহে; উপরন্তু ইহা আইন ও রাষ্ট্রনীতিকে কেয়ার না করার দুঃসাহস। এই দুঃসাহস দেখাইবার স্পর্দ্ধা আজ এইসব সমাজের কলঙ্কগণ পাইতেছে কোথায়? ইহাই জিজ্ঞাস্য। ইহা ছাড়া, জনসাধারণের মধ্যে অনেকে এখনও বলিতেছেন যে বেশ ১৵০ আনা সের যত খুসী পাওয়া যাইতেছিল অনর্থক /১০ পয়সা বাঁচাইবার অর্থহীন প্রেরণাবোধে মানুষকে এক্ষণে নাজেহাল করা হইতেছে। এখন সিভিলসাপ্লাই অফিসে আবার পারমিট এইসব ঝামেলা পোহাইতে হইবে। অর্থাৎ জনগণ এই দর বাঁধাকে সাপ্লাই অফিসে ধর্ণা দেবার পুনঃব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেছে। যাই হোক এখনই এ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা দরকার —সম্মুখে পূজা, এখন যদি চিনির বিভ্রাট সুরু হয় তা কর্ত্তৃপক্ষকে নিশ্চয়ই সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইবে না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটু এ বিষয়ে নজর দিন—আইনের মর্য্যাদা যাতে সত্য সত্য রক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

বন্যার তাণ্ডব

"উপর্য্যুপরি কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে সহরের কয়েকটি অঞ্চল, বাঘনাপাড়া, ধাত্রীগ্রাম অষ্টঘরিয়া, পিণ্ডিরা, নান্দাই প্রভৃতি ইউনিয়নগুলির কতকগুলি গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে। জলে মাঠ, ঘাট সব একাকার হইয়াছে। পরিপক্ক অবস্থায় আউস ধান, আমন ধান্যের চারাগাছগুলি জলের তলে পচিতেছে। এবারে মাঠ ভর্ত্তি ফসল হইয়াছিল, ফলনও ছিল খুব সন্তোষজনক। চাষীর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। চাউলের দর প্রায় তিন চার টাকা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে সব কিছু পণ্ড হইয়া গেল। দুঃখে চাষীরা এখন বুক চাপড়াইতেছে, গৃহহারারা কাঁদিতেছে, জনসাধারণের চক্ষে এখন হতাশা ও নৈরাশ্যের ছায়া। আমরা (গত

২৫শে শ্রাবণ) সম্পাদকীয় নিবন্ধে বন্যার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। এখন উপায় কি? কর্ত্তব্য কি? অতিবৃষ্টি হইলেই যদি বন্যা হয়, তাহা হইলে ডি, ভি সি, পরিকল্পনার একটি মুখ্য বিষয় দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এক গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে জনসাধারণের মনে সংশয় জাগিতেছে যে সমস্ত অঞ্চল কদাপি প্লাবিত হইত না এখন বৃষ্টির প্রকোপ একটু বেশী হইলে সে অঞ্চলগুলি কেন প্লাবিত হইতেছে? প্লাবনের পর রিলিফ দান ও নানাবিধ খয়রাতি সাহায্য দানে মূল রোগের উপশম হইবে না। উহা সাময়িক সাহায্য দিতে সক্ষম।" —ভাগীরথী (কালনা)।

দুর্গাপুর ও স্থানীয় বেকার

"দেশের সন্তান, এই অঞ্চলের বাস্তুচ্যুত বাসিন্দার কাজ জোটে না। অজুহাত বহু। যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে অজুহাত সৃষ্টিতে বাধা জন্মে না। তাই এই শিল্পনগরীতে লোক নিয়োগ কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া বর্দ্ধমান জেলায় অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। রূঢ়কেল্লার রূপ লইবে কি না জানি না তবে এখন হইতে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে এ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যদিও তাহা আদৌ কাম্য নহে। প্রশ্ন জাগিবে ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী কে। অবশ্যই বহুলাংশে সরকারই দায়ী। দুর্গাপুরে নিয়োগ সংস্থা খোলা হইয়াছে। নিত্য শত শত বাঙ্গালী যুবক নাম লেখাইতেছে। সরকার আইন করিয়া নিয়োগ-সংস্থাকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিল্পপতি ও ঠিকাদারদের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে স্থানীয় লোক অধিক সংখ্যায় যাহাতে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহাই কি কর্ত্তব্য শেষ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়? বাধ্য করিবার ধারা কোথায়—স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিবার গ্যারাণ্টি কোথায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি অজুহাতের অভাব হয় না। দক্ষতার প্রশ্ন তুলিয়া অভিজ্ঞতার ধুয়া তুলিয়া স্থানীয় যুবকদের নিরাশ করা হইতেছে। কেন্দ্র হইতে প্রাদেশিক সরকারী মুখপাত্রদের অনুনয় বিনয়, মানবতা ইত্যাদির আবেদন জানাইয়া কোন ফল হয় নাই। অবশ্য একেবারে হয় নাই বলিলে ভুল হইবে। তবে নিয়োগের হার উল্লেখ করিতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হয়। দুর্গাপুরে স্থানীয় বেকার নিয়োগের চিত্র এইরূপ।" —বর্দ্ধমান বাণী।

মামলা আছে, হাকিম নাই

"লালবাগ, ২৩শে সেপ্টেম্বর—গত ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার লালবাগ ফৌজদারী আদালতে কোন নতুন নালিশ দায়ের করা সম্ভব হয় নাই এবং জেনেরাল ফাইলও হয় নাই। কারণ নালিশ করার লোকের অভাব নয় হাকিমের অভাব। উক্ত দিবসে সেকেণ্ড অফিসার সরকারী কাজে অন্যত্র গিয়াছিলেন এবং মহকুমা শাসকও তাঁহার জরুরী সরকারী কার্য্যের তাগিদে সেইদিন আদালতের কার্য্য ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র থার্ড অফিসার। কিন্তু তাঁহার কগনিজেন্স নেবার কোন ক্ষমতা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্পেশাল পারমিশন দিয়ে থাকেন। সেই দিন থার্ড অফিসারকেও সেইভাবে কগনিজেন্স নেবার অনুমতি দিয়ে আদালতের কার্য চালু রাখা যাইত। এই অব্যবস্থার জন্য বহু লোককে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল।"—নিজস্ব —জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

শোক-সংবাদ

কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

খ্যাতনামা কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গত ৮ই ভাদ্র ৭৩ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। কবি হিসেবে ইনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল যাবৎ কৃতিত্বের সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে এসেছেন। ছন্দা, বাঙলার বাঁশী, পদ্মরাগ, নির্মাল্য এবং সদ্য প্রকাশিত বাঁশীর আগুন প্রমুখ গ্রন্থসমূহ তাঁর সৃজনীপ্রতিভার পরিচায়ক।

শিল্পপতি সুধীরকুমার সেন

সেনর‍্যালে ইণ্ডাষ্ট্রীজের চেয়ারম্যান ভারতবর্ষে সাইকেল শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীসুধীরকুমার সেন পশ্চিম জার্মাণীতে কর্মোপলক্ষে অবস্থিতিকালীন গত ১১ই ভাদ্র ৭২ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায় এঁর অগ্রজা। বাইসাইকেল শিল্পের প্রতি ইনি প্রথম জীবনেই অনুরক্ত হন এবং ভারতবর্ষে ঐ শিল্পের প্রসার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তরকালে ভারতীয় বাইসাইকেল শিল্পের প্রধানপুরুষ রূপে জগতের শিল্পমহলে এক বিশেষ আসন অধিকারভুক্ত করেন। বর্ত্তমানকালে বাইসাইকেল শিল্পে ভারতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি স্বর্গত সেনের কর্মদক্ষতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। স্বর্গীয় ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার মহাশয়ের অন্যতমা কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী এঁর সহধর্মিণী।

ডাঃ গণপতি পাঁজা

বাঙলার স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং ভারতের প্রখ্যাত চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা গত ২১শে ভাদ্র ৬৬ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। চর্মরোগ সম্বন্ধে এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান চিকিৎসকমহলে এঁকে একটি প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমক্ষ হয়। উক্ত বিষয়ে প্রভূত অনুশীলনের ফলে সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল ও ভেটিরিনারী শাখার সভাপতির আসন স্বর্গতঃ ডাঃ পাঁজা অলঙ্কৃত করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাব্যে অনাদৃতা

গত বৎসর কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত পূরবী চক্রবর্ত্তী লিখিত "কাব্যে অনাদৃতা" প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখিকার রচনাকৌশল ও বাগবিন্যাস প্রশংসনীয়। কিন্তু বিষয়বস্তুটি তিনি কিছু ভুল ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় শিরোনামাটিও যথাযথ হয় নাই। প্রথমতঃ, দেবযানীর প্রতি সহানুভূতির উচ্ছ্বাসে তিনি কচ ও যযাতির প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন। কচ শুক্রসকাশে বিদ্যার্থিরূপে মাত্র আসেন নাই। আসিয়াছিলেন দেবকুলের জীবন মান রক্ষাকারী মন্ত্রাহরণের জন্য। গুরুগৃহবাস কালে গুরুকন্যা দেবযানীর স্নেহের মর্য্যাদা তিনি অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা দান করেন। অতঃপর সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভান্তে কচ স্বর্গে প্রয়াণের পূর্ব্বে দেবযানীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসেন। কিন্তু মুগ্ধা, কচকে চিরতরে স্বর্গ হইতে দূরে, আপন অঞ্চলছায়া বাঁধিতে চায়। নবযৌবনা প্রবাসসঙ্গিনীর এই মধুর আবেদন অস্বীকার করা, তাহার স্নেহধন্য যুবকের পক্ষে যে কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। জাতির স্বার্থের জন্য আত্মস্বার্থ বলিদান, শ্রেয়ঃর জন্য প্রেয়কে ত্যাগ, শুধু সুকঠিন নয় সুমহান! সত্যই ইহা দুর্লভদেবত্ব! কিন্তু লেখিকা এত বড় ত্যাগের মর্য্যাদা না দিয়া কচকে স্বার্থপর কুচক্রীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গুরুকৃপা লাভের জন্য কচ দেবযানীর হৃদয় হরণ করিয়াছেন, এরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু, কার্য্যতঃ দেখা যায়, দেবযানী স্বেচ্ছায় হৃদয়দান করিয়াছিল আর কচ সে প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন স্বর্গসুখলোভে নয় স্বজাতির রক্ষার জন্য। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর এই স্বজাতিপ্রীতির? অনায়াসেই তিনি, শুক্রাচার্য্যের জামাতারূপে সসম্মানে অসুরপুরে দেবযানীর সঙ্গসুখে স্বপ্নবদির দিনযাপন করিতে পারিতেন। লেখিকার মতে, কচ দেবযানীর জীবনে প্রথম পুরুষ। দেবযানী কি কচের জীবনে প্রথম নারী নয়? তবে, দেবযানীর মুখর বেদনা অপেক্ষা কচের নীরববেদনা কোন অংশে কম? লেখিকার মতে কচের অভিশাপ তাহার "অলজ্জ পৌরুষের" বিকৃত পরিচয়। কিন্তু, প্রথমেই কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণের প্রতি দীর্ঘ সাধনার বিদ্যার বিফলতার অভিশাপ, বুঝি দেবযানীর অসংযতহৃদয়ের উন্মত্ত হিংসার পরিচয় নয়?

দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দেখা যায়, পুণ্যবান যযাতি প্রাণ থাকিতে প্রার্থীকে বিমুখ করিবেন না, এরূপ সত্যবদ্ধ হওয়ায় শর্মিষ্ঠার পুত্র প্রার্থনা পূর্ণ করেন; মাতৃত্ব নারীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। তাই, লেখিকার বনানুসারে "যৌবনজ্বালায়" নয়, পুত্রলাভের জন্য শর্মিষ্ঠা পুত্রদান প্রার্থনা করে। সত্যবদ্ধ হইলেও যযাতি শুক্রের নিষেধ স্মরণে অস্বীকৃত হন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা বলে দেবযানী তাহার ঈশ্বরী, তিনি দেবযানীর ঈশ্বর। সুতরাং ধর্ম্মতঃ তাহারও স্বামী। অতএব যযাতি ধর্ম্মচ্যুত নহেন। কিন্তু লেখিকা তাঁহাকে অন্যায়ভাবে "দুর্ব্বলচিত্ত" ও "রূপমুগ্ধ" বলিয়াছেন।

অতঃপর দেবযানী যখন পিতার নিকট পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তখনও দেখি, লেখিকার তাহার প্রতি সমান সহানুভূতি। সতী সাবিত্রীর শাশ্বতাদর্শের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। "ত্যাগে সুখ ভোগে গ্লানি" যাহার তাহাই প্রেম। কিন্তু ভোগলোলুপা দেবযানী পট্টমহাদেবী হইয়াও বিন্দুমাত্র ত্যাগস্বীকার স্বামীর জন্য করিতে পারে নাই। কুমারী-জীবনেও দয়িতকে না পাইয়া নিষ্ঠুর অভিশাপে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। অথচ, শর্ম্মিষ্ঠা পিতার রাজ্য-পরিজনের জন্য যাবজ্জীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তার পরে, দেবযানীর পুনরায় পরাজয় হয় শর্ম্মিষ্ঠার কাছে মাতৃত্বের পটভূমিকায়। কারণ, শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত যযাতি যখন পুত্রদের যৌবনদানের জন্য আহ্বান করিলেন, তখন শর্ম্মিষ্ঠানন্দন পুরু পিতার জরা গ্রহণ করিল। কিন্তু অসহিষ্ণু মাতা দেবযানীর অসহিষ্ণু পুত্রদ্বয় তাহা অস্বীকার করিল। পুত্রের মাঝেই মাতার চরিত্রের সম্যক বিকাশ হয়। শর্ম্মিষ্ঠার মহান্ ত্যাগ পুত্র পুরুকেও ত্যাগে মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। কিন্তু দেবযানী পারে নাই। এর পর, লেখিকার মতে, যযাতিকে ঘৃণা ব্যতীত দেবযানীর দেবার কিছুই থাকিল না। নিশ্চয় তাহার কারণ, যযাতির উপর চিরতরে দেবযানীর একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়া। এখানেও তাহার ত্যাগের অভাব পরিস্ফুট। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দেবযানীর মুগ্ধ স্বভাব তাহাকে মোহিনী করিয়াছে সত্য। কিন্তু গৃহিণী ও জননীরূপে মহিমময়ী করিতে পারে নাই।

লেখিকার মতে, তাহার এ বিড়ম্বনার জন্য দায়ী তাহার স্নেহান্ধ পিতা, কিন্তু এই অভিযোগ অমূলক, একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। শুক্রাচার্য্য যাহা করিয়াছিলেন তাহার চেয়ে বেশী ভাল কোন পিতাই পারেন না। সমাজের বিরুদ্ধেও তিনি কন্যাকে, সুখ-সৌভাগ্যের জন্য, রাজাধিরাজ যযাতির হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু দেবযানী "পট্টমহাদেবী" হইয়াও কর্মদোষে রাজপ্রিয়া ও রাজমাতা হইতে পারিল না। সে ইহার জন্য স্বয়ং দায়ী তাহার পিতা নহেন। তৃতীয়তঃ, আমার মতে প্রবন্ধটির শিরোনামাও যথাযথ হয় নাই। হওয়া উচিত ছিল "ভাগ্যবিড়ম্বিতা কাব্যনায়িকা" অনাদৃতা নহে। কারণ, অনাদৃতা অর্থ উপেক্ষিতা। কিন্তু মহাকবি ব্যাস দেবযানীকে আদৌ উপেক্ষা করেন নাই। উপরন্তু বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। যে বর্ণনা যুগান্ত পরেও বর্ত্তমান লেখিকাও অসংখ্য জনের এমন কি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে ও করিতেছে। "অনাদৃতা" তাকেই বলা চলে

যে সকল সৌকুমার্য্য সত্ত্বেও পাঠকের ও স্রষ্টার সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার "কাব্যে উপেক্ষিতা" প্রবন্ধে "রামায়ণের লক্ষ্মণপ্রিয়া উর্ম্মিলা" এবং "কাদম্বরীর পত্রলেখা" সম্বন্ধে সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। "উর্ম্মিলা" নবোঢ়ার বেশে দেখা দিয়াই আমাদের স্মৃতি হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইল। সীতার দুঃখের স্রোতে আরও দুঃখিনী "উর্ম্মিলা" ভাসিয়া গেল। আর "পত্রলেখা" পরমসৌকুমার্য্যময়ী হইয়াও "কাদম্বরী" ও "মহাশ্বেতার" পার্শ্বে চিরনিষ্প্রভ হইয়া রহিল! রাজকুমার "চন্দ্রাপীড়ের" সহিত তাহার অসম্ভব সখ্য, কিন্তু কোন আকর্ষণ ছিল না। "চন্দ্রাপীড়" তাহাকে পুরুষবান্ধব "পুণ্ডরীক" অপেক্ষা স্বতন্ত্রা মনে করিতেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে তাহার নারীত্বের প্রতি রচয়িতার ইহা চরম উপেক্ষা।—কিন্তু দেবযানীর এরূপ কোন সমস্যা নাই। সুতরাং সে "অনাদৃতা" বা "উপেক্ষিতা" নহে। অর্চ্চনা দেবী। গুরুধাম। কলিকাতা—২।

বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত শ্রাবণ সংখ্যার 'বৌদ্ধ পঞ্চশীল' শীর্ষক সমালোচনায় বেদের বয়স নির্ণয়ে শ্রীক্ষেম সমাজদার মহাশয় য়ুরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের মত তুচ্ছ করে শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হতে পারেন নি। শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দজীর উক্তিকেও তিনি অবলম্বন করেছেন। শ্রদ্ধেয় স্বামিজী যে ঐতিহাসিক ছিলেন না তা লেখক উত্তেজনার মধ্যে ভুলে গেছেন। খৃঃ-পূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্বে বেদ রচিত হয়েছিল বলে কোন ঐতিহাসিক বলেন নি। লেখক যেভাবে পাশ্চাত্য মনীষিবর্গকে অবজ্ঞা করেছেন, তা লেখকের ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত বিষোদ্‌গার মাত্র। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁদের অক্ষয় কীর্তি এতটুকু ম্লান হতে পারে না। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যবনিকা উত্তোলন করে তাঁরাই আমাদের উজ্জ্বল সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতীয় মনীষিগণ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক পরিপক্ক গবেষণারীতি প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং মেক্‌সমূলর প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণের সমৃদ্ধ চিন্তাধারা দীর্ঘকাল এক্ষেত্রে পথনির্দেশ করবে। বেদের অর্থ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কাছে দুরধিগম্য—লেখকের এ অভিমত নিতান্ত হাস্যাস্পদ। বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুধু স্বামী দয়ানন্দজীর সত্যার্থ প্রকাশে কেন, শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অনুবাদেও রয়েছে। বেদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সে যুগের ভাবধারা ও পরিবেশ অনুভব করার শক্তি থাকা চাই। তা হলেই অনাচ্ছন্ন মনে বেদাধ্যয়ন সম্ভব হবে।

বুদ্ধাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঐতিহাসিক সত্য। একে ধামা চাপা দেবার লেখকের অপচেষ্টা করুণোদ্দীপক। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বুদ্ধ প্রসঙ্গে নিছক কাল্পনিক ব্যাখ্যাপ্রদানের অপকৌশলও তেমনি করুণোদ্দীপক। 'আত্ম' শব্দের উল্লেখ করে বুদ্ধকে উড়িয়ে দেবার দুর্বল যুক্তি অত্যন্ত কৌতুকাবহ। বুদ্ধ পরিনির্বাণ শয্যায় শুয়েও শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন—অত্তদীপা ভিকখবে বিহরথ, অত্তসরণা, অনঞসরণা···। 'অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে' অর্থাৎ আত্মোপমায় কাকেও হত্যা করবে না আঘাত করবে না। ইত্যাদি উক্তিগুলি লেখককে অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। বুদ্ধের অনত্তবাদ বা অনাত্মবাদের মর্মার্থ পল্লবগ্রাহিতায় বোধগম্য নয়। শুধু অনাত্মবাদের উল্লেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে লাভ নেই। এই প্রসঙ্গে লেখকের বৃহস্পতি বুদ্ধের কষ্টকল্পনা দেখে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ কৌতুক অনুভব করবেন।

বৌদ্ধত্ব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে যদি লেখকের ধারণা অস্পষ্ট হয়, তবে ভারতের ইতিহাস অনাচ্ছন্ন মনে অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। শ্রীসমাজদার মহাশয় উত্তেজনার বশে আলোচ্য বিষয় অতিক্রম করে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য ও কুমারিল ভট্টকে টেনে এনে বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেও ক্ষান্ত হননি। তার পরও তিনি এশিয়ার মানচিত্র থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমাদের চীন ঘুরিয়ে তিব্বতে নিয়ে এসেছেন। অবশেষে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইলেণ্ড প্রভৃতি দেশে অহিংস বৌদ্ধধর্মের সহিংস রূপ দেখে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন।

লেখকের শালীনতাবোধের অভাব ও ভাষার অসংযত ব্যবহার দেখে আমরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইনি। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, দম্ভোক্তি ও শালীনতার সীমাতিক্রম মার্জিত মনের পরিচায়ক নয়।
—শীলানন্দ ব্রহ্মচারী।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

৬ মাসের গ্রাহক মূল্য বাবদ ৭'৫০ ন· প· পাঠাইলাম। আগামী আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি নিয়মিত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।—শ্রীমতী মিনতি বসু—সম্বলপুর।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়, পাটনা।

Remitting herewith my subscription for M. Basumati from Ashar to Agrahayana.—Leela Ghose, Meerut. (U. P.)

I am sending herewith Rs 15/- for Masik Basumati.—Secy. Hasimara I. Club.

Remitting herewith our subscription for one year with effect from Asar for your Monthly Basumati.—Head Master, Nasigram High School, Burdwan.

Subscription for Monthly Basumati.—Supdt. C & Z Mission, Howrah.

Please receive Rs. 15/- as my subscription for Basumati—Banee Roy, New Delhi.

১৫৲ টাকা বার্ষিক চাঁদা মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠাইলাম—রেণুকা মিত্র, ভাগলপুর।

আমার অনেক দিন হইতে বসুমতী পত্রিকা পড়বার যে আগ্রহ তাহা প্রকাশ করবার আর অবকাশ পাই নাই। অনুগ্রহপূর্বক মাসিক পত্রিকা V. P. যোগে পাঠাইবেন—Sree Charan Pathak—Chakradharpur. Singhbhum.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক গ্রাহিকা হইবার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে বার্ষিক চাঁদা ১৫, টাকা পাঠাইলাম।—Geeta Das Guptoo, Bina, M. P.

বসুমতী মাসিক সংখ্যার জন্য বাৎসরিক ১৫৲ পাঠাইলাম। দয়া করিয়া আষাঢ় সংখ্যা বসুমতী পাঠাইবেন।—Aloka Sadhukhan—Calcutta.

Herewith sending Rs 9/- as an advance for half-yearly subscription for your Monthly Basumati.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী মীরা বসু, জামসেদপুর।

I send herewith Rs. 15/- for the subscription of Masik Basumati for one year.—H. N. Bailung, Secy., Baghjan Indian Club, Assam.

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। যথারীতি শ্রাবণ সংখ্যা হইতে পাঠাইতে থাকিবেন।—Malati Rani Ganguly, Bombay.

I am remitting Rs. 15/- towards the annual subscription for continuing supply of "M. Basumati" from Sravana issue.—Mrs. Maya Barat, Bombay.

I send herewith Rs. 15/- as yearly subscription for your Monthly Basumati.—N. Khatun, Cachar, Assam.

আষাঢ় মাস হইতে ৬ মাসের মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠানো হইল।—Sm. Santi Lahiri, Kanpur, U. P.

Herewith Rs. 15/- for one year's subscription. Please continue to send your Magazine as usual.—Sri R. Barthakur, Assam.

আগামী ৬ মাসের চাঁদা পাঠালাম। শ্রাবণ মাস থেকে নিয়মিত বসুমতী পাঠাবেন।—Mrs. Indira Mukherjee, Shahdol,

গ্রাহকমূল্য এক বৎসরের জন্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। 'মাসিক বসুমতী' শ্রাবণ সংখ্যা হইতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Mrs. Bela Bagchi, Allahabad.

One year's subscription for Monthly Basumati from the issue of "Aswin."—Mrs. Sudhira Ghosal, Varanashi.

Please accept subscription for "Monthly Basumati" for the period Aswin to Chaitra 1366.—Ava Rani Debi, Kanpur.

Please receive our yearly subscription towards your Monthly Journal.—Welfare Library, Wellington Mill, Hooghly.

১৫৲ বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। এক বৎসরের জন্য গ্রাহক করিয়া ও বর্তমান মাস হইতে 'মাসিক বসুমতী' পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের পত্রিকা প্রবাসী বাঙালীদের সম্পদ-বিশেষ।—Hansara Union Club, Doom Dooma, Assam.

I am sending herewith Rs. 15/- for Monthly Basumati for one year only.—Sm. Manoka Sundari Devi, Lalpur, Ranchi.

Herewith please find Rs. 15/- being the annual subscription for Masik Basumati—Railway Institute, Masiani, Shibsagar, Assam.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা বাবদ ৭।।০ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত বই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দে, দিল্লী।

Please send my copy for another year.—Mamata Sen, Burdwan.

Renewal subscription for Masik Basumati for one year till Ashar 1367.—Burdwan Raj College, Burdwan.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া আমাকে গ্রাহক-শ্রেণিভুক্ত করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণা।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ অগ্রিম পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সুমিতা মল্লিক, বোম্বাই।

বর্তমান বৎসরের বৈশাখ হইতে 'মাসিক বসুমতীর' গ্রাহিকা হইবার জন্য ১৫৲ টাকা মনিঅর্ডার করিলাম।—Kamala Brahmachari, Dehra Dun.

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
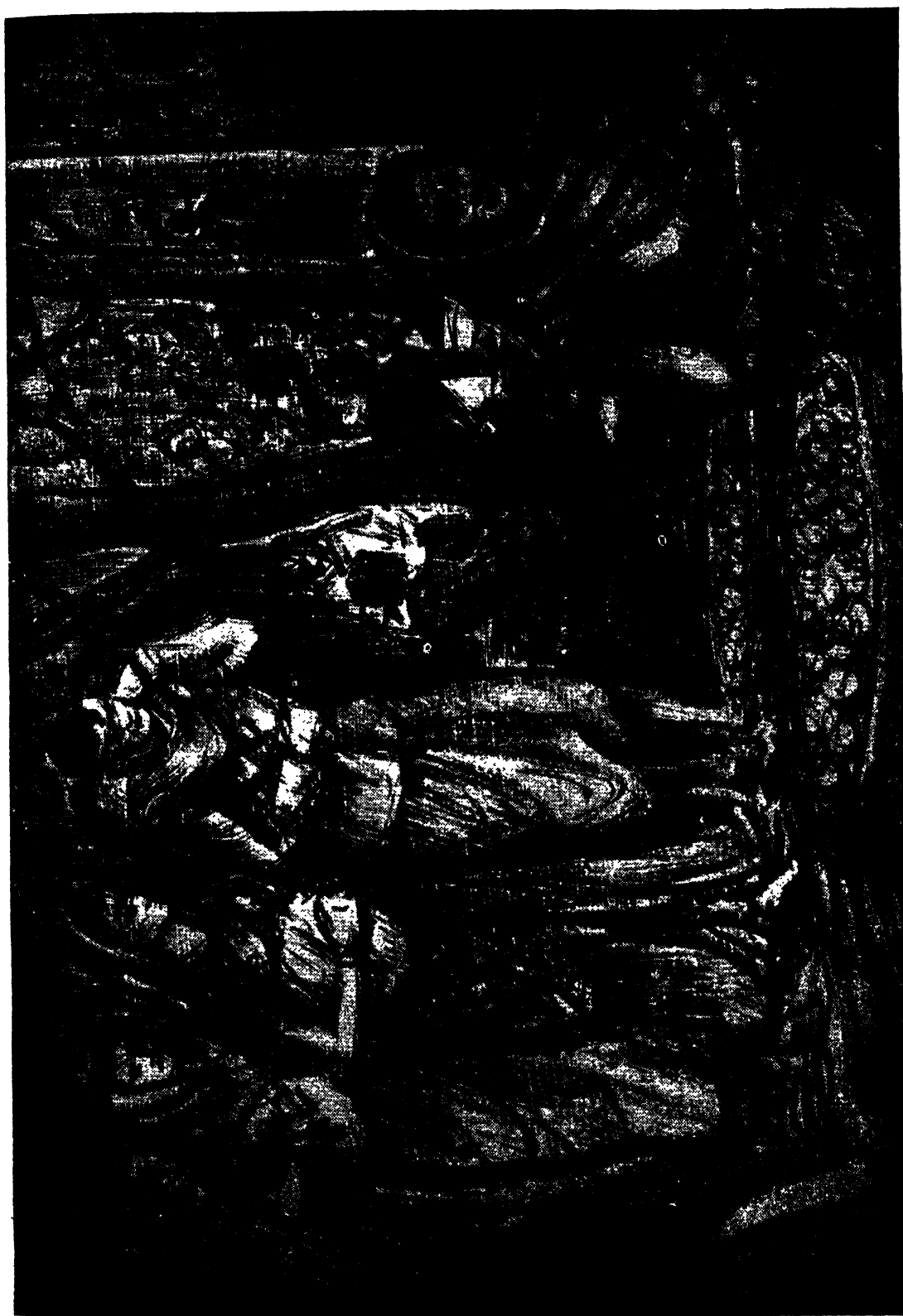
মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তদ্রূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতাসাধন ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে। অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর।

তোমরা আর্য, অনার্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাহাই হও, ভারতভূমিনিবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ, সে আদেশ এই—'চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' বেদান্তের এই আদেশ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে—সমগ্র জগৎকে এই আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক—অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যানপরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।

ঋষিগণের মত চালাইতে হইবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করিতে হইবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে। এই দেখ না, ভারতের কোথাও আর চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি জাতিতে দেশের লোকগুলিকে ভাগ করিতে হইবে। সমস্ত ব্রাহ্মণ এক করিয়া একটি ব্রাহ্মণজাতি গড়িতে হইবে। এইরূপ সমস্ত ক্ষত্রিয়, সমস্ত বৈশ্য, সমস্ত শূদ্রদের নিয়া অন্য তিনটি জাতি করিয়া সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনিতে হইবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছোঁব না' বলিলেই কি দেশের কল্যাণ হইবে? কখন নয়। —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

বাঙলা শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিবিধ মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্যে শক্তির যে বিভিন্ন রূপ ও চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা সাধারণ পরিচয় আমরা জানি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয় (অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইঁহার জন্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে)। রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীকে মুখ্যত: অবলম্বন করিয়া 'কালিকা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই 'কালিকা-মঙ্গলে' রামপ্রসাদ আরাধিত কালিকারও যথার্থ পরিচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধককবিরূপে যে প্রতিভা তাহারও কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় নাই। কিন্তু বাঙলার শাক্তধর্মে ও শাক্ত-সাহিত্যের একটি নূতন দিক খুলিয়া দিলেন এই সাধক কবি; ইহা হইল শাক্তসঙ্গীতের দিক। বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং তাহাকে নিজের একটি বিশেষ সুর সংযুক্ত করিয়া (যাহা আজকাল 'প্রসাদী' সুর নামে খ্যাত) তিনি একদিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ করিলেন—অন্যদিকে মায়ের জন্য সন্তানের আর্তিকে এমন ভাষা ও সুর দিলেন যাহা আমরা পূর্ববর্তী কোনও সাহিত্যেই আর দেখি নাই। এই আর্তি যেন বাঙালী-মনে সঞ্চিত হইয়া রুদ্ধ হইয়াছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে যখন তাহার প্রকাশ ঘটিল তখন বাঙলাদেশের এখানে সেখানে ছোট বড় বহু সাধককবির মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। আমরা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বহুসংখ্যক শাক্তগীতি পাইলাম। ইহাই বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া শাক্ত পদাবলী নামে খ্যাত।

বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয় বলিয়া শাক্ত গানগুলির শাক্ত পদাবলী নাম দেওয়া হইলেও বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কতগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। শাক্ত সঙ্গীতের প্রথম কবি রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গীত রচনার মধ্যে একটা স্বত: উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং রামপ্রসাদের শাক্ত সঙ্গীত রচনার পশ্চাতে বৈষ্ণব পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল এ কথা বলিতে পারি না। রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন বহি:প্রকাশ ঘটে তখন পরিবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে—ভাবের দিক হইতেও, প্রকাশভঙ্গির দিক হইতেও। দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসার বলিতে পারি। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সহস্র সহস্র বৈষ্ণব পদ রচনার ভিতর দিয়া সে ধারা প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপে বহু শতকে প্রবাহিত সাহিত্যের একটি অতি সমৃদ্ধ ধারা একটি বিশেষ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সাময়িক ও পরবর্তী শাক্ত কবিগণের সঙ্গীতগুলির উপরে এই পরিবেশের প্রভাব অতি স্বাভাবিক ভাবেই পড়িয়াছিল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পার্থক্যের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। প্রথমে আমরা মিলের কথাটাই আলোচনা করিতেছি।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতিষ্ঠা মধুর রসে। জীবনের মাধুর্য প্রেমে; সেই প্রেমই বৈষ্ণব কবিগণের প্রধান নহে—একমাত্র অবলম্বন। এই মধুর প্রেমের স্পর্শে দেহও মধুর—গেহও মধুর। বৈষ্ণব কবিগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধুর্যের প্রভাব পড়িয়াছে বাঙলা দেশের শক্তিদেবীর উপরেও। সর্ব সৌন্দর্য মাধুর্যের ঘনীভূত প্রতিমা রাধার প্রভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিতা দেবীগণও যে অনুরূপ মাধুর্যমণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু দেবীগণের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় এই যে রাধা-সৌন্দর্যের প্রভাব ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য করি এই শাক্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে যখন দেখি যে শুধু বাহিরের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় নয়, দেবীর মূল পরিকল্পনাতেই দেবী মধুর রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই—তিনি প্রথমাবধিই মধুররসাশ্রিতা; তাই উমাকে অবলম্বন করিয়া যখন মধুর রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই—বা উমাকে যখন মধুর রসেই প্রতিষ্ঠিতা দেখিতে পাই তখন আমরা সচকিত হই না; কিন্তু অত্যন্ত ভাবে সচকিত হইয়া উঠি যখন দেখি, শুধু অসুরনাশিনী দুর্গা-দেবী নহেন—ভয়ঙ্করীত্বের চরম নিদর্শন যে কালীর মধ্যে তিনিও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধুর রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া উঠিতেছেন।

দেখা যাইতেছে, বাঙালী কবিগণ বৈষ্ণবই হোন আর শাক্তই হোন, মূলে সকলেই মধুর রসের উপাসক। আমরা দেখিতে পাই মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্বতী উমার একটি বিশিষ্ট ধারা, অসুরনাশিনী দেবীর আর একটি পৃথক্ ধারা। পৌরাণিক যুগেই এই দুই ধারা একত্রে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কবিগণ ঐতিহ্যসূত্রে মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, জল ও দুগ্ধের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন দুগ্ধকেই পান করিবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কবিমনোহংসও তেমনই ভাবে মায়ের মধুররূপিণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির

মিশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে মধুররূপিণীকেই বাছিয়া আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাকে লইয়া বাঙলা দেশের জনমনেরই যেন এই মধুর রসের দিকে ঝোঁক। তাই দেখি, বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিতমহলে বা উচ্চকোটি মহলে যতই মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'র সহিত যুক্ত করিয়া অসুরনাশিনী দেবীর পূজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অসুরনাশিনী মূর্তিতে দেখেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাহার পরে তাঁহারা স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন—আসলে আর কিছুই নয়—মায়ের স্বামিগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্র-কন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিন দিনের বাপের বাড়ির উৎসব-আনন্দ—তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই ত আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া' সঙ্গীতের উদ্ভব। এই সঙ্গীতগুলিতে লক্ষ্য করিতে পারিব, গিরিরাজ যখন কন্যা উমাকে লইয়া গিরিপুরে ফিরিয়া আসিলেন তখন গিরিরাণী কন্যাকে বুকে লইতে এলোকেশে ধাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালীতে বলিলেন, মেনকা দশভুজা রণরঙ্গিণী দেবীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেই চাহিলেন না, মা স্পষ্টই বলিলেন,—

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী?

এই রণরঙ্গিণীকে মেনকা—এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কবিমন—শুধু যে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না তাহা নহে—তাঁহাকে উমা বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না; মা স্পষ্ট বলিলেন,—

দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।

তখন আর উপায় নাই! বাঙালী কবির মনস্তুষ্টি করিবার জন্য দশভুজা রণরঙ্গিণী মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল।—

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।
ধরেন অপূর্ব রূপ পূর্বের তনয়া ॥
দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।
নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী ॥
দুই কক্ষে দুই শিশু আশুতোষদারা।
উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা ॥ ১

রসিকচন্দ্র রায়ের গানে দেখি, তাঁহার মেনকাও অভিনব এই নারীকে চিনিতে পারেন নাই অর্থাৎ চিনিতে চাহেন নাই।

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে?
এ তো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে!
* * *
মুখে মৃদু হাসি, সুধারাশি হে, আমার উমাশশীর;
এ যে মেদিনী কাঁপায় হুঙ্কারে ঝঙ্কারে।
হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে,
এ নারীরে কেবা চিনতে পারে! ২

১। দাশরথি রায়ের পাঁচালী। ২। শাক্ত পদাবলী।

শুধু যে ভয়ঙ্করী মূর্তি চাই না তাহা নয়, ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিও চাই না—শুধু মাধুর্যময়ী মূর্তি চাই।—

বলে গেলে হে গিরি, যাই—
আনি গে গিরিজায়,
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়?
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে; ৩

অপর কবি বলিতেছেন—

গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে?
সর্ব্বদেব-তেজ দেহ, জটাজুট শিরোরুহ,
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে।
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসুমোপমা,
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার।৪

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, কবি এই গানটিতে উমার যে সব বর্ণনা করিতেছে তাহা চণ্ডীর পৌরাণিক বর্ণনা; সেই অসুরনাশিনী চণ্ডীকেই যেন কবিগণের একান্তভাবে 'স্নেহের দুলালী' উমার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইতে আপত্তি। পদের শেষে কবিরা একটা আপোস-রফা করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না যে এ আপোস-রফার চেষ্টা তাঁহাদের তত্ত্ববুদ্ধিজাত—কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য দিকে।

পূর্বেই বলিয়াছি যুগে যুগে সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপায়িত মধুররূপিণী উমাকে অসুরনাশিনী চণ্ডীর সহিত মিলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন ধারাগত আপত্তি স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কবিগণ এই আপত্তি জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা অসুরনাশিনী ভয়ঙ্করী কালী মূর্তিকে নিজেদের হৃদয়-পদ্মে স্থাপিত করিয়া যে রূপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কালীকে এইভাবে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির 'অসুর-ভয়াউনী' 'পশুপতি-ভামিনী' ভৈরবী কালীর বর্ণনা করিতেছেন—

বাসর রৈনি সবাসন সোভিত
চরণ, চন্দ্রমনি চূড়া।
কতওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল,
কতও উগিল কৈল কূড়া ॥

৩। ঐ, ঠাকুরদাস দত্ত।
৪। ঐ, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আরও তুলনীয়—
কে রণ-রঙ্গিণী!
কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গণে দাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণকুমারী।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা,
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, মনুজ-দলনী হেরি।
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,
মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিরি।
(ঐ, ব্রজমোহন রায়)

সাঁবর বরণ, নয়ন অনুরঞ্জিত
জলদ-জোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠ-পুট পাঁড়রি
লিধুর-ফেন উঠ ফোকা ॥ ৫

'দিন-রজনী, তোমার চরণ শবাসন শোভিত, তোমার চূড়ায় শোভে চন্দ্রমণি; কত দৈত্যকে মারিয়া মুখে ফেলিলে, কত না উদ্গীরণ করিয়া জড় করিয়াছ! শ্যামল তোমার বর্ণ, তাহাতে রক্তিম নয়ন, যেন কালো মেঘে লাল পদ্ম; তোমার পাটল ওষ্ঠপুটে বিকট ধ্বনি, রুধিরের ফেনায় বুদ্‌বুদ উঠিতেছে।'

এই বিকট মূর্তির মধ্যেই শ্যামার শ্যাম বর্ণের মধ্যে রক্তিম নয়নের শোভা কবির মনে আনিয়াছে শ্যাম জলদের গায়ে রক্তপদ্মের শোভার কথা। রামপ্রসাদের কালীমূর্তির একটি অনুরূপ বর্ণনায় দেখিতেছি—

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজগরাসে ॥
কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল,
অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত,
নগর-নিকর তিমির নাশে ;
কে রে রূপরে ছটায় তড়িত ঘটায়,
ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥৬

পদটির পশ্চাতে যে কবি-মানস রহিয়াছে তাহাকে ভাস করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে পদটির একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার। কালী আসব-আবেশে—অর্থাৎ সুরাপানে বিহ্বলা হইয়া এলোকেশে ঢলিয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে আসিতেছেন; কিন্তু ঢলিয়া ঢলিয়াও দানব-দলনে তাঁহার চরণের ক্ষিপ্রগতি—এবং রণক্ষেত্রে তিনি দানবপক্ষের গজগুলিকে করে ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন, রণোন্মাদিনী দেবীর সর্বাঙ্গে রুধিরচিহ্ন। এই পর্যন্ত কালীর পৌরাণিক রূপ; কিন্তু সাধকের মনের মাধুরীর স্পর্শে এইরূপও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে না; কালীর কালো দেহে রুধিরের ছটা যেন কালিন্দীর কালো জলে ভাসিয়া যাওয়া কিংশুকের ছটা। আবার মনে হইতেছে, মায়ের মুখখানি যেন নীলকমল—চূড়ার অর্ধচন্দ্র এই নীলকমলের উপরেই অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নীলচরণের নখরগুলি হইতে যেন নীলকান্তমণির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া অন্ধকার নাশ করিতেছে; নীলবর্ণের উপরে রূপের ছটায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—দেবী যে ঘোর রবে রণে লম্ফ দিতেছেন—তাহাতে মনে হয় আকাশে গর্জনকারী নীলনবীন মেঘে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে।

এই বর্ণনাটি কাব্যের দিক হইতে নিখুঁত না হইতে পারে—অতিরেক দোষে দুষ্ট হইতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে, পৌরাণিক ভয়ঙ্করী দেবীর কোনও লক্ষণকে বাদ না দিয়া তাহাকেই হৃদয়মধ্যে কতখানি মধুর করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার কি একটি ব্যাকুল প্রয়াস রহিয়াছে কবির সবটুকু বর্ণনার মধ্যে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি অপূর্ব বর্ণনায় দেখি—

তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী।
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী।
রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি'
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ।৭

তুষার-ধবল মহাদেব—তাহার হৃদয়োপর নীলবরণী শ্যামা যেন তুষার-ধবল হ্রদে প্রস্ফুটিতা একটি 'নীলিম নলিনী!' তিমিররাশি দিয়াই সে রূপ গড়া—কিন্তু রূপের বিদ্যুৎ-বিভায় দশদিক্ আলো করাই হইল তাহার কাজ। কোনও কোনও কবি আবার মায়ের পদনখে রবি-শশীর বিভা আনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উন্মাদিনী রণরঙ্গিণী মায়ের চরণে নূপুরও বাঁধিয়া ছাড়িয়াছেন। ৮ কেহ আবার চরণে নূপুরের সহিত কটিতে ঘুঙ্গুরযুক্ত করিয়াছেন। ৯ কোনও কবি আবার সর্বত্র শুধু 'অমিয়া' রূপই লক্ষ্য করিয়াছেন।—

অমিয়া জিনি মুখ শোভা তায়, অমিয়া সম শ্রমজল তায়,
অমিয়া সম পিকভাষে গায়, অমিয়া রূপে সুধাকর ॥ ১০

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের—

নীলবরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী।
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী ॥ ১১

প্রভৃতি বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্ হইতে নয়, মধুর ভাষার দিক হইতেও বৈষ্ণব কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।১২

রামপ্রসাদেরও এই বৈষ্ণব ভাষা ভঙ্গিতে কালীর বর্ণনা দেখিতে পাই—

৫। বিদ্যাপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭৬৬ সংখ্যক পদ।

৬। শা, প, (ক, বি) (শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৭। শা, প, (ক, বি,)।

৮। কে ও বিহরে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী।
চমকে অরুণ রবি শশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি ॥
শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী।
চমকে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী ॥
কাশী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) শা, প, (ক, বি)।

৯। নব জলধর কায়।
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে পায় ॥
ইত্যাদি।
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য; শা, প, (ক, বি)।

১০। গৌরমোহন রায়, শা, প, (ক, বি,)।

১১। শা, প, (ক, বি,)।

১২। মঙ্গল-কাব্যগুলির ভিতরে পার্বতীর মনোহর মূর্তির বর্ণনায় আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যের রাধার রূপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ

নব নীল নীরদ তনুরুচি কে ?
ঐ মনোমোহিনী রে।
তিমির শশধর, বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ।
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃতভাষ ॥ ১৩

অথবা—

এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা।
নখর নিকর হিমকরবর,
রঞ্জিত ঘন তনু মুখ হিমধামা ॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিণী,
হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজ দলে,
ধরাতলে হতরিপু সমা ॥ ১৪

অথবা—

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে,
বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর,
তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল ॥ ১৫

হাতে যে ভয়াল করবাল লইয়া কালী অসুর বিনাশ করিতেছেন তাহাকেও বাঙালী মন রূপান্তরিত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে।

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী।
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌদামিনী ॥১৬

ভক্ত-হৃদয়ে এই কালী-রূপের আকৃতি রসঘনরূপ লাভ করিয়াছে কমলাকান্তের একটি গানে—'মজিল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে।' রামপ্রসাদের দুই একটি গানে এই রূপকে লইয়া ভক্ত-হৃদয়ের রীতিমত একটি উল্লাস জাগিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে ॥১৭

অথবা—

সজল জলধর, কান্তি সুন্দর,
রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মন মানস নৃত্যতি,
রূপ কি ধরে নয়নে ॥১৮

কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপানুরাগ' সহসা খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। এ-ক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী ধরিয়া বাঙলা দেশে শত শত বৈষ্ণব কবি রূপানুরাগের সাধনা করিয়াছেন; সেই সাধনা বাঙলার কবিমানসে 'রূপানুরাগে'র একটা বাসনাকেই প্রবল করিয়া রাখিয়াছিল; সেই বাসনাই অষ্টাদশ শতকে কালীমূর্তিকেও নূতন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছে। নূতন দৃষ্টি বলিতেছি, কারণ কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপানুরাগে'র আভাস কোনও পুরাণে নাই—তন্ত্রেও নাই।

তবে এই 'রূপানুরাগে'র পশ্চাতে মধুররস-প্রীতি ব্যতীত শাক্ত সাধককবিগণের একটি গভীর অনুভূতির প্রশ্ন ছিল। এই সাধক কবিগণ বহুস্থানে কালীর কালো-রূপে হৃদয় আলো করিবার কথা বলিয়াছেন। ইহার ভিতরে একটি গভীর সাধন-রহস্যের কথাও নিহিত আছে, তাহার আলোচনা আমরা এই সাধক কবিগণের সাধনার কথা বিবৃত করিবার সময়েই আলোচনা করিব।

আমরা উপরে লক্ষ্য করিলাম, দেবীর রূপ বর্ণনার কতকগুলি পদে ভাষা ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়াছে। বর্ণনায় এই প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ভক্ত কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' নামক সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থে। কমলাকান্ত এ-সব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য মূর্তির বর্ণনা করেন নাই, দেবী এখানে 'কুল-কুণ্ডলিনী' শক্তি—বাস তাঁহার ষট্চক্রের ভিতরকার সর্বনিম্ন মূলাধারচক্রে। তিনি কখনও বালিকা, কখনও কিশোরী,—কখনও নবীনা যুবতী। তাঁহর দয়িত শিবের অবস্থিতি ভ্রূ-মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রে চলে এই 'নবীনা যুবতী'র অভিসার যাত্রা। এই আজ্ঞাচক্র-রূপ দয়িতধামে আসিয়া মিলিয়াছে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর) ধারা—এখানে জাগিয়াছে ত্রিবেণী-সঙ্গম। 'সাধক-রঞ্জনে'র এই নবীনা যুবতীকে সাধক-কবি গ্রহণ করিয়াছেন কৃষ্ণ-অভিসারিণী রাধার প্রতিচ্ছবিতে; সমস্ত ষট্চক্র-সাধনাই এখানে বৈষ্ণববর্ণিত লীলার

করিয়া আসিয়াছি। দেবীর রূপ-বর্ণনাতে আমরা শাক্ত-পদাবলীতেও মাঝে মাঝে এই ভঙ্গির অনুসরণ দেখিতে পাই। যেমন—

অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তাম্বুজাসনা,
কিঙ্কিণী মণি রচিত, মুকুট শিরোভূষণা।
কুটিল কুন্তল জাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা।
ধনু সদৃশ ভ্রূলতা, ত্রিনয়ন-সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুর বচনা। ইত্যাদি
মহাতাব চাঁদ, শা· প· (ক· বি·)

১৩। ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে ধৃত পদ (১৩৭ সং)।

১৪। ঐ, (১৪৮ সং)। তুলনীয়—

কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,
অঙ্গুলি দংশন করিছে অলি,
মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ
করত পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,
এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহ করতহি নাদ,
চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি। ইত্যাদি।
রামপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থে ধৃত (১৩৮ সং)।

১৫। ঐ (১৫৩ সং)। এই প্রসঙ্গে ১৪২, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২ পদগুলি দ্রষ্টব্য।

১৬। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ· প· (ক· বি·)

১৭। ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখিত 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সঙ্কলিত রামপ্রসাদের পদাবলী (১০৪ সং)।

১৮। ঐ, (১০৪ সং)।

অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু বৈষ্ণব-লীলার রূপকই নয়—তাহা ও ছন্দও গৃহীত সম্পূর্ণভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে। কিছু কিছু নমুনা দিতেছি। রজনীর শেষে প্রভাতে (অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশে জ্ঞানালোকে দেহমন উদ্ভাসিত হইলে) এই 'রমণী' (শিবসঙ্গে রমণের অভিসারিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি) জাগ্রত হইলেন; তিনি তখন ত্রিবেণী তরঙ্গিণীতে স্নানে চলিলেন।

ত্রিগুণা ত্রিবেণী তরাঙ্গিণী ধায়।
কেলি করে কুলকামিনী তায়।
বিহরই রঙ্গিণী সখীগণ সঙ্গে।
বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে।
হেরি হেরি সুন্দরী চকিত নয়ান।
শুড়িত সুচঞ্চল করি অনুমান।
সমবয় সঙ্গিনী নব অনুরাগে।
কিসলয় পরশে কুসুমধনু জাগে।১১

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্নানকেলি; সেই কেলি সমাপন হইলে আবার ধীরে ধীরে তিনি চলেন আপন নিবাসে (মূলাধারে)। এই আপনার ঘরে ফিরিবার বর্ণনা দেখি—

গজপতিনিন্দিত গতি অবিলম্বে।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে॥
চারু চরণগতি অভরণবৃন্দে।
নখরমুকুরকর হিমকর নিন্দে॥
উরসি সরসীরুহ বামা।
করিকর শিখর নিতম্বিনী রামা॥
মৃগপতি দূর শিখরমুখ চায়।
কটিতট ক্ষীণ সুচঞ্চল বায়॥ ইত্যাদি।

এই দেবীকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিভাবের কিছু কিছু বর্ণনাও দেখি। ইহার বাল্যভাবের বর্ণনায় দেখি—

কিয়ে ধনী পেখলু হেরি হেরি তনু
বেরি বেরি মন ধায়।
ইহ তনু অবস দিবস রজনী
রমণী পুন আঁখি ভুলায়॥
মন এ সুন্দরী যদি কহে বাণী।
বচন পরামৃত মৃত তনু মুঞ্জরে
এ তনু সফল করি মানি॥ ইত্যাদি।

তাহার পরে মধ্যভাবে—

কদম্ব কুসুম জনু সতত সিহরে তনু
যদবধি নিরখিলাম তারে।
যদি পাসরিতে চাই আপনা পাসরে জাই
এনা দুখ কহিব কাহারে॥
সেই সে জীবন মোর রসিকের মনোচোর
রমণী রসের শিরোমণি।
পরিহরি লোকলাজে রাখিব হৃদয় মাঝে
না ছাড়িব দিবস রজনী॥

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই; উদ্ধৃতি দিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানিই তুলিয়া দিতে হয়। যেটুকু উদ্ধৃতি দিলাম তাহা দ্বারা শাক্ত সাধকগণও যে নিজেদের সাধনতত্ত্ব বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষ্ণব ধারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহারই একটি বিশেষ নমুনা দিবার চেষ্টা করিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙলার প্রতিবেশী মৈথিলী সাহিত্যেও দেবীর বর্ণনায় বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেবীর বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একটি দুইটি ছত্রে দেবীর কমনীয় মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে আমরা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটি দেবী-বন্দনার পদ দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম। পরবর্তী কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মৈথিল কবিগণের দেবী-বর্ণনার মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করি। মহারাজ মহেশ ঠাকুরের 'তারা' বর্ণনার ভিতরে দেখি—

জয় জয় জয় ভয়ভঞ্জিনি ভগবন্তি
আদি শক্তি তুঅ মায়া।
জনি নব সজল জলদ তুঅ তনুরুচি
পদরুচি পঙ্কজ ছায়া॥২০

মহারাজ মহিনাথ ঠাকুরের কালী-বর্ণনার প্রথম ছত্র—

বদন ভয়াল কান শব কুণ্ডল
বিকট দশন ঘন পাঁতী।

কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রেই দেখি—

ফুজল কেশ বেশ তুঅ কে কহ
জনি নব জলধর কাঁতি।২১

কবি মুকুন্দের দুর্গা-বর্ণনায় দেখি,—

সিংহ চড়লি মাতা অসুর-মিকন্দিনি,
মেদিনী ডোল গতি-দাপে।
আয়ুধ উগ্র শোভএ আঠো কর,
জাহি ডরে অরি উর কাঁপে।

কিন্তু ঠিক পরের বর্ণনাই হইল—

দূর্বাদল সন কান্তি মনোহর,
শিরে শোভ চান কলাপে।২২

আধুনিক কবি বিশ্বনাথ ঝা ভগবতীর গীতে বলিয়াছেন—

জয় জয় সকল অসুরকুলনাশিনি, আদি সনাতনি মায়া।
গিরিবর বাসিনি, শঙ্করভামিনি, নিজ জন পর করু দায়া॥
শ্যামল রুচির বদন তুঅ রাজিত, তড়িতবিনিন্দক নয়নে।
বঘছাল পহিরন, কটি অতি শোভিত, ফণিকুণ্ডল যুগ কানে॥২৩

বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত বাঙলা শাক্ত পদাবলীর আর একটি গভীর মিল লক্ষ্য করিতে পারি উভয় জাতীয় পদাবলীতে বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়। এই বাৎসল্য রসের প্রাবল্যে বাঙালী কবিমনে বৃন্দাবন ও গিরিপুরের মধ্যে ব্যবধান ও ভেদচিহ্ন অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে মুছিয়াও গিয়াছে। এইরূপ হইবারই ত কথা, কারণ বাঙালী কবিমনে বৃন্দাবনও উত্তর

১১। সাধক-রঞ্জন, বসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ)

২০। গীতি-মালা, শ্রীউমানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত। ২১। ঐ। ২২। ঐ। ২৩। ঐ।

প্রদেশে অবস্থিত নয়, গিরিপুরও হিমালয়ের কোনও কন্দরে স্থিত নয়; উভয়ের অবস্থিতিই বাঙলাদেশের মাট-ঘাট-জোড়া শ্যামল অঞ্চলে। সুতরাং ভাবপ্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাবেই ভেদচিহ্নের বিস্মৃতি। একই চিত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণীরও আপোসে ভাব বিনিময় হইয়া গিয়াছে; ইহার মাঝখানে একস্থলে দাঁড়াইয়া 'স্নেহের দুলালী উমা' অপরস্থলে 'স্নেহের দুলাল গোপাল'। বাঙলাদেশের বৈষ্ণব কবিতায় গোপালের বাল্যলীলাকে অবলম্বন করিয়া বুকের সমস্ত স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন যে বাঙালী মা, বাঙলাদেশের শাক্ত কবিতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন করিয়াও তেমনই ভাবে স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন একই মা। অবশ্য লীলার এবং লীলাক্ষেত্রের কিছু পার্থক্য আছে। একজনের বাল্য-লীলা মুখ্যতঃ গোষ্ঠ অবলম্বনে—অপরের বাল্য-লীলা অষ্টমবর্ষেই স্বামীর ঘর করণে। কিন্তু পুত্রকে অবলম্বন করিয়াই হোক আর কন্যাকে অবলম্বন করিয়াই হোক, মা যশোদা রূপেই হোন আর মা মেনকা রূপেই হোন—সেই একই 'মা'কে চিনিয়া লইতে কোনও অসুবিধা হয় না। রামপ্রসাদের গিরিরাণী মেনকা যেখানে গিরিরাজ হিমালয়কে ডাকিয়া বলিতেছেন—

গিরিবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

সেখানে চিত্রটিকে সামান্য একটু পরিবর্তিত করিয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং মেনকা স্থলে যশোদা এবং গিরিরাজের স্থলে ব্রজরাজের কথা স্মরণ করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না। গোপালের গোষ্ঠে যাওয়া লইয়া কবিওয়ালার গান দেখি—

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর
নীলমণি ধনে;
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ,
বলাই হচ্ছে রে মনে।
কুস্বপন দেখেছি ভারি,
যেন হারায়েছি হরি,
বলাই রে তোর করে ধরি,
মন মানে ত নয়ন না মানে।
আজকের মতন যারে তোরা,
ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইয়ে হারা
নয়নতারা দিয়ে বনে।।২৪

ইহারই ঠিক পাশে রাখিয়া দিতে পারি আমরা শাক্ত সঙ্গীত—

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার?
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার।
নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার উমা নাই হে আর।২৫

লীলা-ক্ষেত্রের সকল পার্থক্য সত্ত্বেও মাতৃ-মনের ঐক্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা দেখিতে পাই, গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় দিয়া নন্দরাণী সারাদিন উদ্বেগ-আশঙ্কায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং গোষ্ঠ হইতে গোপাল ফিরিয়া আসিলে ক্ষীর-সর-ননী লইয়া আগাইয়া যাইতেন।

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম
চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইয়ের মুখে দেয় রাণী মনোসুখে
নিরখয়ে চাঁদ মুখপানে।।২৬

শাক্ত পদাবলীতেও অনুরূপভাবে দেখিতে পাই, উমা কৈলাস হইতে ফিরিয়া আসিলে মা মেনকা আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন—

পথ-শ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মাধব,
দিব বদন-কমলে।২৭

কানু সন্ধ্যায় গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিলে—

গোগণ সবহুঁ গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতি আওল
মোহন ভণিত রসাল।।২৮

এবং তাহার পরে—

পঞ্চদীপে নিরমঞ্চন কেল।
কত শত চুম্ব বয়নপর দেল।।২৯

আগমনী সঙ্গীতেও দেখি কৈলাস হইতে ফিরিয়া উমা আসিলে গিরিরাণী মেনকা—

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী॥
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি উমা-মুখ-শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী।।৩০

২৪। মনুলাল মিশ্র; শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখিত 'উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২৫। শা, প, (ক, বি,)।
২৬। বলরাম দাস, পদকল্পতরু।
২৭। মহেন্দ্রলাল খান (রাজা), শ, প, (ক, বি,)
২৮। পদকল্পতরু।
২৯। মোহন, পদকল্পতরু।
৩০। কমলাকান্ত, শা, প, (ক, বি,)

কৃষ্ণের মথুরাগমনের বিচ্ছেদ ব্যথা এবং উমার কৈলাসগমনের বিচ্ছেদ-ব্যথাও বাঙালী কবিগণের মনে খানিকটা সমজাতীয় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কৃষ্ণের মথুরাগমনে যেমন দেখিতে পাই—

কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিল না করতহি গান।৩১

তেমনই উমার কৈলাস গমনেও দেখিতে পাই—

রাণি গো, শুধু তোমারি বেদনা ব'লে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদি ক'রে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়।৩২

কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাইবার পর রাত্রিতে কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখিয়া নন্দরাণী যশোদা কাঁদিয়া উঠিতেন। এই জাতীয় চমৎকার একটি পদ দেখিতে পাই কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্ন-বিলাস' পালার মধ্যে। স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়াছে—সকাল বেলা ব্রজরাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই কথা ব্রজরাজ নন্দকে বলিতেছেন।

শোন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে।
যেন সে অঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধ'রে কাঁদে,
"জননী, দে ননী দে ননী" ব'লে।
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর,
বিধুমুখে যেন কতই মধুস্বর
সঞ্চারিয়ে ডাকে "মা" ব'লে।
যত কাঁদে বাছা বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ সর্,
বললেম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
অমনি সর্ সর্ বলি' ফেলিলেম ঠেলে॥ ইত্যাদি।

সমজাতীয় বহু গান দেখিতে পাই আমাদের আগমনী সঙ্গীতের মধ্যে। এখানে উমার স্বপ্ন দেখিয়া গিরিরাণী মেনকা গিরিরাজকে বলিতেছেন—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতন কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথায় গেল হে,
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে!
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে!
ধৈরয না ধরে মম জীবনে।৩৩

আবার—

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার,
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।৩৪

দাশরথি রায়ের প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে—

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো॥
কহিছে শিখরী, কি করি, অচল,
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো।

কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-কবিতায় বাৎসল্য-রসের শুধু একটানা স্রোতই দেখিতে পাই—মাতৃ-হৃদয়ের বিগলিত স্নেহধারার সন্তানের উপরে—অবিরল বর্ষণ। বাৎসল্য-রসের অপর একটি স্রোত আছে—উহা মাতৃ-পাগল সন্তানের মাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ—সে আকর্ষণ তাহাকে সংসারের অন্য সকল আসক্তির বন্ধন হইতে একেবারে মুক্তি দিয়াছে। মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষণ বাৎসল্য নামে বহুখ্যাত বলিয়া মায়ের প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রতিবাৎসল্য নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাৎসল্য-রূপ সন্তানের এই সর্ববিস্মারক আকুতি বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই—শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, অন্য কোনও সাহিত্যেই—এমন করিয়া নাই যেমন আছে বাঙলা দেশের এই শাক্ত সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক—রামপ্রসাদেই এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি। সুখে দুঃখে, আশায় নৈরাশ্যে পাওয়ায় না পাওয়ায়, হাসিতে অশ্রুতে মিলাইয়া এই 'মা' ডাক। সর্বব্যাপিনী সর্বৈশ্বর্যময়ী আনন্দরূপিণী মাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া রস-বিস্ফারিত নেত্রে করুণার্দ্র কণ্ঠে যেমন মা নাম, তেমনই আবার 'ভবের গাছে জুড়ে দেওয়া' চোখে ঠুলি বাঁধা বলদের মত ঘানির গাছে ঘুরিতে ঘুরিতেই শ্রান্ত কণ্ঠে মায়ের নাম, (৩৫)—না-জানা অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে ভুগিতে ভুগিতেই মায়ের নাম, (৩৬) আবার ডাকিতে ডাকিতে সাড়া না পাইয়া অভিমানের অবিরল অশ্রুতে অথবা অভিমানের কঠিন রোষেও সেই একই মায়ের নাম। এই সাধন-শক্তিতে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে বলিয়াছিলেন—

এমন ছাপান ছাপাইব খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন তেমনি পাছে পাছে ধাবা।

হৃদয়ের সমস্ত আর্তি আকুতি উত্তরহীন নৈঃশব্দ্যের কঠিন শিলাতটে মাথা কুটিয়া কুটিয়া একদিন হয়ত ফুঁসিয়া উঠিয়া বলিয়াছে—

মা ব'লে আর ডাকিস্ না-রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।৩৭

৩১। গোবিন্দ দাস। ৩২। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়; শা. প. (ক. বি.)

৩৩। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. (ক. বি.)।

৩৪। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা. প. (ক. বি.)।

৩৫। 'মা আমায় ঘুরাবি কত' প্রভৃতি, রামপ্রসাদ।

৩৬। 'তারা কোন্ অপরাধে, এ-দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল'। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা. প.

৩৭। নবচন্দ্র রায়; শা. প.

অভিমানে হৃদয়কে কঠোর করিয়া সন্তান বলিয়াছে—

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ।।৩৮

পুঞ্জীভূত অভিমানের জ্বালায় রামপ্রসাদও একদিন মায়ের সহিত সব হিসাব-নিকাস বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

মা মা ব'লে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ।।
ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না ।।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছিস চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ।।

কিন্তু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এই সব সঙ্গীতকারগণ। এই অভিমানের চোখের জলেই হয়ত তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মা যে শ্মশানবাসিনী, অন্যত্র মায়ের আগমন নাই। তখন চলিল একটু একটু করিয়া নিজের হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করিয়া মায়ের লীলা-ক্ষেত্র রচনা করিবার সাধনা। কামনা-বাসনা-আসক্তিকে নিঃশেষে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে শ্মশান করিতে হয়; দগ্ধ কামনা-বাসনার চিতাভস্মের উপরেই স্থাপন করেন সর্বশান্তিদায়িনী মা তাঁহার দুই চরণ। সেই মাতৃ-সাধনায় রত রামলাল দাস দত্তের গান—

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি ।।

আমরা বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর ভিতরকার মিলের কথাই আলোচনা করিতেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে উভয়-জাতীয় পদাবলীতে বর্ণিত বাৎসল্য-রসের কথা বলিতেছিলাম। এই মিলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। বাঙলা দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা সুপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দম্ভপূর্বক বিষহরীর পূজা, মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দিয়া বাসুলী পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই পটভূমির উপরে বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ, ফলে শাক্ত-ধর্মের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য। নবদ্বীপে এই দ্বন্দ্ব-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব রাসযাত্রার পূর্ণিমা রাত্রিতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির তেমাথা-চৌমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসমারোহে পূজিতা হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমরা এই শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের একটা জনপ্রিয় সমন্বয়ের প্রবণতা দেখিতে পাই। ধর্মের ভেদ সহজভাবে অবলুপ্ত হইয়া যায় দুইজাতীয় হৃদয়ে, এক যথার্থ সাধক-হৃদয়ে, দ্বিতীয় কবি-হৃদয়ে। যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কবি-হৃদয়ের যোগ ঘটিয়াছে সেখানে ত আর কথাই নাই। সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজের জনসাধারণও ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী; সুতরাং কবিগণের প্রচারিত সমন্বয়বাদ জনসাধারণ সাদরেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে আমাদের যে সকল যাত্রা-পাঁচালী প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটা শাক্ত-বৈষ্ণবের সমন্বয়ের সুর দেখিতে পাই। এই সব যাত্রা-পাঁচালীতে দেখিতে পাই, রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ছিলেন শক্তি-উপাসক—কালী উপাসক। রাধা লুকাইয়া লুকাইয়া করিতেন কৃষ্ণের পূজা। ননদিনী কুটিলা গিয়া ভ্রাতা আয়ানের কাছে অভিযোগ করিল, বধূ রাধা লুকাইয়া কৃষ্ণের পূজা করে। আয়ান ভগিনীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দেখিতে আসিলেন—আসিয়া দেখেন—

কুঞ্জকাননে কালী, ত্যজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যাম শ্যামা' ভেদ কেন কররে জীব ভ্রান্ত ।।
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।
কি বা কাল শশী, লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী অট্টহাসি বিকট দন্ত ।।
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে সুগন্ধি তুলসী দিয়ে
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত।
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা রঙ্গিণী রাই করে সেবা
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত ।৩৯

বাঙলা দেশে চলিত কৃষ্ণ-যাত্রায় এই পালাটি দর্শকবৃন্দের সোল্লাস সমর্থন লাভ করে—এ সত্য আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রামপ্রসাদের গানেও এই কৃষ্ণ-কালীর উল্লেখ আছে।৪০

ইহার অপর পিঠ দেখিতে পাই শাক্ত পদাবলীতে। সেখানে কৃষ্ণ-কালী বিষয়ে কবিওয়ালা লালু নন্দলালের বিস্তৃত বর্ণনা 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল সঙ্কলিত) গ্রন্থের ৪২—৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সমন্বয় দেখা দিয়াছে শুধুমাত্র জনপ্রিয় কবিদের মারফতে নয়, সেই সমন্বয়ের গভীর রূপ দেখা দিয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যানুভূতির মধ্যে। রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম অনুভূতির মধ্যে তিনি লাভ করিয়াছিলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরম-আনন্দ তাহার মধ্যে শ্যাম ও শ্যামার তিনি কোথাও কোন ভেদ দেখিতে পান নাই। তাই তিনি অতি সহজ ভাবেই গাহিতে পারিলেন—

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।
... ...
নিজ-তনু আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি এলোচুল চূড়া বংশীধারী।

সাধকের নিকটে রূপ ত কেবল ভিতরে কতগুলি ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য এবং লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য।

৩৮। নবচন্দ্র রায়, শা.প.

৩৯। দাশরথি রায়ের পাঁচালী।

৪০। কালবরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি ।।

রামপ্রসাদ প্রধানত: কালীকে অবলম্বন করিয়াই নিজের ভিতরকার ভাবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—মায়ের যে একই সময়ে অসি-মুণ্ড-ধর-ভাবের লীলা চলিয়াছে তাহাই আস্বাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া সে এক পরমসত্যের কালীরূপে লীলা—তাঁহারই কৃষ্ণ লীলা কোনও সময়ে আস্বাদন করিতে সাধকের কিছুই বাধা নাই। তাই লীলা-বৈচিত্র্য-প্রয়াসী রামপ্রসাদেরই গানে দেখি—

যশোদা নাচাত গো মা ব'লে নীলমণি,
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ?

গভীর অধ্যাত্মানুভূতির সহিত সরল কবিপ্রাণ যুক্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে যে সত্য প্রতিভাত হইল তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই অন্যান্য কবিগণের মধ্যেও। সাধক কমলাকান্তও কালীকে 'পরম কারণ' বলিয়াই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এই 'পরম কারণে'র নারীরূপে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, তেমনই পুরুষরূপে প্রকাশিত হইতেও কোন বাধা নাই।

জান না কি মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।
হ'য়ে এলোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।৪১

এ সম্বন্ধে অতি চমৎকার একটি গান দেখিতে পাই নবাই ময়রার। ইঁহারা কবি মরমিয়া সহজপন্থাদের দলের। হৃদয়ের যে মন্দিরে অসি-মুণ্ডধারিণী কালীমায়ের প্রতিষ্ঠা সেই মন্দিরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধুর-লীলা-আস্বাদন করিবার অভিলাস :—

হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে ;
একবার হ'য়ে বাঁকা, দেমা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।
নর কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ওগো ও পাষাণের মেয়ে।
হৃৎ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে ভালবাসি,
একবার ত্যজে অসি ধর মা বাঁশী,
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইয়ে ॥ (৪২)

একটু প্রণিধান করিলেই বোঝা যাইবে, শাক্ত পদাবলীতে এই-জাতীয় গান কোনও তরল প্রভাবজনিত নয় ; এখানে প্রভা[illegible] একেবারেই কিছু নাই এমন কথা বলিতে পারি না ; তবে প্রভা[illegible] অপেক্ষা এখানে অনুভূতির ব্যাপকতাকেও মর্যাদা দিতে হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবও শাক্ত সাহিত্যে কিছু কিছু প[illegible] নাই এমন কথা বলিতে পারি না। গোবিন্দ অধিকারীর রচি[illegible] রাধা কৃষ্ণকে লইয়া শুক-সারীর দ্বন্দ্ব একটি প্রসিদ্ধ গান। (৪৩) ইহারই অনুকরণে পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি 'নন্দী জয়া দ্বন্দ্ব' দেখিতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া।

নন্দী বলে, আমার শম্ভু যেন রজতগিরি,
জয়া বলে, গৌরী আমার স্বুবর্ণ বল্লরী,
রূপে জগৎ আলো।
নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল ফণী,
জয়া বলে, মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি,
শোভা বলব কত !
নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাখা,
জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,
ভোলা তাই উদাসী।
নন্দী বলে, শোভা পঞ্চ বদনমণ্ডলে,
জয়া বলে, দুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে,
পাগল পঞ্চানন। ইত্যাদি।৪৪

---

৪১ শা• প• (ক• বি•) ; তুলনীয়—
অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী।
কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী ॥
রামলাল দাস দত্ত, ঐ।

৪২। শা, প, (ক, বি)
৪৩। শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন ? ইত্যাদি।
৪৪। শা, প, (ক, বি,)।

মিঃ লোমেন হত্যার নায়ক বিনয় বসু

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

ঐ যে নিরীহ-শান্ত গো-বেচারী ধরণের ছেলে, ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, কোন দলাদলিতে যাকে কোন দিন দেখা যায় নাই—সেই বিনয় বসু যে বিপ্লব যুগের প্রলয়-বহ্নিরূপে কোন দিন প্রকাশ পাইবে তাহা মিঃ লোমেন হত্যার পুর্ব্বে কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে? সত্যই এটা একটা অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা।

ঢাকা নগরীতে (বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) আমাদের বাসার নিকটে একটি ছাত্রাবাসে থাকিয়া বিনয় বসু ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়িত। সে খুব সুন্দর বাঁশী বাজাইত, উহাই যেন ছিল তার একমাত্র আনন্দ। আমাদের বাসা হইতে উহাদের ছাত্রাবাসটি দেখা যাইত। ঐ ছাত্রাবাসের ছাদে বসিয়া উহাকে কত দিনই না বাঁশী বাজাইতে দেখিয়াছি। বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনা হইলেও সমস্ত ব্যাপারটা আজও চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসিতেছে। মনে হয় উহা যেন অদ্যকার ঘটনা।

আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে—এই স্বাধীনতা লাভ করিতে কত তরুণই না তাদের অমূল্য জীবন অকালে মৃত্যুর যূপকাষ্ঠে আহুতি দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বহুকালব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ভারত আজ স্বাধীনতার আলোকে উজ্জ্বল এবং মুক্তির আনন্দে উচ্ছল।

যাঁরা স্বাধীনতার সার্থক রূপ দেখিবার পূর্ব্বেই অবিরাম সংগ্রাম করিয়া চিরবিদায় লইয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। স্মরণ করি তাঁদের—যাঁরা শক্তি দিয়া সাহস দিয়া কঠোর সাধনা দিয়া উৎপীড়নের অভাবনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া অকুণ্ঠ চিত্তে সকল পার্থিব সুখ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকের জীবন এক একখানি ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আজ স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা দেশকে—'মা' মনে করিয়া পরাধীনের অবমাননা হইতে তাঁকে উদ্ধার করিতে হাসিমুখে নিজেদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। কবির ভাষায়—'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন।' এই সকল বরেণ্য ও চিরস্মরণীয় বিপ্লবী—ও স্বাধীনতার অগ্রদূতরূপে যাঁরা প্রণম্য—বিনয় বসু যে তাঁহাদের অন্যতম ইহা কে না স্বীকার করিবে?

তাঁদের চিন্তাধারার সাথে, তাঁদের হিংসাত্মক কাজের আদর্শের সাথে আমাদের বিন্দুমাত্র মিল না থাকিলেও তাঁদের জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা, শাসকদের দুঃখ-কষ্টের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করা ও দেশমাতৃকার পদতলে জীবন বিসর্জনের চরম ত্যাগকে চিরকাল কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিয়া নিজেরাই ধন্য হইব। তাঁরা যে ভারতের স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক!

আজ আমি পাঠকদের নিকটে মিঃ লোমেন হত্যার কাহিনী ও সেই সাথে উহার নায়ক বিনয় বসুর কথা যাহা নিজ চোখে দেখিয়াছি —বলিব। বিনয় বসুর নাম কোন্ বাঙ্গালী না জানেন? যিনি জানেন না, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ হয়।

১৯৩০ সনে জুলাই মাসে এই ঘটনা ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রাতে অনুমান দশ ঘটিকায় ঘটে।

মিঃ লোমেন ছিলেন সেই সময়ে পুলিশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা অর্থাৎ I. G. P. এবং মিঃ হডসন ছিলেন ঢাকার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। হিন্দুর প্রতি বিশেষতঃ ছাত্রদের ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের প্রতি—তাহাদের অন্যায় ও অযথা অত্যাচারের জন্য সকল হিন্দু অধিবাসীর নিকটে কুখ্যাত ছিলেন।

ঢাকা নগরীতে ও উহার সংলগ্ন ও অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে ঐ সময়ে প্রবল বেগে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল এবং সেই আন্দোলনে কত স্ত্রী-পুরুষই না যোগদান করিয়া হাসিমুখে অজস্র অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা যেমন গণনাতীত—তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের কাহিনীও তেমনি বর্ণনাতীত!

ঐ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে মদের দোকান, আবগারী দোকানগুলিতে সর্ব্বদা পিকেটিং চলিত। সেজন্য সরকারের আয়ের পথে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি হইত। সেই সাথে প্রায়শঃ হরতালের জন্য ঢাকার পুলিশ প্রভুরা খুবই চঞ্চল ও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কাজের জন্য তাহারা ছাত্রদের—বিশেষতঃ মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের দায়ী করিত। ফলে প্রায়ই নিষ্পাপ ও নিরীহ ছাত্ররা অকারণে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহৃত হইত। গভীর রাত্রিতেই তাহাদের এই পৈশাচিক কার্য্য চলিত। অনেক রাত্রিতে এই সকল ছাত্রের করুণ কান্না শুনিয়াছি।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস—এইরূপ অত্যাচারের ফলে অনেক নিরীহ ছাত্র অবশেষে বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখাইয়াছে। প্রতিশোধ-স্পৃহায় এই সকল তরুণ যুবক যে চঞ্চল হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? এইবার সেই মূল ঘটনায় যাই। ১৯৩০ সনের ১লা জুলাই প্রাতে অনুমান দশ ঘটিকায় মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন এক সাথে হাসপাতালে তাহাদের এক বন্ধুকে দেখিতে আসেন—বন্ধুটি River S. P.—তিনি পূর্ব্বদিন লাটসাহেবের বাড়ীতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও তাঁহাকে হাসপাতালে চিকিৎসার্থ পাঠান হয়।

সেই দিন হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট পূর্ব্ব হইতেই পুলিশে ভরা ছিল। কারণ সেই দিন প্রাতে সাড়ে দশ ঘটিকায় তদানীন্তন লাটসাহেবের পক্ষ হইয়া তাঁহার কন্যার হাসপাতাল পরিদর্শনের কথা। মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন উভয়ের হাতেই প্রকাণ্ড পিস্তল ছিল। তাঁহারা, তাঁদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুকে দেখিয়া হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবের সাথে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বিনয় বসু ও তাহার এক সাথী যাহার নাম বা কোন পরিচয় আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই এবং সে কি ভাবে যে বহু পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইবার সুযোগ পাইল, তাহাও আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে! হঠাৎ মিঃ লোমেনদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনয় বসু উহাদের প্রায় ১০ হাত দূরে আসিয়া মিঃ লোমেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল "গুড মর্ণিং মিঃ লোমেন!" মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন যেই ফিরিয়া দাঁড়াইলেন অমনি বিনয় বসু তার হাতে থাকা রিভলবার দ্বারা মিঃ লোমেনকে উপর্য্যুপরি গুলী করিল ও

বিনয় বসুর সঙ্গীটিও সাথে সাথে মিঃ হডসনকে গুলী করিয়া পিস্তলসহ পলাইল।

মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন উভয়ের হাতের পিস্তল হাতেই রহিয়া গেল। ব্যবহারের সুযোগ হওয়ার পূর্ব্বেই আততায়ীদের গুলীতে বিদ্ধ হইয়া উভয়েই রক্তাক্ত দেহে হাসপাতালের সিঁড়িতে পড়িয়া গেলেন। হাসপাতালে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হইল। ঐ সুযোগে বিনয় বসুর সঙ্গীটি যে কোন পথে পলাইয়া গেল কেহই সঠিক বলিতে পারে না।

বিনয় বসু তার হাতের রিভলবার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ও পায়ের চটি জুতা সেখানে রাখিয়া তার মেসের দিকে সদর রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া চলিল। হাসপাতাল হইতে তাহার মেস অনুমান দুই হাজার হাত হইবে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য এবং কেবল চীৎকার শুনিতেছি "পাকড়াও"—"পাকড়াও"। এত লোকের ভিতর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিনয় বসু তাহার মেসে চলিয়া গেল। এত লোকের মধ্যে কেন যে কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইল না ভাবিলে সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়!

এই ঘটনার প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট পরে বিনয় বসু তার মেস হইতে একটি সাইকেলে নিশ্চিন্ত মনে পলাইয়া গেল। তখন রাস্তাঘাটে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল,—কিন্তু কেহই বিনয় বসুকে ধরিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অজস্র পুলিশের দল হাসপাতাল ও নিকটবর্ত্তী রাস্তা-ঘাট ছাইয়া ফেলিল ও গতানুগতিক ভাবে তাদের কার্য্যক্ষমতা দেখাইতে ত্রুটি করিল না। যেখানে যাহাকে পাইতেছে খানাতল্লাসী করিয়া যতখানি সম্ভব বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিল না। বহু নিরপরাধ যুবক তাদের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া জেলখানায় প্রেরিত হইল। পুলিশ বাহিনী বিনয় বসুকে ধরিতে পারিল না;—তবে তাহার পরিত্যক্ত রিভলবার ও চটিজুতা লইয়া সন্তুষ্ট হইল।

অনেকেই হয়ত জানেন যে, এই ঘটনার কিছুকাল পরে বিনয় বসু কলিকাতায় অন্য একটি বিপ্লবী ঘটনায় মারা যায়।

অজস্র পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া বিনয় বসু কবে কি ভাবে ঢাকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই—কোন দিন যে জানা যাইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখি না। যাহা হউক, মিঃ লোমেন আহত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়া ছিলেন—পরে মারা যান। তাঁহার জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই।

মিঃ হডসন মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। যদিও তিনি প্রাণে রক্ষা পাইলেন কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অকালে অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়েন। আচার-ব্যবহারেও পরবর্ত্তী কালে তিনি খুবই সংযত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় বিনয় বসুর জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঢাকার উচ্চপদস্থ পুলিশ বাহিনীর ধারণা ছিল যে, বিনয় বসু ঢাকাতেই আছে, ঢাকাতেই ধরা পড়িবে এবং ঢাকাতেই বিচারে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলিবে এবং পুলিশ বাহিনীর জয়-জয়কার হইবে। কিন্তু তাহাদেই সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

যে রিভলবার দ্বারা বিনয় বসু মিঃ লোমেনকে হত্যা করে উহার একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস উদ্ধারের কৃতিত্ব রায় সাহেব জিতেন্দ্র ধর, সি-আই-ডি বিভাগের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের। যত দূর মনে পড়ে, এই ঘটনার তদন্তের ভার তাঁকে দেওয়া হইয়াছিল।

মিঃ হাচিন্স নামে একটি খাস বিলাতী সাহেবের পার্ক ষ্ট্রীটে সোনা রূপা জহরতের খুব বড় দোকান ছিল। দোকান ও আত্মরক্ষার জন্য তিনি এই রিভলবারটি লণ্ডন হইতে ক্রয় করেন। মিঃ হাচিন্স ও মিঃ লোমেনের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। ১৯১১ সনের শেষভাগে মিঃ হাচিন্স কিছুদিনের জন্য দার্জ্জিলিংএ বেড়াইতে যান এবং তিনি যে হোটেলে জায়গা নেন, মিঃ লোমেনও সরকারী কাজে সেই স্থানে ঠাঁই নেন। দার্জ্জিলিংএ এ রিভলবারটি লণ্ডন হইতে মিঃ হাচিন্সের নামে ভিঃ পিঃ'তে আসে। ঐ রিভলবারটি দেখিতে খুবই সুন্দর ছিল। উহা দেখিয়া মিঃ লোমেন পরিহাস করিয়া বলেন যে, এমন একটি রিভলবার যদি কেহ আমাকে উপহার দিত, তাহা হইলে আমি নিজেকে মোগল বাদশা মনে করিতাম আর উপহারদাতাকে এক শত একটা মোগল বাদশাহী-মোহর উপহার দিতাম। তখন মিঃ হাচিন্স হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, তুমি যখন পুলিশের Inspector General হইবে, তখন এটি তোমাকে উপহার দিব। ইহা মিঃ হাচিন্সের মুখে নিজে শুনিয়াছি।

মিঃ লোমেন তখন তরুণ যুবক এবং Asst. Police Suptd. রূপে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কে জানিত যে সেই রিভলবারই মৃত্যুর দূতরূপে মিঃ লোমেনের প্রতীক্ষায় ছিল।

মিঃ হাচিন্সের অলঙ্কারের দোকানের সিন্দুক হইতে ১৯১৪ সনের ২৬ শে সেপ্টেম্বর ঐ রিভলবারটি চুরি যায়। সযত্নে ও একান্ত সাবধানে রক্ষিত রিভলবারটি বিনয় বসুর হাতে কবে ও কি ভাবে আসিল তাহা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই।

বিপ্লবীদের কাহিনী ও বিপ্লবের পূর্ণ ইতিহাস যদি কখনও কোন ঐতিহাসিক অসীম পরিশ্রমের দায়িত্ব লইয়া রচনায় প্রবৃত্ত হন, এই কাহিনী হয়ত তাঁহাদের আরব্ধ কাজের সহায়ক হইতে পারে।

১৯১৪ সনের চুরি যাওয়া রিভলবারটি, যেটি দেখিয়া মিঃ লোমেন এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই পুনঃ ১৯৩০ সনে তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু সে ইতিহাস আনন্দের নয়—বেদনার করুণ-কাহিনী।

মিঃ হাচিন্স এই ঘটনায় খুবই ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তার চুরি যাওয়া রিভলবারটি দেখিয়া যখন বলিলেন যে আমি মিঃ লোমেনকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম যে তুমি যখন Inspector General of Police হইবে তখন, এটি তোমাকে উপহার দিব। বোধ হয় আমার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই রিভলবারটি এ ভাবে দেখা দিল। এই প্রকাশ চিরকাল আমাকে আঘাত দিবে। এই ভাবে দেখা না দিয়া যদি চিরকাল রিভলবারটি অপ্রকাশ থাকিত তাহা হইলেই আমি সব চেয়ে বেশী খুসী হইতাম। এই কথাগুলি বলিবার সময়ে লক্ষ্য করিলাম যে তাঁর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

এইরূপ হত্যার পূর্ব্বে রিভলবারটি অন্য কোন ঘটনায় লিপ্ত ছিল কি না তাহা জানা যায় নাই।

জীবনরক্ষার জন্য যেটির প্রয়োজন মনে হইয়াছে তাহাই কি না মৃত্যুর বাহনরূপে নিষ্ঠুর ঘটনায় এই ভাবে দেখা দিল!

ইহাকেই বলে নিয়তি! অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস!!

জীবন গীতা

শ্রীগৌতম সেন

[গীতাকে আমরা ধর্ম-গ্রন্থ ব'লেই জানি। নিত্য পাঠ করি, পূজা করি। কিন্তু এর ভেতরে কি আছে—তা অনেকেই জানি না। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজে জড়িয়ে আছে এই গীতা। নিয়মিত আচরণ করলে জীবনকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করা যায়—এ প্রত্যক্ষ সত্য। তাই এর নাম দিয়েছি জীবন-গীতা। গীতার ভাষ্য করেছেন অনেকেই। তা আরও দুর্বোধ্য। আমি নতুন কিছুই লিখিনি। তাঁদেরই কথা ভেঙে ভেঙে সাধারণকে বোঝাবার জন্যে সহজ ক'রে বলেছি মাত্র।—লেখক]

কুরুক্ষেত্রের সূচনা

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরাভব অনিবার্য জেনেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলেন না। স্নেহান্ধ পিতা, পুত্র দুর্যোধনের দুর্বিনীত ব্যবহার অসহায়ের মতো সহ্য করছেন। জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয়-স্বজন সকলেই চান তার অপরাধের শাস্তি হোক, শাস্তি আসেও তার বজ্র-কঠিন হাত নিয়ে এগিয়ে, কিন্তু দুর্যোধনের মুখের দিকে চেয়ে সে লৌহ-কঠিন হাত শিথিল হয়ে যায়। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মহামতি বিদুর সকলেই দেন উপদেশ। কিন্তু সকল উপদেশকে অগ্রাহ্য ক'রে মদমত্ত দুর্যোধন পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মহাজ্ঞানী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এ যুদ্ধের পরিণাম অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তাঁর সর্বনাশা পুত্রস্নেহ। পুত্র দুর্যোধন এই দুর্বলতার সুযোগকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগালেন। কৌশলে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত ক'রেও রাজা দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না—গোপন ষড়যন্ত্রে তাঁদের বধের ব্যবস্থাও করলেন। সজ্ঞানে একটি পরিবারকে তার অস্তিত্বের দিক দিয়েই শুধু নয়, তার ঐতিহ্য, তার যশঃখ্যাতি প্রভাব-প্রতিপত্তি—এক কথায়, জগৎ-ইতিহাসের পাতা থেকে পাণ্ডবের নাম মুছে ফেলে দেবার সংকল্প নিয়ে রাজা দুর্যোধন কূট রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পুত্রের কীর্তি ও অকীর্তি যখন সমান উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তখন গান্ধারী এলেন আবেদন নিয়ে—পুত্রকে ত্যাগ করবার আবেদন নিয়ে। রাজাকে তিনি তিরস্কার করেন, কটূক্তি করেন—পাপ-পুণ্যের কথা বলেন, ধৃতরাষ্ট্র বিচলিত হন, শাসন করবার প্রতিশ্রুতিও দেন, কিন্তু ঐন্দ্রজালিক দুর্যোধন তাঁর বাকচাতুর্যে ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার সম্মোহিত করেন।

এমনি সম্মোহিত হয়েছিলেন তিনি যখন তাঁকেই সম্মুখে রেখে রাজকুলবধূ দ্রৌপদীকে তারা লাঞ্ছিত করলো! সতীর সেই করুণ কণ্ঠের আবেদন তিনিও স্বকর্ণে শুনেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কিন্তু শ্রবণশক্তি তিনি হারান নি। তিনি স্বকর্ণে শুনেছিলেন, স্বয়ং ভগবানের আশ্বাসবাণী। যে-আশ্বাসবাণী পাণ্ডবদের সমৃদ্ধ করেছিল। গান্ধারী বললেন, এত বড় পাপ সইবে না মহারাজ!

মহারাজ বললেন, ধর্মই তাকে শাসন করবে, যে-ধর্মকে সে লংঘন করেছে।

কিন্তু মহারাজ পাপী-পুত্র বিধাতারও ত্যাজ্য।

তাইতো তাকে ত্যাগ করতে পারি না মহারাণি, আমি যে তার একমাত্র।

গান্ধারী বললেন, আপনি তো শুধু পিতা ন'ন—আপনি যে অগণিত অনুগতের রাজা।

আমাকে শুধু পিতা হয়ে থাকতে দাও মহারাণি!

গান্ধারী তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন, হায় অন্ধরাজা, দুর্ভাগ্য আমার, তোমাকেও আজ উপদেশ দিতে হচ্ছে! নইলে একথা আজ কেন ভুলে গেলে মহারাজ, দেহের একটি অঙ্গে পচ্ ধরলে, সে-অঙ্গ ত্যাগ করাই ধর্ম?

কিন্তু দুর্বল পিতা, নিরুপায় পিতা অসহায়ের মতো সেই পচা-অঙ্গকেই মমতা দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন।

বনবাসের পর পাণ্ডবদের ফিরে আসবার সময় যখন আসন্ন হয়েছে, তখন এলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজ্য-প্রত্যর্পণের প্রস্তাব নিয়ে। দুর্যোধন সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তারা রাজ্য চায় না, চায় বাস করবার একখণ্ড ভূমি। দাম্ভিক দুর্যোধন জানালেন, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও তিনি দেবেন না।

এই ঘোষণায় সকলেই বিচলিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র তিরস্কার করলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য সকলেই এই পাপযুদ্ধ থেকে বিরত হতে বললেন। কিন্তু দুর্যোধনের পদক্ষেপে তখন ধরণী কম্পিত হচ্ছে। বললেন, যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাকেন—বয়স হয়েছে অবসর গ্রহণ করুন।

ভগবান ফিরে গেলেন শূন্যহাতে। অন্তঃপুরে বসে গান্ধারী প্রত্যক্ষ করলেন, আগামী-কালের কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর।

অর্জুনের প্রথম প্রশ্ন

যুদ্ধ-আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে অর্জুন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, এত যে আয়োজন, এ কার জন্যে? আর কেনই বা এ আয়োজন? তুচ্ছ রাজ্য সে আমাকে কি দেবে?

যুদ্ধ দেবে জগৎকে শান্তি। পাপীর উচ্ছেদ হবে। মানুষের কল্যাণে এই যুদ্ধের প্রয়োজন আছে বন্ধু! যুদ্ধ যেখানে আত্মহেতু, সেখানে সে পাপ। তুমি যাবে দুষ্কৃতের বিনাশের জন্যে—ধর্ম করবে অধর্মকে আঘাত।

অর্জুন বললেন, কোন্‌টা ধর্ম, কোনটা অধর্ম সে তুমিই জানো কৃষ্ণ, কিন্তু আমি জানি, যুদ্ধ হত্যারই ভিন্ন নাম।

কৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, এ তত্ত্ব আমি তোমাকে পরে বলবো। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, জগতে কোনো ক্ষত্রিয় যুদ্ধকে পরিহার করবার জন্যে যুক্তি-জাল বিস্তার করে না। কৌরব আজ তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে—তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি তোমার স্বধর্ম পালন করো।

যুদ্ধের বদলে যুদ্ধই কি তবে ক্ষত্রিয়ের একমাত্র স্বধর্ম কৃষ্ণ ?

তোমার ধর্ম আর ব্রাহ্মণের ধর্ম এক নয় অর্জুন !

বেশ বেশ কৃষ্ণ, অর্জুন হাসতে হাসতে বললেন, আমি কিছু জানি না, তুমি যা করাবে তাই করবো। এ-যুদ্ধে আমি হবো রথী, তুমি হবে সারথি।

নিজেকে এমনি সমর্পণ যদি করতে পারো অর্জুন, জয় আমি তোমাকে এনে দেবো।

অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ

পাণ্ডব এবং কৌরব। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের সংঘাত! আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে আছে দানবের সঙ্গে দেবতা। পাপের সঙ্গে পুণ্য। 'সম্ভবামি যুগে যুগে।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই অধর্মকে নাশ করতে আমিই এসেছি বারে বারে, হে পার্থ, তাইতে আমার প্রয়োজন তোমাকে।

অর্জুন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে এসে দাঁড়ালেন শত্রু-সৈন্যের মুখোমুখি। বললেন, শত্রু কে? এরা যে আমার আত্মীয়, কার অঙ্গে করবো অস্ত্রাঘাত? সে-অস্ত্র যে আমারই বুকে ফিরে এসে লাগবে! কে শত্রু, কে মিত্র জানি না—আমি দেখছি, ওঁদেরই মধ্যে রয়েছেন আমার পিতামহ, আমার পিতৃব্য, আমার আচার্য—ওদেরই মধ্যে রয়েছে আমার বংশের ধারা পুত্র-পৌত্রাদি—আমার সখা, বন্ধু আত্মার আত্মীয়—হে কেশব, থামাও তোমার সর্বনাশা যুদ্ধ, আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ যশঃ খ্যাতি। আর কার জন্যেই বা এ-সব? কে ভোগ করবে সে-সম্পদ? আমার বলতে যারা, তাদের বিনাশ ক'রে কি পরম-ঐশ্বর্য ভোগ করবো আমি? আর যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে বলো কৃষ্ণ, আমিই সে-মৃত্যু বরণ করি। নইলে সজ্ঞানে আমি আমার স্বজন-অঙ্গে কখনো অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন সম্ভাবনা দেখে অর্জুন অনুতাপ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, কার জন্যে তোমার এ শোক? জগতে কেউ কি মরে? মরে না। তোমার আমার মতো ওরাও—যারা এই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সমবেত হয়েছে, তারা কেউই মরবে না। আমরা সকলেই ছিলাম, আছি এবং থাকবো—থাকবো জীবন-ধ্বংসের পরেও। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' জীর্ণ বস্ত্রের মতো দেহকে পরিত্যাগ ক'রে আমরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবো।

'এক কাপড়ে ক'দিন চলে?
তেমনি দেহ জীর্ণ হলে
সেটা ছেড়ে নূতন দেহ পরি।'

তবে দুঃখ কিসের? দুঃখ ভোগ করে কে? সে তো আমি? কিন্তু আমি কে? 'আমি'ই আত্মা। আমিই ভোগ করি, আমিই দুঃখ পাই। কিন্তু এ কোন্ আমি? আমার দেহটাই কি আমি? কিন্তু দেহের অনুভব-শক্তি তো ততক্ষণই, যতক্ষণ থাকে দেহে প্রাণ। কিন্তু যখন প্রাণ থাকে না, তখন ভোগ করে কে? দেহ, না দেহাতীত আর কিছু? বলে, অপমান গায়ে এসে লাগে। মিছে কথা। গায়ে লাগে না। গায়ে লাগলে দেহের বিকৃতি হ'তো। দেহের কোনো পরিবর্তনই হয় না, তবু দুঃখ পাই। তবে এ-দুঃখ পায় কে? যে পায়, সে দেহ নয়—সে স্বতন্ত্র। সেই আমি। দেহ নয়, দেহাতীত আত্মা। আত্মাকে চোখে দেখা যায় না। চোখে কি সব কিছু দেখা যায়? কিছু দেখা যায়, কিছু অনুমান ক'রে নিতে হয়। এই যে ইন্দ্রিয়গোচর নয়, অথচ সুখ-দুঃখের ভোগকর্তা—সেই আত্মা।

আত্মা সকলেরই আছে। তোমারও আছে, আমারও আছে—পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যেই আছে। ভিন্ন আধার বলে আত্মা ভিন্ন নয়। একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন আধারকে আশ্রয় ক'রে আছে মাত্র। যেমন আকাশ আছে সকল পাত্রে। পাত্র ভেঙে গেলে, সেই একই আকাশ—খণ্ড আকাশ, বৃহৎ আকাশে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আত্মাও সেই খণ্ড থেকে বৃহতে জগদাত্মায় এসে মিশছে। এই জগদাত্মাই হলো পরমাত্মা। আকাশের যেমন বিনাশ নেই, এই পরমাত্মারও তেমনি ক্ষয় নেই।

ক্ষয় নেই আত্মার, কিন্তু দেহের তো আছে? অর্জুন এই দেহের কথা চিন্তা ক'রেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন: দেহই তো মানুষের সব। দেহই যদি থাকলো না, তবে থাকলো কি? দরদ তো ঐ দেহকেই নিয়ে। কারণ, দেহ আর তখন দেহ নয়—বিশেষ একজন হয়ে আমার নয়ন-মন অধিকার ক'রে বসে আছে। কত যত্ন, কত আদর, কত সাজ-সজ্জা। সেই দেহকে ভোলা কি সহজ কথা? দেহ তো শুধু তখন পুরাতন বস্ত্র নয়—'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।' এই দেহান্তরে সেই বিশেষ-মানুষটিকে পাচ্ছি কোথায়? সে তো আর তখন সে নয়। প্রাণ কাঁদে তো সেই তারই জন্যে।

অর্জুনকে বিহ্বল হতে দেখে ভগবান হাসলেন। বললেন, কে কাঁদে? কাঁদে মানুষ। দুঃখ পেলে কাঁদে। কিন্তু দুঃখ তো ততক্ষণ, যতক্ষণ বস্তুর সঙ্গে থাকে ইন্দ্রিয়ের যোগ। এই সংযোগ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই দুঃখ। রোদে গা পোড়ে—রোদের সঙ্গে গাত্র-চর্মের সংযোগ পর্যন্তই। যেই সংযোগের অভাব হয়, তখন আর সে অনুভূতি থাকে না। তবে যা থাকে না, যা অনিত্য? তাকে সহ্য করাই ভাল। যে-দুঃখ সহ্য করলেই ফুরিয়ে যাবে, তার জন্য আবার কষ্ট কি? মৃত্যুকেও তেমনি সহ্য করতে শেখো। তাহলে ভয় আর থাকবে না। দেহ তো অনিত্য। দেহের বদলে দেহ, রূপের বদলে রূপ। এই একই নিয়মে জগতের সকল বস্তুর রূপান্তর হচ্ছে। দেহীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কেউ রোধ করতে পারে না। যুদ্ধে হোক, ক্ষয়ে হোক, রোগে শোকে—মৃত্যু তার হবেই। তাই ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, মিথ্যা শোক তুমি পরিহার করো। শোক ত্যাগ করে স্বধর্ম পালন করো। স্বধর্ম অর্থাৎ আপন ধর্মের আচরণ করো। কারণ সকলের ধর্ম এক নয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আচরণ করবে না, ক্ষত্রিয়ও করবে না শূদ্রের আচরণ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যেমন যুদ্ধ—সে করবে শত্রুকে আঘাত, ব্রাহ্মণের ধর্ম তেমনি ক্ষমা, শূদ্রের ধর্ম সেবা। কর্ম যত ধর্ম তত। আপন আপন কর্মই তার ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ হলেও, অকারণ যুদ্ধ সে করে না। শত্রুকে বিনাশ করতে অধর্মকে আঘাত করতে সে করে অস্ত্র-ধারণ। স্বধর্ম হলেও সে করে না অপরকে প্ররোচিত। তবে যুদ্ধ যেখানে অপরিহার্য, সেখানে সে ক্লীবের মতো নিশ্চেষ্টও থাকে না।

যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত মহাগাণ্ডীবী কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ভাবী পরিণামকে লক্ষ্য করলেন। মনুষ্যত্বহীন মহাশ্মশানে মহাকালের মহাজিজ্ঞাসা!

অর্জুন বললেন, এ-যুদ্ধের শেষ কোথায়? এক অধর্মকে নাশ করতে সহস্র পাপে পূর্ণ হলো ধরণী। কুল গেলো, কুলধর্ম গেলো, মানুষের সমাজ-বন্ধনে পড়লো প্রচণ্ড আঘাত। মানুষ ভুলে গেলো কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম। ভয়হীন, কুণ্ঠাহীন, নির্লজ্জ ব্যভিচারে পারিবারিক জীবন ভেঙে গেলো। পাপ আজ আর পাপ নয়—তাই জন্ম নেয় নিষ্কলুষ ধরিত্রীর বুকে লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান। যুদ্ধের পরিণাম যদি এই হয়, তবে কাজ নেই কৃষ্ণ, আমার সে-যুদ্ধে। অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের পাশে বসে পড়লেন।

ভগবানের প্রথম উত্তর

অর্জুনকে ধনুর্বাণ ত্যাগ করতে দেখে অপেক্ষমান শত্রু-সৈন্য মহা উল্লাসে শঙ্খধ্বনি করতে লাগলো। অর্জুনের ক্ষত্রিয়-রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু বুদ্ধি তাকে শান্ত করে। বুদ্ধিহীন পশু বিচার করতে জানে না, সামান্যতম উত্তেজনাতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু মানুষ তা পারে না—সে বুদ্ধির অহংকার রাখে।

অর্জুন বিচার ক'রে দেখতে চান, বুদ্ধির পরিমাপে যাচাই করে নিতে চান, এ যুদ্ধে কতটুকু তাঁর ক্ষতি আর কি-ই বা তাঁর লাভ। আমি জয় করি, অথবা তারাই আমাকে জয় করুক—এর মধ্যে কোনটি শ্রেয়, বুদ্ধি দিয়ে তা বিচার করতে পারলেন না।

উত্তর দিলেন ভগবান: তুমি কে? তুমিই কি সব করো? এই আমির অহংকার তোমার সকল বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আছে। তুমি তোমার কাজ করে যাও, কর্মের জন্যেই তুমি এসেছো। কর্মেই তোমার অধিকার—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ফলের দিকে চেও না। এই যে নিরাসক্ত কর্ম, অর্থাৎ সফলতা, নিষ্ফলতা বিষয়ে সমান ভাব রাখা সেই তো যোগ। সমতা তো মুখের কথা নয়, তাকে পেতে হয়—অভ্যাস দ্বারা জয় করতে হয়।

"যোগস্থঃ কুরুকর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

যোগস্থ হয়ে সঙ্গ ত্যাগ ক'রে কর্ম করতে হবে। যোগ কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান। সঙ্গ কি? কর্তৃত্বাভিনিবেশ। আমি কর্তা নই, কর্তা তুমি, ভগবান। কর্মযোগের এই হলো বড় কথা। কর্ম তো সবাই করে—পশু-পক্ষী জীবমাত্রেই। কিন্তু তারা করে নিজের জন্যে, নিজের বা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে। কিন্তু মানুষের কর্ম-জীবন তাদের ঊর্ধ্বে—চেষ্টা ক'রে তাকে সকলের উপরে উঠতে হয়েছে। জন্মের পর থেকেই সে খাড়া হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টার ফলেই হাতকে সে অন্য কাজে লাগিয়েছে—যা অন্য জন্তু-জানোয়ারে পারেনি। দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্ব-ভূমির দিকে, নিজের জানা-শোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। এই যে আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্যে প্রভূত প্রয়াস, এ একমাত্র মানুষেরই আছে। নিজের মধ্যে যে কল্পনাকে সকল কালের সকল মানুষের ব'লে সে অনুভব করেছে তারি দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, মূর্তিতে, ঘরে, ব্যবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালকে প্রচার করতে চায়নি, বিশ্বগত মানুষের আনন্দকে স্থায়ীরূপ দেবার জন্যে তার দুঃসাধ্য সাধনা। এই সাধনার পথেই সে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্ব লোকে উঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওপরে উঠতে গেলে নীচের ধাপটাকে অস্বীকার করা চলে না—তাকে প্রত্যেকটি ধাপ উত্তীর্ণ হতে হবে, তবেই ওপরে ওঠা যাবে।

ভগবান সেই ওপরে উঠবার কৌশলটিই দেখিয়ে দিলেন। বললেন, কর্ম করো। পশু-পক্ষীর কর্ম নয়, জীব-শ্রেষ্ঠ মানুষের কর্ম। ফললাভের প্রত্যাশায় কর্ম নয়, ফল-অফলে সমান জ্ঞান রেখে যে কর্ম, সেই কর্ম তোমাকে করতে হবে।

অর্জুন বললেন, কর্ম তো ক্রিয়া। যা করা যায় তাই কর্ম। ভগবান হাসলেন, বললেন—ঐ যে বললাম, কর্মে অনাসক্তি। কর্ম মানেই স্বধর্ম। তোমার যা ধর্ম সেই অনুযায়ী কর্ম করো। পরধর্ম কখনো গ্রহণ করবে না। কর্ম স্বধর্মাচরণের বাহ্য স্থূল ক্রিয়া।

অর্জুন বুঝতে পারলেন না। ভগবান বললেন, কর্মের সঙ্গে মনের মিলন হওয়া চাই। এই মনের সহযোগ হলেই কর্ম তখন বিকর্ম হয়ে যায়। বাইরের কর্ম সাধারণ কর্ম। আর আন্তরিক কর্মই হলো বিশেষ কর্ম। আবার এই বিশেষ কর্ম নিজ নিজ মানসিক প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্নও হতে পারে। এই বিশেষ কর্মের, এই মানসিক সংগতির সংযোগ-সাধন করলেই নিষ্কামতার জ্যোতি ফুটবে। কর্মের সঙ্গে আন্তরিক ভাবের যখন মিলন হয় তখন সে আর-কিছু হয়ে যায়।

অর্জুন প্রশ্ন করেন, সে কি রকম?

উত্তরে ভগবান বললেন, তেল-পলিতার সংযোগেই কি আলোর উৎপত্তি হয়? হয় না। আলোর উৎপত্তি হয়, তার সঙ্গে জ্যোতির মিলন হলে। কর্মের সঙ্গে বিকর্মের মিলন হলে তবে না নিষ্কামতা আসে। এই কর্মে বিকর্ম ঢাললে তবেই কর্ম দিব্য হয়। তন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্র থাকা চাই। যেমন বাহ্য তন্ত্রের কোনো মূল্য নেই তেমনি কর্মহীন মন্ত্রেরও মূল্য নেই। হাত দিয়ে যেমন, হৃদয় দিয়েও তেমনি সেবা করা চাই। সন্তানের কাছে মায়ের সেবা যেমন। কর্মের সঙ্গে বিকর্মের সংযোগ হলেই শক্তির স্ফুরণ হয়। আর তা থেকেই আসে অকর্ম।

সে আবার কি? কাঠ পুড়ে ছাই হয়। প্রথমে কত বড় কাঠ ছিল, কিন্তু পুড়ে নিস্তেজ ছাই হয়ে গেল। যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করো। কর্মে বিকর্মের জ্যোতি স্পর্শ হলেই অকর্ম হয়। কোথায় কাঠ, আর কোথায় ছাই! ওদের গুণধর্মে এখন কোনো সমতাই নেই। কিন্তু সে যে ঐ কাঠেরই ছাই এতে তো আর ভুল নেই।

তথাপি অর্জুন প্রশ্ন করলেন: কর্মে বিকর্মের সংযোগ হলে অকর্ম হয়—এর অর্থ কি?

এর অর্থ হলো—কর্ম যে করছি তা মনেই হয় না—অর্থাৎ কর্মের বোঝা অনুভব হয় না—কর্ম করেও অকর্তা। কর্মকে নির্মল করার জন্যে যখন অবিরাম চেষ্টা সুরু হয়, তখন আপনা থেকেই কর্ম নির্মল হতে থাকে। নির্বিকার কর্ম যখন সহজভাবে পর পর হতে থাকে তখন কর্ম কখন যে হয়ে গিয়েছে তা টের পাওয়া যায় না। কর্ম সহজ হয়েছে মানে, কর্ম অকর্ম হয়েছে। ছেলে হাঁটতে শেখে—প্রথমে কত কষ্টই না হয়—পরে সে কর্ম তার সহজ হয়ে যায়। কর্মকে অকর্ম করাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে স্বধর্মাচরণরূপ কর্ম করতে হবে। কর্ম করতে করতেই দোষ ধরা পড়বে, তখন বিকর্মের আশ্রয় নিতে হবে। এই চেষ্টার ফলে মন এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে কর্মে আর তখন কষ্টবোধ থাকে না। হাতে হাজার কর্ম

চলতে থাকে কিন্তু মন থাকে শুদ্ধ, শান্ত। বড় বড় কঠিন অবস্থাও আর তখন কঠিন মনে হয় না।

অর্জুন তবু বুঝতে পারেন না, বললেন, কর্ম বিকর্ম অকর্মের কথা ভাল ক'রে বলো। ভগবান বললেন, কর্ম বিকর্ম অকর্ম মিলে সকল সাধনা পূর্ণ হয়। কর্ম হলো স্থূল বস্তু। যে স্বধর্ম-কর্ম আমরা করি তাতে আমাদের মনের সহযোগ থাকা চাই। কর্ম ও বিকর্ম দুইই দরকার। এই দুইয়ের আচরণ করতে করতে অকর্মের ভূমিকা প্রস্তুত হয়। এই কর্মের সহায়তার জন্যেই বিকর্ম নিরন্তর দরকার। অর্থাৎ কর্ম মানেই হলো স্বধর্মের আচরণ করা। স্বধর্ম কি? স্ব-ধর্ম—নিজের ধর্ম। চাষী যে, চাষই তার ধর্ম। অন্য ধর্মের আচরণ তার বিরুদ্ধ কর্ম। এই স্বধর্মাচরণের বাহ্য কর্ম চলতে থাকা কালে তার সহায়তার জন্যে মানসিক যে কর্ম করা হয় তাই বিকর্ম। এই কর্ম ও বিকর্ম এক হয়ে যখন চিত্ত পূর্ণ-শুদ্ধ হয়—সকল ময়লা ধুয়ে যায়, বাসনা ক্ষীণ হয়, বিকার শান্ত হয়, ভেদ-ভাব মিটে যায়—সেই অবস্থাকেই তখন অকর্ম বলা হয়। এই অকর্ম দু'রকমেই করা যায়। এক, দিন-রাত কাজ ক'রেও কিছুমাত্র কাজ করছি না এরূপ বোধ—আর কিছু না ক'রেও অব্যাহত কর্ম করা।

সে আবার কি রকম? অর্জুন বললেন।

যেমন সূর্যের কর্ম। সূর্যের আলো—দানই হ'লো তার সহজ-ধর্ম। তার আলো দেওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। আলো যে সে দিচ্ছে—সে নিজেও জানে না। তার অস্তিত্বই আলো। আলো-দেওয়া-রূপ-ক্রিয়ার কষ্ট তার নেই। তাইতো চব্বিশ ঘণ্টা কর্ম করেও সূর্য লেশমাত্র কর্ম করে না। সাধুদের অবস্থাও তাই। সূর্যের আলোক দানের মতোই তাঁদের কর্ম স্বাভাবিক। যে কর্ম করেও করে না—এ হলো সন্ন্যাসের একদিক, আবার অপরদিক হলো—সে নিজে কোনো কর্মই করে না, অথচ সারা বিশ্বকে কর্মে প্রবৃত্ত করাচ্ছে। অকর্মের বিশেষত্বই হলো এই। তাতে অনন্ত কর্মের উপযোগী শক্তি ভরা থাকে। যেমন বাষ্প—অনন্ত শক্তি রয়েছে তার মধ্যে। না-বলাও ক্রোধের এক রূপ। তাতেও কর্ম হয়। কর্ম না-করার পরিণাম, প্রত্যক্ষ-কর্ম-করার পরিণাম থেকে অনেক বেশী প্রচণ্ড হয়ে থাকে। ঐ অ-বলায় যে কাজ হয়, সহস্র বলাতেও সে-কাজ হয় না। পিতার উপস্থিতিই পুত্রের শাস্তির পক্ষে যথেষ্ট। জ্ঞানী পুরুষের তাই হয়। তার অকর্ম, তার শান্ত ভাব প্রচণ্ড কর্ম ক'রে থাকে। অকর্মী থেকেও সে এত কর্ম করে যা নানা ক্রিয়া দ্বারাও করা যায় না।

ভগবান বললেন, কামনাশূন্য হয়ে কাজ করলে ফলেও আনন্দ হয় না, আবার ক্ষতিতেও হয় না দুঃখ। সুখ-দুঃখের সমানুভূতিই সমত্ব জ্ঞান। যাঁর আত্মা সমভাবাপন্ন তিনি দুঃখভোগ করেন বটে, কিন্তু ঘৃণা করেন না—সুখকে তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাতে উল্লসিত হোন না। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা। ওদের স্বীকার করতে হবে, ওদের উপেক্ষা ক'রে জয় করতে হবে। অভ্যাস করলেই মানুষ তা পারে। অভ্যাসই তো যোগ। অভ্যাসে মানুষ কাম-ক্রোধকেও জয় করতে পারে। এর নাম তিতিক্ষা—সহ্য করবার সংকল্প ও শক্তি।

অর্জুন বললেন, সবকিছু সহ্য করবার জন্যেই যদি মানুষ এসে থাকে এই পৃথিবীতে, তবে কি প্রয়োজন ছিলো এই সৃষ্টি? জগতে ভোগের সহস্র উপকরণ সম্মুখে রেখে মানুষ ভোগ করবে না এই বা কি কথা! তাই যদি, তবে ভগবান ভোগের স্পৃহা দিলেন কেন? কামনাই বা দিলেন কেন? পিপাসার্তের মুখের কাছে জল রেখে তাকে বঞ্চিত করারই বা কি অর্থ?

ভগবান বললেন, ও-কথার অর্থ তা নয়। ভোগে আনন্দ আছে, কিন্তু দুঃখও তো আছে। ভোগের শেষ নেই—যত দেবে, তত খাবে। এই দেওয়ার ইচ্ছাকেই তোমার সংযত করতে বলা হয়েছে। তার মানে, কামনা ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। দুঃখে কাতর হলেই মানুষ দুঃখ পায়। কিন্তু দুঃখ যাকে স্পর্শ করে না, তার দুঃখ কোথায়? দুঃখকে তো সে জয় করেছে। আবার সুখে যার স্পৃহা, সেও দুঃখী, স্পৃহাই হলো পাপ। ভয়, ক্রোধ অনুরাগ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুতে অনুরাগ, এও দুঃখের কারণ। সুখে স্পৃহা-শূন্য ব্যক্তিই পারে সুখকে ভোগ করতে।

অর্জুন বললেন, কিন্তু এ কামনা ত্যাগ করা কি সহজ কথা? দশ ইন্দ্রিয় দশ দিক থেকে বাধা দিচ্ছে। ভগবান উত্তর দিলেন: ঐ ইন্দ্রিয়কেই তো জয় করতে হবে—ইন্দ্রিয়-সংযমই হলো জীবন-বেদের প্রথম কথা।

মন মুখ এক করো। মনই তো হলো যত নষ্টের গোড়া। ভোগ গেলেও মন থাকে। মনের বাসনা কিছুতেই যেতে চায় না। তাই ভগবান বলছেন, কচ্ছপের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিতে শেখো, তাহলে দুঃখ থাকবে না। শক্ত ক'রে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকো—দুষ্ট ঘোড়াকে বশে রাখতে হলে, রাশ টেনে রাখা চাই। যে সকল বিষয়ে রাশ টানতে জানে, সে দুঃখ পায় না। তাই ব'লে মানুষের কি রিপু থাকবে না? রিপু আছে, তার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু খেতে হবে বলে কেউ অতি ভোজন করে না। তার দুঃখ আছেই। এখানেই আসছে সংযমের কথা। এই সংযমের মধ্যেই আছে আনন্দ। যিনি বিধেয়াত্মা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, তিনি রাগদ্বেষবিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের উপভোগে আনন্দলাভ করেন।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।

রাগদ্বেষবিযুক্ত-ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ যার ইন্দ্রিয়-আচরণে অনুরাগও নেই, বিদ্বেষও নেই।

অর্জুন হেসে বললেন, সে আবার কি কথা? ভগবান বললেন, কেমন জানো? রোগী বা দেহ মনে যে অসুস্থ তার কি ভোগে রুচি থাকে? ভোগে রুচি সুস্থ মানুষের, তার বিদ্বেষ নেই। আসক্তি তো আসে বিষয়ের চিন্তা থেকেই। আবার আসক্তি থাকলেই মনে কামনা জাগে। সে কামনার আর শেষ নেই। তখন না পেলে মানুষ রাগ করে। এই রাগ থেকেই অনর্থের সৃষ্টি। সেই জন্যেই ভগবান উপদেশ দিলেন, রাগ এবং দ্বেষ বর্জিত হয়ে ভোগ করো, চিত্তের প্রসন্নতা আসবে। চিত্তের প্রসন্নতাই বুদ্ধিকে স্থির করে। যার সমত্ব নেই তার বিবেক নেই, ভক্তিও নেই। ভক্তি থাকলেই শান্তি, আর শান্তি থাকলেই সুখ। 'আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং' কত নদীর জল এসে পড়ছে সাগরে, সমুদ্র কিন্তু সে জলে উদ্বেলিত হয় না। সে স্থির, অচঞ্চল—সে সকলের জলকে আত্মস্থ ক'রে স্থির। কামনাকেও করতে হবে অমনি করে আত্মস্থ। [ক্রমশঃ।

অমল সেন

ভেরা ফিগ্‌নার রুশ-বিপ্লবের একজন নায়িকা।

অত্যাচারিত রুশিয়ার বুকে নিহিলিষ্ট সংঘের তখন নব-অভ্যুত্থান। এই সংঘের সভ্য সংখ্যা স্ত্রী-পুরুষে মিলে চল্লিশের বেশী ছিল না, কিন্তু এদেরই আতংকে সমগ্র রুশিয়া কেঁপে উঠলো। সংঘ যখন প্রথম গ'ড়ে ওঠে তখন সংঘের সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র আট, কিন্তু তবুও তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংঘকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

ভেরা ফিগ্‌নার এই দুঃসাহসীদেরই একজন। আমাদের দেশের মতো শান্তশিষ্ট লক্ষ্মীমন্ত মেয়েদের সংখ্যা কোনো দেশেই কম নয়। এইসব লক্ষ্মীমন্ত মেয়েরা শান্তশিষ্ট জীবন যাপন ক'রে, গুরুজনদের উপদেশ পালন করে, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ শৃংখলার সাথে সুন্দর পরিপাটিরূপে সম্পন্ন করে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে সুলভ যশ কুড়িয়ে বেড়ায়—এরা হ'ল এক টাইপের মেয়ে।

কিন্তু ভেরা হ'ল নতুন টাইপের মেয়ে। তার পণ হ'ল—অন্যায় অত্যাচার আর অবিচার সইবো না, কারুর 'পরে অন্যায় অত্যাচার আর অবিচার করবো না। যখনই দেখবো কারুর উপরে অন্যায় অত্যাচার আর অবিচার হচ্ছে বুক দিয়ে তাকে রক্ষা করবো।

এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়েই ভেরার প্রথম চোখে পড়লো তার দুঃখিনী জননী জন্মভূমি রুশিয়া এই অত্যাচারে জর্জরিত। তার প্রথম পণ হল এই অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে, এই পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে হবে। এই প্রতিজ্ঞাই ভেরাকে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিল।

খুব অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ভেরা ফিগনার নিহিলিষ্টদের দলে যোগ দিল।

কিন্তু বিপ্লবের পথে পা বাড়াবার আগে ভেরার মনও সংশয়ে দোল খেতো, দ্বিধাযুক্ত হৃদয়ে সে ভাবতো—এই গুপ্তহত্যা—মানুষকে অতর্কিতে খুন করা—এ কি বড় সহজ?

না!

এ অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অত্যন্ত করুণ—যে খুন করে এমনি ভাবে, তারও মনে বেদনা জাগে অজ্ঞাতে। এ নিষ্ঠুর কার্য্য ইচ্ছে করে কেউ করে না, করা উচিতও নয়। কিন্তু তবু কেন করতে হয় এ কাজ? কে দায়ী এর জন্য?

ভেরা ভেবে দেখলো, দায়ী রুশসরকার। অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে মানুষ বিচার চাইতে গেছে বারে বারে। পেয়েছে কি? চতুর্গুণ অন্যায়, চতুর্গুণ অত্যাচার।

অত্যাচারে অত্যাচারে কণ্ঠরুদ্ধ, হস্ত অসাড়! সমগ্র রুশিয়ার সাধারণ মানুষের এই অব্যক্ত বেদনা ভেরা ফিগনার আপনার অন্তর দিয়ে অনুভব করলো।

জারকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে ধরা পড়ে ভেরার এক বন্ধুর ফাঁসী হল!

ভেরা খবরটা শুনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। ফাঁসি? কেন? জারকে সে খুন করেনি! এর চাইতে কম শাস্তি দিলে চলতো না কি? কিন্তু রুশ-সরকার তা দেয় না। তারা কথায় কথায় ফাঁসি দেয়, কথায় কথায় গুলী চালায়, মানুষের প্রাণের কোন দাম নেই যেন!

রুশ সরকার অনর্থক হত্যা করবে দলে দলে মানুষ—তা হবে আইন! আর বে-আইনী ভাবে হত্যাকারী সেই জল্লাদদের—যারা গুলী চালাবার জন্য দায়ী—তাদের হত্যা করা হবে—অপরাধ?

কেন?

কেন না, রুশ-সরকার যা করবে তা-ই আইন।

ভেরার মন থেকে গুপ্তহত্যার প্রতি যে একটা ভীষণ ঘৃণা ছিল, তা ধীরে ধীরে চলে গেল।

রুশ-সরকার বলবান্—খোলাখুলি হত্যা করছে—শত সহস্র। তারা তো খোলাখুলি পারে না, কাজেই গুপ্তভাবে যে ক-জনকে পারে। এই দৃঢ় সংকল্প হ'ল ভেরার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে এক গ্রামে বাস করছিল ভেরা আর তার বোন।

পুলিশ এসেছিল গ্রামে—বিপ্লবীদের উপর ঘোর সন্দেহ। এ গ্রাম আর মোটেই নিরাপদ নয়—এক্ষুনি চলে যেতে হবে—বিদায়ের আয়োজন শুরু হল। গ্রামবাসী ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সবাই তো কেঁদে আকুল। পরম প্রিয়জনকে কে যেন তাদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে দিতে ইচ্ছা নাহি, তবু হায় যেতে দিতে হয়।

সেই স্কুল। ছেলে-মেয়ে, সকল ছাত্রছাত্রীর মুখ আজ আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মতো। আজ শেষ পাঠ!

ভেরার বোন ইভ্‌জিনিয়া পড়ানো সাঙ্গ করে বললো, আমরা যাচ্ছি, বিদায়—আর কিছু সে বলতে পারলো না, কণ্ঠরুদ্ধ।

কোথায় যাচ্ছ দিদিমণি?

অনেক দূরে।

আর আসবে না?

তা কি করে বলবো ভাই?

কেন যাচ্ছ?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে? সেই সুখের স্বর্গ হতে তারা

বেরিয়ে পড়লো গ্রামবাসীদের অশ্রু-অর্ঘের স্মৃতি বহন করে। রাজধানী পেট্রোগ্রাডে এসে পৌঁছালো ভেরা ফিগ্‌নার আর তার বোন ইভ্‌জিনিয়া।

নির্দিষ্ট দিনে ফাঁসি হ'ল ভেরার বন্ধুর, ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন তিনি।

ভেরাকে সে আঘাত সইতে হ'ল। অন্যায় অবিচার তাকে ক্রমাগত ক্ষিপ্ত করে তুললো। এ জার-তন্ত্রের ধ্বংস করা চাই।

এর কিছুদিন পরে ভেরোনিজে একটা সভা হ'ল বিপ্লবীদের। ভেরা ফিগনার এই সভায় অগ্নি-গর্ভ ভাষায় প্রচার ক'রলো, বিপ্লবীদের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হবে জারকে হত্যা করা। যেমন ক'রে হোক্ জারকে হত্যা করার আয়োজন করুন আপনারা।

অনেকেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। আয়োজন চ'ললো। ডিনামাইটের ভার প'ড়লো কিবালশির উপর।

কিবালশি জেল-ফেরং ১৮৭৮ সালে ছাড়া পেয়েছে। সেই থেকে বাড়ীতে ব'সে গোপনে ডিনামাইট তৈরি ক'রে আসছে। প্রচুর ডিনামাইট জমা—

জার ক্রিমিয়া গেছে। তার ফেরার পথে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বোমা নিয়ে ওৎ পেতে থাকা চাই।

জার ফিরছে শীগ্‌গিরই, কাজেই ঝটপট তৈরি হওয়া চাই বোমা-নিক্ষেপ-কারীদের।

কিন্তু তৈরি হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিপ্লবীদের মধ্যে তখন উপদল সৃষ্টি হ'য়েছে। একদল,—তারা বলে, জারের উপর বোমা ছাড়ার জন্য এখনও তারা প্রস্তুত হয়নি।

গরম দল তাতে ক্ষেপে গেল। ফলে, দু'ভাগ হ'য়ে গেল বিপ্লবীরা।

"মৃত্যুঞ্জয়ী দল"-এরা বলে, একটু দেরী করো।

"প্রজার দাবী" দল—এরা চায়, এক্ষুণি জারকে নিপাত ক'রবো। এদের সংগঠনও ছিল ভালো। ভেরা ফিগ্‌নার এই গরম দলের সভা হ'ল।

এই দলই হ'ল শক্তিশালী—এরা প্রজার দাবী প্রতিষ্ঠা করার মহান্ ব্রত নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল।

রুশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান স্থানে এর শাখা-সমিতি গঠিত হ'ল—সকল সমিতিগুলির কাজ এক সুরে বাঁধার জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হ'ল। নেতৃস্থানীয় যারা, তারাই এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য।

এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিই এই বিপ্লবীদলের প্রাণ।

ভেরা ফিগনারের মতো তেজস্বিনী নারী এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে আরো শক্তিশালী ক'রে তুললো।

এবার বোমা নিক্ষেপের আয়োজন শুরু হ'ল।

রুশ সম্রাট জার যে যে পথ দিয়ে ফিরতে পারেন সেই সেই পথের পাশে তিন জায়গায় বোমা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় ব'সে থাকতে হবে—

ওডেসা—খার্কভ—মস্কো।

লোক ঠিক করা হ'ল—কারা যাবে, কোন্ ছলে, কি চাকুরী নিয়ে যাবে!

ভেরা এটা স্থির ধ'রে নিয়েছিল, জারকে হত্যা করার উদ্দীপনা সঞ্চারে তার আগ্রহই যখন সবচেয়ে বেশী তখন তাকে এ তিনের এক জায়গায় পাঠানো হবেই।

কার্য্যকালে দেখা গেল, তার নাম নেই কোথাও।

বেশ একটু উষ্ণ হ'য়ে লোক-নির্ব্বাচনকারী কমিশনারদের কাছে গিয়ে ব'ললে—আমার নাম দেন নি কেন?

দিইনি, যোগ্যতর লোক পেয়েছি ব'লে।

আমাকে আপনারা অযোগ্য মনে ক'রলেন কিসে?

অযোগ্য মনে করিনি। ও ছাড়া আরো অনেক কাজ আছে এখানে, যা আপনি ব্যতীত কেউ আর ক'রতে পারবে না।

আমি সে সব কথা শুনতে চাই না। আপনারা জানেন, জারের হত্যার জন্য আমিই প্রধানতঃ আপনাদের উত্তেজিত ক'রে তুলেছি, কাজেই আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে এ কাজে। আমার নাম ভ'রে দিন।

ওডেসায় বোমা নিয়ে যাওয়ার ভার প'ড়লো ভেরার উপর।

ভেরা যাত্রার উদ্যোগ ক'রতে লাগলো। কাজের বদলি দিয়ে যেতে হবে। বোন জিনিয়া গরমের ছুটিতে রিয়াজান গিয়েছিল সম্প্রতি ফিরে এসেছে। ভেরা তাকে ঠিক ক'রল।

ভেরা ওডেসায় চ'লে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখে, কিবালশিশ হাজির। একখানা ঘর ভাড়া করা হ'ল। কী ক'রে বোমা ফাটানো হবে তারই নানা রকম পরীক্ষা চ'লতে লাগলো সেই ঘরে। কিবালশিশ দেখাতে লাগলো, কি ভাবে বিদ্যুতের তার যোগ ক'রে দূর থেকে বোমা ফাটানো হবে।

বিপ্লবীরা সবাই কায়দাটা শিখে নিল—ফ্রোলেংকা, কলোদকিভিল, লেবেডেভা।

এখন সমস্যা—রেললাইনের তলায় গর্ত্ত খুঁড়ে বোমাগুলি বসানো। বহু আলোচনার পর ঠিক হ'ল, রেলের গার্ডের চাকুরী জোগার ক'রে ফেলতে হবে।

ফ্রোলেংকা গার্ড হ'য়ে ঢুকবে—গার্ডের কামরা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট স্থানেই থাকে, কাজেই বোমা বসানো সহজ হবে খুবই। আর, তাকে যাতে কেউ কোন সন্দেহ না করে, সেজন্য লেবেডেভাকে তার বউয়ের পার্ট ক'রতে হবে।

চমৎকার প্ল্যান!

কিন্তু চাকুরী জোগার করে কে? প্ল্যান তো দিয়েছে ভেরা ফিগ্‌নার।

ভেরা ব'ললো, চাকুরীও আমিই জোগার ক'রে দিচ্ছি।

ভেরা রেলওয়ে অফিসে গেল।

কোন রেল-গার্ডের পদ খালি নেই।

তাই তো—আচ্ছা, দেখা যাক্।

ওডেসার শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট টট্‌লেবেনের ভাবী জামাই ব্যারণ সেনবার্গ ভেরার পরিচিত। তার সংগে দেখা। ভেরার করমর্দ্দন ক'রে সে ব'ললো, আপনি এখানে? এমন বেশে?

ভেরা গম্ভীর হ'য়ে ব'ললো, হ্যাঁ, ভারি বিপদে প'ড়ে এসেছি।

কি বিপদ বলুন তো!

ভেরা বললে, আমার একটি বন্ধুর পত্নী ক্ষয়রোগে ভুগছে—তার খোলা জায়গায় থাকা দরকার, তা যদি হয় তবে তাঁর বাঁচবার কিছু আশা থাকে। তা আর পাচ্ছি কই'? যদি একটা রেলের গার্ডের

চাকুরী জুটতো—হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনার তো খুব প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে রেলওয়েতে। আপনি পারেন না সাহায্য করতে?

ব্যারণ বললেন, ও চাকুরী তো আমার হাতে নয়, সেকশন মাষ্টারের হাতে। আর ও সব পদ খালি আছে ব'লেও মনে হয় না।

ভেরা বললো, তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে সেক্শন মাষ্টারের কাছে এক লাইন লিখে দেবেন কি?

ব্যারণ নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে লিখে দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন।

ভেরা একটু হাসলো মনে মনে।

অভিজাত বংশের মেয়ে ভেরা—তার পোষাক হবে ঝলমলে—হাবভাব হবে রাণীর মতো, তা না হ'য়ে নোংরা পোষাক পরে সে পথে পথে চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই ভেবেই ব্যারণের মাথা হেঁট হচ্ছিল তা বুঝতে বাকী রইলো না তার।

আচ্ছা, ময়ূরের মতো পেখম ধ'রে পথচলা বহুদিন হয় ছেড়েছে সে, 'পলিসি', হিসাবে আবার আজ সাজতে হবে তাকে।

ব্যারণ এ পোষাক দেখে লজ্জিত হয়েছেন সেক্শন মাষ্টারও নিশ্চয় কথা কইবেন না। সব মাটী হবে তা হ'লে, অতএব—যে দেবতা যাতে ভোলে।

ভেরা পোষাক্ ব'দলে ফেললো। স্বভাবতই সে সুন্দরী! আজ যেন সে সৌন্দর্য্য-সাগরে বান্ ডেকেছে!

বেচারা সেক্শন মাষ্টার তাতে ভেসে গেল কিনা জানি না, তবে প্রার্থিত চাকুরীর নিয়োগ পত্র লিখে দিতে মোটেই ইতস্তত ক'রলো না।

ভেরা নিয়োগ-পত্র নিয়ে ছুটে এলো। ঘরের সবাই অবাক্।

একি বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি ভেরার! ভেরা ময়ূরের পেখম খুলে ফেলে ফ্রোলেংকোকে নিয়োগ-পত্র দিল। শিমেন্ এই ছদ্মনাম নিয়ে সে কর্মস্থানে চ'লে গেল, লেভেডভাও তার সংগে গেল।

মেইন ষ্টেশন থেকে সাত-আট মাইল দূরে সে স্থান। বোমা এক ফাঁকে নিয়ে গিয়ে পুঁততে হবে। সব ঠিক—

এমন সময় গোল্ডেনবার্গ ওডেসায় গিয়ে হাজির।

খবর কি?

বোমা চাই—মস্কো লাইনের জন্য যথেষ্ট বোমা নেই।

সে কি! বোমা দিলে এখানকার কাজ কি ক'রে হবে?

জার গুজব এ লাইন দিয়ে জার ফিরবেন না।

ভেরা খবর শুনে দুঃখিত হ'ল। এতো উদ্যোগ আয়োজন সব বৃথা?

গোল্ডেনবার্গ চ'লে গেলো বোমা নিয়ে, কিন্তু পৌছুতে পারলো না গন্তব্য স্থানে। পথে ধরা পড়লো।

সঠিক খবরও এসে পড়লো, জার ওডেসার পথে আসবেন না। খার্কভ আর মস্কো লাইন দিয়ে যাবেন।

কাজেই, ফ্রোলেংকো, লেবেডেভা—ওরাও চ'লে গেল ওডেসা থেকে। ভেরা র'য়ে গেল সেখানে আরো কিছুদিনের জন্য।

জার ফিরে আসছেন ক্রিমিয়া থেকে দু'খানা গাড়ী, সামনের খানায় তার কর্মচারীবর্গ।

বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চ'লেছে গাড়ী।

খার্কভের মধ্যে দিয়ে যাবে—বিপ্লবী দল—ঝিল্যাবভ্, ইয়াকিমোভা, ওকালৎস্কি—বোমা পেতে ওৎ পেতে আছে।

দূরে ট্রেনের শব্দ শোনা গেল—ঝিল্যাবভ্, ইয়াকিমোভা একদৃষ্টে চেয়ে আছে দূরে—

ওকালৎস্কি চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে ব্যাটারির কাছে এলো—সংগীদ্বয়কে অন্য দিকে নিবদ্ধ-চক্ষু দেখে ব্যাটারিটা খুলে তার ভিতরের বন্দোবস্তটা আলগা ও অচল করে আবার যেমনটি ছিল তেমন রেখে দিল। এক মিনিটের কাজ। তার পরেই আবার সংগীদ্বয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো।

ইঞ্জিনের বাতি দেখা গেল।

ওকালৎস্কি বললো, আমি সিগনাল দিচ্ছি—তোমরা ব্যাটারিতে তার সংযোগ কর।

সংগীদ্বয় ব্যাটারির কাছে গিয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে রইলো।

ঘর্ঘর রবে ট্রেন এসে প'ড়লো।

ওকালৎস্কি সিগনাল দিল। সংগীদ্বয় তৎক্ষণাৎ তার সংযুক্ত করলো। কিন্তু নিস্ফল সে সংযোগ—গাড়ী যেন তাদের উপহাস ক'রে চ'লে গেল।

ওকালৎস্কি খাপ্পা হ'য়ে বললে, তোমরা নেহাৎ অপদার্থ, তারটা যোগ ক'রতে পারল না।

সংগীদ্বয় হতাশ হ'য়ে বললো,—তাইতো, কিছুক্ষণ আগেও দেখলুম ঠিক আছে, এরি মধ্যে ব্যাটারি খারাপ হ'য়ে গেল!

আঁা, বলো কি? ব্যাটারি খারাপ! ওকালৎস্কি আকাশ থেকে প'ড়লো।

লোকটা ওস্তাদ গুপ্তচর রুশ-সরকারের।

মস্কো লাইনের কাছেও বোমা নিয়ে বসে আছে একদল বিপ্লবী। এ দলে যিনি সিগ্‌নাল দেবেন, তিনি একজন মহীয়সী নারী—শোফিয়া লুভনা পেরোভস্কায়া, রুশিয়ার এক জাঁদরেল শাসনকর্তার মেয়ে। ভেরা ফিগনারের মতই অভিজাত বংশের মেয়ে। পিতা ছিলেন একটি মূর্তিমন্ত শয়তান, দ্বিতীয় জার! শোফিয়ার মা—দেবীর মতো ছিলেন যিনি—তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার হ'ত। ছোট ছেলে—পিতা তাকে বাধ্য করতো মাকে মারতে, গাল দিতে।

শোফিয়া সইতে পারলো না এ অন্যায় অত্যাচার।

সোজাসুজি বাপের কাছে গিয়ে বললো, তুমি, এ বাড়ী বাসের অযোগ্য ক'রে তুলেছ। আমি বিদায় নিলুম।

পিতা ভয় দেখালেন, বটে। কোথায় যাবে শুনি? যেখানে যাবে পুলিশ পাঠিয়ে ধ'রে আনবো না।

পুলিশের ভয়! কোনোদিনই করেনি শোফিয়া।

গোপনে পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে সে এসে আশ্রয় নিল সহপাঠিনী কোন বন্ধুর বাড়ী, সেখানে থেকে ডাক্তারি পাশ ক'রে পল্লীসেবায় বেরিয়ে প'ড়লো ঠিক ভেরারই মতন। বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত সে বহু আগেই হয়েছিল। সেই ১৯৩ বিচারের সেও অন্যতম আসামী।

শোফিয়ার প্রাণ ছিল অত্যন্ত কোমল লোকের দুঃখ কষ্ট দেখলে কেঁদে ফেলতো। অথচ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন ল'ড়তো তখন এই নারীই হ'য়ে উঠতো ভীষণ, ভৈরবী, অতি নিষ্ঠুরা—

এর উপর প'ড়লো সিগনাল দেওয়ার ভার। রেললাইনের পাশে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে বিপ্লবী সুখোর স্ত্রীর পার্ট নিয়ে এই দিনটির জন্য তৈরি হচ্ছিল সে। জারের গাড়ী কাছে এলো শোফিয়া সময়মতো সিগনাল দিল,—কিন্তু ব্যাটারির তার যোগ ক'রতে একটু দেরি হ'য়ে গেল।

প্রথম গাড়ীটা বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় গাড়ীটা সশব্দ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে হ'য়ে গেল।

ঘটনাচক্রে জার বেঁচে গেল। প্রাণ গেল তার কর্মচারীদের।

জার মারা না গেলেও এ বোমা-ফাটা বৃথা হ'ল না। সমগ্র রুশিয়া সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো যেন, বিপ্লবাদের কেরামতিতে সারা দেশ তোলপাড় হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু জার তোমাকে সুস্থ হ'য়ে বাঁচতে হবে না, অন্যত্র ভীষণতর আয়োজন আগে থেকেই করা হয়েছে।

সম্রাটের শীতাবাস। অনেক কর্মচারী কাজ করে। নানারকম কাজ—দর্জির কাজ, মুচির কাজ, মিস্ত্রীর কাজ।

ষ্টিফেন ব'লে একটা লোক বাক্সো তৈরী করে। রক্ষীদের সংগে তার গলাগলি ভাব। কেউ দোস্ত, কেউ চাচা।

কাজে আসার সময় ষ্টিফেন রোজই মোড়কে ক'রে কী নিয়ে আসে—রক্ষীরা যখন অসতর্ক থাকে, তখন প্রাসাদের ভিতের তলায় একটা গহ্বরে লুকানো একটা বাক্সে তা ফেলে রাখে।

এমনি ক'রে সে জিনিষটা খানিকটা জ'মলো সেই প্রাসাদের তলায় বাক্সে।

রক্ষীরা ঘুণাক্ষরেও কিছু জানলো না।

তারপর একদিন—

কিন্তু তার আগে ভেরার বোন ইভ্‌জিনিয়ার খবর ব'লে নিই। পেবরোজকায়া নাম নিয়ে সে থাকে—তারই সংগে বিপ্লবী বন্ধু ভিয়াংকোভস্কিও থাকেন।

কলেজে থাকতে বোগো নামে একটি মেয়ে ইভ্‌জিনিয়ার কাছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নেয়। মেয়েটির প্রণয়ী ছিল একজন পুলিশের গুপ্তচর। একদিন বোগোকে এসে পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রলো। আদালতে বোগো পোব্‌রোজকায়ার কথা ব'লে ফেললো।

পুলিশও ঠিক পোব্‌রোজকায়ার অর্থাৎ ইভ্‌জিনিয়ার ঘর ঘেরাও ক'রলো।

ঘরে ঢুকে ইভ্‌জিনিয়াকে প্রথমে বন্দী ক'রলো। তারপর তার যুবক বন্ধুকেও ধ'রলো।

ভিয়াৎ টপ্‌ ক'রে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের ক'রে চিবিয়ে ঘরের এক কোণে ফেলে দিল।

পুলিশ সে কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে গেল। একটা বাড়ীর নক্‌সা—কিন্তু কোন্ বাড়ী? তদন্ত চ'লতে লাগলো খুব জোর।

সম্রাটের শীতাবাসে। তারপরে একদিন জার সপরিবারে ভোজ-কক্ষে ঢুকেছেন। হঠাৎ একটা প্রলয় শব্দ। ডিনামাইট।

নীচের ঘরটা নষ্ট হ'ল পঞ্চাশজন বডিগার্ডের প্রাণ গেল। ভোজ-কক্ষ দোতালায়, কাজেই জার এবারও বেঁচে গেলেন।

যথেষ্ট পরিমাণে ডিনামাইট দিলে সে ঘরটাও নির্ঘাৎ উড়ে যেতো। তা হ'ল না। শুধু দেয়ালের ছবি, টেবিলের বাসন-কোসনই ঝনঝন্ শব্দে প'ড়ে চূর্ণ হ'য়ে গেল।

সেই নক্সা।

এবার তার রহস্য ভেদ হ'ল। এই শীতাবাসেরই নক্সা। নক্সার এক জায়গায় একটা X চিহ্ন—সেইখানে ডিনামাইট রাখা হয়—ঠিক ভোজনকক্ষের তলায়।

সুতরাং পোব্‌রোজকায়া আর ভিয়াং নিশ্চয়ই অপরাধী!

ভিয়াতের ফাঁসি হ'ল—

আর ইভ্‌জিনিয়ার সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।

ভেরা দূর থেকে শুনলো সবই। তবুও ওডেসা থেকে আসতে পারলো না। সেখানে সে আর একটা কাজ হাতে নিয়েছে।

কাউন্ট টটলেবেন ওডেসার শাসনকর্তা।

শাসন, অর্থাৎ পীড়নকার্যের সুবিধার জন্য একজন "নিরো"কে তিনি আমদানি ক'রেছেন। নাম তার পানুয়ুটিন।

পানুয়ুটিনই যেন সেখানকার রাজা—তার অত্যাচারে লোক থরহরি কম্পমান।

একবার ২৮ জনকে গ্রেপ্তার ক'রে বিপ্লবী ব'লে বিচার করা হয়, পাঁচজনেরই প্রাণদণ্ড।

এতেও তৃপ্তি নেই পানুয়ুটিনের।

মুলুকে যতো তেজস্বী লোক ছিল তাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে গ্রেপ্তার করা হ'ল। শিক্ষক-ছাত্র-গ্রন্থকার-শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী—কারুকে বাদ দিল না। শহরে একটা সংঘ ছিল,—তা বে-আইনী ব'লে ঘোষণা ক'রে তার প্রায় সব সভ্যকেই গ্রেপ্তার করা হ'ল।

তারপর—বিচার নয়, বিচারের প্রহসন। স্বেচ্ছাতন্ত্রের চরম বিকাশ।

সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, আজীবন কারাদণ্ড—এ ছাড়া কথাই নেই।

দণ্ডিতের আত্মীয়রা এলে এমন হৃদয়হীন পিশাচের মতো ব্যবহার ক'রতো সে!

বাপ-মা ছেলেকে—একমাত্র ছেলেকে দেখতে আসতেন, ভগিনী ভাই-এর সংগে দেখা ক'রতে আসতো, স্ত্রী এসে কেঁদে প'ড়তো—স্বামীকে দেখবো।

হৃদয়হীন পশু এদের সংগে যা-তা ব্যবহার ক'রতো। গর্ভবতী একটি রমণী এসেছেন স্বামীর সংগে দেখা ক'রতে। স্বামী শৃংখলাবদ্ধ অমূলক অপরাধে চিরদিনের মতো চ'লেছেন নির্বাসনে চোখে জল কত আশা ছিল, কত রঙীন স্বপ্ন তরুণী বধূর ফুলের তোড়ার মতো শিশু দেখবেন—জীবনের সকল সাধ অপূর্ণ রেখে চ'লে যেতে হ'চ্ছে আজ একান্ত অসহায়।

তার চোখের জলে যেন স্পষ্ট হ'য়ে এ কথাগুলি ফুটে উঠলো।

স্ত্রী আর সহ্য ক'রতে পারলো না কেঁদে ফেললো।

পানুয়ুটিন মুখ খিঁচিয়ে ব'ললে, কী জ্বালা! বাইরে গিয়ে চেঁচাও যত পারো। তুমি কি এইখানেই ঐ বেজন্মাটার জন্ম দিতে চাও না কি?

এই পানুয়ুটিনের পরলোকযাত্রার পথ প্রস্তুত করার ভার নিল ভেরা।

দলের একটি যুবকের সংগে মিলে ভেরা পানুয়ুটিনের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

লোকটা রোজই একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেড়াতে বেরোয়—একজন রক্ষী সংগেই থাকে, আর একজন পিছনে অনতিদূরে অনুসরণ ক'রতে থাকে।

একজনের উপর ভার দেওয়া হ'ল—সে পানুয়ুটিন্‌কে ছোরা মেরে একটা নির্দিষ্ট দিকে ছুটে যাবে, সেখানে একটা ঘোড়া থাকবে তার পলায়নের সাহায্যের জন্য।

ভেরা সব বন্দোবস্ত এমনি ভাবে যখন ঠিক ক'রেছে, তখন বাধা প'ড়লো।

হেড্‌ কোয়ার্টার থেকে শোফিয়া এবং সেব্‌লিন এসে হাজির। খবর পাওয়া গেছে, জার শীঘ্রই ক্রিমিয়ায় গ্রীষ্মাবাসে যাচ্ছেন। এই শহর দিয়েই যাওয়ার কথা। রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে জাহাজ-ঘাট পর্যন্ত। এর মধ্যে কোথাও একটা ঘাঁটি পেতে মাইন তৈরি ক'রে রাখা চাই।

মাইন হ'চ্ছে ভূ-প্রোথিত ডিনামাইটের স্তূপ। লোক চক্ষুর অগোচর থাকে,—কাজেই ধ্বংসের সুন্দর অস্ত্র।

সেই রাস্তার পাশে দুটো ঘর ভাড়া করা হ'ল।

মনোহারী দোকান।

দিনে দোকান,—দোকানদার সেবলিন, দোকানদারণী শোফিয়া।

রাত্রে—টানেল খোঁড়া ড্রিল দিয়ে। দোকানের জিনিষপত্তর তখন সরিয়ে নেওয়া হ'ত। কাদা-মাটি, ড্রিল ভালো চলে না। দারুণ পরিশ্রম, কেন্দ্র থেকে মাইন্‌-পাতায় ওস্তাদ ইয়াকিমোভা এবং গ্রিগরি এসে যোগ দিয়েছে।

রাত্রে টানলে খুঁড়ে যা মাটি ওঠে, তা ভোরের বেলায় নানা রকম কায়দা ক'রে—মোড়কে, ঠোঙায়, প্যাকেটে ভর্তি ক'রে ভেরার ঘরে এনে জড়ো করা হয়।

এমনি ক'রে বহুদূর পর্যন্ত দীর্ঘ টানেল তৈরি হ'ল।

ডিনামাইট্‌ ঠিক ক'রে সাজাতে গিয়ে গ্রিগরির তিনটে আঙুল উড়ে গেল। খানিকটা ডিনামাইট ফেটেছে। শব্দও কম হ'ল না, তবে কেউ কিছু স্থির ক'রতে পারলো না।

কিন্তু দোকানে আর কিছু জমা ক'রে রাখা সমীচীন নয়। ডিনামাইট্‌, মার্কারি-ফালমিনেট, তার ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম ভেরা ফিগ্‌নার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। গ্রিগরি এখন অকর্মণ্য। তবুও দ্রুত কাজ অগ্রসর হ'তে লাগলো। জার মে-মাসে আসবেন। সবাই তাঁর আসার দিনটির অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রইলো। কিন্তু সম্রাট এলেন না সে শহরে। তাইতো, এত আয়োজন একেবারেই বৃথা হবে? আচ্ছা, অত্যাচারী শাসনকর্তা টটলেবেনকে মারলে হয় না এ দিয়ে?

কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে হুকুম চেয়ে পাঠানো হ'ল।

জবাব এলো, না,—ও-সম্মান জারের জন্যই তোলা থাক, টট্‌লেবেনকে মারতে চাও অন্য উপায়ে মারো।

অন্য উপায়ের মধ্যে বোমাটাই প্রধান। ভেরা ফিগ্‌নার বন্ধুদের নিয়ে আবার লেগে গেল টটলেবেনের পশ্চাদনুসরণে। শত শত যুবকের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসার জন্য ব্যগ্র। এর রক্তে তাদের তর্পণ করা চাই।

একদিন তাদের ফাঁকি দিয়ে টটলেবেন সে স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল।

কাজেই পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে ভেরা এবং অন্যান্য বিপ্লব নায়করা পেটেরগ্রাদে চ'লে এলো।

ভেরা যখন রাজধানীতে গেলো তখন সেখানে আর একটা উদ্যম চলেছে জারকে মারার।

গোরস্কভায়া ব'লে একটা রাস্তা দিয়ে জার যাবেন। রাস্তাটার গায়েই একটা পাথরের সেতু। নীচে, জলের তলায় লুকানো থাকবে ডিনামাইট, ডাঙায়, দূর আড়াল থেকে, ব্যাটারির সাহায্যে তা ফাটানো হবে।

জার এ ফাঁদেও ধরা প'ড়লেন না। নির্দিষ্ট দিনের আগের দিনই তিনি ক্রিমিয়ায় চলে গেলেন—সে-পথে বেড়াতে এলেন না। জারকে মারার কাজও বাধ্য হ'য়ে স্থগিত রাখতে হ'ল কিছুদিনের জন্য।

বিপ্লবীদল আর একটা জরুরী কাজে মন দিল। সৈন্য-সংগ্রহ এবং সৈন্য-সংগঠন।

দেশবাসীর যে অসন্তুষ্টি-ভাব তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। সৈন্য-বিভাগেও তা প্রবেশ ক'রেছে। অনেক সামরিক কর্মচারীকে ব'লতে শোনা যেতো,—রুশসৈন্যরা বিদেশের মুক্তি-যুদ্ধে সাহায্য করার গর্ব করে, কিন্তু তাদের নিজের দেশ যে আজও বন্ধনক্লিষ্ট তা তো দেখে না।

নৌ-বিভাগ এবং গোলন্দাজ সৈন্যদের মধ্যেও অসন্তোষকে আরো উসকিয়ে তুললো।

লেফটেনেণ্ট সুখানভ নৌ-বিভাগীয় কর্মচারী, ইনিই বোধহয় প্রথম বিপ্লবীদের দলে এসে যোগ দিলেন। এঁরই মধ্য দিয়ে নৌ-বিভাগে প্রচার-কার্য চলতে লাগলো।

গোলন্দাজ বিভাগে—ডিগায়েড্‌। ক্রোনষ্টা দুর্গে কাজ করতেন আগে, রাজনৈতিক মতের জন্য কর্মচ্যুত হ'য়ে বিপ্লবীদলে যোগ দেন।

রোগাচেভ, পখিনোটোভ, পেপিন, নিকোলায়েভ—এরাও যোগ দিলেন ক্রমে ক্রমে। স্থির হল,—সৈন্য-বিভাগ 'প্রজার দাবী' দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির অধীনে থাকবে। সাধারণ বিভাগের সংগে এদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কার্য-নির্বাহক সমিতি যখন হুকুম দেবেন—এখন সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় এসেছে, তখন ঝাঁপিয়ে প'ড়বে তারা অস্ত্র নিয়ে।

এ ছাড়া, বিদেশে 'প্রজার দাবী' দলের পক্ষে লোকমত গঠন করার জন্য প্রচার-কার্যও চলছিল। বহু নির্বাসিত যুবকের উপর এ-ভার ন্যস্ত হল। তাদের মধ্যে হার্টম্যান এবং ল্যাভরভ প্রধান।

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ক'রে, আলোচনা দ্বারা, বই ছাপিয়ে এবং বিপ্লব-দল সম্বন্ধে সঠিক খবর প্রচার করা হ'ত। হার্টম্যান ফ্রান্স-আমেরিকা-জার্মানী—দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের নায়কদের কাছে উপস্থিত হ'য়েছেন বিপ্লবদলের কার্যপদ্ধতি নিয়ে। সবাই প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন, যার যেভাবে যতটুকু শক্তি সাহায্য করবেন।

সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা মনীষী কার্ল মার্কস। কার্য-নির্বাহক সমিতি তাঁর কাছে চিঠি দিলেন, যাতে তিনি হার্টম্যানকে সাহায্য করেন প্রচার-কার্যে।

মার্কস অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন। জবাবে তিনি জানালেন, আপনাদের কোন রকম সেবা ক'রতে পারলে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে ক'রবো।

জবাবের সঙ্গে মার্কস নিজের একখানা ফোটোও পাঠিয়ে দিলেন। মার্কসের এ 'আনন্দ অকৃত্রিম। রুশবিপ্লবীদের চিঠিখানা তাঁর কাছে মহামূল্য বস্তু—বন্ধুদের তিনি সগর্বে সেটা দেখিয়ে বেড়াতেন।

এমনি অক্লান্ত চেষ্টার ফলে রুশের দিকে দুনিয়ার নজর প'ড়লো। খবরের কাগজ খুলে সবাই প্রথমেই দেখতো, রুশের খবর কি ?

তারা যাতে সঠিক খবর পায়, বিপ্লবীদল তারও বন্দোবস্ত ক'রলো। নিয়মিতভাবে বিপ্লব-সমিতি থেকে রিপোর্ট আসতো, আর তাই ছাপা হ'ত খবরের কাগজে। কাজেই রুশবিপ্লবীদল সম্বন্ধে সবারই বেশ সহানুভূতির ভাব জন্মালো।

রুশ সরকার তো হার্টম্যানের উপর রেগে অস্থির। দূত পাঠালো ফ্রান্সে—হার্টম্যানকে যাতে রুশ সরকারের হাতে দেয়। কিন্তু দূতকে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসতে হ'ল। ফ্রান্সে—যার যা-ই বৈপ্লবিক মতবাদ থাকে না কেন, আশ্রয় পাবে।

কিন্তু রুশে থেকে—বিদেশে এ-খবর চালান্ দেয় কে ? রুশ পুলিশ তার ওঁত পেতে রইলো। কিন্তু কিছুতেই তাকে বের ক'রতে পারলো না।

কী ক'রে পারবে ?

এ হচ্ছে ভেরা ফিগনার,—পুলিশ যার বাণী শুনেই পাগল, চোখে দেখাবার সৌভাগ্য হয়নি।

পুলিশ বিপ্লবীদের ধ'রে ধ'রে ফাঁসি দেয়।

কত তরুণ জীবন-কুসুম অকালে ঝ'রে যায়—কে তার খোঁজ রাখে ?

এমন অনেক বিপ্লবী আছে, অসীম শক্তি—বিচিত্র জীবন যাদের, নেপোলিয়নের মতো প্রবল হ'তে পারতো যারা বিপ্লবের পথে না গেলে—তারাও ক্রমে বিস্মৃতির সাগরে লীন হ'য়ে যায়। তারা যে বিপ্লবী তাদের জীবন-কথা যতই বিচিত্র হ'ক্ না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার অধিকার নেই কারো। তা রাজদ্রোহ !

এই বিস্মৃতির হাত থেকে এমন অমূল্য জীবন-কথা রক্ষা করার ভার ভেরার উপর। সে-ই বিপ্লবীদের ছবিসহ বিশেষ বিবরণ বিদেশে প্রকাশের জন্য পাঠাতো। বিপ্লবীদের মধ্যে ভেরার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না কেউ।

রাজধানীতে একটা জায়গা আছে—মিখায়লোভস্কি-ফেনিজ।

জার প্রতি রবিবার সেখানে বেড়াতে যান। কিন্তু রোজই এক রাস্তা দিয়ে নয়, এক এক দিন এক এক রাস্তা। বিপ্লবীরা এবার তারই একটা রাস্তায় মাইন পাতবে ঠিক ক'রলো।

মলায়-শদোভয় ব'লে রাস্তাটার উপর দুখানা খালিঘর ছিল, তারই একখানা পছন্দ ক'রে পনিরের দোকান খোলা হ'ল। দোকানদার কে হবে ?

ভেরা ফিগ্‌নার ব'ললে, আমার মনে হয় 'যুবি' এ-কাজের যোগ্য ব্যক্তি ! কমিটি দেখলো, সত্যই তাই। যুবির যোগ্যতা সম্বন্ধে তো কথাই নেই, চেহারাও তার দোকানদার মাফিক। কাজেই তাকেই এ-পদে বাহাল করা হ'ল—তার ছদ্মনাম দেওয়া হ'ল কবোজেভ।

ইয়াকিমোভা ক'রবে বউর পার্ট প্লে। ছদ্মনাম বাসকা।

কবোজেভ-বাসকার পনিরের দোকান।

অন্যান্য পনির ব্যবসায়ীরা প্রথমটা ঈর্ষান্বিত হ'ল আর একটা নতুন পনিরের দোকান দেখে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাদের শংকা দূর হ'ল। এরা তেমন অভিজ্ঞ ওস্তাদ দোকানদার নয়।

মাত্র তিনশো রুবল জোগার ক'রে পনিরের দোকান খোলা হ'য়েছে। মালের ষ্টক্ খুবই কম।

কবোজেভ অতি কৌশলী—কারও বাইরে থেকে বোঝার যো ছিল না, দোকানে জিনিষ এতো কম বা এরা জাল দোকানী।

দোকান থেকে রাস্তার দিকে টানেল খোঁড়া চ'লতে লাগলো। খুঁড়ে মাটি যা ওঠে তাতে বাক্সকে বাক্সো ভর্তি ক'রে লেবেল এঁটে দেওয়া হয় 'পনির'। ক্রেতারা ভাবে, ওঃ, এদের কত মাল আমদানি !

এমনি ক'রে বহুদিন কেটে গেল।

টানেল তৈরি শেষ।

দোকানের এক কোণে মাটির স্তূপ, কয়লা আর খড় দিয়ে মাটি ঢাকা। তার উপরে একটা মাদুর বিছানো।

এখন মাইন-পাতা বাকী।

১৪ই ফেব্রুয়ারী জার সেই পথ দিয়েই চলে গেলেন। মাইন পাতা হয়নি তখনও, কাজেই কিছু করা গেল না তার।

বিপ্লবীদল রাগে অস্থির।

ওঃ, এমন সুযোগ ! আর কতদিনে জার এ পথে আবার আসেন তার ঠিক কি। যাক্, মাইন পেতে তৈরি হ'য়ে থাকা যাক।

ডিনামাইট ইত্যাদি জমা ছিল অন্যত্র এক ঘরে। পুলিশ যেন কী একটা সন্দেহ ক'রে খুব খানাতল্লাস শুরু করে দিল। কাজেই সে ঘর থেকে ডিনামাইট সরানো হ'ল।

ভেরার তীক্ষ্ণ চোখ। একদিন দেখে, দলের একজন লোকের পিছু নিয়েছে একটা পুলিশের গুপ্তচর।

ব্যাপার কী ? মাইনের সম্বন্ধে কোন খবর পেয়েই নাকি ? তাই-ই হবে।

ভেরা তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্তন ক'রে নিয়ে দোকানের দিকে গেল।

ক্রেতার বেজায় ভিড়—বাসকা দিয়ে দিয়ে আর কুলোতে পারছে না। হঠাৎ নতুন এই ক্রেতাটিকে দেখে সে বেশ সচকিত হ'য়ে উঠলো।

খুব ভালো পনির দিতে পারেন ?

হাঁ, আসুন না, ভিতরে এসে দেখুন। নতুন ক্রেতা ভিতরে গেল।

এ হচ্ছে ভেরা ফিগনার। ভেরা পনির দেখার ছলে ব'লে গেল, পুলিশের সাড়া-টারা পাচ্ছ কিছু ?

না তো ! তুমি পেয়েছ নাকি ?

হাঁ। খুব সাবধানে থেকো তোমরা।

বাসকা-কবোজেভ বেশ সতর্ক হ'য়ে চ'লতে লাগলো।

২৭শে ফেব্রুয়ারী।

পুলিশ সন্দেহক্রমে ত্রিগোনী ব'লে একটি কর্মীর ঘর অবরোধ করলো। ত্রিগোনী ধৃত হ'ল (ধরাটা চালাকী, কেন না ত্রিগোনী পুলিশের চর) কিছু পরে ঝিল্যাবভ এসেছে ত্রিগোনীর কাছে, তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার।

কোথাও ডিনামাইটের লীলা-খেলা চলছে, এটা বোধ হয় পুলিশ টের পেয়েছে, কিন্তু বের করতে পারছিল না, কোথায় !

ঠিক পাওয়া খুবই শক্ত, এমনি বিপ্লবীদের বন্দোবস্ত। যাদের উপর কাজের ভার দেওয়া হ'ত, তারা ছাড়া অন্য কেউ জানতো না কোথায় কখন কেমন ক'রে ডিনামাইট ফাটানো হবে।

কাজেই পুলিশ অন্ধ কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগলো।

পুলিশের এ তল্লাস বিপ্লবীরা টের পেয়েছে।

একদিন দলের কয়েকটি লোক পথ চ'লছে। হঠাৎ শুনতে পেলো, আড়ালে কারা দু'জন কথা কইছে।

ও কারা ?

একজন পুলিশ, আর একজন দরোয়ান।

দরোয়ান ব'লছে, এ বাড়ীতে খানাতল্লাস ক'রবেন ? সে কি ? কেন ?

পুলিশ বললে, কর্তাদের মরজি।

খবর শুনে ভেরা বুঝলে, পুলিশ অনেকটা কাছাকাছি এসে প'ড়েছে ঠিক জায়গার।

বিপ্লবীরাও পুলিশের চোখে ধূলি দিতে ওস্তাদ।

কবোজেভ-বাসকা দোকানে বসে পনির বিক্রী করছে, এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজির।

কি চাই আপনার ?

আমি স্বাস্থ্য-বিভাগীয় ডাক্তার। এ দোকান পরিদর্শন ক'রবো।

করুন।

লোকটি ডাক্তার নয়, ডাক্তারবেশী পুলিশ। ঘরে গিয়ে ঢুকলো। উঁচু জায়গাটায় গিয়ে মাদুরটা তুলে দেখে, কয়লা, আর খড়। আর কোথাও কিছু নেই। অপ্রতিভ হ'য়ে চ'লে গেল।

দোকানদাররা একটু মুচকি হাসলো!

আর একদিন আর একজন পুলিশ। মাটি-ভর্তি বাক্সগুলোর গা দিয়ে জল ঝরছিল, তা দেখে পুলিশটা জিজ্ঞাসা ক'রলো, ওতে কি ?

কুবোজেভ হাত-মুখের অপূর্ব ভংগী করে ব'ললো আর ব'লবেন না হুজুর। লোকসানের একশেষ। সস্তার দশ অবস্থা!

ও কি সস্তায় কিনেছিলে ?

হাঁ, নইলে কি বাক্সো-কে-বাক্সো পচা বেরোয় ?

পুলিশটা বুঝতেই পারলো না—এর পরেও সন্দেহের কিছু থাকতে পারে। এতএব সে চ'লে গেল।

পুলিশরা কিছুতেই বের করতে পারলো না কোথায় চক্রান্তের আগুন ধূমায়িত হ'চ্ছে। [ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

শো-কেসে একটি হাতঘড়ি

শো-কেসে দেখলাম একটি হাতঘড়ি।
ড্যালহাউসি স্কোয়ারের এক হিম-ঝরানো ঘরের বাতাসে
বদ্ধ কাঁচের সাজানো বাক্সে
শুয়ে আছে সুন্দরী—মহাকালের প্রণয়িনী।
তার কালো মণিবন্ধনীর উপরে সোনার দুটি ঋজুরেখা—
অবশ হয়ে পড়ে আছে স্থির প্রতীক্ষায়।
তার চতুষ্কোণ হৃৎপিণ্ডের দুর্লভ-শ্রুতি টিক্-টিক্ শব্দে
প্রাণের প্রত্যাশা ধ্বনিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।
কালো রেশমের মণিবন্ধনী যেন রাত্রির নীল অন্ধকার
তাইতে নিলীন হ'য়ে আছে একটি স্বুবর্ণ-কমল।

কোন লীলাময়ীর হাতে লীলাকমল হ'য়ে উঠবে সে ?
কোন আধুনিকা বরবর্ণিনীর গৌর মণিবন্ধে বাঁধা পড়ে
সখীর মত সে জানিয়ে দেবে প্রিয়-মিলনের সময়-সঙ্কেত ?
কিংবা ঐ আঠার শ' টাকা দামের দুর্মূল্য হাতঘড়ি
এখনও বহুকাল থাকবে শায়িতা—
অপেক্ষারতা বয়স্থা রূপসী কুলীন কন্যার মত
শুধু এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর রোমশ শিরাবহুল হাতে
পড়বার জন্য।

হায় রে—হিম-ঝরানো ঘরের শীতল বাতাস—
জনারণ্যে জনবিরল নিরালা!
হায় রে—রাত্রির রহস্যময় নীল অন্ধকার—
যেন মুষ্টিগ্রাহ্য নীল রেশমের মত!
হায় রে—নিওন আলোর নীল আভা ছড়ানো জ্যোৎস্নার ছলনা—
তিমিরাভিসারের আশায় আতুর—
হায় রে—কাচাধারের স্বচ্ছ কবরে শায়িতা—
মহাকালের বিরহিনী নীলবসনা স্বুবর্ণচ্ছবি মূর্চ্ছিতা রূপসী প্রণয়িনী!

ধারাবাহিক রচনা

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

॥ ৪ ॥

কুড়ি পঁচিশদিন পরে আবার আসবেন বলে গেলেন। মাঝে কথা ছিলো 'চন্দ্রগুপ্ত'তে চাণক্য করতে যাবেন বর্ধমানে। বর্ধমান যাবার পথে হাওড়া ষ্টেশনে পড়ে গিয়ে ডান হাতটি ভাঙলেন এবং তার ফলে দু'তিন মাস তাঁকে শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকতে হ'লো। এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও কথা হয়নি কিছুই।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যেয় আমরা কয়েকজন বসে গল্পগুজব করছিলাম এমন সময় বিনয়দা এসে হাজির। বিনয়দার আসাটি অত্যন্ত আকস্মিক বলে রীতিমত অবাক হ'লাম। প্রশ্ন করতে হ'লো না, উনি নিজেই বললেন—ভাদুড়ি মশায় আজ ডেকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে একটি দল খোলা, যেখানে পুরোনো নাটক পড়া, আলোচনা করা নাটকের বিষয়ে, নতুন আর পুরোনো নাটক রিহার্স্যাল দেওয়া, অভিনয় করার ব্যবস্থা থাকবে। তা তোমরা যদি দায়িত্ব নাও তো এ কাজ করা সম্ভব।

চোর চায় ভাঙা বেড়া! এমনিতেই থিয়েটারের সুযোগ পেলে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে এক পায়ে খাড়া, আর স্বয়ং শিশিরকুমারের নেতৃত্বাধীনে অভিনয় শেখবার আর অভিনয় করবার সুযোগ পাবো নতুন বই হবে, এতো অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য। চটপট রাজি হ'য়ে গেলাম। আমাদের দু'জনকে যুগ্ম সম্পাদক করা হ'লো। সভাপতি ও সহ-সভাপতি হ'লেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও কুমারেশ ঘোষ। ভোলাদা দলের নামকরণ করলেন—নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ। স্থির হ'লো আপাততঃ প্রতি বৃহস্পতিবার নাটক পাঠ হবে, পরে সুযোগ সুবিধে মতো পুরোনো বা নতুন নাটক (যখন যেমন পাওয়া যাবে) রিহার্স্যাল দিয়ে অভিনয় করা হবে।

সেই অনুযায়ী ২৪শে জুলাই তিনি প্রথম এলেন ও তারপর থেকে মাঝে এক আধ হপ্তা বাদ দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবারে এলেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন, নাটক পড়লেন। নভেম্বরের শেষে যখন ডিসেম্বরের নাট্যোৎসব করার কথা স্থির হ'লো তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এসেছেন। দৈনিক ওঁর বাসা থেকে ওঁকে নিয়ে এসেছি এবং পৌছে দিয়ে এসেছি আমরা, আসা যাওয়ার পথেও অনেক কথা হয়েছে ওঁর সঙ্গে।

পরবর্তী পাতাগুলোতে সেই সময়কার কথাই লিপিবদ্ধ করছি। ২৪শে জুলাই এলেন কি নাটক পড়বেন, কিভাবে কি করা হবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। প্রথমে বললেন—যাত্রার চলন হয়েচে আমাদের দেশে ৭ম-৮ম শতাব্দী থেকে। তখনকার নাটককে যাত্রা বলত, যাত্রাটি চারদিক খোলা জায়গায় হবে না তিন দিক খোলা জায়গায় হবে সে কথাটি ভাবতে হবে। চারদিক খোলা জায়গায় অসুবিধে হবে এই যে, ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হবে। মাইক ব্যবহার করলে অসুবিধেই হবে।

এ কাজ করতে হলে রাষ্ট্র বা কর্পোরেশনের সাহায্য নিতে হবে এ কথা ঠিকই, কিন্তু অভিনয় করবে কারা? আজকালকার অভিনেতারা ত অভিনয় করতেই জানে না, সিনেমায় অভিনয় করতে গেলে অনেক নাবিয়ে অভিনয় করতে হয় কারণ সিনেমায় মুখটি দশ' গুণ বাড়ে কাজেই সূক্ষ্ম ভঙ্গীও অত্যন্ত বিকৃত লাগে।

আমাদের দেশে অভিনেতার মূল্য নেই, তাই গিরিশবাবুও কোথাও যেতেন না; অন্য অভিনেতাদের ধমকাতেন—রঙ মেখে সামনে দিয়ে বেরুবি কেন? তাঁর বলার কারণ এ রকম করলে অভিনয়ের মায়াটা ক্ষুন্ন হয়।

এবার কি নাটক পড়বেন প্রশ্ন করা হলো, একজন বললেন—ইংরেজি নাটক পড়ুন, উত্তরে বললেন—ইংরেজি নাটক পড়তে হলে সেক্সপীয়র পড়তে হয়, কিন্তু তাতে অসুবিধে অনেক, তার চেয়ে দিশী বই পড়াই ভাল, মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী খুব ভাল বই, টডের সাহায্য নিলেও অনেক কিছু বদলেছেন, বিদেশী এলিজাবেথীয় নাটকের ওপর নির্ভর করেই পদ্মাবতী নাটকটি লিখেছেন অথচ সংস্কৃতেরও কত সাহায্য নিয়েছেন।

গিরিশবাবুর বেশির ভাগ বইই হয়ত অপাঠ্য কিন্তু যে কটি ভাল বই আছে তা এতই ভাল যে বাংলা ভাষায় অমন নাটক প্রায় দেখাই যায় না।

প্রাদেশিকতার প্রশ্ন উঠলে তখন বললেন—জাতীয়তাকে এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ দোষ দিয়েছেন, কিন্তু জাতীয়তার দোষ কী? এ ত ভুল ধরণের জাতীয়তা!

আগেকার দিনে লোকে তীর্থভ্রমণে বেরোলে দেশের কোথাও কোনো রকম বিপদে পড়তে হতো না, অথচ তখন হয়ত এই দুই দেশে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় কথা বলা যায়, এ কথাটা প্রথম আমাদের বুঝিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পাবলিসিটি খুব ভাল ছিল, ঠাকুরবাড়ির অন্যদের অত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথের কোথায় ছিল? দ্বারকানাথ একজন মহৎ লোক ছিলেন।

অভিনয়ের প্রসঙ্গে বললেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা দেশের মঞ্চে প্রথম অভিনয় ঢোকালেন। (বোধ হয় বলতে চাইছেন বাস্তবানুগ অভিনয়।) দানীবাবু চাণক্য আর আওরঙ্গজেব না করলে দেশে অভিনয় আসত না, নয়ত দানীবাবু বা অমর দত্ত ভালভাবে অভিনয়ই করলেনই বা কোথা? শুধু 'এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল'।

গিরিশ বাবু পরমহংসদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন কিন্তু পরার্থপর হলেন কই? ছেলের কথা আর নিজের নাটক ছাড়া অন্য সব বিষয়ে careless ছিলেন। তবে অনেক পড়াশোনা ছিল। কত যে পড়েছিলেন তা কেউ জানে না। সে সময় সামগ্রিক চিন্তা আর drill-এর বড় অভাব ছিল, ব্যক্তিগত জিনিয়াসই ছিল প্রবল।

গিরিশ প্রসঙ্গ থেকে স্বামীজির কথা উঠল, বললেন—বিদেশে

রবীন্দ্রনাথ খুবই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছেন স্বামীজি।

সমসাময়িক (অর্থাৎ আজকালকার) মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে বললেন—সমসাময়িক মঞ্চ সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত।

বাংলা দেশের মাসিক পত্রের কথা উঠল, বললেন—একটা ভাল মাসিকের জায়গা এখনও বাংলা দেশে আছে। ভাল বলতে পুরোনো প্রবাসী আর ভারতীর মত। প্রবন্ধ প্রথমতঃ লেখাতে হয়। লিখতে লিখতে কাঁচা লেখা পাকে। সে চেষ্টা যে করবে সে খাবে কি?

বঙ্কিমবাবুর লোকের ক্ষমতা বিকাশ করানোর অপূর্ব দক্ষতা ছিল, কিন্তু বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী অতুলনীয়, বিবিধ প্রবন্ধের মূল্য দেয়ই বা কে?—জানেই বা কে?

—সব মানুষের মনোবৃত্তি এক; কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা এলানো ভাব আছে। আমাদের থিয়েটার সুরু হ'তেই দু'ভাগ হলো। একটা হ'লে যা মহৎ হ'তে পারত তা' ঝগড়াঝাটির মধ্যে দু'ভাগ হ'য়ে কিছুই হলো না।

কথা শেষ হবার পর কি বই পড়বেন সবাইকে প্রশ্ন করলেন, অনেক তর্ক-বিতর্ক করার পর ঠিক হ'লো গিরিশচন্দ্রের জনা পড়া হবে। বাংলা মঞ্চের নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাটক দিয়ে নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হওয়া যে আনন্দের কথা তা সবাই স্বীকার করলেন।

৩১শে জুলাই উনি এলেন, পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই খবর রটে গেছে যে, শিশিরকুমার পুরোনো সব নাটক পাঠ করবেন। কাজেই ঘরের মধ্যে ছোটখাট জনতা এসে তক্তাপোষের ওপর বসলেন, পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করলেন। দু'একজন তখনও আসেননি বলে বই পড়া কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত রেখে অন্য সমস্ত আলোচনা সুরু করলেন।

প্রথমেই বললেন নাট্য সমালোচক কেমন হবে সেই কথা—প্রকৃত নাট্য সমালোচনা হয় না কারণ সমালোচক হ'তে গেলে নাটকের সঙ্গে নাড়ীর যোগ থাকতে হয়, নয়ত ভালবাসতে হয় নাটককে। বাংলা নাটক ভাল করে পড়া থাকা দরকার তা ছাড়া নিয়মিতভাবে রিহার্স্যাল আর অভিনয় দেখতে হয়। নয়ত leader লেখার মত লেখা লিখিয়ে ত সহজেই কাগজওয়ালারা নাম করিয়ে দিতে পারে। মৃতব্যক্তিদের মধ্যে অমর দত্ত আর দানীবাবু এক সময়েই অভিনয় করতেন। কিন্তু অমর দত্ত কাগজকে কাজে লাগিয়ে খুব পপুলার হয়ে উঠেছিলেন, দানীবাবু কিন্তু অত পপুলার ছিলেন না, অমর দত্তর মত অক্লান্ত কর্মী বাংলা নাট্যশালায় খুব কম ছিলো, কিন্তু অভিনেতা—সে কথা না বলাই ভালো।

—দানীবাবুকেও দাঁড় করালেন গিরিশবাবু। অভিনেতাদের একটি ঢোঙ বা conventional mode of acting ঠিক করে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি সেই অনুযায়ী লিখে ছেলের সুবিধে করে দিলেন।

—আমাদের দেশে আগে থিয়েটারের নাম ছিলো, ভরত কালীদাসের আগেই লেখা হয়েছিল আর রাজশেখর বসুর রামায়ণের অনুবাদের উনিশ পাতার লেখা আছে যে, অযোধ্যার অলিতে গলিতে থিয়েটার ছিলো।

—ইতিহাসে bias একটু থাকবেই, কিন্তু তা establish করা চাই।

কালিদাসের ভৌগলিক জ্ঞান খুবই ভালো ছিল; শাস্ত্রীমশায় জিনিষটা ভালো করেই শিখিয়েছিলেন, শাস্ত্রীমশায়ের লেখা সব এক করে বার করা উচিত। উনি বড় গোঁতো ছিলেন, জোর করে লেখাতে হ'তো। তবে তাঁর সঙ্গে কথা বললেই কত জ্ঞান বোঝা যেত।

—গিরিশবাবুকে আমার প্রহেলিকা মনে হয়। এদিকে পরমহংসদেবের শিষ্য অথচ কখন ত ঠকেননি। মিথ্যে মোকদ্দমাতেও জিতেছেন। গাড়ীতে চড়বার সময় বলছেন—যাচ্ছি অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলব, লোকটি বড্ড জ্বালিয়েছে। তবে থিয়েটার উনি না হ'লে চলত না। ভুবন নিয়োগী, অমৃতলাল আর অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফি কি থিয়েটার চালাতে পারতেন নাকি?

—অর্দ্ধেন্দুবাবুর কথা ছেড়ে দাও, মরবার সময় বলেছিলেন, সর্বাঙ্গে দেশী মদ ঢেলে তবে যেন পোড়ানো হয়। মানুষ বড় ভালো ছিলেন, রিহার্স্যালে আমারই মতো ঝোঁক ছিলো, দশ-বিশ-পঁচিশবার বলতে কষ্ট পেতেন না। রিহার্স্যাল আরম্ভ করলে আর শেষ করতে চাইতেন না, তা লোকে মরুক আর ভরুক।

মানুষটি খুব দুঃসাহসী ছিলেন। 'দস্তাবক্রে' সৌরীন্দ্রমোহনের নকল করে তাঁর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলেন। তবে কালীকেষ্ট ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। শিখিয়েছেন কিন্তু পাত্র-অপাত্র ভেদ না করে।

—গিরিশবাবু কিন্তু কাউকে শেখাতেন না। রিহার্স্যালে বসতেন এক ডাবা পান, আর ব্যাণ্ডি বা হুইস্কির বোতল নিয়ে চাকর সোডার বোতল নিয়ে তৈরী থাকত। দু'তিনবার বলেই বলতেন—ঠিক হ'য়েছে, তোমার বয়সে অমন আমি পারতুম না, এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল তাহলেই হবে।

—তিনকড়িই একমাত্র অভিনেত্রী যাঁকে—গিরিশবাবু খাতির করে চলতেন। একবার মহেন্দ্র মিত্রকে যা বলেছিল, তা (সধবার একাদশী) নাটকেই লেখা আছে। মীরকাশিমে তারার ভূমিকায় অভিনয় করছে, কে বুঝিয়েছে, অন্য দু'জন সুশীলা আর তারা, খুব ভাল পোষাক পরছে আর তোমার বেলা শুধু গেরুয়া! তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে দাঁড়াল, ভাল পোষাক ছাড়া নাববে না।

—গিরিশবাবু বললেন তিনকড়িকে কোন অনুরোধ করতে পারবেন না। কে যায় 'বোঝাতে শেষ পর্যন্ত চারআনি মালিক মহেন্দ্র মিত্র সাহস করে বোঝাতে গেলেন। তিনকড়ি সাফ মুখের ওপর বলে দিলে—তুমি আর টকখাই-টকখাই করো না বাপু, যাও আর ওকালতি করতে হবে না। তোমার মত উকিলের মামলায় আমি হুঁকোর জল ঢেলে দি।

মহেন্দ্রবাবু পালিয়ে বাঁচলেন, শেষ পর্যন্ত একজন বুদ্ধিমান লোক (ভোলাদা বলেন—সমস্তটাই রসিকতা আর তা মিটমাট করাল অর্দ্ধেন্দুবাবু) গিয়ে বোঝালে—আরে, তোমায় কি এমনি গেরুয়া পরাব, পরাব একেবারে খাঁটি সিল্কের গেরুয়া, তখন ঠাণ্ডা হলো তিনকড়ি।

ডাঃ অধিকারী মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে কথা বার করতে চাইতেন।

বললেন—তারার কিন্তু খুব দম্ভ ছিলো। বললেন—থাকবে না কেন, এক সময় থিয়েটারের মালিক পর্যন্ত ছিলেন। অপরেশবাবু ষ্টার থিয়েটার ঠকিয়ে আর্ট থিয়েটারকে বেচে দিলেন আর তার টাকায় ভালুক পাড়ায় দু'খানা বাড়ি কিনলেন, পরে আবার সে বাড়ি বেচে দিয়ে টাকাটা ভোগ করলেন। উনি ছিলেন আওরঙ্গজেব। প্রথমে আমাকেও খুব দাবাতে চেয়েছিলেন।

—পাণ্ডব গৌরব দুবার করেছি, কিন্তু ওর ওপর আমার কোন sympathy নেই।

এই দিন জনার আধাআধি পড়ে শোনালেন।

৭ই আগষ্ট এলেন। প্রথম কথা হল—সেদিন আমি ভুল করেছিলুম, মাইকেলের শর্মিষ্ঠায় আছে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আর গ্রীক নাটকের প্রভাব আছে পদ্মাবতীতে। তার পর বললেন—একজন অভিনেত্রী অনেককাল অভিনয় করছে, মহতী আকাঙ্ক্ষা মানে জানে না। বলে—যুদ্ধ হবে আর কি? তখন আমি বললুম—কথাটার মানে হ'লো পৃথিবীশ্বর হবার ইচ্ছা। বিজিগীষা মানে জানে না।

পুরোনো দিনের অভিনেতাদের সম্বন্ধে বললেন—গিরিশবাবু একটা ভোল করলেন, ছেলেকে বড় করবার জন্যে কতকগুলো বড় বড় পার্ট লিখে গেলেন, দানীবাবু অবশ্য লেখাপড়া জানতেন না। তবে তখন তাঁরা স্বীকার করতেন যে, লেখাপড়া জানেন না। কুসুম বড় ভাল বলেছিল। একটি ছেলে না মেয়েকে শেখাচ্ছি, পার্টটা বোঝানোর জন্যে গোটাকতক ইংরেজি sentence বলেছি তা দেখি সে 'হাঁ' করে দাঁড়িয়ে আছে। কুসুম বললো—ওত খুবই বুঝেছে। যে ভাষায় বললেন, ও ভাষায় যে ও পণ্ডিত!

রামকৃষ্ণের কাছে গিরিশবাবু গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। পরমহংসদেবের শিষ্যরা খুব সাহায্য করেছিলেন। স্বামীজি ছিলেন পেছনে। স্বামীজির অপূর্ব জনপ্রিয়তা ছিলো। পশ্চিমেও স্বামীজির যা জনপ্রিয়তা ছিল, রবীন্দ্রনাথের তা ছিলো না। কিন্তু এদেশে স্বামীজির নাম হ'লো আমেরিকা থেকে নাম করে এসে।

—ওদের দেশে কতকগুলো গরীব লোক থিয়েটার খুললেন, তারপর মিস হর্নিম্যান টাকা দিতে দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের দেশেও গরীব লোকেরাই থিয়েটার খুলেছিলেন। গিরিশবাবু ছাড়া কারো কিছু ছিলো না। অর্দ্ধেন্দুবাবু ছিলেন অন্নদাস। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে থাকতেন, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যত্নআত্তি করতেন, পঞ্চাশ টাকার বেশি কখনও একসঙ্গে চোখে দেখেননি। শীতকালে ওভারকোট আর গরমকালে ড্রেসিং গাউন পরে কাটিয়েছেন। খাবার মধ্যে খেতেন দিশী মদ। দিশী ছেড়ে বিলিতিতে কখনও উঠতে পারেননি। দিশী মদ বোধ হয় তখন চোদ্দ আনা বোতল ছিল।

এবার এলেন জনার প্রসঙ্গে, বললেন—জনা বলা হয় লেডি ম্যাকবেথের দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু পড়লে ত তা মনে হয় না। কাব্য হিসেবে খুবই ভাল বই। ওঁর আর একটা ভাল বই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। নাটকটির দুটি কেন্দ্র—কীচকবধ আর উত্তর গো-গৃহযুদ্ধ। অবশ্য এরকম দুটো কেন্দ্র জনাতেও কিছুটা আছে। প্রবীরের মৃত্যুর পরের অংশটাও নতুন। ওঁর নাটক গ্রীক বা সেক্সপীয়রের নাটকের ছকে নয়, একেবারে নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব। মার্চেন্ট অব ভেনিসে শাইলকের ব্যাপার চোকার পর সেক্সপীয়র যদি পোর্টিয়া আর তার রিং নিয়ে একটা বাড়তি অংক লিখতে পারেন ত' গিরিশবাবুই বা পারবেন না কেন?

—আইন হয় পরে। আরিষ্টটল এরিষ্টোফেনিস আর এসকিউলাসের কত পরে আইন বাঁধলেন। তাছাড়া বিখ্যাত লেখকরা আইন পুরো মাত্রায় কখনই মানেন না। জেন অষ্টেনের লেখার সঙ্গে ডিকেন্সের লেখার যেমন অনেক তফাৎ।

ইংরেজি লেখকদের কথায় বললেন—আর্নল্ড বেনেট ত ভাল লিখতেন। আনা অব ফাইভ টাউনস খুব ভাল বই। ওল্ড ওয়াইভস টেলসও বেশ ভাল লেখা। ওয়েলসও ভাল লিখতেন। মিঃ পলি পড়েছি।

কথায় কথায় 'মহাপ্রস্থান' নাটকের কথা উঠল। বললেন—মহাপ্রস্থান দুটি লোক লিখতে পারতেন—ক্ষীরোদ পণ্ডিত আর গিরিশবাবু, গিরিশবাবু লিখলে ভীষণ ট্রাজিক হ'তো। অবশ্য এর চেয়ে ট্রাজিক আর কি হতে পারতো! তবে উনি বোধহয় মহাপ্রস্থান পর্যন্ত যেতেন না। অর্জুন যেখানে গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না সেখানেই শেষ করতেন। ক্ষীরোদ বাবুকে বলতে উনি লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু একদিন ভেবে এসে বললেন—ভায়া, এখনো ষাট বছর হয়নি, এরি মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের মৃত্যু দেখালে কি আর বাঁচবো।

জনার কথা তুললেন আবার, বললেন—জনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কি? ভাল করে পড়ানো দরকার, শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ানো দরকার, এতে নাটকীয়তাও আছে, কাব্যগুণও আছে, যাঁরা পড়ান তাঁরা ভাগ করে পড়ান না। কিছু ভাগ ভাগ সমালোচনা থাকলেও তাতে এমন অনেক জায়গা আছে না পড়লে বোঝা যায়, তাঁরা বইটা ভাগ করে পড়েননি। তা ছাড়া শ্রদ্ধা না থাকলে কী করে বুঝবেন।

মাইকেলের প্রতি গিরিশ বাবুর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। আমার যখন সতেরো বছর বয়স, তখন প্রথম গিরিশ বাবুর কাছে যাই ইনষ্টিটিউটে রেসিটেশন কম্পিটিশনে, কি ভাবে রেসিটেশন করবো শিখতে। মাইকেলের লেখার যে অংশটি নির্দিষ্ট ছিল সেটা পড়ে দুঃখ করে বলেছিলেন এটাও মাইকেলের লেখার ভালো অংশ নয়, এর চেয়ে অনেক ভালো লেখা আছে তাঁর, এই বলে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পড়ে শোনালেন।

তিনি যে নিজে নাটক লিখবেন, একথা কখনও ভাবেননি। কিন্তু খুব ভালো অভিনেতা ছিলেন। ইউনিভারসিটির উচিত গিরিশ বাবু সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া। তাঁর নাটকের Genesis সম্বন্ধেও খোঁজ নেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ আমায় বলেছিলেন—গিরিশ বাবুর লেখা পড়িনি আর এ বুড়ো বয়েসে পড়তে বলো না। তবে তিনি খুব বড় অভিনেতা ছিলেন।

—দানী বাবুকে যে দেখতে পারতেন না তার কারণ তিনি ত' কেবল ভোগে চলতেন, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর খারাপ অবস্থার সুরু হয়। এক দেবলাদেবীতে খিজির খাঁ হয়ে চেঁচিয়েছিলেন কিছুদিন' তবে পয়সা পাননি।

আজকের দিনে যে যাই করুক, Publicity Conscious সবাই, আমাকে দু বছর কেউ mention করেনি।

এক বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদকের নাম করে বললেন ওকে উনিশ'শ সাতাশ-আটাশ সালে বলেছিলুম, সমালোচনার

জন্যে একটি ভাল ছেলেকে তিন-চারশ' টাকা মাইনে দিয়ে রাখো, আমরা তাকে সাহায্য করবো, তাতে বললে, এমনিতেই কতলোকে লেখা দিতে চাইছে। আর একটি পত্রিকা গোষ্ঠির পরিচালকের নাম করে বললেন—সে বললে, কেউ ত কিছু জানে না। যা লেখবার আপনি বরং লিখে দেবেন, কাগজে ছাপিয়ে দেবো। আমি তাতে রাজি হইনি।

যাবার সময় ঠিক হলো পরের দিন পড়বেন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

আবার এলেন চোদ্দই আগষ্ট। ইতিমধ্যে বার্ণপুরে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেই প্রথমে বললেন—বার্ণপুরে মেজর জেনারেল পি চৌধুরীর বাড়িতে ছিলুম। ভদ্রলোক ex—I. M. S.। ওঁর স্ত্রীকে আমার বড় ভালো লেগেছে। কোনো রকম রং চং মাখা নয়, একেবারে সাধারণ বাঙালী-ঘরের বউ। অথচ যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন সবাই রংমাখা। আর কী যত্ন! খাইয়েছেও খুব ভালো। তাইত বললুম, I am feeling quite at home,

—চৌধুরী সাহেব আই, এন, এ,তেও ছিলেন, জীবনে অনেক এ্যাডভেঞ্চার আছে।

—অভিনয় খুব ভালো হয়নি। (একজন অভিনেতার নাম করে)—এর অবস্থা খুব স্বাভাবিক ছিল না। একবার ঢুকে আর যখন ঢুকলো না তখনই বুঝলুম কিছু গোলমাল হয়েছে। বাঁধা হাততালি পাবার জায়গায় না পেলে এক কথা তিনবার করে বলেছে।

—ষ্টেজটি খুব ভাল, গভীরতা চল্লিশ ফুট, তবে মাঝখানে একটা বাধা আছে (সম্ভবতঃ পিলার) নীচে ছ'শ পঞ্চাশজন লোক ধরে। ষ্টারেও ধরত না। জিজ্ঞাসা করলুম—সবই ত তোমাদের ভালো, কিন্তু মাঝখানে ওটা কেন? ষ্টারের নকল, তা উত্তর দিলে—না, আগে ওই পর্যন্তই ষ্টেজ ছিলো, এখন বাড়ানো হয়েছে। আমি বললুম—ওটা সরিয়ে দিয়ো। আর একটু জিজ্ঞাসা বাদ করো। অভিনয় করতে পয়সা নিই বটে কিন্তু এসব কথা জানতে চাইলে ত' আর পয়সা নেবোনা।

এবারে কতকগুলো সাধারণ কথা বললেন—আমাদের দেশে জাতীয়তা বোধ এসেছে পরে। আর্যরা যে বাইরে থেকে এসেছিল একথা হয়ত সত্যি নয়, নয়ত এদেশের লোকেরাই নিজেদের আর্য বলে চালিয়ে দেয়। মুসলমানরা যখন এদেশে আসে আমাদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রসঙ্গে বললেন—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস লেখা হয় আঠারশ' বিরাশি সালে। তার আগের বছর লেখা হয় রাবণ বধ। প্রথম দিনে উত্তরা কে করেছিল তার নাম পাওয়া যায় না। অমৃতলাল মিত্র করেছিলেন ভীম ছাড়া আরো দুটো পার্ট। গিরিশবাবু করেছিলেন কীচক আর দুর্যোধন। গিরিশবাবু কীচক খুব ভাল করতেন, কিন্তু প্রথম রাত্রির পর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন করতেন মতিলাল সুর। তাই নিয়ে তুমুল হৈ চৈ। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবার ধরলেন। অমৃতবাবু ছিলেন লম্বা চওড়া দশাসই পুরুষ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের দুটি কেন্দ্র, এক কীচক বধ আর এক উত্তর গো গৃহ যুদ্ধ। দুটিকে জুড়েছে উত্তরা-অভিমন্যু বিবাহ আর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ইঙ্গিত।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে বিদেশী কোনো ছোঁওয়া নেই। এর মূল হ'লো পুরো কাশীরাম দাস। এর গড়নটাও সম্পূর্ণ গিরিশবাবুর নিজস্ব।

সেক্সপীয়রের খুব ভক্ত ছিলেন গিরিশবাবু। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন উনি। যত কাল ছিলেন, নতুন কোনো ধারাকে ঢুকতে দেননি।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু পড়াবে কে? সেক্সপীয়র বোধ হয় শ্রীকুমার পড়াতে পারে, পার্সিভাল সাহেবের সব নোট ওর মুখস্থ। প্রফুল্লবাবুও ভাল পড়াতেন শুনেছি। তবে আমাদের যা পড়িয়েছিলেন—ফাইলোলজি—তা ভাল পড়াননি। ফাইলোলজি জানে সুনীতি, একেবারে সব মুখস্থ।

প্রফুল্লবাবুকে পড়ানোর লাইনে আনলেন পার্সিভাল সাহেব। ধমকে বললেন—ডেপুটিগিরি করবে তো আমার কাছে এতদিন পড়লে কেন?"

প্রফুল্লবাবু আগেও এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের জ্বালাতনে পালিয়ে বাঁচলেন। পার্সিভাল সাহেব ওঁকে খুব ভাল বাসতেন। নিজের সব নোট লেখা বই দিয়ে যান।

ও'র সময় পার্সিভাল আর এম, ঘোষ ভাল পড়াতেন। আর একজন ভাল পড়াতেন—বিনয় সেন। উনি ফিলসফি, হিষ্ট্রী আর ইকনমিকসের প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু কোনো দিকে যেতেন না তাই আশুবাবু পছন্দ করতেন না। তবে দলে টানতে চেয়েছিলেন। বিনয়বাবুকে এক কথায় ইন্সপেক্টর অব কলেজেস করেছিলেন। তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন। তাঁকে সবাই নাম ধরে ডাকতে পারতেন না, বাবু বলতে হ'তো।

আশুবাবুর মাঝে মাঝে ওরকম ঠিকে ভুল হ'তো। গুরুদাস বাবুর সঙ্গেও একবার হয়েছিল। ওঁর ছেলে হারাণের চাকরী করে ওঁর কাছে ভোট চান। তাতে গুরুদাসবাবু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

ঐ সময়ে পণ্ডিতরা তাঁদের জ্ঞান দেখাতেন না, নিতান্তই খোঁচা দিয়ে জানতে হ'তো। [ক্রমশঃ।

••• এ মাসের প্রচ্ছদপট •••

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে সাঁওতালী বঙ্গ-ললনা দুই বোনের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ কর্তৃক গৃহীত।
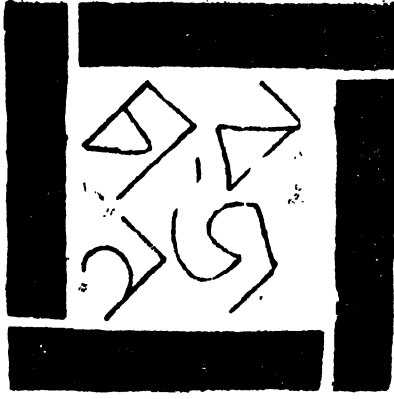
রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

"থামুন, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোকসভায় আমরা বঙ্কিমের গড়ে' তোলা বাংলা ভাষাতেই সকল কথা শুনতে চাই, ইংরাজিতে নয়।" বালকের কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি শুনিয়া সভাস্থ সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে সাহিত্যসম্রাটের স্মৃতিপূজার জন্য শোকসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন রাজসাহীর তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট লোকেন্দ্রনাথ পালিত। সভাপতির অভিভাষণে তিনি ইংরাজিতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী তিনি লণ্ডনে বসিয়াও পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরক্ত ভক্ত। তবুও ইংরাজি ভিন্ন অন্য ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন না এজন্য তিনি ইংরাজিতেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবেন। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হইয়া সভাপতির অভিভাষণ শুনিতেছিল। সহসা সভার এক প্রান্ত হইতে বালকের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিয়া উঠিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজায় বঙ্কিমের গ'ড়ে তোলা বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় বক্তৃতা করা চলিবে না। এই বালক রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের উদীয়মান ছাত্র রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। বালকের প্রতিবাদের সারবত্তা অনুভব করিয়া সভাপতি মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়েন এবং সমুদয় সভায় হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সাহিত্য সম্রাটের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সভার কার্য্যও সমাপ্ত হয়।
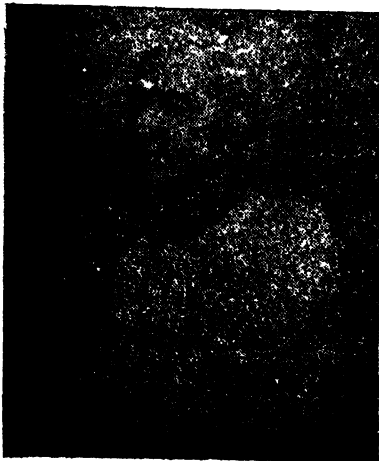
রাজেন্দ্রলাল আচার্য

বঙ্গ ভাষার প্রতি এই অসাধারণ অনুরাগ এবং বঙ্গীয় জাতীয়তার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের জীবনের মূল সুর। কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিরাগভাজন হইয়াও তিনি তাঁহার 'বিপ্লবী বাংলা' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন ভারতবর্ষের বর্তমান স্বাধীনতা গান্ধীবাদের দ্বারা আসে নাই—আসিয়াছে অপরাপর কারণের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক বাঙ্গালী বীর সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় এবং আত্মত্যাগে। তাইত বঙ্গজননীর আর একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বর্গতঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বিপ্লবী বাংলা' পাঠ করিয়া আচার্য্য মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন "এই গ্রন্থে আপনি সত্যকারের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। আপনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য রাজসাহী জেলার এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার কেদারেশ্বর আচার্য্য এম, বি উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু শুধু চিকিৎসক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজসাহীর প্রতিটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যথা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, পাবলিক লাইব্রেরী, হরিসভা, কলেজ, স্কুল প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সহিতই তিনি অগ্রণীরূপে যুক্ত ছিলেন। আজিও রাজসাহীর আপামর জনসাধারণের নিকট 'কেদার ডাক্তার গরীবের মা বাপ ছিলেন' বলিয়াই পরিচিত। এই বিখ্যাত পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র রূপে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়; কিন্তু বিমাতার স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত হইলেও তিনি মায়ের অভাব কোনদিন অনুভব করেন নাই।

রাজেন্দ্রলাল বাল্যকালে রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং প্রথম হইতেই একজন মেধাবী এবং কৃতি ছাত্র হিসাবে পরিচিত হন। শুধু তাহাই নহে; খেলাধূলা, গান-বাজনা, সন্তরণ প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বর্ষাকালে দুরন্ত পদ্মা নদীও তিনি একাধিকবার সাঁতরাইয়া পার হইয়াছেন। ছাত্র জীবনে রাজসাহীর যেখানে যে সদুদ্দেশ্যমূলক আন্দোলন হইয়াছে তাহাতেই তিনি একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কয়েকটি অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

স্কুলের ছাত্র জীবন হইতেই রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য চর্চা সুরু হয় এবং রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকায়' এবং 'শিক্ষক' নামক আর একখানি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে লিখিতে থাকেন। রাজসাহী হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া তথাকার ছাত্র জীবন সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় পড়িতে আসেন এবং রিপণ কলেজে (আধুনিক সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন। রিপণ কলেজ হইতে রাজেন্দ্রলাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বি, এ পাশ করেন। রিপণ কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন এবং তাঁহার কথা মত "Bengali" পত্রিকার নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। রাজেন্দ্রলাল সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রও ছিলেন।

অতঃপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল সরকারী চাকুরী সাব ডেপুটি পদে নিযুক্ত হন এবং যোগ্যতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। কিন্তু স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্য তিনি প্রতিপদে ইংরাজ শাসকগণের বিরাগভাজন হন। তাঁহার প্রথম চাকুরী জীবনে মেদিনীপুরে বন্যাত্রাণ কার্য্যে অভূতপূর্ব্ব সুনাম অর্জ্জন করেন

ঐ সময় তিনি Famine Rules সম্বন্ধে যে নিবন্ধ লেখেন, তাহাতে ইংরাজের প্রচলিত নীতির যে সমালোচনা করেন, তাহা শাসক মহলে আলোড়ন আনয়ন করিয়াছিল এবং উহা তাঁহার পরবর্তী জীবনের উন্নতির প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি বগুড়ায় সাব ডেপুটি থাকা কালে ইংরাজ শাসকগণ কর্ত্তৃক 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ' শীর্ষক গানটি নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিচলিত না হইয়া বগুড়ায়—'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার' রাজেন্দ্রলালের পরামর্শক্রমে ঐ গানটি প্রতিবার বিরতির সময় কনসার্টে বাজাইবার ব্যবস্থা করেন। শুনিতে পাওয়া যায় রাজসাহী বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার রিড সাহেব (পরবর্ত্তীকালে আসামের গভর্ণর) রাজেন্দ্রলালকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত করিবার জন্য সুপারিশ করিলেও বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিবার অপরাধে ফুলার সাহেব তাঁহার মনোনয়ন অগ্রাহ্য করেন।

রাজেন্দ্রলালের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বাংলার প্রতাপ' তাহার পরে তিনি 'রাণী ভবানী,' 'বীর কাহিনী,' 'মারাঠির কথা,' 'ছত্রপতি শিবাজি,' 'দিগ্বিজয়ে বাঙালী,' 'বাঙ্গালীর বল,' 'বাঙ্গালার ধর্ম্মগুরু' (দুই খণ্ডে), 'বিপ্লবী বাংলা,' 'মৃত্যুর পরপারে' (দুই খণ্ডে), 'স্বামী অভেদানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং জুলে ভার্ণের '৮০ দিনে ভূ প্রদক্ষিণ,' 'চন্দ্রলোকে যাত্রা,' 'পাতালে,' 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। টলষ্টয়ের Ressurection ভিক্টর হুগোর Hunch Back of Notterdum, আনাতোল ফ্রাঁসের Red Lily-র মর্ম্মানুবাদ 'পুনর্জ্জন্ম,' 'দেব দেউল' ও 'রক্তকমল' নামে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'নিকালোকান্টির' ভারত বৃত্তান্ত তিনি 'শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়া 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'ফিরিঙ্গী বণিকের' মত রাজেন্দ্রলালের 'ফিরিঙ্গির বাণিজ্যও' এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন রাজেন্দ্রলাল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উপর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। 'মন্বন্তর' উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার মন্বন্তর অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্য হইয়াছে কিন্তু ভয় হয় উহা ছাপিতে গিয়া বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে না হয়।' প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একবার ভোটগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতে রাজেন্দ্রলালের 'বাঙ্গালীর বল' বাংলা সাহিত্যের একশতখানা ভাল বইয়ের অন্যতম বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। ইহাই রাজেন্দ্রলালের রচনার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন। কবিতা ও প্রবন্ধ যে তিনি কত লিখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নাটক রচনা ও অভিনয়েও রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব দেখা যায়। পূর্ব্বে রাজসাহীর আচার্য্যপরিবারে দুর্গোৎসবের সময় নাটক অভিনীত হইত। উক্ত অভিনয়ের জন্য রাজেন্দ্রলাল প্রতিবৎসরই নূতন নূতন নাটক রচনা করিয়া দিতেন এবং উহারই অভিনয় হইত রাজেন্দ্রলালের লিখিত এবং প্রকাশিত নাটকের মধ্যে ঊষা এবং প্রায়শ্চিত্ত উল্লেখযোগ্য।

শুধু সাহিত্যিক হিসাবেই রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব নহে—গঠনকারী কর্ম্মী হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল ব্যক্তি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম। পরবর্ত্তী কালে রাজসাহী ত্যাগ করিয়া বারাকপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার দেশ হিতৈষণা লোপ পায় নাই। বারাকপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং বারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজেরও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক সমিতির সভ্য। বারাকপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ও মঠ প্রতিষ্ঠাও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিনি স্বামীজি মহারাজের বিশেষ স্নেহ ও কৃপাভাজন হইয়াছিলেন এবং স্বামীজির অনেকগুলি ইংরাজি রচনার বাংলা অনুবাদ করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একখানি জীবনীও তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে যুদ্ধে যাইতে থাকেন, রাজেন্দ্রলাল তাঁহাদের একজন উৎসাহী সমর্থক এবং প্রচারক ছিলেন। ৪৯শ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেন্টের জন্য তিনি কয়েকটি জাতীয়সঙ্গীতও রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; যথা—

১। বঙ্গবীরের বংশ আমরা কভু না শত্রু করিব ভয়।
অর্ঘ্য আনিব দেশের তরে অরাতি কিরীট করিয়া জয়, ইত্যাদি।

২। কোথা গোকর্ণ কোথায় কেদার কোথা রাম সেতু কোথা গান্ধার
রণহুঙ্কার ধ্বনিল যাহার জলধি হইতে জলধি শেষ। ইত্যাদি।

রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য রচনায় মুগ্ধ হইয়া ১৩২৬ সালে 'বঙ্গ সাহিত্য সারস্বত মণ্ডল' তাঁহাকে 'পুরাতত্ত্বরত্ন' এবং নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্ত্তীকালে ইংরাজ সরকারও তাঁহার সাহিত্য সাধনার জন্য রাজেন্দ্রলালকে রায় সাহেব উপাধি দান করেন। ইহাব্যতীত বহু পদক ও পুরস্কারও তিনি সাহিত্য রচনার জন্য পাইয়াছেন।

পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী জমিদার বংশের ৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যমা ভগ্নী শ্রীযুক্তা হেমনলিনী দেবীর সহিত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের বিবাহ হয়। তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিশয় মধুর। কিন্তু কয়েকটি পুত্রের পর পর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শেষ জীবন কতকটা শোকাবহ হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার দুইটি পুত্র রঞ্জনলাল ও মিহিরলাল যখন যুদ্ধে গমন করেন, তাহাতে স্বামী-স্ত্রী গৌরবই অনুভব করিয়াছিলেন এবং উভয়ে একত্রে যাইয়া সন্তানদ্বয়কে ফোর্ট উইলিয়ামে পৌছিয়া দিয়া আসেন। "কেন যুদ্ধে যাইতেছ?" জিজ্ঞাসিত হইয়া রঞ্জনলাল বলিয়াছিলেন—"দেশের জন্য—যদি ফিরিয়া আসি, তবে আমাদের সমর-কৌশল শিক্ষা স্বাধীন ভারতের সেবায় নিয়োজিত হইবে। আর যদি না ফিরি, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু 'বাঙ্গালীর বলের' লেখকের উপযুক্তই হইবে।" রঞ্জনলাল সত্যই আর ফিরেন নাই। ব্রহ্মদেশের মিটকিনীর সমরক্ষেত্রে জীবন দিয়া নিজ পিতার 'বাঙ্গালীর বল' রচনার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতেই রাজেন্দ্রলাল পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার 'মৃত্যুর পরপারে' ১ম ও ২য় খণ্ড অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে রাজেন্দ্রলাল এখনও অটুট মনোবল লইয়া সাহিত্য সাধনা করিতেছেন। রোগ তাঁহাকে শীর্ণ করিয়াছে। শোক তাঁহাকে জীর্ণ করিয়াছে, তবুও অবিচলিতচিত্তে তিনি সাহিত্য সাধনা

করিয়া চলিয়াছেন, যাহার মূল সুরই হইল বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা ও শ্রেষ্ঠত্ব। ঐ সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে তিনি করিয়া চলিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ও মঠের মাধ্যমে সমাজসেবা। রাজেন্দ্রলাল শীঘ্রই অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিবেন ;—তিনি শতায়ু হউন।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক]

অপূর্ব্ব কর্ম্মনিষ্ঠা, বিজ্ঞান সাধনা ও সাহিত্যচর্চ্চা এঁর জীবনের মূল মন্ত্র। বহুগুণে বিভূষিত হলেও এই তিনটি বিষয়ের তিনি একনিষ্ঠ পূজারী। তাই এই সাতাত্তর বছর বয়সেও তিনি নিরলস ভাবে সাহিত্য চর্চ্চা করে চলেছেন। বঙ্গ জননীর অমৃত ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন আজও।

বর্ত্তমান কালে যে কয়েকজন শক্তিমান লেখক বিজ্ঞানালোচনায় অগ্রণী হ'য়েছেন তন্মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে—পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র চারুচন্দ্র আধুনিক যুগের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্যিক। সরস বর্ণনাভঙ্গী এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁর রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। চারুচন্দ্রের রচনায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

এই জ্ঞানী, গুণী নিরহঙ্কার অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে এসে বিশ্বভারতী প্রকাশনার সমৃদ্ধ করেন নানাভাবে ও নানাদিকে। বাংলা দেশে যে পাঁচ জন বৈজ্ঞানিক রয়াল সোসাইটীর সদস্য মনোনীত হয় বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্যে তন্মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত মহলানবীশ, শিশির মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ব্যতীত অপর চার জন হচ্ছেন চারুচন্দ্রের ছাত্র। এঁরা ছাড়াও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক স্বর্গতঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জ্জী এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ছাত্র। এঁর জীবনের মাঝে দেখতে পাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংমিশ্রণ—জ্ঞানী গুণীদের অপূর্ব্ব সংযোগ।

১৮৮৩ সালের ২৯শে জুন ২৪ পরগণা জিলার হরিনাভি গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গতঃ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভট্টাচার্য্যের বাল্য ও কলেজ জীবন সম্বন্ধে শ্রীভট্টাচার্য্যের নিজের মুখের কথাই এখানে উদ্ধৃত করছি—

বাল্যকালে একটি নূতন স্কুলে ৩ বছর পড়ে ১০ বছর বয়সে কলকাতায় আসি। কলকাতা মেট্রোপলিটান স্কুলে (বউবাজার থানা) এসে ভর্ত্তি হওয়ার দুই মাস পরে একদিন শুনতে পেলুম সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাপ্রয়াণ করেছেন। এত কাছে থেকে তাঁকে দেখা হলো না। এজন্যে মনে ক্ষোভ রয়ে গেল। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে সেদিন আমাদের স্কুল হ'লো না। ১৮৯৯ সালে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই এবং মেট্রোপলিটান (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজে এফ, এ পড়ি। সে সময়ে আমাদের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন স্বর্গতঃ এন, এন, ঘোষ, জ্ঞান ব্যানার্জী, মোহিতচন্দ্র সেন এবং ক্ষেত্রগোপাল ঘোষ প্রমুখ। ১৯০১ সালে এফ, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যলাভের পর প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ (বি কোর্স) ক্লাসে ভর্ত্তি হলুম। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের অধ্যাপক ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক মিঃ পার্শিভেল প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত অধ্যাপকগণ। আমি যখন ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন ডক্টর পি, কে, রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের পদলাভ করেন কিছুদিনের জন্যে। ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে পদার্থ বিদ্যায় এম, এ, পড়ি এবং ১৯০৪ সালে পদার্থ বিদ্যায় সসম্মানে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এম, এ পড়বার সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণা আরম্ভ করি এবং এম, এ পাশ করার পরও আচার্য্য বসুর অধীনে গবেষণা কার্য্যে রত থাকি। তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যায় লেকচারার হয়ে যোগ দিই। সন তারিখ মাস আর মনে নেই। তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজেই পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হই এবং বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপনা করতে থাকি।

ছাত্রাবস্থায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সান্নিধ্য লাভ করি এবং তাঁর মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের সঙ্গ লাভ করি।

দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকের পদ থেকে শ্রীভট্টাচার্য্য অবসর গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি তিনি বিশ্বভারতী ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে বর্ত্তমানে তিনি রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি, রবীন্দ্র ভারতীর সহ-সভাপতি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ সভাপতি, অবনীন্দ্র পরিষদের সভাপতি, ভারত সভার সহ-সভাপতি প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীভট্টাচার্য্যের দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনে অপর একটি দিক হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা। ১৯১৭ সালে বিশ্বভারতী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সে সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে রচনা ও কবিতা পাঠ করতেন। শ্রীভট্টাচার্য্য তাতে বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি উক্ত সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বভারতী যখন স্থাপিত হ'লো তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রকাশনী বিভাগটির পরিচালনা তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন। শ্রীভট্টাচার্য্যের মুখের কথাই বলি, ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে ভার আমার উপর অর্পণ করেছিলেন সে দায়িত্ব ভার বহন করেছিলাম। আজ দু'বছর হ'ল সে ভার হ'তে অব্যাহতি নিয়েছি। বিশ্বভারতীর কার্য্য নির্ব্বাহক পরিষদ ও তার অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে গোড়া থেকেই আমি যুক্ত ছিলুম।

বর্ত্তমানে 'বসুধারা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার আমার উপরেই পড়েছে। রবীন্দ্র ভারতী ও বিশ্বভারতীর পুস্তক প্রকাশন বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে এখনও আমি সংশ্লিষ্ট আছি।

শ্রীভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানের সাধনায় রত থেকেও পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে চলেছেন আজও। প্রাঞ্জল ও সরল রচনাবলী এঁর অপর বৈশিষ্ট্য। এঁর রচিত গ্রন্থগুলি পাঠক সমাজে

যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এঁর প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য ক্রমেই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্য্য এ যাবত ২৫ খানার উপর পুস্তক প্রণয়ন করেছেন তন্মধ্যে নব্য বিজ্ঞান (১৩২৫), বাঙ্গালীর খাদ্য (১৩২৬), বিশ্বের উপাদান (১৩৫০), তড়িতের অভ্যুত্থান (১৩৫৫), আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৩৪৮), জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৩৫০), ব্যাধির পরাজয় (১৩৫৬) পদার্থ বিদ্যার নবযুগ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমরা এই জ্ঞান তপস্বী, বঙ্গ ভারতীর একনিষ্ঠ পূজারী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং আশা রাখি তিনি আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে বঙ্গজননী তথা ভারত ও বিশ্ববাণীর জ্ঞান ভাণ্ডার-সমৃদ্ধ করবেন।

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

[প্রখ্যাত জ্ঞান-তপস্বী]

'গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলে বহু কষ্টের মধ্যে জীবন চালিয়েছি সংসারের অভাব অনটন সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা কিরূপে হয় আমার ভাল ভাবে জানা আছে'—জানালেন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ছাত্র দরদী অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার সেন। কথাগুলো বলার সময় তাঁহার চোখের সজল ভাব আমার নজর এড়িয়ে যায় নাই।

কলিকাতা সিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরলোকগত অন্নদাচরণ সেন ও ৺বসন্তকুমারী দেবীর প্রথম সন্তান অমিয়কুমার ১৮৯৭ সালের ৭ই আগষ্ট বরিশাল সহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম ছিল বরিশাল জেলার গুটিয়া গ্রাম। ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার দীক্ষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় অন্নদাচরণ নিজ পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া কলিকাতা সিটি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং শিশু পুত্র সহ স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সাত বৎসর পরে উলুবেড়িয়া মহকুমার বানীবন-গ্রামে তাঁহার পরিবারবর্গের বসতি স্থাপনা করেন। অমিয়কুমার স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সিটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে দশ টাকা বৃত্তি সহ ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা, সিটি কলেজ হইতে ১৯১৫ সালে আই-এ-তে দ্বিতীয় ও ১৯১৭ সালে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারীরূপে গ্রাজুয়েট হন এবং ১৯১৯ সালে উক্ত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় ছাত্র হিসাবে এম, এ পাশ করেন। ১৯২০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে কার্য্য যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের সমসাময়িক ও সতীর্থদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অধ্যক্ষ সেনের সহধর্ম্মিণী হলেন ৺এককড়ি সিংহরায়ের কন্যা শ্রীমতী সুরমা সেন, তৃতীয় ভ্রাতা কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅমূল্য সেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিষ্টার অরুণ সেন হলেন সিটি কলেজের কমার্স বিভাগের অধ্যক্ষ।

শ্রীসেন বিগত চোদ্দ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সহিত জড়িত, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি, ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যকরী সমিতির ট্রাষ্টী ও সদস্য, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটীর সদস্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন।

আমার জিজ্ঞাসায় অন্যতম প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ ও ছাত্র সমাজের কল্যাণকামী হিসাবে তাঁহার অভিমত জানালেন :—

১। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদল বাঙ্গালী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার মেধাবী ছাত্র পাওয়া যায় সে স্থান হতে। কিন্তু দুঃখের কথা যে আজ ওই পরিবারগুলি আর্থিক ও অর্থনৈতিক চাপে এবং শিক্ষার বিরূপ আবহাওয়ায় ধ্বংসের পথে। এরা কখনও শ্রমবিমুখ হতে পারে না।

২। উচ্চশিক্ষার সমাপ্তিতে ছাত্ররা যখন স্বদেশ, বিদেশ তথা পৃথিবীর চারিপ্রান্তের সঙ্গে সুপরিচিত হবে—তখনই তাহারা যে কোন আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। তার আগে তাহারা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে—রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে—আর কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের সাথে তাদের হবে শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা।

৩। শিক্ষাধীন বিষয় হবে—হিউম্যানাইটিজ ও বিজ্ঞান। কিন্তু বিদেশে পাঠ্য করা হয়েছে—সমাজবিজ্ঞান, কলাবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। তিনটি স্তরই প্রথমদিকে প্রতিছাত্রকে পড়ান প্রয়োজন—শিক্ষার উচ্চস্তরে যে কোন একটি গ্রহণ করিলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে পূর্ণতা আসিবে। পরিণত মননশীলতা হবে বিশেষ শিক্ষার উর্ব্বর ক্ষেত্র।

৪। সুষ্ঠু পরিবেশে ও সুপরিচালনায় তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স দেশের শিক্ষাধারাকে উন্নততর করিবে।

৫। সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ-চিহ্ন থাকা বর্ত্তমান ভারতে বাঞ্ছনীয় নয়।

৬। আর কলেজী-শিক্ষাকে সর্ব্বতোমুখী উন্নত করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ন্যায় পৃথক 'আণ্ডার-গ্রাজুয়েট' উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন—বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও কলেজ প্রতিনিধিদের নিয়ে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে এই বোর্ড। ইহার প্রধান কাজ হবে কলেজী-শিক্ষাকে সুন্দরভাবে কালের উপযোগী করে পুনর্গঠিত করা।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশন অধ্যাপকদের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে মনোযোগী হয়েছেন—ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহার আরও তৎপর হওয়া বিধেয়। প্রয়োজন হলে দেশে শিক্ষা-কর ধার্য্য করা যেতে পারে—প্রতিটী স্বাধীন দেশে ইহা চালু আছে।

শেষে তিনি ব্যথিত চিত্তে বলেন যে, প্রকৃত জীবনদর্শন যদি আমরা স্থাপনা করি, তবে দেশ থেকে দুর্নীতি, অনাচার ও অবিচারকে চিরতরে নির্ম্মূল করে দেওয়া

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

রায়। আর অনুরোধ করলেন রাজনৈতিক দলগুলিকে—যেন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ছাত্র সম্প্রদায়কে রাজনীতির আবর্ত্ত হতে দূরে রাখা হয়।

ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ রায়

[কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক]

আমার বদ্ধমূল ধারণা যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নির্দ্ধারিত কাজ যদি ঠিকমত করে তবে দৈনন্দিন সমস্যার অনেকটা লাঘব হতে পারে। আজ দেখা যায় যে সর্ব্বস্তরে পরিশ্রমবিমুখতা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর দুর্দশা বৃদ্ধির কারণ। তাই সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী ও বাঙ্গলার সমাজ জীবনকে উচ্চপর্য্যায়ে নিয়ে যেতে হবে—৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণের পর আমায় জানালেন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর শ্রীদ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহরায়।

ছয় ভাই ও চার বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান দ্বিজেন্দ্রবিনোদ ১৯১২ সনের জুলাই মাসে স্বগ্রাম চাঁদপুর বাবুরহাটে (আশীকাঠীতে) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ৺যামিনীমোহন সিংহরায় কুমিল্লা কোর্টে মুহুরী হিসাবে যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন এবং প্রতিটি ছেলেমেয়েকে সুশিক্ষিত করার জন্য সুব্যবস্থা করেন। চাঁদপুর ও কুমিল্লায় সুপরিচিত, সুশিক্ষিত উদ্যোগী যামিনী বাবুকে হারালেন তাঁহার পড়ুয়া সন্তানেরা। ফলে সংসারে দেখা দিল আর্থিক অসুবিধা। তখন দ্বিজেন্দ্রবিনোদ কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে বি, এস-সি-র ছাত্র। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা ও কুমিল্লা কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে তিনি আই, এস-সি পাশ করেন। ফিজিক্সে অনার্স সহ গ্রাজুয়েট হইয়া ১৯৩৫ সালে তিনি Applied Physics-এ প্রথম শ্রেণীর তৃতীয় হিসাবে এম, এস-সি ডিগ্রী লইয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করিতে থাকেন। ইহার পর ১৯৩৭ সালে তিনি আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ১৯৪৪ সালে বিজ্ঞান কলেজে আংশিক সময়ের জন্য লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫০ এর এপ্রিল

ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ রায়

মাসে (দীর্ঘ তের বৎসর আশুতোষ কলেজে থাকার পর) তিনি বিজ্ঞান কলেজে পাকাপাকি ভাবে যুক্ত হন।

ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ লইয়া শ্রীসিংহরায় ১৯৫২ সনে টেডিংটন জাতীয় গবেষণাগারের ফিজিক্স বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫৩র জানুয়ারী হইতে তিনি লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজে গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত হন এবং A study of the Mechanism of Nuclear Boiling নামক প্রবন্ধ দাখিল করিয়া তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ফ্যাকালটি অব ইনজিনিয়ারীং এর D. I. C. হন। Specialized in Heat Transfer তাঁহার গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল। এই সময়ে তাঁাকে ব্রিটিশ ফিজিক্যাল সোসাইটী ও লণ্ডন ইনঃ অব ফিজিক্স এর সদস্য করা হয়। টেডিংটন ও লণ্ডনে তিনি অধ্যাপক ই গ্রিফিথস এফ, আর, এস এবং অধ্যাপক ডি. এম, নিউইট এফ, আর, এস, র অধীনে কার্য্য করেন। বিলাতে থাকার সময় ছুটীতে তিনি পশ্চিম জার্ম্মাণীর কয়লা, ইস্পাত ও অক্সিজেন শিল্পাঞ্চলসমূহ, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি যুদ্ধোত্তর দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জার্ম্মাণ ও ব্রিটিশ Physical Societyর যুগ্ম সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ডাঃ সিংহরায় যোগদান করেন। আমেসটারড্যাম Van-Der-Wal ও ইংল্যাণ্ডের Cavendish Laboratory পরিদর্শন ও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সালের মে মাসে ভারতে ফেরার পর বৎসর এপ্রিলে তিনি বিজ্ঞান কলেজের রীডার নিযুক্ত হন। মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স এর এসোঃ প্রফেসর নিযুক্ত হন কিন্তু ডাঃ সিংহরায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধ্যাপনা জীবনের প্রথমে পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অকুণ্ঠ দরদ ও বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের পর অধ্যাপক পি, এন, ঘোষ এবং অধ্যাপক পি, সি, মহান্তির স্বার্থহীন সহযোগিতা দ্বিজেন্দ্রবিনোদবাবু কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইউনিয়নের সম্পাদক, বিজ্ঞান পরিষদের (বিঃ কলেজ) প্রথম সম্পাদক, ভারতীয় ফিজিকাল সোসাইটীর বর্ত্তমান কর্ম্মসচিব। সিনেটের সদস্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি জড়িত ছিলেন বা আছেন।

১৯৪১ সাল হইতে এই পর্য্যন্ত তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং ভারতীয়, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্ব্বাচিত বই হিসাবে সেগুলি চলিতেছে। ১৯৪১ সালে তিনি ফরিদপুরের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চৌধুরীর তনয়া শ্রীমতী কণিকা দেবীকে বিবাহ করেন। ছবি তোলা তাঁহার 'হবি'। ছাত্রজীবনে 'লীগ অব নেশনস' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পুরস্কার পান। য়ুরোপে থাকার সময় তিনি মহাকবি গ্যেটে ও সেক্সপীয়ারের গৃহে প্রায়ই যাইতেন।

শেষে তিনি বলেন যে, বিজ্ঞান কলেজে এমন কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক রহিয়াছেন—যাঁদের সহায়তায় রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদীনিয়ন্ত্রণ, খাদ্যবৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রভৃতি সমাজহিতকর কার্য্যগুলি সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কারণ এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকগণ বাঙ্গালা তথা ভারতের নানা সমস্যার সমাধানে আগ্রহশীল আর তাঁহারা বরাবর রাজনৈতিক দলাদলির বাহিরে থাকিয়া নিজেদের গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন।

ত্রয়ী —রামকিঙ্কর সিংহ

॥ আলোকচিত্র ॥

সুকেশী —তপতী আচার্য্য

অবগুণ্ঠিতা —মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয় —শ্রীপথিক মুখোপাধ্যায়

খেয়ালী শিশু

—ডাঃ অমূল্যকুমার ঘোষ

—মন্টু ঘোষ

আজমীর শরিফ —সাধনা সো .

ঊর্মিমালা —অমিয় চক্রবর্তী
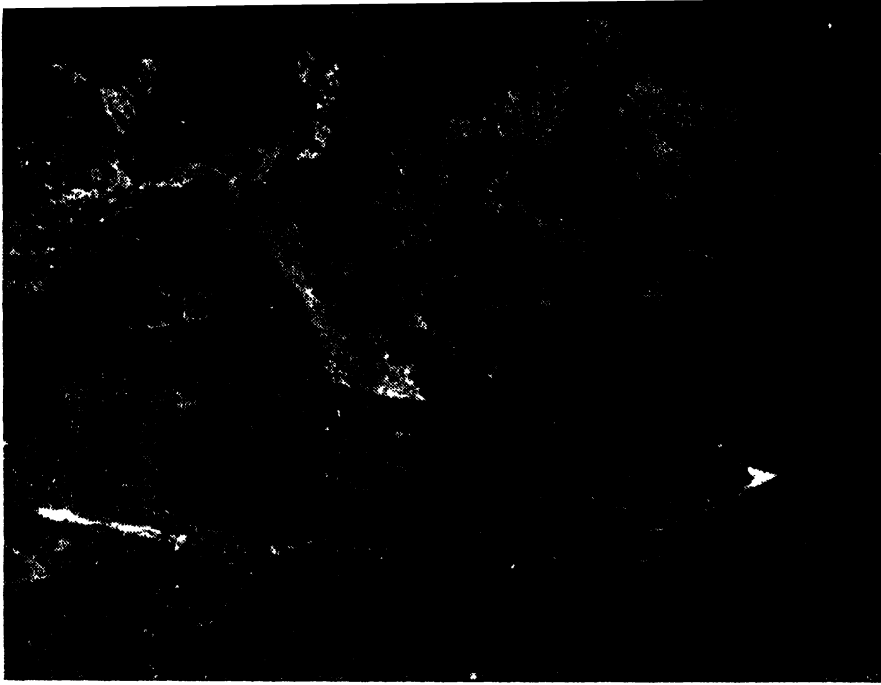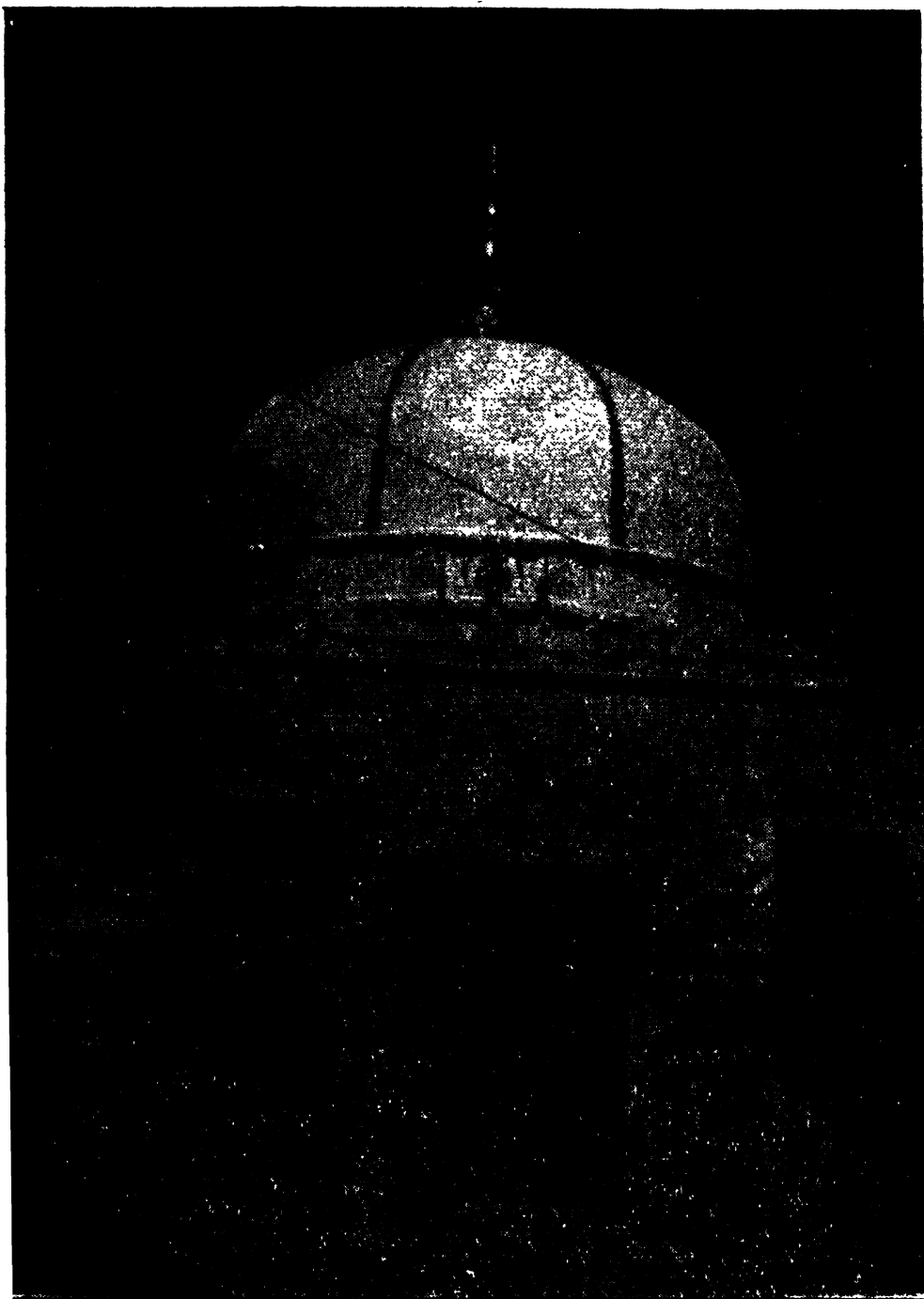
চলো শ্রীধরের ওখানে যাই এবার। নিমাই বললে পড়ুয়াদের। যদি সেখানে জিততে পারি তবেই আমার জয়কার।

শ্রীধর বাজারে কলার খোলা বেচে, বেচে থোর মোচা। সামান্য আয়ের মানুষ, তা থেকে যদি বা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে কৃষ্ণসেবায় ব্যয় করে। যদি উদ্বৃত্ত না থাকে তাতেও দুঃখ নেই, মুখের নাম কে হরণ করবে? দিবানিশি উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ বলে। এত জোরে চেঁচায় পাশের বাড়ির লোক ঘুমুতে পারে না।

'এই উপদ্রবের মানে কী?' নিমাই প্রায় তেড়ে আসে।

নিমাইকে ভীষণ ভয় করে শ্রীধর। বলে, 'বেশ এবার থেকে আস্তে আস্তে নাম করব।'

'কী দরকার এত হাঁক ডাকে? এতকাল তো হরি-হরি করলে কিন্তু হল কী?' নিমাই রুখে থাকে তেমনি। 'অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচল?'

'কই আমার অভাব কই? আমি তো উপোস করে থাকিনা, আর ছোট হোক বড় হোক কাপড়ও তো পরি। রাজা রত্নঘরে থাকুক কিন্তু পাখিও তো আছে বৃক্ষশাখে। রত্ন নেই বলে পাখির দুঃখ নেই। তেমনি তো তার আকাশ আছে।'

'তোমার যখন এত সুখ তখন বিনাদামে জিনিস দাও।' শ্রীধরের সওদাপাতিতে হাত দিল নিমাই।

মুঠো চেপে ধরে বাধা দিল শ্রীধর। বললে, 'জিনিস নেবে তো দাম দিয়ে নেবে, কেড়ে নেবে কেন?'

'তোমার তো অনেক আছে। তবে দেবে না কেন?'

'আমি গরীব, আমার আবার কি থাকবে?'

'তুমি আসলে কৃপণ, দান করতে চাও না।' নিমাই চোখ পাকাল।

'যাই হই, পণ্যের দাম ছাড়তে পারব না। তুমি বরং অন্য দোকানির কাছে যাও।'

'তুমি বললেই হবে? আমার জোগানদার তুমি, আমাকে তোমার কাছ থেকেই নিতে হবে।' নির্বিচল দাঁড়িয়ে রইল নিমাই।

'ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি। আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কোরো না।' করজোড়ে মিনতি করল শ্রীধর।

'না, দ্বন্দ্ব কিসের? নিজের জিনিস নিজে নেব তাতে কার কী মাথাব্যথা? একখাবলা তরকারি তুলে নিল নিমাই।'

'তোমার পায়ে পড়ি। গরীবের তুমি ক্ষতি কোরো না। অন্য দোকানে গিয়ে দৌরাত্ম্য করো।' হাতের থেকে প্রায় আদ্ধেক জিনিস কেড়ে নিল শ্রীধর।

নিমাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'তুমি আমার হাতের জিনিস কেড়ে নিচ্ছ?'

'সবটা নিতে পারলাম কই? ওগো, বাকিটাও ফিরিয়ে দাও।'

নিমাই তবু নরম হল না, বললে, 'এই দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেওয়াটা কি ভালো হল?'

'বা, আমি তোমাকে দিলাম কখন? তুমিই তো জোর করে তুলে নিয়েছ।'

'জানো আমি কে?'

'তা কে না জানে? তুমি টোলের পণ্ডিত, ঔদ্ধত্যের অবতার।'

'আজ্ঞে না। তুমি গঙ্গাকে চেন তো? যে গঙ্গায় প্রতিদিন নৈবেদ্য দাও? কি, চেন?'

বা, পারকর্ত্রী ভগভাগ্যবতী গঙ্গাকে চিনি না? সর্বশ্রমহরা সর্বদুঃখ প্রশমনী। শুদ্ধস্রোতা, তেজোজ্জ্বলা, মধুরদ্রবা। হরিকন্যা পরমার্থা-পুরাতনী।

'বা চিনি বৈকি।'

'সেই গঙ্গার বাপ আমি।'

'ছি-ছি-ছি।' দু হাত দিয়ে কান ঢাকল শ্রীধর। বিষ্ণু-বিষ্ণু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ধীর হয়, ভদ্র হয়, তুমি একেবারে বিপরীত। যতই তোমার বয়স বাড়ছে ততই তুমি দুর্বিনীত হচ্ছ। তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নেই?'

'আমার কাউকেই ভয় নেই। তুমি যদি তোমার দেবতাকে, গঙ্গাকে, বিনিদামে রোজ নৈবেদ্য দিতে পারো, আমাকে বিনিদামে না [illegible]

তো দিতে, পারো। মেয়ে অমনি অমনি পাবে তার বাপ দাম কিছু ধরে দিলেও পাবেনা খানিকটা?'

'বেশ, তোমাকেও অমনি দেব। দাম কমাতে পারবনা।' হাত ছেড়ে দিল শ্রীধর।

'দেবে?' উজ্জ্বল চোখে হাসতে লাগল নিমাই। 'যা বিনিদামে পাওয়া যায় তার মূল্যই অসীম। হোক সে সামান্য, দেওয়ার গুণেই অপরূপ। কিন্তু দেবে কী শুনি?'

'রোজ একটুকরো থোর আর খোলার পাত্র দেব তোমাকে আজীবন।'

'দেবে?'

'দেব। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আর দ্বন্দ্ব কোরো না।'

'না, দ্বন্দ্ব কোথায়? তোমার খোলায় আমি খাব। তোমার থোর মোচাই শ্রীব্যঞ্জন হয়ে উঠবে।'

প্রভু, আমি মূঢ়, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করছে: স্বপ্নতুল্য দেহ পুত্র গৃহ দারা অর্থ ও স্বজনকে সত্য ভেবে ঘুরে মরছি। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে অনিত্যে ও অনাত্মে বিপরীত বুদ্ধি করছি, দ্বন্দ্বে ক্রীড়া করছি সর্বক্ষণ। যা আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই আত্মাকেই জানছি না। তৃণাচ্ছন্ন স্নিগ্ধ জল ছেড়ে মৃগতৃষ্ণার দিকে ছুটছি। তোমাকে ত্যাগ করে ছুটছি দেহাভিমুখে। আমি বিষয়-বাসনায় বিভ্রান্ত, কামে ও কমে ক্ষুভিত, উন্মাদী। মনকে সংযত করতে অসমর্থ। প্রভু, মানুষের সংসারের সমাপ্তি যখন কাছে আসে তখনই সাধুসেবায় তোমার প্রতি তার মমতা হয়। কিন্তু তোমার কৃপা না হলে কে বা করে সাধুসেবা, কার সাধ্য তোমাতে মতি আনে। তুমিই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারণ-আকর। তুমিই পরিপূর্ণ। তুমিই সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিষ্ঠাতা। তোমারই পদপরবশ হলাম, আমাকে পরিত্রাণ করো।

১৫

'মা, আমি কিছু দিন প্রবাস করে আসি।'

শচী চমকে উঠল। 'কোথায়?'

'পদ্মায়। পূর্ববঙ্গে।'

শচী চাইল নিবৃত্ত করতে কিন্তু নিমাই টলল না। লক্ষ্মীকে বললে, মাকে দেখো। মাকে বললে, দেখো লক্ষ্মীকে।

অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত এসেছে, দলে দলে লোক আসছে দিক-দিগন্তর থেকে। পড়ুয়ারা বললে, ভেবেছিলাম নবদ্বীপ যাব, মূর্তিমন্ত বৃহস্পতি দ্বারে এসে দাঁড়াল। তোমার টিপ্পনী মিলিয়ে ব্যাকরণ অভ্যাস করি আমরা, এবার সাক্ষাৎ শিষ্য করো আমাদের। তোমার মুখের অমৃতবচন শুনি।

অমৃতবচনই শোনাতে এসেছি তোমাদের কাছে। প্রথমে নবদ্বীপে না হয়ে এই পদ্মাপূত পূর্বাঞ্চলে। সে বচন পার্থিব বিদ্যা নয়, অমর্ত বিদ্যা।

সে বিদ্যার নাম কি?

সে বিদ্যার নাম হরিনাম। পরিণামে হরিনাম।

এ কী আশ্চর্য কথা!

যে নিমাই উদ্ধতের শিরোমণি, চঞ্চলের জয়োত্তম, দিবানিশি যে পুঁথি-পাঁতি নিয়ে বিভোর, বৈষ্ণবে যার প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা, সে কি না এখন হরিনাম বলছে। শুধু বলছে না স্ফুটকণ্ঠে কীর্তন লাগিয়েছে। শুধু পথে-পথে নয়, নদীতে, নৌকোয়, এপারে-ওপারে। সজ্জন-দুর্জন আচারী-বিচারী অক্ষম-অধম, পতিত-পীড়িত—সবাইকে এক নৌকোর সোয়ারী করে এক বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে। এক আনন্দের বন্দরে।

নিমাইয়ের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে দাঁড়াল এক ব্রাহ্মণ। শুচিভাস্বর মূর্তি।

'কে?'

'আমি তপন মিশ্র।'

'কী চাই?' দৃষ্টি আয়ত করল নিমাই।

'সাধ্য-সাধন বুঝতে চাই। বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে চিত্তের বিভ্রম ঘটেছে।' দুই হাত যুক্ত করল তপন। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

'আমি সাধ্য-সাধনের কী জানি?'

'প্রভু, আপনি জানেন না তো আর কে জানে? কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, এক ব্রাহ্মণ এসে আমাকে বলছে, তপন, নিমাই পণ্ডিত এসেছে, যদি সাধ্যসাধন জানতে চাও তো তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো। জানবে সেই নরনারায়ণ, সেই পূর্ণব্রহ্ম। তার কাছ থেকে জেনে নাও রহস্য। আর এ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা কোথাও যেন আর প্রকাশ কোরো না।'

'শুন শুন ওহে দ্বিজ পরমসুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো—নরনারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ॥

বেদগোপ্য এসকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্মজন্মান্তরে ॥'

যা পাবার জন্যে লোকে ভজনা করে তার নাম সাধ্য। আর সাধ্যবস্তুকে পাবার জন্যে যে অনুষ্ঠান বা আচরণ তার নাম সাধন।

তোমার সাধ্য যদি স্বর্গপ্রাপ্তি, তাহলে সাধন তোমার বেদবিহিত কর্মের উদ্‌যাপন। তোমার সাধ্য যদি পরমাত্মায় মিলন, তাহলে সাধন তোমার যোগ। তোমার সাধ্য যদি ব্রহ্মসাযুজ্য তাহলে সাধন তোমার জ্ঞান। তোমার সাধ্য যদি ভগবৎসেবা, তাহলে সাধন তোমার ভক্তি, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান।

এখন বলো সাধ্য-সাধনের শ্রেষ্ঠ কী? কর্মযোগ, জ্ঞান, ভক্তি—কোনটা? তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি না বললে আর কে বলবে?

'না, এসব কথা বলবে না। জীবে ভগবৎবুদ্ধি মহা পাপ।' নিমাই পাশ কাটাতে চাইল।

'ওসব কথা শুনছি না। তুমি যদি গোবিন্দ না হবে, মাধব না হবে, তবে এই অখ্যাত দেশে আসবে কেন? কেন দেখা দেবে এই অবজ্ঞাতকে?'

'তুমি কী ভাগ্যবান!' বললে নিমাই, 'কৃষ্ণভজনে তোমার রতি হয়েছে।'

'কৃষ্ণভজন?'

'হাঁ, কৃষ্ণই সাধ্য, ভজনই সাধনা।'

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই সাধ্য, একমাত্র কাম্যবস্তু। আর, সাধন এককথায় নামকীর্তন। মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্। ভগবানের নাম সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগমলতার সৎফল এবং অপ্রাকৃত চৈতন্যস্বরূপ।

শিষ্য গুরুকে বললে, আপনি সাধনের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমার পক্ষে অশক্য। যদি শরীরের দ্বারা নিষ্পাদ্য কোনো সাধন থাকে তাই আমাকে বলুন। মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য কোনো কিছুই করতে পারব না, কেন না মন বড় চঞ্চল।

গুরু বললে, বেশ, তোমাকে একটি স্বল্প সাধনের কথা বলছি। তা আর কিছু নয়, গোবিন্দকীর্তন। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ঘুমুতে যাবার আগে ঘুম থেকে চোখমেলে এমন কি পতনকালেও গোবিন্দ-গোবিন্দ বলবে। নামকীর্তন চিত্তচাঞ্চল্যেরও অপেক্ষা রাখে না। চিত্তচাঞ্চল্যেও চলে নামকীর্তন।

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন॥
ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবনধন প্রাণ॥

'কী ভাবে ভজন হবে?' জিগ্‌গেস করল তপন।

'শুধু কেশবের নাম করবে। কলির যুগধর্মই নামকীর্তন।' বললে নিমাই। 'সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা আর কলিতে শুধু হরিকীর্তন।'

'শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥'

'শুধুই নাম?'

'হ্যাঁ, শুধুই নাম।'

'এই সাধ্য-সাধন?'

'হ্যাঁ, এই সাধ্যসাধন। সমস্ত তত্ত্ব এই হরিনাম-সঙ্কীর্তনে।'

'কিন্তু মন্ত্র কী?'

'মন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।' নিমাই তদগত-তন্ময় হয়ে বললে, 'কলিকল্মষনাশক তারকব্রহ্ম নাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ কলিতে অশেষ দোষ, তবু তার একটি মাত্র গুণ আছে। সে হচ্ছে কৃষ্ণকীর্তনের আরাম। একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনের ফলেই সংসারাসক্তি থেকে মুক্তি ঘটে। যাওয়া যায় পরমধামে।'

আদিপুরুষ নারায়ণের নামেই কলির সর্বদোষের নিবারণ। কলিদোষাপহারক কৃষ্ণনাম। সর্বচিত্তহর বলে হরি, সর্বচিত্তাকর্ষক বলে কৃষ্ণ, সর্বচিত্তাভিরাম বলে রাম।

'তন্নাম কিমিতি।' নারদের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মাকে। সেই নামটি কী?

সেই নাম ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। ব্রহ্মা বললে, সমস্ত বেদে এর চেয়ে পরতর আর কিছু নেই।

সেই নাম কীর্তনের বিধি কী?

এর কোনো বিধি নেই। আসন নেই বাসন নেই, রীতি নেই নীতি নেই, নেইবা সংখ্যাপূরণের দায়িত্ব। গোপন-গোচর নেই। সজন বিজন নেই। শুনতে হলে লোকে শুনুক, না শুনলেও বা কী এসে গেল। সর্বত্র পূর্তি, সর্বত্র স্ফূর্তি, সর্বত্র স্বতন্ত্র।

প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা সভে জপ গিয়া করিয়া নির্বন্ধ॥

ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইব সভার।
সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ হরিনাম। আর কিছু নয়, শুধু নামৈকশরণ হয়ে থাকো।

'কিন্তু মনের মধ্যে যে অনেক মল, অনেক কুটিলতা।' করুণ নেত্রে তাকাল মিশ্র।

'নাম করতে করতে দেখবে মন স্থির হয়েছে, স্বচ্ছ হয়েছে, স্বাদু হয়েছে। জানো তো, যার পিত্ত বেশি তার মিছরিও তিক্ত লাগে। ঐ তিক্ততার ওষুধই আবার মিছরি।' নিমাই বললে, 'মিছরি আগে তিক্ততা কাটাবে পরে প্রতিষ্ঠিত করবে তার মিষ্টত্ব। তাই নাম আগে চিত্তকে শুদ্ধ করবে পরে জাগবে কৃষ্ণরতির মাধুর্য। অভ্যাস থেকে চলে আসবে অনুরাগে। আর তখনই বুঝবে কোন্ সাধ্যের জন্যে কী সাধন। কৃষ্ণ প্রেম পাবার জন্যেই কৃষ্ণ কীর্তন। সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে।'

বারে বারে প্রণাম করতে লাগল তপন। বললে, 'যদি অনুমতি করেন তো আপনার সঙ্গে যাই নবদ্বীপ।'

নিমাই উঠে দাঁড়াল। আলিঙ্গন করল তপনকে। বললে, 'না নবদ্বীপ নয়, তুমি কাশী চলে যাও।'

'কাশী? আপনার সঙ্গ ছেড়ে কাশী।' প্রেম-পুলকিত অঙ্গে বিভোর তপন মিশ্র।

'হ্যাঁ, আমিও শিগগির যাচ্ছি সেখানে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করতে হবে। সেখানে তোমার সঙ্গে আমি মিলব, সেখানে তুমি আমার সহচর।'

প্রভুর অতর্ক্য লীলা নির্ণয় করি কী করে? যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগল তপন।

কয়েক মাস পরে বহু ধন-জন নিয়ে নিমাই বাড়ি ফিরল। কিন্তু বাড়িতে আনন্দ নেই কেন? মা এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু মুখে হাসি কই?

'এ কি মা, কী হয়েছে?'

অঝোরে কেঁদে ফেললেন শচী দেবী। 'ঘর লক্ষ্মী শূন্য। লক্ষ্মী চলে গেছে বৈকুণ্ঠে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নিমাই। কান্না ভরা চোখে জিগগেস করল, 'কী হয়েছিল?'

নিজের মনে শান্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, তবু নিরবধি শাশুড়ির সেবা করে চলেছে। নাম মাত্র খায় আর একলা ঈশ্বরবিরহে সমস্ত রাত কাঁদে। ভোর হলে বিষাদের প্রতিমার মত সংসারসীমায় এসে দাঁড়ায়। প্রভুর বিরহই বুঝি একদিন সাপ হয়ে দেখা দিল ঘরের মধ্যে। লক্ষ্মীর পায়ে এসে দংশন করল। কত ওঝা ডাকলেন শচী, কত বিষবৈদ্য, কিছুতেই কিছু হল না। প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে নিয়ে লক্ষ্মী চোখ বুজল।

প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহসর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥

তারপর?

তুলসীদামে সাজিয়ে তাকে আনা হল গঙ্গাতীরে। উঠল হরিনাম কীর্তনের তুফান। ধ্বনিত হল লক্ষ্মীর বিজয়-যাত্রার রথধ্বনি।

শচী শোকে একেবারে ভেঙে পড়লেন।

লোকানুকরণ দুঃখ নিমাইকেও পেয়ে বসল ক্ষণকাল। পরে আত্মস্থ হয়ে বললে, 'মা, কার কে পতি? কার কে পুত্র? শুধু মোহই পতি পুত্র প্রতীতির কারণ। সমস্ত সংসার ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরের অনুবর্তী। যত সংযোগ বিয়োগ সব ঈশ্বর ইচ্ছায়। সুতরাং যা ঈশ্বর ইচ্ছায় ঘটছে তার জন্যে দুঃখ কিসের?'

চোখ মুছলেও জল থেকে যায় শচীর চোখে।

নিমাই বললে, 'তার কত বড় সুকৃতি বলো তো। সে স্বামীর আগে গিয়েছে, স্ত্রীর এর চেয়ে আর বড় কী আকাঙ্ক্ষার থাকতে পারে? স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি। তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী? মৃত্যু কোথায়? সমস্ত শোকের পরপারে আনন্দস্বরূপের অবস্থান। তাকে দেখ'

একলে ঈশ্বর তত্ত্ব—চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥

অন্যনিরপেক্ষ ভগবান ভক্তভাব ধরেছেন অভাববশে নয় স্বভাব বশে। রসিকশেখর কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণ নিজের বিগ্রহ বা শরীরের চেয়েও ভক্তকে প্রিয়তর বলে মানে। ভক্ত শুধু কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করে না কৃষ্ণমাধুর্য চর্বণ করে।

তুমি আমার প্রিয়তম। উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যত প্রিয় আত্মযোনি ব্রহ্মা তত নয়, নয় শঙ্কর, নয়বা সঙ্কর্ষণ। অন্যে কা কথা লক্ষ্মীও তত প্রিয় নয়। তোমাকে বলব কি উদ্ধব, আমি নিজেও আমার কাছে তত প্রিয় নই।

[ক্রমশঃ।
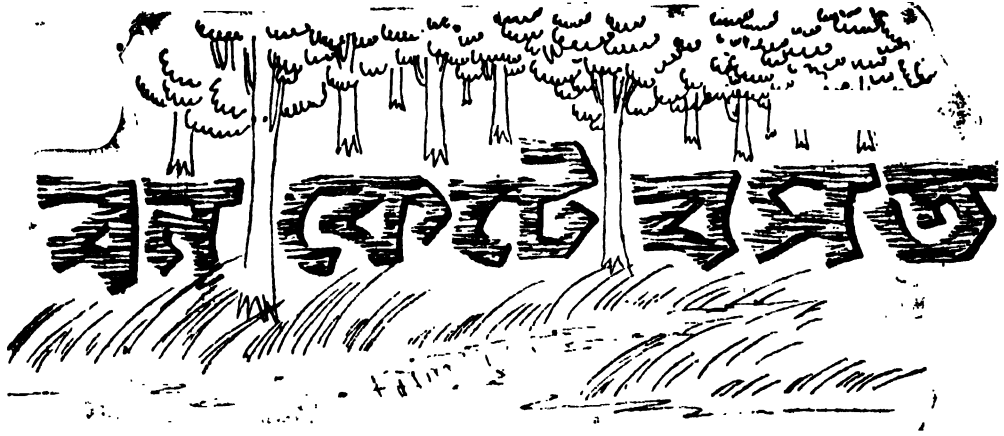
পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

বাইশ

চলে গেল জগা চৌধুরিগঞ্জের আলায়। অনিরুদ্ধ কালোসোনা এবং আরও কত পুরানো সাঙাৎ—হাঁ করে তারা তাকিয়ে থাকে। চোখে দেখেও যেন চিনতে পারছে না। এমন আচমকা এসে পড়া—কোন মতলব নিয়ে এসেছে কে জানে? বসতে বলে না তাকে কেউ। অনিরুদ্ধ তামাক খাচ্ছিল, হাতের কলকেটা এগিয়ে দিল না। অর্থাৎ সেই যে জাতক্রোধ নৌকা সরানো থেকে, এত দিনেও সেটা কিছুমাত্র নরম হয় নি।

জগাই তখন কৈফিয়তের মতো দুটো চারটে কথা খাড়া করে: চলে যাচ্ছি তোমাদের তল্লাট ছেড়ে। তাই ভাবলাম, কে কেমন আছ একবার খবরটা নিয়ে যাই।

ফাঁকা কথা বলেই বোধহয় কানে নিচ্ছে না। আরও তাই বিশদ করে বলতে হল। উদাসী মন নিয়ে এসেছে, কোনরকম বদ মতলব নেই—ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে ওদের নিশ্চিন্ত করে। বলে, বয়ারখোলা যাচ্ছি, আর আসব না। গগন দাস তো কালকের মানুষ, বাদাবনে এই সেদিন এল। যাবার আগে, বলছিলাম কি, আমাদের পুরানো আড্ডা জমানো যাক কয়েকটা দিন। সেই আমাদের পুরানো সবাইকে নিয়ে।

এতক্ষণে অনিরুদ্ধর মুখ খুলল। জগার দিকে চেয়ে সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করে, বয়ারখোলায় কেন?

যাত্রার দল খুলছে ওরা। খুব ধুমধাড়াক্কা।

কালোসোনা বলে, পাঠশালা খোলে তো ওরা বছর বছর। এবারে যাত্রার ঝোঁক উঠল?

ফলন যে দুনো-তেদুনো এবারে। মা-লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে ঢেলেছেন। মনে বড্ড সুখ। তাই বলছে, পাঠশাল শুধু ছেলেদের নিয়ে। যাত্রা হলে ছেলে-বুড়ো সবাই গিয়ে বসতে পারবে। বিবেক পাচ্ছে না, আমায় ধরে তাই টানাটানি। আর সত্যিই তো—গাঙে-খালে বার মাস মেছো-নৌকো বেয়ে বেড়াবার মানুষ কি আমি? গলাখান তো শুনেছ—বল তোমরা সব। শখ হয়েছিল, দুটো-তিনটে বছর এই সব করা গেল। এ মুলুকে মাছের খাতা ছিল না, গড়ে পিটে দিয়ে গেলাম একটা। পয়সা-কড়ি আসছে—রক্তের গন্ধে ছিনেজোঁকের মতো গাঁ-ঘর থেকে কিলবিল করে সব এসে পড়েছে। করে থাক সগোষ্ঠী মিলে। আমি আর ওর মধ্যে নেই দাদা। ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। যাত্রার মানুষ আমরা হলাম বসন্তের কোকিল। যে বাড়ি মচ্ছব সেইখানে ডাক আমাদের। নেচে গেয়ে আমোদস্ফূর্তি করে ঘুরব।

কালোসোনা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, যাচ্ছ কবে এখান থেকে?

পা বাড়িয়ে বসে আছি। গেলেই হল। কিন্তু যে জন্যে এসেছি শোন। যাবার আগে ক'টা দিন গলাখান মেজেঘষে শান দিয়ে নিই। গানবাজনা তো একলা মানুষের ব্যাপার নয়। সন্ধ্যের সময় যে যে পার চলে যেও আমার বাড়ি—আমার চালাঘরে। পথ তো এইটুকু। আলায় মাছ উঠবার সময় হলেই আবার চলে আসবে।

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা যাব তোমার ওখানে?

জগা অনুনয় করে বলে, পুরানো রাগ মনে পুষে রেখ না। ন্যায়-অন্যায় যা কিছু করেছি, সে তো গগন দাসের জন্য। তোমরাও যেমন চৌধুরি বাবুদের জন্য করে থাক। শখ করে কি করি কিছু আমরা? কাজের গরজে করতে হয়, আমাদের হাত ধরে করিয়ে নেয়। নিজেদের মধ্যে কি জন্যে তবে গরম হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে থাকি?

বুঝিয়ে সুজিয়ে একরকম মিটমাট করে জগা ফিরে এলো। সে যেন আপদ-বালাই—বিদায় হয়ে গেলেই তল্লাটের মানুষ বাঁচে। লোক-দেখানো ভাবে মুখেও ওরা কেউ বলতে পারত, একেবারে চলে যাবে কি জন্যে, এসো ফিরে আবার। তা কেউ বলল না—যাওয়ার ব্যবস্থা পাছে সে বাতিল করে দেয় ঐ একটু অনুরোধের অজুহাত পেয়ে। চৌধুরিগঞ্জ শত্রুপক্ষ, তাদের কথা থাক—কিন্তু নতুন আলার গগনের দলবলই বা কী! কাজকর্ম দিব্যি চালু হয়ে গেছে, বলাই-পচা মেছো নৌকো নিয়ে নির্গোলে কুমিরমারি যাচ্ছে, আর জগাকে কার কোন দরকার? সেই একটা মানুষ চালাঘরে একলা পড়ে গজরায়, সে কথা মনে রাখার গরজ নেই এখন কারও।

সেইটেই বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার বাঞ্ছা। চালাঘরের মধ্যে ভিন্ন একটা দল হয়ে ঢোল পিটিয়ে গান গেয়ে জানান দেওয়া যে আমরাও আছি অনেক জন—তোমরা সমস্ত নও। তোমাদের বড় বাইন হয়েছে বলাই, আর বড় গায়েন বোধ করি গগন দাস—ওই এক মজাদার গান হয়ে থাকে, আর গান শুনো আজকে আমাদের।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে করালী পার হয়ে একবার বরাপোতার দিকে যেতে হল। মানুষজন এসে জুটবে, পান-সুপারি তো চাই। তামাক বড়-তামাক দুটোরই ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর কিছু ছাঁচ-বাতাসা আনলেও মন্দ হয় না, আড্ডা ভাঙার পর হরির লুঠের নামে আরও কিছু হুল্লোড় করা যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। জগা ফিরে আসছে বরাপোতা থেকে। খালের ঘাটে ডিঙি। ফিরেছে তবে পচা-বলাই। গাঙে গোন পেয়েছে, পিঠেন বাতাস—তাই এত সকাল সকাল ফিরল। আলায় ঢুকে মালিক গগন দাসের সঙ্গে হিসাবপত্র মেটাচ্ছে। ফিরে এসে নৌকো ধোবে এখনই। ভাল হয়েছে, পচা বলাই আলা থেকে বেরোক, ধরবে তাদের। ধরে সোজাসুজি বলবে, আজকের আড্ডা নতুন আলায় নয়, সাঁইতলার পাড়ার মধ্যে—নিজেদের চালাঘরে। গাওনা-বাজনা সেখানে আজ। চৌধুরিগঞ্জ থেকে ওরা সব আসছে—ঘরের মানুষ তোমরা থাকবে না, সেটা কোন মতে হতে পারে না।

বাঁধের ধারে ঝোপের একটু আড়াল হয়ে সে দাঁড়াল। আচমকা বেরিয়ে অবাক করে দেবে। আলার কাজ সেরে পচা-বলাই বাঁধে এসে পড়ল। দু-হাতে দুটো কলসি প্রতি জনের। কলসি নিয়ে চলল কোথা এখন এই অবেলায়?

খালে নেমে যাচ্ছে। জগা ডাকল, বলাই—

বলাই থমকে দাঁড়াল।

নৌকোয় আবার বেরোবি নাকি? এই তো ফিরে এলি।

মুখ কাচুমাচু করে বলাই বলে, আলার মিঠে জল ফুরিয়ে গেছে। একেবারে ফুরিয়েছে। রাত্তিরে খাবার মতোও নেই। না এনে দিলে নয়। ঘুরে আসি বরাপোতার পার থেকে। কতক্ষণ আর লাগবে!

আবার বলে, কুমিরমারি থেকে খালি ডিঙি বেয়ে নিয়ে এলাম। সকালে যদি বলে দিত, টিউকলের জল ধরে আনতাম ওখান থেকে। যত কলসি খুশি। এই ভোগ ভুগতে হ'ত না।

জগা বলে, চার চারটে কলসি নিয়ে চললি—এত জল কে খাবে? সন্নিপাতের তেষ্টা কার পেল রে?

পচা বলে, খাবে, রান্নাবান্না করবে—

চানও করবে নাকি? বাদাবনে এত নবাবি কার—চারি ঠাকরুনের?

বলাই বলে, কলসি-মাপা জল—চান করে আর কেমন করে? চান-টান সেরে এসে কলসির জলে গামছা ভিজিয়ে তার পরে গা-হাত-পা মুছে নেয়, গায়ে ঢালে এক ঘটি দু-ঘটি। নয় তো নোনা জলে ওর গা চটচট করে।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, মরেছিস তোরা হতভাগা। একেবারে গোল্লায় গেছিস—

বলাই বলে, অভ্যেস নেই, কি করবে? গায়ে নাকি কি সব উঠেছে নুনে জরে গিয়ে। অভ্যেস হয়ে যাবে, তখন আর মিঠে জল লাগবে না।

মরদ হয়ে মেয়েমানুষের নাওয়ার জল বয়ে বেড়াস, মুখ দেখাচ্ছিস কেমন করে তোবা?

বলাই মুসড়ে যায়, মুখ নিচু করে। পচা কিন্তু কিছুমাত্র লজ্জা পায় না। গালি শুনে দাঁত মেলে হাসে। কী যেন মহৎ কর্ম করেছে, পরমানন্দে তার যশোকীর্তন শুনছে।

বলাইকে ধরে ফেলল গিয়ে জগা। কঠিন মুষ্টিতে হাত চেপে ধরেছে। বলে, কলসি রাখ। মানুষজন আসছে আজ বাড়িতে। চৌধুরির আলা থেকেও আসছে। তোর এখন কোথাও যাওয়া হবে না। যায় পচা একলা চলে যাক।

বলাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে—হাঁ-না কিছু রা কাড়ে না। জগন্নাথ গর্জন করে বলে, ফেলে দে কলসি। ভালর তরে বলছি।

একটা কলসি কেড়ে নিয়ে রাগের বশে সত্যি সত্যি ছুঁড়ে দিল। চুরমার হয়ে গেল। পচা চেঁচিয়ে ওঠে, আচ্ছা মানুষ তো। কলসি ভেঙে দিলে, কদ্দুর থেকে জোগাড় করে আনতে হয় জান?

হাত ছেড়ে দিয়ে জগা বলাইকে বলে, আসবি নে?

পচা ইতিমধ্যে ডিঙিতে উঠে পড়েছে। পিছন ফিরে বলাই একবার তার দিকে তাকাল।

জগা বলে, জবাব দে।

বলাই বলে, ফিরে এসে তার পরে যা। এক্ষুণি ফিরব, বেশি দেরি হবে না।

মরগে যা—

নাগালের মধ্যে পেলে জগা গলাধাক্কা দিত হয়তো। কিন্তু বলাই তখন নৌকোয় উঠে পড়েছে।

কাউকে দরকার নেই। ভারি তো কাজ! এবাড়ি ওবাড়ি থেকে একটা দুটো হোগলার পাটি কিম্বা মাদুর চেয়ে এনে পেতে দেওয়া। না দিলেও ক্ষতি নেই, মাটিতে সব বসে পড়বে।

চৌধুরির আলা থেকে অনিরুদ্ধ এল তিন চার জনকে সঙ্গে নিয়ে। পাড়ার ভিতর জগার ঘরে জমায়েত—সাঁইতলা ও আশপাশের মাছ-মারারা সব এলো। রাত গভীর হলে এইখান থেকে জালের কাজে বেরোবে। ছোট চালাঘরে জায়গা দিতে পারে না। খুব চলল। এখানে বসে যা মুখে আসে বলতে পারে, যে গান খুশি গাইতে পার। শাসন-বাঁধন নেই—উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া। আড্ডার মাঝখানে উঠে একবার জগা চুপি চুপি বাঁধের উপরে ঘুরে দেখে এলো। নতুন আলায় সাড়াশব্দ নেই, মিটমিট করে আলো জ্বলছে একটা। খালের ঘাটে ডিঙি—পচা-বলাই অতএব ফিরে এসেছে। কিন্তু অন্য দিনের মতো নাম-কীর্তন নয়, ভক্ত ক'টিকে নিয়ে গগন দাস আজকে বোধ হয় ধ্যানে বসে গেছে।

আসর ভাঙার মুখে জাঁকিয়ে হরিধ্বনি। একবার দু-বার নয়, বারবার শ্মশানে মড়া নিয়ে যাবার সময় হরিবোল দিতে দিতে যায়, এই চিৎকার তারও চেয়ে ভয়ানক। তার সঙ্গে দপাদপ ঢোলের বেতালা পিটুনি। জগাই বাজাচ্ছে। ছাউনির চামড়া না ছেঁড়ে পিটুনির ঠেলায়। সমস্ত মিলিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে একটা তোলপাড় কাণ্ড। লোকজন বিদায় করে জগন্নাথ অনেক দিন পরে আজ মনের সুখে অঘোর ঘুম ঘুমাল।

জগা পরের দিন অনেক বেলায় উঠল। নতুন আলার আসর কাল একেবারে বন্ধ গেছে—ঘুম থেকে জেগে উঠেও সেই আনন্দ। সকালবেলা ওদিককার গতিকটা কি দেখবার জন্ত বাঁধে এসেছে। নিতান্তই প্রাতর্ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে, এমনি একটা ভাব। কোটালের কূলপ্লাবী জোয়ার। খাল ছাপিয়ে পারের গাছগাছালি ডুবিয়ে দিয়ে বাঁধের গায়ে জল ছলাৎ-ছলাৎ করছে।

কাত হয়ে-পড়া একটা বড় বানগাছের গুঁড়ি জলে ডুবে গেছে। চার পাঁচটা ডাল বেরিয়েছে চতুর্দিকে। ডালেরও গোড়ার দিকটায় জল। জগার নজর পড়ল সেখানে। কে মানুষটা দিব্যি ডাল ঠেসান দিয়ে বসে আছে কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে? আবার কে—নবাবনন্দিনীর চানে আসা হয়েছে। আলার ডোবায় কাদা-পচা জল—সে জল শ্রীঅঙ্গে লাগানো চলে না। কেন যে এসব শৌখিন মানুষ বাদাবনে আসে? দালান-কোঠায় বান্ধবন্দি হয়ে থাকলেই পারে, গায়ের চামড়ায় মরচে ধরার যাতে শঙ্কা নেই।

চারুবালার পছন্দের জায়গা। জল ভেঙে এসে গাছের ডালে চড়ে বসেছে। হাতে ঘটি। স্রোতের জলে ঘটি ভরে ভরে গায়ে ঢালছে। ঘটি কখনো বা ডালের ফাঁকে গুঁজে রেখে গামছা ভরে ভরে গায়ে দিচ্ছে। ডালপাতার অন্তরালে লোকের হঠাৎ চোখ পড়ে না—আব্রু রেখে স্নান হয়। বলাইয়ের আনা কলসি-ভরা মিঠে জল—বাড়ি ফিরে সেই জলে গায়ের নোনা ধুয়ে ফেলবে।

জল বাড়ছে, কল-কল বেগে স্রোত এসে ঢুকছে। কোমর পর্যন্ত জলতলে ছিল, দেখতে দেখতে বুক অবধি ডুবে গেল। স্ফূর্তি চারুবালার বেড়ে যাচ্ছে ততই। ডাল ধরে পা দাপাচ্ছে। গাঁয়ের পুকুরে যে সাঁতার কাটত। সুতীব্র স্রোতের মধ্যে ততখানি আর সাহস হয় না, দাপাদাপি করে সাঁতারের সুখ করে নিচ্ছে খানিকটা। গুন গুন করে গানও ধরেছে বুঝি।

আপন মনে ছিল মেয়ে। বাঁধের দিক দিয়ে হঠাৎ বাঘ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বুঝি। এসে কামড়ে ধরে উল্টো এক লাফ। এক লাফে ডাঙার উপর। তখন ঠাহর করে দেখে—কামড়ে ধরেনি, দুই বাহু দিয়ে ধরেছে জাপটে। বাঘ তো নয়, জগা। ছি-ছি, কী লজ্জা! চান করার মধ্যে কী অবস্থায় আনল গো টেনে। টেনে এনে বাঁধের উপর ফেলল। চারু কিল দিচ্ছে দমাদম জগার বুকের উপর, ঘুষি মারছে পাগলের মতো হয়ে। জগাও কি ছাড়বার পাত্র—সজোরে চারুর মুখ ঘুরিয়ে ধরল যে ডালে বসে চান করছিল সেই দিকে: নয়ন তুলে দেখ একবার শ্রীমতী, কী কাণ্ড হয়ে যেত এতক্ষণে!

স্রোতের উপর ভয়াল আবর্ত তুলে কুমীর ভেসে উঠেছে ডালের ভিতরে।

দেখছ? এটা হল বাদাবন। মেয়েমানুষের সুখ করে ঘর-কন্নার জায়গা এটা নয়। শিকার তাক করে অনেক দূর থেকে কুমির ডুব দেয়। জলের নিচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে এসে ভেসে উঠবে ঠিক তার সেই তাক-করা জায়গায়। আমি দেখেছিলাম তাই। এতক্ষণে, নয়তো, কুমীরের মুখে কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে যেতে।

প্রাণ বাঁচিয়ে দিল, তবু চারুবালা কমকম করে ওঠে। তা মরতাম আমি—মরে যেতাম। তোমার কি? তুমি কেন তক্কে তক্কে থাকবে? যেদিকে যাই, তুমি ঘুরঘুর করতে থাক। কানা বুঝি আমি—দেখতে পাইনে?

জগা বলে, ভুল হয়েছে আমার। বাঁধে টেনে না এনে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে ঠিক হত। আপদের শান্তি হত, সাঁইতলা জুড়োত, বাদার মানুষ মনের সুখে কাজকর্মে লাগতে পারত।

গজর গজর করতে করতে যাচ্ছে জগা। নিমকহারাম মেয়ে-মানুষ। কলিকাল কিনা—ভাল করলে মন্দ হয়, গোঁসাই পুজলে কুড়ি হয়। বাগে পেলে আলটপকা যার মুণ্ডু কাঁধের উপর থেকে ছিঁড়ে নেবে, সেই মানুষের পিছন পিছন ঘোরে নাকি জগা! পচা-বলাই শুনতে পেলে কত না হাসাহাসি করবে এই কলঙ্কের কথা নিয়ে!

আশ্চর্য ব্যাপার, উঠানের উপর বড়দা। প্রথমটা মনে হয়েছিল গুণময়ী ভগিনী কিছু লাগানি-ভাঙানি করেছে, তেড়ে এসেছে ঝগড়া করবার জন্য। জগা তৈরি আছে যোল আনার উপর আঠার আনা। অনেক দিন ধরে জমে জমে মনের আক্রোশ বিষের মতো ফেনিয়ে কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে। দাওয়া থেকে উঁকি মেরে দেখে জগা খাতির করে ডাকে: এসো এসো—কী ভাগ্যি, নতুন ঘেরির খোদ মালিক গগনবাবু আজ বাড়ির উপর এসেছেন!

পরিহাস গগন কানে নেয় না। চারুবালার ব্যাপারও কিছু নয়। বলে, নৌকোর কাজ একেবারে ছাড়লে জগন্নাথ? ঘর থেকে তো নড়ে বোসো না।

জগা বলে, কাজ তো তা বলে আটকে নেই। অন্যেরা কাজ শিখে গেছে। কুমিরমারির গঞ্জে মাছের ঝোড়া নামিয়ে দিয়ে রমারম টাকা নিয়ে আসে, টাকা বাজিয়ে তুমি হাতবাক্সে তোল। কাজকর্ম তো দিব্যি চলেছে।

গগন বলে, সে যাই হোক, তিনটে চারটে দিন তোমায় ঠেকিয়ে দিতে হবে জগা। কাল সকালে নৌকো নিয়ে যাবে।

কেন, পচা-বলাই গেল কোথা? মরে গেছে?

বলাই আছে। পচা আর আমার শালা নগেনশশী বরাপোতার হাটুরে নৌকোয় রওনা গেল গাইগরু কিনতে। গোয়াল হল, গরু তো চাই এবারে। পচা হাঁটিয়ে নিয়ে আনবে গরু, কবে ফেরে ঠিকঠিকানা নেই।

জগা এক কথায় কেটে দেয়: আমি পারব না। অন্য মানুষ দেখ।

গগন বলে, মানুষ একজন তো হলেই হল না। কোটালের টান—জলে কুটোগাছটা ফেললে ভেঙে দুই খণ্ড হয়ে যায়। যে সে মানুষ পারবে টান কাটিয়ে নৌকো ঠিক মতো নিয়ে যেতে?

অনুনয় করে আবার বলে, তোমার পাওনাগণ্ডা পুষিয়ে দেব জগা। একেবারে হাত-পা কোলে করে বসলে হবে কেন? নিত্যি দিন না পার, দারে বেদায়ে দেখতে হবে তো! না দেখলে যাই কার কাছে? ধর, তোমার উয্যুগেই তো এ সমস্ত।

জগা হেসে ওঠে: গরু কিনতে চলে গেছে, সে গরুর দুধ খেতে দেবে আমায় এক ছটাক?

হাসতে হাসতে বলছিল। বলতে বলতে স্বর কঠিন হল।

উদ্যুগের কথা তুললে—যখন ছিল, তখন ছিল। পুরানো সেসব মনে রাখ তুমি বড়দা?

রাখি নে?

না। ছাড়াছাড়ি পুরোপুরি হয়ে গেছে। আজকে কেবল দায়ে পড়ে তোমায় আসতে হয়েছে।

বলে জগা কথার মধ্যেই প্রশ্ন করে, কাল গান শুনলে কেমন বড়দা? দুই দল হয়ে গেল আমাদের। আমার একটা, তোমার একটা।

গগন বলে, দল দুটো হোকগে, কিন্তু আমার কোন দল নয়। আমি তোমার দলে জগা।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে গগন মনের কথা ব্যক্ত করে: তোমাদের পাড়া বলে কেন, কোনখানেই তো যাই নে। দেখেছ কোনদিন আলার বাইরে? আমি মরে আছি জগন্নাথ। বেরুতে পারিনে ঐ নগেন শালার জন্যে। হ্যাঁ, সম্পর্ক না থাকলেও শালা ডেকে বলতাম। বিষম খচ্চর। দিবারাত্রি চোখ ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খোঁড়া মানুষ নিজে বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না, অন্যে করলে হিংসে হয়। কি জানি, তোমায় তো একেবারে পয়লা নম্বরের শত্রু ঠিক করে বসে আছে। নগনা নেই বলেই আজ তোমার কাছে আসতে পারলাম।

জগা বলে, সে জানি। শত্রু সকলের তো আমি। তোমার বোনটাও বড় কম যায় না। তাই তো ভাবি বড়দা, কত কষ্টের জমানো আড্ডা—সে দিকে এখন চোখ তুলে তাকাবার উপায় নেই। এ জায়গায় পোকা ধরে গেছে—থাকব না এখানে। ঠিক করে ফেলেছি। তোমরা থাক পয়সাকড়ি আর সংসারধর্ম নিয়ে।

গগন বলে, তা আমায় দুষছ কি জন্যে? আমি কি আনতে গিয়েছিলাম? জান তো সবই। আসবার আগে মুখের কথাটা ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল আমায়?

কিন্তু তোমায় তো তেল চুকচুকে দেখাচ্ছে দিব্যি। মুখের বচনের সঙ্গে চেহারায় মিলছে না। খুব যে দুঃখের পাথারে ভাসছ, চেহারা দেখে কিন্তু মনে হয় না বড়দা।

গগন বলে, বেটা তো মার খেতে পারে—আরে, ধরে মারে তবে উপায়টা কি? শুধু নগনা কেন, নগনার বোনটাও তো চোখে তুলে নাচায়। চানের আগে আচ্ছা করে তেল রগড়াতে হবে, নয়তো ছাড়ে না। খাওয়ার সময় সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও করবে। খাওয়া না হতে তামাক সেজে নিয়ে আসবে চারি। খেয়ে তার পরেই বিছানায় গড়ানো। শোওয়ার পরে দেখে দেখে যায় ঠিকমতো ঘুমুচ্ছি কিনা। দেহে তেল না চুইয়ে যায় কোথায় বল?

জগাও এমনি ভাবছে। নগনার বোনকে সে ভাল জানে না, কিন্তু গগনের বোনকে জেনে বুঝে ফেলেছে। গাই-বকনা কিনে এনে নতুন গোয়ালে ঢোকাবে। বাদাবাজ্যের দুর্দান্ত মানুষগুলোকে মেয়েটা ইতিমধ্যেই জাবনা খাইয়ে শিষ্টশান্ত করে গলায় দড়ি পরিয়ে টান জুড়ে দিয়েছে।

বেলা ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার হয়েছে। কথা বলতে বলতে গগন আর জগা বাঁধের উপরে এলো। ভাঁটা এখন। কলকল স্বনে উচ্ছল আবর্তে জলধারা দূর সমুদ্রে ধেয়ে চলেছে। তারা-ভরা আকাশ, তারার আলো চিকচিক করছে জলে। মাটিতে নেমে-আসা মেঘের মতো ওপারের ঘন কালো বাদাবন। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে জগার মনটা পিছনের কালে ঘুরে বেড়ায়। এই যেখানটায় ঘুরছে, এখানেও তো বন ছিল আগে। আস্তে আস্তে বসতির পত্তন হচ্ছে—জনালয় একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে বনরাজ্য মুঠির মধ্যে চেপে ধরছে। এখানকার লীলাখেলার ইতি। নতুন চালা বাঁধতে হবে ভাঁটি ধরে আবার কোন নতুন জায়গা খুঁজে পেতে নিয়ে। কাঁচা বাদার মধ্যে হৈ-হল্লায় কিছুদিন কাটাবে সেখানে, ঘরগৃহস্থালীর বিষ-নজর যতক্ষণ সেই অবধি না গিয়ে পড়ছে। [ক্রমশঃ।

অঘ্রাণের রং

রথীন্দ্রনাথ সেন

তাহলে আবার আমি হেমন্তের ক্লান্ত মেঘে মেঘে
নিবিড় ধানের গন্ধে অঘ্রাণের আশ্চর্য আঘ্রাণে,
আবার জীবন খুঁজি শঙ্খরাগ স্বপ্নের আবেগে,
নরম রোদের রঙে মুগ্ধ চোখ শিশিরের ঘ্রাণে।
তাহলে আবার আমি লাইলাকে রুক্ষ ঝাউচরে—
পাইনের বনে বনে উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়ার শরীরে,
নিভৃত হিমের স্পর্শে ঝিম ঝিম হরিণ-প্রহরে,
প্রাণের আশ্বাস খুঁজি স্বর্ণস্নিগ্ধ আত্মার গভীরে।
রাত্রির নির্জন মেঘে তারাদের দীপ আনমনে—
জ্বেলে গেলে, জীবনের স্বরলিপি আবার বন্ধ
খুলে দেখি। আদিগন্ত আজ শুধু আলোর চন্দনে
থরো থরো আশ্চর্য অঘ্রাণ আর অঘ্রাণের রং।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকেন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদি কাহিনী যেমনি রমণীয় তেমনি রোমাঞ্চকর। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের অবসানে একটি উপযুক্ত নির্জন স্থানের অন্বেষণ করছিলেন, যেখানে শান্ত বানপ্রস্থে তাঁর শেষ জীবন তিনি নির্বাহ করবেন। এই অন্বেষণে তিনি এক রুক্ষ অনুর্বর প্রান্তরে এসে পৌঁছলেন,—যেখানে শুধু দস্যুদের বাস। ভৃত্যরা তাঁর পাল্কী নামাল, আর অগ্রসর হতে সাহস করল না। বৃদ্ধ ঋষি তাদের অভয় দিলেন—পাল্কী উঠিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। সামনে তৃণশূন্য জনহীন প্রান্তরের মাঝখানে কিছু উঁচু একটি ঢিবি। তার উপর পাশাপাশি দুটি গাছ। সেইখানে তিনি থামলেন।

তখন সূর্যাস্তের অপূর্ব শোভা। সেই যুগল বৃক্ষতলে উপবেশন করে স্তব্ধ হয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ। সেই আশ্চর্যক্ষণে জগদীশ্বরের পরম উপলব্ধি এমন গভীর ভাবে তাঁর ধ্যানে বাজল যে সমস্ত রাত তিনি সেখানে আনন্দ-বিভোর জাগরণে অতিবাহিত করলেন। পরদিন প্রাতে তিনি সেই স্থানের নাম দিলেন,—শান্তিনিকেতন।

এই শান্তিনিকেতনে মহর্ষি তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। জীবন-সায়াহ্নের বহু বৎসর তিনি এই আশ্রমে বাস করেন। এখানে নিস্তব্ধ ধ্যানে তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হোতো। বিশ্বখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ তখন বালক মাত্র। তিনি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। বালক পুত্রের কণ্ঠে স্বরচিত ও রাজা রামমোহন রায় রচিত ধর্মসঙ্গীত শুনতে মহর্ষির বড়ো ভালো লাগত। রামমোহন ছিলেন মহর্ষির যৌবনের গুরু, তিনিই তাঁকে গোঁড়া হিন্দুধর্মের আওতা থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের উদারতর আশ্রয়ে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সংস্কারবিমুক্ত মানবধর্মের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

মহর্ষির আশ্রম-প্রতিষ্ঠা যুগের একটি চমৎকার সত্য ঘটনা আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহর্ষি যখন তাঁর প্রিয় স্থানটিতে ধ্যাননিমগ্ন, তখন দস্যুদলের এক সর্দার চুপি চুপি তাঁর কাছে আসে। কে তাকে বলেছিল যে ঐ গাছ দুটির তলায় অনেক সোনা আছে, তাই ঐ বৃদ্ধ ঐখানে চুপটি করে বসে থাকে। হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ঠিক যখন সে সামনে এল, সেই মুহূর্তেই ঋষি তাঁর চক্ষু উন্মীলন করেন। তাঁর করুণ আঁখির শান্ত দৃষ্টিতে মুহূর্তে অভিভূত হয়ে দস্যু তার তীক্ষ্ণ ছুরিকা ফেলে দু'হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে, অকপটে স্বীকার করে তার পাপ-অভিপ্রায়। মহর্ষি শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দস্যুকে আলিঙ্গন করেন। সেই থেকে দস্যুর জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করল ও বাকি জীবন ধর্মপথে অতিবাহিত করল।

অতি বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। আমি যখন শান্তিনিকেতনে এলাম, তখনো আশ্রমের সর্বস্থান তাঁর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। প্রাচীন সেই দুই বৃক্ষ, যার তলায় বসে তিনি উপাসনা করতেন সেইখানে তাঁর প্রিয় বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে। সেই বাণীতে উদ্‌ঘোষিত রয়েছে পরমেশ্বরের নাম, যিনি প্রাণের আরাম, হৃদয়ের আনন্দ, আত্মার শান্তি। যাঁরা মহর্ষির সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁরা আমাকে বলতেন যে মহর্ষির অপূর্ব মুখচ্ছবি ছিল তাঁর শান্ত সমাহিত অন্তরের প্রতিচ্ছবি। অনেকে এ-ও আমাকে বলেছেন যে বর্তমানে পরিণত বয়সে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকেও ঠিক তাঁর ঋষি পিতার মতোই দেখায়।

শান্তিনিকেতন পুণ্যাশ্রমের প্রান্তসীমায় তিনটি মাত্র অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম অনুশাসন এই যে, এখানে মূর্তিপূজা বারণ। দ্বিতীয় অনুশাসন এই যে, এখানকার পরিধির মধ্যে কোনো প্রকার জীবহত্যা বারণ। আর তৃতীয় এই যে এখানে ধর্ম সম্পর্কিত কোনো প্রকার বিতর্ক চলবে না। এই তিনটি মাত্র বাধা ব্যতিরেকে শান্তিনিকেতনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর উন্মুক্ত আমন্ত্রণ।

প্রতি সপ্তাহে একদিন করে অতি প্রত্যূষে কবি আশ্রমবালকদের ধর্মোপদেশ দান করেন। নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় তিনি ঈশ্বরের পুণ্য পিতৃত্বের কথা বলেন। আশ্রমবাসীরা প্রতিদিন প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরোপাসনা করে। শৈশব থেকে এই সর্বমানবিক ধর্মশিক্ষা ও ধর্মাচরণ তারা লাভ করে।

শান্তিনিকেতনের শান্তিপূর্ণ আশ্রমের মধ্যে অতর্কিতে ভেঙে পড়ল ইউরোপের মহাযুদ্ধের সংবাদ। এই সংবাদ প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মতো

আমার অনেক স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। স্বয়ং খৃষ্ট যে-দিনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—আমার মনে হোলো সেই দিন যেন ঘনিয়ে এসেছে,—মহাবিচারের দিন। মানবপুত্রের নব-অভ্যুত্থানের দিন।

ইংলণ্ডে আমার বৃদ্ধ পিতা ভাবলেন তাঁর এতোদিনের আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ এবার বুঝি সফল হতে চলেছে। অশীতিপর তাঁর বয়স, দেহ অত্যন্ত দুর্বল। আমার ভগিনীদের কাছ থেকে আমি বেদনা-করুণ চিঠি পেতাম, তারা লিখত আমার মা বর্তমান থাকতে আমাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা যেমন ছিল, পিতা সবকিছু ঠিক সেইমত রাখতে চাইলেন। মা-র অবর্তমানে কোনো পরিবর্তন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবের ধারণা হোলো যে এইবার প্রভুর পুনরাবির্ভাবের সময় সমাগত, তিনি এলেন বলে। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা দীর্ঘ পত্রে তিনি আমাকে জানালেন। মুক্তছন্দে লেখা একটি স্বরচিত কবিতাও পিতৃদেব এই সময়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতা ও তাঁর শেষ জীবনের পত্রগুচ্ছ অতি মহার্ঘ সম্পদ বলে আমি সযত্নে রক্ষা করে এসেছি। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই আমার পিতৃদেব দেহরক্ষা করেন।

মহাযুদ্ধ যখন পূর্ণভাবে ঘোষিত হোলো এবং এই যুদ্ধে আমার স্বদেশ জড়িত হয়ে পড়ল, তখন আমার মনের অবস্থা হোলো অতি অদ্ভুত। আমার মনে জাগল নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা,—সন্দেহ আর অস্থিরতায় মুহূর্তে মুহূর্তে বিপরীতমুখী চিন্তার টানাটানি। আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম এমনি শিথিল অস্থিরতা বিপজ্জনক,—অবিলম্বে যদি কঠিন মনে সত্য সিদ্ধান্ত করতে না পারি, তাহলে বিক্ষুব্ধ আবেগের বন্যার ভেসে যেতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধকে আমার অত্যন্ত সাধু ও মহান্ বলে মনে হয়েছিল। আমি দেখছিলাম বিন্দুতম প্রতিবাদ না করে প্রতি দেশের তরুণ সম্প্রদায় মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে,—যে উদ্দেশ্যকে ন্যায় ও সত্য বলে মনে করেছে, সেই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্যে জীবন ও জীবনের চেয়েও মহার্ঘতর সব কিছুকে বিসর্জন দিতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করছে না।

এই মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানব সমাজের যে বিপুল নৈতিক পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল, সেই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতি অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই বৎসরের গোড়ার দিক থেকে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মানবাত্মার বেদনার্ত অন্ধকার,—যে বেদনার কোনো তল নেই, যে অন্ধকারের কোনো সীমা নেই,—সেই বেদনায় মথিত হচ্ছিল কবির মন, সেই অন্ধকার গ্রাস করছিল তাঁর হৃদয়,—সর্বদা তিনি ভাবতেন সারা পৃথিবীর মহা সর্বনাশ বুঝি দিনে দিনে ঘনিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধ যখন বাধল, পরম আশায় তিনি বুক বাঁধলেন এই ভেবে যে প্রাচীন পৃথিবীর রণবিধ্বস্ত স্তূপভিত্তির উপরে এক নবীনতর মহত্তর পৃথিবীর জন্ম হবে।

পৃথিবীর এই গভীরতম বেদনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বপ্রথম আশার একটি আশ্বাস বেজেছিল। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে তাঁর দেরি হয়নি। এই যুদ্ধ সত্যের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে। মিথ্যা ও কলুষকামনার যে হলাহলকে এই যুদ্ধ উৎক্ষিপ্ত করল, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও পাশব বর্বরতার যে নির্লজ্জতাকে দিকে দিকে প্রকাশ করল, তাতে কবি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যুদ্ধের সমস্ত আঘাত যেন তাঁর একলা অন্তরের গভীরে গিয়ে বাজল। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করলেন। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলতে লাগল, যুদ্ধের প্রতি তাঁর ঘৃণাও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল।

মহাযুদ্ধের সূচনাকালে আমার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল সেই দ্বিধা আমার নৈতিক পরাজয়। উত্তেজনার সংক্রামক ব্যাধিতে সমস্ত পৃথিবী আক্রান্ত, রণোন্মাদ তখন বন্যার মতো সর্বদেশের মানব সমাজকে গ্রাস করছে। এই বিপুল তরঙ্গকে প্রতিহত করবার মতো শক্তি আমার ছিল না। যুদ্ধের উন্মাদনা আমার মনের মধ্যে মাথা উঁচু করেছিল, তাকে সংযত করতে আমি পারি নি। যুদ্ধের প্রত্যেকটি সংবাদ আমি তখন উদ্গ্রীব উৎসাহ নিয়ে অনুধাবন করতাম, কেন না হিংসার বীজ আমার মনে তখন উপ্ত হয়েছে। এই বীজ যখন তার ঘৃণ্য দানবীয়তা নিয়ে অবচেতন থেকে চেতনার স্তরে এসে পৌঁছলো,—তখন আমার চমক ভাঙল। নিজেকে ঘৃণা করলাম,—নিজের মনের সঙ্গেই লড়াই সুরু হোলো আমার। কেন না, যখনই আমি উত্তেজনাবিহীন শান্ত মুহূর্তে চিন্তা করেছি, মনের শুভবোধ সর্বদা স্বীকার করেছে যে খৃষ্টনীতি যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। এ ছাড়া শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে স্ফুলিঙ্গের অঙ্গে বাতাস দিয়ে দিয়ে যেমন সেই স্ফুলিঙ্গকে লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত করা হয়, তেমনি শত্রুর প্রতি ঘৃণাকে লেলিহান ধ্বংসশিখায় পরিণত করা হচ্ছে মিথ্যার ঝটিকার সাহায্যে। সেই মিথ্যাকে চিনতে পেরে সাবধান হলাম আমি।

ক্রমে আমার আচ্ছন্ন চোখের মিথ্যা দৃষ্টি খসে পড়ল। মনের ঘোর কাটল। শান্ত অথচ আশংকাতুর মন নিয়ে আমি আমার ধর্মগ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করলাম,—আরো যত্নে ও আরো নিবিষ্টভাবে পড়তে লাগলাম প্রভুর বাণী। প্রভু খৃষ্ট আমাকে পথ দেখালেন, আমি বুঝলাম যে ধর্ম ও যুদ্ধ এই দুই-এর মাঝে কোনো সন্ধি নেই। ঈশ্বর ও যক্ষ—এই দুই প্রভুর উপাসনা একসঙ্গে করা যায় না। যীশুখৃষ্ট সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—

"তোমার শত্রুকে তুমি প্রেম করো; যারা তোমাকে অবজ্ঞা করে তাদের তুমি মঙ্গল করো, যারা তোমার প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করে, তাদের জন্যে তুমি প্রার্থনা করো। তবেই তুমি তোমার পরমপিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে।"

খৃষ্টের এই ঘোষণার কোনো দ্ব্যর্থ নেই, কোনো দুর্বোধ্যতা নেই।

আমি বুঝলাম, সঙ্গীন সমস্যা আমার সম্মুখে। ঈশ্বরের মহিমাকে নূতন করে উপলব্ধি করতে হবে আমাকে। কা'কে আমি পূজা করব? কে আমার ঈশ্বর? ওল্ড টেষ্টামেন্টের গোষ্ঠীদেবতা যিনি তিনিই কি আমার ঈশ্বর? নিউ টেষ্টামেন্টের অন্তরদেবতা যিনি, যাঁর মহিমাকে খৃষ্ট বিশ্বমানবের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনিই কি আমার ঈশ্বর? আমি দেখলাম, রণোন্মাদনাকে মনের মধ্যে বাসা দিয়ে আমি আমার পরম প্রভু খৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসহন্তা হয়েছি। কিন্তু প্রভু আমাকে রক্ষা করেছেন, তিনি তাঁর নিত্যবাণীর সম্মার্জনীঘাতে আমার ক্লিন্ন মানসকে পরিচ্ছন্ন করেছেন, আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন শুভ পথপরিক্রমায়।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমি নিবিড়তম সাহায্য লাভ করেছিলাম। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রেম দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। তিনি তাঁর শান্ত বুদ্ধি দিয়ে আমার সংশয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা আমি অকপটে নিবেদন করতে পেরেছিলাম তাঁর কাছে। অখৃষ্টান হিন্দু হলেও রবীন্দ্রনাথ 'সার্মন অন্ দি মাউন্ট' পাঠ করেছিলেন ও এই উপদেশাবলীর গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন,—'তোমরা খৃষ্টান হয়ে এ কী করছ? স্পষ্টতম নৈতিক নির্দেশ রয়েছে তোমাদের ধর্মে,—সেই নির্দেশ তোমরা পালন করো না কেন?'

অপর এক তৃতীয় সূত্র থেকেও আমি সংকটে সাহায্য লাভ করি। এই সূত্র গান্ধীজির জীবনবেদ। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মহাত্মা গান্ধীর সাহচর্যে আমি দেখেছিলাম 'সার্মন অন দি মাউন্ট'-এর উপদেশাবলীর নিহিত অর্থ কর্মের মাধ্যমে কী ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। খৃষ্টানদের তিনি লজ্জা দিয়েছেন,—তাঁর উদাহরণ আমার চিত্তপটে অবিস্মরণীয়। সত্যই তাঁর শক্তি, তাঁর 'সত্যাগ্রহ' খৃষ্টোপম অনুপ্রাণনা। এই যুদ্ধ সত্যাগ্রহের বিপরীত,—খৃষ্টকে যে অনুসরণ করে যুদ্ধ তার অমিত্র।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও আমার ধর্মগ্রন্থ—এই তিন প্রভাব একটি অচঞ্চল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাকে পৌঁছে দিল। সংশয়ছায়াহীন সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে সত্যের আলোকে আমি দেখলাম যে, এই যুদ্ধ খৃষ্ট-নির্দেশের পরিপন্থী। আমি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলাম যে, এই যুদ্ধ আমার নয়। যুদ্ধের কাজে যোগদানের জন্য যখন নির্দেশ এল, তখন আমি নির্ভীকচিত্তে অস্বীকার করলাম। এই অস্বীকারের অর্থ কারাবরণ। তার জন্যেও আমি সোৎসাহে প্রস্তুত হলাম। যদিও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-পরিপন্থী বলে আমাকে শাস্তিভোগ করতে হয়নি, তবুও সমগ্র মহাযুদ্ধ কালে মুহূর্তের জন্যেও আর কখনো আমার মনে আবিলতা আসেনি। বিশ্বাসই মুক্তি। এই বিশ্বাস আমাকে মহামুক্তি দিল। এই বিশ্বাসের জন্যেও ভবিষ্যতে কখনো অনুতাপ করিনি।

এই মহাযুদ্ধ আমার জীবনে এক মহা পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্যে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণায় আমার চিত্ত বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রণার মধ্যে আমার প্রভু খৃষ্টের প্রসাদ আমি লাভ করেছি,—নব নব স্বপ্ন অগোচর রূপে তিনি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আপনাকে প্রতিভাত করেছেন। দুটি প্রতিজ্ঞা আমি করতে পেরেছিলাম,—প্রথম প্রতিজ্ঞা যে খৃষ্টান-গোষ্ঠীর মত গণ্ডীর মধ্যে আর কখনো থাকব না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধকে সমর্থন করব না। এই উভয় প্রতিজ্ঞাই আমার জীবনে সার্থক হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর আমার জীবনে যীশুর শক্তিকে আমি গভীরতর ভাবে লাভ করেছি, তাঁর প্রসন্নতর মূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে।

এই সময়ে সুশীল রুদ্রের পুত্র সুধীর আমার কাছে এসেছিল। কিছুদিন আমার কাছে থাকার পর অ্যাম্বুলেন্সের কাজ নিয়ে সে ফ্রান্সে যায়। সুধীর আমাকে বলেছিল, 'সার, এখানে এই শান্তিনিকেতনে আপনি আছেন কী করে? এখানে তো 'হোলি কমিউনিয়ন' নেই?'

আমি বলেছিলাম,—এই সব শিশুর দল, যাদের আমি শিক্ষা দিচ্ছি, এরাই আমার 'হোলি কমিউনিয়ন'। আমি বলেছিলাম, ঈশ্বরের নামে শরণাগত তৃষ্ণার্তকে এক পাত্র জলদানই প্রকৃত হোলি কমিউনিয়ন, তাই নয়?

আমার এই কথা সুধীর চিরদিন মনে রেখেছিল। ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে যখন তার পিতার শেষ রোগশয্যা পাশে, আমিও তখন তার সঙ্গে ছিলাম। সুধীর তখন আমাকে বলেছিল, 'শান্তিনিকেতনের সেই সকালটিতে যে কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন সেকথা ফ্রান্সে থাকতে আমাকে বারে বারে সাহায্য করেছে। ফ্রান্সে বিভিন্ন হাসপাতালে সৈনিকদের যখন আমি শুশ্রূষা করতাম, তখন বুঝেছিলাম আপনার কথা কতো সত্য। এই সব রোগীদের দিকে তাকিয়ে আমিও বলতাম, এই আমার হোলি কমিউনিয়ন।' খৃষ্ট বলেছিলেন, "আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করেছিলে।" খৃষ্টবাণীর নিগূঢ় তাৎপর্য আপনার কথাতে আমি উপলব্ধি করেছি।

খৃষ্টের এই পরম বাণী আমার দৈনন্দিন জীবনে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য করেছে, প্রেরণা দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে। কেন না, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আবদ্ধ শুধু মাত্র একটি নৈর্ব্যক্তিক মহা আদর্শ বলে আমি খৃষ্টকে দেখিনি। তাঁকে আমি জীবন্ত মানুষ বলে উপলব্ধি করেছি, যাঁর পরমাত্মার সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমি সর্বদা অনুভব করেছি। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যে নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁর প্রত্যক্ষ বাণীর প্রসাদে শেষ পর্যন্ত আমি সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। প্রভুর সেই বাণীর মধ্যে তাঁর অন্তরের গভীরতম বেদনা ও পরমতম আশ্বাসকে আমি অনুভব করেছিলাম। আমি যেন স্বকর্ণে শুনেছিলাম যে ধ্বংসের উন্মত্ত শোভাযাত্রায় যোগদানের বিরুদ্ধে তিনি আমাকে সাবধান করে বলছেন, আমার পশ্চাতে যে আসতে চায় সে যেন আপন সত্তকে পরিহার করে আপন স্কন্ধে ক্রুসকে গ্রহণ করে একান্ত ভাবে শুধু আমাকেই অনুসরণ করে।

এমনি সময়ে একটি নূতন চিন্তা আমার মনকে অধিকার করতে লাগল। যুদ্ধের আগে আমি আফ্রিকায় গিয়ে আফ্রিকাবাসীদের প্রতি বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছিলাম,—সেখানকার ভারতীয় চুক্তিদাসদেরও আমি দেখেছিলাম। তখন এই বলিষ্ঠ প্রত্যয় আমার চিত্তে সুস্পষ্ট হয়েছিল যে মানুষের এই অবমাননার বেদনা মানবপুত্র যীশুরই অন্তর বেদনা। এবার এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ দেখে আমি স্থিরনিশ্চয় হলাম যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও শোষণনীতি পাপ এই যুদ্ধের মূল কারণ, এবং পৃথিবীর অনুন্নত জাতিরাই এই পাপের প্রধান বলি। যারা অনুন্নত, যারা দুর্বল, খৃষ্ট তাদেরই দলে। ভাগ্য যাদের করুণ, তাদেরই দিকে তাঁর অনন্ত করুণা ধাবিত, তাদেরই তিনি আহ্বান করে বলেছেন,—"এসো তোমরা,—যারা শ্রান্ত যারা গুরুভার—আমার কাছে তোমরা এস,—আমি তোমাদের দেব বিশ্রাম।"

আমার মনের এই সব প্রবল চিন্তা আমি কবির কাছে ব্যক্ত করলাম। আমার ভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল দেখে আমার বড়ো আনন্দ হোলো। বর্ণ-বিদ্বেষ বা জাতীয় অহমিকার সামান্যতম কালিমা তাঁর মনকে কখনো স্পর্শ করেনি। অপরদিকে আবার

বৈজ্ঞানিক প্রগতির জন্য পাশ্চাত্য জগতের প্রতি তাঁর গভীর অনুরক্তি ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের প্রতি অভিযোগও তাঁর মনে ছিল প্রবল। যে স্বাজাত্যগর্ব ও বাণিজ্যিক লালসার বলে পাশ্চাত্য জগত সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে চলেছে, তাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে কবি বলতেন,—'অনেক কিছু গ্রাস করেছে ওরা, এবার এসেছে মৃত্যুর বিষগ্রাস।'

আমি কবিকে বলেছিলাম যে আমার মনে হয় হয়তো এ মহাযুদ্ধ মানুষের বহু মালিন্য মোচনের মুক্তিস্নান। আমার এ কথায় কবির মুখে যে বেদনার প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—

'তোমার কথা সত্য হোক চার্লি, এতে তোমাদেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। কিন্তু এই পাপের মূলে রয়েছে লোভ। মনের গভীর কন্দর থেকে এই লোভের শিকড়কে যদি নির্মূল করা না যায়, তাহলে এই মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হবে অর্থনৈতিক ক্ষতিকে পূর্ণ করবার, দরিদ্র অনুন্নতকে শোষণ করবার। এই লোভ আর এই শোষণ স্পৃহাই হোলো আসল ব্যাধি, এই কালব্যাধি যদি না সারে, তাহলে ব্যাধির বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা করে লাভ কি?'

"এসো তোমরা, যারা শ্রান্ত যারা গুরুভার, আমার কাছে তোমরা এসো"—খৃষ্টের এই কথাগুলি এ সময় নিরন্তর আমার মনে প্রতিধ্বনিত হোতো। তারপর ধীরে ধীরে আমার মন এক পরম চৈতন্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল, আমার অন্তর আমার প্রভুর কাছ থেকে এক পরম নির্দেশ লাভ করল। তিনি আমাকে আহ্বান করলেন এক যুদ্ধে, ইউরোপের বিভিন্ন রণক্ষেত্র জুড়ে যে মহাযুদ্ধ চলেছে, তার চেয়ে মহত্তর যুদ্ধের সম্মুখীন হতে তিনি আমাকে ডাক দিলেন। এ যুদ্ধ খৃষ্টের নিজের যুদ্ধ, সমস্ত পৃথিবীর পদানত নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিংসার বিরুদ্ধে ঘৃণার বিরুদ্ধে তাঁর নিত্যকালের যুদ্ধে তিনি আমাকে তাঁর সৈনিক করে নিলেন। সৈনিক আমি হব না, সামরিক কাজ আমি কিছুতে গ্রহণ করব না, তাতে যে বিপদই আসুক এই ছিল এতদিন আমার দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু এই সংকল্প ছিল নঙর্থক। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্তব্যের আহ্বানে প্রভুর নির্দেশে আমি সৈনিক হতে পারলাম এবার, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিরাটতম ধর্মযুদ্ধে আত্মনিবেদনের নিঃসঙ্কোচ আশ্বাস আমার মনে জাগল।

এই আশ্বাসের কথা আজ এখানে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ। সেদিন কিন্তু এই আশ্বাসকে একনিষ্ঠ আস্থার সঙ্গে আঁকড়ে রাখা মোটেও সহজ ছিল না। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে মহাযুদ্ধ চলেছে, পূর্বে ও পশ্চিমে প্রতিদিনের জয় পরাজয়ের সংবাদে উত্তেজনার তরঙ্গে মন সর্বদা আলোড়িত। এই নিত্য আলোড়নের হাত থেকে পরিত্রাণস্বরূপ কোনো প্রত্যক্ষ কর্তব্যের সন্ধান করা তখন সহজ ছিল না আমার পক্ষে। পৃথিবীর অন্যান্য বর্ণ ও জাতির প্রতি ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের ব্যবহার সম্পর্কে তখনো এ আশাও আমার মনে ছিল, যে ইংরেজ জাতি সাধারণের ব্যতিক্রম, ইংরেজ জাতির ব্যবহার মঙ্গল। এই জাতি যে আমারই জাতি, এই জাতির আদর্শ যে আমারই গৌরব। স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমার পিতার মনে যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাস আমারও রক্তে পোষিত হয়েছিল। বিদেশে এসে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ সত্ত্বেও আমার মনের গভীর অন্তস্তল থেকে সে বিশ্বাসকে আমি মুছে ফেলতে পারিনি।

যে সময়ে দাসত্বপ্রথা রদ হয় ও বিখ্যাত রিফর্ম আইনগুলি পাশ হয়, ঠিক সেই সময়ে আমার পিতৃদেবের জন্ম হয়। স্বাধীনতার প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও সমর্থ মানবত্ববোধের ঐতিহ্য তিনি লাভ করেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। স্বাধীনতা ও মানব কল্যাণের আদর্শ আমাদের ইষ্ট অ্যাংলিক্যান রক্তের ধারায় প্রবাহিত। এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বযুগের চিন্তাধারার গভীর সংযোগ। বৃটিশ ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ একটি স্মরণীয় কাল। ক্লার্কসন, উইলবারফোর্স, লিভিংষ্টোন, শ্যাফ্‌টস্‌বেরি, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, জোসেফিন বাটলার প্রভৃতি মানবরত্ন যে দেশের সন্তান, মানবকল্যাণ ব্রতের ইতিহাসে সে দেশের অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়।

কিন্তু ১৮৮০ সাল নাগাদ আমার স্বজাতির ধ্যানধারণায় এক বিচিত্র পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আফ্রিকা ভূখণ্ডে ও অন্যত্র ইউরোপীয় জাতিদের সাম্রাজ্যলোলুপতার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তনের শুরু। এই সঙ্গে খৃষ্টীয় নির্দেশের পরিপন্থী বর্ণবিদ্বেষ ও জাতি-অহমিকা সারা পৃথিবীতে প্রকটতর হয়ে উঠল। 'শ্বেতকায়' মানুষ সদম্ভে ঘোষণা করল যে সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, তার জাতিই উচ্চতম জাতি। অন্য মানুষ অন্য জাতির সংস্পর্শ থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে লাগল। শুরু হোলো মানুষের প্রতি মানুষের তিক্ত বিদ্বেষ। বিদেশে ভ্রমণ করার ফলে আমি যে-সব দৃশ্য দেখেছি আমার পিতৃদেব তা দেখেন নি, আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। এই ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষ বিশেষ করে পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলে কী লজ্জাকর বীভৎস তার সঙ্গে প্রকট হয়েছে জাত্যভিমানের নামে নির্লজ্জ কুণ্ঠাহীনতার সঙ্গে কতো সাংঘাতিক অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমি তা জানি। এও আমি জানি যে আমার প্রতিদিনের কর্মে ও চিন্তায় সতত যদি খৃষ্টের দৃষ্টি না থাকত তাহলে হয়তো স্বার্থপরতা ও বিজাতির প্রতি ঘৃণায় আমি অনেক শ্বেতকায়কেই ছাড়িয়ে যেতাম। আমি জানি, এই পাপের বীজ আমার মনের মধ্যেও ছিল,—প্রভু যীশুই আমাকে রক্ষা করেছেন।

এই সময়কার সমস্ত অন্তর্দাহের নিবৃত্তি হোলো অতর্কিতে। ১৯১৫ সালের মে মাস। আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটি হোলো। ছাত্র ও শিক্ষকেরা যে যার বাড়ি ফিরল। কয়েকটা দরকারী কাগজ সংগ্রহের জন্য কলকাতা থেকে আবার শান্তিনিকেতনে যেতে হোলো আমাকে। হঠাৎ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অবিলম্বে প্রকট হোলো যে এশিয়াটিক কলেরার সাংঘাতিক কাল ব্যাধি আমাকে ধরেছে। কাছাকাছি কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক নেই। যাকে সে রাত্রের মধ্যেই আনা যায়। সমস্ত রাত কাটল নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায়,—তবু আমার আচ্ছন্ন চৈতন্যে মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল যীশুর বেদনাহত করুণাঘন মূর্তি।

কলকাতা থেকে কবি ছুটে এলেন শান্তিনিকেতনে। আমার

রোগের সংবাদ পেয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব তিনি করেন নি। পরদিন প্রভাতে কবির মুখ দেখে আমি যেন নবজীবন লাভ করলাম। তাঁকে যে আমি কতো ভালোবাসি তা আমি সেই মুহূর্তেই যেন সম্যক উপলব্ধি করলাম। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আমার ছিল কিন্তু এই ভালোবাসা শ্রদ্ধার চেয়ে অনেক গভীর, অনেক আন্তরিক।

কলেরা রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। কবি এবং আমার অন্যান্য সুহৃদরা যাঁদের নিরন্তর সেবায় আমি পুনর্জীবন লাভ করেছিলাম, তাঁরা নিজেরাই যে কোনো মুহূর্তে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারতেন। আপন প্রাণের মমতা না করে তাঁরা আমার শুশ্রূষা করেছিলেন,—গভীর স্নেহভরে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বেশ কিছুদিন পরে আমাকে কলকাতায় এক নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হোলো। তারপর হৃতস্বাস্থ্যলাভের আশায় আমি গেলাম সিমলায়।

ফিজি দ্বীপ

সিমলা পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করে দিনের পর দিন উষ্ণ রৌদ্রের নিচে এক দীর্ঘ বারান্দায় আমি শুয়ে থাকতাম। শরীর এতো দুর্বল যে, কিছু পড়তে পর্যন্ত ক্লান্তি আসত। সেই সময় চুক্তিদাসত্ববদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে একটি সরকারী বিবরণী আমার হাতে এল। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার পরে এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। বইটির পাতা উলটিয়ে দেখতে লাগলাম। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় শ্রমিকদের আত্মহত্যার সংখ্যা ও বিবরণ দেখে আমি চমকে উঠলাম।

ফিজি দ্বীপ বহুদূরে,—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। সেখানেও বহু ভারতীয় শ্রমিকের বাস, বাগিচায় চুক্তিদাসত্ব তাদের জীবিকা। রিপোর্ট পড়ে দেখলাম ভারতবর্ষে কৃষক সম্প্রদায়ের' মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা যতো, তার বহুগুণ বেশি এই ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় বাগিচা-শ্রমিকদের মধ্যে। এর কারণ গৃহগতপ্রাণ প্রবাসীদের দুঃসহ জীবনযাত্রা।

নাটাল ও অন্যত্র ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পাশাপাশি ফিজির ভারতীয়দের জীবনযাত্রার বিবরণ তুলনামূলক ভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। ফিজির বিবরণ এতোই করুণ যে, আমি তা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। নাটালের চুক্তিদাসত্ব প্রথা আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। ফিজি দ্বীপের ভারতীয় শ্রমদাসদের জীবনযাত্রা যে কতো বীভৎসতর তা আমার মানস চক্ষে স্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি বইটি বন্ধ করলাম। বেশি পড়ার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু যেটুকু পড়েছি তার চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো মনে জেগে রইল।

কয়েকদিন পরের কথা। দুপুর বেলা আমি চোখ বুঁজে বারান্দায় শুয়ে আছি। হঠাৎ আমার বন্ধদৃষ্টির সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য যেন ভেসে উঠল। নাটালের সেই দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকটিকে আমি যেন দেখলাম, শ্বেতকায় মালিকের বেত্রদণ্ডের আঘাতে আঘাতে যার সমস্ত পিঠ ক্ষতবিক্ষত। সে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করুণ দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখে আমারও বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। একটু পরেই আমার মানস চক্ষের সামনে তার মুখটি বদলে গেল, আমি দেখলাম মানবপালক পরমপ্রভু যীশুর মুখ, যে মুখকে শিশুকাল থেকে আমি চিনেছি ও একান্ত করে ভালোবেসেছি। এই মুখচ্ছবি আমার মর্মমুকুরে এমনই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম, সমস্ত প্রাণ আমি যেন সঁপে দিলাম কুণ্ঠিত আত্মনিবেদনে। ক্রমে দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলাম সেই নিঃসঙ্গ বারান্দায়। বহুক্ষণ পরে বুঝলাম আমি যা দেখছিলাম তা জাগ্রত স্বপ্ন, মানুষের বেদনা-বঞ্চনার গভীর আবেগের ফলে আমার মগ্ন চৈতন্য এই স্বপ্নের সৃষ্টি করেছে।

আমার বিশ্বাস, সেদিন আমার প্রভু প্রকৃতই আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা আর অন্তর দিয়ে অনুভব করা,—দুইই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা। মুখে যতো আলাদা বলি না কেন, এই দুইয়ের মধ্যে অতি সংকীর্ণ সীমারেখা, অনেক সময় এই রেখা কোথায় তা খুঁজেই পাওয়া যায় না।

সেই উষ্ণ দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতো এই কথাটি আমার মনে উদ্ভাসিত হয়ে গেল যে খৃষ্ট আমাকে আহ্বান করছেন ঐ সুদূর সমুদ্রপারের ফিজি দ্বীপপুঞ্জে,—তাঁর আহ্বান ব্যর্থ হবেনা আমার জীবনে। কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো দ্বিধা নেই,—খৃষ্ট-নির্দিষ্ট কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে। ফিজি দ্বীপে যাত্রার চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল আমার মন। কোন্ পথে যাব, যেতে কতোদিন লাগবে,—এই সব খোঁজ খবর আমি নিতে শুরু করলাম। আমার জীবনের এক নূতন অর্থ নূতন আশা আমি খুঁজে পেলাম, সেই সঙ্গে নবস্বাস্থ্যের স্পর্শ লাগল আমার দুর্বল দেহে। একটু সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির কাছে আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করলাম। কবি সানন্দে তাঁর আশ্রমের কাজ থেকে আমাকে ছুটি দিলেন। পরমবন্ধু উইলি পিয়ার্সন আমার সহযাত্রী হোলো, এতে অপরিসীম আনন্দ হোলো আমার। কবির উদার হৃদয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ভারতবর্ষ থেকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করলাম।

ফিজিতে পৌঁছিয়ে আমরা দেখলাম সেখানকার অবস্থা বই-এ যা পড়েছিলাম তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ। শ্রমদাসত্বের নিগড়বদ্ধ ভারতীয় নারীদের অবস্থা এতো দুঃসহ যে তা বর্ণনা করা যায় না। নাটালে কুলি লাইনে যে নৈতিক অবনতির কুৎসিত চিত্র দেখেছি এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। বরং ফিজির ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে নৈতিক কলংক গাঢ়তর। এমনি শ্রমচুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে হাজার হাজার দরিদ্র ভারতীয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে,—ফিজি, মরিশাস, নাটাল ও বৃটিশ গায়নায় অতিবাহিত করছে বর্ণনাতীত দুঃখের জীবন। তাছাড়া ভারতবর্ষ থেকে আড়কাটিরা প্রতি বৎসর ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতীয় শ্রমিককে দূর-দূরান্তে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দৃঢ়নিশ্চয় হলাম যে এমনি শ্রমিক-সংগ্রহকে পুরোপুরি রদ করা ছাড়া অন্য কোনো মধ্য পন্থা নেই।

উপনিবেশের কৃষি-মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী যে বদলাবে এ আশা করা বৃথা। কিন্তু ভারতবর্ষের জনমত এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই চুক্তিদাসপ্রথার অবসানকে ভারতবাসীর প্রধান রাজনৈতিক দাবী বলে ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত মহিলারা তাঁদের সাগর পারের দুঃখিনী ভগিনীদের বেদনাকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পেশ করা হোলো। তিনি এই বিবরণীর যাথার্থ্য স্বীকার করলেন, ফলে চুক্তিদাসপ্রথার অবসান ঘনিয়ে এল।

ফিজি থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আমরা যে রিপোর্ট দিলাম

তার অব্যবহিত পরেই চুক্তিদাসপ্রথা রদ আইন পাশ হোলো। ফিজির বিভিন্ন বাগিচার দুর্নীতি ও অনাচারের যে সব তথ্য আমরা সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা এমনি প্রত্যক্ষ ও হৃদয়স্পর্শী যে, ভাইসরয় সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের ভারত-সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কিছুমাত্র বিলম্ব করলেন না। চুক্তিদাসপ্রথা রদ করার আইন যাতে যতো শীঘ্র সম্ভব পাশ হয় তার জন্যে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক দপ্তরের অনুরোধে এই আইনে এমন একটি বিপত্তিকর বাক্য জুড়ে দেওয়া হোলো যাতে আমাদের অনেক আশায় বাদ সাধল। আইনের একটি ধারায় বলা হোলো যে এই প্রথার প্রয়োজনীয় রদবদলের জন্যে কিছু বিলম্ব ঘটবে।

চুক্তিদাসপ্রথা রদ হোলো, এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমরা ঐ একটি ধারা সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হইনি। কিন্তু এই ধারার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হয়ে উঠল যে এক বৎসর যেতে না যেতে আবার নূতন করে কাজ শুরু করতে হোলো। আমরা অনুসন্ধান করে জানলাম যে ঐ বিলম্বকর ধারার সুযোগ নিয়ে লণ্ডনে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যাতে আরো পাঁচ বছর ধরে শ্রমিক সংগ্রহ করা চলবে এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যে এক নূতন প্রথায় শ্রমচুক্তির দাসত্বপ্রথাকে এক নূতন রূপে চালু করা হবে। এই প্রথার কলংক সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে, এখন নূতন চাকুরীর মাধ্যমে এই প্রথাকেই পুনর্জীবন দান করা হবে এ কল্পনা করাও অসম্ভব। অতএব আবার নূতন করে শুরু হোলো আমাদের সংগ্রাম।

ফিজি দ্বীপে প্রথম যাত্রা আমার এক অবিস্মরণীয় আনন্দ-অভিযান। আমার ভাগ্যবিধাতা প্রভু আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন, এই নির্দেশের জন্যে তাঁর প্রতি আমার অনন্ত ধন্যবাদ। আমার সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছিলাম এই ফিজি দ্বীপে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন যুগে শতাব্দী ও যোজন পারের দূর-দূরান্তে খৃষ্টবিশ্বাসী, নরনারীর মন খৃষ্টীয় সেবার আদর্শে কী স্বর্গীয় আবেগে বারে বারে অনুপ্রাণিত হয় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমি এখানে লক্ষ্য করেছিলাম, লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছিল আমার জীবন।

সেখানে একজন মিশনারী সাধুর সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর নাম মিষ্টার লেলীন। ফিজিবাসীদের তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। ফিজিবাসী খৃষ্টানী তরুণদের এক 'হোলি কমিউনিয়ন' উৎসবে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন। এই তরুণ খৃষ্টানদের মধ্যে অনেকে কয়েক দিনের মধ্যেই সলোমন ও নিউ হেব্রাইডেস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে যাত্রা করবেন, সেখানকার অসভ্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করবেন খৃষ্টীয় আদর্শ। খৃষ্টের প্রথম শিষ্যরা যেমন একত্র ভোজনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খৃষ্টীয় প্রেরণাকে আপন আপন অন্তরে ভরে নিয়েছিলেন, তেমনি অনুপ্রেরণাকে আমরাও বরণ করে নিলাম এই ধর্মানুষ্ঠানে। একজন ফিজিয়ান খৃষ্টান একটি ধর্মগাথা রচনা করেছিলেন। স্থানীয় যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সেই গানটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হোলো। গানের প্রধান কলিটি নিম্নরূপ :

"সুদূর সমুদ্রপার থেকে
কার কণ্ঠ ভেসে ভেসে আসে ?
কে ডাকে নিরন্তর ?
সে ডাক বাজে আমার কানে,
সে ডাক বাজে তোমার প্রাণে,—
এসো, এসো সমুদ্র পার হয়ে এসো,—
তোমার হাত মিলাও আমার হাতে।"

ফিজিবাসী খৃষ্টভক্তদের কণ্ঠে এই সঙ্গীতের অনির্বচনীয় কারুণ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফিজিবাসী কতো খৃষ্টান প্রচারক স্বদেশ ছেড়ে সমুদ্রপারের দূর দ্বীপে গেছে, এই অভিযাত্রীদের মধ্যে কতোজন প্রাণ বিসর্জন করেছে দুর্গম প্রবাসে। তাদের স্মৃতি নিযুপ্ত রয়েছে এই সঙ্গীতের মধ্যে। এই সঙ্গীতের বেদনা যে সব স্থানীয় খৃষ্টান অধিবাসীদের কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে, তাদেরই নিকটতম পূর্বপুরুষ ছিল অসভ্য বর্বর। আজ তারা বর্বরতার বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় অভিযানে জীবনোৎসর্গ করতে চলেছে। তাদের কানে তাদের প্রাণে দূর-দূরান্তের ডাক এসে পৌঁছেছে। যে ডাক মানুষের প্রতি মানুষের ডাক,—সাহায্য করো, সেবা করো, হাতে হাত মিলাও।

ধর্মানুষ্ঠান সমাপ্ত হোলো। আমি এক দোভাষীর সাহায্য নিয়ে এই সব তরুণ ফিজিয়ান খৃষ্টান প্রচারকদের প্রতি আমার পরিপূর্ণ অন্তরের প্রেম ও শুভকামনা জ্ঞাপন করলাম। বিদেশী তরুণ বন্ধুরা আমার কাছে ঘিরে এল, হাতের মুঠির মধ্যে ভরে নিল আমার হাত।

এমনি আশ্চর্য মুহূর্তে আমার জীবনে আরো এসেছি। এমনি মুহূর্তে প্রতিবার এই কথাই আমার মনে বেজেছে খৃষ্টের সর্বমানবিক প্রেমের প্রসন্ন আলোক আঘাতে ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষে-গড়া সমস্ত বাধা নিষেধের যবনিকা দূর হয়ে যায়। আমি যখন নিজে হাই চার্চের অন্তর্গত ছিলাম তখন আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম যে অ্যাংলিকান খৃষ্টানগোষ্ঠী ও অন্যান্য খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ তা ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু এই বিশ্বাস যে অসত্য তার কত সহজ প্রমাণ খৃষ্টই দিয়ে গিয়েছেন। রবিবার দিন যে 'স্যাবাথের' দিন, এও তো ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু খৃষ্টই আবার সমস্ত বিধান থেকে মানব-মনকে মুক্তি দিয়ে গেছেন, যখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানুষই রবিবারের বিশ্রামকে সৃষ্টি করেছে, রবিবার মানুষকে সৃষ্টি করেনি,—মঙ্গলকর্ম যদি করতে হয় তার জন্যে রবিবারই বা কি, আর অন্যবারই বা কি! একজন ইংরেজ বিশপ একদা বলেছিলেন, সমস্ত বিধানের উপরে মঙ্গল বিধান। খৃষ্টের বাণীই তিনি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন।

আমি আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের প্রেম আরো ব্যাপক আরো উদার। যীশুখৃষ্টের বাণী যদি সত্য হয়, এবং ঈশ্বর যদি প্রকৃত আমাদের সকলের পিতা হন, তাহলে জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আমার ভাই, কেন না প্রতিটি মানুষ আমার পরমপিতারই সন্তান। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরূপে আমাদের কর্তব্য সর্ব দেশের সর্ব জাতির মানবকে আপন বলে গ্রহণ করা, ঈশ্বরের অখণ্ড প্রেমের শক্তিতে আপন অন্তরের প্রেমকে সর্বমানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করা। যীশুখৃষ্ট আমাদের সংস্কারের বন্ধনে বাঁধেন নি। বিশ্বাসের উন্মুক্ত আকাশে তিনি আমাদের মহামুক্তির আশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছেন। জাতি ধর্মের ভেদাভেদ যদি বর্জন করে সারা বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করতে পারি, তবেই প্রভুর সেই মুক্তির আশীর্বাদকে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারব। এবং সেই সঙ্গে এক মহা মহৎ অভিজ্ঞতাও আমরা লাভ করব। খৃষ্টান নামে

অভিহিত নয় এমন অনেক মানুষের হৃদয়ে খৃষ্টীয় আদর্শের কল্যধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব। তারপর শেষ বিচারের দিন যখন আসবে সেদিন লক্ষ্য করব যে সেই সব অখৃষ্টানরাই ঈশ্বর-চরণে স্থান পেয়েছে, যারা মুখে খৃষ্টের নাম নেয় অথচ জীবনে খৃষ্ট-আদর্শকে সম্মান দেয়নি, ঈশ্বর তাদের ঠিকই চিনেছেন, আপন পাদপ্রান্ত থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাদের।

ভারতীয় শ্রমিকদের চুক্তিদাসপ্রথার সম্পূর্ণ অবসানের জন্যে শেষ আন্দোলনের কাহিনী সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদের শেষে বিবৃত করা যাক।

পূর্বেই বলছি যে একই কু-প্রথাকে নূতন নামের-সজ্জা পরিয়ে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। ভারতীয় নেতারা আমাকে অনুরোধ করলেন ফিজি দ্বীপে যেতে। সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকতর ভাবে আমাকে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে হবে। যে অভিশাপ অবর্ণনীয় নৈতিক কলংকের সৃষ্টি করেছে এবং যার ফলে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে প্রচুর তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে সেই অভিশাপ যেন আবার নূতন করে মাথা তুলতে না পারে, তার দায়িত্ব নিয়ে আমি আবার সমুদ্রযাত্রা করলাম।

প্রথমবার আমার সঙ্গে উইলি পিয়ার্সন ছিল। এই দ্বিতীয়বারের ফিজিযাত্রায় আমি সম্পূর্ণ একা। এবার প্রায় এক বৎসর আমি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ছিলাম। এইবারে প্রায়ই শারীরিক অসুস্থতার কষ্ট যেমন ভোগ করি তেমনি ভোগ করি স্থানীয় স্বার্থ-শত্রুতার অধিকতর আঘাত। প্রথমবার ফিজিতে গিয়ে যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম তার কণামাত্রও এবার পাইনি। নিঃসঙ্গতা আর অবসাদে সর্বদা আমার অন্তর ভরে ছিল। তবে প্রথমবারের চেয়ে এবার আমি কাজ করতে পেরেছিলাম অনেক বেশী। এবার আমি যা তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা যেমনই ব্যাপক ও যেমনই গভীর যে এই শ্রমদাসপ্রথার স্বপক্ষে কোনো যুক্তির আর স্থান ছিল না।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আমার এই দ্বিতীয় যাত্রার শুভস্মৃতি আছে বৈ কি। ফিজি ভারতীয় শ্রমিক নারীদের পক্ষ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। আমি সেবার অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে গিয়ে বিভিন্ন মহিলা-সভায় শ্রমচুক্তিবদ্ধ ভারতীয় নারীদের দুঃখ দৈন্যের কথা শুনিয়েছিলাম,—কেমন মিথ্যা ছলচাতুরীর সুযোগে তাদের ভুলিয়ে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানকার বাগিচায় কী বীভৎস ঘৃণ্য জীবন-যাপনে তাদের বাধ্য করা হয়। আমি শুনিয়েছিলাম কী জঘন্য দুর্নীতির পংকে এই ভাগ্যহারা শ্রমিকনারীদের জীবন নিমজ্জিত, তার ফলে কতো খুনোখুনি, কতো আত্মহত্যা, সুস্থ ভদ্র সংসারযাত্রার কী ভয়ংকর পরিণাম!

আমার কথা প্রথম প্রথম অষ্ট্রেলিয়াবাসিনীরা বিশ্বাসই করেন নি। তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে তাঁরা মিসেস্ গার্নহাম নাম্নী এক মহিলাকে ফিজিতে প্রেরণ করলেন। মিসেস্ গার্নহাম যে রিপোর্ট আনলেন তার চিত্র আমার বর্ণনার চেয়ে অনেক ভয়াবহ! অষ্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ এই রিপোর্ট পেয়ে তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন, তাঁরা সমস্বরে দাবী করলেন যে এমনিভাবে বিদেশী শ্রমিক সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। মিস্ প্রীষ্ট ও মিস্ ডিকসন নামে দুই অষ্ট্রেলিয়ান মহিলা তৎক্ষণাৎ ফিজি যাত্রা করলেন। এই দুই মহিলা থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সদস্যা ছিলেন। তাঁরা ফিজিতে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিক নারীদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করলেন। ভারতবর্ষে শ্রীমতী জয়জী পেটিটের নেতৃত্বে একদল মহিলা বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে, অবিলম্বে শ্রমচুক্তিপ্রথা রদ করবার জন্যে যা কিছু করা দরকার তা করা হবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে এই ঘৃণিত প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হোলো। ভারতীয় পুরুষ ও নারী যারা সেদিন পর্যন্ত শ্রমচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল সেদিন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল তারা। সমস্ত উপনিবেশে এই দিনটি মুক্তিদিবস নামে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এই দিনটির অম্লান আনন্দ-ভাতি।

সম্প্রতি ফিজি-প্রত্যাগত কয়েকজনের সঙ্গে আমার লণ্ডনে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের কথা শুনে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, সত্যই অল্প সময়ের মধ্যে ফিজিতে অনেক সুফল ফলেছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, নৈতিক ও শিক্ষামূলক কল্যাণক্ষেত্রেও। শ্রমিকদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পুরাতন কুলি লাইনের দুর্নীতিমূলক জীবনযাত্রার অবসান হয়েছে, সামাজিক জীবনে সুস্থতর ও আনন্দকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, নব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নবস্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ভারতীয় কর্মীর নূতন সংসার।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আমার এই শেষ যাত্রায় আমার প্রধান পাথেয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রীতি ও প্রেরণা। নিঃসঙ্গতার ছায়ায়, শত্রুতার পংকে ও হতাশার অন্ধকারে যখনই আমার মন ডুবে গেছে, তখনই আমার মানস চক্ষে আমি শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত পরিবেশকে কল্পনা করেছি, যেখানে প্রতিদিন প্রত্যুষ-আভার বহু পূর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন স্তব্ধতায় উপবেশন করে আছেন। আমার উত্যক্ত অবসন্ন মন এই স্মৃতিচিত্র থেকে অশেষ সান্ত্বনা লাভ করত। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী থেকেও আমি গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করতাম। সমুদ্রপারের সেই সুদূর দ্বীপে তাঁর একটি চিঠি যেদিন আসত, সেই দিনটিকে জীবনের আশীর্বাদরূপে আমি গ্রহণ করতাম।

ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহে এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে এমনি ভাবে মানুষের কাছ থেকে যে প্রেম যে স্নেহ আমি লাভ করেছি, তুলনাতীত তার ঐশ্বর্য। আমি এ-ও জানি, মানুষের ভালোবাসাকে অতিক্রম করে মানুষের ভালোবাসাকে আপন মঙ্গল ক্রোড়ে স্থান দিয়ে আমার সমগ্র জীবনকে ঘিরে রয়েছে ঈশ্বরের ভালোবাসা, আমার পরমপিতার পরম প্রেম। সেই প্রেম তার নিত্য অঙ্গুলি-নির্দেশে আমাকে সেই চিরন্তন অনন্ত সত্যের পথে পরিচালিত করে চলেছে। এই সত্যের আলোকে সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভাসিত, সর্ব অন্ধকারের নিবৃত্তি। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথও এই অনন্ত অখণ্ড সত্যের পথে আমাকে আকর্ষিত করেছেন। আমার মরদৃষ্টি এই পরম সত্যকে যীশুখৃষ্টের পরমরূপের মধ্যে দর্শন করে ধন্য হয়েছে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
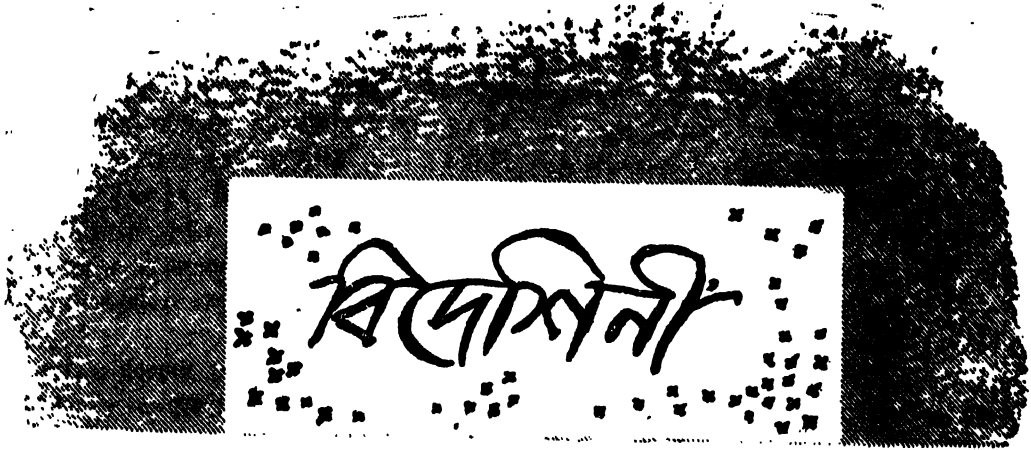
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

এই লালকাকার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। মিঃ লালকাকা সেলেই থাকেন—ঠিক সেলে নয়, সেলেরই অন্তর্গত সন্নিহিত পল্লী ব্রুকলীনে, আমাদের বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে। নরদেনডেন রোডে ত আমার সাক্ষাৎ, নরদেনডেন রোড সোজা দক্ষিণমুখো গিয়ে মিশেছে আর একটি বড় রাস্তায়—নাম মার্সল্যাণ্ড রোড। এই মার্সল্যাণ্ড রোডটিও কোণাকুণি ভাবে চলে গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণে এবং যেখানে নরদেনডেন রোড এসে মিশেছে তারই কাছাকাছি পূর্বমুখো চলে গিয়েছে আমাদের ওল্ড হল লেন। এবং এই মার্সল্যাণ্ড রোডে উত্তরমুখো প্রায় মাইলখানেক গেলেই মিঃ লালকাকার বাড়ী পাওয়া যায়। এ পল্লীটির নামই ব্রুকলীন।

মার্সল্যাণ্ড রোডের বাড়ীখানি মিঃ লালকাকার নিজেরই। বেশ ভাল বাড়ী। মার্সল্যাণ্ড রোডের এ দিকটায় অনেক দোকান পসার আছে, তাই এখানকার বাড়ীগুলি কোনটাই বাগানঘেরা নয়, রাস্তার ফুটপাথের উপর থেকেই উঠেছে। মিঃ লালকাকারও তাই। শুনেছিলাম—মিঃ লালকাকার ভাল ব্যবসা আছে এদেশে, এবং তার বাড়ীর একতলায়ই তাঁর নিজস্ব বেশ বড় দোকান—হরেক রকম জিনিষের—নাম গ্রেস ষ্টোরস। যার নামে এই দোকানটি, অর্থাৎ গ্রেস, মিঃ লালকাকারই স্ত্রী—এদেশী মহিলা। এই মহিলাটিকে অনেকবার দেখেছি—সুন্দরী ঠিক বলা চলে না, তবে সুশ্রী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কথায় বার্তায়, ধরণে ধারণে একটা স্বাভাবিক মাধুর্য্য সবসময়ই চোখে পড়ে। ছোটখাট মানুষটি, ছিমছাম গড়ন, মুখখানিও মন্দ নয়—সব সময়ই যেন একটি হাসি লাগান আছে মুখে। বয়স বছর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে।

মিঃ লালকাকার বয়স কিছু বেশী—দেখলে পঞ্চাশের উপর বলে মনে হয়। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথার মাঝখানটিতে পরিষ্কার টাক এবং মাথার দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। অসাধারণ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ—কথা প্রায় বলেনই না তবে তাঁর সহৃদয়তার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়।

এই লালকাকা-দম্পতির সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল—রবিনহুড গালফ ক্লাবে। রবিনহুড গালফ ক্লাবটি, যেখানে নরদেনডেন রোড মার্সল্যাণ্ড রোডে মিশেছে, সেখান থেকে মার্সল্যাণ্ড রোড ধরে আরও মাইল দুই দক্ষিণে গিয়ে মার্জ্জী নদীর ধারে। ধূ-ধূ করছে সবুজ তরঙ্গায়িত মাঠের মধ্যে ঠিক নদীর কিনারায়ই ক্লাবের ঘরখানি—যেমন এদেশে হয়, চারিদিকে বড় বড় জানালায় সার্সিআঁটা একটা বড় চারচালা বাংলো।

ভিতরে কোনও অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই—রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ত আছেই, তাছাড়া নদীর ধারের বড় হলটি দামী দামী কৌচ সোফা ও কার্পেট দিয়ে সাজান এবং চার কোণে চারটি ছোট তাস খেলার টেবিল ও তৎসংলগ্ন চেয়ার। এই হলটিরই একপাশে একটি কাঠের পর্দার আড়ালে খাওয়ার টেবিল ও চেয়ারগুলি সাজান—একেবারে বারোজন বসে খাওয়া যায়। এ ছাড়া হলটির সংলগ্ন পাশে পাশে অনেক ছোট ছোট ঘর আছে পুরুষদের কাপড় ছাড়ার, মেয়েদের কাপড় ছাড়ার, গলফ খেলার জিনিষপত্র রাখার ইত্যাদি। নদীটির অপর দিকে বাংলোটির উত্তরে ঘনসবুজ গলফ খেলার মাঠ—সমতল মোটেই নয়, নানাদিকে ঢেউ খেলানো। আমাদের দেশে নদী বলতে যা বোঝ, এ নদীটি মোটেই সেরকম নয়—ছোট একটি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। বোধ হয় লাফিয়ে পার হওয়া যায়। তার উপরে, ক্লাবঘরের কাছেই ছোট একটি সেতুও আছে।

বাংলোটির সংলগ্ন পূবের দিকে আর একটি ছোট বাংলো আছে—মিঃ ও মিসেস পেজ থাকেন একটি বছর পঁচিশেকের অবিবাহিত মেয়ে নিয়ে। বৃদ্ধ মিঃ পেজ ও মিসেস পেজের উপরেই এই ক্লাবটি যথাযথ ভাবে চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন মত রান্নাবান্নার ব্যবস্থা এঁরাই করেন—শুধু সকালে টেলিফোন করে বলে দিতে হয় ক'জন যাবে বা ক'জন খাবে। বৃদ্ধা মিসেস পেজের শরীর তত ভাল ছিল না, তিনি বেশীর ভাগই এক কোণে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে কার কি প্রয়োজন লক্ষ্য করতেন। কিন্তু মিঃ পেজ এবং বিশেষ করে মেয়েটি সর্বদা ঘুরে বেড়াত—সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশন করার জন্য। ক্লাবে 'বার' অর্থাৎ মদ খাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল—তারও চাহিদা মতন এরাই সরবরাহ করতেন।

বুলা। তোমাকে আগেই বলেছি, ক্লাবে যাওয়ার আমার খুব ঝোঁক ছিল। দিনটি পরিষ্কার থাকলে প্রায় প্রত্যেক রবিবারই সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমি ও মার্লিন গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যেতাম ক্লাবে। সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা আসতাম ফিরে—লাঞ্চ ও বিকেলের 'চা' সেইখানেই খেয়ে নিয়ে। আমি অবশ্য দিনের বেশীর ভাগই কাটিয়ে দিতাম গলফ খেলে। মার্লিনও যে গলফ একেবারে খেলত না এমন নয়, তবে বেশী খেলতে পারত না। বাকী সময়টা ক্লাবে গল্পগুজব করে কিংবা তাস খেলে কাটিয়ে দিত।

এই ক্লাবেই লালকাকাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এবং ক্রমে ওদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল আমাদের। তার প্রধান কারণ বোধ হয়—আমি ও লালকাকা দু'জনেই ছিলাম ভারতবাসী—অন্য কোনও ভারতবাসী ক্লাবের সভ্য ছিল না। লালকাকা ছিল ভারতের বম্বে অঞ্চলের লোক—পার্শী। কিন্তু বিশেষভাবে ভাবটা জমল মার্লিনের সঙ্গে গ্রেসের। তারও কারণ—যতদূর আমার মনে হয়েছে—দুজনেরই স্বামী ভারতবাসী এবং সেই দিক দিয়ে অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল দুজনের। যদিও এইখানেই বলে রাখি—ক্লাবের সভ্যদের কাছ থেকে কোনও দিন এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর দরুণ আভাষে ইঙ্গিতে পর্য্যন্ত ব্যবহারের কোনও তারতম্য লক্ষ্য করিনি।

লালকাকার সঙ্গে আমার ভাবটা একটা সহৃদয়তার বন্ধনে নিশ্চয়ই দৃঢ় ছিল কিন্তু আমাদের মধ্যে মেলামেশা যে খুব বেশী ছিল, এমন কথা বলতে পারি না। তার কারণ, লালকাকা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং তাঁর স্বভাবও ছিল একটু অন্যরূপ—ঠিক আমার সঙ্গে মেলেনি। আগেই বলেছি—লোকটি কথাবার্ত্তা খুবই কম বলতেন এবং ক্লাবে এসে মদের গ্লাস নিয়ে এক কোণে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন—কোনও খেলাধূলার মধ্যে যেতেন না। সকলের সঙ্গেই দেখা হলে, সৌজন্যের অভিবাদন জানাতে ত্রুটি করতেন না কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তার পরে চুপ হয়ে যেতেন—নিজের সত্ত্বার মধ্যে মসগুল হয়ে।

স্ত্রীটির অর্থাৎ গ্রেসের চরিত্র ছিল ঠিক বিপরীত। অসাধারণ প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল সে—সেকথা আজও জোর করে বলতে পারি। সকলের সঙ্গে মেলামেশায় প্রাণ দিত ঢেলে এবং বিশেষ করে মার্লিনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে তার যেন ক্লান্তি ছিল না। প্রাণের উৎসাহে গলফ খেলা শিখত এবং তাস খেলার টেবিলেও তার উৎসাহের অভাব ছিল না। প্রথম প্রথম লক্ষ্য করতাম—স্বামীকে সব জিনিষের মধ্যে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যেন হাল ছেড়ে দিয়েছিল। স্বামীরও ভাবটা ছিল—আমাকে নিরিবিলি চুপচাপ থাকতে দাও, তুমি জীবনটাকে যেমন খুশী উপভোগ কর, আমার আপত্তি নেই।

এ নিয়ে একদিন মার্লিনের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল—মনে আছে। কথায় কথায় মার্লিন বলেছিল—যাই বল, গ্রেস মেয়ে খুব ভাল।

বললাম, আমি তা ত অস্বীকার করছি না? কিন্তু লালকাকাও লোক খারাপ নয়।

মার্লিন বলল, তা হতে পারে, কিন্তু প্রেমের প্রতি একটু উদাসীন।

শুধালাম, তা কেন বলছ—লালকাকার স্বভাবই ঐ রকম।

বলল, স্বভাব যাই হোক, গ্রেসের সঙ্গে জীবনে সুর মিলিয়ে চলে না—চলতে চায়ও না।

শুধালাম, গ্রেস কিছু বলেছে নাকি তোমাকে?

বলল, না না। গ্রেস সেরকম মেয়ে নয়। তবে বোঝা ত কঠিন নয়।

বললাম, বাইরে থেকে দেখলে তুমি যা বলছ তাই মনে হয় বটে, কিন্তু হয়ত তোমার ভুল। অন্তরের নিবিড়ে হয়ত দুজনেই একই সুরে বাঁধা।

মাথা নেড়ে মার্লিন বলল, না না। গ্রেসের ওদিক দিয়ে একটা গভীর দুঃখ আছে, কথায়বার্ত্তায় সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নি।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, দেখ, একটা জিনিস ভুলনা—ওদের বয়সের অনেক পার্থক্য। লালকাকা যৌবনের সীমানা ছাড়িয়েছে, তাই শরীর এবং মনের দিক দিয়ে সে চায় বিশ্রাম। গ্রেসের এখন ভরা যৌবন—তাই সে চায় উপভোগ। একটু গরমিল ত সেদিক দিয়ে হবেই।

মার্লিন বলল, তা কেন? বয়সের ওরকম পার্থক্য ত আরও অনেক স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আছে—কৈ তাদের ত ঠিক ওরকম হয়নি?

মনে মনে ভাবলাম—কি জানি, হয়ত ঐখানেই ভারতবর্ষের মনের সঙ্গে এদেশের মনের তফাৎ! একটু বয়স হলেই, ভারতবর্ষের মন হয়ত এলিয়ে পড়ে, এদেশের দ্রুত চলার তালে ঠিক চলতে পারে না। মার্লিনকে কিন্তু সে কথাটি না বলে বললাম, হয়ত লালকাকার মনে কোনও একটা নিবিড় দুঃখ আছে—তাই সে নিজেকে ওরকম গুটিয়ে রাখে।

মার্লিন বলল, কিন্তু সেটা গ্রেসকে বলে পরিষ্কার করে নিলেই হয়। গ্রেস ত অবুঝ নয়।

মৃদু হেসে বললাম, হয়ত সেকথা গ্রেসকে ঠিক বলার নয়।

মার্লিন একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু বলল, হবেও বা।

যাই হোক, এখন থেকে মাস আটেক পরের কথা। হঠাৎ একদিন শুনলাম—গ্রেস লালকাকাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে—লালকাকারই দোকানের একটি যুবক কর্ম্মচারী—নাম নাইট—তার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, একটি মাত্র সন্তান বছর আট-নয়ের একটি বালক—তাকেও রেখে গেছে। শুনে আমি ও মার্লিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম—আজও মনে আছে। মার্লিন শুধু একবার বলেছিল, গ্রেসকে কি ভুলই বুঝেছিলাম—ভাল মেয়ে বলেই জানতাম।

* * * *

পরের দিন সন্ধ্যার পরে লালকাকা এলেন আমাদের বাড়ীতে। আমরা ডিনার খেয়ে বসবার ঘরে তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

গ্রেস চলে যাওয়ার পর প্রায় আট মাস লালকাকাকে দেখিনি। লালকাকা যখন এলেন তাঁর চেহারা দেখে সত্যই অবাক হলাম। এ কি চেহারা হয়েছে মিঃ লালকাকার! মাথার দুপাশের চুলগুলি একেবারে সাদা হয়ে গেছে এই ক'মাসের মধ্যেই। মুখের ভাঙনে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটু যেন কুঁজোও হয়ে গেছেন।

সাদর অভ্যর্থনায় লালকাকাকে বসালাম। জানি—লালকাকা

মদ খেতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাই এক পেগ হুইস্কি সোডা মিশিয়ে দিলাম তাঁর সামনে। আমিও একটা শেরী নিয়ে বসলাম।

বুলা! এইখানেই বলে রাখি—আমাদের বাড়ীতে এসবের কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। অবাক হয়োনা,—এদেশে ভদ্রলোক মাত্রেরই বাড়ীতে সুরাপানের বন্দোবস্ত থাকে—নিজেরা না খেলেও অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য রাখতেই হয়। আমি অবশ্য নিয়মিত ভাবে কোনও দিনই সুরাপান করিনি, তবে ঠাণ্ডার দেশে মাঝে মাঝে একটু খেতেই হয়, এবং যখনই খেয়েছি—হুইস্কি আমার কোনদিনই ভাল লাগেনি; হয় শেরী না হয় পোর্ট এইরকম একটা কিছু। মার্লিন সুরাপান একেবারেই পছন্দ করত না।

আমি, লালকাকা—দুজনে বসেছি ঘরে। মার্লিন একপাশে দাঁড়িয়ে লালকাকার দিকে চেয়ে শুধাল, বব্ ভাল আছে ত?

বব্ লালকাকার ছেলের ডাক-নাম।

বললেন, হ্যাঁ। ধন্যবাদ। তাকে ত বোর্ডিং-স্কুলে দিয়েছি—ভালই আছে সেখানে।

মার্লিন বলল, আপনারা বসে কথাবার্ত্তা বলুন। আমায় যদি মাপ করেন, আমি যাই, আমার একটু কাজ আছে।

লালকাকা বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে মার্লিনের দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি থাকবেন না? আমার কথা আপনার সামনে বলতে পারলে আমি খুশীই হতাম।

মার্লিন বলল, বেশ যদি অনুমতি দেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই মার্লিন ঘুরে এসে বসল আমাদের দুজনার থেকেই একটু দূরে।

লালকাকা এতক্ষণ কোনও কথাই বলেন নি। মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিলেন—মাঝে মাঝে সুরার গ্লাসে দিচ্ছিলেন চুমুক।

আমরা দুজনেও চুপ করে বসে আছি—কি আর বলব। কিছুক্ষণ পরে লালকাকা চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে শুধালেন, আপনারা যখন ডেভন, কর্ণওয়ালের দিকে যাচ্ছেন, টর্কীতে যাবেন নিশ্চয়ই?

বললাম, অবশ্য! টর্কী না দেখলে ত ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রতীর দেখাই হল না। যাওয়ার পথে টর্কীতে দু'তিন দিন থেকে 'লু'তে গিয়ে বাস করব—এই ত ইচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, একটা কাজের ভার আপনাদের দিতে পারি কি?

বললাম, বলুন?

বললেন, টর্কীর পাশেই সমুদ্রের ধারে বেবাকোম্ব বলে একটি গ্রাম আছে—টর্কী থেকে মাইল দুই-তিন দূরে। সেইখানে এস্‌টন্ লজ বলে একটি বোর্ডিং-হাউসে—

হঠাৎ চুপ করে গেলেন। হুইস্কির গ্লাসে আর এক চুমুক দিয়ে একটু পরে মাথা নীচু করে বললেন, এসটন লজে গ্রেস থাকে?

আমি ও মার্লিন পরস্পরে চোখ চাওয়াচায়ি করলাম।

আবার বললেন, গ্রেসকে টর্কী দিয়ে যাওয়ার সময়ে যদি কিছু টাকা দিয়ে যান।

পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে সামনে টেবিলের উপর রাখলেন।

বললেন, দু'শো পাউণ্ড।

আমরা দুজনেই অবাক হয়ে লালকাকার মুখের দিকে তাকালাম। কেউ কিছু বললাম না।

একটু পরে লালকাকাই বলে যেতে লাগলেন, গ্রেসের বড় দুর্দ্দশা—আমি খবর পেয়েছি। শরীরও অসুস্থ, টাকা-পয়সাও হাতে একেবারেই নেই—একলাই আছে।

বুঝলাম—যার সঙ্গে গিয়েছিল সেই লোকটি গ্রেসকে ফেলে পালিয়েছে।

শুধালাম, গ্রেস আপনাকে চিঠি লিখেছে বুঝি?

তাড়াতাড়ি বললেন, না—না। সে বড় অভিমানী মেয়ে, মরে গেলেও আমাকে চিঠি লিখবে না। তবে আমি খবর পেয়েছি।

ইচ্ছা হল শুধাই—তাহলে কোথায় আছে, কি ভাবে আছে আপনি জানলেন কি করে, প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ লাগিয়েছিলেন নাকি? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম না।

মার্লিন শুধাল, গ্রেসের নিজের হাতে ত অনেক টাকাকড়ি ছিল!

লালকাকা বললেন, সে টাকা ঠিকই আছে। গ্রেস ত এক পয়সাও নিয়ে যায়নি। এমন কি, তার চেকবইখানাও রেখে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, সত্যিই আপনি খুব উদার।

না—না বলে একচুমুকে হুইস্কির গ্লাসটি শেষ করলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাকে আর এক পেগ হুইস্কি দি?

সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। আর এক পেগ হুইস্কি ও সোডা দিলাম মিঃ লালকাকাকে। এক চুমুকে হুইস্কির গ্লাসের তিন ভাগের একভাগ খেয়ে নিয়ে হঠাৎ যেন কথা বলার অনুপ্রেরণা এল। বললেন, মিসেস চৌধুরী! আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমি উদার একেবারেই নই। গ্রেস যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—সে ত আমারই অপরাধ। গ্রেসের যথাযথ মূল্য আমি তাকে দিতে পারিনি। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ভাল তাকে আমি বাসি—খুবই বাসি। কিন্তু সে ভালবাসা জানিয়ে নিবেদন করার শক্তি আমার ছিল না। তাই সে আমাকে ভুল বুঝল। অভিমান করে গেল চলে। সে ত তার অপরাধ নয়।

মার্লিন শুধাল, কিন্তু গ্রেস ত বোকা ছিল না? সে কি সেটুকু বুঝতে পারেনি?

মিঃ লালকাকা বললেন, ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী—মেয়েদের বোঝা না বোঝা নির্ভর করে প্রাণের অনুভূতির উপরে, বুদ্ধির বিচারের উপর নয়। তার সেই অনুভূতিতে যে কোনও সাড়া জাগাতে পারিনি আমি।

বললাম, তা আপনি ত তাকে অনেক টাকাকড়ি দিয়েছিলেন শুনেছিলাম—খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছিলেন তাকে—

মৃদু হেসে লালকাকা বললেন, টাকাকড়ি পেলেই খুসী হওয়ার মেয়েরা অন্য জাতের—গ্রেস ঠিক সে জাতের নয়।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। পরে মিঃ লালকাকা বললেন, মিসেস চৌধুরী! বিশ্বাস করুন—সে-ও আমাকে ভালবাসে। আমার বিশ্বাস—আজও ভালবাসে। তাই ত চলে গেল। ভাল না বাসলে গ্রেসের মতন মেয়ে চলে যাবে কেন? আজ তার এই রকম দুরবস্থা—আমি তাকে টাকা না পাঠিয়ে পারি?

কথাগুলি বলে কি রকম করুণ ভাবে চাইলেন মার্লিনের মুখের দিকে। সকলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ মার্লিন প্রশ্ন করল, মিঃ লালকাকা! সে যদি আপনার কাছে ফিরে আসতে চায় আপনি তাকে নেবেন?

মিঃ লালকাকা একটু হাসলেন। বললেন, সে ফিরে আসবে না —মিসেস চৌধুরী! অসম্ভব অভিমানিনী সে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে তার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন—আমার দরজা চিরদিনই তার জন্য খোলা।

মার্লিন বলল, আপনারই যোগ্য কথা মিঃ লালকাকা!

শুধালাম, টাকাটা সোজা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন না কেন?

বললেন, সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু তাহলে টাকাটা সে নিত না। তাই আপনাদের কাছে ছুটে এলাম। এক মিসেস চৌধুরী যদি তাকে বুঝিয়ে টাকাটা নেওয়াতে পারেন। পারলে উনিই পারবেন।

কিন্তু টাকাটা নিয়ে গ্রেসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে আমার মন একেবারেই সায় দিচ্ছিল না। মনে হল—স্বামিস্ত্রীর এসব ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভাল। যাচ্ছি আনন্দ করে বেড়াতে—মার্লিনকে আবার এসব ঝামেলার মধ্যে জড়ান কেন? ভদ্রভাবে কি বলে লালকাকার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা যায়! ভেবে বললাম দেখুন মিঃ লালকাকা! এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কি আমাদের উচিত—গ্রেস কি সেটা পছন্দ করবে? সে হয়ত—

হঠাৎ মার্লিন উঠে দাঁড়াল। লালকাকার সামনে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে টাকাটা নিল তুলে।

বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ লালকাকা, আমি আমার যথাসাধ্য করব। গ্রেস আপনার এ উদারতার মর্যাদা দিতে জানে বলে আমার বিশ্বাস।

মিঃ লালকাকা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৃতজ্ঞতা ভরে চাইলেন মার্লিনের দিকে।

* * *

মিঃ লালকাকা চলে গেলে মার্লিনকে বললাম, শেষ পর্য্যন্ত তুমি এ দায়িত্ব নিলে?

মার্লিন শুধু বলল, গ্রেসের প্রতি এটা আমার একটা বড় কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রেস ভালবাসতে জানে বলে মনে হচ্ছে।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, মার্লিকাকার কথা শুনে মনে হল—গ্রেস হয়ত বা সত্যিই লালকাকাকে ভালবাসে।

হেসে বললাম, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ লীনা—লালকাকার কথায় অভিভূত হয়েছ। ভালবাসলে কেউ কখনও স্বামীকে ছেড়ে পালায়?

মার্লিন বলল, পালালই বা কেন? লালকাকার একটা কথা লক্ষ্য করলে না—ভাল না বাসলে চলে যাবে কেন? সত্যিই ত। লালকাকা ত গ্রেসের জীবনে কোনও কাজে কোনও দিন কোনও বাধার সৃষ্টি করেননি—সেটা লালকাকার স্বভাবই নয়। গ্রেস ত লালকাকার চোখের আড়ালে নিজের প্রেমের লীলা অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারত সব দিক বজায় রেখে, পালাবার কি দরকার? টাকাকড়ি, মান সম্মান এমন কি নিজের ছেলেটিকে পর্য্যন্ত ছেড়ে এমন করে অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া—

মার্লিন চুপ করে গেল। শুধালাম, তাতে করে লালকাকার প্রতি ভালবাসা প্রমাণ হল কি করে? বড় জোর এইটুকু মানতে রাজী আছি—গ্রেস হয়ত আসলে মেয়ে তত খারাপ না, একটা মিথ্যা লুকোচুরির জীবন ঠিক সইতে পারেনি।

মার্লিন ইতস্তত করে বলল, তা হতে পারে। কিন্তু গ্রেসের কাজে একটা যেন অন্ধ অভিমানের আভাষ পাচ্ছি, যেন দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়েছিল।

হেসে বললাম, লীনা—একটা কথা ভুলনা। স্বামীকে ভালবাসলে কেউ অন্য প্রেমিক জোটায় না।

মৃদু হেসে মার্লিন আমার মুখের দিকে চাইল। বলল, সেইখানেই ত ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই ত আমি একবার গ্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শুধালাম, দেখা করেই বা কি বুঝবে? গ্রেস কি এ অবস্থায় সরলভাবে কিছু বলবে তোমাকে?

নিজের মনেই বলল, দেখা যাক। তবে একটা কথা বলে রাখি।

শুধালাম, কি?

বলল, যদি বুঝি গ্রেস সত্যই লালকাকাকে ভালবাসে, তবে তাকে আমি ফিরিয়ে দেব লালকাকার কাছে—তোমাকে বলে রাখছি।

চার

গ্লষ্টার ডেভন্ কর্ণওয়াল্ প্রভৃতি ঘুরে দু'-তিন জায়গায় হোটেলে রাত্রিবাস করে এলাম টর্কিতে। উঠলাম—এবিলন হোটেলে। সমুদ্রের ধার দিয়ে পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর চাদের মতন ঘুরে গিয়েছে টর্কি সহরটি—ক্রমে উঠে গিয়েছে উচ্চতর ভূমিতে। সমুদ্রের গায়ে রাস্তাটির ধারে বড় বড় সব বাড়ী—তার মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল হোটেল—এবং বাড়ীগুলির নীচে বেশীর ভাগই নানারকমের দোকান পসার ইত্যাদি সুন্দর সাজান। তা'ছাড়া সমুদ্রের ধারের রাস্তাটির পাশে পাশে কয়েকটি পার্কও আছে—রং-বেরংয়ের আলোবাহারে রাত্রে যেন একটা মায়ারাজ্যের সৃষ্টি হয় সেখানে!

এবিলন হোটেলটি ঠিক সমুদ্রের ধারের বড় রাস্তাটির উপরে নয়। তবে সমুদ্র থেকে খুব বেশী দূরে নয়—একটি ছোট রাস্তার উপরে। এবং এবিলন হোটেলটির পিছনে একটি বাগান—ঘরে বসে তার ফাঁকে ফাঁকে দূরে সমুদ্র দেখাও যায়। হোটেলটির সামনেও ছোটখাট একটি বাগান।

যখন টর্কিতে গিয়ে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রথম সমুদ্রের ধারের দু'-একটা হোটেলে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু পাইনি, সবই ভর্ত্তি ছিল। আরও অনেক হোটেল ঘুরে ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত এবিলন হোটেলে স্থান পেয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। সামনের বাগানটিতে সারি সারি অনেক গাড়ী ছিল—সেইখানেই রেখে দিলাম আমার গাড়ী।

পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেরোবো যাব—এই রকমই ঠিক ছিল এবং সেইভাবেই তৈরী হয়ে ভোজনাগারে ব্রেকফাষ্ট খেতে বসলাম—আমি ও মার্লিন। খাবার ঘরটি বেশ বড় এবং

চারিদিকে ছোট ছোট খাবার টেবিল ও চেয়ার দিয়ে সাজান—কোনটায় বা দুজন বসে খাবার এবং কোনটায় বা চার পাঁচজন। সব টেবিলই ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা এবং প্রত্যেকটির উপর একটি ফুলদানিতে নানা রংয়ের ফুল সাজান। আমরা খাবার ঘরে ঢোকা মাত্র একটি পরিচারিকা এল আমাদের কাছে—তার পোষাকের উপর একটি ধবধবে সাদা এপ্রনে গলা থেকে প্রায় পা পর্য্যন্ত ঢাকা। এসে মৃদু হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, সুপ্রভাত! আপনাদের ঘরের নম্বরটি কত?

বললাম, সতেরো।

'এই দিকে আসুন' বলে আমাদের নিয়ে গেল একটি দু'জন বসে খাবার মতন টেবিলে এবং দেখলাম, তার উপর আমাদের ঘরের সতেরো নম্বরটি আলগা পিতলের হরফে বসান। বুঝলাম—এইটেই আমাদের টেবিল, আগে থেকে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে।

ব্রেকফাষ্ট খাচ্ছি—সেই পরিচারিকাটিই খাবার এনে এনে দিচ্ছে আমাদের টেবিলে। ঘরের আশে-পাশে আরও টেবিলে দু'-চার জন বসে ব্রেকফাষ্ট খাচ্ছে—অনেক টেবিল খালি, হয়ত তারা খেয়ে গেছে কিংবা হয়ত এখনও আসেনি। ঘড়িতে তখনও দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকী—এ হোটেলের নিয়ম অনুসারে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ব্রেকফাষ্ট।

আমরা যে টেবিলে বসে খাচ্ছি তার অনতিদূরে একটি টেবিলে একটি সুদর্শন ইংরেজ যুবক বসে খাচ্ছিল—পরিধানে বেশ দামী পোষাক, সেটা সহজেই চোখে পড়ে। যুবকটি খেতে খেতে লজ্জাহীনের মতন অনবরত মার্লিনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল—সেটুকু শুধু আমি নয়, মার্লিনও লক্ষ্য করেছিল। মার্লিন ত সুন্দরী—বুলা! তা ত জানই। সে কথার আভাস ইতিপূর্ব্বে আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতেই দিয়েছি। এখন একটু পরিণত বয়সে সে রূপ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাজেই মার্লিন যুবকটির মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এ আর বিচিত্র কি? মনে মনে এই রকম কিছু ভেবে বোধ হয় একটু কৌতুকও অনুভব করছিলাম। মার্লিনের দিকে যেন নতুন করে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে! দিনটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাই বোধ হয় একটা গাঢ় সবুজ রংয়ের পোষাক ছিল তার পরিধানে। কালো চুল এবং সেই অন্তস্পর্শী কালো দুটি চোখের মধ্য দিয়ে শুধু মুখের লাবণ্যটুকুই নয়, পরিধানের পারিপাট্যে তার দেহের যৌবনশ্রীও যেন চারিদিকে ঠিকরে পড়ছিল, তার বসার ভঙ্গিমার মধ্যে। আমিও যেন একটা নতুন গর্ব্বে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম—মার্লিনের দিকে। একটু পরে চাপাগলায় বললাম—জান! লোকটি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, চোখ ফেরাতে পারছে না।

মার্লিনও যেন একটু বিরক্তি স্বরে চাপাগলায় বলল, লোকটি অসভ্য—ওদিকে তাকিও না।

* * *

বেবাকোম্বে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। মিঃ লালকাকা ঠিকই বলেছিলেন—টর্কি থেকে মোটরে বেবাকোম্ব যেতে মিনিট দশ-পনেরোর বেশী লাগে না। বেবাকোম্ব মোটেই টর্কির মতন নয়—সমুদ্রতীরের একটি গ্রাম বললেও চলে। টর্কি থেকে একটি পাহাড় ক্রমে উঁচুতে গিয়ে উঠেছে এবং তারই মাথার উপরে বেবাকোম্ব গ্রামখানি—সমুদ্র অনেক নীচে পাহাড়ের তলায়। পাহাড়ের উপর সমুদ্রের ধার দিয়ে একটি রাস্তা এবং তার পাশে গুটিকয়েক ভাল ভাল বাড়ীও আছে—তার মধ্যে তিন চারটিই হোটেল। কিন্তু পিছনের বাড়ীগুলি বেশীর ভাগ মোটেই বড় নয়, চারিদিকে ছড়ান সাধারণ ছোট ছোট বাংলো-কুটীর বলাও চলে। সমুদ্রের ধারের রাস্তাটি বাদ দিয়ে পিছন দিকে একটি মাত্র রাস্তা। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে গিয়েছে টর্কির দিকে। এই রাস্তাটির আশে-পাশে সরু সরু সিমেন্টবাঁধান দু-চারটি পথ হয়ত উপরের দিকে উঠেছে না হয় নেমে গিয়েছে নিচের দিকে—এই পথগুলির ধারে ধারে সব বাংলো।

এসটন লজ এই রকমই একটি বাংলো - খুঁজে নিতে আমাদের দেরী হল না। টর্কির রাস্তা থেকে নিচে নেমে যাওয়া একটি বাঁধান পথের সর্ব্বশেষের বাড়ী।

রাস্তায় গাড়ী রেখে এই পথ দিয়ে নেমে একটি লোহার গেট খুলে ঢুকলাম এসটন লজে। তখন মে মাস, সবুজের গাঢ় অভিযান সুরু হয়েছে। আজ মেঘলা দিনে চারিদিকে পাহাড়ের ঘন সবুজে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। এসটন লজের বাইরের প্রাঙ্গণে সযত্নরক্ষিত বাগানটির ফুলের বাহারেও মুগ্ধ হলাম। সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। একটি বৃদ্ধা এসে দরজাটি খুলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে হঠাৎ আমাদের মনে দ্বিধা এল। কি বলি? মিসেস লালকাকা বলা কি চলবে? হয়ত অন্যনামে আছে এখানে। মার্লিন কথা কইল।

শুধাল, গ্রেস বলে কোনও মহিলা থাকে এখানে?

বৃদ্ধাটি একটু ইতস্তত করে শুধাল, গ্রেস? গ্রেস লালকাকা? আপনারা কি তাকেই চাইছেন?

মার্লিন বলল হ্যাঁ—ধন্যবাদ!

বৃদ্ধাটি বলল, তিনি ত অসুস্থ। যাই হোক, আপনারা ভিতরে আসুন।

দুজনে ভিতরে ঢুকলাম। সামনেই একটা ঘেরা সার্সিআঁটা বারান্দা—কার্পেটপাতা কয়েকটি কৌচ সোফা দিয়ে সাজান। বুঝলাম—এইটেই লাউঞ্জ। যদিও রংয়ে ঢাকা, তবুও বাড়ীটির দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বড় পুরাতন বাড়ীর স্বাভাবিক দৈন্য সহজেই বোঝা যায়। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যেও যে একটা দৈন্য আছে—সেটাও চোখে পড়তে দেরী হয় না। জানালার পর্দাগুলি গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে আলো আসার জন্য।

বৃদ্ধাটি বলল, বসুন—দেখি খবর নিয়ে। কি নাম বলব?

মার্লিন বলল, বলুন—ডাঃ ও মিসেস চৌধুরী—সেল থেকে।

বসলাম। বৃদ্ধাটি ভিতরে চলে গেলেন উঁকি মেরে দেখলাম—বারান্দাটির পাশের ভিতরের ঘরটিই খাবার ঘর। একটু পরে বৃদ্ধাটি ফিরে এল।

বললেন, তিনি ত শোবার ঘরেই বিশ্রাম করছেন। তবে—

মার্লিনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি আসুন।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে।

মার্লিন তুমি একটু বস বলে বৃদ্ধাটির সঙ্গে ভিতরে চলে গেল।

আধ ঘণ্টার উপর কেটে গেল। আমি যেন অস্থির হয়ে উঠলাম।

খানিকটা ঘরের মধ্যে পায়চারী করি, খানিকটা বসে আজকের পড়া খবরের কাগজটি আবার হস্তত পড়ি, খানিকটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের শোভা দেখি—এই ভাবে সময়টি কাটতে লাগল। হঠাৎ ঘরের পর্দা সরিয়ে মার্লিন ঢুকল, সঙ্গে গ্রেস। গ্রেসের দিকে চেয়ে সত্যিই চমকে উঠলাম—এ কি চেহারা হয়েছে তার! অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা, চোখের কোলে কালি দিয়েছে ঢেলে, মুখখানি এত রুগ্ন হয়েছে যে গাল দুটি ভেঙ্গে চোয়ালের হাড় দুটি যেন এগিয়ে এসেছে। আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ মৃদু হেসে বলল, দয়া করে আমার খবর নিতে এসেছেন, সেজন্য সত্যাই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এতক্ষণ আপনাকে একলা অপেক্ষা করতে হয়েছে—সে জন্য মাপ চাইছি। বসুন!

গ্রেস ও মার্লিন ঢোকামাত্র আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তিন জনেই বসলাম। বললাম, না—না। তার জন্য আর কি হয়েছে। তবে আপনাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে।

বললাল, হ্যাঁ। সন্ধ্যার দিকে রোজই একটু জ্বর হয়। তাই দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।

শুধালাম, তা চিকিৎসার কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে?

একটু চুপ করে থেকে বলল, এখানকার একজন ডাক্তার এসে দেখে যান—ওষুধ দিচ্ছেন।

মার্লিন উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে চেয়ে বলল, চল, আজ আমরা যাই। গ্রেসের এখন একটু বিশ্রামে থাকা দরকার।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল।

গ্রেসও উঠে দাঁড়াল। আমাকে বলল, আবার আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মার্লিন আমাকে বলল, ও শুয়েই ছিল। আমি ওকে উঠতে বারণ করেছিলাম। শুনল না। নিজের মুখে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য বেরিয়ে এল।

বললাম, ওঁর বিশেষ করুণা!

গ্রেসকে দু'জনে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মার্লিন গ্রেসকে বলল, তাহলে ঐ কথাই রইল। কাল ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আবার আসব।

গ্রেস বলল, হ্যাঁ।

গাড়ীতে এসে মার্লিনকে বললাম, আবার কাল আসতে হবে—আজ শেষ হল না?

মার্লিন বলল, না। দু'-তিন দিন বোধ হয় আরও আসতে হবে। টর্কিতে দিন দুইয়ের বেশী থাকবনা—এই রকমই কথা ছিল।

বললাম, তাহলে ত টর্কিতেই অনেক দেরী হয়ে যাবে।

হেসে মার্লিন বলল, তার আর উপায় কি বল? গ্রেসের যা অবস্থা দেখলাম—ওর একটা ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার—নইলে ও বাঁচবে না।

শুধালাম, কি কথা হল আজ?

মার্লিন বলল, চল—সমুদ্রের ধারে কোথাও গাড়ীটা থামিয়ে নিয়ে রাখ। সমুদ্রের ধারে বসে বসে কথা হবে।

মার্লিনের কথামত গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে সমুদ্রের ধারের রাস্তায় সমুদ্রের গা ঘেঁষে রাখলাম।

আবার শুধালাম, আজ কি হল?

মার্লিন বলল, আমি ওর ঘরে গিয়ে দেখি—ও বিছানায় শুয়ে আছে। ঘরে গিয়ে ঘরের দৈন্য দেখে মনটা খারাপ হল—পিছনের দিকে ছোট একখানি ঘর, একটি মাত্র সরু জানালা, আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। আমি ওর বিছানায় গিয়েই বসলাম। ধীরে ওর একখানি হাত তুলে নিলাম হাতে।

মার্লিন একটু চুপ করল। শুধালাম, কি কথা হল?

বলল, খানিকক্ষণ কিছু বলেনি—আমার দিকে একবার চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে চুপ করেছিল। আমিই কথা কইলাম।

শুধালাম, কি বললে?

বলল, প্রথমেই বললাম—গ্রেস বব ভাল আছে—বোর্ডিংস্কুলে ভাল ভাবেই মানুষ হচ্ছে—সেইটেই যে ওর মনে সবচেয়ে বড় কথা, সেটা বুঝতে আমার দেরী হয়নি। লক্ষ্য করলাম—চোখ দিয়ে দু'-চার ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

শুধালাম, লালকাকার কথা কিছু হলনা?

বলল, হল বৈ কি। কিছুক্ষণ পরে শুধাল, আমার ঠিকানা তোমরা পেলে কি করে?

তখন বললাম, মিঃ লালকাকা তোমার জন্য বিশেষ অস্থির হয়ে আছেন। তোমার বিষয় তিনি সবই জানেন। তিনিই ত তোমার ঠিকানা দিয়ে আমাদের বিশেষ করে অনুরোধ করলেন দেখা করে তোমার খবর নিতে। তারপর গ্রেসকে শুনিয়ে নিজের মনেই যেন বললাম—কি আশ্চর্য্য উদার লোক লালকাকা! কি দরদী প্রাণ!

কথাগুলি বলে মার্লিন মৃদু হেসে আমার দিকে তাকাল।

হেসে বললাম, বুঝেছি। যাই হোক, কি বলল ওকথা শুনে?

বলল, কিছু না। চুপ করেই রইল।

শুধালাম, টাকার কথা কিছু বলনি?

বলল, না—আজ অতটা নয়।

শুধালাম, তারপর?

বলল, তারপর আর কি? তারপর ওর শরীরের কথাবার্তা কিছু হল। শেষ পর্য্যন্ত উঠে বসল—বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে।

বললাম, তা আজকেই টাকাটা দিয়ে দিলে পারতে। যে দুরবস্থায় আছে—টাকা নিতে দ্বিধা করত বলে আমার মনে হয় না।

বলল, তুমি গ্রেসকে এখনও ঠিক চেননি। লক্ষ্য করলাম—ও, ওদিককার বিষয় একটি প্রশ্ন করেনি, এমন কি ববের দিক দিয়েও নয়, যা বলবার আমিই বলেছি।

বললাম, সেটা স্বাভাবিক লজ্জা।

বললে, তবে, সেই লজ্জা কাটিয়ে আজই কি টাকা নিতে পারে? আর তা ছাড়া—

শুধালাম, কি?

বলল, শুধু টাকা দিলেই ত আমার হল না। আমি গ্রেসকে লালকাকার কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই। [ক্রমশঃ।

Learning to love oneself is the beginning of a life-long romance. —*Oscar Wilde*

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তেরো

লুনা হোটেলে ফিরে এসে পল্লবের মন বিষাদে কালো হয়ে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিস্ময়েরও অবধি রইল না : যুসুফ দেশের কাজ করবে, মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দেবে এ কি ভাবা যায় ? ওর দেহে-মনে একটা পুলক ছেয়ে গেল ভাবতে যে, যুসুফ বাইরে সচরাচর প্রগলভতা ক'রে চললেও জীবন নিয়ে এত গভীর ভাবে ভেবে দেখেছে ! যুসুফকে ও ভালোবাসত বরাবরই, কিন্তু আজ সেই সঙ্গে জেগে উঠল ওর প্রতি শ্রদ্ধা : হাজার টানাছেঁড়া ওঠাপড়া সত্ত্বেও ওর মেরুদণ্ড দুর্বল হ'য়ে যায়নি তো !—যেখানে হাত বাড়ালেই পেত সুন্দরী নারী ও সেই সঙ্গে আধুনিক বিলাসের অজস্র উপকরণ, সেখানে কেমন করে ও মোহ কাটালো—আরামের লোভেও চাইল না তো বাঁধা পড়তে ?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মন আরো অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল : এবার দেশে ফেরাই চাই। যুসুফ-যে-যুসুফ সেও যখন দেশে ফিরে যাচ্ছে তখন ও কেন আর মিথ্যে সময় নষ্ট করে বিদেশী গান শিখে ?

কেবল এলিওনোরার কথা ভেবেই ও ফের পড়ে গেল সংশয়ের দোলায়। দেশে যখন ফিরবেই এবার—তখন কেন আর ওর মনে দুঃখ দিয়ে যাওয়া ? আশ্চর্য ! মানুষের সুখ দেওয়ার ক্ষমতা কত কম, অথচ চলতে ফিরতে সে অপরকে কত দুঃখই না দিতে পারে ! না, ও সালভিনির সঙ্গে দেখা করেই ফিরবে—বিশেষ যখন এলিওনোরাকে কথা দিয়েছে।—যে ওকে সত্যি এত স্নেহ দিয়েছে তার স্নেহের মান রাখতেই হবে : মন ওর কারুণ্যে ভিজে ওঠে।

* * *

কিন্তু মুশকিল হ'ল—সময় যে আর কাটতে চায় না। এলিওনোরার ওখানে মাঝে মাঝে যায় বটে, কিন্তু ঠিক এই সময়েই তাকে সকাল থেকে রাত আটটা ন'টা অবধি ষ্টুডিয়োতে কাটাতে হ'ত একটা নতুন ছবির জন্যে। তাই রাত্রে এলিওনোরার সঙ্গে ডিনারের পর বড় বেশী কথালাপের সময় থাকত না। ও মাঝে মাঝেই সূর্যাস্তের সময়ে যেত টাইবারের তীরে বেড়াতে—রাঙা আলোয় বিখ্যাত সান পিয়েত্রো গির্জার অপরূপ উদাস শোভা উপভোগ করতে। কখনো বা যেত ভ্যাটিকানে মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্কো দেখতে, বা চুপ করে চেয়ে থাকত রাফেলের অপরূপ La Transfigurazione ছবির দিকে : আকাশপথে ঈশা উঠছেন স্বর্গলোকে। ছবি ওর মনকে কখনো এমন ক'রে স্পর্শ করেনি তো এর আগে—ভাবে ও আশ্চর্য হ'য়ে ! মনে পড়ে—কোথায় পড়েছিল একটি কবিতা : "তোমার ব্যথার দানে আমার উঠল যে প্রাণ জেগে !"

কিন্তু তবু ব্যথা ব্যথাই। এক দিকে সে ভ'রে দেয় বটে, কিন্তু অন্য দিকে যেন রিক্ত ক'রে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে ওর মনে ভয় জেগে ওঠে : মারিয়াকে এত ভালোবাসা সত্ত্বেও তো যুসুফ পরে তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে নাগাল পেতে চাইল এলিওনোরার ! তবে ? তবে প্রেম স্থায়ী—এমন ভরসার পথ কোথায় ? কে জানে—হয়ত আইরিনও আজ পেয়ে গেছে এমনি কোনো নতুন মনের মানুষকে যে ওকে সর্বান্তঃকরণে ঠেলে দেবে শিল্পীর জীবনের দিকেই ? কে বলতে পারে ? আর যদি আইরিনের মন ওকে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে থাকে আর কারুর দিকে, তবে তাকে দোষ দেবেই বা কেমন ক'রে ? সে তো ওকে শেষ দিন খোলাখুলিই বলেছিল—কোনো জন্মভূমিই ওর কাছে সর্বার্থসাধিকা নয়—সে চায় সঙ্গীতে সৃষ্টি করতে সুরের পরমানন্দ, দেশ ওর কাছে জড়—মাটি—নিষ্প্রাণ।

চোদ্দ

এলিওনোরার সঙ্গে চার-পাঁচ দিন দেখা হয়নি। সেদিন বিকেলেও Via Appia-য় বেড়িয়ে এসে হোটেলের টেবিলে সান্ধ্য-ভোজনে ব'সে ভাবছে কী করা যায়, এমন সময়ে হোটেলের ম্যানেজার ওকে এসে বললেন সোৎসাহে যে রুষ দেশ থেকে একটি থিয়েটারি দল এক সপ্তাহের জন্যে রোমে এসেছে। অভিনয় করবে চেকভের "চেরি বাগান" আর ডস্টয়েভস্কির "ব্রাদার্স কারামাজভ।"

পল্লব উৎসাহ বোধ করল না—যদিও মাস কয়েক আগে হ'লে আনন্দ ও রাখতে পারত না। ও শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : "ব্রাদার্স কারামাজভ হবে কবে ?"

Domani Signore ! Bellissima dramma ! [১] যদি যেতে চান তবে এখনি টেলিফোন করি—নৈলে কাল টিকিট পাবেন না।

পল্লব পাশ কাটিয়ে যেতে বলল : যেতে ইচ্ছা তো হয়, কিন্তু রুষভাষার একটি কথাও জানি না যে ! মন ওর বিষাদে ভ'রে গেল। এ বইটি আইরিনের অতি প্রিয় বই—যদি আজ সে থাকত তবে কী আনন্দেই না দু'জনে মিলে নাটকটি দেখতে যেত !

পাশের টেবিলে সেই রুষ যুবকটি রোজকার মতন একলাই খাচ্ছিল, হঠাৎ অভিবাদন ক'রে পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় বলল : আমি রুষ। যদি যেতে চান তো আসুন না। আমি দু'টি টিকিট পেয়েছি।

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে বলল : ধন্যবাদ, কিন্তু অন্য টিকিটটা—

যার আসার কথা ছিল তিনি হঠাৎ অসুখে পড়েছেন। আমি আপনাকে প্রতি দৃশ্যই বুঝিয়ে দিতে পারব। এ-নাটকটি আমি পাঁচ ছ' বার দেখেছি মস্কোতে। ব'লে ঈষৎ গর্ব ক'রেই বলল : দেখবার মতন অভিনয়—স্বয়ং স্ট্যানিস্লাভস্কি নাটকটির প্রডিউসার। আর অভিনয়ে রুষরা জগতের সবার সেরা, জানেন হয়ত ?

পল্লব প্রীতকণ্ঠে বলল : বহু ধন্যবাদ ! হ্যাঁ, রুষরা অপরূপ অভিনয় করে শুনেছি আমার এক বন্ধুর কাছে। কিন্তু টিকিটের দাম কত ?

যুবকটি উঠে পল্লবের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল : টিকিটের দাম আমার লাগেনি। আমি প্রতিদিন দু'টি করে ফ্রী পাস পাই। ব'লে পল্লবের সামনের চেয়ারটি দেখিয়ে বলল : Vous permettez ? [২]

১। কাল, সিঞোরে ! অতি চমৎকার নাটক !

২। বসতে পারি কি ?

পল্লব সাগ্রহে বলল: বিলক্ষণ! আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকে। কী পান করবেন?

ধন্যবাদ, আমি মদ খাই না।

* * * * * *

পরিচয়ের উপক্রমণিকা সুরু হ'ল। পল্লব নিজের পরিচয় দিল যথাবিধি। আগন্তুকও দিলেন নিজের পরিচয়, যদিও সংক্ষেপে: এখানে কাজ করেন একটি রুশ-আফিসে। মা নেই। বাপ রুশ, সুইডেনে থাকেন—স্টকহল্মের ডাক্তার—ধনী। মা ওর পনের বৎসর বয়সেই সংসারের হিসেব নিকেশ সাঙ্গ ক'রে পাড়ি দেন পরপারে। ও সেই থেকে মস্কোতেই মানুষ ওর এক কাকার কাছে। ওর বাপ-মা ক্যাথলিক। কিন্তু ও পনের বৎসর বয়স থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছে। নাম শাপিরো।

পনের

শাপিরোর সঙ্গে আলাপ হ'তেই ওর মন গান গেয়ে ওঠে। মনের বিষাদ কাটল না অবশ্য, কিন্তু আঁধার কেটে গেল। ওর একটি প্রিয় গানের একটি চরণ ফিরে ফিরে বাজে ওর প্রাণের তারে:

আয় মা এখন তারারূপে স্মিতমুখে শুভ্রবাসে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।

কী অপরূপ উপমা! যেমন সত্য তেমনি আলোভরা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় ভগবানের কথা, অনেক দিন পরে। তিনি এক হাতে মারেন আর এক হাতে রাখেন। এক হাতে জীবনের পেয়ালা শূন্য করেন আশাভঙ্গে, শোকে, বিচ্ছেদে, বিরহে—কিন্তু যেই মন ভারে আর বইতে পারবে না, ভেঙে পড়বে, অমনি আসে তাঁর করুণা, রিক্ত-পাত্র ফের ভ'রে ওঠে সুধায়। হঠাৎ মনে হ'ল আইরিনের অভাবের জন্য যে-দুঃখ ওর কাছে এত দিন মনে হয়েছে বন্ধ্যা—হয়ত সেই অভাবের, সেই বিরহেরই ওর দরকার ছিল। এ পর্যন্ত ও একটানা পেয়েই এসেছে। ওর পিতার মৃত্যুর পরে কোনো বড় দুঃখ কি শোক পায়নি। আইরিন আনন্দময়ী হ'য়ে ওর জীবনে হানা দিয়ে প্রথম ওকে গভীর আঘাত দিল—কাছে ডেকেই দূরে ঠেলে। সে বেদনার মন্থনে মনে হ'ল ওর—চিত্ত যেন ওর অজ্ঞাতে উঠেছে উর্বর, গ্রহিষ্ণু হয়ে। বেদনার কর্ষণের পর বীজ পড়তে না পড়তে নব আশার অঙ্কুরোদ্গম হ'ল যেন। সারা রাত ওর মন এক আশ্চর্য আনন্দে ছেয়ে গেল। লুনা হোটেলের লাইব্রেরি থেকে ডষ্টয়েভস্কির 'ব্রাদার্স কারামাজভে'র পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ এসে পড়ল একটি জায়গায়।—আইরিনের সঙ্গে ঠিক এই অধ্যায়টিই ও একদিন পড়েছিল সে কী আনন্দে! সেই হারানো আনন্দ যেন স্মৃতির মর্মকুহরে ফের বেজে উঠল আরো নবীন হ'য়ে, আরো গভীর হ'য়ে। কী সুন্দর, পবিত্র, ওজস্বী! মনে পড়ে গেল উপনিষদের একটি বিশেষণ—'ভগবৎ করুণা শুধু শুভদাই নয়, বলদাও বটে।' মনে ওর কৃতজ্ঞতা জেগে ওঠে: প্রভু, কত তো পাই দিনে দিনে, তবু ভুলে যাই কেন যখন কিছু পেয়ে হারাই? বলি কেন তখন ক্ষুব্ধ চিত্তে তুমি নিষ্ঠুর? মনে করি কেন যে যা আমি পেয়েছি তা আমার প্রাপ্য? এই যে আলিয়াশাও বলছে ঐ কথা—যেন ওরি মনের কথা টেনে:

আলিয়াশা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তারপরে হঠাৎ সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—ভেবে পায় না কেন সে মাটিকে চুম্বন করছে দরবিগলিত অশ্রুধারে! কী আনন্দ, আকাশের ঐ তারাদের দিকে চাইতেও ওর চোখের পাতা ভিজে ওঠে কিন্তু কই, মনে হয় না তো—এ মিথ্যে উচ্ছ্বাস, কুণ্ঠা আসে না তো কী করছি ভেবে? মনে হয়—যেন ভগবানের অগণ্য জগত থেকে আলোর রাখী এসে ওর আত্মাকে বেঁধে দিচ্ছে সব-কিছুর সঙ্গে। ওর গায়ে কাঁটা দেয়—সাধ জাগে সবাইকে ক্ষমা করতে, সব-কিছুকে ক্ষমা করতে—সবার উপর ক্ষমা চাইতে—শুধু নিজের জন্যে নয়, সকলের জন্যে। মনে হয় এমনি আরো কত আত্মা আমার জন্যে প্রার্থনা করছে!

পড়তে পড়তে পল্লবের চোখেও জল আসে। মনে পড়ে যায় কুঙ্কুমের একটি কথা: স্বামিজী বলতেন—'গুহায় ব'সেও যদি মহৎ চিন্তা করো, জেনো সে-চিন্তা ব্যর্থ হবে না, ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে।' হঠাৎ ওর বুক ভ'রে যায়—সাধু-সন্তের চিন্তার ও প্রার্থনার ঢেউ হয়ত এমনি অলক্ষ্যে এসেই লাগে কত-শত দূরাশীর প্রাণের তটে—অদৃশ্য মহাত্মাদের বিশ্বকল্যাণ কামনার স্পন্দন হয়ত এমনি প্রত্যক্ষ ভাবেই সুগমর্মরে বেজে ওঠে কত-শত স্বপনীর অন্তরে! পবিত্রতা, অনুকম্পা, সহিষ্ণুতা—আরো কত কী ভাগবত বরাভয় মানুষের তপ্ত মনকে করে তোলে স্নিগ্ধ, বিপদে জাগায় নির্ভয়, ক্রোধের অন্ধকারে ক্ষমার কিরণ, দুর্দৈবের নিরাশায় সাহসের জাগরণী!

সব ছাপিয়ে ওর রোমে রোমে জেগে ওঠে এক নাম-না-জানা আশার ওঙ্কারধ্বনি: অবিশ্বাসীর নাস্তিবাদ ধুয়ে মুছে ভেসে যায় যুগ-যুগান্তের বিশ্বাসীর অস্তিবাদের কলকল্লোলে। আনন্দে ও ঘুমতে পারে না। একটি আরামকেদারা টেনে নিয়ে জানালার কাছে এসে ব'সে চেয়ে থাকে উদার আকাশের পানে, কান পেতে শোনে অম্লান নক্ষত্রদীপালির বরাভয় ঝংকার।

আছে আছে আছে আছে—কিছুই জীবনে ব্যর্থ হয় না, হ'তে পারে না।

ষোল

পরদিন দু'জনে মিলে 'ব্রাদার্স কারামাজভ' অভিনয় দেখতে গেল। কী প্রাণস্পর্শী অভিনয় করে এই আশ্চর্য রুষজাতি! মনে পড়ে ওর মানবপ্রেমিক প্রিন্স ক্রপটকিনের একটি কথা যে, রুষ জাতির মধ্যে আছে একদিকে যেমন নাটকীয় নিষ্ঠুরতা তেমনি অন্যদিকে—অগাধ ঔদার্য। প্রতিভার অবতার ডষ্টয়েভস্কি 'ব্রাদার্স কারামাজভে' দেখিয়েছেন রাশিয়ানদের এই দুটি প্রবৃত্তির স্বতবিরোধ। একদিকে অপরূপ সন্ন্যাসী—পবিত্রতার প্রতিমূর্তি—যুবক আলিয়াশা, অন্যদিকে জঘন্য স্বৈরিণী গ্রুশেংকা। লম্পট ডিমিট্রির মধ্যেও কী মহত্ত্ব! যে-রূপসী কুমারীকে সে চেয়েছিল কাম-চরিতার্থ করতে সে-কিশোরী যখন এল তার পিতাকে বাঁচাতে তখন ডিমিট্রি বলল: যে টাকা চাইছ, দেব, যদি এক রাতের জন্যে আমার হও। কুমারী বেদনায় দিশাহারা হ'য়ে শেষে রাজি হ'ল, এল ওর কাছে গভীর রাতে, নইলে তার পিতার সর্বনাশ! ডিমিট্রি তাকে টাকা দিয়ে বলল: তোমার মহত্ত্বে আমি অভিভূত হয়েছি—ফিরে যাও অনাহত দেহে—এই টাকা নাও। ব'লে কুমারীকে স্পর্শ না ক'রে তার হাতে দিল অঙ্গীকৃত স্বর্ণমুদ্রার থলি। ওর মনে হ'ল—কে বেশি মহৎ? কুমারী, না লম্পট? প্রণাম করল সেই মহান দ্রষ্টাকে যে নরকের রাজ্যে বাস ক'রেও উচ্চারণ করেছিল স্বর্গের

সামমন্ত্র : I believe in the eternal harmony in which, they say, we shall one day be blended.

শাপিরো ওকে চাপা সুরে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, যখনই কোনো চরিত্রের মুখে ফুটে উঠছিল এই ধরণের কোনো অবিস্মরণীয় বাণী। পল্লব কেবলই ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এসব কথা যখনই ও বলে, ওর চোখে জ্বলে ওঠে সে কী এক অপরূপ দ্যুতি! ওর আর সন্দেহ রইল না যে শাপিরো মনে-প্রাণে স্বপনী, আদর্শবাদী। লুনা চোটেলে ওকে প্রথম দিন দেখেই গভীর ভাবে আকৃষ্ট হবার সে আজ কারণ তথা সমর্থন খুঁজে পেল।

অথচ এর পরেই শাপিরোর অন্য রূপ। রোজ যায় সকালে ওর কাজে, ফিরে আসে লাঞ্চে—পরে ফের বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হ'য়ে। পল্লবের সঙ্গে দেখা হয় বটে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় খেতে খেতে কথাবার্তাও হয় বৈ কি, কিন্তু পল্লবই কথা ব'লে চলে দিনের পর দিন। শাপিরো নিজের কথা কিছুই বলে না—মন্তব্য হিসেবে কচিৎ এক-আধটা কথা ছাড়া।

একদিন হঠাৎ পল্লবের মনে কেমন যেন ঈষৎ অভিমান মতন এল। ও শাপিরোকে কাছে পেতে না পেতে ওর জীবনের কত কথাই না ব'লে ফেলেছে—এমন কি আইরিনের কথাও বলেছে—কিন্তু শাপিরো তো প্রতিদানে কিছুই বলে নি—এমন কি রোমে ও কী কাজ নিয়ে আছে সে-সম্বন্ধেও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি! ভাবল ওকে আর বলবে না নিজের মনের কথা। এর নাম কি বন্ধু? একতরফা অন্তরঙ্গতা হয় কখনো?

সতেরো

সেদিন রবিবার—পূর্ণিমা। এলিওনোরা পল্লবকে ওর মোটর পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যা ছ'টায়, লিখল : আজ সন্ধ্যায় ছুটি নিয়েছি, চাঁদের আলোয় হ্রদে নৌকাবিহার করা যাবে। রাতে যদি আমার এখানে থেকে যাও তবে সুখী হব।

পল্লব শাপিরোর জন্যে একটি ছোট চিঠি রেখে গেল যে আজ সন্ধ্যায় ও এলিওনোরার ওখানে যাচ্ছে, রাতে হয়ত না ফিরতেও পারে। এলিওনোরার কথাও ও শাপিরোকে বলেছিল, কিন্তু শাপিরো শুধু এইটুকু মন্তব্য করেছিল : ওরা বিলাসিনীর দল পল! ওদের সঙ্গে মিশে তোমার মতন মানুষ তৃপ্তি পেতে পারে না।

পল্লব একটু ঘা খেয়েছিল ব'লেই আরো শাপিরোকে জানিয়ে দিল যে এলিওনোরার সংস্পর্শ ওর কাছে শাপিরোর চেয়েও কাম্য। কথাটা সত্য নয়, কিন্তু চিঠিতে তবুও ঈষৎ খোঁচা না দিয়ে পারল না : এলিওনোরা বড় সরল—শুভ্র ওর মন। অথচ বিচারকের দল ওকে না জেনে কতই না বিচার করে!

মোটরে চড়ে ওর মন খুঁৎখুঁৎ করে : গায়ে পড়ে এ-সব কথা শাপিরোকে কেন বলতে গেল? কিন্তু রোখ চেপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে : কেন বলব না—ও যখন এলিওনোরাকে ঠেশ দিয়ে কথা বলতে পারল—তার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে?

* * * *

হ্রদ থেকে পোপের বসন্তনিলয় কী সুন্দর দেখায়! চারিদিকে গাছপালা। হঠাৎ এক বুলবুল তান ধরে দেয়।

পল্লব বলে : কী সুন্দর! হাল ওর হাতে।

এলিওনোরা দাঁড় টানতে টানতে বলে : সত্যি। এমন তান দিতে পারে না আর কোনো পাখি।

পল্লব টোকে : তা বলতে পারি না। আমাদের দেশে বসন্তে কোকিল যখন প্রথম ডেকে ওঠে আমি কিছুতেই কোনো কাজ করতে পারি না, শুধু একমনে শুনি আর শুনি।

এলিওনোরা মৃদু হেসে বলে : কারো মিয়ো! আমি বুলবুলকে বড় করিনি তোমাদের কোকিলকে ছোট করতে। তুমি বড় ছেলেমানুষ।

পল্লব ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে বলে : আমিও কিছু ভেবে বলি নি ওকথা। আমি দেশভক্ত বটে, ছেলেমানুষও হ'তে পারি, কিন্তু এটুকু বুঝবার বয়স আমার হয়েছে যে দেশ বড় হ'লেও সবচেয়ে বড় মানুষ।

এলিওনোরা চুপ ক'রে থাকে।

পল্লব বলে : কী হয়েছে? ফের বেফাঁশ কিছু ব'লে ফেলেছি না কি?

এলিওনোরা ম্লান হেসে বলে : না পল! কেবল—থাক গে—কী হবে ব'লে—যখন এর কোনো চারা নেই?

পল্লব উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে : কী হয়েছে এলিওনোরা?

না থাক্। নিজের দুঃখ নিজে বওয়াই ভালো। সালভিনি লিখেছেন তিনি এলেন ব'লে—দিন দশেকের মধ্যেই।

সালভিনি থাক্। বলো কী হয়েছে?

কী বলব ভাই? সেই একই কথা তো ঘুরে ফিরে—

না। আবার কিছু একটা হয়েছে। যুসুফ লিখেছে না কি কিছু?

এলিওনোরা মুখ নিচু ক'রে হঠাৎ ব্লাউসের হাতায় চোখ মোছে।

কী লিখেছে? বলবে না তো?

এলিওনোরা চুপ ক'রে থেকে বলে গাঢ়কণ্ঠে : কী আর লিখবে? ঠিকই লিখেছে। প্রথমে রাগ হয়েছিল। কিন্তু সত্য অপ্রিয় হ'লেই তো মিথ্যা হয় না সব সময়ে?

কী অপ্রিয় সত্য ও বলল ফের?

এলিওনোরা একটু চুপ করে থেকে বলে : আমাদের একটি প্রবচন আছে : 'Dal dire al fare, c'e di mezzo il mare'—শুনেছ কি?

না। কী বললে?

এর মানে—বলার আর করার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অতল সমুদ্র। এটা বুঝেছি হাড়ে হাড়ে সেদিন। য়ুসুফকে কয়েক মাস আগেও বলেছিলাম—ভালোবাসার জন্যে মেয়েরা কী না করতে পারে? বিধাতা নিশ্চয় সেদিন অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছিলেন।

পল্লব চুপ করে থাকে। এলিওনোরা ব'লে চলে : তবে আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়, যে কথা সেদিন তোমাকে বলেছিলাম : যে, কাল আমাদের দিনে দিনে জ্ঞান দান করতে পারে, কিন্তু শক্তি হরণ করে—বিশেষ ক'রে আত্মদানের শক্তি। ব'লে পল্লবের দিকে চেয়ে : আর একথা কত সত্যি বুঝতে পারি—তোমাদের দেখে।

আমাদের?

তোমাকে, মোহনলালকে, রিতাকে। সব চেয়ে বেশি মনে হয় আজ রিতার কথা : এক কথায় সে সব ছেড়ে চলে যেতে পারল তো! ব'লে একটু থেমে : যতই কেন না বিজ্ঞতার গুণগান করি পল, চিরদিন যৌবনই হ'য়ে এসেছে জীবনের রাজা—থাকবেও জীবনের রাজা—কেন না, কেবল যৌবনই এক কথায় ছাড়তে পারে পরিণাম-চিন্তা। আমরা—বিজ্ঞরা—পারি শুধু বড় বড় কথা বলতে। অথচ তবু গুমর কত আমাদের—যে আমরা জানি! কিন্তু জেনে কী হয়? পারাই সব।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে: কিন্তু এর মূল কারণ কি যৌবন, না স্বভাব?

মানে?

মানে যারা পারে তারা যৌবন পেরিয়েও পারে। ব'লে একটু থেমে: আর যারা পারে না যৌবন তাদের উচ্ছল করতে পারে, কিন্তু বল দিতে পারে কি?

এলিওনোরা হঠাৎ বলল: ভুল বুঝে অবিচার কোরো না পল! আইরিন তা নয়—যা তুমি ভাবছ।

পল্লব চমকে ওঠে: কে বলল? য়ুসুফ কি কিছু লিখেছে?

এলিওনোরা ইতস্তত করে: না ঠিক্ আইরিনের কথা লেখেনি, তবে—কিন্তু থাক ও কথা, আমাকে ও বলতে বারণ করেছে।

পল্লব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল: কী এমন কথা যা তোমাকে লিখতে পারল অথচ আমাকে বলা মানা? বলো—বলতেই হবে তোমাকে। আইরিনের সঙ্গে কি ওর দেখা হয়েছে? না, এ-ও বলা মানা?

না। আইরিন এখনো বার্লিনে ফেরেনি—কবে ফিরবে কেউ জানে না। এখনো সে সুইজর্লণ্ডে। শরীর না কি তার ভালো নয়—লিখেছে তার দিদিকে।

পল্লবের মনে অভিমান ফুলে ওঠে, বলে: এই কথাটা জানাতে এত নিষেধ? এলিওনোরার উত্তর না পেয়ে: বলো, বলতেই হবে—আরো আছে নিশ্চয়?

এলিওনোরা বলল: কী বলব ভাই? য়ুসুফ কয়েকটা জল্পনা-কল্পনা করেছে মাত্র। আইরিন যে ঠিক কী ভাবছে তা কেউ জানে না—কারণ সে কাউকেই কিছু লেখেনি।

তবু—

তুমি বড় নাছোড়বান্দা। তবে শোনো। য়ুসুফ লিখেছে যে আইরিনের দিদি মনে করে না আইরিণ তোমাকে বিবাহ করলে তার ফল ভালো হবে।

কিন্তু আইরিন কেন লেখে না সে কথা খুলে?

এলিওনোরা বিব্রত সুরে বলে: ক্ষুব্ধ হোয়ো না ভাই। আইরিন ভালো মেয়ে—আমি বলছি তোমাকে।

ফের এড়িয়ে যাওয়া?

কী বিপদ! আমি কী বলব বলো দেখি—যখন আমরা কেউই জানি না? আমি কেবল বলতে পারি একটি কথা: যে বাইরের ঘটনার যোগাযোগে মানুষের যে ছবি ফুটে ওঠে অনেক সময়েই সে ছবি তার স্বরূপের দিশা দেয় না। একথা আমি জানি নিজেকে দিয়ে। আমি বিলাসে থাকি—কিন্তু তাই বলে সত্যিই বিলাসিনী আমি নই। ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: একথা বললে কে বিশ্বাস করবে বলো? শেষের কথাগুলি বলে ও ধরাগলায়।

পল্লবের হৃদয় কারুণ্যে ভ'রে ওঠে, বলে: তুমি যে বিলাসিনী নও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কেবল তুমি হয়ত—

কী?

একটু কম উচ্চাশিনী হ'লে ভালো হ'ত। তবে হয়ত এখানেও আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি। যদি তাই হয় তবে এই ভেবে আমাকে ক্ষমা কোরো যে, মানুষ মানুষকে ঠিক বুঝতে চাইলেও প্রায়ই পারে না। বোধ হয় সেই জন্যেই যিশু বলেছিলেন কাউকে বিচার না করতে।

এলিওনোরা সায় দিয়ে শান্ত সুরে বলে: ঠিক সেই জন্যেই আমিও বলি তোমাকে, আইরিনকে বিচার না করতে। ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে আহা, ওকে একটু সময় দিলেই বা। ওর মনে অনেক কুণ্ঠা সংশয় অশান্তি হয়ত টগবগিয়ে উঠেছে। একটু থিতিয়ে যেতে দাও না।

পল্লব একটু ভেবে বলে, ঠিক বলেছ এলিওনোরা! তাছাড়া—যদি ওকে সত্যি ভালোবেসে থাকি তবে ওর চিঠিই বা চাইব কেন? তুমি বড় সময়ে কথাটা বলেছ। বওয়া যখন ভার হয় তখনো যে সইতে পারে অনুযোগ অভিযোগ না ক'রে, সেই না জেতে।

এলিওনোরা হঠাৎ বলে, জেতে? শুধু স'য়ে? আমার তো তাই মনে হয়।

এলিওনোরা উদাস কণ্ঠে বলে, ভুল পল, ভুল। জেতে শুধু সেই যে সব ছাড়তে পারে। আর এ-সব-ছাড়ার শক্তি পায় ও শুধু সেই যে চলে হৃদয়ের হুকুম মেনে, মনের মানাকে আমল দিয়ে নয়। কিন্তু চলো—ফিরি। মেঘরা জড়ো হচ্ছে।

চাঁদ ঢেকে গেছে, ওরা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি। হাওয়া উঠল। ওরা ফিরল। [ক্রমশঃ।

[Osamu Dazai's THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্রোহের সূচনা

চিরদিন শোকসাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় বেঁচে থাকা অসম্ভব। কোন একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে, যার জন্য আমায় যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। নূতন শাস্ত্র—ভণ্ডামীর রূপান্তর মাত্র। প্রেম, সে-ও তাই। অর্থনীতির নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যেমন রোজা লাক্সেমবার্গকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছিল, ঠিক তেমনি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রেমকে আঁকড়ে থাকতেই হবে। সমসাময়িক আইনবিশারদ আচারনিষ্ঠ অধার্মিক, প্রতাপসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিয়ে। নির্ভয়ে ঈশ্বরের পায়ে আত্মবিসর্জন দেওয়ার যে বাণী যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যের মুখে দিয়েছিলেন,—আমার বর্তমান অবস্থায় তা বিশেষ অপ্রযোজ্য হবে না।

সোনা, রূপো, তামা দিয়ে ঝুলি বোঝাই করো না। যাত্রাপথের বিবরণ, দু'খানা কোট, জুতো কিম্বা ছড়ি কিছুই সঙ্গে নিও না, মনে রেখো তোমাদের আমি নেকড়ে-ব্যাঘ্রের ভেতর মেষশাবকের মত পাঠাচ্ছি, সুতরাং সর্পের ন্যায় চতুর ও কপোতের ন্যায় নিরীহ হ'তে হবে।

যারা দেহকে আঘাত দিয়ে আত্মার ক্ষতি করতে পারে না, তাদের ভয় পেও না, বরং যে ব্যক্তি দেহ, মন উভয়েরই বিনাশ করতে পারে, তার কাছ থেকে দূরে থেকো।

তোমরা ভাবো, ধরায় শান্তি আনাই বুঝি আমার শান্তি নয়, তরবারি বয়ে এনেছি আমি।

কারণ আমি পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে, মাতার বিরুদ্ধে কন্যাকে, শাশুড়ীর বিরুদ্ধে পুত্রবধূকে উত্তেজিত করতে এসেছি এবং আপন পরিবারের মধ্যেই শত্রু বিভীষণের দেখা পাবে।

যে আমার চেয়েও তার বাবা-মাকে বেশী ভালবাসে—সে আমার যোগ্য নয় এবং যে আমার চেয়েও তার পুত্রকন্যাকে বেশী ভালবাসে, সে-ও আমার যোগ্য নয়।

যে জন্মলাভ করেছে, সে মরবেই, আর যে আমার জন্য জীবন দেবে, তার মরণ নেই।

বিদ্রোহের সূচনা।

যদি প্রেমের কারণে আমি যীশুর এই বাণী পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করি, তবে তিনি আমায় অপরাধী করবেন কি? দেহজ প্রেমের তুলনায় আধ্যাত্মিক প্রেমকে কেনই বা উচ্চতর আসন দেব? এ আমার বোধগম্য নয়। আমার ধারণা দুই-ই এক। যে নারী প্রেমের জন্য, অজানা এক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কিম্বা আনুষঙ্গিক দুঃখের কারণে, দেহ-মন নরকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, আমি সেই নারী। এই আমার গর্ব।

ইজুতে সমাধি দিয়ে, টোকিওতে অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করলেন মামাবাবু। অতঃপর নাওজি এবং আমি, দু'জনের যৌথ সংসার এমন বিশ্রী মোড় নিল যে, মুখোমুখি পড়ে গেলেও পরস্পরের মধ্যে কথা হয় না। মায়ের সমস্ত গহনা বিক্রি করে নাওজি পুস্তক প্রকাশনীর মূলধন সংগ্রহ করল। টোকিওতে নেশার চূড়ান্ত করে ও যখন টলতে টলতে বাড়ী ফিরত, তখন তার মড়ার মত সাদা মুখখানা দেখে দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর শেষ অবস্থা বলে মনে হত।

একদিন বিকেলে নর্তকীশ্রেণীর এক মেয়েকে নিয়ে সে বাড়ী ফিরল। এর পর আর এক দণ্ডও তিষ্ঠনো যায় না দেখে বললাম—আমি ক'টা দিন টোকিওতে ঘুরে আসতে চাই। আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় নাই, তার ওখানে দুটো-তিনটে রাত থেকে আসব। তুমি একটা দিন সংসার দেখো—কেমন? তোমার বান্ধবী রান্না করে দেবে'খন।

নাওজির দুর্বলতার সুযোগ নিতে এক দণ্ডও ইতস্তত করলাম না। সুতরাং এক্ষেত্রে সাপের ধূর্তামি প্রয়োগ করে ব্যাগের ভেতর প্রসাধনের টুকিটাকি আর কিছু খাবার নিয়ে টোকিওতে অভিসারে বেরুলাম।

এক সময়ে কথাচ্ছলে নাওজির কাছ থেকে জেনে নিলাম যে, টোকিওর ছোট লাইনে ওগিকাবু ষ্টেশনের উত্তর ফাটক থেকে মিষ্টার উয়েহারার বাড়ী মাত্র কুড়ি মিনিটের রাস্তা। সেদিন এলোমেলো বেগে শরতের হাওয়া উঠেছিল। ওগিকাবু ষ্টেশনে নামতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এক পথচারীকে মিষ্টার উয়েহারার বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। সঠিক নির্দেশ পাবার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেক অন্ধকার গলিতে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালাম। একা ঐ অবস্থায় চোখে জল এল। হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে চটির ষ্ট্রাপ আলগা হয়ে এল। অসহায় হ'য়ে ভাবছি কি করা যায়, এমন সময় আমার ডানহাতি বাড়ীর সারির মধ্যে একটার গায়ে গৃহকর্তার নাম চোখে পড়ল, অন্ধকারে এক ধ্যাবড়া সাদা। এমনি কেমন যেন

মনে হ'ল, এ নিশ্চয় মিষ্টার উয়েহারার নাম। এক পায়ে চটি পরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজা পর্য্যন্ত এগোলাম। নামের ওপর হুমড়ি খেয়ে দেখলাম বাস্তবিক তাই। উয়েহারা জিরো। কিন্তু ভেতরটা যে একেবারে অন্ধকার!

মিনিট খানেক চুপ করে ভাবলাম, কি করা যায়। শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া হয়ে দরজার গায়ে দেহ এলিয়ে দিলাম—মনে হ'ল এখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব।

জানালার সার্সিতে দু'হাতের আঙুল দিয়ে টোকা মেরে ফিস্‌ফিস্‌ স্বরে বললাম—মাপ করবেন মিষ্টার উয়েহারা!

সাড়া মিলল বটে কিন্তু বামাকণ্ঠে। ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়, সেকেলে গন্ধমাখা জীর্ণ দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলাকে অন্ধকার ঘরের মাঝে দেখা গেল। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—কে গো? গলার স্বরে না আছে রাগ, না আছে ভয়।

মাপ করবেন, আমি—নাম বলার অবসর হ'ল না, আমার প্রেম ওঁর চোখে ঘৃণ্য রূপ নিতে পারে, এই আশঙ্কায় সবিনয় প্রশ্ন করলাম—মিষ্টার উয়েহারা বাড়ী আছেন কি?

না। আমার প্রতি দৃষ্টিতে তাঁর করুণার ছায়া কিন্তু সাধারণতঃ তিনি যেখানে যান—

এখান থেকে অনেক দূর?

না। মনে হ'ল আমার কথায় তিনি কৌতুক বোধ করছেন। ওগিকাবুতে। ষ্টেশনের সামনে শিরাইশি খাবারের দোকানে খোঁজ নিলে, তারা বলতে পারে।

উত্তেজনায় নাচতে ইচ্ছে হল।

ও কি? আপনার চটির এ অবস্থা কি করে হল? আমায় ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় বেঞ্চের ওপর বসতে, মিষ্টার উয়েহারা আমায় একখানা চামড়ার ষ্ট্র্যাপ দিলেন। আমি যখন চটি মেরামতে ব্যস্ত, তখন তিনি একখানা মোমবাতি জ্বেলে আনলেন। অত্যন্ত লজ্জিত, আমাদের দু'খানা বাল্বই পুড়ে গেছে। আমার স্বামী বাড়ী থাকলে একখানা আনিয়ে নিতাম। কিন্তু দু'রাত হ'ল তিনি ফেরেননি এবং মেয়ে নিয়ে আমি সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। পকেটে একটা পয়সা পর্য্যন্ত নেই।

তিনি অত্যন্ত সরল, সহজ হাসিমুখে কথাগুলি বললেন। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে বছর বারো-তেরোর একটি শীর্ণ মেয়ে বড় বড় চোখে আমায় লক্ষ্য করছিল। মনে হল একেবারেই মিশুকে নয়। এদের আমি কিছুতেই আমার শত্রু মনে করতে পারলাম না, কিন্তু এতটুকু অনুমান করা কঠিন ছিল না যে, একদিন এরা আমায় কি রকম ঘৃণার চোখে দেখবে। এই চিন্তা মনে আসতে আমার সমস্ত প্রেমের তাপ নিবে হিম হয়ে গেল। চটি মেরামত করে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে হাতের ধুলো ঝেড়ে নিলাম। সেই মুহূর্তে অজানা দুঃখে, আশঙ্কায় আমার মন ভারী হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল বৈঠকখানার ঐ অন্ধকারে দৌড়ে গিয়ে মিসেস উয়েহারার হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিই। তাঁর সঙ্গে গলা জড়িয়ে কেঁদে মনটা হাল্কা করে নিই। এ চিন্তায় আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার আচরণের মধ্যে কি পরিমাণ ভণ্ডামী ও কদর্য্যতা প্রমাণিত হবে, সে কথা মনে করে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম।

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে ছুটে বাইরে পালিয়ে এলাম। ঝড়ো হাওয়া আমার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেবে মনে হ'ল। মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। আমি তাঁকে ভালবাসি, তাঁর জন্য আমার অন্তরাত্মা কেঁদে মরে, তাঁকে আমার চাই-ই। তাঁর প্রতি ভালবাসার বেগ রোধ করার শক্তি আমার নেই। এ-ও আমি জানি যে, তাঁর স্ত্রীর মত মধুর স্বভাব মহিলা কচিৎ চোখে পড়ে। তাঁর মেয়েটিও সুন্দরী, কিন্তু আমি ঈশ্বরের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। মনে আমার অপরাধের গ্লানির রেখামাত্র নেই। প্রেম ও বিদ্রোহের কারণে মানুষের জন্ম। আমার শাস্তি দেবার কোন যুক্তিসঙ্গত অজুহাত ঈশ্বরের হাতে নেই। আমি অসতী নই। আমি তাঁকে যথার্থই ভালবাসি এবং তাঁর সন্তানের জন্ম হেন কাজ নেই যা আমার অসাধ্য। প্রয়োজন হ'লে দু'-তিন রাত আমি মাঠে-ঘাটে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। হাঁ, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে।

ষ্টেশনের সামনে শিরাইশি খাবার দোকান খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না, সেখানে তাঁকে পেলাম না। তবে নিশ্চয়ই আসাগাওয়াতে আছেন। সম্ভবতঃ আসাগাওয়া ষ্টেশনের উত্তর ফাটক থেকে সোজা দেড়শ' গজ এগিয়ে যেতে হবে সেখানে এক লোহার মিস্ত্রীর দোকান পেরিয়ে আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে উইলো নামে ছোট হোটেল। তারই এক পরিচারিকাকে নিয়ে বর্ত্তমানে মিষ্টার উয়েহারা মেতে আছেন, সেইখানেই সারাটা দিন পড়ে থাকেন। আপাততঃ তাঁর কারবার ঐখানেই সীমাবদ্ধ।

ষ্টেশনে টিকিট কেটে টোকিওর ট্রেণ ধরলাম। আসাগাওয়াতে নেমে নির্দ্দেশ অনুযায়ী শেষ পর্য্যন্ত উইলোতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম কিন্তু সেই হোটেল তখন খাঁ-খাঁ করছে, কেউ নেই।

একদল লোকের সঙ্গে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। এখান থেকে তারা নিশিওগির 'চিজেরি'তে রাতভর মাতলামী করতে গেল—এই পরিচারিকার বয়স আমার চেয়ে কমই হবে, ধীর, স্থির মার্জ্জিত বলেই মনে হ'ল। জানি না, এই মেয়েই তাঁর বর্ত্তমান প্রণয়িনী কি না!

চিজেরি?—নিশিওগির কোন্ জায়গায় হ'তে পারে? হতাশায় চোখে জল আসার জোগাড়। হঠাৎ সন্দেহ হ'ল আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল না তো?

ঠিক জানি না, তবে মনে হয় ষ্টেশনের দক্ষিণে হবে। যা হোক, পুলিশবক্সে খোঁজ নিলে নিশ্চয় তারা বলে দেবে। কিন্তু এক জায়গায় আটকে থাকার মত মানুষ তিনি নন। পথের মাঝে আর কোথাও না জড়িয়ে পড়েন।

আমি চিজেরিতেই আগে খোঁজ করব।—ধন্যবাদ! আবার ট্রেণে উঠলাম—এবার একেবারে উল্টো দিকে। নিশিওগিতে নেমে ঝড় মাথায় নিয়ে পুলিশবক্সের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। সেখান থেকে চিজেরির ঠিকানা জোগাড় করে অন্ধকার পথে প্রায় ছুটে চললাম। চিজেরির নীল বাতি চিনে সোজা গিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলাম। দম-বন্ধ-করা ধোঁয়ায় ভরা ছোট ঘরে দশ-বারো জন মাতাল একটা মস্ত টেবিল জুড়ে হৈ-হৈ করে মদ খাচ্ছে। তার মধ্যে তিন জন মেয়ে। আমার চেয়েও ছেলেমানুষ পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে সিগ্রেট টানছে আর মাতলামী করছে।

ঘরের এক পাশে সরে গিয়ে চারি দিকে চোখ বুলিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করলাম। মনে হল স্বপ্ন দেখছি বুঝি! এ যেন ভিন্ন মানুষ! মাঝের ছ'টা বছরে গোটা মানুষটাই পাল্টে গেছে।

এই কি আমার রামধনু এম, সি, যিনি আমার জীবনের একমাত্র আরাধ্য-দেবতা? ছ' বছর! আগের মতই অবিন্যস্ত কেশদাম—বর্ত্তমানে বিবর্ণ ও বিরল হয়ে এসেছে। মুখখানা স্ফীত ও নিষ্প্রভ, চোখের কোল ঘেঁষে রুক্ষ লালিমা। সামনে ক'টা দাঁত পড়ে গেছে এবং ক্রমাগত কি যেন বিড়-বিড় করে চলেছেন। দেখে মনে হ'ল ঘরের কোণে একটা বুড়ো বাঁদর পিঠ উঁচিয়ে বসে আছে।

আমায় দেখে একটি মেয়ে মিষ্টার উয়েহারাকে চোখ টিপে ইশারা করল। ভদ্রলোক বসে বসেই গলা বাড়িয়ে আমায় দেখলেন এবং নির্বিকার ভাবে থুতনি নেড়ে আমায় ভেতরে ডাকলেন। দলের আর সকলে যেন আমায় দেখতে পায়নি, এই ভাবে সমানে হৈ-হৈ করতে লাগল, কিন্তু ওরই মধ্যে নিজেরা একটু সরে ব'সে মিষ্টার উয়েহারার পাশে আমার জায়গা করে দিল।

আমি কোন কথা না ব'লে চুপ করে বসে রইলাম। মিষ্টার উয়েহারা গেলাস ভরে ধেনোমদ ঢেলে দিলেন। তারপর নিজের গেলাসটিও ভরে নিয়ে হেঁড়েগলায় বললেন—খেয়ে নাও।

আমাদের গেলাস দু'টি কোন মতে পরস্পরের দেহ স্পর্শ করে মৃদু করুণ টুং শব্দ তুলল।

কে যেন চিৎকার করে উঠল,—গিলোটিন্, গিলোটিন্, সু, সু, সু। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ধুয়ো ধরল, গিলোটিন্, গিলোটিন্, সু, সু, সু। তারা পরস্পর গেলাস ঠেকিয়ে মদে চুমুক দিল। দলে দলে তারা ঐ ভাবে অর্থহীন কথাগুলি সুর করে বলে আর গেলাস ঠুকে মদ খায়। যেন ঐ পাগলের প্রলাপ তাদের মদ খাবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। যেই একজন কোন অজুহাতে বেরিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন অতিথি ঘরে ঢুকে মিষ্টার উয়েহারাকে মাথা নেড়ে অভিবাদন করে দলের মধ্যে ভিড়ে যাচ্ছে।

মিষ্টার উয়েহারা, আপনি জানেন একটা জায়গার নাম? আহাহা! আচ্ছা বলুন তো, কথাটার সঠিক উচ্চারণ কি হ'তে পারে? আ:-আ:-আ:। না আহা:-আ:? যে লোকটি সামনে ঝুঁকে এই প্রশ্ন করল আমি তাকে ষ্টেজে অভিনয় করতে দেখেছি, আমার পরিষ্কার মনে আছে, এর নাম কুজিটা, কথাটা আহা:-আ:। ধর তুমি বললে, আহা:-আ:; চিজেরির মদ সস্তা নয়।

একটি মেয়ে বলে উঠল—আপনি একটি মাত্র বিষয়ে কথা বলতে জানেন, সেটি হ'ল টাকা।

এক ছোকরা ভদ্রলোক—এক ফাদিং-এ দু'ঢোক, দামী হ'ল, না সস্তা হ'ল?

আর এক ভদ্রলোক—বাইবেলে বলে তোমায় শেষ ফাদিংটা পর্য্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। একজনের পাঁচটি গুণ আছে, আর একজনের আছে দু'টি, আরও একজন একটি মাত্র গুণের অধিকারী—বাবা:, লম্বা ফিরিস্তি। যীশুর হিসেবের বড্ড কড়াকড়ি ছিল।

আর একজন বললেন—আরে, তার চেয়েও বড় কথা হ'ল, তিনি নিজে মদ খেতেন। বাইবেল ভর্ত্তি মদের গল্প। যে সব লোক মদ ভালবাসে তাদের নিয়ে অনেক আলোচনা পাবে, কিন্তু যারা মদ খায়, তাদের সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য নেই। শুধু ভালবাসলেই পাপ; এতে প্রমাণ হয় যীশু নিজে নিশ্চয়ই মদ খেতেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, উনি এক নাগাড়ে দুই কোয়ার্ট মদ টানতে পারতেন।

হয়েছে, হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের মধ্যে ধর্মভীরু যারা, তারাই যীশুকে নিয়ে টানাটানি করে। ও-সব রেখে মদ চালিয়ে যাও। গিলোটিন্, গিলোটিন্, সু সু সু।

মিষ্টার উয়েহারা দলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী তরুণীর গেলাসের সঙ্গে সজোরে নিজের গেলাস ঠুকে মদে চুমুক দিলেন। ঠোঁটের কশ বেয়ে গড়িয়ে-পড়া তরল পদার্থটুকু অসভ্যের মত হাতের চেটোতে মুছে নিলেন। পর মুহূর্ত্তে পাঁচ-ছয়বার প্রচণ্ড হাঁচি দিলেন।

আমি নিঃশব্দে উঠে পাশের ঘরে গেলাম। ফ্যাকাশে, রুগ্ন চেহারার হোটেলকর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে কলঘরের পথটা জেনে নিলাম। ঘরে ঢুকে দলে পৌঁছবার পথে দেখি 'চী'—সেই সুন্দরী ছেলেমানুষ মেয়েটি আমার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

মধুর হেসে আমায় প্রশ্ন করল—খিদে পায়নি তোমার?

না, সঙ্গে রুটী আছে।

দুর্ব্বল চেহারার পূর্ব্বোক্ত মহিলাটি হিটারের ওপর ক্লান্তভাবে ঝুঁকে পড়ে বললেন,—দেবার মত বিশেষ কিছু নেই আমাদের; সামান্য যা আছে দুটি মুখে দেবে এস। এই মাতালদের পাল্লায় পড়লে সারা রাত পেটে কিছু পড়বে সে ভরসা নেই। এদিকে চী-এর পাশে বসে পড়।

এই কিমু—এদিকে মদ ফুরিয়েছে। পাশের ঘর থেকে এক ভদ্রলোকের সাড়া পেলাম। কিমু ঝি 'যাই' বলে দশ বোতল ধেনো মদ একটা ট্রের ওপর বসিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হোটেলকর্ত্রী তাকে মাঝপথে থামালেন—এক মিনিট দাঁড়াও, আমাদের এখানে দু'বোতল রেখে যাও। পরে মৃদু হেসে যোগ দিলেন—তোমায় কিন্তু একটু কষ্ট দেব। সুজুইয়ার কাছ থেকে দু'বাটি নুডল্ নিয়ে এস। যাবে আর আসবে।

আমি চী-এর পাশে বসে পড়ে হিটারে হাত সেঁকতে লাগলাম।

আয়াস করে বসো, এই নাও কুশন, দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছে—না? মদ খাও না তুমি? মাদাম্ প্রথমে বোতল থেকে মদ ঢেলে নিজের পেয়ালা ভর্ত্তি করলেন, পরে আমাদের দু'জনের পেয়ালাও ভরে দিলেন।

আমরা তিনজনে নীরবে পান করতে লাগলাম। আশ্চর্য্য অন্তরঙ্গ সুরে মাদাম বললেন—তোমরা দুজনেই মদ খেতে অভ্যস্ত দেখছি!

সামনের দরজা খোলার শব্দে চেয়ে দেখি, এক তরুণ যুবা বলছে—মিষ্টার উয়েহারা, মালিক এমন কিপটে যে, কিছুতেই বিশ হাজার ছাড়তে রাজী হল না, শেষ অবধি কোন রকমে দশ হাজার বাগিয়ে এনেছি।

চেক? মিষ্টার রুক্ষ গলায় হুঙ্কার দিলেন।

না, মাপ করবেন। নগদ।

ঠিক আছে, আমি একখানা রসিদ দিয়ে দেব'খন। দলের আর পাঁচজন একটানা গিলোটিন, গিলোটিন্, সু-সু-সু গেয়ে চলল। এমন অবস্থা যে, কথাবার্ত্তার মাঝেও থামে না।

মাদাম্ যথেষ্ট চিন্তিত ভাবে চীকে জিজ্ঞেস করলেন,—নাওজি কেমন আছে?

চী-এর গালে লালের ছোপ লাগল—ইতস্তত করে জবাব দিল—কি করে জানব বল? আমি তোমার গার্জেন নই।

আদৌ বিচলিত না হয়ে মাদাম্ আবার বললেন—মনে হয় সম্প্রতি মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে তার কোন গণ্ডগোল হয়েছে, নইলে দু'জনে তো বরাবর একসঙ্গে থাকেন।

শুনেছি আজকাল সে নাচ শিখছে, সম্ভবতঃ কোন নাচওয়ালীর পাল্লায় পড়েছে।

নাওজি বড় দেহসেবী, মদের ওপর আবার মেয়েমানুষ।

মিষ্টার উয়েহারা এই রকমই বন্দোবস্ত করেছেন।

একেবারে গোল্লায় যাবে ছেলেটা, যখন ওর মত নষ্ট ছেলে একবার এ রাস্তায় পা বাড়িয়েছে—

মৃদু হেসে আমি বাধা দিতে বাধ্য হলাম। চুপ করে শোনা উচিত হবে না মনে করে বললাম—মাপ করবেন, নাওজি আমার ভাই।

মাদাম অপ্রস্তুত হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চী কিন্তু সহজ গলায় বলল—তোমাদের চেহারায় কিন্তু খুব সাদৃশ্য আছে। তোমায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি এক মিনিটের জন্যে চমকে উঠেছিলাম, মনে হয়েছিল সেই বুঝি।

মাদামের গলার স্বরে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল।

হ্যাঁ তাই তো। তাহ'লে তুমি এই নরকে এলে কেন? মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে আলাপ ছিল বুঝি?

হ্যাঁ বছর ছয়েক আগে আমি ওঁকে একবার দেখেছিলাম—আমার গলা বুজে এল, চোখ নীচু করলাম।

নুডল হাতে ঝি দেখা দিল, এত দেরী হয়ে গেল, ভারী লজ্জায় পড়লাম।

মাদাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ঠাণ্ডা হবার আগে খেয়ে নাও।

ধন্যবাদ, বলে নুডল-এর ধোঁয়ার মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে চটপট খেতে সুরু করলাম। বেঁচে থাকার অসীম দুঃখ আমি যেন জীবনে এই প্রথম এমন গভীর ভাবে অনুভব করলাম।

অস্ফুট কণ্ঠে গিলোটিন্, গিলোটিন, সু, সু, সু, গুনগুন্ করতে করতে মিষ্টার উয়েহারা ঘরে ঢুকলেন। আমার পাশে ধপ করে ব'সে পড়ে নীরবে একখানা মস্ত খাম মাদামের হাতে তুলে দিলেন।

খামে কি আছে না দেখেই মাদাম সেটিকে দেরাজে চালান করলেন। হাসিমুখেই বললেন—ভেবো না এতেই তুমি পার পাবে। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পথ পাবে না।

হবে, হবে, সামনে বছর সব শোধ করে দেব।

এ-ও কি বিশ্বাস করতে বল?

দশ হাজার ইয়েন্—কত অজস্র বাল্ব কেনা যায় ঐ দামে। ঐ টাকায় আমার মত মানুষ একটা বছর হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে পারে।

এই লোকগুলোর মাথায় ছিট্ আছে, কিন্তু বোধ হয় ঠিক আমার যে দশা, এদেরও তাই। এমনি করে বাঁচতে না পারলে এরা মরে যাবে। এ কথা যদি সত্যি হয় যে, এ পৃথিবীতে জন্ম নিলে মানুষকে যা হোক্ করে জীবন কাটিয়ে যেতেই হবে, তাহ'লে তার বেঁচে থাকার প্রয়াস, হোক্ না তা কদর্য্য—নিজের চেহারার মত বিশ্রী, তবু তাকে বোধ হয় ঘৃণা করা উচিত নয়। শুধু বেঁচে থাকা, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি এ এক পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব—যার সামনে মানুষ বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল্ করে শুধু চেয়েই থাকতে পারে।

যাই হোক—পাশের ঘরে এক ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—এখন থেকে টোকিওর মানুষ যদি মৌখিক ভদ্রতামাত্র বজায় রেখে, অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করতে না পারে, তবে শিক্ষিত মহলের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে। আজকের দিনে সম্মান, বিশ্বাস আদি গুণাবলি লোকের কাছে আশা করা মূর্খতা। এ যেন ফাঁসিকাঠে ঝোলানো মানুষকে ঠ্যাং ধরে টান মারা। শ্রদ্ধা? সততা! বাজে কথা! এরা তোমায় যদি আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, তবে তোমার আর রক্ষা নেই। আজ জীবনসমুদ্রের ওপর দিয়ে আলগোছে গা ভাসাতে না পারলে তিনখানি মাত্র রাস্তা খোলা থাকে—গ্রামে ফিরে চাষবাস করা, আত্মহত্যা করা, অথবা বেশ্যাবৃত্তি।

আর একজন বললেন—যে হতভাগা এ তিন রাস্তার একটাও নিতে পারে না, তার জন্যে শেষ রাস্তা খোলা আছে—উয়েহারার কাছে ধার করে পাঁড় মাতাল হ'য়ে পড়ে থাকা।

গিলোটিন্, গিলোটিন্। সু, সু, সু।

আধচাপা গলায় মিষ্টার উয়েহারা জিজ্ঞেস করলেন—এখানে তোমার রাত কাটাবার কোন ব্যবস্থা নেই বোধ হয়। আছে?

আমি? মনে হ'ল একটা সাপ নিজেকে ছোবল্ দেবার জন্য মাথা খাড়া করে উঠেছে। বিদ্রোহ। বিজাতীয় ঘৃণায় আমার সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল।

আমার এই বিতৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন করলেন—আমাদের সকলের সঙ্গে একঘরে শুতে পারবে? বাইরে যা দারুণ শীত।

মাদাম বাধা দিয়ে বললেন—না, অসম্ভব! তোমার হৃদয় বলে কোন পদার্থ আছে?

মিষ্টার উয়েহারা দাঁতের গোড়ায় জিভ্ ঠেকিয়ে বিরক্তি সূচক শব্দ করলেন—তাহলে ওর এখানে আসাই উচিত হয়নি।

আমি চুপ করেই রইলাম। তাঁর গলায় স্বর আমায় সেই মুহূর্তে বুঝিয়ে দিল যে, আমার সব চিঠিই উনি পড়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, আমার প্রতি ভদ্রলোকের দুর্বলতার অন্ত নেই।

তিনি বললেন—উপায় কি এখন? ফুকির ওখানে একখানা বিছানার ব্যবস্থা হ'তে পারে। চী, এঁকে সেখানে নিয়ে যাও—কেমন? না, দুটি মেয়ের পক্ষে এত রাতে পথে বেরুনো ঠিক হবে না। কী জ্বালা! আমায় নিজেকেই যেতে হল দেখছি।

পথে বেরিয়ে বেশ বোঝা গেল রাত প্রায় মাঝবরাবর পৌঁছেছে। বাতাসের বেগ কমেছে, তারারা আকাশ জাঁকিয়ে সভা ভেকেছে। আমরা পাশাপাশি হেঁটে চললাম।

আমি বললাম—অন্যদের সঙ্গে বেশ শুতে পারতাম। মিষ্টার উয়েহারা ঘুমচোখে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠলেন। মৃদু হেসে আমিই আবার বললাম—আপনি ইচ্ছে করেই আমার সঙ্গে এলেন—তাই না?

বিরক্ত হাসিতে মুখ বিকৃত করে জবাব দিলেন—সেই তো হয়েছে যত জ্বালা।

সখেদে অনুভব করলাম, ভদ্রলোক আমার প্রেমে পড়েছেন। আপনি দেখছি দারুণ মদ খান। এই কি রোজ রাত্তের ব্যবস্থা?

প্রত্যেক দিন। ভোর থেকে শুরু হয়।

মদ এত ভাল লাগে?

বিশ্রী গন্ধ!

গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আপনার কাজ কেমন চলছে?

খুব খারাপ। এখন যাই লিখতে বসি, তাই বোকার মত ছিঁচ্‌কাঁদুনে হয়ে দাঁড়ায়। জীবনে সন্ধ্যা, শিল্পজগতে সন্ধ্যা, মানবজাতির সন্ধ্যা! কি চরম অধঃপতন!

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—ইউট্রেলো।

হ্যাঁ ইউট্রেলো। লোকে বলে ভদ্রলোক আজও জীবিত আছেন—কিন্তু মদ এখন তাঁকে খাচ্ছে। কঙ্কালসার দেহ। গত দশ বৎসর যাবৎ তাঁর ছবি অবিশ্বাস্য রকম অশ্লীল এবং ততোধিক জঘন্য ছবি আঁকছেন ভদ্রলোক।

শুধু ইউট্রেলোই নন—বেশীর ভাগ প্রতিভাবান লোকেরই আজ এই দশা—না?

হ্যাঁ—তাদের সৃজনীশক্তিতে ভাটা পড়ছে। কিন্তু নতুন যারা, তাদেরও ঐ একই অবস্থা, কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। তুষারাঘাত! যেন অকালে তুষারপাত হয়ে সারা দুনিয়াটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

হাল্কা হাতে আমার কাঁধ বেষ্টন করে আছেন। এ যেন তাঁর গরম আচ্ছাদনের অন্তরালে আমায় রক্ষা করার প্রয়াস। এঁকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি আমার কই? হাঁটতে হাঁটতে তার আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ঘনীভূত করে আনলাম।

পথের পাশে বৃক্ষশাখার দল, পত্রমাত্র-বিবর্জিত অবস্থায় তারা দল বেঁধে রাতের আকাশ ভেদ করে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। ভারী সুন্দর ডালগুলি—না? নিজের মনেই বললাম।

কেমন যেন না-বোঝা সুরে প্রশ্ন করলেন—তুমি বলতে চাও—এই কালো-কালো ডালগুলির সঙ্গে ফুলদের মিতালির কথা,—তাই না?

না। ফুল, পাতা, কুঁড়ি কোনটাই না। আমি ভালবাসি গাছের ডাল। সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থাতেও তারা সম্পূর্ণ প্রাণরসে সিক্ত। মরা ডালের সঙ্গে এদের কত তফাৎ!

অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃতির প্রাণরসের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ আছে এই তো? বলতে গিয়ে ভদ্রলোক কয়েকটা প্রচণ্ড হাঁচি দিলেন।

আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে?

না, তা নয়। আমাদের মদের নেশা যখন চরমে ওঠে তখন এমনি হাঁচি। এ যেন আমার নেশার পরিমাপ যন্ত্র।

আর প্রেম?

কি?

অনুরাগের শিখরে উঠেছে?

ঠাট্টা করো না আমায় নিয়ে। মেয়েরা সব সমান। এমন জটিল তাদের মনোভাব! গিলোটিন্, গিলোটিন্ স্নু-স্নু স্নু। বাস্তবিকই একজন আছে; না ঠিক একজন নয়, আধ জন আছে।

চিঠিগুলো পড়েছিলেন?

সব।

আপনার কাছ থেকে কি রকম উত্তর আশা করতে পারি?

আসলে বনেদি চালে আমার অরুচি। সব ব্যাপারেই তাদের কেমন যেন উদ্ধত, নাক-উঁচু ভাব। সেদিক থেকে তোমার ভাই নাওজি যথেষ্ট উৎরে গেছে, কিন্তু সে-ও মাঝে মাঝে এমন জমিদারী মেজাজ করে যে, আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে।

এই রকম ছোট্ট নদীর পাশ দিয়ে গেলেই ছেলেবেলায় গাঁয়ের নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার কথা মনে পড়ে, বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে।

অন্ধকারে অস্পষ্ট শব্দ করে বয়ে চলেছে এক ছোট্ট নদী, আমরা তার পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম।

তোমরা বড়লোকেরা শুধু যে আমাদের দুঃখ বোঝ না তাই না, উপরন্তু ঘৃণা কর।

তাহলে তুর্গেনিভকে কি বলতে চান?

সে-ও তো তোমাদেরই দলে—ওর প্রতি আমার যথেষ্ট বিতৃষ্ণা আছে।

তার স্পোর্টস্ম্যান্স স্কেচেস?

হ্যাঁ, ওর ঐ একমাত্র বই মন্দ হয়নি বলা যায়।

গ্রাম্যজীবনের বেদনায় ভরা বইখানি।

বেশ, মানলাম তিনি গ্রাম্য অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এই বার হ'ল তো?

আমিও গ্রামের মেয়ে। জমি চাষ করি, একেবারে গরীব চাষী মেয়ে।

তুমি কি এখনও আমায় ভালবাস? এবার তাঁর গলা রুক্ষ হয়ে এল, এখনও কি তুমি সন্তান কামনা কর?

এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

পাহাড়ে যেমন ধ্বস নামে, তেমনি হঠাৎ তাঁর মুখখানা আমার মুখের ওপর নেমে এল। সশব্দে আমায় চুম্বন করলেন। সেই চুম্বনের ভেতর দিয়ে তীব্র কামনার আভাষ পেলাম। গ্রহণ করতে গিয়ে আমার চোখে জল এল। গভীর লজ্জায় আত্মগ্লানিতে সে কান্না

আমার অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করে চোখের ভেতর দিয়ে বন্যার মত নেমে এল।

পাশাপাশি চলতে গিয়ে তিনি বললেন—একটা কাণ্ডই করে ফেললাম। বুড়ো বয়সে তোমার প্রেমে মজে গেলাম। নিজের মনেই হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

আমার কিন্তু একটুও হাসি পেল না। ভ্রূ কুঞ্চিত, অধর স্ফুরিত, আমার সে সময়ের মনোভাব ভাষায় ব্যক্ত করলে এই দাঁড়ায়—অগত্যা।

আমি যেন অন্ধকারে একা চলেছি।

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—ভদ্রলোক বললেন, কি বল মহলা চলবে?

থাক, আর অভিনয় করতে হবে না। শয়তান! মিষ্টার উয়েহারার মুষ্টিবদ্ধ হাত আমার স্কন্ধদেশে নেমে এল। আবার এক বিরাট হাঁচি।

মিষ্টার ফুকির বাড়ীতে সবাই শুয়ে পড়েছে মনে হ'ল। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম! মিষ্টার ফুকি টেলিগ্রাম এসেছে। মিষ্টার উয়েহারা চেঁচামেচি করে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। কে? উয়েহারা তুমি? পুরুষকণ্ঠে সাড়া পেলাম। হ্যাঁ আমি। রাজপুত্র রাজকন্যা এসেছে এক রাতের আশ্রয়ের আশায়। বাইরে এত শীত যে হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। প্রেমের অভিসারের এ কি হাস্যকর পরিণতি!

সদর দরজা খুলে গেল। টাক মাথা, গরগরে রং-এর পাজামাপরা এক পঞ্চাশ বছরের বুড়ো—কেমন যেন সলজ্জ হাসি হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। মিষ্টার উয়েহারা ঘরে ঢুকে কোট না খুলেই অভিযোগ করলেন—কিছু মনে করো না, তোমার ষ্টুডিওঘরখানা বড্ড ঠাণ্ডা, দোতলার ঘর আমার চাই। চলে এস। বলে আমায় হাত ধরে হলঘরের প্রান্তে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চললেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমরা একখানা অন্ধকার ঘর পেলাম, মিষ্টার উয়েহারা সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

আমি বললাম, এ যেন হোটেলের নিভৃত খাবার ঘর—তাই না?

নতুন বড়লোকের রুচি আর কতই বা ভাল হবে? তবু ফুকির মত বাজে মার্কা আর্টিষ্টের পক্ষে এও বাড়াবাড়ি। ভাগ্য যখন তোমায় খুঁজে বেড়ায়, তখন আর পাঁচজনের মত পতনের ভয় থাকে না। এই সব লোকদের ঘাড় ভাঙ্গাই উচিত। যাই হোক শুয়ে পড়, এখন শুয়েই পড়।

এ যেন ওঁর নিজের ঘর-বাড়ী, এমনি ভাবে আলমারি থেকে বিছানাপত্র টেনে-টুনে বের করলেন। তুমি এখানে ঘুমোও—আমি তবে আসি। কাল সকালে এসে তোমায় নিয়ে যাব। নীচে নেমে ডানহাতি কলঘর পাবে।—সিঁড়ি দিয়ে এমন প্রচণ্ড শব্দ করে নেবে গেলেন যে মনে হ'ল, গড়িয়ে পড়েই গেলেন বুঝি! ব্যস ঐ পর্যন্ত। এর পর চারিদিক নিস্তব্ধ, নিশুতি।

আলো নিবিয়ে—বাবার বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন ভেলভেটের কোটখানা খুলে কিমনো পরেই বিছানায় ঢুকে পড়লাম। রেশমী কোমরবন্ধটা শুধু ঢিলে করে নিলাম। ক্লান্তির মুখে মদ খেয়ে শরীরটা ভার হয়েছিল, সহজেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কোন সময়ে ঠিক মনে নেই চোখ খুলে দেখি, ভদ্রলোক আমার পাশে শুয়ে। প্রায় ঘণ্টাখানেক নীরবে যুদ্ধ করে, শেষ অবধি ওর জন্য মায়া হ'ল, আত্মসমর্পণ করলাম।

আপনার জীবনে এই কি একমাত্র সান্ত্বনা?

ঠিক তাই।

কিন্তু এতে আপনার শরীর খারাপ হয় না? আমার ধারণা আপনার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে।

কি করে বুঝলে? সত্যি সেদিন সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছি—অবশ্য একথা কেউ জানে না।

মায়ের মৃত্যুর আগে এই রকম গন্ধ পেয়েছিলাম।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে মদ খাই। দুর্বিষহ, অন্ধকারময় এ জীবন বৃথা! দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, জড়তা হৃদয় বিদীর্ণ করে। তোমার চার পাশের দেওয়াল থেকে যে হাহাকার ওঠে, তা থেকে ধরে নিতে পার এ দুনিয়ায় তোমার জন্য কোন সুখ আর অবশিষ্ট নেই। সব শেষ। মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে দুনিয়াতে বেঁচে থেকে কোন সুখ বা যশের মুখ দেখতে পাবে না, তখন তার কি অবস্থা হয় বলতে পার? এ কি প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রাম! এ শুধু ক্ষুধার্ত প্রাণীদের মুখে অন্নের যোগান দেওয়ার পণ্ডশ্রম। অসংখ্য মানুষের এই যে বেদনা, এ-ও কি অভিনয়?

না।

একমাত্র প্রেমই অমূল্য,—ঠিক যেমনটি তুমি চিঠিতে লিখেছ।

হ্যাঁ।

আমার প্রেমের বাতি ফুৎকারে নিবে গেল।

ঘরে যখন অস্পষ্ট আলো হ'ল, দেখলাম সেই ঘুমন্ত মানুষের চেহারা। দেখলাম মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে চরম ক্লান্তির ছায়া! এ মুখ বলির পশুর: এক অমূল্য বলিদান! আমার প্রেমাস্পদ। আমার রামধনু। আমার সন্তান। ঘৃণ্য পুরুষ। ব্যভিচারী পুরুষ।

মনে হ'ল এই অপূর্ব মুখখানার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই। পুনর্জীবিত প্রেমের উত্তেজনায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি তাঁকে চুম্বন করলাম।

প্রেমের কি মর্মান্তিক প্রহসন!

মিষ্টার উয়েহারা চোখ বন্ধ রেখেই আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। ভুল, আবার ভুল করলাম। চাষার ছেলের কাছে এর বেশী কী-ই বা আশা করা যায়!

এর পর ওঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

এতদিনের সুখের সন্ধান পেয়েছি। যদি চার পাশের দেওয়াল ভেদ করে হাহাকার ওঠেও, তবু আমার সুখের মাত্রা চরমেই থাকবে। আনন্দে আমার হাঁচতে ইচ্ছে করছে।

মিষ্টার উয়েহারা হেসে উঠলেন,—কিন্তু বড় বেশী দেরী হ'য়ে গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

সবে ভোর হ'ল।

সেই দিন সকালে আমার ভাই নাওজি আত্মহত্যা করে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ: কল্পনা রায়।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP

শাপমুক্তি
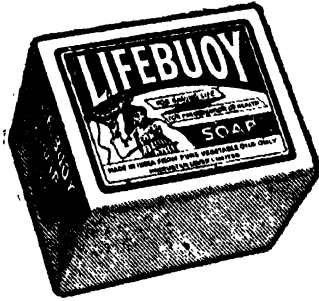
শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

এঁ্যাঃ, সত্যি কি তারা এসেছে?

হ্যাঁ, তারা এসে গেছে। তাদেরই পায়ের শব্দ পাচ্ছে শীলা। ফিস-ফিস কথার আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। ভয়ে বুকটা যেন কুঁকড়ে যায়, তাইত মৃত্যুদূতেরা তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। তাহলে যা শুনেছে, বইতে যা পড়েছে, তা সত্যি? পরলোক আছে—প্রেতলোক আছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা নিয়ে যেতে আসে। মৃত্যুদূতেরা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?—আঁতকে ওঠে শীলা।

মরণের অপর পারটা তার মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। কই? শীলা কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। চোখ মেলে তাকাতে চায়, কিন্তু পারে না। দেহটা যেন অসাড় হয়ে গেছে। নড়বার চড়বারও শক্তি হারিয়েছে শীলা। সংশয় ও আতঙ্কে শীলা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সত্যি কি স্বপ্নের মত এ জগৎটাকে সে ছেড়ে চলে যাচ্ছে? সত্যি কি তার মৃত্যু হয়েছে?

না, না, না। তাহলে এ কি হল? ভাবতে গিয়ে সবই গোলমাল হয়ে যায়। সত্যি কি সে পটাসিয়াম সায়েনাইড খেয়েছিল?

না, সে তা পারেনি। শুধু তারই উদ্যোগ করছিল শীলা। অনেক কষ্টে অনেক ছলনায় বৈজ্ঞানিক স্বামীর গবেষণাগার থেকে তা চুরি করে এনেছিল।

স্পষ্টই মনে পড়ছে, সে ত টেবিলের সামনে বসে চিঠি লিখছিল। সেই মারাত্মক শেষ চিঠি। কিন্তু চিঠি লেখা তার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা ঘুরে গেল। টেবিলের ড্রয়ারেই সেই সাংঘাতিক জিনিসটা রেখে দিয়ে চিঠি লিখতে বসেছিল শীলা।

চিঠির শেষের কথা—"মৃত্যু আমায় মুক্তি দেবে কি না জানি না: কিন্তু তোমার ক্ষমা পেলেই আমি মুক্তি পাব।"

চিঠি শেষ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল শীলা। অমনি উঁয়া-উঁয়া-উঁয়া,—পাশের কোন্ এক বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল সদ্যোজাত শিশুর কান্না। আর তার সঙ্গে শাঁখের আওয়াজ আকাশে-বাতাসে নব জীবনের বার্ত্তা ঘোষণা করছিল। দুপুরের স্তব্ধ বাতাসও যেন মৃদু হিল্লোলে স্বাগত জানাচ্ছিল সেই নবাগত মানব-শিশুকে।

তার নিজের বুক চিরেও যেন উঁয়া-উঁয়া কান্নার স্রোত বের হয়ে এক মূর্ত্তিমান শিশুর রূপ ধরে শীলার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। ফুটন্ত কমলকলির মত সে মুখখানি। সেই মুখে চুমা খেতে গিয়ে সব ভুলে গেল শীলা। সেই শিশুর বাহুবন্ধনে শীলার দম বন্ধ হয়ে গেল। কিছুতেই তাকে ছাড়াতে পারলে না শীলা। আর ত কিছুই তার মনে পড়ে না।

মরতে চেয়েছিল শীলা। কিন্তু এ কি হয়েছিল তার? সে কি মনের দুর্বলতায় এ-সব বিভীষিকা দেখেছে? তাহলে কি এ অবস্থায় ড্রয়ার থেকে বের করে সেই সাংঘাতিক জিনিসটা সে মুখে দিয়েছিল? এরকম কিছুই তার মনে পড়ে না।

তবু মনে সংশয় জাগে,—সত্যি কি সে মুক্তি পেয়ে গেছে? মাটির পৃথিবী থেকে সত্যি কি সে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ, তার সে চিঠি পড়ে প্রশান্তর মনে কি হল, তা জানতে চায় শীলা। নিশ্চয়ই ঘৃণায় প্রশান্ত তাকে অভিশাপ দেবে। না, না, প্রশান্ত তাকে ক্ষমা করবে।

ফিস্-ফিস্ কথার আওয়াজ শীলার কানে ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই মৃত্যুদূতেরা কথা কইছে। কই, কোথায় তারা? কিছুই দেখতে পাচ্ছে না শীলা। সবই যে অন্ধকার! মনে মনে ভাবে,—সে নিজেও অশরীরী হয়ে গেছে। তবু কেন দেহে অবসাদ এসেছে! তার মনে হল,—দেহের মধ্যেই সে এখনও ছটফট করছে। তাহলে আত্মাটা দেহ ছেড়ে এখনও যেতে পারে নি!

কিন্তু এ কি হল? সে যে বিছানায় শুয়ে আছে। নরম বিছানায় বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে শীলা। কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে! এ ঘরেও বিছানা ছিল না! আর প্রশান্তর এখনো ফেরবার সময় হয় নি।

দুপুরবেলা প্রশান্ত কলেজে চলে গেছে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিরিবিলিতে চিঠি লিখছিল শীলা:—শেষ বিদায়ের চিঠি। প্রশান্তর কাছে তার অভিশপ্ত জীবনের স্বীকৃতির কথা জানিয়ে মার্জনা চেয়েছিল শীলা।

আত্মহত্যা ছাড়া যে আর কোন উপায় ছিল না। আত্মভোলা বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্ত। এমন সুন্দর মধুর স্বভাব স্বামীকে সে সুখী করতে পারল না। প্রশান্তকে ছলনা করে নিজের পাপের বোঝা বাড়াতে চায়নি শীলা।

অতীতের সব কথা মনে পড়ায় একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শীলা। সোনার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে মস্ত বড় ভুল করেছিল। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে আজ করছে। এ ছাড়া যে কোন উপায়ই ছিল না।

সমীর তার সর্বনাশ করেছে। তখন অত-শত বুঝতে পারেনি শীলা। সমীর তার দেহে-মনে কি এক উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল। শীলা সে উন্মাদনায় আত্মসমর্পণ করেছিল। সমীরকে বিশ্বাস করেই নিজের সর্বনাশ সে নিজেই ডেকে এনেছে। সমীর আশ্বাস দিয়েছিল; সেই সমীরই করেছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

যে সমীর জাত মানে না ধর্ম্ম মানে না, সমাজ মানে না। সেই সমীরই বাপ-মায়ের দোহাই দিয়ে দূরে সরে গেল। ব্রাহ্মের মেয়েকে তার বাপ-মা ঘরে তুলবেন না; বরং সমীরকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।

সমীরের বুকে মাথা রেখে শীলা কত কেঁদেছে। এমন কি তার পা দু'টি জড়িয়ে ধরে তাকে উদ্ধার করতে বলেছিল। সমীরের সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল শীলা। মিথ্যা আশ্বাসও দিয়েছিল সমীর। কিন্তু শেষ কালে সমীর গাঢাকা দিয়েছিল।

অধ্যাপক শিবনাথের একমাত্র কন্যা শীলা। আপনভোলা ঋষিতুল্য অধ্যাপকের ছাত্রেরা তাঁর অধ্যাপনায় মুগ্ধ। কথায়-বার্তায়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় তিনি ছেলেদের মাতিয়ে তুলতেন। শীলার অন্য ভাইবোনও ছিল না। সমীর কলেজে উপরের ক্লাশে পড়ত। কলেজেই তার সঙ্গে শীলার আলাপ হয়। শিবনাথের ছাত্র বলে শীলাদের বাসগৃহেও তার সেই সূত্রে যাতায়াত সুরু হয়ে যায়। বছর কয়েক আগে শীলা তার মাকেও হারিয়েছে। প্রায় এই নিঃসঙ্গ জীবনে সমীর এক আনন্দের উচ্ছ্বাস নিয়ে হাজির হল। তাদের দুজনের মেলামেশায় শিবনাথ খুশীই হতেন বলে মনে হয়েছিল।

উদ্ভিন্ন যৌবনে সমীর মায়া-মরীচিকার মত শীলার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আত্মভোলা অধ্যাপক সে খবর রাখেন নি। সমীর ভাল ছেলে। তার উপর শহরের নামজাদা এ্যাডভোকেট হরিশ মুখুজ্জের একমাত্র ছেলে সে। হয়ত প্রচ্ছন্ন কোন আপত্তি মনে মনে পোষণ করতেন শিবনাথ।

ব্রহ্মজ্ঞানী অধ্যাপক শিবনাথের কন্যাকে ব্রাহ্মণ হরিশ মুখুজ্জে ঘরে তুলতে পারেন, এমন দুরাশাও হয়ত শিবনাথ করেছিলেন। আজকাল ত এ রকম প্রায়ই ঘটে থাকে। আর শীলা অত-শত চিন্তাও করেনি। সমীরই শেষ মুহূর্ত্তে তাকে শেষ আঘাত দিয়ে তা জানিয়ে দিলে।

নিজের অপরাধের বোঝা পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সমীর সরে পড়ল। শীলা কোন উপায়ই দেখতে পায় না। এমন সময় নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। হায়, মা যদি বেঁচে থাকতেন!

বিজ্ঞানী অধ্যাপক কি ভাবলেন বুঝা গেল না। সমীর আর আসে না। তিনি হয়ত ভাবলেন,—শীলা সমীরকে গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু মেয়ের মনের কোন খবরই তিনি রাখতেন না। রাখবার কোন উপায়ও ছিল না। এমন সময় এল প্রশান্ত। বিজ্ঞানের ছাত্র প্রশান্ত; নূতন অধ্যাপক হয়ে সে কলেজে এসেছে। শিবনাথেরই প্রাক্তন ছাত্র প্রশান্ত। শিবনাথের গবেষণায় সহযোগী হল। শিবনাথের গৃহে প্রশান্তর আনাগোনা চলল। শীলার সঙ্গে তার পরিচয়ও হল।

শীলার মনোজগতে তখন ভয়ানক তোলপাড় চলছে। নিজেকে
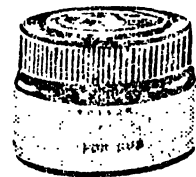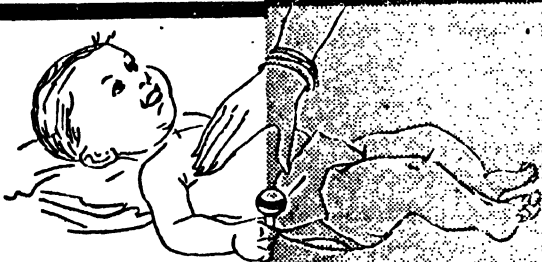
লুকিয়ে রাখতে চায় শীলা। তবুও প্রশান্তর আকর্ষণ সে এড়িয়ে থাকতে পারে না। নিজের নিষ্কৃতির উপায় খুঁজছে শীলা ; এর মাঝে প্রশান্ত এসে দাঁড়িয়ে সবই ভণ্ডুল করে দিলে।

হঠাৎ একদিন শিবনাথ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তাররা বলে গেছে,—এ বয়সে হার্টের অ্যাটাক্। খুব সাবধান থাকতে হবে।

এই অসুস্থ অবস্থায় শীলার জন্তই বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শিবনাথ। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে লাগলেন শিবনাথ,—আমি ত চললায় ; কিন্তু তোর কি উপায় হবে মা ?

ঠিক সেই সময়ে প্রশান্ত এসে হাজির হল। শিবনাথের কথা তার কানে গিয়েছিল। প্রশান্ত বললে,—শীলার জন্ত আপনি ব্যস্ত হবেন না সার। আপনি আগে সেরে উঠুন।

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে এক অঘটনীয় ব্যাপার ঘটালেন শিবনাথ। তিনি শীলার দুটি হাত প্রশান্তর হাতে দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন,—তুমিই এর ভার নাও প্রশান্ত। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমরা সুখী হবে।

শীলা বাধা দিতে পারেনি। ভয়ে কোন কথা বলতে পারেনি শীলা। পরের দিনই বিধিসঙ্গত ভাবে শীলার সঙ্গে প্রশান্তর বিবাহ হয়ে গেল। শীলা অনেক ভেবেছে। প্রশান্তকে সব কথা লিখে জানিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। মুমূর্ষু পিতার মুখের দিকে চেয়ে সে সংকল্প তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

শিবনাথ যে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবেন, শীলা তা ভাবতেও পারেনি। সেদিন রাত্রেই আত্মহত্যা করত শীলা। এ কি করলেন তার বাবা ? সমাজ, বন্ধুবান্ধব এমন কি প্রশান্ত পর্য্যন্ত তার কাছে সেদিন মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে উঠল।

উপায় চিন্তা করতে লাগল শীলা। না, না, তাকে বাঁচতে হবে, ছলনায় অভিনয়ে নামল শীলা। ঐ প্রশান্তকে আঁকড়ে ধরেই তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে তার মুমূর্ষু পিতাকে ; ছলনায় অভিনয় ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই।

প্রশান্তর হাত ধরে নূতন জীবন সুরু করল শীলা। অদ্ভুত এ মানুষটি ! সদা হাসিমুখ। একান্ত শীলার উপরই তার নির্ভর। প্রশান্তর আপ্যায়নে আর তার মাধুর্য্যে শীলা মুগ্ধ হয়ে গেল। নিজের কপট ছলনার কথা ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে শীলা। মনে মনে ভয়,—যদি এ ছলনা ধরা পড়ে ? এ মানুষটিকেও কি শীলা আঘাত দেবে ? প্রশান্ত কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে ? এ কি কোন মানুষের পক্ষে,—কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব ?

না, না, না। প্রশান্তকে সে আঘাত দিতে পারবে না। প্রশান্তকে শীলা ভালবাসে। অতীতের ভুলই একটা ছেলেখেলা মাত্র। তা কি শোধরান যায় না ? মেয়ে হয়ে জন্মানো কি এতই অপরাধ ? সমীর কি করেছে ? সে অপরাধী হয়েও নির্দোষ। সমাজে উচ্চ আসন পাবে সমীর। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে সুখী হবে। আর তারই পাপের বোঝা শীলাকে পিষে মারবে।

শীলা অতীতকে ভুলে যেতে চায়। কিন্তু অতীতের সাক্ষ্য যে সে বহন করেছে। এ যে জীবন্ত সাক্ষ্য। এ সাক্ষ্য যে ধুয়ে-মুছে ফেলবার কোন উপায় নাই। তারই দোষে তার বাবা আর তার স্বামীর মুখেও কলঙ্কের ছাপ পড়বে। তারও দাঁড়াবার ঠাঁই থাকবে না। ঘরে-বাইরে কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই নাই শীলার, মনে করলেও গা শিউরে ওঠে। এই ত আমাদের সমাজ। কেন, অন্ত দেশে ত এমন নয়।

এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেও টিকে থাকে শীলা। মুমূর্ষু শিবনাথের সেবায় তারা দুজনেই এখন ব্যস্ত। কখন যে কি হয় বলা যায় না। মাসখানেকের মধ্যেই তার সমাপ্তি ঘটল। শিবনাথ মারা গেলেন। এবার অস্থির হয়ে উঠল শীলা। না, আর ত কোন বাধাই রইল না। নিজের অপরাধের বোঝায় আরেকজন নিরীহ লোককে বিব্রত করা তার উচিত হবে না। ছলনায় মুখোশ যে তার আপনা-আপনি খসে পড়বে। এরকম অন্তর্দ্বন্দ্বে আরো মাসখানেক কেটে গেল।

প্রশান্তকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। তাকে পেয়ে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছিল শীলা। এ মানুষটিকে ছলনা করতেও তার কষ্ট লাগে। ভেবেছিল, খোলাখুলি সব কথা বলে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু সাহস হয় নি। তবু ভরসা ছিল, প্রশান্ত তাকে ক্ষমা করবে।

এত দিন সবই ছলনায় ঢেকে রেখেছিল শীলা। কিন্তু দৈহিক লক্ষণগুলি ত ঢাকবার নয়। শীলার দেহে সব লক্ষণই প্রকাশ পেতে সুরু হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! প্রশান্ত সহজভাবেই তা নিয়েছে। খুশীর চাঞ্চল্যে প্রশান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশান্ত জানে না যে শীলা সর্ব্বনাশের বোঝাই বইছে।

প্রশান্ত আপন খেয়ালেই বিভোর। দরদেভরা তার মন। প্রশান্ত বলে, এ অবস্থায় তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্ত লোকের দরকার। এখন থেকেই ডাক্তারের পরামর্শ মত চলা উচিত। কি বল ?

শীলা বাধা দেয়। ডাক্তারের নাম শুনলেই ভয়ে আঁতকে ওঠে শীলা। প্রশান্তর বন্ধু ডাক্তার শ্রীমন্ত দু'-একদিন এসেছিল। কিন্তু তার কাছেই শীলা যায়নি ! তাকে এড়িয়ে চলত শীলা।

এ লুকোচুরি আর ভাল লাগে না। তাই ত শেষ পন্থা সে ধরেছে। এই ত ফিস-ফিস আওয়াজ হচ্ছে। নিশ্চয়ই তারা এসেছে। কান পেতে থাকে শীলা।। নাঃ, মিছামিছি এ জগতের কথা ভেবে আর কি হবে ? সে যে পরলোকের পথে পা বাড়িয়েছে। দেহপিঞ্জর থেকে তার আত্মা মুক্তি পেয়ে গেছে। এখনই দূরে দাঁড়িয়ে শূন্যে ভেসে ভেসে সবই সে দেখতে পাবে। তার অশরীরী আত্মা তারপর মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে শীলা। কিন্তু প্রেতলোকের চিন্তা তাকে বিচলিত করে তুলে।

কি জানি অজানা সে প্রেতলোকে কার কাছে দাঁড়াবে শীলা ? তবু মনকে শক্ত করে নেয়। তার বাবা-মা পরলোকে রয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই তার জন্ত অপেক্ষা করছেন। মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়বে শীলা। তার মা নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন।

কোথায় মৃত্যুদূতেরা ? এ যে পরিচিত কণ্ঠস্বর। তাহলে এরাও এতক্ষণ এসে গেছে। চোখ মেলতে চায় শীলা, কিন্তু পারে না, মনে সংশয় জাগে। সত্যি কি সে মুক্তি পেয়ে গেছে ? ঐ যে শীলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে,—না ডাক্তার ! শীলাকে বাঁচাতে হবে।

প্রশান্তর কণ্ঠস্বর। কি ব্যাকুলতা এ-কণ্ঠস্বরে ! শীলার চিঠিখানা টেবিলের উপরই পড়েছিল। প্রশান্ত নিশ্চয়ই এতক্ষণে সে চিঠি পড়ে ফেলেছে। কি লজ্জা ? কি ভাবছে প্রশান্ত ? শীলার কলঙ্কের কথা জেনেও শীলাকে বাঁচাতে চাইছে।

মনে মনে ভাবে শীলা,—আমি ত বেঁচে নাই। ওদের নিন্দা-প্রশংসার বাইরে চলে গেছি। ওরা বুঝতে পারছে না যে আর কোন ডাক্তারই আমাকে আর ফেরাতে পারবে না।

হাসতে চায় শীলা। কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটল কি না সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ কেমন যেন ভয় হয়। তবে কি এখনও তার আত্মা দেহ ছেড়ে যায় নি?

এবার শীলা ডাক্তারের উত্তর শুনতে পায়,—মেণ্টাল শক্‌। এ অবস্থায় রোগী উন্মাদ হয়ে যেতে পারে প্রশান্ত। এঁর জ্ঞান ফিরে আসতে তিন-চার ঘণ্টা লাগতে পারে।

কি সর্বনাশ! এ যে প্রশান্তর বন্ধু সেই গাইনোকোলাজিষ্ট ডাক্তার শ্রীমন্তর গলা! কি বলতে চাইছে শ্রীমন্ত ডাক্তার?

শীলার মন উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে।

ডাক্তার বলতে থাকে,—আমার মনে হয়, ওঁর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই প্রশান্ত। তোমারও নয়, তাঁরও নয়।

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—বাঁচাতে হবে ডাক্তার! শীলাকে বাঁচাতে হবে।

ডাক্তার বলে,—তারই চেষ্টা করছি প্রশান্ত! কিন্তু ভেবে দেখো, মাত্র দু' মাস তোমাদের বিয়ে হয়েছে; কিন্তু এ যে পাঁচ মাসের কেস! এ ভার, এ বোঝা বইতে পারবে তুমি?

প্রশান্ত শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই পারব ডাক্তার! শীলার সমস্ত দায়িত্ব যে এক দিন শপথ করে আমি নিয়েছি। তাকে তুমি ভাল করে তোল।

ডাক্তার বলে,—হ্যাঁ, তারই চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু আমার কথা হয়ত তুমি বুঝতেই পারনি প্রশান্ত!

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—সবই বুঝতে পেরেছি আমি। বুঝতে পেরেছি বলেই অন্য কাউকে না ডেকে তোমাকেই ডেকেছি।

ডাক্তার বলে,—তার কলঙ্ক তোমাকে বইতে হবে প্রশান্ত! তোমার মনের সে জোর আছে?

প্রশান্ত যেন হাসিমুখে উত্তর দেয়,—কলঙ্ক নয় ডাক্তার! এটা আমাদের সমাজেরই গলদ। যৌবনের উন্মাদনায় মানুষ সহজেই এ রকম ভুল করে থাকে। ছেলেদের বেলা কোন দোষ হয় না; তারা নির্বিকার ভাবে সরে পড়ে। মেয়েরাই তাদের অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়ায়। হয় তাদের আত্মহত্যা করতে হয়, না হয় সমাজের বাইরে চলে যেতে হয়। এ রকম আর চলতে পারে না ডাক্তার!

ডাক্তার বলে,—কি করবে তুমি?

প্রশান্ত বলে,—সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করেছি ডাক্তার! সহজ ভাবেই তার সঙ্গে চলব। শীলার কোন দোষ আমি দেখতে পাইনি। তার ভালবাসাই তাকে জয়ী করবে।

ডাক্তার বলে,—কোন দোষ নেই?

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—না, শীলার কোন দোষ নেই। শীলা তার ভুল শুধরে নিয়েছে। শীলাকে বাঁচিয়ে সমস্ত পুরুষজাতির হয়ে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ডাক্তার।

ডাক্তার বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উত্তর দেয়,—প্রায়শ্চিত্ত?

প্রশান্ত বলে,—হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত। আমার ভালবাসা দিয়ে তার অভিশাপ থেকে সমাজকে বাঁচাতে হবে ডাক্তার।

ডাক্তার বলে,—অদ্ভুত মানুষ তুমি প্রশান্ত! সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছি,—সত্যি তুমি অদ্ভুত!

প্রশান্ত বলে,—জানি না, কবে এরূপ অভিশাপ থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত হবে ডাক্তার! জানি না কবে আমরা শাপমুক্ত হব?

প্রশান্তর কথাগুলি শুনে শীলার দেহে-মনে কি এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইনি মানুষ না দেবতা? না, না, আমি যাব না! আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শীলা।

ছুটে আসে প্রশান্ত। আর ছুটে আসে ডাক্তার।

প্রশান্ত শীলার হাত দু'খানি নিজের কোলে টেনে নেয়। শীলার মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় প্রশান্ত।

আবেগে উচ্ছ্বসিত প্রশান্তর কণ্ঠস্বর,—শীলা! শীলা! ভয় নেই। তুমি কাঁদছ কেন? এই যে আমি রয়েছি।

শ্রীমন্ত নাড়ী পরীক্ষা করে বলে,—ট্রাঙ্ক! আর বিশেষ কোন ভয় নাই। তবু সাবধান প্রশান্ত! কোন উত্তেজনার কারণ যেন না ঘটে। এই ওষুধটাই চলবে। আমি আবার আসব।

ডাক্তার বেরিয়ে যায়।

প্রশান্তর কোলে মাথা রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শীলা। তার দু' চোখে ধারা বয়ে যায়।

প্রশান্ত বলে,—ছিঃ, কি পাগলামি করতে গেছলে শীলা! আর ওরকম করো না।

উত্তর দিতে পারে না শীলা। আজ আর কোন লজ্জা নাই, সংকোচ নাই; সমস্ত ভয়, সমস্ত আতঙ্ক তার যেন মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কি দুঃসহ যাতনা সে পাঁচটি মাস বুকে করে নিয়ে আছে; আজ আর কোন যাতনা নাই। নির্ভয় হয়েছে শীলা।

প্রশান্ত বলে, সব ওলট-পালট হয়ে গেল ত? যা হবার হয়ে গেছে; তার জন্য পাগলামি করো না।

প্রশান্তর মুখে প্রসন্ন হাসি।

শীলার মুখে উত্তর নাই। প্রশান্তর বুকে মুখ লুকিয়ে অশ্রুধারায় তাকে ভাসিয়ে দেয়।

কার শাপমুক্তি? সমাজের না শীলার? প্রশান্তর স্পর্শে আজ শীলার পুনর্জন্ম ঘটেছে। প্রেতলোক থেকে ফিরে এসেছে শীলা। আর যে তার কোন ভয় নাই।

সুশীল রায়

নতুনই তবে এসেছেন এ-পাড়ায়। এর আগে কোনো দিন দেখিনি। কিন্তু এখন রোজ দু'বেলাই দেখছি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে।

পায়ে ময়লা কেড্‌স্ জুতো, গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি। চলনেও বিশেষ আঁটসাট ভাব নেই। জীবনটাকে যেন ধরে রাখার জন্যে আর ব্যগ্র নন; কিন্তু জীবনটা যেন নাছোড়, ওঁকে ছাড়তে চায় না কিছুতে।

ক'দিন বাদে ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে পারলাম। নাম দীপঙ্কর সেন; বর্মার রেলে চাকরি করতেন, রিটায়ার করে দেশে ফিরে এসেছেন। নলিনীবাবুর বাড়ির নীচতলার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন। বিপত্নীক। কিন্তু সকন্যক।

খবরটা জানার জন্যে অবশ্য কোনো আগ্রহ ছিল না। কানে এসে গেল, তাই শুনে রাখা গেল।

কখনো-কখনো দেখি পাশের মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পর একটা সিগারেট মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের মনে হেঁটে চলেছেন।

আশ্চর্য লাগে! এত হেঁটে চলে বেড়াবার কি দরকার ওঁর? তাঁর হাঁটার ভঙ্গি দেখে অস্বস্তিই লাগে। শরীর যেন চলে না। যদি না-ই চলে, তবে শরীরটাকে ওভাবে টেনে টেনে বয়ে বেড়াবার দরকার কি

অবশেষে আলাপ হল একদিন। বললেন, উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরি বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য একটা থাকে।

কী সেই উদ্দেশ্য—এ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে বাধল। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম, বিকারও নেই, বিকৃতও নেই, আবেগও নেই, উদ্বেগও নেই। এমনি নিস্পৃহ তাঁর দৃষ্টি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে আছেন এখানে? একা বুঝি?

সংক্ষেপে জবাব দিলেন তিনি। বললেন, প্রায় তাই।

এ ভাবে তাঁর জবাব দেবার অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম না। বললাম, বর্মায় ছিলেন শুনলাম। দেশটা কেমন?

ভালো।

ক'-বছর ওদেশে কাটালেন?

দীপঙ্কর সেন আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, অনেক বছর। সারাটা জীবন।

কথার স্বরে মনে হল কী রকম যেন একটা আক্ষেপ আছে ওই কথায়।

সেদিন কথা এই পর্যন্তই হল। দীপঙ্কর সেন বারান্দা থেকে নেমে বাঁ দিকের মুদির দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট কিনলেন, তার পর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের আমার বারান্দার সম্মুখ দিয়ে চলে গেলেন। আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। মনে হল, আমার ওই সব গায়ে-পড়া প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক সম্ভবতঃ আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

এই জন্যে এই রাস্তা দিয়ে তাঁকে যেতে দেখলেও তাঁর সঙ্গে কয়েক দিন আর কথা বলিনি। কিন্তু লোকটার চলন দেখে ওর উপর কেমন যেন মায়ার ভাব জেগেছে।

একদিন বলে ফেললাম, কোথায় চললেন?

এই—ব'লে সামনের রাস্তার দিক দেখিয়ে দিয়ে সোজা সেই পথে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক বিপত্নীক। তা হোন। কিন্তু উনি নাকি সকন্যক! তবে সেই কন্যাটি কই? তাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখিনে কেন? তাকে দেখে যে ধন্য হয়ে যাব—এমন না হলেও মেয়েটিকে দেখার জন্যে কৌতূহল হতে লাগল।

কোথায় চললেন?

দীপঙ্কর সেন আমার দিকে আলগোছে চেয়ে বললেন, এই—এদিকে। একটু ব্যস্ত আছি।

ব্যস্ততার কথা জানা গেল কেবল তাঁর কথায়। চলার ধরণ দেখে ব্যস্ততার কোনো লক্ষণই বোঝা গেল না।

দিন কয়েক বাদে ভদ্রলোকটি একটু ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়ালেন আমার বারান্দার সামনে। বললেন, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল মশাই! ওই সব দেখে আমার সর্বাঙ্গ গিয়েছিল হিম হয়ে।

কিসের কথা বললেন?

আমার মেয়ে। বিশেষ কোনো অসুখ নেই। কিন্তু কেমন ফিট হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে যায় হাত-পা।

চোখে-মুখে চিন্তার ভাব আনার চেষ্টা ক'রে, গলায় সহানুভূতির স্বর আনার চেষ্টা করে বললাম, এখন কেমন?

ভালো। অনেকটা সুস্থ।

দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠল ক্রমশ। ভদ্রলোকের বয়স যখন তেরো তখন নাকি তিনি পলাতক হন দেশ থেকে। চলে যান আকিয়াব, সেখান থেকে বেসিন, তারপর রেঙ্গুন। পুরো পঞ্চাশ বছর তিনি কাটিয়েছেন ওই দেশে। এখন তাঁর বয়স চৌষট্টি। খুঁটিনাটি হিসেব দিলেন তিনি। পথে-ঘাটে যে সময় খরচ হয়েছে, আর এ দেশেও এসেছেন মাস ছয় হল—এই সব খুচরো কয়েকটা মাস একত্র করলে হয়তো একটা পুরো বছরই দাঁড়িয়ে

যাবে। তাহলে বিদেশে তাঁর কেটেছে ঠিক একটা অর্ধ-শতাব্দী। এই কথা জানানোর মধ্যে দীপঙ্কর সেনের আক্ষেপ আর অহংকার যেন মেশানো বলে বোধ হল।

ছয় মাস হল এসেছেন, কিন্তু আপনাকে খুব বেশি দিন হল তো দেখছি নে।

আপনাদের এদিকে এসেছি মাত্র কয়েক দিন হল। যেদিন এসেছি সেই দিন আর আজকের দিন হিসেবে ধরলে মোট আটাশ দিন হল। তা, দেখতে দেখতে অনেক ক'টা দিনই হয়ে গেল বলতে হবে।

মুখে বললাম, তা বটে!

কিন্তু মনে-মনে বলতে লাগলাম অন্য কথা। এতগুলো দিন কেটে গেল কিন্তু ওঁকে একা ছাড়া আর কাউকে এ-পর্যন্ত দেখা গেল না কেন?

এ 'কেন'র উত্তরের জন্যে অবশ্য কোনো প্রশ্ন করলাম না।

দীপঙ্কর সেন মাঝে মাঝে আসেন। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি নাকি পুরো বর্মীই হয়ে গিয়েছেন। বিয়ে করেছেন ওই দেশে। মোট তিনটি নাকি বিয়ে ওঁর। তিনটিই বর্মী বউ। তাঁর এই মেয়েটি মেজো বউ-এর। কিন্তু সব কেমন যেন—দীপঙ্কর স্বীকার করেন—তাঁর নিজের স্বভাবেই নিশ্চয় কোনো গলদ আছে, নইলে বউগুলো টেঁকসই হল না কেন?

সবাই মারা গেছেন বুঝি?

উঁহু। তাদের কী ইচ্ছে কে জানে—তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য সংসার পেতে বসেছে। আর, শুনেছি বেশ সুখেই নাকি আছে।

একটু ভাবলেন দীপঙ্কর সেন। বললেন, একটা ভালো বাঙালী ছেলে খুঁজছি। মেয়েটাকে গছাব।

ভদ্রলোকের ভাষা শুনে অবাক হলাম, বললাম, বিয়ের বয়েস হয়েছে আপনার মেয়ের?

কি জানি। এ দেশে কোন বয়সে বিয়ে হয় জানিনে। বয়স হল তার বাইশ; গত মার্চে বাইশ পূর্ণ হয়েছে।

বললাম, কিন্তু ওকে আপনার সঙ্গে দেখিনে কেন? খুব লাজুক বুঝি, খুব বুঝি পর্দানসীন?

ছুটোর একটাও না। দীপঙ্কর সেন হাসলেন, বললেন, আমা এ্যাটাক ও ফিটস্থ, রাস্তায় বের হতে দিতে ভয় পাই। কখন কোথায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে ঠিক কি!

নলিনী বাবুর বাড়ির একতলার বাসিন্দে এই বৃদ্ধটি এ-পাড়া মাত করে রেখেছেন।

নলিনী বাবুর স্ত্রী একজন বিশ্বনিন্দুক। কিন্তু শুনলাম, তিনি নাকি দীপঙ্কর সেনের মেয়েটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাপের উপর মেয়েটির যা মমতা—কোনো খাঁটি বাঙালী মেয়েরও নাকি তেমন দেখা যায় না। গুণের আঁচ এর থেকে একটু করতে পারা গেল। রূপ দেখিনি, কিন্তু শুনলাম—রূপেও নাকি সে তেমনি।

এই সব গুজব শুনে সারা পাড়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ছেলে-ছোকরাদের কথা না হয় ধরা না-ই হল, বুড়োদের চোখে-মুখেও বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

নলিনী বাবুর স্ত্রী নাকি মেয়েটির গুণকীর্তন করে বেড়াচ্ছেন। এমন সেবা আর এমন যত্ন তিনি নাকি কখনো দেখেননি। দেখা দূরের কথা, তিনি নাকি কল্পনাও করতে পারেননি।

ভাঙা-ভাঙা বাংলা নাকি বলতে পারে মেয়েটা। নলিনী বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি খুব ভাব হয়েছে। অন্তরের কথাও নাকি অকপটে বলে সে নলিনী বাবুর স্ত্রীর কাছে।

পাড়ার পুরুষরা এই সব গল্প শুনে যেমন পুলকিত, মেয়েরা নাকি তার বিপরীত—তারা নাকি সব মুখ ভার করে আছে; তাদের সব গুণকে ধামা-চাপা দিয়ে বিদেশিনী ওই মেয়েটা সবার উপরে টেক্কা দেবে—এ নাকি বরদাস্ত করা কঠিন।

তার বাপকে ছেড়ে গেছে তার মা। এইজন্যে মায়ের উপরে সে নাকি খুশি নয়। বাপের এই অথর্ব অবস্থা দেখে সে তাই নাকি তার সমস্তটুকু স্নেহ আর মমতা বাপের উপর ঢালছে।

মেয়ের স্নেহমমতা পেয়ে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন দীপঙ্কর সেন। আর, আমরা এই তফাতে বসে এক বিদেশিনী ললনার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মনে মনে হয়তো নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করছি; হয়তো নিজেরা যে স্নেহমমতার মধ্যে লালিত হচ্ছি, তা অকিঞ্চিৎকর বলে অবজ্ঞা করছি। এবং দীপঙ্কর সেনের মত ধন্য হয়ে যাবার জন্যে মনের মধ্যে ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলছি।

কিন্তু হঠাৎ ধন্য হয়ে গেলাম একদিন। তৈরী ছিলাম না। আচমকা বিদ্যুতের একটা ঝলক এসে লাগল যেন চোখে।

সত্যি, চোখ আছে নলিনী বাবুর স্ত্রীর। বর্মী নারীর শারীরিক কোমলতা এবং বঙ্গনারীর দৈহিক লাবণ্য একসঙ্গে মিশে এক অবর্ণনীয় শোভার সৃষ্টি হয়েছে।

চলমান সেই সৌন্দর্যের নির্যাস সঙ্গে নিয়ে হেঁটে চলেছেন দীপঙ্কর সেন।

বাক্ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না—কোথায় চলেছেন?

কিন্তু দীপঙ্কর সেন নিজে থেকেই বললেন, একটু লেকের দিকে চলেছি বেড়াতে। বন্ধুবান্ধব কিছু জোগাড় হয়েছে ওদিকে; যাই। গল্পগুজব করে আসি।

বললাম, আচ্ছা।

ধীরে ধীরে ওঁরা চলে গেলেন। মনে হল, সারা পথে লাবণ্যের বন্যা ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল যেন এক মায়াবিনী! বাতাসে সুগন্ধের প্লাবন সৃষ্টি হল যেন ঐ অঙ্গের সুবাসে।

এই সৌন্দর্য দেখে খুশিতে উথলে ওঠাই উচিত, কিন্তু, অকপটে স্বীকার করি, আমার সমস্ত মন একটা চাপা বেদনায় কেন যেন ভারী হয়ে উঠল। নিজেকে বড়ই ভাগ্যহীন বলে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এই রমণীর ঐ রমণীয় সৌন্দর্য কোন ভাগ্যবান মালাকরের উদ্যান সুশোভিত করবে কে জানে!

সকাল আর বিকাল এই রাস্তা ধরে তিনি যাতায়াত করেন। প্রায়ই তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়েও যান। এই জন্যে রাস্তাটার মর্যাদাই বেড়ে গেল আমার কাছে। যে পথের দিকে তাকাতাম কদাচিৎ, সেই পথটার দিকে চেয়ে থাকায় একটা রোমাঞ্চকর আরাম বোধ করি।

সকালের দিকে তিনি একা যান, বিকেলের দিকে যান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

সেদিন সকালে তিনি চলেছেন এই পথ ধরে, তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খোঁজ কিছু পেলেন ?

কিসের ?

কোনো চোস্ত বাঙালী ছেলের ?

আমার প্রশ্ন শুনে একটু হেসে তিনি বললেন, অত শীগ্‌গির কি পাওয়া যায় ? খোঁজ চলছে। পেতেই হবে।

বললাম, সেদিন অত বন্ধুবান্ধবদের কথা বলছিলেন ?

বললেন, হ্যাঁ। লেকে হাওয়া খেতে আসেন সবাই। রিটায়ার-করা ভদ্রলোকেরা। বেশ হাসি-খুশি। বেশ মিশুক।

পরামর্শ দেবার মত করে বললাম, ওঁদেরই কারো একটা যোগ্য ছেলেকে খোঁজ করুন না।

হাসলেন দীপঙ্কর সেন। বললেন, সেই মতলবেই আছি।

বাধ-বাধ ঠেকছিল, কিন্তু শেষবেশ জিজ্ঞাসা করেই বসলাম, মেয়ে জানে আপনার এই প্ল্যানের কথা ?

বুদ্ধি তো আছে। নিশ্চয় কিছু বোঝে।

বিকেলের দিকে যখন তিনি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যান তখন তাঁর সঙ্গে অবশ্য এত কথা বলিনে।

কয়েক দিন বাদে দেখি, দীপঙ্করের বন্ধুবান্ধব সত্যিই জোগাড় হয়েছে। তাঁরাও দীপঙ্করের সঙ্গে আসতে আরম্ভ করেছেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁর ঘরে বুড়োদের বেশ-একটা মজলিশ বসতে আরম্ভ করেছে।

নলিনী বাবুর স্ত্রী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। বুড়োদের উপর সত্যিই মেয়েটার কি আন্তরিক দরদ ! এমন না হলে আর মেয়ে ! মেয়েদের মন হবে তুলোর মত নরম আর মাখনের মত মোলায়েম—তবেই না সে মেয়ে মেয়ে। তুলোর হাল্কা গদিতে যেমন সন্তর্পণে রাখতে হয় আঙুর, বুড়োদের তেমনি সাবধানে জীইয়ে রাখার জন্যে সে নাকি ব্যগ্র। তার বাপের সহায়হীন অবস্থা দেখেই সম্ভবতঃ তার মনে এই ধরণের স্নেহ জমা হয়েছে।

অনেকে আসেন দীপঙ্করের কাছে। এঁদের মধ্যে জনকয়েককে আমি চিনি। পৃথ্বীশ গুপ্ত, হিমাদ্রি পাকড়াশি, বিপিন চাকী, রেবতী চক্রবর্তী—সকলেই রিটায়ার করেছেন। এঁদের মধ্যে হিমাদ্রি বাবু একটু ছিমছাম।

ছিমছাম দুই দিক থেকে—ধবধবে ফর্সা রং, মাথা-ভর্তি পরিচ্ছন্ন চকচকে টাক, পরনে ফিনফিনে ধোয়া ধুতি-পাঞ্জাবি। তিন ছেলে দুই মেয়ে হিমাদ্রি বাবুর। সকলেই বাইরে থাকে, অর্থাৎ বাংলা দেশের বাইরে। ছেলেদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে, একটি মেয়ে বাকি ছিল, তারও বিয়ে হয়েছে মাস কয়েক হল। আরও একটা দিক অবশ্য আছে—হিমাদ্রি বাবু বিপত্নীক। তাঁর মস্ত বাড়িতে তিনি একা।

হিমাদ্রি বাবুর সঙ্গে দীপঙ্কর সেনের ভাব আবার নাকি একটু বেশি। দুই জনেই বিপত্নীক—একজনের স্ত্রী জীবিত থেকেও নেই, আর এক জনের স্ত্রী লোকান্তরিত। কিন্তু দু'-জনের মিল এই—দু'জনেই স্ত্রীহীন। সুতরাং তাঁদের অন্তরঙ্গতা একটু গাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের এই দিকটা একটু যেন তেতে উঠেছে ; আর, সেই সঙ্গে

একটু যেন মেতেই উঠেছে। ভিন দেশ থেকে এক অজানা মানুষ এসে আমাদের এই অঞ্চলটাকে উচ্চকিত করে তুলেছে!

যে রাস্তা দিয়ে একা-একা ক্লান্ত পদক্ষেপে চলতেন দীপঙ্কর সেন, সেই রাস্তা এখন একটু সরগরমই হয়ে উঠেছে। এখন দীপঙ্করের সমবয়সীরা আসেন। দল বেঁধে গল্প করতে করতে। তার পর, অনেকক্ষণ বাদে তাঁরা আবার দল বেঁধে গল্প করতে করতেই ফিরে যান। জমাট আড্ডা জমে দীপঙ্করের ঘরে।

নলিনী বাবুর স্ত্রী নাকি পাড়ার সকলের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন। বিশ্বনিন্দুক তিনি, কিন্তু তাঁর বাড়ির ভাড়াটেদের ঘরে এই আড্ডা বসা সত্বেও তিনি কেন বিরক্ত না হয়ে ঐ মেয়েটার প্রশংসায় এখনো পঞ্চমুখ—এইটেই হচ্ছে সকলের প্রবল আপত্তি।

কিন্তু নলিনী বাবুর স্ত্রীরও বলার কথা আছে। অমন একটি ফুটফুটে মেয়ে যদি বাঙালীর ঘরে হত, তাহলে দেমাকে মাটিতে তার পা নিশ্চয় পড়ত না। কিন্তু এই মেয়েটি অতগুলো বৃদ্ধের তদারকে আর তদ্বিরে নিজেকে কেমন ব্যস্ত রাখে, আর, সকলের জন্যে কি রকম প্রাণপাত পরিশ্রম করে! অত খাটুনি খাটে, কিন্তু মুখের হাসিটা কেমন জ্বল-জ্বল করতে থাকে সারাক্ষণ।

দুপুরের দিকে একবার আসেন হিমাদ্রি পাকড়াশি। সারা দুপুর বসে বসে গল্প হয়। তারপর একসঙ্গে তিনজন—দীপঙ্কর, দীপঙ্করের কন্যা ও হিমাদ্রি—সান্ধ্যভ্রমণে বের হন।

নলিনী বাবুর স্ত্রী এবার নাকি চটেছেন। তাঁর ভাড়াটে নাকি উঠে যাচ্ছে।

এই খবরে পাড়ার সকলের মনে বুঝি আনন্দের বান ডাকল। ছেলেমহলে হয়তো একটু বিষাদের ছায়া পড়ল, কিন্তু মেয়েমহলের মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি সে ছায়াটুকু উহ্য করে দিল।

সত্যিই। একদিন উঠে গেলেন দীপঙ্কর সেন।

কোথায় গেলেন, সে-খবর জানার আগ্রহ আর কারো রইল না।

নলিনী বাবুর স্ত্রী কিন্তু খোঁজ করে সেটা বা'র করলেন। ওরা হিমাদ্রি পাকড়াশির বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। মস্ত বাড়ি—অনেক জায়গাজ। অনেক আরামে থাকতে পারবে ওখানে।

এ-খবরটা অবশ্য কিছু না। আমি এই রকম আন্দাজই করেছিলাম। হিমাদ্রি বাবুকে আমি চিনি বলেই খবরটা আমার কাছে হয়তো কিছু না। কিন্তু যারা তাকে চেনে না, তাদের কাছে খবরটা অবশ্য একটা খবরই।

ধীরে ধীরে এদিকের সমস্ত চঞ্চলতা স্তিমিত হয়ে এল। যে যার নিজের কাজে এবার বসতে পারল মনোযোগ দিয়ে। অথচ নিখাদ শান্তি কিন্তু সেই কারোরই মনে। একটা সূক্ষ্ম বেদনা মনের একটি নিভৃত কোণায় চিমটি কেটে বসে রইল। অন্তত আমার কথা যদি বলেন, আমার অবস্থাটা এই রকমই হল।

দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। তাঁর কথা ভোলা কষ্ট, অথচ প্রায় ভুলতেই বুঝি বসেছিলাম।

এমনি একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন তিনি। তাঁর এই হঠাৎ আবির্ভাবে একসঙ্গে পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কি খবর বলুন? কেমন আছেন?

ভালোই আছি। চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মেয়ের খবর কি? আপনার মনের মত পাত্র জোগাড় করতে পারলেন?

দীপঙ্কর বাবু বললেন, বড্ড ভালো মেয়ে। যেমন মায়া তেমনি মমতা। আমাকে দেখে-দেখে ওর বুঝি হয়েছে ওই দশা—অসহায় মানুষের উপর ওর বড় টান।

বললাম, এ তো ভালো লক্ষণ। এর জন্যে আপনার গর্বিত হওয়ার কথা।

উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয়। গর্ব আমার আছে।

আর কিছু না বলেই তিনি উঠে চলে যাচ্ছিলেন, বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বললেন, ভেরি প্রাইভেট কিন্তু। কাউকে বলবেন না। হিমাদ্রি পাকড়াশিকে বিয়ে করেছে আমার মেয়ে।

যেন চমকে উঠলাম, বললাম, বলেন কি?

হ্যাঁ। বড় অসহায় মানুষ ওই হিমাদ্রি।

দু'-চোখ ছলছল করে উঠল দীপঙ্কর সেনের। সেটা তো দেখা গেল।

কিন্তু আর কার বুকের ভিতরটা দুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, সেটা কারো চোখে পড়ার কথা নয়।

বললাম, সুখী হোক ওরা।

দীপঙ্কর সেন বললেন, আমিও ওই আশীর্বাদই করছি। বলেই তিনি নেমে গেলেন বারান্দা থেকে।

ম্লান দৃশ্য নয়

শিবশম্ভু পাল

বিষণ্ণতা সম্ভবত রুগ্ন, জীর্ণ শরীরের ম্লান দৃশ্য নয়।

বোধের প্রত্যন্তে নেমে রত্নের সন্ধানে মগ্ন আবিষ্কারকের
সমগ্র হৃদয়, মন পরিশ্রমে অকাতর, দৃঢ়
ইচ্ছার তাড়না তারে দিক থেকে দিগন্তে কত না হাঁটায়
কেন না সে সুদুর্লভ রত্নের ছটায় যত দ্বিধা
অপগত করে যাবে, এই তার সংকল্প মনে।
দৃষ্টি তার দীপ্তজ্যোতি, কৌতূহলে সৌরকরোজ্জ্বল।

এবং বোধের নীচে যতদূর চোখ যায়—শূন্য, কিছু নেই।
সেই সব দ্বিধাগুলি তমিস্রাই চিরকাল থাকে
যেখানে হারায় সব আত্মদান, যুগলতা, অমর কবিতা।

অন্বেষণে ব্যর্থ, তবু বোধের গভীরে ক্লান্তিহীন
পথযাত্রা দৃশ্যমান শরীরের বহিরঙ্গে শুধু
মানুষের উজ্জ্বলতা, দুর্বলতা মহিমায় আভাসিত রাখে।
দু' চোখে প্রশ্নের আলো; সম্ভবত তার পাশে থেকে যেতে পারে
পরিশ্রান্ত মানসের ভারে ক্লান্ত কতগুলি রেখা।

অত্যাশ্চর্য্য
কাপড় কাচার
পাউডার
Surf
নীল
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন. প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন. প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

রাণু ভৌমিক

বেদনাবিদ্ধ অন্তরে শয্যা ত্যাগ করে নীচে দাঁড়ালো শুক্লা। বেদনাহত চোখে তাকায় পরিত্যক্ত শয্যার দিকে। ম্লান হয়ে ওঠে দুটি চোখ—বিকল মনের বিবশ বেদনায়।

শয্যা কি শুধু শয়নের উপকরণ? না, এ যে বিদেহী মনের অনুপম ভাবের আশ্রয়। এর আছে রূপ, রং, প্রাণ। সময়বিশেষে, ব্যক্তিবিশেষে এ হয় পরিবর্তিত, কখন বাসকসজ্জিতা, আসঙ্গ-ঈপ্সিতা, আলিঙ্গনপিয়াসী। কখন বা এক ব্যাকুল বেদনা, মৃত্যুধূসর যন্ত্রণা।

এত দিন এই শয্যা ঘিরেই শুক্লার প্রতীক্ষিত কুমারী-জীবনের অভিলাষ, আশা, আকাঙ্খা মুকলিত হয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী, কত দীর্ঘ দিবস ধরে এই অনুপম মুহূর্তটিকে ঘিরে কল্পনার জাল রচনা করেছে সে। আজ সেই শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, বিরামহীন প্রতীক্ষা সার্থক।

চারিদিকে নিবিড় আঁধার। রজনীর তিমির-মন্দিরে কোন কৃষ্ণকায় পুরোহিত গভীর তপস্যারত। তাঁর তপঃধূমে দিগঙ্গন মলিন। আঁধারের বক্ষ চিরে চিরে তাঁর আহ্বানবাণী আহ্বান করছে আলোককে। শুক্লারই অন্তর-উৎস উৎসারিত এই আহ্বান। বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে সে তপস্যা করছে এতটুকু সহানুভূতির জন্য।

কিন্তু নেই। কেউ নেই। কে বুঝবে তার অন্তর-বেদনা? কে দেখাবে পথ?

কি ভেবে যে ওর মা ওর নাম শুক্লা রেখেছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। শুক্লতা কিছুই তো ছিল না তার! তার মন কালো, রংয়ে নেই ছিটেফোঁটা সাদা। এমন কি তার চোখের মণির চারিপাশের সাদা অংশও যেন রংয়ের ছাপ পড়ে হয়ে উঠেছে কালচে-নীল, তবু তার নাম শুক্লা। ইদানীং শুক্লার মনে হোত, তার নামের সঙ্গে যেন মিল আছে তার জীবনের। সমস্ত শুক্লপক্ষ ধরে চন্দ্রমা নিজেকে ক্ষয় করে প্রস্তুত হয় অমানিশার জন্য। তেমনি ভাবেই সমগ্র জীবনভোর নিজেকে বিন্দু বিন্দু ক্ষয় করে সে তিমির-তমসার প্রতীক্ষিতা, সেই প্রতীক্ষার আজ হয়েছে অবসান। অভিসারে আমন্ত্রিতা হয়ে আজ সে ধন্যা। কিন্তু—

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগিয়ে গেলে বেশ খানিকটা দূরে একটি বাড়ী ডানদিকে পড়ে—সেই বাড়ীটিই দেবানন্দ রায়ের। রাত্রির আঁধারে বাড়ীটা চোখে পড়ে না কিন্তু দিনের আলোয় পাঁচীলঘেরা বাড়ীটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকটা জায়গা পাঁচীল দিয়ে ঘেরা—মাঝখানে মাঝারী আকারের দালান। বাড়ীর চারিপাশের বিস্তৃত জায়গায় শুধু ঘাস। এত জায়গা পড়ে আছে কিন্তু কোথাও একটা ফুলগাছ নেই! অযত্নে কোন বুনো ফুলও ফোটে না!

বাড়ীর মালিককে যে জানে সে এতে মোটেই আশ্চর্য হবে না। বরঞ্চ বাগান দেখলেই বিস্মিত হবে। সে জানে, পথে ফুলগাছ পড়লে দেবানন্দের গাড়ী তাকে দলিত করে চলে যাবে, হাতের সামনে কোন ফুল পেলে দেবানন্দ নিজে তাকে নিষ্পেষিত করবে। ঐ যে হাতে একটু ক্লেদাক্ত আঠার মত লেগে থাকা, এই তার উপভোগ রীতি। সে বলে, দূর থেকে নাক টেনে টেনে গন্ধ নেব, মাথা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে রূপ দেখব—ও সব ন্যাকা ন্যাকা অলস কাব্য-বিলাস আমার নেই। ও সব হচ্ছে তাদেরই—যারা শক্তিহীন, ব্যক্তিত্বহীন, নপুংসক। তারাই একটি মেয়ের পায়ের তলায় পড়ে গদগদ স্বরে বলবে—তুমি মম জীবন। আমি সমস্ত জীবন তোমাকে চেয়েছি, আজ তোমাকে পেয়ে ধন্য হয়ে গেলাম আমি।

কথাটা সত্য। দেবু বলে, কারণ তারা অক্ষম। তারা জানে বহু পরিশ্রমে, প্রাণপণ অধ্যবসায়ে আজ তারা যাকে পেয়েছে তাকে হারালে আর কোন গতি নেই। তাই এর মাঝে অতীন্দ্রিয়তা আরোপ করে, বড় বড় দু'-চার কথা বলে, স্বর্গের ভাব টানাটানি করে বিশিষ্ট করে তুলতে চায় সেই সামান্য ভাব কিন্তু গোড়ায় আমি যা বলেছি তাই চরম কথা। তাদের পৌরুষ নেই, বিষহীন সাপের মত তাই তাদের মুখে একনিষ্ঠতার অহিংসামন্ত্র, প্রেমের হরিনাম।

—এ তোমার অন্যায় কথা—কোন কোন বন্ধু প্রতিবাদ করতো—তুমি বলতে চাও প্রেম নেই জগতে?

—না। প্রেম চলতি অর্থহীন এক শব্দ। প্রেমের দোহাই শক্তিহীনের সম্বল। সম্বলহীন পুরুষ প্রেমের বাণী জপতে জপতে নারীর কাছে যায়। পণ্যশুল্কা নারীকে যেভাবে ব্যবহার করি আমি ঠিক সেই ভাবেই সেই প্রেমিক ব্যবহার করে প্রেমশুল্কা নারীকে। ঠিক তেমনি আকাঙ্খা-পূরণ—ঠিক তেমনি প্রাপ্তির তৃপ্তি। আবার যে সব নারীর প্রেমিক জোটে না তারাই আঠার মত লেগে থাকে একজনের প্রতি। মুখে বলে প্রেমে পড়েছি।

—নরনারীর সম্পর্ক কি শুধু দেহজ? প্রশ্ন করতো কেউ।

—শুধু দেহ! তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বলতো দেবানন্দ, দেহ ভিন্ন আর কি আছে নারীর? বিদ্যা? বুদ্ধি? তোমরা তোমাদের এই

মোহনিয়া মন নিয়েও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, বিদ্যার গরিমায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তবে? তবে কেন পুরুষ রমণীর নিকট যায়? রমণী বুদ্ধিজাবিনী নয়, রূপরঙ্গিণী। সে নরকের দ্বার নয়, স্বর্গের চাবীও নয়—ভোগের সামগ্রী, পুরুষের পরিপূরক। সে কামবনের কোমল কামলতিকা, রসপূর্ণা রসবতী।

বন্ধুদের বিস্ময়াবিষ্ট নীরব দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গর্বিত স্বরে বলে—আমার ক্ষমতা ক্ষয়হীন, আমার বীর্য অন্তহীন। আমি কি জন্য চোরের মত চুপিসাড়ে উঁকি দিয়ে এসে সেই চিন্তার কণ্ডূয়ন করবো? মনকে চোখ ঠেরে কি লাভ? বিদেহী প্রেম আমার নয়। দেহকেই আমি কামনা করি, উপভোগ করি এবং সেই দেহকে অধিকার কিংবা আহরণ করবার ক্ষমতা আছে আমার।

দম্ভোক্তি দেবানন্দ রায়ের মুখে সাজে। সত্যই, কিছুরই অভাব নেই তার। অপরূপ সুন্দর দেহ—অপরিমিত ঐশ্বর্য।

এই দেবানন্দ রায়কে ভালবাসলো কি না শুক্লা মিত্র? শুক্লা মিত্র—যার রূপ নেই, যৌবন নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। উষর মরুকে ভালবেসেছে ক্ষীণকায়া নির্ঝরধারা।

শুক্লা যখন খুব ছোট তখনই ওর মা স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দ্রনাথের গৃহে চলে আসেন। শুক্লার মার হাতে অর্থ ছিল, কাজেই কোন অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে তাঁকে পড়তে হয়নি। ইন্দ্রনাথ তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে না থেকে এঁর সঙ্গে থাকায় কিছু কিছু বক্রোক্তি এবং কুটিল কটাক্ষ যে না হয়েছিল তা নয়। তবে এঁরা কেউ তা গ্রাহ্য করেননি। কেন যে তিনি এখানে এসেছিলেন তা কেউ জানে না। হয়তো ইন্দ্রনাথই জোর করে আনিয়েছিলেন। তাঁর গৃহে পরিজনের আধিক্য ছিল না, কাজেই আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে সুখী হতেন।

ওদের আগমনে সব চেয়ে সুখী হয়েছিল দেবু। ইন্দ্রনাথ ওকে বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে দিতেন না। কাজেই আত্মীয়-স্বজনহীন বিরাট গৃহে বালক দেবু ছিল নিতান্ত একাকী। সে যেন শুধু মাতৃহীন নয়, পৃথিবী-পরিত্যক্ত এক আদম শিশু।

শুক্লাকে পেয়ে ও যেন বেঁচে গেল। প্রকাণ্ড মাঠে দু'টি সমবয়সী শিশু খেলা করতো। একজন যেমনি সুন্দর অপর জন ঠিক তেমনি কুৎসিত না হলেও যথেষ্ট কুৎসিতা। সকলেই তা লক্ষ্য করতেন শুধু ওরা দু'জন ছাড়া।

কৈশোরের স্পর্শ খুলে দেয় ওদের মনের গুহার রুদ্ধ কপাট। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, রুচিবোধ, দেহ ও মনের পরিবর্তনের ধূপছায়ায় সমস্ত পৃথিবী ভিন্ন রূপ ধারণ করে। অন্তর-গুহা হতে নিমন্ত্রিত হয় আদিম আত্মা।

বয়ঃসন্ধিমুখে সেই আত্মা বেরিয়ে আসে। তার উপর পড়ে পৃথিবীর প্রলেপ। তাতে প্রতিফলিত হয় গগনের গরিমা, বিশ্বের মহিমা, অরুণের অরুণিমা, সাগরের কলকল্লোল, সবুজ শস্যের

তারুণ্য, কালো কয়লার কর্কশতা, ইটকাঠ-পাথরের কাঠিন্য। আজকের মানবতা শুধু প্রকৃতির সৃষ্ট নয়—সে মানব-সৃজিত সভ্যতারও বাই-প্রোডাক্ট। উভয়ের মিলিত সত্তা।

বিশ্বস্রষ্টার আদরে এবং মানবের অত্যাদরে গড়া দেবু এই মসৃণ জগতে বেশ দ্রুতই গড়িয়ে যেতে লাগলো। প্রায়ই তাকে বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যেত না। কখন আসতো, কখন যেত, কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, ইন্দ্রনাথ অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে ক্লাব, স্কুল, পার্টি, জলশা ইত্যাদি নানা রকম কথা বলে দিত।

এদিকে বড় হবার উপক্রমণিকাতেই শুক্লাকে আটকে রাখা হয়েছে, বাইরে যাওয়া বারণ—ছেলেদের সঙ্গে মেশা নিষেধ।

ছেলে বলতে তো এ বাড়ীতে আদি এবং অকৃত্রিম এক দেবু। তা-ও সে বাইরে বাইরে এত ব্যস্ত থাকে যে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তবু বাল্যসঙ্গীর সম্বন্ধে এই সতর্কবাণী ওর মনে গভীর পরিবর্ত্তন এনে দিল। যার সঙ্গে এত দিন খেলাধূলো, ঝগড়া, খাওয়া ওঠা-বসা সবই চলেছে আজ তার সম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা কেন? নীরব সঙ্কীর্ণ প্রেমধারা রুদ্ধ আবেগে হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত।

কবি লিখেছেন—সকালবেলা কাটিয়া গেল, বিকাল নাহি যায়—কিন্তু শুক্লার সকাল-বিকাল কিছুই কাটতে চায় না। কি করে কাটবে? মহানগরীর উপকণ্ঠের অধিবাসিনী সে। প্রকৃতির সঙ্গ থেকে একান্ত বঞ্চিত। এখানে প্রভাত প্রতিদিন পৃথক পোষাকে আসে না, মধ্যাহ্নের রৌদ্রময় রিক্ততা, ঘুঘুর ডাকে, কবুতরের হৃদয় স্পন্দনে হয়ে ওঠে না রমণীয়। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া সমগ্র জগতের দুঃখ দৈন্য মালিন্যকে আঁচলে চাপা দিয়ে মানব-মনে স্নিগ্ধ, করুণ স্পর্শ বুলিয়ে দেয় না। শুধু—

শুধু রাত্রি এখানে ঐশ্বর্য্যময়ী। কালোর নিবিড়তার মাঝে কৃষ্ণতর পিচের রাস্তায় দ্রুত সঞ্চরমান আলোর বিন্দুগুলিকে দেখে একটু শিউরে ওঠে শিশুগাছগুলি। বয়স্করা মাথা নেড়ে কি যেন বলে বিড়বিড়িয়ে।

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ঐ প্রাচীরঘেরা প্রকাণ্ড গৃহের এক কক্ষে বাস করে কুমারী শুক্লা। সঙ্গী শুধু বই। তার নিজস্ব ঘরের কোণে কোণে বইয়ের স্তূপ। মনের কোণেও কি তাই?

এই বইয়ের জগৎ সম্পূর্ণ মানস-জগৎ। আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, মোহ, মায়া মমতা, প্রতিহিংসা, পাপ-পুণ্য, জীবন-মরণ সবই সেখানে আছে। আছে তরুণ মনের খোরাক। কিন্তু সবই বাস্তবতাহীন এক অনুপম আবহাওয়ামণ্ডিত। অপরূপ স্বপ্নময়!

শুক্লার স্বপ্নজগতের নায়ক দেবানন্দ। অবশ্য, শুধু শুক্লার কেন, অনেকেরই সে চিত্তচোর। তবে, শুক্লার কথা আলাদা। তার যৌবনের প্রারম্ভে সে শুধু একটি পুরুষকেই দেখছে—যে তার শৈশবের সাথী। পরিচিতের গণ্ডীঘেরা এই যে অপরিচিত যুবক, এই কি তার খেলাঘরের নায়ক দেবুদা'? এর হাসি অজানা, কথা অজানা, ভাবা ভাব সবই অজানা। তবু মনে হয়, একে চিনি। একে জানি। বাইরের অপরিচিতিটুকু মধুরতর করে তোলে মনের পরিচিতটিকে।

কোন অলক্ষ্য অবসরে অদৃশ্য পথে প্রেম শুক্লার হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে বসেছিল! অসীমের সুর শুনেছিল সে। যখন সে চমকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলো তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে প্রত্যাবর্তনের পথ। সেই রুদ্ধ কক্ষে হৃদয়ের রসে জারিত, প্রাণের উত্তাপে প্রতপ্ত হয়ে প্রেম এক অনুপম অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করলো। কল্পনায় যাকে প্রিয় মনে হয়েছিল, এখন সে হল দেবতা।

এদিকে শুক্লার মা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি চারিদিকে পাত্র খোঁজ করতে থাকেন। ছেলে ভাল পাওয়া যায় তো কুল ভাল নয়। বংশ ভাল তো পাত্র অনুপযুক্ত। আবার দুই-ই যদি ঠিকমত জুটলো তবে হয়তো শুক্লাকেই তাদের পছন্দ নয়। একটা না একটা ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। রোজই পাত্রী দেখা চলতে থাকে।

ওদিকে দেবানন্দ রায়ও রোজ পাত্রী দেখছে। তবে তা তার নিজস্ব রীতিতে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে হল্লা করতে করতে এক জায়গায় ঢুকে পড়া—পছন্দ হলো তো সেখানেই রইলো নইলে চল অন্য জায়গায়। মধুসন্ধানী মত্ত মধুকর।

অল্প দিনের তফাতে শুক্লার মা ও দেবানন্দের বাবা দুজনেই মারা গেলেন। দেবানন্দের মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং দু'জন যেন অকস্মাৎ একান্ত স্বাধীন হয়ে ওঠে।

শুক্লার নিকট এ স্বাধীনতা কিছু নয়—শুধু সম্ভাব্য পাত্রের নিকট নিজেকে বার বার দেখানোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্র। কিন্তু দেবানন্দ গৃহকর্তা হয়ে গৃহকেই পরিবর্তিত করে ফেলে। বাইরের আড্ডাকে সে ঘরে টেনে আনলো। সমস্ত দিন বন্ধুদের যাতায়াতে অঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হতে না হতে আনন্দ-মত্ততা উল্লাসে গৃহ মুখর হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়ে। শুধু একটি ঘরে আলো জ্বলে—আর দূর থেকে একটি নারীর হৃদয়-অনল ঐ ঘরের চারিদিক ঘিরে জ্বলতে থাকে।

গভীর রাত্রিতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, বিনিদ্রা শুক্লা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পা টিপে টিপে ও এগিয়ে যায় ঐ আলোজ্বালা ঘরের দিকে।

মৃদু আলোক-উজ্জ্বল ঘর। সাদা চাদরের উপর শুয়ে আছে দেবানন্দ আর কোন অপরিচিতা। মৃদু হাসি,—প্রণয়োচ্ছ্বাস-পরিহাস!

এই যে নারী আজ দেবানন্দ রায়ের শয্যার অংশভাগিনী হয়ে রয়েছে, এ যে শুধু শুক্লার অপরিচিত তাই নয়; হয়তো দেবু নিজেও একে চেনে না। তবু এ শুক্লার কাম্য স্বর্গে বিচরণ করছে আর প্রতিদিনের পরিচিতা শুক্লা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

প্রতি রজনীতেই দেবানন্দের নর্ম-উৎসব যথাযথ সুরু ও সমাপ্ত হতো। কিন্তু সে এসেও জানতো না যে এক গোপন গূঢ়চারিণী নারী তার সমস্ত ব্যভিচারের নীরব সাক্ষী!

এই ঘটনার দৃশ্যগুলি শুক্লার চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দেয়। আগে তার প্রেমে এক শান্ত স্থির সৌন্দর্য্যমহিমা ছিল। প্রিয়তমকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় দুঃখ, দাহ, বেদনা ছিল, উগ্রতা ছিল না। প্রেমাস্পদের দৈহিক মূর্তির বিদেহী রূপ কল্পনা করতো সে। কামহীন, কলুষহীন, শুভ্র নিষ্কলুষ ছিল তার প্রেম। কিন্তু, এখন তার চারিদিকে রুক্ষ দাহ। আগুনের হল্কা। ও এখন পেতে চায়—দিতে চায়। দেহের যে কামনাগুলি, ইন্দ্রিয়ের যে দ্বারগুলি সে এত দিন অতীন্দ্রিয় ভাব দিয়ে রুদ্ধ করে রেখেছে—আজ তারা সবাই আকুল হয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। যত মেয়ে এখানে আসে

তাদের প্রতিটি মেয়েকে সে অভিশাপ দেয়। যা তার একান্ত নিজস্ব তাকে কোন রবাহূত ভোগ করছে।

এই ভাবেই চলছিল। তারপর আজ—

আজ সকাল থেকেই টুকরো টুকরো মেঘে ছেয়েছিল আকাশ। দুপুরের দিকে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। বিকেলে ঝড় কমে গেল বটে কিন্তু বৃষ্টি কমে না। বৃষ্টির একটানা শব্দ, ভিজে-ভিজে হাওয়া মনে কি যেন ভাব আনে। কোন এক নাম-না-জানা অনুভূতি আদিম সরীসৃপের মত জড়িয়ে ধরে মন। পিষে ফেলে, উত্তপ্ত হাল্কা নিঃশ্বাসে অস্থির করে তোলে।

দেবানন্দ আজ সমস্ত দিন বেরুতে পারেনি। বন্ধুরাও কেউ আসে নি। কি করে আসবে? রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। গাড়ী চলছে না।

দুপুর থেকেই দেবু পান করতে সুরু করেছে, রক্তের ধারার মত লাল পানীয়। উগ্র মদিরা তার রক্তকে করে তুলেছে উদ্ধত। রাত্রি যখন প্রায় বারটা সে তার খাস চাকরকে ডেকে বলে—শুক্লাকে একবার এখানে আসতে বল।

অবাক হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে ভৃত্য, জীবনে হয়তো এই প্রথম আদেশ পাওয়া মাত্র তামিল করে না। শুক্লাদি'কে ডাকবে! এইখানে! সে কি আসবে!

দেবু ভালভাবেই জানে শুক্লা আসবে। সে জানে তার তৃষিত নারীহৃদয় এত দিন এত মাস ধরে শুধু এই প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষিতা। বার বার তার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে হাতের ভঙ্গীতে, পায়ের গতিতে, হাসির রেখায়, কথার সুরে, অশ্রুসজলতায়। এতদিন তাকে দেবুর প্রয়োজন ছিল না, কাজেই সে ইচ্ছে করেই এদিকে লক্ষ্য করে নি। কিন্তু, আজ যখন আর কোন উপায় নেই তখন ওকে ধন্য করাই ভাল, মনে মনে ভাবতে থাকে—ওর ডাক শুনে কি রকম মুখভাব হবে শুক্লার? কি অপরূপ তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠবে সেই পিপাসার্ত অধরে? একটু হাসে দেবু।

শুক্লা জেগেই ছিল। আকুলি-বিকুলি হাওয়া, বৃষ্টির মাতাল পদধ্বনি তার অশান্ত হৃদয়কে আরও উদ্বেল করে তুলেছে। ধ্বংস! ধ্বংস হয়ে যাক পৃথিবী—এমন সময় চাকর এসে খবর দিল।

প্রথমে যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না শুক্লা। দেবু তাকে ডেকেছে! ধ্বংসের কালো গহ্বরের অতলে সে ছুটে যাচ্ছিল তখন তাকে কে ফেরাল? প্রেম। এতদিনে অভিসারিকার অপেক্ষা কি শেষ হলো?

কিন্তু, দেবুর ঘরে ঢুকে, সেই শয্যা স্পর্শ মাত্রই এক অদ্ভুত অনুভূতিতে সমস্ত মন বিষিয়ে ওঠে। সেই ঘর—সেই শয্যা।

তার তপস্যার সিদ্ধি নয়, দেবুর বাসনা পরিতৃপ্তির জন্যই তাকে এখানে আনা হয়েছে। প্রেম নয়, ধ্বংসই বাড়িয়েছে হাত।

সাদা চাদরে ঢাকা নির্জীব শয্যা। নির্জীব কি? ওর দিকে তাকাতে ওর প্রতি কণা যেন কথা কয়ে ওঠে—আবরণের প্রতি সূত্রে যেন কামনার ক্লেদাক্ত ইতিহাস—বিষাক্ত ব্যাধির নির্মম উলঙ্গ প্রকাশ। শুক্লার স্বচক্ষে দেখা বিভিন্ন নারীর একই রূপ বিকৃত ও বিক্রীত অভিব্যক্তি শীতল বিতৃষ্ণা, কলুষ হাসি যেন ওকে সহস্র বাহু দিয়ে ঘিরে ধরে। শুক্লার মনের সেই নিদ্রিত অনুভূতিগুলি যেন জাগরিত হয়ে তাকে মৃত্যুগহ্বরে ঠেলে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রেমের অমৃতকুণ্ড নয় মৃত্যুর নারকীয় গহ্বর। এই কামনার অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শুক্লার মনের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দেহভোগ সুখ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উর্দ্ধে, ত্যাগ ও রিক্ততার কোমল আসনে যে অলৌকিক চিরন্তন প্রেম এতদিন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ছিল, আজ এই মুহূর্তে সে নবজীবনের অমৃত পরশে অনাবশ্যক, বিশাল নয়নে তাকালো। দেবুকে সে যেন আরও ভালবাসলো। ক্ষুদ্র, সামান্য প্রবৃত্তিগুলি পুড়ে যেতে থাকে আর তারই আলোতে দীপ্ত দেখালো অনশ্বর প্রেমের প্রদীপ।

দেবু ঘরে ঢোকে। ওর দিকে সহজে হাত বাড়িয়ে বলে—এস। এখানে বোস।

—না। সামান্য একাক্ষর শব্দ কিন্তু তাই যেন অসামান্য হয়ে বার বার দেবুর তীক্ষ্ণ নাসায়, গর্বিত ওষ্ঠাধরে, দৃঢ় চিবুকে আঘাত করতে থাকে। না—কিন্তু কেন?—কেন?

—কোন উত্তর দেয় না শুক্লা।

ওর দিকে তাকায় দেবু। এই মৌনা নারীর নয়নে অশ্রুলেখা নেই। তবু যেন তার আপাত শুষ্কতার পেছনে কোন অশ্রুনির্ঝর প্রকট। কিন্তু কেন শুক্লা তাকে এই অনাবশ্যক অপমানে অপমানিত করছে? নিজেও ভোগ করছে চরম দুঃখ?

—তুমি তো আমাকে ভালবাস। দেবু না বলে পারে না।

—সে কথার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তোমার কাছে।

—না নেই। স্বীকার করে দেবু—কিন্তু তোমার—তোমার কাছে নিশ্চয়ই তা প্রয়োজনীয়।

—আমারও নেই—মৃদু হেসে বলে শুক্লা।

—হঠাৎ এ রকম নিস্পৃহতার কারণ জানতে পারি কি? বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে শান্তভাবে বলে দেবু।

—কোন দিনই বা স্পর্শ-স্পৃহনীয়তা দেখেছিলে? ঠিক সমান ভাবে উত্তর দেয় শুক্লা। তারপর একটু ভিন্ন সুরে বলে—দেবুদা', আমি তোমার যোগ্যা নই।

যোগ্যা যে নও সে কথা খুবই সত্য—কিন্তু তাই বলে অযোগ্যতার অহঙ্কারে আমাকে অপমান করবে? দেবানন্দ রায়ের মুখের উপর বলবে—না? কিন্তু কি করে জব্দ করা যায় এই স্পর্দ্ধিতা নারীকে?

—কি চাও তুমি?

—কি চাই আমি? ভ্রূটা একটু বেঁকে উঠেই আবার প্রশান্ত হয়ে উঠলো—আমি কিছু চাই না কিংবা যা চাই তা দেবার সাধ্য তোমার নেই।—আমার সাধ্য নেই? দেবানন্দ রায়ের অমিত অহঙ্কার যেন বিকৃত মুখে বীভৎস চীৎকার করে ওঠে।

একটু পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত বিদ্রূপে বলে—দেবানন্দ রায়ের সাধ্য নেই শুক্লা মিত্রের প্রার্থনা পূরণের?

মৃদু হাসে শুক্লা। আর সেই শান্ত শুভ্র হাসির দিকে তাকিয়ে এই প্রথম যেন নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করে দেবানন্দ রায়। রূপ যা দিতে পারে না, রূপ যা কিনতে পারে না, তেমনি দুর্লভ ধনের অধিকারিণী এই শান্ত শ্রীহীনা মেয়েটি। সমস্ত রজনীর নীরব বেদনার পুঞ্জীভূত শুভ্রতায় সমগ্র পৃথিবীর ব্যথিত হৃদয়ে মধুসৌরভে যে রজনীগন্ধা ফুটে উঠেছে, তার কাছে রক্তরাঙা গোলাপও হার মেনে যায়! এই তপঃক্লিষ্টা তরুণীর দিকে তাকিয়ে দেবানন্দ রায় মাথা নত করলো। তার মন যেন কোন এক পরশমণির প্রভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। মরুর বুকে জেগে ওঠে এক করুণ ক্রন্দন, দেহাতীতকে পাবার অদম্য অপূরণীয় কামনা।

মরসুমী

প্রফুল্ল রায়

ঠিক এই মরসুমে অর্থাৎ দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে একটা জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে এসে নোঙ্গর ফেলে। মাল-টানা জাহাজ; নাবিকী পরিভাষায় যাকে বলে কার্গো শিপ। নাম এস, এস, ক্যামেরুণ।

জাহাজটার খোল, হ্যাচ, লোয়ার ডেক কার্গোতে ঠাসা। কার্গো খালাস হতে পুরো দু'টি মাস লাগবে।

দু' মাস পর নোনা জল থেকে জঙ্গ-ধরা নোঙর উঠবে। তারপর বছরের মধ্যম ঋতুতে হঠাৎ একদিন আকাশের দিকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া ছুড়ে, তীব্র আকস্মিক একটা ভোঁ বাজিয়ে আস্তে আস্তে ক্যামেরুণ জাহাজ চাটগাঁ বন্দর ছেড়ে চলে যাবে।

দশ বছর ধরে জাহাজটা সমানে চাটগাঁ বন্দরে আসছে। এবারও এল।

ঘড়-ঘড়, কর্কশ শব্দ করে ভারী ভারী শিকলগুলোর সঙ্গে চারটে নোঙর জলে নামল। মাল্লা আর রসিম্যানরা জেটির ক্যাপস্টানে মোটা মোটা কাছি পেঁচিয়ে জাহাজটাকে বেঁধে ফেলল। গ্যাংওয়ে লাগাল।

গ্যাংওয়ে বেয়ে পয়লা যে জেটিতে নামল, রিয়াজুদ্দিনের গলির বাসিন্দারা তাকে বলে সাত দরিয়ার কুটুম। আসলে তার অন্য একটা নাম আছে। নাম তার হবীব। ক্যামেরুণ জাহাজের ছোট সারেঙ সে।

কোন দিকে তাকাল না হবীব। জেটিটা পিছনে ফেলে, বন্দরটা ডাইনে রেখে সোজা রিয়াজুদ্দিনের গলিতে গিয়ে ঢুকল।

দ্বিতীয় ঋতুর দিনটা একটু আগে মরেছে। আকাশটা আবছা আবছা, ছায়া-ছায়া। ভুসো কালির রং ধরেছে সেখানে।

সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। এর মধ্যেই রিয়াজুদ্দিনের গলির খুপরিতে খুপরিতে কেরোসিনের ডিবে জ্বলে উঠেছে। বিকিকিনির হাট বসে গিয়েছে।

কাপড় না, মরিচ না, চাল না, ডাল না—এখানে যা বিকিকিনি হয়, তা হল মাংস। ঠিক মানুষের নয়, মেয়েমানুষের ডাঁটো শরীরের কাঁচা, তাজা মাংস।

দালাল-আড়কাঠিরা শিকার ধরে ধরে আনছে। দরাদরি কষাকষি চলছে।

যারা শিকার পায় নি, এমন একদল মেয়ে গলির মুখে দলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কামঠের মত জুল-জুল করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঠিক এমন সময় হবীব এল।

রিয়াজুদ্দিনের গলিতে সোরগোল পড়ে গেল। এখানকার বাসিন্দারা সবাই চেনে হবীবকে।

একটি মেয়ে নাক টেনে টেনে বলল, আইল লো, দশ মাস পর সাত দরিয়ার কুটুম আইল। তোরা সগলে জোকার (উলু) দে।

কল-কল করে এক ঝাঁক উলু পড়ল।

মেহেদীমাখা লালচে নুর হবীবের। একটি মেয়ে নুরসমেত থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, এ্যাতদিনে আমাগোর মনে পড়ল লাগর?

তীক্ষ্ণ ধারাল শব্দ করে হেসে হেসে ঢলে ঢলে পড়তে লাগল চার পাশের মেয়েগুলো।

কনুই দিয়ে সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে একটা বেঁটে মাংসল মেয়ে সামনে এল। বলল, এইবার ঢলানি থামা লো মাগীরা! সাত দরিয়ার কুটুমরে নিয়া তোরাই যে মজলি! উইদিকে আসমানের বুকখান টুটাফাটা হইয়া যাইতে আছে। এইবার কুটুমেরে ছাইড়া দে।

হবীব কিছু বলে না। মেহেদী-মাখা চোখা নুরে হাত বুলোতে বুলোতে মিট-মিট করে হাসে।

রিয়াজুদ্দিনের গলির বাসিন্দাদের কাকে না চেনে সে? এক আধ দিন না, দশ বছর ধরে সে এখানে আসছে।

দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে ক্যামেরুণ জাহাজ যেই মাত্র চাটগাঁ বন্দরে এসে লাগে, গ্যাংওয়ে বেয়ে পয়লা যে মানুষটি নামে, সে হ'ল হবীব। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এই গলিতে এসে ঢোকে সে।

বেঁটে মেয়েটা বলে, খাড়াইয়া খাড়াইয়া ভাব কী? বেকুব মরদ! যাও, আসমানের কাছে যাও কুটুম।

এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল আসমান। অসহ্য এক সুখের কাঁপুনি তার বুকের ভিতর থরথর করছিল। পা কাঁপছিল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আসমানের সামনে এসে দাঁড়াল হবীব।

গলির মুখটা ছায়া-ছায়া; ফিকে অন্ধকারে জড়িয়ে রয়েছে। এখন মুখের চেহারা দেখা যায়, কিন্তু তার ভাষা পড়া যায় না, রং বোঝা যায় না।

ফিস-ফিস করে আসমান বলল, আইলা মিয়া?

আইলাম।

চল।

আগে আগে চলেছে আসমান। পিছনে হবীব।

চলতে চলতে তারা রিয়াজুদ্দিনের গলির শেষ মাথায় এসে পৌঁছাল। এখানেই আসমানের খুপরি।

খুপরিতে ঢুকে ভিতর থেকে ঝাঁপ এঁটে দিল আসমান। বাঁশের মাচানে পা ঝুলিয়ে বসল হবীব।

ঠিক মাঝখানে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। ডিবেটা থেকে যত আলো পাওয়া যায়, তার ঢের বেশি মেলে ধোঁয়া।

আজ বেশ সাজগোছ করেছে আসমান। চোখে সুর্মার টান মেরেছে। ঘোর লাল কাঁচুলি পরেছে। চৌকো চৌকো খোপ-কাটা একটা শাড়ি পরেছে। হাতের পাতায় মেহেদীর রস মেখেছে। নাকে বেশর গেঁথেছে। লম্বা লম্বা চুল খোঁপায় বেঁধে লাল টুকটুকে মান্দারফুল গুঁজে দিয়েছে।

চকচকে, শাণানো চোখে আসমানকে দেখেছে হবীব। এই তো মাত্র দশ মাস আগে তাকে ছেড়ে গিয়েছে। এই দশ মাসে আসমান আরো খুবসুরত হয়েছে। তার শরীরটা ধাবালো রেখে ফুটিয়ে আরো বেশ ভরে উঠেছে। টান-করা তামাটে চামড়ার আরো জেল্লা ফুটেছে।

নীচে, দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আসমান।

এক সময় আসমান বলল, আজ বুঝি জাহাজ আইল?

হ।

এ্যাত দিনে আমারে মনে পড়ল?

তুমারে সগল সময় মনে পড়ে। কিন্তুক কী করুম? জাহাজের কাম। ইরাণ-তুরাণ, পুট (পোর্ট) ইডেন, মুম্বাসা, পুট ইসমাইলা, পুট শিবার পুস—দুনিয়ার পানি তুলফাড় কইরা বেড়াই। দুনিয়ার এক মাথা থিকা আর এক মাথায় চলে যাই। দিল তো তুমার লেইগা পাগ মেলেই আছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই কী আসা যায়?

একটু থেমে হবীব আবার শুরু করে, যাউক উই সগল। পুট ইডেনে মুখতার মিয়ার লগে দেখা। তার কাছে খপর দিয়া দিছিলাম। পাইছ?

পাইছি।

ঘর ভাড়া কইরা রাখছ?

রাখছি।

তবে চল।

আজ না কাল সকালে যামু।

আচ্ছা।

পরের দিন সকালে রিয়াজুদ্দিনের গলির মুখে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। একটা টিনের বাক্স বিছানা, টুকিটাকি দু'-চারটে বোঁচকা নিয়ে হবীব আর আসমান গাড়িতে উঠল। তারা পাহাড়তলীর দিকে যাবে। সেখানে ঘর ভাড়া করেছে আসমান।

গলির মুখে এ পাড়ার বাসিন্দারা দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিস-ফিস করে তাদের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, আসমান মাগী কত রঙ্গই জানে। মাগী বেবুশ্যে, দুই মাসের সোয়ামী পাতাতে গেল।

ঘোড়ার গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

রিয়াজুদ্দিনের গলি একটা দুঃস্বপ্নের মত পিছনে পড়ে রইল। বন্দর রোড পেরিয়ে, অনেক চড়াই-উতরাই ঘুরে পাহাড়তলীর কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা।

হবীব আর আসমান—দু'-জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক। ঠিক সম্পর্ক না, দুটি জীবন একটি সর্তে, একটি বিচিত্র বোঝাপড়ায় জোড়া লেগেছে।

এক-আধ দিন না। দশ বছর আগে এই সর্ত আর এই বোঝাপড়া শুরু হয়েছিল।

দশ বছর আগে দ্বিতীয় ঋতুর পয়লা দিনটিতে ক্যামেরুণ জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে প্রথম নোঙর ফেলেছিল।

জেটিতে নেমে শহরে গিয়ে ঢুকেছিল হবীব। কসবীপাড়া খুঁজছিল।

চাটগাঁয় তাদের জাহাজ সেই প্রথম এসেছে। এখানকার কিছুই চেনে না হবীব। ঘুরতে ঘুরতে সে আড়কাঠির ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল। আড়কাঠিই তাকে রিয়াজুদ্দিনের গলিতে নিয়ে এসেছিল।

গলির মুখে চোখে-মুখে রং মেখে মেয়েগুলো কামঠের মত ঘুরছিল। শিকার অর্থাৎ হবীবকে দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এক কাণ্ডই করেছিল হবীব।

বাছল না, বিচার করল না, বাজালো না; দরাদরি, কষাকষি করল না। এমন কী ভালো করে দেখল না পর্যন্ত। হাতের সামনে যাকে পেল, ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিল। এক হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। বলল, তুমার ঘর কুনটা?

উই গলির শ্যাষ মাথায়।

ঘরে ঢুকে নিজেই ঝাঁপ আঁটল হবীব। টিমিয়ে টিমিয়ে একটা কুপী জ্বলছিল। ফুঁ দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে দিল।

যার ঘরে ঢুকেছিল, সেই মেয়েটা এতক্ষণ এক পাশে চুপচাপ মুখ বুঁজে দাঁড়িয়েছিল। কুপীটা নিববার পর তাকে দেখা যাচ্ছিল না। গাঢ় অন্ধকারে সে হারিয়ে গিয়েছিল।

হাতড়ে হাতড়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলল হবীব। তিন তুড়ি মেরে পাতলা একটা শোলার মত তাকে বুকের উপর তুলে নিল। তার নরম মাংসল শরীরটাকে ইচ্ছামত ডলে, পিষে, ছেনে, আঁচড়ে, কামড়ে, ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

সমস্ত রাত অন্ধকার খুপরিটা অন্ধ, আদিম এবং বর্বর হয়ে রইল। সকালে উঠে মেয়েটার মুখে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়েছিল হবীব। বলেছিল, আজ রাত্রে আবার আমুম।

মেয়েটা জবাব দেয় নি। জবাব দেবার মত অবস্থাও তার নয়। কাল রাত্রের বর্বর ঝড়টা তার উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছে।

শাড়ি আর কাঁচুলি ফালা-ফালা হয়ে গিয়েছে। নখ আর দাঁতের ঘা খেয়ে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত জমে আছে। শরীরটা ডেলা পাকিয়ে রয়েছে।

হবীব যখন চলে যায়, প্রায় বেহুঁশ, ঘোর ঘোর চোখ মেলে একবার তাকিয়েছিল মেয়েটা। তারপরেই চোখ বুঁজে ফেলেছিল।

সেই রাত্রেও এল হবীব। তার পরের রাত্রেও। তার পর থেকে রোজ রোজ আসতে লাগল। রিয়াজুদ্দিনের গলিতে সেই মেয়েটির খুপরিতে আসা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল।

সমস্ত রাত আঁচড়ে, কামড়ে ছিঁড়ে সকালে মেয়েটাকে, না, মেয়েটাকে নয়, মানুষের আকৃতি পাওয়া এক ডেলা নির্জীব মাংসকে খুপরিটার ভিতর ফেলে রেখে যায় হবীব।

দিন দশেক আসার পরও হবীব একটা কথা বলেনি। শরীরিণী মেয়েটার দেহ ছাড়া কোন ব্যাপারে তার কৌতূহল নেই।

এমন আজব মেহমান রিয়াজুদ্দিনের গলিতে কোন দিন আসে নি।

দিন পনের পর মেয়েটিই প্রথম জিগ্যেস করেছিল, তুমার নাম কী?

হবীব।

তুমি কী চাটিগাঁর মানুষ?

না। আমি জাহাজী, সাত দরিয়ার মানুষ। আমার নাম হবীব।

একটু থেমে হবীব বলেছিল, এই পয়লা আমাগো জাহাজ চাটিগাঁ পুর্টে আসছে। দুই মাস আমরা এইখানে থাকুম। তুমার কাছে আমি রুজ আমুম।

আইসো।

কথার পিঠে কথা আসে। হবীব বলে, নাম কী তুমার?

আসমান।

বাহারের নাম। তুমি যেমুন খুবসুরত, তুমার নামখানও তেমুন খুবসুরত।

আসমান জবাব দেয় না। নীচের নরম ঠোঁটে ধারাল চোখা দাঁত বসিয়ে হাসে! তার হাসিতে ধার আছে, শব্দ নেই। কথায় কথায় রাত বাড়ে। অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে।

হঠাৎ এক সময় আসমান বলে, মেহমান, তুমারে একখান কথা জিগামু?

কী কথা?

তুমি আমারে অমুন কুত্তার লাখান কামড়াও ক্যান? অমুন ডল ক্যান? ছানো ক্যান? সকালে শরীলখান দরদে জরজর হইয়া থাকে।

হবীব হাসে। বলে, আমি হইলাম জাহাজী, সাত দরিয়ার মানুষ। কালা পানির তুফান গুণে আমার জনম কাটে। ইণ্ডিয়ান উসেন, পিসিফিক উসেন, রেড সী, সুইজ খাল—সারা দুনিয়ার পানি মাপতে মাপতেই জনম গেল। পানিতে যখন থাকি, বাঁচার আশা থাকে না। কুনো দিন যে ডাঙ্গার দেখা পামু, এমুন ভরসা থাকে না।

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, পানি দেখতে দেখতে আমরা কুত্তা হইয়া যাই। পুর্টে নেমেই তুমাগো কাছে আসি। জানি, পানিতে তো এক রুজ মরুমই। ডাঙ্গা থিকা, মেয়েমানুষের শরীল থিকা যতটুক ফুত্তি যতটুকু সুখ আদায় করে নিতে পারি! নিজেরে বাগ মানাইতে পারি না আসমান! তুমাগো কামড়াইয়া খামচাইয়া ফুত্তি করি।

হবীবের গলাটা কেমন যেন গাঢ় শোনায়। আসমান কিছু বলে না। একদৃষ্টে সাত দরিয়ার আজব মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে তার কথা শোনে। বুঝি বা হবীবের জন্য একটু দুঃখই হয়।

প্রথম বার এসে ক্যামেরুণ জাহাজ চাটিগাঁ বন্দরে মাস দেড়েক রইল। ঠিক হ'ল প্রত্যেক বছর দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে দুনিয়ার নানা বন্দর থেকে কার্গো নিয়ে জাহাজটা এখানে আসবে।

জাহাজ যেদিন ছাড়বে, তার আগের রাত্রেও আসমানের খুপরিতে এসেছিল হবীব। বলেছিল, কাল জাহাজ ছাড়ব আসমান!

আসমান চমকে উঠেছিল, কই, আগে তো আমারে কও নাই?

আগে তো জাহাজ ছাড়নের ঠিক আছিল না। গলাটা কেমন যেন ধরে গিয়েছিল হবীবের।

জাহাজী মানুষ সে। সাত দরিয়ার তুফান গুণে তার দিন কাটে, রাত ফুরোয়। দিন-রাত, মাস-বছরের হিসেব নেই। দিনের পর দিন কালো, নোনা, অফুরন্ত সমুদ্র দেখতে দেখতে জীবন সম্বন্ধে হবীবের দৃষ্টিভঙ্গিটা হয়ে গিয়েছে একরোখা, বেপরোয়া। দুনিয়ার কোন কিছু সম্পর্কে তার মোহ নেই।

ইরাণ-তুরাণ, পোর্ট এডেন, পোর্ট মোম্বাসা—যে বন্দরেই জাহাজ ভিড়ুক, হবীব আগে ছোটে কসবীপাড়ায়।

দরিয়ার জীবন নারীসঙ্গহীন, নিরুৎসব। সেখানে আশা নেই, নিরাপত্তা নেই, ভরসা নেই, বেঁচে থাকাটা সেখানে একঘেয়ে, বিস্বাদ, অসহ্য।

জাহাজ থেকে ডাঙায় নেমেই হবীব হন্যে হয়ে ওঠে। কসবীপাড়ার মেয়েদের দেহ আঁচড়ে-কামড়ে যতটুকু ফুর্তি আদায় করা যায়! ডাঙার সঙ্গে মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ এটুকুই।

কিন্তু সে বার যেন কী হয়ে গিয়েছিল। দেড় মাসের প্রত্যেকটা রাত আসমানের খুপরিতে কাটিয়ে দেহ বিকিকিনির জৈব সম্পর্কটা ছাপিয়ে দুজনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম, গূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ব্যাপারটা আগে বুঝতে পারেনি হবীব। জাহাজ ছাড়ার আগের রাত্রে টের পেল।

সাত দরিয়ার বেপরোয়া মানুষটার গলা ধরে গেল, আবার

আসুম ; ফিরতি বছরে জাহাজ যখন চাটিগাঁয় আসব, তুমার কাছে আসুম।

কাঁপাগলায় আসমান বলেছিল, আইসো কিন্তুক। মাথার কিরে (দিব্যি)।

বছরের দ্বিতীয় ঋতু যেই শুরু হয়, ক্যামেরুণ জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে আসে। জেটিতে গ্যাংওয়ে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে হবীব নেমে পড়ে। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা আসমানের খুপরিতে চলে আসে।

ক্যামেরুণ জাহাজ পুরো দু' মাস চাটগাঁ বন্দরে থাকে। এ দু' মাসের প্রত্যেকটা রাত আসমানের খুপরিতে কাটায় হবীব। সে হ'ল দ্বিতীয় ঋতুর কুটুম। মরশুমী মেহমান।

রিয়াজুদ্দিনের গলির বাসিন্দারা সবাই চিনে ফেলেছে হবীবকে। তারা তাকে বলে, বর্ষার অতিথি, সাত দরিয়ার কুটুম।

বছর চারেক আসার পর হবীব একদিন বলল, এমুন করে তো আর চলে না।

আসমান বলে, কেমুন করে ?

এই যে বছরের দশখানা মাস আমার দরিয়ায় দরিয়ায় কাটে, আর বেবুশ্যাপাড়ায় আন্ধারে তুমি গুঁইজা থাক। এমুন করে চলব না।

বছরের একটা নির্দিষ্ট মরশুমে আসমানের ঘরে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যায় হবীব। আসমানের ঘরে জীবনের অন্য একটা স্বাদ পায় সে। যে স্বাদটা দরিয়ার উন্মাদ তুফানে নেই, যে স্বাদ ইরাণ তুরাণ মোম্বাসা বন্দরের ভিতর নেই। এ স্বাদটা হল মাটির স্বাদ, ডাঙার স্বাদ, জীবনে নোঙর ফেলার স্বাদ।

এই স্বাদটার টানে বছরে বছরে আসমানের কাছে আসে হবীব।

সাত দরিয়ার মানুষটা কয়েক দিনের জন্য ঘরের আশ্রয় পায়। এই ঘরই তাকে একদিন অস্থির, আচ্ছন্ন করে ফেলল।

হবীব বলে, ভাবতে আছি, দরিয়ার কাম আমি ছেড়ে দিমু। তুমারে এই বেবুশ্যাপাড়া থিকা নিয়া যামু। তুমারে সাদি করে সোংসার করুম।

ফিস-ফিস করে আসমান বলে, সত্যি ?

সত্যি।

আসমান আর কিছু বলে না। অদ্ভুত এক সুখের শিহরণে তার বুকে তির-তির করে কাঁপতে থাকে।

সত্যিই একদিন জাহাজের কাজ ছেড়ে দিল হবীব। পাহাড়তলীতে একটা ঘর ভাড়া নিল। তারপর রিয়াজুদ্দিনের গলি থেকে আসমানকে নিয়ে গেল।

সে বার ক্যামেরুণ জাহাজ হবীবকে রেখেই চাটগাঁ বন্দর ছেড়ে চলে গেল। তিন-চারটে মাস ঝড়ের মত উড়ে গেল।

আসমান আর হবীব পরস্পরকে তারা উন্মাদ সোহাগে জড়িয়ে রাখল। কিন্তু তারপর ? তারপর কোথায় যেন তাল কাটল।

উদাস চোখে এক একদিন আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকত হবীব।

আসমান বলত, কী হইল ?

ফিস-ফিস করে হবীব বলত, কিছু না।

আমার মনে হয়, নিশ্চাত কিছু হইছে।

কী আবার হইব ?

হইছে হইছে। আমি বুঝি।

অল্প একটু হাসে হবীব। নির্জীব, বিষণ্ণ হাসি। ভোঁতা খ্যানখ্যানে আওয়াজ হয়। সে বলে, কী বোঝ আসমান ?

হবীবের কানে মুখ গুঁজে আসমান বলে, সকল বুঝি আমি সকল খপর রাখি। দরিয়ার লেইগা তুমার পরাণ থির নাই।

বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল হবীবের। আসমান কেমন করে তার দিলের কথাটা জানল ? বিমূঢ় চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হবীব।

আসমান বলে, তাজ্জব হইয়া গেলা, তাই না ?

ডাইনে এবং বাঁয়ে মাথা ঝাঁকায় হবীব। হাঁ হাঁ, কী যে বোঝাতে চায়, সে-ই জানে।

আসমান থামে না, তুমি রক্তে রক্তে জাহাজের খোঁজ নিতে যাও। তুমি হইলা দরিয়ার মানুষ, ঘরে তুমার মন বশ খায় না।

ঠিক—

আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে থাকে হবীব। গাঢ়, মন্থর একটা শ্বাস ফেলে।

যার রক্তে দরিয়া মিশে রয়েছে, ঘরে কত দিন তার মন বসে ?

তালটা আগেই কেটেছিল। এবার দু' জনের মাঝখানে চিড় ধরল। চিড়টা একটু একটু করে বাড়তে লাগল।

যে মেয়েমানুষের রক্তে কসবীপাড়ার বীজ রয়েছে, সংসার-ঘর সাজাতে কত দিন তার ভাল লাগে ?

একদিন হবীরের চোখে পড়ল। রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়তলীর সেই বাড়িটার চারপাশে কতকগুলো লোক নেশায় চুরচুরে হয়ে হল্লা করছে।

হবীর গর্জে উঠল, উই কামঠগুলো এখানে আসছে ক্যান ?

আসমান জবাব দেয় না। সেই হাসিটা হাসে, যাতে ধার আছে, শব্দ নেই।

আসমানের রকম-সকম দেখে ক্ষেপে উঠল হবীব। খানিকটা ফুটন্ত রক্ত তার মাথায় চড়ে বসল, দু' হাতে তার গলা টিপে ধরল হবীব। বলল, মাগী বেবুশ্যা, এই দিকে সোংসার করে, উই দিকে কুত্তা এনে ঢুকায় ঘরে !

গলায় জোরে জোরে চাপ দেয় হবীব। আসমানের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে। শ্বাসটা আটকে আসছে।

মরিয়া হয়ে হবীরের তলপেটে লাথি ছুড়ল আসমান। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ল হবীব।

জখমী জানোয়ারের মত দুটো মানুষ একই ঘরের দুই কোণে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকে।

পরস্পরের ভালবাসা, বিশ্বাস এবং নির্ভরতার সূত্রে দু'টি জীবন জোড়া লেগেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের সম্পর্কটা অবিশ্বাস, সন্দেহ আর শত্রুতার সম্পর্ক।

হবীব খেঁকায়, মাগী কুত্তী, কামঠগুলারে ঘরে এনে ঢুকায় !

ক্যান ঢুকামু না ? তুই যাবি দরিয়ায়। আমার চলব কেমনে ? ব্যবসা চালু না রাখলে খামু কী ?

ব্যবসাই চালু রাখ মাগী, তোরে নিয়া আমার চলব না। হাঁপাতে হাঁপাতে হবীব বলে, আমি দরিয়ায় চলে যামু।

সেই ভাল। তুরে নিয়া আমার চলব না। যার মতি থির নয়, তুই-চার রুজ ঘর করতে না করতে যে দরিয়ায় যাইতে চায়, তার উপুর আমার ভরসা নাই। আমি পাড়াতেই চলে যামু।

দরিয়ার মানুষ একদিন দরিয়াতেই চলে গেল। আর রিয়াজুদ্দিনের গলিতে এসে ঢুকল আসমান।

আসমানকে দেখে গলির বাসিন্দারা ফিসফিসিয়ে হাসে। বলে, কী গো আসমান, ঘর-সোংসার থ ইয়া আবার এই দোজখে (নরকে) আইলি যে?

সখ হইছিল; তুই-চার দিন সোংসার করলাম। কিন্তুক সখটা বেশি দিন রইল না। রক্তে রইছে বেবুশ্যাপাড়ার বিষ। কয় দিন সংসার ভাল লাগে?

বলতে বলতে নিজের পুরনো খুপরিতে গিয়ে ঢুকল আসমান।

তারপরের বছরও ক্যামেরুণ জাহাজ এল চাটগাঁয়।

হবীব এল আসমানের খুপরিতে। আসমান খুশীই হল। কয়েক মাস একসঙ্গে সংসার করে হবীবের উপর কেমন একটা টান বসে গিয়েছে।

আসমান বলল, আছ কেমুন?

ভালই।

আসমানের উপর অদ্ভুত এক আক্রোশ নিয়ে দরিয়ায় চলে গিয়েছিল হবীব। দরিয়ায় দরিয়ায় ঘুরে সেই আক্রোশটা উবে গিয়েছে।

হবীব বলল, শ্যাথ আসমান, তুমি কসবীপাড়ার মানুষ, আমি দরিয়ার মানুষ। তুমি এই পাড়া ছাড়তে পারবা না, আমিও দরিয়া ছাড়তে পারুম না।

ঠিক।

আসমান সায় দেয়।

দরিয়া আর কসবীপাড়া ছেড়ে যে আমরা সারা জনম সোংসার করুম, তার উপায় নাই।

ঠিক।

এক কাম করলে কেমুন হয়?

কী কাম?

বছরে তুই মাস আমাগো জাহাজ চাটগাঁয় থাকে। এই তুই মাস তুমি আমি সোংসার পাতলে কেমুন হয়? পুটে পুটে ঘুরি। কত মাগীর কাছেই তো যাই। কিন্তু সোংসারের ঘরের স্বাদ তো পাই না।

আসমান বলে, সারা জনম বারো মাস তো এই দোজখেই কাটাই। তুই মাস যদি সংসার পাততে পারি, সখও মিটে, শান্তিও পাই।

তু' জনের মধ্যে সর্ত হল।

বছরের দ্বিতীয় ঋতুতে ক্যামেরুণ জাহাজ যখন আসবে তখন আসমানকে নিয়ে এই শহরের কোথাও চলে যাবে হবীব। একটা ঘর ভাড়া করে থাকবে।

তু'-মাস জাহাজটা চাটগাঁ বন্দরে থাকবে। এই তু' মাসের মেয়াদে তারা মরশুমী সংসার পাতবে। এই সর্তে, এই চুক্তিতে তুটি জীবন জোড়া লাগল।

রাত গাঢ় হচ্ছে, ঘন হচ্ছে। গাড়িটাকে টেনে টেনে ঘোড়া তুটো পাহাড়তলীর সেই ঘরটার কাছে এসে দাঁড়াল, যেটা আসমান ভাড়া করে রেখেছে। যেখানে তাদের তু' মাসের মরশুমী সংসার পাতা হবে।

এক মুঠো ভিক্ষে পাবো মা!

শ্রীধীরেন বসু

নিরীহ জীবন-দ্বন্দ্বে
মরণের অদ্বৈত মহড়া
নিঃস্ব রসে পূর্ণ করে
নিরাকার ভরা।
নিমগ্ন রাতের পাখা
খুলে দেয় স্তব্ধ বাতায়ন,
বিশ্রামের পরমায়ু
রাতভর করে আপ্যায়ন।

ভোর হ'লে,
সুরু হলে অভিযান
অনিবার্য ভয়ার্ত ভিড়ে
যাত্রাপথ অসংলগ্ন।
মুক্ত দ্বারপথে
এক মুঠো দানা পেলে,
মধ্যাহ্ন অবশ হাতে
ছিন্ন বস্ত্রখানা মেলে
কুড়াই শতেক।
দূর প্রান্ত হতে কভু
সুদূরের ফাটক পাহারা দেখে
থেমে যাই অনিমেখ।

চারি পাশে
নেমে আসে
অস্পষ্ট গোধূলি:
নিজেরে হারাই আমি নিজে।
মরণের ক্ষমা নিয়ে
তবু কেন বেঁচে আছি আমি?
স্বচ্ছন্দ অঙ্কুর শীষে
দারিদ্র্যের বীজে!

ভূস্বর্গ পরিক্রমা

শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ

ভূস্বর্গের মত পহলগামেও সকালে দেখেছি একটা সাদা আস্তরণ দিয়ে বাড়ীর ছাদ, মাঠ আর উপলখণ্ড ঢাকা। শিশির জমে এরকম হয়। এইজন্তে সকালে শেষনাগ নদীর ধারে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে বেড়াবার সময় সাবধানে চলা উচিত। পিছলে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এখানে এক কুকুর নিয়ে বেশ মজা হয়েছিল। সারা কাশ্মীরের কুকুরগুলো বেশ গ্রাম-ফেড্ গোছের। বেশীর ভাগই পথের বাসিন্দা কিন্তু কি তাদের পুরুষ্টু রূপ! বাংলাদেশের ঘেয়ো কুকুর একটাও চোখে পড়েনি। শ্রীনগর থেকে পহলগাম আর ওপাশে উলরি—মানসবল্ অবধি সব পথের কুকুরই রীতিমত ভদ্র-দুরস্ত। হয়ত আব্‌হাওয়াই এর জন্তে দায়ী। নেপালে দেখেছি মানুষগুলো—বিশেষ করে পাহাড়ীরা রীতিমত গায়ে-গতরে। কিন্তু পথের কুকুরের এমন নৈকষ কৌলীন্য চোখে পড়েনি। এমনি এক কুকুরকে রাস্তায় বিস্কুট খেতে দিলাম। ব্যস্, অমনি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। হোটেলে ফেরবার সময় দেখি পিছু নিয়েছে। তারপর সোজা দোতলায় আমাদের কামরায় এসে হাজির। তখন সন্ধ্যা হয়েছে—বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। আমি বিদায় করতেই যাচ্ছিলাম। এগিয়ে এল পুষ্প। বললে—আহা, এত ঠাণ্ডায় বাইরে থাকবে? থাকুক না আজকের রাতটা ঘরের ভেতরে?

বললাম—ক্ষতি কিছু নেই। কুকুর ত দূরের কথা, বাঘা-বাঘা শ্বাপদের সঙ্গেও থাকতে রাজী আছি। 'মন্বন্তরেও মরিনি মোরা, মারি নিয়ে ঘর করি।' কত মারি-ধান্দা, কত রাঘব-বোয়াল, কত নেকড়ে-হায়েনা নিয়ে আমরা বাঙ্গালীরা ঘর করছি! এ তো নিতান্তই নিরামিষ সে তুলনায়!

বাধা দিয়ে হেমপ্রভা বললে—থামুন, থামুন। আপনার সব তাইতেই রসিকতা! কুকুরটা বাইরেই থাকবে।

তথাস্তু। বাইরেই থাকা সাব্যস্ত হোল। পুষ্প তাকে খাইয়ে এল। সারা রাতটা সে বাইরেই কাটিয়ে দিলে। সকালে দরজা খুলে আমি তাকে ভেতরে টেনে আনতে গেলাম—কি আশ্চর্য্য, সে আসবে না! রাতে আসতে দিইনি। তাই অভিমান! অভিমান আর শুধু বাঙ্গালীরই একচেটে নয়! সারা দিন খেয়ে দেয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রইল, সন্ধ্যা হতে আবার ওপরে এল। এবারে সসম্মানে, সাদরে অন্দর মহলে প্রবেশ করতে বললাম। কিন্তু ভূস্বর্গের কুকুর—বাংলার নেড়ী কুত্তা নয়। অভিমানটা নিতান্তই উচ্চগ্রামের। সে এলো না। পুষ্পর হাত থেকেই খেলো। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর দরোয়ান এসে লাঠি মেরে তাকে তাড়িয়ে দিলে। সকালে যথারীতি তার সঙ্গে দেখা হোল—তবে বাড়ীর বাইরের মাঠে। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও ওপরে ওঠা ত দূরের কথা—বাড়ীর চৌকাঠও মাড়াল না। বাপ্‌স! কি অভিমান! সব অপমানগুলিই স্মরণ করে রেখেছে! কাশ্মীরের কুকুরই যখন এই, তখন না জানি ও-দেশের অঙ্গনাদের মনটি কতই স্পর্শকাতর!

মনোজ বাবু গম্ভীর মুখে বললেন—দাদা, এমন ছিমছাম দেশের পুরুষেরা দেহপদপল্লবের চর্চ্চা করবেন আর তার ফলে—ঐ ওদিকের ওরা ক্রমশ: পায়াভারি হয়ে অভিমানদুরন্ত হবেন—এ আর বিচিত্র কি! বৈষ্ণবকাব্যের অভিমান চর্চ্চার যায়গাই ত এই!

বললাম—কিন্তু ভায়া, ও-ব্যাপারের চরম ত হয়ে গেছে মথুরা-বৃন্দাবনে। নিতান্তই ধূলোমাটির পরিবেশে! এখানকার আয়রণ কার্টেনের ওপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে ত পরিচয় হল না? সুতরাং কুকুরের অভিমানটা যে এ-দেশের মাটির ফসল, তা তো বলা যায় না?

কল্যাণী রান্নাঘর থেকে বললে—অভিমানের বিলাস খুব হয়েছে! ও সব আপনারা বুঝবেন না, খাবেন আসুন।

এর পরে আর কাব্যদর্শন চলে না। সুতরাং উঠতে হোল।

ফেরবার পথে আমরা সোজাপথেই চললাম—১২ মাইলের পথ। এ-পথে প্রথম দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে মাওন্। ঝর্ণা আর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। এর পর অনন্তনাগ। এটি একটি ছোট সহর। চারিদিকে বহু ঝর্ণা আছে। তারপর অবন্তীপুর। শ্রীনগর থেকে ১৮ মাইল দূরে। বাস এখানে কিছুক্ষণ থামে। দ্রষ্টব্য হচ্ছে একটি পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মন্দির, বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা, চত্বর—সবই পাথরের। এককালে জমকালো মন্দির ছিল। সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ৮৬৫ থেকে ৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবন্তীবর্ম্মণ ছিলেন কাশ্মীরের অধিপতি। ইনিই এই বিষ্ণুমন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং মন্দিরটি নবম শতকের। "রাজতরঙ্গিণী"তে আছে—অবন্তীবর্ম্মার রাজত্বকালে সুপণ্ডিত মুক্তাকণ, শিবস্বামী, কবি আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর বিদ্যার জন্তে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। মন্ত্রী শূরবর্ম্মাকে দিয়ে উমানাথ-মহেশ্বরের মন্দিরটি (বিষ্ণুমন্দির?) নির্ম্মাণ করান। কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, ওটা মন্দিরই নয়, একটা রাজবাড়ী। পঞ্চপাণ্ডব এখানে নাকি সদ্রৌপদী বাস করেছিলেন। আমাদের অবশ্য তা মনে হোল না। সরকারী আর্টস কলেজের পাশকরা, শিল্পনিপুণা হেমপ্রভা চারদিক

পরীক্ষা করে বললে যে, সরকারী ভাষ্যই ঠিক। অষ্টম শতকের মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের সঙ্গে এর গ্রাউণ্ড প্ল্যানের একটা মিল আছে। পেছনের দিকের বড় বড় থামওয়ালা কলোনেড বা হলগুলো গ্রীকরীতিতে তৈরী। মার্ত্তণ্ড-মন্দিরে তা সুস্পষ্ট। গান্ধারশিল্পের প্রভাব এখানে আছে হয়ত।

চুঁচুড়ার দুই ভাই-বোন——অণিমা ও কল্যাণ শীল যখন ফটো নিতে ব্যস্ত, ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তখন ভাবছিলাম —একে ধ্বংস করল কে? পাঠান সিকান্দার লোদী না মোগলরা? কালাপাহাড়ী ঐতিহ্যে ত ওদের ইতিহাস ভরা। ইসলামাবাদ থেকে ৫ মাইল দূরে একদা-বিখ্যাত মার্ত্তণ্ড-মন্দিরকে ত সিকান্দার লোদীই ধ্বংস করেছেন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে! আজও সেই বিখ্যাত মন্দিরের নীলাভ-ধূসর রংয়ের পাথরগুলো পড়ে রয়েছে। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির গুজরাটে দেখেছি। মামুদের পৈশাচিক হাতে তার কবন্ধরূপ মনকে পীড়া দিয়েছে। তাঁরই সভার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অল্ বেরুণী দম্ভ করে বলেছিলেন—"মামুদ ভারতকে ধ্বংস করে আশ্চর্য্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অধিকৃত স্থান থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদায় নিয়ে কাশ্মীর, বেনারস প্রভৃতি যে-সব স্থানে মামুদের হাত পৌঁছাতে পারেনি, সেই সব দেশে পালিয়েছে।"

অল্ বেরুণীর বহ্বাড়ম্বরেই প্রকাশ, মামুদের সময়ে কাশ্মীরে, বারাণসীতে শক্তিমান হিন্দু রাজা ছিলেন। তখনও হিন্দু-সংস্কৃতি কাশ্মীরে কবন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়নি। সেদিনের আর তার আগের কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের শক্তির কথা মনে পড়ল। গুর্জররাজ রামভদ্রের পুত্র ভোজ উত্তর-ভারতে পালদেব পরাজিত করে ভারতের অধিকাংশ অংশ জয় করেন। কিন্তু কাশ্মীর, বাংলা, সিন্ধু আর মগধ জয় করতে পারেননি। মনে পড়ল অষ্টম শতকের মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের কথা, দ্বাদশ শতকের রাজতরঙ্গিণীর লেখক কহ্লন যাঁর কীর্ত্তি অমর করে রেখে গেছেন। কাশ্মীরের কর্কোট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ইনি। এঁরই সময় হিউয়েন্থ-সাং কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। মগধ, বঙ্গদেশ কামরূপ, উড়িষ্যা, মালব আর গুজরাটেও ইনি প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কান্যকুব্জের যশোবর্ম্মণের মত ইনিও, বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে দেড় হাজার মাইল হেঁটে আসা সোজা কাজ নয়! এই খ্যাতনামা ললিতাদিত্যই সেদিন এক বাঙ্গালী রাজাকে ভুলিয়ে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অবশ্য তাঁর সেই জঘন্য কাজের প্রতিশোধও নিয়েছিল আর এক বাঙ্গালী রাজপুত্র; কাশ্মীরে গিয়ে আর এক রাজার বুকে ছুরি বসিয়ে ললিতাদিত্যের আগে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে আর এক মহানুভব সম্রাট কাশ্মীরকে গরীয়ান্ করেছিলেন। কুষাণ কণিষ্ক কাশ্মীর শুধু জয় করেন নি, চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিও (মতান্তরে জলন্ধরে) সেখানে করেছিলেন।

ভাবছিলাম, একটাও বৌদ্ধমন্দির শ্রীনগরে বা তার আশে-পাশে নেই কেন? লাডাক্ ছাড়া আর কোথাও বৌদ্ধ-স্মারক আছে কিনা জানি না। গাইডবুকেও কোনও উল্লেখ নেই।

বাস ছাড়লো। আমরা ক্রমে পাম্পুরে এসে পৌঁছলাম। দু'পাশে ফিকে বেগুণী রংয়ের জাফরাণক্ষেত দেখা যাচ্ছে। সমগ্র কাশ্মীর জম্মুর মধ্যে এই পামপুর ছাড়া জাফরাণ কোথাও জন্মে না। অন্য জায়গায় জাফরাণ চাষের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, সাফল্য আসেনি। মাটির বিশেষ গুণের জন্যেই এ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও জাফরাণ জন্মায় না। পামপুরের জাফরাণক্ষেত শুধু যে কাশ্মীরকে রাজস্বের একটা অংশ এনে দেয় তাই নয়, এর সৌন্দর্য্যও দেশ-বিদেশের মানুষকে মুগ্ধ করেছে। সিংহাসনলাভের চৌদ্দ বছর পরে জাহাঙ্গীর শাহ যখন কাশ্মীর ভ্রমণে যান চার শত বেগম বাঁদী আর চার শত পালতোলা জাহাজ নিয়ে, তখন পামপুরের এই জাফরাণক্ষেত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আত্মজীবনীতে এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

জাফরাণফুলগুলি চমৎকার দেখতে! মাঠে যখন ফুটে থাকে তখন রং হাল্কা-বেগুণী। কিন্তু তুলবার পর নীলাভ-বেগুণী হয়ে যায়। এই ফুলের হলদে পরাগের সঙ্গে খয়েরী রংয়ের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়া আছে, তাই জাফরাণ। সুতরাং এক তোলা জাফরাণের জন্যে কত ফুল সংগ্রহ করতে হয়, সহজেই অনুমেয়। ইংরেজী অভিধানে এই ফুলকে গাঢ় হলদে রংয়ের বলা হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরে সে রং দেখিনি। ওল, কচু ইত্যাদি গাছের মত এরও মূল থেকে গাছ হয়। সরকারী এম্পোরিয়ামে শ্রীনগরে খাঁটি জাফরাণ পাওয়া যায়। তোলা ১২'৬০ টাকা। হাউসবোটে অনেক সময় আড়াই টাকা তিন টাকা তোলা পাওয়া যায়। আমাদের বোটেও বিক্রেতা এসেছিল কিন্তু ভেজালের ব্যাপারটা জানা ছিল বলে আমরা সাবধান হয়েছিলাম। অধিকাংশ সস্তার জাফরাণই রং-করা কাগজকাটা মাত্র।

সন্ধ্যার আগেই আমরা শ্রীনগরে ফিরলাম। টুরিষ্ট রিসেপশান সেণ্টারে হাজির হতেই বোটওয়ালারা টানাটানি আরম্ভ করল। বে-মরশুম কি না! চিন্তা হোল—ঝিলামে না ডাল-এ, কোথায় থাকা যাবে কোন্ জায়গার পরিবেশ রমণীয়? অবশেষে ডাল-এই স্থির হোল—নেহেরু পার্কের কাছে।

হাউসবোট চার রকমের আছে। স্পেশাল, এ, বি, সি। মধ্যবিত্তের উপযোগী হচ্ছে বি আর সি শ্রেণীর বোট। চার কামরাওয়ালা বি শ্রেণীর মাসিক ভাড়া ৩৫০৲ টাকা আর সি শ্রেণীর ২৫০৲ টাকা। চার কামরায় ছ' জন সহজেই থাকতে পারেন। ড্রইংরুম আর খাবার ঘরের গালিচার উপর বিছানা পেতে শুতে আপত্তি না থাকলে, দশ-বার জনেরও যায়গা হয়। বি শ্রেণীর প্রতিদিনের জন-প্রতি রেট ৮৲ টাকা, অন্ততঃপক্ষে পাঁচ জন থাকলে। সি শ্রেণীর জন-প্রতি দৈনিক রেট ৬৲ টাকা; অন্ততঃ পাঁচ জন থাকতে হয়। গাইডবুকে হাউসবোট, সিকারা, টঙ্গা, বাস ইত্যাদির সব রেট বেঁধে দেওয়া আছে। তার বেশী কেউ নিলে ডিরেক্টার তার প্রতিবিধান করে থাকেন। কিন্তু বে-মরশুমে, যখন বোটে বোটে "টু-লেট" ঝুলতে থাকে—তখন বাঁধা-ববান্ধ রেট চলে না। তখন নিছক ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের নীতি। তখন গরজ বোটওয়ালার। মে আর নভেম্বর হচ্ছে বে-মরশুম। এই সময় দর রীতিমত কমানো যায়। আমরাও এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

বোটের রেট শুধু বোটভাড়া নয়—থাকা, খাওয়া, বৈদ্যুতিক আলো, চাকর ইত্যাদি খাতে সব খরচ ধরে। সকালে বেড টী, তারপরে প্রাতরাশ, দুপুরে ভাত বা রুটি, বিকেলে চা-টোষ্ট আর

রাত্রে রুটি বা ভাত। ট্রাউট মাছ বা ডিম দুবেলাই দেয়। মাংস মধ্যে মধ্যে। যাত্রীর ইচ্ছানুসারে খাদ্যের মেনু বদলায়। যাত্রীদের মধ্যে এবার শতকরা নব্বুই ভাগই ছিলেন বাঙ্গালী। সুতরাং বাঙ্গালী-খানার জন্যে আমরা পীড়াপীড়ি করেছিলাম। ওস্তাদ রাঁধিয়ে শেফালী দি' ওদের রান্নাঘরে গিয়ে নির্দ্দেশ দিয়ে বাঙ্গালী-খানা তৈরী করাতেন।

বোটে গিয়ে ওঠবার আগে একটা চুক্তিপত্রে সই করতে হয়। সই করবার সময় সিকারা সমেত চুক্তি করা দরকার। পারাপারের জন্যে এর প্রয়োজন। বোটের সঙ্গে সিকারা না থাকলে, বোটওয়ালার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় পারাপারের জন্যে। চুক্তির মধ্যে সিকারা ধরা না থাকলে, অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সিকারা নিতে হয়। ডাল্ হ্রদে বা ঝিলামে বেড়াবার জন্যে অবশ্য আলাদা করে সিকারা ভাড়া করতে হয়। বোটওয়ালাই তার ব্যবস্থা করে দেয়। তখন ভাড়া দিতে হয় ঘণ্টা হিসেবে।

বাঙ্গালীদের জলে হাউসবোটে বাস করার একটা মোহ আছে। আমাদের কিন্তু হাউসবোটের জীবন খুব ভালো লাগেনি। তবে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, যার মূল্য কম নয়। সম্ভবতঃ ডাল্ হ্রদের জলেই রান্না হয়। হয়ত এইজন্যেই বহু যাত্রীর প্রথম কয়েক দিন পেটের অবস্থা ভাল থাকে না। খাবার জলটা অবশ্য ভালই। শ্রীনগরের এবং আশে-পাশের সব দর্শনীয় স্থান দেখাশোনা আর কেনাকাটা হয়ে যাবার পর, দু'-তিন দিন হাউসবোটে কাটানই ভালো ব্যবস্থা বলে মনে হয়।

শ্রীনগরের আয়তন মাত্র এগারো বর্গমাইল। উত্তর দিকের বড় পাহাড়টার চূড়ায় আছে "হরিপর্ব্বত দুর্গ" আর পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের উপরে আছে একটি সুন্দর পাথরের মন্দির—"তখ্ত্-ই-সুলেমান" বা "সোলোমনের সিংহাসন।" ডাল হ্রদ এই দুটি পাহাড়েরই পা ধুয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ দিকে আছে শঙ্কর পর্ব্বত আর তার ওপরে শঙ্করনাথের মন্দির। পাহাড়টি হাজার ফিট উঁচু আর মন্দিরটিও হাজার বছরের পুরাতন। নেহেরু পার্কের দক্ষিণে, রাস্তার ডান দিকে আছে শঙ্কর পার্ক। তার ভেতর দিয়ে শঙ্করনাথের মন্দিরে যাবার পাহাড়ী পথ উঠে গেছে। এই পথে সময় বেশী লাগে—তিনটি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। সোজা পথ হচ্ছে—টুরিষ্ট সেণ্টারের কাছ থেকে। মন্দিরটিতে বাহাদুরী কিছু নেই কিন্তু শিবলিঙ্গটি বিশাল। পরিবেশ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সরকার পাহাড়ের ওপর পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছেন। রাত্রিতে সমগ্র শ্রীনগর সহরটার ওপর মন্দিরটি যেন কর্তৃত্ব করছে বলে মনে হয়। ডাল হ্রদ থেকেও রাত্রিতে আলোকোজ্জ্বল শঙ্কর পর্ব্বতের দৃশ্য মনোরম।

হাউসবোটের মালিকেরা বিশ্বাসী। ঝাড়ুদারের কাজ ছাড়া আর সব কাজই পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এরা করে। হাউসবোটের সঙ্গেই একটা ছোট বোট থাকে। পরিবারের মেয়েরা তাতে যাত্রীদের জন্যে রান্নার কাজটা করে। যাত্রীরা জিনিষপত্র সবই এদের জিম্মায় ফেলে রেখে ঘুরে বেড়ান—চুরি হয় না। ব্যবসা এরা জানে, সুতরাং খাতকের ক্ষতি করে না। আমাদের হাউসবোটের মালিক আলি গুসানী অত্যন্ত ভদ্রলোক। সাত দিনের চুক্তি করে পাঁচ দিন থাকার জন্যে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ প্রথমে করেছিলেন কিন্তু নিজেই আবার ক্ষমা চেয়ে নেন। কয়েকটা জিনিষ আমরা ফেলে এসেছিলাম। ঝিলামের তীরে আমাদের হোটেল খুঁজে বের করে, ছেলেকে দিয়ে সেগুলি পাঠিয়ে তবে স্বস্তি পান।

একদিন এঁকে বলেছিলাম—গুসানীজি, আপনার নাম শুনে আমাদের দেশের গোস্বামীদের কথা মনে হচ্ছে।

উত্তরে বলেছিলেন—বাবুজি, আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলাম। মুসলমানরা এ-দেশ জয় করে জোর করে আমাদের মুসলমান করেছিল। আসলে কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ।

কথাগুলো বলবার সময় তাঁর চোখে-মুখে একটা প্রদীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছিল।

বোটের মালিকেরা দরিদ্র নয়। আমাদের অনেককে সাত বার কিনতে পারে। এক একটা হাউসবোট তৈরী করতে খরচ পড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তারও বেশী—অবশ্য কার্পেট, সোফা, কৌচ ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর খরচ ধরে। শীতের সময় অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে মে পর্য্যন্ত এরা শাল, কার্পেট ইত্যাদি নিয়ে নেমে আসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। তাতেও ভালো রোজগার হয়। কোনও কোনও হাউসবোটে একাধিক ব্যক্তির পার্টনারশিপ্ আছে।

সকাল থেকেই হাউসবোটে নানা পশারী সিকারা নিয়ে আসে—ফুল, ফল, মনোহারী জিনিষ, ফিলম্, পেপারমাসি, শাল, জাফরাণ আরও কত কি সওদায় ভ'রে। বাজার দর জানা থাকলে এদের কাছ থেকে কেনা চলে। নবাগতদের না কেনাই ভালো, কারণ এরা বাজার দর অপেক্ষা বেশী নেয়। জাফরাণ এদের কাছ থেকে কিনলে ঠকবার সম্ভাবনাই বেশী।

সেদিন বোটে প্রথম প্রভাত। সোনালি রোদে চারিদিক ঝলমল করলেও ঠাণ্ডার ভয়ে ড্রইংরুমে বসে আমরা আড্ডা জমিয়েছি। এমন সময় মনোজ বাবু বাইরে থেকে ডাকলেন—দাদা, মহারাজ এসে গেছেন, দর্শন করে যান।

আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম কাশ্মীরের বা কোন্ দেশের মহারাজ বুঝি যাচ্ছেন। দেখি—একটা কার্পেট পাতা সিকারায় সুবেশ মাথায় পাগড়ী এক সুদর্শন প্রৌঢ় বসে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—মহারাজ কে? কোথায় তিনি?

চোখের ইসারায় মনোজ বাবু বললেন—ঐ যে উনি।

—ব্যাপার কি?

—উনি নাপিত মহারাজ, কামাবেন কি?

মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। ভবানী বাবুর সখ হচ্ছিল মহারাজের কাছে কামিয়ে দেখেন, কি রকম সাফ্ কামান হয়। হয়ত ওর মধ্যেও কিছু চারুকলার সন্ধান পাওয়া যাবে। জিজ্ঞাসা করলেন—দাড়ি বনানেকা ভাও কিত্না?

—জি, আটে আনা। উত্তর এল গম্ভীর মহারাজের কাছ থেকে।

ভবানী বাবুর গৃহিণী সুমতি বললেন—থাক্ থাক্, আর মহারাজে কাজ নেই! সেফ্টি রেজার আছে না?

বেচারা মহারাজ বঙ্গবাসীদের ভাবগতিক দেখে গম্ভীর চালে সরে পড়ল।

সিকারায় ডাল্ ও ঝিলামে বেড়াবার কাহিনী মনে থাকবে। আমরা আট ঘণ্টার চুক্তি করেছিলাম দুটো সিকারার জন্যে প্রশ-

টাকায়। মরশুমে অবশ্য আরও বেশী লাগে। ডাল্ হ্রদ সাড়ে পাঁচ মাইল দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে আড়াই মাইল। এর লাগাও আছে নাগিন্ হ্রদ। এ দুটি ছাড়া দূরে দূরে আরও এগারোটি হ্রদ কাশ্মীরে আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে উলার, মানসবল, শেষ রামনাগ। কৃষ্ণসায়র আর গঙ্গাবল।

এদেশে ফুলের রাজত্ব জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। সে-সময় গোলাপ আর পদ্ম সারা দেশটাকে মাতিয়ে তোলে। আরও যে কত রকমের ফুল ফোটে তার ইয়ত্তা নেই। রাজতরঙ্গিণীর মতে গ্রীষ্মই কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ ঋতু।

স চাতিরম্যঃ কাশ্মীরো গ্রীষ্মস্ত্রিদিবদুর্লভঃ।
হিমলিঙ্গার্চনৈঃ প্রায়াদ্ বনান্তেষু কৃতার্থতাম্॥

অর্থাৎ কাশ্মীরের গ্রীষ্ম অতি রম্য, স্বর্গেও তা দুর্লভ। সেই সময়ে (রাজা সন্ধিপতি) বনমধ্যে হিমলিঙ্গের (অমরনাথের) পূজা করে কৃতার্থ বোধ করতেন।

সিকারায় যেতে যেতে দেখলাম, পদ্মপাতার সমারোহ—ফুল কিন্তু একটিও নেই। হিন্দু আমলে ডাল-কে পদ্মসরোবর কেন বলা হত তা বুঝলাম। আফশোষ হোল, আরও আগে এলাম না কেন। পদ্মের গোলাপী অরণ্যের মধ্য দিয়ে ভূস্বর্গের সুষমা অনুভব করার সৌভাগ্য হল না। পদ্মের আফশোষ মেটালেন দলের গায়ক-গায়িকারা। ভবানী বাবু, মনোজ বাবু, হেমপ্রভা, পুষ্প আর শুভাদি গান দিয়ে ডাল্-এর ওপর ছড়িয়ে দিলেন মোহ-মদিরতা।

একটা ঘাটে এসে শিকারা লাগল। মাঝিরা জানাল হজরতবাল। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। আমরা এগিয়ে গিয়ে এক বড় মসজিদ দেখলাম। নির্ম্মাতা শাজাহান—১৬৪২ খৃষ্টাব্দে। এখানে হজরত মোহাম্মদের মাথার বারটি চুল সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে। বছরের মধ্যে একদিন তা সব জাতের মানুষকেই দেখতে দেওয়া হয়। মসজিদটির পরিচালকেরা অত্যন্ত ভদ্র। অফিসে টেলিফোন আছে, যে-কেউ বিনা পয়সায় ব্যবহার করতে পারেন। কাশ্মীরে পাবলিক টেলিফোনে দাম দিতে হয় না। অফিস-সংলগ্ন একটি ধর্ম্মশালাও আছে। যে কেউ থাকতে পারেন, জাতিভেদ নেই। পরিবেশটি আমাদের খুবই ভাল লাগল।

সিকারায় করে মোগল উদ্যানগুলিতে বেড়ান যায়। ফেরবার পথে আমরা হাসনাবাদ হয়ে আসি। ওখানে পেপারমাসি বা কাগজের মণ্ড জমাট ক'রে নানা আকৃতির টয়লেট সেট, ফুলদানি, ট্রে ইত্যাদি তৈরী হয়। ওখানেই সারা কাশ্মীরের সেরা পেপারমাসি প্রস্তুতকারক জাফর আলির কারখানা আছে। আমরা কারখানা আর শো-রুম দেখলাম। কাগজের মণ্ডকে জমিয়ে তা দিয়ে কি সুন্দর যে একটা কুটিরশিল্প গড়ে তোলা যায়, তা এখানে না এলে বিশ্বাস করা যেত না, জাফর আলি মালিক হলেও নিজেই আর্টিষ্ট; এখনও নিজে পরিশ্রম করেন। তাঁর কারখানায় পঞ্চাশ জন লোক কাজ করে বললেন। শো-রুমে যে সব কাজ আমরা দেখলাম, যেমন কাশ্মীরী নক্সা সরকারী আর্ট এম্পোরিয়ামেও দেখিনি। তবে জিনিষ অনুপাতে দামও খুব। বাজার অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ বেশী। জাফর আলি একটি উর্দ্দু পত্রিকা নিয়ে এসে, স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ আর তাঁর নিজের ছবি দেখালেন। বললেন—শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁর কারখানাকে এতই ভালবাসতেন যে, কাশ্মীরে এলে তাঁর কারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। শ্রী নেহেরু, পণ্ডিত পন্থ ইত্যাদি ব্যক্তিরাও তাঁর কারখানায় এসেছেন। সব চেয়ে ভালো লাগল পেপারমাসির ট্রের ওপর ওমর খৈয়াম, তাঁর সাকী আর সুরার চিত্রটি। কি নিখুঁত আর জীবন্ত ছবি! এঁদের তৈরী আখরোট কাঠের জিনিষগুলিও পয়লা নম্বরের।

বিকেলের দিকে সিকারায় করে ঝিলামে বেড়াই। আগেই বলেছি শ্রীনগরে ঝিলাম সঙ্কীর্ণ—অধিকাংশ স্থানে বাগবাজারের খালের মত। এক এক যায়গায় দু'পাশে বাড়ীর মাঝখান দিয়ে ঝিলাম চলেছে। তখন মনে হয়েছে ভেনিসে গণ্ডোলায় করে চলেছি।

হাউসবোটে থাকাকালীন একদিন আমরা মোগল উদ্যানগুলি দেখতে গেলাম। টুরিষ্ট রিসেপসান সেণ্টার থেকে বাসে করে যেতে হয়। কেউ কেউ ডাল্ বা ঝিলাম থেকে সিকারাতেও যান। বাস-ভাড়া ১'৭৫ টাকা যাতায়াত। দু'বার বাস ছাড়ে—সকাল সাড়ে আটটায় আর বেলা দুটোয়। বাসের প্রথম বিশ্রাম হারওয়ান্-এ। এখানে জলের রিজার্ভার আর নানা পশুপাখীর ক্ষুদ্র উপনিবেশ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যও চলেছে দেখলাম। হারওয়ান্-এ চীনার গাছের এভেন্যুটি দেখবার মত। এর পরের বিরতি—শালিমার উদ্যানে। শালিমার কথাটির অর্থ—"প্রেমনিলয়।" বাস এখানে এক ঘণ্টা থামে। সুতরাং ভাল করে দেখবার অবসর পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর শাহ এটির নির্ম্মাতা। উদ্যানটির দৈর্ঘ্য ১৭৭৭ ফিট আর প্রস্থ ৮০১ ফিট। তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। জাহাঙ্গীর বাদশাহ কাশ্মীরে এক মাসের সফরে আসবার আগেই সম্ভবতঃ উদ্যানটি তৈরী করানো হয়েছিল। নির্ম্মাতাও সম্ভবতঃ খোজা ওয়েসী। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আছে—তিনি খোজা ওয়েসীকে দিয়ে লাহোরের কাছে মীর ছিল্দ-এ উদ্যান রচনা করিয়েছিলেন।

মিসেস ষ্টুয়ার্টের মতে, উদ্যানটি চোসরোজ্ নামক এক পারসিক কার্পেটের ডিজাইনের অনুকৃতি। যার নাম থেকে কার্পেটের নাম, সেই ইরাণীয় সম্রাট প্রথম চোসরোজ্ সাসানীয় বংশীয় ছিলেন এবং ৫৩১ থেকে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রতিটি উদ্যানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে এক একটি ঝর্ণা-খাল। এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে নাচতে নাচতে নেমে আসছে আর জমা হচ্ছে এক একটা বড় কুণ্ডে। কুণ্ডগুলিতে আছে ফোয়ারা। জল যখন বেশী থাকে তখন ফোয়ারাগুলি খুলে দেওয়া হয়। আমরা ফোয়ারার খেলা দেখতে পাইনি, কারণ জল তখন ছিল না বললেই হয়। বর্ষাতেই এর সৌন্দর্য্য খোলে। খালের দেওয়ালগুলি কোথাও বা মার্বেল পাথর কোথাও বা পুরাতন চুণাপাথর দিয়ে তৈরী। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। রাত্রে জলের ওপর আলোর খেলা চমৎকার। উৎসবমুখর রজনীতে এই সব আলো জ্বালা হয়। ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন যখন কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন খুবই সমারোহ হয়েছিল। ভি, আই, পিদের আগমন ছাড়া আলো আর ফোয়ারার দ্বৈত খেলা সাধারণতঃ দেখানো হয় না। তা তো হবেই—নীচের তলার মানুষ সৌন্দর্য্যের বোঝেই বা কি আর তাদের জীবনে "প্রেমনিলয়ের" মহাভাব উপলব্ধির অবসরই বা কোথায়? জাহাঙ্গীর-শাজাহানের মত প্রেমের সমঝদারই বা ক'জন? বুকোকে তাঁদের চরিত্রদোষ দিলে কি হবে, একটা বিশাল সাম্রাজ্যের টাকার জোরে নান
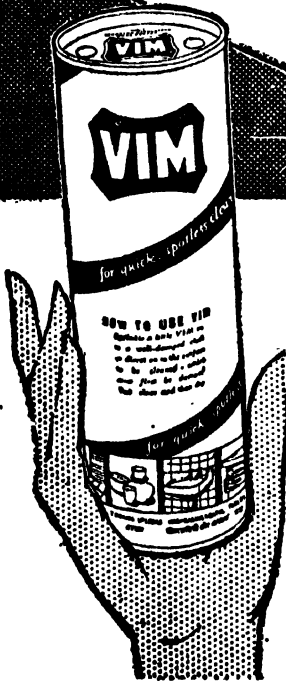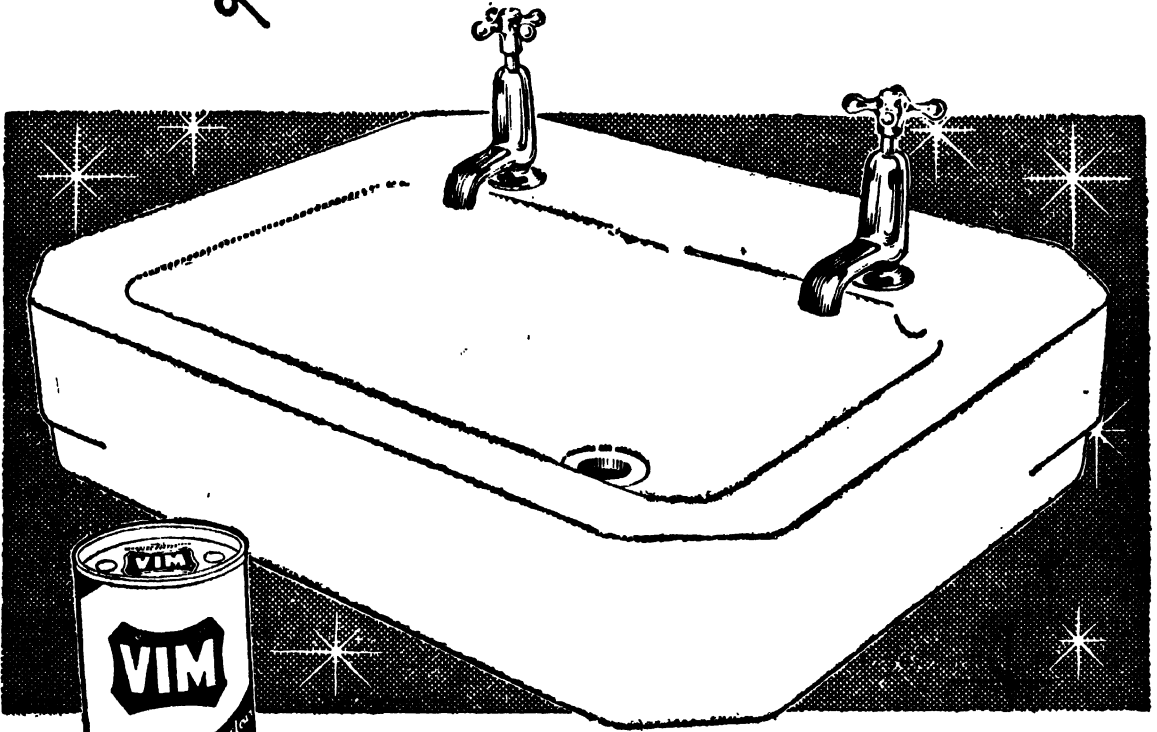
কীর্তির মাধ্যমে, তাঁদের প্রেমকে "কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল" করে রেখে গেছেন। মহাকালকেও ঘুষ দেওয়া যায়!

এর পর বাস থামলো নিশাতবাগে। কথাটির অর্থ "গার্ডেন অফ প্লেজার" বা "প্রমোদোদ্যান"। এর নির্মাতা শাজাহানের শ্বশুর আসফ্ খান, আগ্রার যমুনাপারের "ইতমদ্দোলা" যাঁর বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। উদ্যানটি তৈরী হয় ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে। দৈর্ঘ্যে ৫৯৫ ফিট আর প্রস্থে ৩৬১ ফিট। উদ্যানটি বারটি ছাদে বিভক্ত। ডাল্ হ্রদের তীর থেকে সুরু হয়েছে। ক্রমশঃ এক একটি ছাদে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত উঠে গেছে। প্রতি ছাদে ওঠার জন্যে কয়েকটা পাথরের সিঁড়ি আছে। সম্ভোগের মাত্রা ধাপে ধাপেই বাড়ে। ধাপে ধাপে বাদশাহী খুস্ বাড়িয়ে একেবারে ব্যোমমার্গে পৌঁছে দেওয়াই বোধ হয় আসফ্ খানের উদ্দেশ্য ছিল। বারটি ছাদে ওঠবার পর এত শীতেও কিন্তু আমাদের ঘাম এসে গিয়েছিল। মোগলাই আর বাঙ্গালাই-এ তফাৎ ত হবেই!

মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে সেরা এই নিশান্তবাগ। পরিকল্পনাটি চমৎকার। ডাল্ হ্রদে যখন পদ্ম ফোটে আর ফুলের সময়ে যখন গোলাপ, যুঁই ইত্যাদি নানা ফুলে নিশাত রূপসী হয়ে ওঠে, তখন ডাল্-এর জলরাশি থেকে পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত একটা বিশাল, বিচিত্র, অপরূপ কার্পেট রচিত হয়। ডাল্-এর ওপারে কুড়ি মাইল দূরে পীরপঞ্জাল তখন রচনা করে দক্ষিণের যবনিকা।

শীতকালে এখানে নানা জাতের গাঁদা, মল্লিকা, ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম্, বাটন্‌হোল ইত্যাদি ফুল ফোটে। গাঁদার চেহারা আর রং দেখবার মত। নাগপুর, আমেদাবাদ এমন কি বাংলা দেশের মত বড় বড় মল্লিকা এখানে দেখিনি। তবে হলদে আর সাদা-বেগুনী ছোট ছোট মল্লিকাকে এমন অজস্র ফুটতেও আর কোথাও দেখিনি। এখানের হলদে রংটা বাঙ্গলা দেশের হলদের চেয়েও গভীর আর মনোহারী। দু' পাশের কয়েকটি গাছ ছাতার মত ছাঁটা হয়েছে। তাতে সৌন্দর্য বেড়েছে।

কাগো, কাগো—কাগো দেখুন—বলে উঠল অনিমা।

সে আবার কি?

ঐ যে—কি সুন্দর মিষ্টি আওয়াজ!

ও ত কাক মনে হচ্ছে—কাগো আবার তোমার কোথায়?

বাঃ! কাক বলে ওদের অপমান করবেন? নিতান্ত অভিমানের সুরেই বললে অনিমা।

তোমার কথাই শিরোধার্য্য। ওরা কাগোই—অমন ছোট্ট ছোট্ট কালো চেহারা আর অমন মিষ্টি সুর—কাকই বা বলি কি করে?

মনোজ বাবু বললেন—অনিমা বোধ হয় কাকের সঙ্গে ওগো যোগ করে কাগো করেছে। তা ঠিকই করেছে। এই সুন্দর পরিবেশে একা একা কি ভালো লাগে—পাশে 'ওগো' না থাকলে? ওর একটা ওগোর সন্ধান করতে হয়—

শেফালীদি' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—বলিহারি তোমাদের কল্পনাশক্তির! কোথা থেকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারো তোমরা—

কাশ্মীরী কাক বা কাগো-প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। বাসের হর্ণ বেজে চলেছে—সময় উত্তীর্ণ। তাড়াতাড়ি সদলে উঠে পড়লাম।

নিশাত-এর পরে পড়ে চশমাসাহী। চশমা শব্দের অর্থ ঝর্ণা। জাহাঙ্গীর এর পরিকল্পনা রচনা করেন আর শাজাহান ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তা কাজে পরিণত করেন। এখানের বিখ্যাত ঝর্ণার জলের হজম করাবার শক্তি ভারত-বিশ্রুত। শোনা গেল, প্রধান মন্ত্রী নেহরুর জন্যে নাকি এখান থেকে জল বিমানে করে প্রায়ই দিল্লী যায়। নিশাতের মত এখানেও ছাদের উপর উদ্যান আছে। তিনটি মাত্র ছাদ। উদ্যানও তেমন সযত্নরচিত নয়। হয়ত বাদশাহী আমলে এর চেহারা অন্যরূপ ছিল।

নসীমবাগের খ্যাতি এককালে খুবই ছিল। কিন্তু ডালহ্রদের তীর বরাবর এর বিস্তৃতি নয়, এটি সহরের মধ্যে। নসীমবাগের অর্থ "শীতল বায়ুর উদ্যান।" চীনার গাছের খ্যাতি এককালে এই উদ্যানে খুবই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এটিকে কাশ্মীর সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবার পরিকল্পনা করেছেন। শিক্ষা-অধিকর্ত্তার কাছে শুনলাম, বাড়ী তৈরীর কাজ এই বছর সুরু হবে আর ৬২ সালের মধ্যে সম্ভবতঃ শেষ হয়ে যাবে। আমরা যেয়ে দেখলাম, উদ্যানও আর কিছু নেই। গাছপালা কেটে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন নির্ম্মাণের উদ্যোগপর্ব্ব চলেছে। তবে নতুন করে উদ্যানও রচনা করা হবে।

একদিন উলার হ্রদ দেখতে যাওয়া হোল। এটি এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ। রাজতরঙ্গিণীর আমলে এর নাম ছিল মহাপদ্মহ্রদ। টুরিষ্ট রিসেপসান সেণ্টার থেকে বাস ছেড়ে যায় বেলা ন'টায়। ভাড়া যাতায়াত ৪'৫০ টাকা।

প্রথম বিশ্রাম গন্ধরবলে। এখান থেকে সিন্ধু উপত্যকার দৃশ্য দেখা যায়। লাডাক বৌদ্ধধর্ম্মের দেশ। গন্ধরবল্ থেকে সাত দিন পদব্রজে যাত্রা করবার পর ১১৩০০ ফিট উঁচু জোজি-লা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে রাজধানী লে অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায়। কাশ্মীরের অন্তর্গত একটি প্রদেশ হচ্ছে লাডাক্। এই লাডাকের বিখ্যাত লামা কুশক বাকুলা এখন কাশ্মীর সরকারে এক মন্ত্রী। গুলমার্গ, পহলগাম, সোনামার্গ, কোকরনাগ আর ইউসমার্গের মত গন্ধরবলও একটা স্বাস্থ্যনিবাস।

এর পর কিছুদূর গেলে উলার হ্রদ চোখে পড়ে। কিন্তু বাস উলার-তীরে অনেক পরে থামে। পথিমধ্যে পড়ে ক্ষীরভবানী। একান্ন পীঠের অন্তর্গত ক্ষীরভবানী মন্দির হিন্দুমাত্রেরই পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে নাকি সতীর কণ্ঠ পড়েছিল। পাথরে বাঁধান একটা বিস্তৃত চত্বরের মধ্যে এই মন্দির। চারিদিকে বিশালকায় চীনারের সমারোহ। এমন মোটা গুঁড়িওয়ালা চীনার গাছ খুব কমই দেখা যায়। ভবানীদেবীর মন্দিরটির তিন দিকেই ক্ষীর বা জলে ঘেরা দেওয়া আছে বলেই ঐ নাম। শোনা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন এবং দৈবাদেশও নাকি পেয়েছিলেন। পাণ্ডারা আছেন কিন্তু অন্যান্য অনেক তীর্থস্থানের মত গলাকাটার জন্য ব্যস্ত নন। স্বল্পেই তাঁরা সন্তুষ্ট। চারিদিকের পরিবেশের মধ্যে একটা পবিত্রতা আছে। দেখলাম, অনেক যাত্রীই পুজো করছেন। হেমপ্রভা ফুল নিয়ে শ্রদ্ধানত হয়ে পুজোয় বসে গেল। দলের কেউ কেউ মনে মনে প্রার্থনা জানালেন ভবানী নেতাজীর উপাস্যা দেবী। শিবাজীও এঁর সাধনা করতেন মনে মনে বললাম—মা বাংলা দেশ থেকে লায়েলাপ্পা দূর কর আর মেঘ করে রেখ না।

মানসবল-এ এসে বাস থামলো। উলার-এর সংলগ্ন এক হ্রদ। দৃশ্যাবলী চমৎকার। যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে এখানে

একটি নূতন ঘর তৈরী করা হয়েছে। সম্মুখের পাহাড়ের ঝর্ণাগুলির চশমাশাহীর মতই সুখ্যাতি আছে। এর পরের দর্শনীয় স্থান হচ্ছে বাতপাব। এখানে বাস দেড় ঘণ্টা থামে। উলার এখান থেকে ভালভাবেই দেখা যায়। যতক্ষণ উলার দেখিনি ততক্ষণ মনে মনে এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ সম্বন্ধে একটা রঙ্গীন কল্পনা ছিল—অবস্থাটা ঠিক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "ইয়েরো আন্‌ভিজিটেড্"-এর বা মোনালিসার হাসির পুরাতন কাব্যিক ব্যাখ্যার মত। কিন্তু যখন সে-রূপ দেখলাম তখন বলতে পারলাম না—

নয়ন ন তিরপিত ভেল।

বড় বড় চড়া পড়ে, চড়ার ওপর আগাছা জন্মে ডাল্ লেকের মতই ওকে নিতান্ত "ডাল্" করে দিয়েছে। তবে বিস্তার বেশ আছে। উলারেও বোটে করে বেড়ান যায়, তবে সহজে নয়। শুনলাম সাত-আট দিন থাকবার চুক্তি করলে তবে বোটওয়ালারা যাত্রী নেয়, খরচও অনেক পড়ে। আমরা কোনও যাত্রীকে উলারে বেড়াতে দেখিনি।

এই উলারের উপরেই বন্দীপুর নামে একটি যায়গা আছে। সেখান থেকে ট্রাগবল্ হয়ে বার্জিল আর কামরী গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে গিল্‌গিটে আর পৃথিবীর ছাদ পামীরে যাওয়া যায়। এখন ও-পথ বন্ধ। গিলগিট পাকিস্থানের অধীনে আর পামীর রাশিয়ায়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে তৎপর।

শোপুর আর বারামূলায় বাস থামে ফেরবার পথে। বারামূলাতে শহীদ শেরওয়ানীর একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ১৯৪৮-এ পাকিস্তানের উস্কানিতে উপজাতিরা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন তারা শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এই বারামূলায় এসেছিল। এক যুদ্ধের পর ভারতীয় সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একে কাশ্মীরের দ্বারও অনেকে বলে থাকেন।

উলারের পথে মানসবল্ হয়ে "লোলা উপত্যকা" আছে। গাইডবুকে এর কোনও উল্লেখ নেই। কাশ্মীর ত্যাগ করবার পর এক কাশ্মীরী যুবক সংবাদটা দেন। তাঁর মতে, সমগ্র কাশ্মীরে নাকি তত সুন্দর উপত্যকা আর নেই। ঐ উপত্যকায় যেতে হলে মানস্‌বল্-এ নেমে বেসরকারী বাসে ৩৫ মাইল যেতে হয়, তারপর কিছুটা পদব্রজে। উপত্যকার মাঝামাঝি একটা হ্রদ আছে; নীল, স্ফটিক স্বচ্ছ নাকি তার জল। এক পাহাড়ের মধ্যে এক গুহা আছে। তার এক প্রান্ত নাকি হাজির হয়েছে রাশিয়ায়। তাই নাম "কারারুশ" বা "রুশের মাথা"। ভদ্রলোকের কাছে গল্প শুনলাম—কয়েকজন ইউরোপীয় বৃটিশ আমলে ১২০০ লোক নিয়ে ঐ সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। অবশ্য ওপাশে যদি সত্যিই রাশিয়া থেকে থাকে তাহ'লে ফেরবার কথা নয়। একটা কিছু রহস্য স্থানটাকে ঘিরে আছে তা না হ'লে সরকারী গাইডবুক-এ তার উল্লেখ নেই কেন? আমাদের আফশোষ হল যে, এমন আশ্চর্য্য যায়গাটা দেখতে পেলাম না?

সোনামার্গ-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার গ্লেসিয়ার বা হিমাবাহ। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ভগীরথীর উৎস-সন্ধানে যেয়ে যে-হিমবাহ দেখেছিলেন, তার স্বরূপ কিছুটা বোঝা যায় সোনার্মার্গের হিমবাহ দেখে। শ্রীনগরের টুরিষ্ট সেণ্টার থেকে সপ্তাহে মাত্র দুদিন বাস ছাড়ে। অন্যান্য দিন সামরিক প্রয়োজনে প্রায়ই পথ বন্ধ থাকে। গুলমার্গ বা খেলন্‌মার্গের মত এখানেও ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়। দৃশ্যাবলী অপূর্ব্ব! হিমবাহ যেখান থেকে বেরিয়ে আসছে তার চেহারা অনেকটা বৃহদাকার মাছের খোলা মুখের মতন।

হাউসবোটের স্থবির জীবন কারো কারো খুবই ভালো লাগে। আমাদের কিন্তু কয়েক দিনেই মোহ কেটে গিয়েছিল। যাদের মধ্যে সেই আদিম বেদুইন জেগে ওঠে, তাদের পক্ষে একই পরিবেশে শান্ত, সমাহিত জীবন কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের রক্তে বোধ হয় তার আহ্বান পৌছেছিল। তাই আমরা 'ফর পাশ্চার্স নিউ'—নূতন পরিবেশের সন্ধানে চলে এলাম ঝিলামের তীরে এক হোটেলে। মোগল আমলের সাতটা সেতু আছে এই ঝিলামের' উপর। অবশ্য এখন সেগুলোর চেহারা কিছুটা আধুনিক করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আছে, কাশ্মীরে আসবার সময় তিনি বহু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন জলপথে আর সৈন্যরা সমান্তরাল ভাবে স্থলপথে। তাদের যাত্রাপথ সুগম করে জাহাঙ্গীর নুরউদ্দিন কুলি বেগকে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন জঙ্গল পরিষ্কার আর নদীর উপর সেতু তৈরীর জন্যে। সেই সময়েই সেতুগুলি নির্ম্মিত হয়। একটা সিকারা নিয়ে ঝিলামের সপ্ত সেতু সহজেই দেখা যায়।

শ্রীনগরের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখবার ইচ্ছা ছিল। শুনেছিলাম, জম্মু কাশ্মীরে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত বিনা বেতনে দেওয়া হয় আর সমূহ অর্থের বোঝাটা ভারত সরকারই বহন করে থাকেন। সুতরাং শুধু চীনার, পপ্‌লার আর তুষার নিয়ে সন্তুষ্ট হতে আমরা পারিনি। তাই একদিন কল্যাণীকে নিয়ে রেসিডেন্সী রোডে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেকটারের অফিসে গেলাম। শ্লিপ্ পাঠাতেই ডিরেক্টার মুক্তার আহম্মেদ নিজে এসে খুবই খাতির করলেন। সহকারী ডিরেক্টরের অফিসে নিয়ে গিয়ে বললেন—প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র যেন আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়।

সহকারী ডিরেক্টার শ্যামলাল রায়না কাশ্মীরী হিন্দু। যথেষ্ট খাতির করে বসিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন। কক্ষে উপস্থিত ছিলেন

জম্মু ও কাশ্মীরের শিক্ষা-বিভাগের শারীর শিক্ষার অধিকর্তা শ্রীযুত মালহোত্র আর জনৈক জীবতত্ত্বের অধ্যাপক।

শ্যামলাল রায়না বললেন—কেমন লাগছে আপনাদের কাশ্মীর?

বললাম—'ইয়েরো রি'ভিজিটেডের' মত নয়। কল্পনার আর বাস্তবের কাশ্মীরকে একই রকম মনে হচ্ছে। যাঁরা ভূস্বর্গ বলেছিলেন, তাঁরা মিথ্যা বলেন নি।

বললেন—তা ঠিক। প্রকৃতি এ দেশে মুক্তহস্তে সৌন্দর্য্য ছড়িয়েছেন কিন্তু একটা জিনিষের খুবই অভাব—অর্থের। দেশটা বড়ই দরিদ্র।

বললাম—আমিও সে-কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। আমরা বাঙ্গালীরা দারিদ্র্যের সঙ্গে চির-পরিচিত। কিন্তু এখানের দরিদ্রদের দেখে সত্যিই বেদনাবোধ করেছি। আপনাদের দেশে মধ্যবিত্ত প্রায় নেই। অবশ্য থাকলে ভাল হত কিনা বলতে পারছি না। কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রাণ উপরের তলার আর নীচের তলার দুই যাঁতার চাপে পিষে ফেলা হচ্ছে। আমাদের দেশে মধ্যবিত্তেরাই সহস্র কষ্ট সহ্য করে সভ্যতার আলোকবর্ত্তিকা তুলে ধরে রেখেছিল। ইংরেজ যাদের বিনষ্ট করতে সাহস করেনি, দিল্লীর মসনদওয়ালারা তাদের জীবনকে নরকে পরিণত করছে। এদের নীতি টেনে ওঠানো নয়—টেনে নামানো। তবুও আমার মনে হয়, মধ্যবিত্ত থাকলে কাশ্মীরে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রী আসতো। তারাই নিত্যনূতন কল্যাণ চেষ্টায় ঝাঁপ দিতে পারত।

কথাগুলো বোধ হয় জোরালো হয়েছিল আর আমার শ্রোতারাও ছিলেন উঁচুতলার মানুষ। সুতরাং কথার মোড় ফেরালেন শারীর শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মালহোত্র। বললেন—দেখুন, আমার মনে হয়, বাঙ্গালীদের সঙ্গে কাশ্মীরীদের একটা নাড়ীর যোগ আছে। নানা ভাবেই তার প্রমাণ পেয়েছি—

মনে মনে খুসি হলেও বললাম—তা হয়ত সত্যি। তবে আমি নৃতাত্ত্বিক নই। তাই জোর দিয়ে স্বীকৃতি জানাতে অক্ষম। তবে মনে হয়, কোনও একটা বন্ধন নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে দেড় হাজার মাইল দূর থেকে বাঙ্গালীরা ছুটে আসবেই বা কেন? প্রতি বছরই ত আমাদের দেশ থেকেই বেশী লোক এখানে আসে। এ-বছরের কথাই ধরুন না। কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত শ্রীনগর নাকি কলকাতা হয়ে গিয়েছিল। আগামী বছর হয়ত আরও বেশী বাঙ্গালী বেড়াতে আসবেন। সুতরাং দৈহিক না থাকলেও আত্মিক সম্পর্ক একটা আছেই।

শ্রীযুত রায়না বললেন—বাঙ্গালীদের আমরা শ্রদ্ধা করি। এদেশে উচ্চশিক্ষার সূত্রপাত করেছেন তাঁরাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাটা কি অবৈতনিক? অগ্রগতি কেমন হচ্ছে? বাজেট কত?

বললেন—এদেশে বিনা বেতনেই প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। গত পাঁচ বছরে আমরা তিন গুণ এগিয়ে গিয়েছি। অগ্রগতির হার দ্রুতই বলতে হয়। আগে বাজেট ছিল ৪০ লক্ষ, এখন আড়াই কোটি টাকা। কিন্তু এ তো সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য। টাকা পেলে দেখিয়ে দিতাম আমরা কি করতে পারি।

শারীরশিক্ষার অধিকর্ত্তা বললেন—টাকাটাই বড় কথা নয়। বিজ্ঞান-সম্মত পরিকল্পনা চাই। তা না হ'লে টাকা কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে।

বললাম—অতি সত্য কথা। দুটোরই দরকার। এ-দুটোর ঠিক ঠিক কো-অর্ডিনেশান না হলে কি দুরবস্থা হয়, তা পঞ্চবার্ষিকীর কল্যাণে বেশ বুঝতে পারছি।

শ্রীযুত রায়না বললেন—এগারো বছরের কোর্স পশ্চিম-বাংলায় কি রকম চালু হয়েছে? তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সেরই বা ভবিষ্যৎ কি?

বললাম—পশ্চিম-বাংলার ১৬৮০টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ২৮০টিতে এগারো বছরের কোর্স চালু করা হয়েছে। সবগুলি অবশ্য সর্ব্বার্থসাধক নয়। সরকারী টাকায় স্কুলের বড় বড় বাড়ীও তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে কিনা, এখনও তা বলা যাচ্ছে না। দু'-পাঁচ বছর পরে সমাপ্তি পরীক্ষার ফল দেখে হয়ত বলা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষক-ছাত্র দু'জনেই মুস্কিলে পড়েছেন। পশ্চিম-বাংলার কলেজগুলির কর্তৃপক্ষরা দীর্ঘকাল তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের বিরোধিতা করেছিলেন। তার ফলে গ্রাণ্টস কমিশনের টাকা তাঁদের হাতে পৌছায়নি। সম্প্রতি তাঁরা নয়া তালিম মেনে নিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে শীগ্‌গির তিন বছরের কোর্স চালু হবে।

কল্যাণী করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল। অর্থটা এই—নীরস আলোচনা রেখে চটপট উঠে পড়ুন। বাইরে যেয়ে পাকৌড়ি খেলে কাজ দেখবে। আমিও চোখের ইঙ্গিতে জানালাম—এই উঠলাম বলে। আবার আলোচনায় ডুবে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা এ-বিষয়ে কি করেছেন?

শ্রীযুত রায়না বললেন—জম্মু আর কাশ্মীরের মাত্র দু'টি স্কুলে আমরা এগারো বছরের কোর্স চালু করেছি। কলেজে তিন বছরের কোর্স এখনও চালু হয়নি। তবে করা হবে স্থির হয়েছে।

বললাম—আপনার কি মনে হয়, নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে? সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়গুলির কাণা-ছেলে পদ্মলোচন হবে না ত? পরিচালনার আর আর্থিক ব্যবস্থার দিক থেকে এগুলো একটা বিপর্য্যয় ডেকে আনবে না কি? ইংলণ্ডে ১৯৩৮ সালের স্পেন্স রিপোর্টে সর্ব্বার্থসাধক স্কুলগুলোকে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল—এ ত আপনি জানেন। বৃটিশ সরকার তারপর মালটিলেটারেল্ বিদ্যালয় গড়তে আর এগোন নি। আমাদের মত দরিদ্র দেশের এতো দুঃসাহস কেন বুঝি না। আমেরিকার টাকা আছে। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। আমাদের তা করা কি তোগলকী পাগলামি নয়? উদ্দেশ্য ভাল হলেই কি কাজ ভাল হয়, না বাস্তব বুদ্ধিরও দরকার?

শ্রীযুত রায়না বললেন—আপনার যুক্তির মূল্য আছে। আমরাও নয়া ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছাইনি—এখনও আমরা ভাবছি।

এর পর তিনি কয়েকটি সার্কুলার টাইপ করিয়ে আমাদের হাতে দিলেন—বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে লেখা। আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৪ সালের প্রথমেই যখন আমি কলকাতায় চ'লে এলুম—ঘটনাচক্রের সঙ্গে জীবনধারাও যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল। জীবন যেখানেই থাক, বাইরে ছিল,—যেন পাশেই ছিল। এখন সে জেলে—কতদিন থাকবে কিছুই ঠিক নেই—বুকের পাশটা যেন খালি হয়ে গেছে। গত কয়েকটা বছর ধরে সে ছিল আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক। আমিও তার ডেপুটী হয়ে উঠেছিলুম। বস্তুত জীবন না থাকলে আমার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ হয়ত অন্য ধারায় চলতো,—আর সেটা হত একটা দুর্বিপাকের নামান্তর।

আমি "জীবনবাবু" লিখি না, কারণ তা লিখতে কেমন যেন বাধে। ১৯২০ সালের আগে পরস্পরে "আপনি" বলেই কথা বলতুম। একদিন জীবন বললে, "আপনি-আজ্ঞে" গুলো আর ভাল দেখায় না, ওগুলো বাদ দেওয়া যাক্,—"তুমি" সম্পর্ক'ই ভাল—কি বলেন? আমি বললুম, "বেশ।" তারপর, কে আগে "তুমি" বলবে, তাই নিয়ে প্রায় ভোটাভুটি! দুদিকেই সমান ভোট—কাজেই ফয়সালা হওয়া মুস্কিল। তারপর জীবন দন্ত বিকশিত করে বললে, "তুমি আগে বলুন!" তারপর একচোট হাসাহাসি হয়ে ফয়সালা হয়ে গেল। সে ফয়সালা আজও বলবৎ আছে,—যেমন শত মতভেদের মধ্যেও মূল আদর্শে মিল বরাবরই আছে।

কলকাতায় প্রথমেই প্রয়োজন হল একটা রোজগারের ঠাট—Ostensible means of livelihood - বরানগরের বাড়ীতে থেকে ভাগ্নীজামাই যা ব্যবসা চালাচ্ছিলেন—ভাড়ার কাজ—সেটার হয়েছিল অন্তিমদশা। তাকে খাড়া করতে গেলে, আর সব ছেড়ে সংসারেই জড়াতে হয়। তখনও কিছু টাকা হাতে ছিল,—তাই দিয়ে কলকাতায় শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এক ঘর ভাড়া করে সারদাকে (ব্যানার্জি) বসালুম—হল এক ফার্ণিচারের ব্যবসা—নিলেম থেকে ফার্ণিচার কিনে বিক্রী। খরচ চলে প্রায় পকেট থেকেই। কিছুদিন পরে ময়মনসিংএর আনন্দ মজুমদার—সুরেনদার এক বৃদ্ধ সহকর্মী—কলেজ রো'তে এক বোর্ডিং করলেন,—বোর্ডাররা সবই দলের লোক—সুরেনদার আড্ডা। আমি সেখানেই নীচের তলায় একখানা ঘর নিয়ে উঠে গেলুম। ২৪ সালের অক্টোবরে সেই বাড়ী থেকেই সুরেন দা' প্রভৃতির সঙ্গে রেগুলেশন থ্রি'তে ধরা পড়ি।

যাই হোক,—ব্যবসার outdoor work করার নামে বাইরে ঘোরাফেরা রীতিমত চললো। চৌরীচৌরা কাণ্ডের পর আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন মোটামুটি ব্যর্থ হল বলেই লোকে ধরে নিয়েছিল,—এবং তারপর মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার ও জেল হওয়াতে আন্দোলনের ভাঙ্গন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। কতকগুলো জায়গায় খদ্দর উৎপাদন কেন্দ্র, আর কতকগুলো জায়গায় একমাত্র সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্বরাজ পার্টির প্রচার কেন্দ্র,—এই ছিল কংগ্রেসের মোট শক্তি। শতকরা ৯০ জন উকীল এবং ছাত্র কোর্ট-কলেজে ফিরে গিয়েছিল,—এবং বহু জায়গাতেই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীও উঠে গিয়েছিল—টালা, বরানগর, আলমবাজারেও।

কিন্তু স্বরাজ্য পার্টির গণভিত্তি রক্ষার জন্যও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। আমি টালায় আবার এক কংগ্রেস কমিটী গঠন করলুম—আলীপুরের উকীল শ্রীরামচন্দ্র মিত্র (অমূল্য সিংহের মাতুল) প্রেসিডেন্ট,—আর আমি সেক্রেটারী। বরানগরে কয়েকজনকে নেড়েচেড়ে দেখে হাল ছেড়ে দিলুম। আলমবাজারে তুলসী ঘোষ ও ধীরেন চাটুজ্যে আবার কংগ্রেস কমিটী করে কাজ করতে রাজী হলেন—সেখানে এক কমিটী হল। ভাটপাড়াতে আমাদের একজন পুরাতন সহকর্মী—নগেন দাস, অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে এক দোকান করে বসেছিলেন, —আর ছিলেন কালী ভট্টাচার্য—আগে তিনি বিপিনদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং পরে হয়েছিলেন একজন শ্রমিক নেতা। যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী বলে আমাদের একটি ছেলেও ছিল (এখন একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার)—এঁদের নিয়ে ভাটপাড়াতেও এক কংগ্রেস কমিটী করা হল।

কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনা ছিল আমাদের লক্ষ্য—আমাদের সংগ্রামশীল চেতনার "দুধের সধ ঘোলে মেটানোর" জন্যে আমরা ধরেছিলুম স্বরাজ্য পার্টির সংগ্রামী কর্মসূচীকে। কিন্তু জনগণের সংগ্রামী চেতনা অন্য দুই ধারায় প্রবাহিত হতে সুরু করেছিল।—এক ধারা হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন,—আর তার মধ্যে ধীরে ধীরে বলশেভিকবাদের অনুপ্রবেশ,—এবং আর এক ধারা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক চেতনা ও হাঙ্গামা। এই সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং হাঙ্গামাটাই সব চেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠছিল,—এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন যেহেতু কংগ্রেসের কর্মপন্থার একটা বড় অঙ্গ, সুতরাং কংগ্রেস নেতারা,—কি হিন্দু, কি মুসলমান,—সকলেই সব চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানেরা মসজিদে নমাজ

পড়ছে,—এমন সময় এক হরিনাম সংকীর্ত্তনের দল এক শবযাত্রা করে যাচ্ছে। মসজিদ থেকে মুসলমানেরা বেরিয়ে বললে—এখন নমাজ হচ্ছে,—তোমরা সংকীর্ত্তন একটু বন্ধ করে যাও। হিন্দুরা রাজী হল না,—মুসলমানরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে শবযাত্রার মিছিল ভেঙ্গে দিলে। এই ভাবে একজায়গায় গোলমাল সুরু হতেই সব জায়গায় সেটা ছড়িয়ে পড়লো অনেক বড় হয়ে! মুসলমানেরা দাবী করলো, নমাজের সময় হোক বা নাই হোক,—মসজিদের সুমুখ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া কোন সময়েই চলবে না। হিন্দুদেরও জেদ চড়লো, তারা মসজিদের সুমুখ দিয়ে সংকীর্ত্তন করে যাবেই—গান-বাজনা থামাবে না। ইটপাটকেল গিয়ে দাঁড়ালো লাঠিবাজীতে। নিত্য নতুন জায়গা থেকে লাঠালাঠির খবর আসে।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে,—স্বরাজ এক বছরে দূরে থাক, কত বছরে হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অসহযোগের ফলে কিছু মুসলমান ছাত্রেরও লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিল,—এখন সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা বলতে সুরু করলে—হিন্দুরা লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে আছে,—তাদের চেয়ে মুসলমানদের ক্ষতি হল বেশী।

খিলাফৎ আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে। মুস্তাফা কামাল পাশা সেভার্ণ সন্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ভারতের খিলাফৎ কমিটী উৎসাহিত হয়ে চাঁদা তুলে একখানা এরোপ্লেন কিনে তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সেই কামাল পাশা যখন নতুন তুর্কী রাষ্ট্র গঠন করলেন, তখন সর্বাগ্রে তিনি খিলাফৎই ভেঙ্গে দিলেন। তুরস্কের সুলতান ছিলেন সমগ্র মুসলমান জগতের ধর্মগুরু। তারই নাম খিলাফৎ। প্রেসিডেণ্ট কামাল পাশা মুসলমান জগতের সঙ্গে তুরস্ককে জড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা তুলে দিলেন এবং তুরস্ককে করলেন একটা মডার্ণ ষ্টেট। ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনের স্বভাবতই সমাধি হয়ে গেল।

ভারতের মুসলমানেরা, যাঁরা খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন, এবং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম করছিলেন, দুই দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে, তাঁদের মনের বিষ সাম্প্রদায়িকতার চোরা গলিতে প্রবাহিত হল। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারের যুগে দিল্লীতে আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে মুসলমানেরা জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দিতে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সুরু হওয়ার পর হিন্দুরা যেমন হিন্দুসভার সংগঠন সুরু করেছিল, তেমনি শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনও সুরু করেছিলেন,—মুসলমানদের "শুদ্ধি" করে হিন্দু করে নিতে সুরু করেছিলেন। আবার হিন্দুদের এই শুদ্ধি ও সংগঠনের পাল্টা ব্যবস্থা সুরু করেছিলেন কংগ্রেস নেতা ডক্টর সৈফুদ্দীন কিচলু (এ যুগে যিনি শান্তি সংসদের প্রেসিডেণ্ট রূপে ষ্টেলিন প্রাইজ পেয়েছেন) কিচলুর আন্দোলনের নাম তবলীগ ও তান্জিম আন্দোলন—মুসলমান সংহতির আন্দোলন। এই সব সংগঠনের যুগে—বোধ হয় ২৩ সালের শেষে—দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একদিন এক মুসলমান আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হলেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো বেড়ে গেল। প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা, এবং তা নিয়ে দাঙ্গাও হল।

এই সব ব্যাপারের পাশাপাশি আর এক রকমের আর একটা আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে সুরু হয়েছিল—সে মুসলমানদের কাউন্সিলে সদস্য সংখ্যা এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধির আন্দোলন। বাংলায় এ আন্দোলন বেশ জোর পেয়েছিল,—কারণ এখানে মুসলমানের সংখ্যা যত বেশী, পদাধিকার ছিল তার তুলনায় অনেক কম। কাজেই দেশবন্ধু মুসলমানদের অসন্তোষ নিবারণের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছিলেন, যাতে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শান্ত হয়। তাঁর নেতৃত্বে এক হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বা চুক্তি হয়েছিল,—যাতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী এবং কিছু বেশী কাউন্সিলের সদস্য পদ এবং চাকুরী স্বীকৃত হয়েছিল,—এবং স্থির হয়েছিল,—হিন্দুরা মসজিদের কাছ দিয়ে সংকীর্ত্তনাদি নিয়ে যাওয়ার সময় মসজিদের কিছু আগে থেকে কিছু পরে পর্যন্ত গান বাজনা বন্ধ করে যাবে,—আর হিন্দুদের ধর্মভাবে যাতে আঘাত লাগে, মুসলমানেরা এমনভাবে গোহত্যাদি করবে না।

স্বভাবতই মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই চুক্তিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছিল,—এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের শান্তি-কামনাও করা হয়েছিল। এমন কি এই, চুক্তির পরে ২৪ সালের প্রথমে (বা ২৩ সালের শেষে?) ঈদের সময়, কলকাতার—ইতিহাসে এই একটা মাত্র বৎসর গো-কোর্বাণী হয়নি—বড় মসজিদে কোর্বাণী হয়েছিল একটা উট,—অন্যত্র ভেড়া। সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত "সারথি" পত্রিকায় আমি এই চুক্তি সমর্থন করে এক প্রবন্ধ লিখেছিলুম (২৪ সাল)—যার জন্যে—সুরেনদা বলেছিলেন—ময়মনসিংএ সারথির কিছু মুসলমান গ্রাহক বেড়েছিল। চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের তরফ থেকে প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল। বিশেষত নো-চেঞ্জার কংগ্রেসীদের তরফ থেকে প্রো-চেঞ্জ নেতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের যেন একটা মহাসুযোগ জুটে গিয়েছিল। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুসভা-ঘেঁষা একটা দল গড়ে ওঠার সূত্রপাত হয়েছিল,—যে দল পরবর্তী কালে হিন্দুমহাসভার রীতিমত বিভাগে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং যখন কোকোনদ কংগ্রেসে দেশবন্ধু তাঁর হিন্দু মুসলমান-চুক্তি মঞ্জুরীর জন্যে উপস্থাপিত করলেন, তখন সে মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যাত হল। মৌলানা মহম্মদ আলী বিরক্ত হয়ে বললেন, আজান আর সংকীর্ত্তনই যদি হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেয়ে বড় ধর্ম হয়, তাহলে আমাদের এ দুশ্চেষ্টা ত্যাগ করাই ভাল।

জেলে মহাত্মাজীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল, এবং তাঁকে যারবেদা জেল থেকে পুণার সাশুন হাসপাতালে এনে অপারেশন করা হয়েছিল,—এবং তিনি আরোগ্য হওয়ার পর গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁর মুক্তির পরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোহাটে এক প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয়, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের হাতে হিন্দুরা বহু সংখ্যায় হতাহত হয়। মহাত্মাজী আত্মশুদ্ধির জন্যে ২১ দিন অনশন করেন। অনশনের সময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে সকল সম্প্রদায়ের নেতারা উপস্থিত হয়েছিলেন।

যাই হোক, এদিকে স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলের সাধারণ সিট প্রায় সবগুলো দখল করেছিল, এবং কলকাতা কর্পোরেশনেরও সব সিট দখল করেছিল। কাউন্সিলের নির্বাচনে দুটো কেন্দ্রে হয়েছিল সবচেয়ে বড় জয়। বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথ পরাজিত হয়েছিলেন বিধান রায়ের কাছে, এবং বড়বাজারে এস, আর, দাশ পরাজিত হয়েছিলেন

সাতকড়িপতি রায়ের কাছে। এস, আর, দাশের তখনকার দিনে, ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেশবন্ধুকে বলেছিলেন,—তোমাদের স্বরাজ যেদিন হবে, সেদিন আমি বিলেতে পালাবো!

বিধান রায়কে নির্বাচনে নামিয়েছিলেন দেশবন্ধু স্বয়ং। তিনি প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কংগ্রেসের সদস্য (চার আনার) হয়ে যাও আমরা তোমাকে ইলেকশনে দাঁড় করাই। বিধান বাবু কংগ্রেস সদস্য হতে রাজী হননি—ইলেকশনেও দাঁড়াতে চাননি। তারপর দেশবন্ধু বলেন,—বেশ, কংগ্রেসের সদস্য না-ই হও,—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রার্থী হয়ে ইলেকশনে দাঁড়াও, আমরা তোমাকে সমর্থন করবো। তা-ই শেষ পর্যন্ত হল, বিধান রায় জিতলেন,—এবং তার পরে কংগ্রেসের সদস্য হলেন।

ময়মনসিং-এ নলিনীরঞ্জন সরকারকেও ইলেকশনে নামিয়ে ছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু,—এবং তিনি পরাজিত করেছিলেন এস, এম, বোসকে, যিনি পরবর্তী কালে বোধ হয় অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। বিপ্লবীরা, বিশেষত যুগান্তর পার্টি,—এবং তার তখনকার নেতা সুরেন দা এই সব নির্বাচনে দেশবন্ধুর স্থায়ী হাতিয়ার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

অনুশীলন পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দুই পার্টির মিলনের স্বপ্ন পর্যবসিত হয়েছিল দুই পার্টির প্রতিযোগিতায়, এবং সে প্রতিযোগিতা ক্রমে রক্তারক্তি পর্যন্ত উঠেছিল। ঢাকা ছিল অনুশীলনের দুর্গ,—ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি তাদের দখল করা চাইই,—অথচ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন শ্রীশ চ্যাটার্জি, যিনি অনুশীলনের লোক নন, এবং দুটো বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাঁর যুগান্তরের দাদাদের সঙ্গে, এবং বিশেষভাবে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। অনুশীলনের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী তাঁর ভগিনীপতি উকীল মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকে শ্রীশ বাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দখল করতে খাড়া করেছিলেন। সে প্রতিযোগিতার মুখে একদিন শ্রীশ বাবুকে খুন করবে ভয় দেখাতে এক ছোকরাকে রিভলবার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল,—কিন্তু ঘটনা গড়ালো অন্য দিকে। ছোকরাকে রিভলভার সমেত ধরে শ্রীশ বাবু পুলিসের হাতে দিলেন।

খবরটা যখন কলকাতায় এল, তখন দেশবন্ধু অনুশীলন পার্টির ওপর চটে আগুন হয়ে গেলেন,—এবং যুগান্তরের দাদাদের তরফ থেকে জীবনকে পাঠানো হল ঢাকায়, এক দিকে শ্রীশ বাবুকে অভয় দেওয়ার জন্যে,—আর একদিকে প্রতুলবাবুকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যে যে, শ্রীশ বাবুর ওপর আর কোন আক্রমণের চেষ্টা হলে যুগান্তর পার্টি সেটাকে নিজেদের ওপর আক্রমণ বলেই মনে করবে। তার পরে আর শ্রীশ বাবুর ওপর আক্রমণ হয়নি।

আর একদিকে রিক্রুটিংয়ের টানা-হেঁচড়া। আগে রিক্রুটিংয়ের প্রসেসটা ছিল এক একটি ছেলের পিছনে ছ'মাস ধরে লেগে থেকে তাদের ভারত মাতার দুঃখে কাতর হতে শেখানো,—এবং কিছু বোমা পিস্তল যোগাড় করে ভবিষ্যতে একদিন ইংরেজগুলোকে মেরে তাড়াতে পারলেই যে ভারতমাতার শৃঙ্খল ঝন ঝন করে ভেঙ্গে যাবে, পরাধীনতার বেদনার টনটনানি আর থাকবে না, এবং স্বাধীনতার পতাকা পৎপৎ করে উড়বে,—এই কথা কটা মুখস্থ করানো। কি করে কতদিনে কি হবে, সেটা দাদারা জানেন, ছেলেদের কাজ শুধু দাদাদের ইঙ্গিতে চলা,—কারণ, তারাতো বিপ্লবের সেপাই মাত্র!

বোমা-বন্দুকের কাজকর্ম যখন সামনে কিছুই নেই,—তখন হবু গ্যারিবল্ডীরা সহজেই কথা কটা শিখে ফেলতে এবং আওড়াতে সুরু করে দিত। এই সহজ রিক্রুটিংয়ের স্থলে এক নতুন প্রসেস্ দেখা দিল,—ছেলেগুলোর দুই কাণ দিয়ে দুই দলের নিন্দে ঢুকতে সুরু করলো। অনুশীলন পরে আসরে নেমেছে, সুতরাং আগে তারা সুরু করে দিতেই প্রসেসটা দুপক্ষ থেকেই পাকা হয়ে গেল—সুতরাং ছেলেগুলো "তেএঁটে মাবতে" শুরু করলো। কিছু দিন টানাটানির মধ্যে দুই দলেরই সত্য-মিথ্যা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নিন্দাগুলো শিখে ফেলে শেষ পর্যন্ত একটা দলে ভিড়ে গিয়ে ছেলেটা আর এক দলের নিন্দা প্রচার করে—এই দাঁড়ালো এ যুগের অনেক ভাল ভাল ছেলেরও পরিণতি। যাদের হাত ফসকে যায়, তারা বলে, ছেলেটা পয়মাল।

ঢাকায় সারা জেলা থেকে ছেলেরা কলেজে পড়তে আসে,—গণ্ডার পাণ্ডার মত দুই দলের এজেণ্ট ষ্টেশনে হাজির থাকে তাদের ধরবার জন্যে,—যে যাকে পারে ধরে নিয়ে যায় নিজেদের মেস-বোর্ডিং বা আস্তানায়—এই হয়ে দাঁড়ালো রেওয়াজ। শেষ পর্যন্ত টানাটানি থেকে ছুরিমারা পর্যন্ত সুরু হল। হাত ফস্কানো ছেলেকে পর্যন্ত ছুরি মারা হয়েছে। ঢাকার অনুশীলনের ইতিহাসে এই ছুরিবাজীর বাহাদুরী একটা রেকর্ড। এ সব কথা বাইরের লোক জানেনা,—কিন্তু জানার প্রয়োজন আছে, পরবর্তী কালের ইতিহাস বোঝবার জন্যে।

প্রায় এই রকম টানাটানি সুভাষবাবুকে নিয়েও চলেছিল। তবে তিনি যেহেতু স্কুল পালানো স্কুলবয় নন, সুতরাং তাঁকে ভারত উদ্ধারের গুপ্তপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে যাওয়া চলে না,—আর কানে কানে অপরদলের নিন্দেও চলে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে পদাঘাত,—I C S চাকুরীর মোহের মস্তকে পদাঘাত,—ছাত্র ও তরুণদের কাছে প্রচুর জনপ্রিয়তা,—অর্থাৎ বোমা-বন্দুক-খুন ডাকাতির সম্পর্ক ছাড়া সকল বিষয়েই নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন। সুতরাং তাঁকে রিক্রুট করার একমাত্র কায়দা হল গুণমুগ্ধ ভক্তের মতন "ফোলানে" কথা বলা। তাঁকে নিয়ে দুই বিপ্লবী দলে তারই প্রতিযোগিতা চলেছিল। কিন্তু সে পরবর্তীকালের কথা—পরে হবে।

২৪ সালে তিনি ছিলেন নেতৃত্ব-লোভহীন বিনয়ী নীরব কর্মী। তাঁকে নেতা করে অনুশীলন পার্টিকে নিয়ে কাজ করার যে প্ল্যান উপেনদা করেছিলেন,—সেটা ফেঁসে গিয়েছিল,—এবং তার একমাত্র ফল হয়েছিল,—যুগান্তরের দাদারা বুঝলেন উপেনদাকে কনট্রোল করা যাবে না,—সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন দাদাকে কোণঠাসা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অমরদাকেও তাঁরা খরচের খাতায় লিখলেন, কারণ তিনি উপেনদার পরামর্শেই চলেন, এবং চলবেন।

এদিকে গোপী শার ফাঁসীর পর একদল ছাত্র তার মৃতদেহ নিয়ে সৎকার করবে বলে দাবী করলে—সুভাষবাবু তাদের নেতৃত্ব নিয়ে জেল গেটে গিয়ে হাজির হলেন। স্বরাজপার্টি উপলক্ষে তাঁর যে বিপ্লবী দাদাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা I Bর অজানা নয়। তারপর এই ঘটনায় তাঁর নাম I.Bর খাতায় পাকা হয়ে গেল।

গোপী শা'র সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেছিলেন, তার প্যাট্রিয়টিক মোটিভ থাকতে পারে,—কিন্তু সে কাজটা করেছে অত্যন্ত গর্হিত। দেশবন্ধু বলেছিলেন, তার কাজটা ঠিক হয়নি বটে, কিন্তু তার দেশপ্রেমের তুলনা নেই। এই দুরকমের কথা নিয়ে অ্যালবার্ট হলের এক সভার নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ দুই দলে প্রায় মারামারি হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।

যুগান্তরের দাদারা সরস্বতী লাইব্রেরীর সুবাদে গোপীকে নিজেদের দলের ছেলে বলে দাবী করেন,—কিন্তু তার উপর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রো: জ্যোতিষ ঘোষ (মাষ্টার মশাই)—যিনি সন্তোষ মিত্রেরও সমর্থক ছিলেন। যুগান্তরের দাদারা যে তখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরোধী, এটা ভুললে চলবে না।

যাই হোক, স্বরাজ্যদল কর্পোরেশন দখল করার পর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ নিয়ে এক গণ্ডগোল সৃষ্টি হল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে জয়ী হয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছেন,—তিনি চান, তাঁর কর্মশক্তি প্রমাণ করার বৃহত্তর ক্ষেত্র কর্পোরেশনের কর্মকর্তৃত্ব। দেশবন্ধু স্থির করলেন, তাঁকেই সে পদে বসাবেন।

কিন্তু যে স্বরাজ্য পার্টির সাফল্যের জন্যে যুগান্তরের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, সেই স্বরাজ্যদলের হাতে কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব আসার পরেও সেই যুগান্তর দলের অর্থসমস্যার কোন সুরাহা হবে না,—এ কেমন কথা? ঝুনো শাসমলের গায়ে দাঁত বসানো অসম্ভব,—সুতরাং সুরেন দা ঠিক করলেন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা করতে হবে সুভাষ বাবুকে। তাতে সুভাষ বাবুর সঙ্গেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে, আর কতকগুলো ছেলের চাকরী-বাকরী এবং কিছু অর্থের সংস্থানও হবে। তিনি সুভাষ বাবুকে বললেন। সুভাষ বাবু বললেন, তা কেমন করে হবে?—দেশবন্ধু যে শাসমলকেই বসাতে চান।

তখন নাকি সুরেন দা বাসন্তীদেবীকে গিয়ে ধরলেন, এবং তাঁকে দিয়ে দেশবন্ধুকে রাগ মানিয়ে শাসমলের বদলে সুভাষ বাবুকে কর্পোরেশনের গদীতে বসাবার ব্যবস্থা করলেন। শাসমল বিপ্লবী দাদাদের ওপর এমন ক্ষেপে গেলেন যে, ২৫ সালে (কৃষ্ণনগর)—প্রাদেশিক কনফারেন্সে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বললেন, এরা দেশের জন্যে ডাকাতি সুরু করে' শেষ পর্যন্ত পেশাদার চোর ডাকাতে পরিণত হয়!

ঘটনা সব দেখে যাচ্ছিলুম। খাটছিলুম আর চিন্তা করছিলুম। ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল,—অনেক জিনিষই নতুন ভাবে দেখতে সুরু করেছিলুম। হিন্দু-মুসলমান মিলন যে ধর্মের দোহাই দিয়ে হবার নয়,—ধর্মের—দার্শনিক বা নৈতিক কাঠামোর যে জনগণ পরোয়া করে না,—ধর্মের আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গ নিয়েই যে তাদের কারবার, সুতরাং ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলন কোন দিনই হবে না,—বরং দেশের শতকরা ৯৯ জন মানুষই শ্রমজীবি কৃষক-শ্রমিক বলে তাদের জীবনের বাস্তব অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের মধ্য দিয়েই দেশের শতকরা ৯৯ জন হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব,—এই সব কথা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে শিকড় গাড়ছিল।

আর বিপ্লব? শতকরা ৯৯ জন শোষিত শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামী সংগঠন,—সেটাই কি বিপ্লবের সব চেয়ে বড় আয়োজন নয়? শোষণের অবসানের চেয়ে বিপ্লবের আর কি মহত্তর উদ্দেশ্যই থাকতে পারে? এ সব কথাও ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার অজস্র বাধা এবং বিপরীত যুক্তিও তখনও মনের মধ্যে একটা বিরাট অস্পষ্ট হিজিবিজির মত ঘুরপাক খাচ্ছিল।

জীবনের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্যে মনটা ছটফট করছিল, কিন্তু তার তো উপায় নেই—সুতরাং ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম, —বাইরে থেকে রাজবন্দীদের যখন জিনিসপত্র পাঠানো যায়,—জেল গেটে দিয়ে এলে রাজবন্দীরা পায়,—সেই রকম কিছু চেষ্টা করতে হবে। তদনুসারে শেষপর্যন্ত একদিন এক হাঁড়ি বাগবাজারের রসগোল্লা নিয়ে (বোধ হয় দশসের) মেদিনীপুরে রওনা হলুম—এবং বৃদ্ধ উকীল শ্রীশীতল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হলুম। রাত্রে তাঁর বাড়ীতে থেকে সকালে জেল গেটে উপস্থিত হলুম হাঁড়ি নিয়ে। আমার নামটা এবং রসগোল্লার হাঁড়িটা পৌঁছে গেল নির্বিবাদে,—কিন্তু দেখাটা কিছুতেই সম্ভব হল না। যাই হোক, রসগোল্লা পেয়ে এটুকুতো অন্তত বুঝবে যে, খবর সব ভাল! আমি যে কলকাতায়, এটাও বুঝবে।

কর্পোরেশনের ফাষ্ট ডেপুটী এক্সিকিউটিভ অফিসার করা হয়েছিল নোয়াখালীর উকীল হাজি আবদুর রসিদ খাঁকে। নোয়াখালীর সত্যেন্দ্র মিত্র, আমাদের সত্যেনদা ছিলেন স্বরাজ্য পার্টির সেক্রেটারী। উপেনদার সহকর্মী আন্দামান ফেরৎ বিভূতি সরকারও একটা চাকুরী পেয়েছিলেন,—ট্যাক্স কালেকটিং সরকার! বহুকাল সেই চাকরী-করতে করতেই তিনি মারা গেছেন।

এক নেতার এক "বাহন" ছিল—লোকে তাকে বাহনই বলতো, এবং কেউ কারো কাছে অমুকের বাহন বললেই লোকে তাকে চিনতেও পারতো। সে হয়ে গেল এক লাইসেন্স ইনস্পেক্টর। ঐ নেতাটি কিন্তু জেলে যাননি। যখন একে একে সব নেতা জেলে যাচ্ছেন, তখন তিনি কাশীবাসী হয়েছিলেন।

যাই হোক, চাকরী বণ্টনের এই সব বিশেষ বিশেষ নমুনা ছাড়াও, এমন একটা নমুনা ছিল, যার তুলনা হয় না। বিপ্লব যাদের লক্ষ্য, তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় একা একা কানেকানে কথা বলতে। সকলে সব কথা জানতে পায় না,—ভজাভজি নেই। এ অবস্থায় পাকা জুয়াচোরেরা সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেই সফল হতে পারে। এই রকম এক জুয়াচোর মাঝে থেকে একটা বেশ বড় চাকরী বাগিয়ে নিয়েছিল। উপেনদা বলতেন, বেঁটে লোকগুলো হয় ত্যাঁদোড়,—আর ঢ্যাঙাগুলো হাঁদা। ঘুঘু, শয়তান, ধুরন্ধর অর্থেই উপেনদা "ত্যাঁদোড়" কথাটা বলতেন। উদাহরণও দিতেন কিরণশঙ্কর এবং অমরদাকে (চাটুজ্যে) দেখিয়ে। তিনি নিজে বেঁটে ছিলেন, একথা তাঁকে বললে বলতেন,—বেশ, মিলিয়ে নাও।

কর্পোরেশনের ঐ জুয়াচোরটা ছিল অতি-বেঁটে। তাঁর কায়দাটা ছিল চমৎকার। একটা গরীব জুয়াচোরের সত্যিকারের দৃষ্টান্ত দিলেই কায়দাটা বুঝতে পারবেন।

এক ব্যবসায়ী গুদাম থেকে দোকানে এক গাড়ী (গরুর গাড়ী) মাল নিতে এসেছেন, সঙ্গে আর লোক নেই। রাস্তা থেকে একটা গাড়ী ডাকলেন,—গাড়োয়ান গাড়ীটা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে,—আর গাড়ীর পিছনটা ধরে একটা খোট্টা হেঁটে আসছে। গুদামের সামনে এসে মালিক বললেন, গাড়ী ঘুরাও। খোট্টাটাও বললে ঘুরাও।

গাড়োয়ান মাল বোঝাই করে নিলে, খোট্টাটা তাকে সাহায্য করলে। মাল নিয়ে গাড়ী চললো দোকানের ঠিকানা লেখা "পুর্জা" নিয়ে,—খোট্টাটাও চললো।

গাড়ী দোকানে পৌঁছালো,—খোট্টাটা সঙ্গে নেই। ভাড়া দেওয়া হল, গাড়োয়ান বললে, আউর দশ আনা? মালিক বললেন, কাহে? গাড়োয়ান বললে আপকা আদমী আপকা ওয়াস্তে মাঙ্গ লিয়া। মালিক অবাক।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, খোট্টাটা জুয়াচোর। সে এমন বেপরোয়া ভাবে মালিক ও গাড়োয়ানের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল যে, গাড়োয়ান বরাবর তাকে মালিকের লোক মনে করেছে, আর মালিক মনে করেছেন, ও গাড়োয়ানের লোক। গাড়ী গুদাম ছেড়ে কিছু দূর আসতেই সে গাড়োয়ানকে বলেছে, তুমারা পাশ রুপেয়া হায়?—একঠো দেওতো,—বাবুকা পাশ খুচরা রুপেয়া নেই হায়,—দুকানমে যাকে ভাড়াকা সাথ দিয়া যায়গা। গাড়োয়ান বলেছে, রুপেয়া নেই হ্যায়, দশ আনা পয়সা হ্যায়। সে বলেছে, আচ্ছা ওহি দেও। বলে সে দশ আনা পয়সা নিয়ে সরে পড়েছে।

এ জুয়াচোরটাও ঠিক ঐভাবে সুভাষবাবু ও সুরেনদার মাঝখানে ঢুকে পড়েছিল। কখনো বা সুরেনদা দেখেন সে সুভাষবাবুর সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা কইচে একা,—তিনি বোঝেন, ও সুভাষবাবুর বন্ধুলোক,—আবার কখনও বা সুভাষবাবু দেখেন সুরেনদার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ ভাব,—তিনি মনে করেন সেও একজন বিপ্লবী, সুরেনদার দলের লোক। অথচ সে কোন কালেই না ছিল সুভাষবাবুর, না ছিল সুরেনদার দলের।

যাই হোক, ছোটবড় চাকরী অনেকেই পেয়েছিল। চাকরী পাওয়ার আগে এবং চাকরী পাওয়ার পরে মানুষ একরকম থাকতে পারে না,—যেমন এডওয়ার্ডস টনিক বা সুরবল্লী কষায় খাওয়ার আগে আর পরে মানুষ একরকম থাকতে পারে না। বড় চাকরী বণ্টন মারফৎ দলের কিছু অর্থসংস্থানের আশা স্বাভাবিক,—কিন্তু চাকরী বণ্টনের পরে দেখা যায়, অনুগত অনুগৃহীত বিপ্লবের বন্ধু—"কালেভদ্রে" কিছু চাঁদা এবং মাঝে মাঝে কিছু চা-সিঙাড়া ছাড়া বিপ্লবের জন্যে আর কিছু ছাড়তে নারাজ। সবই দেখলুম এবং জ্ঞানলাভ করলুম। কিন্তু তখনও মুখ ফুটতে দেরী ছিল।

তারপর,—১৯২১-২২ সালে যুগান্তর অনুশীলন দুই দলেরই কিছু অর্থের সংস্থান ছিল, এক দলের সংস্থান কংগ্রেস থেকে,—আর এক দলের ভারত সেবক সংঘ থেকে। ২২ সালের পর দু'দলেরই আগের সংস্থান ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু যুগান্তর দল পেয়েছে দেশবন্ধু ও স্বরাজ্যদলকে,—অনুশীলন তা পায়নি। কাজেই তারা মাঝে মাঝে এক-আধটা জায়গায় ওল্ড মেথড চালিয়ে যাচ্ছিল। ২৪ সালে যুগান্তর দল পেলো কর্পোরেশনের সুযোগ।

কিন্তু স্বরাজ্যদলেরও টাকার প্রয়োজন বেড়ে চলছিল। অর্থাগমের নতুন স্থায়ী পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দেশে অনেক মঠ-মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, যেগুলো লুটে খায় জুয়াচোর সেবাইৎ-মোহান্তের দল। সেগুলোকে পাবলিক ম্যানেজমেণ্টের হাতে আনতে পারলে, এবং সেখানে নিজেরা বসতে পারলে, অতিথিসেবাও নিয়মিত হতে পারে,—প্রজাদের জন্যে নানাবিধ কল্যাণকার্যেরও ব্যবস্থা হতে পারে,—আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ সংগ্রামের কিছু স্থায়ী অর্থসংস্থানও হতে পারে।

হাতের কাছে ছিল তারকেশ্বর মন্দির—বিরাট আয়, অথচ মোহান্ত একটা দুশ্চরিত্র জমিদার ছাড়া আর কিছুই নয়। মোহান্তকে গদীচ্যুত করে ম্যানেজমেণ্ট দখল করতে পারলে ঐ বিরাট আয় দেশের ও দশের কাজে লাগানো যায়। সুতরাং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেসীরা প্রজাদের তরফ থেকে আন্দোলন সুরু করলে। ইতিপূর্বেই অসহযোগ আন্দোলনের এক "বেওয়ারিশ" নেতা স্বামী বিশ্বানন্দ এবং "হঠাৎ স্বামী" সচ্চিদানন্দ (দুজনেই খোট্টা) স্থানীয় লোকদের সাহায্যে মন্দিরটা দখল করে বসেছিলেন—স্থানীয় লোকেরা মন্দিরের আশেপাশের রাস্তা জোড়া করে দিনরাত পালা করে বসে থাকে, মোহান্তের লোকেরা মন্দিরে ঢুকতেই পারে না। মন্দিরের দৈনন্দিন আয়টা স্বামীদের হস্তগত হয়েছে,—মোহান্তের লোকদের সঙ্গে স্থানীয় লোকের গুঁতোগুতি চলছে,—এবং যথাশাস্ত্র দুই "স্বামী"তেও ঠোকাঠুকি সুরু হয়েছে। বিশ্বানন্দ হটে গেছেন, সচ্চিদানন্দ মন্দিরের পাশেই আস্তানা গেড়েছেন প্রায় পাকাপোক্ত ভাবে।

কিন্তু আইনগত সমস্যা হচ্ছে মোহান্তকে গদীচ্যুত করে দেবোত্তর এবং বেনামী জমিদারী দখল করা। আবার আইনগত সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে ব্রাহ্মণ সভা (ভাটপাড়া)।—তারা তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার এক বংশধর খুঁজে বার করে তাকে দিয়ে আদালতে নালিশ করিয়েছে—দুশ্চরিত্র মোহান্তকে গদীচ্যুত করে মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজমেণ্টের ভার ব্রাহ্মণসভার হাতে দেওয়া হোক।

দেশবন্ধু সে মামলারও বাদী, মোহান্তরও বাদী—একটা ত্রিভুজাকার মামলা চলে। এ দিকে মোহান্তর বাড়ী দখলটা মন্দির দখলের পরবর্তী সমস্যা—তার জন্যে সুরু হল সত্যাগ্রহ। প্রথম দিন মিটিং করে বহু লোক জড়ো করে—বাইরে থেকে, কলকাতা থেকেও অনেক লোক এসেছিল—বেশ বড় একদল ভলাণ্টিয়ার মোহান্তর বাড়ীতে হানা দিলে। গেটে পুলিস পাহারাও বাড়ানো হয়েছিল। ভলাণ্টিয়ারা গ্রেপ্তার হল,—খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। নানা স্থান থেকে ভলাণ্টিয়ার আসতে লাগলো। একটা ক্যাম্প তৈরী হল ভলাণ্টিয়ারদের থাকা-খাওয়ার জন্যে। ক্রমে শেওড়াফুলীতেও দ্বিতীয় একটা ক্যাম্প হল! তারকেশ্বর ক্যাম্পের চার্জে সুরেনদা ময়মনসিং থেকে "নিজস্ব লোক" এক সতীশ চক্রবর্তীকে বসালেন, আর শেওড়াফুলীর ক্যাম্পে থাকলেন পাঁচু দা' (ব্যানার্জি)। পরে এই সতীশ চক্রবর্তী কর্পোরেশনে একটা বড় চাকরী পেয়েছিলেন।

প্রথম উত্তেজনা যথাশাস্ত্র মিটিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভলাণ্টিয়ারও কমতে লাগলো। প্রত্যহ ৪ জন করে ভলাণ্টিয়ার মোহান্তর গেটে নির্দিষ্ট সময়ে গেপ্তার হয়, তার পর দিনরাত চলে ভ্যারেণ্ডা ভাজা। নতুন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে প্ল্যান হল, স্বামী সচ্চিদানন্দকে সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়াতে হবে—তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরবে—সচ্চিদানন্দকে মন্দির থেকে হঠানো হবে। কিন্তু সে কিছুতেই নড়তে চায় না,—নানা অজুহাতে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে এক দিন স্বয়ং দেশবন্ধু এলেন তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে। দেশবন্ধু আসছেন শুনে বিরাট ভিড় হল মন্দিরের কাছে, দেশবন্ধু সেই ভিড়ের সামনে সচ্চিদানন্দের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন—লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

তারপর ঘরের ভেতরে সচ্চিদানন্দকে ডেকে নিয়ে দেশবন্ধু রুদ্রমূর্তি ধরে বললেন, মোহান্ত হবার সখ হয়েছে?—কাল যদি সত্যাগ্রহ করে জেলে না যাও, তা হলে—ইত্যাদি—

সঙ্গে সঙ্গে কাগজে খবর বেরিয়ে গেল, স্বয়ং স্বামী সচ্চিদানন্দ কাল সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করবেন। এই সূচিকাভরণ চিকিৎসার ফলে আবার কিছু ভলান্টিয়ার এল,—কিন্তু সে যেন নিদানের ওষুধ,—প্রদীপ নিভবার আগে একবার জ্বলে ওঠার মতন। সুতরাং তখন দেশের নানা দিকে "দলের" লোক পাঠিয়ে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে আনার প্লান হল। আমাকে পাঠানো হল বিক্রমপুরে—আমি সেখানে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে জন ২০ ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। সুরেনদার প্রধান দায় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ—তিনি কোন রকমে কাজ চালান।

এই হুড়-হাঙ্গামার মধ্যে মধ্যে কর্পোরেশনের কাজ আছে,—আর তার ওপরে আছে কাউন্সিলের কাজ। নতুন শাসন-সংস্কারে ব্যবস্থা হয়েছিল, মন্ত্রীদের বেতন কাউন্সিলের ভোটে পাশ করাতে হবে। বৈধ বিধিব্যবস্থার এইখানে একটু ফাঁক, একটু দুর্বলতা আবিষ্কার করে দেশবন্ধু এইখানেই আঘাত হানার ব্যবস্থা করছিলেন। মন্ত্রীদের বেতন বছরে ৬৪০০০৲ টাকা নির্ধারণ করে সরকার কাউন্সিলে এক বিল উপস্থাপিত করলেন। স্বরাজ পার্টি তার এক সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন,—মন্ত্রীদের বেতন বছরে এক টাকা।

সাধারণ ছাড়াও যেসব বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী ছিল, তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে দেশবন্ধুর খাতিরে এবং অনুরোধে স্বরাজ্যদলের দিকে ভোট দিলেন—স্বরাজ্যদলের সংশোধন প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। ব্যাপারটাকে মন্ত্রীদের প্রতি কাউন্সিলের অনাস্থার সামিল বলে গণ্য করা হল,—মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। স্বরাজ পার্টির জয়জয়কারে দেশ উদ্বেল হয়ে উঠলো।

এদিকে মহাত্মাজী অবস্থা বুঝে ঘোষণা করলেন—বর্তমান অবস্থায় স্বরাজ পার্টির কর্মসূচীই কংগ্রেসের কর্মসূচী বলে গৃহীত হওয়া কর্তব্য। তিনি নিজে তখনকার মত কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বরাজ পার্টির হাতে দিয়ে সরে গিয়ে অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে তাঁর ভক্তবাহিনী নিয়ে চরকা-খদ্দরের কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন।

ওদিকে শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল গান্ধী-কংগ্রেসের মোহ কাটিয়ে নিজেদের বিশেষ পথে, এবং তার মধ্যে জঙ্গীভাব এবং বলশেভিকবাদের প্রচার বেড়ে চলছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (কমিউনিষ্ট—মস্কো) প্রেসিডিয়ামের সদস্য এম, এন, রায়ের যোগাযোগে বাংলায় মোজাফ্ফর আহমদ প্রভৃতি ক্রমশ ধীরে ধীরে বলশেভিকবাদের আদর্শ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন—যেমন বম্বেতে ড্যাঙ্গে, মাদ্রাজে শিঙ্গারাভেলু প্রভৃতি—

২০ সালের আগে শ্রমিক আন্দোলন ছিল প্রধানত শ্রমিকদের মধ্যে জনকল্যাণের কাজ—সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল নাম মাত্র। ২০ সালে লালা লাজপৎ রায়কে সভাপতি করে প্রথম এক সভায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের চেষ্টা হয়। তার পর অসহযোগ আন্দোলনের হুড়োহুড়ি থামলে ২২ সালে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে প্রথম সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইউনিয়নের সংখ্যাও নিতান্ত কম, এবং অতি অল্প-শ্রমিকই তাতে সংঘবদ্ধ ছিল। কিন্তু আন্দোলন তাড়াতাড়ি বেড়ে চলছিল,—এবং সরকারের নির্বোধ নির্যাতন নীতির ফল বিপরীত হয়ে শ্রমিক সংঘগুলো ক্রমে সুসম্বদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে বম্বের গিরনি কামগর ইউনিয়ন। একবার ধর্মঘট হল—সরকারী সাহায্যে এক পাঠান শ্রমিক বাহিনী রিক্রুট করে লাগিয়ে দেওয়া হল ধর্মঘট ভাঙ্গতে। ফলে একদিকে বম্বে সহরে লাগলো এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কিন্তু গিরনি কামগর ইউনিয়ন হয়ে উঠলো সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ইউনিয়ন। তার নেতাদের অন্যতম ছিলেন মিরাজকর, যিনি এযুগে বম্বের মেয়র হয়েছিলেন।

যাই হোক,—বলশেভিকবাদের প্রচার অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্যে সরকার ২৪ সালে কাণপুরে এক বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করলেন। বলশেভিক এজেন্টে বলে আটজনের নামে মামলা হয়েছিল।—তার ১ নম্বর আসামী এম এন রায়—তিনি দেশে ছিলেন না বলে তাঁকে হাজির করা যায় নি। মাদ্রাজের শিঙ্গারাভেলুর স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাঁকেও হাজির করা হয়নি—লোকে বলে তিনি নাকে খৎ দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন। পাঞ্জাবের এক প্রোফেসর—গোলাম হোসেন বা ঐ রকম কি নাম—তিনি নাকি স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন, পার্টির জন্যে প্রেস করবো বলে এম এন রায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মেরে দিয়ে আমি নিজের নামে প্রেস করেছি,—সরকারের তো আমাকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত!

শেষ পর্যন্ত—মামলায় বাংলার মোজাফ্ফর আহম্মদ ও কুতুবুদ্দিন আহম্মদ বম্বের ড্যাঙ্গে এবং সওকৎ ওসমানী (কোথাকার, তা ভুলে গেছি)—এই চারজনের কারাদণ্ড হয়। বলশেভিকবাদ প্রচার কিছু দিনের জন্যে থমকে যায়।

এদিকে নূতন মন্ত্রী নিয়োগ করে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের ৬৪০০০ টাকা বেতনের বিল দ্বিতীয়বার কাউন্সিলে পাশ করাতে চেষ্টা করে, এবং সেবারও পরাজিত হয় এবং স্বরাজ পার্টির সংশোধনী প্রস্তাব ১ টাকা বেতন পাশ হয়। সেবার পদচ্যুত মন্ত্রী প্রভাস মিত্রকেও দেশবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সম্মত করিয়েছিলেন। মোট ভোট গুনতি করে সরকার ও স্বরাজ পার্টির পক্ষীয় নিশ্চিত ভোট বাদে কয়েকটা অনিশ্চিত ভোট স্বপক্ষে আনতে পারলেই মেজরিটী হয়—এইভাবে হিসাব করে, অনিশ্চিত ভোটের মধ্যে কটা ভোট হাত করতে হবে,—এবং তার জন্যে কাকে কাকে হাতাবার কি চেষ্টা করতে হবে, স্থির করা হয়। গণতন্ত্রের এই কসরৎ একটা দেখবার জিনিস—দেখলাম।

শেষ পর্যন্ত একজন এম, এল, সি-কে দুদিন একটা বিশেষ জায়গায় আটকে রেখে দেওয়া হল, আমোদ-প্রমোদের সর্ববিধ আয়োজনের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখে। তার জন্যে একদল অনুরূপ রসিক কর্মী বিশেষ ভাবে নিয়োজিত থাকলো এবং এই ভাবে সরকার পক্ষের একটা ভোট নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হল। সরকার পক্ষের আর একটা ভোট নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা হল—তিনি ময়মনসিংয়ের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী। অন্যভাবে কায়দা করতে না পেরে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে আটকে রেখে দেওয়া হল—তারকেশ্বরের মন্দির আগলাবার কায়দায়। তাঁর সুখিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীর দরজার ভিতর

থেকে সুরু করে' চারিদিকের রাস্তায় জনতার এমন ঠাসা ভিড় সৃষ্টি করা হল যে, তিনি বাড়ী থেকে বেরোতেই পারলেন না—ঠিক যখন কাউন্সিলে ভোটাভুটী চলছে। আমরাও সেখানে ছিলুম। সরকার পরাজিত হয়েছে বলে খবর আসার পর তুমুল জয় ধ্বনির মধ্যে পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। এখনকার গান্ধীরাজ হলে অবশ্য লাঠি-গুলী চলতো, এটা এখন সবাই বোঝে, কিন্তু তখন লাঠিগুলী এত সস্তা ছিল না। এ হল ২৪ সালের ২৬ শে আগষ্টের কথা।

মাঝে মাঝে এই রকম ঘোলেই আমাদের সংগ্রামের দুধের সখ মেটে। আনন্দবাবুর বোর্ডিংয়ে রাত্রে দোতালার ঘরে একটা আড্ডা জমে, বাইরের লোকও আসে,—আমরাও গিয়ে বসি। জিতেন লাহিড়ীও প্রায়ই আসেন। হরিদা (চক্রবর্তী) এবং অমর বোসও। আর মাঝে মাঝে ক্যারিকেচারিষ্ট অতুল সেন। তিনি এলে একটু হাস্য-কৌতুক হয়। অন্যদিন হয় দলের Informal meeting এর মত আলোচনা,—বর্তমান কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের আশার স্বপ্ন নিয়ে। চুপি চুপি কথাও দুচারটে হত।

বোমা-বন্দুকের মত বিপজ্জনক রাজনীতি ও গুপ্ত সমিতির আমলে রেওয়াজ ছিল, একজন বিপ্লবীর কাছে একজন তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে "আমাদের লোক" বলে সুপারিশ করলেই সে ঐ তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে অবাধে বিশ্বাস করে। সে যুগে সেটা ছিল এক অপরিহার্য ব্যবস্থা,—এবং তাতে কোন ক্ষতিও হত না,—কারণ লঘুভাবে কেউ কাউকে সুপারিশ করতে পারতো না সে যুগে।

কিন্তু যখন বোমা-বন্দুকের মতন বিপজ্জনক ব্যাপার কিছুই নেই,—অথচ সে যুগের রেওয়াজটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে,—তখন অত্যন্ত লঘু ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবেই—এমন কি দাদারাও—অনেককে "আমাদের লোক" বলে চালাতেন :—নিত্য নূতন "আমাদের লোক" দেখা যেত,—এবং বিশ্বাসও করা হত লঘুভাবেই। ফলে জুয়াচোর বা গুপ্তচরদের নিশ্চয়ই খুব সুবিধে হয়েছিল। বস্তুত গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে সকল দাদাই বুঝতেন যে, সরকার আমাদের দলের ভিতরকার কথা, খুঁটিনাটি কথাও, প্রায় সবই জানে। সম্ভবত আনন্দবাবুর বোর্ডিংয়েরও সকল কথা তারা জানতো।

এইভাবে দিন কাটে। আমার নীচের ঘরে গরম—কাজেই মাঝে মাঝে খোলা ছাদে শুই। প্রকাণ্ড ছাদ,—অনেকে রোজই ছাদে শোয়। এমনিভাবে একদিন সারা ছাদ জুড়ে অনেকেই শুয়ে আছি,—হঠাৎ সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চাইতেই টর্চের আলোতে চোখ ধেঁধে গেল। ছাদ ভরে গিজগিজ করছে পুলিশ,—আরো আসছে। বুঝলুম, আপাততঃ লীলা সাঙ্গ হল। কাকে কাকে নেবে কে জানে—সুরেনদা তো আছেন-ই। নরেশদা এবং মণিদাও (চৌধুরী) আছেন। এঁরা গেলেই সব গড়বড় হয়ে যাবে।

সবাই চললেন নিজ নিজ ঘরে—আমরাও। সকলেরই পিছু পিছু চললো কয়েকজন করে পুলিশ এবং অফিসার। সমগ্র বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে সার্চ হল। এসেছিল ভোর হওয়ার আগে—বেলা অনেক হল সার্চ শেষ করতে। তারপর কয়েকজনকে নিয়ে গিয়ে তুললে গাড়ীতে—আমাকেও। সারদাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, অবস্থা বুঝে যা ভাল মনে কর, অসঙ্কোচে ক'রো।

সে হচ্ছে ২৪ সালের ২৫শে অক্টোবরের সকাল। একবার ইলিসিয়াম রো দেখিয়ে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানেই প্রথম দেখলুম আমাদের ওয়ারেণ্ট রেগুলেশন থ্রি অনুসারে—অর্থাৎ ষ্টেট প্রিজনার—ভারত সরকারের বন্দী। ঐদিন এক অর্ডিন্যান্স জারী হয়েছিল, এবং সারা বাংলায় খানাতল্লাসী করে প্রায় দুশো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতা এলাকার অর্ডিন্যান্স প্রিজনারদের নিয়ে গিয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে।

সেন্ট্রাল জেলে ষ্টেট ইয়ার্ড বা সিগ্রিগেশন ইয়ার্ডে আমাদের তুললে। দেখলুম আমরা ১৮ জন জমেছি—সুভাষবাবু এসেছেন, অনিলবরণ রায়ও এসেছেন,—তাছাড়া এসেছেন সত্যেন দা (মিত্র—স্বরাজ পার্টির সেক্রেটারী) সুরেন দা, নরেশ দা'তো আছেনই, হরিদাও আছেন—অনুকূলদা (মুখার্জি), গিরীনদাও (ব্যানার্জী) আছেন—অমরকৃষ্ণ ঘোষও আছেন—পাবনার রমেন দাসও আছেন, —মলঙ্গার অংশু ব্যানার্জী,—অনুশীলনের সুরেশ ভরদ্বাজ,—আর দুটী তরুণ—রঞ্জিৎ ব্যানার্জী এবং গনেশ ঘোষ (চটগ্রামের জুলু সেনের সঙ্গে সংশিষ্ট)—আর ২।৩ জনের কথা ঠিক মনে নেই।

কিন্তু মজা হল, আমাদের ওয়ারেন্টের তারিখ ২৭শে আগষ্ট। অর্থাৎ ২৬শে আগষ্ট দ্বিতীয়বার মন্ত্রীদের বেতন ব্যাপারে সরকারের পরাজয়ে যেন ক্ষেপে গিয়ে ২৭শে আগষ্ট ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হয়েছিল,—কিন্তু তখন গ্রেপ্তার করা হয়নি,—কারণ তাতে স্পষ্ট বোঝা যেত স্বরাজ পার্টিই আক্রমণের আসল লক্ষ্য। পরে অর্ডিন্যান্স জারি ও গ্রেপ্তারের সঙ্গে ২৫শে অক্টোবর আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লর্ড লিটন মালদহে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলার দুটো প্রধান বিপ্লবী দল সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবী দল গড়ছিল,—একটা দল অবিলম্বে কিছু করার পক্ষপাতী, আর একটা দল আরো প্রস্তুতির পক্ষপাতী।

দেশবন্ধু কাউন্সিলে বক্তৃতায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, স্বরাজপার্টিই আক্রমণের লক্ষ্য—স্বরাজপার্টির কাছে ভোটে পরাজিত হয়ে ক্ষেপে গিয়েই সরকার স্বরাজপার্টির ভাল ভাল কর্মীকে (best workers) গ্রেপ্তার করেছে।

তখন উপেনদা, অমরদা (চট্টোপাধ্যায়), অতুলদা (ঘোষ), মনোমোহন ভট্টাচার্য এবং এক তরুণ নৃপেন মুখার্জি—ষ্টেট প্রিজনার—ফিমেল ইয়ার্ডে থাকতেন—সেটা খালি ছিল ব'লে। আর এক ইয়ার্ডে ফরেনার্স ইনগ্রেস ইনটু ইণ্ডিয়া আইনে বন্দী ছিলেন এক আবদুর রসিদ, শ্বেতকায় পাজামা-ফেজপরা শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত মুসলমান—দিনরাত কোরাণ আর নমাজ নিয়ে থাকেন—পুলিশের মতে বলশেভিক এজেণ্ট—বে-আইনী ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

সন্তোষ মিত্র, ধীরেন বাগচি, সুবোধ লাহিড়ী তখন দার্জিলিং জেলে বদলী হয়েছেন। ষ্টেট ইয়ার্ডের পাশে ছিল বক্স ইয়ার্ড (পরে যেখানে দক্ষিণেশ্বর মামলার আসামীরা থাকতেন)—সেখানে তখন আছেন আন্দামান-ফেরৎ যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত শিবপুর ডাকাতি মামলার নরেন ঘোষ চৌধুরী, ভূপেন ঘোষ, সানুকূল চ্যাটার্জি এবং

রাজাবাজার বোমার মামলার অমৃতলাল হাজরা (শশাঙ্ক বাবু) প্রভৃতি। ভূপেন ঘোষ ছিলেন সর্বপ্রকারের রান্নায় ওস্তাদ। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে তাঁর সঙ্গে করা হল—আমাদের মোট food allowance এর টাকা হিসেব করে তিনি বাজারের ফর্দ করে দেবেন, এবং মালের ভাণ্ডার এবং রান্নার ব্যবস্থা তাঁর হাতেই থাকবে। ডেপুটী জেলার বীরেন বাবু আমাদের দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত—তিনিই এ বন্দোবস্ত করলেন।

তারপর তিনি কার কি কাপড়চোপড় বিছানাপত্র লাগবে জেনে নিয়ে বাজারে গেলেন। এই বাজার করার কাজটা যে লোভনীয়, তা কি বলে দিতে হবে? তিনি খুব যত্ন নিয়ে সব ব্যবস্থা করলেন। কয়েদীদের হাতের রান্নার চেয়ে পুরানো বন্ধুর দরদের রান্না,—সকলেই খুশী হলেন।

কিন্তু প্রথম দিনই আমাদের সত্যেনদা (মিত্র) দইয়ের পরিমাণ কম হয়েছে বলে রেগে টেবিল চাপড়ে চীৎকার করে এক কাণ্ড বাধালেন—ডেপুটী জেলার বাবুকে ডাকিয়ে হিসেব চাইলেন, ১৮ জনের খোরাকী কত? ইত্যাদি। তিনি লজ্জায় জড়সড় হলেন,—আমরাও অনেকেই লুকিয়ে লজ্জা ঢাকলুম,—আর বেচারী ভূপেন বাবু কাতর ভাবে কৈফিয়ৎ দিলেন,—রাত্রে তিনি ভালো কিছু খাওয়াবেন বলে মাল মজুত রেখেছেন,—সকালে তাড়াতাড়ির জন্যে সেটা করে উঠতে পারেননি।

যাই হোক,—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ষ্টেটইয়ার্ডেই নিজেদের তত্ত্বাবধানে কয়েদীদের দ্বারা রান্না করানোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এ সব কূট কৌশল জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞ ঘাঘী বিপ্লবীদের এলাকা—সুভাষবাবু বা অনিলবরণ বাবু এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ—সুতরাং তাঁরা 'থ' হয়ে গেলেন—চুপ করেই সব দেখলেন।

সুভাষবাবুর যে বিপ্লবীদের খাতায় নাম উঠেছে,—দাদারা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। অনিলবরণ লোভনীয় নয়, কারণ তাঁর গান্ধী ভক্তি বাগ মানবে না, সকলেই বুঝতেন—হয়ত মনোরঞ্জনদা ছাড়া। বস্তুত বিপ্লবীদের সঙ্গে আটক থেকে তাঁর মন এমন হাঁপিয়ে উঠেছিল যে, পরে মুক্তি পেয়েই তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যাই হোক,—এর পর এল ভাতা স্থির করার পালা। আইনানুসারে ভাতা নির্ধারিত হবে according to rank and station in life. সুভাষবাবু I. C. S, সত্যেনদা সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলির সদস্য, অনিলবরণ বাংলা কাউন্সিলের সদস্য—এঁরা বিশেষ, এবং বাকি সকলে সাধারণ।

গভর্ণমেণ্ট অনিলবাবুকে সাধারণ ভাতার চেয়ে কিছু বেশী দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি এখানে যখন এম, এল, সি হিসেবে আসিনি,—অতএব সাধারণ ভাতাই নোব। সত্যেনদা এম-এল-এ হিসেবে দৈনিক ১০ টাকা হিসাবে ভাতা দাবী করে দরখাস্ত করলেন—সরকার সেটা নামঞ্জুর করলেন। তখন রণনীতির পরিবর্তন করে সত্যেনদা লিখলেন, শুধু এম-এল-এ বলেই নয়,—তাঁর বহুমূত্র রোগের লক্ষণ আছে, সুতরাং আহারাদি সম্বন্ধে সাবধানতা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত সরকার "মেডিক্যাল গ্রাউণ্ড" বলে তাঁর ১০ টাকা দৈনিক ভাতাই মঞ্জুর করলেন।

পরে তাঁর আর একটা নতুন দাবী এল, এবং সেটা নিয়ে দাদামহলে প্রথমে বিস্ময়, ও পরে চাপা হাস্যকৌতুকের গুঞ্জরণ চললো। সে হচ্ছে তাঁর স্ত্রী-কন্যার জন্য ভাতার দাবী। সবাই জানতেন, তিনি অবিবাহিত,—এই প্রথম শুনলেন, তাঁর স্ত্রী কন্যা বর্তমান। সরকার জবাব দিলেন, তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, তাঁর স্ত্রী-কন্যা নেই,—তিনি বিবাহ করেছেন বলেই কোন প্রমাণ নেই। দাদা বললেন, বৌদির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল কাশীতে, দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে—কোনো বিশেষ কারণে তিনি সে বিবাহের কথা গোপন রেখেছিলেন।—যাই হোক, পরে বৌদির ভাতাও মঞ্জুর হয়েছিল।

তারপর সুভাষবাবুর কথা। তিনি I. C. S., এবং কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার,—সুতরাং তাঁর standard of living ইউরোপীয়ানদের মতন—এই যুক্তিতে তাঁর আহারাদির ভাতা সরকার স্থির করলেন মাসিক ২০০ টাকা। তিনি স্থির করলেন, ইউরোপীয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড তিনি স্বীকার করবেন না, এবং ঐ ভাতা প্রত্যাখ্যান করবেন।

সুরেনদা প্রভৃতি তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, এ ভাতা তাঁকে নিতেই হবে। কারণ এবার জেল থেকে বেরোবার পর তাঁকে যুগান্তর দলের অল-ইণ্ডিয়া প্রতিনিধি, পাবলিক ফিল্ডের নেতা হিসাবে কাজ করতে হবে,—সুতরাং তাঁর স্থান যে সবার উপরে, সেটা দেখতে ও ভাবতে লোকের অভ্যস্ত হওয়া দরকার,—এবং উঁচু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও বেশী ভাতার হিপ্‌নোটিক এফেক্ট তাতে সাহায্য করবে।

এতবড় একটা বিপ্লবী দলের নেতা বলে পরিচিত হওয়া, হঠাৎ ডবল প্রোমোশন, এ অবস্থায় লোকের মাথা ঘুরে যাওয়ারই কথা—বিশেষত তখনও সুভাষবাবুর মাথাটা খুব পাকেনি। তিনি ভাতা প্রত্যাখ্যান করার মতলব ছেড়ে দিলেন।

যাই হোক, আমরা ছয়দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার পর বদলীর অর্ডার এল। সুভাষবাবু, অনিলবরণ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন চললেন বহরমপুর জেলে। অনুকূলদা, গিরীনদা, এবং অংশুবাবু চললেন মেদিনীপুরে এবং আমি, রঞ্জিৎ ব্যানার্জী এবং গণেশ ঘোষ বাঁকুড়ায়। আবার কোন্ নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কে জানে!

[গত মাসের লেখায় অনবধানবশত একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে—১৯২৩ সালের শেষে দিল্লী কংগ্রেসের পর যে ১৭ জন বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা থেকে বিপিনদার নামটা বাদ পড়ে গেছে—বিপিনদা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।]

[ক্রমশঃ।

An idea, to be suggestive, must come to the individual with the force of a revelation.

—*William James*

কবি কর্ণপূর-বিরচিত
আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৬। এই ধরণের যিনি লীলা-গ্রাহী, এই ধরণের ঝলমলে যাঁর আচরণ, তাঁর এই শৈশবাদি পৌগণ্ড দশা অতএব নিত্যলীলা-বল্লার কল্পলতা-রূপেই প্রতিভাত হয় ভক্তজনের কাছে। যদিও এই দশাগুলি বিবাদি এবং পরস্পর-বিরোধী, যেহেতু এগুলিতে রয়েছে মূর্ত্তানন্দত্ব, রয়েছে নিত্য-কিশোরত্ব, রয়েছে অবিকারিত্ব,·· তথাপি, যাঁর স্বেচ্ছায় আচ্ছন্ন থাকে পরমৈশ্বর্য্য, এগুলি যে তাঁরই কল্যাণধর্মী পরমৈশ্বর্য্যের বেগ-ললিত লীলা-প্রকাশ, তা কেমন করে অস্বীকার করা চলে? বিবিধ ভক্তজন আপন আপন বাসনা অনুযায়ী ভগবানকে লাভ করতে চান; এবং তাঁদের অনুগ্রহাধীন বলেই, যিনি সচ্চিদানন্দঘন নিত্যকিশোর, তিনিই নিজেকে প্রকাশিত করেন বাৎসল্য-সখ্য-মধুরাদি সর্বভাব-পোষক বপুঃতে। কাল-কৃত নয় এই অবস্থা। ভবত্ব যেখানে বিজড়িত হয়ে রয়েছে অচিন্ত্য-বৈভবত্বে, সেখানে বাল্যপৌগণ্ডাদির এই সমস্ত লীলা-প্রকাশ হতেই হবে নিস্তর্ক্য-নিত্য এবং এইভাবেই তিনি একদা বিস্ময় বাড়িয়েছিলেন ব্রজপুর-পুরস্ত্রীদের, যেদিন তিনি আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর মোহন মুরলীর ধ্বনি। বাক্যহারা হয়ে গেলেন পুরস্ত্রীরা। কান পেতে শুনলেন সেই ধ্বনি। কী অনবদ্য বেণুবাদন-শীলতা! মুরলীতে বেজে চলেছে মধুর অস্ফুট যেন গান।

২৭। কৃষ্ণের সমীপে ছুটে এসে তাঁরা বললেন···"ওরে কৃষ্ণ, মায়ের বুকের বোঁটা টানতে পারত না তোর ঐ ঠোঁট দুটি, আজ হঠাৎ কেমন করে সেই ঠোঁট দুটো দিয়েই বাজালি···এমন মুরলী? কদিনের মধ্যে কোন্ গুরুর কাছে নিলি কলবেণুর এমন পাঠ?"

··"ওরে ছেলে, তোর মুখের আরতি করে মরি,
আবার বাজা, আবার বাজারে তোর বেণু।"

তাঁরাও বলছেন আর ততক্ষণে নন্দদুলাল পৌঁছে গেছেন জনক-জননীর কাছে। সেখানে গিয়েই তিনি বাজিয়ে দিলেন বেণু। বাজাতে বাজাতে সরস করে তুললেন বাঁশের বাঁশরী।

২৮। সেই দিন থেকে ভস্মধারী শম্ভুর সঙ্গে, কমলযোনি ব্রহ্মার সঙ্গে, নভোমণ্ডলে প্রতিদিন উপস্থিত হতে লাগলেন সুরনগরের নাগরেরা। তাঁরা সকলেই দর্শনার্থী লীলাবালকের;—তমালবরণ যাঁর অঙ্গ, হরিতাল-বরণ যাঁর বসন, যিনি বকুলফুলের রেণু-মাখা তমাল শাখার তুল্যরূপ, যিনি বনকুঞ্জরের শিশুর মত পা-পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে চলেন বনমালা, যিনি বাঙ-মানসের অবসান, মুরলীতে দেন মোহন তান।

২৯। এই রকম করে দিন কাটছে। তারপর একদিন, দিনমণি তখনো অনুদিত গগনে, পদ্মআঁখি নন্দদুলাল তাঁর জননীকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"মাগো মা, ও আমার জনেশ্বরী মাগো, আমার ভয়ঙ্কর মন হয়েছে বন-ভোজনের। সত্যি বলছি, এতটুকু দুষ্টুমি করব না মা। ঘরে বসে খাব না আজ, বনে গিয়ে খাব। ও আমার লক্ষ্মী মা আমার, কথা ঠেলিস নি মা।"

পুত্রের বাক্যের মূলে রয়েছে নিশ্চয় কোনো দুষ্টবুদ্ধি··বুঝতে বিলম্ব হল না ব্রজরাজ-বধূর। তাই তাড়াতাড়ি মাথা নাড়তে নাড়তে যেই বলে উঠেছেন—'না না, না না,' সেই আবার লীলাবালকের কপালখানির উপর নেচে নেচে উঠল ভাঙা ভাঙা চুল, অঙ্গের আভায় আর চোখের আলোকে দূর হয়ে গেল অন্ধকার। অভীষ্ট সিদ্ধির পথ নিতান্ত বিঘ্নিত হয়েছে দেখে লীলাবালককে পথ বেছে নিতে হল শপথের। নিরস্ত নিরুপায় অনুনয় শেষ পর্য্যন্ত আদায় করে ছাড়ল জননীর অনুমতি।

৩০। তারপরে আর সঙ্গী জোটাতে কতক্ষণ? সজোরে শৃঙ্গা বাজিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলেন দাদা শ্রীবলরাম। নিজের নিজের ঘর ছেড়ে দেখতে দেখতে খেলার সাথীরা ছুটে এসে জুটলেন। বলরামের শৃঙ্গা বাজলে দূরও যে নিকট হয়ে যায়।

ত্রিভুবনের নাথতিলক তখন মায়ের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন—"মা, এমন খাবার করে দে মা, যাতে সবাই ভোলে, সকলের মুখে রোচে।" তখন এল বন-ভোজনের উপযোগী ভোজ্যদ্রব্য। বাসি খাবার নয় একটও। এল··চাপ চাপ দই; দধিমহোদধির যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উল্টে পঙ্কপিণ্ড। ভারে ভারে এল ললিত নবনীত ···চাঁদের গায়ের যেন ডেলা ডেলা মাংস। এল পুরু পুরু দুধের সর; ক্ষীর-সমুদ্রের যেন রাশি রাশি ফেনা। এল শষ্কুলী প্রভৃতি সুরসুরভি বহুমূল্য খাদ্য। এল পাঁপড়, এল বড়া··আহা দেখলে সব চোখ জুড়োয়। এতোতেও শেষ নেই। আসছেই তো আসছে। এল মোদক, দেবতাদেরও চোখ টাটায় এমন আমোদক। পিঠে গুলোরও কী সুন্দর চেহারা,···এক একটি যেন পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডল। মিশ্রীর কুঁদোগুলোরও কী বাহার··জমাট শিলার মত দেখতে অথচ গলছে না। এল দইভাত, কী তার পবিত্র সুবাস। এল দুধে-ভেজা চিঁড়ে, ভুরভুর করে গন্ধ উঠছে কর্পূরের, যেন টলটল করছে অমৃতের মাধুর্য্য, এল পরমান্ন,···আবর্ত্তিত জ্যোৎস্না-সার দিয়ে যেন প্রস্তুত। এল আমের আচার, নেবুর আচার···টুপটুপ করছে, রসে গন্ধে।

সমস্ত খাদ্যগুলিই অপরিমিত উপাদেয় ও পেয়··মাতৃবাৎসল্যের মত। সত্যিই লেহ্যগুলিকে তো মন দিয়েও উহ্য করা যায় না। চর্ব্যগুলিও অহো, নয়নের আরাম, অপূর্ব্ব। চূষ্যগুলি একান্তই অদৃষ্য। দুর্লভ পুষ্টিকর সেই খাদ্য-সমারোহ অবলোকন করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন যশোদাদুলাল। সহচরদের হাঁক দিয়ে বললেন—গেল গো··মদ-মাৎসর্য্য সব ধ্বংস হয়ে গেল গো। এবার ভাই, এগুলো তুলে নাও, চল বনে গিয়ে মোদকগুলোকে ধ্বংস করা যাক।

এমন প্রণয়ভরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন নন্দদুলাল যে, একমুহূর্ত্তে অভিমানমুক্ত হয়ে গেল সকলের মনোবৃত্তি। খাদ্য সম্ভার গ্রহণ করবার জন্যে এগিয়ে এলেন সকলে। কিন্তু যিনি সৌন্দর্য্যে ···অর্বুদ কন্দর্পেরও হৃদয়ে অর্বুদ ঘটিয়ে ছাড়েন,··তিনি পুনরায় বললেন—"খাদ্যগুলি সব আধ্যাত্মিকদের হৃদয়ের মত কড়াপাকের। ওগুলো তুলে নিয়ে বাছুরদের পাছু পাছু দৌড়লেও গলে যাবে না কিন্তু··" বলতে বলতে লীলাবালক যথোচিত বণ্টন করে দিতে লাগলেন খাদ্যভার, সখারাও নিতে লাগলেন, যাঁর যেমন ক্ষমতা। কিন্তু খাবার অত হলে হবে কি, কম পড়ে গেল; কৃষ্ণের সখাদের সংখ্যাও

তো আর কিছু কম নয়। রগড় দেখে হাসি চাপতে পারলেন না ভগবজ্জননী। নিয়ে এলেন আরো খাবার, আরো খাবার।

৩১। প্রত্যেকেরি নিজের নিজের সুন্দর সুন্দর বাঁক। শিকের ঝোলানো ভাঁড়! ভাঁড়ে ভাঁড়ে ভাগ করে খাবার নামিয়ে রাখলেন কৃষ্ণসহচরেরা। তারপর সেজেগুজে যেই যাত্রা করবেন সকলে, অমি ভগবজ্জননী নিজের হাতে আবার একবার ছিমছাম করে গুছিয়ে দিলেন শ্রীভগবানের বেশভূষা এবং বিশেষ করে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বেণু, গলায় ঝুলিয়ে দিলেন বনমালা। স্নেহস্রুত ক্ষীরধারায় সিক্ত হয়ে গেল তাঁর কঞ্চুকের অগ্রপরিসর। পুত্রদের সঙ্গে কিছুদূর সঙ্গ নিলেন বালকদের।

আগে আগে চলেছে কৃষ্ণের অসংখ্য বাছুর। পাছে পাছে চলেছে অসংখ্য অনুচরদের প্রত্যেকের অগণিত বাছুর। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ। কী যেন কী কারণে, কিসের যেন কৌতূহলে ঘরে রয়ে গেলেন হলধারী বলরাম।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেলেন মা। দেখতে লাগলেন তাঁর ছেলেটিকে। শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন আর তাঁর পাছু পাছু চলেছেন সখারা। সে এক অতিলোকোত্তর সৌন্দর্য্য-দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের বাম হাতে রয়েছে বেণু, ডানহাতে চারু যষ্টি, কটিদেশে বেত্র এবং পাতায়-রচা অত্যদ্ভুত একটি শৃঙ্গ; চিকণ চুলের চূড়ায় কাঁপছে শিখি-শিখণ্ড; কিন্তু কণ্ঠের উপকণ্ঠে গুঞ্জাহার; আর তাঁর কান দুটিকে ঢেকে রেখেছে নীলোৎপলের নির্মল দুটি মাধুরী।

সত্যিই, বড় আশ্চর্য ঠেকল মায়ের চোখে যখন তিনি দেখলেন·· ঘরে অতো আর অমন ভালো ভালো অলঙ্কার থাকতে কৃষ্ণের ঘটেছে তাতে অবহেলা! আর বৎসপালদের অনুকরণে হঠাৎ অত্যন্ত অনুরাগ ঘটেছে তাঁর বন্য বেশভূষায়! কিন্তু কৃষ্ণ তখন ছুটেছেন ব্রজবালকদের সর্বাগ্রে···বৈজয়ন্তী মালা নাচিয়ে। তাঁর বক্ষের ভিত্তিতে আভা কাটছে শ্রীবৎস-চিহ্নের স্বর্ণ রেখা।

ব্রজবালকদেরও শোভা কিছু কম যায় না। তাঁদেরও প্রত্যেক্যের বাঁ কাঁধে সুন্দর গড়নের বাঁক, বাঁকের ডগায় শিকেয় ঝুলছে ভাঁড়ভর্ত্তি খাবার; কোমরে বেণু, বিষাণ, পত্র-মুরলী আর শৃঙ্গ। তাঁদেরও হাতে—যষ্টি, কানে কুঁচফলের কর্ণপুর, মাথায় ময়ূর-পিচ্ছের রচনা, গলায় গুঞ্জাহার। প্রত্যেকটিকেই মানিয়েছে ভালো কটিতটের ধটির বাহারে।

মাতৃদেবীরা যদিও তাঁদের প্রত্যেকেরই দুহাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন কেয়ূর, বলয়, ঘটা করে কোমরে বেঁধে দিয়েছিলেন কিঙ্কিণী আর মণিময় কোমরবন্ধ, গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন হার, কানে কুণ্ডল, চরণে মঞ্জীর,···তবুও এই ব্রজশিশুদেরও কেমন যেন তেমনটি আগ্রহ ছিল না সেই সব ভূষণে, যেমনটি ছিল তাঁদের ঐ বাছুর-চরানো বন্য সাজে।

৩২। খেলতে খেলতে দূরে চলে গেলেন ব্রজবালকেরা, আর কৌতুকের আকুলতায় চোখ কুঁচকিয়ে বহুক্ষণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্রজরাজমহিষী। তারপরে অতিব্যবধানের বাধায় আর্ত্তা হয়ে ধীরচরণে ফিরে এলেন রাজভবনে।

৩৩। বৎস-বাহিনীটিকে অগ্রে নিয়ে শ্রীভগবান যখন চলেছেন, তখন পরম-স্থবিরতম হলে হবে কি, সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনুপম-কুতূহল-বিলোকনের বৃত্তিনিচয়। পরম আত্মারাম হলে হবে কি, নীলকণ্ঠ শিবেরও হৃদয় ভরে উঠল উৎকণ্ঠিত আনন্দে। মেঘ দেখে যেন নেচে উঠল ময়ূর, সূর্য দেখে যেন মুখ খুলল কমল। নভোরাজ্যে নিমেষ হারিয়ে তাঁরা দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রলিখিতের মত। ইন্দ্রাদি প্রমুখ কৌতুকলম্পট দেবতাদের কথা না তোলাই মঙ্গল।

৩৪। এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন শ্রীভগবান, আর তাঁর পিছিয়ে-পড়া সখারা এদিকে বাজী ধরছেন··কে আগে ছুঁতে পারবে তাঁকে। আমি আগে আমি আগে বলেই দৌড়লেন সকলে। তারপর ছুঁয়েই···'আমি আগে ছুঁয়েছি, আমি আগে'···বলে ঝগড়াও করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। পরস্পরকে এই জয়েচ্ছা! শেষে সকলে···শ্রীকৃষ্ণকেই বরণ করলেন সাক্ষীরূপে। হেন অবস্থায় প্রথমে হেসে ফেললেন শ্রীভগবান। হাসির অমিয়ায় ভেসে গেল দশন-বসন, দিক্‌দিগন্তে যেন ফুটে উঠল শ্বেতকরবী। তারপরে সহচরদের মুখের উপর দৃষ্টি রেখে তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন—"কে আগে, কে পরে, সে বিচারে তোমাদের এত প্রয়োজন কিসের? এই স্থানেই তো তোমরা রয়েছ, তোমরা তো একসঙ্গেই আমাকে পেয়েছ।"

৩৫। মুনিমানস-দুর্লভ দনুজদমন যখন এই প্রকারের আলাপন করতে করতে বাছুরদের পাছু পাছু ছুটলেন, তখন কৌমুদীকন্দকে অনুবর্তন করে তাঁর সেই চঞ্চল তিমিরাঙ্কুর সদৃশ অগ্রসরণ গোপবালকদের সকলের মধ্যেই উচ্ছলিত করে তুলল ক্রীড়ারসের এক অপূর্ব আনন্দ গন্ধ। একদল হরণ করলেন অপর দলের শিক্যা; তাঁদের হাত থেকে আবার সেইটি নিয়ে নিলেন আর একদল; আবার সে দলের হাত থেকে সেইটি ছিনিয়ে নিলেন আর একদল; নিয়েই হোঃ হোঃ হাসি। যাঁদের জিনিষ তাঁদের হাতেই ফিরিয়ে দিলেন সেটি। কেউ কেউ চকিতে বদলিয়ে নিলেন খাদ্য। বদলানোও যেই, ধরাটি পড়াও সেই, ফিরিয়ে দেওয়াটিও সেই; আর তারপরেই হোঃ হোঃ হোঃ হাসির রোল। একখানা বিলাস বটে হাসির, তারপরেই আবার বিলাসভরা আলস্য!

ঐ রে, ঐ দেখ, ও চুরি করেছে ওর পাঁচনবাড়ি। ছিঃ ছিঃ, ঐ দেখ, ও ছিনিয়ে নিয়েছে ওর বেণু। নিয়েছে, চুরি করে নিয়েছে শিঙা, গলা থেকে সরিয়ে ফেলেছে গুঞ্জামালা! হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ, এঁর কাছ থেকে নিয়েছেন উনি, ওনার কাছ থেকে তিনি, তাঁর কাছ থেকে ঐ উনি; এ যে একেবারে চুরির মোচ্ছব। কি মজা রে কি মজা, যার যেটি হারাল, তার হাতেই যে ফিরে আসছে সেটি। হোঃ হোঃ।

৩৬। এইভাবে খেলতে খেলতে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তাঁদের সামনে পড়ল এক গোচারণ-ভূমি। নবীন তৃণাঙ্কুরের পর্য্যাপ্তি দেখে বাছুরদের কী চারপেয়ে আনন্দ! তৃপ্তির খাওয়া খেয়ে যখন তারা বিশ্রাম করতে বসল, তখন ব্রজবালকেরা আবার রঙ্গে উঠলেন মেতে। অতি সুন্দর দেখে একটি গাছের তলা বেছে নিয়ে নিজের নিজের বাঁক ইত্যাদি সামগ্রী সেখানে তাঁরা রাখলেন। তার পরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রগড় করতে করতে তাঁকে হাসাতে হাসাতে রচনা করতে লেগে গেলেন খেলা থেকে খেলান্তর।

নিকটেই একটা ময়ূর নাচছিল, আনন্দে ডাক ছেড়ে। তাই না দেখে তারি নাচের ঢঙে নাচতে লেগে গেলেন কেউ কেউ। দীঘির পাড়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এক বক; তার অনুকরণে

গা কুঁচকিয়ে বসে পড়লেন কেউ কেউ। ব্যাঙ লাফাচ্ছে জলে; অমনি কতকগুলি বালককে ব্যাঙের মত তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়তেই হল জলে। আকাশ দিয়ে এদিক ওদিক উড়ে যায় পাখীরা; অমনি তাদের ছায়া-ধরার খেলায় মেতে উঠতেই হল একদলকে।

বাঁদর বসে আছে গাছের ডালে। মুখ ভেঙিয়ে ভীষণ চেঁচিয়ে সেগুলোকে ভয় দেখানোর খেলা খেলেন কেউ কেউ। কেউ আবার ঝোলানো ল্যাজ ধরে মারেন টান্। বাঁদরগুলো তড়্তড়্ করে চড়ে যায় গাছের ডগায়; কিন্তু এঁরাও কি কেউ কম যান? এঁরাও তড়তড় করে গাছে চড়েন নিমেষে, বাঁদরের সঙ্গে সমানে মারেন লম্ফ। কেউ গেয়ে ওঠেন, কেউ নেচে ওঠেন, কেউ আবার হাসেন··বাঁদরদের লক্ষ্য করে হিল্হিলিয়ে।

ওদিকে আবার আর এক খেলায় কেউ হলেন রাজা, কেউ বা হলেন মন্ত্রী। একজন হলেন কোটাল, অন্যেরা হলেন সামন্ত। অতঃপর কাউকে হতেই হল চোর। অতএব চোরটিকে ধরে রাজার কাছে হাজির করে ক্রুদ্ধমূর্তিতে কাউকে নিবেদন করতেই হল অপরাধের বিজ্ঞাপনা। রাজা জারী করে দিলেন চোর-শাসনী আজ্ঞা।

আবার এদিকে চঞ্চল দুই বালকে মিলে মেড়ার লড়াই। সাম্নাসাম্নি ঘাড় বেঁকিয়ে একবার জোরে তেড়ে আসছেন দুজনে, একবার হেটমুণ্ডে জোরে পিছিয়ে যাচ্ছেন দুজনে। খেলায় এত রগড়ও থাকে। কেউ কেউ ব্যাঘ্র হলেন। গর্জ্জন ছাড়লেন কটু ও পটু। বিভীষিকা অন্যদের। কেউ এলেন টিপিটিপি, পিছন থেকে, দুহাত দিয়ে টিপে ধরলেন অসাবধানীর জোড়া চোখ। আর এই সমস্ত খেলার মধ্যে মূর্তিমান হর্ষ রসময় গ্রাম্য গোপ-বালকেরা মূর্ত্তানন্দ গ্রাম্যবালকরূপী—শ্রীভগবানের সঙ্গে বনভূমি আলোড়িত করে রঙ্গিলা হয়ে উঠলেন, যেমন হয় সিংহশাবকেরা মহাসিংহের শ্রেষ্ঠশাবকের সঙ্গে খেলায়, যেমন হয় হাতীর বাচ্ছারা অভিনবোন্নত জাগ্রত উন্মদ হস্তিশাবকের সঙ্গে খেলায়।

৩৭। তারপর ব্রজবালকেরা সকলে মিলে মন্ত্রণা করলেন—

"আচ্ছা দেখা যাক, কে বেশী জোরে দৌড়াতে পারে, কৃষ্ণ না আমরা?" সকলেই দিলেন দৌড়। শ্রীকৃষ্ণও দৌড়লেন বটে, কিন্তু একটু যেতে না যেতেই তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন সাথীরা।

৩৮। হায়রে, প্রকৃতি বা ব্রহ্মারও অগ্রে বিদ্যমান যাঁর অপ্রমত্ত জাগৃতি, তাঁকে, সেই হেন শ্রীকৃষ্ণকেও দৌড়ে হারিয়ে দিতে গেলেন ব্রজবালকেরা! আশ্চর্য্য, ছাড়িয়েও গেলেন তাঁকে! কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিছু দূর গিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন, সত্যিই একটি বিরাট অত্যাশ্চর্য বস্তু। বস্তুটি আর কিছুই নয়, মাত্র মূর্ত্তিমান পাপের মত এক অসুর, নাম··অঘাসুর।

এই অঘাসুর··বকী (পুতনা) ও বকাসুরের সহোদর। বক-বকী দুজনেই ইতঃপূর্বে যমালয়ে গিয়েছিলেন, তাই অসীম হয়ে উঠেছিল অঘাসুরের ক্রোধ এবং শোক। হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ ও আবেগ নিয়ে তাই তিনি এতকাল কামনা করেছিলেন বৈর-শুদ্ধি। ক্রূরমতি অতি-পামর সেই অঘাসুর আজ নিঃশব্দে ক্ষিপ্র আবির্ভাবে রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন ব্রজবালকদের গোচারণ-পথ। পৃথিবী ছুঁয়ে রইল তাঁর ঠোঁটের নীচের পাটি এবং ঊর্দ্ধে মহাকাশ ছুঁয়ে রইল তাঁর উন্নতমস্তকের উপর পাটি। যেন চরাচর গ্রাস করতে চায় একটি বিপুল হাঁ। ভীত হয়ে উঠলেন ব্রহ্মাদি দেবগণ। এই অদ্ভুত আবিষ্কারে বিস্ময়-বাচাল হলেন ব্রজবালকেরা—

৩৯। "আরে, এতো এক বিচিত্র গিরি-গহ্বর দেখা যাচ্ছে ভাই। দেখ্ দেখ্, চোখ মেলে দেখ্; মনের ভুল, চোখের ভুল, সব ভুলগুলোকে ছেঁটে ফেলে দেখ্।···পৃথিবীতে কিনি এমন রয়েছেন যিনি এই গহ্বরটার শোভা আর রঙ্গ দেখে না মজবেন? ··দেখেছিস্ ভাই, এটি যেন একটি মহাসর্প, বিরাট আলস্যে মুখ হাঁ করে যেন বসে রয়েছে।"

৪০। সত্যিই তো, সর্পদংষ্ট্রার মতই তো দেখাচ্ছে এই গিরিদরীর শৃঙ্গগুলি। ভয়ও পাচ্ছে, আনন্দও হচ্ছে। সত্যিই যেন সাপের দোফালি জিভ আমাদের ভরগুলোকে নেমন্তন্ন করে ডাকছে। গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে নিশ্চয় একজোড়া যোজন-লতা ফুর ফুর করে বাতাসে কাঁপছে।"

৪১। "মহাসর্পের বিষের স্ফুলিঙ্গের মত এই গুহাটা থেকেও ছুটে বেরিয়ে আসছে নানান্ ধাতব কণা। বুঝলে হে, মহাসর্পের তালুতে থাকে অতিভয়, শোক আর বিকার; এই গুহার উপর দিকটাতেও দেখছি, ছড়ানো রয়েছে কুরুবিন্দশিলার বিলাস। দেখিস্ ভাই, মহাসর্পের কুৎসিত ধমনীর মত ঐ লতাগুলো গর্ত্তের দিকে তোদের না টেনে নিয়ে যায়।"

৪২। বটেই তো, বটেই তো, সাপের মাথার দুপাশে থাকে যেমন দু-দুটো সুন্দর চোখ, এই গুহাটারও দুপাশে রয়েছে তেমনি দু-দুটো বড় বড় কমলরাগ-মণি। সাপের নিঃশ্বাসের মত এই দরীটাতেও বইছে উপবন-ওপড়ানো প্রখর পবন; বিষানলের ধূম্রশোভার মত এতেও উঠছে মরকতমণির আভা। গুহার মাথাটাও কি ঠিক ফণার মতনই দেখতে?

৪৩। তাহলে ভাই সব, এখন এস; এই গুহার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। গহ্বর দেখে আর কে সরছে বল ভয়ে?

মনঃস্থির করলেন বটে সকলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কেমন যেন তাঁদের সকলেরি বুদ্ধিদেবীটি কালিয়ে গেলেন সন্দেহে আর শঙ্কায়। শেষে স্থির করলেন—

"সত্যিই যদি এটা প্রবল প্রতাপ সর্পই হয়···তাহলে···? তাহলে আর কি? তাহলে ভাই সব, আমাদের অরিন্দম প্রিয়-সখা এটিকে নির্ঘাৎ মেরে ফেলবেন···বকাসুরের মত। আর উদ্ধার করবেন আমাদেরও। অন্য কারোর সাধ্য নেই অমন ব্যাপার সামলানো।"

এই বলে সকলে মিলে তখন তড়তড় করে সাপ-তাড়ানোর ভঙ্গিতে তালি বাজাতে লাগলেন হাতে। শ্রীভগবানে তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, একান্ত তাঁদের আশ্বস্ততা। কই শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁর সুচারু মুখখানির একটি চারু চাউনি দিয়েও তাঁদের নিষেধ করছেন না। ব্যাস্, তালির করতাল বাজাতে বাজাতে তখন দেবতনয় সকলে ব্রজগোপালেরা প্রবেশ করলেন অঘাসুরের আনন-বিবরে।

[ক্রমশঃ
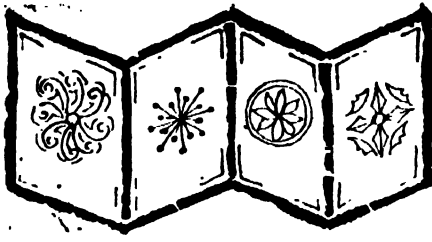
বিখ্যাত সাংবাদিক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত "বেঙ্গলী" পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে পদ্মিনীমোহন নিয়োগী বাঙলার অগ্নিযুগে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। এঁর সাংবাদিক খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। বাঙলার বহু জ্ঞানী-গুণী ও নেতৃস্থানীয় পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ইনি আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে এঁর পত্র বিনিময় হয়। এই অসংখ্য অপ্রকাশিত পত্রের মধ্যে কয়েকখানি মাত্র এখানে প্রকাশ করা হল। ১৯৫৪ সালের ১২ই মার্চ পদ্মিনীমোহন পরলোকগমন করেন। পত্রগুলি শ্রীমতী সাধনা নিয়োগীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ]

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পত্র

দি 'বেঙ্গলী' [স্থাপিত ১৮৫৯] ১২৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
টেলিফোন নং ৯৩৭ কলিকাতা ১৫।৮।১৯১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আমি আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি যে নবাবজাদার 'অন্ততঃ' একটি ভোট আমার জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাকে নিতান্ত আন্তরিকতার সহিত ধন্যবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি। 'অন্ততঃ' কথাটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আপনি আপনার চেষ্টা এখনও ত্যাগ করেন নাই এবং সম্ভব হইলে উভয় ভোটই আপনি আদায় করিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোর হইবে এবং আমি আমার বন্ধুদের যতদূর সম্ভব সমর্থন চাই।

আশা করি আপনি বেশ কুশলেই আছেন। আপনাদের
(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী

পুনশ্চ—নবাবজাদা কখন কলিকাতায় আসেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন এবং তাঁহার ঠিকানাটাও দিবেন। (স্বাঃ) এস, এন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্র

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রিয় নিয়োগী বাবু, ১৯শে আগষ্ট, ১৯১২

আপনার সানুগ্রহ পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনাকে অকপটভাবে আশ্বাস দিতে চাই যে, আমার বন্ধুদের সম্পর্কে আপনার সহৃদয় মতামত ও শুভেচ্ছার আমি খুব মূল্য দিয়া থাকি। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে আমি কখনও কোন ফটো নিতে দিই নাই বলিলেই চলে। কারণ, এই জিনিসটাকে আমি ভয়ের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি। বছর দুই হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যন্ত্রপাতি সহ আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। 'মডার্ণ রিভিয়ু'-এ তাঁহার তোলা একটি ছবি প্রকাশিত হয়। উহাই পুনর্মুদ্রিত করিয়া এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

সাংবাদিকতার সুন্দর কাজটি আপনাকে ছাড়িতে হইয়াছে, সেজন্য দুঃখিত। তবে আমি ভালরকম জানি যে, এই ভিন্ন আপনার উপায় ছিল না।

আপনার 'জাতীয় এলবামটি' পাওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম।

ইতি— আপনাদের
(স্বাঃ) পি, সি, রায়

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের পত্র

শ্রীহরি

বরিশাল
শ্রদ্ধাস্পদেষু, ৭ই বৈশাখ, ১৩১[illegible]

আপনার পত্রখানি কাল পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। আমার শরীর আজকাল বড়ই অসুস্থ। Diabetes বাড়িয়াছে, সুতরাং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আবার আপনাদিগের সম্মিলনীর দিনের পূর্ব দিনই আমার জ্যাকের মামলার তারিখ। অত্যন্ত দুঃখের সহিত এবারও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইতেছে। কি করিব? ইচ্ছা থাকিলেও আপনাদিগের উৎসবে যোগ দিতে পারিতেছি না।

আর যে Indian World পাই না? মূল্য বাকী কত লিখিলেই ত পাঠাইয়া দিতে পারি। আমি বোধহয় লিখিয়াছিলা February মাসে একখানি V. Pতে পাঠাইতে। আমি সাধারণতঃ পত্রিকার মূল্য ঐ মাসে ঐ ভাবে দিয়া থাকি। যাহ মূল্য বাকী কত লিখিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি— অনুগত
(স্বাঃ) অশ্বিনীকুমার দ

অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পত্র

৬৫, হ্যারিসন রোড, কলিকা
২২শে ডিসেম্বর, ১৯১৩

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

চলিত মাসের ১লা তারিখে লিখিত আপনার পত্রের উত্তর দি গৌণ হইল বলিয়া দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। আমি খুবই ব্য ছিলাম এবং সেই কারণেই এই বিলম্ব ঘটিয়াছে।

বাবু ভুবনমোহন হাওলাদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে কথাবার্ত্তায় তাঁর সম্পর্কে আমার বেশ ভাল ধারণাই হইয়াছে। বি দুঃখের বিষয়, আপনি যে পদের জন্য তাঁহার নাম সুপারি করিয়াছেন, সেইটিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিব বলিয়া ম হয় না। আমাদের পরিষদ একজন গ্র্যাজুয়েট কিম্বা অনুর শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চাহেন। এখন যিনি লাইব্রেরীর ভারপ্রা সেই ভদ্রলোকের চেয়েও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন একজন লাইব্রেরীয় আমাদের দরকার। যদি তুলনায় নিশ্চিতরূপে ভাল না হইলে তেমন কোন লোককে নিয়োগ করার আদৌ যৌক্তিকতা থাকিবে না

বাবু শশিভূষণ রায়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন। তাঁহাকে এই কথা বলিবেন যে, ভবানীপুরে তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই বলিয়া তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করার বিষয় আমি প্রায়ই ভাবিয়াছি, কিন্তু, কাজের বিশেষ চাপে ইহা করিতে সময় পাই নাই। তিনি কেমন আছেন—জানিবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম। সুস্থ আছেন জানিতে পারায় আমি খুবই আনন্দিত। ইতি—

আপনাদের

(স্বাঃ) হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র

৬ নং ও ৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০

প্রিয় মহাশয়,

৯ই সেপ্টেম্বরের পত্রে আপনি যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তদনুসারে আমি এই সঙ্গে আপনাকে আমার দুইখানি ফটো এবং স্থানীয় দুইটি পত্রিকার কাটিং পাঠাইতেছি। কাটিংগুলি হইতে আপনার বইয়ের জন্য কিছুটা নোট করিয়া নিতে পারিবেন। এই পত্রিকাগুলির তারিখ হইতে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (তদুপরি উক্ত সংস্থার ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অন্যতম সদস্য), শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের একজন গভর্ণর ও ভারতীয় যাদুঘরের (কলিকাতা) অন্যতম অছি নিযুক্ত হইয়াছি।

আপনি যে ফটোখানি পছন্দ করেন, তাহাই কাজে লাগাইতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবশ্য ইহার ভিতর ছোট যে ফটোটি, তাহাই পছন্দ করি। দুঃখের বিষয়, আমার কোন হাফটোন ব্লক নাই। তবে খুব সম্ভব দুই তিন সপ্তাহের ভিতর আপনাকে আমি একটি দিতে পারিব।

একান্ত অনুরাগী

(স্বাঃ) আর, এন, মুখার্জ্জী।

বাবু পদ্মিনীমোহন নিয়োগী

বরাবরে

সাব এডিটর, 'বেঙ্গলী'

দেশনায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্র

১৪, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২রা জুলাই, ১৯১৭

প্রিয় পদ্মিনী,

তোমার সহৃদয় অভিনন্দন পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কবে পর্য্যন্ত আমার পক্ষে রওয়ানা হওয়া সম্ভব, আমি নিজেই জানি না। তবে কলিকাতা হইতে ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বেই যাত্রা করিব। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের পত্র

৬১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১৮-১-১৯১৩

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার সানুগ্রহ পত্রখানি আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার প্রিয় ভাগ্নের মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে এই আঘাত এতই নিদারুণ ও অপ্রত্যাশিত যে সহ্য করা কঠিন। কিন্তু আমাদের অভিযোগের অবকাশ নাই, সহ্য করাই আমাদের কাজ। আমাদের শোকের মাঝেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই শোকও অন্যভাবে তাঁহার করুণা মাত্র। বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে আমার নিয়োগের ব্যাপারে আমি (১) আমার পেশা ও (২) লর্ড কারমাইকেলের কাছে ঋণী। এই মর্য্যাদার আমি কতখানি অযোগ্য, সে আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি কাজ করিতে চাই ও শিখিতে চাই। এক্ষণে আমার কাছে এইটি আমার শিক্ষার আর একটি ধাপ ছাড়া কিছু নয়। আমি একজন কৃতী ছাত্র হইব কিনা, জানি না। তবে আমি কঠোর শ্রম করিতে চাই। এখন আমার আন্তরিক প্রার্থনা, আমি যেন আমার মাতৃভূমির কোন না কোন কার্য্যে লাগিতে পারি।

আপনাদের

(স্বাঃ) নীলরতন সরকার

বি, কে, রায়চৌধুরীর পত্র

গৌরীপুর

১২।৭।১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

এইমাত্র আমি আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যে আমার জন্য এতটা যত্ন নিয়া থাকেন, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ। বাবু হেমেন্দ্রনাথ রায় এক হিসাবে জলপাইগুড়ি এষ্টেটে যোগদান করিলেও আমি সরকারী ভাবে অন্তত তাঁহার চাকুরী অনুমোদন করিতে পারি না; কিংবা বালিহার এষ্টেটের পরীক্ষিত হিসাব তাঁহার দাখিল করার পূর্ব্বে এই এষ্টেটের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে তাঁহাকে অনুমতি দানে আমি অক্ষম। সুতরাং আমি দুঃখিত যে, ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমি আপনার অনুরোধটি বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। সে যাহাই হোক: আপনি কুমারের নিকট ও ভূপেনবাবুর নিকট এই সম্পর্কে পত্র লিখিতে পারেন। কুমার খুব শীঘ্র সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন। তাঁহার নিজের নির্ব্বাচনের উপরই আমি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিব।

এখন আমি অপেক্ষাকৃত ভাল আছি। ৭ই আগষ্ট কাউন্সিলের পরবর্ত্তী বৈঠকে যোগদান করিতে পারিব। আপনারা ভাল আছেন এই বিশ্বাস রহিল। ইতি—

একান্ত আপনার

(স্বাঃ) বি, কে, রায়চৌধুরী

পীযূষকান্তি ঘোষের পত্র

দি অমৃতবাজার পত্রিকা লিঃ
২, আনন্দ চ্যাটার্জ্জী লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

হাঁ, আপনার বই-এর জন্য ঠিক যে সময় প্রয়োজন হইবে, তখনই ব্লকটি পাইবেন, পূর্ব্বে নহে। কারণ, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এইটি চাহিয়া লিখিতেছেন, তাঁহাদের জন্য আরও কতক কপি মুদ্রণ করিতে চাহিতেছি। হাঁ, ব্লকটি ১১৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ Acme Pressএর বাবু চিন্তাতোষ বসুর নিকটেই আছে।

হিন্দু স্পিরিচুয়েল ম্যাগাজিনের একটি সমালোচনা আপনার কাগজে যাহাতে প্রকাশ পায়, অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিবেন কি? কিছুকাল আগে ঐ কাগজের পঞ্চম বর্ষের সম্পূর্ণ সেটখানি এবং অল্পদিন হয় জানুয়ারীর একটি সংখ্যা আপনাকে পাঠাইয়াছি।

আপনাদের
(স্বাঃ) পীযূষকান্তি ঘোষ

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর পত্র

সন্ট হিল, দার্জিলিঙ
১৫।১০।১২

প্রিয় পদ্মিনী,

চলিত মাসের ৯ই তারিখে লিখিত তোমার পত্রখানি পাইলাম। তুমি জান না যে, আমাদের নৌকাগুলি ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। সবুজ নৌকাটি অর্থাৎ পিনিস (Pinnece) নৌকাটি আমার ভাগে পড়িয়াছে আর বড় ভাওয়ালটি পড়িয়াছে আমার ভাইদের ভাগে। রামসীতা পুকুরে আমার সবুজ নৌকাটির এখন মেরামতী চলিয়াছে। সুতরাং তোমার কাজে উহা আমি দিতে পারিতেছি না এবং তাহার জন্য দুঃখিত। আমার এক পানসি (Panshi) নৌকো আছে। তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী সেইটি আমি তোমার কাজে দিতে পারি। যদি ইহাতে তোমার হয়, তাহা হইলে সন্তোষে আমার ম্যানেজারের নিকট একখানি লিপি পাঠাইতে পার। তাহাতে ঠিক কবে তোমার নৌকাটি দরকার, সেইটি উল্লেখ করিও। আমি সন্তোষে সেইভাবে নির্দ্দেশ দিয়া রাখিতেছি।

আমরা এখানে চেঞ্জে আসিয়াছি এবং আমাদের ভালই কাটিতেছে। আশা করি, তোমরা বেশ সুস্থ আছ। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
(স্বাঃ) প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
(সন্তোষের)

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

ওঁ

১৬ই মে, ১৯১৪
6, Dwarakanath Tagore's Lane

বিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনি যে ছেলেটির সন্ধান দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আপাততঃ আমি কোন কথা দিতে পারিতেছি না, কারণ আমি দুই একটি ছেলে দেখিয়াছি এবং খুব সম্ভবতঃ তাহাদের একজনের সঙ্গে এই বিবাহ হইবে। যদি কোন কারণে এই বিবাহ না হয় তখন আপনার এই পাত্রটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব—আপনি গিরীনবাবুকে লিখিতে পারেন যে তাহারা আপনার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

আপনি এই বিষয়ে যে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিবেন।

ভবদীয়
(স্বাঃ) শ্রীসমরেন্দ্র

সাংবাদিক পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের পত্র

৩৯, ক্রীক রো, কলিকাতা
১৩ই জানুয়ারী, '১৫

প্রিয় পদ্মিনী,

এই মাসের ১০ই তারিখে লেখা তোমার পত্রখানি গতকল্য সন্ধ্যায় আমার হস্তগত হইয়াছে।

তুমি গত শনিবার কিংবা রবিবার কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাও নাই বলিয়া আমি আর আমার সঙ্গে এখানকার তোমার বন্ধুরাও খুবই দুঃখিত। তোমার যে পত্রের এখন উত্তর দিতেছি, তাহাতে তুমি নিজে যেরূপ আভাস দিয়াছ, তাহার চেয়েও সুবিধাজনক সর্ত্তে তোমার জন্য একটা কাজ দেখিয়া রাখিয়াছিলাম। উহা ছিল মাননীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের কাউন্সিল সেক্রেটারীর কাজ এবং সেইটি নয় মাসের জন্য। আমার কথামত তোমার দিল্লীর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য তিনি পঞ্চাশ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি নিজ হইতেই তোমার থাকা ও প্রথম শ্রেণীর গাড়ীভাড়া—সকল খরচ বহনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন কি, তাঁহার এক স্থলে যাত্রার নির্দ্ধারিত তারিখ পর্য্যন্ত শনিবার হইতে গত রবিবারে পিছাইয়া লন। কিন্তু তোমার তারবার্ত্তা পাওয়ার পর তাঁহার পক্ষে তোমার জন্য আর অপেক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই মাসে কাউন্সিলের মাত্র একটি বৈঠক ছিল এবং সেইটি গতকল্য হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী বৈঠক আগামী মাসের ২৩শে তারিখের পূর্ব্বে হইবে না। এই অবস্থায়—আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে যে, তাঁহাকে পুনরায় প্রবোধবাবুকে ডাকিতে হইল। আমার মনে হয়, এই প্রবোধবাবুই রায় সীতানাথের সহিত আবার সিমলায় গিয়াছেন। ইহা একটি বেশ অভিপ্রেত পদ ছিল এবং তুমি যে যথেষ্ট কারণ ছাড়াই এই সুযোগ ছাড়িয়া দিলে, সেজন্য আমি দুঃখিত। যাহা হউক, যাহা গত হইয়া গিয়াছে, তাহার নিমিত্ত দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আমি এই মাত্র আশা করিব শীঘ্রই আর একটি সুযোগ আসিবে এবং তুমি সেই সুযোগ গ্রহণে এইভাবে ইতস্তত করিবে না।

তোমার শরীর ভালই যাইতেছে—ইহাতে আমি সুখী। আশা করি, জামালদায় আরও বেশ কিছুদিন থাকিয়া শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া লইতে সমর্থ হইবে।

রায় সীতানাথের চাকরিটি তোমার উপযুক্ত হইবে, আমি এ মনে করি না। তিনি একটুতেই চটিয়া যাইবার লোক আর তাঁহার ভাইপো—যিনি তাঁহাদের যৌথ সম্পত্তির অংশীদার, সব ব্যাপারেই

তাঁহার উল্টো কাজ। দুইজন মনিব দুই পথে চলিলে, সেখানে চাকরি অভিপ্রেত নয়। কাজটি জোগাড় করা সম্ভব হইলেও আমি তোমাকে সেইটি গ্রহণ করিতে যাওয়ার পরামর্শ দিতাম না। যতদূর মনে হইতেছে তাঁহারা একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিবেন। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
(স্বা:) পৃথ্বীশচন্দ্র রায়

হেমচন্দ্র নাগের পত্র

Mymensingh
13. 4. 15.

My dear Padmini Babu

আপনার চিঠি কাল পাইয়াছি। আজ ১২৲ বার টাকা মনিঅর্ডার করিয়া আপনার নিকট পাঠাইলাম। বাকী ১০৲র postage stamp এই চিঠির সঙ্গে পাইবেন। আমি আসিবার সময় আমার টেবিলের উপর আপনার Hindusthan Review ও তাহার মধ্যে summaryটা রাখিয়া আসিয়াছিলাম—আশা করি পাইয়াছেন। নাটুরা বাড়ী চলিয়া গিয়াছে কি? আমার চেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য যে কষ্ট আপনি স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ।

Yours
Sd/-Hem Chandra Nag

অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পত্র

৬৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট
২৩।৫।১২
সকাল ৭ ঘটিকা

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

বহু দিন হইল আপনাকে একখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়াছি, আপনার কলিকাতায় আসার পর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। আমাদের দুই জনকে হয়ত শীঘ্র কলিকাতা ছাড়িতে হইবে। সেই কারণে একবার যাহাতে আমরা মিলিতে পারি, সেইটি ঠিক রাখুন। একদিন ভোরবেলা কিংবা ৯-৩০টা ও ১০-৩০টার ভিতর কিংবা রাত্রি ৭-৩০টার পর এখানে আসিবার সুযোগ করিতে পারিবেন কি? কখন আসিবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন। আপনার সহিত আমার কয়েকটি বিষয়ে আলাপ আছে।

আপনাদের
(স্বা:) সুরেন দাশগুপ্ত

আশা করি, ঐখানে আপনি সুখেই আছেন। আমি আগামী মঙ্গলবার কি বুধবার রওয়ানা হইয়া যাইতেছি।

প্রিয় পদ্মিনী,

সিমলা হইতে হঠাৎ তোমার একখানি পত্র আসায় আমি সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। বিস্ময়ের হইলেও এমন পত্র পাওয়া প্রীতিপ্রদ ও কাম্য। কলেজ হইতে বাহির হইবার পরই টাঙ্গাইলে যে কতক দিন কাটাইয়াছিলাম, সে দিনগুলি আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলির অন্যতম। আমার স্মৃতিপটে সেই সকল দিনের কথা আজ স্পষ্ট গাঁথা আছে। সেই সময় যাহাদের আমার পড়াইবার সুযোগ হইয়াছিল, আমার প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারি না। আর তোমার ও আমার ভিতর ইহা ছাড়াও একটি বন্ধন ছিল।

পরিবার ও ছেলেমেয়েসহ আমি এখানে আছি। তুমি আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়া আসলে খুবই আনন্দিত হইব। একজন গরীবের পক্ষে যতদূর সম্ভব হয়, সেই পরিমিত আতিথেয়তা তোমাকে প্রদান করা হইবে। দয়া করিয়া অবশ্য আসিও। কোন কারণে আমি নিজে ষ্টেশনে যাইতে না পারিলেও আমার বাড়ীতে তোমায় লইয়া আসার জন্য লোকের ব্যবস্থা রাখিব। পত্রোত্তরে তোমার বক্তব্য জানিতে চাই। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
(স্বা:) এস, এন, দাশগুপ্ত

সৈয়দ নবাব আলির পত্র

২১, ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১লা এপ্রিল, ১৯১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার ৩০শে মার্চ্চের পত্র পাইলাম। 'হেরাল্ড' অফিস হইতে আমি স্যার চার্লস বেইলি'র টাইপ করা ভাষণ পাইয়াছি। সেইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মনে হইতেছে ভাষণটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই।

নাগ মহাশয় তাঁহার পত্রে আমি যেন তাঁহার কাগজের গ্রাহক হই, সেজন্য আপনাকে আমায় বিশেষভাবে বলিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্যাপারটি কি রকম, আমি যে একদম গোড়া হইতেই তাঁহার পত্রিকার গ্রাহক, এই সংবাদটা তিনি রাখেন না। এদিকে কাগজখানি পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে ধানবাড়ী যাইতেছে।

আপনাদের
(স্বা:) সৈয়দ নবাব আলি

কিশোরীমোহন রায়ের পত্র

Pabna

সোদরপ্রতিমেষু, ১৮।১২।১১

আশা করি ভগবৎ কৃপায় আপনি ভাল আছেন। এখানে রবিবারের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি আনন্দ প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, আমরা এরূপ স্বরাজ পাইলে আপাততঃ আর 'স্বরাজ' চাহি না। স্বরাজ যদি কুরাজ হয়, তাহার শাসক সম্প্রদায় যদি নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ না হন, সে আশ্রয়ে যদি জনসাধারণের শান্তিলাভ না হয়, স্বজাতির মধ্যে যদি পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিরাজ করে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা যদি যেমন তেমনি থাকে, তবে সে 'স্বরাজে' কাজ কি? আপনার নিকট আমাদের এই নিবেদন, এই কথাটি উল্লেখ করিয়া 'বেঙ্গলীতে' একটু সহানুভূতিসূচক মন্তব্য প্রকাশিত হইলে অনুগৃহীত হইব। সুখের বিষয়, পাবনার সকলেই এই নূতন কথাটিতে সভাস্থলেই অসাধারণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিরদিনই আমার কার্য্যের প্রতি আপনাদের স্নেহদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাই আপনাকে লিখিলাম। নিবেদনমিতি।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

সৈয়েদ হোসেনের পত্র

৭নং দিদারবক্স লেন
১২ই নভেম্বর ১৯০৮

প্রিয়বরেষু,

সকল দিকে কুশল থাকিলে ইহার ভিতর যাইয়া আপনার সহিত দেখা করা আমার কর্ত্তব্য ছিল। এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমার ডান পাখানি জখম হইয়াছে এবং ইহার ফলে গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমি শয্যাশায়ী রহিয়াছি। আমি এখনও বলিতে গেলে নড়াচড়া করিতে পারি না। তবে দুই এক দিনের মধ্যে খোঁড়াইয়া চলিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি। আমি যে ভাগ্যের কবলে পড়িয়াছি, তাহার বিষয় আপনি জানেন, দেখিতেছি। আপনার অত্যন্ত সহৃদয় অভিনন্দনপত্রের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু বলিতে বাধ্য যে, যে সুযোগ আমি পাইতেছি, ইহাতে আমার মন আদৌ সায় দেয় না। ইহার চেয়ে আর কি খারাপ হইতে পারে। কাজটি আমার পক্ষে কতখানি অপ্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা আপনি নিশ্চয় বুঝিবেন। সুতরাং আপনার সহানুভূতি আমি পাইব। কিন্তু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই দেওয়া চলে না। এবং এক্ষেত্রেও আমার পক্ষে যতই অস্বস্তিকর হউক, সর্ব্বোপরি ঘটনার গতিবেগ অরোধ্য। তবে আমার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের বিষয় জানাইয়া আপনাকে ভারাক্রান্ত করিব না।

শারীরিক সক্ষমতা ফিরিয়া আসিলেই আপনার সহিত দেখা হইবে এবং সেই সময় আরও আলোচনা করিব। ইতি

আপনাদের
(স্বাঃ) সৈয়দ হোসেন

পি, এল, গাঙ্গুলীর পত্র

ঝিন্দ হাউস
সিমলা ডব্লিউ
৬ই অক্টোবর, ১৯০৯

প্রিয় নিয়োগী বাবু,

আপনি আমার এখানে আসিয়া থাকিলে খুবই সুখী হইব। দুঃখের বিষয়, কাজের চাপে আপনাকে আনার জন্য আমি নিজে ষ্টেশনে আসতে পারিব না। ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না, এই বিশ্বাস রাখি। পত্রবাহক আপনাকে আমার দীন কুটীরে লইয়া আসিতে সাহায্য করিবে।

আপনার
(স্বাঃ) পি, এল, গাঙ্গুলী

কিশোরীমোহন চৌধুরীর পত্র

রাজসাহী
১-৭-১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার সহৃদয় অভিনন্দন বাণীর জন্য ধন্যবাদ। ভগবৎ কৃপায় এই বৎসর আমি নির্ব্বাচিত হইয়াছি। সকলের সন্তোষজনক কাজ যাহাতে করিতে পারি, সেইজন্য তাঁহার নিকটই প্রার্থনা জানাই। কাজের চাপে যথা সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই, সে কারণে দুঃখিত। বিলম্ব ঘটিল বলিয়া দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। আবার আপনাকে ধন্যবাদ।

একান্ত আপনার
(স্বাঃ) কিশোরীমোহন চৌধুরী

সত্যানন্দ বসুর পত্র

কলিকাতা
৪ঠা মে, ১৯০১

প্রিয় পদ্মিনী,

তোমার পত্রগুলির আগে জবাব দিতে পারি নাই বলিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছি।

শ্বশ্রূমাতার হাতে স্যানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন ও সার্টিফিকেট ফর্ম্মটি দিয়াছি।

আমার টাকা পরিশোধের জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

নিজস্ব দার্জিলিং সংবাদদাতার নিকট 'দি বেঙ্গলী'র দীর্ঘ পত্র পাওয়া উচিত ছিল। কাগজের 'কলামে' ইহার জন্য আমি বৃথাই খুঁজিলাম।

আশা করি, খারাপ আবহাওয়ার হাত হইতে তোমরা রেহাই পাইয়াছ এবং শুভ্র হিমালয়ের সম্পূর্ণ দৃশ্যই দেখা যাইতেছে।

তোমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে, এই বিশ্বাস রাখিলাম। ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
(স্বাঃ) সত্যানন্দ বসু

আলতাফ আলির পত্র

দার্জ্জিলিং
১৩ই অক্টোবর, ১৯১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

এই মাসের ১১ই তারিখে লিখিত আপনার কার্ডখানি পাইয়া প্রীত হইলাম। আপনি সপরিবারে বগুড়া আসিতেছেন জানিয়া আমার আনন্দ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনার নূতন 'হোম'-এ ঠিকঠাক করিয়া বসিতে বেশী সময় লাগিবে না।

শীঘ্র আপনার উত্তর পাইতে ইচ্ছা করি।

ভবদীয়
(স্বাঃ) আলতাফ আলি

I don't mind living in a man's world as long as I can be a woman in it.

—*Marilyn Monroe*
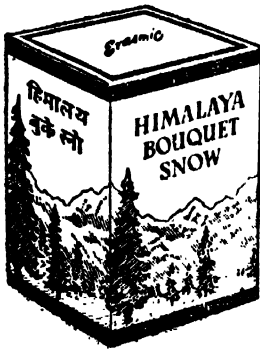
অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

কল্যাণী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অপরাজিতা ঘোষ

একটা বেজে গেল ঢং করে। নিদ্রাদেবী আজ আমার ওপর বিরূপ। একফালি চাঁদের আলো জানালা দিয়ে আমার বুকের ওপর এসে পড়েছে। বলছে যেন ইসারায়, রোজই ত ঘুমাও, দেখ না আজকে ঘুমিয়ে-পড়া রাতে আমার রূপ কত সুন্দর। তোমার মনের পাতায় লেখা হয়ে থাকবে চিরদিন। গর্ব্ব করে বলতে পারবে প্রিয়াকে।

সত্যি এত সুন্দর তুমি! এত স্বপ্নময়! আগে ত কখনও এত ভালো করে তোমাকে দেখিনি। তাই ত তোমাকে নিয়ে কত কাব্য, কবিতা, গান। কণ্ঠ-আলিঙ্গন করে প্রেমিকযুগল সারা রাত ধরে তোমাকে দেখে, আশ আর মেটে না তাদের। তাইত তোমাকে দেখে পাপিয়া ডেকে ওঠে পিউ কাঁহা বলে।

বাইরে হাওয়া-লাগা পার্কের ঝাউগাছগুলো শন্ শন্ করছে। হঠাৎ জেগে-ওঠা ছোট পাখীগুলো কিচির-মিচির করে উঠছে—ভাবছে বোধ হয় ভোর হয়ে এল।

একটু একটু করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে দশ বছর আগের দিনগুলো। বেলাদি। হ্যাঁ বেলাদির কথা।

থার্ড ইয়ারের প্রথম দিন। অনার্স ক্লাস করতে সাত নম্বর ঘরে ঢুকেছি। দেখি, একটি মেয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। জুতোর শব্দ হতেই মেয়েটি পেছন ফিরে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখতে লাগল ড্যাব ড্যাব করে। কি দেখল ওই জানে।

মনে হল মেয়েটি আমার থেকে বড়, দিদির মত। বেশ ছিমছাম চেহারা। লজ্জা পেলাম খুব, চোখ নামিয়ে নিলাম

ঘণ্টা পড়ল। আর একটি ছেলে এল, অধ্যাপকও এলেন। ক্লাস চলার মধ্যেও দেখি, মেয়েটি আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

সারাটা দিন কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম। কেবলই মনে হয়েছে,—কেন মেয়েটা আমার দিকে অমন ভাবে তাকাচ্ছিল। কোনদিন ওকে পথে-ঘাটে কোথাও দেখেছি বলেও ত মনে হয় না।

পরের দিন অনার্স ক্লাস ছিল প্রথম ঘণ্টায়। একটু আগে এসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা এল : তাকালাম না, একটা বই খুলে পড়ার ভাণ করলাম।

—এই শোন।

লজ্জাজনিত চোখে তাকালাম মেয়েটির দিকে।

—তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে মনে কিছু ক'রো না কিন্তু। তোমার থেকে আমি অনেক বড়। চার বছর আগে আই. এ. পাশ করেছি। হেসে হেসে বলে গেল মেয়েটি।

লজ্জাজনিত কণ্ঠে বললাম, আপনি ত আমার দিদির মত।

—হ্যাঁ, আমাকে তুমি দিদি বলেই ডেকো। কি নাম জান তো আমার—বেলা ব্যানার্জ্জি।

আবার বলে যেতে লাগল মেয়েটি, কোন্ ডিভিশনে পাশ করেছ, কোন্ কলেজ থেকে পাশ করেছ, বাংলায় অনার্স নিলে কেন, খুব ভালো লাগে বুঝি বাংলা সাহিত্য পড়তে?

একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলাম।

বেলাদি আমার দিদি ও বন্ধু হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। এমন একদিন এসেছিল, বেলাদি আমাকে দেখতে না পেয়ে থাকতে পারেনি, আমিও পারিনি ওকে না দেখতে পেয়ে। যেদিন ও না আসত, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যেত। আজকের দিনটা মাটি হয়ে গেল, গল্প করা হ'ল না।

একদিন বেলাদিকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—আচ্ছা বেলাদি, আমাকে তোমার এত ভালো লাগল কি করে, আমাকেই তুমি ভাইয়ের মর্য্যাদা দিলে কেন? আমার ত রূপও নেই, গুণও নেই।

একটা সুন্দর উত্তর দিয়েছিল বেশ মনে আছে—'এক নজরে তোমাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। ভাই বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়েছিল। আর কিছু শুনতে চাও?'

তারপর বেলাদির সঙ্গে কত গল্প করেছি, পড়াশুনা নিয়ে কত আলোচনা করেছি, একসঙ্গে বেড়িয়েছি।

সেদিন কি একটা কারণে দেড়টার সময় কলেজ ছুটি হয়ে গেল। বেলাদি আমাকে ওদের বাড়ী যাবার জন্য বিশেষ করে অনুরোধ করল।

বললাম,—আজ থাক, অন্যদিন যাব।

—না না, ওসব শুনছি না। সেই কবে থেকে ত বলে আসছ একদিন যাব, একদিন যাব। আজ আর ছাড়ছি না। যেতেই হবে তোমাকে।

—না না, আজ থাক। বলে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

বোধ হয় বুঝতে পারল আমার মনের ভাব, তাই অভিমান করে বলল,—তাহলে তোমার সঙ্গে আজই আমার সম্বন্ধ ছেদ। আর আমাকে বেলাদি বলে ডেকো না।

কি আর করব? বললাম, চল।

একটু হেসে বলল বেলাদি, স্বদেশ, দুষ্টু ঘোড়াকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় জান?

—কি করে?

—থাক।

চলতে চলতে বেলাদি বলে যেতে লাগল,—তোমাকে আমি নিজের ভাইএর মত ভালবাসি। নিজের একটা ভাইও নেই, বোনও নেই—তাইত তোমাকে আমার সব ভালবাসাটুকু উজাড় করে দিয়েছি। আরো বলল,—আমাদের এই ভাই-বোনের সম্পর্ক যেন চিরদিন এমনি ভাবে থাকে, ফাটল যেন না ধরে এতে।

বেলাদির বাবা মার সঙ্গে আলাপ হ'ল। ওঁদের আপনজন হয়ে যেতে বেশীদিন লাগল না। প্রায়ই যেতাম, দুটো মনখোলা গল্প করে ঘণ্টাকয়েক কাটিয়ে আসতাম, সেই সঙ্গে এক-পেট খেয়ে।

দেখতে দেখতে কলেজ-জীবনের দুটো বছর কেটে গেল। পরীক্ষা হয়ে গেল। রেজাল্টও বার হ'ল। আমরা দু'জনেই সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেলাম।

সেদিন বিকেলে কত আনন্দ করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম দুজনে, কিন্তু বাড়ী ফিরলাম ভারী মন নিয়ে।

গঙ্গার ধারে বসেছিলাম। নদীর বুকের ওপর জাহাজগুলো সারি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে বেলাদি বলল,—একদিন হয়ত তুমি ঐ একটা জাহাজে করে সাতসাগরের পারে চলে যাবে। তোমাকে 'সি অফ' করতে যাব আমি। ফিরে আসবে মস্তবড় হয়ে, সেদিনও যাব আমি তোমাকে 'ওয়েল কাম' করতে।

বললাম,—না বেলাদি, অতদূর স্বপ্ন আমার নেই। তবে এম, এ, পড়ব তুমি আর আমি একসঙ্গে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বেলাদি বলল, এক সঙ্গে না ত কি? আমরা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবো, একসঙ্গে বেরিয়ে আসব। দরখাস্ত কবে করতে হবে বলত?

—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অনার্স যখন পেয়েছি, সীট নিশ্চয়ই মিলবে। আমি না পাই, তুমি ত নিশ্চয়ই পাবে।

এই রকম কত ভালো-লাগা টুকরো টুকরো কথাবার্তা হ'ল।

একটু ঠাট্টা করে বেলাদিকে বললাম,—তোমাকে যে পাবে, তার কত জন্মের পুণ্যের ফলে, একথা মানতেই হবে। এত গুণ, এত রূপ—তোমাকে সে মাথায় করে রাখবে।

হঠাৎ যেন বড় গম্ভীর হয়ে গেল বেলাদি। গম্ভীরভাবেই বলল, বিয়ে আমার হবে না।

—কেন?

কোন উত্তর নেই, চোখদুটো ওর চলে গিয়েছে জাহাজগুলোর ওপরে। নিজেরই একটু কেমন জানি লাগল। বেলাদিকে ত কখনও এরকম গম্ভীর হতে দেখিনি। মনে হ'ল কথাটা বলে অন্যায় করে ফেলেছি। কাটিয়ে নেবার জন্য হেসে বললাম, একটা সামান্য ঠাট্টাও বুঝতে পার না বেলাদি? ভাইএর কি দিদির সঙ্গে একটু ঠাট্টা করারও অধিকার নেই?

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হ'ল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে থেমে থেমে বলল,—এতদিন কেবল ঠাট্টাই করে এসেছি তোমার সঙ্গে—আজ একটু আমার ভেতরের কথা শোন। কাউকে কোনদিন বলিনি, আজ তোমাকে বলছি। শুনে হয়ত একটু দুঃখ পেতে পার এই অভাগী বেলাদির জন্য।

বেলাদির মনে আবার দুঃখ আছে নাকি? সব সময়েই ত হাসে, কত ঠাট্টা ইয়ার্কি করে আমার সঙ্গে। বাপের একমাত্র মেয়ে। কোনদিন অভাব কাকে বলে জানে না, তার আবার দুঃখ আছে নাকি? কিজানি হয়ত থাকতেও পারে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

বেলাদি যেন একটু চেপে চেপে বলল,—আমার স্বামী ছিল, আমি বিবাহিতা।

—কি যা তা বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছে তোমার বেলাদি। শুধু শুনে যাও।

বোমার ভয়ে যে যেখানে পারে পালাচ্ছে কলকাতা ছেড়ে, বাবাও আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আমার এক ঠাকুমার কাছে।

মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখেছি, ঠাকুমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, —হ্যাঁরে বেলা, তুই মাছ খাস্? শাড়ীটারী না হয় পরিস্ ছেলেমানুষ বলে, তাই বলে মাছ মাংস খাস্?

—কেন ঠাকুমা, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—তুই না বিধবা—?

চমকিয়ে উঠলাম কথাটা শুনে। আমি বি-ধ-বা। আমার স্বামী ছিল!

—চমকিয়ে উঠলি কেন? কেন, তুই এসব কিছু জানতিস না? কারুর কাছে কখনও শুনিসনি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ঠাকুমার মুখের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠাকুমা বলে যেতে লাগলেন, তোর ওপরে, তোর আরো তিন বোন ছিল। সব কটারই পাঁচ বছর আর পেরোলো না। পাঁচে পড়ল কি সবকটা টপাটপ মরে গেল। তোর ওপরেরটা যখন মরে গেল তখন তুই তিন বছরের মেয়ে। তোদের বাড়ীর সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সেই সময়ে তোদের ওখানে এক সাধু এসেছিলেন, তোদের বাড়ীর কাছেই তাঁর ডেরা ছিল। আমি তখন তোদের ওখানে ছিলাম। আমার দিদি মানে তোর বাবার মা কেঁদে পড়লেন সেই সাধুর পায়ে। সেই সাধু অনেককিছু বলতে পারতেন। দিদির কথা শুনে সাধু বললেন, তোদের বাড়ীতে একটা অভিশাপ আছে। পাঁচ বছরের বেশী কোন মেয়ে বাঁচবে না তোদের বংশে। এই মেয়েটাকে যদি বাঁচাতে চাস ত পাঁচ বছর বয়স হবার আগে এর বিয়ে দিয়ে দে। যে কোন বর হলেই চলবে।

তোর বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন তোর ঠাকুমা আর তোর দাদু। সারা গাঁ খুঁজলেন তোর দাদু, পাত্র একটাও মিলল না। শেষে এক বুড়ো বিয়ে করতে চাইল পণের লোভে। অগত্যা তোর দাদু সেই বুড়োর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। তোর বাপ মা আপত্তি করেছিল কিন্তু তোর দাদু ঠাকুমার কাছে তাদের আপত্তি টিকলো না। আমারও মনটা খচ্ খচ্ করছিল।

বিয়ে হয়ে গেল তোর সেই ঘাটের মড়ার সঙ্গে। জানিস্ আমার কোলে বসে তোর বিয়ে হয়েছিল; তোকে আমিই সাজিয়ে দিয়েছিলাম।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে একদিন খবর এল, তোর স্বামী মরেছে সাপের কামড়ে। তোর হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল জন্মের মত। তবে একটা লাভ হ'ল, তুই বাঁচলি।

তোর বাবা বলল, মেয়ে বড় হলে আমি আবার ওর বিয়ে দেব। ঐটুকু মেয়ে বিয়ের কি বোঝে। গোটা জীবন ওকে আমি বিধবা থাকতে দেব না। আমরা ত তোর বাবার কথা শুনে কাণে আঙুল দিলাম। ছি, ছি, কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড। বাপ হয়ে মেয়ের আবার বিয়ে দেবে, হিন্দুশাস্ত্রে কেউ কখনও দেখেছে, না শুনেছে!

কদিন পরে তোর বাবা তোর মাকে আর তোকে নিয়ে কলকাতা চলে গেল, নিজের চাকুরীস্থলে।

পরে শুনেছিলাম, তুই নাকি শাড়ী গয়না প'রে পায়ে জুতো লাগিয়ে গট্ গট্ করে ইস্কুল কলেজে যাস্। তা না হয় হ'ল, ছোট মেয়ে শাড়ী গয়না পরে, কিন্তু তাই বলে তোর মা বাবা তোকে মাছ মাংস খেতে দেয়? ছি, ছি, কি ঘেন্না। কালে কালে কত দেখব!

একটু থামল বেলাদি, বোধহয় ধরা গলাটাকে একটু সাফ করে নিতে। আবার বলে চলল, পরদিনই আমি সোজা বাবার কাছে চলে এলাম। ঠাকুমার কাছে যা যা শুনেছি সব বললাম মাকে। মা আমাকে শান্ত করতে চাইলেন। বললেন, ছিঃ ওর জন্য আবার মন খারাপ করে? ওটাত একটা ছেলে-খেলা। কোন্ কালে কি ঘটেছে—যত সব অনাসৃষ্টি। বিয়ে বললেই বিয়ে হয়ে গেল? একটা ছোট শিশু, কি জানে সে বিয়ের? আমি এ বিয়ে মানি না। বেশ জোর গলায় মা বললেন।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম,—না মা, আমিও এ বিয়ে মানি না। কিছু বুঝলাম না, জানলাম না—তিন বছরের ছোট মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেল আমার এক বুড়োর সঙ্গে! এসব সেকালে ছিল, এখন আর নেই!

এর একটা কারণও ছিল, বুঝলে স্বদেশ। তোমার কাছে আমি কিছুই লুকোবো না, আজ উজাড় করে সব বলে যাব। আমি তখন ভালবাসতাম একটি ছেলেকে, নাম সুজিত। একরকম তার আমি বাগ্‌দত্তাই ছিলাম। কিন্তু পরে সেই ছেলেটি আমাকে যে চরম প্রতিদান দিল, ইতর না হলে কেউ পারে না এইরকম করতে।

আচ্ছা, প্রথম থেকে বলে যাই, তা হলে সব বুঝতে পারবে। একটু থামল বেলাদি বোধ হয় ভেবে নিতে!

আজ আমার ধারণা পালটিয়ে গেল। এতদিন বুঝতে পারিনি, কত দুঃখ এই মেয়েটির ভেতরে লুকিয়ে আছে। কি করে পারতে তুমি হেসে খেলে কাটাতে, একদিনও ত তোমাকে গম্ভীর হ'তে দেখিনি।

আবার বেলাদি সুরু করল,—তখন আমার বয়স বছর বারো বোধ হয়, একদিন দেখলাম একটা ছেলে বাবার কাছে এল, একেবারে ভিখিরীর মত চেহারা। শুনলাম ছেলেটা বাবাদের দেশের। বাপ মা কেউ নেই। দেশ থেকে বাবার কাছে এসেছে একটা চাকরীর আশায়। ছেলেটিকে দেখে বাবার একটু দুঃখ হ'ল। এইটুকু ছেলে চাকরী করবে? কি চাকরীই বা পাবে, বড় জোর একটা পিয়নের চাকরী।

বাবা ওকে চাকরী করতে দিলেন না, আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করবার ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির, গাঁয়ের ছেলে যেমন হয়—সাধারণতঃ। তবে লেখাপড়ায় খুব ভালো।

বাবার জন্যই ও আজ এতবড় হয়েছে; দিল্লীতে বেশ বড় অফিসর হয়েছে, ভালো কোয়ার্টার পেয়েছে, দুদিন বাদে হয়ত গাড়ীও কিনতে পারে। ভাবি, বাবা যদি না থাকতেন, ও কোথায় তলিয়ে যেত। বেশ লাগত ছেলেটাকে তখন, ওর কাছে মধ্যে মাঝে পড়া বুঝে নিতে যেতাম। তারপর ত বুঝতেই পারছ, যা হয়ে থাকে। দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেললাম।

বাবারও পছন্দ হয়েছিল সুজিতকে, ঠিক করেছিলেন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন।

এম-এ পাশ করে সুজিত দিল্লীতে ভাল চাকরী পেল। যাবার সময়ে বলে গেল ছুটিতে আসবে, চিঠি দেবে। তবে অবশ্য প্রথম প্রথম কথা রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ও যেদিন চলে গেল, বাড়ীর সবাই আমরা কেঁদেছিলাম, সুজিতও যাবার সময়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছেছিল। বাবা মার দুঃখটা খুব বেশী হয়েছিল। হবারই ত কথা, নিজেদের কোন ছেলে ছিল না, ওকে নিজের ছেলের মত করে এত বড়টা করলেন।

দিনে দিনে সুজিতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে লাগলাম। চিঠিপত্র একেবারে কমে আসতে লাগল, ছুটিতেও আর আসে না। চিঠি দিলে উত্তর পেতাম না।

তারপর একদিন চরম পরীক্ষা হয়ে গেল আমার, নিজের জীবনের সঙ্গে। অতটা ভাবতে পারি নি। এখন মনে হয় ধর্ম না মেনে বোধ হয় ভুলই করেছি—চরম ভুল। হিন্দু ধর্ম্মের যা শাশ্বত তাকে যদি মেনে নিতাম, বৈধব্যকে যদি জীবনের সঙ্গী করে নিতাম, হয়ত এতটা আঘাত পেতাম না। সেদিন ঠাকুমার কথাগুলো সহ্য করতে না পেরে পরের দিনই ফিরে গিয়েছিলাম কলকাতায়, কিন্তু এখানে পালিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারি নি। সুজিত আমাকে না ডাকলেও ত পারত, রাস্তার মাঝে আমাকে এমনভাবে অপমান করল! সত্যি, তোমরা বড় নেমকহারাম।

যাচ্ছিলাম এক বন্ধুর বাড়ী শ্যামবাজারের দিকে। ধর্ম্মতলায় ট্রাম ধরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল, বেলা—। ঘুরে তাকিয়ে দেখি সুজিত, এক গাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে একটা অবাঙ্গালী মেয়ে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, পরে সুজিতের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝলাম ঐ মেয়েটি সুজিতের স্ত্রী।

সমস্ত শরীরটা কি রকম করে উঠল, মনে হল' সমস্ত মাটিটা কাঁপছে, এক্ষুনি পড়ে যাব। কোন রকমে টলতে টলতে সামনের ট্রামটায় উঠে পড়লাম, টালিগঞ্জ যাচ্ছে ট্রামটা। ফিরে গেলাম বাড়ীতে। সব শুনে বাবা বললেন,—"জানতাম। আজকের জগৎটা এই রকমই, যাকে যত করবে, সে ততই এমনি করে প্রতিদান দেবে।"

আমার মনটা সেই যে সুজিত ভেঙ্গে দিয়ে গেল, আজও জোড়া লাগল না, লাগবেও না বোধ হয় কোনদিনও। আমারই ভুল, চরম ভুল করেছি।

বেলাদির স্বর ভারী হয়ে গিয়েছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রাস্তার লাইটের আঁলোয় গাল দুটো চিক চিক করছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কত মেয়ের জীবনে এই রকম হয়, আমরা ক'জনের খবর রাখি।

স্বাত হয়ে গিয়েছিল, উঠে পড়লাম। আরো খানিকক্ষণ হয়ত বসতে পারতাম, বেলাদি আরো হয়ত কত কি বলে যেত, কিন্তু কি লাভ? আরো শোনা মানেই বেলাদির মনে আরো দুঃখের প্রলেপ লাগান। পথে দু'জনে একটিও কথা বললাম না, বলবার মত মনও ছিল না। শুধু বিদায়ের সময়ে বললাম, আচ্ছা চলি বেলাদি। উত্তর এল, এস ভাই। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে ওপরে উঠে গেল বেলাদি।

বাড়ী ফিরলাম তখন ন'টা বেজে গিয়েছে।

সেই আমার শেষ দেখা বেলাদির সঙ্গে, আর আজ দশ বছর পরে দেখা। যেন একটা যুগ পেরিয়ে গিয়েছে। তবে এই দশ বছরের মধ্যে ভুলতে পারিনি বেলাদিকে একটা দিনের জন্যও। মনে হয়েছে ছুটে চলে যাই, কিন্তু পারিনি, পারিনি লজ্জায়। লজ্জাই আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

এম-এ পড়া আর আমার হ'ল না। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম, কোথায় সব মিলিয়ে গেল। ছিটকিয়ে গেলাম রূঢ় সংসারের চাপে। একটা কেরাণীর পদে বহাল হলাম।

ফাইল নিয়ে ঢুকেছি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চেম্বারে। দেখলাম একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক খুব গল্প করছেন সুপারের সঙ্গে। তাঁদের কথাবার্তার সম্বোধন পদ 'তুই' করে। মিঃ সেন আমায় সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, আমার বন্ধু, একসঙ্গে আমরা বি-এ পাশ করেছি। এর নাম অবনী বাড়ুজ্যে, গেজেটেড অফিসার ছিলেন, অবসর নিয়েছেন।

তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে, খুব যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকও দেখি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হঠাৎ বললেন, তোমার নাম স্বদেশ না? আমার মেয়ে বেলার সঙ্গে তুমি পড়তে না?

আমার অনুমান সত্য হয়ে গেল। অবনীবাবু আপনি? ঠিক চিনতে পেরেছি। বেলাদি এখন কোথায়, বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে বোধ হয় এতদিনে। তারপর আপনি কেমন আছেন? এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম কথ গুলো।

অবনীবাবু বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে? বেলা তোমাকে সারা কলকাতা খুঁজে বেড়িয়েছে, তোমার কোন পাত্তা নেই। বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, মা আমার কেঁদেও ছিল পর্য্যন্ত তোমার জন্য। কল্যাণীতে বাড়ী কিনেছি, বেলা ওখানকার স্কুলের টিচার হয়েছে। কবে যাচ্ছ বল।

—হ্যাঁ, যাব একদিন। নিশ্চয়ই যাব আপনাদের ওখানে।

—একদিন ত্বদিন বুঝি না, কবে যাবে ঠিক করে বল। বেলাকে তোমার কথা বলবো, তার হারানো জিনিষ খুঁজে পেয়েছি। জানো, এখনও বেলা তোমার কথা বলে।

অনেক কথা হ'ল অবনীবাবুর সঙ্গে। যাবার সময়ে, কল্যাণীতে আসবার জন্য বার বার করে বলে গেলেন।

দেখলাম, কত বদলিয়ে গিয়েছেন অবনীবাবু। মনের দিক থেকে নয়, চেহারার দিক থেকে।

ছ'দিন পরে বেলাদির একখানা খামভর্ত্তি চিঠি এল। অনেক কথা লিখেছে, পুনশ্চ: দিয়ে লিখেছে, 'কবে আসছো'। এরপরে আরো অনেক চিঠি এসেছিল। প্রত্যেক চিঠিরই বড় কথা হ'ল, 'কবে আসছো'। প্রত্যেকটারই উত্তর দিয়েছি, 'শীগ্‌গির যাচ্ছি' বলে। প্রায় একটা বছর কেটে গেল, এখনও গেলাম না। যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছি না। সেই লজ্জাটা আবার যেন আমার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া কাজের চাপে সময়ও আর হয়ে উঠছিল না।

এবার বেলাদির একখানা ভীষণ কড়া চিঠি এল। খুব অভিমান করে লিখেছে। লিখেছে 'এটাই আমার শেষ চিঠি।'

আর ত বেলাদিকে এড়িয়ে চলা যাবে না। এবার ওর সামনে দাঁড়াতেই হবে। চিঠি দিয়ে আর শান্ত করা যাবে না ওকে। দশ বছর পরেও আমাকে ভুলতে পারেনি, কত আপন করে চিঠিগুলো লিখেছে, তাকে মিথ্যে আশা দিয়ে কি লাভ? লজ্জা কাটিয়েও তার সামনে আমাকে দাঁড়াতেই হবে।

মাস খানেকের ছুটি নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম। পকেটে ডিরেকসন দেওয়া বেলাদির চিঠিটা নিতে ভুলি নি।

খেয়াল হ'ল, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিক। তাকিয়ে দেখি চাঁদ কখন চলে গিয়েছে আমাকে ছেড়ে। ছোট পাখীগুলো কিচির মিচির করছে ভোরের ইঙ্গিত পেয়ে বোধ হয়—।

ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। পাশ ফিরে শুলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চারিদিকে রোদ খট্ খট্ করছে, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। দরজা খুলেই দেখি বেলাদি দাঁড়িয়ে। মুচকি হেসে বলল, যাও, আর একটু ঘুমাও গে। এখনও সকাল হয় নি। বাব্বাঃ কি ঘুমোতেই না পার!

মাষ্টার মশায়

আশা দেবী

মাষ্টার মশায়ের বিদায়ী-সভাটি খুব জোরই হয়েছিল—একথা সবাই-ই একবাক্যে স্বীকার করলো। শুধু যাকে উপলক্ষ করে এত আয়োজন, সেই মাষ্টার মশায় নীরবে নির্জীবের মত বসে রইলেন যেন শেকড়-ছেঁড়া গাছ। মাথাটা চেয়ার থেকে ঢলে পড়েছে—নাক থেকে খসে পড়েছে নিকেলের ডাঁট ভাঙ্গা চশমাটা—সুতোয় বাঁধা না থাকলে হয়তো কাঁচটা ভেঙ্গেই যেত। বন্ধ চোখ-ছুটোতে জলের ধারা। মাষ্টার মশায় মূর্চ্ছা গেছেন।

গলায় তাঁরে গাঁথা শ্বেতপদ্মের মালা, পরনে মেয়েদের দেওয়া তাঁতের থান ধুতি। কোলে টকটকে লাল গীতা খানিকটা রক্তের মত জমে আছে—এটি প্রেসিডেন্টের বিদায়ী উপহার। ত্রিশ বছর ধরে স্কুলে কাজ করছেন,—তাঁরই হাতে গড়া স্কুল। তিনি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা—ছাত্রীদের কাছ থেকে এতটুকু দান তিনি নেবেন বৈকি! গুরুদক্ষিণার চেয়েও এর সঙ্গে যে তাদের সমস্ত হৃদয় মিশে আছে।

কি যেন একটা করুণ রাগিণী গাইলো একটি মেয়ে। গান থামলে সুরু হলো প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা। ছ'বার ইলেকসনে হারা, বহু ঘাটের জল খাওয়া হরিতোষ সমাদ্দার গলা কাঁপিয়ে—নানা সুরে তালে—নানা কায়দায় ভাষণ দিলেন। এক্ষেত্রে যা-যা বলা দরকার, কোন কথাই তিনি বাদ দিলেন না—"দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রদ্ধেয় সুধীরচন্দ্র দাস মশায় আজ আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিচ্ছেন। বিদ্যালয় এখন ক্রমোন্নতির দিকে—উচ্চ থেকে উচ্চতর ধাপে সে এগিয়ে যাচ্ছে—আমরা একে বহুমুখী বিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে উন্নীত করতে চাই। কাজেই নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকের আর এখানে স্থান হবে না। কাজেই আমরা বাধ্য হয়েই এঁকে অবসর"—বলেই প্রেসিডেন্ট এই বক্তৃতাজনিত গুরুতর পরিশ্রমের জন্যে টেবিলের উপর সযত্নে পূর্ব্বসঞ্চিত জলের গ্লাস থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নিলেন। আর এই ফাঁকে স্কুল-কমিটীর মেম্বাররা পটাপট হাততালি দিয়ে নিলেন। জলটা খেয়ে ভিজে-গলাটায় একটা খাঁকারি দিয়ে তিনি আবার সুরু করলেন—"অবশ্য চেষ্টা করলে যে রাখা একেবারে যেত না, এমন নয়। কিন্তু কি জানেন"—বলেই তিনি নিজের হাতের হীরের আংটিটা একবার ঘোরালেন—"ষ্ট্রিক্ট প্রিন্সিপলের দিক থেকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে আর পুরুষ টিচার রাখা হবে না—আমি এই নীতিরই পক্ষপাতী। অবশ্য জানি, এখানকার চাকরীটা গেলে ওঁর বিশেষ কষ্ট হবে। বাড়ীতে ১০।১১ জন খাইয়ে লোক—পাকিস্তানের কল্যাণে আত্মীয়-স্বজনের অভাব নেই বাড়ীতে। রোজগারের লোক উনিই একা—চাকরীটা গেলে সে রাস্তাও বন্ধ; তা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষাবিদ্—তাই নীতির মর্য্যাদা সর্ব্বদাই রক্ষা করবো—এই আমাদের আদর্শ—"

পটাপট করে হাততালি পড়লো কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে। শুধু মেয়েরা যেন আচ্ছন্নের মত বসে রইলো—হাততালি দিতে গিয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে মাষ্টার মশায়ের ছায়ামূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে। একদিনেই যেন লোকটি একেবারে বদলে গেছেন; একদিনেই যেন তাঁর বয়েস একযুগ পার হয়ে গেছে; তিনি যেন একেবারে অপরিচিত হয়ে গেছেন। এত কাছে তিনি ছিলেন এতদিন, যেন এক মুহূর্ত্তে অনেক—অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছেন তিনি। আজ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে কেউ চিনে বের করতে পারবে না।

: মাষ্টার মশায়!—উঠুন, একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। একটা মিষ্টিগলার ডাক এলো যেন অনেক দূর থেকে।

: অ্যাঁ—! ঘুম থেকে জেগে উঠলেন সুধীর দাস। আচ্ছন্ন চোখের ভেতর দিয়ে যেন সবটুকু দেখে নিতে চাইলেন, বুঝে নিতে চাইলেন সব ব্যাপারটা। তারপর একবার শূন্য ঘরটার দিকে, আর একবার ছলছলে চোখের উৎসুক দৃষ্টিমাখা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন: তোরা যা, আমি আসছি।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে যেন আলোর ঝিকিমিকি, মষ্টার মশায় দ্রুতপদে এলেন স্কুলের মাঠে। সমস্ত স্কুলবাড়ীটাকে তিনি একবার চোখভরে দেখে নিলেন। সমস্ত দৃষ্টির অপূর্ণতা যেন ভরে গেল এক মুহূর্তে। মনে হলো—"ভারি সুন্দর তো স্কুলটা!"—এ যেন এক নূতন আবিষ্কার, অভিনব উপলব্ধি মাষ্টার মশায়ের। যারা বিদায়ী সভা উপলক্ষে এসেছিলেন, তাঁরা বক্তৃতা দেবার গুরুত্ব কর্তব্য সমাধা করে হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে বসেছেন চিরাচরিত নিয়ম মত। তাঁদের কলকণ্ঠের বিজয়ী হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে চারতলা থেকে। হয়তো এতক্ষণ তারা হাসির ফাঁকে ফাঁকে চা—আর রসগোল্লা খাচ্ছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য, একটু আগেও তো এদের গলা ভরা কান্না ছিল—অকৃপণ অশ্রুবর্ষণে সভাকে করুণ রসে ভরে দিয়ে ছিলেন এঁরা—এঁরা কি সবাই পাকা অভিনেতা? বুকের ভেতরটা একটা গভীর ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো মাষ্টার মশায়ের। কেন—কেন এমন হয়? কেন এত নিষ্ঠুর হয় এরা? পানের ছিটে লাগা পাঞ্জাবীর হাতে চোখের জল মুছতে গিয়ে চমকে উঠলেন মাষ্টার মশায়। সিঁড়িতে খুট খুট করে গোটাকত পায়ের শব্দ। না—এরা তাঁকে এখুনি ধরে নিয়ে যাবে খাওয়াতে। সরল—পবিত্র ফুলের মত মুখগুলো এদের—পৃথিবীর ক্ষমতা-লোলুপতা এখনও স্পর্শ করেনি মনকে। এখনও কাঁদে এরা অপ্রয়োজনে—স্নেহের উৎস বইছে অন্তঃশীলা ফল্গুর মত, এরা তো কিছুই বোঝে না ওপর তলার কথা, সুতরাং আর থাকা চলে না। এদের মুখ দেখলে মষ্টার মশায় সব ভুলে যান। এখুনি—এখুনি পালাতে হবে এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্তে—নইলে এরা খাওয়াবার জন্তে কাঁদবে, খুব কাঁদবে।

রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে পড়ে মাষ্টার মশায় একটা রিক্সায় চড়ে বসলেন। কোলের থেকে পড়ে যাওয়া গীতার উড়ন্ত পাতাগুলো নিচু মাঠের মধ্যে পড়ে পড়ে বনমর্ম্মরের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল এলোমেলো হাওয়ায়।

রিক্সার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে প্রায় হুমড়ি খেতে খেতে ঘরে ঢুকলেন।

বাড়ীটা আজ খালি মষ্টারমশায়ের। ভারি ভালো লাগলো বাড়ীতে ঢুকেই। অন্তত কিছুক্ষণ একা থাকা যাবে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদা যাবে। সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকারে তলিয়ে আছে—তাঁরই অনাগত ভবিষ্যতের মত। আজ গিন্নীর বোনের বিয়ে। সকালেই সবাই বেরিয়ে গেছে। তিনি বারণ করে ছিলেন। গরীবের আবার আনন্দ—! গরীবের আবার নেমন্তন্ন খাওয়া! ভাবতে গিয়ে হাসি পেল মাষ্টার মশায়ের। না: যাকগে ওরা। এই উপলক্ষে তবু ওরা একটু খুসি হবে। কিছু সময়ের জন্তেও এই বিষাক্ত দারিদ্র্যের দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে, একদিন অন্তত ওরা প্রাণভরে আনন্দ করবে। আর? মাষ্টার মশায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—অন্তত পেট ভরে ভালো মন্দ খাবে—তারপর তো অনন্ত উপবাস।

ঘরে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার জমা হয়ে আছে। আলো আর জ্বালালেন না তিনি। এখনও পকেটে উনষাট টাকা বার আনা আছে। ট্যাঁকে আছে ডিয়ারনেস এলাউন্সের পঁয়ত্রিশ টাকা। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা এখনও পাননি। তবে পাবেন। কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম রিক্সা চড়লেন তিনি। মিথ্যে চার আনা পয়সা নষ্ট করলেন, থাকলে আধ সের আলু হতো।

ঘর অন্ধকার হলেও সবই তাঁর পরিচিত। কাজেই সন্তর্পণে একটা কাঠের বাক্স খুলে একটা মাটির ভাঁড়ে জেলে ভেজানো একদলা আফিং বের করলেন। জীবনের সব কিছুকে আর তিলে তিলে না মেরে একবারেই সব শেষ করে দেবেন তিনি। কত এলোমেলো চিন্তা যেন পাগলের মত মাথায় বাসা বাঁধতে চাইছে—কত কথা আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে,—কত আশার কথা—কত অপূর্ণ সাধের কথা।

খাতা-পেনসিল নিয়ে আজ তাঁকে সব কথাই লিখে যেতে হবে। প্রথমেই ভাবলেন কর্তৃপক্ষকে একটু অনুরোধ করবেন যে, তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে যেন একদিন ছুটী দেওয়া হয়। কিন্তু না—কেন তিনি অনুরোধ করবেন—যারা তাঁকে অন্যায় করে,—জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। পেনসিল দিয়ে ঘষে ঘষে ও জায়গাটা কেটে দেবেন তিনি।

আবার নূতন করে স্থুরু হলো লেখা—"মাত্র দশ পয়সা পকেটে নিয়ে কলকাতায় স্কুল খুলেছিলাম আমি। মনের মধ্যে যেন এখনও সেই ছবি ভেসে উঠছে। দশটি মাত্র ছাত্র; মাদুর পেতে রকে বসে পড়াতাম। মনে পড়ে কার যেন একখানা বই একবার গরুতে পথ দিয়ে যেতে যেতে মুখে করে চলে গিয়েছিল। যখন আকাশ কালো করে সন্ধ্যে নামতো, তখন ছাতু-জল আর একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সান্ধ্য ভোজন সেরে সেই মাদুরটাতেই শুয়ে পড়তাম। তখন বয়স ছিল অল্প,—মন ছিল শক্ত—দেহে ছিল শক্তি। আশা? হ্যাঁ, আশাও ছিল—স্কুল একদিন বড় হবেই, এ বিশ্বাস ছিল আমার। স্বাস্থ্য ছিল ভালো, লোহা খেয়ে লোহা হজম করতাম। কিন্তু আমার ছাত্ররা? তারা আমাকে ছাড়তো না; মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাওয়াত সযত্নে। তাদের ভালোবাসায় আমার মন ভরে থাকতো। ছিলাম ভালই—খেতামও ভালোমন্দ প্রায়ই। মনে পড়ে, আমারই ছেঁড়া মাদুরে বসে পড়ে আমারই ছাত্র তারক দাস বড় স্কুলে গিয়ে জলপানি পেয়েছিল। সেদিন আমি ওকে কোলে নিয়ে নাচতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও লজ্জা পেল ভারি—তবে হ্যাঁ, আমাকে পেটভরে সন্দেশ খাইয়েছিল। এত ভাল সন্দেশ আমি আমার জীবনেও খাইনি।

তারপর ঘরভাড়া বাকী পড়লো। বাড়ীওয়ালা তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে। রকও গেল। সম্পত্তির মধ্যে একটা ছেঁড়া মাদুর, একটা টিনের ফুলকাটা স্যুটকেশ, আর একটা ব্ল্যাকবোর্ড। সব ঘাড়ে করে রাস্তায় নেমে পড়লাম। চার দিন না খাওয়া—না দাওয়া, একটা পার্কের মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ড পেতে মাদুর মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছি। স্যুটকেশ চুরি গেছে। খিদের যন্ত্রণায় প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

গায়ে ঠাণ্ডা হাত পড়লো কার—যেন মা'র হাত, বড় ঠাণ্ডা—বড় স্নিগ্ধ।

: কে রে?—চোখ বুজেই জিজ্ঞাসা করলাম।

: আমি মণিরাম স্যার। আজ চার দিন থেকে আমরা আপনাকে খুঁজছি—চলুন একবার আমাদের বাড়ী। মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। ঠিক মনে পড়ছে স্পষ্ট,—ওদের চীৎকার করে বলেছিলাম: একটু জল, আগে একটু জল দে বাবা, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ওরা আঁজলা ভরে ভরে জল এনে দিলে আমায়—

আঃ আটটি ছোট ছোট হাতের কি মিঠে জলই না সেদিন খেয়েছিলাম—দু'হাত তুলে বললাম, মণিরাম, সন্তে, নীলে, বেণু—বেঁচে থাক—বেঁচে থাক বাবা।

মনিরামের বাড়ী থাকবার ঘর দিলেন—পড়াবার বক দিলেন। সন্তের মার ঘরে দুবেলা খাবার ব্যবস্থা হলো—নীলে মাটির ভাঁড়ে চা যোগাত—আমি যেন ইন্দ্রত্ব পেলাম। আস্তে আস্তে স্কুল বাড়ী ভাড়া নিলাম—সকালে মেয়েদের স্কুল হতো, দুপুরে ছেলেদের, তাও পার্টনার সাপে। আবার দাঙ্গা এলো—সবাই পালাল স্কুল-বাড়ী ছেড়ে; শুধু চেয়ার বেঞ্চি আগলে পড়ে রইলাম আমি—ছাত্র-ছাত্রীরা পালিয়েছে—সামনে অনাহার।

আবার চাকা ঘুরলো। এখন আর ছাত্র ছাত্রী ধরে না। স্কুল বড় হয়েছে—স্কুলের উন্নতি হচ্ছে—এখন আর আমার জায়গা হলো না।

লেখাটা শেষ করে খাতাটা টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে আফিঙের বাটিটা হাতে তুলে নিলেন। কাল সকালেই সমস্ত পৃথিবী থেকে তাঁর নাম মুছে যাবে। পরিবারের এগারটি লোক ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে—এ মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না।—যা কিছু থাকে তা বিক্রি করে বড় জোর একমাস চলতে পারে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় আরো মাস তিনেক।—তার পর।

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন বুকের সমস্ত শিরাগুলো স্কুলের নামে মুচড়ে উঠতে চায়—অসহ্য বেদনায় টনটন করে? যারা তাঁর জন্যে একবারও ভাবলো না, তিনিই বা কেন তাদের জন্যে এত ভাববেন? নাঃ আর ভাববেন না তিনি। উত্তেজিত শিরাগুলো দপ্ দপ্ করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে।

একটু জল—একটু জল খেতে হবে। আজই শেষ তাঁর জল খাওয়ার পালা। কুঁজোতে ছুটে গিয়ে হাত দিলেন। সেটা একেবারে খালি, গড়িয়ে পড়লো—ওতে জল নেই এক ফোঁটাও। বাড়ীর সবাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে, কুঁজোয় জল ভরতে ভুলে গেছে ওরা। আকণ্ঠ তেষ্টায় যেন জিভটা টেনে টেনে নিচ্ছে মুখের ভেতর। সমস্ত শরীরে একটা তীব্র জ্বালা—যেমন সেইদিন লেগেছিল পার্কের মধ্যে শুয়ে শুয়ে।

যেন একটা জেদ চেপে গেল মাষ্টার মশায়ের। এতটুকু দাবীও তাঁর মেটবার নয়? এক-বুক তৃষ্ণা নিয়ে মরতে হবে তাঁকে? একটা ছোট্ট দাবী,—এক গ্লাস জল,—এ-ও তিনি মৃত্যুর সময় পাবেন না? না,—জল তাঁর চাই-ই! অন্তত আজ এই মুহূর্তেই পেতে হবে।

অন্ধকারে এক পা—এক পা করে এগিয়ে গেলেন মাষ্টার মশায় কলের দিকে। বাঁ-হাতে কলটাকে খুলে দিয়ে তার নীচে হাতটা অঞ্জলি করে পেতে দিলেন।

: স্যার—! মাষ্টার মশায়—! মিষ্টিগলার একটা ডাক এলো।

: কে?

: আমরা। আমাদের দেওয়া চাদর, কাপড়, বই—সব ফেলে, না খেয়ে চলে এলেন কেন মাষ্টার মশায়? আমরা কি দোষ করেছি? এই যে খাবার—আমরা নিয়েই এসেছি। একি! কাঁপছেন যে আপনি? হাতে এটা কি? বাটি? জল খাবেন? দিন, আমরা দিচ্ছি—ওমা, গ্লাসে কি যেন। দাঁড়ান, একটু মেজে দি।

: ওরা দিল না মরতে—ওরা আমাকে কিছুতেই দেবে না একটু শান্তি—ডুকরে কেঁদে উঠলেন মাষ্টার মশায়।—পাগলের মত নিজের কপালে করাঘাত করতে লাগলেন।

আবার সেই মাতৃস্পর্শ—তেমনি স্নিগ্ধ—তেমনি ঠাণ্ডা। ওদের হাতে জল খেয়ে আবার তেমনি সুস্থ লাগছে, আবার নিশ্চেতন মনে নতুন করে উপলব্ধি জাগছে, যেমন জেগেছিল সেদিন পার্কে চার দিন না খাবার পর সন্তের হাতে জল খেয়ে।

সত্যিই তো—কি দোষ ওদের? ওরা তো আমায় ত্যাগ করেনি। একটা আশ্চর্য্য উপলব্ধির তরঙ্গ যেন বয়ে গেল তাঁর শিরায় শিরায়। আর মৃত্যুর মধ্যে পলায়নে নয়—জীবনের মধ্যে বাঁচবার প্রেরণায় মাষ্টার মশায় উঠে বসলেন। মণিরামের ছেলে, সন্তের ছেলেদের কে পড়াবে? মীরা, লীলারা তাদের বাড়ীর বুকে নিশ্চয়ই তাঁর পাঠশালা বসাবার ব্যবস্থা করে দেবে।—নয় তো—নিজের বাড়ীর বারান্দায়—? ওরে মীরা—আলোটা জ্বালাতো—?

: জ্বালাবো স্যার? বিনি বললে।

: এত অন্ধকার দেখছিস্ না; আলো না জ্বালালে কি হয়?

: একি আপনি কি বেরুবেন? বিনি বললে।

: দে—তো তোদের নূতন চাদর—কাপড়, আমি এখুনি মণিরামের বাড়ী যাচ্ছি। যাদের বাড়ীর তিনটি ছেলে এবার স্কুলে সীট পায়নি,—আর তোর ভাই খোকাকে বলিস্, কাল থেকে আমার বাড়ীর বারান্দায় কোচিং ক্লাশ বসবে।—আর শোন, আমি বেরুচ্ছি। তোরা খাবারটা ভালো করে ঢেকে ঘরে চাবি দিয়ে বাড়ী যা। আমি ফেরবার পথে তোর বাবার সঙ্গে দেখা করে চাবি নিয়ে বাড়ী ফিরবো।

অন্ধকারের মধ্যেই মাষ্টার মশায় পথে নেমে পড়লেন। নতুন যাত্রায়।

সূর্য্য-সম্ভবা

পূরবী চক্রবর্ত্তী

এক অরুণোদয়ের কাঞ্চন মুহূর্ত্তে তোমায় আমি প্রথম দেখেছিলাম। দেবতার মেয়ে এক দেবিকার রূপে আমার দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করে তোমার সেই সুন্দর উদয়ন আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, মুগ্ধ করেছিল। আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুধু চেয়েছিলাম তোমার পথে। কখন যে তুমি আমার নয়নের সব আকুলতাকে ব্যর্থ করে দূরে চলে গিয়েছিলে—তা আমি জানিনি, বুঝিনি। শুধু বহুক্ষণ পরে অবহিত হয়ে আমি অনুভব করেছিলাম—প্রথম দর্শনের সেই পরম ক্ষণে আপন অজানিতে মর্ত্তের কলুষ জীবন আমার ধন্য হয়ে গেছে,—ধন্য হয়েছে বুঝি এক অমরলোকবাসিনীর মহনীয় আবির্ভাবে।

দীর্ঘ দিনমান পরে ফিরে এসেছি—আবার এসেছি আমার চিরপরিচিত কলকাতায়। প্রবাসের বেদনা আমার দৃষ্টিতে নতুন

করেছে, সূক্ষ্মতর করেছে, আমার অনুভূতির চেতনাকে। সন্ধ্যার ক্ষণে আমি ফিরেছি। আলোকোজ্জ্বল পথের সেই চলমান জনস্রোতের মাঝে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমি একাত্মতাবোধ করেছি—প্রতিটি জিনিষের দিকে পরিচিতকে দেখার আগ্রহে চেয়েছি। কি যেন এক আনন্দের ব্যাকুলতা আমাকে অধীর করেছে। বারে বারে মনে ভেবেছি, এই এ চঞ্চল মহানগরীই তো ছিল দেশের প্রাণকেন্দ্র হবার আদর্শ ক্ষেত্র। রাজধানী দিল্লীর সেই মাপা হাসি আর মেকি জীবনের অস্বচ্ছন্দ গতি আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই তো ছুটি পাওনা হতেই ছুটে এসেছি আমার আপনস্থানে—এই স্বচ্ছন্দ জীবনের দেশে।

গাড়ী থামল আমার বাড়ীর দরজায়। বাড়ীর গাড়ী নয়—ট্যাক্সী। না জানিয়েই আমি চলে এসেছি—সকলকে খুশীতে অবাক করে দেব। ওই তো দ্বারোয়ান আমাকে দেখতে পেয়েছে। বিস্ময়ের আনন্দে সে এগিয়ে এসে আমাকে অভিবাদন জানাল। আমি স্মিতমুখে নেমে এলাম। আর আমার চিন্তা নেই। মালপত্র নামিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে, ওরাই আমার ঘরে সব কিছু তুলে রাখবে। আমি এখন ছুটে যেতে পারি আমার আত্মজনের প্রীতির উচ্ছলতায়। ভুলে যেতে পারি আমার পদমর্য্যাদা। আর গাম্ভীর্য্যের মুখোশ দূরে ফেলে সঙ্গীসাথীর সাহচর্য্যে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করে নিতে পারি এই দশটি দিনের সীমিত মুক্তির প্রতিটি পল অনুপল।

কাকভোরে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিশ্চিন্ত শয্যার আনন্দ থেকে দোর খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। অপব্যয়ের অবসর তো আর নেই। সময় যে আজ সোনা হয়ে গেছে। মুক্তির মুহূর্তগুলিতে যতটুকু মধু-মাধুরী আমি মনের অঞ্জলিতে সঞ্চয় করে নেব—ভবিষ্যতের কর্ম্মমুখর দিনগুলির গ্লানিতে তাইতো আমাকে নবতর উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত করবে—প্রেরণা যোগাবে আমার কর্ত্তব্যের বন্ধুর পথে। সুন্দরের কোন অণুকণা থেকেও তাই আমি আজ নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইনা। শেষরাতের আবছায়ায় এই ঝুলবারান্দার অর্কিড আর মনি প্ল্যাণ্টের সমারোহের মাঝে দাঁড়িয়ে এই যে বিচিত্র অনুভূতি—এর তুলনা কোথায়! পশ্চিমের আকাশে চাঁদটা মস্তবড় হয়ে উঠেছে—অথই নীলের সায়রে যেন ফুটে ওঠা রূপার বরণ ফুলটি। ও তো শুধুই আকাশকুসুম নয়। যাবার বেলায় মুঠি মুঠি আলোর রেণু ছড়িয়ে ও বুঝি পূর্ব্বাচলের সেই জবাকুসুম-সঙ্কাশ-এর পরম আবির্ভাবের কথাই জানিয়ে যেতে চায়। রাতের অন্তরে আলোর আবাহন—সে যে শাশ্বত, সুন্দর। দিগন্তের বুকে দৃষ্টি মেলে দেখলাম উষার প্রথম আভাষ। এত ভোরে প্রকৃতিকে এমন করে আর কখনও দেখিনি। মন আমার ভরে গেল। রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ বাতাস আমাকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। আর আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম প্রকৃতির কোলে পৃথিবীর সেই শান্ত মধুর রূপটি।

শহর কলকাতার এক মর্ম্মসত্য আমি অনুভব করেছি। রাজপথের দুধারে ছোটবড় অনেক বাড়ী। প্রাসাদের পাশেই হয়তো বস্তীর সারি। আর তারই মাঝে সুখে-দুঃখে শোকে-আনন্দে অনেক মানুষ দিন কাটায়। শ্রেণীগত বৈষম্য তাদের মাঝে আপাত বিভেদের আর বিরোধের প্রাচীর তুলেছে—তবু তাদের বেদনার কান্না আর আনন্দের গান এখানকার আকাশে বাতাসে এক হয়ে মিশে আছে। ষ্টেশনের কলরোল-মুখরতাকে অতিক্রম করে বাস্তুহারার দীর্ঘশ্বাস শুনেছি, আবার, মিনিষ্টারের বাড়ীর পাশে সুস্থ সম্মানের জীবনে বেঁচে থাকবার মত আর্থিক সঙ্গতির জন্য দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে অপরিসীম প্রাণশক্তির সংগ্রাম আর তার জয়যাত্রা—তাও দেখেছি। ভালবাসার মাধুর্য্য আর ষড়যন্ত্রের ক্রূরতা, বঞ্চনার ব্যর্থতা আর জীবনযুদ্ধের সার্থকতা এখানে বড় পাশাপাশি আর কাছাকাছি আছে। বিত্তের শুধু অহমিকা নয় উদারতাও আছে, দীনতার মাঝে শুধু হীনতাই নয় উচ্চতর মনোবৃত্তির প্রকাশও আছে। আর সৌন্দর্য্যের পাশে মালিন্য আছে বলেই তো তাদের আবেদন এমন সর্ব্বজনীন হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার এই অভিজাত অঞ্চলে,—সুদৃশ্য আর সুবৃহৎ বাড়ীর সুখসুপ্ত মানুষগুলির শুধু অর্থের আতিশয্যই নয়, সামাজিক সম্মানের প্রচুরতাও আছে। তারা দেশ আর সমাজের শীর্ষস্থানে। তবু তাদের অনেকের চরিত্রগত আদর্শে যে ঘূণ আছে, তা ব্যক্তির অন্তরের সীমারেখা ছাড়িয়ে ব্যষ্টিকে দুর্গতির পথে নিয়ে যায়। আর ঐ বস্তীর মাঝে যারা তাদের পাশেই আছে—তারা তো সমাজের অবহেলা আর অনাদরের জীবন। তারা ছলনা করে, কলহ করে, শুধু বেঁচে থাকার আগ্রহে প্রাণান্ত করে আবার পরস্পরকে ভালও বাসে। সুখে দুঃখে ওরা একে অন্যের সাথী হয়ে থাকে। শেষরাত থেকে রজনীর মধ্যযাম পর্য্যন্ত রাস্তার ঐ জলকলটির ধারে ওদের প্রবহমান কাজের মাঝে নিয়তই প্রকাশ পায় যে, ওদের জীবনেও একটা শৃঙ্খলার ধারা আছে—আর আরও আছে সমাজচেতনা। অনন্ত রূপবৈচিত্র্য এই শহর কলকাতার তবু তার অন্তরে কোথায় যেন এক মিলনের সুর বাঁধা আছে, যা শুনতে আর বুঝতে আমাদের ভুল হয় না। তাইতো কলকাতাকে এমন করে ভালবেসেছি।

রাজধানী দিল্লীর শৃঙ্খলাবোধও রাজকীয়। সেখানে রীতিনীতির শাসন বড় কঠিন। নয়াদিল্লী আর তার আশেপাশের সুপ্রশস্ত পথের ধারের ঐ যে বাড়ীগুলি, ওরা যেন বাস্তব পৃথিবীর নয়—রঙে রূপে আর কল্পনায় ওরা ছবি হয়ে উঠেছে। এক এক পথে যেন একই ছবির অনেকগুলি অনুকরণ। স্থানের ভিন্নতায় শুধু ভিন্নতর হয়েছে ছবির আদর্শ—আর তাতেই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে অর্থ ও সম্মানের মাপকাঠিতে পাওয়া জীবন-ব্যবধানের বিচিত্র রূপ। বড় রাস্তার পাশে গলিঘুঁজির সোজা পথের মতই মানীজনের পাশে সাধারণের ভীড় রাজধানী এড়িয়ে চলতে চায় আর নিজের দীনতাটুকুও সে সযত্নে বিলাসসজ্জার অন্তরালেই রেখে দেয়। তাই স্বাধীন ভারতের মর্ম্মকেন্দ্র—মহানগরী দিল্লী—তার অতীত ঐতিহ্যের গৌরবদীপ্তি নিয়ে দেশ আর বিদেশের কৌতূহলী জনতাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। শুধু দূরের সেই মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংস-শেষের উপরে গড়া, পুরাতন ভারতের বিজয়কীর্ত্তি পুরাণ কেল্লার ভগ্নস্তূপের দিকে চেয়ে, একটিবার দর্শনার্থী মন চমকে ওঠে। ঐ যে মানুষগুলি জরাজীর্ণ প্রাচীরের গুমটিঘরের ফাঁকে ফাঁকে অসুস্থ পরিবেশে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি যুঝে চলেছে—মনে হয়, ওরা যেন চিরন্তন বেদনা আর লাঞ্ছনার মূর্ত্ত প্রতীক—আপাতমধুর বিলাসনগরীকে তার প্রকৃত রূপের কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। আরও একবার দর্শক-অন্তর ব্যথিত হয়ে ভাবে,—

সুপরিকল্পিত নগররূপের অন্তরালে যে শ্রেণীবিভেদের রেখা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জাতীয় চেতনা কবে তাকে বিদেশের অন্ধ অহিত অনুকরণের মতই ত্যাগ করতে পারবে—আর ব্যক্তিসত্তা তার সব উচ্চতা আর তুচ্ছতা নিয়ে এক ভারত-আত্মায় বিলীন হয়ে যাবে। রাজধানী দিল্লী তার সব সৌন্দর্য্য আর গরিমা নিয়ে শ্রেয় হয়েছে—কিন্তু প্রিয় সে হবে কবে, আরও কত দুঃখ তপস্যার অন্তরে!

আরও একটি নূতন দিনের আলো-উজ্জ্বল জাগরণ আমাকে চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে বাস্তবের উদ্দীপনায় ফিরিয়ে আনল। পথে লোক-চলাচল শুরু হয়েছে। গাড়ীগুলো প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। সামনের ঐ গরুগুলোর গলার ঘণ্টা টুং টাং বাজছে। একটু টাটকা দুধের জন্য কত জন এসে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। মুরগীগুলো ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে আর ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে কি যেন। প্রভাত-ভ্রমণে চলেছে কত জন। গৃহহীনের দল ফুটপাথের আশ্রয় ছেড়ে উঠেছে একে একে। বাড়ীর লোকজনও জেগে উঠেছে। বাগানে মালী গাছে জল দিচ্ছে। দ্বারোয়ান এবার গেট খুলে দিল। আমি নীচে নেমে বেরিয়ে এলাম পথে। আর সিগারেটের ধোঁয়ায় মায়াজাল বিস্তার করে সবকিছুই আমার মনের মধ্যে ধরে নিতে চাইলাম। হোস পাইপে জল দিতে এসেছে রাস্তায়। জলে ভিজে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ বার হচ্ছে। ওদিকে ওরা রাস্তা পরিষ্কার করছে। অ্যালসেসিয়ানটাকে বেড়াতে নিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বনি এল আমার কাছে। পা শুঁকে, ল্যাজ নেড়ে, একটু আদর পেতে আর জানাতে চাইল ও পুরাতন প্রভুকে। তারও পরে বাস চলাচল শুরু হল। আকাশে লালের ছোঁয়া লেগেছে কতক্ষণ। সূর্য্য উঠতে আরও কত দেরী! শহরের ইঁটকাঠের অন্তরাল থেকে সূর্য্যের উদয়কাল পাঁজি-পুঁথির হিসাবকে কতকটা ছাড়িয়ে যায় জানি। তবুও তো কাম্য সেই আবির্ভাব। নগরীর বিরস জীবনে সে যে সুন্দরের এককণা মধুর আশীর্ব্বাদ।

সূর্য্যের বুঝি সাত রঙ্। আমার দৃষ্টির আকাশ আচ্ছন্ন করে আছে শুধু এক রঙ্—সে রঙ্ অনুরাগের। শুধু রাত্রির গ্লানিমাকেই অবলুপ্ত করেনি ঐ আলোর লালিমা—আমার জীবন মনকেও বুঝি রাঙিয়ে তুলেছে সব কামনা আর কলঙ্কের কালিমা মুছিয়ে। কোনও এক উজ্জ্বল উন্মেষের তিয়াসা যেন আমাকে অধীর করেছে। তাই অনন্ত প্রীতির আগ্রহ ব্যাকুলতায় অন্তর আর বাহির প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছি আমি নির্নিমেষে—কোন অপরূপের আসার আশায়!

প্রশান্ত ধীর পদক্ষেপে রাজপথ বয়ে তোমার সেই আগমন—সে যেন আমার জীবনসরণিতে এক পরম রমণীয়ের প্রথম সঞ্চরণ! আলুলায়িত কুন্তলা, তরঙ্গক্ষুব্ধ কেশকলাপের মাঝে তোমার ঐ অনিন্দ্য শ্যামলশ্রী নিয়ে তুমি এলে আমার দুয়ার প্রান্তে—মহাবিদ্যায়তনের পথচারিণী এক কন্যাকুমারী—বাতাসে বিপর্য্যস্ত আঁচল সামলিয়ে হাতের বই কটিকে সযত্নে ধরে চলতে চাইলে আপন পথে একান্ত উদাসিনীর মত। শুধু একটিবার অন্যমনা দৃষ্টিতে বুঝি নন্দিত হলাম আমি—আর তখনই উদয়াচলের সেই আলোক-দেবতার দ্যুতিময় হাসি মুঠি মুঠি সোনার আশীর্ব্বাদ হয়ে ঝরে পড়ল তোমার মুখে, বুকে সর্ব্বাঙ্গে। তোমার দুই আয়ত নয়নের স্নিগ্ধ স্মিত বন্দনায় ভাস্বর হলেন ভাস্কর, আর এক মূর্ত্তিমতী আলোক-কন্যার উদ্দেশে আমার মুগ্ধ মনের আরতি তখন ধন্য হয়ে গেল।

মুহূর্ত্তে বাস্তবকে ভুললাম আমি। মনে হল আমি যেন সেই মহাভারতের রাজা সংবরণ—চলার পথে দেখেছি আমার মানসী প্রতিমা সূর্য্যকন্যা তপতীকে! এক দুশ্চর তপস্যার শেষে অমর্ত্তলোকবাসিনী অধরা ধরা দিয়েছিল পৃথিবীর প্রণয়মাল্যের বন্ধনে—আদিত্যকন্যা হয়েছিল সংবরণ-জায়া। কিন্তু ঐ যে শ্রীমতী মেয়ে লাবণ্যের অমৃতধারায় স্নাত হয়ে পৃথিবীর সব নিবিড়তাকে ভুলে দূর আকাশের আলোক-চেতনায় মগ্ন হয়ে গেছে—ওর ঐ দীপ্তোজ্জ্বল রূপের কাছে আমার সব স্পর্দ্ধার কামনা যে ম্লান হতে চায়। আমি তো পুরাণের সেই সুকৃতী রাজা নই। শুধু উচ্ছৃঙ্খল আর দুরন্তযৌবন—আজকের পৃথিবীর মর্ত্ত পুরুষ আমি। শুচিতার প্রতিমূর্ত্তি ঐ দেবপ্রকৃতি মেয়ের প্রিয়হাতের বরণমালার সুরভিতে স্নিগ্ধ হয়ে যাব—দেহমনের সে অকলঙ্কতার গৌরব কোথায় আমার! দুঃসহ আত্মগ্লানির চিত্তশুদ্ধিতেও কি এই দুস্তর জীবন-ব্যবধানকে অতিক্রম করা যায়!

অলোক-সামান্যা কি কখনও অন্তরতমা হয়ে ধরা দেয় পৃথিবীর গেহকোণে! আর সব উচ্ছলতা হারিয়ে জীবন তখন সার্থক হয়ে যায় পরমপ্রাপ্তির আনন্দমধুরতায়!

আরও এক সোনাঝরা সকালের আলোকময় স্মৃতি বারেবারেই উচ্ছল আর উজ্জ্বল করে আমার অন্তরকে। যাত্রার প্রস্তুতি চলেছে শহরতলীর পথে—শান্ত আর স্নিগ্ধ পরিবেশে এক সারাদিনব্যাপী পিকনিকের আয়োজনে। চারখানা গাড়ী বোঝাই করা হচ্ছে জিনিষ আর মানুষে। বন্ধুজন আর আত্মীয় পরিজন—কেউ বা উঠেছে কেউ বা ওঠেনি এখনও। ষ্টুডিবেকারের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যারিয়ারে কি উঠল না উঠল তাই দেখছি দাঁড়িয়ে—পাশে থেকে কাজে সাহায্য করছে বৌদি আর ছোটবোন তিথি। হঠাৎই ওদের যুগ্মকণ্ঠের মুগ্ধধ্বনিতে সচকিত হয়ে ফিরে চাইলাম আমি—"একী এ"! আর তখনই ওদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আবারও দেখলাম আমি তোমাকে। কলরোলমুখরতায় বুঝি মুহূর্ত্তেকের জন্য ব্যাহত হল তোমার অচঞ্চলতা। কৌতুক আর কৌতূহলের দীপ্তিতে নয়ন উদ্ভাসিত করে বারেকের জন্য চেয়ে দেখলে এই বিচিত্র ক্যারাভ্যানের দিকে। শুধু ক্ষণিকের দৃষ্টিবিনিময়। আর তখনই উদীচীর সেই আলোর আবির্ভাবের সোনালী পরশে রঞ্জিত হয়ে উঠল তোমার তনুশ্রী। সূর্য্যকান্তমণির মত আলো উছলে-ওঠা তোমার দুই দৃষ্টিদীপের আনন্দ-আরতিতে বুঝি প্রীত হলেন আলোর দেবতা, আর সে প্রীতির অনুভবে তুমি হলে তখন পরম রমণীয়া! মুহূর্ত্তে সব মুখরতা হারিয়ে কোন অলখ আকর্ষণে যেন সবাই ফিরে দেখল তোমার মুখে! সুন্দরের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হল তাদের অন্তর, আর তোমার অজানায় নীরব শ্রদ্ধার ডালি সাজাল তারা তোমারই উদ্দেশে।

শুক্লবসনা তোমাকে দেখে ওরা বলেছিল মূর্ত্তিমতী বাগ্দেবী। আমি পরিহাসের আবরণে আমার মনের এক মধুর সম্ভাবনাকে অন্তরাল করতে চাইলাম ওদের চোখে—"অবাক্ দেবী বলো। যে অকল্পনীয় সিচুয়েশনের সৃষ্টি হল তাতে, এ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে!" আশ্চর্য্য! ভাবলাম আমি সবার চিন্তাধারার মাঝেই
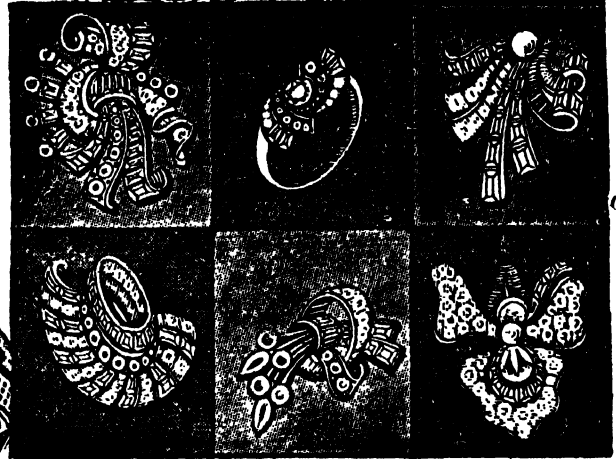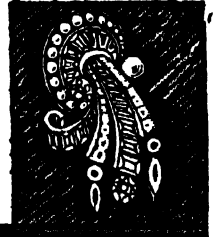
এক সঙ্গতির আভাষ খুঁজে পেয়ে! মর্ত্ত্যের কোনও তরুণলাবণ্য নয়, সূর্য্য-আত্মজার রূপেই তো তুমি আমার হৃদয়কে হরণ করেছ। তুমি বুঝি এই পৃথিবীর মেয়ে নয়, দেবীত্বের অচলায়তনেই তোমার নিত্যপ্রতিষ্ঠা!

আমার জীবনে প্রথমা নও তুমি—তুমি শুধু—একতমা। তবু তুমিই আমার অনন্যা! সপ্তদশ বসন্তের সম্ভার আমার দেহমনকে থরে থরে সাজিয়েছে। আর তারই অনতিক্রমণীয় আকর্ষণে ওরা ছুটে এসেছে জনে জনে—ঐ মুকুলিত যৌবনার দল। ওরা এসেছে, হেসেছে, আর তারও পরে ওরা শুধুই কেঁদেছে। ব্যক্তিত্বের প্রখর প্রসাধনে উচ্ছৃঙ্খল স্বরূপ লুকিয়ে ওদের নিঃশেষ আত্মদান আমি গ্রহণ করেছি। আমার যৌবনের খরতাপজ্বালায় ওরা শুকিয়ে গেছে—ম্লান হয়ে ঝরে গেছে মাটির কলঙ্কে একের পরে এক। আর আমি শুধু অলজ্জ অবহেলার হাসিতে এগিয়ে চলেছি আমার জয়যাত্রার পথে—আরও একটি জীবনকুসুমকে বৃন্তচ্যুত করবার নিষ্ঠুর আনন্দ-অধীরতায়। রূপ, গুণ, বিত্ত, অর্থ আর সামাজিক প্রভাবের ব্যাপকতা—এরাই তো চিরকালের চরিত্রবানদের পরিচিতির মাধ্যম! বিধাতার অপার দাক্ষিণ্যে এর সব কটিতেই আমি ধন্য হয়েছি। সব সন্দেহের স্পর্দ্ধা আর অপবাদের চক্রান্ত আমার পথে এসে তাই থমকে সরে গেছে। ডনজুয়ানের ভূমিকা নিয়েও ঘরে-বাইরে আমার নিষ্কলঙ্ক পরিচয় ব্যাহত হবার অবকাশ ঘটেনি কখনও। নারীত্বের চরমতম অপমান করেছি আমি নির্দ্বিধায়। রূপবিলাসিত পৃথিবীতে নারীকে জেনেছি শুধু পুরুষের বিলাসের এক সুন্দর উপকরণ। তবু সেই অসংখ্য বিভ্রান্ত আর অপার স্খলনের কালেও বুঝি সাধ্বী মায়ের প্রীতিস্নিগ্ধ পবিত্রতার রূপ আমার অবচেতন মানসে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তাই আমার অলসক্ষণকে বারেবারে চমকিত করেছে এক কল্যাণী পার্শ্বচারিণীর মধুময় কল্পনা। আজ এতদিনে বুঝি আমার সেই প্রতীক্ষার অবসান হল। মধুমতী তুমি এলে আমার জীবনে আর মুহূর্ত্তে আমাকে জয় করে গেলে পরমা-প্রকৃতির রূপবিহ্বলতায়!

কলকাতায় এসেছি গেছি আরও কয়েক বার। জীবনের একটা নতুন দিককে জেনেছি আমি। প্রথম ভালবেসেছি এক নারীকে পরম নিবিড়তায়। তাই আসা যাওয়ার ক্ষণে মিলনের আনন্দ আর বিরহের বেদনা অনুভব করেছি গভীরতর ভাবে। কতদিন উন্মুখ হয়ে থেকেছি। তোমাকে দেখার আগ্রহে। কোনও দিন বা দেখেছি তোমায়। আর সেই স্মৃতির আলোয় আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলির বিপদছায়াকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। এর বেশী কিছুই তো আমি কামনা করিনি। তোমাকে অনুসরণ করবার মত প্রাকৃত প্রবৃত্তি আমার হয়নি। তোমাকে কাছে পেতে চাইনি আমি। তোমার জাগতিক পরিচয় জানবার আগ্রহও জাগেনি আমার মনে। আমার অন্তর মাঝেই যে তোমার নিরন্তর অধিষ্ঠানের উজ্জ্বলতা! আমার জীবন মন শুধু এক নতুন ধারায় বয়ে চলেছে এখন। পার্টি, ক্লাব, আর পিকনিকের উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে আমার সংযম দেখে বিস্মিত হয়েছে সকলে। কত সুকন্যার অভিভাবক আমার নির্লিপ্ততায় হতাশ হয়েছে। অন্তরঙ্গজন এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সূত্র অনুসন্ধান করতে চেয়েছে কতবার—আর ফিরে গেছে ব্যর্থমনোরথ হয়ে। আমি নিজেও কি সঠিক বুঝেছি এর কারণ! শুধু জেনেছি ডিক্যান্টারের রক্তিম পানীয়ের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় এই আন্তর অনুরাগের সুধার আস্বাদন!

কতদিন পরে আর দেখিনি তোমায়। হয়তো তোমার কলেজের পাঠ সাঙ্গ হয়েছে এতদিনে। আমার দৃষ্টি থেকে তুমি দূরে সরে গেছ—কিন্তু আরও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছ আমার চেতনাকে। প্রিয় অনুধ্যানের কঠিন ব্রতচর্য্যার এই তো সবে প্রথম পর্ব্ব। জীবনসমুদ্রের মন্থনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখের অমিয়ধারাই নয়—ব্যথা আর ব্যর্থতার গরলও যে উঠে আসে—সে কথা আমি ভুলেছিলাম। বিশ্বাস আর প্রীতির প্রতিদানে নারীকে দিয়েছি শুধু বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা। তার সকরুণ আর্ত্তি আর দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপকে পৌরুষের অহমিকায় তুচ্ছ করেছি। আজ বুঝি তারই প্রায়শ্চিত্তের লগ্ন এল আমার জীবনে। তাই সংশয়িত চিত্তে ভাবি—ঐ বরণীয়ার দেহলীপ্রান্তে আমার মনের প্রার্থনা কি সার্থক হবে কখনও, আর বিচ্ছেদের দুঃখ সাধনার অন্তে দয়িতার হাসির মাধুরীতে মধুময় হয়ে যাবে আমার মিলন-বাসরের শুভলগ্ন!

হিতার্থীজন বিচলিত হয় আমার নিরুচ্ছ্বাস বিষণ্ণতায়। মনে ভাবে এ বুঝি যৌবনধর্ম্মের এক স্বাভাবিক পরিণতি—একক জীবনের মনোবিকলন মাত্র। তাই শুরু হয় খোঁজার পালা—আমার নিঃসঙ্গতা দূর করে মনটাকে সুখী করে দেবার জন্য প্রয়োজন হয় এক সুস্মিতা সহধর্ম্মিণীর। আমি বিরক্ত হই আর এড়িয়ে চলতে চাই এই অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ। বিদ্রূপ আর বেদনার হাসিতে সব আলোচনা আর সমালোচনা থেকে দূরে সরে আপনহারা হয়ে যাই আমার মনোহারিণী সেই শুচিস্মিতার অভিধ্যানে।

কবে যেন কথাচ্ছলে মেয়েমহলে অবতারণা করেছিলাম আমার একান্ত প্রিয় প্রসঙ্গের। নিস্পৃহভাবেই উত্থাপন করেছিলাম সেই পূর্ব্বদর্শিতা সর্ব্বশুক্লার কথা—তার বর্ত্তমানের উপর কেউ আলোকপাত করতে পারে কিনা, প্রকারান্তরে সেটা জেনে নেওয়াই ছিল আমার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার কৌতুকের কুহকে ওরা ভ্রান্ত হয়নি। অনতিপরিচিতা এক পথসঞ্চারিণীর প্রতি আমার এই অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশের আকস্মিকতায় ওরা বিস্মিত হয়েছিল, সুতীক্ষ্ম ব্যঙ্গের খরতায় জর্জ্জরিত করেছিল আমাকে। আর আমি তখন সলজ্জ সঙ্কোচে কোনও অছিলায় দূরে চলে গিয়েছিলাম। শুধু যাবার বেলায় সানন্দ আগ্রহে বৌদির মুখে এক মধুর মন্তব্য শুনেছিলাম—এ মিলন সম্ভব হলে সে নাকি বড় সুন্দর আর সুযোগ্য হয়! স্নেহের আশঙ্কার মাঝে আশার মৃদুল স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে মা সেই অনবলোকিতার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন। কিন্তু অজানার কুহেলীতে সেই অদর্শনাকে যে সকলে হারিয়ে ফেলেছে—তাই ব্যর্থকাম হয়ে গেল তাঁর কল্পনার সব অমিতি। আরও একদিন পরিভাষণের মাঝে আমার আদর্শ নারীর বর্ণনাকে প্রভাবিত করেছিল সূর্য্যস্নাতা সেই অতুলনা কন্যকার জীবন-প্রতীতি। সেদিনও পরিহসিত আর লজ্জিত হয়ে সরে গিয়েছিলাম আমি। আর অবাক হয়ে ভেবেছিলাম—ভালবাসার মোহন ছোঁয়ায় আমার ঊষর মনের বুকেও কি অবশেষে লজ্জার মত ললিত বৃত্তি ফুল হয়ে ফুটে উঠল এবার!

[আগামী বারে সমাপ্য।

তেজস্ক্রিয়তার সম্পদ

মহাযুদ্ধের দারুণ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ পরমাণু শক্তির প্রথম পরিচয় পেয়েছে। পরমাণুর বিস্ফোরণ-ক্ষমতা এবং জীবদেহে তার প্রভাব বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রবল উৎকণ্ঠার কারণ। অনেকে মানুষের এই আয়ত্তাধীন শক্তিকে বিজ্ঞানের অভিশাপ রূপে ধারণা করেছেন। কিন্তু এ হলো একদিক মাত্র। নদী বলতে আমরা যেমন শুধু বন্যাকেই বুঝি না, বাতাস মানে যেমন শুধু ঝড় নয়, পরমাণু শক্তিও তেমনি কেবল ধ্বংসেরই কারণ হয়নি, আমাদের জীবন বিকাশের পক্ষে নানাদিক দিয়ে কল্যাণকরও হয়েছে। যে প্রদীপ তার তলদেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখে, তা-ই আবার দশদিক আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

পরমাণুর বিকিরণ

বিকিরণ বলতে আমরা এতোদিন আলো বা তাপ রূপে শক্তির এক স্থান থেকে অপর স্থানে গমন বোঝাতাম। কিন্তু ১৮৯৫ সালের পর থেকে এই ধারণার পরিবর্তন হলো। ঐ বৎসর ফরাসী বিজ্ঞানী বেকারেল লক্ষ্য করেন যে, বিকিরণের পরিজ্ঞাত উৎস হতে স্বতন্ত্র রূপে ইউরেনিয়াম ধাতু অভিনব এক রশ্মি নির্গত করে। রেডিয়াম, এক্টেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি থেকেও এই রশ্মি প্রকাশ পায়। পদার্থ বিশেষের এই বিকিরণকে আমরা তেজস্ক্রিয়তা বলেছি, ইংরেজীতে রেডিও-এক্টিভিটি।

তেজস্ক্রিয়তার স্বরূপ

পিয়ের কুরী, রাদারফোর্ড এবং ভিলার্ডের গবেষণার ফলে ক্রমশ জানা গেলো যে, তেজস্ক্রিয়তা অযৌগিক বিষয় নয় (Composite phenomenon), আলফা, বিটা ও গামা—এই তিনটি রশ্মির উপাদানে গঠিত। আমরা ইচ্ছা করলে বাতির আলো বন্ধ বা প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মানবসাধ্য কোন প্রক্রিয়ায় এই বিকিরণকে রোধ করা যায় না।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয়তা স্বয়ংক্রিয়, অপ্রতিরোধ্য ; তবে কৃত্রিম উপায়েও তা সৃষ্টি করা চলে। আইরিণ কুরী এবং জোলিও সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সফল হন। সে হলো ১৯৩৩ সালের কথা। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ইলেকট্রণের আঘাত হেনে এই বৈজ্ঞানিক-দম্পতি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি করেন। আইসোটোপ হলো এক কথায় পদার্থের ভিন্নরূপ। সোনার আইসোটোপ আসলে সোনা-ই, তবে একটু তফাৎ এই মাত্র—সোনার ১৯৮ নম্বর পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিটা ও গামা নির্গত হয়ে থাকে। সকল আইসোটোপই তেজস্ক্রিয় নয়, তবে এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট ১,৩০০ আইসোটোপের মধ্যে প্রায় ৪০০ টির থেকেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি পাওয়া যায়।

পরমাণুর বিভাজন : শক্তির নূতন উৎস

১৯৩৪ সালে ইটালীতে এনরিকো ফার্মি ইলেকট্রণের পরিবর্তে নিউট্রণের আঘাত হেনে কৃত্রিম আইসোটোপ সৃষ্টির উপায় আবিষ্কার করেন। এর চার বছর পরে জার্মানীতে একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। হান এবং ষ্ট্রাসম্যান (Hahn and Strasaman) নিউট্রণের আঘাতে ইউরোনিয়ামের পরমাণু ভাঙতে সমর্থ হন। (আমাদের জানা উচিত যে, সৌরজগতের অতি ক্ষুদ্র
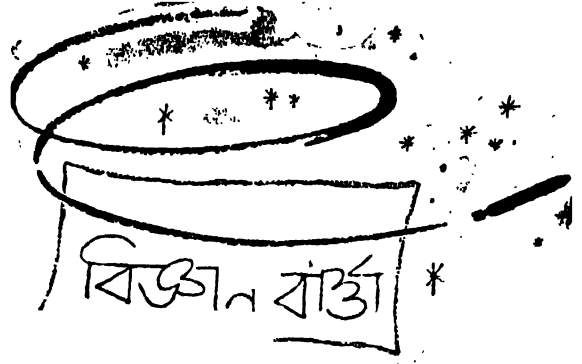
প্রতিকৃতিরূপে পরমাণুর মূলকণা ইলেকট্রণ কেন্দ্রবস্তু বা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে। পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ এই পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা, নিউট্রণ প্রোটন ইত্যাদি নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস তার স্বল্পতম আয়তন গ্রহণ করে আছে মাত্র, সুতরাং কোন পরমাণুর যথাস্থানে আঘাত হেনে তা দু'ভাগে ভাগ করা নিঃসন্দেহ অতি দুরূহ প্রক্রিয়া।) লিজে এবং ফ্রিস (Lise Meitner and Otto Frisch) এই পদ্ধতির নাম দেন 'ফিসন' (Fission), অর্থাৎ পরমাণুর বিভাজন। তাঁরা আরো দেখালেন, ফিসনের ফলে আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পায়। পদার্থের শক্তিতে রূপান্তরের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে (১৯০৫ সালে) আইনষ্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে, শক্তি (যার সাহায্যে কাজ হয়) এবং পদার্থ (যে কোন জায়গা জুড়ে আছে) একই জিনিষের বিভিন্নরূপ মাত্র, পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তিও পদার্থে রূপান্তরিত হ'তে পারে। কয়লা যখন জ্বলে তখনো কিছু পরিমাণ পদার্থ তাপশক্তিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু পরমাণুর বিভাজনের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ কল্পনাতীত ভাবে অধিক—প্রায় ২৬,০০০০০ গুণ।

ফিসন প্রক্রিয়ায় জাত ভগ্নাংশগুলি এক একটি নূতন পরমাণু, সাধারণত এরাও তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে। ইউরোনিয়ামের বিভাজনের ফলে সাধারণত তেজস্ক্রিয় ধাতু ক্রিপ্‌টন ও বেরিয়াম পাওয়া যায়। এরূপে পরমাণুর বিভাজন তেজস্ক্রিয়ার একটি নূতন উৎস। তাছাড়া, ফিসনের প্রভাবে দুই বা ততোধিক নিউট্রণ নির্গত হয়ে থাকে। আমরা জানি, নিউট্রণের সাহায্যে পরমাণুর বিভাজন সম্ভব। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণ ইউরেনিয়ামের বর্তমানে একবার ফিসনের ফলে জাত নিউট্রণ একাধিক পরমাণু বিদীর্ণ করবে, এই দুটি বা তিনটি নিউট্রণ আবার চার থেকে নয়টি ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনের কারণ হবে। এরূপে প্রতিটি থেকে দুটি বা তিনটি, তিনটি থেকে ছটি বা নয়টি পরমাণু—সুতরাং ফিসন প্রক্রিয়া পর্য্যায়বদ্ধ ভাবে অগ্রসর হবে—যেমন এক সারি সিগারেটের খোল কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে একটিকে ধাক্কা দিলেই সবগুলি খোল একে একে পড়ে যায়। ফিসন-এর ক্ষেত্রে অবশ্য এ ক্রিয়া অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ (critical mass) ইউরেনিয়াম একত্রিত হওয়া মাত্রই পারমাণু বিস্ফোরণ ঘটে—অর্থাৎ স্বল্পতম সময়ে অধিকতম শক্তি প্রকাশ পায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন পর্য্যায়বদ্ধ প্রতিক্রিয়া (chain reaction)। বিষয়টি খুবই আশ্চর্য্যজনক—কয়লার দহন-ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেনের সরবরাহ প্রয়োজন, কিন্তু ফিসন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়ামের পরমাণু প্রয়োজনীয় "অক্সিজেন"

অর্থাৎ নিউট্রণ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়, প্রক্রিয়াটি সুরু করার জন্য প্রথমে কয়েকটি নিউট্রণ থাকলেই যথেষ্ট।

পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পর ফ্রেড্রিক জোলিও এবং এনরিকো ফার্মি ইউরেনিয়ামের ফিসনকে সর্বপ্রথম পর্য্যায়-বদ্ধ বলে অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি তখনো প্রমাণ-সাপেক্ষ ছিল। অবশেষে ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর ফার্মির নেতৃত্বে ৪১ জন বৈজ্ঞানিক সত্যসত্যই তা সম্ভব করলেন। আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিচিত্র "রিয়েক্টার"-যন্ত্র (তৎকালীন নাম পরমাণু "পাইল"—চিকাগো পাইল নম্বর এক, CP 1) স্থাপন করে এই বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠী দেখলেন যে, ফিসন প্রক্রিয়া বাস্তবিকই পর্য্যায়বদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলে। ইউরেনিয়ামের পরিমাণ অধিক হলে এই প্রক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রবল বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে, এই বিস্ফোরণ-শক্তিকে আবার সংযত করাও চলে। এরূপে পরমাণুর কেন্দ্রস্থল আঘাত করে আধুনিক মানুষ মৎস্যচক্র ভেদকারী অর্জুনের দ্রৌপদীলাভের ন্যায় এক নূতন শক্তির অধিকারী হলো।

কল্যাণশক্তি পরমাণু

পরমাণু-শক্তির নিয়ন্ত্রণ সর্বকালের মানবজাতির একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তৎকালীন মহাযুদ্ধের কারণে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সর্বপ্রকারে গোপন রাখা হয়েছিল। ফলে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট জাপানের একটি বিখ্যাত সহরে পরমাণুর বিস্ফোরণের আগে পর্য্যন্ত মানুষের এই আয়ত্তাধীন শক্তি সাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিচয় লাভ করেনি। পরমাণুকে আমরা প্রথম ধ্বংসশক্তিরূপে জেনেছি, কিন্তু মহাযুদ্ধের পর এই নূতন শক্তি প্রধান ভাবে শুধু সামরিক উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত থাকেনি, বহু ক্ষেত্রে তা মানুষের কল্যাণ সাধনেও তৎপর হয়েছে। পরমাণু-শক্তির বলে বহু আত্মঘাতী অস্ত্র উদ্ভাবন সম্ভব হলো সত্য, কিন্তু সেই সংগে তা মানুষের অগ্রগতির সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। পরমাণু আজ শক্তির বিকল্প উৎস, পরমাণু আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, পরমাণু শিল্পকাজে কৃষিকর্মে—পরমাণু আজ সকল ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণে ব্রতী হয়েছে।

পরমাণুর "অদৃশ্য হাত"

জল বলতে যেমন সিক্ততা, পরমাণুর সাথে তেমন তেজস্ক্রিয়তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা জানি, এই তেজস্ক্রিয়তা ত্রিবিধ রশ্মির উপাদান। আলফা ও বিটা—বস্তুকণার প্রবাহ মাত্র। আলফা নিউট্রণের এবং বিটা-রে হলো ইলেকট্রণ। গামা কিন্তু প্রকৃত অর্থে বস্তুহীন রশ্মি, এবং এক্স্-রে বা আলোর সংগে তুলনীয়। আলো কাচ ভিজিয়ে যায়, এক্স্-রে মোটা মোটা কনক্রীটের দেওয়াল পর্য্যন্ত ভেদ করতে পারে—গামা রশ্মি এর ভেদন ক্ষমতা (Penetrating power) এক্স্-রের তুলনায় কয়েক শ গুণ। তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিনটির মধ্যে গামা-রেই সবচেয়ে শক্তিশালী, তারপর বিটা রে, এবং সবচেয়ে কম আলফা রশ্মি।

এইচ, জি, ওয়েলস্-এর অদৃশ্য মানুষের গল্প আমরা শুনেছি। যে মানুষকে চোখে দেখা যায় না, পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে তাকে কেমন অনুসরণ করা চলে। পরমাণুর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তাও এমনি "অদৃশ্য হাত"! এই "অদৃশ্য হাত" আমাদের কেমন কাজে আসছে, তার কয়েকটি এখন উল্লেখ করছি।

পরমাণু শিল্পকাজে

তৈল অঞ্চল বা শোধনাগার হতে সাইমোজেন, পেট্রোলিয়াম-ইথার, পেট্রল, গ্যাসোলিন, কেরোসিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের তেল একই নলপথে পর্য্যায়ক্রমে পাঠানো হয়ে থাকে। পরিবহন-ব্যয় এতে কম হয় সত্য, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তেল কখন আসবে তা জানতে না পারায় দু রকম তেল একত্র মিশে যেতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে এর সমাধান আছে। এক শ্রেণীর তেল যখন পাঠানো শেষ হলো তখন তেজস্ক্রিয় এন্টিমনি বা বেরিয়াম নলপথে কিছু পরিমাণে ঢেলে দেওয়া হয়। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, কোন তেজস্ক্রিয়তা সন্ধানী যন্ত্র (Geiger-Müller Counter)-এর সাহায্যে সহজেই তা ধরা পড়বে। তেজস্ক্রিয়তা তৈলবাহী নলগুলিকে বাধামুক্ত রাখার কাজেও সাহায্য করে।

দুটি ধাতুখণ্ডের ঘর্ষণে ক্ষণিকের জন্য যে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে ধাতুর ক্ষয় হয়ে থাকে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ খুবই কম, অণুবীক্ষণের সাহায্যেও সহসা ধরা যায় না, কিন্তু নিয়ত সচল থাকার ফলে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এই ক্ষয়ের পরিমাণ সহজেই প্রকট হয়ে ওঠে। যন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাই মাঝে মাঝে তেল (Lubricating oil) দেওয়ার বিধি আছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তেলের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করার জন্য পূর্বে পরীক্ষা-মূলক ভাবে যন্ত্রকে চালিয়ে ক্ষয়ের পরিমাণ হিসাব করা হতো। কিন্তু কাজটি সময়সাধ্য এবং ব্যয়সাধ্যও বটে—কারণ এই পদ্ধতিতে দামী দামী যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শুধু পরীক্ষাকার্য্যেই নষ্ট হতো। সাধারণ ধাতুফলকের পরিবর্তে যদি যন্ত্রের অংশকে তেজস্ক্রিয় করা হয়, তা হলে ন্যূনতম ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পরিমাণও গাইগার কাউন্টার জানিয়ে দেবে। একটি উদাহরণ দেওয়া ভাল। ক্যালিফর্ণিয়া রিসার্চ করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, এই পদ্ধতি অবলম্বনে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার খরচ করে চার বছরে যে তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, সাধারণ উপায়ে তার অন্তত পঁচিশগুণ অর্থব্যয় ও বার গুণ সময় নষ্ট হতো।

শিল্পে তেজস্ক্রিয়তার আরো বিচিত্র প্রয়োগ আছে। কাগজ বা ধাতুর পাত কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে। জানা দরকার, পুরুর সমতা রক্ষিত হচ্ছে কিনা। তেজস্ক্রিয় থ্যালিয়াম নিমেষেই তা করে দেবে। থ্যালিয়াম বিটা রশ্মির বিকিরক, চলন্ত পাতের নিচে এটি রাখা হয়। পাতটি যত পুরু, রশ্মির তীব্রতাও তত হ্রাস পাবে। তেজস্ক্রিয়তা-সন্ধানী যন্ত্র সহজেই তা ধরতে পারে।

ধাতুতে ধাতুতে জোড়া লাগানো হলো, কিন্তু ভিতরে গলদ থাকতে পারে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, বলা যায় না জলের চাপে কোথাও যদি ফাটল ধরে। ভয় নেই, তেজস্ক্রিয়তা আছে। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ রশ্মি বিকিরণে ভিতরকার ছবি তুলে দেবে—ঠিক যেন 'অটোগ্রাফ' (Auto Graph)। পাঁচ সেণ্টিমিটার (দু' ইঞ্চি)-এর ভিতর হলে তেজস্ক্রিয় ইরিডিয়াম, তার বেশী চাইলে কোবাল্ট (ত্রিশ সেণ্টিমিটার পর্য্যন্ত)।

ব্লাষ্ট ফারনেস্ (Blast Furnace)এর ভিতরটা বিশেষ ইট (Fire Brick) দিয়ে গাঁথা থাকে। কয়েক বছর পরে কিন্তু এই ইট ধ্বসে যায়। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের সাহায্যে সহজেই আমরা

চুল্লীর দেওয়ালের পুরুত্ব মেপে নিতে পারি। ফলে কখন সারাই করা উচিত তা নিয়ে আর সমস্যা থাকে না।

এমন অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া আছে যাদের পরিণত পর্য্যায় মাত্র আমাদের জানা আছে, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা থেকে কি করে বিভিন্ন স্তরে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা আর জানা নেই। যেমন ধরুন, রবারের ভালকানিজেশন (Vulcanization), কার্বোহাইড্রেটের অক্সিজেন-সংযোগ (oxidation) ইত্যাদি। কার্বনে-ডুই-অক্সিজেন (Carbon Dioxide) জল ও সূর্য্যকিরণ হতে কি করে যে উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ও চর্বি গঠন করে (Photo Synthesis) তা-ও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তা যদি কোন দিন জানা যায়, খাদ্য সামগ্রীর জন্য মানুষকে আর কৃষি ও গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভর করতে হতো না। এই কয়টি সামান্য জিনিষ থেকেই খাদ্য সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেতো। যদি তা কোন দিন পারা যায়, একমাত্র তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যেই সম্ভব হবে।

আপাতত পরমাণুর "অদৃশ্য হাত" কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংকেত করেছে। লৌহ-শোধন কার্য্যে ব্লাষ্ট ফারনেস্-এ গন্ধকের পরিমাণ ধাতুর গুণাগুণ নির্ধারণ করে। চুল্লীর ভিতর গন্ধকের ক্রিয়া অনুধাবন করা আগে সম্ভব ছিল না, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা তা সহজ করেছে। তেজস্ক্রিয় গন্ধকের গতি অনুসরণ করে ফারনেস্-এ তার ক্রিয়া উন্নততর করা এখন আর দুরূহ নয়।

তেজস্ক্রিয়তার ফলে শংকর ধাতু বা Alloy-এর গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে যা জানা গেলো, তা সত্যই বিস্ময়কর। অ্যালয়ের দানার ভিতর পরমাণুগুলি নিয়ত গতিসম্পন্ন থাকে, বাইরের কোন পরমাণু অ্যালয়ের সংস্পর্শে দানার এই "আবর্তে" ডুবে যেতে পারে। কার্বনে-ডুই-অক্সিজেন গ্যাসের কথাই ধরা যাক। এই গ্যাসের কার্বন পরমাণু ইস্পাতের ভিতর সহজেই প্রবেশ করে। নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রেও তা-ই। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার দিক থেকে অ্যালয়ের এই দ্রব্যগুণ (Proterty) অত্যন্ত কার্য্যকারী।

পরমাণু কৃষিক্ষেত্রে

ফটোসিনথেসিস্-এর কথা আমরা বলেছি, যার রহস্য মোচন হলে পৃথিবীতে কৃষিকাজ নিরর্থক হয়ে যাবে। গরুর লেকটিক গ্রন্থি (Lactic Gland) সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা অনুরূপ চিন্তা করছেন। এই গ্রন্থির জৈবিক ক্রিয়া (Metabolism) জানা গেলে ঘাস থেকে দুধ তৈরী করা বুঝি আর সমস্যা থাকে না। ভেড়ার গায়ে কি করে লোম জন্মে, দেহে কিভাবে চর্বি সঞ্চয় হয়—এ সমস্ত এখনো মস্ত জিজ্ঞাসা। তেজস্ক্রিয় রশ্মি একদিন তার উত্তর দিতে পারে। কৃষিকাজ এখনো নিরর্থক হয়নি, ফলে তেজস্ক্রিয়তা এখন আমাদের এই কাজে সাহায্যকারী হয়েছে।

সার কখন কিভাবে দিলে গাছের সর্বাপেক্ষা উপকার হয়, তেজস্ক্রিয়তা তা আমাদের জানিয়ে দেয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে গাছের ভিতর সারের কাজ অনুসরণ করা এখন আর সমস্যা নয়। নর্থ করোলিনা কলেজ এইভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, তামাক চাষার গোড়ায় যে সুপার ফস্ফেট (Superphosphate) সার দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ নিরর্থক, কারণ বাড়ন্ত অবস্থায় তামাক এই সার গ্রহণ করে না। এই একটি মাত্র আবিষ্কারে সেখানকার চাষীরা বছরে প্রায় ৪,৩০০ টন সার বাঁচাতে পেরেছিল।

অনেক সময় দেখা যায় সামান্য কোন পদার্থের অভাবে উদ্ভিদ বা জীবদেহ রোগ ধারণ করে। এক সময় রাশিয়ার লাটভিয়ান প্রদেশে গরু ও ভেড়ার পালে মড়ক দেখা দেয়। মস্কোর জীব-প্রজনন প্রতিষ্ঠান জানালেন, দেহে কোবাল্টের অভাব হেতু রোগ দেখা দিয়েছে। তখন সাধারণ খাদ্যের সাথে পশুদের 'কোবাল্টের বটিকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা হলো। ইংলণ্ডে আলফালফা (Alfalfa) এবং অন্যান্য যে সকল উদ্ভিজ্জ শীতকালে নষ্ট হয়ে যেতো, জমিতে ফস্ফরাসের অভাবই তার কারণ, তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যেই এই সন্ধান পাওয়া গেছে।

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে শস্যকীট ধ্বংসও সম্ভব। এই রশ্মির সাহায্যে সম্প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, ডি, ডি, টি কীট ইত্যাদি সকল শ্রেণীর পোকার পক্ষে মারাত্মক নয়, ডি, ডি, টির সাথে অন্যান্য রসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বর্তমানে তা আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন, এবং তা করাও হয়েছে।

কিন্তু শস্যক্ষেতে তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বুশলাণ্ড (Bushland) নামে এক জীবাণুবিদ এই উদ্দেশ্যে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বন্ধ্যাত্ব আনে। বুশলাণ্ড পুংজাতীয় পোকাকে বিকিরণে বিদ্ধ করে উপদ্রুত অঞ্চলে ছেড়ে দেন। স্বাভাবিক স্ত্রী-পোকা এই সকল "তেজস্ক্রিয়" পোকার সংস্পর্শে এসে যে ডিম পাড়ে তা ফুটে আর বাচ্চা বেরোয় না। এইভাবে সহজেই কীট ধ্বংস করা যেতে পারে।

রান্নাঘরে পরমাণু

পরমাণু শুধু কৃষিক্ষেত্রেই কাজ করে নি, রান্নাঘরেও চলে এসেছে। খাদ্য সংরক্ষণ একটি মস্ত সমস্যা। কিন্তু জীবাণুকুলের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। তেজস্ক্রিয়তা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু জীবাণু নির্মূল করতে শক্তিশালী রশ্মির প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বিকিরণের প্রয়োগে কলা ইত্যাদি কয়েক প্রকার ফল অনেকদিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই ব্যবস্থায় খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ ও বর্ণ নষ্ট হয়ে থাকে। মোট কথা, খাদ্য সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয়তা এখনো সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। তবে পেনিসিলিন ইত্যাদি কয়েক প্রকার ওষুধ এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয়, তাপ প্রয়োগে পেনিসিলিন নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগকল্যাণে পরমাণু

চিকিৎসায় এতোদিন আমরা রেডিয়ামের কথা শুনেছি. রেডিয়াম ক্যানসারে ব্যবহার হয়। এই ক্যানসার কি? আমাদের দেহকোষে যে প্রোটিন ও নানাবিধ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic Acid ইত্যাদি) আছে, তার পরিমাণ যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন দেহকোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে—তারই ফল হলো ক্যানসার।

কিন্তু দেহকোষে অ্যাসিডের পরিমাণ কেন বেড়ে যাবে তা এখনো অজ্ঞাত আছে। তাই ক্যান্সার আজও দুরারোগ্য ব্যাধি। তবে কয়েক প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার এই রোগকে অনেকটা সংযত করে এনেছে। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের কথাই ধরা যাক। রূপোর ন্যায় শুভ্র এই মৌলিক পদার্থটিকে আগে বলা হতো "বিত্তহীনের স্বর্ণ"। কিন্তু ক্যান্সারের চিকিৎসায় আজ কোবাল্টের যে দান তা রেডিয়ামের সংগেই তুলনীয়। বিকিরণের দ্বারা দেহকোষ

নষ্ট হয় বলে আমরা জানি, এই জন্যই ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, তেজস্ক্রিয়তার ফলে রুগ্ন দেহকোষের সংগে প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক কোষেরও ক্ষতি হয়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থকে এমন আকারে প্রয়োগ করতে হবে যাতে স্বাভাবিক দেহকোষে তার প্রভাব অত্যন্ত পরিমিত হয়ে থাকে। চিকিৎসার প্রয়োজন বুঝে "বিজ্ঞানের স্বর্ণকে" সহজেই বিভিন্ন আকারে রূপ দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে কোবাল্ট নাইলন তন্তুও ব্যবহার করা হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের দেশেও তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের ব্যবহার হচ্ছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় কিন্তু ক্রমশঃ তেজস্ক্রিয় কেসিয়াম (cesium)-এর ব্যবহার চালু হবে, কারণ এর তেজস্ক্রিয়তা অনেকদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে।

গলদেশে অবস্থিত থাইরয়িড গ্রন্থি (Thyroid Gland) আমাদের জৈবিক ক্রিয়া অনেকাংশ নিয়মন করে। এই গ্রন্থি যখন অধিক মাত্রায় সক্রিয় হয়, তখন থাইরোটোক্সিকাসিস্ (Thyrotoxicosis) রোগ জন্মে, মাইক্সোডেমা (Myxoedema) হলে এই ক্রিয়া হ্রাস পায়। তেজস্ক্রিয় আইওডিনের সাহায্যে থাইরোইড গ্রন্থির ব্যাধি সহজেই নিরাময় হয়।

মাথার ভিতরে টিউমার (Tumour) সন্ধানের জন্য এখন এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। শিরায় খানিকটা তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস্ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি প্রধানত টিউমারে গিয়ে সঞ্চিত হবে, টিউমারে তেজস্ক্রিয় পদার্থ রুগ্ন স্থানে বেশীর ভাগ জমা হয়। তেজস্ক্রিয় সন্ধানী কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে তা অনুধাবন করা তখন আর সমস্যা থাকে না।

তেজস্ক্রিয়তার একটি সফল প্রয়োগ হলো রক্ত চিকিৎসায়। রক্তরসে (Plasma) শ্বেত ও লোহিত কণিকা থাকে বলে আমরা জানি। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে পাঁচ হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। এই সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেড়ে যায় (প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে এক লক্ষ বা তারও অধিক) তখন তা হলো রক্তের ক্যান্সার বা লুকেমিয়া (Lukaemia)। এই মারাত্মক রোগে এক্স্‌-রের ব্যবহার আছে, তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস্‌ও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়!

পরমাণুর "আশীর্বাদ"। রোগ চিকিৎসায় যান্ত্রিক কৌশলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বর্ষিত হচ্ছে।

লুকেমিয়ার বিপরীত হলো পলিসাই-থেমিয়া ভেরা (Polycy-Thaemia vera)—এই রোগে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের প্রয়োগে এ ক্ষেত্রে এক্স্‌-রের চেয়েও অধিক কাজ দিয়েছে।

রোগ নিরাময়ের কথা আমরা মোটামুটি আলোচনা করলাম—মাত্র কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ আইসোটোপকে যে কত বিচিত্র উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে তা ভাবলে সত্যই অবাক হতে হয়। এই কুড়ি বছরে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে পরমাণু যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা স্মরণ করলে আজ নূতন করে মনে হয়—হাঁ, কথাটা ঠিক বটে, জ্ঞানই শক্তি। তেজস্ক্রিয়তা আমাদের জন্য এতই করেছে! এই প্রসংগে মানুষের দেহ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে তথ্য গৃহীত হয়েছে তা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের দেহ—তার মাংসপেশী, হাড়, নখ, চুল—কিছুই স্থির অপরিবর্তিত নয়, বরং নদীর মতই চঞ্চল; নদীর জল যেমন নিয়ত বয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেহগঠনের মৌলিক উপাদানগুলিরও তেমনি সর্বদা পরিবর্তন হয়, আজ যে প্রোটিন বা ক্যালসিয়াম আমার দেহে আছে, কাল তা না-ও থাকতে পারে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষ প্রতি বছর নূতন করে জন্মলাভ করছে। ডাঃ স্কোয়েনহিমার (Schoenheimer) তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেছেন, লবণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করালে তা শিরার মাধ্যমে ঘর্ম গ্রন্থিতে এসে তৎক্ষণাৎ ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়—এক সেকেণ্ডেরও বেশী সময় অপেক্ষা করে না। মানুষের দেহ সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য ধারণা পূর্বে আমাদের ছিল না।

পরমাণু "পঙ্কজাত"

পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগে, এ কথা আমরা শুনেছি। পরমাণু বিকিরণের ক্ষেত্রে তা স্মরণ করা চলে। তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ-কৌশল আজ যে স্তরে উন্নত হয়েছে, তার মূলে ছিল যুদ্ধকামী রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্টপোষকতা। কিন্তু কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে পরমাণু বেশী দিন আটকে রাখা যায় নি; "শান্তির ললিত বাণী" আজ দিকে দিকে উচ্চারিত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকরাও জনসাধারণের সা[ঙ্গে] যোগ দিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এমন পর্য্যন্ত ঘোষণা করেছেন যে, মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে তাঁরা পরমাণু শক্তি নিয়োগ করতে আর সাহায্য করবেন না। কোন কোন রাষ্ট্রশক্তিও এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। নূতন সূচনা দেখা দিয়েছে—অস্ত্র তৈরীর আত্মঘাতী সম্ভাবনা হতে দূরে তেজস্ক্রিয়তা আজ মানুষের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। মানুষ যেন আজ এই বিশ্বাস পোষণ করতে পারে,—হিরোসিমা ও নাগাসিকিতে যা একদিন সুরু হয়েছিল, তা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে; পরমাণু শক্তি এখন আমাদের সভ্যতার লালন করবে। পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব, চিকিৎসায় ওষুধের সমস্যা পরমাণু-শক্তির বলে দূর হবে, জ্ঞানের প্রসার হবে—পরমাণু শক্তি আমাদের জীবন বিকাশের পক্ষে সকল দিক দিয়ে কল্যাণকর হবে।
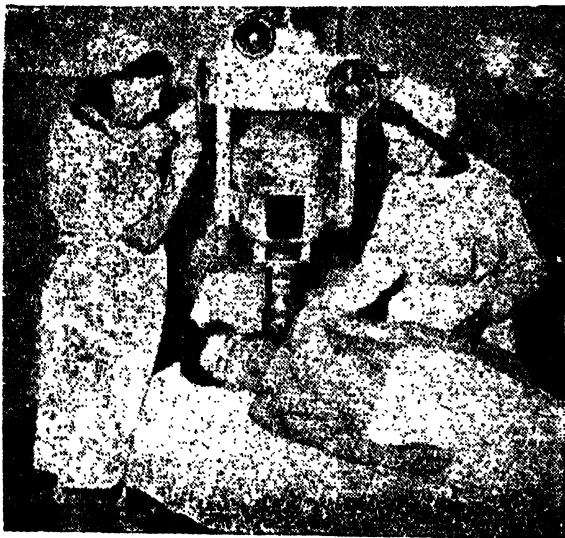
—অশোককুমার দত্ত

পিয়ার্স
সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!
পিয়ার্স সাবান—বিশুদ্ধ গ্লিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্য্যের পক্ষে এত নিরাপদ।
সুগন্ধ পিয়ার্স সাবান আপনার সৌন্দর্য্যচর্চ্চার নিত্য সঙ্গী হোক।
শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়ার্স আদর্শ
পিয়ার্স ট্যালকাম, এত মখমলের মত মোলায়েম, এত অপূর্ব সুগন্ধ—আপনাকে সারাদিন সতেজ, সুন্দর রাখে। সুদৃশ্য হাল্কা হলুদ-সবুজ-সোনালী টিনে পিয়ার্স ট্যালকাম কিনুন।
PEARS
TALCUM
PEARS
TRANSPARENT
SOAP

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

আদূরে অসীমের গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠতেই, ঘরে গিয়ে সোফায় বসলো অনিল, তাক্ষ্ণ নজর রইলো গাড়ী-বারান্দার দিকে। গাড়ী এসে দাঁড়ালো গাড়ী-বারান্দার ভেতর।

মস মস জুতোর শব্দ তুলে ভেতরে চলে গেলো অসীম, আর টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকলো শুকতারা।

অনিলকে বসে থাকতে দেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—এখনও বসে কেন ডার্লিং? খাওয়া হয়নি? শোবে না? কথা বলতে বলতে ধপ করে ওর পাশে বসে পড়ে মাথাটা ওর বুকের ওপর এলিয়ে দিলো সে।

দারুণ ঘৃণার সঙ্গে ওকে সরিয়ে দিয়ে উঠে খাটে বসলো অনিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো—এটা অভিনয় দেখাবার জায়গা নয়। আজ তোমার কাছে সোজা জবাব শোনবার জন্যই বসে আছি।

—তাই নাকি? তা বলো। লাল লাল ফুলো ফুলো চোখ দুটো ওর চোখের ওপর মেলে ধরলো শুকতারা।

সিগারেট ধরালো অনিল। লজ্জাহীনা রমণীর সর্বাঙ্গে একটা ঘৃণাভরা দৃষ্টি বুলিয়ে বললো—রাত বারোটার সময় পরপুরুষের সঙ্গে বেড়িয়ে, ঘরে এসে মাতলামো করতে তোমার একটুও সরম হলো না? ভদ্র পরিবারের সঙ্গে যে তোমার একটা সম্বন্ধ আছে, সেটা কি একেবারেই ভুলে গেছ? বাজারের মেয়েমানুষগুলোকেও যে হার মানালে দেখছি!

উত্তেজিত ভাবে ঘরময় ঘোরা ফেরা করতে করতে বললো অনিল—বহুদিন সাবধান করেছি তোমাকে কিন্তু আজ বুঝলাম চরম অবনতির পাঁকে ডুবেছো তুমি, তোমাকে সে পাঁক থেকে তোলবার সাধ্য বোধ করি স্বয়ং ভগবানেরও নেই।

—তবে এটাও স্থির জেনো, আমি মরামানুষ নই। দিনের পর দিন তোমার বেলেল্লাপনার অসহ্য অত্যাচার আজ আমাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

দাঁতে দাঁত ঘসে, ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চরম উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে অনিল।

সোফায় আধশোয়া ভাবে এলিয়ে থেকে চোখ বুজে কথাগুলো শুনছিলো শুকতারা।

হাই তুলে দুহাতে চোখ কচলে বললো—আঃ। এমন আমেজটা একদম দিলেতো মাটি করে? নালিশ আর নালিশ। কি এমন অপরাধ করেছি গো? জানতেই তো অসীম আমার অনেক—অনেক পুরোনো বন্ধু। তার সঙ্গে একটু বেড়ালে বা দু-এক গেলাশ খেলে যাদের জাত যায় আমি তো তেমন সতী সাবিত্রীদের দলের কেউ নই গো!—আর, তোমারও তো অনেক মেয়ে বন্ধু আছে; তাদের নিয়ে তুমি যদি একটু ফূর্তি করো, তাহলে আমার দিক থেকে একটুও আপত্তি হবেনা, এ আমি হলপ করে বোলতে পারি বরং তোমারও একটু মুখ বদলাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও।

বাঃ! বাঃ চমৎকার! রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুঁসি মেরে বললো অনিল, স্বেচ্ছাচারিণী! কি দরকার ছিলো তবে এই লোক দেখানো বিয়ে করার?—একটা ভদ্র পরিবারের মুখে কালি মাখিয়ে কি লাভ হল তোমার? কোন অধিকারে আমার জীবনটা বিষিয়ে তুলেছো তুমি? জবাব দাও!

শুকতারার উঠে বসবার অবস্থা আর ছিলো না. সোফায় শুয়ে পড়ে খিল্ খিল্ করে হেসে বললো—আহাম্মক আর কাকে বলে। অভিনেত্রীর স্বামী হতেও সাধ যায়, আবার তাকে সতীলক্ষ্মী বউ বানাতেও সখ! যাক্ গে এই রাত দুপুরে গলা ফাটিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করে আর কি ফল হবে বলো, তার চেয়ে দেখে শুনে ঐ সুমিত্রার মতো জড়ভরত একটি বিয়ে করে নিয়ে এসো, সব হাঙ্গামা চুকে যাবে। আমি কিন্তু এখন এক পাও নড়ছিনা, কাল ভেবে দেখবো তোমার কথা।

নাক ডাকতে লাগলো শুকতারার।

ঠোঁট কামড়ে মনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ছুটে বাইরের লনে বেরিয়ে গেলো অনিল। পরিশ্রান্ত দেহখানি এলিয়ে দিলো নরম ঘাসের বিছানার ওপর।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যেন ঘটে গেছে ওর মস্তিষ্কে, তারই সুতীব্র উত্তাপ ওর দেহ মনকে দগ্ধ করতে লাগলো! এমনি ব্যাপার ওদের প্রায়ই ঘটছে আজকাল! উপায় কি? উপায় কি?

মনের গভীর অন্ধকার অতল গুহাপথ হাতড়ে বেড়াতে লাগলো অনিল, কোন ছিদ্র পথে আছে একটু আলো!

পরদিন শুকতারার ডাকে যখন ঘুম ভাঙলো অনিলের হাল্কা রোদ্দুর তখন ঝিল্ মিল্ করছে ঘাসের ওপর!

অঘ্রাণের শিশির জুড়িয়ে দিয়েছে ওর দাহ জ্বালাকে!

বহুদিন পরে আজ ভারি ভালো লাগলো ওর শুকতারাকে!

পরনে ওর চওড়া লালপাড় ধনেখালি সাদা সাড়ী! সদ্যস্নান করা ভিজে চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো,—কপালে কুঙ্কুমের টিপ!

সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি!

মিষ্টি হেসে অনিলের একখানি হাত চেপে ধরে মৃদু টান দিতে দিতে বললে শুকতারা—ওমা, কত ঘুমুবে গো? ন'টায় যে শুটিং আছে! চলো, চলো, চা জল হয়ে গেলো যে!

কাল রাতের সেই লাস্যময়ী শুকতারা সেন তো, এ নয়!—এ যে মঙ্গলময়ী চিরন্তনী নারী। কাল রাতের অত গোলোযোগের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই ওর চোখে, মুখে, সংযত ব্যবহারে।

ওর মুখের দিকে যেন চোখ তুলে চাইতে পারছিলো না অনিল। গত রাতের নিজের উদ্ধত আচরণগুলোকে দিনের আলোতে কেমন অসঙ্গত অর্থহীন বলে মনে হল। নিঃশব্দে উঠে বাথরুমে চলে গেলো সে।

স্নান সেরে চায়ের টেবিলে যোগ দিলো অনিল।

—খেয়ে দেখো তো মাংস'র প্যাটিসগুলো কেমন হয়েছে? অনেকদিন বাদে করেছি কি না, হেসে ওর দিকে চেয়ে বললো শুকতারা।

চমৎকার! প্যাটিসে কামড় দিয়ে বললো অনিল এই সক্কালবেলা আবার এত পরিশ্রম করে এগুলো করতে গেলে কেন?

—বাঃ! তোমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে না বুঝি? সময় পাইনা তো হবে কি?

খাওয়া ফেলে, অনুরাগভরে শুকতারার একখানি হাত নিজের বাঁ হাতে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মিনতিভরা গলায় বললো অনিল—আমাকে ক্ষমা করো তারা! কাল রাতে বড্ড অবিচার করেছি তোমার ওপর। বলো, বলো মাই সুইট হার্ট রাগ নেই তো আমার ওপর?—বুঝতে পারিনা তারা, কেন যে মনটা দিন দিন আমার এত উগ্র হয়ে উঠছে। একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লো অনিল।

নিপুণা অভিনেত্রী বুঝলো তার নতুন অভিনয় কতখানি সাক্‌সেসফুল হয়েছে। অনিলের কাঁধে মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে আদরে গলে পড়া স্বরে বললো সে—বেশ করেছো বলেছো। মাগো, একটু ঝগড়াঝাঁটিও কি করবো না আমরা? তার জন্যে আবার মন খারাপের কি আছে? নাও এবার তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও তো?

গত রাত্রে খাওয়া হয়নি অনিলের। মনের জ্বালা জুড়িয়েছে; এবারে পেটের জ্বালার তাগিদে পরম তৃপ্তি ভরে খাবারের প্লেট খালি করতে সুরু করলো।

শীত গেছে এসেছে বসন্ত! গাছে গাছে জেগেছে কচিপাতার শিহরণ। আবির কুঙ্কুমের ছোপ লেগেছে ডালে ডালে নীল, বেগুণী, বাসন্তী ফুল ঝরিয়ে, উড়িয়ে, বিচিত্র বর্ণের আল্পনা দিয়ে বেড়ায় মদির চঞ্চল, দখিনা বাতাস।

যক্ষপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার রুদ্ধ ভবনের দ্বারে দ্বারে ব্যাকুল করাঘাত করলো সেই উতলা পবন। ওর আকুল আহ্বানে আর ঘরে থাকতে পারে না সুমিতা। লালকুঠির দুধে-ধোওয়া সাদা মার্বেল-পাথরের সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে সে নিচের তলায় নামতে থাকে। ধুলোর আস্তরণে ঢেকে গেছে সিঁড়িটা, এক ধারে আছে শ্বেত মর্ম্মরের ভেনাসের মূর্ত্তি। তার খাঁজে খাঁজে জমেছে পুরু ধুলো। প্রকাণ্ড আয়না সোনার ফ্রেমে বাঁধানো সিঁড়ির বাঁকের মুখে আটকানো। আয়নার ঝকঝকে বেলজিয়াম কাঁচটা, যেন বড় ঝাপসা মনে হল সুমিতার চোখে।

সারি সারি স্ফটিকের স্বচ্ছ বাতিদানগুলো আর জ্বলে না। মৃত দৃষ্টিতে যেন ওরা চেয়ে আছে সুমিতার দিকে। ওদের দিকে একবার নিস্পৃহ ভাবে চেয়ে ধাপের পর ধাপ বেয়ে চললো সুমিতা ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে। অন্দরে যাবার সিঁড়ি এটা। ব্যবহার করে একমাত্র সুমিতা। সদরে কার্পেট মোড়া সুসজ্জিত কাঠের সিঁড়িটা শুধু অসীম আর তার সঙ্গীদের জন্য। চাকর দাসীদের ওঠা নামার জন্য আছে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।

কত—কত দিন; প্রায় বছর খানেক নামেনি সিঁড়ি দিয়ে সুমিতা! যায়নি বাগানে। বাইরে বেরুনো ছেড়েছে এ বাড়ীতে এসে অবধি, তবে মাঝে মাঝে বাগানে বেড়াতো, অর্কিড হাউসে বসতো একা, একা। কখনও বা ওর ভজনদা এসে আপন মনে বলে যেতো লালকুঠির সমৃদ্ধ কাহিনী। কিন্তু তাও বন্ধ করতে হলো, শুকতারার বিদ্রূপভরা বাক্য-বাণের জ্বালায়। আর মাঝে, মাঝে চোখে যা পড়েছে—অসীম, আর শুকতারা—কি জানি ওরা এখন ওখানেই আছে ক না, সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে
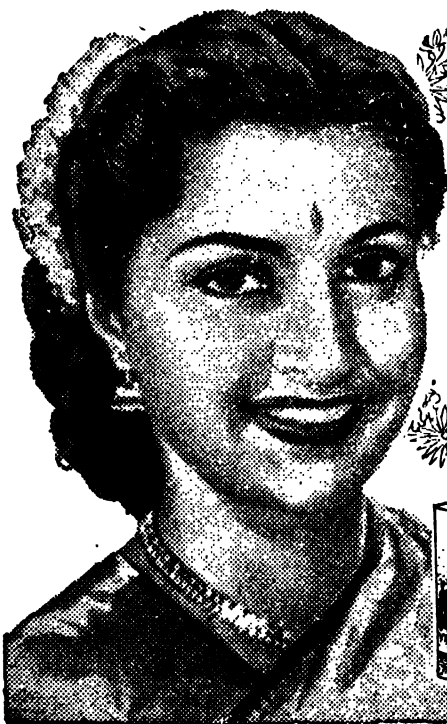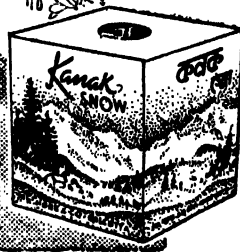
থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে সুমিতা, ওদিকে যাবে কি না। খুলে দিলো বন্ধ শার্শিটা। জানলা দিয়ে হু, হু রবে বয়ে গেলো দমকা বাতাস, ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়লো সিঁড়িতে টাঙানো একখানি ছবি। প্রতিধ্বনি তার গম গম করে বেড়াতে লাগলো শূন্য প্রাসাদের ভেতর। রাশি রাশি কাঁচ ভাঙা ছড়িয়ে রইলো চওড়া সিঁড়ির চাতালটার ওপর।

জনহীন শূন্য পুরী। দু একজন চাকর বামুন যা আছে সব বাইরের আউট হাউসে আড্ডা দিচ্ছে, বেল পেলে তবে ওরা ভেতরে আসে। তাই কেউ এলোনা অতখানি শব্দের ঝঙ্কার শুনে। ছবিখানা সাবধানে তুলে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো সুমিতা। অনেক পুরোনো লণ্ডনের রাজদরবারের ছবি ওটা। ছবির গায়ের পুরু ধুলো লাগলো ওর হাতে।

ব্যথিত দৃষ্টি মেলে বাকি ছবিগুলোর দিকে চাইলো সুমিতা। কত পরিস্কার ঝকঝকে ছিলো আগে ওগুলো, আর আজ কি হাল হয়েছে ওদের? কোনটার কাঁচ নেই কোনটি কাৎ হয়ে ঝুলছে। ধুলোর ঢাকা পড়েছে ফ্রেমের সোনালী রং। মাকড়সার বড় বড় ছেঁড়া জাল ছবিগুলোর গায়ে ঝালরের মত দুলছে।

নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলো সে। সিঁড়ির শেষ ধাপের দুপাশে দুটি ব্রোঞ্জের সৈনিক মূর্ত্তি, ঈষৎ নত মস্তক দাঁড়িয়ে। অটল গাম্ভার্য্যের কাঠিন্য ওদের চোখে মুখে, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। ওরা যেন এই রাজপ্রাসাদের মৌন দর্শক মাত্র। রহস্যঘন নাটকটির সুরু দেখেছে, আজও দাঁড়িয়ে আছে শেষ অঙ্কটি দেখবার জন্য। মূর্ত্তি দুটোর গায়ে পরম স্নেহ ভরে হাত বুলোতে গিয়ে সভয়ে হাত সরিয়ে নিলো সুমিতা। ওদের পাষাণ বুকে কি স্পন্দন জেগেছে? না। তা নয়। ঝট পট শব্দ করে মূর্ত্তিগুলোর খাঁজের ভেতর থেকে দুটো বড় আকারের চামচিকে বেড়িয়ে সাঁই সাঁই শব্দ তুলে ওর মাথার ওপর উড়তে লাগলো। ম্লান আলোতে ওদের বিস্তারিত ছায়াগুলো বিভীষিকার মত নাচতে লাগলো দেওয়ালে দেওয়ালে। সভয়ে পিছু হটে দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো সুমিতা!

আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বুক ভরে টেনে নিলো বাইরের মুক্ত বাতাস। তার পর এদিক চেয়ে নেমে এলো কাঁকর বিছানো পথের ওপর। দেওদারের ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চললো সে। না কেউ নেই, ভজনদাও নয়।

বকুল ফুলের গাছটার তলায় শাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো বেদিটার ওপর গিয়ে বসলো সুমিতা! ঘন গন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে নিঃসাড়ে ভেসে এলো অনেক ছায়াছবি! ওর অনুভূতির মানসিক কেন্দ্রগুলোকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেললো ওরা। তিক্ত বর্ত্তমানটা, পালালো মন থেকে!

হলুদ রঙের কানা ভাঙা চাঁদ আস্তে আস্তে উঁকি মারলো দেওদারের পাতার ফাঁক দিয়ে। টুপ টাপ করে বকুল ফুল ঝরতে লাগলো ওর মাথায় গায়ে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিলোনা ওর। নারী পুরুষের মিশ্রকণ্ঠের উচ্চহাসির শব্দে চমকে উঠলো সুমিতা।

গাছের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়লো, শুকতারার ঘরের বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে অসীম আর শুকতারা।

অসীমের একখানি হাত শুকতারার কোমরে জড়ানো। অপর হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। বাড়ীর পেছনে গ্যারেজের দিকে চলে গেলো ওরা।

মনে পড়লো ছোটমামার কথা। সেই হাসিখুসিতে সদা চঞ্চল ছোটমামার আজ কতই না পরিবর্ত্তন ঘটেছে। গরলে অমৃত ভ্রম শুধু তারই হয়নি, ছোটমামারও হয়েছিলো। তাই দু'জনে একসঙ্গে আকণ্ঠ বিষপান করে, অসহ্য জ্বালায় জ্বলে মরছে। সাধারণ বিষ সকল জ্বালার অবসান ঘটায়। আর এই অসাধারণ বিষ অন্তরে জ্বালিয়ে দেয় জ্বালাময়ী অনির্ব্বাণ শিখা। সেই ভয়াবহ উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছে ওদের দু'জনের আত্মা।

একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে অসীমের গাড়ী বেরিয়ে গেলো গেট দিয়ে। ওর পাশে বসে শুকতারা ড্রাইভ করছে।

দেওদারের আড়াল থেকে কখন চাঁদটা এসে দাঁড়িয়েছে সুমিতার ঠিক সামনের আকাশে। অবারিত জোছনার উচ্ছলধারায় ভেসে গেছে দিক্ দিগন্ত। পাতায়, পাতায়, ফুলে, ফুলে, ঝিলমিল করছে নীলাভ আলো।

উতোল বাতাসের অশান্ত কলরোলে মুখর হয়ে উঠেছে ঝাউ, দেওদার। ওরা যেন মহাশূন্যে শত শত বাহু বিস্তার করে কার উদ্দেশে জানাচ্ছে ব্যাকুল আহ্বান অধীর প্রতীক্ষার বিপুল আবেগে কেঁপে কেঁপে দুলে, দুলে উঠছে। আবার মাঝে মাঝে ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনছে কার পদধ্বনি।

না সে বুঝি আর কোনোদিন আসবে না ফিরে। কোন্ অদৃশ্য নিয়তির নিষ্ঠুর, কঠোর হাতে গঠিত হয়েছে এক দুর্লঙ্ঘ্য বিরাট লৌহ প্রাচীর ওদের দু'জনের মাঝখানে। তাকে অতিক্রম করে আসা কি সম্ভব? উঃ। তবে? তবে কি হবে?

এই ভয়াবহ পাষাণ কারার অতল অন্ধকারে কে দেখাবে একটু আলো? কে তার দুর্ব্বল ভীরু হাতখানি ধরে নিয়ে যাবে এখান থেকে? উঃ মাগো। আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে ওঠে সুমিতা, দামীদা'! দামীদা'।

—মিতা। মিতু।

ভীষণ চমকে উঠলো সুমিতা। কার কণ্ঠস্বর?

ওর ঠিক সামনে সারা গায়ে চাঁদের আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছে সুদাম।

—স্বপ্ন? হ্যাঁ তাই হবে। এরকম স্বপ্নই তো কত বার দেখেছে সে। সেই মন ভোলানো চোখ জুড়ানো স্বপ্নই তার সামনে ভাসছে। বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টি মেলে স্বপ্ন দেখতে লাগলো সুমিতা।

ওর স্বপ্নের ছবিখানি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো কাছে, আরো কাছে। দু'হাত বাড়িয়ে ধরলো ওর হাত দু'খানি।

—অমন করে চেয়ে কি দেখছো মিতা? চিনতে পারছো না? আমি যে তোমার দামীদা'।

—অ্যাঁ। দা'-মী'-দা??? তুমি? তুমি সত্যি দামীদা'? তুমি এসেছো দামীদা'? সাত বছর পরে, তুমি ফিরে এসেছো দামীদা'?

—হ্যাঁ মিতা এই তো, এই তো তোমার কাছে এসেছি। রাগ করেছো? এতদিন আসিনি বোলে? না মিতু। লণ্ডন থেকে ফিরে দুদিন এসেছিলাম, কাকা বললেন তোমার শরীর

যদি আপনি জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে চান

—প'ড়ে দেখুন !

আজকাল ভালভাবে বাঁচবার কত সুযোগ হয়েছে—তবু পুরণো সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব সুযোগ নষ্ট করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের খাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। বনস্পতির ভেতর এই স্নেহপদার্থ আমরা সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কারে বাধে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিজ্জ স্নেহ দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাখনের দেশেও দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির মত উদ্ভিজ্জ স্নেহের ব্যবহার ঢের বেশী। কেন বলবো? কারণ লোকে জেনেছে যে এই সব উদ্ভিজ্জ স্নেহ দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছয়। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বক ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তাঁরা রান্নার জন্যে বিশুদ্ধ স্নেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার সুরু করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

VMA 9204 A

খারাপ, তাই আর বিরক্ত করিনি তোমায়। তারপর কাকাবাবুর হসপিটালটার কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম, যে আসবার সময় পাইনি মোটে। থিয়েটার রোডের বাড়ীখানা খানিকটা ভেঙে চুরে হসপিটালের উপযোগী করে তৈরী করা হলো। এবারে অন্যান্য কাজগুলো আরম্ভ হয়েছে। তাই এসেছি তোমাদের বলবার জন্য। তুমি আর কাকা একদিন গিয়ে যদি দেখে আসো, আরও কি করলে ভালো হয়, তোমাদের মতামত যে আমার বড় প্রয়োজন মিতু। ওর পাশে বসলো সুদাম। একটু হেসে বললো—ভেতরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমার দামীদা' ডাক শুনে ফিরে দেখলাম তুমি এখানে বসে আছো। তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে মিতা ?

—না দামীদা'। আজ এখন তোমায় দেখতে পাইনি।' তবে দেখেছি। এর আগে অনেক—অনেকদিন দেখেছি তোমায়। যখনই ডেকেছি তখনই তো এসেছো তুমি। শুধু আজই নয়।

—কি বলছো মিতু। ঠিক বুঝতে পারছিনা যে। চলো ভেতরে যাই। কাকা কোথায় ?

—বাড়ী নেই। বেরিয়ে গেলেন একটু আগে। ভেতরে যেতে চাইছো ? না, না দামীদা' অনেক অনেককাল বন্দী আছি ওখানে কতদিন জানো ? প্রায় চার বছর হতে চললো কিন্তু আর পারছিনা আর যে আমি পারছি না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো দামীদা' ?

—কি বলছো তুমি মিতু ? নিজের বাড়ী ফেলে কেন যাবে তুমি ? স্থির হও লক্ষ্মীটি। ওসব ইচ্ছে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলো। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বললো সুদাম,—সংসারে থাকতে গেলে কত কি হয় মিতু! সব কিছুকে যে মানিয়ে নিয়ে আমাদের চলতে হবে ভাই !

—বাড়ী ? কোনটা আমার বাড়ী দামীদা' ? নিজের বাড়ীতে কেউ বন্দী জীবন যাপন করে ? সংসার ? কোথায় আমার সংসার ? কোথায় মানিয়ে নেব নিজেকে ? আমার চার পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে শুধু নরকের আগুন, আর তার মাঝখানে পেত্নীর মতো পাক্ খেয়ে বেড়াচ্ছি আমি ! পালাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পথ যেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না দামীদা' ! এই পাঁচ বছর ধরে আমি শুধু ঘুরে মরছি !

—মিতা ! মিতু ! বেদনার্ত্ত গলায় ডাকলো সুদাম ! এত কষ্ট তোমার কিসের জন্যে মিতা ? কিছুই যে জানি না আমি। বলো, কি করবো তোমার জন্যে কিসে শান্তি পাবে তুমি ?.

—দামীদা' ! ম্লান হেসে ওর মুখের দিকে চোখ দুটি তুলে ধরলো সুমিতা।

সুদাম ফিরে চাইলো ওর দিকে। এতক্ষণে ভালো করে নজর দিয়ে দেখলো তার পরম স্নেহের পাত্রীকে !

সরু কালাপাড় সাদা সাড়ী পরনে ওর ! হাতে অল্প কয়েকগাছি সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোনো অঙ্গে নেই আভরণ। একরাশ রুক্ষচুল খোলা পিঠের ওপর ! দুরন্ত বাতাস, বার বার চোখে মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনা রং এলো চুলগুলোকে। মুখখানি যেন বড় করুণ বড় ম্লান। অনেক রোগা হয়ে গেছে আগের চেয়ে মিতা। গালের হাড় দুটো একটু উঁচু লাগছে যেন। চোখ দুটো আরো বড় দেখাচ্ছে মুখের ওপর।

একে ? এতো সেই আগেকার হাস্য চঞ্চলা শান্তি প্রীতিময়ী মিতা নয় ! এ যেন দুঃখ ভারাক্রান্তা এক উদাসিনী নারী ! আবাল্য সাথীর জন্য অন্তরটা ওর হাহাকার করে উঠলো ! সে ভেবেছিলো মিতা সুখে আছে, তার সুখই ছিলো ওর একমাত্র সান্ত্বনা।—কিন্তু সব ভুলের ছায়াগুলো আজ মিলিয়ে গেলো খাঁটি সত্যের আলোয়।

—কি দেখছো দামীদা' বড্ড খারাপ লাগছে আমার চেহারা খানা,—তাই না ?

—না মিতা, ঠিক তা নয়। তবে একটু রোগা হয়ে গেছো, আর,—আর—

—আর দামী বসন ভূষণ নেই অঙ্গে, এই তো ? এখনও কেমন করে বেঁচে আছি, সেটা তো জিজ্ঞেস করলেনা দামীদা'।

এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে কত ঝড়, তুফান গেলো আমার ওপর দিয়ে—তা যদি জানতে তুমি ! জীবনটা আমার একেবারে ছিন্ন, ভিন্ন হয়ে গেছে। দামীদা'। কেন এমন হোল ? কেন তুমি আমাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলে ? যদি তুমি পাশে থাকতে—আর বলতে পারলো না সুমিতা। অবরুদ্ধ কান্নার বেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো। ওর বুকের ভেতর উথলে উঠেছে কান্নার সাগর। দুটি চোখের কূল ছাপিয়ে দর দর করে অঝোর ধারায় ঝরতে লাগলো এত দিনের সঞ্চিত বেদনাশ্রু। দুহাতে চোখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদলো সুমিতা।

কি করবে ভেবে পায়না সুদাম। অবরুদ্ধ বেদনার পাষাণ ভারে ওর বুকটাও কি ভেঙে যাচ্ছেনা ? কিন্তু উপায় কি ? তাকে চোখের জলে ঝরিয়ে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। এতে মিতার আরো ক্ষতি হবে।

কঠোর সংযমের বাঁধ দিয়ে অবরোধ করলো সুদাম অন্তর আলোড়িত করা অসহ্য বেদনার উদ্বেলিত ধারাকে। নিজের দুটি হাতে মিতার হাতখানি চেপে ধরে নত মস্তকে বসে রইলো নির্ব্বাক হয়ে বৃথা সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করে ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো না। প্রাণভরে কাঁদুক ও। হাল্কা হোক কিছুটা মনের গুরুভার। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিলোনা ওদের। বিষাদভরা ছবিখানি বুঝি চাঁদেরও ভালো লাগেনি, তাই সে হাল্কা মেঘেরা আবরণে মুখ ঢেকে ধীরে ধীরে সরে গেছে ওদের সামনে থেকে।

নরম নরম আলো লাগা অন্ধকার ওদের বুকে জড়িয়ে ধরেছে স্নেহময়ী মায়ের মতো। গাছের দীর্ঘ বিলম্বিত ছায়াগুলো গভীর মমতাভরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওদের সর্ব্বাঙ্গে। টুপ টাপ করে বকুল ফুল ঝরে পড়ছে ওদের গায়ে মাথায়।

ঝট পট করে ডানা ঝেড়ে, সিঁ, সিঁ শব্দ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো এক ঝাঁক রাতজাগা পাখী।

চমকে উঠলো সুদাম। কত রাত হলো ? হাতে আজ ঘড়িটা পরে আসা হয়নি, সব কাজেই যেন বড় ভুল হচ্ছে আজকাল। শান্তগলায় ডাকলো সে—মিতা।

—কি বলবে ? রাত হলো চলে যাবো এইতো ? ফুলো, ফুলো চোখদুটো ওর চোখের ওপর মেলে, ভাঙা গলায় বললো সুমিতা পৃথিবীটা কি আশ্চর্য্য দামীদা'।

আজ যা জাজ্জ্বল্যমান সত্য কাল সে মিথ্যা ছায়া মাত্র।

এখানে কি সব মেকি? সব ঝুটো? কোনো কিছুর ওপরেই কি নিশ্চিন্ত নির্ভর করা চলে না দাদীরা'?

সেই বকুলতলা আছে, সেই আছি তুমি, আমি শুধু নেই বুঝি সেই আগের বন্ধনটা আমাদের। ধারালো ছুরি দিয়ে কে যেন সেটা নির্মূল করে কেটে দিয়েছে। তাই আজ তোমাকে চলে যেতে হবে, আর ধরে রাখবার অধিকারও আমার হারিয়ে গেছে।

—না। না। ওকথা বোলোনা মিতা। তা হয় না, কোনোদিন হবে না—গভীর দরদ ভরা গলায় বললো সুদাম—সব মিথ্যার উর্দ্ধে আছে আমাদের এক অবিনশ্বর সত্তা—এক শাশ্বত রূপ। সেখানকার সম্বন্ধ কোনোদিন মিথ্যা হয় না, —সে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি কারুর নেই মিতু। তার স্বরূপ ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না—অন্তরের উপলব্ধি দিয়ে জানতে হয় তাকে। কিসের আলো যেন চক্ চক্ করে জ্বলে উঠলো সুদামের স্থির দৃষ্টি বিস্ফারিত দুটি চোখে।

শির শির করে উঠলো সুমিতার সর্বাঙ্গ। এক অপার্থিব আনন্দ বিজলী খেলে গেলো যেন ওর প্রতিটি শিরায়। সকল অঙ্গে জাগলো পুলক রোমাঞ্চ।

সত্য সূর্য্য উদিত হল অন্তর মহাকাশে। মিথ্যা কুহেলিকার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

মেঘাবরণ সরিয়ে মমতাময়ী চাঁদ মুঠো মুঠো আলোর ফুল ছড়িয়ে দিলো ওদের সর্বাঙ্গে।

হাঁ অনেক রাতই হয়েছে। গাড়ী বারান্দার তলা দিয়ে কাঁকর বিছানো পথটা গোল হয়ে ঘুরে গেটের দিকে গেছে,—সেই পথ ধরে চলেছে সুমিতা আর সুদাম।

ঢং, ঢং করে লালকুঠির ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেলো।

একটু চমক লাগলো ওদের দুজনার। চার ঘণ্টা সময় এমন ছুটে পালালো কি করে?

কাঁকরের ওপর খর খর শব্দ শুনে সেদিকে চেয়ে বললো সুমিতা—ছোটমামা আসছে।

—তাই নাকি। ওর সঙ্গে তো এসে অবধি দেখা হয়নি। দ্রুতপদে এগিয়ে এগিয়ে অনিলকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো সুদাম।

—বিস্ময় ভরে ওর দিকে খানিক চেয়ে থেকে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো অনিল—আরে একি,—একি, সুদাম যে! কবে ফিরলে? বুকের ভেতরের বিবেকের কাঁটা দুটো খচ খচ করে উঠলো আবার।

—তা বছর দেড়েক হয়ে গেলো। হেসে বললো সুদাম। ভালো আছেন তো ছোট মামা! মামীমা কই? আজ আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা হলো না, বড্ড রাত হয়ে গেছে, আরেকদিন এসে ও কাজটা সেরে ফেলবো।

—মামীমা? হো, হো, করে হেসে উঠলো অনিল। তাঁর নাগাল তুমি পাবে ভেবেছো? ভুল করছো ডারলিং। হ্যাঁ শুধু তুমিই নও, ভুল আমরা সকলেই করেছি। আমি, শুকতারা, আমার মা, জামাইবাবু এমন কি মিতাও—আমরা সকলেই যেন একটা ভুলের চাকায় চড়ে অনবরত পাক খাচ্ছি। হাড়, মাংস মন, প্রাণগুলো সব পিষে যাচ্ছে, কিন্তু ওর কবল থেকে ছাড়ান নেই কারুরই।

একটু হেসে আবার বললো অনিল—কিন্তু জানো সুদাম! রুবিটা বড্ড বেঁচে গেছে। এখন বুঝছি, জামাইবাবু ওর কানে ভালো মন্তরই দিয়েছিলেন। আমরা কেউ আর বেশীদিন বাঁচবো না! যে আগুন জ্বলছে এ বাড়ীতে সবাই জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবো।

পরম বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়েছিলো সুদাম। এই কি সেই সদা স্ফূর্ত্তিবাজ, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছোটমামা?

এ যেন জীবন সংগ্রামে পলাতক কোনো হতাশ সৈনিক। কপালে ফুটেছে কয়েকটি গভীর চিন্তারেখা। চোখের কোণে কালি জমেছে। গাল দুটো গর্ত্ত হয়ে গেছে। গভীর ক্লান্তি আর হতাশা ছড়ানো চোখে মুখে।

আপনারা সকলেই যদি অতটা ভেঙে পড়েন ছোটমামা। তবে কে কাকে দেখবে? ব্যথিত ভাবে বললো সুদাম। সুখ, দুঃখ, মিলিয়েই তো মানুষের পূর্ণ জীবন।

—ও সব ফাঁকা বুলি কোনো কাজে লাগবেনা হে হ্যাপি বয়! 'কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'

হাত নেড়ে, অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলতে বলতে হঠাৎ দুহাতে সুদামকে বুক জড়িয়ে ধরে কান্না ভরা গলায় বললো অনিল—ক্ষমা করো আমাকে সুদাম। তুমি আর মিতা আমাকে ক্ষমা করো। গোখরো সাপ মিতাকে ছোবল দিতে আসছে, আমি দেখে শুনেও, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি। কেন জানো? নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। কিন্তু তখন কি বুঝেছিলাম? যে বিষধর কালনাগের সঙ্গে মিতালী করলে তার বিষের ছোবলটাও নিতে হবে? তাই মামা ভাগ্নী দুজনেই আজ বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছি ভাই।

সুদামকে ছেড়ে দিয়ে সুমিতার একখানি হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বলতে থাকে অনিল—জানিস মিতু! এতকাল পরে

আজ মার কাছে গিয়েছিলাম। ক'দিন ধরে বড্ড মার জন্যে প্রাণটা কেমন করছিলো রে।

মা কিন্তু প্রথমে আমার সঙ্গে কথা কইলেন না—আমি মায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলাম। তারপর মায়ের সে-কি কান্না! আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন,—তুই আমার কাছে চলে আয় বাবা। তোদের ছেড়ে আমি যে মরে বেঁচে আছি।

তাই মনে করছি—সব ছেড়ে ছুড়ে মাকে নিয়ে দিনকতক তীর্থ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়বো।

নত মুখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো সুমিতা। চোখের জলে গাল দুটো ওর ভেসে যাচ্ছে।

সুদামেরও চোখদুটো অকস্মাৎ জলে ভরে উঠলো। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছে—ধরা গলায় বললো—যা হয়ে গেছে, তাকে তো আর ফেরানো যাবে না ছোট মামা! অদৃষ্ট বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?—আমাকে যদি কোনো কাজে দরকার মনে করেন ডাকবেন। জানেন বোধহয়, আমি কাকাবাবুর এলগিন রোডের বাড়ীতে আছি। যাবেন একদিন সময় মত। কাকাবাবুর হস্‌পিটালের কাজ হচ্ছে, দেখে আসবেন। আচ্ছা আজ তাহলে চলি।

—যাবো, যাবো। আবার তোমাদের কাছে ফিরে না গেলে, কি যে হবে এর পরে ভাবতেও ভয় করে, জানো সুদাম কেমন ভয় পাই আজকাল। এক হাতের মুঠোয় নিজের মাথার চুলগুলো চেপে ধরে মৃদু গলায় বললো অনিল। মিতার দিকে একটা মমতাভরা দৃষ্টিপাত করে বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীর পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে চললো সুদাম।

বড় অশান্ত চিত্তে তিনটে দিন কাটালো সুমিতা। একি হোলো? সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী রচনা করে তার ভেতর এতদিন আত্মগোপন করেছিলো সে। কিন্তু সহসা সে গণ্ডীর আগল কে যেন ভেঙে দিলো।

খুলে গেছে তার রুদ্ধ ভবনের সব জানলা দরোজাগুলো। হাত ছানি দিয়ে ডাকছে ওকে বাইরের আকাশ, বাতাস। আর যে ঘরে থাকা যায় না। লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা, ভয়, কোন বাঁধনই আর ওকে বেঁধে রাখতে বুঝি পারবে না।

সেদিন ভোর না হতেই বাইরে বেরুবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো সুমিতা। সাদা সাড়ী সরিয়ে রাখলো। পড়লো চাঁপা রং এর ঢাকাই সাড়ীখানা তার সঙ্গে মানিয়ে লাল সিল্কের ব্লাউজ। কানে গলায় হাল্কা ধরণের সোনার গহনা পরে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো চুলটা ঠিক করে নেবার জন্যে। নিজের ছায়াটি আজ কেমন যেন ভালো লাগলো ওর কাছে। না। খুব খারাপ এখনো হয়ে যায়নি মুখখানা।

আপন মনে হাসলো সুমিতা। কালো একখানি ওড়নায় সর্বাঙ্গ ঢেকে নিয়ে নিচে নেমে এলো সুমিতা।

তখন অসীম পটভূমিকার ধূসর রং-এর ওপর ফিকে লালের সবে ছোপ লেগেছে। দিগন্তে থৈ থৈ আঁধার সায়রে আলোর কমল, একটি একটি করে দল মেলতে সুরু করেছে। গাছে, গাছে, ঘনপল্লব অন্তরালে জেগেছে ঘুমভাঙা পাখীদের অস্ফুট কলরব। শিশিরের মণিমুক্তো ছড়ানো গাছের পাতায় ফুলে। ভোরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেল, যুঁইয়ের গন্ধ। এমন মন প্রাণ জুড়োনো প্রভাত সৌন্দর্য্য অনেকদিন পরে আবার দেখলো সুমিতা।

জালের ঘের দেওয়া সারি সারি সবুজ রং কাঠের শূন্য ঘরগুলোর কাছে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো সে।

ময়ূর, নানা জাতের পাখী, আর গিনিপিগ খরগোস থাকতো ঐ ঘরগুলোতে।

ছ' সাত বছর আগে ওরাই ছিলো তার নিত্যসঙ্গী ওকে দূর থেকে দেখতে পেলে, কাছে ছুটে যেতো ওরা। হাত থেকে খাবার খেতো। গায়ে মাথায় উঠে কত আদর জানাতো ওকে। আজ আর তারা কেউ নেই।

ওদের ঘরগুলো আগাছা জঙ্গলে ভরে গেছে। কয়েক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে, একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে, গেটের কাছে এগিয়ে গেলো সুমিতা।

—গেটে তালাবন্ধ। দরোয়ানটা ওদের ঘরের সামনের রোয়াকে পড়ে নাক ডাকাচ্ছিলো, সুমিতার ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে হাঁক দিলো—কৌন হ্যায়?

—গেট খুলে দাও, বাইরে যাবো। আদেশ করলো সুমিতা।

—দিদিমণি? ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে গেট খুলে দিলো দরোয়ান। ড্রাইভারকে ডাকবে কি-না জানতে চাইলো সে।

—না দরকার নেই! বাবুকে বোলো আমি এলগিন রোডের বাড়ীতে গেছি।

দ্রুতপায়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো সুমিতা চলন্তি ট্যাক্সি দেখতে পেলে ডাকবে ভাবলো।

অত ভোরে ট্যাক্সি মেলা সহজ ব্যাপার নয়! জনশূন্য পথটা ঘুমন্ত অজাগরের মতো পড়েছিলো নিঃশব্দে। দুচারটে ভিস্তিওলা ওর গায়ে তখন জল ছিটিয়ে দিচ্ছিলো।

জোরে পা চালালো সুমিতা। এদিক, ওদিক চাইলো—ট্যাক্সির আশায়, না কোথাও নেই তার সারা শব্দটুকুও। অনেকখানি পথ হেঁটে একটা গাছের তলায় এসে দম নেয় সুমিতা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে—দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক নজর ফেরায়! রাস্তার ওপারে দু তিনজন, ভিস্তিওলা আর ঝাড়ুদার দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে কি যেন দেখছিলো।

দু, চারটে কাক আশে পাশে উড়ে উড়ে ডাকাডাকি করছে। একটু দূরে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে; মাঝে, মাঝে সতৃষ্ণচোখে চাইছে সেই দিকে।

সদ্যোজাত শিশুর কচিগলার ক্ষীণ স্বরের কান্না শুনে চমকে উঠলো সুমিতা। চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের শুধোলো।—কি হয়েছে ওখানে?

—কোন্ বদমাইস মাগী একটা ছেলে ফেলে দিয়েছে মা! এখনো বেঁচে আছে ছেলেটা।

—কি সর্বনেশে কথা! দেখি, দেখি—

বলতে বলতে ডাষ্টবিনের কাছে এগিয়ে গেলো সুমিতা। একগাদা নোংরার পাশে একখানি সাদা কাপড়ে জড়ানো সদ্যফোটা পদ্মফুলের মত একটি ছেলে পড়ে আছে।

যুক্তেশ্বর ও মুক্তেশ্বর মন্দির-তোরণ —গীতা বসুমল্লিক

সপিল-পথ

শ্রীপান্থিক (মুখোপাধ্যায়)

পারঘাট —মৌরেন অধিকার

ছায়া ছায়া

—পাঁথিয় চক্রবর্তী
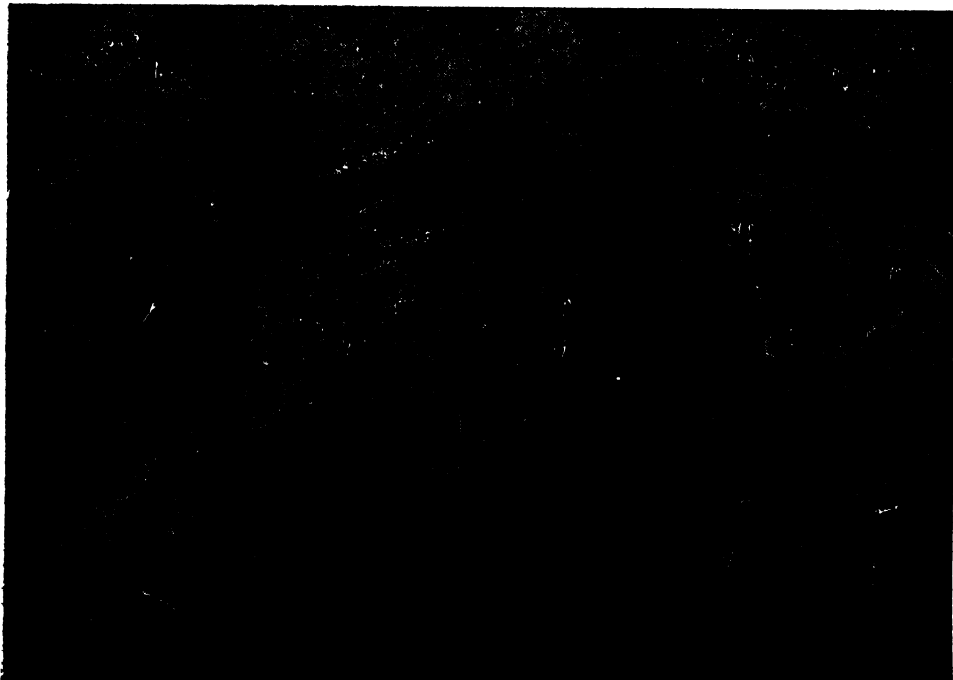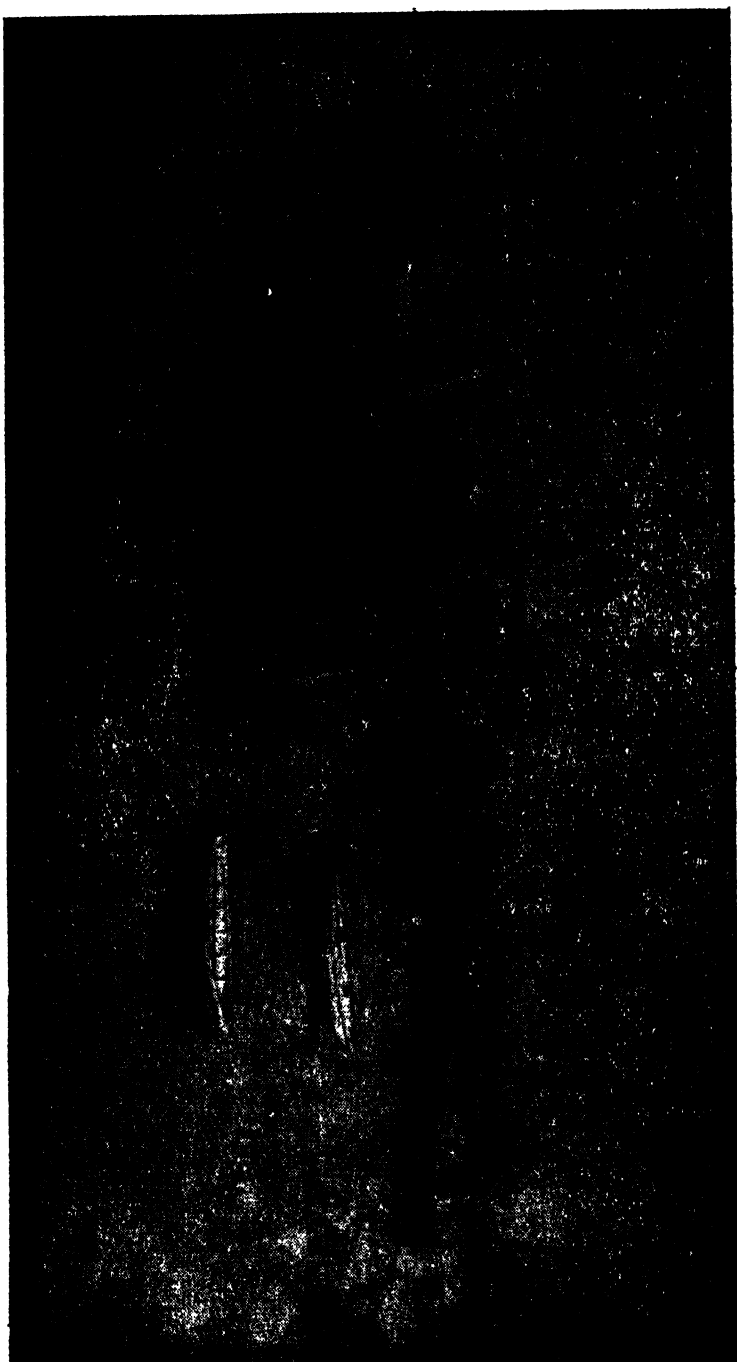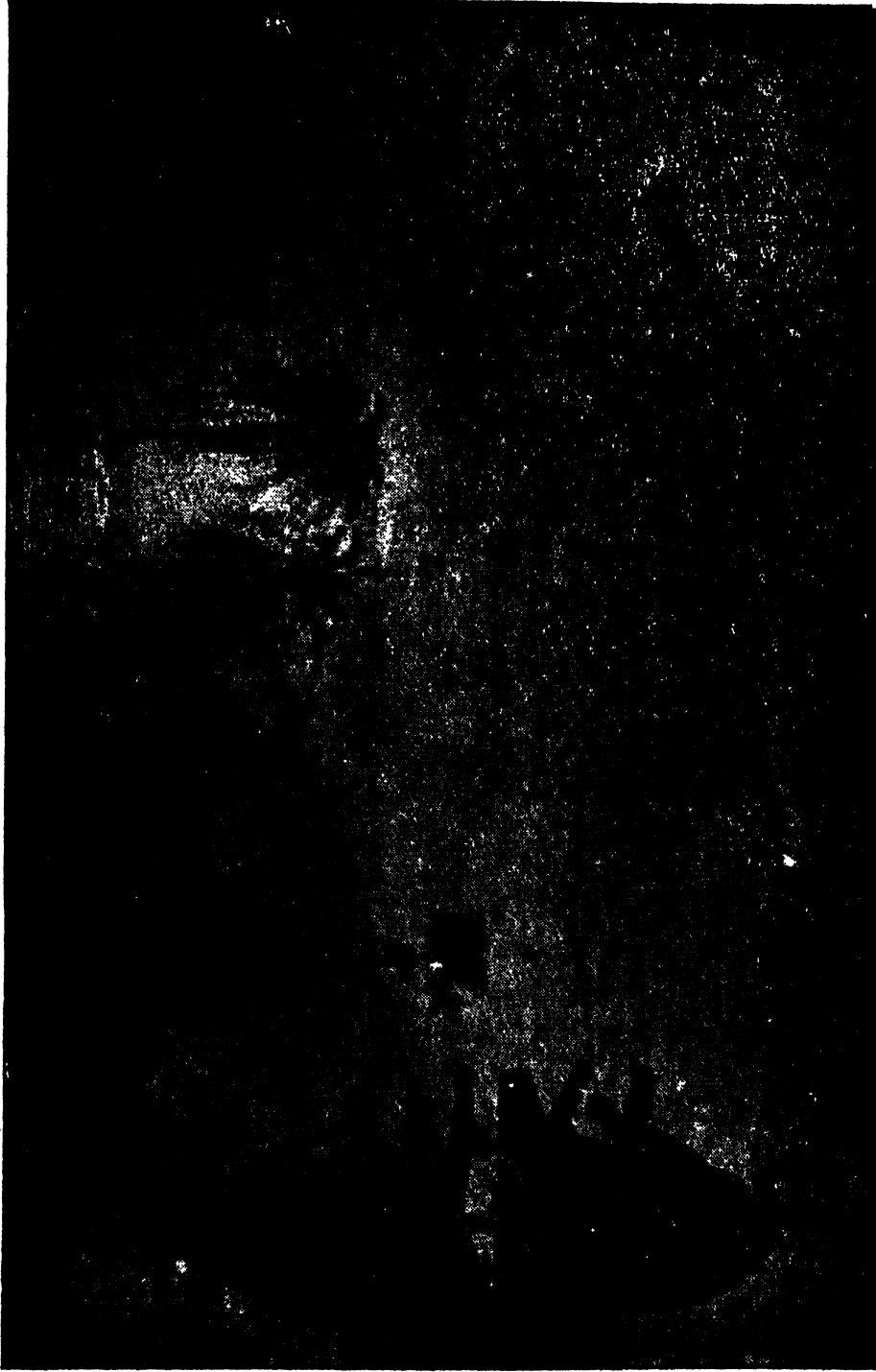
স্নানার্থী —দীপকরঞ্জন ঘোষ

পদ্মফুল ফুটেছে পাঁকের ভেতর। কিন্তু তার গায়ে তো পাঁক নেই। কি অপরূপ, কি পবিত্র ফুলটি?

ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো মেলে অবাক হয়ে দেখছিলো আশ্চর্য্য পৃথিবীটাকে এই অবাঞ্ছিত অতিথিটি। মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়ে মানুষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিলো।

হেঁট হয়ে পরমাশ্চর্য ভাবে ওকে দেখলো সুমিতা। তারপর দু'হাতে ওকে সাবধানে কোলে তুলে নিলো।

—এ মায়ী। বাচ্ছাটা লিবেন আপুনি? অবাক হয়ে শুধোলো বুড়ো ঝাড়ুদারটা।

—হ্যাঁ বাবা। নিয়ে যাবো। আহা! এমন চাঁদের টুকরো ছেলেটাকে কোন পাষাণী ফেলে দিয়েছে গো?

—রাক্ষুসী আছে মা। এই মানুষের ভিতরেই ডান্, রাক্ষস, ভূত, পেরেত্, সব আছে, আবার দেওতাও আছে মা।

রাক্ষুসী দানবীতে কি সন্তান পালে মা? সে জন্ম দিতে পারে, কিন্তুক মা হতে পারে না। তুমি, দেবী ভগবতী মা আছো, সন্তানকে বাঁচাতে সেই দেওতাই তোমাকে হেথায় পাঠিয়েছে মা। কিন্তুক আর দেরী কোরোনা মা, লোক জমে যাবে, পুলিশের হাঙ্গামা হোবে, জল্‌দি চলে যাও।

কোথায় নিয়ে যাবে একে? একটু ভাবলো সুমিতা—তারপর বললো—কাছাকাছি ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?

—যাবে মা, আর একটু গেলেই পাবে। হেঁট হয়ে ওরা প্রণাম করলো সুমিতাকে। ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসলো মিতা। ছোট্ট হাতব্যাগটি খুলে পাঁচ টাকা ওদের দিয়ে বললো—তোমরা খাবার কিনে খেও। রাত প্রভাত না হতে হতে এমন বখশিষ কখনও ওদের বরাতে মেলেনা। মহানন্দে ওরা টাকাটা নিয়ে বললো—চলো মা তোমাকে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে আসি। একজন আগে ছুটলো ট্যাক্সির সন্ধানে। ওর সঙ্গে সঙ্গে চললো বুড়ো ঝাড়ুদার। তুলতুলে নরম মাংস শিশুটি বুকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে সুমিতা।

এক অনাস্বাদিত বিপুল আনন্দময় সত্তা যেন জড়িয়ে ধরেছে ওকে। বিগলিত করুণায় সিক্ত হয়ে গেছে, ওর সারা অন্তরটা। নারী হৃদয়ের সহজাত কোমল বৃত্তিগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে ঐ ক্ষুদ্র মানব শিশুর ছোঁয়া লেগে।

ট্যাক্সি নিয়ে এলো ভিস্তিওলাটি। সুমিতা উঠে বসলো তার ভেতরে। ওরা সকলে আবার প্রণাম করলো সুমিতাকে। বুড়ো ঝাড়ুদারটি কোমরে জড়ানো কাপড়ের খুঁটটি খুলে চোখ মুছলো তারপর একগাল হেসে বললো—ভগবান তোমার ভালো করবে মা। ট্যাক্সি চলতে সুরু করলো এলগিন রোডের দিকে। [ক্রমশঃ।

টিয়াপাখি রঙ

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বসন্ত বাতাসে হ'লে প্রচুর সবুজপত্র পৌষালীর হলুদে পাতায়
তারপর বৈশাখের ধূলো জমে যায়;
কোথায় সুন্দর কচি সবুজের রঙ?
সেখানে ভাসছে যেন বেদনায় খেয়ালী সারঙ।
জীবন-সেতারে বাজে ব্যথার মূর্ছনা
যখন জগতে আর জীবনের সামানায় কঠিন ব্যঞ্জনা।

হৃদয় প্রশান্ত তীর খুঁজে ফেরে যদি
তখন তো চাই তার একটি ঝিরঝিরে নদী;
অফুরন্ত সুর আর অজস্র আশায়
সেখানে তো ঢেউ আনে দক্ষিণের সাগর-ধারায়।
খড়-কুটো ভেসে যা দু'দিনের ম্লান যত কিছু
ভাসিয়ে স্রোতের পিছু-পিছু।

মরিচা ধরার প্রাণে ত্রৈলোক্যের যেন স্পর্শ চাই
চিকচিকে রূপ দেখা চোখের নেশাই;
দু'ফোঁটা বৃষ্টি নেমে এলো মাটির অঙ্গনে
ঝড় নিয়ে পিছনে-পিছনে—
একটি নতুন পৃথিবীর
তুলছে হয়তো সত্যি জন্মের জিগির।

অবাক দৃষ্টি যে তাই মেলে দিই আজ
ঝমঝম্ বৃষ্টি ঝরে আশ-পাশে, ফেলে রাখি কাজ ও অকাজ;
বাড়িগুলো ভিজে গেছে ঝড়ো কাক যত,
মাটি-ভেজা সোঁদা ঘ্রাণ কত
আনন্দ বর্ষার দিনে বুজে
দেখি ঘাস আর পাতা টিয়াপাখি রঙ ধরে সুন্দর সবুজে।

সঙ্গীতশিল্পী শরৎচন্দ্র

শ্রীবলাইকৃষ্ণ সরকার

পূর্বেই বলেছি প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে সঙ্গীতশিল্পী বলে কম লোকেই জানে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার দরকার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় তাঁর দেশবিদেশের অগণিত বিমুগ্ধ পাঠক পাঠিকার কাছে দেওয়ার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। আমরা এদেশী এবং বিদেশী অনেক কবি সাহিত্যিক নাট্যকার, শিল্পী, সাধক ও মনীষীর জীবনে এই গুণটির কথা জেনেছি। তাঁরা অনেকেই গান জানতেন, সঙ্গীত সাধনা করতেন। তাঁদের নাম করা বাহুল্যমাত্র। জানি না সঙ্গীতের প্রেরণা তাঁদের জীবনের সাধনাকে সফলতার ধারায় প্রবাহিত করতো কি না। নাট্য কলা সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির মধ্যে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। এটি সর্বাপেক্ষা রসময়, সৌন্দর্য্যময় ও আবেদনময়। ভাব বা অনুভূতি সূক্ষ্ম পর্য্যায়ে উঠলে তবে তা সঙ্গীতে প্রকাশ পায়। সঙ্গীতকে দৈবভাবের একটি সোপানও বলা চলে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ বা স্ফুরণে সঙ্গীত কম সহায়তা করে না। ভগবল্লাভের জন্যে মানুষের যে আকুলতা তা সঙ্গীত অপেক্ষা এমন প্রকাশ লাভ আর কিসের দ্বারা হতে পারে। এইজন্যই বহু মহাপুরুষ শ্রীভগবানের নাম গান করেছেন, তাঁর গুণকীর্ত্তন করেছেন তাঁকে পাবার জন্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আর কোন সাহিত্যিক ইদানীং পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তিনি একজন পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর জন্যে সারা বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ গর্ব অনুভব করে। সেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। যৌবনে তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা করেছেন, প্রভূত যশ অর্জনও করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজীবনের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমরা আজও পেলাম না। কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে তাঁর সঙ্গীতজীবন সাহিত্যের দিকে নির্দ্দেশিত হোল, তিনি জীবনের মোড় ফিরিয়ে তানপুরা ছেড়ে কলম ধরলেন—সে রহস্য তাঁর বহুবৈচিত্র্যময় জীবনের মতই আমাদের কাছে রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেল।

যতদূর জানা যায় প্রবেশিকা পরীক্ষার পর থেকেই শরৎচন্দ্র গান বাজনায় মেতে ওঠেন বেশী করে। তাঁর প্রিয় সঙ্গী রাজুর কাছে বাঁশী শিখতে আরম্ভ করে দেন। ভাগলপুরে সেই ভূতুড়ে বাড়ীর গঙ্গার ধারের জঙ্গল 'তপোবনে' তাঁর সাধনার আড্ডা ছিল। বন্ধুদের সংগে গানবাজনা তখন রীতিমত চলছে। কিন্তু একটা হারমোনিয়ম নেই। কেনবার টাকাও নেই। অদম্য শরৎচন্দ্র উপায় খুঁজলেন। সঙ্গীত পিয়াসা কলম ধরলেন সাহিত্য রচনায়। কুন্তলীন পুরস্কারের জন্যে তাঁর মন্দির গল্পটি সৃষ্টি হল। ১৩১০ সালে ভাদ্র মাসে তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে সর্ব্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে এটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে ২৫৲ টাকা পুরস্কার লাভ করে ও তাঁর বন্ধুদের প্রয়োজন মেটে। এই হ'ল সঙ্গীতের প্রেরণায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রথম সফল পদক্ষেপ।

এমনি করে শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের সাধনা চলতে থাকে। এর পরই দেখতে পাই মাঝে গান বাজনায় বাধা ও বিরতি এবং ভবঘুরে শরৎচন্দ্রের ছাব।

পিতার ভর্ৎসনায় শরৎচন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংগে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন মজঃফরপুরে। সেখানে উঠলেন এক ধর্ম্মশালায়। রাত তখন গভীর। ধর্ম্মশালার সামনের বাড়ীতে কে একজন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। নিস্তব্ধ নিথর রাত সেই সুরের মূর্চ্ছনায় ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। শরৎচন্দ্র আর থাকতে না পেরে তার সুরে তন্ময় হয়ে ছাদে উঠে গাইতে লাগলেন—

> 'জীবনে যত পূজা হল না সারা
> জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।'

কবিগুরুর এই গানটি বোধ হয় তখন তাঁর ছন্নছাড়া জীবনকে স্পর্শ করেছিল। পরদিন উভয় সুর সাধকের আলাপ হল। বেহালা বাদকটি ছিলেন নিশানাথ—অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখর বাবুর পিসতুত ভাই। শরৎচন্দ্রের মত নিশানাথও ছিলেন ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, পরোপকারী নিঃস্বার্থ যুবক। এইখানেই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে অনুরূপা দেবী ও তাঁর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় ও মজঃফরপুরে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। এখানে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র বহু গান শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী ও শিখর বাবুকে শুনিয়েছেন। গানের সংগে সংগে কিছু কিছু লিখেছেনও তিনি এই সময়।

এরপর এখানে চাকরী না পাওয়ায় ভাগ্যের অন্বেষণে আর পাঁচটা বাঙালীর মতই শরৎচন্দ্র চলে যান বর্ম্মা মুলুকে। ১৯০৫ সালে রেঙ্গুন এ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল আফিসে তাঁর চাকরী পাওয়ার মূলেও আছে তাঁর গান। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় নিঃসম্বল শরৎচন্দ্র যখন বাউণ্ডুলেবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় এম্, কে, মিত্র ম'শাই তাঁর গান শোনেন। তখন তাঁর সংগে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তিনি শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে আসার কারণ জেনে স্বেচ্ছায় তাঁকে একটি চাকুরী যোগাড় করে দেন। এরপর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে অনেকদিন

থাকেন এবং সেখানকার সামাজিক জীবনে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সে ইতিবৃত্ত অনেকেই জানেন। তাঁর নানা গুণাবলীর মধ্যে তিনি কবি নবীনচন্দ্রের কাছে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধিটি লাভ করেন। স্থানীয় বেঙ্গলী সোশ্যাল ক্লাবের উদ্যোগে ১৯০৫ সালে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের যে সম্বর্দ্ধনা সভা হয় তার উদ্বোধন সঙ্গীতে শরৎচন্দ্র যে গানটি গেয়েছিলেন তার পূর্ণ রূপ হ'ল—

'জন্মভূমি সুশোভিত বঙ্গ রঞ্জন আজি হে
এস কবিবর এস হে।
সমবেত যত দেশবাসী
দর্শন তব অভিলাষী
এস কাব্যশিল্পী শশী হে।
এস বঙ্গ হৃদয় ভূষণ—
এস সুন্দর প্রিয় দর্শন
প্রীতি পুষ্প ডালা লহ হে
এস কবিবর এস হে।'

রেঙ্গুনে থাকবার সময় শরৎচন্দ্র বহু জায়গায় বহু সুযোগে বহু গান গেয়েছিলেন। সে সব গানের ও অনুষ্ঠানের কোন হিসেব পরিচয় বা তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নি। তার প্রয়োজন হয়ত তখন ছিল না কিন্তু এখন তার জন্যে আপসোস হয়। তবু যেটুকু জানা যায়—তিনি যে সমস্ত গান গাইতেন বা তাঁর প্রিয় ছিল—তার মধ্যে—

'কোথা ভবদারা! দুর্গতি হারা, কতদিনে তোর করুণা হবে
কবে দেখা দিবি কোলে তুলে নিবি সকল যাতনা জুড়াবে।'—,
'আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল'—,
'এই করেছ ভাল নিঠুর হে'—,
'ভালবাসা নহে ত আলেয়া, আলো সে যে শুধু আলো'—,
'পথের পথিক করেছ আমায় সেই ভালো যে সেই ভালো
আলেয়া আলালে প্রান্তরে ভালে সেই আলো মোর সেই আলো'—
ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে তিনি গেয়েছিলেন—

'তেমনি করে' আবার এসে ডাকাও ঠাকুর প্রেমের বাণ
তাতে ভেসে যাবে ডুবে যাবে জীবের দারুণ অভিমান!!
সেদিন যেমন জীবের লাগি' 'কথামৃত' করলে দান
প্রেম পিয়াসী, বিশ্ববাসী, প্রেমের সুধা করছে পান।—'

শরৎচন্দ্রের গানবাজনা সম্বন্ধে সুবিখ্যাতা নিরুপমা দেবী ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীবিভূতি ভট্ট লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র রসস্রষ্টা রূপেই শেষ জীবনে প্রকটিত। কিন্তু যৌবনে একধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপেই তাঁহাকে দেখিয়াছি।—শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেপরোয়া—কোন দ্বিধা তাঁহাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না।—আমাদের খঞ্জনপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়ত এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলো কবর আছে। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবরস্থানেই মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদা'র বাঁশী চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ম-সহ গান চলিতেছে এবং আমরা দু'চার জনে বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি।—কোনও গভীর রাত্রে সেই মসজিদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌদিকে শুনাইয়া বলিতেন, এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।—আমাদের দল একদিন বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের এক লাইন আবিষ্কার করিল—

'আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি
অমনি মুদ'ল আঁখি।'

ইহার পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু বাঁশী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল—

'গোকুলের মধু ফুরায়ে গেল,
আঁধার আজি কুঞ্জবন।—'

শরৎচন্দ্র শুধু যে গানই জানতেন তা' নয়। তিনি বেশ ভাল তবলচীও ছিলেন। একবার কলকাতায় এক রবিবাসরীয় আসরে সাহিত্য ও সঙ্গীত সভার আয়োজন হয়েছে। শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় সভা আয়োজিত। তিনি সভায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথেরও সে সভায় আসবার কথা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তিনি আসতে পারলেন না।

সভায় কবিতাপাঠ, রবীন্দ্র সঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। কবিতা পাঠ প্রভৃতি হয়ে যাবার পর গান আরম্ভ হল। কিন্তু ভাল
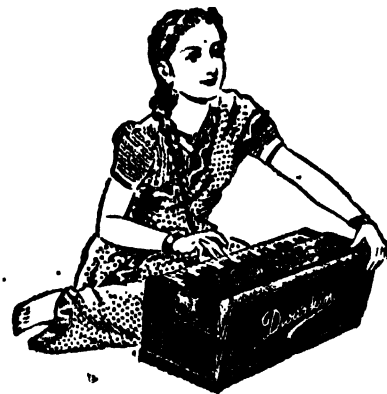
তবলচীর অভাবে গান তেমন জমলো না। তখন শরৎচন্দ্র নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে একটু আফিং আর চায়ের জোগাড় করতে বলে লেগে পড়লেন। তারপর সভা ও গান দুই জমে উঠতে আর দেরী হল না। সভার শেষে সকলে ধরলেন তাঁকে—কোথায় এমন সুন্দর বাজাতে শিখলেন? স্মিত হাসির রেখাটুকু মুখে এঁকে শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—আমার সব সঞ্চয়ই বর্ম্মামুলুকে; তবে তবলাটা শিখেছি লক্ষ্ণৌর এক তবলচীর কাছে। শুধু তবলাই নয়—সেতারও বাজাতে পারতেন তিনি চমৎকার। বহুদিন পরে একদিন পানিত্রাসে সামতাবেড়ের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের সেতার শুনিয়েছিলেন তাদের অনুরোধ মেটাতে। এককালে গানই ছিল শরৎচন্দ্রের জীবিকা; পরে লিখন হল তাঁর সাধনা। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেও কিন্তু তাঁর প্রিয় গান ত্যাগ করতে পারেন নি। পরবর্ত্তী জীবনে গান না গাইলেও শুনতেন প্রচুর। এইজন্যে একটি রেডিও সেট কিনে রেখেছিলেন সামতাবেড়ের বাড়ীতে। এখনও ভগ্ন অবস্থায় সেটিকে দেখতে পাওয়া যায়। সামতাবেড়ে তাঁর শেষ জীবনের অবসর আলয়টি সত্যিই সুরের আবহাওয়ায় ভরপুর ছিল। জীবনের সায়াহ্নে গড়গড়া হাতে কত অলস অপরাহ্ণে বাড়ীর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে দিগন্ত প্রসারিত মাঠের ওপর দিয়ে মেঘ ঢাকা রূপনারায়ণের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকতে জীবনরূপকার শরৎচন্দ্রের মনে কত কথা আর গানই না গুঞ্জন তুলেছে তা কে জানে।

আমার কথা (৫৭)

শ্রীমতী ইলা বসু

সঙ্গীতের পরিবেশে যাঁহার জন্ম—মাত্র ছয় বৎসর বয়সে যিনি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন—পরবর্ত্তীকালে যিনি বাংলা তথা ভারতীয় সঙ্গীতে এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছেন—সেই শ্রীমতী ইলা বসু বলেন:

১৯৩৬ সালের ১০ই আগষ্ট হাওড়া পঞ্চাননতলায় জন্মাই। বাবা শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী ডাকবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন. আর মা হলেন শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী। রাজসাহী জেলার বাসুদেবপুর হল আমাদের স্বগ্রাম। প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেছি। চারি বৎসর পূর্ব্বে হাওড়া জেলা সম্মেলনে প্রথম গান করি—পনর বৎসর বয়সে এলাহাবাদ নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনে যোগ দিই এবং তথায় ধ্রুপদ গানে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও অনার্স সার্টিফিকেট পাই। তার আগের বছর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আমার প্রথম গুরু ছিলেন শ্রীননীগোপাল মিত্র ও পরে শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। শ্রীহরি গাঙ্গুলীর নিকট আমার ভাই দীপক তবলা শেখে। প্রায় বার বৎসর আগে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিশু বিভাগে যোগদান করি। পরে আমি উহার সঙ্গীত-শিল্পী হই। হিন্দুস্থান রেকর্ডে ৺অনুপম ঘটকের পরিচালনায় আমার প্রথম রেকর্ড 'মোর গানেরই ইন্দ্রধনু' হয়। ইহার পর এচ, এম, ভি তে শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর শিক্ষাধীনে রেকর্ড হল 'বনে বনে গাহে কোহেলিয়া।' এ পর্য্যন্ত আমার গাওয়া গানের অনেক রেকর্ড হয়েছে। শারদীয়ায় আমার রেকর্ড হবে 'তোমারেই বেসেছি ভালো' ও 'ছোট করে বলতে গেলে গল্প।' ছোট বয়সে যদিও প্রথম ধ্রুপদ গান শিখি, পরবর্ত্তী সময়ে ঠুংরী, দাদরা ও গজল ভালভাবে আয়ত্ত করি। ছায়াছবিতে আমি নেপথ্য গায়িকা হিসাবে গান গেয়েছি। বর্ত্তমানে 'নৃত্যেরই তালে তালে,' 'এ জহর সে জহর নয়,' 'আকাশ পাতাল,' 'সুধা ও সারহার্দ'-এ গানে অংশ গ্রহণ করেছি। হিন্দী ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমি গেয়ে থাকি। শ্রীঅশোক বসুর সহিত আমি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা। আমার 'হবি' হল কুকুর পোষা এবং তজ্জন্য আমি অনেক টাকা খরচ করে থাকি। বৎসরে কয়েক মাস পাটনায় আমার কাকার নিকট অবস্থান করি। আমার মনে হয় যে আধুনিক সঙ্গীতের সহিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সংমিশ্রণ হলে শ্রোতাদের মনের গভীরে রেখাপাত করে। গজল গান আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীমতী ইলা বসু

To be without some of the things you want is
an indispensable part of happiness.

—*Bertrand Russel*

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

(৩)

১৮৩৩, ১২ই জানুয়ারি সমাচার দর্পণে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়—

শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে।
ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত
পুস্তকের বিবরণ।
ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায়
১ বাঙ্গালা ডিক্সানরি।

অর্থাৎ শ্রীযুত ডাক্তার কেরি সাহেব কর্তৃক রচিত বাঙ্গালা ডিক্সানরি তাহাতে বাঙ্গালা শব্দ সমস্তের অর্থ ইঙ্গরেজীতে ব্যক্ত আছে তাহা বৃহৎ তিন বালামে প্রকাশিত মূল্য ৭০ টাকা।

২ শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা ডিক্সানরি
২ বালম।

তাহার প্রথম বালমে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের। শব্দ সংক্ষেপে অর্পিত আছে। ২৬০০০ বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ইঙ্গরেজীতে করা গিয়াছে। দ্বিতীয় বালমে ২৩৯৮৩ ইঙ্গরেজী শব্দের অর্থ বাঙ্গলাতে লিখা গিয়াছে। দুই বালমের মূল্য ১০ টাকা। পৃথকরূপে লইলে ৬টাকা। (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কৃত সংগ্রহ হতে)। উপরোক্ত ২নং অভিধানটি কেরী সাহেবের অভিধানেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮২৭ খৃ: ইহা প্রকাশ করেন। (কেরী সাহেবের অভিধানের বিস্তৃত বিবরণ 'বাংলা গদ্যের প্রথম' যুগ, সা-প-প, ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ডা: কেরী সাহেবের বৃহৎ অভিধানের পরে বাঙালী রচিত সর্বপ্রথম বর্ণানুক্রমিক বাংলা অভিধান-কার বলে প্রসিদ্ধি আছে স্মার্ত পণ্ডিত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু পাঠশালার অধ্যাপক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ১৭৮৬ খৃ: (?) (১৭০৭ শক ২১শে মাঘ) পালপাড়ায় জন্ম ও ১৮৪৪ খৃ: ২রা মার্চ মৃত্যু। পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। বিদ্যাবাগীশ রাজা রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় কলকাতায় এসে প্রথমে শাস্ত্রচর্চায় প্রবৃত্ত হন আর অধ্যাপনা করেন। ৬ খানি বই লেখেন, তার মধ্যে প্রথমেই তিনি একখানি অভিধান প্রস্তুত করেন। অভিধানখানির নাম—"বঙ্গভাষাভিধান"। ১৮১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় দাম ১৭ টাকা। শোনা যায় তৎকালে এই অভিধান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ 'জ্যোতিষ সংগ্রহসারে'র বিক্রয়লব্ধ অর্থে তিনি সিমলা-হেদুয়ার উত্তরে এক বাড়ী কিনিয়া তথায় বসবাস করেন। ১৮২০ সালে অভিধান-খানির ২য় সংস্করণ হয়। ইহা পূর্বাপেক্ষা বর্ধিতাকারে। এই সংস্করণের স্বত্ব তিনি সোসাইটিকে বিক্রয় করেন। ইতিহাস-অনুসন্ধানীরা এই অভিধানের যে কয়খানির সন্ধান পেয়েছেন—সেগুলির কোনটারই আখ্যাপত্র নেই। কেরী সাহেব এই অভিধানখানিকে তৎকালে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্যে ২০০ কপি ক্রয় করেন।

এর পরে নাম পাওয়া যায় মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের। ইনি একখানি অভিধান রচনা করেন ১৮১৮ সালে।

এই ১৮১৮ সালেই পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত অমরকোষ খানিকে অকারাদি ক্রমে সাজিয়ে বাঙলা ভাষায় তার অর্থ প্রকাশ করে 'শব্দসিন্ধু' নামে বাঙালীদের ব্যবহারোপযোগী অভিধান বের করেন। বইখানির আখ্যাপত্র এইরূপ—

"ভগবান অমরসিংহ। কৃত। অভিধান অকারাদিক্রমে। ভাষায়। বিবরণ করিয়া শব্দসিন্ধু। নাম। রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা। হইল। সন ১২২৫।"

বইখানির ভূমিকার শেষে গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ (১৭৪০ শক) এইভাবে লেখা আছে—

'গগন গণেশ ভুজ গন্ধর্ব্ব ভূমিতে।
গ্রন্থ সমাপ্তির শাক জানিবা পণ্ডিতে॥'

সমাচার দর্পণের (২৫ জুলাই ১৮১৮) নতুন বইয়ের এক ইস্তাহার প্রকাশ হয়—

"ইস্তাহার। শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণ:। এতদ্দেশীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ আকিঞ্চন ভগবান অমরসিংহ কৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী অর্থ ডেক্সিয়ানারীর ন্যায় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য ব কারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অর্থ দিয়া নানার্থ স্বরূপ ৪১১ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারিশত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে যাহার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সোসাইটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি।" (সং-সে-কথা, ১ম, ৬৬)।

১৮১১ সালে ইংরেজ পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson) এক সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রস্তুত করেন। বইখানির নাম—A Dictionary in Sanskrit and English, translated..from Original Compilation prepared by learned Natives for the college of Fort William, Calcutta 1819 পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০০। বইখানির দু রকম দাম ছিল—ভাল বিলিতি কাগজে ছাপা—১০০৲ আর পাটনাই কাগজে ছাপা—৮০৲। ডা: উইলসন সাহেব ১৭৮৬ খৃ: ২৩এ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের সোহো স্কোয়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৮ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ডাক্তার হয়ে ভারতে আসেন। রসায়ন-শাস্ত্রে পারদর্শী বলে ট্যাঁকশালে assay master নিযুক্ত হন। কয়েক বছর পরে ১৮১১-৩৩ খৃ: পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অবসর সময় সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮১৩ সালে কালিদাসের মেঘদূতের ইংরেজি অনুবাদ, তারপর অনেকগুলি কাব্য অনুবাদ করেন। এই সময়েই সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের রচনা হয়। তিনি হিন্দুদের থিয়েটার নিয়েও গ্রন্থ লেখেন—রামচরিতের অনুবাদ করলে তাঁরই অধ্যক্ষতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীতে এই নাটক অভিনীত হয় (১৮৩১)। ১৮৩৩ সালে অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক, ১৮৩৬এ ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ। ১৮৬০ সালে ৮ই মে মৃত্যু।

ডাঃ উইলসন সাহেবের অভিধানখানির একদিকে সংস্কৃত ও আর একদিকে ইংরেজি শব্দ। ইংরেজিতে এক এক শব্দের দু'তিন রকমের মানে আর নানা কোষ গ্রন্থ থেকে তার প্রমাণ দেওয়া আছে।

১৮২০ সালে ক্যাপ্টেন ফেল (Captain Fael) সাহেব মেদিনী কোষ ইংরেজিতে তর্জমা করে সংস্কৃত-ইংরেজি এক অভিধান প্রস্তুত করেন। এই বইখানি ইংলণ্ডে যাঁরা সংস্কৃত শিক্ষা করতে চান তাদের জন্যই বিশেষ ভাবে রচিত হয়েছে।

রেভাঃ উইলিয়াম মর্টন (Rev. William Morton) সাহেবের বাঙলাভাষায় এক অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইখানির নাম —A Dictionary of the Bengali Language, Calcutta 1828. বইখানি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে রক্ষিত আছে। এ ছাড়াও তিনি "Biblical and Theological Dictionary, English and Bengali, Calcutta 1845" নামে একখানি অভিধান রচনা করেন। ইহাও উক্ত সোসাইটীতে রক্ষিত আছে।

ডাঃ কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরী (Felix Carey) ও রামকমল সেন (১৭৮০—১৮৪৪) (যিনি তৎকালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ান ছিলেন) উভয় মিলিয়া দু' খণ্ডে এক অভিধান তৈরী করেন। অভিধানখানির সূত্রপাতের প্রায় দু' বছরের মধ্যেই ফিলিক্স কেরীর মৃত্যু হয় (১৮২৩)। পরে রামকমল সেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক হন। তিনি এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচার সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ। কেরি ও রামকমল সেন উভয়ের মিলিত যে অভিধান তার প্রস্তুতির সংবাদ সমাচার দর্পণে (১৮২১, ৩১শে মার্চ) প্রকাশ হয়েছিল—

"শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীরামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থাকার সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

বিলেতে জনসন সাহেবের ইংরেজি ডিক্সনারীখানি খুব বিখ্যাত। এদেশেও তৎকালে ইংরেজি শিক্ষানবীশদের কাছে অভিধানখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। জন মেণ্ডিস (John Mendies) সাহেব এই অভিধানখানিকে ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেন। নাম—Companion to Johnson's Dictionary in English and Bengalese. ইহা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হয়। দাম হয় ৮৲। ১৮২৮ সালে এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড প্রকাশ হয়। ছাপাও হয় ঐ শ্রীরামপুরে।

১৮২৫ সালের ২২এ জানুয়ারির সমাচার দর্পণে দেখা যায়—"মোং কলুটোলা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে শ্রীলেবেণ্ডার সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত জানসেন ডিক্সনারীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা" অভিধানের বিজ্ঞাপন।

১৮ই জুন ১৮২৫এর বিজ্ঞাপনে দেখা যায় "জনসন ডিকসিয়নারি।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তার জানসেন সাহেব কৃত ইংরাজী ডেকসিয়ানারির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপাইতেছেন।। এই পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক ২ নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। এই পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে⋯।" (সংসে কথা, ১ম, ৭৪)। ১৮৩৪ সালে এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড সমাপ্ত হয়। নাম—"A Dictionary in English and Bengalee, translated from Todd's Edition of Johnson's English Dictionary, 2 Vols. Seerampore Press, 1834."

শ্রীরামপুরের পাদরী কেরী সাহেবের সহকর্মী জোশুয়া মার্সম্যান (J. C. Marshman) যে অভিধানখানি সংকলন করেন, তার নাম "A Dictionary of the Bengali Language," etc. ইহা দু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড ১৮২৭ খৃঃ পত্র সংখ্যা ৫৩১ এবং ২য় খণ্ড ১৮২৮ খৃঃ পত্র সংখ্যা ৪৪০। এই অভিধানটি শ্রীরামপুরে ছাপা হয়।

১৮২৭ সালে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এক অভিধান করেন। অভিধানখানির নাম—A Dictionary of Bengali, Calcutta, 1827. "ইংরাজি বাংলা অভিধান।" তারাচাঁদ তৎকালে 'ইয়ং ক্যালকাটা' দলের ও পরে বর্দ্ধমান রাজের অধীনে কর্ম করিতেন।

১৮২৯ সালে রামধন সেন—পারসী ইংরেজি অভিধান "Dictionary in Persian and English, Calcutta, 1829" রচনা করেন।

১৮৩১ সালে 'শব্দকামধুরাভিধানের' এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। তাতে তিন জন পাণ্ডিত ও একজন সংগ্রহকারের স্বাক্ষর থাকে এবং উহা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়।

১৮৩২ সালে জগন্নাথ মল্লিক সংস্কৃত অমরকোষের প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ দিয়ে বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেন। বইখানির পৃষ্ঠ সংখ্যা ছিল ৪০০। সমাচার দর্পণের (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩২) সংবাদ—

"শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ মল্লিক সম্প্রতি সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠ পরিমিত হইবে। এই মূল গ্রন্থে যাহাদের আবশ্যক তাহাদের ইহাতে মহোদপকার হইবে। এই গ্রন্থ উক্ত বাবু অনুমতিতে শ্রীযুক্ত রামোদয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।"

১৮৩৩ সালে স্যার গ্রেভস চামনি হটন (Sir G. C. Haughton. ১৭৮৮—১৮৪৯) এক বাঙলা-ইংরেজি ও সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করেন। স্যর হটন ১৮০৮ সালে ভারতে এসে বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দেন। বারাসাতে ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ১৮১৫ সালে বিলাতে ফিরে যান—সেখানে প্রাচ্য ভাষায় অধ্যাপক হন এবং একখানি বাংলা-অভিধান তৈরী করেন। অভিধানখানির নাম—"A Dictionary, Bengali and Sanskrit Explained in English..to which is

added an index, serving as a reversed dictionary, London 1833." সমাচার দর্পণে (১৮৩৪, ৪ঠা জুন) প্রকাশ—আমরা শুনিয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম শ্রীযুক্ত স্যর গ্রেবস হৌটন সাহেব লণ্ডন নগরে সংস্কৃত ও বাংলা ও ইংরাজিতে নূতন এক ডিক্সনারী মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের শেষে এতদ্রূপ নির্ঘণ্ট দিয়াছেন—যে তাহা উলট করিয়া পড়িলে ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এখানে ৮০ টাকারও অধিক।

১৮৩৭ সালে ডি'রোজারিও (P. S. D'Rozario) "A Dictionary of Principal Languages of Bengal Presidency in Bengali, Hindi, 1837" নামে একখানি অভিধান করেন।

১৮৩৭ সালে আর একখানি অভিধান পাওয়া যায়। নাম—Dictionary of English, Bengali & Manipuri গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

১৮৩৮ সালে ব্রজনাথ তর্কভূষণ রচিত অভিধান। "শ্রীব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাঁহাকে সর্বলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি এতদ্দেশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন—এই অভিধান এতদ্দেশীয় সর্বলোকের উপকারক হইবেক কারণ বাংলা ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক রচিত যে অভিধান যাহা এক্ষণে ইস্কুলে ব্যবহার্য্য হইতেছে—সেই অভিধান যাঁহারা অধিক বাঙ্গালা শিক্ষা করেন তাঁহাদিগের উপকারক নহে এই ভাবি অভিধান পূর্ব পূর্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে কারণ ইহা অত্যুত্তম বিজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে। (সমাচার দর্পণ, ৮ই আগষ্ট ১৮৩৮)।

সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের অভিধান—সমাচার দর্পণের ১৮ই আগষ্ট ১৮৩৮এর সংবাদে প্রকাশ "পারস্য ও বঙ্গভাষাতে অভিধান। আদালতের কার্য্যে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গভাষার অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে।...বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পারস্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে পঁচিশ শতেরো অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইখানে ঐ মহোপকারক বহুমূল্য গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যল্প মূল্য একটা টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে।"

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বাঙলা ভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলন করেন। নাম—বঙ্গাভিধান। সেই শব্দগুলি অকারাদিক্রমে সাজান হয় এবং তার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় অর্থও প্রকাশ করেন। যেমন—

"অংশ	s.	a share, a part
অংশী	s.	a partner
অকথ্য	a.	unutterable
অকথ্য কথা	s.	unutterable word
অকর্ত্তব্য	a.	improper
অকর্ম্মণ্য	a.	useless
অকল্যাণ	s.	misfortune"

...ইত্যাদি। (সং-সে-কথা, ২য়, ১১৫)।

এই ১৮৩৮ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য যিনি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ (১৮২৪-৩১) ছিলেন ও পরে মুন্সেফ, সদর আমিন, পুর্ণিয়া জেলার আদালতের জজ পণ্ডিত হন, তিনি আইন সংক্রান্ত পারস্য শব্দের বাঙলা সমেত অভিধান প্রস্তুত করেন। নাম—"ব্যবহার-বিচার শব্দাভিধান। সম্বত ১৮৯৫, আষাঢ়, পৃঃ ৩৬।" "ব্যবহার বিচারোপযোগি পারস্য শব্দের সাধু গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ।" ইহা কলকাতায় পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার যাহা লিখেছেন—তাহা আমি সংবাদপত্রে সেকালের কথার ১ম খণ্ডের ৪১৬ পৃঃ হতে উদ্ধৃত করছি—

"সমাবেদন মিদং

ভারতবর্ষস্থ রাজধানীর সকল বিচারস্থলে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা দ্বারা রাজ শাসন ও রাজস্ব আদায় ও অন্য অন্য তাবৎ কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে সুপ্রিম কৌন্শল হইতে যে অবধি আজ্ঞা হইয়াছে এইক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হওয়া সুদূর পরাহত প্রত্যুত বঙ্গদেশের মধ্যে নানা স্থানে নানাবিধ শব্দ প্রয়োগ হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে বোধহয় ঐ সকল স্থানের ব্যবহার নিষ্পত্তি হইয়া যখন দ্বিতীয়বিচারার্থে সদরদেওয়ানিতে উপস্থিত হইবে সেসময়ে বিচারকর্ত্তাদিগের এবং পাঠকলেখকদিগের অনর্থক কাল হরণ ও বৈরক্তি জন্মিতে পারে অতএব এই বিষয়ের যত আবশ্যক পারস্য শব্দ আমি আপন প্রাপ্তব্যবহার বিচার সময়ে ক্রমে ২ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অর্থ মিতাক্ষরাদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া সাধু-গৌড়ীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিয়া তাহা সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক অনেক শব্দ পুনর্ব্বিবেচিত হইয়া মুদ্রিত হইল আমার বাসনা এই পুস্তক বঙ্গ-রাজধানীস্থ সকল বিচারকর্ত্তা মহাশয়দিগের নিকটে স্বীয়ানুকূল্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করিব তাহাতে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ সুচারুরূপে হইতে পারে তাহাতে আমার পরমোপকার হইবে ইতি।

পুনর্ব্বার নিবেদন পারস্য শব্দের গৌড়াক্ষরে লিখনে কোন স্থানে বর্ণবিপর্য্যয় হওয়াতে মহাশয়েরা ত্রুটি ধরিবেন না কারণ স্বরাপ্রযুক্ত পারস্যাক্ষর বিন্যাস করা যায় নাই পরে তাহাতে প্রয়োজনও নাই কেবল সাধু ভাষা গৌড়ীয় দিগদর্শনার্থ ইহা প্রস্তুত করা নতুবা পারস্যাভিধান অনেক আছে কিমধিকং বিজ্ঞবরেষ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত।

সদরআমীন পুরনিয়া।"

[ক্রমশঃ।

Money can't buy health, but I'd settle for a diamond-studded wheelchair.

—Dorothy Parker, authoress
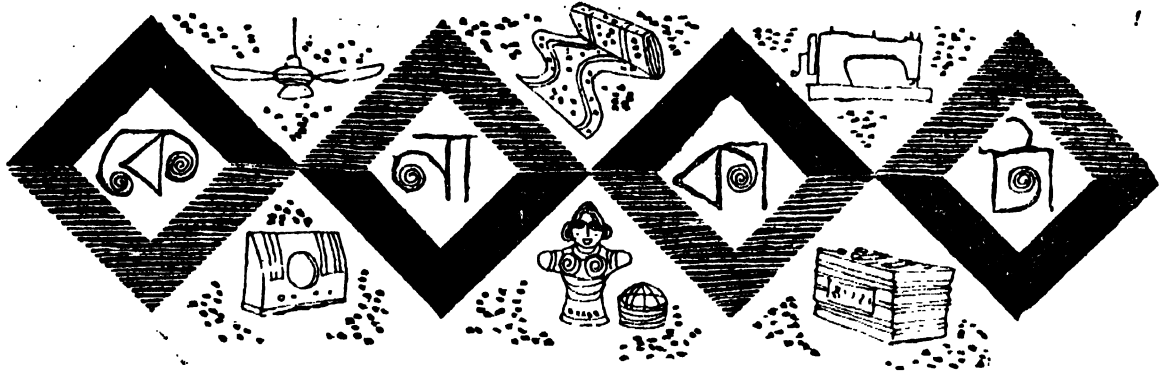
দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংরক্ষণ

পুরনো দুষ্প্রাপ্য জিনিসের দাম সব সময়ই রয়েছে, পরেও থাকবে। বরং বলা যায়, দিন যতই যাবে, অতীত যুগের যে কোন সম্পদের মূল্য বাড়বে বই কমবে না। দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দাবী সেজন্যেই ওঠে।

একটা জিনিস বলতে হয় এই সূত্রে এবং সে গোড়াতেই। এইমাত্র দাম বা মূল্যের কথা যা বলা হলো, সে বস্তুগত যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি কালগত। অর্থাৎ এ অনেকটা বস্তু বা শিল্পের ঐতিহাসিক মূল্য—ওর প্রাচীনত্বের মর্যাদা।

সভ্যতাগর্বী ও অগ্রসর দেশসমূহে পুরনো দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের সমাদর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কত অনুসন্ধান ও কত খননকার্য্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে এজন্যে, বলবার নয়। উদ্যম, দৃষ্টি ও প্রযত্ন এই যেখানে নিবিড়ভাবে থাকে, সেখানেই দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

যা কিছু পুরনো, তা-ই পরিত্যাজ্য, এ ধারণা অচল প্রমাণিত হয়েছে বহুকাল। অনুসন্ধানে অতীতের গর্ভে নিহিত অনেক জিনিসই বর্তমানের চোখে নতুন ঠেকতে পারে। এই যে সহসা চোখে লাগা, মনের ওপর আপনি প্রভাব বিস্তার, পুরনো সামগ্রীর মূল্য স্বীকৃত ও নির্ণীত হয় সর্বাগ্রে এইখানেই।

পুরনো দিনের মুদ্রা, ডাকটিকিট, শিল্পকলা প্রভৃতির মূল্য অনস্বীকার্য্য। এই ধরণের দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে পশ্চিমী দেশগুলোর প্রযত্ন ও তৎপরতার অভাব নেই। পূর্বে যাই হোক, এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলোর মতো ভারতও এখন এগিয়ে আসতে চাইছে বেশ কিছুটা।

প্রাচীন যুগের দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য সোভিয়েট দেশের দরদ ও মমত্বের বুঝি তুলনা হয় না। একটি মাত্র ঘটনা থেকেই এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যেতে পারে। রুশ বিপ্লব তখন পুরাদমে চলেছে—সমগ্র বিশ্ব তখন প্রকম্পিত। পাছে সব ধ্বংস হয়ে যায়, তাই পুরনো দুর্লভ দ্রব্য সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে একটি প্রকাণ্ড দল। সেদিনের অমূল্য সংগ্রহ বা শিল্প সম্ভার নিয়েই রুশিয়ার বিখ্যাত সংগ্রহশালাগুলো (মিউজিয়াম) আজও গর্ব করতে পারছে।

এখনকার যুগে অবশ্য পুরনো জিনিসের স্থায়ী বাজার গড়ে উঠেছে প্রাচ্য-প্রতীচ্য অনেক দেশেই। বিলেতে এই শ্রেণীর বড় বড় বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র বহু দিন থেকেই চালু রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য আসবাবই হোক, অপর কোন মনোরম শিল্প সামগ্রীই হোক, ব্যাপকতর বাজার এর মিলবেই। পুরনো শিল্পদ্রব্য নিয়ে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য করে চলেছেন, বিশ্বের এমন কয়েকটি নামকরা ফার্ম বা সংস্থা : ক্রিষ্টি'জ ও সোদেবাই'জ (লণ্ডন), পার্কে-বার্ণেটস (নিউইয়র্ক), গ্যালারী কার্পেন্টিয়ার (প্যারিস) ইত্যাদি।

একটি কথা মানতেই হবে—সাধারণভাবে পুরনো দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মূল্য ক্রমে বাড়বেই, সহসা কমবে না। বিলেতী বাজারের সাম্প্রতিক বিবরণ—কয়েক বছর আগেও সেখানে প্রাক্ কলম্বিয়া (১৮০১) যুগের জহরতের যে দাম ছিল, আজ তা দাঁড়িয়েছে অন্তত: তিনগুণ। প্রাচীন চিত্রকলার মূল্যও আজকের দিনে বেড়েছে অতিমাত্রায়। বার্ণাড বাকেটের হাতের একখানি শিল্পের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগেও এর বাজার মূল্য যেখানে ছিল মাত্র ১৫ পাউণ্ড, আজ ২৫০ পাউণ্ডের কমে তা পাবার উপায় নেই।

পুরাতত্ত্ববিদদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন অমূল্য জিনিস তথা সেকালের দুষ্প্রাপ্য শিল্প-সামগ্রীর দাম বাড়বার পেছনে অবশ্য কয়েকটি কারণই রয়েছে। একটি প্রধান কারণ বা সূত্র—সরবগাহ থেকে চাহিদা বৃদ্ধি। মানুষ পুরনো সম্পদের মাধ্যমে পুরনো যুগের সাথে পরিচিত হতে চায় কিন্তু সে সম্পদ চাওয়া মাত্রই হাতে পৌছতে পারে না। প্যারিসের বাজারে দু' বছর আগে মাত্র ৮লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দুষ্প্রাপ্য শিল্প সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। বাইরে এদের চাহিদা এতো বেশি হয়ে পড়ে যে, দেখতে দেখতে এই খাতে পাঁচগুণ অর্থাৎ ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এসে যায়।

মোটের ওপর, আজ এই নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, শতাব্দী আগেকার মুদ্রা, ডাকটিকিট, পুঁথি-পুস্তক (বিশেষ করে পাণ্ডুলিপি), শিল্প, ভাস্কর্য্য—এসকলের সংগ্রহ গুরুত্ব অপরিসীম। কখন কার কৌতূহল আকর্ষণ করে কোন্ জিনিসের মূল্য কত দাঁড়াবে, কেউ বলতে পারে না। এই সব মহামূল্য সম্পদ জাতীয় সংগ্রহ-শালায় যত্ন করে রাখবার ব্যবস্থা হলে, সবচেয়ে ভালো হয়।

পুরনো দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব অনস্বীকার্য্য। মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালায় রেখে, এবং প্রচার-পুস্তিকা মারফত তাঁরাই এসকল সম্পদের দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন সহজে। ভারতের জাতীয় সরকার ও পুরাতত্ত্ববিদগণ এদিকে উদ্যোগী রয়েছেন, এ আশার কথা। সম্প্রতি জার্মানীতে প্রাচীন ভারতের শিল্প-সম্পদের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এমনি ধরণের প্রদর্শনী দেশে-বিদেশে যত বেশি হবে, ততোই ভালো, এতে সন্দেহ নেই।

তাসের ব্যবহার ও আধুনিক যুগ

আজকের দিনে এমন দেশ নিতান্ত বিরল, যেখানে তাসের ব্যবহার নেই। মনকে উৎফুল্ল রাখবার এবং অবসর উপভোগের একটি চমৎকার মাধ্যম এই তাস। ব্রিজ, ব্রে, হুইষ্ট, পোকার প্রভৃতি অসংখ্য রকমের তাস খেলা এযুগে চলতি। জুয়ার কেন্দ্র বা আড্ডাগুলোতেও তাস ব্যবহৃত হয় অতিমাত্রায়।

তাসের ব্যবহার ঠিক কোন্ যুগে কি অবস্থায় সুরু হয়েছে, এ নিশ্চয় করে বলা যায় না। ভারতে কিন্তু এর প্রচলন ছিল বহু শতাব্দী আগেই। তবে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত তাস খেলা ইউরোপের অবদান, বিশেষ করে বৃটেনের। সে দেশ থেকেই সারা দুনিয়ায় সম্প্রসারিত হয়েছে তাসের নতুন নতুন জনপ্রিয় খেলা।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে জানা যায়, ইউরোপে তাস খেলার সূত্রপাত হয় চতুর্দশ শতকে। তখনকার দিনের তাস আজকের দিনের মতো এত সুন্দর ও মসৃণ ছিল না, এ সহজেই অনুমেয়। আধুনিক যুগে বাজারে কত চিত্তাকর্ষক সুমুদ্রিত তাস দেখতে পাওয়া যায়। এই উন্নতির জন্যে বিলেতের টমাস ডলা রিউ কোম্পানী বহুলাংশে দায়ী।

সে ১৮৩২ সালের কথা। তখন অবধি ইউরোপে যে তাস ব্যবহৃত হতো, সে হাতে ষ্টেনসিল করে। কাজটি সহজসাধ্যও ছিল না মোটেই, ব্যয়ও হতো প্রচুর। টমাস ডলা রিউ (তাঁরই নামে পরে কোম্পানী হয়) ব্যাপারটি নিয়ে ভাবলেন—আবিষ্কার করলেন তাস ছাপাবার ছাঁচ বা যন্ত্র। ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্থ উইলিয়ম ঐ মুদ্রণ যন্ত্র দিয়ে তাস উৎপাদনের ছাড়পত্র তাঁকে অর্পণ করেন। এই অভিনব আবিষ্কারের পর থেকে তাস ছাপা হয়ে চলে হরদম—অল্পায়াসে তৈরী হয় তাসের এক একটি তাড়া। ক্রমে অনেক মনোরম শিল্পকাজ চলতে থাকে এর ওপর পাতায়—সাহেব, বিবি, গোলামকেও নানাভঙ্গিতে বসানো হয়। ভালো ভালো ডিজাইনের তাস বাজারে যতই আসতে থাকে, তাসের ব্যবহারও বেড়ে যায় সেই অনুপাতেই।

তাস উৎপাদন এ যুগে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সম্পর্কে একটি হিসাব পাওয়া গেছে। ১৮৩২ সালের আগে বছরে তাসের তাড়া তৈরী করা সম্ভব হতো প্রায় দুই লক্ষ। ১৮৫৭ সালে অর্থাৎ ত্রিশ বছর হ'তে না হতেই যান্ত্রিক ব্যবহারে বছরে উৎপাদন ৮ লক্ষে দাঁড়ায়। এর পর শত বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে উৎপাদনের মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়েছে, আজ তা পরিষ্কার। এক্ষণে একমাত্র বৃটেনেই তাস তৈরী হয় বছরে ১০ কোটি তাড়া আর ৮ কোটি তাড়া মার্কিন মুলুকে। ইউরোপ ও আমেরিকার আজ শতকরা প্রায় ৮০টি গৃহেই তাসের নিয়মিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ড লা রিউ কোম্পানীর ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে লণ্ডনে তাস ব্যবসায়ীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। সেইসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন উক্ত নামজাদা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। ১৫টি দেশ থেকে ২১টি কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন আর রুচিসম্মত অসংখ্য ডিজাইনের খেলার তাস জমা হয়েছিল প্রদর্শনীতে।

অতীত দিনের এমন কি পাঁচ শত বছর আগেকারও রকমারী তাস দেখতে পাওয়া যায় ঐ সময়। হাতীর-দাঁত, কচ্ছপের খোলা, মাছের আঁষ, জন্তু-চামড়া প্রভৃতি কত জিনিস দিয়ে তৈরী সে সকল তাস। রাজা প্রথম চার্লসের ব্যবহৃত এক তাড়া দামী তাস আলোচ্য প্রদর্শনীর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল। আর হাতে তৈরী পুরনো ডিজাইন বা নমুনার তাসের ছড়াছড়িও হয়েছিল তুলনায় কম নয়।

আধুনিক যুগে খেলার তাস সত্যি একটি প্রকাণ্ড শিল্পে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারগণ এই খাতে কর বা রাজস্বও পেয়ে থাকেন বেশ মোটারকম। একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকাতেই বছরে তাস কেনা হয় ১ কোটি তাড়া। ভারতেও তাস খেলার প্রসার দিন দিন বেড়েছে ছাড়া কমছে না। শুধু পুরুষরা নয়, অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও এই খেলায় যোগদান করছেন, তাও লক্ষ্য করবার। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এদেশেও তাসকে কেন্দ্র করে একটি বড় শিল্প গড়ে ওঠতে পারে। দেশীয় তাসের মান আশানুরূপ উন্নত হলেই অর্থাৎ আধুনিক যুগ-চাহিদা অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাধীনে তাস সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি হয়, তা হলেই পরনির্ভরতা আপনি হ্রাস পেয়ে যাবে এবং সেই অবস্থাই কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-শ্রমিক

নদীমাতৃক বাংলা বরাবরই কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি প্রধান দেশে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা বেশি থাকবে, এ বলবার অপেক্ষা রাখে না। তবে আধুনিক যুগে সকল দেশই শিল্পমুখী। এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও শিল্পায়নের ব্যাপক উদ্যম চলেছে। সে দিক থেকে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যাও এখানে বাড়ছে দিন দিন।

পশ্চিমবঙ্গের ভেতর কলকাতা ও এর আশে পাশে অর্থাৎ বৃহত্তর কলকাতায় অসংখ্য কল-কারখানা ও শিল্প-সংস্থা চালু রয়েছে। এই কর্ম্ম-সংস্থানগুলোতে দিনরাত কাজ করে চলেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক—কেউ যন্ত্র-কুশলী (ট্রেনিং প্রাপ্ত), কেউ বা তা নয়। এদের ভালোমন্দ প্রশ্ন নিয়ে বহু ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন রয়েছে সক্রিয়।

এই ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙালী শ্রমিক কতজন নিযুক্ত আছে, সঠিক সংখ্যা হাজির করা কঠিন। কিছুদিন হয় রাজ্য সরকারের শ্রমসচিব মিঃ আব্বাস সাত্তার পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি তথ্যবহুল এই দিক থেকে যে, শ্রমিকদের একটা পরিসংখ্যান এতে পাওয়া যায়। মিঃ সাত্তার যা জানিয়েছেন—১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা সমূহে শ্রমিক নিযুক্ত থাকে মোট ৮,৮৭,৪০৬ জন। এর ভেতর বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৩,৬৮,০০০ অর্থাৎ বাঙালী নয়, এমন শ্রমিক ৫ লক্ষের ওপর। মোট শ্রমিকের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ জন কাজ করছে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থায়। অপর দিকে রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৭ লক্ষের কাছাকাছি। এই পরিসংখ্যানে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্ম্মরত শ্রমিকদের ধরা হয়নি, প্রসঙ্গতঃ এটি লক্ষ্য করবার।

বাংলায় বাঙালী শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা তুলনায় কম কেন, এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। একটু বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এই অবস্থার জন্য কর্ম্মীর অক্ষমতা ও অযোগ্যতার চেয়ে অনাগ্রহ ও অমনোযোগিতাই বেশিটা দায়ী। আর তাই যদি হয়ে থাকে, তবে এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন না হলে নয়।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১০

১৮৫৭ সালের সে বসন্তে প্রকৃতি বড় মধুর হয়ে উঠলো। যে গঙ্গায় সারা বছর নৌকা চলে, তার জলে টান এল সত্য। কিন্তু তপ্তদিনের বেলা সুরু হ'ত না হতে অগণিত আম্রকুঞ্জে মুকুল ভরে এল। সে মুকুলে মধু সঞ্চার হলো কি না সে সংবাদ নিতে ব্যস্ত হয়ে এলো মৌমাছি ও ভোমরা। আকাশে বাতাসে এক লঘু আলস্য বিস্তৃত। কো'কল ও বহু পাখীর কুজনে মধ্যাহ্ন গুঞ্জরিত। এ ফাগুরাতে রং খেলা হবে কি না সে খবর না রেখেই হোরিগানের মহলায় মেতে উঠলো গ্রামবাসী। রাত্রি গভীর হলেও শোনা যেতে লাগলো ঢোলক বাজিয়ে গান করে চলেছে কোন উৎসাহী কণ্ঠ —খেল্ রহে পিচকারী নন্দলালা খেল্ রহে পিচকারী!

কিশোর শ্যামের পিচকারীর রঙে নিজের মনের মানুষ কোন গ্রাম্য কিশোরীর আ'ঙিয়া রঙিয়ে হয়তো দেখে গায়ক মনের চোখে। গানের সুর তাই মধুমত্ত কোন করুণ শ্রান্তিতে ফিরে ফিরে বাজে। আমবাগানের মাঝে মাঝে সুবৃহৎ ইঁদারায় জল নিতে এসে মেয়েরা এই তপ্ত বসন্ত দিনের আলস্য যেন অনুভব করে। গতি হয় ধীর। চলিতে চরণ ধূলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। যেন পথ ও পথের ধুলো বড় প্রিয়, বড় সুন্দর। শ্লথ চরণ আর ছেড়ে যেতে চাইছে না সে ধুলো।

শহর কানপুরের সহস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সে মায়া ছড়িয়ে পড়ে। সকালের মানুষ চলাচল ও জীবনের মুখর মন্দ্রে বোঝা যায় না। তবে ঠিক দুপুরে মানুষ বিরতি নেয়। মিঠাইওয়ালার দোকানের সামনে সতৃষ্ণ চোখ চেয়ে বসে থাকে দুটো একটা কুকুর। টাঙ্গা, এক্কার ঘোড়াগুলো কপালে পিতলের সাজ পরে চুপ করে থাকে। শহর বাজারের ধুলোতে, চামড়ার বাজারের তীব্র গন্ধে সর্বত্র দ্বিপ্রহরে একটা ঝিম্‌ঝিম্ ভাব সঞ্চারিত হতে থাকে। উত্তপ্ত বায়ুস্তরের মতো কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে।

কোন বৈষম্য চোখে পড়ে না ইভান্‌স ব্রাইট ও তাদের সমগোত্রীয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের। বসন্ত বলতে তাঁরা যা বোঝেন, এ বসন্ত সে রকম নয়। কিন্তু তবুও মন্দ কি? আলস্য একটা মধুর আলস্য, একটা লঘু আরামের ভেলায় শরীর মন ভাসিয়ে ভেসে চলবার মতোই অনুকূল মনে হয় পরিবেশ। ক্যান্টনমেন্টের চওড়া সুন্দর রাস্তাগুলির দুইপাশে কত না মেহগিনি, শিরীষ, বট, অশ্বথ, পিপুল ও দেওদার গাছ। বিস্তৃত পল্লবিত তাদের শাখাপ্রশাখায় কি সুন্দর মর্মর তোলে বাতাস। সে পথে প্রত্যহ প্রভাতে অশ্বচারণা। বাছাই করা সুন্দর তেজস্বী ঘোড়া ও ঘোড়ী। সহিসের সযত্ন মার্জনায় তাদের গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে। আর উৎকৃষ্ট জিনপোষের সাজে তাদের আরো সুন্দর দেখায়। সুশিক্ষিত সে তুরঙ্গম দুলকি কদমে চলে। চলতে চলতে কথা হয় দুই আরোহীর মধ্যে। গল্‌ফ ও পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী হলো কিনা—মাহশীর ধরবার জন্য ফতেহপুর ও নবাবগঞ্জে যাবার আর কত দেরী—ভালো হুইল এনে দেবে বলেছিলো পার্সি সাহেব—কই, দিল না তো? বড় ঢিলে ঢালা হয়ে গিয়েছে পার্সি। এই তো। কলকাতা থেকে ভালো ব্র্যাণ্ডি আনানো, তাই কি পারলো? যদি ব্র্যাণ্ডির কথাই উঠলো, তবে বলা চলে বিঠুরে নানাসাহেব যে ব্র্যাণ্ডি খাইয়েছে, তারপর আর কিছু মুখে লাগবে না। খাঁটি ফরাসী ব্র্যাণ্ডি। আর সেই শ্যাম্পেন? কি চমৎকার ভাবে রাখা। নানাসাহেবের চেয়েও তার সহকারী আজিমুল্লা এ সব জানে ভালো। আর এ সব জিনিষ এসেছে ওখানে নানাসাহেবের বা সেই বুড়ো পেশোয়ার আমলে।

—কিন্তু নানাসাহেব গেল কেন এখন?

—ধর্ম করতে।

কি হাসির কথা! আচ্ছা, কথায় কথায় মনে হলো, এই যে শোনা গেল ভালভাবে নতুন করে আশ্রয় নেবার মতো সুরক্ষিত একটা ঘাঁটি বানানো হবে? তার কি হলো?

—হুইলার জানেন। তবে তেমন দরকার কি?

সকালের অশ্বারোহণ পর্ব শেষ হলে প্যারেড বা কাছারীতে হাজিরা দিতে হয়। তার আগে প্রাতিরাশের সুবৃহৎ বন্দোবস্ত। প্রশস্ত টেবিল। তাতে অজস্র কাচ ও স্ফটিকের বাসন। ইংল্যাণ্ডের ছাপমারা এই বাসন কলকাতার বন্দর হয়ে পৌঁছিয়েছে এখানে। ডিম, বেকন, টোগট। স্বর্ণাভ মাখন গলে গলে ঝরে পড়ে। কাঁচের বাটিতে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মধু। দিল্লী ও আগ্রা উত্তরের আপেল, পীচ নাসপাতি। উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাবের আঙুর। স্ফটিকের আধারে আঙুরের গুচ্ছ। রসে টলমল সে ফল সম্ভারের কি বিনীত প্রতীক্ষা। কৃষ্ণকায় ভৃত্যদের সসম্ভ্রম অপেক্ষা।

তারপর নভেল বা ম্যাগাজিন পড়া। দ্বিপ্রহরে আবার তেমনই এলাহী মধ্যাহ্নভোজন। সন্ধ্যায় ডিনার, নাচ বা নতুন কোন প্রমোদ। মহিলাদের সময় আর কাটেনা কোনদিন বা সখ যায় হামাম স্নানের। বদ্ধ কুঠুরীতে দুইজন আয়া নগ্ন দেহে বেসম গোলা মাখায়। মেমসাহেব চোখ বুজে চুপ করে থাকেন। ক্রমেই

বেসমের সে আস্তরণ শুকিয়ে ওঠে। চামড়ায় টান লাগে। দাসীরা তখন উত্তপ্ত জলের বড় বড় পাত্র আনে। সে বদ্ধ কুঠুরীতে জলের বাষ্প উঠে গা ভিজিয়ে দেয়। নিপুণ হাতে দাসীরা বেসম তুলে ফেলে। তারপর ল্যাভেণ্ডার গন্ধী উষ্ণ জলে নেমে অবগাহন।

স্নানের পরিশ্রমে এলিয়ে পড়ে বরদেহ। সন্ধ্যায় ক্লাবে বা বাগান পার্টিতে বা ক্যান্টীফেয়ারে অনাত্মীয় কোন অফিসার মেজরের সঙ্গে কথা কইবার সময়েও সেই অলস লাস্ত নয়নের কোণে ভেঙে ভেঙে পড়ে। পুরুষকণ্ঠ থেকে সৌন্দর্যের স্তবস্তুতি শুনতে শুনতে কৌতুক ছলে পালকের পাখা দিয়ে মৃদু তাড়না করতে চান সুন্দরী—কিন্তু কেমন যেন ভঙ্গীমাটা আদর করবার মতো হয়ে যায়।

ব্যাণ্ড বাজে। ব্যাণ্ডে বাজে পরিচিত সুন্দর সুন্দর গানের সুর। কানপুরে বসে ব্যাণ্ডপার্টির কাছে কেউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আশা করে না। টুকরোটাকরা চালু গান শুনলেই মনটা খুসী হয়ে ওঠে। বড় বড় মোমবাতির আলোতে ছায়া নাচে ঘরে। বড় বড় দরজা দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যরা পানীয় নিয়ে চলাফেরা করে। হাসি, আলাপ, কথাবার্ত্তা। বিলেত থেকে অবিবাহিত বোন বা ননদকে ভরসা দিয়ে আনিয়েছেন যাঁরা, সেই সব মহিলারা বিবাহযোগ্য ছেলেদের কোণে টেনে নিয়ে আলাপ করেন। ঘরের মাঝে কার্পেটে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কোনো কৃতীপুরুষ নেপাল বা বর্মা বা পিণ্ডারী যুদ্ধে স্বীয় কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি করেন। কথাবার্তার মধ্যে কখনো বা নেটিভ বদমাসদের কোন আসন্ন নির্বুদ্ধিতার কথা এসে পড়ে। কি যেন করবে তারা। কি যেন শোনা যাচ্ছলো ?

রেজিমেণ্টের ক্লাব ঘরের চূড়া থেকে কানপুরের আকাশে সিংহলাঞ্ছিত ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে। সিংহের থাবায় সুরক্ষিত সাম্রাজ্ঞীর মুকুট।

আর ঐ পতাকায় আশ্বাসেই সুরক্ষিত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জীবন।

• • • •

সত্তাবনের সে বসন্তে চন্দনের পিতামহ চন্দনের সাকাখানার চারিপাশে কুমায়ুনের ভূ-প্রকৃতি সহসা সুন্দর হয়ে উঠলো। সমস্ত বনভূমি এক জাদুমন্ত্রে ফেটে পড়লো গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ও ফলে। কুল ও জাম জাতীয় বনজ ফলের গন্ধে শুধু মৌমাছি-ই ভিড় জমালো না। ঘুগাল ও চিত্রল হরিণের সঙ্গে সঙ্গে ভালুককেও ছায়ার মতো চলাফেরা করতে দেখা গেল। গোছা গোছা ফল ছিঁড়ে লোভীর মতো মুখে পুরে দিয়ে ভালুকশিশু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকলো ঘাড় বাঁকিয়ে। অপরূপ ঐশ্বর্যময়ী এই অরণ্যভূমি। অজস্র তার প্রলোভন ইতস্তত ছড়ানো, ছেটানো। কাঠবিড়ালী, বেজি, খরগোশ, সজারু এইসব ছোট ছোট প্রাণীদেরও ঘাসের মরকত গালিচায় উল্টে পাল্টে খেলা করতে দেখা গেল। সাকাখানা থেকে দেড়মাইল দূরে যে পার্বতী নদী আছে, তার দিকে একদিন গাদাবন্দুক বগলে ও জাল কাঁধে চললো চন্দন। সকালের রোদে আতপ্ত হয়েছে অরণ্যের শিখর। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে রোদ পড়েছে ঘাসে। তপ্ত একটা মিশ্র সৌরভে মন্থর বাতাসের গতি। নিঃশব্দ অতি নিঃশব্দ পরিবেশ। শিকারীর সতর্ক শ্রবণে চন্দনের মনে হলো দূরান্তের অলকানন্দা নদীর গম্ভীর শব্দও যেন শোনা যাচ্ছে। বাতাস শুঁকে আর
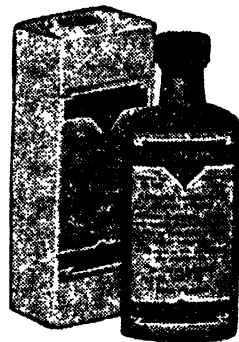
চোখে সব দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো চম্মন। এবার শিকার জমবে। শিকারের প্রকৃষ্ট সময়। নদীর ধারে গিয়ে সে বন্দুক নামালো। গতকাল নুড়ি পাথর দিয়ে জলে বাঁধ দিয়ে গিয়েছিল আজ বুকে নিচু হয়ে পাথর সরিয়ে সরিয়ে দেখে তার জরাক্রান্ত প্রশান্ত মুখখানি হাসিতে ভরে গেল। রূপোলী লম্বাটে মাছের ঝাঁক সিহর হয়ে আছে সেখানে। চুপ করে আছে। জাল ফেলে দিলো চম্মন। তুলে আনলো কয়টা মাছ। তারপরেও ঘাসের 'পরে নিচু হয়ে জলের দিকে চেয়ে রইলো। হ্যাঁ। এবারকার মতো আশ্চর্য শুভ যোগাযোগের বছর আর কখনো আসেনি। তার স্মৃতিতে নেই। প্রকৃতি এমন করে সুজলা সুফলা হয়নি। এবার সে বুঢ়া ম্যাকমোহনকে চিঠি লিখবে। লিখে জানাবে যে শিকারের ও মাছ ধরবার এক স্বর্ণ সংযোগ উপস্থিত। সাহেব চলে আসুক। অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছে। সাহেবকে যদি আসতে হয় তো তাড়াতাড়ি আসতে হবে ঘরে, যাবে চম্মন। ছুটি মঞ্জুর। কিছুদিন ধরে না থাকলে হবে না।

ফিরতে ফিরতে সাফাখানার বাংলোঘরের কাঠের ছাদ চোখে পড়লো। ছাদটার পেছনে শাখাপ্রশাখায় ফুলসম্ভারে ফেটে পড়ছে এ্যাকাশিয়া গাছটা। চন্দন এসে সেবার লাগিয়েছিলো।

দেশে যেতে হবে চম্মনকে। ঐ হতভাগা চন্দনের জন্তে। চম্মনের ছেলে আর বৌ চন্দনকে বশ মানাতে পারে নি। 'আবার সেই বদমায়েশ ছেলেটা পালিয়েছে। জোয়ান রক্ত। দোষ-ই বা কেমন করে দেয় চম্মন। ও বয়সে কি ফর্দা মুখ দেখলে মনটা দোলে না? নিজের যৌবনে সে-ও তো কম রসিক ছিল না।

সহসা চোখের সামনে পড়ে তাজা বাঘের থাবার ছাপ। একেবারে তাজা। আবার হাসির রেখায় ভেঙে পড়ে চম্মনের মুখ। এ হলো ঐ তরুণ বাঘটা। যাকে সে বাচ্চাবেলায় দেখেছিলো মায়ের সঙ্গে খেলতে ঘাসের 'পরে। যে কিছুদিন ছিলো ঐ কালাঢুঙ্গির হাটঘরের পেছনে পরিত্যক্ত কাঠগোলার জঙ্গলে। এবার সে মদকরণ করে জোয়ান হয়ে উঠেছে। সঙ্গিনী খুঁজে গম্ভীর কণ্ঠে আজকাল সে প্রায়ই ডাকে। ডাকে রাত্রির প্রথম প্রহরে। কতদিন শুনেছে চম্মন। সাহেবকে বলবে এটাকে নয়। ঐ কানা বাঘটাকে মারো সাহেব। এক চোখ নেই। কিন্তু জঙ্গল থেকে মোষ বাছুর ধরে বড় জ্বালাতন করছে।

চম্মন চলে, আর নির্ভয়ে তার গায়ের কাছে, দূরে, ঘাসের 'পরে, ডালের 'পরে উড়ে বেড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। কত রঙের, কত জাতের। বনভূমির খুশিয়ালীর দূত এরা। কত রকম কূজনই যে শোনা যায়। চুনির মতো লালচোখ বাঁকিয়ে, রঙীন ল্যাজ ঝাপটে তারা কত রঙ্গে বাহার দিয়ে বেড়ায়।

সাফাখানায় পৌঁছিয়ে মাছের বোঝা নামায় চম্মন। নৈনিতাল থেকে জরুরী খবর পেয়ে চলে যাচ্ছেন এক মেডিক্যাল অফিসার। তাঁর টেবিলে গরম মাছ ভাজা ও কফি পৌঁছিয়ে দেয়। তারপর চিঠির মুসাবিদা করতে বসে। তার বদলীতে যে কাজ করবে সে ছেলেটা লিখতে জানে। তাকে নিয়ে বসে।

• • • •

এলাহাবাদের সন্নিকটে পাপামউয়ের বাংলোয় বসে বুড়ো জজী ম্যাকমোহন চম্মনের সে চিঠি পেয়ে আনমনা হয়ে চেয়ে থাকেন। চম্মনের চিঠি তাঁকে অনেক পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দেয়। চম্মনের স্নেহ প্রীতি ভরা রেখাঙ্কিত মুখখানি মনে পড়ে। চম্মন আজও মনে ভাবে হয়তো, যে ম্যাকমোহন সেই একই মানুষ আছেন' কিন্তু ঈশ্বর জানেন ভরতপুর ও বর্মা, রোহটক, ও পিণ্ডারীযুদ্ধ ফেরৎ সে অসমসাহসী ম্যাকমোহন অনেক বদলিয়ে গিয়েছেন। যে ম্যাকমোহনকে তাঁর সিপাহী সওয়াররা ভালবেসে বুঢ়া সাহেব বলতো—যে ম্যাকমোহনের সঙ্গে কানপুরের হুইলার রেওয়াতে বাজি রেখে চাঁদমারী প্র্যাকটিস করতো, সে ম্যাকমোহন আর নেই।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকেন ম্যাকমোহন। তাঁর বাগানে বড় বড় ঘাস হয়েছে। ঘাস ফুলের ওপর ফড়িং উড়ছে। মালীর ছোট ছেলেটা ছুটেছুটে সেই প্রজাপতি ধরছে। মনে পড়ে যায় অনেক কথা। নিজের বোন এমিলির কথা। আর ব্রাইটের মুখখানাও মনে পড়ে। অন্তরটা কুশ্রী বলেই কি ছেলেটার মুখ অমন সুন্দর? সুন্দর দেহ সুন্দর মনের আধার তো নয়। কেন এমন হলো? তবে তার দুর্ব্যবহারে তাঁর জীবনটা মিছে হয়ে গেল কি? তা নয়। আসলে ম্যাকমোহন শান্ত হয়ে গিয়েছেন। ভেতরে ভেতরে ঝিমিয়ে এসেছে রক্তকণিকা। ম্যাকমোহন নতুন করে আগ্রহ নিয়ে সুরু করেছেন একখানা বই লিখতে। 'Fifty years in India'—এই 'বইখানায় তিনি হিন্দুস্থানকে যেমন জেনেছেন, তেমনি লিখে যাবেন। এদেশের মানুষের পরিচয়—তাদের আচার ব্যবহার, উৎসব, রূপকথা। এখন যেন ম্যাকমোহন বুঝতে পারেন এই দেশটাকে কেমন করে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি। এই দেশটাকে, এ দেশের মানুষগুলিকে। মনে হচ্ছে বয়সই হলো, সঞ্চয় কিছু করলেন না। সঞ্চয় যদি কিছু করে থাকেন—সে হলো এ দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা। তাঁর সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যা তারা ঢেলে দিয়েছে। এর জন্তে স্বদেশবাসীর থেকে কিছুটা দূরে সরে আসতে হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে যেন ক্ষতি বোধ হয় না। এখানকার বিস্তীর্ণ আকাশ, সবুজ মাঠ, অরণ্য, এখানকার সহজ সরল গরীব মানুষগুলি, এদের সঙ্গে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বাস করেছেন তিনি। আজ সত্তরের প্রান্তে এসে মনে হয়। এই দেশের মানুষ, পরোক্ষে তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মনটা স্নেহপ্রবণ, ক্ষমাপ্রবণ হয়েছে। বাইরেটা ঢিলেঢালা হয়েছে। সাধে কি আর সাহেবরা বলে, 'বড় ওরিয়েন্টাল ঢঙের হয়ে যাচ্ছ তুমি!'

তাঁর বাংলোর সামনের জমিটুকু নিয়েছে একটি মালী পরিবার। কঠোর পরিশ্রমে আর সুনিপুণ ধৈর্যে চাষ করেছে জমি। বুনেছে সব্জী। মোতিয়া বেলফুল, চামেলি। অসীম আগ্রহে ঐ দরিদ্র দম্পতি এক একটি গাছের জন্ম থেকে পুষ্প সম্ভার পর্যন্ত যত্ন নেয়। ম্যাকমোহনেরও মন্দ লাগেনা। জীবনের অনেকগুলো বছর ছুটোছুটি করেছেন। লড়াই করেছেন। সে সব কাজকে মহনীয় বলেই জানতেন। এ কাজটাকে-ও এখন তুচ্ছ মনে হয়না। মনে হয় মন্দ কি—বাগান করে আর মৌশুমী পাখীদের দেখে দেখেই তো কেটে যাবে বাকি দিন ক-টা!

চম্মন কি বুঝতে পারবে তাঁকে? শিকার খেলবার মন আর নেই। তবে হ্যাঁ, মাছ ধরবার কথাটা মন্দ নয়। আর এই সময়কার অরণ্যপ্রকৃতি-ও তাঁর ভালো লাগবে। কিন্তু এখন তো

তিনি যেতে পারবেন না। সহসা কি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলো কে জানে! যার জন্য তাঁর মতো বুড়োজঙ্গীদেরও ডাক পড়েছে এলাহাবাদে। তিনি অবশ্য শুনেছেন, যে নেটিভ সিপাহীরা গোলমাল করতে পারে। কিন্তু সে সংবাদের কোনো ভিত্তি আছে কি? রেভিনিউ কলেক্টর ফেয়ার বলছিলেন বটে সেদিন।

ম্যাকমোহন চিঠি লিখতে সুরু করেন। তাঁর খুবই দুর্ভাগ্য, যে চন্দনের সাদর আমন্ত্রণ তিনি রাখতে পারছেন না। একদিন তিনি বলেছিলেন বটে, যে 'গাও. আপনা ঘর মেঁ সি কা দিয়া জ্বালাও'—অর্থাৎ প্রস্তুত হও—আমি আসছি নিমন্ত্রণ রাখতে। তবু দেখা যাচ্ছে সেদিন আজ-ও আসেনি। যা হোক, আবার দেখা যাবে। চন্দনের সাহেব বুড়ো হয়েছেন বটে। তবে এমন বৃদ্ধ হননি, যে চন্দনের নিমন্ত্রণ না রেখেই মরে যাবেন।

বুড়া সাহেবের হাতের হিন্দী লেখাটি চমৎকার। যেন ছাপার অক্ষরে লিখছেন। চিঠি শেষ করলেন। বারান্দায় এসে আবার দাঁড়ালেন। তাকালেন ভ্রূ কুঞ্চন করে। কি প্রশান্ত উজ্জ্বল নীলিমা আজকের আকাশে। ধরণীর বুক থেকে কি তপ্ত সুবাস উঠছে আকাশের দিকে। সহসা ম্যাকমোহনের মনে হলো—এত সুন্দর··· এমন মনোহারিণী বসন্তলীলা আর যেন তিনি দেখেননি। সর্বত্র-ই যেন একটা অদ্ভুত প্রত্যাশা, আনন্দ ও উত্তেজনা সঞ্চারিত। ঐ মৌন প্রকৃতির মধ্যে-ও।

* * * *

ইভান্‌স-এর প্রেমিক চোখে মনে হলো এমন অপরূপ বাসন্তী শোভা আর কখনো দেখেনি সে—এই সাতান্নতে যেমন দেখছে। রেজিমেন্টের অনতিদূরে চৈৎরামদের-ই ছোট্ট একটি বাংলো নিতে ইচ্ছে ছিল ইভান্‌সের—বাড়ীটি নিল। সাজাল-ও সাধ্যমতো আসবাবে। মেঝেয় গালিচা, কুর্শী, ডেকচেয়ার, সেজদানিতে বাতি, এই সব। তবে হুইলার সাহেবের ঢালা হুকুম। কোন ইংরাজ অফিসার ক্যান্টনমেন্টের বাইরে রাত কাটা'তে পারবেন না। কানপুরে সিভিলিয়ান, মিশনারীদের সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নয়। প্রয়োজন হলে তাঁরাও আসবেন ক্যান্টনমেন্টে।

তা হোক, তবু অবসর বিনোদনের সুন্দর পরিবেশ। ইভান্‌স-এর নেটিভ পল্লীতে চম্পার বাড়ীতে যেতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু চম্পা মেহেদী রঞ্জিত ছোট হাতখানি চাপা দিয়েছে ইভান্‌স-এর মুখে ইভান্‌স বলেছে—কেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না?

—কিসে?

—আমার প্রেমে?

—আমার প্রেমের মানুষ যে আরো অনেকে আছে। এমন মানুষটি পেয়ে, যদি তারা অনিষ্ট করে?

—কি হবে?

—আমার দুঃখ হবে না?

ব'লে চম্পা খিলখিল করে হেসেছে। দুঃখের প্রকাশ এমন হাসিতে হয় কি না। ইভান্‌স সে প্রশ্ন তোলেনি। চম্পার হাসিটিও যেন সুন্দর। ইভান্‌স মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছে—চম্পা গান কর।

—কোন্ গান?

—যা তোমার প্রাণ চায়।

ইভান্‌সের অনেক আচার ব্যবহারে অনেক সময় চম্পার তাকে ছেলেমানুষ বোধ হয়। ইচ্ছা করে সে গাঁয়ে শোনা রামসীতার বিয়ের গান ধরে:

—জনকপুরসেঁ রামচন্দ্র কী সীতা লে কর, আয়ে—

রাম ও সীতার মোতির কুণ্ডল, সোনার মালা ও আয়ত নয়নের বর্ণনার কতটুকুই বা বোঝে ইভান্‌স। দেখে চম্পার সহাস্য নয়ন ও গ্রীবার মনোরম ভঙ্গিমা। ঘন কালো চুলগুলি যত্ন করে টেনে তুলে বেণী বাঁধা। ঘন ভুরুর নিচে কালো চোখ। কানে ও সিঁথিতে সাধারণ গহনা। কালো রেশমে নানরঙের কাজ করা ঘাগরা। সবুজ চোলি ও সোনালী আঙ্গিয়াতেও চম্পার যৌবন শাসন মানেনি। ওড়নী নেমেছে তার পরে। ওড়নীর উদ্দেশ্য কিন্তু আবরণ নয়, আভরণ হয়ে ওঠা। তাই লক্ষ্ণৌয়ের চিকণ মলমলের জালি কাজের ওড়নী গলা ছুঁয়ে পড়ে আছে। তার ফাঁকে নিটোল ও কঠিন দুই যুগ্মকোরকের আভাস অতি স্পষ্ট।

ব্রিজদুলারীর দেখাদেখি চম্পা-ও আতরজলে স্নান করে। আজ মৃদু একটা সুগন্ধের জাল অদৃশ্য একটা অদৃশ্য ওড়নার মতোই তাকে ঘিরে রয়েছে। গান শেষ করে চম্পা চায় ইভান্‌সের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের রাঙা আলো তার মুখে চোখে পড়ে আগুনের বিভ্রম সৃষ্টি করে। সত্যই আগুন। মদিরা যৌবনা চম্পা যেন আরো কূলে কূলে ভরে উঠেছে দিন হতে দিনে। বিমুগ্ধ ইভান্‌স চেয়ে চেয়ে একটা কথাই বলতে পারে—চম্পা, বড় সুন্দর তুমি।

চম্পার টানা টানা চোখ হাসে। বলে—তোমাদের মেয়েরা আরো কত সুন্দর।

—তোমার মতো নয় চম্পা।

—কিন্তু আমি তোমার উপর রাগ করেছি সাহেব।

—কেন চম্পা?

—দেখ শহর শুদ্ধ মানুষ হাসে আমার দিকে চেয়ে। আমাকে তুমি কেমন ভালবাস? এখানে তো একদিন ও রইলে না। বলেছিলে আমার তোমার একঘর হবে। সেখানে যেন কত কি?

—চম্পা, তা হলে তুমি সুখী হতে?

—নিশ্চয়।

ইভান্সের বুকে মাথা হেলিয়ে বলে চম্পা। চম্পার সুরভি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বুকখানা-ও যখন তোলপাড় হয় তখন ইভান্স অনেক কথা ভাবতে পারে। তার সতীর্থ অন্যান্য যুবকরা অবশ্য নেটিভ একটা নাচগার্ল-এর সঙ্গে এতটা আন্তরিকতা পছন্দ করে না। আর ইভান্স-ও মনে মনে জানে। যে এই মেয়েটাকে নিয়ে-ই সে কিছু চিরকাল পড়ে থাকবে না। তবে এখন, এমনি সময় তার মনে হয় মন্দ কি। তার নজীর তো এই কানপুরে-ই আছে। সে যদি বিয়ে করে এই মেয়েটিকে? প্ল্যান্টার সাহেবদের মতো কিছু সম্পত্তি করে ফেলে এই উত্তর প্রদেশে? মন্দ কি? বিশাল বাগানের মধ্যে প্রশস্ত বাংলো বাড়ী, গাড়ীঘোড়া, চাকর, দাসী। সে ও না হয় আলবোলা ফরসিতে তামাক খাবে—নিচু চৌকিতে বসবে—প্রয়োজনে দেশী খানা খাবে। যদি ছেলেমেয়ে হয়? তা-ও ভাবতে পারে ইভান্স এখন, তার রক্ত ঐ কৃষ্ণাঙ্গীর রক্তে মিশ্রিত হবে। সৃষ্ট হবে নব নব রক্তকণিকা। বর্ণসঙ্কর শিশুর দল। তাদের শিক্ষাদীক্ষা সদিকে অবশ্য নজর দিতে হবে। আর, নিজেকে ছোট করবার কথা-ই বা সে কেন ভাবছে? এমনও তো হতে পারে যে চম্পাকেই সে গাউন পরিয়ে জাতে তুলবে। চম্পাকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করবে?

—কি ভাবছ?

—কিছু নয় চম্পা।

—আমার কথার তো জবাব দিলে না?

—ও। কি জান, কোন কারণ নেই, শহরে ও বাজারে হিন্দুস্থানীরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। মিছেমিছি গুজব উড়ছে বাতাসে। এমন সময় শুধু ক্যান্টনমেন্টের কেন, সকল ইংরেজদেরই থাকবার মতো ব্যবস্থা ক্যান্টনমেন্টেই করলে ভাল হয়।

—কেন?

—এমনিই চম্পা। তুমি বুঝবে না।

—ও, সকলে তো যাচ্ছে না শহর ছেড়ে?

—হঠাৎ সব সাহেবরা যাবে কেন? তাহলে সন্দেহ করবে না ব্যারাক আর বাজারের মানুষ?

চম্পা যেন বুঝতে পারে না এমনই বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ইভান্সের সহসা মনে হয়, এত বড় কথাটা বলে সে ঠিক করেনি। একটা অসতর্ক কথাকে ঢাকবার জন্য সে আজে বাজে কথা বলে। বলে—সাহেবরা কি ভয় পায় যে চলে যাবে?

—সাহেবরা কখনো ভয় পায়?

চম্পাও সায় দিয়ে বলে। ইভান্স বলে—কখনো ভয় পায় না। তোমার দেশের মানুষ গান শুনে কাঁদে, ধমক খেলে কাঁদে, শরীরে আঘাত লাগলে কাঁদে। আমরা কাঁদি না।

—নিশ্চয়।

—দেখ, সাহেবদের আশ্চর্য ক্ষমতা না থাকলে কেমন করে তারা এত বড় দেশটাকে চালাচ্ছে?

—নিশ্চয়।

ইভান্স বলে—চম্পা, তুমি নাকি যাচ্ছ মগনলালদের বাড়ীতে? বড় জলসায়?

—তুমি মানা করছ?

—কত টাকা পাবে?

—অনেক।

ঘাড় কাৎ করে চেয়ে থাকে চম্পা। ইভান্স বলে—কিসের তোমার এত দরকার চম্পা? এত টাকার?

চম্পা এবার রঙ্গিনী মোহিনী। বলে—সাহেব, আমি রং কিনে আনব। ফাগুয়ার রঙে তোমার সঙ্গে হোলি খেলব।

—Heathen festival!

—রঙ দিয়ে তোমাকে রাঙাব। তুমিও রঙ দেবে আমাকে। দেবে না? এই এখানে রঙ দিতে পার সাহেব?

চম্পা ইভান্সের হাতটা নিয়ে নিজের বুকের ওপর ধরে। বলে—হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাও সেখানে রং চায় চম্পা!

—You vixen!

বলে চম্পাকে কাছে টানে ইভান্স।

• • • •

মগনলালদের সে জলসা সাঙ্গ হয়ে যায়। তবু ভেতরের ঘরে বাতি জ্বলে। মগনলালদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে। চিরকাল তাঁর পরিবার সরকারের মোহরাঙ্কিত ছাড়পত্র নিয়ে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবসা করেছেন। আজও তাঁদের সে ব্যবসা আছে, কিন্তু রেজিমেণ্ট বা রিসালার বানিয়া কারবারীর চিট তাঁকে দেননি ফৌজী কর্তৃপক্ষ। বড় অপমানিত হয়েছেন তিনি।

তাঁর কুঠিতে এক গালিচা বিছানো ঘরে অনেকে আজ সমাগত। কানপুর ফতেপুর ও বিঠুরের সম্ভ্রান্ত লোক কয়জনকে দেখা যায়। সম্পূরণের পাশে বসে শোনে চম্পা। আশ্চর্য সব কথা। চৈৎরাম স্বয়ং, এবং আরো যাঁরা আছেন—তাঁদের আর তার মাঝখানে যে দুস্তর খাদ। সামাজিক বাধা। কি এমন ঘটলো যে সেই বাধার কোন অস্তিত্বই আজ নেই? চৈৎরাম বলেন—দিল্লীতে মোগলশাহী কায়েম হোক, বা এখানে পেশোয়ারা হিন্দুরাজ্য কায়েম করুন—আমাদের তাতে সুবিধা হবে। এই ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গীর চেয়ে সে অনেক ভাল।

—এরা এর মধ্যেই টাকা সরিয়ে নেবার মতলবে আছে খাজাঞ্চিখানা থেকে।

—এদিকে হল কি?

—আমরা বাজার থেকে টাকা গুটিয়ে নিচ্ছি। সোনা তুলে নিচ্ছি। চট করে বাজার চড়লে এক সঙ্গে শ' তোলা সোনা মেলা মুস্কিল।

—বলছেন!

—যাচিয়ে দেখুন!

—কিন্তু খাজাঞ্চিখানার টাকা?

চম্পা একটু কেসে জানান দেয় নিজের উপস্থিতি। বলে—বুঢ়া হুইলার সাদা মনের মানুষ পেশোয়াকে তিনি দোস্ত জানেন। টাকা জমার হিমায়েৎদার তাঁকেও করতে পারেন।

কয় জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চম্পার ওপর পড়ে। তারপর কথা…

হয়—যানবাহনের ব্যবস্থা কেমন! নৌকো না কি গঙ্গায় যাব তেমন চলবে না। নৌকো তুলে ফেলা হবে। ডাকগাড়ী, এক্কা, টাঙ্গা বা পাল্কীও যাতে সহজে পান সহরের ভারতীয় বাসিন্দারা, তাও দেখতে হবে। চম্পার মনে হলো আলোচনাটা যাচ্ছে এমন ভাবে, যে এই কথাই হচ্ছে, প্রয়োজন যেন সমবেত মানুষদের ব্যক্তিগত অসুবিধে না হয়। আবার নিজেকে তিরস্কার করলো সে। ছি! এমন ছোট মন তার?

আরো কিছু কথার পর তার সঙ্গেও কথা কইলেন মগনলাল সঙ্গদ্য কণ্ঠে। তার প্রাপ্য টাকা তার হাতে দিলেন। বললেন—টাকার আমাদের অনেক দরকার হবে। তখন যেন পাই। রাইটর বিবির সঙ্গে দোস্তি আছে ত?

—হাঁ, জী।

—বলো যত গহনা যেন না পরে। লুঠ হয়ে যাবে। পারো ত কিছু চেয়ে নিও।

যখন উঠে দাঁড়ালো চম্পা—তার সে উৎসব সজ্জার দিকে চোখ না পড়ে পারলো না সকলের। সকলেরই মনে অভিসন্ধি আছে, জ্বালা আছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় আগুনে পুড়ে মরতে এই যৌবন-মুকুলমঞ্জরী কেন এলো? তাঁরাই বা কেন তাকে ঠেলে দিচ্ছেন দহন নিশ্চিত জেনে? না কি, উদ্দেশ্য এমনই বৃহৎ যে তাতে এমন প্রস্ফুট চম্পাকলি অনায়াসে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ভাসিয়ে দেওয়া চলে?

ফিরতে ফিরতে সম্পূরণের সেই কথা মনে হয়। সে না বলে পারেনা—চম্পা, তোকে টেনে এনে যে কি করলাম—

চম্পা ঈষৎ হাসে। হাসি ছাড়া তার মুখে কোনদিন কথা শুনলো না সম্পূরণ। কি সুখে, কি দুঃখে। চম্পার হাসি আজ তাকে লজ্জা দেয়। চম্পা বলে—বুড়া আমি যদি নিজে না ভাসতাম, তুমি কি তোমার ঐ মগনলালের কি ক্ষমতা যে আমাকে দরিয়ায় ভাসাও?

সম্পূরণ তারার আলোয় তবু চম্পার মুখে উত্তর খোঁজে। বলে—চম্পা, মাপ করিস। তোর তো চন্দন ছিল। তবু তুই মানলি না কেন? কেন এ পথে এলি?

—বুড়া, সব কথার জবাব হয় না।

জবাব হয় না, জবাব জানে না চম্পা—কি জবাব সে দেবে সম্পূরণকে? হাঁ, তার চন্দন আছে। কতখানি আছে, সে কে বুঝবে? চম্পা জানে তার রক্তে রক্তে আছে, তার হৃৎস্পন্দনে আছে। শৈশব থেকে চন্দনের সঙ্গে সে যে এক নিয়তিতে বাঁধা। সে কথা কাকে বোঝাবে?

তবু কেন অনিশ্চিত এই ভাগ্যের দরিয়ায়, এই মৃত্যুর আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়তে বার বার সাধ যায়? কেন সর্বনাশ তাকে এমন করে ডাকে? এ কোন প্রেম যে চম্পা স্থির থাকতে পারে না? এ প্রেম কি চন্দনের প্রেমের চেয়ে অনেক শক্তিশালী? না, চন্দন আর এই প্রেম এক হয়ে গেছে? বুঝতে পারে না চম্পা। তবে এই তার বিধিলিপি। সে ঘরের নয়, সে পরিবারের নয়, সে সুখ শান্তির সাধ কামনার নয়। তার জন্যে অন্য নিয়তি। অন্য পথ। তা যদি না হবে তো সেই বিস্মৃত শৈশব থেকে কেন প্রতিকূল ঢেউ হতে ঢেউয়ের মাথায় সে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে বার বার? কেন চন্দনকে পাবার মুখে শৈশবের সেই নাড়ীতে নাড়ীতে জড়ানো সংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা? প্রেম, তাই তার কাছে গরল মিশ্রিত। বিষকন্যার মতো প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সে অভিশাপ কি চম্পা অবহেলে বহন করেনি? অবহেলে! হায় যদি অবহেলে হবে তো আজও কেন হৃদয় কাঁদে? ফিরে যেতে চায় সেই ঘরে, সেই গ্রামে, সেই নদীপ্রান্তের বটগাছের শীতলছায়ায়—চন্দনের সঙ্গে?

তার ছিলো গৃহপ্রান্তে প্রদীপ হবার কামনা। ভাগ্য তাকে করেছে দাবানল সঞ্চারী স্ফুলিঙ্গ। এখন তাকে জ্বলতে হবে, আর জ্বালিয়ে চলতে হবে—এই তার অলঙ্ঘ্য পরিণাম।

সম্পূরণরা তাকে সাহায্য-ই করেছে। সম্ভবতঃ চম্পার মনের এই কথাগুলিতে কোন শক্তি ছিলো। সম্পূরণের মনে হচ্ছিলো এ নীরবতাও মুখর। চলতে চলতে নিশীথের এ প্রশান্তি বড় ভাল লাগলো তার। অস্ফুটে বললে—বড় সুন্দর হয়েছে দিন।

সতাবনের আকাশ চিরে একটা উল্কার সূচীরেখা জ্বলে উঠে নিভে গেল সম্পূরণের কথার জের টেনে।

সেই সময় বিশ্রামের জন্য অন্দরমহলে চলতে চলতে মগনলালের সহসা মনে পড়লো একটা কথা: মনে পড়তেই এ-ও বুঝলেন, যে সারাসন্ধ্যা এই ছোট্ট কথাটি মনের তলায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। হাত-পা ধুয়ে চৌকিতে বসেছিলেন। একটি বালক ভৃত্য পা দাবাচ্ছিলো। পিলপাই আছে। গোদ ও বাতের ব্যথায় কষ্ট পান মগনলাল। কিন্তু এই খবর যা জরুরী, তার কাছে আর কিছু ভাববার নেই। তিনি বললেন—আমায় ভাতিজাকে ডাক!

—এখন?

—হাঁ বেওকুব!

জরুরী এত্তেলা পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলো ভাইপো। মগনলালের ছোট ছোট লাল চোখ দুটি অসহিষ্ণু। তিনি বললেন—সে হাজার মণ আটার কথা ভেবেছ?

—কোন আটা?

—সেই গাজিপুরের বদমায়েসের পাঠানো?

—হাঁ! বন্দোবস্তও করেছি।

—কি করলে?

রেজিমেন্টের বানিয়ারাই নিচ্ছে। আটা পাবে কোথায়? গম সরিয়ে ফেলেছে না হাজি সাহেব?

—কি করলে?

—পচা আটা ফেলে দিলাম বিশ বস্তা। বাকি আটা পচায়-ভালোয় মিশাল দিয়েছি। একটু কালো হলো, আর গন্ধ—তা চলে যাবে! বাকি তিন-শো মণ সহরে চালান করে দেব কাল-ই!

—ভাল করেছ। হাঙ্গামা একবার বাধলে কে ঐ আটার বাকি সামলাতো? কেউ না।

এমনি করে আটার ব্যবস্থা হয়ে গেল মগনলালের। চাকরটি আবার গোদ-পা টিপবার অধিকার পেল। ঈষৎ পচা, কালো রং, গন্ধ আটা—গুদাম বন্দী মাল—তার ব্যবস্থা হতে মগনলাল পরম নিশ্চিন্ত হলেন।

[ক্রমশঃ।

৩

পত্রলেখক কে ?

ছেলেরা চেয়েছিল বুড়োকে যক্ষপুরীর গেটের কাছে নামিয়ে রেখেই দিয়ে চলে আসবে, কিন্তু কমলেশ তাতে রাজী হয়নি, বুড়োকে নিয়ে গিয়ে দরো য়ানের ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের ওপর শুইয়ে দেয়। বুড়ো তখনও অজ্ঞান, কমলেশ বলে আমাদের আর একটু অপেক্ষা করা উচিত। যতক্ষণ না ওর জ্ঞান ফিরে আসে।

তাতে কিন্তু অন্য ছেলেরা আপত্তি করে। প্রশান্ত বুঝিয়ে বলে, আর দেরী করলে ঠিক হবে না রে কমল, চল আমরা হোষ্টেলে ফিরে যাই। শঙ্করদা'রা নিশ্চয় আমাদের জন্যে লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করছে।

প্রশান্তর কথা উড়িয়ে দেবার মত নয়। সত্যই সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি নামতে সুরু করেছে। তাছাড়া সকলেরই যখন ফিরে যাবার ইচ্ছে, কমলেশ একলা আর কি করবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুড়োকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে হোষ্টেলের দিকে রওনা হয়।

কমলেশের মন থেকে কিন্তু বুড়োর চিন্তা কিছুতেই যায় না। লাইব্রেরী ঘরে সবাই পড়তে বসলেও সে জানালা দিয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐ বিরাট যক্ষপুরীতে আর কি কেউ বাস ? করে তারা কি জানবে বুড়ো ঐ দরোয়ানের ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ? না, না, ও ভাবে ওকে ফেলে রেখে আসা মোটেই উচিত হয় নি।

সদাশঙ্কর এসে কমলেশের পিঠে হাত রাখে। কি ভাবছিস রে কমল ?

কমল সহজ হবার চেষ্টা করে, কিছু না।

—আমি জানি, বুড়োর জন্যে মন কেমন করছে ?

—আপনি কি করে জানলেন।

—আমি সব শুনেছি। অত ভাববার কি আছে, কাল সকালে গিয়ে একবার দেখে আসিস বরং।

—আমি কি ভাবছিলাম জান শঙ্করদা', বুড়োকে নিয়ে এসে এখানকার হাসপাতালে মিহিরদা'কে দিয়ে চিকিৎসা করালে হয়।

সদাশঙ্কর ম্লান হাসে, ওরা কি আর এখানে আসবে।

—কেন আসবে না শঙ্করদা' ?

—তা জানি না, সদাশঙ্কর যেন ইচ্ছে করেই কমলেশের কথার জবাব দেয় না।

পরদিন ভোর বেলা উঠে কাউকে কিছু না বলে গ্যারেজ থেকে একটা সাইকেল নিয়ে কমলেশ চললো যক্ষপুরীর দিকে। সবে তখন ভোর হচ্ছে, রাতের অন্ধকারকে সরিয়ে দিনের আলো ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, চারদিকে পাখীদের কলরব, বাসা ছেড়ে গাছের ডালের ওপর তারা বসে।

যক্ষপুরীর গেটের কাছে সাইকেল রেখে কমলেশ তাড়াতাড়ি দারোয়ানের ঘরের কাছে হাজির হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য বুড়ো সেখানে নেই। তক্তাপোষের ওপর এখনও তার গলার চাদর পড়ে রয়েছে, মাটিতে জুতো জোড়া, এমন কি ঘরের কোণে লাঠিটাও। তবে সে বুড়ো কোথায় গেল ? তবে কি কেউ তাকে ভেতরে নিয়ে গেছে ? না নিজেই সে উঠে গেছে ? চারদিক ভাল করে দেখে কমলেশ চলল সেই বিরাট প্রাসাদের দিকে। দৈত্যের মত তার বিরাট চেহারা নিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বড় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে 'বুড়ো' 'বুড়ো' বলে বারবার ডেকেও সে কোন সাড়া পেল না। ঘুরে গিয়ে দেখল খিড়কীর দরজাও বন্ধ। কোথাও একটি জানালা খোলা নেই। জনপ্রাণী এর মধ্যে বাস করে বলে বাইরে থেকে মনে হয় না। বিফল মনোরথে কমলেশ হোষ্টেলে ফিরে আসে। কিন্তু বুড়োর কথা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করে না। নানান কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।

দিনকয়েক পরের কথা। কলোনীর ছেলেরা রাস্তা কাটতে মেতে গেছে শহর থেকে কলোনী পর্য্যন্ত একটা সোজা রাস্তা তৈরী

ধনঞ্জয় বৈরাগী

করা হচ্ছে, যাতে সকলেরই যাতায়াতের সুবিধে হয়। ঘুর পথে যেখানে সাত মাইল যেতে হয় এ রাস্তা তিন মাইলে সেখানে পৌঁছে দেবে, সকলেই পালা করে রাস্তা কাটার কাজে হাত লাগায়।

কমলেশ আর অমিতাভ পাশাপাশি কাজ করছিল, অমিতাভ নিজের মনেই গজ গজ করে, এটা কিন্তু শঙ্করদার অন্যায়।

কমলেশ মুখ তুলে তাকায়, কেন কি হয়েছে ?

—আমাদের দিয়ে কেন রাস্তা কাটাচ্ছে ? আমরা তো হোষ্টেলের ছেলে। এ রাস্তা হলে সুবিধে হবে কলোনীর লোকদের, নয় ত গ্রামবাসীর। আমরা খেটে মরব কেন ?

—যে কোন জিনিষ গড়তে হলে সকলকেই কাজ করতে হয়। সেখানে তো তোমার আমার বললে হবে না।

ও-সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। যদি এমনি করে ব্যাগার খাটানো হয় এ স্কুল আমরা ছেড়ে দেব।

কমলেশ আর কথা বাড়ায় না। চুপ-চাপ নিজের কাজ করে, কিন্তু বোঝে অমিতাভ চুপ করে নেই। সে কাজ করতে করতে প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে এই বিষয়েই আলাপ করছে। হাত-পা নেড়ে কত রকম বোঝাচ্ছে।

সেই দিনই রাত্রে শোবার সময় কমলেশ এই কথাই তোলে, আমার ভয় করছে যে প্রশান্ত অমিতাভ বোধহয় দল পাকাবার চেষ্টা করছে, আমরা সবাই মিলে-মিশে কাজ করছিলাম, ওরা না সব গোলমাল করে দেয়।

প্রশান্ত গম্ভীর গলায় বলে, হোষ্টেলের বেশীর ভাগ ছেলেই কিন্তু দেখছি ওর দিকে, কেউ এই রাস্তা কাটায় হাত দিতে চাইছে না। কাল নাকি ওরা শঙ্করদাকে বলবে।

—ছি, ছি, শঙ্করদা' কি ভাববেন বলতো ? নিশ্চয় উনি মনে খুব দুঃখ পাবেন।

পরদিন অমিতাভ সত্যিই গোলমাল পাকাল। কাজ করতে যাবার আগে ছেলেরা জড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার দু'ধারে। শঙ্কর দা' এসে কাজ করতে বলতেই তারা সমস্বরে জানিয়ে দিল যে আর তারা রাস্তা কাটবে না। সদাশঙ্কর চুপ করে সব কথা শুনল, মনে ব্যথা পেলেও তা প্রকাশ না করে বলল, রাস্তাটা তৈরী হলে সকলেরই সুবিধে হবে, তাই তোমাদের কাজ করতে বলেছিলেম। কারুর ওপরই আমি জোর করিনি।

অমিতাভ চেঁচিয়ে বলল, আমরা এখানে পড়াশুনো করতে এসেছি, কুলীগিরি শিখতে আসিনি।

সদাশঙ্কর ম্লান হাসে, আমরা চাই এখানকার ছাত্ররা যাতে মানুষ হয়, এই রাস্তা কাটাটা মানুষেরই কাজ। তাই তোমাদের করতে বলেছিলাম। না ইচ্ছে হয় কোর না।

কমলেশ আর প্রশান্ত শঙ্কর-এর কাছে এগিয়ে যায়, স্পষ্ট গলায় বলে, আমরা কিন্তু কাজ করব শঙ্করদা'।

সদাশঙ্কর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে। এ আমি জানতাম। শুধু লেখাপড়া শিখে কিছু হয় না, আমাদের মানুষ হতে হবে, মানুষের মত মানুষ।

অর্দ্ধেক লোক কাজ না করলে বাকি যারা কাজ করে তাদের উপর চাপ পড়ে বেশী। তবু কমলেশরা ছাড়বার পাত্র নয়। পুরোদমে তারা কাজ করে যাচ্ছে। এ নতুন রাস্তা বুড়োর বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে যাবার কথা। এ ক'দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় রাস্তা যক্ষপুরী ছাড়িয়ে গেল।

অমিতাভরা শুধু যে কাজ করে না, তাই নয়, অন্যদের বাগড়া দিতেও ছাড়ে না। কত সময় শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, শঙ্করদা খাসা এক জোড়া বলদ এনেছে যে, বুদ্ধির বালাই নেই, ওদের যা বোঝাচ্ছে ওরা তাই করছে।

জোড়া বলদ ওরা কাদের বলছে তা বুঝতে কমলেশ আর প্রশান্তর দেরী হয়না, কিন্তু কোনদিন তা নিয়ে ঝগড়া করে না। হাসে, বলে, এমনি বলদই যেন থাকতে পারি, অন্তত কাজ করেও আনন্দ পাবো। অন্যদের দেখাদেখি শেয়াল হলে আর রক্ষে নেই, শুধু ফেউ ডেকে বেড়াতে হবে।

এ কথার আর কেউ উত্তর দিতে পারে না।

এরই মধ্যে একদিন কমলেশ মণিকাদির বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, দেখে রেণুকা শুকনো মুখে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কমলেশ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে দিদি, ওরকম অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছ ?

কমলেশের কথায় রেণুকার চমক ভাঙে, এমনি দাঁড়িয়ে আছি, কাজে যাচ্ছিস্ ? সময় থাকে তো ভেতরে আয় না—

কমলেশ ঘরের ভেতরে ঢোকে, একটু আগে রেণুকা মাদুরের ওপর বসে কয়েকটা ছবির স্কেচ্ করছিল। সেগুলো এখনও চারদিকে ছড়ানো আছে। কমলেশ সেই দিকে তাকিয়ে বলে, এতক্ষণ আঁকছিলে বুঝি ?

রেণুকা ক্লান্ত হেসে বলে, আর ছবি আঁকতে ভাল লাগছে না—

—কেন, তোমার আবার কি হোল ?

—মনে হচ্ছে সারা কলোনী জুড়ে কোন একটা গোলমাল হবে। ঠিক ঝড় ওঠবার আগে আকাশ যেমন থমথম করে এখন সেই অবস্থা।

—তুমি কি করে বুঝলে ?

—মণিকাদির কথা থাক, উনি তো আর আমাদের কাজ শেখাতেই পারছেন না। সব সময় কি যেন ভাবছেন। অমিতাভরা যে হোষ্টেলের ছেলেদের নিয়ে দল পাকিয়েছে, সে শুধু নিজেদের বুদ্ধিতে নয়, এর পেছনে লোক আছে।

কমলেশ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে, কে ?

—কে তা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে শঙ্করদা', মণিকাদি সবাই যেন কোন একজনকে সন্দেহ করছেন। আমিও তো তাই ভাবছি লোকটা কে ?

কমলেশ দৃঢ় গলায় বলে, সে যেই হোক এ আমাদের স্বপ্নরাজ্য। এখানে কোন দলাদলি আমরা আসতে দেব না। কাউকে ভাঙতে দেব না।

সেই দিনই দুপুর বেলা রাস্তায় কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কমলেশ গাছের ছায়ায় জিরুচ্ছিল। পেছন থেকে কে যেন কথা বলে, তোমরা এখানে কি করছ ?

কমলেশ ফিরে তাকায়, দেখে সেই বুড়ো। এতদিন অনেক রকম হাঙ্গামার মধ্যে থেকে বুড়োর কথা এক রকম সে ভুলে গিয়েছিল। এখন তাকে সামনে দেখে আবার পুরোন কথা মনে পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, এখন কি রকম আছেন ?

বুড়ো ভুরু কুঁচকোয়, কেন আমার কি হয়েছিল ?

—বাঃ, আপনি অজ্ঞান হয়ে মাঠে পড়ে গিয়েছিলেন না ? আমরাই তো তুলে নিয়ে এলাম।

—ও, তোমরা ? তাই আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরুলাম। তারপর শরীরটা খারাপ লাগছিল। মাথা ঘুরে গেল। তারপর কি করে যে বাড়ীতে এলাম বুঝতে পারছিলাম না। তাহলে তোমরাই—

কমলেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বড় জল তেষ্টা পেয়েছে, জল খাওয়াবেন ?

—চল আমার বাড়ীর মধ্যে।

কমলেশ জিনিষপত্র নিয়ে বুড়োর পেছনে পেছনে চলল। যক্ষপুরীর বাগানের বেড়া পেরলেও বেশ খানিকটা হাঁটতে হয় বাড়ী পৌঁছবার জন্যে, বুড়ো হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস করে। রাস্তা কাটার উৎসাহ তোমাদের কমে গেছে বুঝি ?

—কই, না।

—ছেলে যেন কম মনে হচ্ছে।

—ও হ্যাঁ, হোষ্টেলের ছেলেরা কাজ করছে না।

বুড়ো নিজের মনেই বিড় বিড় করে, আমি আগেই বলেছিলাম, ব্যাপার ঘাটালেই হোল। আস্তে আস্তে সব টের পাবেন।

কমলেশ কিছু বুঝতে পারে না, বলে, কার কথা বলছেন ?

বুড়ো ঠিক আগের মত কর্কশ গলায় বলে, তোমার তাতে কি ?

খিড়কীর দরজার কাছে এসে বুড়ো দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর আমি জল নিয়ে আসছি।

বুড়ো বাড়ীর মধ্যে চলে যায়। কমলেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, চারদিকটা ভাল করে দেখে আম, কাঁঠালের কি বিরাট বাগান, সারা মাঠটায় শুকনো পাতা ছড়ানো রয়েছে, কমলেশের মনে হ'ল দূর থেকে কে যেন আসছে, পাতার ওপর দিয়ে হাঁটার মচ মচ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কমলেশ তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে সরে যায়। মনে মনে ভাবে, কে আসছে এ বাড়ীতে, যক্ষপুরীর সঙ্গে বাইরের কারুর যোগাযোগ আছে বলে তো এত দিন শোনেনি গাছের ফাঁক দিয়ে সে তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসে, কাছে, কাছে, আরো কাছে। আগন্তুক কে কমলেশ এবার স্পষ্ট দেখতে পায়। কমলেশের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, সে আর কেউ না, অমিতাভ। চোরের মত চার দিক চেয়ে পকেট থেকে একটা খাম বার করে চিঠির বাক্সে ফেলে দেয়: তার পর আবার যে রকম এসেছিল তেমনি দ্রুত পায়ে পালিয়ে যায়।

সব ব্যাপারটাই কমলেশের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়। কলোনীর থেকে বুড়োকে চিঠি লিখছে কে ? সে কি অমিতাভ ? তাহলে তো সরাসরি বুড়োর সঙ্গেই কথা বলতে পারতো। ও নিশ্চয় পিওন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে পত্রলেখক কে ? বুড়োও কি তাহলে এই কলোনী ভাঙ্গার দলের একজন ? সব সন্দেহেরই নিরসন হয় চিঠিটা একবার পড়তে পারলে, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে কমলেশ খিড়কীর দরজার দিকে এগিয়ে যায়। চিঠির বাক্সের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে চার দিক দেখে নিয়ে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করে। চিঠির বাক্সটা পুরোন হলেও মজবুত। কিছুতেই খোলে না। হয় ত গা-চাবী লাগান আছে। ভাল করে দেখবার আর সুযোগ পায় না, বুড়ো এসে পড়ে। এক গেলাস সরবৎ কমলেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে এই নাও খাও।

কমলেশ সরবৎ খেতে খেতে লক্ষ্য করে বুড়ো পকেট থেকে একটা চাবী বার করে চিঠির বাক্সটা খুলে অমিতাভর দিয়ে যাওয়া খামটা বার করে। ওপরের হাতের লেখাটা দেখে নিয়ে নিজের মনে হেসে সযত্নে চিঠিটা ফতুয়ার পকেটে রেখে দেয়। কমলেশ এর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে বলে,·এবার তুমি যাও, আমার একটু কাজ আছে।

কমলেশ বুঝতে পারে চিঠিটা পড়ার জন্যে বুড়ো খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ! কমলেশ চলতে সুরু করলেই বুড়ো বাড়ীর ভেতর ঢুকে খিড়কীর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সারা রাস্তা কমলেশ ভাবতে ভাবতে ফেরে, এই পত্রলেখক কে ? বুড়োর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ?

[ক্রমশঃ।

আধুনিক আফ্রিকাতে পাঁচ মাস

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ। অরণ্য সম্পদই আফ্রিকাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সুজলা সুফলা হয়েও আফ্রিকা শস্য শ্যামলা হয়ে উঠেনি। এদেশের চাষ আবাদ আমাদের দেশের মতন নয়। জঙ্গলে তুলার গাছে তুলা ফলে, কলা আর আনারস গাছে প্রচুর কলা, আনারস জন্মায়, আফ্রিকাবাসীরা সেগুলি বিক্রয় করে জীবিকার সংস্থান করে। কেনিয়া রাজ্যে খুব মকাই ভুট্টার চাষ হয়—ওটা নাকি ভারতীয়দের আমদানী। সোয়ালীভাষায় 'মহিন্দী' অর্থ ভুট্টা এবং 'মহিন্দী' অর্থে ভারতবাসী। ভারতীয়রা এই ভুট্টার আমদানী করেছিল কিনা সে বিষয়ে স্থির মত না থাকলেও এদেশে ইক্ষুর চাষ ভারতীয়রাই আরম্ভ করেছেন—তারা এদেশে ইক্ষুর চাষ করে বহু বড় বড় চিনির কল বসিয়েছে। বহু চা-বাগান ও কফি বাগান আছে তার অধিকাংশেরই মালিক ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাকী অংশ ইউরোপীয়দের। সমগ্র আফ্রিকাতেই জঙ্গল—কাঁটা গাছে ভর্তি, টাঙ্গানাইকা অঞ্চলে ঐ কাঁটা গাছের চাষ করে এক নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে।

কয়েক বৎসর আগে আমরা যখন অষ্ট্রেলিয়াতে খেলা দেখাচ্ছিলাম তখন একজন ইংরেজ দোকানদার আমাদের একটা পার্শেল সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। বাণ্ডিলটার দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাবে আশঙ্কায় আমি তাকে আরও শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে বলাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে ওটা পাটের দড়ি নয় ওটা শিশল দড়ি ভীষণ শক্ত। আমি শিশল দড়ি চিনতুম না, তিনি দেখালেন আমাদের দেশের শণ সুতার দড়ির মত আরও মোটা মোটা আঁশের খুব ধপধপে সাদা শক্ত দড়ি। তিনি বললেন আফ্রিকাতে এই শিশলের চাষ হয়—এই শিশল এখন তোমাদের ভারতবর্ষ-পাকিস্তানের পাট এবং ম্যানিলার শণের দড়িকে পরাস্ত করেছে। এ ভীষণ শক্ত, সুদৃঢ় এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। ঐ দড়ি সস্তা কিনা জানিনা, তবে পাট বা শণের দড়ির চাইতে বহুগুণ শক্ত এবং সুদৃঢ় একথা অবশ্যই স্বীকার করেছিলাম। তারপর সারা

অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ডে টুরের সময় সর্বত্র ঐ শিশলের দড়ির ব্যবহার দেখেছি। কলিকাতায় শিশলের দড়ির প্রচলন নেই বললেই চলে—বিলাত থেকে যখন বড় বড় পার্শ্বেল আসে সেগুলি প্রায়ই ঐ শিশল দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। আমরা আফ্রিকাতে এসে এই শিশলের চাষ দেখতে পেলাম। সব চাইতে বেশী শিশলের চাষ দেখলাম টাঙ্গানাইকার বনভূমিতে। শিশল গাছ আমরা ভারতবর্ষেও অনেক দেখি—আনারস গাছের মতন গাছ পাতার ডগাটা ভীষণ শুঁচালো এবং শক্ত। অনেকে ফুলের বাগানে সখ করে বসান, কেউ কেউ টবেও পুঁতেছেন লক্ষ্য করেছি। আফ্রিকাতে এই শিশলের চাষ খুব বেশী হয়, জঙ্গলের গাছ অযত্নে বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে, ওর পাতা কেটে ফাক্টরীতে সূতা বের করা হয়। এখন এই শিশল টাঙ্গানাইকা এবং কেনিয়ার বড় কৃষিজাত সামগ্রী হয়েছে—ইউরোপীয়ানরা বহু ফাক্টরী গড়ে তুলে শিশলের চাষ করেছেন।

কেনিয়া প্রসিদ্ধ তার ভুট্টা (Maize)র জন্য আর উগাণ্ডা বিখ্যাত তার কলা এবং তুলার জন্য। উগাণ্ডাতে ঐ কলা আর তুলা ছাড়া অন্য কোনও শস্যের চাষ নেই। আফ্রিকার লোকেরা তাই ঐ দেশে শুধু কলা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ওরা কলাকে বলে 'মেই ফু:' আমার মতে ওটা "মেইন ফুড"। উগাণ্ডার প্রতিটি আফ্রিকাবাসী ঐ কলা খেয়েই বেঁচে আছে। কাঁচাকলা জলে ভিজিয়ে ওরা ওদের প্রধান খাদ্য তৈরী করে। কেনিয়া ও টাঙ্গানাইকা এই দুই দেশের যে সব জায়গায় ভুট্টা জন্মায় সেখানে লোকেরা ভুট্টা খেয়ে জীবন ধারণ করে।

টাঙ্গানাইকার মাসাই অঞ্চলে অনেকটা মরুময় আগ্নেয়গিরি সৃষ্ট জংলা ভূমি আছে সেখানে একপ্রকার ঘাস আর কাঁটা গাছ ছাড়া কিছুই জন্মায় না—শতাধিক মাইলব্যাপী ঐ মরুময় অঞ্চলে কোনপ্রকার খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না—তাই ওখানকার মাসাইর অধিবাসীরা শুধুমাত্র গরুর দুধ এবং গরুর টাটকা রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। ওরা জংলী জাতি জঙ্গলেই বাস করে, গরু পোষে এবং গরুর দুধ খায়। গরুর দুধ সংগ্রহ করে প্রথমে দেবতার জন্য উৎসর্গ করে তার পর ওরা নিজেরা পান করে। একপ্রকার তীর ধনুক দিয়ে গরুর গলায় ছিদ্র করে সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত করাতে আরম্ভ করে সেই রক্ত সংগ্রহ করে ওরা বাড়ীর সকলে মিলে পান করে। অনেকগুলি গরুকে এইভাবে তাদের Blod Bankএ রক্তদান করতে হয়। ওরা দেশী লাউয়ের খোলা দিয়ে তাদের পান-পাত্র (kibuyu) তৈরী করে নেয়—প্রত্যেক মাসাইয়ের হাতে ঐ পানপাত্র কিবুয়ু দেখা যায়, আর ওদের পুরুষদের হাতে থাকে তীর ধনুক অথবা বল্লম। ওরা জঙ্গলে নির্ভয়ে যাতায়াত করে দরকার হ'লে ঐ বল্লম দিয়ে সিংহ পর্য্যন্ত বধ করতে পারে। মাসাইদের স্বাস্থ্য খুবই ভাল—শরীর কৃষ্ণবর্ণ এবং চকচকে। ওরা লাল রং খুব ভালবাসে, রক্ত বস্ত্র পরিধান করলে খুব খুশী হয়। ওদেরকে দেখলেই ভয় করে,—মনে হয় দুর্দ্ধর্ষতার প্রতিমূর্ত্তি।

আফ্রিকাতে কালো আদমীদের মধ্যে অনেক রকম ভাষা প্রচলিত হলেও সবাই সোহালী (swahili) ভাষা জানে এবং বুঝতে পারে। সোহালী ভাষায় এদের সঙ্গে কথা বললে সহজেই বন্ধুত্ব করা যায়। এরা দুর্দ্ধর্ষ হলেও খুবই বন্ধুবৎসল। ভাল ব্যবহার করলে, বন্ধুর মত চললে এদের কাছে খুবই সুন্দর, সদয় ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে চললে কোন্ অজানা সংকেতে সারা বনভূমিতে এদের বার্ত্তা অদৃশ্যভাবেই ছড়িয়ে পড়ে, এদের চক্ষু, এদের হাত এড়ানো অসম্ভব! গাছে এরা ঢোল ঝুলিয়ে রাখে, সেই ঢোল বাজিয়ে ওরা সমস্ত জঙ্গলে ওদের সাঙ্কেতিক বার্ত্তা জানিয়ে দেয়। যে জঙ্গলে কোথাও কিছু নাই—মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত বন্ধু এসে জুটতে পারে, আবার পরক্ষণে তারা সবাই অদৃশ্য হতে পারে—যেন সবই সত্যিকার যাদুবিদ্যা—মুহূর্ত্তে আবির্ভাব বা মুহূর্ত্তে জনগণের অদৃশ্য হওয়া এটা ওদের জঙ্গলের ম্যাজিক—ওখানে আমার ম্যাজিক অক্ষম!

কেনিয়াতে "মাউমাউ" আন্দোলন চলেছিল—ওটা এদেশের পার্ব্বত্য কিকুয়ু জাতিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভ্যুত্থান বলে অভিহিত করা হয়। '৪২ সালে ভারতে যেরূপ আন্দোলন চলেছিল বা মালয়ের জঙ্গলে সন্ত্রাসবাদীদের ক্রিয়াকলাপ চলেছিল—এই আন্দোলন ঠিক তেমনই। শ্বেতাঙ্গ বহিরাগত জাতিদের আফ্রিকা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এ যেন আফ্রিকার জংলী (এক শ্রেণী) জাতির সুসংবদ্ধ গরিলা যুদ্ধ!—গত ১৯৫২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট এই 'মাউমাউ'কে বেআইনী ঘোষণা করে কঠোর হস্তে দমন করেছেন এখনও ৮,৪১৪ জন 'মাউমাউ'কে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি জাঞ্জিবার সহরে নিখিল আফ্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিরাট অধিবেশন হয়েছে তাতে সভাপতির ভাষণে বলা হয়েছে যে কেনিয়ার 'মাউমাউ' আন্দোলনকে সাইপ্রাস দ্বীপের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সাইপ্রাসে আর্কবিশপ মাকারিওকে একদিন বিদ্রোহী বলা হয়েছিল আজ তিনিই সেখানকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন—ঠিক সেইভাবে 'মাউমাউ' আন্দোলনের নেতা জোমো কেনিয়েটাকে আজ বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে বৎসরের পর বৎসর কারারুদ্ধ করে রাখলেও, সেই কেনিয়েটাই একদিন মাকারিওর মতই একজন দেশপ্রেমিক নেতা বলে স্বীকৃত হবেন।

সমগ্র আফ্রিকাতে বর্ত্তমানে বিরাটভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে—চারিদিকে সভা, সমিতি, আইন অমান্য, গরিলাযুদ্ধ, সান্ধ্যআইন, আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থা—ঠিক যেন '৪২ সালের ভারতে বসে আছি। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় লোকেরা স্বাধীনতা লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সবাইর মুখে এক বুলি 'আফ্রিকা ছাড়। আফ্রিকা শুধু আফ্রিকানদের জন্য।' এতদিন এই আন্দোলন শুধু শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য ছিল এখন এরা ভারতীয়দিগকেও এদেশ ছেড়ে যেতে বলছে। সবাই এখন ইন্দ-এশিয় লোকদের দোকানপাট ব্যবসা সবকিছুকে অহিংসভাবে 'বয়কট' করতে আরম্ভ করেছে। আমরা থাকতে থাকতে এই কয়েক মাসের মধ্যেই এই আন্দোলন বেশ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি—এর ফল কি হবে তা শুধু ভগবানই জানেন।

আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ—এ দেশের পথ চলতে যখন তখন অসংখ্য বুনো জন্তু জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট এসব অরণ্যকে সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করে বন্যজন্তুকে রক্ষা করে চলেছেন। দেশের সর্ব্বত্র গভর্ণমেণ্টের ন্যাশনাল পার্ক বা game reserve গড়ে উঠেছে। শত শত মাইল লম্বা উঁচু তারের জালের বেষ্টনী দিয়ে

বড় বড় জেলখানা। কৈদী হয়েছে ওতে বন্দী রয়েছে হাতী, সিংহ, গণ্ডার জলহস্তী, জেব্রা, জিরাফ, কুমীর, বাইসন, উটপাখী প্রভৃতি আফ্রিকার বিখ্যাত বন্য জন্তু জানোয়ার। এগুলি সংরক্ষিত অঞ্চল এখানে শিকার করা বেআইনী এমনকি জঙ্গলে প্রবেশ করার সময় কোনপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে লওয়াও আইনবিরুদ্ধ। গাড়ীর 'হর্ণ' বাজানো নিষেধ দুই শত টাকা জরিমানা হয়। দিনের আলোতে জঙ্গলে মোটর গাড়ী নিয়ে যাওয়া চলে, রাত্রিতে থাকা নিষেধ কারণ গাড়ীর আলো জ্বালা চলবে না। গাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ করে—'গাইড' সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হয়। প্রবেশদ্বারে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—আপনার জীবনের জন্য আপনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করছেন। গাড়ীর দরজা খোলা নিষেধ। হর্ণ বাজানো বা আলো জ্বালানো নিষেধ। গাড়ী থেকে নামবেন না, বন্য প্রাণীকে কোন ভাবে ভয় দেখাবেন না, চুপ করে বসে থাকবেন। মাঝে মাঝে বড় বড় সাইনবোর্ড আছে Elephants have the right of way. অর্থাৎ আগে হাতীকে পথ ছেড়ে দিন।

ওখানে পথ চলতে অসংখ্য বুনো হাতী নজরে পড়ে, আগে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হাতীকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। যারা নির্ভয়ে হাতী দেখতে চান তারা দিনের আলোতে Tree Top Hotel অর্থাৎ (ফিল্মের টার্জানের বাড়ীর মত) গাছের উপর হোটেলে আশ্রয় নিয়ে ভালভাবে দেখতে পারেন। গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে অনেক ঐরূপ গাছের হোটেল এ দেশে আছে। আমরা বেলজিয়াম কঙ্গো, উগাণ্ডা এবং সুদানের মধ্যখানে এলবার্টহ্রদে 'মার্চেশন ফলস' দেখতে গিয়ে গভর্ণমেন্টের রেষ্ট হাউস 'পারা সফরী লজে' একরাত্রি ছিলাম—পরদিন একটা লঞ্চে চেপে এলবার্ট হ্রদে বেড়াতে গিয়াছিলাম। রাত্রিতে বুনো হাতীর দল এসে আমাদের ঘরের জানালায় শুঁড় ঘসছিলো নানাভাবে গর্জন করছিলো। হ্রদের জলে কুমীর এবং জলহস্তী মোট বোধ হয় দুই তিন হাজার দেখেছি—আমাদের মোটর লঞ্চের দুই তিন ফুট দূর দিয়ে জলহস্তী ও কুমীরের পাল হেঁটে আর সাঁতরিয়ে বেড়াচ্ছিল। পথে আমরা হাতীও দেখেছি অন্ততঃ একহাজার। জিনজা সহরে মিশরের বিখ্যাত নীল নদের উৎসমুখ ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও রিপন জলপ্রপাতের Ripon Falls Hotelএ আমরা অনেকদিন ছিলাম। রাত্রিতে খেলার শেষে হোটেলে ফিরতেই দেখি বড় বড় দুইটি জলহস্তী আমাদের হোটেলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমাদের গাড়ীর তীব্র আলোক দেখে ঐ দুইটি জন্তু পিচ ঢালা রাস্তা অতিক্রম করে আবার হ্রদের জলে নেমে গেল।

পরক্ষণেই দেখি একটু দূরে রাস্তার পাশে আরও চারিটা বড় বড় জলহস্তী দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওরাও গাড়ীর আলো দেখে জলে নেমে গেল। প্রথম দর্শনে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম কারণ এত কাছে থেকে এর আগে "হিপো" (জলহস্তী) আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। পরে প্রতিদিন হিপো-দর্শন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চলে যখন তখন রাস্তাঘাটে "হিপো" দেখা যায়। নাইরোবীতে গেলে লোকে যে কোন দিন সিংহ দেখতে পারে—সহর থেকে তিন মাইল দূরে সংরক্ষিত বন-অঞ্চলে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্তত পাঁচ সাতটা সিংহের দেখা পাওয়া যায়। ওরা মোটর গাড়ী আর মানুষ দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কলিকাতায় রাস্তায় যেমন ষাঁড় দেখা যায়—বনপথে তেমনি মাঝে মাঝেই সিংহদের দর্শন পাওয়া যায়। দশ বৎসর আগে নাইরোবী সহরের রাজপথেও মাঝে মাঝে সিংহের দেখা পাওয়া যেত। জেনারেল পোষ্টাফিসের কাছে নাকি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিংহের পাল এসে জমা হ'ত। এখন ওরা শুধু সংরক্ষিত বনেই চড়ে বেড়ায়। বাইরে চলে এলেই লোকেরা গুলী করে হত্যা করে ফেলে।

আফ্রিকাতে এখন অনেক বড় বড় ন্যাশনাল পার্ক "সংরক্ষিত বন" গড়ে উঠেছে আর তাদের বেষ্টনী এলাকাও কম নয়। একমাত্র বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকার হিসাব নিলে দেখা যাবে—কেনিয়াতে ৮টি সংরক্ষিত জঙ্গল আছে (১) নাইরোবী রয়েল ন্যাশনাল পার্ক এলাকা ৪৪ বর্গ মাইল (২) টসাভো রয়েল ন্যাশনাল পার্ক ৮,০৬১ বর্গ মাইল (৩) মার্সাবিট ন্যাশনাল পার্ক ১০,০০০ বর্গ মাইল ইহা ছাড়াও গেডী ন্যাশনাল পার্ক, আম্বোসেলী, প্রমুখ অনেক সংরক্ষিত বন আছে। উগাণ্ডা রাজ্যে চারিটি সংরক্ষিত বন আছে তন্মধ্যে 'মার্চেশন ফলস্ ন্যাশনাল পার্ক' এবং 'কুইন এলিজাবেথ ন্যাশনাল পার্ক' খুবই প্রসিদ্ধ টাঙ্গানাইকার মধ্যে যে কয়টি সংরক্ষিত বনভূমি আছে, তার মধ্যে সেরেনগেটি এলাকাই সব চাইতে বিখ্যাত। এই তিনটি দেশের মধ্যে কেনিয়া অঞ্চল তার সিংহের জন্য প্রসিদ্ধ, কাজেই কেনিয়া রাজ্যের প্রতীক চিহ্ন এই সিংহকেই করা হয়েছে, টাঙ্গানাইকা অঞ্চলে জেব্রা এবং জিরাফ খুব বেশী দেখা যায়। আমরা নাইরোবী থেকে টাঙ্গানাইকা আসার সময় ৭০০ মাইল পথে কমপক্ষে তিন-চার হাজার জেব্রা, জিরাফ ও উটপাখী মোটরে বসে বসেই দেখেছি।—এই জিরাফকে এই দেশের প্রতীক চিহ্ন করা হয়েছে উগাণ্ডা রাজ্যে বুনো হাতী এবং জলহস্তী বেশী পাওয়া যায় তাই উগাণ্ডা রাজ্যের প্রতীক হচ্ছে ঐ জংলী হাতী। জিনজা সহরে জলহস্তী খুব বেশী, তাই ঐ সহরের মিউনিসিপ্যালিটি ঐ জলহস্তীকেই তাঁদের প্রতীক চিহ্ন করেছেন। ভারী বিচিত্র এই দেশ। রাস্তাঘাটে পথ চলতে যখন-তখন যে কোনও বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়া বিচিত্র নয়।

এদেশে একপ্রকার মাছি আছে (যার নাম Tsetse fly) ঐগুলি সাধারণ মাছির মতই উড়ে বেড়ায়—কিন্তু ঐ মাছি কামড় দিলে লোকেরা এক নূতন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যার নাম sleeping sickness। বিগত ১৯০১-১৯০৬ সালে (পাঁচ বৎসরে) একমাত্র উগাণ্ডা রাজ্যেই মোট ২০০,০০০ দুই লক্ষ লোক ঐ মাছির কামড়ে sleeping sicknessএ ভুগে মারা গিয়েছে। ইংরেজরা নানাভাবে সতর্কতা নিয়ে, ঔষধপত্র দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে—এখন স্বাস্থ্য অবস্থায় অনেক উন্নতি করে তুলেছে। আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ-গণ্ডার-বুনোহাতী, অন্তরীক্ষে জংলীদের বিষাক্ত ধনুক-তীর, জলে জলহস্তী, কুমীর—ঝোপে ঝাড়ে কর্দমহ্রদ চোরাবালি, সামান্য মাছির কামড়ে অদ্ভুত ব্যাধি, জঙ্গলে মনুষ্যভক্ষক অদ্ভুত গাছপালা। চারিদিকের শত বিপদকে উপেক্ষা করে ভারতীয়রা এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা এদেশে ভাগ্যান্বেষণ করতে এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে নূতন নূতন সহর গড়ে তুলেছে—জনপদের সৃষ্টি করেছে। ইক্ষুর চাষ করে চিনির কল বসিয়েছে, চা এবং কফির চাষ করে বড় বড় ফ্যাক্টরী বসিয়েছে, চারিদিকে শিশলের চাষ, তুলার চাষ,

ভুট্টার চাষ, জঙ্গলের তুলা, কলা, আনারসের পাশেই গড়ে উঠেছে বড় বড় সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী। বড় বড় বিরাট পিচঢালা রাজপথ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বড় বড় সেতু—আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা।

ভারতীয়রা এদেশের ব্যবসায়ে প্রবেশ করে এদেশের সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট প্রাধান্য করে নিয়েছে। টাঙ্গানাইকায় রাজধানী ডারেস সালেম সহরের বর্তমান পৌরপাল (মেয়র) একজন ভারতীয়। এদেশের লোকেরা যখন জঙ্গলে জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে কলা খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে—ভারতীয় বণিকরা এবং ইউরোপীয় বণিক ও রাজনৈতিকরা ততদিনে এদেশে নিজেদের প্রভুত্ব ভালভাবে বসিয়ে নিয়ে দেশের উন্নতির সাথে সাথে নিজেদের ভাগ্যোন্নতি করে তুলেছেন। কৃষ্ণাঙ্গরা আজ ইউরোপীয়দিগকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলছে—ভারতীয়দের নিকট থেকে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা শিক্ষা করেছে—বোধহয় ভারতীয়রা তাদেরকে পেছন থেকে কিছু কিছু শিক্ষাও দিতে চেষ্টা করেছে—যার ফলে আজ কাদের চক্রান্তে ঐ আন্দোলন আজ ভারতীয়দের বিরুদ্ধেও চালানো হচ্চে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অভ্যস্ত বৈদেশিক কূটনৈতিকদের চালে ভুলে কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীরা আজ হয়ত মস্তবড় ভুলই করতে বসেছে। ভারতও এই বুদ্ধিতেই খণ্ডচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়েছে! আফ্রিকা আজ কোনপথে চলেছে—কে জানে?

হৈমবতী উমা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। একবার দেবতা আর অসুরে ভীষণ যুদ্ধ লাগল। দুই দলই পরাক্রমশালী, কে হারে কে জেতে বোঝা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহুদিন যুদ্ধের পর দেবতাদেরই জিত হল। তাদের উল্লাসে আর আস্ফালনে স্বর্গ তোলপাড়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন, আমাদের কি রকম শক্তি। আর অদ্ভুত ক্ষমতা, তাই না অসুরদের পরাজয় করতে পারলাম।

দেবতাদের এই অহঙ্কার দেখে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভাবলেন তাদের এ অহঙ্কার একটু চূর্ণ করা দরকার। একদিন তিনি এক জ্যোতির্ময় যক্ষরূপে দেবতাদের সামনে দাঁড়ালেন। দেবতারা আমোদ আহ্লাদে মশগুল। এমন সময় হঠাৎ অচেনা এক দীপ্তিময়ী মূর্তি দেখে বিস্মিত হলেন, ভয় পেলেন। তিনি কে এই পরিচয় জানবার জন্যে তারা অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবতাদের বৈঠক বসল, তাঁরা অগ্নিদেবকে তাঁদের প্রতিনিধি করে সেই জ্যোতির্ময়ের কাছে পাঠালেন।

অগ্নি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই জ্যোতির্ময় যক্ষ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

অগ্নি সগর্বে উত্তর দিলেন। আমি অগ্নি। আমাকে সবাই জাতবেদাঃ (সর্বজ্ঞ) বলে জানে।

যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন শক্তির অধিকারী?

অগ্নি বললেন, আমার শক্তি এই, স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই ত্রিভুবনে যা আমার সামনে পড়ে তাই আমি দগ্ধ করতে পারি।

—তখন সেই যক্ষ দুই অঙ্গুলীতে একটি শুষ্ক তৃণখণ্ড ধরে বললেন, একে দগ্ধ করো।

কিন্তু দাহিকা শক্তিশালী অগ্নির অহঙ্কার চূর্ণ হল, তিনি প্রাণপণ শক্তিতেও সেই তৃণখণ্ড দগ্ধ করতে পারলেন না নত মস্তকে দেবপুরীতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা জানালেন।

তখন দেবতারা পবন দেবকে পাঠালেন। পবনদেব স্বীয় শক্তিতে আস্থাবান হয়ে তীব্রবেগে যক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন।

যক্ষ তাঁর শক্তির পরিচয় জিজ্ঞেস করলে। তিনি সগর্বে উত্তর দিলেন আমি বায়ু, আমার সামনে যা পড়ে তাই আমি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।

যক্ষ তৃণ খণ্ড ধরে বললেন, এটা উড়িয়ে নিয়ে যাও।

বায়ু তার প্রচণ্ড শক্তি দিয়েও সেই তৃণখণ্ডকে মোটেই হেলাতে পারলেন না। উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। লজ্জায় অধোবদন হয়ে পবনদেব ফিরে এলেন।

দেবপুরীতে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। এই মহাপরাক্রমশালী জ্যোতির্ময় পুরুষ কে তা জানবার জন্য দেবতারা অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁরা পাঠালেন। কিন্তু দেবরাজ সেখানে দাঁড়াবামাত্র নিমেষের মধ্যে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ অদৃশ্য হলেন। দেবরাজ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন চতুর্দ্দিক আলোকিত করে অতি সুন্দরী রূপলাবণ্যময়ী এক নারী মূর্তির আবির্ভাব হল। তিনি কে? না, বিশ্ববন্দিতা সেই হৈমবতী-উমা। তাঁকে দেখে দেবতারা স্তুতি বন্দনা করতে লাগলেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য জ্যোতির্ময় পুরুষের পরিচয় জানতে চাইলেন।

তখন হৈমবতী-উমা বললেন, হে দেবগণ। তোমরা যে আশ্চর্য্য সুন্দর অদ্ভুত তেজোময় পুরুষ দেখে বিস্মিত, ভীত হয়েছ তিনি আর কেউ নন, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা সেই পরমপুরুষ। তোমরা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠেছিলে ভেবেছিলে তোমাদের নিজ শক্তিতে তোমরা অসুরদের জয় করেছ, কিন্তু না, তা নয়, জেনো ঐ বিরাট পুরুষের অঙ্গুলি হেলনে জগতের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তোমরা অসুর জয় করতে পেরেছ। তোমাদের নিজেদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই, তার প্রমাণ এখনই পেয়েছ।

দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ হল। তাঁরা নিজেদের ভ্রম বুঝতে পারলেন, লজ্জিত হয়ে সেই সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন।

কালি থেকে সন্দেশ

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

এবার যে খেলাটার কথা বলছি সেটি খুবই মজাদার। যাদুকরের হাতে আছে একটি কাচের গ্লাস যা ভর্তি আছে কালিতে। ঘন কালো কালি। টেবিলের উপর এই গ্লাস নামিয়ে রেখে তিনি হাতে তুলে নিলেন এক ফালি সাদা কাগজ। সবার সামনে এই সাদা কাগজের ফালিটাকে যাদুকর ডোবালেন কালির গ্লাসে আর তার ফলে কাগজের কালির একটা প্রান্ত কালিতে কলঙ্কিত হল। এ দেখার

পরে দর্শকদের আর কোন সন্দেহই রইলো না যে গ্লাসে সত্যি সত্যিই কালি আছে। এর পরে যাদুকর আরম্ভ করলেন বাগাড়ম্বর :

বন্ধুগণ, এখন যে খেলা আপনাদের সামনে হাজির করছি তা দেখলে আপনাদের সবারই খিদে পাবে! আর সে খিদে দূর করার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

টেবিলের উপর থেকে কালির গ্লাস আর একটা কালো রুমাল তুলে নিয়ে ঐ রুমাল দিয়ে তিনি আচ্ছা করে মুড়ে দিলেন গ্লাসটাকে। আর সুর ক'রে পড়তে থাকলেন ম্যাজিকের মন্ত্র :

আরশুলাদের সঙ্গে আড়ি
তাই যাচ্ছি যায় ময়রা বাড়ি
হুতোম প্যাঁচার হুতো হুতোম ডাক
মিহিদানার মিহি দানা
রাজভোগ যে রাজার খানা
তাই দিয়ে এই গেলাস ভরা যাক।

গ্লাসের ঢাকনা খুলতে তো সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কালি উধাও। গ্লাস ভর্ত্তি হয়ে গেছে কড়া পাকের সন্দেশে! একটি একটি করে তুলে নিয়ে যাদুকর তা পরিবেশন করলেন তাঁর দর্শকদের।

এবারে শোন কেমন ক'রে এই অসম্ভব সম্ভব হল। গ্লাসটাতে কিন্তু আসলে কোনও কালিই ছিল না। গ্লাসটাতে একটু কারসাজি ক'রে নিয়ে ছিলেন যাদুকরমশাই। কানার দিকে আধ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিয়ে ঐ গ্লাসের সারা গায়ে লাগিয়ে ছিলেন ভুষো কালি আর গ্লাসটার ভেতরে রেখেছিলেন সন্দেশ। তোমরা এই খেলা করার সময়ে ব্যবহার ক'রো লম্ফের ভুষো কালি। একটা কেরাসিনের লম্ফ জ্বালিয়ে তার শিখার উপরে ধরে ধরে সহজেই গ্লাসের গায়ে ভুষো কালির পলস্তরা লাগাতে পারবে। গ্লাসের ভেতরে সন্দেশের বদলে বিস্কুট, লেবেনচুষ এমন কি মুড়িও রাখতে পারো তবে কোনও ক্ষেত্রেই গ্লাসের তিন চতুর্থাংশের বেশী অংশ যেন ভর্ত্তি না হয়। কালো রুমাল দিয়ে মুড়ে নেবার সময়ে গ্লাসের গা ভালভাবে মুছে নেবার কৌশলটা কিন্তু অভ্যাস করে নেবে বেশ ভাল ক'রে তা না হলে কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। যে কাগজের ফালিটা দিয়ে যাদুকর গ্লাসে কালির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তাতেও আছে কৌশল। এর সামনের দিকটা সাদা হলেও পেছনের দিকে নীচের প্রান্তে থাকে কালির দাগ। গ্লাসে ঢুকিয়ে তোলার সময়ে যাদুকর কাগজের ফালিটা ঘুরিয়ে দেয় আর দর্শকেরা তাই দেখতে পান যে কাগজের ফালিতে কালি লেগেছে।
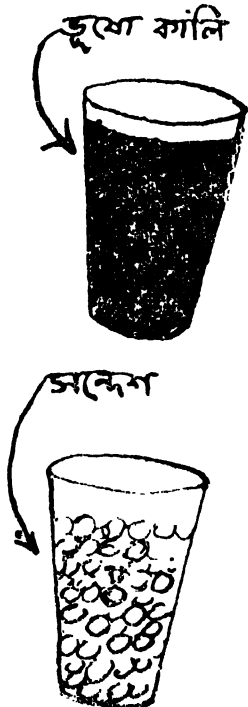
যাদুবিদ্যায় উৎসাহী পাঠক পাঠিকারা আমার সঙ্গে উপযুক্ত জবাবী ডাকমাশুলসহ পত্রালাপ করতে পার A. C. SORCER. Magician, Post Box 16214, Calcutta-29 ঠিকানায়।

স্মরণীয় যাঁরা

কবি কর্ণপূর

পুরীর সমুদ্রের ধারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মঠ। প্রতিবারের মত সেবারেও এসেছেন বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী। সকলেই বৈষ্ণব এঁদের মধ্যে আবার কেউ বা মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরংগ। তাঁরা বৎসরান্তে মহাপ্রভু আর জগন্নাথদেবকে দেখতে আসেন। তাঁর সংগে নাম সংকীর্তন করে কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে যান দেশে।

প্রতিবারের মত এবারেও এসেছেন নদীয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী হ'তে সেন শিবানন্দ, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ। নীলাচল যাত্রীদের অনেককেই তিনি নিজের খরচে সংগে নিয়ে আসেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের মলিক হয়েও তিনি ভগবানকে নিজের সমস্ত কিছু দান করে দিয়ে ভিখিরীর মত জীবন যাপন করছেন। গৃহবিগ্রহ কৃষ্ণরায়ের নামে সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এবারকার তীর্থযাত্রায় তিনি একলা ন'ন। সংগে তাঁর স্ত্রী আর সাত বছরের ছেলে পরমানন্দ। শিবানন্দ এসেছেন মহাপ্রভুর কাছ থেকে পরমানন্দের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। যার ফলে ছেলের ধর্মে মতি হয় এবং মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু মহাপ্রভুর সামনে এসে সাত বছরের ছেলে পরমানন্দ গোঁ ধরল। কিছুতেই কৃষ্ণ নাম করে না। মহাপ্রভু কত চেষ্টা করলেন তবুও পরমানন্দ নীরব। বিরক্ত হয়েই মহাপ্রভু বললেন, জগতের সকলকেই আমি কৃষ্ণ নাম নেওয়ালাম আর এই বালকের কাছে আজ পরাজিত হলাম এ অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা।

সকলেই ছেলের এই ভাব দেখে বিরক্ত হল। শিবানন্দ আর তাঁর স্ত্রী তো মনে মনে চটেই গেলেন। কিন্তু তবু তাঁরা হাল ছাড়লেন না। আরও দিনকয়েক পরে ছেলেকে আবার তাঁরা নিয়ে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে আর আশ্চর্য্যের বিষয় এবার পরমানন্দ মহাপ্রভুর পায়ে মুখ রেখে বলে উঠলেন একটি সংস্কৃত শ্লোক। যে শ্লোক কোন শাস্ত্র বা পুরাণের নয় বালকেরই স্বরচিত। শ্লোকটিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেছিলেন।

সাত বছরের শিশুর মুখে এমন সুন্দর অথচ নির্ভুল শ্লোক শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন, এমন কি মহাপ্রভু পর্যন্ত। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই শিশুর এমন পরিবর্তন দেখে। আর সেই সংগে তখনই তাঁকে 'কবি কর্ণপুর' উপাধি দান করলেন। মহাপ্রভুর প্রদত্ত এই কবি কর্ণপুর উপাধিই উত্তর কালে তাঁকে বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত করে তুলেছিল।

শিবানন্দ ছেলের এই পরিবর্তনে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁকে সবাই কবি কর্ণপুর নামে ডাকতে শুরু করলেন।

কবি কর্ণপুর ছিলেন শিবানন্দের ছোট ছেলে। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। অনেকগুলি বই তিনি লিখেছিলেন। সমস্তগুলিই

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক'ই মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। এ নাটকে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর থেকে পুরীতে বসবাসের সময় পর্যন্ত ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করা আছে।

প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য পুঁথির মত এ নাটকটির রচনা কাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ১৫৭১-৮০ সালে আবার কেহ বলেন ১৫৩২-১৫৪০ সালের মধ্যে নাটকটি লেখা হয়। তবে নানা অনুসন্ধানের পর ঠিক হয়েছে যে নাটকটি ১৫৪০ সালের আগেকার রচনা।

নাটক রচনার কয়েক বছর পরে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনা করেন কবি। ১৫৪২ সালে এটি রচিত হয়। এ কাব্য রচনায় কবি তাঁর আগেকার কবি মুরারি গুপ্তকে অনুসরণ করেছেন।

কবির তৃতীয় গ্রন্থ হচ্ছে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'। এ বইটি নিয়েও বৈষ্ণব সমাজে প্রচুর বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে। অনেকে একে কর্ণপুরের রচনা বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু নানা বাক্‌বিতণ্ডার পরে তাঁর সময়ের কবি নরহরি চক্রবর্তীর কথার পুনরুক্তি করে বলা যায় যে এটিও কর্ণপুর রচনা করেন।

এছাড়া 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ,' 'আর্যাশতক,' 'অলংকার কৌস্তভ' এ বইগুলিও তিনি লিখেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ লিখিত হয়েছিল। অলংকারকৌস্তভ, কাব্যে অলংকারকে কেন্দ্র করে কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও এত পুঁথি রচনা করেও তাঁর নাম আজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত হয়ে রয়েছে। বৈষ্ণব সমাজেও কবি হিসাবে তিনি তেমন খ্যাতি পাননি। তখনকার দিনে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ছিলেন গ্রন্থ অনুমোদনের অধিকর্তা। তাঁরা কবি কর্ণপুরকে ভাল চোখে দেখতেন না। কবির সংগে তাঁদের ধর্ম বিষয়ে বেশ কিছুটা পার্থক্য ছিল আর তাছাড়া তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের রচিত পুঁথিই বাংলাদেশে বেশী প্রচার হোক। ফলে কর্ণপুরের কোন গ্রন্থকেই তাঁরা অনুমোদন করেননি। কিন্তু না করলেও তাঁর গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট ঋণ অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশে বসে কবি কর্ণপুর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইগুলি রচনা করেছিলেন বাঙালী তা থেকে যথেষ্ট আনন্দ আর জ্ঞান লাভ করেছিল। বৃন্দাবনের গোঁসাইরা তাঁকে স্থান না দিলেও তিনি বাঙালীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর স্নেহাশীর্বাদপুত এই ভক্ত কবির কথা তাই বাঙালী ভক্তের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ধারাবাহিক রচনা
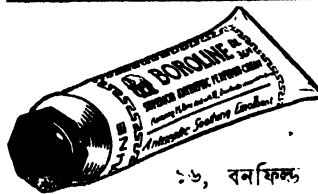
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

জোড়াবাগানের রিপোর্ট থেকে গাকমন্দ খেয়ে ফিরে এসে চিরঞ্জীব বাবু আর একটু মাত্রও নীচের আফিসে দেরী না করে তড় তড় করে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর উপরের কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলেন। এই দিন তাঁর কোয়ার্টারের ভিতরে ঢোকার দরজাটি খুলাই ছিল। কোনও দিকে না দেখে তিনি ভিতরে এসে একটি চৌকীর ওপর গুম হয়ে বসে পড়লেন। চিরঞ্জীব বাবুর মনের এই বিশেষ অবস্থাটি তাঁর স্ত্রী সারদামণির নজর এড়ায় নি। প্রায় দুই তিন দিন যাবৎ তিনি তাঁর স্বামীকে চিন্তিত দেখেছেন। তবে পুলিশের কাজে মাঝে মাঝে এইরূপ হয়েই থাকে। কয়েকদিন মনমরা হয়ে থেকে পুনরায় এঁরা এদের মনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তখন এঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে প্রিয়জনের সঙ্গে পুনরায় কথাবার্ত্তা সুরু করেন। তাঁদের মন তখন প্রিয়জনদের প্রতি দ্বিগুণতর স্নেহ ও প্রীতিতে ভরে যায়। এই সব এতোদিনে সারদামণির গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইদিন তাঁর মুখে শুধু চিন্তা নয়, একটা নিদারুণ বিষাদও যেন ফুটে উঠেছে। এই অবস্থায় স্বামীকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা সারদামণির ছিল না। তবু রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে তিনি স্বামীকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, অমন করে মন খারাপ করে বসে আছো কেন? অফিসের কাজে নূতন কোনও আবার ঝঞ্ঝাট হলো না কি? প্রণব বাবুকে তো আবার আজকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করেছিলে। কখন পুরী থেকে ফিরবেন তিনি? একটা তো বেজে গেল এদিকে। তুমি না হও এর মধ্যে একটুখানি খেয়ে নাও। পরে আবার তাঁর সঙ্গে বসে খাবে আখুন।

নীচে মেঝের উপর একটা মাদুর পেতে বসে চিরঞ্জীব বাবুর শিশু পুত্র চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে একটা বাঙলা পাঠ্যপুস্তক পড়ছিল। অন্যদিন এই সময় স্নানাহারের পূর্ব্বে চিরঞ্জীব বাবু পুত্রের পঠন পাঠন সম্বন্ধে একটু খবর নেন। ছেলে কি পড়ছে বা না পড়ছে তা জানবার বা দেখবার জন্য অন্য কোনও সময় তাঁর হাতে থাকে না। একটু পরেই তাঁকে খেয়ে দেয়ে আবার নীচের অফিসে নেমে যেতে হবে। উপরে ফিরে আসতে কোনও কোনও দিন গভীর রাত্রও হয়েছে। প্রত্যূষে পুত্র তাঁর জেগে উঠে তাঁর দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখবার পূর্ব্বেই তাকে সরকারি কাজের জন্য নীচে নেমে যেতে হয়। পুত্রের দিকে একবার সকরুণ নেত্রে চেয়ে দেখে অন্যমনস্ক ভাবে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর স্ত্রীকে জানালেন, ট্রেণ তো বহুক্ষণ এসে পড়েছে। এখুনি প্রণব বাবু এসে পড়লো বলে। এক সঙ্গে খেতে বসবো আখুন। হয়তো এতোক্ষণ স এসেও পড়েছে। তাঁর কোয়ার্টারে একবার খোঁজ নিয়ে দেখছি : তুমি যাও—

মানুষের মন যখন অত্যধিক খারাপ থাকে, তখন প্রিয়জনের স্পর্শ বোধ হয় অধিকতর অসহনীয় হয়ে উঠে। স্ত্রীকে সুমুখ থেকে অন্তত: কিছুক্ষণের মত বিদেয় দিয়ে চিরঞ্জীব বাবু যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সৌভাগ্যক্রমে স্বামীর মন খারাপের কারণ সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তাঁর এই অসহনীয় অবস্থাকে আরও অসহনীয় করে তুলবার মত সারদামণির হাতে এইদিন পর্য্যাপ্ত সময় ছিল না। বহির্জগৎ সম্বন্ধে নিতান্ত অভিজ্ঞ প্রিয়তমা স্ত্রীকে তাঁর মন খারাপের কারণ সম্বন্ধে কোনও মনগড়া ঘটনার উল্লেখ করে রেহাই পাবার মত মনের অবস্থাও আজ যেন আর তাঁর নেই। নানারূপ প্রশ্ন দ্বারা তাঁকে উত্যক্ত করার জন্য তাঁর কাছে জেঁকে না বসে তাঁর প্রিয়তমার চলে যাওয়াটিই যেন তাঁকে একটা শান্তির প্রলেপ এনে দিলো। মন খারাপের কারণ সম্পর্কীয় ঘটনা সমূহের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যে আদপেই ওয়াকিবহাল নয় তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনও সান্ত্বনার বাণী শুনা বোধ হয় আরও পীড়াদায়ক। তাঁর এইরূপ মানসিক অবস্থায় একমাত্র প্রণব বাবুর মত লোকেই বোধ হয় তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শুনাতে পারে। এইজন্য অন্তরের সঙ্গে চিরঞ্জীব বাবুর মন মাত্র প্রণব বাবুকেই এই সময় কামনা করছিল। মানুষ যা মনে প্রাণে কামনা করে বহু ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন মত এসেও যায়। হঠাৎ কান খাড়া করে চিরঞ্জীব বাবু শুনলো, দরজার কলিং বেলটি ক্রিঙ ক্রিঙ করে বেজে উঠছে। তাড়াতাড়ি উঠে বেরিয়ে এসে চিরঞ্জীব বাবু দেখলেন যে ইতিমধ্যে প্রণব বাবু ষ্টেশন থেকে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে স্নান করে মধ্যাহ্নর আহারের জন্য তাঁদের কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এসে গিয়েছেন।

নীচের আফিসের মুন্সী বাবুদের কাছ হতে এই দিনের রিপোর্ট রুমের ঐ ঘটনা সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ প্রণব বাবু ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিলেন। সস্নেহে চিরঞ্জীব বাবুর কাঁধে হাত রেখে প্রণব বাবু সান্ত্বনার সুরে বলে উঠলেন নীচে এসেই সাহেবদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে কিছুটা শুনলাম। আমি হঠাৎ বাইরে না গেলে বোধহয় এতোটা হতে পারতো না। অন্তত: আমাদের বড় বাবুকেও সময় মত আমি রিপোর্ট রুমে হাজির করে দিতে পারতাম। বড় বাবু যে মাঝে মাঝে কাণ্ডজ্ঞান-হীন হয়ে পড়েন। অথচ তাঁকে বাঁচানোর জন্যেই আমাদের এতো দুর্ভোগ। তা না হলে ছোট সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিরোধের আর কি কারণ থাকতে পারে। সব কথা খুলে তাঁকে না বলার জন্যই না তিনি মিছামিছি আপনাকে সন্দেহ করছেন। এঁরা দেখছি মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে করতে চান না। আপনার সেই জোড়া বাগানের সিংহীর হুমকীর গল্পটাও শুনতে পেলাম। ইতিমধ্যেই দেখছি ব্যাপারটা সর্ব্বত্রই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তা এমন কথা যে শুনছে সে ওদেরই নিন্দে করছে। আমাদের আর কি? ওঁরা ওঁদের ওপরওয়ালাদের অনায়াসে ব্লাফ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নীচেওয়ালাদের তো তা তাঁরা পারেন না। এঁদের

প্রতিটি দুর্ব্বলতা তাঁদের ওপরওয়ালারা না জানতে পারলেও তা তাঁদের নীচের অফসারদের কাছে কোনও দিনই অজ্ঞাত থাকে নি। একদিন আমাদের হাতেও তাঁদের মত এইরূপ অসীম ক্ষমতা আসবে। কিন্তু সেদিন যেন এ'কথা আমরা না ভুলে যাই। এখন এঁদের অবসর গ্রহণ করা পর্য্যন্ত আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আসুন, ভেতরে আসুন। মন খারাপ করবেন না। ভুলে যাবেন না যে আমরা পুরাতন ও নূতন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। অন্য বিষয়ে ভিন্নমত হলেও এই একটি বিষয়ে আমি আমাদের বড়বাবুর সঙ্গে একমত।

যে অসদ্ব্যবহার একই ভাবে সকলকে সহ্য করতে হয় তার জন্যে ভুক্তভোগীদের কেউ কারুর কাছে সম্মানে ছোট হয়ে যায় না। পরস্পর পরস্পরের উপর প্রযুক্ত কটুবাক্য জানতে পারলে তা তাদের কাছে অপমানকর না হয়ে বরং শান্তির পর্য্যায়ে পড়ে। তবে তা তাদের গোষ্ঠির বাইরের কেউ না জানতে পারলেই হ'লো। ছোট সাহেব কিংবা বড় সাহেবকে তাঁদের কোন ওপরওয়ালার ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাঁবেদার অফসারদের গাল পাড়তে দেখলে তাঁরা বুঝে নেন তবে ওপরওয়ালাদেরও ওপরওয়ালা আছে—ঐটুকু যা তাদের সান্ত্বনা। বাঘ নাজেহাল করে তুলে নেকড়েকে। নেকড়ে অনুরূপ ভাবে খেদিয়ে বেড়ায় শৃগালকে। শৃগাল ইচ্ছা করলে খরগোসকে এই একই ভাবে বিব্রত করতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীই এই নিয়মের বশবর্ত্তী। এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে হস্তীর মত বলশালী হতে হবে। নয় তো গণ্ডারের মত শৃঙ্গের সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় তাদের অর্জ্জন করতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে হরিণ ও অশ্বজীবের মত পায়ের জোর। তাই যে ঐরূপ গালই তিনিও তাঁর উর্দ্ধতন অফসারের কাছ হতে একটু আগে খেয়ে এসেছেন। তবে পদমর্য্যাদা ভেদে ভাষার একটু তারতম্য হলেও হতে পারে। উপরন্তু তারা বুঝে যে ভুক্তভোগীদের মধ্যে তারা কেউ একা নয়, এই ব্যাপারে তার আরও অনুরূপ বহু দোসর আছে। এইরূপ অবস্থায় কটুবাক্যগুলি কালক্রমে তার তীক্ষ্ণতা ও দাহশক্তি হারিয়ে ফেলে। ওগুলো তখন অর্থহীন কয়েকটি উচ্চনাদ যুক্ত শব্দে মাত্র পরিণত হয়ে পড়ে। এই সব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা তাদের কাছে তখন একটা স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র মনে হয়। অন্যদিকে কটুবাক্যকারী উর্দ্ধতন অফসার নিজেই তাদের অধস্তন অফসারদের নিকট একটা উপহাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেন। কিন্তু এইরূপ এক চিত্তপ্রস্তুতি সময় ও অভ্যাস সাপেক্ষ। চিরঞ্জীব বাবু নবাগত বিধায় তখনও পর্য্যন্ত মনের এই অবস্থায় পৌঁছতে পারেন নি। তাই বিক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়েই চিরঞ্জীব বাবু প্রণব বাবুকে নিয়ে তাঁর ঘরের ভিতরকার চৌকিটার উপর পুনরায় বসে পড়লেন।

চিরঞ্জীব বাবুর মনের ভিতর তখনও পর্য্যন্ত আগুন জ্বলছিল। তাঁর যা কিছু প্রতিরোধ শক্তি তা বোধ হয় সম্পূর্ণ রূপেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। থেকে থেকে তাঁর মনের মধ্যে এসে পড়ছিল ছোট সাহেবের কয়েকটি কটূক্তি, জানো আমি জোড়াবাগানে একটা সিংহী বসে আছি। এখান থেকে হুঙ্কার দেবো আর দু'টা থানা কেঁপে উঠবে, থর থর। হঠাৎ আসা উত্তেজনার দ্বারা সঙ্কটিত প্রতিরোধ শক্তির অভাবের জন্য দ্বিধা বিভক্ত মনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে মানুষ সময় বিশেষে শিশুরও অধম হয়ে যায়। এই সময় উপহাসের বস্তুও তাদের নিকট বেদনাদায়ক হয়ে উঠে। এই সাধারণ সত্যটি কিন্তু চিরঞ্জীব বাবু এই দিন যেন বুঝেও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হঠাৎ এই সময় চিরঞ্জীব বাবু শুনতে পেলেন তাঁর শিশু পুত্রটি মেঝের উপর বসে তার পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত একটি সিংহ সম্পর্কীত কাহিনীই আপন মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে যাচ্ছে—পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রচুর সিংহ পাওয়া যাইত। প্রাচীন সাহিত্যে হিমালয়ের পাদদেশে সিংহের বহুল অবস্থিতির কথা জানা যায়। এক্ষণে ভারতবর্ষে কুত্রাপি আর সিংহ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে কেবলমাত্র গুর্জ্জর প্রদেশে তিনটি সিংহ বাস করে। পুত্রের মুখের এই কথা কয়টি কানে যাওয়া মাত্র চিরঞ্জীব বাবু হঠাৎ নেমে এসে পুত্রের কপালের উপরে এসে ঝুলে পড়া পাতলা সোনালী রঙের চুল মুঠি করে ধরে নেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, মাত্র গুর্জ্জর দেশে তিনটি সিংহ আছে কিরে? লেখ লেখ। গুর্জ্জর প্রদেশে তিনটি এবং জোড়াবাগানে একটি।

চিরঞ্জীব বাবুর শিশুপুত্র সঞ্জীবচন্দ্র পিতার নিকট হতে

এইরূপ ব্যবহার ইতিপূর্ব্বে কখনও পায়নি। সে পিতাকে খুসী করবার জন্যই এইদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার পাঠ্যপুস্তক হতে একটির পর একটি কাহিনী পড়ে শুনাচ্ছিল। সে হতভম্ব হয়ে ছল ছল চোখে চিরঞ্জীব বাবুর দিকে চাইতেই চিরঞ্জীব বাবুরও চোখে জল এসে গেল। তাঁর মন তখনই পুত্রকে কোলে তুলে নিতে চাইলেও প্রণব বাবুর সম্মুখে দুর্ব্বলতার পর দুর্ব্বলতা দেখাতে তাঁর কেমন যেন একটা সঙ্কোচ হলো। এতক্ষণে একটা প্রচণ্ড আঘাতে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর মনের স্বাভাবিক সত্তা ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে প্রণব বাবুর দিকে অসহায়ের মত চেয়ে রইলেন। চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর সকল কুণ্ঠা হতে মুক্ত করে প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর শিশু পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়ে চিরঞ্জীব বাবুকে ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠলেন, এ আবার কি রকম হলো? এ্যাঁ? দোষ করলো একজন আর শাস্তি হলো আর একজনের। এই না আপনি সেই দিন বড় গলা করে সুবিচারের ওকালতি করেছিলেন, বাঃ বাঃ! সহনশীলতার অভাব পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই। তা আপনার জুয়াড়ীদের মামলার ফল কি হলো। নিশ্চয়ই আপনার সেই উপকারী বন্ধুটির কোনও সুবিচার করা যায়নি। জরিমানা দিয়ে সে বেরিয়ে এলো, বা তাকে কয়েকদিনের মত জেলেই যেতে হলো।

চিরঞ্জীব বাবুও শেষের কথাটা কাণে যাওয়া মাত্র তার মনটা যেন আর একবার জোরে নাড়া দিয়ে উঠল। চিরঞ্জীব বাবু তার বুকের মধ্যে বেদনার উপর একটি নূতন ঝঙ্কার অনুভব করলেন, উপকারী বন্ধু সন্ন্যাসরামের বিচার তখনও শেষ না হলেও অবিচারের একটা আশঙ্কা তাঁর মনের মধ্যে থেকে থেকে খোঁচা দিয়ে উঠে। কিন্তু আজকের বেদনার কাছে সেই দিনের বেদনা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আজকের এই মুহূর্ত্তে তিনি কি এক ছেলেমানুষি করে বসালেন, তাঁর মনে হলো সর্ব্বপ্রথম তাঁর স্ত্রীর কথা, অবোধ পুত্রের প্রতি তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ জানতে পারলে তো সে আর এক অনর্থ বাঁধাবে। চিরঞ্জীব বাবু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

সৌভাগ্যক্রমে চিরঞ্জীব বাবুর স্ত্রী সারদামণি কাছাকাছি কোথাও ছিলেন না। রান্নাঘরের পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চিরঞ্জীব বাবু সলজ্জভাবে তাঁর একমাত্র পুত্রের গালটি সস্নেহে একটু নেড়ে দিয়ে প্রণব বাবুকে বললেন, কি আর বলবো প্রণববাবু! আজ রিজাইন দোবোই ভেবেছিলাম। কিন্তু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সঙ্কল্প আমাকে পরিত্যাগই করতে হলো। তাই-ই বোধ হয় প্রথমে ওর ওপরই আমার রাগ এসে গিয়েছিল। এখোন বুঝছি যে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত এই পুলিশ বিভাগে থেকে যাওয়ার জন্যই বোধ হয় আমার প্রতি ঈশ্বরের নির্দ্দেশ আছে। নিতান্ত ছাত্র অবস্থায় বিয়ে করেই না আমি এইরূপ বিপদে পড়েছি। আপনি কিন্তু প্রণব বাবু এখনও পর্য্যন্ত বিয়ে না করে ভালোই করেছেন। আর যা চাকরী আমাদের, ধ্যেৎ। পুলিশের লোকেদের বিয়ে করার মধ্যে কোনও যুক্তিই নেই।

কি সব আপনি বাজে কথা বলছেন, হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর করলেন। -যুক্তির সঙ্গে বিয়ে করার কি সম্পর্ক? তা ছাড়া যুক্তি তো খুঁজছে একটা উকিল। সে নিজে কিছুই বুঝে না। সে অপরকে বুঝায় মাত্র। আমার কমবাইণ্ড হ্যাণ্ডটির রান্না খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে যখন আপনাদের এখানে এসে সঞ্জীবের মার হাতে রান্না খাই, অন্ততঃ তখনকার মত তো মনে হয় যে বিয়ে একটা করে ফেলাই ভালো। তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপারে কোনও যুক্তি দেখিয়ে কেউ কখনও মুক্তি পেয়েছে বলে তো শুনিনি। অন্ততঃ স্বাভাবিক মানুষ সম্পর্কে এ'কথা আদপেই প্রযোজ্য ব'লে আমি মনে করি না। বিয়ে না করে যারা সংসার ধর্ম্মের দায় এড়াতে চায় তারা ভীতু শুধু তাই নয় তাদের অসামাজিক জীবও বলা যেতে পারে। অন্ততঃ এই সব ভীতু ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন নিউরটিক লোকদের পুলিশ বিভাগে স্থান হওয়া উচিত হবে না। মতান্তরে এদের স্কাউণ্ড্রেল বা আন-প্রোডাকটিভ বলে অভিহিত করলেও অন্যায় হবে না। আমি বিয়ে এখনও করি নি ব'লে যে তা কখনও করবো না, এমন কথা কিন্তু আপনাকে আমি কোনও দিনই বলি নি।

এমনি হাল্কা কথা-বার্ত্তার মধ্যে চিরঞ্জীব বাবুর মনও যে কখন হাল্কা হয়ে গিয়েছে তা তিনি টেরও পান নি। হঠাৎ পিছন হতে চুড়ির একটু ঠুনঠান আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে তাঁরা দেখলেন সারদামণি সহাস্য মুখে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সারদামণিকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর শিশু-পুত্রের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। কিন্তু ততক্ষণ পুত্র সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে পুনরায় হাসি ফুটে উঠেছে। আশ্বস্ত হয়ে চিরঞ্জীব বাবু ও প্রণব বাবু উঠে দাঁড়ালেন। প্রণব বাবুকে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতে দেখে সারদামণি বলে উঠলেন, খুব তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না শেষ করে ফেললাম। আবার এখুনি বার হতে ডাক এলে তো কাউরিই খাওয়া হবে না। আর সেই সঙ্গে আমাকেও সমুখে খাবারের থালা সাজিয়ে রেখে আপনাদের মতই সারাদিন উপবাসী থাকতে হবে। মাসের মধ্যে দিন দশেক তো এই রকম হয়ই। তা আর কি করা যাবে বলুন। আসুন, ভিতরে আসুন। সব তৈরি হয়ে গিয়েছে।

সারদামণি দেবীর সন্দেহ অমূলক ছিল না। তাঁর মুখের কথা কয়টি শেষ হবার পূর্ব্বেই দরজার বাইরে থেকে একজন সিপাহী প্রণব বাবুকে উদ্দেশ করে তার স্বভাবসিদ্ধ বাজখাঁই গলায় বলে উঠলো, হুজুর। বড় সাহেব থানা ভিসিটমে আ'গয়া। বড়ি বাবু আফিসমে হাজির নেহি হ্যায়। আপ আ'গয়া, উনকে আপকো বোলতা হ্যায়। সিপাহীজীর কথা কয়টি চিরঞ্জীব বাবুর স্ত্রী সারদামণি দেবীরও কানে পৌছিয়ে ছিল। সিপাহীর এই হাঁক ডাকে লজ্জিত হয়ে উঠে আপন মনে তিনি বলে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। পাপ মুখে আমার কি পোড়া কথা বার হয়েছিল! সত্য সত্যই কি তা'হলে আপনাদের আজ খাওয়া হবে না।

এই সময়ে বড় সাহেব থানা ভিজিটে এসেছেন শুনে প্রণব বাবু ও চিরঞ্জীব বাবু দু'জনাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে কখনও কখনও এইরূপ ব্যতিক্রম যে পূর্ব্বেও না হয়েছে তা'ও নয়। চিরঞ্জীব বাবুকে অপেক্ষা করতে বলে প্রণব বাবু জুতা দুটা পায়ে দিতে দিতে বলে উঠলেন, আপনি এখোন আর নামবেন না। আপনাকে দেখেই আবার হয়তো তিন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। আমি ওঁকে সামলে এখুনিই আবার ফিরে আসছি।

কোনও দিকে আর দৃকপাত না করে নেমে এসে প্রণব বাবু দেখলেন বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু ইতিমধ্যেই থানার ইন-চার্জ

অফসারের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটি দখল করে বসে রয়েছেন। সরকারী অফসার ধীরাজ বাবু দস্তখতের জন্য প্রয়োজনীয় রেকর্ড বহিগুলি তাঁর সম্মুখে একে একে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রণব বাবু ঘরে ঢুকে তাঁকে অভিবাদন করা মাত্র বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু তাঁকে সম্মুখের চেয়ারটিতে বসতে বলে স্মিত হাস্যে বলে উঠলেন, আসুন। আসুন, প্রণব বাবু। তাহলে এসে গেছেন আপনি। তা বৌমা ভালো আছেন? আর আপনার বাচ্চাটিও ভালো আছে তো! এ্যাঁ?

বড় সাহেবের এই অদ্ভুত প্রশ্নে প্রণব বাবু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনে হলো বোধ হয় তিনি অন্য থানার কাউকে মনে করে কথা বলছেন। একটু কিন্তু কিন্তু করে মাথা চুলকে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, কি বলছেন স্যার, আপনি। আমার বৌ বা বাচ্ছা তো নেই। আমি তো এখোনো বিয়ে থা কিছুই করি নি। প্রণব বাবুর এই উক্তি শুনে বড় সাহেব মহীন্দ্রবাবুও কম বিস্মিত হন নি। বিস্ময়ের ঝোঁকটা একটু সামলে নিয়ে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে হাতের মুঠি পাকিয়ে তিনি একবার তড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তার পর সজোরে চেয়ারের উপর তাঁর পাছাটা ঠুকে দিয়ে বসে পড়ে তাঁর বজ্রমুষ্টি দিয়ে টেবিলের উপর একটা ঘুঁষি মেরে বলে উঠলেন, কি-ই! এতো বড়ো আস্পর্দ্ধা তার। আমাকে মায় ডেপুটি সাহেবকে পর্য্যন্ত কিনা বোকা বানাবে। উঁ। আমি একটা সিংহী; উঁ। বাঘ সিংহীকে পর্য্যন্ত ভয় করে না। দাঁড়াও আমি মজা দেখাচ্ছি। ডিসঅনেষ্ট স্কাউণ্ড্রেল। বলে কিনা প্রণবের বৌএর প্রসব বেদনা হয়েছে। তাকে সে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আর কিনা এদিকে প্রণবের বিয়েই হয় নি। এ্যাঁ, দেখে নেবো তাকে আমি এখুনি।

প্রণব হতভম্ব। অফিসে উপস্থিত সকলেই হতভম্ব। আজ বড় সাহেবের কলমের একটি আঁচড়ে তাদের বড় বাবু সাসপেণ্ড হয়ে যাবেন। মামলা কঠিন। সাক্ষীসাবুত যথেষ্ট। এক প্রণব ও বড় সাহেবের সাক্ষ্যতেই বড় বাবু সাসপেণ্ড হয়ে যাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রেসিডিং সুরু হলে প্রণব বাবুকেই হয়তো করা হবে এক নম্বরের সাক্ষী। বড় বাবুর উপস্থিতিতে বড় বাবুর সামনে এমন সব কথা তাঁকে বলতে হবে যার জন্য বড় বাবুকে চাকুরী হতে একেবারে বরখাস্ত না করলেও তাকে কোনও এক নিম্নের পদে নাবিয়ে দেওয়া হবে। যে বড় বাবুর অধীনে প্রণব বাবুরা কাজ করছে সেই বড় বাবুকে তাদেরই পাশাপাশি তাদেরই একজনের মত হয়ে কাজ করতে হবে। পুলিশ অফিসার হিসেবে তাঁর যত দোষই থাক, প্রণব বাবুদের উপর তাঁর সদ্ব্যবহার ছিল আশাতীত। তাঁর আত্মীয় সুলভ ব্যবহারে অফসার হতে সিপাহী জমাদাররা পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু এখন উপায়? এখন উপায় কি? এখন বড় বাবুকে বাঁচাবার জন্যে যদি সে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয় তাহলে বড় বাবু তো বাঁচবেনই না, উপরন্তু তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নূতন প্রেসিডিং ড্র করা হবে। মিথ্যে বলার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ করারও কোনও অসুবিধে নেই। বড় বাবুর উপকারার্থে কয়েকটা মিথ্যা কথা বলতে প্রণব বাবু প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জলজ্যান্ত একটা বধূ নবজাত শিশুসহ সে এখুনিই তৈরী করে কি করে? তা ছাড়া হাতের তীর একবার বেরিয়ে গেলে তা ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব।

বড় সাহেব মহীন্দ্রবাবুর কিন্তু প্রণব বাবুর মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখবারও অবসর ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি কেতাব ক'টার পাতা কয়টায় একটা করে দস্তখত দিয়ে জেনারেল ডাইরীটা টেনে নিলেন। তারপর তার পাতায় পাতায় বড়বাবুর বিরুদ্ধে মস্ত একটা রিপোর্ট লিখে প্রণব বাবুকে বললেন, কাল সকাল আটটার মধ্যে এই রিপোর্টের একটা কপি আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবে। আমি কালই ওঁকে খতম করে দেবো।

প্রণব বাবুকে তাঁর শেষ আদেশ জানিয়ে বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু শান্তভাবেই উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে তাঁর রাগটা একেবারে পড়ে গিয়েছিল। অধিকক্ষণ অহেতুক ক্রোধ ধরে রাখবার তাঁর কোনও কারণ ছিল না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাম হাতে তাঁর চুলটা কপালের উপর থেকে একটু সরিয়ে দিলেন। তারপর রুমাল বার করে মুখটা পুঁছে নিয়ে বুক পকেটের ফাউনটেন পেনটা সোজা করে বসিয়ে নিলেন। আজ বিকালের দিকে কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। তাই নিয়মমত সন্ধ্যার দিকে থানা ভিজিটে না এসে তিনি এইদিন একটু সকাল সকালই এসে গিয়েছেন। ঠোঁট দুটো দাঁত দিয়ে আলতো ভাবে একবার কামড়ে তিনি একটু ভেবে নিলেন। তার পর শিশ দিতে দিতে যেমন প্রফুল্ল মনে এসেছিলেন, তেমনি প্রফুল্ল মনেই এই থানা থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সেকালে রাজারা এমনি করেই গর্দ্দান নেবার হুকুম দিয়ে অবলীলাক্রমে তাঁদের প্রমোদাগারে প্রবেশ করতেন। একালেও বিচারকরা তেমনি করেই ফাঁসির হুকুম দিয়ে হাসতে হাসতে চায়ের পার্টিতে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসেন। অভ্যাস মানুষের সুকাজ বা অকাজ সকল কাজই সহজ করে তুলে। তা না হলে স্বাভাবিক
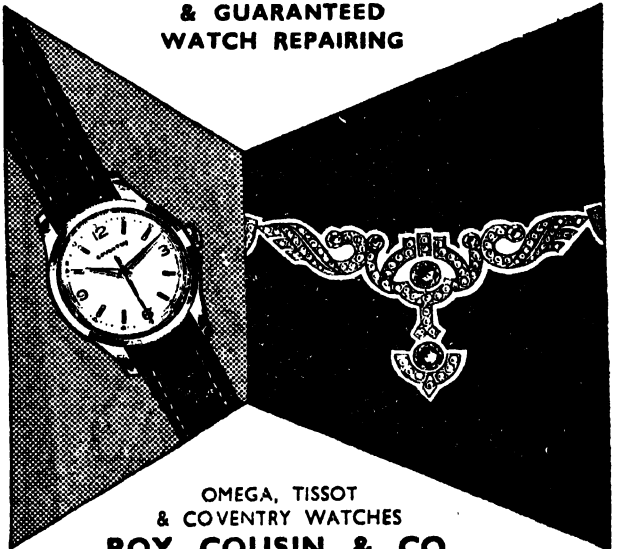
জীবন যাত্রা পালন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো। মানুষ দেহকে দুভাগ না করতে পারলেও সে তার মনকে তথা ব্যক্তিত্বকে দুভাগ কেন বহু ভাগে বিভক্ত করে নিতে সক্ষম। তাই মানুষের চরিত্রের বা মনের একটি দিকই তার সব দিক না। তাই কারুর মাত্র একটি দিক দেখে তাকে বুঝতে চেষ্টা করলে তাকে ভুলই বুঝা হবে। তাই প্রণব বাবু বড়সাহেবের উপর একটু মাত্রও বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং সশ্রদ্ধ ভাবেই তার প্রত্যাগমনের পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চল ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। এই দিনকার ঘটনায় প্রণব বাবু এমনিই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে অন্যদিনের মত এইদিন তাঁর পিছন পিছন ছুটে তাঁকে তাঁর মোটরে পৌছে সেলাম দিয়ে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে পর্য্যন্ত তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রণব বাবুর এই ভুল বা ত্রুটি বড়সাহেবের নজর এড়ায় নি। তিনি ফুটের উপর নেমে গিয়েই একবার থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হয়েছিল প্রণব বাবু বুঝি অন্য দিনের মত এই দিনও তার পিছন পিছন আসছেন। তিনি তাঁকে বারণ করবার জন্যই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পিছন ফিরে প্রণব বাবুকে না দেখে তিনি ঠোঁট বেকিয়ে ধীরে ধীরে মোটরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এতক্ষণে প্রণব বাবুরও সম্বিত ফিরে এসেছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে একি তিনি করলেন। কাঁচা খেকো ওরা। ভুল বুঝলেন না তো আবার। কথাটা মনে হবা মাত্র প্রণববাবু দৌড়ে গাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত এসে মাথা নীচু করে গাড়ীর ভিতরের দিকে চেয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, গুড নাইট, স্যার। কিন্তু তা আর তাঁর

বলা হলো না। সহসা তিনি দেখতে পেলেন বড় সাহেবের স্ত্রীও গাড়ীর মধ্যে বসে আছেন। অপ্রতিভ ভাবে প্রণববাবু দু' পা পিছিয়ে আসা মাত্র গাড়ীখানা হুস হুস করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে আসতে আসতে প্রণববাবু ভাবছিলেন, কিরে বাবা! বড় সাহেব আমাকে দেখেছে তো। না ভদ্রলোক মনে করলে আমি তাঁকে তাচ্ছিল্যই করলাম। প্রণববাবুর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। নিয়ত সম্মান পেয়ে পেয়ে এক সময় মানুষের মন সম্মান পাওয়া বা না পাওয়া সম্বন্ধে বোধ হয় অতিন্দ্রীয়তা লাভ করে। সামান্যতম অবহেলাও তখন আঘাতের আকারে তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করে অপরাধী-মন্য ব্যক্তিদের উপর তাঁদের প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে।

থানায় ফিরেই প্রণববাবু দেখলো চিরঞ্জীববাবু কখন নেবে এসে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। উপরের বারণ্ডার উপর একটা কাপড় শুকাচ্ছিল। সেই কাপড়খানা আড়াল করে তিনি লক্ষ্য করছিলেন, বড় সাহেব কখন চলে যান। বড় সাহেবের গাড়ী ষ্টার্ট দেওয়ামাত্র চিরঞ্জীব বাবু নীচের অফিস ঘরে নেমে এসেছেন। চিরঞ্জীব বাবুকে দেখে প্রণব বাবু অভিযোগের সুরে বলে উঠলেন, আচ্ছা চিরঞ্জীব বাবু। আপনিও তো আজ রিপোর্টে গিয়েছিলেন। বড় বাবু সেখানে আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন বা কি না বলেছেন তা'তো আমাকে আগে ভাগে জানিয়ে দিতে হয়। ওসব কথা শুনলে তো আজ আর আমি বড়ো সাহেবের সামনেই আসতাম না। আপনি শুধু বললেন যে বড় বাবু রিপোর্টে খুউব দেরী করে এসেছিলেন। দেখুন তো কি কাণ্ড হয়ে গেলো। এখন উপায় ?

যেখানে একক আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। সেখানে দলগত ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়। তাই কোনও এক ঘটনা ঘটামাত্র সে সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া এখানকার একটা রেওয়াজ। এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করে তারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। এইভাবে বুঝে সুঝে কথা বলে তারা বহু আসন্ন বিপদ এড়িয়েও যেতে পেয়েছে। এই নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য শুধু প্রণব বাবু কেন থানার প্রত্যেক অফসারেরই চিরঞ্জীব বাবুর উপর বিরক্ত হবার কথা। এইভাবে দলীয় স্বার্থ চিরঞ্জীব বাবু ক্ষুন্ন করবেন তা সকলের বিশ্বাসের বাইরে ছিল। তাই প্রণব বাবুর কথায় বিক্ষুব্ধ হয়ে চিরঞ্জীব বাবু উত্তর করলেন, বিশ্বাস করুন প্রণব বাবু। আমি এই ব্যাপার মাত্র এখন জানতে পারলাম। বাইরের অফিসে বসে থাকায় রিপোর্ট রুমের ভিতরের ঘটনা আমি একটুও জানতে পারিনি। তা' ছাড়া বড় বাবু আমাকে এ বিষয়ে কোনও রূপ সতর্কও করে দেননি।

সারা থানায় সিপাহী জমাদারদের মধ্যেও ইতিমধ্যে এই গণ্ডগোলের কথা মুখে মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছে। সকলেই তাদের বড় বাবুর বিপদের জন্য মনে মনে আতঙ্কিতও বটে। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ভাবছে বড় বাবু কখন থানায় ফিরে আসবেন। ঠিক এই সময় কোথা থেকে খবর পেয়ে বড় বাবু হন্তদন্ত হয়ে থানায় ফিরে এলেন। খুব সম্ভবতঃ থানারই কোনও বিশ্বস্ত অনুচর ট্যাক্সি করে তাঁকে খবর দিয়ে এসেছে। খুব সম্ভবতঃ সেই ট্যাক্সি করেই তিনি ত্বরিৎ গতিতে ফিরে এসেছেন। কাছাকাছি কোথা থেকে টেলিফোনেও তাকে খবর দেওয়া অসম্ভব নয়। বড় বাবু সোজা অফিসে এসে তাঁর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর সম্মুখের চেয়ারগুলিতে বসতে অনুরোধ করে বললেন, হুম।"

দোষ আমারই। তাঁ কি করে জানবো প্রণব আজই ফিরে আসবে। যাক ঠিক আছে। ভুল যখন আমিই করেছি তখন সেই ভুলের সম্মুখীন আমাকেই হতে হবে। বড় সাহেবের সঙ্গে আমার এইবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বাঁধলো। তাই এখন হতে তোমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে। কোনও কাজ কর্মে যেন ভুল ত্রুটি না হয়। অবশ্য ভুল মানুষের হবেই। যে সব ভুল সাধারণতঃ তিনি অগ্রাহ্য করতেন সেই সব ভুল এখন হতে হয়তো বড় করে ধরবেন যেখানে আগে লিখতেন ডাইরীগুলি লিখতে এতো কাটাকুটি করেছো কেন? এ ভেরি কেয়ারলেশ অফিসার। সেখানে এখন হয়তো তিনি লিখে বসবেন, ফলসিফিকেশন্ অব গভর্ণমেণ্ট রেকর্ড উইথ আলটেরীয়ার মোটিভ। তা বসে বসে পোকা বাছতে আরম্ভ করলে অনেক পোকা বার করে আনা যায়। আমার অফিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চেক করলে উনি যা পাবেন, ওঁর অফিস চেক করলে আমিও তাই পেতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ আমাদের যখন নেই তখন ওসব কথা এখন থাক। যাক্, এখন কিছুদিন তোমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে। এর কারণ আমাকে বাগে না পেলে তোমাদের তিনি ধরবেন শুধু আমার শাসন ব্যবস্থার দোষ ধরবার জন্যে। একবার মণ্ট মল্লিককে বলে রাত্রের দিকে বড়সাহেবের ওখানে একবার ঘুরে আসবো, আখুন। সহজে মিটে গেলে আর অযথা শক্তি ক্ষয় করবো না। কাল রববার আর পরশু ছুটি। দু'দিনতো সময় পাওয়া যাচ্ছে। তবে তুমি তোমার পূর্ব্বের ষ্টেটমেণ্টেই ঠিক করে থেকো। সকালে ডাইরী বইতে যা ছাই ভস্ম লিখেছে তা কপি করে ওঁর অফিসে পাঠিয়ে দিও। আমি এখন তা'হলে চলি—

বড়বাবু থানার বাইরে চলে গেলে প্রণব বাবু আপন মনে বলে উঠলো, বাবাঃ। মনের জোর বটে। ভয় ডর বা ভাবনার কোনও বালাই নেই ভদ্রলোকের মধ্যে। প্রণব বাবু অস্ফুট স্বরে কথা কয়টি উচ্চারণ করলেও তা চিরঞ্জীব বাবুর কানে গিয়েছিল। চিরঞ্জীব বাবুও যথাসম্ভব গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলে উঠলো, দেখবেন আখুন প্রণব বাবু। উনি সব ঠিক করে নেবেন। শুনেছি মণ্টু মল্লিক বড় বাবুর বিশেষ বন্ধু। ডিপুটী সাহেবের সঙ্গে তাঁর খাতির আছে। নেপথ্যে থেকে কলকাটি টিপে দিলেই হলো।

প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর এই স্বগতোক্তির কোনও উত্তর দিলেন না। চিরঞ্জীব বাবুর এই কথাগুলো তাঁর মনঃপুত হয়েছিল। তাই মনে মনে তিনিও কামনা করলেন, ভগবান। এই কথাই যেন সত্য হয়। তার পর একটু ভেবে নিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে তিনি চিরঞ্জীব বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন; আরে। দুটো যে বাজে। খেতে যেতে হবে না। আমাদের সঙ্গে উনিও কি উপোস করবেন। চলো চলো, উপরে যাই। কথা কয়টা বলে প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে সিঁড়ীর দিকে এগিয়ে চললো। তাঁর পিছন পিছন অপ্রতিভ ভাবে চললেন চিরঞ্জীব বাবু। সিঁড়ীর উপর উঠতে উঠতে তাঁর বারে বারে মনে হচ্ছিল। বাবাঃ! একটা জুয়া ধারার জন্য এতো কাণ্ড। কে জানে ভাগ্যে আরও কি আছে।

উভয়ে উপরে এসে দেখলেন চিরঞ্জীব বাবুর স্ত্রী খাবারের থালি দুটো ও পাশের বাটী কয়টা কয়েকটা পিতলের গামলা ও ঢাকনী দিয়ে ঢেকে রেখে গালে হাত দিয়ে মেঝের উপর চুপ করে বসে আছেন। তাঁকে এই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সলজ্জ ভাবে প্রণব বাবু বললেন, মাপ করবেন বৌদি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে। নীচে যে একটা অঘটন ঘটছিল তা চিরঞ্জীব বাবুর স্ত্রীর বুঝতে বাকি থাকে নি। খাবারের ঢাকনিগুলি এক একটি করে উঠাতে উঠাতে তিনি উত্তর করলেন, একি বলছেন আপনি বলুন তো। এ রকম কষ্ট কি আমার নূতন না কি? এর পর চিরঞ্জীব বাবুর দিকে ফিরে তিনি অনুযোগের স্বরে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি? ছিছি-ছি ছেলেটাকে মেরে গেছো। কেঁদে কেঁদে খেয়ে নিয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়লো। যাও ও'ঘরে গিয়ে ওকে একটু আদর করে তার পর মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসো। তোমার আর প্রণব বাবুর জন্য বাথরুমে জল সাবান তোয়ালে ঠিক করে রেখেছি। মাংসটা আর একবার না হয় গরম করে দিলাম। তবে ভাতটাত সব ঠাণ্ডাই খেতে হবে। তা' কি আর করা যাবে বলো। তা'ছাড়া এতে তো তোমরা অভ্যস্ত। যাক— [ক্রমশঃ।

বাসবো ভালো

সাধনা দেবী

আজিকে আমার নাইকো তেমন কিছু
সেই অতীত দিনে এসেছি ফেলে সব,
শুধু হৃদয়খানি করব অনুভব
আজি তোমায় ওগো বাসবো ভালো কিছু।

দেবীর বেশে যখন তুমি মায়ায় ছিলে ঢেকে—
রহস্য আর রূপের থেকে ছিলেম অনেক দূরে
হৃদয় শুধু থাকত ভুলে বেসুরো সব সুরে;
অন্ধকারে সেদিন দূরে ছিলেম তোমায় থেকে।

তোমার তরে জীবন ভ'রে চলেছি ভুলের পিছু
জোর ক'রেই কি শুভ-দৃষ্টির চোখ মেলাতে পারি?
যবে সকল দিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে করেছি মাথা নিচু—
পথের দিশা পেলেম তখন বাসনা অপসারি।

আজিকে আমার রিক্তমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা
দীনের বেশে শূন্য হাতেও হটবে না সে পিছু
বাহিরটুকু চায় না সে তো খোঁজে মনের কথা
এবার আমি তোমায় ভুলে বাসবো ভালো কিছু!
আজিকে আমার নাইকো তেমন কিছু!

ভবানী মুখোপাধ্যায়

বত্রিশ

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মার্কসীয় কম্যুনিজম সর্ব প্রথম ব্যবহারিক ভাবে পরীক্ষিত হল, কিন্তু বলশেভিকরা ইংলণ্ডের ক্যাপিটালিষ্টদের চাইতে তীব্র ভাবে আক্রান্ত হলেন সোস্যালিষ্টদের হাতে। ব্রিটিশ শ্রমিক নেতারা যা খুসী বলতে সুরু করলেন।

এর কিছু কাল পরে ফেবিয়ান সোসাইটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, বার্ণার্ড শ' সেই সভায় উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বল্লেন We are Socialists, The Russian side is our side যেহেতু আমরা সমাজবাদী আমাদেরই দল রুশ দল।

এই উক্তির পর সভাগৃহে অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। তারপর যখন সভার কাজ আবার সুরু হল, তখন আর সোভিয়েট সরকার সম্পর্কে কোনো কটূক্তি বর্ষিত হল না।

বার্ণার্ড শ' যখন রাশিয়ায় গেলেন তখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে Hearst Press of America বার্ণার্ড শ'কে অনুরোধ করেছিল তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাদের মারফৎ প্রচারের জন্য। বার্ণার্ড শ' এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বার্ণার্ড শ' জানতেন প্রাথমিক অবস্থায় সোভিয়েট সরকারের হয়ত কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু সারা পৃথিবীকে তা জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যখন লেডী এ্যাষ্টর প্রভৃতির সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণে যাত্রা করলেন তখন সোভিয়েট সরকারের প্রাথমিক ত্রুটি বিচ্যুতির কাল শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা তখন পরিপূর্ণ গরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

লর্ড লোথিয়ান (তখন ফিলিপকের) এক সন্ধ্যায় বার্ণার্ড শ'র বাস ভবনে এসে বললেন—লেডী এ্যাষ্টরের কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন, লর্ড এ্যাষ্টরও সঙ্গে যাবেন। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।

বার্ণার্ড শ' যেন এই চাইছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। রাশিয়া ভ্রমণের পক্ষে সেপ্টেম্বর অক্টোবর হচ্ছে প্রশস্ত। বার্ণার্ড শ' সম্প্রদায় গিয়েছিলেন জুলাই মাসে। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, এমন কি থিয়েটার ওপেরা সব বন্ধ।

বার্ণার্ড শ' স্বয়ং এই ভ্রমণের একটি বিবরণ লিখেছেন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসের Nash's Pall Mall Magazine নামক অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকায়, এই রচনাটি বার্ণার্ড শ'র কোনো গ্রন্থে সংযোজিত হয়নি। এ ছাড়া বার্ণার্ড শ' ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত উইনসটন চার্চিলের বার্ণার্ড শ' নামক প্রবন্ধে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি আলোচনায় কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেন, সেই রচনাটি Sixteen Self Sketches এর মধ্যে আছে। বার্ণার্ড শ'র রাশিয়া পর্যটনের বিবরণ মূলতঃ এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরিবেশন করা যাবে।

শ' বলেছেন, যাওয়া স্থির হওয়ার পর কেউ বলে না খেয়ে মরতে হবে, কেউ বলে গায়ে উকুন ধরবে, কেউ বলে শেষ পর্যন্ত কোতল (liquidated) করবে। সুতরাং এমন একটা নির্বোধের মত কর্ম না করাই শ্রেয়। দলের সমস্ত স্ত্রীলোককে জাতীয়করণ করা হবে আর তারা যা দেখাবে তাই শুধু দেখতে পাবে।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন, তাই অকুতোভয়ে এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়া গেল। যা কেউ করেনা তাই করাটাই ত' বাহাদুরী। সীমান্তে দেখলাম তোরণ শীর্ষে লেখা আছে Communism will do away with all frontiers. সীমান্তের গণ্ডি দূর করবে কম্যুনিজম। নিশ্চয়ই একদিন তাই হবে, তবে উপস্থিত এই তোরণ লিপি স্মরণ করিয়ে দিল পাসপোর্ট বার করতে হবে আর আমি রাশিয়ায় পৌছলাম।

যতটা ভয়ংকর এবং বিভীষিকাময় শোনা গিছল, আসলে সোভিয়েট ভূমি তেমন ভয়াবহ নয়। রাশিয়ায় অর্থ, পদমর্যাদা প্রভৃতি কোনো সম্ভ্রম উদ্রেক করে না, অর্থ না থাকলেও সমান সমাদর। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—I was certainly treated as if I were Karl Marx in person and given a grand reception in the Hall of Nobles, which holds 4000 people and was crammed.

রাশিয়ায় এক সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান সভার সম্বর্দ্ধনায় র‍্যাডেক, লুনাচারসকী, খালাটোক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বার্ণার্ড শ'র রাশিয়ার অনেক বিচিত্র বস্তু চমৎকার লাগল। রেল-ষ্টেশনের সঙ্গে প্রকাণ্ড হল সন্নিবেশিত করা হয়েছে আর সেই সব হলের প্রাচীরগাত্রে ভেনিসের scuola di San Rocco-র মতো সুন্দর দেয়ালচিত্র আঁকা রয়েছে, বার্ণার্ড শ' বলেছেন, এইগুলি 'রিলিজিয়স পেইনটিং' এবং সেই ধর্মের নাম মার্কসবাদ। তিনি সখেদে বলেছেন বিখ্যাত শিল্পী জি, এফ, ওয়াটস্ যখন লণ্ডন এ্যাণ্ড ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের লণ্ডন ষ্টেশনটি বিনা মূল্যে অলংকরণের প্রস্তাব করেছিলেন তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কর্তৃপক্ষরা মনে করেছিলন যে ব্যবসাগত সুবিধার চেয়ে এই ছবি দেখার জন্য ভবঘুরেরা ভীড় করবে। শ' মন্তব্য করেছেন, সোভিয়েট সরকারের বিচারবুদ্ধি অনেক উন্নত, তাই তাঁরা শিল্পীকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দান করে এই ছবি আঁকিয়েছেন।

রাশিয়ার শ্রমিক সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' বলেছেন—রেলের কাজ যারা করছে যেন ছুটিরবেলায় স্বেচ্ছাসেবক কথা বলতে বলতে একটি

তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!
সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা
২৫,০০০ টাকার
চমৎকার পুরস্কার!
২টী
প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার
ভেতর সারা ভারত
ভ্রমন বা নগদ
৪,০০০ টাকা
চারটী
২য় পুরস্কার
এইচ.এম.ভি.
রেডিওগ্রাম
৬টী
৩য় পুরস্কার
মার্ফী অল
ওয়েভ রেডিও
এবং একটি
করে হিন্দ এম্প্যাসডর
সাইকেল
২,০০০
অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার
রঙের বাক্স
বা
ডল্ পুতুল
অভিভাবকরাঃ আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সানলাইটের প্রতিটী মোড়ক পাঠিয়ে তারা সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।
এই প্রতিযোগিতা দুটী বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্য্যন্ত। এই দুটী বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অন্য পুরস্কার যারা পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।
তাড়াতাড়ি করো
শেষ তারিখঃ ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।
বিনামূল্যে আপনার সানলাইট বিক্রেতার কাছ থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে আসুন: প্রতিটী প্রবেশপত্রে একটী সুন্দর ছবি আছে তাতে আপনার ছেলেমেয়েদের রঙ লাগাতে হবে! যে রকম রঙ তাদের ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।
SUNLIGHT SOAP
অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক প্রস্তুত।
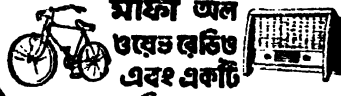
মালগাড়ি এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে এমন ছন্দোময় ভঙ্গীতে ট্রেনের কাজ করল যে মনে হল যেন ব্যালেনৃত্য দেখছি, রাশিয়ায় এই একটি ব্যালেনৃত্য দেখেছি।

বার্ণার্ড শ'র রাশিয়া ভ্রমণের প্রাক্কালে অনেকে তাঁদের ভয় দেখিয়েছিল যে সেখানে খাদ্যাভাব কিছুই জুটবে না। লেডী এ্যাষ্টর তাই প্রচুর টিনে সংরক্ষিত খাদ্যসম্ভার সঙ্গে নিয়েছিলেন, পরে সেগুলি বিলিয়ে দিতে হয়। শ' বলেছেন—রাশিয়ান খাদ্য পুষ্টির দিক থেকে আদর্শস্থানীয়। রাশিয়ানরা কালো রুটি (Black bread) আর বাঁধাকপির স্যুপ খেয়ে বেঁচে আছে জেনে পাশ্চাত্য জগৎ শিউরে ওঠে। তাদের সই অজ্ঞতা মাঠে মারা যাচ্ছে। আমাদের সাদা রুটির চাইতে কালো রুটি সহস্রগুণে ভালো। ক্যাবেজ স্যুপের নাম Stichi, তাতে ক্যাবেজ ছাড়া আরো অনেক কিছু বস্তু আছে, এক হিসাবে স্বচরথের প্রতিদ্বন্দ্বী। যাঁরা আঙুরের রস, দুধ বা লেবুর রসে জীবন ধারণের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেন, তাঁদের অনুরোধ জানাই রাশিয়া ভ্রমণে এসে ব্ল্যাক ব্রেড আর ক্যাবেজ স্যুপের স্বাদ গ্রহণ করতে। আরো অনেক পদ আছে, যেমন সব রকম পরিজের নাম Casha। কোষ্ঠবদ্ধরোগী পশ্চিমের গো-খাদকদের রাশিয়ান কালো রুটি আর ক্যাবেজ স্যুপ, আর সেই সঙ্গে চীজ আর মোটা শশা (রাশিয়ায় এই জিনিষটি প্রচুর পাওয়া যায়) যদি নিয়মিত ভাবে প্রভাতী খানা হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে তার মানসিক ও নৈতিক শক্তি লক্ষ্য করে শিউরে উঠবেন। এখন যেমন প্রতিবেশীর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিকে নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের হেতু মনে করে তাঁরা আতংকিত হয়ে ওঠেন।

বার্ণার্ড শ লিখেছেন যে রাশিয়ায় আব্রু বাঁচিয়ে থাকা শক্ত, যেমন ব্যারাকবাড়ি বা যুদ্ধ জাহাজের অবস্থা। স্তালিন যিনি রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক তিনি সপরিবারে মাত্র তিনখানি ঘরে থাকেন। অবশ্য হোটেল মেট্রোপোলে বার্ণার্ড শ' ঢের বেশী জায়গা পেয়েছিলেন হাত-পা ছড়িয়ে থাকার মতো। তিনি তাই বলেছেন, আমার মতো দরিদ্র সোস্যালিষ্ট লেখকের অদৃষ্টে যদি এই জোটে তাহলে হারসট বা রকফেলারের সইকরা চেকের বিনিময়ে কি না পাওয়া যাবে ?

একদিন পুলিস আদালতের বিরাট প্রাসাদে বেড়াতে গেলেন বার্ণার্ড শ'। সে বাড়িতে আরো অনেক সরকারী অফিস আছে। অবশেষে তিনি দেখলেন একটি ঘরে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে, একটি উঁচু টেবিলের ধারে জনৈক কর্মদক্ষ মহিলা বসে আছেন। প্রশ্ন করে শ' জানলেন তিনিই ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর দুপাশে বসে আছেন একজন পুরুষ ও মহিলা। তাঁরা দুজনে জনসাধারণের পক্ষে ন্যায় বিচার হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখছেন। সেই আদালতের কোথাও পাহারাওলা নেই। জানা গেল লোকটি একটি মাত্র শয্যার অধিকারী সেই জায়গায় একটা পুরা কামরা দখল করে রেখেছিল এই অপরাধ। কি শাস্তি হল তা আর বার্ণার্ড শ জানতে পারেননি, তিনি অন্য ঘরে গিয়ে আর একটি বিচার দেখতে গেলেন।

এই ঘরের ম্যাজিষ্ট্রেটও একজন মহিলা। তিনি রায়দানের পূর্বে বিশ্রাম কক্ষে ঢুকেছেন। বার্ণার্ড শ' শুনলেন যে এখানকার কেসটা বেশ গুরুতর। একটি মেয়ে গর্ভপাতের অপরাধে আগে শাস্তি পেয়েছিল, সে আবার সেই অপরাধ করেছে। অথচ এই কক্ষেও পাহারাওলা নেই, অপরাধী ও দর্শক চেনার উপায় নেই। শ' বিস্মিত হলেন। রাশিয়ার তখনকার আইনানুসারে দু মাসের গর্ভ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে গর্ভবতী মহিলারা গর্ভপাত ঘটাতে পারেন, তার জন্য লাইসেন্সধারী ডাক্তার আছেন। বিচারাধীন মামলার আসামী কোনো নীতিই মানেন নি, নিজের খুশীমত কর্ম করেছেন, তাই বিচার। ম্যাজিষ্ট্রেট অবিলম্বে দুজন জুরীসহ ফিরে এসে সুচিন্তিত রায় দিলেন। এক বৎসর কারাদণ্ড। বার্ণার্ড শ' ভাবলেন এইবার বোধহয় ওয়ার্ডার এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে। একটি স্ত্রীলোক দেওয়ালের ধারে এতক্ষণ বসেছিলেন তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আকাশের দিকে হাত তুললেন। তাঁর ভাষা বার্ণার্ড শ' বুঝলেন না। হয়ত সুবিচার হয়নি এই কথা বলতে চায়। তারপর মেয়েটি দীপ্ত ভঙ্গীতে বিচারসভা ত্যাগ করে চলে গেল।

সবিস্ময়ে শ' প্রশ্ন করলেন—ওকে কি কারাগার নিয়ে যাবে না ?

উত্তর হল—না, ওর কাজে ফিরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ এক বছর তাকে কোনো কারখানার কাজ করতে হবে, এই তার শাস্তি। থিয়েটার বা সিনেমা দেখার অধিকার নেই, রাতে বন্দী ক রাখা বে।

বার্ণা 'প্রাচীন চিত্র গ্যালারী, যাদুঘর প্রভৃতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। লেনিনগ্রাদ ও মস্কো শহরের এই সব সংগ্রহশালায় বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। রুশ বিপ্লবের ফলে যে এতটুকু লুঠতরাজ, গুণ্ডামি হয়নি এই দেখে বার্ণার্ড শ' অবাক। তিনি প্রদর্শকদের বললেন—তোমরা বিপ্লবী বলে বড়াই করো, আর এইসব অমূল্য সম্পদ লুঠতরাজ হয় না বিপ্লবের কালে ? কোনো রকম গুণ্ডামি বা লুঠ হয়নি ? পশ্চিমে হলে এর কিছুই থাকতো না। তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

গির্জাগুলি পর্যন্ত একেবারে অক্ষত।

বার্ণার্ড শ' লিখেছেন যে আমি ভেবেছিলাম লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানীর দল বড়ই কষ্টে আছেন। হয়ত দু বেলা দু মুঠো অন্ন জোটে না। তাঁরা হয়ত অবহেলিত অবজ্ঞাত। এঁদের প্রতিনিধিরা যখন বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁরা কেউ একখণ্ড সাবান বা একজোড়া পুরানো জুতা ভিক্ষা করলেন না। বার্ণার্ড শ'র কাছে লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজের চাইতে এঁদের আনন্দময় মনে হল। তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বললেন—আপনারা ত' লোক সম্প্রদায়, বিদগ্ধ সমাজভুক্ত (intelligentsia ?) তাঁরা অশ্রদ্ধা ভরে বললেন—রামো, আমরা ইনটেলিজেন্টসিয়া নই। বার্ণার্ড শ' বললেন—তা অবশ্য আমি জানতাম, অবশ্য রাশিয়ান সরকার তা জানেন কিনা জানতাম না। তাহলে আপনারা যদি ইনটেলিজেন্টসিয়া না হন তবে কি আপনাদের নাম এবং পরিচয় ?

তাঁরা জবাবে বললেন—আমরা ইনটেলেকচুয়াল প্রলেটারিয়েট। বুদ্ধিজীবি সর্বহারার দল।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন—এর নামই কম্যুনিষ্ট রীতি। যদি তাঁদের জঘন্য অপরাধের জন্য মানব সমাজের দরবারে হাজির করা হয় তবে দেখা যাবে তাঁদের সেই অপরাধই হচ্ছে একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবস্থা, নিজের হতভাগ্য দেশে ফিরে এসে আপনি সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন।

যে সংখ্যা Nash's Magazine-এ বার্ণার্ড শ'র এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যায় জি, কে, চেষ্টারটনের—The true. Sin of Bolshevism নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য, আমি সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি :

যে কোনো বিপ্লব প্রকৃত ঘটনার অনেক আগেই প্রাচীন হয়ে যায়। রুশ বিপ্লবের এই বিশেষ অসুবিধা। রুশ বিপ্লব অনেক দেরীতে ঘটেছে। এতদ্বারা এই কথাই বলতে চাই আসল মুহূর্তের অনেক আগে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত। সাম্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীর বস্তু, বিংশ শতাব্দীর নয়। শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্টরা কম্যুনিজমের আবির্ভাবের অনেক আগেই বিগত হয়েছেন। এদিক দিয়ে বিস্ময়কর ভাবে আমেরিকার বিপ্লব সৌভাগ্যবান, সে কালে শ্রেষ্ঠ রিপাবলিকানরা জীবিত ছিলেন, তখনই রিপাবলিকের জন্ম ঘটেছে। প্রকৃত যুগান্তকারী কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু তা তখন অসফল হয়েছে। আমার বাল্যকালে উইলিয়াম মরিস একটি কথায় কম্যুনিষ্ট আদর্শ প্রকাশ করেছেন—Fellowship is heaven and lack of fellowship is hell—যদি উইলিয়াম মরিসের কালে রুশ বিপ্লব ঘটতো তাহলে সারা পৃথিবীতে আনন্দরোল উঠত। আজ বলশেভিকবাদ সংখ্যাসঘদের ডিকটেটরশিপ মাত্র। এই কারণেই বার্ণার্ড শ' মস্কো ভ্রমণে যাওয়ার সময় খুসী হয়েছিলেন। বার্ণার্ড শ'র প্রগতি মানবিক, কিন্তু সে প্রগতি পিছনের দিকে। ঈগলপাখির মতো বার্ণার্ড শ' তাঁর মনোভংগী নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে গেছেন। তিনি আর আমি উভয়েই যখন বালক ছিলাম তখনকার স্বপ্ন সেইকালে সীমাবদ্ধ। বার্ণার্ড শ' আজো বালক থেকে গেছেন। কিন্তু একথা সত্য রাশিয়া ভ্রমণে বৃদ্ধ বার্ণার্ড শ' তাঁর পুরাতন স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন, সমাজ সরল ও সহজভাবে সেখানে সক্রিয়—যদি অবাধ স্বাধীনতার দুর্দমনীয় কামনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি অবশ্য তা চাই না।

প্রবন্ধটির মূল কথাগুলি মাত্র এইখানে উদ্ধৃত করা হল বার্ণার্ড শ'র বিশিষ্ট বন্ধু ও সমসাময়িক চিন্তানায়কের মত হিসাবেই প্রবন্ধটি মূল্যবান।

আর একজন এই Nash's Magazine এ ১৯৩৭ এ বার্ণার্ড শ'র জীবনী প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

Multitudes of well-drilled demonstrators were served out their red scarves and flags. The massed bands blared. Loud cheers from sturdy proletarians rent the welkin. এই লোকের নাম উইনসটন চার্চিল।

একথা বার্ণার্ড শ' হজম করার পাত্র নন। তিনি এর জবাবে লিখেছেন—এ নিছক কল্পনা মাত্র। ব্যাণ্ড নয়, পতাকা নয়, লাল চাদর নয়, পথের চীৎকার ও রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণকালে শুনিনি। আমি অবশ্য স্বয়ং কার্ল মার্কস সশরীরে হাজির হলে যে অভ্যর্থনা পেতেন তা পেয়েছি Hall of Noblesএ, সেখানে চার হাজার লোক ধরে। সেই কক্ষে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বক্তৃতাদি সংক্ষিপ্ত। লুনাচারসকি বক্তৃতা করলেন। তিনি এবং লিটভিনফ প্রায় সব সময়ে আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি আবিষ্কার করলাম যে সোভিয়েটবাদের বিস্ময়কর সাফল্য স্বচক্ষে দেখার সময় তাঁদের হয়ে ওঠেনি। যথাসম্ভব ভদ্রতা ও সৌজন্য আমার প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে অনাড়ম্বর ভাবে। এই সফরের চূড়ান্ত হয়েছে স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। যে সান্ত্রী ক্রেমলিনের দোরগোড়ায় আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল সেই একমাত্র সৈনিক সারা রাশিয়ায় আমার চোখে পড়েছে।

স্তালিনের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র এই সাক্ষাৎকার বার্ণার্ড শ'র অন্যতম জীবনীকার ভলতেয়ারের সঙ্গে ফ্রেডরিক দি গ্রেট বা নেপোলিয়নের সঙ্গে গ্যয়টের সাক্ষাৎকারের তুলনীয় বলেছেন।

তখনকার কালে স্তালিনের সঙ্গে কারো বড়ো একটা সাক্ষাৎকার ঘটতো না, এমন কি ব্রিটিশ বা মার্কিণ রাষ্ট্রদূতদেরও নয়। বার্ণার্ড শ'র দলবলের বেলায় কিন্তু একটু ব্যতিক্রম করলেন স্তালিন। লর্ড এ্যাষ্টর প্রভৃতি সকলেই এই সুযোগ পেলেন। এই ব্যবস্থায় বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। বার্ণার্ড শ' এই সাক্ষাৎকার করে নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে চান নি। স্তালিনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। লর্ড এ্যাষ্টর সব ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন—স্তালিনের অদম্য রসজ্ঞান ছিল। তিনি রাশিয়ান নয়, সুদর্শন জর্জিয়ান। স্তালিনের আকৃতি যেন পোপ আর ফিল্ড মার্শালের সংমিশ্রণ। স্তালিন আমাদের যা বলার আছে সব উজাড় করে দেওয়ার সুযোগ দিলেন। তারপর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন। তার এক বর্ণও বুঝলাম না। শুধু 'Wrangel' কথাটি বোঝা গেল, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে সব জেনারেলকে ইংলণ্ড লেলিয়ে দিয়েছিল তাঁদের অন্যতম। স্তালিন খুসিতে উপছিয়ে পড়ছিলেন। তবে দোভাষী ভয়ে এমনই তটস্থ যে তার কম্পমান ওষ্ঠে সে শব্দমাধুরী উপভোগ করা গেল না। লিটভিনফ না থাকলে আমরা এতটুকু অনুবাদ পেতাম না।

লেডী এ্যাষ্টর স্তালিনকে বলেছিলেন—সোভিয়েটেরা শিশুপালনের কিছু জানে না।

স্তালিন জানতেন, রাশিয়ার সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। এই কথা শুনেই তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, তিনি বজ্রনিনাদে যেন বলে উঠলেন—ইংলণ্ডে ত' শুনেছি আপনারা ছেলেদের প্রহার করেন।

লেডী এ্যাষ্টর দমবার বা ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়। শিশুপালন শিশুকল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁর নখাগ্রে। শিশুকল্যাণে তাঁর অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। তিনি স্তালিনকে বললেন—আপনি কোনো সহৃদয় রমণীকে লণ্ডনে পাঠাবেন, আমি তাঁকে সযত্নে শিখিয়ে দেব কিভাবে পাঁচ বছরের শিশুদের পালন করতে হয়।

স্তালিন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন এই প্রলয়ঙ্করী রমণী সত্যই হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারেন। একটি খাম নিয়ে তিনি তার ওপর লেডী এ্যাষ্টরের ঠিকানা লিখে দিতে অনুরোধ করলেন।

এই ঘটনাটি স্তালিনের ভদ্রতার পরিচায়ক মনে করলেন বার্ণার্ড শ' এবং তাঁর দলের সবাই। ভদ্রতার খাতিরেই হয়ত ঠিকানা রাখলেন তারপর কেউ আর কোনো খবরই করলেন না হয়ত।

কিন্তু এই দেশের নাম রাশিয়া। লেডী এ্যাষ্টর একজন মহিলা পাঠাতে বলেছিলেন, তিনি লণ্ডনে পা না দিতেই স্তালিন প্রায় বারোজন মহিলাকে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

লেডী এ্যাষ্টরের সঙ্গে বিতর্কের পর লর্ড লোথিয়ান আলোচনা সুরু করলেন। তিনি ইংলণ্ডের উদারনীতিক বুদ্ধিজীবিদের দুর্দশার প্রসঙ্গ তুললেন। সেই দলের দক্ষিণপন্থী যোগ দিয়েছেন সংরক্ষণশীলদের সঙ্গে আর বামপন্থীরা ভাসছেন অকূলে। ব্রিটেনে লেবরপার্টির দ্বারাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ব্রিটিশ রাজনীতির বহুবিধ সমস্যার কথা।

বেশ চলছিল, সহসা লর্ড লোথিয়ান বললেন—পোলিটব্যুরোর উচিত লয়েড জর্জকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ করে এনে রাশিয়ার উন্নতি দেখানো। এই প্রস্তাবে স্তালিন হাসলেন।

স্তালিন হেসেই বললেন—সেটা ঠিক সম্ভব হবে না, মাত্র দশ বছর আগে রুশ বিদ্রোহে লয়েড জর্জের ভূমিকাটি প্রীতিকর ছিল না, জেনারেল র‍্যাংগেল সেইকালে লালফৌজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেছেন। তাঁকে তাই সরকারী ভাবে আমন্ত্রণ জানানো যায় না, তবে তিনি যে কোনো সময় বে-সরকারী ভ্রমণকারী হিসাবে এলে সব কিছুই দেখতে পাবেন।

এইবার সর্বপ্রথম বার্ণার্ড শ' কথা বললেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—উইনসটন চার্চিলকে কি আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব!

স্তালিন এইবার বললেন—মিঃ চার্চিলও এইভাবে আসতে পারেন। তাঁকেও সব সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা আবার তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এই কৃতজ্ঞতার কারণটুকু বড় মজার। সে রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন বার্ণার্ড শ' হেসকেথ পীয়রসনের কাছে। চার্চিল লাল ফৌজের জুতা, সাজ পোষাক আর বন্দুক সরবরাহ করেছেন। চার্চিল যখন সেক্রেটারী অব ওয়ার তখন এক শত কোটির ওপর মুদ্রা পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নেন। রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লবী দলের সাহায্যে। বলশেভিকদল বিজয় লাভ করে বৃটেনের সেই টাকায় জামা-কাপড়, অস্ত্র ইত্যাদি কিনেছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারের মূল গায়েন লর্ড এ্যাষ্টর তখন স্তালিনকে বোঝাতে সুরু করলেন—যদিও ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সোভিয়েট বিরোধী, ইংলণ্ডে সোভিয়েটের প্রতি যথেষ্ট শুভেচ্ছা আছে। ভবিষ্যতে সখ্যতামূলক বোঝাপড়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে।

বার্ণার্ড শ' এই সময় স্তালিনকে প্রশ্ন করলেন—আপনি ওলিভার ক্রমওয়েলের নাম শুনেছেন?

স্তালিন লিটভিনফের সঙ্গে আলোচনা করে ক্রমওয়েল বৃত্তান্ত জেনে নিলেন। লিটভিনফ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—এই সূত্রে সে কথা বলার অর্থটা তেমন স্পষ্ট হল না।

বার্ণার্ড শ' বললেন—উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলি, আয়ার্লাণ্ডে ওলিভার ক্রমওয়েল সম্পর্কে একটি গাথা প্রচলিত আছে। ক্রমওয়েল তাঁর সেনাবাহিনীকে নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন—

> Put your trust in God, my boys,
> And keep your powder dry.

অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করলেন স্তালিন। ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে বললেন—রাশিয়ার বারুদ যথেষ্ট শুখনো রাখা হবে!

বার্ণার্ড শ' বলেছেন—স্তালিনের রসজ্ঞান আগাগোড়াই বেশ স্পষ্ট ছিল। তিনি হাসতে পারেন, হাসতে জানেন। এর পর আমরা আধঘণ্টারও কিছু সময় বেশী ছিলাম, আমাদের ঘড়িতে দেখলাম দু ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট পার হয়ে গেছে।

সোভিয়েট দেশ ভ্রমণ কালে বার্ণার্ড শ'র মনোভংগী নিঃসন্দেহে সোভিয়েট সরকারের প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিল। তাঁর ধারণা এই বিরাট পরিবর্তনে তাঁর ভূমিকা কম নয়। তিনি বলতেন—I always regard myself as the real author of the Russian Revolution because I said that the best thing the soldiers could do in the 1914-18 war was to shoot their officers and go home; and the Russians were the only soldiers who had the intelligence to take my advice.

তা ছাড়া চেষ্টারটন যা বলেছেন তাও ঠিক, বার্ণার্ড শ' মস্কো সফরে তাঁর জীবনের স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন, তাই তাঁর আনন্দ শিশুর মতো।

যাওয়ার সময় সার্লোট শ' লেডী এ্যাষ্টরকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন শ'র প্রতি নজর রাখতে, কারণ বার্ণার্ড শ' ছাড়া পাওয়া শিশুর মতো আশপাশের অবস্থা বিস্মৃত হয়ে যা খুসী করে ফেলতে পারেন, নিজের শরীরের প্রতি অবহেলা করে ঘুরে বেড়াতেও পারেন। কথাটি ঠিক, ব্রাসেলসে বার্ণার্ড শ' সহসা দলভ্রষ্ট হয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলেন, লেডী এ্যাষ্টর ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে আনেন। বার্ণার্ড শ' বলেছেন আমাকে কার্ল মার্কসের সম্মান দিয়েছে রাশিয়া। লেডী এ্যাষ্টর বলেছেন—They received him as if he had been God, we were just no bodies, he was the great man—বার্ণার্ড শ' অবশ্য সকলের সমান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন।

বার্ণার্ড শ' ইংলণ্ডে ফিরে আসার পর তাঁর মস্কো সফরের সবটুকু বাদ দিয়ে যে সংবাদ ইংরাজ ও মার্কিণ সাংবাদিকরা প্রচার করল,—তা অতি হাস্যকর। লেডী এ্যাষ্টর নাকি রাশিয়ায় বার্ণার্ড শ'র দাড়ি ধুইয়ে দিয়েছেন।

বার্ণার্ড শ' স্বয়ং এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন—রাশিয়ায় সাংবাদিকের ভীড় এসে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ওপর উৎপাত করে না, এ পশ্চিমের ব্যাধি। তিন রাত্রি তিন দিন ট্রেণে কাটানোর পর আমাদের স্নানের প্রয়োজন হয়। লেডী এ্যাষ্টরের কাছে প্রয়োজনীয় সাবান ছিল। আমি তাঁকে যখন বললাম, আমার সার্ট যে ভিজে গেল। তিনি বললেন—খুলে ফেলুন। আমি কোমর পর্যন্ত খুলে ফেললাম আমার সার্ট। আমরা মগ্ন হয়ে কথা বলছি, গা মুছছি, আশপাশে তাকাইনি। সহসা কলরবে সচকিত হয়ে দেখি আশপাশে ভীড় জমে গেছে, সবাই আমাদের দেখছে। তারা রিপোর্টার নয়, সঙ্গে ক্যামেরাও ছিল না। তবে মেট্রোপোল হোটেলের সমস্ত কর্মচারী এবং মস্কো সহরের বোধ করি যথাসম্ভব লোক ভীড় করে এই দৃশ্য দেখছে। যতদূর জানি এর জন্য অবশ্য কোনো প্রবেশ-মূল্য আমরা দিইনি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করি নিম্নলিখিত কথোপকথনে। বার্ণার্ড শ' লিটভিনফকে প্রশ্ন করলেন—Now tell me honestly would not you rather not have had a revolution at all?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লিটভিনফ উত্তর দিলেন—My whole

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির মূল প্রতিযোগিতার খেলা গত ১৫ই অক্টোবর থেকে আসামের নওগাঁ সহরে সুরু হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বিজয়ী আটটি দল আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দুইটি গ্রুপে লীগের ভিত্তিতে সেমিফাইন্যাল পর্য্যন্ত খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। সেমিফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে 'নক আউট প্রথায়। প্রথম গ্রুপে গত বৎসরের বিজয়ী বাঙ্গলা, অন্ধ্র প্রদেশ (পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ নামে খ্যাত), বিহার প্রদেশ এবং দ্বিতীয় গ্রুপে বোম্বাই, সার্ভিসেস আসাম ও কেরালাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম গ্রুপের খেলায় বাঙ্গলা দল অপরাজিত থাকিয়া শীর্ষস্থান অধিকারীর সম্মান অর্জ্জন করে। প্রত্যেক খেলায় তাহারা উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন এবং এ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত খেলায় তাদের বিরুদ্ধে কোন গোল হয় নাই। শেষ খেলায় বাঙ্গলার কাছে পরাজিত হওয়ায় অন্ধ্র এই গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিহার দুই পয়েণ্ট ও উত্তর প্রদেশ কোন পয়েণ্ট না পাওয়ায় তাহারা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

দ্বিতীয় গ্রুপে বোম্বাই আসাম ও কেরালার বিরুদ্ধে জয়ী হইলেও গতবৎসরের রানার্স আপ সার্ভিসেস দলের সঙ্গ অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করতে বাধ্য হয়। সার্ভিসেস দল কেরালার বিরুদ্ধে জয়ী হইলেও আসামের সহিত পয়েণ্ট বণ্টনে বাধ্য হওয়ায় তাহারা মাত্র চারিপয়েণ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই গ্রুপে বোম্বাই ও সার্ভিসেস দল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় তাহারা সেমিফাইন্যালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। সেমিফাইন্যালের খেলায় বাঙ্গলা সার্ভিসেস দলের এবং বোম্বাই অন্ধ্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

এই বৎসর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় বিভিন্ন দল বেশ উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত যে কোন দল খেলায় বিজয়ীর আখ্যা লাভ করবেন, বলা যায় না। তবে বাঙ্গলা দল যে চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অক্ষুন্ন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তা বলাই বাহুল্য।

আরতি সাহার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

বাঙ্গলা তথা ভারতের প্রথম মেয়ে-প্রতিনিধি কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। শুধু ভারত নয়, এশিয়ার প্রথম মেয়ে-প্রতিনিধি হিসাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে তিনি যে ভারতের সম্মান বাড়িয়েছেন, তার জন্য প্রতিটি ভারতবাসী গর্ব্ববোধ করবে। কুমারী আরতি সাহা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েও একাগ্র সাধনা অটুট মনোবল ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে যে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন, তা সকলের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে।

আরতি সাহা এখন সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক কলার ছাত্রী। সাঁতারে এই অসামান্য সাফল্য অর্জ্জনের জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর সঙ্গে আমরাও তাঁকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

সিংহল সফরে ভারতীয় ভলিবল দলের সাফল্য

ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা ভলিবল দল সিংহলে টেষ্ট খেলায় 'রাবার' লাভ করিবার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। মহিলা দল উপর্য্যুপরি টেষ্ট খেলায় সিংহলকে পরাজিত করে। পুরুষ দল প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে। শেষ টেষ্ট খেলাটি পর্য্যাপ্ত আলোর অভাবের জন্য পরিত্যক্ত হয়। পুরুষ ও মহিলা দল সকল স্থানেই খেলায় প্রাধান্য প্রকাশ করে। তাহারা মোট ৩০টি খেলায় অংশগ্রহণ করিয়া সকল খেলায় অপরাজিত থাকিয়া সফরের নূতন রেকর্ড করেন।

গারফিল্ড সোবার্সের বিরুদ্ধে সমন জারী

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খ্যাতনামা টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্সের বিরুদ্ধে ষ্টাফোর্ডসায়ারের বিচারালয় হইতে কোর্টে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারী করা হইয়াছে। অভিযোগে তাঁহাকে বেপরোয়া গাড়ী চালাইয়া মৃত্যু ঘটাইবার বিষয় জবাব দিহি করিতে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় উক্ত দুর্ঘটনায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খ্যাতনামা টেষ্ট খেলোয়াড় কোলি স্মিথ মারা যান এবং কয়েকজন খেলোয়াড় গুরুতর রূপে আহত হন।

লক্ষ ডলারের চুক্তি

প্রাক্তন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের মিস এ্যলথিয়া গিবসন ও ফ্লোরিদার ক্যারন হ্যারগমও পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত দুইজনে চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নব্বুইটি সহর পরিভ্রমণ করে পরস্পরের সঙ্গে টেনিস খেলবেন। বিখ্যাত বাস্কেট বল দল হারগেম গ্লোবটটার্সের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বাস্কেট বল খেলার আগে প্রদর্শনী টেনিসে অংশগ্রহণ করবেন। চুক্তি অনুসারে গিবসন প্রায় এক লক্ষ ও হ্যারগ্রেস ত্রিশ হাজার ডলার পাবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে জ্যাক ক্রেমারের দলভুক্ত সেরা পুরুষ পেশাদার খেলোয়াড় রিচার্ড গনজালেসও এ্যলথিয়া গিবসনের মত এত অধিক পরিমাণ পারিশ্রমিক পান না।

Of all liars, the smoothest and most convincing is memory. —*Olin Miller*

রাজভাষা

বাঙলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে, গঠনের ক্ষেত্রে, পুষ্টির ক্ষেত্রে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অবদান অনস্বীকার্য। আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য যে স্থানে উপনীত হতে পেরেছে তার মূলে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কৃতিত্ব যে কতখানি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। সুলভ মূল্যে সাহিত্যের প্রচার করে সর্বসাধারণকে সাহিত্যের অমৃতরস আস্বাদন করানোর যে মহৎ সঙ্কল্প বসুমতী সাহিত্য মন্দির একদা গ্রহণ করেছিলেন আজও তার বিরাম নেই। "রাজভাষা" বসুমতীর প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা পরমভট্টারক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য শিষ্য স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য কীর্তি যার মূল্যায়ন সহজসাধ্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজী ভাষার প্রসার বা তাৎপর্য আজ জগৎজোড়া, বিশ্বসভ্যতায় ঐ ভাষার দানও অসীম, তা ছাড়া ঐ ভাষায় সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ অপরিহার্য ও শ্রেষ্ঠ অংশ রূপ পেয়েছে সুতরাং ঐ ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনার ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থটি এক অনন্যসাধারণ সহায়ক—একটি গ্রন্থের মধ্যে সমগ্র ভাষাটিকে সহজ সরল ও বিস্তারিতভাবে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তুলে ধরেছেন উপেন্দ্রনাথ। ভাষা শিক্ষার্থীদের দল এই গ্রন্থটি থেকে বহুল উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থটি আয়ত্তে থাকলে ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে পারদর্শী হওয়ার কোন অসুবিধা বা বাধা থাকতে পারে না এ বিশ্বাস আমরা পোষণ করি। ইংরাজী ব্যাকরণ, শব্দাদির উচ্চারণ, শব্দের ব্যবহার, প্রয়োগ-প্রণালী, পত্র রচনার কৌশল, সাঙ্কেতিক চিহ্ন, বানান শিক্ষা, কথোপকথন ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাঞ্জল আলোচনা ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে সকলপ্রকার অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে ঐ ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আলোক বিকীরণ করে। প্রকাশক—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

শুভনির্মাল্য

বাঙলা তথা ভারতের অবিস্মরণীয় কবিদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন একটি বিশেষ নাম। গত শতাব্দীতে বাঙলা কাব্যের নবরূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছিল যে কীর্তিমান সন্তানদের সাধনায় নবীনচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। বাঙলাদেশের কাব্য জগতে তাঁর বিরাট অবদানের ইতিবৃত্ত ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। নবীনচন্দ্রের লেখনী কেবলমাত্র কাব্য সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর লেখনী থেকে নাটিকাও জন্ম নিয়েছে। শুভনির্মাল্য গীতিনাট্যটি তাঁর নাটিকা রচনায় দক্ষতার চিহ্ন বহন করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পুত্রের বিবাহোৎসব উপলক্ষে গীতিনাট্যটি রচিত হয়। বিবাহোৎসবকে পটভূমিকা করেই গীতিনাট্যটি রূপ পেয়েছে। নবীনচন্দ্রের জীবনী, সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে এতাবৎ অনেক আলোচনাই হয়েছে কিন্তু সার্থক গীতিনাট্যকার হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি বললেই চলে। বলা বাহুল্য মাত্র যে বাঙলা সাহিত্যের তৎকালীন মানানুসারে শুভনির্মাল্যকে বিচার করলে দেখা যাবে যে শুভনির্মাল্য এক অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি। মহাকবির দেহান্তের অর্ধ শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হবার পর সম্পাদনকারী শ্রীদীপককুমার সেন এই সর্বসমাদৃত অথচ প্রায় বিস্মৃত গ্রন্থটি পাঠক সমাজে নতুন করে উপহার দেওয়ার জন্যে সকলের ধন্যবাদ লাভ করবেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চির প্রণম্য লোকান্তরিত সাহিত্য রথীদের এই জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থগুলিকে বিস্মৃতির অতল অন্ধকার থেকে যত উদ্ধার করা যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এদের প্রসার ও প্রচারের ব্যাপকতার দিকে যত্নবান হওয়ার সময় এসেছে। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর ভূমিকা রচনা সম্পাদিত গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক নবীনচন্দ্র গ্রন্থাগার, ৪৪-২, ক্লাইভ কলোনী, কলিকাতা—২৮। দাম আট আনা মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ

উনবিংশ শতাব্দীর কাছে বাঙালীর ঋণ অপরিশোধনীয়। উনবিংশ শতাব্দী সর্ববিষয়ে যে ভাবে বাঙালীকে ভরিয়ে তুলেছে অন্যান্য শতাব্দীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার জাতীয় জীবনে নবজাগরণের এক জোয়ার এল—তার ফলেই বাঙালীর মননভূমি হতে লাগল উর্বর থেকে উর্বরতর। বিভিন্ন মনীষী, চিন্তানায়ক, দিকপালবৃন্দের শুভ আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। উপরোক্ত পটভূমিকা অবলম্বন করে বাঙলাভাষায় এতাবৎ অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য—খ্যাতনামা কবি ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের গ্রন্থটিও উপরোক্ত পটভূমি অবলম্বন করেই রচিত। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থটি যথেষ্ট পরিমাণে নিজস্বতা, বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তার দাবী রাখে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখকের আলোচনার পরিধি। গ্রন্থটি রচনায় লেখককে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, বলা বাহুল্য সমগ্র গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি সাহিত্যানুরাগী ও ছাত্র সাধারণকে যুগপৎ ভাবে আনন্দ দেবে ও উপকৃত করবে। বাঙালীর নবজাগরণের অন্তর্নিহিত মূলসূত্রটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও লেখক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮০১ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম আন্দোলন সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সুবিস্তৃত

আলোচনা গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশক—এ মুখার্জী য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—সাত টাকা মাত্র।

রম্যাণি বীক্ষ্য (সৌরাষ্ট্র পর্ব)

ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে একদিকে বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে বৈচিত্র্য। সরস্বতীর উপাসকদের কল্যাণে ভারতমৃত্তিকার মহিমা লিপিবদ্ধ হল সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি হল ভ্রমণ কাহিনী। তারপর একাধিক লেখকের অবদানে এই বিভাগটি পুষ্টিলাভ করে চলেছে। ভ্রমণ-কাহিনীর উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে সুসাহিত্যিক সুবোধকুমার চক্রবর্তীর নাম অনুল্লেখ্য নয়। তাঁর রম্যাণি বীক্ষ্য প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া জাগিয়েছিল সাহিত্যজগতে। বর্তমানে রম্যাণি বীক্ষ্যের সৌরাষ্ট্র পর্বটি প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যে ভ্রমণ-কাহিনীর যে একটি বিশেষ আসন স্বীকৃত সুবোধকুমার চক্রবর্তী সেই আসনেরই মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করলেন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে। রচনার প্রসাদগুণে সমগ্র গ্রন্থটি যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি সারবান, তাৎপর্যপূর্ণ এবং অতীব সুখপাঠ্য। কয়েকটি আলোকচিত্রও গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। বর্ণনা যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই সাবলীল। বর্ণনভঙ্গী এবং রচনাশৈলী পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করবার যথেষ্ট শক্তি রাখে। গ্রন্থটির ইতিহাস মূল্যও অসীম। প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে লেখক গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছেন। গ্রন্থের আঙ্গিকটিও গতানুগতিক নয়। ভ্রমণ-কাহিনী হলেও গ্রন্থটি উপন্যাসগন্ধী। টুকরো টুকরো সংলাপের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস বর্ণনায় লেখক অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক এ, মুখার্জী য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম ছ'টাকা মাত্র।

জাতিস্মর কথা

জাতিস্মরবাদ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। জীবিত মানুষের মুখে তার গত জন্মের ইতিকথা আজও যে পরিমাণ বিস্ময় সঞ্চার করে তার তুলনা মেলা ভার। বিগত জীবনের পরিচয়, কাহিনী, ঘটনাবলী সম্বন্ধে দুর্বার কৌতূহল এক চিরন্তন প্রশ্নের রূপ নিয়ে মানব মন অধিকার করে আছে। জাতিস্মরবাদ নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়ে গেছে, অসংখ্য গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে তবু মানব মনের এই কৌতূহলের ক্ষুধা মেটে নি, তাতে ভাঁটা পড়ে নি, তা এখনও অফুরন্ত। এই জাতিস্মরবাদ সম্বন্ধেই উপরোক্ত গ্রন্থটি রচনা করেছেন শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু। গ্রন্থে জাতিস্মরবাদ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানধর্মী ব্যাখ্যা এবং সারবান আলোচনাদি উক্ত শাস্ত্রকে সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলে। লেখকের সহজ সরল ধারায় ঐ শাস্ত্রের বিভিন্ন দুরূহ জটিল বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে যাঁরা আগ্রহশীল এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। কয়েকটি জাতিস্মরের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। প্রকাশক—দি ঘাটশীলা কোম্পানী, ৩ ম্যাঙ্গো লেন। দাম—চার টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র

নোনা জল মিঠে মাটি

বাঙলা দেশের বর্তমানকালের প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রফুল্ল রায় অন্যতম এবং তরুণতমও। ইতিপূর্বে কয়েকটি সুলিখিত উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসটি আন্দামানকে কেন্দ্র করে লেখা। আন্দামানকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় খুব নগণ্য সংখ্যক গ্রন্থই আত্মপ্রকাশ করেছে, এই উপন্যাসটি তাদেরই মধ্যে একটি বিশেষ আসন দাবী করার যোগ্যতা বহন করে। আয়তনের দিক দিয়ে গ্রন্থটি বিরাট হলেও রচনাশক্তির উৎকর্ষে পাঠকের কোথাও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। কেবলমাত্র লেখনীই প্রফুল্ল রায়ের একমাত্র সম্পদ নয়, বুকভরা অনুভূতি তাঁর এক বিরাট সম্পদ আর সেই অনুভূতিরই পরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করে গেলেন এই গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। উপন্যাসের কয়েকটি অংশবিশেষ পাঠকচিত্ত গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সমগ্র আন্দামান যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লেখকের রচনাশৈলী মনোরম। সকল দিক দিয়ে আন্দামানকে লেখক সাহিত্যের পাতায় যে ভাবে প্রকাশ করেছেন সেই প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও প্রশংসার্হ। গ্রন্থের নামকরণ করেছেন কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় য়্যাণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

একান্ত আপন

আজকের দিনের বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে যারা সহায়তা করেছেন স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম। সার্থক কথাশিল্পীরূপে যথেষ্ট সুনামের ইনি অধিকারী এবং সাহিত্যের দরবারে একটি মূল্যবান আসন গ্রহণে সমর্থ হয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসটি সর্বতোভাবে তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। এক অপূর্ব পটভূমিকা অবলম্বন করে উপন্যাসটি রচিত। লেখকের ভাষা, ভাবধারা, বক্তব্য সবকিছুই বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। লেখকের তীব্র হৃদয়ানুভূতি, তীব্র অন্তর্দৃষ্টি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর চিহ্ন উপন্যাসটির পাতায় পাতায় বহন করছে। চরিত্র-চিত্রণে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় আলেখ্যের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের ঘটনাদির ধারা রক্ষণে লেখক যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

ফুলবর্ষিয়া

বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্পের দরবারে শক্তিমান কথাশিল্পী সমরেশ বসু যে আজ একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী এ সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা অর্থহীন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সমরেশ বসুর বিশেষত্ব সম্বন্ধে পাঠকমণ্ডলও সবিশেষ অবহিত আছেন। ফুলবর্ষিয়া তাঁর ছোটগল্পের একটি সংকলন, এতে মোট ছ'টি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি উচ্চাঙ্গের, স্বকীয়তায় ভরপুর এবং যথোচিত বৈচিত্র্যপূর্ণ। চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনা সংস্থাপনে এবং সংলাপ যোজনায় লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার্হ,

গল্পগুলির মধ্যে তাঁর দরদী মনেরই ছায়া দেখা যায়। সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনাকে ঘিরে যে জীবন—সেই জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন লেখক, দরদী মনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধানী মনেরও পরিচয় দিয়েছেন তিনি। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীও গল্পগুলির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে অসীম দক্ষতা সহকারে। শ্রীগণেশ বসু প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

অন্তদৃষ্টি

"হ্যাভ" আর "হ্যাভনট"দের বিরোধ চিরকালের। হ্যাভেদের দল দর্পে অন্ধ, চিরকালের জন্যে হ্যাভনটদের তারা পায়ের তলায় চেপে রাখতে চায়, কিন্তু হ্যাভনটদের অস্থিমজ্জাও পীড়নে জর্জরিত হয়ে জেগে ওঠে, মরণ পণ করে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায় শোষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাই আজকের দিনের সমাজে এক বাস্তব সত্যের রূপ নিয়েছে, তারই প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন হয় সাহিত্যের পাতায়। শক্তিমান লেখক সুনীল ঘোষের "অন্তদৃষ্টি" উপন্যাসটি পাঠ করলে উপরোক্ত মন্তব্যের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। শ্রমিক-মালিক বিরোধ এই গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য হলে আরও একটি বিষয়ে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমাদের মত সুস্থ জীবন যাত্রার পরিবর্তে যারা ঘৃণিত জীবনযাত্রা বেছে নিল, তাদের জন্যেও ভাববার একটা দিক আছে। লেখক একটি ছেলেকে কেন্দ্র করে এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেছেন যে এই পথ তারা স্বেচ্ছায় বেছে নেয় নি, নিয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অস্বীকার করতে না পেরে, তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে সময় ও সুযোগ পেলে তারা অনায়াসে তাদের বিগত জীবনে ফিরে আসতে পারে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত, বক্তব্য জোরালো এবং দরদ অনুভূতি সাপেক্ষ। উপন্যাসটির মাধ্যমে আজকের দিনের সমাজের নানাবিধ গলদ, দুর্নীতি ও ব্যভিচারের এক নগ্নচিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং সেই প্রচেষ্টায় লেখক জয়যুক্ত হয়েছেন, একথা বলতে বাধা নেই। প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, দাম ছ' টাকা মাত্র।

শৃঙ্খলিতা

শুধু একজন আইনজ্ঞ বা শিক্ষাব্রতী হিসেবেই ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যসেবী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। দীর্ঘকাল সাহিত্য সেবা করে সাহিত্যের দরবারেও আজ তিনি সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। উপরোল্লিখিত উপন্যাসটির পটভূমিকা ঐতিহাসিক। শিবাজীর স্বর্গ লাভের পর তাঁর আসন যখন তাঁর অযোগ্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অপদার্থ পুত্র শম্ভাজীর অধিকারভুক্ত সেই সময়ে একদিকে মোগল মারাঠা সংঘর্ষ অন্যদিকে পর্তুগীজদের সর্বগ্রাসী শোষণ—এই দু'য়ের যোগাযোগে গোয়ার আভ্যন্তরীণ সর্বশিষয়ক অবস্থা কি রূপ নিয়েছিল সেই সম্বন্ধীয় একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ডক্টর চন্দ্র এই উপন্যাসটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোয়ার তৎকালীন সামগ্রিক পরিবেশ, রীতি-নীতি, আইন, সমাজ এবং সর্বোপরি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিশদ, চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ লেখক উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। ক্যাথারিনা ও অম্বুর মত প্রেমের দুটি প্রকৃত পূজারিণীর চরিত্র উপন্যাসে যুক্ত হওয়ায় উপন্যাসটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পণ্ডিত বেলভেলকার তো একটি অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি। শুধু মাত্র এই একটি চরিত্র সৃষ্টির জন্যে লেখক পাঠকসমাজের আন্তরিক ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। আমরা আনন্দের সঙ্গেই এ কথা বলতে পারি যে ইতিহাস-গন্ধী যে কটি সার্থক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধি করে এসেছে এতাবৎকাল, শৃঙ্খলিতা তাদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করল। সমগ্র উপন্যাসটি লেখকের কৃতিত্বের, কুশলতার ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। প্রকাশক রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

চা—মাটি—মানুষ

কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ধনী কি নির্ধন, কি পুরুষ কি মহিলা, চায়ের গতিবিধি সর্বত্রই অবারিত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে প্রায় সকলেই চায়ের অনুরাগী। ভারতের যে যে অঞ্চলে চাএর জন্ম হয় সেই উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বিবিধ বৈচিত্র্যে ভরপুর—পাঠক সমাজকে সেই বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীবীরেশ্বর বসু আলোচ্য উপন্যাসটির মাধ্যমে। চা-বাগান এই উপন্যাসের পটভূমিকা। চা-বাগানের নরনারী, তাদের জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার এক সুস্পষ্ট বাস্তব চিত্র লেখক এখানে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এর নায়ক জীবনের প্রতি পদে পদে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল, আঘাত পেল ভালবাসার ক্ষেত্রে, বারংবার পেল লাঞ্ছনা তবু ভালবাসার নেশা তার মন থেকে গেল না। এই হৃদয়স্পর্শী চরিত্রটির মাধ্যমেই জীবনের এক বিরাট সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চা, মাটি আর মানুষের যে নিবিড় সংযোগ, তার সূত্র অন্বেষণে লেখক চিত্ত তৎপর। উপন্যাসটি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে, কাহিনী হৃদয়স্পর্শী, লেখকের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনও সুন্দর হয়েছে। প্রকাশক—কথামালা প্রকাশনী, ১৮-এ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। দাম—চার টাকা মাত্র।

অচিরা

সার্থকনামা কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি খ্যাতি আজকের নয়, দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যের তিনি সেবা করে আসছেন এবং তাঁর সেবায় কাব্য সাহিত্য লাভবানই হয়েছে। যাঁদের কবিতা ভাবে, ভাষায়, কল্পনায়, ব্যঞ্জনায়, চিত্রণে সকল দিক দিয়েই রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে প্রভাতমোহন সেই কবিদের-ই অন্যতম। তাঁর পঁয়ত্রিশটি কবিতাকে একত্রে সংকলিত করে "অচিরা" গ্রন্থটি সৃষ্টি হয়েছে। কবিতাগুলি সুপাঠ্য, চিত্তস্পর্শী এবং বৈশিষ্ট্যবান। বলা বাহুল্য "অচিরা"র কবিতাগুলি প্রভাতমোহনের কবি হিসেবে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রভাতমোহন জীবন দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক, তাঁর কাব্যে সত্য, ও শিব সুন্দরের মহিমা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর সৌন্দর্যবোধ, শব্দচয়ন এবং প্রকাশকৌশল সাধুবাদের দাবী রাখে। রসজ্ঞ ও সুবোদ্ধাদের দরবারে তাঁর কাব্য তার যথাপ্রাপ্য সমাদরই লাভ করুক এই কামনাই করি। প্রকাশক শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো। দাম চার টাকা মাত্র।

অন্তর্দেশীয়-

দেশে-বিদেশে

আশ্বিন, ১৩৬৬ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '৫৯)

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের সমস্যাবলী পর্য্যালোচনায় জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক মন্ত্রিসভা সাব কমিটি গঠন—চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

২রা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের অধিকাংশ দলের পক্ষ হইতে বিধান সভা দপ্তরে রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দাখিল।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর): বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল অভাবনীয় বন্যায় প্লাবিত হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ।

৪ঠা আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শরৎকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশের গুলীবর্ষণ ও লাঠিচালনা প্রসঙ্গে বিরোধী সদস্যদের আনীত মুলতুবী প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট সদস্যদের মধ্যে শেষ অবধি খণ্ডযুদ্ধ।

৫ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে খাদ্যের দাবীতে এবং সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে কলিকাতার বিরাট ছাত্র মিছিল—বিধান সভার অনতিদূরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া ১১৭ জনের গ্রেপ্তার বরণ।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর): ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের দাবী জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট স্মারকলিপি পেশ।

৭ই আশ্বিন (২৪শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের পদত্যাগের জন্য বিরোধী পক্ষের দাবী মানিয়া লইতে ডাঃ রায়ের অসম্মতিসূচক ঘোষণা।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর): চীনা ফৌজের ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘনে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

কলিকাতায় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের অভিমত—ভারত চীন সীমান্ত সম্পর্কিত বিরোধ উভয় রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা মারফত মীমাংসা সম্ভব।

৯ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর): পাঞ্জাবের নবীন নগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইবে বলিয়া সদস্যদের অভিমত প্রকাশ।

১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর): চীন-ভারত সীমানা বিরোধ সম্পর্কে কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির সংশোধিত প্রস্তাবে ঘোষণা—ভারত সীমান্তে চীনাদের আক্রমণ সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করা হইবে।

১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের আনীত দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য।

আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইন্যাল (মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল) খেলা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত—আই. এফ. এ টুর্ণামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত।

১২ই আশ্বিন (২৯শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব রাজ্য বিধান পরিষদে বিনা ডিভিশনে অগ্রাহ্য।

১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বিবৃতি—রাজ্যের বন্যা বিধ্বস্ত হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় পাঁচ লক্ষাধিক একর জমি জলমগ্ন—দুই লক্ষ টন ধান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিশেষভাবে ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর জেলায় দুই দিবসব্যাপী প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝাবাত্যা—অসংখ্য লোক হতাহত, শত শত ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত।

ম্যাকমোহন লাইনই ভারত ও চীনের সীমারেখা—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-এর পত্রের জবাব।

১৫ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর): সহকারী রেলওয়েসচিব মিঃ শাহ নওয়াজ খাঁ-এর ঘোষণা—শিয়ালদহ ডিভিশনে সম্ভবতঃ তিন বৎসরের ভিতর বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচল করিবে।

মহাত্মা গান্ধীর একনবতিতম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে সমগ্র দেশের সঙ্গে বারাকপুর গান্ধীঘাটে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান।

১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর): দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের (ডি, ভি, সি) বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে—ডি, ভি, সি ষ্টাফ এসোসিয়েশন সম্পাদকের বিবৃতি।

১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর): আগে সৈন্যাপসারণ—পরে সীমান্ত বিরোধের আলোচনা—চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইএর পত্রের উত্তরে শ্রীনেহরুর স্পষ্ট উক্তি।

১৮ই আশ্বিন (৫ই অক্টোবর): বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর—পশ্চিমবঙ্গের এই পাঁচটি জেলায় জলপ্লাবনে বিচ্ছিন্ন দুরধিগম্য অঞ্চলগুলির দুর্গত অনশনক্লিষ্ট নর-নারীদের জন্য সামরিক বাহিনীর বিমান হইতে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা।

১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সহিত বৈঠকান্তে কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব শ্রী এস কে. পাতিলের ঘোষণা—খাদ্য বণ্টন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাকে লইয়া শীঘ্রই একটি নূতন খাদ্যাঞ্চল গঠন করা হইবে।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর): ভারত চীন সম্পর্কের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে আশা প্রকাশ করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-এর তারবার্ত্তা।

২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর): ম্যাকমোহন লাইন প্রসঙ্গে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও জেঃ নে উইন (ব্রহ্ম প্রধান মন্ত্রী) বৈঠক।

২২শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর): নদীয়ার সীমান্তে পাকিস্তানী দুর্বৃত্তদের হানা—ভারতীয় সীমান্ত টহলদার পুলিসের গুলীবর্ষণ।

২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর): ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ১২ সপ্তাহে এক সহস্র নাগা বিদ্রোহীকে আটক কিংবা আত্মসমর্পণে বাধ্যকরণের সংবাদ।

২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): তিন দিবস যথারীতি শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের পর কলিকাতা ও সহরতলীতে নির্বিঘ্নে নিরঞ্জন উৎসব সম্পন্ন।

২৫শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর): ভিলাই ইস্পাত কারখানার ইস্পাত উৎপাদন সুরু—ভারত সোভিয়েট সহযোগিতার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা।

২৬শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বিজ্ঞপ্তি—রাজ্যের ৭৫টি সহর (মিউনিসিপ্যাল) এলাকায় কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ার আশঙ্কা।

২৭শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর): বৃহত্তর কলিকাতায় জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশন সমস্যা সম্পর্কে পর্য্যালোচনার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদলের কলিকাতা উপস্থিতি।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও নাট্যকার আচার্য্য মন্মথমোহন বসুর (৯১) কলিকাতার বাসভবনে জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

২৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বন্যার্ত্ত সহায়তা সমিতির সভাপতি শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জ্জী ও সম্পাদক শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, এম পি'র প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট পত্র।

২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে পূর্ব্ব সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে পাক্-ভারত প্রতিনিধিদের বৈঠক আরম্ভ।

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে নয়া দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎকার।

৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর): দিল্লীতে তিন দিবসব্যাপী আলোচনার পর সীমান্ত প্রসঙ্গে পাক্-ভারত বৈঠকের প্রথম পর্ব্ব শেষ।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): কেরলের নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হইবে না—রাজ্যপাল ডাঃ রামকৃষ্ণ রাওএর ঘোষণা।

বহির্দেশীয়—

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর): রাষ্ট্রসংঘে (নিউইয়র্ক) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঐতিহাসিক ভাষণ ও পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পেশ।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর): প্রেঃ নাসেরের অটুট সঙ্কল্প—ইস্রায়েলকে কিছুতেই সুয়েজ খালে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না।

৫ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর): ইরাণের শাহ ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর আলোচনা শেষ—আলোচনান্তে অনাক্রমণ নীতির উপর উভয় পক্ষের যুক্ত ইস্তাহার।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর): রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আলোচনার প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য—ভারতের দেশরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের চেষ্টা ব্যর্থ।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর): সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সলোমন বন্দরনায়ক গুলীতে আহত—বৌদ্ধভিক্ষুর বেশধারী আততায়ী গ্রেপ্তার—সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

৯ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর): গেটিসবার্গের (আমেরিকা) নিভৃত শৈলশিখরে বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আইক-ক্রুশ্চেভ (মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও রুশ প্রধান মন্ত্রী) গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

আততায়ীর রিভলবারের গুলীতে আহত মিঃ বন্দরনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। নূতন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মিঃ বিজয়ানন্দ দহনায়কের শপথ গ্রহণ।

১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর): গেটিসবার্গে দুই দিবস ব্যাপী বৈঠকের পর পাঁচ শত শব্দ সম্বলিত আইক-ক্রুশ্চেভ যুক্ত ইস্তাহার প্রচার। উভয় নেতার সম্মিলিত ঘোষণা—বল প্রয়োগ দ্বারা নহে, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে অমীমাংসিত আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্নাবলীর মীমাংসা করিতে হইবে। আগামী বৎসর (১৯৬০) বসন্তকালে প্রেসিডেণ্ট আইকের সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন।

ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ে জাপানে প্রায় আড়াই সহস্র নর-নারী নিহত বা নিখোঁজ—তিন লক্ষাধিক লোক গৃহহারা।

১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ দিবস ঐতিহাসিক সফর শেষে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মস্কো প্রত্যাবর্ত্তন।

১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে কলিকাতা কলেজের ছাত্রী কুমারী আরতি সাহার (১৯) ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব অর্জ্জন।

১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর): কম্যুনিষ্ট চীনের দশম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত বিরাট কুচকাওয়াজে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের যোগদান।

১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের পিকিংস্থ দূতাবাস চীন কর্ত্তৃক অবরোধ।

১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর): রুশিয়া কর্ত্তৃক সাফল্যের সহিত রকেট যোগে চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী আন্তঃগ্রহ ষ্টেশনে উৎক্ষেপ।

১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) রাষ্ট্রসংঘে ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননের ঘোষণা—ভারত চীনা আক্রমণ বরদাস্ত করিবে না।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মেঃ জেঃ আবদুল করিম কাসেম বাগদাদের পথে মোটরে আততায়ীর গুলীতে আহত।

২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর): বৃটেনে সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলনের রক্ষণশীল দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): চন্দ্রলোক অভিমুখে উৎক্ষিপ্ত রুশিয়ার সর্ব্বশেষ মহাজাগতিক রকেট (লুনিক-৩) পৃথিবী হইতে সর্ব্বোচ্চ উচ্চে উপস্থিতি সম্পর্কে মস্কো বেতারের দাবী।

২৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে তিব্বত পরিস্থিতি আলোচনার দাবীতে আয়ার্ল্যাণ্ড ও মালয়ের আনীত প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত—ভারত ভোটদানে বিরত।

২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): পাক্ প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁর ঘোষণা—১৯৬০ সালের শেষ নাগাদ পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।

৩০শে আশ্বিন (১৭ অক্টোবর): চো ইউ অভিযাত্রী মহিলা দলের নেত্রী সহ ৮ জন সদস্য নিহত হওয়ায় বিশ্বের ষষ্ঠ উচ্চতম শৃঙ্গ বিজয়ের চেষ্টা পরিত্যক্ত।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): পূর্ব্ব সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে দিল্লী বৈঠকান্তে ঢাকায়, পাক-ভারত উচ্চ পর্য্যায়ে আলোচনা সুরু।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এর পরদিনই রাত্রে আমরা খবর পেলাম যে শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়াকে কে বা কাহারা হত্যা করে কুমারটুলীর রাস্তার একটি রোয়াকের উপর ফেলে রেখে গিয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে দেখি, শিউচরণের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটি গৃহের রোয়াকে পড়ে রয়েছে। অকুস্থলে বহু লোককেই এই হত্যা সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, কিন্তু তারা কেহই ঐ নৃশংস হত্যা সম্বন্ধে কোনও খবর আমাদের দিতে পারেনি। মৃত পাগলাবাবুর দেহের ন্যায় শিউচরণিয়ার দেহেও আমি একই প্রকারের ক্ষত লক্ষ্য করেছিলাম। এই উভয় ব্যক্তিকে একই ভাবে বক্ষে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তখনও পর্যন্ত আমরা এই খুনের কোনও কিনারা করতে সমর্থ হইনি। সম্ভবতঃ অনুরূপভাবে নিহত হবার ভয়ে ঐখানকার বস্তি অঞ্চলের কেহ খাঁদাগুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়নি। এ মামলাটি ব্যতীত অপর আর একটি মামলারও আসামীরূপে তাকে আমি খোঁজাখুঁজি করেছিলাম। এই মামলাটি ছিল একটি সিঁদেল চুরির মামলা। কুমারটুলীর এক নামকরা জমিদার বাড়ী হতে একটি টোটাভরা রিভলভারসহ সহস্র সহস্র মুদ্রার জুয়েলারী দ্রব্য চুরি হওয়ায় এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে গঙ্গাবক্ষে নৌকা করে পার হবার সময় হাওড়ার জনৈক পুলিশ-অফিসার তাকে ঐ নৌকাতে গ্রেপ্তারও করেছিল। কিন্তু খাঁদাগুণ্ডা তাকে অতর্কিতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে নিজে সাঁতার কেটে ওপারে উঠে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে খাঁদাগুণ্ডা ছিল এইরূপ এক সাংঘাতিক ব্যক্তি। এইবার আমার আর কোনও সন্দেহ রইলো না যে, এই খোকা ও খাঁদা একই ব্যক্তি এবং তারা দুজনে কখনই বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে না।

এরপর আমরা আর দেরী না করে লালবাজারের পুলিশ হেডকোয়াটারস্ থেকে একদল সশস্ত্র বাহিনী আনিয়ে নিলাম। তারপর দুইখানি লরীতে দুইদিক থেকে অভিযান চালিয়ে অতর্কিতে ঐ বাড়ীটি আমরা ঘেরোয়া করে ফেলে উহার মধ্যে আমরা ত্বরিত' গতিতে ঢুকে পড়লাম। এই বাড়ীটি ১০ নম্বর কৃপানাথ লেনের একটি বস্তির সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। স্থানীয় লোকেদের কেউ কেউ চুপি চুপি আমাদের জানিয়ে দিল যে ঐ বস্তির কোণের ঘরখানিতে ঐ খাঁদাগুণ্ডা নিজে থাকতো এবং তার পাশের ঘরখানিতে এখনও তার আত্মীয় স্বজনেরা বসবাস করছে। এই মামলার হত্যাকারী আসামী খোকা বা খাঁদাকে সেখানে পাওয়া গেল না। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হলো যে হয়তো ঐ ঘরের মাটির মেঝের পাগলার কাটা মুণ্ডটা পুঁতে রাখা হয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ শাবল ও কোদাল এনে ঐখানকার মৃত্তিকা অপসারিত করতে শুরু করলাম। অবশ্য সেখানে বহু খোঁজাখুঁজি করেও কাটা-মুণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তার পরিবর্তে মাটির তলা হতে বার হয়ে আসতে লাগল রাশি রাশি হীরা-মুক্তা ও জহরত অলঙ্কার এবং বাণ্ডিলবন্দী হাজার ও একশত টাকার কারেন্সি নোট। এইদিন ঐ স্থান হতে অলঙ্কারে ও নগদ টাকায় প্রায় ৭০ হাজার টাকার অপহৃত সম্পত্তি আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুধু তাই নয় ঐ ঘরের একটি কোণ হ'তে একটি রক্তরঞ্জিত ধুতি, একটি রক্তরঞ্জিত অন্তর্বাস, দুইটি রক্তরঞ্জিত পাঞ্জাবী এবং অন্যান্য কয়েকটি কাপড় চোপড় আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম। এইগুলি ঘরের ঐ কোণে একত্রে জড় করে রাখা হয়েছিল। ঐ সকল পরিধেয় বস্ত্রাদি পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পেলাম যে উহার প্রতিটি কোণে কোণে একটি ইংরাজী 'S' অক্ষর সূতির দ্বারা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই বাড়ীর অপরাপর ঘরে যারা বাস করে তারা সকলেই ছিল গৃহস্থবেশী বেশ্যা নারী। এরা সাধারণতঃ দিনের বেলা ঝি'গিরি করে এবং রাত্রে তারা করে পেশা। এদের মধ্যে দুই একজন আবার সাধারণ বেশ্যা নারীর পর্যায়ে নেমে এসেছিল। আমি এদের সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে খোকাবাবুর পিতা ও খুল্লতাত নামে পরিচিত দুই ব্যক্তি সাধারণতঃ খোকাবাবু কর্তৃক ভাড়া করা এই ঘর দুইটিতে বসবাস করে। এঁরা খোকাবাবুর আসল বা নকল আত্মীয় কিনা তা তারা বলতে পারে না। তবে তাদের মতে এরা খোকাবাবুর নকল বা পাতানো আত্মীয় মাত্র। প্রথমে এরা খুন সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দিতে চায় নি। খোকাবাবু সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা করা মাত্র তারা আতঙ্কে কেঁপে উঠছিল। আমাদের পীড়াপীড়িতে এদের কেউ কেউ ভয়ে কেঁদেও ফেললে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ইনেসপেক্টার সুনীল রায়ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে এই সকল রূপজীবিনীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় বিবৃতি আদায়ের ব্যাপারে ব্যর্থ মনোরথ হতে দেখে তিনি আমাকে বললেন, এরা এখন যা বলে তা শুনে যাও মাত্র। প্রথম দিনে এরা কোনও দিনই সত্য কথা বলেনি। আজ হতে তিন চার দিন পর এরা সত্য কথা বলবে। সাধারণতঃ বেশ্যা নারীদের সত্যভাষণের নিয়মই হচ্ছে এই। সুনীল বাবু এদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে একটি যুবতী নারী এবং একটি তিলক পরা বৃদ্ধাকে বার করে এনে আমাকে বললেন, এখোন এদের পৃথক পৃথক ভাবে অর্থাৎ একের অবর্তমান অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করো। ভুলে যেও না যে বিভিন্ন বয়সের মানুষ বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা কথা বলে। এই জন্য পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বুঝতে পারবে যে এদের কে কতটুকু মিথ্যে বলছে। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুমি এখন এদের ঐ পাশের ঘরে নিয়ে যাও। ততক্ষণ আমি মেঝেটা আরও একটু খুঁড়ে দেখি। খোকাবাবুর ঘরের মেঝের তলা থেকে

এতো সোনা-দানা বেরিয়েছিল যে একজন দায়িত্বপূর্ণ অফসারের সেখানে উপস্থিতি একান্ত রূপে প্রয়োজন ছিল, তা না হলে স্বপক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় ব্যক্তিদের দ্বারা কয়েকটি দ্রব্য লুঠ পাট হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই জন্য ইনেসপেক্টার সুনীল রায়ের উপদেশ শিরোধার্য করে বেশ্যা নারী দুইটিকে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নিজ নিজ ঘরে নিয়ে তাদের বহুবার অভয় দিলাম এবং এ কথাও তাদের বললাম যে তারা যা বলবে তা কাউকেই জানানো হবে না। এইভাবে বহু সাধ্য সাধনার পর তারা স্বীকার করলো যে তারা খাঁদা বাবুকে একজন খুনে গুণ্ডা বলেই জানে। তবে খোকা নামে কোনও খুনে বা গুণ্ডাকে তারা চেনে না। তা ছাড়া খোকা ও খাঁদা এক ব্যক্তি কিনা তাও তাদের জানা নেই। খাঁদা বাবু প্রায়ই আজকাল তার এই বাড়ীতে আসেন কিন্তু রাত্রিবাস তিনি কদাচ এখানে করে থাকেন। এইদিন ৪ঠা সেপ্টেম্বার ১৯৩৬ আন্দাজ ১২-৩০ মি: ঘটিকায় আমাদের কেউ কেউ দরজার গলির মুখে খদ্দেরের আশায় দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় হঠাৎ খাঁদা বাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকতে ঢুকতে চেঁচিয়ে উঠলেন এই ভাগ যা সব যে যার ঘরে! যতক্ষণ আমি এখানে থাকবো ততক্ষণ কেউ কক্ষনো বেরুবি না। খবরদার! দেখছিস তো এই ছুরি। এই বলে হাতের আস্তিন থেকে একটা ছুরি বার করে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন।—এর পর ভয়ে যে যার ঘরে চলে এসে আমরা দরজা বন্ধ করেছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাউর সাড়া না পেয়ে আমরা মনে করেছিলাম খাঁদাবাবু চলে গিয়েছে। তাই আমরা কেউ কেউ সাহস করে বাইরে এসে দেখি খাঁদা বাবুর বাবা চৌবাচ্চা থেকে বালতি করে জল তুলে কতকগুলো কাপড় চোপড় কাচ্ছে। উঠানের উপর এই সময় জোছনার তীব্র আলো এসে পড়েছিল। এই আলোতে আমরা দেখলাম যে বালতির জল টকটকে লাল। এই সময় খাঁদাবাবু হঠাৎ তার ঘর হতে বার হয়ে এসে ধমকে উঠলো, ফের বের হয়ে এসছিস। যা যা যে যার ঘরে। আমরা খাঁদা বাবুকে সকলে যমের মতই ভয় করে থাকি। তাই 'যাচ্ছি যাচ্ছি' বলে আমরা আপন আপন ঘরে এসে ভয়ে অর্গল বন্ধ করে দিয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। এই কয়টি বিষয় ছাড়া এই খোকা বা খাঁদাবাবুর কার্য্যকরণ সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই বলতে পারবো না। তবে এ'কথা আমরা সকলেই জানি যে খাঁদাবাবুর ব্যবহৃত প্রতিটি পরিচ্ছদে ইংরাজী 'S' অক্ষরটি তারই ইচ্ছা মত লিখে রাখা হতো। আমরাও মধ্যে মধ্যে অনুরুদ্ধ হয়ে ঐ 'S' অক্ষরটি তার কাপড় জামার কোণে কোণে সুতির সাহায্যে তুলে দিয়েছি। এই 'S' অক্ষরটি খাঁদাবাবুর নিকট একটি বিশেষ সখের বস্তু ছিল।

এই সময় আমরা খোঁজাখুজি করে খাঁদার পাতানো পিতার নিকট হতে ধোপার হিসাব সহ একটি নোটবুকও উদ্ধার করতে সমর্থ হই। ঐ নোটবুকের লেখা হতে প্রমাণিত হয় যে কতকগুলি কাপড়-চোপড় ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ তারিখে ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধোপাটির নাম ঠিকানাও ঐ নোটবুকে লিখে রাখা ছিল।

এর পর আমি অন্যান্য অফসারদের খাঁদার পিতার বাটীতে তদন্তরত রেখে ঐ নোটবুকটি সহ মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তাদের ধোপা

মাথুরামের ভাটীখানায় এসে উপস্থিত হলাম। সৌভাগ্যক্রমে ওদের সেই ধোপাটি সেইখানে উপস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সে তখনও পর্য্যন্ত খাঁদার ঐ সকল কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করতে আরম্ভ করেনি। আমরা ঐ নোটবুকের লেখানুযায়ী প্রতিটি বস্ত্র উদ্ধার করে দেখি যে তাদের প্রতিটিতেই এক একটি 'S' অক্ষর সুতির সাহায্যে তোলা হয়েছে তো বটেই, অধিকন্তু ঐ সকল বস্ত্র ও সার্টের স্থানে স্থানে তখনও পর্য্যন্ত শুষ্ক রক্তের প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ দুই জন স্থানীয় সাক্ষীর সমক্ষে ঐ সকল পরিধেয় পরিচ্ছদ সমূহ উহাদের যথাযথ বিবরণ সহ তালিকাভুক্ত করে আপন হেপাজতে গ্রহণ করে নিই। এই সকল কাপড়ে রক্তের দাগগুলি মনুষ্য রক্ত বলে সরকারী রক্তপরীক্ষক অভিমত প্রকাশ করলে উহা যে আসামীদের বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না। তবে কয়েকটি রক্তমাখা কাপড়-চোপড় ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে অপর কয়েকটি রক্ত মাখা কাপড়-চোপড় ঘরে মজুত রাখার অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি উৎফুল্ল হয়ে খাঁদার পিতার বাটিতে ফিরে এসে দেখি ইনেসপেকটার রায় বহুলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঐ পল্লী হতে দেবেনবাবু নামে একটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষীকে খুঁজে বার করেছেন। আমি তাকে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সোল্লাসে তাঁর বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করতে সুরু করে দিলাম। তাঁর মহামূল্যবান বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হলো।

১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসে ১২-৩০ মিনিটে ১০ কৃপানাথ লেনে খাঁদাবাবুর বাটির রোয়াকে বসে আমি বায়ু সেবন করছিলাম। এমন সময় আমি খাঁদাকে নগ্ন পদে একটি সাদা ধুতি ও একটি নীল রঙের সার্ট পরা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হতে দেখি। খাঁদা বাবুর পিছন পিছন তার বন্ধু কেষ্ট বাবুকেও আমি আসতে দেখেছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ে যে আমি খাঁদার ধুতি ও সার্টের উপর রক্তের দাগ দেখে চমকে উঠেছিলাম। আমার ভীত হয়ে উঠার অপর কারণ হচ্ছে এই যে এই সময় খাঁদা একটি উন্মুক্ত ছুরিকার ব্লেড তার সার্টের হাতলের মধ্যে সেঁদিয়ে দিয়ে তার সাদা বাঁটের হাণ্ডেলটি সে তার হাতের মুঠির মধ্যে ধরে রেখেছিল।

খাঁদা কোনও দিকে দৃকপাত না করে ত্বরিত গতিতে তার পিতার ঐ বাটীটির মধ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু কেষ্টোবাবু খাঁদাকে অনুসরণ না করে আমাকে বোধ হয় আগলাবার জন্যই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ভয়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে উত্থান শক্তি পর্য্যন্ত আমার রহিত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে খাঁদা বাবু তার বাটি হতে বার হয়ে এলো। তাকে দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে সে ভালো করে চান করেছে। এই সময় খাঁদা নীল সার্টের পরিবর্ত্তে একটি ক্রীম্ রঙের সার্ট পরে ফেলেছিল। এ ছাড়া সে সারা দেহে প্রচুর সুগন্ধি সেণ্টও মেখে নিয়েছে। আমাকে তখনও পর্য্যন্ত সেখানে বসে থাকতে দেখে খাঁদা পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে তা আমাকে দেখিয়ে ইসারায় আমার চুপ করে থাকতে উপদেশ দিল। তারপর সে নির্বিঘ্নে শিষ দিতে দিতে কেষ্টোর সঙ্গে পুনরায় শোভাবাজার ষ্ট্রীটের দিকে চলে গেল।

এই সাক্ষী দেবেনবাবুর বিবৃতি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল তাতে আমরা সকলেই একমত হয়েছিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই দেবেনবাবুর সহিত খোকাবাবুর পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে কিছুটা তদন্ত করারও আমরা প্রয়োজন মনে করলাম। এই সম্পর্কে দেবেনবাবুকে আমরা বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলাম। নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর সমূহ এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

প্রঃ—আপনার সহিত খাঁদাবাবুর পরিচয় কতদিনের? আশা করি আপনি ওদের একজন দলের লোক নন। এইরূপ একটি দৃশ্য দেখার পরও আপনি থানায় খবর দেননি কেন? ঐদিনকার ঐ নৃশংস খুনের সংবাদটি নিশ্চই আপনার অগোচর ছিল না।

উঃ—আজ্ঞে, সে আমার বাল্যবন্ধু। আমি, খোকা, কেষ্টো ও হরিপদ এককালে স্থানীয় ওরিয়েণ্টেল সেমিনারীতে পড়াশুনা করতাম। তবে নীচের ক্লাশ হতেই আমরা একে একে ঐ স্কুল ত্যাগ করে আসি। আমাদের মধ্যে আমি এবং হরিপদ এই পাড়াতেই বাস করি। আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করে থাকি। আমাদের পূর্ব্বতন বন্ধু খোকা ও কেষ্টোর কথা আর জিজ্ঞেস করে লাভ কি? আজকাল আমরা ওদের সঙ্গ বিশেষ রূপে এড়িয়ে চলে থাকি। পাড়ার আর পাঁচজনের মত আমরা ওদের ভয় করেও চলি। এই

কারণেই আমরা কেউই ওদের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ থানায় পৌঁছিয়ে দিতে সাহসী হইনি। ঐ দিনকার খুনটা যে খাঁদাবাবুরাই করেছিল তা সহজেই আমরা অনুমান করে নিতে পেরেছিলাম।—আজ্ঞে, এই সম্বন্ধে কোনও খবর আপনাদের দিলে ঐ নিহত ব্যক্তির ন্যায় আমরাও একে একে মুণ্ডচ্যুত হয়ে যেতাম। এই জন্যই সব বুঝে বা জেনেও আমরা চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিলাম।

এক্ষণে এই দেবেন, মল্লিনা এবং অম্বিকার বিবৃতি তিনটি তাদের প্রদত্ত বিবিধ সময়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলাম যে ঐ দিন সন্ধ্যা আট বা সাড়ে আট ঘটিকায় খোকা ওরফে খাঁদা তার সাকরেদের সাহায্যে পাগলা ওরফে প্রভুলকে পাকড়াও করে ঐ মেথর গলিতে নিয়ে এসে সন্ধ্যা নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে তাকে ছুরিকাহত করে ফেলে রেখে যায়। এরপর নিকটের কোনও এক নিভৃত বা নিরালা বাড়ীতে বা ঐরূপ কোনও এক সুবিধা জনক স্থানে কিংবা খোকারই কৃপানাথ লেনের বাড়ীতে অলক্ষ্যে এসে তারা একস্থানে তাদের রক্তরঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে তারা রূপজীবিনী ঊষারাণীর গৃহে এসে মলিনাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করে। তবে ঐ রাত্রে ঊষার কক্ষে তারা অধিকক্ষণ সময় অতিবাহিত করেনি। স্বল্পক্ষণ পরে তারা পুনরায় বহির্গত হয়ে ঐ মেথর গলিতে ফিরে এসে পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। এরপর তারা এ মুণ্ডটা নিকটে কোনও এক স্থানে নিক্ষেপ করে খোকা ও কেষ্টো আবার খোকার কৃপানাথ লেনের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ খোকা পাগলার দেহ হতে তার মুণ্ডকর্তন কার্য্যে একাই লিপ্ত হয়েছিল। এইজন্য মাত্র তারই পরিচ্ছদ এই সময় রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠে। এইজন্য এই সময় একমাত্র তারই পুনরায় পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই জন্য কেষ্টবাবুর প্রথম অপারেশনের সময় পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলেও ওই দ্বিতীয় অপারেশনের সময় তার পোষাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি। যতদূর বুঝা যায় যে খাঁদাকে ঐ রাত্রে দুইবার তার রক্তরঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল; প্রথমবার যখন সে পাগলাকে বন্ধুদের সাহায্যে পর্য্যুদস্ত করে তাকে ছুরিকাহত করে এবং দ্বিতীয়বার যখন তাকে তার মুণ্ডকর্তন কার্য্যে লিপ্ত হতে হয়। মুণ্ডকর্তন রূপ দ্বিতীয় অপারেশনের সময় কেষ্টোবাবুর গাত্রে রক্ত না লাগায় তাকে এইবার পোষাক পরিবর্তনের জন্য খোকার বাড়ীর ভিতর ঢুকতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মলিনা ও দেবেন—এই উভয় সাক্ষীর বিবৃতিদ্বয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত একত্রে গ্রহণ করলে বুঝা যাবে যে খোকাকে ঐ রাত্রে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার পোষাক পরিবর্তন করতে হয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে খোকার রক্ষিতা মলিনাসুন্দরী তার দয়িত খোকাবাবুকে নীল রঙের সার্ট পরে ঊষার বাড়ীতে ফিরে আসতে দেখেছে এবং দেবেন তাকে নীল সার্ট ছেড়ে ক্রীম রঙের সার্ট পরে তার বাড়ী থেকে তাকে বেরুতে দেখেছে।

এই খুন সম্বন্ধে উপরের এই থিওরীটি আপাতদৃষ্টিতে সত্য ব'লে মনে হলেও উহাতে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ ছিল। সাক্ষী মলিনাসুন্দরীর বিবৃতি হতে আমরা জেনেছি যে, সে ঊষার কক্ষে খোকার নীল সার্টের উপর কালো বর্ণের দাগ দেখেছিল। কিন্তু দুইটি বিশেষ কারণে ঐ রাত্রে মলিনা খোকার সার্টের উপর সত্যই রক্তের দাগ দেখেছিল কিনা তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমতঃ ঐ নীল সার্টটি পরে খোকা পাগলাকে ছুরিকাহত করলে তার ঐ সার্টের অনেকখানি স্থানে রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠতো। এর কারণ ছুরিকা দেহে প্রবেশ করলে সেখান হতে ফিনকী দিয়ে রক্ত বহির্গত হাওয়া স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য যদি অসাবধানতা বশতঃ খোকার পোষাক পরিবর্তনের সময় তার ঐ নূতন নীল সার্টের সহিত তার রক্তরঞ্জিত পরিত্যক্ত সার্টের সংযোগ হয়ে থাকে তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে নীল কাপড়ের উপর মনুষ্যরক্ত পড়লে উহা রাত্রিকালে কালো দেখায়। ঐ অবস্থায় মনুষ্য রক্তবিন্দু কখনও লোহিত বর্ণের রূপে প্রতীত হয়নি। অন্যদিকে পানের পিচ কোনও এক নীল বস্ত্রখণ্ডের উপর নিক্ষিপ্ত হলে উহা রাত্রিকালে টকটকে লালবর্ণের দেখা যাবে। এইজন্য আমাদের মনে হল যে খাঁদা যখন মলিনার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, যে উহা রক্ত নয় পানের পিচ তখন সে সত্য কথাই বলেছিল। খুউব সম্ভবতঃ খোকা ওরফে খাঁদাবাবু প্রথম অপারেশনের পর পোষাক পরিবর্তন করে পান চিবুতে চিবুতে মলিনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঊষারাণীর ঘরে এসেছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে মলিনার দেখা রক্তের দাগ পানের পিচের দাগ রূপে স্বীকার করে নিলে অবশ্য আমাদের পরিকল্পিত এই থিওরিটি সত্য রূপে প্রতীত হবে।

[ক্রমশ।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বিপুল সাড়া এল জনতার দল থেকেও. আর কেবলমাত্র সাড়া দিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকেনি—আমাদের প্রতি তাদের সহৃদয় মনোভাবের পরিচয় দিতেও এতটুকু কার্পণ্য তারা করেনি প্রকাশ। এই সময়ে এদের প্রীতি, সমাদর, আপ্যায়নের মধ্যে দিয়েই আমার জীবনে সবচেয়ে যা বড় লাভ হয়েছিল—যাকে আজও আমি অসীম-সৌভাগ্যের নামান্তর বলেই মনে করি এবং শুধু আজ কেন চিরকালই করে যাব তা হচ্ছে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। জনগণের প্রীতি, সমাদর, আপ্যায়ন আমায় ভরিয়ে তুলেছে অনেকখানি, তাদের সমাদর আমাকে ঋণী করেছে আমাকে জুগিয়েছে উদ্দীপনা, আমার সামনে দেখা দিয়েছে আমার শিল্পসাধনার গৌরবময় স্বীকৃতির রূপ নিয়ে কিন্তু সরোজিনী নাইডুর সান্নিধ্যলাভের গুরুত্ব বা তাৎপর্য যে অমূল্য. অসীম. অশেষ—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে আমার সঙ্গে দ্বিমত কেউ হবেন না। হায়দ্রাবাদে সরোজিনী নাইডু ও তাঁর পরিজনবর্গ যথেষ্ট উৎসাহে এবং সমাদরে এবং অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে তুলেছিলেন আমাদের। এই উপলক্ষ্যে, এই রচনার সুযোগ নিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণতি উৎসর্গ করি ভারত জননীর মনস্বিনী দুহিতা, জগতের কবিকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা এবং ভারতের প্রথম মহিলা রাজ্যপালিকা (ভারত-কন্যাদের মধ্যে এঁর পর এই আসন অলঙ্কৃত করার গৌরব অর্জন করেছেন একমাত্র এঁরই কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু) স্বর্গীয়া কবি সরোজনী নাইডুর অমর স্মৃতির উদ্দেশে।

স্বর্গীয় স্যার আকবর হায়দারীও আন্তরিক সমাদরে আমায় ভরিয়ে তুলতে দ্বিধা বোধ করেননি। শিল্পের প্রকৃত সমঝদার লোক ছিলেন স্যার আকবর হায়দারী। তাঁর শিল্পরসিক মনের পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর মূল্যবান শিল্প সংগ্রহশালা দেখে, এক কথায় যাকে বলা যায় অপূর্ব। স্যার আকবর যে কত বড় শিল্পবোদ্ধা ছিলেন তা তাঁর সংগ্রহশালাই প্রমাণ করল। আমাদের আরও মুগ্ধ করেছিল নবাব সালারজাঙ্গের প্রাসাদ। স্যার আকবরের বাড়ীতে দেখেছি শিল্পের অপূর্ব সংগ্রহশালা, নবাব সালারজাঙ্গের বাড়ীতে শিল্পসংগ্রহশালা তো 'যাদুঘর' আখ্যাটি এখানে প্রযোজ্য না হলে 'বিবিধ সংরক্ষণশালা' কথাটি এ ক্ষেত্রে অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে।) প্রচুর সংখ্যক সুপ্রাচীন দুর্লভ বস্তুর এবং বহু সিদ্ধ হস্তের সুনিপুণ সৃষ্টি সমূহের সংরক্ষণ নবাবের সমগ্র প্রাসাদের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল এবং সমাগত অতিথিবৃন্দের করেছিল চিত্তহরণ। আমাদের বন্ধু শ্রীজয়গোপাল পিল্লাইয়ের পরিজনবর্গের আন্তরিকতাও এ প্রসঙ্গে ভোলবার নয়।

ব্যাঙ্গালোরে—মহীশূরে কি সুন্দর ভাবে দিনগুলো কেটেছে আমাদের—যত্রতত্র ভ্রমণ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অবলোকন এবং তদ্দর্শনে মুগ্ধ হওন···সত্যি. ভ্রমণে যে অপার আনন্দের বন্যা···বারবার এই কথাটিই মনে পড়ত।

তারপর মাদ্রাজ। মদ্রদেশ। বিশাল ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত। পিঠাপুরমের মহারাজা এবং তাঁর পরিবারবর্গের কাছে পাওয়া গেল প্রভূত আদর আপ্যায়ন। কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করলেন শ্রীমতী অম্মু স্বামীনাথনও। মাদ্রাজের Y. M. C. A আমার জন্য একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন, আমার মনে আছে সেখানে শ্রীমতী অম্মুর বক্তৃতার মধ্যে আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশংসা, উৎসাহ, সুখ্যাতি এবং প্রশস্তিও ছিল।

মাদ্রাজে বাস করার সময় আমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং সবচেয়ে অবিস্মরণীয় যে ঘটনা ঘটল তা হল বালা সরস্বতীর সান্নিধ্যলাভ। শ্রীমতী বালা সরস্বতী—ভারত-নাট্যমের ইতিহাসে যাঁর নাম চিরকালের জন্যে জড়িয়ে থাকবে। ভারতবর্ষের নৃত্যশিল্পের প্রচুর উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে যাঁর কল্যাণে। যে তিনদিন সেখানে আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই তিনদিনের প্রতিটি দিনই তিনি এসে আমাদের উৎসাহ বর্ধন করে গেছেন—আর কেড়ে নিয়ে গেছেন আমাদের সকলের সুগভীর শ্রদ্ধা। আমরা উঠেছিলুম হোটেল কোনেমারায় (Hotel Connemara); সেই হোটেলে এলেন বালা সরস্বতী আমাকে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিটি শিল্পীকে অভিনন্দন জানাতে, বোঝা গেল, আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ শিল্পীকেও আনন্দ দেবার মত নেহাৎ অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চোখে আমাদের অনুষ্ঠান অপাংক্তেয় রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি—মাথা পেতে গ্রহণ করলুম শিল্পীর সস্নেহ আশীর্বাদ। আনন্দ তখন হৃদয় উপচে পড়ছে। সাদর আহ্বান আমাদের জানিয়ে গেলেন তাঁর বাসভবনে। আমাদের পরিতৃপ্তি দেওয়ার জন্যে নিজের নাচ দেখালেন। হ্যাঁ, সেদিন নিজে নেচেছিলেন বালা সরস্বতী আর সেই নাচের স্মৃতি কোনওদিন মুছবে না আমার মন থেকে. সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না সেই দৃশ্য যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনকে ভুলিয়ে দেয় সমকালীন ঘটনারও অনেক কিছু হয়তো বা ক্ষণকালের জন্যে সরে যায় মন থেকে, আপন অস্তিত্বও এক এক সময়ে হারিয়ে যায়—চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য। সেই মুদ্রা, সেই তাল, সেই ভঙ্গীমা, সেই কুশলতা, সেই মাধুর্য। চার ঘণ্টা নেচেছিলেন বালা সরস্বতী। ভাবতে পারেন? একনাগাড়ে নেচেছিলেন—কোন বিরাম, কোন বিরতি বা কোন ছেদ ছিল না সেই নাচে। তাঁর এই যাদুকরী প্রতিভা ভুলিয়ে দিয়েছিল আমাদের স্থান-কাল-পাত্র। কেড়ে নিয়েছিল মুখের ভাষা-বিস্ময়ে

সাধনা বসু

হতবাক। তিনি কি শুধুই শিল্পী? না—শুধু শিল্পী তিনি নন—তিনি নিজেই একজন জীবন্ত বিস্ময়। জীবন্ত আশ্চর্যের তিনি একজন জীবন্ত প্রতীক।

মধুমাখানো অভিজ্ঞতা আর অফুরন্ত সুখস্মৃতি সম্বল করে কলকাতায় ফিরে এলুম। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ হল সমাপ্ত। কলকাতার কর্মজীবনের তরঙ্গে আবার নিজেকে ভাসিয়ে দিলুম স্বভাবতঃই। 'মীনাক্ষী'র নায়িকারূপে নিউ থিয়েটার্সের ছবির কাজ আবার শুরু করলুম। মধুর পরিচালনায়। বাঙলা এবং হিন্দী দুটি ভাষায় তোলা হল মীনাক্ষী। আজকের দিনের প্রখ্যাতনাম প্রযোজক-পরিচালক শ্রীবিমল রায় ছিলেন এর চিত্রকর। চিত্রকর হিসেবে তাঁর অসাধারণ নিপুণতা সর্বজনবিদিত। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হলেন নটশেখর শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীপ্রীতি মজুমদার, শ্রীমতী দেববালা এবং শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি। সুরযোজনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। আগেই বলেছি নায়িকার চরিত্রে রূপ দেওয়ার ভার পড়েছিল আমার উপর। নায়িকা চরিত্রটি একটি নাটকীয় চরিত্র, একটি অন্ধ মেয়ের ভূমিকা। ছবির হিন্দী সংস্করণে নায়কের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন নাজমল হোসেন। বোম্বে টকীজ থেকে দেবিকারাণীর সঙ্গে অভিনয় করার পর থেকে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হন। ছবির বাঙলা সংস্করণে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বাঙলার তৎকালীন চিত্রজগতের অন্যতম প্রধান সুদর্শন অভিনেতা স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রকাশ, 'রাজনর্তকী' ছবিতেও আমার সঙ্গে নায়কের ভূমিকায় যাঁর অভিনয় দর্শকসাধারণ দেখেছেন।

এইবার এখনকার একটি কথা বলি। মাঝে মাঝে যখন "বিরস দিন, বিরল কাজ" অবস্থায় একা বসে থাকি অসংখ্য চিন্তাকে সঙ্গী করে তখন এক-এক সময়ে আমার মনে হয়, আমি ভাবতে চেষ্টা করি ঐ অসংখ্য চিন্তারাশির মধ্যে থেকে একটি চিন্তাই আমার মন অধিকার করে সব চেয়ে বেশী। খ্যাতি, যশ, যৌবন, ঔজ্জ্বল্য স্বকীয়তা ঈশ্বরের করুণায় আমি তো অফুরন্ত পেয়েছি—তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমি তো পূর্ণ হয়ে উঠেছি প্রাপ্তির পরম প্রাচুর্যে। তাঁর কৃপাবৃষ্টি করুণাধারার মত ঝরে পড়ে ধন্য করেছে আমাকে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতা জাগে নি আমার মধ্যে। তার কারণ আমার মতে আমাকে এক "এরিয়েল"এর সঙ্গেই তুলনা করা চলে। গূঢ় গভীর রহস্যতত্ত্বের স্বপ্নজগতের চিরস্থায়ী বাসিন্দার মত, মন যেন সতত নভোচারী, ভাবাশ্রয়ী, কল্পনাবাদী—অসীমের সূত্রসন্ধানে ব্যাকুল, তৎপর, উন্মুখ এবং স্বভাবতঃই সেই জন্যেই জাগতিক পরিবেশ প্রলুব্ধ করতে পারে নি আমার চেতনাকে, আমার অনুভূতিকে, আমার সত্তাকে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে এখানে আমি ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত—তারও উত্তর আছে। ভ্রান্তই হই কি অভ্রান্তই হই, যাই হই না কেন—তা নিয়ে আমার ভাবারই বা কি আছে? কেন না এখনও পর্যন্ত আমি নিজে তার বিচারিকা নই।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি

শরৎচন্দ্রের কাহিনী বাঙলার চিত্রজগতকে যে কতখানি গৌরবান্বিত করেছে তার তুলনা নেই। বাঙলার চিত্রলোকের ইতিহাস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে শরৎ-কাহিনীর অবদান অতুলনীয়। বাঙলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবীও প্রথম জীবনে শরৎচন্দ্রের একাধিক কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে নিজেই একাধিক শরৎ-কাহিনীকে চিত্ররূপ দিয়ে যথেষ্ট সুনাম ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন এবং শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য দর্শকের অকুণ্ঠ সাধুবাদের অধিকারিণী হয়েছেন। চিত্রজগতে তাঁর সাম্প্রতিক অবদান "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি।" শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের প্রথমার্ধকে অবলম্বন করে এই ছবিটির রূপ দেওয়া হয়েছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে এ ধরণের সর্বাঙ্গসুন্দর বাঙলা ছবি অনেক দিনের ব্যবধানে কচিৎ কখনো আত্মপ্রকাশ করে। সকল দিক দিয়ে ছবিটি ত্রুটিহীন। পিসীমার বাড়ীতে বালক শ্রীকান্ত সময় অতিবাহিত করছে, তারপর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগ, তার সঙ্গে ডিঙ্গীতে নৈশবিহার, মাছ চুরি, রীতিমত য্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে তাদের যাত্রা, নতুনদার আবির্ভাব, অন্নদাদির সঙ্গে যোগাযোগ, শাহজীর পরিচয় লাভ, শাহজীর মৃত্যু, শ্রীকান্তকে চিঠি লিখে রেখে অন্নদাদির নিরুদ্দেশযাত্রা, চিঠির মধ্যে দিয়ে ফ্লাশব্যাকে অন্নদাদির আত্মপরিচয় দিয়ে—এই ভাবে ছবিটির চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে, সব শেষে পিছন

থেকে দেখানো হচ্ছে শরৎচন্দ্র সেই অমর কাহিনী লিখে চলেছেন। ছবির পরিচালনা এত উচ্চাঙ্গের হয়েছে যার ফলে সাহিত্যগুরুর রচনার রস কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি, কাহিনীর মূল রস ছবিতে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। শ্রীকান্তের এই অধ্যায়টিতে এমন কয়েকটি বর্ণনা বা বিবরণ আছে যাকে ছবিতে ফোটানো নিতান্ত দুরূহ, আনন্দের সঙ্গে পরিলক্ষ্যণীয় যে সেই সব বর্ণনা বা বিবরণীর চিত্রায়ণে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিটিকে এত নিখুঁতভাবে ফোটানো হয়েছে, যাতে মনে হয়েছে যে বইয়ের কাগজের পাতাকেই এত বড় আকারে দেখতে পাচ্ছি, কিশোরদের য়্যাডভেঞ্চার বলতে যা বোঝায়, বাঙলা ছবিতে তো তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে—কিন্তু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের ডিঙ্গীতে নৈশ অভিযান এমন ভাবে দেখানো হয়েছে, যা রীতিমত শিহরণ বইয়ে দেয় দর্শকমহলে। ছবিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক যথেষ্ট সংযমেরও পরিচয় দিয়েছেন। ছবিতে গান একটিও জোড়েননি অথচ ইচ্ছে করলে বিভিন্ন পরিবেশে পাঁচ ছ'টি গান অনায়াসে জুড়তে পারতেন, বাঈজীকে তিনি আগাগোড়া অন্তরালে রেখে এসেছেন, বিমলার সঙ্গে শাহজীর যে সম্পর্ক, তা মাত্র দু'টি সংলাপের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এই বাঈজীপর্ব ও শ্যালী-ভগিনীপতির প্রেমপর্ব নৃত্য-গীত সহযোগে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে সুবিস্তৃত হয়ে ছবির একটি বিরাট অংশ জুড়ে বসেনি। আভাসে-ইঙ্গিতে, স্বল্প পরিসরে সমগ্র অধ্যায়টি দর্শকদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়ে উঠেছে, আভাস-ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়েই আগাগোড়া অংশটি হৃদয়ঙ্গম করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না দর্শকসাধারণকে। মূল গ্রন্থে আমরা জেনেছি যে, অন্নদা-দিদিকে হত্যা করে শাহজী নিরুদ্দিষ্ট হন। ছবিতে সেই জায়গায় একটু পরিবর্তন করা হয়েছে, দিদিকে রূপায়িত করা হয়েছে বোনে, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে এই পরিবর্তনের পিছনেও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। মেজদার অধ্যায়টিকে আর একটু বড় করলে খুব অশোভন হোত কি? বড় করা মানে অতিরিক্ত সংলাপ দিয়ে নয়—শরৎচন্দ্রই তাঁর গ্রন্থে মেজদাকে আরও খানিকটা চিত্রিত করে গেছেন—সুতরাং তাঁরই বর্ণনানুসারে 'মেজদা' চরিত্রটিকে আর একটু বড় করা যেতে পারত—যেমন দুর্দান্ত গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে শ্রীকান্তদের যেতে হোত দু' মাইল রাস্তা হেঁটে তাঁর তাস খেলার বন্ধুকে ডেকে আনার জন্যে, দারুণ শীতে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে মেজদা বই পড়তেন, শ্রীকান্তদের ঠায় হাজিরা দিতে হোত বইয়ের পাতা উল্টে দেবার জন্যে।

সবচেয়ে প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেলেন শ্যামল গুপ্ত। অতিরিক্ত সংলাপ রচনার দায়িত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর সংলাপ রচনা এত নিখুঁত হয়ে উঠেছে যে শরৎচন্দ্রের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে—কিন্তু কোথাও তা বেমানান লাগে নি, কোন অংশে তা নিম্ন মানের হয় নি। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে শ্যামল গুপ্ত নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ। অভিনয়াংশে কোনও একজন শিল্পীর কথা বলা চলে না। প্রত্যেকটি শিল্পীর অভিনয় স্ব স্ব ভূমিকানুযায়ী অপূর্ব। প্রধান শিল্পীদের অভিনয় তো নিঃসন্দেহে চমৎকার পার্শ্ব শিল্পীরাও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকালিপি এইভাবে হয়েছে—অন্নদাদিদি—কানন দেবী, শাহজী—বিকাশ রায়, পিসীমা—মলিনা দেবী, পিসেমশাই—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ—পার্থপ্রতিম, শ্রীকান্ত—সজল ঘোষ, রায় সাহেব—বীরেশ্বর সেন, বিমলা—শেফালি দেবী, নতুনদা—অতনু ঘোষ, নবীন (বড়দা)—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সতীশ (মেজদা)—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ—অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। থিয়েটারের মেঘনাদের চরিত্রে বীরেকের জন্যে অনেকদিন বাদে মোহন মুখোপাধ্যায়কে দেখা গেল। ছবির চিত্রকর ও সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন যথাক্রমে জি, কে, মেহতা ও পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সোনার হরিণ

অপরাধমূলক রহস্যকাহিনীর যথাযথ চলচ্চিত্রায়ণ দর্শকমহলে যে যথেষ্ট সমাদর পাবে, এ সম্বন্ধে অন্তরে নিশ্চয়তা পোষণ করার কোন বাধা নেই। কিন্তু সেই "যথাযথ" চিত্রায়ণের জন্যে কুশলী হাতের স্পর্শ প্রয়োজন, অপটু হাতের কাজ নয়, এই ক'টি কথাই বার বার মনে পড়ছিল "সোনার হরিণ" দেখতে দেখতে। ছবির নামকরণ ও ক্যামেরার কাজ ছাড়া ছবির আর কিছু উল্লেখযোগ্য, আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক বলে প্রতিভাত হয় না। ছবিটিকে অযথা দীর্ঘ করা হয়েছে। সমগ্র ছবিতে গতির নিতান্ত অভাব। ছবির অর্ধাংশ প্রদর্শিত হয়ে গেছে, তখনও মূলগল্পটি কি বা ছবিটি অপরাধমূলক না মনস্তত্ত্বমূলক না সাধারণ প্রেমোপাখ্যান এই প্রশ্নই বিরাট রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে দেখা দেয়। পরিচালক সবচেয়ে হাস্যকর পরিচয় দিয়েছেন ঘরের জানলার পাশে হাতে-পাওয়া চাঁদের মত কুতুব-মীনার দেখিয়ে। দিল্লী দেখানো হচ্ছে, দর্শককে বোঝাতে হবে সে কথা, অতএব কুতুব-মীনার দিয়ে বুঝিয়ে দাও—হা-হতোহস্মি, দিল্লী যিনি চোখে দেখেছেন তিনিই জানেন মূল দিল্লী থেকে বহু দূরে কুতুব-মীনার এবং কুতুবের আশে-পাশে জনবসতি কোথায়? বহু দূর থেকে কুতুবকে দেখা যায় শূন্যপ্রান্তরে কে যেন ইট-চুণ-সুরকি দিয়ে বাঙলা ভাষায় "চার আনা"র গাণিতিক চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে। একটা হোটেলে খুনোখুনী চলছে। হত্যাকাণ্ড। অন্যান্য বাসিন্দাদের কানে সে গুলির শব্দ পৌছয় না—অনেকক্ষণ বাদে দেখা যায় সিঁড়ির নীচে চারটি লোক কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। একটা আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের এই প্রতিক্রিয়া? যে বিমান নষ্ট করা নিয়ে এত কাণ্ড, এত রহস্য, এত খুনোখুনী সেই বিমান কেন নষ্ট করা হল? কি তার উদ্দেশ্য, সেই ব্যাপারে কার-কার যোগাযোগ ছিল, এই বিষয়গুলি তো আগাগোড়া ছবিতে অস্পষ্ট, এ সম্বন্ধে পরিচালকের নীরবতাই চোখে পড়ল, দর্শকমনে যে এই প্রশ্ন জাগতে পারে বোঝা গেল এ সম্বন্ধে পরিচালক মাথা ঘামাবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করেন নি। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নমিতা সিন্‌হা, অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বিগত দিনের বিখ্যাত চিত্রনায়ক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপকুমার, অশোক সরকার, শ্রীমান তিলক, পদ্মা দেবী, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবির কাহিনীকার রাসবিহারী লাল এবং সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে রঙমহলের প্রচেষ্টা

ধনঞ্জয় বৈরাগী সর্বজন-সমাদৃত নাটক 'এক মুঠো আকাশ' সগৌরবে অভিনীত হয়ে চলেছে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। নাটকটির শততম

অভিনয় রজনী অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—কিন্তু তার উৎসবটি উদযাপিত হবে আগামী ১৬ই নভেম্বর। আমরা অবগত হলুম যে কর্তৃপক্ষ ঐ দিনের টিকিট বিক্রয়লব্ধ টিকিটের সমস্ত অর্থ বন্যার্তদের ত্রাণকল্পে দান করবেন। বাঙলা দেশের জনসাধারণ সুবিদিত আছেন যে আজকাল এই জাতীয় বিশেষ অভিনয়োৎসব উপলক্ষে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয়, উপরোক্ত কারণেই রঙমহলের শিল্পিগণও পুরস্কার না নিয়ে ঐ বাবদ যে পরিমাণ টাকা নির্ধারিত সেই টাকা বন্যার্তদের সাহায্যে ব্যয়িত হোক, এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অসহায়, ভাগ্যবিড়ম্বিত সর্বহারা বন্যার্তদের কল্যাণ কামনায় থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ এবং শিল্পীর দল এই উভয়পক্ষই যে দরদ, সহানুভূতি ও উদার মনোভাবের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্হ।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা "হাত বাড়ালেই বন্ধু" চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায়। সুর দিচ্ছেন নচিকেতা ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * শক্তিমান পরিচালকদ্বয় শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের চিত্রামোদীদের দরবারে আগামী উপহার "শুভবিবাহ"। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, শম্ভু মিত্র, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, তৃপ্তি মিত্র, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, মণিকা দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। * * একাধারে পরিচালক ও অভিনেতারূপে বিকাশ রায় আবার আত্মপ্রকাশ করবেন "রাজাসাজা" ছবিটির মাধ্যমে। এর সংলাপ রচনার ভার নিয়েছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। রূপায়ণে দেখা যাবে বিকাশ রায় উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, ভানু রায়, চন্দ্রাবতী দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি শিল্পীর দলকে। * * "কুহক" ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। সুরারোপ করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছবিটির মাধ্যমে আপনারা উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু বসু, তরুণকুমার, গোপাল মজুমদার, তুলসী চক্রবর্তী, শ্রীমান দীপক এবং শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রূপদক্ষ শিল্পীদের অভিনয় দেখতে পাবেন। * * দীর্ঘকাল পরে পঙ্কজ মল্লিকের সুরসমৃদ্ধ একটি ছবি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। ছবিটির নাম "নিমাই"। পিনাকীভূষণ পরিচালিত এই ছবিটির কাহিনীকার অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে অভিনয় করছেন বলে যে সকল অভিনয়শিল্পীর নাম ঘোষিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বজিৎ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ বাবুয়া ও তিলক, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, রেণুকা রায় এবং শ্রীমতী অনুরাধা গুহের নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়।

গৃহপালিতের কথা

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হিমাঙ্গ শিখর তার পরিপূর্ণ বক্ষের উপমা
সুকুমার সূর্যকরে প্রথমা সে মুগ্ধ-মনোরমা
লক্ষ ফেনচূড় দেহ—মনে মনে সমুদ্রকে সখা
মেনে সে সমুদ্রে গিয়ে তারই ভয়ে হল পলাতকা ;

পাখির ঠোঁটের ক্ষত ব্যঙ্গবিদ্ধ বালুকার শর
তার পায়ে পায়ে ঘুরে ঢেকে দিল দিগন্ত প্রান্তর
নগ্ন-লজ্জা বুকে নিয়ে সৈকতের বিদ্রূপের হাতে
সে হয়ত ধরা দেবে সমুদ্রের পৌরুষ পোড়াতে ;

আমি তাই ভাবলাম, নির্বাপিতা, ঘর কত ভাল—
বাইরে দেয়ালে নিয়ে ত্রিসন্ধ্যার ইন্দ্রধনু আলো
সত্তার সমস্ত ক্লিন্ন গ্লানি থাকে সঙ্কীর্ণ ভিতরে
আর সে মৃত্যুই সাধ্য দুরাকাঙ্ক্ষী বিপন্ন সাগরে ;

আবার বিপুল লজ্জা—সৈকতের শূন্য হলে তূণ
চেয়ে দেখি অধিকৃত শুধু সেই গল্পের নকুণ !

দিল্লীতে রাজ্যপালবর্গ

"দিল্লীতে রাজ্যপাল সম্মেলনে রাজ্যপালগণ নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনতার উপর গুলীচালনা যাহাতে এড়ান যায় তাহার চেষ্টা করা দরকার। আর যদি গুলী চালাইতেই হয় তবে তাহা যেন একেবারে শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জনতার উপর গুলীচালনার ঐতিহ্য এদেশে বৃটিশ আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখার জন্য বৃটিশরা ঐ অস্ত্র দেশ শাসনের স্বাভাবিক উপায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বদেশী আমলে ঐ ঐতিহ্য অনেক আগেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা হয় নাই! ফলে বহু লোককে নিজেদের গণতান্ত্রিক দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়াও প্রাণ দিতে হইয়াছে এবং শাসকশক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা ও বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে। এবার যদি সমস্যাকে শাসকবর্গ নূতন দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চান তো মন্দের ভাল বলিতে হইবে।"

—দৈনিক বসুমতী।

বাঙলার নদ-নদী

"পশ্চিমবঙ্গে বন্যার ফলে নদীর যে সব বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা মেরামতের জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চলতি সরকারী বৎসরের হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এজন্য ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ আছে। কিন্তু চলতি বৎসরে এত টাকা ব্যয় করিয়া উঠা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া চলতি বৎসরের বাকী পাঁচ মাসের জন্য উপরোক্ত পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বাঁধ ভাঙার জন্য বন্যার ফলে এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরে যাহাতে উহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তজ্জন্য আগামী বর্ষাঋতুর পূর্বেই সমস্ত ভাঙা বাঁধ মেরামত করার প্রয়োজন ছিল। কর্তৃপক্ষ আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা কেন যে অসম্ভব মনে করিলেন তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এই কাজে তেমন জটিল কোন কারিগরী ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। উহার জন্য দেশে শ্রমিকেরও কোন অভাব নাই। এরূপ অবস্থায় এই কাজ দুই-তিন বৎসর বিলম্বিত করিবার কোন হেতুই নাই। যাহা হউক, কিছুমাত্র কাজ না হওয়া অপেক্ষা কিছু কাজ হওয়া মন্দের ভাল এবং সেই হিসাবে চলতি সরকারী বৎসরে এজন্য যে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে সেজন্য আমরা আনন্দিত। তবে আমরা আশা করিব যে, নদীর জল আর একটু কমিলেই এই কাজ শুরু হইবে এবং আগামী বর্ষার পূর্বেই যাহাতে অভীপ্সিত কাজ সম্পূর্ণ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। আরও আশা করিব যে, এই টাকার কোন অংশ দুর্নীতির রন্ধ্রপথে উবিয়া যাইবে না। আমাদের নিজের গবর্ণমেণ্টকে এ কথা বলিয়া নিজেরাই লজ্জাবোধ করিতেছি। কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

পৃথিবী থেকে চাঁদ

"সোভিয়েট রাশিয়ার চন্দ্র আবর্তনকারী রকেট লুনিক-৩ চাঁদের অপর পিঠের যে ছবি বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে, তা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদের যে পিঠটি পৃথিবী হইতে দেখা যায়, তাহার পিছন পিঠটা ইতিপূর্বে কোনদিনই মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লুনিক-৩ এই প্রথম তা মানুষের দৃষ্টিতে অবারিত করিল। কিন্তু এই দিকের ছবিতে দেখা গেল, শুষ্ক সমুদ্রের গর্ভ, বহু বিস্তীর্ণ মৃত মরু-অঞ্চল ও ছোট-বড় পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্ত সিক্ততাহীন হ্রদ ছাড়া চাঁদের পিছনে কোন নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য নাই। অর্থাৎ চন্দ্রলোক জলবায়ু ও প্রাণশূন্য মৃত মরু বলিয়া যে ধারণা বহুদিন হইতে চলিত আছে, তা এতদিনে হাতে-কলমে প্রমাণিত হইল। কিন্তু এই যেখানে অবস্থা, সেখানে চাঁদে যাওয়ার জন্য মানুষের আর আগ্রহ থাকিবে কি? শুষ্ক খাল, মৃত আগ্নেয়গিরি ও ক্ষুদে পাহাড় সমাকীর্ণ এই মুল্লুকে সোনা রূপা ইউরেনিয়াম কোন লোভের বস্তু নাই। নগর বন্দর উদ্যান কারখানা কোন কিছু বানানোর সুযোগ নাই। কোন সুখে মানুষ সেখানে যাইবে? গল্প আছে প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার বলিতেন, আর যেখানেই থাক, চাঁদে সোনা নাই। থাকিলে ইংরেজরা ঠিক সেখানে হাজির হইত। ইংরেজদের আজ আর সেদিন নাই, তবে আমেরিকা চাঁদে যাইবার জন্য এ পর্যন্ত লাগাড়ো আয়োজন করিয়াছে। জানি না লুনিক ৩এর ফোটোগ্রাফের পর তাহার উদ্যম অটুট আছে কিনা! তবে রাশিয়া চাঁদে হাজির হওয়ার আগেই ত দেখিতেছি সেখানে তাহার পতাকা প্রোথিত করিয়াছে এবং সমস্ত মরু পাহাড় ও প্রান্তরকে রুশ নামে চিহ্নিত করিয়াছে। এর পর আর দখলী স্বত্ব দাঁড়াইবে কি?"

—যুগান্তর।

রিলিফ কেলেঙ্কারী

"বিষয়টি সামান্য নহে। রিলিফে রাজনীতি করার যে-সকল অভিযোগ উঠিতেছে ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সংবাদে ইহাও প্রকাশ, ডাঃ রায়ের সভাপতিত্বে বন্যাত্রাণ কমিটি গঠিত হওয়ায় কংগ্রেসকর্মীদের প্রয়াস 'দ্বিধাবিভক্ত' হইয়াছে এবং যদিও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন কংগ্রেসের নামে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেছেন তথাপি কংগ্রেসের প্রতিপত্তিশালী ও বিত্তশালী সমর্থকগণ স্বভাবতঃই এইবার মুখ্যমন্ত্রীর কমিটির দিকে বেশী করিয়া ঝুঁকিয়াছেন। কংগ্রেসকর্মীদের এই দ্বিধাবিভক্ত প্রয়াস সত্যই

লজ্জাজনক ব্যাপার! পশ্চিমবাংলার অর্দ্ধকোটি মানুষ যখন বন্যার দুর্গতি ভোগ করিতেছেন ঠিক তখনই রিলিফ সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে এই সকল ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে যে, মানুষকে সত্যকার রিলিফ ও সাহায্য করা অপেক্ষা দলগত স্বার্থ এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধিই বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়াস সরকারী ও বেসরকারী দলের প্রয়াসের সহিত একত্রিত করিয়া সুষ্ঠু রিলিফ ব্যবস্থা গঠনের যে-প্রস্তাব শ্রীজ্যোতি বসু দিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় তৎপরতার সহিত ডাঃ রায় প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। তাহার উপর কংগ্রেসের নিজ দলের ভিতরেই আবার এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত প্রচেষ্টা!"

—স্বাধীনতা।

পূজার আসর

"সংবাদপত্রদের পোয়া বারো। মা দুর্গার ছবির সাথে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের ছবির দারুণ প্রতিযোগিতা! দুর্গতদের ছবি ও কাহিনী নিত্য পাতা জুড়ে আছে। নাই কেবল সাহায্য বিতরণের ছবি! নাই কোন কথা—কত কষ্ট স্বীকার করে দুর্গত এলাকায় সরকারী কর্ম্মচারীরা সরবরাহ পৌঁছে দিচ্ছে! তা কি করে হয়? ভয়াবহ চিত্র ক্ষয়-ক্ষতির বীভৎস রূপ না দিলে কালো বাজার কাঁপবে কেন? মোদ্দা কথা গত পুজোর আসর এই ভাবেই কাটলো।"

—বর্দ্ধমানবাণী।

উদ্বাস্তু ঋণ বণ্টনে গলদ

"করিমগঞ্জ পুনর্ব্বসতি অফিসে একই উদ্বাস্তুর নামে মঞ্জুরীকৃত ৫০০৲ শত টাকা ঋণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে দুইবার বণ্টন করার পর তৃতীয়বার বণ্টন করা কালে তাহা ধরা পড়ে। করিমগঞ্জের পুলিশ এক বৎসর এই ব্যাপারে তদন্তক্রমে করিমগঞ্জ উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি অফিসের দুইজন কেরাণী শ্রীনলিনী নাথ ও শ্রীযতীন্দ্র দত্ত এবং অপর পাঁচজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯, ৪২০ ও ৪৬৮ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ১৯৫৬ ইংরাজীতে শ্রীরাইমোহন নাথের নামে ৫০০৲ শত টাকার পুনর্বাসন ঋণ মঞ্জুর হয়। শ্রীহরিশ দেবনাথ নামক এক ব্যক্তি করিমগঞ্জ উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি অফিসে কোন কোন কর্ম্মচারীর সহিত যোগাযোগ করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে রাইমোহন নাথ নামে পরিচয় দিয়া আবেদনপত্রের ফটো পরিবর্ত্তন ক্রমে উদ্বাস্তু ঋণ গ্রহণ করে। এর পর যখন প্রকৃত রাইমোহন নাথ উপস্থিত হন তখন দরখাস্তের ফটো ঠিক করিয়া আবার তাহাকে একই দরখাস্তের উপর ঋণ দেওয়া হয়। এর পর নকল রাইমোহন নাথের নামে তৃতীয়বার ঋণ বণ্টনের চেষ্টা করা হয়। ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটার শ্রী এ সিদ্দিকী এই সম্পর্কে তদন্তক্রমে রিপোর্ট দেন যে, এই দরখাস্তের উপর পূর্ব্বে দুইবার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ তদন্তক্রমে দুইজন কেরাণী, নকল রাইমোহন নাথ, তাহার দুইজন জামিনদার ও অপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শ্রীহরিশ দেবনাথ পলাতক বলিয়া জানা যায়।"

যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

শিখার উপর ময়ূর পাখা

"প্রতি বছর রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের বিনা খরচায় মোট দুই হাজার মাইল পর্য্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে সদস্যদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত আইনের উপর একটি সংশোধনী বিল আনা হইতেছে। রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের রাস্তা ও গৃহ নির্ম্মাণ, শিল্প, কৃষি, সেচ প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলির সহিত ভালভাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন ও কমিটি মিটিংয়ে যোগ দিবার জন্য যে বেতন ও ভাতা সদস্যদের দেওয়া হয়, তাহা ছাড়াও তাঁহাদের বিনা খরচায় উপরোক্ত ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হইবে। ঐ বিলটি আইনে পরিণত হইলে উহার ব্যবস্থা অনুসারে সদস্যদের দুই হাজার মাইল ভ্রমণের জন্য বিমান রেল অথবা ষ্টীমারের ভাড়া এবং ঐ আইনের বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হইবে।"

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)

যৌতুক নিবারণ বিল

"যৌতুক নিবারণ বিলের উদ্দেশ্য যৌতুক গ্রহণ বা দান নিবারণ করা। বিবাহের দুই পক্ষের মধ্যে যে কোন পক্ষ বিবাহের সময়ে যে সকল গহনা, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিবেন, সেইগুলির মোট মূল্য যদি দুই হাজার টাকার অধিক না হয় তবে তাহা 'যৌতুক' বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক বা দান গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক বা দান গ্রহণের জন্য পণবদ্ধ হন, তবে তাঁহাদের ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে। যৌতুক দাবী করাকেও অপরাধ গণ্য করা হইয়াছে। কোনও বিবাহে, যে নারীর বিবাহ হইতেছে তিনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি যদি কোনও যৌতুক গ্রহণ করেন তবে সেই বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে সেই যৌতুক অবশ্যই সেই নারীর নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে। না করিলে সেই ব্যক্তি দণ্ডিত হইবেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে কোন অপরাধের অনুষ্ঠান হইলে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন জেলশাসকের দ্বারাই তাহার বিচার হইতে পারিবে।" —বারাসাতবার্ত্তা।

সরকারের গাফিলতি

"দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিদারুণ গাফিলতির ফলে গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। কোন কোন খাতে মোট বরাদ্দের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ব্যয় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ও সহরে যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী বাসস্থানের অভাবে অস্বাস্থ্যকর স্থানে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে, কলিকাতায় হাজার হাজার লোক যখন ফুটপাতকেই বাসস্থান করিয়া লইয়াছে, ক্ষমতাতিরিক্ত ভাড়া গণিয়া মধ্যবিত্ত নাগরিককে যে সময় যেখানে সেখানে বাসা করিতে হইতেছে, সেই সময় বাসগৃহ নির্ম্মাণ খাতে বাজেটে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর কাবার হইয়া গেলেও ঐ বরাদ্দের নাম মাত্র টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

বন্যার প্রতিকার

"১৯৫৬ আর এবছরের সর্ব্বধ্বংসী বন্যা সকল তর্কের মীমাংসা করে, সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় জলাধার আর খালের জল মানুষের সকল আশায় বালি দিয়ে সারা রাজ্যে আজ ধ্বংস-উন্মাদনার বিচিত্র রূপ প্রকট করেছে। খালের বাঁধগুলোও অনেক যায়গায় জল নিকাশী ব্যবস্থায় বাধা দিয়ে হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট করেছে। তাই প্রশ্ন করি, মানুষকে এভাবে গৃহহারা সর্ব্বহারা, ছন্নছাড়া করার কারণ কি? আজও কি সরকার তাঁর পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকার করবেন না? আজও কি মান বাঁচানোর জন্য, চোখ রাঙিয়ে, ধমক দিয়ে, গুলীর ভয় দেখিয়ে সকলের জন্য ভবিষ্যতের সকল আশা আকাঙ্খা কি নির্ম্মূল করবেন? ডি, ভি, সি, কর্ত্তৃপক্ষ এবং কোন কোন মন্ত্রী বলছেন যে এরকম অতিবৃষ্টি প্রায় প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার হয়। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল প্রতিভাবান ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিত বিশারদদের এ তথ্য তাঁরা কোথা হতে পেলেন? আমরা জানি পূর্ব্বে কোথায় কত বৃষ্টিপাত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, বিশেষ করে বর্দ্ধমান জেলায় ও ডি, ভি, সি'র জলাধার এলাকায়। আর যদি এরূপ তথ্য তাঁদের জানা ছিল তাহলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা হয়নি কেন?" —নিশান (বর্দ্ধমান)।

সরকারী সাফাই

"দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মুখপাত্র এই সমালোচনার জবাবে কতকগুলি সাফাই গেয়েছেন। প্রথম, এবারের মত বন্যা স্বাভাবিক নয়। অতীতের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে ৫০ বছরে একবার এইরকম বন্যা হয় এবং এই বিশেষ অবস্থায় বন্যা নিরোধ করার ক্ষমতা বর্তমান পরিকল্পনার নাই। দ্বিতীয় সাফাই হচ্ছে যে, আবহাওয়া কি রকম থাকবে, কোন্ অঞ্চলে কবে কতটা বৃষ্টি হবে, এ সম্পর্কে যদি সঠিক ও যথেষ্ট আগে থেকে খবর না পাওয়া যায়, তবে বাঁধের হ্রদে কতটা জল রাখতে হবে আর কতটা কোন্ সময়ে ছেড়ে দিতে হবে, তা সিদ্ধান্ত করা যায় না। অর্থাৎ দোষটা হচ্ছে আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। তৃতীয় একটি হাস্যকর সাফাই হচ্ছে অতিবৃষ্টির ফলে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বৃষ্টিপাতের সঠিক খবর বাঁধ-কর্তৃপক্ষের কাছে না পৌছানয় এই বিপত্তি ঘটেছে।" —জনসাধারণ।

শোক সংবাদ

আচার্য্য মন্মথমোহন বসু

সুপ্রবীণ শিক্ষাব্রতী, নাট্যকলাবিশেষজ্ঞ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য মন্মথমোহন বসু মহাশয় গত ২৭এ আশ্বিন ৯৯ বছর বয়সে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। ইংরাজী, বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় এঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সর্বজনবিদিত। অভিনেতা ও সমালোচকরূপেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। নটগুরু শিশিরকুমার ও নটশেখর নরেশচন্দ্রও এঁর কাছে অভিনয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে পরবর্তী জীবনে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আসন অধিকার করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের বাঙলা ভাষার ইনি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, পরে এমারিটাস প্রফেসারের গৌরবে বিভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক এবং গিরিশ লেকচারারের আসনে বরণ করে সম্মানিত করেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি নানাভাবে জড়িত। ঐ প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যবিভাগের প্রথম সভাপতি হন বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করেন মন্মথমোহন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘেরও ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। এঁর প্রতিভা বা কর্মদক্ষতা বহুমুখী। শিয়ালদহ কোর্টে প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আসনেও মন্মথমোহনকে অধিষ্ঠিত দেখা গেছে। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তদানীন্তন বৃটিশ যুগে শাসনবিভাগের প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও মন্মথমোহন বাঙলা ভাষায় রায় লিখে এক দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। এঁর উভয় পুত্রই (অমিতাভ বসু ও লালমোহন বসু) অভিনেতারূপে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। উভয়েই বর্তমানে পরলোকগত। এই বর্ষীয়ান সুধীবরের তিরোধানে বাঙ্গালার সংস্কৃতি জগতে একজন প্রধান পুরুষের অভাব ঘটল।

স্যার রূপেন্দ্রকুমার মিত্র

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, লেবার য়্যাপিলেট ট্রাইবুনালের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ স্যার রূপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় গত ৫ই কার্তিক ৭০ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রথম জীবনে হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ী রূপে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইনি অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে কিছুকাল অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডুমরাওনের মামলায় ইনি স্যার আশুতোষের সহকারীর অংশগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং আইন ফ্যাকাল্টির ডীনের আসনও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার এঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন। স্যার রূপেনের মৃত্যুতে একজন তীক্ষ্ণধী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক আইনরথীর আসন শূন্য হল।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং পূর্ববাঙলার অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ফরিদপুরের বিশিষ্ট ভূস্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী গত ১২ই আশ্বিন ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ফরিদপুরে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করার অল্পকালের মধ্যেই ইনি দেওয়ানী ফৌজদারী উভয় ক্ষেত্রেই একজন যশস্বী আইনজ্ঞরূপে পরিগণিত হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রচুর পসার সত্ত্বেও জাতীয়তার আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল

আধুনিক কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণে'র জন্মকাল খৃঃ-পূঃ ১৫০০ থেকে ১২০০ বৎসর অনুমিত হ'য়েছে। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার অপেক্ষা রাখে ব'লে মনে করি। সমগ্র বেদের ছ'টি অঙ্গ। তন্মধ্যে জ্যোতিষ একটি। জ্যোতিষ অর্থে Astrology নয়। Astronomy জ্যোতির্বিজ্ঞান। বা গাণিতিক জ্যোতিষ। বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে কাল নিরূপিত হ'ত। প্রায় ৩৩০০ বৎসর পূর্বে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের আবির্ভাব কাল ব'লে নিরূপিত হ'য়েছে। তখন থেকেই বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রাদির সমাবেশ ও অধিষ্ঠান, বিষুবপাত, অক্ষাংশ ও অয়নাংশ ইত্যাদির গণনা সাহায্যে 'অনৈতিহাসিক' প্রাচীন যুগের কাল নির্ণয় অনেকটা সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। পরবর্তী যুগে গাণিতিক জ্যোতিষের আরও সমধিক চর্চা ও উন্নতি সাধন হ'য়েছে। এর ফলে আমরা পাই—বৃহৎসংহিতা, সূর্যসিদ্ধান্ত, পল্লসিদ্ধান্ত, গর্গসিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, আর্য ভট্ট ইত্যাদি গাণিতিক জ্যোতিষ শাস্ত্র বা জ্যোতির্বিজ্ঞান। পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার আবির্ভাব-কাল দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে। (ভাগবতাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) 'স চ দ্বাপর যুগশেষে ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যাং রোহিণী নক্ষত্রে নিশীথে আবির্ভূতঃ। নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষ'মত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ॥"—ইতি থ মাণিকা নাম জ্যোতিগ্র্ন্থঃ। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন আচার্য বরাহদেব বা বরাহ মিহির। বরাহদেব যে গাণিতিক জ্যোতিষে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর রচিত সূর্যসিদ্ধান্ত ও বৃহৎ সংহিতা নামক গ্রন্থে। আধুনিক পঞ্জিকা গণনা প্রথা আচার্যদেবের এই সূর্যসিদ্ধান্তের নিকট ঋণী বললে অত্যুক্তি হ'বে না। অবশ্য এই সময়ে ইউরোপে গ্রীস ও রোম ব্যতীত অন্যত্র গাণিতিক জ্যোতিষের চর্চা ছিল ব'লে মনে হয় না। পরবর্তী কালে ইউরোপ এবং আমেরিকায় গাণিতিক জ্যোতিষের বহুল চর্চা আরম্ভ হয়। এর ফলে আমরা H. Jacoby, M. Winternitz, W. D. Whitney প্রভৃতি মনীষীদের গাণিতিক জ্যোতিষ গণনার পরিচয় পাই। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালের কাল নির্ণয় হয়েছে বরাহদেবের বৃহৎসংহিতায়। আচার্য বরাহ গর্গাচার্যের একটি বচন উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের বয়ঃক্রম কাল খৃঃ-পূঃ ২৪৪৯ বৎসর। তিলক মহারাজের Orion নামক গ্রন্থেও অনুরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। সূর্যসিদ্ধান্তের গণনানুযায়ী কলিযুগের বয়ঃক্রম কাল অদ্যাবধি ৫০৬০ বৎসর নির্ণীত হয়েছে। অতএব দ্বাপর যুগের শেষভাগ খৃষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্ব ধরা উচিত। অতএব আচার্যদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল নিরূপণে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তুলেছে। যেহেতু মহাভারতের কালও ত দ্বাপরযুগে শেষভাগে নির্ণীত হয়েছে। ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল ১৫০০ হতে ১২০০ খৃঃ-পূঃ এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি বা তথ্য নিরূপিত হয়ে বলে মনে পড়ে না। তবে হয়ত কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতে মতের অনুরূপ প্রতিফলন ওটা হতে পারে। অতএব এ মতবাদ সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না।

আধুনিক পুরাতত্ত্ব আলোচনা বা উদ্‌ঘাটনের সূত্র বা ফরমূ অনুযায়ী 'অনৈতিহাসিক' বৈদিকযুগের বা পৌরাণিক যুগের ক নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হয়। সুপ্রাচীন বৈদি যুগের কাল নির্ণয়ের জন্য শিলালিপি, ভগ্নস্তূপ, ভূস্তর, শিলাস্তর এ কি লিপিমালার আঙ্গিক গঠন বৈচিত্র এ বিষয়ে কোন সাহায্যই কর পারবে না। একমাত্র ভাষা ও বর্ণমালার বা ব্রাহ্মীলিপির গঠন সূত্র ধরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সকল কাল নির্ণয় করেছেন সেগুলি অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অধুনা বেদগ্রন্থ বলে যা পরিচি উহা শ্রৌতগ্রন্থ। হাজার হাজার যুগ ধরে শ্রুতিপরম্পরা বেদজ্ঞান বিষয়বস্তু চলে এসেছে। এইজন্য বেদের আর এক নাম শ্রুতি। বেদে সেই আদিম যুগে অর্থাৎ শ্রুতিপরম্পরার কালে বৈদিক লিপি বা ভা কি রূপ জানা দুঃসাধ্য। প্রাচীন বৈদিক ভাষা ও পরবর্তীকালে রূপান্তরিত বৈদিক ভাষা ও বর্ণমালার গঠনাকৃতির পর্যালোচনার ফ আধুনিক পণ্ডিতদের, বিশেষত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাল নির্ণয় অভ্রান্ত, এইরূপ মানসিক প্রবণতার কিছুটা পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজ আছে বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল নির্ণয় সম্বন্ধেও ঐ এক কথা প্রযোজ্য। অবশ্য গাণিতিক জ্যোতিষ নির্ণীত শ্রীকৃষ্ণের জন্মে সমসাময়িক যে দুইটি সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা যে একেবা অভ্রান্ত এরূপ মতের গোঁড়ামী পোষণের মনোভাব আমার নেই গণিত বিচারে যে সময় সময় কিঞ্চিৎ ভ্রান্তির উদ্ভব না হয় এমন কি বলা চলে না। তবে তা মারাত্মক ব্যবধান রচনা করে না। তা গাণিতিক জ্যোতিষের সাহায্য ব্যতীত উক্ত কাল নির্ণয়ও যে দুরূ ব্যাপার, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।—হেম সমাজদার।

পত্রিকা-প্রসঙ্গে

ছেলেবেলা থেকেই মাসিক বসুমতীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় তবে গত দশ বছরের মধ্যে সেই পরিচয় গাঢ় হতে গাঢ়তর হ উঠেছে। যত দিন যাচ্ছে, আপনার সম্পাদনার অনন্যসাধারণ কৃতিত বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি। বাঙলা-দেশে ব্যাঙের ছাতার মত কেব মাত্র নাটকই নয় কাগজও গজিয়ে উঠেছে কিন্তু অধিকাংশই যা চোখে পড়ে সবই গতানুগতিক ধারায় কোনরকমে এগিয়ে চলেছে; না আ

তাদের কোন বৈশিষ্ট্য, না কোন নিজস্বতা, না তারা রেখে যাচ্ছে কোন্ উল্লেখযোগ্য অবদানের গৌরবময় চিহ্ন! কিন্তু যদিও এ কথা বলা বাহুল্যই তবু বলছি যে, মাসিক বসুমতী তাদের ব্যতিক্রম, শুধু ব্যতিক্রম বললে ভুল হয়, এক উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। মাসিক বসুমতীকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি বলেই কয়েকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি বা আপনাকে অনুরোধ জানাই। "বর্ণালী" আগে সত্যিই ভাল লাগত, বেশ লিখছিলেন সুলেখা দাশগুপ্ত, তবে এখন বেশ লিখছেন এ কথা বলা চলে না। কেন না একটি উপন্যাস শেষ করতে তিনি এত দীর্ঘ সময় নিচ্ছেন যার ফলে ঐ উপন্যাস এখনও কেউ পড়ছেন বলে মনে হয় না, এখন বর্ণালী ভয়ানক একঘেয়ে মনে হচ্ছে এবং পড়ারও আর ধৈর্য থাকছে না। আচ্ছা, বর্ণালী তিনি কবে শেষ করবেন জানাবেন কি? আর একটি অনুরোধ—মাসিক বসুমতীতে আজকাল ছোট গল্পের সংখ্যা কিছু কম দেখছি, এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সুখী হব।—বিনীতা সেনগুপ্তা, লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ।

বঙ্গ রমণীর যৌনবিক্রয়

মাসিক বসুমতী আমি নিয়মিত পড়ি। এই ভাদ্র মাসের মাসিক বসুমতীতে নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর লিখিত "বঙ্গ রমণীর যৌনবিক্রয়" (P ৭৪১) পড়িলাম। ঐ প্রবন্ধের প্রথম (paragraph) "অল্প কয়েক দিন—বেণ্টিঙ্কের প্রতিমূর্তি অপসারিত হইয়াছে। ইহা লইয়া...প্রকাশিত হইয়াছে—" এই অপসারণের কথা ৭৫০ পৃষ্ঠার ওপরেই আবার উল্লেখ করা আছে। বেণ্টিঙ্কের মূর্তি কবে অপসারিত হইয়াছিল কিম্বা খবরের কাগজে কবে অনেক আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানি না। আমি অন্তত ৩৫ বৎসর যাবৎ High Court র main gate এ High Court'এর দিকে মুখ করিয়া ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিয়া আসিতেছি; High Court'এর main gate দিয়া যে High Court এ প্রবেশ করে সে ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিতে পায়। Sensation ও Interest'র জন্য ঐরূপ ভুল সংবাদ দিলে কখন কখন কাজ হয় কিন্তু সর্বদা কাজ হয় না, বরং হাস্যাস্পদ হইতে হয় —শ্রীপ্রবোধচন্দ্র কর। ৩৮ এ, রমেশ মিত্র রোড। কলি—২৫।

রাজনৈতিক বন্দিনী

আপনার বাঙ্গালী পরিচিত (চারজন) ভাদ্র সংখ্যা ১৩৬৬ সনের শ্রীমতী কল্পনা যোশীর (পৃষ্ঠা ৭৭৫) বিষয়ে এক জায়গায় জানিয়েছেন যে "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে মেয়ে রাজনৈতিক বন্দিনীদের (———) আন্দামানে প্রেরণ করা হয় নাই।" এ সম্বন্ধে শ্রীমতী বীণা দাসের "শৃঙ্খল-ঝঙ্কার" (পৃষ্ঠা ৬৮) আপনার দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি। "———যখন আমাদের আন্দামান যাবার কথা হয়, মা বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ে যাঁদের চেষ্টায় আমাদের (মেয়েদের) আন্দামান যাওয়া বন্ধ করা হয়—তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন এণ্ড্রুস"। সি, এফ, এণ্ড্রুস-এর নাম এ সম্পর্কে উল্লেখ না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।—শ্রীসময় ভাদুড়ী। ২৫।১, চৌধুরীপাড়া লেন। পোঃ সাঁত্রাগাছি। হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমি আপনাকে ১০৲ পাঠাইলাম। এই বৎসর ভাদ্র মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত (৮ মাস) দয়া করিয়া আপনার মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিবেন। তটিনী দত্ত, গোরক্ষপুর।

১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের ভাদ্র হইতে ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডাঃ এক ক্রীষ্টান। সাঁওতাল পরগণা।

Being the yearly subscription for Monthly Basumati. Please send the same regularly. Principal, Sibsagar College, Joysagar.

আমাকে পুনরায় ভাদ্র মাস হইতে গ্রাহক করিয়া লইবেন। ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—জ্যোৎস্না সেন। বাঁকা ভাগলপুর।

বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। প্রাঞ্জলি দাশগুপ্ত। মীরাট।

আমার ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া হিসাবে জমা করিয়া লইবেন ও পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইবেন। —আরতি মুখোপাধ্যায়। বুলান্দ সহর।

Sending subscription for next twelve months. Rs. 15-0-0 only. R. N. Sikder. Jalpaiguri.

১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অমিতা দেবী, পুর্ণিয়া।

Sending herewith Rs. 7·50 n.p. towards our subscription for the monthly Basumati commencing from Bhadra to Magh. সেক্রেটারী, কুসুম ক্লাব, হুগলী।

Remitting herewith the subscription for Monthly Magazine Basumati for the period from Kartick to Chaitra 1366 B.S. aginst receipt No. 49764. Plsase arrange to supply same regulary, Sm. Radharani Mitra, 27B Indra Biswas Road. Cal-37.

Sending herewith halfyearly subscription with effect from Sravan 1366 B. S. Please acknowledge the receipt of the amount. Head-master, Rajganj M. N. High School. Jalpaiguri.

ফিলাডেলফিয়াতে অমলকুমার ঘোষের নামে মাসিক বসুমতী পাঠাইবার জন্য আগামী কার্তিক হইতে চৈত্র বাবদ ১২৲ পাঠাইলাম। তরুলতা ঘোষ, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১।

আপনার পত্রানুযায়ী রেজেষ্ট্রি খরচ বাবদ ৩৲ পাঠাইলাম। সত্বর মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। নলিনী দিন্দা, মেদিনীপুর।